প্রায় প্রতি সপ্তাহের 'বেস্ট সেলার' প্রাপ্ত অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র

বাংলাবুক পরিবেশিত

ফ্রান্সিস সমগ্র

অনিল ভৌমিক

অখন্ড



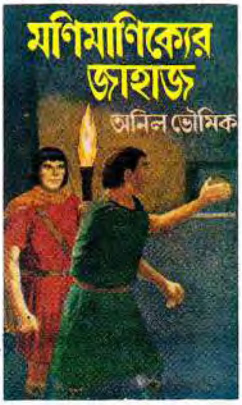

সোনার ঘণ্টা
অনিল ভৌমিক


হীরের পাহাড়
অনিল ভৌমিক


মুক্তোর সমুদ্র
অনিল ভৌমিক


তুষারে গুপ্তধন
অনিল ভৌমিক


রূপোর
নদী
অনিল ভৌমিক


মণিমাণিক্যের
জাহাজ
অনিল ভৌমিক


বিষাক্ত
উপত্যকা
অনিল ভৌমিক

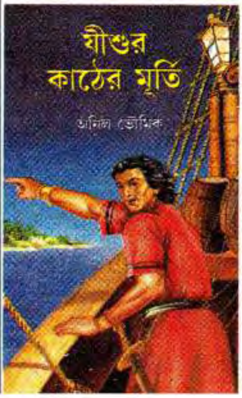

অনিল ভৌমিক


চুনী পান্নার
রাজমুকুট
অনিল ভৌমিক


কাউন্ট রজারের
গুপ্তধন
অনিল ভৌমিক


যোদ্ধামূর্তি রহস্য
অনিল ভৌমিক


রানীর রত্ন ভাণ্ডার
অনিল ভৌমিক


যীশুর
কাঠের মূর্তি
অনিল ভৌমিক


মাজোরকা দ্বীপে ফ্রান্সিস
অনিল ভৌমিক


চার্লসের স্বর্ণসম্পদ
অনিল ভৌমিক


রূপোর চাবি
অনিল ভৌমিক

অনিল ভৌমিক

জীবনপঞ্জী

জন্ম ১৯৩২ চট্টগ্রামে। তবে বাল্য ও প্রথম যৌবন কেটেছে ময়মনসিং জেলার জামালপুর শহরে (অধুনা বাংলাদেশ)। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নিঃসম্বল অবস্থায় দেশত্যাগ ও পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ। অভাব দারিদ্র্যের ঝড়ো সময় কাটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে পেশাগত-জীবন শুরু। কিশোরকালে 'পাঠশালা' পত্রিকায় প্রথম 'সে' গল্প প্রকাশিত। সাহিত্য সাধনার সংকল্প নিয়ে চাকরি ছেড়ে শিক্ষকতার ব্রত গ্রহণ। বড় ছোটোদের জন্য সৃষ্টি করেছেন গল্প উপন্যাস অনুবাদ। অবসর গ্রহণের পরে এখনও সক্রিয়। আকাশবাণীতে প্রখ্যাত লেখকদের গল্প উপন্যাসের বেতার নাট্যরূপ লিখেছেন দীর্ঘকাল। 'পরাশর রায়' এই ছদ্মনামে আকাশবাণীর তালিকাভুক্ত গীতিকার। শিক্ষাগত যোগ্যতা এম এ বিটি।

ফ্রান্সিস সমগ্র
অখণ্ড

অনিল ভৌমিক



উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা

FRANCIS SAMAGRA AKHANDA
By Anil Bhowmick
Published by
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3 College Street Market
Calcutta-700 007

প্রথম প্রকাশ ঃ

শ্রাবণ ১৪২২

পরিবেশনায় ঃ
উজ্জ্বল বুক স্টোরস্
৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎ চন্দ্র পাল
কিরীটি কুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ ঃ
রঞ্জন দত্ত

মুদ্রণে ঃ
ইন্দ্রলেখা প্রেস

ISBN-81-7334-122-2

"আজকের দিনে যে জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সবকিছুর পরেই তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই, যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে।"

রবীন্দ্রনাথ

নেশা সাহিত্য হলেও পেশায় শিক্ষক আমি। ছাত্রদের কাছেই প্রথম বলতে শুরু করি দুঃসাহসী ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের গল্প। দেশ, কাল, মানুষ সবই ভিন্ন, তবু গভীর আগ্রহ নিয়ে ছেলেরা সেই গল্প শুনতো। তখনই মাথায় আসে-ফ্রান্সিসদের নিয়ে লিখলে কেমন হয়। "শুকতারা" পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার ক্ষীরোদ চন্দ্র মজুমদারকে একটা পরিচ্ছেদ লিখে পড়তে দিই। উনি সেটুকু পড়ে খুশী হন। তাঁরই উৎসাহে শেষ করি প্রথম খণ্ড "সোনার ঘণ্টা"। "শুকতারা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় সেটা। পরবর্তী খণ্ড "হীরের পাহাড়"ও "শুকতারা"তেই প্রকাশিত হয়। পরের খণ্ডগুলো প্রকাশের সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেন 'উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির'-এর কর্ণধার কিরীটিকুমার পাল। উভয়ের কাছেই আমি ঋণী।

ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের দুঃসাহসিক অভিযানের সমগ্র কাহিনী একটি বইয়ের মধ্যে পেয়ে কিশোর কিশোরীরা খুশী হবে, এই আশাতেই "ফ্রান্সিস সমগ্র" খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

অক্টোবর ১৯৯০

অনিল ভৌমিক

এই লেখকের কয়েকটি বই

সোনার শেকল
সর্পদেবীর গুহা
মেরীর স্বর্ণমূর্তি
হাতিপাহাড়ের গুপ্তধন
অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র
কিশোর গল্পসম্ভার

সূচীপত্র

সোনার ঘন্টা

অনেকদিন আগের কথা। শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে চলেছে একটা নিঃসঙ্গ পালতোলা জাহাজ। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল — সীমাহীন সমুদ্র।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে পশ্চিমের আকাশটা যেন স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে সেইদিকে তাকিয়ে ছিল ফ্রান্সিস। সে কিন্তু পশ্চিমের আবির-ঝরা আকাশ দেখছিল না। সে ছিল নিজের চিন্তায় মগ্ন। ডেক-এ পায়চারি করতে-করতে মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছিল, কখনো আকাশের দিকে, কখনো সমুদ্রের দিকে। তার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা — সোনার ঘন্টার গল্প কি সত্যি, না সবটাই গুজব। নিরেট সোনা দিয়ে তৈরী একটা ঘন্টা — বিরাট ঘন্টা — এই ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি কোন দ্বীপে নাকি আছে সেটা। কেউ বলে সেই সোনার ঘন্টাটা নাকি জাহাজের মাস্তুলের সমান উঁচু, কেউ বলে সাত-আট মানুষ সমান উঁচু। যত বড়ই হোক — নিরেট সোনা দিয়ে তৈরী একটা ঘন্টা, সোজা কথা নয়।

এই ঘন্টাটা তৈরী করার ইতিহাসও বিচিত্র। স্পেন দেশের সমুদ্রের ধারে ডিমেলো নামে ছোট্ট একটা শহর। সেখানকার গীর্জায় থাকতো জনপঞ্চাশেক পাদ্রী। তারা দিনের বেলায় পাদ্রীর কাজকর্ম করতো। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই পাদ্রীর পোশাক খুলে ফেলে সাধারণ পোশাক পরে নিতো। তারপর ঘোড়ায় চড়ে বেরুত ডাকাতি, লুটপাট করতে। প্রতি রাত্রে দশ-পনেরোজন করে বেরুত। টাকা-পয়সা লুঠ করা তাদের লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্য শুধু একটাই — সোনা সংগ্রহ করা। শুধু সোনাই লুঠ করত তারা।

ধারে কাছে শহরগুলোতে এমন কি দূর-দূর শহরেও তারা ডাকাতি করতে যেত। ভোর হবার আগেই ফিরে আসত ডিমেলোর গীর্জায়। গীর্জার পেছনে ঘন জঙ্গল। তার মধ্যে একটা ঘন্টার ছাঁচ মাটি দিয়ে তৈরি করেছিল। সোনার মোহর বা অলংকার যা কিছু ডাকাতি করে আনত, সব গলিয়ে সেই ঘন্টার ছাঁচে ফেলে দিত। এইভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সোনা দিয়ে ছাঁচ ভরানো চলল।

কিন্তু ঘন্টা অর্ধেক তৈরি হবার পর কাজ বন্ধ হয়ে গেল। এত ডাকাতি হতে দেখে দেশের সব বড়লোকেরা সাবধান হয়ে গেল। তারা সোনা সরিয়ে ফেলতে লাগল। ডাকাতি করে সিন্দুক ভেঙে পাদ্রী ডাকাতরা পেতে লাগল শুধু রুপার মুদ্রা। মোহর বা সোনার অলংকারের নামগন্ধও নেই।

কি করা যায়? ডাকাত পাদ্রীরা সব মাথায় হাত দিয়ে বসল। সোনার ঘন্টাটা অর্ধেক হয়ে থাকবে? তারা যখন ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছে না, তখন একজন পাদ্রী খবর নিয়ে এল — দেশের সব বড়লোকেরা বিদেশে সোনা সরিয়ে ফেলছে জাহাজে করে। ব্যাস। অমনি পাদ্রী ডাকাতরা ঠিক করে ফেলল, এবার জাহাজ লুঠ করতে হবে। যেমন কথা তেমনি কাজ। একটা জাহাজ কিনে ফেলল তারা। তারপর নিজেদের মধ্যে থেকে তিরিশজন বাছাই করা লোক নিয়ে একদিন গভীর রাত্রে তারা সমুদ্রে জাহাজ ভাসাল। বাকি পাদ্রীরা গীর্জাতেই রইল। লোকের চোখে ধুলো দিতে হবে তো! ডিমেলো শহরের লোকেরা জানল — গীর্জার তিরিশজন পাদ্রী বিদেশে গেছে ধর্মপ্রচারের জন্য। কারো মনেই আর সন্দেহের অবকাশ রইল না।

দীর্ঘ তিন-চার মাস ধরে পাদ্রী ডাকাতরা সমুদ্রের বুকে ডাকাতি করে বেড়াল। স্পেনদেশ থেকে যত জাহাজ সোনা নিয়ে বিদেশে যাচ্ছিল, কোন জাহাজ রেহাই পেল না। লুঠতরাজ শেষ করে ডাকাত পাদ্রীরা ডিমেলো শহরের গীর্জায় ফিরে এল। জাহাজ থেকে নামানো হল সোনাভর্তি বাক্স। দেখা গেল কুড়িটা কাঠের বাক্স ভর্তি অজস্র মোহর আর সোনার অলংকার। সবাই খুব খুশী হল। যাক এতদিনে ঘন্টাটা পুরো তৈরী হবে।

ঘন্টাটা সম্পূর্ণ তৈরী হল। কিন্তু মাটির ছাঁচটা ভেঙে ফেলল না। ছাঁচ ভেঙে ফেললেই তো সোনার ঘন্টাটা বেরিয়ে আসবে। যদি সোনার ঝকমকানি কারোর নজরে পড়ে যায়।


ফ্রান্সিস নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে পশ্চিমের লাল আকাশটা দেখল।

তারপরের ঘটনা সঠিক জানা যায় না। তবে ফ্রান্সিস বুড়ো নাবিকদের মুখে গল্প শুনেছে, ডাকাত পাদ্রীরা নাকি একটা মস্তবড় কাঠের পাটাতনে সেই সোনার ঘন্টা তুলে নিয়ে জাহাজের পেছনে বেঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল। সোনার ঘন্টার গায়ে ঘন কালো রং লাগিয়ে দিয়েছিল যাতে কেউ দেখলে বুঝতে না পারে যে ঘন্টাটা সোনার। ভূমধ্যসাগরের ধারে কাছে এক নির্জন দ্বীপে তারা সোনার ঘন্টাটা লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর ফেরার পথে প্রচন্ড ঝড়ের মুখে ডাকাত পাদ্রীদের জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। একজনও বাঁচেনি। কাজেই সেই নির্জন দ্বীপের হদিস আজও সবার কাছে অজানাই থেকে গেছে।

— এই যে ভায়া!

ফ্রান্সিসের চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। ভুঁড়িওলা জ্যাকব কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ও বুঝতেই পারেনি। জ্যাকব হাসতে-হাসতে বলল — ভুরু কুঁচকে কি ভাবছিলে অত?

ফ্রান্সিস নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে পশ্চিমের লাল আকাশটা দেখাল।

— ওখানে কি? জ্যাকব বোকাটে মুখে জিজ্ঞেস করল।

— ওখানে — আকাশে কত সোনা — অথচ সব ধরাছোঁয়ার বাইরে। জ্যাকব এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বাজখাঁই গলায় হেসে বলল — ফ্রান্সিস তোমার নির্ঘাৎ খিদে পেয়েছে, খাবে চলো।

খেতে বসে দুজনে কথাবার্তা বলতে লাগল। ফ্রান্সিস জাহাজের আর কোন নাবিকের সঙ্গে বেশী মিশত না। ওর ভালও লাগত না। কিন্তু এই ভুঁড়িওয়ালা জ্যাকবের সঙ্গে ওর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। ও জ্যাকবের কাছে মনের কথা খুলে বলত।

ফ্রান্সিস ছিল জাতিতে ভাইকিং। ইউরোপের পশ্চিম সমুদ্র পথে ভাইকিংদের দেশ। ভাইকিংদের অবশ্য বদনাম ছিল 'জলদস্যুর' জাত বলে। শৌর্যে বীর্যে এবং জাহাজ চালনায় অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্যে ইউরোপের সব জাতিই তাদের তারিফ করত। ফ্রান্সিস কিন্তু সাধারণ ঘরের ছেলে না। ভাইকিংদের রাজার মন্ত্রীর ছেলে বিদেশী জাহাজে যাচ্ছিল সাধারণ নাবিকদের কাজ নিয়ে নিজের পরিচয় গোপন করে। এটা জানত শুধু ভুঁড়িওলা জ্যাকব।

মুরগীর ঠ্যাং চিবুতে-চিবুতে জ্যাকব ডাকল — ফ্রান্সিস?

— হুঁ —

— তুমি বাপু দেশে ফিরে যাও।

— কেন?

— আমাদের এই দাঁড়বাওয়া, ডেক-মোছা-এসব কম্মো তোমার জন্যে নয়।

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল — তোমার কথাটা মিথ্যে নয়। এত পরিশ্রমের কাজ আমি জীবনে করিনি। কিন্তু জানো তো — আমরা ভাইকিং — যেকোনোরকম কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা আমাদের জন্মগত। তাছাড়া —

— কি?

— ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি সেই সোনার ঘন্টার গল্প —

— ও! সেই ডাকাত পাদ্রীদের সোনার ঘন্টা? আরে ভাই ওটা গাঁজাখুরী গপ্পো।

— আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

— তবে?

— আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভূমধ্যসাগরের ধারে-কাছে কোন দ্বীপে নিশ্চয়ই সেই সোনার ঘন্টা আছে।

— পাগল। জ্যাকব খুক্-খুক্ করে হেসে উঠল।

ফ্রান্সিস একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে চাপাস্বরে বললো — জানো — দেশ ছাড়বার আগে একজন বুড়ো নাবিকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। বুড়োটা বলত — ও নাকি সোনার ঘন্টার বাজনা শুনেছে।

— এ্যাঁ? বলো কি! জ্যাকব অবাক চোখে তাকাল।

— লোকে অবশ্য বুড়ো নাবিকটাকে পাগল বলে ক্ষেপাত। আমি কিন্তু মন দিয়ে ওর গল্প শুনেছিলাম।

— কি-গল্প?

—ভূমধ্যসাগর দিয়ে নাকি ওদের জাহাজ আসছিল একবার। সেই সময় এক প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ওরা দিক ভুল করে ফেলে। তারপর ডুবো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে ওদের জাহাজ ডুবে যায়। ডুবন্ত জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় ও একটা ঘন্টার শব্দ শুনেছিল — ঢং-ঢং। ঝড়জলের শব্দ ছাপিয়ে বেজেই চলেছিল — ঢং-ঢং।

জ্যাকবের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সে হাঁ করে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর জিজ্ঞেস করলে — সোনার ঘন্টার শব্দ?

— নিশ্চয়ই। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

ভুঁড়িওয়ালা জ্যাকবের মুখ দিয়ে আর কথা সরলো না।

পরের দু'দিন জাহাজের নাবিকদের বেশ আনন্দেই কাটলো। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ। জোর বাতাস। জাহাজের পালগুলো হাওয়ার তোড়ে বেলুনের মত ফুলে উঠল। জাহাজ চলল তীরবেগে। দাঁড়টানার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি থেকে নাবিকরা এই দুদিন রেহাই পেল। কিন্তু জাহাজের ডেক পরিষ্কার করা, জাহাজের মালিকের ফাই-ফরমাস খাটা, এসব করতে হল। তবু নাবিকেরা সময় পেল — তাস খেলল, ছক্কা-পাঞ্জা খেলল, আড্ডা দিল, গল্পগুজব করল অনেক রাত পর্যন্ত।

ফ্রান্সিস যতক্ষণ সময় পেয়েছে হয় ডেক-এ পায়চারি করেছে, নয়তো নিজের বিছানায় শুয়ে থেকেছে। ভুঁড়িওলা জ্যাকব মাঝে-মাঝে ওর খোঁজ করে গেছে। শরীর ভালো আছে কিনা, জিজ্ঞেস করেছে। একটু খোশগল্পও করতে চেয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সিসের তরফ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে অন্য নাবিকদের আড্ডায় গিয়ে গল্প জুড়েছে। ফ্রান্সিসের একা থাকতে ভালো লাগছিল, নিজের চিন্তায় ডুবে থাকতে। দেশ ছেড়েছে কতদিন হয়ে গেল। আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়েছে ও। কবে ফিরবে অথবা কোনদিন ফিরবে কি না কে জানে। মাথায় ওর মাত্র একটাই সংকল্প, যে করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে সোনার ঘন্টার হদিস।

সোনার ঘন্টার কথা ভাবতে-ভাবতে কখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল, ফ্রান্সিস জানে না। হঠাৎ নাবিকদের দৌড়োদৌড়ি উচ্চ কণ্ঠে ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি শুনে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু হল কি? এদের এত উত্তেজনার কারণ কি? এমন সময় জ্যাকব ছুটতে-ছুটতে ফ্রান্সিসের কাছে এল।

— সাংঘাতিক কাণ্ড। জ্যাকব তখনও হাঁপাচ্ছে।

— কি হয়েছে?

— ওপরে — ডেক-এ চল — দেখবে'খন।

দ্রুতপায়ে ফ্রান্সিস ডেক-এর ওপরে উঠে এল। জাহাজের সবাই ডেক-এর ওপরে এসে জড়ো হয়েছে। ফ্রান্সিস জাহাজের চারপাশে সমুদ্র ও আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। প্রচন্ড গ্রীষ্মকাল তখন। আর বেলাও হয়েছে। অথচ চারদিকে কুয়াশার ঘন আস্তরণ। সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে। চারদিকে কেমন একটা মেটে আলো। এক ফোঁটা বাতাস নেই। জাহাজটা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার ছাপ। এই অসময়ে কুয়াশা? কোন এক অমঙ্গলের চিহ্ন নয় তো?

জাহাজের মালিক সর্দার নাবিককে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। বোধহয় কি করবে এখন তারই শলা-পরামর্শ করতে। সবাই বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ফ্রান্সিস খুশীতে শিস্ দিয়ে উঠল। আশ্চর্য! শিসের শব্দ অনেকের কানেই পৌঁছল। এই বিপত্তির সময় কোন বেআক্কেলে শিস দেয় রে? তারা ফ্রান্সিসের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। দেখল — ফ্রান্সিসের মুখ মৃদু হাসি। এবার ওদের আরো অবাক হবার পালা। ফ্রান্সিসকে ওরা কেউ কখনো হাসতে দেখেনি। সব সময় গোমড়া মুখে ভুরু কুঁচকে থাকতেই দেখেছে। মাথায় যেন রাজ্যের দুশ্চিন্তা। সেই লোকটা হাসছে? অবাক কাণ্ড!

ফ্রান্সিসের এই খুশীতে অর্থাৎ শিস দিয়ে ওঠাটা কেউ ভালো চোখে দেখল না। তবে সবাই মনে-মনে গজরাতে লাগল। জ্যাকব গম্ভীর মুখে ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়াল। চাপাস্বরে বলল — বেশী বাড়াবাড়ি কোরো না।

— কেন?

— সবাই ভয়ে মরছি, আর তুমি কিনা শিস দিচ্ছো?

ফ্রান্সিস হেসে উঠল। জ্যাকব মুখ বেঁকিয়ে বলল, তোমরা ভাইকিং — খুব সাহসী তোমরা, কিন্তু তাই বলে তোমার কি মৃত্যু ভয়ও নেই?

— আছে বৈ-কি! তবে আমার খুশী হবার অন্য কারণ আছে।

— বলো কি?

— হ্যাঁ। ফ্রান্সিস জ্যাকবের কানের কাছে মুখ দিয়ে চাপা খুশীর স্বরে বলতে লাগল — জানো সেই বুড়ো পাগলা নাবিকটা বলেছিল — ওদের জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়বার আগে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়ার আগে — এমনি ঘন কুয়াশার মধ্যে আটকে গিয়েছিল — ঠিক এমনি অবস্থা, বাতাস নেই, কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার —

ফ্রান্সিস আর জ্যাকব ডেক-এর কোনায় দাঁড়িয়ে যখন কথা বলছিল, তখন লক্ষ্য করেনি যে, ডেক-এর আর এক কোনে নাবিকদের একটা জটলার সৃষ্টি হয়েছে। ওরা ফিস্‌ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে। দু'-একজন চোখের ইশারায় জ্যাকবকে দেখাল। ব্যাপারটা সুবিধে নয়। কিছু একটা ষড়যন্ত্র চলছে। জ্যাকব সজাগ হল। ফ্রান্সিস এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। ও উলটোদিকে মুখ ফিরিয়ে সামনের সাদাটে কুয়াশার আস্তরণের দিকে তাকিয়ে নিজের চিন্তায় বিভোর।

নাবিকদের জটলা থেকে তিন-চারজন ষণ্ডাগোছের নাবিক ধীর পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। জ্যাকব ওদের মুখ দেখেই বুঝলো, কিছু একটা কুমতলব আছে ওদের। ফ্রান্সিসকে কনুই দিয়ে একটা গুঁতো দিল। ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জ্যাকবের দিকে তাকাল। জ্যাকব চোখের ইশারায় ষণ্ডাগোছের লোকগুলোকে দেখাল। তাদের পেছনে-পেছনে আর সব নাবিকেরা দল বেঁধে এগিয়ে আসছে দেখা গেল। ফ্রান্সিস কিন্তু এই থমথমে আবহাওয়াটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে হেসে গলা চড়িয়ে বলল — ব্যাপার কি? অ্যাঁ — এখানে নাচের আসর বসবে নাকি? কিন্তু কেউ ওর কথার জবাব দিল না। ষণ্ডাগোছের লোক ক'জন ওদের দু'জনের কাছ থেকে হাত পাঁচেক দূরে এসে দাঁড়াল। দলের মধ্যে থেকে ইয়া দশাসই চেহারার একজন গম্ভীর গলায় ডাকল — এই জ্যাকব, শোন্ এদিকে।

ফ্রান্সিস তখন হেসে বলল — যা বলবার বাপু ওখান থেকেই বলো না।

সেই নাবিকটা এবার আঙুল দিয়ে জ্যাকবকে দেখিয়ে পেছনের নাবিকদের বলল — এই জ্যাকব ব্যাটা ইহুদী। এই বিধর্মীটা যতক্ষণ জাহাজে থাকবে — ততক্ষণ কুয়াশা কাটবে না — বিপদ আরো বাড়বে! তোমরাই বলো ভাই — এই অলুক্ষুণেটাকে কি করবো?

হই-হই চীৎকার উঠল নাবিকদের মধ্যে।

কেউ-কেউ তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে বলল — জলে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

— খুন কর বিধর্মীটাকে।

— ফাঁসীতে লটকাও।

ভয়ে জ্যাকবের মুখ সাদা হয়ে গেল। কিছু বলবার জন্য ওর ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। কিছুই বলতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ও কেঁদে উঠল। দশাসই চেহারার নাবিকটা জ্যাকবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করতেই ফ্রান্সিস জ্যাকবকে আড়াল করে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের তখন অন্য চেহারা। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। সমস্ত শরীরটা ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠেছে। চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করছে। দাঁতচাপা স্বরে ফ্রান্সিস বলল — জ্যাকব আমার বন্ধু। যে ওর গায়ে হাত দেবে, তার হাত আমি ভেঙ্গে দেব।

একমুহূর্তে গোলমাল হই-চই থেমে গেল। ষণ্ডা ক'জন থম্‌কে দাড়াল। কে যেন চীৎকার করে উঠল — দু'টোকেই জলে ছু'ড়ে ফেলে দাও।

আবার চিৎকার, মার-মার রব উঠল। ফ্রান্সিস আড়চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে

তাকাতে দেখল ডেক-এর কোণার দিকে একটা ভাঙা দাঁড়ের হাতলের অংশটা পড়ে আছে। চোখের নিমেষে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে লাঠির মত বাগিয়ে ধরল। চেঁচিয়ে বলল সাহস থাকে তো এক-একজন করে আয়।

দশাসই চেহারার লোকটা ফ্রান্সিসের দিকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিদ্যুৎগতিতে একধারে সরে গিয়ে ফ্রান্সিস হাতের ভাঙা দাঁড়টা চালাল ওর মাথা লক্ষ্য করে। লোকটার মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরল শুধু — 'অঁ-ক্'। তারপরই ডেকের ওপর সে মুখ থুবড়ে পড়ল। মাথাটা দু-হাতে চেপে কাতরাতে লাগল। ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াতে লাগল। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই থমকে দাঁড়ালো। কিন্তু একমুহূর্ত। তারপরেই আর একটা ষণ্ডাগোছের লোক ঘুঁষি বাগিয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তেড়ে এল। ফ্রান্সিস তৈরী হয়েই ছিল। ভাঙা দাঁড়টা সোজা লোকটার থুতনি লক্ষ্য করে চালাল। লোকটা বেমক্কা মার খেয়ে দু'হাত শূন্যে তুলে ডেক-এর পাটাতনের ওপর চিৎ হয়ে পড়ল। দাঁত ভাঙল কয়েকটা। মুখ দিয়ে রক্ত উঠল। মুখ চেপে ধরে লোকটা গোঙাতে লাগল। ফ্রান্সিস উত্তেজিত নাবিকদের জটলার দিকে চোখ রেখে চাপাস্বরে ডাকাল — জ্যাকব।

জ্যাকব এতক্ষণে সাহস ফিরে পেয়েছে। বুঝতে পেরেছে ফ্রান্সিসের মত রুখে না দাঁড়াতে পারলে মরতে হবে। জ্যাকব চাপাস্বরে উত্তর দিল — কী?

— ঐ যে ডেকঘরের দেয়ালে সর্দারের বেল্টসুদ্ধু তরোয়ালটা ঝোলানো রয়েছে — ঐ দেখছো?

— হ্যাঁ।

— এক ছুটে গিয়ে নিয়ে এসো। ভয় নেই — একবার তরোয়ালটা হাতে পেলে সব'কটাকে আমি একাই নিকেশ করতে পারবো — জল্‌দি ছোট —

জ্যাকব পড়ি কি মরি ছুটল ডেক-ঘরের দেয়ালের দিকে। নাবিকদের দল কিছু বোঝবার আগেই ও দেওয়ালে ঝোলানো তরোয়ালটা খাপ থেকে খুলে নিল। এতক্ষণে নাবিকের দল ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সবাই হই-হই করে ছুটল জ্যাকবকে ধরতে। জ্যাকব ততক্ষণে তরোয়ালটা ছুঁড়ে দিয়েছে ফ্রান্সিসের দিকে। তরোয়ালটা ঝনাৎ করে এসে পড়ল ফ্রান্সিসের পায়ের কাছে। তরোয়ালটা তুলে নিয়েই ও ছুটল ভিড়ের দিকে। ততক্ষণে ক্রুদ্ধ নাবিকের দল জ্যাকবকে ঘিরে ধরেছে। কয়েকজন মিলে জ্যাকবকে ধ'রে ডেক-ঘরের কাঠের দেয়ালে ওর মাথা ঠুকিয়ে দিতে শুরু করেছে। কিন্তু খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসকে ছুটে আসতে দেখে ওরা জ্যাকবকে ছেড়ে দিয়ে এদিক-ওদিক ছুটে সরে গেল। ফ্রান্সিস সেই নাবিকদলের দিকে তরোয়ার উঁচিয়ে গলা চড়িয়ে বলল — জ্যাকব বিধর্মী হোক, আর যাই হোক, ও আমার বন্ধু। যদি তোদের প্রাণের মায়া থাকে জ্যাকবের গায়ে হাত দিবি না।

ফ্রান্সিসের সেই রুদ্রমূর্তি দেখে সবাই বেশ ঘাবড়ে গেল! ওরা জানতো — ফ্রান্সিস জাতিতে ভাইকিং। তরোয়াল হাতে থাকলে ওদের সঙ্গে এঁটে ওটা মুশকিল। ডেক-এর ওপরে এত হই-চই চীৎকার ছুটোছুটির শব্দে মালিক আর নাবিক-সর্দার ওপরে উঠে এল। ওরা ভাবতেই পারেনি, যে ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে। এদিকে দু'জন ডেক-এর ওপর রক্তাক্ত দেহে কাতরাচ্ছে --- ওদিকে ফ্রান্সিস খোলা তরোয়াল হাতে রুদ্রভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

জাহাজের মালিক আশ্চর্য হয়ে গেল। সে দু'হাত তুলে চীৎকার করে বলল —-

শোন সবাই — মারামারি করবার সময় পরে অনেক পাবে, এখন যে বিপদে পড়েছি, তা থেকে উদ্ধারের কথা ভাবো।

এতক্ষণ উত্তেজনা মারামারির মধ্যে সবাই বিপদের কথা ভুলে গিয়েছিল। এখন আবার সবাই ভয়-ভয় চোখে চারদিকে ঘন কুয়াশার দিকে তাকাতে লাগল। কারো মুখে কথা নেই। এমন সময় ষণ্ডাগোছের নাবিকদের মধ্যে একজন চীৎকার করে বলল — এই যে জ্যাকব ও ইহুদী — ওর জন্যই আমাদের এই বিপদ।

আবার গোলমাল শুরু হল। মালিক দু'হাত তুলে সবাইকে থামাবার চেষ্টা করতে লাগল। গোলমাল কমলে বলল — এটা বাপু জাহাজ — গীর্জে নয়! কার কি ধম্মো, তাই দিয়ে আমার কি দরকার। আমি চাই কাজের লোক। জ্যাকব তো কাজকর্ম ভালোই করে।

আবার চীৎকার শুরু হল — আমরা ওসব শুনতে চাই না।

— জ্যাকবকে জাহাজ থেকে ফেলে দাও।

— ফাঁসিতে লটকাও।

জাহাজের মালিক ব্যবসায়ী মানুষ। সে কেন একটা লোকের জন্যে ঝামেলা পোহাবে। সে বলল — বেশ তোমরা যা চাইছ, তাই হবে।

ফ্রান্সিস চীৎকার করে বলে উঠল — আমার হাতে তরোয়াল থাকতে সেটি হবে না।

জাহাজের মালিক পড়ল মহাফাঁপরে! তবে সে বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী। খুনোখুনি-রক্তপাত এসবে বড় ভয়। বলল — ঠিক আছে, আর একটা দিন সময় দাও তোমরা। দাঁড়ে হাত লাগাও — জাহাজ চলুক — দেখা যাক — যদি একদিনের মধ্যেও কুয়াশা না কাটে তাহলে জ্যাকবকে ছুঁড়ে ফেলে দিও।

নাবিকদের মধ্যে গুঞ্জন চলল। একটু পরে সেই ষণ্ডাগোছের নাবিকটা বলল, ঠিক আছে — আমরা আপনাকে একদিন সময় দিলাম।

— তাহলে আর দেরি করো না। সবাই যে যার কাজে লেগে পড়ো। মালিক নাবিক সর্দারের দিকে ইশারা করল। সর্দার ফ্রান্সিসের কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস একবার সেই নাবিকদের জটলার দিকে তাকাল। তারপর তরোয়ালটা সর্দারের হাতে দিল। চাপাস্বরে জ্যাকবকে বলল — ভয় নেই। দেখো — একদিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যাবে।

নাবিকদের জটলা ভেঙে গেল। যে যার কাজে লেগে পড়ল। একদল পাল সামলাতে মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিসদের দল সর্দারের নির্দেশে সবাই জাহাজের খোলে নেমে এল। সেখানে দু'ধারে সার-সার বেঞ্চির মত কাঠের পাটাতন পাতা। সামনে একটা লম্বা দাঁড়ের হাতল। বেঞ্চিতে বসে ওরা পঞ্চাশজন দাঁড়ে হাত লাগাল। তারপর সর্দারের ইঙ্গিতে একসঙ্গে পঞ্চাশটা দাঁড় পড়ল জলে — ঝপ্—ঝপ্। জাহাজটা নড়েচড়ে চলতে শুরু করল। ফ্রান্সিসের ঠিক সামনেই বসেছিল জ্যাকব। দাঁড় টানতে টানতে ফ্রান্সিস ডাকল — জ্যাকব?

— হুঁ।

যদি সেই বুড়ো নাবিকটার কথা সত্যি হয়, তাহলে —

- তাহলে কী?

— তাহলে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ঝড়ের মুখে পড়ব।

— তারপর?

— ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে —

— জলের তলায় অক্কা পাবে —

— তার আগে সোনার ঘন্টাটা বাজনা তো শুনতে পাবো।

জ্যাকব এবার মুখ ফিরিয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল—

—পাগল!

জাহাজ চলল। ছপ্-ছপ্। পঞ্চাশটা দাঁড়ের শব্দ উঠছে। চারিদিকে জমে থাকা কুয়াশার মধ্য দিয়ে জাহাজ চলছে। কেমন একটা গুমোট গরম। দাঁড়িদের গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। একফোঁটা হাওয়ার জন্যে সবাই হা-হুতাশ করছে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটায় সমস্ত জাহাজটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। কে কোথায় ছিটকে পড়ল, তার ঠিক নেই। পরক্ষণেই প্রবল বৃষ্টিধারা আর হাওয়ার উন্মত্ত মাতন। তালগাছ সমান উঁচু-উঁচু ঢেউ জাহাজের গায়ে এসে আছড়ে পড়তে লাগল। জাহাজটা কলার মোচার মত ঢেউয়ের আঘাতে দুলতে লাগল। এই একবার জাহাজটা ঢেউ-এর গভীর ফাটলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই প্রচণ্ড ধাক্কায় উঠে আসছে ঢেউয়ের মাথায়।

ঝড়ের প্রথম ধাক্কায় ফ্রান্সিস মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তবে সামনে নিয়েছিল খুব। কারণ ও তৈরীই ছিল — ঝড় আসবেই। আর সবাই এদিক-ওদিক ছিটকে পড়েছিল। হামাগুড়ি দিয়ে কাঠের পাটাতন ধরে-ধরে অনেকেই নিজের জায়গায় ফিরে এল। এল না শুধু জ্যাকব। কিছুক্ষণ আগে যে ধকল গেছে ওর ওপর দিয়ে। তারপর ঝড়ের ধাক্কায় টাল সামলাতে না পেরে পাটাতনের কোণায় জোর ধাক্কা খেয়ে ও অজ্ঞানের মত পড়েছিল একপাশে। ফ্রান্সিস কয়েকবার জ্যাকব কে ডাকল। ঝড়ের গো-গোঁয়ানি মধ্যে সেই ডাক-জ্যাকবের কানে পৌঁছল না। ফ্রান্সিস দাঁড় ছেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে জ্যাকবকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় জ্যাকব? আর খোঁজা সম্ভব নয়। প্রচণ্ড দুলুনির মধ্যে টাল সামলাতে না পেরে বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল ফ্রান্সিস।

হঠাৎ শক্ত কিছুতে ধাক্কা লেগে জাহাজের তলাটা মড়মড় করে উঠল। দাঁড়গুলো প্যাকাটির মত মটমট করে ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস চমকে উঠল — ডুবোপাহাড়! আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ফ্রান্সিস বহু কষ্টে টলতে-টলতে ডেক-এর ওপর উঠে এল। দেখল, ঝোড়ো হাওয়ার আঘাতে বিরাট ঢেউ ডেক-এর ওপর আছড়ে পড়ছে। আর সে কি দুলুনি! ঠিক তখনই সমস্ত জল-ঝড় বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে শুনতে পেল ঘন্টার শব্দ — ঢং-ঢং-ঢং। ঘন্টা বেজেই চলল। সোনার ঘন্টার শব্দ — ঢং-ঢং।

ফ্রান্সিস উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। ঠিক তখনই মড়মড় শব্দে জাহাজের তলাটা ভেঙে গেল, আর সেই ভাঙা ফাটল দিয়ে প্রবল বেগে জল ঢুকতে লাগল। মুহূর্তে জাহাজের খোলটা ভরে গেল। জাহাজটা পেছন দিকে কাৎ হয়ে ডুবতে লাগল। সশব্দে মাস্তলটা ভেঙ্গে পড়ল। জাহাজের রেলিঙের কোণায় লেগে মাস্তুলটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। উত্তাল সমুদ্রের বুকে মাস্তুলের যে টুকরোটা পড়ল, সেটার দিকে লক্ষ্য রেখে ফ্রান্সিস জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে খেতে কোনোরকমে ভাঙা মাস্তুলটা জড়িয়ে ধরল। বহুকষ্টে মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা দিয়ে নিজের শরীরটা মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে নিল। ওদিকে ঘন্টার শব্দ ফ্রান্সিসের কানে এসে তখন বাজছে — ঢং-ঢং-ঢং।

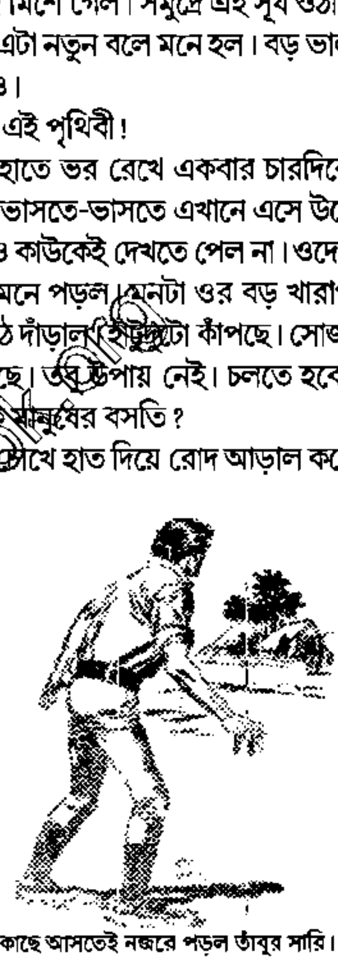
ভোর হয় হয়। পূর্বদিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় আকাশটায় লালচে রঙ ধরেছে। সূর্য উঠতে দেরি নেই। সাদা-সাদা সমুদ্রের পাখীগুলো উড়ছে আকাশে। বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির মধ্যে সমুদ্রের জলের ধার ঘেঁষে ফ্রান্সিস পড়ে আছে মড়ার মতো। কোন সাড়া নেই। ঢেউগুলো বালিয়ারির ওপর দিয়ে গড়িয়ে ওর গা পর্যন্ত চলে আসছে।

সমুদ্র-পাখীর ডাক ফ্রান্সিসের কানে গেল। অনেক দূরে পাখীগুলো ডাকছে। আস্তে-আস্তে পাখীর ডাক স্পষ্ট হল। চেতনা ফিরে পেল ফ্রান্সিস। বেশ কষ্ট করেই চোখ খুলতে হল ওকে। চোখের পাতায় নুনের সাদাটে আস্তরণ পড়ে গেছে। মাথার ওপর আকাশটা দেখলও। অন্ধকার কেটে গেছে। অনেক কষ্টে আড়ষ্ট ঘাড়টা ফেরাল। দেখলো সূর্য উঠছে। মস্তবড় থালার মতো টকটকে লাল সূর্য। আস্তে-আস্তে সূর্যটা ঢেউয়ের গা লাগিয়ে উঠতে লাগল। সবটা উঠল না বড় বিন্দুর মত একটা অংশ লেগে রইল জলের সঙ্গে। তারপর টুপ করে উঠে ওপরের লাল থালাটার সঙ্গে মিশে গেল। সমুদ্রে এই সূর্য ওঠার দৃশ্য ফ্রান্সিসের কাছে খুবই পরিচিত। কিন্তু আজকে এটা নতুন বলে মনে হল। বড় ভাল লাগল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছে-ও।

ফ্রান্সিস জোরে শ্বাস ফেলল — আঃ কি সুন্দর এই পৃথিবী!

বেশ কষ্ট করে শরীরটা টেনে তুলল ফ্রান্সিস। হাতে ভর রেখে একবার চারদিকে তাকাল। ভরসা-যদি জাহাজের আর কেউ ওর মত ভাসতে-ভাসতে এখানে এসে উঠে থাকে। কিন্তু বিস্তীর্ণ বালিয়াড়িতে যতদূর চোখ যায় ও কাউকেই দেখতে পেল না। ওদের জাহাজের কেউ বোধহয় বাঁচেনি। জ্যাকবের কথা মনে পড়ল। মনটা ওর বড় খারাপ হয়ে গেল। গা থেকে বালি ঝেড়ে ফেলে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। হাঁটুদুটো কাঁপছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। শরীর অসম্ভব দুর্বল লাগছে। তবু উপায় নেই। চলতে হবে। লোকালয় খুঁজতে হবে। খাদ্য চাই, কিন্তু কোন দিকে মানুষের বসতি?

সূর্যের আলো প্রখর হতে শুরু করেছে। ফ্রান্সিস চোখে হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে চারদিকে দেখতে লাগল। একদিকে শান্ত সমুদ্র। অন্যদিকে ধুধু বালি আর বালি। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। এ কোথায় এলাম? আর ভেবে কি হবে। ফ্রান্সিস পা টেনে সেই ধু-ধু বালির মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল।


কাছে আসতেই নজরে পড়ল তাঁবুর সারি।

মাথার ওপর সূর্য উঠে এল। কি প্রচণ্ড তেজ সূর্যের আলোর। তৃষ্ণায় জিভ পর্যন্ত শুকিয়ে আসছে। হু-হু হাওয়া বইছে বালি উড়ছে। শরীর আর চলছে না। মাথা ঘুরছে। মাথার ওপব আগুন-ঝরানো সূর্য। বালির দিগন্ত দুলে-দুলে উঠছে। শরীর টলছে। তবু হাঁটতেই হবে। একবার থেমে পড়লে, বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। জোরে শ্বাস নিল ফ্রান্সিস। অসম্ভব! থামা চলবে না।

একি? মরীচিকা নয় তো? ফ্রান্সিস হাত দিয়ে চোখদুটো ঘষে নিল। নাঃ। ঐ তো সবুজের ইশারা। কয়েকটা খেজুর গাছ। হাওয়ায় পাতাগুলো নড়ছে। কাছে আসতেই

নজরে পড়ল তাঁবুর সারি, খেজুর গাছে বাঁধা অনেকগুলো ঘোড়া, একটা ছোট্ট জলাশয়। একটা লোক ঘোড়াগুলোকে দানা-পানি খাওয়াবার তদারকি করছিল। সেই প্রথম ফ্রান্সিসকে দেখতে পেল। লোকটা প্রথমে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। তারপর তীক্ষ্ণস্বরে কি একটা কথা বলে চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁবুগুলো থেকে অনেক লোক বেরিয়ে এল। তাদের গায়ে আরবীদের পোশাক। ঢোলা জোব্বা পরনে। মাথায় বিড়েবাঁধা সাদা কাপড়। কান পর্যন্ত ঢাকা। ফ্রান্সিসের বুকে আর দম নেই। মুখ দিয়ে হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে তখন। ফ্রান্সিস শুধু দেখতে পেল লোকগুলোর মধ্যে কারো কারো হাতে খোলা তরোয়াল রোদ্দুরে ঝিকিয়ে উঠছে। আর কিছু দেখতে পেল না ফ্রান্সিস। সব কেমন আবছা হয়ে আসছে। ফ্রান্সিস মুখ থুবড়ে পড়ল বালির ওপর। অনেক লোকের কণ্ঠস্বর কানে এল। ওরা নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করতে করতে এদিকেই আসছে। তারপর আর কোন শব্দই ফ্রান্সিসের কানে গেল না।

ফ্রান্সিস যখন চোখ মেলল তখন রাত হয়েছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে বুঝল, এটা তাঁবু। আস্তে আস্তে ওর সব কথা মনে পড়ল। চারিদিকে তাকাল। এককোণে মৃদু আলো জ্বলছে। একটা বিছানার মত নরম কিছুর ওপর শুয়ে আছে। শরীরটা এখন অনেক ভাল লাগছে। ওপাশে কে যেন মৃদুস্বরে কথা বলছে। ফ্রান্সিস পাশ ফিরল। লোকটা তাড়াতাড়ি এসে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। লোকটার মুখে দাড়ি-গোঁফ। কপালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। হয়তো তরোয়ালের কোপের। লোকটা হাসল — 'কি? এখন ভাল লাগছে?'

মৃদু হেসে ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল।

— খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

— হ্যাঁ।

লোকটা দ্রুতপায়ে তাঁবুর বাইরে চলে গেল। ফ্রান্সিস বুঝল — এই লোকটাই তার সেবাশুশ্রূষার ভার নিয়েছে।

পরের দিন বিকেল পর্যন্ত ফ্রান্সিস প্রায় সমস্তক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইল। কপালকাটা লোকটাই তার দেখাশুনা করল। ফ্রান্সিস ঐ লোকটার কাছ থেকে শুধু এইটুকুই জানতে পারল, যে এরা একদল বেদুইন ব্যবসায়ী। এখান থেকে কিছুদূরেই আমদাদ শহর। এখানকার সুলতানের রাজধানী। ওখানেই যাবে এরা। আজ সারাদিন এদের দলপতি বারদুয়েক ফ্রান্সিসকে দেখে গেছে। দলপতির দীর্ঘ দেহ, পরনে আরবীয় পোশাক, কোমরে সোনার কাজকরা খাপে লম্বা তরোয়াল। দলপতি বেশ হেসেই কথা বলছিল ফ্রান্সিসের সঙ্গে। ফ্রান্সিসকে তার যে বেশ পছন্দ হয়েছে, এটা বোঝা গেল। দলপতির সঙ্গে সবসময়ই একটা লোককে দেখছিল ফ্রান্সিস। মুখে বসন্তের দাগ। কেমন এবড়ো-খেবড়ো কঠিন মুখ। ধূর্ত চোখের দৃষ্টি। দেখলেই বোঝা যায় লোকটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির।

তখন সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। ফ্রান্সিস তাঁবু থেকে বেরিয়ে একটা খেজুর গাছের নীচে এসে বসল। জলাশয়ের ওপর একজন বেদুইন একটা তেড়াবাঁকা তারের যন্ত্র বাজিয়ে নাকিসুরে গান করছে। ফ্রান্সিস চুপ করে বসে গান শুনতে লাগল। হঠাৎ ফ্রান্সিস দেখল দূরে ছায়া ছায়া বালি-প্রান্তর দিয়ে কে যেন খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। লোকটা এল। তারপর ঘোড়া থেকে নেমেই সোজা

দলপতির তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। একটু পরেই দলপতির তাঁবু থেকে কয়েকজনকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। কয়েকজন ঢুকল। বেশ একটা ব্যস্ততার ভাব। কি খবর নিয়ে এল লোকটা? ফ্রান্সিসের হঠাৎ মনে হল, ওর পাশেই কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। আরে? সেই কপাল-কাটা লোকটা। ওর জন্যে অনেক করেছে অথচ নাম জানা হয়নি।

— আরে বসো-বসো। ফ্রান্সিস সরে বসবার জায়গা করে নিল। লোকটাও বসল।

— কি কাণ্ড দেখ — তোমার নামটাই জানা হয় নি। ফ্রান্সিস বলল।

— ফজল আলি, সবাই ফজল বলেই ডাকে — লোকটা আস্তে-আস্তে বলল।

এবার কি জিজ্ঞেস করবে ফ্রান্সিস ভেবে পেল না।

ফজলই কথা বলল — তুমি আমার কপালের দাগটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলে।

ফ্রান্সিস একটু অপ্রস্তুত হল। বলল — তা ওরকম দাগ তো বড় একটা দেখা যায় না।

— আমার ভাই তরোয়াল চালিয়েছিল। এটা তারই দাগ।

— সে কি!

— হ্যাঁ।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল।

— সেইদিন থেকে তরোয়াল একটা রাখতে হয় তাই রাখি, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা খাপ থেকে বের করিনি। যাকগে — ফজল একটু থেমে বলল — তুমি তো ভাই এখানকার লোক নও।

— ঠিক ধরেছো — আমি ভাইকিং।

— ভাইকিং! বাপস্‌রে, তোমাদের বীরত্বের অনেক কাহিনী আমরা শুনেছি।

— তাই নাকি? ফ্রান্সিস হাসল।

— তোমার নাম?

— ফ্রান্সিস।

— কোথায় যাচ্ছিলে?

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। সোনার ঘন্টার খোঁজে যাচ্ছিলাম, এ সব বলা বিপজ্জনক। তা ছাড়া ও সব বললে পাগলও ঠাউরে নিতে পারে। বলল — এই — ব্যবসায় ফিকিরে —

— জাহাজ ডুবি হয়েছিল?

— হ্যাঁ।

দু'জনের কেউ আর কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিস একবার আকাশের দিকে তাকাল। পরিষ্কার আকাশজুড়ে তারা। কি সুন্দর লাগছে দেখতে। হঠাৎ ফজল চাপাস্বরে ডাকল — ফ্রান্সিস?

— কি?

— যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দল ছেড়ে পালাও।

ফ্রান্সিস চমকে উঠে বললো — কেন?

ফজল চারিদিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বলল — এটা হচ্ছে বেদুইন মরুদস্যুদের দল।

— সে কি!

— হ্যাঁ।

— তুমিও তো এই দলেরই।

— উপায় নেই ভাই — একবার এই দস্যুদলে ঢুকলে পালিয়ে যাওয়ার সব পথ বন্ধ।

— কেন?

— এই তল্লাটের সব শহরে, বাজারে, মরুদ্যানে এদের চর রয়েছে। তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করবে। তারপর —

— মানে — খুন করবে?

— বুঝতেই পারছো।

— কিন্তু — ফ্রান্সিসের সংশয় যেতে চায় না। বলল — সর্দারকে তো ভালো লোক বলেই মনে হল।

— তা ঠিক কিন্তু সর্দারকে চালায় কাসেম — কাসেমকে দেখেছ তো? সব সময় সর্দারের সঙ্গে থাকে।

— হ্যাঁ — বীভৎস দেখতে।

— যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব। ওর মত সাংঘাতিক মানুষ আমি জীবনে দেখিনি।

— হুঁ। কাসেমকে দেখে আমারও তাই মনে হয়েছে।

— কালকেই দেখতে পাবে, কাসেমের নিষ্ঠুরতার নমুনা।

— তার মানে?

আজকে শেষ রাত্তিরে আমরা বেরুবো। গুপ্তচর খবর নিয়ে এসেছে এইমাত্র — মস্তবড় একটা ক্যারাভান (মরুপথের যাত্রীদল) এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূর দিয়ে যাবে।

— ক্যারাভ্যান?

— হ্যাঁ। ব্যবসায়ীদের ক্যারাভ্যান। দামী-দামী মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া মোহর, সোনার গয়নাগাঁটি এসব তো রয়েইছে। ক্যারাভ্যানে তো শুধু ব্যবসায়ীরাই যায় না — অন্য লোকেরাও যায় তাদের পরিবারের লোকজন নিয়ে। দল বেঁধে গেলে ভয় কম।

— তোমরা ক্যারাভ্যান লুঠ করবে?

— সর্দারের হুকুম। কথাটা বলেই ফজল গলা চড়িয়ে অন্য কথা বলতে শুরু করল — শুনেছি তোমাদের দেশে নাকি বরফ পড়ে — আমরা বরফ কোনদিন চোখেও দেখিনি। ফ্রান্সিস কি বলবে বুঝে উঠতে পারল না। তবে অনুমান করলো কাউকে দেখেই ফজল অন্য কথা বলতে শুরু করেছে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল খেজুর গাছের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে এল। কাসেম! কাসেম গম্ভীর গলায় বলল — ফজল, শেষ রাত্তিরে বেরুতে হবে — ঘুমিয়ে নাও গে যাও।

— হ্যাঁ এই যাচ্ছি। ফজল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। চলে যেতে-যেতে গলা চড়িয়ে বলল — তাহলে ঐ কথাই রইল — তুমি ওখান থেকে বরফ চালান দেবে, বদলে আমি এখান থেকে বালি চালান দেবো।

কাসেম এবার কুৎসিত মুখে হাসলো — এই সাদা ভিনদেশী — তুইও যাবি সঙ্গে।

ফ্রান্সিসের সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। কথা বলার কি ভঙ্গী! কিন্তু ও চুপ করে রইল। শরীর দুর্বল। এখন আশ্রয়ের প্রয়োজন খুবই, চটাচটি করলে নিজেরই ক্ষতি। সময় আসুক। অপমানের শোধ তুলবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের তাঁবুর দিকে পা বাড়াল। পেছনে শুনল কাসেমের বীভৎস হাসি — 'ওঃ শাহজাদার গোঁসা হয়েছে — হা—হা।'

মরুদস্যুর দল ঘোড়ায় চলে চলেছে। শেষ রাত্রির আকাশটা কেমন ঘোলাটে। তারাগুলো অস্পষ্ট। একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া বইছে। ফ্রান্সিস উটের লোমের কম্বল কান অব্দি তুলে দিল। কোমরে নতুন তরোয়ালটার খাপটায় হাত দিল একবার।

বালিতে ঘোড়ার ক্ষুরের অস্পষ্ট শব্দ। ঘোড়ার শ্বাস ফেলার শব্দ। মাঝে-মাঝে ঘোড়ার ডাক। মরুদস্যুর দল ছুটে চলেছে। কাসেমের চীৎকার শোনা গেল — আরো জোরে। ফ্রান্সিস ঘোড়ার রাশ অনেকটা আলগা করে দিল। ঘোড়ার পেটে পা ঠুকলো। সকলেই ঘোড়ার চলা গতি বাড়িয়ে দিল।

পূবের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই লাল টকটকে সূর্য উঠল। তারপর নরম রোদ ছড়িয়ে পড়ল ধুধু বালির প্রান্তরে। সেই আলোয় হঠাৎ দূরে দেখা গেল— একটা আঁকাবাঁকা সচল রেখা। ক্যারাভ্যান চলেছে। কাশেমের উল্লসিত উচ্চস্বর শোনা গেল — আরো জোরে।

বিদ্যুৎগতিতে ধুলোর ঝড় তুলে মরুদস্যুর দল ছুটলো ক্যারাভ্যান লক্ষ্য করে। একটু পরেই দেখা গেল ক্যারাভ্যানের আঁকাবাঁকা রেখাটা ভেঙে গেল। ওরা মরুদস্যুর লোকদের দেখতে পেয়েছে। যেদিকে পারছে ছুটছে। কিন্তু মালপত্র আর সওয়ারী পিঠে নিয়ে উটগুলো আর কত জোরে ছুটবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মরুদস্যুর দল ওদের দু'দিক থেকে ঘিরে ধরল। সকালের আকাশটা ভরে উঠল নারী আর শিশুদের ভয়ার্ত চিৎকারে।

শুরু হল খণ্ডযুদ্ধ। ক্যারাভ্যানের ব্যবসায়ীরা কিছু ভাড়াকরা পাহারাদার নিয়ে যাচ্ছিল সঙ্গে। তাদের সঙ্গেই লড়াই শুরু হল প্রথমে। উটের পিঠে কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া ছইগুলো থেকে ভেসে আসতে লাগল ভয়ার্ত কান্নার চিৎকার। কিন্তু সেদিকে কারো কান নেই। সকালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল তরোয়ালের ফলা। তারপর তরোয়ালের সঙ্গে তরোয়ালের ঠোকাঠুকি মূমূর্ষদের চীৎকার, গোঙানি।

ফ্রান্সিস একপাশে ঘোড়াটা দাঁড় করিয়ে যুদ্ধ দেখছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যারাভ্যানের প্রহরীরা প্রায় সবাই বালির উপর লুটিয়ে পড়ল।

এমন সময় ব্যবসায়ীদের মধ্যে থেকে আরো কয়েকজন তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস অবাক হয়ে দেখল তার মধ্যে একটি কিশোর ছেলে। ছেলেটি অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে তরোয়াল চালাতে লাগল। পাঁচ-ছয়জন মরুদস্যু ওকে ঘিরে ধরল। কিন্তু ছেলেটির ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারছে না কেউ। ছেলেটির তরোয়াল চালানোর নিপুণ ভঙ্গী আর দুর্জয় সাহস দেখে ফ্রান্সিস মনে-মনে তার তারিফ না করে পারল না। যারা ওকে ঘিরে ধরেছিল তাদেরই দু'জন রক্তাক্ত শরীরে পালিয়ে এল। ছেলেটি তখনও অক্ষত। সবিক্রমে তরোয়াল চালাচ্ছে। কিশোর ছেলেটিকে দেখে ফ্রান্সিসের মনে পড়ল, নিজের ছোট ভাইটির কথা। তার ভাইটিও এমনি তেজী, এমনি নির্ভীক।

এবার আট-দশজন মরুদস্যু ছেলেটিকে ঘিরে ধরল। কিন্তু ছেলেটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কাছে ওদের বার বার হার স্বীকার করতে হল।

হঠাৎ দেখা গেল, কাসেম ছেলেটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝল কাসেমের নিশ্চয়, কোন কুমতলব আছে। লড়াই তখন শেষ। ক্যারাভ্যানের দলের মাত্র কয়েকজন পুরুষ তখনও কোনোরকমে টিকে আছে। বাকী সবাই মৃত নয় তো মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। রয়েছে শুধু নারী আর শিশুরা। কাজেই লুঠতরাজ চালাতে এখন আর কোন

বাধাই নেই। কিন্তু কাসেমের মতলব বোধহয় কাউকেই বেঁচে থাকতে দেবে না। ফ্রান্সিস ঘোড়াটা চালিয়ে নিয়ে একটু এগিয়ে দাঁড়ালো।

কাসেম তক্কে-তক্কে রইল। ছেলেটি তখন ঘোড়ার মুখ উল্টোদিকে ফিরিয়ে অন্য দস্যু কটার সঙ্গে লড়াই চালাতে লাগল। কাসেম যেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। সে নিচু হয়ে ছেলেটির ঘোড়ার পেটের দিকে জিনের চামড়াটায় তরোয়াল চালাল। জিনটা কেটে দু'টুকরো হয়ে গেল। ছেলেটি জিনসুদ্ধ হুড়মুড় করে গড়িয়ে বালির ওপর পড়ে গেল। ঘোড়ার গা থেকে রক্ত ছিটকে লাগল ওর সর্বাঙ্গে। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কাসেম অট্টহাসি হেসে উঠল। ওর কুৎসিত মুখটা আরো বীভৎস হয়ে উঠল। এবার অন্য দস্যুগুলো ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। কিন্তু কাসেমের ইঙ্গিতে থেমে গেল।

ফ্রান্সিস বুঝল — কাসেমের নিশ্চয়ই কোন সাংঘাতিক অভিসন্ধি আছে। ঠিক তাই। কাসেম নিজের ঘোড়াটাকে ছেলেটির কাছে নিয়ে গেল। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তরোয়াল উঁচিয়ে দাঁড়াল। ছেলেটির সর্বাঙ্গে রক্তের ছোপ। সে বেশ ক্লান্ত এটাও বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাসেম নিচু হয়ে তরোয়ালের ডগায় বালি তুলে ছেলেটির চোখে মুখে ছিটোতে লাগল। দস্যুদলের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে গেল। ওরা ছেলেটিকে চারদিক থেকে ঘিরে মজা দেখতে লাগল। একসময় অনেকটা বালি ছেলেটির চোখে ঢুকে পড়ল। সে বাঁ হাতে চোখ রগড়াতে লাগল। কিন্তু হাতের তরোয়াল ফেললনা ঠিক তখনই বালিতে প্রায় অন্ধ ছেলেটির মাথা লক্ষ্য করে কাসেম তরোয়াল তুললো। ফ্রান্সিস আর সহ্য করতে পারল না। বিদ্যুৎবেগে ঘোড়াটাকে কাসেমের সামনে নিয়ে এল। কাসেম কিছু বোঝবার আগেই কাসেমের উদ্যত তরোয়ালটায় আঘাত করল। আগুনে ফুলকি ছুটল। বেকায়দায় তরোয়াল চালিয়ে ছিল ফ্রান্সিস। তাই মুঠি আলগা হয়ে ওর তরোয়ালটা ছিটকে পড়ে গেল। কাসেম তীব্র দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে গর্জে উঠল — কাফের। তারপরেই ছুটল ফ্রান্সিসের দিকে। ফ্রান্সিস বিপদ গুনলো। কাসেম তরোয়াল উঁচিয়ে আসছে। ফ্রান্সিসের সাধ্য নেই, খালি হাতে ওকে বাধা দেয়।

— ফ্রান্সিস। চাপাস্বরে কে ডাকল। ফ্রান্সিস দ্রুত ঘুরে তাকাল। ফজল! ফজল ওর তরোয়ালটা এগিয়ে দিল। তরোয়ালটা হাতে পেয়েই ফ্রান্সিস কাসেমের প্রথম আঘাতটা সামলাল। কাসেম আবার তরোয়াল তুলল। ঠিক তখনই সর্দারের বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল — কাসেম ভুলে যেও না, আমরা লুঠ করতে এসেছি।'

কাসেম উদ্যত তরবারি নামাল। শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল। দু'জনে কি কথা হল। কাসেম তরোয়াল উঁচিয়ে ক্যারাভ্যানের দিকে ইঙ্গিত করল। কি হয় দেখবার জন্যে মরুদস্যুরা এতক্ষণ চুপ করে অপেক্ষা করছিল। সেই স্তব্ধতা খান-খান হয়ে ভেঙে গেল তাদের চীৎকার। সবাই চীৎকার করতে করতে ছুটল ক্যারাভ্যানের দিকে। তারপর পৈশাচিক উল্লাসে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যারাভ্যানের ওপর। আবার আর্তচীৎকার কান্নার রোল উঠল। অবাধ লুঠতরাজ চলল।

এবার ফেরার পালা। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহগুলোর ওপর দিয়েই দস্যুর দল ঘোড়া ছোটাল। ফ্রান্সিস অতটা অমানুষ হতে পারল না। অন্য দিক দিয়ে ঘুরে যেতে লাগল। হঠাৎ দেখল সেই ছেলেটি মাটিতে হাঁটু গেড়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ফ্রান্সিস একবার ভাবল নেমে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু উপায় নেই। মরুদস্যুর দল অনেকটা এগিয়ে গেছে।

ফ্রান্সিস ঘোড়া ছুটিয়ে দলের সঙ্গে এসে মিশল। ওরা যখন সেই মরুদ্যানে ফিরে এল তখন সূর্য মাথার ওপরে। চারদিকে বালির ওপর দিয়ে আগুনের হল্কা ছুটছে যেন।

বিকেলে খেজুর গাছটার তলায় ফজলের সঙ্গে দেখা হল। ফজল বললো

— অতগুলো লোকের প্রাণ বাঁচালে তুমি ভাই।

কেন?

তোমার কাছে বাধা পেয়েই তো কাসেম আর এগোতে সাহস করেনি।

তা না হলে কি করতো?

— সব ক'জনকে মেরে ফেলতো।

— সে কি! মেয়েরা বাচ্চাগুলো — ওরা তো নিরপরাধ।

— কাসেমের নিষ্ঠুরতার পরিমাণ করতে পারবে না। জাহান্নামেও ওর ঠাঁই হবে না।

— হুঁ।

— ও কিন্তু তোমাকে সহজে ছাড়বে না। সাবধানে থেকো।

— ও আমার কি করবে?

— জানো না তো ভাই, দলের কেউ ওকে ঘাঁটাতে সাহস করে না, এমন কি সর্দারও না। হঠাৎ পেছনে কাকে দেখে ফজল থেমে গেল। কাসেম নয়। দস্যু দলের একজন। কাছে এসে ফ্রান্সিসকে ডাকল — এই ভিনদেশী — তোমাকে সর্দার এত্তেলা পাঠিয়েছেন।

— চলো, ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। তারপর লোকটার সঙ্গে তাঁবুর দিকে চলল।

একটা মোটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় সর্দার রূপোর গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিল। ফ্রান্সিস গিয়ে দাঁড়াতে নল থেকে মুখ না তুলে ইঙ্গিতে তাকে বসতে বললো। জাজিমপাতা ফরাসের ওপর বসতে গিয়ে ফ্রান্সিস দেখল, কাসেমও একপাশে বসে আছে। কাসেম তীব্র দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে একবার তাকাল। পরক্ষণেই যেন প্রচণ্ড ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। এতক্ষণে সর্দার কেশে নিয়ে ডাকল — ফ্রান্সিস।

— বলুন।

— তুমি বিদেশী — আমাদের রাজনীতি তোমার জানবার কথা নয়। তুমি আজকে যা করেছ, অন্য কেউ হলে তাকে এতক্ষণে বালিতে পুঁতে ফেলা হত।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। সর্দার বললো—কাশেম তুমি ওর সঙ্গে লড়তে রাজি আছ?

কাসেম সঙ্গে-সঙ্গে খাপ থেকে একটানে তরবারিটা বের করে বললো — এক্ষুণি।

সর্দার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল — তুমি?

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে বলল — আমি রাজী।

— হুঁ। সর্দার গড়গড়ার নলটা মুখে দিল। কয়েকবার টানল। তারপর বলল — রাত্তিরে তোমাকে ডেকে পাঠানো হবে। তৈরী হয়ে আসবে।

* * *

বালিতে কয়েকটা মশাল পুঁতে রাখা হয়েছে। চারদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে মরুদস্যুদলের লোকেরা। পরিষ্কার আকাশে লক্ষ তারার ভিড়। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে বালিতে ফুটফুটে চাঁদের আলো।

ফ্রান্সিসকে আসতে দেখে মরু-দস্যুদলের ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। ওরা ভিড় সরিয়ে পথ করে দিল। ফ্রান্সিস সহজ ভঙ্গিতে ভিড়ের মাঝখানকার ফাঁকা জায়গাটায়

এসে দাঁড়াল। একদিকে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, তার নিচে সর্দার বসে আছে। সেদিকে দাঁড়িয়ে আছে কাসেম। হাতে খোলা তরোয়ালে মশালের আলো পড়ে চক-চক করছে। মশালের আলো কাঁপছে তার টকটকে লাল আলখাল্লায়। ওকে দেখতে আরো বীভৎস লাগছে। ফ্রান্সিস তখনও খাপ থেকে তরোয়াল খোলেনি।

ফজলকে ডেকে সর্দার কি যেন বলল। ফজল কাসেমকে ফাঁকা জায়গার মাঝখানে এগিয়ে আসতে বলল। ফ্রান্সিসকেও ডাকল। ফ্রান্সিস এবার তরোয়াল খুলল। তারপর পায়ে-পায়ে এগিয়ে কাসেমের মুখোমুখি দাঁড়াল। সর্দার হাততালি দিয়ে কি একটা ইঙ্গিত করতেই কাসেম মুখোমুখি দাঁড়াল। সর্দার হাততালি দিয়ে কি একটা ইঙ্গিত করতেই কাসেম তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস এই অতর্কিত আক্রমণে প্রথমে হকচকিয়ে গেল। কাসেমের তরোয়ালের আঘাত ঠেকাল বটে, কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে বালির ওপর বসে পড়ল। ভিড়ের মধ্যে থেকে হাসির হররা উঠল। আবার কাসেম তরোয়াল চালাল। এবারও একই ভঙ্গীতে ফ্রান্সিস কাসেমের তরোয়ালের ঘা থেকে আত্মরক্ষা করল। তারপর নিজেই এগিয়ে গিয়ে কাসেমকে লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। শুরু হল দু'জনের লড়াই। বিদ্যুৎগতিতেই দু'জনের তরোয়াল ঘুরছে। মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় চকচক করছে তরোয়ালের ফলা। ঠং ঠং ধাতব শব্দ উঠছে তরোয়ালের ঠোকাঠুকিতে।



কাসেম তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মরুদস্যুর দল দেখতে লাগল এই তরোয়ালের লড়াই। কেউ কম যায় না। দু'জনেরই ঘন-ঘন শ্বাস পড়তে লাগল। কপালে ঘামের রেখা ফুটে উঠল। হঠাৎ ফ্রান্সিসের একটা প্রচণ্ড আঘাত সামলাতে না পেরে বালিতে কাসেমের পা সরে গেল। কাসেম কাত হয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস এই সুযোগ ছাড়ল না। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে তরোয়াল চালাল। কাসেম মরীয়া হয়ে সে আঘাত ফেরাল। কিন্তু মুঠি আলগা হয়ে তরোয়াল ছিটকে পড়ল একটু দূরে। কাসেম চিৎ হয়ে বালিতে পড়ে গেল, ফ্রান্সিস তরোয়াল নামিয়ে কাসেমের দিকে তাকাল। কাসেমের চোখে মৃত্যুভীতি। মুখ হাঁ করে সে শ্বাস নিচ্ছে তখন। ফ্রান্সিসও হাঁপাচ্ছে। ফ্রান্সিস তরোয়ালের ছুঁচলো ডগাটা। কাসেমের লাল আলখাল্লায় বিঁধিয়ে একটা টান দিল। লাল আলখাল্লাটা দু'ফালি হয়ে গেল। বুকের অনেকটা জায়গা কেটেও গেল, রক্তে ভিজে উঠল আলখাল্লাটা। মরুদস্যুদের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি উঠল। কোনদিকে না তাকিয়ে ফ্রান্সিস চলল সর্দারের কাছে। ও তো জানে এক রকম দু'জনের মধ্যে তরোয়ালের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বেদুইনদের রীতি কী? সর্দার যা বলবে তাই সে করবে।

'ফ্রান্সিস!' ফজলের অস্পষ্ট সতর্ক কণ্ঠস্বর শুনে ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। খোলা গা, উদ্যত তরোয়াল হাতে কাসেম ছুটে আসছে। ঠিক ওর মাথার ওপর কাসেমের তরোয়াল। পলকমাত্র সময় হাতে। ফ্রান্সিস উবু হয়ে মাটিতে বসে পড়ল। কাসেমের তরোয়াল

নামল। বাঁ কাঁধে একটা তীব্র যন্ত্রণা। তরোয়ালের ঘা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ফ্রান্সিসের মাথায় খুন চেপে গেল। কাপুরুষ! ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। উন্মত্তর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কাসেমের ওপর। কাঁধের যন্ত্রণা উপেক্ষা করে আঘাতের পর আঘাত হানল। কাসেম সেই তীব্র আক্রমণের সামনে অসহায় হয়ে পড়ল। পিছিয়ে যেতে-যেতে কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না সেই আক্রমণের মুখে। তার হাত অবশ হয়ে এল। উপর্যপরি কয়েকবার আঘাত হেনে সুযোগ বুঝে ফ্রান্সিস বিদ্যুৎবেগে তরোয়াল চালাল কাসেমের বুক লক্ষ্য করে। কাসেমের গলা দিয়ে শুধু একটা কাতরধ্বনি উঠল। পরক্ষণেই সে বালির ওপর লুটিয়ে পড়ল। বুকে বেঁধা তরোয়ালটা টেনে খোলবার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর শরীর স্থির হয়ে গেল। ফ্রান্সিস বালিতে হাঁটু গেড়ে বসে তখনও হাঁপাচ্ছে।

তরোয়াল যুদ্ধের এই ফলাফল দস্যুদলের কেউই আশা করেনি। কারণ, এর আগে কাসেমের সঙ্গে তরোয়ালের যুদ্ধে হেরে গিয়ে অনেককেই তারা মৃত্যুবরণ করতে দেখেছে। তরোয়াল যুদ্ধে কাসেম ছিল অজেয়। সেই কাসেম আজ একজন ভিনদেশীর কাছে শুধু হার স্বীকার করা নয়, একেবারে মৃত্যুবরণ করবে, এটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। দস্যুদলে কাসেমের অনুগামীর সংখ্যা কম ছিল না। তারা দল বেঁধে খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে গেল। ফ্রান্সিসকে ঘিরে ধরল তারা, কিন্তু ফ্রান্সিসকে আক্রমণ করবার আগেই সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সবাইকে থামতে ইঙ্গিত করল, তারপর ধীর পায়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে গেল।

কাঁধের যন্ত্রণাটা অনেকখানি কমেছে। একটু আগে সর্দার একজন লোক পাঠিয়েছিল। এই দলে হেকিমের কাজ করে লোকটা। কি একটা কালো আঠার মত ওষুধ ক্ষতস্থানে লাগিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দিল। রক্ত পড়া বন্ধ হল। একটু পরে ব্যথাটা কমতে শুরু করল। কিন্তু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। অনেক রাত পর্যন্ত ও জেগে রইল। দেশ ছেড়েছে কতদিন হয়ে গেল, তারপর জাহাজে নাবিকের জীবন বন্ধু 'জ্যাকব' জাহাজডুবি, সোনার ঘন্টার ঢং-ঢং শব্দ, আর আজ কোথায় এসে পড়েছে। নাঃ, এখান থেকে পালাতে হবে। ছেলেবেলা থেকে যে সোনার ঘন্টার স্বপ্ন ও দেখেছে, তার হদিশ পেতেই হবে। ভাবতে-ভাবতে কখন একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটা আর্ত চীৎকারে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। কে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল। কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। ফ্রান্সিস কান পেতে রইল। আবার চীৎকার। ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল।

ভোর হয়—হয় সূর্য উঠতে আর দেরি নেই। আবছা আলোয় ফ্রান্সিস দেখল — চার-পাঁচজন ঘোড়সওয়ার দস্যু কাকে যেন দড়িতে হাত বেঁধে বালির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। লোকটা হাতে বাঁধা দড়িটা টানছে। কাকুতি-মিনতি করছে। ফ্রান্সিস সেই আবছা আলোতেও চিনল। লোকটা আর কেউ না — ফজল। কিন্তু ফজলকে ওরা কোথায় নিয়ে চলেছে? হঠাৎ ঘোড়াগুলো ছুটতে শুরু করল। ফজল বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। পৈশাচিক আনন্দে ওরা ফজলকে বালির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে চলল।

ফ্রান্সিস বুঝতে পারল ফজল ওকে সাহায্য করেছে — প্রাণে বাঁচিয়েছে। সেই অপরাধের শাস্তিটা ওকে পেতে হচ্ছে। ও আর দাঁড়াল না। যে করেই হোক ফজলকে বাঁচাতে হবে। তাঁবুতে ফিরে এসে পোশাক পরে নিল। কোমরে তরোয়াল বাঁধলো।

তারপর নিঃসাড়ে খেজুর গাছে বাঁধা ঘোড়াটাকে খুলে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। নিজে চলল ঘোড়াটার আড়ালে। জলাশয়ের ওপাশ দিয়ে কিছুটা এগোতেই একটা উঁচু বালিয়াড়ির পেছনে মরুদ্যানটা আড়াল পড়তে ঘোড়ার পিঠে উঠে বালি উড়িয়ে ঘোড়া ছোটাল।

সূর্য উঠল। সকালের রোদে তেজ কম। তাই ফ্রান্সিসের পরিশ্রম হচ্ছিল কম। বেশী দূর যেতে হল না। ফ্রান্সিস দেখল — একটা নিঃসঙ্গী খেজুর গাছে ফজলের হাত বাঁধা দড়িটার একটা কোণা বাঁধা রয়েছে। আর ফজলকে ওরা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফজলের হাত বাঁধা। পা ছুঁড়ে নানাভাবে ও বাধা দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে পারবে কেন? ফ্রান্সিস ঘোড়া ছুটিয়ে সেই দস্যুগুলোর কাছাকাছি আসতেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ও শিউরে উঠল। কি সাংঘাতিক। ফজলকে ওরা চোরাবালিতে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে। চোরাবালিতে আটকে গেলেই গাছের সঙ্গে বাঁধা ফজলের হাতের দড়িটা কেটে দেবে। ফ্রান্সিসের অনুমানই সত্যি হল। ফজলের একটা মর্মান্তিক চীৎকার ওর কানে এল। দেখল — ফজলকে ওরা চোরাবালিতে ঠেলে দিয়েছে। ফজল প্রাণপণ শক্তিতে গাছের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা টেনে ধরে চোরাবালি থেকে উঠে আসার চেষ্টা করছে। এমন সময় একজন দস্যু মাথার ওপর তরোয়াল তুললো দড়িটা কাটবার জন্যে। এক মুহূর্ত। দড়িটা কেটে গেলে ফজল চোরাবালির অতল গর্ভে তলিয়ে যাবে। ওর চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না।



এমন সময় একজন দস্যু মাথার ওপর তরোয়াল তুলল দড়িটা কাটবার জন্য।

ফ্রান্সিস উল্কার বেগে ঘোড়া ছোটাল। তারপর চলন্ত ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে সেই দস্যুটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দড়ি আর কাটা হল না। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না। ছুটে গিয়ে দড়িটা ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল। শুধু ডান হাতেই তাকে টানতে হচ্ছিল। কারণ বাঁ হাতটা তখনও প্রায় অবশ হয়ে আছে। দুটো তিনটে হ্যাঁচকা টান মারতেই ফজল চোরাবালির গহ্বর থেকে শক্ত বালিতে উঠে এল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। বালিতে শুয়ে পড়ল। এতক্ষণের শারীরিক নির্যাতন, তার ওপর এই মৃত্যুর বিভীষিকা, এই সবকিছু তার দেহমনের শেষ শক্তিটুকু শুষে নিয়েছিল।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গেল। দস্যুর দল কি করবে, বুঝে উঠতে পারল না। ফজলকে চোরাবালি থেকে উঠে আসতে দেখে ওদের টনক নড়ল। এবার ফ্রান্সিসকে ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস একবার চারদিক থেকে ঘিরে ধরা দস্যুদের মুখের দিকে তাকাল। তারপর চীৎকার করে বলে উঠল — ফজল আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। যে ওর গায়ে হাত দেবে, আমি তাকে দু'টুকরো করে ফেলবো।

ফ্রান্সিসের সেই ক্রোধোন্মত্ত চেহারা দেখে দস্যুর দল বেশ ঘাবড়ে গেল। এটা যে ফ্রান্সিসের শূন্য আস্ফালন নয়, সেটা ওরা বুঝল। গত রাত্রে তার প্রমাণও পেয়েছে

ওরা। কাজেই ফ্রান্সিসকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করল না। নিজেদের মধ্যে ওরা কী যেন বলাবলি করল। তারপর ঘোড়া ছোটালো সেই মরুদ্যানের দিকে। যতক্ষণ ওদের দেখা গেল ফ্রান্সিস তাকিয়ে রইল। তারপর দ্রুতপায়ে ফজলের কাছে এল। জলের পাত্রটা খুলে ফজলের চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিল। ফজল দু'একবার চোখ পিটপিট করে ভালোভাবে তাকাল। মুখ হাঁ করে জল খেতে চাইল। ফ্রান্সিস ওর মুখে আস্তে আস্তে জল ঢেলে দিতে লাগল। জল খেয়ে ফজল যেন একটু সুস্থ হল। ফ্রান্সিস ওর হাতের দড়িটা কেটে দিল। তারপর ডাকল—ফজল।

ফজল ম্লান হাসল। ফ্রান্সিস বললো — চলো — ঘোড়ায় বসতে পারবে তো?

ফজল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ফ্রান্সিস ওকে ধরেধরে কোনরকমে ঠেলেঠুলে ঘোড়ার ওপর বসিয়ে নিল। তারপর নিজে লাফিয়ে উঠে পেছনে বসল। আর সময় নষ্ট না করে ঘোড়া ছোটাল। এ জায়গাটা ছেড়ে পালাতে হবে। বলা যায় না, হয়তো দলে ভারী হয়ে ওরা এখানে আসতে পারে। হলোও তাই। ফ্রান্সিস পেছন ফিরে দেখল — বালির দিগন্ত রেখায় কালো বিন্দুর মত কালো ঘোড়সওয়ার দস্যুর দল ছুটে আসছে।

ফজল এতক্ষণে যেন গায়ে জোর পেল। ও একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল।

— তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে ভাই।

ফ্রান্সিস হেসে বললো, এখনও আমাদের প্রাণের ভয় যায় নি ফজল।

— কেন?

— পেছনে তাকিয়ে দেখ।

ফজল ফিরে তাকাল। ধুলো উড়িয়ে দূরন্ত বেগে ছুটে আসছে মরুদস্যুর দল। একে অসুস্থ ফজলকে ধরে রাখতে হচ্ছে, তার ওপর কাঁধের কাটা জায়গাটার যন্ত্রণা। ফ্রান্সিস খুব জোরে ঘোড়া ছোটাতে পারছিল না। ক্রমেই মরুদস্যুদের সঙ্গে তাদের ব্যবধান কমে আসছিল।

— ফ্রান্সিস? ফজল ডাকল।

— হুঁ —

— সামনের ঐ যে পাহাড়ের মত একটা বালির টিবি দেখছো?

— হ্যাঁ।

— ঐ টিবিটার ও'পাশেই একটা মরুদ্যান আছে।

— ওখানেই যাবে?

— না.... না। ঐ টিবিটার আড়ালে আড়ালে আমরা ডানদিকে বাঁক নেব।

— কিন্তু —

— এছাড়া বাঁচবার কোন পথ নেই। ওরা ধরেই নেবে আমরা নিশ্চয়ই ঐ মরুদ্যানে আশ্রয় নেব, কারণ আমরা দু'জনেই অসুস্থ — বেশীদূর যেতে পারবো না।

— তা ঠিক।

— কাজেই আমাদের আশ্রয়ের জন্যে অন্য কোথাও যেতে হবে।

— কোথায় যাবে সেটা বলো —

— ডানদিকে মাইল কয়েক গেলেই আমদাদ শহর। একবার ঐ শহরে ঢুকতে পারলে তোমার আর কোন ভয় নেই।

— কেন?

— ওরা অনেকেই দাগী দস্যু — সুলতানের সৈন্যরা চিনে ফেলবে, এইজন্যে ওরা আমদাদ শহরে ঢুকবে না।

— কিন্তু তুমি?

— আমি আর কোথাও আস্তানা খুঁজে নেব।

কথা বলতে-বলতে ওরা পাহাড়ের মত উঁচু বালির ঢিবিটার আড়াল দিয়ে দিয়ে ঘোড়া ছোটাল। অনেকদূর পর্যন্ত আড়াল পেল ওরা। এক সময় ঢিবিটা শেষ হয়ে গেল। সামনে অনেক দূরে দেখা গেল হলদে-সাদা রঙের লম্বা প্রাচীর। ফজল বলল — এই হচ্ছে আমদাদ শহর। আর ভয় নেই।

ফ্রান্সিস পেছনে তাকাল। ধু-ধু বালি। মরুদস্যুর চিহ্নমাত্র নেই।

আমদাদ শহরের প্রাচীরের কাছে এসে পৌঁছল ওরা। ফ্রান্সিস দেখল — শহরের পশ্চিমদিকে তামাটে রঙের পাথরের একটা পাহাড়। ফজল আঙুল দিয়ে পাহাড়টা দেখিয়ে বলল — ঐ পাহাড়ের নীচেই সুলতানের প্রাসাদ। আর পাহাড়ের ও'পাশে সমুদ্র।

— সমুদ্র? — ফ্রান্সিস অবাক হল।

— হ্যাঁ, কেন বল তো?

— জাহাজডুবি হয়ে ভাসতে-ভাসতে ঐ সমুদ্রের ধারেই এসে ঠেকেছিলাম। যদি সমুদ্রের ধারে ধারে পশ্চিমদিকে যেতাম, তাহলে আগেই এই শহরে এসে পৌঁছতাম।

— তুমি তাহলে উলটোদিকে গিয়েছিলে — মরুভূমির দিকে।

গম্বুজঅলা শহরের তোরণ। কাছাকাছি আসতেই ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা নজরে পড়ল। উটের পিঠে, ঘোড়ায় চড়ে শহরে লোকজন ঢুকছে, বেরোচ্ছে। ফজল বলল — এবার ঘোড়া থামাও — আমি এখান থেকে অন্যদিকে চলে যাব।

ফ্রান্সিস ঘোড়া থামাল।

— ফ্রান্সিস।— ফজল ডাকল।

— হুঁ।

— তোমার তরোয়ালটা আমাকে দাও। ওপরের জামাটাও খুলে দাও।

— কেন? ফ্রান্সিস একটু অবাক হলো।

— এই পোশাক আর তরোয়াল নিয়ে শহরে ঢুকলে বিপদে পড়বে। এসব মরুদস্যুদের পোশাক। সুলতানের সৈন্যরা তোমাকে দেখলেই গ্রেফতার করবে। আর ভাই কিছু মনে করো না — তোমার ঘোড়াটা আমি নেব। কোথাও আশ্রয় তো নিতে হবে আমাকে।

— বেশ তো।

— আর একটা কথা।

— বলো।

— শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদ, মদিনা মসজিদ। যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে। মদিনা মসজিদের বাঁ পাশের গলিতে কয়েকটা বাড়ি ছাড়িয়ে মীর্জা হেকিমের বাড়ি। দেখা করে বলো—ফজল পাঠিয়েছে। বিনা খরচে তোমার জখমের চিকিৎসা হয়ে যাবে।

— সে হবে'খন কিন্তু তোমার জন্যে —

আমার জন্যে ভেবো না। হ্যাঁ, ভালো কথা, ফজল কোমর বন্ধনীর মধ্যে থেকে একটা ছোট সবুজ রঙের রুমাল বের করল। রুমালের গিট খুলে দু'টো মোহর বের করল। বলল --- জানো ভাই, এই মোহর দু'টোর পেছনে ইতিহাস আছে। আমাদের কোন এক পূর্বপুরুষ বিরাট এক মরুদস্যুদলের সর্দার ছিল। একটা ক্যারাভ্যান লুঠ করতে গিয়ে সে এই মোহর দুটো পেয়েছিল। কিন্তু মজার কথা কি জানো। শুনেছি যে লোকটার কাছে মোহর দুটো ছিল, সে কিন্তু বণিক বা ব্যবসায়ী ছিল না।

— তবে?

— তার পরনে নাকি ছিল পাদরীর পোশাক।

— পাদ্রী? ফ্রান্সিস চমকে উঠল।

— হ্যাঁ — তোমাদের ওদিককার লোকই ছিল সে। দাড়ি গোঁফ — কালো জোব্বা পরনে। গলায় চেন বাঁধা ক্রুশ।

— হ্যাঁ ঠিকই বলেছো — পাদ্রীই ছিল সে।

— কাণ্ড দেখ — ধর্ম-কর্ম করে বেড়ায়, তার কাছে সোনার মোহর।

— তারপর?

— তারপর থেকে মোহর দুটো বারবার পুরুষানুক্রমে আমাদের কাছেই ছিল। সবশেষে আমার হাতে এসে পড়ে। যাকগে — মোহর দুটো তুমিই নাও।

— না — না।

— ফ্রান্সিস — তুমি তো ঐ দেশেরই মানুষ। ডাকাতি করে পাওয়া জিনিস তুমি নিলে আমাদের পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

মোহর দুটো হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস উলটে-পালটে দেখল। একদিকে একটা আবছা মাথার ছাপ। অন্যদিকে আঁকা-বাঁকা রেখাময় নকশার মত কি যেন খোদাই করা। ফ্রান্সিস কোমরবন্ধনী একটু সরিয়ে মোহর দুটো রেখে দিল।

ঘোড়া থেকে নামল দুজন। ফ্রান্সিস ওর তরোয়াল আর ওপরের জোব্বা খুলে দিল। হঠাৎ আবেগকম্পিত হাতে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল ফজল। বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগল। বোধহয় ফ্রান্সিসের কল্যাণ কামনা করলো। বিদায় জানিয়ে ফজল উঠল ঘোড়ার পিঠে। তারপর মরুভূমির দিকে ঘোড়া ছোটাল। ফজলের কথা ভেবে ফ্রান্সিসের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে তোরণ পেরিয়ে আমদাদ শহরে ঢুকল। তারপর শহরের মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

আমদাদ শহরটা নেহাৎ ছোট নয়। ফ্রান্সিস বেশিক্ষণ ঘুরতে পারল না। কাঁধটা ভীষণ টনটন করছে। ব্যথাটা কমানো দরকার। ফ্রান্সিস খুঁজে খুঁজে মীর্জা হেকিমের বাড়িটা বের করল। দেউড়িতে পাহারাদার ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস অনুরোধ করল --- ভাই আমি অসুস্থ, চিকিৎসার জন্যে এসেছি।

—- সবাই এখানে চিকিৎসার জন্যেই আসে। গম্ভীর গলায় পাহারাদার বলল — আগে হেকিম সাহেবের পাওনা জমা দাও — তারপর।

-- আমি গরীব মানুষ --

—- তাহলে ভাগো — পাহারাদার চেঁচিয়ে উঠল।

ফ্রান্সিস পাহারাদারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল। লোকটা আঁতকে উঠল। কান

কামড়ে দেবে নাকি? ফ্রান্সিস ফিসফিস করে বলল — হেকিম সাহেবকে বলো গেল — একজন রোগী এসেছে — ফজল আলি পাঠিয়েছে।

— ফজল আলি কে?

— সে তুমি চিনবে না। তুমি গিয়ে শুধু এই কথাটা বলো।

— বেশ। পাহারাদার চলে গেল। একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল। তাড়াতাড়ি বলল — কি মুশকিল আগে বলবে তো ভাই। আমার চাকরি চলে যাবে। শীগগির যাও — হেকিম সাহেব তোমাকে ডাকছে।

ফ্রান্সিস মৃদু হেসে ভেতরে ঢুকল। কার্পেট পাতা মেঝে। ঘরের মাঝখানে ফরাস পাতা। তার ওপর হেকিম সাহেব বসে আছেন। বেশ বয়েস হয়েছে। চুল, ভুরু তুলোর মত সাদা। কানে কম শোনেন। কয়েকজন রোগী ঘরে ছিল। তাদের বিদায় দিয়ে ফ্রান্সিসকে ডাকলেন। ফ্রান্সিস সব কথাই বলল। মাথাটা এগিয়ে সব কথা শুনে জামাটা খুলে ফেলতে বললেন। ক্ষতস্থানটা দেখলেন। তারপর একটা কাঁচের বোয়াম থেকে ওষুধ বের করে লাগিয়ে দিলেন। একটা পট্টিও বেঁধে দিলেন। বললেন দিন সাতেকের মধ্যেই সেরে যাবে। ফ্রান্সিস কোমরে গোঁজা থলি থেকে একটা মোহর বের করল। তাই দেখে হেকিম সাহেব হাঁ-হাঁ করে উঠলেন — না — না কিছু দিতে হবে না।

হেকিম সাহেবের বাড়ি থেকে ফ্রান্সিস এবার আমদাদ শহর ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল। দেখার জিনিস তো কতই আছে। সব কি আর একদিনে দেখা যায়? সুলতানের শ্বেতপাথরের তৈরী প্রাসাদ। প্রাসাদের পিছনে সমুদ্রের ধারে খাড়া পাহাড়ের গায়ে দুর্গ, মন্ত্রীর বাড়ি, বিরাট ফুল বাগিচা, বাজার-হাট এসব দেখা হল। বেড়াতে-বেড়াতে খিদে পেয়ে গেল খুব। কিন্তু খাবে কি করে? খাবারের দোকানে তো আর মোহর নেবে না। সুলতানী মুদ্রাও তো সঙ্গে কিছু নেই। ফ্রান্সিস একটা সোনা-রূপো দোকান খুঁজতে লাগল। পেয়েও গেল।

শুঁটকে চেহারার দোকানী খুব মনোযোগ দিয়ে পাথরে মোহরটা বারকয়েক ঘষল। তারপর জিজ্ঞেস করলে — এ সব মোহর তো এখানে পাওয়া যায় না — আসল জিনিষ। আপনি পেলেন কোথায়?

— ব্যবসার ধান্ধায় কত জায়গায় যেতে হয়।

— তা তো বটেই। যাকগে — আমি আপনাকে পাঁচশো মুদ্রা দিতে পারি।

— বেশ তাই দিন।

শুঁটকে চেহারার দোকানীটা মনে মনে ভীষণ খুশী হল। খুব দাঁও মারা গেছে। অর্ধেকের কম দামে মোহরটা পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস কিন্তু ক্ষতির কথা ভাবছিল না। খিদেয় পেট জ্বলছে। কিছু না খেলেই নয়। সুলতানী মুদ্রা তো পাওয়া গেল। এবার খাবারের দোকান খুঁজে দেখতে হয়। খুব বেশী দূর যেতে হল না। বাজারটার মোড়েই জমজমাট খাবারের দোকান। শিক কাবাবের গন্ধ নাকে যেতেই ফ্রান্সিসের খিদে দ্বিগুণ বেড়ে গেল। খাবার দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গোগ্রাসে গিলতে লাগল। যেভাবে ও খেতে লাগল তা দেখে যে কেউ বুঝে নিতো, ওর রাক্ষসের মত খিদে পেয়েছে। ব্যাপারটা একজনের নজরেও পড়ল। সেই লোকটা অন্য জায়গায় বসে খাচ্ছিল।

এবার ফ্রান্সিসের সামনে এসে লোকটি বসল। ফ্রান্সিস তখন হাপুস-হুপুস খেয়েই

চললে। লক্ষ্যই করেনি, কেউ ওর সামনে এসে বসেছে। কাজেই লোকটা যখন প্রশ্ন করলে — আপনিও বোধহয় আমার মতই বিদেশী।

ফ্রান্সিস বেশ চমকেই উঠেছিল। খেতে-খেতে মাথা নাড়ল।

— আমার নাম মকবুল হোসেন — কার্পেটের ব্যবসা করি।

— ও! ফ্রান্সিস সে কথার কোন উত্তর দিল না। খেয়ে চলল। মকবুলও চুপ করে গেল। কিন্তু হাল ছাড়ল না। অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে ফ্রান্সিসের খাওয়া শেষ হয়। মকবুলের চেহারাটা বেশ নাদুসনুদুস। মুখে যেন হাসি লেগেই আছে। ওর ধৈর্য দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল — একে এড়ানো মুসকিল। লোকের সঙ্গে ভাব জমাবার কায়দাকানুন ওর নখদর্পণে।

খাওয়া শেষ করে ফ্রান্সিস ঢেকুর তুলল। মকবুল এবার নড়েচড়ে বসল। হেসে বলল — আপনার খাওয়ার পরিমাণ দেখে অনেকেই মুখ টিপে হাসছিল।

— হাসুক গে। তাই বলে আমি পেট পুরে খাবো না?

— আমিও তাই বলি — মকবুল একইভাবে হেসে বলল — আপনার মত অত সুন্দর স্বাস্থ্য অটুট রাখতে গেলে এটুকু না খেলে চলবে কেন। আলবৎ খাবেন — কাউকে পরোয়া করবেন কেন?

ফ্রান্সিসের খাওয়া শেষ হল। এতক্ষণ মকবুল আর কোন কথা বলেনি। এবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে চাপাস্বরে বলল — জানেন ঠিক আপনার মত আমিও একদিন গোগ্রাসে খাবার গিলেছিলাম। কোথায় জানেন, ওঙ্গালিতে।

— ওঙ্গালি? ফ্রান্সিস কোনদিন জায়গাটার নামও শোনেনি।

— হ্যাঁ — মকবুল হাসল — ওঙ্গালির বাজার। কারণ কি জানেন? তার আগে চারদিন শুধু বুনো ফল খেয়ে ছিলাম।

— কেন?

— বেঁচে থাকতে হবে তো। হীরে তো আর খাওয়া যায় না।

— হীরে? ফ্রান্সিস অবাক হয়ে বেশ গলা চড়িয়েই বলল কথাটা।

— শ-শ-। মকবুল ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল। তারপর আর একবার চারদিক তাকিয়ে নিয়ে চাপাস্বরে বলতে লাগল — এখানকার মদিনা মসজিদের গম্বুজটা দেখেছেন তো?

— হ্যাঁ!

— তার চেয়েও বড়।

— বলেন কি?

— কিন্তু সব বেফরদা।

— কেন?

— আমরা তো আর জানতাম না, যে হীরেটা নাড়া খেলেই পাহাড়টায় ধ্বস নামবে?

— আপনার সঙ্গে আর কেউ ছিল?

— হ্যাঁ, ওঙ্গালির এক কামারকে নিয়েছিলাম হীরের যতটা পারি কেটে আনবো বলে।

— সেটা বোধহয় আর হল না।

— হবে কি করে, তার আগেই ধস নামা শুরু হয়ে গেল।

— ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন? এতক্ষণে ফ্রান্সিস উৎসুক হল। মদিনা মসজিদের গম্বুজের চেয়েও বড় হীরে। শুধু হীরে না বলে হীরের ছোটখাটো পাহাড় বলতে হয় এও কি সম্ভব?

— তাহলে একটু মুরগীর মাংস হয়ে যাক।

— বেশ! ফ্রান্সিস দোকানদারকে ডেকে আরো মুরগীর মাংস দিয়ে যেতে বললো। মাংস খেতে-খেতে মকবুল শুরু করল—কার্পেট বিক্রীর ধান্ধায় গিয়েছিলাম ওঙ্গালিতে জায়গাটা তেকরুর বন্দরের কাছে। আমার ঘোড়ায় টানা গাড়ির চাকাটা রাস্তায় পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল ভেঙে! কাজেই এক কামারের কাছে সারাতে দিলাম। এই কামারই আমাকে প্রথম সেই অদ্ভুত গল্পটা শোনাল। ওঙ্গালি থেকে মাইল পনের উত্তরে একটা পাহাড়। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পাহাড়টার মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে একটা গুহা। দূর থেকে গাছগাছালি ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গুহাটা প্রায় দেখাই যায় না। সূর্যটা আকাশে উঠতে-উঠতে যখন ঠিক গুহাটার সমান্তরালে আসে — সূর্যের আলো সরাসরি গিয়ে গুহাটায় পড়ে। তখনই দেখা যায় গুহার মুখে আর তার চারপাশের গাছের পাতায়, ডালে, ঝোপে এক অদ্ভুত আলোর খেলা। আয়না থেকে যেমন সূর্যের আলো ঠিকরে আসে — তেমনি রামধনুর রঙের মত বিচিত্র সব রঙীন আলো ঠিকরে আসে গুহাটা থেকে। অনেকেই দেখেছে এই আলোর খেলা। ধরে নিয়েছে ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা! ভূতপ্রেতকে ওরা যমের চেয়েও বেশী ভয় করে। কাজেই কেউ এই রঙের খেলার কারণ জানতে ওদিকে পা বাড়াতে সাহস করে নি।

— আচ্ছা, এই আলোর খেলা কি সারাদিন দেখা যেত।

— উঁহু। সূর্যের আলোটা যতক্ষণ সরাসরি সেই গুহাটায় গিয়ে পড়তো, ততক্ষণই শুধু তারপর আবার যেই কে সেই।

— সেই কামারটা এর কারণ জানতে পেরেছিল।

— না, তবে অনুমান করেছিল। ও বলেছিল — ঐ আলো হীরে থেকে ঠিকরানো আলো না হয়েই যায় না। ও নাকি প্রথম জীবনে কিছুদিন এক জহুরীর দোকানে কাজ করেছিল। হীরের গায়ে আলো পড়লেই সেই আলো কিভাবে ঠিকরোয়, এই ব্যাপারটা ওর জানা ছিল। আমি তো শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

— কেন?

— ভেবে দেখুন — অত আলো — মানে আমি তো সেই আলো আর রঙের খেলা পরে দেখেছিলাম — মানে — ভেবে দেখুন হীরেটা কত বড় হলে অত আলো ঠিকরোয়।

তা-তো বটেই। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। বলল — তারপর?

— তারপর বুঝলেন, একদিন তল্পিতল্পা নিয়ে আমরা তো রওনা হলাম। যে করেই হোক গুহার মধ্যে ঢুকতে হবে। কিন্তু সেই পাহাড়টার কাছে পৌঁছে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। নীচ থেকে গুহা পর্যন্ত পাহাড়টা খাড়া হয়ে উঠে গেছে। কিন্তু ঝোপ-ঝাড়, দু-একটা জংলী গাছ আর লম্বা-লম্বা বুনো ঘাস — এছাড়া সেই খাড়া পাহাড়ের গায়ে আর কিস্যু নেই। নিরেট পাথুড়ে খাড়া গা। কামার ব্যাটা বেশ ভেবে চিন্তেই এসেছে বুঝলাম।

ও বললো — চলুন আমরা পাহাড়ের ওপর থেকে নামবো ভেবে দেখলাম সেটা সম্ভব। কারণ পাহাড়টার মাথা থেকে শুরু করে গুহার মুখ অবধি, আর তার আশে-পাশে ঘন জঙ্গল। দড়ি ধরে নামা যাবে।

সন্ধ্যের আগেই পাহাড়ের মাথায় উঠে বসে রইলাম। ভোরবেলা নামার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলাম। পাহাড়টার মাথায় একটা মস্ত বড় পাথরে দড়ির একটা মুখ বাঁধলাম। তারপর দড়ির অন্য মুখটা পাহাড়ের গা বেয়ে ঝুলিয়ে দিলাম। দড়ি গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছল কিনা বুঝলাম না। কপাল ঠুকে দড়ি ধরে ঝুলে পড়লাম। দড়ির শেষ মুখে পৌঁছে দেখি, গুহা তখনও অনেকটা নীচে। সেখান থেকে বাকি পথটা গাছের ডাল গুঁড়ি লতাগাছ এসব ধরে, শ্যাওলা ধরে পাথরের ওপর দিয়ে সন্তর্পণে পা রেখে-রেখে একসময় গুহার মুখে এসে দাঁড়ালাম। বুঙ্গা মানে কামারটাও কিছুক্ষণের মধ্যে নেমে এল। ও যে বুদ্ধিমান, সেটা বুঝলাম ওর কাণ্ড দেখে। বুঙ্গা দড়ির মুখটাতে আরো দড়ি বেঁধে নিয়ে পুরোটাই দড়ি ধরে এসেছে। পরিশ্রমও কম হয়েছে ওর।

— তারপর?

ফ্রান্সিস তখন এত উত্তেজিত, যে সামনের খাবারের দিকে তাকাচ্ছেও না। মকবুল কিন্তু বেশ মৌজ করে খেতে-খেতে গল্পটা বলে যেতে লাগল।

— দু'জনে গুহাটায় ঢুকলাম। একটা নিস্তেজ মেটে আলো পড়েছে গুহাটার মধ্যে। সেই আলোয় দেখলাম কয়েকটা বড় বড় পাথরের চাই — তারপরেই একটা খাদ। খাদ থেকে উঠে আছে একটা ঢিবি। ঠিক পাথরে ঢিবি নয়। অমসৃণ এবড়ো-খেবড়ো গা অনেকটা জমাট আলকাতরার মত। হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ শক্ত। সেই সামান্য আলোয় ঢিবিটার যে কি রঙ, ঠিক বুঝলাম না। তবে দেখলাম যে ওটা নীচে অনেকটা পর্যন্ত রয়েছে, যেন পুঁতে রেখে দিয়েছে কেউ।

বুঙ্গা এতক্ষণ গুহার মুখের কাছে এখানে ওখানে ছড়ানো-ছিটানো বড়-বড় পাথরগুলোর ওপর একটা ছুঁচালো মুখ হাতুড়ির ঘা দিয়ে ভাঙা টুকরোগুলো মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল। তারপর হতাশ হয়ে ফেলে দিচ্ছিলো। আমি বুঙ্গাকে ডাকলাম — বুঙ্গা দেখ তো, এটা কিসের ঢিবি?

বুঙ্গা কাছে এল। এক নজরে ঐ এবড়ো-খেবড়ো ঢিবিটার দিকে তাকিয়েই বিস্ময়ে ওর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। ওর মুখে কথা নেই।

ঠিক তখনই সূর্যের আলোর রশ্মি সরাসরি গুহার মধ্যে এসে পড়ল। আমরা ভীষণ ভাবে চমকে উঠলাম। সেই এবড়ো-খেবড়ো ঢিবিটায় যেন আগুন লেগে গেল। জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড যেন! যে কি তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ। সমস্ত গুহাটায় তীব্র চোখঝলসানো আলোর বন্যা নামল যেন। ভয়ে বিস্ময়ে আমি চীৎকার করে বললাম — বুঙ্গা শীগ্গির চোখ ঢাকা দিয়ে বসে পড় — নইলে অন্ধ হয়ে যাবে।

দু'জনেই চোখ ঢাকা দিয়ে বসে পড়লাম। কতক্ষণ ধরে সেই তীব্র তীক্ষ্ম চোখ অন্ধ করা আলোর বন্যা বয়ে চলল জানি না। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। ভয়ে-ভয়ে চোখ খুললাম। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, নিশ্চিদ্র অন্ধকার চারদিকে। অসীম নৈঃশব্দ। হঠাৎ সেই নৈঃশব্দ ভেঙে দিল বুঙ্গার ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না। অবাক কাণ্ড! ও কাঁদছে কেন? অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে বুঙ্গার কাছে এলাম। এবারে ওর কথাগুলো স্পষ্ট

শুনলাম। ও দেশীয় ভাষায় বলছে — অত বড় হীরে — আমার সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে — আমি কত বড়লোক হয়ে যাব — আমি পাগল হয়ে যাবো।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তাহলে ঐ অমসৃণ পাথুরে ঢিবিটা হীরে? অত বড় হীরে। এ যে অকল্পনীয়। বুঝলাম, প্রচণ্ড আনন্দে চূড়ান্ত উত্তেজনায় বুঙ্গা কাঁদতে শুরু করেছে। অনেক কষ্টে ওকে ঠাণ্ডা করলাম। আস্তে-আস্তে অন্ধকারটা চোখে সয়ে এল। বুঙ্গাকে বললাম — এসো, আগে খেয়ে নেওয়া যাক।

কিন্তু কাকে বলা। বুঙ্গা তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেছে। হঠাৎ ও উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল সেই হীরের ঢিবিটার দিকে। হাতের ছুঁচালো হাতুড়িটা নিয়ে পাগলের মত আঘাত করতে লাগল ওটার গায়ে। টুকরো হীরে চারদিকে ছিটকে পড়তে লাগল। হাতুড়ির ঘা বন্ধ করে বুঙ্গা হীরের টুকরোগুলো কোমরে ফেট্টিতে গুঁজতে লাগল। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতুড়িটা নিয়ে। আবার হীরের টুকরো ছিটকোতে লাগল। আমি কয়েকবার বাধা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু উত্তেজনায় ও তখন পাগল হয়ে গেছে।

— তারপর? ফ্রান্সিস জিজ্ঞাসা করল।

— এবার বুঙ্গা। করল এক কাণ্ড! গুহার মধ্যে পড়ে থাকা একটা পাথর তুলে নিল। তারপর দু'হাতে পাথরটা ধরে হীরেটার ওপর ঘা মারতে লাগল, যদি একটা বড় টুকরো ভেঙে আসে। কিন্তু হীরে ভাঙা অত সোজা? সে কথা কাকে বোঝাব তখন? ও পাগলের মত পাথরের ঘা মেরেই চলল। ঠক-ঠক পাথরের ঘায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল গুহাটায়। হঠাৎ —

— কি হল?

— সমস্ত পাহাড়টা যেন দুলে উঠল। গুহার ভিতর শুনলাম, একটা গম্ভীর গুড়-গুড় শব্দ। শব্দটা কিছুক্ষণ চলল। তারপর হঠাৎ কানে তালা লাগানো শব্দ। শব্দটা এলো পাহাড়ের মাথার দিক থেকে। গুহার মুখের কাছে ছুটে এলাম। দেখি পাহাড়ের মাথা থেকে বিরাট-বিরাট পাথরের চাই ভেঙে-ভেঙে পড়ছে। বুঝলাম, যে কোন কারণেই হোক পাহাড়ের মধ্যে কোন একটা পাথরের স্তর নাড়া খেয়েছে, তাই এই বিপত্তি। এখন আর ভাববার সময় নেই। গুহা ছেড়ে পালাতে হবে। অবলম্বন একমাত্র সেই দড়িটা। ছুটে গিয়ে দড়িটা ধরলাম। টান দিতেই দেখি — ওটা আগলা হয়ে গেছে। বুঝলাম — যে পাথরের চাঁইয়ে ওটা বেঁধে এসেছিলাম, সেটা নড়ে গেছে। এখন দড়িটা কোন গাছের ডালে বা ঝোপে আটকে আছে। একটু জোরে টান দিলাম। যে ভেবেছি তাই। দড়ির মুখটা ঝুপ করে নীচের দিকে পড়ে গেল। এক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে খোদাতাল্লাকে ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। পায়ের নীচের মাটি দুলতে শুরু করেছে। ভালোভাবে দাঁড়াতে পারছি না। টলে-টলে পড়ে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি দড়ির মুখটা একটা বড় পাথরের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। এখন দড়ি ধরে নামতে হবে। কিন্তু বুঙ্গা? ও কি সত্যিই পাগল হয়ে গেল? এত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, বুঙ্গার হুঁশও নেই। ও পাথরটা ঠুকেই চলছে। ছুটে গিয়ে ওর দু'হাত চেপে ধরলাম। বুঙ্গা শীগগির চল—নইলে মরবে। কে কার কথা শোনে। এক ঝটকায় ও আমাকে সরিয়ে দিল। আবার ওকে থামাতে গেলাম। তখন হাতের পাথরটা নামিয়ে ছুঁচালো মুখ হাতুড়িটা বাগিয়ে ধরল। বুঝলাম, ওকে বেশী টানাটানি করলে

ও আমাকে মেরে বসবে। ওকে আর বাঁচানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। গুহার মধ্যে তখন পাথরের টুকরো, ধুলো ঝুপ-ঝুপ করে পড়তে শুরু করেছে। আর দেরি করলে আমারও জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে। পাগলের মত ছুটলাম গুহার মুখের দিকে।

তারপর গুহার মুখে এসে দড়িটা ধরে কিভাবে নেমে এসেছিলাম, আজও জানি না। পর-পর পাঁচদিন ধরে বুনো ফল আর ঝরনার জল খেয়ে হাঁটতে লাগলাম। গভীর জঙ্গলে কতবার পথ হারালাম, বুনো জন্তুজানোয়ারের পাল্লায় পড়লাম। তারপর যেদিন এক সন্ধ্যার মুখে ওঙ্গালির বাজারে এসে হাজির হলাম, সেদিন আমার চেহারা দেখে অনেকেই ভূত দেখবার মত চমকে উঠেছিল।"

মকবুলের গল্প শেষ। দু'জনেই চুপ করে বসে রইল। দু'জনের কারোরই খেয়াল নেই যে রাত হয়েছে। এবার দোকান বন্ধ হবে।

— এই দেখুন — মকবুল ডান হাতটা বাড়াল। মাঝের মোটা আঙুলটায় একটা হীরের আংটি।

— সেই হীরের টুকরো নাকি? ফ্রান্সিস বিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

মকবুল মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল, বলল — বুঙ্গা যখন হাতুড়ি চালাচ্ছিল তখন কয়েকটা টুকরো ছিটকে এসে আমার জামার আস্তিনে আটকে গিয়েছিল। তখন জানতে পারিনি, পরে দেখেছিলাম।

দোকানী এসে তাড়া দিল, রাত হয়েছে দোকান বন্ধ করতে হবে।

দু'জনে উঠে পড়ল। দোকানীর দাম মেটাতে গিয়ে ফ্রান্সিস ওর থলিটা বের করল। সুলতানী মুদ্রাগুলোর সঙ্গে মোহরটাও ছিল। মোহরটা দেখে মকবুল যেন হঠাৎ খুব চঞ্চল হয়ে পড়ল। থাকতে না পেরে বলেই ফেলল — মোহরটা একটু দেখব?

— দেখুন না — ফ্রান্সিস মোহরটা ওর হাতে দিল। ফ্রান্সিস দাম মেটাতে ব্যস্ত ছিল। তাই লক্ষ্য করল না মোহরটা দেখতে দেখতে মকবুলের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। কিন্তু নিজের মনের ভাব গোপন করে ও মোহরটা ফিরিয়ে দিল।

— সুন্দর মোহরটা, রেখে দেওয়ার মত জিনিস।

— হুঁ, — রাখতে আর পারলাম কই? ফ্রান্সিস সখেদে বলল।

— কেন?

— আর একটা ঠিক এরকম দেখতে মোহরও ছিল।

— কি করলেন সেটা?

— এখানকার বাজারে এক জহুরীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি।

— ইস, — মকবুল মাথা নাড়ল — ও ব্যাটা নিশ্চয়ই ঠকিয়েছে আপনাকে।

— কি আর করব, নইলে না খেয়ে মরতে হত।

— কোন্ জহুরীর কাছে বিক্রি করেছেন?

— রাস্তায় নেমে মকবুল জিজ্ঞেস করল — কোথায় থাকেন আপনি?

— এখনো কোন আস্তানা ঠিক করিনি।

— বাঃ, — বেশ — মকবুল হাসল — চলুন আমার সঙ্গে।

— কোথায়?

— সুলতানের এতিমখানায়।

— এতিমখানায়!

— নামেই এতিমখানা — গরীব মানুষেরা থাকতে পায় না। আসলে বিদেশীদের আড্ডাখানা ওটা।

— চলুন — মাথা তো গোঁজা যাবে।

রাস্তায় আসতে-আসতে ফ্রান্সিস মকবুলকে জহুরীর দোকানটা দেখাল। মকবুল গভীরভাবে কি যেন ভাবছিল। দোকানটা দেখে মাথা নেড়ে শুধু বলল — ও।

ফ্রান্সিস আন্দাজও করতে পারেনি মকবুল মনে মনে কি ফন্দি আঁটছে।

মকবুলের কথা মিথ্যে নয়। সত্যিই এতিমখানা বিদেশী ব্যবসায়ীদের আড্ডাখানা। কত দেশের লোক যে আশ্রয় নিয়েছে এখানে। আফ্রিকার কালো-কালো কোঁকড়া চুল মানুষ যেমন আছে, তেমনি নাক চ্যাপ্‌টা কুতকুতে চোখ মোঙ্গল দেশের লোকও আছে।

মকবুল একটা ঘরে ঢুকল। দু'জন লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আর একটা বিছানা খালি, ওটাই বোধহয় মকবুলের বিছানা। ঘরের খালি কোণটা দেখিয়ে মকবুল বলল — ওখানেই আপনার জায়গা হয়ে যাবে, সঙ্গে তো আপনার বিছানা পত্তর কিছুই নেই?

— না।

— আমার বিছানা থেকেই কিছু কাপড়-চোপড় দিচ্ছি, পেতে নিন। ফ্রান্সিস বিছানামত একটা করে নিল। সটান শুয়ে ক্লান্তিতে চোখ বুজল। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিল ঘরের দু'জন লোকের সঙ্গে মকবুল মৃদুস্বরে কি যেন কথাবার্তা বলছে। সে সব কথার অর্থ সে কিছুই বুঝতে পারে নি।

ঘুম ভাঙতে ফ্রান্সিস দেখল বেশ বেলা হয়েছে। লোকজনের কথাবার্তায় এতিমখানা সরগরম। ফ্রান্সিস পাশ ফিরে মকবুলের বিছানার দিকে তাকাল। আশ্চর্য! কোথায় মকবুল? মকবুলের বিছানাও নেই। পাশের বিছানায় লোকটি তখন দু'হাত ওপরে তুলে মুখ হাঁ করে মস্ত বড় হাঁই তুলছিল। ফ্রান্সিস তাকেই জিজ্ঞাসা করল — আচ্ছা, মকবুল কোথায়?

লোকটা মৃদু হেসে হাতের চেটো ওল্টাল, অর্থাৎ সে কিছুই জানে না। মরুক গে এখন হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাওয়ার চেষ্টা দেখতে হয়, ভীষণ খিদে পেয়েছে। হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে এসে ফ্রান্সিস দেখল, ঘরের আর একজন তখন ফিরছে। কিন্তু মকবুল একেবারেই বেপাত্তা। ফ্রান্সিস খেতে যাবে বলে থলেটা কোমর থেকে বের করল, কিন্তু এ কি? থলে যে একেবারে খালি। সুলতানী মুদ্রাগুলো তো নেই-ই, সেই সঙ্গে মোহরটাও নেই। সর্বনাশ! এই বিদেশ বিভুঁই। কে চেনে ওকে? মাথা গোঁজার ঠাঁই না হয় এই এতিমখানায় জুটল। কিন্তু খাবে কি? খেতে তো দেবে না কেউ। তার ওপর কাঁধের ঘা'টা এখনও শুকোয় নি। শরীরের দুর্বলতাও সবটুকু কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই অবস্থায় ও একেবারে সর্বশান্ত হয়ে গেল। ফ্রান্সিস চোখে অন্ধকার দেখল।

ওর চোখমুখের ভাব দেখে ঘরের আর দু'জনেও বেশ অবাক হল— কি ভিনদেশী লোকটার? ওদের মধ্যে একজন উঠে এল। লোকটার চোখের ভুরু দুটো ভীষণ মোটা। মুখটা থ্যাবড়া। ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল — কি হয়েছে?

ফ্রান্সিস প্রথমে কথাই বলতে পারল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল — হল কি? ও রকম ভাবে তাকিয়ে আছেন?

আমার সব চুরি গেছে।

— ও, তাই বলুন। লোকটা নির্বিকার ভঙ্গিতে আবার বিছানায় গিয়ে বসল। বলল-—

—এটা এতিমখানা—চোর, জোচ্চোরের বেহেস্ত মানে স্বর্গ আর কি? তা কত গেছে?

ফ্রান্সিস আন্দাজে হিসেব করে বলল। মোহরটার কথাও বলল।

— ও বাবা। মোহর-ফোহর নিয়ে এতিমখানায় এসেছিলেন? কত সরাইখানা রয়েছে, সেখানেই গেলে পারতেন।

— মকবুলই তো যত নষ্টের গোড়া।

— কে মকবুল?

— কাল রাত্তিরে যার সঙ্গে আমি এসেছিলাম।

— কত লোক আসছে-যাচ্ছে।

— কেন, আপনারা তো কথাবার্তা বলছিলেন মকবুলের সঙ্গে বেশ বন্ধুর মত।

— হতে পারে। হাত উল্টে লোকটা বলল।

ফ্রান্সিস লোকটার ওপর চটে গেল। একে ওর এই বিপদ কোথায় লোকটা সহানুভূতি দেখাবে তা নয়, উলটে এমনভাবে কথা বলছে যেন সব দোষ ফ্রান্সিসের।

ফ্রান্সিস বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল — আপনারা মকবুলকে বেশ ভাল করেই চেনেন, এখন বেগতিক বুঝে চেপে যাচ্ছেন।

অন্য বিছানায় আধশোয়া লোকটা এবার যেন লাফিয়ে উঠল। বলল — তাহলে আপনি কি বলতে চান, আমরা গাঁট কাটা?

— আমি সেকথা বলিনি।

— আলবৎ বলেছেন। ভুরু মোটা লোকটা বিছানা ছেড়ে ফ্রান্সিসের দিকে তেড়ে এল। ফ্রান্সিস বাধা দেবার আগেই ওর গলার কাছে জামাটা মুঠো করে চেপে ধরল। কাঁধে জখমের কথা ভেবে ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

— আর বলবি? লোকটা ফ্রান্সিসকে ঝাঁকুনি দিল।

— কি?

— আমরা গাঁটাকাটা।

— আমি সেকথা বলিনি।

— তবে রে! লোকটা ডান হাতের উল্টো পিঠ ঘুরিয়ে ফ্রান্সিসের গালে মারল এক থাপ্পড়। অন্য লোকটি খ্যাক্-খ্যাক্ করে হেসে উঠল। ফ্রান্সিস আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। ওর নিজের গেল টাকা চুরি, আর উল্টে ওকেই চোরের মত মার খেতে হচ্ছে। ফ্রান্সিস এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিল। তারপর লোকটা কিছু বোঝবার আগেই হাঁটু দিয়ে ওর পেটে মারল এক গুঁতো। লোকটা দু'হাতে পেট চেপে বসে পড়ল। অন্য লোকটা এরকম কিছু একটা হতে পারে, বোধহয় ভাবতেই পারেনি। এবার সে তৎপর হল। ছুটে ফ্রান্সিসকে ধরতে এল। ফ্রান্সিস ওর চোয়াল লক্ষ্য করে সোজা ঘুষি চালাল। লোকটা চিৎ হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল। ফ্রান্সিস বুঝল — এর পরের ধাক্কা সামলানো মুশকিল হবে। কাজেই আর দেরি না করে এক ছুটে ঘরের বাইরে চলে এল। ভুরু মোটা লোকটাও পেছনে ধাওয়া করল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে হুড়কো তুলে দিয়েছে। বন্ধ দরজার ওপর দুমদাম লাথি পড়তে লাগল। ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। দ্রুত পায়ে এতিমখানা থেকে বেরিয়ে এল।

এতবড় আমদাদ শহর। এত লোকজন, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, কোথায় খুঁজবে মকবুলকে কিন্তু ফ্রান্সিস দমল না। যে করেই হোক মকবুলকে খুঁজে বের করতে হবে। সব আদায় করতে হবে। তারপর বন্দরে গিয়ে খোঁজ করতে হবে ইউরোপের দিকে কোন জাহাজ যাচ্ছে কি না। জাহাজ পেলেই উঠে পড়বে। কিন্তু মকবুলকে না খুঁজে বের করতে পারলে কিছুই হবে না। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে না খেয়ে মরতে হবে।

সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াল ফ্রান্সিস। বাজার, বন্দর, অলি-গলি কিছুই বাদ দিল না। কিন্তু কোথায় মকবুল? একজন লোককে তো মকবুল ভেবে ও উত্তেজনার মাথায় কাঁধে হাত রেখেছিল। লোকটা বিরক্ত মুখে ঘুরে দাঁড়াতে ফ্রান্সিসের ভুল ভাঙল। মাফ-টাফ চেয়ে সে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। উপোসী পেটে সারাদিন ওই ঘোরাঘুরি। দুপুরে অবশ্য একফালি তরমুজ চালাকি করে খেয়েছিল।

বাজারের মোড়ে একটা লোক তরমুজের ফালি বিক্রি করছিল। খিদেয় পেট জ্বলছে। সেই সঙ্গে জলতেষ্টা। একফালি তরমুজ খেলে খিদেটাও চাপা পড়বে সেই সঙ্গে তেষ্টাটাও দূর হবে। কিন্তু দাম দেবে কোত্থেকে? অগত্যা চুরি। ফ্রান্সিস বুদ্ধি ঠাওরাল। রাস্তার ধারে এক দল ছেলে খেলা করছিল। ফ্রান্সিস ছেলেগুলোকে ডাকল। ছেলেগুলো কাছে আসতে বলল — ঐ যে তরমুজওলাটাকে দেখছিস, ও কানে শুনতে পায় না। তোরা গিয়ে ওর সামনে বলতে থাক — "এক ফালি তরমুজ দাও — তা'হলেই কানে শুনতে পাবে।" লোকটা খুশী হয়ে ঠিক তোদের একফালি করে তরমুজ দেবে।"

ব্যাস! ছেলের দল হল্লা করতে-করতে ছুটে গিয়ে তরমুজওলাকে ঘিরে ধরল। তারপর তারস্বরে চ্যাঁচাতে লাগল — "এক ফালি তরমুজ দাও — তাহলে তুমি কানে শুনতে পাবে।" তরমুজওলা পড়ল মহা বিপদে। আসলে ওর কানের কোন দোষ নেই। ও ভালই শুনতে পায়। ও হাত নেড়ে বারবার সেকথা বোঝাতে লাগল। কিন্তু ছেলেগুলো সেকথা শুনবে কেন?

তাদের চীৎকারে কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা। একদিকের ছেলেগুলোকে তাড়ায় তো অন্যদিকের ছেলেগুলো মাছির মত ভিড় করে আসে। আর সেই নামতা পড়ার মত চীৎকার। অতিষ্ঠ হয়ে তরমুজওলা ঝোলা কাঁধে নিয়ে অন্যদিকে চলল। ছেলের দলও চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে পিছু নিল। এবার ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। তরমুজওলাকে ডেকে দাঁড় করাল, বলল — তোমার ঝোলায় সব চাইতে বড় যে তরমুজটা আছে, বের কর। তরমুজওলা বেশ বড় একটা তরমুজ বের করল।

— এবার কেটে সবাইকে ভাগ করে দাও।

ছেলেরা তো তরমুজ খেতে পেয়ে বেজায় খুশী। ফ্রান্সিসও একটা বড় টুকরো পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে কামড় দিল, আঃ কি মিষ্টি! হুপুস-হুপুস করে খেয়ে ফেলল তরমুজের টুকরোটা। তরমুজওলা এবার দাম চাইলে ফ্রান্সিস অবাক হবার ভঙ্গি করে বলল - বাঃ, এই যে তুমি বললে কানে শুনতে পেলে সবাইকে তরমুজ খাওয়াবে।

— ও কথা আমি কখন বললাম? তরমুজওলা অবাক।

— এই তো তুমি কানে শুনতে পাচ্ছো।

ছেলেগুলো আবার চেঁচাতে শুরু করল — কানে শুনতে পাচ্ছে।

তরমুজওলা ছেলেদের ভিড় ঠেলে আসার আগেই ফ্রান্সিস ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিল।

একফালি তরমুজে কি আর খিদে মেটে? তবু সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটাল। যদি ওর দুরবস্থার কথা শুনে কারো দয়া হয়, এই আশায় ফ্রান্সিস কয়েকটা খাবারের দোকানে গেল। সব চুরি হয়ে যাওয়ার কথা বলল। অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউই ওকে বিশ্বাস করল না।

সন্ধ্যার সময় শাহীবাগের কোণার দিকে একটা পীরের দরগার কাছে এসে ফ্রান্সিস দাঁড়াল। একটু জিরানো যাক। দরগার সিঁড়িতে বসল ফ্রান্সিস। ভেতরে নজর পড়তে দেখল অনেক গরিব-দুঃখী সার দিয়ে বসে আছে। সবাইকে একটা করে বড় পোড়া রুটি আর আলুসেদ্ধ দেওয়া হচ্ছে। তাই দেখে ফ্রান্সিসের খিদের জ্বালা বেড়ে গেল। সেও সারির মধ্যে বসে পড়ল। যে লোকটা রুটি দিচ্ছিল, সে কিন্তু ফ্রান্সিসকে দেখে একটু অবাকই হল। খাবার দিল ঠিকই, কিন্তু মন্তব্য করতেও ছাল না "অমন ঘোড়ার মত শরীর — সুলতানের সৈন্যদলে নাম লেখাও গে যাও"। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। মুখ নীচু করে পোড়া রুটি চিবুতে লাগল। হঠাৎ দেশের কথা, মা'র কথা মনে পড়ল। কোথায় এই অন্ধকার খোলা উঠোনে ভিখিরিদের সঙ্গে বসে পোড়া রুটি আলুসেদ্ধ খাওয়া আর কোথায় ওদের সেই ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত খাওয়ার ঘর, ফুলের কাজকরা সাদা টেবিল ঢাকনা, ঝকঝকে পরিষ্কার কাঁটা-চামচ, বাসনপত্র। খাওয়ার জিনিসও কত। কত বিচিত্র স্বাদ সে সবের। সেই সঙ্গে মা'র সস্নেহ হাসিমুখ — ফ্রান্সিস চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়াল। না — না — এসব ভাবনা মনকে দুর্বল করে দেয়। এসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। বাড়ির নিশ্চিন্ত বিলাসী জীবনের নাম জীবন নয়। জীবন রয়েছে বাইরে — অন্ধকার ঝড়-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে, আগুন-ঝরা মরুভূমিতে তরবারির ঝলকানিতে, দেশবিদেশের মানুষের স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে।

তখনও রাত বেশী হয় নি। ফ্রান্সিস এতিমখানায় এসে ঢুকল। খুঁজে-খুঁজে নিজের ঘরটার দিকে এগোল। সেই লোক দুটো কি আর আছে? ব্যবসায়ী লোক — হয় তো একরাত্রির জন্য আশ্রয় নিয়েছিল। সকালে নিশ্চয়ই দরজায় ধাক্কাধাক্কি লাথি মারার শব্দে আশেপাশের ঘরের লোক এসে দরজা খুলে দিয়েছে। তারপর দুপুর নাগাদ পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেছে।

দরজাটা বন্ধ। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত মনেই দরজাটা ঠেলল। দরজা খুলে গেল। এই সেরেছে। সেই মূর্তিমান দু'জনেরই একজন যে। মোটা ভুরু নাচিয়ে লোকটা ডাকল — এসো ভেতরে। ফ্রান্সিস নড়ল না। লোকটা এবার হেসে ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রাখতে গেল। ফ্রান্সিস এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিল। ঘরে চোখ পড়তে দেখল অন্য লোকটাও রয়েছে।

— তোমার এখনও রাগ পড়েনি দেখছি। লোকটা হাসল।

ফ্রান্সিস ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটি বললো — বিশ্বাস করো ভাই সকালে তোমার সঙ্গে আমরা যে ব্যবহার করেছি, তার জন্যে আমরা দুঃখিত।

ফ্রান্সিস তবু নড়ল না।

— ঠিক আছে, তুমি ভেতরে এসো। যদি মাফ চাইতে বলো - আমরা তাও চাইবো।

ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকল। লোকটা দরজা বন্ধ করতে উদ্যোগী হতেই ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। বললো দরজা বন্ধ করতে পারবে না।

— বেশ। লোকটা হেসে দরজা খোলা রেখেই ওর কাছে এগিয়ে এল। বলল — এবার বিছানায় বসো।

ফ্রান্সিস নিজের বিছানায় গিয়ে বসল। অন্য লোকটি তখন একটা পাত্র হাতে এগিয়ে এল। পাত্রটা ফ্রান্সিসের সামনে রেখে বলল –– খাও। সারাদিন তো তরমুজের একটা ফালি ছাড়া কিছুই জোটেনি।

ফ্রান্সিস বেশ অবাক হল। এসব এই লোকটা জানলো কি করে? মোটা ভুরুওলা লোকটা এবার বলল — তুমি ঠিকই ধরেছো। মকবুল আমাদের খুবই পরিচিত। ওকে আমরা ভালো করেই জানি। গাঁট কাটার মত নোংরা কাজ ওর পক্ষে করা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের উল্টে তোমাকেই সন্দেহ হয়েছিল।

— আমাকে?

— হ্যাঁ। তাই দুপুরবেলা আমরা দুজন তোমাকে খুঁজতে বেরিয়ে ছিলাম। পেলামও তোমাকে। বাজারের মোড়ে তুমি তখন তরমুজ খাচ্ছিলে।

ফ্রান্সিস হাসল। লোকটা বললো খুব বেঁচে গেছো। তুমিও গা ঢাকা দিলে আর ঠিক তক্ষুণি সুলতানের পাহারাদার এল। অবশ্য কোন বিপদ হলে আমরাও তৈরী ছিলাম তোমাকে বাঁচাবার জন্যে।

— তাহলে তো তোমরা সবই দেখেছো। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ তখনি বুঝলাম—তুমি মিথ্যে বলোনি। সত্যি তোমার সব চুরি হয়েছে—নইলে ওরকম চুরির ফন্দী আঁটো। খাও ভাই—এবার হাত চালাও—খেয়ে নাও আগে।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বললো না নিঃশব্দে খেতে লাগল। পরোটা, মাংস। উটের দুধ দিয়ে তৈরী মিষ্টি চেটেপুটে খেয়ে নিল সব।

এবার মোটা ভুরুওলা লোকটা বলল — শোন ভাই — আমার নাম হাসান। কাল সকালেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আমরাও খোঁজে থাকব — মকবুলের দেখা পেলেই সব আদায় করে লোক মারফত তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তুমি তো এখানেই থাকবে?

— হ্যাঁ, যতদিন না জাহাজের ভাড়া যোগাড় করতে পারি।

— বেশ। এবার তাহলে ঘুমোও। অনেক রাত হল।

ফ্রান্সিসও আর জেগে থাকতে পারছিল না। পরদিন কি খাবে, কি ভাবে জাহাজের ভাড়া সংগ্রহ করবে — এইসব সাতপাঁচ ভাবতে-ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ঘুম ভাঙতে ফ্রান্সিস দেখল — হাসান আর তার বন্ধু দুজনেই চলে গেছে! ঘরে শুধু ও একা। শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল এবার কি করা যায়? কি করে প্রতিদিনের খাবার যোগাড় করবে, অর্থ জমাবে, মকবুলকে খুঁজে বের করবে? দেশে তো ফিরতে হবে? তারপর নিজেদের একটা জাহাজ নিয়ে সোনার ঘন্টা খুঁজতে আসতে হবে। সঙ্গে আনতে হবে সব বিশ্বস্ত বন্ধুদের। কিন্তু সেসব তো পরের কথা। এখন কি করা যায়? ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ ফ্রান্সিসের একটা বুদ্ধি এল। আচ্ছা মকবুলের সেই মস্ত বড় হীরের গল্পটা বাজারের কুয়োর ধারে বসে লোকদের শোনালে কেমন হয়? কত বিদেশী বণিকই তো বাজারে আসে। এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যে গল্পটা আগে শুনেছে। তাহলেই মকবুলের খোঁজ পাওয়া যাবে। কারণ মকবুল ছাড়া এই গল্প আর কে বলবে? ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। এতক্ষণে বাজারে লোকজন আসতে শুরু করেছে নিশ্চয়ই। কুয়োর ধারে খেজুরগাছটার তলায় বসতে হবে।

"সে এক প্রকাণ্ড হীরে! মদিনা মসজিদের গম্বুজের চেয়েও বড়! কি চোখ ধাঁধানো

আলো তার! দু'হাতে চোখ ঢেকে আমরা শুয়ে পড়লাম। সমস্ত গুহাটা তীব্র আলোর বন্যায় ভেসে যেতে লাগল।'' ফ্রান্সিস গল্পটা বলে চলল। লোকেরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। কেউ-কেউ বিরূপ মন্তব্য করে গেল ''গাঁজাখুরী গপ্পো' — অত বড় হীরে হয় নাকি?'' কিন্তু বেশির ভাগ লোকই হাঁ করে গল্পটা শুনল। প্রথম দিন তো। ফ্রান্সিস খুব একটা গুছিয়ে গল্পটা বলতে পারল না। তবু লোকের ভাল লাগল। গল্প বলা শেষ হলে একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের হাতে কিছু মুদ্রা দিল। দেখাদেখি আরো কয়েকজন কিছু মুদ্রা দিল। ফ্রান্সিস মনে-মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। যাক, প্রাণে বেঁচে থাকার একটা সহজ উপায় পাওয়া গেল। গল্প বলে যদি এইরকম রোজগার হয়, তাহলে খাওয়ার ভাবনাটা অন্তত মেটে।

পরের দিন থেকে ফ্রান্সিস আরো গুছিয়ে গল্পটা বলতে লাগল। কয়েকদিনের মধ্যেই সে বেশ ভালো গল্প বলিয়ে হয়ে গেল। গল্পটাকে আরো বাড়িয়ে, আরো নানারকম রোমহর্ষক ঘটনা যোগ করে লোকদের শোনাতে লাগল। রোজগারও হতে লাগল। কিন্তু এতদিনে এমন কাউকে পেল না, যে গল্পটা আগে শুনেছে। তবু ফ্রান্সিস হাল ছাড়ল না। প্রতিদিন গল্পটা বলে যেতে লাগল। সেই বাজারের কুয়োটার ধারে, খেজুরগাছটার নীচে বসে।

একদিন ফ্রান্সিস গল্পটা বলছে –– ''সব সময় নয়, যখন সূর্যের আলো সরাসরি গুহাটায় এসে পড়ে, তখন দেখা যায় আলোর খেলা, কত রঙের আলো —''

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠল এ গল্পটা আমার শোনা।

ফ্রান্সিস গল্প বলা থামিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বিদেশী ব্যবসায়ী। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল — কোথায় শুনেছেন গল্পটা?

— হায়াৎ-এর সরাইখানায়।

— যে লোকটা গল্পটা বলেছে, তার নাম জানেন?

— না, সে নাম বলেনি।

— দেখতে কেমন?

— মোটাসোটা গোলগাল, বেশ হাসিখুশী।

ফ্রান্সিসের আর বুঝতে বাকি রইল না — লোকটা আর কেউ নয়, মকবুল। কিন্তু হায়াৎ? সে তো অনেকদূর। তিনদিনের পথ। উটের ভাড়া গুনবে, সে ক্ষমতা তো নেই। এদিকে শ্রোতারা অস্বস্তি প্রকাশ করতে লাগল। গল্পটা শেষ হয় নি। ফ্রান্সিস ফিরে এসে আবার গল্পটা বলতে লাগল।

কিছুদিন যেতেই কিন্তু গল্পটা লোকের কাছে পুরোনো হয়ে গেল। কে আর একই গল্প প্রতিদিন শুনতে চায়? বিদেশী বণিক-ব্যবসায়ী যারা আসত, তারাই যা দু-চারজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে শুনত। ফ্রান্সিস ভেবে দেখল — রোজগার বাড়াতে হলে আরও লোক জড়ো করতে হবে। নতুন গল্প শোনাতে হবে। এবার তাই সে সোনার ঘন্টার গল্পটা বলতে শুরু করল। চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়ানো শ্রোতাদের উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস সুন্দর ভঙ্গীতে গল্পটা বলতে থাকে — 'নিশুতি রাত। ডিমেলোর গীর্জার পেছনে ঘন জঙ্গলে আগুনের আভা কিসের? সোনা গলানো চলছে। বিরাট কড়াইতে সোনা গলিয়ে ছাচে ফেলা হচ্ছে। কেন না সোনার ঘন্টা তৈরী হবে। কবে তৈরী শেষ হবে? ডাকাত পাদরীরা সোনা গলায় আর ছাঁচে

ঢালে। খুব জমে যায় গল্পটা। শ্রোতারা অবাক হয়ে সোনার ঘন্টার গল্প শোনে। কেউ-কেউ মন্তব্য করে যত সব বাজে গল্প। চলেও যায় কেউ-কেউ। কিন্তু নতুন লোক জড়ো হয় আরো বেশী। এক সময় গল্পটা শেষ হয়। শ্রোতাদের উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলে — সোনার ঘন্টা এখনও আছে, এই সমুদ্রের কোন অজানাদ্বীপে। তোমরা ভাই খুঁজে দেখতে পাব।

গল্প শেষ। শ্রোতাদের ভিড় কমতে থাকে। ফ্রান্সিস হাত পাতে। যাবার আগে অনেকেই কিছু কিছু সুলতানী মুদ্রা হাতে দিয়ে যায়। গল্পটা শুনে সবাই যে খুশী হয়েছে — ফ্রান্সিস বোঝে। ও আরও উৎসাহ পায়, কিন্তু বিপদ হল, এই গল্পটা বলতে গিয়েই।

জোব্বাপরা নিরীহগোছের লম্বামত চেহারার একজন লোক মাঝে-মাঝে ফ্রান্সিসের পেছনে দাঁড়িয়ে গল্প শুনত। ফ্রান্সিস যেদিন থেকে প্রথম সোনার ঘন্টার গল্প বলতে লাগল, সেদিন থেকে লোকটা প্রত্যেক দিন আসতে লাগল। অনেকেই গল্প শুনতে জড়ো হয়। সবাইকে তো আর মনে রাখা যায় না। ফ্রান্সিস আপন মনে গল্পই বলে যায়।

একদিন ফ্রান্সিস যেই গল্পটা শেষ করেছে, পেছন থেকে লোকটা জিজ্ঞেস করল — তুমি সেই সোনার ঘন্টা দেখেছ?

ফ্রান্সিস পেছনে ফিরে লোকটাকে দেখল। গোবেচারা গোছের চেহারা। রোগা আর বেশ লম্বা। ফ্রান্সিস ওকে আমলই দিল না। হাত বাড়িয়ে শ্রোতাদের দেওয়া মুদ্রাগুলো নিতে লাগল।

— সেই সোনার ঘন্টা তুমি দেখেছ? লোকটা একই সুরে আবার করল প্রশ্নটা।

— না। ফ্রান্সিস বেশ রেগেই গেল।

— সেই ঘন্টার বাজনা শুনেছো?

— তোমার কি মনে হয়?

— আমার মনে হয় তুমি সব জান।

ফ্রান্সিস এবার অবাক চোখে লোকটার দিকে তাকাল। ঠাট্টা করে বলল — সবই যদি জানব, তাহলে কি এখানে গল্প বলে ভিক্ষে করি?

— তুমি নিশ্চয়ই জানো সেই সোনার ঘন্টা কোথায় আছে।

ফ্রান্সিস ওকে থামিয়ে দিতে চাইল। বিরক্তির সুরে বলল — বাপু, গল্প গল্পই — গল্পের ঘন্টা সোনারই হোক আর রুপোরই হোক, তাকে চোখেও দেখা যায় না — তার বাজনাও শোনা যায় না।

হঠাৎ লোকটা পরনের জোব্বাটা কোমরের একপাশে সরাল। ফ্রান্সিস দেখল — তরোয়ালের হাতল। লোকটা একটানে খাপ থেকে খুলে চকচকে তরোয়ালের ডগাটা ফ্রান্সিসের থুতনির কাছে চেপে ধরে গম্ভীর গলায় বলল — আমার সঙ্গে চলো।

নিরীহ চেহারার মানুষটা যে এমন সাংঘাতিক, ফ্রান্সিস আগে সেটা কল্পনাও করতে পারেনি। কয়েক মুহূর্তও অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। টুকটাক কথা থেকে একেবারে থুতনিতে তরোয়াল ঠেকান। ফ্রান্সিস ভাবল, আজকে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম।

— চল। লোকটা তাড়া লাগল।

— কোথায়?

— গেলেই দেখতে পাবে।

এ আবার কোন ঝামেলায় পড়লাম। কিন্তু উপায় নেই। লোকটা যেমন তেরিয়া হয়ে আছে, গাঁইগুঁই করলে হয়তো গলায় তরোয়ালই চালিয়ে দেবে।

বেশ, চল। ফ্রান্সিস লোকটার নির্দেশমত বাজারের পথ দিয়ে হাঁটতে লাগল। লোকটা খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে ওর পেছনে-পেছনে যেতে লাগল।

পথে যেতে-যেতে ফ্রান্সিস কোনদিকে যেতে হবে, তা বুঝতে না পেরে মাঝে-মাঝে থেমে পড়ছিল। লোকটা ওর পিঠে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে পথ দেখিয়ে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস মনে-মনে কেবল পালাবার ফন্দি আঁটতে লাগল। কিন্তু পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারল, লোকটা ভীষণ সতর্ক। একটু এদিক-ওদিক ওর পা পড়লেই লোকটা ধমক দিচ্ছে — সোজা হাঁট। পালাবার চেষ্টা করলেই মরবে। ফ্রান্সিস আবার সহজভাবে হাঁটতে লাগল। এবার খুব সরু গলি দিয়ে যেতে লাগল ওরা।

হাত বাড়ালেই বাড়ির দরজা, এত সরু গলি সেটা। ফ্রান্সিস নজর রাখতে লাগল কোন খোলা দরজা পায় কি না। পেয়েও গেল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে ফ্রান্সিস বসে পড়ল। লোকটা তরোয়াল নামিয়ে ওর গায়ের ওপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল—কি হল?

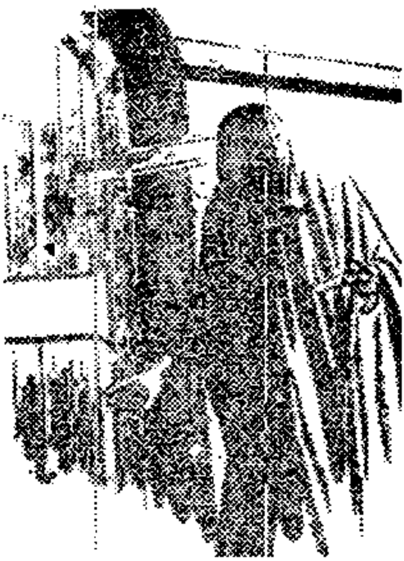
ফ্রান্সিস এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল, তড়িৎগতিতে মাথা দিয়ে লোকটার পেটে গুঁতো মারলো লোকটা টাল সামলাতে পারল না, সেই পাথুরে গলিটায় চিৎ হয়ে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। বাঁদিকের খোলা দরজাটা দিয়ে ভিতরে ঢুকে দরজাবন্ধ করে দিল। তারপরেই ছুটল ভিতরের ঘরের দিকে। বোঝাই যাচ্ছে গৃহস্থ বাড়ি, কিন্তু লোকজন কেউ নেই সে ঘরে। পাশের একটা ঘরে লোকজনের কথাবার্তা শোনা গেল, বোধহয় ওঘরে খাওয়া-দাওয়া চলছে। হঠাৎ ফ্রান্সিসের নজরে পড়ল দেয়ালে একটা বোরখা ঝুলছে। যাক আত্মগোপনের একটা উপায় পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বোরখাটা পরে নিল, তারপর এক ছুটে ভিতরে উঠোনে চলে এল। দেখল ছাদটা বেশী উঁচু নয়। জানলার গরাদে পা রেখে তাড়াতাড়ি ছাদে উঠে পড়ল। তারপর ছাদের পর ছাদ লাফিয়ে-লাফিয়ে পার হতে-হতে বেশ দূরে চলে এল। এবার নামা যেতে পারে। এই জায়গায় ফ্রান্সিস মারাত্মক ভুল করল। আগে থেকে দেখে নিল না গলিটা ফাঁকা আছে কিনা। কাজেই লাফ দিয়ে পড়বি তো পড়, একটা লোকের নাকের ডগায় সে পড়ল। লোকটা বোধহয় গানটান করে। আপন মনে সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে যাচ্ছিল। একটা বোরখা পরা মেয়ে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল দেখে তো ওর গান বন্ধ হয়ে গেল। লোকটা হাঁ করে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। ফ্রান্সিস তার আগেই ওর ঘাড়ে এক রদ্দা মারল। ব্যস! লোকটার মুখ দিয়ে আর টুঁ শব্দটি বেরুল না। সে বেচারা কলাগাছের মত ধপাস করে পড়ে গেল।

ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে ছুটল গলি পথ দিয়ে। একটু পরেই একটা পাতকুয়ো। কুয়োটার ওপরে কপিকল লাগানো। দড়ি দিয়ে চামড়ার থলিতে করে মেয়েরা জল তুলছে। কুয়োটার চারপাশে বোরখা পরা মেয়েদের ভিড়। সবাই জল নিতে এসেছে। ফ্রান্সিসও সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু হলে হবে কি? সেদিন ফ্রান্সিসের কপালটা সত্যিই মন্দ ছিল। সে তখনও জানত না সমস্ত এলাকাটাই সুলতানের সৈন্যরা ঘিরে ফেলেছে।

বাড়ি-বাড়ি ঢুকে তল্লাশি, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। একটু পরেই সুলতানের সৈন্যরা কুয়োতলায় এসে হাজির। কুয়োতলার চারপাশের বাড়িতে তল্লাশি শেষ হল। ঠিক তখনই সৈন্যরা একজন লোককে ধরে নিয়ে এল। লোকটা হাত মুখ নেড়ে কি যেন বলতে লাগল। বোরখার আড়াল থেকে ফ্রান্সিস সবই দেখছিল। সে লোকটাকে চিনতে পারল।

ছাদ থেকে লাফ দিয়ে সে এই লোকটার সামনেই পড়েছিল। এবার আর রক্ষে নেই। সৈন্যদের দলনেতা চীৎকার করে কি যেন হুকুম দিল। সব সৈন্য দল বেঁধে তরোয়াল উঁচিয়ে কুয়োতলার দিকে আসতে লাগল। মেয়েরা ভয়ে তারস্বরে চীৎকার করে উঠল। সৈন্যদের নেতা হাত তুলে অভয় দিল। কিন্তু ততক্ষণে মেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। দু'তিনজনের জলের পাত্র ভেঙে গেল। যে যেদিকে পারল পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সৈন্যরা ছুটে গিয়ে ধরে ফেলতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল এই সুযোগ।

ফ্রান্সিস কুয়োতলার পাথর বাঁধানো চত্বর থেকে এক লাফ দিয়ে নেমেই ছুটল সামনের বাড়িটা লক্ষ্য করে। দরজার কাছে পৌঁছেও গেল। কিন্তু — শন্ ন্-ন্ একটা ছুরি ওর কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল ও দাঁড়িয়ে পড়ল। ছুরিটা সামনের কাঠের দরজায় গভীর হয়ে বিঁধে গেল। একটুর জন্যে ওর ঘাড়ে লাগেনি।



ছুরিটা সামনের কাঠের দরজায়
গভীর হয়ে বিঁধে গেল।

পালাবার চেষ্টা করো না। পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল। ফ্রান্সিস আর নড়ল না। দাঁড়িয়ে রইল। ওর গা থেকে কেউ যেন বোরখা খুলে নিল। ফ্রান্সিস দেখল সেই রোগা লম্বামত লোকটা।

লোকটা হেসে বলল — আর হেঁটে নয় — এবার ঘোড়ায় চেপে চল।

ফ্রান্সিসের আর পালান হল না। ফ্রান্সিসকে রাখা হল মাঝখানে। চারপাশে সৈন্যদল ওকে ঘিরে নিয়ে চলল। ওর পাশেই চলল সেই রোগা লম্বামত লোকটা। আমদাদের পাথর বাঁধানো রাজপথে অনেকগুলো ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠল। ওরা চলল সদর রাস্তা দিয়ে। ফ্রান্সিস তখনও জানতে পারেনি, তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ও সব কিছু ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল। তবু কৌতূহল যেতে চায় না।

ব্যাপার কি? ওকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন?

সৈন্যদলের সঙ্গে ফ্রান্সিসও এগিয়ে চলল। আড়চোখে একবার লম্বামত লোকটাকে দেখে নিল! লোকটা নির্বিকার। কোন কথা না বলে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ফ্রান্সিস এবার লোকটাকে জিজ্ঞেস করল —আচ্ছা, আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

— গেলেই দেখতে পাবে। লোকটা শান্ত স্বরে বলল।

— তবু আগে থেকে জানতে ইচ্ছে করে।

— সুলতানের কাছে।

ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল। বলে কি? দেশের সুলতান! দোর্দণ্ডপ্রতাপ তাঁর। ফ্রান্সিসের মত নগণ্য একজন বিদেশীর সঙ্গে কি সম্পর্ক তার?

— কিন্তু আমার অপরাধ?

সোনার ঘন্টার হদিশ তুমি জান।

আমি কিছুই জানি না।

— সুলতানকে তাই বলো। এখন বকবক বন্ধ কর, আমরা এসে গেছি!

বিরাট প্রাসাদ সুলতানের। ফ্রান্সিস প্রাসাদটা দেখেছে আগে, কিন্তু সেটা বাইরে থেকে। আজকে প্রাসাদে ঢুকছে। স্বপ্নেও ভাবেনি কোনদন সে এই প্রাসাদে ঢুকবে।

মস্তবড় খিলানওলা দেউড়ি পেরিয়ে অনেকটা ফাঁকা পাথর বাঁধানো চত্বর। চত্বরটায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠল — ঠক্-ঠক্। এক কোণার দিকে ঘোড়াশাল। সেখানে ঘোড়া থেকে নামল সবাই। এবার সামনে সেই লম্বামত লোকটা চলল। তারপর ফ্রান্সিস। পেছনে তরোয়াল হাতে দু'জন সৈন্য। ওরা প্রাসাদের মধ্যে ঢুকল।

বিরাট-বিরাট দরজা — ঘরের পর ঘর পেরিয়ে চলল ওরা। সবগুলো ঘরই সুসজ্জিত দামী কার্পেট মোড়া মেঝে। রঙীন কাঁচ বসানো শ্বেতপাথরের দেয়াল। এখানে-ওখানে সোনালী রঙের কাজকরা লতা-পাতা ফুল। লাল টকটকে গদিতে মোড়া ফরাস, বসবার জায়গায় বড়-বড় ঝাড়লন্ঠন ঝুলছে ছাদ থেকে। দরজা জানালা মীনে করা। সুন্দর কারুকাজ তাতে। দরজায়-দরজায় ঝকঝকে বর্শা হাতে দ্বাররক্ষীরা দাঁড়িয়ে আছে। লম্বামত লোকটাকে দেখেই ওরা পথ ছেড়ে দিতে লাগল। একটা লোক ঘরে ঢুকে হাততালি দিল। সৈন্য দুজন দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরটা অন্য ঘরের তুলনায় ছোট। মাঝখানে লাল গদিমোড়া বাঁকানো পায়ার টেবিল দু'পাশের বসবার জায়গাগুলোও লাল গদিমোড়া। দেয়ালে, দরজায়, জানালায় অন্য ঘরগুলোর চেয়ে বেশী কারুকাজ। লোকটা ফ্রান্সিসকে বসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস বসল। লোকটা ভেতরের দরজা দিয়ে কোথায় চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল। কেমন সন্ত্রস্ত ভঙ্গি। ফ্রান্সিসের কাছে এসে মৃদুস্বরে বলল—সুলতান আসছেন। উঠে দাঁড়িয়ে আদাব করবে।

ভেতরের দরজা দিয়ে সুলতান ঢুকলেন। ফ্রান্সিস সুলতান রাজা-বাদশাহদের কাহিনী শুনেছেই এতদিন। চোখে দেখেনি কোনদিন। আজকে প্রথম দেখল। সুলতান বেশ দীর্ঘদেহী, গায়ের রঙ যেন দুধে-আলতায় মেশান। দাড়ি-গোঁফ সুন্দর করে ছাঁটা। মাথায় আরবীদের মতই বিড়েবাঁধা সাদা দামী কাপড়ের টুকরো। তবে পরনে জোব্বা নয়, একটা আঁটোসাঁটো পোশাক। তাতে সোনা দিয়ে লতাপাতার কাজ করা। বুকে ঝুলছে একটা মস্তবড় হীরে বসানো গোল লকেট। গলায় মুক্তোর মালা। সুলতানকে দেখেই লম্বামত লোকটা মাথা নুইয়ে আদাব করল। লোকটার দেখাদেখি ফ্রান্সিসও আদাব করল। সুলতান ফ্রান্সিসকে বসতে ইঙ্গিত করে নিজেও বসলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন — তোমার নাম কি?

— ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিস এতক্ষণে ভাল করে সুলতানের মুখের দিকে তাকাল। সুলতানের চোখের দৃষ্টিটা ফ্রান্সিসের ভাল লাগল না। কেমন ক্রুরতা সেই দৃষ্টিতে। বড় বেশী স্থির, মর্মভেদী।

— তুমি বাজারে যে গল্পটা বল — সোনার ঘন্টার গল্প —

— আজ্ঞে হ্যাঁ — মানে পেটের দায়ে —

গল্পটা কোথায় শুনেছ?

দেশে — বুড়ো নাবিকদের মুখে।

তোমার কি মনে হয়? গল্পটা সত্যি না মিথ্যে?

— কি করে বলি? তবে সত্যিও হতে পারে।

সুলতানের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। বললেন — ওকথা বলছ কেন?

— আমি সেই সোনার ঘন্টার বাজনা শুনেছি।

সুলতান ক্রুর হাসি হাসলেন, বললেন — শুধু বাজনা শোনা যায়, একমাত্র তুমিই জানো সেই সোনার ঘন্টা কোথায় আছে, কেমন করেই বা ওখানে যাওয়া যায়।

ফ্রান্সিস সাবধান হল। বেফাঁস কিছু বলে ফেললে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। বলল — বিশ্বাস করুন সুলতান, আমি এসবের বিন্দু-বিসর্গও জানি না।

— তুমি নিজের চোখে সোনার ঘন্টা দেখেছ। সুলতান দাঁত চেপে কথাটা বললেন।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বুঝল — ভীষণ বিপদে পড়েছে সে। এমন লোকের খপ্পরে পড়েছে, যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যে যাই বলুক না কেন, যতই বোঝাবার চেষ্টাই করুক না কেন — সুলতান কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করবেন না। তবু ফ্রান্সিস বোঝাবার চেষ্টা করল — সুলতান আমি বললাম তো সোনার ঘন্টার বাজনা আমি শুনেছি। তখন প্রচণ্ড ঝড়ে আর ডুবো পাহাড়ের ধাক্কায় আমাদের জাহাজ ডুবে যাচ্ছিল। তখন নিজের প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্তকর অবস্থা। কোত্থেকে বাজনার শব্দটা আসছে, কতদূর সেটা, এসব ভাববার সময় কোথায় তখন?

— মিথ্যেবাদী ফেরেববাজ। সুলতান গর্জন করে উঠলেন। তারপর আঙুল নেড়ে লম্বামত লোকটাকে কি যেন ইশারা করলেন। লোকটা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের পিঠে ধাক্কা দিল — চলো।

ঘরের বাইরে আসতেই সৈন্য দুজন পেছনে দাঁড়াল। সামনে সেই লোকটা। ফ্রান্সিস ভেবেই পেল না, তাকে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

প্রাসাদের পেছন থেকেই শুরু হয়েছে পাথরে বাঁধানো পথ। দুপাশে উঁচু প্রাচীর টানা চলে গেছে দুর্গের দিকে। কালো থমথমে চেহারার সেই বিরাট দুর্গের দিকে ওরা ফ্রান্সিসকে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিসের আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। এই দুর্গেই তাকে বন্দী করে রাখা হবে। কতদিন কে জানে? ফ্রান্সিসের মন দমে গেল। সব শেষ। সোনার ঘন্টার স্বপ্ন দেখতে-দেখতেই এই দুর্গের অন্ধকার কোন ঘরে লোকচক্ষুর অন্তরাল অনাহারে অনিদ্রায় তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই তার ভাগ্যের লিখন। আর তার মুক্তি নেই। কড়কড় শব্দ তুলে দুর্গের বিরাট লোহার দরজা খুলে গেল। ফ্রান্সিস বাইরের মুক্ত পৃথিবীর হাওয়া বুক ভরে টানল। তারপর অন্ধকারে স্যাঁতসেঁতে দুর্গের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল।

যে ঘরে ফ্রান্সিসকে রাখা হল, সেই ঘরটার দেওয়াল এবড়োখেবড়ো পাথর দিয়ে গাঁথা। দুপাশে দুটো মশাল জ্বলছে। তাতে অন্ধকারটা যেন আরো ভীতিকর হয়ে উঠেছে। দেয়ালে দুটো মস্তবড় আংটা লাগানো। তাই থেকে শেকল ঝুলছে। সেই শেকল দিয়ে ফ্রান্সিসের দুহাত বেঁধে রাখা হয়েছে।

সারারাত ঘুমুতে পারেনি ফ্রান্সিস। দুটো হাত শেকলে বাঁধা ঝুলছে। এ অবস্থায় কি ঘুম আসে? তন্দ্রা আসে? শরীর এলিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু লোহার শেকলে টান পড়তেই ঝনঝন শব্দ ওঠে। তন্দ্রা ভেঙে যায়। যে কজন পাহারাদার দরজার কাছে আছে, যে পাহারাদার খাবার দিয়ে গেছে — সবাইকে সে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করছে —

আমাকে এই শাস্তি দেবার মানে কি? কি অপরাধ করেছি আমি? কিন্তু পাহারাদারগুলো বোধহয় বদ্ধ কালা আর বোবা। শুধু ওর দিকে তাকিয়ে থেকেছে অথবা আপন মনে নিজেদের কাজ করে গেছে। কথাও বলেনি, তার কথা যে ওদের কানে গেছে মুখ দেখেও তা মনে হয়নি। ঘুম হল না। হবার কথাও নয়। শেকলে ঝুলে ঝুলে কি ঘুম হয়? তন্দ্রার মধ্য দিয়ে রাত কাটাল। একসময় ভোর হল। সামনে একটা জানালা দিয়ে ভোরের আলো দেখা গেল। সারারাত ঘুম নেই। চোখ দুটো জ্বালা করছে।

একটু বেলা হয়েছে তখন। হঠাৎ লোহার দরজায় শব্দ উঠল — ঝন্ ঝনাৎ। ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ তুলে দরজাটা খুলে গেল। ফ্রান্সিস দেখল — সুলতান ঢুকছে। পেছনে সেই লম্বামত লোকটা। তার পেছনে মাথায় কালো কাপড়ের পাগড়ি, কালো আলখাল্লা পরা আর একটা লোক। তার হাতে চাবুক। সে চাবুকটা পেঁচিয়ে মুঠো করে ধরে রেখেছে।

— এই যে সাহেব — কেমন আছো? সুলতান ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞাসা করলেন।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

— যাক গে, সুলতান ব্যস্তভাবে বললেন — আমার তাড়া আছে। কি ঠিক করলে? সারারাত ভাবার সময় পেলে।

— কোন ব্যাপারে? ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

সুলতান হো-হো করে হেসে উঠলেন — তুমি তো বেশ রসিক হে সব জেনেশুনে রসিকতা করছো — তাও আমার সঙ্গে।

— আমি যা জানি বলেছি — এর বেশি আমি আর কিছুই জানি না।

সুলতান একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর দাঁতে-দাঁত ঘষে বললেন — সোনার ঘন্টা আমার চাই। তার জন্যে যদি তোমার মত দু চারশ লোকের মৃতদেহ ডিঙিয়ে যেতে হয় — আমি তাই যাবো। তবু সোনার ঘন্টা আমার চাই।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। সুলতান আঙ্গুল তুলে ইঙ্গিত করলেন। চাবুক হাতে লোকটা এগিয়ে এল। কপাল পর্যন্ত ঢাকা কালো পাগড়ি। মুখটা দেখা না গেলেও শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। যেন খুশীতে জ্বলজ্বল করছে। কি নিষ্ঠুর! ফ্রান্সিস ঘৃণায় মুখ ফেরাল।

ঝপাৎ — চাবুকের আঘাতটা পেটের কাছ থেকে কাঁধ পর্যন্ত যেন আগুনের ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিল। ফ্রান্সিসের সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠল। ঝপাৎ — আবার চাবুক। তার সবটুকু শরীরে লাগল না। তবু হাতটা জ্বালা করে উঠল; সুলতান হাত তুলে চাবুক থামাতে ইঙ্গিত করলেন। বললেন — এখনও বলো কোথায় আছে সেই সোনার ঘন্টা?

— আমি যা জানি বলেছি।

ঝপাৎ — আবার চাবুক। "বন্ধ মুখ কি করে খুলতে হয় আমি জানি।" কথাটা বলে সুলতান চাবুকওয়ালার দিকে তাকালেন। বললেন, যতক্ষণ না কথা বলতে চায় — ততক্ষণ চাবুক চালাবে। কিছু বলতে চাইলে — সুলতান আঙ্গুল দিয়ে লম্বামত লোকটাকে দেখালেন — রহমানকে খবর দেবে। কালো পোশাক পরা চাবুকওলা মাথা ঝুঁকিয়ে আদাব করল। সুলতান দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগোলেন। রহমানও পেছনে-পেছনে চলল।

ঝপাৎ — চাবুকের শব্দে ফ্রান্সিস চমকে উঠল।

কিন্তু আশ্চর্য! এবারের চাবুকটা ওর গায়ে পড়ল না — দেয়ালে পড়ল। আবার

ঝপাৎ   এবারও দেওয়ালে লাগল। লোকটা কি নিশানা ঠিক করতে পারছে না? ঝপাৎ   ঝপাৎ হঠাৎ কয়েকবার দ্রুত চাবুকটা দেয়ালে মেরে লোকটা চাবুক হাতে ফ্রান্সিসের কাছে এগিয়ে এল। যেন ফ্রান্সিসকে পরীক্ষা করেছে, অজ্ঞান হয়ে গেছে কিনা --- এমনি ভঙ্গিতে ফ্রান্সিসের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। তারপর কপালের কাছ থেকে পাগড়িটা ওপরের দিকে তুলল। কপালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল ---- ফজল! এবার ফ্রান্সিস ভালোভাবে লোকটার মুখের দিকে তাকাল। আরে? এ তো সত্যিই ফজল! মুখে ভুষোমত কি মেখেছে তাই চেনা যাচ্ছিল না। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল — ফজল।

ফজল ঠোঁটে হাত রাখল। তারপর ফিসফিস করে বলল — সামনে জানালাটা দেখেছো!

— হ্যাঁ। ফ্রান্সিসও চাপাস্বরে উত্তর দিলো।

— গরাদ নেই।

— হ্যাঁ।

— সোজা ওখান দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। খাড়া পাহাড়ের গা — কোথাও ঘা খাবার ভয় নেই — নীচে সমুদ্রের জল, তারপর ডুব সাঁতার, পারবে তো?

— নিশ্চয় পারবো।

এমন সময় দুজন সৈন্য ঘুরে ঢুকল। ফজল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে চাবুক চালাল। এবারে চাবুকের ঘাটা ফ্রান্সিসের গায়ে লাগল। ফ্রান্সিসের মুখ দিয়ে কাতরোক্তি বেরিয়ে এল। সৈন্যদের একজন বলল — কি হল এখনও যে মুখ থেকে শব্দ বেরুচ্ছে।

ফজল ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে-চেয়ে চোখ টিপে বলল — এই শেষ ঘা, এটা আর সহ্য করতে হচ্ছে না বাছাধনকে। বলেই চাবুক চালাল — ছপাৎ। ফ্রান্সিসের গায়ে লাগল না। দেয়ালে লেগেই শব্দ উঠল।

ফ্রান্সিস অজ্ঞান হবার ভঙ্গি করল। হাত ছেড়ে দিয়ে শেকলে ঝুলতে লাগল।

—এঃ। নেতিয়ে পড়েছে—একজন সৈন্য ফজলকে লক্ষ্য করে বলল—আর মেরো না।

ফজল চটে ওঠার ভান করল — তোমরা নিজেরা নিজেদের কাজ করো গে যাও। আমি এই ভিনদেশীটাকে একেবারে নিঃশেষ করে ছাড়বো।

— তাহলে তোমারই গর্দান যাবে। একজন সৈন্য বলল।

— কেন?

— সুলতান বলেছেন, যে করেই হোক এই ভিনদেশীটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে — নইলে সোনার ঘন্টার হদিশ দেবে কে?

— হুঁ, তা ঠিক। তাহলে এখন থাক, কি বল?

দু'জন সৈন্যই মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। ফজল চাবুকটা হাতে পাকাতে-পাকাতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল — যাঃ জোর বেঁচে গেলি।

সবাই চলে গেল। ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ তুলে দরজাটা বন্ধ হল। পাহারাদার দরজায় তালা লাগাল।

ফ্রান্সিস এবার আস্তে-আস্তে শব্দ না করে উঠে দাঁড়াল। জানালাটার দিকে ভালো করে তাকাল। ফজল ঠিকই বলেছে। জালানাটায় কোন গরাদ নেই। পাহাড়ের খাড়া গা

বেয়ে কেউ নেমে যাবে এটা অসম্ভব। তাই বোধহয় সুলতান জানালাটাকে সুরক্ষিত করবার প্রয়োজন মনে করেননি। জানালার ওপাশে রাত্রির অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস কেবল পালাবার ফন্দি করতে লাগল। যে করেই হোক পালাতেই হবে। পালাতে গিয়ে যদি মৃত্যু হয় আফশোসের কিছু নেই। কারণ না পালালেও তার মৃত্যু অবধারিত।

পরের সমস্তটা দিন কেউ এল না। একজন পাহারাদার শুধু খাবার দিয়ে গেল। সুলতানও এলো না — চাবুক মারতে ফজলও এল না। কি ব্যাপার।

ফ্রান্সিস ভাবল — হয়তো সুলতান সদয় হয়েছে। সে যে সত্যিই সোনার ঘন্টার হদিশ জানে না, এটা বোধহয় সুলতান বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু সন্ধ্যের পরেই ফ্রান্সিসের ভুল ভাঙল। সুলতান যে কত বড় শয়তান, সে পরিচয় পেতে বিলম্ব হল না।

সন্ধ্যের একটু পরে তিন-চারজন পাহারাদার এল ফ্রান্সিসের ঘরটায়। বড়-বড় সাড়াশি দিয়ে একটা গনগনে উনুন ধরাধরি করে নিয়ে এল ওরা। ফ্রান্সিস অবাক। উনুন দিয়ে কি হবে? ফ্রান্সিস দেখল — দুটো লম্বা লোহার শিক উনুনটায় গুঁজে দেওয়া হলে।

একটু পরেই সুলতান এলেন। সঙ্গে রহমান। ফ্রান্সিস রহমানের পেছনে তাকাল। না ফজল আসে নি। ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একমাত্র ভরসা ছিল ফজল। আজকে সেও নেই। ফ্রান্সিস মনকে শক্ত করল। ফজল যা বুদ্ধি দেবার দিয়ে গেছে। এর বেশী ও একা আর কি করতে পারে? এবার বাঁচতে হলে ফ্রান্সিসকে নিজের সাহস, প্রত্যুতপন্নমতিত্ব আর বুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে হবে। সারারাত ধরে যে ফন্দিটা মনে মনে এঁটেছে সেটাকে কাজে লাগাতে হবে।

— কি হে — চাবুকের মার খেয়েও তো বেশ চাগগা আছ দেখছি। সুলতান মুখ বেঁকিয়ে হেসে বললেন।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। সুলতান বললেন—এবার চটপট বলে ফেল বাছাধন, নইলে—

— সুলতান আপনি মিছিমিছি একটা নির্দোষ মানুষের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছেন।

—ঠিক আছে সোনার ঘন্টার হদিশ বলে ফেল—আমি এক্ষুণি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি।

— আমি যা জানি সেটা —

ফ্রান্সিসের কথা শেষও হল না। সুলতান আঙ্গুল নেড়ে ইঙ্গিত করলেন। একজন পাহারাদার গনগনে উনুন থেকে লাল টক্‌টকে শিক দুটো তুলে নিল। তারপর ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

— এখন বলো — নইলে জন্মের মত চোখ দুটো হারাতে হবে। সুলতানের চড়া গলা শোনা গেল।

ফ্রান্সিস শিউরে উঠল। মানুষ এমন নৃশংসও হয়? ততক্ষণে লোকটা শিক দুটো ওর চোখের সামনে নিয়ে এসেছে। আগুনের উত্তাপ মুখে লাগছে। চোখের একেবারে কাছে লাল শিক দুটো। লাল টকটকে শিকের মুখ ছাড়া ও আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আর এক মুর্হূত। পৃথিবীর সমস্ত আলো রং হারিয়ে যাবে চিরদিনের মত। আর দেরি করা যায় না। ফ্রান্সিস চিৎকার করে উঠল — না-না সব বলছি আমি।

সুলতান ইঙ্গিতে লোকটাকে সরে যেতে বললেন।

— এই তো সুবুদ্ধি হয়েছে। সুলতান হাসলেন।

— সব বলছি সুলতান। কিন্তু তার আগে আমার হাতের শেকল খুলে দিতে বলুন।

সুলতান ইঙ্গিত করলেন। একজন পাহারাদার এসে ফ্রান্সিসের হাতের শেকল খুলে দিল। দুহাতে কবজির কাছে লোহার কড়ার দাগ পড়ে গেছে। সেই দাগের ওপর হাত বুলিয়ে ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে একজন পাহারাদারের খাপ থেকে তরোয়ালটা খুলে নিল। সঙ্গে-সঙ্গে অন্য পাহারাদাররা সাবধান হয়ে গেল। সবাই যে যার তরোয়ালের হাতলে হাত রাখল। এমন কি সুলতানও। ফ্রান্সিস সকলের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর তরোয়ালটা দিয়ে পাথরের মেঝেতে দাগ কাটতে লাগল। সবাই দেখলো ফ্রান্সিস একটা জাহাজের ছবির মত কিছু আঁকছে। সুলতানেরও কৌতূহল। সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস বলতে লাগল — সুলতান এই হল আপনার জাহাজ। এখান থেকে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে লক্ষ্য করে আপনাকে যেতে হবে।

সুলতান মাথা ঝাঁকালেন। ফ্রান্সিস এখানে-ওখানে কয়েকটা ট্যাঁড়া দিল, বলল — এইগুলো হল দ্বীপ। জনবসতি নেই। সব কটাই পাথুরে দ্বীপ। এসব পেরিয়ে যেতে হবে একটা ডুবো পাহাড়ের কাছে। ডুবো পাহাড়টা উঁচু হবে — এই ধরুন ঐ জানালাটা থেকে — ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে জানালাটার দিকে এগোল। বলতে লাগল — এই জানালাটা থেকে হাত পাঁচেক — বলেই ফ্রান্সিস হঠাৎ তরোয়ালটা দাঁতে চেপে ধরে জানালাটার দিকে তীরবেগে ছুটল এবং কেউ কিছু বোঝবার আগেই জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরের অন্ধকারে রাত্রির শূন্যতায় ঝাঁপ দিল। কানের দুপাশে সমুদ্রের মত্ত হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ। বাতাস কেটে ফ্রান্সিস নামছে তো নামছেই।

হঠাৎ — ঝপাং। জলের তলায় তলিয়ে গেল ফ্রান্সিস। পরক্ষণেই ভেসে উঠল — জলের ওপর। সমুদ্রের ভেজা হাওয়া লাগছে চোখেমুখে। মাথার ওপর নক্ষত্রখচিত আকাশ। ফ্রান্সিসের সমস্ত দেহমন আনন্দের শিহরণে কেঁপে উঠল। আঃ — মুক্তি!

ওদিকে দুর্গের জানালায়, জানালায় প্রাচীরের ওপর সৈন্যরা মশাল হাতে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে ফ্রান্সিসকে খুঁজছে। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা কোমরে গুঁজে নিল। তারপর গভীর সমুদ্রের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল। চপ্-চপ্ — জল কেটে তীর ঢুকছে। সৈন্যরা আন্দাজে তীর ছুঁড়তে শুরু করেছে। ফ্রান্সিস আর মাথা ভাসিয়ে সাঁতার কাটতে ভরসা পেল না। যদি একবার নিশানা করতে পারে। সে ডুব সাঁতার দিতে লাগল। ডুব সাঁতার দিতে-দিতে অনেকটা দূরে চলে এল। পেছন ফিরে দেখল — দুর্গটা। এখনও দেখা যাচ্ছে। মশালের ক্ষীণ আলোগুলো নড়ছে। আবার ডুব দিল ফ্রান্সিস। হঠাৎ কিসের একটা টান অনুভব করল। সমুদ্রের নীচের স্রোত ওকে টানছে। একটু পরেই টানটা আরো প্রবল হল আর ওকে মুহূর্তের মধ্যে অনেকদূরে নিয়ে গেল। এবার ভেসে উঠে পেছনে তাকিয়ে দেখল — সব অন্ধকার। দুর্গের চিহ্নমাত্রও দেখা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত মনে সাঁতার কাটতে লাগল।

সারারাত সাঁতার কাটল ফ্রান্সিস। অবসাদে হাত নড়তে চায় না। তখন কোনরকমে শুধু ভেসে থাকা। এইভাবে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে সাঁতার কেটে চলল। পূবের আকাশে অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। একটু পরেই পূবকোণায় লাল সূর্য উঠল। আবার সমুদ্রে সেই সূর্যোদয়ের দৃশ্য। ফ্রান্সিস ভালো করে তাকাতে পারছে না। তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। সবকিছু যেন ঝাপসা দেখাচ্ছে।

তবু চেয়ে-চেয়ে সূর্য ওঠা দেখল। কত পরিচিত দৃশ্য। তবু ভালো লাগল। আবার

নতুন করে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসা — আবার এই পুরোনো পৃথিবী আকাশ, সূর্যোদয় দেখা। ফ্রান্সিসের হাত আর চলছে না। হাত পা ছেড়ে দিয়ে ভেসে চলল অনেকক্ষণ। হঠাৎ সামনেই দেখে একটা পাথুরে দ্বীপ। হোক ছোট দ্বীপ — হাত পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম তো নেওয়া যাবে। দ্বীপটার কাছাকাছি আসতেই পায়ের নীচে পাথুরে মাটি ঠেকল। শ্যাওলা ধরা পাথরে পা টিপে টিপে দ্বীপটায় উঠল। তারপর একটা মস্ত বড় পাথরের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। কানে আসছে সামুদ্রিক পাখির ডাক আর দ্বীপের পাথরে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ। হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে হল — সামুদ্রিক পাখিরা তো এমনি সব দ্বীপেই ডিম পারে। দেখাই যাক না দুটো একটা ডিম পাওয়া যায় কিনা। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। পাথরের খাঁজে-খাঁজে গর্ত খুঁজতে লাগল। প্রথম গর্তটায় কিছুই পেল না। শুধু খড়কুটো শুকনো ঘাস। পরের গর্তটায় ডিমের মস্ত খোল হাতে ঠেকল। দুটো ডিম। ফ্রান্সিস আনন্দে লাফিয়ে উঠল। ডিম দুটো পাথরে ঠুকে ভেঙে খেয়ে নিল। আঃ কি তৃপ্তি! কিন্তু আর শুয়ে থাকা নয়। এখনও নিরাপদ নয় সে। যদি সুলতানের সৈন্যরা জাহাজ বা নৌকা নিয়ে ওকে খুঁজতে বেরোয়? অনেকক্ষণ তো বিশ্রাম নেওয়া গেল। পেটেও কিছু পড়ল। এবার জলে নামতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই এলাকা থেকে দূরে পালাতে হবে।

ফ্রান্সিস জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পূর্ণোদ্যমে সাঁতার কাটতে লাগল। সূর্য মাথার ওপর উঠে এসেছে। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। উজ্জ্বল রোদ জলের ঢেউয়ের মাথায় ঝিকিয়ে উঠছে। ফ্রান্সিস এবার ডুব দিল—আশা—যদি জলের তলায় কোন স্রোতের সাহায্য পায়। কিন্তু নাঃ। নীচে কোন স্রোত নেই। ওপরে ভেসে ওঠার আগে হঠাৎ দেখল ওর ঠিক হাত পাঁচেক সামনে একটা মাছের লেজের মত কি যেন দ্রুত সরে গেল।

হাঙর! হাঙরের মুখ করাতের দাঁতের মত দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস মনে-মনে সাহস সঞ্চয় করতে লাল। এখন ভয় পাওয়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। হাঙরটা আর একবার সাঁৎ করে ওর পায়ের খুব কাছ দিয়ে ঘুরে গেল। বোধহয় পরখ করে নিচ্ছে — লোকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিনা — হাতে অস্ত্র আছে কিনা।

ফ্রান্সিস ভেবে দেখল — ওটাকে এক আঘাতেই নিকেশ করতে হবে — নইলে — একটু আধটু খোঁচা খেলে সঙ্গে-সঙ্গে সাবধান হয়ে যাবে। তখন আর এঁটে ওঠা যাবে না। হাঙরের চলাফেরা জলের ওপর থেকে বোঝা যাবে না। ডুব দিয়ে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়ালটা খুলল। তারপর ডুব দিল। ঝাপসা দেখল — হাত দশেক দূরে হাঙরটা এক পাক ঘুরেই সোজা ওর দিকে ছুটে আসছে! ফ্রান্সিস তরোয়ালের হাতলটা শক্ত করে ধরল। হাঙরটা কাছাকাছি আসতেই ফ্রান্সিস দু'পায়ে জলে ধাক্কা দিয়ে আরো নিচে ডুব দিল। হাঙরটা তখন ওর মাথার ওপর চলে এসেছে। ফ্রান্সিস শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে তরোয়ালটা হাঙরের বুকে বসিয়ে দিল। হাঙরটা শরীর এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে ল্যাজ ঝাপটাতে লাগল। ফ্রান্সিস তরোয়াল ছাড়ল না। এখন ঐ তরোয়ালটাই একমাত্র ভরসা। এটাকে কিছুতেই হারানো চলবে না। ফ্রান্সিস তরোয়ালের হাতলটা ধরে জলের ওপরে মুখ তুলল। তখনও হাঁপাচ্ছে। কিন্তু হাঙরটা যেভাবে শরীর মোচড়াচ্ছে — তাতে তরোয়ালটা ধরে রাখাই কষ্টকর।

ফ্রান্সিস আবার ডুব দিল। হাঙরটার পেটে একটা পা চেপে প্রাণপণ শক্তিতে তরোয়ালটা

টানল। তরোয়ালটা উঠে এল। সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় লাল রক্তে জলটা লাল হয়ে যেতে লাগল। হাঙরটা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি তরোয়ালটা কোমরে গুঁজে পাগলের মত সাঁতার কাটতে লাগল। এই সাংঘাতিক জায়গাটা এখুনিই ছেড়ে যেতে হবে। রক্তের গন্ধ পেলে আরো হাঙর এসে জুটবে - তখন?

ফ্রান্সিস আর ভাবতে পারল না। সাঁতারের গতি আরো বাড়িয়ে দিল।

কতক্ষণ এভাবে সাঁতার কেটেছে তা সে নিজেই জানে না, কিন্তু শরীর আর চলছে না চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে আসতে চাইছে। ঠিক তখনই ফ্রান্সিস অস্পষ্ট দেখতে পেল বাতাসে ফুলে ওঠা পাল। জাহাজ! ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি জল থেকে মুখ তুলে দু'চোখ কচলে তাকাল। হ্যাঁ — জাহাজই। খুব বেশি দূরে নয়। আনন্দে ফ্রান্সিস চিৎকার করে উঠতে গেল। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। সে তাড়াতাড়ি গায়ের ঢোলাহাতা জামাটা তরোয়ালের ডগায় আটকে জলের ওপর নাড়তে লাগল। একটুক্ষণ নাড়ে। তারপর তরোয়ালটা নামিয়ে দম নেয়। আবার নাড়ে। জাহাজের লোকগুলো বোধহয় ওকে দেখতে পেয়েছে। জাহাজটা ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

'ঝপাং —' জাহাজ থেকে দড়ি ফেলার শব্দ হল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি দড়ির ফাঁসটা কোমরে বেঁধে নিল। তারপর দু'হাত দিয়ে ঝোলান দড়িটা ধরল। কপিকলে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ উঠল। নাবিকেরা ওকে টেনে তুলতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল — জাহাজের রেলিঙে অনেক মানুষের উৎসুক মুখ। নিচে জলের মধ্যে ল্যাজ ঝাপটানোর শব্দে ফ্রান্সিস নিচের দিকে তাকাল। মাত্র হাত সাতেক নিচে জলের মধ্যে হাঙরের পাল অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফ্রান্সিস শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল।

জাহাজটা ছিল মালবাহী জাহাজ। নাবিকেরা বেশিরভাগই আফ্রিকার অধিবাসী। কালো-কালো পাথরের কুঁদে তোলা শরীর যেন। ইউরোপীয় সাদা চামড়ার মানুষ যে ক'জন ছিল, ফ্রান্সিস তাদের মধ্যে নিজের দেশের লোক কাউকে দেখতে পেল না।

ফ্রান্সিসের বিছানার চারপাশে নাবিকদের ভিড় জমে গেল। সবাই জানতে চায় ওর কি হয়েছিল, কোথা থেকে আসছিল, যাবেই বা কোথায়? কিন্তু ফ্রান্সিস তাকিয়ে-তাকিয়ে ওদের দেখছিল শুধু। কথা বলার শক্তি ওর অবশিষ্ট নেই। শুধু ইশারায় জানাল — ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। কয়েকজন নাবিক ছুটল খাবার আনতে।

রুটি আর মুরগীর মাংস পেট পুরে খেল ফ্রান্সিস। ওর যখন খাওয়া শেষ হয়েছে তখনই ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল জাহাজের ক্যাপ্টেন। গোলগাল মুখ, পাকানো গোঁফ, ছুঁচালো দাড়ি। ক্যাপ্টেনকে দেখে ভিড় অনেক পাতলা হয়ে গেল। যে যার কাজে চলে গেল। ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসের বিছানার পাশে বসল। জিজ্ঞেস করল — আপনার কি জাহাজডুবি হয়েছিল?

ফ্রান্সিস ঘাড় কাত করল। ক্যাপ্টেন বলল — কোথায় যাচ্ছিলেন? — যাবার কথা ছিল মিশরের দিকে। কিন্তু — । ফ্রান্সিস দুর্বল কণ্ঠে বলল।

— ও, তা আর কেউ বেঁচে আছে?

— জানি না।

ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়াল — আপনাকে আর বিরক্ত করব না। আপনি বিশ্রাম করুন, দু'চার দিনের মধ্যেই সেরে উঠবেন।

— এই জাহাজ কোথায় যাচ্ছে?

— পর্তুগাল।

খুশীতে ফ্রান্সিসের মন নেচে উঠল। যাক, দেশের কাছাকাছিই যাবে। তারপর ওখান থেকে দেশে যাওয়ার একটা জাহাজ কি আর পাওয়া যাবে না?

তিন দিন ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠল না। চার দিনের দিন ডেক-এ উঠে এল। এদিক-ওদিক একটু পায়চারি করল। রেলিঙে ভর দিয়ে সীমাহীন সমুদ্রের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। দু'একজন নাবিক এগিয়ে এসে ওর শরীর ভালো আছে কিনা জানতে চাইলো। ফ্রান্সিস সকলকেই ধন্যবাদ দিল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ওরা তাকে বাঁচিয়েছে। নানা কথাবার্তা হল ওদের সঙ্গে। কিন্তু ফ্রান্সিস সোনার ঘন্টার কথা, মরু-দস্যুদের কথা, সুলতানের দুর্গে বন্দী হয়ে থাকার কথা — এসব কিছু বললো না। কে জানে আবার কোন বিপদে পড়তে হয়।

কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার পর ফ্রান্সিসের শুধু শুয়ে-শুয়ে থাকতে আর ভালো লাগল না। নাবিকের কাজ করবার অভিজ্ঞতা তো ওর ছিলই। একদিন ক্যাপ্টেনকে বলল সেকথা। ছুঁচালো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ক্যাপ্টেন বলল — এখন তোমার শরীর ভালো সারেনি।

— আমি পারবো।

— বেশ হালকা ধরনের কাজ দিচ্ছি তোমাকে।

এ বন্দরে সে বন্দরে মাল খালাস করতে-করতে প্রায় দু'মাস পরে জাহাজটা পর্তুগালের বন্দরে পৌঁছল।

যাত্রা শেষ। বন্দরে জাহাজ পৌঁছতেই নাবিকেরা সব শহরে বেরুল আনন্দ হই-হুল্লা করতে। ফ্রান্সিস গেল অন্য জাহাজের খোঁজে। ওর দেশের দিকে কোন জাহাজ যাচ্ছে কিনা। ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। পেয়েও গেল একটা জাহাজ। ওদের দেশের রাজধানীতে যাচ্ছে। পরদিন ভোর রাত্রে ছাড়বে জাহাজটা। আগের জাহাজে কাজ করে ফ্রান্সিস যা জমিয়েছিল, সবটাই দিল এই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন ওকে নিতে রাজী হল। জাহাজটা ছোট। মালবাহী জাহাজ। নাবিকের সংখ্যাও কম। অনেকের সঙ্গে আলাপ হল ফ্রান্সিসের। শুধু একজন বৃদ্ধ নাবিকের সঙ্গে ফ্রান্সিসের খুব ভাব হল। ডেক ধোয়া-মোছার সময় ফ্রান্সিস তাকে সাহায্য করত।

একদিন সন্ধ্যেবেলা সেই বৃদ্ধ নাবিকটি ডেক-এর রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চুরুট খাচ্ছিল। ফ্রান্সিস তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটা একবার ফ্রান্সিসকে দেখে নিয়ে আগের মতই আপন মনে চুরুট খেতে লাগল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল — আপনি কত জায়গায় ঘুরেছেন?

নাবিকটা শূন্যে আঙুলটা ঘুরিয়ে বলল — সমস্ত পৃথিবী।

— সোনার ঘন্টার গল্পটা জানেন?

নাবিকটি ফ্রান্সিসের দিকে ঘুরে তাকাল। এ-রকম একটা প্রশ্ন সে বোধহয় আশা করেনি। মৃদুস্বরে জবাব দিল — জানি।

আপনি বিশ্বাস করেন?

— করি।

— আমি সেই সোনার ঘন্টার খোঁজেই বেরিয়েছিলাম।

— কিছু হদিস পেলে?

— ঠিক বলতে পারছি না, তবে ভূমধ্যসাগরের একটা জায়গায় — নাবিকটা ওকে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে ম্লান হাসল — কুয়াশা, ঝড় আর ডুবো পাহাড় — তাই কি না?

ফ্রান্সিস আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল — তাহলে আপনি, —

— হ্যাঁ, ভাই — আমাদের জাহাজ প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। তবে আমরা বহু কষ্টে পেছনে হটে আসতে পেরেছিলাম। তাই জাহাজ ডুবির হাত থেকে বেঁচেছিলাম।

নাবিকটা একটু চুপ করে থেকে বলল — একটা কথা বলি শোন — চারদিকে দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলতে লাগল — তুমি বোধহয় গল্পের শেষটুকু জান না।

— জানি বৈকি, ডাকাত পাদরিরা সবাই জাহাজডুবি হয়ে মরে গিয়েছিল।

— না। নাবিকটি মাথা নাড়ল — একজন বেঁচেছিল। সে পরে নিজের জীবন বিপন্ন করে সোনার ঘন্টার দ্বীপে যাওয়ার একটা পথ আবিষ্কার করেছিল। ফিরে আসার অন্য একটা পথও আবিষ্কার করেছিল।

— কেন, যাওয়া-আসার একটা পথ হতে বাধা কি?

— নিশ্চয়ই কোন বাধা ছিল। যাকগে — যাওয়া আসার দুটো সমুদ্র পথের নকশা সে দুটো মোহরে কুঁদে রেখেছিল। সব সময় নাকি গলায় ঝুলিয়ে রাখত সেই মোহর দুটো, পাছে চুরি হয়ে যায়। হয়তো ডাকাত পাদরিটার ইচ্ছে ছিল দেশে ফিরে জাহাজ, লোক-লস্কর নিয়ে যাবে। সোনার ঘন্টা থেকে সোনা কেটে-কেটে আনবে, কিন্তু — ডাকাত পাদরিটা মারা গেল।

তাই নাকি?

— হ্যাঁ, মরু-দস্যুদের হাতে সে প্রাণ হারাল।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। ফজল তো ঠিক এমনি একটা ঘটনাই ওকে বলেছিল। ফ্রান্সিস আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করল — আর সেই মোহর দুটো?

—মরু-দস্যুরা লুঠ করে নিয়েছিল। তারপর সেই মোহর দুটোর হদিস কেউ জানে না।

— আচ্ছা, মরু-দস্যুরা কি জানত, মোহর দুটোয় নকশা আঁকা আছে?

— ওরা তো অশিক্ষিত বর্বর, নকশা বোঝার ক্ষমতা ওদের কোথায়।

এমন সময় কয়েকজন নাবিক কথা বলতে-বলতে ওদের দিকে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস আর কোন প্রশ্ন করল না। তার কেবল মনে পড়তে লাগল সেই মোহর দুটোর কথা। আবছা একটা মাথায় ছাপ ছিল, আর কয়েকটা রেখার আঁকিবুকি।

ঘুম আসতে চায় না ফ্রান্সিসের। নিজের কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করছে! ইস-মোহর দুটো একবার ভালো করে দেখেও নি সে। এইবার মকবুলের মোহর চুরির রহস্য ফ্রান্সিসের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মকবুল নিশ্চয়ই জানত মোহর দুটোর কথা। তাই ও সাঙ্গ গায়ে পড়ে আলাপ জমিয়ে ওকে এতিমখানায় নিয়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সিসের মোহরটা চুরি করেছিল। কিন্তু আর একটা মোহর? সেটা হাতে-না পেলে তো মকবুল পুরো পথের নকশা পাবে না। হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে পড়ল একটা ঘটনা। আশ্চর্য! সেদিন ঐ ঘটনার গুরুত্ব সে বুঝতে পারেনি। একদিন সকালে বাজারে যাওয়ার পথে দেখেছিল সেই জহুরির দোকানটার কাছে বহুলোকের ভিড়। দোকানটা কারা যেন ভেঙে

দাঁড়িয়ে দিয়েছে। আশেপাশের দোকানগুলোর কোন ক্ষতি হয়নি, অথচ ঐ দোকানটা ভেঙেচুরে একশেষ। ফ্রান্সিস শুনল গত রাত্রে দোকানটায় ডাকাত পড়েছিল। আজকে ঐ ডাকাতির অর্থ পরিষ্কার হল। আসলে মকবুল তার সঙ্গীদের নিয়ে সেই দোকানটায় হানা দিয়েছিল। লক্ষ্য সেই মোহরটা চুরি করা। তাহলে মকবুলও সোনার ঘন্টার ধান্ধায় ঘুরছে। আশ্চর্য!

পাঁচদিন পরে জাহাজটা ভাইকিংদের দেশের রাজধানীতে এসে পৌঁছাল। ফ্রান্সিসের যেন তর সয় না। কতক্ষণে শহর-বন্দরে ভিড়বে। জাহাজটা ধীরে-ধীরে এসে জেটিতে লাগল। জেটির গেট খুলে দিতেই ফ্রান্সিস এক ছুটে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

তখন সকাল হয়েছে। কুয়াশায় ঢেকে আছে শহরের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট।

একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করল ফ্রান্সিস। 'টক্-টক্-টক্-টক্' ঘোড়ার গাড়ি চলল পাথর বাঁধানো পথে শব্দ তুলে। ফ্রান্সিসের আবাল্য পরিচিত শহর। খুশিতে ফ্রান্সিস কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। একবার এই জানালা দিয়ে তাকায়, আর একবার ঐ জানালা দিয়ে। কতদিন পরে দেশের লোকজন, পথঘাট দেখতে পেল! এক সময় বাড়ির সামনে এসে পড়ল।

বাড়ির গেট-এর লতাগাছটা দু'দিকের দেয়ালে বেয়ে অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস ওটাকে চারাগাছ দেখে গিয়েছিল। কত অজস্র ফুল ফুটেছে গাছটায়। গেট ঠেলে ঢুকল ফ্রান্সিস। প্রথমেই দেখল মা'কে। বাগানে ফুলগাছের তদারকি করছে। ফ্রান্সিস শব্দ না করে আস্তে-আস্তে মা'র পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। সেই ছোটবেলা সে মাকে এমনি করেই চমকে দিত। ওদের বুড়ো মালিটা হঠাৎ মুখ তুলে ফ্রান্সিসকে দেখেই প্রথমে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর ফোকলা মুখে একগাল হাসল। মা ওকে হাসতে দেখে ধমক লাগাল। তবু হাসছে দেখে মা পেছন ফিরে তাকাল। বয়সের রেখা পড়েছে মার মুখে। বড় শীর্ণ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে মাকে। ফ্রান্সিস আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। মার কান্না আর থামে না। ফ্রান্সিসের মাথায় হাত বুলোয় আর বিড়বিড় করে বলে — পাগল, বদ্ধ পাগল তুই — আমার কথা একবারও মনে হয় না তোর? এ্যাঁ — পাগল কোথাকার —


গেট ঠেলে ঢুকল ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিসের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সে বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করল। ওর চোখে জল দেখলে মাও অস্থির হয়ে পড়বে।

বাবা বাড়ি নেই। রাজপ্রাসাদে গেছেন সেই ভোরবেলা। কি সব জরুরী পরামর্শ আছে রাজার সঙ্গে। যাক — বাঁচা গেল। এখন খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্তে একটা ঘুম দেবে।

কিন্তু ফ্রান্সিসের কপালে নিশ্চিন্ত ঘুম নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মা'র কণ্ঠস্বর শুনল — বেচারা ঘুমুচ্ছে — এখন আর তুলে

— হুঁ। বাবার সেই গম্ভীর গলা শোনা গেল।

একটু পরে দরজা খুলে গেল। আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিসের বাবা এসে বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। ভুরু কুঁচকে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইলেন স্থির দৃষ্টিতে। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বিছানার ওপরে উঠে বসল। বাবা কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই আমতা-আমতা করে বলতে লাগল — ম্-মানে ইয়ে হয়েছে —

— পুরো এক মাস এইখান থেকে কোথাও বেরোবে না।

— বেশ — ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলার চেষ্টা করল না।

— পালিয়েছিলে কেন?

— বললে তো আর যেতে দিতে না।

— হুঁ!

— বিশ্বাস কর বাবা, সোনার ঘন্টা সত্যিই আছে।

— মুণ্ডু।

— আমি সোনার ঘন্টার বাজনার শব্দ শুনেছি।

— এখন ঘরে বসেই সোনার ঘন্টার বাজনা শোন।

— একটা জাহাজ পেলেই আমি —

— আবার! বাবা হেঁকে উঠলেন।

ফ্রান্সিস চুপ করে গেল। ফ্রান্সিসের বাবা দরজার দিকে পা বাড়ালেন। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকলেন — এদিকে এসো।

ফ্রান্সিস ভয়ে-ভয়ে বিছানা থেকে নেমে বাবার কাছে গেল।

— কাছে এসো।

ফ্রান্সিস পায়ে-পায়ে এগোল। হঠাৎ বাবা তাকে দু'হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলে। কয়েক মুহূর্ত। ফ্রান্সিস বুঝল বাবার শরীর আবেগে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। হঠাৎ ফ্রান্সিসকে ছেড়ে দিয়ে ওর বাবা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ফ্রান্সিস দেখল, বাবা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছলেন।

বেশ কিছুদিন গেল। ফ্রান্সিস আবার সেই আগের মতই শক্তি ফিরে পেয়েছে — দৃপ্ত, সতেজ। কিন্তু মনে শান্তি নেই। এও তো আর এক রকমের বন্দী জীবন। ওর মত দুরন্ত ছেলের পক্ষে একটা ঘরে আটকা পড়ে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। তবু বাবার অজান্তে মা ওকে বাগানে যেতে দেয়, গেট-এ গিয়েও দাঁড়ায় কখনো-কখনো। কিন্তু বাড়ীর বাইরে যাবার উপায় নেই। মার কড়া নজর। বন্ধু-বান্ধবের দল বেঁধে আসে। ফ্রান্সিসের কথা যেন আর ফুরোতে চায় না। বন্ধুরা সব অবাক হয়ে ওর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনে। ফ্রান্সিস বলে — ভাই তোমরা যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজী হও, তাহলে সোনার ঘন্টা আমার হাতের মুঠোয়।

ওরা তো সবাই ভাইকিং। সাহসে, শক্তিতে ওরাও কিছু কম যায় না; ওরা হইচই করে ওঠে — আমরা যাব। ফ্রান্সিস ঠোঁট আঙুলে ঠেকিয়ে ওদের শান্ত হতে ইঙ্গিত করে। মা টের পেলে অনর্থ করবে।

ফ্রান্সিসের নিকট বন্ধু হ্যারি। কিন্তু সে চেঁচামেচিতে যোগ দেয় না। সে বরাবরই ঠাণ্ডা প্রকৃতির, কিন্তু খুবই বুদ্ধিমান। সে শুধু বলে — আগে একটা জাহাজের বন্দোবস্ত করো — আমাদের নিজেদের জাহাজ তারপর কার কত উৎসাহ দেখা যাবে।

আবার চেঁচামেচি শুরু হয়। মা ঘরে ঢোকে। বলল কি ব্যাপার?

সবাই চুপ করে যায়। মা সবই আন্দাজ করতে পারে। তাই ফ্রান্সিসের ছোট ভাইটাকে পাঠিয়ে দেয়। সে এসে ওদের আড্ডায় বসে থাকে। ব্যাস আর কিছু বলবার নেই! ওরা যা বলবে ঠিক ফ্রান্সিসের মার কাছে পৌঁছে যাবে। সব মাটি তাহলে —

একা-একা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে দিন কাটতে চায় না। সমুদ্রের উন্মত্ত গর্জন, উত্তাল ঢেউ তাকে প্রতিনিয়ত ডাকে। আবার কবে সমুদ্রে যাবে — বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে, ফ্রান্সিস শুধু ভাবে আর ভাবে। বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করবে তারও উপায় নেই। মার কড়া নজর। অগত্যা একটা উপায় বের করতে হল। রাত্রে মা একবার এসে দেখে যায়, ছেলে ঘুমোল কিনা। ফ্রান্সিস সেদিন ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। মা নিশ্চিন্ত মনে ঘর থেকে চলে যেতেই ফ্রান্সিস জানলা খুলে মোটা লতাগাছটা বেয়ে নিচে বাগানে নেমে এল। তারপর দেয়াল ডিঙিয়ে রাস্তায়।

বন্ধুদের ডেকে পাঠাতে একটু সময় গেল। ততক্ষণ ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে একটা পোড় বাড়িতে বন্ধুদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। একজন-দুজন করে সবাই এল। সোনার ঘন্টা আনতে যাবে, এই উত্তেজনায় হই-চই শুরু করে দিলে ফ্রান্সিস হাত তুলে সবাইকে থামতে বলল। গোলমাল একটু কমলে ফ্রান্সিস বলতে শুরু করল - ভাই সব, শুধু উৎসাহকে সম্বল করে কোন কাজ হয় না। ধৈর্য চাই, চিন্তা চাই। দীর্ঘদিন ধরে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে আমাদের। নিজেদের দাঁড় বাইতে হবে, পাল খাটাতে হবে, ডেক পরিষ্কার করতে হবে, আবার ঝড়ের সঙ্গে লড়তে হবে, ডুবো পাহাড়ের ধাক্কা সামলাতে হবে। কি, পারবে তোমরা?

— আমরা পারবো — সবাই সমস্বরে বলে উঠল।

— হয়তো আমরা পথ হারিয়ে ফেললাম, খাদ্য ফুরিয়ে গেল, জল ফুরিয়ে গেল — তখন কিন্তু অধৈর্য হবে না — নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করাও চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বুক দিয়ে সব কষ্ট সহ্য করতে হবে। কি পারবে?

— পারবো। আবার সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

কয়েক রাত এই রকম সভাও পরামর্শ হল। কিভাবে একটা জাহাজ জোগাড় করা যায়? ফ্রান্সিস দু'একবার বাবাকে বলবার চেষ্টা করেছে— যদি উনি রাজার কাছ থেকে একটা জাহাজ আদায় করে দেন। কিন্তু ফ্রান্সিসের বাবা ওকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন।

হ্যারিই প্রথমে বুদ্ধিটা দিল। হ্যারি কথা বলে কম, কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধিমান। সে বলল — আমরা রাজার জাহাজ চুরি করব।

— জাহাজ চুরি? সবাই অবাক।

— হ্যাঁ, রাজা যখন চাইলে জাহাজ দেবেন না, তখন চুরি ছাড়া উপায় কি।

— কিন্তু ফ্রান্সিস দ্বিধাগ্রস্ত হল।

— আমরা তো সমুদ্রে ভেসে পড়ব, রাজা আমাদের ধরতে পারলে তো! তাছাড়া — যদি সত্যিই সোনার ঘন্টা আনতে পারি তখন

ঠিক ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হল।

গভীর রাত্রি। বন্দরের এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। মশালের আলো জলে কাঁপছে। রাজার সৈন্যরা বন্দর পাহারা দিচ্ছে। অন্ধকারে নোঙর করা রয়েছে রাজার জাহাজগুলো।

প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে ফ্রান্সিস আর তার পঁয়ত্রিশজন বন্ধু জাহাজগুলোর দিকে এগোতে লাগল। পাথরের ঢিবি, খড়ের গাদা, স্তূপীকৃত কাঠের বাক্সের আড়ালে-আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। হাতের কাছে সব চাইতে বড় যে জাহাজটা, সেটাতেই নিঃশব্দে উঠতে লাগল সবাই। যে সব প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছিল, তারা এতগলো লোককে হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে জাহাজে উঠতে দেখে অবাক হয়ে গেল। ওরা খাপ থেকে তরোয়াল খোলবার আগেই ফ্রান্সিসের বন্ধুরা একে-একে সবাইকে কাবু করে ফেলল। তারপর জাহাজ থেকে ছুঁড়ে জলে ফেলে দিল। জাহাজটা কূল ছেড়ে সমুদ্রের দিকে ভেসে চলল।

এদিকে হয়েছে কি, সেই জাহাজে রাজার নৌবাহিনীর সেনাপতি একটা গোপন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল রাজার বিরুদ্ধে। সেনাপতিই ছিল সেই ষড়যন্ত্রের নেতা। যাতে আরো সৈন্য তার দলে এসে যোগ দেয়, গোপন সভার সেটাই ছিল উদ্দেশ্য। তারা আলোচনায় এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে, তারা জানতেও পারল না কখন জাহাজটা চুরি গেছে, আর জাহাজ মাঝ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ জাহাজটা দুলে-দুলে উঠতে লাগল। সেনাপতি আর তার দলের লোকেরা তো অবাক। জাহাজ মাঝ সমুদ্রে এল কি করে? ওরা সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে এল কি ব্যাপার দেখতে। ওরা উঠে আসছে বুঝতে পেরে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা সব লুকিয়ে পড়ল। সেনাপতি তার দলবল নিয়ে ডেক-এ এসে দাঁড়াতেই সবাই লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে ওদের ঘিরে দাঁড়ালো। সেনাপতি খুব বুদ্ধিমান। বুঝল, এখন ওদের সঙ্গে লড়তে গেলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। লোকদের ইঙ্গিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল।



সেনাপতি নিঃশব্দে নিজের তরোয়ালশুদ্ধ
বেল্টটা ডেক-এর ওপর রেখে দিল।

ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল — সেনাপতি মশাই, আপনাকেও আমরা সঙ্গে পাব, এটা ভাবতেই পারিনি। যাকগে, মিছিমিছি তরোয়াল খুলবেন না, দেখতেই পাচ্ছেন আমরা দলে ভারি। এবার আপনাদের তরোয়ালগুলো দিয়ে দিন।

সেনাপতি নিঃশব্দে নিজের তরোয়াল সুদ্ধ বেল্টটা ডেক-এর ওপর রেখে দিল। সেনাপতির দেখাদেখি তার দলের সৈন্যরাও তরোয়াল খুলে ডেক-এর ওপর রাখল। ফ্রান্সিসের দলের একজন তরোয়ালগুলো নিয়ে চলে গেল। সেনাপতি গম্ভীর মুখে বলল — তোমরা রাজার জাহাজ চুরি করেছ — এজন্যে তোমাদের শাস্তি পেতে হবে।

— সে আমরা বুঝবো — ফ্রান্সিস বলল।

— কিন্তু তোমরা জাহাজ নিয়ে কোথায় যাচ্ছো?

— সোনার ঘন্টা আনতে —

সেনাপতি মুখ বেঁকিয়ে হাসল — ওটা একটা ছেলে ভোলানো গল্প।

— দেখাই যাক না। ফ্রান্সিস হাসল।

ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ। পালগুলো ফুলে উঠেছে হাওয়ার তোড়ে। শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে জাহাজ চলতে লাগল দ্রুতগতিতে। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা খুব খুশী। দাঁড় টানতে হচ্ছে না। সমুদ্রও শান্ত। খুব সুলক্ষণ। নির্বিঘ্নেই ওঁরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবে।

ফ্রান্সিস কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তার মনে শান্তি নেই। সারাদিন যায় জাহাজের কাজকর্ম তদারকি করতে। তারপর রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, ফ্রান্সিস তখন একা-একা ডেক-এর ওপর পায়চারী করে। কখনও বা রেলিং ধরে দূর অন্ধকার দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। একমাত্র চিন্তা — কবে এই যাত্রা শেষ হবে — দ্বীপে গিয়ে পৌঁছবে। মাঝে-মাঝে হ্যারি বিছানা থেকে উঠে আসে। ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে — এবার শুয়ে পড়গে যাও।

—হ্যারি—ফ্রান্সিস শান্তস্বরে বলে—তুমি তো জানো সোনার ঘন্টা আমার সমস্ত জীবনের স্বপ্ন। যতদিন না সেটার হদিস পাচ্ছি, ততদিন আমি শান্তিতে ঘুমুতো পারব না।

তবু শরীরটাকে তো বিশ্রাম দেবে! হ্যারি বলে।

— হ্যাঁ, বিশ্রাম। ফ্রান্সিস হাসল — চল।

কতদিন হয়ে গেল। জাহাজ চলেছে তো চলেছেই। এর মধ্যে তিনবার ফ্রান্সিসদের জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়েছিল। প্রথম দু'বারের ঝড় ওদের তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু শেষ ঝড়টা এসেছিল হঠাৎ। পাল নামাতে-নামাতে দুটো পাল ফেঁসে গিয়েছিল। পালের দড়ি ছিঁড়ে গিয়েছিল। সে সব মেরামত করতে হয়েছে। কিন্তু সেলাই করা পালে তো ভরসা করা যায় না। জোর হাওয়ার মুখে আবার ফেঁসে যেতে পারে।

জাহাজ তখন ভূমধ্যসাগরে পড়েছে। কোন বন্দরে জাহাজ থামিয়ে পালটা পালটে নিতে হবে। কিন্তু ফ্রান্সিসের এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হল না। কেউ আর দেরি করতে চায় না। কতদিন হয়ে গেল দেশ-বাড়ি ছেড়ে এসেছে। ফেরার জন্যে সকলেই উদগ্রীব। কিন্তু ফ্রান্সিস দৃঢ় প্রতিজ্ঞ — পালটা পালটাতেই হবে। যে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে তাদের পড়তে হবে, সে সম্বন্ধে কারো কোন ধারণাই নেই। শুধু ফ্রান্সিসই জানে তার ভয়াবহতা। সেই মাথার ওপর উন্মত্ত ঝড় আর নীচে ডুবো পাহাড়ের বিশ্বাসঘাতকতা। সে সব সামলানো সহজ ব্যাপার নয়। প্রায় সকলেরই ধারণা হল, ফ্রান্সিস বিপদটাকে বাড়িয়ে দেখছে। এই নিয়ে ফ্রান্সিসের সঙ্গীদের মধ্যে গুঞ্জনও চলল।

সেনাপতি আর তার সঙ্গীরা এতদিন চুপ করে সব দেখছিল। ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে তার সঙ্গীদের ক্ষেপিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজছিল। এবার সুযোগ পাওয়া গেল! এর মধ্যে ফ্রান্সিসের একটা হুকুমও সবাই ভালো মনে নিল না। ফ্রান্সিসেরই তিনজন সঙ্গী দেশে ফিরে যাবার জন্যে বারবার ফ্রান্সিসকে বিরক্ত করছিল। কিন্তু ফ্রান্সিস অটল। অসম্ভব — ফিরে যাওয়া চলবে না। সে সোজা বলল — ওসব ভাবনা মন থেকে তাড়াও। কাজ শেষ না করে কেউ ফেরার কথা মুখেও এনো না। কিন্তু ওরাও নাছোড়বান্দা। ওদের প্যানপ্যানিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ফ্রান্সিস। তাই যে ছোট্ট বন্দরটায় পালটা পাল্টাবার জন্যে জাহাজটা থামল, ফ্রান্সিস ওদের সেখানে জোর করে নামিয়ে দিল। অন্য জাহাজে করে ওরা যেন দেশে ফিরে যায়। এমনিতেই ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে

উঠেছিল এই ঘটনাটা তাতে আরো একটু ইন্ধন জোগাল। সেই ছোট্ট বন্দরে পালটা বদলে, জাহাজের টুকিটাকি মেরামত সেরে নিয়ে তাদের যাত্রা আবার শুরু হল।

দিন যায়, রাত যায়। কিন্তু কোথায় সেই দ্বীপ? কোথায় সেই সোনার ঘন্টা? সকলেই হতাশায় ভেঙে পড়তে লাগল। এ কোথায় চলেছি আমরা? গল্পের সোনার ঘন্টার অস্তিত্ব আছে কি? না কি সবটাই ফ্রান্সিসের উদ্ভট কল্পনা? সেনাপতি আর তার দলের লোকেরা এতদিনে সুযোগ পেল। তারা গোপনে সবাইকে বোঝাতে লাগল ফ্রান্সিস উন্মাদ। একটা ছেলে ভুলানো গল্পকে সত্যি ভেবে নিয়েছে। আর দিন নেই, রাত নেই সেই কথা ভাবতে-ভাবতে ও উন্মাদ হয়ে গেছে। কিন্তু ও পাগল বলে আমরা তো পাগল হতে পারি না? দীর্ঘদিন আমরা দেশ ছেড়েছি। কোথায় চলেছি, তার ঠিকানা নেই। কবে দেশে ফিরব, অথবা কেউ ফিরতে পারবে কি না, তাও জানি না। একটা কাল্পনিক জিনিসের জন্যে আমরা এভাবে আমাদের জীবন বিপন্ন করতে যাব কেন?

কিন্তু উপায় কি? সবাই মুষড়ে পড়ল। সেনাপতিও ধীরে-ধীরে ফ্রান্সিসের বন্ধুদের মন তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলতে লাগল।

এর মধ্যে আর এক বিপদ। জাহাজে খাদ্যাভাব দেখা দিল। মজুত জলে তখনও টান পড়েনি। কিন্তু কম খেয়ে আর কতদিন চলে? খাদ্য যা আছে, তাতে আর কিছুদিন মাত্র চলবে। তারপর? সেনাপতি বুদ্ধি দিল সবাইকে এখনও সময় আছে। চল আমরা ফিরে যাই। এই সবকিছুর মূলে হচ্ছে ফ্রান্সিস। তার নেতৃত্ব অস্বীকার করো। বেশী বাড়াবাড়ি করলে ওকে জলে ফেলে দাও। তারপর জাহাজ ঘোরাও দেশের দিকে।

কথাটা সকলেরই মনে ধরল। শুধু হ্যারি সবকিছু আঁচ করে বিপদ গুনলো।

ফ্রান্সিস কিন্তু এসব ব্যাপার কিছুই আঁচ করতে পারেনি। ওর তো একটাই চিন্তা যে করেই হোক সেই দ্বীপে পৌঁছতে হবে। আজকাল ওর বন্ধুরা কেমন যেন এড়িয়ে-এড়িয়ে চলে। ওর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়। একমাত্র হ্যারিই আগের মত ফ্রান্সিসের সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। তবে তার প্রশ্নেও সংশয়ের আভাস ফুটে ওঠে।

গভীর রাত্রিতে ডেক-এ দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল দু'জনে। হ্যারি জিজ্ঞাসা করল — ফ্রান্সিস তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর, সোনার ঘন্টা বলে কিছু আছে?

— তোমার মনে সন্দেহ জাগছে? ফ্রান্সিস একটু হাসে।

— সে কথা নয়। এতগুলো লোক একমাত্র তোমার ওপর ভরসা করেই যাচ্ছে।

— হ্যারি আমি জাহাজ ছাড়ার সময়ই বলেছিলাম — যারা আমার সঙ্গে যাচ্ছে, সকলের জীবনের দায়িত্ব আমার। কাউকে বিপদের মুখ থেকে বাঁচাতে গিয়ে আমাকে যদি প্রাণ দিতে হয়, তাই আমি দেব।

— তোমাকে আমি ভালো করেই জানি ফ্রান্সিস — কথার খেলাপ তুমি করবে না! কিন্তু হাজার হোক মানুষের মন তো —

আমি বুঝি হ্যারি! দীর্ঘদিন আমরা দেশ ছেড়ে এসেছি — আত্মীয়স্বজন, বাড়ী ঘরের জন্যে মন খারাপ করবে, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু বড় কাজ করতে গেলে সব সময় পিছুটান অস্বীকার করতে হয়। নইলে আমরা এগোতেই পারব না।

আচ্ছা ফ্রান্সিস, তুমি আমাদের যা-যা বলেছ, সে সব তোমার কল্পনা নয় তো?

ফ্রান্সিস কিছু বলল না। কাঁধের কাছে জামাটা একটানে খুলে ফেলল। ও তরোয়ালের কোপের সেই গভীর ক্ষতটা দেখিয়ে বলল — এটা কি কল্পনা হ্যারি?

হ্যারি চুপ করে গেল। বলতে সাহস করল না যে, ওর বন্ধুরা সবাই ওকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। ফ্রান্সিস কথাটা শুনলে হয়তো ক্ষেপে গিয়ে আর এক কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।

ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চূড়ান্ত রূপ নিল একদিন। সেদিন সকাল থেকেই সেনাপতি আর তার দলের লোকেরা গোপনে ফ্রান্সিসের কয়েকজন বন্ধুকে বলল — জানো আমরা পথ হারিয়েছি। ফ্রান্সিস নিজেই জানে না, জাহাজ এখন কোনদিকে, কোথায় চলেছে।

এমনিতেই সকলের মনে অসন্তোষ জমেছিল। এই মিথ্যা রটনা যেন শুকনো বারুদের স্তূপে আগুন দিল। মুহূর্তে খবরটা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সেনাপতির নেতৃত্বে গোপন সভা বসল। সবাই একমত হলো সেনাপতিই হবে জাহাজের ক্যাপটেন। ফ্রান্সিসের হুকুম আর চলবে না। হ্যারিও সভার ব্যাপারটা আঁচ করে সেখানে গিয়ে হাজির হল। সে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে উঠল। কিন্তু পারল না। তার আগেই কয়েকজন মিলে তাকে ধরে ফেলল। একটা ঘরে কয়েদী করে রেখে দিল। ফ্রান্সিস যাতে আগে থাকতে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে না পারে, তার জন্যে সবাই সাবধান হল।

তখন গভীর রাত। ফ্রান্সিস এক-একা ডেকে পায়চারী করছে। পরিষ্কার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। ফ্রান্সিসের কিন্তু কোনদিকে চোখ নেই। ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে জ্যোৎস্নাধোয়া দিগন্তের দিকে।

হঠাৎ পেছনে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। ও ভেবেছিল হ্যারি এসেছে বোধহয়। কিন্তু না। হ্যারি নয় — সেনাপতি। পেছনে তার দলের কয়েকজন। ফ্রান্সিসের আশ্চর্য হওয়ার তখনও বাকি ছিল। নীচ থেকে সিঁড়ি বেয়ে ফ্রান্সিসের সবাই দল বেঁধে উঠে আসছে ডেক-এ। ব্যাপারটা কি?

সেনাপতি এগিয়ে এসে ডাকল — ফ্রান্সিস?

— হুঁ।

— আমরা কেন উঠে এসেছি বুঝতে পেরেছ?

— না।

— তোমাকে একটা কথা জানাতে।

— কি কথা?

— এই জাহাজ তোমার হুকুমে আর চলবে না।

— কেন?

— তোমাকে কেউ আর বিশ্বাস করে না।

— তাহলে কাকে বিশ্বাস করে?

— আমাকে। এই জাহাজের দায়িত্ব এখন আমার।

ফ্রান্সিসের কাছে এবার সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এই ষড়যন্ত্রের মূলে সেনাপতি আর তার সঙ্গীরা। তারাই ওর বন্ধুদের মন বিষিয়ে তুলেছে। ফ্রান্সিস এবার সকলের দিকে তাকাল। চীৎকার করে বলল — ভাইসব, আমাকে বিশ্বাস করো না তোমরা?

কেউ কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিস সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কেউ-কেউ মুখ ফেরাল। কেউ-কেউ মাথা নিচু করল। আশ্চর্য! হ্যারি কোথায়?

ফ্রান্সিস বুঝল, তা'হলে ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। গভীর দুঃখে তার বুক ভেঙে যেতে লাগল। একটা স্বপ্নকে কেন্দ্র করে এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, সব ব্যর্থ হয়ে গেল। স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। ফ্রান্সিস অশ্রু-রুদ্ধস্বরে বলতে লাগল, 'ভাইসব, অতি নগণ্যসংখ্যক হলেও পৃথিবীর এমন কিছু মানুষ আছে, ঘরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যাদের ঘরে আটকে রাখতে পারে না। বাইরের পৃথিবীতে জীবনমৃত্যুর যে খেলা চলছে -- নিজের জীবন বিপন্ন করেও সেই খেলায় মাতে সে। এর মধ্যেই সে বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে পায়। আমিও তেমনি একজন মানুষ—ফ্রান্সিস একটু থামল। তারপর বলতে লাগল, তোমাদের কারো মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে, সোনার ঘন্টা খুঁজে বের করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য কি? উত্তর খুবই সহজ—আমি বড়লোক হতে চাই? কিন্তু তোমরা আমার বন্ধু। ভালো করেই জানো আমাদের পরিবার যথেষ্ট বিত্তশালী। তবে কেন এত আগ্রহ? কেন এই অভিযান? ভাইসব, উদ্দেশ্য আমার একটাই। ছেলেবেলা থেকে যে গল্প শুনে আসছি, কত রাতের স্বপ্নে দেখেছি যে সোনার ঘন্টা সেটা খুঁজে বের করব। তারপর দেশে নিয়ে যাব। আমাদের রাজাকে উপহার দেব। ব্যস্—আমার কাজ শেষ। এর জন্যে যে কোন দুঃখকষ্ট, বিপদ-বিপর্যয় এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি হতেও আমি দ্বিধাবোধ করব না।

ফ্রান্সিস একটু থেমে আবার বলতে লাগল — তোমরা সেনাপতিকে ক্যাপটেন বলে মেনে নিয়েছো। ভালো কথা। জাহাজের মুখ ঘোরাও দেশের দিকে। ফিরে গিয়ে ঘরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জীবন কাটাওগে। কিন্তু আমি ফিরে যাব না। ফেরার পথে প্রথমে যে বন্দরটা পাব, আমি সেখানেই নেমে যাব। জাহাজ জোগাড় করে আবার আসবো। আমাকে যদি সারাজীবন ধরে সোনার ঘন্টার জন্যে আসতে হয়, আমি আসব।

ফ্রান্সিস থামল। কেউ কোন কথা বলল না। হঠাৎ সেনাপতি চেঁচিয়ে বলল — এসব বাজে কথা শোনার সময় নেই আমার। জাহাজের মুখ ঘোরাও।

ভীড়ের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল। দেশে ফিরে যাবে, এই আনন্দে সবাই চীৎকার করে উঠল। কিন্তু কেউ লক্ষ্য করেনি, চাঁদের আলো ম্লান হয়ে গেছে। ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের মত কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। বাতাস থেমে গেছে। জাহাজের গতিও কমে এসেছে। ভীড়ের মধ্যে কে একজন বলল - এত কুয়াশা এল কোত্থেকে?

কথাটা কারো-কারো কানে গেল। তারা কুয়াশা দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য! এত কুয়াশা? এই অসময়ে? গুঞ্জন উঠল ওদের মধ্যে। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কুয়াশার সেই আস্তরণের দিকে।

ফ্রান্সিস রেলিঙে ভর দিয়ে হাতে মাথা রেখে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সেও লক্ষ্য করেনি চারিদিকের পরিবেশ এই পালটে যাওয়ার ঘটনাটা। হঠাৎ ওর কানে গেল সকলের ভীত গুঞ্জন। ফ্রান্সিস মুখ তুলল। এ কি! চাঁদের আলো ঢাকা পড়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। কুয়াশার ঘন আস্তরণ ঢেকে আস্তরণ ঢেকে দিয়ে সমুদ্র আকাশ।

ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল — 'এক মুহূর্ত নষ্ট করবার মত সময় নেই। দাঁড়ে হাত লাগাও। সামনেই প্রচণ্ড ঝড় আর ডুবো পাহাড়ের বাধা। সবাই তৈরী হও।'

কিন্তু সেই ভীড়ে কোন চাঞ্চল্য জাগল না। সবাই স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল। কি করছে কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না।

হঠাৎ সেনাপতি চীৎকার করে ব'লে উঠল — সব ধাপ্পাবাজি।

ফ্রান্সিস সেনাপতির দিকে একবার তাকাল। তারপর দুহাত তুলে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল — আমাকে বিশ্বাস কর। আমার বন্ধুত্বের মর্যাদা দাও। সবাই তৈরি হও দেরি করো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমরা সোনার ঘন্টার বাজনার শব্দ শুনতে পাবে।

— পাগলের প্রলাপ — সেনাপতি গলা চড়িয়ে বলল।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করো না। ফ্রান্সিস তবু বলে যেতে লাগল — পাল নামাও, দাঁড়ে হাত লাগাও।

ফ্রান্সিস আর বলতে পারল না। পিঠে কে যেন তরোয়ালের ডগাটা চেপে ধরেছে। ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াতে গেল। পারলো না। সঙ্গে-সঙ্গে তরোয়ালের চাপ বেড়ে গেল। শুনল সেনাপতি দাঁত চাপা স্বরে বলছে — আর একটা কথা বলেছো তো, জন্মের মত তোমার কথা বলা থামিয়ে দেব।

সেনাপতির কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় সমস্ত জাহাজটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। উত্তাল ঢেউ জাহাজের রেলিঙের ওপর দিয়ে ছুটে এসে ডেকে আছড়ে পড়ল। সেনাপতি কোথায় ছিটকে পড়ল। অন্য সকলেও এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল। শুরু হল জাহাজের প্রচণ্ড দুলুনি। ডেকে দাঁড়ায় তখন কারসাধ্য। ঠিক তখনই ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে বেজে উঠল সোনার ঘন্টার গম্ভীর শব্দ — ঢং — ঢং — ঢং।

ডেকে এখানে-ওখানে তালগোল পাকিয়ে পড়ে থাকা মানুষগুলো উৎকর্ণ হয়ে শুনল সেই ঘন্টার শব্দ। এই ঘন্টা যেন মন্ত্রের মত কাজ করল। সোনার ঘন্টা — এত কাছে। জাতে ভাইকিং ওরা। সমুদ্রের সঙ্গে ওদের নিবিড় সম্পর্ক। ঝড় প্রচণ্ড সন্দেহ নেই। সমুদ্রও উন্মত্ত। কিন্তু ওরাও জানে কীভাবে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। ওরা আর কারো নির্দেশের অপেক্ষা করল না। একদল গেল দাঁড় বাইতে, আর একদল গেল মাস্তুলের দিকে পাল নামাতে।

মাস্তুলের মাথায় উঠে দেখতে হবে ঘন্টার শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে। ফ্রান্সিস জাহাজের ভীষণ দুলুনি উপেক্ষা করে মাস্তুল বেয়ে উঠতে লাগল। একেবারে মাথায় উঠে প্রাণপণ শক্তিতে মাস্তুলটা আঁকড়ে ধরে রইল। তারপর যেদিক থেকে ঘন্টার শব্দ আসছে, সেইদিকে তাকাল। ঝড়-বৃষ্টির আবছা আবরণের মধ্যে দিয়ে দেখল, দু'টো পাহাড়ের মত পাথুরে দ্বীপ। মাঝখানে সমুদ্রের জল বিস্তৃত। আশ্চর্য সেখানে সমুদ্র শান্ত। সেই সমুদ্রের মধ্যে দূরে একটা নিঃসঙ্গী পাহাড়ের মত দ্বীপ। পাথুরে দ্বীপ নয়। সবুজ ঘাস আছে দ্বীপটার গায়ে। তার মাথায় একটা সাদা রং-এর মন্দির মত। শব্দটা আসছে সেই দিক থেকেই। ফ্রান্সিস আর কিছুই দেখতে পেল না। ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজটা কাত হয়ে গেল। মাস্তুল থেকে প্রায় ছিটকে পড়ার মত অবস্থা। ও তাড়াতাড়ি মাস্তুল বেয়ে নীচে নামতে লাগল। ডেকে পা দেবার আগেই দুটো পাল খাটাবার কাঠ সশব্দে ভেঙে পড়ল। ডেকে কয়েকজন চীৎকার করে উঠল। কি হল, তা আর তাকিয়ে দেখবার অবকাশ নেই।

ফ্রান্সিস ডেকে নেমেই ছুটল সিঁড়ির দিকে। নীচে নেমে চলে এল দাঁড় টানার লম্বা ঘরটায়। সারি-সারি বেঞ্চিগুলোর দিকে তাকাল। দেখলো, সবাই প্রাণপণে দাঁড় টানছে। জাহাজের দুলুনিতে ভালোভাবে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস সেই দুলুনির মধ্যে কোনরকমে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে লাগল — ভাইসব, সামনেই ডুবো পাহাড়। আমরা আর সামনের

দিকে যাব না। জাহাজ পিছিয়ে আনতে হবে। ডুবো পাহাড়ের ধাক্কা এড়াতে হবে। তারপর ঝড়ের ঝাপটায় জাহাজ যে দিকে যায় যাক।

সবাই দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে ফ্রান্সিসের কথা শুনল। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ফ্রান্সিস যে সত্য কথাই বলেছে, এ বিষয়ে কারও মনে আর সন্দেহ রইল না। এবার সবাই উল্টোদিকে দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজ পিছিয়ে আসতে লাগল। ঝড়ের কয়েকটা প্রচণ্ড ধাক্কায় অনেকটা পিছিয়ে এল। কিন্তু ডুবো পাহাড়ের ধাক্কা এড়াতে পারলো না। খুব জোরে ধাক্কা লাগল না তাই রক্ষে। পেছনের হালটা মড়-মড় করে ভেঙে গেল। সেই সঙ্গে পেছনের রেলিঙের কাছে অনেকটা জায়গা ভেঙে খোঁদল হয়ে গেল। তবু খোঁদলটা খুব উঁচুতে হল বলে বেশী জল ঢুকতে পারলো না। জাহাজ ডোবার ভয়ও রইল না। তারপর ঝড়-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে কলার মোচার মত নাচতে নাচতে জাহাজ কোনদিকে যে চললো, তা কেউ বুঝতে পারল না।

ফ্রান্সিস ততক্ষণে জাহাজের খোলের ঘরগুলো খুঁজতে আরম্ভ করেছে। এ ঘরের দরজায় ও ঘরের কাঠের দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতেও হ্যারিকে খুঁজতে লাগল। একটা বন্ধ ঘরের দরজায় ফ্রান্সিস জোরে ধাক্কা দিয়ে ডাকল — 'হ্যারি!'

ভেতর থেকে হ্যারির উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল — 'কে? ফ্রান্সিস!'

ফ্রান্সিস আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না। সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় লাথি মারতে লাগল। কিন্তু দরজা ভাঙল না। মরচে ধরা কড়াটা একটু আলগা হল। তলাটা ঠিকই ঝুলতে লাগল। এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে একটা হাতলভাঙা হাতুড়ি নজরে পড়ল। সেটা এনে মরচে ধরা কড়াটায় দমাদ্দম ঠুকতে লাগল। কয়েকটা ঘা পড়তেই কড়াটা দুমড়ে ভেঙে গেল। খোলা দরজা দিয়ে হ্যারি কোনরকমে ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল।

ফ্রান্সিস দ্রুত বলল — এখন কথা বলার সময় নেই, ডেকে চলো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ফ্রান্সিস বুঝলো জাহাজটা আর তেমন দুলছে না। ডেকে উঠে দেখলো, জল-ঝড় তেমন নেই আর। তবে সমুদ্রে আকাশে এখনও পাতলা কুয়াশার আস্তরণ রয়েছে। হাওয়ায় কুয়াশা উড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। হলোও তাই। কুয়াশা উড়ে গেল। আকাশে দিগন্তের দিকে হেলে পড়া পাণ্ডুর চাঁদটা দেখা গেল। রাত শেষ হয়ে আসছে।

ফ্রান্সিস ডাকল - হ্যারি!

হ্যারি এগিয়ে আসতে ফ্রান্সিস বললো — চলো, হালের অবস্থাটা একবার দেখে আসি।

দেখা গেল, হালটা একেবারেই ভেঙে গেছে। তার সঙ্গে জাহাজের অনেকটা জায়গা ভেঙে হাঁ হয়ে গেছে। সব দেখে শুনে ফ্রান্সিস বললো — বে-হাল জাহাজ, কোথায় যে চলেছে তা ঈশ্বরই জানে।

— সে সব কাল ভাবা যাবে। এখন ঘুমিয়ে নেবে চল। হ্যারি তাগাদা দিলো।

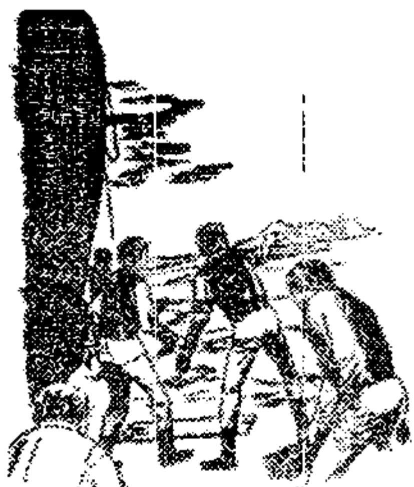
— হ্যাঁ চল। খুব পরিশ্রান্ত আমি। পা টলছে, দাঁড়াতে পারছি না। পরদিন ঘুম ভেঙে যেতেই ফ্রান্সিস ধড়মড় করে উঠল। সকাল হয়ে গেছে। সবাই অঘোরে ঘুমুচ্ছে। গত রাত্রির কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ডেকের দিকে ছুটল। ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলো, আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। সমুদ্রও শান্ত। সাদা রংয়ের সামুদ্রিক পাখিগুলো উড়ছে। তীক্ষ্ণস্বরে ডাকছে। কিন্তু এ কোথায় এলাম? একটা ধু-ধু মরুভূমির

মত জায়গায় জাহাজ কাত হয়ে বালিতে আটকে আছে। এখন আর ভাববার সময় নেই। সবাইকে ডেকে তুলতে হবে। জাহাজ মেরামত করতে হবে। তারপর সেই দ্বীপের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে।

ফ্রান্সিস সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। কাউকে ধাক্কা দিয়ে, কাউকে আস্তে পেটে ঘুঁষি মেরে, কারো পিঠে চাপড় দিয়ে সে গলা চড়িয়ে বলল -- ওঠ সব, ডেক-এ চল।

সবাই একে-একে উঠে পড়ল। উপরে ডেকে এসে দাঁড়াল। ডাঙার ধু-ধু বালির দিকে তাকিয়ে বোধহয় ভাবতে লাগল কোথায় এসে ঠেকলাম? ওদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল -— সবাই কথা বলতে লাগল। সবার মুখে একই প্রশ্ন -- কোথায় এলাম?

ফ্রান্সিস ডেকে এসে দাঁড়াল। সবাইকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, ভাইসব, জাহাজ কোথায় এসে ঠেকেছে, আমরা কেউই বলতে পারব না। ওসব ভাবনা পরে ভাবা যাবে।



লোকটা আঙুল তুলে সেই মরুভূমির মত ধু-ধু বালির দিগন্ত দেখাল।

এখন নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই। একদল চলে যাও রসুই ঘরে —- রান্নার বন্দোবস্ত করো। আর সবাই জাহাজ মেরামতির কাজে হাত লাগাও।

ফ্রান্সিস সেনাপতি আর তার দলের লোকেদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল — আপনাদেরও হাত লাগাতে হবে।

সেনাপতি আর তার সঙ্গীরা মুখ গোমড়া করে সকলের সঙ্গে চলল। ফ্রান্সিস আবার তার বন্ধুদের বিশ্বাস ফিরে পেয়েছে, এটা সেনাপতির দলের কাছে ভাল লাগল না। ওরা ধান্দায় রইল, কি করে ফ্রান্সিসকে অপদস্থ করা যায়।

জাহাজ থেকে কাঠের তক্তা নামানো হল। হালের জায়গাটায় যেখানে খোঁদল হয়ে গেছে, সেই জায়গাটা জোড়া দেবার কাজ চলল। নির্জন সমুদ্রতীর মুখর হয়ে উঠল ওদের হাঁকডাক কথাবার্তায়।

পূর্ণোদ্যমে কাজ চলছে। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল — ওটা কি? তার কণ্ঠে বিস্ময়। তার কথা যাদের কানে গেল, তারা ঘুরে লোকটার দিকে তাকাল। কি ব্যাপার? লোকটা আঙুল তুলে সেই মরুভূমির মত ধু-ধু বালির দিগন্ত দেখাল। সত্যিই তো। দিগন্ত রেখার একটু উঁচুতে কি যেন চিকচিক করছে। একটা, দুটো, তিনটে, অনেকগুলো। চিকচিক করছে যে জিনিসগুলো, সেগুলো চলন্ত। এদিকেই এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে সবাই সেদিকে তাকাল। সকলের চোখেমুখেই বিস্ময়। ওগুলো কি?

সবাই ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি জাহাজ থেকে ঝোলানো দড়ি বেয়ে জাহাজে উঠে পড়ল। রেলিঙে ভর দিয়ে দাড়িয়ে দিগন্ত রেখার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে খুব নিবিষ্টমনে দেখতে লাগল। একটু পরে নিচের দিকে তাকিয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল -- একদল সৈন্য আসছে কালো ঘোড়ায় চেপে। ওদের পরনেও কালো পোশাক। ওদের গলায় লকেটের মত কিছু ঝুলছে। লকেটে সূর্যের আলো পড়েছে,

তাই চিকচিক করছে। নিচে দাঁড়িয়ে থাকা আর সবাইও এতক্ষণে দেখতে পেল, একদল অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে বালির ঝড় তুলে ওদের দিকেই ছুটে আসছে।

ফ্রান্সিস দড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। এখন কি করা? সকলেই ফ্রান্সিসের দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস মাথা নীচু করে গম্ভীরভাবে চিন্তা করল। তারপর মুখে তুলে চীৎকার করে বললো — ওরা লড়তে চাইলে আমরাও লড়ব।

সবাই সমস্বরে হই-হই করে উঠল। চীৎকার করে উঠল—ও-হো-হো। এবার অস্ত্র সংগ্রহ। সেনাপতি আর তার দলের লোকদের তরবারিগুলো জাহাজ থেকে আনা হল। তাছাড়া যাদের তরবারি ছিল, তারাও সেগুলো নিয়ে এলো। ফ্রান্সিস সেনাপতি আর দলের লোকদের তরবারিগুলো বেছে বেছে কয়েকজনের হাতে দিলো। বাদ-বাকিরা হাতের কাছে যে-যা পেল জোগাড় করে নিয়ে এল। ভাঙা দাঁড়, লোহার শেকল, কুড়ুল, লোহার বড়-বড় পেরেক, কাঠের খুঁটি—এসব যে যা পেল, হাতে নিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়াল।

সৈন্যদল ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল। ফ্রান্সিস হিসেব করে দেখল সৈন্যরা সংখ্যায় ওদের চেয়ে বেশি নয়। সমানই হবে। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল — সবাই তৈরি থাকো, কিন্তু আমি না বলা পর্যন্ত কেউ এগিয়ে যাবে না। ওরা ঘোড়ায় যুদ্ধ করবে, ওদেরই সুবিধে বেশি। আমাদের প্রথম কাজই হবে, যেভাবে হোক ওদের মাটিতে ফেলে দেওয়া। তাহলেই জিত আমাদের।

সৈন্যদল অনেক কাছে এসে পড়েছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওদের।

কালো পোশাক পরনে। গলায় ঝুলছে চকচকে লকেট। আরো কাছে। ফ্রান্সিস ওদের ঘোড়া ছোটানোর ভঙ্গি দেখেই বুঝল, ওরা বন্ধুত্ব করতে আসছে না। ওদের লক্ষ্য যুদ্ধ। হঠাৎ ফ্রান্সিসের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল — এগোও — আক্রমণ করো —

প্রচণ্ড কোলাহল উঠল ভাইকিংদের মধ্যে। চীৎকার করতে-করতে সবাই ছুটল সৈন্যদলের দিকে।

প্রথম সংঘর্ষেই বেশ কিছু সৈন্য ঘোড়া থেকে বালির ওপর পড়ে গেল। ভাইকিংদের মধ্যেও আহত হ'ল কয়েকজন। ভাইকিং অশ্বারোহী সৈন্যদের পাঁজরে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিতে লগল। ভাঙা দাঁড়, পেরেক, কুড়ুল দিয়ে ওদের পেছনে আঘাত করতে লাগল। আরও কিছু সৈন্য বালির ওপর পড়ে গেল। এবার শুরু হলো হাতাহাতি যুদ্ধ। ফ্রান্সিসের বাছাই করা দল নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাতে লাগল। সৈন্যরা কিছুতেই ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। একে-একে সৈন্যরা প্রায় সবাই মারা গেল, নয়তো মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে বালির ওপর শুয়ে-শুয়ে গোঙাতে লাগল। জনা দশেক যারা বেঁচেছিল, ঘোড়ার পিঠে উঠে তারা পালাতে শুরু করল। ভাইকিংরা হই-চই করে তাদের তাড়া করলো। অশ্বারোহী সৈন্যরা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল। ভাইকিংদের মধ্যে খুশির বন্যা বয়ে গেল। সবাই আনন্দে চীৎকার করতে লাগল — কেউ নাচতে লাগল, কেউ হেঁড়ে গলায় গান ধরল। যুদ্ধে জয়ের উত্তেজনা স্তিমিত হতে সবাই আবার জাহাজ মেরামতির কাজে হাত লাগাল। আবার কাজ চালালো।

হঠাৎ চিক্‌চিক্ — বালির দিগন্ত রেখায় আবার লকেটের ঝিকিমিকি। ফ্রান্সিস হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকছিল। হ্যারি পেরেক এগিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ হ্যারি ডাকল — ফ্রান্সিস।

— কি?

— ওদিকে চেয়ে দেখ।

ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। দেখলো, দিগন্তরেখার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অজস্র লকেটের ঝিকিমিকি। এতক্ষণে সবাই দেখল। কাজ ফেলে দিয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। সবাই উত্তেজিত –– লড়াই হবে। একটু আগেই একটা লড়াইতে জিতেছে। সেই জয়ের উন্মাদনা এখনও কাটেনি। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইল। বালির ঝড় তুলে এগিয়ে আসছে কালো পোশাক পরা সৈন্যবাহিনী। সূর্যের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে লকেটগুলো। উত্তেজিত ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। কারও উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল — লড়বো আমরা, পরোয়া কিসের? সবাই চীৎকার ক'রে উঠল — ও-হো-হো।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। গভীরভাবে কি যেন ভাবল। তারপর মুখ তুলে সকলের দিকে তাকাল। গুঞ্জন থেমে গেল। সবাই উৎসুক হলো— ফ্রান্সিস কি বলে?

ফ্রান্সিস হাত থেকে হাতুড়িটা বালির ওপর ফেলে দিল। বলল –– না, আমরা লড়াই করব না।

ফ্রান্সিসের এই সিদ্ধান্ত অনেকেরই মনঃপুত হল না। আবার গুঞ্জন শুরু হল। সেনাপতি তার দলের লোকদের নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে শলাপরামর্শ করছিল। এবার সুযোগ বুঝে এগিয়ে এল। সেনাপতি বলল — ফ্রান্সিস, তুমি ভীরু কাপুরুষ, ভাইকিংদের কলঙ্ক। ভিড়ের মধ্যে কেউ-কেউ চীৎকার করে সেনাপতিকে সমর্থন করল। ফ্রান্সিস শান্তস্বরে বলল — আমাকে যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু এতগুলো মানুষের প্রাণ নিয়ে আমি ছিনিমিনি খেলতে পারব না।

— লড়তে গেলে প্রাণ নিতেও হবে, দিতেও হবে। তাই বলে কাপুরুষের মত আগে থাকতে হার স্বীকার করে বসে থাকবো? সেনাপতি ক্রুদ্ধস্বরে বলল।

ফ্রান্সিস আঙ্গুল দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে থাকা সৈন্য-বাহিনীকে দেখাল — বলল আন্দাজ করতে পারেন ওরা সংখ্যায় কত?

–– যতই হোক, আমরা লড়ব।

— সাধ করে নিশ্চিত মৃত্যুকে ডেকে আনছেন।

— তুমি ভীরু দুর্বল।

— বেশ আমার বন্ধুরা কি বলে শোনা যাক।

ফ্রান্সিস ভাইকিংদের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল — ভাইসব, আমি কাপুরুষ নই। তোমরা যদি লড়তে চাও, আমিও তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করব। কিন্তু তোমরা একটু ভেবে দেখ যদি ওরা আমাদের বন্দী করেও নিয়ে যায়, তবু সময় আর সুযোগ বুঝে আমরা পালাতে পারব। কিন্তু একবার এই লড়াইয়ে নামলে আর পালাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এই লড়াইতে আমরা কেউ বাঁচবো না।

সবাই ফ্রান্সিসের কথা মন দিয়ে শুনল। ফ্রান্সিস বলতে লাগল –– তোমরা হয়তো ভাবতে পারো লড়াই না করে হার স্বীকার করা কাপুরুষের কাজ। আমি বলল -— না! শুধু কবজির জোরে লড়াই হয় না, সঙ্গে বুদ্ধির জোরও চাই। আজকে আমরা লড়ব না, কিন্তু পরে লড়তে আমাদের হবেই, শত্রুর দুর্বলতার মুহূর্তে। একেই বলে বুদ্ধির লড়াই।

সবাই চুপ করে রইল। শুধু সেনাপতি গজরাতে লাগল - আমরা ভাইকিং, এভাবে হার স্বীকার করা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা। কিন্তু কেউ তাকে সমর্থন করল না। সেনাপতির দলের লোকেরা গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সুবিধে করতে না পেরে তারা চুপ করে গেল।

সেই কালো পোশাক পরা সৈন্যদল কাছাকাছি এসে ঘোড়ার চলার গতি কমিয়ে দিল। সারবন্দী হয়ে ওরা ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল। ওদের সেই সারি থেকে দুজনকে সকলের আগে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ফ্রান্সিস চমকে উঠল — একি! সুলতান আর রহমান। তা'হলে জাহাজডুবি হয়েও যে ভাসতে-ভাসতে যেখানে এসেছিলে, এবার জাহাজটাও সেইখানে এসেই ঠেকেছে।

সুলতান এবং ফ্রান্সিস দুজনেই দুজনকে দেখতে পেলেন। ফ্রান্সিসের সামনে ঘোড়া থামিয়ে সুলতান ক্রুর হাসি হাসলেন -- এই যে, পুরোনো বন্ধু দেখছি।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। সুলতান বললেন -- হ্যাঁ ভালো কথা, দুর্গের সেই জানালাটায় গরাদ লাগানো হয়েছে।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। সুলতান তরোয়াল খুলে সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিলেন — সব কটাকে বেঁধে নিয়ে চলো।

সৈন্যদল থেকে কিছু সৈন্য ঘোড়া থেকে নেমে এল। সবাইকে সারি বেঁধে দাঁড় করাল। জাহাজে যারা রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তাদেরও এনে সারিতে দাঁড় করানো হল। সকলের বাঁধা হাতের ফাঁক দিয়ে একটা লোহার শেকল টেনে নেওয়া হল। শেকলটার দুই মাথা দুজন অশ্বারোহী সৈন্যের হাতে রইল। পেছনে চাবুক হাতে একজন অশ্বারোহী সৈন্য চলল। বন্দীরা বালির উপর দিয়ে হেঁটে চলল। কেউ দল থেকে একটু পেছলেই চাবুকের ঘা পড়তে লাগল।

পায়ের নীচে বালি তেঁতে উঠেছে। গরম হাওয়া ছুটছে। এর মধ্যে দিয়ে বন্দীরা চলল। কেউ-কেউ ভাবল, এই অপমানের চেয়ে লড়াই করা অনেক ভাল ছিল। কিন্তু এখন আর সেই সুযোগ নেই। এখন ওরা বন্দী। বন্দীদের নিয়ে সুলতান যখন আমদাদ শহরে এসে পৌঁছলেন, তখন সূর্য পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে।

আমদাদ শহরের রাস্তার দু'পাশে ভিড় জমে গেল। সবাই অবাক হয়ে ভাইকিং বন্দীদের দেখতে লাগল। মরুভূমির ওপর দিয়ে এতটা পথ ওরা হেঁটে এসেছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে। পা দুটো যেন পাথরের মত ভারী। শরীর টলছে। অথচ দাঁড়াবার উপায় নেই, বসবার উপায় নেই। অমনি সপাং করে চাবুকের ঘা এসে পড়ছে।

দলের মধ্যে শুধু ফ্রান্সিসই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনও। একবারও পিছিয়ে পড়েনি। ওর মুখে ক্লান্তির কোন ছাপ নেই। কারণ বাইরের কোন কিছুই তাকে ছুঁতে পারছে না। ওর মাথায় শুধু চিন্তা আর চিন্তা — কি করে পালানো যাবে। এতগুলো মানুষের জীবনের দায়িত্ব তার ওপর, সে নিশ্চিন্ত থাকে কি করে?

সুলতানের প্রাসাদে যখন ওরা পৌঁছল, তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। প্রাসাদের সামনের চত্বরে একপাশে ঘোড়াশালের কাছে বন্দীদের বসতে বলা হল। সুলতান প্রাসাদের মধ্যে চলে গেলেন। রহমান কয়েকজন সৈন্যকে ডেকে পাঠাল। চত্বরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা কি সব পরামর্শ করতে লাগল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ফ্রান্সিসের দলের সবাই কাতর হয়ে

পড়ল। বিশেষ করে হ্যারি এমনিতে অসুস্থ ছিল, এখন প্রায় অজ্ঞানের মত হয়ে গেল

যে সৈন্য ক'জন ওদের পাহারা দিচ্ছিল, ফ্রান্সিস তাদের একজনকে কাছে ডাকল। সৈন্যটি কাছে এলে ফ্রান্সিস রহমানকে দেখিয়ে বলল   ওকে ডেকে দাও। পাহারাদার ফ্রান্সিসের কথা যেন শুনতে পায়নি, এমনি ভঙ্গিতে খোলা তরোয়াল হাতে যেমন হেঁটে বেড়াচ্ছিল, তেমনি হেঁটে বেড়াতে লাগল। ফ্রান্সিস চীৎকার করে বলে উঠল   পেয়েছ কি আমাদের? আমরা জন্তু-জানোয়ার? এতদূর পথ চাবুক খেতে-খেতে হেঁটে এসেছি। আমাদের খিদে পায় না, তেষ্টা পায় না?

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হওয়া মাত্র তার দলের লোকেরা হই-হই করে উঠে দাঁড়াল। পাহারাদার সৈন্যটা বেশ ঘাবড়ে গেল। কি করবে বুঝে উঠতে পারল না।

এখানকার চীৎকার হইচই রহমানের কানে গেল। সে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো। সব শুনে সে তখনি একজন সৈন্যকে সুলতানের কাছে পাঠাল। তারপর ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললো — সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু সুলতানের হুকুম না হলে কিছুই দেবার উপায় নেই।

— তাহলে ক্ষুধায় তেষ্টায় আমরা মারা যাই, এই চান আপনারা?

— সুলতান যদি তাই চান, তবে তাই হবে।

ফ্রান্সিসের দলের লোকেদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগল। শেকলে ঝনঝন শব্দ উঠল। কিন্তু কিছুই করবার নেই। তাদের হাত বাঁধা। শেকলের দুটো মুখ দেয়ালে গাথা।



সেই সৈন্যটা ফিরে এল। সুলতান বোধহয় অনুমতি দিয়েছে। রহমান জল আর খাবার আনতে হুকুম দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার এল। পিপে ভর্তি জল এল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই শুয়ে পড়ল। চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে। শুধু কয়েকজন মিস্ত্রীর হাতুড়ি পেটানোর শব্দে মাঝে-মাঝে ওদের ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। মিস্ত্রীরা মোটা মোটা কাঠ পুঁতে কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে দিলো জায়গাটা। এটাই হল ভাইকিংদের বন্দীশালা। বন্দীশালা তৈরী হলে সকলের হাত খুলে দেওয়া হল। বাইরে মিনারওয়ালা দরজার পাশেও মিস্ত্রীরা কাজ করছিল। ফ্রান্সিসের দলের লোকেরা কেউ জানতে পারেনি যে, ওখানে মিস্ত্রীরা একটা ফাঁসিকাঠ তৈরী করছিলো।

রাত্রি গভীর হলো। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু মিস্ত্রীদের হাতুড়ি ঠোকার [illegible] শব্দ ভেঙে দিচ্ছিল। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। দু'হাতে মাথা রেখে সে ওপরের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর চিন্তার যেন শেষ নেই। হঠাৎ একজন পাহারাদার কাঁটাতারের দরজার কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল — ফ্রান্সিস কে?

কেউ কোন উত্তর না দিতে লোকটা আবার বললো   ফ্রান্সিস কে?

প্রশ্নটা কয়েকজনের কানে যেতে তারা বললো — ফ্রান্সিসকে কেন?

সুলতান ডেকেছেন।

এইসব কথাবার্তা কানে যেতে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। সে যাবার জন্যে পা বাড়াল। কিন্তু যাদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তারা ফের চেঁচিয়ে বলল — না ফ্রান্সিস যাবে না। সুলতানকে এখানে আসতে বল।

চিৎকার আর কথাবার্তায় অনেকেরই ঘুম ভেঙে গেল। তারা সবাই একসঙ্গে রুখে দাঁড়িয়ে বললো — না, ফ্রান্সিস একা যাবে না।

এবার কাঁটাতারের দরজার কাছে রহমানের মুখ দেখা গেল। সে হেসে বলল — আমি ফ্রান্সিসকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের ভয় নেই, ওর কোন ক্ষতি হবে না।

ফ্রান্সিস হাত তুলে সবাইকে শান্ত করল। পাহারাদার কাঁটাতারের দরজার তালা খুলে দিল। ফ্রান্সিস বাইরে এসে রহমানের সামনে এসে বললো — চলুন।

রহমান ওকে সঙ্গে নিয়ে চলল। প্রাসাদে ঢোকার আগে রহমান একবার দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল — সুলতান তোমায় ডাকেননি।

— তবে?

— সুলতানের বেগম তোমাকে ডেকেছেন।

ফ্রান্সিস আশ্চর্য হল। বেগমের উদ্দেশ্য কি? কিন্তু — ফ্রান্সিস বলল — আমার মত একজন বিদেশীকে —

— বেগমের সঙ্গে কথা হোক, তাহলেই জানতে পারবে।

সুসজ্জিত ঘরের পর ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলে এল ওরা। অন্দরমহলের জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মেঝের দেয়ালে জাফরী কাটা জানালায় কি সুন্দর কারুকাজ! একসময়ে সিঁড়ি বেয়ে ওরা একটা পুকুরের সামনে এসে দাঁড়াল। পুকুরের চারিদিক শ্বেত পাথরে বাঁধানো। কাঁচের মত শান্ত জল টলটল করছে। পুকুরের ওপাশে বাগানে ফুলের গন্ধে বাতাস ভরে গেছে। বাগানের কাছে একটা দোলনা রূপোর শেকলে বাঁধা। দোলনায় কে যেন বসে আছে। রহমান ফিস ফিস করে বলল—বেগমসাহেবা দোলনায় বসে আছেন।

— একা?

— হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎটা খুবই গোপনীয়।

বেগম-সাহেবার কাছে গিয়ে রহমান আদাব করে সরে এল। ফ্রান্সিসও রহমানের দেখাদেখি আদাব করল। এখানে মশালের ক্ষীণ আলো এসে পৌঁছেছে, তাতে স্পষ্ট বেগমসাহেবার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তবু ফ্রান্সিস বুঝল, বেগমসাহেবা অপরূপা সুন্দরী। ভুরু দুটো যেন তুলিতে আঁকা। টানা লাল ঠোঁটের পাশে একটা তিল। মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠেছে বেগমের পোশাকের সোনার কারুকাজ করা নকশাগুলো।

— তুমিই ফ্রান্সিস? — সুরেলা গলায় বেগমসাহেবা প্রশ্ন করলেন।

— হ্যাঁ, — ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

— তুমি জানো সোনার ঘন্টা কোথায় আছে?

— না।

— কিন্তু সুলতান বলেন, তুমি নাকি সব জানো।

— আমি যা জানি সুলতানকে বলেছি।

— সেই মোহর দু'টোর কথাও বলেছো?

— কোন মোহর? — ফ্রান্সিস আশ্চর্য হল।

তোমার কাছে যে দুটো মোহর ছিল।

তার একটা বিক্রি করে দিয়েছি, আর একটা চুরি হয়ে গেছে।

— তুমি জানো, এ দু'টো মোহরের একটাতে সেই সোনার ঘন্টার দ্বীপে যাওয়ার, অন্যটাতে ফিরে আসার নকশা খোদাই করা ছিল।

— না, আমি জানতাম না।

— তুমি মিথ্যে কথা বলছো। মোহর দুটো তোমার কাছেই আছে।

ফ্রান্সিসের বেশ রাগ হলো। সে গম্ভীর স্বরে বলল — আমি মিথ্যে কথা বলছি না, বেগম-সাহেবা।

— তোমার মৃত্যু তুমি নিজেই ডেকে আনছো।

— তার মানে?

— দেউড়ির খিলানে এতক্ষণে ফাঁসিকাঠ তৈরি হয়ে গেছে।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল — তাহলে আমাকে —

— হ্যাঁ, তোমাকে কাল সকালে ফাঁসি দেওয়া হবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলতে পারল না। একবার মনে হলো, বেগমের কাছে সে প্রাণ ভিক্ষা করে। পরক্ষণেই মনে হল, না আমরা ভাইকিং। আমাদের মৃত্যু ভয় থাকতে নেই। আমার বন্ধুদের কী হবে?

— তারা বন্দী থাকবে।

ফ্রান্সিসের মন শান্ত হল। যাক, আমার বন্ধুরা তো বেঁচে থাকবে। বেগম-সাহেবা কি যেন ইঙ্গিত করলেন। রহমান এগিয়ে এসে আদাব করল। মৃদুস্বরে ফ্রান্সিসকে বলল — চল।

এদিকে ফ্রান্সিসকে নিয়ে রহমান চলে আসার পর ফ্রান্সিসের বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করতে লাগল। পরামর্শ মত সবাই যে যার জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু পরেই হঠাৎ একজন উঠে পরিত্রাহি চীৎকার শুরু করল। যেন সেই চীৎকার শুনেই উঠে পড়েছে, এমনি ভঙ্গি করে বেশ কয়েকজন ওর দিকে ছুটে এল। লোকটা তখন পেটে হাত দিয়ে গোঙাতে লাগল, আর মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। একজন পাহারাদার ওদের চীৎকার চ্যাঁচমেচি শুনে কাঁটাতারের দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালো — কি হয়েছে?

— দেখছো না, পেটের ব্যথায় কাতরাচ্ছে।

— ও কিছু হয়নি।

— বেশ, তুমি নিজেই দেখে যাও।

— হুঁ। পাহারাদারটা ঘুরে দাঁড়ালো।

তখন সবাই মিলে ওকে চটাতে লাগল — ব্যাটা সবজান্তা, তালপাতার সেপাই।

পাহারাদারটা ভীষণ চটে গেল। হেঁকে উঠল — এ্যাই!

কে মুখ ভেংচে ওর হাঁকের নকল মুখে করে বলে উঠল — এ্যাই!

আর যায় কোথায়! পাহারাদারটা তালা খুলে ভেতরে ছুটে এল। কিন্তু খাপ থেকে তরোয়াল খোলবার আগেই পাঁচ-ছয়জন একসঙ্গে ওর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেচারা টু শব্দটিও করতে পারল না। মাটিতে ফেলে কয়েকজন চেপে ধরল। বাদ-বাকিরা পাহারাদারের কোমর-বন্ধনীর কাপড়টা খুলে ফেলল তারপর ঐ কাপড় দিয়ে মুখ বেঁধে কোণায় ফেলে রাখলো।

এবার খোলা দরজা দিয়ে একজন বেরিয়ে বাইরের অবস্থাটা দেখতে গেল। দেখলো,

ওদের যে আর একজন পাহারা দাঁড়িয়েছিল সে দেউড়ির কাছে অন্য পাহারাদারদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। প্রাসাদের সম্মুখে দুজন পাহারাদার শুধু টহল দিচ্ছে। দেউড়ি দিয়ে পালানো যাবে না। ওখানে পাহারাদার সৈন্যদের সংখ্যা বেশি। একমাত্র পথ প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে যদি অন্য কোন দিক দিয়ে পালানো যায়। শেষ পর্যন্ত তাই স্থির হল। পা টিপে-টিপে সবাই বেরিয়ে এল। অসুস্থ হ্যারিকেও ওরা ধরা-ধরি করে সঙ্গে নিয়ে চলল। আস্তে-আস্তে নিঃশব্দে ওরা প্রাচীর টপকাল। প্রাচীরের ও'পাশেই দেখা গেল, একটা ছোট্ট বাগান মত। ফোয়ারাও আছে, তাতে। তারপরেই একটা দরজা। দরজাটা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। কয়েকটা ঘর পেরোতেই দেখা গেল লম্বামত একটা ঘর। টানা টেবিলের মত দেয়ালে কাঠের তক্তা লাগানো। কতরকম খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে। কোর্মা, কোপ্তা, শিক-কাবাবের গন্ধে ঘরটা ম-ম করছে। এতক্ষণে বোঝা গেল, ওরা রসুই ঘরে ঢুকে পড়েছে। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা। তারপরেই পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। খাবারের ওপর। দু'হাত ভরে যে যতটা পারল নিয়ে খেতে আরম্ভ করল। কামড়ে-কামড়ে মাংস খেতে লাগল। এক সঙ্গে এত লোক, তার ওপর খাওয়ার আনন্দ। অল্প-সল্প শব্দ হতে-হতে একেবারে হই-চই শুরু হয়ে গেল। ওরা বোধহয় ভুলেই গেল, যে ওদের পালাতে হবে। খাবারের ঘরের দরজা দিয়ে তরোয়াল হাতে সৈন্যদল ঢুকতে লাগল। সৈন্যরা ঘিরে ফেলে ওদের পিঠে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে হুকুম করল — চলো।

এতক্ষণে এরা সম্বিত ফিরে পেল। কিন্তু এখন আর কিছু করবার নেই। আবার সেই ফিরে আসতে হল কাঁটারে তার ঘেরা বন্দীশালায়।

ফ্রান্সিস ফিরে এসে দেখলো, প্রাসাদের সামনের চত্বরে সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটোছুটি করছে। কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। একজন সৈন্য রহমানকে এসে কি যেন বললো। রহমান ফ্রান্সিসকে বলল — কাণ্ড শুনেছ?

— কি?

— তোমার বন্ধুরা পালিয়েছে।

ফ্রান্সিস হাসলো, যাক, সমস্যার সমাধান ওরা নিজেরাই বুদ্ধি খাটিয়ে বের করেছে তাহলে। রহমান আড়চোখে ফ্রান্সিসকে হাসতে দেখে বলল — কিন্তু ফিরে আসতে হবে। এখান থেকে পালানো অত সহজ নয়।

ফ্রান্সিসকে কাঁটাতারের বন্দীশালায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ফ্রান্সিস দেখল, পাহারাদারের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। পালাবার সব পথই বন্ধ। যাক সান্ত্বনা, বন্ধুরা তো পালাতে পেরেছে। হঠাৎ পাথরে বাঁধানো চত্বরে অনেক মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফ্রান্সিস চমকে উঠল — তবে কি ওরা ধরা পড়ল?

দরজার তালা খোলার শব্দ হল। দরজা খুলে গেল। দেখা গেল ফ্রান্সিসের বন্ধুরা ঢুকছে। তখনও কারও হাতে পাঁঠার ঠ্যাং, কোর্মার মাংসের টুকরো, শিক-বেঁধা শিক-কাবাব। ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে অসুস্থ হ্যারিকে ধরল। তারপর ধরে এনে ওকে শুইয়ে দিল। কেউ কোন কথা বলল না। পরদিন যে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে, একথা ফ্রান্সিস কাউকে বলল না। শুধু বাইরের সৈন্যদের টহল দেওয়ার শব্দ শোনা গেল — টক্-টক্।

তখন সকাল হয়েছে। দেউড়ির কাছে যেখানে ফাঁসিকাঠ তৈরী হয়েছে, সারা আমদাদ শহরের মানুষ সেখানে এসে ভেঙে পড়ল। দুর্গে তুরী বেজে উঠল। একটু পরেই

ফাঁসিকাঠের পাশে ফ্রান্সিসের বন্ধুদের এনে দাঁড় করানো হল। ভীড়ের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সবাই বন্দীদের দেখতে চায়। ফ্রান্সিসকে দাঁড় করানো হল ফাঁসিকাঠের মঞ্চের ওপর। একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে সুলতান এলেন। পেছনে রহমান। রমহানের পেছনে ও কে? এ কি! এ যে সেনাপতিমশাই।

এদিকে হয়েছে কি, ফ্রান্সিসরা যখন ভোরের দিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন সেনাপতি একজন পাহারাদারকে ডেকে বলেছিল — আমি রহমানের সঙ্গে দেখা করতে চাই। পাহারাদারটি প্রথমে রাজী হয়নি। সেনাপতি তখন বলেছিল — রহমানকে শুধু বলবে ভাইকিং দেশের নৌবাহিনীর সেনাপতি দেখা করতে চায়। পাহারাদারটি কি ভেবে রাজি হল। একটু পরেই ফিরে এসে সেনাপতিকে নিয়ে গেল।

সবাই তখন অঘোর ঘুমে। শুধু অসুস্থ হ্যারি জেগেছিল। সে সবই দেখলো। বুঝল — সেনাপতি নিজের জীবন বাঁচাবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে। এতে যদি অন্যদের প্রাণও যায়, ও ফিরে তাকাবে না। হ্যারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে শুয়ে রইল! কাউকে ডাকলও না। ভোর থেকেই সেনাপতিকেও ওরা দেখতে পায়নি। এবার মানে বোঝা গেল। সেনাপতি সুলতানের দলে ভিড়ে গিয়েছে।

সুলতান আসতেই দর্শকদের মধ্যে উল্লাসের বন্যা বইল। চীৎকার করে সবাই সুলতানের জয়ধ্বনি করল। সুলতান ঘোড়া থেকে নেমে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে এলেন। ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে বললেন, ফ্রান্সিস, গলায় দড়ির ফাঁস পরাবার আগে এখনও সময় আছে বলো — সেই মোহর দুটো কোথায়?

— আমি জানি না।

— জাহাজ নিয়ে এসেছ, সোনার ঘন্টা নিয়ে যাবে বলে। এবার জাহান্নামে যাও, সেখানে সোনার ঘন্টার বাজনা শুনতে পাবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

সুলতান চীৎকার করে বলতে লাগলেন — আমাদের দরিয়ায় এসে আমাদেরই চোখের সামনে দিয়ে সোনার ঘন্টা নিয়ে যাবে, তোমাদের দুঃসাহস তো কম নয়? সুলতান এবার ফ্রান্সিসের বন্ধুদের দিকে তাকালো। বললো, আমি জাহাজ নিয়ে যাব, তোমাদের জাহাজও মেরামত করিয়ে দেব। তোমরা যদি জাহাজ চালানোর ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো, তবে তোমাদের আমি মুক্তি দেব।

সবাই চুপ করে রইল। হঠাৎ হ্যারি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো — আমরা যেতে রাজি, কিন্তু আমাদের ক্যাপ্টেন হবে কে?

সুলতান হাসলেন এবং বললেন — তোমাদেরই দেশের নৌবাহিনীর সেনাপতি।

— ওকে আমরা নেতা মানি না। আমরা ফ্রান্সিসকে চাই। হ্যারি বলল।

— হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরা ফ্রান্সিসকে চাই — সবাই চীৎকার করে উঠল।

সুলতান মুশকিলে পড়লেন। এই ভাইকিংদের মত দক্ষ জাহাজ-চালকদের ছাড়া তার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু নিজের এই সমস্যার আভাসও তিনি প্রকাশ পেতে দিলেন না। চীৎকার করে বলে উঠলেন — তোমরা যদি না যাও, তাহলে তোমাদের সকলের ফ্রান্সিসের দশা হবে। তাকিয়ে দেখ, ওকে কি ভাবে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে।

সুলতান রহমানকে কি যেন বললেন। রহমানের ইঙ্গিতে কালো কাপড়ের আলখাল্লা

পরা, কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা একজন লোক ফাঁসির মঞ্চে উঠে এল। সে এসে ঘাড়ধাক্কা দিতে দিতে ফ্রান্সিসকে দড়ির ফাঁসের কাছে নিয়ে এল। কালো কাপড়ের ফুটো দিয়ে লোকটার চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে।

ফ্রান্সিস সম্মুখের সেই দর্শকদের ভিড়ের দিকে তাকাল। বন্ধুদের দিকে তাকাল। দেখলো, হ্যারি চোখের জল মুছছে। আরও কেউ-কেউ অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, পাছে চোখের জল দেখে ফ্রান্সিস দুর্বল হয়ে পড়ে। ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকাল। ঝকঝকে নীল আকাশ। সাদা-সাদা হালকা মেঘ উড়ে যাচ্ছে। পাখি উড়ছে। কি সুন্দর পৃথিবী। ফ্রান্সিসের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। মা'র কথা, বাবার কথা মনে পড়ল। ছোট ভাইটাও কি ওর মতই আধপাগলা হবে? বাড়ির গেটের সেই লতা গাছটা একদিন সমস্ত দেওয়ালটায় ছড়িয়ে পড়বে। অজস্র নীল ফুল ফুটিয়ে জায়গাটাকে সুন্দর করে তুলবে। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ, তারাভরা আকাশ, ঢেউয়ের মাথায় সূর্য ওঠা — এসব আর কোনদিন দেখবে না সে।

কিন্তু ফ্রান্সিসের চিন্তায় বাঁধা পড়ল। কালো কাপড়ের মুখ ঢাকা লোকটা ফাঁসের দড়ি টেনে-টেনে পরীক্ষা করতে-করতে বিড়বিড় করে বলছে — ফাঁসটা আলগা, হাতের বাঁধনটা সময়মত কেটে নিও। পাটাতনের নীচে গর্তটা বুজিয়ে রেখেছি, নেমেই মাটি পাবে।

ফ্রান্সিসের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল — ফজল!

ফজল ধমকের সুরে বলল — তোমার মুখে যেমন খুশীর ভাব ফুটে উঠেছে, যেন ফাঁসি হবে না, বিয়ে হবে তোমার। হুঃ।

ফ্রান্সিস সাবধান হলো। ফজল বলতে লাগল — 'নীচে পড়েই দড়িটা ধরে দু'চারবার জোরে হ্যাঁচকা টান দেবে। তারপর চুপচাপ বসে থাকবে। রাত হলে পেছনের পাটাতনটা খুলে বেরোবে। সামনেই একটা ঘোড়া পাবে।'

ফজল থামলো। তারপর দুহাত তুলে সুলতানের দিকে ইঙ্গিত করল — সব ঠিক আছে। এবার সুলতানের হুকুম। সব গোলমাল থেমে গেল।

ফ্রান্সিস হঠাৎ হাত তুলে এগিয়ে এল। সুলতান জিজ্ঞেস করল — কি ব্যাপার।

— মরবার আগে আমার বন্ধুর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

— কে সে?

— হ্যারি।

সুলতানের হুকুমে হ্যারিকে ধরে ধরে মঞ্চে নিয়ে আসা হল। হ্যারি আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। ওর ছেলেবেলার বন্ধু ফ্রান্সিস। কত হাসি-কান্না মান-অভিমানের জীবন কাটিয়েছে ওরা। হ্যারি ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। ফ্রান্সিস নীচুস্বরে বলতে লাগল — হ্যারি, ভয় নেই, আমি মরবো না। যা বলছি, শোন। তোমরা কেউ সুলতানের বিরোধিতা বা সেনাপতির হুকুমের অবাধ্য হয়ো না। আমি আমাদের ভাঙা জাহাজটায় থাকবো। পরে দেখা হবে।

হ্যারি কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারল না। চোখ মুছে অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের দিতে তাকাতে-তাকাতে মঞ্চ থেকে নেমে এল।

ফজল ফ্রান্সিসের মাথায় কালো কাপড়ের ঢাকনা পরিয়ে দিল। কাপড়টা পরাবার সময় সকলের অলক্ষ্যে ফ্রান্সিসের হাতের বাঁধনটা আলগা করে দিল। তারপর গলায় দড়ির ফাঁসটা পরিয়ে সুলতানের দিকে তাকাল। আবার চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কি হয় দেখবার জন্যে

সবাই উদগ্রীব হয়ে আছে। সুলতান হাত তুলে ইঙ্গিত করল। ফজল ফ্রান্সিসের পায়ের নীচের পাটাতনটা এক টানে সরিয়ে দিল। ফ্রান্সিস ঝুপ করে নিচে পড়ে গেল। সকলেই দেখল দড়িটায় কয়েকটা হ্যাঁচকা টান পড়ল। দুলতে-দুলতে দড়িটা থেমে গেল।

ফ্রান্সিসের ফাঁসি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বধ্যভূমিতে উপস্থিত আমদাদবাসীরা উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। ওদের ফাঁসি দেখা হয়ে গেল। সুলতান, রহমান আর ভাইকিং সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। দর্শকরাও সব আস্তে-আস্তে চলে গেল। ভাইকিং বন্দীরে নিয়ে সৈন্যরা চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বধ্যভূমি নির্জন হয়ে গেল।

দুপুর গেল। সন্ধ্যে পার হল। রাত্রি বাড়তে লাগল। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস হাতের দড়ির বাঁধনটা খুলে ফেলল। তারপর আস্তে-আস্তে পেছনের পাটাতনটা ধরে নাড়া দিল। সত্যিই আলগা। ওটা খুলে এল সামনেই প্রাচীরের ধার ঘেঁষে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, লেজ ঝাপটাচ্ছে। ঘোড়াটার পিঠে জিন বাঁধা। ফ্রান্সিস একলাফে ঘোড়ায় চড়ে বসল। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে দ্রুত বেগে একটা গলিপথে ঢুকে পড়ল। আন্দাজে দিক ঠিক করে দুর্গের দিকে চলল। সমুদ্র ঐ দিকেই। একসময় হু-হু হাওয়া এসে লাগল। সেই সঙ্গে সমুদ্রের মৃদু গর্জন। ঐ তো সমুদ্র। ওপাশে দুর্গের টানা প্রাচীর। সমুদ্রের ধার দিয়ে ফ্রান্সিস বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছোটাল। অল্প অল্প চাঁদের আলোয় জল ঝিকমিক করছে। হু-হু হাওয়া শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। সারাদিনের বন্দীদশা, উপবাস, একফোঁটা জলও খেতে পায়নি। তবু মুক্তির আনন্দ, বেঁচে থাকার আনন্দ। ফ্রান্সিস প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাল। একটু পরেই দূর থেকে দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড কালো জন্তুর মত ওদের ভাঙা জাহাজটা কাত হয়ে পড়ে আছে জলের ধারে।



একটা জাহাজ আসছে এই দিকে।

কেবিন ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল ফ্রান্সিস। সারাদিন যে উত্তেজনা গেছে, শরীর আর চলছে না। কিন্তু খিদেও পেয়েছে ভীষণ। এতক্ষণে ও সেটা বুঝতে পারল। রসুই ঘরটা একবার দেখলে হয়। ফ্রান্সিস উঠে পড়ল। রসুইঘর খুঁজে পেতে দেখলো একজনের পক্ষে যথেষ্ট খাদ্য মজুত রয়েছে। যাক কয়েকদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। উনুন ধরিয়ে ময়দা-আটা-চিনি দিয়ে এক অদ্ভুত খাবার তৈরী করলো ফ্রান্সিস। খিদের জ্বালায় তাই খেলো গোগ্রাসে। তারপর একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুম।

সকাল হয়েছে। রোদ্দুরের তেজ তখনও বাড়েনি। ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করছে আর ভাবছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজটা মেরামত করতে হবে। আবার সমুদ্রে ভেসে পড়তে হবে। সোনার ঘণ্টা আনতেই হবে। কিন্তু কি করে হবে?

ফ্রান্সিস ভেবে-ভেবে কোন কুলকিনারা পেল না। পায়চারি করতে-করতে হঠাৎ ফ্রান্সিস থমকে দাঁড়াল। একটা জাহাজ আসছে এই দিকে। খুব সুন্দর ঝকঝকে একটা

জাহাজ। বাতাসের তোড়ে ফুলে ওঠা সাদা পালগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন উড়ন্ত রাজহাঁস। মাস্তুলে একটা পতাকা উড়ছে পত পত করে। ফ্রান্সিস ভাল করে লক্ষ্য করল হ্যাঁ, সুলতানের জাহাজ। পতাকায় বাদশাহী চিহ্ন ছুটন্ত ঘোড়া আর সূর্য আঁকা।

ফ্রান্সিস আর ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ মনে করল না। কেবিন ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। রাজ্যের চিন্তা মাথায় ভিড় করে এল। সুলতানের জাহাজ এদিকে আসছে কেন? তবে কি হ্যারি বিশ্বাসঘাতকতা করলো? অত্যাচারের মুখে সব বলে দিল? ফ্রান্সিসের হদিশ জানিয়ে দিলো? কিন্তু ওকে ধরিয়ে দিয়ে হ্যারির কি লাভ? লাভ আছে বৈকি? তাহলে সুলতান ওদের মুক্তি দেবে। সবাই দেশে ফিরে যেতে পারবে।

সুলতানের জাহাজটা বালিয়াড়িতে এসে ভিড়লো। ফ্রান্সিসের সব বন্ধুরা হই-হই করতে করতে জাহাজ থেকে নেমে এল। ফ্রান্সিস অনেকটা আশ্বস্ত হল। ওরা যখন এত আনন্দ হই-হুল্লা করছে, তখন নিশ্চয়ই অন্য কারণে জাহাজটা এখানে আনা হয়েছে। গা ঢাকা দিয়ে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ডেক-এ উঠে এল। মাস্তুলের আড়ালে লুকিয়ে সব দেখতে লাগল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা নেমে আসতেই সৈন্যের দল নেমে এসে ওদের ঘিরে দাঁড়াল তারপর সবাই দল বেঁধে এই জাহাজটার দিকে আসতে লাগল। আরো কিছুলোক তখন সুলতানের জাহাজ থেকে হাতুড়ী, পেরেক বড়-বড় কাঠের পাটাতন নামাতে লাগল। তাহলে ওদের ভাঙা জাহাজটা মেরামত হবে। ঐ লোকগুলো কাঠের মিস্ত্রী। ফ্রান্সিস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

মালপত্র নামানো হল। ফ্রান্সিসদের জাহাজটায় মেরামতির কাজ শুরু হল। ভাইকিংরাও হাত লাগাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্জন সমুদ্রতীর বহুলোকের হাঁকডাকে ভরে উঠল। ফ্রান্সিস আড়াল থেকে লক্ষ্য করল, হ্যারি কাজ করার ফাঁকে আড়চোখে এই জাহাজটার দিকে তাকাচ্ছে। বোধহয় ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ খুঁজছে।

দুপুর নাগাদ সুলতানের জাহাজে কার হাঁক শোনা গেল—খানা তৈরি। সবাই চলে এসো। সবাই কাজ রেখে দল বেঁধে জাহাজে খেতে চললো। শুধু হ্যারি থেকে গেল। কেউ-কেউ হ্যারিকে ডাকলে। হ্যারি বলল—হাতের কাজটা শেষ করেই যাচ্ছি। তোমরা এগোও।

জাহাজে ভাঙা হালের জায়গাটায় হ্যারি কাজ করছিল। সে জাহাজের আড়ালে পড়ে গেল। সুলতানের সৈন্যরাও খেয়াল করল না। সবাই জাহাজে উঠে গেল। হ্যারি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। যখন দেখলো কেউ ওকে লক্ষ্য করছে না তখন দড়ি বেয়ে ভাঙা জাহাজটায় উঠে এল। সুলতানের জাহাজ থেকে যাতে পাহারাদার সৈন্যরা দেখতে না পায়, তার জন্যে ডেকের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে সে কেবিনঘরে নামবার সিঁড়ির কাছে পৌঁছলো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চাপাস্বরে ডাকলো — ফ্রান্সিস!

ফ্রান্সিস মাস্তুলের আড়াল থেকে সবই দেখছিল। এবার ছুটে এসে হ্যারিকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলো। হ্যারি প্রথমে একটু চমকেই উঠেছিল পরক্ষণে গভীর আবেগে ফ্রান্সিসকে আলিঙ্গন করলো। দু'জনেরই চোখ জলে ভরে উঠল। আঃ! ফ্রান্সিস তাহলে সত্যিই বেঁচে আছে! সময় অল্প। বেশি কথা হল না। ফ্রান্সিস বললো — তোমরা কেউ সুলতান বা সেনাপতির হুকুমের বিরোধিতা করো না।

— সে সব আমরা ভেবে রেখেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাহাজ নিরাপদে নিয়ে যেতে পারবো তো?

হ্যাঁ, আমি দিনরাত শুধু ঐ ভাবনা নিয়েই আছি।

তোমার কি মনে হয়? পারবে?

নিশ্চয়ই পারবো, পারতেই হবে।

হঠাৎ বাইরের বালিয়াড়িতে বহুকণ্ঠের কলবর শোনা গেলো। হ্যারি দ্রুত উঠে দাঁড়াল। বললো — এখন চলি। নিশ্চয়ই ওরা আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

আবার দেখা হবে। ফ্রান্সিস হেসে হাত বাড়াল। হ্যারি আবেগে ওকে চেপে ধরল। এক মুহূর্ত। তারপরেই দ্রুত ডেকের রেলিঙে দাঁড়িয়ে তীরে বন্ধুদের জটলার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। সবাই হই-হই করে উঠল। যাক, হ্যারির কোন বিপদ হয়নি। হ্যারি দড়ি বেয়ে নেমে এল। তারপর বন্ধুরা ওর জন্যে যে খাবার নিয়ে এসেছিল, বালির ওপর বসে তাই খেতে লাগলো।

দিন পাঁচেক ধরে এইভাবে জাহাজ মেরামতির কাজ চললো, সুলতানের জাহাজে করে ভাইকিংরা আসে। সঙ্গে সৈন্য আর মিস্ত্রীরা। সারাদিন মেরামতির কাজ চলে। সন্ধ্যে নাগাদ আবার ওদের নিয়ে জাহাজটা আমদাদ বন্দরে ফিরে যায়।

জাহাজ মেরামত হয়ে গেল। নতুন পাল খাটানো হলো। জাহাজ রঙ করা হলো। দেখতে হলো যেন, ঝক্‌ঝকে নতুন জাহাজ একটা।

সেদিন হ্যারি লুকিয়ে ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করল। বললো—কালকে জাহাজ ছাড়বে।

— কখন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

— সকালবেলা।

— সুলতান যাচ্ছে নিশ্চয়ই।

— সে আর বলতে। সুলতানের নাকি ভালো করে ঘুমই হচ্ছে না।

— খুবই স্বাভাবিক — নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি ঘন্টা তো।

— মরুক গে। তুমি কিন্তু ডেকে উঠবে না।

— হুঁ। ফ্রান্সিস অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর জিজ্ঞেস করল — আচ্ছা, সুলতান সঙ্গে কত সৈন্য নিয়ে যাচ্ছে।

—ঠিক বলতে পারবো না। তবে রহমান বলেছিল, বাছাই করা সৈন্য নেওয়া হবে।

— হুঁ। ফ্রান্সিস নিজের চিন্তায় ডুবে গেল।

— লড়বে নাকি?

— সে সব সময় সুযোগ বুঝে।

হ্যারি আর বসলো না। ওকে না দেখতে পেলে সৈন্যদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। হ্যারি চলে গেল।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল ফ্রান্সিস। কত চিন্তা মাথায়। ঘুম আসতে চায় না। এক সময় ফ্রান্সিস উঠে পড়ল। দড়ি বেয়ে বালির ওপর নেমে এল। আকাশে চাঁদ, চারদিক ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। নতুন রঙ করা জাহাজটার দিকে তাকিয়ে রইল ফ্রান্সিস। সকালেই তো সমুদ্র যাত্রার শুরু। হয়তো এই যাত্রাই তার শেষ যাত্রা। হয়তো সবাই ফিরে যাবে দেশে, তার আর কোন দিন ফেরা হবে না। দেশ থেকে বহুদূরে এক অজানা সমুদ্রে তার মৃতদেহ ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে যাবে। হয়তো তার মৃত্যু নিয়ে দেশের লোকেরা কয়েকদিন জল্পনা-কল্পনা করবে। তারপর আস্তে-আস্তে সবাই তাকে একদিন ভুলে যাবে।

ফ্রান্সিস শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জাহাজটার দিকে। চাঁদের আলো যেন ঠিকরে পড়ছে জাহাজটার গা থেকে। চারদিকে সেই অসীম শূন্যতার মাঝখানে জাহাজটাকে মনে হতে লাগল, যেন কোন স্বপ্নপুরী থেকে ভেসে এসেছে। বালিয়াড়িতে কিছুক্ষণ পায়চারী করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল ফ্রান্সিস।

তখন সবে সকাল হয়ে সূর্য উঠেছে। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ওপরের ডেক-এ অনেক লোকের চলাফেরার শব্দ। দাড়ি-দড়া বাঁধছে। পাল খাটাচ্ছে। ওদের কর্মচাঞ্চল্যে ঘুমন্ত জাহাজটা জেগে উঠল।

ফ্রান্সিস উঠে বসলো। তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে যে ঘরটায় হ্যারিকে আটকে রাখা হয়েছিল, সেই ঘরটায় চলে এলো। এখন থেকে এই ঘরটাই হবে তার আস্তানা। সুলতানের সৈন্যদের চোখের আড়ালে থাকতে হবে। ওরা যাতে ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে, ফ্রান্সিস বেঁচে আছে, আর এই জাহাজেই আছে।

রহমানের কথাই ঠিক। সুলতান ভাইকিংদের চেয়ে বেশিসংখ্যক বাছাই করা সৈন্য সঙ্গে নিয়েছেন। কিছু রেখেছেন তাঁর নিজের জাহাজে আর বাকি সব ফ্রান্সিসদের জাহাজে। ভাইকিংদের পাহারা দিতে হবে তো! যদি জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়।

পাল খাটিয়ে দড়ি-দড়া বেঁধে দুটো জাহাজই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। দুটো জাহাজেই সুলতানের বাদশাহী চিহ্ন ছুটন্ত ঘোড়া আর সূর্য আঁকা পতাকা ভোরের হাওয়ায় পত্‌পত্‌ করে উড়ছে।

তখন সূর্য দিগন্তের একটু ওপরে উঠেছে। আলোর তেজ তখনও প্রখর হয়নি। সুলতান নিজের জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে রহমান আর ভাইকিংদের সেই সেনাপতি। সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে বেঢপ পোশাক পরা দাড়িওলা একটা লোক সুর করে কি যেন দ্রুত ভঙ্গিতে বলতে লাগলো। বোধহয় ঈশ্বরের কাছে দোয়া প্রার্থনা করা হচ্ছে। সুলতান মাথা নীচু করে শুনতে লাগলেন। লোকটা বলা শেষ করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। এবার সুলতান মাথা তুললেন। খাপ থেকে তরবারি খুলে নিলেন। তারপর তরবারিটা সমুদ্রের দিকে তুলে যাত্রার ইঙ্গিত করলেন। সকালের আলোয় সোনাবাঁধানো হাতলওলা তরবারিটা ঝকঝক করতে লাগল। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলতে শুরু করল। দাড়িরা দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজটা মাঝসমুদ্রের দিকে চললো। সুলতানের জাহাজটা চললো পেছনে-পেছনে। সমুদ্রের বুকে কিছুটা এগোতেই হাওয়া লাগল পালে। পালগুলো দুলে উঠল। পরিষ্কার আকাশের নীচে শান্ত সমুদ্রের বুকে দুটো জাহাজ, একটা সামনে আর একটা পেছনে। চলল জাহাজ দু'টো।



ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল — ঘুরে দাঁড়াও।

দিন যায়, রাত যায়। একা বদ্ধ ঘরে ফ্রান্সিসের দিন কাটে, রাত কাটে। হ্যারি সারাদিন একবার করে আসে। সব খবরাখবর দেয়। ভাইকিংদের মধ্যে বিশ্বস্ত কয়েকজন মাত্র

জানে, ফ্রান্সিস এই ঘরে আছে। তারা কিন্তু ফ্রান্সিসের কাছে আসে না। ফ্রান্সিসের ঘরের বাইরে পালা করে দিনরাত পাহারা দেয়। ওর খাবার-টাবার দিয়ে যায়। সবাই খুব সাবধান — - সুলতানের লোক যাতে ফ্রান্সিসের কোনো কথা না জানতে পারে।

একদিন এক কাণ্ড হলো। সেদিন গভীর রাত। ফ্রান্সিসের ঘরের সামনে পাহারাদার ভাইকিংটা ঘুমে ঢুলছে। হঠাৎ একটা খুট করে শব্দ হতেই সে চমকে উঠে দেখল, একটা ছায়া পিঁপের আড়ালে সাঁৎ করে সরে গেল। ও তাড়াতাড়ি পাটাতনের আড়ালে লুকনো তরবারি বের করল। কিন্তু আর কোন সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ একটা গড়গড় শব্দ হতেই ও চমকে ফিরে তাকাল। দেখলো, অন্ধকার থেকে দু-তিনটে পিঁপে ওর দিকে গড়াতে-গড়াতে ছুটে আসছে। প্রথম পিঁপেটার ধাক্কায় সে, কাঠের মেঝেটায় উপুড় হয়ে পড়ে গেল। অন্ধকার থেকে ছায়ামূর্তিটা ছুটে এসে পাহারাদারটার পিঠের ওপর চড়ে বসল। তারপর নিজের কোমর-বন্ধনীর কাপড় দিয়ে পাহারাদারের মুখটা বেঁধে ফেলল।

বাইরের পিঁপের গড়গড় শব্দে, পাহারাদারের উপুড় হয়ে পড়ার শব্দে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও নিঃশব্দে বিছানার তলায় লুকানো তরোয়ালটা বের করে পা টিপে-টিপে দরজার দিকে এগোল। কোনরকম শব্দ না করে দরজাটা খুলে বাইরে এসে দেখল, একটা ছায়ামুর্তি পাহারাদারের পিঠের ওপর চড়ে বসে আছে। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা ছায়ামূর্তির পিঠে ঠেকিয়ে বললো — উঠে পড়ো বাছাধন।

পাহারাদারের মুখ আর বাঁধা হল না। ছায়ামূর্তি আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। পাহারাদারটা গোঙাতে লাগলো। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বললো — ঘুরে দাঁড়াও।

ছায়ামূর্তি ঘুরে দাঁড়ালো। ফ্রান্সিসের চোখে তখন অন্ধকারটা সয়ে এসেছে। সে চোখ কুঁচকে ভালো করে দেখল। আরে? এ কি? এ যে ফজল। ফ্রান্সিস তরোয়াল ফেলে ফজলকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো। পাহারাদারটা তখনও গোঙাচ্ছে। ফজল তাড়াতাড়ি তার মুখ থেকে কাপড়টা খুলে দিল। পাহারাদারটা ওদের দুজনকে দেখেই হেসে উঠলো। ফ্রান্সিস পাহারাদারকে বলল — যাও ভাই ঘুমিয়ে নাও গে!

ফ্রান্সিস আর ফজল কাঁধ ধরাধরি করে ঘরে এসে বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস বলল — ফজল ভাই, তোমার ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারবো না।

— কি যে বলো তোমার কাছেও কি আমার ঋণ কিছু কম।

— অবাক কাণ্ড — তুমি এখানে এলে কি করে?

— তোমাকে চাবুক মারা, ফাঁসি দেওয়া, এসব দেখে রহমান আমাকে বেশ বিশ্বাসী লোক বলে ধরে নিয়েছিল। তারপর কিছু ঘুষও দিয়েছি। কাজেই সুলতানের সৈন্যদলে জায়গা পেতে খুব অসুবিধে হলো না।

— আমি এই জাহাজেই যাচ্ছি, তুমি বুঝলে কি করে?

ফজল হাসলো। বললো — সোনার ঘন্টা আনতে জাহাজ যাচ্ছে, আর তুমি বেঁচে থাকতে সেই জাহাজে যাবে না, এ কি হয়। ভাল কথা তোমাকে যে দুটো মোহর দিয়েছিলাম, সেগুলো আছে?

ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোহর বিক্রির কথা, মকবুলের মোহর চুরির কথাও বলল।

— মকবুল? ফজল বেশ চমকে উঠল।

— হ্যাঁ, লোকটা নিজের নাম বলেছিল মকবুল।

— কেমন দেখতে বলো তো?

— মোটাসোটা। গোলগাল বেশ হাসিখুশী।

— হুঁ। ফজল দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

— তুমি মকবুলকে চেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞাসা করলো।

— ফজল ম্লান হেসে কপালের কাটা দাগটা আঙ্গুল দিয়ে দেখালো — মকবুলের তরোয়ালের কোপের দাগ।

ফজল বলতে লাগল — হ্যাঁ, ভাই মকবুল আমার খুড়তুতো দাদা। বাবা আর খুড়ো মারা গেল। তারপর বিষয়সম্পত্তি নিয়ে লাগল গণ্ডগোল। বিষয়সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারর সময় পাওয়া গেল একটা পুরানো বাক্স। তাতে সেই মোহর দুটো। বংশ পরম্পরায় ঐ বাক্সটা প্রাপ্য ছিল মকবুলেরই, কিন্তু সে ভীষণ লোভী। একটা ছোট মরূদ্যান আমার ভাগে পড়েছিল। ঐ মরুদ্যানটার ওপর ওর লোভ ছিল বরাবর। সে বলল — তুই বরং এই মোহরের বাক্স বদলে আমাকে ঐ মরুদ্যানটা দে। আমি রাজী হলুম, কি হবে ঐ মরুদ্যানটা নিয়ে। আমি তো আর ব্যবসা করবো না। তার চেয়ে বরং আমাদের বংশের একটা স্মৃতি মোহরের বাক্সটাই আমি রাখি। মকবুলের হাতে পড়লে বিক্রি করে দেবে। আমি রাজী হলাম। মোহরের বাক্সটা আমার কাছেই রইল।

— তারপর?

— মকবুল নতুন পাওয়া সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যবসার ধান্ধায় আমদাদ গেল, হায়াৎ গেল, আরো কত জায়গায় ঘুরে বেড়ালো। আফ্রিকাও নাকি গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ একদিন বাড়ি এলো। মোহরের বাক্সটা আমার কাছ থেকে ফেরৎ চাইলো। আমি দেব কেন? ওকে তো চিনি। নিশ্চয়ই মোহর দুটো বিক্রি করে দেবে। আমি স্পষ্ট বলে দিলাম — এই বাক্স আমার, আমি দেব না।

— তারপর?

— সেই রাত্রেই মকবুল আমাকে খুন করতে এল। খুব ভাগ্যিস — আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তবু তরোয়ালের কোপ এড়াতে পারিনি। কপালে সেই চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছি।

— মকবুল মোহর দুটোর জন্যে এত পাগল হয়ে উঠেছিল কেন?

— কারণটা আমি পরে জেনেছি। সোনার ঘন্টা যে দ্বীপে রয়েছে, সেই দ্বীপে যাবার এবং ফিরে আসার দুটো পথেরই নকশা আঁকা আছে সেই মোহার দুটোতে।

— তাহলে কথাটা সত্যি? ফ্রান্সিস চিন্তিত স্বরে বললো।

— কি সত্যি?

— জানো ফজল, আমিও ঠিক এই কথা শুনেছি।

— তাই নাকি?

— হ্যাঁ।

— যা হোক এই কথাটা জানবার পরই আমি বাড়ি ছাড়লাম। মোহর দুটো রুমালে বেঁধে সব সময় আমার কোমরে রাখতাম। ইচ্ছে ছিল, ঐ নকশাটা কারো কাছে থেকে বুঝে নেব, তারপর কিছু টাকা জমিয়ে জাহাজ কিনে একদিন সোনার ঘন্টা আনতে যাবো। কিন্তু —

— কেন যেতে পারলে না?

আচ্ছা ফজল, তুমি আমাকে মোহর দুটো দিয়েছিলে কেন?

মকবুলের হাত থেকে মোহর দুটো বাঁচাবার জন্যে।

ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বললো — আশ্চর্য! নিজের জীবন বিপন্ন করেও তুমি যে মোহর দুটো হাতছাড়া করো নি — আমি খিদের জ্বালায় সেটা বিক্রি করে দিলাম।

তোমার দোষ নেই ভাই। আমারই বোঝা উচিত ছিল। তুমি বিদেশী কে তোমাকে চেনে? কে খেতে দেবে তোমাকে? আশ্রয়ই বা দেবে কে? যাকগে যা হবার হয়ে গেছে।

— তোমার কি মনে হয়? মকবুল সোনার ঘন্টার দ্বীপে যেতে পেরেছে?

— মনে হয় না। কারণ ও একটা মোহরই পেয়েছে। দুটো মোহর আছে জেনে নিশ্চয়ই অন্যটার খোঁজে আছে। জহুরী ব্যাটা সোনার লোভে অন্যটা বোধহয় এতদিনে গালিয়েই ফেলেছে।

গল্প করতে করতে দুজনের কারোরই খেয়াল নেই যে, রাত শেষ হয়ে এসেছে। ভোর হয়-হয়। হ্যারি ফ্রান্সিসের খোঁজখবর নিতে এল। তখন দুজনের খেয়াল হল যে ভোর হয়েছে। ফজল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। যে ঝোলানো দড়িটা বেয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এসেছিল সেটা বেয়েই নেমে গেল সমুদ্রের জলে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে সাঁতরাতে সাঁতরাতে সুলতানের জাহাজের কাছে গেল। ওখানে একই দড়ি ঝুলিয়ে নেমে এসেছিল। সেই দড়িটা বেয়ে জাহাজে উঠে গেল। তারপর দড়িটা তুলে রেখে পা টিপে-টিপে কেবিন ঘরের দিকে চলে গেল।

জাহাজ দুটো চলল। দিন যায়, রাত যায়। এদিকে ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। এক চিন্তা কি করে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে, ডুবো পাহাড়ের ধাক্কা এড়িয়ে সে সাদা মন্দিরের দ্বীপটায় জাহাজ নিয়ে যাবে।

হ্যারি আসে। দুজনে পরামর্শ হয়।

একদিন গভীর রাত্রে ফজল এলো। তাকে বেশ উত্তেজিত মনে হল। ফ্রান্সিস বেশ অবাকই হল। কি ঘটলো এমন? ফজল কোন কথা না বলে কোমর বন্ধনী থেকে সাবধানে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল। আস্তে-আস্তে ভাঁজ খুলে ফ্রান্সিসের সামনে পাতলো। পার্চমেন্ট কাগজের মত শক্ত পুরোনো কাগজ। হলদেটে হয়ে গেছে। বললো যে বাক্সটাতে মোহর দুটো ছিল, সেই বাক্সে এই কাগজটা পেলাম।

— কিছু লেখা আছে এটাতে?

— না। তবে আমার বেশ মনে আছে, মোহর দুটো এই কাগজটায় জড়ানো ছিল। একটু লক্ষ্য করে দেখো — অনেকদিন জড়ানো ছিল ব'লে দুটো মোহরের দুপিঠের আবছা ছাপ পড়েছে কাগজটাতে।

ফ্রান্সিস এবার উৎসুক হল। হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সত্যিই তাই। কাগজটার দুপাশে দুটো অস্পষ্ট ছাপ। একটাতে মাথার ছাপের মত। অন্যটাতে কয়েকটা ত্রিকোণের আভাস। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি পাহারাদারকে ডাকলো। বললো — রসুইঘর থেকে একটু কাঠকয়লার গুঁড়ো নিয়ে এসো।

খুব সন্তর্পণে ফ্রান্সিস সেই কাগজটায় কাঠকয়লার গুঁড়ো ঘষলো। আস্তে-আস্তে কালো ছাপগুলো স্পষ্ট হলো। একটাতে মাথা আঁকা। অন্যটাতে কয়েকটা ত্রিকোণ নকশা দেখা গেল। ফ্রান্সিস বললো — এটা উলটো ছাপ। আলোয় ধরলে সোজা ছাপ পাবো।

ফ্রান্সিস কাগজটাকে আলোর সামনে ধরল। একটা অস্পষ্ট নকশা ফুটে উঠল।

ফজল একটু উসখুস ক'রে ডাকলো — ফ্রান্সিস?

— কি হলো?

— এটা যাওয়ার পথের নকশা।

— হ্যাঁ। কিন্তু কয়েকটা চিহ্নের মানে বুঝতে পারছি না। ভাবতে হবে।

— কিন্তু আমি তো এখন —

— হ্যাঁ — হ্যাঁ তুমি জাহাজে ফিরে যাও। কাগজটা থাক আমার কাছে।

— বেশ — ফজল চলে গেল।

পরের দিন ফ্রান্সিস হ্যারিকে নকশাটা দেখালো। হ্যারি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। গম্ভীর মুখে বলল — ভুতুরে নকশা।

ফ্রান্সিস হাসলো। বললো—এই দেখ, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি—বলে ফ্রান্সিস 'ক' 'খ' করে প্রত্যেকটি চিহ্নের আলাদা নামকরণ করল। প্রত্যেকটি চিহ্নের অর্থ কি তাও বলল।

হ্যারি হতবাক হয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তারপর বলল — তুমি কি ক'রে বুঝলে ত্রিকোণগুলো পাথুরে দ্বীপ?

—ঝড়ের সময় মাস্তুলে উঠে ঠিক যা-যা দেখেছিলাম—নকশাটাতে তাই আঁকা আছে।

— তাহলে এটাই যাওয়ার পথের নকশা?

— নিশ্চয়ই। কিন্তু গোলমাল বাধিয়েছে 'ক' থেকে 'ঘ' পর্যন্ত এই অস্পষ্ট রেখাটা। রেখাটা আবার 'ঘ' দ্বীপটার চারদিকেও রয়েছে।

— এ তো সোজা।

— সোজা?

— হ্যাঁ, জাহাজটা এই পথে যাবে।

— ধোৎ ধোৎ, এ তো শিশুও বুঝবে — কিন্তু, প্রশ্ন হলো — কি করে?

হ্যারি এবার ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না। বললো—দাগটা মনে হয় সুতো।

— সুতো?

— হ্যাঁ — সুতো দিয়ে জাহাজটা টেনে নিয়ে যেতে বলছে।

ফ্রান্সিস এক মুহূর্ত হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইলো। পরক্ষণেই ওর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে আচমকা এক রদ্দা কষালো হ্যারির ঘাড়ে। হ্যারি বিছানা থেকে প্রায় ছিটকে পড়ে আর কি। ফ্রান্সিসের সেদিকে নজর নেই। সে তখন বিছানায় উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করেছে। হ্যারি ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে অবাক চোখে ফ্রান্সিসের নাচ দেখতে লাগল। নাচ থামিয়ে ফ্রান্সিস ডাকল — হ্যারি ঘাড়ে লেগেছে খুব?

— নাঃ — এমন আর কি! কিন্তু তোমার এই হঠাৎ পুলকের কারণটা কি?

— সুতো।

— সুতো?

— তুমি যে বললে, সুতো দিয়ে জাহাজ টেনে নিয়ে যাওয়া।

তুমি কি তাই করতে চাও নাকি?

— হ্যাঁ, তবে সুতো নয়, মোটা কাছি। দ্বীপটার চারদিকে গোল দাগ মানে কাছিটা দ্বীপের পাথরের সঙ্গে বাঁধতে হবে।

ফ্রান্সিস হ্যারির পাশে এসে বসলো। শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলো — আচ্ছা, হ্যারি, আমাদের জাহাজে কাঠের পাটাতন কত আছে।

আর একটা জাহাজ তৈরি করার মতো নেই।

কিন্তু একটা বেশ শক্ত নৌকো।

- হ্যাঁ, তা তৈরি করা যাবে।

— আর দড়ি-কাছি এ সব?

— যথেষ্ট আছে।

— আজ থেকে তাহলে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের দলের লোকদের ডেকে বলে দাও — সবাইকে হাত লাগাতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা শক্ত নৌকো তৈরি করতে হবে, আর একটা শক্ত লম্বা কাছি।

— কতটা লম্বা?

— যতটা লম্বা হতে পারে?

— বেশ।

দিন-রাত কাজ চললো। নৌকো, জাহাজ তৈরি করতে ভাইকিংরা খুবই দক্ষ। প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সবই জাহাজে মজুত থাকে। দিনকয়েকের মধ্যেই একটা নৌকো তৈরি হয়ে গেল। দড়ি-দড়া যা ছিল, পাক দিয়ে-দিয়ে বেশ শক্ত কাছিও তৈরি হলো একটা। এবার কুয়াশা, ঝড় আর ডুবো পাহাড়ের প্রতীক্ষা। পরদিন সকাল থেকেই সূর্যের আলো কেমন ম্লান হয়ে গেল। সমুদ্রের বুকে এদিক-ওদিক কুয়াশায় জটলা দেখা গেল। হ্যারি ছুটে এলো ফ্রান্সিসের কাছে। বললো — ফ্রান্সিস, আমরা এসে গেছি।

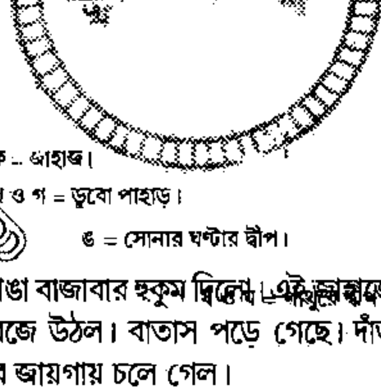
— কুয়াশা? ফ্রান্সিস শুধু এই কথাটাই বললো।

— হ্যাঁ।

— দাঁড়াও, সেনাপতি কি করে দেখা যাক।

—কিন্তু ওর ওপর নির্ভর করতে গেলে আমাদের জাহাজ টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে।

— সেনাপতিরও সেই ভয় আছে। দেখোই না, ও কি করে।



ক = জাহাজ।
খ ও গ = ডুবো পাহাড়।
ঙ = সোনার ঘণ্টার দ্বীপ।

সেনাপতি ছিল ফ্রান্সিসদের জাহাজে। সে শিঙা বাজাবার হুকুম দিলো। এই জাহাজে শিঙা বাজাতে সুলতানের জাহাজেও শিঙা বেজে উঠল। বাতাস পড়ে গেছে। দাঁড় টানতে হবে। পাল নামাতে হবে। সবাই যে যার জায়গায় চলে গেল।

জাহাজ চললো। চারদিকের কুয়াশা ঘন হতে লাগল। একটু পরেই পরেই প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপ্‌টায় ঢেউগুলো ফুলে উঠে জাহাজের গায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেনাপতি হুকুম দিল — দাঁড় বাইতে থাকো।

দাঁড়িরা প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজ একটু এগোয়, আবার ঝড়ের ধাক্কায় পিছিয়ে আসে। সেই ঝড়ের শব্দের মধ্যে সোনার ঘন্টা বেজে উঠল — ঢং-ঢং-ঢং।

সবাই সেই শব্দ শুনলো। সুলতান নিজের জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়েই সেই শব্দ শুনলেন। তাঁর চোখ দুটো ক্ষুধার্ত বাঘের মত জ্বলে উঠল। সোনার ঘন্টা — এত কাছে? সেই জল ঝড়ের মধ্যে সেনাপতি দেখলো — দুদিকে দুটো ডুবো পাহাড়। ঝড়ের ধাক্কাটা আসছে ডানদিক থেকে। ডানদিকের ডুবো পাহাড়ের জন্যে ভয় নেই। কারণ জাহাজ ওদিকে যাবে না। কিন্তু আর একটু এগোলে ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজটা বাঁদিকের ডুবো পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ছিটকে পড়বে। তারপরের কথা সেনাপতি আর ভাবতে পারলো না। সে আর এগোতে সাহস পেল না। জাহাজ ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসতে লাগল। দেখা গেল সুলতানের জাহাজটা এই জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। এই জাহাজের গায়ে এসে লাগল ওটা। ক্রুদ্ধ সুলতান ভাইকিংদের জাহাজে উঠে চীৎকার করে সেনাপতিকে ডাকলেন। সেনাপতি এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

— জাহাজ পিছিয়ে নিয়ে এলেন কেন?

— সামনেই ডুবো পাহাড়। পিছিয়ে না এলে এতক্ষণে দুটো জাহাজই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

— আমি কোন কথা শুনতে চাই না। আমাকে সোনার ঘন্টার দ্বীপে নিয়ে যেতেই হবে। সুলতান গর্জে উঠলেন।

সেনাপতি চুপ করে রইলো। সুলতান কিছুক্ষণ সেনাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন — কি? আপনি জাহাজ নিয়ে যেতে পারবেন না?

সেনাপতি মাথা নাড়ল — না।

সুলতান চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ানো ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বললেন — তোমাদের মধ্যে কেউ পারবে?

কেউ কোন কথা বলল না। সুলতান অসহিষ্ণু স্বরে মন্তব্য করলেন — ভাইকিংরা নাকি খুব সাহসী। জাহাজ চালাতে ওস্তাদ?

হ্যারি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বললো — কথাটা মিথ্যে নয়, সুলতান।

সুলতান কট্‌মট্ করে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন — বেশ, তার প্রমাণ দাও।

— ডুবো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

— তাহলে তোমরা কেউই পারবে না?

— একজন হয় তো পারে।

— কে সে?

— ফ্রান্সিস?

সুলতান অবাক চোখে হ্যারির দিকে তাকালেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন — তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো?

— আজ্ঞে না। ফ্রান্সিস বেঁচে আছে, আর এই জাহাজেই আছে।

সুলতান ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে রহমানের দিকে তাকালেন।

রহমান তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলো — কিন্তু ফ্রান্সিস বাঁচলো কী করে?

— আপনারা কি সেই ইতিহাসই শুনবেন এখন, না দ্বীপে যাবার চেষ্টা করবেন।

সুলতান এতক্ষণে যেন একটু শান্ত হলেন। ধীর স্বরে বললেন — যদি ফ্রান্সিস দুটো জাহাজই নিরাপদে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে ওকে মুক্তি দেবো।

বেশ। তাহলে ফ্রান্সিসকে ডাকি?

হ্যাঁ।

ফ্রান্সিস সিঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনছিল। এবার আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে সুলতানের সামনে দাঁড়াল। ভাইকিংরা ফ্রান্সিসকে দেখে অবাক। পরক্ষণেই সবাই আনন্দে চীৎকার করে উঠল। সুলতান ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন — তুমি বোধহয় সবই শুনেছ।

— হ্যাঁ, কিন্তু আমি একা মুক্তি চাই না, আমাদের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে।

সুলতান মাথা নীচু করে একটু ভাবলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন — বেশ। তাই হবে।

সুলতান আর কোন কথা না বলে নিজের জাহাজে ফিরে গেলেন।

ফ্রান্সিস এবার ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল — ভাইসব, আমি জানি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো। আমি জীবন দিয়েও তোমাদের সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখব।

সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠল। ফ্রান্সিস বললো — অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে আজকে আমরা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। জীবনের কোন দুঃখ-কষ্টই বৃথা যায় না। আমরা সফল হবোই। সোনার ঘন্টার সেই দ্বীপ আমাদের নাগালের মধ্যে। শুধু একটা বাধা ডুবো পাহাড়। সেই বাধা অতিক্রমের উপায় আমরা জানতে পেরেছি। এখন সবকিছু নির্ভর করছে আমাদের শক্তি সাহস আর বুদ্ধির ওপরে। তোমরা আমাকে সাহায্য করো।

সবাই চীৎকার করে ফ্রান্সিসকে উৎসাহিত করলো।

ফ্রান্সিস বলতে লাগল — এবার আমাদের কি কাজ তাই বলছি। কয়েকজন চলে যাও জাহাজের পেছনে। সুলতানের জাহাজটা আমাদের জাহাজের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধতে হবে। আর একদল চলে যাবে দাঁড় টানতে। বাকি সবাই থাকবে ডেকের ওপর।

ফ্রান্সিস একটু থেমে আবার বলতে লাগল — ঝড় শুরু হলেই আমি আর হ্যারি যে নৌকোটা আমরা তৈরি করেছি, সেটাতে চড়ে এগিয়ে যাবো। আমাদের সঙ্গে থাকবে একটা লম্বা কাছি। দুটো ডুবো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে একটু এগোতে পারলেই শান্ত সমুদ্র পাব। তার ডানপাশেই ন্যাড়া পাহাড়ের দ্বীপ। সেখানে পাহাড়ের মাথায় আমরা কাছির একটা প্রান্ত বাঁধবো। কাছিটার আর একটা প্রান্ত থাকবে ডেকে যারা দাঁড়িয়ে থাকবে, তাদের হাতে। আমি কাছিটার তিনবার ঝাঁকুনি দিলেই তারা কাছি টানতে শুরু করবে। দাঁড়িরা দাঁড় বাইতে শুরু করবে। দাঁড়িরা দাঁড় বাইতে শুরু করবে। দুটো জাহাজই বিনা বাধায় ডুবো পাহাড় পেরিয়ে যেতে পারবে। আমরা সফল হবোই।



সুলতান ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বোধহয় সবই শুনেছ।

সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠল — ও-হো-হো। ফ্রান্সিসের নির্দেশমত কাজে লেগে পড়ল সব। জাহাজ আবার এগিয়ে চলল সোনার ঘন্টার দ্বীপের দিকে। একটু পরেই কুয়াশার ঘন আস্তরণ ঘিরে ধরলো জাহাজটাকে। তারপরেই শুরু হলো ঝড়ের তাণ্ডব। ফ্রান্সিস আর হ্যারি নৌকোটা জলে ভাসালো। সেই মস্তলম্বা কাছির একটা প্রান্ত ধরে রইলো জাহাজের ডেকে দাঁড়ানো ভাইকিংরা। ফ্রান্সিস নৌকোর দাঁড় বাইতে লাগল। হালে বসল হ্যারি। ওরা কাছি ছাড়তে-ছাড়তে এগিয়ে চলল। কিন্তু সেই উঁচু-উঁচু ঢেউ পেরিয়ে এগোনো সোজা কথা নয়। তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, ঢেউয়ের ঝাপটা। ফ্রান্সিস প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগল। সেই প্রচণ্ড দুলুনি উপেক্ষা করে হ্যারি হাল ধরে চুপ করে বসে রইলো।

এমন সময় সোনার ঘন্টার গভীর শব্দ শোনা গেল — ঢং-ঢং-ঢং।

জাহাজ থেকে ভাইকিংরা মহা উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে ওদের সেই চীৎকারের শব্দ ফ্রান্সিস আর হ্যারি শুনতে পেল। আজকে চূড়ান্ত লড়াই। দুজনে নতুন উদ্যমে নৌকো চালাতে লাগল। প্রচণ্ড ঢেউয়ের ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস পাকা নাবিকের মত নৌকো চালাতে লাগল। এক-একবার মনে হচ্ছে নৌকোটা বোধহয় ঢেউয়ের গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে, আবার ঢেউয়ের মাথায় উঠে আসছে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস আবছা দেখলো বাঁদিকের ডুবো পাহাড়ের ভেসে ওঠা মাথাটা। সমুদ্রের জলের ঢেউ সরে যেতেই মাথাটা ভেসে উঠছে, পরক্ষণেই ডুবে যাচ্ছে। ঝড়ের ধাক্কাটা আসছে ডানদিক থেকে। কাজেই যে করেই হোক ডানদিক ঘেঁষেই ওদের বেরিয়ে যেতে হবে। নইলে ঝড়ের ধাক্কায় নৌকো বাঁদিকের ডুবো পাহাড়ে গিয়ে আছড়ে পড়বে। নকশাটাতে ডানদিক ঘেঁষে যাওয়ার নির্দেশ আছে। ফ্রান্সিস চীৎকার করে হ্যারিকে বললো — ডানদিক ঘেঁষে।

হ্যারি শক্ত করে হাল ধরে রইলো। আস্তে-আস্তে নৌকো এগোতে লাগলো। সমস্ত শরীর জলে ভিজে গেছে। যেন স্নান করে উঠেছে দুজনে। সমুদ্রের নোনা জলে চোখ জ্বালা করছে। তাকাতেও কষ্ট হচ্ছে। বুকে যেন আর দম নেই। হাত অবশ হয়ে আসছে। শুধু তো দাঁড়টানাই না, কাছিটাও শক্ত করে ধরতে হচ্ছে মাঝে মাঝে। সমস্ত কাছিটাই যাতে সমুদ্রের জলে পড়ে না যায়, তার জন্যে ফ্রান্সিস কাছির প্রান্তটি নৌকোর সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল।

হঠাৎ ডানদিকের ডুবো পাহাড়ের মাথাটা একবার ভেসে উঠেই ডুবে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে পর-পর কয়েকটা ঢেউয়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় নৌকোটা সামনের দিকে এগিয়ে এলো। আশ্চর্য আর বৃষ্টি নেই। হাওয়ার তেজও কমে গেছে। ফ্রান্সিস পেছন ফিরে তাকালো। নৌকো ডুবো পাহাড় ছাড়িয়ে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। তারও পেছনে জাহাজ দুটো। ঝাপসা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন দেখছে ফ্রান্সিস, ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজ দুটো একবার উঠছে, একবার পড়ছে। আর বৃষ্টি নেই। আকাশে জ্বলন্ত সূর্য। পরিষ্কার নির্মেঘ আকাশ। সমুদ্রের ঢেউ শান্ত। সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে দুদিকের পাথুরে দ্বীপ। আরো দূরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা পাহাড়ের দ্বীপ। পাহাড়ের মাথায় একটা সাদা রঙের মন্দির মত। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসল। হ্যারিও হাসল। কিন্তু আনন্দের সময় এখন নয়। আসল কাজই এখন বাকি।

ডানদিকের ন্যাড়া পাহাড়ের দ্বীপটায় ওরা নৌকো লাগাল। নৌকোয় বাঁধা কাছির মুখটা খুলে কাঁধে নিলো ফ্রান্সিস। তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগল। ছোট্ট পাহাড়। শ্যাওলা ধরা পেছল পাথরে সন্তর্পণে পা ফেলে-ফেলে ওরা এক সময় পাহাড়টার

মাথায় উঠে এল। তারপর কাছিটাকে শক্ত প্যাঁচ দিয়ে পাহাড়ের মাথায় বাঁধলো। টেনে দেখলো যথেষ্ট শক্ত হয়েছে। দুজনে মিলে কাছিটাকে যথাসাধ্য টান-টান করে ধরল। তারপর তিনবার জোরে ঝাঁকুনি দিলো। জাহাজের ডেকে যারা কাছিটার আর একটা প্রান্ত ধরে ছিল, তারা সংকেতটা বুঝতে পারল। তারা এবার সবাই মিলে কাছিটা টানতে লাগল। দাঁড়িদেরও খবর দেওয়া হলো। তারাও প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগল। জাহাজ দুটো সেই জল-ঝড়ের মধ্যে দিয়ে দোল খেতে-খেতে ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল। একসময় ডুবো পাহাড় দুটোও পেরিয়ে গেল। হঠাৎ আর বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই। শান্ত সমুদ্র। চারদিকে যতদূর চোখ যায়, শুধু ঝলমলে রোদ। সবাই আনন্দে চীৎকার করে উঠল। একদল ডেকের ওপর নাচতে শুরু করলো। কেউ-কেউ হেঁড়ে গলায় গান ধরলো। সুলতানের জাহাজেও আনন্দের বান ডাকলো। সৈন্যরা কেউ-কেউ চীৎকার করতে করতে শূন্যে তরোয়াল ঘোরাতে লাগল। সুলতান ডেকে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে-নেড়ে সবাইকে উৎসাহিত করতে লাগলেন।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি কাছি বেয়ে-বেয়ে জাহাজে উঠে এল। সবাই উঠে এলো ওদের জড়িয়ে ধরবার জন্যে। ওদের দুজনকে কাঁধে নিয়ে নাচা-নাচি শুরু হয়ে গেল। সেই শান্ত সমুদ্রের বুক ভরে উঠল বহু কণ্ঠের চীৎকার, হই-চই আনন্দধ্বনিতে। জাহাজ দুটো এবার চললো সামনের সেই ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের দ্বীপটার দিকে। চূড়োয় সাদা গোল মন্দিরটায় সূর্যের আলো পড়ছে। ওখানেই আছে সোনার ঘন্টা।

দূরত্ব বেশী নয়। একটু পরেই জাহাজ দুটো সবুজ ঘাসে ঢাকা দ্বীপটায় এসে ভিড়ল। দ্বীপে প্রথমে নামলেন সুলতান। তাঁর সঙ্গে রহমান, তারপর আরো কয়েকজন সৈন্য। সুলতান ফ্রান্সিসকে ডেকে পাঠালেন। ফ্রান্সিস ও হ্যারি আর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এলো। তারপর সবাই সেই ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের গা বেয়ে-বেয়ে উঠতে লাগল। খাড়া পাহাড় নয়, কাজেই পাথরের খাঁজে-খাঁজে পা রেখে ঝোপঝাড় ধরে উঠতে খুব একটা কষ্ট হলো না। মন্দিরের কাছে পৌঁছে সবাই থামলো। তাকিয়ে-তাকিয়ে গোল মন্দিরটা দেখলো। সাদাটে রঙের আস্তরণ মন্দিরটায়। এখানে-ওখানে সবুজ শ্যাওলার ছোপ। জাহাজ থেকে যতটা ছোট মনে হচ্ছিল, ততো ছোট নয়। মন্দিরটায় একটা মাত্র ছোট দরজা। দরজাটা খোলা। কোন পাল্লা নেই। সুলতান একাই মন্দিরটার দিকে এগোলেন। আর সবাই অপেক্ষা করতে লাগল। জাহাজের সবাই ডেকে এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে দেখছে এখানে কি ঘটছে। সবার মনেই বোধহয় এক প্রশ্ন — সোনার ঘন্টা কি এখানেই আছে?

সুলতান মন্দিরে মধ্যে ঢুকলেন। সবাই উৎকণ্ঠিত। সবাই যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপ হয়ে আছে। শুধু সমুদ্রে ঢেউয়ের ওঠা-পড়ার শব্দ। শুধু বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ। আর কোন শব্দ নেই। এতগুলো মানুষ। কারো মুখে কোন কথা নেই।

একটু পরে সুলতান ধীরে পায়ে মন্দিরটা থেকে বেরিয়ে এলেন। ফ্রান্সিসরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এসে একবার ফ্রান্সিসের দিকে আর একবার রহমানের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফ্রান্সিসের বুক দমে গেল। তবে কি সোনার ঘন্টা এখানে নেই? এত দুঃখ-কষ্ট, এত পরিশ্রম সব অর্থহীন? সব ব্যর্থ?

ফ্রান্সিস আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ছুটে মন্দিরটার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। কোথায়

সোনার ঘন্টা? মন্দিরটার মাথা থেকে পেতলের শেকলে ঝুলছে একটা পেতলের ছোট্ট ঘন্টা। চারদিকেই দেয়াল। আর কিছু নেই মন্দিরটাতে। রাগে-দুঃখে ফ্রান্সিসের চোখ ফেটে জল এলো। এই তুচ্ছ একটা পেতলের ঘন্টার জন্যে এত দুঃখ-কষ্ট? সেই ছেলেবেলা থেকে যে স্বপ্ন দেখে এসেছে, সেই স্বপ্ন, এইভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে? সোনার ঘন্টার গল্প তাহলে একটা ছেলেভুলোনো কাহিনী মাত্র? ফ্রান্সিসের মাথায় যেন খুন চেপে গেল। সে দুহাতে পেতলের ঘন্টাটা জোরে ছুঁড়ে দিলো দেওয়ালের গায়ে।

ঢং-ঢং-ঢং— প্রচণ্ড শব্দে ফ্রান্সিস ভীষণ চমকে উঠল। দুহাতে কান চেপে বসে পড়ল। একি? তবে— তবে কি — সমস্ত গোলাকার মন্দিরটাই একটা সোনার ঘন্টা?

ঢং-ঢং—ঘন্টার শব্দ বেজে চললো। বাইরে সুলতান, রহমান, হ্যারি, সঙ্গের সৈন্যরা, নীচে জাহাজের উৎসুক ভাইকিংরা সবাই প্রচণ্ড বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল গোল মন্দিরটার দিকে। এত বড় সোনার ঘন্টা! ঢং-ঢং, গম্ভীর শব্দ ছড়িয়ে পড়তে লাগল মাথার ওপরে নীল আকাশের নিচে শান্ত সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে দূর-দূরান্তরে।

সুলতানের মুখে হাসি ফুটলো। ফ্রান্সিস মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে হ্যারি তাকে জড়িয়ে ধরলো। আনন্দে অতগুলো মানুষের চীৎকার হৈ-হুল্লায় নির্জন দ্বীপ মুখর হয়ে উঠল। কিন্তু এই আনন্দ আর উল্লাসের মুহূর্তে কেউই লক্ষ্য করেনি, যে সেই ডুবো পাহাড়ের দিক থেকে একটা জাহাজ তীরবেগে সোনার ঘন্টার দ্বীপের দিকে ছুটে আসছে।

সেই জাহাজটাকে প্রথম দেখলো রহমান। সে সুলতানের কাছে ছুটে এলো। সুলতান তখন সোনার ঘন্টার বাইরের পলেস্তারটা কতটা শক্ত, তাই পরীক্ষা করছিলেন। রহমান সুলতানকে জাহাজটা দেখালো। তখন জাহাজটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এতক্ষণে সবাই দেখতে পেল সেই দ্রুত ছুটে আসা জাহাজটাকে। একটা কালো পতাকা উড়ছে জাহাজটার মাস্তুলে। তাতে সাদা রঙের মড়ার মাথার খুলি আর ট্যাড়ার মত দুটো হাড়ের চিহ্ন আঁকা। জলদস্যুদের জাহাজ। নীচের জাহাজ দুটোয় সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। সবাই যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে লাগলো। সুলতান, রহমান, ফ্রান্সিস সবাই দ্রুত পায়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসতে লাগল।

জলদস্যুদের জাহাজটা প্রথমে সুলতানের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। খালি গা, মাথায় কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা খোলা তরোয়াল হাতে জলদস্যুরা জাহাজে লাফিয়ে উঠে এল। এবার ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে লাগল। সেখানেও শুরু হল তরোয়ালের যুদ্ধ। চীৎকার, হই-চই, তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দ, আহত আর মুমূর্ষদের আর্তনাদে ভরে উঠল সমস্ত এলাকাটা। লড়াই চলতে লাগল। সুলতান রহমান, ফ্রান্সিস তারাও ততক্ষণে নেমে এসেছে। তারাও ঝাঁপিয়ে পড়ল তরোয়াল হাতে জলদস্যুদের উপর।

যুদ্ধ করতে-করতে হঠাৎ ফ্রান্সিস মকবুলকে দেখতে পেল। তার পরনে জলদস্যুদের পোশাক নয়, আরবীয়দের পোশাক। এতক্ষণে ফ্রান্সিসের কাছে সব স্পষ্ট হলো। তাহলে মকবুলই এই জলদস্যুদের সোনার লোভ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। যুদ্ধের ফাঁকে এক সময় ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে মকবুলকে ডাকলো — মকবুল, আমাকে চিনতে পারছো?

মকবুল ওর দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল — আমি বেঁচে থাকতে সোনার ঘন্টা কেউ নিয়ে যেতে পারবে না।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। নিপুণ হাতে তরোয়াল চালিয়ে জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল।

ফ্রান্সিস! ডাক শুনে ফ্রান্সিস পেছনে তাকিয়ে দেখল ফজল।

মকবুল এদের সঙ্গে এসেছে তাই না? ফজল জিজ্ঞেস করল।

— ঠিক ধরেছ।

কিন্তু ওরা এল কি করে?

— আমাদের জাহাজ অনুসরণ করে ওরা এসেছে। আমরা যেভাবে ডুবো পাহাড় পেরিয়েছি, ওরা ঠিক সেইভাবেই পেরিয়েছে।

— মকবুলকে দেখেছো?

— ঐ যে মাস্তুলটার ওপাশে লড়াই করছে।

ফজল আর দাঁড়ালো না। সেইদিকে ছুটলো। মকবুল কিছু বোঝবার আগেই ফজল মকবুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দুজনের লড়াই শুরু হয়ে গেল। মকবুলের তুলনায় ফজলের হাত অনেক নিপুণ। ফজল বেশ সহজ ভঙ্গিতেই তরোয়াল চালাচ্ছিলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মকবুল বেশ হাঁপিয়ে পড়লো। ফজলও হাঁপাচ্ছিল। একবার দম নিয়ে ফজল বললো—মরুদস্যুদের দলে ঢুকেছিলাম, শুধু এই তরোয়াল চালানো শেখবার জন্যে। তারপর কপালের কাটা দাগটা দেখিয়ে বলল—এটার বদলা নিতে হবে তো।

মকবুল কোন কথা না বলে তরোয়াল উঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবার লড়াই শুরু হল। প্রথম আক্রমণের মুখে ভাইকিং আর সুলতানের সৈন্যরা হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে তাদের বেশি সময় লাগল না। সুলতানের বাছাই করা সৈন্য আর দুর্ধর্ষ ভাইকিংদের হাতে জলদস্যুরা কচু-কাটা হতে লাগল। ওরা পিছু হটতে লাগল। দুজন একজন করে নিজেদের জাহাজে পালাতে লাগল। এদিকে মকবুল ফজলের সঙ্গে লড়াই করতে-করতে হঠাৎ দড়িতে পা আটকে ডেকের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে গেল। ফজল ওর বুকে তরোয়ালটা চেপে ধরল। দুজনেই ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে তখন। দেখতে পেয়ে ফ্রান্সিস ছুটে এলো। ফজলের হাত চেপে ধরে বলল — ফজল, ওকে মেরে ফেলো না।



মকবুল তলোয়ার উঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ফজল দাঁত চিবিয়ে বললো — আমি যদি না মারি, ও আমায় মারবে।

— তবু আমার অনুরোধ, ওকে ছেড়ে দাও।

ফজল এক মুহূর্ত ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল — বেশ। তোমার কথাই রাখলাম।

ফজল তরোয়াল সরিয়ে নিলো। মৃত্যু ভয়ে মকবুলের মুখটা কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। ও হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে যে ও বেঁচে গেল, এটা ওর বুঝতে সময় লাগল। কিছুক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে।

তারপর আস্তে-আস্তে উঠে বসল। ফ্রান্সিস ডাকলো — মকবুল!

মকবুল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালো।

— এই জলদস্যুরা কি তোমার বন্ধু? তুমি কি এদের সঙ্গে ফিরে যেতে চাও?

— না।

— এখনও ভেবে দেখো, ওরা কিন্তু জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে।

সত্যিই জলদস্যুরা তখন নিজেদের জাহাজে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। বাকি কয়েকজন গিয়ে উঠলেই জাহাজ ছেড়ে দেবে। মকবুল ভয়ার্ত চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালো। বললো — না-না, আমাকে ঐ জাহাজে আর পাঠিয়ো না।

—কেন? ফ্রান্সিস ব্যঙ্গ করে বললো—তোমার বন্ধু ওরা। তোমার জন্যে সোনার ঘন্টা উদ্ধার করে দিতে এসেছিলো। এক সঙ্গেই যেমন এসেছো, ফিরেও যাও একসঙ্গে।

— না-না, ওরা আমাকে পেলে হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

—হুঁ। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বললো—এবার আমার মোহরটা ফেরত দাও।

মকবুল কোমরবন্ধনী থেকে একটা থলে বের করলো। থলে থেকে ফ্রান্সিসের সেই চুরি যাওয়া মুদ্রাগুলো আর মোহরটা বের করে ফ্রান্সিসের হাতে দিলো। মোহরটা হাতে পেয়েই ফ্রান্সিস আর ফজল মোহরটার ওপর ঝুঁকে পড়লো। মনোযোগ দিয়ে উল্টো পিঠের দ্বীপ থেকে ফিরে আসার নকশাটা দেখতে লাগল।

মকবুল ক্রুর হাসি হেসে বললো — অন্য মোহরটা যদি পেতাম, তাহলে এই সোনার ঘন্টা তোমরা নিয়ে যেতে পারতে না।

— জানি। ফ্রান্সিস মোহরটা থেকে চোখ না সরিয়েই বললো।

জলদস্যুদের দল দ্রুত জাহাজ চালিয়ে সরে পড়লো। ওদের জাহাজ সমুদ্রের দিগন্তে মিলিয়ে যেতেই সুলতান সোনার ঘন্টা নামিয়ে আনার হুকুম দিলেন। সৈন্যরা সব দড়ি জোগাড় করে তৈরি হতে লাগলো।

নীচে জাহাজে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন সুলতানের হুকুমে মিস্ত্রীরা সোনার ঘন্টার গা থেকে পলেস্তারা খসাচ্ছিলো। এতক্ষরে পলেস্তারা খসানো শেষ হলো। সবাই কাজ ফেলে ডেকে এসে ভীড় করে দাঁড়ালো। সে এক অপরূপ দৃশ্য। বিস্ময়ে অবাক চোখে সবাই তাকিয়ে দেখতে লাগল।

অন্ধকার নামলো সোনার ঘন্টার দ্বীপে, বালিয়াড়িতে, সুদূর প্রসারিত সমুদ্রের বুকে। দ্বীপের সমুদ্রতীর বিরাট একটা কাঠের পাটাতন তৈরি করা হতে লাগল। ঐ পাটাতনে রাখা হবে সোনার ঘন্টা তারপর জাহাজের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে।

রাত গভীর তখন। আকাশে আধভাঙা চাঁদ। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ডেকের ওপরে পায়চারী করছে। কখনও দাঁড়িয়ে পড়ে দেখছে মশালের আলোগুলো কাঁপছে। ঠক্-ঠক্ পেরেক পোঁতার শব্দ উঠছে। মিস্ত্রীদের কথাবার্তাও কানে আসছে। কিন্তু ফ্রান্সিসের সেদিকে কান নেই। নিজের চিন্তায় সে ডুবে আছে। এত দুঃখ-কষ্টর পর সোনার ঘন্টা যদিও বা পাওয়া গেল, কিন্তু সেটাকে নিজের দেশে নিয়ে যাওয়া হলো না! ফ্রান্সিস পাহাড়ী দ্বীপের চূড়োর দিকে তাকালো! জ্যোৎস্না পড়েছে সোনার ঘন্টার মসৃণ গায়ে। একটা মৃদু আলো চারিদিক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ওটা যেন মাটিতে নেই। শূন্যে ভাসছে। স্বপ্নময় রহস্যেভরা এর অপার্থিব সৌন্দর্যের আভাস। ফ্রান্সিসের মন বিদ্রোহ করলো। অসম্ভব! এমন সুন্দর একটা জিনিস, যেটাকে ঘিরে তার আবাল্যের স্বপ্ন গড়ে

উঠেছে, সেটা এভাবে শুধু অর্থ আর লোকবলের জোরে সুলতান নিয়ে যাবে? আর ওরা তাকিয়ে দেখবে? না, এ কখনই হতে পারে না। আপন মনেই ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকাল না-না। যে করেই হোক, সোনার ঘন্টা তারা নিজের দেশে নিয়ে যাবে। এতে যদি তাদের জীবন বিপন্ন হয় হোক্।

পরদিন সকালেই ঘন্টার মাপ অনুযায়ী একটা মস্ত বড় কাঠের পাটাতন তৈরী হলো। এবার সোনার ঘন্টা নামিয়ে আনবার পালা। পাহাড়ের ঢালু গায়ে যে ক'টা খাটো গাছ ছিল, তাতেই দড়ি-দড়া বেঁধে কপিকলের মত করা হলো। তারপর সোনার ঘন্টা বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে নামানো হতে লাগল। কিন্তু দড়ি দড়ার কপিকল সোনার ঘন্টার অত ভার সহ্য করতে পারল না। দু'তিন জায়গায় দড়ি ছিঁড়ে গেল। একটা গাছ তো গোড়সুদ্ধ উপড়ে গেল। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে সোনার ঘন্টা ঢং-ঢং শব্দ তুলে গড়িয়ে পড়লো বালিয়াড়ির ধারে। কয়েকজন ছেঁড়া দড়িদড়াসুদ্ধ ছিটকে মারা পড়লো। কিন্তু সুলতানের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। হুকুম দিলেন, যে করেই হোক সোনার ঘন্টাকে কাঠের পাটাতনের ওপর তুলল। তারপর সেটাকে সুলতানের জাহাজের পেছনে বেঁধে যাত্রা শুরু হলো আমদাদ বন্দরের উদ্দেশ্যে।

মোহরের গায়ে যে নকশা আঁকা ছিল সেটা দেখে হিসাব করে ফ্রান্সিসই ফেরার পথের নিশানা বের করলো। জাহাজ দুটো চললো সেই পথ ধরে একটা অদ্ভুত পাহাড়ের নির্দেশ দেওয়া ছিল নকশাটায়। সেই উঁচু পাহাড়টার নীচে একটা সুড়ঙ্গ পথ। ফ্রান্সিস হ্যারিকে যখন নকশাটা বোঝাল, হ্যারি বলল — তাহলে এই সুড়ঙ্গ পথটা দিয়েই তো ফ্রান্সিস হাসল। বলল — প্রথমতঃ, এই সুড়ঙ্গ পথের খবর আমরা জানতাম না।

— আর দ্বিতীয় কারণ?

— আমার মনে হয়, ঐ পথ দিয়ে একটা জাহাজ এদিক থেকে ওদিকে যেতে পারে, কিন্তু ওদিক থেকে এদিকে আসতে পারে না।

— এ আবার হয় নাকি। হ্যারি অবাক হলো।

— প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল। ফ্রান্সিস হাসলো।

সন্ধ্যের সময় সেই উঁচু পাহাড়টায় দেখা পাওয়া গেল। কাছে যেতে সুড়ঙ্গ পথটাও দেখা গেল। একটা জাহাজ যেতে পারে, এমনি বড় পথ সেটা। ফ্রান্সিসের অনুমানই ঠিক।

সামনে রাত্রির অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে সুড়ঙ্গ পথে ঢোকা বিপজ্জনক। স্থির হলো সকালের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

পরদিন সকালে প্রথমে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ধীরে-ধীরে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকলো। একটু এগোতেই বাইরের আলো ম্লান হয়ে গেল। কেমন ছায়া-ছায়া হয়ে এল ভেতরটা। তবু মাথার ওপর ঝুঁকে পড়া ছাদ, দুপাশের পাথুরে দেওয়াল দেখা যাচ্ছিলো। সুড়ঙ্গটা একটা জায়গায় বাঁক নিয়েছে। খুব সতর্কতার সঙ্গে দেওয়ালে ধাক্কা না লাগিয়ে জাহাজটাকে বাঁক ঘুরিয়ে বের করে নিয়ে আসা হলো। বাঁক ঘুরতে এক অপূর্ব দৃশ্য! এদিকে ওদিকে থামের মত গোল এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে দেয়াল জল থেকে উঠে ওপরের ছাদের সঙ্গে লেগে আছে যেন। সেগুলোর গায়ে নীলাভ দ্যুতিময় পাথরের টুকরো। ওপরের পাথুরে ছাদেও কত বিচিত্র বর্ণের পাথর। সেই ছাদের গা বেয়ে কোথাও বা শীর্ণ ঝরণার মত জল পড়ছে। যেটুকু আলো সুড়ঙ্গের থেকে বাইরে আসছিল, তাই দ্বিগুণিত

হয়ে জায়গাটায় এক অপার্থিব আলোর জগৎ রচনা করেছে। বিচিত্র বর্ণের মৃদু আলোর বন্যা যেন। সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল।

ভাইকিংদের মধ্যে দু-একজন হাতুড়ি নিয়ে এলো। হাতের কাছে এত সুন্দর রঙিন পাথর। পাথুরে থামের গায়ে-গায়ে সেই নীলাভ পাথরের ঝিলিক। লোভ সামলানো দায়। ওরা নিশ্চয় থামগুলো ভেঙে পাথর নিয়ে আসতো। কিন্তু পারলো না ফ্রান্সিসের জন্যে।

ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে বলল — কেউ থামগুলোর গায়ে হাত দেবে না।

ফ্রান্সিসের গম্ভীর কণ্ঠস্বর সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

— কেন? হাতুড়ি হাতে একজন ভাইকিং বললো।

— এই থামগুলো পাহাড়টার ভারসাম্য রক্ষা করছে। যদি কোন কারণে ভেঙে যায়, সমস্ত পাহাড়টাই জাহাজের ওপর ভেঙে পড়বে।

সবাই বিপদের গুরুত্বটা বুঝলো। অগত্যা চেয়ে-চেয়ে দেখা ছাড়া উপায় কি? সবাই নিঃশব্দে সেই অপূর্ব স্বপ্নময় জগতের রূপ দেখতে লাগল। জাহাজ এগিয়ে চললো।

একসময় সুড়ঙ্গের ওপাশে আলো ফুটে উঠল। সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে আসছে। সুড়ঙ্গের মুখ ছেড়ে জাহাজটা বাইরের রৌদ্রালোকিত সমুদ্রের বুকে আসতেই সবাই আনন্দে হই-চই করে উঠল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল — কিছু লক্ষ্য করেছিলে?

— কি?

— সুড়ঙ্গটা ভেতরের দিকে একটা অদ্ভুত বাঁক নিয়েছে। এপাশের কোন জাহাজই সেই বাঁক পেরোতে পারবে না।

— হ্যাঁ, এটা সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার।

পর-পর সুলতানের জাহাজ আর 'সোনার ঘন্টা' বসানো কাঠের পাটাতনটাও সুড়ঙ্গ পেরিয়ে চলে এলো। আবার চললো জাহাজ শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে আমদাদ বন্দরের উদ্দেশ্যে।



'সোনার ঘন্টা'র দ্বীপ থেকে ফিরে আসবার সুড়ঙ্গ পথের নক্সা।

সবাই নিশ্চিন্ত। যাক, অনেকদিন পরে আবার মাটির ওপর পা ফেলা যাবে। ভাইকিংদের কাছে আমদাদ বিদেশ। তবু হোক বিদেশ, মাটি তো। সুলতানের আদেশে মিস্ত্রীরা এর মধ্যেই বড়-বড় চাকা বানাতে শুরু করেছে। সোনার ঘন্টা বসানো পাটাতনটা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত। চাকা লাগাতে পারলে কোন অসুবিধে নেই। ঘোড়া দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে। চাকা বানানোর কাজ চলছে পুরো দমে। জাহাজের সবাই খুসিতে মশগুল।

কিন্তু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। শুধু হ্যারিই ওর একমাত্র সমব্যথী। গভীর রাত্রে ডেকের ওপর দুজন দেখা হয়। সোনার ঘন্টার দিকে আঙুল দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলে — জানো হ্যারি, ওটা আমাদের প্রাপ্য, সুলতানের নয়।

— কিন্তু উপায় কি বলো!

উপায় — বিদ্রোহ।

সে কি! হ্যারি চমকে উঠে।

ফ্রান্সিস ডেকে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে বলে — কালকে রাত্তিরে কয়েকজন ভাইকিংকে নিয়ে এসো। সুলতানের সৈন্যদের একটু কায়দা করে হার স্বীকার করাতে হবে। তারপর সোনার ঘন্টা নিয়ে আমরা দেশের দিকে পাড়ি জমাবো।

- সুলতানের সৈন্যরা কিন্তু সংখ্যায় আমাদের প্রায় দ্বিগুণ।

— হ্যারি, আমি সব ভেবে রেখেছি।

পরের দিন গভীর রাত্রে ফ্রান্সিসের ঘরে সভা বসলো। কয়েকজন বিশ্বস্ত ভাইকিং এলো। কিভাবে বিদ্রোহ হবে, সুলতানের সৈন্যদের কিভাবে বোকা বানানো হবে, এসব কথা ফ্রান্সিস কিছু ভাঙলো না। শুধু ওদের মতামত চাইলো। দুজন বাদে সবাই ফ্রান্সিসকে সমর্থন করলো। সেই দুজন বললো — যদি বিদ্রোহ করতে গিয়ে আমরা হেরে যাই, সুলতান আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। কারণ ওর কাছে আমাদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

ফ্রান্সিস বলল—কথাটা সত্য! কিন্তু এ ছাড়া আমাদের উপায় কি? একবার আমদাদের রাজপ্রাসাদে সোনার ঘন্টা নিয়ে যেতে পারলে আমরা কোনদিনই ওটা উদ্ধার করতে পারবো না।

শেষ পর্যন্ত স্থির হল, অন্য ভাইকিং বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু ফ্রান্সিসের কপাল মন্দ। এ কান সে কান হতে হতে কথাটা সুলতানের কানে গিয়েও উঠলো। সুলতান সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভাইকিংদের কাছ থেকে তরবারি কেড়ে নেবার হুকুম দিলেন। তারপর নিরস্ত্র ভাইকিংদের জাহাজের নীচের কেবিনে বন্দী করে রাখা হল। সেনাপতি আর তার দলের লোকেরাও বাদ গেল না। সুলতান বোধহয় কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ফ্রান্সিসের বিদ্রোহের পরিকল্পনা সমস্ত ভেস্তে গেল।

তখনও সূর্য ওঠেনি। আবছা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দূরে আমদাদের দুর্গ চূড়া দেখা গেল। সূর্য উঠল। চারিদিক আলোয় ভেসে গেল। আমদাদ বন্দরের জাহাজ, লোকজন, দূর্গের পাহারাদার সৈন্য সব স্পষ্ট হল। বন্দর আর বেশি দূরে নেই।

জাহাজ দুটো বন্দরে ভিড়লো। কিন্তু এ কি হলো? জনসাধারণের মধ্যে সেই আনন্দ উল্লাস কোথায়? কই কেউ তো সুলতানের জয়ধ্বনি দিচ্ছে না। দলে দলে ছুটে আসছে না, সেই আশ্চর্য সোনার ঘন্টা দেখতে? সবাই যেন পুতুলের মত নিষ্প্রভ চোখে তাকিয়ে দেখছে সুলতানের জাহাজ তীরে ভিড়লো, পেছনে সোনার ঘন্টার পাটাতন, তারপর ভাইকিংদের জাহাজ।

সুলতান আর রহমান রাজপথ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চললেন রাজ প্রাসাদের দিকে। পেছনে হাতে দড়ি বাঁধা ভাইকিংদের দল। তাদের দুপাশে খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। তাদের পেছনে সোনার ঘন্টা টেনে নিয়ে আসছে আটটি ঘোড়া। চাকা বসানো পাটাতন গড়গড়িয়ে চলছে। এত কাণ্ড সব, তবু রাস্তার দুপাশে দাঁড়ানো আমদাদবাসীদের মধ্যে কোন উত্তেজনা নেই। সৈন্যরা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। এসব দেখে সুলতানের রাগ বেড়েই চললো। এর মধ্যে যে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে, সেটা সুলতান বা ভাইকিংরা কেউই জানতো না। ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুরা ভাইকিং রাজার জাহাজ নিয়ে পালিয়ে আসার কয়েকদিন পরে ভাইকিংদের রাজা মন্ত্রীকে সঙ্গে

নিয়ে সমুদ্রপথে যাত্রা শুরু করেন। রাজার সঙ্গে ছিল দু জাহাজ ভরতি সৈন্য। তারা ফ্রান্সিসের খোঁজ করতে-করতে এই আমদাদ নগরে এসে উপস্থিত হল। তখন সুলতান সৈন্য আর ভাইকিংদের নিয়ে সোনার ঘন্টার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন। সুলতানের সঙ্গে বাছাই করা সৈন্যরা চলে গেছে। ভাইকিংদের রাজা খুব সহজে যুদ্ধ করে আমদাদ দখল করে নিলেন। এবার সুলতানের আর ভাইকিংদের ফেরার জন্য অপেক্ষা করা।

যেদিন সুলতান সোনার ঘন্টা নিয়ে ফিরলেন, সেদিন রাস্তার দু'পাশের দাঁড়ানো লোকজন আর সুলতানের সৈন্যদের আগে থেকেই সতর্ক করে দেওয়া হল — সবাই যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সুলতান যেন ঘুনাক্ষরেও বুঝতে না পারেন, আমদাদ শহর বিদেশীরা দখল করে নিয়েছে। তাই সেদিন কোথাও না ছিল উত্তেজনা, না ছিল উল্লাস। সুলতানের প্রত্যেকটা সৈন্যের পেছনে দাঁড়িয়ে তাদের পিঠে তরোয়াল ঠেকিয়ে ভাইকিং সৈন্যরা আত্মগোপন করেছিল। কেউ যেন টু শব্দটি না করে। ভাইকিংদের রাজা চাইছিলেন — সুলতান যেন আগে থাকতে কোনো বিপদ আঁচ করে পালাতে না পারেন।

রাজপথ দিয়ে চলেছেন সুলতান। পেছনে বন্দী ভাইকিংরা। তারও পেছনে সোনার ঘন্টা। প্রাসাদের কাছে এসে সুলতান দেখলেন, প্রাসাদের প্রধান ফটকের কাছে একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে মন্ত্রী ও প্রধান-প্রধান অমাত্যরা বসে আছেন। মাঝখানে সুলতানের সিংহাসন, সেটা ফাঁকা। তার পাশে একটা সিংহাসনে বেগম বসে আছেন। সুলতান এগিয়ে চললেন।

হঠাৎ বেগম সিংহাসন থেকে নেমে এসে রাজপথ দিয়ে সুলতানের দিকে ছুটে আসতে লাগলেন। কারা যেন তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ততক্ষণে বেগম অনেকটা চলে এসেছেন। সুলতান স্পষ্ট শুনলেন, বেগম চীৎকার করে বললেন — পালাও, পালাও ভাইকিংরা এদেশ দখল করে নিয়েছে।

কিন্তু বেগম কথাটা আর দুবার বলতে পারলেন না। তার আগেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা বর্শা বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে তাঁর পিঠে ঢুকে গেল। বেগম রাজপথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। সুলতান ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে গিয়ে বেগমের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। বেগম ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন — পালাও।

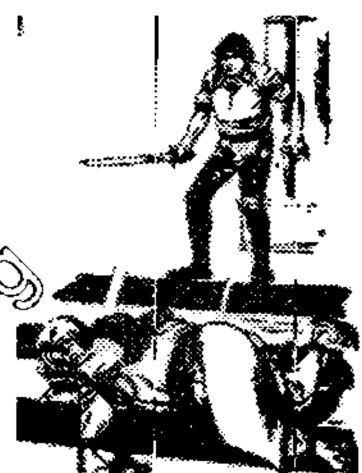
আর কিছু বলতে পারলেন না। তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

ততক্ষণে সুলতানের সৈন্যদের সঙ্গে ভাইকিং সৈন্যদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষেরা চীৎকার করতে করতে যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাতে শুরু করেছে। ব্যাপার দেখে ফ্রান্সিসরা তো অবাক। তারপর ওরা সব বুঝতে পারলো। ভাইকিং সৈন্যরা ছুটে এসে ওদের হাতের দড়ি কেটে দিলো। তরোয়াল হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সুলতানের সৈন্যরা প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগল। কিন্তু দুর্ধর্ষ ভাইকিং সৈন্যদের সঙ্গে তারা কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছিলো না। প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো। সুলতান নিজেও তখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁর নিপুণ তরোয়াল চালনায় বেশ কয়েকজন ভাইকিং ঘায়েল হলো। যুদ্ধের এই ডামাডোলের মধ্যে ভাইকিং সেনাপতি আর তার অনুচরেরা পালিয়ে গেলো।

যুদ্ধ করতে-করতে ফ্রান্সিস হঠাৎ দেখলো, সুলতান রক্তমাখা খোলা তরোয়াল হাতে ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস তরোয়াল উঁচিয়ে হাসলো। বললো — সুলতান, আমি এই দিনটির অপেক্ষাতেই ছিলাম। সুলতান সে কথার কোন জবাব না দিয়ে

জন্তুর মত ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফ্রান্সিস খুব সহজেই সে আঘাত ফিরিয়ে দিয়ে পালটা আক্রমণ করলো। শুরু হলো দুজন নিপুণ যোদ্ধার যুদ্ধ।

যুদ্ধ চললো। দুজনের নাক দিয়ে ঘন-ঘন শ্বাস পড়ছে। দুজনেই দুজনের দিকে কুটিল চোখে তাকাচ্ছে। আঁচ করে নিচ্ছে, কোন দিক থেকে আক্রমণটা আসতে পারে। একসময় সুলতানের আক্রমণ ঠেকাতে-ঠেকাতে ফ্রান্সিস মঞ্চের সিঁড়িতে পা রেখে রেখে ওপরে উঠে গেল। পরক্ষণেই পালটা আক্রমণ করলো। সুলতান এক পা এক পা করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন। হঠাৎ ফ্রান্সিসের পর-পর কয়েকটা তরোয়ালের আঘাত সামলাতে গিয়ে সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে গেলেন। গড়িয়ে গেলেন কয়েকটা সিঁড়ির নীচে। ঠিক তখনই চাকাওয়ালা কাঠের পাটাতনটায় করে সোনার ঘন্টাটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ একটা চাকা গেল ভেঙে। ঘোড়াগুলো টাল সামলালো, কিন্তু সোনার ঘন্টাটা রাজপথে পড়ে ঢং-ঢং শব্দ তুলে কয়েকবার গড়িয়ে গেল। সুলতান ঠিক তখনই মঞ্চের সিঁড়িটা থেকে ওঠবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু উঠতে আর পারলেন না। সোনার ঘন্টা গড়িয়ে সুলতানের ওপর গিয়ে পড়ল। সুলতান আর্ত-চীৎকার করে দুহাত তুলে সোনার ঘন্টাটাকে ঠেকাতে গেলেন, কিন্তু অত ভারী নিরেট সোনার ঘন্টা — পারবেন কেন! সিঁড়ির সঙ্গে পিষে গেলেন। একটা মর্মান্তিক চিৎকার উঠল। ধারেকাছের সকলেই ছুটে এলো। এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় ফ্রান্সিসও বিমূঢ় হয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো। কিন্তু ততক্ষণে সুলতানের রক্তাপ্লুত দেহ বারকয়েক নড়ে স্থির হয়ে গেছে। সুলতান মারা গেছেন।


সুলতান পা পিছলে পড়ে গেলেন।

ফ্রান্সিস! ডাক শুনে ফ্রান্সিস মঞ্চের দিকে তাকালো। দেখলো বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে ভাইকিংদের রাজা। দুজনেই মিটিমিটি হাসছেন। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল। রাজা বললেন — তুমি ভাইকিং জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছো।

— তবু — ফ্রান্সিসের বাবা বললেন, জাহাজ চুরির অপরাধটা?

রাজা বললেন — হ্যাঁ, শাস্তিটা তো পেতেই হবে। এই রাজত্বের শাসনভার তোমাকেই দিলাম।

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বলে উঠল দোহাই, ঐ-টি আমি পারবো না। জাহাজ চালানো, ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করা তরোয়াল চালানো, এসব এক জিনিস, আর একটা রাজত্ব চালানো, সে অন্য ব্যাপার। যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি, এই রাজত্বের ভার ফজলকে দিন।

— কে ফজল?

— আমার বন্ধু। সবদিকে থেকে ফজলের মত উপযুক্ত আর কেউ নেই। সেই এই

দেশেরই মানুষ। যাদের দেশ, তারাই দেশ শাসন করুন, এটাই কি আপনি চান না?

— নিশ্চয়ই চাই। বেশ! ডাক ফজলকে।

ফ্রান্সিস চারিদিকে তাকিয়ে ফজলকে খুঁজলো। কিন্তু কোথাও তার দেখা পেল না। ফ্রানিস বললো—ফজল এখানেই আছে কোথাও। আমাকে সময় দিন, ওকে খুঁজে বের করব।

— বেশ, রাজা সম্মত হলেন।

ফ্রান্সিস দেখলো যুদ্ধ থেমে গেছে। সুলতানের সৈন্যদের বন্দী করা হচ্ছে। সুলতানের মৃতদেহ ঘিরে শোকার্ত মানুষের ভীড়। ফ্রান্সিসের ভালো লাগছিল না এসব। নাঃ আবার বেরিয়ে পড়তে হবে। মাথার ওপরে অন্ধকার ঝোড়ো আকাশ, পায়ের কাছে পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়ছে, উন্মত্ত বাতাসের বেগ। জীবন তো সেখানেই।

ফ্রান্সিস পায়ে-পায়ে রাজার কাছে গিয়ে বললো—এবার একটা ভাল জাহাজ দেবেন?

রাজা সবিস্ময়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন — কেন?

— আফ্রিকার ওঙ্গালি বাজারে যাব —

— আবার?

— চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না — ফ্রান্সিস উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল — কি বিরাট হীরে! কি চোখ ধাঁধানো আলো ছিটকে পড়ছে!

ফ্রান্সিসের আর বলা হলো না।। পেছন থেকে বাবার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল — এখান থেকে আমার সঙ্গে সোজা বাড়ি ফিরে যাবে।

সমাপ্ত

হীরের পাহাড়

অনিল ভৌমিক



ফজল সুলতান হল। আমদাদ নগর জুড়ে খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হল্লা চলল সাতদিন ধরে। ভাইকিংদের রাজা, মন্ত্রী, ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুরা সকলেই আনন্দ-উৎসবে যোগ দিল।

সাতদিন পরে আনন্দ-উৎসব শেষ হল। এবার ঘরে ফেরার পালা। আমদাদ বন্দরে ভাইকিং-রাজার তিনটে জাহাজ তৈরী হল। জাহাজগুলোর কিছু মেরামতির কাজ ছিল, তাও শেষ হল। যে কাঠের পাঠাতনে সোনার ঘণ্টাটা রাখা হয়েছে, সেটা একটা জাহাজের পেছনে কাছি দিয়ে বাঁধা হল। রাজা, মন্ত্রী, ফ্রান্সিস, তার বন্ধুরা, আর সব সৈন্যরা সবাই জাহাজে উঠল। ফ্রান্সিস ফজলকে অনুরোধ করল, মকবুলকে যেন তার সঙ্গে যেতে দেওয়া হয়। ফজলের আপত্তি থাকার কোন কারণ নেই, কিন্তু মুশকিল হল ভাইকিংদের রাজাকে নিয়ে। তিনি বিদেশী বিধর্মী মকবুলকে নিজের দেশে নিয়ে যেতে রাজি হলেন না। ফ্রান্সিস রাজামশাইকে বোঝাল—মকবুল মানুষ হিসেবে খুবই ভাল। তার দায়িত্ব ফ্রান্সিস নিজেই নিল। রাজা আর আপত্তি করলেন না। ফ্রান্সিস তাদের নৌকোটা একটা জাহাজের সঙ্গে বেঁধে নিল। এই নৌকোটাতে করেই বিরাট লম্বা কাছি নিয়ে ফ্রান্সিসরা কুয়াশা-ঝড় আর ডুবো পাহাড়ের বিপদ পার হয়ে সোনার ঘণ্টা আনতে পেরেছিল। সবাই ঐ নৌকোটার কথা ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু ফ্রান্সিস তা ভোলে নি। নৌকোটাকে বরাবর নিজেদের জাহাজের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। আসল কথা, ফ্রান্সিস আবার পালাবার ফিকির খুঁজছিল। নৌকোটা থাকলে জাহাজ থেকে পালানো সহজ হবে। ফ্রান্সিসের এই পালানোর ফন্দীর কথা কেউ জানত না, জানত শুধু ফ্রান্সিসের বন্ধু হ্যারি। নৌকো করে জাহাজ থেকে পালিয়ে আফ্রিকায় নামা যাবে।

—তা যাবে। কিন্তু সেই পাহাড়টাতে যেভাবে ধ্বস নেমেছিল, তারপর এখন যে ওটার কী অবস্থা হয়েছে—

—পাহাড়ের অবস্থা যাই হোক, হীরেটা তো আর পালাবে না।

—হুঁ, কিন্তু আমাদের তো প্রথমে ওঙ্গালির বাজারে যেতে হবে। অনেকটা পথ।

—তাই যাব আমরা।

—বেশ আমার কোন আপত্তি নেই।

—মকবুল, তুমি হবে গাইড। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

—বেশ।

ফ্রান্সিস বলল—মকবুল সমস্ত ঘটনাটা আর একবার বলো তো।

—কোন্ ঘটনা?

—সেই হীরের পাহাড়ের সন্ধান তুমি কীভাবে পেয়েছিলে। কী ঘটেছিল সেখানে।

—কেন? তোমাকে তো সব ঘটনাই বলেছিলাম।

—আবার শুনতে চাইছি। ঘটনাটা আবার শুনলে বুঝতে পারব, ওখানে যে হীরেটা ছিল, সেটার কী হল।

—বেশ, শোন; বলে মকবুল বলতে আরম্ভ করল—আমি কার্পেট বিক্রীর ধান্দায় গিয়েছিলাম ওঙ্গালিতে। জায়গাটাতে তেকরুর বন্দর থেকে যেতে হয়। আমি ঘোড়ায়

টানা গাড়ীতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ গাড়ীর চাকাটা রাস্তায় পাথরের সঙ্গে লেগে গেল ভেঙে। কাছেই এক কামারের কাছে সারাতে দিলাম। কামারটার নাম বুঙ্গা। ওই আমাকে প্রথম সেই অদ্ভুত গল্পটা শোনাল। ওঙ্গালি থেকে মাইল পনেরো উত্তরে একটা পাহাড়। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পাহাড়টার মাঝা-মাঝি জায়গায় রয়েছে একটা গুহা। দূরে থেকে গাছ-গাছালি ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গুহাটার সমান্তরালে এসে সূর্যের আলো সরাসরি গিয়ে গুহাটায় পড়ে। তখনই দেখা যায় গুহার মুখে আর তার চারপাশের গাছের পাতায়, ডালে-ঝোপে এক অদ্ভুত আলোর খেলা। আয়না থেকে যেমন সূর্যের আলো ঠিকরে আসে, তেমনি রামধনুর রঙের মত বিচিত্র সব রঙীন আলো ঠিকরে আসে গুহাটা থেকে। অনেকেই দেখেছে এই আলোর খেলা। ধ'রে নিয়েছে ভূতুড়ে কান্ড কারখানা। ভূত-প্রেতকে ওরা যমের চেয়েও বেশী ভয় করে। কাজেই কেউ এই রঙের খেলার কারণ জানতে ওদিকে পা বাড়াতে সাহস করে নি।

—আচ্ছা, এই আলোর খেলা সারাদিন দেখা যেত ? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—উহুঁ, সূর্যের আলোটা যতক্ষণ সরাসরি সেই গুহাটায় গিয়ে পড়ছে, ততক্ষণই শুধু। তারপর আবার যে-কে সেই।

—সেই কামার বুঙ্গা সে-কি এর কারণ জানতে পেরেছিল ?

—না, ও গুহাটায় গিয়ে দেখে নি—তবে অনুমান করেছিল। বুঙ্গা বলেছিল—ঐ আলো হীরে থেকে ঠিকরানো আলো না হ'য়েই যায় না। ও নাকি প্রথম জীবনে কিছুদিন এক জহুরীর দোকানে কাজ করেছিল। হীরের গায়ে আলো পড়লে সেই আলো কীভাবে ঠিকরোয়, এই ব্যাপারটা ওর জানা ছিল। আমি তো বুঙ্গার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম।

—কেন ?

—ভেবে দেখ ফ্রান্সিস—অত আলো—মানে, আমি তো পরে সেই আলো আর রঙের খেলা দেখেছিলাম—মানে, ভেবে দেখ—হীরেটা কত বড় হলে অত আলো ঠিকরোয়।

—তারপর ?

—তারপর একদিন দড়ি-গাঁইতি এসব নিয়ে পাহাড়টার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যে করেই হোক, সেই গুহার মধ্যে ঢুকতে হবে। কিন্তু সেই পাহাড়টার কাছে পৌঁছে আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে গেল। নীচ থেকে গুহা পর্যন্ত পাহাড়টা খাড়া উঠে গেছে। কিছু ঝোপ-ঝাড়, দু'একটা জঙ্গলী গাছ, আর লম্বা-লম্বা বুনো ঘাস ছাড়া খাড়া পাহাড়ের গায়ে আর কিছুই নেই। নিরেট পাথুরে খাড়া গা। কামার ব্যাটা বেশ ভেবেচিন্তেই এসেছে বুঝলাম। ও বলল—চলুন আমরা পাহাড়ের ওপর থেকে নামবো। ভেবে দেখলাম সেটা সম্ভব। কারণ পাহাড়টার মাথা থেকে শুরু করে গুহার মুখ অবধি আর তার আশে-পাশে বেশ ঘন জঙ্গল। দড়ি ধ'রে নামা যাবে। একটু থেমে মকবুল বলতে লাগল—সন্ধ্যের আগেই পাহাড়ের মাথায় উঠে বসে রইলাম। ভোরবেলা নামার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলাম। পাহাড়টার মাথায় একটা মস্ত বড় পাথরে দড়ির একটা মুখ বাঁধলাম। তারপর দড়ির অন্য মুখটা ঝুলিয়ে দিলাম। দড়ির মুখটা গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছল কিনা, বুঝলাম না। কপাল ঠুকে দড়ি ধরে ঝুলে পড়লাম। দড়ির শেষ মুখে পৌঁছে

দেখি, গুহাটা তখনও অনেকটা নীচে। সেখান থেকে বাকি পথটা গাছের ডাল, গুঁড়ি, লতাগাছ এসব ধরে-ধরে শ্যাওলা-ধরা পাথরের ওপর দিয়ে সন্তর্পণে পা রেখে একসময় গুহাটার মুখে এসে দাঁড়ালাম। বুঙ্গাও কিছুক্ষণের মধ্যে নেমে এল। ও যে বুদ্ধিমান, তো বুঝলাম ওর এক কাণ্ড দেখে। বুঙ্গা দড়ির মুখটাতে আরও দড়ি বেঁধে নিয়ে পুরোটাই দড়ি ধরে এসেছে। পরিশ্রমও কম হয়েছে ওর।

—তারপর? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—দু'জনেই গুহাটায় ঢুকলাম। একটা নিস্তেজ মেটে আলো পড়েছে গুহাটার মধ্যে। সেই আলোয় দেখলাম, কয়েকটা বড়-বড় পাথরের চাঁই—তারপরেই একটা খাদ থেকে উঠে আছে একটা ঢিবি। ঠিক পাথুরে ঢিবি নয়। অমসৃণ এবড়োখেবড়ো গা—অনেকটা জমাট আলকাতারার মত। হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ শক্ত। সেই সামান্য আলোয় ঢিবিটার যে কি রঙ, ঠিক বুঝলাম না। তবে দেখলাম ওটা নীচে অনেকটা পর্যন্ত রয়েছে, যেন কেউ পুঁতে রেখে দিয়েছে। বুঙ্গা এতক্ষণ গুহার মুখের কাছে এখানে-ওখানে ছড়ানো-ছিটানো বড়-বড় পাথরগুলোর ওপর একটা ছুঁচোলো-মুখ হাতুড়ির ঘা দিয়ে ভাঙা টুকরোগুলো মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল। তারপর হতাশ হয়ে ফেলে দিচ্ছিল। আমি বুঙ্গাকে ডাকলাম—বুঙ্গা দেখতো এটা কিসের ঢিবি? বুঙ্গা কাছে এল। এক নজরে ঐ এবড়োখেবড়ো ঢিবিটার দিকে তাকিয়েই বিস্ময়ে ওর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। ওর মুখে কথা নেই। ঠিক তখনই সূর্যের আলোটা সরাসরি গুহাটার মধ্যে এসে পড়ল। আমরা ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। সেই এবড়ো-খেবড়ো ঢিবিটায় যেন আগুন লেগে গেল। জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড যেন। সে কি তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ! সমস্ত গুহাটায় তীব্র চোখ ঝলসানো আলোর বন্যা নামল যেন। ভয়ে-বিস্ময়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম—বুঙ্গা শীগগির চোখ ঢাকা দিয়ে বসে পড়—নইলে অন্ধ হয়ে যাবে।

দু'জনেই চোখ ঢাকা দিয়ে বসে পড়লাম। কতক্ষণ ধরে সেই তীব্র, তীক্ষ্ণ চোখ-অন্ধ-করা আলোর বন্যা বয়ে চলল, জানি না। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। ভয়ে-ভয়ে চোখ খুললাম। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারিদিকে। অসীম নৈঃশব্দ। হঠাৎ সেই নৈঃশব্দ ভেঙে দিল বুঙ্গার ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না। অবাক কাণ্ড! ও কাঁদছে কেন? অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে বুঙ্গার কাছে এলাম। এবার ওর কথাগুলো স্পষ্ট শুনলাম। ও দেশীয় ভাষায় বলছে—অত বড় হীরে—আমার সব দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে—আমি কত বড়লোক হয়ে যাব। বুঝলাম, প্রচণ্ড আনন্দে, চূড়ান্ত উত্তেজনায় ও কাঁদতে শুরু করেছে। অনেক কষ্টে ওকে ঠাণ্ডা করলাম। আস্তে-আস্তে অন্ধকারটা চোখে সয়ে এল। বুঙ্গাকে বললাম—এসো, আগে কিছু খেয়ে নেয়া যাক।

কিন্তু কাকে বলা! বুঙ্গা তখন ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গেছে। হঠাৎ ও উঠে গেল ঢিবিটার দিকে। হাতের ছুঁচলো হাতুড়িটা দিয়ে আঘাত করতে লাগল ওটার গায়ে। টুকরো-টুকরো হীরে চারিদিকে ছিটকে পড়তে লাগল। হাতুড়ির ঘা বন্ধ করে বুঙ্গা হীরের টুকরোগুলো পকেটে পুরতে লাগল। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতুড়িটা নিয়ে। আবার হীরের টুকরো ছিটকোতে লাগল। আমি কয়েকবার বাধা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু উত্তেজনায় ও তখন পাগল হয়ে গেছে।

—তারপর? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

একবার বুঙ্গা করল এক কাণ্ড ! গুহার মধ্যে পড়ে থাকা একটা বড় পাথর তুলে নিল। তারপর দু'হাতে পাথরটা ধরে হীরেটার ওপর ঘা মারতে লাগল, যদি একটা বড় টুকরো ভেঙে আসে। কিন্তু হীরে ভাঙা কি অত সোজা ? সে কথা কা'কে বোঝাব তখন ? ও পাগলের মত পাথরে ঘা মেরেই চলল। ঠক্—ঠক্ পাথরের ঘায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল গুহাটায়। হঠাৎ—

—কী হল ?

—সমস্ত পাহাড়টা যেন দুলে উঠল। গুহার ভেতরে শুনলাম, গম্ভীর গুড়গুড় শব্দ। শব্দটা কিছুক্ষণ চলল। তারপর হঠাৎ একটা কানে তালা লাগানো শব্দ। শব্দটা এল পাহাড়ের মাথার দিক থেকে। বিরাট-বিরাট পাথরের চাঁই ভেঙে পড়ছে। বুঝলাম, যে কোন কারণেই হোক পাহাড়ের মধ্যে কোন একটা পাথরের স্তর নাড়া পেয়েছে, তাই এই বিপত্তি। এখন আর ভাববার সময় নেই, গুহা ছেড়ে পালাতে হবে, অবলম্বন একমাত্র সেই দড়িটা। ছুটে গিয়ে দড়িটা ধরলাম। টান দিতেই দেখি, ওটা আলগা হয়ে গেছে। বুঝলাম, যে পাথরের চাঁইয়ে ওটা বেঁধে এসেছিলাম সেটা নড়ে গেছে। এখন দড়িটা কোন ঝোপে বা গাছের ডালে আটকে আছে। একটু জোরে টান দিলাম। যা ভেবেছি তাই। দড়ির মুখটা ঝপ্ করে নীচের দিকে পড়ে গেল। এক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে খোদাতাল্লাকে ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছিল না। পায়ের নীচের মাটি দুলতে শুরু করেছে। ভালোভাবে দাঁড়াতে পারছি না। টলে পড়ে যাচ্ছিলাম। তাড়াতাড়ি দড়ির মুখটা একটা বড় পাথরের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। এখন দড়ি ধরে নামতে হবে। কিন্তু বুঙ্গা ? ওকি সত্যিই পাগল হয়ে গেল। এত কাণ্ড ঘটছে, বুঙ্গার কোনো হুঁশও নেই। ও পাথরটা-ঠুকেই চলেছে। ছুটে গিয়ে ওর দু'হাত চেপে ধরলাম—বুঙ্গা শীগগির চল্—নইলে মরবি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। এক ঝটকায় ও আমাকে সরিয়ে দিল। আবার ওকে থামাতে গেলাম। এবার ও হাতের পাথরটা নামিয়ে ছুঁচলো-মুখ হাতুড়িটা বাগিয়ে ধরল। বুঝলাম, ওকে বেশী টানাটানি করলে ও আমাকেই মেরে বসবে। ওকে আর বাঁচানোর চেষ্টা করে লাভ নেই।

আবার একটু থেমে মকবুল বলতে লাগল—

—গুহার মধ্যে তখন পাথরের টুকরো গুলো ঝুরঝুর করে পড়তে শুরু করেছে। আর দেরী করলে আমিও জ্যান্ত কবর হয়ে যাবো। পাগলের মত ছুটলাম গুহার মুখের দিকে। তারপর গুহার মুখে এসে দড়িটা ধরে কীভাবে নেমে এসেছিলাম, আজও জানি না। পর-পর পাঁচদিন ধরে শুধু বুনো ফল আর ঝর্ণার জল খেয়ে হাঁটতে লাগলাম। গভীর জঙ্গলে কতবার পথ হারালাম। বুনো জন্তু-জানোয়ারের পাল্লায় পড়লাম। তারপর যেদিন ওঙ্গালির বাজারে এসে হাজির হলাম, সেদিন আমার চেহারা দেখে অনেকেই ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল।

মকবুলের গল্প শেষ হলে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। এক-সময় সে জিজ্ঞেস করল—ওঙ্গালির বাজারে যেতে হলে আমাদের কোন্ বন্দরে নামতে হবে ?

—তেকরুর বন্দরে নামতে হবে।

—ঐ জাহাজগুলো কি সেই বন্দর হয়ে যাবে।

—না। তেকরুর বন্দর পশ্চিম আফ্রিকায়।

ফ্রান্সিস এবার হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—হ্যারি, একটু বুদ্ধি-টুদ্ধি দাও।

হ্যারি হাসল—তোমার বুদ্ধি আমার চেয়ে কিছু কম নয়।

—না, তুমি কিছু বল।

—কী আর বলব! আমাদের ছোট নৌকোটায় করে জাহাজ থেকে পালাতে হবে।

—কখন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—আর দু-তিন দিনের মধ্যেই জাহাজটা উত্তর আফ্রিকার ধার ঘেঁসে যাবে। তখন নৌকোটায় উঠে পালিয়ে গিয়ে উত্তর আফ্রিকায় নামব আমরা।

—তারপর?

—সেখান থেকে তেকরুরগামী জাহাজে করে আমরা তেকরুর যাব।

—বেশ। ফ্রান্সিস আবার পায়চারী করতে লাগল। তারপর থেমে বলল—তাহ'লে পরশু রাতে ঠিক এ সময় মকবুল এখানে আসবে। তারপর পালাব।

মকবুল চলে গেল। হ্যারিও বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই ওর নাক ডাকতে শুরু করল। কিন্তু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। শুয়ে-শুয়ে ফ্রান্সিস হিসেব করতে লাগল—কতটা খাবার-দাবার, খাওয়ার জল, আর কী-কী নিতে হবে।

* * *

পরের দিন। ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করছিল। তখনই দেখা ভাইকিংদের রাজার সঙ্গে। রাজা হেসে ডাকলেন—ফ্রান্সিস?

—আজ্ঞে বলুন।

—হীরের পাহাড়ের ভূত মাথা থেকে নামল?

ফ্রান্সিস নিরীহ ভঙ্গিতে বলল—ওসব ভেবে আর কী করব? আপনি তো একটা জাহাজ দিলেন না।

—ওসব ভাবনা ছাড়। এখন সোজা বাড়িতে।

—বেশ।

রাজামশাই চলে গেলেন। ফ্রান্সিস আবার নিজের ভাবনায় মগ্ন হল। দু'দিন মাত্র হাতে। এর মধ্যে ফ্রান্সিস অনেক খাবার-দাবার একটা প্যাকিং বাক্সে পুরল। একটা বড় কুঁজো ভরতি খাবার জল, দড়ি, আর দু'টো তরোয়াল সব নিজেদের কেবিন ঘরে জমা করল।

তিন দিনের দিন গভীর রাতে মকবুল এল। অনেক রাত হয়েছে তখন। ধরাধরি করে তিনজনে মিলে খাবারের বাক্সটাকে জাহাজের ডেক-এ তুলল। তারপর ওটাকে নিয়ে এল জাহাজের হালের কাছে। আকাশে চাঁদের আলো। ফ্রান্সিস দেখল, ওদের নৌকোটা ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। হালের সঙ্গে কাছি দিয়ে বাঁধা। ফ্রান্সিস কাছিটা টেনে নৌকোটাকে কাছে নিয়ে এল। তারপর খাবারের বাক্সটা দড়ি দিয়ে বেঁধে আস্তে-আস্তে নৌকোটার মাঝখানে নামিয়ে দিল। এবার ফ্রান্সিস দড়ি ধরে ঝুলতে-ঝুলতে নৌকার ওপর নেমে এল। তারপরেই নেমে এল হ্যারি। মকবুল জলের কুঁজোটা দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল।

ফ্রান্সিস কুঁজোটা ধরে নৌকায় নামিয়ে নিল। এবার মকবুল দড়ি ধরে নেমে এল। সবাই তৈরী হল এবার। ফ্রান্সিস কোমরে গোঁজা তরোয়ালটা খুলে জাহাজের সঙ্গে বাঁধা নৌকার কাছিটা কেটে ফেলল। নৌকোটা একবার পাক খেয়ে ঘুরে অনেকটা সরে এল। জাহাজটা আস্তে-আস্তে দূরে সরে যেতে লাগল। চাঁদের আলোয় বেশ কিছুক্ষণ জাহাজটাকে দেখা গেল। তারপর আর দেখা গেল না। জাহাজ থেকে ওরা তখন অনেক দূরে চলে এসেছে। চারদিকে শুধু জল আর জল। জলে ছোট-ছোট ঢেউ। চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছে। হ্যারি আর মকবুল গায়ে কম্বল জড়িয়ে নৌকোর পাটাতনে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। সে নৌকো বাইতে লাগল। ফ্রান্সিস আমদাদ বন্দরে নৌকোটার মেরামতি করিয়েছিল। তখন একটা কাঠের মাস্তুলও লাগিয়ে নিয়েছিল পাল খাটাবার জন্যে। হাওয়ার জোর নেই তেমন। কাজেই ফ্রান্সিস পাল খাটায় নি। বৈঠা দিয়ে নৌকো বাইতে লাগল। সারা রাত ফ্রান্সিস নৌকো বইতে লাগল। ভোরের দিকে জোর হাওয়া ছুটল। ফ্রান্সিস হাওয়ার দিকটা অনুমান করল। ঠিকই আছে। হাওয়া দক্ষিণমুখো বইছে। ফ্রান্সিস পাল খাটাল। হাওয়ার তোড়ে পাল ফুলে উঠলো। নৌকো তরতর জল কেটে ছুটল। ফ্রান্সিস পালের দড়ি-দড়া হালের সঙ্গে বেঁধে হ্যারির পাশে এসে শুয়ে পড়ল। পূর্বদিকে তাকিয়ে দেখলো আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। মাথার ওপর আকাশটা তখনও কালো। তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে। আস্তে-আস্তে আকাশের অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। সূর্য উঠতে বেশী দেরী নেই। উত্তর আফ্রিকার কোথায় নৌকো ঠেকবে, সেখান থেকে তেকরুর বন্দরেই বা কী করে যাওয়া যাবে, এসব ভাবতে-ভাবতে ফ্রান্সিস একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।



তিন দিনের দিন গভীর রাতে মকবুল এল।

হ্যারির ধাক্কায় ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ কচলাতে-কচলাতে ফ্রান্সিস উঠে বসল। দেখল বেশ বেলা হয়েছে। রোদের তেজও বাড়ছে। হ্যারি ডাকল—সকালের খাবার খেয়ে নাও। ফ্রান্সিস সমুদ্রের জলে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। তারপর খেতে বসল।

হ্যারি বলল—কাল সারারাত বোধহয় ঘুমোও নি।

ফ্রান্সিস হাসল। হ্যারি বললো—হাসির কথা নয় ফ্রান্সিস। এভাবে রাত জাগতে শুরু করলে ওঙ্গালির বাজারে আর ইহজন্মে পৌঁছতে পারবে না।

—কিন্তু আফ্রিকার উপকূলে যেখানে হোক, আমাদের পৌঁছুতে হবে।

—তাই বলে রাত জেগে নৌকা বাইতে হবে? হ্যারি অবাক চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

ফ্রান্সিস হেসে বললে—কতদিনের খাদ্য আর জল আমাদের সঙ্গে আছে জানো ?

—না।

—মাত্র চার দিনের। এই চার দিনের মধ্যে আমাদের মাটিতে পৌঁছোতে হবে।

—চারদিন যথেষ্ট সময়। এর মধ্যে আমরা ঠিক পৌঁছে যাব।

—অত নিশ্চিন্ত থাকা ভাল নয় হ্যারি। ফ্রান্সিস বলল। সে দেখল, পাল গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। নৌকো একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল—পাল গুটিয়ে ফেললে কেন ?

—দেখছো না, হাওয়া পড়ে গেছে।

—তাহ'লে বৈঠা বাইতে হবে।

—আমরা বাইছি। তুমি শুয়ে বিশ্রাম কর, পারো একটু ঘুমিয়ে নাও।

—বেশ। ফ্রান্সিস কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল।

ফ্রান্সিস নৌকোর পাঠাতনে শুয়ে পড়ল। প্রচণ্ড রোদ। হাত দিয়ে চোখ ঢাকা দিল। বেশ ঝির-ঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, জলে বৈঠা চালাবার শব্দ উঠছে—ছপ্ ছপ্। হ্যারি আর মকবুল কথা বলছে। সমুদ্রে বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ফ্রান্সিস কাত হয়ে শুলো। রাত জাগা চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে ফ্রান্সিস ধড়মড় করে উঠে বসল। দেখল, বেশ বেলা হয়েছে। মকবুল বৈঠা বাইছে। হ্যারি খাবার-দাবার প্লেটে সাজাচ্ছে।

খেতে-খেতে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি, নিশানা ভুল হয় নি তো ?

— কী করে বলি, তবে দক্ষিণদিক নিশানা করেই তো নৌকা চালাচ্ছি।

—দেখা যাক।

বেলা পড়ে এল। পশ্চিমদিক লাল হয়ে উঠল। আস্তে-আস্তে সূর্য অস্ত গেল। চারদিক অন্ধকার করে রাত্রি নামল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস বৈঠা নিয়ে বসল। আজকেও হয়ত সারারাত বৈঠা বাইতে হবে। হাওয়ার জোর বাড়ে নি এখনও। হ্যারি আর মকবুল পাঠাতনে শুয়ে পড়ল। বেশ কয়েকঘণ্টা কেটে গেল। আস্তে-আস্তে হাওয়ার জোর বাড়তে লাগল। বাপাল ভাল—হাওয়াটা দক্ষিণমুখো। ফ্রান্সিস পাল বেঁধে দিল। হাওয়ার জোরে পাল ফুলে উঠল। নৌকো চলল দ্রুতগতিতে। কেমন শীত-শীত করছে। ফ্রান্সিস কম্বল জড়িয়ে পাঠাতনের একপাশে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম আসতে চায় না। নানা চিন্তা মাথায়। তেকরুর বন্দরে কী করে পৌঁছানো যাবে। সেখান থেকে ওঙ্গালির বাজারে। তেকরুর বন্দরে পৌঁছতে পারলে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়ার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। কিন্তু মাটির তো দেখা নেই। আগে তো আফ্রিকার উপকূলে পৌঁছোতে হবে, তারপর তো তেকরুর যাওয়া। হঠাৎ মা'র কথা মনে পড়ল। বাবার কথা। ওর এইভাবে জাহাজ থেকে পালিয়ে যাওয়ায় বাবা নিশ্চয় ভাল চোখে দেখবেন না। তারায় ভরা কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এক সময় ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। তিনদিন কেটে গেল। নৌকো চলছে তো চলে-ছেই। মাটির কোন চিহ্নমাত্র নজরে পড়ছে না। চিন্তায় ওদের মুখ শুকিয়ে গেল। তাহ'লে কি দিক ভুল হয়ে গেল ? নৌকোয় যা খাবার-দাবার মজুত আছে টেনেটুনে আর

দুটো দিন চলতে পারে। তারপর ? খাদ্য নেই জল নেই। দিনে রোদের প্রচণ্ড তেজ। রাত্রে ঠাণ্ডা। উপোসী শরীরে আর কতদূর যেতে পারবে ওরা ? কতক্ষণই বা নৌকো বাইতে পারবে ?

চার দিন কেটে গেল। পাঁচ দিনের দিন রাত্রে অবশিষ্ট খাদ্য আর জল ওরা খেল না। একেবারে উপোস করে রইল। পরের দিনটা তো চালানো যাবে। পরের দিন গেল আধ-পেটা খেয়ে। তারপরের দিন একেবারে উপোস। এক ফোঁটা জল নেই। খাদ্যও না। উপোসী শরীর নেতিয়ে পড়ে। বৈঠা বাইবার শক্তি নেই। পাল বেঁধে দিল। নৌকা যেদিকে খুশী চলল। ওরা নির্জীবের মত পাটাতনে শুয়ে রইল। সূর্য যেন আগুন বর্ষণ করে সারাদিন। ওরা দিনের বেলা জামা খুলে রাখে, শুধু রাত্রে জামা গায়ে দেয়। ওদের গা পোড়া তামার মত হয়ে গেছে। তৃষ্ণায় বুক পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। কিন্তু এক-ফোঁটা খাবার জল নেই। তৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মকবুল সমুদ্রের জলই খেয়ে নিল। কিন্তু খালি পেটে ঐ নোনতা জল—পেটে পাক দিয়ে বমি উঠে আসে। শরীর আরো অবসন্ন করে দেয়।

হঠাৎ আকাশের কোণায় কালো মেঘ দেখা দিল। দেখতে-দেখতে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। একটু পরেই প্রচণ্ড বৃষ্টি নামল। ওরা আনন্দে নাচতে লাগল। মুখ হাঁ করে বৃষ্টির জল খেতে লাগল। ওরা বৃষ্টির জলে জামা ভিজিয়ে নিতে লাগল। তারপর সেটাই চিপে-চিপে কুঁজোয় জল ভরতে লাগল। একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। ততক্ষণে কুঁজোতে অনেকটা জল ভরা হয়ে গেছে। জলের সমস্যা যা হোক মিটল। কিন্তু খাদ্য ? ফ্রান্সিস কোন সমস্যার সামনেই চুপ করে বসে থাকার মানুষ নয়। সে ভাবতে লাগল—কী করে খাবার জোগাড় করা যায়। পেয়েও গেল একটা উপায়। মাছ ধরতে হবে। অমনি পাটাতনের নীচে থেকে পেরেক হাতুড়ি বের করল। দড়ি তো ছিলই। একটা লম্বা পেরেক হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে-ঠুকে বঁড়শীর মত বানাল। তারপর খাবারের বাক্সটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে রুটির কয়েকটা টুকরো আর গুঁড়ো পেল। সেগুলোই জল দিয়ে মেখে টোপ তৈরী করল। তারপর দড়ির ডগায় পেরেকের বড়শী বাঁধল। বড়শীর ডগায় টোপ লাগিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে বসে রইল।

ঠিক তখনই ওর হঠাৎ নজরে পড়ল তিন-চারটে হাঙর ঠিক নৌকোর পেছনে-পেছনে আসছে। মৃত্যুদূত ? ফ্রান্সিসের অন্যমনস্ক মনটা নাড়া পেল। তবে কি ঐ সাংঘাতিক প্রাণীগুলো ওদের আসন্ন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছে ? ফ্রান্সিস মকবুলের দিকে তাকাল। দেখল, মকবুল অসাড় হয়ে আছে।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। এই বিপদের কথা তো ওদের জানাতে হয়। হ্যারি ফ্রান্সিসের মুখ দেখেই ব্যাপারটা অনুমান করল। বিষন্ন হাসি হেসে বলল—ফ্রান্সিস, আমি জানি তুমি জলে কী দেখছ।

—হ্যারি, তুমি কি আগেই এগুলো দেখেছ ?

—হ্যাঁ, পরশু বিকেল থেকে ওরা আমাদের পিছু ধাওয়া করছে।

—কই, আমাকে তো বল নি ?

—মকবুল পাছে জানতে পারে, তাই বলি নি।



ফ্রান্সিস বঁড়শীটা জলে ফেলে চুপ করে বসে রইল।

কথাটা বোধ হয় মকবুলের কানে গেল। সে পাশ ফিরে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে দুর্বলস্বরে জিজ্ঞেস করল— কী হয়েছে ?

— কিছু না, তুমি ঘুমোও।

মকবুল আর কোন কথা না বলে ক্লান্তিতে চোখ বুঁজলো। ফ্রান্সিস বুঝল, কেন হ্যারি হাঙরগুলোর কথা তাকে বলেনি। মকবুল এমনিতেই প্রচণ্ড রোদে উপবাসে জলকষ্টে নেতিয়ে পড়েছে। হাঙরের কথা জানতে পারলে, সে আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। মনোবল একেবারে হারিয়ে ফেলবে। কাজেই মকবুলকে কিছুতেই হাঙরগুলোর কথা বলা হবে না। ফ্রান্সিস বঁড়শী জলে ফেলে চুপ করে বসে রইল। মাঝে-মাঝে তাকিয়ে হাঙরগুলোকে দেখতে লাগল। ওর মন সংকল্প আরো দৃঢ় হল। যে করেই হোক বাঁচতেই হবে। অনাহারক্লিষ্ট শরীর। বেশীক্ষণ এক ঠাঁয় বসে থাকতে কষ্ট হয়। শিরদাঁড়াটা টনটন করতে থাকে। তবু ফ্রান্সিস দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল। খাদ্য চাই, বাঁচতেই হবে আমাদের। মাথায় শুধু এক চিন্তা—বাঁচতেই হবে।

হঠাৎ দড়িটায় টান লাগল। ফ্রান্সিস দড়িটায় হ্যাঁচকা টান মেরে ঝাঁকিয়ে দেখলে—বেশ ভারী কিছু আটকেছে বঁড়শীটায়। ফ্রান্সিস আনন্দে লাফিয়ে উঠল। হ্যারিও উঠে দাঁড়াল—কী ব্যাপার ?

ফ্রান্সিস ডাকল—হ্যারি শীগ্‌গির এসো, একটা মাছ পাকড়েছি।

হ্যারিও এক লাফে ওর কাছে এল। দু'জনে মিলে দড়ি ধরে টানতে লাগল। একটু পরেই মাছটাকে টেনে নৌকোর ওপর তুলল। বড় আকারের একটা সামুদ্রিক মাছ। দু'জনের আনন্দ দেখে কে ? যা হোক দু'তিন দিনের খাবার জুটল। হ্যারি তার কোমরে গোঁজা ছুরিটা ফ্রান্সিসকে দিল। সে ছুরিটা দিয়ে মাছটা কাটতে লাগল। একটু কাটা হলে দু-তিনটে টুকরো বের করে নিল। হ্যারিকেও এক টুকরো দিল। মহা আনন্দে দু'জনে কাঁচা মাছই চিবিয়ে খেতে লাগল। একটু পরে মকবুলকে ডাকল। তাকেও কয়েক টুকরো মাছ দিল। মকবুল ক্ষিদের জ্বালায় তাই খেতে লাগল। কয়েকদিন উপবাসের পর কাঁচা মাছ ভালোই লাগল। ক্ষিদের জ্বালায় অনেকটা মাছই খেয়ে ফেলল ওরা। বাকীটুকু পাটাতনের নীচে রেখে দিল, পরের দিনের জন্যে।

দিন যায়, রাত যায়, ডাঙার দেখা নেই। শুধু জল আর জল। আধ খাওয়া মাছটা শেষ হলে ফ্রান্সিস আবার চেষ্টা করলো মাছ ধরবার জন্যে। কিন্তু ওর পেরেক-বঁড়শীতে আর মাছ ধরা পড়ল না। সুতরাং একটানা উপবাস চলল কয়েকদিন। শরীরে যেন আর একফোঁটাও শক্তি নেই। অসাড় শরীর নিয়ে তিনজনে নৌকার পাটাতনে শুয়ে থাকে। ফ্রান্সিস মাঝে-মাঝে মাথা উঁচু করে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নেয়—যদি মাটির দেখা মেলে। হাঙরগুলোকে দেখে আর ভাবে, বাঁচবার কোন আশা নেই। খাদ্য নেই, বৃষ্টির পরে রাখা জলও শেষ। এবার আস্তে-আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে।

সেদিন বিকেলের দিকে হঠাৎ ফ্রান্সিসের নজরে পড়ল দূরে জাহাজের পাল। ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে উঠে দাঁড়াল। শরীর দুর্বল! পা দু'টো কাঁপছে। তবু ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। হ্যাঁ—জাহাজই। কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক দূরে। তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে! বৈঠার সঙ্গে গায়ের জামাটা বেঁধে নাড়তে

লাগল। যদি জাহাজের লোকদের নজরে পড়ে। কিন্তু, না জাহাজ এদিকে ফিরল না যেমন যাচ্ছিল, তেমনি যেতে লাগল।

ততক্ষণে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে সংকেত জানাবার আর কোন উপায় নেই। একমাত্র উপায় জাহাজটার দিকে লক্ষ্য করে নৌকোটা চালানো। যদি কোনরকমে জাহাজটার সঙ্গে দূরত্বটা কমানো যায়। শরীর টলছে। হাঁটু দুটো কাঁপছে। কিন্তু এই শেষ চেষ্টা। নইলে মৃত্যু অবধারিত। হঠাৎ মনে পড়ল হাঙরগুলোর কথা। ফ্রান্সিস জলের দিকে তাকাল। হাঙরের দল মাঝে-মাঝে জল থেকে লেজ তুলে ঝাপটা দিচ্ছে। বোধহয় সংখ্যায় আরো বেড়েছে ওরা। ফ্রান্সিস আর চুপ করে শুয়ে থাকতে পারলে না। শরীরের সমস্ত জোর একত্র করে বসল, বৈঠাটা হাতে নিল। তারপর প্রাণ-পণে নৌকো বাইতে লাগল জাহাজটাকে লক্ষ্য করে।

সারারাত ধরে নৌকো বাইল ফ্রান্সিস। ক্লান্তিতে-অবসাদে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু ফ্রান্সিস হার মানে নি। ঐ অবস্থাতেই নৌকো বেয়েছে।

সূর্য উঠল। ভোর হল। ভাল করে তাকাতেও কষ্ট হচ্ছে। তবু তাকাতে হবে—দেখতে হবে জাহাজটা কত দূরে। হঠাৎ দেখল একটা পাতলা কুয়াশার মত আস্তরণের পিছনেই বিরাট জাহাজের পাল। আনন্দে ফ্রান্সিস চীৎকার করে উঠতে গেল। কিন্তু পারল না। গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। ফ্রান্সিস নিজের শরীরটাকে পাঠাতনের ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। হ্যারির কাছে এনে হ্যারিকে ধাক্কা দিল। হ্যারি আস্তে-আস্তে তাকাল ওর দিকে। ফ্রান্সিস অবসাদগ্রস্ত ডান হাতখানা তুলে জাহাজের দিকে ইঙ্গিত করল। তারপর ওর চোখের সামনে সব কিছু মুছে গেল। শুধু শোনা গেল, হ্যারি চীৎকার করে কী বলছে। সেই চীৎকারের শব্দটাও দূরবর্তী হতে-হতে এক সময় মিলিয়ে গেল। সব অন্ধকার। কোনও শব্দই আর ওর কানে পৌঁছোল না। ফ্রান্সিসের অবসন্ন দেহটা জ্ঞান-হারিয়ে পাঠাতনের উপর গড়িয়ে পড়ল।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে ফ্রান্সিস যখন তাকাল, দেখল, ও একটা কেবিনঘরে শুয়ে আছে। দাড়িওলা একজন বুড়োমত লোক ওর নাড়ী টিপে দেখছে। ফ্রান্সিস বুঝল, ইনি ডাক্তার। ফ্রান্সিসকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে ডাক্তার হাসলেন। বললেন—কী? কেমন লাগছে?

—শরীরটা দুর্বল। ফ্রান্সিস টেনে-টেনে বলল।

—সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার একটু খেয়ে নাও। একেবারে বেশী করে খেতে দেওয়া হবে না। কম-কম করে খাবে।

ফ্রান্সিসের মনে হল, ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধটুকুও যেন আর নেই ওর।

—ক'দিন উপোস করে ছিলে? ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

—চার-পাঁচদিন হবে।

—হুঁ—দু'তিন দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে পড়ল হ্যারি আর মকবুলের কথা। ফ্রান্সিস ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠতে গেল। ডাক্তার হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

—বিছানা ছেড়ে এখন ওঠা চলবে না।

—কিন্তু আমার সঙ্গে যারা ছিল আমার বন্ধুরা—তারা কোথায় ?

—পাশের কেবিনেই আছে—

—আমি ওদের দেখতে চাই।

—উঁহু, আজকে নয়, কালকে।

—কিন্তু—

—কোন কথা নয়—শুধু বিশ্রাম এখন।

একটু পরেই একজন লোক মাংসের ঝোল আর রুটি নিয়ে ঢুকল।

ডাক্তার বললেন—নাও, খেয়ে নাও।

ফ্রান্সিস খেতে বসল। এতদিনের উপবাস অথচ খেতে ইচ্ছে করছে না। আসলে উপবাসে-উপবাসে ওর খিদেই মরে গিয়েছিল। যতটা ভাল লাগল খেল। খাওয়ার-দাওয়ার পর শরীরে যেন একটু বল পেল। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলল—অনেক ধন্যবাদ।

—আমাকে নয়—জাহাজের ক্যাপ্টেনকে। এক্ষুনি আসবেন।

একজন লোক কেবিনঘরে ঢুকল। মুখে ছুঁচোলো গোঁফ-দাড়ি। ক্যাপ্টেনের পোশাক পরে। ফ্রান্সিস বুঝল—ইনিই ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল—এখন কেমন আছে ?

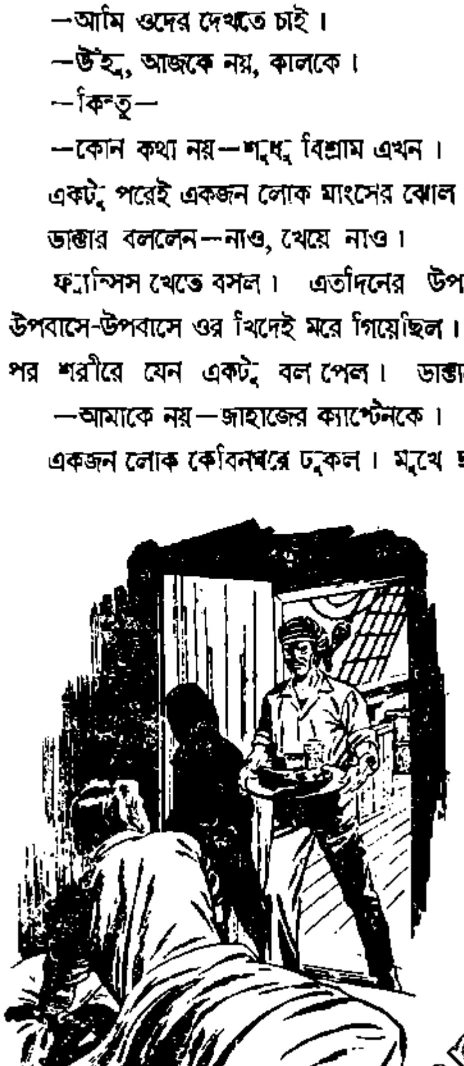
—ভালো। জ্ঞান ফিরেছে, তবে শরীরের দুর্বলতা কাটতে কয়েক দিন যাবে।

—হুঁ। এবার ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল—কেমন আছেন ?

ফ্রান্সিস মাথা কাত করে জানালে —ভালো।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করল—নৌকো করে কোথায় যাচ্ছিলেন ?

ফ্রান্সিস সাবধান হল। হীরের পাহাড়ের কথা বললেই বিপদ বাড়বে তো কমবে না। কাজেই অন্য ছুতো দেখাতে হল। বলল—আমাদের জাহাজ জলদস্যুরা আক্রমণ করেছিল। অনেক কষ্টে আমরা তিনজন জাহাজ থেকে নৌকো করে পালাতে পেরেছিলাম।



একটু পড়েই একজন লোক মাংসের ঝোল আর রুটি নিয়ে ঢুকল।

ক্যাপ্টেন আর কোন কথা জিজ্ঞেস করল না। ফ্রান্সিসও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। খাবার সময় ক্যাপ্টেন বলল—কয়েকদিন বিশ্রাম নিন, খাওয়া-দাওয়া করুন, শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

পরের দিনটিও ফ্রান্সিস কেবিন ঘরে বিছানায় শুয়েই কাটালো। সন্ধ্যে নাগাদ হ্যারি আর মকবুল এল। হ্যারি খুশীতে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। মকবুলও খুশী। বলল—ফ্রান্সিস, তোমার জন্যেই এ যাত্রায় আমরা বেঁচে গেলাম।

হ্যারি জিজ্ঞেস করল—ফ্রান্সিস, তুমি কি শরীরের ঐ অবস্থায় সত্যিই সারারাত নৌকো বেয়েছিলে ?

—উপায় কি ? নইলে এই জাহাজটার কাছে পৌঁছানো যেত না।

তিনজনে মিলে কিছুক্ষণ গল্পগুজব চলল। গল্প বেশির ভাগই ওরা কী করে উদ্ধার পেল, তাই নিয়ে হল। কী করে অচৈতন্য ফ্রান্সিসকে জাহাজে তোলা হল, ওরাই বা দড়ি ধরে কী ভাবে জাহাজে উঠল—এসব নিয়ে কথাবার্তা হল। ফ্রান্সিস একসময় জিজ্ঞেস করল—তোমরা খোঁজ নিয়েছো, জাহাজটা কোথায় যাচ্ছে ?

—হ্যাঁ। আমি খোঁজ নিয়েছি—মকবুল বলল—জাহাজটা পর্তুগীজদের। ওদের একটা বন্দর আছে পশ্চিম আফ্রিকার নিম্বাতে। সেই বন্দরেই যাচ্ছে জাহাজটা।

—ফ্রান্সিস বললে—তাহ'লে তেকরুর বন্দরে যাবার উপায় ?

—নিম্বা থেকেই আর একটা জাহাজ ধরে তেকরুর যেতে হবে—

মকবুল বলল— আর এই জাহাজ দু' একদিনের মধ্যেই নিম্বা পৌঁছুবে।

আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে হ্যারি আর মকবুল চলে গেল। ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। শরীরের দুর্বলতা এখনো কাটেনি। বেশ ক্লান্ত লাগছে শরীরটা। তবু ফ্রান্সিসের চিন্তার যেন শেষ নেই। কী করে তেকরুর বন্দরে পৌঁছুবে। সেখান থেকে কী করে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া যাবে। এসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ফ্রান্সিস আবার একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

দু'দিন পরে জাহাজটা নিম্বা বন্দরে ঢুকলো। ছোট বন্দর। জনবসতি খুবই কম। কিন্তু উপায় নেই। এই বন্দরেই অপেক্ষা করতে হবে অন্য জাহাজের জন্য। ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নামবার আগে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে গেল। ক্যাপ্টেনকে বারবার ধন্যবাদ জানাল। ক্যাপ্টেনই ওদের হদিশ দিল একটা সরাইখানার। একজন পর্তুগীজ সরাইখানাটা চালায়। ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নেমে সেই সরাইখানাটা খুঁজে বের করল। খুবই সস্তা সরাইখানা। খাওয়ার টেবিল, বাসনপত্র নোংরা। তা হোক, এই সরাইখানা এখন স্বর্গ ওদের কাছে। কতদিন অপেক্ষা করতে হয়, কে জানে ? একটা বড়ো দেখে ঘর ওরা ভাড়া নিল। ঘরটার জানালা থেকে সমুদ্র আর নিম্বা বন্দর স্পষ্ট দেখা যায়। কোন নতুন জাহাজ এলে ওদের চোখে পড়বেই।

আগের জাহাজের ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসদের একটা মোহরের ভাঙানি দিয়ে গিয়েছিল পর্তুগীজ মুদ্রায়। মুদ্রাগুলো খুব কাজে লেগে গেল। ফ্রান্সিস খাওয়া থাকার জন্যে দু'দিনের আগাম পাওনা সরাইখানাকে মিটিয়ে দিল। সরাইওলা তাতেই বেজায় খুশী। দুবেলা ওদের খোঁজপত্তর করতে লাগল। স্নানের জল, আলো আর ভাল খাবার-দাবারের সুবন্দোবস্ত করে দিল। জাহাজের খালাসীদের হাঁকে-ডাকে নিম্বা বন্দরটা মুখরিত হয়ে রইল এ ক'দিন। কিন্তু জাহাজটা চলে যেতেই আবার নিঃসাড় হয়ে গেল নিম্বা বন্দর।

নিম্বা বন্দরের একপাশে সমুদ্র। তা ছাড়া সবদিকেই ঘন জঙ্গল। শুধু জঙ্গল ছাড়া দেখবার কিছুই নেই। ফ্রান্সিসরা দুটো দিন নিজেদের ঘরেই শুয়ে বসে কাটিয়ে দিল।

তিন দিনের দিন দুপুর নাগাদ একটা মস্ত বড় জাহাজের পাল দেখা গেল সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায়। জানলা থেকেই দেখা গেল জাহাজটা। তিনজনেই ছুটে বেরিয়ে এল সরাই-

খানা থেকে। জাহাজঘাটায় গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল জাহাজটার জন্যে। এক সময় জাহাজটা ঘাটে এসে লাগল। ফ্রান্সিসের আর তর সইল না। পাটাতন ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে জাহাজে গিয়ে উঠল। মকবুল আর হ্যারি জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে রইল। নতুন জাহাজের ক্যাপ্টেন বেশ দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। দু'চার মিনিট কথাবার্তা চলতেই ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসদের সঙ্গে পুরনো বন্ধুর মত ব্যবহার করতে লাগল। কথায়-কথায় ক্যাপ্টেন জানাল—পানীয় জলের ঘাটতি পড়েছে বলেই এই বন্দরে জাহাজ ভেড়াতে হয়েছে। কাল-কেই আবার জাহাজ সমুদ্রে ভাসবে। তেকরুর বন্দরে মাত্র একবেলার জন্য নোঙর করবে। তারপর আরো কয়েকটা বন্দরে থেমে-থেমে পর্তুগাল যাত্রা করবে।

ফ্রান্সিস খুব খুশী হল। তেকরুর বন্দরে যাওয়ার একটা উপায় হলো। জাহাজ থেকে নেমেই বন্ধুদের এই খবরটা দেবার জন্যে ছুটলো।

সন্ধ্যের সময় কম্বল-টম্বল যা ছিল, তাই নিয়ে ফ্রান্সিসরা জাহাজে এসে উঠল। তেকরুর বন্দরে যাওয়া যাবে, এই উত্তেজনায় ফ্রান্সিসের সারারাত ভালো করে ঘুম হলো না। শুধু তেকরুর বন্দরে পৌঁছুনোই নয়, তারপরেও আছে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া। সেখান থেকে হীরের পাহাড়ে যাওয়া। এইসব ভাবনাচিন্তায় রাত কেটে গেল।

ফ্রান্সিস কেবিন-ঘর থেকে বেরিয়ে ডেক-এ এসে দাঁড়াল। পূর্ব আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। একটু পরে সূর্য উঠল। নিম্বা বন্দরের জঙ্গলের মাথা আলোয় আলোময় হয়ে উঠল। অন্ধকার কেটে গিয়ে সূর্যের আলোয় চারদিক ঝলমল করতে লাগল। ঘড়-ঘড় শব্দে নোঙর তোলা হল। সাড়া পড়ে গেল জাহাজের দাঁড়ি আর লোকজনের মধ্যে। ভালো করে পাল বাঁধা হল। ভোরের হাওয়ায় পালগুলো ফুলে উঠল। জাহাজ চললো তেকরুর বন্দরের উদ্দেশ্যে।

দু'দিন পরে জাহাজটা তেকরুর বন্দরে পৌঁছল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এখানে-ওখানে দু'চারটে আলো টিমটিম করে জ্বলছে। অন্ধকারেও ফ্রান্সিস যতটা আন্দাজ করতে পারল, তাতে বুঝল, তেকরুর বন্দর নিম্বার চেয়ে বড়। জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে জানতে পারল যে, এই তেকরুর বন্দর থেকে হাতির দাঁতের চালান যায় ইউরোপে। তাই এই বন্দরটা হাতির দাঁতের ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। ব্যবসার খাতিরে লোকজনের বাস আছে এখানে। সরাইখানাও আছে।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নেমে এল। একটা মাথা গোঁজার আস্তানা খুঁজতে হয়। এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতেই একটা সরাইখানার খোঁজ পেল। এখান-কার অধিবাসী প্রায় সবাই এদেশীয় নিগ্রো। কালো পাথরে কোঁকড়া চুল, থ্যাবড়া ঠোঁট। সরাইখানার মালিক কিন্তু আরবীয়। ব্যবসার ধান্দায় এখানে এসে সরাইখানা খুলে বসেছে। সে বেশ সাদরেই ওদের গ্রহণ করল। থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিল।

দিনকয়েক কাটলো নিশ্চিন্ত বিশ্রামে। এই ক'দিন কতরকম জাহাজ ভিড়ল তেকরুর বন্দরে। কত দেশের লোক যে নামল, তার ঠিক নেই। এর মধ্যেই ঘটলো এক কাণ্ড।

সেদিন দুপুরে ফ্রান্সিসরা খাওয়া-দাওয়া করছে। খাওয়ার ঘরে বেশী লোকজন নেই। এমন সময় দু'জন লোক ঢুকল সরাইখানায়। খাওয়ার ঘরে এসে খাবারের টেবিলে বসল। দু'জনেরই পরনে আরবীয় পোশাক। একজনের একটা চোখের ওপর কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা

কালো কাপড়ের টুকরো। এক চোখ অন্ধ লোকটার। সেই লোকটাই মোটা গলায় ডাক দিল খাবার দিয়ে যাওয়ার জন্যে। ফ্রান্সিস এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি যে, মকবুল খাওয়া ছেড়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। ফ্রান্সিস মকবুলের দিকে তাকিয়ে আরো আশ্চর্য হলো। মকবুলের মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। ও কোনো কথা বলতে পারছে না।

ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে মকবুল?

কাঁপা-কাঁপা গলায় মকবুল বলল—ঐ লোকটাকে দেখেছো তো?

—কার কথা বলছো?

—ঐ যে একচোখ কানা লোকটা?

—হ্যাঁ দেখছি। তাতে কী হয়েছে?

—লোকটা এক নম্বরের শয়তান। পরে সব বলবো। আমাকে এখন একটু আড়াল করে বসো।

ফ্রান্সিস ওকে আড়াল দিয়ে বসল। মকবুল ভালো করে খেতে পর্যন্ত পারছে না। ফ্রান্সিস আড়াল করে বসা সত্ত্বেও মকবুল কানা লোকটার দৃষ্টির সামনে নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারলে না। সাংঘাতিক দৃষ্টি লোকটার। লোকটা তরোয়ালে হাত রাখল। তারপর টেবিল ছেড়ে উঠে আস্তে-আস্তে এগিয়ে এল ফ্রান্সিসদের দিকে। মকবুল ভয়ে অস্ফুট চীৎকার করে উঠল। ফ্রান্সিস বুঝল, লোকটার মতলব ভালো নয়। যে কারণেই হোক মকবুলকে সহজে ছাড়বে না লোকটা। ফ্রান্সিস ফিসফিস করে হ্যারিকে ডাকল—হ্যারি।

—উঁ।

—ঘর থেকে আমার তরোয়ালটা নিয়ে এসো তো।

হ্যারি এক মুহূর্তও দেরী করল না। ঘরের দিকে ছুটল ফ্রান্সিসের তরোয়ালটা আনতে। কানা লোকটাও ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসও টেবিল ছেড়ে উঠে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল। ঝনাৎ করে শব্দ হলো। লোকটা খাপ থেকে তরোয়াল বের করে ফেলেছে। তরোয়ালের ছুঁচোলো ডগাটা ফ্রান্সিসের বুকে ঠেকিয়ে দাঁতচাপা স্বরে বলল— এই কাফের,তুই সরে যা। ঐ কুত্তাটার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটা চেঁচিয়ে বলল—তুই সরে যা।

ফ্রান্সিস বলল—তার আগে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।

লোকটা এ রকম উত্তর আশা করেনি। বেশ অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তরোয়ালটা নামিয়ে বলল—তা তোর সঙ্গে বোঝাপড়াটা কি এখানেই হবে না, বাইরে যাবি?

হ্যারি ঠিক তখনই তরোয়ালটা এনে ফ্রান্সিসের হাতে দিল। তরোয়ালটা হাতে পেয়ে ফ্রান্সিসের মনের জোর অনেকটা বেড়ে গেল। বলল—তোর যেখানে খুশী।

লোকটা এতক্ষণে ফ্রান্সিসের কথাবার্তা শুনে আর ভাবভঙ্গী দেখে বুঝল, এ বড় কঠিন ঠাঁই। তবু এত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার মানুষও সে নয়। হঠাৎ লোকটা ফ্রান্সিসের মাথা লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। ফ্রান্সিস এই হঠাৎ আক্রমণের জন্যে তৈরীই ছিল।

সে তরোয়াল চালিয়ে মারটা ঠেকাল। শুরু হলো তরোয়ালের লড়াই। কেউ কম যায় না। লোকটা বারবার ফ্রান্সিসকে আঘাত করতে চেষ্টা করে চলল। ফ্রান্সিস শুধু মার ঠেকিয়ে চলল—আক্রমণ করল না। যারা টেবিলে বসে খাচ্ছিল, তারা টেবিল ছেড়ে দেওয়ালের দিকে সরে গেল। তারপর তরোয়াল-যুদ্ধ দেখতে লাগল। হঠাৎ কানা লোকটার একটা মার ফ্রান্সিস ঠিকমত ফেরাতে পারল না। তরোয়ালের ঘায়ে হাতের কাছের জামাটা ফেঁসে গেল! কেটেও গেল। রক্ত পড়তে লাগল। কাণা লোকটা হা-হা করে হেসে উঠল। ফ্রান্সিস মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করল। লোকটা এরকম দ্রুত আক্রমণ আশা করে নি। ফ্রান্সিসের মার ঠেকাতে-ঠেকাতে পিছিয়ে যেতে-যেতে একটা টেবিলের ওপর গিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস লাফ দিয়ে টেবিলে উঠে পা দিয়ে লোকটার তরোয়ালসুদ্ধ হাতটা টেবিলের ওপর চেপে ধরল। লোকটা কেমন বিমূঢ় দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল—কী, আর বোঝাপড়ার দরকার আছে?



পা দিয়ে লোকটার তরোয়ালশুদ্ধ হাতটা টেবিলের ওপর চেপে ধরল।

লোকটা চোখ-মুখ কুঁচকে তরোয়ালটা মুক্ত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু ফ্রান্সিস পা দিয়ে যেভাবে চেপে রেখেছে, তাতে লোকটা হাতের তরোয়াল নাড়াতেও পারল না। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। তারপর জুতোশুদ্ধু পা'টা লোকটার তরোয়াল-ধরা হাতের মুঠোতে জোরে চেপে দিল। লোকটা তরোয়াল ফেলে হাতটা চেপে ধরল। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা পা দিয়ে ঠেলে দিল কাণা লোকটার সঙ্গীর দিকে। সঙ্গীটি তরোয়ালটা তুলে নিল। কিন্তু কী করবে বুঝতে না পেরে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। কানা লোকটা ডান হাতটা চেপে ধরে সঙ্গীটির কাছে এসে দাঁড়াল। সঙ্গীটিকে বেরিয়ে যাবার ইঙ্গিত করে নিজেও দরজার দিকে পা বাড়াল। যাবার সময় মকবুলের দিকে তাকিয়ে বলল—যা, খুব জোর বেঁচে গেলি।

ফ্রান্সিস আবার খেতে বসল। খাওয়া চলছে, তখন ফ্রান্সিস মকবুলকে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার মকবুল? তোমার ওপর ঐ কানা লোকটার এত রাগ কেন?

মকবুল বলতে লাগল—কী আর বলবো? বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। তখন আমি এই অঞ্চলে কার্পেট বিক্রি করতাম। এই কানা লোকটা হচ্ছে এক দস্যুদলের সর্দার। এই দস্যুদলের কাজই হলো ইউরোপ আমেরিকার ক্রীতদাস কেনাবেচার বাজারে ক্রীতদাস চালান দেওয়া। এরা জাহাজে করে আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে ঘোড়া। ঘোড়ায় চড়ে এরা এই দেশের শান্ত নিরুপদ্রব গ্রামগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা ভয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তখন এরা ঘরগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রাণ বাঁচাতে সবাই

দল ভেঙে বেরিয়ে আসে। তখন তাদের ধরে গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় তিন-কোণা গাছের ডোলার এক রকম জিনিস। সেটার মধ্যে দিয়ে দড়ি ভরে দেওয়া হয়। কারো পক্ষে তখন দল ছেড়ে পালানো অসম্ভব। এইভাবে-পঞ্চাশ একশো অল্পবয়সী ছেলেমেয়েকে এরা বেঁধে নিয়ে যায় নিজেদের জাহাজে। তারপর চড়া দামে সেই সব ক্রীতদাসদের বিক্রি করে ইউরোপ-আমেরিকার ক্রীতদাস বেচা কেনার হাটে।

—কিন্তু তোমার ওপরে ওদের রাগের কারণ কী?

—কারণ আছে বৈ কি—মকবুল বলল—আমি যে ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলাম।

—সেটা কী রকম?

—এই সব অঞ্চলে তখন কার্পেট বিক্রি করছিলাম। তখনই হঠাৎ একদিন দেখলাম নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর মর্মান্তিক অত্যাচার। আমি তখন সেই গ্রামটিতে ছিলাম। আমিও বাদ যাই নি। আমাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। অবশ্য কাণা সর্দার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়েছিল। বারবার সাবধান করে দিয়েছিল, আমি যেন ওদের আসার খবর কাউকে না বলি। আমি অন্য গ্রামে গেলাম। সেখানে এই দস্যুদের আসবার কথা বলে দিলাম। সব লোক গ্রাম ছেড়ে পালাল। দস্যুদল গিয়ে দেখল, গ্রাম-ফাঁকা জনপ্রাণীও নেই। ওরা প্রথমে বুঝতেই পারেনি, গ্রামবাসীরা কার কাছ থেকে দস্যুদলের আসার খবর পেল। একচোখ কাণা দস্যুদলের সর্দার কিন্তু ঠিক বুঝল, এটা আমারই কাজ। গ্রাম-গ্রামান্তরে নানা উপজাতির সর্দারদের কাছে তখন কার্পেট বিক্রী করছি। খবরটা আমার পক্ষে রটানোই সম্ভব। আমি করেছিলামও তাই। গ্রাম-গ্রামান্তরে যেখানে গেছি, দস্যুদলের আসার খবর রটিয়ে দিয়েছি। গ্রাম ফাঁকা করে সবাই বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। দস্যুরা এসে দেখেছে গ্রামকে গ্রাম শূন্য—খাঁ-খাঁ করছে। একটা মানুষও নেই। এইবার কাণা সর্দার হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজতে লাগল। আমিও বিপদ আঁচ করে পালিয়ে এলাম এই তেকরুর বন্দরে। তারপর জাহাজে চড়ে নিজের দেশে পাড়ি জমালাম। এখন বুঝছি—দস্যুসর্দারের চোখে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়।

—হুঁ—ফ্রান্সিস বলল—তাহলে তো সর্দার ব্যাটাকে একটু শিক্ষা দিয়ে দিলে ভালো হতো। যাক্‌গে—ফ্রান্সিস আপনমনে খেতে লাগল।

এখন কি করে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া যায়, তাই নিয়ে ওরা পরিকল্পনা স্থির করতে বসল। এইসব জায়গা সম্বন্ধে ফ্রান্সিস বা হ্যারি কারোই কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। একমাত্র ভরসা মকবুল। মকবুল বলল—এখান থেকে মাইল পাঁচেক পূর্বদিকে পর্তুগীজদের একটা দুর্গ আছে। আগে ওখানে পৌঁছুতে হবে আমাদের, তারপর ইতিকর্তব্য স্থির করা যাবে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দুজনেই মকবুলের প্রস্তাবে রাজী হলো।

* * *

পরের দিন সকালবেলা ওরা যাত্রা শুরু করল পর্তুগীজদের দুর্গটার উদ্দেশ্যে। তেকরুর বন্দর এলাকা ছাড়তেই শুরু হল গভীর বন। এরই মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তামত রয়েছে। তেকরুর বন্দর থেকে দুর্গে মালপত্র নিয়ে যাওয়া-আসার জন্যে ঘোড়ায় টানা গাড়ী ব্যবহার করতে হয়। তাই গাড়ী চলার মত রাস্তা হয়েছে। দুধারে ঘন জঙ্গল। তারই

মাঝখান দিয়ে এই সরু রাস্তা ধরে ওরা হাঁটতে লাগল। এতদিন আফ্রিকার জঙ্গল সম্বন্ধে গল্পই শুনেছে ফ্রান্সিস। এবার চাক্ষুষ দেখল আফ্রিকার জঙ্গল কাকে বলে। বন যে এত নিবিড় হতে পারে, ফ্রান্সিস তা ভাবতেও পারে নি কোনোদিন। দুপুর নাগাদ ওরা দুর্গটার সামনে এসে হাজির হল। পাথরের তৈরী দুর্গটা বেশ বড়ই বলতে হবে। সিংহদরজা দিয়ে ওরা দুর্গে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেল। দ্বাররক্ষী কিছুতেই ওদের ঢুকতে দেবে না। ফ্রান্সিস ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বলল—ঠিক আছে—তুমি গিয়ে দুর্গ-রক্ষককে বলো—আমরা ব্যবসার ধান্ধায় এদেশে এসেছি। একটা রাত দুর্গে থাকবো।

দ্বাররক্ষী চলে গেল। একটু পরেই একজন বেশ বলশালী লোক দরজার দিকে এগিয়ে এল। তার পরনে যুদ্ধের পোশাক। তার পেছনে-পেছনে এল দ্বাররক্ষী। ফ্রান্সিস বুঝল—ইনিই দুর্গরক্ষক।

দুর্গরক্ষক বেশ ভারিক্কি গলায় জিজ্ঞেস করল—আপনারা কে ?

—আমরা ব্যবসায়ী। ফ্রান্সিস উত্তর দিল।

—কীসের ব্যবসা আপনাদের ?

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বলে উঠল—কার্পেটের।

—কই—আপনাদের সঙ্গে তো কার্পেট দেখছি না।

—আমরা এই এলাকাটা ভালো করে দেখছি—কার্পেট আনলে বিক্রি-বাট্টা হবে কি না।

—ও !

—আমরা আজ রাত্তিরের মত এখানে থাকতে পারি ? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—নিশ্চয়ই। দুর্গরক্ষক রক্ষীটিকে কি যেন ইঙ্গিত করল। রক্ষীটি ডাকল—আসুন আমার সঙ্গে।

রক্ষীকে অনুসরণ করে ফ্রান্সিসরা একটা ঘরে এসে হাজির হলো।

দুর্গের মধ্যে বেশ পরিচ্ছন্ন একটা ঘর। ফ্রান্সিসদের সেখানে থাকতে দেওয়া হল। যাক্ রাত কাটাবার একটা আশ্রয় পাওয়া গেল। এবার আহারের ব্যবস্থা কি হবে ? কিন্তু সে চিন্তা তাদের বেশীক্ষণ রইল না। খাবার সময়ে রক্ষী এসে তাদের ডেকে নিয়ে গেল।

রাত্রে মস্ত লম্বা একটা টেবিলে সবাই একসঙ্গে খেতে বসল ! প্রায় পঞ্চাশজন সৈন্য দুর্গটায় থাকে। তাছাড়া আজকে রয়েছে দুর্গরক্ষকের দুজন অতিথি আর ফ্রান্সিস ওরা। দেখতে-দেখতে দুর্গরক্ষক তার অতিথি দুজনকে ফ্রান্সিসদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। অতিথিদের মধ্যে একজন বয়স্ক। তার নাম জন। অন্যজন যুবক। তার নাম ভিক্টর। ফ্রান্সিস জনের সঙ্গে আলাপ জমাল। হ্যারি আর মকবুল আলাপ করতে লাগল ভিক্টরের সঙ্গে। কথায়-কথায় জন বলল—আমরা এখানে এসেছি হাতী শিকার করতে। দাঁতাল হাতি মেরে দাঁতগুলো নিয়ে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করবো। অবশ্য দাঁতগুলো নিয়ে যাবার সময় এই দুর্গরক্ষককেও কিছু প্রাপ্য অর্থ দিতে হবে।

ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—আপনারা কি হাতী শিকার করতে ওঙ্গালির বাজারে যাবেন ?

—সেটা আমি তো ঠিক বলতে পারবো না। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে একজন এদেশীয় নিগ্রো। মাসাই উপজাতির লোক। এরা বাধ্য আর খুব ভালো তীরন্দাজ। সেই গাইডই জানে আমরা কোথা দিয়ে কোথায় যাবো।

-সেই গাইড কোথায় ?

-সে তার সঙ্গীদের সঙ্গে বারান্দায় বসে খাচ্ছে।

-ওর সঙ্গী মানে।

-আমরা কুড়ি জন মাসাইকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। মালপত্র বওয়া, রান্না করা, বিষ মাখানো তীর দিয়ে হাতী শিকার করা, হাতীর দাঁতগুলো বয়ে আনা—এইসব ওরাই করবে।

—আপনার গাইডটিকে জিজ্ঞেস করুন তো সে ওঙ্গালির বাজার চেনে কিনা।

—ডাকছি—বলে যারা খাবার পরিবেশন করছিল, তাদের একজনকে ডেকে বলল—গাইডটাকে একবার ডেকে দিতে।

একটু পরেই নেংটি পরা খালি গায়ে একজন নিগ্রো এসে জনের সামনে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস অনেক চেষ্টা করেও লোকটাকে বোঝাতে পারল না। তখন মকবুল মাসাইদের ভাঙা-ভাঙা ভাষায় জিজ্ঞেস করল—ওঙ্গালির বাজার চেনো ?

লোকটা মাথা ঝাঁকাল অর্থাৎ চেনে। মকবুল আবার জিজ্ঞেস করলো—ওখানে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে ?

লোকটা মাথা ঝাঁকাল অর্থাৎ নিয়ে যেতে পারবে।

ফ্রান্সিস তখন জনকে বলল—আপনাদের সঙ্গে আমরাও যাবো।

—বেশ তো। জন খুশী হ'য়ে সম্মত হল। মকবুল তখন গাইডটাকে নিয়ে পড়ল। নানাভাবে বোঝাতে লাগল—ওরা যেখানে হাতি শিকার করতে যাবে, সেখান থেকে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া যাবে কিনা! লোকটাও বার-বার মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, হ্যাঁ, যাওয়া যাবে।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মকবুলের মধ্যে কথা হতে লাগল। ফ্রান্সিস এই ভেবে খুশী যে, কিছুদিনের মধ্যে ওরা ওঙ্গালির বাজারে পৌঁছুতে পারবে। তারপর হীরের পাহাড়। মকবুল বেশী কথা বলছিল না। খুব গম্ভীরভাবে কিছু ভাবছিল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—কি হে মকবুল, তুমি চুপচাপ যে!

—একটা কথা ভাবছি।

—কী ভাবছো ?

—জন সাহেবের গাইড কোন্ এলাকা দিয়ে নিয়ে যাবে জানি না। যদি উত্তর দিক্ দিয়ে আমরা ওঙ্গালির বাজারে যাই, তবে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু দক্ষিণ দিক দিয়ে গেলে সেই অঞ্চলে 'মোরান' নামে একদল উপজাতির পাল্লায় পড়বো। ভীষণ হিংস্র এই মোরান উপজাতির লোকেরা। এদের খাদ্য হলো শুধু কাঁচা মাংস, দুধ আর ষাঁড়ের রক্ত।

—কিন্তু আমরা তো আর তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহ'লেও। এরা সহজে কাউকে ছেড়ে দেয় না। এরা সব সময় যুদ্ধের পোশাক পরে থাকে। কোমরে ঝোলানো থাকে লম্বা দা, হাতে বর্শা আর তীর-ধনুক, কোমরের গেঁজে চকমকি পাথর, তারপর জলের থলি। সারা গায়ে-মুখে নানা রঙের উল্কি আঁকা।

—তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ মকবুল—ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—হয় তো তাই। মকবুল পাশ ফিরতে-ফিরতে বলল।

* * *

সকালবেলা লোকজনের ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকিতে দুর্গের চত্বরটা মুখর হ'য়ে উঠল। মাসাই

কুলীরা সব মালপত্র নিয়ে তৈরী হল। ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মকবুল তৈরী হ'য়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগল জন আর ভিক্টরের জন্যে। একটু পরে জন আর ভিক্টর এল। কুলীদের লাইন করে দাঁড় করানো হল। সামনে রইল সেই গাইড। সঙ্গে জন আর ভিক্টর। লাইনের মাঝামাঝি রইল ফ্রান্সিস আর মকবুল। দলের শেষের দিকে রইল হ্যারি।

যাত্রা শুরু হল। দুর্গের সামনে বেশ বড় একটা মাঠ। তারপরেই শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল। গাইডটির হাতে একটা লম্বাটে দা। কোথাও-কোথাও দা দিয়ে জঙ্গল কেটে যাওয়ার পথ করে নিতে হচ্ছে। শুধু বন আর বন। কত রকমের গাছগাছালি, ফল-ফুলই বা কত রকমের। জঙ্গল এত ঘন যে সূর্যের আলো পর্যন্ত ঢুকতে পারছে না। আন্দাজেই বেলা বুঝে নিতে হচ্ছে। বনে আর কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না—শুধু বানর আর বেবুনের কিচিমিচি ডাক। সেই সঙ্গে বিচিত্র সব পাখির ডাক। দুপুর নাগাদ একটা ঝরণার কাছে এসে দলটি থামল। এবার খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে হল। ফ্রান্সিসের ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল। প্রাণ ভরে ঝরণার জল খেয়ে নিল। আঃ! কি সুন্দর স্বাদ জলের। ওর দেখাদেখি অনেকেই ঝরণার জল খেল! খাবারের বাক্স খোলা হলো। সবাইকে খেতে দেওয়া হ'ল। আসার সময় ফ্রান্সিস পথে কয়েকটা বনমুরগী দেখেছিল। মনে-মনে ঠিক করল—কালকে কয়েকটা বনমুরগী মেরে মাংস খেতে হবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু হল যাত্রা। গভীর জঙ্গলের মধ্যে পথ করে নিতে হচ্ছে। কাজেই তাড়াতাড়ি হাঁটা যাচ্ছিল না। থেমে-থেমে চলতে হচ্ছিল।

সন্ধ্যে হবার আগেই বনের রাস্তা অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এবার রাত্তিরের জন্যে বিশ্রাম। ফ্রান্সিসদের একটা আলাদা তাঁবু দেওয়া হ'ল। রাতটা নির্বিঘ্নেই কাটল। তাঁবুর কাছেই একটা চিতাবাঘ কিছুক্ষণ ধ'রে গর্ গর্ ক'রে ডেকেছিল। পরে আর চিতাবাঘের ডাক শোনা যায়নি। শেষ রাত্তিরের দিকে দুটো হায়না তাঁবুর কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কুলীরা আগুন জেলে শুয়েছিল। পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মারতে সে দু'টো পালিয়েছিল।

পরদিন সকালে তাঁবু আর জিনিসপত্র গোছ-গাছ করে আবার রওনা হল সবাই। সেই জঙ্গল কেটে পথ তৈরী করতে হল। গভীর বন। শুধু বাঁদর, বেবুন আর পাখির কিচিমিচি। সবাই সার দিয়ে চলছে। গতকালকের মত কয়েকটা বনমুরগীর দেখা পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস আর লোভ সামলাতে পারল না। গাইড নিগ্রোটির কাছ থেকে তীর-ধনুক চেয়ে নিল। তারপর একটা মুরগীর দিকে নিশানা করে তীর ছুঁড়ল। কিন্তু তীরটা কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল। পরের বার আরো সাবধানতার সঙ্গে তীর চালাতে একটা মুরগী বিদ্ধ হল। এইভাবে সাতটা মুরগী মারা পড়ল। সেদিন দুপুরে মুরগীর মাংস দিয়ে খাওয়াটা ভালোই হল। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু জিরিয়ে আবার যাত্রা শুরু হল!

সেই একঘেয়ে বন। বাঁদর, বেবুন আর পাখি-পাখালির ডাক। মাঝে সুন্দর ঝরণা। তৃপ্তিভরে ঝরণার জল খেয়ে নিল সবাই। তারপর আবার পথচলা। কুলীদের সর্দার পথ চলতে-চলতে কাঁপা-কাঁপা গলায় কী একটা দুর্বোধ্য গানের সুর ধরল। বাকী কুলীরা সবাই সেই সুরে গাইতে-গাইতে পথ চলল।

* * *

ছ'দিন পরের কথা। দুপুর নাগাদ ওরা একটা বিস্তীর্ণ মাঠের মত জায়গায় এসে উপস্থিত

জল। সেই মাঠে দলবদ্ধভাবে চরে বেড়াচ্ছে অনেক জেব্রা। কুলীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। জেব্রার মাংস ওদের খুব প্রিয়। কুলীদের সর্দার তীর-ধনুক নিয়ে কয়েকটা বুনো ঝোপের আড়ালে-আড়ালে জেব্রাগুলোর অনেক কাছাকাছি চলে গেল। তারপর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের বিরতিতে প্রায় একসঙ্গে পাঁচটা তীর ছুঁড়ল। সবগুলো তীরই একটা জেব্রার গলায়, পেটে, কাঁধে গিয়ে বিঁধলো। আহত জেব্রাটা ছুটে চলল। সর্দার কুলীও ছুটল। তার সঙ্গে আরো দু'তিনজন জেব্রাটাকে ধাওয়া করল। অন্যান্য জেব্রাগুলো ততক্ষণে পালিয়েছে। আহত জেব্রাটার সাদা-কালো ডোরাকাটা চামড়ায় রক্তের ছোপ লাগল। জেব্রাটা আর দ্রুত ছুটতে পারছিল না। বোঝা গেল, জেব্রাটা বেশ আহত হয়েছে। কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করবার পর জেব্রাটাই ক্লান্তিতে মাটিতে বসে পড়ল। তখন কুলীদের সর্দার আর কয়েকজন নিগ্রো কুলী মিলে জেব্রাটাকে বেঁধে নিয়ে এল। জেব্রাটাকে কাটা হল। তারপর আগুন জেলে জেব্রার মাংস পুড়িয়ে ওরা মহানন্দে খেতে লাগল। সন্ধ্যে হ'য়ে এল। ঐ মাঠেই একটা নিঃসঙ্গী গাছের নীচে তাঁবু ফেললো। রাতটা নিরুপদ্রবেই কাটাল।

কিছু খেয়ে-দেয়ে সকালবেলা আবার যাত্রা শুরু হল। মাঠের এলাকা ছেড়ে আবার নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে দলটি এগিয়ে চলল। সেই গভীর বনের নীচে আধো আলো-অন্ধকারের মেশামেশি। তারই মধ্য দিয়ে পথ ক'রে দলটি এগিয়ে চলল।

হঠাৎ যেন জাদুমন্ত্রবলে কয়েকজন লোক দলটির চলার পথের ওপর এসে দাঁড়াল। মনে হলো, এতক্ষণ যেন ওরা এদে'র গতিবিধির ওপর নজর রেখেছিল। কারণ ওরা এদের যাবার পথের ওপরেই দাঁড়াল। অগত্যা দলটি থমকে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস দেখল, সেই লোকগুলি নেংটি পরে আছে। সারা গায়ে মুখে নানারঙের উলকি আঁকা। হাতে বর্শা তীর-ধনুক, কোমরে ঝোলানো লম্বাটে দা। মকবুল তখন ওর পাশে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস বুঝতে পারেনি। মকবুল ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রাখতেই ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। বলল—কী ব্যাপার?

মকবুল ইশারায় আস্তে কথা বলতে বলল। তারপর চাপাস্বরে বলল—এরাই উপজাতির লোক। এদের কথাই তোমাকে বলেছিলাম।

—কিন্তু এদের মতলবটা কি? ফ্রান্সিস চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করল।

—ঠিক বুঝতে পারছি না। মকবুল গলা নামিয়ে উত্তর দিল। ফ্রান্সিসদের দলের সামনে ছিল গাইডটি। তার সঙ্গেই এদের কথাবার্তা চলল। গাইডটি ফিরে এসে জনকে বলল—এই লোকগুলি কাপড়, আয়না, চিরুনি, পুঁতির মালা এইসব চাইছে।

জন রেগে বলল—ওসব আমরা দেব না। তারপর আগন্তুক দলটির দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল—ভালো চাও তো রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াও।

লোকগুলোর মধ্যে যে দলপতি, তার গালে লম্বা কাটা দাগ। জনের কথা শুনে তার চোখ দু'টো যেন জ্বলে উঠল মুহূর্তের জন্যে। সে চীৎকার করে কী একটা ব'লে উঠল। তারপর যেমন বন ফুঁড়ে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

জন এসব নিয়ে মাথা ঘামাল না। চেঁচিয়ে হুকুম দিল—চলো সব।

আবার হাঁটা শুরু হল। হাঁটতে-হাঁটতে মকবুল এক সময় ফ্রান্সিসের কাছে এল। ধীরে-ধীরে বলল—জন সাহেব কাজটা ভালো করল না।

—কেন ? ফ্রান্সিস বলল।

—ওরা সহজে ছেড়ে দেবে না। আপোসে মিটিয়ে নিলেই ভালো ছিল। কিন্তু তা না করে ওদের রাগিয়ে দেওয়া হল।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। মনে-মনে ভাবল—মকবুল মিছিমিছি ভয় পাচ্ছে। কী করবে ওরা ? মকবুল কিন্তু ব্যাপারটা সহজ ভাবে নিল না। মাথা নীচু করে কী যেন ভাবতে-ভাবতে হাঁটতে লাগল। আবার মাঝে-মাঝে ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে বনের চারদিকে তাকিয়ে কী যেন দেখে নিতে লাগল। মকবুল যে ভীষণ ভয় পেয়েছে, এটা ওর চোখ-মুখ দেখেই ফ্রান্সিস বুঝতে পারল।

আরো দু'দিন হাঁটা পথে যাত্রা চলল। তিন দিনের দিন ফ্রান্সিসদের দল একটা ছোট পাহাড়ের নীচে উপস্থিত হল। এদিকে জঙ্গলটা তত ঘন নয়। একটু ছাড়াছাড়া গাছ-পালা। তারই মধ্যে দেখা গেল ইতস্তত: ছড়ানো হাতীর কঙ্কাল। গাইড বুঝিয়ে বলল—মরবার সময় উপস্থিত হলে হাতীরা নাকি বুঝতে পারে। তখন দল ছেড়ে বনের মধ্যে নিরুপদ্রব একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে শুয়ে পড়ে। তারপর হয় মৃত্যু। এসব জায়গা-গুলো গাইডরা খুব ভালোভাবেই চেনে। সেই জন্যেই গাইডদের নিয়ে হাতীর দাঁত শিকার করতে আসা সুবিধাজনক। দেখা গেল, পাহাড়টা একেবারে চাঁছাছোলা পাথরের ঢিবি একটা গাছও নেই পাহাড়টায়। তবে একটা জলপ্রপাত আছে। আঁজলা ভরে সেই জল-প্রপাতের জল খেল অনেকেই।

হঠাৎ গাইডটিকে দেখা গেল উত্তেজিত ভঙ্গীতে ছুটে আসছে। গাইডটি যে সংবাদ দিল তা অপ্রত্যাশিত। পাহাড়টাতে একটা গুহা রয়েছে। সেখানে নাকি অনেক হাতির দাঁত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ফ্রান্সিস, জন, ভিক্টর সবাই ছুটল গুহাটার দিকে। বাইরের আলো থেকে প্রায় অন্ধকার গুহাটায় ঢুকে প্রথমে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আস্তে-আস্তে গুহার অন্ধকারটা সরে আসতে দেখা গেল অনেকগুলো হাতীর দাঁত ও হাতীর কঙ্কাল ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। জন আর দেরী করল না। কুলীদের হুকুম দিল দাঁতগুলো সব একত্র করে বেঁধে তাঁবুতে নিয়ে রাখতে। ফেরবার সময় প্রত্যেক কুলীকে একটা করে দাঁত বয়ে নিয়ে আসতে হবে।

হাতীর দাঁতগুলো নিয়ে আসার বন্দোবস্ত হচ্ছে, এমন সময় গাইড খবর নিয়ে এল, এক-পাল হাতী পাহাড়ের নীচের জঙ্গল ঝোপঝাড় ভেঙে এই দিকেই আসছে। তাড়াতাড়ি লম্বামত একটা বাক্স থেকে তীব্র বিষমাখা তীর-ধনুক বের করা হল। গাইডটি নিজে তীর-ধনুক নিল। তাছাড়া আরো দু'জনকে তীরধনুক দিল। তিনজন তিন জায়গায় দাঁড়াল। গাইডটি দাঁড়াল পাহাড়ের গায়ে-লাগা একটা বড় পাথরের ওপর। অন্য দু'জনের মধ্যে একজন পাহাড়ের নীচে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রইল আর একজন দাঁড়াল পাথরের আড়ালে।

কিছুক্ষণ পরেই একদল হাতী গাছপালা, ঝোপঝাড় ভাঙতে-ভাঙতে এগিয়ে এল। যে-খানে এসে হাতীগুলো দাঁড়াল, সেখানটায় বন-জঙ্গল ছাড়া-ছাড়া। ওদের ওপর নজর রাখতে কোন অসুবিধে হল না। হাতীগুলোর মধ্যেই দু'টো হাতী দাঁতাল ছিল। বাকীগুলো মা-হাতী আর বাচ্চাহাতী। পাথরের ওপর থেকে গাইডটি চীৎকার করে বলল—'শুধু

দাঁতাল হাতী দু'টোকে মার'।

কথাটা শেষ হতে না হতেই তীর ছুটল। পাঁচ-সাতটা তীর পর-পর গিয়ে বিঁধল হাতী দু'টোর গায়ে। হাতী দু'টো কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। তারপর এক সময় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। অন্য হাতীগুলো ততক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আবার তীর ছুঁড়ল। হাতী দু'টোর গায়ে বিদ্ধ হল তীরগুলো। হাতী দু'টো আর উঠতে পারল না। আস্তে-আস্তে মাটির ওপরে এলিয়ে পড়ল। তীর বিষের প্রতিক্রিয়া শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতী দু'টো জোরে-জোরে শ্বাস ছাড়তে-ছাড়তে মারা গেল। তখন কুলীদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। তারা সবাই ছুটে গেল হাতী দু'টোর কাছে। ওদের মধ্যে একজন ধারাল ছুরি দিয়ে হাতীর পেটটা গোল করে কাটল। তারপর ভেতরে ঢুকে হাতীর মস্তবড় মেটেটা কেটে নিয়ে এল। ততক্ষণে আর এক দল কুলী জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা কাঠ এনে আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে। ফ্রান্সিস একবার ভাবল, ওদের বারণ করে। কারণ হয়তো হাতীটির রক্তের সঙ্গে-সঙ্গে মেটেটাও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বারণ করতে যাওয়া বৃথা। হয়তো এরকম অবস্থায় হাতীর মেটে এর আগেও ওরা খেয়েছে। ওরা হাতীর মেটে আগুনে ঝলসাতে লাগল। ফ্রান্সিসরা তীর দিয়ে যে বুনো মুরগী মেরেছিল—তাই রান্না চাপাল।

রান্না শেষ হলে ফ্রান্সিসরা কয়েকজন জলপ্রপাতে স্নান করতে গেল। গত বেশ কয়েক-দিন স্নান করা হয় নি। এখন স্নান করার সাধ মনের সুখে মেটাল ওরা। তারপর খেতে বসল। ওদিকে কুলীরা খাচ্ছে, আর এদিকে ফ্রান্সিসদের দল খাওয়া-দাওয়া চলছে। হঠাৎ বনের চারদিক কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। না পাখি-পাখালির ডাক, না বাঁদর, বেবুন, শিপাঞ্জীর কিচিরমিচির ডাক। ফ্রান্সিসের কাছে ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত লাগলো। এ সময় মকবুল ফ্রান্সিসের কাছে সরে এলো। তারপর মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস, আমরা বোধহয় বিপদে পড়বো।

—কীসের বিপদ ?

—লক্ষ্য করো নি—এই জায়গাটা কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

—তাতে কী হয়েছে—

—কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারবে, মোরান উপজাতির লোকেরা সাংঘাতিক। বনের পশুপাখিও ওদের ভয় করে চলে। মকবুলের কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে জন চীৎকার করে নিজের খাবারের থালার ওপর ঝুঁকে পড়ল। দেখা গেল জনের পিঠে একটা তীর এসে বিঁধেছে। জন বারকয়েক উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। মাটিতে শুয়ে পড়ল। কী হল, সেটা বোঝবার আগেই আর একটা তীর এসে বিঁধলো ভিক্টরের পিঠে। ভিক্টর মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল। মকবুল খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠল—ফ্রান্সিস, শীগগির পালাও। ফ্রান্সিস আর হ্যারি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে দু' একজন কুলীর গায়ে তীর লেগেছে। তাদের মধ্যেও হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সবাই পালাতে চাইছে। এলোপাথাড়ি আরো কয়েকটা তীর ফ্রান্সিসদের আশেপাশে পড়ল।

ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মকবুলকে আঙ্গুল দিয়ে পাহাড়টা দেখিয়ে চীৎকার করে বলল—পাহাড়ের দিকে চলো। তারপর তিনজনেই ছুটতে শুরু করল। কিন্তু একটু পরেই

ওদের থামতে হল। পাহাড়ের নীচে থেকে শুরু করে সমস্ত জঙ্গল এলাকায় ওদের চারদিক ঘিরে আস্তে-আস্তে জঙ্গলের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াতে লাগল—মোরান উপজাতির যোদ্ধারা। কোমরে ঝোলানো লম্বাটে দা। হাতে তীর-ধনুক আর বর্শা। মুখে খালি গায়ে উল্কি আঁকা। প্রায় শ' পাঁচেক হবে। পালাবার কোন উপায় নেই। ফ্রান্সিসরা আস্তে-আস্তে ওদের তাঁবুর কাছে এসে অপেক্ষা করতে লাগল দেখা যাক্, ভাগ্যে কী আছে?

মোরান যোদ্ধাদের মধ্যে একজন তীব্রস্বরে কু-উ-উ বলে ডাক দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত যোদ্ধারা বর্শা উঁচিয়ে একসঙ্গে আনন্দে চীৎকার করে উঠল। অর্থাৎ যুদ্ধে জয় হয়েছে। শত্রুরা পরাস্ত। প্রায় সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁবুগুলোর ওপর। জিনিসপত্র সব ছত্রাখান করে দিল। তারপর তাঁবুগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। সেই আগুন ঘিরে চলল উন্মত্ত নৃত্য। ফ্রান্সিসরা অসহায়ভাবে তাই দেখতে লাগল।



মোরান যোদ্ধাদের মধ্যে একজন তীব্র-স্বরে কু-উ-উ বলে ডাক দিল।

একটু পরে পাঁচ-ছয় জন মোরান যোদ্ধা এগিয়ে এল ফ্রান্সিসদের দিকে। ওদের দলের প্রথমেই রয়েছে সেই গাল কাটা সর্দার। খুশীতে ওর চোখ দুটো চিকচিক করছে। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে লোকটা চীৎকার করে কী যেন বলল। সঙ্গে-সঙ্গে দু'তিনজন যোদ্ধা এগিয়ে এল। তারা ফ্রান্সিস, মকবুল আর হ্যারির হাত পেছনে দিকে বেঁধে ফেলল। লতাগাছ যে এত শক্ত হয়, ফ্রান্সিসের তা জানা ছিল না। বাঁধনটা যেন চামড়াটা কেটে বসে গেল।

এতক্ষণ ব্রাক্স-প্যাটরা ভাঙা চলছিল। হঠাৎ ওদের নজরে পড়ল গুহা থেকে এনে জড়ো করে রাখা হাতীর দাঁতগুলো ওপর। একজন ছুটে এসে সর্দারকে বোধহয় সেই কথাই জানাল। সর্দার সব হাতীর দাঁতগুলো নিতে হুকুম দিল। এমন কি মরা হাতী দুটোর দাঁতও ছাড়ানো হল। বোঝা গেল—ওরাও হাতীর দাঁতের মূল্য জানে।

ফ্রান্সিসদের হাত বাঁধবার সঙ্গে-সঙ্গে কুলীদের হাতও বাঁধা হয়েছিল। এটা হ্যারির নজরে পড়ল একবার। হ্যারি মকবুলকে ডাকল—মকবুল।

—কি?

—আমাদের ভাগ্যে যা আছে হবে। তুমি ওদের সর্দারকে বুঝিয়ে বলো যে, কুলীদের ওপর কোন অত্যাচার না করে। ওদের কোন দোষ নেই।

মকবুল গালকাটা সর্দারকে মোরানদের ভাঙা ভাষায় কথাটা বলল। সর্দার এক মুহূর্ত হ্যারির দিকে তাকাল। তারপর কী একটা বলে উঠতেই কুলীদের হাতের বাঁধন কেটে দেওয়া হল। এবার গালকাটা সর্দার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে চলতে ইঙ্গিত করল।

পেছন থেকে কয়েকজন ফ্রান্সিসদের ধাক্কা দিল। সর্দার পাঁচ-ছয় জন সঙ্গী নিয়ে আগে-আগে চলল। তাদের পেছনে ফ্রান্সিসদের তিনজন। তাদের পেছনে অন্য সব মোরান যোদ্ধারা। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলা শুধু হল। যতক্ষণ বনজঙ্গলের ছায়ায়-ছায়ায় হেঁটেছে ওরা ততক্ষণ গরম লাগে নি, কিন্তু যখনই বন ছাড়িয়ে ফাঁকা-ফাঁকা মেঠো জায়গা দিয়ে হাঁটতে হয়েছে, তখনই অসহ্য গরমে ঘেমে উঠেছে ফ্রান্সিসরা। পথে দু'জায়গায় মাত্র থেমেছিল ওরা জল খাবার জন্যে। বিকেল নাগাদ ওরা সকলে মোরানদের গ্রামে এসে পেঁছাল। গোল-গোল পাতায় ছাওয়া বাড়ীগুলো। সামনে উঠোন—বেশ নিকোনো—পরিষ্কার। গ্রামের মধ্যস্থলে একটা উন্মুক্ত চত্বরে খুঁটির সঙ্গে ফ্রান্সিসদের তিনজনকে বেঁধে রাখা হল।

*   *   *

রাত হতেই শুরু হল জয়োল্লাস। ওদের ঘিরে মোরানদের নাচ শুরু হল। একজন তীক্ষ্ণস্বরে কী গাইতে লাগল। বাকীরা সবাই নাচতে লাগল। মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় জায়গাটা যেন আরো ভয়ানক হয়ে উঠল। সারারাত ধরে ফ্রান্সিসরা কেউ দু' চোখের পাতা এক করতে পারল না। শেষরাতের দিকে মোরানদের উল্লাসে একটু ভাঁটা পড়ল। একটু পরেই ভোর হল। সারারাতের অতিনিদ্রায় ফ্রান্সিসের একটু তন্দ্রা এসেছিল। সেই তন্দ্রাটুকুও ভেঙে গেল সর্দারের হাঁকডাকে। একটা কিছুর আয়োজন চলছে, এটা ফ্রান্সিস বুঝল। কিন্তু আয়োজনটা কীসের, সেটা তখনও বুঝতে পারল না।

একটু বেলা হতেই দেখা গেল, গাঁয়ের লোকেরা সেই চত্বরে এসে গোল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটায় একটা হাঁড়িমত বসালো। তার সামনে বালি দিয়ে সীমা টেনে একটা গোলমত করা হল। তার ওপর গাছের শুকনো ডাল বিছিয়ে দেওয়া হল। সেই গোলের একটা দিক শুধু খোলা রইল। এসব দেখে মকবুল আস্তে ডাকল—'ফ্রান্সিস !'

ফ্রান্সিস মুখ ঘুরিয়ে মকবুলের দিকে তাকাল। দেখল—ভয়ে মকবুলের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। স্পষ্টই বোঝা গেল, ওর সারা শরীর কাঁপছে। ফ্রান্সিস বলল… কী হয়েছে মকবুল ?

মকবুল অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলল…'ফ্রান্সিস আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত।'

ফ্রান্সিস কথাটা শুনে চমকে উঠল। তবু শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল—কী করে বুঝলে ?

—ঐ যে গোলমত জায়গাটা সাজাচ্ছে—ওখানে শুকনো ডাল গুলোতে ওরা আগুন দেবে। তারপর ঐ গোল জায়গাটায় ছেড়ে দেবে একটা বিষধর সাপ। গোলের যে দিকটা খোলা, সেইদিক দিয়ে সাপটা বেরোতে চেষ্টা করবে। আর সেখানে মাথা প্রায় মাটিতে ঠেকিয়ে রাখা হবে আমাদের কাউকে। আগুনের বেড়াজাল থেকে বেরোতে না পেরে সাপটা ক্ষেপে উঠবে। তারপর খোলা দিকটায় শোয়ানো মাথায় ছোবল মারবে।

বিমূঢ় ফ্রান্সিস কোন কথা বলতে পারল না। কী সাংঘাতিক ? সত্যিই একটু পরে গোল করে সাজানো-শুকনো ডালগুলোতে ওরা আগুন লাগিয়ে দিল। জোর ঢাক বেজে উঠল। ঝুড়ি থেকে একটা সাপ বের করে ছেড়ে দেওয়া হলো সেই গোল জায়গাটায়। সাপটা যতবার বেরোবার চেষ্টা করলো, ততবারই আগুনের তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ফুঁসতে লাগল।

এবার দু'তিনজন লোক মকবুলের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর মকবুলকে টানতে লাগল। মকবুল বুঝল নিশ্চিত মৃত্যু। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও যেন হঠাৎ মনোবল ফিরে পেল। চীৎকার করে বলে উঠল—ফ্রান্সিস এরা নানাভাবে কষ্ট দিয়ে মানুষ মারে। আমার মৃত্যু অবধারিত। তাই বলছি—তোমরা সুযোগমাত্র পালিও।

—কিন্তু কী করে? হতাশার ভঙ্গীতে ফ্রান্সিস বলল। লোকগুলো মকবুলকে ধরে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করল। মকবুল দ্রুত বলে যেতে লাগল—'এরা বুনো হাতির দঙ্গলে মানুষ ছুঁড়ে দিয়ে মারে, কুমীরভরা নদীতে মানুষকে জোর করে ঠেলে দেয়। আর একটা খেলা খুব প্রিয়। সর্দার একটা তীর ছোঁড়ে। তারপর যাকে মারবে, তাকে বলা হয় ছুটে গিয়ে তীরটা খুঁজে বের করতে। সে ছুটতে শুরু করলেই এদের দলের একজন তাকে ধরতে ছোটে। যদি লোকটা তাকে ধরবার আগেই সে তীরটা খুঁজে পেয়ে যায়, তাহ'লে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়—নইলে মৃত্যু।' মকবুল হাঁপাতে লাগল। লোকগুলো মকবুলকে সজোরে টানতে লাগল। মকবুল গায়ের সমস্ত শক্তিতে ফ্রান্সিসের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বলল—'যদি তীর খোঁজার খেলা হয়—তাহ'লে তীর খোঁজার জন্য দাঁড়িও না। প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে যেও। এছাড়া এদের কাছ থেকে বাঁচবার আর কোন পথ নেই। এদের কোনদিন বিশ্বাস করো না।'



মকবুল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সাপটির দিকে।

এবার লোকগুলো মকবুলের ঘাড় ধরে ধাক্কা দিতে লাগল। মকবুল আর বাধা দিল না। ওদের নির্দেশমতই চলল গোল জায়গাটার দিকে। গোল জায়গাটার যেদিকটা ফাঁকা সেইখানে মকবুলকে ঠেলে হাঁটু গেড়ে বসানো হল। তারপর জোর করে ওর মাথাটা নুইয়ে দেওয়া হলো। মকবুল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সাপটার দিকে। পালাতে গিয়ে বারবার আগুনের ছ্যাঁকা খেয়ে-খেয়ে সাপটা তখন ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মকবুলের মাথাটা সামনে রেখে ফুঁসে উঠে ছোবল বসাল। চারপাশে ঘিরে দাঁড়ানো লোকেরা চীৎকার করে উঠল। মকবুল মাটিতে এলিয়ে পড়ল। ওর সারা মুখটা কালচে হয়ে উঠল। দু'একবার এপাশ-ওপাশ করতে-করতে স্থির হয়ে গেল মকবুলের শরীরটা। উল্লাসে মোরানরা চীৎকার করে উঠল। ঢাক বেজে উঠল।

ফ্রান্সিস অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল। কত সুখ-দুঃখের সঙ্গী মকবুল। এমনি করে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল। চোখ ফেটে জল এল ফ্রান্সিসের। কিন্তু কাঁদতে পারল না। ঘটনার ভয়াবহতা তাকে কিছুক্ষণের মধ্যে বিমূঢ় করে দিল। পরক্ষণেই দৃঢ় হয়ে উঠল ফ্রান্সিস। যেমন করেই হোক এর শোধ তুলতেই হবে।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকল—'হ্যারি।'

হ্যারি মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। হয়তো যা ঘটে গেল, সেটা আন্দাজেই বোঝবার চেষ্টা করছে। তাকিয়ে দেখতে পারেনি। আস্তে-আস্তে মাথা তুলে হ্যারি ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি আমাদের ভাগ্যে কী আছে, জানি না। যা-ই ভাগ্যে থাকুক এবার হাতদুটো খোলা পেলে এর প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে—মনে থাকে যেন।

হ্যারি কোন কথা বলল না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আবার মাথা নীচু করে নিজের ভাবনায় ডুবে গেল।

বেলা বাড়তে লাগল। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় ওরা দাঁড়িয়ে রইল। গতকাল দুপুরে আধপেটা খাওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে একটা দানাও পেটে পড়ে নি। তার ওপর সারারাত ঘুম হয় নি। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেল—তবু ফ্রান্সিস জল খেতে চাইল না। হ্যারি জল খেতে চেয়েছিল। ফ্রান্সিস রেগে-ফুঁসে উঠেছিল—'হ্যারি—জল না খেতে পেয়ে যদি মরেও যাই, কোন দুঃখ নেই। কিন্তু এদের কাছ থেকে এক ফোঁটা জলও খেতে চাই না।' ওরা হ্যারির জন্য জল নিয়ে এল। কিন্তু হ্যারি মাথা নেড়ে জল খেতে অস্বীকার করল।

সূর্য তখন মাথার ওপরে—যেন আগুন ছড়াচ্ছে। গালকাটা সর্দার দু'জন সঙ্গী নিয়ে ওদের কাছে এল। সকলেরই পরনে যুদ্ধের সাজ। কোমরে লম্বাটে দা, একহাতে ধনুক, অন্য হাতে বর্শা। কোমরে জলের থলি আর চকমকি পাথর। সর্দার এগিয়ে এসে কী একটা বলল। একজন লোক এসে ফ্রান্সিস আর হ্যারির হাতের বাঁধন খুলে দিল। সর্দার কী একটা চীৎকার করে হুকুম করল। সর্দারের দু'তিন-জন সঙ্গী ফ্রান্সিসের পিঠে ধাক্কা দিয়ে চলতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি এগিয়ে চলল। সকলের সামনে গালকাটা সর্দার।

জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকামত জায়গায় সবাই এসে দাঁড়াল। সর্দারের হাতে তীর-ধনুক ছিল না। সে একজনের হাত থেকে তীর নিয়ে ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের বোঝাতে লাগল, কী করতে হবে ওদের। মকবুলের কথা ফ্রান্সিসের মনে পড়ল। এটা সেই তীর খুঁজে বার করার খেলা। এই শেষ সুযোগ—পালাবার একমাত্র উপায়—ফ্রান্সিস নিজের মনকে বোঝাল। খুব মৃদুস্বরে লক্ষ্য করে বলল—আমি যা-যা বলবো, মন দিয়ে শুনে সেই মত কাজ করবে। ফ্রান্সিস সর্দারের দিকে এবার মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাল যে, সর্দার যা বলছে, সে তা বুঝতে পেরেছে। তারপরে সর্দারকে ইঙ্গিতে বোঝাল যে, দু'জনকেই একসঙ্গে ছুটতে দেওয়া হোক। সর্দার কী ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। সর্দারের হুকুমে ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে জামা-জুতো খুলে ফেলতে হল। এবার ধনুকে তীর লাগিয়ে যেদিকে তাক করল, সেদিকে বেশ কিছু দূরে একটা টিলা রয়েছে, দেখা গেল। ওদিকে যেতে হলে কাঁটাগাছের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। খালি পায়ে যে কী অবস্থা হবে, ফ্রান্সিস সেটা সহজেই অনুমান করতে পারল। যাতে কাঁটাগাছ ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বেশী জোরে ছুটতে না পারে, তার জন্যই জুতো খুলতে হুকুম দেওয়া হল। সর্দার আর সঙ্গীদের পায়ে কিন্তু চামড়া জড়ানো লতাপাতা দিয়ে বাঁধা জুতোর মত

জিনিস পরা। ওদের পক্ষে ছুটতে ততো অসুবিধে হবে না।

সর্দার টিলার দিকে লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়ল। তীরটা কোথায় পড়বে ফ্রান্সিস মোটামুটি আন্দাজ করে নিল। ফ্রান্সিস ছুটবে কিনা ভাবছে—সর্দার ওর গায়ে ধনুকের খোঁচা দিল। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে হ্যারিকে বলে উঠল—'টিলার তলায়'।

তারপর ছুটতে আরম্ভ করল। হ্যারি বুঝল, টিলার তলায় ফ্রান্সিস অপেক্ষা করবে।

একটু পরে সর্দার একজনকে ইঙ্গিত করতেই সে ফ্রান্সিসকে ধরতে ছুটল। সর্দার আবার তীর ছুঁড়ল। তীরটা বাঁদিক ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। আগের তীরটা গিয়েছিল টিলার দিকে। হ্যারি ছুটতে শুরু করল।

এদিকে ফ্রান্সিস কিছুদূরে ছুটে আসতেই বুঝতে পারল, কাঁটাগাছে ঝোপঝাড়ে ওর দুটো পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। কিন্তু জীবন তার চাইতে মূল্যবান। তাই প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল টিলা লক্ষ্য করে। হঠাৎ নজরে পড়ল, তীরটা বুনো ঝোপে আটকে আছে। কিন্তু ফ্রান্সিস মুহূর্তের জন্যেও দাঁড়ালো না। সমান বেগে ছুটতে লাগল। টিলার তলায় পৌঁছে ফ্রান্সিস একটা পাথরে বসে হাঁপাতে লাগল। একটু পরে হ্যারির অস্পষ্ট গলা শুনতে পেল। হ্যারি ডাকছে—'ফ্রান্সিস'।



লোকটা হঠাৎ ফ্রান্সিসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—'এই যে আমি এখানে।'

হ্যারি হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বলল—'তুমি দৌড় শুরু করার একটু পরেই একজনকে পাঠানো হয়েছে তোমার সন্ধানে—হয়তো বা আমার পেছনে কাউকে পাঠানো হয়েছে। নষ্ট করার সময় নেই—দৌড়াও।'

ওরা ছুটতে শুরু করবে, এমন সময় পেছনের পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সর্দারের ছ'জন সঙ্গীর মধ্যে একজন। সেও হাঁপাচ্ছে, ফ্রান্সিস বলে উঠল—'হ্যারি, বাঁদিকের পাথরের আড়ালে যাও—ওখান দিয়েই বেরুবো আমরা।' লোকটা তখন কোমরে গোঁজা লম্বাটে দা-টা বের করে ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। হ্যারি একলাফে পাথরের আড়ালে চলে গেল। তারপর আড়াল থেকে বেরিয়ে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল। এদিকে ফ্রান্সিস এক দৃষ্টিতে লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটার দশাসই চেহারা, তার ওপর হাতে দা। ফ্রান্সিস নিরস্ত্র। সে পালাবার ফিকির খুঁজতে লাগল। লোকটা হঠাৎ ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস খুব দ্রুত উবু হয়ে বসে পড়ল, লোকটা তাল সামলাতে পারল না। উবু হয়ে পাথরের উপর গিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস সুযোগ বুঝে ছুটতে লাগালো। লোকটা মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কপালে হাত বুলাতে লাগল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস অনেক দূরে চলে গেছে। লোকটা ওদের লক্ষ্য করে দা হাতে ছুটতে লাগল।

হ্যারি যেদিকে ছুটে গিয়েছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ফ্রান্সিস ছুটতে শুরু করল। হঠাৎ ঝাঁকড়া-পাতা গাছের তলা থেকে হ্যারির চাপাস্বরে ডাক শুনতে পেল। গাছটার তলায় গিয়ে দেখল, হ্যারি ভয়ার্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে দৌড়াবার ইঙ্গিত করল। আবার দু'জনের ছুট শুরু হলো। বেশ কিছুটা দৌড়োবার পর ফ্রান্সিস কান পেতে রইল, যদি পেছনে কোন শব্দ শোনা যায়। কিন্তু কোন শব্দ তো নেই। শুধু বাঁদর আর পাখির কিচিরমিচির। পেছনের জঙ্গলটা ভাল করে দেখার জন্যে সামনেই যে পাথরের টিবিটা ছিল, হ্যারি সেটাতে গিয়ে উঠল। তারপর পেছনের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল—যদি অনুসরণকারী কাউকে নজরে পড়ে। হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে পড়ল ওদের হাতে তীর-ধনুক আছে। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে ডাকল—'হ্যারি, শীগ্‌গির নেমে এসো।'

হ্যারি নামবার জন্যে মাত্র একটা পা তুলেছে, পেছনের জঙ্গল থেকে একটা তীর এসে হ্যারির পায়ে বিঁধল। হ্যারি একটু দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। পাথরের গা ঘেঁসে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস পাগলের মতো ছুটে গিয়ে প্রথমে এক হ্যাঁচকা টানে তীরটা খুলে ফেলল। তারপর মাথাটা কোলে তুলে নিল। হ্যারি হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল—ফ্রান্সিস, শীগ্‌গি পালাও।

—না, তোমাকে ছেড়ে যাবো না। এবার ফ্রান্সিসের চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল।

হ্যারি বলে উঠল—পাগলামি করো না ফ্রান্সিস— শীগগির পালাও। তোমার কাছে এখন এক সেকেণ্ডের দামও অনেক। পালাও শীগগির।

ফ্রান্সিস তবুও অনড় হয়ে বসে রইল। হ্যারির তখন কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে। অনেক কষ্টে বলতে লাগল—আমি বাঁচবো না—আমার জন্যে ভেবো না। তুমি পালাও।

—না। ফ্রান্সিস কাঁদতে-কাঁদতে বলল—আমি তোমাকে না নিয়ে যাবোই না।

হ্যারি শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে আস্তে আস্তে উঠে ফ্রান্সিসের গালে একটা চড় মারল। উপবাসে অনিদ্রায় তৃষ্ণায় কাতর ফ্রান্সিসের শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল।

—শীগগির পালাও—হ্যারি ক্লান্তস্বরে বলল। হঠাৎ পেছনের জঙ্গলে ঝোপে-ঝাড়ে শব্দ উঠল। ফ্রান্সিস আর বসল না। হ্যারির মাথাটা কোল থেকে মাটির ওপর নামিয়ে দিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে শুরু করল। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর পেছনে শুনল একজন লোকের হর্ষোল্লাস। নিশ্চয়ই হ্যারিকে দেখতে পেয়েছে।

ফ্রান্সিস প্রাণপণে ছুটতে লাগল। যতবার হ্যারির কথা মনে পড়েছে, ততবারই চোখে জল এসেছে। দু'গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। বারবার চোখ মুছতে লাগল হাতের উলটো পিঠ দিয়ে। কিন্তু চোখের জল বাধা মানছে না। চোখের দৃষ্টি বারবার ঝাপসা হয়ে আসছে। চোখ মুছে নিতে হচ্ছে বারবার। ফ্রান্সিস মনে-মনে নিজের ওপরেই দোষারোপ করতে লাগল। কেন সে হ্যারিকে পথের টিবিটায় উঠতে বাধা দিল না। অনুসরণকারীর হাতে তীর ধনুক আছে, এই কথাটা মনে করতে তার এত সময় লাগল কেন?

একটু সাবধান হলে হ্যারিকে এভাবে প্রাণ দিতে হত না। দু' দুজন সঙ্গীকে চিরদিনের জন্যে হারানোর বেদনা তার মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করল। তবু ভীত হল না ফ্রান্সিস। বরং প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে উঠল তার মন। এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। হ্যারি আর ফিরবে না। মকবুলও নয়। তবু তাদের হয়ে প্রতিশোধ নিতে হবে। ফ্রান্সিস চোখ মুছল। না, কান্না নয়। বজ্রকঠিন হতে হবে। সংকল্পে দৃঢ় থাকতে হবে।

ফ্রান্সিস ছুটে চলল। এখন ভীষণ সাবধান হতে হবে। সজাগ থাকতে হবে। কোন শব্দই যেন কান এড়িয়ে না যায়। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। নাক-চোখ-মুখ দিয়ে যেন আগুনের হালকা বেরোচ্ছে। একটু জল চাই। কপাল ভালো ফ্রান্সিসের। হঠাৎ একটা ঝরণার দেখা পেল। একটু জল খাওয়ার সময় হয়তো পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস জল খেতে হাঁটু গেড়ে বসল। কিন্তু জল খাওয়া হলো না। পেছনে শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ উঠল। ফ্রান্সিস চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে শুরু করল।

এবার সামনেই পড়ল কয়েকটা বড়-বড় পাথরের টিলা। ফ্রান্সিস ছুটতে-ছুটতে টিলার ওপাশে চলে গেলো। পেছনেই একটা পাহাড়ী নদী। বেশী বড় নয়, কিন্তু তীব্র স্রোত। ফ্রান্সিস নদীর কাছে একটা বড় পাথরের আড়ালে বসে হাঁপাতে লাগল। একটু জিরিয়ে নিয়ে আঁজলা ভরে নদীর জল খেলো। তারপরে টিলার পাথরগুলোর আড়ালে-আড়ালে ওপরে উঠল। বেলা পড়ে এসেছে—তবু পাথরগুলো আগুনের মত গরম। একটা পাথরের গায়ে-গায়ে লেগে, আড়াল থেকে আস্তে-আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াল। দেখল, বনজঙ্গলের মধ্যে থেকে অনুসরণকারীদের মধ্যে একজন মাথা নীচু করে কী যেন দেখতে-দেখতে এগিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস বুঝল, এদের চোখে ধুলো দেওয়া প্রায় অসম্ভব। বনজঙ্গলের নাড়ী-নক্ষত্র ওদের জানা। ছুটে আসার সময় ফ্রান্সিসের পায়ের চাপে যে গাছগুলোর ডালপালা ভেঙেছে, লোকটা তাই দেখে ঠিক ফ্রান্সিসের পালাবার পথ চিনে নিচ্ছে। ফ্রান্সিস ভেবে দেখল, এই এক মস্ত সুযোগ। একজনের সঙ্গে তবু লড়া যাবে। কিন্তু গালকাটা সর্দার আর তার সঙ্গীরা এসে পড়লে ভীষণ বিপদ। মৃত্যু অনিবার্য। ফ্রান্সিস একটা ফন্দী বার করল।

টিলাটার নীচেই অনেকটা জায়গা জুড়ে বালি রয়েছে। তারই একধারে ফণীমনসা গাছের মত এক ধরনের গাছ। হাতী শিকার করতে যাওয়ার সময় ফ্রান্সিস এ ধরণের গাছ দেখেছে। এই গাছটার মোটা-মোটা পাতা ভেঙে দিলেই টপ্-টপ্ করে ঘন সাদা দুধের মত রস পড়তে থাকে। ফ্রান্সিস কিছু শুকনো পাতা জড়ো করে একটা গাছের নীচে রাখলে। তারপর গাছটার দু'টো পাতা ভেঙে দিল। টপ্-টপ্ করে শুকনো পাতাগুলোর ওপর রস পড়তে লাগল আর বেশ শব্দ হতে লাগল। শব্দ শুনলেই মনে হবে কেউ যেন শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হাঁটছে। এবার ফ্রান্সিস একটা বড় গোছের পাথর কাঁধের ওপর তুলে ধরে রাখল। ওর এক মাত্র অস্ত্র। তারপর দাঁড়াল এসে সেই গাছটার ঠিক উল্টোদিকে একটা পাথরের আড়ালে। আশঙ্কা উত্তেজনায় ফ্রান্সিসের বুক টিপ্ টিপ্ করতে লাগল। সময় যেন আর কাটে না।

এক সময় দেখা গেল, সেই লোকটা খুব সন্তর্পণে বালির ওপর পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ লোকটা ফ্রান্সিসের দিকে পেছন ফিরে উল্টোমুখো হয়ে দাঁড়াল। নিশ্চয়ই শুকনো পাতায় গাছের রস পড়ার শব্দ কানে গেছে ওর। ফ্রান্সিস এই সুযোগের প্রতী-

শক্ত ওই ছিল। লোকটা চালাকি ধ'রে ফেলার আগেই কাজ সারতে হবে। ফ্রান্সিস আর দেরী করল না। দুই লাফে এগিয়ে এসে পাথরটা দু'হাতে তুলে প্রচণ্ড বেগে ঘা বসাল লোকটার মাথায়। লোকটা এই হঠাৎ আক্রমণে একদিকে যেমন হকচকিয়ে গেল, তেমনি মাথায় জোর ঘা লাগতে বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস আর এক মুহূর্তও দেরী করল না। ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিল। লোকটাও উঠে দাঁড়িয়ে বসেছে তখন। ফ্রান্সিসও সঙ্গে-সঙ্গে লোকটার বুক লক্ষ্য করে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বর্শা চালাল। 'অক্'—করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল লোকটার মুখ থেকে। তারপরেই লোকটা চিত হয়ে বালির ওপর পড়ে গেল। বার কয়েক ওঠবার চেষ্টা করল। তারপর স্থির হয়ে গেল। হ্যারি আর মকবুলের মৃত্যুর প্রতিশোধ সে নিতে পেরেছে, এই ভেবে ফ্রান্সিস উল্লাসে চীৎকার করে উঠতে চাইল। কিন্তু বিপদের গুরুত্ব বুঝে চুপ করে রইল। হাঁপাতে-হাঁপাতে কপালের ঘাম মুছল। তারপর মৃত লোকটির কোমর থেকে লম্বাটে দা'টা নিল, বুক থেকে টেনে বর্শাটা খুলে নিল। ধনুক নিল—তীরগুলো নিল। জলের থলি আর চকমকি পাথর নিয়ে কোমরে গুঁজল এবার জুতো। বুনো লতাপাতা দিয়ে বাঁধা চামড়ার জুতোর মত জিনিসটা পায়ে পরে নিল। যখন নীচু হয়ে জুতো পরছে, তখনই বেলা শেষের একটা লম্বাটে ছায়া নড়ে উঠল। চকিতে মুখ তুলে তাকাতেই দেখল—আর একটা লোক। গালকাটা সর্দারের আর একটা সঙ্গী। লোকটা দাঁত বের করে হাসল। বীভৎস সেই হাসি। প্রকাণ্ড লোকটা কোমর থেকে লম্বাটে দা'টা খুলে নিল।



ফ্রান্সিস দ্রুতহাতে লোকটার পেটে বর্শাটি আমূলে বিঁধিয়ে দিল।

শুরু হ'ল দা নিয়ে যুদ্ধ। দা'য়ে-দায়ে যখন ঘা লাগছে, ফ্রান্সিসের হাতটা ঝন্‌ঝন্ করে উঠছে। হাত অবশ হয়ে আসছে। উপবাসে অনিদ্রায় শরীরের যা অবস্থা, তাতে সামনা-সামনি-লড়াইয়ে এর সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব। অন্য পথ নিতে হবে। হঠাৎ ফ্রান্সিস নীচু হয়ে এক মুঠো বালি তুলে নিল। আর লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছুঁড়ে মারল লোকটার চোখে। লোকটার মুখের বীভৎস হাসি মিলিয়ে গেল। চোখ-মুখ কুঁচকে লোকটা এলোপাতাড়ি দা ঘোরাতে লাগল। । ফ্রান্সিস দ্রুতহাতে লোকটার পেটে বর্শাটা আমূল বিঁধিয়ে দিল। লোকটা পেটে হাত দিয়ে বসে পড়ল। টেনে বর্শাটা খোলবার চেষ্টা করতে লাগল। পারল না। কাৎ হয়ে বালির ওপর শুয়ে শুয়ে গোঙাতে লাগল। লোকটার পেট থেকে বর্শাটা খুলে নিয়ে ফ্রান্সিস এগিয়ে চলল নদীটার দিকে। খুব সাবধানে নদীতে নামল। নদীতে জল বেশী নয়, তীব্র স্রোত। তার ওপর পাথরগুলো

শ্যাওলা ধরা। পা টিপে-টিপে সাবধানে নদী পার হলো। তার ওপারে উঠেই দেখতে পেল, বনের নীচে অন্ধকার জমে উঠেছে। অন্ধকারে ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এবার রাত্রির আশ্রয় খুঁজতে হয়। একটু এগিয়েই বনের মধ্যে কয়েকটা বিরাট আকারের গাছ জড়াজড়ি করে আছে দেখা গেল। তারই মধ্যে একটা গাছে ফ্রান্সিস উঠল। অনেকটা ওপরে একটা মোটা ডাল খুঁজে নিয়ে হেলান দিয়ে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। শরীর যেন আর চলতে চাইছে না। মাথাটা খালি-খালি লাগছে। একটুক্ষণ চোখ বুজে থাকল। চোখ খুলতেই নজরে পড়ল গাছটায় বেশ কিছু ফল ঝুলছে। পাকা হলুদ রঙের ফলও রয়েছে। কিন্তু গাছটা কী গাছ—ফলগুলোই বা খাওয়া যায় কি না—এসব কিছুই জানা নেই। খিদের জ্বালায় ফ্রান্সিস ডাল বেয়ে-বেয়ে মগডালে উঠে কয়েকটা পাকা ফল পেড়ে নিয়ে এল। দা' দিয়ে কাটল। মুখ দিয়ে একবার চিবোতেই থুঃ থুঃ করে ফেলে দিল। কী অসম্ভব তেতো! ফলগুলো ফেলে দিল।

রাত গভীর হ'ল। দুর্বল-ক্ষুধার্ত শরীরে ঘুমও আসতে চায় না। হ্যারি আর মকবুলের কথা মনে পড়ল। ফ্রান্সিসের চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠলো। কোথায় রইলো বন্ধুরা, ওঙ্গালির বাজার আর হীরের পাহাড়। এই গভীর রাতে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত বন্য পরিবেশে ও গাছের ডালে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে।

হঠাৎ নদীর ধার থেকে ভেসে এল কাদের চড়া সুরের কান্না। নিশ্চয়ই গালকাটা সর্দারের দলের লোকদের কান্না। তা'হলে সর্দার তার সঙ্গীদের নিয়ে নদী পর্যন্ত এসে গেছে। তারাই তাদের দুই মৃত সঙ্গীদের জন্যে কাঁদছে। মৃতদেহ দুটো বোধহয় নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে। তার আগে এই কান্না। সারারাত চড়া সুরে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদল ওরা। ফ্রান্সিসের যতবার তন্দ্রা ভেঙে গেছে, ততবারই শুনতে পেয়েছে এই কান্না। হ্যারি আর মকবুলের জন্যে ফ্রান্সিসের মনেও কম বেদনা জমে নেই। ওরা তবু কাঁদছে—মনের ব্যথা-বেদনার ভার কমছে তা'তে। কিন্তু ফ্রান্সিস? কাঁদতেও পর্যন্ত পারছে না।

ফ্রান্সিস চোখ মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ভোরের দিকে একটু ঘুম এসেছিল। ঘুম ভাঙতেই দেখল, ভোর হ'য়ে গেছে। তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এল। তারপর ছুটতে শুরু করল। ছুট-ছুট। সর্দারের দলের সবাই এসে গেছে। কাজেই এবার ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। ছুট—ছুট। পাগলের মত ছুটতে লাগল ফ্রান্সিস।

ছুটতে-ছুটতে একটা ফাঁকা মাঠের মত জায়গায় এসে পৌঁছল। একটা মাটির ঢিবির ওপর ব'সে ফ্রান্সিস হাঁপাতে লাগল। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা সাপ ঢিবি থেকে বেরিয়ে এল। এই সাপটাকে মেরে খেলে কেমন হয়? ভাবতেই ফ্রান্সিসের খিদে আরো বেড়ে গেল। দা'য়ের এককোপে সাপটার গলার কাছ থেকে দু'টুকরো করে ফেলল। তারপর মাথাটা ফেলে দিয়ে দা' দিয়ে বাকীটুকুর চামড়া ছাড়িয়ে নিল। এবার টুকরো-টুকরো করে কেটে মুখে ফেলে চিবোতে লাগল। কাঁচা-কাঁচা স্বাদটুকু বাদ দিলে খেতে মন্দ লাগল না। খাওয়া শেষ হলে একটা ঢেঁকুর তুলল। যা হোক একটা কিছু তো পেটে পড়ল। তিন দিন হ'তে চলল—চান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই—শরীর যেন আর চলতে চাইতে না। ছুটে আসতে-আসতে পথে একটু-একটু ক'রে জল খেয়েছে। জলের থলি খালি। জল

খাওয়া হ'ল না।

হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তেই দেখা গেল,একটা বাচ্চা হরিণ বেড়াচ্ছে। এই হরিণের বাচ্চাটাকেই মারা যাক। ফ্রান্সিস বর্শাটা ভালো ক'রে বাগিয়ে ধ'রে ঘাসের ওপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে চলতে লাগল। হরিণটার খুব কাছে এসে পড়ল ফ্রান্সিস। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েই বর্শাটা ছুঁড়ল। কিন্তু ক্ষুধার ক্লান্তিতে হাতটা কেঁপে গেল। বর্শাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। হরিণটা এক ছুটে পালিয়ে গেল।

বর্শাটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে হরিণ টাকে খুঁজতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল। ঠিক তখনই নজরে পড়ল একটা ডোবার মতো জলাশয়। ফ্রান্সিস নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। দু'তিন বার চোখটা ঘষল। নাঃ—মিথ্যা নয়। সত্যিই একটা জলাশয়। ফ্রান্সিস একটু অস্পষ্ট চীৎকার করে সোজা ছুটল জলাশয়টার দিকে। তারপর সারা গায়ে জল ছিটোতে লাগল। শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। থলিটাতে জল ভরে নিল। হঠাৎ লোকজনের কথাবার্তা কানে যেতেই তাড়াতাড়ি জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ল একটা গ্রাম। খড়ে ছাওয়া বাড়ি-ঘর। পরিস্কার তকতক করছে উঠোন। ফ্রান্সিস আরো ভালো ক'রে দেখতে চাইল। তাই নীচু হ'য়ে কিছুটা এগিয়ে এসে একটা বুনো খেজুর গাছের আড়ালে বসে দেখতে লাগল। কোন্ উপজাতি এরা, ফ্রান্সিস বুঝল না। তখন গ্রামের লোকজনের দুপুরের খাওয়া চলছে। ফ্রান্সিসের ক্ষিদে দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই। রাত্রি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

সন্ধ্যের মধ্যেই গ্রামবাসীরা রাত্রির খাওয়া খেয়ে নিল। তারপর সবাই গ্রামটার মাঝামাঝি একটা জায়গায় এসে জমায়েত হ'ল। চাঁদের ম্লান আলোর চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াল সবাই। ঢোলের মত মাটিতে বসানো একটা বাজনা বাজিয়ে নাচ আর গান শুরু হ'ল। একজন মিহি সুরে গান ধরল। সে থামলে যারা নাচছিল, তারা সেই সুরে গান গাইতে লাগল। সেই সঙ্গে চলল নাচ। অনেক রাত অব্দি হল্লা চলল। তারপর তারা কেউ-কেউ ঘুমুতে ঘরে গেল—কেউ-কেউ বা গরমের জন্যে তালপাতার চ্যাটাই পেতে বাইরেই শুলো।

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে গাছের আড়ালে থেকে বেরিয়ে এল। তারপর পায়ে-পায়ে এগোলো সামনেই যে বাড়িটা পড়ল তার দিকে। ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। তারপর রান্না করা খাবার-দাবার যা অবশিষ্ট ছিল, সব নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ঠিক তখনই দেখল, একটা তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে চ্যাটাইয়ের বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছে। চাঁদের ম্লান আলোয় ছেলেটি অবাক্ চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস বুঝলো—ছেলেটি তাকে নিশ্চয়ই খাবার চুরি করতে দেখেছে। কী আর করা যায়। ফ্রান্সিস মুখের ওপর আঙুল রেখে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করল। ছেলেটি কিন্তু এবার ভয় পেল। পাশে শোয়া বাবাকে ডাকতে লাগল। কী যেন বারবার বলতে লাগল। ওর বাবা বিরক্তির ধমক দিতে। পাশ ফিরে শুল। ছেলেটিও আর কোন কথা না বলে শুয়ে পড়ল।

গাছের আড়ালে বসে ফ্রান্সিস গোগ্রাসে খাবার গুলো গিলতে লাগল। সেই খাবারের কীই বা গন্ধ, কীই বা স্বাদ—কিছুই বুঝে ওঠার মত মনের অবস্থা ফ্রান্সিসের ছিল না। শুধু

খাবারটা গোগ্রাসে খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হলে ফ্রান্সিস সেই জলাশয়টার ধারে গেল। পেট ভরে জল খেয়ে বুনো খেজুর গাছের আড়ালে ফিরে এসে বসল। ঘুম পাচ্ছে। ফ্রান্সিস কয়েকটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে এল। সেগুলো পেতে বিছানার মত করল। তারপর সটান শুয়ে পড়ল। অসহ্য ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে পড়ল। সব দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

পাখি-পাখালির ডাকে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল অনুসরণকারী গালকাটা সর্দার আর তার সঙ্গীদের কথা। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল। তারপর চারিদিকে সাবধানে তাকিয়ে দেখে নিল। না! কেউ নজরে পড়ছে না। ফ্রান্সিস নিশ্চিত হয়ে গাছে ঠেস দিয়ে বসল। গ্রামটার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হলো! কাল রাত্তিরে কত নাচগান বাজনা চলেছিল। এই সকালবেলাতেই কোথায় গেল সব। এখন গ্রামটাকে পরিত্যক্ত শ্মশানের মত মনে হচ্ছে।

একটু বেলা হতেই দেখা গেল গ্রামের শেষ প্রান্তের দিক থেকে একদল অশ্বারোহী লোক ছুটে আসছে। সকালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে তাদের হাতের তরোয়াল। তাদের পরনে আরবীয় পোশাক। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের আসার কারণটা স্পষ্ট হল। ঘরের দরজা ভেঙে তারা সবাইকে টেনে-টেনে বের করতে লাগল। কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করলে তরোয়ালের ঘায়ে তাকে মেরে ফেলতে লাগল। এতক্ষণে ফ্রান্সিসের মনে পড়ল মকবুলের কথা। মকবুল বলেছিল, কী করে একদল লোক দেশের নিরীহ গ্রামবাসীদের ধরে জাহাজে করে ইউরোপে-আমেরিকায় ক্রীতদাস বেচা-কেনার বাজারে নিয়ে যায়। কী অমানুষিক অত্যাচার! ওরা যাদের ধরেছিল, তাদেরই গলায় তিনকোণা গাছের ডালের একটা বেড়ীর মত পরিয়ে দিচ্ছিল, তারপর বেড়ীগুলো দড়ি দিয়ে পরপর বেঁধে দুতিনজন অশ্বারোহী টেনে নিয়ে যেতে লাগল। নিশ্চয়ই এখান থেকে হাঁটিয়ে ওদের জাহাজে নিয়ে গিয়ে তোলা হবে। তারপর চালান দেওয়া হবে। হঠাৎ ফ্রান্সিসের নজর পড়ল সর্দারের ওপর। আরে! এটাই তো সেই লোক। বাঁ চোখটা কাপড়ের ফালিতে ঢাকা—এক চোখ কাণা লোকটা। তেকরুর বন্দরের সরাইখানায় এই লোকটাই তো মকবুলের দিকে তেড়ে গিয়েছিল। সেদিন হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিল। আজকে এই সর্দারের দফা-রফা করতেই হবে। রাগে ফ্রান্সিস কাঁপতে লাগল। ইতিমধ্যে অনেক বাড়ীঘরেই আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সকালের আকাশ ভরে উঠেছে আর্ত মানুষদের কান্না আর চীৎকারে। কী নির্মম এই ক্রীতদাসের ব্যবসায়ীরা! গত রাত্রের সেই ছেলেটা ওর বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। অশ্বারোহী লোকটার ভ্রুক্ষেপ নেই। গলায় বাঁধা দড়িটা টেনে নিয়ে চলেছে।

ফ্রান্সিসের আর সহ্য হল না। গাছের আড়াল থেকে একলাফে বেরিয়ে এসে বর্শা হাতে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল কানা সর্দারের দিকে। কেউ কিছু বোঝবার আগেই ফ্রান্সিস ঘোড়ায় বসা সর্দারের বুকে বর্শাটা বিঁধিয়ে দিল। সর্দার ঘোড়া থেকে উল্টে মাটিতে পড়ে গেল। সর্দারের ধারে-কাছে যারা ছিল, তারা হইচই করে উঠল। তারপর ফ্রান্সিসের পেছনে ছুটল। ফ্রান্সিস প্রাণপণে ছুটতে-ছুটতে একটা জলপ্রপাতের কাছে এল। তারপর এক মুহূর্ত দেরী না করে জলপ্রপাতে ঝাঁপ দিল। জলের টানে কোথায় ভেসে গেল—অশ্বারোহী দস্যুর দল তার কোনো হদিসই করতে পারল না।

ফ্রান্সিসের মনে হলো জলের টানটা কমেছে। জল থেকে মুখ তুলে জলপ্রপাতটা আর দেখতে পেল না। অনেকটা দূরেই চলে এসেছে। এবার পাহাড়ী নদীটার ধারে এসে পাড়ে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু শরীর এত দুর্বল যে, স্রোতের বিপরীতে দাঁড়াতে পারছে না। হঠাৎ পারের দিক থেকে একটা বাড়িয়ে ধরা হাত দেখে ফ্রান্সিস চমকে উঠল। ও—সেই গত রাত্রিতে দেখা ছেলেটা হাত বাড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস ছেলেটার হাত ধরল। তারপর বেশ কষ্ট করেই নদীর পাড়ে উঠে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

*   *   *

কতক্ষণ শুয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ কে যেন গায়ে ধাক্কা দিতে লাগল। ফ্রান্সিস চোখ মেলে তাকাল। সেই ছেলেটি। সে আস্তে উঠে বসল। দেখল, ছেলেটির হাতে ধরা একটা পাতায় কী সব খাবার। একটা মাছও সেদ্ধও রয়েছে তার মধ্যে। ফ্রান্সিস পাতাটা টেনে নিল। তারপর খেতে লাগল আরাম করে। ছেলেটি মুখ দেখে মনে হলো, ছেলেটি খুব খুশী হয়েছে। কেউ কারো কথা বুঝল না। তাই দু'জনেই তাকিয়ে আছে দু'জনের দিকে।

একটু সুস্থ হয়ে হাঁটতে লাগল। ছেলেটিও তার সঙ্গে-সঙ্গে চলল। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা পাহাড়ী জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। সেখান থেকে অনেক দূরে ছেলেটির গ্রাম দেখা গেল। গ্রামের কিছু-কিছু ঘরবাড়ি অর্ধদগ্ধ হয়ে পড়ে আছে। ছেলেটি কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ফ্রান্সিসকে ইঙ্গিতে বলল—আমি গ্রামে যাবো। ফ্রান্সিস আপত্তি করল। কে জানে, আরবীয় দস্যুরা এখনও ওৎ পেতে আছে কিনা। কিন্তু ছেলেটি কোন কথাই শুনল না। আস্তে-আস্তে পা বাড়াল নিজের গ্রামের দিকে। কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল ছেলেটার ওপর। ফ্রান্সিসের চোখে জল এল।

ছেলেটি চলে যেতে ফ্রান্সিস আবার একা হয়ে গেল। কেউ কারো কথা না বুঝলেও ছেলেটি সঙ্গী তো ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ফ্রান্সিসের। হঠাৎ মনে পড়ল—অনুসরণকারী গালকাটা সর্দার আর তার সঙ্গীদের কথা। ফ্রান্সিস দ্রুত পা চালাল।

এদিকে ফ্রান্সিসকে অনুসরণকারী দলের নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া লেগে গেল। একজন আর বেশী দূর যেতে আপত্তি করল। সে বার-বার বলতে লাগল—নিজেদের গ্রাম থেকে আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি। একটা লোকের জন্য আমাদের এই ছুটোছুটি করা অর্থ-হীন। সে শুধু আপত্তিই করল না। একেবারে বেঁকে বসল। সর্দার বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু লোকটা শুনল না। সে উল্টোমুখে নিজেদের গ্রামের উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করল। কিন্তু বেশীদূরে যেতে পারল না। সর্দার ছুটে এসে তার পিঠে বর্শা বসিয়ে দিল। লোকটা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। দু' একবার কাতর আর্তনাদ করল। তারপর মারা গেল। রইল সর্দার আর তিনজন। তারা এবার ফ্রান্সিসের যাওয়ার পথের নিশানা খুঁজতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে ছুটতে লাগল। প্রচণ্ড গরমে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে যেন। মাথার ওপরে সূর্য যেন আগুন ছড়াচ্ছে। ফ্রান্সিসের মাথা ঘুরতে লাগল। চোখের সামনে সবকিছু যেন ঝাপসা হয়ে আসছে।

ফ্রান্সিস এ-সময় যাচ্ছিল হলুদ নুড়ি ছড়ানো একটা পাহাড়ে জায়গা দিয়ে টলতে-

টলতে। নুড়িগুলো ওপর প্রায় পড়ে যেতে-যেতে ফ্রান্সিস হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠল। নুড়িগুলোর গায়ে-গায়ে জড়িয়ে আছে, কত বিচিত্র রঙের কত রকম সাপ। ফ্রান্সিস শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে দ্রুত ছুটে পেরিয়ে গেল সাপের জায়গাটা! তারপর একখণ্ড ঘাসের জমির ওপর বসে হাঁপাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই ফ্রান্সিসের অনুসরণকারী দলটি এই-সাপজড়ানো নুড়িগুলোর ওপর এসে দাঁড়াল। তারাও বুঝতে পারে নি যে, এক জায়গায় এত সাপ রয়েছে। একটা সাপ একজনের পায়ে জড়িয়ে ধরল। সে ঝাঁকুনি দিয়ে দূরে ছুড়ে দিল সাপটাকে। কিন্তু আর সবাইকে সাবধান করবার আগেই একজনের পায়ে সাপ কামড়াল। লোকটা মাটিতে পড়ে গেল। এতক্ষণে সবাই বুঝল, কী সাংঘাতিক জায়গা দিয়ে ওরা যাচ্ছে। তারা সঙ্গীকে রেখেই দৌড়ে পালিয়ে গেল। গালকাটা সর্দারের সঙ্গী রইল মাত্র দু'জন। তবু ছাড়ল না। দু'জন সঙ্গী নিয়েই সে ছুটতে লাগল। তাড়াতাড়ি ছোটবার জন্যে ওরা তীর-ধনুক বর্শা ফেলে দিয়েছিল। শুধু লম্বাটে দা'গুলো কোমরে ঝোলানো রইল।



তীরগুলো চারিদিকের শুকনো গাছগুলোর উপর ছুঁড়ে মারতে লাগল।

কী একটা শব্দ হ'তে ফ্রান্সিস পিছনে ফিরে তাকাল। দেখলো দু'জন সঙ্গী নিয়ে গালকাটা সর্দার ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল। ছুট-ছুট— প্রাণপণে ছুটতে লাগল ফ্রান্সিস। ছুটতে-ছুটতে সে একটা মালভূমির মত জায়গায় এসে দাঁড়াল। দেখল, চারপাশের গাছগাছালি কেমন শুকনো। অসহ্য গরমে ঘাসগুলো পর্যন্ত শুকিয়ে খড়ের মত হয়ে গেছে। দূরে দেখা গেল, ঢালু পাহাড়ে জায়গা ধরে সর্দার সঙ্গী সহ ছুটে আসছে।

ফ্রান্সিস তীরধনুক হাতে নিল। কিছু শুকনো ঘাস ছিঁড়ে কয়েকটা তীরের মাথায় বাঁধল। তারপর চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে তীরগুলো চারিদিকের শুকনো গাছগুলোর ওপর ছুঁড়ে মারতে লাগল। গাছগুলো এত শুকনো এত ছিল যে, তীরগুলো এসে পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠলো। মালভূমির মত জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস দেখল, চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখা।

সর্দার আর তার সঙ্গীরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আগুনের জাল পেরিয়ে ফ্রান্সিসকে ধরা অসম্ভব। আর ফ্রান্সিস তীর-ধনুক আর বর্শা হাতে আনন্দে নাচতে লাগল। সর্দার শুধু তাকিয়ে-তাকিয়ে ফ্রান্সিসের নাচ দেখতে লাগল। রাগে সর্দারের

মুখটা আরো কুৎসিত হয়ে উঠল। কিন্তু কোন উপায় নেই। প্রায় সারারাত আগুন জ্বলল। ফ্রান্সিস আগুনের মাঝখানে একটু নিশ্চিন্তে রাতটা কাটাল।

ভোর হতেই ফ্রান্সিস লাফিয়ে-লাফিয়ে গাছের পোড়া কাণ্ড ডাল-পালা পার হয়ে আবার ছুটতে শুরু করল। এক সময় পিছন ফিরে দেখল—সর্দার তার সঙ্গী দু'জনকে নিয়ে ছুটে আসছে। উপবাসে অনিদ্রায়, উৎকণ্ঠায় ফ্রান্সিসের শরীর আর চলছিল না যেন। তবুও সে পাগলের মত ছুটতে লাগল। কিন্তু দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। সর্দার আর সঙ্গীদের পায়ের চাপে ঝোপ-ঝাড়ের ডালপালা ভাঙার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস হাঁ করে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে লাগল। শরীরে আর একফোঁটা শক্তি নেই। ক্লান্তিতে, অবসাদে ইচ্ছে করছিল মাটিতে শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নেয়। কিন্তু পেছনেই ওরা যমদূতের মত আসছে। আর দৌড়তে পারছে না ফ্রান্সিস। ওর মাথা ঘুরতে লাগল।

হঠাৎ বনটা শেষ হয়ে গেল। ফ্রান্সিস দেখলো। সামনেই মাঠ পেরিয়ে পর্তুগীজদের সেই দুর্গটা। ফ্রান্সিস আর ছুটতে পারল না। চোখের সামনে সবকিছু দুলছে যেন। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। ফ্রান্সিস মাঠের মধ্যেই শুয়ে পড়ল।

গালকাটা সর্দার বনের মধ্যে থেকেই দেখতে পেল ফ্রান্সিস মাটিতে শুয়ে পড়েছে। সর্দার সঙ্গী দু'জনকে বনের মধ্যেই অপেক্ষা করতে বলল। তারপর নিজে ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। ফ্রান্সিস দেখল, কী ভয়ংকর হয়ে উঠেছে সর্দারের মুখ। সর্দার কোমর থেকে দা'টা খুলে নিল। তারপর দা'টা উঁচিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস মাটিতে গড়িয়ে-গড়িয়ে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সর্দার দা'টা উঁচু করে কোপ মারতে গেল। ঠিক তখনই একটা তীর এসে সর্দারের ডান কাঁধে বিঁধল। সর্দার দা'টা ফেলে কাঁধে হাত দিয়ে চেপে বসে পড়ল। আরো কয়েকটা তীর এখানে-ওখানে লাগল।

ফ্রান্সিস দেখল দুর্গটা থেকে জন পঞ্চাশেক পর্তুগীজ তীরন্দাজ পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে। গালকাটা সর্দার তীরন্দাজ বাহিনীকে দেখল। হাত দিয়ে তখন রক্ত ঝরছে। একবার ফ্রান্সিসের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে নিয়ে এক ছুটে বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। বনের আড়াল থেকে সর্দার আর সঙ্গী দু'জন তাকিয়ে রইল ফ্রান্সিসের দিকে। হাতের শিকার ফসকে গেল। ফ্রান্সিস দেখল, তীরন্দাজ বাহিনী অনেক কাছে এসে পড়েছে। আর কিছু দেখতে পেল না। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

পর্তুগীজ সৈন্যরা অজ্ঞান ফ্রান্সিসকে ধরাধরি করে দুর্গের দিকে নিয়ে চলল। ঝোপ-জঙ্গলের আড়াল থেকে গালকাটা সর্দার আর তার সঙ্গীরা অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল। কিছুই করবার নেই। শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে।

* * *

ফ্রান্সিস যখন জ্ঞান ফিরে পেল, দেখল দুর্গেরই একটা পরিচ্ছন্ন ঘরে সে শুয়ে আছে। আগেরবারও তাদের এই ঘরটাতেই থাকতে দেওয়া হয়েছিল। ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে দেখে একজন সৈন্য বিছানার দিকে এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—কিছু খাবেন?

ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে জানাল সে খাবে। ফ্রান্সিসের ক্ষুধার বোধই ছিল না। তবু ভাবল—কিছু খেলে হয়তো শরীরটা ভালো লাগবে। সৈন্যটি চলে যাবার একটু পরেই দুর্গাধ্যক্ষ হেনরী দু'জন সৈন্য নিয়ে ঢুকে। ফ্রান্সিসকে বললো—কেমন আছেন?

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে জানাল, সে ভালো আছে।

হেনরী জিজ্ঞেস করল—আপনার সঙ্গী দু'জন কোথায় ?

হ্যারি আর মকবুলের কথা মনে পড়ল। চোখ ছলছল করে উঠল ফ্রান্সিসের। ভারী গলায় আস্তে-আস্তে বলল—ওরা কেউই বেঁচে নেই।

—আপনারা নিশ্চয়ই মোয়ানা উপজাতিদের পাল্লায় পড়েছিলেন। এই উপজাতির লোকেরা সাংঘাতিক হিংস্র। আবার ধর্মভীরুও খুব। জঙ্গলের নানা গাছ-পাথর পুজো করে। যাক গে, আপনি যে বেঁচে আসতে পেরেছেন—এটাই মহাভাগ্য আপনার।

এমন সময় একজন সৈন্য খাবার-দাবার নিয়ে ঢুকল। হেনরী বলল—নিন, এখন চারটি খেয়ে নিন—পরে কথা হবে।

দুর্গাধ্যক্ষ হেনরী চলে গেল। ফ্রান্সিস বিছানায় উঠে বসল। তারপর আস্তে-আস্তে খেতে লাগল। সবকিছুই বিস্বাদ লাগছে। তবু না খেলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে।

খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল—এখন কী করবো ? ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া, হীরের পাহাড়ের খোঁজ করা, একা-একা সম্ভব নয়। আরো কয়েকজনকে চাই। আর যদি হীরেটা পাওয়াই যায়, সেটা নিয়ে আসার জন্যেও আরও লোকজন চাই, গাড়ি চাই। এখন দেশে ফিরে যাওয়াই ভালো। গাড়ি-ঘোড়া লোক-জন নিয়ে আবার আসবো। এত সহজে হাল ছেড়ে দেব না। এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস দিন-পাঁচেক সেই দুর্গে রইল। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রামে শরীরটা ভালো হয়ে উঠল। হেনরীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফ্রান্সিস একদিন তেকরুর বন্দরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

* * *

সন্ধ্যে নাগাদ তেকরুর বন্দরে পেঁছিল। উঠল সেই পুরনো সরাইখানাতেই।

পরের দিন থেকে ফ্রান্সিস জাহাজঘাটায় গিয়ে খোঁজ করতে লাগল—ওর দেশের দিকে কোন জাহাজই পেল না। এদিকে সঞ্চিত পর্তুগীজ মুদ্রাও ফুরিয়ে আসছে।

অবশেষে একটা জাহাজ পাওরা গেল। যাবে ফ্রান্সের ক্যালে বন্দরে। ফ্রান্সিস সেই জাহাজেই উঠল। ক্যাপ্টেনকে সব কথাই বলল। শুধু হীরের পাহাড়ের কথাটা বলল না। ক্যাপ্টেন সব শুনে তাকে নিয়ে যেতে রাজী হল।

ফ্রান্সিস বলল—আমাকে কিন্তু খালাসীর কাজ দিতে হবে।

—বেশ, তাই করবেন। ক্যাপ্টেন বলল।

তেকরুর বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ল দুপুরবেলা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। চারিদিকে কেমন একটা মেটে আলো ছড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস ডেক-এ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল তেকরুর বন্দরের দিকে। বার-বার হ্যারি ও মকবুলের কথা মনে পড়তে লাগল। চোখে জল এল ফ্রান্সিসের। দু'জন বন্ধুকে আফ্রিকার মাটিতে রেখে তাকে ফিরতে হচ্ছে দেশে। ফ্রান্সিস অপসৃয়মাণ তেকরুর বন্দরের দিকে তাকিয়ে মনে-মনে বলল—আমি আবার আসবো। যে হীরের সন্ধানে বেরিয়ে আমি আমার প্রিয় বন্ধুদের হারিয়েছি, সেই হীরে আমাকে পেতেই হবে। যতদিন পর্যন্ত না সেই হীরে পাই, ততদিন আমি আসবো।

একটু পরে তেকরুর বন্দরের চারিদিকের বনজঙ্গল সব মুছে গেল। জাহাজ চলে এল মধ্য সমুদ্রে।

দিন যায়, রাত যায়। জাহাজ চলেছে। ইতালীর কয়েকটা বন্দর ছুঁয়ে এবার চলেছে স্পেন-এর দিকে। ফ্রান্সিস জাহাজটার খালাসীর কাজ করে, আর দেশে যাবার জাহাজ ভাড়া জমায়। স্পেন হয়ে জাহাজ চলল এবার ফ্রান্সের ক্যালে বন্দরের অভিমুখে। ফ্রান্সিস একা-একা থাকতেই ভালোবাসে। জাহাজের কারো সঙ্গে বন্ধুত্বও হয় নি। জাহাজের লোকেরা তাকে 'দাম্ভিক' বলেই ধরে নিয়েছে। ফ্রান্সিস নিজের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত। কাজেই কে কী ভাবল, এই নিয়ে মাথা ঘামায় নি। জাহাজে দেশের কাউকে পায়নি। এজন্যে মনটা যেন আরো খারাপ হয়ে গেছে। কারো সঙ্গেই সে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পারল না।



ফ্রান্সিস ডেক-এ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল তেকরুর বন্দরের দিকে।

একদিন সকালের দিকে ক্যালে বন্দরে এসে জাহাজটা ভিড়ল। ফ্রান্সিস ক্যাপ্টেনকে অনেক ধন্যবাদ দিল। তারপর জাহাজ থেকে জাহাজঘাটায় এসে দাঁড়াল।

দিনটা সেদিন পরিষ্কার। উজ্জ্বল রোদে চারদিক ঝলমল করছে। ক্যালে বন্দরে অনেক জাহাজের ভীড়। ফ্রান্সিস এক জাহাজ থেকে আর এক জাহাজে খোঁজ করতে লাগল—নরওয়েগামী কোন জাহাজ পাওয়া যায় কিনা। পাওয়া গেল একটা জাহাজ। জাহাজটা ছোট। জাহাজটার কাজ গরু-ঘোড়া চালান দেওয়া। তাই খড়ে-গোবরে জাহাজটা নোংরা হয়ে আছে। কিন্তু উপায় কি? জাহাজটা জার্মানীর কয়েকটা বন্দরে থেমে-থেমে ভাইকিং রাজ্যের রাজধানী রিবকায় যাবে। সরাসরি রিবকা যাচ্ছে, এমন জাহাজ কবে পাওয়া যাবে, কে জানে? তাই ফ্রান্সিস এই ছোট্ট জাহাজটাতেই মালপত্র নিয়ে এসে উঠল। জমানো টাকা দিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দিল। একটা রাত জাহাজেই অপেক্ষা করতে হল। পরের দিন ভোরবেলা জাহাজ ছাড়ল।

দিন পনেরো পরে জাহাজটা একদিন সন্ধ্যেবেলা রিবকা বন্দরে এসে পৌঁছাল। ফ্রান্সিসের আর তর সইছিল না, জাহাজ থেকে পাঠাতন ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে বন্দরে নেমে এল। কতদিন পরে আবার ফিরে এসেছে তার আবাল্য পরিচিত শহরে।

ফ্রান্সিস আনন্দে প্রায় ছুটে এসে দাঁড়াল শহরের রাস্তায়।

একটা গাড়ি ভাড়া করল। গাড়ি চলল শহরের রাস্তা ধরে। ফ্রান্সিস একবার এই জানালা, একবার অন্য জানালা দিয়ে দেখতে লাগল শহরের পরিচিত দৃশ্য—বাড়ি ঘর-দোকানপাট। তখন রাত হয়েছে। এখানে-ওখানে আলো জ্বলে উঠেছে।

একসময় গাড়িটা ওদের বাড়ির গেট-এর কাছে এসে থামল। ফ্রান্সিস সামান্য মালপত্র যা ছিল, তাই নিয়ে গাড়ি থেকে নামল। ভাড়া মিটিয়ে লতা গাছে ঘেরা গেট-এ এসে দাঁড়াল। গেট-এর লতাগাছটা সারা দেয়াল ঘিরে ফেলেছে। গেট-এ ঝোলানো কড়াটা জোরে-জোরে নাড়ল। বাগানের মালীটা এল। গেট-এর আলোতে সে ফ্রান্সিসকে চিনতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই?

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—আরে আমি ফ্রান্সিস। দরজা খোল।

এতক্ষণে ফ্রান্সিসকে চিনতে পেরে মালীটা ফোকলা দাঁতে একবার হাসল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ফ্রান্সিসের মালপত্র হাতে নিল। ফ্রান্সিস ঢুকলে মালপত্র নিয়ে মালীটা তার পিছু-পিছু আসতে লাগল।

মা বাইরের ঘরেই বসেছিল। কোলের ওপর একটা ছিটকাপড়ের টুকরো। বোধহয় কিছু সেলাই-ফোঁড়াই করছিল। মালীটাকে বারণ করবার আগেই ও ডেকে বসল—কর্তা মা। মা সেলাই থেকে মুখ তুলে তাকাল, মা'র মুখটা বড় শীর্ণ দেখাচ্ছে, তাতে বয়সের বলিরেখা। মা একটুক্ষণ ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে রইল। ফ্রান্সিসের চোখ দু'টো ছলছল করে উঠল। ফ্রান্সিস গভীর কণ্ঠে ডাকল—মা।

ফ্রান্সিস ফিরে এসেছে। মা তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস তার আগেই মাকে জড়িয়ে ধরে বলল—তুমি বসো মা।

মা ফ্রান্সিসের মুখে মাথায় হাত বুলোতে লাগল। ধরা গলায় বলল—হ্যাঁরে পাগল, তুই কবে সুস্থির হবি বলতে পারিস?

ফ্রান্সিস সে কথার জবাব না দিয়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগল—মা—মাগো—আমার মা।

মা এবার কেঁদে ফেলল। ফ্রান্সিস বলল—আমি তো ফিরে এসেছি মা—তবে আর তুমি কাঁদছো কেন মা?

একটু পরে মা চোখ মুছতে-মুছতে জিজ্ঞেস করল—তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না, বাবা কোথায়?

—লাইব্রেরী ঘরে। আজকে আর দেখা করিস না, তোকে দেখলেই রাগারাগি শুরু করবে। আজকে চুপচাপ খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়গে। কাল সকালে বলা যাবে'খন।

কিন্তু ফ্রান্সিস ফিরে এসেছে, এমন একটা আনন্দ সংবাদ মালীটা চেপে রাখতে পারল না। ফ্রান্সিসের বাবাকে গিয়ে বলল।

ফ্রান্সিস সবে খেতে বসেছে, এমন সময় বাবা এসে হাজির। ফ্রান্সিসকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করলেন না। মাকে বললেন—কুলাঙ্গারটা ফিরে এসেছে, কই আমাকে তো বলোনি!

—ম্—মানে ভাবছিলাম—মা আমতা-আমতা করতে লাগল।

—তোমার আদরেই তো ছেলেটা উচ্ছন্নে গেল—বাবা বললেন।

—ঠিক আছে, আগে ওকে খেতে দাও—কতোদিন ভালো করে খায়নি, কে জানে!

বাবা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—জাহাজ থেকে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলে?

—ইয়ে—আফ্রিকা।

—সেখানে আবার কিসের জন্য ?

—জানো বাবা—একটা মস্ত বড় হীরে—

বাবা হাত নাড়লেন—বুঝেছি—বুঝেছি, এইজন্যেই তুমি রাজামশাইয়ের কাছে জাহাজ চেয়েছিল।

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা—তোমার একবারও কি আমাদের কথা মনে পড়ে না ?

বাবার গলা বুজে আসে। তাঁর মন কাঁদছে, কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করতে রাজী নন। ফ্রান্সিস সে কথার কোন জবাব না দিয়ে মাথা গুঁজে বসে রইল।

—অনেক হয়েছে—এবার ওকে খেতে দাও—মা বলল।

—হুঁ—বলে বাবা চলে গেলেন। বেরিয়ে যাবার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুধু বললেন—তোমার এখন বাড়ী থেকে বেরুনো বন্ধ !

সত্যি কয়েদখানায় থাকার মত অবস্থা করে তোলা হল। দু'জনকে মোতায়েন করা হল। একজন বাড়ীর ভিতরে, অন্যজন গেট-এ। ফ্রান্সিস ভেবে দেখল—এখন চুপচাপ থাকাই ভালো।

এইভাবেই কাটল কয়েক মাস। বাড়ীর মধ্যেই বন্ধ হয়ে রইল ফ্রান্সিস। রাজামশাই ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন। সেই দিনটিতেই শুধু বাইরে যাবার অনুমতি মিলেছিল। অবশ্য সঙ্গে একজন সৈনিক ছিল। আর একটা অনুমতি অনেক কষ্টে আদায় করেছিল ফ্রান্সিস। রাজার সৈন্যদের তাঁবুতে গিয়ে ওদের সঙ্গে তীর ছোঁড়ার অভ্যাস করা। এই তীর ছোঁড়া অভ্যাস করার সময়ও ফ্রান্সিসের সঙ্গে একজন সৈন্য পাহারা থাকত। ফ্রান্সিস প্রতিদিন খুব মনোযোগ দিয়ে তীর ছোঁড়া অভ্যাস করতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্সিস সেরা তীরন্দাজ হয়ে উঠল।



ফ্রান্সিস গাছটা বেয়ে নামতে লাগল।

মাস কয়েক পরে ছেলের সুমতি হয়েছে দেখে বাবা ভেতর বাড়ির সৈন্যটিকে সরিয়ে নিলেন। এই কাজের ভার পড়ল ছোট্ট ভাইটির ওপর। কিন্তু গেট-এর সৈন্যটি বহাল রইল। এবার ফ্রান্সিস তৎপর হলো। শুরু হলো, একটু রাত হলেই বাড়ি থেকে পালানো। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে মা ছেলেকে একবার দেখে যায় ঘুমুলো কিনা। ফ্রান্সিস তখন নিঃসাড় শুয়ে থাকে। মা নিশ্চিত মনে চলে গেলেই জানালার পাশে লতা-গাছটা ধরে নীচে নামে। তারপর দেওয়াল ডিঙিয়ে রাস্তায়।

বন্ধুরা নির্দিষ্ট পোড়ো বাড়িটায় এসে জমায়েত হয়। জোর মতলব চলে। এবারের লক্ষ্য হীরের পাহাড় ! হ্যারির জন্যে সবাই দুঃখ করে। ফ্রান্সিস এই উদাহরণটি তুলেই

বলল—ভাইসব—হ্যারি যেভাবে জীবন দিয়েছে, তেমনি একইভাবে আমাদেরও জীবন যেতে পারে। তাই বলছি—যারা নির্ভীক, যে কোন বিপদের মোকাবিলা করতে রাজী আছে—শুধু তারাই এগিয়ে এসো। অনেক বাছাইয়ের পর প্রায় চল্লিশজনকে পাওয়া গেল। এর মধ্যে দশজনকে ফ্রান্সিস নির্বাচন করল—এরাই যাবে হীরের পাহাড়ে। বাকীরা তেকরুর বন্দরে জাহাজেই থাকবে।

এবার শুরু হলো যাত্রার আয়োজন। প্রথমেই ছুতোর মিস্ত্রী ডেকে একটা খোলাঘোড়ার টানা গাড়ি তৈরী করানো শুরু হল। ঘোড়ায় টানা গাড়িটা শেষ হতে প্রায় মাসখানেক লাগল। গাড়িটা চালানোর জন্যে চারটে ঘোড়াও কেনা হল। দলের মধ্যে রিঙ্গোই ছিল ওস্তাদ গাড়িচালক। সে দু'বেলা রিবকার রাজপথে গাড়িটা চালিয়ে অভ্যেস করে নিতে লাগল। ফ্রান্সিস অনেক কষ্টে বাবার কাছ থেকে রিঙ্গোর সঙ্গে গাড়ি চালানোর শেখার অনুমতি আদায় করল। রাজপথে গ্যাড়ি চালায় দু'জনে। রাস্তার লোকেরা দেখে, কিন্তু এতবড় একটা খোলা ছাদের গাড়ি তৈরি করার কোন কারণ খুঁজে পায় না। গাড়ি আর ঘোড়াগুলো রাখা হয় পোড়ো বাড়িটাতে।

এবার জাহাজের বন্দোবস্ত। রাজামশাইয়ের কাছে চাইলে হয়তো একটা জাহাজ পাওয়া যেত। কিন্তু ফ্রান্সিসের বাবা ছেলেকে আবার সমুদ্রযাত্রায় বেরুতে দিতে ঘোরতর আপত্তি করবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই রাজামশাইয়ের ইচ্ছা থাকলেও উনি জাহাজ দিতে পারবেন না। সুতরাং একমাত্র উপায় জাহাজ চুরি করা। পোড়ো বাড়িতে শেষ জমায়েত-এর রাত্রে জাহাজ চুরি করে চালানোর নির্দিষ্ট দিনক্ষণও স্থির হয়ে গেল।

* * *

সেদিন গভীর রাত। জাহাজঘাটায় রাজার সৈন্যরা জাহাজ পাহারা দিচ্ছে। এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় অন্ধকার একেবারে দূর হয়নি। জায়গায়-জায়গায় অন্ধকার বেশ গাঢ়। তেমনি এক অন্ধকার কোণা থেকে একদল লোক একটা জাহাজে উঠে এল। তারপর একে-একে পাহারাদার সৈন্যদের কাবু করে ফেলল। হাত-মুখ বেঁধে তাদের কেবিন ঘরে আটকে রাখা হল। লোকগুলো ধরাধরি করে একটা গাড়ি জাহাজে তুলল। তারপর পাটাতনের ওপর দিয়ে চারটে ঘোড়াকে সন্তর্পণে হাঁটিয়ে এনে জাহাজে তোলা হয়। ঠিক তখন জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে দুটো খড়ের গাদায় আগুন লাগানো হল। বলা বাহুল্য, এই সবই ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের কাজ।' দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের শিখা অনেক উঁচুতে উঠল। জাহাজের খালাসীরা আর পাহারাদার সৈন্যরা ছুটোছুটি করে জল এনে খড়ের গাদায় ঢালতে লাগল। জাহাজ-ঘাটায় অপেক্ষমান জাহাজগুলোতে পাছে আগুন লেগে যায়, এই আশঙ্কায় অনেক জাহাজের নোঙর তুলে দূরে গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হল। সেইখানে জাহাজগুলো অপেক্ষা করতে লাগল, আগুন একেবারে নিভে যাওয়ার জন্যে। শুধু একটি জাহাজ অপেক্ষা করল না। লোকলস্কর নিয়ে জাহাজটা পাল তুলে জল কেটে ছুটে চলল। এটা ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদেরই কান্ড। জাহাজঘাটায় আগুন নিভল। গভীর সমুদ্র থেকে জাহাজ-গুলো জাহাজঘাটায় ফিরে এল। হিসেব করে দেখা গেল, ভাইকিং রাজার একটা জাহাজ কম পড়েছে। জাহাজটা যে চুরি করে একদল লোক পালিয়ে গেছে, এ বিষয়ে কোন

সন্দেহ রইল না। রাজার কাছে খবর গেল। কিন্তু রাজামশাই এই নিয়ে বেশী উচ্চবাচ্য করলেন না। তিনি বুঝলেন, এ নিশ্চয়ই ফ্রান্সিসেরই কাজ। কিন্তু ফ্রান্সিসের বাবা ব্যস্ত হলেন। ভোরবেলাই শুনলেন তিনি, ফ্রান্সিসকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে-সঙ্গে রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। রাজামশাই সব শুনে বললে —ক'টা দিন যাক—ওরা যদি তার মধ্যে না ফেরে, তবে আমরা ওদের খোঁজে বেরুবো।

ফ্রান্সিসের বাবা অগত্যা রাজার কথাই মেনে নিলেন।

* * *

দিন যায়, রাত যায়। জাহাজ চলছে, ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের নিয়ে। হাওয়ার তোড়ে পালগুলো ফুলে ওঠে। দাঁড়িদের তখন কোন কাজ থাকে না। তারা ডেক-এর ওপর গোল হয়ে বসে ছক্কা-পাঞ্জা খেলে। আর একজন তখন ডেক ধোয়া-মোছা করে পালের দড়িদড়া ঠিক করে। এইভাবে দিনরাত জাহাজটা ভেসে চলে।

দু'বার ভীষণ ঝড়ের পাল্লায় পড়তে হয়েছিল। প্রথম ঝড়টি জাহাজের কোন ক্ষতি করতে পারে নি। কিন্তু দ্বিতীয় ঝড়টির সময় পাল নামাতে একটু দেরী হয়েছিল। দু'টো পাল ফেঁসে গিয়েছিল। পাল দু'টো আবার সেলাই করা হল। পালের দড়ি-দড়া কাঠ সব পালটানো হলো।

পালে হাওয়া লাগলে সবাই দাঁড় টানার একঘেঁয়ে কাজ থেকে ছুটি পায়। গান গেয়ে, ছক্কাপাঞ্জা খেলে, তাস খেলে সময় কাটায়। শুধু অবসর নেই ফ্রান্সিসের। সে একা-একা ডেকের ওপর পায়চারী করে। মাঝে-মাঝে ছাদখোলা গাড়িটা দেখে। কখনও বা শূন্যদৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর ভাবনার শেষ নেই। তেকরুর বন্দরে পৌঁছবার পর কী-কী করতে হবে—মোরান উপজাতিদের এলাকা দিয়ে না গিয়ে উত্তর দিক থেকে কী করে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া যাবে। এতগুলো লোকের নিরাপত্তার চিন্তা তার মাথায়। এটা তাকে পালন করতেই হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন রয়েছে, তেমনি জন্তু-জানোয়ারের দিক থেকেও বিপদ কম নেই। এইসব বিপদের মধ্যে দিয়ে হীরের পাহাড়ে যেতে হবে, আবার ফিরেও আসতে হবে। লোভাতুর মানুষের সংখ্যাও পৃথিবীতে কম নেই। বিপদ সেইদিক থেকেও কিছু কম নয়। কাজেই সব সময় সজাগ থাকতে হবে। নিশ্চিন্ত হবার সময় এখনও আসেনি।

দীর্ঘদিন মাটির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কেউ-কেউ অসহিষ্ণুস্বরে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে, কবে জাহাজটা তেকরুর বন্দরে পৌঁছোবে। কারো পক্ষেই সঠিক কতদিন লাগবে, বলা শক্ত। তাই অনেকেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। ফ্রান্সিসের সোনার ঘণ্টা আনতে যাবার সময় জাহাজের বন্ধুদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা ছিল। তাই এবার সে স্পষ্টই বলে দিয়েছে—অধৈর্য হলে চলবে না! সবেতেই তার নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতে হবে। কোনোরকম বিশৃঙ্খলা দেখা গেলে, সে যে কোন বন্দরে নেমে যাবে। সেখান থেকে ফিরে আবার নতুন লোকজন নিয়ে আসবে। সোনার ঘণ্টা আনতে যারা তার সঙ্গে গিয়েছিল, তারা অনেকেই এই অভিযানে তার সঙ্গী হয়েছে। তাদের ওপরেই ফ্রান্সিসকে বেশী নির্ভর করতে হচ্ছে। ফ্রান্সিসের ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। মুশকিল হয়েছে নতুনদের নিয়ে। তারা বেশ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। এ খবর ফ্রান্সিসের কানেও

ওঠে। সে ডেক-এ সবাইকে নিয়ে সভা মতো করে। সেখানে সে বলে—ভাইসব, হীরের পাহাড়ের হীরে ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, সেই আগ বাড়িয়ে হাত তুলে দেবে। দস্তুরমত মরণপণ সংগ্রাম করে, সেটা সংগ্রহ করতে হবে। কাজেই আমাদের অধৈর্য হলে চলবে না। তেকরুর বন্দরে পৌঁছুতে আমাদের আর বেশীদিন লাগবে না। তারপরেও যে কাজ আছে, তা বেশ কঠিন। দেশে ফিরে যাবার কথা, ঘরে নিশ্চিত জীবনের কথা, আমাদের ভুলে যেতে হবে। এখন চাই অটল সাহস, শক্তি আর বুদ্ধি। সবাই শান্ত হয়ে ফ্রান্সিসের কথা শোনে। এই অভিযানের গুরুত্ব মনে করে অসহিষ্ণু বন্ধুরা শান্ত হয়। যে যার নিজে-নিজের কাজে লেগে পড়ে।

একদিন সকালে জাহাজটা তেকরুর বন্দরে এসে পৌঁছলো। দীর্ঘদিন পরে মাটির দেখা পেয়ে সবাই উল্লাসিত হল। দল বেঁধে নেমে পড়ল জাহাজঘাটায়। চিৎকার করে কথা বলতে লাগল, হৈ-হল্লা করতে লাগল, গান গাইতে লাগল, গাড়িটা আর ঘোড়া চারটেকে জাহাজ থেকে নামালো হলো। রিঙ্গো দ্রুতহাতে গাড়িটায় ঘোড়া জুড়ল। গাড়িটায় তোলা হলো বেশ কয়েকদিনের খাবার-দাবার, জল আর কয়েকটা লম্বা কাছি। যে দশজন সঙ্গে যাবে বলে ফ্রান্সিস আগে স্থির করেছিল, তাদের নিয়ে ফ্রান্সিস গাড়িতে উঠে বসল।

দুপুর নাগাদ ওদের গাড়িটা পর্তুগীজ দুর্গটার সামনে এসে হাজির হলো। দুর্গে তখন খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হবার আয়োজন চলেছে। একজন সৈনিক এসে দুর্গাধ্যক্ষ হেনরীকে ফ্রান্সিসের কথা জানাল। হেনরী দুর্গের ভিতরে আসতে বলে দিল।

সেই রাতটা ফ্রান্সিসরা দুর্গটাতেই রইল। রাত্রে খাবার টেবিলে হেনরীর সঙ্গে দেখা হল। কথায়-কথায় হেনরী একটু বিস্ময়মিশ্রিত সুরে ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করল—কার্পেট বিক্রী করতে এত লোকজন নিয়ে এসেছেন কেন?

ফ্রান্সিস কী বলবে, বুঝে উঠতে পারতে না পেরে আমতা-আমতা করে বললো—ইয়ে হয়েছে—মানে কালকে এখান থেকে বেরিয়ে আমরা এক-একজন এক-একদিকে যাবো। কার্পেটের চাহিদা কেমন বুঝে নিতে।

—কিন্তু শুনলাম, আপনাদের সঙ্গে নাকি কার্পেটও নেই।

—কার্পেট আছে তেকরুর বন্দরে—জাহাজে। এখানকার চাহিদা বুঝেই আমরা কার্পেট নিয়ে আসবো।

হেনরী আর কোন কথা জিজ্ঞেস করল না। তবে ফ্রান্সিসের উত্তরগুলো তার যে মনমতো হয়নি, এটা বোঝা গেল। তারপর এটা-ওটা নিয়ে কথাবার্তা চলল। ফ্রান্সিস একসময় জিজ্ঞেস করল—আমাদের একজন গাইড দিতে পারেন?

—গতবার আপনাদের যে গাইড ছিল, তাকে পেতে পারেন।

—তাহ'লে তো খুবই ভালো হয়। কিন্তু কালকে ভোরবেলা ওকে খবর দিয়ে আনা কি সম্ভব?

—কিছু ভাববেন না। আমি এই রাত্রেই মাসাইদের গ্রামে লোক পাঠাচ্ছি। কাল সকালেই গাইড পেয়ে যাবেন।

—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

তখন সবে ভোর হয়েছে, গাইড এসে হাজির। অগত্যা ফ্রান্সিসকে বিছানা ছেড়ে

উপস্থিত হল। অনেক কষ্টে ফ্রান্সিস গাইডকে বোঝাল যে, ওরা উত্তর দিক দিয়ে ওঙ্গালির এলাকারে যেতে চায়। গাইড মাথা ঝাঁকালো, অর্থাৎ সে ফ্রান্সিসের কথা বুঝতে পেরেছে।

সকালবেলা ঘোড়ার ডাকে, গাড়ির চাকার ক্যাচ্ কোঁচ শব্দে লোকজনের কথাবার্তায় দুর্গ প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে উঠল। সকলে কিছু খেয়ে নিল। তারপর গাড়িতে গোছ-গাছ করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুদূর বনের মধ্যে দিয়ে যেতে হল। তারপরেই শুরু হল দিগন্তবিস্তৃত মেঠো জমি। গাইড জানালে—এইসব জায়গায় সিংহ থাকে, কাজেই সাবধান। কপাল ভালো সিংহের সামনা-সামনি পড়তে হলো না। দূরে একটা সিংহীকে দেখা গেল। একটা গাছের চারপাশে চক্কর দিচ্ছে। গাইড বোঝাল, ওখানে সিংহীটার কাচ্চাবাচ্চা আছে। তাই সিংহীটা ঐ জায়গা ছেড়ে নড়ছে না। গাইডের একটা ব্যবহার ফ্রান্সিসের কাছে রহস্যময় লাগল। যেখান দিয়ে ওরা যাচ্ছিল—ধারে কাছে কোন গাছ থাকলে সেটার ডাল কেটে দিচ্ছিল। গাইডকে কারণটা জিজ্ঞেস করল ফ্রান্সিস। গাইড বোঝাল যে, সিংহের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এসব তুকতাক করছে।

গাড়ি চলছে, চলার বিরাম নেই। ফ্রান্সিসরা চলেছে তো চলেছেই। গাইড বোঝাল—মোরান উপজাতিদের এলাকার বাইরে দিয়ে যেতে হচ্ছে, তাই ঘুর পথ নিতে হয়েছে—এতে একটা সুবিধে হয়েছে—ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ করে যেতে হচ্ছে না, ঘোড়ার গাড়ি সহজেই যেতে পারছে।

সেদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। শুনল—ঘোড়াগুলো অস্বস্তিতে মাটিতে পা ঠুকছে, মাঝে-মাঝে ডেকে উঠছে। ফ্রান্সিস উঠে বসল, নিশ্চয়ই হায়না এসেছে। তীর-ধনুক নিয়ে ফ্রান্সিস তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। ঘোড়াগুলো যে গাছটায় বাঁধা আছে, সেইদিকে পায়ে-পায়ে এগোলো। কিন্তু গাছটা পর্যন্ত আর যাওয়া হলো না।

ও কি? গাছটার আড়ালে অল্প-অল্প অন্ধকারে দুটো চোখ জ্বল-জ্বল করছে। ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল।

সিংহ! দ্রুতপায়ে তাঁবুতে ফিরে এল। আরো কয়েকজনকে সঙ্গে চাই। ইতিমধ্যে ঘোড়ার ডাকে দু'-একজনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ফ্রান্সিসের ধাক্কায় তারা উঠে বসল। ফ্রান্সিস ফিসফিস করে বলল—সিংহ এসেছে, শিগগির তৈরী হয়ে এসো। কথা ক'টা বলেই তাঁবুর বাইরে চলে গেল। বাইরে আগুনের যে ধুনি জ্বালানো হয়েছিল, সেটা প্রায় নিভে গেছে, আকাশের চাঁদও ক্ষীণ। একটা খুব ম্লান আলো চারিদিকে ছড়ানো। এতে সিংহটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, শুধু চোখ দুটো আবছা অন্ধকারে জ্বলে উঠছে।

ফ্রান্সিস হাঁটু গেড়ে বসল। তখনই কয়েকজন তীর-ধনুক নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস ফিসফিস্ করে বলল—সিংহটা সামনের গাছটার পেছনেই রয়েছে। তোমরা দু' দলে ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে যাও, আমি প্রথমে ধুনীর পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেই তীর চালাবো। তোমরাও লক্ষ্য স্থির করে তীর চালাবে।

যারা তীর-ধনুক নিয়ে এসেছিল, তারা দু'দলে ভাগ হয়ে দু'-পাশে চলে গেল। ঘোড়াগুলো আবার মাটিতে পা ঠুকতে লাগল, আর দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার জন্য দড়িতে টান দিতে লাগল। ফ্রান্সিস আর দেরী করল না। ধুনী থেকে একটা আধপোড়া কাঠ

ছুঁড়ে মারল গাছটার দিকে। কাঠটা মাটিতে পড়তেই কতকগুলো স্ফুলিঙ্গ উড়ল। ফ্রান্সিস অন্ধকারে চোখ দুটোর দিকে লক্ষ্য রেখে তীর ছুঁড়ল। তীরটা কোথায় গিয়ে বিঁধল বোঝা গেল না। কিন্তু সিংহটা প্রচণ্ড গর্জন করে লাফিয়ে এসে পড়ল ধুনীটার কাছে। এবার সিংহটার অস্পষ্ট শরীরের রেখা দেখা গেল। সিংহটা আবার গর্জন করে উঠল। বোধহয় ফ্রান্সিসের বন্ধুরা কেউ তীর ছুঁড়েছে।

সিংহটা গর্-গর্ করে উঠেই লাফ দিয়ে পড়ল গাছটার কাছে। ঘোড়াগুলো জোরে ডেকে উঠল, আর দড়ির বাঁধন ছিড়ে ফেলার জন্যে চাপাচাপি শুরু করে দিল। তখনই ফ্রান্সিস তার এক সঙ্গীর ভয়ার্ত চীৎকার শুনতে পেল। সিংহটা কিন্তু আর দাঁড়াল না। চাঁদের ক্ষীণ আলোয় দেখা গেল, সিংহটা ছুটে চলে যাচ্ছে। এই রাত্রিবেলা সিংহের পিছু ধাওয়া করা বোকামি। ফ্রান্সিস ছুটে সঙ্গীটির কাছে গেল। দেখা গেল আঘাতটা মারাত্মক নয়। সিংহের থাবার নখে হাত ছড়ে গেছে। ওরা সঙ্গে যে ওষুধপত্র এনেছিল, তাই দিয়ে হাতটা বেঁধে দিল। সঙ্গীটি প্রাণে বেঁচেছে, এতেই তারা খুশী হল।

সকালে কিছু খাওয়া-দাওয়া করে ফ্রান্সিস দু'জন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সিংহটার খোঁজে বেরুলো। গাছের তলাটায় দেখল রক্তের গাঢ় দাগ। বোঝা গেল, সিংহটা বেশ আহত হয়েছে। ঘাসের ওপর পাতার ওপর রক্তের দাগ দেখে-দেখে ফ্রান্সিসরা আহত সিংহটার হদিস খুঁজতে বেরুলো। রক্তের দাগ দেখে-দেখে অনেকটা যাবার পর কয়েকটা পাথরের আড়ালে দাগগুলো শেষ হয়েছে দেখা গেল। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে সঙ্গের দু'জনকে দু'পাশ দিয়ে যেতে বলল। নিজে আস্তে-আস্তে খুব সন্তর্পণে পাথরের ওপাশে চলে গেল। দেখল ঠিক পাথরের আড়ালেই সিংহটা শুয়ে খুব মৃদুস্বরে গর্ গর্ করছে। অন্য পাথরগুলোর মাথায় দুই সঙ্গীর মুখ দেখতে পেল ফ্রান্সিস। ইশারায় তাদের তীর চালাতে বলে নিজেও সিংহটার বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল। সিংহটা গর্জন করে লাফিয়ে উঠল। ততক্ষণে আরো কয়েকটা তীর এসে লাগল। সিংহটা নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ল। ওর গর্-গর্ ডাকও একসময় বন্ধ হয়ে গেল।



নিজেও সিংহের বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল।

সিংহটা মারা গেছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্য ফ্রান্সিস কয়েকটা পাথরের নুড়ি ছুঁড়ে মারল। কিন্তু সিংহটা নড়ল না। এবার ফ্রান্সিস সাহসে ভর করে পাথরের আড়াল থেকে এগিয়ে এসে সিংহটার লেজ ধরে পা ধরে টানল। দেখল, ওর তীরটা সিংহটার হৃৎপিণ্ড ভেদ করেছে। এবার ফ্রান্সিস নিশ্চিত হলো যে, সিংহটা মারা গেছে। ফ্রান্সিস তার সঙ্গীদের ডাকল। দু'জন সঙ্গী মহানন্দে চীৎকার করতে লাগল। সিংহটার চারপাশে

খুরে-ঘুরে নাচতে লাগল। তাঁবুতে ফিরে এই সংবাদ দিতে সবাই হই-হই করে উঠল। তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হল। মাঠের বিস্তৃত জমি ছেড়ে এবার ছাড়া-ছাড়া গাছপালার বন-জঙ্গল শুরু হল।

তিনদিন পর একদিন সন্ধ্যেবেলা ফ্রান্সিসরা ওঙ্গালির বাজারে এসে পৌঁছল। নামেই বাজার। কয়েকটা চারদিক খোলা খড়ের চাল দেওয়া ঘর। এখানেই বোধহয় বাজার বসে এখন সন্ধ্যেবেলা দু-চারটে দোকানদার আনাজ-পত্র নিয়ে বসে আছে। কিন্তু লোকজন এখন এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাইডটি জানাল, সিংহের ভয়ে সন্ধ্যের পর এখানে কোন লোকজন থাকে না।

একটু রাত হলে হাটের একটা ঘরে তারা আশ্রয় নিল। রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালবেলাই আবার পথ শুরু হল। ফ্রান্সিস গাইডটিকে বোঝাল বোঝাল ওরা কোথায় যেতে চায়। উত্তর দিকটা দেখিয়ে বলল—ঐদিকে একটা পাহাড়, তা আমরা সেখানেই যাবো। তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। গাইডটি রাজী হল।

সেই দিনটি পথেই কাটল। পরদিন দুপুরবেলা ফ্রান্সিসরা একটা পাহাড় দেখতে পেল, পাহাড়টার কাছাকাছি এসে দেখল পাহাড়টা খুব উঁচু নয়। গাছপালাও খুব বেশী নেই। মকবুল ঠিকই বলেছিল—পাহাড়টার একপাশ খাড়া উঠে গেছে। অন্য দিকটা এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ঢিবি রয়েছে। এইদিক দিয়েই মকবুল আর বুঙ্গা বোধহয় পাহাড়ে উঠেছিল। ধ্বস নামায় নিশ্চয়ই গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। সেই মুখটা খুঁজে বের করতে হবে।

ঘুরে-ফিরে পাহাড়টা দেখতে-দেখতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সেই রাতটা ওরা পাহাড়টার নীচে কাটাল। পরদিন সকালবেলা শুরু হলো পাহাড়ে ওঠা। রিঙ্গো রইল, গাড়ি-ঘোড়ার পাহারায়। বাকী সবাই পাহাড়ে উঠতে লাগল এবড়ো-খেবড়ো পাথরে পা রেখে একসময় ওরা পাহাড়ের মাথায় উঠে এল। সেখানে মস্তবড় একটা পাথরের সঙ্গে কাছিটা বেঁধে পাহাড়ের খাড়াই দিকটা ঝুলিয়ে ছিল। ফ্রান্সিস বন্ধুদের বলল—আমিই প্রথমে নামছি। যদি গুহা খুঁজে পাই আমি, দু'বার কাছিটায় হ্যাঁচ্‌কা টান দেব। তখন তোমরা বেল্‌চা-গাঁইতি নিয়ে নেমে আসবে।



ফ্রান্সিস কোমরে তরোয়ালটা গুঁজে কাছি ধরে ঝুলে পড়ল।

ফ্রান্সিস কোমরে তরোয়ালটা গুঁজে কাছিটা ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর খাড়াই পাথরের এখানে-ওখানে পা রেখে-রেখে অনেকটা নেমে এল। তখনই দেখল, কয়েকটা গাছ আর বুনো ঝোপের আড়ালে একটা গুহার মুখ। কিন্তু মুখটা ধুলো-বালি-পাথরে বন্ধ

হয়ে গেছে। মুখটা বন্ধ হয়ে গেলেও দু'তিনজন লোক দাঁড়াবারমত জায়গা সেখানে রয়েছে। ফ্রান্সিস গাছের ডালে পা রেখে গুহার মুখটাতে এসে দাঁড়াল, তারপর কাছিটা ধরে দু'টো হ্যাঁচ্‌কা টান দিল।

একটু পরেই ফ্রান্সিসের দু'জন সঙ্গী কাছি ধরে-ধরে নেমে এল। তাদের হাতে ছিল বেল্‌চা আর গাঁইতি। সংকীর্ণ জায়গাটায় তিনজন দাঁড়াল। তারপর একজন গাঁইতি চালিয়ে ধুলোবালি, পাথর আলগা করে দিতে লাগল। অন্যজন বেল্‌চা দিয়ে ধুলোবালি, পাথর নীচে ফেলে দিতে লাগল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আট-দশজন দাঁড়াবার মত জায়গা হয়ে গেল। ফ্রান্সিস ঠিক বুঝল, এটাই সেই গুহা। ধুলোবালি পাথরের ধ্বস নেমে মুখটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এরপর আর সকলে নেমে এল। ধুলোবালি, পাথর সরাবার কাজ চলল পুরোদমে। সারাদিন কাজ চলল, তারপর একটু রাত হলে কাজকর্ম বন্ধ করে সবাই খেয়ে ছিল। রাত্রের মত সবাই ওখানেই জায়গা করে শুয়ে পড়ল।



সাপের শরীরটা কিছুক্ষণ ছটফট করে স্থির হয়ে গেল।

শেষ রাত্রির দিকে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও চমকে উঠল কী একটা ঠাণ্ডা জিনিস কাছির মত ওর পা'টা জড়িয়ে ধরেছে। ফ্রান্সিস পা সরিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় দেখল, একটা অজগর সাপ ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেওয়ালের দিকে সরে গেল। তারপর কোমর থেকে তরোয়ালটা খুলে অজগরটার দিকে নজর রাখল। মস্ত বড় সাপটা খুব ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে। ওর লেজটা তখনও ফ্রান্সিসের দু'জন সঙ্গীর পায়ের ওপর রয়েছে। মাথা তুলে সাপটা আর একটু এগোতেই ফ্রান্সিস প্রচণ্ড বেগে অজগরটার মাথা লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। তরোয়ালের আঘাতে সাপটার মাথা কেটে দূরে ছিটকে পড়ল। কাটা শরীরটা থেকে গল্‌-গল্‌ করে রক্ত বেরোতে লাগল। সাপের শরীরটা কিছুক্ষণ ছটফট করে স্থির হয়ে হয়ে গেল। ফ্রান্সিস কাউকে আর ডাকল না। সাপের দু-টুকরো শরীর আর মাথাটা তরোয়ালের ডগায় করে গুহার বাইরে ফেলে দিল। তারপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা ফ্রান্সিসের সঙ্গীরা ঘুম থেকে উঠে ধুলোবালি পাথরের মধ্যের চাপ-চাপ রক্ত এল কোত্থেকে। ফ্রান্সিস তখনও ঘুমোচ্ছে। ওকে ডাকল ওরা। ফ্রান্সিস উঠে বসল। ফ্রান্সিস হেসে বললে—'কাল রাত্রিতে একটা অজগর মেরেছি। তারই রক্ত।'

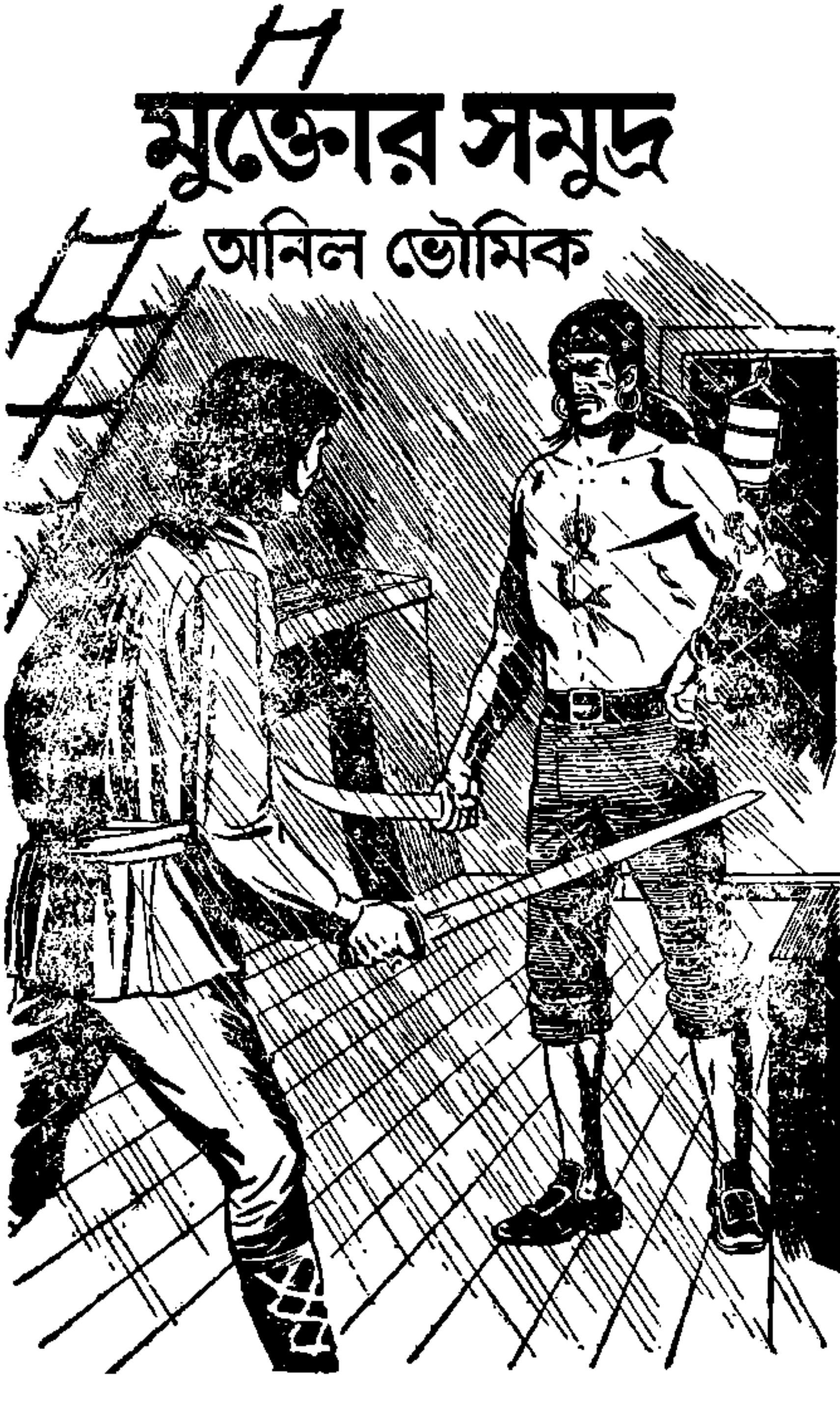
সবাই ধুলোবালি-পাথর সরাবার কাজে লেগে পড়ল। হঠাৎ দেখা গেল, ধুলোবালির

'যদি চিরদিনের জন্য যাও, তবে 'মুক্তোর সমুদ্রে' যাও।'

—'ভাজিম্বা'দের প্রবাদ

মুক্তোর সমুদ্র

অনিল ভৌমিক



স্তরটা শেষ হয়ে গেছে। একটা ফোকর পাওয়া গেল। বোঝা গেল, এখানেই ধুলোবালি আর ছোট-ছোট পাথরের স্তর শেষ হয়ে গেছে। সেই স্তরটা খুঁড়ে ফেলতেই গুহাটা স্পষ্ট দেখা গেল। উত্তেজনায় সবাই চেঁচিয়ে উঠল। ফ্রান্সিসও কম উত্তেজিত হয়নি। মদিনা মসজিদের গম্বুজের মত হীরেটা তখন প্রায় হাতের মুঠোয়।

গুহাটার ভিতরটা অন্ধকার। সন্তর্পণে কিছুটা এগোতেই ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, একটা বিরাট গহবর নীচের দিকে নেমে গেছে। ওকে দাঁড়িয়ে পড়তেই দেখে পিছন থেকে একজন জিজ্ঞেস করল—কী হল ফ্রান্সিস?

ফ্রান্সিস বলল—আর এগোনো যাবে না—সামনেই একটা গহ্বর।

সঙ্গীদের একজন জিজ্ঞেস করল—মকবুল কি তোমাকে এই গহ্বরের কথা বলেছিল?

—না।

—তাহ'লে?

একটু ভেবে ফ্রান্সিস বলল—মনে হচ্ছে, পাহাড়টায় ধ্বস নামার সময় হীরেটা বোধহয় এই গহ্বরেই পড়ে গেছে।

—এটা তো তোমার অনুমান—একজন সঙ্গী বলল।

—পরীক্ষা করলেই অনুমানটা সত্যি কিনা বোঝা যাবে।

—কী ভাবে পরীক্ষা করবে?

—আমি গহ্বরের মধ্যে নামব।

ফ্রান্সিসের সঙ্গীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। তারা কেউই ফ্রান্সিসকে একা ছাড়তে রাজী নয়। তারা বলল—তোমার সঙ্গে আমরাও নামবো।

ফ্রান্সিস বলল—সে হয় না। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে বিপদে পড়া চলবে না।

—কিন্তু তোমার একারও তো বিপদ ঘটতে পারে।

—একটা বিপদ তো কাল রাত্তিরে শেষ করেছি। বড় জোর আর একটা অজগর থাকতে পারে। ভয়ের কিছু নেই। তোমার কাছিটার একটা দিক পাথরের সঙ্গে বেঁধে দাও।

কাছিটা বাঁধা হল ফ্রান্সিস কাছিটা ধরে ঝুলে পড়ল। হাতে একটা মশাল জেবলে আস্তে-আস্তে গহবরের মধ্যে নামতে লাগল। চারদিকে পাথরের চাঁই, তারই মধ্যে দিয়ে গহ্বরটা সুড়ঙ্গের মত নেমে গেছে।

বেশ কিছুটা নামবার পর পায়ের নীচে একটা পাথরের মতো কি যেন ঠেকল। জিনিস-টার গা এবড়োখেবড়ো। ওটার ওপর দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস মশালটা নীচে নামিয়ে আনল। আশ্চর্য! সেই অমসৃণ জিনিসটায় মশালের আলো পড়তে আলো ঠিকরে পড়ল। তাহ'লে এটাই মকবুলের হীরে। ফ্রান্সিস মশালটা এদিক-ওদিক ঘোরালো। ঠিকরে পড়া আলোর দ্যুতিও অন্ধকারে এদিক-ওদিক নড়তে লাগল। ফ্রান্সিস আনন্দে চীৎকার করে উঠল। সমস্ত গহ্বরটা সেই চীৎকারে প্রতিধ্বনিত হল। গহ্বরের মুখে দাঁড়ানো ফ্রান্সিসের বন্ধুরা চীৎকার করে সাড়া দিল।

এবার আসল কাজ। ফ্রান্সিস হীরেটার ওপর বসে একটু জিরিয়ে নিল। তারপর কাছি দিয়ে হীরেটাকে চারদিক থেকে বাঁধল। এই বাঁধার সময় ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল

গহ্বরটা এখানেই শেষ হয়নি। হীরেটা আটকে আছে খাঁজের মত জায়গায়। তার পাশেই গহ্বরটা নেমে গেছে আরো নীচে। মশাল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আন্দাজ করে দেখল মকবুল যত বড় হীরের কথা বলেছিল, এই হীরেটা ততো বড় নয়। তখনই ফ্রান্সিসের মনে হলো পাহাড়ের ধ্বস নামার সময় নিশ্চয়ই হীরেটা দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। একটা টুকরো এখানকার খাঁজে আটকে আছে, অন্যটা এই গহ্বরের আরো নীচে পড়ে আছে। গহ্বরের জমাট অন্ধকারে নীচে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না।

হীরেটা ভালো করে বেঁধে ফ্রান্সিস কাছি ধরে-ধরে ওপরে উঠতে লাগল। একসময় গহ্বরের মুখে এসে উঠে দাঁড়াল। আনন্দে উত্তেজনায় ফ্রান্সিস তখন কথা বলতে পারছে না। বন্ধুদের সুসংবাদটা দেবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গেল, তখনই পিঠে কে যেন তরোয়ালের ডগা চেপে দাঁতচাপা স্বরে বলল, চুপ করে দাঁড়ান আপনাদের বন্ধুদের মত।

ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো। দেখল, ওর পিঠে তরোয়াল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুর্গাধ্যক্ষ হেনরী। তার সঙ্গে একদল সৈন্য। ফ্রান্সিস অবাক হয়ে গেল। দেখল ওদের বন্ধুদের সব গুহার একপাশে আটকে রাখা হয়েছে। তাদের তরোয়াল কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দু'একজনকে আহতও মনে হল। হেনরী ঠাট্টার সুরে বলল—এখানে নিশ্চয়ই কার্পেট বিক্রী করতে আসেননি?

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

—বোধহয় ভাবছেন আমরা এখানে এলাম কি করে? খুবই সোজা উত্তর। আপনারাই পথ দেখিয়ে এনেছেন।

—আমরা? ফ্রান্সিস বিস্ময় সুরে বলল।

—হ্যাঁ—আপনাদের গাইডকে বলাই ছিল, সে যেন পথে চিহ্ন রেখে আসে—ও তাই করেছিল—সুতরাং আপনাদের খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হয় নি।

ফ্রান্সিস এবার বুঝল, কেন গাইডটি গাছের ডাল কেটে রাখত—মাটিতে দা, দিয়ে হিজিবিজি দাগ কাটত। ফ্রান্সিস বেশ কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল—আমাদের পিছু ধাওয়া করার মানে কি?

আপনাদের যাওয়ার কথা ছিল ওঙ্গালির বাজারে—কিন্তু এখানে এলেন কেন?

—আমরা যেখানে খুশী যেতে পারি।

—তা পারবেন। কিন্তু এত কষ্ট করে এখানে আসার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কিছুক্ষণ আগে আপনি গহ্বর থেকে আনন্দে চীৎকার করে উঠেছিলেন। আপনার বন্ধুরাও তাতে সাড়া দিয়েছিল। আমরা তখন গুহার মুখে আড়ালে দাঁড়িয়েছিলাম। আপনার এত আনন্দিত হওয়ার কারণটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেনরী বলল—তাহ'লে কাছিটা তুলে দেখতে হয়, আপনাদের এত আনন্দের কারণটা কি?

—বেশ দেখুন, ফ্রান্সিস বলল।

হেনরী তার সৈন্যদের হুকুম দিল কাছিটা ধরে টেনে তুলতে।

ফ্রান্সিসদের বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—আপনারাও একটু সাহায্য করুন। সকলে মিলে কাছিটা টানতে লাগল। আস্তে-আস্তে কাছি-বাঁধা হীরেটা উঠে আসতে লাগল।

যখন গুহার ওপর এনে হীরেটা রাখা হল, তখন হেনরী হেসে বলল—এই পাথরটার জন্যে আপনাদের এত উল্লাস ?

জিনিসটা সামান্য নয়—ফ্রান্সিস শান্ত স্বরে বলল—এটা একটা হীরের খণ্ড।

—বলেন কি ! হেনরীর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

ধ্বস নামার আগে এই পাহাড়ের এই গুহার মুখেই আলোর বিচিত্র খেলা দেখা যেত।

—হ্যাঁ, শুনেছি একটা পাহাড় আছে, লোকে বলে মায়াপাহাড়।

—এই পাহাড়ই সেই মায়াপাহাড়। আর গুহার মুখেই আলোর বর্ণচ্ছটা দেখা যেত।

বিস্ময়ে হেনরীর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। সে হীরেটার কাছে ছুটে গেল। হীরের অমসৃণ গায়ে হাত বুলোতে লাগল। কিন্তু তার মনে সন্দেহ থেকেই যায়। সে বলল—আপনি কি করে জানলেন এটা হীরে ?

—মকবুলের কাছ থেকে।

—মকবুল কে ?

—আমার বন্ধু। আগেরবার যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সে আমার সঙ্গে আর ফিরতে পারে নি। হিংস্র মোরানদের হাতে মারা গেছে।

—ও। কিন্তু এটা কি সত্যিই হীরের খণ্ড ? হেনরীর সন্দেহ তবু যেতে চায় না।

—গুহার মুখে হীরেটা নিয়ে আসুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন।

—বেশ। হেনরী তার সৈন্যদের ইঙ্গিত করল। তারা সবাই কাছিটা ধরে টেনে হীরের গুহার মুখের কাছে নিয়ে এল। যেটুকু সূর্যের আলো তেরছা হয়ে পড়ল, তাতেই হীরেটা জ্বলজ্বল করে উঠল। বিচিত্র রঙের ছটা বেরোতে লাগল হীরেটার গা থেকে। হেনরী চোখ দুটো লোভে চকচক করে উঠল। সে সঙ্গে-সঙ্গে তার সৈন্যদের হুকুম দিল—কাছিটা ধরে আস্তে-আস্তে হীরেটা পাহাড়ের নীচে নামিয়ে দাও।

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি হাত তুলে সৈন্যদের ইঙ্গিত করে হেনরীর কাছে এগিয়ে এসে বলল—এই হীরেটা কি আপনি নিয়ে যেতে চান ?

—অবশ্যই—হেনরী হাসল—নইলে এত কষ্ট করে আপনাদের পিছু এলাম কেন ?

ফ্রান্সিস গম্ভীর স্বরে বলল—দেখুন, আপনারা একদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই আপনাকে আমি সব কথা বলেছি, কিছুই গোপন করি নি। আমি যদি না বলতাম, তাহ'লে একটা এবড়োখেবড়ো পাথরের খণ্ড ভেবে আপনারা চলে যেতেন।

—তা কি বলা যায়। সমুদ্র পেরিয়ে এতদূর থেকে আপনারা এসেছেন কার্পেট বিক্রী করতে, তাও সঙ্গে আপনাদের কার্পেট নেই। একটা গাড়ী এনেছেন, তার আবার মাথা খোলা। এই সবকিছুই আমার মনে সন্দেহের উদ্বেগ উঠেছিল। যে পাথরটা আপনারা তোলার আয়োজন করেছিলেন, সেটা দামী কিছু, এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সেটা যে একটা আস্ত হীরে, এটা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল।

—তাহ'লে আর একটা কথা আপনাকে জানাই। এই হীরেটা একটা খণ্ডমাত্র।

—বলেন কি ?

—হ্যাঁ, এটা আমার অনুমান। পাহাড়ে যখন ধ্বস নেমেছিল, তখন আস্ত হীরেটা

দু'খণ্ড হয়ে যে গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে পড়ে যায়। এই খণ্ডটা আমি পেয়েছি গহ্বরটার একটা খাঁজে। অন্য খণ্ডটা গহ্বরের তলদেশে কোথাও পড়েছে।

—তাই নাকি। হেনরী খুশীতে লাফিয়ে উঠল।

—আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। ফ্রান্সিস গম্ভীরস্বরে বলল—সেই অন্য হীরের খণ্ডটার জন্যে আমি আবার গহ্বরে নামব। যদি সেই খণ্ডটা পাই, তাহ'লে আপনারা এটা নিয়ে যাবেন, আমাদের কোন আপত্তি নেই।

—আপত্তি থাকলেই বা শুনছে কে?

—তাহ'লে লড়ে নিতে হবে।

হেনরী হো-হো করে হেসে উঠল—একমাত্র আপনার কোমরেই তরোয়াল আছে—ওটা আর নিইনি। আপনার দলের বাদবাকী সকলের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং গুহার মুখ থেকে নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এর পরেও লড়তে চান?

—হ্যাঁ, আমি একাই লড়বো।

—কেন মিছিমিছি বেঘোরে প্রাণটা দেবেন।

ফ্রান্সিস তরোয়ালের হাতলে হাত রাখল। হেনরী তাই দেখে বলে উঠল—উঁহু, উঁহু—খুন-খারাপি আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। তার চেয়ে আমাদের একজন লোক গহ্বরে নামুক। খোঁজ করে দেখুক, আর একটা হীরের খণ্ড পায় কিনা।

—আগে বলুন সেটা পেলে কে নেবে?

—বেশ। আর একটা হীরের খণ্ড পেলে আপনারা নেবেন।

—খুব ভালো কথা।

হেনরীর ইশারায় সৈন্যদল থেকে একজন এগিয়ে এল। আবার গহ্বরের মধ্যে কাছি ফেলা হল। লোকটি কাছি ধরে নামতে লাগল। এক হাতে মশাল ধরে লোকটি অনেকটা নেমে গেল। একটু পরেই হঠাৎ লোকটির আর্তনাদ শোনা গেল। সেই আর্তনাদ গহ্বরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সবাই ছুটে গহ্বরের কাছে গেল। কাছি টেনে দেখা গেল, লোকটা কাছি ছেড়ে গহ্বরের নীচে পড়ে গেছে। কি কারণে এমনটা হলো, কেউই ভেবে পেল না। হেনরী কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। চোখের সামনে এরকম মৃত্যু দেখে কেউই আর গহ্বরে নামতে সাহস পেল না।

এবার ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা তাকে নানাভাবে নিবৃত্ত করতে চাইল। কিন্তু পারল না। ফ্রান্সিস বলল, আমার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না। আমি এখন যা বলি মন দিয়ে শোন। যারা কাছি ধরে ছিল তাদের বলল—আমি কাছি ধরে দুবার ঝাঁকুনি দিলেই কাছি ছাড়তে থাকবে, যতক্ষণ না আমি গহ্বরের একেবারে শেষে নেমে কাছিটায় আবার দু'টো ঝাঁকুনি না দিই। যদি হীরের খণ্ডটা পাই, তাহ'লে সেটাকে কাছি দিয়ে বেঁধে কাছিটাতে আবার দু'টো ঝাঁকুনি দেব। তখন তোমরা কাছি টেনে তুলবে।

ফ্রান্সিস এক হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে কাছি বেয়ে নীচে নামতে লাগল। কিছুদূর নামতেই সেই গহ্বরের খাঁজটার কাছে এল। মশালের আলো পড়তে দেখল দু'টো বিষধর সাপ সেই খাঁজটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবার ফ্রান্সিস বুঝতে পারল। আগের লোকটা নিশ্চয়ই বিশ্রাম নিতে এখানে দাঁড়িয়েছিল। তখনই সাপ কামড়েছে। আর লোকটাও এই

অতর্কিত আক্রমণে হকচকিয়ে নীচে পড়ে গেছে। ফ্রান্সিস হাতের মশালটা সেই খাঁজের ধুলোবালির মধ্যে পুঁতে দিল। এবার সাপ দুটোকে স্পষ্ট দেখা গেল। ফ্রান্সিস পা দুটো দিয়ে কাছিটা জড়িয়ে ধরল। কোমরে থেকে তরোয়াল খুলল। তারপর একটা সাপের মাথার দিকে লক্ষ্য রেখে সজোরে তরোয়াল চালাল, সেই সাপের মাথাটা কেটে ছিটকে পড়ল। সাপের শরীরটা বারকয়েক নড়ে উঠল। তারপর আর নড়ল না। এবার আর একটা সাপ। সেই সাপটা কিন্তু বিপদ বুঝে পাহাড়ের ফাটলটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। আর সাপটাকে দেখা গেল না। ফ্রান্সিস আবার কাছিটাতে দু'বার ঝাঁকুনি দিল, ওপর থেকে যারা কাছি ধরেছিল, তারা কাছি ছাড়তে লাগল। ফ্রান্সিস মশালটা ধুলোবালি থেকে তুলে নিয়ে আবার নামতে লাগল।


সাপের মাথাটা কেটে ছিটকে পড়ল।

বেশ কিছুটা নামবার পর দেখল, নীচে যেখানে গহ্বরটা শেষ হয়ে গেছে, সেখানে লোকটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। ওর হাতের মশালটা একপাশে পড়ে গিয়ে তখনও জ্বলছে। সেই মশালের আলো যে এবড়ো-খেবড়ো পাথরটায় পড়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, আর সেটা যে আর একখণ্ড হীরে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। ফ্রান্সিস নামতে-নামতে হীরেটার ওপর এসে দাঁড়াল। তারপর লোকটার মৃতদেহ একপাশে সরিয়ে কাছি টেনে-টেনে হীরেটা বাঁধল। বাঁধা হলে কাছিটায় ধরে দুটো ঝাঁকুনি দিল। গহ্বরের ওপর থেকে সবাই আস্তে-আস্তে হীরেটা ওপরে উঠতে লাগল। সেই সঙ্গে ফ্রান্সিসও উঠতে লাগল।

গহ্বরের মুখে আসতেই ফ্রান্সিস নেমে এল। তারপর সবাই মিলে টানতে-টানতে হীরেটাকে গুহার মধ্যে নিয়ে এল।

হীরের আর একটা খণ্ড দেখে হেনরীর আনন্দ দেখে কে! সে একবার একখণ্ড হীরের কাছে যায়, আর পরক্ষণেই অন্য হীরেটার কাছে যায়। ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে দৃঢ় পদক্ষেপে হেনরীর কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল—তাহ'লে আপনি কি স্থির করলেন?

—কোন ব্যাপারে?

—একটা হীরের খণ্ড আমরা নেব, আর একটা আপনারা নেবেন।

—অসম্ভব!

—জানেন, এত বড় দুই খণ্ড হীরে যদি পর্তুগালে নিয়ে গিয়ে রাজাকে দিতে পারি—রাজসভায় আমার সম্মান কত বেড়ে যাবে।

—কিন্তু কথা ছিল—একখণ্ড হীরে আমরা নেব।

—তেমন কোন কথা হয়েছে বলে তো আমার মনে পড়ছে না।

—তাহ'লে আপনি কি রক্তক্ষয় চান?

হেনরী ফ্রান্সিসের কথা কানেই নিল না। নিজের সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল—হাঁ করে দেখছ কি। হীরে দু'টো নীচে নামাও।

সৈন্যরা তাড়াতাড়ি কাছি দিয়ে বাঁধা হীরের খণ্ডটা টানতে-টানতে গুহার মুখের কাছে নিয়ে এল। তারপর ধরে-ধরে আস্তে-আস্তে নীচে নামিয়ে দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস শক্ত চোখে একবার হেনরীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর তরোয়ালের হাতলে হাত রাখল। বন্ধুরা সব ছুটে এসে ওর হাত চেপে ধরল, বললো—ফ্রান্সিস, এমন পাগলামি করো না।

ফ্রান্সিস অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলে উঠল—যে হীরের জন্যে আমার দু'জন বন্ধু প্রাণ দিয়েছে, সেটা আমি এভাবে হাতছাড়া হতে দেব না।

বন্ধুরা কোন কথা শুনল না। বারবার ফ্রান্সিসকে শান্ত হতে অনুরোধ করতে লাগল। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে কি যেন ভাবল। তারপর তরোয়ালের হাতল থেকে হাত সরাল।

দ্বিতীয় হীরের খণ্ডটাও ততক্ষণে নামানো শুরু হয়েছে। আস্তে-আস্তে ওটাও নামানো হল। এবার সকলের নামবার পালা, প্রথমেই নেমে গেল হেনরী, তারপর তার সৈন্যরা।

এবার নামল ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুরা। নীচে নেমে ফ্রান্সিস দেখল, ওদের গাড়িতে একখণ্ড হীরে তোলা রয়েছে। হেনরীও একটা গাড়ি নিয়ে এসেছে। সেটাতে হীরের অন্য খণ্ডটা তোলবার তোড়জোড় চলছে। সৈন্যরা সবাই মিলে ধরাধরি করে হীরেটা হেনরীর গাড়িতে তুলল।

বেলা পড়ে এল। সন্ধ্যে হতে আর বেশী দেরী নেই। ফ্রান্সিসদের তো আর কিছু করবার নেই! তারা সে রাতটা এখানেই কাটিয়ে যাবে স্থির করল। হেনরীও তার সৈন্যদের নিয়ে রাত্রিবাসের জন্য বন্দোবস্ত করতে লাগল।

* *

রাত গভীর হল। সারাদিন খাটুনির পর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম নেই শুধু ফ্রান্সিসের চোখে আর হেনরীর দুই প্রহরারত সৈন্যের চোখে। ওরা দু'জন খোলা তরোয়াল হাতে হীরে দু'টো পাহারা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস শুয়ে ছটফট করতে লাগল। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না এখন কি করবে। শুধু সুযোগের আশায় বসে থাকা ছাড়া কিছুই করবার নেই। অথচ সময় নেই। একবার যদি হীরে দু'টো নিয়ে হেনরী দুর্গে ঢুকতে পারে, তাহ'লে হীরে দু'টো আর ফিরে পাওয়া অসম্ভব। ফ্রান্সিস এক-একবার উঠে মশালের আলো দেখছে হেনরীর সৈন্যরা আর তার বন্ধুরা সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে। ওর কিন্তু ঘুম আসছে না। চুপচাপ শুয়ে আছে ও।



তখনই·শুনল-ফ্রান্সিস-আমি হ্যারি-

হঠাৎ দেখল, অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে-মেরে কে যেন এদিকেই আসছে। ফ্রান্সিস ঘুমের ভান করে শুয়ে-শুয়ে লোকটাকে দেখতে লাগল। লোকটা কাছাকাছি আসতে দেখল—লোকটার খালি গা, পরনে শুধু একটা নেংটি। মুখে গায়ে উল্কি আঁকা। ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল—মোরান উপজাতির লোক। ফ্রান্সিস শিয়র থেকে তরোয়ালটা টেনে নিয়ে এক লাফে উঠে দাঁড়াল। লোকটা প্রথমে হকচকিয়ে গেল তারপরই ছুটে এসে ফ্রান্সিসের তরোয়ালসুদ্ধ হাতটা চেপে ধরল। ফ্রান্সিস হাতটা ছাড়াবার জন্যে লোকটাকে ধাক্কা দিতে যাবে তখনই শুনল—ফ্রান্সিস—আমি হ্যারি।



ফ্রান্সিসের তরোয়ালসুদ্ধ হাতটা চেপে ধরল।

ফ্রান্সিস প্রায় লাফিয়ে উঠল—হ্যারি, তুমি এখনও বেঁচে আছ!

হ্যারি আস্তে বলল—এইটুকু শব্দ করো না। পরে সব বলবো।

ফ্রান্সিসের আনন্দে তবু বাধা মানছে না। হ্যারির হাত চেপে ধরল।

হ্যারি চুপিচুপি বলল—এখন আমাদের অনেক কাজ। মন দিয়ে শোন, তোমাকে কি করতে হবে।

—বলো।

—সব বন্ধুদেরও জাগাও। পাহারাদার সৈন্য দুটোকে কাবু করে সবাই যেন গাড়ি দুটোয় উঠে বসে। তারপর ঘোড়াগুলোকে এনে গাড়িতে জুড়তে হবে। কোনরকম শব্দ যেন না হয়। কিন্তু সমস্যা হল গাড়ি চলাবে কে?

—রিঙ্গো একটা গাড়ি চালাবে, অন্যটা আমি চালাবো।

—তুমি পারবে তো?

—হ্যাঁ—আমি অনেকদিন চালিয়ে-চালিয়ে অভ্যেস করেছি।

—বেশ। এবার পরের কাজ। সমস্ত জায়গাটা মোরান উপ-জাতিরা ঘিরে ফেলেছে। আমি একটা সংকেত দিলেই ওরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে মোরানদের বলা আছে তারা যুদ্ধ করবে না—শুধু এদের আটকে রাখবে।

—বলো কি!

—হ্যাঁ। আমি খড়কুটো তীরের ডগায় আটকে আগুন জ্বালিয়ে চারদিকে ছুঁড়ে মারব। ঠিক তখনই ওরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে। আগুনের তীর ছুঁড়েই আমি লাফিয়ে তোমার গাড়িতে উঠবো। তারপর আর কিছু করবার নেই। যত দ্রুত সম্ভব গাড়ি চালিয়ে আমাদের পালাতে হবে। বুঝেছ?

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকাল। তারপর গুঁড়ি মেরে তার বন্ধুদের কাছে-কাছে গিয়ে একে-

একে সবাইকে জাগাল। ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে সবাইকে চুপ করে থাকতে নির্দেশ দিল। তারপর রিঙ্গোকে সঙ্গে নিয়ে গুঁড়ি মেরে-মেরে চলল পাহারাদার দু'টির উদ্দেশ্যে। হঠাৎ পিছন থেকে লাফ দিয়ে মুহূর্তে পাহারাদার দু'টিকে কাবু করে ফেলল ওরা। দু'টো পাহারাদারের মুখে রুমাল গুঁজে হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখল। তারপর ঘোড়াগুলোকে আস্তে-আস্তে এনে গাড়ি দু'টোতে জুতল। চাপা স্বরে সবাইকে ডাকল গাড়িতে ওঠার জন্যে। সবাই দু' ভাগ হয়ে সন্তর্পণে গাড়ি দু'টোতে উঠে বসল।

এবার হ্যারি খড়কুটো বাঁধা তীরগুলো মশাল থেকে আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে চারদিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল। সবকটা তীর ছুঁড়েই হ্যারি এক লাফে গাড়িতে উঠে বসল। ফ্রান্সিস আর রিঙ্গো গাড়ি ছেড়ে দিল। আর ঠিক তখনই শোনা গেল চারদিকে মোরানদের চীৎকার। বনের চারদিকে আগুন ধরে গেছে। তারই মধ্য দিয়ে ফ্রান্সিসরা জোরে-জোরে চালিয়ে গাড়ি দু'টোকে বের করে নিয়ে এল। তারপর গাড়ি দু'টো বেগে ছুটল। ফ্রান্সিস পেছনে তাকিয়ে দেখল সমস্ত বনটায় আগুন লেগে গেছে। হেনরীর সৈন্যরা যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে।

সারাদিনে মাত্র একবার দুপুরবেলায় গাড়ি থামিয়ে একটা ঝরণার ধারে বসে খেয়ে নিল সবাই। তারপর আবার গাড়ি ছুটল। হেনরী যে গাড়িটায় এসেছিল, তার মধ্যে হীরের খণ্ডটা আঁটেনি। তাই কাছি দিয়ে গাড়িটার সঙ্গে বাধা হয়েছিল। গাড়ি চলার ঝাঁকুনিতে কাছিটা আলগা হয়ে গিয়েছিল। সেটার আবার নতুন করে বাঁধা হলো। আবার ছুটল গাড়ি। সন্ধ্যার সময় গাড়ি থামানো হল। রাতটা কাটল উন্মুক্ত আকাশের নীচে। তাঁবু ফেলে আসতে হয়েছে। ফ্রান্সিস বুদ্ধি করে খাবারের বাক্সটা তুলে নিয়েছিল, তাই যাহোক কিছু খাবার জুটল। রাত্রে বিশ্রাম নিয়ে আবার ভোর হতেই গাড়ি ছুটল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের পাশে এসে বসল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো—হ্যারি এবার বলতো, তুমি কি করে বাঁচলে?

হ্যারি বলতে লাগল—তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, পায়ে তীর লাগার পর একটা পাথরের ঢিবি থেকে আমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ, মনে আছে।

—যে পাথরের ঢিবির নীচে আমি পড়ে গিয়েছিলাম, সেই পাথরটাকে মোরানরা দেবতা জ্ঞানে পুজো করত। পাথরটাতে রঙ-বেরঙের দাগ, নীচে পুজোর ফুল এসব ছিল। আমরা কেউ কিন্তু সে-সব লক্ষ্য করিনি। আমাদের অনুসরণকারী যে লোকটা আমাকে দেখে উল্লাসে চীৎকার করে উঠেছিল। আমাকে মারবার জন্যে দা উঁচিয়ে এগিয়ে এল। কিন্তু পাথরের ঢিবিটার দিকে হঠাৎ নজর পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়ল। এমনিতেই মোরানরা ধর্মভীরু। তার ওপর যে পাথরটাকে ওরা পুজো করে, তারই নীচে আমি পড়ে আছি—এসব দেখে-শুনে লোকটার মুখ শুকিয়ে গেল। সে দা'টা কোমরে গুঁজে আমার কাছে এল। পা দিয়ে তখন গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। লোকটা আমাকে পাঁজাকোলা করে গালকাটা সর্দারের কাছে নিয়ে এল। সর্দার সব কথা শুনে ওদের এক সঙ্গীকে ইঙ্গিত করল। সে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। একটু পরেই কিছু লতাপাতা নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে এল। সেই লতাপাতা দিয়ে আমার পা'টা বেঁধে দিল। অনেকটা আরামবোধ

করলাম। তারপর সর্দারের দু'জন সঙ্গী কাঁধ ধরে-ধরে এগোলাম ওদের গ্রামের দিকে। সেখানে একটা বাড়িতে রেখে ওরা চলে এল।

—তারপর ?

—আমার চিকিৎসা আর সেবা-শুশ্রুষা করল। কিছুদিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। তবে এখনও একটু খুঁড়িয়ে চলতে হয়। হোক, আমার সঙ্গে মোরানরা ভালো ব্যবহার করতে লাগল। আসলে ওরা ধরে নিয়েছিল, আমি ওদের দেবতা প্রেরিত মানুষ। আস্তে-আস্তে আমি ওদের পরামর্শদাতা হয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে মোরান-সর্দার কোন কাজই করত না।

—হ্যারি, তুমি আমাদের খোঁজ পেলে কী করে ?

—ওঙ্গালির বাজার থেকে মাইল পনেরো উত্তরে হীরের পাহাড়; এটা আমি জানতাম। আমি সেইজন্যে সেই পাহাড়টার কাছে একজন মোরানকে পাহারায় রেখেছিলাম। আমি জানতাম, তুমি আসবেই। তোমরা যখন এলে তারপর থেকে সমস্ত ঘটনাই আমরা দেখেছি। দুর্গরক্ষক লোকটা যে কিছুতেই হীরে দু'টো হাতছাড়া করবে না, এটা বুঝেছিলাম। আমি তখনই দুর্গরক্ষক আর তার সৈন্যদলকে নিঃশেষ করতে পারতাম। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম বিনা রক্তক্ষয়ে কার্যোদ্ধার করতে। শুধু পালাবার সুযোগ করে নেওয়া। মোরানদের নির্দেশ দিয়েছিলাম, আমি আগুনের তীর ছোঁড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তারা যেন চীৎকার হইহুল্লো করে দুর্গরক্ষক আর তার সৈন্যদের ঘাবড়ে দেয়। এই সুযোগটা পেলে গাড়ি নিয়ে আমরা পালাতে পারবো। হলোও তাই।

—কিন্তু তুমি আমাদের সঙ্গে পালাবে এটা মোরানরা জানে ?

—না, ওরা জানে আমি আবার ওদের কাছে ফিরে আসবো। তাই চারদিকে আগুন লাগাবার সংকেত দিয়েছিলাম। আগুন নিয়ে ওরা এত ব্যস্ত থাকবে যে, আমার পালানোটা ওরা লক্ষ্য করতে পারবে না।

—হ্যারি তুমি বেঁচে আছো, দেখে এত খুশী হয়েছি যে—কী বলবো আমি। আবেগে ফ্রান্সিসের গলা বুঁজে এল।

ফ্রান্সিস ওসব আর ভেবো না। হ্যারি ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রাখল। বলল—তোমরা নিশ্চয়ই জাহাজ নিয়ে এসেছো।

—হ্যাঁ, তেকরুর বন্দরে জাহাজ রয়েছে।

—তাহ'লে এখন আমাদের একটা কাজ—যে করেই হোক হীরে দু'টো জাহাজে তোলা।

গাড়ি ছুটে চলল। ফ্রান্সিস আর বিঙ্গো দু'জনেই যথাসাধ্য দ্রুত গাড়ি চালাবার চেষ্টা করছে। দিগন্তবিস্তৃত মেঠো জমিতে পড়ে রাত্তিরেও গাড়ি চালাতে লাগল। গাইডটির নির্দেশে চলে ওরা পথটা আরো সংক্ষিপ্ত করে নিল। এই সংক্ষিপ্ত পথে নাকি সিংহের ভয় আছে। কিন্তু কপাল ভাল বলতে হবে—সামনা-সামনি কোন সিংহ পড়েনি।

* *

দু'দিন পরে এক সন্ধ্যায় ওরা তেকরুর বন্দরে এসে পৌঁছল। সঙ্গের গাইডটিকে এবার বিদায় দিল ওরা। ওকে পুঁতির মালা, আয়না, চিরুনি দিল, গাইডটা খুশী হল।

ফ্রান্সিসের জাহাজের বন্ধুরা হইহই করে উঠল। অবাক্ চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল হীরের খণ্ড দুটি। তারপরেই আনন্দে কেউ-কেউ হেঁড়ে গলায় গান ধরল—নাচতে লাগল কেউ-কেউ। ফ্রান্সিস গাড়িতে দাঁড়িয়ে সবাইকে ডেকে বলল—ভাইসব, এখনও নিশ্চিন্ত হবার সময় আসেনি। আনন্দ করার সময় পরে অনেক পাবে। এখন হীরে দুটো জাহাজে তোলার জন্যে সবাই হাত লাগাও।

হীরে দুটো গাড়ি থেকে নামাতে রাত হয়ে গেল। চারদিক মশাল পুঁতে তারই আলোতে কাজ চললো। এবার হীরে দুটো জাহাজে তোলার জন্য সবাই কাঁধ লাগালো। জাহাজে ওঠার পাঠাতনে সাবধানে পা ফেলে একটা হীরের খণ্ড জাহাজে তোলা হল। দুর্ঘটনা কিছু ঘটল না। তবে একজন পা পিছলে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। জাহাজ থেকে দড়ি ফেলা হল। লোকটি নিজেই দড়ি বেয়ে জাহাজে উঠে এল। ফ্রান্সিস সবাইকে ডেকে বলল—আমাদের এক্ষুনি জাহাজ ছেড়ে দিতে হবে। এখানে এক মুহূর্তও আর দেরী করবো না আমরা।

ঘড়ঘড় শব্দে নোঙর তোলা হলো। পাল খাটানো হলো। হাওয়া লাগতেই পালগুলো ফুলে উঠল। জাহাজ চললো গভীর সমুদ্রের দিকে।

জাহাজে ততক্ষণে মশাল হাতে নাচ শুরু হয়ে গেছে। গান গাওয়া চলল সেই সঙ্গে। সবাই জুটলো সেখানে হীরের খণ্ড দুটোর চারপাশে ঘুরে-ঘুরে সবাই নাচতে লাগল। শুধু ফ্রান্সিস একা ডেকে-এ দাঁড়িয়ে তেকরুর বন্দরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বারবার মকবুলের কথা মনে পড়তে লাগল। চোখ ঝাপসা হয়ে এল বারবার। তেকরুর বন্দরের আলো আস্তে-আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল। চোখ মুছে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

॥ শেষ ॥

এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী অধ্যায়—সোনার ঘণ্টা ১৪
এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়—মুক্তোর সমুদ্র ১৪, তুষারে গুপ্তধন ১৪, রুপোর নদী ১৪



দ্রুতবেগেই দু'জনের তরোয়াল চলতে লাগল।

মুক্তোর সমুদ্র

মুক্তোর সমুদ্র

ফ্রান্সিসদের জাহাজ পশ্চিম আফ্রিকা উপকূলের বন্দর ছেড়ে এসেছে অনেকক্ষণ। জাহাজ এখন মাঝসমুদ্রে। নির্মেঘ আকাশে বাতাসে তেমন জোর নেই। সমুদ্রও তাই শান্ত। জাহাজের ডেক-এর ওপর পায়চারী করছিল ফ্রান্সিস। ভাবছিল, আফ্রিকা থেকে হীরে নিয়ে আসার কষ্টকর অভিজ্ঞতার কথা। সেই সঙ্গে বারবার মনে পড়ছিল মোরান উপজাতিদের হাতে মকবুলের নির্মম মৃত্যুর কথা। বারবার চোখে জল আসছিল এইকথা ভেবে। মকবুলকেও বাঁচাতে পারল না। নিজের জীবনের বিনিময়ে মকবুলই তাকে বাঁচাবার পথ ক'রে দিলো। পায়চারী করতে করতে ফ্রান্সিস এসে দাঁড়াল ডেক-এ রাখা গাড়ি দু'টোর কাছে। বিরাট হীরের খন্ড দু'টো গাড়িতে রাখা। কাজকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে জাহাজের সকলেই একবার ক'রে হীরে দু'টো দেখে যাচ্ছে। কী বিরাট হীরের টুকরো দু'টো! তাদের চোখে বিস্ময়ের শেষ নেই। ফ্রান্সিস হীরে দু'টোর কাছে দাঁড়াল। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশে গভীর লাল সূর্যটা জলের ঢেউয়ের মাথায়। পশ্চিম দিগন্ত থেকে প্রায় মাঝ আকাশ পর্যন্ত লাল রঙের শব্দহীন ঢেউ। সেই আলো পড়েছে জাহাজে। হীরে দু'টো লাল রঙের সেই রঙীন আলোয় স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। অনেকেই চারপাশে ভীড় করে সেই অপরূপ রঙের খেলা দেখছে। ঢেউ ছোঁয়া দিগন্তে আস্তে-আস্তে সূর্য অস্ত গেল। তারপরেও পশ্চিমাকাশে লাল আলো.' ছাপ রইল অনেকক্ষণ। তারপর অন্ধকার নামতে হীরে দু'টোর গায়েও আলোর েলা মিলিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস ডেকের ধারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। আকাশে ততক্ষণে তারা ফুটে উঠেছে। নিষ্প্রভ ভাঙা চাঁদটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। একটা নরম জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

হ্যারি কাছে এসে ডাকল — 'ফ্রান্সিস'।

ফ্রান্সিস ফিরে তাকিয়ে হ্যারিকে দেখে বলল — হুঁ'।'

তারপর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'—এবার ঘরে ফেরা যাক্, তুমি কি বলো?' হ্যারি বলল।

'— হ্যাঁ' — ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

— 'মনে হচ্ছে, তুমি এতে খুব খুশী নও?' হ্যারি হেসে বললো।

ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। বললো সত্যিই আমি খুশী নই। কী হবে ফিরে গিয়ে? আবার তো সেই সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন। উদ্দেশ্যহীন এক-ঘেঁয়ে জীবন, খাও-দাও ঘুমোও।'

— আবার বেড়িয়ে পড়বে ভাবছো।

দেখি

— হ্যারি হাসল — 'তুমি আর বেরোতে পারবে ব'লে মনে হয় না'।

— কেন?

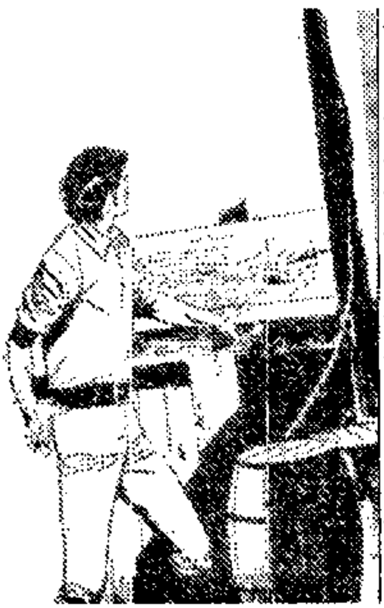
— রাজাকে এর আগে 'সোনার ঘন্টা' এনে দিয়েছো, এবার অতবড় দু'টো হীরে নিয়ে যাচ্ছো। এবার রাজামশাই তোমাকে নির্ঘাৎ সেনাপতি ক'রে দেবে।

ফ্রান্সিস হাসলো — 'ওসব তালপাতার সেপাইগিরির মধ্যে নেই। ঠিক পালাবো আবার।'

দু'জনে আর কোন কথা বললো না। হ্যারি একটু পরেই চ'লে গেল। ফ্রান্সিস দূরে অন্ধকারে সমুদ্র আর তারা ভরা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে নানা কথা ভাবতে লাগল।

* * *

দিন যায়। ওদের জাহাজ চলে শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে। ভাইকিংরা সকলেই আনন্দে আছে। কতদিন পরে আবার দেশে ফিরে চলেছে! যখন ডেক ধোয়া, রান্না করা, পাল ঠিক করা, দড়ি-দড়া বাঁধা, দাঁড়-বাওয়া এসব কাজ থাকে না, তখন জাহাজের ডেক-এর এখানে-ওখানে জড়ো হয়; ছোট-ছোট দল বেঁধে ছক্কা-পাঞ্জা খেলে, নয়তো গান নাচের আসর বসায়, নয়তো দেশবাড়ির গল্প করে। এতবড় দু'টো হীরের খন্ড নিয়ে দেশে যাচ্ছে' ওরা কী সম্বর্ধনাটাই না পাবে, এসব কথাও হয়।



ফ্রান্সিস ডেক-এ একা একা পায়চারী ক'রে বেড়ায় আর ভাবে এখন নিরাপদে দেশে ফিরতে পারবে তো?

শুধু ফ্রান্সিস অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুতে পারে না। ডেক-এ একা-একা পায়চারী ক'রে বেড়ায় আর ভাবে এখন নিরাপদে দেশে ফিরতে পারবে তো? পথে জল-দস্যুদের ভয় আছে, প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ে জাহাজ ডুবি হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে লক্ষণ ভাল। সমুদ্র শান্ত, বাতাসও বেগবান। পালগুলো ফুলে উঠেছে। দ্রুত গতিতে জাহাজ চলেছে। আর দাঁড় বাইতে হচ্ছে না। কিছুদিনের মধ্যেই দেশে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু শান্ত আর নিরুপদ্রব সমুদ্রযাত্রা ফ্রান্সিসের ভাগ্যে নেই। এটা ও কয়েকদিন পরেই বুঝতে পারলো।

* * *

সেদিন অমাবস্যার রাত! কালো আকাশ, সমুদ্র সব একাকার। মাথার ওপর শুধু কোটি-কোটি তারার ভীড়। তারাগুলো জ্বল্‌জ্বল্ করছে! পরিষ্কার, নির্মল আকাশ।

তখন মধ্যরাত্রি। এতক্ষণ ডেকে একা-একা পায়চারী করছিল ফ্রান্সিস। কিছুক্ষণ আগে কেবিনে ফিরে এসেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে একটু পরেই। জাহাজে সবাই ঘুমিয়ে

পড়েছে। শুধু হীরের গাড়ি দু'টো পাহারা দিচ্ছে দু'জন ভাইকিং। তারাও এতক্ষণ গল্পগুজব ক'রে গাড়ির চাকায় ঠেসান দিয়ে এখন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন।

অন্ধকার সমুদ্রের মধ্য দিয়ে একটা পর্তুগীজ জলদস্যুর জাহাজ নিঃশব্দে ওদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। সেই ধাক্কায় একজন পাহারাদারের তন্দ্রা ভেঙে গেলেই হাঁই তুলে চোখ তুললো। কেবিনের সামনে একটা কাঁচে ঢাকা লণ্ঠনের আলো জ্বলছিল। হঠাৎ সেই আলোয় ও দেখলো কারা যেন হাতে খোলা তরোয়াল নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। এত রাত্রে এরা আবার কারা? ভুল দেখছে মনে ক'রে ও দু'চোখ কচ্‌লে নিলো! আর সত্যিই তো। মাথায় ফেট্টি বাঁধা, বুকে-হাতে উল্কি আঁকা একটা লোক এগিয়ে আসছে। পেছনে আরো ক'জন। জলদস্যু! আতঙ্কে ও চিৎকার ক'রে উঠতে গেল। কিন্তু পারল না। তরোয়ালের এক আঘাতে ও ডেক-এ লুটিয়ে পড়ল। ওর সঙ্গীটির যখন তন্দ্রা ভাঙল দেখলো, কয়েকটা বলিষ্ঠ হাত ওকে দ্রুত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলছে। চিৎকার ক'রে উঠে কি হচ্ছে সেটা বলবার আগেই ওকে হীরের গাড়ির চাকার সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো।

তারপর জলদস্যুরা ছুটলো কেবিনঘরগুলোর দিকে। তার মধ্যে দু'জন অস্ত্রশস্ত্র রাখার ঘরের সামনে পাহারায় দাঁড়িয়ে গেল, যাতে কেউ এখান থেকে অস্ত্র না নিয়ে যেতে পারে। কেবিন ঘরে সবাই অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ তরোয়ালের খোঁচা খেয়ে সবাই একে-একে উঠে বসলো। সামনে তাকিয়ে দেখলো মাথায় ফেট্টি বাঁধা বড়-বড় গোঁফ আর বড়-বড় জুলপীওলা জলদস্যুরা দাঁড়িয়ে। হাতে খোলা তরোয়াল। যুদ্ধ করা দূরে থাক, কেউ অস্ত্রাগারের দিকে পা বাড়াতে পারল না। ফ্রান্সিস-হ্যারিরও এক অবস্থা। এখন ওদের সঙ্গে লড়তে যাওয়া মানে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে ডেকে আনা। জলদস্যুদের দলের একজন বেঁটে মত লোক এগিয়ে এসে পর্তুগীজ ভাষায় সবাইকে বললো — 'সবাই ডেকে-এ চলো।'

সবাইকে সার বেঁধে ওপরে ডেক-এ আনা হলো। ডেক-এর একপাশে সবাইকে বসতে বলা হলো। ওরা যখন বসলো, তখন বেঁটে জলদস্যুটা চীৎকার ক'রে কী যেন বলে উঠলো। সঙ্গের জলদস্যুরা একসঙ্গে চিৎকার ক'রে উঠল। ওদের ক্যারাভেল জাহাজ থেকেও আর একদলের চিৎকার শোনা গেল। ভাইকিংরাও বুঝলো, এটা ওদের জয়ধ্বনি। বেঁটে জলদস্যুটা এবার চিৎকার ক'রে বলতে লাগল — 'তোমাদের এখানেই থাকতে হবে। কাল সকালে আমাদের ক্যাপ্টেন লা ক্রুশ এই জাহাজে আসবেন। তিনি যা বিবেচনা করবেন, তোমাদের ভাগ্যে তাই ঘটবে। এখন চুপচাপ ব'সে থাকো। চাও কি ঘুমোতেও পারো। কিন্তু কেউ যদি বেশী চালাকি দেখাতে যাও, তাহ'লে তার মুণ্ডু উড়িয়ে দেবো।'

একমাত্র বেঁটে জলদস্যুটার গায়ে ডোরাকাটা গেঞ্জি। ও পেটের কাছ থেকে গেঞ্জীটা একটু তুলে মুখ মুছে নিলো। ভাইকিংদের ঘিরে আট-দশ জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিতে লাগল। এদিকে ক্যাপ্টেন লা ক্রুশের নাম শুনে ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। লা ক্রুশের নাম শোনেনি, এমন লোক এই তল্লাটে নেই। লা ক্রুশ জাতিতে ফরাসী, একটা পা কাঠের। ওর মতো নৃশংস-নির্মম জলদস্যুকে সকলেই যমের মত ভয় করে। ও জাহাজ লুঠ ক'রে শুধু ধনরত্নই নেয়

না, জাহাজের লোকেদের ধ'রে ক্রীতদাসের হাটে বিক্রী করে। ভাইকিংরা বেশ ভীত হলো। ভাগ্যে কী আছে, কে জানে? বেঁটে জলদস্যুর কথাগুলো ফ্রান্সিস, হ্যারি শুনল। হ্যারি-ফ্রান্সিসের কাছে ঘেঁসে এসে বসে চাপাস্বরে ডাকলে — ফ্রান্সিস?

— হুঁ।

— আমরা তাহ'লে কুখ্যাত জলদস্যু লা ক্রুশের পাল্লায় পড়লাম।

— 'হুঁ'।

— 'এখন কি করবো?' হ্যারি জিজ্ঞাসা করল।

— 'কিছু করবার নেই। সময় আর সুযোগের সন্ধানে থাকতে হবে।' একটু থেমে ধরা গলায় ফ্রান্সিস বললো, 'আমার সবচেয়ে দুঃখ কি জানো? এত দুঃখ কষ্ট সহ্য ক'রে এক বন্ধুর প্রাণের বিনিময়ে যে হীরে দু'টো আনলাম, সেটা লা ক্রুশের মত একটা জঘন্য জলদস্যুর সম্পত্তি হয়ে যাবে।'

— ফ্রান্সিস জলদস্যুর দল এখনো জানেনা ও গাড়ি দু'টোয় কী আছে। সূর্য উঠলে ওরা হীরে দু'টো চিনে ফেলবে। সূর্য ওঠার আগেই আমাদের একটা উপায় বার করতে হবে, যাতে ওরা হীরের খন্ড দু'টোকে না চিনে ফেলে।

— 'তুমি কিছু ভেবেছো?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

— 'হ্যাঁ, বুদ্ধি ক'রে হীরে দুটোকে ঢাকা দিতে হবে।' হ্যারি বললো।

— কিন্তু কী ক'রে?

— তুমি ওদের বেঁটে সর্দারটাকে গিয়ে বলো, যে গাড়ি দু'টোয় বারুদ আছে। বৃষ্টি হ'লে বারুদ ভিজে যাবে। কাজেই ছেঁড়া পাল দিয়ে গাড়ি দু'টো ঢাকতে হবে।

ফ্রান্সিস একমুহূর্ত হ্যারির দিকে হেসে কাঁধে এক চাপড় দিলো — 'জব্বর উপায় বের করেছো। বলছি এক্ষুণি, কিন্তু ও ব্যাটা রাজি হবে কি?'

—রাজি হবে। তুমি কিন্তু এরকম ভাব করবে যে ঢাকা দিলেও হয়, না দিলেও হয়। সাবধান বেশি আগ্রহ দেখাবে না। তাহ'লে ওদের মনে সন্দেহ হ'তে পারে।

— দেখি, ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসকে উঠে দাঁড়াতে দেখে একজন পাহারাদার তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এলে। ফ্রান্সিস দু'হাত ওপরে তুলে দিল। পাহারাদার এসে বাজখাঁই গলায় বলল — 'কি হলো তোমার?'

— আমাকে ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে চলো। বিশেষ জরুরী কথা আছে।

— ক্যাপ্টেন এখন ঘুমুচ্ছে। যা বলবার কাল সকালে বলবে।

— না, এখুনি দেখা করতে হবে।

পাহারাদারটা মুখ ভেংচে উঠল — 'কোথাকার রাজা হে তুমি, যখন খুশী লা ক্রুশের সঙ্গে দেখা করতে চাও — তোমার ভাগ্য ভালো যে এখনো তোমার মাথাটা শরীরের সঙ্গে লেগে আছে, উড়ে যায় নি।'

ফ্রান্সিস একবার ভাবলো, লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে উচিত শিক্ষা দেবে কিনা! পরমুহূর্তে ভাবলো, মাথা গরম করলে সব কাজ পন্ড হ'য়ে যাবে। আগে হীরে দুটোকে ঢাকতে হবে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল — 'ভাই তোমরা হচ্ছো বীরের জাত, আমাদের মত ভীতু-দুর্বল লোকেদের ওপর কি তোমাদের চোখ রাঙানো উচিত।'

পাহারাদারটাও হেসে গোফ মুচরে বলল — 'তুমি বড় সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে পারো।'

ডোরাকাটা গেঞ্জী গায়ে বেঁটে লোকটাই বড় সর্দার। সে কথা কাটাকাটি শুনে এগিয়ে এসে মোটা গলায় বলল - 'কী হ'য়েছে!'

ফ্রান্সিস বড় সর্দারকে হাত তুলে সম্মান দেখাল। তারপর বললো — 'দেখুন, একটা সমস্যার কথা বলছিলাম।'

— 'কী সমস্যা?'

হীরে রাখা গাড়ি দু'টোর দিকে হাত দেখিয়ে ফ্রান্সিস বললো — 'ঐ গাড়ি দু'টোয় প্রচুর বারুদ রাখা আছে। বৃষ্টি হলে সব বারুদ ভিজে যাবে। যদি ছেঁড়া পাল-টাল দিয়ে ঢেকে দেওয়ার অনুমতি দেন তাহ'লে'—

—'পাগল নাকি? পরিস্কার আকাশ — বৃষ্টি হবে না' — বড় সর্দার বললো।

— বলছিলাম, আপনি তো আমার চেয়েও অভিজ্ঞ, জানেন তো ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি এসব জায়গায় কখন মেঘ ক'রে, কখন ঝড় হয়, বৃষ্টি হয়, মা মেরীও তা জানেন না।

বড় সর্দার ভেবে বললো, 'হুঁ।'



তারপরে মেঘের দিকে হাত দেখিয়ে বলল,
বলছিলাম, আপনি তো আমার চেয়েও অভিজ্ঞ
কিন্তু আপনাদের তো যুদ্ধ-টুদ্ধ করতে হবে

— তাছাড়া ভেবে দেখুন, আমি শুধু আমাদের জন্য বলছি না, আমাদের আর বারুদ দিয়ে কি হবে কিন্তু আপনাদের তো যুদ্ধ-টুদ্ধ করতে হবে, ভেজা বারুদ নিয়ে তখন কী করবেন?

— হুঁ, তা ঠিক।' বড় সর্দার মাথা ঝাঁকাল — 'কিন্তু তোমরা কেমন বেআক্কেলে হে, যে খোলা ডেকে বারুদ রেখেছো?'

— ভিজে গিয়েছিল তাই শুকোতে দিয়েছিলাম।

— 'অ'। যাও, ঢাকা দিয়ে দাও।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকল। হ্যারি কাছে এলে চোখ টিপে বললো — 'কেল্লা ফতে! ক্যাপ্টেন রাজী হয়েছে।'

ও আরো কয়েকজনকে ডাকল। তারপর গুদোম ঘর থেকে দু'টো বড়-বড় ছেঁড়া পালের অংশ এনে ঢাকা দিতে শুরু করলো। বড় সর্দার দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। প্রায় অন্ধকারে ও কিছুই বুঝতে পারছিল না। পাল ঢাকা দিয়ে ফ্রান্সিসরা দড়ি-দড়া দিয়ে শক্ত করে হীরেটাকে গাড়ির সঙ্গে বেঁধে দিলো। ওদের কাজ সারতেই ভোর হয়ে গেল। ভাইকিংদের মধ্যে যারা জেগে ছিল, তারা হীরের গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু আর আলোর খেলা দেখা গেল না। পাল দিয়ে ঢাকা হীরে থেকে দ্যুতি বেরোবে কি ক'রে? জলদস্যুরাও গাড়ি দু'টো বারুদের গাড়ি ভেবে তাকিয়ে দেখলো না। ফ্রান্সিস আর হ্যারির মুখে সাফল্যের হাসি ফুটে উঠলো। যাক্ — হীরে দু'টোকে জলদস্যুদের হাত থেকে এখন আপাততঃ বাঁচানো গেছে।

সকাল হলো। এবার জলদস্যুদের ক্যারাভেল জাহাজটা দেখা গেল! পালের গায়ে ক্রুশ চিহ্ন। মাস্তুলের মাথায় পতাকা উড়ছে। কালো কাপড়ের মাঝখানে মানুষের কঙ্কাল আঁকা। ফ্রান্সিসদের জাহাজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা।

একটু বেলা হ'তেই পাহারাদার জলদস্যুদের মধ্যে ব্যস্ততা দেখা গেল। বড় সর্দার একবার দ্রুত ওদের জাহাজে গেল। তারপর দ্রুত পায়ে ফিরে এলো। জলদস্যুদের মধ্যে বেশ একটা সাজো-সাজো রব পড়ে গেল। একটু পরেই কাঠের পায়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে একটু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এই জাহাজে এলো লা ক্রুশ। মাথায় বাঁকানো টুপী। গালপাট্টা দাড়ি গোঁফ। কালো জোবরা পরনে, তাতে সোনালী জরির কাজ করা, গলায় ঝুলছে একটা হাঁসের ডিমের মত মুক্তোর লকেট। কোমরে মোটা বেল্ট। তাতে হাতীর দাঁতে বাঁধানো বাঁটের তরোয়াল ঝোলানো। পায়ে হাঁটু অবধি ঢাকা বুট, অন্য পা-টা কাঠের। ডানহাতে ধরা একটা শেকল। শেকলে বাঁধা একটা বাচ্চা চিতাবাঘ। লা ক্রুশ খুব ধীর পায়ে এসে এই জাহাজের ডেক-এ দাঁড়াল। জলদস্যুরা সব চুপ করে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। লা ক্রুশ একবার চোখ পিট্-পিট্ করে চারদিকে তাকিয়ে নিলো। তারপর ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে বলল — 'তোমরা ভাইকিং, ভালো জাহাজ চালাও, ভালো যুদ্ধ করো, কিন্তু তোমরা, বড় দরিদ্র, তোমাদের এই জাহাজে মূল্যবান কিস্সু পাবো না।'

ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষার সঙ্গে ফরাসী ভাষা মিশিয়ে লা ক্রুশ বলতে লাগলো — 'তবে কেন আশী মাইল সমুদ্রপথ তোমাদের পেছনে ধাওয়া করে এলাম?'

খুক্-খুক্ করে হেসে উঠল লা ক্রুশ। তারপর হাসি থামিয়ে বলল — 'সেটা এই জন্যে।' কথাটা বলেই লা ক্রুশ খাপ থেকে তরোয়াল খুল্লো। তারপর বেশ দ্রুত ছুটে গিয়ে হীরের গাড়ির ওপর বাঁধা দড়িগুলো কাটতে লাগলো। তারপর ওখান থেকে সরে এসে ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে খুক-খুক করে হেসে উঠলো। ফ্রান্সিস ও হ্যারি পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। তবে কী লা ক্রুশ হীরের কথা জানে? লা ক্রুশ হঠাৎ চিৎকার করলো — 'ওপরের ঢাকনা সরাও।'

তিন-চারজন জলদস্যু ছুটে গিয়ে ছেঁড়া পাল দুটো খুলে ফেলল। সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল হীরে দু'টো। নীল্‌চে-হলুদ কত রকমের আলো বিচ্ছুরিত হ'তে লাগল। ভাইকিংরা কেউ অবাক হলো না। কারণ, এসব রঙের খেলা ওরা অনেকদিন দেখেছে। অবাক হল জলদস্যুরা। ওরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। চোখে পলক পড়ে না। লা ক্রুশও কম অবাক হয় নি। এত বড় হীরে? ওর কল্পনারও বাইরে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে হীরে দুটোর দিকে তাকিয়ে রইলো লা ক্রুশ। তারপর ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে লা ক্রুশ বলতে লাগল — 'তেকবুর বন্দরের কাছে যে দুর্গ আছে, সেখান থেকে হেনরী সময় মতই আমার কাছে লোক পাঠিয়ে ছিল। তোমরা ওকে ভাঁওতা দিয়ে হীরে নিয়ে পালাচ্ছো, এই সংবাদ পেতেই তোমাদের পিছু নিলাম। আমাদের 'ক্যারাভেল' জাহাজ যে অনেক দ্রুত গতিসম্পন্ন, সেটা আর একবার প্রমাণিত হলো।' খুক-খুক করে হেসে উঠল লা ক্রুশ।

ফ্রান্সিসের আর সহ্য হ'ল না। ও আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। হ্যারি ওকে বারণ করতে গেল। কিন্তু ফ্রান্সিস শুনল না। ও উঠে দাঁড়িয়ে বললো — 'ক্যাপ্টেন লা ক্রুশ আমার কিছু বলবার আছে।'

দু'তিন জন পাহারাদার তরোয়াল হাতে ছুটে এলো। লা ক্রুশ হাত তুলে ওদের থামিয়ে দিল। বললে — 'বলো'।

— দুর্গাধ্যক্ষ হেনরী মিথ্যে অভিযোগ করেছেন। আমরা তাঁকে ভাওতা দিতে চাই নি। তিনি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাকে এক খন্ড হীরে দিয়েছিলাম। কিন্তু লোভের বশে তিনি দু'টো খন্ডই জোর ক'রে নিতে গিয়েছিলেন আমরা সেটা হ'তে দিই নি। কারণ হীরের দু'টো খন্ডই আমাদের প্রাপ্য। আমরাই হীরের পাহাড়ের খোঁজ জানতাম। আমার এক বন্ধু এই জন্য প্রাণ দিয়েছে। কাজেই এই হীরের নায্য দাবীদার আমরা। হেনরীকে এই হীরে পেতে বিন্দুমাত্র কষ্টও করতে হয় নি। তবে কি করে উনি বলেন, যে আমরা ওকে ভাঁওতা দিয়েছি।

লা ক্রুশ কী ভাবল। তরোয়ালের হাতলে হাত বুলোলো দু'একবার। দাড়িতে হাত বুলিয়ে, তারপর কেশে নিয়ে বললো — 'ওসব তোমাদের ব্যাপার। হীরে দু'টো আমি পেয়েছি, ব্যাস।' বলে ক্রুশ চোখ পিট্‌ পিট্‌ করে হাসল।

— আমাদের কি হবে?

— তোমাদের আমার জাহাজে কয়েদ ঘরে থাকতে হবে।

— কেন?

লা ক্রুশ খুক্‌-খুক্‌ ক'রে হাসল — 'তোমরা যে বেঁচে আছো, এই জন্য মা মেরীকে ধন্যবাদ দাও। তোমাদের যে প্রাণে মারতে বলিনি, তার কারণ এই হীরে দু'টো। তোমাদের নিয়ে আমরা প্রথমে যাবো ডাইনীর দ্বীপে। সেখানে লুঠের মাল রেখে যাবো চাঁদের দ্বীপে। তারপর ইউরোপের দিকে। ক্রীতদাস বিক্রীর হাটে তোমাদের বিক্রী করবো। এরমধ্যে অবশ্য ভালো খদ্দের পেলে হীরে দু'টোও বিক্রী করে দেব'।

— আমাদের বিক্রী-করা হবে কেন?

লা ক্রুশ ক্রুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠল — 'তুমি যে এখনো আমার সঙ্গে কথা বলতে পারছো, জেনো সেটা আমার দয়া।'

হ্যারি ফ্রান্সিসের হাত ধরে টানল— 'ফ্রান্সিস মাথা গরম করো না। ব'সে পড়ো।'

ফ্রান্সিস বসে পড়ল। লা ক্রুশ বড় সর্দারের দিকে তাকিয়ে বলল — 'এদের সব কয়েদ ঘরে ঢোকাও। তারপর এই জাহাজটাকে আমাদের ক্যারাভেলের পেছনে বেঁধে নাও।'

লা ক্রুশ আর কোনদিকে না তাকিয়ে কাঠের পা ঠক্-ঠক্ করতে করতে নিজের ক্যারাভেল-এ ফিরে গেল।

বড় সর্দার চেঁচিয়ে হুকুম দিলো — 'সব ক'টাকে কয়েদ ঘরে ঢোকাও। পাহারাদার জলদস্যুরা সব এগিয়ে এলো। ভাইকিংদের সারি বাঁধা হলো। ক্যরাভেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল ওদের। ডেক থেকে কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে। ওরা নামতে লাগল। অনেক ক'টা ধাপের পর ক্যারাভেলের সবচেয়ে নীচের অংশে একটা লম্বা ঘর। লোহার মোটা-মোটা শিক লাগানো। ঘরটার জানালা বলে কিছুই নেই। ঐ শিকল লাগানো দরজা থেকেই যেটুকু আলো আসে। স্যাৎসেঁতে অন্ধকার। বাইরের আলো থেকে এসে কিছুই নজরে পড়ে না। অন্ধকার স'য়ে আসতে ওরা দেখল লম্বা ঘরটার ধার বরাবর একটা মোটা শেকল। শেকলের দুটো দিক। একদিকে জাহাজের কাঠের খোলের সঙ্গে গাঁথা। অন্য দিকটা একটা বড় কড়ার সঙ্গে আটকানো। বড় সর্দার সেই দিকে শেকলটার মুখ একটা আংটা থেকে খুলে নিলো। এদিকে কোনের দিকে একজন জলদস্যু দাঁড়িয়ে। সে প্রত্যেকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে এক-এক ক'রে চাবি দিয়ে হাতকড়া আটকে দিতে লাগল। বড় সর্দার এক একজনের হাত কড়ার মধ্যে দিয়ে শেকলের মুখটা ঢুকিয়ে দিতে লাগল। হাতকড়ার মধ্যে দিয়ে শেকল বাঁধা অবস্থায় ওরা পরপর বসতে লাগল। যখন সবাইকে এভাবে বসানো হলো, তখন বড় সর্দার শেকলটা একটা আংটার মধ্যে আটকে দিয়ে যে হাতকড়া পরাচ্ছিল, তাকে ডাকল। সে এসে শেকলটা চাবি দিয়ে এঁটে দিল। বোঝা গেল, এই লোকটাই কয়েদ ঘরের পাহারাদার। ও-ই বন্দীদের সব দেখাশুনা করে। অদ্ভুত দেখতে লোকটা। যেমন কালো চেহারা, তেমনি মুখটা। মুখটা যেন আগুনে পোড়া তামাটে কালো। এমন ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যেন কিছুই দেখছে না, শুনছে না। মুখ দেখলে মনে হয় যেন জীবনে কোনদিন হাসে নি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। একেবারে নরকের প্রহরী। এতক্ষণে হাতকড়া শেকলের ঝন্ ঝন্ শব্দ হলো। তবু ভাইকিংদের মধ্যে কেউ উঠে দাঁড়ালে শেকলে ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠেছে। এতক্ষণে চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে ফ্রান্সিস চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। যে ভাবে শেকল বাঁধা হাতকড়ি পরানো হোল তাতে এসব ভেঙে পালানো অসম্ভব, দু'দিকে নিরেট কাঠের খোল। দরজায় মোটা গরাদ। ফ্রান্সিসের মন দমে গেল। শেষে ক্রীতদাসত্বকে মেনে নিয়ে জীবন শেষ করতে হবে? ও এই সব ভাবছে, তখনই শুনল প্রায় অন্ধকার কোন থেকে কে

ফ্যাস্‌ফেসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল—'উ—উ গেলাম পা মাড়িয়ে দিয়েছে—ও হোহো —।'

ফ্রান্সিস ভালো করে তাকিয়ে দেখলো — কোণার দিকে একটা লোক পায়ে হাত বুলোচ্ছে আর চ্যাঁচাচ্ছে। এই লোকটা তো আমাদের দলের নয়, ফ্রান্সিস ভাবলো। তাহ'লে এই লোকটা আগে থেকেই শেকল বাঁধা ছিল। পুরানো কয়েদী। হাতে শেকল আটকানো; ও এগিয়ে যেতে পারল না। ঐ লোকটার পাশেই ছিল হ্যারি। লোকটার পায়ে হাঁটুতে হাত বুলোতে-বুলোতে বললো — 'খুব লেগেছে? অন্ধকারে দেখতে পাইনি।'

লোকটা এতক্ষণে শান্ত হলো। দু'একবার উ—হু—হু চুপ করলো।

হ্যারি জিজ্ঞেস করল — 'তুমি ভাই কদ্দিন এখানে আছো?'

লোকটা বলল—এখানে কি দিন-রাত বোঝা যায়, যে দিন-মাস-বছর গুণবো?

এবার ফ্রান্সিস লোকটির দিকে ভালো করে তাকাল। দেখলো, লোকটার মাথা ভর্তি লম্বা লম্বা কাঁচাপাকা চুল। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। গায়ে শতছিন্ন একটা জামা। পরণে ছেঁড়া পায়জামা। প্রায় বুড়ো এই মানুষটা ক্রীতদাসের হাটে হয়তো ভালো দামে বিকোবে না। তাই হয়তো একে এখনও কয়েদঘরে রেখে দিয়েছে, মরে গেলে সমুদ্রে ফেলে দেবে।

লোকটার জন্যে ফ্রান্সিসের সহানুভূতি হলো। কে জানে কতদিন এই পশুর জীবন কাটাচ্ছে লোকটা? ও হ্যারিকে বলল—'হ্যারি, জিজ্ঞেস করতো—ওর নাম কি?'

হ্যারি জিজ্ঞেস করতে, লোকটা ফ্যাস্‌ফেসে গলায় বলল — 'ফ্রেদারিকো।'

— 'তুমি কি পর্তুগীজ?' হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

— 'না স্প্যানিশ, তবে পর্তুগীজদের সঙ্গে থেকে-থেকে ওদের ভাষাতেই কথা বলা অভ্যেস হ'য়ে গেছে'।

কথাটা ব'লে ফ্রেদারিকো কোমর থেকে কী বের ক'রে মুখে দিয়ে চিবোতে লাগল। হ্যারি জিজ্ঞেস করল — 'কি চিবুচ্ছো?'

— তামাকপাতা।

— এখানে তামাকপাতা পেলে কি ক'রে?

ফ্রেদারিকো খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে উঠল। মাথায় আঙুল ঠুকে বললো — বুদ্ধি-টুদ্ধি খরচ করলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে'।

তারপর আস্তে-আস্তে বললো, 'ঐ যে পাহারাদারটাকে দেখছো পাথরের মত মুখ, মনে হয় দয়া-মায়া ব'লে কোন জিনিস ওর মনে নেই।'

— ওর মুখ দেখে তো তাই মনে হয়।

— ঠিক। কিন্তু ওরও বৌ-ছেলেমেয়ে আছে। ওর মনেও স্নেহ-ভালোবাসা আছে। ওর নাম বেনজামিন। ও মাঝে মাঝে হাত দেখায়। একবার একদল জিপসীদের সঙ্গে আমি বেশ কিছুদিন ছিলাম। ভালই হাত দেখতে শিখেছিলাম। বেনজামিন হাত দেখায়, আর আমি ওকে ওর বৌ-ছেলেমেদের খবরাখবর ব'লে দিই। ব্যাস, বেনজামিন এতেই খুশি।'

ফ্রেদারিকো একটু থেমে বললো একবার লিসবনের কাছে দিয়ে এই ক্যারাভেলটা যাচ্ছিল, আমি ওর হাত দেখে বললাম — 'তুমি শিগগীর বাড়ি যাও, তোমার ছেলের মরণাপন্ন অসুখ।'

ও লা ক্রুশের কাছে ছুটি নিয়ে লিসবন ওর বাড়িতে ছুটে গেল। দেখল, সত্যিই ছেলেটি মারা যায় যায়। চিকিৎসা-টিকিৎসার পর ছেলেটি সুস্থ হ'ল। বেনজামিন আবার ফিরে এল। ব্যস্! তারপর ওর কাছে আমার কদর বেড়ে গেল। যা চাই, তাই এনে দেয়। লুকিয়ে আমার জন্য মাংস-টাংস নিয়ে আসে।'

— তাহলে তো ওর সাহায্যে তুমি পালাতেও পারো।

— তা' পারি। কিন্তু লা ক্রুশ মাঝে-মাঝেই আমার কাছে আসে। প্রতিদিন আমার খোঁজ করে। যদি কোনদিন এসে দেখে আমি পালিয়েছি, প্রথমেই বেন্‌জামিনের গর্দান যাবে। অন্য পাহারাদার যে দু'জন আছে, তাদের হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

— 'লা ক্রুশ তোমার কাছে আসে কেন?' হ্যারি জানতে চাইলো।

— 'সে অনেক ব্যাপার!'

ফ্রেদারিকো আর কোন কথা বলল না। চোখ বন্ধ করে তামাকপাতা চিবুতে লাগল।

এক সময় হ্যারি লক্ষ্য করল ফ্রেদারিকো গলায় লকেটের মত ঝোলানো একটা কী যেন বের করল। তারপর মুখের কাছে ধ'রে দাঁত-মুখ খিঁচোতে লাগল। হ্যারি দেখলো, ওটা একটা আয়নার ভাঙা টুকরো। গলার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। একদিকের ভাঙা মুখটা ছুঁচলো। ফ্রেদারিকো আয়নাটার মুখ দেখছে আর ভেংচি কাটছে। ওর কান্ড দেখে হ্যারির হাসি পেলো। বললো — 'এই অন্ধকারে মুখ দেখতে পাচ্ছো?'

— 'পারছি বৈ কি'! ফ্রেদারিকো হাসলো — 'কিছুদিন থাকো, বেড়ালের মত অন্ধকারে তুমিও দেখতে পাবে। তখন আর আলো সহ্য হবে না। আলোর সামনে চোখ জ্বালা করবে। চোখ জলে ভরে যাবে।'

হ্যারি ভাবল, সত্যিই দীর্ঘদিন এভাবে অন্ধকার কয়েদ ঘরে পড়ে থাকলে বাইরের আকাশ-মাটি-জলের কথা ভুলেই যেতে হবে।

ফ্রান্সিসদের কয়েদ ঘরের বন্দীজীবন কাটলো কয়েকদিন। দু'বেলা খাওয়া জুটল পোড়া পাঁউরুটি, আর আলু-মুলো এবং আনাজ মেশানো ঝোল। বেনজামিনই ওদের খাবার-দাবার জল দেয়। বেনজামিনকে আরো দু'জন পাহারাদার সাহায্য করে। ফ্রেদারিকো কিন্তু মাংস, সামুদ্রিক মাছের ঝোল, এসব খেতে পায়। ওর বেলা বেশ ভালো ফুলকো রুটি। হ্যারি বুঝল, ফ্রেদারিকো বেন্‌জামিনের হাত দেখেই বেশ সুবিধে করে নিয়েছে।

ফ্রান্সিসদের কয়েদ ঘরের জীবন এভাবেই কাটতে লাগল। দিন যায়, রাত যায়। দিনরাতের পার্থক্যও ওরা ভালোভাবে বুঝতে পারে না! দরজার পেছনে অন্ধকার না থাকলে বোঝে দিন, আর ওদিকটা অন্ধকার হ'লে বোঝে রাত্রি। ফ্রেদারিকোর সঙ্গে হ্যারির আর কোন কথাবার্তা হয়নি, ফ্রেদারিকো শুধু তামাক

পাতা চিবোয় আর ঝিমোয়। আর মাঝে-মাঝে আয়নার ভাঙা টুকরোটা বের করে মুখ দেখে। মুখ ভ্যাংচায়। আপন মনেই বিড়-বিড় ক'রে কী বলে আর ঝিমোয়।

*　　　　*　　　　*

একদিন। তখন দিনই হবে। কারণ গরাদ দেওয়া দরজার ওপাশে আলোর আভাস ছিল। হঠাৎ বেন্‌জামিন আর দু'জন পাহারাদারকে খুব সন্ত্রস্ত মনে হ'লো। বেন্‌জামিন এক সময় ফ্রেদারিকোর কানের কাছে মুখ নিয়ে কী কী সব ফিস্‌ফিস্ করে ব'লে গেল।

একটু পরেই গারদ দরজার কাছে খট্ খট্ শব্দ উঠল। লা ব্রুশ আসছে বোঝা গেল। দরজা খুলে পাহারাদারেরা স'রে দাঁড়াল। লা ব্রুশ কাঠের পাঠাতনে ঠক্-ঠক্ শব্দ তুলে এগিয়ে এল। ওর হাতে একটা শঙ্কর মাছের চাবুক। আর কারো দিকে না তাকিয়ে লা ব্রুশ ফ্রেদারিকোর সামনে এসে দাঁড়াল। গম্ভীরগলায় ডাকল 'ফ্রেদারিকো।'

— 'আজ্ঞে—' ফ্রেদারিকো আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। ও যেন কাঁপছে। কেমন ভীত-সন্ত্রস্ত ওর ভাবভঙ্গী।

— 'তাহ'লে কি ঠিক করলে। পনেরো দিন সময় চেয়েছিলে। সে সময় পেরিয়ে গেছে।'

ফ্রেদারিকো ফ্যাসফেসে গলায় বলল — 'আমি সত্যিই কিছু জানি না।'

— 'তুমি সব জানো। মুক্তোর সমুদ্র থেকে অক্ষত দেহে বেরোবার উপায় একমাত্র তুমিই জানো'।

— 'আমি যা জানি 'সবই আপনাকে বলেছি।'

ফরাসী ভাষায় গালাগাল দিয়ে লা ব্রুশ চাবুক চালাল। চাবুকের ঘায়ে ফ্রেদারিকো পড়ে যেতে-যেতে কোন রকমে দাঁড়িয়ে রইল। লা ব্রুশ ওর গলায় ঝোলানো লকেটের হাঁসের ডিমের মতো মুক্তোটা দেখিয়ে বলল, 'বল, এটা তুই কী ক'রে আনলি'?

ফ্রেদারিকো পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল — 'ভাইকিংদের রাজার ভান্ডার থেকে চুরি করে এনেছি।'

'মিথ্যে বলছিস্।' লা ব্রুশ বাঘের মতো গর্জন করে উঠল। আবার চাবুক পড়ল ফ্রেদারিকোর গায়ে। একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ উঠল ওর গলায়। একে বয়েসের ভারে জীর্ণ-শীর্ণ শরীর; তার ওপর এই চাবুকের মার। ফ্রেদারিকোর শরীর কাঁপছে তখন। ফ্রান্সিসের আর সহ্য হল না। ও দ্রুত উঠে দাঁড়াল হাতকড়া বাঁধা হাতটা তুলে বলল — 'ওকে আর চাবুক মারবেন না।'

লা ব্রুশ তীব্র দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর দাঁত চাপাস্বরে বলল — 'তা'হলে ওর মারটা তুমিই খাও।'

প্রচন্ড জোর চাবুক চালিয়ে চলল ফ্রান্সিসের শরীরের উপর। চাবুকের আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে ফ্রান্সিসের শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। কিন্তু ওর মুখ থেকে একটা কাতর ধ্বনিও বেরোল না। দাঁতে-দাঁত কামড়ে মুখ বুঁজে চাবুকের মার সহ্য করতে লাগল। লা ব্রুশ এক সময় চাবুক মারা থামিয়ে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস

শরীরের অসহ্য ব্যথায় ভেঙে পড়ল না। সোজাসুজি লা ক্রুশের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিসের ওপর এই অত্যাচার দেখে ভাইকিংদের রক্ত গরম হয়ে উঠল। শেকলে প্রচন্ড শব্দ তুলে সবাই উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসকে কয়েকজন ঘিরে দাঁড়াল। হ্যারি চেঁচিয়ে বলল — 'এবার আমাদের মারুন।'

লা ক্রুশ একবার ওদের দিকে তাকাল। তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর হাতের চাবুকটা কাঠের মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলল। ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে ফ্রেদারিকোর দিকে তাকিয়ে বলল — 'এই শেষবার বলছি আর পনেরো দিন সময় দিলাম। এই শেষ। এর মধ্যেই আমরা চাঁদের দ্বীপে পৌঁছব। যদি অক্ষত দেহে মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো আনার উপায় না বলিস্, তাহ'লে হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলবো তোকে।'

বলে লা ক্রুশ কাঠের পায়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দ তুলে চ'লে গেল।

চাবুক কুড়িয়ে নিয়ে বেন্‌জামিন ক্যাপ্টেনের পেছনে-পেছনে চ'লে গেল।

ফ্রান্সিস বসে পড়ল। কিন্তু পেছনে হেলান দিয়ে বসতে পারল না। পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা। হ্যারি ওর জামাটা তুলে ধরল। চাবুকটা পিঠের মাংস কেটে ব'সে গেছে। সারা পিঠে কালসিটে দাগ। কিন্তু ও চোখ বুঁজে চুপ করে বসে রইল। দাঁতে-দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল।

রাত্রে খাবাার সময় ফ্রান্সিস বুঝলো, জ্বর এসেছে। কিছুই খেতে পারল না। কুন্ডলী পাকিয়ে কাঠের পাটাতনের উপর শুয়ে রইলো। অসম্ভব শীত করছে। মাথাটা ভীষণ দপ্ দপ্ করছে। পিঠের জ্বালাটা আরো বেড়েছে। ওর শরীরটা কুঁকড়ে যেতে লাগল। কিন্তু ও মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলো না। তাই কেউ ওর শরীরের অবস্থাটা বুঝতে পারলো না। যখন ও খেতেও উঠলো না, তখন হ্যারির মনে সন্দেহ হ'ল। ও হাতকড়ি বাঁধা দু'টো হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিসের কপালে রাখলো। জ্বলে কপাল পুড়ে যাচ্ছে। হ্যারি ওর গালে-গলায় হাত দিল। ভীষণ জ্বর উঠেছে। হ্যারি তাড়াতাড়ি ডাকল, 'ফ্রান্সিস'।

প্রথম ডাকে সাড়া পেলো না। আবার ডাকল 'বন্ধু'—

ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে সাড়া দিতে হ্যারি বললো — 'শরীর খুব খারাপ লাগছে?'

—'জ্বর এসেছে। সেরে যাবে।' স্পষ্ট বোঝা গেল যে ওর গলা কাঁপছে।

কিন্তু হ্যারি বুঝলো, জ্বর এত বেশি যে ফ্রান্সিসের বোধশক্তিও লোপ পেয়েছে। আর কিছুক্ষণ পরে ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। হ্যারি দ্রুত ভাবতে লাগল, ওষুধ কী ক'রে পাওয়া যায়। জ্বরটা কমাতেই হবে। ও ফ্রান্সিসের শরীরের অবস্থা অন্য কয়েকজন ভাইকিংকে বললো, কিন্তু কেউ কোন উপায় বলতে পারলো না। ওরা অসহায়ভাবে ফ্রান্সিসের কুন্ডলী পাকানো শরীরের দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ ওর নজর পড়লো ফ্রেদারিকোর ওপর। ফ্রেদারিকোও তখন থেকে একটানা গোঙাচ্ছে। শরীরের এই অবস্থায় ওর পক্ষে চাবুকের মার সহ্য করা সম্ভব হয়নি।

হ্যারি ভেবে দেখলো, একমাত্র ফ্রেদারিকোই পারে ফ্রান্সিসের জন্য ওষুধ আনতে। ও যদি বেন্‌জামিনকে বলে তা'হলেই একটা উপায় হ'তে পারে। হ্যারি ঝুঁকে পড়ে ফ্রেদারিকোকে ডাকল, 'ফ্রেদারিকো — ফ্রেদারিকো —'।

ফ্রেদারিকোর মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল। এই অবস্থাতেই ও

গোঙাচ্ছিল। আরো কয়েকবার ডাকতে ফ্রেদারিকো জলে ভেজা চোখ মেলে হ্যারির দিকে তাকাল।

হ্যারি বললো, 'ফ্রেদারিকো শোন। খুব বিপদ — ফ্রান্সিসের ভীষণ জ্বর এসেছে। আর কিছুক্ষণ এই জ্বর থাকলে ও অজ্ঞান হ'য়ে যাবে। শীগগির একটা উপায় বের করো।'

— 'কার জ্বর এসেছে?'

— 'যে ছেলেটি তোমার হয়ে চাবুক খেলো।'

— 'এ্যাঁ বলো কি!'

হ্যারি তখন আঙ্গুল দিয়ে ফ্রান্সিসের কুন্ডলী পাকানো শরীরটা দেখালো। ফ্রেদারিকো কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল — 'আমাকে বাঁচাতে গিয়ে — ঈস্! আমি কী করি এখন?'

ফ্রেদারিকো নিজের কষ্টের কথাও ভুলে গেল।

— বেন্‌জামিন তো তোমার কথা শোনে, ওকে একবার ব'লে দেখো।

— 'ভালো বলেছো, কিন্তু ও কী অতটা করবে?'

রাতের খাওয়া হ'য়ে গেছে। এঁটো থালা, গ্লাস নিতে প্রহরী দু'জন এসেছে। বেনজামিন ওদের পেছনে এসে দাঁড়াল। ওরা থালা নিয়ে বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করবে। প্রহরী দু'জন থালা গ্লাস নিয়ে চলে গেল। চকিতে ওদের যাওয়ার পথের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বেন্‌জামিন দ্রুতপায়ে ফ্রেদারিকোর কাছে এলো। নীচু হয়ে বসে ফিস্‌ফিস্ ক'রে জিজ্ঞেস করলো — 'ফ্রেদারিকো — কেমন আছো?'

ফ্রেদারিকো মাথা নেড়ে বলল, 'আমার কথা বাদ দাও, ঐ ছেলেটাকে একটু দেখো তো, ভীষণ জ্বর এসেছে ওর।'

বেন্‌জামিন একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর কোন কথা না ব'লে উঠে চ'লে গেল।

ফ্রান্সিস তখন জ্বরের ঘোরে বেঁহুশ। ও যেন স্বপ্নের মত স্পষ্ট দেখতে পেলো, ওদের বাড়িটা বাগানটা সূর্যালোকে ঝল্‌মল্ করছে। গাছপালা, ফুল কী, হাওয়া। উজ্জ্বল আলোয় ভরা মধ্য বসন্তের আকাশ। ও বাগানের দোলনায় দোল খাচ্ছে। হাস্যোজ্জ্বল মা'র মুখ। ওর দোলনা ঠেলে দিচ্ছে। ও উঁচুতে উঠে যাচ্ছে নেমে আসছে। ছোটবেলার একটা আলোকোজ্জ্বল দিন ও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। একজন পরিচারিকা কী নাম যেন, ওর মাকে এসে ডাকলো। ওর মা চ'লে গেল। পরিচারিকাটি দোলনা ঠেলে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস চ্যাচাচ্ছে 'আরো উঁচুতে ঠেল, আরো উঁচুতে।' পরিচারিকাটি ভীতস্বরে বলছে 'না, কর্তামা বকবে। তবু সে বেশ জোরেই ঠেলতে লাগল। ফ্রান্সিসের চোখের সামনে আকাশ, সাদাটে মেঘ, ঘরবাড়ি, গাছ-বাগান সব দুলছে। গায়ে হাওয়া লাগছে। ও খুশীতে চিৎকার করছে। হঠাৎ ছবিটার উজ্জ্বলতা কমতে লাগল। আস্তে-আস্তে অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। মাথাটা যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে।

কয়েদ ঘরের লোহার দরজা খোলার শব্দ হলো। বেন্‌জামিন কী যেন একটা

জিনিস লুকিয়ে নিয়ে আসছে। ও চুপিচুপি এসে ফ্রেদারিকোর হাতে একটা চিনেমাটির ছোট বোয়াম দিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো — 'এটা ওর পিঠে আস্তে-আস্তে লাগিয়ে দাও, তুমিও লাগাও, সব সেরে যাবে। পরে ওটা নিয়ে যাবো। সাবধান, কেউ যেন না দেখে ফ্যালে।' বলে কাঠের পাটাতনে কোন শব্দ না তুলে বেন্‌জামিন চ'লে গেলো।

হ্যারি বোয়ামটা ফ্রেদারিকোর হাত থেকে নিলো। তারপর আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিসের পিঠে লাগিয়ে দিতে লাগলো। লাল আঠা-আঠা ওষুধটা। ওটা লাগাতেই ফ্রান্সিসের শরীর কেঁপে উঠলো। হ্যারি সাবধানে আলতো হাতে লাগাতে লাগলো। কেটে যাওয়া কালসিটে পড়া জায়গায় লাগানো শেষ হলো। কে জানে এটা কী ওষুধ? সারবে কিনা? এবার ফ্রেদারিকোর দিকে ফিরলো। ওর শতচ্ছিন্ন জামাটা সরিয়ে ওষুধটা লাগিয়ে দিল আস্তে-আস্তে। ফ্রেদারিকো অস্পষ্ট স্বরে গোঙাতে-গোঙাতে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়লো। রাত বাড়তে লাগলো। আস্তে-আস্তে সবাই ঘুমিয়ে পড়তে লাগলো। শুধু হ্যারির চোখে ঘুম নেই। হাতকড়া বাঁধা হাতটা দিয়ে মাঝে-মাঝেই ফ্রান্সিসের কপালের উত্তাপটা দেখছে।

রাত গভীর হতে বেনজামিন পা টিপে-টিপে এলো। ওষুধের বোয়ামটা নিয়ে চ'লে গেল খুব সাবধানে। দু'জন প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে।

সেই রাত্রির দিকে হ্যারির একটু তন্দ্রামত এসেছিল। ফ্রান্সিস বোধহয় পাশ ফিরে শুলো, তাই শেকলে শব্দ উঠলো। হ্যারির তন্দ্রা ভেঙে গেল। ও তাড়াতাড়ি ওর কড়া লাগানো হাতটা ফ্রান্সিসের কপালে রাখল। দেখলো, কপাল ঠান্ডা। বোধহয় জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে হ্যারিকে ডাকতেই হ্যারি মুখ নীচু ক'রে ওর দিকে তাকিয়ে বলল — ''কি?''

ফ্রান্সিস বললো — 'শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে।'

'ও কিছু না — কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হ'য়ে যাবে' — হ্যারি বলল।

তারপর কড়া লাগানো হাতটা দিয়ে ফ্রান্সিসের কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস আবার ঘুমিয়ে পড়লো। হ্যারি আর ঘুমোল না। ফ্রান্সিসের কপালে-মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।

সকাল হ'য়ে গেছে। সকলেই উঠে বসেছে। শুধু ফ্রান্সিস আধশোয়া হ'য়ে। শরীরের দুর্বলতাটা এখনও সম্পূর্ণ কাটে নি। ওদের সকালে বরাদ্দ খাবার আলুসেদ্ধ আর কফিপাতা মেশানো সূপ। সকলেই খাচ্ছে। ফ্রেদারিকো তখন হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার বন্ধু কেমন আছে?'

— মনে হচ্ছে জ্বরটা ছেড়েছে। তবে শরীরটা এখনও দুর্বল আছে।

— বন্ধুর নাম কি?

— ফ্রান্সিস।

ঠিক এই সময়ে বেনজামিন খাবারের থালা নিয়ে এলো। ফ্রেদারিকো ইশারায় ওকে ডাকলো। কাছে আসতে মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস ক'রে বললো 'ঐ যে ছেলেটি ফ্রান্সিস, ওকে আমার সঙ্গে রাখো।' বেন্‌জামিন সাবধানে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো। তখন আর দু'জন প্রহরী খেতে গেছে। বেন্‌জামিন চাবি বের করে ফ্রান্সিসের

কাছে এসে ওর হাতের কড়া খুলে দিল। তারপর বললো — 'তুমি ফ্রেদারিকোর পাশে থাকবে। এসো।'

ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে উঠে ফ্রেদারিকোর পাশে বসলো। ওখানে ওর হাতকড়া আটকে দিয়ে বেনজামিন চলে গেল। এবার হ্যারি আর ফ্রান্সিস ফ্রেদারিকোর পাশেই জায়গা পেল। ফ্রান্সিসও এটাই চাইছিল। কিন্তু বেন্‌জামিন তো কথা শুনবে না তাই ও কোনকথা বলেনি। ফ্রেদারিকোকে লা ক্রুশ মুক্তোর সমুদ্রের কথা জিজ্ঞেস করেছে। মুক্তোর সমুদ্র কী? কোথায় আছে এই মুক্তোর সমুদ্র? কথাটা শুনে পর্যন্ত ফ্রান্সিসের মনে তোলপাড় চলছে। ফ্রেদারিকোর পাশে বসতেই ফ্রেদারিকো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল — 'তুমি আমাকে চাবুকের মার থেকে বাঁচিয়েছো ফ্রান্সিস, তোমার ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারবো না।'

— 'পারবে!' ফ্রান্সিস ক্লান্ত হাসি হেসে বলল।

— কি ক'রে।

— যদি বলো মুক্তোর সমুদ্র ব্যাপারটা কি?

কথাটা শুনে ফ্রেদারিকোর মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল। ভীতমুখে ও বললো না না — মুক্তোর সমুদ্রের কথা ভুলে যাও — ওখানে গেলে কেউ ফেরে না।

ফ্রান্সিস হাসল। 'তুমি বলো তো মুক্তোর সমুদ্র ব্যাপারটা কি?'

— 'তুমি ওখানে যেতে চাও'? ফ্রেদারিকো অবাক চোখে তাকাল।

— আগে শুনি তো।

— গেলেও ফিরে আসতে পারবে না।

— ঠিক আছে, ধ'রে নাও না আমার কৌতূহল হ'য়েছে।

ফ্রেদারিকো মুখ নীচু করে কী ভাবলো। তারপর বলল — 'দেখো লা ক্রুশকে আমি সবই বলেছি, কিন্তু মুক্তোর সমুদ্র থেকে অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসবার ব্যাপারটা আজও আমার কাছে রহস্য থেকে গেল। কিন্তু লা ক্রুশের বিশ্বাস যে আমি সেটাও জানি। অথচ ঐ রহস্যটা যে ভেদ করা অসম্ভব, সেটা আমি ওকে বোঝাতে পারি নি।'

'ঠিক আছে' — ফ্রান্সিস উঠে বসে বলল - 'তুমি যা জানো, বলো।'

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগলো — কত বছর আগেকার কথা আমি বলতে পারবো না। কারণ এখানকার এই নরকে দিন রাত্রির কোন পার্থক্য নেই। আমি প্রথম-প্রথম দিনরাত্রের হিসেব রাখারই চেষ্টা করেছি। পরে হাল ছেড়ে দিয়েছি।

ফ্রেদারিকো থেমে তার কোমরের গাঁট থেকে তামাকপাতা বের ক'রে মুখে ফেলে চিবুতে-চিবুতে বলতে লাগল — 'একবার চাঁদের দ্বীপের কাছাকাছি আমাদের জাহাজ এসেছিল। আমাদের জাহাজটা ছিল মালবাহী জাহাজ। গায়েরও জোর ছিল, খাটতেও পারতাম খুব। ক্যাপ্টেন আমাকে খুব ভালোবাসতো। সেই প্রথম আমরা চাঁদের দ্বীপে যাচ্ছি।'

— চাঁদের দ্বীপ কোথায়?

— আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ডাইনী দ্বীপ, তারও দক্ষিণে।

— লা ক্রুশ যে সেদিন বলেছিল এই ক্যারাভাল ডাইনী দ্বীপে যাবে।

— তা-তো যাবেই। লা ক্রুশ সমস্ত লুঠের সম্পদ ঐ দ্বীপেই রাখে। তারপরেই ও যাবে চাঁদের দ্বীপে।

— ও। তারপর?

— চাঁদের দ্বীপের বন্দরটার নাম 'সোফালা'। এই দ্বীপের অধিবাসীদের বলা হয় 'ভাজিম্বা'। হল্‌দে চামড়া, বেঁটেখাটো মানুষ এরা। সোফালা বন্দর থেকে প্রচুর তামাক আর মধু রপ্তানি হয়। আমাদের জাহাজ থেকে চিনি, ময়দা, কাপড়-চোপড় এসবের বদলে তামাক পাতা, মধু নেওয়া হলো। এসব বাণিজ্যের জন্য ভাজিম্বাদের রাজার অনুমতি নিতে হয়। রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজসভায় রাজার অনুমতি প্রার্থনা করতে হয় — এই রীতি। কিন্তু এই চাঁদের দ্বীপের খ্যাতি অন্য কারণে। সেটা হলো এখানকার 'মুক্তোর সমুদ্র'। এই অঞ্চল দিয়ে যে সব জাহাজ যায়, সেইসব জাহাজের লোকরা সকলেই এই মুক্তোর সমুদ্রের গল্প শোনে। কিন্তু কেউ জানে না সেই মুক্তোর সমুদ্র কোথায়। তবে এটা সবাই জানতে পারে, যে সেখানে গেলে কেউ ফিরে আসে না। পরে সেই মুক্তোর সমুদ্র আমি দেখেছিলাম। আসলে ওটা একটা ল্যাগুন। ভাজিম্বারাও বলে মুক্তোর সমুদ্র। মস্তবড় ঝিনুক-এর তলায় বড়-বড় মুক্তো। হাঁসের ডিম থেকে শুরু ক'রে উটপাখির ডিমের মতো বড় সেই মুক্তো।'

— 'বলো কি?' ফ্রান্সিস আশ্চর্য হ'য়ে বললো। হ্যারিও কম অবাক হয় নি। বলো কি? এত বড় মুক্তো।

— সেই মুক্তোর সমুদ্র কী ঐ দ্বীপের মধ্যেই?

— 'হ্যাঁ' বলে ফ্রেদারিকো চুপ ক'রে গেল। আর কোনো কথা না বলে চোখ বুঁজে তামাক পাতা চিবুতে লাগল। ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই অধীর হ'য়ে উঠলো। ফ্রান্সিস ব'লে উঠলো — 'তারপর'?

ফ্রেদারিকো সেই চোখ বুঁজে তামাকপাতা চিবুতে লাগল। হ্যারি ওকে মৃদু ঝাঁকুনি দিল — 'ফ্রেদারিকো, কি হ'লো?

ফ্রেদারিকো পাতা চিবুনো বন্ধ ক'রে চোখ মেলে ফ্যাস্‌ফেসে গলায় বললো — 'এই জোয়ান বয়েসে তোমার জীবন শেষ হয়ে যাক, এটা আমি চাই না।'

' —সেটা আমরা বুঝবো। তুমি বলো।' ফ্রান্সিস অধৈর্য হ'য়ে বলল। কিন্তু ফ্রেদারিকো সেই যে চুপ করলো আর একটি কথাও বললো না। ফ্রান্সিস আর হ্যারি অনেক ভাবে কথা বলাবার চেষ্টা করল, কিন্তু ফ্রেদারিকো মুখে একেবারে কুলুপ এঁটে দিল। সেই চোখ বুঁজে তামাক পাতা চিবুতে লাগল। শেষে ফ্রান্সিস আর হ্যারি হাল ছাড়লো।

এর মধ্যে ফ্রান্সিস সুস্থ হলো। বেনজামিনের ওষুধে খুব উপকার হতে কয়েকদিনের মধ্যেই আবার ও আগের মতো গায়ে শক্তি ফিরে পেল।

*   *   *

দিন যায়। ক্যারাভেলও চলেছে। কোনদিকে কোথায় যাচ্ছে, ফ্রান্সিসরা কেউ জানে না। ওদের একঘেঁয়ে বন্দীজীবন কাটাতে লাগল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি পালাবার

কত ফন্দী বার করে, কিন্তু কোনটাই শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করা যাবে না মনে হয়। ওরা হাল ছেড়ে দিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

এদিকে ফ্রেদারিকোও আর মুক্তোর সমুদ্রের গল্প করে না। ঐ প্রসঙ্গ তুললেই ও চুপ ক'রে যায়। চোখ বুঁজে তামাকপাতা চিবোয়। কখনও বা গলায় লকেটের মতো ঝোলানো ভাঙা আয়নাটায় মুখ দেখে, চোখ বড়-বড় ক'রে নাম কুঁচকে ভেংচি কাটে। অন্য অনেক কথা বলে — ওর অতীত জীবনে জিপসিদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার গল্প বা জাহাজী জীবনের গল্প সব বলে। কিন্তু মুক্তোর সমুদ্রের কথা উঠলেই চুপ করে থাকে।

এক দিন। সকালই হবে তখন। হঠাৎ ক্যারাভেলটা যেন থেমে আছে মনে হলো। জলদস্যুদের হাঁক-ডাক শোনা গেল। নোঙর ফেলবার ঘড়্-ঘড়্ শব্দ ভেসে এলো। সেই সঙ্গে পাখির কিচির-মিচির ডাক। নিশ্চয়ই কোন স্থলভূমিতে ক্যরাভেল লেগেছে। ফ্রান্সিসের মনটা খারাপ হ'য়ে গেল — আঃ কতদিন মাটি দেখিনা গাছপালা দেখি না — পাখি-পাখালির ডাক শুনি না, আকাশ দেখি না। ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বাড়ির কথা মনে পড়লো। মা'র কথা। সবার কথা। ছোট ভাইটা এখন না জানি কত বড় হয়েছে। আর কি ওদের দেখতে পাবো? কোনদিন কি আর মাটি-আকাশ দেখতে পাবো? ফ্রান্সিস হঠাৎ মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসলো। এসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। তাহলে শরীর মন ভেঙে যাবে। তা কখনই হতে দেওয়া চলবে না। এই বন্দী জীবন থেকে যে ক'রে হোক পালাতে হবে। এবার যেতে হবে মুক্তোর সমুদ্রে। উট পাখীর ডিমের মত মুক্তো। আঃ কল্পনাই করা যায় না। এখন শুধু ফ্রেদারিকোর কাছ থেকে মুক্তোর সমুদ্রের খোঁজটা নেওয়া। তারপর এখান থেকে পালানো! পালাতেই হবে। যে ক'রে হোক।

একটু পরেই বেনজামিন আর দু'জন প্রহরী সকালের খাবার নিয়ে এল। সকলে খাচ্ছে, তখনই বেনজামিন বলল — 'খাওয়ার পরে তোমাদের মধ্যে থেকে চারজন এসো। ক্যাপ্টেন লা ক্রুশ তলব করেছে। সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো কি ব্যাপার। হঠাৎ জরুরী তলব। খাওয়া শেষ ক'রে কয়েকজন ফ্রান্সিসের দিকে স'রে এলো। ফ্রান্সিস বুঝে উঠতে পারল না। কী বলবে? যখন ডেকেছে, যেতেই হবে। না গেলে অগ্নিমূর্তি ধারণ করবে লা ক্রুশ। বলা যায় না হয়ত চাবুক হাতে ছুটে আসবে। তখন মুখ বুঁজে মার খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ফ্রান্সিস বেনজামিনকে জিজ্ঞাসা করলো 'কেন ডেকেছে?'

' — আমি জানি না। আমি হুকুমের চাকর।' বেনজামিন বললো। ওর পাথরের মত মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। ফ্রান্সিস ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে বললো, — 'ঠিক আছে যে কেউ চারজন যাও।' ভাইকিংরা উঠে দাঁড়ালো। বেনজামিন ওর কোমরে ঝোলানো চাবির গোছা থেকে চাবি নিয়ে চারজনের হাতকড়া খুলে দিলো। চারজন হাতের কব্জিতে হাত বুলোতে-বুলোতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য তবু মুক্তি তো। বাইরের মাটি-আলো-বাতাসে যেতে পারবে। বহুদূর, বিস্তৃত আকাশের নিচে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। কতদিন পর ছাড়া পেল, তা মা মেরীই জানে।'

বেনজামিন চারজনকে নিয়ে চলে গেল। এতক্ষণ ফ্রেদারিকো ঘুমিয়ে ছিল। আজকাল রাত্রে ওর ভালো ঘুম হয় না। ঘুম তাই ওর চোখে লেগেই থাকে। বেশ বেলা অব্দি ঘুমোয়। বেনজামিন ওর জন্যে বেলাতেই খাবার আনে। অন্যদের যে খাবার দেওয়া হয়, সে খাবারও দেয় না। কোনদিন কলা আধখানা, ডিম নয়তো বিস্কুট-পাঁউরুটির টুকরো। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বেনজামিন এসব খাবার এনে দেয়।

কিছুক্ষণ পরে বেনজামিন লুকিয়ে খাবার নিয়ে এল। ধাক্কা দিতে ফ্রেদারিকোর ঘুম ভাঙল। খাবার এগিয়ে দিল। চারজন ভাইকিংকে লা ক্রুশ ডেকে নিয়ে গেছে, এ খবর ও জানতো না। কথায় কথায় হ্যারি সেকথা ওকে বলল। ফ্রেদারিকো ভীষণভাবে চমকে উঠল। ফ্যাস্‌ফেসে গলায় যতটা জোর দেওয়া সম্ভব, ততোটা জোর দিয়ে বলল — 'করেছো কি? ওদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে?'

— 'তার মানে?' হ্যারি তো অবাক। ফ্রান্সিসও এদের কথাবার্তা শুনে এগিয়ে এল। ফ্রেদারিকো বলল — 'জানো, ওদের কেন নিয়ে গেল লা ক্রুশ?'

— 'তা কি ক'রে বলবো।' হ্যারি বলল।

— 'এই ক্যারাভেল জাহাজ ডাইনীর দ্বীপে এসে লেগেছে। লা ক্রুশ ওর লুট করা ধন সম্পত্তি ডাইনীর দ্বীপে কোথায় কোন গহ্বরে কোন গুহায় লুকিয়ে রাখবে। অত লুটের মাল ব'য়ে নিয়ে যেতে লোক দরকার, তাই ওদের নিয়ে গেছে।'

— তবে আর ভয়ের কি আছে?' ফ্রান্সিস বলল;

— 'হুঁ' — ফ্রেদারিকো খানিকক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল — 'লা ক্রুশ ওদের দিয়ে লুটের মাল রেখে আসবে। ওরাও জায়গাটা দেখবে। এর পরেও কি লা ক্রুশ ওদের বাঁচিয়ে রাখবে?'

সত্যিই তো! এ কথাটা তো ওরা ভাবে নি। লা ক্রুশ তো ওদের ওখানেই মেরে ফেলবে। গুপ্তধন ভান্ডারের খোঁজ জানে, এমন কাউকেই বেঁচে থাকতে দেবে, এ অসম্ভব। ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। ওদের ফিরিয়ে আনাতে হবে। কিন্তু কি ক'রে ফিরিয়ে আনব? ওরা চলে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। এতক্ষণে বোধহয় ডাইনীর দ্বীপে পৌঁছেও গেছে।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে ডাকল — 'বেনজামিন — বেনজামিন।'

বেনজামিন দরজার কাছে গারদ ধ'রে দাঁড়াল।

— লা ক্রুশ কোথায়?

— বলা বারণ।

— আমাদের চারজন লোক?

— বলা বারণ।

— লা ক্রুশকে বলো আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

— এখন দেখা হবে না।

— 'এক্ষুনি ক্যাপ্টেনকে ডাকো।' ফ্রান্সিস ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে অন্য ভাইকিংরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওদের চারজন বন্ধুর বিপদের

আশঙ্কা ওদেরও ভীষণভাবে বিচলিত করল! লোহার শেকলে হাতকড়ায় ঝনঝন শব্দ উঠল।

বেনজামিন ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে দেখে তারপর চ'লে গেল। ফ্রান্সিস চিৎকার ক'রে ডাকল — 'বেনজামিন।'

কিন্তু বেনজামিন ফিরল না। অন্য দু'জন পাহারাদার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। কোমর থেকে তরোয়াল খুলে দরজায় পাহারা দিতে লাগল।

রাগে-দুঃখে নিজেদের অসহায় অবস্থায় কথা ভেবে ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। ও যদি বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারতো, যে ওর বন্ধুদের সাংঘাতিক বিপদ হ'তে পারে, তা'হলে নিশ্চয়ই রুখে দাঁড়াত। কিন্তু এখন আর কিছু বলার নেই। সর্বনাশ যা হবার হ'য়ে গেছে। ওই বন্ধু চারজন আর কোনদিন ফিরবে না। ওর ক্রুদ্ধ চোখ-মুখ থেকে আগুন ঝরতে লাগল। পাগলের মত হাতের কড়াটা কাঠের মেঝেয় ঠুকতে লাগল। কব্জীর চামড়া ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। হ্যারি ওকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল। বারবার বলতে লাগল — 'ফ্রান্সিস শান্ত হও। মাথা ঠিক রাখো।'

ফ্রান্সিস তবুও মাথা ঝাঁকিয়ে মেঝেতে হাতের কড়াটা জোরে-জোরে ঠুকে চললো। তারপর একসময় ক্লান্ত হ'য়ে রক্তাক্ত হাত দুটো ওপরের দিকে তুলে ফোঁপাতে লাগল।

*　　　　*　　　　*

ওদিকে সেই চারজন ভাইকিং কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে যখন ডেক-এ উঠলো — সকালের ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল রোদে ভালো করে তাকাতেই পারল না। চোখে হাত চাপা দিয়ে চলল। ক্যারাভেল-এর মাথার কাছে এসে দেখল একটা মোটা কাছি ঝুলছে। নীচে জলের ওপর একটা ছোট নোকা। নৌকার মাঝখানে একটা পেতলের কারুকাজ করা লোহার বড় সিন্দুকের মত বাক্স। একটু দূরেই ডাইনির দ্বীপ, দূরবিস্তৃত বালিয়াড়ি। নারকোল গাছের সারি। তারপরে সবুজ গাছ-গাছালি ঢাকা পাহাড়। কতদিন পরে মাটি-গাছপালা-আকাশ দেখছে। ওদের আনন্দ ধরে না। বেনজামিনের নির্দেশে ওরা কাছি-বেয়ে নেমে এল। একটু পরেই ডেক-এর ওপর খট্ খট্ শব্দ তুলে লা ক্রুশ এল। জলদস্যুরা সবাই সন্ত্রস্ত। জাহাজের মাথার কাছে একটা দড়ির জালমতো ঝুলছিল। লা ক্রুশকে সকলে ধরাধরি করে সেই জালের মধ্যে বসিয়ে দিল। আস্তে-আস্তে জালটা দড়ি দিয়ে নামাতে লাগল, লা ক্রুশ নৌকোর ওপর আসতেই জাল দোলানো বন্ধ হলো। লা ক্রুশ কাঠের পা বের করে জাল থেকে ঠক্ ক'রে নৌকোর ওপর নামল। ভাইকিং চারজন দেখল লা ক্রুশের কোমরে তরোয়ালের সঙ্গে নক্সা আঁকা মিনে করা একটা লম্বা নল ওলা পিস্তল গোঁজা। লা ক্রুশ নৌকায় বসেই দ্বীপের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে হুকুম দিল — চল।

চারজনে দাঁড় বাইতে লাগল। এতক্ষণে ওদের চোখে আলো সহ্য হ'য়ে গেছে। ওরা বেশ জোরে-জোরেই দাঁড় বাইতে লাগল। এখানে সমুদ্র শান্ত। ঢেউয়ের খুব ধাক্কা নেই। ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বীপে পৌঁছল। দ্বীপের বালিয়াড়িতে প্রথম

নামল লা ক্রুশ। পেছন ফিরে বলল — 'ঐ সিন্দুকটা নিয়ে আমার পেছনে-পেছনে তোরা আয়।'

— 'কোথায়'? একজন ভাইকিং জিজ্ঞাসা করল।

— 'চল না সব দেখবি' — লা ক্রুশ খুক-খুক ক'রে হেসে বললো।

ওরা ধরিধরি করে সিন্দুকটা নামাল। তারপর ধরে-ধরে বয়ে নিয়ে চলল লা-ক্রুশের পেছনে।

একটু পরেই শুরু হলো পাহাড় এলাকা, রাস্তা বলে কিছুই নেই, এবড়ো-খেবড়ো পাথর-নুড়ি, বুনো ঝোপ-জঙ্গল ঠেলে এগোতে হচ্ছে। লা ক্রুশ আগে-আগে চলেছে। তরোয়াল চালিয়ে ঝোপ-জঙ্গল কেটে এগোচ্ছে। পেছনে ওরা চারজন! অসম্ভব ভারী বাক্স। তারপর ওরকম উঁচু-নীচু রাস্তা। ওরা ঘেমে উঠল। লা ক্রুশ এক একবার থামছে, আর পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছে। এতক্ষণে ওরা লক্ষ্য করলো যে মাথার ওপর গাছের ডালাপালা থেকে কী যেন ওদের গায়ে পড়ছে। মাটিতে খালি পা কিসে লেগে খুড়-খুড় করছে। একজন ভালো করে দেখল — জোঁক পা কামড়ে ধরছে। গাছের ডাল থেকে গায়ে পড়ছে জোঁক লা ক্রুশের পরনে লম্বা কোট, এক পায়ে বুটজুতো আর এক পা তো কাঠের। ওর কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ভাইকিংরা ভীত হয়ে পড়ল। এত জোঁক?

ওরা তাড়াতাড়ি বাক্স নামিয়ে জোঁক ছাড়াতে লাগল। লা ক্রুশ ঘুরে দাঁড়িয়ে তরোয়াল ওঁচাল — 'জলদি চল্'।

ওরা আর কি করে! তবু একজন ভাইকিং বলে উঠল, 'জোঁকে খেয়ে ফেলছে — হাঁটবো কি করে! লা ক্রুশ খুক্ খুক্ করে হাসল — 'অনেকদিন মানুষের রক্ত খায় নি তো। চল্। গুহায় পৌঁছে নুন দিয়ে দেবো। চল্ জলদি।'

আবার চলা শুরু হলো তখন ওদের গায়ে হাতে-পায়ে জোঁক আছে। একটা খাড়াইয়ের ওপর এসে পৌঁছল ওরা। ওপর থেকে ঝর্ণার জল পড়ছে। জায়গাটা ভেজা-ভেজা। অনেক ফার্ণ গাছ। পাথরে সবজে শ্যাওলার আস্তরণ।

লা ক্রুশ হাত তুলে থামতে ইঙ্গিত করল। ওরা বাক্সটা নামিয়ে হাঁপাতে লাগল। গায়ে লেগে থাকা জোঁক টেনে তুলতে লাগল। একজন লা ক্রুশকে বলল — 'কই নুন দিন'?

লা ক্রুশ কোমরে বেল্টের মধ্যে থেকে একটা পুটুলি বের করল। পুটুলি থেকে ওদের হাতে নুন ঢেলে দিল। নুন লাগাতেই জোঁকগুলো টুপটুপ করে খসে পড়ল। লা ক্রুশ ও নিজের গায়ের দু'এক জায়গায় নুন লাগাল! জোঁকগুলো খসে পড়ল। লা ক্রুশ এবার শ্যাওলার আস্তরণে ঢাকা একটা মস্তবড় পাথরের চাঁই ধ'রে টানল। পাথরটা বেশ কিছুটা সরে গেল। ফাটল দেখা গেল। লা ক্রুশ ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ে সরে এসে বলল — 'এই চাঁইটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দে।'

ওরা চারজন মিলে পাথরটা টান দিয়ে সরাতে ফাঁকটা আরো বড় হল।

'আরে খুলতে হবে' — লা ক্রুশ বলল।

আবার ওরা ধাক্কাধাক্কি শুরু করল। একজন মানুষ ঢোকাবার মত ফাঁক হল। আবার কয়েকটা ধাক্কায় বাক্স গলে যাবার মতো ফাঁক হলে লা ক্রুশ বলল —

'এবার শুধু দু'জনকে বাক্সটা ভেতরে নিয়ে গিয়ে রাখতে হবে।' ভাইকিংদের মধ্যে দু'জন এগিয়ে এল। বেশ কষ্ট করে দু'জন ফাটলদার মধ্যে দিয়ে বাক্সটা নিয়ে ভেতরে ঢুকল। দেখল, ভেতরটা একটা গুহা, অন্ধকার। শুধু পাথরের চাঁইয়ের ফাটলটার মধ্যে দিয়ে কয়েকটা একইরকম লোহার বাক্স। পেতল দিয়ে নক্সা করা। ওরা বুঝল, এটাই হচ্ছে লা ক্রুশের গুপ্ত ধনভান্ডার হঠাৎ ওরা পায়ে হোঁচট খেল। ভালো করে তাকিয়ে দেখল কয়েকটা নরকঙ্কাল। হয়তো আরো নরকঙ্কাল আছে, কিন্তু এই আলোতে দেখা যাচ্ছে না। এইবার ওরা ভীত হলো, পরস্পরের হাত ধরল। লা ক্রুশের এই গুপ্ত ধনভান্ডারের খোঁজ জানার পর লা ক্রুশ কি ওদের বেঁচে থাকতে দেবে? একজন চেঁচিয়ে উঠল - শীগগির পালাও। দু'জনে পাথরের ফাটলের দিকে ছুটল। ঠিক তখনই সেই ফাটলের মুখে এসে দাঁড়াল লা ক্রুশ। হাতে উদ্যত রিভলবার, ওরা কিছু বোঝবার আগেই লা ক্রুশ গুলি চালাল। নিখুঁত নিশানা। দু'টো গুলিই ওদের হৃৎপিন্ড ভেদ করল। একজন তবু মাটিতে পড়ে আঁ-আঁ করে দু'একবার কাতরাল। অন্যজন মাটিতে পড়ে আর নড়ল না।

বাইরে যে দু'জন 'ভাইকিং' দাঁড়িয়েছিল, তাদের একজনের নাম 'বিস্কো'। লা ক্রুশ পিস্তল হাতে ওদের দু'জনের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই বিস্কো চেঁচিয়ে উঠল 'পালাও।' বিস্কো চিৎকার করে উঠেই খাড়াই থেকে একটা গাছ লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। গাছটার মগডাল ধরে ঝুলে পড়ল। ডালটা ভেঙে গেল কিন্তু খুলে এলো না। ও প্রথম ধাক্কাটা সামলালো। তারপর ডাল বেয়ে নেমে আসতে লাগল। এত দ্রুত বিস্কো ঝাঁপ দিয়েছিল, যে লা ক্রুশ পিস্তল নিশানা করবার অবকাশ পেল না, অন্যজনও সঙ্গে-সঙ্গে নীচের দিকে ছুটল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। লা ক্রুশের নিখুঁত নিশানার গুলি ওর পিঠ ভেদ করে ঢুকে পড়ল। ও খাড়াই পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা পাক খেয়ে নীচে গাছ-গাছুলির আর ঝোপের মধ্যে গড়িয়ে পড়ল। যে গাছটায় বিস্কো লাফিয়ে পড়েছিল — সেই গাছটা লক্ষ্য করে লা ক্রুশ পিস্তল থেকে দু'টো গুলি ছুঁড়লো। কিন্তু কোনটাই বিস্কোর গায়ে লাগল না। কারণ, বিস্কো ততক্ষণে অন্য একটা ঝোপে আত্মগোপন করেছে।

লা ক্রুশ পিস্তলটা কোমরে গুঁজতে গুঁজতে আপনমনেই খুক-খুক করে হেসে উঠল। তারপর ঠক্-ঠক্ করে এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে ফাটলের পাথরটায় ধাক্কা দিল। প্রাণপণে বার-কয়েক ধাক্কা দিতেই পাথরটা আগের মত লেগে গেল। সবুজ-শ্যাওলায় ঢাকা পাথরের গায়ে ফাটলটা কোথায়, সেটা আর বোঝবার উপায় রইল না।

একবার লা ক্রুশ কাঠের পায়ে ঠক্-ঠক্ শব্দ তুলে আসতে লাগল। ঝোপ-জঙ্গল ঠেলে আসতে লাগল। গাছের পাতা থেকে বেশ কয়েকটা জোঁক পড়ল। গায়ে-পায়ে লেগেও রইল কয়েকটা। সমুদ্রের তীরে এসে নুন ছিটিয়ে জোঁকগুলো ফেলে দিল। তারপর কাঠের পায়ে ভর দিয়ে নৌকোয় উঠে বসল। নৌকা ছেড়ে দিয়ে দাঁড় বাইতে লাগল।

* * *

এদিকে ফ্রান্সিসরা প্রথম দুটো গুলির শব্দ অস্পষ্ট শুনেছিল। কিন্তু পরের

গুলির শব্দগুলো স্পষ্টই শুনলো। ওদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। দু'একজন ফ্রান্সিসকে ডেকে বলল, 'ফ্রান্সিস — নিশ্চয়ই বিস্কোরা কোন বিপদে পড়েছে। তুমি কিছু একটা করো।'

ফ্রান্সিস মুখ নীচু করে গভীর বিষাদে মাথা নাড়ল — 'কিছুই করার নেই। এই অন্ধকূপ থেকে বেরোতে না পরালে আমরা অসহায়। এখন সবরকম অন্যায়-অবিচার মুখ বুঁজে সহ্য করে যেতে হবে। কোন উপায় নেই।'

কথা বলতে-বলতে ফ্রান্সিসের মুখ ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল। দুচোখ জ্বালা করে জলে ভরে উঠল। ভাইকিং বন্ধুরা কিন্তু অধৈর্য হয়ে উঠল। পরস্পর এই নিয়ে বলতে-বলতে সবাই উঠে দাঁড়াতেই হাতের কড়ায় শেকলে শব্দ উঠল। ওরা একসঙ্গে প্রচন্ড জোরে চিৎকার করে উঠল — 'হো—হো—ও—ও।'

বেনজামিন ছুটে এসে দরজার গরাদের ওপাশে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে দু'-একজন চীৎকার করে বলল — 'আমাদের বন্ধুরা কোথায়?'

— 'আমি কিছু জানি না।' বেনজামিন নির্বিকার মনে জবাব দিল।

— 'তুমি ওদের নিয়ে গেলে কেন?' একজন জিজ্ঞেস করল।

— ক্যাপ্টেনের হুকুমে।

— ক্যাপ্টেন ওদের কোথায় নিয়ে গেছে?

— 'বলা বারণ'। বেনজামিনের মুখ পাথরের মত শক্ত-ভাবলেশহীন।

— 'তোকে খুন করবো — একজন চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে সকলে চিৎকার করে উঠল — 'হো—ও—ও'। সবাই শেকল ধরে টানতে লাগল। কিন্তু অত্যন্ত শক্ত ভাবে কাঠের কাঠামোতে গাঁথা শেকলের ঝন্-ঝন্ শব্দই শুধু হলো। ঐ শেকল ছেঁড়া অসম্ভব। ওরা আবার একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল — 'হো—ও—ও'। ঠিক তখনই ঐ গন্ডগোলের মধ্যে ফ্রান্সিস অস্পস্ট ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনল। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। কড়ায় বাধা দু'হাত তুলে বলল — 'ভাইসব— শান্ত হও, খুব সম্ভব লা ক্রুশ আসছে।'

একটু পরেই পাহারাদার দু'জন সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়াল। বেনজামিন এগিয়ে এসে দরজা খুলতে লাগল। দরজা খোলা হল। লা ক্রুশ ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে এগিয়ে এসে ভাইকিংদের জটলার দিকে তাকিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল — 'এত চেঁচামেচি কিসের?'

ফ্রান্সিস এতক্ষণ মাথা নীচু করে চুপচাপ বসেছিল। এইবার উঠে দাঁড়াল। তখন গোলমাল থেমে গেল। ফ্রান্সিস বলল — 'আমাদের বন্ধুরা কোথায়?'

লা ক্রুশ ওর দিকে ঘুরে তাকিয়ে খুব সহজ ভঙ্গীতে বলল — 'দু'জন আমার গুপ্ত ভান্ডারে পাহারা দিচ্ছে। একজন পালাতে গিয়ে মারা গেছে।'

— অতগুলো গুলীর শব্দ পেলাম কেন?

লা ক্রুশের ক্রুদ্ধ চোখ-মুখ নরম হ'য়ে এল। খুক্-খুক্ করে হেসে উঠল। বলল — 'ও এই ব্যাপার? আরো দু'টো তোতা পাখি মেরেছি — রাত্তিরে রোস্ট খাবো। তোফা মাংস'।

— আপনার গুপ্তভান্ডার কোথায়?

'—বলবো না' — লা ক্রুশ ক্রুদ্ধভঙ্গীতে চীৎকার করে উঠল।

— 'আমাকে বলতেই হবে'। ফ্রান্সিস দাঁত চাপাস্বরে বলে উঠল — 'বলতে হবে আপনাকে ওদের দু'জনকে কোথায় রেখে এসেছেন'?

একটু থেমে লা ক্রুশ বলল — 'ডাইনির দ্বীপে যাও, খুঁজে বের কর গে।'

' — আপনার গুপ্তভাণ্ডারের ওপর আমাদের বিন্দুমাত্র লোভ নেই, কিন্তু ঐ দু'জনকে এক্ষুনি ফিরিয়ে আনতে হবে —' ফ্রান্সিস বলল।

ক্রুদ্ধস্বরে লা ক্রুশ বলে উঠল — 'অনেক সহ্য করেছি, আর একটা কথা বলবে তো —' বলে লা ক্রুশ কোমরের বেল্টে গোঁজা পিস্তলটা বার করে ফ্রান্সিসের বুকের দিকে নিশানা করে স্থির দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস তিক্ত হাসি হাসল। বলল, 'লা ক্রুশ তুমি একটা জঘন্য নরঘাতক খুনে। কিন্তু তোমার কুবুদ্ধি কিছু কম না। তুমি কিছুতেই এখন আমাদের মারবে না। বাঁচিয়ে রাখবে। য়ুরোপের ক্রীতদাসের বাজারে আমাদের জন্যে ভালো দাম পাবে এই আশায়'। লা ক্রুশ এক মুহূর্ত কি ভাবল। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রাখতে-রাখতে সহজভঙ্গীতে বলল — 'নাম কি তোমার'?

— 'ফ্রান্সিস আমার নাম' — একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল 'লা ক্রুশ — সোনার ঘন্টার গল্প শুনেছো?'

— হ্যাঁ-হ্যাঁ — ওটা একটা ছেলে ভুলানো আজগুবি গপ্‌পো।

— না ওটা গল্প নয়। সেই সোনার ঘন্টা এখন আমাদের দেশে।

— 'বলো কি'। লা ক্রুশ বেশ অবাক হয়ে বলল।

— 'হ্যাঁ। বহু দুঃখকষ্ট স্বীকার করে আমি আর আমার বীর বন্ধুরা সেই সোনার ঘন্টা এনেছি। অতবড় হীরে এনেছি, যার জন্যেও কম কষ্ট করিনি'। ফ্রান্সিস একটু থেমে বলল, 'তাই বলছিলাম গুলির ভয় দেখিও না — ফ্রান্সিস মৃত্যুকে ভয় পায় না। কিন্তু এই বলে রাখছি যদি আমাদের বন্ধুদের কাউকে তুমি হত্যা করে থাকো তো তোমার মুক্তি নেই, আমি প্রতিশোধ নেবই'।

লা ক্রুশ খুক্-খুক্ করে হেসে উঠে বলল — 'হাতে হাতকড়া, তাও শেকলে বাধা। প্রতিশোধের কথা ভাবতে-ভাবতেই জীবন শেষ হয়ে যাবে।'

— 'বেশ থাক না আমার জীবন। আমার বীর বন্ধুরা রয়েছে, তারা প্রতিশোধ নেবে — আমার ভাই রয়েছে, সে তোমাকে খুঁজে বের করে প্রতিশোধ নেবে। আমরা ভাইকিং'।

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে না হতেই সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল ও—ও—হো-হো—ও। চীৎকার থামতে ফ্রান্সিস বলতে লাগল, 'লা-ক্রুশ আমার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে দেখ, তোমার চাইতে অনেক সুখে, অনেক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আমি জীবন কাটাতে পারতাম। কিন্তু আমি সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চিন্ত জীবন ঘৃণা করি। আমি ভালোবাসি ঝড়-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবিপদ, দুঃখ-কষ্টের জীবন। মানুষের জীবনের এখানেই সার্থকতা। এই শেষকথা জেনে যাও লা ক্রুশ, মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। তোমার মত একটা জলদস্যুকে তো নয়ই'। আবার একটু থেমে বলল, 'তোমরা তো কাপুরুষ। নিরস্ত্র অবস্থায় আমাদের বন্দী করেছ। আমাদের হাত খুলে দাও, আর একটা করে তরোয়াল দাও — ধূলোর মত উড়ে যাবে তোমরা।'

সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল ও—হো—হো—ও।

লা ক্রুশ আর কোন কথা না ব'লে কাঠের পা ঠক্-ঠক্ করতে করতে চ'লে গেল। তারপর বেনজামিন দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে ব'সে পড়ল। তখন ও রাগে ফুঁসছে। রক্তাক্ত কব্জির দিকে তাকিয়ে ও চুপ করে ব'সে রইল। ওর পাশে হ্যারিও চুপ ক'রে বসে রইল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হ্যারি ডাকল — 'ফ্রান্সিস—'

— বলো।

— লা ক্রুশের কথা থেকে কিছুই বোঝা গেল না। দু'জনকে পাহারায় রেখে এসেছে মানেটা কি? পালালোই বা কে?

— কিছুই বুঝতে পারছি না।

ফ্রেদারিকো আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছে। দু'জনে ওর দিকে তাকাল। ফ্রেদারিকোর ফ্যাস্‌ফেসে গলায় বলল — 'ফ্রান্সিস, বুঝলে কিছু।'

ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। ফ্রেদারিকো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল — 'বোধহয় ওদের চারজনের কেউ বেঁচে নেই।'

— বলো কি?

— জলদস্যুদের রীতিনীতি আমি ভালো ক'রেই জানি। ওরা ওদের গুপ্তধন ভান্ডারের মধ্যে লুটের মাল রাখতে যাদের নিয়ে যায়, তাদেরই হত্যা করে রেখে আসে। এতে কারো পক্ষে গুপ্তধন ভান্ডারের খোঁজ পাওয়ার উপায় থাকে না। তার উপর ওদের একটা কুসংস্কারও আছে। যাকে বা যাদের মেরে রাখা হয়, তারা নাকি জিন হয়ে সেই গুপ্তধন পাহারা দেয়।

ফ্রান্সিস অস্পষ্টস্বরে বলল — 'তাহলে ওরা কেউ বেঁচে নেই।'

'একজন পালিয়েছে বলল — হয়তো সেই বেঁচে আছে।'

ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলল! কিন্তু কদিন বাঁচবে। ডাইনীর দ্বীপ নাম। বুঝতেই তো পারছো কী ভয়াবহ জায়গা। তারপর বললো — 'আচ্ছা ফ্রেদারিকো, তুমি কখনো ডাইনীর দ্বীপে গেছো?'

— একবার-তাও দিনে বেলা। ইয়া বড়-বড় কত যে জোঁক ঐ দ্বীপে। আধ-ঘন্টার মধ্যে আমরা পালিয়ে এসেছিলাম। তোমাদের যে বন্ধু পালিয়েছে, সে যদি জোঁকে'র হাত থেকে বাঁচবার উপায় বার করতে পারে, তাহলে হয়তো বেঁচে যেতে পারে। কারণ এখানে প্রচুর পাখী আছে আর মিঠে জলের ঝরনা আর হ্রদ আছে।

— 'তুমি তাহলে এইদিকে কয়েকবার এসেছো'? হ্যারি বলল।

— 'হ্যাঁ বেশ কয়েকবার। এরই দক্ষিণে কয়েকশো মাইল দূরে চাঁদের দ্বীপ।'

ফ্রান্সিস আধশোয়া হয়ে এতক্ষণ হারানো বন্ধুদের কথা, কি উপায়ে এখান থেকে পালানো যায়, এসব নানা কথা ভাবছিল। হঠাৎ চাঁদের দ্বীপ কথাটা কানে যেতে ও সজাগ হয়ে উঠে বসে বলল — 'ফ্রেদারিকো তুমি কিন্তু চাঁদের দ্বীপ মুক্তোর সমুদ্র এসবের কথা আর কিছুই বললে না।'

ফ্রেদারিকো কিছুক্ষণ ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর ফ্যাসফেসে

গলায় বলল, 'ফ্রান্সিস, তোমাকে আমি বেশ কয়েকদিন লক্ষ্য করলাম।' একটু চুপ ক'রে থেকে বলল — 'দেখলাম, তুমিই উপযুক্ত। তোমাকেই সব বলছি। কিন্তু যদি মুক্তোর সমুদ্রে গিয়ে প্রাণহানি হয়, তখন কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবে না।'

— সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। সমস্ত ঘটনাটা আমাকে বলো। তারপর আমি ভেবে দেখবো, আমরা যাবে কি যাবো না।

— 'শোন তাহলে।' ফ্রেদারিকো কোমর থেকে তামাকপাতা বের ক'রে মুখে ফেলে চিবুতে-চিবুতে বলতে লাগল — 'তোমাকে আগে কিছু ঘটনা ব'লেছি। আবার বলি শোন। একটা মালবাহী জাহাজে কাজ করতাম তখন। জাহাজটা ফিরছিল আফ্রিকার এক বন্দর থেকে। প্রচন্ড ঝড়ের পাল্লায় পড়ে জাহাজটা অনেক দক্ষিণদিকে চলে গিয়েছিল। ফিরে আসছি, তখনই, আমাদের ফেরার পথে পড়ল চাঁদের দ্বীপ। আমার জাহাজ জীবনে অনেকের মুখেই চাঁদের দ্বীপের কথা শুনেছি। এবার চোখে দেখলাম। দূর থেকে দেখা গেল কাঁচের পাহাড়।'

— 'কাঁচের পাহাড় মানে?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

— 'দ্বীপের উত্তরদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে এই কাঁচের পাহাড়। যেন কাদায় তাল শুকিয়ে নিরেট পাথর হ'য়ে গেছে! এমন এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো মাটি-পাহাড় গড়া প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়াল। এই সেই এবড়ো-খেব্‌ড়ো পাথরগুলো এমন ছুঁচালো আর ধারালো যেন ভাঙা কাঁচের মত। সেখানে পা রাখার উপায় নেই। পা ফালা-ফালা হয়ে যাবে। পা পিছ্‌লে পড়লে তো সমস্ত শরীর টুকরো-টুকরো হ'য়ে কেটে যাবে। কথাটা শুনে বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু জাহাজটা যখন কাঁচ পাহাড়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন দেখলাম সত্যিই তাই। এবড়ো-খেবড়ো উঁচু-উঁচু পাথরের ছুঁচালো ডগা। সেই পাহাড়ে ওঠা তো দূরের কথা, পা রাখার উপায় নেই।' একটু থেমে তামাকপাতা চিবোতে-চিবোতে ফ্রেদারিকো আবার বলতে লাগল — 'ঐ পাহাড়ের পাশ দিয়ে-দিয়ে আমরা সোফালা বন্দরে এলাম। চাঁদের দ্বীপের ওটাই একমাত্র বন্দর, ঐ যে কাঁচপাহাড় বললাম, তার ও পাশেই মুক্তোর সমুদ্র।'

— 'ও' পাশেই'? ফ্রান্সিস আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

— হ্যাঁ, কিন্তু কাঁচের পাহাড় পেরিয়ে যাওয়া শুধু অসম্ভব নয়, অকল্পনীয়।

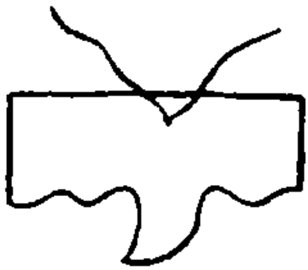
— তারপর?

— জাহাজটা সোফালা বন্দরে নোঙর ক'রে রইল। আমরা দ্বীপটা ঘুরে-ঘুরে দেখলাম। কিন্তু সব জায়গায় আমাদের যাওয়ার হুকুম ছিল না। লম্বা-লম্বা বর্শা হাতে সব পাহারাদাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ ক'রে উত্তর-পূর্বমুখো যেদিকে মুক্তোর সমুদ্র, সেদিকে যাওয়ার উপায় ছিল না।

ফ্রেদারিকো একটু থামল। তারপর গলায় ঝুলানো ভাঙা আয়নার অংশটা গলা থেকে খুলল। আয়নাটা উল্টেপিটে যেখানে পারা লাগানো থাকে, সেইদিকে কি যেন খুঁটতে লাগলো, কালচে চামড়ার মত কি যেন একটা খুঁটে-খুঁটে তুলছে। যখন খুঁটতে-খুঁটতে সবটা তুলে ফেলল, তখন দেখা গেল এক টুকরো সাদাটে

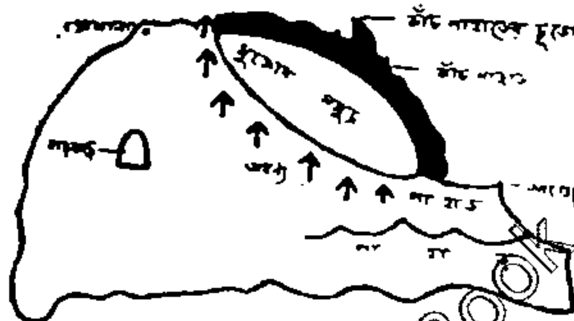
চামড়া। ওটা ফ্রান্সিসের হাতে দিয়ে ফ্রেদারিকো বলল — 'এই দেখ চাঁদের দ্বীপের আর মুক্তোর সমুদ্রের নক্সা।'

নক্সাটা দেখতে ছিল এই রকম —



ফ্রান্সিস হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। দ্বীপটা দেখতে ঠিকই আধখানা চাঁদের মত। নক্সাটা সোজা করলে একরকম কালো-কালি দিয়ে আঁকা নক্সা। দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কিছু লেখাও নেই।

ফ্রেদারিকো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে-দেখিয়ে সব বোঝাল। ফ্রান্সিস মনে মনে সেগুলোর নাম ভেবে নিয়ে তারপর ম্যাপটাকে উল্টে করে ধরতেই একটা স্পষ্ট নক্সা ফ্রান্সিসের চিন্তায় ধরা দিল। সেটা দাঁড়াল ঠিক এই রকম—



ফ্রেদারিকো বলতে লাগল — 'একদিন রাজবাড়ি দেখতে গেলাম। নামেই রাজবাড়ি। দেখতে ট্রাভেলার্সট্রীর পাতা দিয়ে ছাওয়া বাড়ি। ঐ গাছের মূল শিরা থেকে দরজা তৈরি করা হ'য়েছে। এই ট্রাভেলার্সট্রী যে এদের কত কাজে লাগে, তা বলবার নয়। এই গাছের পাতার গোড়ায় জল জমা থাকে। নাড়ালেই প্রচুর মিষ্টি জল পড়ে। পাতার গোড়া ফুটো করলেও জমা জল পড়ে'। ফ্রেদারিকো একটু ভেবে বলতে লাগলো — 'রাজবাড়ির প্রবেশপথের মাথায় মরা মানুষের মাথার খুলি সারি-সারি সাজানো। ভেতরে ঢুকে রাজসভা দেখলাম, বৃদ্ধ রাজা কাঠের তৈরি সিংহাসনে ব'সে আছে। আশ্চর্য! রাজার মাথা ন্যাড়া। একটিও চুল নেই। পরে শুনলাম, কাঁচ পাহাড়ের পাথর দিয়ে ঘষে-ঘষে চুল তুলে ফেলা হয়। রাজার গলায় হাঁসের ডিমের মত আকারের মুক্তোর মালা। রাজার সিংহাসনেও মুক্তো

বসানো। পরনে সর্বাঙ্গে ঢাকা সাটিনের কাপড়। রাজপুরোহিত, সেনাপতি মন্ত্রী সকলের গলাতেই মুক্তোর মালা। রাজসভার জাঁকজমক নেই। কিন্তু রাজাকে সবাই মান্য ক'রে চলে। চারদিকে বর্শা হাতে ভাজিম্বা সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে।

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগল — 'রাজসভার কাজ চলছে। তখনই রাজপুরোহিত উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু ক'রে রাজাকে কি বলল। রাজা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে রাজপুরোহিতের দিকে তাকিয়ে কী ব'লে উঠল। তখনই লক্ষ্য করলাম রাজপুরোহিতের গলায় একটা ভাঙা আয়না লকেটের মত ঝুলছে। পরে ঐ ভাঙা আয়না আমি পেয়েছি। আসলে ওটা ছিল জোড়া দেওয়া দু'টো আয়না। তারই একটা আমার গলায় ঝুলছে।'

— অন্য ভাঙা আয়নাটা?

— 'সেই কথাটাই এবার বলবো।' ফ্রেদারিকো কিছুক্ষণ তামাক-পাতা চিবুলো। তারপর বলতে লাগল — 'পরের দিন আমাদের জাহাজ সোফালা বন্দর ছেড়ে ইউরোপের দিকে পাড়ি দেবে। আগের দিন রাত্রিবেলা। অসহ্য গরম। সমুদ্রেও বাতাস পড়ে গেছে, আমাদের কয়েকজন ডেক-এ ব'সে গল্পগুজব করছি, হঠাৎ দেখি ডেকের ওপর দিয়ে একটা লোক টলতে-টলতে আসছে। একটু লক্ষ্য ক'রে বুঝলাম লোকটা ভাজিম্বা, তবে সাধারণ ভাজিম্বারা যা পরে, ওর পরনে তা নয়। ওর পরনে সাটিনের কাপড়। কোমরে সিল্কের কাপড়ের ফেট্টি! একটু চাঁদের মেটে আলোতে এসব লক্ষ্য করলাম। আমি ছুটে গিয়ে ওকে ধরলাম। দেখি কাঁধের দিকে কাপড় রক্তে ভিজে উঠেছে। কাপড়টা সরাতেই লক্ষ্য করলাম কাঁধে বর্শার আঘাতের গভীর ক্ষত। দর্‌দর্‌ করে রক্ত পড়ছে। আমি দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধ'রে আমার কেবিনও ঘরে নিয়ে এলাম। ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। কাবু হ'য়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমি ছেঁড়া কম্বলের টুকরো দিয়ে ক্ষত জায়গাটা চাপা দিলাম। রক্তপড়া যখন কমলো, তখন আমার ছেঁড়া জামার টুকরো দিয়ে একটা পট্টি বেঁধে দিলাম। এতক্ষণ ভাজিম্বাটি গোঙচ্ছিল, কথা বলতে পারছিল না। এবার ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় জল খেতে চাইলে। আমি ওকে জল খেতে দিয়ে বিশ্রাম করতে ব'লে ছুটলাম জাহাজের বৈদ্যির কাছে। বৈদ্যিকে নিয়ে যখন এলাম, দেখলাম রক্তপড়া অনেক কমেছে। বৈদ্যি তার চোঙের পাত্র থেকে মাখনের মত একরকম ওষুধ বের করলে। পট্টি খুলে ছেঁড়া কম্বলের টুকরো খুলে ফেলে আস্তে-আস্তে মাখনের মত ঐ ওষুধটা দিয়ে পট্টি বেঁধে দিল। একটু পরেই রক্তপড়া বন্ধ হল। ওর ব্যথারও বোধহয় উপশম হ'ল। ও ঘুমিয়ে পড়ল। দেখলাম, আহত লোকটি ঘুমিয়ে আছে। আমি আর কি করি? কাঠের মেঝেতে একটা কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম।'

ঘুম ভাঙলো একটু বেলাতে। উঠেই আহত লোকটির দিকে তাকালাম। দেখি সেও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম — 'কেমন আছো?' এবার লক্ষ্য করলাম লোকটির বয়স খুবই কম। ছেলে-মানুষই বলা যায়। ও মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল। বুঝলাম এখন একটু ভালো বোধ করছে. ওকে রেখে রসুই ঘ'রে গেলাম। সকালের খাবার খেতে। খেয়েদেয়ে ওর জন্যেও কিছু

খাবার লুকিয়ে নিয়ে এলাম। ও খাচ্ছে যখন, তখনই জাহাজের ডেক থেকে জোর-জোর কথা ভেসে এল। অস্পষ্ট হ'লেও ক্যাপ্টেনের গলা শুনলাম। বলছে — 'এই জাহাজে কেউ আসেনি।' বুঝলাম, ছেলেটির খোঁজে নিশ্চয়ই ভাজিম্বারা এসেছে। ধরা পড়লে ছেলেটির মৃত্যু সুনিশ্চিত। যে কারণেই হোক ছেলেটিকে ওরা মেরে ফেলতে চায়। আমি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। ছুটে গিয়ে ছেলেটির ডান হাত ধ'রে আস্তে টানলাম — 'শিগগির আসো।' ছেলেটি তখনও খাওয়া শেষ করে নি। ও একটুক্ষণ আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আমি তাড়া দিলাম 'চলো'। ও খাওয়া ফেলে আমার পিছনে-পিছনে চললো। ছুটে গিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকলাম। চারদিকে তাকিয়ে লুকোবার জায়গা খুঁজলাম। পেলাম। বড়-বড় ময়দার বস্তার পেছনে যে ফাঁক পেলাম, তাই দেখিয়ে বললাম — 'শীগগির লুকাও এখানে। কোনরকম শব্দ করবে না। ভয় নেই, আমি ডেকে নিয়ে যাবো।' ওকে লুকিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি কেবিন ঘরগুলোর দিকে এলাম। যে দুই বন্ধু গত রাত্রে আহত ছেলেটিকে দেখেছে, তাদের একজনকে পেলাম। একপাশে ডেকে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললাম — 'কাল রাত্তিরে যে আহত ভাজিম্বাকে দেখেছো, তার কথা কাউকে বলো না। সে মাথা নেড়ে সম্মত হলো। ওদের নিয়ে ডেক-এ উঠে এলাম। দেখলাম, কয়েকজন ভাজিম্বা সৈন্য বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে ওদের সেনাপতি। তার গা খোলা। গলায় ঝুলছে একটা মুক্তোর লকেট। পরনে সাটিনের কাপড়। কোমরে সিল্কের পট্টি বাঁধা। মুখটা পাথরের মত কঠিন। তার হাতে খোলা তরোয়াল। আমাদের ক্যাপ্টেন তখন বলছে — 'যদি কেউ আসতো, তা'হলে নিশ্চয়ই আমাদের নজরে পড়তো।'

কিন্তু সেনাপতির মুখ কঠিন। কথাটা সে বিশ্বাস করেছে ব'লে মনে হলো না। তখনই দেখি গতরাত্রে আমার সঙ্গী অন্য বন্ধুটি ক্যাপ্টেনের কাছে যাচ্ছে। ঐ বন্ধুটি জাতিতে স্প্যানিশ। আমি স্প্যানিশ ভাষায় ব'লে উঠলাম 'সাবধান গতরাত্রির কথা ব'লো না।' বন্ধুটি বুদ্ধিমান। মাথাটা একবার নেড়ে সহজ ভঙ্গীতে ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বললো — 'কাল বাতাস পড়ে গিয়েছিল। গরমের জন্যে আমরা অনেক রাত পর্যন্ত ডেকে ছিলাম। কাউকে দেখিনি।' ক্যাপ্টেন সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললো — 'দেখলেন তো ও বলছে, ওরা কাউকে দেখে নি।' কিন্তু সেনাপতির মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বলল — 'ছেলেটি ভীষণ আহত ছিল।' এই কথা বলে সেনাপতি মাথা নীচু ক'রে ডেক-এর ওপর নজর রাখতে-রাখতে জাহাজের পেছনের দিকে যেতে লাগল। সৈন্যরাও সঙ্গে-সঙ্গে চলল। হঠাৎ পেছনদিককার ডেক-এর দিকে একজায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো। বলে উঠল — 'রক্ত'। ক্যাপ্টেনও সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। দেখলো সত্যিই ডেক-এ ফোঁটা-ফোঁটা রক্তের দাগ। সেনাপতি আপন মনে বিড়-বিড় ক'রে বলল — 'মাহাবো!'

আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। বুঝলাম, ছেলেটির নাম মাহাবো। সেনাপতি মুখ তুলে ক্যাপ্টেনকে বলল — 'জাহাজ দেখবো।'

ক্যাপ্টেন ব'লে উঠল 'বেশ তল্লাশী করুন।'

সেনাপতি সঙ্গের সৈন্যদের নিয়ে জাহাজ তল্লাশী শুরু করল। প্রত্যেকটি কেবিন ঘরে, দাঁড়টানার ঘরে, রসুই-ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে দেখল, কিছুই বাদ দিল না। কিন্তু মাহাবোকে কোথাও পেল না। সেনাপতিটি অপ্রসন্নমুখে ডেক-এ রক্তের দাগ-দাগ জায়গাটার কাছে কয়েকবার পায়চারি করলো। তারপর ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলো — 'জাহাজ কবে ছাড়ছেন?'

ক্যাপ্টেন বললো — 'আমাদের তো লেনদেনের কাজ মিটে গেছে। আমরা আজকেই জাহাজ ছাড়বো।'

সেনাপতি মাথা ঝাঁকাল — 'না আজ জাহাজ যাবে না।'

— 'কেন!' ক্যাপ্টেন 'বেশ অবাক হ'লো।'

সেনাপতি কালচে ছোপ লাগা দাঁত বের ক'রে হাসল। মনে হ'লো মুখ ভ্যাংচাল। তারপর পর্তুগীজ ভাষায় বলল 'আমি কামেরোকে আনতে যাচ্ছি। ওকে নিয়ে আসা পর্যন্ত ভাজিম্বা সৈন্যরা এখানেই থাকবে।' তারপর চোখ পিট্-পিট্ করে বলল 'কামেরোকে জানেন? রক্তের গন্ধ শুঁকে ও আহত শিকার ধ'রে আনে গভীর জঙ্গল থেকে। ওর নাকটা ছোট, কিন্তু ওর নাককে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব।

সেনাপতি আর কোন কথা না ব'লে জাহাজ থেকে নোঙরের দড়ি ধ'রে ধ'রে নৌকায় নেমে গেল। একাই বেয়ে চললো সোফালা বন্দরের দিকে। সৈন্যরা জাহাজেই রইল।

ফ্রেদারিকো এতক্ষণে থামল। ফ্রান্সিস তাড়া দিল — 'মুক্তোর-সমুদ্রের ব্যাপারটা বলো।'

— বলছি-বলিছ—সব বলবো। তার আগে একটু জল খাবো। খুব তেষ্টা পেয়েছে।'

হ্যারি একটু স'রে গিয়ে জলের জালা থেকে নারকেলের মালা দিয়ে জল ভরে নিয়ে এল। ফ্রেদারিকো ঢক-ঢক ক'রে জল খেল। তলানি যে জলটুকু ছিল, তাই দিয়ে চামড়ার আঁকা নক্সাটা ভেজাল। তারপর আবার ভাঙা আয়নাটার পেছনে সেঁটে দিল। আবার কোমরের গাঁট থেকে তামাকপাতা বের করলো। মুখে ফেলে চিবুতে-চিবুতে বলল — 'আমি বিপদ আঁচ করলাম। এরকম জংলী মানুষের কথা আমি শুনেছিলাম। শিকারীরা এদের নিয়ে জঙ্গলে শিকার করতে যায়। আহত জানোয়ারের রক্তের গন্ধ শুঁকে-শুঁকে, যেখানেই জানোয়ারটা থাকুক না কেন ঠিক বের করে। কামেরো সেই রকম জংলী মানুষ। জাহাজী বন্ধুদের আমার কেবিনঘরে জড়ো করলাম। সব বললাম। জংলী কামেরো এসে ভাজিম্বা ছেলেটিকে ও খুঁজে বের করবেই। তবে একটা বাঁচোয়া, রক্তটা বাসি হ'য়ে গেছে ধরতে পারবে না মনে হচ্ছে। কিন্তু সাবধানের মার নেই। যদি 'মাহাবো' অর্থাৎ ছেলেটি ধরা পড়ে, তবে আমাদের কাজ হবে সেনাপতি-শুদ্ধ সব ক'টা সৈন্যকে জলে ফেলে দেওয়া আর এক মুহূর্ত দেরী না করে জাহাজ ছেড়ে দেওয়া।

'কিন্তু ক্যাপ্টেন কি রাজি হবে?' একজন জাহাজী বন্ধু বলল।

'ক্যাপ্টেনকে বোঝাবার দায়িত্ব আমি নিলাম।' ওদের বললাম, 'তোমরা শুধু সেনাপতি আর সৈন্যদের জলে ফেলে দিতে সাহায্য ক'রো। ওরা রাজি হলো।'

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগল — 'আমি সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করলাম। গতরাত্রের সব ঘটনা বললাম। ক্যাপ্টেন কয়েকবার মাথা নেড়ে বললে — 'উহুঁ মাহাবোকে ওদের হাতে তুলে দিতেই হ'বে।'

আমি বললাম — 'তাহ'লে ওরা ওকে সঙ্গে-সঙ্গে মেরে ফেলবে।'

— 'ওসব ওদের ব্যাপার — আমরা ওসবের মধ্যে নেই।' ক্যাপ্টেন বলল।

— তাই ব'লে জেনেশুনে একটা এত অল্পবয়সী ছেলেকে খুনীদের হাতে তুলে দেবেন?

— 'উপায় কি?' ক্যাপ্টেন হতাশার ভঙ্গী করল।

— 'উপায় আমরা বের করেছি। কিন্তু আপনি আপনার ঘর থেকে বেরোবেন না।'

— কেন?

— 'তাহ'লে আপনার দায়িত্ব থাকবে না। যা করবার, আমরাই করবো।'

ক্যাপ্টেন কিছুতেই রাজি হবে না। আমিও নাছোড়বান্দা। আমি আশ্বাস দিলাম 'এই চাঁদের দ্বীপে আবার কবে আসবো — তার ঠিক কি? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি শুধু ঘর থেকে বেরোবেন না, তাহ'লেই হলো। ক্যাপ্টেন বারকয়েক — আপত্তি ক'রে অবশেষে রাজি হলো।'

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগল — 'দুপুরের দিকে সেনাপতি নৌকায় চড়ে এল। সঙ্গে সেই জংলী মানুষ কামেরো। জাহাজে উঠেই সেনাপতি ক্যাপ্টেনের খোঁজ করলো। আমরা বললাম, উনি অসুস্থ। নিজের কেবিনে শুয়ে আছেন। সেনাপতি কামেরোকে রক্তের দাগ পড়েছে ডেক-এর যে জায়গায়, সেদিকে নিয়ে চললো। কামেরো উচ্চতায় তিনফুটও হবে না। মাথায় বড়-বড় চুল ওর চোখ-মুখ ঢেকে দিয়েছে। পরনে একটা নেংটি। সারা গায়ে নানারকম নানারঙের উল্কি আঁকা। কামেরো রক্তের শুকিয়ে যাওয়া ফোঁটাগুলোর ওপর উবু হ'য়ে বোধহয় গন্ধই শুঁকলো। মুখ তুলে সেনাপতিকে কি বললো। বোধহয় বাসি হ'য়ে গেছে ব'লে রক্তের গন্ধ পাচ্ছে না, সে কথাই বলল। কামেরো আবার বার কয়েক গন্ধ শুঁকলো। তারপর ঐ অবস্থাতেই চললো নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে। আমরা আগে লক্ষ্য করি নি। এবার লক্ষ্য করলাম, সিঁড়ির কোণের দিকে বেশ কিছুটা রক্ত লেগে আছে। মনে পড়লো, মাহাবো এই জায়গায় টাল নিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। আমি ধ'রে ফেলেছিলাম। এই জায়গায় তাই ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তাই ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত জ'মে বেশকিছুটা রক্তের দাগ এখানে রয়েছে। কামেরো মুখ উবু অবস্থায় কুকুরের মত একটা লাফ দিল বুঝলাম, আর উপায় নেই। মাহাবো ধরা পড়বেই। আমি চাপা গলায় বন্ধুদের সে কথা বললাম — সব তৈরি থেকো। একজনকে পাঠালাম নোঙরের জায়গায়। আমরা ইসারা করতেই ও যেন নোঙর তুলে ফেলে। অন্যরা সব তৈরি হ'য়ে গেলাম। এবার কামেরো চলল আমার কেবিনঘরের দিকে। সেখানে রক্তমাখা কম্বলের টুকরো ছেঁড়া কাপড় পেল। কামেরো লাফাতে লাগল। তারপর চললো ভাঁড়ার ঘরের দিকে। কপাল মন্দ। ভাঁড়ার ঘরের মধ্যেই পড়ে ছিল রক্তভেজা আর একটা কম্বলের টুকরো। তাড়াতাড়িতে অসাবধানে ওটা পড়ে গিয়ে থাকবে।

কামেরো এবার ভাঁড়ার ঘরের চারিদিকে তাকাতে-তাকাতে ঘুরতে লাগল। যে ময়দার বস্তার আড়ালে মাহাবো লুকিয়ে ছিল, কামেরো হঠাৎ সেইদিকে ছুটে গেল। সেনাপতি আর সৈন্যরাও ছুটলো। মাহাবো ধরা পড়ে গেল। আমরা গিয়ে মাহাবোকে ঘিরে দাঁড়ালাম। আমার বন্ধুদের কয়েকজনের হাতে তরোয়াল দেখে সেনাপতি একবার থমকাল। সৈন্যরাও কি করবে বুঝে উঠতে পারলো না। আমিও সেনাপতিকে বললাম — 'ওপরে ডেক-এ চলুন।'

— আগে মহাবোকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও।

— 'ঠিক আছে আপনারা ডেক-এ চলুন। আমরা মাহাবোকে নিয়ে যাচ্ছি।'

সেনাপতি কিছুক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর — সৈন্যদের অনুসরণ করবার ইঙ্গিত ক'রে ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে চলল। মাহাবোকে আমার কেবিন ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আমরাও ওপরের ডেক-এ উঠে এলাম। মাহাবোকে আমাদের সঙ্গে না দেখে সেনাপতি তাদের ভাষায় চীৎকার ক'রে কি ব'লে উঠলো। সৈন্যরা বর্শা উঁচিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। আমরাও ভাঙা হালের টুকরো, বড়-বড় পেরেক, আর নোঙরের ভাঙা টুকরো নিয়ে সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। লড়াই শুরু হলো। আমাদের বন্ধুদের কয়েকজন তরোয়াল ভালোই চালাত। প্রথমেই সেনাপতি ঘায়েল হলো। ওর হাত থেকে তরোয়াল ছিট্‌কে পড়লো। আমরা সেনাপতিকে ধরাধরি ক'রে তুলে ছুঁড়ে জলে ফেলে দিলাম। সেনাপতির এই অবস্থা দেখে বাকী সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়ল। দু'জন বর্শা ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাকিগুলোকে আমরাই ধরে জলে ফেলে দিলাম। কামেরোকেও জলে ছুঁড়ে ফেলা হলো। ওরা সাঁতরে ওদের নৌকোর দিকে চললো। ততক্ষণে জাহাজের নোঙর তুলে ফেলা হ'য়েছে। দ্রুত তাতে দড়ি দড়া ঠিক ক'রে পাল তুলে দিলাম। দাঁড়িরাও দাঁড় বাইতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে জাহাজ বাইরের সমুদ্রে চ'লে এলো। সোফালা বন্দর, চাঁদের দ্বীপ চোখের সামনে থেকে মুছে গেল। আমরা মহাসমুদ্রে এসে পড়লাম। জাহাজ বেগে চললো উত্তরের দিকে।'

ফ্রেদারিকো থামল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি প্রচণ্ড মনোযোগের সঙ্গে ওর গল্প শুনতে লাগল। একটু থেমে ফ্রেদারিকো আবার বলতে শুরু করলো — 'মাহাবোকে সুস্থ ক'রে তোলার জন্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করলাম না। ওষুধ-পত্র সেবাশুশ্রূষা সবই চললো। কিন্তু মাহাবো সুস্থ হলো না। বরং ঘা পেকে ফুলে ওর অবস্থা দিন-দিন খারাপ হ'তে লাগল। আমাদের বৈদ্য বললো, যে বর্শা দিয়ে ওকে আঘাত করা হ'য়েছিল। তা'তে নাকি বিষ মাখানো ছিল। বিষক্রিয়ার জন্যই ওই ঘা শুকোবে না, বরং শরীরের অন্য জায়গাও বিষ ছড়িয়ে যাবে। মাহাবোকে বাঁচানো যাবে না। কয়েকদিন পরেই মাহাবোর ভীষণ জ্বর এল। ওর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। ওর আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলো। সেদিন গভীর রাত্রি। আমি মাহাবোর বিছানার পাশে ব'সে ওর মাথার জলে ভেজা ন্যাকড়া বুলোচ্ছি আর হাওয়া করছি। ও হঠাৎ চোখ খুললো। দেখলাম চোখ — দু'টো লাল টক্‌টক্ করছে। ও কিন্তু সুস্থ মানুষের মতোই ব্যবহার করতে লাগল। আমার হাতটা দু'হাত দিয়ে

জড়িয়ে ধ'রে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলতে লাগল — 'বন্ধু তোমার নাম জানি না, কিন্তু তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার পরিচয় তুমি জানো না। তুমি চাঁদের দ্বীপের রাজসভা দেখেছো নিশ্চয়ই। কত বড়-বড় মুক্তো দিয়ে রাজসভা সাজানো। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি সকলের গলায় মুক্তো। মুক্তো সমুদ্র থেকে সংগ্রহ ক'রে আনতো এসব আমার বাবা।

— তোমার বাবা ছাড়া আর কেউ মুক্তো সংগ্রহ করতে পারে না কেন? আমি জানতে চাইলাম।

মাহ্‌বো বলল, 'কারণ মুক্তোর সমুদ্রের প্রহরী লাফ্ মাছ। এই মাছেরা যে কি সাংঘাতিক, কল্পনাও করতে পারবে না। এদের চোখের দৃষ্টি স্থির আর হিংস্র। সমুদ্রের নীচের শ্যাওলা আগাছা এসবের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তীক্ষ্ন ধারালো দাঁত দিয়ে এরা শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার জন্যে এদের পিঠের শিরদাঁড়ায় সারি-সারি ফাঁপা ছুঁচের মত কাঁটা থাকে। এই কাঁটাগুলো ওরা শিকারের গায়ে বসিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে ফাঁপা কাঁটাগুলোর মধ্যে দিয়ে আঠা-আঠা বিষ ঢেলে দেয়। যার গায়ে ঐ বিষ ঢোকে, সে অসহ্য ব্যথায় অজ্ঞান হ'য়ে যায়। তারপরেই সে মরে যায়। এই হিংস্র লাফ্ মাছ ঐ মুক্তোর সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়। ওদের হাত থেকে বাঁচবার কোন উপায় নেই।'

— 'তাহ'লে তোমার বাবা মুক্তো সংগ্রহ ক'রে অক্ষত দেহে ফিরে আসতো কি করে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

— সেটাই রহস্যময়। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম। বাবা মুক্তোর সমুদ্র থেকে ফিরে এলে বাবার গলায় ঝোলানো ভাঙা আয়নাটা থাকতো না। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন — 'সাঁতরাবার সময় খুলে পড়ে গেছে।' বাবা তার কিছুদিন পরেই ভিনদেশী কোন জাহাজে চড়ে মরিটাস দ্বীপে চ'লে যেতেন। আমি জানি না মরিটাস দ্বীপ কোথায়। কিছুদিন পরে ফিরে আসতেন। গলায় ঝোলানো থাকতো ঠিক অমনি আকারের একটা ভাঙা আয়না। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, বসির আয়নাঅলার কাছ থেকে আয়নাটা তৈরি করে এনেছেন। আমি শুধু এইটুকুই জানতাম।

— তারপর?

— কয়েকদিন আগের কথা চাঁদের দ্বীপের রাজা বাবাকে ডেকে বললেন — 'এই মুক্তো ভিনদেশী লোকের মোহরের বিনিময়ে কিনে নিতে চায়। মুক্তোর সমুদ্রে তো অঢেল মুক্তো আছে। এবার আমি কিছু মুক্তো তুলে বিক্রি করবো।' বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন — 'এই মুক্তো চাঁদের দ্বীপের অধিষ্ঠাতা দেবতার দান। এমনি দিতে পারেন, কিন্তু দেবতার এই দান নিয়ে ব্যবসা করতে পারবেন না।' কিন্তু রাজারও এক গোঁ। বিক্রী করার জন্যে আরো মুক্তো তোলাবেন। রাজা দু'জন ভাজিম্বাকে পাঠালেন মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো তুলে আনতে। তারা সেই যে জলে নামলো, আর ওপরে উঠতে পারল না। আমাদের একটা প্রবাদই আছে — 'যদি চিরদিনের জন্যে কোথাও যেতে চাও, তাহ'লে মুক্তোর সমুদ্রে যাও।' রাজার যত রাগ গিয়ে পড়লো বাবার ওপর। রাজা বুঝলেন বাবা ছাড়া কেউ অক্ষত

শরীরে মুক্তো নিয়ে আসতে পারবেন না। শুরু হলো এর উপায় ব'লে দেবার জন্যে বাবার ওপর দৈহিক অত্যাচার। যখন চরমে উঠলো, বাবা তখন আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। শাস্তিঘরে দেখলাম, বাবা প্রায় অজ্ঞানের মত পড়ে আছেন। ঐ অবস্থাতেই আমাকে কাছে ডাকলেন। বাবার হাত-বুনো লতা দিয়ে বাঁধা। আমার কানের কাছে মুখ ফিস্‌ফিস্ করে বললেন — 'আমার গলা থেকে আয়নাটা খুলে নে। এটা জোড়-লাগানো দু'টো আয়না। বসির আয়নাওলার আয়না সঙ্গে থাকলে মুক্তোর সমুদ্রে কোন ভয় নেই।' বাবা আর কিছু বলতে পারলেন না। চোখ বন্ধ ক'রে জোরে শ্বাস নিতে লাগলেন। আমি বাবার গলা থেকে জোড়া-লাগানো আয়নাটা খুলে কোমরে গুঁজে রাখলাম। ব্যাপারটা কিন্তু সেনাপতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সেনাপতি আমাকে বলল, 'দেখি তোমার বাবা তোমাকে কি দিলো।' আমি কোমরে গোঁজা আয়নাটা বের করবার ভান করলাম। চারদিক এই ফাঁকে দেখে নিলাম। এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। তখন রাত গভীর। একজন সৈন্য শুধু বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে। অন্য কয়েকজন গুটিসুটি মেরে ঘরের বারান্দায় ব'সে আছে। আমি সঙ্গে-সঙ্গে এক লাফে আলোর এলাকা ছাড়িয়ে অন্ধকারে পড়লাম। সেনাপতি চেঁচিয়ে উঠল — 'মাহাবোকে ধর্ —।' ঐ সৈন্যটা সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকারেই আমাকে লক্ষ্য ক'রে বর্শা ছুঁড়ল। ওরা অন্ধকারেও দেখতে পায়। আমি ব'সে পড়তে-পড়তে বর্শাটা ছুটে এসে কাঁধে বিঁধল। আমি বর্শাটা টেনে খুলে ফেললাম। রক্ত ছুটল। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটলাম। একবার ভাবলাম বনের দিকে যাই। কিন্তু জানতাম কামেরোকে লেলিয়ে দেবে সেনাপতি। ও ঠিক আমাকে খুঁজে বের করবে। তার চেয়ে ভিনদেশী জাহাজে চড়ে পালিয়ে যাওয়া ভালো। তাই অন্ধকারে ছুটতে-ছুটতে এসে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারপর তোমাদের জাহাজে এসে উঠলাম।' মাহাবো সমস্ত ঘটনাটা এইভাবে থেমে-থেমে বললো। বুঝতে পারছিলাম ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মুক্তোর সমুদ্রের রহস্যের টানে ওকে আর থামতে বলিনি। মাহাবো দুর্বল হাতে ওর কোমরের জোড়া আয়নাটা বের ক'রে আমার হাতে দিল। ম্লান হেসে বলল — 'যে জন্যে আমার বাবা মারা গেল, যে জন্যে আমিও বাঁচবে না, সেই অমূল্য জিনিসটি তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। অযত্ন ক'রো না। পারো তো মুক্তো এনো। কিন্তু সেই মুক্তো নিয়ে ব্যবসা ক'রো না। তাহ'লে চাঁদের দ্বীপের অধীশ্বরের অভিশাপ লাগবে।' এই ছিল মাহাবোর শেষ কথা। শেষরাত্রের দিকে আমার কোলে মাথা রেখে মাহাবো মারা গেল। এই কয়েকদিনেই ছেলেটির ওপর আমার মায়া পড়ে গিয়েছিল। ওর মৃতদেহটি কোলে নিয়ে আমি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদলাম।'

ফ্রেদারিকো থামল। ওর গল্পের এই ভাজিস্বা ছেলেটির জন্য ফ্রান্সিস ও হ্যারি দু'জনেই গভীর সহানুভূতি অনুভব করল। দু'জনেই চুপ ক'রে রইলো। ফ্রেদারিকো চুপ ক'রে তামাক চিবোচ্ছে। কিন্তু ওরা দু'জন আর ওকে বলবার জন্যে অনুরোধ করতে পারল না। ফ্রেদারিকো নিজে-নিজেই বলতে শুরু করল — 'ফ্রান্সিস তোমাকে সব ঘটনাটাই বলবো। শোন — তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। আয়নাটা পরে থাকি। লোকে দেখলে হাসে। আমিও আয়নাটায় মুখ দেখি, ভেংচি কাটি

দিন কাটতে লাগল এ জাহাজে, ও জাহাজে ঘুরে-ঘুরে। কিন্তু দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে যাবে এমন জাহাজ অনেকদিন চেষ্টা করেও পেলাম না। হঠাৎ একটা জাহাজ পেলাম। শুনলাম, জাহাজটা চাঁদের দ্বীপের সোফালা বন্দরে যাবে। তবে অনেক ক'টা বন্দরে ঘুরে যাবে। আমি সেই জাহাজে খালাসীর কাজ নিলাম। এ বন্দর সে বন্দর ঘুরতে-ঘুরতে জাহাজটা একদিন সোফালা বন্দরে এসে ভিড়ল। মাহাবো বলেছিল, আয়নাটা যেন কোন ভাজিম্বার চোখে না পড়ে। রাজপুরোহিতের আয়না আমার গলায় দেখলে ওরা আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে মেরে ফেলবে। কারণ ওরা বিশ্বাস করে যে আয়নাটা মন্ত্রপুত। রাজপুরোহিত ছাড়া আর কারো ওটা পরার অধিকার নেই। একটা কথা বলা হয়নি, আয়নাটা একদিন গলা থেকে খুলে পরিষ্কার করছি। হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গেল। আয়নার জোড়াটা খুলে গেল। তখনই ভেতরে সাঁঠা চামড়ায় আঁকা নক্সাটা পেলাম। যা হোক — আমি আয়না দু'টো কোমরে গুঁজে সোফালা বন্দরে নামলাম। তখন রাত হ'য়েছে। ঘন বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চললাম মুক্তোর সমুদ্রের দিকে। কিন্তু জানতাম না যে কেউ যাতে মুক্তোর সমুদ্রে নেমে মুক্তো চুরি করতে না পারে, তার জন্য ভাজিম্বারা মুক্তোর সমুদ্রের এপাশে বনের মধ্যে অনেক ফাঁদ পেতে রেখেছে। কারোর উপায় নেই সেই ফাঁদ এড়িয়ে যায়। আমিও পারলাম না। বুনো লতায় তৈরি সেই ফাঁদে হঠাৎ পড়ে গেলাম। খোঁড়া গর্তের মধ্যে পড়ে রইলাম। হয়তো একটু তন্দ্রামত এসেছিল। তন্দ্রা ভেঙে গেল পাখির ডাকে। ভোর হয়েছে। কত বিচিত্র রকম পাখি। কিন্তু এ সব দেখার অবকাশ কোথায়। ভাজিম্বাদের হাতে ধরা পড়লাম। ভাগ্যে কি আছে কে জানে। একটা বিচিত্র বর্ণের লেমুর তার আঙ্গুলগুলো মানুষের সমান। গর্তটার কাছ দিয়ে কয়েকবার ঘুরে গেল। ভাবলাম, ভাজিম্বাদের হাতে ধরা পড়ার আগে বুনো শুয়োরের দাঁতের ঘায়ে প্রাণটা না যায়।

একটু বেলা হ'তে দূরে কাদের কথাবার্তা শুনলাম। একটু পরেই একদল ভাজিম্বা শিকারী ওখানে এল। ওরা ভেবেছিল, কোন বুনো জানোয়ার বোধহয় ফাঁদে পড়েছে। আমাকে দেখে ওরা খুব অবাক হলো না। হয়তো মুক্তো চুরি করতে এসে অনেকেই এইরকম ফাঁদে ধরা পড়েছে। এটা নতুন কিছু নয়। ওরা আমাকে টেনে তুললো। তারপর বুনো লতায় হাত বেঁধে আমাকে নিয়ে চললো। ওদের লক্ষ্য ছিল যে রাজবাড়ি, সেটা বুঝতে আমার অসুবিধে হ'লো না। কারণ দুটো আয়নার মাঝখানে সাঁঠা চাঁদের দ্বীপের নক্সাটা দেখে-দেখে আমার প্রায় মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। রাজবাড়িতে যখন পৌঁছলাম, তখন বেশ বেলা হ'য়েছে। বোধহয় রাজাকে আমার ধ'রে আনার খবর দেওয়া হয়েছিল। রাজসভায় রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি একটু পরেই এলেন। সেনাপতি আমাকে ঠিক চিনল। কাল্চে ছোপ ধরা দাঁত বের করে দাঁত খিঁচুনি দেওয়ার মত হাসলো। আমার বিচার শুরু হ'ল। সেনাপতি আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বার-বার রাজাকে কি সব গড় গড় ক'রে বলে গেল। ন্যাড়ামাথা রাজা ডান হাতটা ওপরের দিকে তুলে তর্জনীটা উঁচিয়ে ধরলেন, তারপর বেশ জোরে কি যেন বললেন। তারপর মুক্তো বসানো কাঠের সিংহাসন থেকে নেমে চ'লে গেলেন। মন্ত্রী আর উপস্থিত অন্যান্য দু'চারজন গণ্যমান্য ব্যক্তি রাজার

পিছু-পিছু চলে গেলেন। সেনাপতি এগিয়ে এসে ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বলল — 'মুক্তো চুরি করতে এসিছিলি। সেই মুক্তোর সমুদ্রেই তোকে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। যত পারিস, মুক্তো তুলে নিস্।' কথাটা ব'লে দাঁত খিঁচিয়ে হাসলো। সৈন্যদের কি হুকুম দিল। ওরা আমাকে টেনে নিয়ে চললো। সৈন্যরা একটা ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দিল। ঘরটা দেখেই বুঝলাম, এটাই শাস্তিঘর। মাহাবোর মুখে এই শাস্তিঘরের কথাই শুনেছিলাম। ঘরটার চারদিকে কাঁটাগাছের বেড়া। রেনট্রির পাতায় ছাওয়া ঘর। মেঝেটা মাটির। এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো। একপাশে একটা মাটির পাত্রে জল রাখা। মাঝখানে একটা জ্বলন্ত উনুন। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করতে লাগল। গমে দর্ দর্ করে ঘামতে লাগলাম। কাল রাত্রে সেই জাহাজ থেকে খেয়ে বেরিয়েছিলাম। এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চললো — কিছু খাই নি। ওরা খেতে দেবে ব'লেও মনে হলো না। চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। ভাবতে লাগলাম একমাত্র ভরসা কোমরে গোঁজা দু'টো আয়নার টুকরো। আয়নার ধারালো কোণা দিয়ে যদি কোনভাবে পাতার বাঁধন কাটতেপারে। কিন্তু বাঁধন কাটলেই কি পালাতে পারবো? বাইরে ভাজিম্বা যোদ্ধারা পাহারা দিচ্ছে। মাহাবো বলেছিল, 'ওরা নাকি অন্ধকারেও দেখতে পায়।'

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগল — এসব সাতপাঁচ ভাবতে-ভাবতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কিছুই খেতে দিলো না। মাটির পাত্রটায় মুখ চুবিয়ে পেট ভ'রে জল খেলাম। রাত হলো। শাস্তিঘরের সামনের উঠোনে মশাল জ্বালিয়ে দিলো। পাহারা ঠিকই চললো।

একটু রাত হ'তে হঠাৎ পাহারাদার সৈন্যদের মধ্যে ব্যস্ততা লক্ষ্য করলাম। একটু পরেই সেনাপতি এল। সৈন্যদের কি হুকুম করল। ওরা আমাকে ঘর থেকে টেনে বের করল। তারপর সেনাপতির পেছনে-পেছনে আমাকে নিয়ে চলল। চাঁদের দ্বীপের নক্সাটা অনেকবার দেখে আমার সবই জানা হ'য়ে গিয়েছিল। উত্তর-পূর্ব মুখে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, বুঝলাম তার মানে গভীর বন এলাকা পার হয়ে মুক্তোর সমুদ্র। কিন্তু ওরা আমাকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছে কেন, বুঝলাম না। সবার আগে যে যোদ্ধাটি চলছে, তার হাতে মশাল। তারপরেই সেনাপতি। তারপর আমাকে মাঝখানে রেখে সৈন্যরা চলেছে গভীর বনের মধ্য দিয়ে। আমরা চলেছি। বন্য পশুর ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। রাতজাগা পাখিগুলো তীক্ষ্মস্বরে ডেকে অন্য গাছে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। ঝিঁ-ঝিঁ পোকার একটানা গান শোনা যাচ্ছে। একসময় গভীর বন শেষ হ'য়ে গেল। ছাড়া-ছাড়া গাছপালা শুরু হ'ল। তারপর আগুনে-প্রবালের একটা টিবি লম্বা চলে গেছে। সেটা দৌড়ে পার হ'তে হলো। টিবিটায় পা রাখা যায় না। এত গরম। তারপরই একটা ল্যাগুন। আকাশে ভাঙা চাঁদ। তারই নিস্তেজ আলোয় দেখলাম ল্যাগুনটার জল স্থির, ঢেউ নেই। ওপারে কাঁচ পাহাড় আর তার বাঁকানো চূড়া! বুঝলাম, এটাই মুক্তোর সমুদ্র। এই মুক্তোর সমুদ্র নিয়েই কত কল্পনা ছিল আমার। কত কথা শুনেছি এর সম্বন্ধে। আজকে সেটা আমার চোখের সম্মুখে। আমি বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে মুক্তোর সমুদ্র দেখতে লাগলাম।'

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগল, সেনাপতি আমার কাছে এলো। ভেংচিকাটার মত হেসে বলল — 'এই দ্যাখ্ মুক্তোর সমুদ্র। তোকে ভাসিয়ে দেব। যত পারিস্ মুক্তো তুলিস।'

তারপর চড়া সুরে কি হুকুম দিলো। সৈন্যরা ছুটে এসে আমাকে ধরলো। টানতে টানতে জলের ধারে নিয়ে গেল। দেখলাম, জলের ধারে একটা নৌকার মতো বাঁধা। গাছের গুঁড়ি কুড়ে ভাজিম্বারা একরকমের নৌকো তৈরি করে। এটা সেই রকম নৌকো। আমাকে ওরা নৌকোয় তুললো। তারপর বুনোলতা দিয়ে নৌকোর সঙ্গে হাত-পা বেঁধে দিল। ওরা নৌকোটা জোরে ঠেলে দিতে আমি মুক্তোর সমুদ্রের মাঝ বরাবর ভেসে এলাম। বুঝে উঠতে পারলাম না, আমাকে না মেরে এভাবে জলে ভাসিয়ে দিল কেন। অবশ্য একটু পরেই এর কারণ বুঝলাম। নৌকাটার তলায় ফুটো, ফুটো দিয়ে নৌকায় ততক্ষণে জল উঠতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকোসুদ্ধ আস্তে-আস্তে ডুবে যাবো। মাহাবো হিংস্র লাফ্ মাছের কথা বলেছিল। এরাই নাকি মুক্তোর সমুদ্রের প্রহরী। একবার জলে পড়লে ওরা সুতীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে আমার শরীর ফালা-ফালা ক'রে ফেলবে। ভয়াল মেরুদন্ড ফাঁপা কাঁটা বিঁধিয়ে দেবে। আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। ওপরে আকাশে ভাঙা চাঁদ। তারা জ্বলছে। এই সব কিছু মুছে যাবে। মৃত্যু এসে সব রং আলো মুছে দেবে। চোখের কোণ জলে ভিজে উঠলো। আমি চোখ বুঝলাম। হঠাৎ মনটা বিদ্রোহ করল। কেন মরবো? মরবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করবো না? হাত-পা বাঁধা এই অবস্থায় মৃত্যুকে মেনে নেব? আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। পারের দিকে তাকালাম। দেখি তিন-চারটে মশাল জ্বলছে। বুঝলাম, ওরা পাহারা দিচ্ছে এখনো। সারা তীরটা জুড়েই পাহারা দিচ্ছে। ওরা নিশ্চিত জানে মুক্তোর সমুদ্র থেকে কেউ জীবন নিয়ে ফিরে আসে না। তবু আমার মৃত্যু সম্বন্ধে ওরা নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। আমি তাড়াতাড়ি বাঁধা হাত দু'টো নিয়ে কোমরের গোঁজা খুঁজলাম। আয়না দুটো রয়েছে। অনেক কষ্টে একটা আয়না বের করলাম। তারপর আয়নাটার বাঁকা ছুঁচালো মুখটা হাতের তলাটায় ঘষতে লাগলাম। ভাগ্যি জংলী লতাটা শুকনো ছিল না। কাঁচা লতা-গাছটা ঘষতে-ঘষতে লতাটা কাটতে লাগলাম। হাতটা অবশ্য অক্ষত রইল না। কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। হাত অন্তরে একটু বিশ্রাম করি। আবার ঘষি। কিছুটা ছিঁড়ে আসতে আবার হ্যাঁচকা টান দিলাম। লতাটা ছিঁড়ে গেল। ততক্ষণে নৌকার অর্দ্ধেকটা ডুবে গেছে। বাঁধা হাত পা দু'টো জলের নিচে। এবার পায়ের তলাটা কাটতে লাগলাম। পা'টাও আয়নার কোণায় খোঁচা লেগে কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ এক টানা ঘষার পর পা'য়ের বন্ধনটা কেটে গেল। ভাবলাম, নৌকো থেকে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ি। কিন্তু তাতে শব্দ হবে। শব্দ শুনলে সেনাপতির, ভাজিম্বা সৈন্যদের সন্দেহ হ'তে পারে। তাই আমি নৌকোর সঙ্গে-সঙ্গে আস্তে-আস্তে জলের নীচে তলিয়ে গেলাম। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করছিল লাফ্ মাছগুলো ছুটে আসবে। ছুঁচালো ধারলো দাঁত নিয়ে আমার শরীরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফালা-ফালা ক'রে দেবে। নয়তো পিঠের ফাঁপা টন-কাঁটা ফুটিয়ে দেবে। হঠাৎ জলের নীচে দেখি এক আলোর আভাস। তাহ'লে এইখানেই কি

মুক্তো আছে? আমি ভুলে গেলাম মৃত্যুদূত লাফ্ মাছের কথা। আমি তাড়াতাড়ি সেই আলো ধ'রে নীচে নেমে এলাম। সে এক অপরূপ দৃশ্য। ওখানের তলাটা একটু এবড়ো খেবড়ো হলেও সমান। তার ওপর বড়-বড় মুক্তো ছড়িয়ে পড়ে আছে। একটা তীব্র নীলচে আলো বেরোচ্ছে মুক্তোগুলো থেকে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মুক্তোগুলোকে। মুক্তোগুলো পড়ে আছে মেঝের মত জায়গাটায়। আর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বড়-বড় আকারে ঝিনুক কল্পনাই করা যায় না। কোন কোন ঝিনুকের মুখ খোলা। তার মধ্যে মুক্তো। সেই আলোকিত জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ ডানহাতে একটা প্রচন্ড ধাক্কায় আমার হাত থেকে আয়নাটা মেঝের মত জায়গাটায় পড়ে গেল। সেই আয়নাটা থেকে তীব্র আলো বিচ্ছুরিত হ'তে লাগলো। দেখলাম, একটা ছাইরঙা মাছ ঐ আয়নার মধ্যে প্রচন্ড জোরে ঢুঁ মারল, ওটা নিশ্চয় মৃত্যুদূত লাফ্ মাছ। আরো লাফ্ মাছ ছুটে আসছে দেখলাম। আমার দম ফুরিয়ে এসেছিল। আমি দ্রুত ওপরে উঠতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি জলের ওপর পৌঁছলাম। দেখলাম, এখানে জলের গভীরতা বেশী নয়। এবার আয়নার রহস্যটা পরিষ্কার হ'য়ে গেল। আয়নাটার একটা বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করছিলাম যে, এর আলো প্রতিবিম্বিতকরার ক্ষমতা সাধারণ আয়নার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। এই আয়না মাছেদের আকৃষ্ট করে। মাছগুলো তখন পাগলের মত আয়নাটায় ঢুঁ মারতে থাকে। ভুলে যায়, ধারে-কাছে কোন শিকার আছে কিনা। লক্ষ্যই করে না কিছু। রাজ পুরোহিত তাই এই আয়না নিয়ে মুক্তো তুলতে আসতেন। যখন লাফ্ মাছেরা ঢুঁ দিতে ব্যস্ত, তখন উনি মুক্তো সংগ্রহ ক'রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জলের ওপরে উঠে আসতেন। তারপর সাঁতরে পারে উঠতেন। আমি এইসব ভাবতে-ভাবতে জলের ওপর ভেসে থেকে অনেকটা দম নিলাম। তারপর একডুবে নীচে নেমে গেলাম। হাতের কাছে যে মুক্তোটা পেলাম, সেটা নিয়ে উঠে আসছি, দেখি আয়নাটার কাছে অনেকগুলো লাফ্ মাছ জড়ো হয়ে ক্রমাগত ঢুঁ দিচ্ছে জায়গাটার জল রক্তে লাল হ'য়ে উঠেছে। হয়তো মাছগুলোর মুখ থেঁতলে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে এলাম। দূরের পারের দিকে তাকালাম। পারে দুরে-দূরে তিন জায়গায় তিনটে মশাল জ্বলছে। ওদিক দিয়ে পালানো অসম্ভব। মুক্তোটা কোমরে গুঁজে আমি কাঁচ পাহাড়ের দিকে সাঁতরাতে লাগলাম। ঐ কাঁচপাহাড়টাই পেরোতে হবে। যেদিকে আগ্নেয়গিরি সেদিকটায় দেখলাম, জল থেকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। আবার পারের ওদিকে ভাজিম্বা সৈন্যদের নিয়ে সেনাপতি ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজেই কাঁচপাহাড় ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়ে পালাবার উপায় নেই। কাঁচপাহাড়ের কাছাকাছি এসেছিলাম বোধহয়, তখনই হঠাৎ নিচের দিকে একটা টান অনুভব করলাম। আমি আর একটু সাঁতরে এসেছি, হঠাৎ এক প্রচন্ড জলের টানে আমি তলিয়ে গেলাম। সেই টানে আমি কোথায় ভেসে চললাম জানি না। প্রায় অজ্ঞানের মতো হ'য়ে গেলাম। হঠাৎ দেখি আমি কাঁচপাহাড় পেরিয়ে এসেছি। সামনে মহাসমুদ্রে চলে আসাটা আজও আমার কাছে রহস্যময় থেকে গেল।'

ফ্রেদারিকো থেমে থুঃ-থুঃ ক'রে চিবানো তামাকপাতা ফেললো। আবার কোমরে গোঁজা তামাকপাতা নিয়ে মুখে ফেলে চিবুতে লাগল।

— আচ্ছা জলের টানটা কি নীচু থেকে এসেছিল? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

— হ্যাঁ।

— তুমি কি তলিয়ে গিয়েছিলে?

— হ্যাঁ। সে কি টান!

— হুঁ। তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

— তারপর সাঁতরেই সোফালা বন্দর চ'লে এলাম। নিজের জাহাজে উঠলাম। মুক্তোটা বেশ কিছুদিন সকলের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলাম না। জাহাজের সবাই মুক্তোটার কথা জেনে গেল। বাধ্য হ'য়ে সবাইকে মুক্তোটা দেখালাম। সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেল। এতবড় মুক্তো? মানুষের কল্পনার বাইরে। জাহাজী বন্ধুদের কাছে আমার কদর বেড়ে গেল। ক্যাপ্টেনও আমাকে সমীহ করতো?

— তারপর?

— ওটাই আমার বিপদের কারণ হলো। লা ক্রুশ আমাদের জাহাজ অধিকার করলো। সবাইকে এই কয়েদঘরে বন্দী করে। জাহাজ লুঠ করলো। তখনই নিজে বাঁচবার জন্যে আমাদের ক্যাপ্টেন এক চাল চাললো। ক্যাপ্টেন বলল — 'যদি আমাদের সবাইকে ছেড়ে দাও, তা'হলে তোমাকে হাঁসের ডিমের মত একটা মুক্তো দিতে পারি।' লা ক্রুশের চোখ লোভে চক্-চক্ করে উঠল। ও রাজী হলো। আমার কাছ থেকে ও মুক্তোটা ছিনিয়ে নিলো! আর সব বন্ধুরা মুক্তি পেলো। জাহাজে ক'রে চ'লে গেলো। আমি কিন্তু মুক্তি পেলাম না। সেই থেকে এই কয়েদঘরে আছি। কতদিন, কতবছর জানি না। লা ক্রুশ এখানে এসে কখনো ধমকায়, চাবুক মারে। কখনো ওর ঘরে নিয়ে আমার কাছ থেকে জানতে চায় মুক্তোর সমুদ্র থেকে কি ক'রে মুক্তো নিয়ে অক্ষত দেহে ফিরে আসা যায়। মারের মুখে আমি সবই বলেছি। কিন্তু বলি নি এই আয়নার কথা, চাঁদের দ্বীপের নক্সার কথা। কাঁচ পাহাড় কি ক'রে পেরোলাম, সেই রহস্য তো আমি নিজেও আজ পর্যন্ত ভেদ করতে পারি নি।

ফ্রেদারিকো থামলো। তারপর আস্তে-আস্তে বললো — "ফ্রান্সিস তোমাকে সবটাই বললাম। কিন্তু তুমি না গেলেই ভালো। ভাজিম্বাদের একটা প্রবাদই আছে — 'যদি চিরদিনের জন্যে কোথাও যেতে চাও, তা'হলে মুক্তোর সমুদ্রে যাও।'"

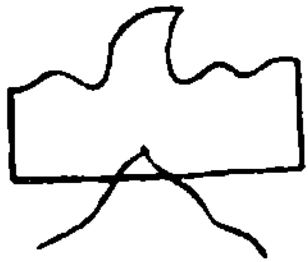
ফ্রান্সিস কোন কথা বললো না। পেছনের কাঠে ঠেসান দিয়ে চুপ ক'রে চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে রইল। গম্ভীর ভাবে ভাবতে লাগল ফ্রেদারিকোর বলা সমস্ত ঘটনাগুলো। মুক্তোর সমুদ্রে পৌঁছোনোর সমস্যার সমাধান সহজ না হ'লেও খুব কঠিন নয়। অরণ্য অঞ্চলে ভাজিম্বাদের পাতা ফাঁদগুলো সম্পর্কে সাবধান হ'লেই নিরাপদে মুক্তোর সমুদ্রে পৌঁছোনো যাবে। কিন্তু তারপর? লাফ্ মাছের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানো গেলেও মুক্তোর সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসবে কি ক'রে? ফ্রেদারিকো যখন অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, তখন সুড়ঙ্গ বা গভীর খাদ একটা কিছু আছে। কিন্তু সেটা কোথায় আছে? ফ্রেদারিকোর কথা থেকে সঠিক কোন উপায় বের করা যাচ্ছে না। তবে কি আয়নাটার মধ্যেই কোন রহস্য

আছে? আয়নাটা ভালভাবে পরীক্ষা করলেই হয়তো সমাধানেই ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। ফ্রান্সিস গভীরভাবে এই সমস্যার নানা সমাধানের কথা ভাবতে লাগল। কিন্তু ভেবে-ভেবে কোন কুল-কিনারা পেল না। ফ্রেদারিকো জলের টানে বেরিয়ে এসেছিল। এটা কোন গর্ত বা সুড়ঙ্গ বা খাদের অস্তিত্বের কথা বোঝাচ্ছে। কিন্তু সেটা সঠিক কোথায়, ফ্রেদারিকো তাও বলতে পারছে না। সমুদ্রের-জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে কিনা কে জানে। ফ্রান্সিস এবার চোখ খুলল। বললো — ফ্রেদারিকো তোমার আয়নাটা একবার দাও তো।

— কেন?

— দেখি, ওটা থেকে এর রহস্য ভেদ করা যায় কিনা।

ফ্রেদারিকো গলা থেকে দড়িতে বাঁধা আয়নাটা ওকে দিল। ফ্রান্সিস খুব মনোযোগ দিয়ে ভাঙা আয়নাটা দেখতে লাগল। আয়নাটা দেখতে এই রকম —



ফ্রান্সিস আয়নাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। ও একটা জিনিস বুঝল, যে আয়নাটা ওভাবে ভাঙেনি। ঐ রকম আঁকাবাঁকা ছুঁচালো মুখ ক'রে ওটা কাটা হ'য়েছে। আয়নাটার পেছনে পারার পলেস্তারা বেশ মোটা। তাই আলো প্রতিফলনের ক্ষমতা এই আয়নাটার অনেক বেশি। আয়নাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে দেখেও ফ্রান্সিস কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। আর পাঁচটা সাধারণ আয়না থেকে এর কাঁচটা মোটা। এইটুকুই বুঝল শুধু। আয়নাটা বিশেষ যত্নে তৈরী, এটা বুঝতে অসুবিধা হল না। আয়নাটার নীচের দিকে একটা ফুটো। ঐ ফুটোর মধ্যে দিয়ে দড়ি গলিয়ে লকেটের মত গলায় ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা। এই জন্যে কি ফুটোটা করা হ'য়েছে, না ফুটোটার অন্য কোন তাৎপর্য আছে? গলায় ঝুলিয়ে রাখার সুবিধের জন্যেই ফুটোটা করা হয়েছে। এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে? ও আয়নাটা ফ্রেদারিকোকে দিল।

দিন যায়, রাত যায়। ক্যারাভেল চলেছে। হঠাৎ একদিন রাত্রে ফ্রেদারিকো ভীসণ অসুস্থ হ'য়ে পড়ল। ওর ভীষণ জ্বর এলো। প্রায় অজ্ঞানের মত অসাড় পড়ে রইলো? বেনজামিন লুকিয়ে ওষুধ এনে দিলো। ফ্রান্সিস ওষুধ খাওয়ালো। দু'তিনবারে ওষুধ পড়তে একটু সাড় এলো শরীরে। ওরা মনে করলো বিপদ কাটলো। ফ্রেদারিকো অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে শুনে লা ক্রুশ কাঠের পা নিয়ে ঠক্ ঠক্ করতে-করতে এল। ফ্রেদারিকোর সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল — 'এই ফ্রেদারিকো — আর ঢঙ্ দেখিও না।'

'— ও সত্যিই অসুস্থ' ফ্রান্সিস বলল — ওর হাত খুলে দিতে বলুন।'

লা ক্রুশ খুক্ খুক্ ক'রে হেসে উঠল — 'কিস্সু হয়নি — দু'ঘা চাবুক পড়লেই উঠে দাঁড়াবে।'

ফ্রান্সিস চুপ করে রইলো। কোন কথা বললো না। লা ক্রুশ বেনজামিনকে ডেকে বলল — 'বৈদ্যিকে ডেকে নিয়ে আয় তো।'

একটু পরেই জাহাজের বৈদ্যি এলো। লা ক্রুশ ওকে বলল — 'দ্যাখ তো ও সত্যিই অসুস্থ, না ঢঙ করছে।'

বৈদ্যি ফ্রেদারিকোকে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করল। তারপর বলল — ও ভীষণ অসুস্থ। বোধহয় আর বাঁচবে না।

— 'সে কি?' লা ক্রুশ চেঁচিয়ে উঠল - 'আর দু'একদিনের মধ্যেই আমরা চাঁদের দ্বীপে পৌঁছবো। ফ্রেদারিকোকে তখন খুবই প্রয়োজন। ওকে তুমি যে ক'রেই হোক আর ক'টা দিন বাঁচিয়ে রাখো।

— 'চেষ্টা করবো ক্যাপ্টেন।' বৈদ্যি বলল। লা ক্রুশ বেনজামিনকে ডাকল — 'ফ্রেদারিকোর শুশ্রূষা দেখাশুনার ভার তার ওপর রইলো। দেখিস্ যেন পট্ ক'রে ম'রে না যায়।' বলে লা ক্রুশ চ'লে গেল।

বেনজামিনও বেরিয়ে গেল। একটু পরেও ছেঁড়া পালের টুকরো আর একগাদা খড় নিয়ে এলো। ফ্রেদারিকো যেখানে শুয়ে ছিল, সেখানে খড় ছড়িয়ে দিলো তার ওপর ছেঁড়া পালের কাপড় পেতে দিলো। বেশ একটা বিছানার মত হলো। ফ্রেদারিকোর হাতের কড়া খুলে ওকে আস্তে-আস্তে ঐ বিছানায় শুইয়ে দিলো। বৈদ্যি আবার কিছুক্ষণ ফ্রেদারিকোকে পরীক্ষা করে তারপর ওষুধ খাওয়ালো। একটু রাত হ'তে বৈদ্যি চ'লে গেল। বেনজামিন এক ঠায় ফ্রেদারিকোর মাথার কাছে ব'সে রইল। ও রাত্রে একবারের জন্যে উঠলো না। নিজে গেলও না।

ভোরের দিকে ফ্রেদারিকো বোধহয় একটু সুস্থ বোধ করল। এপাশ থেকে ওপাশ ফিরল। তখন জ্বরটাও বোধ হয় কমের দিকে। বেনজামিন ওর কপালে হাত দিলো। ওকে একটা সুস্থ দেখে নিজের কাজে চলে গেল।

তখনই ফ্রেদারিকো ইসারায় ফ্রান্সিসকে কাছে ডাকল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এলে ফ্রেদারিকো দুর্বল হাতে গলা থেকে আয়নাটা খুলে ওর হাতে দিল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল — 'ফ্রান্সিস, তোমাকে আমি উপযুক্ত মানুষ ব'লে মনে করি। সব কথা তোমাকে বলেছি। কিছুই গোপন করি নি। সাহস থাকলে তবেই মুক্তো এনো। কিন্তু সেইসব মুক্তো নিয়ে কোনোদিন ব্যবসা ক'রো না।'

ফ্রান্সিস মাথা নীচু ক'রে রইলো। কোন কথা বলল না। আয়নাটা দু-একবার উল্টে-পাল্টে দেখে কোমরে গুঁজে রাখলো।

একটু বেলা হ'তে লা ক্রুশ কাঠের পা ঠক্-ঠক্ করতে করতে এলো। খুক্-খুক্ ক'রে হেসে ফ্রেদারিকোর কাছে এসে দাঁড়াল। বললো — শুনলাম, ভালো আছো। তা'হলে এবার মুক্তোর সমুদ্রে রহস্যটা বলো।

—- আমি যা জানি বলেছি, আর কিছু জানি না।

লা ক্রুশ চীৎকার ক'রে উঠল — 'মিথ্যাবাদী ফেরেববাজ! তুমি আমার কাছে সব কথা বলিস্ নি।' একটু থেমে বলল 'সেরে ওঠ্, তারপর চাব্‌কে তোর পিঠের

চামড়া তুলবো।' লা ক্রুশ চ'লে গেল। বেনজামিন ফিরে এসে ফ্রেদারিকোর কাছে বসলো। ওকে একটা ওষুধ খাইয়ে বেনজামিন বলল — 'ক্যাপ্টেন কি জানতে চায় ব'লে দিলেই তো পারো। কতদিন আর চাবুকের মার খাবে?'

— 'তুই পাগল হ'য়েছিস্ বেনজামিন — ঐ রকম একটা নরঘাতক শয়তানকে মুক্তোর সমুদ্রের রহস্য বলে দেব? অসম্ভব।' দুর্বল শরীরে যতটা গলার জোর দিয়ে বলা সম্ভব ফ্রেদারিকো বললো। বেনজামিন আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে চলে গেলো।

দুপুরের দিকে ফ্রেদারিকো ফ্রান্সিসকে ডেকে বলল — 'কপালে হাত দিয়ে দেখো তো, মনে হচ্ছে আবার জ্বরটা বাড়ছে।

ফ্রান্সিস কড়ায় বাঁধা হাত দু'টো ফ্রেদারিকোর কপালে রাখলো। দেখলে বেশ গরম। বুঝল বেশ জ্বর এসেছে। মিথ্যে ক'রে বলল — 'জ্বরটা সামান্য বেড়েছে, ও কিছু না সেরে যাবে।'

ফ্রেদারিকো কোন কথা বলল না। চোখ বুঁজে চুপ ক'রে শুয়ে রইল।

তখন সন্ধ্যে হ'বে। ফ্রেদারিকো মাথা এপাশ-ওপাশ ক'রে গোঙাতে লাগল। ভীষণ জ্বরে ওর গা পুড়ে যাচ্ছে। একটু পরেই ও জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বেন্জামিনকে ডাকতে লাগলো। বেন্জামিন কয়েদ ঘরে ঢুকেই ফ্রেদারিকোর কাছে দৌড়ে এলো। কপালে হাত দিয়েই বুঝলো অবস্থা ভালো নয়। ও ছুটলো বৈদ্যিকে ডাকতে। বৈদ্যি সব দেখে শুনে ওর চিবুকের ছুঁচালো দাড়িতে হাত বুলোলো কয়েকবার। তারপর ঝোলা থেকে একটা ওষুধ বের ক'রে বেন্জামিনকে দিলো খাইয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু ফ্রেদারিকোকে ওষুধ খাওয়ানো গেলো না। দাঁতে-দাঁত লেগে আছে। মুখে ঢেলে দিতে ওষুধটা মুখের কষ বেয়ে পড়ে গেলো। বৈদ্যি একটু মাথা নেড়ে হতাশার ভঙ্গি করল। তারপর ওর ঝোলাটা নিয়ে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে কয়েকটা জোর ঝাঁকুনি দিয়ে ফ্রেদারিকোর দেহটা স্থির হ'য়ে গেল। ওর শরীরটা আস্তে-আস্তে একেবারে ঠান্ডা হ'য়ে গেল। ফ্রান্সিস ওর গায়ে হাত দিলো। দেখলো বরফের মত ঠান্ডা। বুকে কান পাতলো, কোন শব্দ নেই। নাকের কাছে হাত রাখলো। নিঃশ্বাস পড়ছে না। বেনজামিন তখনও একটা কাঁচের পাত্রে জল ঢেলে ওষুধ গুলছিল! ফ্রান্সিস ডাকলো — 'বেন্জামিন।'

বেন্জামিন কোন কথা না ব'লে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল — 'ফ্রেদারিকো মারা গেছে।'

বেন্জামিন বিশ্বাস করলো না। ও ফ্রেদারিকোর কপালে হাত রাখলো। বুকে হাত রাখল। তারপর মাথাটা নাড়তে লাগল। ফ্রেদারিকোর শরীরে কোন সাড় নেই। বেন্জামিন গোল মুখ কুঁচকে উঠল। ও দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিসরা সকলেই অবাক চোখে বেন্জামিনের দিকে তাকিয়ে রইল। এই পাথরের মত কাল্চে কঠিন মুখের মানুষটার মধ্যে তা'হলে স্নেহ-ভালবাসার অস্তিত্ব আছে। অন্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাহ'লে ওর কোন পার্থক্য নেই। আশ্চর্য! বেন্জামিনের কঠিন ভাবলেশহীন মুখে কোন কিছু বোঝার উপায় ছিল না।

সারারাত ফ্রেদারিকোর মৃতদেহটা ঘরের বিছানাতেই পড়ে রইল। পরদিন

সকালবেলা একজন জলদস্যু এল। মাথা ঢাকা রুমাল, একটা ভাঁজকরা সিল্কের চাদরের মত। বোঝা গেল, কেউ মারা গেলে এই লোকটাই পাদ্রীর কাজ করে। পাদ্রীর হাতে একটা শতছিন্ন বাইবেল। বাইবেলটা একবার ফ্রেদারিকোর কপালে ছোঁয়ালো। তারপর বাইবেল থেকে কিছুটা পড়ল। 'আমেন' ব'লে কপালে, বুকে, কাঁধে, হাত ছুঁইয়ে ক্রুশের চিহ্ন আঁকল। তারপর চলে গেল। বেন্‌জামিন আর দু'জন পাহারাদার ফ্রেদারিকোর মৃতদেহ ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেল সমুদ্রে ফেলে দেবার জন্যে।

ফ্রেদারিকোর মৃত্যুসংবাদ শুনে লা ক্রুশের মুখের ভাব কেমন হলো, সেটা আর ফ্রান্সিসদের দেখা হ'ল না। তবে সংবাদটা শুনে লা ক্রুশ যে খুব মুষড়ে পড়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ফ্রান্সিস ভাবল, এর পরে লা ক্রুশ বোধহয় চাঁদের দ্বীপে আর যাবে না। ওর এই অনুমানটা হ্যারিকে বললো। হ্যারি কিন্তু মাথা নেড়ে বলল — উঁহু — দেখো — ও চাঁদের দ্বীপে যাবেই। মুক্তোগুলো ও হাতছাড়া করবে না কিছুতেই।

হ্যারির অনুমানই ঠিক হলো দু'দিন পরেই লা ক্রুশের ক্যারাভেল 'সোফালা' বন্দরে ভিড়ল। পেছনে বাঁধা ফ্রান্সিসদের জাহাজটা।

তখন সবে ভোর হ'য়েছে। 'সোফালা' নামেই একটা বন্দর। এমন কিছু বড় বন্দর নয়। জাহাজঘাটা বলে কিছুই নেই। জাহাজ থেকে নৌকো ক'রে পারে যেতে হয়। সেদিন বন্দরটায় আর কোন জাহাজ ছিল না।

বেলা হ'লে দু চারজন ভাজিম্বা বন্দরে এসে দাঁড়াল। ওরা বোধহয় মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া আসা করে। পণ্য বিনিময়ে প্রথায় সেই সময়ে চললেও লা ক্রুশ তো জলদস্যু ওর জাহাজে বিনিময় যোগ্য পণ্য থাকার কথা নয়। ছিলও না। তবু বড় সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে লা ক্রুশ নৌকোয় চড়ে বন্দরের দিকে চলল। লা ক্রুশ বেশ জমকালো পোষাক পরেছে। কোমরের বেল্ট-এর ওপর জড়ির কাজকরা সিল্কের কাপড়ের কোমরবন্ধ। তাতে হাতির দাঁতের বাটঅলা তরোয়াল গোঁজা। পিস্তলটা নেয়নি। মাথার টুপিটা পরিষ্কার। পায়ের পোষাকটার সোনালী জড়িগুলো চক্-চক্ করছে। পায়ের একটা বুট ঘষে-ঘষে বেশ পরিষ্কার করা হ'য়েছে। গোঁফ মোম দিয়ে পাকিয়ে ছুঁচালো করা হ'য়েছে। বড় সর্দার কিন্তু সেই মার্কামারা গেঞ্জী গায়ে। পায়ে বুট জুতো। লা ক্রুশ কিন্তু হাঁসের ডিমের মতো মুক্তো বসানো গলার হারটা পরেনি। ওর যে মুক্তোর সমুদ্রের একটা মুক্তো আছে, এটা ও প্রকাশ করলো না। এটা তার বুদ্ধির পরিচয় দিল। সমুদ্রের তীরে নেমে তারা দু'জন বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। লক্ষ্য রাজবাড়ি। যে দু'চারজন ভাজিম্বা এসে বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বেশ অবাক হ'য়ে লা ক্রুশের পোষাক, তরবারি এসব দেখতে লাগল। বড় সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে লা ক্রুশ চললো রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে।

তীরভূমির বালি ছাড়াতেই দেখা গেল দু-তিনটে বড়-বড় ঘর। সেই রেনট্রির পাতা বাকল দিয়ে তৈরি। এগুলো গুদাম ঘর। তামাকপাতা মধু, এসব এই ঘরগুলোতে রাখে। বিদেশী জাহাজ আসে। কাপড়, চিনি এসব জিনিসের সঙ্গে

ভাজিম্বা ব্যবসাদারেরা পণ্য বিনিময় করে, এই জন্যেই এখানে গুদামঘর করা হ'য়েছে।

গুদামঘরগুলো ছাড়িয়ে লা ক্রুশ আর বড় সর্দার হেঁটে চললো। এই জায়গাটায় বাজার মত ব'সেছে। বুনো ফল, আনারস, নানা রকম সামুদ্রিক মাছের পসরা নিয়ে ভাজিম্বা ব্যবসাদারেরা বসেছে। এখানে ভাজিম্বাদের ভিড় হ'য়েছে। লা ক্রুশ আর বড় সর্দার চলেছে। অনেকেই চেয়ে-চেয়ে ওদের দেখেছে।

লা ক্রুশ যখন রাজবাড়ি পৌঁছল, তখন একটু বেলা হ'য়েছে। রাজদরবার তখনও শুরু হয় নি। শুধু সেনাপতি আর কিছু দ্বাররক্ষী দরবারঘরে রয়েছে সেনাপতি একটা কাঠের আসনে বসে আছে। লা ক্রুশ সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করলো — 'রাজা কখন আসবে?'

— 'আসার সময় হ'য়ে এসেছে।' সেনাপতি ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বলল। একমাত্র সেনাপতিই পর্তুগীজ ভাষা একটু বোঝে। ভাঙা-ভাঙা বলতেও পারে।

কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন লাল সার্টিনের কাপড় পরা কয়েকজন রক্ষী খোলা তরোয়াল হাতে দরবার ঘরে ঢুকলো। তাদের পেছনে-পেছনে ন্যাড়া মাথা রাজা ঢুকলো। তার সঙ্গে মন্ত্রী আর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কয়েকজন ঢুকলো। যে যার কাঠের আসনে বসলো। রাজা মুক্তো বসানো কাঠের সিংহাসনে বসলো।

একপাশে একটি ভাজিম্বা স্ত্রীলোক দাঁড়িয়েছিল। সেনাপতি তাকে গিয়ে কি বললো। স্ত্রীলোকটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। তারপর রাজার দিকে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে কি বলতে লাগলো। ওর বলা শেষ হ'লে রাজা ডানহাত ওপরের দিকে তুলে তর্জনী উঁচু ক'রে কি বলল। স্ত্রীলোকটি চোখ মুছে — সেনাপতির দিকে তাকিয়ে রইলো। সেনাপতি কি যেন বললো। স্ত্রীলোকটি তখন হাসতে হাসতে চ'লে গেলো।

তখন সেনাপতি লা ক্রুশের কাছে এসে বললো — 'আপনার নাম কি?'

— বলুন যে লা ক্রুশ এসেছে। কিছু সওদা করতে চায়।

সেনাপতি তখন রাজার কাছে গেল। আস্তে-আস্তে কি বললো। রাজা লা ক্রুশকে কাছে আসার ইঙ্গিত করল। লা ক্রুশ এগিয়ে রাজার কাছে এলে রাজা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। লা ক্রুশ রাজার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল চুম্বন ক'রে শ্রদ্ধা জানাল। শ্রদ্ধা জানাবার এই রীতিটা লা ক্রুশ আগে থেকে জানতো। তারপর রাজা কি জিজ্ঞেস করলেন। সেনাপতি কাছে এগিয়ে এলো। পর্তুগীজ ভাষায় রাজার প্রশ্নটা বললো — তুমি কি সওদা করতে চাও? লা ক্রুশ বললো — 'আমার সঙ্গে দু'টো মস্ত বড় হীরের খন্ড আছে। তার একটা আপনাকে দিতে চাই। বদলে আমাকে দেড়'শ মুক্তো দিতে হবে।'

সেনাপতি কথাটা ভাজিম্বা ভাষায় রাজাকে বলল। রাজা দু' একবার ন্যাড়া মাথাটা ঝাঁকালেন। তারপর বললেন — 'আগে হীরের খন্ডটা দেখবো, তারপর কথা হবে।'

' — বেশ — কখন দেখতে আসবেন বলুন' — লা ক্রুশ বললো।

— 'বিকেলে যাবো' — রাজা বললেন।

কথাবার্তা এখানেই শেষ হলো। ততক্ষণে দু'জন-একজন ক'রে আরো কয়েকজন বিচারপ্রার্থী এসে জড়ো হ'য়েছে। লা ব্রুশ বড় সর্দারের সঙ্গে ফিরে এলো।

বিকেল নাগাদ লা ব্রুশ ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে রাজার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। সঙ্গে বড় সর্দার।

একটু পরেই চাঁদের দ্বীপ থেকে অনেকগুলো নৌকো এই জাহাজের দিকে আসছে দেখা গেল। নৌকাগুলো যখন এগিয়ে এলো, দেখা গেল, মাঝখানের নৌকোটায় রাজা ব'সে আছেন। অন্য নৌকোগুলোতে সেনাপতি, মন্ত্রী ও নানা অমাত্যরা।

রাজা-মন্ত্রী সেনাপতি আর অন্যান্য ব্যক্তিরা জাহাজটায় উঠে এল। হীরে রাখা গাড়ি দু'টোর কাছে তাদের নিয়ে গেল লা ব্রুশ। রাজা, সেনাপতি, মন্ত্রী আর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ঘুরে-ঘুরে হীরে দু'টো দেখলো। ওদের চোখে গভীর বিস্ময়। হীরে দু'টোর ওপর অস্তগামী সূর্যের আলো পড়ল। বিচিত্র রঙের খেলা চলল হীরে দু'টোর গায়ে। রাজা খুব খুশী। কয়েকবার নিজের ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। রাজা সেনাপতিকে ডেকে বললেন, 'আমরা দু'টো খন্ডই নেবো।' সেনাপতি সে কথা লা ব্রুশকে বললো। লা ব্রুশ মাথা নেড়ে বলল — 'না—একটা খন্ডই আমরা বিক্রী করব।'

কথাটা সেনাপতি রাজাকে বলতেই ক্রোধে রাজার মুখ আরক্ত হলো। রাজা চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন — 'দুটো খন্ডই আমার চাই।' রাজা আর দাঁড়ালেন না। জাহাজ থেকে সবাই নৌকোয় নেমে গেল। নৌকোয় চড়ে সবাই ফিরে গেল চাঁদের দ্বীপে।

লা ব্রুশ এবার বুঝল, সাবধান হবার সময় এসেছে। ভাজিম্বারা যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে হীরে দু'টোর লোভে। তাই লা ব্রুশ গোলন্দাজ জলদস্যুদের ডাকলো। হুকুম দিল — 'কামান, গোলা সব তৈরি রাখো। তৈরি হও সব?'

জলদস্যুরা অস্ত্রঘর থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনে ডেক-এ জড়ো করল। সবাই তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাত হ'তে লাগল। জলদস্যুরা জাহাজের ডেক-এ সারিবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। লা ব্রুশ অধীর হ'য়ে কাঠের পা ঠক্ ঠক্ ক'রে ডেক-এ পায়চারি করতে লাগল। সময় বয়ে চললো। রাত গভীর হ'তে লাগল।

হঠাৎ দেখা গেল সোফালার সমুদ্র তীরে মশাল হাতে ভাজিম্বা যোদ্ধারা জড়ো হ'তে লাগল। হাজার-হাজার মশালের আলোয় সমুদ্রতীর ভরে গেল। ওরা নৌকায় চড়ে লা ব্রুশের ক্যারাভেল-এর দিকে আসতে লাগল।

লা ব্রুশ একদৃষ্টিতে এতক্ষণ তাকিয়েছিল মশালের আলোয় উজ্জ্বল সমুদ্রতীরের দিকে। এবার লা ব্রুশ কোমার থেকে তরোয়াল বের করল। শূন্যে তরোয়ালের কোপ দেবার মত চালিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল 'গোলা ছোঁড়ো'।

দু'টো কামান সঙ্গে-সঙ্গে গর্জে উঠল। কামানের গোলা দু'টো অন্ধকার দিয়ে জ্বলন্ত উল্কার মতো গিয়ে পড়লো সমুদ্রতীরে। আর্ত চীৎকার উঠল ভাজিম্বা সৈন্যদের মধ্যে। একটুক্ষণ বিরতির পর আবার আগুনের গোলা ছুটল। পড়ল গিয়ে মশাল হাতে ভাজিম্বা সৈন্যদের মধ্যে। আবার আর্ত চীৎকার উঠল। এবার দেখা গেল, মশালগুলো ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেছে। এর মধ্যে বেশ কিছু ভাজিম্বা সৈন্য নৌকা বেয়ে ক্যারাভেলের গায়ে লাগল। ক্যারাভেল থেকে ঝোলানো দড়ি-দড়া নোঙরের দড়ি এসব বেয়ে ভাজিম্বা সৈন্যরা অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে ক্যারাভেলের ডেক-এ উঠে আসতে লাগল। শুরু হলো সম্মুখ যুদ্ধ। জলদস্যুদের হাতে তরোয়াল। ভাজিম্বা সৈন্যদের হাতে লম্বা বর্শা। ওরা বর্শা ছুঁড়ে দু'জন জলদস্যুকে ঘায়েল করলো। কিন্তু বর্শা হাতছাড়া হওয়াতে নিরস্ত্র অবস্থায় ওদের মৃত্যুবরণ করতে হলো। আস্তে-আস্তে ভাজিম্বা সৈন্যদের অনেকেই মারা পড়ল। যে দু'একজন বেঁচে ছিল, তারা বর্শা ফেলে দিয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল। ওদিকে তখনও কামানের গোলা ছুটছে। সমুদ্রতীরে বহু ভাজিম্বা সৈন্য মারা পড়ল। যারা নৌকায় চড়ে এসেছিল, তাদের অনেকে জলদস্যুদের হাতে মারা পড়ল। ভাজিম্বারা হেরে যেতে জলদস্যুরা চীৎকার ক'রে উঠলো।

কামানের গোলার শব্দ যুদ্ধের হৈ-হুল্লা ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরে ব'সে শুনতে পাচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর যখন জলদস্যুরা এক সঙ্গে মিলে জয়ধ্বনি দিলো তখন ওরা বুঝল, যুদ্ধ শেষ। ভাজিম্বারা পরাজয় বরণ করেছে। ফ্রান্সিস ডাকল — 'হ্যারি?'

হ্যারি চিন্তিতস্বরে বলল — 'হুঁ, লা ক্রুশ যুদ্ধে জিতে গেল।'

— ভাজিম্বারা জিতলে তবু মুক্তির আশা ছিল কিন্তু এখন। ফ্রান্সিস আর কথাটা শেষ করলো না।

— হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। একটা উপায় বার করতেই হবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা না ব'লে কাঠে ঠেসান দিয়ে চোখ বুজে আধশোয়া হ'য়ে রইল।

লা ক্রুশ খুব খুশি। ও এটাই চাইছিল। ওর পরিকল্পনাই ছিল চাঁদের দ্বীপ অধিকার করা। তা'হলেই মুক্তোর সমুদ্র হাতের মুঠোয়, যত খুশি মুক্তো তোলা যাবে। মুক্তো বিক্রী করে, হীরে বিক্রী ক'রে ও কোটি-কোটি গিনির মালিক হবে। তখন জলদস্যুদের ছেড়ে নিজের দেশে চলে যাবে। প্রচুর জায়গা জমি কিনে রাজপ্রাসাদের মত বাড়ি ক'রে রাজার হালে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে।

ভোর হলো। লা ক্রুশের কয়েকজন জলদস্যু জলে নামল। যে সব নৌকাগুলো চড়ে ভাজিম্বারা এসেছিল, সেগুলো সমুদ্রের এখানে-ওখানে ভাসছিল। জলদস্যুরা সে-সব নৌকাগুলো ক্যারাভেল-এর কাছে নিয়ে এল। সে সব নৌকাগুলোতে জলদস্যুরা উঠল। ক্যারাভেল-এর সঙ্গে যে নৌকাটা থাকে, সেটাতেই জালে ক'রে লা ক্রুশকে নামিয়ে দেওয়া হলো। লা ক্রুশ আর অন্য জলদস্যুরা নৌকায় চড়ে চললো সোফালা বন্দরের দিকে। আজ কিন্তু লা ক্রুশের গলায় ঝুলছে মুক্তোর লকেট বসানো মালাটা।

ওরা সমুদ্রতীরে পৌঁছে দেখলো, কামানের গোলায় এখানে-ওখানে নানা জায়গায় গর্ত হ'য়ে গেছে। বহু ভাজিস্বা সৈন্যদের মৃতদেহ সমুদ্রতীরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। সবার সামনে লা ক্রুশ। হাতে খোলা তরোয়াল। কোমরে গোঁজা পিস্তল। ওর পেছনেই বড় সর্দার। তারপর অন্য জলদস্যুরা। সবার হাতেই খোলা তরোয়াল।

ওরা রাজবাড়ি পৌঁছে দেখলো রাজবাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। লা ক্রুশ আস্তে-আস্তে গিয়ে কাঠের সিংহাসনে বসলো। খুশিতে হা-হা ক'রে হাসতে লাগল। জলদস্যুরাও ক্যাপ্টেনের হাসির সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু মুক্তোর খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল, একটা মুক্তোও রাজদরবারে নেই। শুধু সিংহাসনে যে ক'টা মুক্তো গাঁথা ছিল, সে ক'টাই আছে শুধু। লা ক্রুশ রেগে আগুন হ'য়ে গেল। ক্রুদ্ধস্বরে বড় সর্দারকে হুকুম দিল — 'রাজা-সেনাপতি এরা সব কোথায় লুকিয়ে খুঁজে বের কর। কোন দয়া-মায়া দেখাবে না। যাকে পাবে কচুকাটা করবে।

হৈ-হৈ করতে জলদস্যুরা তরোয়াল হাতে বেরিয়ে পড়লো। সব ঘর বাড়ি খুঁজতে লাগল। স্ত্রীলোক, শিশুদের অবাধে হত্যা করতে লাগল। পুরুষ যাদের পেল, কিছু মেরে ফেলল — কিছুকে ধ'রে এনে শাস্তিঘরে পুরল। কিন্তু কেউ রাজা বা সেনাপতির কোন হদিশ দিতে পারল না।

রাজবাড়িতে গিয়ে জলদস্যুরা লা ক্রুশকে এই সংবাদ দিল। লা ক্রুশ চীৎকার ক'রে বলল — 'নিশ্চয়ই জঙ্গলে লুকিয়েছে। সব কটাকে খুঁজে বের কর।'

বড় সর্দার কয়েকজন জলদস্যুকে রাজা, সেনাপতি আর অন্যদের খুঁজে বের করবার ভার দিল। তারা বনের দিকে চলে গেলো।

লা ক্রুশ কাঠের সিংহাসন থেকে সব ক'টা মুক্তো বের ক'রে দেবার হুকুম দিল। জাহাজে মেরামতে কাজ করে, কাঠের কাজ জানা এক জলদস্যু মুক্তোগুলো বের করবার জন্যে ছেনি-বাটালি-হাতুড়ি নিয়ে এল। লা ক্রুশ বড় সর্দারকে বলল 'যে কটা ভাজিস্বাকে ধরেছো, আমার কাছে নিয়ে এসো।'

শাস্তিঘর থেকে আট-দশজন ভাজিস্বাকে লা ক্রুশের সামনে আনা হ'ল। লা ক্রুশ ওদের দিকে তাকিয়ে বললো — 'তোমাদের মধ্যে যে আমাদের মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো এনে দিতে পারবে, তাকেই আমি ছেড়ে দেব।'

বন্দী ভাজিস্বারা লা ক্রুশের কথা এক বর্ণও বুঝলো না। ওরা নির্বাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। ক্রুশ তখন গলায় ঝোলানো মুক্তোর লকেটটা দেখাল। নানা-ভাবে ওদের বোঝাল' এবার ওরা বুঝলো। ভয়ে ওদের মুখ শুকিয়ে গেল। ওরা মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

লা ক্রুশ বড় সর্দারকে ডেকে বললো — 'এদের মধ্যে চারজনকে বেছে রাখো। কাল সকালে এদের নিয়ে মুক্তোর সমুদ্রে যাবো।'

বড় সর্দার ভাজিস্বাদের শাস্তিঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। চারজনকে বেছে নিয়ে

আলাদা ঘরে রাখল। যারা রাজা, সেনাপতির খোঁজে জঙ্গলে গিয়েছিল, তারা সন্ধ্যেবেলা ফিরে এল। ওরা কারো খোঁজ পায় নি। গভীর অরণ্য ভাজিম্বাদের নখদর্পণে। জঙ্গলের লুকানো জায়গা থেকে ওদের বের করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। একথা বড় সর্দারই লা ক্রুশকে বোঝাল। কোন কথা না ব'লে গুম হ'য়ে ব'সে রইল লা ক্রুশ। শুধু দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল।

সন্ধ্যের পর থেকেই লা ক্রুশ ভাজিম্বাদের প্রিয় তোয়কো মদ খেতে লাগল। জলদস্যুরা তোয়কো খেয়ে রাস্তায় কোন বাড়ির উঠানে, নয়তো গাছের নীচে ফুর্তির চোটে গড়াগড়ি খেতে লাগল। লা ক্রুশ তোয়কোর নেশায় বুঁদ হয়ে কাঠের সিংহাসনের ওপরেই গুটি-শুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়ল। নিজেকে ভাবতে লাগল সম্রাট নেপোলিয়ন।

পরের দিন একটু বেলায় লা ক্রুশের ঘুম ভাঙল। বড় সর্দারকে ডেকে বলল 'চারজনকে বেছে রেখেছো?'

বড় সর্দার মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'চলো সব, মুক্তোর সমুদ্রে যাবো। এক্ষুণি।'

মুক্তোর সমুদ্রে যাবার পথ ব'লে কিছু নেই। ঘন গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাছের ডাল, ঝোপ কেটে-কেটে পথ ক'রে নিতে হচ্ছে। কত বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র আকারের পাখি এই বনে। কত রকমের গাছ-পাখি এই বনে। প্রচুর রেন-ট্রী, র্যাফিয়া-রাখা গাছ, পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু। মাথায় পাতাগুলো সুন্দরভাবে ছড়ানো। বিচিত্র রকমের লেমুর, ফোসা, তন্দ্রাকাস প্রাণী। বনের মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে-ক'রে ওরা যখন মুক্তোর সমুদ্রের ধারে পৌঁছল, তখন বেশ বেলা হ'য়ে গেছে। মুক্তোর সমুদ্রের জল নীল, নিস্তরঙ্গ। দূরে কাঁচপাহাড় দেখা যাচ্ছে।

যে চারজন ভাজিম্বাকে লা ক্রুশ ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, এবার তাদের জলে নামাবার তোড়জোড় চলল। বড় সর্দার ওদের জলে ঠেলে-ঠেলে শাসাচ্ছে আর ওরা ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে আসছে। লা ক্রুশ বলল — 'দু'জন-দু'জন ক'রে নামাও। উঠে আসতে চাইলে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে দাও, তাহ'লেই আর উঠে আসতে সাহস পাবে না।'

তাই করা হলো। লা ক্রুশ চেঁচিয়ে বললো — 'ডুব দিয়ে নিচে থেকে মুক্তো এনে দাও, তাহ'লেই তোমাদের ছেড়ে দেবো।' ভাজিম্বারা এতক্ষণে ভালোভাবেই বুঝে ফেলেছে লা ক্রুশ কি চায়। দু'জন ভাজিম্বাকে ঠেলে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। একজন উঠে আসতে-আসতে পারের দিকে এলে বড় সর্দার বর্শার খোঁচা দিতে লাগল। তারপর কেউ তরোয়ালের খোঁচা, কেউ ভাঙা ডাল দিয়ে মাথায় মারতে লাগল। এবার ভাজিম্বা যুবকটি জলে ডুব দিল। অন্যজন যে ডুব দিয়েছিল, সে আর উঠল না। এই যুবকটি মাত্র একবার জলের ওপর মাথা তুলেছিল। তারপর ডুবে গেল। আর উঠলো না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আর দু'জনকে নামানো হ'ল একইভাবে। তরোয়াল বর্শা, আর গাছের ডাল উঁচিয়ে রইল জলদস্যুরা। ওরাও উঠে আসতে সাহস পেল না। একজন ডুব দিলো। ওর দেখাদেখি অন্য মধ্যবয়স্ক ভাজিম্বাটিও ডুব দিল। যে প্রথম ডুব দিয়েছিল সে আর উঠল না। কিন্তু মধ্যময়স্ক ভাজিম্বাটি উঠল। তাড়াতাড়ি পারের দিকে সাঁতরে আসতে লাগল। জলদস্যুরা চীৎকার ক'রে উৎসাহ দিতে লাগল। মধ্যবয়স্কটি এসে পারে উঠল।

দেখা গেল ওর ডান হাতের মুঠোয় একটা মুক্তো। লোকটা হাঁপাতে লাগল। দেখা গেল ওর সারা গায়ে যেন ছুঁচ বিঁধিয়ে ফুটো ক'রে দেওয়া হয়েছে। রক্ত বেরুচ্ছে ফুটোগুলো দিয়ে। লোকটা বারকয়েক মাথা এপাশ করল। তারপর আস্তে-আস্তে চোখ বন্ধ ক'রে ঘুমিয়ে পড়ল। ওর দিকে তখন কারো খেয়াল নেই। সবাই লা ক্রুশের চারপাশে জড়ো হ'য়ে মুক্তোটা দেখছে। লা ক্রুশের লকেটের চেয়ে এই মুক্তোটা বড়। লা ক্রুশ হাসছে ঘিরে দাঁড়ানো জলদস্যুরাও আনন্দে অধীর হ'য়ে চীৎকার করতে লাগল। কেউ কেউ নাচতে লাগল। মুক্তো এনেছিল যে মধ্যবয়স্ক ভাজিম্বাটি, সে তখন মারা গেছে।

কয়েকদিন কাটলো। লা ক্রুশের মনে শান্তি নেই। সমস্ত চাঁদের দ্বীপের রাজ্য এখন ওর। মুক্তোর সমুদ্র হাতের কাছে — ওরই অধিকারে। অথচ মুক্তো তোলা যাচ্ছে না। মুক্তোর সমুদ্রে যত মুক্তো আছে, সব চাই ওর। কিন্তু এনে দেবে কে? যে ক'জন ভাজিম্বাকে শাস্তিঘরে রাখা হয়েছে, সব ক'জনই বৃদ্ধ-অথর্ব। তারা মুক্তো আনতে পারবে না। জলদস্যুরা ওর হুকুমে শক্ত সামর্থ্য ভাজিম্বাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কাউকে ধরতে পারছে না। বনের মধ্যে সব যেন হাওয়ায় মিলে গেছে।

ক্রুদ্ধ লা ক্রুশ কখনও কাঠের সিংহাসনে উঠে কাঠের পা নিয়ে লাফাচ্ছে, কখনও বিনা কারণে বড় সর্দারকে যাচ্ছেতাই বলছে, তরোয়াল খুলে জলদস্যুদের তাড়া দিচ্ছে — 'যে ক'রে হোক, শক্ত সমর্থ ভাজিম্বাদের ধ'রে আনো।'

বড় সর্দার, জলদস্যুরা লা ক্রুশের ভয়ে সন্ত্রস্ত।

এদিকে কয়েদ ঘরে ফ্রান্সিসদের একঘেঁয়ে দিন কাটছে। বেনজামিনের কাছে ওরা শুনেছে চাঁদের দ্বীপ এখন লা ক্রুশের কবজায়। রাজা, সেনাপতি সব পালিয়েছে।

সেদিন সকালে খাবার নিতে এলে বেন্‌জামিনকে ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলে — 'লা ক্রুশ কবে ক্যারাভেল-এ ফিরবে?'

— সব মুক্তো না নিয়ে ফিরবে না ক্যাপ্টেন।

— সে কি এখনও মুক্তো পায় নি?

— চারজন ভাজিম্বাকে নামিয়েছিল। তিনজন জল থেকে উঠতেই পারে নি। একজন মাত্র একটা মুক্তো এনে দিয়েই ম'রে গেছে। লোকটার সারা গা ফুটো-ফুটো হ'য়ে গিয়েছিল।

ফ্রান্সিস ম্লান হাসল। বললো — 'হবেই তো — মুক্তোর সমুদ্রের প্রহরী লাফ্ মাছ বড় সংঘাতিক।'

খাবার দিতে-দিতে বেন্‌জামিন অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললো — 'তুমি জানলে কি ক'রে?'

'— আমি জানি। ক্যাপ্টেনকে ব'লো আমি মুক্তো এনে দিতে পারি।'

হ্যারি চম্‌কে উঠল। চাপাস্বরে বলল — 'কী বলছো যা-তা।'

ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকালো। বললে — 'হ্যারি আমাদের মুক্তির এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।'

— কিন্তু খুনী লা ক্রুশের কি লোভের শেষ আছে?

— দেখা যাক না। এটাই আমাদের মুক্তির শেষ চেষ্টা। বেন্‌জামিন যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল — 'কথাটা ক্যাপ্টেনকে ব'লো।'

একঘন্টা সময় কাটে নি। বেন্‌জামিন হাঁপাতে হাঁপাতে কয়েদ ঘরে এসে ঢুকলো। ফ্রান্সিসের কাছে এলো। ওর হাতকড়া খুলতে-খুলতে বলল — 'চলো, তোমাকে ক্যাপ্টেন ডেকেছে।'

ফ্রান্সিস উঠতে গেল। হ্যারি ওর হাত চেপে ধরল — 'তুমি পাগল হ'য়েছো?'

ফ্রান্সিস হ্যারির হাতে চাপা দিয়ে ম্লান হাসলো — 'যদি আমার প্রাণের বিনিময়ে আমার এতগুলো বন্ধু মুক্তি পায়, তাহ'লে ক্ষতি কি?'

— 'না, তোমাকে যেতে দেব না।' হ্যারির চোখে জল এসে গেল।

'— ছিঃ, হ্যারি, কাঁদছে? আমরা না ভাইকিং?' ফ্রান্সিস বলে উঠল। হ্যারি আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিসের হাত ছেড়ে দিলো। ফ্রান্সিস বেন্‌জামিনের অলক্ষ্যে একবার কোমরে গোঁজা আয়নাটায় হাত বুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। লোহার দরজার কাছে একবার ঘুরে দাঁড়াল। বললো 'ভাইসব — যদি আমি না ফিরি, তবে হ্যারিকে তোমরা দলনেতা ব'লে মেনে নিও। ও যা বলবে তাই ক'রো।'

কথাটা ব'লে ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল। ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। সবাই হ্যারির মুখে ঘটনাটা শুনল। ওদের মুক্তির বিনিময়ে ফ্রান্সিস তার নিজের জীবনটা বাজি ধ'রেছে। সকলেই হৈ-হৈ ক'রে উঠল — 'ফ্রান্সিসকে ফিরিয়ে আনো। ওর জীবনের বিনিময়ে আমরা মুক্তি পেতে চাই না।'

হ্যারি ভাইকিংদের লক্ষ্য করে বললো — 'ভাইসব — তোমরা শান্ত হও। শোন — ফ্রান্সিস মুক্তোর সমুদ্রের ভয়াবহ বিপদের কথা সবই জানে। সেই বিপদ থেকে বাঁচবার উপায়ও জানে। শুধ মুক্তোর সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসার রহস্যটা ওর অজানা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো যেন এই রহস্যটাও ভেদ করতে পারে। তাহ'লেই ওর জীবনের কোন আশঙ্কা থাকবে না। সকলেই চুপ ক'রে হ্যারির কথা শুনল। কেউ আর কোন কথা বলল না।

বেন্‌জামিনের পেছনে-পেছনে যখন ফ্রান্সিস কয়েদঘরের বাইরে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল, তখন চোখে আলো লাগাতে ওর অস্বস্তি হ'তে লাগল। ডেক-এ উঠেই বাইরের উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকাতে পারল না। চোখ জ্বালা করে বুঝে এল। ও দুহাতে চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বেন্‌জামিন ওর দিকে তাকিয়ে বলল — হঠাৎ বাইরে এলে ও-রকম হয়। একটু পরেই সয়ে যাবে। তাই হলো। আস্তে-আস্তে আলো সহনীয় হয়ে উঠল। ও এবার চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিল। বেন্‌জামিনের পেছনে-পেছনে হাঁটতে লাগল।

দু'জনে জাহাজ থেকে নৌকায় নামল। বেনজামিন 'সোফালা বন্দর লক্ষ্য ক'রে নৌকো চালাতে লাগল।

সমুদ্রতীরে পৌঁছে ফ্রান্সিস দেখল, এখানে-ওখানে তখন ভাজিম্বাদের মৃতদেহ পড়ে আছে। কামানের গোলায় সমুদ্রতীরে কোথাও-কোথাও বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

কামানের মুখে ভাজিম্বারা দাঁড়াতে পারে নি। শুধু বর্শা নিয়ে কি কামানের বিরুদ্ধে লড়া যায়।

সোফালা বন্দরের একটা গুদোমঘরও বিধ্বস্ত হ'য়েছে। নির্জন চারদিক। একজন ভাজিম্বাকেও ওরা দেখতে গেল না। বাজারের মত জায়গাটা খাঁ-খাঁ করছে। যে বাড়িগুলো চোখে পড়লো, সেগুলোর দরজা খোলা। কোন জনপ্রাণী নেই। ফ্রান্সিস যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুভব করল। লা ক্রুশের ভয়ে নিশ্চয়ই যারা বেঁচেছিল, তারা বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। এক শ্মশানের রাজা হ'য়ে বসেছে লা ক্রুশ।

ফ্রান্সিসকে নিয়ে বেনজামিন যখন রাজবাড়িতে গিয়ে পৌছল, তখন একটু বেলা হ'য়েছে। লা ক্রুশ কাঠের সিংহাসনে হাত পা ছড়িয়ে বসেছিল। ফ্রান্সিসকে ঢুকতে দেখেই ও লাফিয়ে উঠল। খুক্-খুক্ ক'রে হাসলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো — 'এসো-এসো, ফ্রান্সিস এসো। সত্যি তোমরা বীরের জাত। মুক্তোর সমুদ্রে নামার কথা শুনে সকলের যখন ভয়ে মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, তখন তুমি নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে রাজি হ'য়েছো। এ সোজা কথা? হ্যাঁ? সত্যিই তুমি বীর।'

ফ্রান্সিস এসব কথা ভুলল না। ও প্রথমেই শক্ত ভঙ্গিতে শর্তের কথা তুলল — আমি মুক্তো এনে দেবো কিন্তু একশর্তে।'

— কি শর্ত?

— আমাকে আর আমার বন্দী বন্ধুদের সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তি দিতে হবে। আমাদের জাহাজ ফিরিয়ে দিতে হবে।

— 'বেশ তো ভালো কথা। কিন্তু হীরে দু'টো আমার ক্যারাভেল-এ রেখে যেতে হবে।'

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। ভেবে দেখল, এ ছাড়া উপায় নেই। হীরে উদ্ধারের কথা পরে ভাববো। বলল — বেশ! এবার আর একটা শর্ত।

— বলো।

— আমি একবার ডুব দেবো। আমার ডান হাতের মুঠোয় যে ক'টা মুক্তো আঁটে, সে ক'টাই পাবেন।

লা ক্রুশ একটু হতাশার ভঙ্গিতে বলল — সে আর ক'টা। বড় জোর তিনটে।

— ঐ তিনটে পেয়েই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

লা ক্রুশ একটুক্ষণ ভেবে দাড়িতে হাত বুলিয়ে তারপর বললো — 'বেশ, তাই হবে।'

ফ্রান্সিস একটু হেসে বললো — 'অবশ্য আপনার মত খুনে নরঘাতক যে কতটা শর্ত অনুযায়ী চলবেন, তাতে আমার সন্দেহ আছে।'

তাহাতে বড় সর্দার খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এলো। লা ক্রুশ হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে খুক-খুক ক'রে হেসে বললো — 'যাও খেয়ে নাও গে, আমরা এক্ষুণি বেরুবো।'

পাশের ঘরটাতে রসুইখানা করা হ'য়েছে। বড়সর্দারই ফ্রান্সিসকে ওখানে এনে বসালো। লম্বা-লম্বা সুস্বাদু রুটি, প্রচুর মাংস, মাছ এসব খেতে দিল। কয়েদ ঘরে জঘন্য

খাদ্য খেয়ে-খেয়ে খিদেটাই যেন ম'রে গেছে। এটাও একটা কারণ, আর একটা কারণ বন্ধুদের শুকনো ক্ষুধার্ত মুখগুলো ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ফ্রান্সিস আর খেতে পারলো না। একপাশে খাবার সরিয়ে রেখে উঠে পড়লো। বড় সর্দার হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল — 'করো কি — করো কি, পেট পুরে খেয়ে নাও। অনেকক্ষণ জলে থাকতে হবে।'

— 'আমি আর খাবো না।' ফ্রান্সিস শান্তস্বরে বললো।

* * *

বনের মধ্যে দিয়ে মুক্তোর সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হ'ল। প্রায় সব ক'জন জলদস্যুকেই সঙ্গে নেওয়া হ'য়েছে। এটা দেখে ফ্রান্সিস লা ব্রুশকে জিজ্ঞেস করল — 'এত লোক কি হবে? আমরা তো যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না।'

লা ব্রুশ খুক্-খুক্ ক'রে হাসলো। বললো — 'বিপদ-আপদের কথা কি বলা যায়।'

মুক্তোর সমুদ্রের কাছাকাছি পড়ল অগ্নি-প্রবালের স্তর। সেটা দ্রুতপায়ে পেরোল সবাই। ঠিক দুপুরবেলা ওরা মুক্তোর সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছল। ফ্রান্সিস দেখলো জল শান্ত। হাওয়ায় শিরশির ঢেউ উঠছে। দূরে ঢাকা কাঁচ পাহাড়ের কালো প্রাচীর! ডানদিকে খাড়া উঠে গেছে। প্রকৃতি যেন সুরক্ষিত ক'রে রেখেছে এই মুক্তোর সমুদ্রকে। অবশেষে মুক্তোর সমুদ্র আজ ফ্রান্সিসের চোখের সামনে। কিন্তু বন্ধুরা কেউ দেখতে পেলো না। ফ্রান্সিস মুক্তোর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে এসব সাতপাঁচ ভাবছে, লা ব্রুশ তাড়া দিল — 'কই! নামো শিগ্‌গির।'

ফ্রান্সিস জলে নামল। তারপর সাঁতরাতে-সাঁতরাতে মাঝখানটায় এসে চারদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে ডুব দিল। একটু নামতেই দেখল, আলোর উৎস, সেই অপূর্ব সুন্দর মুক্তোগুলো। ফ্রেদারিকো ঠিকই বলেছিল, তলাটা অমসৃণ। তাতে বড়-বড় আকারের ঝিনুক। কোনটার মুখ খোলা, কোনটা বন্ধ। কোনো-কোনো ঝিনুকের খোলা মুখের মধ্যে মুক্তো রয়েছে। জায়গাটার অপরূপ সৌন্দর্য, মানুষের কল্পনাতেও বোধহয় আসবে না, এমনি অপার্থিব সেই সৌন্দর্য। একটা গভীর বেগুনে নীল আলো জায়গাটাতে আলোকিত ক'রে রেখেছে। হঠাৎ গা ঘেঁষে কি একটা চলে যেতেই ফ্রান্সিস সম্বিত ফিরে পেলো। দেখল, মুক্তোর সমুদ্রের বিভীষিকা লাফ মাছ। পিঠের ছুঁচলো কাঁটাগুলো উঁচিয়ে আছে। বেগুনে নীল আলো লেগে গায়ের আঁশগুলো চক-চক ক'রে উঠলো। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি কোমরে গোঁজা আয়নাটা বের ক'রে অমসৃণ তলাটায় রেখে দিলো। বেশ জোরালো আলো প্রতিবিম্বিত হ'ল। লাফ্ মাছটাকে ওদিকে দ্রুত যেতে দেখলো। দম ফুরিয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস জল ঠেলে উপরে ভেসে উঠলো। ওদিকে ভেসে উঠতে দেখে জলদস্যুরা হৈ-হৈ করে উঠলো। লা ব্রুশের মুখেও হাসি।

ফ্রান্সিস আবার ডুব দিলো। এক ডুবে সোজা নীচে নেমে এলো। ছড়িয়ে থাকা মুক্তো থেকে তিনটে মুক্তো তুললো। তখনই লক্ষ্য করলো অনেক ক'টা লাফ মাছ আয়নাটার কাছে জড়ো হয়েছে। কয়েকটা মাছ আয়নাটায় ঢুঁ দিয়ে যাচ্ছে। ঐ জায়গায় জলটা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। মাছগুলোর মুখ নিশ্চয়ই ফেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

ফ্রান্সিস পায়ে জলের ধাক্কা দিয়ে ওপরে উঠে এল। জলদস্যুরা ওকে জীবিত দেখে আবার চীৎকার ক'রে উঠল। ফ্রান্সিস সাঁতরাতে-সাঁতরাতে তীরে এসে উঠল। লা ব্রুশ খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে এলো। ফ্রান্সিস জল থেকে উঠতে যাবে, লা ব্রুশ ছুটে এসে বললো — 'উঠো না — উঠো না — আর তিনটে দাও।'

ফ্রান্সিস কঠোর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো। বললো — 'এক মুঠোয় যে ক'টা আঁটে তাই এনেছি, দু'বার নামবার তো কথা ছিল না।'

লা ব্রুশ খুক্‌-খুক্‌ ক'রে হাসলো — 'আর তিনটে ব্যাস্‌।'

ফ্রান্সিস বুঝল, যুক্তি শোনার মানুষ নয় লা ব্রুশ। আর তিনটে মুক্তো পেলে যদি সন্তুষ্ট হয়, তা'হলে সেটা এখনই দেওয়া সম্ভব। কারণ লাফ্‌ মাছগুলো এখন আয়নাটায় টুঁ দিতে ব্যস্ত।

ফ্রান্সিস আবার সাঁতরে মাঝখানের দিকে চলল। লা ব্রুশ বড় সর্দারকে ইশারায় ডাকল। ফিস-ফিস করে বললো — সবাইকে তীর বরাবর ছড়িয়ে দাঁড়াতে বলো। ও যেন কিছুতেই উঠে না আসতে পারে। যত মুক্তো আছে, সবই আমার চাই।'

বড় সর্দার ঘুরে দাঁড়িয়ে সবাইকে তাই বললো। তীর বরাবর সবাই তরোয়াল আর বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে পড়লো। ফ্রান্সিসের আর তীরে উঠে আসার উপায় রইলো না।

ফ্রান্সিস মাঝখানটায় এসে ডুব দিল। ফ্রেদারিকো ঠিকই বলে ছিল। গভীরতা বেশি নয়। খুব তাড়াতাড়ি তলায় পৌঁছে গেল। আর তিনটে মুক্তো তুলতে পারলেই মুক্তি আমাদের সকলের। কিন্তু এ কি? ফ্রান্সিসের মাথাটা ঘুরে উঠলো। আয়নার আলোর প্রতিফলন তো দেখা যাচ্ছে না! কোথায় গেল আয়নাটা? হয়তো উলটে গেছে। আর এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না। ফ্রান্সিস সঙ্গে-সঙ্গে হাতে-পায়ে জল ঠেলে, জলে কয়েকটা ধাক্কা দিয়ে ওপরে ভেসে উঠলো। তীরের দিকে সাঁতরাতে যাবে, তখনি দেখলো সারা তীর জুড়ে জলদস্যুরা তরোয়াল, বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে। ওকে ভেসে উঠতে দেখে সবাই অস্ত্র উঁচিয়ে হৈ-হৈ ক'রে উঠল। শয়তান লা ব্রুশ! তোমার মতলব আমার কাছে পরিষ্কার! ফ্রান্সিস মনে-মনে বলল। তারপর এক মুহূর্ত দেরী না ক'রে প্রাণপণে কাঁচ পাহাড়ের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল। ফ্রেদারিকো একটা সুড়ঙ্গমত পথ পেয়েছিল সেটা কোথায়? এই রহস্যটুকু ভেদ করার মধ্যে ওর জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে। ও কাঁচপাহাড়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। হঠাৎ বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত একটা চিন্তা ওকে নাড়া দিয়ে গেল। ঐ যে কাঁচ পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু মাথাটা, ওটা বাঁদিকে কাত হ'য়ে ভাঙা কাঁচের মত উঁচিয়ে ছুঁচালো হ'য়ে আছে না? ফ্রেদারিকোর আয়নাটাও সোজা করে ধরলে ঠিক এমনি — বাঁকা ছুঁচালো একটা দিক ছিল। গলায় ঝোলাবার দড়ি পরবার জন্যে ঠিক ছুঁচলো মাথার নীচে বরাবর ছিল ফুটোটা কি শুধু দড়ি পরাবার জন্য ছিল? না—না—ভীষণ ভাবে চমকে উঠে ফ্রান্সিস প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলো — ওটাই সুরঙ্গপথের ইঙ্গিত। আর এক মুহূর্ত দেরী নয়। শেষ রহস্যের সমাধান হ'য়ে গেছে!

শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে ফ্রান্সিস কাঁচপাহাড়ের চূড়ো লক্ষ্য ক'রে সাঁতার কাটতে লাগল। একটু পরেই নীচে একটা জলের টান অনুভব করল। আর একটু

এগোতেই প্রচন্ড জলের টানে ও তলিয়ে গেল। কিছু স্পষ্ট চোখে পড়ছে না। শুধু দেখলো একটা অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে দিয়ে ও প্রচন্ড বেগে ছুটে চলেছে জলের টানের সঙ্গে-সঙ্গে। হঠাৎ অন্ধকার কেটে গেল। এখানে আলো আছে। জলের টান আর নেই। হাতে-পায়ে জল ঠেলে ফ্রান্সিস ওপরে ভেসে উঠলো। পেছনে তাকিয়ে দেখলো, কাঁচপাহাড় টানা চলেছে সোফালা বন্দরের দিকে। সামনে অসীম সমুদ্র। আঃ — মুক্তির উল্লাস ও জলের মধ্যে দুটো পাক খেল।

ফ্রান্সিস গা ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ দম নিলো। তারপর আস্তে-আস্তে সাঁতার কেটে চলল সোফালা বন্দরের দিকে।

সোফালা বন্দরের কাছাকাছি এসে একটা পাথরের আড়ালে ও হাঁপাতে লাগল। পশ্চিমদিকে তাকিয়ে দেখল সূর্য অস্ত যেতে দেরি আছে। দূরে লা ক্রুশের ক্যারাভেল• আর ওদের জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ, সমুদ্রতীরের দিকে সামুদ্রিক পাখিগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে, আর তীক্ষ্মস্বরে ডাকছে। ও বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে মুক্ত প্রকৃতির রূপ দেখতে লাগল। কতদিন এই আকাশ, মাটি, পাখি, সমুদ্র দেখিনি। কতদিন? হঠাৎ হ্যারি আর অন্য বন্ধুদের বন্দী জীবনের কথা মনে পড়তে ওর মনটা খারাপ হ'য়ে গেল।

পশ্চিমদিকের আকাশ আর সমুদ্রে গভীর লাল রং ছড়িয়ে সূর্য অস্ত গেল। কিন্তু তখনই অন্ধকার নেমে এল না। চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসার জন্যে ফ্রান্সিসকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো।

রাত্রি নেমে আসতেই ফ্রান্সিস ওদের জাহাজটার দিকে সাঁতরে চলল। জাহাজের কাছে পৌঁছে ও নোঙর বাঁধা মোটা কাছিটা বেয়ে-বেয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। লা ক্রুশ এই জাহাজে কোন পাহারাদার রাখে নি। ওকে আর লুকিয়ে কেবিনঘরে আসতে হলো না। কেবিনঘরে আসার সময় ও আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, ক্যারাভেল-এ দু'জন পাহারাদার জলদস্যু ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও ভেবে নিশ্চিন্ত হলো যে ওদের জাহাজটা অন্ততঃ নিরাপদ। এখানে নির্বিবাদে আশ্রয় নেয়া চলবে।

নিজের কেবিনে ঢুকে ফ্রান্সিস ভেজা জামাকাপড় ছাড়ল। ভীষণ খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে হয়। রসুইঘরে গিয়ে ঢুকল। উনুন ধরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে গরম-গরম রুটি আর সুপ তৈরি করল। পেট ভ'রে খেয়ে কেবিনঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। অনেক চিন্তা মাথায়। কি ক'রে বন্ধুদের মুক্ত করা যাবে? কি ক'রে হীরেসুদ্ধ জাহাজটা নিয়ে পালানো যাবে? ও যে মুক্তি পেয়েছে, এটা বন্ধুদের জানানো প্রয়োজন। কিন্তু কি ক'রে জানাবে?

দু'তিনদিন কেটে গেল। ফ্রান্সিস ওদের জাহাজেই লুকিয়েই রয়েছে। খায়-দায় আর ভাবে, কি ক'রে বন্ধুদের মুক্ত করা যায়। ওদিকে লা ক্রুশ-এর ক্যারাভেল-এ যথেষ্ট সংখ্যক জলদস্যুরা রয়েছে, ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে বন্ধুদের মুক্ত করা অসম্ভব। ফ্রান্সিস সুযোগের প্রতীক্ষায় রইল।

ওদিকে বড় সর্দার কয়েকজন জলদস্যুকে নিয়ে পলাতক ভাজিম্বাদের খোঁজে বন-

জঙ্গল তোলপাড় করছিল। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি তো দূরের কথা কোনো সাধারণ ভাজিম্বা যোদ্ধাকেও ওরা খুঁজে বের করতে পারল না।

একদিন বিকেলের দিকে পাহাড়ী এলাকায় বড় সর্দার দলবল নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ একটা পাথরের আড়াল থেকে একটা বর্শা ছুটে এসে বড় সর্দারের পিঠে বিঁধে গেল। বড় সর্দার উবু হ'য়ে পাথরের ওপরপড়ে গেল। বর্শাটা পিঠ ভেদ ক'রে বুক পর্যন্ত চলে এসেছে। বড় সর্দার মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল। দু'তিনজন জলদস্যু মিলে বর্শাটা খুলে ফেলল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। আহত বড় সর্দারকে কাঁধে নিয়ে ওরা রাজবাড়িতে নিয়ে আসার পথে বড় সর্দার মারা গেল। বড় সর্দারের সঙ্গীরা অবশ্য যে পাথরের আড়াল থেকে বর্শাটা ছুটে এসেছিল, সেখানে তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজল, কিন্তু কারোর দেখা পেল না। ওদের মনে বেশ ভয়ও ঢুকেছিল। আবার কখন কোন পাথরের আড়াল থেকে বর্শা ছুটে আসে। ওরা সন্ধ্যে হবার আগেই ঐ তল্লাট ছেড়ে চলে এল।

লা ব্রুশ মৃত সর্দারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর চেঁচিয়ে হুকুম দিল — 'ক্যারাভেল'-এ যত লোক আছে, সবাইকে এখানে জড়ো কর। ক্যারাভেল-এ শুধু বেন্‌জামিন থাকবে, পাহারা দেবে। আর গোলাঘর পাহারা দেবার জন্য দু'জন থাকবে। আর কাল সকালেই পাহাড়ী এলাকার দিকে তল্লাসীতে বেরুবে। কোন ভাজিম্বাকে দেখলেই হত্যা করবে।

লা ব্রুশ ছোট সর্দারকে বড় সর্দারের দায়িত্ব দিল। এই সর্দার ছিল একটু রোগাঢ্যাঙা। সে পরদিন সকালেই নৌকো চড়ে ক্যারাভেল-এ এলো। সমস্ত পাহারাদারকে নৌকো ক'রে সবাইকে দ্বীপে নিয়ে এল। তারপর রাজবাড়িতে এনে জড়ো করল। ক্যারাভেল-এ রইল শুধু বেন্‌জামিন। আর দু'জন গোলাঘর পাহারাদার।

সব জলদস্যু বড় সর্দারের নেতৃত্বে খোলা তরোয়াল হাতে বন-জঙ্গল চষে ফেলল। কোন ভাজিম্বাকেই ধরতে পারল না। দুপুরের পরে শুরু করল, পাহাড়ী এলাকায় তল্লাসী; একজন ভাজিম্বা পাথরের আড়াল থেকে পালাতে গিয়ে ওদের নজরে পড়ে গেল। বড় সর্দার সবার আগে তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটল ভাজিম্বা যুবকটিকে ধরতে। কিন্তু বেগতিক বুঝে ভাজিম্বা যুবকটি উঁচু খাড়া পাহাড় থেকে মুক্তোর সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরে চললো পারের দিকে। কিছুদূর সাঁতরাবার পর যুবকটি হঠাৎ হাত-পা ছেড়ে আস্তে-আস্তে জলে ডুবে গেল, আর উঠল না।

খাড়া পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে জলদস্যুরা এসব দেখছে। তখনই পেছন থেকেআর একটা বর্শা তীব্র বেগে ছুটে এল। লাগল একটি জলদস্যুর মাথায়। সে তাল সামলাতে না পেরে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে নীচে মুক্তোর সমুদ্রে এসে পড়ল। বারকয়েক সাঁতরাবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে সেও জলের নীচে তলিয়ে গেল।

সন্ধ্যে হবার আগেই জলদস্যুর দল রাজবাড়িতে ফিরে এল।

লা ব্রুশ হাত-পা ছড়িয়ে কাঠের সিংহাসনে বসেছিল। পাশেই শেকলে বাঁধা চিতাবাঘের বাচ্চাটা। ঢ্যাঙা সর্দারের মুখে সব শুনে লা ব্রুশের গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হলো। সে হাতীর দাঁতে বাঁধানো তরোয়ালের হাতলটায় অস্থিরভাবে হাত বুলোতে লাগল।

নিজের জাহাজের মাস্তুলের আড়ালে লুকিয়ে ফ্রান্সিস সবই দেখলো। জলদস্যুরা সব দল বেঁধে চাঁদের দ্বীপে চ'লে গেল কেন, বুঝল না। তবে এটা বুঝল যে, ওখানে নিশ্চয়ই কোন গন্ডগোল হ'য়েছে, যে জন্যে সবাইকে তলব করা হ'য়েছে। তা'হলে বোধহয় শুধু বেন্‌জামিন ক্যারাভেল-এর পাহারায় রইল। কারণ ঐ দলে ও বেন্‌জামিনকে দেখে নি।

সেদিন সন্ধ্যে হ'তেই বাতাস পড়ে গেল। আকাশের দক্ষিণ-পূর্ব কোন্ থেকে মেঘ উঠে আসছে, এটা ফ্রান্সিস লক্ষ্য করে নি। ও কেবিন ঘরে পায়চারি করছিল আর ভাবছিল, এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। বন্ধুদের মুক্ত করতে হ'লে এই সুযোগ। বেন্‌জামিন একা। ও হয়তো বাধা নাও দিতে পারে। ও ফ্রেদারিকোকে ভালবাসত। ওর কথা শুনত। সেই সূত্রে ফ্রান্সিসদের সঙ্গে ও ভালো ব্যবহার করত। মাঝে-মাঝে যে দুর্ব্যবহার না ক'রেছে তা নয়, তবে তার জন্যে ওকে দোষ দেওয়া যায় না। লা ক্রুশের হুকুমেই এ'রকম ব্যবহার করতে বাধ্য হ'য়েছে। বেন্‌জামিন বাধা হ'য়ে দাঁড়াবে না। তাই যদি হয়, তা'হলে বন্ধুদের মুক্ত করতে কোনো অসুবিধেই নেই।

একটু রাত বাড়লেই হঠাৎ হাওয়ার প্রবল ঝাপটায় জাহাজটা যেন কেঁপে উঠল। শুরু হ'ল প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টি। অন্ধকার সমুদ্র ভয়াবহ রূপ নিল। আকাশে মুহ-র্মুহ বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সঙ্গে বাজপড়ার গম্ভীর শব্দ। ফ্রান্সিস খুশির চোটে দু'বার বিছানায় গড়াগড়ি খেয়ে নিল। যে সুযোগের আশায় ও দিন গুনেছে, সেই সুযোগ আজ উপস্থিত। ও তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিল। পোষাক পান্টাল। কোমরে তরোয়াল গুঁজল। তারপর ওপরে ডেকে উঠে এল। জাহাজটা ভীষণ দুলছে। সেই সঙ্গে ঝড়ো বাতাসের ঝাপটা আর বৃষ্টির অবিরল ধারা। ও টাল সামলাতে-সামলাতে চললো জাহাজের মাথার দিকে। এই মাথার দিকেই ক্যারাভেলের সঙ্গে জাহাজটাকে বাঁধা হয়েছে। ফ্রান্সিস জাহাজের মাথায় পা ঝুলিয়ে ধরল। তারপর কাছিটার হাত দিয়ে ধ'রে-ধ'রে ক্যারাভেল-এর ওপর উঠে এল। ডেক-এ কেউ নেই। নিচে কেবিনটায় নামবার সিঁড়ির মুখে একটা কাঁচঢাকা আলো ঝড়ো ঝাপটায় দোল খাচ্ছে। ও পায়ে টাল সামলে ডেক পেরোল। নিচে নামবার সিঁড়ির কাছে এলো। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চললো। কয়েকটা আলো ঝুলছে বটে, কিন্তু তাতে অন্ধকার কাটে নি। সারা গা জলে ভিজে গেছে, যেন স্নান ক'রে উঠেছে। নামতে-নামতে ও কয়েদঘরের কাছে চ'লে এল। কয়েদঘরের সামনে মাথার কাছে যে আলো জ্বলছে, সেই আলোয় দেখলো, খোলা তলোয়ার হাতে বেন্‌জামিন দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছে। বাতিটা ও ক্যারাভেল দুলছে, সেই সঙ্গে কাঠে ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ শব্দ উঠছে। ও দেখলো, বেন্‌জামিন একা। অন্য কোন পাহারাদার নেই।

ফ্রান্সিস কয়েক পা এগিয়ে ডাকল — 'বেন্‌জামিন।'

বেন্‌জামিন প্রথমে ডাকটা শুনতে পেল না। ফ্রান্সিস আর একটু গলা চড়িয়ে ডাকল — 'বেন্‌জামিন।'

এবারের ডাকটা কানে গেল। বেন্‌জামিন দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। ঐ স্বল্প আলোয় ও ফ্রান্সিসকে চিনতে পারল না। ফ্রান্সিস আলোর দিকে এগিয়ে এলো, এবার ফ্রান্সিসকে

চিনতে পেরে ও বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেল। ফ্রান্সিস! মুক্তোর সমুদ্র থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে। কিন্তু এক মুহূর্তমাত্র, তারপরই বেন্‌জামিন সতর্ক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল — 'এখানে কি চাও?'

ফ্রান্সিস হাসল। বললো—'আমাদের বন্ধুদের মুক্তি।'

— আমার হাতে তরোয়াল থাকতে সেটি হবে না।

ফ্রান্সিস ওর কাছ থেকে এই ব্যবহার আশা করে নি। বললো — 'বেন্‌জামিন, তুমি আমাদের শত্রু। তবু বিশেষ ক'রে তোমাকে শত্রু ব'লে কখনও ভাবি নি। আমি তোমার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছি।'

কথাটা ব'লে ফ্রান্সিস হাত বাড়াল। বললো — 'তুমি সাহায্য করো।'

— 'না।' বেন্‌জামিন রুখে দাঁড়াল — 'লা ক্রুশের নুন খেয়ে আমি বেইমানি করতে পারবো না।

ফ্রান্সিস বুঝে উঠতে পারল না কি করবে। বেন্‌জামিন এভাবে রুখে দাঁড়াবে ও স্বপ্নেও ভাবে নি। বললো — কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে লড়বো না।

— 'কাপুরুষ।' বেন্‌জামিন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য করল।

ফ্রান্সিসের চোখ দুটো রাগে জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই ও শান্তস্বরে বললো — 'বেন্‌জামিন আমি মিনতি করছি, আমার কাজ আমাকে করতে দাও।'

—'না।' কথাটা শেষ করেই বেন্‌জামিন তরোয়াল উঁচিয়ে এগিয়ে এল। কোমর থেকে তরোয়াল খুলে ফ্রান্সিস বললো — 'তুমি আমাকে লড়াইয়ে নামতে বাধ্য করলে।'

বেন্‌জামিন তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসের ওপর। ফ্রান্সিস খুব সহজে মার ঠেকাল, বেন্‌জামিন দ্রুতহাতে তরোয়াল চালাতে লাগলো। ফ্রান্সিস শুধু তরোয়ালের ঘা ঠেকাতে লাগলো আর আত্মরক্ষা করতে লাগলো।

তরোয়াল যুদ্ধ চললো। জাহাজের দুলুনির মধ্যে দু'জনের পক্ষেই পা ঠিক রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তবু ঐ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই লড়াই চললো। দু'জনেই হাঁপাতে লাগলো। এটা ঠিক যে ফ্রান্সিসের তরোয়ালের মারের মোকাবিলা বেন্‌জামিনকে করতে হচ্ছে না। ফ্রান্সিস শুধু আত্মরক্ষাই করে চলেছে। বেন্‌জামিনের মার ঠেকাচ্ছে, কিন্তু ফিরে আক্রমণ করছে না। এতে বেন্‌জামিনেরই পরিশ্রম হচ্ছিল বেশি। ফ্রান্সিস সে তুলনায় কম ক্লান্ত হলো। এক সময় তরোয়াল চালানো বন্ধ ক'রে বেন্‌জামিন দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপাতে লাগলো। ফ্রান্সিস বললো — 'বেনজামিন তোমাকে আমরা বন্ধু বলেই জানি। তুমি ওষুধ এনে দিয়ে আমাকে সুস্থ করেছিলে। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিনীতভাবে বলছি, 'তুমি আমাকে বাধা দিও না। আমাকে চাবির গোছাটা দাও।'

বেন্‌জামিন তার উত্তরে কোন কথা না ব'লে ফ্রান্সিসের ওপর নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস মার ঠেকাতে-ঠেকাতে পিছিয়ে যেতে লাগলো। পিছোতে-পিছোতে সিঁড়ির গোড়ায় এসে গেল। বেন্‌জামিন তরোয়াল চালাতে-চালাতে ওপরে উঠতে লাগলো। আসলে ফ্রান্সিস চাইছিল ডেক-এ উঠে আসতে। তাহ'লে নড়াচড়া করবার পিছু হটবার অনেকটা জায়গা পাওয়া যাবে।

দু'জনেই আস্তে-আস্তে ডেক-এ উঠে এল। বাইরে বৃষ্টি কমছে তখন। কিন্তু ঝড়ো হাওয়ার দাপট সামনে চলেছে। ফ্রান্সিস ভাবল — এ ভাবে ও কতক্ষণ আত্মরক্ষা করবে? বোঝা যাচ্ছে, সুযোগ পেলেই বেন্‌জামিন ওকে আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করবে না। বেন্‌জামিনকে রোখবার একটাই রাস্তা ওকে আহত করা। এ ছাড়া উপায় নেই কোন।

এবার ফ্রান্সিস আর পিছু না হটে রুখে দাঁড়াল। বেন্‌জামিনকে আক্রমণ করল। ফ্রান্সিসের আক্রমণের নিপুণ ভঙ্গী দেখে বেন্‌জামিন বুঝল, শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছে ও। এবার সত্যিকারের লড়াই শুরু হল। কেউই কম যায় না। দু'জনেরই ঘন-ঘন শ্বাস পড়ছে। এগিয়ে -পিছিয়ে লড়াই চলল। ফ্রান্সিস সুযোগ খুঁজতে লাগল কি ক'রে বেন্‌জামিনকে আহত করা যায়। ওর ডান হাতটাকে অকেজো ক'রে দিতে হবে। ফ্রান্সিস হঠাৎ আক্রমণের চাপ বাড়িয়ে দিল। বেন্‌জামিন পিছু হটতে লাগল। ফ্রান্সিস আক্রমণের চাপ সমান রাখল যাতে বেন্‌জামিন বুঝতে না পারে, কোথায় যাচ্ছে, কিসে পা পড়ছে ওর। ঠিক এ সময়ই বেন্‌জামিন সিঁড়ির মুখে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস এত দ্রুত তরোয়াল চালাচ্ছিল, যে বেন্‌জামিন বুঝতেও পারে নি, আর এক পা পিছোলেই সিঁড়ি। নিচে নামবার সিঁড়ি। পিছোতে গিয়ে বেন্‌জামিনের পা নিচে সিঁড়ির খাঁজে পড়ে গেল। ও টাল সামলাল, কিন্তু ফ্রান্সিস ততক্ষণে বিদ্যুৎবেগে ওর ডান হাত লক্ষ্য করে তরোয়াল চালিয়েছে। একটা গভীর ক্ষত হ'য়ে গেল হাতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। বেন্‌জামিন তরোয়াল ফেলে দিয়ে আহত হাতটা বাঁ হাতে চেপে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস ওকে জোরে ধাক্কা দিল। বেন্‌জামিন উলটে ডেকের ওপর চিত হয়ে পড়ে গেল। একটা গোঙানির শব্দ বেরুলো ওর গলা থেকে। ও তখন মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে। ফ্রান্সিস দ্রুতহাতে ওর কোমরের বেল্ট-এ এর কড়ার সঙ্গে আটকানো চাবির গোছাটা খুলে নিল। তারপর ছুটল সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে। কয়েদঘরের সামনে এসে যখন দাঁড়াল, তখন ভীষণ হাঁপাচ্ছে ও। তাড়াতাড়ি বড় আকারের তালাটা খুলে ফেলল। ভেতরে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা অনেকেই জেগে ছিল। কারণ তখনও রাতের খাওয়া হয়নি। বাকিরা শুয়ে-বসে-ঘুমিয়ে ছিল। যারা জেগেছিল, তারা দরজা খুলতে দেখে ভাবল, রাতের খাবার এসেছে। সেই প্রায় অন্ধকারে ওরা ফ্রান্সিসকে চিনতে পারল না। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল — 'হ্যারি।'

হ্যারি জেগেই ছিল। ও চমকে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। এ কি! ফ্রান্সিস। হ্যারি প্রায় চিৎকার করে উঠলো — 'ফ্রান্সিস!'

ফ্রান্সিস ছুটে এসে হ্যারিকে জড়িয়ে ধরল। আনন্দে হ্যারির চোখে জল এসে গেল। হ্যারিকে ছেড়ে দিয়ে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বললো — 'ভাইসব, আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। আমাদের এক্ষুণি পালাতে হবে। কিন্তু কোন শব্দ নয়। আনন্দ-উল্লাসের সময় পরে পাওয়া যাবে।' যারা জেগেছিল, তারা ঘুমন্ত আর তন্দ্রাচ্ছন্নদের ঠেলা দিয়ে বলল, 'এই ওঠ, ফ্রান্সিস এসেছে।'

সকলেই উঠে বসল, কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস গোছা থেকে চাবি বের ক'রে সবাইকে একে-একে মুক্ত করল। বললো — 'আস্তে-আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে

সবাই কাছি বেয়ে-বেয়ে আমাদের জাহাজে চলে যাও। কোনরকম শব্দ ক'রো না।'

সবাই সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে গেল। হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস সবার শেষে ডেক-এ এল। দেখলো, বেন্‌জামিন তখনও শুয়ে আছে। তবে গোঁঙাচ্ছে না। হ্যারি বলে উঠল — 'এ যে বেন্‌জামিন। এত রক্ত ও কি মারা গেছে?'

'— না।' ফ্রান্সিস বলল — ওর গায়ে তরোয়াল না চালিয়ে উপায় ছিল না। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে বসল। বললো — 'হ্যারি — দু'একজনকে ডাকোতো। বেন্‌জামিনকে আমার কাঁধে তুলে দাও।'

দু'চারজন তখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আহত বেন্‌জামিনকে দেখছিল। দু'জন এগিয়ে এল। হ্যারিও এসে হাত লাগাল। ওরা বেন্‌জামিনকে ধরাধরি করে ফ্রান্সিসের কাঁধে চাপিয়ে দিল। বেন্‌জামিন আবার গোঙরাতে শুরু করল। অত ভারী শরীরটা বয়ে নিয়ে যেতে ফ্রান্সিসের বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ও দাঁত চেপে শরীরটাকে বয়ে নিয়ে চলল। কাছিটার কাছে এসে পা বাড়িয়ে আস্তে-আস্তে কাছিটায় ঝুলে পড়বার সময় বলল — 'বেন্‌জামিন, বাঁ হাতে শক্ত করে আমাকে ধরে থাকো।'

বেন্‌জামিন তাই করল। ঝড়ো বাতাসে দু'টো জাহাজই দুলছে। ওরই মধ্যে দড়ি বেয়ে-বেয়ে ফ্রান্সিস ওকে ওদের জাহাজের মুখের কাছে নিয়ে এল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো — 'বেন্‌জামিনকে ধরো। ওকে নিয়ে গিয়ে ওষুধ-টষুধ দাও। আমি আস্‌ছি।'

দু'চারজন ভাইকিং বেন্‌জামিনকে ধ'রে তুলে নিল। ফ্রান্সিস দড়ি ধ'রে-ধ'রে আবার ক্যারাভেল-এ ফিরে এল। দেখল — হ্যারি আর আরো কয়েকজন ভাইকিং দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস বলল — 'হ্যারি, শিগ্‌গির আমাদের জাহাজে চ'লে যাও। আমি একটু পরেই আসছি।'

ওরা চলে গেল। ফ্রান্সিস সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটলো গোলাঘরের দিকে। গোলাঘরের সামনে পৌঁছে দেখলো দু'জন পাহারাদার গোলাঘর পাহারা দিচ্ছে। এত যে ব্যাপার ঘটে গেছে, তা ওরা কিছুই জানে না। ফ্রান্সিস বুঝল, ঝড়বৃষ্টির শব্দের জন্যেই ওরা কোন শব্দ পায় নি।

ও চারদিকে তাকাতে লাগল। দেখল গোলাঘরে ঢোকার দরজার ডানদিকে অনেকগুলো কাঠের পাটাতন সাজিয়ে রাখা। ওগুলোর পেছনটা ফাঁকা। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ওখানে। ফ্রান্সিস পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা কাঠের টুকরো ঐ অন্ধকার জায়গাটা লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। কাঠের টুকরোটা সশব্দে ঐ জায়গাটায় পড়লো। দু'জন পাহারাদারই দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মধ্যে একজন তরোয়াল উঁচিয়ে পা টিপে-টিপে ঐ অন্ধকার জায়গাটায় গিয়ে ঢুকল। কাঠের জড়ো করা পাটাতনের আড়ালে পড়ে গেল ও। ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে ছুটে এসে অন্য পাহারাদারটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোকটা কিছু বোঝবার আগেই ওর হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল লোকটা চিত্ হ'য়ে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে ওর বুকে তরোয়ালটা ঢুকিয়ে দিল। মনে-মনে বলল — অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছ তোমরা। তোমাদের ওপর দয়া দেখানো অর্থহীন। ও দ্রুতহাতে লোকটার কোমরের বেল্ট থেকে চাবিটা খুলে নিল। গোলাঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। দেখলো, অনেকগুলি কাঠের বাক্সে টাই করা কামানের গোলা।

একটা বন্ধ বাক্স, সেটায় বোধহয় পিস্তলের গুলি। দেয়ালে সারি-সারি টাঙানো তরোয়াল, কুঠার বর্শা। ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে দেখলো অন্য পাহারাদারটা ছুটে আসছে। ও এক হ্যাঁচ্‌কা টানে কেরোসিন তেলের কাঁচের আলোটা খুলে কামানের গোলাগুলোর ওপর ছুঁড়ে মারল। কাঁচটা ভেঙে চারিদিকে ছিটিয়ে পড়লো। কাঠের বাক্সগুলোর কেরোসিনের আগুন ছিট্‌কে পড়ে আগুন লেগে গেল।

আলো নিভে যাওয়াতে দরজার কাছটা অন্ধকার হয়ে গেছে তখন? পাহারাদারটা অন্ধকারেই তরোয়াল চালাল। ফ্রান্সিস তৈরিই ছিল ও মারটা ফিরিয়ে তরোয়াল দিয়ে ঐ লোকটার তরোয়াল চাপ দিয়ে ওকে প্রচন্ড জোরে একটা ধাক্কা দিল। লোকটা প্রায় ছিটকে পড়ে গেল। সেই ফাঁকে ফ্রান্সিস সিঁড়িটার দিকে লক্ষ্য ক'রে ছুটল। পাহারাদারও উঠে ওর পিছু নিল। ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। পাহারাদারও উঠতে লাগল। দু'জনকেই প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হচ্ছিল। কাজেই কেউই কাউকে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিল না। ফ্রান্সিস হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ঘুরে দাঁড়াল। লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে তরোয়াল তুলল। ফ্রান্সিস ঠিক তখনই লোকটার চোয়াল লক্ষ্য ক'রে একটা ঘুঁষি মারলো। লোকটা ছিট্‌কে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠতে লাগল।

ডেক-এ উঠেই ও ছুটলো ক্যারাভেল-এর পেছন দিকে। ও যখন ওদের জাহাজের সঙ্গে বাঁধা কাছিটায় ঝুলে পড়ল, তখনই প্রচন্ড শব্দে গোলাঘরে প্রথম গোলাটা ফাটলো। সমস্ত ক্যারাভেলটা কেঁপে উঠল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি দড়ি বেয়ে নিজেদের জাহাজে চ'লে এল। তারপর কাছিটার ওপর তরোয়াল চালাতে লাগল। তরোয়ালের কয়েকটা কোপ পড়তেই কাছিটা কেটে গেল। ক্যারাভেলটা আস্তে-আস্তে কিছুদূর স'রে গেল। ওদিকে ক্যারাভেল-এর গোলাঘরে তখন একটার পর একটা গোলা ফাটছে।

ফ্রান্সিস হাঁপাতে-হাঁপাতে কেবিনঘরগুলোর দিকে ছুটলো। তখনই হ্যারির সঙ্গে দেখা। ফ্রান্সিস বললো — শিগ্‌গির, আমাকে বেন্‌জামিনের কাছে নিয়ে চলো।

একটা কেবিন ঘরে হ্যারি ওকে নিয়ে এল। দেখল বেন্‌জামিন শুয়ে আছে। ছেঁড়া কম্বল দিয়ে ওর ডানহাতে একটা ব্যান্ডেজমত বাঁধা। ফ্রান্সিস ওর পাশে বসে হাঁপাতে লাগল। একটু দম নিয়ে ডাকল — 'বেন্‌জামিন'।

বেন্‌জামিন চোখ মেলে ওর দিকে তাকাল।

— 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে যেতে চাও?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

'— না।' বেন্‌জামিন স্পষ্টস্বরে বলল — 'আমি আমাদের জাহাজে ফিরে যাবো।'

'— আর কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদের জাহাজের চিহ্নমাত্রও থাকবে না।'

— 'তার মানে?' বেন্‌জামিন অবাক চোখে ওর দিকে তাকাল।

— 'তোমাদের ক্যারাভেল-এর গোলাঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এসেছি। শুনতে পাচ্ছো না গোলা ফাটার আওয়াজ'?

বেন্‌জামিন আর কোন কথা বলল না।

— 'বেন্‌জামিন' — ফ্রান্সিস বলল — 'অনেক নিরীহ, নিরাপরাধ মানুষের চোখের জলে, বুকের রক্তে ভিজে গেছে তোমাদের ঐ ক্যারাভেল-এর ডেক, কয়েদঘর। অনেক

অভিশাপ বর্ষিত হ'য়েছে ঐ অভিশপ্ত ক্যারাভেল-এর ওপর। ওটাকে পোড়াতে পেরে আমার আজ আনন্দের সীমা নেই। ঐ ক্যারাভেল-এর সঙ্গে লা ব্রুশকে পোড়াতে পারলে, আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম। কিন্তু এবার সেটা হ'ল না।' একটু থেমে ও বলল — 'আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু আমি আবার আসবো। লা ব্রুশের সঙ্গে আমার শেষ বোঝাপড়া এখনো বাকি।'

বেন্‌জামিন একইভাবে ওপরে তাকিয়ে থেকে বলল — 'আমি হুকুমের চাকর।'

'সেটা আমি বুঝি বেন্‌জামিন। তাই বলছি তুমি আমাদের সঙ্গে দেশে চলো।'

বেন্‌জামিন আস্তে-আস্তে মাথা নাড়ল।

— তা'হলে কি করবে এখন? আমরা এক্ষুণি জাহাজের নোঙর তুলবো। তাড়াতাড়ি বলো।

বেন্‌জামিন ধীরস্বরে বলল — 'আমাকে ভাজিস্বাদের একটা নৌকায় তুলে দাও। আমি চাঁদের দ্বীপে যাবো।'

'— লা ব্রুশ যা নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পশু, ও তোমাকে মেরে ফেলবে।'

'— তবু —' বেন্‌জামিন মাথা নাড়ল — 'আমাকে ওর কাছেই ফিরে যেতে হবে।'

'— বেন্‌জামিন — তুমি কেন নিজেকে ঐ নরঘাতকটার কাছে নিয়ে যেতে চাইছো?'

বেন্‌জামিন একবার ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল — 'লা ব্রুশের মত প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষকে তোমরা চেনো না। আমি যদি পালিয়ে যাই, ও কখনো না কখনো দেশের দিকে ফেরার পথে লিসবনের কাছাকাছি কোন জায়গায় আড্ডা গাড়বে। তারপর ওর কোন বিশ্বস্ত লোককে পাঠিয়ে আমার বৌ-ছেলেমেয়েকে খুন করাবে।'

'— বলো কি?' ফ্রান্সিস আর ওখানে যারা উপস্থিত ছিল, সকলেই লা ব্রুশ যে কি সাংঘাতিক মানুষ, সেটা বুঝল।

'তার চেয়ে এই ভালো — আমার যা হবার হোক — আমার বৌ-ছেলেমেয়ে বেঁচে থাক।'

ফ্রান্সিস বা হ্যারি কেউ কোন কথা বলল না। দু'জনেই চুপ ক'রে রইল। তারপর ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকলো — 'চলো ওপরে ডেক-এ যাই।'

যাবার সময় দু'জন ভাইকিংকে বললো 'তোমরা বেন্‌জামিনকে ওপরে নিয়ে এসো।'

ওরা ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল। দেখলো — ক্যারাভেলটা দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। আগুনের আভায় ধারে কাছে সমস্ত এলাকাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে দু'-একটা গোলা ফাটছে। আগুনের ফুলকি ছিটকে উঠছে অনেকদূর পর্যন্ত।

বেন্‌জামিনকে তখন ওপরে আনা হ'য়েছে। ও শূন্যদৃষ্টিতে জ্বলন্ত জাহাজটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ ফেরাল।

ঝড়-বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। বাতাসের সেই উন্মত্ত বেগ আর নেই।

ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছে একটা ভাজিস্বাদের গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী করা নৌকা ঢেউয়ের মাথায় ওঠা-নামা করছিল। ফ্রান্সিস একজন ভাইকিংকে বলল ঐ

নৌকাটা জাহাজের কাছে নিয়ে আসতে। ভাইকিংটা জাহাজের দড়ি বেয়ে-বেয়ে জলে নামল। সাঁতরে গিয়ে নৌকোটা জাহাজের কাছে নিয়ে এল। একটা কাছিতে ফাঁস মত পরানো হ'ল। তার মধ্যে বেন্‌জামিনকে বসিয়ে সেই নৌকাটায় ধ'রে-ধ'রে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। একটা দাঁড়ও দেওয়া হ'ল। ভাইকিংটা নৌকোটাকে সজোরে চাঁদের দ্বীপের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজে দড়ি বেয়ে-বেয়ে আবার জাহাজে উঠে এল।

জ্বলন্ত ক্যারাভেলটার আলোয় চাঁদের দ্বীপের তীর পর্যন্ত অনেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ওরা দেখল — সেই নৌকাটা আস্তে-আস্তে, চাঁদের দ্বীপের দিকে চলেছে। বেন্‌জামিন দাঁড় টানছে বাঁহাতে। কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে ফ্রান্সিস সকলের দিকে তাকাল। বললো — 'নোঙর তোলো। দাঁড় ঘরে যাও — পাল খুলে দাও। এক্ষুণি জাহাজ ছাড়ো।'

ভাইকিংদের মধ্যে উৎসাহের ঢেউ ব'য়ে গেল। বন্দীজীবনের শেষ। এবার মুক্ত জীবন। স্বদেশে ফিরছে সবাই। উৎসাহের সঙ্গে যে যার কাজে লেগে পড়ল! জাহাজ চলল উত্তর মুখে। ভাইকিংদের দেশের উদ্দেশ্যে। বেগবান বাতাস। মেঘমুক্ত আকাশ শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজ চলল।

পরদিন দুপুরের দিকে চোখে পড়ল ডাইনীর দ্বীপের তটরেখা, সবুজ পাহাড়, গাছ-গাছালি। সকলেই ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। ফ্রান্সিস তখন নিজের কেবিনঘরে শুয়ে ছিল। নির্বিবাদে হীরে দু'টো নিয়ে দেশে না ফেরা পর্যন্ত ওর মনে স্বস্তি নেই। সবাই এসে বলল — 'ডাইনীর দ্বীপে এসে গেছে। বিস্কোকে খুঁজে দেখবো আমরা।'

ফ্রান্সিস উঠে বসল। বললো 'জাহাজ তীরে ভেড়াও। জানি না বিস্কো বেঁচে আছে কিনা, তবু আমাদের খুঁজে তো দেখতে হবে।'

সমুদ্রতীরের যত কাছে সম্ভব, জাহাজ ভেড়ানো হ'ল। কিন্তু ভাইকিংদের আর দ্বীপে যেতে হ'ল না। ওরা ডেক থেকে দেখলো সমুদ্রতীরে কে একজন লোক হাতে একটা ছেঁড়া জামা নিয়ে ঘোরাচ্ছে। দূর থেকে চিনতে কষ্ট হ'লেও বুঝলো, ঐ লোকটাই বিস্কো।

জাহাজ থেকে একটা ছোটো নৌকো নামানো হ'ল। কয়েকজন যাবে বিস্কোকে আনতে। ফ্রান্সিস ওদের বলল 'লা ক্রুশের গুপ্ত ভাণ্ডারের সব কিছু আমরা নিয়ে আসবো। আগে বিস্কোকে সঙ্গে নিয়ে সে সব আনতে হবে।'

চারজন নৌকো করে চলল ডাইনীর দ্বীপের দিকে। ওরা যখন দ্বীপে গিয়ে নামল, বিস্কো ছুটে এসে ওদের জড়িয়ে ধরল। বিস্কোর শরীর খুব খারাপ হ'য়ে গেছে! জামা কাপড় শতছিন্ন। তবুও বেঁচে আছে, তাতেই সকলে খুশি হ'ল। ওরা বলল — 'ফ্রান্সিস বলেছে লা ক্রুশের সব গুপ্তধন নিয়ে যেতে। আমাদের ওখানে নিয়ে চলো।'

বিস্কো বলল — 'তার আগে আমার আস্তানায় চলো। গায়ে নুন মেখে নিতে হবে।'

'সমুদ্রতীরের কাছেই যেখানে থেকে পাহাড়-জঙ্গল শুরু হ'য়েছে সেখানে রেন ট্রি গাছের পাতা, বাকল, এসব দিয়ে একটা ঘরমত তৈরি করা হ'য়েছে। বিস্কো বলল —

'এই আমার আস্তানা।' ও গাছের পাতার একটা বড় ঠোঙায় ক'রে তেল মেশানো নুন নিয়ে এল।

— তুমি এসব পেলে কোথায়?

' — সমুদ্রের জল থেকে নুন তৈরী করেছি — 'বিস্কো বলল — 'আর ঐ পূর্ব কোণায় একটা ঝর্ণার জলের সঙ্গে মেশানো এই তেল পেয়েছি। এই দু'টো মিশিয়ে গায়ে মাখলে, জোঁক কামড়ে ধরলে সঙ্গে-সঙ্গে মরে যায়। এই জিনিসটা ব্যবহার করতাম বলেই আমি এখনো বেঁচে আছি।

সকলেই সেই তেল-নুন গায়ে মেখে নিল। তারপর বিস্কো ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। গাছগাছালি ঘেরা হাজার-হাজার জোঁকের জায়গাটা ওরা পেরোলো। ওদের জোঁকে কামড়ে ধরলো বটে, কিন্তু মুহূর্তেই মরে খসে পড়লো।

ওরা লা ক্রুশের গুপ্তধন রাখার গুহাটার কাছে এল। বিস্কো ব'লে দিলো কিভাবে পাথরের মুখটা সরাতে হবে। সবাই ধাক্কাধাক্কি ক'রে নিরেট পাথারটা কিছুটা সরাল। তারপর সবাই ভেতরে ঢুকল। অন্ধকার গুহা। প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। অন্ধকারটা সরে আসতে ওরা দেখলো বেশ কয়েকটা নরকঙ্কাল পড়ে আছে। তার মধ্যে ওদের দু'জন বন্ধুর কঙ্কালও রয়েছে। বিস্কো আসবার সময় পথে সব ঘটনা ওদের বলেছে। গুহাটার শেষের দিকে বেশ কয়েকটা বাক্স রয়েছে। ওপরে পেতলের কাজ করা। ওরা ঐ দুটো বাক্স নিয়ে জোঁকের জায়গাটা পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে চ'লে এল। বাক্স দুটো নৌকায় তোলা হ'ল। বিস্কো আর একজন ভাইকিং নৌকায় চড়ে বাক্স দু'টো জাহাজে নিয়ে এলো। সবাই ছুটে এসে বিস্কোকে জড়িয়ে ধরলো। বিস্কোকে নতুন কাপড়-জামা দেওয়া হ'ল। তারপর খাবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল ওকে। এতদিন পরে বন্ধুদের দেখে ওর যেন কথা আর ফুরোতে চায় না। ফ্রান্সিস বলল — 'বিস্কো পরে সব শুনবো, এখন পেট পুরে খেয়ে নাও।'

নৌকোটা একজন ভাইকিং চালিয়ে নিয়ে গেল ডাইনীর দ্বীপে, আবার গুপ্তধনের কাছে। গুহা থেকে দুটো ভারি বাক্স জাহাজে নিয়ে আসা হ'লো। সন্ধ্যের আগেই লা ক্রুশের অত সাধের গুপ্ত ধনভান্ডার শূন্য হ'য়ে গেল। সব জাহাজে তুলে নিয়ে আসা হলো।

বাক্সের তালাগুলো ভাঙা হলো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি বাক্সগুলো খুলে-খুলে দেখলো। কত মোহর, কত জড়োয়ার গয়না। হীরে-মুক্তো বসানো ছোরা, ছোট আকারের তরবারি। কত বিচিত্র আকারের গয়না-গাঁটি। সকলেই এসে জড়ো হ'ল সেখানে। সকলের চোখেই বিস্ময়। এসব জিনিসের গল্পই শুনেছে ওরা। জীবনে কোনদিন দেখেনি।

সন্ধ্যের পরেই জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হ'ল। শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজ উত্তরমুখে যাত্রা শুরু করলো। ভাইকিংদের আজ খুব আনন্দের দিন। অত বড় দু'টো হীরে, মোহর, মণিমাণিক্য ভরা লা ক্রুশের লুটের সম্পদ সব আজ ওদের হাতে।

রাত্রিবেলা জাহাজের ডেক-এর ওপর নাচগানের আসর বসলো। সবাই নাচ-গানের তালে-তালে হাততালি দিতে লাগলো। জমে উঠলো আসর।

ফ্রান্সিসও ঐ আসরে কিছুক্ষণ বসেছিল। তারপর একটু রাত হ'তেই নিজের কেবিনে

ফিরে এল। রাত্রে জাহাজ পাহারা দেবার জন্যে পাহরাদারের সংখ্যা বাড়াল ফ্রান্সিস। লা ক্রুশের মতো আবার কোন জলদস্যু যাতে অনায়াসে রাত্রির অন্ধকারে এসে জাহাজ খালি না করতে পারে। সকলেই ফ্রান্সিসের কথা মেনে নিল। দিনরাত সমানে জাহাজ পাহারা দিতে লাগল ওরা।

জাহাজ চললো। ফ্রান্সিসের ইচ্ছে মরিটাস দ্বীপের খোঁজটা নিয়ে যাওয়া। কথাটা ও হ্যারি আর অন্যান্য ভাইকিংদের বলল। অনেকেই জানতে চাইল, দ্বীপটা কোথায়? ফ্রান্সিস বলল — 'আমি সঠিক জানি না। তবে পশ্চিম আফ্রিকার কাছাকাছি কোথাও হবে। চাঁদের দ্বীপ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। রাজপুরোহিত মরিটাস দ্বীপে এসে বসির আয়নাওয়ালার কাছ থেকে আয়না তৈরী করিয়ে নিয়ে যেতো। কাজেই মরিটাস বেশি দূরে হবে বলে মনে হয় না। আমাদের পূর্বদিকে যেতে হবে।'

বেশির ভাগ ভাইকিং বন্ধুরা কিন্তু আপত্তি করল। বললো — 'আমরা অনেকদিন দেশ ছেড়ে এসেছি। সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত মূল্যবান হীরে আর লা ক্রুশের গুপ্তধন রয়েছে। আমাদের তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে হবে। পথে দেরি করলে কে জানে আবার কোনো বিপদে পড়বো কিনা। ফ্রান্সিস একটু ভাবল। তারপর ওদের কথাতেই রাজি হল। হ্যারিও ওকে তাই বোঝাল। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপদে দেশে ফিরতে হবে।

জাহাজ আর পূর্বদিকে ফেরানো হ'ল না। সবাই প্রচন্ড উৎসাহ নিয়ে জাহাজের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গতি আরো দ্রুত হলো। দাঁড়িরা দাঁড় বইতে লাগল, আরো দু'টো বাড়তি পাল লাগানো হ'লো। জাহাজ চলল পূর্ণ বেগে।

সমুদ্রপথে বার দুই-তিনেক ঝড়ের কবলে পড়তে হলো। তবে ঝড় খুব সাংঘাতিক কোন ক্ষতি করতে পারলো না। ভাইকিংরা প্রাণপণে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করলো। যে ক'রেই হোক জাহাজটাকে অক্ষত রাখতে হবে। দু'একটা পাল ফেঁসেও গেল। এর চেয়ে বেশি কোন ক্ষতি হ'ল না।

বেশ অল্পদিনের মধ্যেই জাহাজটা ইউরোপের কাছাকাছি এসে গেলো। তারপর দিন দশেকের মাথায় ভাইকিংদের রাজধানীর 'ডক'-এ এসে লাগল। তখন ভোর হয়েছে সবে। বন্দরে লোকজন বেশি ছিল না। এরকম কত জাহাজ তো আসে। ওরা সেইভাবেই এক নজর তাকিয়ে জাহাজটাকে দেখলো শুধু।

ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুদের আর তর সইল না। জাহাজ 'ডক'-এ লাগাবার সঙ্গে-সঙ্গে ওরা লাফিয়ে নেমে পড়ল। যে যার বাড়িতে চলে গেল। ওদের মুখেই শহরবাসীরা প্রথম জানতে পারল ফ্রান্সিস দুটো বিরাট হীরের খন্ড আর জলদস্যু ক্যাপ্টেন লা ক্রুশের ধনসম্পদ বোঝাই ক'রে ফিরেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবরটা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল।

এদিকে জাহাজে হীরে দু'টো আর লা ক্রুশের ধনসম্পদ পাহারা দেবার লোকের অভাব পড়ে গেল। অনেকেই বাড়ি চ'লে গেছে, বাকি যারা রইল, তারাও বাড়ি যাবার জন্যে ছটফট করতে লাগল। ফ্রান্সিসকে তারা তাদের ছেড়ে দেবার জন্যে বারবার অনুরোধ করতে লাগল। ফ্রান্সিস আর কি করে? ও তখন একজনকে রাজার কাছে

পাঠাল। সংবাদ দিল রাজাকে যে আমরা অত্যন্ত মূল্যবান কিছু জিনিস এনেছি, আপনি জাহাজ পাহারা দেবার জন্যে কিছু সৈন্য পাঠান।

কিছুদিনের মধ্যেই ঘোড়ায় চড়ে একদল সৈন্য এল। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হ'ল। এবার ওদের হাতে পাহারার ভার দিয়ে ও আর হ্যারি বাড়ি যেতে পারবে। কিন্তু ফ্রান্সিসদের আর বাড়ি যাওয়া হ'ল না। সৈন্যদের মধ্যে যে নেতা ছিল, সে ফ্রান্সিসের হাতে একটা চিঠি দিল। রাজা লিখেছেন — 'তোমার কথামত সৈন্য পাঠালাম। তুমি আর হ্যারি জাহাজ থেকে নামবে না। তোমাদের উপযুক্ত সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করছি।'

ফ্রান্সিস হ্যারিকে চিঠিটা দেখাল। হ্যারি হেসে বললো — 'সোনার ঘন্টা আনার সময় তো আমরা ছিলাম না। তাই এবার আমাদের সম্বর্ধনা জানিয়ে সেটা পুষিয়ে দেবে।'

কাজেই ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে জাহাজেই থাকতে হ'ল। ওদের আর বাড়ি যাওয়া হ'ল না। অন্য সব ভাইকিং বন্ধুদের ওরা বাড়ি চলে যেতে বললো।

এর মধ্যেই খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। জাহাজঘাটায় মানুষের ভিড় বাড়তে লাগল। সবাই নির্বাক বিস্ময়ে হীরে দু'টো দেখছে। আস্তে-আস্তে ভিড় বাড়তে লাগল। ঘন্টাখানেক না যেতেই বিরাট জনারণ্যের সৃষ্টি হ'ল। 'ডক'-এর সামনে রাস্তাঘাট লোকে ভ'রে গেলো। সবাই ফ্রান্সিসকে দেখতে চায়। ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে আসুক, জোর গলায় লোকেরা এসব বলতে লাগলো। হ্যারি বললো — ফ্রান্সিস একবার ডেক-এ উঠে ওদের সামনে দাঁড়াও। ওরা তোমাকে দেখতে চাইছে। ফ্রান্সিস বিরক্তির সঙ্গে বললো — 'এ সব আমার ভালো লাগে না।'

'— তবু ওরা চাইছে, তোমারই তো স্বদেশবাসী। যাও।' হ্যারি বললো,

ফ্রান্সিস ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল — 'তাহলে তুমিও চলো।'

'— বেশ —'

দু'জনে কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে ওপরে ডেক-এ এসে দাঁড়াতেই জাহাজঘাটার জনারণ্য আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে উঠল। সে কি বিপুল হর্ষধ্বনি দিতে লাগল।

হঠাৎ জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগলো। রব উঠল — 'রাজা আসছেন — রাজা আসছেন।' জনতা সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিলো। সামনে সুন্দর পোযাক সজ্জিত রাজার দেহরক্ষীদল ঘোড়ায় চ'ড়ে আসছে পেছনে রাজার গাড়ি। কালো দামী কাঠের গাড়ি। ধবধবে সাদা চারটে ঘোড়া টেনে আনছে। গাড়ির গায়ে সোনালি-রূপালী রঙের কত কারুকাজ। মাথাটা খোলা। সামনে কোচম্যান বসে আছে। লাল-সাদা কি সুন্দর পোষাক তার পরনে। মাথার টুপিতে রূপালি ঝালর। ঘোড়াগুলোর পিঠেও সোনালি ঝালর দেওয়া সাজ। গাড়ির ভেতরে মুখোমুখি দু'টো বসার গদি। তাতেও নানা কারুকাজ। একদিকের আসনে ব'সে আছেন রাজা আর রাণী। বিশেষ উৎসবের দিনে তাঁরা যেমন পোযাক পরনে, আজকেও পরণে তেমনি পোযাক। রাণীর পরণে ধব্‌ধবে সাদা পোষাক, তাতে সোনালী জরির সূক্ষ্ম কাজ করা। রাজার পরণে সবুজ রঙের পোযাক। তবে বোতামগুলো সোনার। মাথায় হীরে বসানো সোনার মুকুট।

রাজা-রাণীকে দেখে সেই বিরাট জনারণ্যে হর্ষধ্বনি উঠল। রাজার দীর্ঘজীবন কামনা

ক'রে ধ্বনি উঠল। রাজা-রাণী হাসিমুখে সকলের দিকে হাত নাড়াতে লাগলেন। রাজার গাড়ির পেছনে আরো কয়েকটা সুসজ্জিত গাড়ি ? তাতে আসছেন মন্ত্রী অর্থাৎ ফ্রান্সিসের বাবা ও গণ্যমান্য আমাত্যরা।

রাজার গাড়ি এসে ফ্রান্সিসদের জাহাজটার কাছে থামল। বাঁধানো ডক থেকে জাহাজ পর্যন্ত একটা কাঠের তক্তা আগে থেকেই ফেলা ছিল। রাজা-রাণী নামলেন। তারপর তক্তাটার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে জাহাজটায় উঠলেন। ফ্রান্সিস আর হ্যারি এগিয়ে এল রাজা ফ্রান্সিসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর হ্যারিকে। ফ্রান্সিস রাজাকে হীরের গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। একজন সৈন্য ছেঁড়া পালের ঢাকাটা খুলে দিলো। তখন সূর্যের আলো পড়ল হীরে দু'টোর ওপর। কি অপূর্ব তেজালো দ্যুতি বেরোতে লাগলো হীরে দু'টো থেকে। হাজার-হাজার বিস্ময়াবিষ্ট মানুষগুলোর মুখে কোন কথা নেই? রাজাও বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ঘুরে-ঘুরে হীরে দু'টো দেখতে লাগলেন। এত বড় হীরে? এতো অবিশ্বাস্য! রাজার চোখ-মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তিনি এবার পেছন ফিরে জাহাজঘাটার জনারণ্যের দিকে তাকিয়ে হাত তুললেন। সব গোলমাল, গুঞ্জন থেমে গেল। রাজা গা চড়িয়ে বলতে লাগলেন 'দেশবাসীগণ, ফ্রান্সিস, হ্যারি আর তাদের বীর সহগামীরা যে দুঃখ-কষ্ট স্বীকার ক'রে এই হীরে দু'টো এনেছে, তার জন্যে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তাদের সম্মনার্থে আমি সারা দেশে আজ থেকে তিনদিন উৎসবের দিন ব'লে ঘোষণা করলাম। দেশবাসীগণ, — আপনারা তাদের দীর্ঘজীবন কামনা করুন!'

রাজার কথা শেষ হ'তেই হাজার কণ্ঠে ফ্রান্সিস ও হ্যারির জয়ধ্বনি উঠল। রাজা দু'হাত তুলে আবার সবাইকে থামালেন। বলতে লাগলেন — 'আমার প্রিয় দেশবাসীগণ। আজকে আমার কি আনন্দ হচ্ছে, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। যেদিন সোনার ঘন্টা নিয়ে এসেছিলাম, সেদিনও আমরা আনন্দোৎসব করেছিলাম। কিন্তু সেদিনের আনন্দোৎসবে দুই বীর ভাইকিং ফ্রান্সিস আর হ্যারি অনুপস্থিত ছিল। তাই আজকে আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ হচ্ছে।'

আবার একটু থেমে রাজা বলতে লাগলেন — 'হীরে দু'টো আজকে এই জাহাজেই থাকবে। কালকে হীরে দুটো নিয়ে মিছিল বেরোবে এবং সারা রাজধানী ঘুরবে। তারপর হীরে দু'টোকে প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে।'

রাজা থামলেন। আবার জনতা হর্ষধ্বনি ক'রে উঠল। হ্যারি রাজার কাছে এগিয়ে এল। বললো — 'আপনি নিশ্চয়ই কুখ্যাত জলদস্যু লা ব্রুশের নাম শুনেছেন'?

— হুঁ — ও জাতে ফরাসী।

— আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর গুপ্ত ধনভান্ডারও আমরা উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি।

— 'বলো কি!' রাজা অবাক হলেন।

— চলুন, আপনি দেখবেন আসুন।

রাজাকে মালখানাঘরে নিয়ে গেল হ্যারি আর ফ্রান্সিস। সেই পেতলের কাজকরা বাক্সগুলো খুলে রাজাকে দেখালো ওরা। রাজা এত দামী গয়নাগাঁটি, মোহর দেখে

অবাক। রাজা কিছুক্ষণ ঐ গয়নাগাঁটি হীরে-জহরতের দিকে তাকিয়ে বললেন 'এসব পাপের ধন সব বিক্রী করে সেই অর্থ কোন সৎকাজে লাগাতে হবে।'

রাজা ডেক-এ উঠে এলেন। তারপর কাঠের তক্তার উপর দিয়ে ডেকে এলেন। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকেও সঙ্গে আসতে বললেন। ওরা দু'জনে পরপর নেমে এল। রাজা বললেন — 'তোমরা আমাদের গাড়িতে চড়ে আমাদের সঙ্গে প্রাসাদে যাবে।'

রাজা ও রাণীর সঙ্গে এক গাড়িতে চড়া! ফ্রান্সিস আর হ্যারি পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। রাজা গাড়িতে উঠে ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ওরা দু'জনে রাজা-রাণীর সামনের দিকে লাল গদি মোড়া জায়গায় গিয়ে বসলো। আবার উপস্থিত জনতা হর্ষধ্বনি ক'রে উঠল। সামনে সুসজ্জিত ঘোড়ায় চড়া দেহরক্ষীরা, পেছনে গণ্যমান্য অমাত্য ও মন্ত্রীর গাড়ী। যাত্রা শুরু হ'লো রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে।

পথেও শহরবাসীদের উপ্‌চে পড়া ভীড়, সেই ভীড়ের মধ্য দিয়ে যেতে বেশ দেরিও হ'ল। উপস্থিত সবাই রাজা-রাণী আর ফ্রান্সিস ও হ্যারির জয়ধ্বনি করল।

রাজপ্রাসাদের বিরাট চত্বরে পৌঁছে রাজা-রাণী গাড়ির থেকে নেমে এলেন। ফ্রান্সিস আর হ্যারিও নামল। রাজা-রাণীর সামনে ফ্রান্সিস এসে দাঁড়ালো। বললে — 'আমরা অনেকদিন বাড়ী ছাড়া। বুঝতেই পারছেন মানে —'

'— নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই। তোমরা এখন বাড়ি যাও।' রাজা বললেন।

রাণী একটু হেসে বললেন — 'এখন ছাড়া পেলে। কিন্তু আজ রাতে প্রাসাদে তোমাদের নিমন্ত্রণ। রাতের খাবারটা আমাদের সঙ্গে খাবে।'

কথাটা ব'লে রাণী ডানহাতের দস্তানাটা খুলে হাতটা এগিয়ে দিলেন। ওরা দু'জন সসম্ভ্রমে রাণীর হাত চুম্বন করল। রাজা-রাণী প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

'— বাড়ি চলো।' পেছনে বাবার কণ্ঠস্বর শুনে ফ্রান্সিস ফিরে তাকালো। ফ্রান্সিস কোন কথা না ব'লে বাবার গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল। আর একজন অমাত্য হ্যারিকে তাঁর গাড়িতে ডেকে নিলেন। গাড়ি চললো। মন্ত্রীমশাই কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন রাস্তার জড়ো হওয়া লোকজন বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। কেউ-কেউ ফ্রান্সিসকে চিনতে পেরে হাত বাড়িয়ে দিলো। গাড়ি খুব দ্রুত চলছে না। ফ্রান্সিস হেসে সকলের সঙ্গেই করমর্দন করল। ওর বাবা এবার কোচ্‌ম্যানকে লক্ষ্য করে বললেন — 'গাড়ি জোরসে্‌ চালাও।' এবার দ্রুত ছুটল। রাস্তার লোকেরা কেউ-কেউ ফ্রান্সিসকে দেখে হাত নাড়ল। ফ্রান্সিসও হাত নাড়ল। এবার ওর বাবা বললেন — 'আবার কবে পালাবে?'

ফ্রান্সিস উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল — 'বাবা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, কি বড়-বড় মুক্তো।'

'তোমাকে পাহারা দেবার জন্যে দু'ডজন সৈন্য বাড়িতে মোতায়েন করবো।' ফ্রান্সিস কোন কথা বললো না। চুপ ক'রে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ কেমন একটু ধরা গলায় বাবা বললেন — 'হ্যাঁরে, তুই তোর কি মা'র কথাও ভাবিস্‌ না'?

ফ্রান্সিস মাথা নীচু করলো।

— 'তোর মা তোর জন্যে ভেবে-ভেবে অকালে মরে যাক্‌, এটাই কি চাস্‌ তুই?'

ফ্রান্সিস কোন কথা বলতে পারলো না। মার কথা ওর বেশি ক'রে মনে পড়তে লাগল। আস্তে-আস্তে বলল — 'মা কেমন আছেন?'

— 'মনে শান্তি থাকলে তো ভালো থাকবে?' বাবা চড়া গলায় বললেন।

গাড়িতে আর কোন কথা হ'ল না। বাড়ির কাছে আসতে ফ্রান্সিস দেখলো দেয়ালে-দেয়ালে জড়ানো সেই লতাগাছটা আরো বেড়েছে। সমস্ত দেওয়ালটাতেই ছড়িয়ে পড়েছে আর অজস্র নীলফুল ফুটে আছে সমস্ত দেওয়াল জুড়ে। ও দেখলো গেট-এর কাছে মা দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে একজন পরিচারিকা। মা'র মুখ-শরীর আরো শীর্ণ হয়েছে। মুখে সুস্পষ্ট বলিরেখা। এক বুক শূন্যভরা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর। একসঙ্গে আনন্দের, আবার দুঃখেরও।

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গিয়ে মা'কে জড়িয়ে ধরলো। মা ওর কপালে চুমু খেল। বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলো, 'চিরকালের পাগল তুই — কবে তোর এ পাগলামি যাবে, এ্যাঁ? বুড়ি মা'র কথা একবারও পড়ে না তোর?'

ফ্রান্সিস অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলল — 'আমার মা বুড়ি না।'

মা হাসল। কিছু বলল না। বাবা এর মধ্যে কাছে এলেন। বললেন — 'চলো।'

বাড়ির দিকে যেতে যেতে মা বললো, 'হ্যাঁরে — সবাই বলছে তুই নাকি বিরাট দু'টো হীরে এনেছিস্?'

— হ্যাঁ মা। কালকে তোমাকে জাহাজঘাটে নিয়ে গিয়ে দেখাবো।'

মা মাথা নাড়লেন — 'ও দেখে কি হবে। তুই ফিরে এসেছিস্ এতেই আমি খুশি।'

বাবার দিকে তাকিয়ে বলল — 'দেখেছো, ছেলেটা কেমন রোগা হ'য়ে গেছে।'

বাবা একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে মুখে একটা শব্দ করলেন — 'হুম্।'

* * *

সন্ধ্যে হ'তে না হতেই মা ফ্রান্সিসকে বলতে লাগল — 'রাজার বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছিস, একটু সভ্য-ভব্য হবি তো?'

ফ্রান্সিস হেসে বলল — 'আমি কি বুনো-ভাজিস্বাদের মত?'

'— ভাজিস্বা আবার কারা?' মা তো অবাক।

' — সে তুমি বুঝবে না। যাকগে — কি করতে হবে বলো।'

' — ভালো ক'রে, স্নান-টান ক'রে পরিপাটি মাথার চুল আঁচড়ে, সবচেয়ে ভালো পোষাকটি পরে, সুগন্ধি গায়ে ছড়িয়ে রাজবাড়িতে যেতে হবে?'

ফ্রান্সিস কপালে ভুরু তুললো — 'এতো কিছু করতে হবে?'

মা হাসল — 'হ্যাঁ, শুধু রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস না, নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছিস — কাজেই —।'

মা যেভাবে বললো, সে ভাবেই ফ্রান্সিসকে সাজগোজ করতে হ'ল। গাড়িতে উঠে দেখলো বাবাও বিশেষ সাজপোষাক পরেছেন। মা শরীর ভালো নেই বলে গেলেন না।

গাড়ি চললো। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি রাজপ্রাসাদের সিঁড়ির সামনে পৌঁছালো। চারদিকে নানারঙের নানারকমের ঘোড়ায় টানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যা বেশ হবে ব'লেই ফ্রান্সিসের মনে হ'ল।

বিরাট হলঘরে একদিকে নাচ-বাজনার আসর। অন্যদিকে বিরাট টেবিলে নানা মুখরোচক খাবার সাজানো। টেবিলের ধারে-ধারে চেয়ার পাতা। মাথার ওপরে ঝাড়-লন্ঠন। তাতে নানা আকারের রঙীন কাঁচ বসানো। দেয়ালে বিরাট-বিরাট তেলরঙের ছবি। চারদিক আলোয়-আলোয় ঝক্‌মক্‌ করছে।

ফ্রান্সিস যখন বাবার সঙ্গে ঢুকল, তখন ঢিমে-তালে বাজনা বাজছে। অভ্যাগত স্ত্রী-পুরুষ জোড়ায়-জোড়ায় নাচছে, সেই বাজনার তালে-তালে। প্রবেশের দরজার মুখোমুখি রাজা-রাণী আর রাজকুমারী মারিয়া বসে আছে। ফ্রান্সিসের বাবা রাজার কাছে গিয়ে একটু মাথা নিচু ক'রে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। রাণী ডানহাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি রাণীর হস্ত চুম্বন করলেন। বাবার দেখাদেখি ফ্রান্সিসও তাই করলো। ওর বাবা তারপর যেদিকে গণ্যমান্য অমাত্যরা হাতের মদের গ্লাস নিয়ে এখানে-ওখানে জটলা বেঁধে কথাবার্তা বলছেন, সেখানে চলে গেলেন।

রাজা রাজকুমারী মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন — 'এই হচ্ছে ফ্রান্সিস'।

ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে মারিয়ার হস্ত চুম্বন করল। কি অপরূপ সুন্দরী মারিয়া। ফ্রান্সিস সব ভুলে বেশ বোকার মতই রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

মারিয়া হেসে বলল — 'আপনি খাবার সময় আমার পাশে বসবেন — আপনার সোনার ঘন্টা, হীরে দু'টো আনার গল্প শুনবো।'

ফ্রান্সিস তখনো দেখছে রাজকুমারীকে। হলুদ গাউন পরে রাজকুমারীকে মনে হচ্ছে যেন একটা ফুটন্ত ফুল। রাজকুমারী হাসলে গালে টোল পড়ে। রাজা একটু কাশলেন। ফ্রান্সিস ফের সম্বিত ফিরে পেল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

তারপর বেশ দ্রুতপায়ে ওখান থেকে সরে এল। দেখলো, একপাশে ওর সব বন্ধুরা দাঁড়িয়ে পরস্পর কথা বলছে। সবাই সেজেগুজে এসেছে। হ্যারিও রয়েছে। বন্ধুদের মধ্যে এসে ও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এত জাঁক-জমক, আলো-বাজনা নাচ ও বিচিত্র দামী-দামী পোষাকে সজ্জিত নরনারীর ভীড় এসব ভালো লাগছিল না ওর। কিন্তু এখান থেকে এখন চলেও যাওয়া যায় না। স্বয়ং রাণীর নিমন্ত্রিত অতিথি ওরা! ভালো না লাগলেও থাকতে হবে। ও হ্যারির সঙ্গে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে লাগল, আর অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে খাওয়ার ডাক পড়বে। খাওয়াটা হ'য়ে গেলেই এই জায়গা থেকে পালানো যাবে। কিন্তু খাওয়ার তখনও অনেক দেরি। তখন নাচের আসর জমে উঠেছে। সুবেশা সুন্দরী মেয়েরা এসে ফ্রান্সিসের বন্ধুদের নাচের আমন্ত্রণ জানাতে লাগল। ওরা বন্ধুরা প্রায় সকলে কিছুক্ষণ সময় নেচে এলো। ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করলো, পাছে কোন মেয়ে ওদের নাচের আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মগোপন করা গেল না। রাজকুমারী মারিয়া খুঁজে খুঁজে থামের পেছনে ফ্রান্সিসকে আবিষ্কার করল। হাত বাড়িয়ে বলল — 'চলুন আমার সঙ্গে, নাচবেন আসুন।'

হতাশার একটা ভঙ্গি ক'রে ফ্রান্সিস মারিয়ার সঙ্গে নাচের জায়গায় এলো। দু'জনে বাজনার তালে-তালে নাচতে লাগল। যারা নাচতে-নাচতে ওদের দু'জনের কাছে যারা

আসছে, তারাই মাথা নুইয়ে একবার ক'রে রাজকুমারীকে অভিবাদন জানাচ্ছে। নাচতে-নাচতে রাজকুমারী বললো 'এবার কি আনতে যাবেন?'

যাক্ অন্য কিছু জিজ্ঞেস করে নি। এমন একটা বিষয় জিজ্ঞেস করেছে, যা নিয়ে কথা বলতে ফ্রান্সিসের উৎসাহে কমতি নেই। ও নাচ থামিয়ে হাত দিয়ে দেখালো — 'জানেন, মুক্তোর সমুদ্রের মুক্তোগুলো এত বড়-বড়।'

রাজকুমারী হাসল। তার চোখে বিস্ময়! বললো — 'বলেন কি?'

— আমি নিজের চোখে দেখেছি।

— আমার জন্যে কিন্তু একটু বড় মুক্তো আনবেন, আমি লকেট তৈরি করবো।

' — আনবো বৈকি!' ফ্রান্সিস বলল — 'ওসব তো বিক্রী করা যাবে না।'

— কেন?

— চাঁদের দ্বীপের অধিষ্ঠাতা দেবতার অভিশাপ লাগবে।

— চাঁদের দ্বীপ কোথায়?

— আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর।

— আপনি কবে যাবেন?

ফ্রান্সিস একটু চিন্তিতস্বরে বলল — 'দেখি।'

নাচের বাজনা থেমে গেল। সকলেই করতালি দিল। ফ্রান্সিসও সঙ্গে-সঙ্গে রাজকুমারীকে অভিবাদন জানিয়ে থামের আড়ালের কাছে চ'লে এল। দেখলো, হ্যারি-দাঁড়িয়ে আছে। এখনও কেউ ওকে পাকড়াও করতে পারে নি। হ্যারি মুচকি হেসে বলল — রাজকুমারী যেভাবে তোমাকে ডেকে নিয়ে গেল, তাতে সত্যিই তুমি ভাগ্যবান।

— এখন ভাগ্যে খাওয়াটা জুটলেই পালাতে পারি।

— আমারও এত জাঁকজমক, বা নাচ, ভীড় ভালো লাগছে না।

একসময় রাজা উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে আহারে বসতে বললেন। সবাই একে-একে খেতে বসলো। একজন পরিচারক এসে ফ্রান্সিসকে ডেকে নিয়ে গেল। ওকে রাজকুমারীর পাশেই বসতে হ'ল। সামনে টেবিলের কত রকমের খাবার থরে-থরে সাজানো। চাইলেই পরিবেশনকারীরা খাবার তুলে দিচ্ছে। কেউ-কেউ নিজেরাই তুলে নিচ্ছে। রাজকুমারী খেতে-খেতে বলল — আপনার 'সোনার ঘন্টা' গল্পটা আমায় বলুন।'

ফ্রান্সিসের মনে পড়লো, আমদাদ শহরের বাজারের কুয়োর ধারে খেজুরতলায় কতদিন এই গল্পটা বলেছে ও। সেইভাবেই ও গল্পটা বলতে শুরু করল। কুয়াশা, ঝড় আর জাহাজ ভেঙে যাওয়ার ঘটনাগুলো বলার সময় ও খেতে ভুলে যাচ্ছিলো। রাজকুমারী হেসে তখন বললো — 'খেতে-খেতে বলুন।'

এক সময় খাওয়া শেষ হ'ল। সকলেই টেবিল ছেড়ে উঠে এল। ফ্রান্সিসের গল্পও শেষ হ'ল। রাজকুমারী বললো — 'কিন্তু আপনার হীরে আনার গল্পটা শোনা হ'ল না। ওটা কবে বলবেন?'

ফ্রান্সিস কি বলবে ভেবে পেল না। আমতা-আমতা ক'রে বললো — 'সেটা মানে — যেদিন আপনি বলবেন।'

' — ঠিক আছে আমি আবার খবর পাঠাবো।'

ফ্রান্সিস হ্যারিকে খুঁজতে লাগল। ভীড়ের একপাশে ওকে পেলো। বললো, 'চলো পালাই।'

— রাজা-রাণীকে অভিবাদন জানিয়ে যেতে হয়, এটাই রীতি। দেখছো না, সকলেই রাজা-রাণীকে অভিবাদন জানিয়ে চ'লে যাচ্ছে।

' — চলো, ওটা সেরে আসি।' ওরা যখন রাজা-রাণীকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে, তখন পাশে বসা রাজকুমারী হেসে মৃদুস্বরে বলল — 'আমি কিন্তু খবর পাঠাবো।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

দু'জনে বাইরে আসছে। হলঘরের দরজার কাছেই বাধা। ফ্রান্সিসের বাবা দাঁড়িয়ে বললেন — 'আমার সঙ্গে যাবে।'

' — হ্যারি রয়েছে আমার সঙ্গে —'

' — হ্যারিও আমাদের সঙ্গে যাবে। ওকে ওর বাড়ির কাছে নামিয়ে দেবো।'

আর উপায় নেই, বাবার সঙ্গে যেতেই হবে। তিনজনে গাড়িতে উঠলো। গাড়ি চললো। কেউ কোন কথা বলছে না। ফ্রান্সিস, হ্যারি দু'জনেই বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিসের বাবা এক সময় বললেন — 'তুমি রাজকুমারীকে কি বলছিলে অতো।'

' — সোনার ঘন্টার গল্পটা শোনাচ্ছিলাম।'

' — হুম্।' ওর বাবা আর কিছু বললেন না।

*　　　*　　　*

পরের দিন সকালে জাহাজ থেকে হীরে গাড়ি দু'টো নামানো হ'ল। ঘোড়া জুড়ে গাড়ি দু'টোকে রাস্তায় আনা হ'ল। সামনে সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্যদল, পেছনেও আর একদল অশ্বরোহী সৈন্য। গাড়িটা দু'জন কোচম্যান চালাতে লাগল। মিছিল চললো রাজধানীর পথ দিয়ে। হাজার-হাজার লোক জড়ো হলো রাস্তায়, বাড়ির ছাতে, বারান্দায়, অলিন্দে। অবাক বিস্ময়ে সবাই দেখতে লাগল হীরে দু'টো। সূর্যের আলো সোজা পড়েছে হীরে দু'টোয়। নীল, বেগুনী, সবুজে কত বিচিত্র রঙের আলোর খেলা চললো হীরে দু'টোর গায়ে। অতবড় দু'টো হীরে, আর তাতে অজস্র রকম রঙের খেলা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শহরবাসীরা চেয়ে রইলো। সব প্রধান-প্রধান রাস্তা ঘুরে মিছিলটা রাজপ্রাসাদে এসে শেষ হলো। হীরে দু'টো রাখা হ'ল রাজার নিজস্ব যাদুঘরের বিরাট ঘরটায়। তার পাশেই রাখা আছে সেই বিখ্যাত 'সোনার ঘন্টা।'

শুরু হ'ল ফ্রান্সিসের গৃহবন্দী জীবন। ওর বাবা যা বলেছিলেন, তাই করলেন। আট দশজন সৈন্য বাড়ির চারিদিকে ছড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলো। ফ্রান্সিস হতাশ হ'ল। এবার আর পালানো যাবে না। ও ভাবতে লাগলো — পালাবার একটা উপায় বার করতেই হবে। প্রথমে যেতে হবে মরিটাস দ্বীপে। বসির আয়নাওলাকে খুঁজে বের করতেই হবে। একটা বিশেষ শক্তিশালী আয়না ওকে দিয়ে তৈরি করাতে হবে। তারপর

চাঁদের দ্বীপে। লা ক্রুশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তারপর মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো সংগ্রহ। কিন্তু তার আগে বাড়ির এই বন্দীজীবন থেকে তো মুক্তি চাই। সেটা কি ক'রে হবে।

বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে একটা উপায় বার করা যেতো। কিন্তু বাবার স্পষ্ট হুকুম কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। অতঃপর ফ্রান্সিস মা'কে বলল — 'ঠিক আছে — আর কেউ না আসুক, অন্ততঃ হ্যারিকে এখানে আসতে দাও।'

মা বাবাকে বলল। দু'একবার আপত্তি ক'রে বাবা রাজি হলেন। বললেন — 'হ্যারি একা আসতে পারবে।'

তাই হ'লো। হ্যারি দু'বেলাই আসে। ফ্রান্সিস এতেই খুশি। দু'জনেই নানা পালাবার বন্দী-ফিকির ভাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনটাই কার্যকরী হবে ব'লে মনে হয় না।

কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা রাজবাড়ির একটি গাড়ি এসে ফ্রান্সিসদের বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। গাড়িটা কালো কাঠের তৈরি। নানা সোনালি কারুকাজ সারা গাড়িটার গায়ে। ঘোড়া দু'টোরও সাজের কতো ঘটা। সবুজ-সাদা পোষাক পরা কোচম্যান ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা ক'রে একটা চিঠি দিল। মোটা কাগজে বাঁকা-বাঁকা হরফে লেখা। ওপরে কোন সম্বোধন নেই। শুধু লেখা — 'আপনি গল্প শোনাবেন বলেছিলেন। আজকে অবশ্যই আসবেন —' ইতি — মারিয়া।

রাজকুমারী গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। কাজেই সোজা কথা নয়। ফ্রান্সিসের না গিয়ে উপায় রইল না। মা ওকে সাজিয়ে গুজিয়ে দিলো। রাজকুমারীর পাঠানো গাড়ি চড়ে ও রাজপ্রাসাদে গেল। বিরাট হলঘর পেরিয়ে টানা বারান্দা। তারপর কত ঘর। মেঝেটা শ্বেতপাথরে বাঁধানো। দেয়ালে, জানালায়, দরজায় সোনালি-রূপালি কাজ করা। একজন পরিচারক ফ্রান্সিসকে অন্দরমহলে নিয়ে এসেছিল, এক পরিচারিকার জিম্মায়। পরিচারিকাটি ওকে রাজকুমারীর বসার ঘরে নিয়ে গেল। ছোটবেলায় ফ্রান্সিস অনেকবার বাবার সঙ্গে এসেছে। বড় হ'য়ে এই প্রথম এল। তখন যেমন অবাক চোখে তাকিয়ে সব দেখতো, আজও তেমনি অবাক চোখে দেখতে লাগলো চারদিকের সাজসজ্জা, আলো, রঙ্।

রাজকুমারী ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। ও কাছে আসতে রাজকুমারী ডান হাতটা বাড়িয়ে ধরলো। ও সেই হাত চুম্বন করল। গদিমোড়া একটা সবুজ রঙের চেয়ার পরিচারিকাটি এগিয়ে দিল। ও তাতে বসল। রাজকুমারী মারিয়া হেসে বলল — 'কি খাবেন বলুন?'

' — আমি এইমাত্র খেয়ে এসেছি।' ফ্রান্সিস দ্রুত ব'লে উঠল।

' — তবু একটু ফলের রস খান।' রাজকুমারী পরিচারিকাটিকে ইঙ্গিত করলো। পরিচারিকাটি চ'লে গেল। একটু পরে শ্বেতপাথরের গ্লাসে ফলের রস নিয়ে এল। ওটা খাচ্ছে ও। তখনই রাজকুমারী বললো — 'হীরে দু'টো আনার গল্পটা বলুন।

ফ্রান্সিস ফলের রস খেতে-খেতে গল্পটা শুরু করল — 'গল্পটা প্রথম শুনেছিল মকবুলের মুখে, আমদাদের এক সরাইখানায়।'

ও গল্পটা ব'লে চললো। রাজকুমারী থুতনিতে আঙ্গুল ঠেকিয়ে খুব মনোযোগ

দিয়ে শুনতে লাগল গল্পটা। গল্প শেষ হতে রাজকুমারী অবাক হ'য়ে বললো — 'এত সব কান্ড করেছেন আপনি?'

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। শুধু সলজ্জ মৃদু হাসলো। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে রাজকুমারীর হস্ত চুম্বন ক'রে বলল — 'আজকে এই থাক্। আর একদিন আপনাকে 'মুক্তোর সমুদ্রে'র গল্প বলবো।'

' — আমিও আপনাকে আনাতে গাড়ি পাঠাবো।' রাজকুমারী বললো।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল — 'বেশ।'

সেই গাড়ি চড়েই ও বাড়ি ফিরে এল। গাড়ি চড়ে ফিরে আসতে-আসতেই একটা চিন্তা ওর মাথায় খেলে গেলো। রাজকুমারী তো আবার গাড়ি পাঠাবে। সেদিন এই চলন্ত গাড়ি থেকেই পালাতে হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। বাড়ির ঐ কড়া পাহারা থেকে পালাবার কোন উপায় নেই। আবার রাজকুমারী কবে গাড়ি পাঠায় ও সেই আশায় রইল। এর মধ্যে ফ্রান্সিস বাবাকে বলল — 'আমি রোজ কয়েক ঘন্টার জন্যে সমুদ্রের ধারে যাবো।'

— 'কেন?' বাবা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

— 'মুক্তোর শিকারীরা কিভাবে মুক্তো তোলে, তাই দেখবো।'

' — বেশ যেতে পারো — কিন্তু তিনজন সৈন্য পাহারা যাবে।'

ফ্রান্সিস সম্মত হলো।

ফ্রান্সিস তিনজন সৈন্যের পাহারায় সমুদ্রের ধারে যেতে লাগলো। যে সব মুক্তো শিকারীরা শুধু কোমরে গোঁজা একটা মাত্র ছোরা নিয়ে জলে ডুব দিয়ে ঝিনুক তুলে আনে, তারপর ঝিনুক ভেঙে বা মুখ খুলে মুক্তো বের করে, ও তাদের সঙ্গে ক'দিনের মধ্যেই ভাব জমিয়ে ফেললো। ওরা কিভাবে ডুব দিয়ে, কিভাবে দ্রুত জল ঠেলে নামে, কিভাবে হাঙরের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে, কিভাবে দম বেশিক্ষণ রাখে, ঐ সবকিছুই শিখে নিল। তারপর ওদের সঙ্গে জলে ডুব দিয়ে ঝিনুক আনতে লাগলো। দিন সাত-আটের মধ্যেই ও প্রায় পাকা মুক্তো শিকারী হ'য়ে গেল। এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সময় জলের নীচে থাকতে শিখলো, দ্রুত কেটে নেমে যেতে, উঠে আসতে শিখলো। শিখলো কি ক'রে হাঙরের আক্রমণ ঠেকাতে হয়। ওরা শেখালো যে জলের নিচে কখনো হাঙরকে নীচে থাকতে দেবে না। তাহলেই হাঙরের হৃৎপিন্ড লক্ষ্য ক'রে ছোরা চালানো সহজ। ফ্রান্সিস এভাবে দু'টো আক্রমণকারী হাঙরও মারলো। মুক্তো শিকারীরা খুব খুশী হ'ল। ও যে অল্পদিনেই প্রায় একজন পাকা মুক্তো শিকারী হ'য়ে গেছে, এ বিষয়ে ওদের কোনো সন্দেহ রইলো না। ফ্রান্সিস চলে আসার দিন অনেক রাত পর্যন্ত মুক্তো শিকারীদের সঙ্গে রইলো। ওদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে রান্না-বান্না করলো, খাওয়া-দাওয়া করলো। তারপর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলো।

পরের দিন সকালে হ্যারি ওর কাছে এলো। ও হ্যারিকে সমস্ত পরিকল্পনার কথা বলল। হ্যারি বলল — 'তার চাইতে তুমি রাজকুমারীকেই বলো না — ও যেন রাজাকে বলে, তোমাকে একটা জাহাজ দেবার জন্যে।'

— 'তা আমি বলতে পারি। রাজাও আপত্তি করবেন না, জানি। কিন্তু মুস্কিল হ'য়েছে বাবা-মাকে নিয়ে। বাবা কিছুতেই রাজি হবেন না। কাজেই আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে, সুযোগ বুঝে আবার জাহাজ চুরি করে পালাতে হবে।'

হ্যারি আর কিছু বললো না, বুঝল ফ্রান্সিস ওর পরিকল্পনা পাল্টাবে না। যা ভেবেছে তা করবেই।'

দু'দিন পরে আবার সন্ধ্যের সময় রাজকুমারীর পাঠানো গাড়ী এল। ফ্রান্সিস যথারীতি সাজগোজ করল। বাড়ির বাইরে যাবার আগে মা'কে একবার জড়িয়ে ধরল। মা তো অবাক। জিজ্ঞেস করল — 'কি হ'ল তোর? হঠাৎ এভাবে জড়িয়ে ধরলি।'

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। ওর চোখে জল এসে গেছে। জানে কথা বললেই ওর অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠস্বর মা ধ'রে ফেলবে। মা'র মনে সন্দেহ হবে। কাজেই ও তাড়াতাড়ি মা'কে ছেড়ে দিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল।'

মেঝেয় দামী-দামী কার্পেট পাতা, দরজা-জানালায় নানা কারুকাজ করা ঘরগুলো পেরিয়ে ও অন্দরমহলে রাজকুমারীর বসার ঘরে এলো। রাজকুমারী মারিয়া ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। ও 'মুক্তোর সমুদ্র'র গল্প বলতে লাগলো, 'জলের নীচে মেঝের মত একটু এব্ড়ো-খেব্ড়ো জায়গায় কত মুক্তো ছড়িয়ে আছে। একটা নীল্‌চে বেগুনী রঙের আলোয় জায়গাটা ভ'রে আছে। বীভৎস চেহারার লাফ্ মাছ পিঠের কাঁটাগুলো উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরাই হচ্ছে মুক্তোর সমুদ্রের প্রহরী....।'

গল্প শেষ হ'তে রাজকুমারী বললো — 'আপনি কি আবার মুক্তো আনতে যাবেন?'

— 'কেন?' ফ্রান্সিস ভেঙে কিছু বললো না।

' — আমার লকেটের জন্যে একটা বড়ো মুক্তো আনবেন কিন্তু।'

ফ্রান্সিস হেসে মাথা ঝাঁকালো।

রাজবাড়ির গাড়ি চলে ও ফিরে আসছে। তখন রাত হ'য়েছে। রাস্তাঘাটে আঁধারি বাজারের কাছে গাড়ি, ঘোড়া, লোকজনের ভিড়। কোচ্‌ম্যান গাড়ির গতি কমালো। ফ্রান্সিস এই সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। কোচ্‌ম্যানের অজ্ঞাতে চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে আস্তে-আস্তে রাস্তায় নেমে পড়ল। কোচ্‌ম্যান কিছু বুঝতেই পারল না। গাড়ি চালিয়ে সে আপনমনেই চলে গেল।

ফ্রান্সিস বিস্কোর বাড়ির দিকে চললো। ও জানে, ও পালিয়েছে জানলে বাবা প্রথমেই হ্যারির বাড়িতে খোঁজ নেবেন। কাজেই হ্যারিদের বাড়িতে থাকা চলবে না।

বিস্কোদের বাড়িতে যখন পৌঁছলো, তখন বেশ রাত হ'য়েছে। দোতলায় বিস্কো কোন ঘরে থাকে, ফ্রান্সিস জানতো। দেখলো সেই ঘরের জানালা অব্দি একটা মোটা লম্বাগাছ উঠে গেছে। কত ফুল ফুটে আছে সেই গাছটায়। ও দেওয়াল টপকে বাগানে ঢুকল। গাছের আড়ালে-আড়ালে চলে এলো জানলাটার নীচে। তারপর লম্বা গাছটা বেয়ে উঠতে লাগলে। নরম লম্বাগাছ। বেশি চাপ দিয়ে ভরসা হচ্ছে না। খুব সাবধানে লতাগাছটা বেয়ে ও জানালাটার কাছে এল। জানালায় কয়েকটা টোকা দিল। বিস্কো তখন শুয়ে পড়েছিল। জানালায় টোকা দেওয়ার শব্দ শুনে এসে জানালা খুলে দিল। অন্ধকারে ফ্রান্সিসকে চিনতে ওর অসুবিধে হ'ল, ও একটুক্ষণ অবাক হ'য়ে তাকিয়ে

রইল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বললো — 'আমি ফ্রান্সিস।' বিস্কো চিনতে পেরে হাসলো। হাত বাড়িয়ে বললো — 'কি ব্যাপার এত রাত্রে এভাবে লুকিয়ে —।'

ফ্রান্সিস ওর বাড়ানো হাতটা ধ'রে লতাগাছটা থেকে জানালায় উঠে এলো। তারপর ঘরের মধ্যে নামলো। বিস্কো বিছানাটা দেখিয়ে বললে, 'বসো'।

ফ্রান্সিস বসলো। ওর পালাবার গল্প বললো। তারপর বললো, 'তোমাদের বাড়িতে দুচারদিন আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। আমার পালাবার খবর পেলেই বাবা আমার খোঁজে লোকজন পাঠাবেন। আমার প্রায় সব বন্ধুর বাড়িতেই বাবার পাঠানো লোকজন আমার খোঁজে আসবে। আমি জানি প্রথমেই খোঁজ হবে হ্যারিদের বাড়িতে। তারপর একে-একে সকলের বাড়ি।'

— তুমি অনায়াসে আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে পারো। কেউ তোমার খোঁজ পাবে না। কিন্তু তুমি কি ভেবেছো, মানে তোমার পরিকল্পনাটি কি?'

— 'সব বন্ধুদের আবার একত্র করবো। রাজার জাহাজ চুরি ক'রে পালাবো। যাবো চাঁদের দ্বীপে। আবার মুক্তো আনবো।

এসব যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে দু'জনে কথাবার্তা হ'ল অনেকক্ষণ, তারপর দু'জনে একই বিছানায় শুয়ে পড়লো। বাকি রাতটুকু ঘুমোল।

পরের দিন। ফ্রান্সিসের বাবা বুঝলেন, ফ্রান্সিস আবার পালিয়েছে। এবারের,লক্ষ্য নিশ্চয়ই 'মুক্তোর সমুদ্র' থেকে মুক্তো আনা। কারণ ফ্রান্সিস মুক্তোর ব্যাপারে কি যেন বলেছিলো। ওর বাবা নিজেই এলেন হ্যারির বাড়িতে। হ্যারি সে সব শুনে আকাশ থেকে পড়লো। ও বললো গত দু'দিন যাবৎ ফ্রান্সিসের সঙ্গে তার দেখা নেই. সে জানেই না, যে ও পালিয়েছে। প্রায় সব বন্ধুদের বাড়িতে খোঁজ খবর ক'রে ফ্রান্সিসের বাবা হাল ছেড়ে দিলেন। ওর মা মুখে কিছু বললো না। আড়ালে কাঁদলো কিছুক্ষণ।

পরের কয়েকটা দিন ফ্রান্সিস বিস্কোর বাড়িতেই খেয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলো। তারপর বিস্কোকে পাঠালো হ্যারি আর অন্য বন্ধুদের খবর দিতে। রাত্রিবেলা যেন সবাই সেই পোড়ো বাড়িতে আসে। সভা হবে।

পোড়ো বাড়িটায় যখন ফ্রান্সিস এলো, তখন রাত হয়েছে। অনেক বন্ধু এসে গেছে। বাকিরা দু'জন একজন ক'রে আসতে লাগল। কিছু পরেই ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়ালো। বলতে লাগলো, 'ভাইসব, আমরা আবার সমুদ্রযাত্রা করবো। বাবার আপত্তি, কাজেই ইচ্ছে থাকলেও রাজা আমাদের জাহাজ দেবেন না। কাজেই সোজা রাস্তা জাহাজ চুরি। পরশুদিন এইসময় এইখানে সবাই তৈরি হয়ে হাজির থাকবে। রাত্রির অন্ধকারে জাহাজ চুরি ক'রে আমরা পালাবো।

সবাই 'ও-হে-হো করে চীৎকার করে ফ্রান্সিসের প্রস্তাবে সম্মতি জানালো। সভা ভেঙে গেলো। নির্দিষ্ট দিনে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা রাত একটু গভীর হ'তে পোড়ো বাড়িটায় জড়ো হ'তে লাগলো। সবাই সমুদ্রযাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে।

দল বেঁধে সবাই জাহাজঘাটায় এসে হাজির। জাহাজঘাটায় এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। জলে সেই আলোর প্রতিবিম্ব কাঁপছে। খোলা তরোয়াল হাতে রাজার সৈন্যরা জাহাজ পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিস সবাইকে কেরোসিন কাঠের ভাঙ্গা বাক্স আর খড়ের

গাদার পেছনে লুকিয়ে পড়তে বললো। পাথরের দেওয়াল আর থামের আড়ালে ফ্রান্সিস আর তার তিন-চারজন সঙ্গী পাহারাদার খুব কাছাকাছি চলে এলো। তারপর একটুক্ষণ অপেক্ষা ক'রেই সুযোগ বুঝে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সৈন্য ক'জনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। ফ্রান্সিস একটা মশাল নিয়ে খড়ের গাদা আর কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপর ছুঁড়ে দিলো। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। অন্য পাহারাদারেরা ছুটে এলো। ওরা তাড়াতাড়ি কোমরে তরোয়াল গুঁজে বালতি নিয়ে সমুদ্র ঘাট থেকে জল তুলতে লাগল। আর আগুনে ছিটিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু আগুন নিভলো না, বরং বেড়েই চললো। জাহাজে না আগুন লেগে যায়, এই জন্য ওরা ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। এই গোলমালের মধ্যে ফ্রান্সিস একটা ভালো দেখে জাহাজ লক্ষ্য করে, জাহাজঘাটা থেকে পাতা তক্তার ওপর দিয়ে ছুটলো, সঙ্গী কয়েকজনও ছুটলো। হাতে একটা মশাল নিয়ে ও জাহাজের ডেক-এর ওপর দাঁড়িয়ে নাড়তে লাগলো। জাহাজঘাটায় লুকিয়ে থাকা বন্ধুরা দ্রুত ছুটে গিয়ে জাহাজটায় উঠলো। তাড়াতাড়ি নোঙর তুলে নিলো ওরা। একদল চলে গেল দাঁড়ঘরে। দাঁড় বাইতে লাগলো। জাহাজ মাঝসমুদ্রের দিকে এগিয়ে চললো। এতক্ষণে যে সৈন্যরা আগুন নেভাচ্ছিল, তারা দেখলো একটা জাহাজ মাঝসমুদ্রের দিকে ভেসে চলেছে। তখন অনেক দেরি হ'য়ে গেছে। জাহাজটাকে আর ফেরাবার উপায় নেই।

শান্ত সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে জাহাজ চললো। দাঁড়ঘরে যারা দাঁড় বাইছিল, তারা বাদে প্রায় সবাই ডেকঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। ফ্রান্সিস আর হ্যারির চোখে ঘুম নেই। ওরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলো। ফ্রান্সিস বললো — 'হ্যারি, আমাদের প্রথমেই খুঁজে বের করতে হবে মরিটাস দ্বীপটা কোথায়।'

— আন্দাজে কোথায় খুঁজে বেড়াবে?

— আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ দ্বীপে আছে পশ্চিম আফ্রিকার কাছাকাছি কোথাও, আর চাঁদের দ্বীপ থেকে বেশি দূরে নয়।

— কি ক'রে বুঝলে?

— চাঁদের দ্বীপের রাজপুরোহিত যখন ওখানে মাঝে-মাঝে যেতো, তখন নিশ্চয় মরিটাস দ্বীপ চাঁদের দ্বীপেরই কাছাকাছি কোথাও আছে।

— তুমি কি মরিটাস দ্বীপে বসির আয়নাওয়ালাকে খুঁজবে?

— হ্যাঁ—খুঁজে বের করতেই হবে। ওর কাছ থেকে আয়না তৈরি করিয়ে নিতে হবে। নইলে 'মুক্তোর সমুদ্র' থেকে মুক্তো তোলা যাবে না।

— কিন্তু বসির আয়নাওয়ালাকে কি করে খুঁজে বের করবে?

— কত বড় আর হবে মরিটাস দ্বীপ। নিশ্চয়ই খুঁজে বের করতে পারবো। কথা বলতে-বলতে ভোর হলো, রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত ওরা ঘুমিয়ে পড়লো।

* * *

জাহাজ চলেছে। মাঝখানে এক সামুদ্রিক ঝড়ে ওদের জাহাজের দু'টো পাল ছিঁড়লো, হালেরও ক্ষতি হ'লো। ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে বন্দরে জাহাজটাকে নোঙর করা হ'লো। পাল-হাল সারাই করা হ'লো। এসময়ে ফ্রান্সিস দেশী-বিদেশী জাহাজী নাবিকদের

সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব জমাতে লাগলো। একটু কথাবার্তার পরেই ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করে, 'মরিটাস দ্বীপটা কোথায় বলতে পারেন?' সকলেই মাথা নাড়ে-'উঁহু জানি না, নামই শুনিনি কখনো।' শুধু একজন বৃদ্ধ নাবিক বলেছিল — 'নাম শুনেছি, তবে সঠিক কোথায় বলতে পারবো না।' ফ্রান্সিসও হাল ছাড়লো না। যাকে পায়, যার সঙ্গে আলাপ হয়, তাকেই জিজ্ঞাসা করে, 'মরিটাস দ্বীপটা কোথায় জানেন?'

কেউ বলতে পারে না। অবশেষে পশ্চিম আফ্রিকার তেকরুর বন্দরে ওদের জাহাজ ভিড়লো। তেকরুর বন্দর ফ্রান্সিসদের পরিচিত। এই বন্দর দিয়েই ওরা হীরে আনতে গিয়েছিলো। হীরে এনে এই বন্দর থেকেই ওরা দেশের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলো। তেকরুর বন্দরে পাঁচ-ছ'টা ছোট-বড় বিদেশী জাহাজ নোঙর করা ছিলো। জাহাজ ফাঁকা করে সব নাবিকরাই পারে নেমে এসেছিলো। হাজার হোক মাটির টান। যে ছোট হোটেলটা ওখানে ছিলো, সেখানে তিল ধারণের জায়গা নেই। ভীষণ ভীড় সেখানে। সবাই খাচ্ছে-দাচ্ছে, আনন্দে হৈ-হল্লা করছে। ভাইকিংকরাও হোটেলে খাওয়া-দাওয়া, আনন্দে-হল্লোড়ে মেতে উঠলো। হ্যারি জাহাজ থেকে নামেনি। ওর শরীরটাও ভালো নেই। ফ্রান্সিস হোটেলে খেতে-খেতে যাকে সামনে পেলো, তাকেই মরিটাস দ্বীপের কথা জিজ্ঞেস করলো। সকলেই বললো, তারা জানে না। একজন বললো 'দক্ষিণদিকে কোথায় শুনেছি।'

হোটেলের ভেতরের হৈ-হট্টগোল আর ভালো লাগছিলো না।

ও বাইরে চ'লে এলো। দেখলো, হোটেলের কয়েকটা লোক রসুইঘরের কাছে কাকে মারছে। লোকটা চীৎকার করে কাঁদছে, আর ছেড়ে দেবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করছে। ফ্রান্সিস জটলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। নির্দয়ভাবে মার খাচ্ছে লোকটা। ওর সহ্য হ'লো না। লোকগুলোকে দু'হাতে সরিয়ে দিল ও। দেখলো লোকটা এমন মার খেয়েছে, যে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। ও হোটেলে লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে?' লোকগুলোর মধ্যে থেকে একজন মোটাসোটা লোক এগিয়ে এসে বলল — 'এটা চোর। প্রায় মাসখানেক হ'ল সুযোগ পেলেই রসুইঘরে ঢুকে খাবার চুরি ক'রে খায়। এর আগেও মার খেয়েছে। কিন্তু স্বভাব যায় নি। আজকে তাই ধ'রে আচ্ছামত দিলাম। আর কোনোদিন এদিকে আসবে না।'

ফ্রান্সিস নীচু হ'য়ে লোকটাকে তুলে দাঁড় করালো। তারপর ওকে ভীড় থেকে সরিয়ে নিয়ে আসবার সময় কিছু মুদ্রা মোটাসোটাকে হাতে গুঁজে দিলো। ওরা যে যার কাজে চলে গেলো।

ফ্রান্সিস লোকটাকে নিয়ে জাহাজঘাটার কাছে এলো। এখানে একটা আলো জ্বলছিল। সেই আলোতে দেখলো লোকটাকে বৃদ্ধই বলা যায়। হয়তো না খেয়ে থাকার জন্যেই লোকটাকে আরো শীর্ণ লাগছে দেখতে। ফ্রান্সিস ওর হাতে কয়েকটা পর্তুগীজ মুদ্রা দিলো। তারপর বললো — 'তোমার নাম কি?'

— 'চুকো।' লোকটা বুকে-পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে বললো।

— 'তুমি চুরি করো কেন?'

— কি করবো? বয়স হ'য়েছে। জাহাজের ঐ অত খাটুনির কাজ করে পেরে

উঠি না। তাই দিন কুড়ি আগে যে জাহাজে কাজ করতাম, তার ক্যাপ্টেন আমাকে এখানে ফেলে জাহাজ নিয়ে চ'লে গেছে। চুরি ক'রে খেতে পেয়েছি ব'লেই এখনো বেঁচে আছি, নইলে কবে ম'রে ভূত হ'য়ে যেতাম।' চুকো ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল।

— 'হুঁ'। ফ্রান্সিস একটু ভাবলো। মরিটাস দ্বীপের কথা একে জিজ্ঞেস ক'রে লাভ নেই। সেই একই উত্তর শুনতে হবে — 'জানি না।'

তবু জিজ্ঞেস করলো — 'এ দিকটায় তুমি কতবার এসেছো।'

— অনেকবার।

— চাঁদের দ্বীপ, ডাইনীর দ্বীপ চেনো এ'সব।

— ভালো করেই চিনি।

— চাঁদের দ্বীপে কারা থাকে?

— যারা থাকে, ওদের বলে 'ভাজিম্বা।'

ফ্রান্সিস বেশ অবাক হ'লো। একটু আশান্বিত হয়ে ও জিজ্ঞেস করলো — 'মরিটাস দ্বীপ চেনো?'

— চিনি বৈকি।

ফ্রান্সিস চমকে উঠলো। লোকটা বলে কি। তবু একটু যাচাই ক'রে নিতে হয়। বললো — 'মরিটাস দ্বীপটা কোথায় জানো?'

— চাঁদের দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে।

ফ্রান্সিস যে হাতে স্বর্গ পেল। তা'হলে তো একে ছাড়া হবে না। জিজ্ঞেস করল — 'ঐ দ্বীপে তুমি কখনো গেছো?'

— 'আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।' চুকো পেছনে ফিরে হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে ওকে ধরলো। বললো — 'চলো আমাদের জাহাজে। তোমাকে আজ পেট পুরে খাওয়াবো।'

চুকো ফিরে দাঁড়াল — 'বেশ চলো।'

ফ্রান্সিস আর ওকে কোন প্রশ্ন করলো না। একে পেট খিদেয় জ্বলছে, তার ওপর ঐ লোকগুলোর মার খেয়েছে। ও যে এখনো মাটিতে শুয়ে পড়েনি, এটাই আশ্চর্য। ও চুকোকে জাহাজে নিয়ে নিজের কেবিন ঘরে নিয়ে এলো। ভাইকিংরা যারা চুকোকে দেখলো, তারা বেশ অবাক হ'ল। ফ্রান্সিস আবার হঠাৎ হাভাতেটাকে কোত্থেকে ধ'রে নিয়ে এল? চুকোকে বসিয়ে ফ্রান্সিস ছুটলো হ্যারিকে ডাকতে। হন্তদন্ত হ'য়ে ওকে কেবিনঘরে ঢুকতে দেখে হ্যারি বেশ অবাক হ'ল। বললো — 'কি হয়েছে?'

— 'সে পরে বলবো, তুমি এখন শীগগির আমার ঘরে এসো।' হ্যারি উঠে দাঁড়ালো। নিজের কেবিনঘরের দিকে যেতে-যেতে ফ্রান্সিস বললো — 'চুকো নামে একটা লোককে আমার ঘরে বসিয়ে রেখেছি। তুমি একথা সেকথা বলে নানা গল্প ফেঁদে ওকে আটকে রাখবে। সাবধান যেন ও পালাতে না পারে।'

নিজের কেবিনঘরে ঢুকে চুকোকে দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল — 'হ্যারি, এর নাম চুকো। জাহাজে-জাহাজে বহু জায়গায় ঘুরেছে।' এবার চুকোর দিকে তাকিয়ে বলল - 'চুকো, এ হ'ল হ্যারি, আমার প্রাণের বন্ধু। দু'জনে গল্প-টল্প কর।'

— 'আমার খিদে পেয়েছে।' চুকো ভাঙাগলায় বলল।

— 'আমি এক্ষুণি খাবার নিয়ে আসছি।' ফ্রান্সিস দ্রুত বেরিয়ে গেল। রসুইঘরে ঢুকে মাংস, রুটি যা হাতের কাছে পেলো থালায় তুলে নিল। ফিরে এসে দেখলো চুকো আর হ্যারি দু'জনেই চুপ ক'রে ব'সে আছে। হ্যারি দু'-হাত ছড়িয়ে হতাশার ভঙ্গী করলো। তার মানে চুকো এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। ফ্রান্সিস বুঝলো — সত্যিই ওর খিদে পেয়েছে। খাবারের থালা টেবিলের ওপর রেখে বললো — 'চুকো — খেয়ে নাও।' চুকো যেন খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মিনিট দশ-পনেরো একনাগাড়ে খেয়ে গেল। একটা কথাও বললো না। খেতে-খেতে জল তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু সেটা বলতে গিয়ে মুখ দিয়ে শব্দ বেরুলো না। খাবারে গলা আটকে গেছে। হাতের ইশারায় জল দিতে বললো। ফ্রান্সিস তৈরিই ছিলো। তাড়াতাড়ি গ্লাসে জল নিয়ে এল। এক চুমুকে সবটা জল খেয়ে নিয়ে চুকো ঢেকুর তুলল। তারপর আস্তে-আস্তে খেতে লাগলো। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল — 'চুকো — এই জাহাজে থাকবে?'

— 'হুঁ।' শব্দ ক'রে চুকো ঘাড় নাড়ল। তারপর বললো — 'কিন্তু কোন কাজ করতে পারবো না।'

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বলে উঠলো — 'তোমাকে কিছুই করতে হবে না।'

— 'তাহ'লেই থাকা যাবে।'

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বললো না। চুপ ক'রে চুকোর খাওয়া দেখতে লাগলো। একটুক্ষণের মধ্যেই মাংস-রুটি শেষ। চুকো ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললো — 'আমার এখনো কিন্তু পেট ভরে নি।'

— 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই —' ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে ইসারা ক'রে ছুটলো রসুইঘরের দিকে। আর একদফা মাংস-রুটি নিয়ে এল। চুকো আবার নিঃশব্দে খেতে লাগলো। এবার আরো আস্তে-আস্তে, খেতে লাগল। খাওয়া শেষ ক'রে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে হাসলো। ফ্রান্সিসও কৃতার্থের হাসি হাসলো।

হাতমুখ ধুয়ে এসে চুকো বিছানায় চোখ বুঁজে আধশোয়া হ'লো। ফ্রান্সিস একটু সময় নিল। কি ভাবে কথাটা পাড়বে ভেবে নিলো। তারপর বললো — 'চুকো — তুমি তো অনেক জায়গায় ঘুরেছো।'

চুকো চোখ বন্ধ ক'রেই তর্জনীটা ঘোরাল। তার মানে সমস্ত পৃথিবী।

— 'তা হলে তো মরিটাস দ্বীপেও গেছো তুমি।'

— 'দু'বার।' চোখ বন্ধ করেই চুকো বলতে লাগল — 'একবার দ্বীপে নেমে ছিলাম, অন্যবার আর নামিনি। জাহাজেই ছিলাম।'

— 'চুকো — আমাদের ঐ দ্বীপে নিয়ে যেতে হবে।'

— 'সে অনেক ঝঞ্ঝাট, দ্বীপটার চারদিকে আধডোবা প্রবালের স্তর। কোমর অবধি জল ঠেলে যেতে হয়। কোথাও গলা অবধি জল।'

— 'জাহাজ থেকে নেমে হেঁটেই যাবো।' ফ্রান্সিস বললো। চুকো হাসলো — 'আগুনের প্রবালে পা রাখলে পা জ্বালা করতে থাকবে, তাছাড়া এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা, অসাবধান হ'লে পা কেটে দোফালা হয়ে যাবে।'

— 'তবে ওখানকার লোকেরা যাতায়াত করে কি ক'রে?'

— 'ভাজিম্বাদের নৌকো দেখেছো, গাছের গুঁড়ি কুঁড়ে-কুঁড়ে তৈরি করে।'

— 'হ্যাঁ দেখেছি।'

— 'ঐ ডেঙো নৌকোয় চড়ে ঐ জায়গাটা পার হ'তে হয়।'

— 'কতটা জায়গায় এই প্রবালের স্তর?'

— 'কোথাও এক মাইল, কোথাও দু'মাইল। তারপর দ্বীপের মাটি।'

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ ভাবলো। তারপর বলল — 'ওখানে আয়না কিনতে পাওয়া যায়?'

— 'আয়না তৈরিই তো মরিটাস দ্বীপের মানুষদের একমাত্র জীবিকা। ওখানকার বালি খুব মিহি। সোডা বা পটাশ পাহাড় এলাকায় প্রচুর। তাই দিয়ে খুব ভালো কাঁচ তৈরি হয়। লাল ভার্মিলিয়ন দিয়ে পারদ তৈরি করে তাই দিয়ে নানারকম আয়না বানায় ওরা। দূর-দূর দেশের লোকেরা ওখানে আয়না কিনতেই জাহাজ ভেড়ায়।'

ফ্রান্সিস চুকোকে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করলো না। জিজ্ঞেস করলেও চুকো আর কথা বলতো না। কারণ ও ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

জাহাজ এবার চললো দক্ষিণমুখো। ফ্রান্সিস ভেবে দেখলো চাঁদের দ্বীপ হ'য়েই ওদের যেতে হবে। চাঁদের দ্বীপ থেকে ভাজিম্বাদের গুঁড়ি কাটা নৌকা নিতে হবে, যে ক'টা পাওয়া যায়। কথাটা ও হ্যারিকে বললো, ঐ নৌকো জোগাড় না ক'রে যাওয়া অর্থহীন। প্রবালের স্তর না পেরোতে পারলে ঐ দ্বীপেও যাওয়া যাবে না।

— 'বুঝলে হ্যারি' — ফ্রান্সিস বলল — 'মাহাবো সঠিক জানতো না, ওর বাবা সেই রাজপুরোহিত কিভাবে আয়না আনতো। আমার মনে হয়, ঐ রাজপুরোহিত ভাজিম্বাদের ডোঙা নৌকা চড়েই মরিটাস দ্বীপে যেত। বসির আয়নাওলাকে দিয়ে আয়না তৈরি করিয়ে ঐ ডোঙায় চড়েই ফিরে আসত। এটা ঐ রাজপুরোহিত খুব গোপনে করত।'

— 'আমারও তাই মনে হয়।' হ্যারি মাথা নেড়ে বললো।

* * *

দিন পনেরো-কুড়ি কাটলো। খুব সাংঘাতিক ঝড়ের মুখে পড়তে হ'লো না ওদের। দু'-একদিন যা ঝড়বৃষ্টি হলো, তাতে ওদের কোন ক্ষতি হ'ল না।

দূর থেকে দেখা গেলো ডাইনীর দ্বীপ। সেই সবুজ পাহাড় গাছ-গাছালি ঘেরা। চাঁদের দ্বীপ আর বেশি দূরে নেই।

দিন কয়েক পরেই ওরা চাঁদের দ্বীপের কাছে এলো। দূর থেকেই দেখা গেলো কালো কাঁচপাহাড়ের টানা এবড়ো-খেবড়ো প্রাচীর। তখন দুপুরবেলা। ফ্রান্সিস জাহাজ থামাতে বলল। রাত হ'লে তবে সোফালা বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো হ'লো। ফ্রান্সিস হ্যারির সঙ্গে পরামর্শ করলো। বললো — 'আমরা কেউ দ্বীপে নামবো না। আমাদের কাউকে দেখলে লা ক্রুশের দস্যুদলের লোকেরা চিনে ফেলতে পারে।'

— 'এক কাজ করা যাক', হ্যারি বলল, 'চুকোকে পাঠাও। ভাজিম্বাদের দু'-একটা নৌকো ও অনায়াসে বন্দরের ঘাট থেকে নিয়ে আসতে পারবে।'

— 'আমিও চুকোকে পাঠাবার কথাই ভাবছিলাম।'

রাত হ'লো। ফ্রান্সিসরা আস্তে-আস্তে জাহাজটা সোফালা বন্দরের কাছে নিয়ে এলো।

চুকোকে ডাকা হ'লো। কি করতে হবে, বলা হ'লো। চুকো মাথা নেড়ে বললো — 'ওসব আমি পারবো না। সবে খেয়ে উঠেছি। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

ফ্রান্সিসরা পড়ল মহা সমস্যায়। ওরা যতই চুকোকে বোঝায়, চুকো ততই মাথা নাড়ে আর বলে — 'আমার এখন ভীষণ ঘুম পেয়েছে।

এবার হ্যারি এগিয়ে এলো। চুকোর কাঁধে হাত রেখে হ্যারি ডাকল — 'চুকো।'

— 'হুঁ।' চুকো চোখ বুজে ঝিমুতে-ঝিমুতে বলল।

— তুমি একটা জাহাজের মালিক হতে চাও?

চুকো চোখ খুলে বড়-বড় চোখে হ্যারির দিকে তাকাল।

— 'হ্যাঁ—' হ্যারি বলল — 'যদি ডোঙা-নৌকো একটা এনে দিতে পারো — তুমি তার বদলে একটা জাহাজ পাবে।'

— 'বাজে কথা।' চুকো আবার চোখ বুজল।

— 'আচ্ছা — মুক্তোর সমুদ্রের নাম শুনেছো?'

— 'ওখানে গেলে কেউ ফেরে না।'

— 'আমরা ওখান থেকে মুক্তো তুলে আনবো।' হ্যারি বললো।

— 'তোমার মাথায় গোলমাল হ'য়েছে, ঘুমোগে যাও।' চুকো নিস্পৃহস্বরে বললো।

— 'চুকো — আমার মাথা ঠিক আছে। তোমাকে আমরা হাঁসের ডিমের মত দুটো মুক্তো দেব।'

চুকো এবার চোখ তুলল। বলল — 'মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো আনতে পারবে?'

— অনায়াসে পারবো, যদি তুমি শুধু একটা নৌকা এনে দাও।

— তোমরা যাচ্ছ না কেন?

— সে অনেক কথা। তোমাকে পরে বলবো। এখন এই কাজটুকু ক'রে দাও। তোমরা হচ্ছো স্পেন দেশের লোক। বীরের জাত সামান্য কাজটুকু করতে পারবে না।

হঠাৎ চুকো উঠে দাঁড়ালো। একবার চারপাশের দাঁড়ানো ভাইকিংদের দিকে জামাটা হাত দিয়ে ঝেড়ে নিল। ওর ভাবভঙ্গী দেখে অনেকেই আড়ালে হাসলো। হাসি সামলাতে অনেকে কেবিনঘরের বাইরে চলে গেল। চুকো [illegible]। চুকো গম্ভীর ভঙ্গীতে বললো — 'একটা নৌকো নিয়ে আসা এ আর কি এমন কাজ।' ও দরজার দিকে এগোলো। হঠাৎ পেছন ফিরে বলল — 'হ্যারি — আমাকে দু'টো মুক্তো দিতে হবে কিন্তু।'

— কথা যখন দিয়েছি নিশ্চয়ই দেবো। তুমি মুক্তো বিক্রী ক'রে জাহাজ কিনো।

চুকো বীরদর্পে বেরিয়ে গেলো। জাহাজ থেকে দড়ি বেয়ে-বেয়ে জলে নেমে গেল। তারপর সাঁতরে চললো সোফালা বন্দরের দিকে চারদিকে নিশ্চিদ্র অন্ধকার। জাহাজের আলোগুলো নেভানো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ডেক-এ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরেই অন্ধকারে জলভাঙার শব্দ উঠলো। অন্ধকারে ফ্রান্সিস ভালো করে তাকিয়ে দেখলো দু'টো নৌকো আসছে। একটাতে ভূতের মত চুকো ব'সে আছে। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বললো — 'চুকো — নৌকোদু'টো দড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখো।'

নৌকো দু'টো জাহাজের ঝোলানো দড়ির সঙ্গে চুকো বেঁধে দিলো। তারপর উঠে এলো জাহাজের ডেক-এ। গম্ভীরচালে হেঁটে কেবিন-ঘরের দিকে চ'লে গেলো।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের ডেকে বলল — আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা নয়। এই অন্ধকারের মধ্যেই আমাদের পালাতে হবে। সবাই যে যার জায়গায় যাও। জাহাজ দক্ষিণমুখে চালাও।

নোঙর তোলা হ'লো। জাহাজ চললো দক্ষিণমুখো। কিন্তু মরিটাস দ্বীপ কি ঠিক দক্ষিণ দিকে? সংশয় দেখা দিলো ফ্রান্সিসের মনে। ও কেবিনঘরে গিয়ে ঢুকলো। দেখলো চুকোর ভিজে জামাকাপড় পালটানো হয়ে গেছে। ও ঘুমোবার উদ্যোগ করছে। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো — 'চুকো — এখন আমরা কোনদিকে যাবো?'

'দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে।' চুকো গম্ভীর ভঙ্গীতে বললো।

— মরিটাস দ্বীপে পৌঁছতে কতদিন লাগবে?

— 'হুঁ!' চুকো হেসে বললো — 'কাল সকালেই পৌঁছে যাবো।'

সত্যিই তাই। পরদিন ভোর-ভোর সময়ে দূর থেকে মরিটাস দ্বীপ দেখা গেলো। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল দ্বীপটার একদিকে ন্যাড়া পাহাড়, পাথর, ধুলো-বালি। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। অন্যদিকে সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়, গাছ-গাছালি।

চুকোর নির্দেশমত এখন জাহাজ চলছে। প্রবালের স্তরের কাছাকাছি এসে চুকো হাত তুলে জাহাজ থামাবার নির্দেশ দিলো। চুকো ঠিকই বলেছিল। জাহাজের কাছ থেকে তীর পর্যন্ত আগুনে প্রবালের স্তর। জাহাজ থেকে সেই লাল প্রবাল স্তর স্বচ্ছ জলের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো লাল সবুজে রঙের প্রবাল স্তর বিস্তৃত। এই স্তরের কাছে আরো দু'টো জাহাজ নোঙর করা ছিলো। তার মধ্যে একটা জাহাজ ছোট ভাঙাচোরা। অন্য জাহাজটা নতুন। জলদস্যুদের ক্যারাভেল সেটা। তবে মাস্তুলের মাথায় কোন পতাকা উঠছে না। কাজেই বোঝা যাচ্ছে না, সেটা অন্য কোন দেশের জাহাজ।

ফ্রান্সিস এসব দেখছিলো। চুকো ফ্রান্সিসের কাছে এলো। বললো — 'একটা ভাঙা নৌকায় মাত্র একজনই যাওয়া যাবে।'

— কেন? দু'তিনজন উঠলে কি হবে?

— নৌকো নীচের প্রবাল স্তরে আট্‌কে যাবে।

কাজেই ফ্রান্সিস আর চুকো দড়ি বেয়ে-বেয়ে দু'টো নৌকোয় নেমে এলো। তারপর দাঁড় বেয়ে দ্বীপের দিকে চললো। ফ্রান্সিস জলের দিকে তাকিয়ে দেখলো, স্বচ্ছ নীল, জলের মধ্য দিয়ে প্রবালস্তর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কত বিচিত্র রকমের মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নৌকো দু'টো দ্বীপের মাটির কাছে এসে লাগলো। ফ্রান্সিস দেখলো ওরকম আরো দুটো ডোঙা নৌকো তীরে বাঁধা রয়েছে। ও' নৌকো দু'টো বেঁধে রেখে উঁচু-নীচু ধুলোটে পথ ধ'রে এগোতে লাগলো। একটু ওরেই বাজার দেখা গেল। সারি-সারি আয়নার দোকান। আয়না ছাড়াও রয়েছে নানা কারুকাজ করা গ্লাস, রেকাবি, জগ। ফ্রান্সিস পরপর কয়েকটা দোকানে জিজ্ঞেস করল — বসির আয়না- ওলার দোকান

কোনটা? কিন্তু কেউই বলতে পারলো না। ওরা ঘোরাঘুরি করছে তখনই একজন লোক চুকোকে জড়িয়ে ধরলো। চুকো প্রথমে চমকে উঠলো। তারপর লোকটাকে দেখে স্প্যানিশ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলো — 'আরে তুমি?' রাস্তার মধ্যেই দু'জনে গলা জড়াজড়ি ক'রে গল্পে মেতে উঠলো। ফ্রান্সিস তফাতে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। ওদের বকর্-বকর্ তখনও চলছে। ও বুঝলো, অনেকদিন পরে দুই বন্ধুর দেখা। ওদের কথা তাড়াতাড়ি ফুরোবে না। ফ্রান্সিস ডাকল — 'চুকো — আমার ভীষণ তাড়া।' চুকো ব'লে উঠলো — 'আমি আমার বন্ধুকে পেয়েছি। ওদের জাহাজেই যাবো। তোমাদের সঙ্গে যাবো না।'

ফ্রান্সিস হাসল — 'কিন্তু তোমার পাওনা মুক্তো দুটো?'

— 'হুঁ —' চুকো আবার হেসে বললো — 'ভাজিম্বাদের প্রবাদ জানো তো — 'যদি তুমি চিরদিনের জন্যে কোথাও যেতে চাও তাহ'লে মুক্তোর সমুদ্রে যাও।' তোমরা কোনোদিনই মুক্তো আনতে পারবে না কেউই'।

— 'ঠিক আছে। তাহ'লে চলি চুকো — তুমি আমাদের অনেক উপকার করছো। তোমার কাছে আমরা ঋণী রইলাম।'

ফ্রান্সিস এবার একাই এ দোকানে ও দোকান ঘুরতে লাগলো। কিন্তু বসির আয়নাওলার দোকান কোথায় ঠিক বলতে পারলো না।

ঘুরতে-ঘুরতে বেলা হ'লো। খিদেও পেয়েছে ভীষণ। ফ্রান্সিস ভাবলো জাহাজে ফিরে যাবে। বিকেলের দিকে আসবে। কিন্তু কেমন একটা জেদ চেপে গেলো। বসির আয়নাঅলার হদিশ আজকেই খুঁজে বের করবো। জিজ্ঞেস করতে-করতে একজন বৃদ্ধ দোকানদার বললো, 'বসিরের কোন দোকান নেই। ও নিজের বাড়িতেই আয়না বানায় আর ওখান থেকেই বিক্রী করে।'

— ওর বাড়িটা কোথায়?

— সোজা চলে যাও। একটা ন্যাড়া পাহাড়ের নীচে দেখবে পান্ডানাস গাছ। ওখানেই কোথাও ও থাকে।

হাঁটতে-হাঁটতে এসে ফ্রান্সিস পান্ডানাস গাছটা দেখতে পেলো। ওখানে দাঁড়িয়ে এদিক দেখছে, তখনই একটা দশ বারো বছরের ছেলে এসে ইসারায় জানতে চাইলো, ফ্রান্সিস কি চায়। ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে থেমে-থেমে বললো, বসির আয়নাঅলার বাড়ি। ছেলেটি মাথা ঝাঁকিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল। ফ্রান্সিস ওর পেছনে-পেছনে একটা বাড়িতে ঢুকলো। ট্রাভেলার্স ট্রী'র কান্ড ডাল দিয়ে বাড়িটা তৈরি। ওপরটা পান্ডানাস গাছের পাতায় ছাওয়া। একটা ঘরের দিকে দেখিয়ে ছেলেটি চ'লে গেলো। ফ্রান্সিস দরজাটার কাছে গেলো। একটু ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেলো। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকলো — 'বসির, বসির।' কোন উত্তর এলো না। ও দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। ভেতরের অন্ধকারে কি একটা নড়ে উঠল, আর সঙ্গে-সঙ্গে মাথায় একটা আঘাত পেয়ে ফ্রান্সিস উবু হ'য়ে মেঝেয় পড়ে গেলো। পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই জ্ঞান হারালো।

যখন ওর জ্ঞান ফিরলো দেখলো, সেই ঘরের একটা খুঁটির সঙ্গে ওর হাতদু'টো বাঁধা। মাথায় অসহ্য ব্যথা। তাকিয়েই আবার চোখ বন্ধ করল।

'হা—হা—হা—।' হাসির শব্দে ফ্রান্সিস চমকে তাকাল। দেখলো, খোলা তরোয়াল হাতে সামনে দাঁড়িয়ে লা ক্রুশের সেই ঢ্যাঙামত ছোট সর্দার।

— 'জ্ঞান ফিরেছে তাহ'লে। হা-হা — আমি ভাবলাম তরোয়ালের হাতলের এক ঘায়েই বুঝি অক্কা পেলে।' ফ্রান্সিস কোন কথা বললো না। ঢ্যাঙা সর্দার বললো — 'আমাদের জাহাজ পুড়িয়ে দিয়েছিলে। মুক্তো বিক্রী ক'রে লা ক্রুশ নতুন জাহাজ কিনেছে। আসার সময় নিশ্চয়ই সেটা চোখে পড়েছে।'

ফ্রান্সিসের মনে পড়লো আসার সময় একটা নতুন জাহাজ দেখেছিল। ও দুর্বলস্বরে বললো — 'হ্যাঁ দেখেছি। কিন্তু তুমি এখানে কেন?'

— 'হা-হা — যে কারণে তুমি বসিরের কাছে এসেছো, আমিও সেই জন্যেই এসেছি। কথাটা ব'লে ঢ্যাঙা সর্দার গলার কাছে হাত নিয়ে বললো — 'এই দেখো বসিরর হাতে তৈরি আয়না। এটাই ওর হাতে তৈরি শেষ আয়না। ওকে আমি খতম করে দিয়েছি।' ফ্রান্সিস দেখলো সেই ভাঙা আয়নার মত একটা আয়না ওর গলায় ঝুলছে। ওকোন কথা বললো না। মনে-মনে বললো — কি নির্মম এই জলদস্যুরা। ঢ্যাঙা সর্দার বলে উঠলো — 'তোমাকেও খতম করতাম। কিন্তু এখনও সে সময় আসে নি।'

— 'আয়নার কথা তোমরা জানলে কি ক'রে?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো।

— 'ভাজিম্বাদের সেনাপতি জঙ্গলের মধ্যে পাতা ফাঁদে ধরা পড়েছে। প্রাণের মায়া সকলেরই আছে। মেরে ফেলার ভয় দেখাতে ও যা জানে, সব বলেছে। রাজপুরোহিত মরিটাস দ্বীপে এসে বসির আয়নাঅলার কাছ থেকে আয়না বানিয়ে যেতো। তারপর মুক্তোর সমুদ্রে সে আয়না নিয়ে নামতো আর মুক্তো নিয়ে অক্ষতদেহে ফিরে আসতো। এটুকু আমরা তার কাছ থেকে জেনেছি। কিন্তু আয়নাটা কোন কাজে লাগতো, সেটা সেনাপতির জানা নেই। নানাভাবে আমরা সে কথা বের করবার চেষ্টা করেছি। শাস্তিঘরের কোন শাস্তিই বাদ দিইনি। শেষে বোঝা গেল আয়নাটা কি কাজে লাগতো, ও সত্যিই সেটা জানে না।' একটু থেমে ঢ্যাঙাসর্দার তরোয়ালের সরু মাথাটা ফ্রান্সিসের গলায় ঠেকালো। একটু চাপ দিয়ে বললো — 'এবার তুমি বলো আয়নাটা কি কাজে লাগে। আমি তোমার জন্যেই এখানে এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম।'

ফ্রান্সিস চুপ ক'রে রইলো। তরোয়ালের ডগার চাপ বাড়ল। ও ঢ্যাঙা সর্দারের চোখের দিকে তাকালো। কি নির্মম ভাবলেশহীন চোখ। বুঝলো, ওকে এই মুহূর্তে হত্যা করতে ঢ্যাঙা সর্দার বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করবে না। ওর হাতও কাঁপবে না। ঢ্যাঙা সর্দার চেঁচিয়ে উঠলো — 'বলো — নইলে মরো।'

ফ্রান্সিস বলল — 'ঐ আয়না রাখলে লাফ্ মাছগুলো ঐ আয়নাটার প্রতিবিম্ব দেখে বিভ্রান্ত হয়। প্রাণপণে আয়নাটার ওপর ঢুঁ মারতে থাকে। মুখ ফেটে যায়, আয়নার কোণায় লেগে মুখ ফালা হ'য়ে যায়, তবু ওরা ঢুঁ মেরে চলে। সেই ফাঁকে মুক্তো তুলে নিতে হয়।'

— 'তাহ'লে এই ব্যাপার।' ঢ্যাঙা সর্দারের মুখে খুশি যেন উপচে পড়ছে। বললো — 'কত মুক্তো আছে ওখানে?'

— 'যত মুক্তো আছে তা বিক্রী করে তোমার পরের চার পুরুষ পর্যন্ত কাউকে কিছু করতে হবে না। যে অর্থ তারা পাবে, দু'হাতে খরচ ক'রেও তা শেষ করতে পাবে না।

ঢ্যাঙা সর্দারের মুখ হাঁ হয়ে গেল। এত মুক্তো? ওর আর তর সইছিল না। ও কোমরে তরোয়াল গুঁজলো। বললো — 'তোমার কাছে যা জানার জেনে নিয়েছি। তুমি আমাদের জাহাজ পুড়িয়ে দিয়েছিলে। আমিও এই বাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দেবো। মর পুড়ে তুই।' ঢ্যাঙা সর্দার ছুটে বাইরে চলে গেলো। একটু পরেই ঘরের কোণার দিকটা ধোঁয়ায় ভ'রে গেলো। তারপরেই দেখা গেলো আগুনের শিখা।

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো ছোট-বড় আয়না সাজানো। পা বাড়িয়ে দেখলো আয়নাগুলোর নাগাল পাওয়া যায় কিনা। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা ঝিমঝিম করছে। কিন্তু বাঁচতে হ'লে আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে ফ্রান্সিস আয়নাগুলোতে লাথি মারলো। চৌচির হ'য়ে ভেঙে আয়নার টুকরোগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে গেলো। একটা ধারালো মুখওলা টুকরো ফ্রান্সিস পা দিয়ে টেনে-টেনে কাছে আনলো। তারপর ব'সে পড়ে অতিকষ্টে হাত বেঁকিয়ে টুকরোটা তুলে নিল। ঘরের একপাশের ট্রাভেলার্স ট্রীর কান্ড কেটে তৈরি বেড়া আগুনে পুড়ে ফুলকি তুলে ধপাস ক'রে পড়ে গেল। আগুন পাতায় ছাওয়া চালায় উঠে আসছে। ফ্রান্সিস কাঁচের টুকরোটা হাতে বাঁধা দড়িটায় ঘষতে লাগলো। কব্জি কেটে রক্ত পড়তে লাগলো। ফ্রান্সিস সব ব্যথা-যন্ত্রণা ভুলে এক-নাগাড়ে কাঁচটা ঘষতে লাগলো। দড়িটা কিছুটা কেটে যেতে এক হ্যাচ্‌কা টানে দড়িটা ছিঁড়ে ফেললো। ততক্ষণে মাথার ওপরের ছাউনিতে আগুন লেগে গেছে। বাইরে অনেক মানুষের চীৎকার, চেঁচামেচি কানে এলো। একবার দেখতে হয় বসির বেঁচে আছে কি না। ফ্রান্সিস দৌড়ে পেছনের ঘরে এল। দেখল, কম্বল পাতা বিছানায় শুভ্র দাড়ি-গোঁফঅলা এক বৃদ্ধ শুয়ে আছে। কাছে এসে দেখলো, একটা ছোরা তার বুকে আমূল বেঁধা। বুঝলো, বসির বেঁচে নেই। মাথার ওপর থেকে ছাউনির একটা অংশ সশব্দে ভেঙে পড়লো। আগুনের ফুলকি উড়ল। আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। ফ্রান্সিস জ্বলন্ত দরজার মধ্যে দিয়ে এক লাফে বাইরে চ'লে এলো। দেখলো, অনেক লোক জড়ো হ'য়েছে। তারা জল ছিটিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে।

আগুন থেকে ফ্রান্সিসকে বেরিয়ে আসতে দেখে অনেকেই অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। দু'একজন কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করতে এগিয়ে এলো। ফ্রান্সিস কোনোদিকে তাকাল না। একছুটে রাস্তায় উঠে এলো। তারপর সমুদ্রতীর লক্ষ্য ক'রে জোরে ছুটতে লাগলো।

হাঁপাতে-হাঁপাতে সমুদ্রের তীরে পৌঁছলও। দেখলো, ওদের জাহাজ আর অন্য ভাঙাচোরা জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু নতুন জাহাজটা নেই। ও আর এক মুহূর্তও দেরী করলো না। লাফিয়ে ডোঙা নৌকায় উঠলো। দ্রুত হাতে দাঁড় বেয়ে ওদের জাহাজের দিকে চললো।

জাহাজে উঠে দেখলো ডেক-এর এখানে-ওখানে দল বেঁধে সবাই খেলায় মত্ত। ওর মধ্যে আবার নাচের আসরও বসেছে। ফ্রান্সিস চিৎকার ক'রে বলতে লাগল —

'ভাইসব — এক্ষুণি পাল তুলে দাও — দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে চলে যাও। আপ্রাণ চেষ্টায় জাহাজের যতটা গতি বাড়ানো সম্ভব বাড়াও। কেউ দেরি করবে না।'

সকলেই প্রথমে হকচকিয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলো কিছু একটা হ'য়েছে। জাহাজের ডেক-এর মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। একদল দড়ি-দড়া ঠিক ক'রে পাল খুলে দিলো। গড়-গড় শব্দে নোঙর তোলা হ'ল। দাঁড়িরা দাঁড় টানতে শুরু করলো। একটা পাক খেয়ে জাহাজ চললো উত্তর-পূর্ব মুখো।

ফ্রান্সিস ডেক-এ দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো — 'কিছুক্ষণ আগে একটা নতুন জাহাজ নোঙর তুলে চলে গেছে, তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো। সেই জাহাজটায় আছে লা ক্রুশের ছোট সর্দার। যেভাবেই হোক চাঁদের দ্বীপে পৌঁছবার আগেই ওটাকে সমুদ্রপথে ধরতে হবে! আমরা ভাইকিংরা নাকি জাহাজ চালাতে ওস্তাদ। আজকে তা' প্রমাণের সময় এসেছে। চূড়ান্ত গতিতে জাহাজ চালাও। ঐ জাহাজটাকে ধরা চাই-ই চাই।' ডেক-এ যারা ছিল, তারা একসঙ্গে 'ও-হো-হো—' শব্দ ধ্বনি দিল। দাঁড়িঘর থেকেও ঐ ধ্বনি ভেসে এলো। জাহাজ দ্রুত বেগে জল কেটে ছুটল।

এতক্ষণে ফ্রান্সিসের শরীর জুড়ে অবসাদ নামলো। এতক্ষণ মাথায় তরোয়ালের হাতলের ঘা-এর ব্যাথা ভুলে ছিল। তার ওপর সারাদিন এক ফোঁটা জলও পায় নি। বলতে-বলতে লক্ষ্য করলো ফ্রান্সিসের মাথার পেছনদিকের চুলে জমাট রক্তের জট, ঘাড়ে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ। দু'হাতের কব্জিতে কাল্‌চে রক্তের দাগ। হ্যারি ব'লে উঠলো, 'ফ্রান্সিস এসব কি?'

ফ্রান্সিস ক্লান্তভাবে একটু হাসলো। তারপর সব ঘটনা বললো। ওদের মধ্যে যে ওষুধ-টষুধ দেয়, হ্যারি তাকে ডেকে পাঠাল। ফ্রান্সিসের মাথা ভালো ক'রে জল দিয়ে ধুয়ে সেই লোকটা ওষুধ লাগিয়ে দিল। ব্যাথা একটু কমলো। ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। পেট পুরে খেলো। তারপর একটু বিশ্রাম ক'রে নিলো। পরে হ্যারিকে ডেকে নিয়ে জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়ালো। বেশ ভালো গতিতেই জাহাজ চলছে।

রাত বাড়তে লাগলো। ছোট সর্দারের ক্যারাভেল জাহাজের দেখা নেই। ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করে। কখনো দিগন্তের দিকে স্থির দৃষ্টি তাকিয়ে থাকে। জাহাজে কারো চোখেই ঘুম নেই। দাঁড়িরা প্রাণপণে দাঁড় বাইছে। দু'-তিনজন মাস্তুলে উঠে বসে আছে। দড়ি-দড়া টেনে পালগুলো যাতে বেশি বাতাস পায়, তার জন্যে চেষ্টা করছে। জাহাজটা যেন উড়ে চলেছে, এমনি তার গতিবেগ।

হঠাৎ মাস্তুলের ওপর থেকে একজন চেঁচিয়ে বললো — 'জলদস্যুদের ক্যারাভেলটা দেখা যাচ্ছে। ওটার চেয়ে অনেক বেশি গতিতে আমাদের জাহাজ যাচ্ছে।'

ফ্রান্সিস দিগন্তের দিকে তাকালো। অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ার মত ক্যারাভেল-এর পালগুলো নজরে পড়ল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বললো — 'জাহাজের সব আলো নিভিয়ে দাও। কেউ কোন শব্দ করবে না। আমরা অন্ধকারে ক্যারাভেলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসদের জাহাজ ক্যারাভেল-এর অনেক কাছে চ'লে এলো।

কিন্তু ছোট সর্দারও কম চালাক নয়। ও জানতো যে ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই ওদেরই পেছনে ধাওয়া ক'রে আসবে। ওরাও সজাগ ছিলো। সেটা বোঝা গেলো, যখন ক্যারাভেল থেকে কামান দাগা শুরু হ'ল। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কামানের আগুনের গোলা ফ্রান্সিসদের জাহাজ লক্ষ্য ক'রে ছুটে এলো। কপাল ভালো। গোলাটা জাহাজ পার হ'য়ে সমুদ্রের জলে পড়ল। হ্যারি বলল — 'ফ্রান্সিস ওরা টের পেয়েছে। জাহাজের গতি কমাও। জাহাজ সরিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

— 'না —' ফ্রান্সিস বলল — 'ওদের লোকসংখ্যা কম। সর্দার বেশি লোক নিয়ে আসেনি। যদি ওদের দাঁড়ির সংখ্যা বেশি থাকতো, তাহ'লে এত তাড়াতাড়ি ওদের ধরতে পারতাম না।'

— 'কিন্তু কামানের গোলার মুখে আমরা কি ক'রে এগোবো?' হ্যারি বললো।

ফ্রান্সিস বললো — যদি জাহাজে আগুন লাগে, তবু আমরা এগিয়ে যাবো।' আর একটা গোলা এসে জাহাজটার পেটের কাছে লাগলো। ওই জায়গাটায় কাঠ ভেঙে একটা খোঁদল হ'য়ে গেলো। আর একটা গোলা এসে মাস্তুলের ওপর পড়লো। পালে আগুন লেগে গেলো। মাস্তুলের ওপর যে ভাইকিংটা ছিলো, সে ছিট্‌কে জলে পড়ে গেলো। দাঁড়িরা কিন্তু টেনে চললো। পাল থেকে আগুন ছড়ালো। আস্তে-আস্তে ডেক-এও আগুন লেগে গেলো। ততক্ষণে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ক্যারাভেল-এর অনেক কাছে চলে এসেছে। আবার একটা গোলা এসে ডেক-এ পড়লো। আগুন আরো ছড়িয়ে পড়লো। ফ্রান্সিস এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। শুধু দেখছিল ক্যারাভেলটা কত দূরে। এবার ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে ফিরে বললো — 'শীগ্‌গির দাঁড়দের উঠে আসতে বলো।' হ্যারি ছুটল ওদের ডেকে আনতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই তরোয়াল নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ো। ঐ ক্যারাভেল-এ উঠে লড়াই শুরু হবে।' ঠিক তখনই গোলা ছুটে আসছে দেখা গেলো। একসঙ্গে সবাই চীৎকার ক'রে উঠলো 'ও-হো-হো'। তারপরই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো। গোলাটাও এসে ডেক-এর ওপর পড়লো। এক মুহূর্তের ব্যবধানে ওরা বেঁচে গেলো। দাঁতে তরোয়াল চেপে সবাই সাঁতরে চললো ক্যারাভেলটার দিকে। ওদিকে ফ্রান্সিসদের জাহাজটায় তখন অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হ'য়েছে। দাউ-দাউ করে জ্বলছে জাহাজটা। ঐ আগুনের আভায় চারদিক আলোকিত হ'য়ে গেল।

ক্যারাভেল-এর গা থেকে যে দড়িদড়া ঝুলছিলো, ভাইকিংরা সাঁতরে এসে তাই বেয়ে উঠতে লাগলো। দু'তিনজন জাহাজের ডেক-এ ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু পারলো না। জলদস্যুদের তরোয়ালের ঘায়ে কয়েকজনের মৃত্যু হ'লো। ফ্রান্সিস বুঝলো — এভাবে — ওঠা যাবে না। ও তখন পিছনের হালের কাঠের খাঁজে-খাঁজে পা রেখে-রেখে নিঃশব্দে ডেক-এর ওপর উঠে এলো। দেখলো আট-দশজন জলদস্যু জাহাজের রেলিং ধ'রে ঝুঁকে নীচে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের হাতে খোলা তরোয়াল। ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে ছুটে গিয়ে পরপর দু'জনের পিঠে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিলো। অন্য দস্যুরা ঘুরে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে ফ্রান্সিসকে আক্রমণ করুক, এটাই সে চাইছিল। ও নিপুণ হাতে তরোয়াল চালিয়ে ওদের আটকে রাখলো। সেই ফাঁকে দড়ি বেয়ে-বেয়ে ভাইকিংরা

ক্যারাভেল—এর ডেক-এ উঠে এলো। শুরু হলো তরোয়ালের লড়াই। জলদস্যুরা দু-একজন মারা পড়তেই বাকিরা প্রাণ বাঁচাতে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফ্রান্সিস চারদিক তাকিয়ে কোথায় সেই ঢ্যাঙা ছোট সর্দারকে দেখতে পেল না। কোথায় গেলো ছোট সর্দার? ও দ্রুতপায়ে ছুটলো নিচে কেবিনঘরের দিকে। সব কেবিনঘর ফাঁকা। রসুইঘর, ভাঁড়ারঘর, কয়েদঘর কোথাও ঢ্যাঙা সর্দার নেই। ও ওপরে ডেক-এ উঠে এলো। রেলিঙে ভর দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালো। ওদের জাহাজের আগুনের আভায় দেখলো, একটা ডোঙা-নৌকো ভেসে চলেছে। একটা লোক ডোঙা-নৌকাটা দাঁড় দিয়ে বাইছে। নিশ্চয়ই ঢ্যাঙা ছোট সর্দার। নৌকায় চড়ে পালাচ্ছে।

ফ্রান্সিস এক মুহূর্তও দেরী করলো না। তরোয়ালটা দাঁতে চেপে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঐ ডোঙা-নৌকোটা লক্ষ্য ক'রে প্রাণপণে সাঁতার কাটতে লাগলো। ডোঙা-নৌকাটা উঁচু-উঁচু ঢেউয়ের ধাক্কায় বেশিদূর যেতে পারল না। ফ্রান্সিস অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকাটার কাছে পৌঁছে গেলো; সত্যিই ঢ্যাঙা ছোট সর্দার। ফ্রান্সিসকে দেখতে পেলো ও। সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড় ফেলে কোমর থেকে তরোয়াল খুললো। নৌকোর ওপর থেকে ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য ক'রে তরোয়াল চালালো। ফ্রান্সিস স'রে এলো দ্রুত। কিন্তু ততক্ষণে তরোয়ালের ফলাটা ওর বুক ছুঁয়ে গেছে। জামা কেটে গেলো। বুকের অনেকটা জায়গা লম্বালম্বি কেটে গেছে। রক্ত বেরোচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝলো, নৌকোর কাছে গিয়ে ওকে আক্রমণ করা যাবে না। ওকে অন্য উপায়ে মারতে হবে। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা দাঁতে চেপে ডুব দিল। ঢ্যাঙা সর্দার নৌকার উপর দাঁড়িয়ে তরোয়াল উঁচিয়ে চারদিকে জলে তাকাতে লাগলো। কখন ফ্রান্সিস ভেসে ওঠে। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা হাতে নিয়ে নৌকাটার এক হাতের মধ্যে হঠাৎ ভেসে উঠলো। ঢ্যাঙা সর্দার তরোয়ালটা চালাবার আগেই ফ্রান্সিস ওর তরোয়ালের বাঁটটা বর্শার মত ধ'রে দেহের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে ওর বুক লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়লো। আর সঙ্গে-সঙ্গে ডুব দিলো। তরোয়াল সোজা ঢ্যাঙা সর্দারের বুকে গিয়ে বিঁধে গেল। ঢ্যাঙা সর্দার নিজের তরোয়াল ফেলে দিয়ে বুকে বেঁধা তরোয়ালটা দু'হাতে টেনে বার করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল। তরোয়ালটা টেনে খোলার জন্যে বার কয়েক নিস্ফল চেষ্টা করলো। তারপর শুয়ে পড়ে কয়েকবার হাত-পা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে স্থির হ'য়ে গেলো।

ফ্রান্সিস নৌকাটায় উঠলো। নৌকাটা জোরে দুলে উঠলো। ও ঢ্যাঙা সর্দারের গলা থেকে আয়নাটা খুলে নিলো। তখনই হঠাৎ একটা বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকাটা কাত হ'য়ে গেলো। ফ্রান্সিস দু'হাতে জল ঠেলে-ঠেলে ক্যারাভেলে-এর দিকে সাঁতরাতে লাগলো।

দড়ি বেয়ে-বেয়ে ক্যারাভেল-এ উঠলো। মাথার তীব্র যন্ত্রনাটা এতক্ষণে অনুভব করলো। সমস্ত শরীর জুড়ে অসহ্য ক্লান্তি। চোখের সামনে সব কেমন ঝাপসা হ'য়ে এলো। হ্যারি ছুটে এসে ওকে ধরলো। ফ্রান্সিসের শরীরে আর একফোঁটা শক্তি নেই। ও শরীর ছেড়ে দিলো। কয়েকজন ভাইকিং ছুটে এল। সবাই ধরাধরি ক'রে ফ্রান্সিসকে ওর কেবিনঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলো। বৈদ্যিকে ডাকা হ'লো। সে এলে ফ্রান্সিসের মাথায় ও বুকে ওষুধ লাগিয়ে দিলো। মাথার তীব্রতা একটু কমলো বটে, যা হোক

ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়লো। আয়নাটা তখনও ওর হাতে ধরা। হ্যারি হাত থেকে আয়নাটা নিয়ে ওর শিয়রের কাছে রেখে দিলো।

সকাল হ'লো। ভাইকিংরা সকলেই খুব খুশি। একটা ঝকঝকে নতুন জাহাজ পাওয়া গেছে। রাত্রে ভালো ক'রে দেখা হয় নি। এখন সবাই ঘুরে-ঘুরে ক্যারাভেলটা দেখতে লাগলো। সত্যিই ক্যারাভেলটা সুন্দর। ভালো জাতের কাঠে তৈরি।

ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙলো। মাথার ব্যথাটা অনেক কমেছে। আবার বৈদ্যি এসে ওষুধ দিয়ে গেলো। ও শিয়রের কাছ থেকে আয়নাটা এনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। ঠিক ফ্রেদারিকোর সেই আয়নার মত কাটা। নীচে ছিদ্র। হ্যারি ঘরে ঢুকলো। বললো 'কি হে কেমন আছো?'

ফ্রান্সিস হাসলো — 'এখন অনেকটা ভালো।'

— কি করবে এবার ভেবেছো কিছু?

— হুঁ। ভেবেছি জাহাজটা দু'দিন এখানেই থাকবে। আমি ভীষণ ক্লান্ত। দু'টো দিন বিশ্রাম চাই। তারপর চাঁদের দ্বীপে — লা ক্রুশের সঙ্গে মোকাবিলা।

পরের দু'দিন জাহাজ ওখানেই থেমে রইলো। পাল নামিয়ে রাখা হ'লো। জাহাজের কোন কাজ নেই। বেশ একটা ছুটির আবহাওয়া। সবাই ডেক-এর এখানে-ওখানে জটলা বাঁধলো। কোথাও ছক্কাপাঞ্জা খেলা চললো, কোথাও মোটা ভারি গলায় গান চললো, কোথাও দেশের বাড়ির গল্পগাছা চললো। দু'দিন পরে সন্ধ্যেবেলা আবার সাজ-সাজ রব। একদল উঠলো মাস্তুলে। একদল পাল বাঁধলো, একদল চলে গেল দাঁড়ঘরে! জাহাজ চললো চাঁদের দ্বীপ লক্ষ্য ক'রে।

সোফালা বন্দরে গিয়ে জাহাজটা যখন নোঙর করল, তখন গভীর রাত্রি। যে ক'টা ডোঙা-নৌকা জাহাজটার সঙ্গে বাঁধা ছিল, সেই নৌকোয় চড়ে দফায় দফায় ভাইকিংরা সবাই সমুদ্রতীরে গিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়ালো।

আকাশে ভাঙা চাঁদ। অল্প জ্যোৎস্নায় ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে গুদোমঘর, নির্জন বাজার পেরিয়ে সবাই রাজবাড়ির দিকে চললো।

রাজবাড়ির কাছে পৌঁছে অল্প চাঁদের আলোয় দেখলো দু'জন জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে রাজবাড়ি পাহারা দিচ্ছে। এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। ফ্রান্সিস নিম্নস্বরে বলল — আমি আর হ্যারি ঐ দু'টোকে ঘায়েল করছি। তারপর আমি ইসারা করলেই সবাই রাজবাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘরের আড়ালে-আবডালে পাহারাদার দুই জলদস্যুদের কাছাকাছি চ'লে এলো। তারপর সুযোগ বুঝে দু'জনে একসঙ্গে পাহারাদার দু'জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। গলা চেপে ধ'রে দু'জনকেই মাটিতে ফেলে দিলো। হ্যারি একজন পাহারাদারের বুকে সোজা তরোয়াল চালিয়ে দিল। অল্প গোঙানি বেরুলো ওর গলা থেকে। ফ্রান্সিস অন্যটাকে তরোয়ালের বাঁট দিয়ে মাথায় মারলো। জলদস্যুটা জ্ঞান হারালো। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে তরোয়াল তুলে আক্রমণের ইঙ্গিত করলো।

'ও—হো—হো—' প্রচন্ড চীৎকারে রাত্রির আকাশকে বিদীর্ণ ক'রে ভাইকিংরা রাজবাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঘুমন্ত জলদস্যুর দল আচমকা এই আক্রমণে

বিছানা ছেড়ে ওঠারও সময় পেল না। দু'-একজন অন্ধকারে বাইরে ছুটে এলো। তারপর ধরবার আগেই গা ঢাকা দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাকি সব ক'জন জলদস্যুকে বন্দী করা হ'ল। ওদের রাখা হ'ল শাস্তিঘরে।

এর মধ্যে ফ্রান্সিস বেন্‌জামিনকে খুঁজল। কিন্তু কোন ঘরেই তাকে পেলো না। বারান্দায় নেই, বাইরের চত্বরেও নেই। বুঝলো, লা ক্রুশ ওকে মেরে ফেলেছে। ফ্রান্সিস ছুটলো, দরবার ঘরের মধ্যে দিয়ে ভেতরের অন্দরমহলে।

অন্দরমহলের ঘরে তখন লা ক্রুশ চীৎকার চ্যাঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে সবে উঠে বসেছে। তাড়াতাড়ি পিস্তল নিয়ে ঘরের বাইরে আসতে যাবে, তখনই দরজার মুখে একেবারে ফ্রান্সিসের মুখোমুখি। লা ক্রুশ পিস্তল তুললো। ফ্রান্সিস তার আগেই দ্রুত বসে পড়লো। গুলি ছুটে গিয়ে দরজাটায় লাগলো। ফ্রান্সিস আর দ্বিতীয়বার গুলি চালাবার সময় দিলো না। লা ক্রুশের পিস্তল ধরা হাত লক্ষ্য ক'রে বিদ্যুৎবেগে তরোয়াল চালালো। আঙুল কেটে গেলো। পিস্তলটাও ছিট্‌কে পড়লো। লা ক্রুশ বিছানার পাশে রাখা হাতীর দাঁতের বাঁটঅলা তরোয়ালের দিকে হাত বাড়ালো। কিন্তু কাটা আঙুল নিয়ে তরোয়ালটা তুলতে পারলো না। ফ্রান্সিস ততক্ষণে দ্রুতহাতে তরোয়ালটা ওর বুকে আমূল বিঁধিয়ে দিল। মুখ দিয়ে একটা কাতর শব্দ বেরিয়ে এল। দু'-তিনবার এপাশ-ওপাশ করে লা ক্রুশ বিছানার ওপর পড়ে গেলো। ওর শরীরটা স্থির হ'য়ে গেল।

ফ্রান্সিস তখন হাঁপাচ্ছে। হ্যারির সঙ্গে আর কয়েকজন ভাইকিং ছুটে ঘরে ঢুকলো। দেখলো লা ক্রুশের মৃত শরীরটা পড়ে আছে। ওরা আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠল — 'ও—হো—হো—।' বাইরের উঠোন থেকে, বারান্দা থেকে অন্য সব ভাইকিংরা চীৎকার ক'রে সাড়া দিল। অর্থাৎ যুদ্ধে জয় হয়েছে।

দরবার কক্ষে গিয়ে ফ্রান্সিস বসলো। একটু পরে কয়েকজন ভাইকিং ভাজিম্বা সেনাপতিকে নিয়ে এল। সেনাপতিকে ওরা শাস্তিঘর থেকে ধ'রে নিয়ে এলো। সেনাপতির হাঁটবার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। তার সারা শরীরে আগুন দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়ার দাগ। চোখ দু'টো কোটরে বসা। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি উঠে সেনাপতিকে বললো 'আপনি জেনে খুশি হবেন অত্যাচারী লা ক্রুশ মারা গেছে। ওর ছোটো সর্দারও মারা গেছে। অন্য সঙ্গীরা অনেকেই বন্দী, কিছু অন্ধকারে পালিয়েছে।' সেনাপতি কথাগুলো শুনলো। একটু হাসি ফুটলো তার মুখে।

— 'আপনি দিন কয়েক খাওয়া-দাওয়া করুন, বিশ্রাম করুন, তারপরে আপনাকে নিয়ে বনে-পাহাড়ে যাবো। রাজা, মন্ত্রী আর সব ভাজিম্বাদের ফিরিয়ে আনবো। আপনাদের চাঁদের দ্বীপ আপনাদের হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে আমরা চলে যাবো।' ফ্রান্সিস বললো।

অন্দরমহলে যে ঘরে লা ক্রুশ থাকত একটা কারুকার্য করা কাঠের বাক্সে তিনটে মুক্তো পাওয়া গেল। আর কোথাও মুক্তো পাওয়া গেল না। বাকি যে দু'-তিনটে মুক্তো লা ক্রুশ পেয়েছিল, বোধহয় বিক্রী করে জাহাজ কিনেছে। ফ্রান্সিস স্থির করলো, তাহলে এবার 'মুক্তোর সমুদ্র' থেকে কিছু মুক্তো তুলতে হবে।

কয়েকদিন পরে হ্যারি আর দু'জন ভাইকিংকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস চললো মুক্তোর সমুদ্রের উদ্দেশ্যে, সঙ্গে নিলো আয়নাটা। এখানে-ওখানে ভাজিম্বাদের পাতা ফাঁদ এড়িয়ে

ওরা যখন আগুনে প্রবালের স্তর পেরিয়ে মুক্তোর সমুদ্রের ধারে এলো, তখন বেলা দুপুর। জলে শির্ শির্ ঢেউ উঠছে। চারিদিকে শুধু পাখির ডাক। আর কোন শব্দ নেই।

ফ্রান্সিস একটা কম্বলের ঝুলিমত এনেছিল। সেটা নিয়ে আর আয়নাটা কোমরে গুঁজে জলে ঝাঁপ দিল। সোজা নীচে নেমে গেল। অসমান তলদেশে আগে কোমর থেকে খুলে আয়নাটা রাখলো। তারপর জলের ওপরে উঠে এলো। ভালো ক'রে দম নিয়ে আবার ডুব দিলো। দেশে মুক্তো শিকারীদের সঙ্গে জলের নীচে ডুব দেওয়া, সাঁতার দেওয়া, এসব ভালোভাবেই অভ্যেস করেছিল। এখন সেটা দারুণভাবে কাজে লাগলো।

সেই অপরূপ দৃশ্য জলের তলদেশে। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মুক্তো। বড়-বড় ঝিনুকের মুখখোলা পেটেও মুক্তো। ঝিনুকের সংখ্যাও কত। সেই নীলচে-বেগুনী আলোর বন্যা। ফ্রান্সিস দেখলো বেশ কয়েকটা লাফ্ মাছ আয়নাটাতে ঢুঁ দিচ্ছে। রক্ত বেরুচ্ছে মাছগুলোর থেকে। তবু ঢুঁ দেবার বিরাম নেই। ফ্রান্সিস মুক্তো তুলতে লাগলো। ভরতে লাগলো সঙ্গে আনা কম্বলের ঝোলাটাতে। দম ফুরিয়ে গেলে উপরে উঠে এলো। আবার ডুব দিলো। আবার মুক্তো তুলতে লাগলো। ঝোলাটা ভরে গেলো। অনেক মুক্তো তুলে ফেলাতে জলের তলদেশে আলোর তেজ কমে গেলো। আয়নাটা থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হ'তে লাগলো, তাতে আগের উজ্জ্বলতা আর রইলো না। আর এখানে থাকা বিপজ্জনক। ওর দিকে লাফ্ মাছের নজর পড়তে পারে। ও উপরে উঠে এলো। সাঁতরে এসে পারে উঠে ঝোলাটা হ্যারির হাতে দিলো।

এত মুক্তো? আর কত বড়-বড়। হ্যারি খুশিতে ঝোলাটা উঁচিয়ে হাসতে লাগলো। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ জলের ধারে ব'সে দম নিলো, তারপর সকলেই ফিরে চললো।

ফ্রান্সিস ঝোলা ভর্তি মুক্তো এনেছে, দেখে ভাইকিংরা আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে গেলো। রাত হ'লে চত্বরে আগুন জ্বেলে তার চারপাশে সবাই ঘুরে-ঘুরে নাচতে লাগলো, আর গলা ছেড়ে গান গাইতে লাগলো। সারারাত আনন্দের আসর চললো। যখন আনন্দের জোয়ার ঝিমিয়ে এলো, তখন ভোর হয়-হয়।

*　　*　　*

দিন সাতেক কেটে গেলো। ভাজিম্বা সেনাপতি এখন একেবারে সুস্থ। সে ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বারবার ফ্রান্সিসকে ধন্যবাদ দিলো। ওদের জন্যেই সে বেঁচে গেছে, এটা সে জীবনেও ভুলবে না, একথাই বারবার বলতে লাগল।

কদিন পর ফ্রান্সিস একদিন সেনাপতিকে বললো, 'চলুন বনে গিয়ে রাজা, মন্ত্রী আর অন্য যারা আছে, তাদের নিয়ে আসি। আমরা এবার দেশে ফিরবো।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি সেনাপতিকে নিয়ে চললো। ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় সেনাপতি সেই সব অত্যাচারের কাহিনী বলছিল পথ চলতে-চলতে।

বনের মধ্যে ঢুকল ওরা। হ্যারি বললো — 'আর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে এলে হ'তো।' ফ্রান্সিস বললো — 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনি নি। কারণ অত লোকজন দেখলে আত্মগোপনকারী ভাজিম্বারা আমাদের ভুল বুঝতো। আমাদের বিপদই বাড়তো তাতে।' হ্যারি ভেবে দেখলো কথাটা ঠিক।

প্রথমে ছাড়া গাছপালা। তারপর বন ঘন হ'তে লাগলো। সূর্যের আলো পর্যন্ত ঢোকে না, এমন নিবিড় সেই বন। সেনাপতি ব'লে যেতে লাগলো, এই বনে-পাহাড়ে কি কষ্টের মধ্যে দিন কেটেছে। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কত ভাজিম্বা যুবক লা ক্রুশের সঙ্গীদের হাতে ধরা দিয়েছে। লা ক্রুশ ওদের পেট পুরে খেতে দিয়েছে। তারপর ধ'রে নিয়ে গেছে 'মুক্তোর সমুদ্রে'। জোর ক'রে বর্শার খোঁচা মেরে ওদের মুক্তো আনতে জলে নামিয়ে দিয়েছে। তারপর কেউ বেঁচে ফিরে আসেনি।

ওরা নানা কথা বলতে-বলতে বনজঙ্গল ভেঙে চলেছে। তখনই ফ্রান্সিস লক্ষ্য করলো বাঁদিকে একটা পান্ডানাস গাছের ডাল ভীষণ জোরে দুলে উঠলো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই ফ্রান্সিস দেখলো একটা বর্শা বিদ্যুৎ বেগে ছুটে আসছে হ্যারির দিকে। ফ্রান্সিস সঙ্গে-সঙ্গে হ্যারিকে জোরে ধাক্কা দিল। হ্যারি উবু হ'য়ে একটা ঝোপের ওপর পড়ে গেল। কিন্তু শেষ রক্ষা হ'লো না। ফ্রান্সিস দ্রুত স'রে যেতে গেলো, কিন্তু ততক্ষণে বর্শাটা ছুটে এসে ফ্রান্সিসের উরু ছুঁয়ে চ'লে গেলো। এক পলকে ঘটনাটা ঘটে গেল। ফ্রান্সিসের উরু অনেকটা জখম হ'ল। গলগল ক'রে রক্ত ছুটলো। ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। মাটিতে শুয়ে পড়লো। হ্যারি পাগলের মত ছুটে এসে ওর উরুটা চেপে ধরলো। কিন্তু রক্ত পড়া বন্ধ হ'লো না। ফ্রান্সিস ব্যথায় গোঙাতে লাগলো। হ্যারি চীৎকার ক'রে সেনাপতিকে বললো 'শীগ্‌গির ভাজিম্বাদের বলুন, আমরা ওদের শত্রু নয়।'

সেনাপতি সঙ্গে-সঙ্গে ভাজিম্বাদের ভাষায় চীৎকার ক'রে একনাগাড়ে কি বললো। বোধহয় লা ক্রুশের পরাজয় সংবাদ দিলো। ফ্রান্সিসরা যে ওদের বন্ধু, এ কথাও বললো। বনজঙ্গলের গাছ-গাছালির আড়াল থেকে ভাজিম্বা যোদ্ধারা বর্শা হাতে কাছে আসতে লাগলো। কাছে এসে ফ্রান্সিসদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো ওরা। রোগার্ত, পাংশুমুখ ওদের। কতদিন না খেয়ে আছে, কে জানে। সেনাপতি ওদের কি বললো। ওদের মধ্যের একজন ছুটে গিয়ে একটা লতাগাছ নিয়ে এলো। ফ্রান্সিসের জখমের দু'পাশে লতা দিয়ে বেঁধে দিলো। রক্তপড়া একটু কমলো। তারপর ঐ ভাজিম্বাটি লতাগাছটার কয়েকটা পাতা মুখে পুরলো। কিছুক্ষণ চিবিয়ে তারপর উরুর ক্ষতের উপর সেই চিবিয়ে থ্যাৎলানো পাতাগুলো লাগিয়ে দিলো। একটু জ্বালা ক'রে উঠলো। আস্তে-আস্তে ঠান্ডা লাগলো ক্ষতের জায়গাটা। ফ্রান্সিস একটু আরাম বোধ করলো।

সেনাপতি ওদের কি জিজ্ঞেস করলো। ওরা বাড়িয়ে দূরের পাহাড়টা দেখলো। সেনাপতি ফ্রান্সিস আর হ্যারির দিকে তাকিয়ে পর্তুগীজ ভাষায় বললো — 'ঐ পাহাড়ের কোন গুহায় রাজা আছেন। আমি রাজা-মন্ত্রী ওদের আনতে যাচ্ছি। ওদের ব'লে যাচ্ছি এর মধ্যে ওরা গাছের ডালপালা কেটে মাচামতো তৈরী করবে। তাতে আপনাকে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি রাজা-মন্ত্রী নিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি রাজা, মন্ত্রী এবং অন্য সব গণ্যমান্য ভাজিম্বাদের নিয়ে সেখানে এলো। সেনাপতি ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে দেখিয়ে রাজাকে কি বললো। রাজা হেসে ফ্রান্সিস আর হ্যারির গায়ে হাত বুলালো। চারজন ভাজিম্বা ফ্রান্সিসের মাচাটা কাঁধে তুলে নিল। সকলে মিলে এবার ফিরে চললো রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে। এবার ভাইকিংবদের দেশে ফেরার পালা। এর মধ্যে একদিন ফ্রান্সিস হ্যারিকে বললো — 'হ্যারি, আমাকে একবার রাজদরবারে নিয়ে চলো।'

— ওখানে যাবে কেন?

— আমি যে 'মুক্তোর সমুদ্র' থেকে অনেক মুক্তো এর মধ্যেই এনেছি, সেই কথাটা রাজাকে বলবো। দেশে মুক্তো নিয়ে যাবার অনুমতি চাইবো।

— মনে তো হয় না; রাজা এতে আপত্তি করবে।

— তবু ব'লে-কয়ে নেওয়াটাই ভালো।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি নৌকোয় চড়ে চাঁদের দ্বীপে এলো। রাজদরবারে ওরা যখন পৌঁছলো, তখন দুপুর হ'য়ে গেছে। দেখলো, রাজসভার কাজ চলছে। ওদের দরবার ঘরে ঢুকতে দেখে সেনাপতি এগিয়ে এসে ওদের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে বসার জায়গা ক'রে দিলো। ফ্রান্সিস সেনাপতিকে বললো, 'রাজাকে আমরা একটা কথা বলতে চাই।'

— কি কথা?

— আপনি রাজাকে বলুন, যে আমি রাজার অনুমতি না দিয়ে 'মুক্তোর সমুদ্র' থেকে কিছু মুক্তো তুলেছি। এখন এ সব মুক্তো নিয়ে যেতে পারি কিনা।

তখন রাজসভায় একটা বিচার চলছিলো। সেটা শেষ হ'তেই সেনাপতি উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসের কথাগুলো রাজাকে বললো। রাজা মৃদু হেসে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে ভাজিম্বা ভাষায় কি সব বলে গেলো। সেনাপতি সেটা পর্তুগীজ ভাষায় বলে দিলো — 'রাজা বলছেন, আপনি যে সৎ এবং মহৎ প্রকৃতির মানুষ, এটা আপনার ব্যবহারেই প্রকাশ পেয়েছে। আপনি আমাকে না জানিয়ে অনায়াসে মুক্তোগুলো নিয়ে চলে যেতে পারতেন। আপনি তা করেন নি। এতেই আপনার সততা প্রকাশ পাচ্ছে। আপনি সাহস আর বুদ্ধিবলেই মুক্তো সংগ্রহ করেছেন। ঐ মুক্তোগুলো আপনার সাহসিকতার পুরস্কার। তবে চাঁদের দ্বীপে অধিষ্ঠাতা দেবতার নামে শপথ ক'রে বলছি, ঐ মুক্তোগুলো নিয়ে ব্যবসা করবেন না। আমি ঐ ব্যবসা করতে চেয়েছিলাম ব'লেই রাজত্ব হারিয়েছিলাম। চাঁদের দ্বীপের অধিষ্ঠাতা দেবতার অভিশাপ লেগেছিলো। আমার অনুরোধ, আপনি তা করবেন না। যে সব মুক্তো আপনি সংগ্রহ করেছেন, সে সবই আপনার।' ফ্রান্সিস মাথা নুইয়ে বারবার রাজাকে ধন্যবাদ দিলো। তারপর জাহাজে ফিরে এলো।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজে ফিরতেই সবাই ছুটে এলো। ফ্রান্সিস ওদের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলো 'জাহাজ ছাড়ো, এবার দেশে ফেরা যাক্।

সকলেই একসঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলো 'ও-হো-হো-।'

ঘর্ ঘর্ শব্দে নোঙর তুলে নতুন জাহাজটা দ্রুত বেগে ঢেউ ভেঙে ছুটলো।

বিকেল হ'য়ে এসেছে। ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিম আকাশে নেমে আসা সূর্যের শেষ আলোয় ওখানে যেন রঙের বন্যা চলেছে। সেইদিকে আনমনে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টিতে গোঁজা কি যেন বের করলো। হ্যারি দেখলো। হ্যারি দেখলো, বেশ বড় আকারের মুক্তো একটা। হেসে বললো — ''কি ব্যাপার? এই মুক্তোটা এখনও যে হাতছাড়া করছো না?''

ফ্রান্সিস হেসে বললো — 'এটা সবচেয়ে বড়। এটা রাজকুমারীকে উপহার দেবো।'

'— তাই বলো।' হ্যারি হাসলো। ও আর কোনো কথা বললো না। লাল আলোময় দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস তখন কি কথা ভাবছিলো, তা ফ্রান্সিসই জানে।

তুষারে গুপ্তধন

অনিল ভৌমিক



তুষারে গুপ্তধন



জাহাজ চলেছে ভাইকিংদের স্বদেশের দিকে। সমুদ্র শান্ত। হাওয়ার বেগও যথেষ্ট। পালগুলো প্রায় বেলুনের মত ফুলে উঠেছে। নিরুদ্বেগ সমুদ্রযাত্রা। ভাইকিংরা সকলেই খুশী। অনেকদিন পর স্বদেশে ফিরে চলেছে। হাওয়া ভাল থাকাতে দাঁড় টানতে হচ্ছে না।শুধু ডেক ধোয়া-মোছা, পালের দড়ি ঠিক-ঠাক করা এসব কাজ। সে আর কতক্ষণের কাজ। বাকী সময় ওরা হৈ-হল্লা ক'রে, ছক্কা-পাঞ্জা খেলে। গান গায়, বাজনা বাজায়, নাচে। রাত হ'লে ডেকের এখানে ওখানে সবাই গোল হ'য়ে বসে। দেশের বাড়ীর গল্প করে। সোনার ঘণ্টা নিয়ে গেছে ওরা, অত বড় দু'টো হীরে। এবার নিয়ে যাচ্ছে হাঁসের ডিমের মত মুক্তো। দেশের লোকেরা অবাক হ'য়ে যাবে। মানুষের কল্পনাতেও আসে না এত বড় মুক্তো! কী সম্বর্ধনাটাই না ওরা পাবে!

ফ্রান্সিস, হ্যারি দুই বন্ধুও খুশী। তবে ফ্রান্সিস মাঝে-মাঝে বলে হ্যারিকে—'দেখ ভাই, দেশে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারবো না। জানো তো হীরে নিয়ে যাবার সময় কী ক'রে লা ক্রুশের পাল্লায় পড়েছিলাম।'

হ্যারি হেসে বলে—'মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করছো। এবার অনেক সাবধান হ'য়েছি।'

—'তবু বলা যায় না কিছু।' ফ্রান্সিস বলে। হ্যারি ঠিকই বলেছে। এবার জাহাজের পাহারাদারের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন রাত জেগে পাহারা দেয়। পরের দিন বাকীরা। ঘরে-ঘরে সকলের ওপরই রাত জেগে পাহারা দেবার ভার পড়ে। ফ্রান্সিস, হ্যারি, বিস্কো কেউ বাদ যায় না। তবে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা হ্যারিকে সারারাত জাগতে দেয় না! ওকে জোর ক'রে ঘুমুতে পাঠিয়ে দেয়। হ্যারি বড় একটা সুস্থ থাকে না। এটা-ওটা লেগেই আছে। হ্যারি তাই দুঃখ ক'রে বলে—'ফ্রান্সিস আমাকে না আনলেই ভালো করতে।'

ফ্রান্সিস মাথা নাড়ে। বলে—'তোমাকে ছাড়া আমি কোথাও বেরোবোই না।'

—তোমাদেরই তো ভোগান্তি।

—'হোক ভোগান্তি।' তারপর থেমে বলে—'এ্যান্তনীকে সেই জন্যেই সঙ্গে এনেছিলাম। এ্যান্তনী রাজ-চিকিৎসকের সাগরেদ। ও অনেক ওষুধ-পত্তরও সঙ্গে এনেছে। কখন কে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে, কে আহত হয়। চিকিৎসা করতে হবে তো।'

—'তারপর বরাবরের রোগী আমি তো আছিই।'

দু'জনেই দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

হ্যারি এর মধ্যেই একদিন গুরুতর অসুস্থ হ'য়ে পড়ল। সেদিন বিকেলে হ্যারি ডেক-এ দাঁড়িয়ে দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে, হঠাৎ ওর মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। তারপর বুকে একটা মোচড়।দু'হাত শূন্যে তুলে হ্যারি ডেকের ওপর পড়ে গেল। ধারে কাছে যারা ছিল ছুটে এল। হ্যারির মুখটা তখন বেঁকে গেছে। হাত-পা শক্ত কাঠ। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে। চোখে শূন্য দৃষ্টি। খবর পেয়ে ফ্রান্সিস ছুটে এল। একটু পরে এ্যান্তনী ওর ওষুধ রাখার বেতের বাক্সটা নিয়ে এল। ও হ্যারির শক্ত হাত-পা বারকয়েক

টানাটানি করল। তারপর বুকে কান রাখল। নাকের সামনে আঙ্গুল রাখল। খুব ধীরে শ্বাস পড়ছে। প্রায় বোঝাই যায় না। বুকে হৃদস্পন্দনও অস্পষ্ট। বেতের বাক্স খুলে একটা চিনেমাটির বোয়াম বের করল। দু'হাত তুলে সবাইকে বলল—'সরে যাও—হাওয়া ছাড়ো।'

সবাই স'রে গেল। এ্যান্তনী বোয়াম থেকে আঙ্গুলের ডগায় ক'রে ওষুধ বার করল। তারপর হ্যারির নাকের কাছে ধরল। হ্যারি সেই শক্ত হাত-পা নিয়ে একই-রকম ভাবে শুয়ে রইল। এ্যান্তনী কিছুটা ওষুধ হ্যারির নাকে লাগিয়ে দিল।

বেশ কিছুক্ষণ পর হ্যারির মুখ থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরুলো। কয়েকবার মাথাটা এ'পাশ-ও'পাশ ক'রে হ্যারি সহজ দৃষ্টিতে তাকালো। মাথা ঘুরিয়ে চারদিক তাকিয়ে নিল। শক্ত হাত-পা নরম হ'ল। ও আস্তে-আস্তে উঠে বসল। ফ্রান্সিস ওর মুখের ওপর ঝুঁকে বলল—'এখন কেমন লাগছে?'

—'একটু ভালো।' দুর্বল স্বরে হ্যারি বলল—'আমার কী হয়েছিল?'

—'কিছু না, মাথা ঘুরে গিয়েছিল বোধহয়।'

—'মাথা ঘুরে গিয়েছিল ঠিকই, তারপর বুকে একটা চাপা ব্যথা। তারপর সব কেমন অন্ধকার হ'য়ে গেল।

—'ও ঠিক হয়ে যাবে। এখন কেবিনে যেতে পারবে? আমার কাঁধে ভর দিয়ে?'

—'বোধহয় পারবো।'

হ্যারি উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু পারলো না। বোঝা গেল, ওর শরীরের দুর্বল ভাবটা এখনও কাটে নি। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে ওর হাতটা নিজের কাঁধে তুলে নিল। তারপর ধরে-ধরে আস্তে-আস্তে সিঁড়ির দিকে নিয়ে চলল। হ্যারিকে বিছানায় শুইয়ে দিল ফ্রান্সিস। অল্পক্ষণের মধ্যেই হ্যারি অনেকটা সহজ হল। এ্যান্তনী একটা মোটা কাপড়ের পুঁটুলি থেকে দু'টো কালো-কালো বড়ি বের করল। হ্যারির হাতে দিয়ে বলল—'খেয়ে নাও।'

একজন জলের গ্লাস নিয়ে এল। হ্যারি বড়ি দু'টো খেয়ে নিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল ও। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। এবার ফ্রান্সিস এ্যান্তনীকে জিজ্ঞেস করল 'হ্যারির কী হয়েছে?'

—'ঠিক বুঝতে পারছি না।' এ্যান্তনী বেতের বাক্স বন্ধ করতে-করতে বলল—'মনে হয় মৃগী রোগের মত কিছু। দেশে ফিরে ওর ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।'

—'হুঁ'।

ফ্রান্সিস মুখ নীচু করে কি যেন ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর কেবিন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর যারা ছিল তারাও বেরিয়ে এল।

জাহাজ চলেছে। দু'-একবার অল্প ঝড় উঠেছিল সমুদ্রে। কিন্তু জাহাজের কোন ক্ষতি করতে পারে নি। দিন-রাত জাহাজ পাহারা দেওয়া চলল। শুধু হ্যারিকে কোন কাজে ডাকা হতো না। হ্যারি এখন মোটামুটি সুস্থ। ও কাজ-টাজ করতে চায়। কিন্তু ফ্রান্সিস চড়া গলায় বলে দিয়েছে—'তোমাকে কোন কাজ করতে হবে না। এখন শুধু বিশ্রাম'।

হ্যারি আর কি করে। চুপচাপ শুয়ে-বসে থাকে। ফ্রান্সিসরা ওর ঘরে আসে গল্প-টল্প করে ওর সঙ্গে। ফ্রান্সিস মাঝে-মাঝে ওকে ডেকের ওপর নিয়ে যায়। ফ্রান্সিসের হাত ধরে আস্তে-আস্তে পায়চারী করে। কিছুদিন যেতে হ্যারি সুস্থ হয়ে উঠল। আগের মতই কাজকর্ম করতে লাগল।



পর্তুগালের কাছাকাছি আসতে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা এক প্রকাণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ল। তখন বিকেল। সূর্য অস্ত যায়-যায়। হঠাৎ একটা কালো মেঘ উঠল পশ্চিম আকাশের দিকে। সেই মেঘ বড় হতে-হতে, ছড়াতে-ছড়াতে সমস্ত আকাশ ঢেকে দিল। ওর মধ্যে পূব আকাশটা কেমন আগুনরঙা হয়ে উঠল। টিপ-টিপ বৃষ্টি পড়তে লাগল। সারা আকাশ জুড়ে ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। আঁকা-বাঁকা বিদ্যুৎরেখা সারা আকাশ চিরে ফেলতে লাগল যেন। তারপরই হঠাৎ প্রচণ্ড গোঁ-গোঁ শব্দ উঠল। আর তারপরই বিরাট-বিরাট ঢেউ ছুটে এলো। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বাতাস। ঢেউগুলো কান-ফাটানো শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসদের জাহাজের ওপর। ভাইকিংরা অভিজ্ঞ নাবিক। ওরা আকাশের চেহারা দেখেই বুঝেছিল, বেশ বড় রকমের ঝড় আসছে। ওরা সমস্ত পাল নামিয়ে ফেলেছিল। দাঁড়গুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর তৈরী হয়ে ডেক-এ এসে দাঁড়িয়েছিল ঝড়ের মোকাবিলা করবার জন্য।

কিন্তু ওরা যতটা আশঙ্কা করেছিল, ঝড় তার চেয়েও ভয়াবহ চেহারা নিল। মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে মুহুর্মুহু জলের উত্তাল ঢেউ, জাহাজের ডেকের ওপর ভেঙে পড়তে লাগল। ভাইকিংরা ঐ প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কার মধ্যে, পালের দড়ি মাস্তুল হুইল আঁকড়ে ধরে রইল। সবাই ভিজে জবজবে হয়ে গেল। যে হুইল ধরে দাঁড়িয়েছিল, সে ওর মধ্যেই হুইল ঘুরিয়ে চলল। জাহাজের গতি পরিবর্তন করে ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপটার মোকাবিলা করতে লাগল। জাহাজের প্রচণ্ড দুলুনির মধ্যে পা ঠিক রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কয়েকজন পারলও না পা ঠিক রাখতে। রেলিঙের গায়ে, মাস্তুলের গায়ে ধাক্কা খেয়ে কয়েকজন আহতও হল। একেবারে নতুন জাহাজ। তাই ঝড়ের এই প্রচণ্ডতা সহ্য করতে পারল। মাত্র আধঘণ্টা ঝড় চলল। তাতেই সবাই কাহিল হয়ে পড়ল। ঝড় কমল। অল্প-অল্প বৃষ্টি চলল কিছুক্ষণ। তারপরেই আকাশ পরিষ্কার। সন্ধ্যের আকাশে আবার তারা ফুটল।

তারপরে আর ঝড়ের পাল্লায় পড়তে হল না। কিছুদিন পরেই জাহাজ ভিড়ল ভাইকিং দেশের বন্দরে। অনেকদিন পর দেশে ফেরা। সকলেই খুশী। তার ওপর অত বড়-বড় মুক্তো নিয়ে ফিরেছে। দেশের মানুষেরা তো তাই দেখে অবাক হয়ে যাবে।

জাহাজটা যখন জাহাজঘাটায় ভিড়ল, তখন ভোর হয়-হয়। জাহাজঘাটায় লোকেরা তাকিয়েও দেখল না ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে। ওরা তো জানে না কি নিয়ে কত দূর দেশ পাড়ি দিয়ে, এই জাহাজ আসছে। ফ্রান্সিসদের বন্ধুদের আর তর সইল না। ওরা বাড়ী যাবার জন্যে বার-বার ফ্রান্সিসকে বলতে লাগল। ফ্রান্সিস আর কী করে। ওদের বাড়ী যেতে অনুমতি দিল। শুধু বিস্কোকে বলল — 'রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজাকে জানিয়ে যাবে যে, আমরা ফিরেছি। সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত মূল্যবান মুক্তো। রাজামশাই যেন এসব নিয়ে যাবার জন্যে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেন।'

সৈন্যদল না আসা পর্যন্ত ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজে থাকবে, এটাই স্থির হল। বন্ধুরা সব হৈ হৈ করতে করতে পথে নামল, তারপর গাড়িভাড়া করে ছুটল যে-যার বাড়ির দিকে। আধঘণ্টার মধ্যে একদল অশ্বারোহী সৈন্য এল। সৈন্যদের দলপতি জাহাজে উঠে ফ্রান্সিসের কাছে এল। সসম্মানে রাজার একটা চিঠি ওর হাতে দিল। মোটা কাগজে মোড়ানো চিঠিটা খুলে ফ্রান্সিস পড়ল — 'তুমি আর হ্যারি অপেক্ষা করবে। আমার গাড়ি যাবে তোমাদের আনতে।'

হ্যারি চিঠিটা পড়ে বলল—'এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

সৈন্যরা! জাহাজের দেখাশুনোর ভার নিল। ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরে একটা বড় কাঠের বাক্সে মুক্তোগুলো রাখা ছিল। সৈন্যরা পাহারা দিতে লাগল সেই কেবিন ঘর।

এরমধ্যে শহরে রটে গেছে বড়-বড় অনেক মুক্তো নিয়ে ফ্রান্সিসদের ফেরার কথা। আস্তে-আস্তে জাহাজঘাটায় লোক জমতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই উৎসুক জনতার ভীড় বাড়তে লাগল। ভীড় ক্রমে জনসমুদ্রে পরিণত হ'ল। রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেল! উৎসুক জনতা ধ্বনি দিতে লাগল—'ফ্রান্সিস, দীর্ঘজীবী হও'। তারপর চীৎকার শুরু হ'ল—'আমরা ফ্রান্সিসকে দেখতে চাই'।

কেবিন ঘরে ব'সেছিল ফ্রান্সিস আর হ্যারি। হ্যারি হেসে বলল—'আর লুকিয়ে থাকা চলবে না। চলো ডেকে গিয়ে দাঁড়াই'।

—'আমার এসব আর ভালো লাগে না'। বিরক্তির সঙ্গে বলল ফ্রান্সিস।

—'উপায় নেই, চলো'—বলে হ্যারি উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসকেও উঠতে হ'ল।

দু'জনে ডেক-এ এসে দাঁড়াতেই মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠল—'ফ্রান্সিস দীর্ঘজীবী হও'।

দু'জনেই হেসে হাত নাড়াতে লাগল উৎসুক জনতা মুক্তোগুলো দেখতে চেয়ে চীৎকার করতে লাগল। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে ওর বাছাই করা মুক্তোটা বের করল। তারপর হাত তুলে দেখাতে লাগল। জনারণ্যে চাঞ্চল্য জাগল। সকলেই অবাক —এত বড় মুক্তো! অনেকক্ষণ ধরে করতালি চলল। সে শব্দে কান পাতা দায়। আবার শুরু হ'ল ধ্বনি—'ফ্রান্সিস দীর্ঘজীবী হও'।

এর মধ্যে রাজার পাঠানো আটটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি এল। জনতার ভীড় স'রে গিয়ে পথ ক'রে দিল। গাড়ির চালকের মাথায় পালকগোঁজা টুপী। পরণে জেল্লাদার পোশাক। ঘোড়াগুলি সুসজ্জিত। কালো গাড়িটার গায়ে সোনালী পাতের কারুকাজ। গাড়িটা জাহাজঘাটায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজ থেকে নেমে এল। উঠল গাড়িটায়। তখনও জনতার উল্লাসধ্বনি চলেছে। ওদের নিয়ে গাড়ি চলল রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে।

গাড়ির সামনে ও পেছনে দু'দল সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য চলল। জনসমুদ্রের মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে গাড়ি চলল। দর্শকের অনুরোধে ফ্রান্সিসকে মাঝে-মাঝে মুক্তোটা তুলে দেখাতে হ'ল। অতবড় মুক্তো দেখে সবাই হতবাক। পরক্ষণেই উল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠছে সবাই।

একসময় রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটক পেরোল গাড়িটা। ফ্রান্সিসরা দেখল রাজপ্রাসাদের বড়-বড় সিঁড়িগুলির ওপর লাল কার্পেট পাতা। সিঁড়িগুলি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে রাজা ও রাণী দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন প্রধান-প্রধান অমাত্য ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। আবার রাজার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন মন্ত্রীমশাই, ফ্রান্সিসের বাবা।

গাড়ি এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস, হ্যারি গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। সমবেত সকলেই করতালি দিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানাল। ওরা প্রথমে রাণীর কাছে দাঁড়াল। রাণীর পরণে একটা গোলাপী রঙের গাউন। গলায় ছোট-ছোট মুক্তোর হার। রাণী হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। দু'জনেই বাঁ পা ঝুঁকিয়ে মাথা নীচু ক'রে রাণীর হস্ত চুম্বন করল। রাজার দিকে ফিরে দাঁড়াতেই রাজা ফ্রান্সিসকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর হ্যারিকে। রাজা শুধু বললেন —'তোমরা আমার দেশের গৌরব।'

হঠাৎ রাজার পেছনে রাজকুমারী মারিয়া এগিয়ে এল হাসতে হাসতে।

ফ্রান্সিস এতক্ষণ মারিয়াকে দেখতেই পায়নি। ওরা দু'জনে মাথা ঝুঁকিয়ে রাজকুমারীর হস্ত চুম্বন করল। একটা ফিকে সবুজ রঙের গাউন পরে আছে মারিয়া। ফ্রান্সিসের মনে হ'ল যেন সবুজ ডাঁটায় সদ্য ফোটা একটা লিলাক ফুল। মারিয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে উঠল—'আমার জন্যে যে মুক্তো আনবেন বলেছিলেন।'

—'এই যে'— ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে মুক্তোটা বের ক'রে মারিয়ার হাতে দিল। মুক্তোটা হাতে নিয়ে মারিয়া খুশিতে মাথা দুলিয়ে হেসে উঠল। বাবা ও মাকে মুক্তোটা দেখাতে লাগল। ওদিকে সমবেত অমাত্যরা অভিজাত ব্যক্তিরা হাঁ হয়ে দেখতে লাগল সেই মুক্তোটা। এত বড় মুক্তো! ও-যে মানুষের কল্পনার বাইরে। বেশ গুঞ্জন উঠল সেই ভীড়ের মধ্যে।

ফ্রান্সিস বলল—'রাজকুমারী'।

—'বলুন!' মারিয়া খুব খুশীভরা চোখে ওর দিকে তাকাল।

—'জাহাজে আরও মুক্তো রয়েছে। তাই থেকেও মুক্তো বেছে নিতে পারেন।'

—'না'—মারিয়া মাথা ঝুকিয়ে আস্তে-আস্তে বলল—'আপনি যেটা দিয়েছেন, সেটাই আমি নেবো।'

একথা শুনে ফ্রান্সিসও খুশী হ'ল। কারণ ও খুব যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছিল বাছাই করা মুক্তোটা।

রাণী একটু এগিয়ে এসে ডাকলেন—'ফ্রান্সিস।'

ফ্রান্সিস সসম্ভ্রমে বলল—'বলুন।'

—'আজকে রাত্রে এখানে তোমাদের সকলের নিমন্ত্রণ। তোমরা সবাই আসবে।'

—'নিশ্চয়ই রাণী-মা'। ফ্রান্সিস মাথা ঝুঁকিয়ে বলল।

এবার রাজামশাই উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—'কালকে জমকালো মিছিল ক'রে মুক্তোগুলো জাহাজ থেকে এখানকার যাদুঘরে আনা হবে। আগামী দু'দিন দেশব্যাপী আনন্দ উৎসব হবে।'

সকলেই করতালি দিল। এদিকে রাজপ্রাসাদের বাইরে উৎসুক সাধারণ মানুষের ভীড় বাড়তে লাগল। সকলেই ফ্রান্সিসকে দেখতে চায়। রাজার ঘোষণাটা তাদের মধ্যে প্রচারিত হ'ল। সকলে সমস্বরে ধ্বনি দিল—'আমাদের রাজা দীর্ঘজীবী হোন।'

রাজার এই ঘোষণা প্রচার করতে একদল অশ্বারোহী সৈন্য বেরিয়ে পড়ল।

এবার ফ্রান্সিস একটু এগিয়ে এসে রাজামশাইকে বলল— 'আমরা অনেকদিন ঘর ছাড়া আমাদের যেতে অনুমতি দিন।'

—'নিশ্চয়ই। তোমরা এবার বাড়ি যাও।' রাজা বললেন।

সকলেই রাজা-রাণী ও রাজকুমারীকে সম্মান জানিয়ে নিজেদের গাড়িতে গিয়ে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস ও হ্যারি রীতিমাফিক রাজা-রাণী ও রাজকুমারীর কাছে বিদায় নিল। ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামছে তখনই ফ্রান্সিস শুনল, পেছন থেকে ওর বাবা বলছেন- 'তোমরা দু'জনে আমার গাড়িতে গিয়ে ওঠ।'

ফ্রান্সিস কোন কথা না ব'লে হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ওর গাড়িতে গিয়ে উঠল। ওর বাবাও এসে বসলেন। গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়ি প্রাসাদের বাইরে আসতেই সমবেত জনতা ধ্বনি দিল—'আমাদের রাজা

দীর্ঘজীবী হোন। ফ্রান্সিস দীর্ঘজীবী হোক।'

সকলেই ফ্রান্সিসদের গাড়ীর কাছে এগিয়ে আসতে চায়। ভালো ক'রে দেখতে চায় ওদের। ফ্রান্সিস আর হ্যারি হেসে হাত নাড়তে লাগল। গাড়ি আস্তে-আস্তে চলল। ভীড় ছাড়িয়ে গাড়ি দ্রুত ছুটল। হ্যারির বাড়ির কাছে এসে থামল।

হ্যারি নেমে যাবার সময় বলল—'রাত্তিরে দেখা হচ্ছে।'

এবার বাবার সঙ্গে একা। গাড়ি চলেছে। আবাল্য-পরিচিত শহরের রাস্তাঘাট। ভালোই লাগছিল ফ্রান্সিসের। কতদিন পরে এখানে ফিরল। হঠাৎ কেন জানি মা'র জন্যে মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। ও থাকতে না পেরে বলল— 'মা কেমন আছেন?'

—'শয্যাশায়ী'! বাবা গম্ভীর গলায় বলল।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল— 'বলো কি বাবা?'

বাবা আর কোন কথা বললেন না।

—'বৈদ্যিরা কী বলছে?'

—'নানা রকম অসুখের কথা বলছে। তবে আমার মনে হয়'—

বাবা একটু কাশলেন—'তোমার জন্যে ভেবেভেবেই এই অবস্থা।'

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না।

বাড়ির গেটের সামনে গাড়িটা এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস গাড়ি থেকে নেমে দেখল দেয়ালের গায়ে জড়ানো লতাগাছটা আরো অনেক দূর ছড়িয়েছে। নীল ফুলে ছেয়ে আছে দেওয়ালটা। বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখল বাগানটা অযত্নে শ্রীহীন হয়ে আছে। কিছু আগাছাও গজিয়েছে এখানে-ওখানে।

এবার ফ্রান্সিস বুঝল—মা নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে। কে আর বাগানের দিকে লক্ষ্য রাখবে। বাড়িতে ঢুকে ফ্রান্সিস আর অন্য কোনদিকে তাকাল না। ছুটল মা'র শোবার ঘরের দিকে। দোরগোড়া থেকেই ডাক দিল—'মা-মাগো'।

ওর মা তখন একটা বালিসে ঠেসান দিয়ে আধশোয়া হয়ে শুয়েছিলেন। ফ্রান্সিস দেখল, মা আরো রোগা হয়েছে। মুখের কপালের বলিরেখাগুলো আরও স্পষ্ট হয়েছে।

চোখ কুঁচকে মা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফ্রান্সিস এসেছিস বাবা?'

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলতে পারল না। ওর বুক ঠেলে কান্না এল। কিন্তু ও কাঁদল না।

জানে ওর চোখে জল দেখলে মা আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। মা-ও ওর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে শান্তস্বরে বলতে লাগল- 'কবে যে আর এসব পাগলামি যাবে। তোর বাবা তোর জন্যে এত ভাবে, যে কী বলবো। কত রাত দেখেছি, বারান্দায় পায়চারী করছে।'

কথা বলতে-বলতে মা'র চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল। ফ্রান্সিসও বুকে একটা শূন্যতা অনুভব করল। অনেকক্ষণ মাকে জড়িয়ে ধরে থেকে নিজের আবেগ সামলাল।

মা বলে উঠল—'নে ওঠ, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নে।'

ফ্রান্সিস মুখ তুলল। বলল—'এখন কেমন আছ মা?'

—'তুই এসেছিস, এবার ঠিক ভালো হয়ে যাবো।'

—'তুমি ভালো না হওয়া পর্যন্ত আমি দূরে কোথাও যাবো না।'

—'কথা দিলি, মনে থাকে যেন।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ফ্রান্সিস ভেবেছিল একা-একা খেয়ে নেবে। কিন্তু সেটা হল না। খাবার টেবিলে বাবার মুখোমুখি বসে দু'জনেই চুপচাপ খেতে লাগল।

একসময় বাবা বলল—'আবার কোথাও বেরোবে নাকি?'

—'না। মা ভালো না হওয়া পর্যন্ত আমি বাড়িতেই থাকবো।

—'তাহলে বাড়িতে পাহারাদার রাখার প্রয়োজন নেই?'

—'না।'

—'ভাল।'—আর কোন কথা না বলে বাবা খেতে লাগলেন।

অনেকদিন পরে নরম বিছানায় শান্ত পরিবেশে শুয়ে ফ্রান্সিস জেগে থাকতে পারল না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। একটানা বিকেল পর্যন্ত ঘুমলো ও।

★ ★ ★

সন্ধ্যার পর থেকেই মা'র তাগাদা' শুরু হলো—'রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ। যা, ভালো পোশাক-টোশাক পরে নে।'

মা বিছানায় শুয়ে শুয়েই পরিচারিকাকে দিয়ে ফ্রান্সিসের পোশাকগুলো আনাল। তাই থেকে বেছে-বেছে একটা খুব ভালো পোশাক বের করল। ফ্রান্সিস বেশ কষ্ট করে পোশাকটা পরল। বোতাম-টোতাম আটকাল। গলা পর্যন্ত আঁটা সেই পোশাক পরে ওর অস্বস্তিই হতে লাগল। কিন্তু উপায় নেই। রাজবাড়ির নিমন্ত্রণ।

ও যখন সেজেগুজে মা'র কাছে এল, তখন মা ওকে দেখে খুশীই হলো। পোশাকটা বেশ মানিয়েছে ফ্রান্সিসকে। মা ওর গায়ে সেন্ট ঢেলে দিল। বাবাও ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে নিয়েছিলেন দু'জনে গিয়ে উঠতেই গাড়ি চলল রাজবাড়ীর দিকে।

রাজপ্রাসাদের সিঁড়ির নীচের চত্বরে অনেক গাড়ি ঘোড়া। গাড়ি-গুলোর গঠন-ভঙ্গীও বিচিত্র। বোঝা গেল, অনেক লোকজন এসেছেন।

আলোকোজ্জ্বল বিরাট হলঘরের একদিকে রাজা-রাণী বসে আছেন—পিঠের দিকে উঁচু বিরাট দু'টো চেয়ার। রাজার পরণে চকচকে সোনালী-রূপালী কাজ করা পোশাক। রাণীও খুব সেজেছেন। পরণে চকচকে রূপোলী সাটিনের পোশাক। কাঁধের কাছে ঝালর দেওয়া টকটকে লাল কাপড়ের ফুল। রাণী ফ্রান্সিসকে দেখে হাসলেন তারপর ডান হাতের দস্তানাটা খুলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফ্রান্সিস প্রথমতঃ হাতে চুম্বন করল। রাজাও ফ্রান্সিসকে দেখে হাসলেন। রাজা-রাণীর পাশের চেয়ারটা খালি ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ দেখা গেল, রাজকুমারী মারিয়া নাচের আসরের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। দুধের মত সাদা একটা গাউন পরণে। সকালের চেয়ে এখন আরো বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। একটু হাঁপাচ্ছেও। বোধহয় নেচে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিসকে দেখে মারিয়া হাসল। তারপর বলল— 'আমার সঙ্গে খেতে বসবেন। মুক্তোর সমুদ্রের গল্প শুনবো।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে হাসল। মারিয়া নিজের চেয়ারটায় বসে পড়ল। ফ্রান্সিস এবার ওখান থেকে সরে এসে ভীড়ের মধ্যে বন্ধুদের খুঁজতে লাগল।

প্রথমেই বিস্কোর সঙ্গে দেখা। বেশ জমকালো পোশাক পরেছে। বিস্কো এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, বোধহয় নাচের সঙ্গিনী খুঁজছে। অন্যসব বন্ধুদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই দেখা হলো। বাকিরা সব মহানন্দে বাজনার তালে-তালে নাচছে।

হঠাৎ একটা খুব রঙচঙে পোশাক পরা মেয়ে এসে ফ্রান্সিসের সামনে দাঁড়াল। ভুরুর ভঙ্গী করে বলল, 'নাচবেন আসুন।'

ফ্রান্সিস খোঁড়াতে খোঁড়াতে দু'পা পিছিয়ে গেল। মেয়েটি বলে উঠল— 'কী হয়েছে আপনার?'

ফ্রান্সিস মুখ-চোখ কুঁচকে বলল, ডান পাটা মচকে গেছে। কাজেই বুঝতেই পারছেন।'

মেয়েটি দু'হাত ছড়িয়ে হতাশার ভঙ্গী করল, তারপর চলে গেল যেদিকে ফ্রান্সিসের অন্য সব বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে আড়াল খুঁজতে লাগল। একটাকে ঠেকানো গেছে। আবার কার পাল্লায় পড়তে হয়। ঘরের পেছনের দিকে দুটো বড় থাম। ফ্রান্সিস দ্রুত হেঁটে গিয়ে একটা থামের আড়ালে দাঁড়াল। অস্পষ্ট শিস দেওয়ার শব্দ শুনে পেছনে তাকাল। অন্য থামটার আড়ালে হ্যারি দাঁড়িয়ে হাসছে। ফ্রান্সিস একছুটে গিয়ে হ্যারির কাছে দাঁড়াল। বলল, 'খুব ভালো জায়গা বেছেছো। কেউ খুঁজে পাবে না আমাদের।'

—'অত সহজে রেহাই পাবে না তুমি।' হ্যারি বলল।

—'তার মানে?'

—'মারিয়া তোমাকে ঠিক খুঁজে বের করবে।'

—'দেখি, যতক্ষণ গা ঢাকা দিয়ে থাকা যায়।' একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, 'এত আলো-বাজনা-নাচ-জমকালো পোশাকপরা মেয়ে-পুরুষ, এর চেয়ে জাজিস্বাদের নাচের আসর অনেক সুন্দর, উপভোগ করার।'

ওরা দু'জনে এসব নিয়ে কথাবার্তা বলছে, হঠাৎ রাজকুমারী মারিয়া এসে হাজির। হাসতে হাসতে বলল, 'ঠিক জানি আপনি এখানে লুকিয়ে আছেন। নাচবেন চলুন।'

ফ্রান্সিস হতাশভঙ্গিতে হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারি হাসি চাপতে মুখ ফেরাল। নাচের জায়গায় বেশ ভীড়। ওর মধ্যেই ফ্রান্সিস আর মারিয়া নাচতে লাগল। যখন নাচিয়েরা মারিয়ার সামনে পড়ে যাচ্ছে, তখনই মাথা নুইয়ে সম্মান জানাচ্ছে। নাচতে-নাচতে হঠাৎ সেই জমকালো পোশাকপরা মেয়েটি মুখোমুখি পড়ে গেল ফ্রান্সিসের। মেয়েটি অবাক-চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ওর নাচের জুটিকে কানে-কানে কী বলতে লাগল। ফ্রান্সিস সঙ্গে-সঙ্গে নাচ থামিয়ে হাত দিয়ে হাঁটুটা চেপে ধরল। মারিয়া বলে উঠল, —'কী হলো?'

ফ্রান্সিস চোখ-মুখ কুঁচকে বলল— 'সকালে হঠাৎ পা ফসকে মুচকে গেছে।'

—'ইস আগে বলেন নি কেন? এই পা নিয়ে কেউ নাচতে আসে?'

—'কী করবো, আপনি ডাকলেন।'

—'তাই বলে, যাক গে আপনি বন্ধুদের কাছে যান'।

ফ্রান্সিস খোঁড়াতে খোঁড়াতে নাচের আসর থেকে বেরিয়ে এল। আবার থামটার আড়ালে হ্যারির কাছে এসে দাঁড়াল। হ্যারি বেশ অবাকই হলো। বলল, 'এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পেলে?'

ফ্রান্সিস হেসে নিজের মাথায় টোকা দিয়ে বলল, 'মস্তিষ্ককে কাজে লাগাও। অনেক সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে।'

থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ দু'জনে গল্প করে কাটাল। এক সময় ফ্রান্সিস

বলে উঠল, 'কখন খেতে ডাকবে রে বাবা। এসব পোশাক-টোশাক পরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

একটু পরে ঢং করে ঘণ্টা বাজল। বাজনা থেমে গেল, নাচও বন্ধ হলো। সবাই পাশের ঘরে খাবার টেবিলের দিকে যেতে লাগল। আবার মৃদু বাজনা উঠলো। সবাই খাবার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। রাজা ও রাণী এলেন, সঙ্গে রাজকুমারী। তাঁরা চেয়ারে আসন গ্রহণ করতে সব নিমন্ত্রিতরা বসলেন। রাজকুমারীর পাশের চেয়ারটা তখনও খালি। ফ্রান্সিস আর হ্যারি বসতে যাচ্ছে, হেড বাবুর্চি এসে ফ্রান্সিসকে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি রাজকুমারীর পাশে বসবেন।'

অগত্যা ফ্রান্সিসের আর হ্যারির পাশে বসা হলো না। ও রাজকুমারীকে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে রাজকুমারীর পাশের চেয়ারটায় বসল।

বিরাট লম্বা টেবিলে কত খাবার সাজানো। যে যেমন খুশী তুলে নিয়ে খাও। বাবুর্চিরাও টেবিলের চারপাশে ঘুরছে। যে-যা চাইছে, সন্তর্পণে প্লেটে তুলে দিচ্ছে। খাওয়াদাওয়া খুব জোরে চলছে। রাজকুমারী খেতে-খেতে বলল, 'আপনার মুক্তোটা লকেট করে একটা হার গড়াতে দিয়েছি।'

ফ্রান্সিস হাসল। বলল, 'মুক্তোটা আপনার পছন্দ হয়েছে'?

—'খুব'। রাজকুমারী বলল, 'এবার আপনার মুক্তোর সমুদ্রের গল্পটা বলুন'।

ফ্রান্সিস এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কী নিয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে কথা বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ও জলদস্যু লা ক্রুশের হাতে ধরা পড়া থেকে গল্পটা শুরু করে দিল। মাঝে-মাঝে খেতে ভুলে যাচ্ছিল। তখন রাজকুমারী হেসে বলছিল, 'খেতে-খেতে বলুন।'

ফ্রান্সিস লজ্জিত মুখে খেতে শুরু করছিল তখন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো, কিন্তু ফ্রান্সিসের গল্প শেষ হলো না। নিমন্ত্রিতেরা রাজা-রানী রাজকুমারীকে সম্মান জানিয়ে একে-একে বিদায় নিতে লাগল। বিভিন্ন রকমের ঘোড়ার গাড়ী তাঁদের নিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। ফ্রান্সিস আর হ্যারিও রাজা রানী ও রাজকুমারীকে সম্মান জানিয়ে বিদায় নিল। ওরা সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে, তখনই হ্যারি ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'রাজকুমারী তোমাকে লক্ষ্য করছে কিন্তু।'

সঙ্গে-সঙ্গে ফ্রান্সিস খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। হ্যারি অবাক হয়ে বলল, 'কী হলো তোমার'?

—'কিছু না, চলো'। দু'জনে বাইরে চত্বরে এসে দাঁড়াল। বাবা আসতেই ফ্রান্সিস বলল —'বাবা হ্যারিদের গাড়িতে যাচ্ছি'।

—'বেশ, কিন্তু সোজা বাড়ি'। মন্ত্রীমশাই চলে গেলেন। ওরা দু'জনে গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলল।

একটু পরে হ্যারি বলল, 'তোমার বাবা তোমাকে একা ছেড়ে দিল'?

—মা খুব অসুস্থ।

—ও জানতাম না তো।

—জানো হ্যারি মা'কে কথা দিয়ে ফেলেছি, মা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও যাবো না।

—তুমি শান্ত হয়ে বসে থাকবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।

—উপায় নেই, তাই।

গাড়ী চলল। রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণে খাওয়া-দাওয়া, এসব নিয়ে কথা হ'ল। এক সময় ফ্রান্সিসদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। ফ্রান্সিস নেমে গেল। নামার সময় বলল, 'হ্যারি মাঝে-মাঝে এসো'।

হ্যারি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ফ্রান্সিস সোজা মা'র ঘরে এসে হাজির হ'ল। মা ওর জন্যই জেগে ছিল। ঘুমোয় নি তখনও। ফ্রান্সিস মা'র বিছানায় বসল। মা'র একটা হাত ধ'রে বলল, 'মা এখন কেমন আছো'?

—'আমার কথা থাক্। তোদের নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া কেমন হ'ল বল্'।

ফ্রান্সিস উৎসাহের সঙ্গে সে-সব কথা বলতে লাগল। রাজকুমারী মারিয়ার কথাও বলল। পা মচ্‌কানোর বাহানা তুলে নাচের আসর থেকে পালানো, সে-সব কথাও বলল। মা হেসে বলল, 'তোর মাথায় এত দুষ্টুবুদ্ধিও খেলে'।

এক সময় ফ্রান্সিস বলল, 'মা, কতকিছু নিয়ে এলাম, তুমি কিছুই দেখলে না'।

—'দাঁড়াও, তুমি ভালো হ'য়ে ওঠ। তোমাকে রাজার যাদুঘরে নিয়ে যাবো। সব দেখাবো তোমাকে'।

—'সে দেখা যাবে'খন। এবার যা, রাত হ'ল'।

ফ্রান্সিস নিজের ঘরে এল পোশাক-টোশাক ছেড়ে যখন শুয়ে পড়ল, তখন রাত হয়েছে। ও শুয়ে-শুয়ে নানা কথা ভাবতে লাগল। মা সুস্থ হ'য়ে উঠলেই আবার বেরিয়ে পড়বো। এবার কোনদিকে দেখা যাক, মূল্যবান কিছুর খোঁজ পাওয়া যায় কিনা! একসময় এ-সব ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

★ ★ ★

পরদিন জাহাজঘাটায় হাজার-হাজার লোকের ভীড় জমে গেল। সকলেই মুক্তো দেখতে চায়। মুক্তো-ভরা বাক্সটা নিয়ে মিছিল বেরোবে। ফ্রান্সিসের অনুরোধে বিস্কোই সমস্ত দায়িত্ব নিল। একটা কালো গাড়ি। নানা সোনালী-রূপালী কাজ করা তাতে। সেই গাড়িটার মাঝখানে একটা বেদীমত করা হয়েছে। গাঢ়নীল রঙের ভেলভেটের কাপড় মোড়া হ'য়েছে সেটা। তারই ওপর আটটা গর্ত মতো করা হ'য়েছে। আট'টা মুক্তো রাখা হয়েছে তাতে। বাকী মুক্তোগুলি রাখা হ'য়েছে বেদীর ভেতরে। বিস্কো রইলো সেই গাড়ীতে। সঙ্গে দু'-তিনজন বন্ধু। গাড়ির সামনে ও পেছনে ঝালর দেওয়া সবুজ পোষাক পরা সুসজ্জিত দুই দল অশ্বারোহী সৈন্য। জাহাজঘাটা থেকে মিছিল শুরু হ'ল। হাজার-হাজার লোক ফ্রান্সিস ও রাজার নামে জয়ধ্বনি দিল। মিছিল এগিয়ে চলল প্রধান রাজপথ দিয়ে। সবাই যাতে মুক্তোগুলো স্পষ্টভাবে দেখতে পায়, তার জন্যে বিস্কো আর তার বন্ধুরা মাঝে-মাঝে বেদী থেকে মুক্তো তুলে হাত উঁচু ক'রে দেখাতে লাগলো।

দর্শকরা তো বিস্ময়ে হতবাক। এত বড় মুক্তো! মিছিল চললো। সারা শহরের লোক যেন ভেঙ্গে পড়েছে রাস্তায়। শহরবাসীরা যেন মেতে উঠলো।

সারা শহর ঘুরে একসময় মিছিলটা শেষ হ'ল রাজপ্রাসাদের সামনের চত্বরে। মুক্তোসুদ্ধু বেদীটা আর বাকী সব মুক্তোগুলো রাখা হ'ল রাজার যাদুঘরে। এই যাদুঘরেই রাখা আছে 'সোনার ঘণ্টা' আর 'হীরের চাঁই' দু'টো। স্থির হ'ল, পরদিন থেকে যাদুঘর উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে জনসাধারণের জন্যে। রাজার ফরমাস অনুযায়ী দু'দিনব্যাপী সারা রাজ্যে আনন্দ উৎসব চলল।

দেশবাসী তাতে মেতে উঠল। চলল খাওয়া-দাওয়া হৈ-হল্লা।

ফ্রান্সিস আর বাড়ি থেকে বিশেষ বেরোয় না। মন্ত্রীমশাইও ওর জন্যে পাহারাদার বসায় নি। একঘেয়ে দিন কাটতে লাগল ফ্রান্সিসের। মা মাসখানেকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল। এখন হাঁটাচলা, সংসারের সব কাজকর্ম করে। ফ্রান্সিস আর তার বাবা দু'জনেই নিশ্চিন্ত হলেন। ফ্রান্সিস সময় কাটাবার জন্যে কী করবে ভেবে পায় না। কখনও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ছক্কা-পাঞ্জা ফেলে, নয়তো বিছানায় শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে। হ্যারি, বিস্কো আর অন্যান্য বন্ধুরা অনেকেই আসে। গল্প-গুজব হয়। তবু ফ্রান্সিসের একঘেঁয়েমি কাটতে চায় না।

কিছুদিন কাটলো। একদিন সকালে রাজার একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ফ্রান্সিসের বাড়ির সামনে। কোচ্‌ম্যান বাড়ির ভেতরে এল। সঙ্গে একটা চিঠি। ফ্রান্সিস বাইরের ঘরে এসে ওর কাছ থেকে চিঠিটা নিল। রাজা লিখেছেন—

'স্নেহের ফ্রান্সিস,

পত্রপাঠ আমার সঙ্গে দেখা কর। বিশেষ প্রয়োজন'।

আর কিছুই লেখেন নি রাজামশাই। ফ্রান্সিসও ভেবে পেল না, কী এমন প্রয়োজন পড়ল যে, রাজা একেবারে গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস ভালো পোশাক-টোশাক পরে তৈরী হয়ে নিয়ে গাড়ি চেপে চলল রাজামশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। রাজপ্রাসাদের সামনের চত্বরে এসে গাড়ি দাঁড়াতেই একজন প্রাসাদরক্ষী এগিয়ে এল। মাথা নুইয়ে ফ্রান্সিসকে সম্মান জানিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'মহানুভব রাজা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন'।

ফ্রান্সিস ওর পেছনে পেছনে চলল। সুসজ্জিত কয়েকটা ঘর পেরিয়ে রাজবাড়ির ভেতরে একটা পুকুরের ধারে এল। পুকুরটার চারধার শ্বেতপাথরে বাঁধানো। পরিষ্কার নীল জল তাতে। অনেক মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত রঙের কত রকমের মাছ। তারপরেই একটা বাগানমত। এলাকাটা রাজার নিজস্ব চিড়িয়াখানা। বাঘ, ময়ূর, সাপের খাঁচা পেরিয়ে দেখল, রাজামশাই একটা নতুন খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। খাঁচাটায় একটা মেরুদেশীয় শ্বেত ভল্লুকের বাচ্চা। রাজা ভালুকটাকে গমের দানা খাওয়াচ্ছেন, আর পাশে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলছেন।

ফ্রান্সিস রাজার সামনে গিয়ে অভিবাদন করে দাঁড়াল। রাজা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রেখে পাশের ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছে ফ্রান্সিস, আমাদের ভাইকিং জাতির গর্ব।

ফ্রান্সিস এত উচ্চ প্রশংসায় বেশ বিব্রত বোধ করল। এবার পাশের ভদ্রলোককে দেখিয়ে রাজা বললেন, 'ইনি হচ্ছেন এনর সোক্কাসন। দক্ষিণ গ্রীনল্যাণ্ডের রাজা। একটা জরুরী ব্যাপারে উনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান'।

ফ্রান্সিস মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানালো। ভালো করে দেখলো রাজা এনর সোক্কাসনকে। বিশাল দেহ রাজার, মুখে দাড়ি, গোঁফ। পরণে ছাইরঙের গরম কাপড়ের আলখাল্লার মত। গলায় সোনার মোটা চেন, হীরা-বসানো লকেট তা'তে। কোমরবন্ধনীটাও সোনার মোটা চেন-এর। মাথায় সীলমাছের চামড়ায় তৈরী টুপী। সোক্কাসন হাত দুটো ঘষে নিয়ে বললেন, 'চলুন কোথাও বসা যাক'—

পুকুরের ধারে শ্বেতপাথরের বেদী রয়েছে। ফ্রান্সিস একটা বেদী দেখিয়ে বলল, 'ওখানে বসা যেতে পারে'।

দু'জনে যখন যাচ্ছে ওদিকে, তখন ভাইকিংদের রাজা বললেন, 'ফ্রান্সিস এই মেরুভল্লুকটা রাজা সোক্কাসন আমাকে উপহার দিয়েছেন।'

ফ্রান্সিস সোক্কাসনকে জিজ্ঞেস করলো, 'মেরুভল্লুক কি মাংসাশী?'

সোক্কাসন বললেন, 'হ্যাঁ, ওখানে তো ঘাস-গাছপালা বলে কিছু নেই। বরফের জলের মাছটাছ খায়'।

দু'জনে বেদীতে বসল। সোক্কাসন বললেন, 'এখানকার যাদুঘরে আপনার আনা সোনার ঘণ্টা, হীরে, মুক্তো দেখেছি! আপনার দুঃসাহসের প্রশংসা শুনেছি।'

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না, সোক্কাসন বলতে লাগলেন, 'আসল কথায় আসি। আপনি নিশ্চয়ই এরিক দ্য রেডের নাম শুনেছেন'?

—'হ্যাঁ উনি তো গ্রীনল্যাণ্ডের প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। তাঁকে নিয়ে গল্প প্রচলিত আছে'।

—'আমরা তাঁরই বংশধর। এরিক দ্য রেডই ওখানে প্রথম য়ুরোপীয়দের বসতি স্থাপন করেন। তার আগে ওখানে ল্যাপ্ এস্কিমোরা বাস করত। উত্তরের দিকে আর এক উপজাতি বাস করতো এবং এখনও বাস করে। তাদের বলে ইউনিপেড। এরা অসভ্য-বর্বর-হিংস্র। এদের রাজার নাম এ্যাভান্ডাসন'। সোক্কাসন একটু থামলেন, তারপর বলতে লাগলেন, 'এরিক দ্য রেড ওদিকে আলাস্কা, এদিকে আইসল্যাণ্ড, নরওয়ের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর ধনসম্পত্তি লাভ করেছিলেন। তা ছাড়া কিছু পথ-হারানো জাহাজ, তার মধ্যে জলদস্যুদের জাহাজও তাঁর অধিকারে এসেছিল। এই ধনসম্পত্তি তিনি যে সবটাই সৎপথে উপার্জন করেছিলেন তা নয়। যা হোক, আমার দেশের রাজধানীর নাম 'বাট্টাহালিড'। সেখানে আমার প্রাসাদ আছে'। একটু থেমে হেসে বললেন, 'এখানকার প্রাসাদের মত নয় কিন্তু, খুবই সাধারণ। এরিক দ্য রেডের আমলে ওটা তৈরী হয়েছিল। তা ছাড়া বড় গীর্জা আছে একটা। এখন সমস্যা দাঁড়িয়েছে, এরিক দ্য রেডের খামখেয়ালীপনার জন্যে। উনি তাঁর উপার্জিত ধনভাণ্ডার যে কোথায় রেখে গেছেন, সেটা আজও রহস্যময়'।

—'উনি কি সেটা বলে যান নি'। —ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো।

—'না। কারণ চিরশত্রু ইউনিপেডদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি হঠাৎ মারা যান! কাজেই স্ত্রী-পুত্র বা মন্ত্রী কাউকেই গুপ্ত-ধনভাণ্ডারের কথা বলে যেতে পারেন নি। এই নিয়ে আমার দেশে অনেক লোককাহিনী প্রচলিত আছে'।

—'আচ্ছা, উনি গীর্জা তৈরী করিয়েছিলেন'?

—'হ্যাঁ, এবং বেশ যত্নের সঙ্গেই সেটা তৈরী করিয়েছিলেন'।

—'তাহ'লে খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি ছিল'।

—'তা ছিল'।

—'তাঁর ব্যবহৃত কী-কী জিনিস আপনাদের কাছে আছে'?

—'অস্ত্রশস্ত্র, কিছু পোশাক আর নরওয়ের ভাষায় অনুদিত বাইবেল'।

—'উনি কি নিজেই অনুবাদ করেছিলেন?'

—'হ্যাঁ, আমাদের তাই বিশ্বাস'।

—'হুঁ'। ফ্রান্সিস একটু থেমে ভাবল। তারপর বলল, 'ঐ গুপ্তধন কোথায় আছে বলে আপনাদের ধারণা?'

—'রাজপ্রাসাদের গীর্জায় অথবা সুক্কারটপ পাহাড়ের নীচে কোথাও'।

—'আপনারা ভালোভাবে খুঁজে দেখেছেন'?

—'কয়েক পুরুষ ধরেই খোঁজাখুঁজি চলছে। কিন্তু কেউ কোন হদিস করতে পারে নি'।

—'এবার রাজা সোক্কাসন, বলুন আমাকে কী বলতে চান'?

সোক্কাসন একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। দাড়িতে হাত বুলোলেন। তারপর বললেন, 'দেখুন, ভেবে দেখলাম আপনি শুধু দুঃসাহসীই নন, বুদ্ধিমানও। আপনিই পারবেন, এ গুপ্তধনের হদিস বার করতে। দেশের রাজা হিসেবে, আপনাকে আমাদের দেশে যাবার সাদর আহ্বান জানাচ্ছি'।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আপনার আমন্ত্রণে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত। কিন্তু আমার মা এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। কাজেই এখনই আমি কিছু বলতে পারছি না'।

—'ঠিক আছে, আপনি সময়-সুযোগমত যাবেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন'। সোক্কাসন বললেন।

—'ফ্রান্সিস সব শুনলে'? ভাইকিংদের রাজা এগিয়ে এলেন।

দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল, 'হ্যাঁ মহারাজ'!

—'কী? এরিক দ্য রেডের ধন-ভাণ্ডার খুঁজে বের করতে পারবে'? রাজা মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

—'বাট্টাহালিডে আগে যাই, সব দেখে-শুনে তবেই বলতে পারবো'।

রাজামশাই একটু আমতা-আমতা ক'রে বললেন, 'ইয়ে—দেখো—আমি তোমাকেই এই কাজের উপযুক্ত ব'লে মনে করি। তবে তোমাকে কিন্তু তোমার বাবা-মার সম্মতি নিয়ে যেতে হবে'।

—'বেশ'।

ফ্রান্সিস সোক্কাসনকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কবে দেশে ফিরছেন'?

—'দু-তিনদিনের মধ্যেই'।

—'আচ্ছা, তাহ'লে চলি'। ফ্রান্সিস দু'জনকেই মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে রাজাপ্রাসাদের প্রধান ফটকের দিকে পা বাড়াল। রাজার গাড়ি ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। গাড়িতে চড়ে ও বাড়ির দিকে এল। সারাপথ এরিক দ্য রেডের গুপ্তধনের কথা ভাবতে-ভাবতে এল। ফ্রান্সিসের একঘেঁয়ে দিন কাটতে লাগল। বন্ধুরা আসে, গল্পগুজব হয়। ওরা চলে গেলে ফ্রান্সিস আবার একা। সময় পেলেই অবশ্য মা'র বিছানায়, মা'র পাশে এসে বসে। মা'কে সোনার আমদাদ নগর, চাঁদের দ্বীপ, আফ্রিকার বন-জঙ্গল এসব গল্প শোনায়। ছাড়া-ছাড়া ভাবে বলে, মা তাই শোনে। মা'র ভাবতেও অবাক লাগে, পৃথিবীতে এমন সব মানুষেরা আছে, এমন সব দেশ আছে। গল্প করার সময়ই ও একদিন বলল, 'মা, তুমি কি আর কোথাও যেতে দেবে না'?

—'না'। মা শান্তস্বরেই বলল, 'অনেক হয়েছে, এবার সংসার করো'।

ফ্রান্সিস বুঝল, মা'কে রাজী করানো খুব মুস্কিল হবে। ও মা'র কাছে রাজা সোক্কাসনের গল্প করলো, কিন্তু তিনি যে ওকে গ্রীনল্যাণ্ডে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এসব কিছু বলল না।

কথায়-কথায় হ্যারিকে একদিন এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন, আর রাজা সোক্কাসনের

আমন্ত্রণের কথা বলল। হ্যারি সব শুনে একটু ভাবল। তারপর বলল, 'তুমি ওখানে গেলে, তোমাকে ওরা রাজার হালে রাখবে সন্দেহ নেই, কিন্তু পারবে কি গুপ্তধন খুঁজে বের করতে'?

—'সেটা বাট্রাহালিডে না গিয়ে তো বলতে পারছি না'।

—'তোমার বাবা-মা যেতে দেবেন'?

—'না দেন তো আবার জাহাজ চুরি করে ওদেশে যাবো'?

আস্তে-আস্তে বন্ধুরাও শুনল, রাজা সোক্কাসনের আমন্ত্রণ, এরিক দ্য রেডের গুপ্তধনের কথা। ওরা তো ফ্রান্সিসকে উত্যক্ত করলো, 'চলো আবার ভেসে পড়ি'।

ফ্রান্সিস হাসে আর বলে, 'হবে-হবে, সময় আসুক'।

★ ★ ★

মা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আবার সংসারের সব ভার কাঁধে তুলে নিয়েছে। ফ্রান্সিস মা'র সঙ্গে বাগান দেখাশুনা করে। অনেক নতুন ফুলের চারা লাগিয়েছে। কয়েকটা ফলের গাছও লাগিয়েছে। বাগানটা যেন আবার শ্রী ফিরে পেয়েছে।

একদিন দুপুরে বাবা ফ্রান্সিসকে তাঁর নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। এ-সময়টা বাবা রাজবাড়িতেই থাকেন। আজকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন। ফ্রান্সিস ঘরে ঢুকতেই বাবা বললেন, 'বসো কথা আছে'।

ফ্রান্সিস আসনপাতা কাঠের চেয়ারটায় বসল।

একটু কেশে নিয়ে বাবা বললেন, 'রাজামশাই আমাকে সব কথা বলেছেন। বাট্রা-হ্যালিড থেকে রাজা সোক্কাসন চিঠি পাঠিয়েছেন। তুমি কবে নাগাদ যেতে পারবে, জানতে চেয়েছেন'।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না।

—'তোমার কী ইচ্ছে'?

—'বাবা তুমি তো জানো, গৃহবন্দী জীবন আমার অসহ্য'।

—'হুঁ'।

—'তোমরা অনুমতি দিলেই আমি যাবো। মা'র শরীর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তা'ছাড়া গ্রীনল্যাণ্ড এমন কিছু দূরের দেশ না। যাচ্ছিও রাজার অতিথি হয়ে'।

কিছুক্ষণ চুপ করে দেখে বললেন, 'দেখি তোমার মা কী বলেন'?

ফ্রান্সিস আর মা'কে কিছু বলল না। কিন্তু বাবার কাছ থেকে মা সবকিছুই জানলো। সেদিন মার ঘরে ঢুকতেই মা বলল, 'হ্যাঁরে, তুই নাকি গ্রীনল্যাণ্ড যাবি ঠিক করেছিস'?

—'কী করবো বলো, ঘরে বসে থাকতে-থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি'।

—'তাই বলে আবার ঘরবাড়ি ছেড়ে, অজানা-অচেনা দেশে—না-না'!

—'বুঝছো না কেন—' ফ্রান্সিস মা'কে বোঝাতে লাগলো, 'রাজা সোক্কাসনের অতিথি হয়ে আমি যাচ্ছি। দেশটা এমন কিছু দূরেও না'।

—'তবু বিপদ-আপদের কথা কি কিছু বলা যায়'?

—'তাই যদি বলো মা, তা'হলে তো এক্ষুণি ভূমিকম্প হতে পারে, তখন কোথায় থাকবে তুমি, আর কোথায় থাকবো আমি'।

—'অমন অলুক্ষুণে কথা বলিস নে'। মা বলল।

—'ঠিক আছে, আজই চলো রাজার যাদুঘর দেখতে'।

—'কেন'।

—'কত দূর-দূর দেশ থেকে আমরা কী এনেছি তোমাকে দেখাবো'।

—'সে তো সব শুনেছি'।

—'শুধু শুনেছো, আজকে নিজের চোখে দেখবে, চলো'।

কিছুক্ষণের মধ্যে মা তৈরী হয়ে নিল। ফ্রান্সিসও তৈরী হয়ে মা'কে ডাকতে এলো। আজকে খুব খুশী। মা তো সোনার ঘণ্টা, হীরে, মুক্তো এসব দেখে নি। আজকে দেখবে।

ওদের গাড়ি চললো। অনেকদিন পরে বাইরে বেরিয়ে মা'র ভালোই ল্যাগছিল। যাদুঘরের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। ফ্রান্সিস মা'কে হাত ধরে গাড়ি থেকে নামালো। যাদুঘরের দরজায় দু'জন ভাইকিং সৈন্য খোলা তলোয়ার হাতে পাহারা দিচ্ছিলো। দু'জনেই ফ্রান্সিসকে চিনতে পেরে মাথা নুইয়ে সম্মান জানালে।

প্রথম ঘরটাতে রাখা ছিল 'সোনার ঘণ্টা'টা। মা তো সোনার ঘণ্টা দেখে হতবাক। এত বড়ো ঘণ্টা, তাও নিরেট সোনায় তৈরী। মা বিশ্বাস করতে চাইল না। ফ্রান্সিস হেসে বলল, হাত দিয়ে দেখো'।

মা ঘণ্টাটার গায়ে হাত বুলোতে লাগলো। মা'র তখনও বিস্ময়ের ভাব কাটে নি। বলল, 'তোরা এটা এনেছিস'?

—'হ্যাঁ'। ফ্রান্সিস বলল, 'চলো মা পাশের ঘরে'।

পাশের ঘরে রাখা হয়েছে হীরের টুকরো দু'টো। আবার মা'র অবাক হবার পালা। এত বড়ো হীরে? মা'র সংশয় তবু যেতে চায় না। বলল, 'এই সবটাই হীরে'?

ফ্রান্সিস হাসলো, 'হ্যাঁ-মা'।

পরের ঘরটায় গেল ওরা। একটা উঁচু বেদীমত করা হয়েছে সেখানে। গাঢ় বেগুনী রঙের ভেলভেট কাপড়ে ঢাকা। তা'তে মুক্তোগুলো রাখা হয়েছে। এত বড়ো-বড়ো মুক্তো? মা'র মুখে আর কথা নেই। পাশেই রাখা হয়েছে লা ব্রুশের লুঠ করা মোহর অলঙ্কার ভর্তি বাক্স দু'টো। ফ্রান্সিস বলল, 'মা তোমাকে তো লা ব্রুশের গল্প বলেছি। এ-সব হচ্ছে ঐ কুখ্যাত খুনী জলদস্যুটার সম্পত্তি।'

মা অবাক হয়ে দেখতে লাগল। কত মোহর, কত অলঙ্কার। ফ্রান্সিস বলল, 'মা, তুমি এই থেকে একটা অলঙ্কার নেবে?'

—'না।' মা দৃঢ়স্বরে বলল, 'কত নিরীহ মানুষের রক্তে ভেজা এ-সব অলঙ্কার। এসব পরলে অমঙ্গল হয়।'

ফ্রান্সিস বুঝলো, মা'কে অলঙ্কার নিতে রাজী করানো যাবে না। মা আর একবার সব ঘুরে-ঘুরে দেখল। তারপর গাড়িতে এসে উঠলো। মা'র তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। গাড়ি চললো। ফ্রান্সিস একসময় হেসে বলল, 'এবার বিশ্বাস হলো তো?'

—'হুঁ'। মা আর কোনো কথা বলল না।

—'এবার বুঝলে তো, তোমার ছেলে কতটা সাহস আর বুদ্ধি রাখে!'

—'আমার বুঝে দরকার নেই। তুমি আমার চোখে চোখে থাক, তা'হলেই হবে।'

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে রইল, তারপর মৃদুস্বরে ডাকল, 'মা।'

—'বল।'

—'তাহ'লে এবার আমাকে গ্রীনল্যাণ্ডে যেতে দেবে তো?'

—'আবার?'

—'রাজা সোক্কাসনের অতিথি হয়ে। ভয়ের কিছু নেই।'

—'কদ্দিনের মধ্যে ফিরবি?'

—'কদ্দিন আর?' ফ্রান্সিস মা'কে নিশ্চিন্ত করবার জন্যে বললো, 'মাস দু'য়েক। একটু থেমে বলল, 'মা তুমি রাজী হলেই বাবা আর আপত্তি করবেন না।'

—'দেখি তোর বাবার সঙ্গে কথা বলে।' মা বলল। খুশীতে ফ্রান্সিস মা'কে জড়িয়ে ধরলো।

মা মৃদু হেসে বলল, 'ছাড়-ছাড় পাগল ছেলে।'

ক'দিন পরে রাজবাড়ি থেকে গাড়ি এলো। কোচম্যান ফ্রান্সিসকে রাজকুমারীর চিঠি দিলো। চিঠিতে শুধু লেখা—

'আপনার মুক্তো আনার গল্পটা শুনবো। অবশ্য আসবেন।

—মারিয়া।'

মা ফ্রান্সিসকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিল। সে রাজপরিবারের গাড়ি চড়ে রাজবাড়িতে চললো।

অন্দরমহলে একজন পরিচারিকা ওকে একটা ঘরে বসালো। কী সুন্দর সাজসজ্জা সেই ঘরে। দেয়ালে লাল-হলুদ পাথর বসানো। নানা রঙের মোজাইকের কাজ করা মেঝে। জানলায় রঙীন কাঁচ। তার মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো নানা রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘরটাতে। মারিয়া ঘরে ঢুকলো। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়ালো, মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। একটা হালকা সবুজ রঙের গাউন পরেছে মারিয়া। মাথায় সোনালী চুল বিনুনী বাঁধা। কী সুন্দর যে লাগছে দেখতে। ফ্রান্সিস কথা বলবে কি, ও যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে ডুবে গেল।

—'খেয়ে নিন আগে।'

মারিয়ার কথায় ফ্রান্সিস যেন সম্বিত ফিরে পেল। দেখলো, একজন পরিচারিকা শ্বেতপাথরের গ্লাসে সরবৎ এনেছে, সঙ্গে একথোকা আঙ্গুর। ফ্রান্সিস সুগন্ধি সরবৎটা একচুমুকেই খেয়ে নিল। তারপর আঙ্গুর খেতে-খেতে মুক্তোর সমুদ্রের গল্প বলতে লাগলো। মারিয়া গালে হাত দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে সেই গল্প শুনতে লাগলো। গল্প সবটা সেদিন শেষ হলো না। আর একদিন আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফ্রান্সিস সেদিন বাড়ি চলে এলো।

আবার একদিন মারিয়ার চিঠি নিয়ে রাজ পরিবারের সেই কালো চকচকে কাঠে সোনালী-রূপালী কাজ করা গাড়িটা এলো। সেদিনও সরবৎ, আপেল খাওয়ার পর ফ্রান্সিস মুক্তোর সমুদ্রের গল্পটা বলতে লাগলো, 'জলের নীচে নেমে দেখি একটা নরম নীলচে আলো। মেঝের মতো তলায় কত মুক্তো ছড়ানো। সেই আলো আসছে ছড়ানো মুক্তোগুলো থেকে। সে এক অপার্থিব দৃশ্য। অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখছি, হঠাৎ গা ঘেঁষে চলে গেলো কুৎসিত-মুখো একটা লাফ মাছ।'

ফ্রান্সিস গল্প বলছে, আর মারিয়া অবাক হয়ে শুনতে লাগলো সেই গল্প। একসময় গল্প শেষ হলো, মারিয়ার বিস্ময়তার ঘোর তখনও কাটে নি।

একটু চুপ করে থেকে মারিয়া বলল, 'আপনি এতো কাণ্ড করেছেন?'

ফ্রান্সিস সলজ্জ হাসলো। মারিয়া বলল, 'এবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

—'এবার বরফের দেশ গ্রীণল্যাণ্ডে যাবো।'

—'সব ঠিক হয়ে গেছে?'

—'উঁহু, বাবার সম্মতির অপেক্ষায় আছি।'

—'গ্রীণল্যাণ্ডে যাচ্ছেন কেন?'

—'এরিক্ দ্য রেডের নাম শুনেছেন তো?'

—'হ্যাঁ, উনি তো ওখানকার প্রবাদ-পুরুষ ছিলেন।'

—হ্যাঁ, তাঁরই গুপ্তধন উদ্ধার করতে।' ফ্রান্সিস বলল।

* * *

কয়েকদিন কেটে গেল। সেদিন ফ্রান্সিসের বাবা তাড়াতাড়ি রাজবাড়ি থেকে ফিরলেন। ফিরেই ফ্রান্সিসকে ডেকে পাঠালেন। ফ্রান্সিস বাবার ঘরে গেল। মন্ত্রীমশাই টেবিলে মুখ নীচু করে কিছু লিখছিলেন। ফ্রান্সিস ডাকল, 'বাবা!'

মন্ত্রীমশাই মুখ তুলে বললেন, 'তুমি কি রাজা সোক্কাসনের দেশে যেতে চাও?'

—হ্যাঁ, বাবা। এই অলস-নিষ্কর্মার জীবন আমার ভালো লাগে না।'

—'হুঁ। তোমার মা তোমার এই যাওয়ার ব্যাপারে, সমস্ত দায়িত্বটাই আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে।'

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

—'রাজামশাইও আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন, আমি যেন সম্মতি দিই।' একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'সবদিক ভেবে আমি সম্মতি দিলাম।'

ফ্রান্সিস ভেবেই রেখেছিলো, বাবা কিছুতেই রাজী হবেন না। কিন্তু এভাবে এক কথায় বাবাকে রাজী হতে দেখে তার মন আনন্দে নেচে উঠলো। ইচ্ছে হলো, ছুটে বাবাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু বাবার সঙ্গে ও-রকম ব্যবহারে সে অভ্যস্ত নয়। হেসে বলল, 'মাকে বলে আসি?'

—'যাও। কিন্তু একটা কথা, আমি একমাস সময় দিলাম। এক মাসের মধ্যে তুমি চলে আসবে। তার মধ্যে গুপ্তধন উদ্ধার হোক বা না হোক'।

—'বেশ। তবে আমার একটা কথা ছিল।'

—'বলো।'

—'বাট্রাহালিড পৌঁছতেই প্রায় দিন পনেরো-কুড়ি লেগে যাবে। তারপর গুপ্তধন খোঁজা। এত-সব একমাসে হবে?'

—'বেশ আর পনেরো দিন।' মন্ত্রীমশাই বললেন।

—'ঠিক আছে, আমি ওর মধ্যেই ফিরে আসবো।'

—'আমাকে কথা দিচ্ছো কিন্তু।'

—'হ্যাঁ বাবা।' সে বলল।

* * *

দেখতে-দেখতে বাট্রাহালিডে যাওয়ার দিন এসে গেল। ফ্রান্সিস এর মধ্যে হ্যারি ও বিস্কো ছাড়া আরও দশজন বন্ধুকে বেছে নিল।

রাজামশাই সৈন্য দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে আর লোক নিতে রাজী না।

সেদিন সকাল থেকেই জাহাজঘাটায় লোকজনের ভীড় হয়ে গেল। যে জাহাজে ফ্রান্সিসরা যাবে, সেই জাহাজটা একেবারে নূতন। কামানও বসানো আছে। রাজামশাই জাহাজটা নিজে ' বেছে দিয়েছেন।

একটু বেলা হতেই ফ্রান্সিসরা দল বেঁধে এলো। একটু পরে রাজা-রানী আর মারিয়া এলো। সঙ্গে মন্ত্রী, সেনাপতি, অমাত্য আর শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। জাহাজঘাটায় একটা সোনালী ঝালর দেওয়া সামিয়ানা টাঙানো হয়েছিলো, নীচে বসবার আসন। রাজা-রানীর সঙ্গে আর সকলে সামিয়ানার নীচে বসলেন। ফ্রান্সিসরা একে-একে সকলকে অভিবাদন জানিয়ে জাহাজে গিয়ে উঠলো। এবার আর রাতের অন্ধকারে জাহাজ চুরি করে পালানো নয়। দিনের বেলা স-সম্মানে সকলের উপস্থিতিতে জাহাজে চড়ে যাত্রা করা। সমুদ্রের দিকে মুখ করে দু'বার কামান দাগা হলো। ঘর-ঘর শব্দে নোঙর তোলা হলো। পালগুলো তুলে দেওয়া হলো। আকাশ পরিষ্কার, সমুদ্রও শান্ত। বাতাসের তোড়ে পালগুলো ফুলে উঠল। জাহাজঘাটা থেকে সকলেই জাহাজটার দিকে তাকিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

রাজামশাই রাজা এনর সোক্কাসনকে লেখা একটা শীলমোহর করা চিঠি দিয়েছিলেন ফ্রান্সিসকে। বেশ যত্ন করে চিঠিটা রেখে দিল। ফ্রান্সিস বুদ্ধি করে সকলকে যত বেশী সম্ভব, গরম কাপড়-চোপড় আনতে বলে দিয়েছিল। গ্রীণল্যাণ্ডের ঠাণ্ডায় ওদের দেশীয় পোশাক চলবে না।

জাহাজ-যাত্রা শুরু হলো। জাহাজ চললো উত্তর-পশ্চিমমুখো। প্রথমে আইসল্যাণ্ডে যাবে। তারপর গ্রীণল্যাণ্ডে। দিন-রাত জাহাজ চলছে। ফ্রান্সিস আর তাঁর বন্ধুরা খুশীতেই আছে। ঝড়-ঝাপটার কবলে পড়েনি ওরা। বেশ নির্বিঘ্ন যাত্রা।

দিন-সাতেক যেতে না যেতেই চারপাশের আবহাওয়ায় পরিবর্তন দেখা গেলো। সূর্যের আলোয় আর সেই তেজ নেই। বেশ ঠাণ্ডা। উত্তরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সকাল আর রাত্রে কুয়াশা পড়ে। তারই মধ্যে জাহাজ চলছে। যতদিন যাচ্ছে ঠাণ্ডাও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সবাইকে বেশী-বেশী গরম পোশাক পরতে হচ্ছে, আর কান-ঢাকা টুপী।

হঠাৎ একদিন ওরা সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈল দেখতে পেলো। খুব বড়ো নয়, তবে ওপর থেকে বোঝবার উপায় নেই। কারণ হিমশৈলের বেশীর ভাগটাই থাকে জলের তলায়। যতো এগোচ্ছে জাহাজ, ততোই বিরাট আকারের সব হিমশৈলের সামনে পড়ছে। তাই সারাক্ষণ দু'তিনজন করে নজর রাখছে হিমশৈলের দিকে। কোনভাবে যদি জাহাজটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায় জাহাজ আর আস্ত থাকবে না। তাই দিনরাত সজাগ থাকতে হচ্ছে।

জাহাজ একদিন আইসল্যাণ্ডে পৌঁছল। বন্দরটার নাম রেকজাভিক, ছোট্ট বন্দর। তিনদিকে বিরাট-বিরাট বরফের খাঁড়া পাহাড়। তারই নীচে খাঁড়ির মধ্যে বন্দরটা। ফ্রান্সিসরা জাহাজ ভেড়ালো সেই বন্দরে। এখানে স্ক্রেলিং উপজাতির বাস। ওরা চামড়ার তৈরী তাঁবুতে থাকে। সীলমাছের চামড়ায় তৈরী কায়াক নৌকায় চড়ে এলো ওরা। এই কায়াক নৌকো উলটে গেলেও জলে ডুবে যায় না। পরণে চামড়া পোশাক, মাথার টুপীও চামড়ার। দলে-দলে ওরা নৌকা চড়ে এলো। ফ্রান্সিস প্রথমেই ওদের সঙ্গে শত্রুতা করল না। ওরা জাহাজে উঠতে চাইলে, উঠতে দিল। ঐ স্ক্রেলিংদের মধ্যে থেকে সর্দার গোছের একজন এগিয়ে এলো ফ্রান্সিসদের দিকে। ভাঙা-ভাঙা নরওয়ের ভাষায় বলল, রঙিন কাপড় আছে কিনা। ফ্রান্সিসদের কাছে লাল-নীল নানা রঙের কাপড় ছিল। সে-সব ওদের দেওয়া হলো, দেখা গেল ওরা খুব খুশী। সেই সব কাপড় ছিঁড়ে-ছিঁড়ে মাথায়

বাঁধতে লাগলো। সর্দার কী যেন বলে উঠলো। কয়েকজন জাহাজ থেকে নেমে নৌকো থেকে নিয়ে এলো মেরুদেশের ভল্লুক আর বলগা হরিণের দামী দামী চামড়া। ফ্রান্সিসরাও ওসব পেয়ে খুব খুশী। স্ক্রেলিংরা দল বেঁধে হৈ-হৈ করতে-করতে মাথায় ছিট-কাপড়ের ফেট্টি বেঁধে নৌকায় চড়ে চলে গেলো। কোনো ঝামেলা না হতে দেখে ফ্রান্সিসরা খুশী হলো। সেই রাতটা ওরা রেকজাভিক বন্দরেই রইলো।

পরদিন আবার যাত্রা শুরু হলো। আইসল্যাণ্ডের তীরভূমির কাছ দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে। তখনই দেখলো সীলমাছ আর সিন্ধুঘোটকের দল। ওগুলো কখনো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আবার উঠছে বরফের তীরে। এইভাবে ওগুলো ছোট-ছোট মাছ ধরে খাচ্ছে। আবার এক দঙ্গল সিন্ধুঘোটককে দেখলো চুপচাপ শুয়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। গোঁফদাড়ি আর বড়-বড় দু'টো দাঁতওলা সিন্ধুঘোটকগুলো এমনিতে শান্ত। বরফগলা হিমজলে ওদের কোনো অস্বস্তিই নেই।

একদিন পরেই ফ্রান্সিসদের জাহাজ আইসল্যাণ্ডের আর একটা বন্দর হোলটা-ভানসসের কাছাকাছি এলো। উঁচু-উঁচু পাহাড়ের মত বরফের চাঁই, তারই নীচে বন্দর। ওদের ইচ্ছে ছিল বন্দরে জাহাজ ভেড়ানোর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারল না। তখন বিকেল, এমনিতেই এসব অঞ্চলে সূর্যালোক বেশীক্ষণ থাকে না। তাছাড়া কুয়াশা তো রয়েইছে। সেই আবছা-অন্ধকারে ফ্রান্সিসরা দেখলো, ল্যাপজাতীয় আদিবাসীরা অনেকগুলো কায়াক নৌকোয় চড়ে, ওদের জাহাজ লক্ষ্য ক'রে আসছে। ল্যাপদের হাতে কুঠার আর তীরধনুক। হঠাৎ ঝাঁকে-ঝাঁকে তীর এসে ওদের জাহাজে পড়তে লাগলো, দু'চার জন আহতও হলো। বোঝাই যাচ্ছে, ল্যাপরা বন্ধুত্ব করতে আসছে না। ওদের উদ্দেশ্য জাহাজ লুঠ করা। ল্যাপরা মাঝে-মাঝে চীৎকার করে উঠছে, শূন্যে ধারালো কুঠার তুলে আস্ফালন করছে।

ফ্রান্সিস সবাইকে ডেকে বলল, 'এই বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো হবে না।' জাহাজের মুখ ঘোরানো হলো। কিন্তু ল্যাপরা সেই মাঝে-মাঝে চীৎকার করে উঠছে, আর জাহাজের পিছু ছাড়ছে না দেখে ফ্রান্সিস তখন হুকুম দিল, 'গোলা ছোঁড়ো।'

গোলন্দাজরা কামানের কাছে জড়ো হলো। ফ্রান্সিস তরোয়াল তুলে ইঙ্গিত করতেই গোলা ছুটলো ল্যাপদের নৌকো লক্ষ্য করে। কয়েকটা নৌকো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। আবার গোলা ছুটলো, আবার কয়েকটা নৌকো-সুদ্ধ ল্যাপরা জলে পড়ে গেলো। ওদের মধ্যে থেকে আহতদের আর্তনাদ শোনা গেলো। আর তীর ছুঁড়লো না ওরা, নৌকোগুলো বন্দরের দিকে ফিরে যেতে লাগলো। জাহাজের মুখ ঘোরানো হলো গ্রীণল্যাণ্ডের দিকে। জলে ভাসমান বরফের স্তর এড়িয়ে জাহাজ নিয়ে যেতে হলো। কাজেই জাহাজের গতি ছিল ধীর। প্রায় তিনদিন লেগে গেলো গ্রীণল্যাণ্ডে আসতে। কয়েকদিন পরেই জাহাজ ভিড়লো দক্ষিণ গ্রীণল্যাণ্ডের বন্দরে।

এই বন্দর সমতল জমির ওপর কোনদিকে উঁচু পাহাড়ের মত, বরফের চাঁই নেই। এই বন্দরটা একটু বড়ো। বন্দরের ধারে-ধারে এস্কিমোদের চামড়ার তাঁবুর বসতি। এই প্রথম ফ্রান্সিসরা এস্কিমোদের দেখলো। বন্দরে আরো দু'তিনটি জাহাজ ছিল। ওরা জাহাজ থেকে দল বেঁধে নেমে এলো। কিন্তু ঠাণ্ডায় যেন সমস্ত শরীর জমে যাচ্ছে। তবু অনেকদিন পরে মাটিতে পা দেওয়া, তার আনন্দই আলাদা। ভাগ্য ভালো বলতে হবে। কুয়াশা কেটে গিয়ে কিছুটা উজ্জ্বল রোদ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। বরফে পড়ে

সেই রোদ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এস্কিমোদের চামড়ার তাঁবুর কাছাকাছি আসতে এস্কিমোরা বেরিয়ে আসতে লাগলো। খুঁটির ওপর দড়ি বেঁধে ওরা ওদের বলগা হরিণের চামড়ায় তৈরী লোমওলা পোশাকগুলো রোদে শুকোতে দিয়েছে। ফ্রান্সিসরা কাছাকাছি আসতে, কয়েকজন এস্কিমো একটা বড়ো তাঁবুর কাছে গিয়ে কাকে ডাকতে লাগলো। একজন মোটাগোছের লোক সেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো। তার পোশাক অন্যান্য এস্কিমোদের তুলনায় একটু বেশী পরিচ্ছন্ন। তার মুখে কালো চোঙের মতো কী একটা। তামাক খাচ্ছে বোধহয়, মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। বোঝা গেল, এই লোকটাই এস্কিমোদের সর্দার। সর্দার ফ্রান্সিসদের দেখলো, তারপর তাঁবুর মধ্যে ঢুকলো। একটু পরেই হাতে কী নিয়ে বেরিয়ে এলো। সেটা একটা ছুরি আর ছুঁচ। ফ্রান্সিসই সবার আগে ছিল। এস্কিমোদের সর্দার ছুরি আর ছুঁচটা ওর হাতে দিয়ে এস্কিমোদের ভাষায় বলল, 'কুয়অনকা।' কথাটার অর্থ 'তোমাকে ধন্যবাদ'।

ফ্রান্সিস সেটা না বুঝলেও এটা বুঝলো যে, এস্কিমো সর্দার ওদের সঙ্গে বন্ধুত্বই করতে চায়। ফ্রান্সিস বিস্কোকে ডেকে বললো, 'বিস্কো জাহাজে যাও, রঙীন কাপড় যা আছে নিয়ে এসো।'

বিস্কো চলে গেলো। ফ্রান্সিস নরওয়ের ভাষায় বলল, 'আমরা বাট্রাহালিডে যাবো। রাজা এনর সোক্কাসন আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমরা তো এই দেশে এসেছি একজন পথ-প্রদর্শক পেলে খুবই ভালো হয়।'

এস্কিমো-সর্দার এবার ডানহাতের তর্জনী নিজের বুকে ঠেকালো। তারপর বলল, 'কালুটুলা'।

ফ্রান্সিস বুঝলো, ওর নাম কালুটুলা। তারপর ভাঙা-ভাঙা নরওয়ের ভাষায় বলল, 'তোমরা আমাদের বন্ধু হলে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করবো।'

এর মধ্যে বিস্কো রঙীন কাপড় নিয়ে এলো। ফ্রান্সিস সে-সব কালুটুলার হাতে দিল। কালুটুলা খুব খুশী দেখে অন্যান্য এস্কিমোরাও খুশী হলো। বারবার বলতে লাগলো 'কুয়অনকা।'

তারপর বলল, 'এখানকার ঠাণ্ডায় তোমাদের এ পোশাক চলবে না। কয়েকদিন অপেক্ষা করো। তোমাদের চামড়ায় পোশাক তৈরী করে দেবো।'

ফ্রান্সিস বলল, 'আপাততঃ আমাদের দু'টো পোশাক তৈরী করে দিলেই হবে।'

কালুটুলা মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল, ও তাই করবে, বাট্রাহালিডে যেতে হলে কীভাবে যেতে হবে, ওদিকে আবহাওয়া কেমন, এসব নিয়ে কিছু কথাবার্তা হলো। তারপর ফ্রান্সিসরা চলে এলো। এস্কিমো মেয়ে-পুরুষ সকলেই হাত নেড়ে ফ্রান্সিসদের বিদায় জানালো। গ্রীণল্যাণ্ডে এসে এস্কিমোদের কাছে এই সাদর অভ্যর্থনা পেয়ে ফ্রান্সিস খুশীই হলো।

* * *

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিস আর হ্যারি নেমে এলো জাহাজ থেকে। কালুটুলার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলো। জানতে চাইলো পথ-প্রদর্শক পাওয়া গেছে কিনা? কালুটুলা কাকে যেন ডাকতে পাঠালো। একটু পরেই একজন বেশ বলশালী যুবক তাঁবুতে এলো। পরণে এস্কিমোদের মাথা কান-ঢাকা লোমের পোশাক।

কালুটুলা বলল—'এর নাম সাঙখু, ভাল্লুক শিকারে ওস্তাদ।'

সাঙখু দাঁত বের ক'রে হাসল। সে অল্প-অল্প নরওয়ের ভাষা বলতে পারে। বলল- 'আপনারা কবে যাবেন?'

—'দু' তিনদিনের মধ্যেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছতে হবে।'

—'ঠিক আছে।' কালুটুলা বলল— 'আজ রাত্রে আমাদের এখানে নাচের আসর বসবে। আপনারা আসবেন।'

সেই রাতে আকাশটা অনেক পরিষ্কার ছিল। কিছু তারাও আকাশে দেখা যাচ্ছিল। চাঁদও। অল্প চাঁদের আলো পড়েছে বরফঢাকা বন্দর এলাকায়। ফ্রান্সিসরা দল বেঁধে চলল এস্কিমোদের তাঁবুগুলোর উদ্দেশ্যে। দূর থেকেই শুনতে পেল কুকুরদের ডাক। প্রত্যেক এস্কিমো পরিবারই কুকুর পোষে। কুকুর ওদের নানা কাজে লাগে। কুকুর ওদের শ্লেজগাড়ি চালায়, হারপুন দিয়ে শিকার করা, সীল অথবা সিন্ধুঘোটক কুকুরই কামড়ে ধরে নিয়ে আসে। কুকুরগুলোর গায়ে খুব ঘন লোম। তাঁবুর বাইরেই কুকুরগুলো থাকে। তুষার পড়লে, তুষারে একেবারে ঢাকা পড়ে যায়। কী ক'রে তারই মধ্যে ফুটো করে শ্বাস নেয়, ঘুমোয়। ডাকলেই তুষার ঝেড়ে ফেলে উঠে বসে।

ওরা এস্কিমোদের বসতিতে পৌঁছে দেখল—একটা জায়গা ঘিরে সীলমাছের তেলে চুবোনো মশাল জ্বলছে। সেই আলোগুলোর মাঝখানে নাচের জায়গা। দু'জন এস্কিমো দু'টো ড্রাম নিয়ে এলো। সাঙখু আর ওর সঙ্গীরা নাচের জায়গায় দাঁড়াল। ড্রাম বাজনা শুরু হলো। সাঙখু আর ওরা নানান অঙ্গভঙ্গী ক'রে তালে-তালে নাচতে লাগল। সেই তালে-তালে একজন এস্কিমো বিচিত্র সুরে গান গাইলো। আবার কয়েকজন মুখ দিয়ে শব্দও করতে লাগল।

রাত বাড়তে লাগল। গুড়ি-গুড়ি মিহি তুষারকণার বৃষ্টি শুরু হলো। চাঁদ তারা ঢাকা পড়ে গেল। গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিকে। ফ্রান্সিসরা আর বসলো না। ওরা জাহাজে ফিরে এলো।

পরদিন থেকে ফ্রান্সিস আর বসে-বসে সময় কাটাল না। সাঙখুর সঙ্গে এর মধ্যেই ওর বেশ ভাব হ'য়ে গিয়েছিল। ও সাঙখুর কাছে স্লেজগাড়ি চালানো শিখতে চাইল। সাঙখু খুশীই হলো এই প্রস্তাবে। ও ফ্রান্সিসকে নিয়ে একটা স্লেজগাড়ির কাছে এলো। শিস্ দিয়ে কুকুরগুলোকে ডাকল। দু'পাশে ছ'টা-ছ'টা ক'রে বারোটা কুকুরকে পর পর লম্বা লাগামের সঙ্গে জুড়লো। দু'জনে উঠে বসলো স্লেজগাড়িটায়। স্লেজগাড়ির কোন চাকা থাকে না। সব মিলিয়ে গাড়িগুলো লম্বায় প্রায় তের ফুট হয়। চওড়ায় চার ফুট। সাঙখু শিস্ দিয়ে চাবুক চালাল। কুকুরগুলো গাড়ি টেনে নিয়ে ছুটলো বরফের ওপর দিয়ে। ফ্রান্সিস অনুমানে বুঝল, গাড়ির গতি নেহাৎ কম নয়। বল্‌গা হরিণ টানলে এর চেয়ে অনেক বেশী গতি হয়। মাঝে-মাঝেই চাবুক চালাচ্ছে। বরফ ভাঙ্গার একটা ছড়-ছড় শব্দ উঠছে শুধু।

গাড়ি চালাতে-চালাতে সাঙখু বলল—'এই চাবুকই হলো আসল। শুধু একটা কুকুরকে চাবুক মারলে হবে না। সব ক'টা কুকুরকেই একসঙ্গে চাবুক মারতে হবে। আবার চাবুকের শব্দও করতে হবে। চাবুকের চামড়াটা ফিরিয়ে আনতে হবে সাবধানে। অসাবধান হলে লম্বা লাগামে চাবুকের চামড়াটা জড়িয়ে যায়। তখন চালক ছিট্‌কে বরফের মধ্যে পড়ে যায়।'

ফ্রান্সিস বেশ মনোযোগ দিয়ে তার কথাগুলো শুনল। সাঙখু এবার চালকের জায়গাটা

ফ্রান্সিসকে ছেড়ে দিলো। ফ্রান্সিস লাগাম ধরে খুব সাবধানে চাবুক চালাতে লাগলো। কুকুরগুলোর মাথার ওপর চাবুকের শব্দও করতে লাগলো। অত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও ওর চাবুকের চামড়াটা লম্বা লাগামের সঙ্গে জড়িয়ে গেলো। ও প্রায় ছিট্‌কে পড়ে যাচ্ছিল। সাঙখু মুহূর্তে লাগাম শক্ত হাতে টেনে ধরে গাড়ি থামালো। চাবুকের চামড়াটার জট খুলে আবার গাড়ি ছোটালো সাঙখু। আবার ফ্রান্সিস চালকের জায়গায় বসলো। লাগাম ধরে গাড়ি চালিয়ে ওরা ফিরে এলো।

কয়েকদিনের মধ্যেই ফ্রান্সিস স্লেজগাড়ি চালানো শিখে নিলো। ও এবার হ্যারিকে স্লেজগাড়ি চালানো শেখাতে লাগলো। কিন্তু হ্যারির দুই-তিন দিন চেষ্টা করেও সুবিধে হলো না। ও হাল ছেড়ে দিলো।

এবার ফ্রান্সিস সাঙখুর কাছে শিখতে লাগলো, এস্কিমো আর ল্যাপদের যুদ্ধরীতি। ওরা অস্ত্র হিসাবে তীরধনুক, বর্শা আর চওড়া ফলাওলা কুঠার ব্যবহার করে। তীরধনুক, বর্শা তার কাছে নতুন কিছু নয়, কিন্তু কুঠার চালানোটা নতুন। সাঙখু ঐ অঞ্চলের নামকরা ভালুক শিকারী। সে ফ্রান্সিসকে কুঠার চালানো শেখাতে লাগলো। কুঠার তরোয়ালের মত হাল্কা নয়, বেশ ভারী। কুঠার ঘোরাতে, আঘাত করতে বেশ দমের দরকার। প্রথম-প্রথম ফ্রান্সিস অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। পরে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেলো। খুব দ্রুত স্থান পরিবর্তন ও কুঠারের আঘাত হানা এসব শিখে গেলো।

এর মধ্যে এস্কিমো-সর্দার কালুটুলা ফ্রান্সিসদের জন্যে দু'টো এস্কিমোদের পোষাক তৈরী করিয়ে দিলো। সিন্ধুঘোটকের চামড়ায় তৈরী সেই মাথা-ঢাকা পোশাক। মুখের দিকে চারপাশে আর পোশাকের হাঁটুর কাছে বল্গা হরিণের লোম দিয়ে কাজ করা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি পোশাক পরলো, কিন্তু ভীষণ শক্ত-শক্ত লাগলো। তখন কালুটুলা পোষাক দু'টোয় ভালো করে সীলমাছের তেল মাখাতে বললো।

তেল মাখাতে পোশাক দু'টো অনেক নরম হলো।

এবার যাত্রা শুরু করতে হবে। ফ্রান্সিসের বাবা দেড় মাসের মেয়াদ দিয়েছেন। এর মধ্যেই সব সেরে ফিরতে হবে। এসব জায়গায় আকাশে সূর্য বেশীক্ষণ থাকে না। তাই সব সময়ই একটা আবছা আলো থাকে। সূর্য অস্ত গেলেই একেবারে নিকষ অন্ধকার। কাজেই দিন থাকতেই পথ চলতে হবে।

একদিন সকাল থেকে যাত্রার উদ্যোগ চললো। যা-যা দরকার পড়তে পারে, সে সবই তোলা হলো স্লেজ গাড়িটায়—শুকনো সীলমাছ, সিন্ধুঘোটকের মাংস, কাঠ, চকমকি পাথর, সীল মাছের তেল-মাখানো মশাল, কুঠার, বর্শা, তীরধনুক, তরোয়াল, তাঁবু। দু'টো স্লেজগাড়িতে কুকুরগুলো জুড়ে দেওয়া হলো। একটা স্লেজগাড়িতে সাঙখু আর হ্যারি থাকবে। অন্যটায় ফ্রান্সিস একা।

জাহাজ থেকে নেমে ফ্রান্সিস আর হ্যারি গাড়ি দু'টোর কাছে এলো। সব দেখে শুনে নিলো। এবার যাত্রা। সাঙখু, হ্যারি ফ্রান্সিস সবাই গাড়িতে উঠে বসলো। এস্কিমো সর্দার কালুটুলা আর কিছু এস্কিমো এসে দাঁড়ালো। তখন সকাল, সূর্যের ম্লান আলো পড়েছে দিগন্তব্যাপী বরফ-ঢাকা প্রান্তরে। ফ্রান্সিসদের বন্ধুরা জাহাজ থেকে হাত নেড়ে ওদের বিদায় জানালো। গাড়ি দু'টো ছুটলো তুষার প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে। স্লেজগাড়ির চাপে বরফ ভাঙার খস্‌খস্‌ শব্দ শুধু। মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক। প্রথমে ওরা যাবে কোর্টল্ডে। সেখানে কিছু এস্কিমোদের বসতি আছে। সেখান থেকে রাজধানী বাট্টাহালিডে।

গাড়ি দু'টো চললো। চারদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। দুপুর নাগাদ একটা জায়গায় থামলো ওরা। খাবার খেলো, বিশ্রাম করলো, তারপর আবার যাত্রা করলো।

সূর্য অস্ত গেল, অন্ধকার নেমে এলো। তার মধ্যে দিয়েই গাড়ি দু'টো ছুটলো। রাত্রে আর এক জায়গায় বিশ্রাম নিলো। চকমকি ঠুকে মশাল জ্বালিয়ে কাঠ দিয়ে উনুন জ্বালাল। শুকনো মাংস রান্না করে খেলো। তারপর সেই তুষার প্রান্তরে তাঁবু খাটালো। রাতটা কাটালো তাঁবুতে। বাইরের উনুনের আগুন নেভালো না, সারারাত জ্বললো ওটা। আগুনে ওরা হাত-পা সেঁকে নিলো। সাঙখু বললো, 'আগুন থাকলে শ্বেতভল্লুক, হিংস্র নেকড়ে এসব ধারে-কাছে ঘেঁষবে না।'

পরদিন তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হলো। আবহাওয়া বেশ ভালই থাকলো, তিনদিন নির্বিঘ্নেই কাটলো। কিন্তু তার পরদিনই আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা গেল। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেলো, হু-হু উত্তুরে হাওয়া ছুটলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো তুষার-ঝড়ের তাণ্ডব। তবে ঝড় বেশীক্ষণ রইলো না, পরেই তুষার-ঝড় বন্ধ হলো। ওরা তাঁবু খাটিয়ে রাতের মতো বিশ্রাম নিলো।

পরদিন তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হলো। তখন দুপুরের কাছাকাছি সময়। একটা বরফের টিলামত পড়ল। সেটা ঘুরতেই একটা শ্বেত-ভালুকের মুখোমুখি পড়ে গেল ওরা। কুকুরগুলো দাঁড়িয়ে পড়লো, ঘেউ-ঘেউ করে ডাকতে লাগল। শ্বেত-ভালুকটা সামনের দু'পা তুলে আক্রমণের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়লো। ফ্রান্সিসের গাড়িটাই সামনে ছিল। সে গাড়ির গায়ে বেঁধে-রাখা কুঠারটা নিয়ে এক লাফে নেমে দাঁড়ালো বরফের ওপর। টিলাটার কাছ থেকে সরে দাঁড়ালো, যাতে আক্রান্ত হলে পিছিয়ে আসতে পারে। সাঙখুও কুঠার হাতে নেমে এলো। কুকুরগুলো সমানে ডেকে চলেছে।

বিরাট চেহারার ভালুকটা দু'পা তুলে গলায় গর্-গর্ শব্দ করতে-করতে দুলে দুলে ছুটে আসতে লাগলো। হাতের ধারালো নখগুলো বেরিয়ে আছে। মুখ হাঁ করা চক্‌চকে ধারালো দাঁত বেরিয়ে আছে। সাঙখু লাগামের দড়ি থেকে কুকুরগুলোকে খুলে দিতে লাগলো। ছাড়া পেতেই কুকুরগুলো একে-একে ভালুকটার চারপাশে জড়ো হতে লাগলো আর প্রাণপণে ঘেউ-ঘেউ করতে লাগলো। আর একপাশ থেকে ফ্রান্সিসও এগিয়ে আসতে লাগলো। সাঙখু কুঠারটা এদিক ওদিক ঘোরাতে লাগলো, আর ঘা-মারবার সুযোগ খুঁজতে লাগলো।

এক সময় ভালুকটা সাঙখুর দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই ফ্রান্সিস ভালুকটার পেছনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারপর বিদ্যুৎগতিতে কুঠারের কোপ বসালো ভালুকটার পিঠে। ভালুকটা ঘা খেয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে। সাঙখুর হাতে প্রচণ্ড থাবা মারল। সাঙখুর হাত থেকে কুঠার ছিটকে পড়ে গেল, ও বরফের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে গেল। ওদিকে ভালুকের পিঠ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। আহত পশুটা ভয়ংকর হয়ে উঠলো। গোঁ-গোঁ শব্দ করতে-করতে ওটা সাঙখুর দিকে ছুটলো।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে ডাকল, 'সাঙখু, এই নাও।' বলে ও কুঠারটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল। সে শোয়া অবস্থাতেই কুঠারটা বরফ থেকে তুলে নিল। তারপর এক ঝট্‌কায় উঠে দাঁড়ালো। তখন ভালুকটার সঙ্গে ওর দূরত্ব দু'হাতও নয়। ভালুকটা থাবা মারার জন্য সামনের থাবাটা বাড়ালো। সে আর এক মুহূর্তও দেরী করল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে

প্রচণ্ড জোর কুঠার চালালো ভালুকটার মাথা লক্ষ্য করে। দু'চোখের ওপরে কপালে লাগলো ঘা'টা, মাথাটা দু'ফাঁক হয়ে গেল। প্রচণ্ড গর্জন করে ভালুকটা বরফের ওপর ধপাস্ করে পড়ে গেল। বার কয়েক নড়ে স্থির হয়ে গেল। বরফের ওপর রক্তের ধারা বইলো। সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বরফের ওপর বসে পড়লো।

ফ্রান্সিস ছুটে এলো, দেখলো সাঙখুর ডান হাত থেকে রক্ত পড়ছে। ভালুকটার থাবার নখের আঁচড় লেগেছে। ফ্রান্সিস কাটা জায়গাগুলোতে বরফ ঘষতে লাগলো। একটু পরেই রক্ত পড়া বন্ধ হলো। সে এবার উঠে কোমরে ঝোলানো ছুরিটা বের করলো। তারপর মৃত ভালুকটার কাছে গেলো। নিপুণ হাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে শ্লেজগাড়িতে রাখলো। ফ্রান্সিসও গাড়িতে উঠলো, কুকুরগুলোকে আবার লাগামের সঙ্গে বাঁধা হলো।

আবহাওয়া বেশ ভালই চললো ক'দিন। তিনদিন নির্বিঘ্নেই কাটলো। কিন্তু তার পরদিনই আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা গেল। হঠাৎ সব আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেল। হু-হু করে উত্তুরে হাওয়া গর্জন করে ছুটলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো তুষার-ঝড়ের তাণ্ডব। সে-কী হাওয়ার প্রচণ্ডতা, যেন শ্লেজগাড়িটা উল্টে ফেলবে। সেইসঙ্গে ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে বরফকুচির প্রচণ্ড ঝাপটা।

দু'চোখ কুঁচকে দৃষ্টি রেখে, ফ্রান্সিস গাড়ি চালাতে লাগলো। সেই প্রচণ্ড ঝড়ের বেগের মধ্যে গাড়ি চলতে লাগলো শামুকের গতিতে। ফ্রান্সিস কয়েক হাত দূরেও দেখতে পাচ্ছিল না। ঘন কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা, সেইসঙ্গে বরফকুচির ঝাপটা। হঠাৎ একসময় পাশে তাকালো। আব্‌ছা অন্ধকারে হ্যারিদের গাড়িটা দেখতে পেল না। ভাবলো ঝড়টা থামুক, তখন খোঁজ করা যাবে।

প্রায় আধঘণ্টা ঝড়ের এই তাণ্ডব চললো। তারপর আস্তে-আস্তে ঝড়ের গর্জন বন্ধ হলো। বরফকুচির ঝাপটা থেমে গেলো। আস্তে-আস্তে চারদিকে ঘন কুয়াশার আবরণ পাতলা হ'তে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো ফুটলো। দিগন্তের দিকে অনুজ্জ্বল সূর্যটাকে দেখা গেলো। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে লাগলো। কিন্তু হ্যারিদের গাড়ি কোনদিকে দেখতে পেল না। যতদূর চোখ যায়, শুধু বরফের শুভ্র প্রান্তর। হ্যারিদের গাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। ফ্রান্সিসের একটু দুশ্চিন্তা হলো। একেবারে একা পড়ে গেলো অপরিচিত জায়গায়। সঙ্গে সাঙখু নেই। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে কে? তবু একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলো, যে হ্যারি সাঙখুর সঙ্গে আছে। ফ্রান্সিস সূর্যের দিকে তাকালো। উত্তর দিকটা ঠিক ক'রে নিলো। তারপর গাড়ির মুখ একটু ঘুরিয়ে সোজা উত্তর দিকে লক্ষ্য করে গাড়ি চালাতে লাগলো। কোর্টল্ড সোজা উত্তর দিকে।

সূর্য অস্ত যেতেই চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলো। ফ্রান্সিস মাথার ওপর অস্পষ্ট ধ্রুবতারার দিকে দেখলো। ঠিক উত্তরে যাচ্ছে ও। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিকের অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে উঠলো। ফ্রান্সিস মাথার ওপর অস্পষ্ট ধ্রুবতারার দিকে দেখলো। ফ্রান্সিস রাত্রির মত বিশ্রামের জায়গা খুঁজে নিল। তাঁবু খাটাল। মশাল জ্বেলে আগুন জ্বালাল। সিন্ধুঘোটকের শুকনো মাংস রাঁধলো। কুকুরগুলোকে খেতে দিলো। তারপর নিজে খেয়ে শুয়ে পড়লো। চারদিকে অসীম নিঃশব্দ। একটু পরেই চাঁদ উঠলো। একটা নরম মৃদু আলো ছড়ানো চারদিকে। ফ্রান্সিসের অনেক চিন্তা এখন। গাড়িতে খুব বেশিদিনের রসদ নেই। রসদ ফুরোবার আগেই হ্যারিদের গাড়ির খোঁজ পেতে হবে, নয়তো কোর্টল্ড

পৌঁছতে হবে। এ-সব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

ভোরবেলা উঠে তাঁবু গুটিয়ে নিলো। কুকুরগুলোকে লম্বা লাগামে বাঁধলো। তারপর গাড়ি ছোটালো। দিগন্তের ওপরে সূর্যকে লক্ষ্য রেখে দিক ঠিক ক'রে নিলো।

এইভাবে তিনদিন কেটে গেল। কিন্তু হ্যারিদের গাড়ির হদিশ পাওয়া গেল না। কোর্টল্ড পৌঁছানো হল না। ফ্রান্সিস এবার মজুত খাদ্য দেখতে গিয়ে দেখল, আর একদিনের মত খাদ্য আছে। খুব দুশ্চিন্তায় প'ড়ে গেল ফ্রান্সিস। সমুদ্রতীরে পৌঁছতে পারলে সীলমাছ, সিন্ধুঘোটক শিকার ক'রে দিন কাটানো যেত। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ বরফের প্রান্তরে খাদ্য জুটবে কোত্থেকে?

সেদিনটা ও উপোস ক'রে রইলো। কিন্তু কুকুরগুলোকে খেতে দিলো। গাড়ি চালু রাখতেই হবে। এখন এই গাড়িই একমাত্র ভরসা।

দু'দিন কাটলো। খাদ্য শেষ। ক্ষুধার্ত কুকুরগুলো কত জোরে আর গাড়ি টানবে? গাড়ির গতিও কমে গেলো। দু'দিনের উপবাসী ফ্রান্সিস কোনরকমে লাগাম ধ'রে নিয়ে বসে রইল। গাড়ি চললো ঢিমেতালে।

সেদিন একটা বরফের চাঙরার পাশটা ঘুরতেই চোখের পলকে একটা নেকড়ে বাঘ কুকুরগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কুকুরগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে ঘেউ-ঘেউ করে ডাকতে লাগলো। ততক্ষণে নেকড়েটা একটা কুকুরের ঘাড় কামড়ে ধরে নিয়ে পালিয়ে গেল। ফ্রান্সিস ধনুক হাতে নেবারও অবসর পেলন। ও নেমে গাড়ি থেকে একটা কুকুরকে খুলে নিয়ে গাড়ির পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলো। বিজোড় হ'লে গাড়ি টানায় অসুবিধে হ'বে।

রাত্রে তাঁবু খাটালো। খাদ্য তো শেষ। নিজেও খেল না। কুকুরগুলোকেও কিছু খেতে দিতে পারলো না। ঘুমুবে তারও উপায় নেই। প্রতিমুহূর্তেই আশঙ্কা করছে সেই নেকড়েটা এসে না হাজির হয়। একবার খাদ্যের সন্ধান পেয়েছে। ওটা আবার ঠিক আসবে। অন্য নেকড়ে বাঘ শেয়াল আসতে পারে। সারারাত ঘুমুতে পারলো না। মাঝে-মাঝে তন্দ্রা এসেছে। পরক্ষণেই তন্দ্রা ভেঙ্গে গেছে। নড়েচড়ে ব'সে তাঁবুর বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। হাতে তীর-ধনুক। তাঁবুর বাইরে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে সারারাত।

পরদিন আবার গাড়ি চললো। অনাহারে শরীর দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। কুকুরগুলোর অবস্থাও তাই। ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে আসছে ফ্রান্সিসের। কিন্তু অনেক কষ্টে চোখ খুলে রেখেছে। হঠাৎ কুকুরগুলো ডেকে উঠলো। ও সজাগ হলো। তীর-ধনুক শক্ত হাতে ধরলো। ভালো ক'রে তাকাতে নজরে পড়লো কী-যেন একটা বরফের ওপর দিয়ে আসছে। ঠিক যা ভেবেছে তাই। একটা ছাই-রঙা নেকড়ে বাঘ। ওটা সেই বাঘটাই। কারণ একটা কুকুর শিকার ক'রে ওটার সাহস বেড়ে গেছে। গুটি-গুটি মেরে নেকড়ে বাঘটা এগিয়ে আসছে। সে গাড়ি থামাল তারপর বাঘটার দিকে নিশানা ক'রে তীর ছুঁড়ল। দুর্বল হাতের ছোঁড়া তীর। নেকড়েটার পাশে বরফে গেঁথে গেল। নেকড়েটা একটু পেছনে সরে গেলো। তারপর আবার আসতে লাগলো। এবার ফ্রান্সিস মনে জোর আনল। নেকড়েটাকে না মারতে পারলেও ওটাকে আহত করতেই হবে। নইলে সবকটা কুকুরও শিকার করবে। তখন এই বরফের প্রান্তরে মৃত্যু অনিবার্য। এবার নিশানা ঠিক ক'রে

সে তীর ছুঁড়ল। তীরটা এবার নেকড়েটার পেটের মধ্যে লাগলো। নেকড়েটা শূন্যে লাফিয়ে উঠলো। সঙ্গে-সঙ্গে সে আর একটা তীর ছুঁড়ল। তীরটা লাগলো কিনা ও বুঝতে পারলো না। কিন্তু নেকড়েটা একটা গোঁ-গোঁ শব্দ তুলে পালালো। এই ক্ষণিক উত্তেজনার পর শরীরে আবার ক্লান্তি নামলো। অবসাদে ফ্রান্সিস পা ছড়িয়ে প্রায় শুয়ে পড়ল। শক্ত হাতে লাগাম ধ'রে রাখতে পারছে না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে আসছে। কখন সন্ধ্যে হয়েছে, রাত্রি নেমে এসেছে—তার খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা তীব্র আলো চোখে লাগতে ও চোখ মেললো। দেখল পরিষ্কার আকাশে দিগন্তের ওপর মধ্যরাত্রির সূর্য জ্বলছে। বিচিত্র বর্ণের আলোর বন্যা নেমেছে চারদিকে।

সে এক অপার্থিব অপরূপ দৃশ্য। দিগন্ত বিস্তৃত বরফের মধ্য থেকে কত রকমের কত বর্ণের আলো বিচ্ছুরিত হ'তে লাগলো। দামী চুনী পান্নার পাথরের মতো মনে হ'তে লাগলো বরফের টুকরোগুলোকে। কোথাও তুষারকে মনে হ'তে লাগলো গলিত সোনার স্রোত। খুব উজ্জ্বল আর বর্ণাঢ্য হ'য়ে উঠলো চারদিক। আলো আর রঙের খেলা চললো কিছুক্ষণ। হঠাৎ সব আলো রং মুছে গেলো। মেঘের মত ঘন কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা পড়ল মধ্যরাত্রির সূর্য। আবার অন্ধকার নেমে এল। ফ্রান্সিস ক্লান্তিতে চোখ বুঁজলো। গাড়ি চলল টিকিয়ে-টিকিয়ে। কতক্ষণ ও এই পথে অসাড়ের মত পড়েছিল জানে না।

হঠাৎ অনেক দূর থেকে অস্পষ্ট কুকুরের ডাক শুনতে পেল। ওর গাড়ির কুকুরও একটা ডেকে উঠলো। অবসাদগ্রস্ত শরীরটা একটু টেনে তুলে দূরে তাকাল। অন্ধকার কিছুই দেখতে পেল না। আবার কুকুরের ডাক। এবার অনেকটা স্পষ্ট। কুকুরের ডাক যেদিক থেকে আসছে, সেইদিকে গাড়ির মুখ ঘোরালো। টাল সামলাতে গিয়ে হঠাৎ ওর মাথাটা ঘুরে উঠলো। সে অজ্ঞানের মত হ'য়ে গেলো। হাতের লাগাম খুলে গেলো। ও গাড়িতে বসার আসন থেকে গড়িয়ে পড়ল বরফের ওপর। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বোধটাই আর শরীরে সইলো না।

★ ★ ★

ফ্রান্সিস যখন চোখ খুললো, তখন দেখলো একটা তাঁবুর নীচে পশুলোমের বিছানায় ও শুয়ে আছে। শরীরের অসাড় ভাবটা কমেছে। তাঁবুটা বেশ বড়। সীলমাছের তেলের দীপ জ্বলছে। এস্কিমোদের মত পোশাক-পরা একটা লোক উনুনের ধারে বসে আছে। লোকটা একটা ছোট চামড়ার ব্যাগের মত নিয়ে এল। ফ্রান্সিস তাকিয়ে আছে। লোকটা হাসল। তারপর এস্কিমোদের ভাষায় কি বললো। ফ্রান্সিস শুধু 'গরম' এই কথাটা বুঝল। বুঝল, যে ব্যাগটায় গরম জল ভরা আছে। ও হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিল। তারপর উঠে ব'সে হাতে-পায়ে সেঁক দিতে লাগলো। আস্তে-আস্তে শরীরের অসাড় ভাবটা একেবারেই কেটে গেলো। লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিসকে সুস্থ হ'তে দেখে ও খুব খুশী হ'ল। হাতের ভঙ্গী করে বললো, ফ্রান্সিস কিছু খাবে কিনা। ফ্রান্সিস মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো। লোকটা আগুনের ধারে গেলো। থালায় করে গরম-গরম রুটি আর বল্গা হরিণের মাংস নিয়ে এলো। সে আস্তে-আস্তে খেতে লাগলো। উপোসী পেট মুচড়ে ওঠে। তবু খেতে হবে। সুস্থ থাকতে হবে। ও খেতে লাগলো।

খেতে গিয়ে এবার ঠোঁট দুটো জ্বালা করে উঠলো। আঙ্গুল বোলালো ঠোঁট দুটোয়। ঠাণ্ডায় ফেটে গেছে। আঙ্গুলে রক্তের ছোপ লাগলো। ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরিয়েছে। কিছুই

মুখে তুলতে পারছে না। ফ্রান্সিস ইসারায় লোকটাকে কাছে ডাকলো। লোকটা কাছে এলো আঙ্গুল দিয়ে ঠোঁট দুটো দেখলো। লোকটা হাসলো। চলে গেলো তাঁবুটার কোণার দিকে। আঙ্গুলের ডগায় মাখনের মত হলদেটে কি একটা জিনিস নিয়ে এলো। ফ্রান্সিসের ঠোঁটে আস্তে-আস্তে লাগিয়ে দিল। জ্বালাভাবটা একটু কমলো। সে আবার খেতে লাগলো। ও খাচ্ছে, তখনই কয়েকজন তাঁবুতে ঢুকলো। সবারই পরণে এস্কিমোদের মতো পোশাক। তাদের মধ্যে একজনের চেহারা দশাসই। তার কোমরে রূপোর বেল্ট মত। মাথা-ঘাড় ঢাকা টুপীটা মেরুশেয়ালের চামড়ার। লেজটা পেছনদিকে ঝুলছে। পরণের পোশাকও অন্যদের চেয়ে পরিষ্কার। ফ্রান্সিস বুঝল এই লোকটা এদের সর্দার। সর্দার এগিয়ে এসে এস্কিমোদের ভাষায় কি জিজ্ঞেস করলো। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে না-বোঝার ভঙ্গী করলো। তখন সর্দারটি ভাঙা-ভাঙা নরওয়ের ভাষায় বলল, 'এখন কেমন আছেন?'

ফ্রান্সিস বললো, 'ভালো আছি। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।'

সর্দার হেসে বললো, 'আর ঘণ্টাখানেক দেরি হলে আপনি ঠাণ্ডায় জমে যেতেন। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন।'

—'কি হয়েছিল বলুন তো?'

—আপনার শ্লেজগাড়ির কুকুরের ডাক আমরা শুনেছিলাম। কি ব্যাপার দেখতে যাবো, তখনই দেখি আপনার শ্লেজগাড়িটা কুকুরগুলো অনেক কষ্টে টেনে আনছে। কাছে আসতে এবার দেখলাম, চালকের আসনটা শূন্য। বুঝলাম, চালকটি বরফের মধ্যে কোথাও পড়ে গেছে। আমরা মশাল জ্বেলে নিয়ে শ্লেজগাড়ি নিয়ে ছুটলাম। আপনার গাড়িটার চলার দাগ তখনও বরফের ওপর রয়েছে। ভাগ্যি ভালো তখন তুষারবৃষ্টি হয়নি। তুষারবৃষ্টি হলে ঐ দাগ ঢাকা পড়ে যেত। আমরা দাগ ধরে - ধরে কিছুদূর যেতেই দেখলাম, আপনি বরফের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। ধরাধরি করে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর সেই লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'ওর নাম নুয়ালিক। ওর শুশ্রূষাতেই আপনি সুস্থ হয়েছেন।'

ফ্রান্সিস হেসে নুয়ালিকের দিকে তাকাল। দেখুন, নুয়ালিকও হাসছে। ও হাত বাড়িয়ে নুয়ালিকের একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিয়ে এস্কিমোদের ভাষায় বলল, 'কুয়অনকা।'

নুয়ালিক কথাটা শুনে আরো খুশী হয়ে হাতটা ঝাঁকাতে লাগলো।

এবার সর্দার জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?'

সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়লো হ্যারি আর মাঙ্গুর কথা। ও এতক্ষণ নিজের কথাই ভাবছিল। ফ্রান্সিস বললো, 'কোর্টল্ডের উদ্দেশ্যে আমি আমার বন্ধু আর একজন এস্কিমো বেরিয়েছিলাম।

—'এই জায়গাই কোর্টল্ড। তবে আপনি বোধহয় অনেক ঘুরে-ঘুরে এসেছেন?'

—'বলতে পারেন, আমার বন্ধু এসে পৌঁছেছে কিনা? প্রচণ্ড তুষার-ঝড়ে আমি ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম।'

—'আমি তো ঠিক বলতে পারছি না' সর্দার বললো, 'আপনি ভাববেন না। বিশ্রাম করুন, আমি খবরের জন্যে লোক পাঠাচ্ছি। কিন্তু আপনারা এখানে কার কাছে আসছিলেন?'

—'এখান থেকে আমরা বাট্টাহালিড যাবো। আমরা ভাইকিং। রাজা এনর সোক্কাসনের

আমন্ত্রণে আমার এখানে এসেছি।'

—'তাই বলুন। আপনারা আমাদের রাজার অতিথি।'

এস্কিমো-সর্দার খুব খুশী। হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরলো। বললো, 'কিছু ভাববেন না। আপনার বন্ধুর খোঁজ করছি। কয়েকদিন বিশ্রাম করুন। বাট্টাহালিড্ যাবার ব্যবস্থা করে দেব।' বলে সর্দার সঙ্গের লোকদের কি নির্দেশ দিল, তারপর সবাইকে নিয়ে চলে গেল।

বেশী খেতে পারলো না ফ্রান্সিস। ঠোঁটের জ্বালা-জ্বালা ভাবটা কমলেও খিদেটা যেন একেবারেই মরে গেছে। তবু কিছু খাবার পেটে গেল বলেই শরীটায় যেন একটু সাড় এল। এবার ঘুমুতে পারলে অনেকটা ক্লান্তি কাটবে। সে পাশ ফিরে শুলো। কিন্তু তখনই তাঁবুর বাইরে হ্যারি ডাকছে শুনলো, 'ফ্রান্সিস - ফ্রান্সিস।'

—'ওঃ হ্যারি।'

হ্যারি ততক্ষণে তাঁবুতে ঢুকে ফ্রান্সিসের বিছানার দিকে ছুটে এসেছে। হ্যারি আর তাকে উঠে বসার সুযোগ দিলো না। শোয়া অবস্থাতেই ওকে জড়িয়ে ধরলো। ধরে রইল কিছুক্ষণ। ফ্রান্সিসই জোর করে ছাড়ালো নিজেকে। দেখলো হ্যারির চোখে জল। সে হাসলো, 'এই - কী ছেলেমানুষি হচ্ছে?'

সাঙখু তাঁবুর ভেতর ঢুকে দুই বন্ধুর কাণ্ড দেখে হতবাক। নুয়ালিক আগুনের ধারে বসেছিল। সাঙখু গিয়ে ওখানে বসলো। কথাবার্তা বলতে লাগলো।

হ্যারি বিছানার পাশে বসলো। বললো, 'তুষার-ঝড় কেটে যাবার পর দু'দিন আমরা তোমাকে খুঁজে বেরিয়েছি। তুষার-ঝড়ে তোমার গাড়ির চলার দাগ মুছে গিয়েছিলো। তাই তোমার গাড়ির চলার পথের কোন হদিশ পাইনি। তবু খুঁজেছি। এদিকে দেখি খাদ্য ফুরিয়ে আসছে। কুকুরগুলোও দিন-রাত ছুটে ছুটে ক্লান্ত। স্থির করলাম, কোর্টল্ডে চলে আসি। হয়তো তুমি এর মধ্যে কোর্টল্ডে চলে এসেছো। এখানে এসে তোমাকে পেলাম না। য়ুরোপের লোকেরা তো এখানে বেশী আসে না, তুমি এলে সঙ্গে সঙ্গেই খবর পেতাম।'

একটু থামলো হ্যারি। তারপর বলতে লাগলো, 'দু'দিন হলো এখানে এসেছি। প্রতিদিন সকালে-বিকেলে বেরিয়েছি তোমার খোঁজে। যদি তোমার কোন হদিশ পাই। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হল। তারপর এই মাত্র একজন লোক গিয়ে তোমার এখানে আসার সংবাদ দিলো। শুনেই ছুটে আসছি।

হ্যারি একনাগাড়ে কথা বলে যেন হাঁপিয়ে উঠলো। ফ্রান্সিস হাসলো। তারপর ওর পথে কি ঘটেছে সবই বললো। তারপর বললো, 'মধ্যরাত্রির সূর্য দেখেছো কী? অপরূপ সেই দৃশ্য।'

—'না'।হ্যারি বললো, 'বোধহয় মেঘ-কুয়াশার জন্যে আমরা দেখতে পাইনি।' তারপর বললো, 'তুমি এখন ঘুমোও, রাত হয়েছে। কালকে তোমাকে আমাদের আস্তানায় নিয়ে যাবো।'

* * *

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে ফ্রান্সিস তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখলো আচমকা উজ্জ্বল রোদ। ওর নিজের শরীরটাও বেশ ঝরঝরে লাগছে। ক্লান্তি অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। নুয়ালিক এসে খাবার দিয়ে গেলো। তখনই হ্যারি আর সাঙখু এলো। হ্যারি বললো, 'এখন শরীর

কেমন?'

—'অনেকটা ভালো।'

—'আমাদের আস্তানায় যেতে পারবে তো?'

—'পারবো। কিন্তু সর্দার কখন আসবে?'

—'এটাই তো সর্দারের তাঁবু। আসবেন এক্ষুণি।'

ফ্রান্সিস বেরোবার জন্যে তৈরি হতে-হতে সর্দার এলো। ফ্রান্সিস বললে, 'আমার বন্ধু এসে গেছে। আমি ওদের সঙ্গে যাচ্ছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি আর নুয়ালিক আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।'

সর্দার কিছু বললো না, হাত বাড়ালো শুধু। ফ্রান্সিস ওর সঙ্গে হাত মেলালো। তারপর হ্যারি আর সাঙখুর সঙ্গে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো।

বাইরের আলো অন্যদিনের চেয়ে একটু উজ্জ্বল। ফ্রান্সিস বেশ খুশী মনে পথ চলতে লাগলো। একসময় ও হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার স্লেজগাড়িটা?'

—'ওটা আমি কাল রাতেই নিয়ে গেছি। কুকুরগুলো তো আমারই পোষা কুকুর' - সাঙখু বললো।

* * *

ছোট্ট জায়গা 'কোর্টল্ড'। বেশীর ভাগই তাঁবু, তবে বড়-বড় তাঁবুও আছে। পাথরের বাড়িও আছে দেয়ালগুলো বেশ মোটা। সড আর পাথর দিয়েই বাড়িগুলো তৈরি। এমনি একটা সড আর পাথরে তৈরী বাড়িতে হ্যারিরা আস্তানা নিয়েছে। ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস দেখলো, বেশ ভারী-ভারী পাথরের ঘরটা, ভেতরটা বেশ গরম। স্লেজগাড়ি থেকে জিনিসপত্র আগেই নামানো হয়েছিল। সিন্ধুঘোটকের চামড়া, সীলমাছের চামড়া, এসব দিয়ে সাঙখু ফ্রান্সিসের জন্য একটা বিছানা করে দিল। ফ্রান্সিস তাতে আধশোয়া হয়ে শুয়ে পড়লো। শরীরের দুর্বলতা এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি।

বিকেলের দিকে ফ্রান্সিস স্লেজগাড়িটা নিয়ে বেরলো। কাছাকাছি ঘুরে ফিরে দেখলো। এমনি বিশ্রাম নিতে গিয়ে তিনদিন কেটে গেল। এর মধ্যে এস্কিমোদের সর্দার দু'দিন এসেছিল। কয়েকটা এডার পাখি দিয়ে গিয়েছিল খাবার জন্য।

ফ্রান্সিস সেদিন বললো, 'হ্যারি আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আর দেরী করা ঠিক হবে না। বাবা দেড়মাসের মধ্যে কাজ সেরে ফিরতে বলেছেন। আর সময় নষ্ট নয়, চলো কালকেই বাট্টাহালিড রওনা দিই।'

—'বেশ! তুমি সুস্থবোধ করলে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে সাঙখু সঙ্গে থাকলে ভালো।'

—'দরকার নেই। দু'জনে একা গাড়ি নিয়ে যাবো।'

—'বেশ চলো, তাই যাওয়া যাবে।'

সাঙখু রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করছিল। ফ্রান্সিস তাকে কাছে ডাকল। ও কাছে আসতে ফ্রান্সিস কোমরবন্ধনী থেকে দুটো মোহর বের করে ওর হাতে দিল। সাঙখু খুব খুশী হয়ে দাঁত বের করে হাসল। ফ্রান্সিস বললো, 'সাঙখু কাল সকালেই আমরা বাট্টাহালিড রওনা হচ্ছি। তুমি আঙ্গামাগাসালিকে ফিরে যাও'।

সাঙখুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ওর বোধহয় ইচ্ছা ছিল, ফ্রান্সিসদের সঙ্গে বাট্টাহালিডে যাবার। ফ্রান্সিস পরদিন সব মালপত্র বাঁধা-ছাদা করে স্লেজগাড়িতে রাখল।

শুকনো সীলমাছ, সিন্ধুঘোটকের মাংস এসব নিল। খাবার-দাবার একটু বেশীই নিল। সাঙখু সঙ্গে থাকবে না, পথ হারালে যাতে বিপদে পড়তে না হয়।

সূর্য দেখে উত্তর দিকটা ঠিক করে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। একবার পেছন ফিরে দেখলো, সাঙখু ম্লানমুখে পাথরের ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আগের দিন এস্কিমো-সর্দারের সঙ্গে কথা হয়েছিল। সে বলেছিল, এখান থেকে সোজা উত্তরে বাট্টাহালিড। পথে তুষার-ঝড়ের পাল্লায় না পড়লে চার-পাঁচদিন লাগবে। সেই অনুযায়ী ফ্রান্সিস সোজা উত্তর দিকে গাড়ি চালাতে লাগল। বরফের প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে শ্লেজগাড়ি বেশ দ্রুত গতিতেই ছুটলো।

সেই প্রান্তর দিয়ে যেতে-যেতে মাঝে-মধ্যেই গলা-বরফের জায়গায় পড়তে লাগলো। গলা বরফের মধ্যে কুকুরগুলো পড়ে যেতে লাগল। ফ্রান্সিসরা নেমে গাড়িটাকে টেনে পিছিয়ে আনতে লাগলো, তারপর শক্ত বরফ-এলাকা দিয়ে সাবধানে গাড়ি চালাতে লাগলো। তবু গাড়ি গলা বরফের মধ্যে পড়তে লাগলো। ফ্রান্সিস এবার বুদ্ধি করে সন্দেহ হলেই গাড়ি থামিয়ে ফেলছিল। বরফের টুকরো তুলে ছুঁড়ছিল প্রান্তরের দিকে। বরফের টুকরোটা ডুবে গেলেই বুঝছিল গলা বরফ। পাশ কাটিয়ে শক্ত বরফের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল।

সারাদিন গাড়ি চালিয়ে সন্ধ্যেবেলা একটা জায়গা বেছে নিয়ে তাঁবু খাটালো। এস্কিমোদের মতো চকমকি পাথরে ইস্পাতের টুকরো ঠুকে আগুন জ্বালাল। সীলমাছের তেলের আলোয় তাঁবু গরম রাখা ও রান্না দুটোই চালাতে লাগলো। রাত কাটিয়ে পরদিন আবার পথ চলা।

যেদিন চাঁদ-তারার আলো স্পষ্ট থাকে, মেঘ-কুয়াশা কম থাকে, সেদিন রাত্রেও গাড়ি চালাতে লাগলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাট্টাহালিড পৌঁছতে হবে। মাঝে-মাঝে শক্ত-শক্ত বরফের বড়-বড় টুকরো ছড়ানো প্রান্তর পড়তে লাগলো। বরফের ধাক্কা বাঁচিয়ে কুকুরগুলো যাতে চোট না খায়, এইসব দেখে-শুনে চালাতে গিয়ে গাড়ি চলতে লাগলো ধীরগতিতে। ও-রকম এলাকা তিন-চার জায়গায় পড়ল।

এর মধ্যেই একদিন ফ্রান্সিসরা দেখলো অরোরা বোরেয়ালিস বা 'মেরুজ্যোতি'। উত্তর-মেরুর চৌম্বকক্ষেত্র থেকে এই বিচিত্র আলোর উৎপত্তি। উত্তর দিগন্তের ওপরে আকাশটায় যেন লক্ষ-লক্ষ আতসবাজি জ্বলে উঠলো। বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল আলোর মালা। চোখ ধাঁধানো আলো নয়, নরম জ্যোৎস্নার মত আলো। বিচিত্র সেই আলোর খেলা—এ-এক অভিজ্ঞতা।

পথে কখনও কখনও কয়েকটি এস্কিমো পরিবারের একত্র বসতি এলাকা দেখতে পেলো। এস্কিমোদের সীলমাছের চামড়ার তৈরী তাঁবুকে বলে 'টুপিক'। এসব টুপিকেও আশ্রয় জুটল মাঝে-মাঝে। এভাবে চলে-চলে পাঁচদিনের মাথায় ওরা বাট্টাহালিড পৌঁছলো।

* * *

বাট্টাহালিড নামেই রাজধানী। এমন কিছু বড় শহর-টহর নয়। তবে কোর্টল্ডের চেয়ে বেশ বড়। অনেকটা এলাকা জুড়ে মাটি আর পাথরের তৈরী বাড়ি-ঘর। এখানে শুধু এস্কিমোরাই থাকে না, য়ুরোপীয় শ্বেতাঙ্গরাও অনেক আছে। আবার চারদিকে এস্কিমোদের টুপিকও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

তখন সকাল। পাথরের বাড়িঘর থেকে, টুপিক থেকে অনেকেই ঔৎসুক্যের সঙ্গে ফ্রান্সিসদের দেখলো। রাজবাড়ি সহজেই পাওয়া গেল। পাথর, মাটি আর সড দিয়ে তৈরী রাজবাড়িটা বেশ বড়।এখানে য়ুরোপীয়রাও এস্কিমোদের মতো চামড়ার পোশাক পরে। রাজবাড়ির দিকে যেতে গিয়ে ওরা দূর থেকেই গীর্জাটা দেখতে পেল। বেশ উঁচু পাথরের তৈরী গীর্জাটা, তার মাথায় একটা বিরাট কাঠের ক্রশ।

ওদের গাড়ি রাজবাড়ির সামনে দাঁড়ালো। দেখলো, কুঠার হাতে দু'জন য়ুরোপীয় সৈন্য রাজবাড়ি পাহারা দিচ্ছে। ওদের সঙ্গে ফ্রান্সিস নরওয়ের ভাষায় কথা বললো। কথা বুঝতে বা বলতে এদের কোন অসুবিধে হলো না। ওদের মধ্যে একজন রাজবাড়ির মধ্যে রাজাকে সংবাদ দিতে চলে গেল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি অপেক্ষা করতে লাগলো। একটু পরেই রাজা এনর সোক্কাসন নিজে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে-পেছনে এলেন আরো কয়েকজন। বোধহয় মন্ত্রী ও অমাত্যরা। ফ্রান্সিস ও হ্যারি মাথা নুইয়ে সকলকে সম্মান জানালো। ফ্রান্সিস ভাইকিং রাজার চিঠিটা রাজাকে দিল।

রাজা হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিসের হাত ধরলেন। বললেন, 'আপনারা এসেছেন, খুব খুশী হয়েছি। এখন কয়েকদিন বিশ্রাম করুন। আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। তারপর কাজের কথা ভাবা যাবে। চলুন রাজবাড়ির ভেতরে।'

রাজা ও অমাত্য সকলেরই পরণে ছাই রঙের গরম কাপড়ের আলখাল্লা মত। মাথা ঘাড় ঢাকা সেই কাপড়ে। কোমরে চেন বাঁধা, রাজার কোমরের চেনটা সোনার। ফ্রান্সিস আর হ্যারি রাজা ও অমাত্যদের সঙ্গে রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকল। কালো-কালো বড়-বড় পাথরের ঘরগুলো, বারান্দা, অলিন্দ। এসব পেরিয়ে একটা বড়-হলঘর। এটাই বোধহয় রাজসভাগৃহ। কারণ একটা পাথরের বেদী রয়েছে। তাতে লতাপাতা খোদাই করা। বল্গা হরিণের চামড়ার সময় তাতে। এটাতেই রাজা এসে বসলেন। আরো কিছু-কিছু কাঠের আসন রয়েছে, মন্ত্রী-অমাত্যরা সে-সব আসনে বসলেন। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকেও দুটো আসনে বসতে দেওয়া হলো।

যদিও দিনের বেলা, তবু সভাগৃহে জ্বলছে কয়েকটা মশাল।

রাজা পাথরের বেদী থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'আপনারা সকলেই আমাদের পূর্বপুরুষ 'এরিক দ্য রেডে'র কথা জানেন। আরো জানেন তাঁর গুপ্তধনের কথা। বহুদিন চেষ্টা করেও আজও কেউ গুপ্তধন আবিষ্কার করতে পারে নি'। তারপর একটু থেমে বলতে লাগলেন, 'আপনারা জানেন, ভাইকিংরা বীরের জাতি। তাই ভাইকিংদের রাজার কাছে আমি এই গুপ্তধন আবিষ্কারের কথা বলি। তখন তিনি ভাইকিং জাতির গর্ব ফ্রান্সিস এবং তার বন্ধুদের সাহায্য নেবার কথা বলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, ফ্রান্সিস ও তার বন্ধু এখানে এসেছেন। ফ্রান্সিস ও তাঁর বন্ধুরা এই গুপ্তধন খুঁজে বের করবেন, এই বিশ্বাস আমি রাখি। কারণ'—

এই বলে রাজা ফ্রান্সিসের আনা সোনার ঘণ্টা, হীরে, মুক্তো এসবের কথা সংক্ষেপে বললেন। রাজার বক্তৃতা শেষ হলে সকলে করতালি দিল। রাজা পাথরের সিংহাসনে বসে ফ্রান্সিসকে ইশারায় ডাকলেন। ফ্রান্সিস উঠে রাজামশাই-এর কাছে গেল। রাজা একজন এস্কিমোকে কাছে ডাকলেন। সাধারণ এস্কিমোদের চেয়ে এই লোকটি অন্যরকম। বেশ লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান। রাজা তাকে দেখিয়ে বললেন, 'ফ্রান্সিস, এর নাম 'নেসার্ক'। নেসার্কই আপনাদের দেখাশুনো করবে। আপনারা ওর সঙ্গে যান'।

দু'জনে রাজাকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে চলে এলো। নেসার্ক এসে ওদের কাছে দাঁড়াল। পরিষ্কার নরওয়ের ভাষায় বললো, 'আমার সঙ্গে আপনারা আসুন'।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি নেসার্কের সঙ্গে সভাগৃহের বাইরে এলো।

নেসার্কের পেছনে আসতে-আসতে দেখল, একটা চত্বরে অনেক কুকুর বাঁধা। এর পরেই হরিণশালা, আঁকাবাঁকা শিঙ্‌ওলা অনেক বল্‌গা হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। একটা জায়গায় তার দিয়ে ঘেরা। বোঝা গেল, শ্লেজগাড়ি চালাবার জন্যে কুকুর আর হরিণগুলোকে রাখা হয়েছে।

পাথরের বারান্দা দিয়ে যেতে গিয়ে, ওরা দু'পাশে কয়েকটা ঘর দেখল। কোনটা অস্ত্র-শস্ত্র রাখার ঘর, কোনটায় পুরনো আমলের জিনিসপত্র রাখা, কোনটায় সৈন্যরা থাকে। শেষের দিকে একটা ঘরের সামনে নেসার্ক দাঁড়াল। ঘরের দরজাটা শ্লেট-পাথরের তৈরী। নেসার্ক দরজাটা খুলল। দেখা গেল, ফ্রান্সিসদের শ্লেজগাড়ি থেকে সব জিনিসপত্র এনে এই ঘরে রাখা হয়েছে। ফ্রান্সিস বুঝল, এটাই ওদের আস্তানা। দু'জন এস্কিমো ঘরটা গোছ-গাছ করতে লাগল। নেসার্ক ওদের বল্‌গা হরিণের চামড়া বিছিয়ে বিছানামতো করা হলো। এই দিনের বেলাতেও ঘরটা অন্ধকারমত। নিবু-নিবু হয়ে আসা একটা সীলমাছের তেলের প্রদীপ জ্বলছিল।

প্রদীপটার সল্‌তে উস্‌কে দিয়ে নেসার্ক বললো, 'তাহলে আপনারা বিশ্রাম করুন, দরকার পড়লেই দয়া করে ডাকবেন'।

সব এস্কিমোরা চলে গেল। হ্যারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'এবার শোয়া যাক'। ও বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে বললো, 'দেখছো ফ্রান্সিস, ঘরটা বেশ গরম'।

—'ঐ সীলমাছের প্রদীপের জন্যে। এই প্রদীপকে এস্কিমোরা নানা কাজে লাগায়'। ঘরময় পায়চারী করতে-করতে ফ্রান্সিস বললো।

—'তুমি কি সারাদিনই পায়চারী করবে না কি'?

ফ্রান্সিস হেসে বললো, 'জানো তো কোন কিছু গভীরভাবে চিন্তা করবার সময় আমি পায়চারী করি'।

—'হু, কী ভাবছো অত'?

—'এরিক দ্য রেডের গুপ্তধনের কথা। এখানকার রাজবাড়ির কোথাও আছে সেই ধনভাণ্ডার। কিন্তু কোথায়? কী সূত্র ধরে এগোলে ওটার হদিশ পাবো'?

—'রাজার সঙ্গে কথা বলো। দেখো সূত্র পাও কি না'?

—'হু, রাজবাড়ির অন্দরমহলটা ভালো করে দেখতে হবে। যে ঘরে এরিক দ্য রেড থাকতেন, সেই ঘরটাও খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে হবে। অনেক কাজ'।

—'এখন কয়েকটা দিন তো বিশ্রাম কর'।

ফ্রান্সিস হেসে বললো, 'বিশ্রাম করবার উপায় নেই। তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে হবে, বাবার হুকুম'।

সেই দিনটা ওরা অবশ্য শুয়ে-বসে কাটালো। নেসার্ক ওদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করল। বিকেলের দিকে ফ্রান্সিস নেসার্ককে ডেকে বললো, 'তুমি আমাদের শ্লেজগাড়িটা তৈরী রাখতে বলো। আমরা একটু ঘুরে ফিরে দেখবো'। সে মাথা নেড়ে চলে গেল।

শ্লেজগাড়িটা বিকালে রাজবাড়ির বাইরে আনা হলো। ফ্রান্সিস ও হ্যারি গিয়ে গাড়িতে উঠলো। গাড়ি ছেড়ে দিল। বাট্রাহালিড এমন কিছু বড়ো শহর নয়। কয়েক পাক ঘুরতেই

সব বাড়িঘর, টুপিক দেখা হয়ে গেল। এবার ওরা গীর্জাটার কাছে এল। গীর্জাটা বেশ বড়ো, কালো-কালো পাথর গেঁথে তৈরী। এরিক দ্য রেড নিজে নাকি এটা তৈরী করিয়েছিলেন। ওরা গাড়ি থেকে নেমে গীর্জাটায় ঢুকলো। গীর্জার সামনের চত্বরে অনেক ক্রুশ পোঁতা। তার মানে এটাকে কবরখানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ওরা গীর্জার মধ্যে ঢুকলো। বেশ অন্ধকার-অন্ধকার ভেতরটা। মেঝে থেকে উঁচুতে দু'তিনটে কাঁচের জানলা। তাতে লাল-নীল-হলুদ নানা রঙের কাজ করা। তারই মধ্যে দিয়ে বাইরের একটু আলো এসে পড়েছে। মেঝের কিছু কাঠের বেঞ্চিমত পাতা। সামনে পাথরের বেদী। তার ওপর ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের একটা মূর্তি। বেশ বড় মূর্তিটা, পেতলের তৈরী। একটা কাঠের বেদীর ওপর সেটা রাখা, তার সামনে কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে। ভেতরটায় আর বিশেষ কোন সাজসজ্জা নেই। চৌকোনো পাথর দিয়ে মেঝেটা তৈরী। সব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, অনেকদিনের পুরনো গীর্জা। দেয়ালে কোথাও-কোথাও সবুজে শ্যাওলা ধরেছে।

গীর্জা থেকে ওরা যখন বেরিয়ে এল, তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। ওরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এলো। বিছানায় গা এলিয়ে দিতে ফ্রান্সিস বলল, 'আর এভাবে সময় কাটানো নয়। কাল থেকেই কাজে নামতে হবে'।

—'বেশ তো, লেগে পড়ো'। হ্যারি এই বলে শুয়ে পড়লো।

পরদিন ফ্রান্সিস নেসার্ককে বললো, 'তুমি একটু রাজামশাইকে খবর দাও। যে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই'।

একটু পরেই নেসার্ক ফিরো এলো। বললো, 'আমার সঙ্গে চলুন। রাজা এনর সোক্কাসন আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন'।

ওরা দু'জনে চট্‌পট তৈরী হয়ে নিল। তারপর রাজবাড়ির অন্দরমহলের দিকে চললো। অন্দরমহলটা বড় কিছু নয়। বিশেষভাবে সাজানো-গোজানো কয়েকটা ঘর পেরিয়ে একটা ঘরের সামনে এসে নেসার্ক বলল, 'আপনারা এই ঘরে যান'।

ঘরে ঢুকে ওরা দেখল, একটা গোল পাথরের টেবিলমত। চারপাশে কয়েকটা কালো ওক্ কাঠের চেয়ার, সবুজ গদী আঁটা। ফ্রান্সিস বুঝলো, এটা রাজার মন্ত্রণালয়। ওরা দু'জনে চেয়ারে বসল। একটু পরেই রাজা এলেন। পরণে সেই ঘাড়-মাথা ঢাকা হলদে গরম কাপড়ের হাঁটু পর্যন্ত আলখাল্লা। কোমরে সোনার চেন। ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালো। রাজামশাই কাঠের চেয়ারে বসে বললেন, 'কী ব্যাপার ফ্রান্সিস'?

—'দেখুন, আমরা খুব কম সময় নিয়ে এখানে এসেছি। কাজেই তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরে যেতে হবে। এরিক দ্য রেডের গুপ্তধনের সন্ধান আজ থেকেই করতে চাই। এজন্যে আপনার অনুমতি চাইছি'।

—'আমার কোন আপত্তি নেই। বলুন, কীভাবে অনুসন্ধান শুরু করতে চান'?

—'প্রথমে আমি অন্দরমহলের ঘরগুলো দেখবো'।

—'বেশ'। এই বলে রাজা হাতে একটা তালি বাজালেন। নেসার্ক এসে দাঁড়ালো মাথা নীচু করে। রাজা বললেন, 'তুমি অন্দরমহলের সবাইকে কিছুক্ষণের জন্যে দরবার ঘরে যেতে বলো'। সে চলে গেল।

—'আপনারা অন্দরমহলটা দেখতে চাইছেন কেন'?

—'এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন কোথায় আছে, তার একটা সূত্র পাই কিনা, সেইজন্যেই

অন্দরমহলটা দেখবো। তারপর দেখবো, এরিক দ্য রেড যে ঘরে থাকতেন, বিশেষ করে যে ঘরে তিনি জীবনের শেষ বছরগুলো কাটিয়েছেন।' ফ্রান্সিস বললো।

—'অন্দরমহলের শেষ ঘরটাতেই এরিক দ্য রেড শেষ জীবনে থাকতেন। ঐ ঘরটাকে অনেকটা যাদুঘরের মতো করে রাখা হয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত পোশাক, কালিদান-কলম, বইপত্র এসব রাখা আছে। আপনারা অন্য ঘর-টরগুলো দেখুন। ? যাদুঘরে সবশেষে আপনাদের নিয়ে যাবো। ঐ ঘরের চাবিটা শুধু আমার কাছেই থাকে।'

—'বেশ'।

নেসার্ক তখনই এসে বললো, 'চলুন।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি চললো অন্দরমহলের দিকে। একই রকম পর-পর কয়েকটা পাথরের তৈরী ঘর, দরজাগুলো কাঠের। ঘরের ভেতরে বল্‌গা হরিণের চামড়ার বিছানা। শুধু রাজা-রানীর ঘরের মেঝেয় লতাপাতা আঁকা কার্পেট বিছানো। চোখ-ধাঁধানো সাজসজ্জা নেই সে-সব ঘরে। ফ্রান্সিস সবগুলো ঘরই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল। সব ঘরই এক রকম, বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। একটু অন্ধকার-অন্ধকার ঘরগুলোয় সীলমাছের তেলের প্রদীপ জ্বলছিল। রাজা-রানীর শোয়ার ঘরটাই যা সুসজ্জিত।

রানী বিছানায় বসেছিলেন। ওদের দেখে এগিয়ে এলেন। ফ্রান্সিস ও হ্যারি রানীর ডান হাতে চুম্বন করে সম্মান জানালো। রানী একটা সবুজ রঙের নরম কাপড়ের গাউন পরেছিলেন। মাথায় কোন ঢাকা ছিল না। রানী অপরূপ সুন্দরী, গায়ের রঙ দুধে-আলতা মেশানো। গলায় একটা মুক্তোর মালা, সাজ-সজ্জায় জাঁকজমক কিছু নেই। তিনি সুরেলা গলায় বললেন, 'আপনারা ভাইকিংদের দেশ থেকে এসেছেন?'

ফ্রান্সিস হেসে বললো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'ওর কাছে শুনলাম, আপনারা এরিক দ্য রেডের গুপ্তধনের সন্ধান করবেন।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আমার মনে হয়, এরিক দ্য রেডের যাদুঘরে কিছু সূত্র পেলেও পেতে পারেন।'

'এ কথা কেন বলছেন?'

—'কারণ, ঐ ঘরটাই সবচেয়ে পুরানো। এই ঘরগুলো তৈরী হয়েছে পরে।'

ফ্রান্সিস মনে-মনে রানীর বুদ্ধির প্রশংসা করল। ও বললো, 'আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা এখন ঐ যাদুঘরেই যাবো।'

রানী কোন কথা না বলে হাসলেন। ওরা রানীকে সম্মান জানিয়ে ফিরে চললো।

ওরা মন্ত্রণালয়ে ফিরে এলো। রাজা ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

ফ্রান্সিস বললো, 'মহারাজা, এবার আমরা এরিক দ্য রেডের যাদুঘরটা দেখবো।'

ওরা চললো অন্দরমহল পেরিয়ে একেবারে শেষের দিকে। সেখানেই একটা ঘরের সামনে এসে রাজা দাঁড়ালেন। তাঁর কোমরে চেন-এর সঙ্গে বাঁধা দুটো বড়-বড় চাবি। তারই একটা খুলে নিলেন। ঘরে ঝুলছে মস্ত বড় একটা তালা। তিনি চাবি দিয়ে তালাটা খুললেন। বেশ ধাক্কা দিয়ে দিয়ে দরজাটা খুলতে হলো। বোঝাই গেল, ঘরটা অনেকদিন খোলা হয়নি।

ওরা ঘরের ভেতরে ঢুকলো। ভেতরটা কেমন অন্ধকার-অন্ধকার। একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ, আলো না হলে কিছুই দেখা যাবে না। নেসার্ক এইজন্যেই বোধহয় একটা মশাল নিয়ে এসেছিল। চক্‌মকি পাথর ঠুকে আলো জ্বালাল। এবার ঘরের পুরানো আসবাবপত্র

সব দেখা গেল। বেশীর ভাগই কালো ওক কাঠের তৈরী। চারদিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, এরিক দ্য রেডের ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্র। একটা বিরাট পাথরের পাশে টেবিলের ওপর রাখা আছে রূপোর কলমদানি, রূপোর দোয়াত। পাশে একটা কাঠের আলমারী মত। তাতে রাখা আছে তাঁর ব্যবহৃত পোশাকপত্র। অত্যন্ত দামী যে-সব জাঁকালো পোশাক। সোনার কাজ করা বেল্ট। আর একটা জায়গায় আছে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র। মিনে-করা খাপে ছোরা, হাতীর দাঁতের বাঁটে সোনার কাজ করা তরোয়াল। খাপটায় হীরে-বসানো, মিনে-করা সেটা।

পাথরের টেবিলের ওপর একটা বই সহজেই নজরে পড়ে। লাল রঙের চামড়ার মলাট দেওয়া বই। রাজা বইটা টেবিল থেকে তুলে নিলেন। ফ্রান্সিস, চারদিকে ঘুরে-ঘুরে দেখছিল। রাজা বইটা হাতে নিয়ে ফ্রান্সিসকে ডাকলেন, 'ফ্রান্সিস এই বইটার কথা আপনাকে বলেছিলাম, বোধহয় মনে আছে আপনার।'

ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বইটা হাতে নিল। বইটা চামড়ায় বাঁধানো। ভেতরে উল্টে দেখল, বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট'-এর অনুবাদ করেছিলেন, তাই না।'

—'হ্যাঁ, সবটাই তাঁর নিজের হাতের লেখা।'

ফ্রান্সিস বইটার পাতা উল্টে ভালভাবে দেখতে লাগলো। বহু পুরনো বই। বিশেষ কোন কালিতে লেখা, তাই লেখাগুলো এখনও স্পষ্ট। বইটার মলাটের পরের পাতাতেই তাঁর নিজের হাতের স্বাক্ষর। বোঝাই যাচ্ছে, তিনি মনেপ্রাণে অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। ফ্রান্সিস রাজাকে জিজ্ঞাসা করল, 'উনি আর কিছু লেখেন নি?

—'না'। রাজা বললেন, তবে বংশ পরম্পরায় একটা কথা চলে আসছে যে উনি নাকি 'নিউ টেস্টামেণ্ট'ও অনুবাদ করেছিলেন। তবে সেই বইটা আমরা এখনও কেউ চোখে দেখি নি'।

ফ্রান্সিস বইটা ভালো করে দেখলো। প্রাচীন পুঁথি যেমন হয় বৈশিষ্ট্যহীন। তিনি একজন ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনিই প্রথম তাঁর তৈরী গীর্জার জন্যে য়ুরোপ থেকে ধর্মযাজক আনিয়েছিলেন। কাজেই খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল, ও বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফ্রান্সিস ঘুরে-ঘুরে জিনিসপত্রগুলো দেখলো। কিন্তু গুপ্তধনের সূত্র পাওয়া যেতে পারে, এমন কিছু দেখলো না। তবু বইটার গুরুত্বকে ফ্রান্সিস মনে-মনে স্বীকার করলো। নরওয়ের ভাষায় অনুবাদ, কাজেই পড়তে অসুবিধে হবে না। ও রাজাকে বললো, 'একটা বিনীত নিবেদন ছিল আপনার কাছে।'

—'বলুন।'

—'আমি কয়েকদিনের জন্যে বইটা নিতে পারি।'

রাজা একটু ভাবলেন। বললেন, 'দেখুন এই ঘরের সব জিনিসই আমরা সযত্নে রাখি। কাউকে কিছু দেবার প্রশ্নই ওঠে না। তবে—'একটু থেমে রাজা বললেন, 'আপনি আমার অতিথি। একটা গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন। সুতরাং আপনাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করা আমার কর্তব্য।'

ফ্রান্সিস বললো, 'দেখুন বইটা কতটা আমার কাজে লাগবে, তা এখনই বলতে পারছি না। তবে কোথায়-কীভাবে কোন্ সূত্র পাবো, তা এখনই বলা যায় না। চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া—এই আর কি।'

—'বেশ, আপনি কয়েকদিনের জন্য নিন। তবে আর কাউকে নয়, আমার হাতেই

ফেরৎ দেবেন।'

—'হ্যাঁ, আপনাকেই দেবো।'

রাজা বইটা ফ্রান্সিসের হাতে দিলেন। বইটা নিয়ে ওরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এলো। হ্যারি বিছানায় বসতে-বসতে বললো, 'হঠাৎ বইটা নিয়ে এতো ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন?'

ফ্রান্সিস হেসে বললো, 'জানো তো আমাদের দেশের প্রবাদ — 'কোন কিছুকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করো না, এমন কি ধূলোকেও নয়। দেখাই যাক না কোন আলোর সন্ধান পাই কিনা? তা'ছাড়া বাইবেল অনেক দিন পড়া হয় নি। পড়লে একটু পুণ্যার্জন তো করা হবে।'

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর হ্যারি শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস প্রদীপের আলোয় এরিক দ্য রেডের নিজের হাতের লেখা বাইবেলটা পড়তে লাগলো। পড়তে-পড়তে বুঝল-তাঁর বেশ সাহিত্যজ্ঞান ছিল। অনুবাদের ভাষা যথেষ্ট সাবলীল, অথচ কতদিন আগের লেখা। অনেক রাত পর্যন্ত বইটা পড়ে রেখে দিলো।

পরের দিনই বইটা পড়া শেষ হ'লো। হ্যারি বললো, 'কী হে কেমন লাগলো?'

—খুব স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। শুধু ধর্মজ্ঞানই নয়, তাঁর সাহিত্য জ্ঞানও ছিলো প্রসংশনীয়। তুমি পড়বে?'

—'দাও পাতা ওল্টাই। সময় তো কাটবে।' হ্যারি বইটা নিয়ে পড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ পড়ার পর বইটার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে ডাকলো, 'ফ্রান্সিস?

'হুঁ।' ফ্রান্সিস তখনও একনাগাড়ে পায়চারী ক'রে চলেছে।

—'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো?'

—'কী ব্যাপার?'

—'প্রত্যেকটি অধ্যায়ের আরম্ভের অক্ষরটা লাল রঙের মোটা অক্ষরে লেখা।'

—'বোধহয় সে আমলে এ-রকম রীতিই ছিলো।'

—'বেশ, তা' ঠিক হ'ল। কিন্তু অন্য কালিতে লেখা কেন?'

—'দেখা যাক।' হ্যারি একমনে বইটা পড়তে লাগলো।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস প্রদীপ জ্বেলে এলোমেলোভাবে বইটার পাতা ওল্টাতে লাগলো। একসময় ডাকলো, 'হ্যারি, বইটার বিশেষত্ব কিছু দেখলে?'

হ্যারি ডান হাতের চেটো ওল্টালো, বললো, 'কিছু না।' তারপর বিছানায় কাত হ'য়ে শুলো। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো। ফ্রান্সিস তখনও বইটার পাতা এলোমেলোভাবে ওল্টাচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে হ'ল আচ্ছা লাল অক্ষরগুলো একত্র করলে কি কোন সাঙ্কেতিক কথা পাওয়া যায়। ও তাই করলো। চারটে পরিচ্ছেদের প্রথম অক্ষরগুলো একত্র ক'রে ভাবলো। কিন্তু কোন অর্থ দাঁড়ালো না। হাল ছেড়ে দিয়ে বইটা উল্টো ক'রে রেখে দিলো। প্রদীপ নেভাবার আগে বইটার দিকে আবার তাকালো। ভাবলো, আচ্ছা উল্টো দিক থেকে দেখা যাক। ও আবার বইটা খুললো। এবার উল্টো দিক থেকে প্রথম অক্ষরগুলো মনে-মনে সাজাতে লাগলো। দু'টো শব্দ পেলো, 'যীশুর চরণে।' ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠলো। একটা অর্থ তো আসছে। ও হ্যারিকে ঘুম থেকে ডেকে তুললো।

হ্যারি উঠে ব'সে চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বললো, 'কী হলো?'

—'আমি' এক-একটা অক্ষর ব'লে যাচ্ছি, তুমি লেখ।'

—'লিখবো। কালি-কলম কোথায়?'

ফ্রান্সিস এদিক-ওদিক তাকালো। তারপর নিজের বিছানায় বল্‌গা হরিণের চামড়াটা তুলে নিলো। চামড়ার উল্টো দিকটা পাতলা। সেদিকটা সাদাটে। বললো, 'এটাতে লেখ।'

—'কিন্তু কালি?'

ফ্রান্সিসকে সাঙখূ একটা ছুরি দিয়েছিলো। ওটা ফেরৎ দেওয়া হয়নি। ও বিছানার পাশ থেকে ছুরিটা নিলো। ছুরিটা দিয়ে নিজের আঙ্গুলের ডগা একটুখানি কাটলো। তারপর ছুরির ডগায় একটু রক্ত মাখিয়ে নিয়ে ছুরিটা হ্যারির দিকে এগিয়ে বললো, 'এটা দিয়ে লেখো।

'তোমার যত পাগলামো।'

ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে হাসলো। তারপর উল্টো দিক থেকে বইটার পরিচ্ছেদভাগ অনুযায়ী অক্ষর গুলো ব'লে যেতে লাগলো। ছুরির ডগায় রক্ত শুকিয়ে গেলে আবার আঙ্গুল থেকে রক্ত নিয়ে দিতে লাগলো। সব অক্ষর লেখা হলো। দুই বন্ধুই ঝুঁকে পড়ল সমস্ত লেখাটার ওপর। স্পষ্ট অর্থ পাওয়া যাচ্ছে, 'যীশুর চরণে বিশ্বাস রাখো।' দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকালো। এরা কল্পনাও করে নি যে উল্টোদিক থেকে অক্ষরগুলো সাজালে একটা অর্থ বেরিয়ে আসবে। অথচ তাই হলো। ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠলো। বললো, 'হ্যারি, একেবারে অন্ধকারে ছিলাম। একটুআলোর আভাস পেয়েছি।'

—'কিন্তু কথাটা আমাদের কোন কাজে লাগবে?' হ্যারি বললো।

—'লাগবে-লাগবে। আজ না হয়, কাল। আসল কথা এরিক দ্য রেড সূত্র রেখে গেছেন। সেইটাই বুদ্ধি খাটিয়ে বের করতে হবে।'

—'তুমি কি এই কথাটাকে একটা সূত্র মনে কর।'

—'নিশ্চয়ই। নইলে অক্ষরগুলোকে এভাবে সাজিয়ে ব্যবহার করা হবে কেন? এটা অনেক ভেবেচিন্তেই করা হয়েছে।

—'হুঁ।' হ্যারি আর কোনো কথা বললো না।

ফ্রান্সিস বললো, 'একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্ম বিশ্বাসী। রাজবাড়ি নয়, গীর্জাটাই হবে আমাদের লক্ষ্য। সমাধানের সূত্র আছে গীর্জাটাতেই, অন্য কোথাও নয়।'

—'হু' কথাটা চিন্তা করবার। হ্যারি বললো।

ফ্রান্সিস আবার লেখাটার দিকে ঝুঁকে পড়ে ভালো ক'রে পড়লো, 'যীশুর চরণে বিশ্বাস রাখো, বইটার পাতাগুলো এলোমেলো ওল্টালো। কিন্তু আর কিছু বিশেষত্ব দেখলো না। পরদিনই ফ্রান্সিস নেসার্ককে দিয়ে রাজাকে খবর পাঠালো। মন্ত্রণাঘরেই রাজা ওদের সঙ্গে দেখা করলেন। ফ্রান্সিস বইটা ফেরৎ দিয়ে বললো, 'একটা ক্ষীণ সূত্র পেয়েছি বইটা থেকে।'

'—'সত্যি।' রাজার মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হলো।

ফ্রান্সিস তখন বইটার উল্টো দিক থেকে অক্ষর সাজিয়ে কীভাবে একটা অর্থপূর্ণ কথা পেয়েছে সে-সব বললো। রাজা বেশ আশ্চর্য হলেন। বললেন, 'অবাক কাণ্ড আমরা তো কতদিনই বইটা দেখে আসছি। কিন্তু এভাবে তো ভাবি নি। আপনি যে কত বুদ্ধিমান, সেটা এতেই বোঝা গেলো।'

ফ্রান্সিস বললো, 'আমার মনে হয়, গীর্জাটাতেই আমরা সন্ধানের সূত্র পাবো। যীশুখৃষ্ট এবং খৃষ্টধর্মের সঙ্গে যোগ আছে, এই ধনভাণ্ডার গোপন রাখার ব্যাপারে।'

—'দেখুন চেষ্টা ক'রে। তবে যা করবার তাড়াতাড়ি করবেন।' রাজা বললেন।

—'কেন মহারাজ—' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো।

—'আমাদের চিরশত্রু ইউনিপেড্‌দের আক্রমণের আশঙ্কা করছি।'

—'বলেন কি?'

—'হ্যাঁ। আমাদের গুপ্তচর সংবাদ এনেছে, উত্তরদিকে ওদের মধ্যে যুদ্ধের আয়োজন চলছে। ওরা শ্লেজগাড়ি, অস্ত্র এ-সব সংগ্রহ করছে। যে কোনদিন আমাদের আক্রমণ করতে পারে।'

—'হুঁ। দেখি কাল থেকেই আমরা কাজে নামছি।'

—'তাই করুন। ওদের রাজা এভান্ডাসন অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির লোক। বছর কয়েক হ'ল রাজা হ'য়েছে। এই বাট্টাহালিড জয় করার উদ্দেশ্য একটাই, এরিক দ্য রেডের গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করা। ওরা অসভ্য বর্বর। ওরা পাহাড়ের গুহায় নয়তো মাটিতে গর্ত ক'রে থাকে। এই হিংস্র মানুষদের দয়া-মায়া ব'লে কিছু নেই।' রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস আর কিছু বললো না। নিজের আস্তানায় ফিরে এল। হ্যারি তখন বেড়াতে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। বললো, 'রাজাকে সব বলেছো।'

—'হ্যাঁ।'

—'কি বললেন রাজা।'

—'খুব খুশী হলেন। কিন্তু হ্যারি?'

ফ্রান্সিস একটু থেমে বললো, 'একটা বিপদের সূচনা লক্ষ্য করছি।'

—'কি বিপদ?' হ্যারি জিজ্ঞাসা করলো।

ফ্রান্সিস রাজামশাইয়ের আশঙ্কার কথা বর্বর ইউনিপেড্‌দের কথা সব বললো।

—'তা'হলে এখন কি করবো?' হ্যারি চিন্তিত স্বরে বললো।

—'আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে যাবো। চলো কাল থেকেই লাগবো।'

—'বেশ—' হ্যারি মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো।

* * *

পরদিন ফ্রান্সিস নেসার্ককে দিয়ে একটা মশাল আনালো। বাইরে আজকের আকাশটা কিছু পরিষ্কার। তবু গীর্জার ভেতরের অন্ধকারে এই আলোয় কিছুই দেখা যাবে না। ভালোভাবে সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে হ'লে আরো একটা মশাল চাই।

নেসার্ককে সঙ্গে নিয়ে ওরা গীর্জার দিকে চললো। কতদিনের পুরনো গীর্জা। কালো-কালো পাথরে শ্যাওলা ধ'রে গেছে। কবরখানা পেরিয়ে ওরা গীর্জার সামনে এসে দাঁড়ালো। বিরাট শ্লেটপাথরের দরজা। দরজায় মস্ত বড় একটা তালা ঝুলছে। নেসার্ক কোমরে ঝোলানো একটা লম্বা পেতলের চাবি বের করলো। ও যখন তালা খুলছে, তখন ফ্রান্সিস বললো, 'গীর্জাটা দেখাশুনা করবার কেউ নেই?'

—'একজন যাজক ছিলেন। তিনি বছর খানেক হলো মারা গেছেন। রাজামশাই নরওয়ে থেকে একজন নতুন যাজক আনার জন্য চেষ্টা করছেন।'

দরজা খোলা হ'ল। বেশ জোরে ধাক্কা দিয়ে খুলতে হ'ল। ওরা ভেতরে ঢুকলো। অন্ধকার ভেতরটা। নেসার্ক চকমকি ঠুকে মশালটা জ্বালালো। মশালের আলোয় বেশ

পরিষ্কার দেখা গেলো চারদিকে। পাথরের বেদীটা লাল সাটিনের কাপড়ে ঢাকা। ঢাকনাটায় হলুদ সুতোর কাজ করা। তা'তে ঝালর লাগানো।

পেছনের গলি জানলায় রঙীন কাঁচ। পাথরের বেদীটার ওপর একটা কাঠের বেদী। তার ওপর ক্রুশবিদ্ধ যীশুর বেশ বড় পেতলের মূর্তি। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মুখে ক্ষীণ হাসি। মাথাটা একটু ঝুঁকে পড়েছে। চোখ দু'টো খুব সজীব, এক পাশে তাকিয়ে আছেন। ''যীশুর চরণে বিশ্বাস রাখো—'' কথাটা মনে হতেই ফ্রান্সিস যীশুর মূর্তিটার পায়ের দিকে তাকালো। দেখলো, যীশুর পায়ে পেরেক পোঁতা। ক্রুশের কাঠটা নীচের কাঠের বেদীটার মধ্যে ঢোকানো। ঐ কাঠটাই মূর্তিটার ভারসাম্য রক্ষা করছে। ফ্রান্সিস কাঠটা, কাঠের বেদীটা ভালো ক'রে দেখলো। কিন্তু কিছুই বিশেষত্ব পেল না। ফ্রান্সিস দেখছে, তখনই মশালের আলোটা আড়াল পড়ে গেলো। ও দেখলো, যীশুর মূর্তিটার পিছনে মেঝের কাছাকাছি এক কোণের দেওয়ালে একটা লোহার আংটা বেরিয়ে আছে। নেসার্ক তাতে মশালটা রেখেছে। ফ্রান্সিস একটু আশ্চর্য হলো। অত নীচে মশাল রাখবার আংটা? আলো তো ঢাকা পড়ে যাবে।

নেসার্ককে বললো, 'অত নীচে মশাল রাখলে আলো তো ঢাকা পড়ে যাবে।'

নেসার্ক বললো, 'ওটা মশাল রাখারই আংটা। বরাবর উৎসবের দিনে ওখানেই মশাল রাখা হয়। এরিক দ্য রেডের আমল থেকে নাকি তা চলে আসছে। ও'পাশের দিকটা দেখিয়ে বললো, ও-দিকেও ঠিক এ-রকম একটা আংটা আছে। ফ্রান্সিস সেদিকে লক্ষ্য ক'রে দেখলো, ঠিক ও-রকমই একটি আংটা আছে। ফ্রান্সিস সেদিকে লক্ষ্য ক'রে দেখলো, ঠিক ও-রকমই একটি আংটা মেঝের কাছাকাছি দেয়ালে গাঁথা। হ্যারির দিকে ফিরে বললো, 'হ্যারি, ব্যাপারটা একটা অদ্ভুত লাগছে না? অত নীচে মশাল রাখবার আংটা?'

—'হুঁ। হয়তো আগে কিছু রাখা হ'ত, এখন মশাল রাখা হয়।'

—'আগে কী রাখা হ'ত?'

—'এ-বিষয়ে আমরা সবাই অন্ধকারে। কারণ, ব্যাপারটা আজকের না অনেকদিন আগের।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'ঠিক। তবে ব্যাপারটা অদ্ভুত।'

দু'জনে আর কিছুক্ষণ গীর্জাটার ভেতরে ঘোরাঘুরি করলো মনোযোগ দিয়ে সবকিছু দেখলো। তারপর আস্তানার দিকে ফিরে আসতে লাগল, তখনই একটু দূরে উত্তরদিকে পাহাড়টা দেখলো ফ্রান্সিস। এসে অবধি সব জায়গা দেখা হ'য়েছে, কিন্তু পাহাড়টা দেখা হয়নি। ও নেসার্ককে ডাকলো, 'নেসার্ক।'

—'বলুন?'

—'ঐ পাহাড়টার কী নাম?'

—'সক্কারটপ পাহাড়।'

—'কত উঁচু?'

—'খুব বেশী নয়?'

—'ও!'

—'পাহাড়টার ও'পাশের নিচের দিকে আমার টুপিক।'

—'চলো, তোমার টুপিক কালকে দেখতে যাবো।' হ্যারি বললো।

—'বেশ তো আপনারা গেলে.আমাদের বুড়ো বাবা-মাও খুব খুশী হ'বে। নেসার্ক বললো।

পরের দিন দুটো শ্লেজগাড়িতে চড়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারি চললো পাহাড়টার ওপাশে। সঙ্গে নেসার্ক। পাহাড়টাকে বাঁ দিকে রেখে ওরা ঘুরে ওপাশে গেলো। দূর থেকেই নেসার্কের টুপিক দেখা গেলো। আজকের দিনটা অন্যদিনের চেয়ে বেশ উজ্জ্বল। সাদা বরফের পাহাড়টা থেকে যেন আলো ছিটকে পড়ছে। আজকে শীতটাও একটু কম। খুব ভালো লাগছিলো ফ্রান্সিসের।

ওরা নেসার্কের টুপিকের সামনে এসে গাড়ি থামালো।

টুপিকের বাইরে দড়িতে হরিণের চামড়া শুকোতে দেওয়া হয়েছে, এস্কিমোদের তাঁবু যেমন হয়ে থাকে। নেসার্কের বাবা-মা বেরিয়ে এলো টুপিক থেকে। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে ওরা জড়িয়ে ধরলো। এস্কিমোদের ভাষায় কি যেন বলতে লাগলো। নেসার্ক হেসে বললে, বাবা-মা বলছে, 'আমাদের গরীবের টুপিক। আপনাদের উপযুক্ত সমাদর করতে পারবো না বলে কিছু মনে করবেন না যেন।'

ওদের টুপিকের মধ্যে বিছানায় বসতে বললো। ওরা দুজনে বসলো। সকালেই নেসার্কের মা ওদের জন্য বল্গা হরিণের মাংস রেঁধে রেখেছিলো। তাই খেতে দিলো সঙ্গে রুটি এতো সুস্বাদু হয়েছে রান্না, যে এক বাটি মাংস ফ্রান্সিস এক লহমায় খেয়ে নিলো।

হ্যারি ওর কাণ্ড দেখে হাসলো। তারপর নিজের বাটি থেকে কিছুটা মাংস আর ঝোল ওর বাটিতে ঢেলে দিলো। নেসার্ক অবশ্য বলতে লাগলো, 'আরো মাংস আছে। আপনারা পেট ভরে খান।'

কিন্তু ফ্রান্সিস লজ্জায় চাইতে পারলো না।

খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা চারপাশটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখলো। দেখবার কিছুই নেই। শুধু বরফ আর বরফের বিরাট-বিরাট চাঁই পাহাড়টার গায়ে।

'বিদায় দেবার সময় ফ্রান্সিস নেসার্কের বাবা-মার হাত ধরে বার-বার বললো, 'কুয়অনকা! কুয়অনকা!'

এস্কিমোদের ভাষার এই শব্দটাই ও জানে শুধু। নেসার্ককে বললো, 'তুমি এরকমভাবে তোমাদের বসতি থেকে দূরে থাকো কেন?'

নেসার্ক হেসে আঙ্গুল দিয়ে পাহাড়টা দেখালো। বললো, 'জ্যোৎস্না রাত্রে এই পাহাড়ের রূপ দেখেন নি। সে-যে কী অপরূপ দৃশ্য। টুপিকের ফাঁক দিয়ে সেই দৃশ্য দেখি। মনে হয়, সমস্ত পাহাড়টা যেন একটা বিরাট হীরের খণ্ড। মৃদু আলো ঠিকরোয় বরফের চাঁইগুলো থেকে। আমার কাছে এই সবকিছু ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে হয়। আপনারা হয়তো আমাকে পাগল ঠাওরাবেন কিন্তু—'

—'না নেসার্ক। তুমি যা বলছো, তা মিথ্যে নয়। তোমার মত দেখার চোখ, আর অনুভবের মন পাওয়া ভাগ্যের কথা।' ফ্রান্সিস নেসার্কের কাঁধে হাত রেখে কথাগুলো বললো।

নেসার্ক টুপিকেই থেকে গেল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি একটা শ্লেজগাড়ি চড়ে বাট্টাহালিডে ফিরে এলো।

ফ্রান্সিসদের দিন কাটতে লাগলো। ও নেসার্কের কাছ থেকে গীর্জার চাবিটা নিয়ে

রেখেছে। কখনো হ্যারিকে নিয়ে কখনো একা গীর্জাটায় ঢোকে। চারদিক ঘুরে-ঘুরে দেখে -- হয়তো এই গীর্জার নীচেই লুকনো আছে গুপ্তধন? কিন্তু কোথায়? পায়চারী করে আর ভাবে -- কোথায়, কিভাবে লুকনো আছে সেই গুপ্তধন? কিন্তু ভেবে-ভেবে কুল-কিনারা পায় না। আর কোন নতুন সূত্রও পায় না।

রাজা সোক্কাসন মাঝে-মাঝে ডেকে পাঠান, জিজ্ঞাসা করেন -- 'অনুসন্ধানের কাজ কেমন চলছে? ফ্রান্সিস বলে, 'চেষ্টা করছি, কিন্তু কোন সূত্র পাচ্ছি না।'

একদিন ফ্রান্সিস রাজাকে জিজ্ঞেস করল --'এরিক দ্য রেডের লেখা আর কোন বই আপনার যাদুঘরে আছে?'

'না! তবে শুনেছি, উনি 'নিউ টেস্টামেন্ট' ও অনুবাদ করছিলেন। কিন্তু সেই বইখানা আমরা কেউ চোখে এখনও দেখি নি।'

★ ★ ★

এভাবেই ফ্রান্সিসের দিন কাটতে লাগলো।

এর মধ্যেই একদিন ভোরবেলা রাস্তায় লোকজনের খুব হৈ-হৈ ডাকাডাকি শোনা গেল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও বাইরে এসে দেখলো, দলে-দলে এস্কিমোরা, রাজার সৈন্যরা কুঠার, বর্শা হাতে পাহাড়টার দিকে চলেছে। হ্যারিরও ঘুম ভেঙে গেল। ও এসে ফ্রান্সিসের পাশে দাঁড়ালো। কী ব্যাপার, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

একটু পরেই নেসার্ক এলো। ওরও হাতে কুঠার, ও হাঁপাচ্ছিল। বললো, গুপ্তচর খবর নিয়ে এসেছে, ইউনিপেড্‌রা সাক্কারটপ পাহাড়ের নীচে জড়ো হয়েছে। হয়তো এতক্ষণে আক্রমণ শুরু করবে। আপনারা বাইরে বেরোবেন না -- রাজা হুকুম দিয়েছেন। আপনারা আমাদের অতিথি। আপনাদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।'

--'ওদের কি লোকজন বেশী?' ফ্রান্সিস জানতে চাইলো।

--'হতে পারে। এর আগে দু'দু'বার আমরা ওদের হঠিয়ে দিয়েছি। এবার তাই হয়তো বেশী লোকজন নিয়ে এসেছে'।

নেসার্ক আর দাঁড়ালো না। ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত স্লেজগাড়িতে উঠে পড়লো।

একটু বেলা হতেই যুদ্ধক্ষেত্রের কোলাহল এখানে এসেও পৌঁছতে লাগলো। সন্দেহ নেই, মরনপণ যুদ্ধ চলেছে।

হ্যারি ডাকলো, 'ফ্রান্সিস?'

--'উ?'

--'এখন কী করবে?'

--'সন্ধ্যে নাগাদ যুদ্ধের কোলাহল স্তিমিত হয়ে এল। রাত নেমে আসতে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। দুটো একটা করে স্লেজগাড়ি আহত-নিহতদের নিয়ে ফিরতে লাগলো। রাজবাড়ি বাইরের সব ঘরে আহতদের রাখা হলো। অনেক রাত পর্যন্ত আহতদের আর্তনাদ শোনা গেল।

তখন গভীর রাত, হঠাৎ দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ। ফ্রান্সিসের আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ও আস্তে-আস্তে হ্যারিকে ধাক্কা দিলে। ঘুম ভেঙ্গে হ্যারি উঠে বসলো। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে বললো, 'তরোয়ালটা হাতে নিয়ে তৈরী থাকো।' তারপর নিজে তরোয়াল হাতে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তখনও দরজায় ধাক্কা দেওয়ার বিরাম নেই। ফ্রান্সিস বললো, 'কে?'

—'আমি — আমি নেসার্ক।' নেসার্ক ঘরে ঢুকেই বললো, 'চলো, আগে রাজামশাই কী বলেন শুনি।'

দুজনে নেসার্কের পিছু-পিছু রাজবাড়ির সামনে এলো। অল্প জ্যোৎস্নায় ওরা দেখলো, অনেকগুলো শ্লেজগাড়ি সাজানো হয়েছে। এসব কাজ চলেছে নিঃশব্দে। মশালও জ্বালানো হয়নি। বল্গা হরিণ-টানা একটা শ্লেজগাড়িতে রাজা-রানী বসে আছেন। রানীর কোলে ঘুমন্ত শিশু রাজকুমার। ওরা মাথা নুইয়ে রাজা-রানীকে সম্মান জানালো। রানীকে আগে ফ্রান্সিস দেখেছিল। কী সুন্দর উজ্জ্বল ছিল তাঁর রূপ। আজকে দেখলো মলিন মুখ বিমর্ষ, চিন্তাক্লিষ্ট।

রাজা ফ্রান্সিসকে কাছে ডাকলেন। কেমন ভগ্নস্বরে বললেন, 'দেখুন, যুদ্ধ আমাদের অনুকূলে নয়। আমার প্রজারা আমাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। তারা প্রাণপণ যুদ্ধ করছে করবেও, কিন্তু আমাদের জয়ের কোন আশা নেই। আমরা কোর্টল্ডে আশ্রয় নিতে যাচ্ছি। আপনাদের জন্যে গাড়ী তৈরী রাখা হয়েছে, আসুন।'

ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে বললো, 'না মহারাজ, আমরা এখানেই থাকবো। ইউনিপেড্‌দের সঙ্গে আমাদের তো কোন শত্রুতা নেই।'

—'তা' হলেও ওরা হিংস্র বর্বর। সভ্য রীতি ওরা মানে না।'

—মহারাজ, কব্জির জোরে নয়, বুদ্ধির জোরেই আমরা বেঁচে থাকবো। ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

রাজা সোক্কাসন ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবলেন। ওদিকে রাজা ও অমাত্যদের পরিবারের লোকজন নিয়ে অন্য গাড়িগুলো রওনা হতে শুরু করেছে। রাজা সেদিকে একবার তাকালেন। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে ফিরে বললেন, দেখুন আমি আপনাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবার সব বন্দোবস্ত করেছিলাম। কিন্তু আপনারা রাজী হলেন না। এরপরে আপনাদের যদি কোন ক্ষতি হয়, তার জন্যে আমাকে দায়ী করবেন না।'

—'না মহারাজ। আমরা নিজেদের দায়িত্বেই এখানে থাকছি।'

—'বেশ।' রাজা গাড়ি-চালককে ইঙ্গিত করলেন।

বল্গা হরিণে-টানা গাড়ি বরফের ওপর দ্রুতবেগে ছুটলো। অন্য গাড়িগুলোও ছুটলো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের ঘরে ফিরে এলো। দুজনেই আর ঘুমুতে পারলো না। হ্যারি একসময় বললো, 'এভাবে থেকে যাওয়াটা কি ভালো হলো?'

—'পালিয়ে গিয়েই বা কী হতো? অলস সময় কাটাতাম শুধু। কিন্তু এখানে থাকলে গুপ্তধনের খোঁজ চালিয়ে যেতে পারবো।'

—'কিন্তু ইউনিপেড্‌রা কি আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে?'

—'দেবে, কারণ ওদের রাজা এভাল্ডসনের লক্ষ্য এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন। আমরা ওর এই ধনলিপ্সাটাকেই কাজে লাগাবো। আমরা সেই ধনভাণ্ডার খুঁজে দেবো, এই শর্তে আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।

—'হুঁ কথাটা ঠিক। কিন্তু এভাল্ডসন কেমন লোক, তা এখনও জানি না।'

—'দেখা যাক।' এই সব কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে বাকী রাতটুকু কেটে গেল।'

★ ★ ★

পরের দিন সকাল থেকেই আবার হৈ-হল্লা। যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যেতে লাগল সৈন্যরা।

দুপুর নাগাদ আহত-নিহত সৈন্যদের নিয়ে গাড়ি ফিরতে লাগল। তার পেছনেই দলে-

দলে ইউনিপেড্‌রা বাট্টাহালিডে ঢুকতে লাগল। বোঝাই গেল, রাজা সোক্কাসনের সৈন্যরা হেরে গেছে। ফ্রান্সিস ও হ্যারি এই প্রথম ইউনিপেড্‌দের দেখলো। এস্কিমোদের মতই পোশাক ওদের। তবে অত্যন্ত নোংরা আর ছেঁড়াখোড়া। মুখে-হাতে কাদা মাখা, ঘাড় মাথা-ঢাকা নোংরো টুপীর মত। মাথায় খোঁচা-খোঁচা চুল তারই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে। চোখ মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ওরা হিংস্র। ওদের হিংস্রতার নমুনা ফ্রান্সিস আর হ্যারি দেখলো। আহত এস্কিমোদের একটা গাড়ী রাস্তার পাশে ছিল। ইউনিপেড্‌রা চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই গাড়ির ওপর। কুঠার চালিয়ে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলতে লাগল সেই আহতদের। তাদের করুণ চীৎকারে আকাশ ভরে উঠলো। আর একদল ইউনিপেড্ কুঠার আর বল্লম হাতে কাছাকাছি টুপিকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নারী শিশুদের কান্নার রোল উঠলো। ওরা বোধহয় কাউকে বেঁচে থাকতে দেবে না। নির্বিবাদে হত্যা করবে সবাইকে। শ্মাশান করে ছাড়বে বাট্টাহালিড্‌কে।

ফ্রান্সিসরা দরজা বন্ধ করে সরে এল। বিছানায় বসলো না, পায়চারী করতে লাগলো। ওদিকে বিজয়ী ইউনিপেড্‌দের হৈ-হল্লা চীৎকার চলেছে। এক সময় হঠাৎ ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়লো। চিন্তিতস্বরে ডাকল, 'হ্যারি।'

—'বলো।'

—'আমরা কি ভুল করলাম?'

হ্যারি বিছানায় বসেছিল, এবার উঠে এসে ফ্রান্সিসের মুখোমুখি দাঁড়ালো। দৃঢ়স্বরে বললো, 'তুমি এই চিন্তাকে একেবারে প্রশ্রয় দিও না। আমরা যা করেছি, ঠিক করেছি, ঠিক করেছি। মনটা শক্ত করো।'

ফ্রান্সিস বুঝলো, হ্যারি ঠিক কথাই বলেছে। এখান থেকে না যাওয়ার সিদ্ধান্তের পর, আর পালানোর প্রশ্ন ওঠে না। তা-ছাড়া এখন আর পালাবার উপায়ও নেই।

বাইরের হৈ-হল্লা সমানে চলেছে, তখন হঠাৎ দরজায় প্রচণ্ড জোরে লাথি পড়তে লাগল। শ্লেটপাথরের দরজা, ভেঙে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দু'জনেই তাড়াতাড়ি তরোয়াল তুলে নিল। তারপর ফ্রান্সিস পায়ে-পায়ে এগিয়ে দরজাটা খুলে দিয়েই ঝট করে পেছিয়ে এলো। দু'জন ইউনিপেড্ হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লো।

ফ্রান্সিস নরওয়ের ভাষায় চীৎকার করে বললো, 'কী চাই?'

ওরা এতক্ষণে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। ওরা এস্কিমোদের দেখবে ভেবেছিল, দেখলো দু'জন য়ুরোপীয়ানকে। একজনের হাতে একটা রক্তমাখা কুঠার, অন্যজনের হাতে বর্শা। ফ্রান্সিসের কথা ওরা কিছুই বুঝলো না। দু'জনে একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। তারপর কুঠার হাতে লোকটাই প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসের ওপর। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে তরোয়াল চালালো। কিন্তু তরোয়ালটা ওর বুক ছুঁয়ে গেল। চামড়ার নোংরা পোশাকটা দো ফালা হয়ে গেল।

ওদিকে অন্য লোকটা হ্যারিকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল। হ্যারি ঝট্ করে বসে পড়লো। বর্শাটা ওর মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে পাথুরে দেয়ালে লেগে ঝনাৎ করে পড়ে গেল মেঝের ওপর। ওদিকে কুঠার হাতে লোকটা ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে কুঠার চালালো। কিন্তু ভারী কুঠার নিয়ে তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করা যায় না, ফ্রান্সিস সেই সুযোগটা নিল। ঝট্ করে মাথা সরিয়ে কুঠারের ঘাটা এড়িয়ে, একমুহূর্ত দেরী করল না। নীচু হয়ে সোজা তরোয়াল বসিয়ে দিল লোকটার বুকে।

লোকটা 'অঁক' করে একটা শব্দ তুলে চিৎ হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল। তারপর গোঙাতে লাগল। ওদিকে বর্শা হাতছাড়া হওয়ায় অপর লোকটি খালি হাতে দাঁড়িয়ে রইল। একবার দরজার দিকে তাকালো, অর্থাৎ পালাবার ধান্দা। কিন্তু ফ্রান্সিস ওকে সেই সুযোগ দিল না। ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার ওপর। তারপর লোকটার পেটে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল। লোকটা মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে গোঙাতে লাগল। আগের লোকটি তখন মরে গেছে। ফ্রান্সিস জোরে শ্বাস ফেলে ফেলে বললো, —'দুটোকেই বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে।'

ওরা তাই করল। লোক দুটোকে পাঁজকোলা করে তুলে নিয়ে বাইরে বরফের ওপর ফেলে দিল। অত লোকজনের ছুটোছুটি হৈ-হল্লার মধ্যে কারো নজরে পড়লো না ব্যাপারটা।

ওরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সারাটা দিন আর কেউ ওদের ঘরের দিকে এলো না। কিন্তু সন্ধ্যের পর ওদের দরজার সামনে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শুনলো ওরা। দরজা একটু ফাঁক করে দেখলো, একদল ইউনিপেড় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মশাল হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোধহয় রাজবাড়ির ঘরগুলোতে হানা দিতে বেড়াচ্ছে।

বিছানায় বসল দু'জনে। খুব চিন্তিত স্বরে ফ্রান্সিস হ্যারিকে বললো, 'এখন কী করা যাবে?'

হ্যারি বললো, 'অতলোকের মোকাবিলা করতে যাওয়া বোকামি। লড়াই নয়, বুদ্ধি খাটিয়ে বাঁচতে হবে।'

হ্যারির কথা শেষ হতে না হতেই দরজায় দমাদ্দম লাথি পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে দরজায় ধাক্কা। ফ্রান্সিস এগিয়ে দরজা খুলে পেছিয়ে দাঁড়ালো। ইউনিপেড়রা মশাল হাতে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। কারোর হাতে বর্শা, কারোর হাতে কুঠার। মশালের আলোয় ওদের ভাবলেশহীন কাদা মাখা মুখ বীভৎস লাগছে দেখতে। ওরা ফ্রান্সিসদের দেখে একটু অবাক হলো।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বললো, 'হ্যারি তরোয়াল ফেলে দাও।'

দু'জনেই তরোয়াল ফেলে দিল। পাথরের মেঝেতে শব্দ হলো - ঝনাৎ - ঝনাৎ। ওরা যে যুদ্ধ চায় না, বরং আত্মসমর্পণ করছে, ফ্রান্সিস এটা ওদের বোঝাল। ওদের মধ্যে থেকে একজন বলশালী চেহারার লোক এগিয়ে এসে এস্কিমোদের ভাষায় কী বলল। সবটুকু না বুঝলেও ফ্রান্সিস বুঝল, ও বলতে চাইছে তোমরা এখানে কী করছো? ফ্রান্সিস চীৎকার করে নরওয়ের ভাষায় বললো, 'আমরা রাজা এভাল্ডাসনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ফ্রান্সিস বারবার কথা বলতে লাগল, আর রাজা এভাল্ডাসন শব্দটার ওপর জোর দিতে লাগল। ওরা ফ্রান্সিসের কথা না বুঝলেও রাজা 'এভাল্ডাসন' শব্দটা বুঝল। ওদের মধ্যে দু'একজন দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলে উঠে কুঠার তুলে ধরল। বলশালী লোকটা হাত তুলে ওদের নিরস্ত করল। তারপর একজনের হাত থেকে দড়ি নিয়ে এগিয়ে এলো। ফ্রান্সিস আবার চীৎকার করে বললো, 'রাজা এভাল্ডসনের সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই।' এদিকে বলশালী লোকটা ও আর একজন মিলে, ফ্রান্সিস ও হ্যারির হাত পিছমোড়া করে বেঁধে তারপর ফ্রান্সিসকে দরজার দিকে ধাক্কা দিল।

ফ্রান্সিস রাগে ফুঁসতে লাগলো। কিন্তু এখন এই পরিবেশে মাথা গরম করা বোকামি। এখন বাঁচতে হবে।

★ ★ ★

ইউনিপেড়্দের দল ওদের নিয়ে চললো। রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকল ওরা। তারপর সভাগৃহে ঢুকল। ফ্রান্সিস দেখলো, অনেকগুলো মশাল জ্বলছে। রাজার পাথরের বেদীমত আসনটায় কে মোটামত একটা লোক হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। ফ্রান্সিস বুঝল, এই লোকটাই ইউনিপেড়্দের রাজা — 'এভান্ডাসন'। রাজার পরণেও নোংরা পোশাক। মুখটা বেশ ভারী। কপালের ওপর খোঁচা - খোঁচা চুল নেমে এসেছে। মুখে সামান্য দাড়ি-গোঁফ। কুত্কুতে চোখ। দেখলো, রাজা একটা বল্গা হরিণের আস্ত ঠ্যাং থেকে মাংস ছাড়িয়ে খাচ্ছে। রাজার আসনের পাশেই একটা রক্তমাখা কুঠার পড়ে আছে। সেই বলশালী লোকটা একনাগাড়ে কী বলে যেতে লাগলো, আর রাজামশাই কুতকুতে চোখে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগলো। লোকটার কথা শেষ হলে রাজামশাই মাংস খাওয়া থামিয়ে চীৎকার করে কী বলে উঠলো। দু-তিনজন ইউনিপেড় ছুটে এসে ফ্রান্সিসদের ধাক্কা দিতে লাগলো। ফ্রান্সিস বুঝলো না, রাজা কী আদেশ দিলো। তবে এটা বুঝলো, যে বিপদ কাটে নি। ও তাড়াতাড়ি ফিরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললো, 'রাজা এভান্ডাসন আপনাকে একটা জরুরী কথা বলতে চাই।' এদিকে ইউনিপেড়্রা ওদের দুজনকে ঠেলছে আর ফ্রান্সিস একনাগাড়ে কথাটা বলে চলেছে ওখানে। কেউই ওর কথা বুঝল না। এমন সময় অমাত্যদের আসনে বসা একজন লোক উঠে রাজাকে গিয়ে কী বললো, তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে ভাঙা - ভাঙা নরওয়ের ভাষায় বললো - 'তোমার নাম কি?'

ফ্রান্সিস খুশী হল। অন্তত একজনকে পাওয়া গেল যে নরওয়ের ভাষা বোঝে। তখন উত্তর দিল — 'ফ্রান্সিস'।

ফ্রান্সিস এবার লোকটার দিকে তাকালো। দেখলো, একজন অল্প দাড়ি - গোঁফওয়ালা বৃদ্ধ। মুখ-চোখ বেশ শান্ত, যদিও পরণে সেই নোংরা চামড়ার পোশাক। বৃদ্ধ বললো, 'আমি ইউনিপেড়্দের মন্ত্রী। একমাত্র আমিই নরওয়ের ভাষা একটু বুঝি, আর একটু বলতে পারি। রাজাকে তুমি কী জরুরী কথা বলতে চাও?'

—'আমরা জাতিতে ভাইকিং।' ফ্রান্সিস বললো, 'আমরা এখানে এসেছি, এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন খুঁজে বের করতে।'

এরিক দ্য রেডের নামটা শুনে রাজা মাংস খাওয়া থামিয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালো।

—'তোমরা কি কোন খোঁজ পেয়েছো?'

—'না, তবে একটা মূল্যবান সূত্র পেয়েছি।'

রাজামশাই এবার অস্বস্তি প্রকাশ করলো। মন্ত্রীকে ডেকে কি বললো। মন্ত্রীও ঐ ভাষায় কিছু বললো। রাজামশাই ঠ্যাং চিবুনো বন্ধ করে কি বলে উঠলো।

মন্ত্রী বললো, 'রাজা এভান্ডাসন জানতে চাইছেন, তোমরা কী ধরনের সূত্র পেয়েছো'?

ফ্রান্সিস ফিস্ফিস করে বললো, "হ্যারির ওষুধে কাজ হয়েছে।" বোধহয় কতটা কাজ হয়েছে, বোঝার জন্য ফ্রান্সিস বলে উঠলো, 'তার আগে আমাদের হাতের বাঁধন খুলে দিতে হবে।'

মন্ত্রীমশায় বলশালী লোকটাকে কি বললো। দু'জন এসে ওদের হাতের বাঁধন খুলে দিলো। ফ্রান্সিস তখন 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বইয়ের কথা, সাংকেতিক লেখা, এসব বলে গেলো।

রাজা অধৈর্য হয়ে বারবার মন্ত্রীকে কি বলতে লাগলো। মন্ত্রী কোন কথা না বলে মনোযোগ দিয়ে ফ্রান্সিসের কথা শুনতে লাগলো। কথা শেষ হলে মন্ত্রী রাজাকে ইউনিপেড্‌দের ভাষায় সব বলে গেলো। রাজা ঠ্যাং ছুঁড়ে ফেলে সিংহাসনের ওপর এক লাফে উঠে দাঁড়ালো। তারপর চীৎকার করে কি বলে উঠলো।

মন্ত্রী বললো, 'রাজামশায় বলছেন, 'এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন তাঁর এক্ষুণিই চাই।'

ফ্রান্সিস মৃদু হাসলো। বললো, 'রাজাকে বলুন, অত তাড়াতাড়ি উদ্ধার করা সম্ভব হলে, অনেক আগেই লোকে উদ্ধার করতো। যাকগে, আমরা আর কোন সূত্র পাই কিনা, সেই চেষ্টায় আছি।'

মন্ত্রী রাজাকে তাই বললো। রাজামশাই আবার কি বললো, মন্ত্রী বললো, 'রাজামশাই জিজ্ঞেস করছেন, তোমরা কি পারবে?'

—'চেষ্টা করবো। তবে, দুটো শর্ত আছে।'

—'বলো।'

—'এক, যে ঘরে আমরা ছিলাম, সেই ঘরে আমাদের থাকতে দিতে হবে। দুই আমাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দিতে হবে।'

মন্ত্রী রাজাকে সব কথা বললো। রাজা কপালে হাত বুলালো একবার। তারপর কি বললো। মন্ত্রী বললো, 'রাজামশাই আপনাদের শর্তে রাজী হয়েছেন। তবে তাঁরও একটা শর্ত আছে।'

—'সেটা কী?'

—'তোমরা একজন যখন বাইরে বেরোবে, অন্যজনকে তখন ঘরে থাকতে হবে। দু'জনে একসঙ্গে কোথাও যেতে পারবে না।'

ফ্রান্সিস রাজার মুখের দিকে তাকালো। দেখলো, অল্প-অল্প গোঁফের ফাঁকে রাজা মিষ্টি-মিষ্টি হাসছে। ও বুঝলো, বর্বর অসভ্য হলে কি হবে, রাজা এভাল্ডাসন নির্বোধ নয়। ও সেই শর্তে রাজী হল। এখন যা শর্ত দেবে, তাই মেনে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। মন্ত্রী বললো, 'কবে থেকে কাজে লাগবে?'

—'কাল থেকেই।'

—রাজা আবার আসনে বসলো। আরো কয়েকজন এস্কিমোদের ধরে আনা হয়েছে। এবার তাদের বিচার হবে বোধহয়।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের আস্তানায় ফিরে এলো।

★ ★ ★

পরের দিন ঘুম ভাঙতে ফ্রান্সিস দরজার বাইরে কাদের চলাফেরার শব্দ শুনলো। ও দরজা খুললো। দেখলো, দু'জন ইউনিপেড্ কুঠার হাতে দরজায় পাহারা দিচ্ছে। তার মানে রাজা এভাল্ডাসন ওদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়নি। হ্যারিকে ডেকে তুলল ও, পাহারার কথা বললো। হ্যারি বললো, 'এসব মেনে নিতেই হবে — উপায় নেই।'

সারাদিন ফ্রান্সিসরা ঘরে বসে কাটালো। বিকেলের দিকে ফ্রান্সিস বেরলো। পাহারাদার দু'জনও ওর সঙ্গে - সঙ্গে চললো। সে গীর্জায় গেল, কোমরে গোঁজা ছিল চাবিটা।

ও দরজা খুলে গীর্জায় ঢুকলো, ঘুরে - ঘুরে দেখতে লাগল চারদিক। আজকেও সেই কড়া দুটো ওর নজর কাড়লো। এত নীচে দুটো কড়া গাঁথার অর্থ কী? এ সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে আবার আস্তানায় ফিরে এলো।

এদিকে ইউনিপেড্‌রা এসে বাট্টাহালিডের যে কটা পাথরের বাড়ি ছিল, সে - কটা রাজ বাড়ির ঘরগুলো যত টুপিক ছিল দখল করে নিয়েছে। টুপিকের বাইরে আগুন জ্বেলে ওরা মাংস ঝলসায়, খায় আর অনেক রাত পর্যন্ত হৈ-হল্লা করে।

সেদিন ওরা দু'জনে বিছানায় বসে আছে। বাইরে যথারীতি পাহারাদার দু'জন পাহারা দিচ্ছে। হ্যারি ডাকল, 'ফ্রান্সিস।'

—'বলো।'

—'আমাদের একজনকে পালাতেই হবে।'

—'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছিলাম। দেখ, গুপ্তধন খুঁজেছি, এই ধোঁকা দিয়ে বেশীদিন চলবে না। তার আগেই আমাদের কাউকে আঙ্গামাগাসালিকে যেতে হবে - বন্ধুদের নিয়ে আসতে হবে। তারপর কোর্টল্ড থেকে রাজা সোক্কাসনের যত সৈন্য আছে, সবাইকে একত্র করে বাট্টাহালিড আক্রমণ করতে হবে। এখান থেকে ইউনিপেড্‌দের তাড়াতেই হবে।'

—'তাহলে তুমিই পালাও -' হ্যারি বললো।

—'পালালে তো আমাকেই পালাতে হবে, তুমি এত ধকল সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু আমি পালালে তোমার না কোন বিপদ হয়।'

—'শোন -' হ্যারি বললো, 'তুমি পালালে আমি বলবো যে, আমি একটা নূতন সূত্র পেয়েছি। রাজা এরিক দ্য রেডের যাদুঘরটা আমাকে ভালো করে দেখতে হবে। প্রত্যেকদিন অনেকক্ষণ ধরে ঐ যাদুঘরে কাটাবো। এভাবে রাজা এভাল্ডার্ডের বিশ্বাস অর্জন করবো। যাদুঘরের জিনিসপত্র নাড়া-চাড়া করবো। পাথরে মেঝে খুঁড়তে বলবো, এ-সব করতে-করতে তুমি লোকজন নিয়ে আসতে পারবে। তারপর শেষ লড়াই'।

হুঁ তাই করো। আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।'

পরের সারাটা দিন ফ্রান্সিস বা হ্যারি কেউই বেরলো না। সারাদিন এই পরিকল্পনা নিয়েই পরামর্শ করল। একটু রাত হতে ফ্রান্সিস তৈরি হলো। বেশী পোশাক পরলো, বিছানা থেকে হরিণের চামড়াটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়ালো। তরোয়ালটাও নিল। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর ও ঘরের বাইরে এলো। পাহারাদার দু'জন ওর সাজসজ্জা দেখে একটু অবাকই হলো। তবে ওরা বোধহয় ভাবলো যে ঠাণ্ডার রাত, তাই বেশি পোশাক পরেছে।

ফ্রান্সিস গীর্জার দিকে হাঁটতে লাগল। পাহারাদার দু'জন পেছনে চললো। ওরা তো আর জানে না, সে মনে-মনে কী ফন্দী এঁটেছে?

গীর্জায় পৌঁছে সে চাবি দিয়ে বিরাট তালাটা খুললো। ভেতরে ঢুকে চকমকি ঠুকে মোমবাতি জ্বালাল। এটা-ওটা দেখতে লাগল। দরজার বাইরে পাহারাদার দু'জন দাঁড়িয়ে রইল।

একটু রাত হলে, একজন পাহারাদার দরজায় ঠেস দিয়ে বসে ঘুমুতে লাগল। অন্যজন দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস দেখলো, এই সুযোগ। ও আংটায় বসানো একটা মশাল নিয়ে দরজার কাছে এলো। যে লোকটা জেগেছিল, তাকে আকারে-ইঙ্গিতে বোঝালো

যে, মশালটা ও জ্বালাতে পারছে না। ও যেন এসে জ্বেলে দিয়ে যায়। লোকটা গীর্জার ভেতরে ঢুকলো। হাতের কুঠারটা মেঝের উপর রেখে, চকমকি পাথরে ইস্পাতের টুকরো ঠুকতে লাগল। ফ্রান্সিস অভিজ্ঞতা থেকে জানতো, এখানকার ঠাণ্ডায় মশাল জ্বলতে সময় লাগে। লোকটা চকমকি ঠুকে চলল। আস্তে-আস্তে গীর্জার বাইরে চলে এলো ফ্রান্সিস। ঘুমন্ত লোকটাকে ঠেললো কয়েকবার। ঠেলতেই লোকটা উঠে দাঁড়াল। চোখ কচলে দেখে সামনে ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে ওকে বোঝাল যে, গীর্জার ভেতরে তোমার বন্ধু তোমাকে ডাকছে। লোকটা ঘুমচোখে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখল না। ও তাড়াতাড়ি গীর্জার মধ্যে ঢুকে পড়লো। ফ্রান্সিস এই সুযোগের প্রতীক্ষাতেই ছিল, ও সঙ্গে-সঙ্গে হ্যাঁচকা টানে দরজাটা বন্ধ করল। তারপর চাবি বের করে তালা লাগিয়ে দিল। আর এক মুহূর্ত দেরী নয়, সে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে এলো। তারপর বরফের ওপর দিয়ে ছুটে চললো সাক্কারটপ পাহাড়টার দিকে। উপায় নেই, ওই পাহাড়টা ডিঙোতে হবে। পাহাড়ের ধার দিয়ে যেতে গেলে, ওরা স্লেজগাড়ি চালিয়ে ওকে সহজেই ধরে ফেলবে। কিন্তু গাড়ি তো আর পাহাড়ে উঠতে পারবে না।

বরফের ওপর দিয়ে ছুটতে-ছুটতে পাহাড়ের নীচে পৌঁছে ফ্রান্সিস হাঁপাতে লাগল।

এতটা পথ একছুটে চলে এসেছে, এতক্ষণ মেঘ-কুয়াশায় অন্ধকার ছিল চারদিক। এবার মেঘ-কুয়াশা কেটে গেল। আকাশে দেখা গেল পূর্ণিমার চাঁদ। বেশ কিছুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল। ইউনিপেড়রা যখন এখনও স্লেজগাড়ি নিয়ে তাড়া করেনি, তার মানে ঐ পাহারাদার দুটো গীর্জা থেকে বেরোতে পারেনি। গীর্জাটা লোকালয় থেকে একটু দূরেই। ওরা দরজা ধাক্কা দিলেও কারো কানে সে শব্দ পৌঁছবে না। তাছাড়া ইউনিপেড়রা অনেকেই আগুন জ্বেলে মাংস ঝলসাচ্ছে আর আগুনের চারপাশে বসে ড্রাম পেটাচ্ছে আর গাইছে, হৈ-হল্লা করছে। কাজেই দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ কানেই যাবে না।

বরফের চাঁইয়ের ওপর সাবধানে পা ফেলে-ফেলে ফ্রান্সিস পাহাড়টায় উঠতে লাগল। দম নেবার জন্যে মাঝে-মাঝে থামছে, আবার উঠছে। এত উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তার মধ্যেও পাহাড়ের গায়ে চাঁদের মৃদু আলো পড়ে, যে অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে, তা ওর দৃষ্টি এড়ালো না। সত্যিই, অপূর্ব দৃশ্য। সারা পাহাড়টা থেকে একটা নরম আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। নেসার্ক যে কেন এই সৌন্দর্যকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেছে, এবার তার কারণ খুঁজে পেল ও।

এমন সময় চুড়োয় পৌঁছল ফ্রান্সিস। চাঁদটা তখন কিছুটা পূর্বদিকে ঢলে পড়েছে। ঘুরে দাঁড়াতে চুড়োর ওপাশে ওর দৃষ্টি পড়ল। ও চমকে উঠলো একটা দৃশ্য দেখে। চুড়োর ওপাশেই পাহাড়ের বুকে একটা বিরাট জলাশয়, প্রকৃতির কি আশ্চর্য খেয়াল! সেই টলটলে জলের ওপর কোথাও-কোথাও স্বচ্ছ কাঁচের মত বরফের পাতলা আস্তরণ। সেই জলাশয়ে চাঁদের আলো পড়ে এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। সে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলো। তারপর জলাশয়ের ধার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে পাহাড়ের পেছন দিকে এলো। উঁচু-নীচু বরফের চাঁইয়ের ওপর পা রেখে-রেখে ও নীচে নেমে এলো। অস্পষ্ট দেখতে পেল নেসার্কের চামড়ার তাঁবু।

ও যখন তাঁবুর সামনে পৌঁছল, তখন একেবারে দম শেষ। একটু দাঁড়িয়ে থেকে দম নিল। তারপর তাঁবুর চামড়া একটু সরিয়ে ডাকল, 'নেসার্ক – নেসার্ক।'

ও জানতো, নেসার্ক রাজার সঙ্গে কোর্টল্ডে চলে গেছে। থাকলে এখানে তার মা-বাবা আছে। বারকয়েক ডাকার পর কার নড়া-চড়ার শব্দ পেল। ও এবার একটু গলা চড়িয়ে ডাকল, 'নেসার্কের মা আছেন? নেসার্কের মা?'

এস্কিমোদের ভাষায় কে বলে উঠলো, 'কে?'

ফ্রান্সিস বুঝলো, এটা নেসার্কের মার গলা, ও খুশী হলো। অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে বললো, 'আমি ফ্রান্সিস, নেসার্কের বন্ধু'।

এবার চক্‌মকি ঠোকার শব্দ শুনলো ও। প্রদীপ জ্বালল, দেখল নেসার্কের মা বিছানা থেকে উঠে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ঐ আলোতে বুড়ী ফ্রান্সিসকে চিনে হাসল, মুখে বলিরেখাগুলো স্পষ্ট হলো। ফ্রান্সিস এস্কিমোদের ভাঙা-ভাঙা ভাষায় বললো, 'আমি পালিয়েছি, এখানে থাকব—শ্লেজগাড়ি চাই'।

নেসার্কের মা মাথা নাড়ল, অর্থাৎ শ্লেজগাড়ি নেই। ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। শ্লেজগাড়ি না পেলে কোর্টল্ড পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। অগত্যা একটা শ্লেজগাড়ি বাট্টাহালিড্ থেকে চুরি করতে হবে। ফ্রান্সিস এবার অন্য বিছানাটার দিকে তাকাল। কিন্তু নেসার্কের বাবাকে দেখতে পেল না। জিজ্ঞেস করলো, 'নেসার্কের বাবা কোথায়?'

বুড়ী কথাটা শুনে দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো। বুঝলো, নেসার্কের বাবা মারা গেছে। ফ্রান্সিস বললো, 'কবে উনি মারা গেলেন?'

বুড়ী বললো 'ইউনিপেড়্‌রা ওকে মেরে ফেলেছে।'

বলে হাত দিয়ে কুঠারর চালাবার ভঙ্গী করল, অর্থাৎ কুঠার দিয়ে মেরেছে। বুড়ী নিজে বোধহয় কোনরকমে পালিয়ে বেঁচেছে।

ফ্রান্সিস নেসার্কের বাবার বিছানায় বসে, হাতের ভঙ্গী করে বললো, 'এখন ঘুমোব।'

বুড়ী মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল। সে শুয়ে পড়লো। অনেক চিন্তা মাথায় ভীড় করে এলো। শরীর প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লো। আর চিন্তা না করে ও ঘুমাবার চেষ্টায় পাশ ফিরে শুলো।

পরের সারাটা দিন ও টুপিকেই রইল। একবারও বেরুলো না। ইউনিপেড়্‌রা নিশ্চয়ই ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দুপুরে নেসার্কের বুড়ী-মা ওকে খুব যত্ন করে খেতে দিল। এত সুস্বাদু রান্না অনেকদিন খায়নি ও। পাছে বুড়ীর কম পড়ে যায়, এইজন্যে সে একটু কম করেই খেলো।

টুপিকের ফাঁক দিয়ে ফ্রান্সিস সারাক্ষণ বাইরের দিকে নজর রাখলো। বিকেলের দিকে দেখলো দূরে একটা শ্লেজগাড়ি পাহাড়ের পাশ দিয়ে বাঁক নিচ্ছে। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি গুঁড়ি মেরে টুপিক থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর বরফের কয়েকটা চাঁইয়ের আড়ালে পাহাড়টার নীচে এলো। একটা বিরাট বরফের মধ্যে আত্মগোপন করলো। একটু পরেই একটা শ্লেজগাড়ি টুপিকের সামনে এসে দাঁড়ালো। ফ্রান্সিস আড়াল থেকে দেখলো, সেই শক্তিশালী চেহারার লোকটা টুপিকের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে এস্কিমোদের ভাঙা-ভাঙা ভাষায় বলছে, 'ভেতরে কে আছিস্ — বেরিয়ে আয়।' বুড়ী বেরিয়ে এলো। লোকটা তেমনি চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলো, এখানে ইউরোপিয়ান একজন এসেছিলো?'

বুড়ী জোরে - জোরে মাথা নাড়তে লাগল।

লোকটা বিশ্বাস করলো না। টুপিকের ভেতরে ঢুকলো। একটু পরে বেরিয়ে এলো। গাড়িতে উঠতে-উঠতে বললো, 'কাউকে দেখলে খবর দিবি'।

বুড়ী মাথা নেড়ে বললো, 'আচ্ছা।'

বরফের ওপর ছড্ - ছড্ শব্দ তুলে শ্লেজগাড়িটা চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কুকুরগুলোর ডাক শোনা গেলো। তারপর গাড়িটা পাহাড়ের আড়ালে চলে গেলো। ফ্রান্সিস বরফের ফাটলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। বুঝলো, এখানে থাকা নিরাপদ নয়। ইউনিপেড্রা নিশ্চয়ই হন্যে হয়ে খুঁজছে। কোর্টন্ডের দিকে পালাতে হবে। কিন্তু তার জন্যে একটা শ্লেজগাড়ি চাই।

ও সন্ধ্যে থেকে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলো। ঘুম থেকে উঠে খেয়ে নিলো। তারপর বুড়ী আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। রাত একটু গভীর হতেই ফ্রান্সিস তরোয়ালটা কোমরে ঝুলিয়ে, চামড়ার আর পশুর লোমে তৈরী চাদরটা গলায় জড়িয়ে নিলো। তারপর টুপিক থেকে বেরিয়ে এলো। বুড়ীকে ডাকলো না।

বাইরে কালকের রাতের মতোই জ্যোৎস্না পড়েছে। অপরূপ দেখাচ্ছে বরফের পাহাড়টা, যেন চাঁদের নরম আলো গায়ে মেখে শূন্যে ভাসছে ওটা।

পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে ফ্রান্সিস বেশ কিছুক্ষণ পর বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে গীর্জাটার কাছে এলো। গীর্জা, পাথরের বাড়িগুলোর আড়ালে - আড়ালে গুঁড়ি মেরে রাস্তার ধারে চলে এলো। অনেকক্ষণ থেকেই ইউনিপেড্দের ড্রাম বাজানো, হৈ-হল্লা শুনতে পাচ্ছিল। একবার দেখলো, পাশে একটা বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। অনেক ইউনিপেড্ আগুনটার চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে বসেছে। ড্রামের বাদ্যি চলছে, গানও গাইছে অনেকে। আর আগুনে মাংস ঝলসানো চলছে।

ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে লাগলো, যদি কোন শ্লেজগাড়ি পাওয়া যায়। দেখলো, শ্লেজগাড়ি কয়েকটাই আছে। কিন্তু কুকুর আর বল্গা হরিণগুলো খুঁটিতে বাঁধা। হরিণ বা কুকুরগুলো নিয়ে গিয়ে গাড়িতে জোড়া, বেশ ঝুঁকির ব্যাপার। ও যখন ভাবছে শেষ পর্যন্ত এই ঝুঁকি নিতেই হবে, তখনই দেখলো, একটা শ্লেজগাড়ি রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াল। দুটো লোক নামলো গাড়িটা থেকে। ম্লান চাঁদের আলোয় ও একটা লোককে চিনলো, সেই শক্তিশালী চেহারার লোকটা। সঙ্গীটিকে নিয়ে লোকটা আগুনের কুণ্ডের দিকে যেতে লাগলো। ফ্রান্সিস আনন্দে লাফিয়ে উঠলো, একেবারে তৈরী শ্লেজগাড়ী পাওয়া গেছে। লোকটা বোধহয় এই গাড়ি চড়ে ওকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ফ্রান্সিস পাথরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর বরফের ওপর গুঁড়ি মেরে-মেরে শ্লেজগাড়িটার কাছে এলো। ইউনিপেড্রা তখন ড্রাম পেটাচ্ছে, হৈ-হল্লা করছে। সে আস্তে-আস্তে গাড়িটাতে উঠে বসল। ধীরগতিতে গাড়িটা পাথরের বাড়ির আড়ালে-আড়ালে চালিয়ে নিয়ে কিছুটা দূরে এলো। এমন সময় ঐ অগ্নিকুণ্ডের দিক থেকে, কে যেন চীৎকার করে বললো। ও দেখলো, কয়েকজন ইউনিপেড্ কুঠার হাতে ছুটে আসছে। ও এবার কুকুরগুলোর গায়ে জোরে চাবুক হাঁকালো। কুকুরগুলো জোরে ছুটতে লাগল। গাড়ি ছুটল দ্রুতগতিতে। একটু পরেই গাড়িটা বরফের প্রান্তরে এসে পৌঁছল। ও পেছনে তাকিয়ে দেখলো, বিস্তৃত তুষার প্রান্তরে লোকজন বা গাড়ির কোন চিহ্ন নেই।

গাড়ি চললো, ফ্রান্সিস আর গাড়ি থামাল না। বাকী রাতটুকু সমান গতিতে চালাতে লাগলো। বলা যায় না, বল্গা হরিণ-টানা শ্লেজগাড়ি নিয়ে যদি ইউনিপেড্রা ওর নাগাল পায়।

পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত গাড়ি চালালো। কিন্তু গাড়ির গতি কমে এলো।

কুকুরগুলো অনেকক্ষণ ছুটে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে নিজেও যথেষ্ট ক্লান্তবোধ করছিল, তাই গাড়ি থামালো। কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিলে, তারা বসে জিভ বার করে হাঁপাতে লাগল। সে এবার গাড়িটায় কী-কী আছে পরীক্ষা করে দেখলো, সিন্ধুঘোটকের শুকনো মাংস, সীলমাছের টুকরো যত্ন করে রাখা। ঠ্যাং চর্বি-নাড়িভুঁড়ি এসব কুকুরের খাদ্যও আছে। শুকনো কাঠের টুকরো পেল কিছু, কিন্তু তাঁবু নেই। সেই খোলা প্রান্তরে ও চক্‌মকি ঠুকে আগুন জ্বেলে মাংস রাঁধলো। নিজেও খেলো, কুকুরগুলোকেও খেতে দিল। তারপর আবার সব গুটিয়ে নিয়ে দক্ষিণমুখো গাড়ি চালালো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোর্টল্ড পৌঁছতে হবে।

সন্ধ্যে হলো, তবু ফ্রান্সিস গাড়ি থামালো না। একটু রাত হতে গাড়ি থামিয়ে আবার আগুন জ্বেলে রান্না করলো। নিজে খেলো, কুকুরগুলোকেও খেতে দিল। তারপর উন্মুক্ত বরফের প্রান্তরে বল্গা হরিণের চামড়া পেতে শুয়ে পড়লো। পায়ের কাছে আগুন জ্বালিয়ে রাখল। ওর ভাগ্য ভাল, তুষার বৃষ্টি হলো না, শান্তিতেই কাটল রাতটা।

পরদিন আবার যাত্রা। এই পথে অনেক চাঁই-ভাঙা বরফ ভেঙে গাড়ি চালাতে হলো। খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে গিয়ে গাড়ির গতি গেল কমে। এবড়ো খেবড়ো সেই বরফের প্রান্তর পেরোতে দুপুর গড়িয়ে গেল। দুপুরে বিশ্রাম করে খাওয়া দাওয়া সেরে, সে আবার গাড়ি চালাতে লাগল।

সন্ধ্যের আবছা অন্ধকারে কোর্টল্ডের পাথরের বাড়িঘর নজরে পড়ল। বির্বিঘ্নে পথটা পার হতে পেরেছে বলে, সে মনে-মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো।

রাজা সোক্কাসনের বাসস্থান খুঁজে পেতে বেশী দেরী হলো না। একটা পাথরের বাড়িতে পুত্র ও রানীকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। বাড়িটার চারদিকে পাহারা দিচ্ছে একদল সৈন্য। ফ্রান্সিসকে দেখে ওরা চিনতে পেরে পথ ছেড়ে দিল।

একটা ঘরে বল্গা হরিণের চামড়ার বিছানায় রাজা সোক্কাসন বসেছিলেন। একটা মৃদু আলো জ্বলছিল ঘরে। ফ্রান্সিস রাজাকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। রাজা কেমন যেন শূন্যদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন। রাজার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চোখ-মুখ দেখে সে মনে ব্যথা পেল। আস্তে-আস্তে বাট্টাহালিডে কী ঘটেছে, কী করে ও পালালো এইসব কথাই বলে গেল। রাজা শুনে গেলেন। তারপর বিষাদগ্রস্ত স্বরে বললেন, 'ফ্রান্সিস, আমি রাজ্যোদ্ধারের কোন আশাই দেখছি না। বাকী জীবনটা আমাকে এখানেই নির্বাসনে কাটাতে হবে।'

ফ্রান্সিস বললো, 'উদ্যম হারাবেন না মহারাজ। আমি একটা পরিকল্পনা ছকে নিয়েছি। যদি সফল হই, তাহলে আপনি আবার রাজ্য ফিরে পাবেন।'

রাজা কিছুক্ষণ ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'দেখুন চেষ্টা করে।'

—'আচ্ছা নেসার্ক কোথায়?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—'ও আঙ্গাগাসালিকে গেছে, খাবার-দাবার জিনিসপত্র আনতে।'

—'কবে ফিরবে।'

—'আজকেই ফেরার কথা।'

—'তাহলে আমি কিছুক্ষণ পরে আসবো।'

ফ্রান্সিস ঘরের বাইরে এলো। ও নুয়ালিকের খোঁজে বেরলো। খুঁজতে-খুঁজতে ও

স্থানীয় এস্কিমো-সর্দারের তাঁবুতে এলো। নুয়ালিক তাঁবুতেই ছিল, তাকে দেখে হাসল। ফ্রান্সিস বললো, 'নুয়ালিক, একটা থাকবার আস্তানা দাও।'

নুয়ালিক সব কথা বুঝল না, শুধু হাসতে লাগলো। ফ্রান্সিস তখন অঙ্গ-ভঙ্গী করে বোঝালো, ও শুয়ে থাকবার জায়গা চায়। নুয়ালিক মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝালো, তার একটা আস্তানা ও করে দেবে। সেটা করে দিলও। বড় তাঁবুটার কোণার দিক থেকে একটা ছোট ছেঁড়া তাঁবুর জায়গাগুলো দেখে ফ্রান্সিস হতাশ হলো। এই ছেঁড়া তাবুতে কি থাকা যাবে? নুয়ালিক ওর মনের ভাব বুঝতে পারল। একটু হেসে ও নিজের তাঁবু থেকে ছুঁচ আর চামড়া-পাকানো সুতো নিয়ে এলো। এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁবুটা সেলাই করে একেবারে নতুনের মতো করে দিল। তাঁবুর ভেতরে একটা কাঠের পাটাতনমতো পেতে দিল। তার ওপর সিন্ধুঘোটকের চামড়া পেতে দিল। ফ্রান্সিস চুরি-করা শ্লেজগাড়িতে কিছু বিছানার সরঞ্জাম পেল। সে-সব পেতে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সুন্দর বিছানামত হয়ে গেল। একটা সীলমাছের তেলের প্রদীপও জ্বেলে দিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ এই নতুন আস্তানাটায় রইলো। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে পরবর্তী যে কাজগুলো করতে হবে, সে-সব ভাবল। সবার আগে নেসার্ককে চাই। একমাত্র সেই হ্যারির খোঁজ আনতে পারবে। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে উঠে পড়লো। চললো, যে বাড়িতে রাজা আছেন সেইদিকে। বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছল যখন তখন রাত হয়েছে। বাইরে একজন এস্কিমো সৈন্য ভাবভঙ্গীতে জানালো, রাজা শুয়ে পড়েছেন। এখন দেখা হবে না। ফ্রান্সিস ওকে বারবার বলতে লাগলো, 'নেসার্ক ফিরেছে কিনা, সেই খবরটা আমার চাই।'

সৈন্যটা কিছুই বুঝতে পারল না। তখন সে বারবার 'নেসার্কে'র নাম করতে লাগল। সৈন্যটা তখন আঙ্গুল দিয়ে একটা তাঁবু দেখালো। তাহলে নেসার্ক ঐ তাঁবুটাতেই আছে।

ফ্রান্সিস তাঁবুটার কাছে গিয়ে নেসার্কের নাম ধরে ডাকতেই, সে বেরিয়ে এলো। ও তো ফ্রান্সিসকে দেখে অবাক, ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। দুজনে তাঁবুটাতে ঢুকল। আরো দু'জন এস্কিমো সৈন্য ভেতরে শুয়ে আছে। নেসার্ক বাট্টাহালিডের খবর জিজ্ঞেস করলো। সে সব ঘটনা বলে গেল, হ্যারীর বন্দীদশার কথাও বললো। এবার নেসার্ক জিজ্ঞেস করলো, 'আমার বাবা-মার সংবাদ কিছু জানেন?'

—'তোমাদের তাঁবুতেই আমি প্রথমে আশ্রয় নিয়েছিলাম।'

—'বাবা-মা ভালো আছে তো?'

'এ্যাঁ - হ্যাঁ - হ্যাঁ।' ফ্রান্সিস আমতা - আমতা করে বললো।

নেসার্কের মনে একটু সন্দেহ দেখা দিল। বললো, 'সত্যি করে বলুন।'

ফ্রান্সিস একটু ভাবল, এখন সামনে অনেক কাজ। নেসার্ক যদি বাবার মৃত্যুসংবাদে ভেঙে পড়ে, তাহলে সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে।

হ্যারি এখনও বন্দী, যা করবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে হবে। তবু বাবার মৃত্যু-সংবাদ ছেলের কাছে গোপন রাখা উচিত হবে না। সে নেসার্কের কাঁধে হাত রাখলো। তারপর বলতে লাগলো, 'নেসার্ক আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ। আমার বন্ধুকে বাঁচাতে হবে। বাট্টাহালিড্ ইউনিপেড্দের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে। এখন তোমার সাহায্য না পেলে আমি কিছুই করতে পারবো না।'

—'আপনি সত্যি কথাটাই বলুন। যত দুঃখের হোক, আমি সহ্য করবো।'

—'তোমার বাবাকে ইউনিপেড্রা মেরে ফেলেছে।'

নেসার্ক শুধু একবার তার মুখের দিকে তাকালো। তারপর মাথা নীচু করে বসে রইলো। একটু পরেই ওর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো। ফ্রান্সিস বুঝলো, ও নিঃশব্দে কাঁদছে। সে ওর দু'কাঁধে হাত রেখে ডাকল, 'নেসার্ক, ভাই কেঁদো না, বরং প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবো।'

নেসার্ক ক্ষাণিকক্ষণ চুপ করে থেকে চোখ মুছলো। তারপর সহজ গলায় বললো, 'আমি এর প্রতিশোধ নেবো।'

ফ্রান্সিস উৎসাহের সঙ্গে বললো, 'আমিও তাই বলি। ভেঙে পড়লে চলবে না। মনকে শক্ত করে কর্তব্যগুলো করে যেতে হবে। এখন এছাড়া উপায় নেই।'

—'আপনি কি ভেবেছেন বলুন'। নেসার্ক সহজ গলায় বললো।

—'আমার মূল পরিকল্পনা কার্যকর করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন হ্যারিকে, মানে আমার বন্ধুকে মুক্ত করে আনা। এটা আমরা পারবো না। কারণ আমাদের ওরা সহজেই চিনে ফেলবে।'

—'আমি চেষ্টা করবো।' নেসার্ক বললো, 'আপনি জানেন না, আমি অনেকদিন ইউনিপেড্দের হাতে বন্দী ছিলাম। ওদের ভাষা, জীবনযাত্রার পদ্ধতি সবই আমি জানি।'

—'তাহলে একমাত্র তুমিই পারবে।'

—'বেশ, এখন আপনি কী করবেন?'

—'কাল সকালেই আমি রাজা সোক্কাসনের কাছে একটা বল্গা হরিণ-টানা শ্লেজগাড়ি চাইব। গাড়ি নিয়ে আমি আঙ্গামাগাসালিকে যাবো। আমার বন্ধুদের নিয়ে এখানে আসব। তার পরের পরিকল্পনাটা এখানে এসে তৈরী করবো। তুমি ততোদিন কোথাও যাবে না, এখানেই থাকবে। ইউনিপেড্দের রাজা এভাল্ডাসন যে কোন মুহূর্তে আমার বন্ধুকে মেরে ফেলতে পারে।'

ঠিক আছে, আপনি আপনার বন্ধুদের নিয়ে আসুন। আমি এখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করবো।

ফ্রান্সিস ওর হাত জড়িয়ে ধরে ঝাঁকুনি দিল। তারপর তাঁবুর বাইরে চলে এলো। নিজের তাঁবুতে ফেরার সময় দেখলো, দিগন্তবিস্তৃত বরফের প্রান্তরে মৃদু জ্যোৎস্না পড়েছে। ও হিসেব করে দেখলো, এখন শুক্লপক্ষ চলছে। তার মানে আরও বেশ ক'দিন রাত্রে চাঁদের আলো পাওয়া যাবে। এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না।

পরদিন সকালেই নেসার্ককে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস রাজার সঙ্গে দেখা করলো। সে মোটামুটি তার পরিকল্পনা বললো। রাজা যেন কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। বললেন, 'তুমি পারবে ইউনিপেড্দের তাড়াতে?'

—'চেষ্টার ত্রুটি করবো না। এখন আমার একটা দ্রুতগামী গাড়ি চাই।'

—'তুমি আমার গাড়িটাই নাও। আমি তো আর এখন কোথাও বেরোচ্ছি না।' সেইমত নির্দেশ দিলেন।

বাইরে এসে ফ্রান্সিস নেসার্ককে বললো, 'তুমি গাড়িটা নিয়ে আমার তাঁবুর কাছে এসো। প্রায়োজনীয় সব জিনিস গাড়িটাতে দিও। আমিও আমার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়ে তৈরী থাকবো।

তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে ফ্রান্সিস তৈরী হয়ে নিল। একটু পরেই নেসার্ক রাজার বল্গা

হরিণে টানা গাড়িটা নিয়ে হাজির হলো। সব দেখে-শুনে সে দক্ষিণমুখো গাড়ি চালাতে লাগলো।

বল্গা হরিণে - টানা গাড়ি। তুষারের প্রান্তর দিয়ে অত্যন্ত বেগে ছুটে চললো। ও স্থির করল, সন্ধ্যের আগে আর গাড়ি থামাবে না। কিন্তু বিকেলের দিকে কুয়াশার গাঢ় আস্তরণের সামনে সব কিছু ঢেকে দিল। একটু পরেই প্রায় মাথার কাছে নেমে আসা মেঘ - কুয়াশা, তুষারবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ওর গাড়ি ধীরে-ধীরে চললো। ওর সমস্ত পোশাক তুষারে ঢেকে গেল।

ওর ভাগ্য ভালো বলতে হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রচণ্ড হাওয়ার ঝাপটা শুরু হলো। মেঘ - কুয়াশা উড়ে গেল, হাওয়ার বেগের প্রচণ্ডতাও কমলো। সন্ধ্যের মুখে আকাশে মেরু-নক্ষত্র দেখা দিল। একটু পরে অস্পষ্ট চাঁদের আলোও দেখা গেল। ফ্রান্সিস বুঝল, হরিণগুলোর বিশ্রাম দরকার। নিজেও ক্লান্ত, এবার বিশ্রাম চাই। দুটো চাঁইয়ের কাছে এসে ও গাড়ি থামালো। দুটো চাঁইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় তাঁবু খাটালো। চকমকি ঠুকে আগুন জ্বেলে, শুকনো মাংস রাঁধলো। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লো। নানা চিন্তা মাথায় ভীড় করে এলেও, ওরই মধ্যে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন আবার পথ চললো। গাড়ির গতি যথেষ্ট বাড়িয়ে দিল। একেবারে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত একনাগাড়ে গাড়ি চালালো। দুপুরে বিশ্রামও নিল না, কিছু খেলোও না। সন্ধ্যেয় গাড়ি থামলো, রাত্রির মতো বিশ্রাম।

তিনদিনের দিন ও আঙ্গামাগাসালিক বন্দরে পৌঁছল। দূর থেকে সাঙুই ওকে প্রথম দেখলো, তখন দুপুর। সাঙখু ছুটতে-ছুটতে কাছে এলো। গাড়ি থামিয়ে সাঙখুকে তুলে নিল। যেতে যেতে বললো, 'কেমন আছো সাঙখু?'

সাঙখু হেসে মাথা ঝাঁকালো।

সমুদ্রের ধারে এসে থামল। দেখলো, ওদের জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে ও বন্ধুদের ডাকতে লাগলো। জাহাজের ডেকেই দাঁড়িয়ে ছিল বিস্কো। ফ্রান্সিসকে দেখে ওর মুখ খুশীতে ভরে উঠলো। ও ছুটোছুটি করে সবাইকে ডাকতে লাগলো। সবাই এসে ডেক-এ জড়ো হলো। কিন্তু ওরা বেশ অবাক হলো ফ্রান্সিসের সঙ্গে হ্যারিকে না দেখে। ওরা তাড়াতাড়ি জাহাজ থেকে দড়ির সিঁড়ি ফেলে দিল। ফ্রান্সিস আর সাঙখু সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে জাহাজে উঠে এলো। সব বন্ধুরা ফ্রান্সিসকে ঘিরে ধরল। হ্যারির কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো।

ফ্রান্সিস সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বলে গেল। তারপর সবাইকে সম্বোধন করে বললো, 'ভাইসব, অনেক বিশ্রাম করেছো। আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না। সাঙখুর সঙ্গে কয়েকজন চলে যাও। অন্ততঃ চারটে স্লেজগাড়ি আর কুকুর জোগাড় করে আনো। আমরা এক্ষুণি কোর্টল্ড রওনা হবো।'

বিস্কো বললো, 'ফ্রান্সিস, আমাদের আধঘন্টা সময় দাও। আমরা খেয়ে-দেয়ে তৈরী হয়ে নিচ্ছি। তোমারও নিশ্চয়ই খাওয়া হয়নি?'

—'বেশ আমিও খেয়ে - দেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সারতে হবে।'

সাঙখু স্লেজগাড়ি যোগাড় করতে চলে গেল। একটু পরেই এস্কিমো - সর্দার কালুটুলা এলো। বোধহয় সাঙখুর কাছে খবর পেয়েছে। ও মুখ গম্ভীর করে ফ্রান্সিসের কাছে সব শুনলো তারপর ভাঙা-ভাঙা নরওয়ের ভাষায় বললো, 'ইউনিপেড্রা বর্বর অসভ্য।

ওদের বিশ্বাস করো না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধুকে বাঁচাও'।

কালুটুলা আর কোন কথা না বলে জাহাজ ছেড়ে চলে গেল।

সমুদ্রের ধারেই সব স্লেজগাড়ি তৈরী হয়ে নিল। ফ্রান্সিস সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস গাড়িতে তুলে নিতে বললো। গোটাদশেক কুঠারও নিতে বলে দিলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই তৈরী হয়ে গাড়িতে এসে বসল। ফ্রান্সিসও তার গাড়িতে উঠলো এমন সময় কুঠার হাতে সাঙখু এসে হাজির। বললো, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।'

অগত্যা ওকেও গাড়িতে তুলে নেওয়া হলো। রওনা হবার আগে ফ্রান্সিস গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে বললো, 'চাবুক চালাবার সময় সাবধান, যেন চাবুকটা লম্বা লাগামে আটকে না যায়। কারো অসুবিধে হলে সাঙখুকে ডেকো, ও সব বুঝিয়ে দেবে।'

ফ্রান্সিস গাড়িতে বসে ওর গাড়ি ছেড়ে দিলে। দেখা গেল, সবাই ওর পেছনে পেছনে গাড়ি চালাতে শুরু করলো।

যাত্রা শুরু হলো, গাড়ির মিছিল চললো। গাড়ি চলাকালে বরফ ভাঙার খসখস শব্দ, ওদের কথাবার্তা, ডাকাডাকির শব্দে নির্জন বরফের প্রান্তর মুখর হয়ে উঠলো। কিছু দূরে যেতেই দুটো গাড়ি আটকে গেল। সেই চাবুক লাগামে আটকে যাওয়ার ব্যাপার। সাঙখু উঠে এসে চাবুক খুলে আবার গাড়ি চালু করল। আবার সব গাড়ির একসঙ্গে চলা শুরু হলো।

ফ্রান্সিস যতটা তাড়াতাড়ি কোর্টন্ডে পৌঁছবে ভেবেছিল, তা আর হলো না। প্রায় পাঁচদিন লেগে গেল। এখানে পৌঁছে তারা আগের তাঁবুটাতে আস্তানা নিল। পথে তুষার-ঝড়ের পাল্লায় পড়তে হলো না বলে ওরা খুশী হলো।

সন্ধ্যেবেলা ফ্রান্সিস সবাইকে নিজের তাঁবুতে ডাকলো। সবাই এলে সে বললো, 'ভাইসব, আমাদের আর দেরী করা চলবে না। আমি নেসার্ককে নিয়ে কাল সকালেই বাত্ত্রাহালিডে রওনা হবো। তোমরা দুপুর নাগাদ রওনা দেবে। সাঙখু তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তোমরা কুকুরটানা গাড়িতে যাবে, কাজেই তোমাদের ওখানে পৌঁছতে দেরী হবে। তোমরা পৌঁছবার আগেই আমরা হ্যারিকে মুক্ত করবো। তার পরের কাজ ওখানে তোমরা পৌঁছবার পর ঠিক করব।

সভা ভেঙে গেল। কথা বলতে-বলতে ওর বন্ধুরা নিজেদের তাঁবুতে চলে গেল। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে সে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভাবতে লাগলো।

ভোর হতেই নেসার্ক ওর কাছে এলো। রাজা সোক্কাসনের বল্গা হরিণ-টানা স্লেজগাড়িটা ওর তাঁবুর বাইরে রাখা ছিল। খুব তাড়াতাড়ি সব গোছ-গাছ করে নিয়ে ও আর নেসার্ক গাড়িতে উঠে বসল। বন্ধুরা কয়েকজন এসে বিদায় জানালো। ও গাড়ি ছেড়ে দিতে বললো। নেসার্ক গাড়ি চালাতে লাগলো। ও গাড়ি চালাতে ওস্তাদ। নিপুণ হাতে বেশ দ্রুতগতিতে ও গাড়ি চালাতে লাগলো।

গাড়ি চললো বরফের প্রান্তরের ওপর দিয়ে। আকাশ অনেকটা পরিষ্কার। বেশ দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। দুপুরের একটু আগে ওরা দুটো মেরুভল্লুক দেখলো। কাছাকাছি আসতে দেখলো, একটা মা-ভালুক আর বাচ্চা। নেসার্ক গাড়ি চালাতে-চালাতে বললো, 'বাচ্চাটা ধরবো নাকি?'

—'না।' ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বললো, 'এখন প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কাছে মূল্যবান।'

নেসার্ক আর কোন কথা না বলে গাড়ি চালাতে লাগলো। ভালুক দুটোর কিছু দুরে গাড়িটা চললো। নেসার্ক বেশী কাছে গেল না। এক মা ভালুক তার ওপর সঙ্গে বাচ্চা আছে। হয়তো আক্রমণ করে বসতে পারে।

কিছুদূর এগিয়ে ওরা তাঁবু খাটালো। রান্না-খাওয়া সেরে আবার গাড়ি ছোটালো। পথে ওরা মেরু জ্যোতি দেখলে,া, কি অপরূপ দৃশ্য। ফ্রান্সিস আগেও দেখেছে, তাই খুব অবাক হলো না। তাছাড়া ওর মনে তখন নানা চিন্তা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার মত মনের অবস্থা নয়।

দিন চারেকের মধ্যেই ওরা বাট্টাহালিডের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। তখন সকাল, আকাশে মেঘকুয়াশা নেই। অনুজ্জ্বল রোদে ওরা দূর থেকে বাট্টাহালিডের ঘর-বাড়ি, টুপিক দেখতে পেল। ফ্রান্সিস তখন গাড়ি চালাচ্ছিল, ও গাড়ি থামালো। আর এগুনো ঠিক হবে না। ইউনিপেড্‌দের নজরে পড়ে যেতে পারে ওরা। গাড়ি থামিয়ে তাঁবু খাটালো। একটু বিশ্রাম করে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সারল।

তারপর ফ্রান্সিস নেসার্ককে বললো, 'নেসার্ক, তুমিতো আমাদের থাকবার ঘরটা দেখেছ। আমার বন্ধু হ্যারি ঐ ঘরেই আছে। খুব সাবধানে তাকে মুক্ত করতে হবে।

—'এখন নয়, আমি রাত্রে যাবো।' নেসার্ক বললো।

—'বেশ-' ফ্রান্সিস বললো।

'সন্ধ্যে গেল, রাত হলো। রাত বাড়তে নেসার্ক একটা কুঠার হাতে নিল। তারপর তাঁবু থেকে বেরলো। ওখানে শ্লেজগাড়ি নিয়ে যাওয়া চলবে না, হেঁটে যেতে হবে। ফ্রান্সিস নেসার্কের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল, নেসার্ক মৃদু হাসল। তারপর বরফের প্রান্তরের ওপর দিয়ে বাট্টাহালিডের দিকে হাঁটতে লাগলো। আকাশে ভাঙা চাঁদ, মৃদু জ্যোৎস্না পড়েছে বরফের ওপর। নেসার্ক হেঁটে চললো।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ সেই বরফের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তাঁবুতে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুমুতে পারলো না। নানা চিন্তা ভীড় করে এলো। মাঝে-মাঝে তন্দ্রা এলো। পরক্ষণেই তন্দ্রা ভেঙে উঠে বসতে লাগলো। নেসার্ক কখন ফেরে এই চিন্তা। হ্যারি কেমন আছে, কে জানে?

রাত শেষ হয়ে এসেছে তখন। নেসার্কের ডাকে ওর তন্দ্রা ভেঙে গেলো। নেসার্ক বিছানায় বসে হাঁপাতে লাগলো। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। ফ্রান্সিসের মন চিন্তাকুল, উৎকণ্ঠিতও। তবু কোন প্রশ্ন করলো না। একটু পরে নেসার্ক বললো, 'আপনাদের ঐ ঘরে হ্যারি নেই।'

ফ্রান্সিস চমকে উঠে বসলো। 'তবে ও কোথায়?'

—'তার হদিশ করতে পারিনি, তবে খবর জোগাড় করেছি যে, কিছু এস্কিমোকে রাজা এভাল্ডাসান রাজবাড়িতে বন্দী করে রেখেছে। কাল রাত্রে সেখানে খোঁজ করবো'।

পরের দিনটা শুয়ে বসে কাটালো। আবার রাত হলে নেসার্ক কুঠার হাতে বাট্টাহালিডের দিকে চললো।

সারারাত ফ্রান্সিস দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারলো না। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। আবার উঠে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ায়। দেখে নেসার্ক আসছে কিনা। শেষরাতের দিকে নেসার্ক ফিরে এলো। বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলো। তারপর ডাকলো 'ফ্রান্সিস?'

—'বলো। হ্যারিকে পেলে?'

—'একটা দুঃসংবাদ আপনাকে দিতে হচ্ছে।'

—'শীগগির বলো।'

—'হ্যারি - মারা গেছে।'

ফ্রান্সিস দ্রুত বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো। ওর বুক থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ও দ্রুত এগিয়ে এসে নেসার্কের দু'কাঁধে হাত রাখলো, 'সব বলো নেসার্ক।'

রাজবাড়িতে যারা বন্দী আছে, তাদের মধ্যে হ্যারিকে দেখলাম না। তাহলে হ্যারিকে কোথায় রাখা হয়েছে? রাজবাড়ির অন্য ঘরগুলো, টুপিকগুলো, সব জায়গায় খুঁজে-খুঁজে দেখলাম। হতাশ হলাম, কোথাও হ্যারি নেই।' নেসার্ক একটু থামলো। তারপর বলতে লাগলো, 'ওদের নাচ - গানের এক আসরে গিয়ে বসলাম। সেখানেই ইউনিপেড্‌দের এক সর্দারের সঙ্গে ভাব জমালাম।

—'হ্যাঁ, ঐ লোকটাকে আমি চিনেছি। আমাদের দেখাশুনার ভার ছিল ঐ লোকটার ওপরে। ওর শ্লেজগাড়িটা নিয়েই আমি পালিয়েছিলাম।

—'তারপর?'

—'কথায়-কথায় ও বললো, একদিন রাত্তিরে ওরা নাকি দেখে, হ্যারি ঘরে মরে পড়ে আছে।'

—'তাহলে ওরা হ্যারিকে মারেনি?'

—'ও তো তাই বললো। ওরা আর বৈদ্যি-টদ্যি ডাকেনি, একটা বিদেশীর জন্যে কে আর ঝামেলা অতো পোহায়? ওরা মৃতদেহটা সক্কারটপ পাহাড়ের এক গুহায় ফেলে দিয়েছিল।'

ফ্রান্সিস মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে রইলো। ও নিজেকে সংযত করবার অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। একসময় দু'হাতে মুখ ঢেকে ও কেঁদে উঠলো। নেসার্ক ওর কাঁধে হাত রাখলো সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ফ্রান্সিসের কান্না বন্ধ হল না। ওর বারবার হ্যারির কথা মনে হতে লাগলো। হ্যারির হাস্যোজ্জ্বল মুখ, ওর কথা বলার ভঙ্গী ও প্রতিজ্ঞাদৃঢ় মুখ, সবই মনে পড়তে লাগলো। ফ্রান্সিস কাঁদতে লাগলো।

সে যখন একটু শান্ত হল, তখন ভোর হয়ে গেছে।

একটু বেলায় ফ্রান্সিসের বন্ধুরা এসে পৌঁছল। বিস্কো ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। দেখলো, সে শুয়ে আছে। ওরা এল, অথচ সে একবারও তাঁবুর ভেতর থেকে বেরল না, এটা বিস্কোর কাছে একটু অদ্ভুত লাগলো। ও বুঝলো, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। ও আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিসের গায়ে ধাক্কা দিল। বললো, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

ফ্রান্সিস এতক্ষণ চোখ চাপা দিয়ে শুয়ে ছিল। এবার চোখের ওপর থেকে হাতটা সরালো। বিস্কো দেখলো, ফ্রান্সিসের চোখে জল। বলে উঠলো 'কী হয়েছে ফ্রান্সিস?'

ফ্রান্সিস কোন কথা বলতে পারলো না। বিস্কো বুঝলো, হ্যারি নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে। ও জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যারি কেমন আছে?'

ফ্রান্সিস ভগ্নস্বরে আস্তে - আস্তে বললো, 'বিস্কো হ্যারি মারা গেছে।'

বিস্কো চমকে উঠে বললো, 'বলো কি?'

তখন ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে নেসার্ক যে খবর এনেছে, সব বললো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসের বন্ধুরা খবরটা শুনলো। এতক্ষণ ওরা বেশ খুশীমনে তাঁবুতে কাটাচ্ছিল। নতুন দেশ, ভালোই লাগছিল ওদের। হ্যারির মৃত্যুসংবাদ মুহূর্তে ওদের সবাইকে স্তব্ধ করে দিলো। সবাই নিঃশব্দে ফ্রান্সিসের তাঁবুতে এসে ওকে ঘিরে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস উঠে বসল। তারপর ধীরস্বরে বলতে লাগলো, 'ভাইসব, আজকে আমাদের বড় শোকের দিন। আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু হ্যারি মারা গেছে। কিন্তু আমি কোনদিন হার মানি নি, আজকেও মানবো না। হ্যারির মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নেবই। একটু থেমে ও বলতে লাগলো, 'ভাইসব, আমি পরিকল্পনা ছকে রেখেছি। আজ রাত্রেই আমরা বাট্টাহালিড্‌কে ডানদিকে রেখে অনেকটা ঘুরে সক্কারটপ পাহাড়ে যাবো। সবাই সারাদিন বিশ্রাম করে নাও। সন্ধ্যের পরেই অন্ধকার হলে আমরা আবার যাত্রা শুরু করব।'

সবাই আস্তে - আস্তে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে গেল। সন্ধ্যের পর ভাইকিংদের মধ্যে কর্মতৎপরতা শুরু হল। সবাই বরফের প্রান্তরে এসে দাঁড়ালো।

বিস্কো ফ্রান্সিসকে ডাকতে এল। 'ফ্রান্সিস, আমরা তৈরী, চলো।'

ফ্রান্সিস তাঁবুর বাইরে এল। বিস্কো বললো, 'আমরা কি শ্লেজগাড়িতে যাবো।'

—'না।' ফ্রান্সিস বললো, 'গাড়ির কুকুর নিশ্চয়ই চুপ করে থাকবে না, ডাকবে। তাহলে আমরা ধরা পড়ে যাবো। আমাদের হেঁটে যেতে হবে। সবাইকে কুঠার নিতে বলো।

পরপর সবাই দাঁড়াল। একটু রাত হতেই যাত্রা শুরু হলো। আকাশে ভাঙা চাঁদ উঠল একটু পরেই। নরম জ্যোৎস্না পড়ল বরফের প্রান্তরে। শুধু জুতোর তলায় বরফ ভাঙার শব্দ আর উত্তরে হাওয়ার শন্‌-শন্‌ শব্দ। চারদিকে আর কোন শব্দ নেই।

প্রায় মাঝরাতে ওরা সক্কারটপ পাহাড়ের তলায় গিয়ে পৌঁছল। তারপর ঘুরে পাহাড়ের পেছনে গেল। সেখান থেকে পাহাড়ে ওঠা শুরু হল। এতদূর হেঁটে এসে তারপর পাহাড়ে ওঠা। সকলেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

বিস্কো ফ্রান্সিসকে বললো, 'সবাই খুব ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম নিতে দাও।'

ফ্রান্সিস বিস্কোর দিকে তাকাল। দৃঢ়স্বরে বললো, 'না। আজ রাতের মধ্যেই সব সারতে হবে। পাহাড়ে উঠতে শুরু কর।' এই কথা বলে ফ্রান্সিস সবার আগে পাহাড়ে উঠতে লাগলো।

ফ্রান্সিসের সহ্যশক্তি দেখে সকলেই অবাক হল। তাকে দেখে মনেই হচ্ছিল না, ও এতটা পথ হেঁটে এসেছে। ওর সর্বাঙ্গে যেন প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা। বাকী সকলের আর বসা হল না। ওরা ফ্রান্সিসের পেছনে - পেছনে পাহাড়ে উঠতে লাগলো। কেউ - কেউ চাঁদের মৃদু আলোয় বরফের পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে লাগলো। পাহাড়ের প্রায় চূড়োর কাছাকাছি ওরা পৌঁছল, তখন বিস্ময়ে সবাই হতবাক হয়ে গেল। সম্মুখে গলা জলের বিরাট সরোবর। তাতে চাঁদের আলো পড়ে এক বিচিত্র রূপময় জগৎ রচনা করেছে। উত্তুরে হাওয়ার মাঝে-মাঝে মৃদু ঢেউ।

ফ্রান্সিস সকলের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর বললো, 'ভাইসব বরফ কেটে এই গলা জলের স্রোত আমরা বাট্টাহালিড্রের দিকে নামিয়ে দেবো। ভাসিয়ে দেবো। ভাসিয়ে দেব, তছনছ করে দেব সবকিছু। একটু থেমে বললো, 'এবার সবাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও কারণ এর পরে আর বিশ্রাম করার অবকাশ পাবে না। এই জলধারা নামতে

শুরু করলেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আমাদের পাহাড়ের পেছন দিকে নেমে যেতে হবে, নইলে সেই জলধারায় আমরাও ভেসে যাবো।

সবাই বরফের ওপর বসল। তখনও অনেকে হাঁপাচ্ছিল। ওখান থেকে কুয়াশার জন্যে বাট্টাহালিড্‌দের ঘর বাড়ী, তাঁবু গীর্জা কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু ইউনিপেড্‌দের ড্রাম বাজনা, হৈ-হল্লা শোনা যাচ্ছিল। বসে রইল অনেকে। কেউ-কেউ বরফের ওপর শুয়ে পড়লো। সকলেই অবাক হয়ে চাঁদ, পাহাড়, সরোবর দেখছিল।

কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। কুঠার হাতে নিয়ে বরফের ওপর কুঠার চালাল, শব্দ উঠল ঠক্। বেশ শক্ত বরফ। ফ্রান্সিসের দেখাদেখি আর সবাই উঠে দাঁড়াল। সবাই মিলে বরফের ওপর কুঠার চালাতে লাগলো। শুধু হাওয়ার শন্ - শন্ শব্দ, মানুষের শ্বাসের শব্দ আর বরফে কুঠারের আঘাতের শব্দ।

ঠক্ - ঠক্ - বরফ ভাঙার কাজ চলছে। রাত শেষ হয়ে এল প্রায়। চাঁদ দিগন্তের দিকে অনেকটা ঢলে পড়েছে। খাল কাটা শেষ হল। আবার একটু বিশ্রাম করে নিল সবাই। এবার সরোবরের দিক থেকে কয়েকটা বরফের চাঁই ভেঙে ফেলার পরই সরোবরের জল খাল দিয়ে নীচের দিকে ছুটল। ফ্রান্সিস কুঠার শূন্যে ঘুরিয়ে চীৎকার করে বললো, আর এক মুহূর্ত দেরী নয়। সবাই পাহাড়ের পেছন দিকে আসতে শুরু কর।'

সবাই ছুটল পাহাড়ের পেছন দিকে। বরফের চাইয়ে সাবধানে পা রেখে - রেখে সবাই নামতে লাগলো।

ওদিকে মুক্ত জলস্রোত ছুটলো নীচের দিকে। গলা জল বরফের চাঁইয়ের ফাটলগুলোতে ঢুকতে লাগলো। বরফের চাঁইগুলো আল্‌গা হয়ে যেতে লাগলো।

প্রচণ্ড শব্দে চাঁইগুলো ফেটে যেতে লাগলো। বড়-বড় বরফের টুকরো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ফ্রান্সিসদের কাটা খাল বড় হতে লাগলো। মুহুর্মুহু বরফের চাঁই ফাটতে লাগলো। জলপ্রপাতের মত জলধারা প্রচণ্ড বেগে ছুটল বাট্টাহালিড়ের দিকে। জলধারার প্রথম ধাক্কাতেই টুপিকগুলো খড়কুটোর মত ভেসে গেল। ফ্রান্সিসরা নামতে-নামতে বুঝতে পারছিল, মুর্হমুহ বরফের চাঁই ফাটার ধাক্কায় পাহাড়টা কেঁপে - কেঁপে উঠছে। বাট্টাহালিড়ের দিক থেকে ভেসে এল চীৎকার, কান্না-কাটির শব্দ। বিরাট-বিরাট বরফের চাঁই পাহাড়ের নীচে ভেঙে পড়তে লাগলো। গীর্জা, রাজবাড়ি আর অন্য সব পাথরের বাড়ি-ঘর ভেঙে পড়ল। গীর্জার চূড়োর কাঠের ক্রুশটা ভেঙে পড়ল। শুধু রাজবাড়িটার বিশেষ কোন ক্ষতি হলো না। তবে জলের প্রচণ্ড ধাক্কা থেকে রেহাই পেল না কিছুই।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চললো বরফ ফাটার শব্দ এবং জলস্রোত। ফ্রান্সিসরা ততক্ষণ অপেক্ষা করল পাহাড়ের ওপাশে। তারপর সবাই আসতে লাগল বাট্টাহালিড়ের দিকে। প্রান্তরের বরফ আর শক্ত নেই। যেখান দিয়ে জলধারা বয়ে গেছে সেখানে বরফ আর কাদায় জায়গাটা দুর্গম করে তুলেছে। তারই মধ্যে দিয়ে ওরা হেঁটে চললো।

ওরা যখন বাট্টাহালিডে ঢুকল দেখলো, এখানে - ওখানে ইউনিপেড্ সৈন্যরা মরে পড়ে আছে। একটা টুপিকও দাঁড়িয়ে নেই, সব ভেসে গেছে। শুধু রাজবাড়ি আর চূড়াভাঙা গীর্জাটা দাঁড়িয়ে আছে। রাজবাড়িটার অনেক জায়গায় পাথরের দেওয়ালের পাথর খসে পড়েছে। ফ্রান্সিস ভেবেছিল, এই জলধারায়, ইউনিপেড্ সৈন্যরা ভেসে

গেছে। কিন্তু রাজবাড়ির কাছাকাছি আসতেই, বেশ কিছু সৈন্যকে রাজবাড়ি থেকে আসতে দেখলো।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললো 'এখনও কিছু ইউনিপেড্ আছে। তোমরা তাদের মোকাবিলা করো। আমি গীর্জাটায় যাচ্ছি।'

ফ্রান্সিস একা গীর্জার দিকে চললো। এর মধ্যেই ভাইকিংদের সঙ্গে অবশিষ্ট ইউনিপেড্দের রাস্তায়, রাজবাড়িতে লড়াই শুরু হয়ে গেল। ইউনিপেড্রা কুঠার চালাতে ওস্তাদ। ভাইকিংরা কুঠার ফেলে তরোয়াল বের করে ওদের সঙ্গে লড়তে লাগলো। চাঁদের মৃদু আলোয় এই লড়াই চললো! উভয়পক্ষের চীৎকার ছুটোছুটিতে বাট্রাহলিড্ জেগে উঠলো।

ফ্রান্সিস গীর্জাটার দরজায় এসে দাঁড়ালো। দরজাটা হাঁ করে খোলা। বোঝা গেল, তালাটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। ও ভেতরে ঢুকল। অন্ধকারে কিছুই নজরে পড়ছে না। তবে জানলা দিয়ে যে অল্প চাঁদের আলো আসছিল, তাতে দেখলো, জানলার কাঁচ অনেকটা জায়গায় ভেঙে গেছে। কেমন ফাঁকা লাগছে বেদীটা। সেই আলোতেই ও দেখলো, যীশুর বড় মূর্তিটা মেঝেয় পড়ে আছে। হয়তো জলের ধাক্কায় পড়ে গেছে। কিন্তু কিভাবে কোথায় পড়ে আছে, দেখা যাচ্ছে না। ও মেঝের কাছে কড়াটার কাছে গেল। দেখলো, একটা মশাল আটকানো রয়েছে। চক্‌মকি ঠুকে মশাল জ্বালতে গেল। কিন্তু বরফজলে ভেজা মশাল সহজে জ্বলতে চায় না। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর মশাল জ্বললো। মশালের আলোয় দেখলো, যীশুর মূর্তিটা মেঝেয় উবু হয়ে পড়ে আছে। একটা হাত ভেঙে গেছে। ও মূর্তিটা তোলার জন্য হাত লাগালো। উঃ অসম্ভব ভারী। কয়েকজন মিলে ছাড়া যাবে না। এটা একার কর্ম নয়।

হঠাৎ দরজায় একটা ধাক্কার শব্দ হলো। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। মশালের অল্প আলোয় দেখলো, কে যেন ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ও ভাবল, কোন ভাইকিং বন্ধু বোধহয়। পরক্ষণেই ভুল ভাঙল, লোকটার হাতে কুঠার। ভাইকিংদের হাতে তো কুঠার থাকার কথা নয়। ও মূর্তিটা ডিঙিয়ে পিছিয়ে এলো।

ভালোভাবে আলো পড়তেই দেখলো রক্তমাখা কুঠার হাতে রাজা এভান্ডাসন। মুখটা হিংস্র, চোখের দৃষ্টি কুটিল। ও বুঝলো, এই অসভ্য বর্বর রাজা সুযোগ পেলেই তাকে হত্যা করবে। বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করবে না। ফ্রান্সিসও সেইভাবে নিজেকে তৈরী করে নিল। এক ঝটকায় খাপ থেকে তরোয়াল খুলে ফেলল।

রাজা এভান্ডাসন একবার দাঁত বের করে হাসল। বিড়-বিড় করে ওর নিজের ভাষায় কি বললো। তারপর কুঠার ওপরের দিকে তুলে কোপ দেওয়ার ভঙ্গীতে ছুটে এলো ওর দিকে। ও তৈরীই ছিল, একপাক ঘুরেই তরোয়াল চালালো। রাজার টুপিটা কেটে গেল, রক্ত বেরলো। রাজা আবার কুঠার উঁচিয়ে আসতেই তরোয়াল চালালো ফ্রান্সিস। কুঠারের সঙ্গে তরোয়াল লেগে ঝন্‌ঝন্ শব্দ উঠলো। কুঠারের সঙ্গে লড়াই করতে ফ্রান্সিস অভ্যস্ত নয়। কাজেই বারবার সরে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে লাগল। আর সুযোগ পেলেই তরোয়াল চালিয়ে রাজাকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলো। ঐ মশালের আলোতে দু'জনের লড়াই চললো। দু'জনেই পরিশ্রান্ত হলো। জোরে জোরে শ্বাস পড়তে লাগলো দু'জনের।

ফ্রান্সিস ক্লান্ত হলো বেশী। কারণ সন্ধ্যের পর থেকে ও একরকম বিশ্রামই পায়নি।

অতটা পথ হেঁটেছে, পাহাড়ে উঠেছে, খাল কেটেছে, তারপর কাদা বরফের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এখানে এসেছে। এই মোকাবিলার আগে একটু বিশ্রামের দরকার ছিল। কিন্তু এখন আর সে-সব ভেবে লাভ নেই। সম্মুখে মৃত্যুদূতের মতো দাঁড়িয়ে রাজা এভাল্ডাসন। হিংস্র বর্বর রাজা। ফ্রান্সিস নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চললো লড়াই। ও বেশ বুঝতে পারল, তার দম ফুরিয়ে আসছে। জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল ও।

এক সময় রাজা এপাশ-ওপাশ কুঠার ঘোরাতে-ঘোরাতে এগিয়ে এলো। একবার কুঠারের ফলাটা ওর প্রায় মাথা ছুঁয়ে গেল। ও সঙ্গে-সঙ্গে তরোয়াল চালালো, রাজার মাথাটা লক্ষ্য করে। কিন্তু রাজা দ্রুত মাথা সরিয়ে নিল। কোপটা পড়ল রাজার কাঁধে। কাঁধ থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো। কিন্তু তরোয়ালটা বের করে নিয়ে আসার আগেই রাজা কুঠারটা তুলে মারতে উদ্যত হলো। ও মেঝেয় পড়ে থাকা যীশুর মূর্তিতে পা লেগে বেদীর ওপর চিৎ হয়ে পড়ল। ঠিক মাথার ওপর রাজার উদ্যত কুঠার। ডান কাঁধে তরোয়ালের গভীর ক্ষতের জন্য রাজা কুঠারটা সবল হাতে ধরতে পারছিল না। তবু ঐ অবস্থাতেই কুঠারে ঘা দিলে ওর বুকেই সেটা লাগবে।

ফ্রান্সিসের তখন অসহায় অবস্থা। কিন্তু কুঠারের ঘাটা নেমে আসার আগেই হঠাৎ রাজার হাতটা কেমন যেন অবশ হয়ে এলো। হাত থেকে কুঠারটা পড়ে গেল মেঝেয়। রাজা হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর। ও এক ধাক্কায় রাজাকে সরিয়ে দিল। বেদীর গা থেকে গড়িয়ে রাজা উপুড় হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। ও দেখলো, রাজার পিঠে একটা কুঠার আমূল বিঁধে আছে। মুখ তুলে দেখলো, দরজার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে। লোকটা এগিয়ে আসতে ও দেখলো, নেসার্ক। তাহলে নেসার্কই দূর থেকে কুঠার ছুঁড়ে মেরেছে- নির্ভুল নিশানা।

নেসার্ক কাছে এলে ফ্রান্সিস হাঁপাতে - হাঁপাতে বললো, 'নেসার্ক তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। রাজার কুঠারের শেষ ঘাটা আমি বোধহয় এড়াতে পারতাম না।'

ও দেখলো, নেসার্কের চোখে জল। সে মৃদুস্বরে কাঁদো-কাঁদো গলায় বললো 'শেষ অবধি বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নিয়েছি।'

এমন সময় আরো কয়েকজন ভাইকিং এসে গীর্জায় ঢুকলো। তারা ফ্রান্সিসকে অক্ষত দেখে খুশীই হলো। ওরা বললো, 'ফ্রান্সিস, ইউনিবেগুদের প্রায় সবাই মারা গেছে, বাকীরা পালিয়েছে। এখন বাট্টাহালিড ওদের হাত থেকে মুক্ত।'

ফ্রান্সিস হাসল, তারপর পাথরে বেদীটায় হেলান দিয়ে বসল। ভাইকিংরা ঘুরে ঘুরে গীর্জাটা দেখতে লাগল। একজন বেদীটার ওপরে উঠলো। দেখলো, আরও ওপরে আর একটা কাঠের বেদী। ও জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা ফ্রান্সিস, এই কাঠের বেদীটার ওপর কী ছিল?'

—'ঐ যে মেঝেয় যীশুর মূর্তিটা আছে, সেটা বসানো ছিল?'

—কিন্তু এই ঢোকানো গর্তটার মধ্যে কী যেন একটা রয়েছে?'

—'কী রয়েছে?'

—'একটা বইয়ের মত কিছু!'

—'বই?'

ফ্রান্সিস কথাটা বলেই মেঝে থেকে লাফিয়ে তাড়াতাড়ি বেদীটার ওপর উঠলো। দেখলো, যে কাঠের বেদীটায় মূর্তিশুদ্ধ ক্রুশটা বসানো ছিল, তার মধ্যে 'চৌকোণ গর্ত

রয়েছে। একটা লাল-মলাটের মত কিছু দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে উঠলো, 'শীগগির মশালটা নিয়ে এসো।'

একজন ছুটে গিয়ে মশালটা নিয়ে এলো। ও দেখলো, ঠিক এরিক দ্য রেডের 'ওল্ড টেষ্টামেন্টের' বইয়ের মত লাল মলাট। ও বইটা আস্তে-আস্তে বের করে মলাট ওল্টালো। লেখা দেখল, 'নিউ টেস্টামেন্ট।'

এই বইটার কথা রাজা সোক্কাসন বলেছিলেন। কিন্তু এই বইটা কোথায় আছে, তা কেউ জানত না। সেই চামড়ার তৈরী কাগজে এরিক দ্য রেডের নিজের হাতে লেখা। সেই প্রথম অক্ষরগুলো মেলায়। কিন্তু শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। প্রায় অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছে। শরীর আর চলছে না, মনও আর কিছু ভাবতে পারছে না। ওদিকে ভোর হয়ে এসেছে, বাইরে ফ্যালকন পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস বইটা হাতে নিয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কয়েকজন চলে যাও। আমাদের তাঁবু জিনিসপত্র শ্লেজগাড়িগুলো সব এখানে নিয়ে এসো। এখানে সবকিছু জলে ভিজে গেছে। শুকনো বিছানাপত্র খাবার চাই।' কথাটা বলে ক্লান্ত পায়ে গীর্জার দরজার দিকে এগুলো। আর সবাই ওর পেছনে-পেছনে আসতে লাগল।

গীর্জার বাইরে এসে নেসার্ক ফ্রান্সিসকে বললো, 'আমি আমাদের টুপিকে যাচ্ছি।'

ও মাথা নেড়ে বললো, 'বেশ - কিন্তু তোমাকে কালকেই কোর্টল্ড রওনা হতে হবে। রাজা সোক্কাসনকে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

—'ঠিক আছে, আমি কালকেই যাবো।' নেসার্ক কথাটা বলে চলে গেল।

যে ঘরটায় ফ্রান্সিস আর হ্যারি আস্তানা নিয়েছিল, সেই ঘরটার সামনে ও এলো। শ্লেটপাথরের দরজা সরিয়ে ও ভেতরে ঢুকল। তখন আলো ফুটেছে, সেই ম্লান আলোয় দেখলো, বিছানার সবকিছু ভিজে গেছে। ভেজা বিছানাটা মেঝেয় ফেলে দিল ও। তারপর পাথরের ওপর শুয়ে পড়ল। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

★ ★ ★

তখন বেশ বেলা হয়েছে। এতক্ষণ কেউ আর ফ্রান্সিসকে ডাকেনি। ও একটু ঘুমিয়ে নিল। সবাই তাঁবু খাটাতে, জিনিসপত্র গোছ-গাছ করতে ব্যস্ত। এমন সময় ওরা দেখলো নেসার্ক শ্লেজগাড়ি চালিয়ে আসছে। নেসার্কের সঙ্গে ও কে বসে? এ কী। এ যে হ্যারি! কাছাকাছি যারা ছিল গিয়ে গাড়ি ঘিরে দাঁড়াল। সে কি উল্লাস তাদের। হ্যারি বেঁচে আছে? অন্যরাও খবর পেল। হ্যারি গাড়ি থেকে নামতে সবাই ওকে এক এক করে জড়িয়ে ধরল। হ্যারি হাত নাড়ছিল আর হাসছিল। হ্যারিকে বেশ রুগ্ন দেখাচ্ছিল। তবু বেঁচে আছে তো। সবাই হৈ-হৈ করতে-করতে ছুটলো ফ্রান্সিসের ঘরের দিকে। আচমকা এই হৈ-চৈতে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও চোখ কচ্‌লাতে-কচ্‌লাতে উঠে বসলো।

বন্ধুরা চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, 'হ্যারি বেঁচে আছে, হ্যারি বেঁচে আছে।'

ফ্রান্সিস নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তখনই হ্যারিঘরে ঢুকল। সে এক লাফে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে হ্যারিকে জড়িয়ে ধরল। ওর চোখ বেয়ে জলের ধারা নামলো। হ্যারির চোখও শুকনো রইল না। হ্যারি বেশ জোর করে ফ্রান্সিসের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হল। দু'জনেই হাসি-হাসি মুখে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

এক সময় ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি হয়েছিল হ্যারি?'

—'সে এক কাণ্ড!' হ্যারি বলতে লাগলো, 'জানো তো আমার মৃগীরোগের মত একটা

অসুখ হয়েছে। তোমার মনে আছে বোধহয়, জাহাজে একবার অজ্ঞানের মত হয়ে গিয়েছিলাম।'

—'হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে।' ফ্রান্সিস বললো।

—'এখানেই একদিন রাত্রে আমার ও-রকম হল। বোধহয়, যে আমাকে রাতের খাবার দিতে এসেছিল, সেই পাহারাদারটাই আমাকে ঐ অবস্থায় প্রথম দেখে। জানি-না ওরা বদ্যি-টদ্যি ডেকেছিল কিনা। বোধহয় নয়। নিজেরাই ধরে নিয়েছিল, আমি মরে গেছি। তারপর আমাকে ওরা সক্কারটপ পাহাড়ের দুটো বরফের ফাটলের মধ্যে রেখে আসে। যখন আমার জ্ঞান ফিরলো দেখি, বরফের ফাটলের মধ্যে আমি পড়ে আছি। একে শরীর দুর্বল তার ওপর ভয়ানক ঠাণ্ডায় তখন হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে। ভেবে দেখলাম, এইভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে পড়ে থাকলে আমার মৃত্যু অবধারিত। কাজেই শরীরের অবশিষ্ট সমস্ত শক্তি একত্র করে উঠে বসলাম। তারপর দাঁড়ালাম। দেখলাম, পায়ের কোন সাড় পাচ্ছি না। কোনরকমে ফাটলের বাইরে এলাম। কোথায় যাবো এবার? বাট্রাহালিডে যাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। হঠাৎ মনে পড়ল, ওপাশে নেসার্কের টুপিক আছে। তুমি আর আমি ওখানে গিয়েছিলাম। হ্যারি থামলো।

—'তারপর?'

—'অসাড় পা দুটো হিঁচড়ে-হিঁচড়ে চললাম পাহাড় পেরিয়ে। তখনই গলা জলের জলাশয়টা আমি দেখেছিলাম। অপূর্ব সেই দৃশ্য। বরফের ওপর শুয়ে বিশ্রাম করি, আবার চলি। এভাবে পাহাড়ের ওপরে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন ভোর হয়ে গেছে। আকাশ পরিষ্কারই ছিল। নেসার্কের টুপিকটা দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আর চলার ক্ষমতা নেই তখন। বরফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চললাম। একটু থামি, দম নিই, তারপর আবার শরীরটা বরফের ওপর দিয়ে হিঁচড়ে চলি। অনেক কষ্টে নেসার্কের টুপিকের সামনে এলাম। নেসার্কের মা তখন চামড়া শুকোতে দিচ্ছিল। আমাকে দেখে ঠিক চিনল না। আমার তখন কথা বলার শক্তিও নেই। নেসার্কের মা আমাকে ধরে ধরে টুপিকের মধ্যে নিয়ে গেল। কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বাললো। তারপর আমার গায়ে, হাতে পায়ে, সেঁক দিতে লাগলো। কিছুক্ষণ সেঁক চললো। আমি আস্তে-আস্তে হাত-পায়ের সাড় পেলাম। একটু পরেই বেশ সুস্থ বোধ করলাম। আমি বারবার নেসার্কের মাকে ধন্যবাদ দিলাম। তারপর ওখানেই থেকে গেলাম। নেসার্কের মাকে অবশ্য বললাম, আমরা নেসার্কের সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। কিন্তু বুড়ী-মা আমার কোন কথাই বুঝল না। তার ছেলের মত আমাকে সেবা করে একেবারে সুস্থ করে তুললো।'

—'তারপর থেকে ওখানেই রইলে?'

—'হ্যাঁ। অবশ্য ভেবেছিলাম স্লেজগাড়ি চড়ে কোর্টল্ড যাবো। কিন্তু গাড়ি পাইনি ওখানে। তাছাড়া শরীরও দুর্বল, সাহস পেলাম না।' একটু থেমে বললো, 'নেসার্কের তাঁবুতেই অপেক্ষা করতে লাগলাম তোমাদের জন্যে। তারপর গত রাতে ঘন-ঘন বরফের চাঁই ভাঙছে কেন, প্রথমে বুঝলাম না। একটু ভেবে-চিন্তে বুঝলাম, পাহাড়ের ওপরের দিকে যে সরোবরটা দেখেছিলাম, তার জলের ধারা নেমে আসাতেই বরফের চাঁই ভাঙছে, তাই পাহাড়টা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। বুঝলাম, খাল কেটে জল নামানো হয়েছে, আর এর পেছনে তুমি আছো। তখন মনে-মনে সহস্রবার তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করলাম। তারপর সকালেই নেসার্ক এলো। সব শুনলাম ওর কাছে।'

এতক্ষণ ফ্রান্সিস গভীর মনোযোগের সঙ্গে হ্যারির কথা শুনছিল। হঠাৎ ওর মনে পড়ল, যীশুর বেদিতে পাওয়া এরিক দ্য রেডের 'টেষ্টামেন্ট' বইটার কথা। ও তাড়াতাড়ি পোশাকের পকেট থেকে বইটা বের করে বললো, 'এই বইটা দেখো।'

—'এটাতো এরিক দ্য রেডের লেখা বাইবেল - আগেই দেখেছি।'

—'সেটা ছিল একই রকম দেখতে 'ওল্ড টেষ্টামেন্ট'। এটা 'নিউ টেষ্টামেন্ট' - অন্য খণ্ডটা।'

—'কোথায় পেলে এটা?'

—হ্যারি সাগ্রহে বইটা হাতে নিল। ফ্রান্সিস কী করে বইটা পেল, রাজা এভাল্ডাসনের মৃত্যু - সব বললো।

হ্যারি আস্তে - আস্তে বললো, 'এবার বোঝা যাচ্ছে ঐ সাংকেতিক কথাটার অর্থ -যীশুর চরণে বিশ্বাস রাখো।' অর্থাৎ মূর্তির পায়ের নিচেই ছিল এটা।'

মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ ভাবলো হ্যারি। তারপর মাথা তুলে বললো, 'ফ্রান্সিস এই বইটাতে নিশ্চয়ই কোন সংকেত আছে।'

মুখ ফিরিয়ে নেসার্ককে বললো, 'রাজবাড়ি থেকে আমাদের জন্য এক টুকরো কাগজ আর কালি নিয়ে এসো।'

তারপর ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি শুয়ে বিশ্রাম কর। আমি সংকতেটা উদ্ধার করছি।'

—'মাথা খারাপ? তুমি সংকেত উদ্ধার করবে, আর আমি শুয়ে থাকবো? উঁহু সেটি হবে না। আমার বিশ্রাম নেওয়া হয়ে গেছে'।

একটু পরেই নেসার্ক কাগজ-কলম নিয়ে এলো। দুই বন্ধু বইটার ওপর ঝুঁকে পড়লো। হ্যারি বইটার পাতা পেছন থেকে ওল্টাতে লাগলো আর প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথম মোটা অক্ষরটা বলে যেতে লাগলো আর লিখতে লাগলো। নেসার্ক, সাঙখু আর ভাইকিং বন্ধুরা অবাক হয়ে দুই বন্ধুর কাণ্ড দেখতে লাগলো। হ্যারি সবগুলো অক্ষর বললো। লেখা হল সব অক্ষরগুলো। দুই বন্ধু উত্তেজনায় ঝুঁকে পড়ল কাগজটার ওপর। স্পষ্ট অর্থবহ কথা, 'যীশুর দৃষ্টির সম্মুখে কিছুই গোপন থাকে না।' দুই বন্ধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। ফ্রান্সিস বললো, 'কী বুঝছো হ্যারি?'

—'আমার মনে হয়, এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন এই গীর্জাতেই আছে। যীশুর মূর্তি তৈরী করা এবং এখানে বেদীর ওপর রাখার পেছনে নিশ্চয়ই এরিক দ্য রেডের কোন উদ্দেশ্য ছিল।'

—'তা - তো বুঝলাম। কিন্তু এই সংকেত থেকে গুপ্ত ধনভাণ্ডারের হদিশ পাবে?'

—'নিশ্চয়ই পাবো। তবে গভীরভাবে ভাবতে হবে। সেইজন্যে সময় চাই।'

—'বেশ ভাবো।' ফ্রান্সিস বললো।

বন্ধুরা সবাই চলে গেল। দুই বন্ধু পাথরের ওপর বসে রইলো। একটু পরে সাঙখু আর দু'জন ভাইকিং শুকনো চামড়া দিয়ে ওদের বিছানা তৈরী করে দিয়ে গেল। হ্যারি বিছানায় শুয়ে কাগজের লেখাটা পড়তে লাগলো। সেই দিনটা ওরা শুয়ে-বসে ঘরেই কাটাল। বাইরে বেরোলো না।

পরদিন নেসার্ককে ওরা কোর্টল্ডি পাঠাল রাজা সোক্কাসনকে এখানে নিয়ে আসতে। তাঁর রাজত্ব তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই একটা কর্তব্য শেষ হবে।

নেসার্ক বলগা হরিণ-টানা গাড়িটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

দু'জনে ঘরের দিকে ফিরে আসছে, তখনই ফ্রান্সিস বললো, 'হ্যারি, তুমি তো এসে গীর্জাটাকে দেখোনি।'

—'না।'

—জলের ধাক্কায় নীচুদিকের জানলাটার কাঁচ ভেঙে গেছে, গীর্জার মাথার ক্রুশটা ভেঙে গেছে, মূর্তিটাও মেঝের ওপর পড়ে আছে। একবার দেখে আসি চলো।'

-'বেশ চলো।' এই বলে গীর্জার দিকে যেতে-যেতে ফ্রান্সিস তিন-চারজন ভাইকিং বন্ধুকে ডেকে নিল।

ওরা গীর্জার সামনে গিয়ে পৌঁছল। ফ্রান্সিসের মাথায় তখনও ঐ সাংকেতিক কথাটা 'যীশুর দৃষ্টির সম্মুখে কিছুই গোপন থাকে না' ঘুরছিল। ও নানাভাবে কথাটা ভাবতে-ভাবতে গীর্জার অন্ধকার পরিবেশে ঢুকলো। ভাঙা জানলার মধ্য দিয়ে যেটুকু আলো আসছে, তাতেই যা দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস বন্ধুদের বললো, 'মূর্তিটা তুলে বেদীতে বসাতে হবে। হাত লাগাও সবাই।'

সবাই মূর্তিটার কাছে এল। ধরাধরি করে মূর্তিটা তুললো। তারপর কাঠের বেদীটায় বসাতে গিয়ে দেখলো, উল্টোমুখো হয়ে যাচ্ছে।

হ্যারি বলে উঠলো, আরে উল্টো হয়ে যাচ্ছে, সোজা করে বসাও।'

কথাটা ফ্রান্সিসের কানে যেতেই ও চমকে উঠলো। পর-পর কয়েকটা কথা ওর মনে বিদ্যুৎ ঝলকের মত খেলে গেলো, 'যীশুর চরণে বিশ্বাস রাখো', পায়ের নীচেই পাওয়া গেল বাইবেলের পরের খণ্ড, দুটো বই-এর উল্টো দিক থেকে অক্ষর সাজিয়ে অর্থময় ইঙ্গিতপূর্ণ কথা পাওয়া গেছে, মূর্তিটার মুখও যদি উল্টোদিকে করা যায়, 'যীশুর দৃষ্টির সম্মুখে কিছুই গোপন থাকে না।'

উল্টোদিকের মুখ দৃষ্টির লক্ষ্য। কিসের দিকে সেই দৃষ্টি? ফ্রান্সিস চীৎকার করে উঠলো, 'মূর্তিটা উল্টোদিকে মুখ করেই রাখো। দেখো রাখা যায় কিনা।'

সকলেই ফ্রান্সিসের এই কথায় আশ্চর্য হলো। হঠাৎ উল্টোমুখী করে মূর্তি রাখার কল্পনা ওর মাথায় এলো কেন? যাহোক ওরা মূর্তিটা উল্টোমুখী করে বেদীতে বসাল। আশ্চর্য! ঠিক মাপে আটকে গেলো।

ফ্রান্সিস পায়ের জুতো খুলে ফেললো। তারপর এক লাফে বেদীটার ওপর উঠলো। ওর কাঁধের কাছে পেতলের মূর্তিটা। ফ্রান্সিস মূর্তিটার মুখের কাছে মুখ আনল। মূর্তির চোখের দৃষ্টিটা সামনের দিকে নয়। একটু তেড়চা। আশ্চর্য!

ফ্রান্সিস চীৎকার করে ডাকলো, 'হ্যারি, শীগগির উঠে এসো'।

হ্যারিও জুতোটা খুলে উঠলো।

ও বললো, 'হ্যারি, মূর্তিটার দৃষ্টি লক্ষ্য করে তাকাও।'

হ্যারিও মূর্তিটার মুখের কাছাকাছি বাঁ-দিকের আংটাটা। ও বলে উঠলো, 'ফ্রান্সিস, আংটাটা!'

ফ্রান্সিস তখন ঘর-ময় পায়চারী করতে করতে বলছে 'মেঝের অত কাছে আংটা - মশাল রাখবার জন্য? অসম্ভব।' পায়চারী থামিয়ে বলে উঠলো, এরিক দ্য রেডের গুপ্ত-ধনভাণ্ডার আমাদের হাতের মুঠোয়। আংটায় আটকানো পাথর সরাতে হবে। সবাই যাও, কুঠার নিয়ে এসো। পাথরের খণ্ড আলগা করে তুলতে হবে।'

হ্যারি বেদী থেকে এক লাফে নেমে এল। ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'সাবাস্ ফ্রান্সিস - সাবাস্! তুমি সংকেতটা ঠিক ধরতে পেরেছ।'

ফ্রান্সিস তখন নীচু হয়ে আংটাটা যে পাথরের গায়ে ওটা পোঁতা আছে, সেটা পরীক্ষা করতে লাগলো। দেখলো পাথরটা বেশ বড়।

বন্ধুরা কুঠার নিয়ে এসে হাজির হল। ফ্রান্সিস ওদের বললো, 'দু'জন দু'দিক থেকে পাথরের জোড়ের খাঁজে কুঠারের কোপ বসাও।'

দু'জন দু'দিকে দাঁড়িয়ে কুঠারের কোপ বসাতে লাগলো। কিন্তু অনভ্যস্ত হাতের কোপ ঠিক জোরে পড়ছিল না। ওদিকটা কিছু অন্ধকার থাকাতেই এটা হয়তো হচ্ছে।

ফ্রান্সিস বললো, 'মশাল জ্বালিয়ে আনো।'

মশাল আনা হলো অল্পক্ষণের মধ্যেই। আবার কুঠার চালালো ওরা, কিন্তু ঠিক জোরে লাগলো না। পাথরের চাকলা উঠে এলো শুধু। এর মধ্যেই মুখে-মুখে সবাই জেনে গেছে যে, গুপ্ত ধনভাণ্ডার খোঁড়া হচ্ছে। সবাই এসে ভীড় করে দাঁড়ালো। ফ্রান্সিস মুখ তুলে সকলের দিকে তাকাল। বললো, 'নেসার্ক নেই, মুস্কিল হলো।'

হঠাৎ সাঙখুর দিকে নজর পড়লো। ভালুক শিকারী ও, কুঠার চালাতে ওস্তাদ। ফ্রান্সিস তাকে ডেকে বললো, 'ঠিক পাথরের জোড়ের ওপর কুঠার চালাও। পাথরটা তুলে নিতে হবে।'

সাঙখু কুঠার হাতে এগিয়ে এলো। ঠিক জোড়ের মুখে কুঠারের কোপ পড়তে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাথরটা আলগা হয়ে গেল। ফ্রান্সিস সাঙখুকে থামতে বললো। তারপর আংটাটা ধরে টানতে লাগলো। বুঝলো, পাথরের জোড় এখনও খোলেনি। আবার সাঙখু কুঠার চালাতে লাগলো। পাথরটা আরো আলগা হতে ফ্রান্সিসের নির্দেশে থামল ও। তারপর হাঁপাতে লাগলো। ফ্রান্সিস কয়েকজনকে একসঙ্গে আংটাটা ধরে টানতে বললো। চার-পাঁচজন মিলে আংটাটা ধরে টানতে লাগলো। আস্তে-আস্তে পাথরটা দেয়াল থেকে বেরিয়ে এলো। আরও কয়েকটা হ্যাঁচকা টান পড়তেই হুড়-মুড় করে পাথরটা খুলে এলো। ফ্রান্সিস মশালটা নিয়ে খোঁদলের কাছে ধরে দেখলো, সিঁড়ির মতো পাথর পাতা। কিন্তু আরো পাথর না খসালে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না - নামবার সিঁড়ি কিনা? একটা পাথর খুলে আসাতে খুব সুবিধে হলো। আশেপাশে পাথরগুলোর জোড় আলগা হয়ে গেল। দু'একজন মিলে টানতেই পাথরগুলো খুলে আসতে লাগলো।

ফ্রান্সিস মশাল এগিয়ে নিয়ে দেখলো, একটা গুহার মতো। নীচের দিকে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে, অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ও কিছুক্ষণ মশাল হাতে দাঁড়িয়ে, ভেতরের বদ্ধ বাতাসটা বেরিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করল। তারপর মাথা নীচু করে ঢুকে দেখলো, ভেতরটা বেশ বড়। মাথা না নামিয়ে ও সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলো। পেছনে-পেছনে চললো হ্যারি।

একটা ঘরের মতো জায়গায় এসে সিঁড়িটা শেষ হয়েছে। ঘরটার দেয়াল পাথরের তৈরী। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট কাঠের বাক্স। সোনার পাত নিয়ে বাক্সটায় নানা কারুকাজ করা। মিনে করা আছে তাতে। মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠলো মিনে করা সোনার পাত। বাক্সটা বেশ পরিষ্কার, ঠাণ্ডা ও বরফের দেশ বলেই বাক্সটায় ধুলোর আস্তরণ পড়েনি।

বাক্সটায় খোলার দিকটায় দেখা গেল, একটা রূপোর তালা ঝুলছে। রূপোর তালাটাতেও মিনের কাজ করা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। লা ক্রুশের গুপ্তধনের বাক্সগুলোর দ্বিগুণ এই বাক্সটা। ওরা দু'জনেই বাক্সটার কারুকাজ দেখে অবাক হলো। হঠাৎ হ্যারি ওর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো, 'ফ্রান্সিস ডান কোণায় দেখো।'

ফ্রান্সিস মুখ তুলে ডানদিকে মশালটা বাড়াতে নিজে ভীষণভাবে চমকে উঠলো। দেখলো, এস্কিমোদের পোশাকপরা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। ডানহাতটা বাড়ানো। বোঝাই যাচ্ছে - মৃত মানুষ, ভীষণ শীতের দেশ বলেই অবিকৃত আছে মৃতদেহটা। কিন্তু বড় জীবন্ত। এবার ও মৃতদেহটার বাড়ানো হাতের দিকে লক্ষ্য করল। দেখলো, হাতের তেলোয় একটা বড় আকারের সোনার চাবি। ও আস্তে-আস্তে হাত বাড়িয়ে চাবিটা তুলে নিল। কী ঠাণ্ডা মৃতের হাতটা।

চাবিটা দিয়ে তালা খুললো ফ্রান্সিস। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে বাক্সের ডালাটা খুলে ফেললো। দেখলো, মশালের আলোয় ঝিক্‌মিক্‌ করছে সোনার মোহর, হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্না বসানো বিচিত্র সব অলঙ্কার। মোহর, অলংকারে বাক্সটা ঠাসা। দামী মণি-মুক্তো বসানো খাপে ভরা কয়েকটা ছোরা। কয়েকটা ছোট্ট সোনার কুঠার, মিনের কাজ করা তাতে।

ওদিকে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা বাইরে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। কতক্ষণে এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন দেখবে। এদিকে সিঁড়ি দিয়ে একজনের বেশী নামা যায় না। ফ্রান্সিস ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল। বললো, 'হ্যারি, চলো আমরা বাইরে যাই। ওরা একে একে দেখে যাক্‌।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি সিঁড়ি দিয়ে পর-পর ওপরে উঠে এলো। ওরা আসতেই সবাই একজন-একজন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ধনভাণ্ডার দেখে যেতে লাগলো। দু'চারজন মৃত এস্কিমোটাকে দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। ওরা দেখে একে-একে ওপরে উঠে আসছে যখন, বিস্ময়ের ঘোর তখনও তাদের কাটেনি। এত ধনসম্পদ? একসঙ্গে?

সবারই দেখা হলো। ফ্রান্সিস তখন বললো, 'এবার বাক্সটা ঘরে নিয়ে যেতে হবে। এখানে এত ধনসম্পদ ফেলে রাখা যাবে না - কে-কে যাবে যাও।'

চার-পাঁচজন ভাইকিং তৈরী হলো। দু'জনে ঘরের ভেতরে নামল। বাক্সটার দু'পাশে দুটো পেতলের কড়া। সেই দুটো ধরে ওরা বাক্সটা সিঁড়ির কাছে নিয়ে এলো। বেশ ভারী বাক্সটা - বেশ পরিশ্রম হলো ওটা তুলে আনতে। অন্য দু'জন তখন একে-একে সিঁড়ি বেয়ে বাক্সটা বাইরে নিয়ে এলো। তারপর চারজন বাক্সটা কাঁধে তুলে নিয়ে গীর্জার বাইরে এলো। তারপর সবাই মিলে চললো, ফ্রান্সিসের আস্তানার দিকে। ওরা খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠলো। হৈ-হৈ করতে করতে বরফ-কাদার মধ্যে দিয়ে চললো-গানও ধরল কে যেন।

ফ্রান্সিস ও হ্যারির ঘরে বাক্সটা রাখলো ওরা। তারপরেও এসব নিয়ে বসে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বললো। তারপর নিজেদের তাঁবুতে, রাজবাড়ির যে সব ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল, সে-সব ঘরে ফিরে গেলো।

পরের দিন ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘর থেকে বেরলো না। শুয়ে-বসে দিনটা কাটিয়ে দিল। রাত হলে ভাইকিংরা তাঁবুর সামনে আগুন জ্বেলে, অনেক রাত পর্যন্ত আনন্দ

হৈ-হল্লা করলো। আগুনের চারপাশে ঘুরে - ঘুরে নাচল, গান গাইল।

পরের দিন, তখন বিকেল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের ঘরে বসে কথাবার্তা বলছে। ফ্রান্সিস বললো, 'বাবাকে কথা দিয়েছিলাম, দেড় মাসের মধ্যে ফিরবো। কিন্তু বোধহয় কথা রাখতে পারবো না। যা বুঝতে পারছি আরো কয়েকদিন দেরী হবেই। এখন রাজা সোক্কাসন এলে বাঁচি। সব ধনদৌলত তাঁর হাতে না তুলে দেওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

ওদের এসব কথাবার্তা চলছে, তখনই একজন ভাইকিং এসে খবর দিল, 'রাজা সোক্কাসন নিজে এসেছেন।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি তৈরী হয়ে বাইরে বেরোতে যাবে, তার আগেই রাজা এসে ঘরে ঢুকলেন, পেছনে রানী। দু'জনেই মাথা নীচু করে সম্মান জানালো। রাজা ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরলেন। ও তখন ভাবছে, রাজা-রানীকে কোথায় বসাব? রাজার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে বললো, 'আপনাদের কোথায় যে বসতে দিই?'

রানী হেসে বললেন, 'আমরা এখানেই বসছি।'

রানী হ্যারির বিছানায় বসলেন, রাজা ফ্রান্সিসের বিছানায়। বসেই যখন পড়েছেন, তখন আর কী করা যাবে?

ফ্রান্সিস বললো, 'আপনারা তো এখনো এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন দেখেন নি।'

কথাটা শেষ করেই ও চাবি দিয়ে বাক্সটার তালা খুলে ডালাটা তুললো। রাজা-রানী দু'জনেই বিস্ময়ে হতবাক। এত মূল্যবান সম্পদ?

রানী বিছানা থেকে নেমে কিছু গয়নাগাঁটি তুলে-তুলে দেখলো।

ফ্রান্সিস বললো, 'আপনারা এসে গেছেন। বাক্সটা লোক পাঠিয়ে রাজবাড়িতে নিয়ে যান। এবার আমাদের ছুটি দিন।'

রাজা কিছুক্ষণ বাক্সটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরস্বরে বললেন, 'এই গুপ্ত ধনভাণ্ডার তুমিই আবিষ্কার করেছ— এর সবটাই তোমার প্রাপ্য।'

ফ্রান্সিস বললো — 'না মহারাজ। উত্তরাধিকার সূত্রে এই সম্পদ আপনারই প্রাপ্য।'

রাজা মাথা নাড়লেন, 'না, তা হয় না। তোমাকেই নিতে হবে এই ধন ভাণ্ডার।'

হ্যারি এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার এগিয়ে এসে বললো, 'মহারাজ এবার আমি একটা কথা বলবো?

—'বলো।'

—'বলছিলাম, আপনি যদি ফ্রান্সিসকে অর্ধেক ধনভাণ্ডার দেন, তাহলে আর কোন সমস্যাই থাকে না।'

ফ্রান্সিস ভেবে দেখলো, এ ছাড়া সমাধানের কোন পথ নেই। ও বললো, 'আপনি যখন আমাকে দিতেই চান, তখন অর্ধেক দিন। তাতেই আমি খুশী হবো।'

—'বেশ।' রাজা উঠে দাঁড়ালেন। রানী বিছানা ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললেন, 'আজ রাত্রে রাজবাড়িতে আপনাদের সকলের নিমন্ত্রণ। আসবেন কিন্তু।'

—'নিশ্চয়ই।' ফ্রান্সিস বললো। আবার ওরা রাজা-রানীকে সম্মান জানালো। রাজা ও রানী চলে গেলেন।

*　　*　　*

রাত্রে ফ্রান্সিসরাও রাজবাড়িতে খেতে গেল। একটা বড় ঘরে খাওয়ার আয়োজন করা

বাক্সটায় খোলার দিকটায় দেখা গেল, একটা রূপোর তালা ঝুলছে। রূপোর তালাটাতেও মিনের কাজ করা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। লা ক্রুশের গুপ্তধনের বাক্সগুলোর দ্বিগুণ এই বাক্সটা। ওরা দু'জনেই বাক্সটার কারুকাজ দেখে অবাক হলো। হঠাৎ হ্যারি ওর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো, 'ফ্রান্সিস ডান কোণায় দেখো।'

ফ্রান্সিস মুখ তুলে ডানদিকে মশালটা বাড়াতে নিজে ভীষণভাবে চমকে উঠলো। দেখলো, এস্কিমোদের পোশাকপরা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। ডানহাতটা বাড়ানো। বোঝাই যাচ্ছে - মৃত মানুষ, ভীষণ শীতের দেশ বলেই অবিকৃত আছে মৃতদেহটা। কিন্তু বড় জীবন্ত। এবার ও মৃতদেহটার বাড়ানো হাতের দিকে লক্ষ্য করল। দেখলো, হাতের তেলোয় একটা বড় আকারের সোনার চাবি। ও আস্তে-আস্তে হাত বাড়িয়ে চাবিটা তুলে নিল। কী ঠাণ্ডা মৃতের হাতটা।

চাবিটা দিয়ে তালা খুললো ফ্রান্সিস। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে বাক্সের ডালাটা খুলে ফেললো। দেখলো, মশালের আলোয় ঝিক্‌মিক্‌ করছে সোনার মোহর, হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্না বসানো বিচিত্র সব অলঙ্কার। মোহর, অলংকারে বাক্সটা ঠাসা। দামী মণি-মুক্তো বসানো খাপে ভরা কয়েকটা ছোরা। কয়েকটা ছোট্ট সোনার কুঠার, মিনের কাজ করা তাতে।

ওদিকে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা বাইরে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। কতক্ষণে এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন দেখবে। এদিকে সিঁড়ি দিয়ে একজনের বেশী নামা যায় না। ফ্রান্সিস ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল। বললো, 'হ্যারি, চলো আমরা বাইরে যাই। ওরা একে একে দেখে যাক্‌।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি সিঁড়ি দিয়ে পর-পর ওপরে উঠে এলো। ওরা আসতেই সবাই একজন-একজন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ধনভাণ্ডার দেখে যেতে লাগলো। দু'চারজন মৃত এস্কিমোটাকে দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। ওরা দেখে একে-একে ওপরে উঠে আসছে যখন, বিস্ময়ের ঘোর তখনও তাদের কাটেনি। এত ধনসম্পদ? একসঙ্গে?

সবারই দেখা হলো। ফ্রান্সিস তখন বললো, 'এবার বাক্সটা ঘরে নিয়ে যেতে হবে। এখানে এত ধনসম্পদ ফেলে রাখা যাবে না - কে-কে যাবে যাও।'

চার-পাঁচজন ভাইকিং তৈরী হলো। দু'জনে ঘরের ভেতরে নামল। বাক্সটার দু'পাশে দুটো পেতলের কড়া। সেই দুটো ধরে ওরা বাক্সটা সিঁড়ির কাছে নিয়ে এলো। বেশ ভারী বাক্সটা - বেশ পরিশ্রম হলো ওটা তুলে আনতে। অন্য দু'জন তখন একে-একে সিঁড়ি বেয়ে বাক্সটা বাইরে নিয়ে এলো। তারপর চারজন বাক্সটা কাঁধে তুলে নিয়ে গীর্জার বাইরে এলো। তারপর সবাই মিলে চললো, ফ্রান্সিসের আস্তানার দিকে। ওরা খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠলো। হৈ-হৈ করতে করতে বরফ-কাদার মধ্যে দিয়ে চললো-গানও ধরল কে যেন।

ফ্রান্সিস ও হ্যারির ঘরে বাক্সটা রাখলো ওরা। তারপরেও এসব নিয়ে বসে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বললো। তারপর নিজেদের তাঁবুতে, রাজবাড়ির যে সব ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল, সে-সব ঘরে ফিরে গেলো।

পরের দিন ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘর থেকে বেরলো না। শুয়ে-বসে দিনটা কাটিয়ে দিল। রাত হলে ভাইকিংরা তাঁবুর সামনে আগুন জ্বেলে, অনেক রাত পর্যন্ত আনন্দ

হৈ-হল্লা করলো। আগুনের চারপাশে ঘুরে - ঘুরে নাচল, গান গাইল।

পরের দিন, তখন বিকেল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের ঘরে বসে কথাবার্তা বলছে। ফ্রান্সিস বললো, 'বাবাকে কথা দিয়েছিলাম, দেড় মাসের মধ্যে ফিরবো। কিন্তু বোধহয় কথা রাখতে পারবো না। যা বুঝতে পারছি আরো কয়েকদিন দেরী হবেই। এখন রাজা সোক্কাসন এলে বাঁচি। সব ধনদৌলত তাঁর হাতে না তুলে দেওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

ওদের এসব কথাবার্তা চলছে, তখনই একজন ভাইকিং এসে খবর দিল, 'রাজা সোক্কাসন নিজে এসেছেন।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি তৈরী হয়ে বাইরে বেরোতে যাবে, তার আগেই রাজা এসে ঘরে ঢুকলেন, পেছনে রানী। দু'জনেই মাথা নীচু করে সম্মান জানালো। রাজা ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরলেন। ও তখন ভাবছে, রাজা-রানীকে কোথায় বসাব? রাজার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে বললো, 'আপনাদের কোথায় যে বসতে দিই?'

রানী হেসে বললেন, 'আমরা এখানেই বসছি।'

রানী হ্যারির বিছানায় বসলেন, রাজা ফ্রান্সিসের বিছানায়। বসেই যখন পড়েছেন, তখন আর কী করা যাবে?

ফ্রান্সিস বললো, 'আপনারা তো এখনো এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন দেখেন নি।'

কথাটা শেষ করেই ও চাবি দিয়ে বাক্সটার তালা খুলে ডালাটা তুললো। রাজা-রানী দু'জনেই বিস্ময়ে হতবাক। এত মূল্যবান সম্পদ?

রানী বিছানা থেকে নেমে কিছু গয়নাগাঁটি তুলে-তুলে দেখলো।

ফ্রান্সিস বললো, 'আপনারা এসে গেছেন। বাক্সটা লোক পাঠিয়ে রাজবাড়িতে নিয়ে যান। এবার আমাদের ছুটি দিন।'

রাজা কিছুক্ষণ বাক্সটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরস্বরে বললেন, 'এই গুপ্ত ধনভাণ্ডার তুমিই আবিষ্কার করেছ— এর সবটাই তোমার প্রাপ্য।'

ফ্রান্সিস বললো — 'না মহারাজ। উত্তরাধিকার সূত্রে এই সম্পদ আপনারই প্রাপ্য।'

রাজা মাথা নাড়লেন, 'না, তা হয় না। তোমাকেই নিতে হবে এই ধন ভাণ্ডার।'

হ্যারি এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার এগিয়ে এসে বললো, 'মহারাজ এবার আমি একটা কথা বলবো?

—'বলো।'

—'বলছিলাম, আপনি যদি ফ্রান্সিসকে অর্ধেক ধনভাণ্ডার দেন, তাহলে আর কোন সমস্যাই থাকে না।'

ফ্রান্সিস ভেবে দেখলো, এ ছাড়া সমাধানের কোন পথ নেই। ও বললো, 'আপনি যখন আমাকে দিতেই চান, তখন অর্ধেক দিন। তাতেই আমি খুশী হবো।'

—'বেশ।' রাজা উঠে দাঁড়ালেন। রানী বিছানা ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললেন, 'আজ রাত্রে রাজবাড়িতে আপনাদের সকলের নিমন্ত্রণ। আসবেন কিন্তু।'

—'নিশ্চয়ই।' ফ্রান্সিস বললো। আবার ওরা রাজা-রানীকে সম্মান জানালো। রাজা ও রানী চলে গেলেন।

* * *

রাত্রে ফ্রান্সিসরাও রাজবাড়িতে খেতে গেল। একটা বড় ঘরে খাওয়ার আয়োজন করা

বাক্সটায় খোলার দিকটায় দেখা গেল, একটা রূপোর তালা ঝুলছে। রূপোর তালাটাতেও মিনের কাজ করা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। লা ক্রুশের গুপ্তধনের বাক্সগুলোর দ্বিগুণ এই বাক্সটা। ওরা দু'জনেই বাক্সটার কারুকাজ দেখে অবাক হলো। হঠাৎ হ্যারি ওর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো, 'ফ্রান্সিস ডান কোণায় দেখো।'

ফ্রান্সিস মুখ তুলে ডানদিকে মশালটা বাড়াতে নিজে ভীষণভাবে চমকে উঠলো। দেখলো, এস্কিমোদের পোশাকপরা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। ডানহাতটা বাড়ানো। বোঝাই যাচ্ছে - মৃত মানুষ, ভীষণ শীতের দেশ বলেই অবিকৃত আছে মৃতদেহটা। কিন্তু বড় জীবন্ত। এবার ও মৃতদেহটার বাড়ানো হাতের দিকে লক্ষ্য করল। দেখলো, হাতের তেলোয় একটা বড় আকারের সোনার চাবি। ও আস্তে-আস্তে হাত বাড়িয়ে চাবিটা তুলে নিল। কী ঠাণ্ডা মৃতের হাতটা।

চাবিটা দিয়ে তালা খুললো ফ্রান্সিস। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে বাক্সের ডালাটা খুলে ফেললো। দেখলো, মশালের আলোয় ঝিক্‌মিক্‌ করছে সোনার মোহর, হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্না বসানো বিচিত্র সব অলঙ্কার। মোহর, অলংকারে বাক্সটা ঠাসা। দামী মণি-মুক্তো বসানো খাপে ভরা কয়েকটা ছোরা। কয়েকটা ছোট্ট সোনার কুঠার, মিনের কাজ করা তাতে।

ওদিকে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা বাইরে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। কতক্ষণে এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন দেখবে। এদিকে সিঁড়ি দিয়ে একজনের বেশী নামা যায় না। ফ্রান্সিস ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল। বললো, 'হ্যারি, চলো আমরা বাইরে যাই। ওরা একে একে দেখে যাক্‌।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি সিঁড়ি দিয়ে পর-পর ওপরে উঠে এলো। ওরা আসতেই সবাই একজন-একজন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ধনভাণ্ডার দেখে যেতে লাগলো। দু'চারজন মৃত এস্কিমোটাকে দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। ওরা দেখে একে-একে ওপরে উঠে আসছে যখন, বিস্ময়ের ঘোর তখনও তাদের কাটেনি। এত ধনসম্পদ? একসঙ্গে?

সবারই দেখা হলো। ফ্রান্সিস তখন বললো, 'এবার বাক্সটা ঘরে নিয়ে যেতে হবে। এখানে এত ধনসম্পদ ফেলে রাখা যাবে না - কে-কে যাবে যাও।'

চার-পাঁচজন ভাইকিং তৈরী হলো। দু'জনে ঘরের ভেতরে নামল। বাক্সটার দু'পাশে দুটো পেতলের কড়া। সেই দুটো ধরে ওরা বাক্সটা সিঁড়ির কাছে নিয়ে এলো। বেশ ভারী বাক্সটা - বেশ পরিশ্রম হলো ওটা তুলে আনতে। অন্য দু'জন তখন একে-একে সিঁড়ি বেয়ে বাক্সটা বাইরে নিয়ে এলো। তারপর চারজন বাক্সটা কাঁধে তুলে নিয়ে গীর্জার বাইরে এলো। তারপর সবাই মিলে চললো, ফ্রান্সিসের আস্তানার দিকে। ওরা খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠলো। হৈ-হৈ করতে করতে বরফ-কাদার মধ্যে দিয়ে চললো-গানও ধরল কে যেন।

ফ্রান্সিস ও হ্যারির ঘরে বাক্সটা রাখলো ওরা। তারপরেও এসব নিয়ে বসে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বললো। তারপর নিজেদের তাঁবুতে, রাজবাড়ির যে সব ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল, সে-সব ঘরে ফিরে গেলো।

পরের দিন ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘর থেকে বেরলো না। শুয়ে-বসে দিনটা কাটিয়ে দিল। রাত হলে ভাইকিংরা তাঁবুর সামনে আগুন জ্বেলে, অনেক রাত পর্যন্ত আনন্দ

হৈ-হল্লা করলো। আগুনের চারপাশে ঘুরে - ঘুরে নাচল, গান গাইল।

পরের দিন, তখন বিকেল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের ঘরে বসে কথাবার্তা বলছে। ফ্রান্সিস বললো, 'বাবাকে কথা দিয়েছিলাম, দেড় মাসের মধ্যে ফিরবো। কিন্তু বোধহয় কথা রাখতে পারবো না। যা বুঝতে পারছি আরো কয়েকদিন দেরী হবেই। এখন রাজা সোক্কাসন এলে বাঁচি। সব ধনদৌলত তাঁর হাতে না তুলে দেওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

ওদের এসব কথাবার্তা চলছে, তখনই একজন ভাইকিং এসে খবর দিল, 'রাজা সোক্কাসন নিজে এসেছেন।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি তৈরী হয়ে বাইরে বেরোতে যাবে, তার আগেই রাজা এসে ঘরে ঢুকলেন, পেছনে রানী। দু'জনেই মাথা নীচু করে সম্মান জানালো। রাজা ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরলেন। ও তখন ভাবছে, রাজা-রানীকে কোথায় বসাব? রাজার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে বললো, 'আপনাদের কোথায় যে বসতে দিই?'

রানী হেসে বললেন, 'আমরা এখানেই বসছি।'

রানী হ্যারির বিছানায় বসলেন, রাজা ফ্রান্সিসের বিছানায়। বসেই যখন পড়েছেন, তখন আর কী করা যাবে?

ফ্রান্সিস বললো, 'আপনারা তো এখনো এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন দেখেন নি।'

কথাটা শেষ করেই ও চাবি দিয়ে বাক্সটার তালা খুলে ডালাটা তুললো। রাজা-রানী দু'জনেই বিস্ময়ে হতবাক। এত মূল্যবান সম্পদ?

রানী বিছানা থেকে নেমে কিছু গয়নাগাঁটি তুলে-তুলে দেখলো।

ফ্রান্সিস বললো, 'আপনারা এসে গেছেন। বাক্সটা লোক পাঠিয়ে রাজবাড়িতে নিয়ে যান। এবার আমাদের ছুটি দিন।'

রাজা কিছুক্ষণ বাক্সটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরস্বরে বললেন, 'এই গুপ্ত ধনভাণ্ডার তুমিই আবিষ্কার করেছ— এর সবটাই তোমার প্রাপ্য।'

ফ্রান্সিস বললো — 'না মহারাজ। উত্তরাধিকার সূত্রে এই সম্পদ আপনারই প্রাপ্য।'

রাজা মাথা নাড়লেন, 'না, তা হয় না। তোমাকেই নিতে হবে এই ধন ভাণ্ডার।'

হ্যারি এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার এগিয়ে এসে বললো, 'মহারাজ এবার আমি একটা কথা বলবো?

—'বলো।'

—'বলছিলাম, আপনি যদি ফ্রান্সিসকে অর্ধেক ধনভাণ্ডার দেন, তাহলে আর কোন সমস্যাই থাকে না।'

ফ্রান্সিস ভেবে দেখলো, এ ছাড়া সমাধানের কোন পথ নেই। ও বললো, 'আপনি যখন আমাকে দিতেই চান, তখন অর্ধেক দিন। তাতেই আমি খুশী হবো।'

—'বেশ।' রাজা উঠে দাঁড়ালেন। রানী বিছানা ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললেন, 'আজ রাত্রে রাজবাড়িতে আপনাদের সকলের নিমন্ত্রণ। আসবেন কিন্তু।'

—'নিশ্চয়ই।' ফ্রান্সিস বললো। আবার ওরা রাজা-রানীকে সম্মান জানালো। রাজা ও রানী চলে গেলেন।

* * *

রাত্রে ফ্রান্সিসরাও রাজবাড়িতে খেতে গেল। একটা বড় ঘরে খাওয়ার আয়োজন করা

হয়েছে। সব এাস্কিমো সৈন্যরা ওদের মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। ফ্রান্সিসকে বসতে হলো রাজা ও রানীর মাঝখানে। নেসার্কের মুখে পরে ফ্রান্সিস শুনেছিল, এটা একটা নাকি দুর্লভ সম্মান। অন্য দেশের রাজা - মহারাজাকেই এই সম্মান দেওয়া হয়। অনেক রাত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া চললো। রাজা ওদের বিদায় জানাতে রাজবাড়ির প্রধান ফটক পর্যন্ত এলেন। তখনই ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কবে ফিরে যাবেন?'

—'কালকে দুপুর নাগাদ আমার দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হব।'

রাজা বললেন, 'ধনভাণ্ডার দু'ভাগ করার দায়িত্ব মন্ত্রীকে দিয়েছি। কাল সকালেই তোমার প্রাপ্য অর্ধাংশ পৌঁছে দেওয়া হবে।'

একটু আমতা - আমতা করে ফ্রান্সিস বললো, 'যদি কিছু মনে না করেন আর একটা অনুরোধ।'

—'বলো!'

—'ধনভাণ্ডারের বাক্সটা আমার খুব পছন্দ। বড় সুন্দর বাক্সটা।'

রাজা হেসে উঠলেন। এ আর বেশী কথা কি। ওটা তোমাকেই দেব।'

ওরা রাজার কাছে বিদায় নিয়ে চলে এল নিজেদের আস্তানায়।

*　　　*　　　*

পরের দিন সকাল থেকেই শুরু হল ভাইকিংদের কর্মতৎপরতা। সবাই হাত লাগালো জিনিস-পত্র গোছগাছ করতে। কথাবার্তা, ডাকাডাকিতে মুখর হয়ে উঠলো বাট্টাহালিড্। ওরা যাবার আয়োজনে ব্যস্ত, তখনই রাজার বলগা হরিণে টানা শ্লেজগাড়িটা নিয়ে নেসার্ক এল। গাড়িটায় এরিক দ্য রেডের অর্ধেক ধনভাণ্ডারসহ বাক্সটা রাখা। নেসার্ক ফ্রান্সিসকে বললো, 'রাজার নির্দেশে এই বাক্সটাসহ আপনাকে আঙ্গামাগাসালিখ বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই রওনা হবার জন্যে তৈরী হল। রাজা, নেকাস্টা, মন্ত্রী, কয়েকজন অমাত্য এলেন ওদের বিদায় জানাতে। রাজা ফ্রান্সিসকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর ফ্রান্সিস এসে গাড়িতে উঠলো।

যাত্রা শুরু হল।

সকলেই খুশী। আবার স্বদেশে ফিরে যাচ্ছে। হৈ-হৈ করে বরফের প্রান্তরের ওপর দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগলো। দিনটা মেঘ আর কুয়াশায় মুক্ত। রোদ খুব উজ্জ্বল নয়। তবু অনেকদূর পর্যন্ত আলো ছড়ানো দেখা যাচ্ছে। চীৎকার করে ওরা কুকুরগুলোকে উৎসাহ দিচ্ছে। বাতাসে চাবুকের ঘা-এর শব্দ উঠছে। বেশ জোরেই চললো শ্লেজগাড়িগুলো। সবার সামনে ফ্রান্সিসের গাড়ি। নেসার্ক চালাচ্ছে গাড়িটা। ও-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। তুষার আর বরফে ঢাকা প্রান্তরে পথ বলে কিছু থাকে না। শুধু দিক ঠিক করে গাড়ি চালাতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়, হিমবাহ আর গলা বরফের এলাকার দিকে। গাড়ি যেন হিমবাহ আর গলা বরফের মধ্যে গিয়ে না পড়ে। সামনে রয়েছে নেসার্ক। ও-ওর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে সব দিকে নজর রেখে চলেছে।

দু'দিন বেশ নির্বিঘ্নেই কাটল। কিন্তু কোর্টল্ড পৌঁছবার আগের দিন বিকেলের দিকে কুয়াশায় চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো। ফ্রান্সিস গাড়ি চালক সবাইকে নির্দেশ দিল গাড়ি থামিয়ে আসন্ন ঝড়ের মোকাবিলা করতে। নইলে ঝড়ের মধ্যে যে কোন গাড়ি দলছুট হয়ে যেতে পারে। ফ্রান্সিসের এই ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। ওর নির্দেশমতো

গ্যাড়িগুলো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরেই শুরু হলো তুষারবৃষ্টি, আর সেই সঙ্গে প্রবল ঝড়ো হাওয়ার ঝাপ্টা। কেউ-কেউ কুকুরগুলোর আড়ালে, বরফের ওপর উবু হয়ে রইলো। ফ্রান্সিস এর আগেও ঝড়ের কবলে পড়েছে। কিন্তু আজকের ঝড়টা আরো প্রচণ্ড। নাক-মুখ চাপা দিয়ে সে গাড়িতে বসে রইলো। প্রায় সকলেরই এক অবস্থা। শুধু নেসার্ক আর সাঙখু ঝড়ের মধ্যে বলগা ও কুকুরগুলোর পরিচর্যা করতে লাগলো। এগুলোর গায়ে জমা তুষার পরিষ্কার করে দিতে লাগলো। গাড়ির লাগাম, দড়ি-দড়া ঠিক করতে লাগলো।

ভাগ্য ভাল, অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝড়ো হাওয়া কমলো। তুষারবৃষ্টিও কমে এলো। আবার যাত্রা শুরু হল। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার গাঢ় হলো। রাত্রি নামলো। ওরা সে রাত্রের মত থামলো। তাঁবু খাটাল, রান্না করে খাওয়া-দাওয়া সারলো। তারপর রাতের মত ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন আবার যাত্রা শুরু হল। দুপুরের দিকে ওরা কোর্টল্ড পৌঁছল। একদিন পুরো বিশ্রাম নিল। তারপর আবার যাত্রা।

কয়েকদিন পরে আঙ্গামাগাসালিক বন্দরে পৌঁছল। পথে তুষারঝড়ের কবলে পড়তে হয়নি। যাত্রা নির্বিঘ্নেই শেষ হল। পথে সাঙখু একটা শ্বেতভালুক শিকার করেছিল। ছুরি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভালুকটার চামড়া ছাড়িয়ে গাড়িতে তুলে নিয়েছিল। হ্যারি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অবশ্য কোর্টল্ডে একদিন বিশ্রাম নিয়ে হ্যারি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

আঙ্গমাগাসালিকে ওরা পৌঁছল বিকেলের দিকে। তখনই চারদিক প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। স্লেজগাড়িগুলো থেকে জিনিসপত্র নিয়ে একেবারে অন্ধকার হয়ে আসার আগে জাহাজে তোলা হল। খুব উৎসাহের সঙ্গে সবাই কাজ করে গেল। রাত্রে জাহাজ চালানো বিপজ্জনক। কারণ এখানকার সমুদ্রে বহুদূর পর্যন্ত হিমশৈল ভেসে বেড়াচ্ছে। কোন একটার সঙ্গে অন্ধকারে ধাক্কা লাগলে জাহাজডুবি হবে। কাজেই স্থির হল সকালে রওনা হব। রাত্রি হল। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা নৌকো করে তীরে এল। কালুটুলার তাঁবুতে গেল। কালুটুলা খুব খুশী হল। আগুন জেলে এস্কিমোরা আগুনের চারপাশে নাচছিল, ড্রাম বাজাচ্ছিল, গান গাইছিল। ওরা সেই নাচ-গানের আসরে যোগ দিল। অনেক রাত-পর্যন্ত নাচ-গান চললো। তারপর জাহাজে ফিরে এল।

পরদিন নেসার্ক ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে এল। ফ্রান্সিস নেসার্ককে জড়িয়ে ধরল। আবেগে ও কথা বলতে পারছিল না। নেসার্কের এক অবস্থা। ফ্রান্সিস বাক্স থেকে একটা মনিমুক্তোখচিত খাপওয়ালা ছোরা বের করে রেখেছিল। সে ওটা নেসার্কের হাতে দিল। নেসার্ক নিতে রাজী হচ্ছিল না। তখন ফ্রান্সিস বললো, 'এটা তোমাদেরই অতীতের এক রাজার সম্পত্তি। এটা তোমারই প্রাপ্য।'

নেসার্ক নিল ছোরাটা। ওর চোখমুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওর ওপর ফ্রান্সিসের কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। ও বার-বার ফ্রান্সিসকে ধন্যবাদ দিতে লাগলো। তারপর হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বলগা হরিণে-টানা স্লেজগাড়িটা নিয়ে চলে গেল।

এবার এস্কিমো সর্দার কালুটুলা আর সাঙখুর কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি কালুটুলার তাঁবুতে গেলো। জাহাজে যে ক'টা রঙীন কাপড় ছিল সব নিয়ে

গেল। রঙীন কাপড়গুলো কালুটুলাকে উপহার দিল। কালুটুলা বার-বার বলতে লাগলো 'কুয়অনকা' অর্থাৎ 'তোমাকে ধন্যবাদ'। সাঙখুকে ওরা জড়িয়ে ধরল। ওদের জন্যে অনেক করেছে সাঙখু। ফ্রান্সিস দু'জনকে দুটো মুক্তো দিল। ওরা রঙীন কাপড় আর মুক্তো পেয়ে খুব খুশী হল। ওরা জাহাজে ফিরে এল। এবার স্বদেশের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা। দড়ি-দড়া ঠিক করে পাল খাটিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। বরফের দেশ পেছনে পড়ে রইল। জাহাজ চললো দক্ষিণমুখো। সমুদ্রের জলে এখানে-ওখানে হিমশৈল ভাসছে। তার মধ্য দিয়ে ধাক্কা এড়িয়ে সাবধানে জাহাজ চালাতে লাগলো। ওরা খুব দক্ষ জাহাজচালক।

★ ★ ★

জাহাজ চলতে লাগলো। কয়েকদিন পরেই দেখা গেল, সমুদ্রে আর হিমশৈল ভাসছে না। এবার বেশ গরম বোধ হতে লাগলো। ভাইকিংরা এস্কিমোদের মাথাঘাড় ঢাকা পোশাক ছেড়ে তাদের পোশাক পরতে লাগলো। সমুদ্র শান্ত। বাতাসও বেগবান। পাল ফুলে উঠলো। জাহাজ চললো দ্রুতগতিতে। একদিন শুধু ঝড়ো আবহাওয়ার মধ্যে পড়লো ওরা। কয়েক ঘণ্টা পরেই সে আবহাওয়া আর রইলো না।

জাহাজ একদিন ভাইকিংদের দেশে পৌঁছলো। তখন দুপুরবেলা। বন্দরে লোকজনের ভীড় ছিল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ ভিড়লে অনেকেই ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে চিনলো। ওরা হৈ-হৈ করে উঠলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসদের ফেরার খবর রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়লো। হাজার-হাজার লোক জাহাজঘাটায় এসে ভীড় করলো। চীৎকার করে বলতে লাগলো, 'ফ্রান্সিস, তোমরা কি এনেছ, আমাদের দেখাও।'

অগত্যা ফ্রান্সিস ওর বন্ধুদের এরিক দ্য রেডের বাক্সটা নিয়ে গিয়ে দেখাতে বললো। ওরা বাক্সটা বাইরে নিয়ে এলো। কয়েকজন মিলে উঁচু করে বাক্সটা দেখাতে লাগলো। হীরে-জহরৎ আর চুনী-পান্নার কারুকাজ করা ছোরা, কুঠার দেখে ওরা অবাক হয়ে গেল। এবার বন্ধুরা অনেকে এসে বললো, 'ফ্রান্সিস, অনেকদিন আমরা বাড়িছাড়া। আমাদের বাড়ি যেতে দাও।'

ফ্রান্সিস কী আর করে। বললো, 'আমি আর হ্যারি থাকছি। রাজার সৈন্য না-আসা পর্যন্ত আরো কয়েকজন থাকো। বাকীরা বাড়ি যাও।'

অনেকেই জাহাজ থেকে নেমে ঘোড়ার গাড়ী ধরতে ছুটল। ফ্রান্সিস বিস্কোকে বললো, 'তুমি বাড়ি যাবার সময় রাজপ্রাসাদে আমাদের আসার সংবাদটা দিয়ে যেও।'

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, বেশ কিছু বন্ধু জাহাজে ফিরে এলো। এক সময় বিস্কোও ফিরে এলো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি এর অর্থ বুঝলো না। কী ব্যাপার? ওরা সব ফিরে এলো কেন? ওরা সবাই কেমন ফ্রান্সিসকে এড়িয়ে-এড়িয়ে যেতে লাগলো। ফ্রান্সিস যত ওদের ফিরে আসার কারণ জানতে চাইল, ওরা ততোই কোন কথা না বলে সরে-সরে যেতে লাগলো।

হ্যারি এবার বিস্কোকে ধরলো। আড়ালে ডেকে নিয়ে বললো, 'কী হয়েছে বলো তো? তোমরা ফ্রান্সিসকে অমন এড়িয়ে-এড়িয়ে যাচ্ছে কেন?'

বিস্কো একটু চুপ করে রইলো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'হ্যারি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি, ফ্রান্সিসের মা দিন-পাঁচেক আগে মারা গেছেন। যারা বাড়িতে গেছে, তারাই খবরটা শুনেছে। ফ্রান্সিসের এই দুঃখের দিনে ওর পাশে না থেকে, বাড়িতে শুয়ে

আরাম করবো? তাই ফিরে এসেছি।'

হ্যারি মহা সমস্যায় পড়লো। ওকে কীভাবে এই ভীষণ শোকাবহ কথাটা জানাবে? তখনই দেখলো, ফ্রান্সিস তার দিকেই আসছে। ও এসেই জিজ্ঞেস করলো, 'কী ব্যাপার বলো তো? ওরা এ-রকম ব্যবহার করছে কেন?'

হ্যারি নিজেও ফ্রান্সিসের মাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। এ-রকম মা পাওয়া ভাগ্যের কথা। এই খবর শুনে পর্যন্ত বুকে একটা টনটনে ব্যথা ও অনুভব করছিল। প্রাণপণে সেই ব্যথাটা সহ্য করছিল। একটু ধরা গলায় ও বললো 'তুমি বাড়ি যাও।'

—'সে কি! তুমি একা থাকবে?'

—'তা কেন? বিস্কো থাকবে, যারা ফিরে এসেছে, তারাও থাকবে।'

ফ্রান্সিস এবার ঘুরে হ্যারির চোখের দিকে সরাসরি তাকাল। একটু গম্ভীর স্বরে বললো, 'কী ব্যাপার বলো তো? তোমাদের সকলের ব্যবহারেই আমি কেমন একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করছি। মনে হচ্ছে, তোমরা আমার কাছে কিছু লুকচ্ছো!'

—'তুমি বাড়ি যাও।' হ্যারি সহজ গলায় বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারলো না। ওর গলার ব্যথা-কাতর ভাবটা চাপা থাকল না।

হঠাৎ ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করে উঠলো ফ্রান্সিস, 'বাড়ি যাবো না আমি।'

তারপর দ্রুত এগিয়ে হ্যারি গলার কাছে জামাটা মুঠো করে চেপে ধরে দাঁতচাপা স্বরে বলে উঠলো, 'পরিষ্কার বলো, কী হয়েছে?'

হ্যারির প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলো। হ্যারি তবু চুপ করে রইলো। কোন কথা বললো না।

—'হ্যারি -ই-ই।' ক্রুদ্ধস্বরে ফ্রান্সিস বলে উঠলো।

হ্যারি শান্ত স্বরে বললো, 'আমার জামা ছেড়ে দাও।'

ফ্রান্সিস ওর জামা ছেড়ে দিল। হ্যারি আগের মতই শান্তস্বরে বললো, 'দুঃখের সঙ্গে বলছি, কথাটা তুমি আমাকে বলতে বাধ্য করলে।'

'হ্যাঁ -হ্যাঁ বলো'। ফ্রান্সিস একটু হাঁপাতে - হাঁপাতে বললো।

—'পাঁচদিন আগে তোমার মা মারা গেছেন।'

ফ্রান্সিস কেমন যেন শূন্যদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। একটা কথাও বলতে পারল না। চোখের সামনে ও যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ও আস্তে-আস্তে জাহাজ-ঘাটার সঙ্গে লাগিয়ে রাখা পাটাতন দিয়ে হেঁটে জাহাজঘাটায় নামলো। বিস্কো ছুটে এলো হ্যারির কাছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো, 'ওকে এই অবস্থায় একা ছেড়ে দিলে?' বলেই ও ফ্রান্সিসের দিকে ছুটে যেতে গেল।

হ্যারি ওকে আটকে দিল। বললো, 'ওকে একাই যেতে দাও, আমরা বরং জাহাজে থাকি।'

ওদিকে ফ্রান্সিসকে জাহাজ থেকে নামতে দেখে, জনতার ভীড়ে উল্লাসধ্বনি উঠলো- 'ফ্রান্সিস দীর্ঘজীবী হও।'

ইতিমধ্যে সবাই ঘিরে ধরলো ফ্রান্সিসকে। সকলেই ওর সঙ্গে করমর্দন করতে চায় ওর গায়ে হাত দিতে চায়। কিন্তু ওর নিরাসক্ত উদাসীন ভাব দেখে সকলেই একটু আশ্চর্য হলো। ফ্রান্সিস দৃঢ় পায়ে ভীড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে গেল। সবাই ওকে যাবার পথ করে দিল। সে কোন দিকে তাকালো না। সোজা গিয়ে একটা গাড়িতে উঠলো,

গাড়ি চলতে শুরু করলো। কেউই তার এই নিরাসক্ত ব্যবহারের কারণ বুঝলো না। তবু দু'পাশে ভীড় করে লোকেরা গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে যেতে লাগলো।

ফ্রান্সিস হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো, 'গাড়ি জোরে চালাও।'

গাড়ির কোচম্যান সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। ভীড় পেছনে রইলো। গাড়ি দ্রুতগতিতে ছুটল। বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। আস্তে-আস্তে গাড়ি থেকে নামলো। দেখলো, সেই নীলফুলের লতাগাছটা দেয়ালের গায়ে আরো - আরো অনেকদুর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। কত নীলফুল ফুটে আছে। এই গাছটা তো মা-ই লাগিয়েছিল।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকলো ফ্রান্সিস। ফুলে-ফুলে ছেয়ে আছে সারা বাগানটা। মার বরাবরের অভ্যেস ছিল, খুব সকালে বাগানটার পরিচর্যা করা। দাঁত-ফোকলা মালীটাকে নিয়ে সারা সকালটাই মার এই বাগানে কাটতো। ফুলগাছের জটলার মধ্যে থেকে মালীটা তখনি উঠে দাঁড়ালো - হাতে বেল্‌চা। বোধহয় ফুলগাছের নীচের মাটি আল্‌গা করে দিচ্ছিল। ওকে দেখেও কিন্তু বরাবরের মত ফোকলা দাঁতে হাসলো না। কেমন চুপ করে, একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

ফ্রান্সিস বাড়ির ভেতর ঢুকল। যেখানে যে জিনিস থাকবার, তাই আছে। মা যেমন করে ঘরদোর সাজিয়ে রাখত, সেভাবেই সাজানো রয়েছে। ও নিজের ঘরে ঢুকলো। বিছানা আসবাবপত্র সব পরিচ্ছন্ন ভাবে গোছানো, যেমন বরাবর দেখে এসেছে। বিছানায় বসলো একটু, ভালো লাগলো না বসে থাকতে। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মার ঘরে। সব পরিপাটি সাজানো। বিছানাটা বরাবরের মতো সুচারুভাবে পাতা, যেন এক্ষুণি এসে শোবে। শেষের দিকে মা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যখন-তখন এসে বিছানায় শুয়ে থাকতো। বাবার ঘরে গেল ও, সেই একই ভাবে সাজানো-গোছানো। দেয়ালে মার একটা ছবি, হাতে আঁকা রঙিন ছবি। ও এক দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো। ছবিতে হাসি-হাসি মুখ। এমনি হাসিহাসি মুখেই মা বলতো-'হ্যারে, কবে তোর পাগলামি সারবে? বুড়ী মা'টার কথা কি তোর একবারও মনে পড়ে না?'

ফ্রান্সিস আর তাকিয়ে থাকতে পারল না। পাগলের মত সারা বাড়িতে প্রতিটি ঘর ঘুরে বেড়ালো। বাবা আর ছোট ভাইটা বাড়ি নেই। কাউকে পেলো না, শূন্য বাড়ি - মা নেই। ভাবতে-ভাবতে ছুটে এলো নিজের ঘরে। তারপরই বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠলো। সমস্ত শরীর থর কাঁপতে লাগলো। বুকটা যেন খালি হয়ে গেছে - শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। শরীরের এই অবস্থা নিয়ে ও কাঁদতে লাগলো।

কখন বিকেল হয়েছে ও জানে না। হঠাৎ বাবার ডাক শুনলো, 'ফ্রান্সিস—'

ও বিছানা থেকে আস্তে-আস্তে উঠে বসলো। দেখলো, বাবা আর ছোট ভাই দরজায় দাঁড়িয়ে। ও চোখ মুছে নিল। বাবা আস্তে-আস্তে এসে বিছানায় ওর পাশে বসলেন। একটু কেশে নিয়ে সহজভাবেই বললেন, 'রাজবাড়িতে তোমাদের ফেরার সংবাদ পেয়েছি।'

একটু থেমে বললেন, 'শরীর ভালো আছে তো?'

ফ্রান্সিস মাথা নাড়লো। ভাবলো, বাবা এত সহজ ভাবভঙ্গীতে কথা বলছেন, যেন কিছুই হয়নি। ও বাবার মুখের দিকে তাকালো। বাবা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ উঠে চলে গেলেন। ছোট ভাইটা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস ওকেই ডাকল, ও কাছে আসতে জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যারে, মা খুব কষ্ট

পেয়েছিল?'

—'নাঃ।' ভাইটি মাথা নাড়লো। বললো, 'সেদিন বিকেল থেকে হঠাৎ শরীরটা ভালো লাগছে না বলে, বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। বাবা বাড়িতেই ছিলেন। রাজবৈদ্যকে ডেকে আনা হলো। মা তখনও জ্ঞান হারায় নি! কেবল তোমার কথা বলছিল — 'পাগল ছেলেটা এখনও ফিরলো না - ওকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে।'

কথাটা শুনে ফ্রান্সিস আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, ওর ভাইয়ের চোখেও জল এলো। একটু সুস্থির হয়ে ফ্রান্সিস বললো, 'তারপর?'

—'সন্ধ্যের সময় মা জ্ঞান হারালো। রাজবদ্যি ওষুধ-টষুধ দিল, কিন্তু কাজ হলো না। সারারাত এভাবে কাটালো। ভোরের দিকে একটু জ্ঞান ফিরেছিল, চারদিকে তাকাচ্ছিল মা। তারপর আবার অজ্ঞান। একটু বেলা হতেই মা--'

ও আর বলতে পারল না। ফ্রান্সিস অনেকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটা পাখি কিচ কিচ্ শব্দ করে একবার ঘরে ঢুকছে, আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। ও একসময় চোখ ফিরিয়ে দেখলো, ভাইটি ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

রাতের দিকে হ্যারি-বিস্কোরা কয়েকজন এলো। সবাই চুপ-চাপ বসে রইলো, কথা বললো না বেশী। আগে যখন আসত, কত কথা হতো ওদের মধ্যে। কিন্তু আজকে সবাই চুপচাপ। ফ্রান্সিস এখনও মার মৃত্যুশোকের ধাক্কাটা পুরোপুরি সামলাতে পারেনি। তাই ওর মন চাইছিল অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে। তাই জিজ্ঞেস করলো, 'এরিক দ্য রেডের' গুপ্তধন কীভাবে আনা হলো?'

—'সব উৎসব, শোভাযাত্রা রাজা বাতিল করে দিয়েছেন। রাজবাড়ির একটা গাড়িতে করে বাক্সটা এনে রাজার যাদুঘরে রাখা হয়েছে।' হ্যারি বললো।

—'আসল কথা তোমার মার মৃত্যুতে রাজা অত্যন্ত শোক পেয়েছেন। তিনি কোনরকম আনন্দ-উৎসব এ সময় করতে চান না।' বিস্কো বললো।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বললো না। আরো কিছুক্ষণ বসে রইলো ওরা। তারপর একটু রাত হতে সকলে চলে গেল।

ফ্রান্সিস যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। কোথাও বেরোয় না। চুপচাপ নিজের ঘরে বসে থাকে। কখনও কখনও মার ঘরে গিয়েও বসে থাকে। সেদিন মার ঘরের কাছে এসে দেখলো, বাবা একদৃষ্টিতে মার ছবিটার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। চোখের জল গাল বেয়ে পড়ছে। এই ঘটনাটা ওর মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। বুঝলো, বাবাকে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। বড় চাপা স্বভাবের মানুষ। বুঝলো, বাবার শোক ওর চেয়ে কিছু কম নয়।

সারাদিন ফ্রান্সিসের একা-একা কাটে। রাতের দিকে বন্ধুরা আসে। একটু কথাবার্তা হয়, তারপর ওরা চলে গেলে আবার ও একা। এভাবেই দিন কাটতে লাগলো ওর। এর মধ্যে একদিন রাজা রাজপরিবারের একটা গাড়ি পাঠালেন ফ্রান্সিসের কাছে। কোচম্যান এসে ওর সঙ্গে দেখা করলো। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে রাজার একটা চিঠি ওর হাতে দিল। চিঠিটা পড়লো ও। ছোট্ট চিঠি—

'স্নেহের ফ্রান্সিস,

তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। তবু আমার কাছে একবার এসো।'

নীচে রাজার স্বাক্ষর। রাজা ডেকেছেন কাজেই একবার যেতেই হবে। ও যখন

সাজপোশাক পরছে, তখনই মার কথা মনে পড়লো। রাজবাড়িতে যাবার সময় মাই ওকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিত। পোশাক পরতে থাকা ওর হাতটা থেমে গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ও। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো। ও আবার পোশাক পরতে লাগলো। অনেকদিন পরে আয়নায় নিজের মুখ দেখলো। বেশ রোগাই হয়ে গেছে, ও ওটা বুঝলো। মাথায় শেযবারের মতো চিরুনী বুলিয়ে ও গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

গাড়ি চললো। গ্রীনল্যাণ্ড থেকে এসে পর্যন্ত ও বাড়ির বাইরে বেরোয় নি। এতদিন পরে পথে বেরিয়ে ওর ভালোই লাগলো। জমজমাট বাজারের কাছে আসতে গাড়ির গতি কমে এলো। রাস্তার ভীড়ের মধ্যে যারাই ওকে চিনল, তারাই হেসে হাত নাড়লো। অগত্যা ওকেও কখনও-কখনও হাত নাড়তে হলো, হাসতে হলো!

একসময় গাড়ি রাজবাড়িতে এসে পৌঁছল। রাজার একজন দেহরক্ষী ওকে রাজবাড়ির মধ্যে নিয়ে চললো। সাজানো-গোছানো দেয়ালে, জানলায় নানা কারুকাজ করা অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে মন্ত্রণা কক্ষের সামনে এসে দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘরটা দেখিয়ে দিতে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে দেহরক্ষী চলে গেল। ফ্রান্সিস ঘরে ঢুকে দেখলো, রাজা বসে আছেন। সামনে শ্বেতপাথরের বিরাট গোল টেবিল। আঁকা-বাঁকা আবলুস কাঠের পায়াঅলা কয়েকটা সবুজ গদীআঁটা চেয়ার টেবিল চারপাশে পাতা। রাজাকে ও মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। রাজা ওকে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ফ্রান্সিস, তোমার মার মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক পেয়েছি। রাজবাড়ির উৎসবে উনি বড় একটা আসতেন না। তবু যে ক'দিন তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি তাঁর কথাবার্তা ব্যবহারে এটা বুঝেছিলাম, উনি খুব শিক্ষিতা ও রুচিশীলা মহিলা ছিলেন।'

রাজা থামলেন। ফ্রান্সিস কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না, ও চুপ করে রইলো।

রাজা একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'তোমাকে যে-কারণে ডেকে পাঠিয়েছি সেটা বলি।'

—'বলুন।'

—'এরিক দ্য রেডের যে ধনসম্পদ তুমি এনেছ, সেটা কী করতে চাও?'

—'আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।'

—'তা হয় না ফ্রান্সিস। এনর সোক্কাসন এটা ব্যক্তিগতভাবে তোমাকেই দিয়েছেন। তুমি যা বলবে তাই হবে।'

—'আমি এখন - মানে - ঠিক গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারছি না।'

রাজা একটু চুপ করে রইলেন তারপর বললেন, 'আমারই ভুল হয়েছে। তোমার এই মানসিক অবস্থায় - ঠিক আছে, তুমি পরেই বলো।'

—'তাহলে আমাকে যাবার অনুমতি দিন।'

—হ্যাঁ, এসো। আমরা পরে কথা বলবো।' রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে সম্মান জানালো। তারপর ঘরের বাইরে চলে এলো। দেহরক্ষী ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে পাশে নিয়ে দেউড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

ফ্রান্সিসের দিন একইভাবে কাটতে লাগলো। তবে এখন ও আর বাড়িতে সবসময় থাকে না। মাঝে-মাঝে বিকেলের দিকে বেরোয়। লোকজনের ভীড় এড়িয়ে সমুদ্রের ধারে আসে। নোঙর করা জাহাজগুলো দেখে। লোভ হয়, আবার একটা জাহাজ নিয়ে

বেরিয়ে পড়তে। সাত-পাঁচ ভাবে, আর একা-একা সমুদ্রের তীরে ঘোরে।

একদিন এইরকম সমুদ্রের তীরে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্য করেননি, রাজবাড়ির একটি সুদৃশ্য ঘোড়ার গাড়ি ওর কাছাকাছি এসে থামলো। ও নিজের মনেই সমুদ্রের দিকে মুখ করে হাঁটছিল। ঝালর লাগানো রঙীন পোশাক পরা রাজবাড়ীর কোচম্যান ওর সামনে এসে দাঁড়াল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বললো, 'আপনাকে রাজকুমারী ডাকছেন।'

ফ্রান্সিস ঘুরে তাকিয়ে দেখলো, 'রাজকুমারী মারিয়া একা গাড়িটায় বসে আছে। ওকে দেখে মৃদু হাসল। ও গাড়িটার কাছে এগিয়ে গেল। রাজকুমারীকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। রাজকুমারী বললো, 'খুব যদি ব্যস্ত না থাকেন, আমার গাড়িতে আসতে পারেন।'

ফ্রান্সিস একটু দ্বিধায় পড়লো, ওর মন চাইছিল একা-একা ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু ওদিকে রাজকুমারীর আমন্ত্রণও উপেক্ষা করা যায় না। অগত্যা ও গাড়িতেই উঠল। রাজকুমারীর নির্দেশে গাড়ি চললো। ঝলমলে পোশাক পরা রাজকুমারী, গাড়ির ভিতরে একটা তৃপ্তিদায়ক সুগন্ধ, ডুবন্ত সূর্যের আলো, ঘোড়ার পায়ের শব্দ— এই সবকিছু হঠাৎ ওর ভালো লাগলো।

রাজকুমারীর সেই উচ্ছলতা আজকে নেই। হয়তো শোকগ্রস্ত ফ্রান্সিসের সামনে সেটা বেমানান লাগবে, এই জন্যেই রাজকুমারী চুপ করে রইলো। গাড়ি চললো। একসময় রাজকুমারী বললো, 'আপনার মার মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোক পেয়েছি।'

ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে রইলো। কোন কথা বললো না। রাজকুমারী বলালা, 'আপনার শরীরটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে।'

ফ্রান্সিস চুপ করে রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে রইলো। কোন কথা বললো না। রাজকুমারী বললো, 'আপনার শরীরটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে।'

ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। রাজকুমারী বললো, 'যদি আপনার ইচ্ছে হয়, আমাদের বাড়ি যেতে পারেন। অনেকদিন আপনার মুখে গল্প শুনিনি।'

প্রথমে ওর যেতে ইচ্ছে হলো না। একা থাকতেই ভালো লাগছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ইচ্ছে হলো। ওখানে গেলে, রাজকুমারীর সঙ্গে কথাবার্তা বললে হয়তো মনটা একটু শান্ত হবে। ফ্রান্সিস বললো, 'আজকে নয়, আর একদিন গাড়ি পাঠাবেন যাবো।'

মারিয়া তারপর ওর গ্রীনল্যাণ্ড অভিযান নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো। ফ্রান্সিস ওর কথা বলার প্রিয় বিষয় পেয়ে গেল। কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েই ও মধ্যরাত্রিতে সূর্য দেখবার অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস সেই আগের ফ্রান্সিস হয়ে গেল। উৎসাহের সঙ্গে ও বরফের দেশে ওর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলো। মারিয়া খুশী হলো যে, ফ্রান্সিস ওর শোকাহত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। গভীর মনোযোগ দিয়ে মারিয়া পর পর গল্প শুনতে লাগলো। গাড়ি এসে দাঁড়ালো ফ্রান্সিসদের বাড়ির দরজায়।

মারিয়া আগেই কোচ্‌ম্যানকে সেই নির্দেশ দিয়েছিল। ফ্রান্সিস অগত্যা গল্প থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলো। মারিয়া মৃদুস্বরে বললো, 'আবার গাড়ি পাঠাবো — আসবেন কিন্তু।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো।

আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিসের মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেল। ও আবার আগের মতই হয়ে উঠলো। বন্ধু - বান্ধবেরা আসে, জোর আড্ডা ও গল্প-গুজব চলে।

এর মধ্যে মারিয়া দুদিন গাড়ি পাঠিয়েছিল। ফ্রান্সিস সেজে-গুজে রাজবাড়ি গেছে। এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন আবিষ্কারের গল্প বলেছে। গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে মারিয়া সেই গল্প শুনেছে। গল্প বলতে-বলতে কখনও মার কথা মনে পড়েছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থেকেছে ও। মারিয়া বুঝতে পেরেছে সেটা। মৃদুস্বরে বলেছে, 'মার কথা ভেবে মন খারাপ করো না। আমি তোমার একজন শুভার্থী বন্ধু। তোমার মনে কোন দুঃখ না থাক, এটাই আমি চাই।'

এই সহানুভূতির কথায় ফ্রান্সিস দুঃখ ভোলে। বলে, 'আমি জানি। তাই তোমার কাছে এলে আমি দুঃখ ভুলে যাই।'

এরকম মাঝে-মাঝেই ফ্রান্সিস রাজবাড়িতে যেতে লাগল। মারিয়ার সঙ্গে ওর হৃদ্যতা বেড়েই চললো।

★ ★ ★

ফ্রান্সিসের বাবা একদিন সন্ধ্যেবেলা ওকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালো। ও ঘরে ঢুকে দেখলো, বাবা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। ও বললো, 'বাবা, আমাকে ডেকেছিলে?'

—'হ্যাঁ।' বলে বাবা ফিরলেন 'বসো - একটা জরুরী কথা আছে।'

ফ্রান্সিস বসলো। বাবা একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'দেখো, তোমার মা বেঁচে থাকলে তিনিই সব ব্যবস্থা করতেন। যাকগে কথাটা হলো - রাজামশায়ের খুব হচ্ছে, তুমি রাজকুমারী মারিয়াকে বিয়ে করো।'

ফ্রান্সিস অনুমান করেছিল, এমনি একটা কথা উঠবে। কাজেই ও খুব আশ্চর্য হলো না এতে।

বাবা বলতে লাগলেন, 'রাজা - রানী দু'জনেই কয়েকদিন ধরেই বলছেন।' একটু থেমে বললেন, 'রাজকুমারী মারিয়াকে ছোটবেলা থেকেই জানি। ওর মতো বুদ্ধিমতী সহৃদয় মেয়ে হয় না। আমার মত যদি জানতে চাও তাহলে বলি, এই বিয়ে হলে আমি খুব খুশী হবো। তোমার মা বেঁচে থাকলে তিনিও খুশী হতেন।'

ফ্রান্সিস বাবার মুখের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারলো না। মাথা নীচু করে আস্তে-আস্তে বললো, 'তুমি খুশী হলে আমার আপত্তি নেই।'

বাবা হেসে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালেন। এগিয়ে এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

রাজামশাই একদিন রাজসভায় বিয়ের কথাটা ঘোষণা করলেন। রাজ্যের লোকেরা খুব খুশী হলো। বন্ধুরা দল বেঁধে এসে ফ্রান্সিসকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল।

রাজকুমারী মারিয়া এরপর আর গাড়ি পাঠায় না। ফ্রান্সিসও লজ্জায় আর রাজবাড়ি যায় না। এক শুভদিনে নগরের সবচেয়ে বড় গীর্জায় রাজকুমারী মারিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সিসের খুব আড়ম্বর করে বিয়ে হয়ে গেল। সাতদিন ধরে উৎসব চললো। 'এরিক দ্য রেডের' গুপ্তধনের বাক্সটা রাজকুমারী যৌতুক হিসেবে পেলো।

একে রাজকুমারীর বিয়ে, তাও আবার সকলের প্রিয় ফ্রান্সিসের সঙ্গে। দেশের অধিবাসীরা আনন্দে যেন পাগল হয়ে গেল। হৈ-হল্লা, খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান সাতদিন ধরে চলল।

হাজার-হাজার বাজী পুড়লো রাতের আকাশে।

রূপোর নদী

রাজকুমারী মারিয়ার সঙ্গে বিয়ে হলো ফ্রান্সিসের। ভাইকিং দেশের অধিবাসীরা সাত দিন ধরে আনন্দ উৎসব করল। সকলের প্রিয় ফ্রান্সিস। তার বিয়ে। কনে রাজকুমারী মারিয়া। কাজেই দেশের লোকের আনন্দ আর ধরে না।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে বিয়ের পর ফ্রান্সিস আর মারিয়া এল ফ্রান্সিসদের বাড়ি। সামনে ঘোড়সওয়ারের সারি। রূপোর ঝালর ঝুলছে ঘোড়াগুলোর মুখে-পিঠে। ঘোড়সওয়ারদের পরনে সবুজ-হলুদ পোশাক। টুপি থেকে ঝুলছে সোনালী ঝালর। ঘোড়সওয়ারদের সারির পরে একটা কালো ওক কাঠের গাড়িতে বরকনের সাজে ফ্রান্সিস আর মারিয়া। গাড়িটা খোলা গাড়ি। গাড়ির গায়ে সোনালী কাজ করা লতাপাতা। গাড়ি চলছে মন্থর গতিতে। দু'পাশের রাস্তার ধার থেকে, বাড়িগুলো থেকে লোকজন ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে ফ্রান্সিসদের গাড়িতে। ওদের দু' জনের গাড়ির পর কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের গাড়ি। তার মধ্যে ফ্রান্সিসের বাবার গাড়িও আছে।

শোভাযাত্রা এসে শেষ হলো ফ্রান্সিসদের বাড়ির সামনে। গাড়ি থেকে নেমে বরকনে পাশাপাশি হেঁটে ঢুকল বাড়িতে। এত আনন্দ হৈ-হল্লার মধ্যেও বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে ফ্রান্সিসের বুকটা হাহাকার করে উঠল। বারবার মা'র কথা মনে পড়তে লাগল। মা বেঁচে থাকলে কত খুশি হতো। ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। মারিয়া পাশে-পাশে যাচ্ছিল। ও ফ্রান্সিসের মনের অবস্থাটা বুঝতে পারল। মৃদুস্বরে সান্ত্বনা দিল, 'মা'র কথা ভেবে মন খারাপ করো না। কারণ মা তো চিরদিন থাকেন না।'

ফ্রান্সিস পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল। তারপর আস্তে- আস্তে হেঁটে দু'জনে বাড়িতে ঢুকল।

ফ্রান্সিসের নতুন সংসার শুরু হলো। মারিয়া রাজকুমারী হলে কী হবে, খুব কাজের মেয়ে। কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ির দু'টো ঝিকে সঙ্গে নিয়ে খেটেখুটে ঘরদোরের চেহারাই পাল্টে ফেলল। ফ্রান্সিসের মা মারা যাবার পর ঘরদোর তেমন যত্ন করে আর কে সাজাবে-গুছোবে। মারিয়া আবার ঘরদোরের আগের চেহারা ফিরিয়ে দিল। ফ্রান্সিস এতে খুব খুশি হলো।

আনন্দে কাটতে লাগল দু'জনের জীবন। আজকে প্রিয় বন্ধু হ্যারির বাড়িতে নিমন্ত্রণ। কালকে আর এক বন্ধু বিস্কোর বাড়িতে। এভাবে প্রায় প্রতিদিন এ বাড়ি-ও বাড়ি নিমন্ত্রণ লেগে রইল। এর ওপর রয়েছে এখানে-ওখানে সন্ধ্যায় নাচের আসর। সবাই চায় ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে। আনন্দের স্রোতে ভেসে চলল দিনগুলো।

কোনো-কোনো দিন বিকেলে দু'জনে গাড়ি চড়ে বেরোয়। রাস্তায় ময়দানে, সমুদ্রের ধারে-ধারে ঘুরে বেড়ায়। পথে লোকজন ওদের অভিবাদন জানায়। কেউ-কেউ এগিয়ে এসে করমর্দন করে। বেশ আনন্দে কাটতে লাগল দু'জনের দিন।

বন্ধুরা ফ্রান্সিসের বাড়ি আসে। আগের মতোই আড্ডা বসে। সোনার ঘন্টা আনা, হীরে মুক্তো আনার সেই কষ্টকর অভিজ্ঞতার কথা বলাবলি করে ওরা। কেউ কেউ উৎসাহে

বলে ওঠে — ' চলো ফ্রান্সিস, আবার জাহাজ নিয়ে ভাসি।'

দিন কাটে। মাঝে-মাঝে ফ্রান্সিস হাঁপিয়ে ওঠে। এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বেকার জীবন ওর ভাল লাগে না। মারিয়া পাছে মনে ব্যথা পায়, তাই ফ্রান্সিস মুখ ফুটে কিছু বলে না। কিন্তু মাঝে-মাঝে একা বেরিয়ে পড়ে। ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রের ধারে চলে আসে। বন্দরে দেশ-বিদেশ থেকে এসে নোঙর করা জাহাজগুলো দেখে। কতরকমের পতাকা উড়ছে সেসব জাহাজগুলোতে। নাবিকদের সঙ্গে গল্পটল্প করে। কোত্থেকে আসছে, কোথায় যাবে, এসব কথা হয়।

একদিন এমনি একা-একা বেড়াচ্ছিল ফ্রান্সিস। রাত হয়েছে তখন। বন্দরের ধারে পরপর কয়েকটা সরাইখানা। তারই একটাতে ঢুকল ফ্রান্সিস। দোকানটায় আলো জ্বলছে, বিরাট উনুনে রুটি সেঁকা হচ্ছে। কাঠের টানা টেবিলে বেঞ্চিতে লোকজন খাচ্ছে। ফ্রান্সিসও ওদের সঙ্গে বসল। যে ছেলেগুলো খাবার দিচ্ছিল, তাদের একজনকে ডাকল। ছেলেটি কাছে এলে বলল — ' চারটে ফুলকো রুটি আর মাংস নিয়ে এস্যো।'

ছেলেটি চলে গেল। দোকানদার এক পেটমোটা ইহুদি। ইয়া গোঁফ মুখে। তার সামনে একটা কালো কাঠের বাক্স। দাম নিচ্ছে, ভাঙানি ফেরত দিচ্ছে। খুব ব্যস্ত সে।

ফ্রান্সিস চারিদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে। বেশীর ভাগই বিদেশী নাবিক। এইরকম দু'টো নাবিকের দল খেয়েটেয়ে বেরিয়ে যেতেই সরাইখানাটায় ভিড় কমে গেল। ফ্রান্সিস খাচ্ছে। তখনই দোকানদারের হঠাৎ নজর পড়ল ফ্রান্সিসের দিকে। এ কী? ফ্রান্সিস আমার দোকানে? সে তাড়াতাড়ি বাক্সে তালা লাগিয়ে ছুটে এল ফ্রান্সিসের সামনে। হাত নেড়ে দ্রুত বলতে লাগল 'আপনি-মানে-আমার দোকানে মানে-আপনাকে-কি বলবো মানে, ফ্রান্সিস্ আমার দোকানে'।

'আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। নিজের কাজ করুন গে।' ফ্রান্সিস বলল।

দোকানদার তবু কিছু বলতে গেল। ফ্রান্সিস তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল — 'উঁহু-কোন কথা নয়, নিজের কাজে যান।'

দোকানদার ফিরে গিয়ে কাঠের বাক্সের সামনে বসল। খদ্দেরদের কাছ থেকে দাম নিতে লাগল। ভাঙানি ফেরত দিতে লাগল। ফ্রান্সিসের খাওয়াও প্রায় হয়ে এসেছে। তখনই শুনল টেবিলের ওপাশ থেকে কে বলল — ' আপনিই ফ্রান্সিস?'

বেশ মোটা ভারী গলা লোকটার। ফ্রান্সিস তাকাল লোকটার দিকে। লোকটা মধ্যবয়সী। মুখে কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ। মাথায় কাঁচাপাকা বাবরি চুল, বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। পরনে নাবিকদের ঢিলে হাতাঅলা পোশাক। ফ্রান্সিস দেখল লোকটা খাওয়া বন্ধ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ও 'হ্যাঁ' বলল। তারপরই আবার খেতে লাগল।

লোকটা বলল — 'আপনার কথা আমরা অনেক শুনেছি। পাদ্রীদের সোনার ঘণ্টা এনেছেন, হীরে, মুক্তো এনেছেন। আপনি তো এই দেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ।'

ফ্রান্সিস খেতে-খেতেই হাসল। কোনো কথা বলল না। লোকটা চুপ করে থেকে বলল — 'রূপোর নদীর কথা শুনেছেন?'

ফ্রান্সিস চমকে উঠল কথাটা শুনে। খাওয়া থামিয়ে লোকটার দিকে তাকাল। কাঁচাপাকা ভুরুর নীচে লোকটার চোখ দু'টো কেমন রহস্যময়। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল — 'না'

তারপর একটু থেমে বলল — 'আপনি জানেন রূপোর নদী কী? কোথায় আছে

সেটা?'

'হ্যাঁ জানি। রূপোর নদী আছে কঙ্কাল দ্বীপে।'

'আপনি দেখেছেন সেই নদী?'

লোকটা মাথা নাড়ল। বলল — 'না', তারপর তার পাশে বসা আরো দু'জন নাবিককে দেখিয়ে বলল — ' আমরা সবাই মিলে দীর্ঘ ছ'মাস ঐ দ্বীপে ছিলাম। তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু খুঁজে পাই নি।'

'কঙ্কাল দ্বীপ কোথায়?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

'ডাইনির দ্বীপ চেনেন?'

'হ্যাঁ।'

'তার পাঁচশ মাইল পশ্চিমে।'

' দ্বীপটা কি জনহীন?'

'না। ইকাবো নামে এক জাতীয় লোক ওখানে বাস করে। তাদের গায়ের রঙ তামাটে। চোখ নীল। মাথায় লম্বা চুল। ওরা মাথার চুল বেণী পাকিয়ে রাখে। এদের রাজা আছে।'

ফ্রান্সিস বেশ মনোযোগ দিয়ে নাবিকদের কথা শুনছিল। এবার বলল — ' আচ্ছা, ইকাবোরা আপনাদের এতদিন কঙ্কাল দ্বীপে থাকতে দিয়েছিল কেন?'

লোকটা দাড়ির ফাঁকে হাসল। বলল — 'ওদের বাগে আনতে হয়েছিল কী করে জানেন? আয়না, চিরুনি, টুপি, চকচকে পুঁতির মালা এসব রাজাকে দিয়েছিলাম। রূপোর নদীর কথা ইকাবোদের মুখেই শুনেছিলাম। কিন্তু কোথায় সেই নদী, অনেক খুঁজেও আমরা তার হদিস পাই নি।'

' কিন্তু রূপোর নদী যে আছেই, এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেন কী করে?'

'কঙ্কাল দ্বীপের পাহাড়ের নীচে আছে ওদের দেবমন্দির। সেই মন্দিরের থাম রূপোর তৈরী। সামনে নিরেট রূপোর থাম পোঁতা আছে। এত রূপো ওরা পেল কোথায়? একথা জিজ্ঞেস করলে রাজা বলেছিল ওদের পূর্বপুরুষরা এই রূপো পেয়েছিল রূপোর নদী থেকে।'

'আচ্ছা ঐ দ্বীপে নদী আছে?'

'হ্যাঁ, একটাই নদী। পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে এসেছে। ওরা বলে কুন্‌হা নদী। ওদের ভাষায় 'কুন্‌হা' অর্থ রূপো।'

'কুন্‌হা নদীর জলের রং কেমন?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

'কালচে জল।' লোকটা বলল।

নাবিকদের আর তার সঙ্গীদের তখন খাওয়া হয়ে গেছে। রাতও বাড়ছে। দোকানে ওরা ছাড়া আর কোনো খদ্দের নেই। সরাইখানার মালিক দোকান বন্ধ করে দিত। কিন্তু ফ্রান্সিসকে নাবিকদের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত দেখে দোকান বন্ধ করতে বলেনি।

ফ্রান্সিসেরও খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ও উঠে দাঁড়ালো। নাবিকটির দিকে হাত বাড়াল। নাবিকও ওর হাত ধরল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল — 'আপনার নাম কি?'

'পাঞ্চো। আমার দেশ স্পেনে।'

'আমরা কঙ্কাল দ্বীপে যাবো। রূপোর নদী খুঁজে বের করবো।'

পাঞ্চো দাড়িগোঁফের ফাঁকে হাসল — 'দেখবেন চেষ্টা করে'

তারপর ফ্রান্সিস ওদের আর নিজের রুটি মাংসের দাম দিতে গেল দোকানদারের কাছে।

দোকানদার কিছুতেই দাম নেবে না; বারবার বলতে লাগল — 'আপনি আমার দোকানে এসেছেন। কত সৌভাগ্য আমার।'

ফ্রান্সিস বুঝল লোকটা কিছুতেই দাম নেবে না।

একটা খালি ঘোড়ার গাড়ি আসছিল। গাড়ি থামিয়ে ফ্রান্সিস গাড়িতে উঠে বসল। বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হলো। মারিয়া তখনও জেগে ছিল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে বলল — 'বাইরে খেয়ে এসেছি। আর খাবো না।'

'আমি তো খাবো। খাবার টেবিলে বসবে এসো।।'

ওরা খাবার টেবিলে বসল। মারিয়া খাচ্ছে তখনই ফ্রান্সিস ওকে পাঙ্কোর কথা, কঙ্কাল দ্বীপ, ইকাবোদের কথা আর রূপোর নদীর কথা বলতে লাগল। মারিয়া খেতে-খেতে সব শুনল। তারপর বলল — 'কী ভাবছো, যাবে।'

'নিশ্চয়ই।' ফ্রান্সিস উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল।

'কিন্তু পাঙ্কোরা ছ'মাস খুঁজেও যার হদিস পায়নি, তোমরা তা পারবে?'

ফ্রান্সিস বলল — 'সেটা ঐ দ্বীপে না পৌঁছে বলতে পারবো না। ওখানে গিয়ে সব খবরাখবর নিয়ে তবেই বুঝবো রূপোর নদী আসলে ছিল না, সবটাই মনভোলানো গপ্পো।'

'কিন্তু — '

'মারিয়া — তুমি ভালো করেই জানো — এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বেকার জীবন আমার কাছে অসহ্য। আবার জাহাজ নিয়ে ভেসে পড়ব, সে কথা ভাবতে - ভাবতে আমি বোধহয় আজ রাতে ঘুমোতে পারবো না।'

'আমার কোনো আপত্তি নেই।' মারিয়া খেতে - খেতে বলল।

'এই তো চাই মারিয়া।' ফ্রান্সিস খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল — 'আমি জানতাম তুমি আপত্তি করবে না।'

মারিয়া হাসল। বলল — 'তোমার মন আমি বুঝি ফ্রান্সিস। তুমি ভালোবাসো দুরন্ত জীবন।'

ফ্রান্সিস বলল — 'তা ঠিক।'

'কিন্তু তোমার বাবাকে রাজী করাতে পারবে এবার?'

'দেখি বলে-কয়ে। না পারলে আবার পালাতে হবে।'

'বরং আমিই তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বলবো। মনে হয় আমি বললে উনি আপত্তি করবেন না।'

পরদিনই ফ্রান্সিস সব বন্ধুদের খবর পাঠালো বিস্কোকে দিয়ে। বিস্কো সবাইকে খবর দিয়ে এল রাতে সেই পোড়ো বাড়িটায় আসতে।

একটু রাত হতেই ফ্রান্সিস তৈরী হলো সেই পোড়ো বাড়িতে যাবার জন্যে। মারিয়াও চলল ওর সঙ্গে। ওরা যখন পোড়ো বাড়িতে পৌঁছল, তখন ফ্রান্সিসের অনেক বন্ধুরাই এসে গেছে। ফ্রান্সিসের সঙ্গে মারিয়াকে দেখে সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসের সব বন্ধুরা এসে হাজির হলো। গল্পগুজব আনন্দ উল্লাসের শব্দে বাড়িটা গম্ গম্ করতে লাগল। একসময় ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে গলা চড়িয়ে বলল — 'ভাইসব। আমরা আবার সমুদ্রযাত্রায় বেরুবো।'

সবাই একসঙ্গে আওয়াজ তুলল — 'ও হো-হো।'

ফ্রান্সিস বলতে লাগল — 'ডাইনির দ্বীপের পশ্চিমে একটা দ্বীপ আছে। কঙ্কাল

দ্বীপ। জানি না কেন দ্বীপটার নাম 'কঙ্কাল দ্বীপ'। সেখানে ছিল রূপোর নদী। কিন্তু আজ কেউ সেটার খোঁজ জানে না। 'পাঞ্চো' নামে একজন স্পেনীয় লোক ঐ দ্বীপে ছ'মাস রূপোর নদীর সন্ধানে কাটিয়েছে। কিন্তু কোনো হদিস পায়নি। এবার আমরা যাবো সেই রূপোর নদীর সন্ধানে।' ফ্রান্সিস থামল।

একজন ভাইকিং বলল — 'রাজা কি এই অভিযানের জন্যে জাহাজ দেবেন?'

ফ্রান্সিস তার দিকে তাকিয়ে বলল — 'যদি দেন ভালো,না দিলে আবার চুরি করবো।'

সবাই চেঁচিয়ে উঠলো — 'ও হো-হো।'

এবার হ্যারি এগিয়ে এল। বলল — 'কিন্তু সত্যিই কি রূপোর নদীর অস্তিত্ব আছে।'

ফ্রান্সিস বলল — ' ইকাবো নামে এক উপজাতি বাস করে ওখানে। ওদের পূর্বপুরুষরা পাহাড়ের ধারে তৈরী করেছে রূপোর থামওলা একটা মন্দির। ওদের উপাস্য দেবতার মন্দির। এত রূপো তারা পেল কোথায়? নিশ্চয়ই রূপোর নদী থেকে। রূপোর থামও আছে মন্দিরের সামনে।'

' ঐ দ্বীপে কি কোনো নদী আছে?' একজন ভাইকিং জিজ্ঞাসা করল।

ফ্রান্সিস বলল — ' ঐ দ্বীপে মাত্র একটা নদী — 'কুন্‌হা'। ইকাবোদের ভাষায় কুন্‌হা শব্দের অর্থ রূপো।'

ওদের কথাবার্তা ভাইকিংরা নিবিষ্ট মনে শুনল। ফ্রান্সিস এবার চেঁচিয়ে বলল — 'ভাইসব তোমরা কি এই অভিযানে বেরোতে রাজী?'

সবাই চিৎকার করে উঠল — ' ও-হো-হো।'

ফ্রান্সিস বলল — 'আজকের মত সভা এখানেই শেষ। আমি আর হ্যারি এর মধ্যে সব পরিকল্পনা করবো। কারা যাবে, তার তালিকা তৈরী করবো। তারপর আর একটি সভা ডাকা হবে এবং শেষ সিদ্ধান্ত জানানো হবে।'

সভা ভেঙে গেল। ভাইকিং বন্ধুরা একে-একে চলে গেল। ফ্রান্সিস আর মারিয়াও ফিরে চলল।

* * *

কয়েকদিন পরে এক রাতে ফ্রান্সিস আর ওর বাবা খেতে বসেছে। মারিয়া পরিবেশন করছে। রাঁধুনি রয়েছে। তারই পরিবেশন করার কথা। কিন্তু এ কাজটা মারিয়া নিজেই করে। দু'বেলা ফ্রান্সিস আর মন্ত্রীমশাই খেতে বসলে মারিয়াই খাবার পরিবেশন করে। খেতে-খেতে ফ্রান্সিস ডাকল — 'বাবা।'

মন্ত্রীমশাই মুখে শব্দ করলেন — ' হুঁ।'

ফ্রান্সিস বলল — 'যদি অভয় দাও,তাহলে একটা কথা বলি।'

'বলো।'

'আমি সমুদ্রযাত্রায় বেরোতে চাই।'

'আবার?' বাবা কড়া চোখে ওর দিকে তাকালেন।

'কঙ্কাল দ্বীপে আছে রূপোর নদী। আমি তারই সন্ধানে বেরোতে চাই।'

বাবা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন — 'মাকে তো অনেক কষ্ট দিয়েছ। এবার মারিয়াকেও দুশ্চিন্তা কষ্টের মধ্যে ফেলতে চাও?'

'মারিয়ার কোনো আপত্তি নেই।' ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসের বাবা মারিয়ার দিকে তাকালেন। মারিয়া মাথা নিচু করে মৃদুস্বরে বলল — 'বাবা, ও গেলে আমার কোনো দুশ্চিন্তা বা কষ্ট হবে না।'

' ঠিক আছে। মারিয়া, তুমি যদি সব মেনে নিতে পারো তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

খুশিতে ফ্রান্সিসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এত সহজে বাবার সম্মতি পাওয়া যাবে, তা ও ভাবতে পারেনি। ও মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল। মারিয়াও হাসল। ফ্রান্সিস একটু তাড়াতাড়ি খেতে লাগল; খেয়েই ছুটতে হবে হ্যারিদের বাড়ির দিকে। সব বলতে হবে ওকে। বাবা গলা খাঁকারি দিলেন— ' আস্তে খাও।'

রাজামশাইও শুনলেন কথাটা। মারিয়াও বাবাকে সব বুঝিয়ে বলল। রানীও শুনলেন। দুজ'নেই আপত্তি তুললেন। বিয়ে-টিয়ে করে ফ্রান্সিস এখন সংসার পেতেছে। এখন আর ওসব পাগলামি কেন? মারিয়া বলল — ' মা, তোমরা অপত্তি করো না।'

'পাগল হয়েছিস। কোথায় কঙ্কাল দ্বীপ, কোথায় রূপোর নদী, কী পরিবেশ, ওখানে কোন অসভ্য জাতির বাস — কোন সাংঘাতিক বিপদ কখন ঘটে তার কিছু ঠিক আছে?' রাজা বললেন।

'কিন্তু আগে তো তুমিই ফ্রান্সিসকে উৎসাহ দিতে।'

'তখনকার কথা আলাদা। এখন ওর জীবনের সঙ্গে তুইও তো জড়িয়ে গেছিস। এখন আর ও একা নয়।'

'ওকে এমনি যেতে না দিলে ও জাহাজ চুরি করে পালাবে।'

'ঠিক আছে—আমরা কথা বলবো ওর সঙ্গে। রাত্রে তোদের নিমন্ত্রণ রইলো। তোর হাতেই একটা চিঠি দিচ্ছি ফ্রান্সিসকে। ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি।'

মারিয়া রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে এসে ফ্রান্সিসকে সব বলল। রাজার চিঠি দিল। ফ্রান্সিস বলল—'বেশ চলো।'

রাত্রে ফ্রান্সিস আর মারিয়া এল নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। অনেক ক'টা সুসজ্জিত ঘর পেরিয়ে ওরা অন্দর মহলে ঢুকল। রাতের খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। একটা লম্বাটে ঘরে। ঝাড়লণ্ঠনের নীচে ঝকঝকে টেবিল ও কাঠের সবুজ গদিমোড়া চেয়ার, বাসনপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুস্বাদু খাবার থরে-থরে সাজানো।

রাজা-রানী ফ্রান্সিসদের অপেক্ষায় বসেছিলেন। ওরা আসতেই রাজা বললেন— 'বসে পড় তোমরা। খেতে-খেতেই কথা হবে।' পরিচারকরা খাবার-দাবার এগিয়ে দিল।

ফ্রান্সিস ও মারিয়া চেয়ারে বসে খাওয়া শুরু করেছে, তখনই রানী হেসে ডাকলেন—'ফ্রান্সিস!'

'বলুন।' ফ্রান্সিস রানীর দিকে তাকাল।

'তুমি নাকি আবার সমুদ্রযাত্রায় যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় যাবে?'

'কঙ্কাল দ্বীপে—রূপোর নদীর খোঁজে।'

রাজা একটু কেশে বললেন—'ফ্রান্সিস—এখন তুমি সংসারী হয়েছো। সোনার ঘণ্টা থেকে শুরু করে অনেক কিছু এনেছো। তোমার বীরত্ব নিয়ে চারণ কবিরা গান বেঁধেছে।

সারা রাজ্যে সেই গান গেয়ে বেড়ায়। আর কেন। এবার সংসারে মন দাও।'

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল—'আমার এই অভিযানে বাবার মত আছে, মারিয়ারও কোনো আপত্তি নেই। শুধু আপনারাই আপত্তি করছেন।'

'তুমি রাগ করলে ফ্রান্সিস?' রানী জিজ্ঞেস করলেন।

'না। তবে আপনারা আমাকে নিরুৎসাহ করবেন, এটা কখনো ভাবিনি।'

রাজা বললেন—'মারিয়া ছেলেমানুষ—ও কী বোঝে। তোমার বাবাও সম্মতি দিয়েছেন মারিয়া রাজী হয়েছে বলেই। যাক গে—এ খেয়াল ছাড়ো।'

ফ্রান্সিস আর কোনো কথা বলল না। মাথা গুঁজে খেতে লাগল। বুঝল রাজা-রাণী কিছুতেই সম্মতি দেবেন না। অগত্যা সেই পুরনো রাস্তাই ধরতে হবে। জাহাজ চুরি করতে হবে। ফ্রান্সিসের অভিযান নিয়ে আর কোনো কথা হলো না। রাজা-রানী অন্য বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন ।

খাওয়া শেষ করে রাজা-রানীর থেকে বিদায় নিয়ে দু'জনে বাড়ি ফিরে এল।

পালকের বিছানায় অনেক রাত অবধি জেগে রইল ফ্রান্সিস। নানা চিন্তা মাথায়। তারপর বিছানা থেকে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। হঠাৎ মারিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। ও একটু অবাক হলো, ফ্রান্সিসকে পায়চারি করতে দেখে। বলল 'তুমি ঘুমুবে না?'

'হ্যাঁ। তারপর এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

মারিয়া বলল—'কী ঠিক করলে?'

ফ্রান্সিস হেসে বলল—'সব ছক ভাবা হয়ে গেছে। আমি যাবোই।'

'ঠিক আছে। এখন ঘুমোও'। মারিয়া বলল।

পরদিন ফ্রান্সিস বিস্কোর কাছে গেল। ওকে দিয়ে সবাইকে খবর পাঠাল—রাত্রে সেই পোড়ো বাড়িটায় সভা হবে। সবাই যেন আসে।

রাত্রে ফ্রান্সিস পোড়ো বাড়িটায় যখন এল, তখন প্রায় সবাই এসেছে। আজকে মারিয়া এল না। ফ্রান্সিস সবাইকে ডেকে বলল—'ভাইসব, এইবারের সমুদ্রযাত্রায় আমরা আবার অসুবিধেয় পড়েছি। রাজামশাই-এর মত নেই। তাই উনি জাহাজ দেবেন না। এখন একটাই পথ খোলা জাহাজ চুরি।'

সবাই চেঁচিয়ে উঠল-'ও-হো-হো।'

ফ্রান্সিস বলতে লাগল—'কাল রাত্রে আমরা যাত্রা শুরু করবো। যারা-যারা যাবে, তাদের নাম পড়ছি।'

ফ্রান্সিস হ্যারি[illegible] দিকে হাত বাড়াল। হ্যারি তালিকার কাগজটা ওকে দিল। ফ্রান্সিস সব নাম পড়ে গেল। মোট তিরিশ জন। যাদের নাম নেই, তারা গুঞ্জন তুলল। ফ্রান্সিস বলল—'ভাইসব—[illegible]দের নাম বাদ গেল তারা দুঃখ করো না। অন্য কোনো অভিযানে তাদের পরে নেওয়া হবে।'

একটু থামল ফ্রান্সিস। পরে বলতে লাগল—'এবার যারা যাবে তাদের বলছি, কাল রাত্রে অস্ত্রশস্ত্র পোশাক নিয়ে জাহাজঘাটায় উপস্থিত থাকবে নিশানঘরের কাছে। জাহাজ চুরির সেই আগের পদ্ধতি আমরা নেব।'

থামল ফ্রান্সিস। তারপর আবার বলতে লাগল—'ভাইসব জেনে রেখো—অনিশ্চিতের পথেই আমাদের যাত্রা। আদৌ 'কঙ্কাল দ্বীপ' বলে কোনো দ্বীপ আছে কিনা জানি না। থাকলেও সেখানে রূপোর নদী ছিল কি ছিল না তাও জানি না। শুধু জানি ডাইনি

দ্বীপের পশ্চিমে এই কঙ্কাল দ্বীপ আছে। কত দিন যাবে এই দ্বীপ খুঁজে বের করতে জানি না। কাজেই আমাদের ধৈর্য ধরে খুঁজতে হবে। ততদিন আমাদের অধৈর্য হলে চলবে না। হয়তো খাদ্য ফুরিয়ে যাবে, হয়তো খাবার জলও ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের অধৈর্য হলে চলবে না। তোমাদের কোনো ওজর আপত্তি শোনা হবে না। আমার আর হ্যারির কথাই হবে শেষ কথা। সেই কথা শুনেই তোমাদের চলতে হবে।'

ফ্রান্সিস থামলো। বন্ধুরা সব একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—'ও-হো-হো।'

সভা শেষ হলো। সবাই চলে গেল। সবশেষে বেরিয়ে এল ফ্রান্সিস আর হ্যারি। পথে আসতে-আসতে হ্যারি বলল—'রূপোর নদীর গল্পটা ছেলেভুলোনো গপ্‌পো কিনা কে জানে।'

ফ্রান্সিস বলল—'যদি কঙ্কাল দ্বীপের খোঁজ পাই, তাহ'লে বুঝবো রূপোর নদী আছে, মানে ছিল'।

'আমরও তাই মনে হয়।' হ্যারি বলল।

বাড়ি ফিরে খেতে বসে ফ্রান্সিস ওদের পরিকল্পনার কথা মারিয়াকে বলল। মারিয়া বলল—'বাবা রাগ করবে না তো?'

ফ্রান্সিস হেসে বলল—'যখন তাল-তাল রূপো নিয়ে ফিরবো, তখন তোমার বাবা খুশিই হবেন।'

'ঠিক আছে—তোমরা নির্বিঘ্নে ফিরে এসো এখন আমার একমাত্র কামনা' মারিয়া বলল।

পরদিন সারা সকাল বিকেল ফ্রান্সিস আর বাড়ি থেকে বেরোল না। চুপচাপ শুয়ে-বসে সময় কাটাল।

সন্ধ্যে হতেই খেয়ে নিল। পোশাক-তলোয়ার সব গুছিয়ে তৈরী হলো। বাবাকে কিছু বলল না। বাবা আর রাজামশাই-এর অজান্তেই জাহাজ চুরি করতে হবে।

একটু রাত হতেই ফ্রান্সিস মারিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিল। মারিয়ার দু'চোখ ছল-ছল করে উঠল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—'অত ভীতু হলে চলবে না।'

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে ফ্রান্সিস একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করল। টক্ টক্ টকাস্- গাড়ি চলল পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে। গাড়ি কিছুটা চলতে ফ্রান্সিস জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পেছনের দিকে তাকাল। দেখল, দেউড়ির আলোর নীচে মারিয়া তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস একটু উন্মনা হয়ে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই দুর্বল হয়ে পড়া মনকে শক্ত করল। এসব কি ভাবছে সে? মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ও গলা চড়িয়ে বলল...'ভাই, একটু তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাও।'

গাড়ি চলার বেগ বাড়ল। গাড়ি বন্দরের জেটির কাছে এসে থামল। ফ্রান্সিস গাড়ি থেকে নেমে এল। ভাড়া চুকিয়ে দ্রুত পায়ে নিশানঘরের সামনে এল। দেখল,—প্রায় সবাই এসে গেছে। একটু অপেক্ষা করতেই বাকিরা এসে পড়ল।

ফ্রান্সিস সবাইকে অপেক্ষা করতে বলল। তারপর নিজে নিশান ঘরের আড়াল থেকে জেটিতে এল। কিছুক্ষণ এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াল। অন্ধকারে জাহাজগুলো ভাসছে কোনো জাহাজে আলো আছে, কোনো জাহাজে নেই। একটা জিনিষ লক্ষ্য করল যে আজকে অনেক পাহারাদার সৈন্য জাহাজঘাটা পাহারা দিচ্ছে, সাধারণত এত পাহারাদার সেনা জাহাজঘাটায় থাকে না। ফ্রান্সিস বুঝল—পাহারা এত কড়াকড়ি করা হয়েছে রাজার আদেশে।

রাজা জানেন যে ফ্রান্সিস যদি জাহাজ চুরি করে পালাবে এটা স্থির করে থাকে তবে সেটা করবেই। কাজেই রাজা সাবধান হয়েছেন।

ফ্রান্সিস একটু চিন্তায় পড়ল। পাহারাদার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই না করে, রক্তপাত না ঘটিয়ে কী করে জাহাজ চুরি করা যায়। নিশানঘরের আড়ালে ও যখন এল তখন বন্ধুরা ওকে ঘিরে ধরল। জিজ্ঞেস করতে লাগল এখন কী করবে ওরা। ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে বলল—'রাজা টের পেয়েছেন যে আমরা জাহাজ চুরি করবো। তাই বন্দরের পাহারায় অনেক সৈন্য মোতায়েন করেছেন।'

তারপর হ্যারিকে বলল—'হ্যারি—একটা কিছু উপায় বার করো। কোনো খুনখারাপির মধ্যে আমরা যাবো না।

হ্যারি হেসে বলল—'তোমার বুদ্ধি আমার চেয়ে কিছু কম নয় । তুমিই একটা উপায় বার কর।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকাল—'না—মাথাটা কেমন হালকা লাগছে। কিছু ভাবতেই পারছি না।

বিস্কো এগিয়ে এল। বলল—'খড়, কেরোসিন বাক্সে আগুন লাগিয়ে দিই। এর আগে তো এভাবেই পালিয়েছি'।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—'রাজামশাই অত বোকা ভেবো না। সারা জাহাজঘাটা সাফ্। খড়, কেরোসিন, কাঠের বাক্স কিছুছু নেই।'

কথাটা শুনে সকলেই বেশ চিন্তায় পড়ল। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। ওদিকে রাতও বাড়ছে। অনেকেই নিশানঘরের সিঁড়িতে বসে পড়ল।

হঠাৎ হ্যারি উঠে দাঁড়াল। বলল—সৈন্যরা আমাকে চিনে ফেলবে। তাই বিস্কোকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। বিস্কো সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেবে কোন জাহাজটায় আটা, ময়দা, চিনি এসব খাবার ভালো মজুত আছে, জল আছে। সেই অনুযায়ী আমরা একটা জাহাজ বেছে নেব। তারপর জাহাজ নিয়ে পালাবার উপায় ভাববো।'

হ্যারি আর বিস্কো চলে গেল। জাহাজঘাটায় এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। জলে কাঁপছে সেই আলো। একটা পাথুরে দেওয়ালের পেছনে হ্যারি দাঁড়াল। বিস্কো গেল সৈন্যদের সঙ্গে গল্প জমাতে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বিস্কো ফিরে এল। বলল—সব খবর পেয়েছি। প্রথম তিনটে জাহাজের পরে চার নম্বর জাহাজটায় সব খাবার-দাবার জল রাখা আছে, ওটা কাল সকালে লিসবনের দিকে রওনা হবে। জাহাজটা নতুন, খুব মজবুত।'

কোন্ জাহাজটা নিয়ে পালাতে হবে সেটা ঠিক হলো। কিন্তু পালাবার উপায়? হ্যারি জাহাজঘাটার জ্বলন্ত মশালগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। জাহাজগুলোও দেখতে লাগল। তখনই দেখল দু'নম্বর জাহাজটা থেকে শীল মাছের তেলের পিপে খালাস করা হচ্ছে। জাহাজটার ডেকে অনেকগুলো তেলের পিপে সাজিয়ে রাখা। জাহাজ থেকে ঘাট পর্যন্ত একটা কাঠের পাটাতন পাতা। জাহাজের খালাসীরা পিপেগুলো পাটাতনের ওপর দিয়ে ঘাটে এনে জড়ো করছে। হ্যারি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। হঠাৎ একটা চিন্তা ওর মাথায় খেলে গেল। পিপেগুলোতে আগুন লাগালে কেমন হয়? খুব সহজেই তেলের পিপেগুলোতে আগুন ধরে যাবে। হ্যারি দ্রুত বলে উঠল—' বিস্কো—চলো'।

ওরা দু'জনে নিশানঘরের নিচে এল। বন্ধুরা বসে ছিল, তারা উঠে এল। হ্যারি

চাপাস্বরে ডাকল 'শাঙ্কো—শাঙ্কো কোথায়।'

শাঙ্কো এগিয়ে এল—'তীর ধনুক এনেছো তো?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

শাঙ্কো মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বলল—'নিশ্চয়ই'।

'তাহলে এক কাজ কর। অন্ধকারে কোনো জাহাজ থেকে তেলেভেজা মশালের পলতে নিয়ে এসো। শীগ্‌গির।'

শাঙ্কো খুব দক্ষ তীরন্দাজ, অনেক প্রতিযোগিতায় ও তীর ছোঁড়ায় প্রথম হয়েছে। শাঙ্কো তীর-ধনুকটা বিস্কোকে দিল। তারপর অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

সবাই অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই শাঙ্কো ফিরে এল। হাতে মশালের তেলেভেজা পলতে। হ্যারি বিস্কোর হাত থেকে একটা তীর নিল। তেলে ভেজা পলতেটা তীরটায় জড়াল। শাঙ্কোর হাতে তীরটা দিয়ে বলল...মশালের আগুন থেকে তীরটায় আগুন জ্বালাও। তারপর অন্ধকার জাহাজঘাটায় গিয়ে দাঁড়াও। দেখবে দু'নম্বর জাহাজটা থেকে তেলের পিপে নামানো হচ্ছে। একটা পিপেয় জ্বলন্ত তীর ছোঁড়ো। শীল মাছের তেল খুব দাহ্য পদার্থ। সঙ্গে সঙ্গে কাঠের পিপেটায় আগুন লেগে যাবে। সেই আগুন ছড়াতেও সময় নেবে না। শীগ্‌গির যাও।

শাঙ্কো জ্বলন্ত তীর-ধনুক নিয়ে চলে গেল। একটু এগোতেই দেখল—দু'নম্বর জাহাজের পিপে খালাস হচ্ছে। ও হাতের কাছের মশালটা থেকে তীরটায় আগুন লাগাল। দেখল খালাসীরা পাটতনের ওপর দিয়ে একটা তেলের পিপে গড়িয়ে নিয়ে আসছে। সেই পিপেটা লক্ষ্য করে ও জ্বলন্ত তীর ছুঁড়ল। তীরটা গিয়ে কাঠের পিপেটায় বিঁধে গেল। মুহূর্তের মধ্যে পিপেটায় আগুন লেগে গেল। যে দু'জন খালাসী ওটা গড়িয়ে নিয়ে আসছিল, তারা জ্বলন্ত পিপেটা ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে সরে গেল। জ্বলন্ত পিপেটা গড়াতে-গড়াতে পাটাতন থেকে সরে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। নিভে গেল আগুন। শাঙ্কো নিজের কপালে চাপড় দিয়ে... ইস্ ফস্কে গেল।'

শাঙ্কো হ্যারির কাছে ফিরে এল। আর একটা পলতে নিল। তীরে জড়াল। আবার মশালের আলো থেকে তীরটায় আগুন জ্বালল। ততক্ষণে খালাসীরা আবার পিপেগুলো পাটাতনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে তুলতে শুরু করেছিল। লক্ষ্য স্থির করে শাঙ্কো জ্বলন্ত তীরটা ছুঁড়ল। পিপেটায় জ্বলন্ত তীর ঢুকে গেল। পিপেটায় দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। খালাসি দু'জন পিপে ছেড়ে দিয়ে সরে গেল। জ্বলন্ত পিপেটা ঢালু পাটাতন দিয়ে গড়াতে-গড়াতে জাহাজের ডেক-এর দিকে চলল। ডেক-এর সাজিয়ে রাখা পিপেগুলোয় গিয়ে পড়ল জ্বলন্ত পিপেটা। মুহূর্তের মধ্যে আর একটা পিপেতে আগুন ধরে গেল। দেখতে-দেখতে আরো ক'টা পিপেয়। প্রচণ্ড শব্দে প্রথম পিপেটা ফাটল এবার। চারিদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই ফাটল আর একটা পিপে। চোখের পলকে জাহাজটার ডেকে আগুন লেগে গেল। আগুনের ফুলকি ছিটকোতে লাগল অনেক দূর পর্যন্ত।

সৈন্যরা প্রথমে হকচকিয়ে গেল। ওরা বুঝতেই পারল না জাহাজে আগুন লাগল কী করে। তারপরেই ওরা সবাই জ্বলন্ত জাহাজটার সামনে এসে হৈচৈ শুরু করল। কিন্তু পিপেগুলো যে প্রচণ্ড শব্দে ফাটছে, তাই ওরা কাছে যেতে সাহস পেল না। দূর থেকে বালতি করে জল ছুঁড়ে দিতে লাগল। কিন্তু আগুন তাতে নিভল না। আগুন আরো ছড়িয়ে পড়ল।

ওদিকে হ্যারি চাপাস্বরে বলে উঠল—'সব ছোটো—চার নম্বর জাহাজটায় গিয়ে

উঠবে। কোনো শব্দ করবে না।'

তত‌ক্ষণে শাঙ্কোও এসেছে। সবাই দ্রুত পায়ে ছুটল চার নম্বর জাহাজটার দিকে। দ্রুতহাতে পাটাতন পেতে সব নিঃশব্দে জাহাজটায় উঠে পড়ল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল সবাইকে—'নোঙর তোল—নিঃশব্দে। দাঁড়ঘরে চলে যাও কিছু। কোনো শব্দ না করে দাঁড় বাইতে থাকো।'

ফ্রান্সিসের কথামতো সবাই কাজে লেগে পড়ল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নোঙর তোলা হলো—দাঁড় বাওয়া শুরু হলো। জাহাজটা আস্তে আস্তে ভেসে চলল গভীর সমুদ্রের দিকে।

ওদিকে সৈন্যরা জাহাজের আগুন নেভাতে ব্যস্ত। কিন্তু একটু পরেই বুঝল যে আগুন নেভানো অসম্ভব। আগুন তখন সমস্ত জাহাজটায় ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝে-মাঝে প্রচণ্ড শব্দে পিপেও ফাটছে। কাছে যেতে সাহস হচ্ছে না কারো।

এদিকে আগুন আর হৈ-চৈয়ের মধ্যে সৈন্যরা দেখল, একটা জাহাজ গভীর সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। সৈন্যরা ভেবে উঠতে পারল না কী করবে ওরা। জাহাজটা তত‌ক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। সৈন্যরা হাল ছেড়ে দিল। ঐ জাহাজ আর ফেরানো সম্ভব নয়। এদিকে অন্য জাহাজগুলোতেও যাতে আগুন না লেগে যায়, তার জন্যে ওরা জ্বলন্ত জাহাজটার নোঙর তুলল। জ্বলন্ত জাহাজটা ঠেলে দিল গভীর সমুদ্রের দিকে। অন্য জাহাজগুলোতে আর আগুন লাগল না। জ্বলন্ত জাহাজটা ভেসে চলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজটা বন্দর থেকে অনেকদূরে এসে পড়েছে তখন। ভাইকিংরা খুশীতে চিৎকার করে উঠল—'ও-হো-হো-।' দাঁড়ীদের ঘর থেকে দাঁড়ীরাও চীৎকার করে উঠল 'ও-হো-হো-।' ঘড়ঘড় শব্দে পালগুলো তোলা হলো। সব পাল হাওয়ার তোড়ে ফুলে উঠল। একটা পাক খেয়ে জাহাজটা যেন জল কেটে উড়ে চলল। জাহাজ চলল দক্ষিণমুখো।

জাহাজ চলেছে। ওপরে নির্মেঘ আকাশ। নীচে শান্ত সমুদ্র বাতাসও বেগবান। পালগুলো ফুলে উঠেছে বাতাসে। বেশ জোরেই চলল জাহাজ। ভাইকিংদের আর দাঁড় বাইতে হচ্ছে না। শুধু জাহাজের ডেক মোছা, পালের দড়িদড়া ঠিক রাখা আর রান্নাবান্না এ ছাড়া কোনো কাজ নেই।

রাত হলে ওরা ডেক-এ জড় হয়। ছক্কা-পাঞ্জা খেলে। নাচে, গান গায়। ফ্রান্সিস আর হ্যারিও নাচগানের আসরে বসে কখনো। নাচগানের আসর ভেঙে যায় আর একটু রাত হলেই। ফ্রান্সিস তখন ডেক-এ একা-একা পায়চারি করে বেড়ায়। হ্যারিও কোনো দিন ওর সঙ্গে থাকে। দু'জনে কথাবার্তা হয়—রাত বাড়ে। দু'জনে কেবিন ঘরে ফিরে আসে। শুয়ে পড়ে।

এর মধ্যে একদিন বিকেলে অন্ধকার করে মেঘ জমল। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। বিদ্যুতের জ্বলন্ত রেখা আঁকাবাঁকা জলের মতো কালো আকাশটায় ফুটে উঠতে লাগল। সেই সঙ্গে বজ্রপাতের প্রচণ্ড গভীর শব্দ।

দেখতে-দেখতে প্রচণ্ড গতি নিয়ে বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহাজটার ওপর। ভাইকিংরা অভিজ্ঞ নাবিক। ওরা আগেই দড়িদড়া কেটে পাল নামিয়ে ফেলেছিল। এবার জাহাজের হুইলের সামনে দাঁড়াল কয়েকজন। বাকীরা দাঁড়ীঘর থেকে উঠে এল ডেক-এ। তৈরী হলো ঝড়ের মোকাবিলা করবার জন্যে।

শুরু হলো ঝড়ের তাণ্ডব। বিরাট-বিরাট ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল জাহাজের ডেক-এ। জাহাজ একবার ঢেউয়ের ধাক্কায় অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছে। আবার আছাড় খেয়ে নেমে আসছে ঢেউয়ের ফাটলের মধ্যে। আবার উঠছে। আবার পড়ছে। জাহাজের প্রচণ্ড দুলুনিতে কেউ স্থির হয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ডেক-এর ওপর এদিকে-ওদিকে ছিটকে পড়ছে। ওরই মধ্যে ভাইকিংরা হুইল ঘুরিয়ে চলল। দড়িদড়া আঁকড়ে ধরে টাল সামলাতে লাগল। জলে ভিজে সবাই যেন স্নান করে উঠল।

প্রচণ্ড ঝড় চলল প্রায় আধঘন্টা। হঠাৎ ঝড়ের দাপট কমে গেল। বাতাসের বেগ কমে এল। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থেমে গেল। বাতাসের বেগ স্বাভাবিক হলো। মেঘ উড়ে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। তারা ফুটল আকাশে। ঝড়ের প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত ভাইকিংরা যে যেখানে পারল কেউ বসে পড়ল, কেউ শুয়ে পড়ল।

ঠিক করেছিল প্রথমে ডাইনীর দ্বীপে যাবে। দ্বীপে নামবে না। ঐ দ্বীপ থেকে দিক নির্ণয় করে পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে জাহাজ চালাবে। তবেই পৌঁছুতে পারবে কঙ্কাল দ্বীপে। পাঙ্কো সে রকমই বলেছিল।

জাহাজ চলছে। এর মধ্যে আর ঝড়ের পাল্লায় পড়তে হয়নি। বেশ দ্রুতই চলছে জাহাজ। অনেকদিন হয়ে গেল। ভাইকিংদের মধ্যে একটু গুঞ্জন শুরু হলো। এখনও ডাইনীর দ্বীপে পৌঁছোতে পারলাম না। সেখান থেকে আবার কঙ্কাল-দ্বীপ। তার দূরত্ব কত কে জানে? হ্যারি শুনল এসব কথা। কিন্তু ফ্রান্সিসকে কিছু বলল না।

একদিন ভোর-ভোর সময়ে দূর থেকে দেখা গেল ডাইনীর দ্বীপ। স্পষ্ট দেখা গেল না। কারণ একটা কুয়াশার আস্তরণ দ্বীপটাকে ঘিরে ছিল। মাস্তুলের ওপর যে নজরদারি করছিল সেই প্রথম দেখল ডাইনী দ্বীপ। ও চীৎকার করে বলে উঠল—'ফ্রান্সিস, ডাইনীর দ্বীপ।'

ওর চীৎকার চেঁচামেচিতে অনেকেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল। ফ্রান্সিসের ঘুম খুব পাতলা। ওপ্রথম ডাকেই উঠে পড়ল। ডেক-এর ওপর উঠে এল। ভোরের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে সবাই ডাইনীর দ্বীপ দেখল।

একটু বেলা হতেই কুয়াশার আবরণ সরে গেল। স্পষ্ট দেখা গেল ডাইনীর দ্বীপ। সবুজ পাহাড়, সবুজ গাছগাছালি।

ফ্রান্সিস ডেক-এ দাঁড়িয়ে দ্বীপটা দেখল। তারপরে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—'জাহাজের মুখ পশ্চিমদিকে ঘোরাও। সোজা পশ্চিমে দিকে যেতে হবে আমাদের। তাহলেই কঙ্কাল দ্বীপে পৌঁছবো আমরা।'

জাহাজের মুখ ঘোরান হলো পশ্চিমদিকে। জাহাজ চলল জল কেটে। লক্ষ্য কঙ্কাল দ্বীপ।

জাহাজ চলল। কয়েকদিন পরে এক রাতে ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করছে। হ্যারি এল। ফ্রান্সিস বলল 'হ্যারি এই জাহাজে কাঠ কত আছে'?

'কাঠের তক্তাগুলো গুণে দেখি নি। তবে কাঠের স্তূপটা ছোট নয়।'

'তুমি কালকেই ভাল করে দেখ—কেমন কাঠ আছে।'

'কী করবে কাঠ দিয়ে?'

'সেই কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরী করতে হবে। যে ক'টা নৌকা হয় বানাতে হবে। কঙ্কাল দ্বীপে যেতে লাগবে। জাহাজ থেকে সরাসরি দ্বীপে নামা যাবে না।'

'বেশ—ফার্নান্দো ওস্তাদ কাঠের মিস্ত্রী। ওকেই বলবে কয়েকজনকে নিয়ে কাজ শুরু করতে।'

ফার্নান্দোকে বলতে ও পরদিনই নৌকা তৈরীর কাজে হাত লাগাল।

* * *

জাহাজ চলেছে। এর মধ্যে দু'বার ঝড়ের মুখে পড়েছিল জাহাজটা। তবে ঝড় তেমন প্রচণ্ড ছিল না। দু'তিনটে পাল ফেঁসে গিয়েছিল শুধু। সেগুলো মেরামত করে জাহাজ পূর্ণ গতিতেই চলল।

মাঝখানে দিন চারেক হাওয়া পড়ে গিয়েছিল। পালে কাজ হয়নি। ক্রমাগত দাঁড় বাইতে হয়েছিল ভাইকিংদের।

দিন কুড়ি কেটে গেল। কিন্তু কঙ্কাল দ্বীপের দেখা নেই। এবার বেশ জোরে গুঞ্জন উঠল ভাইকিংদের মধ্যে। হ্যারীর কানে গেল সে কথা। ও বুঝল এই অসন্তোষকে বাড়তে দিলে যে কোনো মুহূর্তে ভাইকিংরা ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। ও ফ্রান্সিসকে বলল সব কথা। ফ্রান্সিস সেইদিন সন্ধ্যেবেলাই ডেক-এ সভা ডাকল।

সন্ধ্যে হতেই ভাইকিংরা ডেক-এ এসে জড়ো হলো। একটু পরেই ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে কেবিন ঘর থেকে ডেক-এ উঠে এল। সব ভাইকিং বন্ধুদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফ্রান্সিস বলতে লাগল—'ভাইসব—এই অভিযানে বেরোবার আগেই আমি বলেছিলাম আমাদের পথ ভুল হতে পারে, খাদ্যজল ফুরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের অধৈর্য হলে চলবে না। সোনার ঘন্টা আনতে গিয়েও এরকম সমস্যায় আমাদের পড়তে হয়েছিল। সেদিন বন্ধুরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আমার সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে বলেই বলছি কেউ যদি হতাশ হয়ে পড়ো তাহ'লে বলো, সামনে কোনো বন্দর পেলে তাকে নামিয়ে দেবো। সে অন্য জাহাজ ধরে দেশে ফিরে যাবে।' একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল—'বলো তোমরা কে-কে ফিরে যেতে চাও।'

ভাইকিংরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কোনো কথা বলল না। ফ্রান্সিস সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর—'তাহলে সবাই হাত লাগাও। বাতাস পড়ে গেছে। দাঁড়ীরা দাঁড়ঘরে যাও। যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ চালাও। কঙ্কাল দ্বীপে আমাদের যেতেই হবে।'

ভাইকিংরা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—'ও—হো—হো—।' তারপর যে যার কাজে লেগে পড়ল। জাহাজের গতি বাড়ল অল্পক্ষণের মধ্যেই।

আরো দু'দিন কাটল। বাতাসের বেগ বাড়ল। পাল ফুলে উঠল। দাঁড় বাওয়াও চলল। জাহাজ চলল দ্রুত গতিতে। ভাইকিংরা আবার আগের মতো প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা ফ্রান্সিসকে মনে - প্রাণে বিশ্বাস করে।

* *

পরের দিন। সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলে পড়েছে। তখনও অস্ত যায়নি। মাস্তুলের মাথায় পালা করে ওরা থাকে।

চারদিক নজর রাখে। সেই বিকেলে মাস্তুলের নজরদার চিৎকার করে উঠল—'ডাঙা দেখা যাচ্ছে—ডাঙা।' ফ্রান্সিসকে খবর দেওয়া হলো। ও দ্রুতপায়ে ডেক-এ উঠে এল। হ্যারিও এল।

ফ্রান্সিস নজরদারকে চীৎকার করে বলল—'কী দেখছো?'

'মনে হচ্ছে একটা দ্বীপ। একটা পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে।' নজরদার বলল।

'জাহাজ ঠিক ঐ দ্বীপের দিকে যাচ্ছে?' ফ্রান্সিস বলল।

'না। আমাদের একটু উত্তরের দিকে সরে যেতে হবে।'

ফ্রান্সিস জাহাজ চালকের কাছে এল। বলল—'একটু উত্তর দিক ঘেঁষে চালাও।'

জাহাজ একটু উত্তরমুখো হলো।

একটু পরেই অস্তগামী সূর্যের আলোয় দ্বীপটা দেখা গেল। লাল আকাশের নীচে কালো পাহাড়ের মাথাটা দেখা গেল। মানুষের মাথার খুলির মতো। জাহাজ থেকে সবাই দেখছিল পাহাড়টা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি এটাই কি কঙ্কাল দ্বীপ?'

'আমার বিশ্বাস এটাই কঙ্কাল দ্বীপ, দেখছো না পাহাড়টা দেখতে করোটির মতো।'

'হ্যাঁ—মানুষের মাথার খুলির মতো।' ফ্রান্সিস বলল। একটু পরেই পশ্চিমের লাল আলো আকাশ থেকে মুছে গেল। অন্ধকার নেমে এল।

ফ্রান্সিস জাহাজের চালককে বলল—'জাহাজ থামাও।'

তারপর সবাইকে বলল—'পাল নামাও। দাঁড় বাওয়া বন্ধ কর। কাল দিনের বেলা দ্বীপের দিকে যাবো আমরা।'

একটু পরেই জাহাজ থেমে গেল।

পুব আকাশের আধভাঙা চাঁদটা আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হলো। মেটে জ্যোৎস্না ছড়াল সমুদ্রের ওপর। আবছা দেখা গেল দূরের কঙ্কাল দ্বীপ।

পরদিন সকালে কারো কোনো কাজ নেই। সকালের খাবার খেয়ে সকলেই ডেকে-এসে জড়ো হলো। দেখতে লাগল কঙ্কাল দ্বীপ। পাহাড়ের চূড়োটা ন্যাড়া। কিন্তু পাহাড়ের নীচ থেকে শুরু করে চারদিকে প্রচুর গাছপালা। তীরের কাছে জঙ্গল অত ঘন নয়। অতদূর থেকে মানুষ জন্তু বা পাখি দেখা গেল না। হঠাৎ একজনের নজর পড়ল—গভীর সমুদ্রের দিকে দূরে একটা ভেলামত কী যেন ঢেউয়ের মাথায় উঠছে পড়ছে। সে সঙ্গীদের ডাকল—'দ্যাখ্ তো ওটা কী?' প্রায় সকলেরই দৃষ্টি পড়ল ওদিকে। কিন্তু অতদূর থেকে ওরা বুঝতে পারল না জিনিসটা কি?



দেখতে লাগল কঙ্কাল দ্বীপ

দু'জন ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে খবর দিল। ফ্রান্সিস ডেকে-এ উঠে এল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ভেলাটার দিকে। তারপর ফিরে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এক কাজ কর—জাহাজ চালু কর। ঐদিকে জাহাজ নিয়ে চল।'

কথামত সবাই কাজে লেগে পড়ল। জাহাজটা একবার নড়ে গভীর সমুদ্রের দিকে চলতে লাগল। জাহাজটা যত কাছে যেতে লাগল ভেলাটা ততই স্পষ্ট হতে লাগল।

কাছে আসতে দেখা গেল—কতকগুলো গাছের কাণ্ড দিয়ে, বুনো লতা দিয়ে বাঁধা একটা ভেলা। তার ওপর দু'জন মানুষ। একজন বৃদ্ধ, অন্যজন যুবক। দু'জনের হাত পা ভেলাটার সঙ্গে জংলী লতা দিয়ে বাঁধা। বৃদ্ধটির গায়ে বিচিত্র রঙের ডোরাকাটা আলখাল্লার

মতো কী একটা। যুবকটির গা খালি। দু'জনেরই পরনে ঘাসের তৈরী ঘাগরামতো। বৃদ্ধটির মাথায় লাল কাপড়ের ফেট্টি। তা'তে কয়েকটা লম্বা পাখির পালক গোঁজা।

ফ্রান্সিস ডেক থেকে দেখল সব। কিন্তু বুঝে উঠতে পারল না মানুষ দু'টো বেঁচে আছে কিনা। ফ্রান্সিসের কথামতো এর মধ্যেই পাঁচটা নৌকো তৈরী হয়েছিল। তারই একটা জলে নামানো হলো। বিস্কো একটা বৈঠা হাতে জাহাজের ঝোলানো দড়ি বেয়ে বেয়ে নৌকোটায় নামল, তারপর নৌকা বেয়ে চলল ভেলাটার দিকে। কাছে আসতে ও নৌকো থেকে ভেলাটায় উঠল। প্রথমে লতা দিয়ে বাঁধা যুবকটির বুকে নিজের কান চেপে ধরল। তারপর নাকের কাছে হাত রাখল। উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে জাহাজের বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—'শ্বাস পড়ছে—বেঁচে আছে।' এবার বৃদ্ধটিকে পরীক্ষা করল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'দু'জনেই বেঁচে আছে!'

তারপর বিস্কো কোমরে গোঁজা ছোরাটা বের করল। লতার বাঁধন কাটল। প্রথমে যুবকটি আস্তে আস্তে উঠে বসল। বৃদ্ধটি শুয়েই রইল। বিস্কো যুবকটিকে বলল...'নৌকোয় চড়তে পারবে?'

যুবকটি ওর ভাষা বুঝল না। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল।

বিস্কো এবার পর্তুগীজ ভাষায় বলল। যুবকটি বুঝল না। মাথা নাড়ল। তখন বিস্কো স্প্যানিশ ভাষায় বলল। যুবকটি এবার চোখ খুলে ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায় বলল—'আমার নড়বার শক্তি নেই।' বিস্কো বুঝল ওদের নৌকোয় তোলা যাবে না। ও নিজের নৌকোয় ফিরে এল। নৌকো থেকে কাছি নিয়ে কাঠের ভেলাটার সঙ্গে বাঁধল। তারপর ভেলাটাকে টেনে নিয়ে এল জাহাজের কাছে। জাহাজ থেকে ভাইকিংরা একটা দড়িতে ফাঁস পরিয়ে ঝুলিয়ে দিল। বিস্কো যুবকটিকে তুলে ধরে ফাঁসটায় বসিয়ে দিল। জাহাজ থেকে ভাইকিংরা টেনে টেনে যুবকটিকে জাহাজে তুলে নিল। আবার দড়ির ফাঁস নামিয়ে দিল। বিস্কো অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে তুলে ফাঁসে বসিয়ে দিল। বৃদ্ধের দেহটি ফাঁসে ঝুলতে লাগল। ভাইকিংরা দড়ি টেনে টেনে বৃদ্ধটিকে জাহাজে তুলে নিল। বিস্কোও নৌকোটা জাহাজের গায়ে বেঁধে দড়ি ধরে জাহাজে উঠে এল।

ততক্ষণে কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে বৃদ্ধ ও যুবকটিকে একটা কেবিনঘরে নিয়ে শুইয়ে দিয়েছে। ওদের গায়ে কম্বল ঢাকা দিয়েছে। যুবকটি তবু চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু বৃদ্ধটি মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল। আবার চোখ বন্ধ করে ফেলছিল।

ফ্রান্সিস যুবকটির কাছে এসে বসল। বিস্কো ফ্রান্সিসকে বলল—যুবকটি স্প্যানিস ভাষা বোঝে।' ফ্রান্সিস যুবকটিকে জিজ্ঞেস করল—'তোমরা কারা?' যুবকটির খুব দুর্বল কণ্ঠে বলল—'ইকাবো।' ফ্রান্সিস পাম্বোর কাছে শুনেছিল কঙ্কাল দ্বীপের অধিবাসীরা ইকাবো জাতি।

'তোমরা কঙ্কাল দ্বীপের অধিবাসী?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা যে দ্বীপটিকে এখান থেকে দেখছি সেটাই কি কঙ্কাল দ্বীপ?'

'হ্যাঁ?' তারপর যুবকটি ভীষণ ক্লান্তস্বরে বলল—'আমার কথা বলতে—কষ্ট।' ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। বলল—'মাপ করো ভাই—এসময় আমার কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত হয়নি।' ও বিস্কোর দিকে তাকাল। বলল—'বিস্কো, ওদের আগে জল খেতে দাও, তারপর গরম মাংস রুটি।'

বিস্কো অল্পক্ষণের মধ্যে সব ব্যবস্থা করল। প্রথমে যুবকটিকে ধরাধরি করে বিছানায় বসানো হলো। তারপর জল খাওয়ানো হলো। জল খেয়ে যুবকটি একটু সুস্থ হলো যেন। ওর হাতে মাংস রুটির থালা দেওয়া হলো। যুবকটি বৃদ্ধটির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বিস্কোকে জিজ্ঞেস করল—'আমার বাবা বেঁচে আছেন?' বিস্কো বুঝল বৃদ্ধটি ওর বাবা। বলল—হ্যাঁ—বেঁচে আছেন। তুমি নিশ্চিন্ত মনে খাও।' যুবকটি আস্তে আস্তে খেতে লাগল।

কয়েকজন ধরাধরি করে বৃদ্ধটিকে উঠিয়ে বসাল। জল খাওয়াল। তারপর মাংস রুটির থালাটা ওঁর হাতে দিল। বৃদ্ধটি কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল। তারপর চোখ খুলে ছেলের দিকে তাকিয়ে ইকাবো ভাষায় কী বলল। ছেলেটিও মৃদুস্বরে কী উত্তর দিল। বৃদ্ধটি আস্তে আস্তে খেতে লাগল।

রাত্রে ফ্রান্সিস একা একা ডেক-এ পায়চারি করছিল। কী করবে এখন তাই ভাবছিল। হ্যারি এসে ওর কাছে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস পায়চারী থামিয়ে বলল—ওরা কি সুস্থ এখন।

'না, এখনও ওদের দুর্বলতা কাটেনি।'

এখন কী করবো বলো তো?'

'এখন কঙ্কাল দ্বীপে যাবে কি না ভাবছো?'

'হ্যাঁ।'

'আমার মনে হয় কয়েকদিন অপেক্ষা করা ভাল।'

'ও কথা বলছো কেন?'

'দেখ—এরা ইকাবো। কী এরা অপরাধ করেছে যে ভেলায় বেঁধে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে? অথবা কঙ্কাল দ্বীপে এমন কিছু ঘটেছে যে জন্যে এদের ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা না জেনে এখন কঙ্কাল দ্বীপে যাওয়াটা উচিত হবে না।' হ্যারি বলল।

'ঠিকই বলেছো।' ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—'এদের কাছে আগে সমস্ত ব্যাপারটা শুনি তারপর সিদ্ধান্ত নেবো।'

কয়েকদিনের মধ্যেই যুবকটি আর তার বাবা অনেকটা সুস্থ হলো। ফ্রান্সিস দু'বেলাই ওদের খোঁজখবর নিতে যেতো।

আজকেই বিকেলের দিকে ওদের কেবিনঘরে এল। দেখল যুবকটি বিছানায় বসে আছে। বৃদ্ধটি শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস হেসে বলল—'ভাই—এখন কেমন আছো?' 'ভালো।' যুবকটি মাথা নেড়ে হাসল। বলল—'আপনারা আমাদের বাঁচিয়েছেন। আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।'

ফ্রান্সিস হেসে ওর পিঠ চাপড়াল—'মানুষ হিসেবে আমাদের যা কর্তব্য তাই করেছি।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—'তোমার এখন কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে না তো?'

'না।'

'তাহ'লে তোমাদের ব্যাপারটা একটু বল। আসল কথা তোমাদের ব্যাপারটা না জানা পর্যন্ত আমরা কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না।'

যুবকটি ফ্রান্সিসের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল। পাশেই ছিল হ্যারি। হ্যারি বলল—'তোমার বলতে কোন আপত্তি আছে?'

'না: তা কেন?' তারপর আস্তে আস্তে যুবকটি বলতে লাগল—'আমার বাবা হচ্ছেন ইকাবোদের রাজা। আমি রাজপুত্র। আমার নাম মোকা।' একটু থেমে মোকা বলতে লাগল—কঙ্কাল দ্বীপের দক্ষিণে বেশ দূরে ত্রিস্তানদের একটা দ্বীপ আছে। ওরা আমাদের

চিরশত্রু। এর আগেও অনেকবার আমাদের দ্বীপ আক্রমণ করেছে। কিন্তু আমাদের হারাতে পারে নি।' মোকা থামল। একটু দম নিল। তারপর বলতে লাগল—'কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য। কিছুদিন আগে দ্বীপে ভীষণ ভূমিকম্প হয়েছিল। অনেক ইকাবো তাতে মারা যায়। কমসংখ্যক যোদ্ধা নিয়ে এবার ত্রিস্তানদের আক্রমণ রোধ করতে পারলাম না। আমরা হেরে গেলাম। আমাদের যোদ্ধারা বনে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। আমি আর বাবা ধরা পড়লাম ত্রিস্তানদের হাতে। ওরা আমাদেব প্রাণে মারল না। ভেলায় বেঁধে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল।'

'কতদিন আগে?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

'তা বলতে পারবো না। দিন সাতেকের কথা মনে আছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।'

'তাহলে কঙ্কাল দ্বীপ এখন ত্রিস্তানদের দখলে?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'এখন তোমরা কী করবে?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

মোকা একটু চুপ করে থেকে বলল—'আমরা প্রাণে বাঁচবো এটা তো স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন আপনাদের দয়ায় আমরা বেঁচে গেছি। এবার নতুন করে ভাবতে হবে এখন আমরা কী করবো?'

মোকার কথা শেষ হলে বৃদ্ধ রাজা মোকাকে ইকাবোদের ভাষায় কী জিজ্ঞেস করল। দু'জনে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। ওদের কথা শেষ হলে ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—

'তোমার বাবা মানে রাজামশাই কী বললেন?'

'বাবা বলছেন—পলাতক যোদ্ধাদের একত্র করে তিনি আবার ত্রিস্তানদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। তাতে তাঁর মৃত্যু হলে তিনি মৃত্যুই মেনে নেবেন।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি চুপ করে রইল। কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে পড়ল রূপোর নদীর কথা। ও জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা তোমাদের দ্বীপে কি রূপোর নদী আছে?'

মোকা যেন একটু চমকাল। বলল—'রূপোর নদীর কথা আপনি কি করে শুনলেন?'

'পাঞ্চো নামে একজন স্প্যানিশ নাবিক বলেছিল। আমাদের দেশে এক সরাইখানায় পাঞ্চোর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।'

'পাঞ্চো।' মোকা হাসল। বলল—'পাঞ্চো কিছুদিন আমাদের দ্বীপে ছিল। ওর কাছেই আমি স্প্যানিশ ভাষা শিখেছি। ও রূপোর নদীর খোঁজে এসেছিল। এর আগেও দু'তিনজন এসেছে। কিন্তু রূপোর নদীর খোঁজ কেউ পায়নি। ত্রিস্তানরা যে আমাদের দ্বীপ দখল করেছে, ওদেরও লোভ রূপোর নদীর দিকে।' একটু থেমে মোকা বলল—'কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ রূপোর নদী খুঁজে পায়নি।'

'তোমরা নিজেরা খুঁজেছো?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। অনেকভাবে চেষ্টা করেছি—খুঁজেছি, পাইনি।'

'তোমার বাবাও জানেন না বোধহয়?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

'না বাবাও জানেন না।'

'তোমরা কী মনে করো?' হ্যারি বলল—'সত্যিই রূপোর নদী ছিল, না সবটাই একটা ছেলে-ভুলানো গপ্পো?'

'না—গপ্‌পো নয়। বাবা বলেন—রূপোর নদীর কথা তিনি আমার ঠাকুরদার মুখে শুনেছেন। তা ছাড়া আমাদের দ্বীপের দেবতা—গিয়ানি। তার মন্দিরমত একটা পুজোর স্থান আছে। সমস্ত মন্দিরটা তাল তাল রূপোর থাম দিয়ে তৈরী। সামনে আছে রূপোর থাম। আমাদের পূর্বপুরুষরা এত রূপো পেল কোত্থেকে?'

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—'হ্যারি, এবার বুঝতে পারছো?'

'হুঁ। কিন্তু রূপোর নদী গেল কোথায়?' হ্যারি বলল।

'আচ্ছা মোকা—' ফ্রান্সিস বলল—'তোমাদের দ্বীপে তো একটাই নদী?'

'হ্যাঁ।'

'সেটার নাম কুনহা?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের ভাষায় কুন্‌হা-র অর্থ রূপো—তাই কিনা?'

'হ্যাঁ, আপনি এতসব জানলেন কী করে?'

'পাঞ্চো বলেছে।'

'পাঞ্চো—চোর। ঠকবাজ।' মোকা বেশ রেগে বলল—'জানেন ও গিয়ানির মন্দিরের একটা থাম চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।'

ফ্রান্সিস একটু আশ্চর্য হলো। বলল—'আমি অতশত জানি না। পাঞ্চো আমার বন্ধু নয়, এক রাত্রের আলাপ। ঠিক আছে—' ফ্রান্সিস মোকার বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল—'তোমরা বিশ্রাম করো। পরে কথা হবে।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে এল।

রাত্রে ফ্রান্সিস একা একা জাহাজের ডেক-এ পায়চারি করছিল। গভীরভাবে ভাবছিল—কী করবে এখন? হ্যারি এল। ওর মাথায়ও এক চিন্তা। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে দু'জনে কথাবার্তা বলছে, তখনই বিস্কো এল। একটা দুঃসংবাদই নিয়ে এল ও। বলল—'ফ্রান্সিস, জাহাজে খাবার জল ফুরিয়ে এসেছে। কী করবে?'

'কঙ্কাল দ্বীপ থেকেই জল আনতে হবে।' ফ্রান্সিস বলল।

'কিন্তু দিনের বেলা যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'না, রাত্রে যেতে হবে।'

'তাহ'লে আজ রাত্রেই যেতে হয়।'

'ঠিক আছে। দু'টো পিঁপে নিয়ে তোমরা চারজন যাও কিন্তু তার আগে মোকার সঙ্গে কথা বলতে হবে। কঙ্কাল দ্বীপে কোথায় পানীয় জল পাওয়া যাবে তার হদিস একমাত্র ও-ই দিতে পারবে।' ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল—'চলো তো হ্যারি—মোকার সঙ্গে কথা বলে আসি।'

ওরা দু'জনে মোকা যে কেবিনঘরে ছিল সেই ঘরে এল। দেখল রাজামশাই মোকা দু'জনেই ঘুমিয়ে আছেন।

ফ্রান্সিস মোকাকে আস্তে আস্তে ঠেলল। ঘুম ভেঙে মোকা বসল। এত রাত্রে ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে দেখে ও অবাকই হলো। ফ্রান্সিস বলল—'মোকা—আমাদের জাহাজে জল ফুরিয়ে এসেছে। তোমাদের দ্বীপে কোথায় পানীয় জল পাওয়া যাবে?'

'পাহাড়ের নীচে উত্তর দিকে একটা ঝর্ণা আছে। আমরা আছি দ্বীপের দক্ষিণ দিকে। যারা যাবে তাদের উত্তর দিক থেকে দ্বীপে নামতে হবে।'

'যে বেলাভূমি আমরা এদিক থেকে দেখছি সেখানে নেমেও তো উত্তর দিকে যাওয়া যায়।'

'যে বেলাভূমিটা এদিক থেকে দেখছেন তাকে মৃতের বেলাভূমি বলা হয়।

'কেন?'

'এই বেলাভূমির কাছে সমুদ্রের নীচে যে বালি আছে তা অত্যন্ত হালকা। পা দিয়ে দাঁড়ালে বালি দ্রুত পায়ের নীচে সরে যায়। এখান দিয়ে তীরে উঠতে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু। তাই এইদিকের বেলাভূমির ধারে কেউ আসে না। দেখবেন এই দিকের বেলাভূমির ধারে ত্রিস্তানদের একটাও ক্যানো নৌকা বাঁধা নেই। সব উত্তরের খাঁড়িগুলোতে বাঁধা আছে।' মোকা বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—'হ্যারি—আমি এই দিক দিয়েই দ্বীপে নামবো ভেবেছিলাম। ভীষণ বিপদে পড়তাম তা'হলে।'

মোকা বলল—'উত্তর দিকে পাহাড় পর্যন্ত একটা রাস্তা আছে। কিন্তু সেই রাস্তাটা নিশ্চয়ই ত্রিস্তান যোদ্ধারা পাহারা দিচ্ছে। যারা জল আনতে যাবে তাদের যেতে হবে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।'

'ঠিক আছে।' ফ্রান্সিস বলল—'ওদের উত্তরের জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই যেতে বলবো।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। বিস্কো আর তিনজন ভাইকিংকে নিয়ে তৈরী হয়ে ফ্রান্সিসের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ফ্রান্সিস বলল—'বিস্কো—দুটো জলের পিপে নিয়ে যাও। কিন্তু এদিকের সমুদ্রের তীরে নামা চলবে না। তোমাদের যেতে হবে উত্তর দিকে। সেখানে খাঁড়ি আছে। সেখানে নেমে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের দিকে যাবে। পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে ঝর্ণা পাবে। রাস্তামতো নাকি আছে ওখানে। কিন্তু সেই রাস্তা দিয়ে যাবে না। ত্রিস্তান যোদ্ধারা পাহারা দিচ্ছে সেই রাস্তা।'

'ঠিক আছে। আমরা নৌকা নিয়ে উত্তর দিক থেকে দ্বীপে যাবো।'

বিস্কোরা চলে গেল। একটু পরেই দু'টো নৌকায় ওরা দু'টো জলের পিপে নামাল। তারপর নৌকো চলল কঙ্কাল দ্বীপের দিকে। আকাশে ভাঙা চাঁদ। ম্লান জ্যোৎস্নায় ওরা নিঃশব্দে নৌকো বেয়ে চলল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজ থেকে তাকিয়ে রইল ওদের নৌকোর দিকে। একটু পরে আর নৌকো দেখা গেল না। পাতলা কুয়াশায় আড়াল পড়ে গেল। ওরা নিজেদের কেবিনে এসে শুয়ে পড়ল।

ভোর হলো। বেলা বাড়ল। কিন্তু বিস্কোদের নৌকোর দেখা নেই। হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বেশ চিন্তিত স্বরে বলল—'ওরা ফিরলো না। কী ব্যাপার বলো তো?

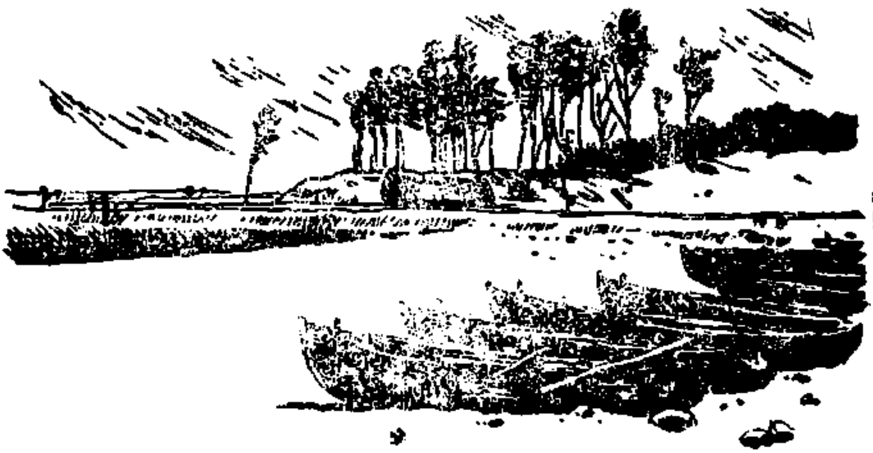
চিন্তার কথা। দেখি আজকের দিনটা।' হ্যারি বলল।

সারাদিনই ফ্রান্সিসের চিন্তায় চিন্তায় কাটল। বিস্কোদের নৌকোর দেখা নেই।

সন্ধ্যে হলো। রাত বাড়তে লাগল। সবাই ডেক-এ এসে জড়ো হলো। তাকিয়ে রইল কঙ্কাল দ্বীপের দিকে। বিস্কোদের নৌকোর কোনো পাত্তাই নেই। কয়েকজন ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল ওরা বিস্কোর খোঁজে দ্বীপে যাবে। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। বলল—'না আমি একা যাবো।' হ্যারি আপত্তি করল। ফ্রান্সিস বুঝিয়ে বলল—বিস্কোরা নিশ্চয়ই ত্রিস্তানদের হাতে ধরা পড়েছে। আমি একা বোকার মতো ওদের সঙ্গে লড়তে যাবো না। শুধু কী ঘটেছে সেটা জেনে আসবো। তারপর সবাই মিলে যাবো। লড়াই যদি করতে হয়

তখনি করবো।

রাত একটু গভীর হলে ফ্রান্সিস পোশাক পরে নিল। কোমরে তরোয়াল গুঁজল। তারপর দড়ি বেয়ে জাহাজ থেকে নৌকোয় নেমে এল। আজকের চাঁদ আরো উজ্জ্বল। জ্যোৎস্নায় চিক্‌চিক্ করছে ঢেউয়ের মাথা।



ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বৈঠা বাইতে লাগল। ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে নৌকো এগিয়ে চলল কঙ্কাল দ্বীপের দিকে।

উত্তর দিক থেকে ঘুরে যেতে হলো বলে একটু দেরীই হলো কঙ্কাল দ্বীপে পৌঁছতে। উত্তর দিকের দ্বীপের খাঁড়িগুলোতে দেখল অনেক ক্যানো নৌকো বাঁধা। ফ্রান্সিস নৌকা নিয়ে তীরের জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল। তখনি আবছা জ্যোৎস্নায় দেখল ওদের দু'টো নৌকো একটা খাঁড়িতে বাঁধা। ফ্রান্সিস বুঝল—এখানেই বিস্কোরা নেমেছে। ফ্রান্সিসও নৌকোটা ভেড়াল ওখানে। একটু নীচু ঝুঁকেপড়া গাছের ডালে নৌকোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ও মাটিতে নামল। বনের মধ্যে দিয়ে চলল পাহাড়টার দিকে।

বনের নীচে অন্ধকার গভীর। যেখানে গাছগাছালি একটু কম সেখানে ভাঙা জ্যোৎস্না পড়েছে ঘাসে ঝোপে। বিচিত্র সব শব্দ শোনা যাচ্ছে। কয়েকটা নিশাচর পাখি ডানা ঝাপটাল। এক গাছ থেকে উঠে অন্য গাছে গিয়ে বসল।

ফ্রান্সিস কোমর থেকে খুলে তরোয়ালটা হাতে নিল। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে চলল।

হঠাৎ ভাঙা জ্যোৎস্নার আলোয় দেখল দু'টো জলের পিপে পড়ে আছে। একটা কাত হয়ে পড়ে আছে, অন্যটা সোজা বসানো। সেটার ভিতর হাত দিয়ে দেখল জল ভরা। বুঝল বিস্কোরা এখানেই ধরা পড়েছে।

তাহলে ঝর্ণাটা কাছেই। কিন্তু সেদিকে গিয়ে লাভ নেই। বরং ত্রিস্তানদের আস্তানা কোন দিকে দেখতে হয়। বিস্কোদের বন্দী করে নিশ্চয়ই ওদিকে কোথাও রাখা হয়েছে।

ফ্রান্সিস ডানদিকে ঘুরল। বন থেকে বেরোতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে ত্রিস্তানদের আস্তানা। ও এগিয়ে চলল।

হঠাৎ পায়ের কাছে কী যেন কিলবিল করে উঠল। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা শক্ত বুনো লতা ওর পায়ে ফাঁস হয়ে লেগে গেল। চোখের নিমেষে লতার বাঁধনটা এক হ্যাঁচকা টানে সামনের গাছের মাঝামাঝি টেনে তুলল ওকে। হাত থেকে তরোয়ালটা ছিট্‌কে গেল। ডাল থেকে ঝোলানো লতার ফাঁদ ওর বাঁ পাটা বাঁধা। ওর মাথা নীচের দিকে। ও ঝুলতে লাগল। বুঝল ত্রিস্তানরা বনের মধ্যে ফাঁদে পেতে রেখেছে। সেই ফাঁদেই ও ধরা পড়েছে।

মাথা নীচের দিকে। পা ওপরে। ফ্রান্সিস ঝুলতে লাগল। শব্দ করে কয়েকটা পাখি গাছটা থেকে উড়ে গেল। হাতে তরোয়ালটাও নেই যে বুনো লতার ফাঁসটা কাটবে। ও ঝুলতে লাগল। গায়ের ঢোলা জামাটা মুখের ওপর আটকে গেল। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও। জামাটা দু' হাত দিয়ে খুলে নীচে ছুঁড়ে ফেলল।

বেশ কিছু সময় কাটল। মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। ও বুঝল ঐভাবে আর কিছুক্ষণ ঝুললে মাথায় রক্ত উঠে অজ্ঞান হয়ে যাবে। ও শরীরটা বাঁকাতে লাগল। কয়েকটা ঝুল খেয়ে হঠাৎ শরীরটা বাঁকিয়ে পায়ের ওপরের লতাটা ধরে ফেলল। কিছুক্ষণ রইল ওভাবে। তারপর প্রাণপণ শক্তিতে লতাটা দু'হাতে ধরে আস্তে আস্তে একটু সোজা হলো। পায়ের লতার বাঁধনটায় ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাঁপাতে লাগল। পায়ের বাঁধনটা প্রায় হাঁটুর কাছে উঠে এল। বুনো লতাটা যেন কেটে বসল পায়ে। ঘষা লেগে লেগে অনেকটা জায়গা ছড়ে গেল। ভীষণ জ্বালা করতে লাগল। যে ডাল থেকে ফাঁদের লতাটা ঝুলছে সেই ডালটা বেশ উঁচুতে। নাগাল পাওয়া অসম্ভব।

বেশ কিছুক্ষণ কাটল। মাঝে মাঝে তন্দ্রামত এল। কিন্তু পায়ের অসহ্য জ্বালায় তন্দ্রা ভেঙ্গে যেতে লাগল।

কতক্ষণ এভাবে ফ্রান্সিস ঝুলে রইল ও জানে না। চারপাশের বনে জঙ্গলে পাখি ডাকতে লাগল। বিচিত্র ডাক পাখিগুলোর।

ওপরে গাছের পাতার ফাঁকগুলো দিয়ে ফ্রান্সিস দেখল আকাশ আর কালো নয়। তা'হলে ভোর হয়েছে। গাছের নীচের অন্ধকার তখনও কাটেনি। ও নিরুপায়। কিছুই করার নেই ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া। হাতে তরোয়ালটা থাকলে তবু কিছু করতে পারত। কিন্তু এখন একেবারেই অসহায়, অসহ্য ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়ছে যেন।

ফ্রান্সিস আর ওভাবে বেশীক্ষণ থাকতে পারল না। বুনো লতাটা থেকে হাত ছেড়ে দিল। আবার মাথা নিচু পা ওপরে করে ঝুলতে লাগল।

কতক্ষণ এভাবে ঝুলে রইল তা'ও হিসেব করতে পারল না। হঠাৎ বনের মধ্যে কাদের কথাবার্তা ভেসে আসতে লাগল। তখন বনের নীচে কিছুদূর পর্যন্ত বেশ দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস দেখল পাঁচজন লোক কথা বলতে বলতে আসছে। দুর্বোধ্য সেই ভাষা। হাতে ওদের কাঠের লম্বা বর্শা। মাথাটা ছুঁচলো। ওদের পরনে তাসক ঘাসের ঘাগরা। গায়ে কিছু নেই। কপালে গালে বুকে লাল সাদা রঙের দাগ। ফ্রান্সিস বুঝল—এরা ত্রিস্তান যোদ্ধা। ফাঁদে কেউ ধরা পড়ল কিনা খুঁজতে এসেছে। ওরা এসব ফাঁদ পেতেছে নিশ্চয়ই পলাতক ইকাবোদের ধরবার জন্যে।

ওরা একটু দূর থেকেই ফ্রান্সিসকে ঝুলতে দেখল। সবাই একসঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায়

কী বলে চিৎকার করে উঠল। ছুটে ওরা সিডার গাছটার নীচে এল। একজন টিকটিকির মতো গাছের কাণ্ড বেয়ে ওপরে উঠে গেল। তরতর করে ডাল ধরে ধরে ফ্রান্সিস যে ডাল থেকে ঝুলছিল সেইটার কাছে এল। কোমর থেকে একটা ধারালো লোহার টুকরো বের করল। সেটা দিয়ে ফাঁদের তলাটা কাটতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল মাথা সোজা করে মাটিতে পড়লে ও ভীষণভাবে আহত হবে। তাই শরীরটা বেঁকিয়ে ও তৈরী হলো। লতাটা কাটা হতেই পিঠ দিয়ে একটা ঝোপের ওপর পড়ল। ঘাড়ে লাগল তবু। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পারল না। আবার শুয়ে পড়ল। ত্রিস্তান যোদ্ধারা বর্শা উঁচিয়ে ছুটে এল। ফ্রান্সিসকে তুলে ধরল। ও একবার ভাবল ছিট্‌কে-যাওয়া তরোয়ালটা খুঁজে বের করবে। পরক্ষণেই ভাবল তরোয়ালের কথা বললে হয়তো ত্রিস্তানরা ক্ষেপে যাবে। বিপদ বাড়বেই তাতে। বরং চুপচাপ থাকা যাক। দেখা যাক ওকে ত্রিস্তানরা কী করে।

ত্রিস্তান যোদ্ধারা নিজেদের ভাষায় কী বলাবলি করল। তারপর ফ্রান্সিসকে ধাক্কা দিয়ে চলবার ইঙ্গিত করল। ধাক্কা খেয়ে ফ্রান্সিস রাগে জ্বলে উঠল। কিন্তু কোনো কথা বলল না। ওদের নির্দেশমত হাঁটতে লাগল। ছড়ে-যাওয়া পা'টা অসম্ভব জ্বালা করছে। কিন্তু উপায় নেই। ওদের অবাধ্য হলে হয়তো প্রাণ বিপন্ন হতে পারে।

ফ্রান্সিসকে সামনে রেখে ত্রিস্তান যোদ্ধারা পেছনে চলল।

কিছুক্ষণ বনের মধ্যে দিয়ে চলার পর বনের বাইরে এল ওরা। ঘাস, বুনো ঝোপে ঢাকা প্রান্তর উঠে গেছে পাহাড়ের দিকে। উজ্জ্বল রোদে দেখা গেল পাহাড়ের ন্যাড়া মাথাটা। সবুজের চিহ্ন নেই ওখানে। নিরেট কালচে পাথরের প্রায় গোল মাথাটা। ফ্রান্সিস দূর থেকে দেখেছিল পাহাড়ের মাথাটা। এবার কাছ থেকে উজ্জ্বল রোদে দেখল। ঠিক মানুষের মাথার করোটির মতো দেখতে। চোখের ফুটোর মতো বড় একটা গর্তও দেখা যাচ্ছে। অন্য গর্তটা আধ-ভাঙা। দ্বীপের উত্তর দিকটাই বসতি এলাকা। সেখানে যখন পৌঁছল তখন বেশ বেলা হয়েছে। একটু দূরে দূরে তাসক ঘাসের ছাউনি দেওয়া পাথর দিয়ে তৈরী ইকাবোদের বাড়ি দেখা গেল। পাথর সাজিয়ে বেশ শক্ত করেই বাড়িগুলো তৈরী।

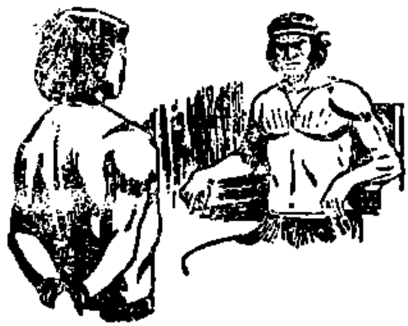
ফ্রান্সিসকে সামনে রেখে ত্রিস্তানরা হেঁটে আসছিল। বাড়িগুলো থেকে ত্রিস্তান যোদ্ধারা বেরিয়ে এল। দেখতে লাগল বন্দী ফ্রান্সিসকে, পেছনের যোদ্ধার দলকে। সবই ইকাবোদের বাড়ি। হয়তো ইকাবোরা পালিয়েছে, নয়তো ওদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটা বাড়িঘর ছাড়া বাকিগুলো যোদ্ধারা দখল করে নিয়েছে।

পাহাড়ের মাথার নীচে যেখান থেকে ঘাস-ঢাকা জমি শুরু হয়ে নীচে নেমে এসেছে সেখানেই ছাড়া ছাড়া বাড়ি নিয়ে বসতি এলাকা। যে কিছু ইকাবো বৃদ্ধ আর মেয়েরা ও শিশুরা ছিল তারা ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। পাথরের বাড়িঘর ছাড়িয়ে পাহাড়ের মাথার কাছাকাছি আসতে দেখা গেল একটা বড় ঘর। কাঠ আর পাথরের। চালাটা তাসক ঘাসের হলেও ভালোভাবে তৈরী। ফ্রান্সিস আন্দাজে বুঝল এটা নিশ্চয়ই রাজার বাড়ি। ইকাবোদের রাজা তো এখন জাহাজে। ত্রিস্তানদের রাজা নিশ্চয়ই এখানে আস্তানা গেড়েছে।

অনেক ত্রিস্তান যোদ্ধা ওদের পিছনে পিছনে রাজবাড়ির দিকে আসতে লাগল। রাজবাড়ির বাইরে একটা পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ। তার দু'পাশে পাথরের আসন মতো সাজানো।

প্রাঙ্গণের মাঝখানে ফ্রান্সিসকে দাঁড় করানো হলো। দুজন ঢুকল রাজার ঘরের মধ্যে। এর মধ্যে পাঁচ ছ'জন ত্রিস্তানপ্রাঙ্গণের দু'পাশে রাখা পাথরগুলোতে বসল। ওরা সবাই বয়স্ক, বৃদ্ধ। বোঝা গেল ওরা যোদ্ধা নয়। রাজার পরামর্শদাতা, পারিষদবর্গ।

একটু পরেই ঘরটা থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি খুব বলিষ্ঠ দেহী ত্রিস্তান। মুখে বুকে উল্‌কি আঁকা। নাক টিকালো, মাথার লম্বা চুল পিছনের দিকে ঝুঁটি করে বাঁধা। ফ্রান্সিস ধরে নিল ইনিই ত্রিস্তানদের দলনেতা। তিনি বেরিয়ে আসতে পাথরের ওপর বসে থাকা বৃদ্ধরা উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে একটা কাঠের সিংহাসন মতো এনে বাইরে রাখা হলো। সিংহাসনে বসার জায়গায় পাখির পালকের গদি । বলিষ্ঠদেহী লোকটি একবার চারদিকে চেয়ে নিয়ে কাঠের সিংহাসনে বসলেন।



একজন ত্রিস্তান দলনেতার সামনে এসে দাঁড়াল। উবু হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দলনেতাকে সম্মান জানাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ত্রিস্তান ভাষায় গড়গড় করে কী বলে গেল। ফ্রান্সিস তার বিন্দুবিসর্গও বুঝল না। দলনেতা তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। যোদ্ধাটি উত্তর দিল। এবার দলনেতা একজন পারিষদের দিকে তাকিয়ে কী বললেন। সেই পারিষদটি উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসকে আস্তে আস্তে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্প্যানিশ ভাষায় জিজ্ঞেস করল—'তুমি কে?' ফ্রান্সিস আশ্বস্ত হলো যে যাহোক একজনকে পাওয়া গেল যে ওর কথা কিছু বুঝবে। ফ্রান্সিস বলল—'আমরা জাতিতে ভাইকিং।'

'তুমি এসেছো কেন?' বৃদ্ধটি জিজ্ঞেস করল।

'জাহাজে জল ফুরিয়ে গেছে, জল নিতে এই দ্বীপে এসেছিলাম।' থেমে থেমে বৃদ্ধটি বলল—'যুদ্ধ হয়েছে—আমরা জিতেছি—রাজা মরেছে। বনে আমাদের পাতা ফাঁদে তুমি ধরা পড়েছো—।' এসময় দলনেতা বৃদ্ধটিকে কী বললেন। বৃদ্ধ বলল—'সেনাপতি বলছেন—তুমি গুপ্তচর—ত্রিস্তানদের ক্ষতি করতে তুমি এখানে এসেছো।' ফ্রান্সিস এবার সেনাপতির দিকে তাকালো। বলল—'আপনি ভুল করছেন। আমার আগে আরো চারজন ভাইকিং এই দ্বীপে এসেছে—জল নিতে। তারা জল নিয়ে ফিরতে পারেনি। তাই তাদের খোঁজে আমি এসেছিলাম।' বৃদ্ধটি সেনাপতিকে ত্রিস্তান ভাষায় সব বলল। সেনাপতি উত্তরে কী বললেন। বৃদ্ধটি বলল—'সেনাপতি বলছেন—সেই চারজনও ধরা পড়েছে। তোমরা গুপ্তচর।'

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। তাহলে বিস্কোরাও ধরা পড়েছে। ও চিৎকার করে বলল—'আমরা কোন অপরা করিনি। যুদ্ধেও অংশ নিইনি। দ্বীপের দক্ষিণে আমাদের জাহাজ রয়েছে। জল নিয়ে জাহাজে যাবো। তারপর জাহাজ ছেড়ে দেব।

বৃদ্ধটি সেনাপতিকে বলল সে কথা। সেনাপতি মাথা ঝাঁকিয়ে কী বলে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধটি বলল—'সেনাপতি বলছেন—প্রাণদণ্ড।'

ফ্রান্সিস বুঝল—এই সেনাপতি নির্মম। নরহত্যা তার কাছে কিছু না। সেনাপতি ঘরে ফিরে গেলেন।

কয়েকজন ত্রিস্তান যোদ্ধা এসে ফ্রান্সিসকে ধাক্কা দিয়ে হাঁটবার ইঙ্গিত করল।

ওখান থেকে পাহাড়ের ঢাল নেমে গেছে উপত্যকার মতো একটা জায়গায়। উপত্যকার কাছাকাছি আসতেই ফ্রান্সিস দেখতে পেল ইকাবোদের রূপোর মন্দিরটা। প্রায়

কুড়ি ফুট উঁচু মন্দিরটা। চারকোণা। থামগুলো নিরেট রূপোর। সামনেও অর্ধবৃত্তাকারে কয়েকটা রূপোর থাম। মোটা মোটা থাম। মন্দিরের মধ্যে গিয়ানি দেবতার মূর্তি। চৌকোণা একটা কাঠের থাম কুঁদে কুঁদে তৈরী হয়েছে গিয়ানির মূর্তি। মন্দিরের মাথার ছাউনি তাসাক ঘাস আর নারকেল পাতায় শক্ত করে বোনা। থামগুলোতেও কুঁদে কুঁদে নানা কারুকাজ করা। প্রচুর কাঁচা রূপো না পেলে এত বড় মন্দির তৈরী করা যায় না। রূপোর নদী ছেলে-ভুলানো গপ্পো নয়। সত্যি এরকম কিছু ছিল। যেখান থেকে মোকার পূর্বপুরুষরা প্রচুর রূপো পেয়েছিল। ফ্রান্সিস উপত্যকা দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে যেতে দেখল। এটাই তাহ'লে কুন্হা নদী।

উপত্যকা পার হয়ে ওরা এবার ওপরের দিকে উঠতে লাগল। বেশ কিছুটা ওঠবার পর ওরা একটা গুহার সামনে এসে দাঁড়াল। এবার ফ্রান্সিস ফিরে দাঁড়াল। দেখল প্রায় কুড়ি পঁচিশজন ত্রিস্তান যোদ্ধা এসেছে। কারণটা একটু পরেই বুঝল যখন সবাই মিলে গুহার মুখের পাথরটা ঠেলতে লাগল। কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলির পর গুহার মুখের পাথরটা কিছুটা সরে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে ত্রিস্তান যোদ্ধারা ফ্রান্সিসকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। তারপর পাথর ঠেলে গুহার মুখ বন্ধ করতে লাগল।

গুহার ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। প্রথমে ফ্রান্সিস কিছুই দেখতে পেল না। একটা ভ্যাপসা গরম অনুভব করল। পাথুরে দেয়ালের খাঁজে একটা মশাল জ্বলছে। সেই মশালের নীচে এসে ও দাঁড়াল। পাথুরে মেঝেতে কয়েকজনকে শুয়ে থাকতে দেখল। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই দু'জন লোক এসে ওকে জড়িয়ে ধরল। বিস্কো? ফার্নান্ডো? ফ্রান্সিস খুশিতে চিৎকার করে উঠল—'তোমরা বেঁচে আছো? কিন্তু আর দু'জন কোথায়?'

'বলছি।' বিস্কো বিষণ্ণ স্বরে বলল—'বসো।'

ততক্ষণে অন্ধকারে ফ্রান্সিসের চোখ অনেকটা সয়ে এসেছে। দেখল আরো চারজন মেঝেতে শুয়ে আছে। ওরা ইকাবো। কিন্তু বন্ধু দু'জন কোথায়?

ফ্রান্সিস মেঝেতে বসল। বিস্কো ফার্নান্দো বসল। ফ্রান্সিস বলল—'কী হয়েছিল বলো তো?'

'আমরা পিপে ভর্তি করে জল নিয়ে ফেরার পথে গর্ত-ফাঁদে আটকে পড়ে গিয়েছিলাম। ত্রিস্তানরা আমাদের বন্দী করে ওদের রাজার কাছে নিয়ে আসে।' বিস্কো বলল।

'রাজা নয়, ও সেনাপতি। লোকটা সাপের মতো ধূর্ত আর বাঘের মত হিংস্র।'

'একজন বৃদ্ধ ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায় আমাদের জানাল আমাদের নাকি প্রাণদণ্ড হয়েছে। তারপর এই গুহায় এনে বন্দী করল।'

'তারপর?'

'তারপর কয়েকজন বন্দী ইকাবোর সঙ্গে আমাদের দুই বন্ধুকে ধরে নিয়ে গেল। ওরা কেউ আর ফেরেনি।' বিস্কো আস্তে আস্তে বলল।

বন্ধুদের এই মৃত্যুসংবাদে ফ্রান্সিস প্রথমে চমকে উঠল। তারপর গভীর দুঃখে ওর বুক ভেঙে যেতে লাগল। ও কথা বলতে পারল না। ওর শরীরটা থর থর করে কেঁপে উঠল। একটু ফুঁপিয়ে উঠল ও। বিস্কো ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রেখে চাপ দিল। মৃদুস্বরে বলল—'ফ্রান্সিস আমরা এখনো মুক্ত নই। ভেঙে পড়লে চলবে না।'

ফ্রান্সিস স্থির হলো। চোখ মুছে বলল—'পালাতে হবে।'

'কিন্তু কী করে?'

'ত্রিস্তানরা কীভাবে আমাদের খেতে দেয়—কীভাবে পাহারা দেয় সেটা খুঁটিয়ে দেখি—তারপরই পালাবার পরিকল্পনা করবো।' একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—'আচ্ছা গুহাটার চারধার ভালো করে দেখেছো?'

'হ্যাঁ দেখেছি—নিরেট পাথর চারদিকে।'

'কিন্তু কোথাও না কোথাও ফাঁকফোকর নিশ্চয়ই আছে। নইলে এই বদ্ধ গুহায় তোমরা মরে যেতে।'

'হ্যাঁ, একটা বড় ফোকর আছে ওপরে দিকে। ঐ দেখ।' বিস্কো আঙুল দিয়ে দেখাল। ফ্রান্সিস দেখল গুহাটার ছাতের দিকে একটা বড় পাথুরে ফোকর। দু'জন মানুষ একসঙ্গে বেরোতে পারে এরকম ফোকর। কিন্তু এত উঁচুতে ওঠা? অসম্ভব। গুহার মুখের পাথরটাও এমন চেপে বসে আছে যে সামান্যতম ফাঁকও নেই। তাছাড়া ওটা সরানো পাঁচ ছয়জনের পক্ষে সম্ভব নয়। বিস্কো বলল—ঐ ফোকরটা দেখেই আমরা রাত-দিনের পার্থক্য বুঝতে পারি। ওখানে দিনের বেলা আলো থাকে।'

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে শরীর। ছড়ে যাওয়া পায়ের জ্বালাটাও কমে নি। কিন্তু এখন বিশ্রামের সময় কোথায়। ও পাথুরে মেঝের ওপর এদিক ওদিক পায়চারি করল কিছুক্ষণ। তারপর পাথরের খাঁজ থেকে মশালটা তুলে নিয়ে সমস্ত গুহাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। চারদিকেই নিরেট পাথর। গুহার শেষ মাথায় দেয়ালের মতো সমান কিছুটা জায়গা। এখানে ওখানে পাথুরের বড় বড় টুকরো ছড়ানো। ফিরে এসে গুহাটার মাঝামাঝি দাঁড়ালো। ওপরদিকে বড় ফোকরটা দেখল। তারপর বিস্কোকে ডাকল। বিস্কো কাছে এলে ওর হাতে মশালটা দিয়ে পাথুরে দেয়ালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে ঐ ফোকরটার দিকে উঠতে লাগল। কিছুটা উঠল। কিন্তু ফোকরটা তখনও বেশ দূরে। আর এগোতে পারল না। পাথুরে দেয়ালের খাঁজে শরীরের ভারসাম্য রাখা যাচ্ছে না। ও পাথুরে খাঁজে খাঁজে পা রেখে নেমে এল।

যে চারজন ইকাবো মেঝেয় শুয়েছিল তারা এবার উঠে বসল। ফ্রান্সিসের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস পাথুরে দেয়াল থেকে নেমে বসল। হাঁপাতে লাগল।

এমন সময় গুহার মুখের পাথরটা সরে যেতে লাগল। বিস্কো ফ্রান্সিসকে ফিসফিস করে বলল—'খাবার দিতে যে লোকটা ঢুকবে তাকে খতম করে তো আমরা পালাতে পারি।'

ফ্রান্সিস হাসল—'পাগল হয়েছো। এই পাথর সরাতে অন্তত কুড়িজন ত্রিস্তান ওর সঙ্গে আসে। আমরা তো মোট সাতজন। তাও নিরস্ত্র।'

দুজন ত্রিস্তান গুহায় ঢুকল। হাতে হাতে করে কয়েকটা মাটির পাত্রে খাবার ওদের সামনে রাখল। ম্যাকরেল মাছসেদ্ধ, বুনো কলা আর বুনো আলুসেদ্ধ। বিস্কো চিৎকার করে বলে উঠল—'নিয়ে যা এসব। আমার বন্ধুদের হত্যা করেছিস তোরা, তোদের দেয়া খাবার—থুঃ-থুঃ।' বিস্কো থুতু ফেলল। লোক দু'টো বেশ রেগে গেছে মুখ দেখেই বোঝা গেল। বিস্কো বলল—'কাল রাত্রেও ওদের দেওয়া খাবার আমরা খাইনি।' ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—'আহাম্মকের কাজ করেছো। না খেলে দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়বে—পালানোর কোন আশা থাকবে না। বরং বেশী বেশী করে খাবে। শরীরে জোর রাখবে তবে না পালাতে পারবে। খেয়ে নাও।'

বিস্কো আর আপত্তি করল না। ওদের দেখাদেখি ইকাবো বন্দীরাও খেতে লাগল। খাওয়া শেষ করে ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে আরো খাবার চাইল। ওরা খাওয়া নিয়ে ঝামেলা পাকাচ্ছে না দেখে ত্রিস্তান যোদ্ধা দু'টি খুশি হলো। একটা বড় মাটির পাত্র নিয়ে এল। বোধ হয় ওদেরও খাবার আছে ওর মধ্যে। ফ্রান্সিস তাই চেয়ে চেয়ে খেল। বিস্কোরাও বেশী করে খেল। আর কেউ বেশী চাইল না। ত্রিস্তান দু'জন এঁটো পাত্র নিয়ে চলে গেল। একটু পরে বড় কাঠের পাত্রে জল নিয়ে এল। নারকেলের মালা চুবিয়ে জল নিয়ে ফ্রান্সিসরা খেল। পেট ভরে জল খেল ফ্রান্সিস, এত জলতেষ্টা পেয়েছিল ও বুঝতেই পারেনি।

ত্রিস্তান দু'জন চলে গেল। গুহার মুখে পাথরটার চাপা দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস উঠে পাথরটা কাছে গেল। দেখল মুখে মুখে চেপে বসে গেছে। জলও গলবে না এমন নিরেটভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।

ফ্রান্সিস ফিরে এসে পাথুরে মেঝেতে শুয়ে পড়ল। বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ । পাশ ফিরে ইকাবো বন্দীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু ওরা ফ্রান্সিসের কোনো কথাই বুঝতে পারল না। হাল ছেড়ে দিয়ে ফ্রান্সিস চোখ বুজে বিশ্রাম করতে লাগল।

একটু তন্দ্রাও এসেছিল। কিন্তু পায়ের ছড়ে যাওয়া জায়গাটায় জ্বালা করে উঠল। তন্দ্রা ভেঙে গেল। হঠাৎই মনে পড়ল দেশের কথা। বাবার কথা। মারিয়ার কথা। কোথায় বাড়ির ধপধপে সাদা পালকের নরম বিছানা আর কোথায় ও শুয়ে আছে। এবড়ো খেবড়ো পাথুরে মেঝে। পিঠের হাড়ে খোঁচা দিচ্ছে। মৃদু হাসি ফুটলো ফ্রান্সিসের মুখে। যাও সব। ও এক ঝট্‌কায় উঠে পড়ল।

আবার মশালটা নিয়ে গুহার পাথুরে দেওয়ালগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। আবার এল গুহার শেষে। সেই একটু সমতল একটা পাথরের স্তর। ও সমতল স্তরটায় একটা পাথর দিয়ে ঠুকতে লাগল। আশ্চর্য! নিরেট পাথরের আওয়াজ পাচ্ছে না। ফ্রান্সিস দেওয়ালের মতো জায়গাটায় কান চেপে ধরল। খুব মৃদু শব্দ। প্রায় ধরাই যায় না। জলের শব্দ।

ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে বিস্কোকে ডাকল। ওর চড়া গলায় ডাকের শব্দটা গুহার মধ্যে গমগম করতে লাগল। বিস্কো ছুটে ওর কাছে এল। বলল— কি ব্যাপার?'

এই জায়গাটায় কান পেতে শোনো তো -কোন শব্দ শুনতে পাও কিনা দেখতো?' বিস্কো ঐ জায়গাটায় কান চেপে পাতল। একটু পরেই ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল। চেঁচিয়ে বলে উঠল-। ফ্রান্সিস, জলের শব্দ।' ফ্রান্সিস বলল— এখানটায় পাথুরে আস্তরণটা বেশী মোটা নয়। মনে আছে মোকা বলেছিল, কিছুদিন আগে এই দ্বীপে ভূমিকম্প হয়ে গেছে। কাজেই পাথর মাটির স্তরে কিছু পরিবর্তন ঘটা আশ্চর্য নয়।' ফ্রান্সিস তারপর চেঁচিয়ে ফার্নান্দোকে ডাকল-'ফার্নান্দো, আমরা প্রায় মুক্তির দোরগোরায়।' ফার্নান্দোও ছুটে এল। কান পাতল, ওর মুখেও হাসি ফুটে উঠল। ইকাবো বন্দীরা অবাক চোখে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখল । ওরা বুঝে উঠতে পারল না এত খুশি হবার কী কারণ ঘটল ।

ফ্রান্সিস ওদের ইশারায় কাছে ডাকল। এরা উঠে ফ্রন্সিসের কাছে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস একটা ছুঁচোলো মুখ পাথর তুলে নিল। দেওয়ালের মত পাথুরে স্তরে একটা জায়গায় গোলমত দাগ দিল। ওদেরও পাথর তুলতে বলল। বড় বড় পাথরের টুকরো ওখানে এখানে পড়েছিল। ফ্রান্সিস ঐ কিছুটা সমতল দাগ দেওয়া জায়গায় পাথরের ছুঁচালো মুখ খন্ডটা দিয়ে ঘা মারতে লাগল। ওদেরও তাই করতে ইঙ্গিত করল। ওরা এবার ব্যাপারটা

বুঝতে পারল দ্রুত হাতে পাথর তুলে নিল। তারপর এলোপাথাড়ি ঘা মারতে লাগল। ফ্রান্সিস ওদের থামিয়ে দিল। দেখিয়ে দিল নির্দিষ্ট জায়গায় কী করে একজন করে পরপর ঘা মারবে। ওরা সেইভাবে ঘা মারতে লাগল। গুহাটায় সেই শব্দ প্রচন্ড জোরে প্রতিধ্বনি হতে লাগল।

ফ্রান্সিস বিস্কোকে বলল -'আগে ওরা ঘা মারতে থাকুক। ওরা পরিশ্রান্ত হলে আমরা আরম্ভ করবো।' চলল ঐ নির্দিষ্ট জায়গাটায় পাথর দিয়ে ঘা মারা। গুহাটায় শব্দ উঠতে লাগল-'দুম-দুড়ুম-।'

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ইকাবো বন্দীরা ঘা মারল। এবার ওরা হাঁপাতে লাগল। দু'জন বসে পড়ল। ফ্রান্সিস ওদের সরে যেতে বলল। ওরা বিশ্রাম করতে লাগল।

ফ্রান্সিস কাছে গিয়ে ভালো করে জায়গাটা দেখল। ঘাগুলো ঠিক এক জায়গায় পড়ে নি দু'একটা জায়গায় সামান্য গর্তমত হয়েছে। ওর মধ্যে যে জায়গাটা বেশি গর্তমত হয়েছে ও সে জায়গাটা বেছে নিল। বিস্কো আর ফার্নান্দোকে জায়গাটা দেখিয়ে বলল-'ঠিক এ জায়গাটায় ঘা মারো।

ওরা তিনজন এবার ঘা মারতে লাগল। গুহাটায় দুম দুম শব্দপ্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ একটানা ঘা মেরে ওরা ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। ঘা মারা থামিয়ে ওরা বসে পড়ল। হাঁপাতে লাগল।

ফ্রান্সিস ওপরে ফোকরটার দিকে তাকাল। দেখল ওখানে আলো কমে এসেছে। তার মানে বিকেল হয়েছে। ভাবল, আজ রাতের মধ্যেই ঐ আস্তরণটা ভাঙতে হবে। তারপর রাতের অন্ধকারে পালানো। ও এবার ইকাবোদের ইঙ্গিত করল। দেখিয়ে দিল কী করে একই জায়গায় পরপর ঘা মেরে যেতে হবে।

আবার ঘা মারা চলল। কিন্তু ঐ জায়গাটায় ফাটল দেখা দিল না।

এবার ফ্রান্সিসরা ঘা মারতে লাগল। চলল ঘা মারা। ফ্রান্সিস ফোকরটার দিকে তাকাল। অন্ধকার হয়ে গেছে। তা'হলে বাইরে এখন রাত।

পাথরের ঘা মারা চলল। দুম্ দুম্ শব্দও উঠতে লাগল।

হঠাৎ ফার্নান্দোর হাতের পাথর আস্তরণ ভেঙে ঢুকে গেল । জল ছিটকে ঢুকল । ফুটো থেকে পাথরটা খুলে নিয়ে আসতেই ফোয়ারার মতো জল ঢুকতে লাগল । ফ্রান্সিস বলল,— 'ঘা মারা থামিও না । ফাটল বড় করতে হবে ।'

ওরা ঘা মেরে চলল । ফাটল আর একটু বড় হলো । কিন্তু মানুষের শরীর বেরোবার মতো বড় হলো না ।

ফ্রান্সিস বুঝল- বৃথা চেষ্টা। এর বেশি ফাটল বড় হবে না। বাকীটুকু নিরেট। ওদিকে গুহায় জল ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিস্কো শঙ্কিত স্বরে ডাকল।-'ফ্রান্সিস?'

'বলো।'

'গুহায় জল জমছে। আমরা কী করবো?'

'এই সম্ভাবনাটা আমি আগেই ভেবে রেখেছি।' ফ্রান্সিস বলল।

'কী ভেবেছ তুমি?'

'জল বাড়বে। ডুব জল হলে আমরা ভেসে থাকবো। জল উঁচুতে উঠতে থাকবে।

আমরাও উঁচুতে উঠতে থাকবো। তারপর ঐ ফোকরে পৌঁছে যাব।'

বিস্কো আর ফার্নান্দো একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল-'ও হো হো।' বিস্কো দু'হাতেফ্রান্সিসকে জড়িয়ে বলে উঠল—'সাবাস ফ্রান্সিস।'

ওদিকে ইকাবো বন্দীরা শঙ্কিতভাবে দেখতে লাগল যে গুহায় জল জমেছে। ওরা ভয়ে পাথুরে দেয়াল বেয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু খাড়া দেয়াল। উঠবে কি করে?

ফ্রান্সিস ওদের সাঁতারের ভঙ্গি দেখাল। ওরা মাথা ঝাঁকাল। অর্থাৎ সাঁতার জানে। ওরা দ্বীপবাসী। সাঁতারে ওস্তাদ। ফ্রান্সিস তারপর আঙুল দিয়ে ওদের ওপরের ফোকরটা দেখাল। এতক্ষণে ওরা ফ্রান্সিসের পরিকল্পনাটা বুঝতে পারল। হাসি ফুটল ওদের মুখে।

গুহাটায় আস্তে-আস্তে জল বাড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁটু অব্দি জল উঠল। ওদিকে ফুটো দিয়ে প্রচণ্ড বেগে জল ঢুকছে। জলও বাড়ছে। গুহার মুখের পাথরটা এমন এঁটে বসে গেছে যে ওখান দিয়ে এক ফোঁটা জলও বেরোতে পারছে না।

সময় কাটতে লাগল । জল বাড়তে লাগল । আস্তে- আস্তে কোমর অব্দি জল উঠল। বাড়তে লাগল জল । আস্তে-আস্তে কাঁধ পর্যন্ত জল উঠল । ওরা হাতে পায়ে জল ঠেলতে -ঠেলতে ভেসে রইল ।

আরো বাড়ল জল । ওরা একই ভাবে ভেসে রইল ।

আস্তে আস্তে জলের স্তর গুহার মাথার কাছে চলে এল । মশালটা নিভে গেছে ততক্ষণে। চারিদিক অন্ধকার । শুধু ফোকরটা দিয়ে একটু আলোর আভাস ।

ফ্রান্সিস ফোকরটার কাছে এসে পায়ে ধাক্কা দিয়ে লাফিয়ে ফোকরের পাথুরে খাঁজটা ধরে ফেলল । তারপর শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ফোকরের ওপর উঠে এল । পরিশ্রমে ও হাঁপাতে লাগল । চারদিকে তাকাতে লাগল । কিন্তু অন্ধকারে কিছুই বুঝল না। ভাবল— বেরোনোর পথ পরে খোঁজা যাবে, আগে ওদের সবাইকে টেনে তুলি ।

ও ফোকরটার দু'পাশে পায়ের ভর রেখে মাথা নিচু করে ডাকল—'বিস্কো— এই দিকে।' অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না । ফ্রান্সিসের গলার শব্দ লক্ষ্য করে বিস্কো সাঁতরাতে সাঁতরাতে এগিয়ে এল । হাত বাড়াল । ফ্রান্সিস ওর বাড়ানো হাতটা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ওকে ওপরে তুলে নিল । বিস্কো বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল । ফ্রান্সিস এবার চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকতে লাগল । ওর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে সবাই অন্ধকারে সাঁতরাতে-সাঁতরাতে ওর কাছে এল । ও একে-একে সবাইকে তুলে নিল ।

এবার বেরোবার পথ খোঁজা । ওরা সকলেই তখন ভীষণ পরিশ্রান্ত । কিন্তু ফ্রান্সিস ওদের বিশ্রাম করতে দিল না । চেঁচিয়ে বলল—'এক মুহূর্তও আর দেরি করা চলবে না । রাত থাকতে থাকতেই আমাদের পালাতে হবে।'

ফ্রান্সিস সবার আগে - আগে পায়ে-পায়ে এগোল । দেখল এ জায়গাটাও একটা গুহা মতো । কিছুটা এগোতেই সামনে দেখল যেন একটা অর্ধগোলাকার পর্দা ঝুলছে । তাতে তারা জ্বলছে । আকাশ। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল - 'আমার পেছনে - পেছনে এসো। সামনেই গুহার মুখ ।'

একটু পরেই গুহাটার মুখে এসে দাঁড়াল সবাই । সামনেই দূরবিস্তৃত আকাশ । বেশ উজ্জ্বল চাঁদ । নরম জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে চারদিকে — উপত্যকায়, বসতিতে, বনে ।

ফ্রান্সিস ইকাবো বন্দীদের আঙুল দিয়ে দূরের বন দেখাল । ইঙ্গিত করল — ওখান দিয়ে আমরা পালাব । বন্দীরা মাথা ঝাঁকাল । মানে - বুঝেছে ।

পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে ঢালু জমি। ফ্রান্সিস দক্ষিণ দিকে চলল। ম্লান জ্যোৎস্না পড়েছে উপত্যকায়, ঘাসের ঢালু জমিতে, পাথরে। সেই অলোয় ওরা দ্রুত ছুটতে লাগল বনের দিকে।

ওরা দূর থেকে দেখল বনের ধারে আগুন জ্বলছে। আগুন ঘিরে ত্রিস্তান যোদ্ধারা বসে হৈ হল্লা করছে।

দূর থেকে ফ্রান্সিস দেখে আশ্চর্য হলো দ্বীপের বিচিত্র সব পাখি সেই আগুনের কাছে উড়ে - উড়ে আসছে। ত্রিস্তান যোদ্ধারা গাছের ডাল দিয়ে গিয়ে পাখি মারছে আর আগুনে পুড়িয়ে খাচ্ছে। আশ্চর্য। মৃত্যু জেনেও পাখির ঝাঁক উড়ে - উড়ে আসছে। ঐ দলের পেছনে বিরাট একটা পাথরের চাঁই। সেটার আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গিয়ে ওরা বনে ঢুকে পড়ল।

আর চাঁদের আলো নেই। অন্ধকারেই ছুটতে হচ্ছে ওদের। বনের নীচে ভাঙা - ভাঙা জ্যোৎস্না পড়েছে কোথাও কোথাও। ফ্রান্সিস হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ও সবার আগে আগে যাচ্ছিল। ওকে থামতে দেখে সবাই থেমে পড়ল। ফ্রান্সিস বলল — 'বিস্কো, আমরা সামনে যাবো না। ইকাবোদের আগে-আগে ছুটতে দাও। ওরা সহজেই পাতা ফাঁদ দেখে বুঝতে পারবে। তখন সকলেই সাবধান হতে পারব।' বিস্কো বলল, 'ঠিক বলেছো।' ও ইকাবোদের কাছে কাছে ডাকল। তারপর ইঙ্গিতে অঙ্গভঙ্গী করে ফাঁদের ব্যাপারটা বোঝাল। বিস্কো কী বলছে সেটা ওরা বুঝল। ওদের মধ্যে একজন বুকে আঙুল ঠুকে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে ধরল। তার মানে ওরা আগে যাবে।

এবার ইকাবোরা আগে আগে চলল। চলার গতি কমিয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে ওরা চলল। ফ্রান্সিসরা ওদের পেছনে পেছনে যেতে লাগল।

হঠাৎ নিস্তব্ধ বনে একসঙ্গে কয়েকটা পাখি বিচিত্র সুরে শিস দিয়ে ডেকে উঠল। সঙ্গে -সঙ্গে ইকাবোরা দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন ইকাবো মাটিতে উবু হয়ে বসে পড়ল। তারপর পাখির মতো শিস দিল। শিসের শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। হঠাৎ বনের অন্ধকার থেকে তিনজন ইকাবো ওদের সামনে এসে দাড়াল। ইকাবোরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। মৃদুস্বরে কথা বলতে লাগল। এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস ওদের কাছে গিয়ে ছোটার ইঙ্গিত করল। যারা বনের আড়াল থেকে বেরিয়েছিল তারা আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ফ্রান্সিস বুঝল ইকাবোরা পাখির মতো শিস দিয়ে পরস্পরকে সঙ্কেত দিতে পারে।

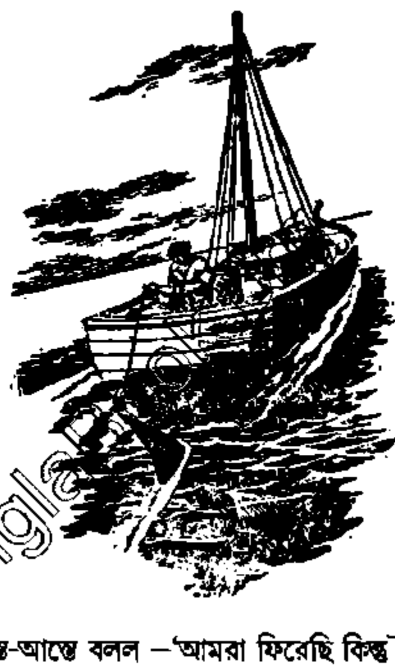
আবার ওরা চলতে লাগল। এত সাবধানতা সত্ত্বেও একজন ইকাবো লতার ফাঁদে আটকে গেল। এক ঝটকায় সে উঠে গেল ওপরে। মাথা নীচে ঝুলতে লাগল। আর একজন ইকাবো দ্রুত গাছের কাণ্ড বেয়ে উঠে গেল। যে ডাল থেকে ফাঁদটা ঝুলছিল সেই ডালটা ধরে ঝুঁকে ঝুলন্ত লতাটা কামড়াতে লাগল। একটু পরেই লতাটা ছিঁড়ে গেল। ফাঁদে আটকানো ইকাবোটিও মাটিতে পড়ে গেল।

আবার চলা শুরু হলো। কিছুদূর যেতেই একটা ঝর্ণার কাছে এল ওরা। ফ্রান্সিস সবাইকে থামতে ইঙ্গিত করল। আঁজলায় জল ভরে ও জল খেতে লাগল। একে একে সবাই জল খেল। বিস্কো বলল—' এই ঝর্ণা থেকেই জল নিয়ে ফিরছিলাম আমরা।"

'তাহলে কাছেই জলের পিপে দুটো আছে। ও দু'টো পেলে আমরা জল ভরে নিয়ে যাব!"

ওরা চলল। কিছুটা এগোতেই জ্যোৎস্নার ভাঙা আলোয় দেখল পিপে দুটো পড়ে আছে। একটায় জলভরা আছে। অন্যটা কাত হয়ে পড়ে আছে। ফ্রান্সিস, বিস্কো আর ফার্নান্দো পিপেটা নিয়ে ঝর্ণার দিকে ফিরে গেল। একটু পরেই জলভর্তি পিপেটা নিয়ে ফিরল। ওরা একটা পিপে আর ইকাবোরা অন্য পিপেটা নিয়ে চলতে শুরু করল। ফ্রান্সিস এদিক-ওদিক নজর রেখে চলল— যদি হারানো তরোয়ালটা পাওয়া যায়। কিন্তু নজরে পড়লো না। মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর।

বনের মধ্যে ত্রিস্তানদের ফাঁদ এড়িয়ে ওরা যখন সমুদ্রের ধারে পৌঁছল তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। ওদের ভাগ্য ভাল দেখল তিনটি নৌকাই গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা আছে। গাছের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল বলেই নৌকাগুলো ত্রিস্তানদের নজরে পড়েনি। নৌকায় কাঠের বৈঠাও রয়েছে। ওরা ধরাধরি করে পিপে দু'টো একটা নৌকায় তুলল। সেটাতে রইল বিস্কো। ফ্রান্সিস এবার ইকাবোদের ইঙ্গিত করল ওদের সঙ্গে যাবার জন্য। কিন্তু ওরা মাথা ঝাঁকাল। আঙুল দিয়ে বনটা দেখাল। অর্থাৎ ওরা বনে ফিরে যাবে। ফ্রান্সিস ওদের সঙ্গে হাত মেলাল। তারপর একটা নৌকায় গিয়ে উঠল। অন্যটায় উঠল ফার্নান্দো। নৌকা ছেড়ে দিল। একটা পাক খেয়ে নৌকো ঢেউয়ের ওপর নাচতে- নাচতে চলল। ফ্রান্সিস পেছনে তাকিয়ে আর ইকাবোদের দেখতে পেল না। ওরা বনের মধ্যে চলে গেছে।



ফ্রান্সিসরা যখন জাহাজের গায়ে এসে নৌকা লাগাল তখন ভোর হয়ে এসেছে। জাহাজের রেলিং থেকে ঝুঁকে হ্যারি ডাকল 'ফ্রান্সিস? 'ফ্রান্সিস উত্তর দিল 'হ্যারি'। তখনই জাহাজে হ্যারির ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি সুরু হয়ে গেল। অনেকেই ঘুম থেকে উঠে রেলিঙ দিয়ে ঝুঁকে ফ্রান্সিসদের দিকে দড়ি ছুঁড়ে দিল। ফ্রান্সিসরা দড়ি চেপে ধরে রইল। ভাইকিংরা ওদের টেনে টেনে তুলল। একটু পরে কয়েকজন নেমে এসে জলের পিপে দুটোও দড়ি বেঁধে জাহাজে তুলল।

নিজের কেবিনঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখে হাত চাপা দিল। হ্যারি বলল—'তুমি খুব পরিশ্রান্ত। বিশ্রাম কর - পরে আসবো।'

ফ্রান্সিস চোখ থেকে হাত সরাল। আস্তে-আস্তে বলল —'আমরা ফিরেছি কিন্তু বাকী দু'জনের কোনো খোঁজ পাইনি।"

'ওদের কি হত্যা করা হয়েছে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে ত্রিস্তান সেনাপতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর লোক। হয়তো মেরেই ফেলেছে ওদের।'

হ্যারি কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল। তারপর যখন কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন ফ্রান্সিস বলল — 'বৈদ্যকে একটু পাঠিয়ে দাও তো। বাঁ পা'টা ছড়ে

গেছে। সমুদ্রের নোনা জল লেগে জ্বালাটা বেড়ে গেছে। ঘুমোতে পারব 'না।'

'পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঘুমোবার চেষ্টা কর। পরে সব শুনবো।' হ্যারি চলে গেল।

হ্যারির মুখেই ভাইকিংরা ওদের দুই বন্ধুর নিখোঁজ হয়ে যাবার খবর পেল। বন্ধু দু'জনের জন্যে ওদের ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। ওরা ধরেই নিল বন্ধু দু'জন বেঁচে নেই।

সেদিন ফ্রান্সিস আর কেবিনঘর থেকে বেরোলো না। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিল। পরের দিন বাইরে এল। ডেক-এ ঘুরে বেড়াল। সবসময়ই ভাবতে লাগল এরপর কী করবো?

একদিন পরে। সেদিন রাতে ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারী করছিল। হ্যারি এল। ফ্রান্সিস বিস্কোদের নিয়ে পালাবার কাহিনী হ্যারি শুনছিল। ও কাছে আসতে ফ্রান্সিস বলল--'হ্যারি একটা বুদ্ধি দাও।'

'কী ব্যাপার?' হ্যারি জানতে চাইল।

'এখন কি করবো?'

'মনে হয় রাজপুত্র মোকার সঙ্গে আগে কথা বল। ও কী বলে শোনা যাক।'

তখন দু'জন ভাইকিং হালের কাছে শুয়ে ছিল। হ্যারি তাদেরই একজনকে পাঠাল মোকাকে নিয়ে আসতে।

একটু পরেই মোকা এল। ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়াল। ও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ফ্রান্সিস বলল—'মোকা—কঙ্কাল দ্বীপে আমাদের বন্দী হওয়া, পালানো সব কথাই তোমাকে বলেছি।' একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল— 'সত্যি কথা বলি এবার। মোকা— আমরা এবার রূপোর নদী খুঁজে বের করতেই এখানে এসেছি।'

মোকা চুপ করে কোনো কথা না বলে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস বলল— কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কঙ্কাল দ্বীপ এখন ত্রিস্তানদের দখলে। কাজেই রূপোর নদীর খোঁজ করা এখন অসম্ভব।

মোকা বলল — 'ত্রিস্তানরা ভীষণ হিংস্র। আমাদের ওপর চরম অত্যাচার করেছে। যদি আপনারা আমাদের সাহায্য করেন তবে আমরা কঙ্কাল দ্বীপ থেকে তাদের তাড়িয়ে দিতে পারব।'

'আচ্ছা' যদি আমরা নদী খুঁজে বের করতে পারি নিশ্চয়ই অনেক রূপো পাবো। সেসব কি আমরা নিয়ে যেতে পারবো?

মোকা কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে ভাবতে লাগল। তারপর মাথা তুলে বলল—'এসব নির্ভর করছে কতটা রূপো আপনারা পাবেন তার ওপর। আপনারা বাবার আর আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এজন্যেই আমরা আপনাদের কাছে ঋণী। এরপরে যদি ত্রিস্তানদের পরাজিত করতে আমাদের সাহায্য করেন তা'হলে আমাদের কৃতজ্ঞতা আরো বাড়বে। তখন আপনারা যদি রূপো চান মানে যতটা পারেন ততটাই চান তা'হলেও আমরা তো না করতে পারবো না।'

'না মোকা।' তোমাদের অসন্তুষ্ট করে আমরা কিছু নেব না।'

'বেশ।' মোকা বলল।

'দেখ মোকা —ত্রিস্তানরা আমাদের দু'জন বন্ধুকে বন্দী করেছে। তারা বেঁচে আছে, কি তাদের মেরে ফেলা হয়েছে এখনও জানি না। যদি ত্রিস্তানরা ওদের মেরে থাকে তা'

হলে একজন ত্রিস্তানকে আমরা ফিরে যেতে দেব না। যদি না মেরে থাকে এবং ওদের জাহাজে ফিরে আসতে দেয় তা'হলে যে অন্যায়ভাবে ত্রিস্তানদের কোন ক্ষতি আমরা করবো না। তোমাদের সমস্যা তোমরাই মেটাবে।'

মোকা মাথা নীচু করে কি ভাবল। তারপর বলল— আমি নিশ্চিত যে ত্রিস্তানরা ওদের মেরে ফেলেছে। যদি না মেরে থাকে তা'হলে নিশ্চয়ই সেনাপতি কোন চাল চেলেছে। তবে এটা সত্যি, ওদের বেঁচে থাকার কোনো আশা নেই।

'আমারাও সেই কথাই ভাবছি।' ফ্রান্সিস বলল।

'এখন কী করবেন ভাবছেন?' মোকা জানতে চাইল।

'দু'একটা দিন যাক। এর মধ্যে ওরা না ফিরলে ওদের মুক্ত করতে আমরা ত্রিস্তানদের আক্রমণ করবো।'

'বেশ।' মোকা আর কিছু বলল না। চলে গেল।

পরদিন রাত্রে ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করছে। একা। হ্যারি আসেনি তখনও।

হঠাৎ কঙ্কাল দ্বীপের দিকে চোখ পড়তে ফ্রান্সিস চমকেউঠল। কঙ্কাল দ্বীপের বনে আগুনের লাল আভা। বোঝা যাচ্ছে সে আগুন ছড়াচ্ছে। আকাশে চাঁদ অনেকটা উজ্জ্বল। সেই বন থেকে জ্যোৎস্নায় আলোকিত আকাশে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। ফ্রান্সিস দ্রুত কেবিন ঘরের দিকে ছুটল। হ্যারিকে ডেকে নিয়ে এল। হ্যারি সেই আগুনের দিকে তাকিয়ে বলল — 'এ আগুন হঠাৎ লাগেনি। ত্রিস্তানরা লাগিয়েছে। তুমি বলেছিলে বনে আত্মগোপনকারী কয়েকজন ইকাবোকে তুমি দেখেছো। আরো অনেক ইকাবো নিশ্চয়ই ঐ বনে আত্মগোপন করে আছে। এই আগুন লাগানোর উদ্দেশ্য হলো ওদের পুড়িয়ে মারা।

ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে ছুটোছুটি করতে দেখে ডেকের ওপর শুয়ে-থাকা কয়েকজন ভাইকিং-এর ঘুম ভেঙে গেল। ওরা উঠে এসে ফ্রান্সিসের কাছে দাঁড়াল। আগুন দেখল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ভাইকিংরা জানতে পারল কঙ্কাল দ্বীপে আগুন লেগেছে। সবাই ডেক-এ এসে জড়ো হলো। রাজপুত্র মোকাও এল। আগুন দেখে ও পাগলের মত ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। ফ্রান্সিসের হাত দুটি ধরে কাঁদো- কাঁদো স্বরে ও বলে উঠল—' আপনারা ইকাবোদের বাঁচান '

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল — 'দেখ মোকা— ওরা যদি সাঁতরে এসে জাহাজে আশ্রয় নেয় আমরা ওদের আশ্রয় দেব, খাদ্য দেব। কিন্তু ওদের জন্য এগিয়ে গেলে আমরা ত্রিস্তানদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবো। এটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না।'

'কি বলছো ফ্রান্সিস— হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল'— 'চোখের সামনে লোকগুলো পুড়ে মরবে আর আমরা বসে থাকবো?'

'ভুলে যেও না হ্যারি আমাদের দুজন বন্ধু এখনও ত্রিস্তানদের হাতে বন্দী।'

'ঠিক। কিন্তু তুমি এখন জানো না ওরা বেঁচে আছে না হত্যা করা হয়েছে।'

'কিন্তু'—.

'কোনো কিন্তু নয় ফ্রান্সিস। ভালো করে তাকিয়ে দেখ, জ্বলন্ত বনের আগুনের আলোয় দেখ— ত্রিস্তানদের ক্যানো নৌকাগুলো ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইকাবোরা সাঁতরে এসেও প্রাণ বাঁচাতে পারবে না।'

ফ্রান্সিস কঙ্কাল দ্বীপের দিকে তাকাল। আগুনের আভায় আর উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায়

দেখল কয়েকটা ক্যানো নৌকা ঐ বনের কাছে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফ্রান্সিস সব ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকাল। চেঁচিয়ে বলল— 'একদল দাঁড়ঘরে চলে যাও। জাহাজ দ্বীপের দিকে নিয়ে চল। আর একদল অস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে এস। পাঁচটা নৌকাই জলে ভাসাও।' একটু থেমে ডাকলো — 'শাঙ্কো'

শাঙ্কো এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল— 'তুমি তীর ধনুক নিয়ে আমার নৌকোয় চলো।' মোকা এগিয়ে এল। বলল— 'আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।'

'বেশ'— ফ্রান্সিস বলল। দাঁড় বাওয়া শুরু হলো। জাহাজ আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল কঙ্কাল দ্বীপের দিকে।

দ্বীপের কাছাকাছি এসে জাহাজ থামানো হলো। হ্যারির অনুমানই ঠিক। যেসব ইকাবোরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে পালাতে চাইছে, ত্রিস্তানরা ক্যানো নৌকো থেকে তাদের বুকে পিঠে কাঠের বর্শা বিঁধিয়ে দিচ্ছে।

পাঁচটা নৌকোই জলে নামানো হলো। তরোয়াল, বল্লম হাতে ভাইকিংরা ত্রিস্তানদের ক্যানোগুলো লক্ষ্য করে এগোতে লাগল।

একেবারে সামনের নৌকোটায় ফ্রান্সিস, মোকা আর শাঙ্কো। ক্যানোগুলোর কাছাকাছি এসে ফ্রান্সিস বলল—'শাঙ্কো—বর্শা হাতে ক্যানোয় দাঁড়ানো ত্রিস্তানদের মারো। নৌকো দুলছে। নিখুঁত নিশানা নিয়ে মারবে। তীর যেন বাজে খরচ না হয়।' নৌকোগুলো এগিয়ে চলল।



তখনই মোকা নৌকোয় উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত গোল করে মুখের কাছে এনে তীক্ষ্ণ সুরে শিস দিতে লাগল। ও থামলেই বনের দিক থেকেও অমনি শিসের শব্দ ভেসে এল। বেশ কয়েকবার মোকা শিস দিল। বনের দিক থেকেও শিসের শব্দ ভেসে এল। মোকা নৌকোয় বসে পড়ল। বলল—'ফ্রান্সিস—আমার সঙ্কেত ওরা পেয়েছে। সঙ্কেতে বলেছি আমি আর বাবা বেঁচে আছি। ওরা যেন সাঁতরে জাহাজে আশ্রয় নেয় জাহাজের লোকেরা আমাদের বন্ধু।'

ওদিকে ভাইকিংরা তরোয়াল বল্লম হাতে ত্রিস্তানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। নৌকো আর ক্যানোর ওপর লড়াই শুরু হলো ত্রিস্তানদের সঙ্গে।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের নির্দেশে ত্রিস্তানদের লক্ষ্য করে নিখুত নিশানায় তীর ছুঁড়তে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ কিছু ত্রিস্তান যোদ্ধা মারা পড়ল। আরোহীহীন ত্রিস্তানদের ক্যানোগুলো এখানে-ওখানে ঢেউয়ে দোল খেতে লাগল। সেগুলোতে সাঁতরে এসে ইকাবোরা উঠতে লাগল।

বেগতিক বুঝে ত্রিস্তানরা ক্যানো নিয়ে পালাতে লাগল। আধঘন্টার মধ্যে ত্রিস্তানরা

বেশ কিছু মরল, বাকিরা প্রাণভয়ে পালাল ক্যানোয় চড়ে।

মোকা নৌকোয় উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ইকাবোদের ভাষায় কী বলতে লাগল। ইকাবোরা সাঁতরে চলল জাহাজে। কেউ-কেউ ভাইকিংদের নৌকোয় উঠে পড়ল। মোকা একবারে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে একজন আহত ইকাবোকে নৌকোয় নিয়ে এল।

ফ্রান্সিস দেখল বনের আগুন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। তবে আকাশে এখনো কালো ধোঁয়া উঠছে। ও নৌকোয় উঠে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল—'ভাইসব—জাহাজে ফিরে চল।'

সব ভাইকিংরা চেঁচিয়ে উঠল—'ও-হো-হো। জাহাজেও শোনা গেল প্রতিধ্বনির মতো—ও-হো -হো।

আস্তে-আস্তে নৌকোগুলো জাহাজের দিকে ফিরে যেতে লাগল।

সব ইকাবোদের জাহাজে আশ্রয় দেওয়া হলো। অনেক ইকাবোদের গা-হাত-পা পুড়ে গিয়েছিল। ভাইকিংরা কয়েকজন আহত হয়েছিল। জাহাজের বৈদ্য তাদের চিকিৎসার ভার নিল।

এসব তদারকি করতে হলো হ্যারিকে। ফ্রান্সিস নিজের কেবিনে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ও।

একটু বেলায় ওর ঘুম ভাঙল। সকালের খাবার খেয়ে ও ডেক-এ উঠে এল। দেখল আহতরা এখানে-ওখানে শুয়ে আছে কম্বল পেতে। হ্যারি সব দেখাশুনো করছে।

একপাশে দেখল মোকা বসে আছে। ওর পেছনে রেলিঙে রোদে শুকোচ্ছে রাজার সেই গায়ের কাপড়টা। মোকা চড়া রোদের মধ্যে বসে আছে। ফ্রান্সিস বলল—'মোকা, তুমি ছায়ায় গিয়ে বসো।'

মোকা রাজার গায়ের কাপড়টা আঙুল দিয়ে দেখাল।

'ওটা তো তোমার বাবার গায়ে থাকে। ভিজল কী করে?'

'কাল রাত্রে ওটা গায়ে দিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম। একজন আহত ইকাবোকে বাঁচাতে জলে নেমেছিলাম। তাই ভিজে গিয়েছিল। এই কাপড়ের নাম কোহালহো।'

'ঠিক আছে, ওটা শুকোক — তুমি ছায়ায় গিয়ে বসো।' মোকা মাথা নাড়ল। বলল—'ঐ কোহালহো গিয়ানির মন্ত্রপূত। আমাদের রাজবংশে বহুকাল ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কোনোমতেই ঐ কোহালহো আমরা কাছছাড়া করি না। আমাকে এ রোদেই বসে থাকতে হবে।'

ফ্রান্সিস কাপড়টাকে একটা সাধারণ গায়ে দেবার কাপড় ভেবেছিল। বলল—'কাল রাতে তুমি ওটা গায়ে দিয়েছিলে কেন?'

'আমাদের নিয়ম রাজবংশের যে যুদ্ধে যাবে তাকেই এই পবিত্র কোহালহো গায়ে দিয়ে যেতে হবে। কালকে আমি গিয়েছিলাম, তাই যুদ্ধে জয় হয়েছে।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—'তাহলে ব্রিস্তানদের সঙ্গে যুদ্ধে তোমরা হেরে গেলে কেন?'

'ওরা হঠাৎ আক্রমণ করেছিল। বাবা পবিত্র কোহালহো গায়ে দিয়ে বেরোবার আগেই বন্দী হন।'

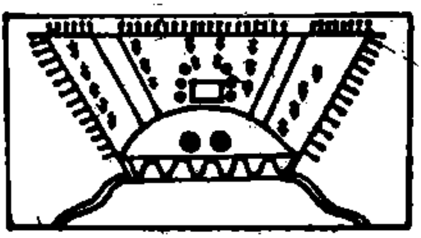
'হুঁ।'

ফ্রান্সিস একটু কৌতূহলী হলো। রেলিঙে মেলে দেওয়া কোহালহোটা দেখতে লাগল। নারকেলের আঁশ থেকে তৈরী মোটা কাপড়। তা'তে ছবির মতো কিছু নক্সা আঁকা। রাজামশাই

কোহালহো ভাঁজ করে গায়ে দেয়। তাই নক্সা বোঝা যায়নি। এখন ভাঁজ খুলে মেলে দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্সিস কাছে গিয়ে ভালো করে দেখল কাপড়টা। ওটাতে কিছু ছবির মতো নক্সা আঁকা। তিনটি রঙ তাতে। সাদা, গেরুয়া আর সবুজ।

নক্সা ছবিটা দেখতে একরকম—

ফ্রান্সিস নক্সা ছবিটা দেখল। অতীতের কঙ্কাল দ্বীপের কোনো আদিবাসী ইকাবো এঁকেছে। আনাড়ির হাতে আঁকা নক্সা। বোঝাই যাচ্ছে কাপড়টাই বহুদিনের পুরোনো। রঙ নক্সা সবই অস্পষ্ট। যেদিকে ওটা ভাঁজ করা থাকে সেদিকের রঙ অনেকটা স্পষ্ট।



একটু বেলা হয়েছে তখন। হঠাৎ বিস্কো ছুটতে-ছুটতে ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরে এল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল—'ফ্রান্সিস, শিগগির এসো। ব্রিস্তানরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে।'

ফ্রান্সিস সঙ্গে-সঙ্গে ছুটল ডেক-এর সিঁড়ির দিকে। ছুটে ডেক-এর রেলিঙে এসে দাঁড়াল। দেখল, কঙ্কাল দ্বীপ থেকে অনেকগুলো ক্যানো নৌকো ওদের জাহাজের দিকে আসছে। দু'দিক দু'সার ক্যানো নৌকো। মাঝখানে দু'টো নৌকো একটা কাঠের পাটাতন দিয়ে বাঁধা। তার ওপর কাঠের সিংহাসনটা পাতা সেনাপতি বসে আছে। সেনাপতির হাতে তরোয়াল। তার পেছনে দুটি ব্রিস্তান যোদ্ধার হাতেও তরোয়াল। ফ্রান্সিস বুঝল ওদের ফেলে-আসা তরোয়াল ওরা পেয়েছে।

সেনাপতির নৌকো দুটোর পেছনে একটা ক্যানো নৌকো। এখানে ভাইকিং এর পোষাক পরা কারা দু'জন বসে আছে? ফ্রান্সিস চমকে উঠল—একি! ওদেরই দু'জন বন্ধু। একটু কাছে আসতেই বোঝা গেল দু'জনেরই হাত-পা বাঁধা। দুই বন্ধুকে দেখে জাহাজের ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল—'ও-হো-হো—।' দূর থেকে বোঝা গেল দুই বন্দী বন্ধু ম্লান হাসল। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে ওরা। যাক, বেঁচে আছে। ফ্রান্সিস এতেই খুশী হলো। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারল্ না—সেনাপতির মতলবটা কী?

জাহাজের কাছাকাছি এসে সব ক্যানো নৌকো থেমে গেল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—'হ্যারি।' হ্যারি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—'ওদের মতলবটা ঠিক বুঝছি না। সবাইকে বলো তৈরী হতে। অস্ত্রঘর থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনে ডেক-এ রাখো। কিন্তু ওরা যেন টের না পায়।'

ফ্রান্সিসের নির্দেশমত সবাই তৈরী হলো। ডেক-এ রাখা হলো অস্ত্রশস্ত্র।

একটা ক্যানো নৌকো এগিয়ে এল। দেখা গেল তা'তে দাঁড়িয়ে আছে অল্প অল্প স্প্যানিশ ভাষা জানে সেই বৃদ্ধটি। ক্যানো নৌকোটা জাহাজের খুব কাছে এল। বৃদ্ধটি চেঁচিয়ে বলল—'যুদ্ধ নয়—বিনিময়—এসেছি।'

'কীসের বিনিময়?' ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'সংবাদ—রাজা, রাজপুত্র মোকা—জীবিত—জাহাজে।'

'কী করে বুঝ[illegible]?'

'কাল রাত্রে—মোকা—যুদ্ধ—শিস দিয়ে নির্দেশ—। তা[illegible] রাজাও [illegible]ত—

জাহাজে।'

বিস্কো চেঁচিয়ে বলল—'রাজা, রাজপুত্র কেউ আমাদের জাহাজে নেই।'

বৃদ্ধ দোভাষীটি সেনাপতিকে সে কথা বলল বোধহয়। সেনাপতি কী বলল। বৃদ্ধটি চেঁচিয়ে বলল— 'সেনাপতি বলেছেন— মিথ্যে বললে — চোখের সামনে বন্দী দু'জন— হত্যা।'

ফ্রান্সিস এবার বিনিময় কথাটার অর্থ বুঝল। বলল— ' বেশ — রাজা আর রাজপুত্র জীবিত। আমাদের জাহাজে আছে।'

'তা' হলে' — বৃদ্ধ দোভাষী বলল—'রাজা- রাজপুত্রকে দিন— দু'জন বন্দী নিয়ে যান।'

ফ্রান্সিস দ্রুত ভাবতে লাগল— এই সুযোগ। জীবিত অবস্থায় বন্ধু দু'টিকে ফিরে পেতে গেলে বুদ্ধি খাটাতে হবে। বলল— 'বেশ আমরা রাজি। কিন্তু কথা দিন রাজা ও রাজপুত্রকে আপনারা প্রাণে মারবেন না।'

কথাটা বৃদ্ধ সেনাপতিকে বলল। সেনাপতি উত্তরে কী বলল। বৃদ্ধ বলল— ' সেনাপতি বলেছেন — আমাদের ব্যাপার— আপনারা বিদেশী— কোনো কথা নেই।'

' বেশ — রাজপুত্রের সঙ্গে কথা বলি। তারপর বলছি।' আসলে ফ্রান্সিস ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা ভাবছিল। একটু সময় চাই যার জন্যে।

ফ্রান্সিস ভাবতে ভাবতে মাথা নীচু করে কয়েকবার পায়চারি করল ডেক-এর ওপর। হ্যারি কাছেই ছিল। পায়চারি থামিয়ে বলল —'হ্যারি— উপায় বাতলাও।'

'রাজা আর রাজপুত্রকে পেলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলবে।'

'এ তো জলের মতো পরিষ্কার।'

'ওদের হাত থেকে বন্ধুদের উদ্ধার করতে হবে আবার রাজা–রাজপুত্রকেও বাঁচাতে হবে।'

'কিন্তু কী করে।'

'আমি একটা উপায় ভেবেছি।'

'হুঁ'। বলো।'

'পরিকল্পনাটা এ'রকম— জাহাজ থেকে দু'টো দড়ি ঝুলবে।'

'বেশ।'

'একটা দড়ি বেয়ে আমাদের এক বন্ধু জাহাজে উঠে আসবে। অন্য দড়িতে রাজাকে নামিয়ে দেওয়া হবে। তারপর অন্য বন্ধু আর রাজপুত্র।'

'বুঝলাম। তা রপর?'

'রাজা আর রাজপুত্র নৌকায় নেমে ওরা কিছু বোঝার আগেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাছেই জাহাজ, ডুব সাঁতার দিয়ে জাহাজ পেরিয়ে ওপাশে ভেসে উঠবে। ওরা রাজা আর রাজপুত্রকে আক্রমণ করার আগেই আমরা ওদের জাহাজে তুলে নেব।''

'সাবাস হ্যারি।' ফ্রান্সিস হেসে হ্যারির কাঁধে এক চাপড় মারল। তারপর দু'জনে চলল রাজা আর রাজপুত্রের কেবিনের দিকে। কেবিনে ঢুকে দেখল রাজা মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে আছে। রাজপুত্র শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল ওদের দিকে। চোখে মুখে মৃত্যুভীতি। ফ্রান্সিস ওর কাঁধে হাত রাখল। বলল—'বিপদের সময় সাহস হারাতে নেই।' তারপর আস্তে আস্তে সমস্ত পরিকল্পনাটা বলল। মোকার মুখচোখ উজ্জ্বল হলো। ফ্রান্সিস বলল—

কিছছু ভয় পেও না। আমরা আছি। এছাড়া আমাদের বন্ধুদের বাঁচাবার অন্য কোনো পথ নেই। এখন তোমার বাবাকে সব বুঝিয়ে বলো। ডুব সাঁতার দিয়ে জাহাজ পেরোতে পারবেন কিনা বলে দেখ।'

মোকা রাজামশাইকে সব বুঝিয়ে বলল। রাজামশাই সব শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে কি সব বলে গেল। মোকা বলল—'বাবা বলছেন—আপনাদের পরিকল্পনা খুব সুন্দর হয়েছে। উনি ডুব সাঁতার দিয়ে জাহাজ পেরোতে পারবেন।'

এ সময় রাজামশাই মোকাকে কিছুক্ষণ ধরে কী বললেন। মোকা বলল—'বাবা বলছেন ভবিষ্যৎ কী ঘটবে জানা নেই—কাজেই উনি আমাকে কোহালহো পরিয়ে অভিষেক করতে চান। জাহাজে তো অনেক ইকাবো আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সামনেই তিনি এই অনুষ্ঠান করবেন।'

'বেশ—'

ফ্রান্সিস বলল—'তোমার বাবাকে ডেক-এ নিয়ে চলো।'

ওরা সবাই ডেকে-এসে দাঁড়াল।

যে সব আহত, আগুনে-পোড়া এবং সুস্থ ইকাবোরা জাহাজে আশ্রয় নিয়েছিল তারা রাজাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। দু'হাত সোজা ওপরে তুলে মাথা নীচু করে রাজাকে অভিনন্দন জানাল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

রাজা সকলের দিকে একবার তাকিয়ে ইকাবোদের ভাষায় কিছুক্ষণ বলে গেলেন। তারপর নিজের গায়ের কোহালহো মোকার গায়ে পরিয়ে দিলেন। গলায় নারকেলের দড়িটা ফিতের মতো বেঁধে দিলেন।

মোকা রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। উপস্থিত ইকাবোরা খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠল। জাহাজের রেলিঙে ঝুঁকে একজন ইকাবো কিছুক্ষণ ধরে নানা সুরে শিস দিল। বোধহয় সাঙ্কেতিক শিস দিয়ে ও কঙ্কাল দ্বীপের ইকাবোদের এই সংবাদ জানাল।

ওদিকে সেনাপতি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। ফ্রান্সিস এত দেরি করছে কেন? ফ্রান্সিস সেটা বুঝতে পারল। এবার ও রেলিঙের ধারে এগিয়ে এল। ও দোভাষী বৃদ্ধকে কীভাবে কেমন করে বন্দীদের জাহাজে তোলা হবে—রাজা আর রাজপুত্রকে নামানো হবে, সব বুঝিয়ে বলতে লাগল।

আর হ্যারি ওদিকে জাহাজের ওপাশে শক্ত কাছি ঝুলিয়ে দিল। সবাইকে তৈরী থাকতে বলল।

ফ্রান্সিসের কথা দোভাষী সেনাপতিকে বুঝিয়ে বলল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সেনাপতি। ফ্রান্সিস সেনাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সেনাপতির সম্মতির ওপর সব নির্ভর করছে। একটু পরে সেনাপতি কী যেন বললেন। দোভাষী বলল—'সেনাপতি রাজী হয়েছেন। তবে ওঠা-নামার দড়ি থাকবে পাশাপাশি।'

'বেশ।' ফ্রান্সিস বলল। ওদিকে সেনাপতির একজন দেহরক্ষী হাতের তরোয়াল দিয়ে ভাইকিং বন্দীদের হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিল।

ফ্রান্সিস তখনই শাঙ্কোকে ইশারায় ডাকল। ও কাছে আসতে ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—'আমার কাছে থাকো। আমার কথামত তীর ছুঁড়বে। নিশানা যেন নিখুঁত হয়।'

শাঙ্কো তীর-ধনুক নিয়ে ফ্রান্সিসের আড়ালে এসে দাঁড়াল।

বন্দী দু'জন ভাইকিংদের নিয়ে ক্যানো নৌকোটা একজন ত্রিস্তান যোদ্ধা জাহাজের

গায়ে এসে লাগল।

কাছিতে ফাঁসমত পরিয়ে, তাতে রাজাকে বসিয়ে নামিয়ে দেওয়া হলো আস্তে আস্তে ক্যানো নৌকোর ওপর। অন্য কাছি ধরে বন্দী ভাইকিংটি জাহাজে উঠে এল। জাহাজে নামতেই কয়েকজন ভাইকিং ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল।

এবার রাজপুত্র মোকা। দ্বিতীয় ভাইকিং বন্ধুটিকে তোলা হতে লাগল জাহাজে। ও জাহাজে উঠল। সবাই ওকে ঘিরে ধরল।

মোকা নামতে লাগল। ফ্রান্সিস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেনাপতির দিকে। সে কোনো ইঙ্গিত করে কিনা। দেখল, সেনাপতি চুপ করেই বসে আছে। রাজা ও রাজপুত্র দু'জনেই তো এখন তার হাতের মুঠোয়।

মোকা ক্যানো নৌকোতে নেমেই চাপাস্বরে বোধহয় বাবাকে কিছু বলেই পাক খেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজাও ঝাঁপ দিতে গেলেন। কিন্তু একটু দেরি হলো। ততক্ষণে ক্যানো নৌকোয় বসা ত্রিস্তান যোদ্ধাটি কাঠের বর্শা তুলে ছুঁড়ে মেরেছে রাজার বুক লক্ষ্য করে। ফ্রান্সিস চীৎকার করে উঠল—'শাঙ্কো।' শাঙ্কো সঙ্গে-সঙ্গে তীর ছুঁড়ল। তীর গিয়ে লাগল ত্রিস্তান যোদ্ধার ডান কাঁধে। কিন্তু ততক্ষণে বর্শা ছোঁড়া হয়ে গেছে। বর্শা বিঁধেছে রাজার বুকে। ক্যানো নৌকো থেকে গড়িয়ে জলে পড়ে গেলেন। ওখানকার জল লাল হয়ে উঠল। ত্রিস্তান যোদ্ধাটি বাঁ হাতে কাঁধ চেপে নৌকোয় বসে পড়ল। ওদিকে তিন-চারটি ক্যানো নৌকো মোকাকে খুঁজতে লাগল বর্শা উঁচিয়ে। কিন্তু মোকা আর ভেসে উঠল না। মোকা তখন ডুব-সাঁতার দিয়ে জাহাজ পেরিয়ে জাহাজের ওপারে ঝোলানো কাছি ধরে উঠছে। সাত-আটজন ভাইকিং দ্রুত হাতে কাছি টেনে মোকাকে জাহাজে তুলে নিল।

চোখের পলকে এত ঘটনা ঘটে গেল। সেনাপতি কাঠের সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে কী বলে উঠল। সব ত্রিস্তান যোদ্ধারা বর্শা উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল—'শাঙ্কো, সেনাপতিকে।' সঙ্গে-সঙ্গে শাঙ্কোর তীর ছুটল। একেবারে সেনাপতির বুকে গিয়ে বিঁধল। নিখুঁত নিশানা। সেনাপতি দু'হাত তুলে উল্টে পড়ল কাঠের পাটাতনের ওপর। তারপর কাতরাতে লাগল।

এরকম কিছু ঘটবে ত্রিস্তানরা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি। ওরা হকচকিয়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। তখনই দোভাষী বৃদ্ধটি চিৎকার করে কী বলে উঠল। তারপর তার ক্যানো নৌকোটা কঙ্কালদ্বীপের দিকে চালাতে লাগল।

আর ক্যানো নৌকোগুলোও ওটার পেছনে-পেছনে চলল কঙ্কাল দ্বীপের দিকে। মারাত্মক আহত সেনাপতিকে নিয়ে ত্রিস্তান যোদ্ধারা ফিরে গেল কঙ্কালদ্বীপে।

* * *

সেদিনটা কাটল। ফ্রান্সিসরা সারাদিনই সজাগ রইল যদি ত্রিস্তানরা ফিরে আক্রমণ করে তার মোকাবিলা করার জন্যে। কিন্তু ত্রিস্তানরা আর এমুখো হলো না।

বাবার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত রাজপুত্র মোকা চুপ করে বসে রইল আর মাঝে-মাঝেই ওর চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। ফ্রান্সিসরা ওকে সান্ত্বনা দিল। বলল—'অল্পের জন্যে তোমার বাবাকে বাঁচাতে পারলাম না। যাকগে— তোমাদের দ্বীপ ত্রিস্তানরা দখল করে আছে। আগে ওদের তাড়াতে হবে। এখন ভেঙে পড়লে চলবে না।'

মোকা ওদের কথায় একটু শান্ত হলো।



ফ্রান্সিস বলতে লাগল—ভাইসব আজ রাত্রেই আমরা কঙ্কালদ্বীপে যাবো!

সন্ধেবেলা ফ্রান্সিস সব ভাইকিংদের ডেক-এ জমায়েত হতে বলল।

সন্ধ্যেবেলা সবাই এসে ডেক-এ বসল। ফ্রান্সিস বলতে লাগল—'ভাইসব—আজ রাত্রেই আমরা কঙ্কালদ্বীপে যাবো। ত্রিস্তানরা আমাদের দুই বন্ধুর সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করেছে। ওরা ত্রিস্তান সেনাপতিকে রূপোর নদীর হদিস বলে দেবে এই ভাঁওতা দিয়ে কোনো রকমে নিজেদের জীবন বাঁচিয়েছে। যা হোক—ত্রিস্তানরা ওদের প্রাণে মারেনি। কাজেই ত্রিস্তানরা আমাদের শত্রু নয়। আমরা ওদের ভয় দেখিয়ে বশ্যতা স্বীকার করাবো। আমরা আগ বাড়িয়ে ওদের হত্যা করবো না। আক্রান্ত হলে তবেই যুদ্ধ করবো।' ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল—'এখন তাড়াতাড়ি খেয়ে বিশ্রাম করে নাও। গভীর রাত্রে আমাদের যাত্রা শুরু হবে।'

সবাই চলে গেল। ফ্রান্সিসের কথামত খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করতে লাগল।

গভীর রাত্রে নৌকোয় করে যাত্রা শুরু হলো। প্রথম নৌকোটায় গেল ফ্রান্সিস, হ্যারি, বিস্কো আর তীর ধনুক নিয়ে শাঙ্কো। বনের মধ্যে নেমে ওরা অন্যদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সে রাত্রে চাঁদ অনেক উজ্জ্বল। সমুদ্রে, বনের মাথায় জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। বোধহয় পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়।

পাঁচটা নৌকোয় দফায়-দফায় ভাইকিংরা আর সুস্থ ইকাবো যোদ্ধারা বনের আড়ালে তীরে নামল। ইকাবোদের হাতে কাঠের বর্শা। ভাইকিংরা তরোয়াল, বর্শা নিল। সবাই যখন এল তখন ফ্রান্সিস মোকাকে বলল—'এই বনে অনেক ইকাবো আত্মগোপন করে আছে। তুমি শিস দিয়ে জানিয়ে দাও যে আমরা ওদের বন্ধু শত্রু নই।'

বনের মধ্যে কিছুটা গিয়ে মোকা উবু হয়ে বসে শিস দিতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ নানা সুরে শিস দিল।

একটু পরেই দেখা গেল অন্ধকারে বনের আড়াল থেকে একজন দু'জন করে কাঠের বর্শা, গাছের ভাঙা ডাল দিয়ে তৈরি লাঠি নিয়ে ইকাবোরা বেরিয়ে আসছে। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন ইকাবো এসে ওদের দলে যোগ দিল। সকলেই রোগার্ত। কতদিন না খেয়ে আছে কে জানে।

ফ্রান্সিস সবাইকে লক্ষ্য করে চাপাস্বরে বলল—'আমরা বনের মধ্যে দিয়ে যাবো না। ওখানে ত্রিস্তানরা অনেক ফাঁদ পেতে রেখেছে। আমরা চড়াইয়ের ঢাল বেয়ে উঠবো। আমি না বললে কেউ আক্রমণ করবে না।' ফ্রান্সিস মোকাকে বলল— 'ইকাবোদের কথাটা বলে দাও।' মোকা ওদের ভাষায় কথাগুলো বলে দিল। ইকাবো যোদ্ধারা মাথা এপাশ-ওপাশ করল। অর্থাৎ ওরা বুঝেছে।

বন ছেড়ে সবাই চড়াইয়ের ঘাসে ঢাকা ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল। বেশ দূর পর্যন্ত জ্যোৎস্নায় দেখা যাচ্ছে।

কিছুটা এগোতে বাঁ দিকে বনের ধারে আগুন জ্বলছে দেখা গেল। ত্রিস্তান যোদ্ধারা ওখানে দল বেঁধে বসে আছে। দ্বীপের বিচিত্র সব পাখি উড়ে-উড়ে আগুনের কাছে আসছে। ওরা সেসব মেরে পুড়িয়ে খাচ্ছে।

ফ্রান্সিসের নির্দেশমতসবাই হামাগুড়ি দিয়ে ওদের কাছাকাছি গেল। তারপর ওদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল।

ফ্রান্সিস মোকাকে বলল — 'চেঁচিয়ে ওদের বলো যে ওদেব আমরা ঘিরে ফেলেছি। বাঁচতে হলে ওরা যেন অস্ত্রত্যাগ করে।'

ফ্রান্সিসের নির্দেশে হঠাৎ সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ত্রিস্তানরা পাখি মারতে মারতে হঠাৎ দেখল— কারা ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তখনই মোকা ত্রিস্তানদের ভাষায় বলতে লাগল—' তোমরা শোন। শুধু আমরা, ইকাবোরা নই, আমাদের দলে আছে ভাইকিংরা। এরা দুর্ধর্ষ জাতি। এদের হাতে তরোয়াল থাকলে এদের সঙ্গে যুদ্ধে কেউ পারে না। আমরা মিছিমিছি রক্তপাত চাই না। তোমরা অস্ত্রত্যাগ কর। আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করবো না।'

ওদের মধ্যে কয়েকজন বর্শা উঁচিয়ে ধরেছিল। কিন্তু চারদিক তাকিয়ে ভাইকিং আর ইকাবো যোদ্ধাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দেখে বর্শা নামাল। নিজেদের মধ্যে কী কথাবার্তা বলল। তারপর হাতের বর্শাগুলো মাটিতে ফেলে দিতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সবাই অস্ত্রত্যাগ করল।

ফ্রান্সিস বিস্কোকে বলল— 'যাও— বর্শাগুলো নিয়ে এসো। পাহাড়ের কোনো গুহায় গিয়ে রেখে এসো।'

বিস্কো আর কয়েকজন মিলে বর্শাগুলো আনতে গেল।

হঠাৎ ফ্রান্সিসদের পেছনে একটা বিরাট পাথরের চাঁয়ের আড়াল থেকে আট দশজন ত্রিস্তান যোদ্ধা বর্শা হাতে ছুটে এল। ফ্রান্সিসরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল— লড়াই' ।' ভাইকিংরা কেউ কেউ হঠাৎ এই আক্রমণে আহত হলো। আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে ওরা ঘুরে আক্রমণ করল। ত্রিস্তানরা হাতে বর্শা ছুঁড়ে মারছে। পরক্ষণেই নিরস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ছে। ভাইকিংরা সহজেই ওদের ঘায়েল করতে লাগল তরোয়াল ও বর্শা দিয়ে।

লড়াই অল্পক্ষণেই মিটে গেল। কয়েকজন ইকাবো বন থেকে লতাগাছ নিয়ে এল। তাই দিয়ে ত্রিস্তানদের পিছমোড়া করে হাত বাঁধা হলো।

ফ্রান্সিসরা এবার চলল রাজবাড়ি লক্ষ্য করে। চড়াই দিয়ে হেঁটে ওরা ওপরের দিকে চলল। বসতি এলাকা শুরু হলো। ভাইকিং আর ইকাবো যোদ্ধারা ঘরে ঘরে ঢুকতে লাগল। ত্রিস্তানদের বন্দী করে আনতে লাগল। ত্রিস্তানরা বোধহয় ভাবেনি এত তাড়াতাড়ি

ওরা আক্রান্ত হবে। ফ্রান্সিস আগেই বলেছিল যেন বেশি গোলমাল না হয়। কিন্তু গোলমাল হৈ চৈ চিৎকার কিছু হলো। তা'তেই রাজবাড়ির পাহারাদার ত্রিস্তানরা সাবধান হয়ে গেল। ওরা গাছ-পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিল।



ফ্রান্সিসরা রাজবাড়িতে পৌঁছে দেখল রাজবাড়ি অরক্ষিত পড়ে আছে। জ্যোৎস্নার আলোতে রাজবাড়ির চারপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—'ত্রিস্তানরা নিশ্চয়ই এখানেই আত্মগোপন করে আছে। তোমরা রাজবাড়ির সামনে জড়ো হও আর চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখো। খবরদার—অস্ত্র হাত থেকে নামাবে না।' মোকাও এই কথাগুলো ইকাবো যোদ্ধাদের বলল।

রাজবাড়ির সামনে সবাই জড়ো হলো। তৈরী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

মোকা, ফ্রান্সিস আর হ্যারি বাড়ির ভেতর ঢুকল। একটা ঘরে দেখল ম্যাকরেল মাছের তেলের একটা প্রদীপ জ্বলছে। তাসক ঘাসের একটা বিছানা। তাতে গাছের নরম ছাল বিছানো। কে একজন শুয়ে আছে।

ফ্রান্সিস দ্রুত ছুটে গিয়ে লোকটার গলায় তরোয়াল চেপে ধরল। দেখল—আহত সেনাপতি। সেনাপতি ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। ফ্রান্সিস তরোয়াল সরিয়ে নিল। মোকাকে বলল—'সেনাপতিকে বলো—ওর দলের প্রায় সবাই বন্দী। আমরা রক্তপাত চাই না। ওরা এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাক।' মোকা সেনাপতিকে ত্রিস্তান ভাষায় সে কথা বলল। সেনাপতি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। বিড়বিড় করে বললো—'আমরা চলে যাবো।'

ঘরের আর এক কোণায় অন্ধকার আর একটা বিছানা ছিল। সেখানে শুয়েছিল দোভাষী বৃদ্ধটি। সে এবার উঠে আলোর কাছে এল। ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে বলল—'সেনাপতি অসুস্থ—গুরুতর। আমাদের সৈন্যদের হত্যা করবেন না। কাল এই দ্বীপ ছেড়ে যাব।

ফ্রান্সিস বলল—'আক্রান্ত না হলে আমরা কাউকে আক্রমণ করি না। ত্রিস্তান যোদ্ধারা কিছু আহত হয়েছে কিন্তু কাউকে আমরা মারিনি। শুধু বন্দী করেছি।'

ঠিক তখনি বাইরে জোর চিৎকার হৈ চৈ শোনা গেল। লুকিয়ে থাকা ত্রিস্তানরা আক্রমণ করেছে। জোর লড়াই চলল বাইরে। বেশ কিছুক্ষণ। আবার চারিদিক নিঃশব্দ। শুধু আহতদের আর্তনাদ মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল।

ফ্রান্সিসদের নির্দেশে সব ত্রিস্তানদের হাত বেঁধে একটা গুহায় রাখা হল। পূর্বদিকের আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে। আহত ভাইকিং আর ইকাবোদের নৌকা করে জাহাজে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

সকাল হলো। দোভাষী বৃদ্ধটি ফ্রান্সিসকে এসে বলল-'চিকিৎসক-সেনাপতির চিকিৎসা।'



লুকিয়ে থাকা ত্রিস্তানরা

ফ্রান্সিস তখনই ফার্নান্দোকে জাহাজে পাঠাল। কিছুক্ষণ পরে জাহাজের বৈদ্য এল। সেনাপতির বুকের ক্ষত পরীক্ষা করল। ওষুধ দিয়ে পট্টি বেঁধে দিল। দোভাষী বৃদ্ধ ফ্রান্সিসকে বারবার ধন্যবাদ জানাল।

একটু বেলা হতে সেনাপতি বৃদ্ধ দোভাষীকে ডেকে কী বলল। বৃদ্ধ ফ্রান্সিসকে এসে বলল— সেনাপতি সুস্থ বোধ করছেন। ত্রিস্তান বন্দীদের ছেড়ে দিন। আমরা রওনা হব।

ত্রিস্তান বন্দীদের হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হলো। ওরা সবাই সমুদ্রের ধারে এসে জড়ো হলো। সারি সারি ক্যানো নৌকা রাখা হলো। প্রথমে আহতদের নৌকোয় তোলা হল। আহত সেনাপতিকে কয়েকজন কাঁধে করে নিয়ে এল। জোড়াবাঁধা দু'টো ক্যানো নৌকায় পাটাতনে সেনাপতিকে শুইয়ে রাখা হল। সঙ্গে রইল বৃদ্ধ দোভাষীটি। তারপর সবাই একে একে ক্যানো নৌকায় উঠতে লাগল। সবাই উঠলে সারি বেঁধে সব নৌকা চলল দক্ষিণমুখো ত্রিস্তানদের দ্বীপের উদ্দেশ্যে।

দু' একদিনের মধ্যেই কঙ্কালদ্বীপে জীবন ফিরে এল। যারা বনে লুকিয়েছিল তারা সবাই এল। ইকাবোদের ঘরে ঘরে আবার শান্তি ফিরে এল।

কঙ্কালদ্বীপে রইল শুধু ফ্রান্সিস আর হ্যারি। সব ভাইকিংরা জাহাজে ফিরে গেল।

সেদিন শেষরাত। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দুজনে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ কয়েকজন ইকাবো এসে ওদের ঘরের সামনে চিৎকার করে কী বলতে লাগলো। ওদের হাতে মশাল। ফ্রান্সিস আর হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস উঠেই শিয়র থেকে একটা তরোয়াল নিল। গাছের ডাল কেটে তৈরী দরজার দিকে এগোল। হ্যারিও একটা তরোয়াল নিল। চলল ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে।

বুনো লতায় বাঁধা দরজাটা খুলে ফ্রান্সিস বাইরে এল। বলল —কী ব্যাপার? যে কজন ইকাবো এসেছে তাদের দেখেই ফ্রান্সিস চিনল এরা রাজবাড়ির পাহারাদার। ওরা ফ্রান্সিসকে হাত পা নেড়ে কী বোঝাতে লাগল। ফ্রান্সিস ওদের একটা কথা বুঝল — বন্দী। আর বুঝল ওরা বারবার রাজা মোকার নাম করছে। ওরা রাজবাড়ির দিকে ইঙ্গিত করতে লাগল। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল— 'হ্যারি মনে হচ্ছে মোকা কোনোভাবে বন্দী হয়েছে। রাজবাড়িতে চলো।'

দু'জনে রাজবাড়ির দিকে চলল। জ্যোৎস্না বেশী উজ্জ্বল নয়। চারিদিকে নিস্তব্ধ। দু'জনে আগে আগে চলল। পেছনে চলল রাজবাড়ির পাহারাদার।

ওরা রাজবাড়িতে পৌঁছল। ভেতরে রাজা মোকার ঘরে ঢুকে দেখল পাথরের

ওপর বিছানো তাসক ঘাসের বিছানা ছত্রাখান হয়ে আছে। মোকা নেই। ফ্রান্সিস মৃদু আলোয় চারদিকে দেখল। ঘর শূন্য। একপাশে পাথরের ওপর ছড়ানো রয়েছে মোকার গায়ের সেই কোহালহোটা।

তখনই পাহারাদারদের মধ্যে কয়েকজন দু'জন পাহারাদারকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। দু'জনই আহত। তার মধ্যে একজনের আঘাত সাংঘাতিক। তখনই একজন পাহারাদার বারবার 'ত্রিস্তান' এই কথাটা বলতে লাগল। এবার ফ্রান্সিস ব্যাপারটা বুঝতে পারল। রাতে ত্রিস্তানরা এসে মোকাকে ধরে নিয়ে গেছে। ত্রিস্তানরা আবার আসতে পারে। একথা ওরা ভাবতেই পারেনি। কিন্তু তাই ঘটল। পাহারাদারটি এবার সমুদ্র তীরের দিকে ইঙ্গিত করতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল ক্যানো নৌকা চালিয়ে ত্রিস্তানরা এসেছিল। কতক্ষণ আগে ধরে নিয়ে গেছে সেটা পাহারাদারদের বারবার জিজ্ঞেস করেও জানতে পারল না। বলল-- 'হ্যারি— কিছুই বুঝতে পারছি না। কখন ধরে নিয়ে গেল? ওদের দলেই বা কতজন ছিল? যাগ্‌গে, চলো সমুদ্রের ধারে যাওয়া যাক। যদি ওদের ধরা যায়।'

দু'জনে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তারপর দ্রুত ছুটল সমুদ্রতীরের দিকে। সমুদ্রতীরে যেখানে ত্রিস্তানরা ক্যানো নৌকা নিয়ে এসেছিল, পাহারাদাররা সেখানে ওদের দু'জনকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস তাকাল সমুদ্রের দিকে। ত্রিস্তানদের ক্যানো নৌকার চিহ্নমাত্র নেই। অল্প জ্যোৎস্নায় দেখা যাচ্ছে দূরে সমুদ্রের বুকে পাতলা কুয়াশার আস্তরণ। তার মানে ধরে নিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে।



ফ্রান্সিস বলল — 'হ্যারি কী করা যায় বলো তো?'

'মোকাকে ত্রিস্তানদের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে।'

'তার মানে যুদ্ধ।'

'হ্যাঁ প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হবে।'

'আমি যুদ্ধে রক্তপাত এসব এড়াতে চাইছি।'

'বেশ, সে চেষ্টা করা যাক। ত্রিস্তানরা মোকাকে বন্দী করল কেন—কী ওদের উদ্দেশ্য তা তো আমরা জানি না।'

'ভাবছি, কালকেই জাহাজে নিয়ে ত্রিস্তানদের দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হব।'

'দু' একজন ইকাবোকে সঙ্গে নিতে হবে। ওরা ঠিকনিশানা রেখে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে।'

ওরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল যখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। হ্যারি আবার

শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়েও পড়ল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমলো না। কী করে মোকাকে উদ্ধার করবে তারই পরিকল্পনা করতে লাগলো। পাখির ডাক শোনা গেল। ভোর হলো।

ফ্রান্সিস বিছানা থেকে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে একটা বুনো আনারস খেল। তারপর চলল রাজবাড়ির দিকে। সেখানে পৌঁছে দেখল অনেক ইকাবো মেয়েপুরুষ সেখানে জড়ো হয়েছে। কেউ কেউ কাঁদছে। ফ্রান্সিস বুঝল— ওরা সত্যিই মোকাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। ফ্রান্সিসকে দেখে কয়েকজন ইকাবো মেয়েপুরুষ ছুটে এল। ফ্রান্সিসের হাত ধরে কী বলেতে লাগল। ওদের মুখে বারবার 'রাজা মোকা কথাটা শুনে ফ্রান্সিস বুঝল ওরা কি বলতে চায়? ফ্রান্সিস রাজবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে সবাইকে শান্ত হবার ইঙ্গিত করল। সকলে চুপ করল। ফ্রান্সিস তখন অঙ্গভঙ্গী করে ত্রিস্তানদের দ্বীপ থেকে কী করে মোকাকে মুক্ত করে আনবে সেটা বোঝাল। ও বারবার 'মোকা' 'ত্রিস্তান' আর 'মুক্তি' এই কথা ক'টার ওপর জোর দিয়ে বলল। ইকাবোরা বুঝতে পারলো ফ্রান্সিস মোকার মুক্তির কথাই বলছে। ওরা আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল। হাসতে লাগল। ফ্রান্সিসও হাসল। খুশীই হলো— যাক, ইকাবোরা ওর কথা বুঝতে পেরেছে।

ও তখন পাহারাদারদের সর্দারকে ইঙ্গিতে ডাকল। সর্দার কাছে এল। ফ্রান্সিস ওকে ইঙ্গিতে বোঝাল ওরা জাহাজ চালিয়ে ত্রিস্তানদের দ্বীপে যাবে। সর্দার ওদের নিয়ে যেতে পারবে কিনা। কয়েকবার 'মুক্তি' 'ত্রিস্তান' কথাগুলো শুনে সর্দার মাথা ঝাঁকাল। তারপরে নিজের বুকে বারবার ছুঁইয়ে ও বোঝাল ও ওদের নিয়ে যেতে পারবে।



সেদিন দুপুরেই ফ্রান্সিস হ্যারি আর পাহারাদারদের নিয়ে সমুদ্রতীরের দিকে রওনা হলো। নৌকো চালিয়ে ওরা ওদের জাহাজে এসে উঠল। সকলেই ওদের ঘিরে ধরল। ঠিক বুঝল না ফ্রান্সিস হঠাৎ এল কেন? ফ্রান্সিস সকলের দিকে তাকিয়ে বলল— ভাইসব — কাল রাত্রে ত্রিস্তানরা লুকিয়ে কঙ্কাল দ্বীপে এসেছিল। মোকাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। জানি না ওদের উদ্দেশ্য কি? যা হোক আমরা আজকেই জাহাজ নিয়ে যাচ্ছি যাত্রা করবো ত্রিস্তান দ্বীপ লক্ষ্য করে। একজন ইকাবো সর্দারকে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের ঠিক পথে নিয়ে যাবার জন্য। এখন সবাই বিশ্রাম করো। রাত হলেই আমরা যাত্রা করব। মোকাকে মুক্ত করাই

আমাদের উদ্দেশ্য ।'

সব ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল—'ও-হো-হো ।' তারপর সবাই যে যার কাজে চলে গেল ।

রাতের খাওয়া - দাওয়া শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ হলো । ফ্রান্সিস আর হ্যারি ইকাবো সর্দারকে নিয়ে জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়াল । ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল— 'নোঙর তোল। পাল খাটাও । বাতাস পড়ে গেছে । দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে যাও ।' মুহূর্তে জাহাজে কর্মব্যস্ততা শুরু হলো । ঘড়ঘড় শব্দে নোঙর তোলা হলো । কয়েকজন মাস্তুল বেয়ে উঠে গেল ওপরে। পাল খুলে দিল । ইকাবো সর্দারের নির্দেশমতো জাহাজ চলল দক্ষিণ-পশ্চিম-মুখো। আজ জ্যোৎস্না তেমন উজ্জ্বল নয় । আবছা আলোয় পাতলা কুয়াশা ঢাকা সমুদ্রের ওপর দিয়ে, জাহাজ চলল ঢেউ ভেঙে ।

সারারাত জাহাজ চলল । পরের দিন ভোর ভোর সময়ে মাস্তুলের ওপর নজরদার ভাইকিংটি চেঁচিয়ে বলল— 'ত্রিস্তান দ্বীপ দেখা যাচ্ছে ।'

সকালে সমুদ্রের বুকে কুয়াশার পাতলা আবরণ কেটে গেল । দেখা গেল ত্রিস্তান দ্বীপ। দ্বীপে দুটো পাহাড়ের পাথুরে চূড়া দেখা গেল । পাহাড় দুটো একেবারে ন্যাড়া, সবুজের চিহ্নমাত্র নেই । শুধুই নীচের দিকে গাছগাছালির ভীড় । ফ্রান্সিসের পাশেই দাঁড়িয়েছিল হ্যারি । বলল—'একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছো ?'

'কী ?' ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকাল ।

'ডানদিকের চূড়োটার মাথা ভাঙা ।'

'হ্যাঁ, কেমন চ্যাপ্টা মতো ।'

'ওটা আগ্নেয়গিরির মুখ ।' হ্যারি বলল ।

'এখন বোধহয় মৃত ।' ফ্রান্সিস বলল ।

'হতে পারে । তবে সেটা কাছে না গিয়ে বলা যাবে না ।'

ফ্রান্সিসের নির্দেশে জাহাজের পাল নামিয়ে ফেলা হলো । দাঁড়িরা দাঁড় বাওয়া বন্ধ করল । ঘরঘর শব্দে নোঙর ফেলা হলো ।

সবাইকে ডেক-এ আসতে নির্দেশ দিল ফ্রান্সিস । সবাই ডেক-এ এল । ফ্রান্সিস বলল—'ভাইসব— শুধু আমি আর বিস্কো ত্রিস্তান দ্বীপে যাবো । তোমরা সবাই জাহাজে থাকবে ।' দুচারজন আপত্তি তুলল । বলল— 'তোমরা মাত্র দুজন যাবে । এটা বিপজ্জনক।' ফ্রান্সিস বলল— 'তা ঠিক' । তবে আমি প্রথমে যুদ্ধে জড়াতে চাইছি না । আমরা দুজনেই ওদের হাতে ধরা দেব । ওরা নিশ্চয়ই আমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাবে । তখনই জানতে পরবো ওদের উদ্দেশ্য কি ? তাছাড়া যাকে মুক্ত করতে যাচ্ছি সেই মোকা কোথায় আছে সেটা জানতে পারবো । এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই ।'

ফ্রান্সিস থামলে হ্যারি বলল— 'যদি তোমাদের কাউকে ওরা মুক্তি না দেয় ?'

তখন তোমরা আমাদের মুক্ত করতে যাবে । তিন দিনের মধ্যে আমরা যদি না ফিরি তখন তোমরা আক্রমণ করবে । ফ্রান্সিস থামল । আর কেউ কোনো কথা বলল না। বোঝা গেল, সকলেই ফ্রান্সিসের পরিকল্পনা মেনে নিল ।

কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস আর বিস্কো তৈরী হয়ে এল । কিছু খাবার আর তরোয়াল নিল সঙ্গে । জাহাজ থেকে ঝোলানো দঁড়ি বেয়ে বেয়ে দু'জনে একটা নৌকায় নেমে এল। দড়ি খুলে নৌকা ছেড়ে দিল । বিস্কো বৈঠা তুলে নিল । নৌকো বাইতে লাগল ত্রিস্তান

দ্বীপের উদ্দেশ্য। ঢেউয়ের ঘায়ে নৌকা ওঠা-পড়া চলল। পরিষ্কার নীল আকাশ। আকাশ সমুদ্র জুড়ে ঝকঝকে রোদ।

ত্রিস্তান দ্বীপে যেখানে পৌঁছল সে দিকটায় বড় বড় গাছের জঙ্গল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে একটা ফাঁকা জায়গায় ওরা নৌকা ভেড়াল।

তীরে নেমে একটা বড় পাথরের সঙ্গে নৌকার দড়িটা বাঁধল। তারপর দু'জনে এগিয়ে চলল। কয়েক পা এগিয়েছে তখনই জঙ্গল থেকে একদল ত্রিস্তান যোদ্ধা কাঠের বর্শা হাতে ওদের দিকে ছুটে এল। দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। যোদ্ধারা ওদের ঘিরে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে সর্দার গোছের একজন ত্রিস্তান ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করল। ফ্রান্সিসরাও কিছুই বুঝল না। ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল খুলে সামনের ঘাসে-ঢাকা জমিতে ফেলে দিল। বিস্কোও ফ্রান্সিসের দেখাদেখি তরোয়াল ফেলে দিল। তখন সর্দার গোছের একটা একজনকে কী বলল। সে ছুটে গিয়ে বনের মধ্যে থেকে একটা লতাগাছ নিয়ে এল। পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে লতা দিয়ে ফ্রান্সিস আর বিস্কোর হাত বাঁধল। তারপর সর্দার চলার ইঙ্গিত করল। ওরা দু'জন সর্দারের নির্দেশমতো হাঁটতে লাগল। একজন এদের তরোয়াল দুটো তুলে নিয়ে চলল।

কিছুটা এগোতেই বসতি এলাকা শুরু হলো। বাড়িগুলো সব কাঠ পাথর আর তাসক ঘাসের তৈরি। বাড়িগুলো থেকে ত্রিস্তান স্ত্রী-পুরুষ বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা বেরিয়ে এল। দেখতে লাগল বন্দী দু'জনকে।

একটু পরেই চারিদিকে পাথরের দেয়াল-ঘেরা একটা বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। বাড়িটা বড় আর মজবুত। বোঝা গেল এটা রাজার বাড়ি।

পাথরের দেয়ালের মাঝখানে একটা উঠোন মতো। সেখানেই ফ্রান্সিস আর বিস্কোকে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। সামনেই গাছের ডাল ফালি করে তৈরী একটা সিংহাসন মতো। তাসক ঘাস আর পাখির বিচিত্র পালক দিয়ে তৈরী একটা বসবার আসন।

একটু পরেই দীর্ঘদেহী প্রৌঢ় মতো একজন লোক বেরিয়ে এল। উপস্থিত ত্রিস্তানরা সকলেই মাথা নোয়াল। বোঝা গেল ইনিই রাজা। মোকার মতো এই রাজার গায়েও একটা কোহালহো। গলায় একটা বিনুনির মতো বাঁধা। কপালে গালে শরীরে উল্কি আঁকা। হাতে একটা সাপের মতো আঁকাবাঁকা লাঠি।

রাজার পেছনে পেছনে যে বৃদ্ধ লোকটি বেরিয়ে এল তাকে দেখে ফ্রান্সিস অনেকটা নিশ্চিত হলো। বৃদ্ধটি সেই দোভাষী। অল্প অল্প স্পেনীয় ভাষা বুঝতে পারে বলতেও পারে। সে একপাশের একটা পাথরে বসল। রাজা সিংহাসনে বসলে উপস্থিত সব ত্রিস্তানরা বসল। রাজা হাতের বাঁ লাঠিটা ফ্রান্সিসদের দিকে ইঙ্গিত করে তীক্ষ্নস্বরে কী বলে উঠলেন। রাজার শরীরের তুলনায় কণ্ঠস্বর ভীষণ সরু। ফ্রান্সিস সেই দোভাষী বৃদ্ধের দিকে তাকাল। বৃদ্ধটি এবার উঠে দাঁড়াল। রাজার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে নিয়ে কী বলল। রাজাও কী বললেন। বৃদ্ধটি এবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল।



বলল–"মহামান্য রাজা-তোমরা-কেন?' ফ্রান্সিস বলল–'আপনারা অন্যায়ভাবে কঙ্কালদ্বীপের

রাজাকে বন্দী করে এনেছেন। আমরা রাজা মোকার মুক্তির জন্যে এসেছি।' বৃদ্ধটি বলল - 'রাজা - গিয়ানির মন্দির-যত রূপোর থাম-চাই-বিনিময়ে রাজা মোকা-।' ফ্রান্সিস বুঝল রূপোর থামগুলোর ওপরই রাজার লোভ। বলল—

'ঠিক আছে-রাজা মোকার সঙ্গে আমাদের এই নিয়ে কথা বলতে দিন। মোকাকে রাজী করবার চেষ্টা করব।'

বৃদ্ধটি রাজাকে তাই বলল। রাজা কী বলল যেন। কয়েকজন ত্রিস্তান যোদ্ধা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস আর বিস্কোকে ধাক্কা দিয়ে চলবার নির্দেশ দিল। দু'জনে নির্দেশমত চলল। ওদিকে রাজসভায় বিচারপ্রার্থী একজনকে রাজা কি যেন বলতে লাগল।

উৎরাই বেয়ে ফ্রান্সিসরা উঠতে লাগল। একবারে ন্যাড়া পাহাড়। শুধু পাথর আর ধুলো। ঘাসও জন্মায়নি সেখানে।

একটি বাড়ির সামনে এসে ত্রিস্তান যোদ্ধারা থামল। পাথর আর তাসক ঘাসের ছাউনির ঘর। খণ্ড খণ্ড ডাল দিয়ে তৈরী দরজা। বুনো লতা দিয়ে বাঁধা। সেই বাঁধন খুলে একজন দরজা খুলল। ফ্রান্সিসদের ভেতরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ওরা দুজন ভেতরে ঢুকল। ত্রিস্তান কয়েকজনও ঢুকল।

বাইরের আলো থেকে ঘরে ঢুকে অন্ধকার লাগল। কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না ওরা। অন্ধকার চোখে একটু সয়ে এলে দেখল ঘরের মেঝেয় তিনি চারটে কাঠের খুঁটি পোঁতা। ত্রিস্তানরা ফ্রান্সিস আর বিস্কোকে দুটি খুঁটির কাছে নিয়ে গেল। তারপর বুনো লতা দিয়ে খুঁটির সঙ্গে হাত বেঁধে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

ফ্রান্সিস এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরটা ভাল করে দেখছিল, তখনই নজর পড়ল একটা খাটের নীচে বন্দী একজন পা ছড়িয়ে মাটিতে বসে আছে। ফ্রান্সিস চোখ কুঁচকে তাকাল বন্দীটির দিকে। চমকে উঠল—'আরে মোকা।' মোকাও তখন ফ্রান্সিসের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে। এবার ফ্রান্সিসকে চিনতে পেরে হাসল। মোকার চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে। বেশ খারাপ হয়ে গেছে চেহারা; ফ্রান্সিস ডাকল—'মোকা?'

'বলুন।' মোকার কণ্ঠস্বরে হতাশা।

তোমার সঙ্গে এ কটা জরুরি কথা আছে।

মোকা কোনো কথা না বলে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল।

'ত্রিস্তানদের রাজার সঙ্গে কথা হলো। রাজা বলেছে তোমাদের গিয়ানির মন্দিরের রূপোর থামগুলো ওকে দিয়ে দিলেই ওরা তোমাকে মুক্তি দেবে।'

'জানি।'

'তুমি রূপোর থামগুলো দিয়ে দিও না।'

মোকা একটু ক্ষণ মাথা নীচু করে রইল। তারপর মুখ তুলল। ফ্রান্সিস সেই স্বল্প আলোয় দেখল মোকার চোখে জল। মোকা ভারী গলায় আস্তে আস্তে বলল—'গিয়ানির পবিত্র মন্দিরের থাম—অসম্ভব। ওগুলো ত্রিস্তানদের দেবার আগে আমার যেন মৃত্যু হয়।'

ফ্রান্সিস ও রকম উত্তর আশা করেনি। ও বুঝল গিয়ানি দেবতা আর তার মন্দিরের ওপর ইকাবোদের শ্রদ্ধাভক্তি কত গভীর। বলল—'আমাকে মাফ কর মোকা। আমি ঠিক বুঝিনি।' একটু থেমে বলল—'কিন্তু এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার কথাটাও তো ভাববে?'

মোকা ম্লান হাসল। বলল—'আমি নিজে না হয় এই বন্দীদশাতেই মারা গেলাম।

আমার প্রজারা তো বাঁচবে—গিয়ানির পবিত্র মন্দিরও থাকবে।'

ফ্রান্সিস আর কোনো কথা বলল না। বুঝল—মুক্তির অন্য কোনো উপায় ভাবতে হবে।

ফ্রান্সিসদের বন্দীদশার দু'দিন কাটল। ত্রিস্তানরা ওদের সারাদিনে দু'বার খাবার দিয়ে যায়। বুনো ফলের তরকারী মতো আর সামুদ্রিক মাছ সেদ্ধ। খিদের জ্বালায় তাই খেয়েছে ওরা। তারপর নারকেলের মালায় চক্ চক্ করে জল খেয়েছে।

সেদিন বিকেলে সেই দোভাষী বৃদ্ধ ত্রিস্তানটি এল। রাজাই নাকি পাঠিয়েছে ফ্রান্সিসদের সিদ্ধান্ত জানতে। ফ্রান্সিস স্পষ্ট বলল—'গিয়ানির দেবতার মন্দিরের থামের বিনিময়ে মোকা বাঁচতে চায় না। বৃদ্ধটি কথা শুনে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। ফ্রান্সিস বলল—'রাজাকে গিয়ে বলুন—বিনা শর্তে আমাদের সবাইকে যেন মুক্তি দেন। নইলে আমাদের জাহাজ কাছে আছে। আমার বন্ধুরা তৈরী। কালকের মধ্যে আমাদের মুক্তি না দিলে আমার বন্ধুরা এই দ্বীপ আক্রমণ করবে। তখন আপনারা কেউ বাঁচবেন না।' আমরা ভাইকিং। একমাত্র মৃত্যু হলেই আমরা অস্ত্র ত্যাগ করি তার আগে নয়। রাজাকে বলুন—আমরা অযথা রক্তপাত চাই না।'

বৃদ্ধটি ফ্রান্সিসের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল।

বেশ রাত তখন । ঘরের কোণায় ম্যাকরেল্ মাছের তেলের প্রদীপ জ্বলছে খুঁটিতে হাত বাঁধা অবস্থাতেই ফ্রান্সিসরা শুয়ে আছে মাটিতে। বিস্কো আর মোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। দরজার বাইরে একটা পাথরের উপর একজন ত্রিস্তান পাহারাদার বসে আছে। ও ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ছে। ফ্রান্সিস দেখল ওদেরই একটা তরোয়াল পাহারাদার কোলের ওপর রেখেছে। ও তরোয়ালটার দিকে তাকিয়ে রইল। ঈস্ একবার খোলা হাতে তরোয়ালটা পেলে—হঠাৎ একটা কানফাটা শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক লাল আলো ঝলসে উঠল বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে মাটি দুলে উঠল। ঘরটা একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল। দরজাসুদ্ধু বাইরের পাথরের দেয়ালটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল পাহারাদারের ওপর। ওর কোল থেকে তরোয়ালটা ছিটকে গেল। মোকা আর বিস্কো লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ভীষণ দুলে দুলে উঠছে ঘরটা ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল—আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে।

বিস্কো চেঁচিয়ে বলল—'ফ্রান্সিস, আমার খুঁটিটা উপড়ে গেছে।

'তাহলে শীগগির ভাঙা দরজার কাছে যাও। আলো এখনও নেভেনি। তরোয়ালটা খুঁজে বের কর। আমাদের বাঁধন কাটো তাড়াতাড়ি।' ফ্রান্সিস দ্রুত বলে গেল।

আবার আলোর ঝলকানি। সেইসঙ্গে গুড় গুড় একটানা শব্দ। আবার মাটি দুলে উঠল। বিস্কো খুঁটিটা থেকে হাতটা খুলে নিল। কোনরকমে টাল সামলাতে সামলাতে ভাঙা দরজার কাছে গেল। প্রদীপের ম্লান আলোয় দেখল পাথরের নীচে তরোয়ালের হাতলটা বেরিয়ে আছে। ও হাতলটা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তরোয়ালটা বের করে আনল। তারপর ছুটে এল ফ্রান্সিসদের কাছে। ওদের দু'জনের হাতের বাঁধন কেটে দিল। নিজেরটাও কাটল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল 'বাইরে চলো শীগগির।'

ওরা দ্রুত ছুটতে যাবে তখনই ঘরের একপাশের পাথুরে দেওয়াল শব্দ তুলে ভেঙে পড়ল। ঐ দেয়ালের দিকে ছিল মোকা। মোকা স'রে আসতে আসতেও শেষ রক্ষা হলো না। একটা বড় পাথর গড়িয়ে মোকার ডানপায়ে এসে পড়ল। মোকা আর্তনাদ করে উঠল। তারপর বসে পড়ল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল—'বিস্কো মোকার পায়ের দিকে ধরো।

বিস্কো ছুটে গিয়ে মোকার পায়ের দিকে ধরল। ফ্রান্সিস ধরল ওর মাথার দিক। তারপর সন্তর্পণে ভাঙা দেয়ালের পাথর ডিঙিয়ে ওরা বাইরে চলে এল। ঠিক তখনই সমস্ত ঘরটা শব্দ তুলে ভেঙে পড়ল।

ওরা দু'জনে মোকাকে কাঁধে নিয়ে ছুটল সমুদ্রতীরের দিকে । একবার পেছন ফিরে দেখল—সেই চ্যাপ্টা মাথা পাহাড়টার মাথা থেকে লক্ষ লক্ষ ফুলকির মতো আগুনের ফশা থেকে থেকে ছিটকে উঠছে আকাশের দিকে। সেই আলায় ত্রিস্তান দ্বীপ আলোকিত। বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্রও দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। পাহাড়ের মাথা থেকে কালো ঘন ধোঁয়া বেরোচ্ছে গল গল করে! আকাশে অনেক দূর উঠে গেছে সেই ধোঁয়া।

পায়ের নীচে ধুলো পাথরভর্তি জমি দুলে দুলে উঠছে। হঠাৎ সামনেই একটা ফাটল দেখা গেল। ফাটল থেকে তোড়ে গরম ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ওরা ফাটল এড়িয়ে অন্যদিকে ছুটল।

আগ্নেয়গিরির মাথায় আগুনে-আলোর তীব্রতা কখনও বাড়ছে কখনও কমছে। ওরা বসতির কাছে এল। দেখল ত্রিস্তানদের অনেক বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। চিৎকার কান্নাকাটি শোনা গেল। কিছু ত্রিস্তান বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে দেখা গেল। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে আগ্নেয়গিরির দিকে মুখ করে। একবার দু'হাত তুলছে। উবু হয়ে মাটিতে দু'হাত রাখছে। আবার উঠে বসছে।

নেমে আসার পথে এখানে ওখানে ত্রিস্তান যোদ্ধাদের মুখোমুখি পড়ল ওরা। কিন্তু ত্রিস্তান যোদ্ধারা তখন নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত। ওদের দিকে চাইবার সময় কোথায়

আবার একটা ছোট ফাটল পড়ল। ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ওরা লাফিয়ে পার হলো। কাঁধে আহত মোকা। খুব জোরে ছুটতে পারছিল না ওরা।

ফ্রান্সিস আর বিস্কো সমুদ্রতীরে পৌঁছুল। কিন্তু নৌকো কোথায়? তীর ধরে খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলের আড়ালে একটা ক্যানো পেল। সেটাতেই উঠল ওরা। মোকাকে সাবধানে গলুইতে শুইয়ে দিল। আগ্নেয়গিরির মাথায় কখনও কখনও আগুনের আলোর তীব্রতা ঝলসে উঠছে। সেই আলোয় ফ্রান্সিস দেখল মোকার ডান পা'টা বেশ জখম হয়েছে। রক্ত পড়ছে। সমুদ্রের জল হাত দিয়ে তুলে ক্ষতের জায়গাটা ধুয়ে দিল। ক্ষতে নোনা জল লাগাতে বোধহয় জ্বালা করে উঠল। মোকাও কঁকিয়ে উঠল। কোনো কথা বলল না।

এবার ফ্রান্সিস সমুদ্রের দিকে তাকাল। আগ্নেয়গিরির আলোয় যতদূর দেখা যাচ্ছে ওদের জাহাজ কোথাও নেই। ফ্রান্সিস বলল—'বিস্কো, আমরা দক্ষিণ ঘেঁষে এসেছি। দ্বীপের ধার ধার দিয়ে এবার উত্তর ঘেঁষে যাবো।'

ফ্রান্সিস নৌকোর গলুইতে বৈঠা খুঁজল। পেল না। তখন নৌকোর ওপর বুক লাগিয়ে শুয়ে হাত দিয়ে জল ঠেলতে লাগল। সমুদ্রে তখন বাতাসের তেজ নেই। শান্ত সমুদ্র। ঢেউও ছোট ছোট। হাত দিয়ে জল ঠেলে নৌকো চালাতে লাগল ফ্রান্সিস। নৌকো দ্বীপ ঘুরে চলল। ফ্রান্সিস ডাকল—'বিস্কোও তুমিও হাত লাগাও'' বিস্কো ওর মত শুয়ে পড়ে হাত দিয়ে ঠেলতে লাগল। নৌকো চলল। কোথাও কোথাও সমুদ্রের জল ভুস্ ভুস্ করে উঠছে। ওরা সেগুলো পাশ কাটিয়ে চলল।

ফ্রান্সিস আগ্নেয়গিরির দিকে তাকাল। দেখল—এবার পাহাড়ের মাথা থেকে গলিত লাভার স্রোত নেমে আসছে। লাল হলুদ ধোঁয়া উঠছে গলিত লাভা থেকে।

ত্রিস্তান দ্বীপের পশ্চিমদিকের বাঁকটা পেরোতেই ওরা অস্পষ্ট দেখল দূরে ওদের

জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। হাত দিয়ে জল ঠেলে ঠেলে ওরা জাহাজের দিকে নৌকো নিয়ে চলল।

ক্যানো নৌকো ঢেউ ভেঙে খুব আস্তে আস্তে চলছে। বিস্কো একবার চিৎকার করে উঠল-ও-হো-হো-!' কিন্তু সেই চিৎকার জাহাজে গিয়ে পৌঁছল না।

হঠাৎ আগ্নেয়গিরিতে আর একবার অগ্ন্যুদ্‌গার ঘটল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে গায়ের জামাটা খুলে উঠে দাঁড়াল। জামাটা হাতে দিয়ে ঘোরাতে লাগল। এবার সমুদ্রে অনেকদূরে পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা গেল। জাহাজে ভাইকিংরা সবাই ডেক্-এ এসে দাঁড়িয়ে আছে তখন। হ্যারিকে সবাই জিজ্ঞেস করছিল—'আমরা কী করবো এখন?'

হ্যারি দু'হাত তুলে বলল—'ফ্রান্সিস তিন দিন অপেক্ষা করতে বলেছিল। আমাকে ভাবতে দাও।' আর কেউ কোনো কথা বলল না।

হ্যারি ভুরু কুঁচকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ত্রিস্তান দ্বীপের দিকে। তখনই আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুদাগার হলো। সেই আলোয় হ্যারি নজরে পড়ল ক্যানো নৌকোটা। নৌকোয় দাঁড়িয়ে কে কাপড় নাড়ছে। হ্যারি চীৎকার করে বলল—'ভাই সব, ফ্রান্সিসরা আসছে। ঐ দেখ ক্যানো নৌকো।'

ততক্ষণে অনেকেরই নজরে পড়েছে ক্যানো নৌকোটায়। ওরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল-'ও-হো-হো-।'

ফ্রান্সিস আর বিস্কোও নৌকো থেকে চিৎকার করল—'ও হো-হো-।' ওদের চিৎকার জাহাজ থেকে শোনা গেল না।

নৌকোর আসার গতি দেখে হ্যারির মনে সন্দেহ হলো। এত আস্তে আসছে কেন নৌকোটা? ও কয়েকজন ভাইকিংকে ডাকল। বলল—নৌকো নামাও। ওদের নৌকো নিয়ে এসো।'

তখনই কয়েকজন ভাইকিং দড়ি বেয়ে নেমে এল নৌকোর ওপর। তারপর দু'টো নৌকো চলল ফ্রান্সিসদের নৌকো লক্ষ্য করে।

ভাইকিংরা ফ্রান্সিসদের নৌকোটা ওদের একটা নৌকোর সঙ্গে বাঁধল। তারপর দ্রুত চলল জাহাজের দিকে।

ফ্রান্সিসরা যখন জাহাজের ডেক-এ উঠল তখন বন্ধুদের মধ্যে আনন্দের বান ডাকল যেন। ফ্রান্সিস বিস্কো অক্ষত দেহেই ফেরেনি শুধু মোকাকেও মুক্ত করে এনেছে।

মোকাকে ধরাধরি করে কেবিন ঘরে শুইয়ে দেওয়া হলো। জাহাজের বৈদ্য কাঁচের বোয়ামে ওষুধপত্র নিয়ে এল। মোকার ক্ষত পরীক্ষা করে ওষুধ দিল। মোকা ঘুমিয়ে পড়ল। জাহাজ আবার রওনা হ'ল কঙ্কালদ্বীপের উদ্দেশ্যে।

এবার শুরু হলো ফ্রান্সিসের রূপোর নদী খোঁজা। অনেক অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু রূপোর নদীর হদিস পায়নি। সেই নদী খুঁজে বের করতে হবে।

কঙ্কালদ্বীপে ফ্রান্সিস আর হ্যারি ইকাবোদের দেওয়া একটা ঘরে আস্তানা নিয়েছে। প্রায় সারাদিনই ওরা দ্বীপটা ঘুরে বেড়ায় যদি রূপোর নদীর কোনো হদিস মেলে। দ্বীপটা নেহাৎ ছোট নয়। কাজেই চার-পাঁচ দিন লেগে গেল সমস্ত দ্বীপ ঘুরে ফিরে দেখতে।

বসতি এলাকায় ওরা যখন ঘুরে বেড়ায় ইকাবোরা মাথা নুইয়ে ওদের শ্রদ্ধা জানায়। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ইকাবোদের বাচ্চা ছেলেমেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করে। ইকাবোরা খুব খুশী হয়।

সেদিন ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—'চলো গিয়ানির মন্দিরটা দেখে আসি।ওটা ভালো করে দেখা হয়নি।'

দুজনেই বেরোল মন্দিরটার উদ্দেশ্যে।

কঙ্কাল পাহাড়ের মাথার নীচেই দক্ষিণ দিকে সেই মন্দিরটা ।এদিকটায় ইকাবোদের বসতি কম। ওরা ঘুরে ঘুরে মন্দিরটা দেখতে লাগল। মন্দিরটা চারকোণা। গাছের ডাল, তাসক ঘাস আর নারকেল পাতা দিয়ে বোনা ছউনি মন্দিরের চারটে চৌকোণা থাম রূপোর। বেশ মোটা রূপোর থামগুলো।

তাছাড়া মন্দিরের সামনে অর্ধগোলাকারভাবে সাজানো ছটা রূপোর থাম। হাত দিয়ে দেখল, বেশ মোটা নিরেট রূপোর তৈরী থামগুলো। তাতে লতাপাতা আঁকা নানা কারুকার্য। ওখানে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস মুখ উঁচু করে পেছনে তাকাল। দেখল কঙ্কালের মাথার পেছনটা। এবার দক্ষিণমুখে তাকাল। দেখল বাঁ দিকে একটা নদী বয়ে চলেছে। জলের রঙ হলুদ।ফ্রান্সিসের মনে পড়ল বন্দীদশা থেকে পালানোর সেই ঘটনা। সেদিন ওরাই পাথরের পাতলা আস্তরণ ভেঙে এই নদীটাকে মুক্তি দিয়েছিল। নদীটা সেই গুহা থেকে বেরিয়েছে।

ডানদিকে শুধু বনজঙ্গল। বনজঙ্গল খুব ঘন নয়। ছাড়া ছাড়া।

মন্দিরের ভেতরে অন্ধকারে দেখল কাঠের খোদাই করা গিয়ানি দেবতার মূর্তি। অনেক ইকাবো এসেছে বুনো ফুল ফল দিয়ে গিয়ানির পুজো দিতে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখল। তারপর নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল।

সন্ধ্যেবেলা বিস্কো এল। বলল—'ফ্রান্সিস, একবার জাহাজে এস।'

'কেন? কী হলো?'

'বন্ধুদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।'

'হুঁ।'

'ওরা আর এখানে থাকতে চাইছে না। অনেকদিন হয়ে গেল—দেশে ফিরে যেতে চাইছে।'

'রাত্রে আমি জাহাজে যাবো। সবাইকে ডেক-এ থাকতে বলবে।'

'বেশ।' বিস্কো চলে গেল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি চলল রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে। পথে ইকাবোদের সঙ্গে দেখা হলে তারা মাথা নুইয়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে সম্মান জানাতে লাগল।

রাজবাড়ির ভেতরের ঘরে ঢুকে ওরা দেখল মোকা প্রদীপের আলোয় কী করছে। ওরা কাছে যেতে মোকা হেসে বলল—'আসুন।'

'পা কেমন আছে?'

'ভাল।' মোকা বলল।

ওরা দেখল মোকা ওর গায়ের কোহালহোর মতো একটা কাপড়ে কী আঁকছিল। গাছের ডাল থেঁতো করে তুলির মতো বানিয়েছে। ওরা যে পাথর গুঁড়ো করে রঙ বানায় শরীরে মুখে উল্কি আঁকার জন্য, তেমনি রঙ একটা চ্যাপ্টা পাথরে রাখা। হ্যারি জিজ্ঞেস করল—'ছবি আঁকছো?'

'হ্যাঁ, বলতে পারেন ছবিই। জানেন তো আমাদের মুখের ভাষা আছে—কিন্তু আপনাদের মতো কোনো অক্ষর নেই।আপনাদের জাহাজে থাকার সময় কিছু চামড়ার বই

আমি দেখেছি। তখনই ভেবেছি আমাদের ভাষায় লিখিত অক্ষর তৈরী করবো। সেইসব অক্ষর তৈরী করছি।

হ্যারি আর ফ্রান্সিস কথাটা শুনে খুশী হলো। হ্যারি মোকার কাঁধেই চাপড় দিয়ে বলল—'এই তো কাজের মতো কাজ। আমি আসবো। এই ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করবো।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।' মোকা হেসে বলল।

হ্যারি বলল—'অক্ষরগুলো তৈরী করতে খুব কল্পনার আশ্রয় নিও না। তোমরা মুখে গায়ে যে উল্কি আঁকো সেই রূপগুলো দিয়ে অক্ষর তৈরী করো। ইকাবোদের কাছে সেসব সহজবোধ্য হবে। পরিচিত উল্কি র রূপ দেখে ওরা তাড়াতাড়ি অক্ষর চিনতে পারবে।'

'ভালো কথা বলেছেন।' মোকা বলল—'আমি এদিকটা আগে ভাবিনি।'

মোকা আর হ্যারি অক্ষর তৈরীর পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলতে লাগল। ফ্রান্সিস চুপ করে কিছুক্ষণ ওদের কথা শুনল। তারপর একসময় বলল—'হ্যারি, এখন ওসব আলোচনা রাখো। মোকার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

'বেশ বলো।'

ফ্রান্সিস মোকাকে বলল—'দেখ মোকা, আমরা সারা কঙ্কাল দ্বীপ যথাসাধ্য ঘুরে ঘুরে দেখেছি। কিন্তু রূপোর নদীর কোন হদিস্ করতে পারছি না।'

'অনেকেই চেষ্টা করেছে। বাবাও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কেউ খুঁজে বের করতে পারেনি। মোকা বলল।

'আচ্ছা—রূপোর নদীর সম্বন্ধে তোমার বাবা কী বলতেন? সত্যিই কি রূপোর নদী ছিল?'

'বাবা বিশ্বাস করতেন যে রূপোর নদী ছিল। বাবা আমাকে একদিন বলেছিলেন যে তিনি নাকি ঠাকুর্দার মুখে শুনেছেন—রূপোর নদী বেরিয়েছে কঙ্কালের জটা থেকে।'

ফ্রান্সিস চমকে উঠলো। কঙ্কালের জটা মানে কঙ্কালের মাথার পেছন দিক। সেদিকে একটা নদী তো ওরাই গুহা থেকে বের করে দিয়েছিল। কিন্তু সে নদীর জলতো হলদেটে। সেটায় কি রূপোর গুঁড়ো আছে? দেখতে হয় তাহলে।

'আর কিছু বলতেন তোমার বাবা?'

'না। শুধু ঐ কথাই একদিন বলেছিলেন।'

'তোমার কী মনে হয়?'

'দেখুন, ঐ নিয়ে আমি ভাবি না। রূপো তো খাদ্য নয় যে ইকাবোরা খাবে। উত্তরের বন অনেকখানি পুড়ে গেছে। জন্তু-জানোয়ার, পাখি মারা গেছে। কিছু দিনের মধ্যে আমার প্রজাদের খাদ্যাভাব দেখা দেবে। আমি ঐ নিয়েই ভাবছি এখন।'

কথাটা শুনে ফ্রান্সিস খুব খুশী হলো। একজন দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন রাজার মতোই মোকার চিন্তা। ফ্রান্সিস বলল—'তোমাকে আর বিরক্ত করবো না। চলি।'

দুজনে ফিরে এল।

একটু রাত হতে ফ্রান্সিস আর হ্যারি নৌকো বেয়ে চলল জাহাজের দিকে। আজকে জ্যোৎস্না আরও উজ্জ্বল। সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় জ্যোৎস্না চিকচিক করছে। শান্ত হাওয়া বইছে।

ওরা যখন জাহাজের ডেক-এ উঠল—দেখল সব ভাইকিংরা উপস্থিত। বসে দাঁড়িয়ে

সবাই ফ্রান্সিসের জন্যে অপেক্ষা করছে।

ফ্রান্সিস একবার সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগল—'ভাইসব—যাত্রা শুরু করবার আগেই আমি বলেছিলাম অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করবার জন্যে আমাদের তৈরী থাকতে হবে। আমরা এখানে চড়ুইভাতি করতে আসিনি। রূপোর নদী খুঁজে বের করবার সংকল্প নিয়ে এসেছি। অবশ্য কষ্ট লড়াইয়ের দিন শেষ হয়েছে। এখন বুদ্ধির জোরে এগোতে হবে। তার জন্যে তোমাদের প্রয়োজন পড়বে হয়তো। কিন্তু সেটা পরে। এখন তো তোমাদের আনন্দেই দিন কাটছে। তবে অধৈর্য হয়ে উঠছো কেন?' ফ্রান্সিস থামল। কেউ কোনা কথা বলল না। ফ্রান্সিস আবার বলতে লাগল—'যা হোক আমাদের বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না। রূপোর নদীর হদিস পেতে আর দেরী নেই। কব্জির লড়াইয়ের দিন শেষ। এখন বুদ্ধির লড়াই চলছে। এ সময়ে তোমরা 'দেশে যাবো' এই বলে ঝামেলা বাড়িও না। এভাবে আমার মনের একাগ্রতা নষ্ট করো না। এটা আমার আদেশ নয়—অনুরোধ। ব্যাস্—আর আমার কিছু বলবার নেই। ফ্রান্সিস থামল কেউ কোনো কথা বলল না।



হ্যারি বলল—'যদি কারো কিছু বলার থাকে বলো। পরে যেন বাড়ি ফেরার বায়না তুলে ঘোঁট পাকিও না।'

একজন ভাইকিং বলল—'ফ্রান্সিস একটা কথা তুমি কি বিশ্বাস করো রূপোর নদী বলে কিছু আছে?'

'অবশ্যই।' ফ্রান্সিস বলল—'যেমন তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো এটা সত্য, তেমনি রূপোর নদী আছে এটা সত্য।'

'কবে নাগাদ এই রহস্য ভেদ করতে পারবে?' আর একজন ভাইকিং বলল।

'সেটা নির্ভর করছে রহস্যের সূত্রগুলোর ওপর। তবে যতদূর মনে হয় সপ্তাহখানেকের মধ্যেই এই রহস্যের একটা সমাধানে পৌঁছুতে পারবো।'

আর কেউ কোনো কথা বলল না। সভা ভেঙে গেল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডেকে বলল—'চলো আজকে কঙ্কাল পাহাড়টা ভালো করে দেখবো। ওটার মাথায় ওঠা যায় কিনা সে চেষ্টা করবো। অবশ্য প্রথমে দেখবো হলুদ জলের নদীটা।'

দুজনে বেরোল। সকালের ঝকমকে রোদে-ছাওয়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরের দিকে চলল। হলুদ জলের নদীটার কাছে এল। ফ্রান্সিস নদীটা ভালো করে দেখতে লাগল। নদীর দুধারে হলুদ রঙের স্তর জমে গেছে। ও কোমরের ফেট্টি থেকে একটুকরো বড়

ন্যাকড়া বের করল। নদীর জল একটা নারকেলের মালা দিয়ে তুলে ন্যাকড়ায় ছাঁকল। বেশ কয়েকবার। দেখা গেল ন্যাকড়ায় হলুদ স্তর জমে আছে। ফ্রান্সিস সেই স্তর আঙুল দিয়ে ঘেঁটে দেখে হতাশার ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়ল। ও রূপোর গুঁড়ো আশা করেছিল। দেখল—তেমন কোনোকিছুর চিহ্নমাত্র নেই।

এবার দুজনে চলল কঙ্কাল পাহাড়ের দিকে। চড়াই হয়ে উঠতে লাগল দুজনে। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল। পাহাড়টার মাথাটা নরকঙ্কালের মাথার মতো। চোখের একটা বড় গর্তও তাতে। আর একটা গর্ত অর্ধেকটা আছে। বাকীটা ভেঙে ধসে গেছে। হ্যারি সব দেখতে দেখতে বলল—'জানো, আমার কেমন সন্দেহ, এই মাথার পুরোটাই প্রকৃতির খেয়াল নয়। মোকাদের পূর্বপুরুষরা এই মাথার চোখ দুটো পাহাড় কুঁদে করেছে।'

ফ্রান্সিস ভালো করে দেখল চোখ দুটো। সত্যি সমান দূরত্বে দুটো গহ্বর। প্রকৃতির খেয়াল নাও হতে পারে।

ফ্রান্সিস মাথাটার দিকে তাকাল। তিন দিকই ঢালু। ওঠার উপায় নেই। একমাত্র যে চোখের গর্তটা ধসে গেছে সেখান দিয়েই ওঠা যেতে পারে। সেদিকে পরপর ভাঙা পাথর ছড়ানো। বোধহয় ভূমিকম্পেই এটা হয়েছে।

ফ্রান্সিস পশ্চিম দিকের ঐ ধসা জায়গাটায় এল। ভালো করে ছড়ানো পাথরগুলো দেখল। একটা দুটো করে পাথরে পা রেখে ওপরে উঠতে লাগল। চোখের গর্ত ছাড়িয়ে কপালের কাছে উঠে এল। আর ওঠার উপার নেই। ও লক্ষ্য করল কয়েকটা খোঁদল রয়েছে মাথার দিকে। সেগুলোতে পা রেখে রেখে একসময়ে ফ্রান্সিস বুক দিয়ে ঘষটে ঘষটে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছল। পরিষ্কার সব দেখা যাচ্ছে। উত্তর দিকে ইকাবোদের বসতি, কুনহা নদী, বনজঙ্গল সমুদ্র। দূরে ওদের জাহাজ।

এবার বুক চেপে আস্তে আস্তে দক্ষিণমুখো হলো। ঠিক নীচেই [illegible] মন্দির। ছ'টা রূপোর থাম। বাঁদিকে হলুদ জলের নদী বয়ে যাচ্ছে। বনজঙ্গল। তারপরেই সমুদ্র।

হঠাৎ এই দৃশ্যটাই ওকে নাড়া দিল। ও চমকে ভালো করে তাকাল। ঠিক এমনি একটা ছবি ও কোথায় দেখেছে। বাঁদিকে হলুদ নদী। সবুজ গাছের নক্সা। সারি সারি। ডানদিকে কী যেন একটা? হ্যাঁ—সাদা রঙের নদী। কিন্তু এখানে সেটা নেই। কোথায় দেখেছি—এমনি নক্সা ছবি? কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ—রাজা মোকার গায়ের কাপড়টা — কোহালহো, জাহাজে রোদ্দুরে শুকোচ্ছিল। ফ্রান্সিস চীৎকার করে উঠল—কোহালহো।

হ্যারি নীচ থেকে বলল—'কী হয়েছে?'

ফ্রান্সিস চীৎকার করে বলল—'রূপোর নদীর রহস্য— ভেদ করেছি। চলো মোকার কাছে।'

ফ্রান্সিস দ্রুত পাহাড়ের মাথা থেকে নামতে লাগল। হঠাৎ খোঁদল থেকে পা পিছলে গেল। পড়তে পড়তেও টাল সামলাল। উত্তেজনায় ওর সারা শরীর তখন কাঁপছে। ও সাবধান হলো। মাথা ঠাণ্ডা করে আস্তে আস্তে নামতে লাগল।

নীচে নেমেই ডাকল—'হ্যারি, শিগগির এসো।' বলে ছুটল রাজবাড়ির দিকে। পেছনে

হ্যারিও ছুটল।

রাজবাড়ির সামনের চত্বরে তখন বিচারসভা বসেছে। মোকা কোহালহো গায়ে দিয়ে কাঠের সিংহাসনে বসে আছে। সামনে একদল ইকাবো দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে মোকার সামনে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'মোকা—এখন তোমার বিচারসভা বন্ধ কর। জরুরি কথা আছে।'

'কী ব্যাপার ফ্রান্সিস? মোকা বেশ আশ্চর্য হলো।

'বলছি। তুমি ইকাবোদের যেতে বল।'

মোকা ওদের ভাষায় কিছু বলল। ইকাবোরা মোকাকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে চলে গেল।

ফ্রান্সিস বলল—'মোকা, মনে হচ্ছে রূপোর নদীর হদিস পেয়েছি।'

মোকার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মোকা জিজ্ঞাসা করলো,—'কোথায় তার হদিস পেলে? যা আমাদের পূর্বপুরুষরা খোঁজ করে পায়নি।'

ফ্রান্সিস বলল,—'সবচাইতে আশ্চর্যের জিনিস কি জানো? রূপোর নদীর হদিশের নক্সা তোমরা বংশপরম্পরায় বহন করে চলেছো।'

ফ্রান্সিস আবার বলল—'মোকা—তোমার গায়ের কোহালহোটা সিংহাসনের ওপর মেলে দাও। ভাঁজ খুলে।'

মোকা আরো আশ্চর্য হলো। তবু ফ্রান্সিস বলছে। কাজেই কোনো কথা না বলে গলায় নারকেলের দড়ি দিয়ে বাঁধা কোহালহোটা খুলে সিংহাসনের উপর মেলে দিল। সেই নক্সার ছবিটা। কঙ্কাল পাহাড়ের মাথা থেকে ফ্রান্সিস ঠিক এই ছবিটাই দেখেছে। শুধু দুটি জিনিষ নেই। গিয়ানির মন্দিরের একটা থাম আর ডানদিকে নদীর ধারাটা। একটা থাম পাখোরা চুরি করে নিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল—'দেখ তোমরা, আমি ছবির নক্সাগুলোর নাম দিচ্ছি। তাহলেই বুঝতে পারবে।

ফ্রান্সিস একে একে ছবিগুলোর নাম দিতে থাকল। তারপর একসময় নাম দেওয়া শেষ হলো;

ফ্রান্সিসের দেওয়া নাম দিয়ে ছবির নক্সাটা দাঁড়াল এরকম ঃ-

(নক্সা-ছবিটা পরপৃষ্ঠায় দেখুন)

হ্যারি আর মোকা ঝুঁকে পড়ে নক্সা-ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখল। হ্যারি বলল—'কিন্তু রূপোর নদী কোথায়?'

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—'ডানদিকে যে নদীটা চলে গেছে দেখ ওটা সাদা রঙের আঁকা। ওটাই রূপোর নদী।'

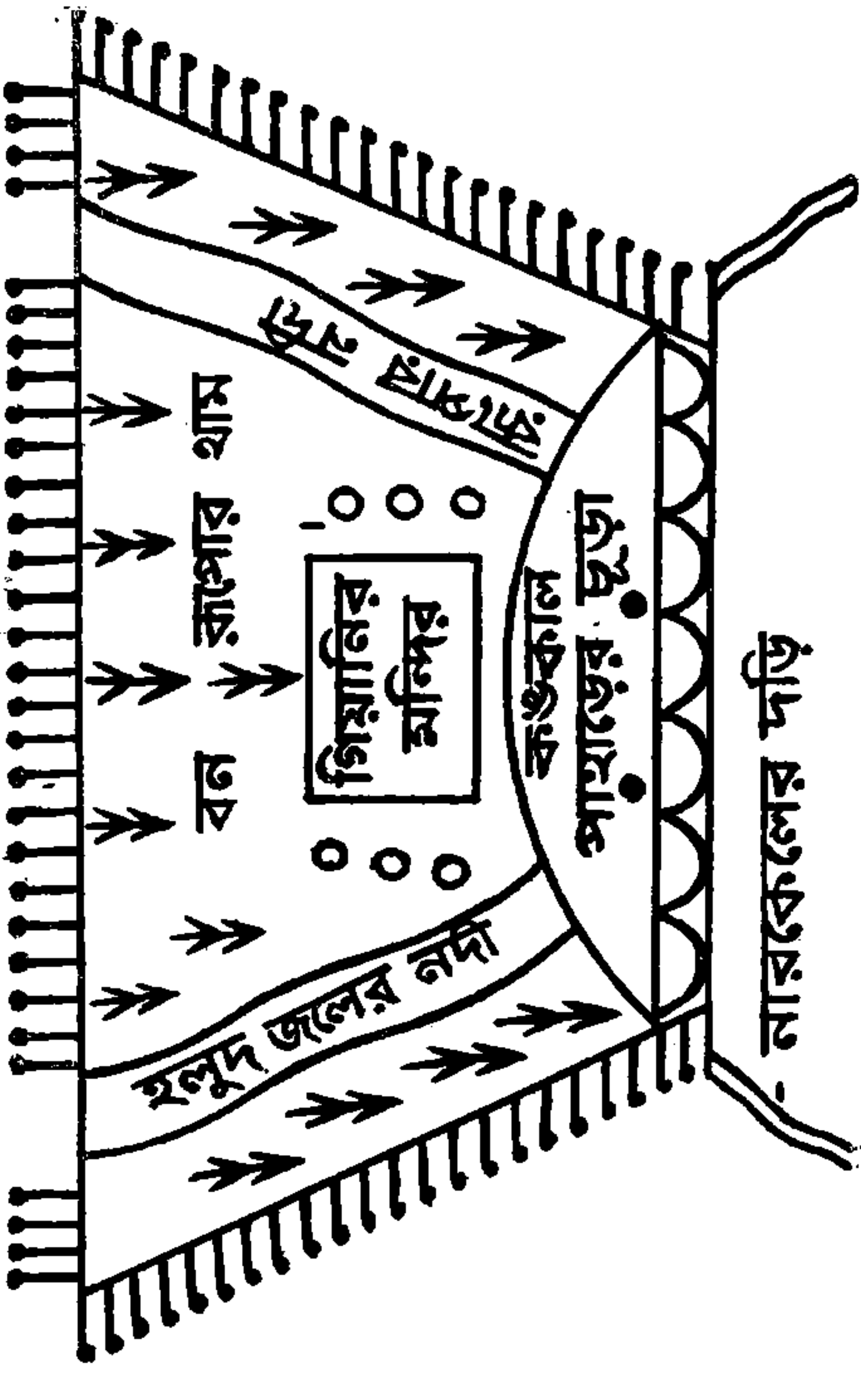
'কিন্তু কোনো নদীই তো ওদিকে নেই।'

'অতীতে ছিল। ভূমিকম্পে বা প্রাকৃতিক কোনো বিপর্যয়ে সেই নদীর উৎসমুখ বন্ধ হয়ে গেছে।'

'এখন কী করবে?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'সেই উৎসমুখটা খুলে দিতে হবে। তার জন্যে সকলের সাহায্য চাই। আমরা আর ইকাবোরা মিলে সেই উৎসমুখ খুলে দেব।'

মোকা বলল — ' কিন্তু সেই নদী থেকে কি রূপো পাওয়া যাবে?'


বন
রূপোর থাম
হলুদ জলের নদী
গিয়ানির মন্দির
রূপোর নদী
কঙ্কাল পাহাড়ের চূড়া
নারকেলের দড়ি

'নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।' ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারির দিকে ফিরে বলল—'হ্যারি চলো। কঙ্কালের বাঁ চোখের কাছে পশ্চিমদিকে যে ধস দেখা যায় সেদিকটা আমায় খুঁটিয়ে দেখতে হবে। রূপোর নদীর উৎস ওখানেই চাপা পড়েছে।'

দু'জনে উঠল। মোকা বলল—'চলুন, আমিও যাবো।'

ওরা চড়াই পেরিয়ে কঙ্কাল পাহাড়ের মাথার কাছে পৌঁছল। দেখল কঙ্কালের বাঁ চোখের কাছ থেকে পাথরের ধস নেমেছে। ফ্রান্সিস ভাঙা পাথর ধুলোবালির স্তূপ ভালো করে দেখতে লাগল। হঠাৎ নজরে পড়ল নীচে একটা খুব সরু জলধারা নেমে গেছে। ও বলে উঠল—'দেখ তোমরা—এখানে কোথাও নিশ্চয়ই জমা জলের স্তর আছে। নইলে ঐ সরু ঝর্ণা থাকত না।'

'ঐ সরু ঝর্ণাই অনেকদিন থেকে দেখছি আমরা। তবে মাঝে মাঝে ওটা শুকিয়ে যায়। বলল মোকা।

'হতে পারে।' ফ্রান্সিস বলল—'তবু এই জায়গাই আমাদের খুঁড়তে হবে। হ্যারি—কাল সকাল থেকেই আমরা খোঁড়ার কাজ শুরু করবো। তুমি জাহাজে বন্ধুদের খবর দিয়ে এসো। মোকা—তুমি ইকাবোদের বলো তারা যেন আমাদের সাহায্য করে।'

মোকা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

ফ্রান্সিস ও জায়গাটায় দাঁড়িয়ে হ্যারি আর মোকাকে কাছে ডাকল। বলল—'ঠিক আমার দৃষ্টি বরাবর নীচের দিকে তাকিয়ে দেখ। কল্পনা কর ঐ নক্সা-ছবির মতো একটা নদী বয়ে গেছে। স্পষ্ট সেই ধারার গতিপথটা দেখতে পাবে। লক্ষ্য করে দেখ সেই গতিপথে শুধু ধুলোবালি আর পাথর । কোন গাছ জন্মায় নি ।

'গাছ জন্মায়নি কেন?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই ওখানে রূপোর স্তর জমেছিল। রূপোর স্তরে গাছ জন্মাবে কী করে? ওপরের মাটিতে কিছু ঘাস জন্মেছে শুধু।'

ওরা ফিরে এল।

সেইদিনই খবরটা রটে গেল—রূপোর নদীর হদিস পাওয়া গেছে। খুঁজে বের করা হবে নদী।

সকাল থেকেই দলে দলে ইকাবো মেয়ে পুরুষ বাচ্চা ছেলেমেয়েরা জড়ো হলো সেখানে। কিছু পরে হ্যারি ভাইকিংদের জাহাজ থেকে নেমে এল। সঙ্গে আনল গাঁইতি, কুড়ুল, কাছি আর হাতুড়ি।

ফ্রান্সিস, আর মোকা এসে পড়েছে তখন। ফ্রান্সিস জায়গা নির্দিষ্ট করে দিল।

শুরু হলো পাথরের স্তূপ সরানোর কাজ। ইকাবোরাও হাত লাগাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাথরের স্তূপ সরাতে দেখা গেল একটা গুহার মুখ। গুহার নীচের দিকটার পাথরের স্তর ভেজা। ফ্রান্সিস বুঝল কাছেই কোথাও জল আছে। সেই জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে এসে জায়গাটা ভিজিয়ে দিয়েছে।

গুহায় ঢুকল ফ্রান্সিস। সঙ্গে বিস্কো আর হ্যারি। বাইরের আলো অল্পই আসছে। বেশ অন্ধকার অন্ধকার ভাব।

একটু এগোতেই ফ্রান্সিস দেখল—একটা বড় গহ্বর নেমে গেছে। ফ্রান্সিস পেছনে দাঁড়ানো বিস্কোকে বলল—'কাছি আর একটা জ্বলন্ত মশাল আনো। কাছিটা ঝুলিয়ে দাও।'

বিস্কো নিয়ে এল সেসব। ফ্রান্সিস মশালটা হাতে নিয়ে ঝোলানো কাছি ধরে ধরে

নামতে লাগল। এক মানুষসমান নামতেই পায়ে ঠেকল একটা পাথরের চাই। ও দেখল এই পাথরের চাঁইটা গহ্বরের মুখটা বুজিয়ে দিয়েছে। হয়তো ওপর থেকে পড়েছিল। পাথরের চাঁইটা ভেজাভেজা। তার মানে নীচে জল আছে।

ফ্রান্সিস মুখ তুলে বলল—'বিস্কো, কয়েকজনকে নামতে বলো। এই পাথরের চাঁইটা ভাঙতে হবে।'

মশালটা পোঁতা হলো পাথরের খাঁজে। ফ্রান্সিস একটা চুনা পাথরের টুকরো দিয়ে চাঁইটার মাঝবরাবর দাগ দিল। সবাইকে বলল—'এই দাগ বরাবর ঘা মারো, যত জোরে পারো।'

পাঁচ ছ'জন কাছি ধরে নামলো। শুরু হলো পাথরের চাইটার ওপর গাঁইতি, কুড়ুল আর বড় বড় হাতুড়ি চালানো। গাঁইতি কুড়ুলের ঘা পড়তে লাগল পাথরের ওপর। আগুনের ফুলকি ছিটকোতে লাগল।

একদল পরিশ্রান্ত হলে অন্য দল নামছে। এইভাবে ঘা মারা চলল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল ঘা মারা।

হঠাৎ পাথরের চাঁইটা ফেটে গেল। যারা হাঁতুড়ি গাঁইতি চালাচ্ছিল ওটার ওপর দাঁড়িয়ে তারা কিছু বোঝার আগে পাথরের চাঁইয়ের একটা অংশ ভেঙে পরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তোড়ে জল উঠতে লাগল। মুহূর্তে গহ্বরটা জলে ভরে গেল। যারা গাঁইতি, হাতুড়ি চালাচ্ছিল তারা কাছি ধরে একে একে উঠে এল। জল গুহার মুখ দিয়ে ছুটল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে, আশ্চর্য! জল সাদাটে। পরিষ্কার। গুহা থেকে জল বেরোতে দেখে বাইরে দাঁড়ানো সবাই উল্লাসে চিৎকার করে উঠল।

মশাল নিভে গেছে। ফ্রান্সিস প্রায় অন্ধকারে জলভরা গহ্বরটায় নামল কাছি ধরে। এক ডুব দিয়ে দেখল পাথরের চাঁইয়ের একটা অংশ ভেঙে উল্টে যাওয়াতে অন্য পাথরের চাঁইটাও আলগা হয়ে গেছে। ও জল থেকে মুখ তুলল। কিছুক্ষণ শ্বাস নিল। তারপর দম বন্ধ করে আবার ডুব দিল। হাতের কাছিটা সেই আলগা চাঁইটার চারিদিকে বাঁধল। এটা করতে তিন-চারবার ওকে ডুব দিতে হলো জলে। মুক্তোর সমুদ্রে যাবার আগে ও অনেকক্ষণ জলে ডুবে থাকার অভ্যাস করেছিল। সেটা কাজে লাগাল। এবার উঠে এল। সবাইকে বলল—'চলো সব গুহার বাইরে। ওখান থেকে আমরা কাছি ধরে টানবো। চাঁইটা তাহলেই কাত হয়ে যাবে, আরো জল উঠবে তখন। সেই জলের তোড়ের সামনে আমরা হয়তো ভেসে যেতে পারি।'

সবাই গুহার বাইরে এল। শুরু হল কাছি টানা। একটু পরেই পাথরের চাঁইটা কাত হয়ে গেল। বেশ জোরে গুহার মুখ থেকে জলের ধারা বেরিয়ে এল। বাইরে নুড়ি পাথরের ধুলোবালি সব ভাসিয়ে নিয়ে চলল। এবার জলধারা একটা নদীর চেহারা নিল। সবাই গুহার মুখ থেকে সরে দাঁড়াল।

জলে ভেজা কাপড়-চোপড় নিয়ে ফ্রান্সিস একটা পাথরের ওপর বসল। কিন্তু এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে বসে থাকতে পারল না। শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। যারা এতক্ষণ গাঁইতি কুড়ুল চালাচ্ছিল তারাও এখানে ওখানে বসে পড়ল, কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। ইকাবোরা তখনও আনন্দে হৈ হৈ করছে।

ওদিকে রূপোর নদীর ধারা বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। নুড়ি পাথর ধুলোবালির মধ্যে দিয়ে।

একসময় ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকল । হ্যারি এল । ফ্রান্সিস বলল — 'নদীটার জলের রঙ দেখেছো ?'

'হ্যাঁ সাদাই।'

'একটা ন্যাকড়ার জল নিয়ে ছেঁকে দেখ তো কিছু তলানি পড়ে কিনা ।'

কিছুক্ষণ পরে হ্যারি ফিরে এল । হেসে বলল—সাবাস ফ্রান্সিস । তোমার অনুমানই ঠিক । ন্যাকড়ায় গুঁড়ো গুঁড়ো রূপোর আস্তরন পড়েছে । অবশ্য খুব অল্প।

'হতেই হবে' । ফ্রান্সিস বলল 'দীর্ঘদিন ধরে নদীর নীচে এই স্তর পুরু হয়ে জমত । তাই থেকেই ইকাবোরা রূপো তুলতো ।'

সন্ধ্যে হয়ে গেল । ভাইকিংরা জাহাজে ফিরে গেল । ইকাবোরা নিজেদের বসতিতে। ফ্রান্সিস ও হ্যারি নিজেদের আস্তানায় ।

পরদিন। একটু বেলা হয়েছে তখন । ফ্রান্সিসের সবে ঘুম ভেঙেছে । হ্যারি উঠে পড়েছে। মুখ ধুচ্ছে ।

হঠাৎ মোকা ছুটতে ছুটতে এল । হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,'শিগগির দেখবেন আসুন।'

'কী হয়েছে' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল ।

'রূপোর স্তর পাওয়া গেছে।'

'সত্যি ? হ্যারি চমকে উঠল ।

ফ্রান্সিস হাসল— 'ঐ নদীই আসল রূপোর নদী । কুন্‌হা নয় । ওরা আর দেরী করল না দ্রুত পায়ে চলল নদীর দিকে ।

সত্যিই রূপোর স্তর । নদীর জল ওপরের ছোট পাথর ধুলো-বালি মাটি সরিয়ে দিয়েছে। বড় বড় কিছু পাথর পড়ে আছে । সেসবের আড়ালে নীচে রূপোর স্তর দেখা যাচ্ছে । গুহা সামনেই সেই স্তরটা স্পষ্ট দেখা গেল । প্রায় এক হাত পুরু নিরেট রূপোর আস্তরণ দেখা গেল । তারপর থেকে পাথর জমা । ওগুলোর নীচটা এখনও পরিষ্কার হয়নি।

'এত রূপো ? এ যে কল্পনাতীত ।' মোকা চীৎকার করে বলে উঠল ।

'মোকা—নইলে মন্দিরের অতগুলো থাম নিরেট রূপোর তৈরি হলো কি করে ? ফ্রান্সিস বলল ।

—তবে একটা কথা । তোমাদের কুনহা নদীটা শুকিয়ে যাবে ।

—'বলেন কি ?' মোকা আশ্চর্য হ'ল ।

—হ্যাঁ। কারণ আমার যতদূর মনে হয়— অতীতে কোন সময় কঙ্কাল দ্বীপে প্রচণ্ড ভুমিকম্প হয়েছিল । তাতে রূপোর নদী আর হলুদ জলের নদীর উৎস গলিত লাভা পাথরের ধ্বংসের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল । তখনই সৃষ্টি হয়েছিল কুন্‌হা নদী । অন্য এক উৎস থেকে । এখন রূপোর নদী আর হলুদ জলের নদী মুক্ত হয়েছে । তার ফলে অতীতের কঙ্কাল দ্বীপের ভৌগোলিক বিন্যাস আবার অতীতের রূপ নিয়েছে । কুনহা নদী আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে। থাকবে শুধু রূপোর নদী আর হলুদ জলের নদী । অবশ্য এগুলো নামেই নদী । আসলে একটা বড় আকারের ঝর্ণা ।

—আচ্ছা হলুদ নদীতে রূপোর গুঁড়া নেই কেন ? হ্যারি জিজ্ঞেস করল ।

—তার কারণ দু'টো নদীরই উৎস এক হলেও রূপোর নদী রূপোর গুঁড়ো মেশানো পাথরের স্তরের মধ্যে দিয়ে এসেছে । কিন্তু হলুদ জলের নদী এসেছে গন্ধকের স্তরের মধ্য

দিয়ে ।'তাই নদী দুটোর জলের রংএও পার্থক্য রয়েছে ।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের আস্তানায় ফিরে চলল ।ইকাবোরা তখনও রূপোর নদীর দু'ধারে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে ।

জাহাজ থেকে ভাইকিংরা আনন্দে হৈ হৈ করে এল ।রূপোর নিরেট আস্তরণ দেখে হতবাক । মাঝে মাঝেই ওরা চিৎকার করে উঠতে লাগল–'ও –হো– হো।'

রাত তখন গভীর ।নিজেদের আস্তানা তাসক ঘাস বিছানো বিছানায় ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘুমিয়ে আছে । ঘরটায় ম্যাকরেল মাছের তেলের আলো জ্বলছে ।

হঠাৎ কার ডাক শুনে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল ।কান পাতল ।ওর বাম ধারে আবার কে ডাকল ।বুঝল – মোকা ডাকছে ।উঠে বসল ।হ্যারি বলল– 'মোকা ডাকছে মনে হচ্ছে ।

–হ্যাঁ ।' ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে পাথুরে মেঝেয় দাঁড়াল ।

– এত রাতে ডাকাডাকি করছে ।কী ব্যাপার ?

–'দেখি।' ফ্রান্সিস বলল ।।

–'তরোয়াল নিয়ে যাও।' হ্যারি বলল ।

–না-না বিপদের কিছু নেই ।

সিডার গাছের কাঠের তৈরী দরজার পাল্লাটা খুলল ফ্রান্সিস ।দরজাটা তখনও সম্পূর্ণ খোলা হয় নি ।দু'তিন জন লোক এক ধাক্কায় দরজার সবটা খুলে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ।হঠাৎ এই ধাক্কায় ফ্রান্সিস মেঝের ওপর পড়ে গেল ।সঙ্গে সঙ্গে দু তিনজন ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ।উঠে দাঁড় করাল ।তারপর হাতদুটো টেনে নিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল ।ওদিকে আরো কয়েকজন ছুটে গিয়ে হ্যারির ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়ল। হ্যারি কিছু বোঝার আগেই ওর দু'হাত পেছনে নিয়ে বেঁধে ফেলল ।

এবার দরজা দিয়ে মোকা ঢুকল ।ঘরের মৃদু আলোতে ফ্রান্সিস দেখল মোকার মুখ ভয় কাতর । মোকার পিঠে তরোয়াল ঠেকিয়ে আর একজন লোক ঢুকল। তার মাথায় কাঁচা পাকা বাবড়ি চুল ! মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফ। লোকটার কাঁচাপাকা ভুরুর নীচে চোখদুটো কেমন রহস্যময় ।হাসল লোকটা । মোটা গলায় বলল-'ভাইকিং দেশের শ্রেষ্ঠ বীর ফ্রান্সিস –আমাকে চিন্তে পারো? তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল লোকটার মুখের দিকে ।চিনতে দেরী হ'ল না ।লোকটা পাঞ্চো ।সেই নিজের দেশে সমুদ্রের ধারের এক সরাইখানায় এই পাঞ্চোর সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল ।এই পাঞ্চোর মুখেই ও প্রথম শুনেছিল-রূপোর নদীর কথা ।ফ্রান্সিস বলল-'হ্যাঁ চিনেছি ।তুমি পাঞ্চো ।পাঞ্চো হাসল ! বলল-'তোমরা সেই বন্দর থেকে জাহাজ চুরি করে পালালে ।আমরাও একটা ছোট জাহাজে চড়ে তোমাদের পিছু নিলাম ।তোমরা কঙ্কাল দ্বীপে এলে ।আমরাও পশ্চিমদিকের জঙ্গলের আড়ালে জাহাজ লুকিয়ে প্রতীক্ষায় রইলাম ।ত্রিস্তানদের সঙ্গে যুদ্ধ হল ।ত্রিস্তানরা যুদ্ধে হেরে গেল। নিজেদের দ্বীপে চলে গেল ।সবই দেখেছি আমরা ।' পাঞ্চো থামল । তারপর বলতে লাগল 'ঠিক জানতাম নদীর হদিশও তুমিই বের করবে যা আমরা কখনই পারবো না ।তাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একজন লোক ইকাবোদের পোশাক পরে সব সময় থাকতো ।তারপর জানলাম–তুমি রূপোর নদী আবিষ্কার করেছো ।ফ্রান্সিস আমি জানতাম একমাত্র তুমিই এই ধাঁধার সমাধান করতে পারবে ।'

–'এখন কী চাও ?' ফ্রান্সিস ক্ষুব্ধস্বরে বলল ।

— এই ঘরে তোমাদের বন্দী করে রাখবো । তোমাদের জাহাজের বন্ধুরা এ কথা জানতেও পারবে না'। মোকাকে বন্দী করব না । ওকে সব সময় আমাদের সঙ্গে রাখবো । ইকাবোরা তাদের রাজাকে মুক্তই দেখবে । ওদের মনে কোন সন্দেহ হবে না ।

–তারপর ?' ফ্রান্সিস জানতে চাইল ।

–তারপর আসল কাজ । গিয়ানি মন্দিরের সব কটা রূপোর থাম আমাদের জাহাজে নিয়ে যাবো। রূপোর নদী থেকে যতটা রূপো সম্ভব কেটে নেব । ইকাবোদের মনে কোন সন্দেহ হবে না। ওরা ভাববে রাজাই এসব আমাদের দিচ্ছে । কেউ বাধা দেবে না । ওদিকে তোমাদের জাহাজের বন্ধুরা কিছু বোঝার আগেই আমরা জাহাজ ছেড়ে দেব । দেশে ফিরে তালতাল রূপো বিক্রি করে আমি রাজার হালে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব ! পাঙ্কো হা হা ক'রে হেসে উঠল।

— অত সহজে সব কাজ হাসিল করতে পারবে না'পাঙ্কো ?

— তুমি বাধা দেবে ?

— আমি তো বন্দী । কিন্তু জাহাজে আমার বন্ধুরা রয়েছে । দু'তিন দিন আমাদের কোন খবর না পেলেই খোঁজ করতে এখানে আসবে । তখন ? তোমরা তো দশ বারো জন। আমরা তিরিশ । পারবে মোকাবিলা করতে ?

— তার আগেই আমরা কাজ হাসিল করবো ।' দাড়ি গোঁফের ফাঁকে পাঙ্কো হাসল।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল । কী ভাবল কিছুক্ষণ । তারপর বলল–

— কিন্তু পাঙ্কো - রূপোর চেয়েও অনেক দামী জিনিস রয়েছে এই দ্বীপে ।' পাঙ্কো স্পষ্ট চমকে উঠল । বলল - 'কী জিনিস ?'

— সোনা ।

— সোনা ?' পাঙ্কো লাফিয়ে উঠল । বলল–'তুমি তার খোঁজ জানো ?'

— না ।

পাঙ্কো এক লাফে ফ্রান্সিসের সামনে এসে দাঁড়াল । তরোয়ালের ডগাটা ফ্রান্সিসের কণ্ঠনালীতে চেপে ধরল । দাঁতচাপা স্বরে বলল–' তুমি নিশ্চয়ই জানো । বলো সেই সোনা কোথায় ? ফ্রান্সিস নির্বিকার ভঙ্গীতে বলল–' দেখ পাঙ্কো আমি যদি সেই সোনার হদিস জানতাম তাহলে তোমাকে আগ বাড়িয়ে বলতে যেতাম না ।'

–'হুঁ' ।' পাঙ্কো তরোয়াল সরিয়ে নিল ।– কিন্তু তুমি কি নিশ্চিত যে এখানে সোনা আছে ।

—হ্যাঁ রূপোর স্তরের মত সোনার স্তর ।

—বলো কি !

—হ্যাঁ । তবে সেই ধাঁধার সমাধান মাথা খাটিয়ে বের করতে হবে ।

—কোথায় রয়েছে সেই ধাঁধার সমাধান ?

—ঐ যে — মোকার গায়ে জড়ানো কোহালহোর মধ্যে । পাঙ্কো মোকার গায়ের কোহালহোর দিকে তাকাল । কিছুই বুঝল না । অস্পষ্ট হ'য়ে আসা কিছু নক্সা আঁকা ওটাতে।

—ওটা পেলে তুমি সোনার হদিশ করতে পারবে ?

—চেষ্টা করতে পারি ।'

পাঙ্কো মোকার দিকে তাকাল । বলল— 'মোকা— তোমার গায়ের ঐ কাপড়টা খুলে দাও।'

—না । মোকা ঘাড় নাড়ল । বলল—'এটা গিয়ানির মন্ত্রপূত কোহালহো । এটা খুলতে পারবো না ।' পাঞ্চো রুখে উঠল । তরোয়াল উঁচিয়ে মোকাকে বলল— 'এক্ষুণি ওটা খুলে দে । নইলে তোর মাথা কেটে ফেলে ওটা নেব । পাঞ্চোর চোখ দু'টো জ্বলতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল— ওটা না পেলে পাঞ্চো নির্ঘাত মোকাকে হত্যা করবে । 'ফ্রান্সিস ডাকল— 'মোকা' ?

—'কী?' মোকা ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল ।

—কোহালহোটা এর আগেও আমাকে দিয়েছো । এবারও দাও । আমি কোহালহোর পবিত্রতা নষ্ট হ'তে দেব না ।

—কিন্তু—'

—আমি জানি মোকা । কোহালহো তোমরা কখনও হাতছাড়া করো না । সেদিন জাহাজে কোহালহো রোদে শুকাতে দিয়ে তুমি প্রচণ্ড রোদের মধ্যে সারাদিন কোহালহোর সামনে বসে ছিলে । তবু আমার অনুরোধ —আজকে রাতের মত কোহালহোটো আমার কাছে দাও। দেখি ধাঁধার সমাধান করতে পারি কিনা । পারি বা না পারি— কালকেই তোমার কোহালহো ফিরিয়ে দেব । মোকা মাথা নীচু করে দাড়িয়ে রইল একটুক্ষণ । তারপর গা থেকে কোহালহোটা খুলতে খুলতে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল — 'ফ্রান্সিস— আপনি আমাদের প্রাণে বাঁচিয়েছেন । আপনার কাছে আমি অশেষ ঋণী । শুধু আপনি চাইলেন— তাই এই কোহালহো আপনাকে দিলাম ।

'—তুমি নিশ্চিত থাকো মোকা— এর পবিত্রতা রক্ষা করবো ।' ফ্রান্সিস বলল।

'পাঞ্চো এবার সঙ্গীদের হুকুম করল— এই দু'জনকেই দু'টো খুঁটির সঙ্গে বাঁধো ।' ওর সঙ্গীরা এগিয়ে এল । ফ্রান্সিস এবার মোকাকে বলল —মোকা— তোমার কোহালহোটা আমার সামনে মেঝেতে পেতে দাও । আমি ধাঁধার সমাধানটা বের করবো ।'

মোকা গা থেকে কোহালহোটা খুলে ফ্রান্সিসের সামনে রাখলো ।

হঠাৎ মোকা উবু হয়ে শিস দিয়ে উঠল । পাঞ্চো দ্রুত ছুটে এসে মোকার মাথার ওপর তরোয়াল উঁচিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল —'শিস দেওয়া বন্ধ কর— নইলে—; মোকা শিস দেওয়া বন্ধ করল । পাঞ্চো বলল— 'তোমাদের শিস দিয়ে খবর পাঠানোর ব্যাপারটা আমি জানি । সাবধান— আর শিস দেবে না '। তারপর পাঞ্চো দলের সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল—'মোকাকে শিস দিতে দেখলেই মেরে ফেলবে ।' পাঞ্চোর এই হুকুমের অর্থটা সঙ্গীরা বুঝল না । তবে মাথা ঝাঁকিয়ে ওরা বোঝার ইঙ্গিত করল ।

মোকা বলল— 'ফ্রান্সিস- আপনাদের বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম । কিন্তু হ'ল না । আমাকে ক্ষমা করুন ।

'—তুমি এই নিয়ে মন খারাপ করো না মোকা'— ফ্রান্সিস বলল ।

পাঞ্চো বলল — 'ফ্রান্সিস তুমি ধাঁধার সমাধান করবার চেষ্টা কর । সোনা আমার চাই।

—চেষ্টা করবো সমাধান বের করতে ।

—তোমাকে একদিন সময় দিলাম । যদি না পারো— তোমাদের দু'জনকে খতম করে জাহাজে উঠব গিয়ে । তারপর দেশের দিকে পাড়ি জমাবো । জলদি — সময় নেই ।

পাঞ্চো তার সঙ্গীদের আর মোকাকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । বাইরে থেকে ঘরের দরজা ভালো করে বন্ধ করে দিল । ঘরের বাইরে বারন্দায় পাঞ্চোর এক

সঙ্গী তরোয়াল হাতে পাহারা দিতে লাগল ।

পাঙ্কো ওরা চলে যেতে চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল ।

এবার হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল— 'তুমি ঠিক জানো আর একটা সোনার স্তর আছে এই দ্বীপে ?

—পাগল হয়েছো । আর কিছু নেই এই দ্বীপে ।

— তাহ'লে তুমি সোনার স্তরের কথা বললে কেন ?

—'এবার সেটা বুঝবে।'

এই ব'লে ফ্রান্সিস খুঁটির সঙ্গে বাঁধা শরীরটা উঁচু করে তুলে বসল । বলল । হ্যারি- এবার আলোটা আমার বাঁধা হাত দুটোর কাছে তোমার পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে এস।

হ্যারি পা বাড়িয়ে ঠেলে ঠেলে আলোটা ফ্রান্সিসের বাঁধা হাত দু'টোর দিকে এগিয়ে আনতে লাগল । আলোটা একটা মাটির পাত্র । তাতে তেল ভরা । পলতে করা হয়েছে গাছের পাতলা আঁশ দিয়ে ।

ফ্রান্সিস বলল— 'হ্যারি— যদি পাঙ্কোকে বলতাম আলোটা আমার কাছে এনে দাও তাহলে ওর সন্দেহ হ'ত । ও কিছুতেই আলোটা কাছে রাখতে দিত না । কিন্তু ঐ ধাপ্পাটা দিতেই ও কোন আপত্তি করল না । এবার দেখ ।

ফ্রান্সিস এবার দঁড়ি বাঁধা হাত দু'টো আলোর শিখার ওপর রাখল । বাঁধা দড়িটা পুড়তে লাগল । সেইসঙ্গে ফ্রান্সিসের হাতের কব্জিও । কিন্তু ফ্রান্সিস দাঁত চেপে কব্জি পোড়ার অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগলো । আস্তে আস্তে দড়িটা পুড়ে যেতে লাগল । বেশ কিছুটা পুড়ে যেতেই ফ্রান্সিস দুহাতে হ্যাচকা টান দিল । পোড়া দড়ি ছিড়ে গেল । ফ্রান্সিস এক লাফে উঠে দাঁড়াল । দু'হাতের কব্জি তখন পুড়ে কালো হয়ে গেছে । অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল । ছুটে গেল বিছানার কাছে । শিয়রের কাছে রাখা তরোয়ালটা নিল । তরোয়ালটা নিয়ে এল হ্যারির কাছে । দ্রুত হাতে তরোয়াল ঘষে হ্যারির হাতের বাঁধন খুলে ফেলল । হ্যারিও লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল । বিছানায় শিয়রের পাশ থেকে ওর তরোয়ালটা তুলে নিল ।

ফ্রান্সিস চিৎকার করতে লাগল—' পাহারাদার শিগগির এসো — ঘরে আগুন লেগেছে। আগুন-আগুন।' পাহারাদার তাড়াতাড়ি ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ঘরের ভেতরে ঢুকল । দরজার আড়ালেই দাঁড়িয়েছিল ফ্রান্সিস । ও ডান পা'টা বাড়িয়ে দিল । ফ্রান্সিসের পায়ে হোঁচট খেয়ে পাহারাদার উবু হয়ে ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল । ফ্রান্সিস ওর তরোয়ালের বাঁট দিয়ে পাহারাদারের ঘাড়ে মারল । লোকটা আর মেঝে থেকে উঠল না । জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল— 'হ্যারি শিগগির —ছোটো ।' বলেই ফ্রান্সিস লাফিয়ে ঘরটার বাইরে চলে গেল । পেছনে হ্যারিও এল । দু'জন ছুটল সমুদ্রতীরের দিকে ।

অন্ধকার রাত। আকাশে অজস্র তারা । সমুদ্রের দিক থেকে জোরালো হাওয়া বইছে ।

ফ্রান্সিস ধ্রুবতারাটা দেখে নিল । তারপর দিকটা ঠিক রেখে ছুটল উত্তর- পূর্ব মুখে সমুদ্রের ধার ঘেঁসে গাছগাছলির গায়ে ওদের নৌকো বাঁধা আছে । নৌকা খুঁজে বের করে নৌকো চড়ে জাহাজে উঠবে গিয়ে ।

দু'জনে অন্ধকার পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ছুটল ।

সমুদ্রের ধারে বনজঙ্গলের কাছে যেসময় পৌঁছল তখন পুব আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সূর্য উঠতে বেশী দেরী আর নেই।

ফ্রান্সিস সমুদ্রের ধারের জংলা এলাকাটায় ওদের নৌকা দুটো খুঁজতে লাগল। আশ্চর্য! একটা নৌকোও নেই। ফ্রান্সিস বুঝল—এসব পাঞ্জোর কাজ। নৌকাগুলো লুকিয়ে রেখেছে কোথাও যাতে ফ্রান্সিসরা ওদের জাহাজের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতে না পারে।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল— 'হ্যারি পাঞ্জো নিশ্চয় সব নৌকা লুকিয়ে রেখেছে। আমাকে সাঁতার কেটে জাহাজে যেতে হবে। তুমি পারবে না অত কষ্ট করতে। তুমি বনের আড়ালে লুকিয়ে থাকো। আমি বন্ধুদের নিয়ে আসছি।'

—বেশ তো। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিল। আগুনে পোড়া দুহাতের কব্জিতে সমুদ্রের নোনা জল লাগতে অসহ্য জ্বালা করে উঠল। ওর মুখ দিয়ে চাপা আর্তস্বর বেরিয়ে এল। তবু ফ্রান্সিস দুহাতে জলকেটে সাঁতরে চলল জাহাজের দিকে।

আকাশটা অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে। দূরে জাহাজটা দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস সাঁতরে চলল। তখনই সূর্য উঠল পূর্ব আকাশে। খুবই পরিচিত দৃশ্য। তবুও আজকে বড় ভাল লাগল সূর্য ওঠা দেখতে। বন্দীজীবন থেকে মুক্তি, বন্ধুদের কাছে যাচ্ছে এসবের জন্যও ওর মন খুশী আজকে।

সাঁতরে চলল ফ্রান্সিস। সকালের রোদ ছড়িয়ে পড়ল সমুদ্রের জলে। জাহাজ আর বেশী দূরে নয়। অনেকখানি সাঁতরে আসতে হলো ওকে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে শরীর। হাতের কব্জি জ্বলছে। সমুদ্রের নোনা জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে।

একসময় জাহাজের কাছে এসে পৌঁছল। ঝোলানো দড়ি দড়া ধ'রে উঠতে গেল। কিন্তু শরীর আর বইছে না। হাতে জোর পাচ্ছে না যে দড়ি ধরে উঠবে।

ফ্রান্সিস দড়ি ধরে হাঁপাতে লাগল। বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে চিৎকার করে ডাকাল — বিস্কো।' কিন্তু কেউ শুনতে পেরেছে বলে মনে হল না। আবার পর পর দুবার ডাকল 'বিস্কো বিস্কো।'

এবার রেলিঙ ধ'রে কে মুখ বাড়িয়ে দেখল। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলে উঠল — 'দড়ির মই নামাও।' ভাইকিংটি এবার ফ্রান্সিসকে চিনতে পারলো। ও ছুটল। সবাইকে খবর দিতে। একটু পরেই সবাই এসে জড়ো হ'ল রেলিঙের ধারে। তাড়াতাড়ি দঁড়ির মই নামিয়ে দিল। ফ্রান্সিস দড়ির মই বেয়ে বেয়ে জাহাজে উঠে এল।

সবাই এসে ফ্রান্সিসকে ঘিরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস তখনও হাঁপাচ্ছে। বিস্কো বলল - 'ফ্রান্সিস কী হয়েছে ? সব শুনে বিস্কো বলল—'হ্যারির কোন বিপদ হবে নাতো ?'

—না। ওকে বনের আড়ালে রেখে এসেছি।

—তাহলে এখন কী করবে ?

—লড়াই— পাঞ্জোর দলের সঙ্গে।

সবাই চিৎকার ক'রে উঠল—'ও-হো-হো-হো—'

জাহাজের বদ্যিকে খবর পাঠানো হল। বদ্যি এল। ফ্রান্সিসের আগুনে পোড়া দু'হাতের কব্জিতে ওষুধ লাগিয়ে দিল। জ্বালা যন্ত্রণা কমল।

ফ্রান্সিস সবাইকে বলল— 'আমি ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নেব। এর মধ্যে সবাই তৈরী

হয়ে নাও।'

ঘন্টাখানেক কাটল। সবাই খাওয়া দাওয়া সেরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে এল। ফ্রান্সিসও খেয়ে দেয়ে তৈরী তখন।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল নৌকো নিয়ে। মাত্র দুটো নৌকো রয়েছে। বাকী তিনটে নৌকো তো কঙ্কাল দ্বীপে রয়েছে। পাঙ্খো লুকিয়ে রেখেছে সেগুলো।

ফ্রান্সিস বলল— 'দুটো নৌকোতেই আমরা দফায় দফায় দ্বীপে যাবো। বিস্কোকে বলল—— 'বিস্কো— হ্যারির জন্যে খাবার নিয়ে যেও।'

প্রথম দফায় ফ্রান্সিস বিস্কো আর শাঙ্কোকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে সবাই কঙ্কালদ্বীপের সমুদ্রতীরের বনের মধ্যে জড়ো হল। হ্যারি এর মধ্যেই খেয়ে নিল।

বিস্কো বলল— 'এখন আমরা কোথায় যাবো? গিয়ানির মন্দির। পাঙ্খো ওর দল নিয়ে নিশ্চয়ই এখানে আছে। রূপোর থামগুলো চুরীর মতলব ওর।' ফ্রান্সিস বলল।

ওরা পাহাড়ের সবুজ ঘাসে-ভরা ঢাল দিয়ে উঠতে লাগল।

এক সময় কঙ্কালের মাথার কাছে এসে পৌঁছল সবাই। ফ্রান্সিস নীচে তাকিয়ে দেখল ওর অনুমানই ঠিক। বেশ কিছু শক্ত সমর্থ ইকাবোকে দিয়ে পাঙ্খো রূপোর থাম তোলাচ্ছে। দুটো থাম তোলা হয়েছে। পাথুরে মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছে থাম দুটো। বাকীগুলো তোলবার চেষ্টা চলছে।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল — 'দুভাগে ভাগ হয়ে সবাই নীচে নামো। ওদের কাছাকাছি গিয়ে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। আমি না বললে কেউ আক্রমণ করবে না।'

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বেয়ে দু'দল ভাইকিং দুপাশ থেকে নামল। তারপর গিয়ানি মন্দিরের পেছনের দিকে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

তখনই একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়াল থেকে ফ্রান্সিস দেখল একটু দূরে মোকা একটা পাথরের ওপর বসে আছে। অসহায় মোকা দেখছে ওর চোখের সামনে পাঙ্খোর দল রূপোর থামগুলো তুলছে।

ফ্রান্সিস মোকাকে ডাকতে গিয়ে সাবধান হল। মোকার ঠিক পেছনেই তলোয়ার হাতে পাঙ্খোর দলের একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে!

ফ্রান্সিস তখন একটা পাথরের



তলোয়ার হাতে ছুটে এল পাহারাদারটা

নুড়ি হাত দিয়ে কুড়িয়ে নিল । তারপর ছুঁড়ল মোকার দিকে । মোকার গায়ে নুড়িটা লাগতেই মোকা এদিকে ফিরে তাকাল । দেখল— ফ্রান্সিস পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে । মুক্ত ফ্রান্সিসকে দেখে ওর চোখমুখ খুশিতে উজ্জ্বল হল। পাহারাদারটা দেখল সেটা । সে-ও ওদিকে তাকাল । ফ্রান্সিস পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়বার আগেই পাহারাদার ওকে দেখল । তলোয়ার হাতে ছুটে এল পাহারাদারটা। কাছাকাছি আসতেই বিস্কো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । দু'জনে জড়াজড়ি করে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে অনেকটা নীচে নেমে এল । বিস্কোই আগে উঠে দাঁড়াল । পাহারাদারটা উঠে দাঁড়াতে গেল । তার আগেই বিস্কো তরোয়াল চালাল ওর ডান হাত লক্ষ্য করে । তরোয়ালের ঘা লাগল ওর ডান কাধে । তরোয়াল ফেলে লোকটা কাটা কাঁধ বাঁ হাতে চেপে ধরল । তারপর শুয়ে পড়ে গোঙাতে লাগল ।

এবার ফ্রান্সিস হাতের তরোয়াল উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল ।— 'সবাই নেমে চলো — গিয়ানির মন্দিরের দিকে।'

ভাইকিংরা দ্রুতপায়ে পাহাড়ের ঢাল থেকে নেমে আসতে লাগল । এবার পাঞ্চোর নজরে পড়ল ফ্রান্সিসরা । ইকাবোরা থাম তোলার কাজ বন্ধ রেখে তাকিয়ে রইল সেই দিকে । পাঞ্চো আর তার সঙ্গীরা তরোয়াল উঁচিয়ে লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়ে গেল ।

মন্দিরের কাছাকাছি এসে ফ্রান্সিস দুহাত তুলে নির্দেশ দিল 'থামো' ।

ভাইকিংরা পাঞ্চোর দলের মুখোমুখি দাঁড়ালো ।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডাকল । শাঙ্কো তীরধনুক হাতে ফ্রান্সিসের পাশে এসে দাঁড়াল ।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল — 'পাঞ্চো তুমি ভাইকিংদের বীরত্বের কথা জানো । আমরা তোমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছি । সংখ্যায় আমরা তোমাদের দ্বিগুণ । যদি প্রাণের মায়া থাকে— তাহলে এক্ষুনি অস্ত্র ত্যাগ কর ।'

—না — সবগুলো রূপোর থাম আমার চাই ।

—পাঞ্চো— ভালো করে ভেবে দেখো —একবার লড়াইতে নামলে তোমরা কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না ।

—আমরা পরোয়া করি না ।

—বেশ— তাহ'লে তুমিই আমাদের লড়াইয়ে নামতে বাধ্য করলে । ফ্রান্সিস বলল ।

ঠিক তখনই গিয়ানি মন্দিরের পুরোহিত পাগলের মত ছুটতে ছুটতে গিয়ে একটা রূপোর থাম জড়িয়ে ধরল । পাগলের মত চিৎকার করে কী বলতে লাগল ও কাঁদতে লাগল । পাঞ্চো ছুটে গিয়ে পুরোহিতের মাথার বেণী ধরে এক হ্যাচকা টান দিল । পুরোহিত থাম ছেড়ে পাথুরে মাটিতে ছিটকে পড়ল । পাঞ্চো পুরোহিতের মাথার ওপর তরোয়াল উঁচিয়ে ধরল । —পাঞ্চো ? ফ্রান্সিস চিৎকার করে ডাকল । পাঞ্চো ফ্রান্সিসের দিকে রক্তচক্ষু

মেলে একবার তাকাল শুধু। পুরোহিত এই ফাঁকে মাটি থেকে উঠে পালাতে গেল। পাঙ্কো আবার ওর মাথার বেণী টেনে ধরল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—'শাঙ্কো-চালাও তীর।' ওর পাশে দাঁড়িয়ে শাঙ্কো তৈরীই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে পাঙ্কোর বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল। নিখুঁত নিশানা। তীরটি ঠিক পাঙ্কোর বুকে গিয়ে বিঁধল। পাঙ্কো ঠিক তখনই তরোয়াল চালাল। কিন্তু তরোয়ালের কোপ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল। পুরোহিতের মাথায় কোপ লাগল না। শুধু ওর মাথার বেণীটা কেটে গেল। পাঙ্কো তরোয়াল ফেলে দিল। দুহাত বুকে চেপে ধরে তীরটা টেনে ধরল এক হ্যাঁচকা টানে তীরটা টেনে খুলে ফেলল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। পাঙ্কো টলতে টলতে পাথুরে মাটিতে গড়িয়ে গেল। দেহটা নড়াচড়া করল কয়েকবার। তারপর স্থির হয়ে গেল।

দলের সর্দারের ঐ মৃত্যু দেখে দলের বাকী সঙ্গীরা ভয়ার্ত চোখে চারিদিকে তাকাতে লাগল। তারপর এক পা করে পিছোতে পিছোতে ছুটতে শুরু করল পেছনের দিকে। ওরা ছুটল দ্বীপের উত্তরদিককার সমুদ্রতীরের দিকে। ফ্রান্সিস বলে উঠল -- বিস্কো -শিগগির ছুটে যাও। ফেরাও ওদের। ওদিকে বালিয়াড়িতে মৃত্যুর ফাঁদ পাতা। ওদিক দিয়ে সমুদ্র নামলে কেউ বাচবে না ওরা।'

বিস্কো ছুটল পাঙ্কোর সঙ্গীদের পেছনে পেছনে। চীৎকার করে বলতে লাগল — ওদিকে যেওনা। ফিরে এসো। কোন ভয় নেই। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ওরা ছুটে চলল মৃত্যু —সৈকতের দিকে।

এত কাণ্ড ঘটে গেল। ইকাবোরা সবাই অবাক হয়ে সব ঘটনা দেখল।

মোকা ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ও কাঁদতে লাগল। ফ্রান্সিস হেসে বলল —'কান্না থামাও। তোমার প্রজাদের সাহস দাও। এখন কান্নার সময় নয়। মোকা শান্ত হ'ল। তারপর ইকাবোদের দিকে তাকিয়ে ওদের ভাষায় কী বলে গেল। ইকাবোরা একে একে ফ্রান্সিসের সামনে এসে মাথা নীচু ক'রে সম্মান জানিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস মেঝেয় বিছানো কোহালহোটা তুলে নিয়ে মোকার গায়ে পরিয়ে দিল। মোকা বলল ঃ

—'আপনি য বললেন সোনার স্তর আছে—কোহালহোর নক্সা থেকে তা খুঁজে বের করবেন।'

ফ্রান্সিস হেসে বলল— এ সব গপ্পো ফেঁদেছিলাম পালাবার ফন্দী করতে। তোমাদের দ্বীপে আর দামী কিছু নেই। তুমি হতাশ হলে তাই না ?

—না ফ্রান্সিস, আমি খুব খুশী হলাম। যদি রূপো সোনা আরো থাকত তবে সব লুঠে নিতে কত জলদস্যু খুনী ডাকাত আসত এই দ্বীপে। আমার প্রজাদের জীবনে অশান্তি নেমে আসত। খুন জখম রক্তপাতে দ্বীপ কলুষিত হ'ত। তার চেয়ে এই ভাল। রূপো যা পাব তাই দিয়ে শুধু গিয়ানি মন্দিরের থাম বসিয়ে যাব। সবই উৎসর্গ করবো দেবতার

উদ্দেশ্যে।'

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল— 'সত্যি মোকা— তোমার মত আমি খুব কমই দেখেছি। একজন আদর্শ রাজা তুমি।' একটু চুপ ক'রে থেকে বলল— 'সভ্যজগৎ থেকে কতদূরে এই কঙ্কাল দ্বীপ। অথচ কত প্রগতিশীল তোমার মন, তোমার চিন্তা। ভাবলে অবাক হ'তে হয়। মোকা কথা বলল না। মৃদু হাসল শুধু। তারপর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

—তোমার হাত কেমন আছে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—এখন একটু ভালো' বিছানায় বসতে বসতে ফ্রান্সিস বলল।

— তবে ফেরা যাক কী বলো? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ তবে আর একটা কাজ রয়েছে।

—আবার কি কাজ?

—আমাদের নৌকা তিনটে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। তাছাড়া পশ্চিম সমুদ্রতীরের দিকে একবার যেতে হবে।

—কেন?

—পাঞ্চো ওর দলবল নিয়ে একটা ছোট জাহাজে চড়ে এসেছিল। ওদিকেই পাঞ্চোর জাহাজটা কোথাও লুকানো আছে। সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

—পাঞ্চোর সঙ্গীরা বাধা দিতে পারে।

—হ্যারি, ওঁরা কেউ বেচে নেই।

—বলো কি?

—হ্যাঁ উত্তর সমুদ্র তীরের দিকে পালিয়েছিল ওরা। ওখানে সমুদ্রে কেউ বেঁচে ফেরে না। জাহাজটা এখন খালি। হয়তো দু একজন পাহারাদার থাকলেও থাকতে পারে।

—জাহাজ নিয়ে কি করবে তুমি? হ্যারি জানতে চাইল।

—মোকাকে দেব। তাহলে ত্রিস্তানদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে।

—এখনই বেরুবে?

—হ্যাঁ। চলো - বেলা থাকতে থাকতে জাহাজটা খুঁজে বের করতে হবে।

—চলো।

দু'জনে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বেরুলো। চলল পশ্চিমমুখে। সমুদ্রতীরের দিকে। ঘন জঙ্গল ওদিকটায়। ফ্রান্সিস একটা বিরাট উঁচু সীডার গাছের মাথায় উঠল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ নজরে পড়ল একটা গাছের ডালপাতার ফাঁকে একটা কাঠের মাস্তুলের মত। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এল।



দু'জন মিলে নোঙর খুলল।

নীচে মাটিতে নামতে হ্যারি বলল—'কী? কিছু হদিশ পেলে?'

—হ্যাঁ, চলো।

দিক ঠিক ক'রে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলল দু'জনে। গভীর জঙ্গল। পচা পাতার স্তূপ জ'মে আছে গাছগুলোর নীচে। পা ফেললে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। গাছের নীচে অন্ধকার। মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও রোদের ভাঙা ভাঙা টুকরো যেন। ওর মধ্যে দিয়েই চলল দু'জনে। ফ্রান্সিস নিশানা ঠিক ক'রে চলছিল।

কিছুক্ষণ পরেই দেখল একটা সামুদ্রিক খাঁড়ি দ্বীপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সেই খাঁড়িতে একটা ছোট্ট জাহাজ নোঙর করা। জাহাজটার কাছাকাছি আসতে দেখল ওদের নৌকো তিনটে দড়ি দিয়ে জাহাজটার সঙ্গে বাঁধা।

জাহাজে ওঠার জন্যে একটা কাঠের পাটাতন ফেলা ছিল। পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে ওরা জাহাজটায় উঠল। জাহাজের ডেক, কেবিনঘর, দাঁড়ঘর, রসুইঘর সবে ঘুরে বেড়াল ওরা। কেউ নেই জাহাজটায়। ছোট জাহাজ। তবে খুব মজবুত।

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি এসো নোঙর খুলতে হবে।

দুজনে মিলে নোঙর খুলল। হ্যারি দাঁড় ঘরে চলে গেল। দাঁড় টানতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল গাছপালার এলাকা ছাড়াতে না পারলে পাল খাটানো যাবে না। তাই ও দাঁড়ঘরে গেল। দু'জনে মিলে দাঁড় বাইতে লাগল। একটু পরেই জাহাজটা চলতে শুরু করল। যেতে যেতে খাড়ি ছেড়ে সমুদ্রে এসে পড়ল।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিস নিপুণ হাতে দড়ি দড়া ঠিক ক'রে পাল খাটিয়ে দিল। পালে হাওয়া লাগতেই পাল ফুলে উঠল। জাহাজ দ্রুত ছুটল।

ওদের জাহাজ যেদিকে ছিল নতুন পাওয়া জাহাজটা সেই দিকে নিয়ে এল। তারপর দ্বীপের ধারে নিয়ে এল। তারপর জাহাজটার নোঙর ফেলল।

তখন বিকেল। ফ্রান্সিস ও হ্যারি জাহাজ থেকে পাটাতন ফেলল। তারপর দ্বীপে নামল। চলল রাজবাড়ির দিকে।

রাজবাড়িতে মোকার সঙ্গে দেখা হ'ল। ফ্রান্সিস বলল—মোকা আমাদের সঙ্গে চলো। একটা জিনিস দেব তোমাকে।

—'কী?' মোকা বেশ অবাক হ'ল কথাটা শুনে।

—'চলোই না।' ফ্রান্সিস তাগাদা দিল।

—'বেশ চলুন।'

সমুদ্রের ধারে এসে ছোট্ট জাহাজটা দেখে মোকা কিছুই বুঝতে পারল না। এই জাহাজ তো ওরা আগে দেখেনি। কোত্থেকে এল এই জাহাজ। ফ্রান্সিস মোকার মনের অবস্থা বুঝল। বলল—মোকা এই জাহাজটা তোমাকে দিলাম।

মোকা নির্বাক। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস তখন ওকে সমস্ত ঘটনাটা বলল। এবার মোকা বুঝল পাগ্গোরা এই জাহাজে চড়েই এসেছিল। আজ ওরা কেউ বেঁচে

নেই।

মোকা জাহাজটায় উঠল ঃ কেবিন ঘর, দাঁড়ঘর সব ঘুরে ঘুরে দেখল। আনন্দে ওর চোখে জল এসে গেল। বলল—'ফ্রান্সিস আপনি আবার আমাদের বাঁচালেন। আর ত্রিস্তানদের ভয় করি না। ওরা যদি আবার আক্রমণ করে এই জাহাজই সেই আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারবে। আপনার কাছে আমরা চিরঋণী হ'য়ে রইলাম।' ও আবেগে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি মোকাকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের আস্তানায় যখন ফিরে এল তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে।

পরদিন দুপুরে খেতে বসে ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি—জাহাজে খবর পাঠাও। বিদায় কঙ্কাল দ্বীপ। এবার দেশে ফেরা।'

'কিছু রূপো নিয়ে যাবো না?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'নাঃ।' ফ্রান্সিস বলল—'রাজাকে অনেককিছু এনে দিয়েছি। এবার আর নাই বা কিছু নিয়ে গেলাম।'

বিকালে মোকা এল। জিজ্ঞেস করল—'আপনারা কি আজই যাচ্ছেন?'

'না, কালকে জাহাজ ছাড়বো।' ফ্রান্সিস বলল।

'একটা অনুরোধ ছিল আমার।'

'বলো।'

'আপনাদের ঋণ কোনোভাবেই শোধ করতে পারবো না, তাই বলছিলাম—মন্দিরের দু'টো রূপোর থাম যদি আপনারা গ্রহণ করেন।'

'কী বলছো মোকা? তোমাদের দেবতার পবিত্র থাম।'

'আমি সর্দারদের সঙ্গে কথা বলেছি। সবাই সম্মতি দিয়েছে। পুরোহিতও বলেছে—এতে কোনো পাপ হবে না। পরে দু'টো থাম তৈরী করে দিলেই হবে।'

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বুঝে উঠতে পারল না কী বলবে। হ্যারি বলল—'নাও ফ্রান্সিস। মোকা এত করে বলছে। তাছাড়া এই থাম দুটো হবে ইকাবোদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের নিদর্শন;

—'বেশ'—ফ্রান্সিস বলল।

পাঞ্চো যে দু'টো থাম খুঁড়ে তুলেছিল—সে দু'টো পাশাপাশি রাখা হ'ল।

জল দিয়ে থামের তলায় লেগে থাকা মাটি ধোয়া হলো। নারকেল ছোবড়া দিয়ে ঘষে উজ্জ্বল করা হলো থাম দুটো। লতাপাতা পশুপাখি খোদাই করা থাম দুটো সুন্দর লাগল দেখতে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দাঁড়িয়ে এসব দেখছিল। মোকাকে পুরোহিত কী বলল। মোকা ফ্রান্সিসকে বলল—'পুরোহিত বলছে—এগুলো পবিত্র থাম। এই দুটোতে যেন কারো পা না লাগে। এগুলো কোনো কারণেই গলাবেন না বা বিক্রি করবেন না।'

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—'নিশ্চিন্ত থাক। এই থামের পবিত্রতা আমরা রক্ষা করবো।'

বেশ ভারী থাম। দু'দল ইকাবো কাঁধে করে দুটো নিয়ে চলল সমুদ্রতীরের দিকে। ফ্রান্সিস আর হ্যারিও চলল সেই সঙ্গে। সবার সামনে পুরোহিত বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে চলল।

সমুদ্রতীরে থাম দুটো নামানো হলো। একটু সমস্যা দেখা দিল। কী করে থাম দুটো জাহাজে তোলা যায়।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে পাঠাল জাহাজের গায়ে বাঁধা সবগুলো নৌকো নিয়ে আসতে। হ্যারি একটা নৌকো চালিয়ে জাহাজে গেল। কয়েকজন ভাইকিং নৌকোগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ পরেই এল।

ফ্রান্সিস নৌকোগুলো পরপর সাজাল। মোটা কাছি দিয়ে নৌকোগুলো পরস্পর বাঁধলো। তারপর ইকাবো আর ভাইকিংরা মিলে থাম দুটো সেই নৌকোয় বাঁধা সারির ওপর আস্তে আস্তে রাখল। খুব ভারী থাম দুটোর ভারে নৌকোগুলোর অনেকটা জলে ডুবে গেল। থাম দুটো এবার নৌকোগুলোর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো। থাম দুটোর আর গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রইল না।

ভাইকিংরা বৈঠা হাতে নৌকোয় উঠল। এবার ফ্রান্সিসের বিদায় নেবার পালা। মোকা ফ্রান্সিসকে বুকে জড়িয়ে ধরল। কিছুক্ষণ ঐভাবেই রইল। আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে ফ্রান্সিস এবার জড়ো হওয়া ইকাবো নারীপুরুষ শিশুদের দিকে তাকাল। সবাই নির্বাক তাকিয়ে আছে ফ্রান্সিসের দিকে। দু'একজন চোখ মুছছিল। ফ্রান্সিসেরও মনটা খারাপ হয়ে গেল। ম্লান হেসে ও হাত নেড়ে বলল—' বিদায় ভাই বোনেরা ইকাবোরা কোনো কথা বলল না। একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

ফ্রান্সিস নৌকোয় গিয়ে উঠল। হাতে বৈঠা তুলে নিল। দড়িবাঁধা নৌকোর বহর চলল জাহাজের দিকে। নৌকোর ওপর থাম দুটো।

জাহাজের কাছে পৌঁছে ও পেছন ফিরে তাকাল। দেখল ইকাবোরা তেমনি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জাহাজে উঠল সবাই। দড়ি বেঁধে থাম দুটো তোলা হলো জাহাজে। নৌকোগুলো বাঁধা হলো জাহাজের সঙ্গে।

ডেকে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—'নোঙর তোল। পাল তুলে দাও। দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে যাও। বাতাসের তেমন জোর নেই।'

'সব ভাইকিংরা চীৎকার করে উঠল একসঙ্গে—ও—হো—হো।' তারপর সবাই যে যার কাজে লাগল।

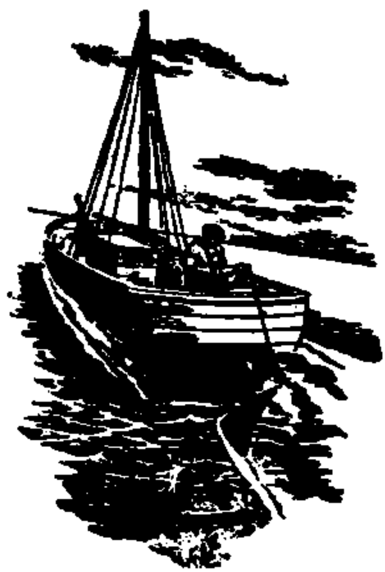
ঘড় ঘড় শব্দে নোঙর উঠল। পাল খাটানো হলো। জলে দাঁড় পড়তে লাগল—ছপ্—ছপ্।

একটা পাক খেয়ে জাহাজ চলল। সরে সরে যেতে লাগল কঙ্কাল দ্বীপ। কিছুক্ষণ পরেই আর দেখা গেল না কঙ্কাল দ্বীপ। এখন চারিদিকে শুধু অথৈ জল।

জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস তখনও কঙ্কাল দ্বীপের দিকে তাকিয়ে আছে। তখনও ওর মন বিষণ্ণ।

—সমাপ্ত—

বিষাক্ত উপত্যকা



বিষাক্ত উপত্যকা

কঙ্কাল দ্বীপ থেকে ফ্রান্সিসদের জাহাজ যাত্রা শুরু করল স্বদেশের দিকে। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়েছিল ফ্রান্সিস আর ওর অভিন্নহৃদয় বন্ধু হ্যারি। ফ্রান্সিস ভাবছিল কঙ্কাল দ্বীপের বর্তমান রাজা মোকার কথা। মন খারাপ লাগছিল ওর। উপহার হিসেবে মোকা ওদের দুটো বিরাট রূপোর থাম দিয়েছে। জাহাজের ডেকের ওপরেই থাম দুটো রেখে দিয়েছে ওরা। দিন রাত নিয়ম করে পাহারা দেওয়া চলছে। আফ্রিকা থেকে হীরের খণ্ড নিয়ে আসার সময় ওরা নির্মম জলদস্যু লা ক্রুশের পাল্লায় পড়েছিল। আবার যাতে ওরকম কোনো বিপদ না হয় তার জন্যে রাত জেগেও পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে।

জাহাজ চলেছে। নির্মেঘ আকাশ। বাতাস বেগবান। পালগুলো ফুলে উঠেছে। জাহাজ সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে দ্রুত চলেছে। দাঁড় বাওয়া বন্ধ। জাহাজের কাজও নেই তেমন। ভাইকিংরা জাহাজে এখানে ওখানে বসে শুয়ে আড্ডা দিচ্ছে। এবার রূপোর থাম নিয়ে যাচ্ছে।

দেশবাসীকে অবাক করে দেবে। সেই সব গল্প, দেশ বাড়ির গল্প এসব চলছে।

বিকেল হলো। পশ্চিমাকাশে লাল টকটকে সূর্য অস্ত গেল। মনে হলো যেন সূর্যটা সমুদ্রের উঁচু উঁচু ঢেউয়ের মধ্যে ডুবে গেল।

সাত আট দিন কেটে গেছে। জাহাজ চলেছে ফ্রান্সিসদের দেশের দিকে।

সেদিন বিকেল হয়ে এসেছে। ভাইকিংরা এখানে ওখানে গল্প করছে। হঠাৎ মাস্তুলের মাথায় বসে থাকা নজরদারের চিৎকার শোনা গেল—ডাঙা দেখা যাচ্ছে—বাঁ দিকে। ভাইকিংরা সবাই এসে মাস্তুলের নিচে জড়ো হলো। একজন ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে।

একটু পরেই ফ্রান্সিস হ্যারি দুজনেই ডেকে উঠে এল। জাহাজটা তখন ডাঙার অনেকটা কাছে চলে এসেছে। দেখা গেল ডাঙাটা পাথুরে। এক ফোঁটা সবুজ নেই কোথাও। সমুদ্র থেকে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়। গেরুয়া রঙের পাহাড়। পাথর ধুলোবালির রঙও গেরুয়া। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—হ্যারি তোমার কী মনে হয়? এটা কি একটা দ্বীপ না দেশ?

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

—এখানে তো খাবার জলও পাবো বলে মনে হয় না। পাশ কাটিয়ে চলে যাই কী বলো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ, মিছিমিছি এখানে জাহাজ ভিড়িয়ে কী হবে। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে জাহাজ চালককে সেই নির্দেশই দিতে যাবে, তখনই মাস্তুলের মাথা থেকে নজরদার চেঁচিয়ে বলে উঠল—একটা সাদা কাপড় মতো কী যেন দেখা যাচ্ছে।

এবার ফ্রান্সিস আর হ্যারি ভালো করে তাকাল। জাহাজটা তখন অনেক কাছে চলে এসেছে। দেখল—পাহাড়ের গায়ে একটা গুহামতো কী দেখা যাচ্ছে। তার সামনে একটা গাছের মোটা ডাল পোঁতা। ডালের মাথায় এক টুকরো সাদা কাপড় বাঁধা। হাওয়ায় উড়ছে। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল-সাদা কাপড়টা দেখেছো?

—হ্যাঁ।

—তাহলে তো ওখানে মানুষ আছে। আর লক্ষ্য করে দেখ—ওটা শুধু কাপড় নয়। একটা ছেঁড়া সাদা জামা।

—হুঁ। হ্যারি বলল—তার মানে বুনো মানুষ না, সভ্য মানুষই কেউ আছে। এখন একদল মানুষ আছে না একজন আছে সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

—যাহোক—সাদা জামাটা খুঁটিতে বাঁধা হ'য়েছে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। কী করবে এখন?

—একজনই থাক আর একদলই থাক—ওদের তো উদ্ধার করতেই হবে। জাহাজ ভেড়াতে বলো।



জাহাজটা ঐ পাহাড়গুলোর কাছে নেওয়া যাবে?

—কিন্তু ভেড়াবে কোথায়? উঁচু উঁচু পাথর সব। তা ছাড়া সন্ধ্যে হয়ে আসছে। অন্ধকারে একটা অজানা অচেনা জায়গায় নামা কি ঠিক হবে? হ্যারি বলল।

—তাহলে জাহাজ এখানেই থামাতে বলি। কাল সকালে যা করার করবো।

—সেটাই ভালো হবে।

পরদিন। সকালের খাবার খেয়েই ফ্রান্সিস ডেকে এসে দাঁড়াল। জাহাজ-চালককে বলল—তোমার কী মনে হয়—জাহাজটা ঐ পাহাড়গুলোর কাছে নেওয়া যাবে?

—হ্যাঁ—যাবে। কারণ পাহাড়গুলো খাড়া উঠে গেছে। কিন্তু এদিক দিয়ে ঐ পাহাড়ে নামা যাবে না।

—কিন্তু আমাদের তো ওখানে যেতে হবে।

—পাহাড়গুলোর ওপাশটা দেখা যাক।

—তাহলে তাই কর।

জাহাজ চলতে শুরু করল। গেরুয়া রঙের পাহাড়গুলোর ওপাশে জাহাজটা আসতেই দেখা গেল একটা সমভূমি মতো রয়েছে। তবে অসমান। পাথর ধুলোয় এবড়ো খেবড়ো। তবে তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যাবে।

জাহাজটা সেই জায়গার অনেকটা কাছে নিয়ে আসা হলো। তারপরেই ডুবো পাথর। জাহাজ যাবে না। জাহাজ থেকে পাটাতন ফেলা হলো। পাটাতন পাথুরে জমি পর্যন্ত গেল না। ওটুকু জলে হেঁটে যেতে হবে।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—আমি শাঙ্কোকে নিয়ে আগে যাচ্ছি। কী ব্যাপার দেখে আসি।

—তোমরা মাত্র দুজন যাবে। যদি কিছু বিপদ হয়?

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডাকল। শাঙ্কো এলে বলল—যাও তীর ধনুক নিয়ে এসো। আর এক টুকরো লাল কাপড়।

একটু পরেই শাঙ্কো তীর-ধনুক হাতে এলো। পাটাতনে পা রেখে রেখে দুজনে তীরের কাছে এলো। বাকিটুকু জলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। দুজনেই জলে নামল। কোমর অব্দি জলে ডুবে গেল। শ্যাওলা ধরা পেছল পাথরের ওপর পা রেখে ওরা এগিয়ে গেল। তারপর তীরে উঠল।

ফ্রান্সিস চারিদিকে তাকাল। আশ্চর্য! সব পাথরের রঙ গেরুয়া। অন্য কোনো রঙের পাথর নেই। এবার ওরা পাথরের টুকরো ছড়ানো জায়গা দিয়ে চলল। একটু এগোতেই পাহাড়ে ওঠার মতো পথ পেল। বড় বড় পাথরের চাঁই ছড়ানো। সেগুলোর ওপর পা রেখে রেখে উঠতে লাগল। রোদ বেশ চড়া। সমুদ্রের হু হু হাওয়া বইছে বলেই ওরা ঘামছে না। পাথরগুলো এর মধ্যেই তেতে উঠেছে।

উঠতে উঠতে একসময় গুহাটা যে পাশ থেকে দেখেছে সেইদিকে চলে এল। এখানে পাথর কম। গুহাটা দেখা গেল। গুহা পর্যন্ত গেরুয়া রঙের ধুলোটে পথ।

এক সময় গুহার সামনে এল। দেখল—গাছের ডালে বাঁধা সাদা জামাটা শতছিন্ন। গেরুয়া ধুলোমাখা। তাতে নীল হলুদ সুতোর কাজ করা।

ওরা এবার গুহার মুখে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ইঙ্গিত করল। শাঙ্কো তীর ধনুক বাগিয়ে ধরল।

আস্তে আস্তে তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিস গুহার মধ্যে ঢুকতে লাগল। পেছনে তীর উঁচিয়ে শাঙ্কো। বাইরের তীব্র রোদ থেকে এসেছে। একটু এগোতেই অন্ধকার। কিছুই নজরে পড়ছে না। ফ্রান্সিস অল্পক্ষণ দাঁড়াল। শাঙ্কোও দাঁড়াল। অন্ধকারটা চোখে একটু স'য়ে আসতেই দেখল একটু দূরে শুকনো ঘাসের একটা বিছানা। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। খালি গায়ে একটা মানুষ সেই বিছানায় শুয়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে একজন শ্বেতকায় মানুষ। এখন অবশ্য রোদে জলে পুড়ে গায়ের রঙ ঘোর তামাটে।

ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—আপনি কে? কোনো সাড়া শব্দ

নেই। ফ্রান্সিসের কণ্ঠস্বর গুহাটায় প্রতিধ্বনিত হলো। ফ্রান্সিস আবার বলল—আপনার নাম কী? লোকটি নিশ্চুপ। শরীরে কোনো সাড়া নেই। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকাল। শাঙ্কো আস্তে বলল—মরে টরে যায়নি তো?

—বুঝতে পারছি না।

ফ্রান্সিস বিছানাটার পাশে এসে বসল। লোকটার ডান হাতটা তুলে নিল। হাতটা একেবারে ঠাণ্ডা নয়। নাড়ী দেখল। নাড়ী চলছে ক্ষীণ ভাবে। বুকে কান পাতল। দুর্বল হৃৎপিণ্ডের শব্দ। তাহলে বেঁচে আছে। ফ্রান্সিস এদিক ওদিক তাকাল। দেখল পাথুরে মেঝেয় একপাশে একটা মাটির হাঁড়ি। হাঁড়িটার কাছে গেল। দেখল তাতে জল ভরা। আরো কয়েকটা হাঁড়িকুড়ি রয়েছে। কালো পোড়া। ও হাতে জল নিল। এগিয়ে এসে লোকটার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিল। বারকয়েক জলের ঝাপটা দেবার পর হঠাৎ কয়েকবার পিট পিট করে লোকটা চোখ খুলল। তারপর মাথাটা আস্তে আস্তে এপাশ ওপাশ করল। এতক্ষণে ফ্রান্সিস অনেকটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। দেখল লোকটা মধ্যবয়স্ক। মাথায় লম্বা চুল। মুখে বড় বড় দাড়ি গোঁফ।

ফ্রান্সিস এবার ঝুঁকে লোকটার কানের কাছে মুখ এনে পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—আপনি কে?

খুব ক্ষীণস্বরে দুর্বলকণ্ঠে লোকটা বলল—বা-রিন থা-স।

—আপনি কি অসুস্থ?

—হ্যাঁ। বারিনথাস ক্ষীণকণ্ঠে পোর্তুগীজ ভাষায় বলল।

—আপনি এখানে কী করে এলেন?

—সে অ-নে-ক কথা। আ-আ-মি-বারিনথাস—আর কথা বলতে পারল না। ভীষণভাবে কাশতে লাগল। কাশির ধমকে বুকটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। কাশি একটু কমতে ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—আপনি কতদিন এখানে আছেন?

বারিনথাস আস্তে আস্তে ডান হাতটা তুলল। কাঁপা কাঁপা আঙুল তুলে গুহার দেয়ালটা দেখাল। ফ্রান্সিস অস্পষ্ট দেখল গেরুয়া পাথরে দেয়ালে কতকগুলো টানা টানা দাগ। বোঝা গেল দিনের হিসেব। ফ্রান্সিস ওকে আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করল না। বুঝলো কথা বললে লোকটা আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। শাঙ্কোকে বলল—শাঙ্কো, একে জাহাজে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এ অবস্থায় নেওয়া যাবে না। তুমি এক কাজ করো। জাহাজের বদ্যিকে ডেকে আনো। চিকিৎসা চলুক। একটু সুস্থ হলে তখন নিয়ে যাবো।

শাঙ্কো চলে গেল বদ্যিকে ডাকতে।

জাহাজ থেকে বদ্যি ওষুধপত্র নিয়ে এল। মৃতপ্রায় বারিনথাসকে পরীক্ষা করে বলল—অসুখ তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়। অনাহারে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ভালো হয়ে যাবে।

বদ্যি কোনো রকমে ওষুধ খাওয়ালো। বদ্যি চলে গেল। ফ্রান্সিস বারিনথাসের জন্যে জাহাজ থেকে পোশাক কম্বল পাঠিয়ে দিল।

দিন তিনেক চিকিৎসা চলতে বারিনথাস অনেকটা সুস্থ হলো। ফ্রান্সিস বারিনথাসের

সঙ্গে কথা বলে এইটুকু জানতে পারল—ও জাতিতে স্প্যানিশ। তবে পোর্তুগীজ ভাষা ভালোই জানে। স্পেনদেশের রাজধানী মাদ্রিদে সে থাকতো। রাজসভার এক গণ্যমান্য অমাত্যের বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাজ করত।

বারিনথাস এখন সুস্থ। কয়েকজন ভাইকিং বারিনথাসকে ধরে ধরে জাহাজে নিয়ে এল। আসার সময় বারিনথাস ঘাসের বিছানার তলা থেকে একটা চামড়ায় বাঁধানো বড় খাতা নিয়ে এল। খাতাটা দেখে ফ্রান্সিস বেশ অবাক হলো। কী আছে ওটাতে যে বারিনথাস অনেক যত্নে ওর কাছে রেখে দিয়েছে।

দিন দশেক কাটল। ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা তাগাদা দেয়। বলে, এখানে পড়ে থেকে কী হবে? চলো দেশে ফিরি। কিন্তু ফ্রান্সিসের মন তখন বারিনথাসের বলা একটা কথাই ভাবছে। বারিনথাস একবারই কথাটা বলেছিল। বলেছিল—বিষাক্ত উপত্যকার নাম শুনেছো?

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলেছিল—না। বারিনথাস আস্তে আস্তে বলেছিল—তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো। সব তোমাকে বলবো। শরীরটা ভালো হোক।

এই বিষাক্ত উপত্যকার কথা শুনেই ফ্রান্সিস উৎসুক হয়েছিল। কোথায় এই বিষাক্ত উপত্যকা? কী আছে ওখানে? নামটাও বা এরকম কেন? ফ্রান্সিস অনেক কষ্টে নিজের ঔৎসুক্য চেপে রাখল। বন্ধুদের ডেকে বলল—আর কয়েকটা দিন। বারিনথাস সুস্থ হলেই জাহাজ ছাড়বো।

একদিন রাতের খাওয়াদাওয়ার পর ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—চলো বারিনথাসকে দেখে আসি।

বারিনথাসের কেবিনঘরে ঢুকল ওরা। দেখল বারিনথাস আয়নায় দেখে দেখে চুল আঁচড়াচ্ছে। ওদের ঢুকতে দেখে আয়না চিরুনি রেখে বসল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসতে বসতে বলল—তারপর এখন কেমন আছো বন্ধু?

—ভালো। বারিনথাস হাসল। হ্যারিও বসল।

—আচ্ছা—বিষাক্ত উপত্যকা ব্যাপারটা কী? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

বারিনথাস একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর শিয়রের কাছে রাখা সেই চামড়ার বইটা বের করল। বলল—এই বইটা দেখ।

ফ্রান্সিস বইটার পাতা ওল্টালো। প্রাচীন বই। সাদাটে চামড়ায় লেখা। ফ্রান্সিস লেখার ভাষাটা কিছুই বুঝল না। হ্যারিকে দিল। হ্যারি উল্টেপাল্টে দেখে বলল—মনে হচ্ছে কোনো প্রাচীন ভাষায় লেখা।

—ঠিকই ধরেছেন—এটা প্রাচীন ল্যাটিন ভাষায় লেখা। এই বইটা পড়বার জন্যে আমি অনেক কষ্টে ঐ ভাষাটা শিখেছি। তারপর বইটা পড়েছি। একটু থেমে বলল—বইটা পেয়েছিলাম অদ্ভুতভাবে। মাদ্রিদে রাজপ্রাসাদের পাঠাগারে। সেখানে নানা বিষয়ে পড়াশোনা করতে যেতাম। আগেই বলেছি আমি গৃহশিক্ষকতা করতাম। তখনই ঐ পাঠাগারে একবাক্স পুরোনো বই পুঁথির মধ্যে এই বইটা পাই। সব বইই তো হাতে লেখা। মোটামুটি সব বইয়ের লেখকের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই বইটার লেখকের নাম নেই। বইটার নাম 'ন্যাভিগেশিও'। সেন্ট ব্রেণ্ডন নামে একজন ধর্মযাজকের সমুদ্রযাত্রা নিয়ে লেখা। নানা দ্বীপ নানা জায়গায় গিয়েছিল

সেন্ট ব্রেণ্ডন। একবার আয়ার্ল্যাণ্ডের অনেক পশ্চিমে এক অজানা দেশে পৌঁছেছিল। সেই দেশের নাম স্ত্রোমো। রাজধানীর নাম তুলা। সেই দেশে সেই রাজধানীতে আমি গিয়েছিলাম।

—কোথায় সেই দেশ? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—এখান থেকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে গেলে আট দশ দিনের পথ।

—তাহলে এটা একটা দ্বীপ নয়?

—না, এটা একটা দেশের পূর্বভাগ। একটু থেমে বারিনথাস বলতে লাগল—ন্যাভিগেশিও বইটাতে এসবের একটা অতীত ইতিহাসও লেখা আছে। সেটা বলছি।

বারিনথাস বলতে লাগল—পশ্চিমের দিকে অ্যাজটেক সভ্যতার পত্তন করেছিল একদল রেড ইণ্ডিয়ান। সেই উপজাতির নাম ছিল তলতেক উপজাতি। যে সাম্রাজ্য তারা গড়েছিল তা এক গৃহযুদ্ধে ভেঙে যায়। সেই গৃহযুদ্ধের মধ্যে যারা বেঁচেছিল কালহুয়াকান নামে এক উপজাতি—নেতার নেতৃত্বে তারা আরো পূর্বদিকে সরে আসে। এদের আরাধ্য দেবতার নাম কোয়েতজালকোয়াত্তি। সংক্ষেপে—কোয়েতজাল। এই দেবতা নাকি তাদের আদেশ দিয়েছিল—যে উপত্যকায় দেখবি একটা পাথরের ওপর ফণিমনসা গাছ সেখানেই তোরা বসতি স্থাপন করবি। কালহুয়াকানের নেতৃত্বে সেই তলতেক উপজাতির দল মহামূল্যবান হীরে চুনি পান্না দামী পাথর আর প্রচুর সোনা নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে খুঁজতে বেরোয় কোথায় আছে সেই উপত্যকা যেখানে পাথরের চাঁইয়ের ওপর রয়েছে ফণিমনসার গাছ। দীর্ঘ বারো বছর তারা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াল সেই উপত্যকার খোঁজে। দলের কত লোক মারা গেল, কিন্তু অন্বেষণ চলল। অবশেষে ওরা এসে পৌঁছল এই স্ত্রোমো নামে জায়গাটায়। এখানেই তারা দেখল একটি উপত্যকা যেখানে একটি মাত্র পাথরের উপর একটা ফণিমনসার কাঁটাছাওয়া গাছ। ওদের যাযাবরবৃত্তি শেষ হলো। এখানেই কালহুয়াকান বসতি স্থাপন করল। রাজধানীর নাম তুলা। কোয়েতজাল দেবতার বড় মন্দির তৈরি করল পাথর গেঁথে। দেবতার মূর্তি কাঠ দিয়ে তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করল। বারিনথাস থামল। বইটা খুলে একটা আলগা পাতা বের করল। বলল—এই দেখ কোয়েতজাল দেবতার ছবি।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি দেখল ছবিটা।

—কিন্তু এ তো গেল ইতিহাস। বিষাক্ত উপত্যকা কী? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

বারিনথাস হাসল। বলল—আর একটু ইতিহাস আছে। সব বলছি। একটু থেমে বলতে লাগল—কালহুয়াকানের নেতৃত্ব সেই দল যে মহামূল্যবান হীরে পান্না চুনি প্রচুর সোনা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বেরিয়েছিল সে সবের কী হলো? ন্যাভিগেশিও বইটিতে তার হদিস নেই। কিন্তু ইঙ্গিত আছে। কালহুয়াকান নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলেন, সবাই তাকে রাজা বলে মেনে নিল। এখন সেই প্রচুর ধনসম্পত্তি কোথায় লুকিয়ে রাখা যায় এই নিয়ে রাজা কালহুয়াকান খুব চিন্তায় পড়লেন। এই সময়েই সেন্ট ব্রেণ্ডন সেই দেশে গিয়ে হাজির হলেন। রাজা কালহুয়াকান তাঁর কোনো ক্ষতি করলেন না। দু একটা ছোটখাট যুদ্ধে ব্রেণ্ডন-এর পরামর্শ নিলেন

তিনি। সেসব যুদ্ধে সেই পরামর্শেই জিতলেন। এবার ধনসম্পত্তি লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে ব্রেণ্ডন-এর পরামর্শ চাইলেন। ব্রেণ্ডন সমস্ত দেশ, ধারেকাছের গুহা-গহ্বর পাহাড়ের ঢাল সব তন্নতন্ন করে দেখলেন। কিন্তু সেই ধনসম্পত্তি লুকিয়ে রাখার মতো জায়গা পেলেন না।

একটু থেমে বারিনথাস বলতে লাগল—অবশেষে ব্রেণ্ডন এলেন বিষাক্ত উপত্যকায়। উপত্যকাটি কোয়েতজাল মন্দিরের পেছনেই। কাছের পাহাড়ের ঢাল থেকে একটা ছোট্ট ঝর্ণা নেমে এসেছে এই উপত্যকায়। খুব ক্ষীণ সেই জলধারা যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। সেই ঝর্ণার জল সাংঘাতিক বিষাক্ত। দূর থেকে দেখেছি সেই জলের রং গাঢ় সবুজে। সেই জল জমে জমে সমস্ত উপত্যকাটিতে বিষাক্ত হয়ে গেছে। সেখানে সবসময় কুয়াশা জমে থাকে। সমস্ত উপত্যকাটি ঘাসের চিহ্ন মাত্র নেই। সবুজে শ্যাওলার মতো স্তর জমে আছে। সেই স্তরে মানুষ বা জন্তু জানোয়ার পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়া বেরোয়। সেই সঙ্গে তীব্র কটু গন্ধ আর মানুষ বা জন্তু-জানোয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। কোনো তলতেক ভুলেও ওদিকে যায় না। তাই ঐ উপত্যকার নাম বিষাক্ত উপত্যকা। বারিনথাস থামল। একটু হাঁপাতে লাগল।

—ব্রেণ্ডন কী করলেন? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

বলছি। বারিনথাস বলল—ঐ বিষাক্ত উপত্যকার মাঝখানে আছে একটি পাথরের চাঁই আর তার ওপর একটা ফণিমনসার গাছ। সেই গাছটা যে কী করে বেঁচে আছে এটা এক আশ্চর্য ব্যাপার। তার চেয়েও আশ্চর্য বিষাক্ত উপত্যকায় সবুজ কাঠির মতো এক ধরনের ছোট ছোট গাছ আছে। তাতে গাঢ় বেগুনী রঙের ফুল ফুটে থাকে। সেই ফুল যদি কেউ শোঁকে সে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যায়। মরে যায় না। কয়েক ঘন্টা পর সুস্থ হয়, কিন্তু তার ঘ্রাণশক্তি চিরদিনের জন্যে লুপ্ত হয়ে যায়।

—তারপর? ফ্রান্সিস আগ্রহ সহকারে বলল।

—ন্যাভিগেশিও বইটিতে লেখা আছে ব্রেণ্ডন রাজাকে ঐ বিষাক্ত উপত্যকাতেই ধনভাণ্ডার লুকিয়ে রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। রাজা নাকি তাই করেছিলেন। কিন্তু কী করে সেই ধনভাণ্ডার লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তা লেখক লেখেননি। তারপর ব্রেণ্ডন আয়ার্ল্যাণ্ডে ফিরে এসেছিলেন। সেখানেই মারা যান। কিন্তু বিষাক্ত উপত্যকায় রক্ষিত সেই ধনভাণ্ডারের কোনো হদিস তিনি কাউকে দিয়ে যেতে পারেননি।

—এটা কত দিন আগের কথা? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—প্রায় দুশো বছর।

—এখনো কি ঝর্ণাটা থেকে বিষাক্ত জল পড়ে?

—হ্যাঁ, তবে চুঁইয়ে চুঁইয়ে।

—সেই পাথরের চাঁই ফণিমনসার গাছ এখনো আছে?

—হ্যাঁ। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

—উপত্যকার মধ্যে দিয়ে পাথরের ওপর ফণিমনসার গাছের কাছে যাওয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়? অসম্ভব।

—আচ্ছা পরে তো অনেকে রাজা হয়েছে, তারা কেন এই গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টা করেনি?

—করেছে, কিন্তু ঐ বিষাক্ত উপত্যকা! প্রথম রাজা কালহুয়াকান এরপর যারাই রাজা হয়েছে সবাই কালহুয়াকান পদবীটা তাদের নামের সঙ্গে ব্যবহার করত। এই রীতি এখন পর্যন্ত সব রাজাই মেনে এসেছেন। এখন যে রাজা তারও পদবী কালহুয়াকান।

—আপনি তো ঐ দেশে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। ব্রেগুনের ন্যাভিগেশিও বইটি পড়েই আমার ঔৎসুক্য জাগে। মাদ্রিদ থেকে বেরিয়ে পড়ি এই স্ত্রোমো রাজ্যের উদ্দেশে। বেশ কটা জাহাজ বদলে একদিন এই গেরুয়া পাহাড় এলাকায় এসে নামলাম। কয়েকদিন সেই গুহাটাতে রইলাম। তারপর গেরুয়া পাহাড়ের ওপাশের সবুজ তৃণভূমি থেকে যাত্রা করেছিলাম স্ত্রোমো দেশের উদ্দেশে।

—পায়ে হেঁটে? হ্যারি জানতে চাইল।

—না, ঘোড়ায় চড়ে।

—ঘোড়া পেলেন কোথায়?

—গেরুয়া পাহাড়ের ওপাশে সবুজ তৃণভূমির কথা বললাম, সেখানে অনেক বুনো ঘোড়া আর বুনো ভেড়া চরে বেড়ায়। একটা বুনো ঘোড়া ধরে পোষ মানিয়ে তার পিঠে চড়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম।

তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

—দিন আট দশেক পরে স্ত্রোমো দেশে পৌঁছলাম। আগেই বলেছি ওখানে তলতেক উপজাতির বাস। ওরা ভেড়ার চামড়ার ফুলপ্যাণ্ট মতো পরে। ওরা তুলোর চাষ জানে। প্রায় সমতল স্ত্রোমো দেশের মাটি কালো। তুলোচাষের খুব উপযোগী। তুলো থেকে সূতীর পোশাক বানিয়ে ওরা ব্যবহার করে। ওদের বাড়িঘর বলে কিছু নেই, বংশ পরম্পরায় চামড়ার তাঁবুতে বাস করে। তাঁবু ছিঁড়ে গেলে সারিয়ে নেয়। শুধু কোয়েতজাল দেবতার মন্দিরটা পাথর গেঁথে তৈরি।

—ঐ দেশে গিয়ে আপনি বিপদে পড়েননি?

—প্রথমে কয়েকবার বিপদে পড়েছিলাম। তখন আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। ওরা নাহুয়াতল ভাষায় কথা বলে। ঐ ভাষার কয়েকটা শব্দ আমি শিখেছিলাম। তারই সাহায্যে কথা দিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে সৈন্যদের বললাম—আমাকে রাজা কালহুয়াকানের কাছে নিয়ে চল। ওরা আমাকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজাকে অনেক কষ্টে বোঝালাম যে আমি ব্রেগুন-এর বংশধর। ব্রেগুন নামটা ওদের কাছে পরিচিত। ব্রেগুন প্রথম রাজা কালহুয়াকানের পরামর্শদাতা ছিলেন এটা রাজা জানতেন। আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম। আমার স্বাধীন চলাফেরায় আর কোনো বাধাই রইল না।

—কিন্তু আপনি গিয়েছিলেন কেন? হ্যারি বলল।

বারিনথাস হাসল—এখনও বুঝতে পারলে না?

—সেই গুপ্ত ভাণ্ডার উদ্ধার করতে তাই কি না? ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক তাই। কিন্তু দীর্ঘ দশ বারো বছর চেষ্টা করেও সেই ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারিনি। তবে সেই দেশটার সব জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজে আমি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি যে গুপ্ত ভাণ্ডার আছে ঐ বিষাক্ত উপত্যকার মধ্যে যে পাথরের ওপর ফণিমনসার গাছ আছে ওখানেই।

—কিন্তু—ফ্রান্সিস বলল—একটা কথা ভেবেছেন কি সেই বিষাক্ত জলের উপত্যকার মধ্যে ব্রেগুন বা রাজা কালহুয়াকান কী করে গুপ্ত ভাণ্ডার রেখে এলেন?

—আমার মনে হয় দুশো বছর আগে ঐ উপত্যকাটা হয়তো অতটা বিষাক্ত হয়ে ওঠেনি।

—তাহলে তো পরবর্তীকালে রাজারা সহজেই গুপ্ত ভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারতেন। ফ্রান্সিস বলল।

বারিনথাস একটু ভাবল। বলল—হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো।

—আমার মনে হয় ওখানে পৌঁছবার এবং ফিরে আসার নিরাপদ কোনো পথ আছে। হয়তো বিষাক্ত উপত্যকার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বরাবর কোনো পথ চলে গেছে। সেই পথে গিয়েই ধনভাণ্ডারে রেখে আসা হয়েছিল। কিন্তু পরে সেই পথ বিষাক্ত জলে ডুবে যায়। পাথরের ওপর ফণিমনসার গাছের কাছে আর তারপরে কেউই যেতে পারে নি। ফ্রান্সিস বলল।

বারিনথাস কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবল। তারপর মাথা তুলে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে হাসল। ফ্রান্সিস তুমি সত্যিই বুদ্ধিমান।

হ্যারি হেসে বলল—ফ্রান্সিসের বুদ্ধি আর সাহসের কাহিনী নিয়ে আমাদের দেশের চারণকবিরা গান বেঁধেছে। গ্রামে গ্রামান্তরে সেই কাহিনী ওরা গেয়ে বেড়ায়।

—বলো কি!

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল —থাক ওসব কথা। আপনি বিশ্রাম করুন। পরে কথা হবে।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি নিজেদের কেবিন ঘরে চলে এল।

তখন রাত হয়েছে। ফ্রান্সিস জাহাজের ডেকে পায়চারি করছে। সমুদ্রের হু হু হাওয়ায় ওর মাথার চুল এলোমেলো হচ্ছে। মাথার ওপর নির্মেঘ আকাশ। পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়। চাঁদ উজ্জ্বল। চাঁদের নরম



ফ্রান্সিস জাহাজের ডেকে পায়চারি করছে।

আলো পড়েছে গৈরিক পাহাড়ে, সমুদ্রে।

এ সময় হ্যারি ডেকে উঠে এল। ফ্রান্সিস হ্যারির কাছে এল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, ভাইকিং বন্ধুরা তো দেশে ফেরার জন্যে উদগ্রীব। কী করবে এখন?

—এখন দেশে ফেরা হবে না।

—কিন্তু ওরা কি শুনবে?

—শুনতে হবে। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—তলতেকের দেশ স্রোমোতে যাব। কালহুয়াকান রাজাদের গুপ্তধন উদ্ধার করতে হবে।

—পারবে?

—ওখানে সব দেখেশুনে তবে বুঝতে পারবো।

—তুমি কি এজন্যে, বারিনথাসের সাহায্য নেবে?

—হ্যাঁ—তা তো নিতেই হবে। ওর সঙ্গে এই নিয়ে কালকে কথা বলবো। ও কেন ফিরে এলো, একা, একা গুহায় পড়ে রইল, এসব এখনও শোনা হয়নি।

—তাহলে আগে কথাবার্তা বলে তারপর সিদ্ধান্ত নাও।

—বেশ, তাই হবে।

পরদিন। ফ্রান্সিস আর হ্যারি বারিনথাসের কেবিনঘরে এল। বারিনথাস তখন ন্যাভিগেশিও বইটা পড়ছিল। ওদের দেখে বই বন্ধ করে উঠে বসল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ওর বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস বলল—এখন কেমন বোধ করছেন?

—খুব ভালো।

—আমাদের স্রোমো দেশে নিয়ে যেতে পারবেন?

—এ্যা? বারিনথাস বেশ চমকে উঠল।

—শুনুন—আমি স্থির করেছি আমরা কয়েকজন ঐ দেশে যাবো। আপনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। প্রথম রাজা কালহুয়াকানের ধনসম্পদ আমরা খুঁজে বের করবো।

—অসম্ভব। বারিনথাস মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল—আমি দীর্ঘ পনেরো বছরের আপ্রাণ চেষ্টাতেও পারিনি।

—আমি এখুনি অসম্ভব বলতে রাজী নই। ফ্রান্সিস বলল—ওখানে যাবো। সব দেখবো তারপর ভাববো। যদি বুঝি অসম্ভব, তখনই অসম্ভব বলবো। তবে একটা কথা জানবেন—একটা ক্ষীণ সূত্র থাকেই যেটা ধরে চিন্তা করে সমাধান বের করা যায়।

—দেখবেন চেষ্টা করে। বারিনথাস বলল।

—এবার বলুন তো আপনি তুলা থেকে চলে এলেন কেন?

—সে অনেক ব্যাপার। আমি যে সেই গুপ্ত ভান্ডারের খোঁজে আছি এটা কী করে রাজা টের পেয়ে গেল। আমাকে তখন থেকে চোখে চোখে রাখতে লাগল। আমি এর মধ্যে তলতেক উপজাতির রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। আমি নাহুয়াতল ভাষাও অনর্গল বলতে পারি। কিন্তু শত চেষ্টা করেও গুপ্তধনের হদিস করতে পারলাম না। যা হোক—কী যে দুর্বুদ্ধি হলো আমার। সেনাপতির দলে ভিড়ে গেলাম। সেনাপতি ষড়যন্ত্র করেছিল রাজাকে সিংহাসন থেকে উচ্ছেদ করতে।

সেনাপতি অনেক মূল্যবান মুক্তো মণিমাণিক্য দেবার লোভ দেখিয়ে আমাকে দলে টানল। কিছু অনুগামী সৈন্য নিয়ে সেনাপতি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। রাজা কালহুয়াকান নিষ্ঠুর হাতে সেই বিদ্রোহ দমন করলেন। বিদ্রোহী সেনাপতি ও সৈন্যদের সঙ্গে আমিও বন্দী হলাম। এখন তলতেক উপজাতিদের একটা ধর্মীয় রীতি প্রচলিত আছে, প্রতি তিন মাস অন্তর অমাবস্যার রাতে ওরা কোয়েতজাল দেবতার মন্দিরে নরবলি দেয়। অন্য উপজাতিদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় যাদের বন্দী করা হয় তাদেরই বলি দেওয়া হয়। মৃতদেহগুলি ছুঁড়ে ফেলা হয় বিষাক্ত উপত্যকায়। যে সব বিদ্রোহীদের বন্দী করা হয়েছিল তাদের বলি দেওয়া হতে লাগল। আমার ভাগ্যেও মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু তার আগেই বহু কষ্টে আমি পালালাম। পালিয়ে চলে এলাম এই গৈরিক পাহাড়ের আস্তানায়। গুহার বাইরে একটা গাছের ডাল পুঁতে ছেঁড়া জামাটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। যদি কোনো জাহাজযাত্রীদের নজরে পড়ে। আমাকে উদ্ধার করে। বারিনথাস কথা শেষ করে একটু হাঁপাতে লাগল।

—হুঁ। শুনুন—আমরা যাবো। আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন? ফ্রান্সিস বলল।

—পারবো বৈ কি। কিন্তু আপনাদের জীবনের নিরাপত্তা আমি দিতে পারবো না। উল্টে রাজা কালহুয়াকান আমাকে হাতের কাছে পেলে মেরে ফেলবে।

—ঠিক আছে। সে সব সমস্যার মোকাবিলা আমরাই করবো। ফ্রান্সিস বলল—ব্যাপারটা কি জানেন। জীবনে দুঃসাহসিকতা আমি পছন্দ করি। তাই আমি সমুদ্রযাত্রা করি, দ্বীপে দেশে ঘুরে বেড়াই। যে কোনো কঠিন কাজ করতে আমি ভালোবাসি। প্রথম রাজা কালহুয়াকানের গুপ্ত ধনসম্পদের ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। কিন্তু সেটা উদ্ধার করবার জন্য নিজের বুদ্ধি সাহস সব কাজে লাগাতে আমি আগ্রহী। বলতে পারেন এটাই আমার জীবন-দর্শন। অবশ্যই এ ব্যাপারে আমার বন্ধুরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে।

—আপনার কথাগুলো আমার কাছে একটু অদ্ভুত লাগছে। গুপ্তধনের ওপর কোনো লোভ নেই অথচ সেটা উদ্ধার করতে আগ্রহী—এটা ঠিক বুঝলাম না।

হ্যারি হেসে বলল—ফ্রান্সিসের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আরো দৃঢ় হোক তাহলেই ওর মনটাকে বুঝবেন।

—আচ্ছা চলি। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। হ্যারিও উঠল।

জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়াল দুজনে। হ্যারি বলল—তাহলে কী স্থির করলে? তলতেকদের দেশে যাবে?

—যাবো বৈকি।

—কিন্তু বন্ধুরা কি সব রাজী হবে? বাড়ি ফেরার জন্যে সবাই মুখিয়ে আছে।

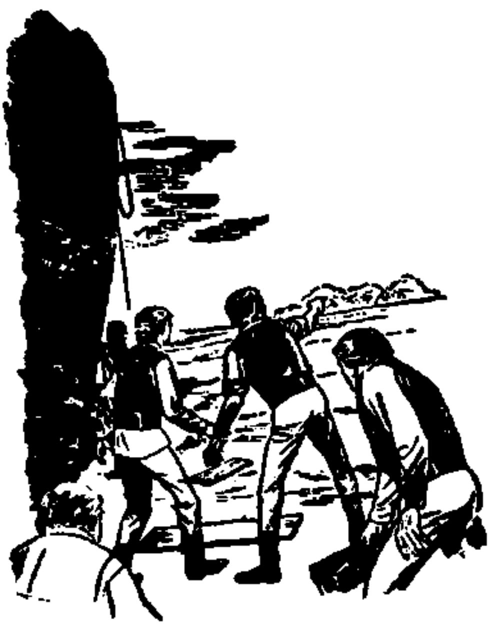
—সে সব আমি বুঝিয়ে বলছি। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর সবাইকে ডেকে উপস্থিত থাকতে বলো।

—বেশ।

সেদিন রাতে খাওয়া দাওয়া বেশ তাড়াতাড়িই সারল সব ভাইকিংরা। ফ্রান্সিস রাতে সভা ডেকেছে। সবাইকে উপস্থিত থাকতে হবে। কেন সভা ডেকেছে ফ্রান্সিস

সেটা এ-কান ও-কান হতে হতে সবাই জেনে গেল। ফ্রান্সিস আবার নতুন এক অভিযানে যাবে। কিন্তু খবরটা সত্যি কিনা সেটা ফ্রান্সিসের মুখে শোনার জন্যে সবাই ডেকে এসে জড়ো হলো।

একটু পরেই ফ্রান্সিস এল। সঙ্গে হ্যারি। সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ওপরে মেঘহীন আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলছে। সমুদ্রের শোঁ শোঁ হাওয়া আর ঢেউয়ের মৃদু গর্জন। এ ছাড়া চারদিকে কোনো শব্দ নেই।



এখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে দিন আট দশেকের পথ

ফ্রান্সিস একবার সবার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলতে লাগল ভাইসব, এখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে দিন আট দশেকের পথ। তারপর একটা দেশ। নাম স্ত্রোমো। রাজধানীর নাম তুলা। সেখানে আছে এক উপত্যকা। নাম বিষাক্ত উপত্যকা। নাম শুনেই বুঝতে পারছো সেই উপত্যকা কত মারাত্মক। বিষাক্ত জলাভূমি ওটা। কোনো প্রাণী ঐ উপত্যকায় পড়লে মুহূর্তে তার মৃত্যু হয়। এই জলাভূমির মাঝখানে রয়েছে একটা পাথরের চাঁই আর একটা ফণিমনসার গাছ। আর এখানেই রয়েছে তলতেক উপজাতির প্রথম রাজা কালহয়াকানের গুপ্তধন। ফ্রান্সিস একটু চুপ করল। তারপর বলতে লাগল—ভাইসব, ঐ গুপ্ত ধনভাণ্ডার আমরা খুঁজে বের করবো। সেইজন্যে আমি, হ্যারির সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করেছি আমরা তিনজন—আমি হ্যারি আর আমাদের তীরন্দাজ শাঙ্কো ঐ গুপ্তধন উদ্ধারে যাবো। ফ্রান্সিস চুপ করল। কেউ কোনো কথা বলল না। ফ্রান্সিস বলল—ভাইসব, তোমাদের কিছু বলবার থাকলে বলো।

একজন ভাইকিং বলল—তোমরা ফেরা না পর্যন্ত তো আমরা দেশে ফিরতে পারবো না।

—হ্যাঁ, তোমাদের এখানেই থাকতে হবে।

—কিন্তু ফ্রান্সিস, বিস্কো বলল—আমরা অনেকদিন দেশ ছাড়া। আমাদের মনের অবস্থাটা একবার বিবেচনা করো।

—বিস্কো, তুমি আমাকে জানো। আমাকে সংকল্পচ্যুত করা কঠি
যখন স্থির করেছি—যাবোই। তোমরা জাহাজ নিয়ে চ
...রাকে দিন কাটাও

—কিন্তু তোমরা তিনজন?

—আমরা স্ত্রোমো যাবো। এখনই বলতে পারছি না গুপ্তধন খুঁজে বের করতে পারবো কিনা। পারি বা না পারি ফিরে এসে এখানে থাকবো। কোনো জাহাজ নিশ্চয়ই পাবো। তখন দেশে ফিরে যাবো।

বিস্কো চেঁচিয়ে উঠলো—না, তোমাদের রেখে আমরা দেশে ফিরে যাবো না।

সব ভাইকিং চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো—।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—আমি গর্বিত যে তোমাদের মতো বন্ধু আমি পেয়েছি। ঠিক আছে। তাহলে দু'একদিনের মধ্যে আমরা রওনা হবো।

এবার হ্যারি বলল—আমরা কী ভাবে যাবো?

—বারিনথাস আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ও সঙ্গে থাকলে দোভাষীর কাজটা ও চালাতে পারবে।

—কিন্তু ভুলে যেও না ফ্রান্সিস—বারিনথাস পলাতক বন্দী। ও রাজা কালহুয়াকানের সুনজরে নেই।

ফ্রান্সিস একটু ভাবল মাথা নিচু করে। তারপর বলল—কথাটা ঠিকই বলেছো। ঠিক আছে, আগে স্ত্রোমোতে চলো তো, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবো।

সভা ভেঙে গেল। ভাইকিংরা সব কথাবার্তা বলতে বলতে কেবিনে চলে গেল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস হ্যারির কেবিনে এল। ওর হাতে ন্যাভিগেশিও বইটা। হ্যারি বলল—বইটা দেখলে?

—হ্যাঁ। প্রাচীন ল্যাটিন ভাষা। পড়তে তো পারবো না। তবে কোয়েতজাল দেবতার ছবিটা ভালো করে দেখেছি। 'আচ্ছা হ্যারি' ফ্রান্সিস বইটা হ্যারির সামনে এগিয়ে ধরল। একেবারে শেষ পাতাটা দেখিয়ে বলল—দেখ তো, এই শেষ ক'টা লাইন কেমন অন্যভাবে সাজানো বলে মনে হচ্ছে না—যেন ছড়া বা কবিতার মতো।

হ্যারি মনোযোগ দিয়ে জায়গাটা দেখল। বলল—তোমার অনুমান সত্যি। এটা আগের লেখা গদ্যের মতো নয়, মনে হচ্ছে ছড়া জাতীয় কিছু।

—হ্যারি চলো, বারিনথাসের সঙ্গে এই নিয়ে কিছু কথা বলবো।

দু'জনে যখন বারিনথাসের কেবিনঘরে ঢুকল, বারিনথাস তখন একটা ভাঙা আয়নায় মুখ দেখছে। ওদের দেখে আয়নাটা রেখে দিল। দু'জনে বসল।

—আপনার বইটা।

বারিনথাস বইটা নিয়ে বিছানায় রাখল।

ফ্রান্সিস বলল—বইটা ভালো করে দেখলাম। আচ্ছা, দেবতা কোয়েতজালের মূর্তিটা একটু অদ্ভুত না?

—কেন বলো তো?

—কোয়েতজালের হাত দু'টো পেছনে। এরকম দেবমূর্তি বড় একটা দেখা যায় না।

—এটা তোমার নজরে পড়েছে তাহলে? হ্যাঁ ঠিকই—দেবমূর্তির হাত দুটো পেছনে।

মুখটা কঙ্কাল।

—হ্যাঁ, কোয়েতজালের জীবন ও মৃত্যুর দেবতা।

—মূর্তিটা কত বড়?

—একজন সাধারণ মানুষের উচ্চতার সমান।

—একটা কথা—ফ্রান্সিস বলল। তারপর বিছানা থেকে বইটা নিয়ে বারিনথাসের হাতে দিল। শেষ পাতাটা বের করে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—এটা কী লেখা বলুন তো?

বারিনথাস হাসল। বলল—এটা একটা উদ্ভট ছড়া। মাথামুণ্ডু বোঝার উপায় নেই।

—তবু—ছড়াটা অনুবাদ করে বলুন তো?

—ছড়াটা কিন্তু ল্যাটিন ভাষায় লেখা নয়। তলতেক উপজাতির মুখের ভাষা নাহুয়াতল—সেই ভাষায় লেখা। স্পেনীয় বর্ণমালায়।

—আপনি তো ঐ ভাষা জানেন। অনুবাদে অর্থ বলুন।

বারিনথাস বলল—ঠিক অক্ষর সাজিয়ে অনুবাদ করলে এইরকম দাঁড়ায়—

অদ্ভুত অদ্ভুত!
ব্রেগুনের ছড়া।
পা আছে হাত নেই
মাথা
এক হাত পিঠে বাঁধা
টল্‌মল্ টল্‌মল্
অতল তল অতল তল।
এক হাত ধূলিময়
মুখ নয় কথা কয়
আঙুল তুলে হে—
কোন ভুলে হে—
পাথরেতে মনসা গাছ
কিম্ভূত কিম্ভূত।

ছড়াটা শেষ হতে ফ্রান্সিস বলল—ছড়াটা আর কয়েকবার বলুন।

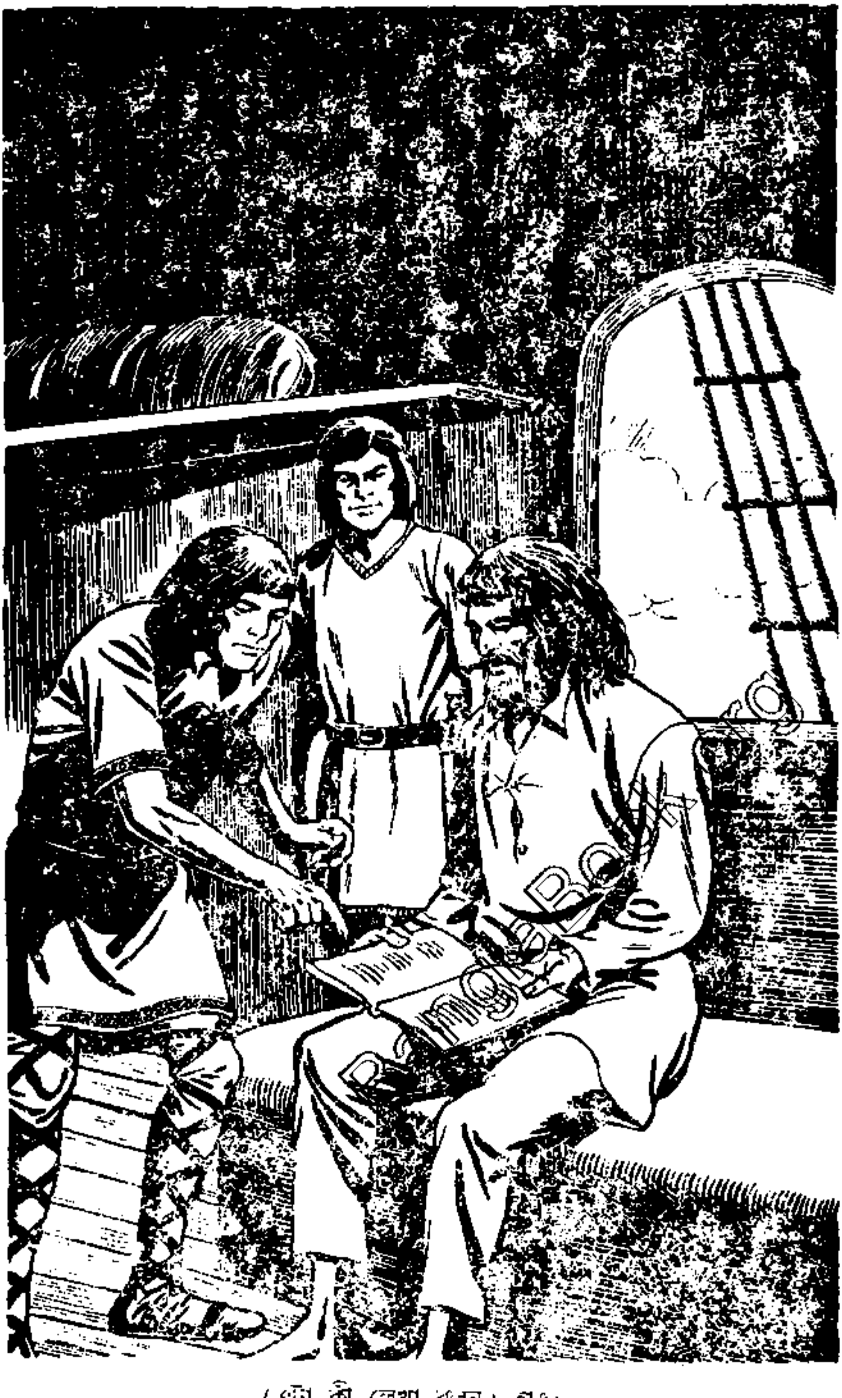
বারিনথাস বার পাঁচেক ছড়াটা বলল। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে গভীর মনোযোগ দিয়ে ছড়াটা শুনল।

একটু পরে হ্যারি বলল—কিছু বুঝলে?

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকাল—নাঃ। তবে এই ছড়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্রেগুনের এই ছড়াটা অর্থহীন উদ্ভট নয়। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারবো দেবমন্দির—মূর্তি—বিষাক্ত উপত্যকা-রাজবাড়ি দেখার পর। মোট কথা, ওদেশে গেলে। এবার ফ্রান্সিস বারিনথাসের দিকে তাকাল—আচ্ছা, একটা ব্যাপার। যাজক ব্রেগুন রাজাকে ধনভাণ্ডার লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিলেন তো?

—হ্যাঁ।

—এই জন্যে নিশ্চয়ই ব্রেগুন তলতেক সৈন্যদের বা অন্য লোকদের সাহায্য



(এটা কী লেখা বলুন তো?)

নিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, বইটিতে লেখা আছে ব্রেগুন সেনাপতি ও সৈন্যদের সাহায্য নিয়েছিলেন।

—তাহলে তো তাদের এই গুপ্ত ভাণ্ডারের হদিশ জানার কথা।

—কিন্তু ব্রেগুনের পরামর্শে রাজা কালহুয়াকান সেই সেনাপতি ও সৈন্যদের বিষাক্ত উপত্যকায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

—রাজা নিজেও কি জানতেন না? তিনি তো তাঁর বংশধরদের বলে যেতে পারতেন।

—এখানেই ব্রেগুন আর ধর্মযাজকের মতো নির্লিপ্ত থাকেননি। তিনি একটা চাল চেলেছিলেন। তিনি ধনসম্পদের নেশায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন। রাজাকে বলেছিলেন—আমি দেশে যাচ্ছি। ফিরে এসে আপনাকে জানাব কীভাবে আমি ধনভাণ্ডার লুকিয়ে রেখেছি। রাজাও ওকে বিশ্বাস করে দেশে যেতে দিয়েছিলেন। ব্রেগুনের মতলব ছিল দেশে ফিরে আরও লোকজন নিয়ে সেই ধনভাণ্ডার চুরি করবে। দেশে নিয়ে যাবে। কিন্তু ব্রেগুনের এই আশা অপূর্ণই থেকে গেছে। বয়েসও হয়েছিল। কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। তখনই ন্যাভিগেশিও গ্রন্থের লেখকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ব্রেগুন লেখককে তাঁর সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বিভিন্ন দ্বীপ দেশের কাহিনী, স্রোমো দেশের কাহিনী মুখে মুখে বলেছিলেন। লেখক সেই কাহিনী লিখেছিল। তারপর ব্রেগুন মারা গেলেন। রাজা কালহুয়াকানের আর জানাই হলো না সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডারের হদিস।

—তাহলে দেখা যাচ্ছে—ফ্রান্সিস বলল—একমাত্র ব্রেগুনই জানতেন কোথায় এবং কীভাবে লুকোনো আছে সেই ধনভাণ্ডার।

—ঠিক তাই। বারিনথাস বলল।

—এবার বলুন তো, কীভাবে যাবো আমরা? হ্যারি বলল।

—এই পাহাড়ের ওপাশে আছে বহুদূর বিস্তৃত সবুজ ঘাসের প্রান্তর। সেখানে অনেক বুনো ঘোড়া ভেড়া চরে বেড়ায়। সেই ঘোড়া ধরতে হবে। পোষ মানাতে হবে। সেসব ঘোড়ার পিঠে মোটা কাপড়ের জীন বাঁধতে হবে। তারপর সেইসব ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে, বারিনথাস বলল।

ফ্রান্সিস বলল—এ তো সময়সাপেক্ষ।

—হ্যাঁ, দিনকয়েক ঘোড়াগুলোকে পোষ মানাতেই যাবে।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—তাহলে কালকেই আমরা ঐ প্রান্তরে যাবো। ঘোড়া ধরতে পোষ মানাতে আপনি কিন্তু সাহায্য করবেন।

নিশ্চয়ই করবো।

—চলি।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি চলে গেল।

পরদিন দুপুরে বারিনথাসকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো চলল সবুজ প্রান্তরের উদ্দেশে। বারিনথাস সঙ্গে নিল লম্বা দড়ি। গোল করে পাকানো। ফ্রান্সিস বলল—দড়ি নিলেন ঘোড়া বাঁধবার জন্যে?

—হ্যাঁ। দ্যাখো দড়ি দিয়ে ফাঁস তৈরি করেছি। এই ফাঁসকে বলে ল্যাসো। বুনো ঘোড়ার গলায় ফাঁস ছুঁড়ে বাঁধতে হয়। শিখে গেলে তোমরাও পারবে।

গৈরিক পাহাড়ের পাথরের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে ওরা পাহাড়টা পার হলো। ফ্রান্সিস দেখল, দূরে বিস্তৃত সবুজ ঘাসের প্রান্তর। মাঝে মাঝে ছড়ানো ছিটানো পাথর।

ওরা এক সময় প্রান্তরের মুখে এসে দাঁড়াল। দেখল অনেক বুনো ঘোড়া ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। বারিনথাস ঘোড়াগুলোর দিকে যেতে যেতে বলল—আমার ঘোড়াটাও এই দলের মধ্যে আছে।

বারিনথাস ঘোড়াগুলোর কাছে যেতেই ঘোড়াগুলো এদিক ওদিক সরে গেল। বারিনথাস তীক্ষ্ণস্বরে শিস্ দিল। দেখা গেল একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়েছে। সেটার পিঠে মোটা কাপড়ের জিন বাঁধা। মুখে দড়ির লাগাম। বারিনথাস আস্তে আস্তে ঐ ঘোড়াটার কাছে গেল। ঘোড়াটার চোয়ালের কাছে চোখের কাছে আলতো চাপড় মেরে মেরে আদর করতেই ঘোড়াটা চি-হিঁ-হিঁ করে ডেকে উঠল। বারিনথাস তখন মাটি থেকে একটা বেশ বড়সড় পাথর তুলে ল্যাসোর অন্য প্রান্তে বাঁধল। তারপর পেটের কাছে নিয়ে লাফিয়ে ঘোড়াটার পিঠে উঠে বসল। তাকে ছোটাল বুনো ঘোড়াগুলো যেখানে ঘাস খাচ্ছিল সেইদিকে। মুহূর্তে বারিনথাস বুনো ঘোড়ার দঙ্গলের একেবারে কাছে পৌঁছে গেল। বুনো ঘোড়াগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুট লাগাল। বারিনথাস একটা গায়ে সাদা ছিট ছিট ছুটন্ত ঘোড়ার পেছনে ছুটল। বুনো ঘোড়াটা ছুটছে। বারিনথাস পেছনে পেছনে ছুটল। এবার বারিনথাস হাতের দড়িটা শূন্যে ঘোরাতে লাগল। ঘোরাতে ঘোরাতে একসময় ছুঁড়ে দিল সাদা ছিট ছিট ঘোড়াটার গলায়। মুহূর্তে ল্যাসোর ফাঁস জড়িয়ে গেল ঘোড়াটার গলায়। বারিনথাস এবার বাঁ হাতে কোলের কাছে ধরা দড়ি বাঁধা পাথরটা মাটিতে ফেলে দিল। বুনো ঘোড়াটা দড়ি বাঁধা পাথর টানতে টানতে ছুটল। বারিনথাস এবার নিজের ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিল। বুনো ঘোড়াটার গতি তখন অনেক কমে গেছে। আরো কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করল ঘোড়াটা। তারপর ক্লান্ত হয়ে আস্তে আস্তে একসময় দাঁড়িয়ে পড়ল। বারিনথাস বুনো ঘোড়াটার কাছে এল। ল্যাসোর দড়িটা ধরে টানতে টানতে ফ্রান্সিসদের দিকে আসতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল ক্লান্ত বুনো ঘোড়াটার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে।

বারিনথাস নিজের ঘোড়া থেকে নামল। বুনো ঘোড়াটার চোখের কাছে চোয়ালে আলতো চাপড় মেরে আদর করতে লাগল। ঘোড়াটা শান্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইল। বারিনথাস লাগাম জিন ছাড়াই এক লাফে ঘোড়াটার পিঠে চড়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা ছুটল। কিন্তু জোরে নয়। ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ওটা। বারিনথাস এপাশ ওপাশ ঝাঁকুনি খেতে খেতে বসে রইল। কখনো ঘোড়াটার গলা জড়িয়ে ধরল, কখনো ঘোড়াটার ঘাড়ের লম্বা লম্বা কেশর টেনে ধরল। ঘোড়াটাকে কিছুক্ষণ ছুটিয়ে বারিনথাস তার পিঠ থেকে নামল। তারপর ওটার গলায় দড়ি পরিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এল ফ্রান্সিসদের কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এটা আর দু'একদিনের

মধ্যেই পোষ মেনে যাবে। তোমরা দু'জন আমার পুরোনো ঘোড়াটায় চড়ে যাবে।

বারিনথাস এবার ঘোড়া দু'টোকে দড়ি দিয়ে পাথরের একটা খণ্ডের সঙ্গে বেঁধে রাখল। তিনজনে এরপর গেরুয়া পাহাড় পেরিয়ে জাহাজে ফিরে এল।

পরের দু'তিনদিন ধরে বারিনথাস নতুন ঘোড়াটাকে পোষ মানাল। ঘোড়াটা শান্ত হলো। বারিনথাস ঘোড়াটার মুখে দড়ির লাগাম পরাল—পিঠে মোটা কাপড়ের জিন বাঁধল।

রওনা হবার দিন এসে গেল। সেদিন সকাল থেকেই ফ্রান্সিস খুব ব্যস্ত। জল, ময়দা, খাবার দাবার, ঘোড়ার খাদ্য ছোলা সব জড়ো করল। তরোয়াল, তীর ধনুক, বর্শাও নিল। জাহাজ থেকে গেরুয়া পাহাড়ে নামল। বারিনথাস বারবারই বলছিল—আরো ঘোড়া পোষ মানিয়ে বেশি লোক নিয়ে চলো। কিন্তু ফ্রান্সিস রাজী হয়নি।

চার পাঁচজন ভাইকিং বন্ধু ওদের মালপত্র বয়ে নিয়ে চলল।

তখন দুপুর। ওরা ঘাসের প্রান্তরে এসে পৌঁছল। দু'টো ঘোড়া পাথরে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। বারিনথাস নতুন ঘোড়াটার পিঠে উঠল। হ্যারি ওর পেছনে বসল। বন্ধুরা কিছু মালপত্র ঘোড়াটার পিঠের দু'পাশে ঝুলিয়ে দিল। পুরোনো ঘোড়াটার পিঠে উঠল ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো। বন্ধুরা ঐ ঘোড়ার পিঠেও বাকী মালপত্র ঝুলিয়ে দিল।

যাত্রা শুরু করার আগে ফ্রান্সিস বন্ধুদের উদ্দেশে বলল—তোমরা সজাগ থেকো। রুপোর থামদু'টো পাহারা দিও। যদি আমাদের কোনো বিপদ হয় তোমাদের এখানে খবর পাঠাবো। তবে আমরা তো লড়াই করতে যাচ্ছি না। কাজেই বিপদে পড়ার আশঙ্কা নেই। এবার তোমরা জাহাজে ফিরে যাও।

ফ্রান্সিস ঘোড়া ছোটাল। বন্ধুরা হাত নেড়ে বিদায় জানাল। তারপর জাহাজে ফিরে এল।

সন্ধ্যে নাগাদ একটা পাহাড়ী এলাকায় এল ফ্রান্সিসরা। রাতে পথ চলা যাবে না। একটা বড় ঝাঁকড়া পাতাঅলা গাছের নিচে ওরা ঘোড়া থেকে নেমে বসল। আজ রাতের মতো এখানেই আশ্রয়। বিশ্রাম।

চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাল শাঙ্কো। রান্না করল শাঙ্কো। খাওয়া দাওয়া সেরে ঘোড়া দুটোকে গাছের সঙ্গে বাঁধল। একটা পাত্রে জল ছোলা খেতে দিল। ঘাসের ওপর কম্বল পেতে ওরা শুল। ফ্রান্সিস বাদে ওরা তিনজন ঘুমিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ও উঁচু গাছটার ঝুপসি ডালপাতার দিকে তাকিয়ে রইল। চারদিকে অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষ চলছে বোধহয়। নানা চিন্তা মাথায়। স্ত্রোমো কেমন দেশ। কোনো বিপদ হবে কিনা। গুপ্তধন শেষপর্যন্ত উদ্ধার করা যাবে কিনা। এসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে আবার সব বাঁধা ছাঁদা করে ঘোড়ার পিঠে উঠল ওরা। বারিনথাস রওনা হবার সময়ই বলল, ঘোড়া জোরে ছুটিও না। কোনো কারণে ঘোড়া অসুস্থ হয়ে পড়লে সর্বনাশ। এই পথে ঘোড়াই একমাত্র সম্বল। তাই ওরা ঘোড়া জোরে ছোটাচ্ছিল না।

বিচিত্র প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে ওরা চলল। কোথাও উঁচু পাহাড়। কোথাও গভীর

খাদ। অনেক নিচে রুপোলি ফিতের মতো পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে। কোথাও লালরঙের ধুলোর প্রান্তর। তার মধ্যে ছড়ানো পাথর। ঘোড়া ছুটছে। পেছনে উঠছে লাল ধুলোর ঝড়। কোথাও পেয়েছে ছোট নদী। ঘোড়াগুলো পেট ভরে জল খেয়ে নিয়েছে। ওরাও জল খেয়েছে। চামড়ার থলেয় জল ভরে নিয়েছে।

তিন চার দিন কেটে গেল। ফ্রান্সিস বারিনথাসকে বলল—চলো, রাতেও আমরা এগিয়ে যাই। আমার বন্ধুরা বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত। কাজেই বেশি দেরি করতে পারবো না।

বারিনথাস রাজী হলো। ওরা রাতেও ঘোড়া ছোটাতে লাগল।

পাঁচদিনের দিন বিকেলে ওরা সবুজ গাছগাছালিভরা একটা জায়গায় এল। দেখলে দূরে দূরে কয়েকটা পাথরের বাড়িঘর। কোন কোন বাড়ি রোদে পোড়া ইঁটে তৈরী। এদিকে ওদিকে তুলো গাছের ক্ষেত। বাড়ির সামনে মেয়েরা দাঁড়িয়ে বসে আছে। বাচ্চা ছেলেপুলেরা এদিকে ওদিকে খেলছে। সবাই অবাক চোখে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল।

বারিনথাস ঘোড়া থামাল। ফ্রান্সিসও ঘোড়া থামাল। বারিনথাস বলল—স্রোমো দেশ শুরু হলো। এরা তলতেক উপজাতির মানুষ।

সেই রাতটা ওখানেই একটা গাছের নিচে ওরা রইল। বারিনথাস কাছাকাছি কোনো তলতেক-এর তাঁবু থেকে খরগোশের মাংসের ঝোল নিয়ে এল। কয়েকদিনের পর ভালো খাবার পেট ভরে খেল সবাই। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠেই সব গোছগাছ করে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হলো।

দুপুরের দিকে ওরা রাজধানী তুলায় পৌঁছল। দূর থেকে পাথরে গড়া বাড়ি চোখে পড়ল। বারিনথাস বলল—ঐ বাড়িটাই কোয়েতজাল দেবতার মন্দির। মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছতে বারিনথাস আঙুল দিয়ে মন্দিরের পেছনে একটা উপত্যকা মতো নিচু জায়গা দেখাল। বলল—এটাই হচ্ছে বিষাক্ত উপত্যকা।

—একটু ভালো করে দেখতে হয়। কথা বলে ফ্রান্সিস ঘোড়া থেকে নামল। উপত্যকার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। বারিনথাস ঠিকই বলেছে। ঐ দুপুরেও জায়গাটায় কুয়াশা ছড়িয়ে আছে। যেন ধোঁয়া উঠছে। জলের রঙ সঠিক বোঝার উপায় নেই। জলাভূমি মতো। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু আশ্চর্য—কাঠি কাঠি ঘাসের মতো গাছ আছে আর তাতে অজস্র গাঢ় বেগুনি রঙের ফুল ফুটে আছে। উপত্যকাটার একপাশে একটা ছোট পাহাড় উঠে গেছে। অন্যপাশে কোয়েতজাল দেবতার পাথরের মন্দির।

বারিনথাস আঙুল উঁচিয়ে বলল—ঐ দেখ, পাথরে ফণিমনসার গাছ।

ফ্রান্সিস দেখল সত্যিই উপত্যকাটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা কালো পাথর। তার ওপর একটা ফণিমনসার গাছ।

তুলা নামেই রাজধানী। তেমন কিছু জমজমাট জায়গা নয়। তুলার চারপাশে এক মানুষ উঁচু পাথুরে দেয়াল। বোধহয় শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে। পাথরের বাড়িঘর এলাকাটায়। এখানে বেশি সংখ্যক লোকজনের বাস। পাথরের দেয়ালের বাইরে বাজার মতো বসেছে। লোকজন কেনাকাটা করছে। মেয়ে পুরুষ

সকলের গায়েই মোটা সুতোর পোশাক। নানা বিচিত্র রঙের পোশাক সেসব। পোশাক থেকে সুতোর ঝালর ঝুলছে। এমন সময় দেখা গেল একদল সৈন্য এগিয়ে আসছে। সৈন্যদের গায়ে কোনো পোশাক নেই। পরনে পা পর্যন্ত ঢাকা এক ধরনের পোশাক। খালি গায়ে মুখে লাল হলুদ সবুজ উল্কি আঁকা। মাথায় লাল কাপড়ের ফেট্টি। তাতে অনেক পাখির পালক গোঁজা। সৈন্যদের হাতে লোহার ছুঁচোলোমুখ বর্শা।

সৈন্যরা এসে ওদের ঘিরে দাঁড়াল। বারিনথাস ডান হাত ওপরে তুলে নাহুয়াতল্ ভাষায় কী বলে গেল। সৈন্যদের মুখে হাসি দেখা গেল। কথাটা শুনে ওরা খুশি হয়েছে বোঝা গেল। সকলে সরে গেল।

ফ্রান্সিস ফিসফিস্ করে বলল—হ্যারি ওদের এত খুশি হবার কারণ কী?

—বোধহয় বারিনথাস বলল, আমরা বন্ধু, শত্রু নই। তাছাড়া বারিনথাস পলাতক বন্দী। অথচ ও বেশ নির্ভয়েই সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলল। আত্মগোপনের কোনো চেষ্টাই করল না।

বারিনথাসের পিছু পিছু ওরা চলল। কোয়েতজাল দেবতার মন্দিরের পাশে একটা পাথরের বাড়ি। ছাউনিটা এই এলাকায় যে লম্বা লম্বা ঘাস হয় তাই দিয়ে তৈরি। বারিনথাস বলল—এটা রাজবাড়ি। চলো—সব আগে রাজার সঙ্গে দেখা করার নিয়ম।

যেতে যেতে ফ্রান্সিস বলল—বারিনথাস তোমার বাড়ি কোনটা?

বারিনথাস আঙুল দিয়ে রাজবাড়ির ডানপাশে একটা পাথরের বাড়ি দেখাল।

রাজবাড়িতে ঢুকল ওরা ঘোড়া থেকে নেমে। আলো থেকে অন্ধকার ঘরে ঢুকে ওরা প্রথমে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। অন্ধকার সয়ে আসতে দেখল একটা তুলো কাপড়ের আসনে জাগুয়ারের চামড়ার ওপর রাজা বসে আছে। খাড়া নাক। গায়ের রঙ তামাটে। মাথায় পাখির পালকের মুকুট। কপালে হলুদ কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। রাজা ফ্রান্সিসদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

বারিনথাস দু'হাত ওপরে তুলে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর মাথা মেঝের ওপর রাখল। উঠে বসল। তারপর নাহুয়াতল্ ভাষায় কী বলে গেল। রাজার মুখে হাসি ফুটল। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে ডাকল হ্যারি।

হ্যারি চাপাস্বরে বলল—লক্ষ্য করেছি—কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না।

—বারিনথাস বলেছিল রাজা ওকে পেলে মেরে ফেলবে। এখন দেখছি রাজা ওর কথা শুনে খুব খুশী। ওকে কিছু বলছে না।

এবার রাজা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে কী বলল। বারিনথাস দোভাষীর কাজ করতে লাগল। তাতে রাজা ও ফ্রান্সিসের কথাবার্তা এইরকম দাঁড়াল।

রাজা—তোমরা জানো তোমাদের এখানে কেন আনা হয়েছে?

ফ্রান্সিস—আমাদের আনা হয়নি। আমরা নিজেরাই এসেছি।

রাজা—কেন?

ফ্রান্সিস—প্রথম রাজা কালহুয়াকানের গুপ্তধন বের করবো তাই।

রাজা—সেই গুপ্তধন কোথায় আছে জানো?

ফ্রান্সিস—না। তবে শুনেছি বিষাক্ত উপত্যকার মাঝখানে।

রাজা—বিষাক্ত উপত্যকা কেমন জায়গা জানো?

ফ্রান্সিস—জানি।

রাজা—পারবে গুপ্তধন উদ্ধার করতে?

ফ্রান্সিস—আগে সব দেখি শুনি তারপর বলতে পারবো।

রাজা (হেসে)—যদি ততদিন বাঁচো।

ফ্রান্সিস—তার মানে?

রাজা—কোয়েতজাল দেবতা যেমন জীবনের দেবতা তেমনি মৃত্যুরও দেবতা।

ফ্রান্সিস বারিনথাসের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—এসব কথার মানে কী?

—রাজার মেজাজের কিছু স্থিরতা নেই। ভুলে যাও এসব কথা।

ফ্রান্সিস দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। দেখল—ঘরের দরজার কাছে দু'জন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে দ্রুত বলে উঠল—হ্যারি শাঙ্কো—পালাও—আমার পেছনে।

ফ্রান্সিস এক লাফে দরজার কাছে চলে এল। পেছনে হ্যারি আর শাঙ্কো। দরজায় পাহারাদার সৈন্য কিছু বোঝবার আগেই ফ্রান্সিস দু'জনকেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। তারপর এক লাফে বাইরের চত্বরে গিয়ে দাঁড়াল। পেছনে হ্যারি আর শাঙ্কো। ঠিক তখনই দরজার পাহারাদার একজন উঠে দ্রুত হাতে বর্শা ছুঁড়ল। বর্শা গিয়ে বিঁধল ফ্রান্সিসের বাঁ পায়ে। ফ্রান্সিস হাত দিয়ে এক টানে বর্শাটা খুলে ফেলল। গলগল করে রক্ত ছুটল। ফ্রান্সিস বসে পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়াল। ছুটতে যাবে দেখল ততক্ষণে রাজবাড়ির পাহারাদার সৈন্যরা ওদের ঘিরে ফেলেছে। ফ্রান্সিস আবার দু'হাতে পা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল। শাঙ্কো তখন তীর ছোঁড়ার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। বলে উঠল—শাঙ্কো, ধনুক নামাও। এখন লড়াই নয়।

শাঙ্কো ধনুক নামাল। হ্যারি ছুটে এসে ফ্রান্সিসের পায়ের জখমের জায়গার ওপরে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল—যদি রক্তপড়া বন্ধ করা যায়। রক্ত পড়া একটু কমল বটে কিন্তু একেবারে বন্ধ হলো না।

এর মধ্যে রাজা কালহুয়াকান বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে বারিনথাস। রাজা চিৎকার করে বারিনথাসকে কী বললেন। বারিনথাস ফ্রান্সিসদের কাছে এসে দাঁড়াল। হেসে বলল—পালাতে গিয়ে ভুল করলে। রাজার রাগ বাড়িয়ে দিলে। এবার চলো গারদ ঘরে। ওখানেই থাকতে হবে কয়েকদিন।

—কয়েকদিন কেন?

—সেটাও কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝবে। বারিনথাস হেসে বলল।

ফ্রান্সিস এক ঝটকায় দ্রুত উঠে দাঁড়াল। রাজার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল—আমাদের নিয়ে কী করতে চান?

রাজা একবার ফ্রান্সিসদের দিকে ক্রুদ্ধ নজরে তাকিয়ে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। বারিনথাস হেসে বলল—তাহলে এবার আসল কথাটা বলি। আর চারদিন পর অমাবস্যা পড়বে। সেই রাতে কোয়েতজাল দেবতার বেদীতে তোমাদের বলি দেওয়া হবে।

তিনজনেই ভীষণভাবে চমকে উঠে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বারিনথাসের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—তাহলে এইজন্যেই তুমি আমাদের প্রথম রাজা কালহুয়াকানের গুপ্তধনের লোভ দেখিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—আমার আরো বন্ধুদের আনতে বলেছিলে?

—ঠিক তাই। আমার কাজই এই। রাজা আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছেন একটি চুক্তিতে—তিন মাস অন্তর অমাবস্যার রাতে নরবলি দেবার জন্যে আমি মানুষ যোগাড় করে আনবো। আমিও এ কাজে রাজী হলাম এইজন্যে যে আমি তাহলে এখানে থাকতে পারবো। গুপ্তধন খুঁজতে পারবো। তারপর একদিন গুপ্তধন উদ্ধার করে নিয়ে পালাতে পারবো।

—কিন্তু গেরুয়া পাহাড়ের গুহায় গিয়েছিলে কেন? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

ওটা আমার ফাঁদ পাতার জায়গা। গুহার বাইরে ছেঁড়া জামা ঝুলিয়ে রাখি, জাহাজ এলে জাহাজের লোকেরা সেই সংকেত দেখে আমাকে উদ্ধার করে। আমি গুপ্তধনের লোভ দেখিয়ে জাহাজের লোকদের এখানে নিয়ে আসি। তাদের বলি দেওয়া হয়। রাজাও আমার ওপর খুশি হয়। আমিও নিশ্চিন্তমনে গুপ্তধন খুঁজি।

—এর আগেও নিরীহ মানুষদের লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসেছো?

—হ্যাঁ, তবে এর আগেরবারগুলোতে দশ পনেরো জন করে এনেছি। এবার তোমরা তিনজন মাত্র। বোধহয় কয়েদ রয়েছে কিছু।

ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আস্তে আস্তে বলতে লাগল—বারিনথাস, মৃত্যুর মুখ থেকে তোমাকে আমরা ফিরিয়ে এনেছি, ওষুধ দিয়েছি, সেবা-শুশ্রূষা করে তোমাকে সুস্থ করেছি। খাদ্য দিয়েছি, আশ্রয় দিয়েছি। যে পোশাকটা পরে আছো সেটাও আমরাই দিয়েছি। বদলে আমাদের হত্যা করবার জন্যে নিয়ে এলে! কী অকৃতজ্ঞ! কী সাংঘাতিক মানুষ তুমি!

নির্বিকার বারিনথাস বলল—নইলে গুপ্তধন খুঁজবো কী করে।

ফ্রান্সিস বলল—আমাদের ভাগ্যে যাই ঘটুক তোমাকে একটা অনুরোধ করে যাই—এমন কাজ আর করো না। এতে মানুষ মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাবে। আমরা জানোয়ারেরও অধম হয়ে যাবো।

বারিনথাস হাসল শুধু।

বারিনথাস সৈন্যদের উচ্চস্বরে কী আদেশ করল। সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের টেনে নিয়ে চলল।

ফ্রান্সিস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। তখনো ওর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ছে। হ্যারি চলতে চলতে বলল—ফ্রান্সিস, বারিনথাসকে ওষুধ দেবার কথা বলবো?

—না, ওরকম একটা জঘন্য প্রকৃতির মানুষের কোনো সাহায্য আমি চাইবো না।

—কিন্তু এত রক্ত পড়ছে—তুমি দুর্বল হয়ে পড়বে।

—শরীরের দিক থেকে, মনের দিক থেকে নয়। হ্যারি, আমরা লড়াই করবো মনের জোরে।

ঘরটা রাজবাড়ির দক্ষিণ কোণায়। দেওয়ালগুলো পাথর গেঁথে তৈরি। তখনও ফ্রান্সিসদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়নি। অবশ্য তরোয়াল তীর ধনুক হাতে থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্সিস তখন লড়াই করার কথা নিজে ভাবছিল না। ও আহত। ওদিকে সৈন্যরা সংখ্যায় জনা দশেক। এই অবস্থায় একবার লড়াইয়ে নামলে ওরা তিনজন বাঁচবে না। বরং বন্দী করে রাখলে পরে পালানোর উপায় বার করা যাবে। বুদ্ধি খাটিয়ে সেই কাজটিই করতে হবে। এখন ওরা যা করতে চাইছে সেটা মেনে নেওয়াই ভালো।

ওরা কয়েদ ঘরের কাছাকাছি চলে এসেছে ঠিক তখনই দু'জন অশ্বারোহী সৈন্যদের কাছে এসে থামল। অশ্বারোহী সৈন্য দু'জন ঘোড়া থেকে নামল। সৈন্যদের কাছে এসে ওরা হাত পা নেড়ে ওদের ভাষায় কী বলল। সৈন্যটি বর্শা উঁচিয়ে মুখ হাত দিয়ে থাবড়াতে থাবড়াতে উলুধ্বনির মত এক অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। তারপর শব্দ থামিয়ে ছুটল ঐ শহরের চারপাশে গাঁথা পাথুরে দেয়ালের দিকে।



উলুধ্বনির মতো এক অদ্ভুত শব্দ করতে লাগলো।

শুধু যে দু'জন সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল সেই দু'জন রইল। তারা সামনের একটা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঘোড়া দুটো বাঁধতে লাগল। তখনই ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল—'হ্যারি-শাঙ্কো'—এই সুযোগ। ঘোড়া দুটো বাঁধবার আগেই ঘোড়া দু'টো ছিনিয়ে নিতে হবে। একটায় আমি অন্যটায় শাঙ্কো আর হ্যারি তুমি জলদি।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ছুটে গিয়ে সৈন্য দু'টোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সৈন্য দু'জন ভাবতেও পারে নি যে ওরা এভাবে আক্রান্ত হবে। ফ্রান্সিস একজন সৈন্যের ঘাড়ে তরোয়ালের বাঁট দিয়ে ঘা মারল। সৈন্যটা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। শাঙ্কো অন্য সৈন্যটার মাথা দু'হাতে ধরে গাছের গায়ে ঠুকে দিল। ঐ সৈন্যটাও গাছের গোড়ায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস আহত পা নিয়েও লাফিয়ে একটা ঘোড়ার পিঠে উঠল। তরোয়ালটা কোমরে গুঁজল। লাগাম হাতে নিয়ে ঘোড়ার পেটে পা দিয়ে জোরে খোঁচা মারল। ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠে ছুটল। শাঙ্কোও ততক্ষণে আর একটা ঘোড়ায় উঠে পড়েছে। হ্যারিও সেই ঘোড়ার পিঠের সামনের দিকে লাফিয়ে শাঙ্কো বাঁ হাতে হ্যারিকে সামনে বসিয়ে নিয়ে ঘোড়া ছোটাল।

একটু পরেই তুলা শহরের পাথুরে দেয়াল ছাড়িয়ে ওরা বাইরের প্রান্তরে চলে এল। দেখল তলতেক সৈন্যরা কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। হয়তো অন্য কোন উপজাতির সৈন্যদের সঙ্গে। ওরা দেখল দু'দলের কিছু সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করছে। বাকিরা মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে। ফ্রান্সিস দ্রুত দেখে নিল অন্য উপজাতির যোদ্ধারা অনেকেই বন্দী হ'য়েছে। উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন যোদ্ধা মাটিতে পড়ে আছে আহতদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। তবে তলতেক যোদ্ধারা প্রায় জয়ের মুখে। অন্য উপজাতির লোকেরা ঘোড়ায় চড়ে পালাচ্ছে।

কয়েকজন তলতেক সৈন্য ফ্রান্সিসদের দেখল। ঘোড়া চালাতে চালাতে শাঙ্কো বলল—'ফ্রান্সিস কোনদিকে?' ফ্রান্সিস বলে উঠল—বাঁ দিকে—ঐ পাহাড়ের দিকে।' বিষাক্ত উপত্যকাকে বাঁ পাশে রেখে ওরা উত্তরের পাহাড়টা লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটাল।

এতক্ষণে যে কজন তলতেক সৈন্য ফ্রান্সিসদের দেখেছিল তারা বুঝল যে বন্দীরা পালাচ্ছে। এবার ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে ফ্রান্সিসদের ধাওয়া করল। কিন্তু ফ্রান্সিসরা ততক্ষণে অনেকটা চলে গেছে।

ফ্রান্সিস ঘোড়া ছোটাচ্ছে। কিন্তু খুব একটা দ্রুত ঘোড়া ছোটাতে পারছে না। বর্শা বেঁধা বাঁ পাটা অসাড় লাগছে। তবু ও প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাতে লাগল। কারণ ততক্ষণে ফ্রান্সিস দেখেছে পেছনে কিছু দূরে তলতেক সৈন্যরা ধুলো উড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে শাঙ্কো ব'লে উঠল, ফ্রান্সিস—সৈন্যরা আসছে।

—হ্যাঁ দেখেছি। ঘোড়া ছোটাও। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে ওরা। পেছনে তলতেক সৈন্যরা। ফ্রান্সিস ওর বাঁ পাটা দেখল। রক্ত পড়ছে তখনও। ঘোড়ায় চড়ার ঝাঁকুনিতে রক্ত বেশী বেরোচ্ছে। পা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বেশ দুর্বল লাগছে শরীরটা। শাঙ্কো আর হ্যারি তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস একটু পেছনেই পড়ে গেল। শাঙ্কো ঘোড়ার চলার গতি কমালো। ফ্রান্সিসদের কাছাকাছি পিছিয়ে এল। ফ্রান্সিস আহত। ঘোড়া থেকে যদি পড়ে যায়? এতে তলতেক সৈন্যদের সঙ্গে ওদের ধ'রে ফেলবে। ওর নিজের এই আহত শরীর। পারবে কি তলতেক সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই চালাতে?

তলতেক সৈন্যদের সঙ্গে ওদের দূরত্ব আরো কমে এল। তলতেক সৈন্যদের মধ্যে একজন লোহামুখ বর্শা ছুঁড়ল। সেটা ফ্রান্সিসদের থেকে বেশ দূরে এসে মাটিতে গেঁথে গেল।

একটা ঘাসে ঢাকা উপত্যকার মধ্যে একটা পায়ে চলা রাস্তার ওপর দিয়ে ওরা ছুটছে তখন। শাঙ্কো আর হ্যারির ঘোড়া আগে ছুটছিল। উৎরাইটা পেরোতেই হঠাৎ শাঙ্কো দেখল—সামনে গভীর খাদ। খাদের অনেক নীচে একটা পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মুখের রাশ প্রাণপণে টেনে ধরে চেঁচিয়ে উঠল—'ফ্রান্সিস সামনে খাদ। থামো।' ফ্রান্সিস তখন ঠিক ওদের পেছনে। শাঙ্কোর কথাটা কানে যেতে ফ্রান্সিসও প্রাণপণে ঘোড়ায় রাশ টেনে ধরল। ঠিক খাদের মুখে ওরা থেমে গেল।

ফ্রান্সিস দেখল—নদীর খাদটার ওপর দিয়ে একটা দড়ির সেতু বাঁধা। শক্ত পাকানো দড়ি দিয়ে তৈরী সেতুটা। এপারে সেতুটা দুটো মোটা কাছির মত দড়ি দিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা। দেখল ওপারে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে কাছি দুটো টান টান বাঁধা। মাঝখানে সেতুটা হাত পাঁচেক দড়ির জাল বোনা। ওটার ওপর দিয়ে অনায়াসে হেঁটে পার হওয়া যায়। অনেক নীচে দেখল ছোট্ট পাহাড়ী নদী এঁকে বেঁকে চলেছে। খাদটার দুপাশের পাহাড়ে ঘন বন। নীচেও দুপাশে অনেকটা জায়গায় বন জঙ্গল। দড়ির সেতুটা দিয়ে মানুষ হেঁটে যেতে পারে। কিন্তু ঘোড়া যেতে পারবে না।

ফ্রান্সিস পেছনে তাকাল। একজন ঘোড়সওয়ার তলতেক সৈন্য অনেক কাছে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস দ্রুত ভাবতে লাগল কী করবে এখন। হঠাৎ মনে একটা চিন্তা ধাক্কা দিল। হ্যাঁ—এ ছাড়া উপায় নেই। ফ্রান্সিস ঘোড়া থেকে নামল। শাঙ্কো আর হ্যারিও নামল। ফ্রান্সিস বলল—'শাঙ্কো—সামনেরটার মোকাবিলা আমি করছি। তুমি পেছনেরগুলোকে ঠেকাও।

শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে তীর ধনুক হাতে নিল। নিশানা করল পেছনের একজন সৈন্যকে। ছুঁড়ল তীর। নিখুঁত নিশানা। ঘোড়াসুদ্ধ সৈন্যটা লাফিয়ে উঠে মাটির ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। তীরটা ওর বুকে লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিন চারজন সৈন্য ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিল।

এদিকে খুব কাছে এগিয়ে আসা সৈন্যটা ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল। ফ্রান্সিস মাথা নীচু করে দ্রুত সরে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট বর্শাটা একটা পাথরের গায়ে লেগে ছিট্‌কে পড়ল। পাথরের গায়ে আগুন ছিটকোল। ফ্রান্সিস এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে তরোয়াল খুলে চালাল সৈন্যটার ডান উরু লক্ষ্য করে। উরু কেটে রক্ত ছুটল। সৈন্যটা চিৎকার করে দু'হাতে আহত উরুটা চেপে ধরল। ও তখন বুঝতে পারে নি সামনে খাদ, দড়ির সেতু। লাগাম ছাড়া হতেই ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল। পড়ল গিয়ে দড়ির সেতুটার ওপর। প্রচণ্ড জোরে দুলে উঠল সেতুটা। দড়িতে পা আটকে ঘোড়াটা কাত হয়ে গেল। সৈন্যটা লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে গেল। কিন্তু পারল না। ঘোড়াটা পাক খেল। ঘোড়াসুদ্ধ সৈন্যটা ছিট্‌কে পড়ল। গভীর খাদের শূন্যতার মধ্যে দিয়ে নীচে পড়তে লাগল। মৃত্যুমুখী সৈন্যটা ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠল। সেই চীৎকারের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল পাহাড়ের গায়ে গায়ে। ঘোড়া আর সৈন্যটা আছড়ে পড়ল অনেক নীচে পাহাড়ী নদীটার ওপর। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। সৈন্যটার অন্তিম চীৎকার তখনও খাদের দু'পাশের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ওদিকে শাঙ্কো তীর মেরে আর একটা সৈন্যকে ঘায়েল করছে। বাকী কয়েকজন সৈন্য এবার দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দেখল—ঐ সৈন্যদের পেছনে আরো সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে ধুলো উড়িয়ে আসছে।

ফ্রান্সিস নদীখাদের দিকে তাকাল। দড়ির জালের সেতু। লোক চলাচলের জন্য। শক্ত দড়ির জাল। ওপারে যাওয়া যায়। কিন্তু লাভ নেই। পেছনে আরো সৈন্য আসছে। এখন লড়াই করতে যাওয়া বোকামি। একমাত্র উপায় দড়ির সেতুটা কেটে

ফেলা। কিন্তু ওপারে গিয়ে সেতুর দড়ি কাটার সময় নেই। সৈন্যরা অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। দড়ির সেতুটাও কাটতে হবে আবার সৈন্যরা এসে পৌঁছোবার আগে ওপরে পৌঁছতে হবে। কিন্তু কীভাবে? ফ্রান্সিস একটু আগেই সেটা ভেবে রেখেছিল। সেইভাবেই কাজ শুরু করতে হবে। তার আগে ও নদীখাদটার মুখে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল সেতুটা ছিঁড়ে ফেলে ওপারে নীচে গিয়ে কোথায় লাগবে। দড়ির সেতুটার মোটামুটি মাপটা ভেবে নিয়ে দেখল দড়ির সেতুর এই মাথাটা যেখানে ঝুলে গিয়ে লাগবে সেখানে ঝোপ আর জঙ্গল। ও নিশ্চিত হল। ওদের আহত হবার ভয় নেই। ও ফিরে এসে দাঁড়াল। দড়ির সেতুর যে মোটা কাছি দু'টো একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল সেখানে। দেখল তলতেক সৈন্যরা তীরের আক্রমণের ভয়ে সন্তর্পণে গতি কমিয়ে এগিয়ে আসছে।

ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল—'হ্যারি শাঙ্কো শিগগির এই কাছিটা কাটো।' বলেই ও কাছির একটায় তরোয়ালের কোপ দিল। হ্যারিও তরোয়াল দিয়ে ঘা দিল। তরোয়ালের কোপে দড়ির ছিবড়ে বেরিয়ে গেল। শাঙ্কো তীর ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে কোমরে গোঁজা ছুরিটা বের করল। বলল—ফ্রান্সিস সেতুটা কাটতে চাইছো কেন?

সেতুটা কেটে এদিকের কাছি দুটো ধরে আমরা ঝুলে পড়বো। ঝুল খেয়ে ওপারের খাদের নীচের দিকে ঝোপ জঙ্গলে গিয়ে পড়বো। তারপর দড়ির সেতু বেয়ে ওপরে উঠে পালাবো। দড়ির সেতু ছেঁড়া হলে তিলতেক সৈন্যরা নদীখাত পেরোতে পারবে না।

শাঙ্কো হেসে বলল—'সাবাস সাবাস'। শাঙ্কো ওর ছোরা দিয়ে ঘষে ঘষে একটা কাছি কেটে ফেলল। অন্য কাছিটা তখন প্রায় কাটা হ'য়ে গেছে। ফ্রান্সিস তরোয়াল কোমরে গুঁজল। হ্যারিও তরোয়াল কোমরে গুঁজল। ফ্রান্সিস বলল—কাছি আর দড়ির জাল ধ'রে ঝুলে পড়। হ্যারি আর শাঙ্কো খাদের মুখের কাছে কাটা কাছি আর জাল ধ'রে ঝুলে পড়ল। ফ্রান্সিসও ছুটে এসে ঝুলে পড়ল। ঠিক তখনই দু'জন তলতেক সৈন্য ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে এল ওদের ধরতে। কিন্তু ততক্ষণে তিনজনের ভারে অন্য অল্প কাটা কাছিটাও ছিঁড়ে গেছে। ছেঁড়া দড়ির সেতু ধ'রে ঝুলে নেমে তিনজন ওপারে পাথুরে দেয়ালের নীচের দিকে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ল।

তলতেক সৈন্যরা নদীখাতের মুখে দাঁড়াল। নীচে তাকিয়ে দেখল ফ্রান্সিসরা তলায় ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঝুলছে। সৈন্যরা ভাবতেও পারেনি ফ্রান্সিসরা এভাবে ওদের হাত থেকে পালাবে। তলতেক সৈন্যরা নদীখাদ-এর পাশ দিয়ে এদিক-ওদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেখে এল। না ঃ নদীখাদ পার হবার কোন উপায় নেই। সৈন্যরা কিছুক্ষণ ওখানে বিশ্রাম নিল। তারপর দল বেঁধে চলে গেল।

ছেঁড়া কাছি দড়ি ধ'রে ঝুলে নেমে ফ্রান্সিস হ্যারি শাঙ্কো ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ল। তা'তে ওদের হাত পা ছড়ে গেল। ফ্রান্সিসের আহত পায়েও একটা গাছের ডাল লাগল। আবার ঘা খাওয়া জায়গাটা থেকে রক্ত পড়তে লাগল। কিন্তু ফ্রান্সিস দাঁত চেপে সহ্য করতে লাগল। যাক্—মৃত্যুর হাত থেকে তো বাঁচা গেছে। পায়ের ক্ষত শুকিয়ে যাবে। কিন্তু রাজা কালহুয়াকানের কয়েদ ঘরে বন্দী হ'লে

জীবিত অবস্থায় আর ওরা বেরিয়ে আসতে পারতো না।

ফ্রান্সিস নীচের দিকে তাকালো। ছোট আঁকাবাঁকা নদীটা অনেক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যে উচ্চতায় ওরা দড়ির সেতু ধ'রে ঝুলছে সেখান থেকে হাত ফস্কে নীচে পড়লে ওদের শরীর গুঁড়িয়ে যাবে। নদীটার জলস্রোতে অনেক বড় বড় পাথরের বাধা। তীব্র গতিতে ব'য়ে যাওয়া নদীর জল সেই পাথরগুলোতে ঘা খাচ্ছে। জল ছিট্‌কে উঠছে। তাই শব্দও হচ্ছে। ফ্রান্সিস স্পষ্ট সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছিল্।

এ সময় হঠাৎ হ্যারি ব'লে উঠল—ফ্রান্সিস —'আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে।' ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি তুমি নীচের দিকে তাকিও না।' তারপর বলল—'হ্যারি শাঙ্কো—এবার দড়ির ফোকরে হাত-পা ঢুকিয়ে আঁকড়ে ধ'রে ওপরের দিকে উঠতে থাকো।' ফ্রান্সিস প্রথম কিছুটা উঠে দেখাল কী ভাবে উঠতে হবে। হ্যারি আর শাঙ্কো সেভাবে উঠতে লাগল। উঠতে বেশ কষ্টই হচ্ছিল। একদিকে নদীখাদের শূন্যতা অন্যদিকে তীব্র হাওয়া। দড়ির সেতুটা দোল খেতে লাগল।

আস্তে আস্তে ওরা উঠতে লাগল। একসময় ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি এখন কেমন আছো?' হ্যারি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'একটু ভালো। কিন্তু ফ্রান্সিস আর কতটা উঠতে হবে? ফ্রান্সিস মাথা উঁচু ক'রে দেখল। বলল—'আর কিছুটা। কোন দিকে তাকিও না। শুধু উঠতে থাকো। সামনে দড়ির দিকে তাকিয়ে থাকো।'

আবার আস্তে আস্তে সেতুর দড়ির জালে হাত পা রাখতে রাখতে ওরা উঠতে লাগল। হ্যারি কোনদিকে তাকাচ্ছিল না।

হঠাৎ দড়ির জাল শেষ। সামনেই একটা বড় পাথর। এবার টান দেওয়া দু'টো কাছি বেয়ে বেয়ে ওরা পাথরটার ওপর টেনে-হিঁচড়ে শরীরটাকে নিয়ে উঠল। পা রাখল পাথরটায়। শাঙ্কো আর হ্যারি তখনও হাঁপাচ্ছে। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। ফ্রান্সিসও পরিশ্রান্ত। তবে শাঙ্কো আর হ্যারির মত কাহিল হ'য়ে পড়েনি। ওকে দুর্বল ক'রে দিচ্ছিল পায়ের ক্ষতের যন্ত্রণাটা।

পাথরটায় ওপর বসল তিনজনে—ভীষণ হাঁপাতে লাগল। পশ্চিম দিলে নদী খাদের কোনাকুনি সূর্য দিগন্তের অনেক কাছে নেমে এসেছে। সন্ধ্যে হ'তে খুব দেরী নেই। হ্যারি বলল—

—ফ্রান্সিস—এ আমরা কোথায় এলাম?

—কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু বিশ্রাম ক'রে চলো হাঁটতে থাকি।'

—কোনদিকে?' শাঙ্কো বলল।

—ঐ উত্তরদিকে। ফ্রান্সিস আঙুল তুলে দেখাল। ও দিকে দেখা গেল গম্ভীর বনাঞ্চল।

—কিন্তু ওদিকে কোথায় যাবো? শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস বলল—'একটু বুদ্ধি খাটাও শাঙ্কো। এই পাথরটার ওপাশে তাকিয়ে দেখ—একটা অস্পষ্ট পায়ে চলা পথ। তার মানে এখান দিয়ে দড়ির সেতু পেরিয়ে লোকজন যাতায়াত করে। এই অস্পষ্ট পথটা ধ'রে যদি আমরা বনের মধ্যে দিয়ে এগোতে থাকি নিশ্চয়ই মানুষজনের বসতি পাবো! সেটা বনের মধ্যেও হ'তে পারে,

বনের শেষেও হ'তে পারে।'

—'কিন্তু সেই মানুষজন তো আমাদের সঙ্গে শত্রুতাও করতে পারে।'—হ্যারি বলল।

—সেটাই স্বাভাবিক হ্যারি। ফ্রান্সিস বলল—'আমরা বিদেশী বিধর্মী' আমাদের এরা কেউ ডেকে খাদ্য ও আশ্রয় দেবে না। যদি দেয় ভালো, না দিয়ে আক্রমণ করলে আত্মরক্ষার জন্য লড়াইয়ে নামতে হবে। অবশ্য যদি ওরা সংখ্যায় অল্প হয়। সংখ্যায় বেশী হ'লে বনের আড়ালে আড়ালে পালাবো।

পাথরের ওপর ব'সে তিনজনে একটু জিরিয়ে নিল। ফ্রান্সিসের পায়ের ক্ষতস্থান থেকে তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। ফ্রান্সিস বেশ দুর্বল বোধ করছে। কিন্তু হাত পা ছেড়ে বিশ্রাম করার সময় এখন নয়। সামনে এগোনো ছাড়া উপায় নেই। পেছনের সেতু তো ওরা কেটে ফেলেছে।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বলল—'চলো ঐ বনের দিকেই যাওয়া যাক। লোকালয় নিশ্চয়ই পাবো। কারণ এই পথটা দিয়ে লোক চলাচল করে।' হ্যারি আর শাঙ্কোও উঠে দাঁড়াল। হ্যারি বলল, 'ফ্রান্সিস তুমি পারবে হাঁটতে? কতটা হাঁটতে হয় কে জানে।' ফ্রান্সিস হাসল—'না পারলে চলবে কেন। শাঙ্কো বলল—'আমরা তোমাকে ধ'রে নিয়ে যাবো?

—না-না। চলো।' ফ্রান্সিস খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। হ্যারি আর শাঙ্কো চলল। হ্যারি বলল—'এখন আমাদের দুটো জিনিস দরকার। ফ্রান্সিসের চিকিৎসা আর খাদ্য। আশ্রয় না জুটলেও ক্ষতি নেই। গাছতলায় শুয়ে পড়বো।

ওরা যখন বনের কাছে পৌঁছল তখনও সন্ধ্যে হয়নি। কিন্তু বনের বিরাট বিরাট গাছগাছালি আর ঝোপের নীচে এর মধ্যেই অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। এতক্ষণ ওরা যা লক্ষ্য করেনি এবার সেটা লক্ষ্য করল। বনের সমস্ত গাছের লতার পাতা শুকিয়ে হলুদ হ'য়ে গেছে। গাছ লতার শুকনো পাতা নীচে মাটিতে স্তূপ হ'য়ে জমে আছে। অনেক গাছ-গাছালিতে একটা পাতাও নেই। শুকনো আঁকাবাঁকা ডাল উঁচিয়ে আছে আকাশের দিকে। মাঝে মাঝে শুকনো গরম হাওয়া ছুটে আসছে। শুকনো ডাল পাতায় শব্দ তুলছে। ওরা তিনজনেই অবাক হ'য়ে শুকনো বনটার দিকে তাকিয়ে রইল। তখনই হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এখানে প্রচণ্ড খরা চলছে। বোধহয় কয়েক বছর এদিকে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। তাই বনটার এই অবস্থা।

ফ্রান্সিস বলল—'ঠিকই বলেছো। অনাবৃষ্টির জন্যেই এই অবস্থা। এখন সমস্যা হ'ল এই বনে বা ধারে-কাছে যারা থাকে তাদের তো শোচনীয় অবস্থা। আশ্রয় ও খাদ্য পাওয়া যাবে কি?

—'চলো এগিয়ে যাই তো। দেখা যাক অবস্থাটা।' হ্যারি বলল।

ওরা বনের মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগল। একে অন্ধকার। তার ওপর জমে থাকা শুকনো পাতায় হাঁটু অব্দি ডুবে যাচ্ছে। কাজেই চলার গতি কমে গেল। তবু চলল ওরা। রাত নামার আগে যদি একটা আশ্রয়, কিছু খাদ্য জল পাওয়া যায়। শুকনো ঝরা পাতার ঢিবির ওপর দিয়ে ওরা হেঁটে চলল। ফ্রান্সিসের কষ্ট হ'তে লাগল সবচেয়ে বেশী। একে কাটা ঘা তার ওপর শুকনো ডালপাতার ঘষটানি।

যন্ত্রণা মাঝে মাঝে অসহ্য হ'য়ে উঠছে। তবু ফ্রান্সিস দাঁত চেপে কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল। ও যদি শারীরিক কষ্ট বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করে তা'হলে হ্যারি শাঙ্কো দু'জনেই অস্থির হ'য়ে পড়বে। কাজেই ফ্রান্সিস নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। নিজের জ্বালা যন্ত্রণার কথা বলল না।

হঠাৎ দু'পাশের শুকনো পাতায় জোরে শব্দ উঠল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে তরোয়াল খুলে ফেলে ডাকল—'হ্যারি—শাঙ্কো।' হ্যারিও ততক্ষণে তরোয়াল কোমর থেকে খুলে ফেলেছে। শাঙ্কোও তীর ধনুক নিয়ে তৈরী। বুনো জন্তু-জানোয়ারের আশঙ্কাই করছিল ওরা। কিন্তু বুনো জন্তু-জানোয়ার নয়। ঝরা পাতায় শব্দ তুলে জমাট অন্ধকারের মত একদল মানুষ ওদের ঘিরে ধরল। অন্ধকারে ফ্রান্সিসরা অনুমান করতে পারল না ওরা সংখ্যায় কত। মুহূর্তে লোকগুলো ওদের বুকের কাছে বর্শা উঁচিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর তরোয়াল নামাল। চেঁচিয়ে বলল—'হ্যারি শাঙ্কো—লড়াই নয়।' হ্যারি তরোয়াল নামাল। শাঙ্কো তীর ধনুক নামাল।

লোকগুলোর মধ্যে একজন বর্শা হাতে এগিয়ে এল। ওদের ভাষায় চীৎকার ক'রে কী বলল। ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না। চুপ ক'রে রইল। সেই সবার সামনে এগিয়ে আসা লোকটা নিজের লোকদের দিকে ফিরে কী বলল। দু'তিনজন এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসদের পিঠে বর্শার খোঁচা দিয়ে হাঁটতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা হাঁটতে লাগল। পেছনে লোকগুলো। শুকনো পাতায় জোর মড়্‌মড়্ শব্দ উঠল। সবাই চলল।

শাঙ্কো চাপাস্বরে বলল—'এরা কী করতে চায় আমাদের নিয়ে?'

—'কিছুই বুঝছি না।' ফ্রান্সিস বলল।

—এদের হাতে মশাল-টশাল থাকলে তবু এদের ভালোভাবে জানতে পারতাম।

—পাগল হয়েছো শাঙ্কো।' হ্যারি বলল—'এই শুকনো খটখটে বনে মশাল তো দূরের কথা এককণা আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়লে সমস্ত বন জ্বলে যাবে।

—দেখাই যাক না কোথায় নিয়ে যায়। একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়াল ওরা। এবার ফ্রান্সিসরা লোকগুলোকে দেখল। ওলতেকদের মতই মোটা সূতীর কাপড় গায়ে কোমরে। মাথায় কাপড়ের ফেট্টি। তা'তে পালক গোঁজা। হাতে বর্শা। বোঝা গেল এরা যোদ্ধা। প্রান্তরের পরেই দেখা গেল—পাথরের বাড়িঘর। ছাতগুলো পাথরের না। ঘাস পাতার। তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে।

এই যোদ্ধাদের আসতে দেখে বাড়িঘর থেকে লোকজন বেরিয়ে এল। তাদের হাতে মশাল। স্ত্রীলোক, বৃদ্ধরা এই যোদ্ধাদের ঘিরে ধরল। তাদের ভাষায় নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। যোদ্ধারা ঐ ভীড়ের মধ্যে পথ ক'রে ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। যেতে যেতে যোদ্ধারা ভীড় ক'রে আসা লোকজনদের কী বলতে লাগল। দু'একজন স্ত্রীলোক চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। অন্যদের চোখমুখেও দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা গেল। ফ্রান্সিসরা বুঝল কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু ঠিক বুঝল না এখানকার মানুষগুলো এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'ল কেন? কী জানতে চাইছে ওরা?

ফ্রান্সিসদের নিয়ে যোদ্ধার দল একটা বড় পাথরের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

বাড়িটার সামনে পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি উঠে গেছে। সবাই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। একটা বিরাট দরজা সামনে। এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো কাঠের দরজা। দরজার কাঠ ভালো ক'রে চাঁছা হয়নি। দরজার দু'দিকে দেয়ালে মশাল জ্বলছে। বর্শা হাতে দু'জন দ্বারী দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে ঢুকল ওরা।

পাথরে বাঁধানো মেঝে। বিরাট লম্বাটে ঘর। দু'দিকে মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় দেখা গেল ঘরের শেষ দিকে একটা কাঠের সিংহাসন। রঙ্‌-বেরঙের মোটা কাপড়ে ঢাকা। পালকের গদী। যোদ্ধাদের দলনেতা ফ্রান্সিসদের সিংহাসনের সামনে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস আস্তে বলল, বোধহয় রাজার বাড়ি—এটা রাজ দরবার।'

—আমারও তাই মনে হচ্ছে।' হ্যারিও গলা নামিয়ে বলল।

যোদ্ধারা সবাই পিছিয়ে দাঁড়াল। সামনে রইল শুধু দলনেতা।

একটু পরেই ও পাশের পাথরের থামের দিক দিয়ে একজন ঢুকল। তার পরনে নানারঙের জমকালো পোশাক। মাথায় লাল কাপড়ের ফেট্টি। তাঁতে নানারকম রঙীন পাখির পালক গোঁজা। বোঝা গেল ইনিই রাজা। ততক্ষণে সব যোদ্ধারা দলপতি দু'হাত সামনে মেলে মেঝেয় হাঁটুগেড়ে মাথা নিচু করল। রাজা আস্তে আস্তে গিয়ে সিংহাসনে বসলেন। এবার সবাই উঠে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস রাজাকে দেখছিল। রাজার বয়েস হয়েছে। চোখে মুখে বয়েসের ছাপ পড়েছে। তবে বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। এই বয়েসেও শরীর ঋজু। চলাফেরা বলায় বেশ স্বচ্ছন্দ।



রাজা মৃদু হাসলেন। ভাঙা ভাঙা
স্পেনীয় ভাষায় বললেন—
তোমরা—বিদেশী?

রাজা একটুক্ষণ ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওদিকে যোদ্ধাদের দলনেতা তাদের ভাষায় কী ব'লে যেতে লাগল। দলনেতা থামল। রাজা মৃদু হাসলেন। ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বললেন—তোমরা—বিদেশী?' ফ্রান্সিস এটা ভাবেনি। ও ভাবছিল কী ক'রে রাজাকে সব কথা বলবে। এখন রাজা স্পেনীয় ভাষা বলায় ও একটু চমকাল। খুশীও হ'ল যে রাজা স্পেনীয় ভাষা জানেন। রাজা বললেন—'আমাকে সম্মান।' ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—'হ্যারি শাঙ্কো—একটু মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাও। তিনজনেই একটু মাথা নুইয়ে আবার সোজা করল। রাজা বললেন—'শুনলাম কেন এসেছো?' ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে স্পেনীয় ভাষায় সব কথা বলল। রাজা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন—'বারিনথাস—স্পেনীয় ভাষা শিখিয়েছে। বারিনথাস মন্দ—। তুলার

রাজা—কালহুয়াকান—ছোটভাই। বারিনথাস—ভাইর মন বিষিয়ে—আমাকে দেশত্যাগী। এখানে নতুন রাজ্য স্থাপন—চোলুলা। আমি রাজা হুয়েমাক।' যোদ্ধাদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—'আমার প্রজা শ্রদ্ধা করে—ভালোবাসে।' একটু থেমে রাজা বললেন—'আজ তুলায়—যুদ্ধ হ'য়েছে—আমার যোদ্ধা—কালহুয়াকানের যোদ্ধা—ফলাফল এখনও জানি না।' ফ্রান্সিস বলল, 'রাজা হুয়েমাক আমরা পালাবার সময় যুদ্ধক্ষেত্রের কাছ দিয়েই এসেছি। দেখেছি আপনার সৈন্যদলকে যুদ্ধ করতে। কিন্তু—'

—কিন্তু? রাজা হুয়েমাক সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকালেন।

—কিন্তু আপনার সৈন্যরা বোধহয় হেরে গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আস্তে আস্তে মাথা নিচু করলেন। তারপর আস্তে আস্তে মুখ তুললেন। তাঁর দু'চোখ ছলছল করছে। ভারী গলায় বললেন—

—মারা গেছে? সবাই?

—না-না। ফ্রান্সিস ব'লে উঠল—'অনেক যোদ্ধাকে আমরা আত্মরক্ষার জন্যে স'রে যেতে দেখেছি।'

—কিন্তু কেউ ফিরল না—এখনও।' রাজা বিষণ্নস্বরে বললেন।

এবার ফ্রান্সিস সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। যে যোদ্ধারা শুকনো বনের মধ্যে ছিল ওরা অপেক্ষা করছিল যারা যুদ্ধে গেছে তাদের জন্যে। হয়তো সেই যোদ্ধারা আহত হয়ে ফিরে এলে এরা তাদের জায়গায় যেতো। কিন্তু ফ্রান্সিসরা দড়ির সেতু কেটে ফেলেছিল। তাই পরাজিত যোদ্ধারা কেউ এই পথে ফিরতে পারেনি। সেইজন্যে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা স্ত্রীলোকেরা এই যোদ্ধাদের ঘিরে সাগ্রহে জানতে চাইছিল সেই যোদ্ধারা কেউ ফিরছে কি না। এই যোদ্ধারা বলেছিল কেউ ফেরে নি। তাই স্ত্রীলোকদের মধ্যে কান্নার রোল উঠেছিল। ফ্রান্সিস বলল—রাজা হুয়েমাক—আপনাকে আমি বলেছি একটা পাহাড়ি নদী পেরিয়ে আমরা এসেছি।

—পুয়েবেলা নদী। রাজা বললেন।

—নদীটার ওপর দিয়ে কীভাবে এসেছি বলিনি। নদীটার ওপর একটা দড়ির সেতু ছিল। আমরা সেটা কেটে ফেলে—ঝুলতে ঝুলতে এপারে এসেছি। সেতুটা নেই তাই আপনার সৈন্যদল আসতে পারেনি।

রাজা বললেন—'সেতু নেই—অনেক ঘুরে—আসবে। দেরী হবে। প্রজারা ভালোবাসে—তুলা থেকে নির্বাসিত—আমি—সঙ্গে এসেছে—আমার সন্তানতুল্য—কোয়েতজাল রক্ষা করবেন।' রাজা মাথা নীচু করলেন।

ফ্রান্সিস একটু নিশ্চিন্ত হ'ল। কথায় ও ব্যবহারে বোঝা যাচ্ছে রাজা হুয়েমাক মানুষটা ভাল। ওদের কোন ক্ষতি করবে না। এতক্ষণে ফ্রান্সিস পায়ের যন্ত্রণার তীব্রতা অনুভব করল। ও পায়ের দিকে তাকাল। দেখল চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। শরীরটা ভীষণ দুর্বল লাগছে। ফ্রান্সিস রাজার দিকে তাকিয়ে বলল—'রাজা হুয়েমাক—আমি খুব অসুস্থ—একটু বিশ্রাম করতে চাই।' রাজা বললেন—'কী অসুখ?' হ্যারি ব'লে উঠল—'পালাতে গিয়ে আমার বন্ধুর পায়ে বর্শা বিঁধেছে।' হ্যারি নীচু হ'য়ে ফ্রান্সিসের পায়ের ক্ষতস্থান দেখাল। রাজা দ্রুত কী ব'লে উঠলেন।

দু'জন যোদ্ধা বেরিয়ে গেল। রাজা বললেন—'বদ্যি—চিকিৎসা বসো'। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মেঝেতেই ব'সে পড়ল। আহত পা'টা অসাড় লাগছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। হ্যারিও ওর পাশে বসল।

একটু পরেই মোটা মত একটা লোক এল। লোকটা তখনও বেশ হাঁপাচ্ছে। বোধহয় রাজার ডাক পেয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। ওর হাতে একটা পুঁটুলি। বোঝা গেল বদ্যি।

বদ্যিকে হ্যারি ফ্রান্সিসের পায়ের ক্ষতস্থানটা দেখাল। বদ্যি পুঁটুলিটা পাশে রেখে ব'সে পড়ল। ক্ষতস্থানটা ভালো ক'রে দেখল। তখনও ক্ষতস্থান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। এবার বদ্যি পুঁটুলি খুলল। দুটো চ্যাপ্টামত পাথর বের করল। সে দু'টো মেঝেয় রেখে পুঁটুলি থেকে দু'টো ছোট গোল শুকনো ফল বের করল। তারপর বের করল একটা কাঠের মুখঢাকা পাত্র। ফল দুটো একটা চ্যাপ্টা পাথরে রেখে অন্য পাথরটা দিয়ে চেপে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে ফেলল। এবার কাঠের পাত্র থেকে একটা তেলের মত জিনিস গুঁড়োটায় ঢালল। মাখাল। তারপর ওটা নিয়ে আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের ক্ষতস্থানে চেপে চেপে লাগিয়ে দিতে লাগল। ওষুধটা লাগাতেই ফ্রান্সিস যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল। সবটা ওষুধ লাগাতেই ফ্রান্সিসের জ্বালা যন্ত্রণা অনেক কমে গেল। একটা ঠাণ্ডা ভাব ক্ষতস্থানটায়। ফ্রান্সিস বদ্যির দিকে তাকিয়ে হাসল। বদ্যিও হাসল। তারপর সব জিনিসপত্র পুঁটুলিতে ভরল। উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। তারপর চলে গেল। রাজা ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন—'এই যোদ্ধারা—অনুগামী—ননোয়াক্লা—তোমাদের বিশ্রাম—ব্যবস্থা—করবে।' রাজা যোদ্ধাদের দলনেতাকে কী বললেন। দলনেতা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসকে আস্তে ধ'রে ধ'রে তুলল। ফ্রান্সিসের ডান হাতটা নিজের কাঁধে দিয়ে হ্যারি আর শাঙ্কোকে পেছনে পেছনে আসতে ইঙ্গিত করল। দলনেতা ফ্রান্সিসকে ধ'রে নিয়ে চলল।

ওরা রাজবাড়ির বাইরে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামল। তারপর ডানদিকে চলল। এদিকেও একটা পাথরের সিঁড়িওলা বাড়ি। ফ্রান্সিসরা ঠিক বুঝল না এটা কীসের বাড়ি। হ্যারি দলনেতাকে ইঙ্গিতে বাড়িটা দেখিয়ে জানতে চাইল এটা কী। দলনেতা কী ব'লে গেল। তার মধ্যে কোয়েতজাল কথাটা ওরা বুঝল। তার মানে এখানেও জীবন ও মৃত্যুর দেবতা কোয়েতজালের মন্দির আছে।

বেশ কয়েকটা বড় পাথরের ঘর বাড়ি ছাড়িয়ে একটা বাড়ির সামনে এসে দলনেতা থামল। বাড়ির দরজাটা চ্যালা কাঠের। দলনেতা গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। ভেতরে ঢুকল। ফ্রান্সিসরাও ভেতরে ঢুকল। একজন সৈন্য একটা মশাল জ্বেলে ঘরের পাথুরে দেয়ালের খাঁজে রাখল। দেখা গেল ঘরটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। একপাশে শুকনো ঘাসের বিছানা। তার ওপর মোটা সূতীর কাপড় বিছানো।

দলনেতা ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের জানাল এই ঘরেই ফ্রান্সিসরা থাকবে। ওদের খাবারদাবার এই ঘরে নিয়ে আসা হবে। এখানেই ওরা খাবে থাকবে। দলনেতা তার সৈন্যদের নিয়ে চলে গেল। শুধু একজন সৈন্যকে রেখে গেল ফ্রান্সিসদের দেখাশোনা করার জন্যে।

ফ্রান্সিস আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। কোমর থেকে তরোয়াল খুলে হ্যারিকে দিল। তারপর আস্তে আস্তে ঘাসের বিছানায় বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। হ্যারি ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোর তুলনায় বরাবরই দুর্বল। হ্যারিও খুব ক্লান্তিবোধ করছিল। ও বিছানায় পা ছড়িয়ে বসল। শাঙ্কোও বসল। ফ্রান্সিস ক্লান্তস্বরে বলল—'হ্যারি—রাজা হুয়েমাকের সব কথা বুঝলে?'

—হ্যাঁ—কিছু কিছু বোঝা গেল। আগে হুয়েমাক কালহুয়াকান উপাধি নিয়ে তুলার রাজা ছিলেন। বারিনথাস ওঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। ছোটভাইকে সেই ষড়যন্ত্রে সঙ্গী করে নেয়। তারপর ছোটভাই তলতেক সৈন্যদের রাজা হুয়েমাকের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। অবশ্যই তাকে সাহায্য করে বারিনথাস। রাজা হুয়েমাক তার অনুগত ননোয়াক্লা যোদ্ধাদের নিয়ে তুলা থেকে পালিয়ে আসেন এই চোলুলায়। নতুন বসতি গড়ে তোলেন অনুগত যোদ্ধা আর প্রজাদের নিয়ে। তুলায় রাজা হন তাঁর ছোটভাই রাজ পরিবারের প্রচলিত পদবী কালহুয়াকান নামে পরিচিত হন। ফ্রান্সিস বলল—'তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছো কী ঘটেছিল। তবে এই সবকিছুর পেছনে কলকাঠি নেড়েছে বারিনথাস। তাই রাজা হুয়েমাক বলেছিলেন—'বারিনথাস মন্দ যদিও এই বারিনথাসের কাছে উনি স্পেনীয় ভাষা শিখেছেন।' শাঙ্কো বলল—'তাহ'লে তো এই চোলুলায় অধিবাসীরাও তলতেক উপজাতির লোক।

—হ্যাঁ ঠিকই বলেছো। তবে এখানে রাজা হুয়েমাকের অনুগামী যোদ্ধাদের নাম ননোয়াক্লা।' ফ্রান্সিস বলল।

একটু রাত হ'তেই দু'জন লোক ফ্রান্সিসদের ঘরে এল। চীনেমাটির থালায় খাবার নিয়ে এল ওরা। একটা মাটির বড় হাঁড়িতে ক'রে জল। খাবার হচ্ছে ভুট্টার রুটি, কীসের মাংস, ধান টিয়া টমেটো। তিনজনে আস্তে আস্তে খাওয়া শেষ করল। তিনজনেরই প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। জল খেতে গিয়ে মুস্কিল হ'ল। জলের পরিমাণ কম। তিনজনে খাওয়ার পর আর সামান্য জল রইল। শাঙ্কো ইঙ্গিতে হাঁড়ি তুলে জল চাইল। লোক দু'টি মাথা নাড়ল। বোঝা গেল আর জল দিতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে এই জলেই আমরা চালিয়ে নেব।' লোক দু'টো এঁটো বাসনপত্র নিয়ে চলে গেল।

ঘরের কোনায় অনেক বড় বড় শুকনো ঘাস জড়ো করা ছিল। সেসব এনে ছড়িয়ে পেতে বিছানাটা বড় করা হ'ল। তার উপর কাপড় পেতে তিনজনে শুয়ে পড়ল। হ্যারি ডাকল-'ফ্রান্সিস?'

—হুঁ। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে পাশ ফিরল।

—এখন কেমন আছো?' হ্যারি বলল।

—অনেকটা ভালো।

—খাওয়া দাওয়া তো মোটামুটি ভালোই কিন্তু খাবার জল এত কম দিচ্ছে কেন? হ্যারি বলল।

—হ্যারি—সেতু পেরিয়ে আসার সময় মনে আছে একটা বনের মধ্যে দিয়ে আমরা এসেছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—একেবারে শুকনো পাতা ঝরা বন।

—তার মানে দীর্ঘকাল এই চোলুলায় বৃষ্টি হচ্ছে না। দেখনি পাথরের বাড়ি ঘরগুলোয় কেমন ধুলোটে আস্তরণ পড়ে গেছে। তাই এই অঞ্চলে জলকষ্ট দেখা দিয়েছে। হয়তো অনেক দূর থেকে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। ধারে কাছের ঝর্ণাগুলো বোধহয় শুকিয়ে গেছে।

—ঠিক বলেছো।' হ্যারি বলল।

অনেক রাত তখন। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের শব্দে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও কান পেতে রইল। বেশ কয়েকটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ এসে বাইরের প্রান্তরটায় থামল। লোকজনের হাঁক ডাক শোনা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে বাইরে লোকজনের ছুটোছুটির শব্দ পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস উঠে বসল। মশালের আলোয় দেখল হ্যারি আর শাঙ্কো নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠল। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজার কাছে গেল। দরজার হুড়্‌কো খুলল। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। দেখল চাঁদের নিস্তেজ আলোয় সামনের খোলা জায়গাটায় অনেক লোকজন জড় হ'য়েছে। অনেকের হাতে মশাল। অনেকে মশাল হাতে ছুটোছুটি করছে। আহত লোকজনের গোঙানি শোনা যাচ্ছে। তা'হলে তুলার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যোদ্ধারা ফিরে এসেছে।

ঘুম ভেঙে হ্যারি আর শাঙ্কো এসে ফ্রান্সিসের পাশে দাঁড়াল। হ্যারি বলল—কী ব্যাপার?

—তুলাতে যুদ্ধ হচ্ছিল আমরা দেখে এসেছিলাম। এদিকে ফেরার পথের দড়ির সেতুটা আমরা কেটে দিয়েছিলাম। তাই নলোয়াল্কা যোদ্ধারা অনেক ঘুরে পুরেবেলা নদী পেরিয়ে এসেছে। অনেকেই যুদ্ধে আহত। যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরার পথেও অনেকে মারা গেছে বোধহয়।' ফ্রান্সিস বলল।

—আমার খুব চিন্তা হ'য়েছিল আবার কোন ঝামেলায় পড়লাম।' হ্যারি বলল।

—চলো আমরা যতটা পারি ওদের সাহায্য করি।' ফ্রান্সিস বলল।

ওরা তিনজনে লোকজনের ভীড়ের দিকে গেল। দেখল একজন স্ত্রীলোক একজন মৃত নলোয়াল্কা যোদ্ধার বুকের ওপর পড়ে পাগলের মত কাঁদছে। আরো কয়েকজন স্ত্রীলোক বুক চাপড়ে কাঁদছে। তাদের স্বামীপুত্র বা আত্মীয়স্বজন কেউ হয়তো ফিরে আসেনি।

কোয়েতজাল মন্দিরের সামনের পাথরের সিঁড়ির ওপর আহতদের শুইয়ে দেওয়া হ'য়েছে। রাজবদ্যি তার শিষ্য বদ্যিদের নিয়ে আহতদের চিকিৎসা করছে। ওর দম ফেলার ফুরসত নেই।

ফ্রান্সিসরা দেখে আশ্চর্য হ'ল রাজা হুয়েমাক সঙ্গে কয়েকজন গণ্যমান্য সঙ্গী নিয়ে ঘুরে ঘুরে আহতদের দেখছেন। কাউকে উৎসাহিত করছেন কাউকে সমবেদনা জানাচ্ছেন। রাজার গায়ে রাজকীয় পোশাক নেই। রাতে যে সাধারণ পোশাক পরে ঘুমিয়েছিলেন তাই পরেই চলে এসেছেন। রাজার সঙ্গী একজন রাজার সঙ্গে চলতে চলতে কী ব'লে যাচ্ছিল। ঐ সঙ্গীটি বোধহয় সেনাপতি। রাজাকে হয়তো যুদ্ধের বিবরণ দিচ্ছিল। রাজা শুনছিলেন আর মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছিলেন।

ফ্রান্সিসরা আহতদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একজন আহত ননোয়াক্রা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে কী বলল। ফ্রান্সিসরা বুঝল না। তখন যোদ্ধাটি ইঙ্গিতে ওকে তুলে বসিয়ে দিতে বলল। শাঙ্কো সেটা বুঝতে পেরে দ্রুত গিয়ে যোদ্ধাটিকে বসিয়ে দিল। লোকটি তখন হাতের ইঙ্গিতে জল খেতে চাইল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো যাও আমাদের ঘর থেকে জলের হাঁড়িটা নিয়ে এসো।' শাঙ্কো দ্রুত ছুটে গিয়ে জলের হাঁড়িটা নিয়ে এল। পিপাসার্ত আহত যোদ্ধাটি সাগ্রহে জল খেল। ওকে জল খেতে দেখে চারপাশের আহত যোদ্ধাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল—'মাজাপান—মাজাপান।' ফ্রান্সিসরা কথাটার অর্থ বুঝল না। কিন্তু অন্য আহতদের তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে জলের হাঁড়িটার দিকে ইঙ্গিত করছে দেখে বুঝল—ওরা মাজাপান মানে পানীয় জল চাইছে। ফ্রান্সিস জলের হাঁড়ি নিয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু কয়েকজনকে জল দিতেই হাঁড়ির জল শেষ হ'য়ে গেল। তখনও আহতদের মধ্যে গুঞ্জন চলছে—'মাজাপান মাজাপান।' ফ্রান্সিস অসহায় দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাচ্ছে তখনই দেখল রাজা হুয়েমাক ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ফ্রান্সিস বলল, 'রাজা—আহতরা জল চাইছে।' রাজা চিন্তাগ্রস্ত মুখে বললেন—জানি—নিরুপায়—বহুদিন—বৃষ্টি নেই—খরা —ঝর্ণা সরোবর—শুকনো—অনেক দূরে—ঝর্ণা—জল—আনতে গেছে।' ফ্রান্সিস বলল—'রাজা এই সমস্যাটার কথা আহত ননোয়াক্রাদের বলুন। ওরা ভীষণ তৃষ্ণার্ত—।' রাজা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললেন—'স্বাভাবিক—ঘোড়ার পিঠে শুয়ে রাজপথ হেঁটে—আহতরা এসেছে—।' কথাটা শেষ ক'রে রাজা নাহুয়াত্‌ল ভাষায় সেনাপতিকে কী বললেন। সেনাপতি চীৎকার ক'রে কী ব'লতে লাগল। তার মধ্যে রাজা হুয়েমাক কথাটা ফ্রান্সিসরা বুঝল। সব চীৎকার কান্নাকাটি থেমে গেল। শুধু মৃদু গোঙানির শব্দ শোনা যেতে লাগল। রাজা হুয়েমাক সিঁড়িগুলোর মাথায় গিয়ে দাঁড়ালেন। দু'হাত ওপরে তুলে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বেশ কিছুক্ষণ বক্তৃতার মত বললেন নাহুয়াত্‌ল ভাষায়। রাজার কথা এতক্ষণ সবাই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শুনল। রাজার বক্তৃতা শেষ হ'লে আবার সবাই নিজের কাজ করতে লাগল। বোঝা গেল রাজা হুয়েমাক যুদ্ধ, জলের সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এসব নিয়েই বলেছেন।

তখনই একজন ঘোড়সওয়ার সেখানে ঘোড়া ছুটিয়ে এল। তার পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা আর একটা ঘোড়া। সেটার পিঠে একটা বেশ বড় পীপে। বোঝাই গেল জলের পীপে। জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল। মাটির আর চীনেমাটির বাটি নিয়ে অনেকে এগিয়ে এল। পীপে থেকে জল বিতরণ শুরু হ'ল। রাজা হুয়েমাক তখনও সঙ্গীদের নিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় বাকী রাতটুকু এখানেই থাকবেন। আহতদের মধ্যে জল বিতরণ শুরু হ'ল। ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল 'রাত আর বেশি নেই। চলো—যতটুকু পারা যায় ঘুমিয়ে নি।' তিনজনে নিজেদের ঘরে ফিরে এল। শুয়ে পড়বার আগে ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি—হুয়েমাক একজন আদর্শ রাজা।'

—ঠিক বলেছো। যুদ্ধে হেরে গেছেন তবু নিজের কর্তব্যে অটল।' হ্যারি বলল।

—তুলনায় কালহুয়াকান একটা নরপশু।' ফ্রান্সিস বলল।

—অবশ্যই।' হ্যারি বলল।

দু'তিনদিন শুয়ে ব'সে কাটাল ওরা। ফ্রান্সিস সম্পূর্ণ সুস্থ না হ'লে আর কিছু ভাবা যাচ্ছে না। শাঙ্কোও বেশ অধৈর্য হ'য়ে উঠল। সেদিন বলল—'চলো ফ্রান্সিস আমরা জাহাজে ফিরে যাই।'

ফ্রান্সিস বলল—'তোমার ইচ্ছে হ'লে চলে যেতে পারো। আমরা যাবো না।'

—কী করবে এখন?' শাঙ্কো বলল।

—সুস্থ হ'য়ে আবার তুলায় যাবো। প্রথম রাজা কালহুয়াকানের গুপ্তধনভাণ্ডার খুঁজে বের করবো।

—মাথা খারাপ? তুলায় গেলেই ওরা আমাদের বন্দী করবে। তারপর কোয়েতজাল মন্দিরে বলি দেবে।' শাঙ্কো বলল।

—বুদ্ধি খাটিয়ে সব করতে হবে। গুপ্তধন উদ্ধার করবো আবার আমাদের কোন ক্ষতি হবে না ঐ ভাবেই কাজ সারতে হবে।' ফ্রান্সিস বলল।

—আমার এরকম নিষ্কর্মার মত বসে থাকতে ভালো লাগছে না। আমি শিকার করতে যাবো। শাঙ্কো তীরধনুক গোছাতে গোছাতে বলল।

—বেশ যাও। কিন্তু সাবধান কালহুয়াকানের সৈন্যদের হাতে যেন ধরা পড়ো না।' ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো তীরধনুক নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এভাবেই দিন কাটতে লাগল। শাঙ্কো কোনদিন সকালে কোনদিন বিকেলে বনে জঙ্গলে শিকার করতে বেরিয়ে যায়। রাজবৈদ্যর চিকিৎসায় ফ্রান্সিস এখন সুস্থ। বাঁ পায়ে আগের মতই জোর পাচ্ছে।

সেদিন সন্ধে থেকেই আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হ'ল। রাত্রি হ'তেই ঝ'ড়ো হাওয়া শুরু হ'ল। গভীর রাত। ফ্রান্সিসরা ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ শুরু হ'ল বজ্রপাত। প্রচণ্ড জোর শব্দে বাজ পড়তে লাগল। তারপরই শুরু হ'ল বৃষ্টি। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল।

বাইরে লোকজনের চীৎকার হৈ হল্লা আরম্ভ হ'ল। হ্যারিও ঘুম ভেঙে উঠে বসল। হ্যারি বলল—'কী ব্যাপার বলো তো?

—বুঝলে না—এতদিন পরে বৃষ্টি এল। তাই ওরা আনন্দ করছে।'

—চলো তো দেখি।' হ্যারি বলল।

দু'জনে দরজা খুলে দাঁড়াল। দেখল অন্ধকারে স্ত্রী পুরুষ বাচ্চা কাচ্চা সবাই বৃষ্টিতে ভিজছে। নাচছে কয়েকজন। ওদের মধ্যে নাকি গলায় গান গাইছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ওদের মাঠেতে দেখা যাচ্ছে। কয়েকজন কী সব বাজনা নিয়ে এল। কচ্ছপের খোল দিয়ে তৈরী বাজনা। একটা হাড়ের কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে। তালে তালে নাচছে সবাই। লোকগুলো যেন পাগল হ'য়ে উঠেছে। কতদিন পরে বৃষ্টি হ'ল কে জানে।

রাজপ্রাসাদের পাথরের দরজার কাছে দু'জন জ্বলন্ত মশাল হাতে এসে দাঁড়াল। তাদের পেছনে পেছনে রাজা হুয়েমাক এসে দাঁড়ালেন। রাজাকে দেখে নৃত্যরত নারীপুরুষের আনন্দ দ্বিগুণিত হ'ল। রাজা হুয়েমাক দু'হাত নেড়ে নেড়ে ওদের উৎসাহিত করতে লাগলেন।

বেশ কয়েকদিনের গুমোট গরমের পর বৃষ্টিভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল—দরজা খোলা থাক। ঘরটা ঠাণ্ডা হোক। দু'জন দরজা থেকে চ'লে এল। শুয়ে পড়ল। বাইরে তখনও দাপাদাপি নাচানাচি চলছে। ফ্রান্সিস বলল—'বুঝলে হ্যারি—এরাও তলতেক উপজাতি। নাহুয়াত্‌ল ভাষায় কথা বলে।'

—তা তো হবেই। এরা আর রাজা হুয়েমাকের অনুগত ননোয়াক্রা যোদ্ধারা তো তুলাতেই ছিল। রাজা হুয়েমাকের সঙ্গে ওরাও দেশত্যাগ করেছিল। কাজেই ভাষা তো এক হবেই।

দু'জনে আর কোন কথা হ'ল না বাইরে আনন্দ উল্লাস তখন স্তিমিত হয়ে এসেছে। বৃষ্টিও থেমে গেছে। আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে শুধু।

পরদিন সকালে শাঙ্কো তীরধনুক নিয়ে শিকার করতে বেরিয়ে গেল। শাঙ্কো প্রতিদিনই বুনো মুরগী নীল কতিঙ্গা পাখি, লাল চামচ ঠোঁট পাখি শিকার ক'রে আনে। পাখীর মাংস খাওয়া হয় আর চোলুলার লোকেরা ভীড় ক'রে আসে কতিঙ্গা পাখির, লাল চামচঠোঁট পাখির পালক নিতে। এসব পাখির পালক খুব দামী আর তলতেকরা মাথায় গুঁজে গর্ব অনুভব করে।

সেদিন দুপুর হ'য়ে গেল শাঙ্কো শিকার থেকে ফিরল না। ফ্রান্সিস আর হ্যারি তখনও ভাবল শাঙ্কো এখুনি আসবে। কিন্তু দুপুর পেরিয়ে বিকেল হ'তে চলল শাঙ্কো তখনও ফিরল না। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দু'জনেই চিন্তায় পড়ল। এত দেরী হবার কথা তো নয়।

সন্ধের সময় দু'জন ননোয়াক্রা যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের ঘরে এল। কী বলতে লাগল। হ্যারি ওদের বলল—কোথায় যাবো? রাজা হুয়েমাকের কাছে? রাজা হুয়েমাক কথাটা শুনে যোদ্ধা দু'জন মাথাটা বারবার ঝাঁকাতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—' চলো রাজার কাছেই যাওয়া যাক। এদের কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

দু'জন যোদ্ধার সঙ্গে ওরা দু'জন রাজার পাথরের প্রাসাদে এল। ভেতরে ঢুকল। দেখল রাজা হুয়েমাক কাঠের সিংহাসনে বসে আছেন। রাজসভার গণমান্য ব্যক্তিরাও রয়েছেন। ফ্রান্সিস ও হ্যারি মাথা নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানাল। রাজাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হ'ল। রাজা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বললেন—' তোমাদের বন্ধু—পুয়েবেলা নদীর সেতুর কাছে কালহুয়াকানের সৈন্যরা ধরেছে—চারজন ননোয়াক্রা যোদ্ধাকেও —ধরে নিয়ে গেছে—তুলাতে।

ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই ভীষণভাবে চমকে উঠল। শাঙ্কোকে ধ'রে নিয়ে গেছে? দু'জনেই পরস্পরের মুখের দিকের তাকাল।

—কখন ধ'রে নিয়ে গেছে? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—'দুপুরে।' রাজা বললেন। ফ্রান্সিস বুঝে উঠতে পারল না কী করবে। ফ্রান্সিস রাজাকে বলল—'কিন্তু পুয়েবেলা নদীর সেতু তো আমরা কেটে দিয়ে এসেছিলাম।'

—'কালহুয়াকান—সৈন্যরা—সেতু কাঠের করেছে—পাকাপোক্ত—আমরা জানতাম না।' রাজা বললেন।

—'তা'হলে তো কালহুয়াকান যে কোন সময় আপনার রাজ্য আক্রমণ করতে পারে।' হ্যারি বলল।

—পারে—আমরা তৈরী—লড়াই হবে। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি সে তো পরের কথা। এখন শাঙ্কোকে মুক্ত করার কথা ভাবো।'

—'তা তো বটেই। কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিনা কী করবো?' হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস মাথা নীচু ক'রে দু'তিনবার পায়চারী করল। হ্যারি জানে গভীরভাবে ফ্রান্সিস যখন কিছু ভাবে তখন পায়চারী করে। হঠাৎ ফ্রান্সিস রাজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল।—'একমাত্র উপায় আমাদের ধরা দেওয়া।'

—'মানে?' রাজা সপ্রশ্নদৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

—আমি আর আমার বন্ধু কালহুয়াকান সৈন্যদের হাতে ধরা দেব। ওরা আমাদের নিশ্চয়ই কয়েদখানায় নিয়ে যাবে। আমাদের বন্ধুকেও নিশ্চয়ই ওখানেই রেখেছে। পরে বুদ্ধি করে কয়েদখানা থেকে পালাবো।' ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে?' রাজা বললেন।

—পারতেই হবে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ফ্রান্সিস বলল—দেখ—পারো কিনা। রাজা বললেন।

ওরা দু'জন মাথা একটু নীচু ক'রে রাজাকে সম্মান জানিয়ে চলে এল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় শুল দু'জনে। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস ধরা দেওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

—'এ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না।' ফ্রান্সিস বলল।

—কালহুয়াকানের সৈন্যরা তো আমাদের মেরেও ফেলতে পারে।

—পারে কিন্তু যাতে মেরে না ফেলে তার জন্য বরাবর রাজা কালহুয়াকান ও বারিনথাসের কাছে আমাদের নিয়ে যেতে বলবে। তাহ'লেই ওরা আর মারবে না।

তাছাড়া কোয়েতজালের কাছে বলি দেবার জন্য ওদের তো মানুষ দরকার। বলি দেবার জন্যেই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে।'

—হুঁ তা ঠিক। তাহ'লে কবে ধরা দেবে?' হ্যারি বলল।

—কালকেই। দেরী করা চলবে না।

—যদি শাঙ্কোকে এর মধ্যেই মেরে ফেলে থাকে? হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। ডান হাতটা বাড়িয়ে মশালের আগুনের কাছে রেখে বলল—'তাহলে এই আগুন ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—রাজা কালহুয়াকান আর বারিনথাস দু'জনকেই আমি হত্যা করবো। তারপর আমার মৃত্যু হোক—কোন দুঃখ থাকবে না আমার।

হ্যারি আর কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিস বিছানায় শুল। শুয়ে শুয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভাবতে লাগল। এক সময় ওর দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

পরদিন সকালে জলখাবার খেয়েই ওরা দুজন তৈরী হ'তে লাগল। কোমরের ফেটিতে তরোয়াল গুঁজল। রাজা হুয়েমাক ওদের দু'জনকে দুটো সূতীর মোটা চাদর দিয়েছিল। সেদুটো গায়ে জড়াল। তারপর ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দু'চারজন ননোয়াল্কা সৈন্য এগিয়ে এল। রাজার আদেশ—ওদের ফ্রান্সিসদের সঙ্গে যেতে

হবে। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে ওদের সঙ্গে [illegible] নিষেধ করল। তারপর প্রান্তর পেরিয়ে ওরা দু'জন সেই শুকনো পাতাঝরা বনের দিকে চলল।

বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে দু'জনে। শুকনো গাছপালা ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চলল ওরা। দিন কয়েক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। তবু গাছপালা সতেজ হয়নি। সেই শুকনো মরা মরা।

শুকনো বন শেষ হ'ল ওরা দু'জনে সেতুর কাছে এল। সত্যিই সেতুটা বেশ পাকাপোক্ত করা হয়েছে। গাছের ডাল ফালা ক'রে দড়ি দিয়ে বেঁধে বেশ শক্ত সেতু তৈরী করা হয়েছে। হ্যারি বলল—এর ওপর দিয়ে ঘোড়ার চড়ে যাওয়া যাবে?

—না—তবে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে আর কালহুয়াকান চোলুলা আক্রমণ করলে এভাবেই ঘোড়া পার করবে।

ওরা হেঁটে সেতু পার হ'ল। এখন কালহুয়াকানের রাজত্ব শুরু হ'ল।

কিছুদূর এগোতেই দূর থেকে নজরে পড়ল কয়েকজন ঘোড়সওয়ার ধুলো উড়িয়ে আসছে। হ্যারি বলল—'মনে হচ্ছে কালহুয়াকানের সৈন্যদল।' ফ্রান্সিস বলল—'তাই মনে হচ্ছে।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা ওদের কাছে এসে পড়ল। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে দেখেই ওরা ঘোড়ার গতি কমাল। কাছে এসে ওরা ঘোড়া থামাল। নাহুয়াত্‌ল ভাষায় ওরা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করল। ওদের মধ্যে থেকে দাড়ি গোঁফ ওলা একজন ঘোড়া থেকে নেমে এল। ফ্রান্সিসের সামনে এসে দাঁড়াল। বাকী সৈন্যরা বর্শা উঁচিয়ে তৈরী হ'ল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—হ্যারি—তরোয়াল ফেলে দাও। ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই কোমরে গোঁজা তরোয়াল বের ক'রে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর দু'হাত তুলে দাঁড়াল। দলনেতার দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস দু'টো কথা বার বার বলতে লাগল—রাজা 'কালহুয়াকান' আর 'ব্রিনথাস'। দলনেতা কী বুঝল কে জানে। ও হাত তুলল। সৈন্যরা বর্শা নামাল। দলনেতা হাত নামিয়ে চেঁচিয়ে কী বলল। একজন সৈন্য জিনের সঙ্গে বাঁধা দড়ি দলনেতার দিকে ছুঁড়ে দিল। দলনেতা দড়িটার একটা মাথা নিয়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারির দু'হাত বাঁধল। তারপর দড়ির অন্য মাথাটা হাতে নিল। তরোয়াল দু'টো মাটি থেকে তুলে নিয়ে একজন ঘোড়সওয়ারের হাতে দিল। তারপর সে নিজের ঘোড়ায় উঠল। ঘোড়ার জিনের সঙ্গে দড়ির অন্য মুখটা বাঁধল।

তারপর দলনেতা ঘোড়া চালাল। অন্য সৈন্যরাও ঘোড়ায় চড়ে চলল। ওদের পেছনে পেছনে ফ্রান্সিস ও হ্যারি হাত বাঁধা অবস্থায় হাঁটতে লাগল।

দলনেতা কী ব'লে উঠল। একজন ঘোড়সওয়ার সৈনিক দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে তুলার দিকে চলে গেল।

ঘোড়া চালাতে চালাতে দলনেতা কী একটা বলে উঠল। অন্য সৈন্যরা হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দলনেতা ঘোড়ার গতি বাড়াল। হাত বাঁধা দড়িতে টান পড়ল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দৌড়াতে লাগল। দলনেতা ঘোড়ার গতি আরো বাড়াল। অন্য সৈন্যরাও সেই সঙ্গে ঘোড়ার গতি বাড়াল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘোড়ার অত দ্রুত

গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারল না। মাটিতে পড়ে গেল। দলনেতা ওদের দুজনকে হাতে দড়িবাঁধা অবস্থায় মাটির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। ধুলো মাটি আর পাথুরে জায়গা দিয়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারির শরীর হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে চলল। সৈন্যরা হো হো হাসতে লাগল।

একটা ছুঁচালো পাথরে ফ্রান্সিসের ঘা খাওয়া বাঁ পাটা লাগল। ওখানকার ক্ষতটা শুকিয়ে গিয়েছিল। এখন ছুঁচালো পাথরের ধাক্কায় জায়গাটা কেটে গেল। রক্ত বেরিয়ে এল। যন্ত্রণায় ফ্রান্সিসের প্রায় অজ্ঞান হ'য়ে যাওয়ার মত অবস্থা। দাঁত চেপে ও যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল। হ্যারি এমনিতেই শরীরের দিক থেকে বরাবর দুর্বল। ও যেন এই হিঁচড়ানি আর সহ্য করতে পারছিল না। ওদের দু'জনেরই কনুই হাঁটু ভীষণ ভাবে ছড়ে গেছে। পোশাক ছিঁড়ে গেছে। সমস্ত শরীর ধুলোয় ভর্তি হ'য়ে গেছে। ফ্রান্সিস ওর মধ্যেই মাথা উঁচু ক'রে দেখল বিষাক্ত উপত্যকার কাছে চলে এসেছে ওরা। সেই পাথরের ওপর ফণী-মনসার গাছ। তারপরেই তো কোয়েতজালের মন্দির। ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে বলে উঠল—হ্যারি—এসে গেছি। আর একটু সহ্য কর।



এবার দলনেতা ঘোড়ার গতি অনেক কমিয়ে দিল। অন্য সৈন্যরাও গতি কমাল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল। ধুলোয় লাল শতছিন্ন পোশাক, ছড়ে যাওয়া শরীর নিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল। দেখল বারিনথাস ওর পাথরের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় আগেই ওকে ঘোড়সওয়ার দিয়ে খবর পাঠানো হ'য়েছে। বারিনথাস কী একটা ব'লে উঠতে ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা দাঁড়িয়ে পড়ল। বারিনথাস ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে গেল। হেসে বলল—'পুরোনো বন্ধুরা যে। বলেছিলাম কিনা—পালিয়ে বাঁচবে না।' ফ্রান্সিস আর হ্যারি দু'জনেই ভীষণ হাঁপাচ্ছিল। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। হ্যারি বলল—বারিনথাস, আমরা ধরা পড়িনি। ইচ্ছে ক'রে ধরা দিয়েছি।—তাই নাকি? খুব ভালো হ'ল। কয়েদ-ঘরে জনা চারেক ননোয়াক্কা সৈন্য রয়েছে। তোমাদের এক বন্ধুও রয়েছে। এবার কোয়েতজাল দেবতার পুজো খুব ধুমধাম ক'রে হবে। অনেক বলি হবে।' ফ্রান্সিস আর হ্যারি দু'জনেই এত কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যেও হাসল। যাক—শাঙ্কো বেঁচে আছে।

বারিনথাস চীৎকার ক'রে কী ব'লে উঠল। দলপতি আবার ওদের টেনে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিস হাঁটতে হাঁটতে বলল—বারিনথাস—রাজা কালহুয়াকান আর তলতেক

যোদ্ধাদের বলে দাও—আজ থেকে ওরা আমাদের শত্রু হ'ল। পশুর মত যেভাবে আমাদের মাটিতে পাথরে হিঁচড়ে এনেছে—এই অমানুষিক অত্যাচার আমরা কোনদিন ভুলবো না। এই সব অত্যাচারের প্রতিশোধ আমরা নেব।' বারিনথাস হেসে বলল—'প্রতিশোধের কথা ভাবতে ভাবতেই তোমাদের জীবন শেষ হ'য়ে যাবে। রাজা কালহুয়াকানের কয়েদঘর থেকে আজ পর্যন্ত কেউ পালাতে পারেনি।'

—'দেখা যাক।' ফ্রান্সিস বলল।

তলতেক সৈন্যরা ওদের দু'জনকে টেনে নিয়ে চলল কয়েদঘরের দিকে। একসময় কয়েদ ঘরের সামনে পৌঁছল ওরা। কোয়েতজাল মন্দিরের কাছেই কয়েদঘর।

দরজার দু'পাশে দু'জন পাহারাদার সৈন্য দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিসদের সৈন্যরা বন্দী করে নিয়ে আসছে দেখে একজন পাহারাদার কাঠের দরজার হুড়কোমতো লম্বা কাঠটা খুলে নিল। দরজা খুলে গেল। সৈন্যরা ধাক্কা দিয়ে ফ্রান্সিসদের ঘুরে ঢুকিয়ে দিল। তারপর দু'জনেরই হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। সৈন্যরা চলে গেল। বারিনথাস বলল—পালাবার চেষ্টা করো না। করলে—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—ঐ দশা হবে।

ফ্রান্সিস আলো থেকে অন্ধকার ঘরটায় ঢুকে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। এইবার অন্ধকার ভাবটা চোখে সয়ে এল। দেখল দু'জন লোককে কড়িকাঠে দু'পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ফ্রান্সিস ও হ্যারি দেখল দু'টো কাঠের খুঁটিতে হাত পা বাঁধা অবস্থায় শাঙ্কো নির্জীবের মত পড়ে আছে। পাহারাদার দু'জন এবার ফ্রান্সিস ও হ্যারির হাত পা দড়ি দিয়ে দু'টো কাঠের খুঁটির সঙ্গে বাঁধল। ফ্রান্সিস বা হ্যারি কারোরই তখন এতটুকু শক্তি নেই যে পাহারাদারদের বাধা দেবে।

বারিনথাস বলল—'তোমাদের বন্ধুকে তো পেলে। সন্ধের দিকে খবর নিতে আসবো।' বারিনথাস যাবার সময় পাহারাদার দু'জনকে নাহুয়াতল ভাষায় কী ব'লে গেল। পাহারাদার দু'জন ঘরের বাইরে গেল। তারপর কাঠের হুড়কো টেনে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

গারদ ঘরের দরজা খোলা হ'ল, নতুন বন্দীদের আনা হ'ল, বাঁধা হ'ল অথচ শাঙ্কো মাথা নিচু ক'রেই রইল। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল না।

ফ্রান্সিস ক্লান্তস্বরে ডাকল—'শাঙ্কো।' ডাক শুনে শাঙ্কো চমকে উঠল। এ তো ফ্রান্সিসের গলা। ও মাথা তুলে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। প্রায় অন্ধকারেও ফ্রান্সিসদের চিনল। ও দুর্বল কণ্ঠে বলল—ফ্রান্সিস হ্যারি তোমাদের বন্দী করেছে এরা?

—না। আমরা নিজেরাই ধরা দিয়েছি।' হ্যারি আস্তে আস্তে বলল। শাঙ্কো এবার দেখল—ফ্রান্সিস আর হ্যারির পোশাক ছেঁড়া ফোড়া। মুখে মাথায় সারা গায়ে পাহাড়ী লাল ধুলো মাটি। ও অবাক হ'য়ে গেল। শাঙ্কো বলল—' তোমাদের এ অবস্থা হ'ল কী ক'রে?'

—পরে বলবো সব। এখন ভীষণ ক্লান্ত। ফ্রান্সিস দুর্বলস্বরে বলল। হ্যারি বলল—শাঙ্কো—এই দুজন ননোয়াক্লা যোদ্ধাকে ঝুলিয়ে রাখা হ'য়েছে কেন?

—'ওরা রাজা কালহুয়াকানকে অপমান করেছিল।' শাঙ্কো বলল।

হ্যারি খুঁটির সঙ্গে হাত পা বাঁধা অবস্থাতেই শুয়ে পড়ল। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে

পড়েছে ও। ফ্রান্সিস একবার হ্যারির দিকে তাকাল। কিছু বলল না। এবার ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সার সার কয়েকটা খুঁটি পোঁতা মেঝেয়। কোণার দিকে দু'জন খুঁটির সঙ্গে ওদের মতোই হাত পা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। মাথার ওপর লম্বা লম্বা ঘাস পাতার ছাউনি। তার নীচে গাছের মোটা মোটা ডালের কড়ি বরগা। সেই কড়ি বরগা থেকে দু'জনকে মাথা নিচু অবস্থায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর জানেন ওরা বেঁচে আছে কিনা। চারপাশের দেয়াল পাথরের।

হ্যারির দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনল—ফ্রান্সিস, আমরা বোধহয় বাঁচবো না। পালাবার উপায় নেই।

—হ্যারি, ফ্রান্সিস বলল—এখনি ভেঙে পড়ো না। এখনও চারদিন সময় আছে হাতে। মৃত্যুর ভাবনা না ভেবে পালানোর উপায় ভাবো।

শাঙ্কো বলল—এখান থেকে কি পালানো সম্ভব?

—দু'একদিন যেতে দাও। ওদের পাহারা দেবার পদ্ধতিটা দেখি। তখন ভেবে দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

পায়ের ক্ষতস্থানে অসম্ভব ব্যথা। ব্যথা বেড়েই চলছে যেন। ফ্রান্সিস পায়ের ক্ষতস্থানের দিকে তাকাল। দেখল তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে।

তখন দুপুর। হুড়কো টেনে দরজা খুলে একজন পাহারাদার ঢুকল। বড় একটা মাটির পাত্রে যবসেদ্ধ। কয়েকটা ছোট ছোট মাটির পাত্র প্রত্যেক বন্দীর সামনে রাখল। যবসেদ্ধ দিল। সেদ্ধ মাছ দিল আর বুনো আলুর ঝোল। তারপর প্রত্যেকের হাতের বাঁধন খুলে দিল। ফ্রান্সিস বলল—কিছ্ছু ফেল না। পেট পুরে খাও। খেতে ভালো না লাগলেও খাও।

পাহারাদার সৈন্যটি ঝুলন্ত বন্দী দু'জনকে খইয়ে দিল। ঘরের এক কোণায় রাখা বিরাট জালার মতো পাত্র থেকে জল এনে সবাইকে খাওয়াল। তারপর একবার দরজার দিকে তাকিয়ে নিয়ে দেখল অন্য পাহারাদারটি উঠোনে আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। এই সুযোগে ও ওর মাথার মোটা ফেট্টিটা খুলে ফেলল। নিচু হয়ে ফ্রান্সিসের পায়ের ক্ষতস্থানে শক্ত করে বেঁধে দিল। তারপর সবার হাত আগের মতো বেঁধে দিয়ে এঁটো বাসনপত্তর নিয়ে দ্রুত চলে গেল। অন্য পাহারাদারটি এসে হুড়কো টেনে দরজা বন্ধ করে দিল।

ক্ষতস্থানে কাপড় বাঁধা পড়ায় ফ্রান্সিস একটু আরাম পেল। ব্যথাটাও অনেকটা কমল। ফ্রান্সিস হেসে মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি, দেখ বারিনথাসও মানুষ—এই পাহারাদারটাও মানুষ! অথচ দু'জনের কত পার্থক্য।

সন্ধে হলো। দরজা খুলে সেই পাহারাদারটা ঢুকল। মাথায় ফেট্টি বাঁধা নেই। একটা মশাল নিয়ে এসেছিল সেটা দরজার ওপরে পাথরের খাঁজে বসিয়ে রেখে গেল।

মশালটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফ্রান্সিস হঠাৎ চমকে উঠে বসল। ওর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চাপাস্বরে বলল—হ্যারি, তুমি মৃত্যুর কথা বলছিলে, আমি তোমাকে নতুন জীবনের কথা বলছি।

—তার মানে? হ্যারি অবাক চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

—আজ রাত্রেই আমরা মুক্তি পাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—কী করে?

—দেখতেই পাবে। এখন শুধু বারিনথাসের আসার অপেক্ষা।

—বারিনথাস মুক্তি দেবে আমাদের?

—না, মুক্তির উপায় করে দেবে।

হ্যারি চিন্তিত হলো। ফ্রান্সিসের জ্বর আসেনি তো? প্রলাপ বকছে যেন। ও বলল—ফ্রান্সিস, তোমার শরীর ভালো আছে তো?

—আমার কথা প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে তাই না?

—হ্যাঁ।

ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। হ্যারি আর কোনো কথা বলল না।

একটু রাতে বারিনথাস এল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—এসো, মুক্তিদূত এসো।

—কাছে এসো, তোমার কানে কানে বলবো, গুপ্তধন উদ্ধারের হদিস।

—ঠিক। বারিনথাস লাফিয়ে উঠল। প্রায় ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। ফ্রান্সিসের মুখের কাছে কান নিয়ে এল। মুহূর্তে এক অদ্ভুত কাণ্ড করল ফ্রান্সিস। বারিনথাসের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিল। বারিনথাস এক ঝট্‌কায় সরে গেল। রাগে উত্তেজনায় ও থরথর করে কাঁপতে লাগল। চিৎকার করে পাহারাদারদের ডাকল। পাহারাদার দুজন এক লাফে ঘরে ঢুকল। বারিনথাস চিৎকার করে কী হুকুম দিল। পাহারাদার দু'জন ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। তারপর ফ্রান্সিসকে টেনে দাঁড় করাল। হাতের বাঁধন খুলে দিল। একজন লাফিয়ে কড়িকাঠে উঠল। তারপর দুজনে মিলে ফ্রান্সিসকে কড়িকাঠ থেকে মাথা নিচু করে ঝুলিয়ে দিল। দু'হাত বেঁধে দিল। ফ্রান্সিস এইবার হো হো করে হেসে উঠল। বারিনথাস চিৎকার করে বলল—এইবার তোর মরণ। মর তুই—।

ফ্রান্সিস এবার হাসি থামিয়ে বলল—বারিনথাস, আমার তো মৃত্যু ছাড়া গতি নেই। তোমাকে একটা শেষ অনুরোধ করবো। রাখবে?

—এই তো, এবার বুঝেছো তো আমাকে অপমানের ফল কী?

—বুঝলাম বৈ কি। তা শেষ অনুরোধ আমার। আমাদের দুটো তরোয়াল আর ধনুকবাণ ছোরা এই ঘরে রেখে যাও।

—কেন?

—মরেই তো যাবো, মরবার আগে অস্ত্রগুলো দেখতে দেখতে মরতে চাই। আমাদের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ঐ অস্ত্রগুলোর সঙ্গে।

—ভালো—ভালো। বারিনথাসের হুকুমে পাহারাদাররা ফ্রান্সিসদের তরোয়াল, শাঙ্কোর ধনুকবাণ ছোরা ঐ ঘরের মেঝেয় রেখে গেল।

—আর একটা কথা। ফ্রান্সিস বলল—আগুনকে নাহুয়াত্‌ল্ ভাষায় কী বলে?

—ওমেতে।

—শেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাকে। ফ্রান্সিস হাসল।

বারিনথাস চলে গেল। হুড়কো টেনে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

হ্যারি এতক্ষণ অবাক হয়ে এইসব অদ্ভুত ঘটনা দেখছিল। একটা কথাও বলতে পারেনি। এইবার ভাবল যে বর্শাটা ফ্রান্সিসের পায়ে বিঁধেছিল তাতে কি বিষ মাখানো ছিল? সেই বিষে কি ফ্রান্সিসের মাথায় গোলমাল হলো? গভীর দুঃখে হ্যারির বুক ভেঙে যেতে লাগল। বাল্যবন্ধু ফান্সিস—শেষে তার এইভাবে মৃত্যু হবে? ও ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল একবার। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। হ্যারিকে কাঁদতে দেখে শাঙ্কোর চোখেও জল এল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি, কেঁদো না। পায়ের ক্ষত ছাড়া আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু হ্যারি তবু চাপা শব্দে কাঁদতে লাগলো। পাহারাদার ওদের রাতের খাবার দিয়ে গেল। খাওয়া হলে পাহারাদার চলে গেল।

রাত বাড়ল। হঠাৎ ফ্রান্সিস নিজের শরীরটাকে দোলাতে লাগল। দোলা বাড়তে লাগল। একবার একটা জোরে দুলুনি দিয়ে মশালের কাছে কাঠের কড়ি কাঠ দু'হাতে ধরে ফেলল। ঐ অবস্থায় ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে দড়ি দিয়ে বাঁধা হাত দু'টো মশালের আগুনের কাছে নিয়ে আসতে লাগল। খুশিতে হ্যারি চাপাস্বরে বলে উঠল—ফ্রান্সিস।'

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—চুপ।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে হাতবাঁধা দড়িটা মশালের আগুনের ওপর রাখল। দড়িটা পুড়ে যেতে লাগল। ফ্রান্সিসের হাত দু'টোতে আগুনের ছ্যাঁকা লাগছে। কালো হয়ে যাচ্ছে হাতের ঐ জায়গাটা। দড়িটা আগুনে কিছু পুড়তেই ফ্রান্সিস এক হ্যাঁচকা টানে দড়ি খুলে ফেলল। আবার ঝুলতে লাগল।

একটু দম নিয়ে শরীরটা বেঁকিয়ে ওপরের দিকে হাত বাড়িয়ে ঝোলানো দড়িটা ধরল। তারপর আস্তে আস্তে দু'হাত তুলে ওপরের কড়িকাঠটা ধরে ফেলল। শরীরের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কড়িকাঠটায় উঠে বসে পড়ল। দু'হাত নামিয়ে পায়ের বাঁধন খুলে ফেলল। কড়িকাঠ থেকে ঝুলে মেঝেয় নামল। আস্তে যাতে কোনো শব্দ না হয়। মেঝে থেকে নিজের তরোয়ালটা তুলে নিল। তারপর একে একে সকলের হাত পায়ে দড়ির বাঁধন কেটে দিল। ননোয়াক্রা যোদ্ধারা মুক্তি পেয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে হাসল। হ্যারি তরোয়াল তুলে নিল। শাঙ্কো তীর-ধনুক আর ছোরাটা নিল।

এইবার ফ্রান্সিস ঘরের চারদিকে তাকাল। দেখল এক কোণায় শুকনো ঘাসের বিছানামতো। ও একটানে মশাল খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল ঘাসের বিছানাটার ওপর। দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—সবাই 'ওমেতে' বলে চেঁচিয়ে ওঠো। তিনজন মিলে চিৎকার করে উঠল—'ওমেতে' 'ওমেতে'। চিৎকার চলল। ননোয়াক্রা যোদ্ধারাও গলা মেলাল।

দরজা খুলে দু'জন পাহারাদার ঢুকল। আগুন দেখে ওরা হতবুদ্ধি। যোদ্ধারা পাহারাদার দু'জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিল ঘুঁষি মেরে দুজনকেই মেঝের ফেলে দিল। কিল ঘুষি খেয়ে দুজন পাহারাদারই অজ্ঞান হয়ে গেল। ফ্রান্সিস উপকারী পাহারাদারটিকে আঘাত করতে চায়নি। কিন্তু এখন যা হবার তা হয়ে গেছে। যোদ্ধারা এক ছুটে পালিয়ে গেল।

ওদিকে আগুন কয়েদঘরের ঘাসের ছাউনিতে লেগে গেল। কালো ধোঁয়া উঠতে

লাগল। ধোঁয়া আগুন দেখে তলতেকদের বাড়িতে বাড়িতে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। তলতেকরা ছুটে আসতে লাগল। আগুনের আভায় আকাশ লাল হয়ে গেল। সৈন্যরাও জলের জন্যে ততক্ষণে ছুটোছুটি শুরু করেছে।

এই সুযোগে ফ্রান্সিসরা বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রাজবাড়ির দিকে ছুটল। পেছনে হ্যারি ও শাঙ্কো। কিছুটা এগিয়ে ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। শাঙ্কোকে বলল—শাঙ্কো, তুমি বারিনথাসের বাড়ি চেন তো?

—হ্যাঁ সেদিন ও দেখিয়েছিল।

—যে করেই হোক বারিনথাসকে ধরে রাজবাড়িতে নিয়ে এসো। একেবারে রাজার শোবার ঘরে। আমরা ওখানে থাকবো।

শাঙ্কো লোকজনের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে চলে গেল।

দু'জনে রাজবাড়িতে ঢুকল। দেখল পাহারাদার সৈন্যরা কেউ নেই। সবাই আগুন নেভাতে ব্যস্ত। শুধু একজন সৈন্য রাজার শোবার ঘরের দরজায় পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিস সোজা সৈন্যটার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পায়ে ক্ষত। হাত দু'টোও অক্ষত নেই। তবু ফ্রান্সিস দমল না। ফ্রান্সিস বর্শাটা আমূল বিঁধিয়ে দিল সৈন্যটার বুকে।

রাজার শোবার ঘরে ঢুকে দেখল রাজা ঘাস-বিছানো গদির মতো বিছানায় বসে আছেন। বাইরের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে বোধহয় ঘুম ভেঙে গেছে। ফ্রান্সিস একছুটে গিয়ে রাজার বুকের ওপর তরোয়াল চেপে ধরল। রাজা কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। ফ্যাল ফ্যাল করে ফ্রান্সিস ও হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফ্রান্সিস বুঝল রাজাকে কোনো কথা বলে লাভ নেই। কিছুই বুঝবেন না উনি। বারিনথাসের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

ওদিকে শাঙ্কো খুঁজে খুঁজে বারিনথাসের বাড়ি পেল। দ্রুত ঘরে ঢুকে পড়ল। দেখল এত গোলমাল হৈ-চৈয়ের মধ্যেও বারিনথাস ঘাসের বিছানায় গুড়িশুড়ি মেরে ঘুমিয়ে আছে। শাঙ্কো ওকে ধরে জোরে ধাক্কা দিল। বারিনথাস লাফিয়ে উঠে বসল। চেঁচিয়ে বলে উঠল—কে? কে?

শাঙ্কো কোমর থেকে ছোরাটা খুলে ওর পিঠে ঠেকাল। ছোরাটায় চাপ দিয়ে বলল—রাজবাড়িতে চলো।

—কেন?

—দরকার আছে। যদি যেতে যেতে কোনো চালাকি করো ছোরাটা আমূল ঢুকিয়ে দেব।

—না—না—চলো যাচ্ছি।

বারিনথাস বিছানা থেকে নেমে বাড়ির বাইরে এল। শাঙ্কো ওর পিঠে ছোরা ঠেকিয়ে ওকে প্রায় ঠেলে নিয়ে চলল। লোকজনের ছুটোছুটি চ্যাঁচামেচি তখনও চলছে। তবে গারদঘরে আগুন অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে।

বারিনথাস আর শাঙ্কো রাজার শয়নঘরে ঢুকল। দেখল ফ্রান্সিস রাজার বুকে তরোয়াল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে হ্যারি। বারিনথাস তো এই দৃশ্য দেখে অবাক। ফ্রান্সিস হেসে বলল—বারিনথাস এসো। খুব আশ্চর্য হয়েছো তাই না?

—না—মানে—তোমরা কী করে—

—সেসব পরে হবে। তুমি রাজাকে বলো আমার হুকুমে এখন তাঁকে চলতে হবে। নইলে তরোয়াল বুকে বিঁধিয়ে দেব।

বারিনথাস নাহুয়াতল্ ভাষায় রাজাকে সে কথা বলল। রাজা দুবার জোরে মাথা নাড়লেন। বারিনথাস বলল—রাজা বিপদ বুঝতে পেরেছেন এবং তোমার হুকুম শুনতে রাজী হয়েছেন।

ফ্রান্সিস বলল—এবার তুমি বাইরে যাও। রাজবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে সব সৈন্য পাহারাদারদের বলো—রাজা কালহুয়াকানের হুকুম, তোমরা সবাই অস্ত্রত্যাগ কর। তারপর বাইরের প্রাচীরের ওপাশে চলে যাও। রাজার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ ভেতরে ঢুকবে না। শাঙ্কোকে বলল—বারিনথাসকে নিয়ে বাইরে যাও। পিঠের ওপর ছোরা ঠেকিয়ে রাখবে। যদি বোঝ অন্যরকম কিছু বলছে সঙ্গে সঙ্গে ওকে হত্যা করবে।

শাঙ্কো বারিনথাসকে ঠেলতে ঠেলতে বাইরের বারান্দায় নিয়ে এল। তখন আগুন নিভে গেছে। হৈচৈ থেমে গেছে। সৈন্য পাহারাদার নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে।

বারিনথাস চিৎকার করে নাহুয়াতল্ ভাষায় ওদের লক্ষ্য করে কী বলতে লাগল। শাঙ্কো তীক্ষ্ণচোখে সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওরা কী করে লক্ষ্য রাখল। দেখল সৈন্যরা হাতের বর্শা মাটিতে রেখে দিতে লাগল। মাথা নুইয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। বোধহয় রাজার আদেশকে সম্মান জানাল। তারপর প্রাচীরের ওপাশে চলে যেতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব সৈন্য পাহারাদার চলে গেল।

বারিনথাসকে নিয়ে শাঙ্কো রাজার শয়নকক্ষে ফিরে এল। সব কথা ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস বলল—বারিনথাস, আমি রাজার সঙ্গে কথা বলবো। তুমি দোভাষীর কাজ কর।

—বেশ।

রাজা ও ফ্রান্সিসের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো।

ফ্রান্সিস—রাজা কালহুয়াকান, আপনার বংশের প্রথম রাজা যে ধনসম্পত্তি এখানে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন তার ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। কিন্তু আমি বুদ্ধির খেলা পছন্দ করি। সেই ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল যাজক ব্রেন্ডনের পরামর্শমতো। আমি সেই ধনসম্পদ উদ্ধার করবার চেষ্টা করবো। এই জন্যে আপনার সাহায্য চাই। আপনি সাহায্য করবেন কী?

রাজা—নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু যা কেউ পারেনি। আপনিও পারবেন না।

ফ্রান্সিস—চেষ্টা করতে দোষ কি। কাল থেকে আপনাকে ও বারিনথাসকে সঙ্গে নিয়ে আমরা গুপ্তধনের অনুসন্ধান শুরু করবো। আপনি রাজী?

রাজা—হ্যাঁ।

ফ্রান্সিস—তাহলে আজকে বাকী রাতটুকু আমরা বিশ্রাম করবো। ঘুমুবো। কাল থেকে কাজে নামবো।

রাজা—বেশ।

ফ্রান্সিস—আমি আহত। আমার চিকিৎসার জন্যে একজন বদ্যি ডেকে দিন। ক'টা দিন আমাকে সুস্থ থাকতে হবে।

রাজা—বেশ ব্যবস্থা করছি।

বারিনথাসই একজন রাজভৃত্যকে ডেকে নিয়ে এল। রাজা তাকে কী বললেন। রাজভৃত্য একটু পরেই একজন খুব রোগা লম্বামতো লোককে ধরে নিয়ে এলো। লোকটার মুখে দাড়ি গোঁফ। গলায় নানারঙের পাথরের মালা। গায়ে তুলোর কম্বলের মতো। বিচিত্র বর্ণের নক্সা আঁকা তাইতে। বোঝা গেল বদ্যি। হাতে কয়েকটা চোঙ্। ফ্রান্সিসের হাত পা দেখল। মাথা নাড়ল। তারপর পায়ের ক্ষতস্থানে কাপড়ের ফেট্টি খুলে কয়েকটা পাতা চেপে বেঁধে দিল। ফ্রান্সিস একটু আরাম পেল। হাতের কব্জিতে আঠামতো মলম লাগাল। তারপর চলে গেল।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি রাজার শোবার ঘরের পাশে শুকনো ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে ফ্রান্সিসের শরীরটা দুর্বল লাগল। ভীষণ ক্লান্তিতে ও ঘুমিয়ে পড়ল। শাঙ্কো তীর-ধনুক হাতে রাজাকে আর বারিনথাসকে পাহারা দিতে লাগল।

পরদিন দুপুর নাগাদ ফ্রান্সিসের শরীরে ব্যথা শুরু হলো। ফ্রান্সিস বুঝল ওর জ্বর হয়েছে। কিন্তু আসল কাজ এখনো বাকী। এখন শরীরের কথা ভাববার সময় নেই।

রাজা ও বারিনথাসকে সামনে রেখে ওরা কোয়েতজাল দেবতার মন্দিরে ঢুকল। পাথরে গড়া মন্দির। ভেতরটা একটু অন্ধকার অন্ধকার।

কোয়েতজাল দেবতার মূর্তির সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। মূর্তিটার উচ্চতা এক মানুষ সমান। কাঠ কুঁদে কুঁদে বিচিত্র কাজ মূর্তির গায়ে। হাত দুটো পেছনে। ফ্রান্সিস বারিনথাসকে বলল—তোমার ব্রেন্ডনের বইয়ের শেষে যে ছড়াটি লেখা সেটা মনে আছে?

—সমস্ত বইটাই আমার মুখস্থ।

মূর্তিটার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে ফ্রান্সিস বলল—ছড়াটা বলো তো।

বারিনথাস বলতে লাগল—

অদ্ভুত—অদ্ভুত
ব্রেন্ডনের ছড়া।
পা আছে হাত নেই।
মাথা ঠিক খাড়া।
এক হাত পিঠে বাঁধ্
টল্‌মল্ টল্‌মল্
অতল্ তল্ অতল্ তল্।

—থামো। ফ্রান্সিস বলে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে মূর্তিটার পেছনে দাঁড়াল। দেখল মূর্তিটার কাঁধের কাছ থেকে একটা পাড়অলা কালো কাপড় ঝুলছে। তবে কাপড়টা একেবারে জীর্ণ। এখানে ওখানে ছোপ লাগা। ফেঁসে গেছে।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে পেছন দিয়ে পাথরের বেদিটায় উঠল। মূর্তির কাপড়টা হাত বাড়িয়ে খুলতে যাবে—রাজা চেঁচিয়ে উঠলেন। কী যেন বললেন। ফ্রান্সিস

দাঁড়িয়ে পড়ল। বারিনথাস বলল—রাজা বলছেন ওটা দেবতার পবিত্র গাত্রাবরণ। তুমি বিধর্মী। ছোঁবে না।

—তাহলে রাজাকেই বলো গাত্রাবরণটা খুলে দিক।

বারিনথাস রাজাকে সেই কথা বলল। রাজা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন। সাবধানে দেবতার গাত্রাবরণটা খুলে ফেললেন। সকলেই চমকে উঠল। এ কী? কোয়েতজাল দেবমূর্তির পেছনে রাখা দু'টো হাতই ভাঙা। মুহূর্তে ফ্রান্সিস দেবমূর্তির পিঠের কাছে ঝুঁকে পড়ল। দেখল—মূর্তির ডান হাতটা পিঠের কাছে একটা লোহার কড়ার সঙ্গে বাঁধা ঝুলছে। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসল—হ্যারি, ছড়াটার যে অর্থ আমি করেছি তাতে এই খানেই হাতটা থাকার কথা। ও বারিনথাসকে বলল—রাজাকে বলো এই হাতটা ভাঙা ডানহাতে বসিয়ে দিক।

বারিনথাস রাজাকে সেইকথা বলল। রাজা তখনও অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন ভাঙা হাতটার দিকে। বারিনথাসের কথামত রাজা মূর্তির পিঠ থেকে হাতটা খুলে নিলেন। তারপর মূর্তির ভাঙা হাতটায় বসিয়ে দিলেন। ঠিক খাপে খাপে লেগে গেল।

ফ্রান্সিস চারপাশে তাকিয়ে দেখল বেদীর কাছে কয়েকটা শুকনো মালা পড়ে আছে। ও একটা মালা তুলে নিল। ফুলগুলো খুলে ফেলে মোটা সুতোটা বের করল। রাজার দিকে এগিয়ে ধরে ইশারায় হাতটা বেঁধে দিতে বলল। রাজা তাই করলেন। তারপর বেদী থেকে নেমে এলেন।

ফ্রান্সিস সুতো দিয়ে জোড়া দেওয়া হাতটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আওড়াতে লাগল—টল্‌মল্ টল্‌মল্—অতল্ তল্ অতল্ তল্। মূর্তির হাতের আঙুলগুলো পরস্পর আবদ্ধ এবং করতল প্রসারিত। নিচের মেঝের দিকে। ফ্রান্সিস তখনও বলছে—অতল্ তল্—অতল্ তল্। মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ফ্রান্সিসের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কী নির্দেশ দিচ্ছে জোড়া লাগানো ডান হাতটা? মেঝে কেন কালো আর সাদা পাথরে বাঁধানো? অবশ্য পাথরগুলো অমসৃণ। তবু রঙের বৈষম্য কেন?

জ্বর বেড়েছে ফ্রান্সিসের। সমস্ত শরীরটা যেন কাঁপছে। কানের দুপাশ ঝিমঝিম করছে। ফ্রান্সিস শরীরের এই অবস্থাকে আমল দিল না। হাঁটু গেড়ে মেঝের ওপর বসে পড়ল। আর সবাই অবাক চোখে ফ্রান্সিসের কাণ্ডকারখানা দেখছে। শুধু হ্যারি অচঞ্চল। ও বুঝতে পারছে সমাধানের কোনো সূত্র ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই পেয়েছে।

ফ্রান্সিস মেঝের চারদিকে দৃষ্টি বোলাতে লাগল। দেখল মূর্তির প্রসারিত ডান হাত সোজাসুজি কয়েকটা সাদা পাথরের দিকে নির্দেশ করছে যেন। তার চারদিকে অন্য পাথরগুলো কালো। অন্য পাথরগুলো ছোটবড় এলোমেলো বসানো। কিন্তু সাদা পাথরগুলো অনেকটা চৌকোনো ধরনের আর যেন বেশ যত্নে বসানো।

ফ্রান্সিস এক লাফে দাঁড়াল। বলল—হ্যারি, আমার পদক্ষেপ নির্ভুল। এই সাদা পাথরগুলো তুলতে হবে। তার জন্যে লোক দরকার। আমরা ক'জন পারবো না। কী করা যায় বলো তো।

—তলতেক সৈন্যদের সাহায্য নিতে হবে। দাঁড়াও—বারিনথাসকে বলতে হবে।

—তাতে আমরা বিপদে পড়তে পারি।

—তার ব্যবস্থাও করতে হবে। হ্যারি বারিনথাসের দিকে তাকাল। বলল—তুমি প্রাচীরের ওপাশ থেকে পাঁচজন সৈন্যকে ডেকে নিয়ে এসো। ওরা যেন লোহার কুডুল নিয়ে আসে। তোমার পেছনে ছোরা হাতে শাঙ্কো থাকবে। বেচাল দেখলে তোমাকে হত্যা করবে। কী? পারবে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—কেন নয়। তবে গুপ্তধনের অর্ধেক আমাকে দিতে হবে।

—আগে তো উদ্ধার করি। হ্যারি হেসে বলল।

বারিনথাসের পেছনে ছোরা হাতে শাঙ্কো চলল

অসুস্থ ফ্রান্সিস মেঝের ওপর বসে পড়ল। ওর ভয় হতে লাগল জ্বরের ঘোরে ও না অজ্ঞান হয়ে যায়।

একটু পরেই কুড়ুল হাতে পাঁচজন তলতেক সৈন্য মন্দিরে ঢুকল। পেছনে বারিনথাস। তার পেছনে শাঙ্কো।



হ্যারি এক লাফে গিয়ে রাজার সামনে দাঁড়াল। হাতের তরোয়ালের চকচকে ফলাটা রাজার গলায় ঠেকিয়ে বলল—বারিনথাস, সৈন্যদের বলো—যদি ওরা আমাদের আক্রমণ করে তাহলে ওদের রাজা আমার হাতে মারা যাবে।

এদিকে সৈন্যরা রাজাকে দেখে মাথা নোয়াল। শ্রদ্ধা জানাল। বারিনথাস হ্যারির কথাগুলো ওদের বলল। ওরা চুপ করে শুনল।

এবার ফ্রান্সিস উঠল। সৈন্যদের এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। সৈন্য পাঁচজন এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস আকারে ইঙ্গিতে ওদের বোঝাল—সাদা পাথরগুলোর খাঁজে খাঁজে কুড়ুলের কোপ মেরে পাথরগুলোকে তুলতে হবে। সৈন্যরা মাথা ঝাঁকাল। তারপর সাদা পাথরগুলোর খাঁজে কুড়ুলের ঘা দিতে লাগল। জোর ঠকঠক শব্দ উঠল মন্দিরে। রাজা ও বারিনথাস অবাক চোখে দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণ কুড়ুলের ঘা চলল। দু'তিনটে সাদা পাথর আলগা হয়ে গেল। ফ্রান্সিস তাকিয়ে রইল সেদিকে। ওরা পাথর ক'টা তুলে ফেলতেই ফাঁক দেখা গেল। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—সরে যাও সব।

সৈন্যরা কিছু না বুঝে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। একজন সৈন্য একটা সাদা

পাথর নিচু হয়ে সরাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা ওর হাত থেকে পড়ে গেল। ও অজ্ঞান হয়ে ঐ ফোকরের মধ্যে মাথা রেখে গড়িয়ে পড়ল। বারিনথাস চিৎকার করে তলতেকদের ভাষায় বলল—উঠে এসো সব। সৈন্যরা এক লাফে সরে এল। যে সৈন্যটা পড়ে গিয়েছিল সে ততক্ষণে মরে গেছে।

কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল সবাই। বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে সৈন্যদের কাজ শুরু করতে বলল। আবার কুড়ুলের ঘা চলল। সাদা পাথর সব ক'টা তুলে ফেলল ওরা। নিচে অন্ধকার। সৈন্যটার মৃতদেহ তুলে মেঝেয় রাখা হলো।

ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো, শীগগির মশাল জ্বেলে আনো। মন্দিরেরই পাথরের খাঁজে চারটে মশাল ছিল। শাঙ্কো চকমকি ঠুকে জ্বালল সব কটা। নিজে একটা নিল। বাকি তিনটে ফ্রান্সিস হ্যারি ও বারিনথাসকে দিল।

ফ্রান্সিস গর্তের মুখে এসে মশাল ধরল। দেখল পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে। ফ্রান্সিস চিৎকার করে উঠল—হ্যাবি সুড়ঙ্গ। আমরা সাফল্যের মুখে।

সবাই এগিয়ে এল।—অবাক হয়ে দেখল সুড়ঙ্গের মুখে সিঁড়ি।

প্রথমে ফ্রান্সিস তারপর একে একে সবাই নামতে লাগল। বিস্মিত রাজার মুখে কোনো কথা নেই।

কিছুটা নামতেই দেখল সুড়ঙ্গটা টানা চলে গেছে। ফ্রান্সিস দিক্‌নির্ণয় করে বুঝল সুড়ঙ্গটা বিষাক্ত উপত্যকার নিচে দিয়েই চলে গেছে।

সুড়ঙ্গের গায়ে এবড়ো খেবড়ো পাথরের গাঁথুনি। বোঝাই যাচ্ছে মানুষের হাতে তৈরি। সুড়ঙ্গে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ধুলো। ঐ ধুলোর মধ্যে দিয়েই ওরা চলল। মশালের আলোয় চারিদিকে তাকাতে তাকাতে ওরা সুড়ঙ্গপথে চলল। দশ বারো পা এগোতেই দেখল বাঁদিকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির মাথায় গোলমত মুখ। পাথর-কুচির ঢাকনা দেওয়া। তাতে গুঁড়ো পাথরের প্রলেপ।

হ্যারি বলল—ঐ উঁচু মুখটাতেই কি পাথর আর ফণীমনসার গাছ?

—না। ফ্রান্সিস বলল—মনে রেখো, কোয়েতজাল দেবতার বাঁ হাতটা এখনো পাইনি।

ওরা কথা বলছে তার মধ্যেই বারিনথাস একটা কুড়ুল হাতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের সেই গোল মুখমতো জায়গাটা লক্ষ্য করে উঠতে লাগল। হ্যারি চিৎকার করে ডাকল—বারিনথাস, এখনো আমরা হদিস পাইনি। নেমে এসো।

ফ্রান্সিস বলল—কোনো লাভ নেই ওকে ডেকে। ও এখন গুপ্তধনের লোভে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। ওকে বাধা দিতে গেলে ও তোমাকেই মেরে ফেলবে।

ততক্ষণে বারিনথাস ঐ মুখটার কাছে পৌঁছে গেছে। পাগলের মতো এলো। পাথাড়ি কুড়ুলের ঘা মারতে শুরু করল। একটু পরেই কুচি পাথর পড়তে শুরু করল। তারপরই গাঢ় সবুজ রঙের বিষাক্ত জলের ধারা। জলের ধারা প্রথমেই পড়ল বারিনথাসের মুখে, শরীরে, বারিনথাসের শরীর থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল। সতীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার করে বারিনথাস সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে ধুলোর মধ্যে পড়ে গেল। দু'একবার ঝাঁকুনি খেয়ে বারিনথাসের দেহ স্থির হয়ে গেল। তখনও বিষাক্ত

জলের ধারা নামছে। তবে পরিমাণে বেশী নয়।

এদিকে বারিনথাসের এই ভয়াবহ মৃত্যু দেখে রাজা ও সৈন্যরা ভয় পেয়ে গেল। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ রাজা ছুটলেন সুড়ঙ্গ থেকে বেরোবার সিঁড়ির দিকে। তার পেছনে সৈন্যরাও হাতের কুড়ুল ফেলে দিয়ে ছুটল। শাঙ্কো ধনুকে তীর পরাল। ওদের দিকে নিশানা করল। ফ্রান্সিস ডান হাত তুলল—শাঙ্কো, তীর ছুঁড়ো না। ওদের যেতে দাও।

রাজা ও সৈন্যরা পালিয়ে গেল। শাঙ্কো ধনুক নামাল।

হ্যারি বলল—ঐ বিষাক্ত জলে সুড়ঙ্গ ভেসে যাবে না তো?

অনেক দিন লাগবে। দেখছো না এক হাঁটু ধুলো, সব জল শুষে নেবে। ফ্রান্সিস বলল—তবু আমাদের তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।

—এখন কী করবে?

—দেবমূর্তির আর একটা হাত খুঁজতে হবে। চলো সুড়ঙ্গর শেষ পর্যন্ত দেখি।

আবার চলল তিনজনে। ধুলোর মধ্যে তিনজনেরই হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। তবে অসুস্থ ফ্রান্সিসের কষ্ট হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। তবু ও তা বুঝতে দিল না। বাঁ পাটা টেনে টেনে দাঁতে দাঁতে চেপে ও হাঁটতে লাগল।

একটু এগিয়ে আবার পাথরের সিঁড়ি। ওপরে সেই গোলমতো জায়গাটা পর্যন্ত উঠে গেছে। ওরা দাঁড়াল না। হাঁটতে হাঁটতে সুড়ঙ্গের শেষ পর্যন্ত গেল। আবার পাথুরে সিঁড়ি উঠে গেছে। ওপরটায় সেই গোলমতো জায়গা।

সুড়ঙ্গ শেষ। ফ্রান্সিস বলল—দেখা যাচ্ছে তিনটি সিঁড়ি আছে। তিনটি সিঁড়ির মাথায় গোলমতো জায়গা। একটা তো দেখা গেল। বিষাক্ত উপত্যকার জল বেরিয়ে এল। বাকী রইলো দু'টি। কুড়ুলের ঘা দিয়ে পরীক্ষা করবার উপায় নেই। আস্তরণ ভেঙ্গে বিষাক্ত জল নেমে আসতে পারে। কাজেই আগে দেখতে হবে কোন গোল জায়গাটায় ঘা মারবো। একটু থেমে বলল—হ্যারি, ছড়ার পরের অংশটা বলো তো।

হ্যারি বলতে লাগল—

এক হাত ধূলিময়
মুখ নয় কথা কয়
আঙুল তুলে হে—
কোন ভুলে হে—
পাথরেতে মনসা গাছ
কিম্ভুত কিম্ভুত।

ফ্রান্সিস বলল—চলো ফেরা যাক। মশালগুলো ভালো করে ধরো। তোমরা চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলো। আমিও দেখছি।

ওরা ফিরে আসতে লাগল। তখনই হঠাৎ ফ্রান্সিসের মাথাটা ঘুরে উঠল। চোখের সামনে দুলতে লাগল সুড়ঙ্গের পাথুরে দেওয়াল, ধুলোর ঢিবি, সিঁড়ি, সিঁড়ির মাথায় গোলমত জায়গাগুলো। ধুলোর ওপর গড়িয়ে পড়ে যেতে যেতে ফ্রান্সিস কোনরকমে পাশের পাথুরে দেওয়ালে হাত রেখে নিজেকে সামলাল। ধুলোর ওপর দিয়ে ছুটে

এসে শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে ধরে ফেলল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—আর নয়। এখন পালাই চলো। তোমার শরীরের যা অবস্থা তাতে তোমার চিকিৎসা এখুনি প্রয়োজন। নইলে তোমাকে বাঁচানো যাবে না।

—কিন্তু এতটা এগিয়ে মানে আর একটামাত্র সূত্র। তাহলেই সব রহস্যের সমাধান।' ফ্রান্সিস ক্লান্তস্বরে বলল।

—'না ফ্রান্সিস—এখন আমরা পালিয়ে গেরুয়া পাহাড়ে চলে যাবো।' শাঙ্কো বলল।

—না-না—চোলুলা যাবো। চিকিৎসা হবে, বিশ্রাম নেব—সুস্থ হয়ে আবার আসবো শেষ সূত্রটা সমাধানের জন্যে।' ফ্রান্সিস খুব দুর্বলকণ্ঠে বলল।

—বেশ-এখন ভাবছি সুড়ঙ্গের বাইরে বেরুলে রাজা কালহুয়ানের সৈন্যরা যদি আক্রমণ করে? হ্যারি বলল।

—যে ক'জন সৈন্য এখানে নেমেছিল তারা বারিনথাসের ভয়াবহ মৃত্যু দেখেছে। এতক্ষণে অন্য সৈন্যরা সে খবর পেয়েছে। আমার তো মনে হয় ভয়ে ওরা কেউ ধারে কাছে নেই। তবু শাঙ্কো তীর ধনুক নিয়ে তুমি সামনে থাকো।' কথাগুলো বলে ফ্রান্সিস হাঁপাতে লাগল। যন্ত্রণায় ওর মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। ভালো করে তাকাতে পারছে না পর্যন্ত।

ওরা আস্তে আস্তে মন্দিরের চত্বরে ওঠার সিঁড়ির কাছে গেল। প্রথমে উঠতে লাগল শাঙ্কো তীর ধনুক বাগিয়ে। তারপরে ডানহাতে খোলা তরোয়াল আর বাঁ হাতে ফ্রান্সিসকে ধরে ধরে হ্যারি উঠতে লাগল।

মন্দিরের চত্বরে উঠে ওরা দেখল কোথাও কোন সৈন্যের চিহ্নমাত্র নেই। আস্তে আস্তে কোয়েতজালের মূর্তির কাছে এল ওরা। দেখল একা রাজা কালহুয়াকান দেবমূর্তির বেদীর কাছে মাথা নীচু করে বসে আছে। দুহাত ওপরে তোলা। রাজা ওদের দিকে ফিরেও তাকাল না। মুখে বিড় বিড় করে কী বলছে।

ওরা আস্তে আস্তে মন্দিরের বাইরের দিকে চলল। শাঙ্কো চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিল। ফ্রান্সিস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলল। নিজেকে ওর এত ক্লান্ত এত দুর্বল মনে হচ্ছিল যে পারলে ওখানেই শুয়ে পড়ে।

মন্দিরের বাইরে এল ওরা। মন্দিরের সিঁড়ি সামনের প্রাঙ্গণ কোথাও কোন সৈন্য বা পাহারাদার কেউ নেই। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—'শাঙ্কো এই সুযোগ। শিগগির তিনটে ঘোড়া জোগাড় কর।

শাঙ্কো ধনুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে, তীরগুলো কাঁধের খাপে রেখে ছুটে গেল। লোকেরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে তখনই দেখল আগুনেপোড়া গারদঘরের ওপাশে তিন চারটে ঘোড়া একটা খুঁটিতে বাঁধা। ঘোড়াগুলোর পিঠে খড়ভরা মোটা কাপড়ের জিন। শাঙ্কো ছুটে গেল। দড়িগুলো খুঁটি থেকে দ্রুতহাতে খুলে নিল। তারপর তিনটে ঘোড়াকে টানতে টানতে মন্দিরের সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল। প্রথমে হ্যারি আর শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে একটা ঘোড়ায় তুলে দিল। তারপর কোমরে তরোয়াল গুঁজে হ্যারি আর একটা ঘোড়ার পিঠে উঠল। শাঙ্কোও দ্রুত অন্য ঘোড়ার পিঠে উঠল। এখানে ওখানে তলতেক স্ত্রীপুরুষরা জটলা করছিল। ওরা শুধু তাকিয়ে

তাকিয়ে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। কেউ কোন কথা বলল না। ওরা বোধহয় ব্যারিনথাসের অপমৃত্যুর কথা আলোচনা করছিল।

দ্রুত ঘোড়া ছোটাল তিনজনে। প্রাচীরের বাইরে এল। দেখল তলতেক সৈন্যরা বসে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, গল্পগুজব করছে। ওরা ফ্রান্সিসদের ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে দেখল। ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। কারণ তখনও ওরা রাজার আদেশ পায়নি।

বাঁদিকে বিষাক্ত উপত্যকাকে রেখে ওরা উত্তর দিকে পুয়েবেলা নদীর সেতুর উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছোটাল। একটা বিস্তৃত প্রান্তরে এসে পড়ল। ফ্রান্সিস কষ্ট করে পেছনে তাকাল। না তলতেক সৈন্যরা পিছু ধাওয়া করেনি। ফ্রান্সিস এতক্ষণ শরীরের জ্বর যন্ত্রণা দাঁত চেপে সহ্য করছিল। আর পারল না। মাথাটা ব্যথায় ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন। হঠাৎ চোখের সামনে সাদা রঙের ফুলকি মত দেখল। অবসাদে শরীর ছেড়ে দিল। ছিটকে পড়ল ঘোড়া থেকে।

হ্যারি আর শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থামাল। নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। দু'জনে ধরাধরি ক'রে তুলল ফ্রান্সিসকে। ফ্রান্সিসের ঘোড়াটা ওরা ছেড়ে দিল। শাঙ্কো নিজে ঘোড়ায় উঠল। নীচে থেকে হ্যারি ফ্রান্সিসের প্রায় অচেতন শরীরটা শাঙ্কোর সামনের দিকে ঠেলে ধরল। শাঙ্কো দু'হাতে ফ্রান্সিসকে ওর সামনে তুলে নিল। হ্যারি ওর ঘোড়ায় উঠল। ঘোড়া ছোটাল আবার। শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে বাঁ হাতে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রাখল। ডান হাতে লাগাম ধরল। ঘোড়া ছোটাল।

ফ্রান্সিসের যেন মনে হ'ল শরীরটা খুব হাল্কা হ'য়ে গেছে। কোনো জ্বালা যন্ত্রণা নেই আর। ও যেন স্বপ্ন দেখতে লাগল—ওদের বাড়ির গেটে এ সেই নীল ফুলের গাছটা। গেটে এ দাঁড়িয়ে আছে ওর বাবা আর মারিয়া। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মা যেন বাগান থেকে ছুটে আসছে। চারদিকে উজ্জ্বল রোদ। দুরন্ত হাওয়া বইছে। ও যেন ঘোড়ায় চড়ে ওদের দিকে চলেছে। ওর শরীরটা দুলছে। বাবা-মারিয়া ও দূরে মা—হাসছে। ফ্রান্সিস এগিয়ে চলেছে। আস্তে আস্তে।

সামনেই পুয়েবেলা নদীর সেতু। শাঙ্কো আর হ্যারি ঘোড়া থামাল। শাঙ্কো ঘোড়া থেকে নামল। তারপর ফ্রান্সিসকে ঘোড়ার ওপর শুইয়ে দিল। ফ্রান্সিসকে ধ'রে ধ'রে ঘোড়াটাকে আস্তে আস্তে চালিয়ে নিয়ে সেতুটা পার হ'ল। হ্যারিও ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে সেতু পার করাল।

তারপর আবার ঘোড়ায় চড়ল দু'জনে। যখন ওরা সেই শুকনো পাতাঝরা বনে ঢুকল তখন বিকেল হয়ে এসেছে। কিছুদিন আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। তবু বনের গাছ-গাছালি ঝোপঝাড় সব শুকিয়ে আগের মত হয়ে গেছে। বনের গাছ-গাছালি লতাপাতার মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালানো যায় না। দু'জনে ঘোড়া থেকে নামল। বনের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে এল। বন শেষ হল। ঘোড়া চালিয়ে ওরা চোলুলায় ঢুকল। ওদের পাথরের ঘরটার সামনে এসে থামল। হ্যারি দেখল চোলুলার অনেক স্ত্রী-পুরুষ ছুটে আসছে। হ্যারি আর শাঙ্কো দুজনেই তখন ভীষণ পরিশ্রান্ত। ওরা দুজনে ঘোড়া থেকে নামল। ধরাধরি করে ফ্রান্সিসের অচেতন দেহটা ওরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামাল। নিয়ে চলল ঘরের মধ্যে। ঘরে

ঢুকে ঘাসের বিছানায় ফ্রান্সিসকে শুইয়ে দিল। ফ্রান্সিসের কপালে হাত দিল হ্যারি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত হ্যারি আর শাঙ্কো ফ্রান্সিসের পাশে শুয়ে পড়ল। হ্যারি চোখ বুজল। শুনতে পাচ্ছে দরজার কাছে দাঁড়ানো স্ত্রী-পুরুষরা ওদের ভাষায় কী বলাবলি করছে। একজন ননোয়াক্কা যোদ্ধাই বোধহয় চীৎকার ক'রে হ্যারিদের কী জিজ্ঞেস করল। হ্যারির কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। ও বুঝতেও পারল না কী জিজ্ঞেস করছে। ক্লান্ত স্বরে হ্যারি বলল—রাজবৈদ্যকে ডাকো। কিন্তু ওর কথা কেউ ভালো শুনতেও পেল না আর শুনলেও বুঝতো না।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে হ্যারি জানে না। হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়ানো লোকজনদের চ্যাঁচামেচি বন্ধ হয়ে গেল। সবাই স'রে দাঁড়াল। রাজা হুয়েমাক ঘরে ঢুকলেন। কাছে এসে বিছানায় বসলেন। আস্তে আস্তে বললেন—'বন্ধুরা—শরীর ভালো নেই?' হ্যারি রাজার গলা শুনে কষ্ট ক'রে উঠে বসল। মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল। ক্লান্তস্বরে বলল—'ফ্রান্সিস ভীষণ অসুস্থ। রাজবৈদ্যকে ডাকুন।' রাজা দরজার দিকে তাকিয়ে কী ব'লে উঠলেন। একজন ননোয়াক্কা যোদ্ধা ছুটে চলে গেল। তাঁর মুখ গম্ভীর হ'ল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন—'তোমরা?'

—আমরা ভালো। শুধু ভীষণ ক্লান্ত আমরা।' হ্যারি বলল। রাজা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—'বিশ্রাম—খাবার—।' তারপর বললেন—'চারজন ননোয়াক্কা যোদ্ধা —বন্দী ছিল।'

—ওরা পালিয়েছে—চ'লে আসবে।' হ্যারি বলল।

রাজা হাসলেন। বললেন—'আমার সন্তান।'

তারপর রাজা হুয়েমাক চ'লে গেলেন।

একটু পরেই রাজবৈদ্য এল। ফ্রান্সিসের কপালে গলায় হাত দিয়ে পরীক্ষা করলে। তার আগের মতই শুক্‌নো ফল গুঁড়িয়ে ওষুধ তৈরী করল। ওষুধের লেই লাগিয়ে দিল ফ্রান্সিসের পায়ের কাটা জায়গায়। ফ্রান্সিস একটু কুঁকিয়ে উঠল। তারপর রাজবৈদ্য ফ্রান্সিসকে হ্যারির শাঙ্কোর ছড়ে যাওয়া কনুই হাঁটু জলে ন্যাকড়ায় ভিজিয়ে আঠামত ওষুধ লাগিয়ে দিল। তারপর হ্যারিকে চারটে ছোট কালো বড়ি দিল। ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে খাইয়ে দিতে বলল। রাজবৈদ্য চ'লে গেল।

দু'জন পাহারাদার ওদের খাবার দিয়ে এল। ঘরে মশাল জ্বালিয়ে দিল। রাত হ'ল। হ্যারি ইঙ্গিতে ওদের খাবার রেখে খেতে বলল। ওরা খাবার-জল রেখে চ'লে গেল।

রাত বাড়তে লাগল। হ্যারির ক্লান্তি অনেকটা দূর হ'য়েছে। কনুই হাঁটুর জ্বালাও অনেকটা কমেছে। শাঙ্কোও উঠে বসল। ওরও শরীর ভালো লাগছে এখন। হ্যারি ফ্রান্সিসের কপালে হাত দিল। জ্বর কমেছে অনেক। তখনই ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর চোখ মেলে তাকাল। হ্যারি ডাকল—'ফ্রান্সিস?'

—'উঁ?' ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে হ্যারির দিকে তাকাল।

—'এখন শরীর কেমন লাগছে।?' হ্যারি বলল।

—ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। বলল 'ভালো। আচ্ছা আমার কী হয়েছিল?'—

—সে সব কথা পরে হবে খন। তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই? হ্যারি বলল।

—ভীষণ। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা খাবার রেখে দিয়েছি। খাবে এসো। হ্যারি বলল।

তিনজনেই খেতে বসল। পাখির মাংসের ঝোল। বীন, টম্যাটোর তরকারি। ভুট্টার রুটি। তিনজনেরই খিদে পেয়েছিল। পেট পুরে খেল। জল খেয়ে শুয়ে পড়ল। তিনজনেই ক্লান্ত। এদিকে ফ্রান্সিসকে সুস্থ দেখে হ্যারি আর শাঙ্কো নিশ্চিন্ত হল। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। ফ্রান্সিস শুধু জেগে রইল। মনে পড়ল—তুলার কোয়েতজাল মন্দির—দেবমূর্তি ভাঙা হল—সুড়ঙ্গ—সিঁড়ি—গোলমত ফোকর। কিন্তু গুপ্তধন খুঁজে বার করা যায়নি। এসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

দিন চারেক কাটল। রাজবৈদ্যের চিকিৎসায় ফ্রান্সিস এখন অনেকটা সুস্থ। তবে শরীরের দুর্বলতা এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। হ্যারি ও শাঙ্কো এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। শুধু ঘরে বসে থাকতে শাঙ্কোর ভালো লাগে না। ও শিকার করতে যেতে চায়। কিন্তু ফ্রান্সিস ওকে যেতে দেয় না। একবার বিপদে পড়েছে। অনেক কষ্টে ওকে মুক্ত ক'রে ফিরিয়ে এনেছে। আবার কিছু হ'লে? ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলেছে—আরো তীর তৈরী কর। হয়তো পরে কাজে লাগবে। শাঙ্কো দু'বেলা তাই করে। বেশ কিছু তীর তৈরী ক'রেছে এর মধ্যে।

রাজা হুয়েমাক প্রতিদিন ফ্রান্সিসদের ঘরে আসেন। ওদের খোঁজখবর নেন। নানা কথা হয়। সেদিন সকালে ফ্রান্সিসকে বললেন—'চলো—আমার পড়ার ঘর তোমাকে দেখাবো। ফ্রান্সিস বেশ আগ্রহ বোধ করল। সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকতে ভালোও লাগে না।

রাজার সঙ্গে ফ্রান্সিস চলল। লম্বা লম্বা পাথরবাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে ওরা কোয়েতজাল দেবতার মন্দিরে ঢুকল। এখানে প্রতিদিন দেবতার পুজো হয়; ফ্রান্সিস দেখল এখানকার কোয়েতজালের মূর্তিটাও তুলার মন্দিরের মূর্তির মতই। উচ্চতাও প্রায় এক। মূর্তির বেদীতে বুনো ফুল ফুলের মালা ছড়ানো।

রাজা হুয়েমাক মূর্তির সামনে কিছুক্ষণ হাঁটু গেড়ে বসল। দু'হাত ওপরে তোলা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তুলার রাজা কালহুয়াকান—নরবলি—পূজা—আমি মানি না—মনে করি—কোয়েতজাল শুধু জীবনের দেবতা—মৃত্যুর নয়। ফ্রান্সিস রাজা হুয়েমাকের এই মনোভাবের মনে মনে প্রশংসা করল। রাজা বললেন—এখানে কয়েদ ঘর নেই—মানুষ সৎ—বিশ্বাস করি।

মন্দিরের পাশেই একটা বড় ঘর। ফ্রান্সিসকে নিয়ে রাজা সেই ঘরে ঢুকলেন। সাদাসিদে ঘর। কয়েকটা লম্বাটে পাথরের ওপর কিছু চামড়াবাঁধা বই। ফ্রান্সিস বইগুলো খুলে দেখল ভেড়ার সাদা চামড়ার পাতা। হাতে লেখা বই। ভাষা স্পেনীয়। পাথরের ওপর একটা চীনে মাটির দোয়াত কালি। পাশে মোটা ঘাস কেটে তৈরী কলম। পাশে কয়েকটা ভেড়ার সাদা চামড়া। বোঝা গেল এই কালি কলম চামড়ায় লেখা হয়। রাজা বললেন—এই ঘরে পড়ি—লিখি।

—'বইগুলো কোথায় পেলেন?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—বারিনথাস—প্রথমে ভালো—পরে মন্দ। স্পেনীয় ভাষা—শিখেছি। রাজা বললেন।

—'এখন আপনি কী পড়েন—কী লেখেন?' ফ্রান্সিস বলল।

—স্পেনীয় ভাষার অক্ষরে—নাহুয়াত্‌ল ভাষা—তৈরী—চেষ্টা।

ফ্রান্সিস শুনে খুব খুশী হ'ল। বলল—সত্যি আনন্দের কথা। আপনি সত্যি আপনার প্রজাদের কথা ভাবেন।

—প্রজা—সন্তান। বিদেশের জ্ঞান-চাই। রাজা বললেন। তারপর বললেন—

—স্পেনীয় অক্ষর লেখ। রাজা একটা সাদা চামড়া এগিয়ে দিল। ফ্রান্সিস কলম দিয়ে স্পেনীয় বর্ণমালা লিখে দিল। রাজা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। জোরে পড়লেন। ফ্রান্সিস হেসে বলল—

—আপনি স্পেনীয় ভাষা মোটামুটি শিখেছেন।

—আরো ভালো—শেখাবেন? রাজা বললেন।

—ঠিক আছে—আমি যতটুকু জানি শেখাবো। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা খুশীর হাসি হাসলেন। বললেন—কাল সকাল—।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস পরদিন থেকে সকালে রাজার ঘরে আসতে লাগল। ও রাজাকে আরো ভালোভাবে স্পেনীয় ভাষা শেখাতে লাগল। নিজেও নাহুয়াত্‌ল্ ভাষা শিখতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে রাজা হুয়েমাক স্পষ্ট স্পেনীয় ভাষা বলতে শিখলেন। ফ্রান্সিস মোটামুটি নাহুয়াত্‌ল্‌ভাষা শিখল।

সেদিন দুপুরের দিকে। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘরে রয়েছে। ঘরের দরজায় বসে শাঙ্কো লোহার ফলা দিয়ে তীর তৈরী করছে। হঠাৎ দেখল একজন মনোয়াক্সা যোদ্ধা শুকনো বনটা থেকে বেরিয়ে ছুটে রাজবাড়ির দিকে আসছে আর চীৎকার করে কী বলছে। শাঙ্কো বুঝল একটা কিছু হয়েছে। ও ছুটে ফ্রান্সিসের কাছে গেল। বলল ফ্রান্সিস একজন যোদ্ধাকে বনের দিক থেকে দৌড়ে আসতে দেখলাম—বোধহয় কিছু হয়েছে।

—যোদ্ধাটা কোথায় গেল?

—রাজবাড়িতে।

তিনজনেই দরজায় এসে দাঁড়াল। সত্যি একটা কিছু হয়েছে। লোকজন ছুটোছুটি করছে। সকলের মুখেই ভয়।

ঠিক তখনই রাজবাড়ি থেকে একজন মনোয়াক্সা যোদ্ধা ছুটতে ছুটতে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। ফ্রান্সিস এই যোদ্ধাটাকে চেনে। দেখা হলেই এই যোদ্ধাটা হাসে। রাজা হুয়েমাক এই দেহরক্ষী যোদ্ধাটিকে দিয়েই বরাবর ফ্রান্সিসকে ডেকে পাঠায়। আজকে যোদ্ধাটি কিন্তু হাসছে না। বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ফ্রান্সিসকে কিছু বলল। ফ্রান্সিস এখন নাহুয়াত্‌ল্ ভাষা একটু বোঝে। রাজা ডাকছেন—এটুকু বুঝল। ও বলল—আমি আসছি।

ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে এসে রাজপ্রাসাদে ঢুকল। দেখল রাজদরবারে গণ্যমান্যরা বসে আছেন। রাজা হুয়েমাক কাঠের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দুটিচোখে দুশ্চিন্তা। রাজা ফিরে তাকিয়ে ফ্রান্সিসকে দেখলেন। অনেক পরিষ্কার স্পেনীয় ভাষায় বললেন—"ফ্রান্সিস রাজা কালহুয়াকান আমার রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে। ওরা

ভোরবেলা একটা একটা করে ঘোড়া পুয়েবেলা নদীর সেতুর ওপর দিয়ে পার ক'রে এপারে এসেছে। তারপর পদাতিক সৈন্যরা এসেছে। শুকনো বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসা অসুবিধে। তাই বনের পাশ দিয়ে অনেক দূরে ঘোড়া ছুটিয়ে সৈন্যদল আসছে। পেছনে পদাতিক সৈন্যরা। বিকেলের মধ্যেই এসে পড়বে।"

—তাহলে আপনার সৈন্যদের তৈরী হ'তে বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—সে আদেশ আমি দিয়েছি—আমার সন্তানতুল্য প্রজাদের ভাগ্যে যা ঘটবে আমার ভাগ্যেও তাই ঘটুক।

—আপনার উপযুক্ত সিদ্ধান্তই আপনি নিয়েছেন। ফ্রান্সিস বলল—

'ভাবছি যুদ্ধ না ক'রে সন্ধির প্রস্তাব করবো কিনা।' রাজা বললেন।

'তা'তেও আপনি বা আপনার প্রজারা রেহাই পাবে না।'

'কালহুয়াকানের মত নরপশু সন্ধির প্রস্তাব মানবে না। বলি দেবার জন্যে অনেক বন্দী পাবে। এতেই ওর আনন্দ।' ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক বলেছো। মরতে যখন হবেই তখন লড়াই ক'রেই মরবো। রাজা বললেন। তারপর রাজা নাহুয়াত্‌ল্ ভাষায় গণ্যমান্যদের নিজের সিদ্ধান্তের কথা বললেন। গণ্যমান্যরা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর মাথা নীচু করে রাজাকে সম্মান জানিয়ে চলে গেলেন। ফ্রান্সিস বলল—'মহামান্য রাজা—আপনার এই বিপদে আমরা মাত্র তিনজন কী সাহায্য আর আপনাকে করতে পারবো। তাছাড়া—আমি নিজে এখনো সুস্থ নই। আমার বন্ধুরা থাকলে—যাকগে দেখি কী করতে পারি। ফ্রান্সিস মাথা একটু নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানিয়ে চলে এল।

ফ্রান্সিস নিজেদের ঘরে ফিরে এল। হ্যারি আর শাঙ্কোকে সব বলল। হ্যারি বলল—কিন্তু তোমার যা শরীরের অবস্থা—

—না তরোয়াল নিয়ে আমি যুদ্ধ করতে পারবো না। তুমিও খুব সুস্থ নও। এক শাঙ্কো।' ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকাল। বলল—'এবার বুঝলে কেন তোমাকে অনেক তীর তৈরী করতে বলেছিলাম।'

ফ্রান্সিস বিছানার ধার থেকে তরোয়াল তুলে কোমরে গুঁজল। হ্যারিও তরোয়াল নিল। শাঙ্কো ধনুক নিল। কাঁধের খাপে অনেক তীর নিল।

ওরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। ঠিক তখনই একদল ননোয়াক্কা যোদ্ধা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে বেড়িয়ে গেল বনের বাঁদিক লক্ষ্য করে। সামনের প্রান্তরে পদাতিক সৈন্যরা সারি বেঁধে দাঁড়াতে লাগল।

ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কোকে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগল আর নাহুয়াত্‌ল্ ভাষায় ভেঙে ভেঙে বলতে লাগল—খাদ্য নাও—শুকনো বনে—পালিয়ে যাও।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই নারী শিশু বৃদ্ধারা হাতে খাবারের পুটুলি নিয়ে শুকনো বনের দিকে ছুটে পালাতে লাগল। সন্ধের আগেই চোলুলা জনহীন হ'য়ে গেল।

সন্ধের সময়ই—কালহুয়াকানের অশ্বারোহী সৈন্যরা চোলুলায় পৌঁছল। পদাতিক ননোয়াক্কা সৈন্যরা যুদ্ধ করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে কালহুয়াকানের পদাতিক সৈন্যরাও এসে পৌঁছল। যুদ্ধ চলল।

একটা পাথরের বাড়ির আড়াল থেকে এতক্ষণ শাঙ্কো নিখুঁত নিশানায় তীর ছুঁড়ে বেশ কিছু কালহুয়াকানের ঘোড়সওয়ার সৈন্য মেরেছে। কিন্তু অন্ধকার নেমে এল তখনই। অন্ধকারে শাঙ্কো নিশানা ঠিক করতে পারল না। ও তীর ছোঁড়া বন্ধ করল। অনর্থক তীর নষ্ট করল না।

ননোয়াক্রা যোদ্ধারা বীরের মত কালহুয়াকানের অশ্বারোহী সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করল। কিন্তু কালহুয়াকানের পদাতিক সৈন্যরা আসতে ননোয়াক্রা যোদ্ধাদের প্রতিরোধ ভেঙে গেল। তারা হেরে যেতে লাগল। আহত আর মুমূর্ষুদের আর্তনাদে প্রান্তর ভরে উঠল। পরাজিত ননোয়াক্রা সৈন্যদের দড়ি দিয়ে হাত বেঁধে বন্দী করা হ'ল। প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ল।

ওদিকে রাজা কালহুয়াকানের সৈন্যরা রাজপ্রাসাদে ঢুকল। রাজসভার গণ্য মান্যদের বন্দী করা হ'ল। রাজা হুয়েমাকের দেহরক্ষীরা যখন লড়াই করছে তখন রাজা ছুটে এলেন। বললেন—'তোমরা পালাও। আমি একা লড়াই করবো।' করলেনও তাই। তাঁর বাঁ কাঁধে বর্শা বিঁধল। আহত হ'য়ে তিনি প্রাসাদের সিঁড়ির ওপর পড়ে গেলেন। আহত রাজা হুয়েমাক বন্দী হলেন।

যুদ্ধে রাজা কালহুয়াকানের সৈন্যরা জিতল। ওরা মুখে হাতের থাবড়া দিয়ে শব্দ করতে লাগল। চীৎকার করতে লাগল। তারপর জনশূন্য বাড়িগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লুঠপাট চলল অবাধে।

যুদ্ধজয়ী রাজা কালহুয়াকান একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে ব'সে এসব দেখছিলেন। এবার ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। কালহুয়াকানের পরনে রাজবেশ। দু'কানে অলঙ্কার। গলায় দামী পাথরের মালা। তিনি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সোজা গিয়ে রাজা হুয়েমাকের সিংহাসনে বসলেন। সঙ্গে ছিল গণ্যমান্যরা। তারা মাথা নীচু ক'রে সম্মান জানিয়ে রাজা কালহুয়াকানের সামনে দাঁড়াল। রাজা কালহুয়াকান রাজসভাগৃহের চারদিকে তাকাতে তাকাতে হা হা ক'রে হেসে উঠলেন। তাঁর অনেকদিনের বাসনা পূর্ণ হ'ল। রাজা হুয়েমাককে চোলুলা থেকে তাড়িয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। রাজা হুয়েমাকের এই রাজধানী চোলুলা দখল করার কল্পনাও তাঁর অনেকদিনের।

বিজয়ী কালহুয়াকানের সৈন্যদের বিজয়োল্লাস আস্তে আস্তে স্তিমিত হ'য়ে রাত বাড়তে লাগল।

ফ্রান্সিসরা নিজেদের ঘরে ফিরে এল। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে শুয়েছে সবে তখনই শুনল দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কার শব্দ। নিশ্চয়ই কালহুয়াকানের সৈন্যরা। এই ঘরের দরজা বন্ধ দেখে ধ'রে নিল ভেতরে মূল্যবান কিছু আছে। দরজায় ধাক্কা দেওয়া চলল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দ্রুত বিছানা থেকে উঠল। তরোয়াল হাতে নিল। ফ্রান্সিস জ্বলন্ত মশালটা মেঝেয় চেপে নিভিয়ে ফেলল। ঘর অন্ধকার হ'য়ে গেল। শাঙ্কোও উঠে দরজার হুড়কোটা খুলে দিয়েই দ্রুত পিছিয়ে এল। চার-পাঁচজন রাজা কালহুয়াকানের সৈন্য এক ধাক্কায় দরজা খুলে ঢুকল। প্রথম সৈন্যটার বুকে লাগল শাঙ্কোর তীর। সে উবু হ'য়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল। পরেরটির ঘাড় লক্ষ্য

ক'রে হ্যারি তরোয়াল চালাল। সৈন্যটির বর্শা হাতেই রয়ে গেল। ঘাড়ে গভীর ক্ষত নিয়ে সে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল। পরের সৈন্যটি অন্ধকারেই বর্শা ছুঁড়ল। বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। ফ্রান্সিস এক লাফে এগিয়ে এসে সৈন্যটার বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল। সৈন্যটা দু'হাত শূন্যে তুলে চিৎ হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। পরেরটাকে ঘায়েল করল শাঙ্কোর ছোঁড়া তীর। আহত সৈন্যটা দোর গোড়াতেই পড়ে গেল। পরের সৈন্যটি আর ভয়ের চোটে ঘরেই ঢুকল না। এক লাফে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।



ফ্রান্সিসরা ধরাধরি ক'রে মৃত সৈন্যদের দরজার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঘরে ফিরে হ্যারি আর শাঙ্কো বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে থেকেই বলল—ঘরের দরজা বন্ধ ক'রো না। তাহ'লেই কালহুয়াকানের সৈন্যরা ভাববে এ ঘর লুঠ হ'য়ে গেছে। আর ঢুকবে না।' শাঙ্কো তীর ধনুক পাশে রেখে শুয়ে পড়ল। হ্যারি তরোয়াল হাতে বিছানায় ব'সে রইল। ফ্রান্সিস বলল—'তোমরা সজাগ থেকো—আমি একটু ঘুরে আসছি।

—এত রাতে কোথায় যাবে?' হ্যারি জানতে চাইল।

—রাতেই সুবিধে। এক্ষুনি আসছি।' ফ্রান্সিস কথাটা বলে দরজার বাইরে এল। সাবধানে চারিদিকে অন্ধকারে নজর রেখে চলল প্রাসাদের সিঁড়ির দিকে। দেখল এখানে ওখানে আগুন জ্বেলে কালহুয়াকানের সৈন্যরা হৈ হৈ করে খাওয়া দাওয়া করছে। সেই আলোয় দেখল কোয়েতজাল মন্দিরের সিঁড়িতে আহত নানোয়াক্কা সৈন্যরা শুয়ে বসে আছে। প্রান্তরে হাতবাঁধা বন্দীরা সারি বেঁধে বসে আছে। ওরই মধ্যে সেই রাজবৈদ্যকে দেখল ফ্রান্সিস। রাজবৈদ্য সঙ্গে দুজন বৃদ্ধকে নিয়ে আহত সৈন্যদের চিকিৎসা করছে। সঙ্গী বৃদ্ধের হাতে ওষুধের দুটো থলি। রাজবৈদ্য নিচু হয়ে একজন নানোয়াক্কা সৈন্যর ক্ষতে ওষুধ লাগাচ্ছে তখনই একজন কালহুয়াকানের সৈন্য রাজবৈদ্যের দিকে বর্শা উঁচিয়ে ছুটে এল। বর্শা ছোঁড়ার আগেই ফ্রান্সিস সৈন্যটার বুকে বর্শা বিঁধিয়ে দিল। সৈন্যটা বর্শা ফেলে মাটিতে উবু হয়ে পড়ে গেল। রাজবৈদ্য উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস রাজবৈদ্যকে চাপাস্বরে ভাঙা ভাঙা নাহুয়াত্‌ল্ ভাষায় বলল—রাজা হুয়েমাক—খুঁজছি—কোথায়? রাজবৈদ্য মাথা নাড়ল। ও জানে না।

ফ্রান্সিস আবার অন্ধকারে সাবধানে চলল। সামনেই কোয়েতজালের মন্দির। ফ্রান্সিস ভেবে দেখল এই ডামাডোলের মধ্যে রাজা হুয়েমাককে পাওয়া যাবে না।

তাছাড়া তিনি এতক্ষণে বন্দী। কালহুয় কানের সৈন্যরা নিশ্চয়ই তাঁকে পাহারা দিচ্ছে। অথচ রাজাকে একটা নির্দেশ দিতেই হবে। কী ক'রে এই নির্দেশটা রাজা হুয়েমাকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়? আচ্ছা চিঠি পাঠালে কেমন হয়? ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে কোয়েতজালের মন্দিরে ঢুকে পড়ল। একপাশে রাজার পাঠকক্ষ। এখানে শত্রুসৈন্যরা নেই। মন্দিরে আর পাহারা দেবার কী আছে। ফ্রান্সিস অন্ধকারে পা টিপে টিপে পাঠকক্ষে ঢুকল। দেখল মশাল জ্বলছে। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে একটা ভেড়ার সাদা চামড়া টেনে নিল। দোয়াতের কালিতে কলম ঢুকিয়ে লিখল—

মহানুভব রাজা হুয়েমাক—

একটা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছি। আপনি রাজা কালহুয়াকানকে বলবেন সব বন্দীদের সঙ্গে নিয়ে আপনি হেঁটে শুকনো বন পেরিয়ে প্রথমে পুয়েবেলা নদীর সেতুর কাছে যাবেন। আপনাদের পেছনে—আসবেন রাজা কালহুয়াকান ও তাঁর সৈন্যরা। আপনি রাজা কালহুয়াকানকে প্রতিশ্রুতি দেবেন যে আপনি নিজে বা কোন বন্দী পালাবে না। শুকনো বনে আত্মগোপনকারী সবাইকে ডেকে নিয়ে যাবেন। বনে কেউ যেন না থাকে।

ইতি ফ্রান্সিস।

চিঠিটা লিখে ফ্রান্সিস পাঠকক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। এখন চিন্তা এই চিঠি হুয়েমাকের কাছে কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়। রাজা হুয়েমাককে কোথায় রাখা হ'য়েছে কে জানে। রাজা হুয়েমাকের এখানে কোন কয়েদ ঘরও নেই। অগত্যা কাল সকালে চেষ্টা করতে হবে।

ফ্রান্সিস সতর্কভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজেদের ঘরে নিয়ে এল। হ্যারি শাঙ্কো দু'জনেই জেগে ছিল। ফ্রান্সিস ঢুকতেই হ্যারি বলল—তোমার কোন বিপদ হয়নি তো?

না। শত্রুসৈন্যরা আর এখানে এসেছিল? ফ্রান্সিস বলল।

—না। রাত বেশী নেই। শুয়ে পড়।' হ্যারি বলল।

ওরা বিছানায় শুল বটে। কিন্তু ভালো ঘুম হ'ল না কারোরই। রাতে খাওয়া হয়নি। ভোরেই উঠে পড়ল ওরা। খিদেও পেয়েছে। আবার সকালের আলোয় দেখল রাজবৈদ্যর একজন সঙ্গী যাচ্ছে। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—শুনুন। বৃদ্ধটি থামল। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ফ্রান্সিসকে দেখতে পেল। এগিয়ে এসে দোর গোড়ায় দাঁড়াল। ফ্রান্সিস হাতের ভঙ্গী করে বলল—'খাবার।' বৃদ্ধটি হাসল। তারপর চলে গেল।

—ও কি খাবার আনতে পারবে? শাঙ্কো বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল। ওরা অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই বৃদ্ধটি ফিরে এল। হাতে একটা পুঁটুলি। ঘরে ঢুকে পুঁটুলি খুলে খাবার বের করল। সেই ভুট্টার রুটি। বুনো ফলের তরকারি। খিদের জ্বালায় তিনজনেই উবু হ'য়ে বসে খেতে লাগল। বৃদ্ধটি হাসতে লাগল। তিনজন ক্ষুধার্তকে খাইয়ে বৃদ্ধটি খুশীই হয়েছে বোঝা গেল। খাওয়ার পর চীনেমাটির পাত্রগুলো নিয়ে যাচ্ছে তখন ফ্রান্সিস ভাঙা ভাঙা নাহুয়াতল ভাষায় ধন্যবাদ জানিয়ে বলল—রাজা হুয়েমাক কোথায়?

বৃদ্ধটি দরজার কাছ থেকে আঙুল তুলে দেখাল। ফ্রান্সিসরা দেখল—রাজপ্রাসাদের সিঁড়ির ওপর রাজা হুয়েমাক হাতবাঁধা অবস্থায় বসে আছেন। রাজবৈদ্য রাজার কাঁধের ক্ষতে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছে। বৃদ্ধটি একনাগারে কী ব'লে গেল। ফ্রান্সিস মোটামুটি বুঝল। বলল—'জানো, কালরাতে রাজা হুয়েমাককে রাজবৈদ্য চিকিৎসা করতে চেয়েছিল। রাজা রাজি হননি। বলেছেন—আমার প্রজাদের আগে চিকিৎসা কর। তারপর আমাকে। তাই এখন সকালে চিকিৎসা হচ্ছে।' হ্যারি বলল 'সত্যি—এরকম মানুষ কম দেখা যায়।' বৃদ্ধটি চলে গেল। ফ্রান্সিস ভাবল, এই সুযোগ। রাজাকে চিঠিটা দিয়ে আসি। কিন্তু দেখল—দু'জন শত্রুসৈন্য রাজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে বর্শাহাতে পাহারা দিচ্ছে। অন্য উপায় ভাবতে হবে। তখনই দেখল শাঙ্কো ওর তীরগুলো খাপে গুছিয়ে রাখছে। ফ্রান্সিস ডাকল—'শাঙ্কো শিগগির তীর ধনুক নিয়ে এসো।' বিপদ আঁচ ক'রে শাঙ্কো তীর ধনুক বাগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল 'ভয় নেই।' তারপর শাঙ্কোর হাত থেকে তীরটা নিল। চিঠিটা কোমরবন্ধনী থেকে বের করল। চিঠিটা একটা তীরের ফলায় জড়ালো। তারপর রাজা হুয়েমাক যে ওদের যে নতুন পোশাক পরতে দিয়েছিল তারই ঝুল থেকে সুতো ছিঁড়ে নিল। তীরের ফলার সঙ্গে চিঠিটা বেঁধে দিল। তারপর তীরটা শাঙ্কোর হাতে দিয়ে বলল—'ঐ দেখ রাজা হুয়েমাক সিঁড়িতে বসে আছে। ঠিক তীর ছুঁড়ে রাজার সামনে চিঠিটা ফ্যালো। পারবে তো?' শাঙ্কো মাথা ঝাঁকাল। তারপর নিশানা ঠিক ক'রে শাঙ্কো তীরটা ছুঁড়ল। ঠিক রাজা হুয়েমাকের পায়ের কাছে তীরটা পড়ল। রাজা দু'একবার এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর বাঁধা হাতদু'টো বাড়িয়ে তীরটা তুলে নিলেন। সুতোর বাঁধন খুলে চিঠি বার করলেন। খুব মন দিয়ে বারকয়েক পড়লেন। এতক্ষণ ফ্রান্সিস রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাকিয়ে ছিল। এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—যাক রাজাকে নির্দেশটা দিতে পেরেছি।' রাজার পাহারাদার একজন দেখল রাজা চিঠি পড়ছে। পাহারাদারটা মুখ নামিয়ে দেখল চিঠিটা। স্পেনীয় ভাষায় লেখা। ও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না। তবু চিঠিটা ছিনিয়ে নিল। রাজার এতক্ষণে বারকয়েক পড়া হ'য়ে গেছে। চিঠিটা নিয়ে পাহারাদার সৈন্যটি রাজপ্রাসাদে ঢুকল। দেখল রাজা কালহুয়াকান সিংহাসনে হাত পা গুটিয়ে শুয়ে আছেন। সৈন্যটি মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে চিঠিটা রাজার হাতে দিল। তারপর কী বলে গেল। বোধহয় কী করে চিঠিটা পেয়েছে তাই বলল। রাজা কালহুয়াকান সিংহাসনে উঠে বসলেন। চিঠিটা পড়বার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই পড়তে পারলেন না। তখন চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে পড়লেন। সৈন্যটি চ'লে এল।

পাথরের সিঁড়িতে রাজা হুয়েমাক ব'সে আছেন।

একটু পরেই একজন সৈন্যদের দলনেতা ঘোড়ায় চড়ে সিঁড়ির কাছে এল। দু'তিনজন সৈন্য এগিয়ে গেল। দলনেতা তাদের কী বলল। তারা খুব হাসাহাসি করল। একজন ছুটে গিয়ে একটা লম্বা দড়ি নিয়ে এল। ফ্রান্সিস ঘরের দরজার আড়াল থেকে সবই লক্ষ্য করছিল। সৈন্যটা দড়ির একটা প্রান্ত আহত রাজা হুয়েমাকের হাতে বাঁধল। ফ্রান্সিস ডাকল—হ্যারি দেখে যাও। ওরা যে খেলা আমাদের সঙ্গে খেলেছিল সেই একই খেলা খেলছে রাজা হুয়েমাকের সঙ্গে। হ্যারি শাঙ্কো দু'জনেই

এগিয়ে এল। দেখতে লাগল দরজার আড়াল থেকে।

রাজা হুয়েমাকের হাতে দড়ি বেঁধে সৈন্যটি দড়ির অপর প্রান্ত ঘোড়সওয়ার দলনেতার হাতে দিলে। দলনেতা দড়িতে এক হ্যাঁচকা টান দিল। রাজা হুয়েমাক কিছু ভাবছিলেন। চম্‌কে উঠে দাঁড়ালেন। দলনেতা ঘোড়া চালাতে লাগল। দড়িবাঁধা রাজাও হাঁটতে লাগলেন ঘোড়ার পেছনে পেছনে। হঠাৎ দলনেতা ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিতেই আহত রাজা মাটিতে পড়ে গেলেন। দলনেতা মাটিতে ধুলোয় হিঁচড়ে নিয়ে চলল রাজাকে। শত্রুসৈন্যরা উল্লাসে চীৎকার করতে লাগল। রাজাকে হিঁচড়ে নিয়ে দলনেতা ঘোড়াটাকে ঐ মাঠের মত জায়গাটায় পাক খাওয়াতে লাগল। রাজার পোশাক ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। সারা গায়ে ধুলো। কাঁধে বর্শার জখম। তবু রাজা নিঃশব্দে এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে বেদনায় দুঃখে ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। ও চোখ বন্ধ ক'রে বলল—'শাঙ্কো—মারো ঐ ঘোড়সওয়ারকে।' শাঙ্কো বলল—'অত দূরে তীর যাবে না।'

—ফ্রান্সিস তারপর খুব নিবিষ্টমনে তাকিয়ে ঘোড়সওয়ারকে দেখল। ঐ তো—সেই দাড়িগোঁফওলা দলপতি। বলল—'হ্যারি—' সেই লোকটা না?

—হ্যাঁ।' হ্যারিও দেখতে দেখতে বলল।'

—শাঙ্কো—পাথরের বাড়ির আড়ালে আড়ালে কাছে চ'লে যাও।

ঐ নরপশুটাকে হত্যা করা চাই।' শাঙ্কো বিছানা থেকে কাপড়টা নিয়ে গা মাথা ঢাকল। তীর ধনুক নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পাথরের বাড়িগুলোর আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল। সব সৈন্যরা তখন ঐ কাণ্ড দেখতে ব্যস্ত। খুব মজা পাচ্ছে। শাঙ্কোর দিকে কারো চোখ পড়ল না। শাঙ্কো মন্দিরের সামনে পাথরের সিঁড়ির একপাশে মাথা নীচু ক'রে বসে পড়ল। তারপর ধনুক বাগিয়ে ধরল। একটার বেশী তীর ছোঁড়া যাবে না। কাজেই নিশানা নিখুঁত হ'তে হবে। একটু সময় নিল শাঙ্কো' তারপর তীর ছুঁড়ল। নির্ভুল নিশানা। তীরটি দলনেতার বুক ভেদ করল। দু'হাত ওপরে তুলে সে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গেল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে মন্দিরের ওপাশে চলে গেল। এক মুহূর্ত। সৈন্যরা তখনও ভাবছে কী হ'ল? তারপরই অনেকে ছুটে গেল দলনেতার দিকে। আর কিছু সৈন্য এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। কে তীর ছুড়ল? কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না ওরা। গা মাথা কাপড়ে ঢাকা শাঙ্কো ততক্ষণে ঘরে চ'লে এল। ওদিকে কয়েকবার এপাশ ওপাশ করে দলনেতা মারা গেল। রাজা হুয়েমাক মাটি থেকে উঠলেন। টলতে টলতে হাঁটতে লাগলেন। ওভাবেই হাঁটতে হাঁটতে কোনরকমে এসে পাথরের সিঁড়িতে শুয়ে পড়লেন। তাঁর পায়ের পোশাক তখন ছিন্নভিন্ন, রক্ত ধুলোয় ভরা সারা শরীর।

কিছুক্ষণ পরে রাজা হুয়েমাক উঠে বসলেন। পাহারাদার যে সৈন্যটি রাজা কালহুয়াকানের কাছে চিঠিটা নিয়ে গিয়েছিল তাকে জিজ্ঞেস করলেন—ওদের রাজা কোথায়? সৈন্যটি বলল—সিংহাসনে ব'সে আছেন। রাজা হুয়েমাক রাজপ্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর পা কাঁপছে তখনো। ফ্রান্সিস দরজার আড়াল থেকে সব দেখছিল।

কিছু সময় গেল। রাজা হুয়েমাক ফিরে এলেন। আবার সিঁড়িটায় বসলেন।

বেলা বাড়তে লাগল। ওদিকে রাজবৈদ্যর দুই বৃদ্ধ সঙ্গী কোত্থেকে ভুট্টার রুটি তরকারি বিরাট কাঠের পাত্রে ক'রে নিয়ে এসেছে। বন্দী নলোয়াক্কা যোদ্ধাদের খাইয়ে দিল। আহতদেরও খেতে দিল। রাজা হুয়েমাকও খেলেন। তবে সামান্য নিলেন।

রাজা কালহুয়াকানের সৈন্যরা একটা জাগুয়ার শিকার ক'রে আনল। জাগুয়ারের চামড়া ছাড়িয়ে মাংস কাটল। আগুন জ্বেলে তাই পুড়িয়ে খেতে লাগল। খাওয়া দাওয়া হ'তে হ'তে আরও বেলা হ'ল।

রাজপ্রাসাদ থেকে রাজা কালহুয়াকান বেরিয়ে এলেন। সিঁড়িতে বসা রাজা হুয়েমাককে কী বললেন। রাজা হুয়েমাক উঠে দাঁড়িয়ে বন্দী যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে বলতে লাগলেন।—'আমার সন্তানতুল্য প্রজারা—সর্ব প্রথমে আমি যাবো। তারপর তোমরা আসবে। আমরা আগে ঐ শুকনো বন পেরিয়ে পুয়েবেলা নদীর সেতুর কাছে গিয়া অপেক্ষা করবো। তারপর রাজা কালহুয়াকান ও তার সৈন্যদল আসবেন কিন্তু সাবধান কেউ পালিয়ে যাবে না। আমার প্রতিশ্রুতির মূল্য তোমরা দেবে ঐ বিশ্বাস আমার আছে।' রাজা থামলেন। ফ্রান্সিস হেসে বলল—রাজা হুয়েমাক এই কথাগুলো আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন। উনি জানেন যে আমরা এই ঘরেই থাকি।'

রাজা হুয়েমাক প্রান্তরে নামলেন। এগিয়ে চললেন বনের দিকে। পেছনে বন্দীরা আসতে লাগল। বনের কাছে এসে রাজা চেঁচিয়ে কী বলতে লাগলেন। ফ্রান্সিস অস্পষ্ট শুনে বলল—' রাজা ঠিক ঠিক আমার নির্দেশ পালন করছে। বনের আত্মগোপনকারী সব প্রজাদের তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য বলছেন।'

রাজা হুয়েমাক বন্দীদের নিয়ে শুকনো বনে ঢুকলেন। শুকনো গাছগাছালি ঝরাপাতার বনের নীচে তখনও একটু অন্ধকার রয়েছে। রাজার নির্দেশে একজন বন্দী চেঁচিয়ে রাজার কথাগুলো বলতে বলতে চলল। বনের আড়াল আবডাল থেকে স্ত্রীলোক-বৃদ্ধ-ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এসে বন্দীদলের সঙ্গে চলল। কিছু আহত যোদ্ধাও এসে যোগ দিল। ছেলেমেয়ে কোলে মায়েরাও এসে যোগ দিল।

একসময় বন শেষ হ'ল। রাজা হুয়েমাক তাঁর প্রজাদের নিয়ে পুয়েবেলা নদীর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ওদিকে রাজা কালহুয়াকানের সৈন্যরাও তৈরী হ'ল। সবার আগে দু'টো ঘোড়া রাখা হ'ল। প্রথম সাদা ঘোড়াটায় রাজা কালহুয়াকান উঠলেন। রাজপ্রাসাদ থেকে একটা লম্বাটে কালো কাঠের সিন্দুক কয়েকজন সৈন্য কাঁধে ক'রে নিয়ে এল। পেছনের ঘোড়াটার পিঠে বাক্সটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসরা সবই দেখছিল। বাক্সটা দেখে ফ্রান্সিস বলল—'বাক্সটায় নিশ্চয়ই রাজা হুয়েমাকের ধনসম্পত্তি আছে।'

এবার রাজা কালহুয়াকানের সৈন্য ঘোড়াগুলোকে লাগাম ধ'রে টেনে নিয়ে চলল। পদাতিক সৈন্যরা হেঁটে চলল।

রাজা কালহুয়াকান বনে ঢুকলেন। কিন্তু ঘোড়া থেকে নামলেন না। দু'তিনজন

সৈন্য কুড়ুল হাতে সামনের গাছপালার ডাল পাতা কাটতে কাটতে চলল। পথ পরিষ্কার হ'তে লাগল। রাজা কালহুয়াকান ঘোড়ার পিঠে চড়ে চললেন। পেছনের বাক্স পিঠে ঘোড়াটাও চলল পেছনে পেছনে।

সব সৈন্যদের নিয়ে রাজা কালহুয়াকান বনের মধ্যে দিয়ে চললেন।

ফ্রান্সিস ঘর থেকে দেখল প্রান্তর জনশূন্য। ও আগেই সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল। ঘরের কোনা থেকে দু'টো তেলে-ভেজা মশাল নিল। সঙ্গে চকমকি পাথর। ব'লে উঠল—হ্যারি শিগগির চলো, শাঙ্কো তীর ধনুক নিয়ে এসো।

তৈরী হয়ে ওরা ঘরের বাইরে এল। তারপর দ্রুত ছুটল বনের দিকের মন্দিরের সিঁড়িতে শুয়ে থাকা বসে থাকা ননোয়াক্কা যোদ্ধারা ওদের ছুটে যেতে দেখে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল।

বনের কাছাকাছি পৌঁছল ওরা। ফ্রান্সিস উঁচু হয়ে বসল। একটু ধুলো মাটি থেকে নিয়ে হাত উঁচু করে আস্তে আস্তে ফেলল। দেখল ধুলোগুলো উত্তর দিকে ঘেঁষে পড়ল। তার মানে হাওয়া উত্তরমুখী। ফ্রান্সিস বলে উঠল—এটাই চাইছিলাম। তারপর ফ্রান্সিস চকমকি ঠুকে একটা মশাল জ্বালাল। অন্য মশালটা থেকে তেলে ভেজা কাপড়ের টুকরো ছিঁড়ে নিল। একটা তীরের ফলায় জড়ালো। জ্বলন্ত মশাল থেকে তীরের ফলায় জড়ানো কাপড়ে আগুন লাগাল। জ্বলন্ত তীরটা শাঙ্কোর হাতে দিয়ে বলল—' এই তীরটা বনের পেছন দিকে ছোড়ো।' এইবার হ্যারি ও শাঙ্কো বুঝতে পারল, হ্যারি হেসে বলল—'সাবাস ফ্রান্সিস।' শাঙ্কো দ্রুত হাতে তীর ছুঁড়ল। জ্বলন্ত তীর উড়ে গিয়ে বনের পেছন দিককার গাছগাছালিতে গিয়ে পড়ল। শুকিয়ে যাওয়া গাছগাছালিতে সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে গেল। তারপর আবার তীরে কাপড় জড়াল ফ্রান্সিস। আবার আগুন লাগাল। বলল—'এবার যত দূরে পারো তীর ছোঁড়ো।' আবার আগুন মুখে তীর ছুড়ল। প্রায় বনের মাঝামাঝি পড়ল। ওখানেও আগুন লেগে গেল। উত্তরে হাওয়ার মুখে আগুন ছড়াতে লাগল। তারপর শাঙ্কো দ্রুতহাতে আরো আগুনজ্বালা তীর ছুঁড়ল। সমস্ত বনেই আগুন লেগে গেল। বনে আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ওদিকে আগুন আর ধোঁয়ার বেড়াজালে পড়ে গেল কালহুয়াকানের সৈন্যরা। কালহুয়াকান নিজেও। পাগলের মত সৈন্যরা বনের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। কিন্তু চারদিকেই আগুন আর ঘন ধোঁয়া। আগুন ছড়াতে লাগল। উঁচু উঁচু গাছগুলোকে পেঁচিয়ে আগুনের কুণ্ডলী ওপরের দিকে উঠতে লাগল। রাজা কালহুয়াকান ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। পালাতে গেলেন। কিন্তু কোনদিকে পালাবেন? চারদিকেই আগুন আর গাঢ় ধোঁয়া। বনের মাথায় আকাশে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল। দু'তিনজন সৈন্য ঘোড়ার পিঠে উঠে আগুনের বলয় পার হ'তে গেল। কিন্তু ঘোড়াসুদ্ধ পুড়ে মরল। প্রাণভয়ে ভীত ঘোড়াগুলো পাগলের মত এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের নীচেও অনেক সৈন্য মারা পড়ল। আগুনের শিখা ওপরে আকাশের দিকে অনেকটা উঠে গেল। বিকেলের আকাশে বন থেকে কালো ধোঁয়া উঠতে লাগল।

রাজা হুয়েমাক সেতুর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার প্রজাদের নিয়ে। সবাই অবাক

চোখে বনের মাথায় ধোঁয়া আগুন দেখতে লাগল। রাজা হুয়েমাক ধোঁয়া উঠতে দেখে আগেই বুঝেছিলেন শুকনো বনে আগুন লেগেছে। আরো বুঝলেন ফ্রান্সিসই আগুন লাগিয়েছে আর এইজন্যেই তাঁকে চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিল। রাজা মৃদু হেসে মনে মনে ফ্রান্সিসকে অজস্র ধন্যবাদ জানালেন।

আগুন বনের দুদিকে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। এই পুয়েবেলা নদীর সেতুর কাছে দাঁড়িয়েও বন্দী আর চোলুলার লোকজনদের গায়ে আগুনের উত্তাপ এসে লাগল। রাজা হুয়েমাক চেঁচিয়ে বললেন—'সেতুর ওপারে চলো।' সবাই সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে ওপারে চলে গেল। একজন নলোয়াক্কা যোদ্ধা এরমধ্যেই দাঁত দিয়ে কামড়ে হাতের বাঁধা দড়ি ছিঁড়ে ফেলেছিল। সে ছুটে রাজার হাতের বাঁধা দড়ি খুলে দিল। রাজা নিজেই তখন যোদ্ধাদের হাতের বাঁধন খুলে দিতে লাগলেন। সব বন্দীরা মুক্ত হ'ল। সবাই ওখানেই পাথরে মাটিতে ব'সে পড়ল। জ্বলন্ত বনের দিকে তাকিয়ে রইল।

সন্ধে হ'ল। কিন্তু জ্বলন্ত বনের আগুনের আভায় বহুদূর দিনের আলোর মত পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল।

বনের আগুন থেকে মাত্র দু'জন সৈন্য পালিয়ে আসতে পেরেছিল। একজন বনের বাইরে এসেই মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল। অন্যজন মাটিতে শুয়ে রইল মড়ার মত। তারও বাঁচার আশা নেই।

ওদিকে ফ্রান্সিস, হ্যারি আর শাঙ্কো বনের ধার থেকে স'রে এসে প্রান্তরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস সেই ভীষণ অগ্নিলীলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল—'এই আগুন থেকে একজনেরও বাঁচার আশা নেই। আমাদের ওপর রাজা কালহুয়াকানের সৈন্যদের পশুর মত অত্যাচারের প্রতিশোধ তাহ'লে নিতে পারলাম। উফ্—আমার ঘুম পাচ্ছে চলো।'

ফ্রান্সিসরা ঘরে ফিরে এল। ফ্রান্সিসের শরীরের দুর্বলতা তখনও কাটেনি। ও ঘরে ঢুকেই বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং একটুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। গত রাতে কারোর ঘুম হয়নি। হ্যারি আর শাঙ্কোও শুয়ে পড়ল।

রাত বাড়তে লাগল। বনের আগুনের তেজও কমে আসতে লাগল। শেষ রাতের দিকে আগুন অনেকটা স্তিমিত হ'য়ে এল।

ওদিকে রাজা হুয়েমাক তাঁর প্রজাদের নিয়ে পুয়েবেলা নদীর সেতুর ওপাশে ব'সে রইলেন। আগুনে পোড়া বনের ওপর দিয়ে চোলুলায় ফেরা অসম্ভব। সারারাত কাটল।

ভোর হ'ল। ঘুম ভেঙে গেছে। তখনও ফ্রান্সিস শুয়ে ছিল। হ্যারি ডাকল—ফ্রান্সিস—কী করবে এখন?'

—'রাজা হুয়েমাক আর তার প্রজাদের চোলুলায় ফিরিয়ে আনবো।'—কিন্তু বনের আগুন এখনও সম্পূর্ণ নেভেনি। বন ঘুরে আসতে গেলে বহু দূর ঘুরে আসতে হবে। নিদ্রাহীন ক্ষুধার্ত মানুষগুলো কি পারবে?' হ্যারি বলল।

এর মধ্যে বৃদ্ধ লোকটি ওদের খাবার দিয়ে গেল। খেয়েদেয়ে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—'চলো, আগুনের অবস্থাটা দেখে আসি।'

তিনজনে ঘরের বাইরে এল। চলল আগুনে পোড়া বনের দিকে। বনের কাছে এসে দেখল তখনও বনের কোন কোন জায়গা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কিন্তু কিছু পোড়া কালো গাছ তখনও দাঁড়িয়ে আছে। মাটির ওপর স্তূপাকার শুকনো পাতা পুড়ে গেছে। কিন্তু তখনও ওসব জায়গায় ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। কী করে পোড়া বন পার হওয়া যায়? কী ক'রেই বা রাজা হুয়েমাকের কাছে যাওয়া যায়? শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস রাজা হুয়েমাকের আর তার প্রজাদের বিপদ কিন্তু এখনও কাটেনি।



এর মধ্যে বৃদ্ধ লোকটি ওদের খাবার দিয়ে গেল।

—ও কথা বলছো কেন? হ্যারি জিজ্ঞাস করল।

—ভেবে দেখ—রাজা কালহুয়াকান হয়তো সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে আসেনি। কিছু সৈন্য রাজধানী তুলাতে হয়তো রয়েছে। তারা আগুনের খবর পেয়েছে নিশ্চয়ই। এর মধ্যে তারা রাজা কালহুয়াকানের সৈন্যদের কী হ'ল নিশ্চয়ই জানতে আসবে। ওরা সশস্ত্র হ'য়েই আসবে। পুয়েবেলা সেতুর কাছে নিশ্চয়ই রাজা হুয়েমাক ও তার নিরস্ত্র সৈন্য লোকজনদের দেখবে। তখন তারা আক্রমণ করলে কেউ বাঁচবে না।' ফ্রান্সিস মন দিয়ে শাঙ্কোর কথাগুলো শুনল। বলল—'তুমি ঠিক বলেছো। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজা হুয়েমাক আর তাঁর প্রজাদের এখানে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু কী ক'রে?' হ্যারি এতক্ষণ একটা ভাঙা পাথরের বাড়ির দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ ওর মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। ও বলল—'আচ্ছা ফ্রান্সিস—একটা কাজ করলে হয় না? ঐ ভাঙা বাড়িটা থেকে পাথরের টুকরো এনে যদি পোড়া বনের মধ্যে পেতে আমার এগিয়ে যাই তাহলে বনের শেষে পৌঁছোতে পারবো না? ভেবে দেখ—পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে আমাদের পা পোড়ার কোন ভয় নেই। রাজা হুয়েমাক আর তার প্রজারাও ঐ পাথরের ওপর পা রেখে চ'লে আসতে পারবে।' ফ্রান্সিস হেসে বলল—'সাবাস হ্যারি। হ্যাঁ এটা সম্ভব। তবে ঐ ভাঙা বাড়িতে যত পাথরের খণ্ড পাবো তা'তে কি সবটা বন পেরুনো যাবে?

—কাজটা তো শুরু করি—এগিয়ে তো যাই তারপর দেখা যাবে। হ্যারি বলল।

তিনজনেই কাজে লেগে পড়ল। ফ্রান্সিস বনের ধারে দাঁড়াল। শাঙ্কো ভাঙা বাড়িটা থেকে পাথরের খণ্ড তুলতে লাগল। দিতে লাগল হ্যারির হাতে। হ্যারি

সেটা এনে ফ্রান্সিসকে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস পোড়া বনের মধ্যে সেগুলো পাততে লাগল। ফাঁক ফাঁক ক'রে। তারপর পাতা পাথরে পা দিয়ে বনের মধ্যে এগোতে লাগল। কিছুক্ষণ পর পর জায়গা পরিবর্তন করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। আস্তে আস্তে বনের মধ্যে বেশ দূরে এগিয়ে গেল ওরা। তখন বেলা হ'য়েছে। ফ্রান্সিসরা পাতা পাথরে পা রেখে রেখে ফিরে এল। দেখল দু'তিনজন আহত ননোয়াক্কা যোদ্ধা উঠে এসে ওদের কাজকর্ম দেখছে। ফ্রান্সিস ভাঙা ভাঙা ওদের ভাষায় বলল—'পারবে সাহায্য করতে? আমরা বিশ্রাম করবো।' যোদ্ধাদের মধ্যে একজন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর তিনজন যোদ্ধাই ফ্রান্সিসদের মত পাথর পাতার কাজে লেগে পড়ল। ফ্রান্সিসরা একটু বিশ্রাম নিল। তারপর আবার কাজে লেগে পড়ল।

দুপুর হ'ল। বৃদ্ধ লোকটি খাবার নিয়ে এল। খাবার খেয়ে আবার সবাই কাজ শুরু করল।

বিকেলের আগেই ওরা পোড়া বনের প্রায় শেষে পৌঁছে গেল। কিন্তু আর পাথর নেই। ভাঙা বাড়ির পাথর শেষ হ'য়ে গিয়েছিল আগেই। এখান ওখান থেকে আরো পাথর জোগাড় করেছে, কিন্তু আর ভাঙা পাথর পাওয়া যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস হেঁটে হেঁটে শেষ পর্যন্ত এল। ভালো ক'রে দেখল আর একটুখানি গেলেই পোড়া বন শেষ। ও দেখল এখানকার আগুন নিভে গেছে। রাজা হুয়েমাক ওদের কাঁচা চামড়ার জুতো মত দিয়েছিল। ফ্রান্সিসের পায়ে সেই জুতো। ও পোড়া পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে বাকিটুকু পেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিসের দেখাদেখি হ্যারি শাঙ্কো আর আহত যোদ্ধারাও বাকিটুকু হেঁটে পার হ'য়ে গেল।

এবার ফ্রান্সিসরা চলল রাজা হুয়েমাকের খোঁজে। পুয়েবেলো নদীর সেতু পেরিয়েই দেখল প্রজাদের নিয়ে রাজা বসে আছেন।

ফ্রান্সিসদের দেখে রাজা হুয়েমাক বেশ আশ্চর্য হলেন। ওরা আগুনে পোড়া বন পার হ'ল কী ক'রে। সব আগুন তো এত তাড়াতাড়ি নিভে যাবার কথা না? রাজা হুয়েমাক কিন্তু ভীষণ খুশী হলেন। উঠে দাঁড়ালেন। ফ্রান্সিসরা কাছে আসতেই ফ্রান্সিসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজার ছেঁড়া পোশাকে তখনও ধুলো রক্ত লেগে রয়েছে। হ্যারি শাঙ্কো যোদ্ধারা সবাই মাথা নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানাল। রাজা বললেন—'ফ্রান্সিস তোমরা পোড়া বন পেরিয়ে এলে কী ক'রে?'

—'পাথর ফে ন ফেলে পাথরের ওপর হেঁটে হেঁটে পার হ'য়েছি। আপনাদেরও সেভাবেই পার হ তে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।' ফ্রান্সিস বলল।

—কেন?

রাজা কালহুয়াকানের কিছু সৈন্য হয়তো তুলায় আছে। ওরা রাজার খোঁজে এদিকে আসতে পারে। যে কোন মুহূর্তে। কাজেই আর দেরী করবেন না। আপনি প্রজাদের সেভাবেই নির্দেশ দিন। এদিকে ফ্রান্সিসদের আসতে দেখে সবাই এদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। রাজা হুয়েমাক সকলের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বললেন, 'পোড়া বন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে পার হ'তে। রাজার কথা শেষ হ'তে সবাই ছুটল পোড়া বনের দিকে। সবার আগে বাচ্চা কোলে

মায়েদের তারপর স্ত্রীলোকেরা, বাচ্চারা, বৃদ্ধবৃদ্ধারা রওনা হ'ল। যোদ্ধারা গেল তারপর। সবশেষে রাজা ও ফ্রান্সিসরা।

ওরা বনের মাঝামাঝি এসেছে তখনই দেখল দক্ষিণ দিক থেকে ধূলো উড়িয়ে একদল অশ্বারোহী ছুটে আসছে। বোঝাই গেল কালহুয়াকানের যে সৈন্যরা তুলাতে ছিল তারাই রাজার খোঁজে এসেছে। সৈন্যদল পুয়েবেলা সেতুর কাছে এসে দাঁড়াল। এবার একটা একটা ক'রে ঘোড়া হাঁটিয়ে পার করতে হবে। ওরা বোধহয় সেইজন্যেই তৈরী হ'তে লাগল। ওরা তখনও জানে না রাজা কালহুয়াকান তাঁর সমস্ত সৈন্যসহ পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। বোঝা গেল ফ্রান্সিসদের আশঙ্কাই সত্য।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। সবাই একে একে চোলুলা নগরে ফিরল। আহত রাজা হুয়েমাক এত অত্যাচার দুশ্চিন্তা পরিশ্রম সহ্য করতে পারলেন না। রাজপ্রাসাদের প্রবেশ করবার আগেই পাথরের সিঁড়ির ওপর প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি রাজাকে ধ'রে ফেললেন। প্রায় অচেতন রাজাকে সিঁড়ির ওপর শুইয়ে দিল। হ্যারিকে বলল—শিগগির রাজবৈদ্যকে ডেকে আনো। হ্যারি কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর রাজবৈদ্যকে পেল। তার হাত ধরে টেনে সঙ্গে আসার জন্যে ইঙ্গিত করল। রাজবৈদ্য এল। প্রায় অচেতন রাজার কাছে বসল। পুঁটুলি থেকে ওষুধপত্র বের করল। রাজার কাঁধের ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিল। রাজার কাছেই ব'সে রইল। ওদিকে রাজা হুয়েমাকের প্রজারা যে যার লুঠ হয়ে যাওয়া বাড়িতে ফিরল। চীনেমাটির বাসনকোসন যা পেল জড়ো করল। শুকনো কাঠ দিয়ে উনুন ধরিয়ে রাতের রান্না শুরু করল। পুরো একটা রাত আর একটা দিন উপবাসী হ'য়েছে। সবাই ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা হুয়েমাক একটু সুস্থ হলেন। উঠে বসলেন। ফ্রান্সিসরা রাজাকে ধরাধরি ক'রে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এল। শয়নঘরে এনে রাজাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। পাহারাদার দু'জন সৈন্যকে ঐ ঘরে রেখে ফ্রান্সিসরা নিজেদের ঘরে চলে এল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস রাজার খোঁজ নিতে গেল। দেখল রাজা যাস তাঁর পালকের বিছানায় বসে আছেন। অনেকটা সুস্থ এখন। ফ্রান্সিসকে দেখে হেসে বললেন—'তোমাদের কাছে আমি আর আমার প্রজারা চিরকালের জন্যে ঋণী র'ইলাম।' ফ্রান্সিস বলল—'ওসব থাক। একটা জরুরী কথা আপনাকে বলতে এসেছি।' একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—'আপনার প্রাসাদ থেকে রাজা কালহুয়াকান একটা কাঠের সিন্দুকমত নিয়ে যাচ্ছিল। কী ছিল ঐ সিন্দুকে?' রাজা শান্তস্বরে বললেন—'জানতাম, আমার ঐ দামী অলঙ্কার হীরে মুক্তো কালহুয়াকান লুঠ ক'রে নিয়ে যাবেই।'

—'কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস—নিয়ে যেতে পারেনি। এখন ঐ সিন্দুক নিশ্চয়ই বনের মধ্যে পড়ে রয়েছে। হয়তো সোনা রূপার অলংকার সব আগুনের তাপে গলে গেছে। তবে হীরে মুক্তো দামী পাথর এসব নিশ্চয় রয়েছে।' ফ্রান্সিস বলল।

—কী হবে ওসব অলঙ্কার মণিমুক্তো দিয়ে। রাজা বললেন।

—ও কথা বলবেন না! ফ্রান্সিস বলল—'ভবিষ্যতে আপনার প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে প্রয়োজন পড়বে।'

—ও কি আর উদ্ধার করা যাবে?

—কেন যাবে না। আমরাই উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—'বেশ—দেখ চেষ্টা ক'রে।' রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস ঘরে ফিরে এল। রাত একটু বাড়তেই চোলুলার অধিবাসীদের আনন্দ গান নাচ হৈ হল্লা শুরু হ'ল। ওরা বোধহয় ভাবতেও পারেনি এভাবে বন্দী জীবন থেকে, অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবে। ফ্রান্সিসরা দরজায় দাঁড়িয়ে মশালের আলোয় আলোকিত প্রান্তরে চোলুলার অধিবাসীদের নাচ দেখতে লাগল। গান শুনতে লাগল।

পরদিন ভোরেই খবর রটে গেল যে রাজা কালহুয়াকানের সৈন্যরা আক্রমণ করতে আসছে। ননোয়াক্কা যোদ্ধাদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কয়েকজন যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে এসে ডাকাডাকি করতে লাগল। ফ্রান্সিসরা উঠে পড়ল। বাইরে এসে শুনল আক্রমণের কথা।

ফ্রান্সিস হ্যারি তরোয়াল নিল। শাঙ্কো নিল তীরধনুক। ওরা প্রান্তরে এসে দাঁড়াল। ননোয়াক্কা যোদ্ধারাও ততক্ষণে বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

পোড়া বনের ছাই উড়িয়ে কিছুক্ষণ পরেই কালহুয়াকানের সৈন্যরা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়ল। প্রান্তরে আসতেই শুরু হ'ল লড়াই। ওরা সংখ্যায় বেশি ছিল না। ওরা হয়তো ভেবেছিল ওদের দেশের অন্য সৈন্যদেরও এখানে পাবে। এসেই দেখল ওদের দেশের একজন সৈন্যও নেই। ওরা বেশ দমে গেল। ননোয়াক্কা সৈন্যরা মরণপণ লড়াই করতে লাগল। শাঙ্কো তীর ছুঁড়ে একটার পর একটা শত্রু সৈন্যকে ঘায়েল করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা হার স্বীকার করল। জনাদশেক বন্দী হ'ল। বেশ কিছু মারা গেল। বাকীরা ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল। চোলুলার অধিবাসীরা যুদ্ধজয়ের আনন্দে চীৎকার হৈ-হল্লা শুরু করল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাজা হুয়েমাক যুদ্ধজয়ের সংবাদ শুনলেন। কোয়েতজাল দেবতাকে স্মরণ ক'রে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করলেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস বলল—চলো—রাজা হুয়েমাকের সেই সিন্দুকটা খুঁজতে হবে।

ওরা পোড়া বনের কাছে এল। ফ্রান্সিস ঠিক যেখান দিয়ে রাজা হুয়েমাক ঢুকেছিল সেই জায়গাটা লক্ষ্য করল। সেখান দিয়েই ফ্রান্সিস ঢুকল। পেছনে হ্যারি শাঙ্কো আর কয়েকজন ননোয়াক্কা যোদ্ধা।

পোড়া বনের মধ্যে কিছুটা গেল ওরা। ফ্রান্সিস প্রত্যেককে একটা ক'রে পোড়া গাছের ভাঙা ডাল নিতে বলল। তাই দিয়ে ছাইয়ের গাদা সরিয়ে সরিয়ে সবাই সেই সিন্দুকটা খুঁজতে লাগল। এক জায়গায় ছাই সরিয়ে হ্যারিই প্রথম দেখতে পেল—সিন্দুকটার পুড়ে যাওয়া কোণাটা। হ্যারি চীৎকার ক'রে ডাকল—'ফ্রান্সিস এই যে সিন্দুকটা।' সবাই ছুটে এল। দেখল সিন্দুকটা সবটা পুড়ে যায়নি। আধ-পোড়া অবস্থায় পড়ে আছে। তবে দেখা গেল ফ্রান্সিস যা বলেছিল তাই হ'য়েছে। সোনা রূপার অলঙ্কার চাকতি সব গলে সিন্দুকটার গায়েই লেপ্টে আছে। মণিমুক্তোগুলো কালচে হ'য়ে গেছে। কিন্তু হীরের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। ফ্রান্সিসরা

ঐ অবস্থাতেই পোড়া সিন্দুকটায় যতগুলি মণি-মুক্তো দামী পাথর ভরল। গলিত সোনা রূপোর পাত ক'টা হাতে নিল। সব নিয়ে চোলুলায় ফিরে এল ওরা। তারপর রাজপ্রাসাদে রাজার শয়নকক্ষে ঢুকল। রাজাকে সব জিনিস ফ্রান্সিস দিয়ে দিল। রাজা খুশীই হলেন।

দিন সাতেক কেটে গেল। রাজা হুয়েমাক অনেকটা সুস্থ হলেন। রাজা কালহুয়াকান মারা গেছেন। তুলায় এখন রাজা কালহুয়াকানের এক মন্ত্রী শাসনকার্য চালাচ্ছেন। সেদিন তিনি রাজা হুয়েমাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চোলুলায় এলেন। রাজা হুয়েমাককে সবিনয়ে অনুরোধ করলেন স্ত্রোমো দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে। রাজা হুয়েমাক জানালেন তিনি চোলুলার প্রজাদের নিয়েই আনন্দে থাকতে চান। নতুন রাজ্যভার নিতে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। মন্ত্রীই যেন শাসন করবার দায়িত্ব নেন। মন্ত্রী দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি বারবার বলতে লাগলেন স্ত্রোমোর রাজা হ'তে পারে একমাত্র প্রথম কালহুয়াকানের বংশধররাই। সুতরাং রাজা হুয়েমাকই বংশধর হিসেবে রাজা হওয়ার উপযুক্ত। এবার রাজা হুয়েমাক দ্বিধায় পড়লেন। ভেবে পেলেন না কী বলবেন। তাই তিনি বললেন মন্ত্রী যেন দিন কয়েক পরে আসেন। রাজা হুয়েমাক এর মধ্যে ভেবে ইতিকর্তব্য স্থির করলেন।

সেদিন সন্ধেবেলা রাজা হুয়েমাক ফ্রান্সিসকে ডেকে পাঠালেন। ফ্রান্সিস রাজপ্রাসাদে এল। রাজা হুয়েমাক কালহুয়াকানের মন্ত্রীর সব কথা বললেন। ফ্রান্সিস বলল—আপনি অবশ্যই স্ত্রোমোর শাসনভার গ্রহণ করুন।

—'কী লাভ? এই তো বেশ আছি।' রাজা বললেন।

—না মহামান্য রাজা—আপনার মত প্রজাবৎসল মহান মানুষকে ওরা রাজা হিসেবে পেলে ওরা ধন্য হ'য়ে যাবে। আমরা য়ুরোপীয়রা সভ্য ব'লে গর্ব করি কিন্তু আমাদের য়ুরোপেও আপনার মত রাজা খুব কমই আছে।

—'কিন্তু চোলুলার কী হবে?' রাজা বললেন।

—চোলুলাকেও স্ত্রোমো রাজ্যের মধ্যে নিয়ে নিন। রাজধানী স্থাপন করুন তুলাতে। দু'দেশের প্রজাই তো এক। তলতেক জাতিও। কোন অসুবিধের কারণ নেই। আপনার সুশাসনে তলতেক জাতি আরও সভ্য হোক উন্নত হোক। এটা কি আপনিও চান না? ফ্রান্সিস বলল। রাজা হুয়েমাক ফ্রান্সিসের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। মাথা নিচু ক'রে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন— 'বেশ ওদেশের মন্ত্রীকে সে কথাই বলবো।'

—মহামান্য রাজা—আমার কয়েকটা কথা বলার আছে।

—বলো।

তুলার বিষাক্ত উপত্যকার নীচে প্রথম রাজা কালহুয়াকানের গুপ্তধনের খোঁজ আমরা পেয়েছি।

—'বলো কি।' রাজা আশ্চর্য হ'য়ে বললেন—'কতকাল ধ'রে ঐ গুপ্তধনের সন্ধান চলছে আর তুমি তার খোঁজ পেয়ে গেছো?'

—'হ্যাঁ—যাজক ব্রেগুনের একটা ছড়ার মধ্যে সাংকেতিক নির্দেশ ছিল। আমি তার সাহায্যেই এগিয়েছি। এখন মাত্র একটা সংকেত বাকি। আমি নিশ্চিত সেই

সংকেতের অর্থ বার করতে পারবো যদি আপনি আমাদের অনুমতি দেন।' ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ গুপ্তধনের ওপর আমার কোন লোভ নেই।

—তা' জানি। কিন্তু প্রথম রাজা কালহুয়াকানের বংশধর হিসেবে ঐ গুপ্তধন আপনারই প্রাপ্য।

—ঠিক আছে। দেখ যদি খুঁজে বের করতে পার। রাজা বললেন।

—আমরা ঠিক গুপ্তধন আবিষ্কার করতে পারবো। তবে একটা অনুরোধ—আপনি তো এখন সুস্থ। আপনি তুলাতে আসুন এটাই আমরা চাই।

—'বেশ। স্রোমোর শাসনভার নিলে তুলাতে তো আমাকে যেতেই হবে।' রাজা বললেন।

রাজাকে সম্মান জানিয়ে ফ্রান্সিস চলে এল।

পরদিন রাজা কালহুয়াকানের মন্ত্রী তুলা থেকে এলেন। রাজা হুয়েমাক রাজ্যের শাসনভার গ্রহণে সম্মতি জানালেন। বললেন পরদিন সকালে তিনি তুলায় যাবেন। তাঁর সঙ্গে যাবে শুধু ছ'জন ননোয়াল্কা যোদ্ধা আর তিনজন বিদেশী বন্ধু। কোন রকম জাঁকজমক যেন করা না হয়। তিনি প্রথমে তুলার কোয়েতজাল মন্দিরে যাবেন। পুজা দেবেন। তুলার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন। তারপর সিংহাসনে বসবেন।

পরদিন সকালে রাজা হুয়েমাক রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। একটা সুসজ্জিত ঘোড়াতে উঠলেন। দু'পাশে তিনজন ক'রে ননোয়াল্কা অশ্বারোহী যোদ্ধা রইল। পেছনে তিনটে ঘোড়ায় ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কো।

রাজা হুয়েমাককে সামনে রেখে যাত্রা শুরু হ'ল। রাজা খুবই সাধারণ পোশাক পরেছেন। দেহে কোন অলংকার নেই। শুধু মাথায় গোঁজা পাখির পালকগুলো যা জমকালো। প্রান্তর পোড়া বন পেরিয়ে রাজাকে নিয়ে সবাই এল পুয়েবেলো নদীর সেতুর কাছে। সবাই ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়াগুলো হাঁটিয়ে পার করানো হ'ল। তারপরই স্রোমো রাজ্য। মন্ত্রী ও কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা মাথা নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানালেন। তারপর রাজার পেছনে পেছনে চললেন তুলার দিকে।

তুলায় প্রবেশের মুখে দাঁড়িয়েছিল নানারঙের পোশাক পরা কয়েকটি মেয়ে। তারা রাজাকে সম্মান জানিয়ে অনেক ফুল ছড়িয়ে দিল। একদল পুরুষ কাছিমের খোলের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নেচে নেচে চলল।

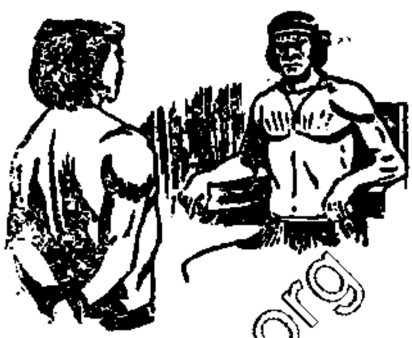
কোয়েতজাল মন্দিরের সামনে এসে সবাই ঘোড়া থেকে নামল। পুরোহিত মন্দিরের সিঁড়ির ওপরই দাঁড়িয়েছিল। সে ফুল ফল ছড়িয়ে জোরে জোরে কী আওড়াতে লাগল। রাজা মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। পুরোহিত থামল। রাজা মন্দিরে ঢুকলেন। বুনো ফল, ফুল পাতা দিয়ে কোয়েতজালের পুজো করলেন। তারপরে বাইরে এসে দাঁড়ালেন মন্দিরের সিঁড়ির মাথায়। ততক্ষণে সামনের প্রান্তরে তুলার অধিবাসীদের ভীড় জমে গেছে। অধিবাসীরা অনেকেই মুখে থাব্‌ড়া দিয়ে শব্দ ক'রে আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

রাজা হুয়েমাক দু'হাত ওপরে তুললেন। সব কোলাহল বন্ধ হ'য়ে গেল। রাজা হুয়েমাক হাত নামিয়ে বলতে লাগলেন—'আমার প্রিয় সন্তানতুল্য প্রজাগণ—এই দেশের শাসনভার আমি এইজন্যে নিলাম যাতে আরো মানুষের মঙ্গল আমি করতে পারি। দু'টো নির্দেশ আমার—কয়েদঘর ব'লে এখানে কিছু থাকবে না। যেটা আছে সেটা হবে মেয়েদের তাঁতঘর। দুই—কোয়েতজালের মন্দিরে নরবলি প্রথা আমি বন্ধ ক'রে দিলাম। কোয়েতজাল শুধু মৃত্যুর দেবতা নয় জীবনেরও দেবতা। মূল্যবান সম্পদ, খ্যাতি যশ, রাজ্যজয়, সম্মান, প্রতিপত্তি এসব নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র ভাবি না। আমার চিন্তা একটাই—প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধান, আর দেশের উন্নতি।' রাজার কথা শেষে তুলার অধিবাসীরা আনন্দধ্বনি দিল।

তারপর রাজা হুয়েমাক ফ্রান্সিসদের ও মন্ত্রী গণ্যমান্যদের নিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

রাজা হুয়েমাক সিংহাসনে বসলেন। দু'পাশে মোটা নক্সাকরা কাপড়বিছানো কাঠের আসনে বসলেন আগের মন্ত্রী আর তুলার গণ্যমান্যরা।

ফ্রান্সিসরা রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস রীতিমাফিক শ্রদ্ধা জানিয়ে বলল—'মহামান্য রাজা—আমাদের জাহাজে ফেরার সময় হ'য়েছে। এমনিতেই অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। এখন আমরা প্রথম রাজা কালহুয়াকানের গুপ্তভাণ্ডার খুঁজতে যাচ্ছি। আপনি অনুমতি দিন।



রাজা হুয়েমাক সিংহাসনে বসলেন।

—বেশ যাও। প্রয়োজন হ'লে আমার যোদ্ধাদের নিয়ে যেতে পারো।

—তার দরকার হবে না।

ফ্রান্সিসরা রাজসভা থেকে চলে এল। প্রাসাদের বাইরে এসে চলল কোয়েতজালের মন্দিরের দিকে। মন্দিরে ঢুকে মূর্তির পেছনে এল ওরা। দেখল আগের মতই পাথর সরানো আছে। কেউ সুড়ঙ্গপথের মুখ বন্ধ করেনি। ফ্রান্সিস বলল—'শাঙ্কো, মশাল নাও।' শাঙ্কো মন্দির থেকে দু'টো জ্বলন্ত মশাল নিয়ে এলো।

মশালের আলোয় সিঁড়ির পথ দেখে দেখে ওরা আস্তে আস্তে নামল। নীচে সিঁড়ির কাছে তিনটি কুডুল পাওয়া গেল। রাজা কালহুয়াকানের সৈন্যরা সেদিন পালাবার সময় ফেলে গেছে। ফ্রান্সিস দু'টো কুডুল হাতে নিল। আর একটা দিল হ্যারিকে।

ধুলোভরা পাথুরে মেঝে দিয়ে ওরা আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। দেখল প্রথম খোঁদলটা থেকে বিষাক্ত জল ফোঁটা ফোঁটা পাথরের সিঁড়িটির ওপর পড়ছে। বারিনথাসের মৃতদেহ নেই। হয়তো বিষাক্ত জলে গলে গেছে। হয়তো সরিয়ে ফেলা হ'য়েছে। বিষাক্ত জল যা সিঁড়ি গড়িয়ে আসছে তাই নীচের ধুলোয় শুষে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা দ্বিতীয় খোঁদলটার কাছে এল। মাথা উঁচু ক'রে ফ্রান্সিস দেখল সেই একই রকম খোঁদল। পাথরের সিঁড়ি খোঁদল পর্যন্ত উঠে গেছে। হেঁটে হেঁটে তৃতীয় খোঁদলের কাছে এল। সেই একই রকম খোঁদলটা পর্যন্ত পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে। ফ্রান্সিস বলল—এবার ফিরবো। শেষ সমাধান এখনও বের করতে পারিনি। কিন্তু সেই সমাধান এখানেই পাবো। তোমরা পাথরের ছাত দেয়াল মেঝের দিকে ভালো ক'রে নজর রাখো। মূর্তির ভাঙা বাঁ হাতটা এখনো পাইনি। আস্তে আস্তে ফিরে চলো। ভাঙা বাঁ হাতটা পেতেই হবে।

ওরা ধুলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে ফিরতে লাগল। তীক্ষ্ণ নজর রাখলো চারদিকে। ফ্রান্সিস মুখে মুখে ছড়ার শেষটুকু আওড়াতে লাগল—এক হাত ধুলিময়। মাঝখানের সিঁড়ির কাছে এসে ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল—'হ্যারি—দেখ তো ওটা কী?' মশালের আলোয় দেখা গেল ধুলোর মধ্যে থেকে কী যেন একটু উঁচু হ'য়ে আছে। ফ্রান্সিস ধুলো ঠেলে তাড়াতাড়ি ওখানে এল। দেখল একটা হাত ধুলোয় পোঁতা। হাতের তর্জনীটা ওপরের দিকে উঁচিয়ে আছে যেন কিছু নির্দেশ করছে। ফ্রান্সিস তর্জনীর নির্দেশ লক্ষ্য করল। দেখল তর্জনীটা নির্দেশ করছে ওপরে সেই দ্বিতীয় গোল খোঁদলটা। ফ্রান্সিস ঐ দিকে তরোয়াল উঁচিয়ে চীৎকার ক'রে বলল— 'হ্যারি ঐ যে গুপ্তধন।'

—কী ক'রে বুঝলে?

—এই হাতটাই কোয়েতজাল দেবতার ভাঙা বাঁ হাত যেটা আমরা খুঁজছিলাম। একবার ছড়াটা মনে করো—

এক হাত ধুলিময়
মুখ নয় কথা কয়
আঙুল তুলে দে—

ঐ দেখ হাতের তর্জনীটা ঐ গোলমত খোঁদলটার দিকেই ইঙ্গিত করছে কিনা ফ্রান্সিস বলল।

তারপর ফ্রান্সিস তরোয়াল কোমরে গুঁজে হাতের কুড়ুলটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেল। হ্যারি হাত বাড়িয়ে ওকে আটকাল। বলল—যদি কুড়ুল চালালে গোল জায়গাটা ভেঙে গিয়ে বিষাক্ত উপত্যকার জল নেমে আসে।

—অসম্ভব। আমি নিশ্চিত ওখানেই রয়েছে গুপ্তধন।

—'বেশ—সবাই একসঙ্গে উঠবো। একসঙ্গে কুড়ুল চালাবো। মরতে হয় তিনজন একসঙ্গে মরবো।' হ্যারি বলল।

'—আমরা মরবো না হ্যারি।' ফ্রান্সিস বলল।

—না। বারিনথাসের ভয়াবহ মৃত্যু আমরা দেখেছি। তোমরাও যদি—না ফ্রান্সিস—যা করবার একসঙ্গে করবো।' হ্যারি বলল।

সিঁড়িটা প্রশস্ত নয়। তিনজন কোনরকমে গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে উঠতে লাগল। গোলমত খোঁদলটার কাছে উঠে এল। শাঙ্কো হাতের মশাল পাথরের খাঁজে আটকাল। তারপর তিনজন একসঙ্গে ঐ জায়গায় কুড়ুলের ঘা দিল। পাথর কুচি ঝরে পড়ল ওদের মাথায় গায়ে। আবার কুড়ুল চালাল। আবার পাথর কুচি ঝরে পড়ল। তারপর

হ্যারি ও শাঙ্কো কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিস দেহের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে হঠাৎ সজোরে ও জায়গাটায় কুড়ুলের ঘা মারল। ওর কুড়ুলের ফলাটা কীসের মধ্যে ঢুকে গেল। ফ্রান্সিস ব'লে উঠল—'হ্যারি যেটাকে পাথর বলা হয়েছে সেটা আসলে পাথর নয়। খুব সম্ভব কাঠ আর সেটা রাখা হ'য়েছে ঠিক বিষাক্ত উপত্যকার মাঝখানে।

আবার তিনজনে কুড়ুল চালাল। কুড়ুলের ফলা বসে যেতে লাগল। ভেঙে পড়ল কাঠের টুকরো। ফুটো হ'য়ে গেল আর সেখান থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগল হীরে মোতি চুনী পান্না—দামী দামী সব পাথরের টুকরো। ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে বলল—'হ্যারি প্রথম কালহুয়াকান রাজার গুপ্তধন। এবার তিনজনেই উৎসাহের সঙ্গে কুড়ুল চালাতে লাগল। কাঠ কেটে ফাঁকটা বড় হ'ল। ঝর ঝর ক'রে হীরের টুকরো, পান্না চুনী সোনার চাকতি পড়তে লাগল। সিঁড়িতে জমা হ'তে লাগল সেসব। হঠাৎ গড়িয়ে পড়ল কোয়েতজাল দেবতার দু'ফুটের মত উঁচু একটা সোনার মূর্তি। মূর্তির দু'চোখ দামী পাথরের। সারা গায়ে হীরে মণিমাণিক্য বসানো। মন্দিরে যে মূর্তি আছে অবিকল তেমনি দেখতে এই মূর্তি। ফ্রান্সিস মূর্তিটায় হাত দিল না। ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপার। রাজা হুয়েমাক হয়তো বিধর্মী মূর্তি স্পর্শ করেছে ব'লে মনঃক্ষুণ্ণ হ'তে পারেন।

ফ্রান্সিস বলল—'আর কাটার দরকার নেই। শাঙ্কো—রাজা হুয়েমাককে গিয়ে সব বলো। উনি যেন জনাকয়েক ননোয়াল্কা যোদ্ধা নিয়ে এখানে আসেন।' শাঙ্কো চ'লে গেল। ফ্রান্সিস মণিমাণিক্য ছড়ানো সিঁড়ির ওপর ব'সে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে রাজা হুয়েমাক এলেন। সঙ্গে কয়েকজন ননোয়াল্কা যোদ্ধা। ফ্রান্সিস সিঁড়ি থেকে নেমে এল। রাজা হুয়েমাক অবাক হ'য়ে দেখতে লাগলেন সিঁড়িতে ছড়ানো মণিমাণিক্য। ফ্রান্সিস বলল—মহামান্য রাজা—আমরা বিধর্মী তাই কোয়েতজাল দেবতার ভাঙা বাঁ হাত, এই মূর্তি ছুঁইনি। এবার আপনি যা করার করুন।

রাজা হুয়েমাক ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দে তাঁর চোখে জল এসে গেল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—'সাবাস ফ্রান্সিস।'

রাজা যোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন ওপরের কাঠের আস্তরণ সব ভেঙে ফেলতে। একজনকে বললেন কাপড়ের বস্তা আনতে। যোদ্ধারা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। কাঠের আস্তরণ কুড়ুল চালিয়ে ভাঙতে লাগল। আরো মণিমাণিক্য হীরে চুনী পান্না পড়তে লাগল। যোদ্ধাটি কাপড়ের বস্তা নিয়ে ফিরে এল। কাপড়ের বস্তায় সব ভরা হ'তে লাগল।

ফ্রান্সিস বলল—'মহামান্য রাজা—আমাদের কাজ শেষ। এবার আমরা গেরুয়া পাহাড়ে যাবো। সেখান থেকে জাহাজে। আপনি এক জন পথপ্রদর্শক আমাদের সঙ্গে দিন।'

—'নিশ্চয়ই।' রাজা আস্তে আস্তে সিঁড়ির কাছে গেলেন। কোয়েতজালের ছোট মূর্তিটা তুলে নিলেন। তারপর মূর্তিটা ভালো ক'রে দেখলেন। ফ্রান্সিসের দিকে বাড়িয়ে ধ'রে বললেন—ফ্রান্সিস এই দেবমূর্তি তোমাদেরই প্রাপ্য। নাও।

ফ্রান্সিস বুঝে উঠতে পারলো না কী করবে। ও হ্যারি আর শাঙ্কোর দিকে তাকাল। হ্যারি বলল—'নাও ফ্রান্সিস। এ তো সম্মানের।' ফ্রান্সিস মূর্তি নিয়ে হাত দিয়ে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরল। রাজা হেসে বললেন—'তলতেক জাতির উপাস্য দেবতার মূর্তি। এ মূর্তিকে কখনো অপবিত্র ক'রো না। দেশে ফিরে কোন পবিত্রস্থানে এই দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা ক'রো।'

—নিশ্চয়ই করবো।' ফ্রান্সিস বলল। তারপর বলল—'মহামান্য রাজা—আমাদের কাজ শেষ। আমরা যাচ্ছি।'

ওরা মাথা নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানিয়ে ধুলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে সুড়ঙ্গের সিঁড়ির কাছে এল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্দিরে এল। দেখল পুরোহিত কোয়েতজাল দেবতার ভাঙা বাঁ হাতটা জোড়া দিচ্ছে।

ফ্রান্সিসের মনে কী হ'ল। ও দেবমূর্তির সামনে এসে মাথা নুইয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা জানাল। তারপর তিনজনে মন্দিরের বাইরে এল।

সামনের প্রান্তরে ওদের ঘোড়া বাঁধা ছিল। ওরা সেদিকে চলল। একজন ননোয়াক্লা যোদ্ধা মন্দির থেকে ছুটে এসে ওদের কাছে দাঁড়াল। হেসে ফ্রান্সিসের হাতে একটা ছোট কাপড়ের ঝোলামত দিল। ফ্রান্সিস ঝোলার মুখ খুলে দেখল—কিছু মণিমাণিক্য। ফ্রান্সিস ঐ ঝোলাতেই মূর্তিটা রাখল। যোদ্ধাটি বলল—সেই পথপ্রদর্শক। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

চারজনে ঘোড়ায় উঠল। ফ্রান্সিস ঝোলাটা ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বেঁধে রাখল।

সামনে পথপ্রদর্শক। পেছনে ওরা তিনজন। লাল ধুলো উড়িয়ে ওদের ঘোড়া ছুটল। বিষাক্ত উপত্যকার পাশ দিয়ে যাবার সময় ফ্রান্সিস ঐ দিকে তাকাল। দেখল সেই ধোঁয়াটে ভাব, বেগুনী রঙের ফুল আর মনসা গাছটা। ফ্রান্সিস বলল—জানো হ্যারি ঐ মনসা গাছটাও কাঠের। লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে ওটা করা হয়েছে।'

সামনেই বিস্তৃত প্রান্তর। ঘোড়া ছুটল পূর্বদিক লক্ষ্য ক'রে। গেরুয়া পাহাড়ের উদ্দেশ্যে।

সমাপ্ত

এই পর্বের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি

সোনার ঘণ্টা ★ হীরের পাহাড় ★ মুক্তোর সমুদ্র ★ তুষারে গুপ্তধন ★ রূপোর নদী ★ মণিমাণিক্যের জাহাজ।

এই পর্বের পরবর্তী অধ্যায়গুলি

চিকামার দেবরথী ★ চুনীপান্নার রাজমুকুট ★ কাউন্ট রজারের গুপ্তধন ★ যোদ্ধামূর্তির রহস্য ★ রাণীর রত্নভাণ্ডার।

মণিমানিক্যের জাহাজ



পথে কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে ফ্রান্সিস, হ্যারি আর শাঙ্কো সারাদিন ঘোড়া ছোটাল। পথপ্রদর্শকটি পাঁচ দিনেই ওদের গেরুয়া পাহাড়ে পৌঁছে দিল। তারপর চলে গেল নিজের দেশে।

গেরুয়া পাহাড়ে ওরা যখন পৌঁছল তখন বিকেল। একটু দূরেই সমুদ্রে জাহাজ ভাসছে। শাঙ্কো একটা ছোট পাথররের ওপর উঠে চিৎকার করে ডেকে বলল—'ভাইসব, আমরা এসেছি।' জাহাজের ডেক-এ দু'তিনজন ভাইকিং দাঁড়িয়েছিল। তারা শাঙ্কোর ডাক শুনল। ফ্রান্সিসদের দেখতে পেল। ওরা চীৎকার চ্যাঁচামেচি করে বাকি বন্ধুদের ডাকাডাকি শুরু করল। ফ্রান্সিসের শরীরের দুর্বলতা তখনও কাটেনি। তার ওপর এত দূর পথ ঘোড়া ছুটিয়ে আসা। ও একটা পাথরের ওপর শুয়ে পড়ল। হ্যারিও বসল ওর পাশে। একটু পরেই কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু এল। দুর্বল ফ্রান্সিসকে দু'তিনজন ধরে নিয়ে চলল। পেছনে হ্যারি আর শাঙ্কো। জলে নামতে হলো সবাইকে। কারণ জাহাজে ফেলা কাঠের পাটাতন মাটিপাথর পর্যন্ত আসেনি। ফ্রান্সিসকে কাঁধে করে নিয়ে চলল। পাটাতন দিয়ে হেঁটে চলল।

ফ্রান্সিসরা জাহাজে উঠতেই ওরা কী এনেছে দেখবার জন্যে বন্ধুরা সবাই ওদের ঘিরে ধরল। শাঙ্কো থলে থেকে বের করে কোয়েতজাল দেবতার অতি সুন্দর মূর্তিটা দেখাল। সবাই অবাক। বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল মূর্তিটা। তারপরই চিৎকার করে উঠল—'ও—হো—হো।' সবাই জানতে চায় সমস্ত ঘটনা। ফ্রান্সিস বলল—'আমরা ভীষণ পরিশ্রান্ত। পরে তোমাদের সব বলবো। এখন কিছু খাবার ব্যবস্থা করো। প্রায় উপোস করে আছি।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি কেবিনঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ওখানেই ওদের খেতে দেওয়া হলো। শাঙ্কো কিন্তু তখনও বেশ সতেজ। ওকে ঘিরে ধরল সবাই। শাঙ্কো বিপুল উৎসাহে ওদের বিষাক্ত উপত্যকার গল্প শোনাতে লাগল।

পরদিন সকালেই জাহাজের নোঙর তোলা হলো। পাল খাটানো হলো। জোর হাওয়া বইছে তখন। পালগুলো ফুলে উঠল। জাহাজ চলল ভাইকিংদের দেশের দিকে।

মাসখানেক পরে জাহাজ ভাইকিংদের রাজধানীর জাহাজঘাটায় ভিড়ল।

তখন সকাল। জাহাজঘাটায় লোকজন কম। কেউ ফ্র্যান্সিসদের জাহাজ লক্ষ্যই করল না। কত জাহাজ তো আসে। রাজাকে সংবাদ দিতে একজন ভাইকিংকে পাঠানো হলো। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি চড়ে রাজা, রানী, মারিয়া, মন্ত্রী ও অমাত্যরা এলেন। এইবার জাহাজঘাটায় লোকজন জমতে শুরু করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই জনারণ্যের সৃষ্টি হলো। ওদিকে জাহাজে রাজা, রানী, মারিয়া, মন্ত্রী ও অমাত্যরা রূপোর থাম, কোয়েতজাল দেবতার মূর্তি দেখে সবাই বিস্মিত হলেন। রাজা ঐ

জাহাজের ডেকেই বললেন—'ফ্রান্সিসরা জাহাজ চুরি করেছিল। ওদের সে অপরাধ আমি মার্জনা করলাম।' ফ্রান্সিসের বাবা মন্ত্রীমশাই শুধু মুখে মৃদু শব্দ করলেন—'হুম্।'

রূপোর থাম দুটো রাখা হলো রাজার জাদুঘরে। ফ্রান্সিসের অনুরোধে রাজবাড়ির সামনের চত্বরের কোণায় তৈরি হলো শ্বেতপাথরের একটা ছোট মন্দিরমতো। তাতে স্থাপিত হলো কোয়েতজাল দেবতার মূর্তি। ফ্রান্সিস আর মারিয়া মাঝে মাঝেই আসে মূর্তি দর্শন করতে। ভক্তি জানাতে।

দিন কাটে। খাওয়া ঘুম। তবে এর মধ্যেই যখন বন্ধুরা আসে তখন ফ্রান্সিসের ভালো লাগে। গল্পগুজবে আড্ডা জমে ওঠে। যে সব অভিযানে ওরা গিয়েছিল সেই সব অভিযানের গল্প হয়। উৎসাহে উদ্দীপনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে ওরা। হ্যারি এমনিতেই কম কথা বলে। কিন্তু বিস্কো শাঙ্কোদের উৎসাহ প্রবল। অধৈর্য হয়ে ওঠে ওরা। বলে—'চলো ফ্রান্সিস আবার বেরিয়ে পড়ি।' ফ্রান্সিস হাসে। বলে—উদ্দেশ্যহীন বেড়িয়ে বেড়ানো আর এই ঘরে বসে থাকা—একই। একটা লক্ষ্য তো চাই।' ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকায়। বলে—'কী হলো হ্যারি?' হ্যারি একটু মাথা নেড়ে বলে—'দেখা যাক চেষ্টা করে—অভিযানে বেরোবার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।' বন্ধুদের এই আড্ডায় মারিয়াও আসে মাঝে মাঝে। কিন্তু নতুন অভিযানের ব্যাপারে কোনো কথা বলে না।

এভাবেই দিন কাটছিল। ফ্রান্সিস কোনোদিনই দুপুরে ঘুমোতো না। এখন ঘুমোয়। আশ্চর্য! সেটাই অভ্যেস হয়ে গেল। অবশ্য বেশিক্ষণ নয়। আধ ঘন্টা মতো ঘুমিয়ে উঠতে লাগল। কিছুদিন হলে মারিয়াও এসময় বাড়ি থাকে না। কোথায় যায় কে জানে!

মারিয়া থাকলে তবু গল্প করে সময় কাটতো।

সেদিন বিকেলের দিকে মারিয়া বাড়ি ফিরতে ফ্রান্সিস বলল—'তুমি দুপুরে কোথায় যাও বলো তো?'

—'রাজবাড়িতে।' মারিয়া বলল।

—'কেন'?

—'রাজবাড়ির গ্রন্থাগারে পড়তে যাই।' মারিয়া বলল।

—'তা বইগুলো নিয়ে এসে পড়লেই পারো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'নিয়ম নেই। মারিয়া বলল।

'তোমাদের বাড়িতে গ্রন্থাগার। তোমাকেও নিয়ম মানতে হবে?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয় মানাতে হবে। তাছাড়া ভেড়ার চামড়ায়, পার্চমেন্ট কাগজে লেখা, আঁকা বই। টানা হ্যাঁচড়া করলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

—'হুঁ'। তা এখন কী বই পড়ছো?'

ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—'আইসল্যান্ডের এক একটা বই। প্রায় একশ বছর আগের লেখা। জানো তো আইসল্যান্ডের অধিবাসীরা গীতিকাব্য গল্পকাহিনী ভীষণ ভালোবাসে। আসলে আইসল্যান্ডের অধিবাসীরা তো বেশির ভাগই ভাইকিং—আমাদের দেশের মানুষ। কিছু আছে আয়ারল্যান্ডের আর অন্য দেশের লোক। ওখানকারই একজন কবি নাম থরগিলমন আরি। সংক্ষেপে কবি আরি নামে পরিচিত। তাঁর বই 'আইসল্যান্ডিগা

বক' বা আইসল্যান্ডবাসীদের বই। সেটাই পেয়েছি।'

—'বইটা পড়া হয়ে গেছে?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—'প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভাইকিংরা দলে দলে আইসল্যান্ডে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। সমুদ্রের খাঁড়িতে, নদীতে প্রচুর মাছ। বহুবিস্তৃত তৃণভূমি। কবি আরি বলেছেন, সেই তৃণের প্রতিটি পাতা থেকে যেন মাখন ঝরে পড়ছে। তাহলেই বুঝতে পারছো কী উর্বর সেইসব দিগন্তবিস্তৃত তৃনভূমি। ভাইকিংরা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল ঘোড়া, গরু, ভেড়া যন্ত্রপাতি, অস্ত্র, ধর্মীয় মূর্তি আর আগুন।'

—'হ্যাঁ, অনেকদিন আগে থেকেই অনেক ভাইকিং আইসল্যান্ডে বসতি স্থাপন করেছে। তোমাদের আত্মীয়স্বজনও তাঁদের মধ্যে আছেন।;

—'ঠিক বলেছো। তাঁরাই এক একজন এক একটি অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে রাজা হয়েছেন।' একটু থেমে মারিয়া বলল—'ওসব ইতিহাস থাক। শুধু একজনের কথা বলি। তার নাম ফ্রোকি। তিনি রেভক্জাভিক-এ রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। রাজা হলেও তিনি জীবন শুরু করেছিলেন জলদস্যু হিসেবে। রাজা হয়েও জলদস্যুতা ছাড়েননি। দীর্ঘকাল আইসল্যান্ডের দক্ষিণ সমুদ্রে বিদেশী জাহাজ দখল করেছেন। নির্বিচারে লুঠ করেছেন। এই জলদস্যুতা করে তিনি প্রচুর সোনা মণিমাণিক্য পেয়েছিলেন। কবি আরি বলেছেন—রাজা ফ্রোকি সেই সোনা দিয়ে একটা ছোট্ট জাহাজ তৈরী করিয়েছিলেন। সেই ছোট্ট জাহাজটি বোঝাই করেছিলেন মণিমাণিক্য দিয়ে। তারপর মণিমাণিক্যসুদ্ধ সেই সোনার জাহাজ যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন তা কেউ জানে না।'

ফ্রান্সিস এতক্ষণ বিছানায় আধাশোয়া হয়ে মারিয়ার মুখে গল্প শুনছিল। মণিমাণিক্যসুদ্ধ সোনার জাহাজের রহস্যের কথা শুনে ও লাফিয়ে উঠে বসল। বলল—'দাঁড়াও—দাঁড়াও। সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলো তো।'—'আমি আর নতুন কী বলবো? কবি আরি যা তাঁর বইতে লিখে গেছেন তাই বলছি।' মারিয়া বলল।

—'বেশ, বলে যাও।'

—'এই সোনার জাহাজ রাজা ফ্রোকি কেন লুকিয়ে রেখেছিলেন তা কবি আরি সঠিক বলতে পারেননি। তবে অনুমান করেছেন যে সময় নরওয়ে থেকে অনেক ভাইকিং সমুদ্র পেরিয়ে রেভকজাভিক-এ বসবাস শুরু করেছিল। পাছে সেই সোনার জাহাজের কথা ছড়িয়ে পড়ে, পাছে চুরি হয়ে যায় তাই রাজা ফ্রোকি সেই জাহাজটা লুকিয়ে ফেলেছিলেন।'

—'এই সোনার জাহাজের কথা তখন কি আর কেউ জানতো না।

—'কবি আরি এই সম্পর্কে কিছু বলেননি। তবে যে স্বর্ণকার সেই জাহাজের নক্সা তৈরি করেছিল, তৈরি কবি আরি ঘটনাচক্রে তার খোঁজ পেয়েছিলেন। সেই স্বর্ণকারের নাম থরবার্গ। থরবার্গ তখন মৃত্যুশয্যায়।'

—'আচ্ছা রাজা ফ্রোকি কি তখন বেঁচে ছিলেন?' ফ্রান্সিস বলল।

—'না। ফারো দ্বীপপুঞ্জের কাছে এক জলযুদ্ধে রাজা ফ্রোকি হঠাৎ মারা যান।' মারিয়া বলল।

—'তাহলে থরবার্গ তো সেই নিখোঁজ সোনার জাহাজ উদ্ধার করতে পারতো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'হয়তো পারতো। কিন্তু তার উপায় ছিল না। কারণ তখন থরবার্গ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তার প্রায় বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। কাউকে সব গুছিয়ে বলে যাবার মত অবস্থা তার ছিল না। তাছাড়া সংসারে থরবার্গের কেউ ছিলও না।'

—'হুঁ। তারপর?' ফ্রান্সিস বলল।

—'মুমূর্ষু থরবার্গ কবি আরিকে দিয়েছিল একটু মসৃণ ভেড়ার চামড়া। তার এক পিঠে একটা জাহাজের মুখ নানারঙে আঁকা। অন্য পিঠে একটা ত্রিভুজের মতো আঁকা।'

—'দাঁড়াও দাঁড়াও—' ফ্রান্সিস বলে উঠল—'তুমি দেখেছো সেই ছবি আঁকা চামড়াটা?'

—'হ্যাঁ। কবি আরির ঐ পুরনো বইয়ের মধ্যে আছে।'

—'বইটা তো রাজবাড়ির গ্রন্থাগারে।' ফ্রান্সিস বললো।

—'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা—থরবার্ক ঐ ক্ষুদে জাহাজটার মাপ বলেছিল?'

—'না। তবে ছবিটায় মাপ লেখা আছে পাঁচ ফুট।'

ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে বিছানা থেকে নেমে এল। বলল—'তৈরি হয়ে নাও। আমরা এক্ষুণি রাজবাড়ির গ্রন্থাগারে যাবো।'

—'কী বলছো? সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গ্রন্থাগার কখন বন্ধ হয়ে গেছে।' মারিয়া বলল।

—'তুমি চলো। গ্রন্থাগারিককে অনুরোধ করবো। কিছুক্ষণের জন্য গ্রন্থাগারের মধ্যে যেন যেতে দেন।'

মারিয়া হেসে বলল—'তোমার মাথায় মাঝে মাঝে এমন ভূত চাপে না যে কী বলবো।' মারিয়া এবার উঠতে উঠতে বলল—'তোমার অনুরোধ গ্রন্থাগারিক ফেলতে পারবেন না। কিন্তু তুমি তো সবটা শুনলে না।'

—'যেতে যেতে শুনবো। জলদি তৈরি হয়ে নাও।' ফ্রান্সিস বলল।

ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে দুজনে রাজবাড়ি চলল। ফ্রান্সিস বলল—'এবার বলো।'

মারিয়া বলতে লাগল—'কবি আরি লিখেছেন—মুমূর্ষু থরবার্গ কী যেন বলতে চেয়েছিল। কবি আরি থরবার্গের মুখের কাছে অনেকক্ষন কান পেতে দুটো কথা খুব অস্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছিলেন।'

—'সেই কথা দুটো কী?' সাগ্রহে ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—'সপ্তম স্তম্ভ।' মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস কথা দুটো কয়েকবার আওড়াল—'সপ্তম স্তম্ভ।' তারপর বলল—আচ্ছা আইসল্যান্ডে স্তম্ভ কোথায় আছে?

—'রেভক্‌জাভিকেই আছে। জানো—রেভক্‌জাভিকের চারপাশে সুন্দর পাহাড়। উত্তরের পাহাড়ের নিচে একটা বিস্তৃত সমতলভূমি। সেখানে কয়েকটা স্তম্ভ পোঁতা আছে। রাজা ফ্রোকি সেই স্তম্ভ পুঁতিয়েছিলেন। সেখানে প্রত্যেক মাসের পনেরো তারিখে নাচগানের আসর বসে। এই জায়গাটার নাম লোগবার্গ। কত মানুষ আসে।

মেলা বসে যায় যেন। অনেক রাত পর্যন্ত নাচগান চলে।' মারিয়া বলল।

—'আচ্ছা—ঐ জায়গায় স্তম্ভ কেন পোঁতা হয়েছিল?'

—'কবি আরি বলেছেন—হয়তো রাজা ফ্রোকির ইচ্ছে ছিল ওখানে একটা উপাসনা মন্দির তৈরি করার।'

—'কটা স্তম্ভ পোঁতা আছে ওখানে?' ফ্রান্সিস বলল।

—'আমি তো যাইনি। ঠিক জানি না?' মারিয়া বলল।

রাস্তায় লোকজন। গাড়ি চলেছে। পথের ধারে দোকানপাট, বাড়িতে আলো জ্বলছে। ফ্রান্সিস বলল—'গ্রন্থাগারের চাবি কার কাছে থাকে?'

—'গ্রন্থাগারিকের কাছে।'

—'কোথায় থাকেন উনি?'

—'রাজবাড়ির পূবকোণায়।'

ফ্রান্সিস গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কোচোয়ানকে সেখানে যেতে বলল।

খবর পেয়ে গ্রন্থাগারিক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। মাথা নুইয়ে ফ্রান্সিসকে মারিয়াকে সম্মান জানালেন। বারবার বলতে লাগলেন—'আমি—মানে আপনারা—বুঝতে পারছি না—'

ফ্রান্সিস হেসে বলল—'আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। গ্রন্থাগারের চাবিটা নিয়ে আমাদের সঙ্গে আসুন। গ্রন্থাগারে আমরা একটু পড়াশুনা করবো।'

—'নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই।' গ্রন্থাগারিক প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। ছুটলেন চাবি আনতে।

গ্রন্থাগারের পাহারাদার দরজার কাছেই পাহারা দিচ্ছিল। ফ্রান্সিসদের দেখে অবাক। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল। গ্রন্থাগারিক ওকে আলো নিয়ে আসতে বললেন। পাহারাদার একটা মোটা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে এল। বিরাট দরজার বড় তালাটা গ্রন্থাগারিক খুললেন। ঘরঘর শব্দে দরজাটা খুলল। সকলে ভেতরে ঢুকল। গ্রন্থাগারিক বললেন—'কি বই পড়বেন আপনারা?'

—'আইসল্যান্ডের কবি আরির বই।' ফ্রান্সিস বলল।

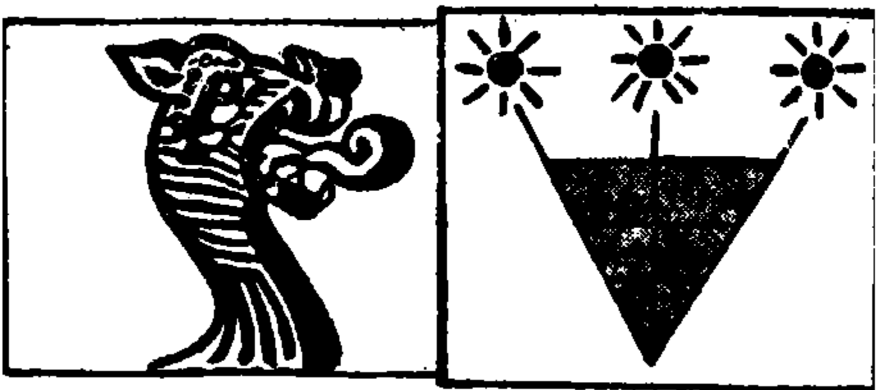
—'কবি আরি ছাড়াও আইসল্যান্ডের লেখক পলিরিয়াস, স্ল্যাবো,—

বাধা দিয়ে ফ্রান্সিস বলে উঠল—'না না—শুধু আরির বই পড়বো। মারিয়া জানে বইটা কোথায় আছে। আলোটা রেখে আপনারা কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যান।'

—'নিশ্চয়-নিশ্চয়—।' গ্রন্থাগারিক বললেন। তারপর পাহারাদারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

মারিয়া মোমবাতিটা হাতে নিয়ে এগোল। চারপাশে কাঠের পাটাতনে নানা আকারের হাতে লেখা বই রয়েছে। মারিয়া একটা বড় আকারের চৌকোণা বইয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। মোমবাতিটা রাখল। দেখা গেল বইটা সিন্ধুঘোটকের মোটা চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা। মারিয়া মোটা মলাট ওল্টাল। বইয়ের নাম লেখা—"আইসল্যান্ডিগা বর্ক"। মোটা পার্চমেন্ট কাগজের বেশ কিছু পাতা উল্টে সেই ভেড়ার সাদা চামড়ায় আঁকা রঙ করা ছবিটা বের করল। ফ্রান্সিস খুব মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল। এটা একটা জাহাজের মুখ। নানা রঙে আঁকা। ছবিটা

দেখতে এরকম—নিচে লেখা 'দীর্ঘ সর্প'। পাঁচ ফুট লম্বা এক ফুট চওড়া। ফ্রান্সি



বুঝল ঐ জাহাজটার ক্ষুদে মাপ এটা। জাহাজের মুখের ছবিটার পেছনের পাতা আঁকা একটা ত্রিভুজের মতো।

ফ্রান্সিস খুব মনোযোগ দিয়ে ছবির ত্রিভুজটা দেখল। জাহাজের ব্যাপারটা বুঝল জাহাজটার নাম 'দীর্ঘ সর্প।' জাহাজের পুরো ছবি নেই। আছে শুধু সামনের মুখটা কিন্তু অন্য পিঠের ত্রিভুজটার কোনো অর্থই বুঝতে পারল না। এই ত্রিভুজটা আঁকা মানে কি? ফ্রান্সিস ছবি দুটো বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। মারিয় ঐ ছবি দুটো আগেই দেখেছিল। এবার বলল—'চলো—দেরি হয়ে যাচ্ছে; গ্রন্থাগারিক মশাই অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।'

ফ্রান্সিস ছবিটা থেকে মুখ তুলল। কোনো কথা না বলে মারিয়ার মাথার চুলে হাত দিয়ে কি দেখতে লাগল। মারিয়া অবাক।

—'কী ব্যাপার?' মারিয়া বলল।

—'তোমার মাথার চুলে গাঁথা এই কাঁটাটা খুলে দাও তো।' ফ্রান্সিস বলল তারপর চ্যাপ্টামতো সোনার কাঁটাটা দেখাল। মারিয়া আর কিছু বলল না। কাঁটাটা চুল থেকে খুলে দিল। ফ্রান্সিস দিয়ে বইয়ের পাতলা চামড়াটা কাটতে লাগল চ্যাপ্টা মতো কাঁটাটা মারিয়া ওর কান্ড দেখে চাপা স্বরে বলে উঠল—'এই —কী করছো?'

—'চুরি। বইয়ের এই ছবির পাতাটা আমার চাই।' ফ্রান্সিস বলল। ততক্ষণে পাতাটা কাটা হয়ে গেছ। ফ্রান্সিস বলল—'এটা তোমার পোশাকের আড়ালে নিয়ে চলো।'

—'কী কান্ড—তুমি—।' মারিয়া কথাটা আর শেষ করতে পারল না।

ফ্রান্সিস বলল—'চুপ। চলো।'

ওরা দরজার কাছে এল। গ্রন্থাগারিক ও পাহারাদার এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—'দেখুন—সব পড়া হলো না। পরে আসবো।'

—'অবশ্যই, অবশ্যই।' গ্রন্থাগারিক বললেন। এদিকে মারিয়া কোনোরকমে ছবির ছেঁড়া পাতাটা পোশাকের আড়ালে চেপে ধরে আছে। এই শীতেও মারিয়া ঘেমে উঠেছে। যদি ছবিসুদ্ধ ধরা পড়ে, লজ্জা অপমানের আর শেষ থাকবে না।

গাড়িতে উঠে মারিয়া ছবির পাতাটা ফ্রান্সিসকে দিল। বলল—'উফ্—কী কান্ড তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকে চোর বানালে?' ফ্রান্সিস হো হো করে হেসে উঠল

—'কী দরকার ছিল চুরি করার? বাবাকে বললেই পারতে।' মারিয়া বলল।

—'আমি এখন কাউকে এই ছবির কথা জানাতে চাইনা। তাই—।' ফ্রান্সিস বলল—'তাছাড়া ছবি আর ত্রিভুজটা নিয়ে ভাবতে হবে তো। তাই হাতের কাছে রাখবো।'

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস ও মারিয়া শোবার ঘরে এল। ফ্রান্সিস বলল—'মারিয়া, তুমি ঘুমোও।'

—'তুমি শোবে না?'

—'না—আমাকে এই ছবিটা খুব ভাবিয়ে তুলেছে।'

—'তুমি এটা নিয়ে ভাববে, ঘুমুবে না আর আমি নাক ডাকিয়ে ঘুমুবো? অসম্ভব।' মারিয়া বলল।

—'বেশ, তাহলে এসো সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা যাক।' দু'জনে বিছানায় বসল।

ফ্রান্সিস ছবিটা বিছানায় পাতল। রূপোর ঝকঝকে মোমবাতিদানটা বিছানায় রাখল। এবার খুব মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল। একটু পরে বলল 'আচ্ছা মারিয়া—কবি আরি স্তম্ভ সম্পর্কে কী লিখছে?'

—'লিখেছেন যে মণিমাণিক্য বোঝাই সেই সোনার জাহাজের সঙ্গে স্তম্ভগুলোর একটা সম্পর্ক আছে। কারণ, স্বর্ণকার থরবার্গ মরবার আগে—'সপ্তম-স্তম্ভ' এই কথা দুটো বহুকষ্টে বলতে পেরেছিল। কিন্তু সম্পর্কটা যে কী তা কবি আরি নিজে বুঝে উঠতে পারেননি। সবটাই অনুমান।' মারিয়া বলল।

—'হুঁ।' ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর বলল—'দেখো—জাহাজের মুখের ছবিটায় কোনো রহস্য আছে কি নেই এটা ঠিক এখুনি বলা যাচ্ছে না। তবে আমার মনে হয় পেছনের ত্রিভুজটার রহস্য খুব গভীর। মণিমাণিক্য-বোঝাই ঐ স্বর্ণজাহাজটা কোথায় গোপনে রাখা হয়েছে তার হদিস পাওয়া যাবে ঐ ত্রিভুজটা থেকে।'

এবার মারিয়া ঝুঁকে পড়ে। 'ত্রিভুজের মতো ছবিটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে বলল—'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো?'

—'হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না ঐ তিনটে চিহ্নের অর্থ কি?' ফ্রান্সিস বলল।

এবার মারিয়া বলল—'সাপের মুখের মতো এই ছবিটায় একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো?'

—'কী?' ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া বলল—'ত্রিভুজের ওপরের দিকে তিনটে চিহ্ন।'

—'হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না ঐ তিনটে চিহ্নের অর্থ কী?' ফ্রান্সিস বলল।

এবার মারিয়া বলল—'সাপের মুখের মতো এই ছবিটায় একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো.'

—'কী?'

—'সাপের মাথার দিকে সাতটা মণির মতো চিহ্ন।'

—'বলো কী?' ফ্রান্সিস চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি ছবিটা নিয়ে দেখতে দেখতে

থিংভেলিরে লোকজন জড় করে রাজা হয়ে বসেছে।' রাজা বললেন।

—'কিন্তু আমরা তো যাচ্ছি রেভ্‌কজাভিকে।' ফ্রান্সিস বলল।

—'হ্যাঁ, রেভকজাভিকের রাজা এখন ইনগল্‌ফ। ইনগল্‌ফ আমাকে বরাবরই সম্মান করে। ওকে আমি চিঠি লিখে তোমার হাতে দেবো, ও তোমাদের সমাদর করবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে যে সপ্তাহখানেক আগে ইনগল্‌ফ আমাকে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছে যে গুমন্ড নাকি ওর রাজ্য আক্রমণ করার জন্যে তোড়জোড় করছে। এ সময় তোমরা যাবে তাই ভাবছি তোমরা না বিপদে পড়ো।' রাজা বললেন।

—'আমরা যাতে যুদ্ধে না জড়িয়ে পড়ি সে চেষ্টাই করবো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'ঠিক আছে—তোমরা যা ভালো বুঝবে করবে।'

—'আমাদের একটা ভালো জাহাজ দিতে হবে।' ফ্রান্সিস বলল।

—'বেশ।' রাজামশাই বললেন।

—'যাত্রার দিনটা পরে আপনাকে জানাবো;। ফ্রান্সিস বলল।

—'আচ্ছা'—রাজা বললেন।

ফেরার পথে ফ্রান্সিস হ্যারির বাড়ি গেল। হ্যারি সব শুনে লাফিয়ে উঠল—আবার অভিযান। ঠিক হলো হ্যারি বিস্কো, শাঙ্কো আর অন্য বন্ধুদের খবর দেবে। পরদিন বিকেলে ফ্রান্সিসের বাড়িতে মিলিত হবে সবাই।

বিকেলে প্রায় সব বন্ধুই এল। গল্পগুজবে আড্ডা জমে উঠল। একসময় ফ্রান্সি উঠে দাঁড়াল। সবাই চুপ করল। ফ্রান্সিস বলল—'ভাইসব—আবার অভিযানে বেরুবো আমরা। এবারের গন্তব্যস্থল—আইসল্যান্ড।' তারপর ফ্রান্সিস কবি আরির বই, ছবি নক্‌শা, রাজা ফ্রোকির গুপ্তধন, মণিমাণিক্য-বোঝাই জাহাজ, সপ্তম স্তম্ভ সব কথাই বলল। সবশেষে বলল—'ভাইসব, দুটো সুসংবাদ দিচ্ছি—এক—রাজামশাই আমাদের জাহাজ দেবেন—ভাল জাহাজ, আর দুই—এই অভিযানে মারিয়াও আমাদের সঙ্গে যাবে।' সব ভাইকিং বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল—'ও-হো-হো—।' তারপর আলোচনা করে স্থির হলো, পাঁচ তারিখে ওরা জাহাজ নিয়ে অভিযানে বেরুবে।

দেখতে দেখতে পাঁচ তারিখ এসে গেল। এর মধ্যে সবাই গরম জামাকাপড় কিনল। খাদ্য অস্ত্রশস্ত্র সব যোগাড় করে রাখল। গ্রীনল্যান্ডে ওরা এর আগে এক অভিযানে গিয়েছিল। কাজেই শীতের দেশ সম্পর্কে ওদের অভিজ্ঞতা আছে। তাছাড়া—আইসল্যান্ড গ্রীনল্যান্ডের মতো সবসময় বরফে ঢেকে থাকে না।

যাত্রার দিন একটা সুদৃশ্য মজবুত জাহাজ জাহাজঘাটায় আনা হলো। ফ্রান্সিসরাও তখন সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস—কম্বল, বেলচা, দড়ি এসব জাহাজে রাখল। তারপর খাদ্য-জল।

জাহাজঘাটায় একটা সুন্দর সামিয়ানা টাঙিয়ে তার নিচে রাজবাড়ি থেকে আনা চেয়ার-টেবিল রাখা হলো। মারিয়া, ফ্রান্সিস ও বন্ধুরা জাহাজে উঠল। ডেক-এ এসে দাঁড়াল। রাজা,মন্ত্রী ও অন্যান্য গণ্যমান্য অমাত্যরা সামিয়ানার নিচে এসে বসলেন। কামান দাগা হলো। ঘর ঘর শব্দে নোঙর তোলা হলো। ফ্রান্সিসদের জাহাজ গভীর সমুদ্রের দিকে ভেসে চলল।

দিন সাতেকের মধ্যে জাহাজ ফারো দ্বীপে পৌঁছল। সেখান থেকে দক্ষিণ আইসল্যান্ডের বন্দর অলিম্পটাজর্ড-এ পৌঁছল।

আলোর দেশ ছেড়ে এবার ফ্রান্সিসরা অন্ধকারের দেশে পৌঁছল। সত্যি চারিদিকে নিকষ অন্ধকার নয়, শেষ বিকেলের ম্লান-আলোর মত আকাশে মাটিতে আলো ছড়ানো। তাতে কাছাকাছি সবকিছুই অস্পষ্ট হলেও দেখা যায়। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। সবাই বাড়তি গরম পোশাক গায়ে পরে নিল।

কিছুদিন পরে ফ্রান্সিসদের জাহাজ রেভক্জাভিক বন্দরে পৌঁছল। রেভক্জাভিক বেশ বড় বন্দর। বেশ কটা জাহাজ নোঙর করা। মারিয়া ফ্রান্সিসকে বলল— 'রেভক্জাভিক কথাটার অর্থ হলো বাষ্পাচ্ছন্ন উপসাগর।'

ফ্রান্সিস বিস্কোকে ডাকল। ওর হাতে রাজার চিঠিটা দিল। বলল—'এখানকার রাজা ইনগল্ফের হাতে চিঠিটা পৌঁছে দাও।' বিস্কো চিঠি নিয়ে চলে গেল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা জাহাজ থেকে নেমে জায়গাটা দেখতে লাগল। বেশ কিছু বাড়িঘর আছে। বাড়িঘর সবই পাথরে তৈরি, ছাদ মোটা ঘাসের আস্তরণে তৈরি, রাস্তায় লোকজনের ভিড়। প্রায় সবাই ভাইকিং। দোকানপাট, কড মাছের গুদাম এসব আছে। বাড়িগুলো লম্বাটে। লম্বা ঘর। দু'পাশের দেয়ালে কাঠের পাটাতন। শোয়া, রান্না করা ঐ পাটাতনেই। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা ঘুরেফিরে বন্দরটা দেখতে লাগল। তখনই ওরা দেখল পথ দিয়ে ঘোড়ায় টানা একটা বেশ জমকালো গাড়ি আসছে। গাড়ির কালো চকচকে কাঠে সোনালী লতাপাতার কাজ। ওরা বুঝল রাজা ইনগল্ফ চিঠি পেয়ে আসছেন। ওরা তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরে এল।

রাজার ঘোড়ার গাড়ি জাহাজঘাটায় এসে থামল। রাজা ইনগল্ফ আর রাণী দু'জনেই এসেছেন। ফ্রান্সিস আর মারিয়া জাহাজ থেকে নেমে এল। রাজা ও রানীকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। রাজা ইনগল্ফ ফ্রান্সিসকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—'ফ্রান্সিস, চারণ কবিদের গানে তোমার নানা বীরত্বের কাহিনী শুনেছি। তুমি আমাদের দেশে এসেছো এ জন্যে আমরা গর্ব অনুভব করছি।' ফ্রান্সিস মৃদু হেসে চুপ করে রইল। ওদিকে রানীও মারিয়ার সঙ্গে নানা কথা বলতে লাগলেন। কেমন লাগছে এ দেশ—আসতে কষ্ট হয়েছে কিনা—এসব।

একটু পরে রাজা-রানীর সঙ্গে গাড়িতে চড়ে ফ্রান্সিস ও মারিয়া রাজবাড়িতে এল। রাজবাড়িটাও পাথরের। বেশ বড়। চারদিকে পাথরের দেয়াল।

একটা ঘর ফ্রান্সিস ও মারিয়াকে ছেড়ে দেওয়া হলো। খুব সাজানো-গোছানো পাথরের ঘর। দেয়ালে পাথর কেটে ফুল লতাপাতার কাজ।

একসময় ফ্রান্সিসদের খাবারঘরে আসার জন্যে বলতে একজন পরিচারক এল। ওরা তার সঙ্গে চলল।

ওরা দু'জনে খাবার ঘরে ঢুকল। একটা লম্বাটে বেশ বড় মসৃণ পাথরের খাবার টেবিল। ধারে ধারে কারুকাজ করা ও কাঠের চেয়ার পাতা। রাজা-রানী তাঁদের পাশেই ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে বসালেন। মন্ত্রী, সেনাপতি ও অন্য অমাত্যরাও এসে বসলেন। পরিবেশনকারীরা খাবার পরিবেশন করতে লাগল। খাওয়া-দাওয়া চলল। রাজা ইনগল্ফ ফ্রান্সিসকে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—'রাজামশাইর চিঠিতে তোমরা আসছো এটা জেনেছি। কিন্তু তোমরা কেন এসেছো সেটা উনি লেখেননি।'

ফ্রান্সিস তখন আস্তে আস্তে কবি আরির 'আইসল্যানিগা বক'-এর কথা রাজা ফ্রোকি কর্তৃক গোপনে লুকিয়ে রাখা মণিমাণিক্য-বোঝাই সোনার জাহাজ এসবের

কথা বলল।

রাজা ইনগল্‌ফ বললেন—'তোমরা কি সেই গুপ্তধন খুঁজে বের করতে চাও?'

—'হ্যা, আমরা সেজন্যেই এসেছি।' তারপর ফ্রান্সিস বলল—'এখানে কোথায় পনেরো দিন পর পর নাচগানের আসর বসে?'

—'ও, বুঝেছি। ঐ জায়গাটা কাছেই। উত্তরে যে পাহাড়টা আছে তার নিচে। জায়গাটার নাম লোগবার্গ।' রাজা বললেন।

—'ওখানে কি কয়েকটা স্তম্ভ আছে?' ফ্রান্সিস বলল।

—'হ্যাঁ।' রাজা বললেন।

—'ক'টা স্তম্ভ আছে?' ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—'ছ'টা। ঐ স্তম্ভগুলোর নিচেই নাচগানের আসর বসে।'

—'আমি আর মারিয়া কালকে দেখতে যাবো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'ঠিক আছে। তোমাদের গাড়ি দেওয়া হবে।' রাজা বললেন।

—'আচ্ছা—থিংভেলির রাজা গুমন্ড কি আপনার রাজ্য আক্রমণ করার জন্যে তৈরি হচ্ছে?' ফ্রান্সিস বলল।

রাজা ইনগল্‌ফ একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—'হ্যাঁ। এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। দু' দু'বার ওরা আক্রমণ করেছিল। হেরে পালিয়ে গেছে। এবার আক্রমণ করলে কী হবে জানি না।'

ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল—'আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। তবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে অবশ্যই আপনার পক্ষে যোগ দেবো।'

রাজা ইনগল্‌ফ খুব খুশি হলেন। বললেন—'তোমরা যাতে রাজা ফ্রোকির গুপ্তধন খুঁজে বের করতে পারো তার জন্যে তোমাদের আমি যথাসাধ্য সাহায্য করবো।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে ফ্রান্সিস ও মারিয়া নিজেদের ঘরে এল। ফ্রান্সিস বলল—'বুঝলে মারিয়া—ওখানে ছ'টা স্তম্ভ আছে। তার মানে আর একটা স্তম্ভ, মানে সপ্তম স্তম্ভটা ওখানেই কোথাও আছে।'

মারিয়া বলল—'তাহলে দেখা যাচ্ছে সাত সংখ্যাটা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' 'হুঁ।' ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। বলল—'চলো কালকে লোগবার্গের স্তম্ভ দেখতে যাবো।'

পরদিন ফ্রান্সিস আর মারিয়া গাড়ি চড়ে লোগবার্গে গেল। তারপর মাটিতে পোঁতা স্তম্ভগুলোর কাছে এসে দাঁড়াল। উত্তরদিকে একটা ছোট পাহাড়। তার নিচে এই সমতল ঘাসে ঢাকা জায়গাটা। এক সারিতে তিনটে স্তম্ভ আর এক সারিতে তিনটে স্তম্ভ। গোল। পাথর কেটে স্তম্ভগুলো তৈরি করা হয়েছে। বেশি মোটা নয়। মাটিতে পোঁতা হয়েছে। ফ্রান্সিস স্তম্ভগুলোর গায়ে হাত দিয়ে দেখল মসৃণ। স্তম্ভ কুঁদে কুঁদে কিছু ফুল, পাখি লতাপাতার নক্সা আঁকা হয়েছে। স্তম্ভগুলোর রঙ সাদাটে। মোট ছ'টা স্তম্ভ। কিন্তু সপ্তম স্তম্ভটা কোথায়? ফ্রান্সিস ঐ সমতল ভূমির চারদিকে তাকাল। অল্প আলোয় যতদূর দৃষ্টি যায় আর কোনো স্তম্ভ নেই। মারিয়া ঘুরে ঘুরে স্তম্ভগুলো দেখছিল। গোল স্তম্ভগুলো বেশি উঁচু নয়। দেড় মানুষ উঁচু। প্রথম স্তম্ভগুলোর প্রতিটির সামনে হাত পাঁচ-ছয় উঁচু চৌকোনো পাথরের থামের মতো। থামের মাথাটা গোল। গোলের মুখের দিকটা কিছুটা বেরিয়ে আছে। মারিয়া

ঠিক বুঝল না এগুলো কী? ফ্রান্সিসকে ডেকে বলল—'এই চৌকোণো থামের মতো এগুলো কী?' ফ্রান্সিস কাছে এল। চৌকোণো থামগুলো দেখল। কিন্তু ও নিজেও বুঝতে পারল না। মাথা নাড়ল।

ওরা দু'জনে ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল। তখনই ফ্রান্সিস দেখল কিছুদূরে পাহাড়ের নিচে একটা পাথরের ঘর। ছোট ঘর। ঘরটায় ছাউনি এখানকার রীতি অনুযায়ী মোটা শুকনো ঘাসের। ফ্রান্সিস তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ঘরটা থেকে একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। লোকটার মুখের দাড়ি-গোঁফ, মাথার চুল সব সাদা।। একটা লম্বা কাঠের মাথায় ঝাঁটা বাঁধা। সেটা লোকটার কাঁধে। বৃদ্ধটি ঝাঁটা নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে ফ্রান্সিস আর মারিয়ার কাছে এল। একবার ওদের দেখল। তারপর স্তম্ভপোঁতা জায়গাটা ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগল। মারিয়া এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—'এ জায়গাটা পরিষ্কার করছেন কেন?'

বৃদ্ধটি সাদা ভুরু কুঁচকে মারিয়ার দিকে তাকাল। পাকা দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে হাসল। বলল—'তোমরা বুঝি নতুন এসেছো?'

—'হ্যাঁ।' মারিয়া বলল।

—'আজকে পনেরো তারিখ। ঘন্টাকয়েক পরে এখানে নাচগানের আসর বসবে।' বৃদ্ধ বলল।

'প্রত্যেক পনেরো তারিখই নাচগান হয় এখানে তাই না?' মারিয়া বলল।

—'হ্যাঁ—আর আমার কাজ হলো সেদিন এই জায়গাটা ঝাঁটটাট দিয়ে পরিষ্কার রাখা আর উৎসবের সময় প্রদীপ জ্বালানো।'

কথাটা শুনে ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। বলল—'এখানে প্রদীপ কোথায়?'

বৃদ্ধটি আঙুল দিয়ে চৌকোণো থামগুলো দেখাল। বলল—'ঐ তিনটে প্রদীপ। মোটা কাপড় পেঁচিয়ে পলতে তৈরি করি। তারপর প্রদীপগুলোর মাথায় শীল মাছের তেল ঢালি। প্রদীপ জ্বালিয়ে দিই। এই কাজগুলো করাই আমার চাকরি।' বৃদ্ধটি আবার ঝাঁট দিতে লাগল। ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে পাথরের প্রদীপগুলো দেখল। দেখল সত্যিই বড় প্রদীপের মতো ওগুলো। ওগুলোর মাথায় তেলকালি লেগে আছে।

—'আপনি কতদিন এই কাজ করছেন?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

বৃদ্ধটি সাদা ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বলল—'সেই কতদিন থেকে—মনে নেই।'

—'আচ্ছা আপনি কি বরাবর এই ছ'টা স্তম্ভই দেখেছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'সপ্তম স্তম্ভের কথা শুনেছেন কখনও?'

বৃদ্ধ একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—'আমার আগে যে এখানে কাজ করতো, কথায় কথায় সে একদিন বলেছিল এখানে রাজা ফ্রোকি আর একটা স্তম্ভ পুঁতেছিলেন। তবে সেটা পাথরের না, সোনার।

কথাটা শুনে ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলল—'আর কী বলেছিল?'

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল—'না, আর কিছু না।' তারপর নিজের কাজ করতে লাগল।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ স্তম্ভ, প্রদীপ, ঘাসে ঢাকা জায়গাটা দেখল। কিন্তু কিছুই বুঝে

উঠতে পারল না। এই স্তম্ভগুলোর সঙ্গে মণিমাণিক্য-বোঝাই সোনার জাহাজের সম্পর্ক কী? আরো একটা সোনার স্তম্ভ নাকি আছে। সেটাই বা কোথায়? তবে একটা কথা ফ্রান্সিস বুঝল যে এই স্তম্ভগুলোর সাহায্যেই সপ্তম স্তম্ভটা খুঁজে বার করতে হবে। তাহলেই রাজা ফ্রোকির গুপ্তধনের হদিস পাওয়া যাবে।

দু'জনে গাড়িতে চড়ে রাজবাড়িতে ফিরে এল।

খাওয়া-দাওয়ার সময় ফ্রান্সিস রাজা ইনগল্ফকে বলল—'এবার আমরা জাহাজে ফিরে যাবো।'

রানী বলে উঠলেন—'উহুঁ—তোমরা এখানেই থাকবে।'

—'তাহলে এক কাজ করা যাক—' ফ্রান্সিস বলল—'মারিয়া এখানে আপনার কাছে থাক। আমাকে জাহাজে বন্ধুদের সঙ্গে থাকতেই হবে।'

—'বেশ—তাতে আমাদের আপত্তি নেই।' রাজা বললেন।

—'আজকে লোগবার্গের উৎসবে তোমরা যাবে না?' রানী বললেন।

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবো। বন্ধুদেরও নিয়ে যাবো। মারিয়া এখান থেকে আপনাদের সঙ্গে যাবে।' ফ্রান্সিস বলল।

রাজার দেওয়া গাড়িতে চড়েই ফ্রান্সিস জাহাজঘাটায় এল। জাহাজে উঠতেই বন্ধুরা ওকে ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস বলল—'সবাই তৈরি হয়ে নাও। একটু পরেই আমরা লোকবার্গ যাবো। আজ ওখানে উৎসব। নাচগানের আসর বসবে।'

সব ভাইকিংরা হৈ হৈ করে উঠল। সবাই খেয়েদেয়ে তৈরি হতে চলে গেল।

স্থানীয় চাষীদের কয়েকটা শস্যটানার গাড়ি যোগাড় করা হলো। ঘোড়াও পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস আর ওর বন্ধুরা গাড়িতে আর ঘোড়ায় চড়ে হৈ হৈ করতে করতে চলল লোগবার্গের দিকে। যাবার সময় দেখল এই বন্দর নগরের রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছে। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে উৎসবে যোগ দিতে। চারদিকে উৎসবের আবহাওয়া।

ওরা লোগবার্গ পৌঁছল। তখন অল্প অন্ধকারে পাথরের তিনটি বড় প্রদীপ জ্বালাবার কাজ চলছে। সেই বৃদ্ধটি সাদা মোটা লম্বা কাপড় পেঁচিয়ে পলতে তৈরি করল। তারপর একটা ছোট কাঠের মই প্রদীপস্তম্ভের গায়ে লাগাল। মইয়ে উঠে লম্বা আর মোটা পলতে প্রদীপে রাখল। পলতের মুখটা বাড়িয়ে রাখল। এবার লোকটি একটা শীল মাছের তেলের পিপে নিয়ে এল। মই দিয়ে উঠে তিনটে প্রদীপেই তেল ঢালল। তারপর চকমকি ঠুকে একটা মশাল জ্বালল। মশালের আগুন দিয়ে প্রদীপগুলো জ্বেলে দিল। প্রদীপগুলো ভালো করে জ্বলে উঠতেই জায়গাটা আলোয় আলোময় হয়ে উঠল।

অনেক লোক এসেছে। পাহাড়ের খাঁজকাটা পাথরে বসেছে সবাই। ওই পাথরগুলোতে বসে সাধারণ দর্শকরা। ওখানেই সামনের দিকে একটা বড় পাথরের বেদীমতো। বেদীতে পাথর কুঁদে ফুল পাতা পাখির ছবির অলঙ্করণ। একটু পরেই খয়েরী রঙের সুদৃশ্য একটা মাথা খোলা গাড়িতে চড়ে রাজা ইনগল্ফ ও রানী এলেন। রানীর পাশে মারিয়া। রাজা-রানী উৎসবের সাজে সেজে এসেছেন। মারিয়াও একটা হাল্কা সবুজ রঙের নতুন পোশাক পরে এসেছে। রাজা-রানী ও মারিয়া

সেই কাজ-করা বেদীতে বসল। দর্শকরা সমস্বরে রাজার জয়ধ্বনি দিল। ততক্ষণে ফ্রান্সিসরাও খাঁজকাটা পাথরের আসনে বসে পড়েছে।

সেই বৃদ্ধ লোকটি আরো দু'তিনজনের সাহায্যে একটা লতাপাতা বোনা মোটা বিরাট কাপড় নিয়ে এল। স্তম্ভগুলোর পেছনে ঘাসের জমিতে সেটা পেতে দিল ওরা।

স্তম্ভের একপাশে তিন-চারটে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাদ্যযন্ত্রীরা বসল। শুরু হলো বাজনা। আইসল্যাণ্ডের নানা রঙের সুতোয় কাজ-করা পোশাক পরে একদল মেয়ে এসে দাঁড়াল নাচের জায়গায়। একটি মেয়ে এগিয়ে এসে সুরেলা গলায় বাজনার সঙ্গে গান ধরল। শুরু হলো নাচ। অন্য মেয়েরা দল বেঁধে, কখনও হাত ধরাধরি করে, কখনও হাত ছাড়িয়ে নাচতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আসর জমে উঠল। দর্শকরা মাঝে মাঝে চিৎকার করে নাচিয়েদের উৎসাহিত করতে লাগল। একসময় নাচ-গান থামল।

এবার রাজা-রানী আসন ছেড়ে উঠলেন। সবাই উঠে দাঁড়াল। রাজা ও রানী তাঁদের ঘোড়ার গাড়ির দিকে চললেন। পেছনে মারিয়া। তাঁরা গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি চলল। সুন্দর পোশাক পরা চারজন দেহরক্ষী ঘোড়ায় চড়ে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলল।

আবার শুরু হলো বাজনা-নাচগান। দর্শকদের মধ্যে থেকেও কিছু লোক গিয়ে নাচের আসরে যোগ দিল। আনন্দ হর্ষধ্বনি উঠল দর্শকদের মধ্যে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে নাচগান চলল। তারপর উৎসব শেষ হলো। দর্শকরা উঠে দলে দলে গাড়িতে চড়ে, পায়ে হেঁটে ফিরে চলল। ফ্রান্সিসরাও ফিরে চলল বন্দরের দিকে।

ওদিকে লোগবার্গের উৎসব থেকে রাজা-রানী ও মারিয়া ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ফিরে আসছে রাজবাড়িতে।

রাজা ইনগল্ফের গাড়ি চলেছে। সামনে দু'জন ও পেছনে দু'জন অশ্বারোহী দেহরক্ষীও চলেছে। রানী হেসে মারিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন—'কী? উৎসব কেমন লাগল?'

'খুব ভালো। বিরাট পাথরের প্রদীপের আলোয় এরকম নাচগান—অপূর্ব।' মারিয়া বলল।

অল্প আলোয় গাড়ি চলেছে। একটু কুয়াশার জটলা এখানে ওখানে। গাড়ি একটা মোড়ে এল। এখানে দুটো রাস্তা। একটা চলে গেছে বন্দর শহরের দিকে। রাজবাড়ির দিকে। অন্য রাস্তাটা সোজা চলে গেছে এ রাজ্যের সীমান্তের দিকে। সীমান্ত পেরিয়েই থিংভেলির রাজ্য। সেই রাস্তাটা খুব ভালো নয়। এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে রাস্তা। এ রাস্তাটায় লোকজন গাড়িঘোড়ার চলাচলও কম। রাস্তার মাঝখানে দু'পাশে কোথাও কোথাও তুষার জমেছে।

ঠিক মোড়টায় হঠাৎ ঘন কুয়াশা গাড়িটাকে ঘিরে ধরল। একে আলো কম, তার ওপর কুয়াশা। গাড়ির চালক গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। গাড়িটা শহর ও রাজবাড়ি যাওয়ার পথটা ধরবে, ঠিক তখনই কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এল একদল অশ্বারোহী সৈন্য। গাড়িটাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল। গাড়ির চালক ঘোড়ার রাশ টেনে গাড়ি থামিয়ে ফেলল। রাজা ইনগল্ফ সেই সৈন্যদের পোশাক

দেখেই চিনলেন-এরা রাজা গুমণ্ডের সৈন্য। রাজার দেহরক্ষী চার অশ্বারোহী সৈন্য প্রথমে কুয়াশার মধ্যে ঠিক বুঝল না গাড়ি থামল কেন। এবার দেখল রাজা গুমণ্ডের সৈন্যদের। কিন্তু ততক্ষণে রাজা গুমণ্ডের সৈন্যরা ওদের ঘিরে ফেলেছে। দেহরক্ষী চারজন সঙ্গে সঙ্গে কোমরের খাপ থেকে তরোয়াল উঁচিয়ে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হলো। শত্রুসৈন্য সংখ্যায় কুড়ি-পঁচিশজন। দেহরক্ষীরা মাত্র চারজন। রাজা ইনগল্‌ফ ওপরখোলা গাড়ি থেকে সবই দেখলেন। উনি সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে দেহরক্ষীদের শান্ত হতে বললেন। দেহরক্ষী সৈন্যরা তরোয়াল নামাল। রানীর ভয়ে মুখ সাদা হয়ে গেল। উনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। মারিয়াও ভীত হলো। তবে একেবারে ভেঙে পড়ল না। মনে সাহস সঞ্চয় করল। ভাবল—দেখা যাক না কী হয়। মারিয়া রানীকে জড়িয়ে ধরল। স্পষ্ট বুঝল রানীর সারা শরীর কাঁপছে। মারিয়া মৃদুস্বরে বলল—'কাঁদবেন না। ভয়ের কিছু নেই।' রাজা এবার শত্রুসৈন্যদের দিকে তাকালেন। বেশ দৃঢ়স্বরে বললেন—'তোমরা কী চাও?'

শত্রুসৈন্যের দলপতি এগিয়ে এল। বলল—'আমাদের রাজা গুমণ্ডের হুকুম—রাজকন্যা মারিয়াকে বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে।'

—'অসম্ভব।' রাজা চিৎকার করে বললেন—'মারিয়াকে বন্দী করে নিয়ে যেতে হলে আমাদেরও তার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।'

দলপতি বেশ চিন্তায় পড়ল। একটু ভেবে বলল—'বেশ। আপনাদেরও সঙ্গে যেতে হবে।'

—'আমরা প্রস্তুত।' রাজা বললেন।

দলপতি বলল—'তার আগে আপনার দেহরক্ষীদের অস্ত্রত্যাগ করতে হবে।'

—'বেশ।' রাজা দেহরক্ষীদের দিকে তাকিয়ে অস্ত্রত্যাগের ইঙ্গিত করলেন। দেহরক্ষীরা অস্ত্রত্যাগ করল। পাথুরে রাস্তায় তরোয়াল ফেলে দিল ওরা। একজন সৈন্য তরোয়াল কুড়িয়ে নিল। ঝন্‌ঝনাৎ শব্দ উঠল। এবার শত্রুসৈন্যের দলপতির নির্দেশে দেহরক্ষী সৈন্যদের ঘিরে ফেলা হলো। গাড়িও ঘিরে ফেলা হলো। তারপর শত্রু-দলপতি গাড়ির চালককে হুকুম দিল—'এই রাস্তা ধরে গাড়ি চালাও। যত তাড়াতাড়ি পারো। সীমান্ত পেরিয়ে থিংভেলির দিকে। জল্‌দি।' গাড়ি চলল। গাড়ি আর দেহরক্ষীদের ঘিরে শত্রুসৈন্যেরাও চলল। এবড়োখেবড়ো তুষার-জমা পাহাড়ি রাস্তা। চালক গাড়ি খুব জোরে চালাতে পারছিল না।

গাড়ি চলছে। শত্রুসৈন্যরাও ঘোড়া ছুটিয়ে চলছে হঠাৎ আবার একটা কুয়াশার আস্তরণ সবাইকে ঢেকে ফেলল। একজন দেহরক্ষী ঘোড়া থেকে লাফ দিল রাস্তার ধারে খাদের তুষারের মধ্যে। ঠিক তখনই কুয়াশার আস্তরণ সরে গেল। পেছনের একজন শত্রুসৈন্য সেই অল্প আলোয় সঙ্গে সঙ্গে পলায়নপর দেহরক্ষীকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল। নির্ভুল নিশানা। বর্শা ওর পিঠে গেঁথে গেল। দেহরক্ষীটি আর পালাতে পারল না। উবু হয়ে খাদের তুষারের মধ্যে পড়ে গেল। রাজা সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে বাকি তিনজন দেহরক্ষীকে বললেন—'তোমরা পালাবার চেষ্টা করো না।' রাজা বসলেন। আবার গাড়ি চলল। শত্রুসৈন্যরাও চলল ঘোড়া ছুটিয়ে। গাড়ির সামনে পেছনে।

মারিয়া রানীকে ধরে রইল। রানী আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। রাজা মৃদুস্বরে

বললেন—'কাঁদছো কেন? আমি তো এখনো বেঁচে আছি।'

ঘণ্টা দুয়েক পরে দূরে আলোয় দেখা গেল কালো রঙের টানা নিচু পাহাড় একটা। এই নিচু পাহাড়টাই রেভক্জাভিক ও থিংভেলির রাজ্যের সীমানা। পাহাড়টার ওপরে জমা বরফ। শীতার্ত হাওয়া ছুটে আসছে ঐ সীমানা পাহাড়ের দিক থেকে।

ওদিকে খাদের মধ্যে পড়ে থাকা আহত দেহরক্ষীটি তখনও বেঁচে ছিল। পিঠে গাঁথা বর্শাটা খুলে ফেলেছিল। রক্তাক্ত দেহে সে কোনোরকমে খাদের তুষার থেকে শরীরটাকে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে উঠেছিল পাথুরে রাস্তাটায়। তারপর রাস্তাতেই পড়ে রইল সে।

উৎসবে হৈ-হল্লা আনন্দ করে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা তখন খুবই ক্লান্ত। ওরা জাহাজে উঠে যে যার কেবিনঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু পরেই সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল না। কেবিনঘরে ঢুকে মোটা মোমবাতিটা চকমকি পাথর ঠুকে জ্বালল। তারপর বিছানার তলা থেকে কবি আরির সেই ছবি ও নক্সা আঁকা কাগজটা নিয়ে বসল। ছবি আর নক্সাটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। 'দীর্ঘ সর্প' জাহাজের মুখের ছবি এটা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সাপটার মুখে সাতটা দাঁত, মাথায় সাতটা মণি কেন? ত্রিভুজের নক্সাটার অর্থ কী? ফ্রান্সিস গভীরভাবে এইসব ভাবছে তখনই হ্যারি ওর ঘরে ঢুকল। বলল—'আলো জ্বলছে দেখে এলাম। কী ব্যাপার? ঘুমুবে না?'

—'হ্যাঁ, এইবার শোব।' ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি ওর পাশে এসে বসল।

—'এই ছবি নক্সা তো দেখেছো?' ফ্রান্সিস বলল।

—'হুঁ দেখেছি।' হ্যারি বলল।

—'কিছু বুঝতে পারছো?' ফ্রান্সিস বলল।

—'নাঃ। তা তুমি তো ঐ স্তম্ভ, জায়গাটা ভালো করে দেখে এসেছো। তুমি কিছু বুঝলে?' হ্যারি বলল।

—'উঁহু।—সাদাটে পাথরের স্তম্ভ। স্তম্ভ যেমন হয়। খুব সরুও নয়, খুব মোটাও নয়। সাধারণ স্তম্ভ।' ফ্রান্সিস বলল।

—'হুঁ।' হ্যারি নক্সাটা ভালো করে দেখল। হঠাৎ বলে উঠল—'আচ্ছা ত্রিভুজের ওপরে দেখো তিনটি চিহ্ন রয়েছে। প্রত্যেকটি রেখার শেষে। কীসের চিহ্ন এগুলো?'

—'দেখেছি। আমার মনে হয় ওগুলো সূর্য।' ফ্রান্সিস বলল।

—'ফ্রান্সিস—এটা আইসল্যান্ড। ছ'মাস সূর্যের দেখাই পাওয়া যায় না। তাও আবার একটা নয় তিনটে সূর্য।' হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—'নাঃ, কিছুতেই বুঝতে পারছি না।' তারপর বলল—'লক্ষ্য করে দেখো নিচের একটা বিন্দু থেকে তিনটে সরলরেখা উঠে গেছে। এভাবেই একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে।'

—'আর একটা জিনিস লক্ষ্য করো—নিচের বিন্দুর কাছে কিন্তু সূর্যের মতো ঐ চিহ্নটা নেই।' হ্যারি বলল।

—'হ্যাঁ, সেটাও লক্ষ্য করেছি।' ফ্রান্সিস হেসে বলল।

হ্যারি উঠে দাঁড়াল। বলল—'নাও এবার ঘুমোও। পরে ভাবা যাবে।' হ্যারি

চলে গেল। ফ্রান্সিস ছবির কাগজটা বিছানার নিচে রাখল। তারপর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। ঐ নক্সা ছবির কথা ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না। হঠাৎ হ্যারির ডাকাডাকিতে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ও হ্যারির মুখের দিকে তাকাল। হ্যারি বলল—'শীগগির ওঠো। রাজার প্রাসাদের দু'জন পাহারাদার এসেছে। তারা তোমাকে কী বলতে চায়।'

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল। রাজবাড়ির পাহারাদার সৈন্য দু'জন এগিয়ে এল। একজন বলল—'আপনিই ফ্রান্সিস।'

'হ্যাঁ,'—ফ্রান্সিস বলল।

পাহারাদার সৈন্যটি বলল—'সেনাপতি একটা সংবাদ আপনাকে জানাতে বলেছেন।'

—'বলো।'

—'রাজা-রানী ও রাজকন্যা মারিয়া লোগবার্গের উৎসব থেকে ফিরছিলেন। পথে রাজা গুমগুর সৈন্যরা তাঁদের বন্দী করেছে। তারপর থিংভেলিরে নিয়ে গেছে।' সৈন্যটি বলল।

ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে একলাফে উঠে দাঁড়াল। বলল—'সব খুলে বলো।'

সৈন্যটি বলতে লাগল—'আমরা দু'জন রাজবাড়ির সদর দেউড়ি পাহারা দিচ্ছিলাম। লোগবার্গে উৎসব শেষ হয়ে গেল। লোকজন সব ফিরে এল। ঘরে ঘরে আলো নিভিয়ে সবাই শুয়ে পড়ল। রাস্তাঘাট নির্জন হয়ে গেল। অথচ রাজা-রানী আর রাজকন্যা মারিয়াকে নিয়ে তখনও গাড়ি রাজবাড়ি ফিরল না। আমরা ভাবলাম হয়তো রাজা-রানী, রাজকন্যা মারিয়াকে উষ্ণ প্রস্রবণ, আগ্নেয়গিরি এসব দেখাতে নিয়ে গেছেন। আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু গাড়ি ফিরল না। আমাদের কেমন সন্দেহ হলো। আমরা দু'জন ঘোড়ায় চেপে লোগবার্গে গেলাম। উৎসব অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গেছে। যে দু'চারজন লোক পাহাড়ের খাঁজে শুয়ে বসে ছিল তাদের কাছে জানলাম রাজা-রানী রাজকন্যা মারিয়াকে নিয়ে অনেকক্ষণ আগেই গাড়িতে চলে এসেছেন। আমরা অন্য যে পাথুরে পথটা থিংভেলির দিকে গেছে সে পথ দিয়ে ঘোড়া ছোটালাম। এই পথের ধারেই দুটো উষ্ণ প্রস্রবণ আর হেকলা আগ্নেয়গিরি আছে। কিছুদূর আসতেই দেখলাম রাজার এক দেহরক্ষী ভীষণ আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে। মুমূর্ষু রক্ষীটি কোনোরকমে বলতে পেরেছিল—'বন্দী—রাজা গুমগু—থিংভেলির।' তারপরই রক্ষীটি মারা গেল। আমরা ফিরে এসে সেনাপতিকে খবর দিলাম। উনি আপনাকে খবর দেবার জন্যে আমাদের পাঠিয়েছেন।'

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ঘরের কাঠের মেঝেয় কয়েকবার পায়চারি করল। পায়চারি থামিয়ে বলল—'হ্যারি—বোঝাই যাচ্ছে তিনজনেই রাজা গুমগুর হাতে বন্দী হয়েছে।' একটু থেমে বলল—'আমরা রাজা গুমগুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে চাইনি। কিন্তু এখন তো রাজা-রানী আর মারিয়াকে মুক্ত করতেই হবে। কাজেই প্রয়োজনে যুদ্ধে নামতেই হবে।' এদিকে খবরটা জাহাজে ছড়িয়ে পড়ল। সব ভাইকিংরা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—'যাও—সবাইকে ডেক-এ আসতে বলো।'

সব ভাইকিং ছুটে এল। জাহাজের ডেক-এ জড়ো হলো। ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ডেক-এ উঠে এল। সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—'ভাইসব—তোমরা নিশ্চয়ই জেনেছো যে থিংভেলির রাজা গুমণ্ড রাজা ইনগলফ, রানী ও মারিয়াকে বন্দী করেছে। আমরা চাইনি যুদ্ধে জড়াতে। কিন্তু এখন প্রয়োজনে লড়াইতে নামতেই হবে। রাজা-রানী ও মারিয়াকে মুক্ত করতে হবে।' ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল—'আমি আর হ্যারি সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে রাজবাড়ি যাচ্ছি। তোমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে রাজবাড়িতে এসো। সেনাপতির সঙ্গে কথা বলে আমরা ইতিকর্তব্য স্থির করবো।'

সব ভাইকিং চিৎকার করে উঠল—'ও—হো—হো—।' তারপর অস্ত্রঘরের দিকে ছুটল। যুদ্ধের উন্মাদনা জাগল ওদের মধ্যে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি গাড়ি চড়ে রাজবাড়িতে এল। সেনাপতি দরবার কক্ষে ফ্রান্সিসের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ফ্রান্সিস ও হ্যারি ঘরে ঢুকল। সেনাপতি ওদের ভেলভেটে মোড়া কাঠের আসনে বসতে ইঙ্গিত করলেন। ওরা বসল। সেনাপতি বললেন—'সবাই তো শুনেছেন। এখন রাজা-রানী ও রাজকন্য মারিয়াকে মুক্ত করতে গেলে যুদ্ধ করতেই হবে।'

—'ঠিক আছে। আমাদের কিছু ঘোড়া দিতে হবে।' ফ্রান্সিস বলল।

—'তার সব ব্যবস্থা হবে। প্রথমে অশ্বারোহী বাহিনী যাবে। পেছনে যাবে পদাতিক বাহিনী। সীমান্ত পেরিয়ে প্রথমে অশ্বারোহী বাহিনী থিংভেলির আক্রমণ করবে। তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে যাবে পদাতিক বাহিনী।' সেনাপতি বললেন।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—'আমার বন্ধুরা এখুনি এসে পড়বে। আপনি আপনার সৈন্যদের একত্র করুন।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ভাইকিংরা রাজবাড়ির সামনের বিস্তৃত প্রান্তরে এসে উপস্থিত হলো। রাজা ইনগলফের সৈন্যরাও অস্ত্র নিয়ে প্রান্তরে এসে মিলিত হলো। অশ্বারোহী ও পদাতিক দু'ভাগে সৈন্যদের ভাগ করা হলো। সমস্ত বাহিনীর সামনে রইল সেনাপতি, ফ্রান্সিস আর তীরধনুক হাতে শাঙ্কো।

রেভক্জাভিকের মানুষেরা এসে জড়ো হলো এই যুদ্ধযাত্রা দেখতে। রাজা-রানী ও মারিয়া রাজা গুমণ্ডের হাতে বন্দী হয়েছে এ সংবাদ ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে।

সেনাপতি থিংভেলির দিকে তরোয়াল তুলে ইঙ্গিত করলেন। সব সৈন্য চিৎকার করে উঠল। ভাইকিংরাও ধ্বনি তুলল—'ও—হো—হো—।' যুদ্ধযাত্রা শুরু হলো।

মাথার ওপরে স্বল্পালোকিত আকাশ, মাটিতেও কুয়াশা আর অন্ধকার আর এখানে ওখানে জমা তুষার। তার মধ্যে দিয়ে সৈন্যবাহিনী থিংভেলির দিকে এগিয়ে চলল। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে তখন।

সবার আগে চলেছে দশ-বারোজন মশালধারী। মশালের আলোয় ওরা পথ দেখিয়ে দিয়ে চলল।

বেশ কয়েক ঘণ্টা পর দূরে অস্পষ্ট দেখা গেল টানা পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় বরফ। ওটাই সীমান্ত। নিচু টানা পাহাড়ের চড়াই পেরোলেই থিংভেলির রাজ্যের শুরু।

হঠাৎ দেখা গেল সীমান্ত পাহাড় থেকে নেমে আসছে দুটো আলোর বিন্দু।

একটু এগিয়ে আসতেই বোঝা গেল দুটো চলন্ত মশাল। আর একটু পরে আলোছায়ায় দেখা গেল একটা ঘোড়ার গাড়ি আসছে। গাড়িটায় মশালের আলো পড়েছে। দেখা গেল রাজা ইনগল্‌ফের গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি তরোয়াল আকাশের দিকে তুলে থামবার ইঙ্গিত করলেন। সৈন্যবাহিনী আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গাড়িটা কাছে এল। থামলে দেখা গেল গাড়িতে রাজা ও রানী। মারিয়া নেই। ছাতখোলা গাড়িটায় উঠে দাঁড়ালেন রাজা ইনগল্‌ফ। গাড়ির দু'পাশের মশালের আলো পড়েছে তাঁর মুখে। দু'হাত ওপরে তুলে রাজা ইনগল্‌ফ বলতে লাগলেন—'আমার বীর যোদ্ধারা—আমাকে আর রানীকে রাজা গুমগু মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু বন্দী করে রেখেছে রাজকন্যা মারিয়াকে। রাজা গুমগু এক শর্তে আমাদের মুক্তি দিয়েছে। শর্তটা হচ্ছে আমাকে আর রানীকে রেভক্‌জাভিক ছেড়ে দক্ষিণ-পূর্বে স্কালহল্টে চলে যেতে হবে। মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা সময় দিয়েছে রাজা গুমগু। আমি ও রানী স্কালহল্টে পৌঁছে রাজা গুমগুকে সংবাদ পাঠালে সে রাজকন্যা মারিয়াকে মুক্তি দেবে।' রাজা থামলেন।

সমস্ত সৈন্যরা নীরব। শুধু শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে চলেছে। দু'একটা ঘোড়ার ডাক শোনা যাচ্ছে। রাজা ইনগল্‌ফ আবার বলতে লাগলেন—'আমি এই শর্তে সম্মত হয়েছি। রাজকন্যা মারিয়ার জীবন রক্ষা করা আমার কর্তব্য। তাই আমি আর রানী রাজবাড়িতে যাবো এখন। সব ব্যবস্থা করে স্কালহল্টে চলে যাবো। তোমরাও আমার সঙ্গে চলো। আমি রক্তপাত চাই না। বিনা রক্তপাতে রাজকন্যা মারিয়াকে মুক্ত করার জন্য অন্য কোনো পথ নেই। আমাকে এই নির্বাসন মেনে নিতেই হবে।'

এবার ফ্রান্সিস ঘোড়া নিয়ে রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—'রাজা ইনগল্‌ফ—আমাদের একবার সুযোগ দিন। চেষ্টা করে দেখি রাজকন্যা মারিয়াকে মুক্ত করতে পারি কিনা।'

—'বেশ। দেখো চেষ্টা করে। কিন্তু কোনোরকম রক্তক্ষয় নয়।' রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস এবার সেনাপতির কাছে এল। বলল—'থিংভেলির রাজবাড়ির পথঘাট সম্পর্কে খুব ওয়াকিবহাল একজন কাউকে আমাদের দিন।'

সেনাপতি চারদিকে তাকিয়ে একজন অশ্বারোহী সৈন্যকে ইঙ্গিতে ডাকল। লোকটি এগিয়ে এল। লোকটার মুখে দাড়ি-গোঁফ, একটু রোগামতো, লম্বা। সেনাপতি লোকটাকে দেখিয়ে বললেন—'এর নাম প্লিনি। থিংভেলির সব জায়গা ওর নখদর্পণে। ও আপনাদের সাহায্য করতে পারবে।'

—'বেশ। এসো প্লিনি।' ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারিকে বলল—'বিস্কো আর শাঙ্কোকে নিয়ে আমি থিংভেলির যাচ্ছি। যদি পঞ্চাশ ঘণ্টার মধ্যে না ফিরি তবে তোমরা থিংভেলিরে আমাদের উদ্ধারে যেও।'

বিস্কো আর শাঙ্কো এগিয়ে এল। প্লিনিও এল। তখনই ফ্রান্সিস রাজার গাড়িতে রানীকে দেখল। মশালের আলোয় দেখল রানীর মুখ ভয়ার্ত, ফ্যাকাশে। গাড়িতে নিথর বসে আছেন।

সেনাপতির ইঙ্গিতে সৈন্যদল ফিরে চলল। ভাইকিংদের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। একটা যুদ্ধ হতে হতে হলো না। আর কী করা যাবে। ওরাও ফিরে চলল।

মাথার ওপর টিমটিমে তারার আলোর আকাশ। সামনে কুয়াশা আর তুষারে ঢাকা অন্ধকার পথ। চলল ফ্রান্সিসরা ঘোড়া ছুটিয়ে।

বেশ কয়েক ঘন্টা পর থিংভেলির নগরের কাছে ওরা পৌঁছল। একটা ছোট পাথুরে টিলার পেছনে ফ্রান্সিস ঘোড়া থামাল। বিস্কোরাও থামল। ফ্রান্সিস বলল—'ঘোড়া ছুটিয়ে নগরে ঢোকা যাবে না। সহজেই লোকের নজরে পড়ে যাবো। ঘোড়া এখানে রেখে নগরে ঢুকতে হবে।'

টিলার এপাশেই একটা ছোট ওক গাছ। সেই গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঘোড়াগুলো বাঁধা হলো।

ফ্রান্সিস বলল—'প্লিনি—ঘরবাড়ি পাথরের আড়ালে আড়ালে আমাদের রাজবাড়ি নিয়ে চলো।'

—'ঠিক আছে। আমার পেছনে পেছনে আসুন।' প্লিনি বলল। ফ্রান্সিসরা প্লিনির পেছনে পেছনে নগরে ঢুকল।

থিংভেলির খুব বড় নগর নয়। তবে খুব ছোটও নয়। সারা নগরের বাড়িঘর অন্ধকার। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। পথের এখানে ওখানে পাথরের খাঁজে জ্বলন্ত মশাল। সেই মশালের আলোতেই পথ দেখে ওরা চলল। পাথরের বাড়িঘরের আড়ালে আড়ালে, কখনও ফাঁকা রাস্তা দৌড়ে পেরিয়ে ওরা রাজবাড়ির সামনে এল। পাথরের বাড়ির আড়াল থেকে দেখল রাজবাড়ির সদর দেউড়িতে অনেক মশাল জ্বলছে। দ্বাররক্ষীরা সংখ্যায় আট দশজন। খোলা তরোয়াল হাতে প্রধান প্রবেশ পথ পাহারা দিচ্ছে। প্লিনি একটু চিন্তিত স্বরে বলল—কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না।

—কেন? কী হলো? বিস্কো বলল।

—এত পাহারাদার তো দেউড়িতে থাকে না। প্লিনি বলল।

—তার মানে তুমি বলতে চাইছো এত পাহারাদার এখানে সাধারণত থাকে না—এই তো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। প্লিনি মাথা ঝাঁকাল।

—যাক এতে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল।

—কী ব্যাপারে? শাঙ্কো বলল।

—অর্থাৎ মারিয়াকে এই রাজবাড়িতেই বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে। তাই এত জোরদার পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর প্লিনির দিকে তাকিয়ে বলল—সদর দেউড়ি ছাড়া অন্য কোন পথে ভেতরে ঢোকা যাবে? প্লিনি একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—রাজবাড়ির পেছনে একটা গোপন পথ আছে। চলুন সেটা দেখা যাক। আবার পাথরের বাড়ির আড়ালে আড়ালে ওরা চলল। রাজবাড়ি ঘুরে প্লিনি ওদের রাজবাড়ির পেছনে নিয়ে এল। পাথুরে দেয়ালের একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল প্লিনি। ওরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। প্লিনি চৌকো পাথর দিয়ে গাঁথা দেয়াল হাত দিয়ে দেখাতে লাগল। একটা জায়গায় চৌকো পাথর ধরল একটা। দু'হাতে পাথরটা আস্তে আস্তে টানতে লাগল। পাথরটা নড়ল। এবার প্লিনি পাথরটার দু'দিকে অল্প নাড়া দিয়ে দিয়ে খুলে আনতে লাগল। কয়েকবার এপাশ ওপাশ নেড়ে টানতেই পাথরটা খুলে এল। প্লিনি পাথরটা মাটিতে রাখল। পাথুরে দেয়ালে একটা খোঁদল

মত হলো। প্রিনি খোঁদলটায় হাত ঢোকাল। ওপাশের দেয়ালে দুটো মশাল আটকানা ছিল। তার আলোয় দেখা গেল খোঁদলটায় একটা গোল কাঠের চাকতি। প্রিনি চাকতিটা আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগল। একটু মৃদু গোঁ গোঁ শব্দ উঠল। দেয়ালে একটা কাঠের দরজা লম্বালম্বি ফাঁক হলো। প্রিনি চাকা ঘোরাতে লাগল। ফাঁকটা বড় হ'তে লাগল। একসময় একজন মানুষ ঢোকার মত ফাঁক হলো। এখানেই প্রিনি একটা সাংঘাতিক ভুল করল। দরজার ফাঁকটা আরো বড় করল না। তাতে মাত্র একজন মানুষ ঢুকতে বা বেরোতে পারে এরকম বড় রইল। প্রথমে প্রিনি ঢুকল। ফ্রান্সিসরা এখানেও ভুল করল। ভেতরের অবস্থা কেমন অর্থাৎ নিরাপদ কিনা এটা প্রিনির কাছ থেকে না জেনেই ওরা তিনজন ঢুকে পড়ল। ঠিক তখনই প্রিনি চাপাস্বরে ব'লে উঠল—'পালাও।' ফ্রান্সিস দেখল গুমণ্ডের প্রায় দশ বারোজন প্রাসাদরক্ষীর দল মশাল হাতে দেয়ালের ধার ঘেঁষে পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিসরা ওদের প্রায় মুখোমুখি পড়ে গেল। ফ্রান্সিসরা ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু প্রাসাদরক্ষীরা ততক্ষণে ওদের দেখে ফেলেছে। ওরা খোলা তরোয়াল হাতে চিৎকার করতে ছুটে এল। ফ্রান্সিসরা ঐ ছোট দরজা দিয়ে একসঙ্গে বেরোতে পারল না। ফ্রান্সিস দেখল প্রাসাদরক্ষীদের চিৎকার শুনে আরো অনেক রক্ষী খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে আসছে। বিস্কো কোমর থেকে তরোয়াল খুলল। শাঙ্কো তীরধনুক বাগিয়ে ধরল। প্রিনির মুখ ভয়ে সাদা হ'য়ে গেল। ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠল—বিস্কো-শাঙ্কো—লড়াই নয়।' বিস্কো তরোয়াল নামাল। শাঙ্কো ধনুক নামাল। প্রাসাদরক্ষীরা চারপাশ থেকে ওদের ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল খুলে পায়ের কাছে পাথরের চত্বরে তরোয়াল ফেলে দিল। ঝনাৎ করে শব্দ হলো। দেখাদেখি বিস্কো আর প্রিনিও তরোয়াল ফেলে দিল। শব্দ হলো ঝনাৎ-ঝনাৎ। এবার চিবুকে ছুঁচোলো গোঁফ-ওলা একজন রক্ষী এগিয়ে এল। বোধহয় প্রাসাদরক্ষীদের দলনেতা। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল—'তোমরা কে?

ফ্রান্সিস বুঝল প্রকৃত পরিচয় দিতে গেলে বিপদ বাড়বে। রাজা গুমণ্ড ওর পুরনো শত্রু। যদি রাজা গুমণ্ড শোনে যে ফ্রান্সিসকে বন্দী করা হয়েছে তাহলে শুধু ফ্রান্সিসের নয় ওদের সকলেরই জীবন বিপন্ন হবে। রাজা গুমণ্ড এই সুযোগ সহজে ছাড়বে না। মারিয়ার জীবনও বিপন্ন হবে। কোনমতেই ওদের আসল পরিচয় দেওয়া চলবে না। ফ্রান্সিস এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল—আমরা রাজা ইনগল্ফের সৈন। দলনেতা ছুঁচলো-দাড়ি গোঁফে হাত বুলিয়ে বলল—'কিন্তু তোমাদের মধ্যে মাত্র একজনের পরনে রাজা ইনগল্ফের সৈন্যদের পোশাক।

—আমরা ছদ্মবেশে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন?

—রাজকুমারী মারিয়াকে উদ্ধার করতে। ফ্রান্সিস বলল।

ছুঁচলো দাড়ি গোঁফওয়ালা হো হো ক'রে হেসে উঠল। বলল—এবার তোমাদের কে উদ্ধার করে দেখ।' তারপর অন্য রক্ষীদের দিকে তাকিয়ে বলল—'সব ক'টাকে কয়েদঘরে ভর।' একজন রক্ষী ফ্রান্সিসদের তরোয়ালগুলো তুলে নিল। ফ্রান্সিসদের কোমর থেকে তরোয়ালের খাপগুলোও নিল। শাঙ্কোর কাঁধ থেকে ধনুক তীরভরা তূনীর নিয়ে নিল। তারপর রাজবাড়ির পুবকোণার দিকে ধীর পায়ে চলল। অন্য

রক্ষীরা ফ্রান্সিসদের ধাক্কা দিয়ে বলল—'চল্।' ঐ রক্ষীর পেছনে পেছনে ফ্রান্সিসরা চলল। ওদের পেছনে পেছনে চলল সাত আটজন রক্ষী। সবার হাতেই খোলা তরোয়াল। বিস্কো আর শাঙ্কো রাগে ফুঁসতে লাগল। এভাবে লড়াই না ক'রে বন্দীত্ব মেনে নিতে হলো? কিন্তু উপায় নেই। ফ্রান্সিসের আদেশ। মানতেই হবে। যেতে যেতে ফ্রান্সিস চারদিকে নজর রেখে চলল। দেখল—দেয়ালের এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। অনেক প্রাসাদরক্ষী এখানে ওখানে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এ অবস্থায় এখন পালাবার চেষ্টা করলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। ফ্রান্সিস চলল। চারদিকে ঠিক নজর রাখল। রাজবাড়ির পুবকোণায় একটা পাথরের ঘরের সামনে ওরা এল। ঘরটার কাঠের দরজার দু'পাশে দুটো মশাল জ্বলছে। দরজার সামনে দু'জন রক্ষী খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সবার সামনে যে রক্ষীটি ফ্রান্সিসদের তরোয়াল আর শাঙ্কোর তীর ধনুক নিয়ে যাচ্ছিল সে ঐ ঘরটার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজার ধারে দাঁড়ানো একজন রক্ষী কোমর বন্ধনী থেকে লম্বা একটা চাবি বের করে দরজার বড় তালাটা খুলে দিল। রক্ষীটি ফ্রান্সিসদের তরোয়াল আর শাঙ্কোর তীর ধনুক নিয়ে ঘরটায় ঢুকল। ফ্রান্সিস বুঝল—এই ঘরটা অস্ত্রাগার। এখানেই ওদের অস্ত্রগুলো রাখতে হবে। ঘরটার মাথায় একটা শীলমাছের ছবিওয়ালা পতাকা উড়ছে। রাজা গুমগুের পতাকা। ঐ অস্ত্রাগার ছাড়িয়ে পাথুরে চত্বর। তারপরেই আর একটা পাথরের লম্বাটে ঘর। সেই ঘরের বাইরে অনেকগুলো মশাল জ্বলছে। পাঁচ ছ'জন রক্ষী খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ঘরের সামনে ফ্রান্সিসদের দাঁড় করানো হলো। ফ্রান্সিস বুঝল—এটাই কয়েদঘর। ছুঁচোলো দাড়ি গোঁফওয়ালা রক্ষীদলের নেতা গলা চড়িয়ে বলল—'দরজা খোল্।' একজন রক্ষী ছুটে বন্ধ দরজার কাছে গেল। কোমর থেকে একটা লম্বা চাবি বের করল। বেশ বড় একটা তালা ঝুলছে দরজায়। রক্ষীটি সেই তালা খুলল। দরজাটায় ধাক্কা দিল। ঘর্ ঘর্ শব্দ করে লোহার দরজাটা খুলে গেল। ফ্রান্সিসরা খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস দেখল দরজাটায় খাড়া খাড়া লোহার গারদ বসানো। দরজার চৌকোণো চারদিক মোটা লোহার। হাত খোলা থাকলেও এই লোহার দরজা ভাঙা অসম্ভব। রক্ষীরা ওদের প্রায় ঠেলে গারদঘরে ঢুকিয়ে দিল। ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস দেখল ঘরটা বেশ লম্বা। ঘরটায় চারটে মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় দেখা গেল ছোট ছোট কাঠের খুঁটিতে হাত বাঁধা অবস্থায় রয়েছে কয়েকজন বন্দী। দরজা খোলার শব্দে তাদের মধ্যে দু'একজন মুখ তুলে ফ্রান্সিসদের দেখল। বন্দীদের মধ্যে কয়েকজনের গায়ে রাজা গুমগুের সৈন্যাবহিনীর পোশাক। হয়তো কোন অপরাধে ওদের বন্দী করা হয়েছে।

চার জন রক্ষী এগিয়ে এল ফ্রান্সিসদের দিকে। অন্য বন্দীদের বাঁধা হাতের মধ্যে দিয়ে একটা লম্বা মোটা দড়ি টানা দেওয়া। সেই দড়ির একটা মুখ বাঁদিকের পাথুরে দেয়ালে গাঁথা একটা লোহার আংটার সঙ্গে বাঁধা। অন্য দিকটা ডানদিকের দেয়ালে গাঁথা আর একটা লোহার আংটার সঙ্গে বাঁধা। একজন রক্ষী সেইদিকের আংটা থেকে দড়ির মুখটা খুলে হাতে নিল। অন্য রক্ষীরা ফ্রান্সিসদের জোর করে এক একেকটা খুঁটির সামনে বসিয়ে দিল। ওদের হাত দু'টো ছোট দড়ি নিয়ে বেঁধে দিল। এবার লম্বা দড়ি হাতে রক্ষীটি এসে ফ্রান্সিসদের বাঁধা হাতের মধ্যে দিয়ে

দড়িটা টেনে নিল। তারপর ডানদিকের দেয়ালের লোহার আংটার সঙ্গে বেঁধে দিল। লম্বা দড়িটার মধ্যে সব বন্দীদের বাঁধা হাতও বাঁধা পড়ল। অন্য বন্দীদের মত ফ্রান্সিসদেরও হাত কাঠের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হলো। সব দেখে ফ্রান্সিসের মুখ গম্ভীর হলো। ওর মনে তখন একটাই প্রশ্ন—এই কয়েদঘর থেকে কি পালানো যাবে না? ফ্রান্সিসদের এভাবে বেঁধে রেখে রক্ষীরা চলে গেল। ওরা লোহার দরজা বন্ধ করে দিল। শব্দ হলো—ঢঢাং—ঢং। তালা লাগিয়ে দিল। একটু পরে বিস্কো ডাকল—ফ্রান্সিস?'

—উঁ? ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল।

—এখান থেকে পালানো অসম্ভব। বিস্কো বলল।

—হুঁ। দেখা যাক্। ফ্রান্সিস বলল।

—এবার বন্ধুদের খবর পাঠাতে হয়। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—খবর পাঠাবে কী করে? খবর পাঠাতে হলেও তো আমাদের মুক্তি পেতে হবে।

—তাহলে উপায়? বিস্কো বেশ ভীতস্বরে বলল।

—দাঁড়াও—সব দেখিটেখি। তারপর পালানোর উপায় বার করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। খুব ক্লান্তি বোধ করল ফ্রান্সিস। খুঁটিতে হাতবাঁধা অবস্থায় ও মেঝেয় শুয়ে পড়ল। খুব পুরু করে না হলেও মেঝেয় খড়বিছানো ছিল। ফ্রান্সিস খড়ের ওপর শুয়ে মাথার ওপর মোটা ঘাসে তৈরী চালার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চোখ বুঁজল। ভাবতে লাগল—এভাবে মাত্র চারজনের আসা উচিত হয়নি। সব বন্ধুদের নিয়ে আসা উচিত ছিল। তার মানেই লড়াই। রক্তপাত। মৃত্যু। কিন্তু রাজা ইনগল্‌ফ রক্তপাত চান না। মৃত্যু চান না। লড়াই রক্তপাত না চাইলে বুদ্ধির লড়াই চালাতে হয়। সেজন্যেই ওদের একটু সাবধান হয়ে সজাগ থাকা উচিত ছিল। প্লিনির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে গিয়ে এই বিপদ হলো। ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ডাকল—'প্লিনি।'

—বলুন। প্লিনি বলল।

—তুমি কি জানতে না ঐ গোপন দরজার কাছেও প্রাসাদরক্ষীরা থাকতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—বিশ্বাস করুন—এর আগেও দু'দুবার যুদ্ধের সময় ঐ গোপন পথ দিয়ে ঢুকে আমাদের সৈন্যদের উদ্ধার করেছি। আজকে এত প্রাসাদরক্ষী পাহারা দিচ্ছে আমি ভাবতেও পারিনি। আমিই আপনাদের এই বন্দী দশার জন্যে দায়ী। আমাকে মাফ করুন। প্লিনি বলল। ফ্রান্সিস চোখ খুলে হাসল। বলল—তুমি এই নিয়ে দুঃখ করো না। আমাদের খুব সতর্ক থাকা উচিত ছিল। আমাদের সকলেরই, অভুল হ'য়েছে। ফ্রান্সিস বলল। আবার চোখ বন্ধ ক'রে শুয়ে রইল।

এখানে তো দিন ব'লে কিছুই নেই। শুধু রাত। কাজেই দিন-রাতের কোন হিসেব নেই। সময় ধরে হিসেব। প্রায় ঘণ্টা দু'তিন পরে হঠাৎ লোহার দরজায় শব্দ উঠল ঢং—ঢঢাং। শব্দ শুনে ফ্রান্সিস উঠে বসল। পাঁচ-ছ'জন রক্ষী ঢুকল। ওদের হাতে একটা বড় কাঠের পাত্র। একজনের হাতে বড় কাঠের থালার মত। তা'তে মোটা মোটা পোড়া রুটি। রক্ষীরা বন্দীদের হাতের বাঁধন খুলে দিল। সবার

সামনে রাখল বড় বড় পাতা। কোন গাছের পাতা কে জানে। পাতায় রুটি দিল। কাঠের হাতায় ক'রে হেরিং মাছ সেদ্ধ আর আলু সেদ্ধ ডাঁটা লতাপাতার তরকারী। বন্দীরা খেতে লাগল। ফ্রান্সিস খেতে খেতে বলল—পেট পুরে খাও। খেতে ভালো না লাগলেও খাও।' খাবার খুব বিস্বাদ লাগল না। বিস্কো ও প্রিনি শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কথামত চেটেপুটে খেল। ফ্রান্সিস আরো রুটি তরকারী চাইল। সব খেল। কয়েদঘরের একপাশে রাখা মাটির বড় জালা। তাতে জল রাখা আছে। সবাইকে নারকোলের মালায় জল ভরে এনে খাওয়ানো হলো। বন্দীদের খাওয়া শেষ হ'তে রক্ষীরা চলে গেল। ঢঢাং—ঢং শব্দে লোহার দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেল। যাবার আগে ওরা অবশ্য বন্দীদের হাত বেঁধে দিতে ভুলল না।

ফ্রান্সিস খুঁটিতে হাতবাঁধা অবস্থায় আবার খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ল। বলল—এখানে তো রাত-দিন বোঝার উপায় নেই। তবে মনে হয় আমাদের দেশে এখন রাত।

—'কী ক'রে বুঝলে? বিস্কো বলল।

—কারণ আমার ঘুম পাচ্ছে। ফ্রান্সিস হেসে বলল—'বিস্কো—তোমরাও ঘুমিয়ে নাও। যতটা পারো বিশ্রাম নাও। শরীরটা। ঠিক রাখো।' বিস্কোরা জানে ফ্রান্সিস অনেক ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে কথা বলে। বিস্কোও ফ্রান্সিসের মত খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ল। দেখাদেখি শাঙ্কোও। শুধু প্রিনি ব'সে রইল। প্রিনি তো এই দেশের মানুষ। হয়তো ওর এখনও ঘুমের সময় হয়নি। শাঙ্কো একসময় ডাকল—ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকাল। বিস্কো ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল—'রক্ষীরা আমাকে ধরবার আগেই আমি আমার বড় ছোরাটা জামার নিচে লুকিয়ে ফেলেছিলাম।' ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ব'লে উঠল—'সাবাস্। ওটা অনেক কাজে লাগবে।'

দিনের হিসেবে ফ্রান্সিসদের বন্দীদশার দু'দিন কেটে গেল। ফ্রান্সিসরা কেউই বুঝে উঠতে পারছে না কীভাবে পালাবে। ফ্রান্সিস শুয়ে বসে সারাক্ষণ পালানোর ফন্দী ভাবে। কিন্তু কোনটাই কাজের মনে হয় না।

ওদিকে রেভক্জাভিকে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা ভীষণ চিন্তায় পড়ল। দু'দিন কেটে গেল অথচ ফ্রান্সিসরা কেউ ফিরল না। নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে ওরা। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা ভেবে পাচ্ছে না কী করবে এখন। ওরা দল বেঁধে হ্যারির কাছে এল। হ্যারির মনও দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত। ওরা হ্যারিকে প্রশ্ন করল এখন কী করবে?

হ্যারি বলল—দেখ—আমার মনে হয় ফ্রান্সিসরা ফিরে আসবে। যদি ওরা ধরা পড়েও ফ্রান্সিস ঠিক পালাতে পারবে। কিন্তু আমি ভাবছি—ধরা পড়লেই ফ্রান্সিসের জীবন বিপন্ন হবে। হয়তো ও পালাবার সময়টুকুও পাবে না।

—কেন? ও কথা বলছো কেন? বন্ধুরা ব'লে উঠল।

—তোমরা জানো না থিংভেলির রাজার পরিচয়। ওখানকার রাজা গুমগু আমাদের রাজার সেনাপতি ছিল। তোমাদের অনেকেরই মনে আছে সোনার ঘণ্টা আনার সময় এই সেনাপতি গুমগু আমাদের কী বিপদের মুখে ফেলেছিল? কাজেই একবার যদি গুমগু ফ্রান্সিসকে চিনতে পারে তাহ'লে ফ্রান্সিসকে ও সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করবে। আমার ভীষণ দুশ্চিন্তায় কারণ এটাই। তবে ফ্রান্সিস যথেষ্ট বুদ্ধিমান। ধরা পড়লেও ও আত্মপরিচয় দেবে না। বন্ধুদের কেউ কেউ বলে উঠল—'তাহ'লে আমরা আজই

থিংভেলির আক্রমণ করবো। ফ্রান্সিসদের আর মারিয়াকে মুক্ত ক'রে নিয়ে আসবো। হ্যারি হেসে বলল—'ওটা করা আত্মহত্যার সামিল। আমরা সংখ্যায় পঞ্চাশজনের মত। রাজা গুমণ্ডের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শুধু আমরা লড়াই ক'রে পারবো না। হেরে যাবো। আমাদের অনেককে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তারই চেয়ে—আরো একটা দিন অপেক্ষা করি। যদি এর মধ্যে ফ্রান্সিসরা ফিরে না আসে তবে রাজা ইনগল্‌ফের কাছে আমরা যাবো। একজন বন্ধু বলল—হ্যারি আর একটা কথা ভাববার আছে। রাজা গুমণ্ড রাজা ইনগল্‌ফ ও রানীকে মুক্তি দিয়েছিল একটি শর্তে যে রাজা ইনগল্‌ফ রেভক্‌জাভিক ছেড়ে দক্ষিণ-পূর্বে স্কালহল্টে চ'লে যাবেন। বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্কালহল্টে চ'লে গেছেন এই সংবাদ পেলে তবেই রাজা গুমণ্ড রাজকুমারী মারিয়াকে মুক্তি দেবে। রাজা ইনগল্‌ফ এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন।

—হ্যাঁ—হ্যারি বলল—আমিও সংবাদ পেয়েছি। রাজ ইনগল্‌ফ রেভক্‌জাভিক ছেড়ে স্কালহল্টে চ'লে যাবার জন্যে সৈন্যদের প্রস্তুত হ'তে বলেছেন।' একজন ভাইকিং-বন্ধু বলল—'তাহ'লে তো রাজকুমারী মারিয়ার মুক্তির ব্যাপরটা সহজ হ'য়ে গেল। হ্যারি হাসল। বলল—ব্যাপারটা অত সহজে ভেবো না। রাজা ইনগল্‌ফ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্কালহল্ট চ'লে গেলেই গুমণ্ড এসে এই রেভক্‌জাভিকে রাজা হ'য়ে বসবে। তার রাজত্ব বাড়বে। কিন্তু রাজকুমারী মারিয়াকে কখনো মুক্তি দেবে না। গুমণ্ডকে আমি ভালভাবেই চিনি। ওর মত শয়তান ধুরন্দর এত সহজে এই সুযোগ ছেড়ে দেবে না। গুমণ্ড রাজকুমারী মারিয়ার মুক্তিপণ হিসেবে এরপর আমাদের রাজার কাছে আরো অনেক অর্থ সুবিধা এসব দাবী ক'রে বসবে। তাই বলছিলাম আরো একটা দিন দেখি। যদি ফ্রান্সিসরা না ফেরে আর মারিয়াকেও রাজা গুমণ্ড মুক্তি না দেয় তবে রাজা ইনগল্‌ফের কাছে যাবো। বলবো—আপনার স্কালহল্টে যাওয়া চলবে না। আপনাকে রাজা গুমণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে। আপনার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে থেকে আমরাও যুদ্ধ করবো।

—কিন্তু রাজা ইনগল্‌ফ কি তা'তে রাজি হবেন? একজন বন্ধু বলল।

—রাজি করাতেই হবে—হ্যারি বলল—রাজা গুমণ্ডের চালের কাছে আমরা বিনা যুদ্ধে হার স্বীকার করবো না। এখন আর কয়েকদিন আমরা অপেক্ষা করি। দেখা যাক্ কী হয়।

হ্যারির বুদ্ধিমত্তার ওপর ওর বন্ধুদের অগাধ বিশ্বাস। ওরা আর কোন কথা না ব'লে নিজেদের কেবিনে চলে গেল।

ওদিকে ফ্রান্সিসদের একঘেয়ে দিন কাটছে। থিংভেলির কয়েদঘরে। সেদিনও ফ্রান্সিস খুঁটিতে হাত বাঁধা অবস্থায় খড়পাতা মেঝেয় শুয়ে আছে। তাকিয়ে আছে ঘরটার ওপরের ঘাসের আচ্ছাদনের দিকে। এখানে এক ধরনের মোটা ঘাস প্রচুর জন্মায়। সেই ঘাস শুকিয়ে নিয়ে বাড়িঘরের মাথায় লোক আচ্ছাদন করে। ফ্রান্সিস এরকম আচ্ছাদনের বাড়ি নিজেদের দেশে দেখেনি। ওর মনে একটা চিন্তা খেলে গেল—আচ্ছা—এই ঘাসের চাল কি খুব শক্ত হয়? ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। ডাকল—নিলনি—

—বলুন। প্লিনি ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

ফ্রান্সিস বলল—আচ্ছা তুমি তো এই দেশের লোক। বলো তো ঐ মোটা ঘাসের চাল কি খুব শক্ত হয়? প্লিনি চালটা একবার দেখে নিয়ে বলল—গাছের সরু ডাল কাঠ এসব দিয়ে খাঁচা মত তৈরী করা হয়। তা'তে চেপে শুকনো ঘাস বসিয়ে এই চাল করা হয়। তা একটু শক্ত হয় বৈকি। তুষার বৃষ্টি জমা—বরফের চাপ তো পড়ে। কিন্তু ভেঙে পড়ে না।

—হুঁ। ফ্রান্সিস আরো মনোযোগ দিয়ে ঘাসের চালটা দেখতে লাগল। অনেক উঁচু। ঘরটার মাথার কাছে এপাশের দেয়ালে আর ওপারের দেয়ালে লোহার গারদ বসানো দু'টো ছোট জানালামত আছে। কাঁচের জানলা। অসম্ভব। অত উঁচুতে তো ওঠাই যাবে না। তখনই দেখল—ঘাসঢাকা চালের নিচে টানা টানা কড়ি কাঠের মত। গাছের ডাল ফালা ক'রে ওগুলো লম্বালম্বি বসানো। কড়িকাঠগুলো থেকে ঘাসের চালের মধ্যে হাত তিনেক ফাঁক। যদি কোনভাবে ঐ কড়ি কাঠ পর্যন্ত ওঠা যায়—ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিস্কো ফ্রান্সিসকে লাফিয়ে উঠতে দেখে ব'লে উঠল—কী হলো ফ্রান্সিস?

—মুক্তি। ফ্রান্সিস হেসে মৃদুস্বরে বলল। কথাটা সকলের কানে গেল না। কিন্তু বিস্কো, শাঙ্কো, প্লিনির কানে গেল। ওরা অবাক হ'য়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। কী বলতে চায় ফ্রান্সিস? বিস্কো শাঙ্কো, ফ্রান্সিসকে ভালো ক'রেই চেনে। ফ্রান্সিস কখনো বাজে কথা বলে না। নিশ্চয়ই মুক্তির কোন পথ ও খুঁজে পেয়েছে। প্লিনি ভাবল—লোকটার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। এই কয়েদঘর থেকে এই পাহারাদারদের হাত থেকে মুক্তি? অসম্ভব। ফ্রান্সিস ফিস্ ফিস করে বলল—খাওয়াদাওয়ার পর কাজে লাগবো। সব তৈরী থেকো।' এবার ফ্রান্সিস ব'সে পড়ল। কিন্তু শুয়ে পড়ল না। চোখ বুঁজে ভাবতে লাগল।

ঘণ্টা কয়েক পরে লোহার দরজায় ঢং-ঢঢাং শব্দ উঠল। রক্ষীরা খাবার নিয়ে ঢুকল। ফ্রান্সিসদের খাওয়াদাওয়া শেষ হ'তে রক্ষীরা ওদের হাত বেঁধে দিয়ে চলে গেল। ঢঢাং-ঢং শব্দ তুলে দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। বাইরে পাহারাদারদের বিশেষ সাড়া শব্দ নেই। ফ্রান্সিস বসা অবস্থাতেই বিস্কোর যতটা কাছে আসা সম্ভব এল। তারপর বাঁধা হাত দু'টো বিস্কোর জামার তলায় ঢুকিয়ে দিল। আস্তে আস্তে বিস্কোর বড় ছোরাটা বের ক'রে নিয়ে এল। ছোরাটা বিস্কোর হাতে দিল। বিস্কো বাঁধা হাত দু'টো দিয়ে ছোরাটার বাঁট ধরল। তারপর ফ্রান্সিসের হাতবাঁধা দড়িটা কাটতে লাগল। উত্তেজনায় বিস্কোর হাত কাঁপছে। ও ঠিকমত ছোরাটা ধরতে পারছিল না। ছোরার ফলাটা এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে ফ্রান্সিসের হাতে কব্জিতে বসে যাচ্ছিল। বেশ কয়েকটা জায়গা কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। ফ্রান্সিস ওসব গায়ে মাখল না। শুধু দাঁতচাপা স্বরে বলল—জলদি। একটুক্ষণের মধ্যেই দড়ি কেটে গেল। ফ্রান্সিস খোলা হাত নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছোরাটা নিয়ে বিস্কোর হাতের বাঁধার দড়িটা কেটে ফেলল। বিস্কোকে ছোরাটা দিল। বলল—সবাইর দড়ি কাটো। কিন্তু লম্বা দড়িটা কেটো না। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল দরজার দিকে। লোহার দরজায় কান পাতল। বাইরেরটা নিঝুম। শুধু দু'জন পাহারাদারের জুতোর মৃদু খট্ খট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস দরজা থেকে স'রে এসে ঘরটার মাঝামাঝি দাঁড়াল। বিস্কো ততক্ষণে

প্রায় সব বন্দীর হাতের দড়ি কেটে দিয়েছে। অন্য বন্দীরা অবাকচোখে ফ্রান্সিসের কাণ্ড দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস এবার লম্বা দড়িটা যে লোহার কড়ার সঙ্গে বাঁধা সেখানে গেল। কড়া থেকে দড়ির বাঁধনটা খুলতে লাগল। ফ্রান্সিসরা জাতিতে ভাইকিং। জাহাজের ব্যাপারে ওরা সুদক্ষ। জাহাজে পাল খাটানো থেকে শুরু ক'রে নানা কাজে দড়ি দড়া বাঁধতে হয় খুলতে হয়। ওরা এসব ব্যাপারে নিপুণ। খুব সহজেই ফ্রান্সিস দু'টো লোহার আংটা বাঁধা দড়ি খুলে ফেলল। এবার লম্বা দড়ির একটা মাথা নিয়ে বিস্কোর কাছে এল। বিস্কোর দড়ি কাটার কাজ শেষ। সব বন্দীরা হাত খোলা। ফ্রান্সিসরা ছাড়া অন্য বন্দীরা তখনও অবাক। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে আছে। এখনও সম্পূর্ণ মুক্তি পায়নি। তবু হাত দু'টো তো খোলা। এটাই বা কম কি। বিস্কোর হাত থেকে ফ্রান্সিস ছোরাটা নিল। লম্বা দড়ির এক কোণায় ছোরাটা বাঁধল। তারপর ওপরে কড়িকাঠের দিকে তাকাল। ছোরাটা দড়ির সঙ্গে দোলাতে দোলাতে কড়িকাঠের দিকে ছুঁড়ে দিল। বার তিনেক ফস্কে গেল। তারপর দড়ি বাঁধা ছোরা কড়িকাঠের ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে নিচে ঝুলে পড়ল। ফ্রান্সিস একপাশের দড়ি ছাড়তে লাগল। আস্তে আস্তে ছোরা বাঁধা দড়ির মুখটা নিচে নেমে আসতেই ফ্রান্সিস ধরল। ছোরাটা খুলে কোমরে গুঁজল। বিস্কোদের দিকে তাকিয়ে বলল—দড়ির একটা দিক তোমরা টেনে ধর। অন্য দিকটা ধ'রে আমি উঠবো। বিস্কো ইঙ্গিতের সব বন্দীকে ডাকল। সব বন্দীরা এগিয়ে এল। ওরা সবাই দড়ির একটা দিক টেনে ধরল। দড়ির অন্য দিকটা ধ'রে ফ্রান্সিস কড়িকাঠের দিকে লক্ষ্য ক'রে দড়ি বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগল। জাহাজে দড়ি ধ'রে ওঠা নামায় ফ্রান্সিসরা সুদক্ষ। একটুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস কড়িকাঠটা ধ'রে ফেলল। শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কড়িকাঠের ওপর বসল। মাথা নিচু ক'রে বসতে হলো। কারণ কড়িকাঠ আর ঘাসের চালের ফাঁক তিন ফুট মত। এবার ফ্রান্সিস কোমর থেকে ছোরাটা বের করল। মাথার ওপর মোটা ঘাসের ছাউনি। ছাউনির আঁটি বাঁধা ঘাসের আস্তরণ শক্ত ক'রে একটা কাঠের খাঁচার সঙ্গে বাঁধা। ফ্রান্সিস প্রথমে খাঁচাটার বাঁধা দড়িগুলো কাটতে লাগল। বেশ কয়েকটা খাঁচার দড়ি কাটতেই ঘাসের আঁটিগুলো আলগা হ'য়ে গেল। খাঁচার কাঠগুলোও তখন আলগা হ'য়ে গেছে। কাঠগুলো ফ্রান্সিস দু'হাতে সরাতে লাগল। একটুক্ষণের মধ্যে খাঁচার কাঠের টুকরোগুলো একেবারে আলগা হ'য়ে গেল, ফ্রান্সিস এবার ওপরের ঘাসের ছাউনি দু'হাত দিয়ে টেনে টেনে সরাতে লাগল। একটুক্ষণের মধ্যে খাঁচার কাঠের টুকরোগুলো একেবারে আলগা হ'য়ে গেল, ফ্রান্সিস এবার ওপরের ঘাসের ছাউনি দু'হাত দিয়ে টেনে টেনে সরাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘাসের আঁটি স'রে গিয়ে মাথার ওপরে কুয়াশা ঢাকা আকাশ দেখা গেল। একজন মানুষ বেরুতে পারে এরকম ফাঁক হ'য়ে গেল। নিচে দাঁড়ানো বিস্কো শাক্কো আর অন্যান্য বন্দীরা অবাক চোখে ফ্রান্সিসের কাণ্ড দেখতে লাগল। ছাউনি ফাঁক হ'তে, আকাশ দেখা যেতে বন্দীরা পালাবার জন্যে চঞ্চল হ'য়ে উঠল! ফ্রান্সিস ছোরা কোমরে গুঁজে তাড়াতাড়ি দড়ি ধ'রে নেমে এল। ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল চেপে চাপাস্বরে বলল—'চুপ।' তারপর ইশারায় সবাইকে কাছে ডাকল। ফিস্ ফিস্ করে বলল—'ওপরে ঘাসের ছাউনিতে ফোকর করেছি। কিন্তু ছাউনি হাল্কা। সবাই একসঙ্গে দাঁড়াতে পারবো না। কাজেই একজন একজন ক'রে দড়ি বেয়ে উঠে ছাউনি যে

পাথরের দেয়ালের ওপর গাঁথা সেই দেয়ালের সঙ্কীর্ণ মাথায় দাঁড়াতে হবে। সবশেষে আমি উঠবো। তারপর কড়িকাঠে বাঁধা মোটা-দড়িটা নিয়ে ছাউনির দেয়াল থেকে পেছনে নিচে মাটিতে নামিয়ে দেব। আর দড়ি ধ'রে ধ'রে একজন ক'রে মাটিতে নেমে যাবো। এতে সময় বেশি লাগবে। কিন্তু উপায় নেই। দু'তিনজন একসঙ্গে নামতে গেলে দড়ির টানে কড়িকাঠ ভেঙে যাবে। এবার কাজে ন্যামো, যা বললাম মনে রেখো। 'ফ্রান্সিসের নির্দেশমত সবাই একজন একজন ক'রে দড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। ছাউনির ফোকর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দেয়ালের অল্প জায়গায় দাঁড়াতে লাগল। সবশেষে ফ্রান্সিস উঠল। ও দড়িটা তুলে নিয়ে পেছনের দেয়ালের গা লাগিয়ে দড়িটা মাটিতে নামিয়ে দিল। এবার একজন একজন ক'রে পাথর বাঁধানো চত্বরে নামতে লাগল। ফ্রান্সিস ফিস্ ফিস্ ক'রে ওদের কানে কানে ব'লে দিল—'দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াবে।' সবাই নেমে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। সবশেষে ফ্রান্সিস নামতে যাবে—দেখল পুবদিকের একটা পাথরের বাড়ি পাশ ছাড়িয়ে ছয় সাতজন প্রাসাদরক্ষী পাথরের চত্বর দিয়ে আসছে। দু'জনের হাতে মশাল। ফ্রান্সিস নামল না। চুপ ক'রে দড়ি ধ'রে বসে রইল। রক্ষীদের মশালের আলো এতদূর এলো না। বিস্কোরা অন্ধকারে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে রইল। রক্ষীরা পাথরের চত্বরে থপ্ থপ্ শব্দ তুলে চলে গেল। চলে গেল রাজবাড়ির দিকে।

এবার ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে দড়ি ধ'রে নেমে এল। নেমেই দ্রুতহাতে কোমর থেকে ছোরাটা বের করল। তারপর হাত পাঁচেক দড়ি কেটে নিল। দড়িটা কোমরে জড়িয়ে রাখল।, যদি পরে কোন কাজে লাগে। ফ্রান্সিসরা ছাড়া অন্য বন্দীরা যারা ছিল তারা এবার ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফিস্ ফিস্ ক'রে একজন বলল—'আপনি আমাদের বাঁচালেন। রাজা গুমগুের কয়েদঘরে যে একবার কয়েদ হয় সে আর কোনদিন জীবন্ত বেরিয়ে আসতে পারে না। কত নিরীহ প্রজাদের যে গুমগু হত্যা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। আমরা রাজা গুমগুের সৈন্যবাহিনীতে ছিলাম। রাজার আদেশে একদল নিরীহ নারী-শিশুকে হত্যা করার আদেশের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের কয়েদঘরে বন্দী করা হয়েছিল। আপনার জন্যে মুক্তি পেলাম। এবার আমরা পালাই। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। বলল—না ভাই—তোমাদের আমাদের সঙ্গেই পালাতে হবে। তোমরা নিরস্ত্র। যদি ধরা পড়ো তোমরা লড়াইও করতে পারবে না। তোমরা গুমগুের সৈন্যদের হাতে বিনাযুদ্ধে মারা যাবে। ততক্ষণে রাজা গুমগুের পাহারাদার সৈন্যরাও জেনে যাবে যে আমরা পালিয়েছি। নিরস্ত্র আমরাও ধরা পড়বো। আমরাও বাঁচবো না।

—তা'হলে এখন কী করবেন? বন্দী সৈন্যদের মধ্যে থেকে একজন বলল। ফ্রান্সিস সবাইকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করল। সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস নিচুস্বরে বলল—'আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা চলবে না, আমরা এখন অস্ত্রঘরে যাবো। অস্ত্রঘর থেকে আমাদের অস্ত্রগুলো উদ্ধার করবো। তারপর প্লিনি যে গোপন দরজা দিয়ে ঢোকার ব্যবস্থা করেছিল সেই গোপন দরজা খুলে পালাবো। এবার চলো অস্ত্রাগারে।' সবাই পাথরের বাড়ির দেয়ালের আড়ালে আড়ালে চলল। সৈন্যরা যখন ফ্রান্সিসদের ধ'রে নিয়ে আসছিল তখন ফ্রান্সিস অস্ত্রাগারটি ভালো ক'রে দেখে রেখেছিল। অস্ত্রাগারের মাথায় শীলমাছ আঁকা পতাকাটা উড়ছিল। ফ্রান্সিস দেখেই

চিনল। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে সবাইকে দাঁড়াতে বলল। তারপর অস্ত্রাগারের পাথরের দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে দেখল—অস্ত্রাগারের দরজায় দু'জন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। হাতে খোলা তরোয়াল নিয়ে দু'জন দরজার সামনে ঘুরছে, দরজার দু'পাশে দু'টো মশাল জ্বলছে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—'বিস্কো—আমি বাঁদিকেরটা। তুমি ডানদিকেরটা। গলা চেপে ধ'রেই চোখ-মুখ ঢেকে বেঁধে ফেলবে।' অন্যদের দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে ব'লে ফ্রান্সিস আর বিস্কো কুয়াশা ঢাকা চত্বর মাথা নিচু ক'রে পেরিয়ে পাহারাদার দু'জনের কাছাকাছি পৌঁছে অস্ত্রাগারের দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াল। একটু দম নিল। তারপর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়ে দু'জন পাহারাদারের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। পাহারাদার দু'জনের হাতের তরোয়াল ছিট্‌কে গেল। কুয়াশায় আস্তরণের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস আর বিস্কো এত দ্রুত বেরিয়ে এল যে পাহারাদার দু'জন হকচকিয়ে গেল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস একটা পাহারাদারের গলা হাত দিয়ে চেপে ধরল। পাহারাদারটি টুঁ শব্দ করতে পারছে না। পাহারাদারদের কোমরের ফেট্টিটা ফ্রান্সিস অন্য হাতে খুলে ফেলল। তারপর ফেট্টিটায় পাহারাদারের চোখ-মুখ ঢেকে মুখ বেঁধে দিলে। নিজের কোমর থেকে দড়িটা বের ক'রে পাহারাদারটির হাত পা বেঁধে ফেলে রাখল। কোমর থেকে ছুরি বের ক'রে বাকি দড়িটা কেটে বিস্কোর দিকে এগিয়ে ধরল। বিস্কোও একই কায়দায় অন্য পাহারাদারটির মুখ হাত পা বেঁধে ফেলে রাখল। ফ্রান্সিস আগেই দেখেছিল মোটা পাহারাদারটির কোমরে চাবির গোছা ঝুলছে। ও চাবির গোছাটা নিল। চাবিটাও আগে দেখেছিল। সেই লম্বা চাবিটা খুলে দরজার বড় তালাটায় লাগাল। এক মোচড়েই তালাটা খুলে গেল। ওদিকে শাঙ্কো, প্লিনি আর অন্য সদ্য মুক্ত সৈন্যরাও ছুটে এল। সবাই অস্ত্রাগারে ঢুকল। দেখল দেয়ালে জ্বলন্ত মশাল আটকানো। সেই আলোয় দেখা গেল সারি সারি তরোয়াল বর্শা ঢাল এসব সাজানো। ফ্রান্সিস নিজেদের তরোয়ালগুলোর খোঁজে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। দেখল ঘরের ডানকোণায় ওদের তরোয়াল রাখা হ'য়েছে। সঙ্গে শাঙ্কোর তীর ধনুক। শাঙ্কো ছুটে গিয়ে তীরের খাপ ধনুক তুলে নিল। ফ্রান্সিস, বিস্কো, প্লিনি নিজের নিজের তরোয়াল তুলে নিল। সদ্যমুক্ত সৈন্যরাও তরোয়াল ঢাল হাতের কাছে যেমন পেল নিয়ে নিল। ফ্রান্সিসের কানে এল বন্দী পাহারাদার দু'জনের গোঙানি। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল—জলদি—বাইরে চলো। সবাই দ্রুত ছুটে অস্ত্রাগারের বাইরে এল। ফ্রান্সিস দরজায় তালা লাগাল। তারপর চাবির তোড়াটা অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিল। চাপাস্বরে ডাকল—'প্লিনি।' প্লিনি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—'সেই গোপন দরজার কাছে নিয়ে চলো। ঐ দরজা দিয়েই আমরা পালাবো।' প্লিনি মাথা ঝাঁকিয়ে আগে আগে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ছুটল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। একটা লম্বাটে পাথরের বাড়ির পেছনে এসে প্লিনি দাঁড়াল। সবাই একটু হাঁপাচ্ছে তখন। প্লিনি সামনের পাথুরে চত্বরের পরে পাথরের দেয়ালে যেখানে দু'টো মশাল জ্বলছে সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—ঐ দু'টো মশালের মাঝখানে সেই গোপন দরজাটা। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস সেই মশাল দু'টোর দিকে তাকিয়ে রইল। রক্ষী সৈন্যরা যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। এক মুহূর্তও দেরী করা চলবে না। ফ্রান্সিস দ্রুত চিন্তা ক'রে নিল। ঐ মশাল দু'টো আগে নেভাতে হবে। জায়গাটা অন্ধকার ক'রে ফেলতে হবে। তারপর দরজা খুলে পালাতে হবে। ফ্রান্সিস সকলের

দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল—'আমি আর প্রিনি আগে যাচ্ছি। মশাল দু'টো নিভিয়ে দেব। মশাল নিভলেই তোমরা কোন শব্দ না করে দেয়ালটার কাছে চলে যাবে।' ফ্রান্সিস প্রিনিকে ইঙ্গিত করল।

তারপর মাথা অনেকটা নিচু করে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে পাথরের চত্বর পেরিয়ে চলল। ফ্রান্সিসের দেখাদেখি প্রিনিও মাথা নিচু ক'রে চলল। দেয়ালের কাছে পৌঁছেই ফ্রান্সিস তরোয়াল খুলল। দু'টো লোহার আংটায় মশাল দু'টো রাখা। ফ্রান্সিস মাথা নিচু অবস্থাতেই তরোয়ালের ডগার এক খোঁচায় একটা জ্বলন্ত মশাল পাথরের চত্বরে ফেলে দিল। চত্বরে জমা বরফ জলে পড়ে জ্বলন্ত মশালটা নিভে গেল। ফ্রান্সিস এবার সতর্ক দৃষ্টিতে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে চারিদিকে তাকাল। না। রক্ষীদলের মশালের আলো কোনদিকে দেখা যাচ্ছে না। এবার তরোয়ালের খোঁচায় আর একটা জ্বলন্ত মশাল ফেলে দিল। ওটাও নিভে গেল। জায়গাটা অন্ধকার হ'য়ে গেল। ওদিকে মশাল নিভতেই বিস্কো শাঙ্কো ওরা দল বেঁধে দ্রুতগতিতে পাথুরে চত্বর পেরিয়ে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। প্রিনি গোপন দরজা খোলবার জন্য পাথরের ছোট চাঁইটা সরাচ্ছে তখনই দূরে কুয়াশা ঢাকা কয়েকটা মশালের আবছা আলো দেখা গেল। ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল—'প্রিনি—জলদি।' প্রিনি ততক্ষণে পাথরটা খুলে ফেলেছে। কাঠের চাকতিটা ঘোরাতে শুরু করেছে। একটা মৃদু গোঁ গোঁ শব্দ তুলে লোহার দরজাটা খুলে যেতে লাগল। মশাল হাতে প্রাসাদরক্ষীরা তখন অনেকটা কাছে চ'লে এসেছে। একজনের বেরোবার মত ফাঁক হ'তেই ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল—এক এক ক'রে বেরিয়ে যাও।' প্রথমে সদ্যমুক্ত গুমণ্ডের সৈন্যরা বেরোতে লাগল। তারপর বিস্কো, শাঙ্কো, তারপর প্রিনি আর ফ্রান্সিস। রক্ষী-সৈন্যরা ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে। গোপন দরজা খোলা হয়েছে। বন্দীরা পালাচ্ছে। ওরা জ্বলন্ত মশাল হাতে ছুটে আসতে লাগল। এবার প্রিনি দেয়ালের ওপাশের চৌকোণো ফোকরের পাথরটা খুলল। কাঠের যন্ত্রটা ভেঙে দিল। পাথরের কয়েকটা ঘা মেরে কাঠের যন্ত্রটা ভেঙে দিল। দরজা একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল। তখন দেয়ালের ওপাশে প্রাসাদ রক্ষীদের চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল। কিন্তু ওরা বন্ধ দরজা খুলতে পারল না। ফ্রান্সিসরা তখন কিছুটা এগিয়ে গেছে। প্রিনি ছুটে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। ফ্রান্সিস তখন কিছুটা এগিয়ে গেছে। প্রিনি ছুটে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। ফ্রান্সিস একটা উষ্ণ প্রস্রবণের পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে বলল—প্রিনি, যেখানে ঘোড়া রেখে এসেছি সেখানে নিয়ে চলো।' প্রিনি উত্তর মুখে ঘুরল। তখনই রাজা গুমণ্ডের সদ্যমুক্ত সৈন্যদের একজন বলল—আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। এবার আমরা যাই।' ওরা পর পর ফ্রান্সিসের ডানহাত ধরে ঝাঁকুনি দিল। তারপর কুয়াশা আর অল্প অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলে গেল। ফ্রান্সিস বিস্কো আর শাঙ্কো প্রিনির পেছনে পেছনে ছুটল অল্প অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে দিয়ে একদিকে লোকবসতি কম। কয়েকটা বাড়ি পড়ল। দরজা জানলা বন্ধ। অন্ধকার। প্রিনি ওদের পথ দেখিয়ে সেই ঝরাপাতার বনে নিয়ে এল। বনের ধারের ওক গাছের সঙ্গে ঘোড়াগুলো বাঁধা আছে দেখা গেল। যাক্—ঘোড়াগুলো চুরি হয়নি। এখন এই ঘোড়াই ভরসা। তিনজনে গাছে বাঁধা দড়ি খুলে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। প্রিনি ঘোড়া ছোটাল। ফ্রান্সিসরা প্রিনির পেছনে পেছনে ঘোড়া ছোটাল।

শীতার্ত হাওয়া এলোমেলো বইছে। চোখের সামনে কুয়াশা সেই হাওয়ায় কখনো সরে যাচ্ছে কখনো জট পাকাচ্ছে। চোখেমুখে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টা লাগছে। ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। মাথার ওপরে আকাশও সাদাটে কুয়াশায় ঢাকা। গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার পড়ছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘোড়া ছোটাল ফ্রান্সিসরা। ঘোড়াগুলোর মুখে ফেনা জমেছে। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। ফ্রান্সিসরাও ক্লান্ত। কয়েদঘরে খাওয়া ঘুম কোনটাই যথেষ্ট হয়নি। ফ্রান্সিস ভাবল—কিছুক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন। নিজেদের ঘোড়াগুলোরও। ফ্রান্সিস ডাকল—'প্লিনি।'

—বলুন। প্লিনি ওর দিকে তাকাল।

—আমাদের কিছুক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন। এখানে কোথাও লোকবসতি আছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—আর আধঘণ্টা ঘোড়া ছোটালে একটা ছোট্ট গ্রাম পাওয়া যাবে। ছোট্ট গীর্জা আছে। সেখানে একজন পাদ্রী আছেন। বেশ কয়েকঘর বসতিও আছে। প্লিনি বলল।

—তাহ'লে ওখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেব। ফ্রান্সিস বলল।

কিছুক্ষণ পরেই দূর থেকে একটা ছোট্ট গীর্জার তিনকোণা মাথা দেখা গেল। কাছে গীর্জার কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল গীর্জার পাশে বেশ কয়েকটা বাড়ি। ওরা গীর্জাটার সামনে এসে ঘোড়া থামাল। দেখল ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। তাহ'লে এই ছোট্ট গাঁয়ের লোকেরা জেগে আছে।

ঘোড়া থেকে ওরা নামল। গীর্জার পাশেই একটা ন্যাড়া গাছ। গাছটায় ঘোড়ার দড়ি বাঁধল। গীর্জার পাশেই যে পাথর আর কাঠের ঘরটা আছে তার পাথুরে বারান্দায় ফ্রান্সিস উঠে এল। কাঠের দরজায় ধাক্কা দিল। ঘরের ভেতর থেকে এক বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'আসছি।' দরজা খুলে গেল। পাদ্রীর পোশাক পরা এক বৃদ্ধ মোটা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে এগিয়ে এলেন। ফ্রান্সিসরা মাথা নীচু ক'রে শ্রদ্ধা জানাল। বৃদ্ধ ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন—

—তোমরা কোত্থেকে আসছো ভাই?

—আমরা থিংভেলির থেকে আসছি। রেভকজাভিক যাবো। ঘোড়াগুলোর জন্যে দানাপানি আর আমাদের জন্য সামান্য কিছু খাবার। পাদ্রী হাসলেন। বললেন—তোমরা আমাদের অতিথি। তোমাদের খাদ্য দেওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা আমার কর্তব্য। ভেতরে এসো।

ফ্রান্সিসরা ঘরের মধ্যে ঢুকল। দেখল—ঘরটা ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একপাশে একটা বিছানা। ওদিকের দেয়ালের কাছে একটা চৌকোনো গর্তে আগুন জ্বলছে। তা'তেই ঘরটা বেশ গরম হ'য়ে আছে। বাইরের ঠাণ্ডা থেকে ঘরের গরমে ঢুকে সকলেরই ভালো লাগল। একটা কাঠের টেবিল আর টানা বেঞ্চমত দেখিয়ে পাদ্রী বলল—'তোমরা বসো। আমি লোকজনকে খবর দিতে যাচ্ছি। তোমাদের খেতে দেবার মত যথেষ্ট খাদ্য পানীয় তো আমার ঘরে নেই।'

ফ্রান্সিসরা বেঞ্চমত জায়গাটায় বসল। পাদ্রী টেবিলে জ্বলন্ত মোমবাতিটা রেখে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরেই পাদ্রী ফিরে এলেন। ঘরে ঢুকলে। তাঁর পেছনে দাড়িগোঁফঅলা একটি স্বাস্থ্যবান যুবকও ঢুকল। যুবকটি হেসে বলল—'আপনারা আমাদের অতিথি।

একটু অপেক্ষা করুন। আপনাদের খাবার আসছে।

—আমাদের ঘোড়াগুলো খুব পরিশ্রান্ত। বিস্কো বলল। যুবকটি হেসে বলল—ঘোড়াগুলোর দানাপানির ব্যবস্থা করেছি। আপনারা নিশ্চিন্ত হোন।

ফ্রান্সিসরা সকলেই খুব ক্লান্ত। এতক্ষণে হাত পা ছড়িয়ে বসতে পেরে একটু আরাম পেল। পাদ্রী আপনমনেই বলতে লাগলেন—'এখানে পাঁচ সাত ঘরের বাস। আমরা সবাই বড় ভয়ে ভয়ে আছি।

—কেন বলুন তো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—রাজা গুমণ্ড অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা। তার রাজত্বে আমরা কেউ সুখে নেই সারাক্ষণ ভয় কখন রাজা গুমণ্ডের সৈন্যরা এসে হাজির হয়। খুন জখম লুঠপাট ওদের কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার। রাজার কাছে নালিশ করতে গেলে কারো রেহাই নেই, রাজা গুমণ্ড তাকে ফাঁসিয়ে দেয়। সে কোন অভিযোগ অনুযোগ কানেই তোলে না। সৈন্যরা যা খুশী ক'রে বেড়ায়। পাদ্রী আস্তে আস্তে বললেন।

—তাহ'লে তো এখানে এক অরাজক অবস্থা চলছে। বিস্কো বলল। পাদ্রী কোন কথা না ব'লে আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালেন। ফ্রান্সিস বলল—আপনাদের উচিত সব প্রজাদের নিয়ে রাজা গুমণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো।

'অসম্ভব—' পাদ্রীমশাই হেসে মাথা নাড়লেন। ফ্রান্সিস বলল—আপনি এখানে কতদিন আছেন?

—অনেকদিন। সাদা ভুরু কুঁচকে পাদ্রী বললেন। দেখছেনই তো ছোট্ট গ্রাম এটা। এক তুষার ঝড়ে পথ হারিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছিলাম। কতদিন আগের কথা। এই ছোট্ট গ্রামের মানুষেরা সেবাযত্ন ক'রে আমাকে বাঁচিয়েছিল। নইলে আমার বাঁচার কোন আশাই ছিল না। তারপর কী ক'রে এখানকার মানুষদের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম কী এক বন্ধনে। প্রথমে এদের ছেলেমেয়েদের জন্য পাঠশালা খুললাম। তারপর আস্তে আস্তে অনেক অনাথ ছেলেমেয়েকে আশ্রয় দিলাম। একটা আশ্রমমত গড়ে তুললাম।

—আশ্রমের খরচ চালান কী ক'রে? বিস্কো জিজ্ঞেস করল।

—ভিক্ষে ক'রে। মাঝে মাঝে থিংভেলির নগরে চ'লে যাই। রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রি। অবশ্য কিছু ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন তাঁরা বরাবর আমাকে অর্থ সাহায্য করেন।

—রাজা গুমণ্ড সাহায্য করেন না? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল। পাদ্রীমশাই হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন—কিচ্ছু না। কয়েকবার গেছি সাহায্য চাইতে। উনি একটা কথাই বলেছেন—এসব অনাথ বাচ্চাকাচ্চার বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। মরুক সব। কথাটা শুনে ফ্রান্সিসরা অবাক হ'যে গেল। একজন দেশের রাজা এ ধরনের কথা বলতে পারে?

দাঁড়ি গোঁফঅলা যুবকটি বলল—এই পাদ্রীমশাই আমাদের কাছে দেবতার মত। গীর্জার কাজ চালান আবার পাঠশালা, হাতের কাজের শিক্ষাকেন্দ্রও চালান। কত অনাথ ছেলে মেয়ে কী সুন্দর কম্বল, গরম পোশাক বোনে। ফ্রান্সিস এসব শুনে খুব খুশী হ'ল। পাদ্রীমশাইকে বলল—'আপনার মত মানুষেরা যত বেশী থাকবেন আমাদের ততই মঙ্গল।' 'কথাটা ব'লে বিস্কোকে বলল—বিস্কো দেখতো তোমার

থলিতে ক'টা স্বর্ণমুদ্রা আছে।' বিস্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা রেশমী থলি বের করল। থলি খুলে দেখল চারটে স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে। ফ্রান্সিস স্বর্ণমুদ্রাগুলো নিয়ে পাদ্রীমশাইর হাতে দিল। বলল—এর বেশী তো নেই। যা আছে দিলাম।'

পাদ্রীমশাই হেসে বললেন—আপনাদের এই দানই আমার কাছে অনেক। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। বলে পকেটে স্বর্ণমুদ্রা রাখলেন। তখনই কাঠের দরজা ঠেলে দু'জন স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকল। তাদের হাতে বড় বড় কাঠের পাত্র। তারা সেসব টেবিলে রাখল। তারপর ছোট ছোট কাঠের থালা ফ্রান্সিসদের সামনে পেতে দিল। থালায় পরিবেশন করল গরম গরম গোল রুটি আর ভেড়ার মাংস। খাবার দেখে এতক্ষণে ফ্রান্সিস বুঝল যে ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে। বিস্কোদের অবস্থাও তাই। সবাই খেতে লাগল। পাদ্রীও খেতে লাগলেন। যুবকটিও খেতে বসল।

সবাই খাচ্ছে। স্ত্রীলোক দু'জন চলে গেল। তখনও সবার খাওয়া শেষ হয় নি। হঠাৎ ফ্রান্সিসের কানে ঘোড়ার ডাকের শব্দ এল। ওদের ঘোড়া বাঁধা বারান্দার পরেই। ওদের ঘোড়ার ডাক নয়। খুব মৃদু শব্দ। দূর থেকেই এল শব্দটা। ফ্রান্সিস চমকে উঠল। খাওয়া ফেলে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। বিস্কো শাঙ্কো ওর দিকে অবাক চোখে তাকাল। বিস্কো বলে উঠল—কী ব্যাপার ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল—রাজা গুমণ্ডের সৈন্যরা আমাদের পিছু ছাড়েনি। শিগগির পালাও। জল্‌দি।' কথাটা ব'লেই ফ্রান্সিস দরজার দিকে ছুটল। বিস্কো শাঙ্কোও খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। ছুটল ফ্রান্সিসের পেছনে। কিন্তু দরজা খুলতে গিয়েই ফ্রান্সিস থমকে গেল। বাইরের তুষারগলা জলে কাদায় ঘোড়ার থপ্‌ থপ্‌ শব্দ উঠল। ফ্রান্সিস দ্রুত ফিরে দাঁড়াল।

এক ছুটে পিছিয়ে এল। টেবিলে রয়েছে ওদের আধখাওয়া খাবারের কাঠের পাত্রগুলো। ফ্রান্সিস দুহাতে ওদের পাত্রগুলো টেবিল থেকে মেঝেয় ফেলে দিল। ঘরটার আর একপাশে তাকাল। দেখল পেছনে একটা কাঠের আগল দেওয়া কাঠের ছোট দরজা। ফ্রান্সিস ওদিকে কয়েকপা ছুটে বলল এদিকে। আগল খুলে দরজাটা খুলল। ঢুকে পড়ল অন্ধকার ছোট ঘরটায়। পেছনে পেছনে বিস্কোরাও। ওদিকে পাদ্রীমশাই আর যুবকটি প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না ফ্রান্সিসরা পেছনের ঘরে আত্মগোপন করল কেন। একটু পরেই দরজায় ধাক্কার শব্দ শোনা গেল সেই সঙ্গে উঁচুগলায় চীৎকার, 'দরজা খোল্‌। খোল্‌ দরজা।' গুমণ্ডের সৈন্যরা এসেছে। পাদ্রীমশাই আর যুবকটির মুখভয়ে সাদা হয়ে গেল। ওরা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। আবার দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা আর চীৎকার—খোল্‌ দরজা!

ফ্রান্সিস অন্ধকারে ঘরটার চারিদিকে তাকাল যদি বাইরে বেরোবার কোন দরজা পাওয়া যায়। না—নেই। ঘরটায় গম আটার বস্তা। বড় বড় কাঠের থালা। আরো অন্য বস্তা সাজানো। বোঝা গেল ভাঁড়ার ঘর এটা। ফ্রান্সিস এবার ছোট কাঠের দরজার ফাঁকফোকর দিয়ে দেখতে লাগল গুমণ্ডের সৈন্যরা কী করছে। ধাক্কার চোটে দরজা প্রায় ভেঙে পড়ার অবস্থা। এসব দাড়িগোঁফঅলা যুবকটি ভয়ে ভয়ে দরজার কাছে গেল। তারপর দরজার আগলটা খুলে দিল। গুমণ্ডের সৈন্যরা হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকে পড়ল। সবার হাতে খোলা তরোয়াল। সংখ্যায় ওরা পাঁচজন। প্রথমেই রয়েছে সেই ছুঁচোলো দাড়িগোঁফঅলা দলনেতাটি। সে ঢুকেই এক ধাক্কায়

যুবকটিকে মেঝেয় ফেলে দিল। ছুঁচোলো দাড়িগোঁফঅলা দলনেতা তরোয়ালের ডগাটা যুবকটির বুকের ওপর ঠেকাল। বলল—'এখানে পলাতক কয়েদীরা এসেছিল? যুবকটি মেঝেয় শোওয়া অবস্থাতেই মাথা নাড়ল। ফ্রান্সিসরা যে পলাতক কয়েদী একথা তো সত্যিই যুবকটি জানতো না। ও সত্যি কথাটাই মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানাল। দলনেতা তরোয়াল সরাল। যুবকটি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দলনেতা একবার পাদ্রীমশাইর দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর ঘরের চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল—দু'জন চলে যা। অন্য বাড়িগুলো দ্যাখ। দু'জন সৈন্য তরোয়াল হাতে বাইরে বেরিয়ে গেল। দলনেতা এবার টেবিলের ধারে কাঠের থালা ছিটোনো খাবার দেখতে পেল। তারপর সন্দেহ দৃঢ় হ'ল। ও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে যুবকটিকে বলল—তুই মিথ্যে কথা বলছিস্। ওরা এখানে এসেছিল। তোরা ওদের ছেড়ে দিয়েছিস্। মর্ তবে।' দলনেতা যুবকটির বাঁ কাঁধে তরোয়ালের কোপ বসাল। রক্ত বেরিয়ে এল। যুবকটি কাঁধে হাত চেপে কাঁপতে কাঁপতে মেঝেয় ব'সে পড়ল। গোঙাতে লাগল।

ফ্রান্সিস দরজার ফোকর দিয়ে সব দেখছিল। ও এবার একটানে কোমর থেকে তরোয়াল খুলে ফেলল। চাপা স্বরে বলল—'বিস্কো শাঙ্কো তৈরী হও।' বিস্কো আর প্রিনি সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে তরোয়াল খুলল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে ধনুক নামিয়ে ধনুকে তীর চড়াল। দলনেতার এবার নজরে পড়ল ভাঁড়ার ঘরের কাঠের ছোট দরজাটার দিকে। ও এক পা এক পা ক'রে তরোয়াল উঁচিয়ে দরজাটার দিকে আসতে লাগল। পাদ্রীমশাই হঠাৎ দুহাত তুলে ছুটে এসে দলনেতার সামনে দাঁড়ালেন। কান্নাভেজা গলায় ব'লে উঠলেন—না—না।' দলনেতা এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। তারপর বিদ্যুৎবেগে তরোয়াল বসিয়ে দিল পাদ্রীমশাইর বুকে। বৃদ্ধ দু'হাত তোলা অবস্থায় টেবিলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লেন। তারপর গড়িয়ে মেঝেয় পড়ে গেলেন।

ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে উঠল—'লড়াই। তারপর পায়ের এক লাথিতে দরজা খুলে ছুটে গিয়ে দলনেতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দলনেতা এত হঠাৎ আক্রান্ত হবে স্বপ্নেও ভাবে নি। ও কোনরকমে ফ্রান্সিসের তরোয়ালের মার ঠেকাল। তারপরেই শুরু হ'ল দু'জনের তরোয়ালের লড়াই। ততক্ষণে শাঙ্কোর ছোঁড়া তীর একজন সৈন্যের বুকে বিঁধে গেছে। সেও মারা পড়ে গেছে। অন্য সৈন্যটির ওপর তরোয়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিস্কো আর প্রিনি। দু'জনের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা সৈন্যটার ছিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই কপালে তরোয়ালের ঘা খেয়ে টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তখনই পাশের বাড়িগুলো থেকে নারী ও শিশু কণ্ঠের চীৎকার ও কান্নার রোল উঠল। ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাতে চালাতে বলল—'বিস্কো—ওদের বাঁচাও।' বিস্কো প্রিনি আর শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তখনও ফ্রান্সিস আর দলনেতার তরোয়ালের লড়াই চল্‌ছে। ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাতে চালাতে বুঝল ও যে কোন মুহূর্তে দলনেতাকে হত্যা বা আহত করতে পারে। কিন্তু ও তা করলনা। একবার হঠাৎ আক্রমণের চাপ বাড়িয়ে দিল। পরক্ষণেই এত জোরে তরোয়াল চালাল যে দলপতির হাত থেকে তরোয়াল ছিট্‌কে মেঝেয় ঝন্ ঝন্ শব্দে পড়ে গেল। নিরস্ত্র দলনেতা তখন হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ওর মুখে মৃত্যুভয় ফুটে উঠল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে তরোয়ালের ডগাটা বুকে চেপে

ধরল। বলল—'তোমাকে আমি হত্যা করবো না। শুধু কয়েকটা কথা বলি শোন।' একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল—'কী জীবন তুমি কাটিয়েছ? রাজা গুমণ্ডের আদেশ পালন করেছো। ভালো খেয়ে পরে আনন্দ করেছো। আর নির্বিচারে নারী শিশুদের নিরীহ মানুষদের হত্যা করেছো। এই পৃথিবীতে তোমার মত নরপিশাচের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। অথচ দেখ—যে বৃদ্ধ পাদ্রীমশাইকে তুমি হত্যা করলে তিনি সারাটা জীবন এই বসতির মানুষদের প্রাণ দিয়ে ভালো বেসেছেন। তাদের মঙ্গলের জন্যে নিজের সব আনন্দবিলাস সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিয়েছেন। এমন একজন দেবতুল্য মানুষ মরে যাবেন আর তোমার মত নরপশু বেঁচে থাকবে এ তো হয় না। দলনেতা হাউ-মাউ ক'রে কেঁদে উঠে ফ্রান্সিসের পায়ে পড়ল। দু'হাতে ফ্রান্সিসের পা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বলল—

—আমাকে মারবেন না—আমাকে মারবেন না!

—না—তোমাকে মারবো না—' ফ্রান্সিস বলল—'আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর আমি যা বলবো তুমি তাই করবে।

—হ্যাঁ করবো—নিশ্চয়ই করবো। দলনেতা কাঁদতে লাগল।

—এই পাদ্রীমশাই এখানে যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন সেইভাবে তোমাকে বাকী জীবন কাটাতে হবে। উনি যা যা কাজ করতেন সেই সব কাজ তোমাকে করতে হবে। এখানকার সবাইকে ভালোবাসতে হবে। তাদের মঙ্গল ছাড়া তুমি আর কিছু ভাববে না। কী? রাজী? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনি যা বলবেন আমি সে সব করবো। দলপতি বলল।

ফ্রান্সিস তরোয়াল নামাল। বলল—'অবশ্য তোমার মত নরপশুর প্রতিশ্রুতিকে আমি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করিনা। তবু তোমাকে বেঁচে থাকার একটা সুযোগ দিলাম।'

তখনই দরজা দিয়ে বাকি দুজন সৈন্য ঢুকল। পেছনে বিস্কো ওরা। সবাই হাঁপাচ্ছে। সৈন্য দু'টির সারা গায়ে রক্তের দাগ। ফ্রান্সিস ওদের দিকে তাকিয়ে বলল—'এই দুজন কি কাউকে হত্যা করেছে?

—না—তার আগেই আমরা পৌঁছে গেছিলাম। তবে দু'একটা বাড়িঘর লুঠ করেছে। বিস্কো বলল।

—তবে ওদের বন্দী ক'রে রাখো। ফ্রান্সিস বলল। বিস্কো সৈন্য দুজনকে টেনে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢোকাল। তারপর ভাঁড়ার ঘরের কাঠের হুড়কোটা টেনে বন্ধ করে দিল।

এবার ফ্রান্সিস সৈন্যদের দলপতির দিকে তাকাল। বলল—এই আহত যুবকটির চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। তোমাদের দু'জন সৈন্য যদি ম'রে গিয়ে না থাকে তাদেরও চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। পাদ্রীমশাইকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে গীর্জার পাশের বাগানে কবর দেবে। পাদ্রীমশাইর পোশাকের পকেটে চারটে স্বর্ণমুদ্রা পাবে তাই দিয়ে এইসব ব্যবস্থা করবে। তারপর যে পরিমাণ অর্থ থাকবে তা আশ্রমের কাজে ব্যয় করবে। ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল—'আমরা এখন রেভকজাভিক ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু আমি আবার এখানে আসবো। দেখবো তুমি যে প্রতিজ্ঞা করলে তা পালন করেছো কিনা। যদি দেখি তুমি এখান থেকে পালিয়ে গেছো—'। দলপতি দু'হাত নেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল—না-না আমি প্রতিজ্ঞা করছি পালাবো না।

—দেখা যাক। তবে যদি পালাও তা'হলে আমি তোমাকে একদিন খুঁজে বার করবোই। তখন তোমাকে যে অবস্থায় পাবো যেখানে পাবো তোমাকে হত্যা করবো। 'মনে রেখো আমার নাম ফ্রান্সিস।' ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে পাদ্রীমশাইর মৃতদেহের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল। দুঁহাতে মৃতদেহের ডানহাতটা তুলে নিল। শ্রদ্ধার সঙ্গে চুম্বন করল। আস্তে আস্তে হাতটা নামিয়ে রাখল। তারপর উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের চোখ দু'টো জলে ভরে উঠল। জামার হাতায় চোখ মুছে বিস্কোদের দিকে তাকাল। কান্নাভেজা গলায় বললো—'চলো।' সবার আগে ফ্রান্সিস পেছনে বিস্কো, শাঙ্কো ও প্লিনি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। ঘরের গরম থেকে বাইরে বেরোতেই শীতার্ত হাওয়া ছুটে এল। ফ্রান্সিসের শরীরটা কেঁপে উঠল। গাছে বাঁধা ঘোড়াগুলোর কাছে ওরা এল। ঘোড়ায় চড়ল সবাই। ঘোড়া ছোটাল রেভকজাভিকের দিকে। সবার আগে প্লিনি পথ দেখিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলল।

ফ্রান্সিসরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলল রেভকজাভিকের উদ্দেশ্যে। চারদিকের সাদাটে কুয়াশা ঘন হ'তে শুরু করল। ঘণ্টাকয়েক পরেই শুরু হ'ল তুষার ঝড়। সেই সঙ্গে তুষারবৃষ্টি। তুষারের ঝড় বৃষ্টিতে ফ্রান্সিসরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। তুষারঝড়ের সাঁই সাঁই শব্দের মধ্যে ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে ডাকল—'প্লিনি?' একটু দূর থেকে প্লিনি উত্তর দিল—বলুন।

—আর কতদূর? ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে বলল।

— ঠিক বুঝতে পারছি না। প্লিনিও চীৎকার ক'রে বলল। এবার বিস্কোর উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'ফ্রান্সিস থামো নইলে আমরা দলছুট হয়ে যাবো। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। 'ফ্রান্সিস বলল—চলবে না। শুধু ঘোড়ার গতি কমিয়ে দাও। তারপর ফ্রান্সিস গলা জড়িয়ে বলল—' প্লিনি—তুমি সবার সামনে থাকো। মুখে শব্দ করতে থাকো। সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে আমরা ঘোড়া ছোটাব।' তখন 'প্লিনি চীৎকার ক'রে একটা গান গাইতে লাগল। সেই গানের শব্দ লক্ষ্য ক'রে ফ্রান্সিস বিস্কো আর শাঙ্কো ঘোড়া ছোটাতে লাগল। প্লিনি ঘুরে ফিরে সেই গানটাই গাইতে লাগল। এখানকার ঘাসের উপত্যকায় ভেড়া চরাবার সময় ভেড়া চালকরা যে গান গায় সেই গান।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তুষার ঝড় থেমে গেল। বৃষ্টির জোর কমল। তারপর বৃষ্টি একেবারে থেমে গেল। তখনই পাতলা কুয়াশার আস্তরণের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল টানা পাহাড়ের চড়াই। রেভকজাভিকের সীমান্ত। ফ্রান্সিস টানা পাহাড় দেখেই বুঝল সেটা। ও চীৎকার ক'রে উঠল—'ও হো—হো'। বিস্কো আর শাঙ্কোও চীৎকার ক'রে উঠল—'ও হা—হো।' তুষারের ঝড়বৃষ্টিতে ফ্রান্সিসদের সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। হাওয়ার তেজ কমলেও ফ্রান্সিসরা ঠান্ডায় কাঁপতে লাগল।

টানা পাহাড়ের চড়াই পেরিয়ে ঘোড়া ছোটাল ফ্রান্সিসরা। এখন চারদিক পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছে। কুয়াশার আস্তরণও পাতলা। দূর থেকে আলোর বিন্দু দেখা গেল। রেভকজাভিক নগরের আলো।

ওরা যখন নগরে ঢুকল তখন পথঘাট প্রায় জনশূণ্য। ঘরে ঘরে আলো নেভানো। পথে দুএকজন পথচারী। ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে রাজবাড়ির সামনে এল। ঘোড়া থামাল। সবাই হাঁপাচ্ছে তখন। ফ্রান্সিস বলল—বিস্কো শাঙ্কো তোমরা জাহাজে চলে যাও।

প্লিনি তুমিও বাড়ি যাও আমি রাজা ইনগলফের সঙ্গে কথা ব'লে জাহাজে ফিরবো।' বিস্কো শাঙ্কো আর প্লিনি চলে গেল! দ্বাররক্ষী একজন ফ্রান্সিসের কাছে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—'রাজা ইনগলফকে খবর দাও।

রাজা ঘুমিয়ে আছেন । 'দ্বাররক্ষী বলল।

ঘুম ভাঙাও। খবর দাও যে ফ্রান্সিস থিংভেলির থেকে ফিরে এসেছে। দ্বাররক্ষী আর কোন কথা বলল না। দ্রুতপায়ে রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ল।

ফ্রান্সিস রাজবাড়ির চত্বর আস্তে আস্তে হেঁটে পেরিয়ে এল। রাজবাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। এতদূর ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে। পেটপুরে খেতেও পারেনি। একটু পরেই সেই দ্বাররক্ষী ছুটে এল। বলল—'রাজা আপনাকে ডাকছেন। ফ্রান্সিস দ্বাররক্ষীর পেছনে পেছনে রাজবাড়ির অভ্যন্তরে ঢুকল। কয়েকটা ঘর পার হ'য়ে রাজার শয়নকক্ষে ঢুকল। দ্বাররক্ষী শয়নকক্ষে ঢুকল না। ফ্রান্সিস কাঁচঢাকা আলোতে দেখল রাজা ইনগলফ পাখির পালকের বিছানায় বসে আছেন। রাজা ইনগলফ ফ্রান্সিসের পেছন দিকে তাকালেন। মারিয়াকে না দেখে তিনি হতাশার ভঙ্গী করলেন।

বললেন—ফ্রান্সিস বলেছিলে রাজকুমারী মারিয়াকে মুক্ত ক'রে আনবে। ফ্রান্সিস একটু মাথা নত ক'রে বলল—না—পারলাম না। রাজার মুখ চিন্তাকুল হ'ল। একটু মাথা নেড়ে বললেন—'তাহ'লে তো আমাদের সৈন্যদের নিয়ে স্কালহল্টে চলে যেতেই হবে।' ফ্রান্সিস একটু চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল—আপনি কি মনে করেন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আপনি স্কালহল্টে চ'লে গেলে গুমন্ড তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে?

—জানি না। কিন্তু এছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। রাজা হতাশস্বরে বললেন। ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। আসলে ও এত পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল যে ভালো ক'রে গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারছিল না। ও একটু মাথা নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ফ্রান্সিস বন্দরে এল ঘোড়ায় চড়ে। অনেক চিন্তা ওর মাথায়। জাহাজে উঠতেই বন্ধুরা ওকে ঘিরে ধরল। বিস্কো শাঙ্কোর কাছে সবই শুনেছে ওরা। ফ্রান্সিসের অভিযান ব্যর্থ। মারিয়াকে ওরা মুক্ত করে আনতে পারে নি। ফ্রান্সিস বন্ধুদের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল—সবই শুনেছো তোমরা। আমি খুবই পরিশ্রান্ত। খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করবো। তবে একটা কথা জেনে রেখো—মারিয়াকে আমি মুক্ত ক'রে আনবই। আজ অথবা কাল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ওর কেবিনঘরে চলে গেল।

খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে ফ্রান্সিস প্রায় ঘণ্টা চারেক ঘুমোল। এর মধ্যে হ্যারি বার দু'য়েক ফ্রান্সিসকে দেখে গেছে। ও ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙায় নি।

ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙল। কিন্তু ও শুয়েই রইল। ভাবতে লাগল এরপরে কী করবে। হ্যারি কেবিনঘরে ঢুকল। কোন কথা না ব'লে ফ্রান্সিসের পাশে বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—এখন আমরা কী করবো বলোতো?

—রাজা ইনগলফ কী বললেন? হ্যারি বলল।

—উনি স্কালহল্টে যাবার জন্যে মনস্থির ক'রে ফেলেছেন।

—তুমি বোধহয় জানো না স্কালহল্টের রাজা হ্জরলিফ রাজা ইনগলফের ভাই

হ্যারি বলল।

—না আমি জানতাম না। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজ পরিবার ওখানে সুখেই থাকবেন। কিন্তু ভাবনার কথা হ'ল আমরা কি করবো? এখানে রাজা ইনগলফের সৈন্যরা থাকবে না। গুমন্ড এসে এখানকার রাজা হ'য়ে বসবে। সে তার সৈন্যবাহিনীও নিয়ে আসবে। এখনকার চেয়েও আমাদের বিপদ হবে আরো বেশী। কাজেই আমাদেরও স্কালহল্টে চ'লে তারপর যেতে হবে। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস হ্যারির কথাগুলো মন দিয়ে শুনল। বলল—হ্যারি, সবাইকে জাহাজের ডেকে জমায়েত হ'তে বলো। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে। আমি যাবো।'

হ্যারি সবাইকে জমায়েতের খবর দিতে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা জাহাজের ডেকে এসে জড়ো হ'ল। একটু পরেই ফ্রান্সিস এল সঙ্গে হ্যারি। এতক্ষণ সবাই কথাবার্তা বলছিল। ফ্রান্সিস আসতেই সবাই চুপ করল। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে বলতে লাগল—'ভাইসব—তোমরা জানো থিংভেলির রাজা গুমন্ড অতীতে আমাদের দেশের সেনাপতি ছিলেন। আমাদের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে তাকে এখানে নির্বাসিত করা হয়। সে থিংভেলির রাজা হ'য়ে বসে। এখন সে এক চাল চেলেছে। রাজকুমারী মারিয়াকে সে কৌশলে অপহরণ করিয়াছে। মারিয়ার মুক্তিপণ হিসেবে সে দাবী ক'রেছে রাজা ইনগলফকে রেভকজাভিকের রাজত্ব ছেড়ে স্কালহল্টে চলে যেতে হবে। সোজা কথায় বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে গুমন্ড রেভকজাভিকের রাজা হ'য়ে বসবে। তার রাজত্বের সীমানা বাড়বে। ফ্রান্সিস থামল। ভাইকিংরা কেউ কোন কথা বলল না। মাথার ওপর পাতলা কুয়াশার আবরণের মধ্যে দিয়ে আকাশে কয়েকটা তারা দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে উত্তরে শীতার্ত হাওয়া বইছে। ফ্রান্সিস আবার বলতে লাগল—'আমি রাজা ইনগলফের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা চারজন মারিয়াকে মুক্ত করতে পারি নি এই জেনে তিনি স্থির সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন যে তিনি পরিবারসহ এবং সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে স্কালহল্ট চ'লে যাবেন। তাহ'লেই রাজা গুমন্ড মারিয়াকে মুক্তি দেবে। কিন্তু আমি গুমন্ডকে ভালো করেই চিনি। সে তার প্রতিশ্রুতি কক্ষণো রাখবে না। ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলতে লাগল—'হ্যারির সঙ্গে এই নিয়ে কথা হ'য়েছে। আমি স্থির করেছি আমরাও জাহাজে চড়ে স্কালহল্টে গিয়ে থাকবো। এবার এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত বলো।' ফ্রান্সিস থামল। সবাই চুপ ক'রে রইল। নীরবতা ভাঙল বিস্কো। বিস্কো বলল—ফ্রান্সিস—আমরা যদি এখানে থাকি? লড়াই করি? গুমন্ডের সৈন্যবাহিনীকে যদি এখানকার অধিকার নিতে না দি? ফ্রান্সিস বলল—সেক্ষেত্রে দু'টো সমস্যা আছে। এক—রাজা ইনগলফের সৈন্যবাহিনী এখানে থাকবে না। লড়তে হ'লে আমাদের জনা পঞ্চাশেককে একটা বড় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। মরণপণ লড়াই করলেও আমরা পারবো না। দ্বিতীয়ত—মারিয়া এখনও থিংভেলির বন্দী হ'য়ে আছে। আমরা এখানে যুদ্ধে নেমেছি এই সংবাদ—গুমন্ড পেলে মারিয়ার বিপদ বাড়বে। বলা যায় না হয়তো রাজত্বের লোভে গুমন্ড মারিয়াকে হত্যার হুমকি দিতে পারে। তখন আমাদেরই যুদ্ধ থামাতে হবে। কাজেই সবদিক বিবেচনা ক'রে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা এখানে থাকবো না রাজা ইনগলফের সঙ্গে আমরাও স্কালহল্টে আশ্রয় নেব।'

ফ্রান্সিস থামল। সমবেত ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হ'ল। দু'একজন বলে উঠল—'তবু আমরা যুদ্ধ করবো। কিন্তু আর কাউকে সমর্থক না পেয়ে ওরা চুপ ক'রে গেল। একজন ভাইকিং বলে উঠল—কিন্তু রাজকুমারী মারিয়ার মুক্তি কী হবে? ফ্রান্সিস বলল—আমরা স্কালহল্টে জাহাজ নিয়ে থামবো। যদি কোনভাবে রাজা গুমন্ড মারিয়াকে মুক্তি না দেয় তবে আবার চেষ্টা করবো মারিয়াকে মুক্ত করতে। যদি কোনভাবেই না পারি তবে রাজা ইনগলফকে বাধ্য করবো যুদ্ধে নামতে। রাজা ইনগলফের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে আমরাও যুদ্ধ করবো। মারিয়াকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আমরা কেউ আইসল্যান্ড ছেড়ে যাবো না।' ভাইকিংরা সবাই উল্লাস চীৎকার ক'রে উঠল—ও—হো—হো—হো।

—এবার তোমরা বলো এখন কী করবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল একজন ভাইকিং বন্ধু বলে উঠল—তুমি যা বলবে আমরা তাই করবো। সবাই প্রায় একসঙ্গে কথাটা সমর্থন করল।

—তাহ'লে বলছি—আমরা জাহাজ নিয়ে স্কালহল্টে গিয়ে থাকবো। রাজাকেও আমাদের জাহাজে আসতে অনুরোধ জানাবো। তিনি আমাদের সঙ্গী হ'লে ভালোই। তারপর রাজা গুমন্ড কী ক'রে সেটা দেখবো। তারপর প্রয়োজনে লড়াইয়ে নামবো। ফ্রান্সিস বলল। সভা ভেঙে গেল। ভাইকিংরা কথা বলতে বলতে নিজেদের কেবিনে চ'লে গেল। ফ্রান্সিস আর হ্যারিও নিজেদের কেবিনে চলে এল। ফ্রান্সিস বিছানায় আধশোয়া হ'য়ে ভাবতে লাগল—এবার কী করবে? বন্ধুদের মতামত জানা গেল। এবার রাজা ইনগলফের সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে।

দিনের হিসেবে পরদিন ফ্রান্সিস রাজা ইনগলফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। সঙ্গে হ্যারিকে নিয়ে গেল। ওরা যখন রাজবাড়ি কাছে গেল দেখল দক্ষিণে সৈন্যদের ছাউনি থেকে সৈন্যরা বেরিয়ে আসছে। রাজবাড়ির ওপাশের প্রান্তরে সৈন্যরা জড়ো হচ্ছে। এরা পদাতিক সৈন্য। রাজবাড়িরর সামনের বিরাট চত্বরে জড়ো হচ্ছে অশ্বারোহী সৈন্যরা। চারিদিকে সাজ সাজ রব। সবাই ব্যস্ত। বোঝাই যাচ্ছে রাজার আদেশে সৈন্যরা স্কালহল্টে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

দ্বাররক্ষীকে দিয়ে রাজাকে সংবাদ পাঠিয়ে ওরা দু'জন মন্ত্রণাকক্ষে ঢুকল। পাথরের টেবিলের চারপাশে রাখা বাঁকানো পায়াঅলা ওককাঠের চেয়ারে বসল। তখনই সেনাপতি কক্ষে ঢুকল। সেনাপতিও বসল। একটু পরে রাজা ইনগল্‌ফ কক্ষে প্রবেশ করলেন। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল।

রাজা তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলেন। রাজার মুখ দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল রাজা খুবই চিন্তান্বিত। নিজের রাজত্ব ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। চিরশত্রু গুমন্ড তার প্রতিশ্রুতি রাখবে কিনা, মারিয়াকে মুক্তি দেবে কি না, এসব চিন্তা তো রাজার হবেই।

প্রথমে রাজা সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করলেন—

—আপনার সব ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে?

—সৈন্যদলের জমায়েত এতক্ষণে হ'য়ে গেছে। এবার আপনার অনুমতি। সেনাপতি বলল।

—আপনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্কালহল্টের উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করুন। পথে কোথাও যদি রাজা গুমন্ডের সৈন্যদের মুখোমুখি পড়ে যান—সংযত থাকবেন। অযথা সংঘর্ষ

ও রক্তপাত আমি পছন্দ করি না এটা আপনি জানেন।' সেনাপতি উঠে দাঁড়াল। মাথা নীচু ক'রে সম্মান জানিয়ে বলল—'জানি মহামান্য রাজা।' সেনাপতি চ'লে গেল।

এবার ফ্রান্সিস বলল—মহামান্য রাজা—আপনি কখন যাবেন?

—ঘণ্টা কয়েক পরেই। রাজা বললেন।

—যদি কিছু না মনে করেন তাহ'লে একটা অনুরোধ জানাই।

—বলো।

—আমরা তো আমাদের জাহাজ চালিয়ে স্কালহল্টে যাচ্ছিই। যদি আপনারা আমাদের জাহাজে চড়ে যান তাহ'লে আমরা নিজেদের ভাগ্যমান মনে করবো। রাজা ইনগলফ্ কিছুক্ষণ মাথা নিচু ক'রে ভাবলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন—'হ্যা তা যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তোমাদের কোন অসুবিধা হবে নাতো।

তাহ'লে শোন—আমি ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যে তোমাদের জাহাজে যাবো।'

ফ্রান্সিস ও হ্যারি উঠে দাঁড়াল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে ফ্রান্সিস বলল—আমরা এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করছি।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজে ফিরে এল। সবাইকে ফ্রান্সিস বলল—ভাইসব—রাজা ইনগলফ আমাদের জাহাজে চড়ে স্কালহল্টে যেতে সম্মত হ'য়েছেন।' সকলেই খুব খুশী হ'ল। এবার হ্যারি বলল—'রাজপরিবারের বসবাসের উপযোগী কর। সব ভাইকিং হৈ হৈ ক'রে কাজে লেগে পড়ল।

ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে জাহাজের চেহারা ফিরে গেল। জাহাজের ডেক, সিঁড়ি, মাস্তুল কেবিনঘর সব ঝকঝক করতে লাগল। এমনিতেই জাহাজটা ছিল নতুন আর খুব ভালো। কাজেই ভাইকিংদের খুব খাটতে হ'ল না।

রাজপরিবারে থাকার জন্যে কেবিন ঘরটাও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হ'ল। মোটা মোটা কম্বলের বিছানা, পরিষ্কার বিছানার ঢাকনা, পরিচ্ছন্ন বালিশ সব ব্যবস্থা করা হ'ল। এবার রাজপরিবারের আসার জন্যে প্রতীক্ষা।

ঠিক সময়মতই রাজার মাথা খোলা গাড়ি এল। সেই কালো রঙের গাড়ির গা চক্চক্ করছে। তাতে সোনালি ফুল লতাপাতার কাজ। রাজা রানী ও সাত আট বছর বয়েসের রাজকুমার। রাজারানী ও রাজকুমারের পরনে খুব একটা জমকালো পোশাক নয়। রাজার গাড়ির পেছনে আর একটা সাধারণ গাড়িও এল। দেখা গেল সেটাতে একটা কাঠের লম্বামত শক্ত সিন্দুক। বোঝা গেল—ওটা রাজকোষ। স্বর্ণমুদ্রা হীরে মণিমাণিক্য আছে ওটাতে। আরো দু'টো বাক্স। জামাকাপড় আর প্রয়োজনীয় জিনিস ওদুটোতে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি বেশ ভালো পোশাক পরে জাহাজঘাটে দাঁড়িয়েছিল। রাজার গাড়ি এসে থামতেই ফ্রান্সিস আর হ্যারি এগিয়ে গেল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। রাজা, রানী রাজপুত্র গাড়ি থেকে নেমে এলেন। তারপর পাতা কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে জাহাজে উঠলেন। বিস্কো তাঁদের পথ দেখিয়ে নির্দিষ্ট কেবিন ঘরে পৌঁছে দিল। জাহাজ দেখে কেবিন ঘর দেখে রাজপুত্র খুব খুশী। সে সারা জাহাজে ছুটোছুটি করতে লাগল। রাজা ও রানী কেবিনঘরে ঢুকে চুপ ক'রে বসে রইলেন। দু'জনের কারোর মন ভালো নেই।

ফ্রান্সিস সেই কেবিন ঘরে ঢুকল। বলল—মহামান্য রাজা—আপনাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? রাজা মৃদু হেসে বললেন—না। তারপর বললেন—'ফ্রান্সিস আমার রাজকোষ একটা সিন্দুকে রাখা আছে। ঐ সিন্দুকটা একটা নিরাপদ জায়গায় রেখো।

—ওটা আমরা অস্ত্রঘরে রেখেছি। দু'জন ক'রে ভাইকিং সারাক্ষণ ঐ ঘর পাহারা দেয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ফ্রান্সিস বলল—দরজায় দু'জন পাহারাদার রয়েছে। আপনাদের যখন যা প্রয়োজন চাইবেন।' তখনই রানী মৃদুস্বরে বললেন—'মারিয়া থাকলে কত খুশী হ'ত। কথাটা শুনেও ফ্রান্সিসও দুঃখ পেল। বন্দিনী মারিয়ার কথা তখনই মনে পড়ল। ও বলল—'মহা মাননীয়া আপনি যে মারিয়াকে সত্যি ভালোবাসেন এটা আপনার কথা থেকেই প্রমাণিত হ'ল। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' কথাটা বলে ফ্রান্সিস মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে চ'লে এল।

জাহাজ চলেছে। রাজা ও রানী নিজেদের কেবিন ঘর থেকে বড় একটা বেরোন না। সারাক্ষণ কেবিন ঘরেই থাকেন। দু'জনেরই মন খারাপ! মারিয়া এখনও মুক্তি পেল না। রাজা ইনগলফ ভাবেন মারিয়ার যদি কোন বিপদ হয় তাহ'লে ভাইকিংদের রাজার কাছে কী জবাবদিহি করবেন? রাজা গুমন্ডের সঙ্গে লড়াইয়ে নামবো? এই চিন্তাটাও রাজা ইনগলফের মাথায় মাঝে মাঝে আসে। কিন্তু তিনি রক্তক্ষয় চান না। এর আগে রাজা গুমন্ড দু'দুবার তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছিল ব'লেই তিনিই যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দু'বারই রাজা গুমন্ড হেরে গেছে। এবার তাই তাকে বিপদে ফেলতে মারিয়াকে অপহরণ করেছে। রাজা গুমণ্ড ভালো ক'রেই জানে এবার রাজা ইনগলফকে চাপ দিয়ে সে শুধু তাঁর রাজত্বই পাবে না আরো কিছু সুবিধেও আদায় ক'রে নেবে। কিন্তু রাজা ইনগলফ এ অবস্থায় একেবারে অসহায়। কিছুই করার নেই তাঁর। তাই রাজা রানী দু'জনেই চিন্তিত। তাঁদের মনে আনন্দ নেই।

এদিকে রাজপুত্র খুব খুশী। সারাক্ষণ জাহাজের এ মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে বেড়ায়। ছুটোছুটি করে আর মাঝে মাঝেই ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরে-ঢুকে গল্প শোনবার বায়না ধরে। ফ্রান্সিসের মন চিন্তাকুল। তবু রাজপুত্র এলেও খুশীই হয়। ওকে সোনার ঘণ্টা , হীরের পাহাড়ের গল্প বলে। রাজপুত্র গালে হাত দিয়ে অবাক চোখে সেসব গল্প শোনে। গল্প বলতে বলতে ফ্রান্সিসের মনে পড়ে যায় মার কথা, মারিয়ার কথা। মাও অবাক চোখে শুনতেন এইসব গল্প।—বলতেন—হ্যাঁরে তুই এতসব কান্ড করেছিস—এ্যাঁ! ফ্রান্সিস হাসতো। বলতো—তোমার ছেলে কি ঘরে বসে দুধ পনীর খাওয়ার ছেলে? মা বলতেন—আমার দরকার নেই অত দুঃসাহসী ছেলে। বাড়িতে আমার চোখের সামনে থাক্ তুই আমার, তা'তেই সুখ, তা'তেই আনন্দ। মারিয়াও কী গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওর মুখে গল্প শুনতো! তাই গল্প বলতে বলতে ওর মনটা উদাস হয়ে যায়। গল্প বলা থামিয়ে ও মার কথা মারিয়ার কথা ভাবে। রাজকুমার তাগাদা দেয়—তারপর কী হ'ল বলো না।' ফ্রান্সিস আবার গল্প বলতে শুরু করে।

দিনের হিসেবে দু'দিন পর সাদাটে ধোঁয়া কুয়াশার মধ্যে স্কালহল্ট বন্দরের অস্পষ্ট আলো দেখা গেল। আস্তে আস্তে জাহাজ এসে বন্দরে ভিড়ল। জাহাজ থেকে ঘাটের

গায়ে তক্তা ফেলা হ'ল। দেখা গেল দু'টো গাড়ি বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে। রাজা ইনগলফের সেনাপতি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। বোঝা গেল সে সৈন্যবাহিনী নিয়ে আগেই পৌঁছে গেছে।। একটা মাথা খোলা গাড়ি থেকে রাজা হ্জরলিফ ও রানী নেমে এলেন। ও দিকে রাজা ইনগলফ্ ও রানী রাজপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজঘাটায় নামলেন। রাজা হ্জরলিপ তো রাজা ইনগলফের ছোট ভাই। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন। ভাইকিংরা ধরাধরি ক'রে রাজা ইনগলফের রাজকোষ সেই লম্বা সিন্দুকটা অন্য গাড়িটায় তুলে দিল। রাজা রানীরা ও রাজপুত্র সামনের গাড়িটায় চড়ল। গাড়োয়ান চাবুকের শব্দ ক'রে প্রথম গাড়িটা ছেড়ে দিল। পরের গাড়িটিও ওটার পেছনে পেছনে চলল। সেই গাড়িতে বসল রাজা ইনগলফের সেনাপতি। রাজা হ্জরলিফের দুই সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে পেছনে পেছনে চলল।

রাজবাড়ির সদর দেউড়িতে পৌঁছল গাড়ি। দ্বাররক্ষীরা বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছিল। রাজাদের গাড়ি আসতেই ওরা মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাল। গাড়ি রাজবাড়িতে ঢুকল। রাজা হ্জরলিফের বাড়ি তেমন বড় না। তবে মোটামুটি সাজানো গোছানো।

রাজবাড়ির অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন সবাই। রাজা ইনগলফ একটু বিশ্রাম নিলেন। তারপর মোমবাতির আলোর সামনে বসে মোটা পার্চমেনট কাগজে রাজা গুমন্ডকে চিঠি লিখতে বসলেন। লিখলেন—আমি প্রতিশ্রুতিমত সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্কালহল্টে চ'লে এসেছি। এবার আপনার প্রতিশ্রুতিমত রাজকুমারী মারিয়াকে মুক্তি দিয়ে প্রেরিত দূতের সঙ্গে এখানে পাঠিয়ে দিন। রাজা ইনগলফ্ তার সেনাপতিকে ডেকে পাঠালেন। চিঠি থিংভেলিরে পৌঁছে দিতে বললেন। সেনাপতি চিঠি এনে প্লিনিকে খবর দিল। প্লিনি এলে তাকেই চিঠি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিল। প্লিনি তখনই ঘোড়ায় চড়ে রওনা হ'ল থিংবেলিরের উদ্দেশ্য।

দিনের হিসেবে পরদিন প্লিনি ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এল। কিন্তু সঙ্গে মারিয়া নেই। প্লিনি রাজবাড়িতে ঢুকল। রাজা ইনগলফকে একজন রক্ষী খবর দিতে গেল। রাজা ইনগলফ বেশ ব্যস্ত হ'য়ে বাইরের ছোট ঘরটায় ঢুকলেন। প্লিনি মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—রাজা গুমন্ড কোন চিঠি দেন নি। আপনাকে জানাতে বলেছেন যে তিনি প্রথমে রেভকজাভিক যাবেন। নতুন রাজ্যের অধিকার বুঝে নেবেন। তারপর আপনাকে চিঠি দেবেন। ততদিন মারিয়াকে বন্দিনী থাকতে হবে। রাজা ইনগলফ মাথা নিচু ক'রে একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন—ঠিক আছে তুমি যাও। ফ্রান্সিসকে সংবাদটা দিয়ে যেও।

প্লিনি জাহাজে উঠে ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করল। সব কথা বলল। পাশে হ্যারিও ছিল। সব শুনে ফ্রান্সিস বলল বুঝলে হ্যারি আমি এই আশঙ্কাই করছিলাম। রাজা গুমন্ড দাঁও মারার এই সুযোগ সহজে ছেড়ে দেবে না। মারিয়ার মুক্তির বিনিময় ও অনেক কিছু চাইবে।

—তাহ'লে এখন কী করবে? হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস শ্বাস ছেড়ে হতাশার ভঙ্গীতে দু'হাত ছড়িয়ে বলল—'কিচ্ছু করার নেই। এখন শুধু অপেক্ষা ক'রে থাকা।'

প্লিনি বলল—রাজা গুমন্ডের কাছে আমাদের রাজার দূত হ'য়ে এর আগেও আমি গেছি। কথা ব'লে দেখেছি—অত্যন্ত ধুরন্ধর লোক। সব সময় প্যাঁচ কষছে

কী করে আমাদের রাজাকে বিপদে ফেলা যায়।

—প্লিনি—'ফ্রান্সিস বলল—'যা বুঝতে পারছি গুমণ্ডের বিরুদ্ধে রাজা ইনগলফকে কিছুতেই যুদ্ধে নামাতে পারবো না। কাজেই শেষ পর্যন্ত আবার আমাদের অভিযানে বেরোতে হবে। মারিয়াকে মুক্ত করতে হবে। তুমি তৈরী থেকো।

—নিশ্চয়ই।' প্লিনি বলল। তারপর প্লিনি চলে গেল।

দিনের হিসেবে কয়েকদিন পরেই প্লিনি সংবাদ নিয়ে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। রাজা গুমন্ড তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে রেভকজাভিকের দখল নিয়েছে। তারপর সমস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি হানা দিতে সৈন্যদের ঢালাও হুকুম দিয়েছে। সৈন্যরা অবাধে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাড়ি হানা দিয়ে স্বর্ণমুদ্রা, দামী পাথর, গয়নাগাঁটি লুঠ করছে। কেউ বাধা দিতে এলে বা প্রতিবাদ করলে নির্দ্বিধায় হত্যা করছে। সাধারণ মানুষদের ওপরও সৈন্যরা নির্বিবাদে অত্যাচার উৎপীড়ন চালাচ্ছে। ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল—আমি জানতাম এটাই হবে। এখানেই শেষ নয়। গুমন্ড আরো স্বর্ণমুদ্রা দাবী করবে। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই।

সত্যিই তাই ঘটল। রাজা গুমন্ডের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে দু'জন দ্রুত এল রাজা ইনগলফের কাছে। রাজা গুমন্ড লিখেছে—আপনি রাজকোষ স্কালহল্টে নিয়ে গেছেন। ঐ রাজকোষ প্রেরিত দূতদের দিয়ে এখানে পাঠিয়ে দেবেন। রাজকোষ পেলেই রাজকুমারী মারিয়ার মুক্তি কথা বিবেচনা করা হবে।

রাজা ইনগলফ দূত দুজনকে বসিয়ে রেখে ছোটভাই রাজা হজরলিফ এর সঙ্গে কথা বলতে অন্দরমহল এলেন। সব শুনে রাজা হজরলিফ বললেন—রাজকুমারী মারিয়ার মুক্তির জন্য রাজকোষ এখন দিয়ে দাও।

রাজকুমারী মুক্তি পাক তারপর দু'জন মিলে সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিংভেলির আক্রমণ করবো।'

—না—না—রক্তক্ষয় আমি চাই না। রাজা ইনগলফ বললেন।

—ঠিক আছে—সে সব পরে ভাবা যাবে। তুমি এখন রাজকোষ দিয়ে দাও।

—বেশ। রাজা ইনগলফ তাঁর দেহরক্ষীদের আদেশ দিলেন। দেহরক্ষীরা ধরাধরি ক'রে সেই লম্বাটে কালো ফুল লতাপাতার কাজ করা সিন্দুকটা অন্দরমহল থেকে নিয়ে এল। রাজা হজরলিফের একটা মাথাখোলা গাড়িতে তুলে দিল। রাজা গুমন্ডর দূত দু'জনের একজন গাড়িতে বসে রইল। অন্যজন গাড়ি চালাল রেভকজাভিকের উদ্দেশ্যে।

ফ্রান্সিসরা প্লিনির কাছ থেকে এই সংবাদ পেল। ফ্রান্সিস পাশে বসা হ্যারির মুখের দিকে একবার তাকাল। কিন্তু কোন কথা বলল না। ভাইকিং বন্ধুরাও শুনল এই সংবাদ। তারা এসে ফ্রান্সিসকে বারবার বলতে লাগল—ফ্রান্সিস যুদ্ধ ছাড়া রাজকুমারী মারিয়াকে মুক্ত করা যাবে না। তুমি রাজা ইনগলফকে বল—আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। বলল উপায় নেই। আমাদের হাত-পা বাঁধা। মারিয়ার বাঁচামরা এখন রাজা গুমন্ডের হাতের মুঠোয়। আমরা নিরুপায়।' হ্যারিও ভাইকিং বন্ধুদের একই কথা বুঝিয়ে বলল। বন্ধুরা রাগে ফুঁসে উঠল। কিন্তু নিজেদের অসহায়তার কথা ভেবে চুপ ক'রে রইল।

আইসল্যান্ডে তো এখন শুধুই রাত। দিন ব'লে কিছু নেই। কাজেই দিন রাতের

মোট হিসেবে কয়েকদিন পরেই প্লিনি এসে খবর দিল—রাজা গুমন্ড রেভজাভিকএ লুঠকরা ধনসম্পদ আর রাজকোষ নিয়ে থিংভেলিরে ফিরে গেছে। রেভকজাভিক রাজ এখন তার সেনাপতির অধীনে। তার হুকুমে রেভকজাভিকে অত্যাচার নিপীড়ন চলছে।

দিনকয়েক পরে থিংভেলির থেকে রাজা গুমন্ডের একজন দূত এল। সঙ্গে রাজা ইনগলফকে লেখা গুমন্ডের চিঠি। চিঠিতে গুমন্ড লিখেছে—আপনার রাজকোষ পেয়েছি। এবার আপনার বন্ধু ভাইকিংদের রাজাকে বলুন যেন উনি সোনার ঘণ্টা তাঁর যাদুঘর থেকে বের করে আমাকে দিয়ে দেন। কারণ সোনার ঘণ্টা আমারই প্রাপ্য। তাহলেই তার মেয়ে মুক্তি পাবে। নইলে মুক্তির কোন আশা নেই।

রাজা ইনগলফ সমস্যায় পড়লেন। ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। অন্দরমহলে এলেন। ছোটভাই রাজ হজরলিফকে সব জানিয়ে বললেন এখন কী করবেন তিনি। দু'জনেই সমস্যাটা নিয়ে ভাবলেন। কথা বললেন। তারপর রাজা হজরলিফ বললেন—'দাদা তুমি চিঠি দাও। লেখ যে ভাইকিংদের রাজাকে সব জানিয়ে চিঠি দিচ্ছি। রাজা ইনগলফ দূতের হাত দিয়ে একটা চিঠি পাঠালেন। লিখলেন—আপনার দাবী জানলাম। আমি সবকিছু জানিয়ে একটা চিঠি দূত মারফৎ ভাইকিংদের রাজাকে জানাচ্ছি। মনে হয় মেয়ের মুক্তিপণের এই দাবী তিনি মেনে নেবেন। এজন্যে কিছু সময় যাবে। এরমধ্যে রাজকুমারীর যেন কোন ক্ষতি না হয়। দূত চিঠি নিয়ে চলে গেল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজে এসে প্লিনি সব সংবাদ ফ্রান্সিসকে জানাল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসে ছিল। সব শুনে হ্যারিকে ডেকে বলল—'চলো রাজা ইনগলফের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করব। একটু পরেই রক্ষী ওদের মন্ত্রণাকক্ষে নিয়ে এল। গদীআঁটা চেয়ারে ওরা বসল। একটু পরেই রাজা ইনগল্ফ কক্ষে ঢুকলেন। তিনজনেই উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে সম্মান জানাল। রাজা ইনগল্ফ হাতের ইংগিতে ওদের বসতে বললেন। বসল ওরা। রাজা চেয়ারে বসলে ফ্রান্সিস বলল—প্লিনির মুখে আমরা সব শুনলাম।

—তোমাদের রাজার মতামত জানাবার জন্যেই আমাকে সময় চাইতে হ'ল। 'রাজা বললেন। বেশ চিন্তাভারাক্রান্ত দেখা দিল রাজাকে।

—আপনি সময় চেয়ে ভালোই করেছেন। এতে আমাদের কাজের সুবিধা হল। ফ্রান্সিস বলল।

—কোন কাজের কথা বলছো। রাজা জানতে চাইলেন।

—আমরা কয়েকজন মিলে আবার থিংভেলির যাবো। যে কেরই হোক মারিয়াকে মুক্ত ক'রে আনবো। ফ্রান্সিস বলল। রাজা ইনগল্ফ মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবলেন। মাথা তুলে বললেন—'ফ্রান্সিস তুমি যথেষ্ট সাহসী বুদ্ধিমান। তোমাকে কিছু বলার নেই। কিন্তু এভাবে বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়া, যদি তোমাদের কিছু হয়?

—আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন—' হ্যারি বলল—' ফ্রান্সিসরা বিপদে পড়লে আমরা সব ভাইকিং যাবো উদ্ধার করতে।

—তবু তোমাদের রাজা কী উত্তর দেন সেটা জানবার জন্যে তোমাদের কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত। রাজা বললেন। —না মাননীয় রাজা—' ফ্রান্সিস বলল—'এখনই ঠিক সময় অভিযানে বেরুবার। কারণ রাজা গুমন্ড এখন অনেক নিশ্চিন্ত। ও ভালো

ক'রেই জানে আমাদের রাজা তাঁর মারিয়াকে প্রাণের চেয়েও বেশী স্নেহ করেন ভালোবাসেন। সুতরাং আমাদের রাজা নিশ্চয়ই কন্যার জীবনের বিনিময়ে সোনার ঘণ্টা দিয়ে দিতে ইতস্তত করবেন না। কাজেই রাজা গুমন্ড এখন মারিয়াকে পাহারা দেবার ব্যাপারে একটু ঢিলে দেবেন। আমরা যে আবার হানা দিতে পারি—মারিয়াকে আবার মুক্ত করার জন্যে যেতে পারি এটা সে ভাবতেই পারবে না। তাই এই সুযোগ হাত ছাড়া করা চলবে না।' রাজা ইনগলফ কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—বেশ —দেখ চেষ্টা করে। ফ্রান্সিসরাও উঠে দাঁড়াল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে ওরা চলে এল।

সেইদিন জাহাজে ফিরেই ফ্রান্সিস হ্যারি, বিস্কো শাঙ্কো আর প্লিনিকে নিয়ে আলোচনায় বসল। কীভাবে অভিযান চালানো হবে বিপদের হাত থেকে বাঁচতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে—এই সব নিয়ে আলোচনা হ'ল।

দিনের হিসেবে পরদিনই ফ্রান্সিস বিস্কো শাঙ্কো আর প্লিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাত্রা শুরু করল থিংভেলিরের উদ্দেশ্যে। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল প্লিনি।

পথে ওফাস নদী পড়ল। নদীর পাড়ে আছে একটা কাঠ বাঁধা ভেলার মত। বেশ বড়। নদীটি খুবই শান্ত। খুব বেশী বড়ও নয়। নদীর এপারে ওপারে এখানে ওখানে বরফ জমে আছে। দু'টো ঘোড়া নিয়ে ফ্রান্সিস আর বিস্কো কাঠের ভেলাটায় উঠল। লম্বা কাঠের লগি বিস্কো ঠেলতে লাগল। আস্তে আস্তে নদী পার হ'য়ে ঘোড়া দু'টো নিয়ে ওরা ওপারে নামল। কাঠের ভেলাটার সঙ্গে একটা লম্বা দড়ি বাঁধা ছিল। দড়ির মুখটা এপারে একটা ছোট গাছের সঙ্গে বাঁধা। প্লিনি এবার সেই দড়িটা ধরে টানতে লাগল। শূন্য ভেলাটা এপারে এল। এবার শাঙ্কো আর বিস্কো একইভাবে দুটো ঘোড়া নিয়ে নদী পার হ'ল। এবার একটা পাতাঝরা বড় গাছের নিচে বসল ওরা। সঙ্গে আনা খাবার খেল। একটুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাত্রা শুরু।

কুয়াশা কোথাও ঘন কোথাও পাতলা। মাথার ওপর সাদা ধোঁয়াটে আকাশ। তারা ঢাকা পড়ে গেছে। ম্লান আলো চারদিকে। সেই আলোয় পথ দেখে ওরা ঘোড়া ছোটাল।

পথে আর একবার বিশ্রাম নিল ওরা। খাওয়া দাওয়া করল। তারপর আবার ঘোড়া ছোটাল।

ঘণ্টা দশ-বারো কাটল। তারপর ওরা থিংভেলির নগরের দেয়ালের কাছে পৌঁছল। ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়াগুলোর লাগাম একটা গাছের গায়ে বেঁধে দিয়ে পায়ে হেঁটে নগরে প্রবেশ করল। দেখল কোন বাড়িতে আলো জ্বলছে না। তার মানে সবাই ঘুমুচ্ছে। পথে এখানে ওখানে পাথরের দেয়ালে জ্বলন্ত মশাল। এ পথ সে পথ ঘুরে দেয়ালের আড়ালে প্লিনি ওদের রাজবাড়ির পেছনে নিয়ে এল। এখানেই দেয়ালের গায়ে আছে সেই গোপন দরজাটা। চৌকোনো পাথরটা খুলল প্লিনি। খোঁদলে হাত বাড়িয়ে দেখল সেই কাঠের চাকাটা আছে। ও চাকাটা আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগল। অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ তুলে কাঠের দরজাটা খুলে গেল। তার মানে ভাঙা চাকাটা মেরামৎ করা হয়েছে। ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল খুলে খুব সন্তর্পণে পা ফেলে দরজা পেরিয়ে ঢুকল। দেখল এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে

বটে কিন্তু কোন প্রাসাদরক্ষী নেই কোথাও। ফ্রান্সিস মনে মনে হাসল। রাজা গুমন্ড এখন সোনার ঘণ্টার স্বপ্নে বিভোর এখন নিশ্চিন্তও। কাজেই আগের বারের মত প্রসাদরক্ষীর সংখ্যা বাড়ায় নি। তাছাড়া তাকে রেভকজাভিকে রাখতে হয়েছে। ফ্রান্সিস দরজা দিয়ে বাইরে এল। প্লিনি বলল।

—কী দেখলেন?

—একজন রক্ষীও চোখে পড়ল না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহ'লে চলো ঢুকে পড়ি। বিস্কো বলল।

—না এখন না। ফ্রান্সিস বলল। তারপর প্লিনির দিকে তাকিয়ে বলল—সৈন্যদের আস্তানা কোথায়।

প্লিনি আঙুল তুলে একটু দূরে উত্তর দিকে বেশ কয়েকটা টানা লম্বা পাথরের ঘর দেখাল। ঘরগুলোর ছাউনি এদেশীয় রীতি অনুযায়ী মোটা শুকনো ঘাসের।

ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে সবাইকে আসতে বলল। রাস্তা পেরিয়ে সবাই একটা দেয়ালের কাছে এল। দেয়ালের পাথরের খাঁজে দুটো মশাল আড়াআড়ি বসানো ছিল। দুটো জ্বলন্ত মশালই ফ্রান্সিস খাঁজ থেকে তুলে নিল। এবার একটা মশাল পাথরে ঘা মেরে নিভিয়ে ফেলল। অন্য জ্বলন্ত মশালটা হাতে নিয়ে উবু হয়ে বসল। মশালটা বিস্কোর হাতে দিল। তারপর নেভানো মশালটার মাথার দিক থেকে জড়ানো কাপড়ের লম্বা ফালি খুলতে লাগল। বেশ গরম। আস্তে আস্তে চারটে ফালি খুলে নিল। উঠে দাঁড়িয়ে শাঙ্কোকে বলল—'শাঙ্কো, এগুলোর চারটে তীরের ফলায় জড়াও।' শাঙ্কো এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ও দ্রুত হাতে চারটে তীরের ফলায় কাপরের ফালি জড়িয়ে ফেলল। ফ্রান্সিস বলল—'তীরগুলোতে জ্বলন্ত মশাল থেকে আগুন ধরাও। তারপর সৈন্যদের ছাউনির ওপর ছুঁড়ে দাও।' শাঙ্কো একটা তীরের ফলার কাপড়ে জ্বলন্ত মশাল থেকে আগুন ধরাল। তারপর নিশানা ঠিক করে ছুঁড়ল। কুয়াশার মধ্যে তীরটা উড়ে গিয়ে পড়ল। শুকনো মোটা ঘাসের ছাউনিতে সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে গেল। তারপর শাঙ্কো পরপর তিনটে জ্বলন্ত তীর ছুঁড়ল। সৈন্যদের সব ছাউনিতেই আগুন লেগে গেল। কিছু সৈন্য বোধহয় জেগেছিল। তারা 'আগুন আগুন' বলে চিৎকার চ্যাচামেচি শুরু করল।

এদিকে ফ্রান্সিস বলল—'খোলা দরজা দিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকবো। ছোট সবাই, জল্‌দি।' চারজনে দ্রুত ছুটে অন্ধকার রাস্তাটা পেরিয়ে রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ল। ফ্রান্সিস ছুটতে ছুটতে বলল—'প্লিনি, অন্দরমহলে নিয়ে চলো। রাজার শয়নকক্ষে। জল্‌দি।' ছুটল চারজন।

ওদিকে সৈন্যদের ছাউনিতে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। সৈন্যরা সব বেরিয়ে এসেছে ছাউনি ছেড়ে। কাঠের বড় বড় বালতি নিয়ে অনেকেই ছুটে যাচ্ছে কাছের উষ্ণ প্রস্রবণের দিকে। ওখান থেকে জল এনে জল ছিটিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা চলেছে।; কুয়াশাভরা আকাশে আগুনের আভা ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে কালো ধোঁয়া।

রাজবাড়ির অন্দরমহলের রক্ষীরা ছুটে জানালার কাছে চলে এসেছে। সবাই আগুন দেখছে। অন্দরমহলের কাছে কোনো রক্ষী নেই।

ফ্রান্সিসরা রক্ষীদের দুটো ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা চারজন রক্ষীর একেবারে সামনে পড়ে গেল। রক্ষীরা অবাক। এরা কোত্থেকে এল?

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—'শাঙ্কো-বিস্কো—ওদের প্রাণে মেরো না। আহত করো।' বিস্কো আর শাঙ্কো তরোয়াল খুলে রক্ষীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হলো তরোয়ালের লড়াই। শাঙ্কো আর বিস্কো নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাতে লাগল। একটুক্ষণের মধ্যেই দু'জন রক্ষী হাতে কাঁধে তরোয়ালের ঘা খেয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। বাকি দু'জনের সঙ্গে লড়াই চলল। ফ্রান্সিস প্লিনির হাত ধরে টানল—'চলো।'

দু'জন ঘরের পর ঘর পেরিয়ে চলল। একটা ঘরে দরজার সামনে দেখল দু'জন রক্ষী। একজন খোলা তরোয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যটি দরজায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। হাতে ঠিক তরোয়াল ধরে আছে। ফ্রান্সিসদের দেখে জাগ্রত রক্ষীটি হকচকিয়ে গেল। পরক্ষণেই তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্লিনিও তরোয়াল হাতে এগিয়ে গেল। শুরু হলো দু'জনের তরোয়ালের লড়াই। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে ঘুমন্ত রক্ষীটির হাত থেকে তরোয়ালটা ফেলে দিল। পাথরের মেঝেতে ঝনাৎ করে তরোয়ালটা পড়ে যাওয়ার শব্দে রক্ষীটি ঘুম ভেঙে চমকে চোখ চাইল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে ওর গলায় নিজের তরোয়ালের ফলাটা ঠেকিয়ে বলল—'রাজকন্যা মারিয়াকে কোন্ ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে?' রক্ষীটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস তরোয়ালে আরো একটু চাপ দিল। বলল—'বল—রাজকন্যা মারিয়া—কোথায়?' রক্ষীটি এবার তাড়াতাড়ি দরজাটা দেখিয়ে বলল—'এই ঘরে,' ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীটির ঘাড়ের কাছে তরোয়ালের বাঁটটা দিয়ে একটা ঘা মারল। রক্ষীটি 'উঃ' শব্দ করে মেঝেয় পড়ে গেল। ওদিকে প্লিনি তখনও অন্য রক্ষীটির সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।

ফ্রান্সিস ঘরটার মধ্যে ঢুকল। বাইরের 'আগুন-আগুন' চিৎকার আর লোকজনের হৈ-হল্লায় মারিয়ার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ও শুয়ে শুয়েই ভাবছিল কোথায় আগুন লেগেছে? এমন সময় ফ্রান্সিসের চাপা স্বরের ডাক শুনল—মারিয়া—মারিয়া।'

মারিয়া দ্রুত বিছানায় উঠে বসল। দেখল সামনেই ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে। মারিয়া বিছানা থেকে নেমে এল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—"এক মুহূর্ত দেরী নয়। শিগগির চলো।' বলেই ও দরজার দিকে ছুটল। মারিয়াও পেছনে পেছনে ছুটল। ঘরের বাইরে এসে দেখল যে প্লিনি তখনও রক্ষীটির সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। প্লিনির পোশাক এখানে ওখানে তরোয়ালের ঘায়ে ছিঁড়ে গেছে। সারা দেহ রক্তাক্ত। ফ্রান্সিস বুঝল—প্লিনি আর আত্মরক্ষা করতে পারবে না। ফ্রান্সিস বুঝল রক্ষীটি তরোয়াল চালনায় নিপুণ। ফ্রান্সিস মনে মনে ওর প্রশংসা করল। কিন্তু হাতে সময় কম। ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘায়েল করতে হবে। ফ্রান্সিস দু'একবার আত্মরক্ষার ভান করেই দ্রুত লাফিয়ে উঠে লোকটার ডান কাঁধের কাছে তরোয়ালের কোপ বসিয়ে দিল। রক্ত বেরিয়ে এল। লোকটা তরোয়াল ফেলে কাঁধ বাঁ হাতে চেপে ধরল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে রক্ষীটিকে বলল—'আমাদের রাজার শয়নকক্ষে নিয়ে চলো। জল্‌দি।' বলেই হাতের তরোয়ালটা রক্ষীটির পিঠে চেপে ধরল। রক্ষীটি একটা কাতর শব্দ করে এগিয়ে চলল। ফ্রান্সিসরা ওর পেছনে পেছনে চলল। আহত প্লিনিও চলল।

রাজার শয়নকক্ষের দরজায় দু'জন রক্ষী খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছিল। ঝোলানো মোমবাতির আলোয় ফ্রান্সিসদের আসতে দেখে তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে

এল। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—'তোমরা যদি আমাদের আক্রমণ করো তাহলে তোমাদের এই বন্ধুটিকে আমি নিকেশ করে দেবো।' রক্ষী দু'জন থমকে দাঁড়াল। এবার ভালভাবে দেখল যে ফ্রান্সিস ওর তরোয়ালের ফলা রক্ষীটির পিঠে চেপে ধরেছে। রক্ষীটির কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে। ওরা তরোয়াল নামিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল।

সবাইকে নিয়ে ফ্রান্সিস রাজা গুমগুর শয়নকক্ষে ঢুকল। দু'তিনটে কাঁচ ঢাকা মোমবাতি জ্বলছে শয়নকক্ষে। দামী কাঠের সুদৃশ্য কারুকাজ-করা পালঙ্ক। পাখির পালকের নরম বিছানা। কিন্তু ফ্রান্সিসের তখন এসব দেখার সময় নেই। ও বিছানার দিকে তাকাল। রাজা গুমগু বিছানায় নেই। রাজা গুমগু কাঁচের কারুকার্য করা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে তাকিয়ে আগুন দেখছিল। সৈন্য ও লোকজনের 'আগুন-আগুন' চিৎকার হৈ-হল্লায় রাজার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঐ জানালার কাছটা একটু অন্ধকারমতো। ফ্রান্সিস ঘরের চারদিকে তাকিয়েও বুঝতে পারল না রাজা কোথায় আছে। তখনই জানালার অন্ধকার জায়গাটি থেকে রাজা গুমগু গলা চড়িয়ে বলল—'তোমরা কে? কী চাও তোমরা?' ফ্রান্সিস এবার রাজা গুমগুকে দেখতে পেল। বলল—'সেনাপতিমশাই—আপনার এখানে নির্বাসন হয়েছিল। এখন থিংভেলির রাজা হয়েছেন।' রাজা তখনও ফ্রান্সিসকে চিনতে পারেননি। বলল—'তুমি কে?'

ফ্রান্সিস আলোর কাছে এগিয়ে এল।

এখন যদি নিরস্ত্র আপনাকে হত্যা করি? হেসে বলল—এবার চিনতে পারছেন?

—'ও—ফ্রান্সিস।' রাজা গুমগু মৃদুস্বরে বলল।

—'হ্যাঁ। সোনার ঘণ্টা আনতে যাবার সময় আমাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে ছিলেন। এখন যদি নিরস্ত্র আপনাকে হত্যা করি?' রাজা গুমগু কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করল। 'যাকগে—'ফ্রান্সিস বলল—'আক্রান্ত না হলে আমি আক্রমণ করি না। নিজের জীবন বিপন্ন না হলে আমি নরহত্যা করি না। সামনে এগিয়ে আসুন।'

রাজা গুমগু এগিয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস দেখল অতীতের সেনাপতির মুখে চোখে বয়েসের ছাপ পড়েছে। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে এখনও ধূর্তামি। ফ্রান্সিস বলল—'আপনি আমার সামনে থাকবেন। আপনার পিঠে তরোয়ালের ফলা ঠেকিয়ে রাখবো আমি। এইভাবে আমরা নিরাপদে রাজবাড়ি থেকে বেরুবো। তারপর একইভাবে আপনাকে গাড়িতে চড়িয়ে রেভক্জাভিকে নিয়ে যাবো। কোনোরকম চালাকি করতে গেলে আপনাকে আমি তৎক্ষণাৎ হত্যা করবো। মনে থাকে যেন।' কথাটা শেষ করেই ফ্রান্সিস এক লাফে রাজা গুমগুর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। রাজার পিঠে তরোয়ালের ফলা চেপে বলল—'চলুন। কিন্তু ধোঁকা দেবার চেষ্টা করবেন না।'

রাজা গুমগু বুঝল ফ্রান্সিসের কথামতোই তাকে এখন চলতে হবে। ওর কথার অবাধ্য হলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। কাজেই রাজা ধীরপায়ে শয়নকক্ষের দরজার দিকে চলল। ঠিক পেছনেই তরোয়াল ধরে ফ্রান্সিস। তারপর মারিয়া ও প্লিনি।

দরজার বাইরে আসতেই ফ্রান্সিস দেখল বিস্কো আর শাঙ্কোকে চার-পাঁচজন সৈন্য ঘিরে ধরেছে। তরোয়ালের প্রচণ্ড লড়াই চলছে। দুই বন্ধুরই গায়ের পোশাক তরোয়ালের ঘায়ে ছিন্নভিন্ন। কাঁধে, হাতে, বুকে রক্তের ছোপ।

রাজা গুমণ্ড ও ফ্রান্সিসকে দেখে সৈন্যরা লড়াই থামাল। মাথা নিচু করে রাজাকে সম্মান জানাল। ফ্রান্সিস বলল—'ওদের অস্ত্রত্যাগ করতে বলুন।' রাজা গুমণ্ড ডান হাত তুলে অস্ত্রত্যাগের ইঙ্গিত করল। সৈন্যরা তরোয়াল ফেলে দিল। পাথরের মেঝেয় শব্দ উঠল—ঝনাৎ—ঝনাৎ। হাঁপাতে হাঁপাতে বিস্কো আর শাঙ্কো ফ্রান্সিসদের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—'পেছনে পেছনে এসো।' তারপর রাজাকে বলল—সৈন্যদের বলুন—গাড়ি তৈরি করে সিঁড়ির সামনে রাখতে।' সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে সেই কথা বলল। ফ্রান্সিস বলল, 'জল্‌দি।' তিনজন সৈন্য ছুটে চলে গেল। দ্বাররক্ষী আর সৈন্যরা বুঝল—রাজার জীবন বিপন্ন। এখন ফ্রান্সিসদের আক্রমণ করলে রাজার প্রাণ যাবে। কাজেই ওরা সামনে থেকে সরে দাঁড়াল। রাজাকে সামনে রেখে ফ্রান্সিসরা চলল বাইরের সিঁড়ির দিকে।

বাইরে রাজবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ফ্রান্সিস দেখল রাজার ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কালো কাঠে সোনালি লতাপাতার কাজকরা গাড়ি। গাড়ির দু'দিকে বসার আসন। চার ঘোড়ার খোলা গাড়ি।

রাজাকে সামনে রেখে ফ্রান্সিসরা গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল—'একটা আসনে মারিয়া বসবে। অন্যটায় আহত প্লিনিকে শুইয়ে ওর মাথা কোলে নিয়ে বিস্কো বসবে। রাজা গাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার পেছনে পিঠে তরোয়াল ঠেকিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকবো। শাঙ্কো তীর-ধনুক বাগিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। এবার ওঠো সবাই।'

সবাই গাড়িতে উঠল। ফ্রান্সিসের নির্দেশমতো সবাই যে যার জায়গা করে নিল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে কোচওয়ানকে বলল—'স্কালহল্ট চলো। বেচাল করেছো কি তোমাকে শেষ করে দেবো।'

গাড়ি চলল। রাজবাড়ির প্রধান দরজার সামনে তখন বেশ কিছু সৈন্য নগরবাসী ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস রাজা গুমণ্ডের পিঠে তলোয়ারের চাপ দিয়ে বলল—'সৈন্যদের বলুন—কেউ যেন আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা না করে।' রাজা গুমণ্ড ডান হাত ওপরে তুলে সৈন্যদের লক্ষ্য করে সেকথা বলল। গাড়ি রাজবাড়ির থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল। তারপর চলল স্কালহল্টের দিকে। পথের লোকজন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা দেখল। একসময় নগর শেষ হলো। উন্মুক্ত প্রান্তর পড়ল। সেই প্রান্তরের টুকরো পাথর ছড়ানো রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটল রেভক্‌জাভিকের দিকে।

আকাশ-দিগন্তে অল্প আলো। সেই আলোও প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে নীলচে কুয়াশায়। রাস্তার এখানে ওখানে তুষার জমেছে। তার মধ্যে দিয়েই অল্প ঝাঁকুনি খেতে খেতে গাড়ি ছুটল।

ঘণ্টা কয়েক কেটে গেল। গাড়ি থামানো, বিশ্রাম, খাওয়া এসব কথা কারো মনেই পড়ল না। ফ্রান্সিস বার বার কোচোয়ানকে দ্রুত গাড়ি চালাতে বলছিল।

চাইছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্কালহল্টে পৌঁছুতে। বলা যায় না রাজা গুমণ্ডের সৈন্যরা যদি একসঙ্গে ছুটে এসে ওদের ঘিরে ধরে তাহলে বিপদে পড়তে হবে। কাজেই গাড়ি ছোটাও যত জোরে পারো।

একসময় দূর থেকে কুয়াশার আস্তরণের মধ্যে দিয়ে ওফাস নদী দেখা গেল। নদীর এই পারে এসে গাড়ি থামল। কাঠের ভেলাটা এপারেই ছিল। প্রথমে কোচোয়ান আর শাঙ্কো, প্লিনি, বিস্কো গাড়িটা তুলে ভেলায় ওঠাল। বিস্কো লগি ঠেলে নৌকোটা পার করল। দড়ি ধরে টেনে কাঠের ভেলাটা আবার এপারে আনা হ'ল। ঘোড়া চারটে পার করা হ'ল। সঙ্গে প্লিনি আর কোচোয়ান। ঘোড়াগুলো ওপারে পৌঁছলো। ঘোড়াগুলো নামিয়ে আনল বিস্কো। কোচোয়ান ঘোড়াগুলো গাড়ির সঙ্গে জুড়তে লাগল। ততক্ষণে রাজা গুমণ্ড আর মারিয়া ভেলায় চড়ে এপারে এসে পৌঁছল গুমণ্ডের সামনে খোলা তরোয়াল হাতে প্লিনি দাঁড়িয়ে রইল। মারিয়া গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। এবার ফ্রান্সিস ও শাঙ্কো ভেলায় চড়ে পার হ'তে লাগল। ভেলাটা নদীর মাঝামাঝি এসেছে এমনই সময় একটা ছোট বরফের চাঁই ভেসে এসে ভেলাটায় জোর ধাক্কা মারল, ভেলাটা লাফিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস টাল সামলাল কিন্তু শাঙ্কো পারল না। ছিটকে নদীর জলে পড়ে গেল। ওদিকে এই ঘটনা দেখে প্লিনি দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠল। রাজা গুমণ্ডও এই সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল। সে পেছন থেকে সেই হাত তোলা অবস্থায় প্লিনিকে এক ধাক্কা দিল। ও মুখ থুবড়ে কাদা বরফের মধ্যে পড়ে গেল। রাজা গুমণ্ড বিস্কো ছুটে আসার আগেই এক লাফে ছুটে গিয়ে তরোয়ালটা তুলে নিল। তারপর বিদ্যুৎবেগে গাড়িটায় লাফিয়ে উঠল। তরোয়ালের ধারালো জায়গাটা মারিয়ার গলার কাছে ঠেকিয়ে চিৎকার ক'রে ব'লে উঠল—তোমরা কেউ এক পা এগিয়ে এলে আমি মারিয়াকে হত্যা করবো। এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাবে ফ্রান্সিসরা কেউ কল্পনাও করেনি। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি লগি ঠেলে নদীর এপারে এসে পড়ল। কিন্তু আর এগোল না। দাঁড়িয়ে পড়ল। ও ধ'রেই নিয়েছিল শাঙ্কো নদীর জল থেকে ভেলায় উঠে পড়েছে। কিন্তু শাঙ্কো জলে থেকেই সব ঘটনাটা দেখল। তারপর কাঁধের তূনীরটা এক হাতে ধ'রে রেখে ডুব সাঁতার দিয়ে এপারে চ'লে এসেছে ততক্ষণে। মাথা না তুলে বরফ কাদা জলের মধ্যে দিয়ে সাদা কুয়াশার আস্তরণের মধ্যে দিয়ে বুক ঘেঁচড়ে আস্তে আস্তে একটা বড় বরফ ঢাকা পাথরের চাঁইয়ের পেছনে গিয়ে আড়াল নিল। উত্তেজনার মাথায় রাজা গুমণ্ড শাঙ্কোকে লক্ষ্যই করতে পারল না। গুমণ্ড চেঁচিয়ে কোচোয়ানকে ডাকল। কোচোয়ান গাড়িতে উঠে নিজের আসনে বসল। গাড়ি জোতা হ'য়ে গেছে তখন। গুমণ্ড গলা চড়িয়ে হাঁকল—'গাড়ি চালাও—জোরে।' কোচোয়ান ঘোড়াগুলোর গায়ে চাবুক হাঁকাল। গাড়ি চলতে শুরু করল। ওদিকে ফ্রান্সিস, প্লিনি, বিস্কো সব পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। নড়ল না ওরা। যদি ওদের এগিয়ে যেতে দেখে রাজা গুমণ্ড মারিয়ার গলায় তরোয়াল বসিয়ে দেয়।

ওদিকে শাঙ্কো বরফ ঢাকা পাথরের আড়ালে ব'সে তীর পরিয়ে ধনুক বাগিয়ে ধরল। গাড়িটা হাত কুড়ি এগিয়েছে তখন। শাঙ্কোর নাক মুখ দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে তখন। মাত্র একটা তীরে রাজা গুমণ্ডকে ঘায়েল করতে হবে। নিশানা নিখুঁত হওয়া চাই। ছিলা টেনে গভীর মনোযোগের সঙ্গে রাজা গুমণ্ডের তরোয়াল

ধরা ডান বাহু লক্ষ্য ক'রে শাঙ্কো তীর ছুঁড়ল। পাকা হাত শাঙ্কোর। সাদা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তীরটা ছুটে এলো। লাগল ঠিক রাজা গুমগুের ডান বাহুর ওপরের দিকে। রাজা গুমগু আঃ শব্দ ক'রে লাফিয়ে উঠল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গাড়ির ভেতরেই পড়ল। মারিয়া নিচু হ'য়ে দ্রুত হাতে তরোয়ালটা তুলে নিয়ে বরফ কাদা জলে ফেলে দিল। রাজা গুমগু বাঁ হাত দিয়ে টেনে তীরটা খুলে ফেলল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। ও সামনের আসনে বসে পড়ল। গোঙাতে লাগল। মারিয়া চিৎকার ক'রে ডাকল—ফ্রান্সিস—বিস্কো—শিগগির এসো। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিসরা কিছু দেখতে পারছিল না। কিন্তু মারিয়ার চিৎকার ওদের কানে পৌঁছাল। মারিয়া চিৎকার ক'রে কোচোয়ানকে বলল—'গাড়ি থামাও।' কোচোয়ান গাড়ি থামাল। ফ্রান্সিসরা ছুটে এল। খোলা তরোয়াল হাতে গাড়ি ঘিরে দাঁড়াল। রাজা গুমগু তখনও ডান বাহু বাঁ হাতে চেপে গোঙাচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝল শাঙ্কো তীর ছুঁড়ে গুমগুকে ঘায়েল করেছে। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে শাঙ্কোকে খুঁজতে লাগল। একটু পরেই দেখল জলেভেজা পোশাক নিয়ে শাঙ্কো ক্লান্ত পায়ে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হেঁটে ওর দিকে আসছে। ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে শাঙ্কোকে জড়িয়ে ধরল। বিস্কোও গিয়ে জড়িয়ে ধরল।

আবার সবাই গাড়িতে উঠল। ক্লান্ত শাঙ্কো মারিয়ার পাশে বসল। রাজা গুমগুের পাশে বসল বিস্কো। ফ্রান্সিস আর প্লিনি খোলা তরোয়াল হাতে গুমগুের সামনে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে কোচোয়ানকে বলল—গাড়ি ছাড়ো—যত জোরে পারো চালাও।' গাড়ি দ্রুত ছুটল। ফ্রান্সিস দেখল রাজা গুমগুের পোশাকের ডান হাতের কাঁধের কাছে রক্তে ভিজে উঠেছে। গুমগু অল্প অল্প গোঙাচ্ছে।

কুয়াশাও বরফ কাদা জলের মধ্যে দিয়ে গাড়ি জোরে ছুটল। শপাং—শপাং—চাবুকের শব্দ শোনা গেল। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে গাড়ি চলল।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে গাড়ি চলল। একসময় ম্লান আলোয় দূর থেকে দেখা গেল জ্বলন্ত মশালের আলোর বিন্দু। স্কালহল্ট আর দূরে নয়। গাড়ি চলল। ফ্রান্সিস এতক্ষণ এক মুহূর্তের জন্যে তরোয়াল নামায়নি। শাঙ্কোও তীর-ধনুক একভাবে ধরে আছে। বলা যায় না পথের ধারে তুষার ঢাকা পাথরের আড়ালে রাজা গুমগুের সৈন্যরা ওৎ পেতে আছে কিনা।

কিছুক্ষণ পরে স্কালহল্ট নগরে গাড়ি প্রবেশ করল। এইবার ফ্রান্সিস তরোয়াল নামিয়ে কোমরের কোষে রাখল। শাঙ্কোও কাঁধে ধনুক ঝোলাল তীর রাখল কাঁধের তূনীরে।

বিস্কো আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—'ফ্রান্সিস, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ। বসো।' 'ফ্রান্সিসও এতক্ষণে ভীষণ ক্লান্তিবোধ করল। ও আসনে বসে পড়ল। প্লিনি এখন অনেকটা সুস্থবোধ করছিল।

স্কালহল্ট নগরে বন্দরে তখন মানুষের কর্মচঞ্চল জীবন বয়ে চলেছে। দোকানে বাজারে নগরবাসীদের ভিড়। প্রায় সকলেই দেখল গাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা রাজা গুমগুকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলন্ত গাড়ির পেছনে মানুষের জটলা ছুটে এল। রাজবাড়ির সামনে যখন গাড়ি এল তখন চারদিকে মানুষের ভিড়ে ছয়লাপ। সবাই ফ্রান্সিসদের দেখছে—দেখছে গাড়িতে আহত রাজা গুমগুকে। কিন্তু ওরা কেউই বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কী?



রাজবাড়ির সদর দেউড়ি খোলাই ছিল। দ্বাররক্ষীরা পথ ছেড়ে দিল। গাড়ি রাজবাড়ির চত্বরে ঢুকল। থামল এসে সিঁড়ির সামনে। এর মধ্যে রাজবাড়ির অন্দরমহলে সংবাদ পৌঁছে গেছে যে, ফ্রান্সিসরা মারিয়াকে মুক্ত করে রাজা গুমগুকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস একজন দ্বাররক্ষীকে ডেকে রাজামশাইকে আসার জন্য বলে পাঠাল।

একটু পরেই রাজা ইনগল্ফ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। উনি খবরটা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি। বন্দী রাজা গুমগুকে দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ফ্রান্সিস গাড়ি থেকে নেমে রাজা ইনগল্ফকে সম্মান জানিয়ে বলল—'মারিয়া এখন মুক্ত। রাজা গুমগুকেও বন্দী করে এনেছি। এবার আপনার চিরশত্রুর ব্যবস্থা কী করবেন করুন।'

—তোমরা ভেতরে আসবে না?' রাজা বললেন।

—'না। আমরা খুব পরিশ্রান্ত। আমাদের এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। মারিয়াকে নিয়ে এই গাড়িতেই আমরা জাহাজে ফিরে যাবো। তবে প্লিনি থাকবে। ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিন।'

'বেশ।' রাজা ইনগল্ফ বললেন। তারপর রাজা গুমগুকে বললেন—'আপনি নেমে আসুন। আপনার বিচার হবে।' রাজা গুমগু কোনো কথা না বলে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। প্লিনিও নামল। তারপর রাজা ইনগল্ফের পেছনে পেছনে রাজা গুমগু ও প্লিনি রাজপুরীতে প্রবেশ করল। ফ্রান্সিস কোচওয়ানকে গাড়ি জাহাজঘাটায় নিয়ে যেতে বলল।

গাড়ি চলল জাহাজঘাটার দিকে।

জাহাজঘাটায় গাড়ি এসে থামল। ফ্রান্সিসদের দেখে ওদের বন্ধুদের আর তর সইল না। ওরা ছুটে জাহাজ থেকে পাটাতনের ওপর দিয়ে নেমে এল। গাড়ি থেকে ফ্রান্সিস নামতেই হ্যারি ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। হ্যারির চোখে জল এল। ফ্রান্সিস হ্যারির পিঠে মৃদু চাপড় দিতে দিতে বলল—'এই—ছেলেমানুষি করো না।' তারপর হ্যারিকে ছেড়ে দিয়ে ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—'সব বলবো। তার আগে জাহাজে চলো। গরম গরম ভেড়ার মাংস আর রুটির ব্যবস্থা করো।'

দল বেঁধে সবাই জাহাজে উঠে এল।

দিনের হিসেবে পরদিনই রাজা ইনগল্ফ প্লিনিকে ফ্রান্সিসের কাছে পাঠাল। প্লিনি বলল—মহামান্য রাজা ইনগল্ফ আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়িতে এল। মন্ত্রনাকক্ষে রাজা এসে বসলেন। সঙ্গে সেনাপতি। রাজা ইনগল্ফ বললেন—ফ্রান্সিস—এখন তো আর এখানে থাকার মানে হয় না। ভাবছি—ঘণ্টা কয়েক পরে সৈন্যদের নিয়ে আমি, রানী ও রাজপুত্র রেভক্জাভিক ফিরে যাবো।

—না মাননীয় রাজা—এখনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে রেভক্জাভিক যাবেন না। বরং আপনি, মহামান্যা রানী ও রাজপুত্র আমাদের জাহাজে ফিরে চলুন। বন্দী রাজা গুমগুকেও আমরা পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবো। রেভক্জাভিক পৌঁছে রাজা গুমগুর সেনাপতি ও সৈন্যদের অস্ত্রত্যাগে বাধ্য করাবো। যদি তার আগেই আপনার

সৈন্যবাহিনী রেভক্জাভিক পৌঁছে যায় তাহলে সাংঘাতিক যুদ্ধ লেগে যাবে। কারণ রেভক্জাভিকে রাজা গুমগুের সেনাপতি ও সৈন্যরা এখনও জানে না যে রাজা গুমগু আমাদের হাতে বন্দী, কাজেই আপনার সেনাপতিকে আদেশ দিন তিনি যেন দিনের হিসেবে চারদিন পর তার অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে রেক্জাভিক যাত্রা করেন। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস ঠিকই বলেছে মাননীয় রাজা। হ্যারি বলল।

রাজা ইনগল্ফ কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—সেনাপতি আপনি কী বলেন?

—হ্যাঁ মহামান্য রাজা—ফ্রান্সিস সঠিক পরামর্শই দিয়েছেন। সেনাপতি বলল।

—বেশ তাই হবে। রাজা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ফ্রান্সিসরাও উঠে দাঁড়াল। রাজাকে সম্মান জানিয়ে ওরা জাহাজে ফিরে এল। ফ্রান্সিস সব ভাইকিং বন্ধুদের ডেকে বলল—রাজপরিবার আমাদের জাহাজে চড়ে রেভক্জাভিক দিয়ে যাবেন। বন্দী রাজা গুমগুকেও আমরা এই জাহাজেই নিয়ে যাবো। একটা নির্দিষ্ট কেবিন ঘরে তাকে বন্দী ক'রে রাখা হবে। হুঁশিয়ার গুমগু যেন আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে না পারে।

জাহাজে সাজো সাজো রব পড়ে গেল। আগেই সেই বড় কেবিন ঘরটাই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হ'ল। বন্দী রাজা গুমগুের ঘরটাও তৈরি রাখা হ'ল। এবার প্রতীক্ষা—রাজপরিবার কখন আসে। গুমগুকে কখন নিয়ে আসা হবে।

দিনের হিসেবে পরদিন রাজা হজরলিফের রাজকীয় গাড়ি চড়ে রাজা ইনগল্ফ রানী ও রাজপুত্র এল। নির্দিষ্ট ঘরে তাদের আপ্যায়ণ ক'রে নিয়ে আসা হ'ল। রাজকীয় গাড়ির পেছনে এল একটা সাধারণ গাড়ি। তাতে হাত বাঁধা অবস্থায় রাজা গুমগু। গুমগুর ডানবাহুতে কাঁধে কম্বলের ফেট্টি জড়ানো। রাজার চারজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে সেই গাড়িটা পাহারা দিতে দিতে নিয়ে এল। রাজা গুমগুকে তার নির্দিষ্ট কেবিনঘরে রাখা হ'ল। পাহারাদার সেই চারজন সৈন্য তো রইলই ভাইকিংরাও সব সময়ের জন্য দুজন রইল।

নোঙর তোলা হ'ল। জাহাজ চলল রেভক্জাভিকের উদ্দেশ্যে। রাজা ইনগল্ফ আর রাণীর মন এখন অনেক ভালো। তাঁরা মাঝে মাঝে ডেকে উঠে আসেন। ফ্রান্সিস, হ্যারি এবং তাদের ভাইকিং বন্ধুদের সঙ্গে গল্প-টল্প করেন। সবচেয়ে খুশী রাজকুমার। সে সারা জাহাজ টহল দিয়ে বেড়ায়। ছুটোছুটি ক'রে ক্লান্ত হ'লেই চলে আসে ফ্রান্সিসের কেবিনে। বলে গল্প বলো। ফ্রান্সিসের জীবনে তো ঘটনা কম নেই। ও সেইসব গল্প বলে। গল্প শেষ হ'লেই রাজকুমার ছোটে টহল দিতে।

জাহাজ রেভক্জাভিক বন্দরে পৌঁছল। রেভক্জাভিক এখন রাজা গুমগুের সেনাপতি সৈন্যদের দখলে। কাজেই ফ্রান্সিসরা আগে থেকেই অস্ত্রহাতে তৈরী হ'ল। জাহাজঘাটায় জাহাজ ভিড়ল। ভাইকিংরা পাটাতন ফেলল। বন্দরে রাজা গুমগুের সৈন্যরা পাহারায় ছিল। জাহাজ দেখে এবং সশস্ত্র ভাইকিংদের দেখে ওদের মনে সন্দেহ হ'ল। ওরা পরস্পরকে ডাকাডাকি ক'রে একত্র করল। প্রায় দশ পনেরোজন সৈন্য জাহাজঘাটায় খোলা তরোয়াল হাতে সারি দিয়ে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসও এটাই চাইছিল। রাজা গুমগু এখন বন্দী এবং ওদের কব্জায় এটা গুমগুের সৈন্যরা ও সেনাপতি

জানুক। ফ্রান্সিস ওর তরোয়ালটা হ্যারিকে রাখতে দিল। তারপর পাতা পাটাতন দিয়ে নেমে জাহাজঘাটে এল। গুমণ্ডের সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল। ফ্রান্সিস দু'হাত ওপরে তুলে চিৎকার ক'রে বলল—আমি নিরস্ত্র। আমি যুদ্ধ করতে আসেনি।' একজন মোটামত সৈন্য এগিয়ে এল—

—তোমরা কোত্থেকে এলে?

—স্কালহল্ট থেকে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী চাও তোমরা? সৈন্যটি বলল।

—তোমরা তোমাদের সেনাপতিকে সংবাদ দাও যে রাজা গুমণ্ড তাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। আমি সেই চিঠি দিতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল। তখনই একটি সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে সেখানে এল। মোটা সৈন্যটি অশ্বারোহী সৈন্যকে বলল চিঠির কথা। সৈন্যটি ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—চিঠিটা আমাকে দিন। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

—না—সেনাপতিকে এখানে আসতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। অশ্বারোহী সৈন্যটি আর কোন কথা না ব'লে রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছোটাল। ফ্রান্সিস জাহাজে উঠে এল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা ইনগলফের কালো রঙের সোনালি লতাপাতার কাজ করা গাড়িটায় চড়ে সেনাপতি এল।

এবার ফ্রান্সিস রাজা গুমণ্ডকে হাতবাঁধা অবস্থায় এনে ডেকে দাঁড় করালা। পেছন থেকে তরোয়ালের ডগাটা রাজা গুমণ্ডের পিঠে ঠেকিয়ে রাখল। সেনাপতি রাজা গুমণ্ডের এই বন্দীদশা দেখে হতবাক। ততক্ষণে জাহাজঘাটায় অনেক লোক জড় হয়েছে। তারাও কম আশ্চর্য হ'ল না। রেভক্জাভিকের অধিবাসীদের মধ্যে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক জাহাজঘাটায় এসে ভীড় করতে লাগল।

এবার ফ্রান্সিস বলল—রাজা গুমণ্ড—আপনার সেনাপতিকে হুকুম দিন সব সৈন্য যেন এক্ষুণি অস্ত্রত্যাগ করে। রাজা গুমণ্ড একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর সেনাপতিকে লক্ষ্য ক'রে বলল—সব সৈন্যকে অস্ত্রত্যাগ করতে বলো।' সেনাপতি রাজা গুমণ্ডের অবস্থাটা সহজেই বুঝল। সে গাড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে বলল—'সৈন্যগণ—রাজা গুমণ্ডের জীবন বিপন্ন। তোমরা অস্ত্রত্যাগ কর।' উপস্থিত সব সৈন্যরা হাতের তরোয়াল, কাঁধের তীর ধনুক পাথর বাঁধানো জাহাজঘাটায় ফেলে দিল। শব্দ উঠল—ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ। তখনই বিস্কো তরোয়াল হাতে—আর শাঙ্কো ধনুক বাগিয়ে দ্রুত জাহাজ থেকে নেমে এল। পাথুরে জাহাজঘাটা থেকে সব অস্ত্র তুলে নিয়ে একপাশে জড়ো ক'রে রাখল। তারপর দু'জনে অস্ত্রগুলি পাহারা দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস রাজা গুমণ্ডকে বলল—'সেনাপতিকে হুকুম দিন সব সৈন্য জড়ো ক'রে উনি যেন এক্ষুণি রাজবাড়ির উত্তরের প্রান্তরে চলে যান। একজন সৈন্যও যেন রেভক্জাভিক নগরে না থাকে।' রাজা গুমণ্ড চেঁচিয়ে সেই কথা সেনাপতিকে বলল। উপস্থিত সৈন্যরা দল বেঁধে উত্তরের প্রান্তরের দিকে চলল। সেনাপতি গাড়ি থেকে নেমে একটা ঘোড়ায় চড়লো। ছুটল সৈন্যদের ছাউনিতে রাজা গুমণ্ডের এই আদেশ জানাতে।

ফ্রান্সিস প্রিনিকে ডেকে বলল—নেমে গিয়ে একটা সাধারণ ঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়ে এসো। প্রিনি জাহাজ থেকে নেমে গেল গাড়ির খোঁজে। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—যাও রাজপরিবারকে নিয়ে এসো।' হ্যারি চলে গেল।

একটু পরেই রাজা ইনগল্ফ রানী আর রাজকুমার জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালেন। রাজা রানী ও রাজকুমারকে দেখে জাহাজঘাটায় জড়ো হওয়া রেভক্জাভিকের অধিবাসীরা আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে গেল। সত্যিই তারা রাজাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে। তারা উল্লাসে করতালি দিতে লাগল। রাজা ইনগল্ফ মৃদু হেসে ডান হাত তুলে কয়েকবার নাড়লেন। তারপর রানী ও রাজকুমারকে নিয়ে পাটাতন দিয়ে নামতে লাগলেন। জনতা সোল্লাসে ধ্বনি দিল—আমাদের রাজার—জয় হোক। আমাদের রাজা—দীর্ঘজীবী হোন।

রাজা, রানী, রাজকুমার কালো গাড়িটায় গিয়ে উঠলেন। লোকেরা স'রে দাঁড়িয়ে পথ ক'রে দিল। গাড়ি চলল রাজবাড়ির উদ্দেশে।

ততক্ষণে প্রিনি একটা সাধারণ গাড়ি নিয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে রক্ষী সেই চারজন সৈন্যকে ডাকল। বলল—রাজা গুমণ্ডকে ঐ গাড়িতে চড়াও। পাহারা দিয়ে রাজবাড়িতে নিয়ে যাও। সাবধান—পালাতে না পারে।

এবার চারজন সৈন্যের পাহারায় রাজা গুমণ্ড পাতা পাটাতন দিয়ে নেমে এসে গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলল। মাঝখানে রাজা গুমণ্ডকে দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ল। চারপাশে চারজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে রইল।

জনতা স্তব্ধ হ'য়ে এই দৃশ্য দেখছে। রাজা গুমণ্ড এই রেভক্জাভিকে কিছুদিন রাজত্ব ক'রে গেছে। তার হুকুমেই তার সৈন্যরা যে নিষ্ঠুর নিপীড়ন চালিয়েছিল রেভক্জাভিকের মানুষদের ওপর তা তারা ভুলতে পারেনি। হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে কে চিৎকার ক'রে উঠল খুনী শয়তান রাজা গুমণ্ড।' তারপরই একজন রাস্তা থেকে একটা পাথরের টুকরো ছুঁড়ল রাজা গুমণ্ডকে লক্ষ্য ক'রে মুহূর্তে জনতা উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই গাড়ির ওপর। চারজন সৈন্য বহুকষ্টে ভীড় ঠেকাল। এইবার শুরু হ'ল রাজা গুমণ্ডের ওপর পাথর বৃষ্টি। সৈন্যরা আত্মরক্ষার জন্যে গাড়িতে বসে পড়ল। পাথরের ঘায়ে রাজা গুমণ্ডের কপাল মাথা ফেটে গেল। দর্ দর্ ক'রে রক্ত পড়তে লাগল। সারা শরীর রক্তাক্ত হ'ল। রাজা গুমণ্ড জ্ঞান হারিয়ে গাড়ির মধ্যে পড়ে গেল। পাথর ছোঁড়া বন্ধ হ'ল। গাড়ির কোচোয়ান এবার জোর গাড়ি চালাল। গাড়ির পেছনে পেছনে আরও কিছু লোক ছুটে আসতে লাগল চিৎকার করতে করতে।

গাড়ি রাজবাড়ির সদর দেউড়ি পেরিয়ে খোলা চত্বরে ঢুকল। তারপর রক্ষী সৈন্যদের নির্দেশ অনুযায়ী—পূবকোনায় কয়েদ ঘরের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। রাজা গুমণ্ডের তখন জ্ঞান ফিরেছে। একে বাহুতে শাঙ্কোর তীরের ক্ষত তারপর এই পাথর বৃষ্টি রাজা গুমণ্ডের তখন উঠে দাঁড়াবার শক্তিও অবশিষ্ট নেই। সৈন্যরা ধরাধরি ক'রে রাজা গুমণ্ডকে কয়েদ ঘরে ঢুকিয়ে দিল। রাজা গুমণ্ডের নাক মুখ থেকে তখনও রক্ত ঝরছে।

দিনের হিসেবে পরদিন প্রিনি ফ্রান্সিসদের জাহাজে এল। রাজা ইনগল্ফ ফ্রান্সিস ও মারিয়াকে ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করেছেন। এ নিমন্ত্রণ জানাতেই রাজা প্রিনিকে

পাঠিয়েছিলেন। প্লিনির সঙ্গে কথা বলতে বলতে ফ্রান্সিসের মনে পড়ল সেই ছোট্ট গীর্জাটা ঘিরে ছোট্ট গ্রামটার কথা। মারিয়া পাশেই বসে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার ফ্রান্সিস সেই ছোট্ট গ্রামটার কথা, সেই ছুঁচলো দাড়ি গোঁফঅলা দলপতির কথা সব মারিয়াকে বলল। মারিয়া সব শুনে বলল—চলো না সেই ছোট্ট গ্রামটা দেখে আসি।

—বেশ চলো। ফ্রান্সিস বলল। ওর নিজেরও খুব ইচ্ছে করছিল সেই গ্রামটায় যেতে। তাই প্লিনিকে বলল।

—প্লিনি—তিনটি ভালো ঘোড়ার ব্যবস্থা করো। আমরা তিনজনে ঐ ছোট্ট গ্রামটায় যাবো। প্লিনি উঠে দাঁড়াল।

বলল—আমি এক্ষুনি ঘোড়া নিয়ে আসছি। আপনারা তৈরী হোন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লিনি ঘোড়া নিয়ে জাহাজঘাটায় এল। তারপর ফ্রান্সিস মারিয়া ও প্লিনি ঘোড়া ছোটাল সেই ছোট্ট গ্রামটার উদ্দেশ্যে। প্লিনি সামনে থাকল। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

মাথার ওপর আকাশ। আকাশে ম্লান আলো। চারপাশে পাতলা সাদাটে কুয়াশার আস্তরণ। তার মধ্যে দিয়ে ওরা ঘোড়ায় চড়ে চলল।

বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। এক সময় ওরা সেই ছোট্ট গ্রামটায় পৌঁছল। দেখল সেই ছোট গীর্জাটা। গীর্জাটাকে ঘিরে পাথরের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলছে। বোঝা গেল সবাই জেগে আছে।

ঘোড়া থেকে নামল ওরা। গীর্জার লাগোয়া পাদ্রীমশাইয়ের সেই ঘরের দরজায় এসে ওরা দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বন্ধ দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে দাঁড়াল সেই ছুঁচালো দাড়ি গোঁফওলা দল নেতা, দাড়ি গোঁফ আছে, তবে মোম দিয়ে মেজে ছুঁচালো করা নেই। লোকটা মোমবাতির আলোয় একটা মোটা চামড়ার বই পড়ছিল। বোধহয় বাইবেল। ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে বলল—'চিনতে পারো?' লোকটা সঙ্গে ফ্রান্সিসকে চিনল। ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিসও হেসে ওকে জড়িয়ে ধরল। ওর পিঠে আদরের চাপড় দিল। আলিঙ্গন আলগা ক'রে ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—মারিয়া—আমার স্ত্রী। লোকটি মারিয়াকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। বলল—'বসুন—বসুন।' তিনজনে বেঞ্চিতে বসল।

—তোমার নাম কী ভাই? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

ইসলিফ।' তারপর ইসলিফ বলল—'আপনার নাম আমি জানি না। কিন্তু আপনি আমার সমস্ত জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আমি আজ অন্য মানুষ।' ফ্রান্সিসও ভালো ক'রে ইসলিফকে দেখল। সত্যি ইসলিফের পরনে চাষীদের পোশাক। চোখে মুখে শান্ত ভঙ্গী। ইসলিফ একটা ছেলেকে ডাকল। বলল—সবাইকে বল্ আমার পরম বন্ধু এসেছেন। ছেলেটা চলে গেল। একটু পরেই কিছু লোকজন এল। সেই স্ত্রীলোক দু'জনও এল। তারা ফ্রান্সিস আর প্লিনিকে দেখে চিনল। বার বার বলতে লাগল—আপনারা সেদিন আমাদের সকলের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। আপনারা বসুন। না খাইয়ে আপনাদের ছাড়বো না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই স্ত্রীলোকেরা খাবারের আয়োজন করল। গরম গরম গোল রুটি, ভেড়ার মাংস আর নানা সব্জির তরকারির মত। ওরা খেতে লাগল। খুব

সুস্বাদু রান্না। ফ্রান্সিস গোগ্রাসে খেতে লাগল। হঠাৎ ইসলিফ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্না ভেজা গলায় বলল—

ভাবলে আমার দুঃখে কষ্টে বুক ভেঙে যায়—কী অশান্ত কী বিশ্রী জীবন আমি কাটিয়েছি। বিশ্বাস করুন—আজ আমার মনে অপার শান্তি অসীম তৃপ্তি। আমার বাকী জীবন আমি উৎসর্গ করেছি এই ছোট্ট গ্রামটার মানুষদের জন্যে। কথাটা শুনে ফ্রান্সিস খুশী হ'ল। মৃদু হেসে ইসলিফের পিঠ চাপড়াল। মারিয়া খেতে খেতে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে গল্প করতে লাগল।

ওরা যখন ফিরে আসার জন্যে ঘোড়ায় উঠল ছোট্ট গ্রামের মানুষগুলো ওদের ঘিরে ধরল। বারবার বলতে লাগল—আবার আসবেন।

ফ্রান্সিসরা ঘোড়া ছোটাল রেভক্জাভিকের উদ্দেশ্যে। ঘোড়া চালাতে চালাতে ফ্রান্সিস ডাকল—মারিয়া।

—বলো।' মারিয়া বলল।

—দেখ—জীবনে অনেক মূল্যবান জিনিস আমি অনেক কষ্টে—আবিষ্কার করেছি উদ্ধার করেছি। তা'তে খুশী হ'য়েছি। কিন্তু ইসলিফের জীবনধারা বদলাতে পেরেছি দেখে আমার সমস্ত মনপ্রাণ কী এক আনন্দে তৃপ্তিতে ভ'রে উঠেছে তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না।

মারিয়া একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল—তোমার আনন্দে আমিও আনন্দিত। তোমার তৃপ্তিতে আমারও তৃপ্তি। ফ্রান্সিস বলল—প্লিনি—ভেড়া চড়ায় যারা তাদের সেই গানটা গাও না। প্লিনি হাসল। তারপর গলা চড়িয়ে সেই গানটা গাইতে লাগল। একটু পরে ফ্রান্সিস প্লিনির গলার সঙ্গে গলা মেলাল। মারিয়াও যোগ দিল। তিনজনের মিলিত কণ্ঠের গানের সুর দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

একসময় দূর থেকে রেভক্জাভিক নগরের আলো ওরা দেখল। নগরে প্রবেশ করল ওরা। ফ্রান্সিস বলল—'প্লিনি—রাজা গুমণ্ড যে কয়েদঘরে বন্দী আছে সেখানে আমাদের নিয়ে চলো।

—বেশ চলুন।' প্লিনি বলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজবাড়িতে প্রবেশ করল ওরা। চত্বর পেরিয়ে প্লিনি ওদের কয়েদ ঘরের দরজায় নিয়ে এল ওদের। দরজার দু'পাশে চারটে মশাল জ্বলছে। রক্ষীরা খোলা তলোয়ার হাতে পাহারা দিচ্ছে। ঘোড়া থেকে তিনজনে নামল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে একজন রক্ষীকে বলল—দরজা খোল। রাজা গুমণ্ডের সঙ্গে আমার কথা আছে। রক্ষীরা ফ্রান্সিসকে চিনল। প্লিনিও বলল ওদের। একজন গিয়ে দরজার বড় তালাটা খুলল। লোহার গারদ বসানো দরজাটা খুলল। তিনজনে ভেতরে ঢুকল। মশালের আলোয় দেখল একটা লম্বাটে পাথরের ওপর রাজা গুমণ্ড কম্বল গায়ে শুয়ে আছে। ওদের ঢুকতে দেখে গুমণ্ড উঠে বসল। ফ্রান্সিস বলল—আপনার চিকিৎসা হ'য়েছে? গুমণ্ড কোন কথা না ব'লে মাথা নেড়ে বোঝাল চিকিৎসা হয়েছে।

ফ্রান্সিস বলল—রাজা গুমণ্ড—আপনার রাজত্বের নমুনা আমরা থিংভেলিরে দেখে এসেছি। আপনার সৈন্যদের অত্যাচারে নিপীড়নে আপনার নিরীহ প্রজারা জর্জরিত। মাত্র কয়েকদিন এই রেভক্জাভিকে রাজত্ব ক'রে গেছেন। সেই কয়দিন যে অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন তার স্মৃতি এখানকার মানুষ ভুলে যায়নি।

তাই জাহাজঘাটায় আপনার প্রতি তীব্র ঘৃণায় ওরা আপনাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। ফ্রান্সিস থামল। রাজা গুমণ্ড মুখ নিচু ক'রে রইল। ফ্রান্সিস বলল—এই ঘটনা দেখে সহজেই অনুমান করতে পারছেন থিংভেলিরে আপনার প্রজাদের মনোভাব। তাই বলছিলাম—সারা জীবন তো নিষ্ঠুর উল্লাসে শুধু মানুষ হত্যা করেছেন আর নিপীড়ন অত্যাচার চালিয়েছেন। আজ আপনার ভাববার সময় এসেছে বাকী জীবনটা আপনি কীভাবে কাটাবেন। ফ্রান্সিস থামল। এতক্ষণে রাজা গুমণ্ড মুখ তুলে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস থামল। এতক্ষণে রাজা গুমণ্ড মুখ তুলে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—আপনার কি এর জন্য কোন অনুশোচনা হয় না?' রাজা গুমণ্ড একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন—সেদিন জাহাজঘাটে যেভাবে আমাকে অপমানিত লাঞ্ছিত করল এখানকার অধিবাসীরা তা'তে একটা কথা বুঝলাম যে আমাকে আমার প্রজারা কী ঘৃণা করে।' একটু থেমে রাজা গুমণ্ড বলল—আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। কিন্তু আমার তো জীবন শেষ হ'য়ে যাবে এই কয়েদঘরেই।

—না' ফ্রান্সিস বলল—'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আপনার মুক্তির জন্যে যদি আপনি প্রতিশ্রুতি দেন যে প্রজাদের মঙ্গল ছাড়া বাকী জীবন আপনি আর কিছু ভাববেন না।

—যদি সত্যিই আমি থিংভেলির রাজ্যের রাজপদ ফিরে পাই আমি সর্বতোভাবে প্রজাদের কল্যাণসাধন করবো। রাজা গুমণ্ড বলল।

—বেশ। 'ফ্রান্সিস বলল—'আমি বিশ্বাস করি আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি সততার সঙ্গে রক্ষা করবেন। আপনাকে মুক্তি দেবার জন্যে আমি রাজা ইনগল্‌ফকে অনুরোধ করবো। মনে হয় তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন।' ফ্রান্সিস ফিরে দাঁড়াল। মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল।

তারপর ফ্রান্সিসরা জাহাজে ফিরে এল।

দিন কাটতে লাগল। ফ্রান্সিস ঘুমোনোর আগে পর্যন্ত কবি আরির বইয়ে পাওয়া ছবি আর নক্সাটা দেখে। কিন্তু তার রহস্য আর উদ্ধার করতে পারে না।

দু'একদিন পরে পরে মারিয়া অথবা হ্যারিকে নিয়ে লোগবার্গে যায়। ঘুরে ঘুরে স্তম্ভগুলো দেখে, প্রদীপ দেখে, ঘাসে ঢাকা জায়গাটা দেখে কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। ফ্রান্সিস এখানে এলেই সেই বৃদ্ধ লোকটির ঘরে যায়। বৃদ্ধটির সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। বৃদ্ধটির নাম হ্রোলগ। সে আইসল্যাণ্ডের পুরোনো দিনের অনেক গল্প করে। কিন্তু সপ্তম স্তম্ভের ব্যাপারে ফ্রান্সিস আর নতুন কিছু জানতে পারে না। হ্রোলগ সেই পুরোনো কথাটাই বলে—আর একটা স্তম্ভ রাজা ফ্রোকি নাকি পুঁতেছিলেন। পাথরের নয়—সোনার স্তম্ভ। কিন্তু সে জানে না সেটা কোথায় পোঁতা হয়েছিল।

দেখতে দেখতে উৎসবের দিন এসে গেল। নগর থেকে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে উৎসবের সাজে সেজে পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চলেছে লোগবার্গে। ফ্রান্সিস, মারিয়া আর বন্ধুরাও চলল লোগবার্গে।

স্তম্ভগুলোর কাছে ওরা যখন পৌঁছল তখন দেখল প্রদীপ জ্বালানো হয়ে গেছে। আলোয় ভরে গেছে নাচগানের আসর। ওরা পাহাড়ের গায়ে খাঁজকাটা আসনগুলিতে

বসল। একটু পরেই গাড়ি চড়ে রাজা ইনগল্‌ফ ও রানী এলেন। নিজেদের নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। সেদিন দর্শকের সংখ্যা আগের দিনের চেয়ে বেশি।

উৎসব শুরু হলো। একদল মেয়ে রঙচঙে বাহারি পোশাকে সেজে স্তম্ভগুলোর পেছনে যে নক্সা-তোলা মোটা কাপড় বিছানো হয়েছে তাতে এসে দাঁড়াল। বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠল। দুটি মেয়ে এগিয়ে এসে গান ধরল। গানের বিষয় রাজা ফ্লোকির বীরত্বের কাহিনী। ওরা দু'জন গান শেষ করতে চারদিকে করতালির শব্দ শোনা গেল। এবার সব মেয়েরা মিলে গাইতে লাগল ভেড়াচালকদের গান। পাহাড়ের সবুজ ঘাসে লোকেরা ভেড়া চরিয়ে বেড়ায় এটা তাদের গান। এই গান শেষ হতে রাজা-রানী চলে গেলেন। আবার গান আর সেই সঙ্গে নাচ শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুহুমুর্হু করতালির মধ্যে আসর জমে উঠল। পুরুষ দর্শকরাও অনেকে নাচের আসরে যোগ দিল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে নাচগান চলল। প্রদীপের আলো কমে গেল। একসময় নাচগানের উৎসব শেষ হলো।

দর্শকরা নগরে ফিরে যেতে লাগল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরাও ফেরার জন্যে একত্র হলো। ফ্রান্সিস মারিয়াকে বলল—'তুমি ওদের সঙ্গে ফিরে যাও। আমি আর হ্যারি কিছুক্ষণ পরে যাচ্ছি।'

মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—'তোমাদের দু'জনের সঙ্গে আমিও থাকবো। তোমাদের সঙ্গেই ফিরবো।'

ফ্রান্সিস বলল—'বেশ।' বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—'তোমরা চলে যাও। আমরা পরে যাবো।'

বন্ধুরা হৈ হৈ করতে করতে চলে গেল।

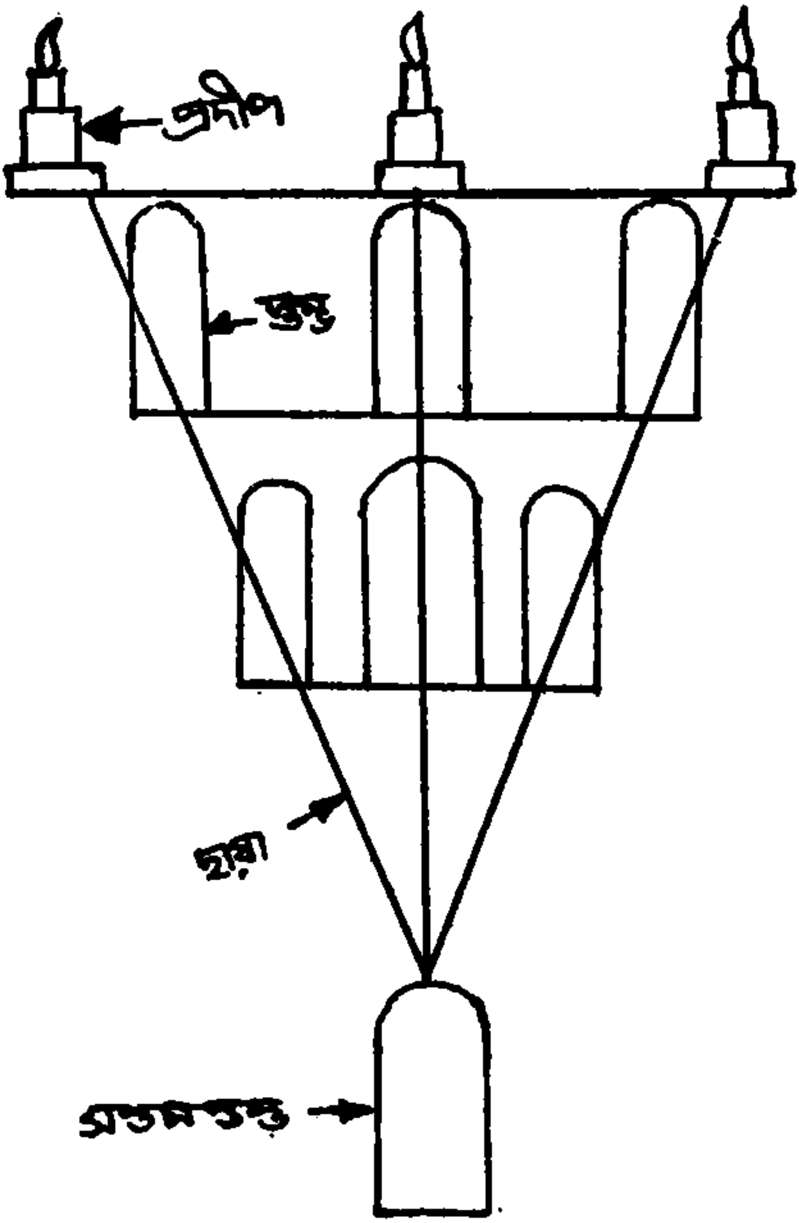
কিছুক্ষণের মধ্যেই উৎসবপ্রাঙ্গণ জনহীন হয়ে গেল। সেদিনের মতো আজও কয়েকজন লোক পাহাড়ের খাঁজে এখানে ওখানে ভেড়ার লোমের মোটা কম্বল জড়িয়ে শুয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে দেখা গেল।

ফ্রান্সিস পাথরের আসন ছেড়ে স্তম্ভগুলোর কাছে এল। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। সঙ্গে মারিয়া আর হ্যারি। একটুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ফ্রান্সিস যে নক্সা বোনা মোটা কাপড়টা পাতা ছিল তার ওপরে বসে পড়ল। তারপর হাতে মাথা রেখে আধশোয়া হলো। পাথরের প্রদীপের আলো কমে গেছে। ফ্রান্সিস তাকিয়ে রইল ছ'টা স্তম্ভ আর পাথরের প্রদীপগুলোর দিকে। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল মাটিতে পাতা মোটা কাপড়ের নক্সাগুলোর ওপর খুব আবছা স্তম্ভের ছায়া পড়েছে। ছায়াগুলো লম্বা হয়ে নেমে এসেছে। তবে স্পষ্ট নয়। কাপড়ের নক্সার জন্যে আর প্রদীপের আলোগুলোও কমে এসেছে বলে। তবে এটা বোঝা যাচ্ছে ছায়া তিনটে ত্রিকোণ। নক্সাটাও তো ত্রিকোন! ফ্রান্সিস শরীরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে ডাকল—'হ্যারি।'

হ্যারি আর মারিয়া ছুটে এল। হ্যারি বলল—'কি ব্যাপার?'

—'এই নক্সাকাটা কাপড়টা সরাতে হবে।' ফ্রান্সিস বলল।

তারপর তিনজনে মিলে কাপড়টা সরাতে লাগল। তখনই দেখল, হ্রোলগ আস্তে আস্তে আসছে। ও আসার আগেই কাপড়টা তোলা হয়ে গেছে। দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে হেসে হ্রোগল বলল—'তোমরা কেন তুলছো! ওটা তো আমার কাজ।'



তিনটি ছায়াই মিলেছে এক বিন্দুতে।

ফ্রান্সিস সে কথায় কান দিল না। ও তখন মাথা নিচু করে ঘাসের জমিতে স্তম্ভের যে অস্পষ্ট ছায়া পড়েছে তাই দেখছিল। এবার মুখ তুলে বলল—'হ্রোগল—আপনি প্রদীপ তিনটের পলতে উস্কে দিন তো। যতটা পারেন প্রদীপের আলোটা উজ্জ্বল করুন।'

হ্রোগল চলল প্রদীপের পলতে উস্কে দিতে। বিড়বিড় করে মাথা নেড়ে বলতে লাগল—'ছেলেটার মাথাও খারাপ হয়ে গেছে।'

হ্রোগল মই বেয়ে উঠল। লম্বা কাঠের লাঠিটা দিয়ে পরপর তিনটে পাথরের প্রদীপের পলতে উস্কে দিল। উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল চারদিক।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলে উঠল—'হ্যারি মারিয়া—দেখো স্তম্ভের তিনটে ছায়া মিলছে কিনা।'

হ্যারি আর মারিয়া দেখল—সত্যিই তাই। স্তম্ভ ছ'টির ছায়া একটা বড় ত্রিভুজের সৃষ্টি করেছে। তিনটে ছায়াই মিলেছে নিচে একটা বিন্দুতে।

ফ্রান্সিস এখানে যতবার আসে—ছবি আর নক্সার কাগজটা সঙ্গে করে নিয়ে আসে। আজকেও এনেছিল। ও ঢোলা জামার তলা থেকে নক্সাটা বের করল। নক্সার কাগজটা ঘাসে ঢাকা মাটিতে পাতল। বলল—'হ্যারি, মারিয়া—দেখো—নক্সার ওপরের দিকের তিনটি আলোর চিহ্ন। এগুলো ঐ তিনটে পাথরের প্রদীপ। তার নিচের বিন্দুগুলোতে যদি ছ'টা স্তম্ভের কল্পনা করো তাহ'লে নক্সাটা এরকম দাঁড়াবে কিনা. অর্থাৎ প্রদীপশিখাগুলো থেকে তিনটে ছায়ার দাগ কল্পনা করো। সেই ছায়াগুলো ঠিক নিচে একটা বিন্দুতে মিলে ত্রিভুজের সৃষ্টি করবে। দেখো ভালো করে—

মারিয়া ও হ্যারি ঝুঁকে পড়ে দেখল—ঠিক তাই। ফ্রান্সিস বলল—'ঐ দেখো—স্তম্ভের ছায়াগুলো ঐ জায়গায় মিশে গেছে।' দেখা গেল সত্যিই তিনটি ছায়া ঐ জায়গাটায় মিশে গিয়ে একটা ত্রিভুজের সৃষ্টি করেছে। ফ্রান্সিস ঐ মিশে যাওয়া বিন্দুতে মাটিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে দু'হাত ওপরে তুলে বলে উঠল—'এইখানে আছে সেই রহস্যময় সপ্তম স্তম্ভ।'

হ্যারি একটুক্ষণ ভাবল। সত্যিই তো। নক্সাটা তো এই নির্দেশই দিচ্ছে। হ্যারি ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। চিৎকার করে বলতে লাগল—'সাবাস্—সাবাস্ ফ্রান্সিস।' মারিয়া তখনও রহস্যভেদ করার ব্যাপারটা সঠিক বুঝতে পারিনি। হ্যারি এসে আস্তে আস্তে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। মারিয়া আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল। তিনজনেই প্রায় নাচতে লাগল।

বৃদ্ধ হ্রোলগ এসব দেখে বলে উঠল—'ছেলেমেয়েরা —নাচ অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে।'

হ্যারি ছুটে এসে হ্রোলগকে জড়িয়ে ধরে নাচতে লাগল। এদিকে ওখানে যারা কম্বল জড়িয়ে ঘুমিয়েছিল তাদের এই চ্যাঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। ওরা উঠে বসল কেউ কেউ। হ্যারিদের নাচ দেখতে লাগল।

ফ্রান্সিস হ্রোলগকে বলল—'আপনাকে সেদিন আপনার বাগানে বেলচা নিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখেছিলাম। আছে তো ওটা?'

—'তা, থাকবে না কেন।'

'—আপনি হ্যারিকে নিয়ে যান। বেলচাটা ও নিয়ে আসবে।,' ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি একটু পরেই বেলচাটা নিয়ে এল। ফ্রান্সিস বেলচাটা হাতে নিল। তিনটে ছায়া যে বিন্দুতে মিশেছে সেখানে বেলচাটা বসিয়ে দিল। বলল—'এই জায়গাটা খুঁড়তে হবে।' তারপর নিজেই বেলচা দিয়ে জায়গাটা খুঁড়তে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ খুঁড়ল। তারপর হ্যারিকে ডাকল। হ্যারিও খুঁড়তে লাগল। তবে হ্যারি বরাবরই শরীরে দিক থেকে দুর্বল ও অল্পেতেই হাঁপিয়ে উঠল। তখন ফ্রান্সিস হাত লাগাল। চলল গর্ত খোঁড়া।

ওদিকে যারা শুয়ে বসে ছিল তারা তো অবাক। হলো কি এই পুরুষ দুটোর আর মেয়েটির। এতক্ষণ হৈ হৈ নাচানাচি করে এখন মাটি খুঁড়তে শুরু করেছে? দিল গর্ত খুঁড়ে উৎসবের নাচগানের জায়গাটা নষ্ট করে। ওরা দু'তিনজন কাছে এল। মাটি কাটা দেখল। একজন বলল—'কী ব্যাপার? এখানে গর্ত খুঁড়েছেন কেন?'

ফ্রান্সিস বেলচা চালতে চালতে বলল—'এখানে ঐ স্তম্ভগুলোর মতো একটা স্তম্ভ আছে কিনা খুঁড়ে তাই দেখবো।'

—'বেশ, একটা পাথরের স্তম্ভ না হয় পেলেন। কিন্তু তাতে হবেটা কী?' আর একজন বলল।

হ্যারি বলল—'সেটা এখনই ঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে একটা রহস্যের সমাধান হবে।'

লোকগুলো পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল—এগুলো কি পাগল নাকি? ততক্ষণে আর বাকি সবাই এসে ওখানে জড় হয়েছে। নানা মন্তব্য করতে লাগল ওরা। ফ্রান্সিস মাটি খুঁড়ে চলল। হ্যারি ওদের দিকে তাকিয়ে বলল—'ভাই, তোমরাও একটু সাহায্য করো না।'

ওরা সব গাঁয়ের চাষী। এসব কাজ ওদের কাছে কিছুই না। সবাই রাজী হলো না। দু'জন শুধু বোধহয় কৌতূহলবোধ করল। মজার খেলা দেখাই যাক না। একটি যুবক ফ্রান্সিসকে থামতে বলল। ফ্রান্সিস খোঁড়া থামিয়ে হাঁপাতে লাগল। যুবকটি বেলচা হাতে নিল। বলল———'এসব আপনাদের কাজ নয়।' তারপর নিপুণ ভঙ্গীতে বেলচা চালাতে লাগল। একটুক্ষণের মধ্যেই হাঁটুসমান গর্ত করে ফেলল।

হ্যারি বলল—'ফ্রান্সিস—কোনো কিছুর হদিস তো পাওয়া যাচ্ছে না।'

ফ্রান্সিস চিন্তিতস্বরে বলল—'হুঁ, তাই তো দেখছি। দেখা যাক আর হাত কয়েক খুঁড়ে।' এবার যুবকটি বেলচা রেখে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—'তুমি উঠে এসো। আমি খুঁড়ছি।'

অন্যজন এগিয়ে এসে বলল—'না—আপনি বিশ্রাম করুন। আমি হাত লাগাচ্ছি।'

এই লোকটি একটু বয়স্ক। যুবকটি গর্ত থেকে উঠে এল। বয়স্ক লোকটি খুঁড়তে লাগল। হাত খানেকও খোঁড়েনি, হঠাৎ বেলচায় কী লেগে ঠং করে শব্দ হলো। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে গর্তের মধ্যে তাকাল। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা গেল না। বয়স্ক লোকটি হাত দিয়ে দিয়ে ওখানকার মাটি সরিয়ে সরিয়ে জিনিসটা দেখল। বলল—'মনে হচ্ছে লোহার ডান্ডার মতো কিছু।'

ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি, শীগগিরি হ্রোলগের ঘর থেকে একটা মশাল জ্বালিয়ে

নিয়ে এসো।'

হ্যারি ছুটে চলে গেল। বয়স্ক লোকটি ঐ লোহার ডান্ডাটার চারপাশে খুঁড়তে লাগল। কাটা মাটি সরাতে লাগল।

হ্যারি জ্বলন্ত মশাল নিয়ে এল। ফ্রান্সিস বয়স্ক লোকটিকে বলল—'তুমি ভাই এসো। আমি খুঁড়ছি।'

লোকটি গর্ত থেকে উঠে এল। ফ্রান্সিস মশাল হাতে গর্তে নামল। যেটাকে লোকটা লোহার ডান্ডা বলছিল সেটার গায়ে তখনও মাটি লেগে আছে। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে ওটার গা থেকে মাটি মুছে ফেলল। মশালের আলোয় দেখল—লোহা নয়—সোনা। সোনার দন্ড মতো। তার গায়ে সবুজ নীল মীনে করা। এইবার ফ্রান্সিস বিপদ আঁচ করল। যদি লোকগুলো জানতে পারে যে ওটা লোহা নয় সোনা, তাহলেই বিপদ। সোনার লোভে মানুষ উন্মত্ত হয়ে যায়। তখন মানুষ মানুষকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাছাড়া এরা গরিব চাষী। সোনার জন্যে নিজেরাই খুনোখুনি শুরু করে দেবে। ফ্রান্সিসদের তো খুন করবে প্রথমেই।

ফ্রান্সিস কোনো কথা না বলে মশালটা খোঁড়া মাটির মধ্যে গুঁজে দিল। মশাল নিভে গেল। গর্তটা অন্ধকার হয়ে গেল। ফ্রান্সিস মশাল নিভিয়ে ফেলল যাতে চাষী লোকগুলোর সোনার দন্ড দেখতে না পায়। গর্তের ওপরে উঠে এল। বয়স্ক লোকটি জিজ্ঞেস করল—'ওটা লোহার ডান্ডা তাই না?'

ফ্রান্সিস হেসে বলল—'হ্যাঁ, এত খাটুনি বৃথাই গেল। বোধহয় ফ্রান্সিসদের পাগলামির ব্যাপারেই কথা বলতে লাগল ওরা।

হ্যারির কাছে এসে ফ্রান্সিস দাঁড়াল। হ্যারি বলল—'লোহার একটা ডান্ডাকে তুমি সোনার স্তম্ভ বলবে?

ফ্রান্সিস ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল—'চুপ।' তারপর হ্যারি কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল—'হ্যারি—লোহার নয়—সোনার দন্ড মতো। তাতে মীনের কাজ করা।

—'বলো কি?' হ্যারি চমকে উঠল।

—'আস্তে।' ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল—'হেংরিদের একটা আধভাঙা ঘোড়া গাড়ি আছে দেখেছি। গোড়াটা তেজীয়ান না হলেও মোটামুটি ছুটতে পারবে। তুমি গাড়িটায় চড়ে বন্দরে চলে যাও। বিস্কো শাঙ্কো আর জনার দশেক বন্ধুকে দিয়ে এসো। সবাই যেন অস্ত্র নিয়ে আসে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

হ্যারি চলে গেল। মারিয়া সন্দেহ করল কিছু একটা হয়েছে। কাছে এসে বলল—'কী হয়েছে ফ্রান্সিস'

—'পরে বলবো।' ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল। অন্য মেয়ে হলে হয়তো কী হয়েছে সেটা জানবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়ত। কিন্তু মারিয়া খুব বুদ্ধিমতী। সে বুঝল যে এখন চুপ করে থাকাই ভাল। সময় এলে ফ্রান্সিস নিজে থেকেই সব বলবে। ফ্রান্সিস বলল—'খুব পরিশ্রান্ত—বুঝলে? চলো—ঐ স্তম্ভে হেলান দিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিই।

একটা স্তম্ভে হেলান দিয়ে ফ্রান্সিস শরীর ছড়িয়ে আধশোয়া হলো। মারিয়াও কাছে বসল। অস্পষ্ট আলোয় ওরা দেখল একটা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে হ্যারি

চলেছে সঙ্গে বৃদ্ধ হ্রোগল।

ফ্রান্সিস একবার চারদিকে তাকাল। দেখল চাষী শ্রেণীর সেই লোকগুলো ভেড়ার লোমের মোটা কম্বল জড়িয়ে শুয়ে। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে সবাই। পাথরের প্রদীপের আলো নিভে এসেছে। আকাশে দিগন্তে ম্লান আলো। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল—'মারিয়া—সপ্তম স্তম্ভের রহস্যের সমাধান মরেছি।' মারিয়া খুশীতে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে ফ্রান্সিসের ইঙ্গিতে থেমে গেল। ফ্রান্সিস নিম্নস্বরে বলল—'একটা সবুজ মীনে করা সোনার দন্ড পেয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওটা জাহাজের মাস্তুল অর্থাৎ 'দীর্ঘ সর্প' জাহাজটা ওখানেই পুঁতে রাখা হয়েছে। 'সপ্তম স্তম্ভ' যেটা থরবার্গ বলেছিল সেটা আসলে সোনার মাস্তুল। স্তম্ভ নয়।'

—'এখন কী করবে?' মারিয়াও নিচু স্বরে বলল।

—'এখানে যে চাষীরা ঘুমিয়ে আছে তারা কিছু বোঝার আগেই আমাদের বন্ধুদের এখানে নিয়ে আসতে হবে। তাই হ্যারিকে গাড়ি করে পাঠালাম। বন্ধুরা এলেই নিশ্চিন্ত। ঐ চাষী লোকগুলোর মনে সন্দেহ হয় এমন কোনো কথা আমরা এখন বলবো না। তেমন কোনো কাজও করবো না। চুপ করে বন্ধুদের জন্যে অপেক্ষা করবো।' মারিয়া কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

অনেকটা সময় কেটে গলে। ফ্রান্সিস মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল। তখনই দেখল দূরে রাস্তার ওপর অল্প অন্ধকার আর কুয়াশার মধ্যে মশালের আলোর বিন্দু পর পর কয়েকটা। গাড়ি আসছে। একটুক্ষণের মধ্যেই গাড়ির চাকার শব্দ শোনা গেল। কয়েকটা ঘোড়ায় টানা চাষীদের গাড়ি বোঝাই হয়ে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা এল। সবার পেছনে হ্রোলগের গাড়ি।

গাড়ি থেকে নেমে বন্ধুরা হৈ-হৈ করতে ছুটে এল। সকলের হাতেই খোলা তরোয়াল। শুধু শাঙ্কোর কাঁধে ধনুক ও তুনীর। ওরা ধরেই নিয়েছিল—এবার লড়াই হবে। নইলে ফ্রান্সিস অস্ত্রশস্ত্র আনতে বলবে কেন!

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—'ভাইসব—ঐ গর্তটা খুঁড়ে আরো বড় করতে হবে। হাত লাগাও।' ভাইকিং বন্ধুরা হাতের তরোয়াল স্তম্ভগুলোর কাছে জমা করে রাখল। হ্যারি বুদ্ধি করে চারটে বেলচা হ্রোলগের গাড়িতে করে নিয়ে এসেছিল। পাঁচজন ভাইকিং বেলচা চালিয়ে গর্ত গভীর করতে লাগল। তবে লড়াই হলো না বলে সকলেই বেশ মনমরা হয়ে গেল।

আরো হাতখানেক খুঁড়তেই দেখা গেল পাথরের ছোট ছোট চাঁই দিয়ে বাঁধানো একটা জায়গা। সেই চাঁইগুলোর একটা ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে সোনার দন্ডটা।

ওরা ফ্রান্সিসকে ডাকল। ফ্রান্সিস ঘোড়ার গাড়িতে রাখা মশাল নিয়ে গর্তে নামল। মশালের আলোয় দেখল নিচেটা পাথর দিয়ে বাঁধানো। ফ্রান্সিস বুঝল—ঐ বাঁধানো জায়গাটাতেই রাখা আছে ক্ষুদে 'দীর্ঘ সর্প' সোনার জাহাজ। দেখা গেল বাঁধানো জায়গাটা লম্বাটে। ফ্রান্সিস গর্ত থেকে উঠে এল। বলল—'ঐ বাঁধানো পাথরগুলো খুলে ফেল। দেখা যাক কী আছে ওর মধ্যে।'

খুঁড়তে খুঁড়তে প্রায় সাত ফিট বাঁধানো জায়গাটা পাওয়া গেল। এবার পাথরগুলো খুলতে হবে। গাঁইতি চাই। হ্রোগলই ওর ঘর থেকে একটা গাঁইতি নিয়ে এল। একে একে পাথরের ছোট ছোট চাঁইগুলো জোড়ামুখে চাড় দিয়ে খোলা হতে লাগল।

কয়েকটা চাই খুলতেই দেখা গেল চকচকে গাড় নীল রঙের কাপড়ে কী যেন ঢাকা। সব চাঁই খুলতেই দেখা গেল—একটা পাঁচ ফিট লম্বা সোনার জাহাজ। তার মাস্তুলটা তো আগেই দেখা গিয়েছিল। ক্ষুদে জাহাজের মুখটা অবিকল সেই ছবির সাপের মুখের মতো। মশালের আলো পড়তে জাহাজের সোনার গা ঝিকিয়ে উঠল। ক্ষুদে জাহাজটা পাথরের চাঁইয়ের বাক্সের মধ্যে ছিল বলেই মাটি লাগেনি। এবার ফ্রান্সিস গর্তে নামল। বিস্কো মশাল হাতে নামল। ফ্রান্সিস গাড় নীল কাপড়টা সরাল। ঝক্মক্ করে উঠল জাহাজের এক ফুট চওড়া খোল বোঝাই মণিমাণিক্য, দামী পাথরের টুকরো।

ততক্ষণে ভাইকিংরা আর কয়েকজন চাষী সবাই ঝুঁকে পড়েছে গর্তটার ওপর। ফ্রান্সিস ক্ষুদে জাহাজটা তুলতে গেল। তুললও কিছুটা। কিন্তু বেশ ভারী। তাছাড়া তুলতে গেলে জাহাজটা কাত হবে। খোল থেকে মণিমাণিক্য দামী পাথরগুলো ছড়িয়ে নিচে পড়ে যাবে। ফ্রান্সিস বললো—'বিস্কো—মশালটা ওপরে কারো হাতে দাও। তারপর জাহাজের ওপাশটা ধরো। দু'জনে মিলে তুলতে হবে।'

মশাল গর্তের ওপরে একজন নিল। ফ্রান্সিস আর বিস্কো মিলে ক্ষুদে সোনার জাহাজটা তুলতে লাগল। আস্তে আস্তে ওপরে তুলতেই এতক্ষণে মশালের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল সোনার ক্ষুদে জাহাজ, মাস্তুল। অপরূপ সবুজ নীল মীনে করা জাহাজের ঝকঝকে গা, মাস্তুল। জাহাজের খোলভর্তি মণিমাণিক্য দামী পাথরের স্তূপ। তার মধ্যে কিছু দামী হীরের সোনার গয়নাগাঁটিও আছে।

এই দৃশ্য দেখে কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। তারপাই শুরু হলো ভাইকিংদের চিৎকার—'ও—হো—হো—হো—।'

ওদিকে চাষী লোকগুলোর সকলেরই ঘুম ভেঙে গেছে। ওরা ছুটে এল। সোনার জাহাজ, মণিমাণিক্য দেখে ওরা বিস্ময়ে হতবাক। হাঁ করে দেখতে লাগল জাহাজটা।

গর্ত থেকে উঠে আসতেই ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। শুরু হলো ফ্রান্সিসকে কাঁধে তুলে নাচ। মারিয়াও খুশিতে নেচে উঠল। ছুটে এসে জাহাজের সোনার গায়ে হাত ঘষতে লাগল, মণিমাণিক্য তুলে নিয়ে দেখতে লাগল। তখনই ও দেখল জাহাজটার গায়ে লেখা—'দীর্ঘ সর্প।'

ক্ষুদে সোনার জাহাজটা রাখা হলো স্তম্ভগুলোর কাছে। ফ্রান্সিসের নির্দেশ হ্যারি গাড়ি নিয়ে ছুটল নগরের দিকে—রাজা ইনগল্ফকে এই সংবাদ জানাতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা রেভক্জাভিক নগরে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। রাজা ইনগল্ফ ও রানী ততক্ষণে গাড়িতে চড়ে এসেছেন। রেভক্জাভিক নগরের লোকেরাও ছুটে আসতে লাগল লোগবাগের দিকে যেন আবার নাচ-গানের উৎসব হবে।

রাজা ইনগল্ফ জাহাজ ও মণিমাণিক্য দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। আনন্দে ফ্রান্সিসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রানীও খুশি। মারিয়াকে বুকে টেনে নিলেন। রাজা ফ্রান্সিসের মুখ থেকে শুনলেন মণিমাণিক্যের জাহাজ উদ্ধারের গল্প।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই জায়গাটা লোকারণ্য হয়ে গেল। সবাই অবাক চোখে দেখতে লাগল সেই অপরূপ সোনার জাহাজ, মণিমাণিক্য।

এবার রাজা ইনগল্ফ ফ্রান্সিসকে বললেন—'এই মহামূল্য জাহাজ নিয়ে এখন কী করবে?'

—'এই গুপ্তধন-তো এই দেশেরই রাজা ফ্রোকির। কাজেই এই দেশেই থাকবে।'

রাজা ইনগল্ফ বললেন—'তা ঠিক। তুমি তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। কিন্তু ফ্রান্সিস—মারিয়াকে উদ্ধার করতে, আমার রাজ্যকে শত্রুর হাত তেকে বাঁচাতে এই গুপ্তধন উদ্ধার করতে যে সাহস, বুদ্ধি ও শৌর্যের পরিচয় তুমি দিয়েছো তাতে এই 'দীর্ঘ সর্প' তোমারই প্রাপ্য।'

ফ্রান্সিস কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। হ্যারির দিকে তাকাল।

হ্যারি নম্রস্বরে বলল—'রাজা ইনগল্ফ—আপনি আপনার যে উদার মনের পরিচয় দিলেন তা আমরা কোনদিন ভুলবো না। আমার প্রিয় বন্ধু ফ্রান্সিস সোনার ঘন্টা, হীরে-মুক্তো এসব এনেছে আর সেসব আমাদের রাজার জাদুঘরে রক্ষিত আছে এই 'দীর্ঘ সর্প' জাহাজ আইসল্যান্ডবাসীদের রাজা ফ্রোকির সম্পত্তি। তাই এটা আপানার প্রাসাদেই থাক। বরং মণিমাণিক্যগুলো ফ্রান্সিসকে দিন।

রাজা একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—'বেশ তাই হবে।' তারপর বললেন—'ফ্রান্সিস, মণিমাণিক্য রেখে দাও। শুধু জাহাজটা আমাদের গাড়িতে তুলে দাও। গাড়ি আস্তে আস্তে যাবে আমার দেশবাসী এই মহামূল্যবান গুপ্তধন স্বচক্ষে যেন দেখতে পায়।'

রাজা ইনগল্ফের কথামতো মারিয়া একটা চামড়ার থলিতে মণিমাণিক্য গয়নাগাটি ভরে রাখল। জাহাজটা তুলে দেওয়া হলো রাজার গাড়িতে। রাখা হলো সামনের আসনের ওপর। রাজা-রাণী গাড়িতে উঠলেন।

ফ্রান্সিস কী ভেবে গাড়িতে বসা রাজা ইনগল্ফের দিকে এগিয়ে গেল। বলল—মহামান্য রাজা—আপনার কাছে আমার দু'টো অনুরোধ আছে।

—বেশ—বলো। রাজা বললেন।

—প্রথম অনুরোধ—ফ্রান্সিস বলল—'আপনি রাজা গুমন্ডের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। রাজা গুমন্ডকে মুক্তি দিন এবং তার হারানো রাজ্য থিংভেলির তাকে ফিরিয়ে দিন।

রাজা ইনগল্ফ একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—'ফ্রান্সিস তুমি এই অনুরোধ করছো কেন?'

—কারণ আমি রাজা গুমন্ডের মনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। তিনি অনুতপ্ত। আমাকে তিনি বলেছেন আবার থিংভেলির রাজ্যের রাজা হ'লে তিনি বাকি জীবন প্রজাদের কল্যাণ সাধন করবেন। গুমন্ড আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁকে একবার তাঁর কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন। ফ্রান্সিস বলল। রাজা ইনগল্ফ দ্বিধায় পড়লেন। একদিকে চিরশত্রু রাজা গুমন্ডের প্রতি সমস্তজীবন কারাবাসের আদেশ অন্যদিকে স্নেহাস্পদ ফ্রান্সিসের অনুরোধ। একটু ভেবে নিয়ে রাজা ইনগলফ বললেন—'ফ্রান্সিস—তোমার অনুরোধ কি আমি রক্ষা না ক'রে পারি? ঠিক আছে—রাজা গুমন্ডকে আমি মুক্তি দেব। তার রাজত্বও তাকে ফিরিয়ে দেব।

—অশেষ ধন্যবাদ মহামান্য রাজা। ফ্রান্সিস মাথা নুইয়ে বলল।

—তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ? রাজা বললেন;

ফ্রান্সিস এবার মারিয়ার হাত থেকে মণিমাণিক্য গয়নাভরা চামড়ার থলিটা নিল। থলিটা এগিয়ে ধ'রে বলল—'আপনি দয়া করে এই মণিমাণিক্য অলঙ্কার নিল।

এসব রাজা গুমন্তকে মুক্তির সময় দেবেন।' রাজা আবার চিন্তায় পড়লেন। বললেন—'কিন্তু ফ্রান্সিস—রাজা গুমন্ত ভীষণ স্বার্থপর লোভী অর্থ পিশাচ।

—জানি। তবু তাঁকে আমি অনুরোধ করবো—এই সমস্ত মণিমাণিক্য বিক্রি ক'রে অর্থ সংগ্রহ ক'রে তা যেন উনি প্রজাদের কল্যাণে ব্যয় করেন। ফ্রান্সিস বলল। এবার রাজা চামড়ার থলিটা নিলেন। রানীর হাতে দিলেন। বললেন—বেশ—এইসব মণিমাণিক্য অলঙ্কার রাজা গুমন্তকে দেব। তোমারই এই গুপ্তসম্পদ উদ্ধার করেছো। নইলে এই গুপ্তধন মাটির নিচেই পড়ে থাকতো। কাজেই এ ব্যাপারে তুমি যা চাইবে তাই হবে। ফ্রান্সিস মারিয়া ও হ্যারি মাথা নুইয়ে রাজা রানীকে সম্মান জানাল। রাজা কোচওয়ানকে গাড়ি চালাতে ইঙ্গিত করলেন। গাড়ি চলল।

গাড়ি ধীরগতিতে চলল রেভক্জাভিকের দিকে। রাজার গাড়ির মশালের আলো পড়েছে দশ ফুট দীর্ঘ সোনার জাহাজে। ঝক্ঝক্ করছে জাহাজের গা—মীনে করা মাস্তুল। উপস্থিত মানুষেরা অবাক হয়ে দেখতে লাগল। জনতার মধ্যে থেকে অনেকে নিঃশব্দে গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল। সোনার জাহাজ সোনার মাস্তুল। কী অপূর্ব সুন্দর। দেখে দেখে ওদের যেন সাধ মিটছে না। আস্তে আস্তে রাজার গাড়ি কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস মারিয়া, হ্যারি ও বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—চলো সবাই। সবাই ধ্বনি তুলে আনন্দোচ্ছাস প্রকাশ করল—ও—হো—হো।

ফ্রান্সিস মারিয়া ও হ্যারি একটা গাড়িতে উঠল। অন্য গাড়িগুলোয় উঠল ভাইকিং বন্ধুরা সব গাড়ি চলল রেভকজাভিকের উদ্দেশ্যে।

গাড়ি নগরে প্রবেশ করলে ফ্রান্সিস কোচওয়ানকে বলল—'কয়েদঘরের কাছে নিয়ে চলো।' গাড়ি রাজবাড়ির চত্বরে ঢুকল। তারপর গিয়ে দাঁড়াল কয়েদঘরের সামনে। ফ্রান্সিসরা গাড়ি থেকে নামল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে একজন রক্ষীকে বলল—রাজা গুমন্তের সঙ্গে দেখা করবো। দরজা খুলে দাও। একজন রক্ষী বড় তালাটা খুলল। লোহার দরজা খুলল। ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরে ঢুকল। রাজা গুমন্ত আজকে শুয়ে ছিল না দাঁড়িয়ে পায়চারী করছিল। মুখ ফিরিয়ে ফ্রান্সিসকে দেখল। বলল—রাজা ইনগলফকে আমার কথা বলেছেন?

—বলেছি। আপনি খুব শিগগিরই মুক্তি পাবেন।

থিংভেলির রাজ্য আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—সত্যি? রাজা গুমণ্ড দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। তার চোখে মুখে গভীর বিস্ময়। গলায় বলে উঠল—'সত্যি আমি মুক্তি পাবো?'

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল। রাজা গুমণ্ড কিছুক্ষণ দু'হাত তুলে ওপরের দিকে তাকিয়ে রইল। যখন মুখ নামাল ফ্রান্সিসরা দেখল—রাজা গুমণ্ডের চোখে জল। কান্না ভেজা গলায় গুমণ্ড বলল—'ফ্রান্সিস—তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

—কিন্তু আপনার প্রতিশ্রুতি? ফ্রান্সিস বলল।

—অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। গুমন্ত ম্লান হেসে বলল।

—এই আইসল্যান্ডের একজন রাজা ছিলেন ফ্লোকি। তাঁর নাম শুনেছেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। উনি ছদ্মবেশে জলদস্যুতাও করতেন।' গুমন্ড বলল।

—সেই রাজা ফ্রোকির গুপ্তধন আমরা উদ্ধার করেছি।

—বলো কি? গুমন্ড বেশ আশ্চর্য হ'ল।

—হ্যাঁ। দশ ফুট লম্বা একটা সোনার জাহাজ আর জাহাজের খোল ভর্তি মণিমাণিক্য অলঙ্কার। ফ্রান্সিস বলল। রাজা গুমন্ড বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেল।

—এই সব মণিমাণিক্য অলঙ্কার আপনাকেই দেওয়া হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাকে? গুমন্ড আরও আশ্চর্য হ'ল।

—হ্যাঁ—দেওয়া হবে একটি শর্তে—সেই মণিমাণিক্য অলঙ্কার বিক্রি ক'রে একটি অর্থভান্ডার আপনি গড়ে তুলবেন। সেই অর্থ ব্যয়িত হবে শুধুমাত্র আপনার প্রজাদের কল্যাণে। অন্য কোন কারণে একটি স্বর্ণমুদ্রাও আপনি ব্যয় করতে পারবেন না।' রাজা গুমন্ড নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—ফ্রান্সিস—সত্যিই তুমি মহান। ফ্রান্সিস শুধু বলল—আপনার শরীর এখন কেমন?

—আমি অনেকটা সুস্থ। ফ্রান্সিস তোমাকে ধন্যবাদ। গুমন্ড বলল।

ফ্রান্সিসরা জাহাজে ফিরে এল। জাহাজের ডেকে উঠতেই বন্ধুরা ওদের ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—জাহাজ ছাড়ো। এবার মাতৃভূমিতে ফেরা। সব ভাইকিং বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—'ও—হো—হো।' তারপর যে যার কাজে লেগে পড়ল। দড়িদড়া টেনে বিরাট বিরাট পাল খাটানো হ'ল। ঘড়্ঘড়্ শব্দে নোঙর তোলা হ'ল। একটা পাক খেয়ে জাহাজ মহাসমুদ্রের দিকে জল কেটে চলল। পাশে দাঁড়ানো মারিয়াকে ফ্রান্সিস হেসে বলল—'তোমার কি দুঃখ হচ্ছে মারিয়া?

—কেন বলো তো? মারিয়া বলল।

—অত মূল্যবান মণিমাণিক্য রেখে এলাম।

মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—'দুঃখ নয় তোমার জন্যে আজ আমি গর্ববোধ করছি।' ফ্রান্সিস হেসে হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—হ্যারি—তোমার?' হ্যারি কোন কথা না ব'লে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া হ্যারি—আগের অভিযানগুলোর শেষে কত মূল্যবান জিনিস নিয়ে দেশে ফিরেছি। আজ না হয় শূন্য হাতেই ফিরলাম—কী বলো? কেউ কোন কথা বলল না। নিস্তেজ আলো আর কুয়াশা ঢাকা আকাশের নিচে সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে ওরা তাকিয়ে রইল। জাহাজ চলল।

সমাপ্ত

এর পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি :—

সোনার ঘণ্টা, হীরের পাহাড়, মুক্তোর সমুদ্র, তুষারে গুপ্তধন, রূপোর নদী

এর পরবর্তী অধ্যায়গুলি :—

বিষাক্ত উপত্যকা, চিকামার দেবরক্ষী, চুনীপান্নার রাজমুকুট, কাউণ্ট রজারের গুপ্তধন, যোদ্ধামূর্তি রহস্য, রানীর রত্নভাণ্ডার, চার্লসের স্বর্ণসম্পদ।

চিকামার দেবরক্ষী

ফ্রান্সিস আর মারিয়া রাজবাড়ির গাড়ি চড়ে রেভকজাভিকের জাহাজঘাটায় এল। একটু পরেই ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা শস্যটানা গাড়িতে চেপে জাহাজঘাটায় এল। জাহাজে উঠে সবাই আনন্দে হৈ হৈ করতে লাগল। যে মণিমাণিক্যের জাহাজের খোঁজে ওরা এসেছিল তা উদ্ধার করা হয়েছে। ওদের আনন্দ ধরে না।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া হাসিমুখে জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালো। সব বন্ধুরা ওদের ঘিরে দাঁড়ালো। বন্ধু ভাইকিংরা চীৎকার করে উঠলো--'ও হো-হো-হো।' ফ্রান্সিস হাসল। হাত তুলে ওদের থামতে ইঙ্গিত করল। চীৎকার হৈ-হল্লা বন্ধ হলো। ফ্রান্সিস বলল 'ভাইসব, রাজা ইনগলফ ও রাণী আমাদের আজ ভোজসভায় যোগ দিতে অনুরোধ করেছেন। আমরা ভোজসভায় অবশ্যই যাবো। তারপর ফিরে এসে জাহাজ ভাসাবো স্বদেশের উদ্দেশ্যে।' সব ভাইকিংরা আনন্দে চীৎকার করে উঠল--'ও-হো-হো।' এবার সবাই ভোজসভায় যাবে বলে পোশাক পরে তৈরি হতে গেল।

ক'ঘন্টা পরে ভাইকিংরা ভোজসভার শেষে জাহাজে ফিরে এল। ফ্রান্সিস ও মারিয়া রাজা ইনগলফের বিশেষ অতিথি হিসেবে গিয়েছিল। ওরাও রাজবাড়ির গাড়িতে ফিরে এল। ফ্রান্সিস জাহাজ ছাড়ার ইঙ্গিত করল। ঘরঘর শব্দে জাহাজের নোঙর তোলা হলো, বাতাসের তেমন জোর নেই। দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে চলে গেল। সমুদ্রের জলে দাঁড় চালাবার শব্দ উঠল, ছপ্ ছপ্। সব কটা পাল খাটানো হলো। পালে হাওয়া লাগল। জাহাজটা আস্তে আস্তে রেভকজাভিক বন্দর ছেড়ে মহাসমুদ্রের দিকে চলল।

দিনকয়েক পরেই জাহাজ দিনরাতের অঞ্চলে চলে এল। শীতের তীব্রতা কমে গেল। সবাই বাড়তি পোশাক খুলে ফেলল। জাহাজ চলল ভাইকিংদের দেশের দিকে।

সেদিন দুপুরবেলা। জোর হাওয়ায় জাহাজের পালগুলো ফুলে উঠেছে। আকাশও পরিস্কার। দাঁড় টানার কাজ থেকে ছুটি। ভাইকিংরা বেশিরভাগই নিজেদের কেবিনে শুয়ে বসে বিশ্রাম করছে। অনেকে ঘুমিয়েও নিচ্ছে। জাহাজের ডেকের নিস্তেজ রোদে কয়েকজন ভাইকিং কম্বল পেতে শুয়ে আছে। ওদের মধ্যে বিস্কোও আছে। হঠাৎ মাস্তুলের মাথায় বসা নজরদার নিচে ডেকের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল--'একটা জাহাজ এইদিকে আসছে।'

--'কোন দেশের জাহাজ?' শুয়ে থাকা বিস্কো চেঁচিয়ে বলল।

--'মাস্তুলে একটা পতাকা উড়ছে-ঠিক ঠাহর করতে পারছি না কোন দেশের পতাকা।' নজরদার বলল।

--'মরুক গে', বিস্কো বলল--'দেখো জলদস্যুদের জাহাজ যেন না হয়।'

একটু সময় গেল। সেই জাহাজটা বেশ কাছে চলে এসেছে। নজরদার এতক্ষণে জাহাজটার পতাকা ভালোভাবে দেখতে পেল। স্পেনদেশের পতাকা। নজরদার নিশ্চিত হলো। নজরদার চেঁচিয়ে বলল--'স্পেন দেশের জাহাজ।'

বিস্কো শুয়ে শুয়েই বলল-- 'ঠিক আছে।'

জাহাজটা তখন ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ের কাছে পাশে পাশেই চলেছে। হঠাৎ নজরদার দেখল সেই জাহাজের মাস্তুল থেকে স্পেনদেশের পতাকা নামিয়ে ফেলা হলো। সেখানে ওড়ানো হলো কালো কাপড়ে সাদা মড়ার মাথা আর ট্যাড়া আঁকা জলদস্যুদের পতাকা। নজরদারের বুক কেঁপে উঠল-- জলদস্যুদের জাহাজ। ও চিৎকার করে উঠল-- 'জলদস্যু।' কিন্তু ওর গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। যেটুকু শব্দ গলা দিয়ে বেরুলো তা কারো কানেই গেল না। ততক্ষণে জলদস্যুদের জাহাজটা ভাইকিংদের জাহাজের গায়ে এসে লেগেছে। কোনোরকম শব্দ না করে জলদস্যুরা খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে এই জাহাজে উঠতে লাগল। প্রথমে উঠল জলদস্যুদের দলপতি। ছুঁচোলো গোঁফ দাড়ি মুখে। মাথায় বাঁকা কালো টুপি। গায়ে জমকালো পোশাক। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা বুট। জলদস্যুদের ইয়া গোঁফ, গাল পর্যন্ত জুলপি, মাথায় ঝাঁকরা চুলে লাল কাপড়ের ফেট্টি, গায়ে ডোরাকাটা গেঞ্জি।

নজরদার দ্রুত মাস্তুলের গায়ে লাগানো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল— 'জলদস্যু-সাবধান।' ও কথাটা একবারই বলতে পারল। জলদস্যুর দলপতি কোমরের বেল্টে গোঁজা লম্বা ছুরিটা বের করে ছুঁড়ল নজরদারের দিকে। ছুরিটা পাক খেয়ে ছুটে গিয়ে নজরদারের বুকে বিঁধে গেল। ও দড়ির সিঁড়ি থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিঁধে যাওয়া ছুরিটা ধরে টানতে গেল। ছুরিটা বুক থেকে বের করতে পারল না। ছিটকে পড়ল জাহাজের রেলিং-এর ওপর। তারপর পাক খেয়ে সমুদ্রের জলে।

ততক্ষণে যে চারজন ভাইকিং ডেকে কম্বল পেতে শুয়ে ছিল তাদের দু'জনের বুকেও জলদস্যুরা তরোয়াল বিঁধিয়ে দিয়েছে। ওরা টু শব্দটিও করতে পারল না। বিপদ আঁচ করে বিস্কো দ্রুত উঠে পড়ল। দেখল উদ্যত তলোয়ার হাতে জলদস্যুরা ওদের ঘিরে ধরেছে। জলদস্যুদের দলপতি এগিয়ে এসে হাতের তরবারির ডগাটা বিস্কোর বুকে ঠেকিয়ে স্পেনীয় ভাষায় বলল-- 'কোনোরকম শব্দ করবে না। চলো তোমাদের অস্ত্রঘরটা দেখিয়ে দাও।' ততক্ষণে অন্য ভাইকিংটির মাথায় একজন জলদস্যু তলোয়ারের বাঁট দিয়ে ঘা মেরেছে। ভাইকিংটি দু'হাতে মাথা চেপে ডেকের ওপর গড়িয়ে পড়ে গেল।

এবার বিস্কোর পিঠে জলদস্যুদের দলপতি তলোয়ারের ডগা ঠেকিয়ে বলল-- 'চলো।'

বিস্কো দাঁড়িয়েই রইল। ও তখন ভাবছে কী করে ফ্রান্সিস ও হ্যারিকে ওই বিপদের কথা জানাবে। ওর পিঠে তলোয়ারের চাপ বাড়িয়ে দস্যু দলপতি বলল- 'চলো, নাহলে তলোয়ার বিঁধিয়ে দেব।' বিস্কো বুঝল এখন এদের কথামতো চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। রুখে দাঁড়ালে ওকে ঠিক হত্যা করবে। বিস্কো আস্তে আস্তে চলল। সিঁড়ি বেয়ে ওরা নামতে যাবে দলপতি চাপাস্বরে বলল-- 'কোনো শব্দ যেন না হয়।'

বিস্কো সামনে, পেছনে দস্যু দলপতি ও অন্য দস্যুরা নামতে লাগল। বিস্কো ওদের অস্ত্রঘরের সামনে নিয়ে এল। আঙুল দেখিয়ে বলল-- 'অস্ত্রঘর।' দলপতির

নির্দেশে দু'জন জলদস্যু খোলা তলোয়ার হাতে ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। জলদস্যুদের দলপতি বলল-- 'তোমাদের ক্যাপ্টেন কে? তার কাছে আমাকে নিয়ে চলো।' বিস্কো চিন্তায় পড়ল। যে করেই হোক সে ফ্রান্সিসকে মুক্ত রাখতে চাইল। যদি ফ্রান্সিস ধরা না পড়ে তাহলে ফ্রান্সিস বুদ্ধি খাটিয়ে নিশ্চয়ই বিপদ থেকে সকলকে উদ্ধার করতে পারবে। জলদস্যু নেতা ওর পিঠে তলোয়ারের চাপ বাড়াল। গম্ভীর গলায় বলল-- 'চলো। কোনোরকম চালাকি করেছ কি মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।'

বিস্কো চলল। পেছনে পেছনে জলদস্যু নেতা। ওর পেছনে চারজন খোলা তলোয়ার হাতে জলদস্যু। ঠিক তখনই একটা কেবিন ঘরের দরজা খুলে একজন ভাইকিং বেরিয়ে এল। পড়ল একেবারে বিস্কো আর জলদস্যুদের সামনে। বিস্কো বলে উঠল-- 'এই আমাদের ক্যাপ্টেন।'

জলদস্যু নেতা একলাফে সামনে গিয়ে ভাইকিংটির গলায় তলোয়ার ঠেকিয়ে বলল-- 'তুমিই এই জাহাজের ক্যাপ্টেন? ভাইকিংটির মুখ তখন ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। দু'হাত ওপরে তুলে ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল-- 'না-না, আমি না। ফ্রান্সিস।' বিস্কো চোখের ইঙ্গিতে ভাইকিং বন্ধুটিকে বোঝাল যেন ও বলে যে, ওই ক্যাপ্টেন। কিন্তু বন্ধুটি ত সেটা বুঝল না উল্টে ফ্রান্সিসের নাম বলে দিল।

জলদস্যু নেতা এবার রাগত দৃষ্টিতে বিস্কোর দিকে তাকাল। বলল-- 'আমাকে ধোঁকা দিচ্ছিলে।' একজন জলদস্যুর দিকে তাকিয়ে বলল— 'একে ডেকে নিয়ে যাও। বন্দী কর।' এবার দলনেতা ভাইকিংটির দিকে তাকাল। বলল-- 'আমাকে ফ্রান্সিসের কাছে নিয়ে চলো। কোনোরকম চালাকি করবে না।' ভাইকিংটিকে সামনে রেখে জলদস্যু চলল।

সবাই ফ্রান্সিস ও মারিয়ার কেবিন ঘরের সামনে দাঁড়াল। ভাইকিংটি আঙুল দিয়ে দরজাটা দেখাল। দস্যুনেতা গলা নামিয়ে বলল-'ফ্রান্সিসকে ডাকো।' ভাইকিংটি দরজায় টোকা দিল। ডাকল-ফ্রান্সিস-ফ্রান্সিস।'

ফ্রান্সিস তখন বিছানায় আধশোয়া হয়ে বিশ্রাম করছিল। মারিয়া বিছানায় বসে রুমালে এমব্রডারি করছিল। ডাক শুনে মারিয়া এসে দরজা খুলে দিল। জলদস্যু নেতা উদ্যত তরবারি হাতে এক ধাক্কায় দরজাটার সবটা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ফ্রান্সিস একলাফে বিছানা থেকে নেমে কাঠের দেয়ালে ঝোলানো তরোয়ালটার দিকে ছুটল। কিন্তু তরোয়াল হাতে নেবার আগেই দু'জন জলদস্যু দুদিক থেকে ফ্রান্সিসকে জাপটে ধরল। ফ্রান্সিস শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। জলদস্যু দু'জনের তরোয়ালের খোঁচা লেগে ফ্রান্সিসের বুক পিঠ হাত কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। মারিয়া বুঝল ওরা সকলেই বিপদে পড়েছে। কিন্তু মারিয়া ভয় পেল না। দৃপ্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল-'আপনি কে?' জলদস্যু-দলপতি একটু মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে হেসে বলল-'আমার নাম আলবার্তো।'

-'তুমি জলদস্যু।' মারিয়া চেঁচিয়ে বলল।

'হ্যাঁ, আলবার্তো বলল-'মাদ্রিদ নগরে পাঁচ একর জমি কিনেছি। বাড়ি হচ্ছে। সোনা, রুপো, হীরে, অলঙ্কার এসব আমার এখন খুব প্রয়োজন। তাই জাহাজ লুঠ

করি। আর একটা কাজও করতে হয়। ক্রীতদাস সংগ্রহ ও বিক্রি।

-'ঠিক আছে,' মারিয়া বলল- 'আমাদের যা সোনা রুপো অলঙ্কার আছে দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের জাহাজ থেকে দূর হও তোমরা।'

'-খুব ভালো কথা। আপনি সেসব একত্র করুন। কিন্তু আপনাদের কাউকে তো ছাড়া হবে না। কাছাকাছি ডাঙ্গায় যেখানে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট পাবো সেখানেই আপনাদের বিক্রী করে দেব। সাদা চামড়ার ক্রীতদাস, অনেক দাম পাওয়া যাবে।'

ফ্রান্সিসকে ততক্ষণে দু'জন জলদস্যু দুহাত, বুক, ঘাড় দড়ি জড়িয়ে বেঁধে ফেলেছে। ফ্রান্সিস বাধা দেয়নি। ও বুঝতে পেরেছে এখন লড়াই অসম্ভব। খালি হাতে এখন লড়াই চলবে না। সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে। আলবার্তো জলদস্যু দু'জনকে ইঙ্গিত করল। ওরা ফ্রান্সিসকে ধরে নিয়ে চলল। পেছনে মারিয়া। মারিয়ার দু'টো হাত ততক্ষণে বাঁধা হয়ে গেছে। সামনে আলবার্তো, পেছনে ফ্রান্সিসরা। সবাই চলল ডেকে ওঠার সিঁড়ির দিকে।

ওদিকে জলদস্যুরা চেষ্টা করল যাতে নিঃশব্দে সব কাজ সারা যায়, কিন্তু পারল না। ওদের দ্রুত চলাফেরায় কাঠের পাটাতনে শব্দ হলো বেশ। দু'চারজন ভাইকিং কেবিন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জলদস্যুদের দেখল। অস্ত্রঘরের সামনে খোলা তরোয়াল হাতে জলদস্যুরা পাহারা দিচ্ছে। ওরা হতাশ হলো। জলদস্যুরা ওদের ঘিরে ফেলল। ওদের হাত বেঁধে নিয়ে চলল ডেকে ওঠার সিঁড়ির দিকে।

ফ্রান্সিস মারিয়া হ্যারি আর সব ভাইকিংদের জাহাজের ডেকে জলদস্যুরা জড়ো করল। আলবার্তো সকলের দিকে তাকিয়ে বলল-'তোমরা সবাই বন্দী। শুধু-' আঙুল দিয়ে মারিয়াকে দেখিয়ে বলল-'ইনি স্ত্রী লোক। ইনি থাকবেন একটি কেবিন ঘরে। সেই ঘরের দরজার সামনে অবশ্যই পাহারাদার থাকবে। একটা কাজ তাঁকে করতে হবে। এই জাহাজে সোনা-মুক্তো-হীরে যা কিছু দামী জিনিস আর অলঙ্কার আছে সব একত্র করে আমাকে দিতে-হবে।'

-'যদি না দিই।' মারিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলল।

-'তাহলে আপনি এবং এই জাহাজের কেউ বেঁচে থাকবেন না। সবাইকে মেরে হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলা হবে।' আলবার্তো বেশ জোরের সঙ্গে বলল। ফ্রান্সিস একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল-'মারিয়া-কোনো কথা বলো না।' ভাইকিংরা সবাই তখন রাগে ফুঁসছে। বিনা যুদ্ধে এভাবে হার স্বীকার করা ওদের সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু উপায় নেই। এ অবস্থায় খালি হাতে লড়া যাবে না। ওরা চুপ করে রইল।

আলবার্তো মারিয়ার সামনে এল। মারিয়ার বাঁধা হাত খুলে দিল। বলল-'যান এই জাহাজে যা কিছু সোনা দানা, হীরে, মুক্তো আছে সব নিয়ে আসুন।' একজন জলদস্যুর দিকে তাকিয়ে আলবার্তো বলল-'এর সঙ্গে যা! সব যোগাড় হলে এঁকে আমাদের ক্যারাভালে-এ নিয়ে যাবি। পাঁচ নম্বর কেবিন ঘরে বন্দী করে রাখবি। পাহারা দিবি।'

জলদুস্যটি খোলা তরোয়াল হাতে মারিয়ার কাছে এসে দাঁড়াল। মারিয়া তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আলবার্তো গলা চড়িয়ে হুকুমের স্বরে বলল-'যান।'

ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল-'মারিয়া কথার অবাধ্য হয়ো না।' মারিয়া একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে এগোলো।

আলবার্তোর হুকমে সব জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। তারপর ওদের ঠেলে নিয়ে চলল জাহাজের ডেকের পাশে কাছের রেলিঙের দিকে। দুটো জাহাজই তখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিসদের একে একে জলদস্যুদের ক্যারাভেল জাহাজে নিয়ে আসা হলো। সিঁড়ি দিয়ে নিচে জাহাজের খোলে নামানো হলো। একটা লোহার শিক লাগানো দরজার সামনে ওদের আনা হলো। একজন পাহারাদার জলদস্যু দরজাটার তালা খুলল। দেখা গেল এই দিনের বেলায়ও প্রায় অন্ধকার কয়েদ ঘর। ফ্রান্সিসদের প্রত্যেকের সেই ঘরে ঢোকানো হলো। তিনজন কয়েদ ঘরের পাহারাদার জলদস্যু ফ্রান্সিসদের প্রত্যেকের হাতে দড়ি বেঁধে দিল। তারপর লোহার মোটা শিকওয়ালা দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করল। তালা লাগাল। তারপর দরজার সামনে খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিতে লাগল।

ভাইকিংরা কেউ কেউ কাঠের মেঝেয় শুয়ে পড়ল, কেউ কেউ বসে পড়ল। কেউ কেউ পায়চারি করতে লাগল। ফ্রান্সিস কাঠের দেয়ালে পিঠ চেপে বসল। পাশে বসল হ্যারি আর বিস্কো। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল-আমাদের সাবধান থাকা উচিত ছিল। বিস্কো বলল-'ইস্-নজরদার যদি একটু আগে বলতো-'

-'ওসব ভেবো-না আর'- ফ্রান্সিস বলল। একটু থেমে বলল- 'চারদিক ভালো করে দেখেছি। দরজা ছাড়া আর কোথা দিয়েও পালাবার উপায় নেই। তবে পা খোলা আছে আর শাঙ্কো বলেছে 'ওর বড় ছুরিটা ও জামার ভেতর লুকিয়ে রেখেছে। ক'টা দিন থাক। ওদের পাহারা দেবার নিয়ম, খাবার দেবার নিয়ম এসব দেখি। তারপর মুক্তির ফন্দী আঁটিবো।' আর কেউ কোনো কথা বলল না। লোহার গরাদ দেওয়া ওপারে তখন আলোর ভাব কমে এসেছে। বাইরে বোধহয় বিকেল হলো।

চার পাঁচ দিন কেটে গেল। মারিয়া ওর গয়নাগাটি স্বর্ণমুদ্রা যা ছিল সবই আলবার্তোকে দিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে আলবার্তো মারিয়া যে ভাইকিং রাজার মেয়ে এটা জেনেছে। ও ঠিক করেছে-কোনো বন্দরের ক্রীতদাস কেনা বেচার হাটে ভাইকিংদের বিক্রি করে দেবে। তারপর ভাইকিংদের দেশের বন্দরে যাবে। মারিয়ার মুক্তিপণ হিসেবে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ভাইকিং রাজার কাছে দাবি করবে।

জাহাজ চলল। দিনের পর দিন। ফ্রান্সিসদের একঘেয়ে জীবন কাটতে লাগল কয়েদ ঘরে।

ওদিকে পাঁচ নম্বর কেবিনে মারিয়ারও একঘেয়ে বন্দিনী জীবন কাটছে। মারিয়ার বেশি চিন্তা ফ্রান্সিসদের জন্য। ওতো তবু আকাশ আলো সমুদ্র দেখতে পায়। ফ্রান্সিসরা তো অন্ধকারে পড়ে আছে। আলবার্তো মারিয়াকে মাত্র একবার ফ্রান্সিসদের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দিয়েছে। আধঘন্টার জন্য।

মারিয়া আসে। লোহার দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। ওর মুখ বিষণ্ণ। ফ্রান্সিসের সঙ্গে কথা হয়। সামান্য কথাবার্তা। দু'জনের কারও কিছুই তো বলবার নেই। যা

কিছু কথা এই বন্দী জীবন নিয়েই। মারিয়ার কাছেই ফ্রান্সিস জেনেছিল যে আলবার্তো ওর ক্যারাভেল জাহাজের পেছনে ফ্রান্সিসদের জাহাজটাও বেঁধে নিয়ে চলেছে। মারিয়া তখনও ফিসফিস করে বলে-'ফ্রান্সিস-এই বন্দীদশা থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই?'

ফ্রান্সিসও চাপাস্বরে বলে-'আছে। নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেই মুক্তি পেতে হবে আমাদের কারও জীবন বিপন্ন না করে আর সুযোগ বুঝে।' ওরা এসব কথা খুব আস্তে বলে, যাতে পাহারাদারের কানে না যায়। মারিয়া এভাবে প্রতিদিনই আসে। কথা বলে। চলে যায়।

এর মধ্যে ফ্রান্সিসদের চারজন ভাইকিং বন্ধু নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করল পালাবে। কথাটা ওরা আর কাউকেই বলল না।

সেদিন রাতে তিনজন জলদস্যু পাহারাদার লোহার শিকের দরজা খুলে খাবার নিয়ে ঢুকল। সেই চারজন ভাইকিং পাহারাদারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন পাহারাদারকে কাবু করল। কিন্তু হাত বাঁধা অবস্থায় কি লড়াই করা চলে? বাকি দু'জন পাহারাদার তরোয়াল নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাইকিং চারজন তরোয়ালের মার ঠেকাবে কী করে? চারজনই তরোয়ালের ঘায়ে আহত হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন গুরুতর আহত হলো। রক্তাক্ত দেহে ওরা গোঙাতে লাগল। ফ্রান্সিসরা যে ওদের সেবা-শুশ্রূষা করবে তারও উপায় নেই। সবারই হাত বাঁধা। পাহারাদাররা দরজা বন্ধ করে পাহারা দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস একজন পাহারাদারকে ডাকল। সে দরজার কাছে মুখ বাড়াল। ফ্রান্সিস বলল-'আমার বন্ধুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করো।'

-'ক্যাপ্টেন আলবার্তোর হুকুম না হলে হবে না।' পাহারাদার বলল।

ফ্রান্সিস ভীষণ রেগে গেল। বলল-'এক্ষুণি আলবার্তোকে আসতে বলো।'

-'ক্যাপ্টেন এখন বিশ্রাম করছেন।' পাহারাদার বলল।

ফ্রান্সিস লোহার দরজায় প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে উঠল -'আমার আহত বন্ধুরা যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে উনি বিশ্রাম করছেন?' ফ্রান্সিসের চিৎকার করে বলা কথাগুলো শুনে সব ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে লোহার দরজার কাছে এল। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল- 'ও-হো-হো।' পাহারাদার এই চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে ঘাবড়ে গেল। ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল-'যাও শিগগির।' পাহারাদারটি কী ভাবল কে জানে। ও চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আলবার্তো লোহার গারদ-আঁটা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল-'আমাদের চারজন বন্ধু আহত। ওদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।'

আলবার্তো হেসে বলল-'ওরা আমার রক্ষীদের আক্রমণ করেছিল। ফল যা হবার তাই হয়েছে।'

-'কিন্তু ওরা আহত-ওদের চিকিৎসা-।'

আলবার্তো চেঁচিয়ে বলে উঠল-'ওসব হবে না। মরুক ওরা।' ফ্রান্সিসও গলা চড়াল-'যদি বিনা চিকিৎসায় ওরা কেউ মারা যায় তোমাকে আমি ছাড়বো না আলবার্তো। তোমাকে যেখানে যে অবস্থায় পাবো আমি হত্যা করবো।' আলবার্তো হো হো করে

হেসে উঠল। বলল-'ঐ স্বপ্ন দেখতে দেখতেই তোমার জীবন এই কয়েদ ঘরে শেষ হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস আগুন-ঝরা চোখে আলবার্তোর দিকে তাকিয়ে রইল। কোনো কথা বলল না। আলবার্তো চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা ফিরে এসে নিজেদের জায়গায় বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। কয়েকজন ভাইকিং তখন জলের পাত্র করে জল এনে আহতদের শরীরে ক্ষতস্থান বেঁধে দিল। রক্ত পড়া বন্ধ হলো।

কিছুক্ষণ পরে মারিয়া এল। লোহার গরাদ দেওয়া দরজায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস উঠে একটু দ্রুত পায়েই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ফিসফিস করে বলল' এক্ষুনি আমাদের জাহাজে চলে যাও। বৈদ্য যে কটা ওষুধের বোয়াম আনতে বলে নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে ওদের ভাইকিং বৈদ্যকে ডাকল। বৈদ্য আড়মোড়া ভেঙে উঠল। ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল-'মারিয়া আমাদের জাহাজে যাচ্ছে। কী কী ওষুধের বোয়াম আনবে বলে দাও। 'বৈদ্যও নিচুস্বরে বলল-'রাজকুমারী, আমার কেবিনঘরের তাকে দেখবেন কালো, হলুদ আর নীল রঙের তিনটে বোয়াম আছে। আপনি হলুদ বোয়ামটা থেকে একমুঠো গুঁড়ো একটা কাগজের ঠোঙায় ঢেলে আনবেন।'

-'আমি বোয়ামটাই নিয়ে আসতে পারি।' মারিয়া বলল।

-'তা পারেন। কিন্তু এই কয়েদঘরের দরজায় লোহার শিক লাগানো। এইটুকু ফাঁক দিয়ে বোয়াম ঢুকবে না। আপনাকে প্রত্যেক দিন ঠোঙায় করে লুকিয়ে ওই গুঁড়ো আনতে হবে।' বৈদ্য বলল।

-'মারিয়া দেরি করো না-শিগগির যাও।' ফ্রান্সিস তাগাদা দিল। মারিয়া পাহারাদারদের দিকে তাকিয়ে বলল-'ওদের পোশাক ভীষণ ময়লা হয়ে গেছে। আমি আমাদের জাহাজ থেকে কিছু পোশাক আনতে যাচ্ছি।' পাহারাদার দুজন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। মুখে কিছু বলল না।

মারিয়া ডেকে উঠে এল দ্রুতপায়ে। একজন জলদস্যুকে দেখল মাস্তুলে ঠেসান দিয়ে ঝিমুচ্ছে। মারিয়া ডাকল-'শুনছো?' লোকটা চোখ মেলল। মারিয়াকে দেখেই একলাফে উঠে দাঁড়াল। তরোয়ালের হাতলে হাত রাখল। মারিয়া হেসে বলল-'লড়াই করতে আসিনি। তুমি তোমাদের দড়ির মইটা ধরো। আমি আমাদের জাহাজে যাবো।'

-'কেন?' জলদস্যু বলল।

-'আমার স্বামী আর বন্ধুরা তো কয়েদ ঘরে বন্দী হয়ে আছে। ওদের পোশাক নোংরা হয়ে গেছে। কিছু পোশাক আনবো।'

-'কিন্তু ক্যাপ্টেনের হুকুম ছাড়া-'

-'আরে আমি তো পালাচ্ছি না। ক্যাপ্টেনকে পরে আমি বলবো' খন। মারিয়া বলল।

জলদস্যুটা আর কিছু বলল না। জাহাজের পেছন দিকে চলল। জাহাজের পেছনের কাঠের রেলিংয়ের গায়ে একটা দড়ির মই আটকানো। মইটার মাঝে মাঝে কাঠের ফালি বাঁধা। মইটা বাঁধা রয়েছে ফ্রান্সিসদের জাহাজের সঙ্গে। দুটো জাহাজ একটা মোটা কাছিতে বাঁধা। জলদস্যুটি মইয়ের একটা মাথা কাঁধে নিয়ে কাছিটা ধরে ঝুলে ঝুলে

ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠল। তারপর কাছিটা একটা হুক-এর সঙ্গে আটকে টেনে ধরে রইল। মারিয়া মইয়ের কাঠের ফালিগুলোর ওপর পা রেখে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এল। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে মারিয়াকে আসতে হলো। দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৈদ্যর কেবিন ঘরে ঢুকল। তাকের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে খুঁজতে হলুদ বোয়ামটা পেল। বোয়ামটা নিয়ে মারিয়া নিজের কেবিনঘরে চলে এল। নিজের আর ফ্রান্সিসের কিছু পোশাক নিল। অন্য কেবিনঘরগুলোতে ঢুকে অন্য ভাইকিং বন্ধুদের পোশাক নিল। সব পোশাক পেঁচিয়ে বাঁধবার আগে হলুদ বোয়াম ভেতরে রেখে দিল। পেঁচিয়ে বাঁধা পোশাকের বোঁচকার মধ্যে রইল বোয়ামটা।

পোশাকের বোঁচকা দেখে জলদস্যুটি কিছু বলল না। মারিয়া মই বেয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ক্যারাভেল জাহাজে ফিরে এল। নিজের কেবিনে ঢুকল। কাপড়ের বোঁচকার মধ্যে থেকে হলুদ বোয়াম বের করল। একটা রুমালে হলুদ গুঁড়ো একমুঠো ঢালল। বোয়ামটা কাঠের তাকে লুকিয়ে রাখল। তারপর কাপড়ের বোঁচকার মধ্যে ওষুধ রুমালটা রেখে কয়েদঘরের সামনে এল। চারজন ভাইকিং পালাবার চেষ্টা করছিল বলে এখন নিয়মে কড়াকড়ি করা হয়েছে। সব ভাইকিংদের হাত খুলে দেওয়া হয়েছে। খাবারদাবার দরজার নিচের একটা ফোকর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আলবার্তোর হুকুম কোনো কারণেই যেন দরজা খোলা না হয়। মারিয়া কাপড়ের পুঁটলি খুলে একটা করে পোশাক গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস টেনে নিতে লাগল। হলুদ ওষুধ জড়ানো পোশাকটা দেবার সময় মারিয়া বেশ জোরে বলল-'এই পোশাকটা এক্ষুনি পর।' ফ্রান্সিস বুঝল। মৃদু হেসে বলল-'আচ্ছা'। তারপর পোশাকটা নিয়ে বৈদ্যর কাছে এল। পোশাকের ভাঁজ খুলে ওষুধটা মেঝেয় ঢালল। বৈদ্য বলল 'জল'। একজন ভাইকিং নারকেলের মালায় করে জল নিয়ে এল। বৈদ্যর নির্দেশমতো হলুদের গুঁড়োর মধ্যে অল্প করে জল ঢালতে লাগল। বৈদ্য গুঁড়োটা মাখাতে লাগল। একটু পরেই আঠার মতো দেখতে হলো। বৈদ্য ওষুধ নিয়ে আহত ভাইকিং কজনের ক্ষতে লাগিয়ে দিল। একটু জ্বালা করে উঠেই একটা ঠান্ডা ভাব লাগল। ওদের ব্যথা অনেক কমে গেল।

পরের কদিনই মারিয়া একটা করে পোশাক আনল আর হলুদ গুঁড়ো ওষুধ দিয়ে গেল। তিনজন আহত ভাইকিং মোটামুটি সুস্থ হলো। কিন্তু একজন আহত ভাইকিং ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওষুধ লাগানো চলল। কিন্তু ওর বুকের ক্ষতস্থান ফুলে পেকে উঠল। একদিন দুপুরে বাড়াবাড়ি অবস্থা হলো। প্রচন্ড জ্বরে ওর গা পুড়ে যেতে লাগল। ভাইকিংটি প্রলাপ বকতে লাগল। সন্ধ্যের সময় অজ্ঞান হয়ে গেল। একটু রাত বাড়তে ভাইকিংটি হঠাৎ চোখ বড় বড় করে চারদিকে তাকাতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করল। শেষবারের মতো ওর শরীরটা নড়ে উঠে স্থির হয়ে গেল। ফ্রান্সিস মৃত বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল। ওর চোখ ফেটে জল এল। দুহাতে মুখ চেপে ও কেঁদে উঠল। হ্যারি এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত রাখল। সব ভাইকিং বন্ধুরা মুখ নিচু করে বসে রইল। অনেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস চোখ মুছে হ্যারিকে বলল-'হ্যারি-ও নিজের জীবন দিয়ে আমাদের মুক্তির উপায় করে দিয়ে গেল।' হ্যারি কোনো কথা বলল না।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে গেল। রক্ষীদের বলল-'আমাদের এক বন্ধু মারা গেছে। আলবার্তোকে খবর দাও।' একজন রক্ষী চলে গেল। একটু পরেই কাঠের

মেঝেয় জুতোর শব্দ তুলে আলবার্তো এল। পেছনে জলদস্যুদের বৈদ্য। রোগা। পাকা দাড়ি। কয়েদ ঘরের দরজা খোলা হলো। শুধু বৈদ্য ঢুকল। মৃত ভাইকিংটির বুকে কান পাতল। আঙুল দিয়ে চোখ খুলে দেখল। হাতের পায়ের নাড়ি টিপে দেখল। তারপর মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বলল-'মারা গেছে।' কয়েদঘরের বাইরে গিয়ে আলবার্তোকে বলল সে কথা। আলবার্তো ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল-'এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করলে এই অবস্থাই হবে। মড়া কালকে সমুদ্রে ফেলা হবে।

ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। চিৎকার করে বলল, -'না আজকে রাতেই মড়া এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে।'

-'কেন?' আলবার্তো বেশ আশ্চর্য হয়েই বলল।

-'আমরা একটা মড়ার সঙ্গে রাত কাটাতে পারবো না।'

আলবার্তো ঠাট্টা করে হেসে বলল-'কিছুক্ষণ আগেও তো ও তোমাদের বন্ধু ছিল।'

-'সে ছিল ছিল। এখন তো একটা মড়া। বিদায় করো এটাকে।' ফ্রান্সিস বলল।

-'হুঁ-তাই হবে।' আলবার্তো পাহারাওয়ালাদের সে কথা বলল। তারপর চলে গেল।

ফ্রান্সিসের এ ধরনের কথাবার্তায় ভাইকিং বন্ধুরা অবাক হয়ে গেল। ফ্রান্সিসের এ কী কথাবার্তা! এ কী ব্যবহার! বন্ধুদের জন্যে যে ফ্রান্সিস নিজের জীবন দিতে তৈরী থাকে, সে এক মৃতবন্ধু সম্পর্কে এরকম কথা বলছে। হ্যারির সহ্য হলো না, ও ফ্রান্সিসের মুখোমুখি দাঁড়াল। দৃঢ়স্বরে বলল-' ফ্রান্সিস সাবধান, মৃতবন্ধু সম্পর্কে এরকম কথা যদি আর একটা বল, তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব না।'

ফ্রান্সিস শুধু ফিসফিস করে বলল-'রাত্রি চাই-অন্ধকার চাই।' তারপর ফ্রান্সিস দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে একজন পাহারাদারকে ডাকল। বলল-'আচ্ছা ভাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

-'কী কথা?' একজন পাহারাদার এগিয়ে এসে বলল।

-'আমার দৃঢ় বিশ্বাস জাহাজটা থেমে আছে অথবা খুব আস্তে চলছে।'

-'আরে-ঠিক বলছো। দু'দিন যাবত হাওয়া পড়ে গেছে। জাহাজ প্রায় চলছেই না। কিন্তু তুমি কী করে বললে?'

-'আমরা ভাইকিং-সমুদ্র জাহাজ এসবের গতিপ্রকৃতি আমরা সহজেই ধরতে পারি।' ফ্রান্সিস তারপর বলল- 'তা ভাই দেরি করছো কেন। মড়াটা তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও।'

-'তোমাদের রাতে খাওয়া হলেই নিয়ে যাবো।' পাহারাদার জলদস্যুটি বলল।

-'জলদি কর, জলদি কর।' ফ্রান্সিস কথাটা বলে দরজার কাছ থেকে চলে এল।

ফ্রান্সিস দু-একজন ভাইকিং বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু এক হ্যারি ছাড়া আর সবাই মুখ ফিরিয়ে রইল। মৃত বন্ধু সম্পর্কে ফ্রান্সিস যা কিছুক্ষণ আগে বলেছে সেটা বন্ধুরা ভুলতে পারেনি। ছিঃ এত নোংরা মন ফ্রান্সিসের। একটু পরেই পাহারাদাররা রাতের খাবার দিয়ে গেল। প্রায় কেউই বিশেষ খেল না। ফ্রান্সিস কিন্তু পেট পুরে খেল। সব বন্ধুরা দেখল সেটা। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল তারপর। একটু পরে একজন পাহারাদার জলদস্যু একটা মোটা কাপড়ের বস্তা গরাদের মধ্য দিয়ে ভাঁজ করে গলিয়ে দিল। সঙ্গে একটা দড়ি। পাহারাদার বলল-'মড়াটা বস্তায় পুরে মুখ বেঁধে

দরজার কাছে রেখে সবাই সরে যাও। আমরা ঢুকে মড়া নিয়ে আসবো। তখন কাছে আসবে না।

শাঙ্কো বস্তা দড়ি নিয়ে এল। এবার মৃতদেহ এই বস্তায় ভরতে হবে। ফ্রান্সিস ফিসফিস করে ডাকলে-'শাঙ্কো'। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে বলল-'শিগগির ছোরাটা দাও।' শাঙ্কো ঢোলা জামার নিচ থেকে ছোরা বার করে ফ্রান্সিসের হাতে দিল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঢোলা জামায় ছোরাটা ভরে রাখল। সকলের দিকে তাকিয়ে বলল-'তোমরা সব দরজার কাছে গিয়ে ভিড় করে দাঁড়াও যাতে পাহারাদাররা দেখতে না পায় এখানে কী হচ্ছে! সবাই এবার বুঝল ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই কোনো ফন্দী এঁটেছে। সবাই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ভিড় হয়ে গেল দরজার সামনে। ফ্রান্সিস দ্রুত বস্তাটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। বলল-'শাঙ্কো, বস্তার মুখ বেঁধে দাও।' শাঙ্কো তাড়াতাড়ি বস্তার মুখ বাঁধল। ফ্রান্সিস বস্তা বন্দী হলো। হ্যারি বলে উঠলো-'সাবাস্ ফ্রান্সিস।' ফ্রান্সিস বস্তার মধ্যে থেকে বলল-'আস্তে।'

বিস্কো শাঙ্কো আর কয়েকজন ভাইকিং বস্তাটা কাঁধে নিয়ে দরজার কাছে এল। একজন পাহারাদার বলল-'মড়া আবার কাঁধে করে নিয়ে আসছো। টেনে হিঁচড়ে আনো।'

-'না আমাদের বন্ধু তো-' হ্যারি বলল-'তা ভাই তোমরাও কাঁধে করে নিয়ে যেও।

-'কাঁধে করে পারবো না। তবে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবো।' পাহারাদার বলল।

দরজা খুলে ওরা বস্তাটা ধরল। ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। ততক্ষণে একজন পাহারাদার দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে।

বস্তা বন্দী ফ্রান্সিসকে চার পাঁচজন জলদস্যু ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। ডেকে এসে আর ঝুলিয়ে নিল না। ডেকের কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে হিড়হিড় করে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। ঘষা লেগে ফ্রান্সিসের মাথার পেছনে পিঠে জ্বালা করতে লাগল। ফ্রান্সিস দাঁত চেপে সহ্য করতে লাগল। মুখে কোনো শব্দ করল না। ডেকের রেলিঙের কাছে এসে দু'জন জলদস্যু বস্তা বন্দী ফ্রান্সিসকে দোলাতে লাগল। তারপর ছুঁড়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল।

জলে পড়েই বস্তা সুদ্ধ ফ্রান্সিস জলে ডুবে যেতে লাগল, ফ্রান্সিস তৈরিই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে জামার তলা থেকে ছোরাটা বার করে মোটা কাপড়ের বস্তায় ঢুকিয়ে দিয়েই জোরে হ্যাঁচকা টান দিল। বস্তা লম্বালম্বি কেটে গেল। ফ্রান্সিস বস্তার ভেতরে থেকে বেরিয়ে এল। জলের মধ্যে এইজন্যে ওকে বেশ কিছুক্ষণ দম আটকে থাকতে হলো। মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো আনার জন্য ফ্রান্সিস মুক্তো শিকারীদের সঙ্গে থেকে দম বেশিক্ষণ রাখার অভ্যেস করেছিল। এখন সেটা কাজে লেগে গেল। হাত পায়ে জলের মধ্যে কয়েকটা ধাক্কা দিয়েই ও জলের ওপরে ভেসে উঠল। হাঁপাতে লাগল। ওর ভাগ্য ভালো। দেখল ক্যারাভেল জাহাজ আর ওদের জাহাজ খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছে। মৃদু জোৎস্না পড়েছে সমুদ্রের জলে, জাহাজে। বাতাস তেমন জোরে বইছে না। তাই ঢেউও কম।

ফ্রান্সিস ওদের জাহাজটা লক্ষ্য করে সাঁতরাতে লাগল। একটু পরেই ওদের জাহাজের পিছন দিকের জলে ডোবা হালটা ধরল। হালের কাঠের খাঁজে খাঁজে পা রেখে

একটু উঠল। তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। একটু জিরোল। হাঁপানো একটু কমল। দেখল হাতের কাছে একটা মোটা কাছি ঝুলছে। ফ্রান্সিস কাছিটা বেয়ে বেয়ে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল। এক সময় হালের গায়ে পা রেখে জাহাজের ডেকে নামল। দেখল ওদের জাহাজের কোথাও আলো জ্বলছে না। ওর গায়ের পোশাক ভিজে সপ্ সপ্ করছে। সিঁড়ি দিয়ে নামল অন্ধকারে। দ্রুত পায়ে নিজের কেবিন ঘরে ঢুকল দ্রুত হাতে ভেজা পোশাক ছেড়ে পোশাক পরে নিল। দেয়াল থেকে তরোয়ালটা নিয়ে কোমরে গুঁজল। তারপর একটা কাচ ঢাকা লণ্ঠন জ্বালল। সেটা নিয়ে চলল অস্ত্রঘরের দিকে। অস্ত্রঘর খুলল। বিস্কোর জন্যে আর একটা তরোয়াল কোমরে গুঁজে নিল। এবার শাঙ্কোর ধনুকটা নিল কাঁধে, বুকে ছিলাটা চেপে রাখল। কাঁধে ঝোলাল তীর ভর্তি তূণীরটা। আলোটা নিয়ে ওপরে ওঠার সিঁড়ির কাছে এল। আলোটা নিভিয়ে ফেলল। আলো জলদস্যুর নজরে পড়লে বিপদে পড়তে হবে। কাচ ঢাকা লণ্ঠনটা রেখে দিল। ডেকে উঠে এল। দেখল জলদস্যুদের ক্যারাভেলের ডেকে কয়েকটা আলো জ্বলছে। গভীর রাত। জলদস্যুরা নিজেদের কেবিনে ঘুমিয়ে আছে। মাস্তুলের আড়ালে দাঁড়াল ফ্রান্সিস। কিছুক্ষণ লক্ষ্য রেখে দেখল চার পাঁচজন জলদস্যু ডেকে জাহাজ পাহারা দিচ্ছে। দুজনের হাতে খোলা তরোয়াল। বাকিরা তরোয়াল পাশে রেখে ডেকে বসে আছে।

ফ্রান্সিস ওদের জাহাজের সামনের দিকে এল। চাঁদের আলো খুবই অস্পষ্ট। তবু যদি জলদস্যুরা দেখে ফেলে তাই ও হামাগুড়ি দিয়ে এল। কাঠের ফালি বাঁধা দড়ির মইটা তখনও দুটো জাহাজের মধ্যে লাগানো ছিল। মারিয়া ঐ দড়ির মই দিয়েই দু জাহাজে পারাপার করছিল। ফ্রান্সিস-হামাগুড়ি দিয়ে দড়ির মইয়ের ওপর দিয়ে এল। নামল জলদস্যুদের ক্যারাভেল-এর ডেকে। একটুক্ষণ অপেক্ষা করল। না জলদস্যুরা, পাহারাদাররা ওর আসা বুঝতে পারেনি।



ফ্রান্সিস এবার দড়ির মইয়ের হুকটা খুলে দিয়েই জাহাজের অন্ধকার কোণাটায় সরে এল। কাঠ বাঁধা মইটা জাহাজের গায়ে গিয়ে লাগল। বেশ জোরে শব্দ উঠল—খট্‌ট্--। দস্যু ছুটে এল। জাহাজের হালের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে দেখতে লাগল শব্দটা কিসের। ফ্রান্সিস এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। এক লাফে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে জলদস্যুটার মাথায় তরোয়ালের বাঁট দিয়ে এক ঘা মেরেই নিজের জায়গায় এলো। জলদস্যুটি মুখে কোনো শব্দও করতে পারল না। অজ্ঞান হয়ে রেলিঙের মুখ জুড়ে পড়ে রইল। অন্য পাহারাদার জলদস্যুটি দু একবার ওর অজ্ঞান বন্ধুকে ডাকাডাকি করল। তারপর খোলা তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বুঝল এর সঙ্গে তরোয়াল নিয়ে লড়তে গেলে তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দ হবে। ডেকে বসে থাকা জলদস্যুরা শব্দ শুনে ছুটে

আসবে। কাজেই কোনোরকম শব্দ করা চলবে না। নিঃশব্দে কাজ সারতে হবে। ও অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। জামার তলা থেকে ছোরাটা বের করল। তারপর পেছন থেকে জলদস্যুটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে তার মুখ চেপে ধরল যাতে কোনো শব্দ না করতে পারে। তারপর ছোরাটা আমূল ওর পিঠে বসিয়ে দিল। জলদস্যুটা কয়েকবার নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল। ফ্রান্সিস ওকে ধরে আস্তে আস্তে ডেক-এর ওপর শুইয়ে দিল, যাতে কোনো শব্দ না হয়।



এবার ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল অন্য পাহারাদাররা মৃদু স্বরে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। এত কান্ড হলো ওরা কিছুই বুঝতে পারল না।

সিঁড়ির ঘর হাত বারোর মধ্যে। ফ্রান্সিস ডেকের মেঝেয় বুক পেতে শুয়ে পড়ল। তারপর বুক দিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলল। তারপর নিচে নামার সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ল। তখনই ফ্রান্সিস শুনল ডেকের জলদস্যুরা ওদের বন্ধু দুজনকে ডাকাডাকি করছে। ফ্রান্সিস বুঝল-- আর দেরি করা চলবে না। কাচ ঢাকা আলোয় ও দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। কয়েদঘরের সামনে যখন এল তখন ও হাঁপাচ্ছে। দেখল দুজন

জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে কয়েদঘর পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিস ভাবল এদের হত্যা না করে যাতে কয়েদ ঘরের চাবিটা নেওয়া যায় ও সেই চেষ্টাই করবে। কয়েদঘরের দরজার কাছে একটা কাচ ঢাকা বাতি ঝুলছিল। ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল বের করে আস্তে আস্তে পাহারাদার দুজনের সামনে এসে দাঁড়াল। পাহারাদার দুজন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। এ কী? এ কী করে গারদ ঘরের বাইরে এল। তাও হাতে তরোয়াল নিয়ে। পরক্ষণেই ওরা লড়াইয়ের জন্য তরোয়াল উঁচিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল—'যদি প্রাণে বাঁচতে চাও আমার সঙ্গে লড়াই করতে এসো না। আমি ফ্রান্সিস। তোমাদের মতো দশজনের সঙ্গে লড়াই করা আমার কাছে কিছুই না। গারদ ঘরটা খুলে দাও। বন্ধুদের মুক্তি দাও। আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করব না।'

পাহারাদার দু'জন একটু থমকে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে একজন তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস একপাক ঘুরে তরোয়াল চালাল বিদ্যুৎবেগে। ওর মাথায় তরোয়ালের কোপ বসে গেল। জলদস্যুটা তরোয়াল ফেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। অন্য পাহারাদারটির মুখ মৃত্যুভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ফ্রান্সিস গম্ভীর গলায় বলল--'দরজা খুলে দাও'। লোকটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোমরে গোঁজা চাবির তাড়া বের করল। কয়েদ ঘরের তালা খুলতে লাগল।

ওদিকে হ্যারি সারারাত ঘুমুতে পারেনি। ওর এক চিন্তা-ফ্রান্সিস বস্তা কেটে বেরতে পারল কিনা, হয়তো পারেনি। এসব বিপদের কথা ভাবছিল। তখনই ও কয়েদ ঘরের দরজার কাছে ফ্রান্সিসের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। ও আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বিস্কো শাঙ্কো অন্য বন্ধুদের ধাক্কা দিতে দিতে চাপা স্বরে বলতে লাগল-'ওঠ-ওঠ-ফ্রান্সিস এসেছে।' দু'জন একজন করে সকলেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে দাঁড়াতে লাগল সবাই। হ্যারি চাপা স্বরে বলল-'কোনরকম শব্দ করো না।' তখনই কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। ফ্রান্সিস এক লাফে ঢুকল। কয়েদঘরে ঢুকেই ফ্রান্সিস ঠোঁটে আঙুল রাখল। সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল।

ফ্রান্সিসের নির্দেশে সবাই চুপ করে রইল। হ্যারি ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ওর চোখে জল এসে গেল।

ফ্রান্সিস বলল- 'পাগলামি করো না! এখন বড় লড়াই সামনে।' ফ্রান্সিস বিস্কোকে তরোয়াল খুলে দিল। শাঙ্কোকে দিল তীর ধনুক। বলল- 'ভাইসব, এবার চূড়ান্ত লড়াই। সবাই জলদস্যুদের অস্ত্রাগারে চলে যাও। অস্ত্র নিয়ে প্রত্যেক কেবিনঘরে ঢুকে জলদস্যুদের বন্দী কর। তারপর সবাইকে বন্দী করে ডেকে নিয়ে এসো। জল্‌দি। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করো না।'

ওদিকে ডেকের ওপরে যে পাহারাদার তিনজন ছিল তারা মৃত ও আহত বন্ধু দু'জনকে দেখে বুঝল কিছু একটা হয়েছে। ওরা সিঁড়ির দিকে ছুটল কেবিনঘরে ঘুমন্ত বন্ধুদের ডাকতে। কিন্তু সিঁড়ির কাছে আসতে দেখল খোলা তরোয়াল নিয়ে ভাইকিংরা দলে দলে উঠে আসছে। ওরা বুঝল এখন লড়াই করতে যাওয়া বোকামি। তবু দুজন তরোয়াল হাতে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আহত হয়ে গড়িয়ে পড়ল। গোঙাতে লাগল। কেবিন থেকে নিরস্ত্র জলদস্যুদের বন্দী করে এনে ডেকে জড়ো করা হলো।

এদিকে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো খুঁজে খুঁজে মারিয়াকে যে কেবিনঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে সে ঘরটা পেল। দেখল বাইরে তরোয়াল হাতে একজন পাহারাদার দাঁড়িয়ে। পাহারাদারটি কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিস ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁ হাতে গলা চেপে ধরল। লোকটা বেরিয়ে আসা চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। শাঙ্কো পাহারাদারটির হাত থেকে তরোয়ালটা কেড়ে নিল। ফ্রান্সিস বলল '—যাও ডেকে যাও'। তারপর ওর গলা ছেড়ে দিল। ফ্রান্সিস তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। ও এগিয়ে এসে দরজায় টোকা দিল। একবার, দু'বার। মারিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। বলল— 'তুমি, — মানে আমি কী বলবো—।' ফ্রান্সিস হেসে বলল— 'কিছু বলতে হবে না। শিগগির ডেকে চলে যাও। —ওখানে সবাই আছে।'

'—কিন্তু তোমরা?'

'—আলবার্তোর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যাচ্ছি। তুমি যাও' মারিয়া আর কথা বাড়াল না। সিঁড়ির দিকে ছুটল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো আলবার্তোর ঘরের সামনে এল। দেখল দরজা খোলা। একজন জলদস্যু ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় আলবার্তোকে লড়াইয়ের খবরটা দিতে এসেছে। জলদস্যু ওদের দেখেই চিৎকার করে উঠল—'ক্যাপ্টেন—ঐ যে।' আলবার্তো দ্রুত এগিয়ে এল। দেখল তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে। পেছনে তীর ধনুক হাতে শাঙ্কো। আলবার্তো নিজেও তখন যুদ্ধসাজে তৈরি। সোনা দিয়ে বাঁধানো ওর তরোয়ালের হাতল। ও হাতল চেপে এক টানে তরবারি কোষমুক্ত করল। ফ্রান্সিস হেসে বলল '—তাহলে আলবার্তো। তুমি লড়াই চাও?' আলবার্তো কোন কথা না বলে তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো। ফ্রান্সিস বলল—'তোমার জাহাজ এখন আমাদের কব্জায়। সব জলদস্যু বন্দী। এরপরেও তুমি লড়াই করতে চাও।' আলবার্তো ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল— 'হ্যাঁ, হিম্মৎ থাকে তো লড়ো।'

'—বেশ। এখানে এই ছোট ঘরে লড়াই করা অসুবিধে। ডেকে চলো।' ফ্রান্সিস বলল।

আলবার্তোকে আর জলদস্যুকে সামনে রেখে ফ্রান্সিসরা সিঁড়ি বেয়ে ডেকে উঠে এল। দেখল— ভোর হয়েছে। নরম রোদ ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে, সমুদ্রের জলে, জাহাজে, একটু পরেই আলবার্তোর সঙ্গে তরোয়ালের লড়াইয়ে নামতে হবে। এই সুন্দর রোদে উজ্জ্বল নীল আকাশ— কতদূর ছড়িয়ে আছে। শান্ত সমুদ্রের জলে রোদের নাচন— ফ্রান্সিসের মনটা কেমন যেন করে উঠল। এ অপূর্ব সুন্দর পরিবেশে লড়াই—রক্তপাত—হত্যা? ওর মন মানল না। শেষবার চেষ্টা করতে হবে যাতে এই অমানবিক রক্তপাত হত্যা এড়ানো যায়।

কিন্তু আলবার্তো নির্বিকার। ডেকে দাঁড়িয়ে ও তরোয়াল ওঠাল। ওর মুখ কঠিন। চোখে হত্যার নেশা। মুখ বেঁকিয়ে হেসে বলল-'ফ্রান্সিস কী হলো? তৈরি হও।' ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। তরোয়াল নামিয়ে রাখল।

'-কী হল ভাইকিং? ভয় পেয়ে গেলে? আলবার্তো বলল। ফ্রান্সিসের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। কিন্তু মনকে শান্ত করল। বলল-'আলবার্তো, আমি জানি তুমি

নরঘাতক। অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করছো। ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করার জন্য নিরীহ মানুষদের কয়েদঘরে জানোয়ারের মতো দীর্ঘদিন বন্দী করে রেখেছো। সেই তোমাকে আমার অনুরোধ-যে জীবন তুমি কাটিয়েছো,সেই জীবনের কথা ভুলে যাও। নতুন করে সৎ মানুষের মতো বাকি জীবনটা কাটাও। মানুষ হত্যা নয়-মানুষকে ভালোবাসতে শেখ। মানুষের সেবা কর, দুঃখী-অভাবী মানুষের দুঃখ দূর কর, অভাব দূর কর। তোমার ধনসম্পত্তি কম নয়।'

আলবার্তো হো হো করে হাসল। বলল-'ফ্রান্সিস তুমি সত্যিই ভয় পেয়ে গেছো'।

ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। বলল,আলবার্তো তোমাকে আমি বাঁচার সুযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি বুঝলে না। তোমার মতো নরপশুরা জীবনের উজ্জ্বল দিক কোনো দিন দেখতে পায় না। যাকগে-তুমিই আমাকে লড়াইয়ে নামালে। আমার কোন দায়িত্ব রইল না'।

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে না হতেই আলবার্তো তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে আলবার্তোর তরোয়ালের মার ঠেকাল। শুরু হল দুজনের তরোয়ালের লড়াই। ডেকের একপাশে বসে আছে নিরস্ত্র জলদস্যুর দল। অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র ভাইকিংরা আর মারিয়া। মারিয়া শুনেছে তরোয়াল চালনায় ফ্রান্সিস সবার সেরা। কিন্তু কোনোদিন ফ্রান্সিসের তরোয়াল লড়াই দেখে নি। আজকে সেই সুযোগ এল। মারিয়া এমনিতে খুব শক্ত মনের মেয়ে। কিন্তু আজকে ও একটু আশঙ্কাই বোধ করল। কারণ ও ঠিক বুঝল যে আলবার্তো সুযোগ পেলে ফ্রান্সিসকে হত্যা করতে পিছপা হবে না। আলবার্তো বার বার আক্রমণ করতে লাগল। ও তরোয়ালের মার ঠেকাতে লাগল। ও চাইছিল যাতে আলবার্তো অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। আলবার্তো সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। আলবার্তোর একটা তরোয়ালের মার ঠেকাতে গিয়ে ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াতে গেল। তখনই আলবার্তো তরোয়াল ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য দিক থেকে তরোয়াল চালাল। তরোয়ালের চকচকে ফলাটা ফ্রান্সিসের বাঁ বাহু ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। পোশাকটা কেটে তরোয়াল বসে গেল। রক্তের ধারা বইল। মারিয়া চিৎকার করে উঠল। ফ্রান্সিস একবার ক্ষতস্থানের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল আলবার্তোর ওপর । এবার আর আত্মরক্ষা নয়। ফ্রান্সিস আক্রমণ করল। ফ্রান্সিসের তরোয়ালের মার ঠেকাতে ঠেকাতে আলবার্তো ভাল করেই বুঝতে পারল এ বড় কঠিন ঠাঁই। মারিয়া ফ্রান্সিসের নিপুণ তরোয়াল চালানো দেখে অবাক হয়ে গেল। কী অনায়াস ভঙ্গীতে ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাচ্ছে। বিদ্যুৎগতিতে স্থান পরিবর্তন করছে। কিন্তু পিছোচ্ছে না। এইভাবে আক্রমণের চাপ রাখছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে আলবার্তোর হাত অবশ হয়ে এল। তরোয়াল আর হাতের বশে রইল না। ! ও এলোমেলো তরোয়াল চালাতে লাগল। ফ্রান্সিস এই সুযোগ ছাড়ল না। এক পাক দ্রুত ঘুরেই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তরোয়ালের এক ঘা মারল আলবার্তোর তরোয়ালে। আলবার্তোর হাত থেকে

তরোয়াল ছিটকে গিয়ে মাস্তুলের কাঠে বিঁধে গেল। বেঁধা অবস্থায় তরোয়ালটা দুলতে লাগল। ওর চোখে মুখে মৃত্যু ভয় ফুটে উঠল। ফ্রান্সিস শেষ আঘাতের জন্য তরোয়াল তুলল। ফ্রান্সিসও হাঁপাচ্ছে তখন। কিন্তু তরোয়াল চালাল না। আস্তে আস্তে তরোয়াল নামাল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,— 'তোমার জাহাজ আর তোমার দলবল নিয়ে যাও— এক্ষুনি এই তল্লাট ছেড়ে পালাও।' ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। কেউ লক্ষ্য করেনি যে আলবার্তোর কোমরে বেল্ট-এ একটা ছোরা গোঁজা আছে। এইবার আলবার্তো দ্রুত হাতে ছোরাটা টেনে বের করল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। শাঙ্কো আলবার্তোকে কোমরে হাত দিতে দেখেই বুঝেছিল ওর উদ্দেশ্য কি। আলবার্তো ছোরা ছুঁড়ে মারার সঙ্গে সঙ্গেই শাঙ্কো ফ্রান্সিসের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল! দুজনে জড়াজড়ি করে ডেকের ওপর পড়ে গেল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।তখনই মাস্তুলের ওপর বসে থাকা নজরদার চেঁচিয়ে উঠল—'ডাঙা দেখা যাচ্ছে, ডাঙা।'

সকলেই হৈ হৈ করে উঠে জাহাজের রেলিঙের কাছে জড়ো হলো। সত্যি দূরে বিস্তীর্ণ বালির তটরেখা দেখা যাচ্ছে। এই হৈচৈ-র মধ্যে আলবার্তো জাহাজের রেলিঙে দ্রুত উঠে পড়ল। উদ্দেশ্য সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়া। কারণ কাছেই সমুদ্রতীর। সাঁতরে পালাতে পারবে। কিন্তু আলবার্তো শাঙ্কোর নজর এড়াতে পারেনি। শাঙ্কো অতি দ্রুত ধনুকে তীর পরিয়েই তীর ছুঁড়ল। একেবারে নিঁখুত নিশানা শাঙ্কোর। তীর আলবার্তোর পিঠে বিঁধে গেল। আলবার্তো দুহাত উপরে তুলে ছিটকে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। ডেক থেকে ভাইকিংরা ও জলদস্যুর দল দেখল যে আলবার্তো আর ভেসে উঠল না। জলে যেখানে আলবার্তো পড়েছিল সেখানের জলটায় একটু লাল রঙ লাগল। হ্যারি আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল--'ফ্রান্সিস, আমাদের এক বন্ধুর মৃতদেহ এখনো কয়েদঘরে পড়ে আছে।' ফ্রান্সিস দ্রুত বলে উঠল—'সত্যিই তো। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়নি।' কথাটা বিস্কোর কানে গেল, বলল, 'আমরা কয়েকজন যাচ্ছি।'

একটু পরেই বিস্কোরা কয়েদঘর থেকে বন্ধুর মৃতদেহ ডেকে শুইয়ে দিল। সবাই চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াল। ভাইকিংদের মধ্যে যে ধর্মযাজকের কাজ করে সে এগিয়ে এল। তার গলায় ঝুলছে একটা ভাঁজ করা চাদরের মতো। হাতে একটা চামড়ার ছেঁড়াখোঁড়া বাইবেল। ওটার পাতাগুলো সব খোলা। ভাইকিং যাজক তাই থেকে একটা পাতা খুলে বিড়বিড় করে কি পড়ল। সবশেষে বলল,—'আমেন।' তখন মৃতদেহটা একটা মোটা কাপড়ের থলেতে ঢোকানো হলো। মাথার দিকে বেঁধে দেওয়া হলো। দুজন ভাইকিং মৃতদেহটি নিয়ে জাহাজের রেলিঙের কাছে গেল। মৃতদেহটি দোলাতে দোলাতে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল। কেউ কোনো কথা বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

নিরস্ত্র জলদস্যুর দল থেকে একজন যুবক জলদস্যু ফ্রান্সিসের সামনে এসে দাঁড়ালো। বলল—'আমাদের ক্যাপ্টেন মারা গেছে। এখন আমরা কি করবো'?

ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডেকে বলল—'এখন এই জলদস্যুদের নিয়ে কি করবে'?

—'ওদের মুক্তি দেব—ওদের ক্যারাভেল জাহাজ নিয়ে ওরা চলে যাবে। কিন্তু একটি প্রতিজ্ঞা ওদের করতে হবে বাকি জীবন ওরা আর জলদস্যুতা করবে না। দেশে ফিরে সৎ জীবনযাপন করবে'।

ফ্রান্সিস যুবকটির দিকে তাকাল. বলল—'কী, এই শর্তে তোমরা রাজী?

—'হ্যাঁ আমরা রাজী।' যুবকটি বলল।

—'কিন্তু একটা সমস্যার সমাধান এখনই করতে হবে।' হ্যারি বলল।

—'দেখ—আলবার্তোর কেবিন ঘরে নিশ্চয়ই লুণ্ঠিত ধনসম্পদ রয়েছে। এখন আলবার্তো মারা গেছে ঐ লুঠ করা সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে এবার এই জলদস্যুদের নিজেদের মধ্যে মারামারি খুনোখুনি শুরু হয়ে যাবে।

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। বলল—'কথাটা সত্যি। এই ধনসম্পত্তি কি হবে?'

শাঙ্কো বলল— ওগুলো আমরা দেশে নিয়ে গিয়ে রাজার জাদুঘরে রাখবো।

—'না শাঙ্কো', ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—'অনেক নিরীহ মানুষের রক্তে ভেজা ঐ অভিশপ্ত ধনসম্পদ আমরা কোনমতেই নেবো. না। হ্যারিকে দায়িত্ব দিচ্ছি—হ্যারিই ঐ ধনসম্পদ জলদস্যুদের মধ্যে যতটা সম্ভব সমান ভাগে ভাগ করে দেবে।'

—'বেশ!' হ্যারি রাজি হলো। জলদস্যু যুবকটিকে হ্যারি বলল,—'চলো—তোমাদের সঙ্গে কথা আছে. যেখানে জলদস্যুরা বসে আছে যুবকটিকে নিয়ে হ্যারি সেদিকে গেল।

মারিয়া এগিয়ে এল ফ্রান্সিসের কাছে। বলল, 'তুমি আহত। কাটা জায়গা থেকে এখনো রক্ত পড়ছে। তুমি কেবিনে চলো। তোমার বিশ্রামও দরকার।'

—'হ্যাঁ চলো।' ফ্রান্সিস বলল। তারপর বিস্কোকে বলল—'আমাদের জাহাজ চালককে বলো আমাদের জাহাজটা যতটা সম্ভব তীরের কাছে যেন নিয়ে যায়।'

দুপুরের খাওয়ার সময় হ্যারি ফিরে এলো। ফ্রান্সিসকে বলল—'ভাগবাঁটোয়ারা করে এসেছি এবার কি করবে?'

—'ওদের ক্যারাভেল জাহাজের সঙ্গে আমাদের জাহাজটা যে দড়ি দিয়ে বাঁধা সেটা শাঙ্কোকে কেটে দিতে বলো। জলদস্যুরা ওদের জাহাজ করে দেশে ফিরে যাক।

তাই করা হলো। জলদস্যুদের মুক্তি দেওয়া হলো ওরা ওদের ক্যারাভেল জাহাজে তাড়াতাড়ি পাল খাটাল। হাওয়ার তোড়ে পাল ফুলে উঠল। ওদের জাহাজ গভীর সমুদ্রের দিকে চলল। ডেকে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসরা তা দেখল।

কিছুক্ষণ পরে রসুইঘর আর ভাঁড়ার ঘরের দায়িত্ব যে তিনজন ভাইকিং-এর হাতে ছিল তারা ফ্রান্সিস আর হ্যারির কাছে এল। একজন বলল-'এবার কি দেশে ফিরবে?'

--'হ্যাঁ।' ফ্রান্সিস বলল। অন্য ভাইকিংটি বলল-'কিন্তু আমরা জানিনা আমরা কোথায় এসেছি। তীরের যে বালিয়াড়ি দেখছি তাতে বুঝতে পারছি না এটা কোনো দেশ না দ্বীপ। দিক ঠিক করে দেশে ফিরতে আমাদের কতদিন লাগবে জানি না।'

--'তা তো ঠিকই,' হ্যারি বলল।

অন্য ভাইকিংটি বলল-'ভাঁড়ার ঘরে যা ময়দা চিনি খাবার দাবার আছে তাতে তবু কিছুদিন চলবে। কিন্তু খাবার জলের পরিমান অনেক কমে গেছে। কিছু খাবার জল না জোগাড় করতে পারলে সাংঘাতিক সমস্যায় পড়ে যাবো।'

ফ্রান্সিস হ্যারি দুজনেই ভাবল কিছুক্ষণ। হ্যারি প্রথমে বলল-'ফ্রান্সিস, যে ডাঙাটা দেখা যাচ্ছে ওখান থেকেই খুঁজে পেতে খাবার জল জোগাড় করতে হবে।' তারপর দিক ঠিক করে দেশের দিকে পাড়ি দেবো।'

--ঠিক বলেছো তোমরা'-ফ্রান্সিস বলল-'তাহলে কালকেই আমরা তীরে নামবো। দ্বীপ হোক আর দেশ হোক খাবার জল খুঁজে বার করতেই হবে।'

পরদিন সকালের খাবার খেয়েই ফ্রান্সিস বিস্কো আর শাঙ্কোকে তৈরি হয়ে আসতে বলল। বিস্কো তরোয়াল নিয়ে এল আর শাঙ্কো তীর ধনুক নিয়ে এল। মারিয়ার যাওয়ার ব্যাপারে ফ্রান্সিস দু'একবার আপত্তি জানাল । কিন্তু মারিয়া জেদ ধরল ও ওদের সঙ্গে যাবেই। অগত্যা ফ্রান্সিস আর আপত্তি করল না।

জাহাজের গায়ে ঝোলান একটা শক্তপোক্ত নৌকা জলে নামানো হলো। দড়ি বেয়ে বেয়ে ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নৌকায় নেমে এল। মারিয়াকে নামানো হলো দড়ির জালে দাঁড় করিয়ে। খাবার দাবার, খাওয়ার জল এসব প্রয়োজনীয় জিনিস আগে থেকে নৌকায় রাখা হয়েছিল আর দুটো জল রাখবার খালি পিপে। মারিয়া নেমে আসতেই বিস্কো নৌকো ছেড়ে দিল। বিস্কো আর শাঙ্কো নৌকো বাইতে লাগল তীরভূমি লক্ষ্য করে।

আধ ঘন্টার মধ্যে নৌকো তীরে ভিড়ল। ফ্রান্সিসরা নামল। মারিয়া কিন্তু কারো সাহায্য ছাড়াই নৌকো থেকে লাফিয়ে নামল। সবাই বিস্তীর্ণ বেলাভূমির বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল।

অনেকটা হাঁটার পর ওরা থামল। দেখল যতদূর চোখ যায় শুধু ধু ধু বালির প্রান্তর। ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল।

সাদা-ধূসর রঙের বালি। কোনদিকে সবুজের চিহ্ন নেই। দু'একটা পাখি মাঝে মাঝে বালিতে ছায়া ফেলে উড়ে যাচ্ছে। তীব্র রোদ-বালিতে প্রতিফলিত হয়ে চোখে এসে লাগছে। ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ। গরম হাওয়া বইছে।

কিছুক্ষণ চলার পর ওদের নজরে পড়ল স্তূপিত শিলার তালচে পাহাড়। বেশি উঁচু নয়। তার ওপাশে কিছু সবুজ গাছগুলির মাথা দেখা গেল। ফ্রান্সিস আশ্বস্ত হলো-যাক মরুভূমির মত জায়গাটা খুব দূরবিস্তৃত নয়।

টানা পাহাড়ের কাছে ওরা এল। পাথরে পা রেখে ওরা পাহাড়টায় উঠল। দেখল ওপাশে একটু দূর থেকে বনভূমি শুরু হয়েছে। খুব ঘন ঘন বন নয়। ছাড়া ছাড়া। দূরে কিছু ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। ছাইগাদা দিয়ে গেথেঁ গেথেঁ তৈরি বাড়িঘর। ছাদ পেইকো ঘাসের। ফ্রান্সিস বলল-'মানুষের বসতি আছে দেখছি। চলো ওখানেই জলের খোঁজ করা যাক। ওরা পাথরের চাঁইয়ে পা রেখে রেখে নামতে লাগল। ফ্রান্সিস অবশ্য মারিয়াকে হাত ধরে সাহায্য করতে লাগল। মারিয়া প্রায় নেমেই এসেছিল, হঠাৎ একটা পাথরের টুকরোয় পা রাখতেহ টুকরোটা সরে গেল। মারিয়া টাল সামলাতে পারল না। পাথরের চাঁইয়ের মাথা থেকে নিচে পড়ে গেল একটা

বড় গহ্বরের মধ্যে। ভাগ্য ভালো -নিচে ছিল বালি। বালির ওপর মারিয়ার দু'পা পড়ল। ওর শুধু হাতটা একটু ছড়ে গেল। পাথরের চাঁইয়ের ধারে এসে ফ্রান্সিসরা হাঁটু গেড়ে বসে নিচে তাকাল। গহ্বরটা একটু অন্ধকারই, তবু দেখল মারিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস ডেকে বলল-তোমার কি খুব লেগেছে?'

মারিয়া হেসে বলল-'কিছছু না।'

-এবার ফ্রান্সিস অন্যদের দিকে তাকাল। বলল-'এখন মারিয়াকে তোলা যায় কী করে?'

-'জাহাজ থেকে দড়ি আনতে হবে'। বিস্কো বলল-

ওদিকে মারিয়া গহ্বরটার চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একটু অন্ধকার হলেও পাথুরে দেয়াল, খোঁদল এসব দেখতে পাচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা গুহার মুখ। মুখটা বেশ বড়। একজন মানুষ মাথা উঁচু করে ঢুকতে পারবে। মারিয়া আস্তে আস্তে গুহাটার মুখে এসে দাঁড়াল। দেখল কাঠের ফালি দিয়ে তৈরি একটা দরজা গুহার মুখটায়। তার মানে এই গুহায় নিশ্চয়ই মানুষ থাকে। তাহলে এই গহ্বর থেকে বেরোবার পথও নিশ্চয়ই আছে। মারিয়া চারিদিকে ঘুরে ঘুরে পথ খুঁজতে লাগল। কিন্তু পথ কোথায়? চারিদিকেই পাথরের অমসৃণ গা। হঠাৎ এক জায়গায় দেখল যেন ওখানে অন্ধকারটা কম। মারিয়া দ্রুত পায়ে সেখানে এল। দেখল দুটো পাথরের মাঝখানে একটা পাথরের ফাটল। মারিয়া বালির ওপর হাঁটু মুড়ে বসল। তারপর বালির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে ফাটলের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তার মানে এই গুহায় যে বা যারা থাকে তারা এই পথেই যাতায়াত করে। লুকিয়ে থাকার পক্ষে ভালো জায়গা।

মারিয়া-বাইরে পাথরের চাঁইয়ের নিচে এসে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে ডাকল-'ফ্রান্সিস।' বিস্কো তখন জলের খালি পিপে রেখে জাহাজ থেকে দড়ি আনতে যাবে বলে তৈরি হচ্ছে। তখন মারিয়ার ডাক ওদের কানে গেল। ওরা তাড়াতাড়ি পাথরের চাঁই থেকে নেমে এল। দেখল মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে। মারিয়া বলল-'এই গহ্বরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার পথ আছে।'

—'ভালই হলো', ফ্রান্সিস বলল—'আমরা তোমাকে দড়ি দিয়ে তুলব ভাবছিলাম।'

—'ফ্রান্সিস —এর ভেতর একটা গুহা আছে। গুহার মুখের কাঠের দরজা আছে। মনে হয় মানুষ বাস করে।'

—'বলো কি।' ফ্রান্সিস একটু আশ্চর্য হলো।

বিস্কো বলল—'চলো না ফ্রান্সিস দেখা যাক।'

সবাই হামাগুড়ি দিয়ে ফাটল পেরোল। গুহার মুখে এসে দাঁড়াল। ফালি কাঠের দরজাটা একটুকরো দড়ি বাঁধা ছিল। ফ্রান্সিস খুলল দড়িটা। তারপর একে একে সবাই গুহাটায় ঢুকল। ভেতরটা বেশ অন্ধকার। চোখে ভাবটা সয়ে আসতে ওরা দেখল—গুহার একপাশে শুকনো ঘাসের বিছানা। তার ওপর মোটা কাপড়ের কম্বল মতো পাতা। অন্য পাশে পোড়া হাঁড়ি কুড়ি, পাথরের টুকরো পেতে উনুন। একপাশে এলোমেলো গাছের বাঁকা কান্ড কুঁদে কুঁদে তৈরি বিচিত্র সব মূর্তি। এসব

কী মূর্তি ফ্রান্সিসরা বুঝল না। আবার মা-ছেলে, বিয়ের বর-কনে, এসবের মূর্তিও আছে। ওরা বুঝল এখানে একজনই মানুষই থাকে। বিছানায় একটা মাত্র ঢিলাঢালা পোশাক পঞ্চো পড়ে আছে। সব দেখেটেখে ফ্রান্সিস বলল—'চলো, আর কিছু দেখার নেই। তবে লোকটাকে পেলে এখানে জলের সন্ধান পাওয়া যেত।'

ওরা গুহার বাইরে আসতেই একজন মধ্যবয়স্ক লোকের মুখোমুখি পড়ল। লোকটা ভীষণভাবে চমকে উঠল। ও বোধহয় ওর গোপন আস্তানা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল। লোকটা দ্রুত পেছন ফিরল। পালাবার ধান্ধা। বিস্কো জোরে ছুটে গিয়ে লোকটার ঢিলেঢালা পোশাক পঞ্চোটা পেছন থেকে চেপে ধরল। লোকটার পালানো হলো না। বিস্কো লোকটাকে ধরে ফ্রান্সিসের কাছে নিয়েএল। লোকটা বেশ ভয় পেয়ে গেছে বোঝা গেল। লোকটার কাছে আসতে ফ্রান্সিস হেসে হাত তুলে ওকে ভয় না পেতে ইঙ্গিত করল। লোকটা যেন একটু নিশ্চিন্ত হলো। ফ্রান্সিস কথা বলতে গিয়ে সমস্যায় পড়ল। কী ভাষা বুঝবে লোকটা? ফ্রান্সিস প্রথমে পর্তুগীজ ভাষায় জিজ্ঞেস করল—'তোমার নাম কী?' লোকটা বুঝল না। তাকিয়ে রইল।এবার ফ্রান্সিস স্প্যানিশ ভাষায় বলল—'তোমার ভয় নেই। তোমার নাম বলো।' লোকটার চোখমুখ উজ্জ্বল হলো। বোঝা গেল ও ফ্রান্সিসের কথা বুঝছে। লোকটা ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায় বলল, —'আমি মেস্তিজো—চিকিমাদের দেবতার পূজারী।

ফ্রান্সিস এবার ভালোভাবে মেস্তিজোকে দেখল। মেস্তিজোর মাথায় লম্বা লম্বা চুল। মুখের দু'পাশের আধখানায় হলুদ রঙ মাখা। দু'কানের লতিতে সোনার কাঠি বেঁধানো। পরনে ঢিলেঢালা পঞ্চো পোশাক। ওর একহাতে একটা ঘাসের তৈরি ঝুড়ি। তাতে ক্যারোপ বীনএর বেশ কয়েকটা রুটি। অন্য হাতে একটা চীনেমাটির কুঁজো মতো। বোঝা গেল খাবার জল তাতে। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হলো যে মেস্তিজোর হাতে অস্ত্র নেই।তার মানে সে যোদ্ধা নয়। ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো, তোমার কোন ক্ষতি আমরা করবো না। আমাদের জাহাজ সমুদ্রতীরে রয়েছে। আমরা পানীয় জল নিতে এসেছি। তুমি পানীয় জলের জায়গাটা দেখিয়ে দাও।' ফ্রান্সিস কথাগুলো থেমে থেমে বলল যাতে মেস্তিজো সহজে বুঝতে পারে।

মেস্তিজো মাথার লম্বা লম্বা চুল ঝাঁকিয়ে বলল—'চলো জলের জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি' ফ্রান্সিস বিস্কো আর শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—'তাহলে তোমরা ওর সঙ্গে যাও। জল নিয়ে এসো।'

মেস্তিজো হাতের খাবারের ঝুড়ি জলের কুঁজো ওর গুহাঘরে রেখে এল। তারপর জলের জায়গা দেখাতে চলল। পেছনে পিপে নিয়ে বিস্কো ও শাঙ্কো চলল। ফ্রান্সিস বলল—'মারিয়া —চলো আমরা গুহাঘরে গিয়ে বসি।' দু'জনে এসে ফালি কাঠের দরজা খুলে গুহায় ঢুকল। খড়ের বিছানায় গিয়ে বসল দু'জনে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্কোরা পিপে ভর্তি জল নিয়ে ফিরে এল। এদিকে বেশ বেলা হয়ে গেছে সকলেরই খিদে পেয়েছে। জাহাজ থেকে খাবার দাবার আনা হয়েছিলো। মারিয়া সে সব খাবার সবাইকে ভাগ করে দিল। মেস্তিজোকেও দেওয়া হলো। মেস্তিজো খুব খুশি। ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো—আমি তোমার খাবার

খাবো। তুমি আমাদের খাবার খাও।'

মারিয়া মেস্তিজোর খাবার খেতে চাইল। মেস্তিজো ঘাসে তৈরি ঝুড়ি থেকে রুটি, সামুদ্রিক মাছ, বীন, লঙ্কামেশানো আলুর তরকারি বের করে দিল। ফ্রান্সিস মারিয়া খেতে লাগল। নতুন ধরনের খাবার। দু'জনের ভালো লাগলো।

খাওয়াদাওয়ার পর মেস্তিজো বিছানায় পাতা কাপড় তুলে খড়গুলো গুহার মেঝেয় আরও জায়গায় ছড়িয়ে দিল। তারপর দুটো কম্বল মতো মোটা কাপড় পেতে দিল। ফ্রান্সিসরা সবাই বসল তাতে। শাঙ্কো শুয়ে পড়ল, বিস্কো আধশোয়া হলো। ফ্রান্সিস, মারিয়া আর মেস্তিজো বসে রইল। এতক্ষণ ফ্রান্সিস ভাবছিল—মেস্তিজোর কথা। স্পেনীয় ভাষায় কথা বলে অথচ আচার আচরণ মোটেই স্পেনীয়দের মতো নয়। ওর আসল পরিচয়টা কী? এই গোপন গুহাঘরে লুকিয়ে থাকে কেন? ফ্রান্সিস ডাকল—'মেস্তিজো?'

—'বলুন।'

'দেখ তোমার ভাষা শুনে বুঝেছি তুমি স্পেনীয়। অবশ্য তোমার কথা কিছুটা ভাঙা ভাঙা তবু ভাষাটা তো স্পেনীয়। তাছাড়া তুমি আমার স্পেনীয় ভাষাও বুঝতে পারছো। অথচ তোমার এখনকার চেহারা মোটেই স্পেনীয়দের মতো নয়। কী ব্যাপার বলো তো?' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো আস্তে আস্তে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলতে লাগল—'সে অনেকদিন আগের কথা। আমার বয়স তখন ছয় সাত। স্পেনের ডিমেলো শহরে বাবা-মার সঙ্গে থাকতাম। এটুকু আমার মনে আছে। বাবা মালবাহী জাহাজে কাজ করতেন। তখন একবার বাবা-মার সঙ্গে আমিও সমুদ্রযাত্রায় বেরোলাম। মাস চার পাঁচ জাহাজেই কাটল। ঝড় ঝাপটায় আমাদের জাহাজ বার কয়েক প্রায় ডুবে যাচ্ছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে আমরা বেঁচে থেকেছি। জাহাজ ডোবেনি। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।

একদিন আকাশে ঘন মেঘ করে সন্ধ্যের পরেই ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তবু বাবা আর জাহাজের নাবিকেরা ঝড়ের মোকাবিলা করবার জন্য তৈরি হল। চলল ঝড়ের সঙ্গে লড়াই। বড় বড় পাল সব নামিয়ে ফেলা হল। ঝড়ের ঝাপটায় প্রচণ্ড বেগে জাহাজ দুলতে লাগল। এই জাহাজটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে যাচ্ছে পরক্ষণেই ঢেউয়ের ফাটলে নেমে আসছে। জাহাজের প্রচণ্ড দুলুনিতে আমরা কেবিন ঘরের এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ছি। অনেকের মাথা ফাটল, হাত পা ভাঙল। আমি ডেকএ যেতে সাহস পেলাম না।

আকাশ মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাজ পড়ছে। হঠাৎ জাহাজটা ভীষণ জোরে দুলে উঠল। ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে কানে এল মড়মড় শব্দ। জাহাজটা কাত হতে লাগল। একটু পরেই অনেকটা কাত হয়ে গেল। কেবিন ঘরে আমি একা, বাবা আর তার বন্ধুরা ডেকে গেছে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে। হঠাৎ নাবিকদের চিৎকার—জাহাজ ডুবছে। সাবধান। তখনই দেখি পায়ের কাছে জল ঢুকতে লাগল। আমি বুঝলাম আর এখানে থাকা চলবে না। জাহাজ ডুবছে। দ্রুত ছুটলাম সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি দিয়ে কি উঠতে পারি? সিঁড়ি নাগরদোলার মত দুলছে। কোনরকমে

শরীর পা ঠিক রেখে ডেকএ উঠে এলাম। ততক্ষণে কেবিনঘরগুলো ডুবিয়ে দিয়ে সমুদ্রের জল ডেকএ উঠে এসেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে। তারই আলোতে বাবাকে খুঁজতে লাগলাম। ওদিকে নাবিকেরা একে একে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমি বুঝলাম বাবাকে এই অবস্থায় খুঁজতে গেলে আমি আর বাঁচব না। তখন আমি হালের কাছে এসেছি। দেখি দড়ি বাঁধা একটা কাঠের থাম মত। আমি মাথাটা গড়িয়ে নিয়ে চললাম। ডেক-এর রেলিঙের ধারে নিয়ে এলাম। তারপর নিজের শরীরটা দড়ি দিয়ে থামটার সঙ্গে বাঁধলাম। ঠিক তখনই বোধহয় জাহাজটা ডুবে গেল। কয়েকজন নাবিকের চিৎকার কোলাহল শুনলাম। বিরাট এক ঢেউয়ের ধাক্কায় থামসুদ্ধু আমি ছিটকে পড়লাম ঝড়োন্মত্ত সমুদ্রে। প্রাণপণে থামটা জড়িয়ে ধরলাম। ঢেউয়ের ধাক্কায় বিদ্যুতের আলো ঝলসে ওঠা সমুদ্রের ওপর দিয়ে আমি ভেসে চললাম। কতক্ষণ জানি না। আমার আর কিছু মনে নেই।

যখন চোখ খুললাম দেখি ভোর হ'য়েছে। সমুদ্রের ধারে ভেজা বালির মধ্যে থাম জড়িয়ে ধ'রে আমি পড়ে আছি। নুনে বালিতে চোখ বুঝে গেছে। খুলতে কষ্ট হচ্ছিল। কিছুক্ষণ শুয়ে রইলাম। হাওয়ার শব্দ। সমুদ্রের মৃদু গর্জন শুনতে লাগলাম। তারপর আস্তে আস্তে চোখ খুললাম। রোদের তেজ বাড়তে লাগল। শরীরটা গরম হ'ল। আস্তে আস্তে থামে বাঁধা দড়িটা খুললাম। তারপর বালিয়াড়িতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মাথাটা ঘুরে উঠল। টাল সামলে সোজা হলাম। চারদিকে তাকালাম। একদিকে সমুদ্র। অন্যদিকে ধুধু বালি। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। এখানে পড়ে থাকলে না খেয়ে মরতে হবে। কাজেই কোথাও লোকজন বাড়িঘর আছে কিনা খুঁজে বের করতে হবে। সেই বালির মরুভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে চললাম আমি।

আস্তে আস্তে সূর্য পশ্চিমদিকে অনেকটা নেমে এল। গতসন্ধ্যেয় পেটে কিছু পড়েনি। গলা শুকিয়ে কাঠ। ক্ষুধা তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় আমি টলতে টলতে হেঁটে চললাম।

হঠাৎ দেখি একটু দূরেই কিছু বাড়িঘর। ঠিক দেখছি তো? দু'চোখ কচলে নিলাম। হ্যাঁ-থাম দেওয়া পাথরের বাড়িঘর। আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠতে গেলাম। গলা দিয়ে কোন শব্দই বেরোলো না। হাঁটতে লাগলাম। এখানে বালি গরম নয়। বালি মাটি মেশানো শক্ত জমি। আমি তখন আর হাঁটতে পারছি না। সেই জমির ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চললাম।

প্রথম যে বাড়িটা পেলাম সেটার দরজার ওপর আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। কাঠের ফালি কেটে তৈরি দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। সেই শব্দটাই আমি শেষ শুনেছিলাম। তারপরই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আর কিছুই মনে নেই।

আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে এল। অস্পষ্ট কাদের কথাবার্তা কানে আসতে লাগল। সেই শব্দ আস্তে আস্তে আমার কানে স্পষ্ট হ'ল। কিন্তু সেই কথাবার্তার কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না। বেশ কষ্ট করে চোখ খুললাম। আমার গলায় গোঙানির শব্দ উঠল। কথাবার্তা থেমে গেল। কে একজন একটু দ্রুতই আমার মাথার কাছে এল। কপালে হাত রাখল। আমি দেখলাম মুখের দু'পাশে রঙমাখা একটা মুখ। লোকটা

আমার চোখ খোলা দেখে হাসল। আমি অনেক কষ্ট করে বললাম জল। লোকটি কিছুই বুঝল না। তাকিয়ে রইল। আমি আস্তে আস্তে ডানহাতটা তুলে জল খাওয়ার ভঙ্গি করলাম। লোকটা বুঝল। গলা চড়িয়ে কী বলল। সামুদ্রিক মাছের তেলের আলো জ্বলছিল ঘরটাতে। সেই আলোয় দেখলাম একজন স্ত্রীলোক চিনেমাটির বাটিতে জল নিয়ে ছুটে এল। স্ত্রীলোকটির মুখে কোনো রঙ লাগানো নেই। আমি মুখ হাঁ করলাম। স্ত্রীলোকটি আস্তে আস্তে মুখে জল ঢেলে দিতে লাগল। আমি থেমে থেমে অনেকটা জল খেলাম। মুখ গলা নাকের শুকনো ভাবটা কেটে গেল। অনেকটা স্বাভাবিক হলাম আমি। স্ত্রীলোকটি হাসল। আমার মুখের কাছে মুখ এনে কী বলল। কিছুই বুঝলাম না। স্ত্রীলোকটি এবার হাত তুলে মুখে ছুঁইয়ে খাওয়ার ইঙ্গিত করল। আমি আস্তে আস্তে মাথা কাত ক'রে সম্মতি জানালাম। স্ত্রীলোকটি চলে গেল। এবার লোকটি এগিয়ে এল। হেসে আমার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কী যে ভাল লাগল। রাতে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। এত ক্লান্ত যে কথা বলতে পারছিলাম না। লোকটি ও স্ত্রীলোকটি আমায় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু ওদের ভাষা আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। চুপ ক'রে থাকা ছাড়া উপায় কী? একটু থেমে মেস্তিজো আবার বলতে লাগল দিন চার পাঁচেক কাটল। আমি তখন অনেকটা সুস্থ। জানলাম যেখানে আমি আশ্রয় পেয়েছি সেটা একটা ছোট শহর। নাম চিক্লাই। লোকটির নাম জামিলি। সমুদ্রে মাছ ধরাই তার কাজ। চিক্লাই শহরের অধিকাংশ লোকই সমুদ্রে মাছ ধরেই সংসার চালায়। মেস্তিজো থামল, ফ্রান্সিস বলল তারপর? মেস্তিজো বলতে লাগল।

জামিলির আশ্রমে আমার দিন কাটতে লাগল। জামিলিরা যে ভাষায় কথা বলে তার নাম উনকা। জামিলির পরিবারের সঙ্গে থাকতে থাকতে আমি তাড়াতাড়ি উনকা ভাষা শিখে গেলাম। মাছ ধরার কাজে জামিলিকে আমি সাহায্য করতাম। এইভাবে আমি ঐ পরিবারেরই একজন হ'য়ে গেলাম। জামিলির স্ত্রী মায়ের মত স্নেহে যত্নে আমাকে মানুষ করতে লাগল। মেস্তিজো এই পর্যন্ত ব'লে থামল। ফ্রান্সিস বেশ আগ্রহের সঙ্গে মেস্তিজোর জীবনের কাহিনী শুনছিল। মেস্তিজোকে একটু দম নিতে সময় দিল। তারপর বলল-মেস্তিজো তারপর কী হ'ল বলো। মেস্তিজো আবার বলতে শুরু করলো-এবার চিকামা উপত্যকার কথা বলি। চিক্লাই থেকে বেশ কিছুটা উত্তরে চিকামা উপত্যকা। এই উপত্যকা ঘিরে গড়ে উঠেছিল মোচিকা রাজ্য। চিকামা উপত্যকাতেই রাজধানী চিকমা। অনেক মানুষের বাস সেখানে। সবাই উনকা ভাষায় কথা বলে। তাই এদের বলা হয় উনকা। এই উনকাদের রাজা ছিল কোলা। খুব উদার হৃদয়ের মানুষ। এই মোচিকা রাজ্যের উত্তরে চিমু রাজ্য। সেই রাজ্যের রাজার নাম লুপাকা। একটু থেমে মেস্তিজো বলতে লাগল-দুই রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘদিনের শত্রুতা। তখন আমি যুবক। নানা প্রয়োজনে আমাদের চিকামা যেতে হত। জামিলির সঙ্গে একদিন চিকামার উদ্দেশ্যে বেরোলাম। চিকামায় খুব ভালো মাছ ধরা জালের সুতো পাওয়া যায়। তা ছাড়া সংসারেরও কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করার ছিল। আমরা যখন চিকামা পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে হয় হয়। একটা সরাইখানায় দুজনে আশ্রয় নিলাম। রাতে খেতে বসেছি

তখনই সরাইখানার লোকজনের মুখে শুনলাম অবস্থা ভালো নয়। চিমুদের রাজা লুপাকা চিকিমার উত্তর সীমান্তে সৈন্য সাজিয়ে অপেক্ষা করছে। যে কোন মুহূর্তে মোচিকা রাজ্য আক্রমণ করতে পারে। জামিলি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল। খেয়ে উঠে শুতে এলাম দু'জনে। ঠিক করেছিলাম সেদিন রাতটা বিশ্রাম নিয়ে পরদিন কেনাকাটা করবো। জামিলি বলল-কেনাকাটা দরকার নেই। কাল ভোরেই চিক্লাই রওনা হবো। এই চিকিমায় আর থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়। ভোরে উঠতে হবে। শুয়ে শুয়ে জামিলির মুখে উনকা আর চিমুদের শত্রুতার নানা গল্প শুনেছিলাম। জামিলি সে সব বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।' একটু থেমে মেস্তিজো বলতে লাগল-' গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল। চারপাশের বাড়িতে ও সরাইখানায় লোকজনের চিৎকার হৈ হল্লা চলছে তখন। জামিলি আর আমি দু'জনেই ছুটে বাইরে এলাম। দেখলাম উনকা সৈন্যরা মশাল আর লোহার ছুঁচালো মুখ বর্শা হাতে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই রাজবাড়ি থেকে রাজা কালো ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এল। পেছনে ঘোড়ায় চড়ে এল রাজার দেহরক্ষী সৈন্যরা। রাজা কোলার মাথায় লাল রঙের মোটা কাপড়ের ফেট্টি। তাতে লাল হলুদ বিচিত্র সব পাখির পালক গোঁজা। গায়ে কাচের টুকরো বসানো পঞ্চো। বিচিত্র রঙের সুতোর কাজ করা পঞ্চোটায়। জামিলি বলল 'এটাই নাকি রাজা কোলার যুদ্ধযাত্রার পোশাক।' রাজা উত্তর দিকে ঘোড়া ছোটাল। পেছনে অশ্বারোহী দেহরক্ষীরা। তারপরে পদাতিক সৈন্যরা। চারদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো। চিকিমার অধিবাসীরা চিৎকার ক'রে রাজা কোলার জয়ধ্বনি দিল। সৈন্যরা উত্তর মুখে চলল। একটা নিচু পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেল রাজা কোলা আর তার সৈন্যরা। মেস্তিজো থামল। তারপর আবার বলতে লাগল 'কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম অন্ধকারে মশাল হাতে উত্তর দিক থেকে লোকজন ছুটে আসছে। খবর পাওয়া গেল চিমুদের রাজা লুপাকার সঙ্গে রাজা কোলার যুদ্ধ বেঁধে গেছে। শুরু হল লোকজনের চিৎকার চ্যাঁচামেচি ছোটাছুটি। আমরা আর সরাইখানায় ঢুকলাম না। যুদ্ধের খবরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। উত্তর দিক থেকে আবার কিছু লোকজন ছুটতে ছুটতে এল। তাদের কাছে খবর পাওয়া গেল প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। কে জিতবে কে হারবে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না।' একটু থেমে মেস্তিজো বলতে লাগল- 'বাকি রাতটা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েই কাটল। ভোর হ'ল তখনও লড়াই চলছে। জামিলি আর আমি সরাইখানায় ঢুকলাম। নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে বাইরে এলাম। তখনও রাস্তাঘাটে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। আমরা আর অপেক্ষা করলাম না। চিক্লাইয়ের উদ্দেশ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটতে শুরু করলাম। দুপুর নাগাদ চিক্লাই এসে পৌঁছলাম। ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত সারা শরীর ধূলিধূসরিত। চিক্লাইয়ের লোকজন আমাদের দেখে লড়াইয়ের খবর জানার জন্যে ছুটে এল। আমরা আর কথা বলতে পারছি না। তবু সংক্ষেপে বললাম সব। লড়াই চলছে। কে হারে কে জেতে বলা শক্ত।

বিকেলের একটু আগে। পরিশ্রান্ত আমি আর জামিলি ঘরে শুয়ে ব'সে বিশ্রাম করছি এমন সময় কে যেন খবর দিয়ে গেল রাজা লুপাকা তার পরাজিত সৈন্যদের

নিয়ে উত্তরে চিমু রাজ্যে পালিয়ে যাচ্ছে। রাজা কোলা তাঁর সৈন্যদের নিয়ে চিকিমায় ফিরে এসেছেন। বিজয় উৎসব চলছে চিকিমায়। চিক্লাই শহরের লোকজন আনন্দে চিৎকার করতে করতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল আর রাজা কোলার জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

তখন সন্ধ্যে হয় হয়। আমি শহরের পথে পথে কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে হৈ হল্লা শুনে ফিরে এসে ঘরে বিশ্রাম করছি। জামিলি আনন্দ উৎসব শেষ ক'রে ফেরেনি। হঠাৎ শুনলাম কাঠের দরজায় হাত দিয়ে চাপড়াবার শব্দ। তেমন জোরে চাপড়ানো হয়নি। তবু আমি মৃদু শব্দ পেলাম। তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। দরজা খুলে দিলাম। দেখি একজন মধ্য বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে। মুখের একপাশে হলুদ রং। মাথায় ফেট্টি। পালক গোঁজা তাতে। লোকটির গায়ে চাদরের মত একটা হলদে কাপড় জড়ানো। লোকটি এতক্ষণ মুখ নিচু ক'রে জোরে জোরে শ্বাস ফেলছিলো। এবার মুখ তুলে তাকাতেই চমকে উঠলাম- আরে এ যে রাজ পুরোহিত ল্লামা। চিকামার হুয়াকা দেবতার পুরোহিত। আমি তাড়াতাড়ি ল্লামাকে দু'হাতে তুলে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানালাম। তারপর তাঁকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলাম। ল্লামা তখন এত ক্লান্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। সারা গায়ে ধুলো বালি। স্ত্রীলোকেরা ল্লামাকে খুব যত্ন করে হাত মুখ ধুইয়ে খেতে দিল বীনের রুটি তরকারি। খেয়ে দেয়ে ল্লামা বিছানায় শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে যেন শরীরে মনে একটু জোর পেল। জামিলি আমাকে চিকামা নিয়ে যেতো। হুয়াকা দেবতার পূজায় উৎসবেও গেছি। তখন ল্লামাকে দেখেছি। হুয়াকা দেবতার বেদী থেকে সমবেত ভক্তদের দিকে প্রসাদী ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

জামিলি তখনই বাড়ি ফিরল। ল্লামাকে দেখে সেও অবাক। জামিলি ল্লামাকে মাথা নুইয়ে হাত বাড়িয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে জিজ্ঞেস করল- 'আপনার এ রকম অবস্থা হ'ল কী ক'রে?' ল্লামা ক্লান্তস্বরে বলল- 'তার আগে বলো - যুদ্ধের সংবাদ কী?'

রাজা কোলা জয়লাভ করেছে। লুপাকা তার সৈন্যদের নিয়ে চিমু রাজ্যে পালিয়ে গেছে। ল্লামা খুশিতে প্রায় চিৎকার করে উঠল- রাজা কোলা দীর্ঘজীবী হোন। হুয়াকা দেবতার জয় হোক। এবার ল্লামা আস্তে আস্তে গায়ের লাল কাপড়টা বাঁদিকে সরাল। দেখা গেল কাঁধের কাছে বর্শার ক্ষত। গাছের লতাপাতা দিয়ে বাঁধা। রক্ত পড়ছে না। ল্লামা বলল- 'লুপাকার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়েছে জানতাম। দুপুরের দিকে তিতিকাকা হ্রদের থেকে পূজোর জল আনতে যাচ্ছি হঠাৎ পাঁচ ছ'জন সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে একেবারে আমার সামনে এসে হাজির। ওরা বোধহয় দলছুট সৈন্য ছিল। আমি তো ছুটতে লাগলাম তিতিকাকা বনের দিকে। ওরাও পিছু নিল। একজন বর্শা ছুঁড়ল। লাগল না আমার গায়ে। কিন্তু পরের বর্শাটি কাঁধ ছুঁয়ে গেল। কাটা জায়গা থেকে রক্ত ছুটল। আমি দাঁড়ালাম না। ঐ অবস্থায়ই ছুটে জঙ্গলে ঢুকে গেলাম। চিমু সৈন্যরা তিতিকাকা বনের কিছুই চেনে না। আমাদের কাছে ঐ বনের সবই চেনা। অল্পক্ষণের মধ্যেই আত্মগোপন করলাম গভীর বনের মধ্যে। কিন্তু বর্শার ঘায়ে কাঁধ থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি তখনও। কিছু বুনো লতাপাতা আমি চিনতাম। সে সব পাতা থেঁতলে লাগালাম গায়ে। রক্ত পড়া বন্ধ হ'ল। জ্বালা

যন্ত্রণাও কমল। তারপর ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে হাঁটতে হাঁটতে চালা মরুভূমিতে এলাম। উত্তর দিক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই চিক্লাই এসে পৌঁছলাম। জানি তোমাদের সেবা শুশ্রূষার কয়েক দিনের মধ্যে সুস্থ হবো। মেস্তিজো থামল। ফ্রান্সিস মেস্তিজোর জীবন কাহিনী বেশ মন দিয়ে শুনছিল। বলল-তারপর?'

'মেস্তিজো বলতে লাগল- 'দু'তিন রাত জেগে খুব কষ্ট ক'রে রাজ পুরোহিত প্লামার সেবা শুশ্রূষা করলাম। প্লামা দিন সাতেকের মাথায় একেবারে সুস্থ হ'য়ে গেল। এবার চিকিমা চলে যেতে হবে। আবার হুয়াকা দেবতার পূজো শুরু করতে হবে। রাজা কোলা যুদ্ধে জিতেছেন। কাজেই এবারের পূজোয় খুব ধূমধাম হবে।'

প্লামা যাবে পরদিন। তার আগের দিন রাতের বেলা জামিলিকে ডেকে বলল 'দেখ মেস্তিজোর প্রাণপণ সেবা শুশ্রূষাতেই আমি এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হলাম। মেস্তিজো ছেলেটি খুবই সৎ পরিশ্রমী আর দয়াবান। যদি তুমি আপত্তি না কর তবে মেস্তিজোকে আমি চিকামা নিয়ে যাবো। ওকে রাজপুরোহিতের সব ক্রিয়াকর্ম পদ্ধতি শেখাবো। আমার অবর্তমানে মেস্তিজোই হবে রাজপুরোহিত। জামিলি চুপ করে রইল। কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। ওদিকে আমার মন তখন আনন্দে নেচে উঠেছে। জামিলি আমার দিকে তাকাল। বলল- 'তোর কী ইচ্ছে বল।'

—'আমি প্লামার সঙ্গে যাবো। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম।'

—'বেশ। জামিলি আর কোন আপত্তি করল না। মুস্কিল হ'ল জামিলির স্ত্রীকে নিয়ে। আমাকে জড়িয়ে ধ'রে তাঁর কান্না আর থামে না। সত্যি উনি আমাকে মার মত স্নেহ যত্নে মানুষ করেছিলেন। আমিও তাঁকে মা বলেই মেনে নিয়েছিলাম। যা হোক মাঝে মাঝে আসবো এই কথা দিয়ে ছাড়া পেলাম। পরদিন ভোরেই প্লামার সঙ্গে চললাম চিকামা। দুপুর নাগাদ চিকামা পৌঁছলাম। এর আগেও চিকামা এসেছি। হপ্তাতে জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে। এখন এসেছি থাকতে। চিকামা শহরে থাকবো এ স্বপ্ন আমার অনেক দিনের। আজকে সেই স্বপ্ন সার্থক হ'ল।



মেস্তিজো গল্প থামিয়ে ফ্রান্সিসকে বলল- আপনি তো চিকামা যাননি। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। মেস্তিজো বলতে লাগল বড় সুন্দর জায়গা চিকামা। এখানে এক উঁচু পাথরের স্তূপের ওপর উনকাদের দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। নিখাদ সোনায় তৈরি সেই দেবমূর্তি কতদিন আগে তৈরি হ'য়েছিল কেউ জানে না। এই দেবমূর্তিকেই উনকারা বলে হুয়াকা। প্রতিদিন প্লামা হুয়াকার পুজো করে। আমি প্লামাকে নানাভাবে পুজোর ব্যাপারে সাহায্য করি। থাকি দেবমূর্তির পাথরের

বেদীর কাছেই একটা পাথরের ঘরে ম্লামার সঙ্গে। এই হুয়াকা দেবতা মন্দিরের প্রাঙ্গনে মাঝে মাঝে উৎসব হয়। সারা চিকামার লোক দল বেঁধে আসে সেই উৎসব দেখতে পূজো দিতে ও আনন্দে অংশগ্রহণ করতে।

—সেই দেবতার স্বর্ণমূর্তি দেখতে কেমন? 'ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল। মেস্তিজো আঙুল দিয়ে গুহার প্রায় অন্ধকারে কোণায় রাখা একটা কাঠের মূর্তি দেখাল। ফ্রান্সিসরা সেইদিকে তাকাল। দেখল কাঠের মূর্তি কয়েকটা। 'দেখতে এ রকম-'

—আসল মূর্তিটা কত উঁচু? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হাত আড়াই তিনেক। রাজপুরোহিত ম্লামা শুধু পূজোআর্চা করত না। পাথর, এলগারোর গাছের আঁকাবাঁকা কাণ্ড কুঁদে মূর্তি বানাতো। আমিও তার কাছে থেকে তার সঙ্গে কাজ ক'রে এসব বানানো শিখে ছিলাম। ঐ মূর্তিগুলো আমারই তৈরি। মেস্তিজো থামল। ফ্রান্সিস বেশ মনোযোগ দিয়েই মেস্তিজোর গল্প শুনছিল। তবে উৎসাহিত হবার কোন তথ্য পাচ্ছিল না।

'—এবার তোমার সম্পর্কে বলো, ফ্রান্সিস বলল-'তুমি চিকামা থেকে পালিয়ে এসে এখানে আত্মগোপন করে আছো?'

'—চিমু রাজ্যের রাজা লুপাকা এবার রাজা কোলার মোচিকা রাজ্য আক্রমণ করার



জন্যে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে লাগল। উত্তরের পাহাড়ী এলাকার উপজাতিদের নিয়ে লুপাকা এক দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিল। মাস তিনেক আগে লুপাকা সেই দুর্ধর্ষ সেনাদের নিয়ে মোচিকা রাজ্য আক্রমণ করেছিল। রাজা কোলা এই আক্রমণের সম্ভাবনার কথা গুপ্তচরের মারফৎ যখন জানলেন তখন আর সৈন্য সাজিয়ে নতুন সৈন্য

জোগাড় ক'রে সেই আক্রমণের মোকাবিলা করার সময় নেই। তবু রাজা কোলা সৈন্যবাহিনী নিয়ে উত্তর সীমান্তের দিকে চললেন। কিন্তু সীমান্ত পর্যন্ত যাবার আগেই চিমু সৈন্যরা আক্রমণ করল। সেই পাহাড়ী বন্য হিংস্র চিমু সেনাদের সামনে রাজা কোলার সৈন্যবাহিনী দাঁড়াতেই পারল না। ধুলোর মত উড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত লড়াই ক'রে রাজা কোলা মৃত্যুবরণ করলেন। মোচিকা সৈন্যরা পিছু হটে এল। পরে চিমুদের পদাতিক বাহিনীও এল। শুরু হল অগ্নিসংযোগ আর অবাধ লুন্ঠন। রাজা লুপাকা চিকামার রাজ সিংহাসনে বসল। তারপর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিল।

—'লুপাকা এসে এখানে উনকাদের কাছে যত সোনা অলঙ্কার দামি পাথর পেল সব কেড়ে নিল। মাস দু'য়েক কাটল। একদিন লুপাকা হুয়াকা স্বর্ণমূর্তি নিজের চিমু রাজ্যে নিয়ে যেতে চাইল। হুয়াকাভক্ত উনকাদের কোনো আপত্তিই সে গ্রাহ্য করল না। সৈন্যরা স্বর্ণমূর্তি নামিয়ে আনতে গেল। তখনই ধরা পড়ল যে, যে মূর্তিটা রাখা আছে সেটা সোনার নয় কাঠের। এত সুন্দর রঙ মিশিয়ে তৈরি যে কারো বোঝবার উপায় ছিল না। রাজা লুপাকা ভীষণ ক্ষেপে গেল। আসল স্বর্ণমূর্তি তাহলে কে সরিয়েছে? কে লুকিয়ে রেখেছে সেই স্বর্ণমূর্তি? রাজা লুপাকার যত রাগ গিয়ে পড়ল রাজপুরোহিত ল্লামার ওপর। ল্লামার সঙ্গে তার শিষ্য আমাকেও বন্দী করা হলো। ভীষণ অত্যাচার চলল ল্লামার ওপর। ল্লামা বলল—'রাজা কোলার নির্দেশেই সে আসল স্বর্ণমূতির মতো একটি কাঠের মূর্তি তৈরি করেছিলো। সেটা নিয়ে রাজা কোলা কী করেছেন তা সে জানে না।

রাজা লুপাকার রক্ষীদের নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে রাজপুরোহিত ল্লামা কয়েদঘরেই মারা গেল আমার কোলে মাথা রেখে।' মেস্তিজো থামল।

ফ্রান্সিস এতক্ষণে আধশোয়া হয়ে মেস্তিজোর কথা শুনছিলো। স্বর্ণমূর্তির রহস্যের কথা শুনেই ও সোজা হয়ে বসল-'বোঝা যাচ্ছে রাজা কোলা আশঙ্কা করেছিলেন যে রাজা লুপাকা তাঁর দেশ আক্রমণ করতে পারে। তাঁর পরাজয় হতে পারে। যুদ্ধে জিতেও যাতে রাজা লুপাকা স্বর্ণমূতি নিয়ে নিজের দেশে যেতে না পারে তার জন্যে তিনি নকল হুবুহু একরকম দেখতে একটা কাঠের মূর্তি ল্লামাকে দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন।

—'ঠিক বলেছেন।' মেস্তিজো বলল।

—'এখন প্রশ্ন হলো রাজা কোলা সেই আসল স্বর্ণমূর্তি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন?' ফ্রান্সিস বলল।

—'তাদের হদিস কেউ জানে না।' মেস্তিজো বলল-'রাজা লুপাকা এখন হন্যে হয়ে সেই আসল স্বর্ণমূর্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।' ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবল। তারপর ঘাসের বিছানা থেকে উঠে নকল কাঠের মূর্তিটার কাছে গেল। ভাল করে দেখল। বলল-'মেস্তিজো, রাজপুরোহিত কি এ ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিতই তোমাকে দিয়ে যেতে পারেনি?'

—'না, স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। তবে রাজা কোলাকে সে জিজ্ঞেস করেছিল—এই নকল কাঠের মূর্তি তিনি কেন তৈরি করেছেন?' মেস্তিজো বলল।

—'তার উত্তরে রাজা কোলা কী বলেছিলেন?' ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—'শুধু হেসে বলেছিলেন-সবই কপালের লিখন।' মেস্তিজো বলল।

—'সবই কপালের লিখন—' কথাটা ফ্রান্সিস বার কয়েক বিড়বিড় করে বলল। কী অর্থ কথাটার? ফ্রান্সিস গুহার পাথুরে মেঝেয় কয়েকবার পায়চারি করল। বিস্কো বলল—'ফ্রান্সিস, ব্যাপারটা কি তোমার কাছে রহস্যময় লাগছে?'

—'অবশ্যই-' ফ্রান্সিস পায়চারি থামিয়ে বলল-'আর আমি স্থির করে ফেলেছি ঐ স্বর্ণমূর্তি খুঁজে বের করতে আমি চিকামা উপত্যকায় যাবো।

—'পারবে খুঁজে বের করতে?' মারিয়া বলল।

—'আগে নকল মূর্তিটা দেখি। চারপাশ ভালো করে দেখি, তবেই বুঝতে পারবো মূর্তি উদ্ধার করতে পারবো কিনা।' ফ্রান্সিস বলল। এবার ফ্রান্সিস মেস্তিজোর দিকে তাকিয়ে বলল- 'তুমি এই গুহাঘরে লুকিয়ে আছ কেন?'

—'গুরুদেব ল্লামা মারা যাওয়ার পর রাজা লুপাকা আমার ওপর অত্যাচার শুরু করে-' মেস্তিজো বলল-'কোনোরকমে পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে আছি।'

—'তুমি রাজা লুপাকাকে কী বলেছ?' ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—'ঐ যে কথাটা রাজা ল্লামাকে বলেছিলেন-সবই কপালের লিখন।'

—'হুঁ।' ফ্রান্সিস কপাল কুঁচকে ভাবল একটুক্ষণ। বলল-'রাজা লুপাকা বোধহয় কিছুই বোঝেনি।'

—'না। এই জন্যেই তো আমার উপর রাগ। এখানে লুকিয়ে থাকি। আমি তো রাজপুরোহিত ল্লামার সহকারী ছিলাম। তাই উনকারা আমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। আমার খাবার লুকিয়ে পাঠিয়ে দেয়। কখনো আমিও খাবার আনতে যাই।' মেস্তিজো বলল।

—'তুমি তাহলে উনকা ভাষা জানো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'অনর্গল বলতে পারি।' মেস্তিজো বলল। ফ্রান্সিস বিস্কোদের দিকে তাকাল। বলল—'বিস্কো, শাঙ্কো-বিকেল হয়ে গেছে। তোমরা অস্ত্রশস্ত্র এখানে রেখে জল নিয়ে জাহাজে চলে যাও। বন্ধুদের গিয়ে বল-আমরা চিকামায় যাবো। স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করবো। ওরা যেন দিন দশ পনেরো আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে। ততদিন আমরা না ফিরলে ওরা যেন সশস্ত্র হয়ে চিকামায় যায়। সব বলে তোমরা দু'জনে ফিরে এসো।'

—'বেশ—' বিস্কো বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। শাঙ্কো উঠল। ফ্রান্সিস বলল—'মারিয়া তুমি ওদের জাহাজে ফিরে যাও।'

মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—'না, আমিও তোমাদের সঙ্গে চিকামা যাবো।'

—'বেশ, চলো—' ফ্রান্সিস বলল- 'আমরা কিন্তু বেড়াতে যাচ্ছি না। যে কোনো মুহূর্তে বিপদে পড়তে পারি।'

—'আমি ভয় পাই না।' মারিয়া দৃঢ়স্বরে বলল।

বিস্কো আর শাঙ্কো সন্ধ্যের আগেই জলের পিপে নিয়ে জাহাজে চলে গেল। গুহাঘরটা একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে গেল। মেস্তিজো চকমকি ঠুকে পাথরের খাঁজে রাখা একটা মশাল জ্বালাল। মশালটা সামুদ্রিক মাছের তেলে ভেজানো ছিল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে আর মারিয়াকে শোনাচ্ছিল ওর চিকামায় কাটানো জীবনের কথা। ফ্রান্সিস বেশ মনোযোগ দিয়ে সেই অভিজ্ঞতার কথা শুনছিল। ওর এত মনোযোগ দিয়ে

শোনার উদ্দেশ্য যদি স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারের কোনো সূত্র পাওয়া যায়।

একটু রাতে বিস্কো আর শাঙ্কো ফিরে এল। বলল-'বন্ধুরা সবাই ফ্রান্সিসের কথা মন দিয়ে শুনেছে। ওরা খুসি হয়েছে ফ্রান্সিস আর এক অভিযানে যাচ্ছে শুনে।' ওরা জাহাজ থেকে খাবার এনেছিল। রাতের খাওয়ার পর ওরা শুকনো ঘাস ছড়ানো বিছানায় শুয়ে পড়ল।

গভীর রাত তখন। দূরের সমুদ্রের মৃদু গর্জন শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ কিসের শব্দে মারিয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল ও আর কোনো শব্দ হয় কি না শোনার জন্যে কান পেতে রইল। আবার শব্দ হলো। দু-চারটে পাথরের টুকরো বাইরে চাঁই পাথরের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। ও ফ্রান্সিসকে ফিসফিস করে ডাকল-'ফ্রান্সিস, ফ্রান্সিস।' ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল-'শুনেছি। আসার পথে ধূসর রঙের শেয়াল দেখেছিলাম। বোধহয় শেয়ালের পাল, খাবারের ধান্ধায় এসেছে।'

ঠিক তখনই কাঠের ফালিতে তৈরি গুহাঘরের দরজা খোলার শব্দ হলো। স্পষ্ট শব্দ। ফ্রান্সিস বিপদ আঁচ করল। একলাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। হাত বাড়িয়ে তরোয়ালটা নিয়ে চাপাস্বরে ডাকল-'বিস্কো-শাঙ্কো।'

বিস্কো শাঙ্কো তখনও ঘুমে অচেতন। মারিয়া ওদের জোরে ধাক্কা দিল। দু'জনেই দ্রুত উঠে বসল। ততক্ষণে কয়েকজন লোক এসে গুহাঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে। মশালের আলোয় দেখা গেল- লোহার ছুঁচালো মুখওয়ালা বর্শা। সকলের হাতেই বর্শা। বর্শা ছোঁড়ার জন্যে উঁচিয়ে ধরল ওরা। লোকগুলো বেঁটে। শক্ত-সমর্থ। গায়ের রঙ হালকা তামাটে। মাথায় লম্বা চুল। কপালে লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। তাতে পাখির পালক গোঁজা। পরনে ঢিলেঢালা পোশাক-পঞ্চো। মুখের দুপাশে লাল রং মাখা। শাঙ্কো দ্রুত তীর ধনুকের দিকে হাত বাড়াল। ফ্রান্সিস বলে উঠল-'শাঙ্কো, আগেই লড়াই নয়।' ফ্রান্সিস তরোয়াল ফেলে দিল। মেস্তিজোর দিকে তাকিয়ে দেখল ভয়ে মেস্তিজোর মুখ সাদা হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল-'মেস্তিজো এরা কারা?'

—'রাজা লুপাকার সৈন্য। আমাকে ধরলে মেরে ফেলবে।' সৈন্য ক'জন কিন্তু ফ্রান্সিসদের আর মারিয়াকে দেখে অবাক। সৈন্যদের মধ্যে সবচেয়ে বলশালী লোকটা ভারী গলায় কী বলে উঠল। ফ্রান্সিস বলল-'মেস্তিজো-এরা যা বলবে আমাকে তা বলো।'

—'ও দলনেতা। বলছে-তোমরা কে?' মেস্তিজো বলল।

—'বলো, আমরা ভাইকিং। রাজা ইকোলার লুকোনো স্বর্ণমূর্তি আমরা খুঁজে বের করতে এসেছি। আমরা লড়াই চাই না।' ফ্রান্সিস বলল। মেস্তিজো উনকা ভাষায় কথাগুলোকে দলনেতাকে বলল। দলনেতা কিছুক্ষন মাথা নিচু করে কী ভাবল। তারপর মাথা তুলে কী বলল। মেস্তিজো বলল-'দলনেতা বলছে, ওরা আমার খোঁজে এসেছিলে। কিন্তু আপনারা বিদেশী। আপনাদেরও ওরা বন্দী করবে। রাজা লুপাকার কাছে নিয়ে যাবে। তারপর রাজা লুপাকা যা করবার করবে।'

—'খুব ভাল কথা। কিন্তু মেস্তিজো, ওকে বলো আমাদের কারো যেন কোনো ক্ষতি না হয়।' ফ্রান্সিস বলল। মেস্তিজো কথাটা দলনেতাকে বলল। দলনেতা মাথাটা দু'পাশে নাড়ল। বোধহয় কথাটা মেনে নিল। দলনেতার ইঙ্গিতে একজন সৈন্য নিজের কোমরে

জড়ানো কালো রঙের লম্বা দড়ি বের করল। সেই দড়ি দিয়ে প্রথম মেস্তিজো তারপর মারিয়ার হাত বাঁধা হলো। তারপর ফ্রান্সিসদের বাঁধা হলো। আর একজন সৈন্য ফ্রান্সিসদের তরোয়াল শাঙ্কোর তীর ধনুক নিল। শাঙ্কো ওদের চোখের আড়ালে বড় ছোরাটা ঢোলা জামার মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

গুহাঘর থেকে সবাই বাইরে এল। দু'জন সৈন্য মশাল হাতে সামনের দিকে চলল। পেছনে দলনেতা, অন্য সৈন্য আর ফ্রান্সিসরা চলল।

পাহাড়ী এলাকা পেরোতেই পুব আকাশ লাল হলো। একটু পরেই সূর্য উঠল। দেখা গেল এদিকটায় বালির চিহ্নমাত্র নেই। চারিদিকে সবুজ গাছগাছালি। বীন, তুলো আলুর ক্ষেত। মাঝে মাঝে দু'চারটে পাথরগাঁথা বাড়ি। পেইকো ঘাসের ছাউনি। সেসব বাড়ি থেকে পুরুষ স্ত্রীলোক বাচ্চাকাচ্চারা বেরিয়ে এল।

অবাক হয়ে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। বিশেষ করে হলদে গাউন পরা মারিয়াকে। ওদের পরনে মোটা সুতোর হাতে তৈরি ঢোলা পোশাক। পোশাকে নানা রঙের সুতোর কাজ।

ধুলোটে রাস্তা দিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে ওরা ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই চিকামা পৌঁছাল। দেখা দেখা গেল সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের উপত্যকায় চিকামা নগর। এখানে জনবসতি বেশি। পাথরের বাড়িঘরও অনেক। চিকামার অধিবাসীরাও অবাক চোখে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। মারিয়ার পোশাক দেখে ওরা আশ্চর্য হলো বেশি।

একটা পথরের লম্বাটে ঘরের সামনে এসে দলনেতা দাঁড়ালো। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন সৈন্য গিয়ে ঘরটায় কাঠের দরজায় লাগানো একটা বড় হুক টেনে খুলল। দলনেতা ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢোকার জন্য ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। ঘরে ঢুকেই ফ্রান্সিস বুঝল এটা কয়েদঘর। হাত বাঁধা অবস্থায় প্রায় আট-দশজন লোক ঘরটায় শুয়ে বসে আছে।

ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে সঙ্গে সঙ্গে বলল-'দলনেতাকে বলো, আমাদের কেন কয়েদঘরে রাখা হচ্ছে?'

মেস্তিজো ভয়ে সে কথা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দলনেতাকে বলল!

দলনেতার উত্তরটা মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল-'দলনেতা বলছে, ও রাজাকে সব বলবে। তারপর আপনাদের রাজসভায় রাজার সামনে উপস্থিত করবে। রাজা যা করার করবেন। ততক্ষণ কয়েদঘরেই থাকতে হবে।'

অগত্যা ফ্রান্সিসদের এই বন্দী জীবন মেনে নিতেই হলো।

দুপুরের দিকে কয়েদঘরের রক্ষীরা বড় বড় পাতা পেতে ফ্রান্সিসদের খেতে দিল। হাত খুলে দিল। ওরা খেতে লাগল। ফ্রান্সিসরা বন্দীদশায় যেমন বরাবর বলে তেমনি বলল-'পেট ভরে খাও। খেতে ভালো না লাগলেও খাও। শরীরটা ঠিক রাখো।' মেস্তিজোর গুহাঘরে যে খাবার ফ্রান্সিস আর মারিয়া খেয়েছিল তেমনি খাবার। খুব সুস্বাদু হলেও খাবার অন্যরকম বলেই ভালো লাগলো। ফ্রান্সিস চেটেপুটে খেল। খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই সৈন্যদের দলনেতা সেই, বেঁটে বলশালী লোকটা এল। মেস্তিজোর সঙ্গে কী কথা হলো।

মেস্তিজো বলল-'ফ্রান্সিস, চলো, রাজা আমাদের ডেকেছেন। রাজসভায় যেতে

হবে।'

হাত বাঁধা অবস্থাতেই ওরা দলনেতার পেছনে পেছনে চলল। রাস্তার দু—ধারের লোকজন বেশ ঔৎসুক্যের সঙ্গে ওদের দেখতে লাগল। রাস্তার পাশ থেকে হঠাৎ একজন পুরুষ ও একজন নারী ছুটে এসে মেন্তিজোকে মাথা নিচু করে দু'হাত বুকে রেখে বোধহয় শ্রদ্ধা জানালো। সৈন্যরা ঐ দু'জনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ফ্রান্সিস বুঝল, মেন্তিজো রাজপুরোহিতের শিষ্য ছিল। ওকে উনকারা এখনও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু রাজা লুপাকার সৈন্যদের ভয়ে এগিয়ে এসে শ্রদ্ধা জানাতে সাহস পাচ্ছে না।

রাজবাড়িটা বেশ উঁচু, বড় ও পাথরের তৈরি। পাথরের ছাদ। ওরা রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকল। একটু অন্ধকার মতো ভেতরটা। দিনের বেলায়ও পাথুরে দেয়ালে মশাল জ্বলছে। রক্ষীরা লোহার ছুঁচালোমুখ বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে।

একটু এগোতেই ফ্রান্সিসরা দেখল রাজসভা চলছে। একটা পাথরের সিংহাসনে রাজা লুপাকা বসে আছে। দু'পাশে আরো কয়েকটা পাথরের ছোট আসনে বোধহয় মন্ত্রী গণ্য মান্যরা বসে আছে। রাজা বেঁটে। বয়েস হয়েছে। তবু বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। মাথায় লম্বা চুল। কপালে চকচকে কাপড়ের হলুদ রঙের ফেট্টি। তাতে সুন্দর লম্বা লম্বা পালক গোঁজা। দুকানের লতিতে সোনার কাঠি গাঁথা। গায়ে পঞ্চো। তবে পঞ্চোর কাপড় মোটা নয়। পাতলা। মুখের অর্ধেক অংশে লাল রঙ মাখা।

ফ্রান্সিসরা যখন পৌঁছল তখন একটা বিচার চলছিল বোধহয়। রাজা বোধহয় রায় দিল। বিচারপ্রার্থীরা মাথা নুইয়ে বুকে দু'হাত রেখে সম্মান জানিয়ে চলে গেল। দলনেতা মাথা নুইয়ে দু'হাত বুকে রেখে সম্মান জানিয়ে কী বলে গেল। রাজা ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

ফ্রান্সিস রাজার কঠিন মুখ দেখে আর ধূর্ত চাউনি দেখে বেশ চিন্তায় পড়ল। একে কি বোঝানো যাবে? তবে সোনা মণিমাণিক্যের লোভ বড় সাংঘাতিক। সেই লোভেই রাজা হয়তো ওদের কোনো বিপদে ফেলবে না।

এবার রাজা আর ফ্রান্সিসের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো। মেন্তিজো দোভাষীর কাজ করতে লাগলো।

রাজা-'তোমরা ভাইকিং?'

ফ্রান্সিস- 'হ্যাঁ।'

রাজা মারিয়াকে দেখিয়ে বললো-'এ কে ?'

ফ্রান্সিস-'রাজকুমারী মারিয়া। আমার স্ত্রী'।

রাজা-'তোমাদের সব কথা শুনলাম। পারবে গুপ্ত স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে?'

ফ্রান্সিস-'সবকিছু দেখবো আগে, যতটা সম্ভব খবর সংগ্রহ করবো তারপর বলতে পারবো।'

রাজা-'বেশ, দ্যাখো চেষ্টা করে।'

ফ্রান্সিস-'এর জন্যে আমাদের মুক্তি দিতে হবে। সব জায়গায় অবাধে ঘুরতে দিতে হবে।

রাজা-'বেশ, কিন্তু মারিয়াকে রাজপ্রাসাদে রাখা হবে।'কথাটা বলে রাজা মৃদু হাসল। ফ্রান্সিস বুঝল ওরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তাই মারিয়াকে নজরবন্দী রাখা হবে।

ফ্রান্সিস বলল-'বেশ।'

এবার রাজা মেস্তিজোর দিকে তাকাল। রাগে রাজার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। ভয়ে মেস্তিজো বেশ কাঁপতে লাগল। চিৎকার করে রাজা কী বলে উঠল। একজন রক্ষী ছুটে এসে মেস্তিজোকে ধরল। ভয়ে মেস্তিজো কাঁদতে লাগল। মেস্তিজোকে টেনে হিঁচড়ে রাজার সামনে দাঁড় করানো হলো। আর একজন রক্ষী লম্বা চাবুক হাতে এগিয়ে এল। কোনো সামুদ্রিক মাছের সরু লেজ দিয়ে তৈরি চাবুকটা। চাবুকটার গায়ে ছোট ছোট কাঁটা। নির্মম হাতে চাবুক চালাল মেস্তিজোর গায়ে। মেস্তিজো যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। দেখা গেল পিঠে যেখানে চাবুকের ঘা পড়েছে সে জায়গা থেকে পঞ্চোতে রক্ত ফুটে উঠেছে। রাজা আবার চিৎকার করে কী বলে উঠল। মেস্তিজো বারবার মাথা নোয়াতে লাগল আর মুখে কী বলতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল রাজা মেস্তিজোর কাছে গুপ্ত স্বর্ণমূর্তির হদিস জানতে চাইছে। আবার চাবুক আছড়ে পড়ার আগেই ফ্রান্সিস ডান হাত তুলে মেস্তিজোর কাছে দাঁড়াল।

আবার রাজা আর ফ্রান্সিসের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো।

মেস্তিজো কাঁপা কাঁপা গলায় দোভাষীর কাজ করতে লাগল।

ফ্রান্সিস-'মেস্তিজোকে মুক্তি দিতে হবে।

রাজা-'না, ও স্বর্ণমূর্তির খোঁজ জানে।'

ফ্রান্সিস-'না, ও জানে না। ও যা জানে সব আপনাকে বলেছে।'

রাজা-'না, ওকে মুক্তি দেওয়া হবে না।'

ফ্রান্সিস-'তাহলে স্বর্ণমূর্তির সন্ধান আমরা করবো না। আমরা জাহাজে ফিরে যাবো।'

রাজা ভুরু কুঁচকে কী ভাবল। তারপর বলল-'যদি মেস্তিজো পালিয়ে যায়?'

ফ্রান্সিস-'ওর দায়িত্ব আমাদের। ও পালিয়ে গেলে আমরা যে কোনো শাস্তি মেনে নেব।'

রাজা লুপাকা ভেবে দেখলো যে রক্ষী মরে গেল, মেস্তিজো এত অত্যাচারেও কিছুই বলতে পারছে না, নিজের অনেক চেষ্টা করেও স্বর্ণমূর্তির হদিস করতে পারেনি-এখন যদি এই ভাইকিংরা হদিস বার করতে পারে তবে করুক না। বিদেশী বিধর্মী এরা। কাজ ফুরুলে মেরে ফেলাও যাবে।

—'বেশ।'রাজা বলল।

—'মেস্তিজো সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবে। ওর সাহায্য খুবই প্রয়োজন।' ফ্রান্সিস বলল।

রাজা মাথা দু'পাশে নাড়ল। তার মানে সম্মতি দিল।

—'আর একটা কথা।' ফ্রান্সিস বলল।

রাজা ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

—'আমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো ফেরৎ দিতে হবে। মারিয়া তো রাজপ্রাসাদে নজরবন্দী থাকবে। কাজেই আমরা তো আর ওকে ফেলে পালাতে পারবো না।' ফ্রান্সিস বলল। রাজা সম্মতির ভঙ্গি করল।

ফ্রান্সিস আবার বলল-'সারাদিনে মারিয়াকে একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দিতে হবে। অবশ্য মারিয়ার সঙ্গে আপনার প্রাসাদরক্ষীরাও থাকবে।'

রাজা সম্মতির ভঙ্গি করল। ফ্রান্সিসদের হাতের বাঁধন একজন খুলে দিল।

রাজসভা থেকে ফ্রান্সিসরা চলে এল। মেস্তিজোর পিঠের দিকটা তখনও রক্তে ভেজা। বাইরে এসে ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে ওর কাঁধে ভর দিতে বলল। মেস্তিজো তখনও ভালো করে হাঁটতে পারছে না। ফ্রান্সিস বলল-'মেস্তিজো, দলনেতাকে বলো যেন তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।' দলনেতা ওদের সামনে সামনে যাচ্ছিল। মেস্তিজো ওকে কাঁপা কাঁপা গলায় সে কথা বলল। দলনেতা কিছু বলল না।

রাজবাড়ির পেছনদিকে ওরা কিছুদূর এল। একটা পাথরের বাড়ির সামনে দলনেতা দাঁড়াল। দরজা খুলে ফ্রান্সিসদের ইশারায় ঢুকতে বলল। ফ্রান্সিসরা বাড়িটায় ঢুকল। সামনের ঘরটা বেশ খোলামেলা। একপাশে শুকনো ঘাস বিছানো। দলনেতা হাততালি দিল। বাড়ির ভেতর থেকে দু'জন লোক এঘরে ঢুকল। দলনেতা তাদের কী বলল।

মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল-'এই দু'জন আমাদের দেখাশুনা করবে।'

লোক দু'জনে বাড়ির মধ্যে গেল। একটু পরেই ফিরে এল। হাতে মোটা কাপড়ের কম্বলমতো। সেটা শুকনো ঘাসের গাদার ওপর পেতে দিল। মেস্তিজো বোধহয় জল চাইল। লোক দু'জন চীনে মাটির বড় কুঁজোর মতো নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা প্রায় সকলেই জল খেল। ওরা বিছানায় বসল। মেস্তিজো শুয়ে পড়ল।

এবার দলনেতা মারিয়ার দিকে তাকিয়ে কী বলল। মেস্তিজো বলল-'মারিয়া, দলনেতা আপনাকে রাজবাড়ির অন্দরমহলে রেখে আসবে। এখন যেতে বলছে।' মারিয়া বিছানা থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ওর চোখ জলে ভিজে উঠল। মারিয়া বেশ শক্ত মনের মেয়ে। কিন্তু ফ্রান্সিসদের জন্যে ওর মন বেশ খারাপ হয়ে গেল। তাই দেখে ফ্রান্সিস হেসে বলল- 'মারিয়া, আমরা ভাইকিং। আমরা শুধু কব্জির জোরে লড়াই করি না, বুদ্ধির জোরেও লড়াই করি। আমাদের মন খারাপ করো না, যাও। দিনে একবার তো দেখা হবেই।'

মারিয়া কোনো কথা বলল না। মাথা নিচু করে বোধহয় ফ্রান্সিসদের কথা ভাবতে ভাবতেই আস্তে আস্তে দলনেতার পেছনে পেছনে চলে গেল। ফ্রান্সিসদেরও মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বিস্কো বলল-'চলো ফ্রান্সিস, জাহাজে ফিরে যাই।'

'অসম্ভব,' ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল-'বিস্কো তুমি আমাকে ভালো করেই জানো। তোমরা সবাই চলে গেলেও আমি একা এখানে থাকবো। স্বর্ণমূর্তি খুঁজবো, উদ্ধার

করবো। তারপর ফিরবো।'

'—না-না ফ্রান্সিস, তোমাকে ছেড়ে যাবো না।' বিস্কো দ্রুত বলে উঠল। শাঙ্কোও বলল- 'আমরা তোমর সঙ্গেই থাকবো।'

ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় আধশোয়া হলো। ভাবতে লাগল স্বর্ণমূর্তির কথা। কোথায় কীভাবে রাখা হতো সেই মূর্তিটা তা দেখতে হবে। মেস্তিজো শুয়ে আছে। তখনও অল্প অল্প গোঙাচ্ছে।

একটু পরেই একটা রোগা বেঁটেমতো লোক ঘরে ঢুকলো। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ। মাথায় হলুদ কাপড়ের পাগড়ি মতো। গলায় নানারঙের পাথরের মালা। লোকটার হাতে একটা চীনেমাটির বোয়াম। বোঝা গেল লোকটা বৈদ্য। বৈদ্য মেস্তিজোর কাছে গেল। পিঠের দিকে পঞ্চো সরিয়ে চাবুকের ক্ষত দেখল। তখনও ক্ষত থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। বৈদ্য বোয়াম থেকে থেকে সবুজ রঙের আঠা আঠা মতো একটা ওষুধ বের করল। আঙুল দিয়ে ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিল। মেস্তিজো একটু কঁকিয়ে উঠল। তারপর শান্ত হলো। বোধ হয় ব্যাথা জ্বালা একটু কমল। একটা ছোট ন্যাকড়ার পুঁটলি করে চারটে কালো বড়ি বাঁধল। মেস্তিজোকে কী বলল। তারপর চলে গেল।

দু'দিন কেটে গেল। ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে সময় কাটাতে লাগল। মেস্তিজো সুস্থ না হলে কিছুই করার নেই। সেই দু'দিনই মারিয়া এসে ওদের দেখে গেল। সেদিন ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে বলল-'এখন তোমার শরীর কেমন?'

—'অনেকটা ভালো।' মেস্তিজো বলল।

—'আমাদের নিয়ে চিকামায় একটু ঘোরাঘুরি করতে পারবে?' ফ্রান্সিস বলল।

—'পারবো।'

—'তাহলে আজই চলো।' ফ্রান্সিস বলল।

বিকেল নাগাদ ফ্রান্সিসরা মেস্তিজোকে সঙ্গে নিয়ে চিকামা দেখতে বেরুল। প্রথমে রাজবাড়ির সামনে এল। রাজবাড়ি ওরা আগেই দেখেছে।

মেস্তিজোকে ফ্রান্সিস বলল-'রক্ষীদের বলো, মারিয়াকে নিয়ে আসতে। মারিয়াও আমাদের সঙ্গে যাবে।' মেস্তিজো একজন দ্বাররক্ষীকে বলল সে কথা। একথাও বলল যে, এটা রাজার হুকুম। রক্ষীটি রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকল। একটু পরেই মারিয়া বেরিয়ে এল। ওদের সঙ্গে চলল। পেছনে দু'জন রক্ষীও চলল।

পথে বেশ ভিড়। কিছুদূর আসার পর ডানদিকে একটা উঁচু বেদীমতো দেখা গেল। বেদীটি কাটা। বেদীর ওপরে একটা মূর্তি প্রায় ঢেকে গেছে। বেদীর সামনে এসে ফ্রান্সিস দেখল- মেস্তিজোর গুহাঘরে দেখা সেই কাঠের মূর্তির মতোই এই মূর্তিটা। তবে মেস্তিজোর মূর্তিটা ছিল ছোট। এটা একটু বড়। প্রায় আড়াই তিন ফুট।

মেস্তিজো বলল—'এই আমাদের দেবতা হুয়াকার মূর্তি। তবে এটা আসল সোনার মূর্তি নয়, কাঠের।'

—'মেস্তিজো, মূর্তিটা থেকে ফুলপাতা সরিয়ে দাও।' ফ্রান্সিস বলল। 'ভালো করে দেখি।

মেস্তিজো বেদীর মসৃণ সিঁড়ি বেয়ে উঠল। মূর্তিটা থেকে ফুলপাতা সরাল। সিঁড়িতেও ছড়িয়ে আছে ফুলপাতা। ফ্রান্সিস মূর্তিটা ভালো করে দেখল। সত্যি, এত সুন্দর রঙ ব্যবহার করা হয়েছে যে মনে হচ্ছে সোনার মূর্তি। সিঁড়িতে বেদীতে পাথর কুঁদে কুঁদে ফুল লতাপাতার কাজ করা হয়েছে।

ফ্রান্সিস বলল-'মেস্তিজো, এখানকার কারুকাজ কি তোমরা করেছো?'

—'না, রাজা কোলা নিজেই এই কারুকাজ করেছেন। রাজা কোলার আর একটা পাথরের কাজ দেখ।' মেস্তিজো সামনে আঙুল তুলে দেখাল। দেখা গেল একটা বিরাট পাথরের মাথা। একটা ছোটখাটো আস্ত পাহাড় কেটে খুঁদে কুঁদে ঐ মাথাটা তৈরি করা হয়েছে।

মেস্তিজো বলল-'এই মাথাটা পাথর কেটে আমরা তৈরি করেছি-রাজা কোলা, গুরুদেব শ্লামা আর আমি।

—'দেবরক্ষীর মাথা।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস বলল-'দেবরক্ষীরও পুজো হয় নাকি?'

—'হ্যাঁ, হুয়াকা দেবতার সঙ্গে দেবরক্ষীরও পুজো হয়।' মেস্তিজো বলল।

—'অত উঁচুতে লোক ওঠে কি করে? ফ্রান্সিস বলল।

—'অনেক উঁচু একটা কাঠের মই আছে।'

'সেটা বেয়ে সবাই ওঠে। ফুলপাতা দিয়ে পুজো করে। আমরাও পাথর কেটে



তৈরি করার সময় ঐ মইটা ব্যবহার করতাম।' মেস্তিজো বলল। ফ্রান্সিসরা স্বর্ণমূর্তির পাথরের বেদীতে ফুল-লতাপাতা, পাখির কাজ, দেবরক্ষীর মাথা সব দেখতে লাগল। সত্যি দুটোই দেখতে খুব সুন্দর। রাজা কোলা যে একজন দক্ষ ভাস্কর ছিলেন এসব দেখে সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল। সব দেখেশুনে ফ্রান্সিসরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল। মারিয়াকে নিয়ে রাজবাড়িতে চলে গেল।

দিন সাতেক কাটল। প্রায় প্রত্যেকদিনই ফ্রান্সিস মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে হুয়াকা দেবতার স্বর্ণমূর্তি দেবরক্ষীর মাথা দেখতে যায়। ঘুরে ফিরে দেখে। কিন্তু আসল স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারের কোনো সূত্র পায় না। শাঙ্কোর কাছে এসব একঘেয়ে লাগে। ও তাই দুপুরের খাওয়া সেরেই তীরধনুক নিয়ে পাখি খরগোশ শোল শিকার করতে বেরিয়ে যায়। ডানদিকের সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের ওপারেই বনজঙ্গল শুরু হয়েছে। খুব গভীর বন নয়। তবে গাছপালা প্রচুর। ঐ বনজঙ্গলেই শাঙ্কো শিকার করতে যায়।

এর মধ্যে রাজা লুপাকা ফ্রান্সিসকে ডেকে পাঠিয়েছিল। স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে পারবে কি না। পারলে কবে নাগাদ পারবে এসব জিজ্ঞেস করেছিল। মেস্তিজোর মারফৎ ফ্রান্সিস বলেছে—'খোঁজ খবর করছি। কোনো সূত্র এখনও পাইনি। তবে বেশিদিন লাগবে না।'

সেদিনও শাঙ্কো তীরধনুক নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিল দুপুরে খেয়ে দেয়ে। বিকেল হয়ে গেল তখনও ফিরল না। ফ্রান্সিস আর বিস্কো ভাবল শাঙ্কো বোধহয় বেশি শিকার পেয়েছে তাই আসতে দেরি হচ্ছে। কিন্তু সন্ধ্যে হলো। রাত হলো শাঙ্কো ফিরল না। এবার ফ্রান্সিস আর বিস্কো চিন্তায় পরল।

ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে বলল-'শাঙ্কো এখনও শিকার থেকে ফিরল না, কী ব্যাপার বলো তো?'

-'ঐ তিতিকাকা জঙ্গলে হিংস্র প্রাণী নেই। তবে বিষধর সাপ আছে। শাঙ্কোকে কি সাপেই কামড়াল নাকি, ঠিক বুঝতে পারছি না।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় আধশোয়া হয়ে ছিল। ভাবল, এভাবে অপেক্ষা করে দুশ্চিন্তাই বাড়বে শুধু। ঐ বনে-জঙ্গলে গিয়েই শাঙ্কোর খোঁজ করা ভালো। ও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ডাকল-'বিস্কো অস্ত্র নাও। শাঙ্কোর খোঁজে যাবো।' বিস্কো দেয়ালের খাঁজে রাখা তরোয়ালটা নিল। ফ্রান্সিস বিছানার তলা থেকে নিজেদের তরোয়াল বার করল। বলল-'মেস্তিজো, তুমি আমাদের সবার সামনে চলো।'

তিনজন ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের দিকে চলল। মেস্তিজো সবার সামনে চলল। হাতে জ্বলন্ত মশাল। পাহাড় পেরিয়ে ওপাশে নামল। জঙ্গলে ঢুকল। খুব নিবিড় বন নয়। গাছপালা লতাগাছ এসব বেশ ছাড়া ছাড়া। ওরা মশালের আলোয় গাছপালার মধ্যে দিয়ে চলল বনে পথ বলে কিছু নেই। বেশ কিছুটা এল। কিন্তু ফ্রান্সিস ভেবে পেল না এই রাতের বেলা বন-জঙ্গলের মধ্যে কোথায় শাঙ্কোকে খুঁজবে। তবু দু'হাতে তালু মুখের সামনে গোল করে চিৎকার করে ডাকল-- 'শাঙ্কো-শাঙ্কো।'কিন্তু নির্জন বনভূমিতে কোনো উত্তর ভেসে এল না। শুধু একটা পাখির দল কিচ্‌মিচ্ করে উঠল। রাতজাগা পাখিরা ডানা ঝাপটাল। বিস্কোও একইভাবে চিৎকার করে বলল-- 'শাঙ্কো, আমরা এসেছি। তোমার কোনো ভয় নেই। শাঙ্কো-ও।' কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। ওরা এগোতে লাগল।

হঠাৎ ফ্রান্সিসের কানে এল শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ। ও থমকে দাঁড়াল। তরোয়ালের হাতলে হাত রাখল-'বিস্কো, সাবধান।' ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে না হতেই ওদের চারদিকে শুকনো পাতা ভেঙে কারা ছুটে এল। ওদের চারপাশে ঘিরে

দাঁড়াল একদল যোদ্ধা। তাদের হাতে উদ্যত বর্শা। মেস্তিজো যোদ্ধাদের মশালের আলোতে দেখেই চিৎকার করে কী বলে উঠল উনকা ভাষায়। সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধারা বর্শা নামাল। সবাই মাথা নিচু করে মেস্তিজোকে সম্মান জানাল। মেস্তিজো বলল-'ফ্রান্সিস, আপনারা যুদ্ধ করবেন না। এরা আমাদের বন্ধু। এরা উনকা সৈন্য। রাজা কোলার সৈন্যবাহিনীর সৈন্য। যুদ্ধে পরাজয়ের পর এরা এই তিতিকাকা জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছে।'

ফ্রান্সিস আর বিস্কো তরোয়াল খুলল না আর। যোদ্ধাদের মাথায় কালো কাপড়ের ফেট্টি। তাতে পাখির পালক গোঁজা। মুখের দুপাশে লাল রঙ লাগানো। ওদের দলনেতা এগিয়ে এল মেস্তিজোর সামনে। মেস্তিজোর সঙ্গে দলনেতা কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল। তারপর মেস্তিজো ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল-'শাঙ্কোকে এরা রাজা লুপাকার গুপ্তচর ভেবে বন্দী করে রেখেছে। তবে ভয়ের কিছু নেই। শাঙ্কো ভালো আছে।'

শাঙ্কোকে ওরা যেখানে রেখেছে সেখানে আমাদের নিয়ে যেতে বলো।' ফ্রান্সিস বলল। মেস্তিজো দলনেতাকে বলল সে কথা। দলনেতা মাথা ঝাঁকাল। কী বলল। তারপর গাছপালার মধ্যে দিয়ে চলল। মেস্তিজো বলল-'চলুন ওদের পিছনে পিছনে। একটু পরে মশালের আলোয় দেখা গেল বনভূমির গাছপালা পাতলা হয়ে এসেছে। সামনে গাছপালার আড়ালে একটা লম্বাটে বাড়ি দেখা গেল। পেইকো ঘাসের ছাউনি। কাঠ পাথর মিলিয়ে বাড়িটা নতুন তৈরি হয়েছে। বাড়িটার পরেই একটা বড় হ্রদ বেশ বড়। হ্রদের জলে মৃদু ঢেউ।

সবাই বাড়িটার সামনে এল। বর্শা হাতে চারজন উনকা যোদ্ধা এগিয়ে এল। মেস্তিজোকে দেখে তারাও মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাল। ফ্রান্সিস বুঝল উনকা রাজপুরোহিতের শিষ্য বলে মেস্তিজোকে শ্রদ্ধা করে, ভালোও বাসে। দলনেতা রক্ষী যোদ্ধাদের কী বলল। ওরা চলে গেল। দলনেতার সঙ্গে ফ্রান্সিসরা এসে বাড়িটার সামনে উঠোনে দাঁড়াল। দলনেতা একটা লম্বা ঘর দেখিয়ে মেস্তিজোকে কি বলল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল-'আপনাদের এই ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।' ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। লম্বাটে ঘর। কাঠ আর পাথরের দেয়াল। ঘরের দু'পাশের দেয়ালে দুটো বাতি জ্বলছে। তার আলোয় দেখা গেল সারা ঘর জুড়ে শুকনো ঘাসের বিছানা। তাতে মোটা কম্বলমতো পাতা। প্রায় আট-দশজন উনকা যোদ্ধা তাতে শুয়ে বসে আছে। ফ্রান্সিসরা এতটা হেঁটে তখন বেশ ক্লান্ত ওরাও বিছানায় বসল। ঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে অনেকগুলো বর্শা।

একটু পরেই শাঙ্কো হাসিমুখে ঘরে ঢুকল। ওর কাঁধে তীর ধনুক। ও ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। শাঙ্কোকে সুস্থ দেহে দেখে বন্ধুরা খুশি হলো।

-'এখানে তোমার ওপর কোনো অত্যাচার করা হয়নি তো? ফ্রান্সিস বলল।

-' না-না। এরা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে। কারণ ধরা পড়ার পর আমি বারবার মেস্তিজোর নামটা বলেছি। তাতেই দেখলাম ওরা আমাকে বিশ্বাস করল।' শাঙ্কো তীর ধনুক রেখে বিছানায় এসে বসল। ওরা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতে লাগল।

বিস্কো বলল-'ফ্রান্সিস, স্বর্ণমূর্তি-বেদী,-- দেবরক্ষীর মাথা সব তো দেখলে। আসল স্বর্ণমূর্তির কোনো হদিস করতে পারলে?'

—'এখনই কিছু বলতে পারছি না। সব বার বার ভালভাবে দেখতে হবে। সূত্র একটা পাবোই। ফ্রান্সিস বলল। ওরা কথাবার্তা বলছে। তখনই মেস্তিজো ঢুকল। ফ্রান্সিসের পাশে এসে বসল। বলল--'ফ্রান্সিস-এরা তোমাদের আজকে রাতে এখানে অতিথি হিসেবে থাকতে অনুরোধ করেছে।' ফ্রান্সিস বিস্কোর দিকে তাকাল। বিস্কো বলল-- 'রাতে তো আমাদের কোনো কাজ নেই। থাকি না এখানে। একটা রাতই তো'। ফ্রান্সিস মেস্তিজোর দিকে তাকিয়ে বলল-- বেশ। বন্ধুরা যখন বলছে।'

—'উনকা যোদ্ধারা খুব খুশি হবে। যাক ওদের কথাটা বলে আসি।' মেস্তিজো চলে গেল।

রাত বাড়ল। একসময় একজন উনকা যোদ্ধা এসে ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের রাতের খাওয়া খেতে ডাকল। ফ্রান্সিসরা ঘরের বাইরে এল। লম্বাটে ঘরের সামনে উঠোনে দেখল তিনকোণা পাতা পেতে দেওয়া হয়েছে। যোদ্ধারা খেতে বসছে পাতার সামনে। ওরাও খেতে বসল। ফ্রান্সিস দেখল উনকা সৈন্যরা সংখ্যায় একশ'রও বেশি। খেতে দেওয়া হলো সেই বীন আলুর তরকারি। ক্যারোপটা বীনের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি রুটি, সামুদ্রিক মাছের ঘন ঝোলমতো। ওরা খেতে লাগল। খিদেও পেয়েছিল বেশ।

সবারই খাওয়াদাওয়া শেষ হলো। ফ্রান্সিসরা আগের ঘরে এসে বিছানায় বসল। অন্য যোদ্ধারাও এসে বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল। ফ্রান্সিসরা এই উনকা ভাষার বিন্দুবিসর্গ বুঝল না। তবে মাঝে মাঝে ওদের কথাবার্তার মধ্যে লুপাকার নাম ওরা শুনছিল।

কিছুক্ষণ পরে মেস্তিজো এল। পেছনে সেই দলনেতা ওরা দু'জনে ফ্রান্সিসের কাছে এসে বসল। মেস্তিজো দলনেতাকে দেখিয়ে ফ্রান্সিসকে বলল,-'ওরা বলছিল তোমরা কী বলতে চাইছো। ফ্রান্সিস, মেস্তিজো বলল- তোমরা ভাইকিং। তোমাদের শৌর্যবীর্যের কথা খুব ছেলেবেলায় আমি শুনেছি। তাই আমিও চাই তোমরা এদের সাহায্য কর। তোমাদের সাহায্য পেলে ওদের সাফল্য সুনিশ্চিত।'

'কীভাবে সাহায্য পেলে ওদের সাফল্য সুনিশ্চিত।'

'কীভাবে সাহায্য করবো সেটা সেটা বলো। ফ্রান্সিস বলল।

'এই উনকা যোদ্ধাদের এই চিতিকাকা বনে আশ্রয় নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। সব উনকা যুবকদের একত্রিত করছে। শক্তি সংগ্রহ করে ওরা কিছুদিন পরেই রাজা লুপাকার সৈন্যবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। যে করেই হোক, ওরা উনকাদের রাজ্য থেকে সৈন্যসহ রাজা লুপাকাকে তাড়াবে। এটাই ওদের প্রতিজ্ঞা। দেশ ও জাতিকে যে করেই হোক শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবে। সেইজন্য ওরা তোমাদের সাহায্য চায়।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ ভাবল ব্যাপারটা। হ্যারি থাকলে ভালো হতো। ওর পরামর্শ নেওয়া যেত। ফ্রান্সিসকে একাই ভাবতে হলো সব। ভেবে নিয়ে ও বলল-- 'তার মানে ওরা চাইছে আমরা যেন ওদের দলে যোগ দিই, রাজা লুপাকার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে

লড়াইয়ে নামি।'

'হ্যাঁ, তোমাদের সাহায্যে উনকাদের রাজ্য জয় করতে পারলে ওরা তোমাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস বলল— 'কিন্তু মেস্তিজো-- রাজা লুপাকা তো কখনও আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি। অবশ্য গুপ্ত স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারের পর রাজা লুপাকা অন্য চেহারা নিতে পারে। এমনকি আমাদের হত্যাও করতে পারে। আমি সেটা ভালো করেই জানি। রাজা লুপাকা অসৎ ও লোভী। তবু এখনও তো ও আমাদের বিপদে ফেলেনি। কাজেই আমরা কেন রাজা লুপাকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে যাবো। এসব তোমাদের ব্যাপার। তোমরা মিটিয়ে নাও।'

—'তাহলে তোমরা এদের সাহায্য করবে না?' মেস্তিজো বেশ মনঃক্ষুন্ন হয়ে বলল।

'--না, এই অবস্থায় পারবো না। তাছাড়া ভেবে দেখ, মারিয়া এখন রাজা লুপকার হাতের মুঠোয়। মারিয়া বন্দিনী। আমরা যুদ্ধে উনকাদের সাহায্য করছি, এ সংবাদ রাজা লুপাকা পাবেই। তখন মারিয়ার জীবন বিপন্ন হতে পারে। সবদিক ভেবে বলছি এখন, আমাদের এসব ব্যাপারে না জড়ানোই ভালো।' ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

মেস্তিজো ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বলল-'আজ হোক, কাল হোক -- লড়াই হবেই।'

মেস্তিজোর এই দৃঢ় সংকল্পের কথা শুনে খুশি হল। যে কোন কাজে দৃঢ় মনোবল বজায় রাখা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে জেতার মনোভাব এটা ফ্রান্সিস খুবই পছন্দ করে, ঘাসের বিছানায় শুতে শুতে ফ্রান্সিস বলল-- মেস্তিজো তোমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে কিন্তু ভাবছি এত অল্প সৈন্য নিয়ে চিমু সেনাবাহিনীর সঙ্গে তোমরা কতদিন লড়াই চালাতে পারবে? মেস্তিজো বলল-'ফ্রান্সিস তোমাকে একটা কথা এখনও জানাইনি। কথাটা খুবই গোপনীয়। তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই বলছি-- রাজা কোলার যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র পিসকোজকে যুদ্ধক্ষেত্রেই পিতার মৃত্যুসংবাদ জানানো হল। পিসকোজ বুঝল, এখন পশ্চাদপসরণ আর আত্মরক্ষা ছাড়া উপায় নেই। পরাজয় সুনিশ্চিত কয়েকজন বিশ্বস্ত সহরক্ষীকে নিয়ে পিসকোজ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালালো চাণ্ডিনের দিকে। বেশ কিছুদিন রাজপুত্রের কোন সংবাদ কেউ জানতো না। মাত্র মাসখানেক আগে রাজপুত্র পিসকোজ এই তিতিকাকা আস্তানায় খবর পাঠিয়েছে সে সুস্থ আছে। চাণ্ডিনের জঙ্গলে আত্মগোপন করে ঐ পাহাড়ি এলাকার উপজাতিদের একত্র করছে।. সেখানে অস্ত্র তৈরি করে উপজাতিদের সুশিক্ষিত সৈন্য হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এখানেও সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। রাজপুত্র পিসকোজ এখানে সংবাদ পাঠিয়েছে সে যখন রাজা লুপাকার সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করতে বলবে তখনই আক্রমণ শুরু করতে হবে। তার আগে সবাইকে আত্মগোপন করে থাকতে হবে তিতিকাকার জঙ্গলে, চাণ্ডিনের জঙ্গলে। রাজা লুপাকার গুপ্তচররা যেন তাদের হদিশও না পায়। একটু থেমে মেস্তিজো বলল-বুঝলে ফ্রান্সিস চিকামার মানুষেরা পিসকোজকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করে। নিরুদ্দিষ্ট রাজপুত্র যদি উনকা সৈন্যদের সামনে এসে আত্মপ্রকাশ করে তবে তাদের মনোবল হাজারগুণ বেড়ে যাবে। সেই শেষ লড়াইয়ে আমরা জিতবোই। রাজা লুপাকাকে এ দেশ ছেড়ে

পালাতেই হবে।

'—মেস্তিজো আমিও চাই-তোমরা স্বাধীনতা ফিরে পাও।' ফ্রান্সিস বলল।

রাত বাড়ল। ফ্রান্সিসরা ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ও তখন ভাবছে-- গুপ্ত স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করা যাবে কি? কোনো সূত্রই তো পাচ্ছি না। এখানে বেশিদিন থাকাও চলবে না। দেরি দেখে হয়তো বন্ধুরা এসে হাজির হবে। আবার স্বর্ণমূর্তির সন্ধান করতে ওরা ব্যর্থ হলে লোভী রাজা লুপাকা কি চেহারা ধরে কে জানে? হয়তো ওদেরও মারিয়ার মতো বন্দী করে রাখতে পারে। এসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালেই ওরা চিকামায় নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল। আসার সময় দলনেতা ফ্রান্সিসকে বেশ সুন্দর ফুল-পাতার কাজ করা একটা পঞ্চো উপহার দিল। ফ্রান্সিস খুব খুশি হলো। বারবার বলল- 'ধন্যবাদ'। মেস্তিজো কথাটা বুঝিয়ে বলল দলনেতাকে। দলনেতা হাসল।

বিকেলে মারিয়া একা। সঙ্গে সেই দু'জন চিমু পাহারাদার সৈন্য। মেস্তিজো সারা দুপুর টানা ঘুমিয়ে তখনই উঠল। আড়মুড়ি ভাঙতে ভাঙতে বলল-'যাবে নাকিহুয়াকার উৎসবে'?

--'কোথায় হবে'? বিস্কো জানতে চাইল।

--'ঐ হুয়াকা দেবতার স্বর্ণমূর্তির বেদীর সামনে। নাচ গান হবে। রাজা লুপাকা ও রানী দুজনেই নাকি আসবে। রাজা লুপাকা এখন চেষ্টা করছে উনকাদের মন জয় করতে। যাবে তোমরা?

মারিয়া খুশির চোটে হাততালি দিল। বলল—'ফ্রান্সিস, চলো না।'

'—যাবে তো! কিন্তু লুপাকা কি তোমাকে ওখানে যাবার অনুমতি দেবে?' ফ্রান্সিস বলল।

--'কেন দেবে না? আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না।' মারিয়া বলল

--'ঠিক আছে। মেস্তিজো কখন আরম্ভ হবে উৎসব?' ফ্রান্সিস বলল।

--'একটু রাতে। আমরা খেয়ে-দেয়ে যাবো। উৎসব বেশ কিছুক্ষণ চলবে।' মেস্তিজো বলল

--'তাহলে এক কাজ করো মেস্তিজো। তুমি মারিয়াকে নিয়ে রাজা লুপাকার কাছে যাও। রাজাকে বলো যেন মারিয়াকে উৎসবে যেতে অনুমতি দেয়। অবশ্য সঙ্গে পাহারাদার থাকবে।' ফ্রান্সিস বলল।

--'দেখি বলে।' মেস্তিজো ঘাসের বিছানা ছেড়ে উঠল। মারিয়াকে নিয়ে রাজবাড়িতে গেল।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই মেস্তিজো ফিরে এল মারিয়াকে নিয়ে। সঙ্গে সেই দু'জন চিমু পাহারাদার। হেসে বলল--'রাজা লুপাকার মেজাজ এখন খুব ভালো। চিকামার গন্যমান্য উনকারা নাকি দল বেঁধে রাজারানীকে উৎসবে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করে গেছে। কাজেই অনুমতি বলার সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেছে।'

রাতের খাওয়া-দাওয়া সারল ফ্রান্সিসরা। মারিয়া পাহারাদার সৈন্য দু'জনও ওদের সঙ্গে খেল।

মূর্তিতে। বেদীও ঢেকে গেছে ফুলপাতায়। কিছু লোক আবার বিরাট উঁচু কাঠের মই বেয়ে উঠে দেবরক্ষীর মাথায় গলায় ফুলপাতা ছুঁড়ে দিচ্ছে। অত উঁচু মইটা বোধহয় পূজো দেবার সুবিধের জন্যেই এখন লাগানো হয়েছে।

ফ্রান্সিস ভাবল—হুয়াকার মূর্তিটা তো কাছে থেকে দেখছি কিন্তু দেবরক্ষীর মূর্তিটা ভালো করে দেখা হয়নি। কারণ তখন মইটা ছিল না। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া তোমরা অপেক্ষা কর। দেবরক্ষীর মাথাটা কাছে থেকে দেখে আসছি।'

ফ্রান্সিস কাঠের সেই অনেক উঁচু মইটার কাছে গেল। তারপর ওপর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মইটা বেয়ে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে মূর্তির মুখের কাছে এল। মোটা ঠোঁট দাঁত পেরলো। নাক ছাড়ালো। চোখ দুটো পুরো গোল নয়। কেমন চৌকো মতো। চোখ দুটো পার হলো। কপাল পার হলো। উঠে এল মাথার উষ্ণীষের কাছে। এতক্ষণ গলা মুখ চোখ নাক চোখ সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এসেছে। কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করে এমন কিছুই দেখতে পেল না। দেবরক্ষীর উষ্ণীষের ওপর নামল ফ্রান্সিস। চারদিকে তাকিয়ে দেখল। বিকেলের নরম আলোয় অনেকদূর দেখা যাচ্ছে। চিকামার রাজবাড়ি বাড়িঘর রাস্তা তিতিকাকা বন দূরে সমুদ্রের দিকে পাহাড়ের সারি সব দেখা গেল। নিচের দিকে তাকিয়ে হুয়াকার মূর্তি বেদী পূজার্থী ও মারিয়াদের দেখল। ফ্রান্সিস মনে মনে রাজা কোলার প্রশংসা করল। একটা ছোট পাহাড় কেটে এইরকম মূর্তির মাথা তৈরি করা শুধু পরিশ্রমের কাজই নয় সেইসঙ্গে শিল্পবোধও থাকা চাই।

এবার ফ্রান্সিস নামবার জন্যে মইয়ে পা রাখল। তারপর আস্তে আস্তে নামতে লাগল। উষ্ণীষ পার হলো। যখন মূর্তিটার কপালের কাছে এল তখনই মূর্তিটার কপালের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস থমকে দাঁড়াল। কপালে কী যেন কুঁদে আঁকা। ও প্রথমে ভাবল হয়তো কপালের কোনো অলঙ্কার। ভালো করে দেখলো। সন্দেহ হলো। অলঙ্কার নয়-কী যেন পাথর কুঁদে লেখা। বিদ্যুৎচমকের মতো হঠাৎ ওর মনে পড়ল রাজপুরোহিত ল্লামার শেষ কথাটা-রাজা কোলা যে কথাটা বলেছিলেন-'সবই ললাটের লিখন।' তাহলে তো এই মূর্তিটার কপালে নিশ্চয়ই কিছু লেখা আছে। এই লেখাটা তো তাহলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কী লেখা আছে কপালে?

ফ্রান্সিস দ্রুত নেমে এল মই বেয়ে। ফ্রান্সিসকে এভাবে দ্রুত নেমে আসতে দেখে মারিয়া সবাই বেশ আশ্চর্য হলো। কী হলো ফ্রান্সিসের? নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে।

ফ্রান্সিস মই থেকে নেমে মেস্তিজোর কাছে ছুটে এল। বলল—' মেস্তিজো, রাজা কোলা বলেছিলেন 'সবই ললাটের লিখন।' তাই কিনা?'

—'হ্যাঁ। মেস্তিজো বলল। কিন্তু ফ্রান্সিস এই কথাটা বলেছে কেন ও ঠিক বুঝল না। কথাটার এত গুরুত্বই বা দিচ্ছে কেন।

—'তোমার গুরুদেব রাজপুরোহিতও এই কথাটাই বলেছিল সবই ললাটের লিখন। তাই কিনা?'

'—হ্যাঁ।'

—'চলো মই বেয়ে উঠতে হবে। এসো তাড়াতাড়ি।' ফ্রান্সিস বলল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসের এই পাগলামির কারণ বুঝল না। তবু ফ্রান্সিসের কথামতো মইয়ের কাছে এল। দু'জনে মই বেয়ে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস উঠতে উঠতে বলল—'মেস্তিজো,

তুমি, তোমার গুরুদেব রাজপুরোহিত আর রাজা কোলা মিলে এই মূর্তিটা বানিয়েছিলে। পাথর কুঁদে।'

—'হ্যাঁ।' মেস্তিজো বলল- 'তবে বলতে পারো রাজা কোলার কৃতিত্বই বেশি। সমস্ত পরিকল্পনাটাই রাজা কোলার। উনিই পাথর কেটেছেন কুঁদেছেন আমরা শুধু পাথর মসৃণ করেছি।'

দেবরক্ষীর কপালের কাছে এসে ফ্রান্সিস বলল—' ললাটের লিখন মানে কপালের লেখা।' এবার মূর্তির কপালের সেই লেখাগুলো দেখাল। 'বলো তো ওগুলো কী লেখা?' মেস্তিজো লেখাগুলো দেখল। লেখাগুলো দেখতে এমনি—



(০৪৮১২১৬)

মেস্তিজো মনোযোগ দিয়ে লেখাগুলো দেখে বলল-'এগুলো কোনো লেখা নয়। পর পর কয়েকটা উনকা ভাষায় অঙ্কের সংখ্যা কুঁদে লেখা। আমার মনে হয় রাজা কোলা এগুলো পরে কুঁদে লিখেছিলেন।'

—'বলো তো সংখ্যাগুলো কী?' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো পড়ে পড়ে বলল-০ ৪ ৮ ১২ ১৬। ফ্রান্সিস আশা করেছিল লুকানো স্বর্ণমূর্তির সম্বন্ধে কোনো সাঙ্কেতিক লেখা। এখন বুঝল এগুলো অঙ্ক। একটু হতাশই হলো। তবু অঙ্কগুলো মনে মনে মুখস্থ করল। বলল- 'আর কিছু লেখা নেই?'

—'না। কিন্তু এই অঙ্কগুলো দিয়ে তোমার কী হবে?' মেস্তিজো বলল।

—'হবে হবে। তবে অনেক ভাবতে হবে এই অঙ্কগুলো নিয়ে। তবেই রহস্য ভেদ করা যাবে। রাজা কোলা যখন নিজে এই অঙ্কগুলো কুঁদে লিখেছিলেন তখন নিশ্চয়ই এই অঙ্কগুলোর গুরুত্ব আছে। তাছাড়া 'ললাটের লিখন' কথাটা ভুলে যেও না।' ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিস নামতে লাগল। ও তখনও অংকের সংখ্যাগুলো নিয়ে ভেবে চলেছে। সঙ্গে মেস্তিজোও নামতে লাগল। মূর্তিটার মুখের কাছে এসে মুখটা দেখতে লাগল। মোটা ঠোঁট মূর্তিটার। প্রায় চৌকোনো। দাঁতগুলো পর পর সাজানো। ফ্রান্সিস কিছুটা অন্যমনস্ক ভঙ্গীতেই দাঁতগুলো দেখতে লাগল। হঠাৎ ওর মনে হলো-অঙ্কের ব্যাপার যখন, তখন দাঁতগুলো সংখ্যায় কটা দেখতে হয়। ও

গুনলো। মোট ১৬টা দাঁত। এবার মূর্তিটার কপালের দিকে তাকাল। ঐ তো ওখানে শেষ সংখ্যা-১৬। আশ্চর্য! তাহলে তো সংখ্যাগুলোর সঙ্গে ষোলোটা দাঁতের একটা সম্পর্ক রয়েছে। কী সেই সম্পর্ক ?

মই বেয়ে দু'জনে নেমে এল। মারিয়া বিস্কো শাঙ্কো এগিয়ে এল। মারিয়া বলল- 'কী ব্যাপার ফ্রান্সিস? তোমাকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে।'

একটু হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল- 'হ্যাঁ মারিয়া স্বর্ণমূর্তির রহস্যের সমাধান প্রায় হাতের মুঠোয়। তবে ভাবনাচিন্তা করতে হবে।

বিস্কো, শাঙ্কো জানে ফ্রান্সিস ওসব ব্যাপারে কখনও বাজে কথা বলে না। ও নিশ্চয়ই মূর্তি উদ্ধারের হদিস পেয়েছে।

ওদের মধ্যে আর কোনো কথা হলো না। মারিয়া এই ব্যাপারে ফ্রান্সিসকে কোনো প্রশ্ন করল না। সময় হলে ফ্রান্সিস সব বলবে। ফ্রান্সিসরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল। মারিয়াকে নিয়ে রক্ষী দু'জন রাজবাড়ি চলে গেল।

ফ্রান্সিস ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ ঘাসের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। মেস্তিজোর মনে তখনও সংশয়। ফ্রান্সিস কি পারবে? দেবরক্ষী মূর্তির কপালে কয়েকটা অঙ্কের সংখ্যা লেখা আছে। তা থেকে কি স্বর্ণমূর্তি কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা বের করা যাবে?

ফ্রান্সিস উঠে বসল। বলল-'মেস্তিজো তুমি দুটো কাজ কর। লেখবার জন্যে একটা সাদা চামড়া আর কালি কলম নিয়ে এসো। আর তামার হাতুড়ি ছেনি কোথায় আছে?'

—'ও দু'টোও নিয়ে এসো।' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো চলে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে এল। হাতে সাদা চামড়া আর পালকের কলম দোয়াতদান। হাতুড়ি ছেনিও সঙ্গে এনেছে।

ফ্রান্সিস নিল সে সব। মেস্তিজো বিস্কো শাঙ্কো সাগ্রহে এগিয়ে এল। দেখা যাক ফ্রান্সিস কী করে এসব নিয়ে। ফ্রান্সিস ভেড়ার চামড়ায় কালি কলমে লিখল—

০ ৪ ৮ ১২ ১৬

সংখ্যাগুলো লিখে ও ভাবতে লাগল এবং সংখ্যাগুলো নিশ্চয়ই কোনো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার দিকে ইঙ্গিত করছে। সে সংখ্যাটা কত? ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল। এই সংখ্যাগুলো দিয়ে কী হবে তা ওরা বুঝতেই পারল না। সংখ্যগুলো মুখে আওড়াতে আওড়াতে ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল সব সংখ্যার মধ্যে ব্যবধান রয়েছে চার অঙ্কের। তাহলে ৪ই সেই নির্দিষ্ট সংখ্যাগুলো ইঙ্গিত করছে।

ফ্রান্সিস খুশির হাসি হাসল। উৎসাহের কারণ কী? ফ্রান্সিস বলল-'মেস্তিজো চলো দেবরক্ষীর মূর্তিতে উঠবো।'

—'কেন?' মেস্তিজো বলল।

—'তুমি হাতুড়ি ছেনি দিয়ে দেবরক্ষীর চার নম্বর দাঁতটা তুলবে।' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো অবাক। বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হলো?'

—'সেটা পরে বুঝবে? চলো।' ফ্রান্সিস বলল।

সবাই দেবরক্ষীর মূর্তির সামনে এল। তখন রাত হয়েছে। বেদী প্রাঙ্গণ জনশূন্য। বেদীর সামনে প্রাঙ্গনের ধারে মশাল জ্বলছে। চারপাশ মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস মইটার সামনে এল। মেস্তিজোকে ইঙ্গিতে মই বেয়ে উঠতে বলল। দু'জনে মই বেয়ে উঠতে লাগল। মেস্তিজোর হাতে হাতুড়ি ছেনি। বিস্কো শাঙ্কো নিচে দাঁড়িয়ে রইল।

মই বেয়ে উঠতে উঠতে দু'জনে মূর্তিটার মুখের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল-'মূর্তির পাথরটা কি খুব শক্ত?'

—'না-না। এটা বোসেটা পাথর কেটে তৈরি। বোসেটা পাথর সাধারণ পাথরের চেয়ে নরম।'

—'তাহলে চার সংখ্যায় দাঁতটা ছেনি দিয়ে কেটে তোলো।' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো হাতুড়ি ছেনি হাতে চার নম্বর দাঁতটার কাছে মইয়ে পা রেখে দাঁড়াল। এই মূর্তি তৈরির সময় ও পাথর কাটার কাজ করেছে। ওর অভ্যেস আছে এই ভাস্করের কাজে। ও চার সংখ্যার দাঁতটায় হাতুড়ি ছেনি চালাতে চালাতে হেসে বলল-'তোমার ধারণা এই দাঁতের খোঁদলে স্বর্ণমূর্তি আছে?'

—'ধারণা নয়, বিশ্বাস।' ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল। ও একটা মশাল নিয়ে এসেছিল। সেটা মেস্তিজোর সামনে ধরে রইল। উত্তেজনায় ওর হাত কাঁপছে। নির্জনে মন্দির প্রাঙ্গণে হাতুড়ি ছেনির ঠক্ ঠক্ শব্দ উঠছে। মেস্তিজো পাথর-দাঁত ভাঙতে লাগল। সত্যি বোসেটা পাথর তেমন শক্ত নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দাঁত অনেকটা ভেঙে খোঁদল দেখা গেল। কিন্তু খোঁদল শূন্য, কিছু নেই তাতে। মেস্তিজো একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল-'পেলে কিছু?'

—'হিসেব মেলেনি। আবার ভাবতে হবে। চলো নামি।' ফ্রান্সিস মই বেয়ে নামতে লাগল। পেছনে মেস্তিজো। বিস্কো শাঙ্গো তখন নিচে দাঁড়িয়ে ভাবছে ফ্রান্সিস কি সত্যিই লুকোনো স্বর্ণমূর্তি খুঁজে পেল? ফ্রান্সিস আর মেস্তিজোকে আস্তে আস্তে নামতে দেখে ওরা বুঝল ফ্রান্সিস ব্যর্থ। স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে পারেনি।

ফ্রান্সিসরা আস্তানায় ফিরে এল। পথে কেউ কোনো কথা বলল না। ঘাসের বিছানায় আধশোয়া হয়ে ফ্রান্সিস অঙ্কের সমাধান ভাবতে লাগল।

পরিদিন সকালে ফ্রান্সিসের স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারের কথা চিকামায় ছড়িয়ে পড়ল। লোকজন বেদীর সামনে এসে ভিড় করল। দেখল দেবরক্ষীর দাঁত ভাঙা হলো কেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা বিশ্রাম করছে। রাজবাড়ি থেকে রাজার একজন দেহরক্ষী এল। ফ্রান্সিসকে কী বলল। ফ্রান্সিস কিছুই বুঝল না। মেস্তিজোর দিকে তাকাল। মেস্তিজো বলল-'রাজা লুপাকা তোমাকে ডেকেছে।'

—'ও। ঠিক আছে। তুমি আমার সঙ্গে চলো। নইলে কেউ কারো কথা বুঝবে না। 'ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজোও ফ্রান্সিসের সঙ্গে রাজবাড়ি চলল।

রাজা লুপাকা পাথরের সিংহাসনে বসেছিল। ফ্রান্সিস ও মেস্তিজো সামনে এসে দাঁড়াল। মেস্তিজো মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। ফ্রান্সিস মাথা নোয়াল না। এই লুপাকার আদেশেই সেদিন গায়ক তরুণটি প্রাণ হারিয়েছিল। এই বেদনা ফ্রান্সিস ভুলতে পারেনি। দু'জনের কথাবার্তার মধ্যে মেস্তিজো দোভাষীর কাজ করল। রাজা ও ফ্রান্সিসের মধ্যে কথাবার্তা হলো এই রকম—

রাজা-'স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে পারবে?'

ফ্রান্সিস- 'হ্যাঁ।'

রাজা- [হেসে] 'কোনোদিনই পারবে না।'

ফ্রান্সিস- 'দেখা যাক। অপেক্ষা করুন।'

রাজা- 'না, আমি আর অপেক্ষা করবো না। দু'দিন সময় দিলাম। হয় স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করো, নইলে আমার রাজত্ব থেকে বিদেয় হও।'

ফ্রান্সিস- 'দু'দিন অনেক সময়।'

রাজা- 'আর একটা কথা। শুনলাম তুমি সোনার মূর্তি খুঁজতে গিয়ে দেবরক্ষীর মূর্তির ক্ষতি করেছো। ঐ মূর্তির আর ক্ষতি করা চলবে না।'

ফ্রান্সিস- 'কিন্তু ঐ মূর্তি তো আপনার চিরশত্রু রাজা কোলার হাতে তৈরি।'

রাজা- 'ঐ মূর্তির নিচে আমি আমার নাম ভাস্কর হিসেবে খোদাই করে দেবো। ওটা আমার তৈরি বলে সবাই জানবে।'

ফ্রান্সিস- 'বেশ। তবে একটা কথা। ঐ মূর্তির আর একটু ক্ষতি আমি করবো, কারণ প্রথমবারে আমার হিসেব মেলেনি। এটুকু আপনাকে মেনে নিতে হবে।'

রাজা 'যদি স্বর্ণমূর্তি পাই তবে এটুকু মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। ফ্রান্সিসের সঙ্গে আর কোনো কথা হলো না। ওরা দুজন আস্তানায় ফিরে এল।

একটু সকাল সকাল খেয়ে নিল শাঙ্কো। বরাবরের মতো তীর ধনুক নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়ল। চলল তিতিকাকা বনের দিকে। বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সারা দুপুর শিকার করল-'দু'টো খরগোস আর চারটে বুনো মুরগি। বিকেলের দিকে ফিরে আসছে তখন আত্মগোপনকারী তিনজন উনকা সৈন্যের সঙ্গে দেখা। ওরা শাঙ্কোর সঙ্গে সঙ্গে তিতিকাকা বনের প্রান্ত পর্যন্ত এল। এখানে ঘাসে ছাওয়া প্রান্তরের ওপর দিয়ে চিকামা যাওয়ার ধুলোটে পথ। ওরাও পথের কাছাকাছি এসেছে, দেখল দু'জন চিমু সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে এলাকাটা পাহারা দিচ্ছে। উনকা তিনজন ওদের দেখা মাত্র বনের দিকে ছুটল। চিমু ঘোড়সওয়ার সৈন্যরাও পিছু ধাওয়া করল। একজন বর্শা ছুঁড়ল। একজন উনকা সৈন্যের পিঠে গেঁথে গেল বর্শাটা। সে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। বাকি দু'জনের একজনের একজন ঘুরে দাঁড়িয়ে বর্শা ছুঁড়ল। বর্শা বিঁধল চিমুসৈন্যের একজনের ঘোড়ার পেটে। ঘোড়াটা জোরে লাফিয়ে উঠল। তারপর আরোহী সৈন্যটিকে নিয়ে ঘাসের প্রান্তরে পড়ে গেল। অন্য জন ছুটে এল। উনকা সৈন্য দু'জন ততক্ষণে বনের আড়ালে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। শাঙ্কো চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার চিমু সৈন্য দু'জন শাঙ্কোর কাছে এল। দু'জন ঘোড়া

থেকে নেমে এল। একজন শাঙ্কোর তীর ধনুক কেড়ে নিল। অন্যজন শাঙ্কোর দু'হাত দড়ি দিয়ে বাঁধল। বাঁধা দড়িটা ধ'রে ঘোড়ায় উঠল অন্যজনও তীর ধনুক নিয়ে ঘোড়ায় উঠল। দু'জন আস্তে আস্তে চালাল। শাঙ্কোর হাতে বাঁধা দড়ি একজন ধ'রে নিয়ে চলল। শাঙ্কোও কোন প্রতিবাদ না ক'রে চলল ওদের পেছনে পেছনে। সৈন্য দু'জন মুখ ফিরিয়ে শাঙ্কোকে নানা কথা জিজ্ঞেস করছে। শাঙ্কো ওদের কোন কথাই বুঝতে পারে নি। চুপ ক'রে থেকেছে।

তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। রাজবাড়ির পশ্চিমদিকে একটা লম্বাটে পাথরের ঘরের সামনে এসে সৈন্য দু'জন ঘোড়া থেকে নামল। শাঙ্কো যেসব খরগোস, বুনো মুরগি শিকার করেছিল সেসব সেই সৈন্যটি নিয়ে গেলো। অন্য সৈন্যটি ঘরটার দরজার কাছে গেলো, দরজার দু'পাশে মশালের আলোয় দেখা গেল দুজন সৈন্য বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে। শাঙ্কো বুঝল, এটা কয়েদঘর; সৈন্যটি এবার শাঙ্কোর কাছে এল। হাত বাঁধা শাঙ্কোকে নিয়ে ঘরটার দরজার কাছে এলো ততক্ষণে দরজাটা খোলা হয়েছে, কয়েদঘরের পাহারাদার সৈন্যটি শাঙ্কোকে ঘরের মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল। শাঙ্কো এবার চারপাশে তাকিয়ে ঘরটা দেখল। লম্বাটে ঘর। পাথুরে দেওয়ালে দুপাশে দুটে মশাল জ্বলছে। তার আলোয় দেখল মেঝেতে লম্বা লম্বা শুকনো ঘাস বিছানা। তার ওপর হাত বাঁধা অবস্থায় শুয়ে বসে আছে কয়েকজন উনকা সৈন্য। শাঙ্কো প্রথমে শুকনো ঘাসের ওপর বসল। তারপর শুয়ে পড়ল।

ওদিকে যত রাত বাড়তে লাগল ফ্রান্সিসের ও বিস্কোর উদ্বেগ ততই বাড়তে লাগল। শাঙ্কো এখনো ফিরে এলো না-কী হল ওর? ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। আরো রাত বাড়লো। শাঙ্কো তখনও ফিরে এলো না, ফ্রান্সিস অধৈর্য্য হয়ে বলল—

—বিস্কো তৈরি হয়ে চলো, তিতিকাকা বনে যাবো। বিস্কো উঠে দাঁড়ালো, কোমরে তরোয়াল গুঁজলো। ফ্রান্সিসও কোমরে তরোয়াল গুঁজে নিলো। মেন্তিজোর দিকে তাকিয়ে দেখল মেন্তিজো ঘুমিয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস ওর দিকে এগিয়ে গেলো। কাঁধে ঠেলা দিয়ে ডাকল- মেন্তিজো, মেন্তিজো।

—মেন্তিজো বন্ধ চোখ খুলে তাকালো।

ফ্রান্সিস বলল-শাঙ্কো এখনো ফেরেনি। চল ওকে খুঁজতে যাবো।

মেন্তিজো তাড়াতাড়ি উঠে বসে বলল- সে কী? শাঙ্কোর আবার কী হলো?

ফ্রান্সিস বলল- কিছুই বুঝতে পারছি না। চলো দেখি।

তিনজনে বাড়ির বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়াল. রাত তখন গভীর। দেখল রাস্তা জনশূন্য, এখানে ওখানে দু-একটা মশাল জ্বলছে। তিনজনে চলল তিতিকাকা বনের দিকে। বনের কাছাকাছি এসে দেখল ঘাসের প্রান্তরে জ্যোৎস্না পড়েছে, তিতিকাকা বনের গাছ গাছালির মাথায়ও জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। ওরা বনের মধ্যে ঢুকলো। এগিয়ে চলল। দেখল ডালপালার ফাঁকফোকর দিয়ে এখানে ওখানে ভাঙা জ্যোৎস্না

পড়েছে। ওরা আত্মগোপনকারী উনকা সৈন্যদের আস্তানার উদ্দেশ্যে চলল। ফ্রান্সিস ও বিস্কো মাঝে মাঝেই গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগলো-

—'শাঙ্কো-ও শাঙ্কো-ও-।'

কিন্তু উনকা সৈন্যদের আস্তানার কাছাকাছি আসতেই কয়েকজন উনকা সৈন্য উদ্যত বর্শা হাতে ছুটে এলো।

মেন্তিজো চিৎকার করে বলল।- 'আমরা বন্ধু। আমি মেন্তিজো।'

সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাঙা জ্যোৎস্নায় আলোর মেন্তিজোকে চিনতে পারলো। মাথা নুইয়ে তাকে সম্মান জানালো। ফ্রান্সিস ও বিস্কোকেও চিনতে পারল। ঘরটার কাছাকাছি আসতেই সৈন্যদের দলপতি ছুটে এলো ফ্রান্সিসদের দেখে। চিৎকার করে কী বলে উঠল। মেন্তিজো সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে উঠল—সর্বনাশ শাঙ্কোকে চিমু সৈন্যরা বন্দী করে নিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস চমকে উঠে বলল।- সে কী? কখন?

এবার দলপতি এগিয়ে এসে মেন্তিজোকে কী বলল। মেন্তিজো ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—আজকে বিকেলের দিকে বনের বাইরে চিকামা যাবার রাস্তার ধারে শাঙ্কোকে ওরা বন্দী করেছে তারপর চিকামায় নিয়ে গেছে। বোধহয় কয়েদখানায় বন্দী করে রেখেছে।'

ফ্রান্সিস বলে উঠল—'বিস্কো চলো চিকামায় ফিরি।' এসময় দলপতি মেন্তিজোকে কী সব বলল। মেন্তিজো বলল।

—ফ্রান্সিস রাজপুত্র পিসকোজ এই আস্তানায় এসেছেন। উনি তোমাদের কথা শুনেছেন। তোমরা যদি ওর সঙ্গে কথা বলো তাহলে খুবই ভালো হয়।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল। —'বেশ, কিন্তু বেশি সময় দিতে পারবো না। আমাদের এক্ষুনি চিকামায় ফিরে যেতে হবে আর শাঙ্কোর মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে হবে।'

'—ঠিক আছে। চলো।' মেন্তিজো বলল।

মেন্তিজো আর দলপতি আগে আগে চলল। পেছনে অন্য সৈন্যরা আর ফ্রান্সিস ও বিস্কো। একটু এগোতেই সেই লম্বাটে বাড়িটার সামনে এল ওরা। এবার দলপতি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সেই বাড়িটার বড় উঠোন মত জায়গায় এল ওরা। দলপতি পূর্ব কোণার একটা ঘরের দিকে চলল। ঘরের কাছে এসে দেখা গেল ঘরের দরজা খোলা। দলপতি দরজার সামনে দাঁড়াল। দু'হাত বুকে রেখে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে কী বলল। ঘরের ভেতর থেকে ভরাট গলায় কার কথা ভেসে এল। দলপতি ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। প্রথমে মেন্তিজো ঢুকলো। পেছনে ফ্রান্সিস আর বিস্কো। ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস দেখল মোটা কাপড় পাতা ঘাসের বিছানায় একজন শক্ত সমর্থ যুবক ব'সে আছে। মাথায় লাল কাপড়ের ফেট্টি। কিন্তু কোন পাখির পালক নেই। মেন্তিজো মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে ফ্রান্সিসকে গলা নামিয়ে বলল—'রাজা কোলার ছেলে রাজপুত্র পিসকোজ।' ফ্রান্সিস আর বিস্কো

অল্প মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাল। রাজপুত্র পিসকোজ হেসে বিছানা থেকে উঠল। ফ্রান্সিসের ডানহাতটা ধ'রে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল—'তুমি ফ্রান্সিস—বীর-নাম শুনেছি-ব'সো।' রাজপুত্র পিসকোজ নিজে বিছানায় বসল। ফ্রান্সিসের হাত ধ'রে বসাল' বিস্কো বসল। রাজপুত্র বলল—মেস্তিজো- অল্প স্পেনীয় ভাষা-শিখেছি। গুছিয়ে -বলতে পারবো না। রাজা লুপাকা-চিকামা দখল-অত্যাচার-হত্যা-বন্দী-তাড়াবো লুপাকাকে-চিকামা-স্বাধীন-আপনাদের সাহায্য। ফ্রান্সিস প্রথমে বুঝে উঠতে পারলো না কী বলবে। একটু ভেবে নিল। বলল-এব্যাপারে আপনার এখানকার দলপতিকে আমি সব বলেছি। মেস্তিজোও জানে। আমরা এক্ষুণি আপনাদের সাহায্য করতে পারবো না। কারণ রাজকুমারী মারিয়া এখন রাজ প্রাসাদে প্রায় বন্দিনী। আমরা এই অবস্থায় রাজা লুপাকার সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে চাই না। আমার বক্তব্য মেস্তিজো আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে। মেস্তিজো মৃদুস্বরে কিছুক্ষণ রাজপুত্রকে কী বলল। রাজপুত্র চুপ ক'রে সব শুনল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। বলল-'আপনার বন্ধু-বন্দী-লুপাকা হৃদয়হীন -নৃশংস-বন্ধু-জীবন বিপন্ন-। ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠল। ফ্রান্সিস বলল—রাজা লুপাকা যদি আমার বন্ধুকে আমার অনুরোধে মুক্ত দেয়-ভালো কথা। কিন্তু যদি আমার বন্ধুর ওপর অত্যাচার করে তবে বন্ধুর মুক্তির জন্যে, মারিয়ার মুক্তির জন্যে আমাদের অস্ত্র ধরতেই হবে। তখন আপনাদের পাশে আমাদের পাবেন।' রাজপুত্র হেসে হাত তুলে ব'লে উঠল—'দুঃসাহসী ফ্রান্সিস তোমাদের সামান্য সাহায্য-অনেক। ধন্যবাদ। ফ্রান্সিসরা আবার মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে ঘরের বাইরে চলে এল। মেস্তিজোও বাইরে এল। বলল-চলো আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো। তিনজন চলল চিকামার দিকে। পথে মেস্তিজো বলল—ফ্রান্সিস আমাদের খাওয়া দাওয়া কিন্তু কিছুই হয়নি। চলো আস্তানায় গিয়ে কিছু খেয়ে নি, ফ্রান্সিস বলল। —' শাঙ্কোকে সুস্থ না দেখা পর্যন্ত আমার মুখে খাওয়া রুচবে না। পথে আসতে আসতে সূর্য উঠল, ভোর হল। ওরা যখন রাজবাড়ির পাশেই সেই লম্বা ঘরওয়ালা কয়েদঘরের সামনে এসে পৌঁছল তখন সকাল হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস কয়েদঘরের দরজার গিকে এগিয়ে গেল। এই কয়েদঘরে ওদের আগে বন্দী ক'রে রাখা হ'য়েছিল। দেখল চারজন চিমু সৈন্য বর্শা হাতে কয়েদঘর পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে কাছে ডাকল, বলল—

—'মেস্তিজো ওদের জিজ্ঞাসা করো যে শাঙ্কোকে এখানে বন্দী করা হয়েছে কী না? আর শাঙ্কো সুস্থ আছে কী না।

মেস্তিজো পাহারাদারদের এসব কথা জিজ্ঞেস করল। উত্তরে পাহারাদাররা কী সব বলল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসের দিকে ফিরে বলল।

'হ্যাঁ, শাঙ্কোকে এখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে আর শাঙ্কো সুস্থ আছে।'

—শাঙ্কোকে কেন বন্দী করা হয়েছে জিজ্ঞাসা কর।

—চিমু পাহারাদারী মেস্তিজোকে কী বলল। মেস্তিজো বলল—

—ওরা সন্দেহের বশে শাঙ্কোকে বন্দী করেছে। ওদের সন্দেহ তিতিকাকা বনে যেসব উনকা সৈন্যরা আত্মগোপন করে তাদের সঙ্গে শাঙ্কোর যোগ আছে। শাঙ্কো গুপ্তচর। একটু পরেই রাজসভার কাজ শুরু হবে। তখন রাজার সামনে শাঙ্কোকে হাজির করা হবে। রাজা বিচার করে শাস্তি দেবেন সেই শাস্তিই শাঙ্কোকে পেতে হবে। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ভেবে দেখল এক্ষুনি চিমু পাহারাদারদের সঙ্গে লড়াইতে নামা উচিত হবে না। সময় ও সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ওরা ফিরে এসে রাজবাড়ির সিংহদ্বারে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস, বিস্কো সারারাত কিছু খেতেও পারেনি, ঘুমুতেও পারেনি। মেস্তিজোরও একই অবস্থা তিনজন তখন প্রচণ্ড পরিশ্রান্ত। সদর দেউড়ির পাশে একটা লম্বাটে পাথরের ওপর ওরা বসে পড়ল।

বেলা বাড়তে লাগলো। একসময় রাজবাড়ির সদর দেউড়ি খুলে গেলো। লোকজন রাজসভার ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ফ্রান্সিসরাও গেলো। একসময় রাজা লুপাকা এলো। পাথরের সিংহাসনে বসল। ততক্ষণে পাহারাদার সৈন্যরা হাত বাঁধা শাঙ্কোকে রাজার সামনে এনে উপস্থিত করেছে। একজন পাহারাদার শাঙ্কোকে দেখিয়ে গড়গড় করে কী সব বলে গেলো। রাগে রাজা লুপাকার মুখ লাল হয়ে উঠল। চিৎকার করে রাজা কী বলে উঠল। মেস্তিজো চাপা গলায় বলে উঠল--

'ফ্রান্সিস, পাঁচ ঘা বেত মারার হুকুম হয়েছে'। তখন লম্বা, কালো বেত হাতে একজন সৈন্য এগিয়ে এলো। প্রচণ্ড জোরে চাবুক চালালো শাঙ্কোর পায়ে। শাঙ্কোর সমস্ত শরীর নড়ে উঠল। ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। বসে পড়ল, ফ্রান্সিস বুঝল চাবুকের পাঁচটা ঘা শাঙ্কো সহ্য করতে পারবে না, অজ্ঞান হয়ে যাবে। ও মেস্তিজোকে বলল--

শিগগির রাজাকে বলো চাবুক মারা বন্ধ করতে। আমি রাজার সঙ্গে কথা বলব। মেস্তিজো চিৎকার করে দুহাত ওপরে তুলে লুপাকাকে সে কথা বলল। এবার মেস্তিজো মারফৎ রাজা লুপাকা ও ফ্রান্সিসের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো-।

ফ্রান্সিস- শাঙ্কো আমার বন্ধু। তাকে চাবুক মারা হচ্ছে কেন?

রাজা-- ও গুপ্তচর।

ফ্রান্সিস-- আপনি তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন?

রাজা-- আমার সৈন্যরা তার প্রমাণ পেয়েছে।

ফ্রান্সিস-- মিথ্যে কথা, যদি এ মিথ্যে অভিযোগে আমার বন্ধুকে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে গুপ্ত স্বর্ণমূর্তি আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব না।

রাজা-- কিন্তু তোমাদের তো সেই জন্যই এখানে থাকতে দেওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সিস-- আমার বন্ধুকে যদি মুক্তি দেওয়া না হয় তাহলে আমি স্বর্ণমূর্তি খুঁজবো না।

রাজা-- তাহলে তোমাদের দুজনকেও বন্দী করা হবে।

ফ্রান্সিস-- বেশ তাই করুণ। কিন্তু আমার বন্ধুকে আর একটাও চাবুক মারা চলবে না।

রাজা-- ওর আরো চারটে চাবুকের ঘা পাওনা আছে।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে উঠল-- না-না।

রাজা লুপাকা আঙুল নেড়ে পাহারাদারদের ইঙ্গিত করল, ওরা পাঁচজন ছুটে এসে ফ্রান্সিস ও বিস্কোর হাত বেঁধে ফেলল। তারপর ওদের কোমর থেকে তরোয়াল খুলে নিল। আবার চাবুকের ঘা পড়ল শাঙ্কোর পিঠে, তারপর আবার। শাঙ্কো পাথুরে মেঝেতে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চাবুকের ঘায়ে আহত শাঙ্কোর দিকে। ফ্রান্সিসের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। বিস্কোর চোখেও জল। ওরা অসহায় বন্দী, কিছুই করার নেই।

পাহারাদাররা ফ্রান্সিস ও বিস্কোকে নিয়ে হাঁটতে লাগল কয়েদঘরের দিকে। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগল। ওর মাথায় অনেক চিন্তা। শাঙ্কোর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। মারিয়ারও যাতে কোন বিপদ না হয় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। ওদের দুজনকে কয়েদঘরে ঢোকানো হল। একটু পরেই পাহারাদাররা আহত শাঙ্কোকে কয়েদঘরে রেখে গেলো। ফ্রান্সিস ও বিস্কো আহত শাঙ্কোর ওপর ঝুঁকে পড়ল। বাঁধা দুটো হাত দিয়ে ফ্রান্সিস শাঙ্কোর মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এমন সময় কয়েদঘরের দরজায় টং করে শব্দ হলো। ফ্রান্সিস দেখল মেস্তিজো লোহার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস তাকাতেই ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে লোহার দরজার কাছে দাঁড়াল। মেস্তিজো বলল— 'ফ্রান্সিস, অনেক কায়দা করে রাজা লুপাকাকে হাত করেছি। বলেছি ফ্রান্সিসদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখব এবং এইভাবে রাজপুত্র পিসকোজ ও আত্মগোপনকারী উনকা সৈন্যদের সব খবরাখবর জোগাড় করব এবং তা রাজা লুপাকাকে জানাবো। রাজা খুব খুশি, আমাকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছে।' ফ্রান্সিস বলল-- 'মেস্তিজো- তুমি যে করেই হোক শাঙ্কোর চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।'

'দেখছি,' একথা বলে মেস্তিজো চলে গেলো। ফ্রান্সিস এবার শাঙ্কোর পাশে ভাল ক'রে বসল। শাঙ্কোর মাথা নিজের কোলে তুলে নিল। শাঙ্কো ব্যথায় একটু কঁকিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস ডাকলো-- 'শাঙ্কো'।

--উঁ?

--খুব কষ্ট হচ্ছে?

--না। শাঙ্কো মৃদু হাসল। বলল--'বুঝলে ফ্রান্সিস-- আমি খুব আহত হবার ভান করেছি যাতে আরো চাবুক খেতে না হয়। তবে পিঠটা ভীষণ জ্বালা করছে। দেখতো কতটা কাটল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে শাঙ্কোর জামাটা খুলতে লাগল। বিস্কোও সাহায্য করল। জামা খোলা হ'লে মশালের আলোয় ওরা দেখল তিন চারটে লম্বাটে কালশিটের দাগ শাঙ্কোর পিঠে। একটা দাগ একেবারে পিঠের চামড়া কেটে বসেছে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে কাটা জায়গাটা থেকে। ফ্রান্সিস বুঝল--

শাঙ্কোর চিকিৎসা প্রয়োজন। নইলে কাটা জায়গাটা পেকে যেতে পারে। ফ্রান্সিস বলল-- 'বিস্কো চিনেমাটির হাঁড়িটায় জল নিয়ে এসো।' বিস্কো উঠল। ঘরের কোনায় রাখা হাঁড়িটা থেকে চিনেমাটির বাটিতে ক'রে জল নিয়ে এল। ফ্রান্সিস নিজের কোমরের ফেট্রি থেকে কিছুটা কাপড় ছিঁড়ল। কাপড়ের টুকরোটা জলে চুবিয়ে শাঙ্কোর পিঠের কালসিটে দাগে, কাটা জায়গায় আস্তে আস্তে জল বুলিয়ে দিল। শাঙ্কো একবার নড়ে উঠল। জল লাগায় বেশ জ্বালা ক'রে উঠল। পরে একটু ঠাণ্ডা লাগায় ভাল লাগল।

তখনই কয়েদঘরের দরজায় শব্দ হ'ল। দেখা গেল দরজা খোলা হচ্ছে। দু'জন পাহারাদার বন্দীদের জন্যে চীনামাটির বড় গোল পাত্রে খাবার নিয়ে ঢুকল। ওরা বন্দীদের হাতের বাঁধন খুলে দিল। তিনকোণা পাতা বন্দীদের সামনে ঘাসের ওপর বিছিয়ে দিল। খাবার ঢেলে দিল। গতরাত থেকে খাওয়া নেই, ঘুম নেই। ফ্রান্সিসরা যেন ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গেছে। ফ্রান্সিস খাবার খেতে খেতে বলল-- কিছুই ফেলো না-- পেট পুরে খাও। মুখে ভালো না লাগলেও খাও। বন্দীদশায় ফ্রান্সিস সব সময় একথা বলে। শাঙ্কোও উঠে বসে খেতে লাগল। সেই ধানের রুটি, বুনো আলু আর সামুদ্রিক মাছের ঝোল। মেস্তিজোর আস্তানায় তিতিকাকা বনের আস্তানায় এমনি খাবারই ওরা খেয়েছে। খেয়ে অভ্যস্ত হ'য়েছে। পেট পুরেই খেল তিনজনে। তারপর অনেকটা জল খেল। পাহারাদাররা এঁটো পাতা নিয়ে চলে গেল। ফ্রান্সিসরা ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল।

কয়েক ঘণ্টা কাটল। খেয়ে দেয়ে ফ্রান্সিস গায়ে বেশ জোর ফিরে পেল। লোহার দরজায় আবার শব্দ উঠল- ঢ ঢাং ঢং ঘর্ র্ র্। ওরা দেখল মেস্তিজো একটা লম্বা মত বুড়ো লোককে নিয়ে ঢুকছে। লোকটার মুখে পাকা দাঁড়ি গোঁফ। মাথায় কালো কাপড়ের ফেট্রি বাঁধা। মাথায় পাকা চুল পেছনে বেণীর মত পাকানো। গলায় নানা রঙের পাথরের টুকরোর মালা, হাতে একটা বোঁচকা। ফ্রান্সিস বুঝল লোকটা বদ্যি। বদ্যি শাঙ্কোর কাছে এসে বসল। ওর পিঠের কালসিটে দাগ, চাবুকের ঘা এসব ভালো করে দেখল। তারপর ঝোলা থেকে চীনামাটির বোয়াম বের করল। একটা গাছের পাতা বের করল, তারপর সেই পাতায় বোয়াম থেকে হলুদ রঙের কিছু গুঁড়ো ঢালতে ঢালতে মেস্তিজোকে জল নিয়ে আসতে বলল।

--মেস্তিজো জল নিয়ে এলো, বদ্যি সেই জল গুঁড়োটার ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঢেলে আঠার মতো করল। তারপর শাঙ্কোর পিঠে আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিল। প্রথমে শাঙ্কো একটু চেঁচিয়ে উঠল, বোধহয় জায়গাগুলো জ্বালা করে উঠল। তারপর শাঙ্কো শান্ত হলো। বোধহয় জ্বালা যন্ত্রণা একটু কমল। ওষুধ লাগিয়ে বদ্যি মেস্তিজোকে কী বলল, মেস্তিজো পাতাটায় ওষুধ কিছুটা রেখে দিল। তারপর চলে গেল, মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল-- ওষুধ রইল। কাল সকালে লাগিয়ে দিও। সেদিন কাটল, মেস্তিজো পরের দিনও ওষুধ এনে দিলো।

দিন চারেক কাটল, শাঙ্কো এখন অনেকটা সুস্থ। সেদিন ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে

বলল-

--দেখো, রাজা লুপাকা শাঙ্কোকে যেভাবে বিনা কারণে শাস্তি দিলো, তাতে রাজার বিরুদ্ধে আমি রুখে দাঁড়াতে পারতাম। কিন্তু মারিয়ার কথা ভেবে আমি নিজেকে সংযত করেছি।

—ফ্রান্সিস। মেন্তিজো বলল--

--তোমাকে বলিনি কিন্তু এখন তো বলতেই হয়। মারিয়াকে একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাকে বাইরে বেরুতে দেওয়া হচ্ছে না। কারো সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না।

ফ্রান্সিস বলল।

--এটা হবে আমি জানতাম। কিন্তু এখন যে করেই হোক মারিয়াকে উদ্ধার করতে হবে, মেন্তিজো তুমি কী একা পারবে।

—নিশ্চয়ই পারবো। মেন্তিজো বলল--

--আমি সেসব ছকে রেখেছি। কিন্তু আমার ভয় হলো পরে রাজা লুপাকা এসব জানতে পারলে আমার জীবন বিপন্ন হবে।

--তোমার কোনো ভয় নেই। তোমাকে দুটো কাজ কতে হবে। মারিয়াকে মুক্ত করতে হবে আর আমাদের জাহাজে আমার বন্ধুদের বিপদের সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে। ভাবছিলাম রাজা লুপাকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামব না। কিন্তু আর লড়াইয়ে না নেমে উপায় নেই। তুমি আমার বন্ধুদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে সোজা তিতিকাকা বনে গিয়ে রাজপুত্র পিসকোজের কাছে নিয়ে যাবে। পিসকোজ যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকামা আক্রমণ করে। আমি এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করব কিন্তু যদি পালাতে না-ও পারি আমার বন্ধুরা এসে ঠিক আমাদের উদ্ধার করবে। মেন্তিজো বলল—

ঠিক আছে আমি যাচ্ছি, দেখি কতদূর কী করতে পারি। মেন্তিজো সেদিন সন্ধ্যেবেলা রাজা লুপাকার সঙ্গে দেখা করল। বলল—

--মহারাজ আমি গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়েছি যে রাজপুত্র পিসকোজ আগামী পূর্ণিমার দিন চিকমা আক্রমণ করবে।

--পূর্ণিমা কবে?রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

--আর সাতদিন পরে। তারপর মেন্তিজো বলল।

--কালকে দেবরক্ষীর পূজো। সেই উৎসবে আপনি ও মহারাণী আসবেন। রাজকুমারী মারিয়াকেও আসার অনুমতি দেবেন এই আমার অনুরোধ। রাজা কিছুক্ষণ ভাবলেন তারপর বললেন।

--বেশ তাই হবে, কিন্তু রাজকুমারী মারিয়ার সঙ্গে পাহারাদার সৈন্য যাবে। --বেশ। মেন্তিজো বলল।

পরদিন দুপুর থেকেই দেবরক্ষীর পূজোর উৎসব শুরু হ'ল। চিকামার অধিবাসীরা দলে দলে পুজোর আঙ্গিনায় আসতে লাগল। মই বেয়ে উঠে দেবরক্ষীর

গলায় মালা পরাতে লাগল। দেবরক্ষীর মূর্তির বেদীতে ফুল পাতা ছড়িয়ে দিতে লাগল।বুনো গাছের শুকনো কষ জড়ো করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। সুগন্ধি ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল পূজাঙ্গনে। মেন্তিজো সারাদিন পুজো নিয়ে ব্যস্ত রইল। উৎসব জমে উঠল সন্ধ্যাবেলা। সমস্ত পূজাঙ্গন ঘিরে অনেক মশাল জ্বলল। শুরু হ'ল নাচ গান। দলে দলে মেয়েরা সুর করা নাচের আসরে নাচগান করতে লাগল।

সন্ধ্যের পরেই ঘোড়ায় চড়ে রাজা লুপাকা ও রানী এল উৎসব প্রাঙ্গনে। বসল দেবরক্ষীর মূর্তির বেদীতে। রাজা রানী দু'জনেই বেশ সেজেগুজে এসেছে। শুধু চারদিকে দাঁড়ানো চিমু সৈন্যরা রাজারানীর জয়ধ্বনি দিল। চিকামার অধিবাসীরা কোন জয়ধ্বনি দিল না।

একটু পরেই দু'জন পাহারাদার সৈন্যের পাহারায় মারিয়া এল। মারিয়া চিন্তাগ্রস্ত। ফ্রান্সিস, বিস্কো, শাঙ্কো বন্দী। কয়েদঘরে কী কষ্টে না জানি ওদের দিন কাটছে মারিয়ার এই উৎসবে আসার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মেন্তিজো ওর সঙ্গে দেখা করে বারবার অনুরোধ করেছে- এই উৎসবে আপনি অবশ্যই আসবেন। আপনার মন ভালো নেই। তবু আসবেন। তাই মারিয়াকে আসতে হলো। মারিয়া বেদীতে বসে উৎসব দেখতে লাগলো। এই সময় মেন্তিজো ওর কাছে এলো। বলল---

—আপনি আমার সঙ্গে আসুন। দেবরক্ষীর পূজা করুন তাহলে আপনার মঙ্গল হবে। মারিয়া উঠে মেন্তিজোর পেছনে পেছনে আসতে লাগল। মারিয়ার পাহারাদার দুজন চিমু সৈন্য ওকে অনুসরণ করল। ওরা সকলে এসে মেন্তিজোর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল, মেন্তিজো ইঙ্গিতে পাহারাদার দুজনকে বাইরে দাঁড়াতে বলল। তারপর মারিয়াকে নিয়ে ঘরে তুলল, ঘরে ঢুকে মেন্তিজো ওর পুরোহিতের পোশাক নানান রঙের সুতোর কাজ করা গায়ের চাদরটা ফেলে দিল। একটা পঞ্চো গায়ে পরে নিল। তারপর পেছন দিকটার দরজাটা খুলে মারিয়াকে চাপা-স্বরে ডাকল—রাজকুমারী তাড়াতাড়ি চলে আসুন! দুজনে দরজার বাইরে এল। তারপর মেন্তিজো দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলো। পেছনে মারিয়া। মারিয়ার পাহারাদার দুজন সৈন্য তখনো বর্শা হাতে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে মেন্তিজো ও মারিয়া যতটা দ্রুত সম্ভব যেতে লাগলো। সব লোকজন তখন উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা। ওদের লক্ষ্যই করল না। মেন্তিজো ও মারিয়া রাস্তায় এসে নামল। রাস্তা জনশূন্য। সবাই উৎসবের প্রাঙ্গনে গিয়ে জড়ো হয়েছে। এক সময় ওরা চিকামা শহর থেকে বেরিয়ে এলো। আকাশে খণ্ড চাঁদ। তার আলোয় মেন্তিজো দেখল ধারে কাছে লোকজন নেই। এবার মেন্তিজোও দাঁড়িয়ে পড়ল। মারিয়াও দাঁড়িয়ে পড়ল। দুজনেই বেশ হাঁপাচ্ছে তখন। মেন্তিজো বলল—

—রাজকুমারী—ফ্রান্সিস আমাকে দুটো দায়িত্ব দিয়েছে। এক, আপনাকে মুক্ত করার সেটা করলাম। দুই, জাহাজে গিয়ে ফ্রান্সিসের বন্ধুদের সব কথা জানানো। এইবার আমাকে সেই কাজটা করতে হবে। আপনি জাহাজে ফিরে যাবেন তো।

মারিয়া বলল—না আপনি চিকামাতেই কোথাও আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিন। ফ্রান্সিসরা মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আমি চিকামা ছেড়ে যাবো না।

—কিন্তু চিকামায় থাকা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয় থাকলে আপনি যে কোন সময় বিপদে পড়তে পারেন।

—তাহলে চিকামার বাইরে আমার অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দিন। মেস্তিজো বেশ চিন্তায় পড়ল। ও ভাবতে লাগলো মারিয়াকে চিকামার বাইরে কোথায় রাখা যায়। তখন হঠাৎ মনে পড়ল তিতিকাকা বনের সেই আস্তানার কথা। বলল—

তিতিকাকা বনের মধ্যে আত্মগোপনকারী উনকা সৈন্যরা একটা আস্তানা তৈরি করেছে। সেখানে মৃত রাজা কোলার পুত্র পিসকোজ আছে। আপনি ঐ আস্তানায় নিরাপদে থাকতে পারবেন।

—তাহলে খুবই ভালো হয়। মারিয়া বলল।

মেস্তিজো মারিয়াকে তিতিকাকা বনের দিকে নিয়ে চলল।

তিতিকাকা বনের মধ্যে যখন ওরা ঢুকল তখন রাত গভীর। বনের গাছপালার নিচে অন্ধকার। পথ বলে কিছু নেই। বনের এখানে ওখানে চাঁদের ভাঙা অস্পষ্ট আলোয় মেস্তিজো দ্রুত এগিয়ে চলল, পেছনে মারিয়া। এক সময় ওরা সেই কাঠের বাড়ির কাছে এলো। হঠাৎ তিন চার জন আত্মগোপনকারী উনকা সৈন্য ওদের ঘিরে ধরল। মেস্তিজো চিৎকার করে বলে উঠল। উনকা সৈন্যরা ওকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। তারপর ওদের বাড়িটার মধ্যে নিয়ে গেলো। ঘরে ঢুকে মারিয়া মশালের আলোয় দেখল লম্বাটে ঘরটায় অনেক লোকজন ঘাসের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। এক কোনায় রাজপুত্র পিসকোজ ঘুমিয়ে ছিল। মেস্তিজো কাছে বসে কী বলে ডাকলো। পিসকোজের ঘুম ভেঙে গেলো। সে উঠে বসল। মারিয়াকে দেখে বেশ অবাকই হলো। মেস্তিজো রাজপুত্রকে এক নাগাড়ে কী বলে গেলো। রাজপুত্র কী বলল। তখন মেস্তিজো মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—আমি রাজপুত্রের কাছে আপনার পরিচয় দিয়েছি। রাজপুত্র আপনাকে এখানেই থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মেয়েরা যে ঘরে থাকে সেই ঘরে। এবার মেস্তিজো মারিয়াকে নিয়ে ঘরের বাইরে এলো। একটা বড় উঠোন পেরিয়ে পুব কোণায় একটা ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। মেস্তিজো ঘরের দরজাটায় আস্তে ধাক্কা দিল। ভেতর থেকে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। মেস্তিজো কী বলল। দরজা খুলে একজন মধ্যবয়স্কা উনকা স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। মেস্তিজো তাকে কী বলল। স্ত্রীলোকটি মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে কী বলল। তারপর দরজা থেকে স'রে দাঁড়াল। মেস্তিজো মারিয়াকে বলল—রাজকুমারী আপনি এখানে থাকবেন। এরাই আপনার দেখাশুনো করবে। আমি সমুদ্রতীরে যাচ্ছি। ফ্রান্সিসের বন্ধুদের খবর দিতে। মারিয়া ঘরটায় ঢুকল। দেখল ঘরে দু'টো মশাল জ্বলছে। মেঝেয় ঘাসের বিছানায় মোটা কাপড়ের চাদর পাতা। কিছু স্ত্রীলোক শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। ঘুম ভেঙে

দু'একজন মারিয়াকে দেখল। মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোকটি মারিয়াকে বিছানা দেখাল। হেসে কী বলল। বোধহয় মারিয়াকে শুতে বলল।

মেস্তিজো উঠোন মত জায়গাটায় নামল। তারপর ঐ আস্তানা থেকে বেরিয়ে এল। চলল মরুভূমির মত সেই ঢালা সমুদ্রতীরের উদ্দেশ্য। দু'একটা টিলার মত পাহাড়ী এলাকা পার হ'য়ে মেস্তিজো সেই মরুভূমির মত এলাকায় এল। তখন চাঁদ পশ্চিমদিগন্তে হেলে পড়েছে। মৃদু-জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে মরুভূমি এলাকায় জোরে হাওয়া আসছে। সমুদ্রের দিক থেকে বালি উড়ছে। মেস্তিজো চলল সমুদ্রতীরের দিকে।

ভোর হ'ল। মেস্তিজো দূর থেকে সমুদ্রের তীরে নোঙর করা ফ্রান্সিসদের জাহাজটা দেখল। ও জাহাজটাব কাছে যখন পৌঁছল তখন সকাল। সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে মেস্তিজো ভাইকিংদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চিৎকার করে ডাকাডাকি শুরু করল। দু'জন পাহারাদার ভাইকিং জাহাজের রেলিং-ধরে কাছে এলো, ঝুঁকে পড়ে মেস্তিজোকে দেখলো। মেস্তিজো চিৎকার করে বলল—

—খুব জরুরি খবর আছে। আমাকে জাহাজে উঠতে দাও। ততক্ষণে আরো কিছু ভাইকিং ডেকের -রেলিং এর কাছে হাজির হয়েছে। ওরা তখন একটা কাঠের পাটাতন নামিয়ে দিল তীর পর্যন্ত। মেস্তিজো কাঠের পাটাতনের ওপর হেঁটে গিয়ে জাহাজে উঠল। ভাইকিংরা ওকে ঘিরে ধরল। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল

—কী সংবাদ? মেস্তিজো বলল—

—সব বলছি। আগে আমাকে কিছু খেতে দিন, ভাইকিংরা ওকে খাবার ঘরে নিয়ে গেলো। মাংস, রুটি খেতে দিলো। মেস্তিজো খাচ্ছে তখনি হ্যারি এলো। হ্যারি জিজ্ঞাসা করল—

আপনি কে? কী খবর এনেছেন? মেস্তিজো তখন আস্তে আস্তে নিজের পরিচয় ফ্রান্সিসদের বন্দী দশা আর তিতিকাকা বনে মারিয়া আশ্রয় লাভের কথা বলল? তারপর ফ্রান্সিসের নির্দেশও জানলো।

হ্যারি বলল। — আমরা সকালের খাবার খেয়েই চিকামা রওনা হবো আপনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ভাইকিংরা খাওয়া সেরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জাহাজের ডেক-এ এসে জমায়েত হ'ল। প্রথমে মেস্তিজো পাটাতন দিয়ে হেঁটে জাহাজ থেকে নামলো ওরা আকাশের দিকে তরোয়াল উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল— —ও হো-হো-হো মরুভূমির ওপর দিয়ে শুরু হলো। মরুভূমির বালি এর মধ্যেই তেতে উঠেছে। সমুদ্রে দিক থেকে হাওয়া ছুটছে জোরে। সূর্যের তেজও বেশ. তার মধ্য দিয়েই ভাইকিংরা চলল। দুপুর নাগাদ চিক্লাই শহরে এসে পৌঁছল। সেখান থেকে হেঁটে চিকামায় এসে যখন পৌঁছল তখন বিকেল। মেস্তিজোরা চিকামা শহরে ঢুকলো না কয়েকটা পাহাড়ি টিলা পেরিয়ে তিতিকাকা বনে ঢুকলো। যখন তিতিকাকা বনের আস্তানায় এসে পৌঁছল তখন সন্ধ্যে হয় হয়। মেস্তিজো হ্যারিকে

রাজপুত্র পিসকোজের কাছে নিয়ে গেলো। পিসকোজ সমাদরে হ্যারিকে ঘাসের বিছানায় বসালো। তারপর ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় ফ্রান্সিসের বিপদের কথা বলল—

—এই অবস্থায় আমাদের আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। মেস্তিজো রাজা লুপাকাকে বলেছে যে, আপনারা পূর্ণিমার দিন আক্রমণ করবেন। পূর্ণিমার এখনো ছ'দিন বাকি। রাজা লুপাকা এই কটা দিন নিশ্চিত থাকবে। সেইজন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আক্রমণ করতে হবে। আপনার আপত্তি না থাকলেও আমরা কালকেই চিকামা আক্রমণ করতে পারবো। পিসকোজ মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বলল—

রাজা লুপাকাকে তৈরি হবার সময় দেবো না। কালকে রাতেই আমরা আক্রমণ করবো। আমি আজকেই সব আস্তানায় খবর পাঠাচ্ছি কাল বিকেলে সব সৈন্যরা এখানে-জড়ো হবে। এই সময় মারিয়া ঘরে ঢুকল। হ্যারি মারিয়াকে মুক্ত ও সুস্থ দেখে খুশি হলো। উঠে দাঁড়িয়ে তাকে মাথা নিচু করে সম্মান জানালো। বলল—

রাজকুমারী কালকে যুদ্ধ শুরু হবে। এ অবস্থায় আপনার এখানে না থাকাই ভালো, আপনি রাজী হলে আপনাকে জাহাজে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি। মারিয়া দৃঢ় স্বরে বলল— না- আমি এখানেই থাকবো।

—কিন্তু এই লড়াই হাঙ্গামার মধ্যে আপনার কিছু হ'লে—

—আমার কিছু হবে না।

—বেশ। হ্যারি আর কিছু বলল না। রাজকুমার পিসকোজ বলল—এই লড়াইয়ে আমাদের সাহায্য করুন আমরা চাই।

—নিশ্চয়ই। তবে আপনারা আপনাদের যে রকম যুদ্ধ নীতি সেভাবে লড়াই চালাবেন। আমরা আমাদের নীতি অনুযায়ী লড়বো। হ্যারি বলল।

—বেশ। পিসকোজ বলল। এবার হ্যারি মেস্তিজোকে বলল—আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। আপনাকে চিকামায় যেতে হবে।

—সে কী ক'রে হয়। রাজকুমারী মারিয়াকে আমি পালাতে সাহায্য করেছি একথা এতক্ষণে রাজা লুপাকা জেনে গেছে। আমি চিকামায় ঢুকলেই চিমু সৈন্যরা আমাকে বন্দী করবে। রাজা লুপাকার কাছে নিয়ে যাবে। কী সাংঘাতিক শাস্তি—

—দাঁড়ান দাঁড়ান, শাস্তি এড়ানোর উপায় বার করছি। হ্যারি বলল। তারপর পাথরের মেঝেয় দু'একবার পায়চারি করল। ভাবতে লাগল। একসময় মেস্তিজোকে বলল— আচ্ছা আপনি তো রাজপুরোহিত। পুজো করতে আপনার করতে কী কী লাগে?

—ফুল লতাপাতা তিতিকার হ্রদের পবিত্র জল— ধোঁয়ার জন্যে গাছের শুকনো কষ এ সব!

—তিতিকাকা হ্রদের জল তো শুধু আপনিই আনেন? হ্যারি বলল—

—তাহ'লে ধরা পড়লে রাজা লুপাকাকে বলবেন— রাজকুমারী মারিয়া পুজো করতে চেয়েছিলো। তাই তাকে সঙ্গে নিয়ে আপনি তিতিকাকা হ্রদে পবিত্র জল

আনতে যাচ্ছিলেন। তখনই আত্মগোপনকারী উনকা সৈন্যরা আমাদের বন্দী ক'রে তাদের আস্তানায় নিয়ে গিয়েছিল। আপনি অনেক কষ্টে পালিয়ে চিকামায় চলে এসেছেন। পারবেন না এসব বলতে?

মেস্তিজো একটু চিন্তা করে বলল—হ্যাঁ তা পারবো।

—এইবার রাজাকে আপনি বলবেন যে দিন কয়েকের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু হবে। সেই যুদ্ধে যাতে রাজা লুপাকা জয়লাভ করতে পারেন তার জন্য আপনি কালকে সন্ধ্যেবেলা পূজার আয়োজন করেছেন। সব চিকামাবাসীরা যেন সেই পূজা উৎসবে অংশগ্রহণ করে। মেস্তিজো হ্যারির পরামর্শটা ভাবতে লাগল। রাজপুত্র পিসকোজ বলল— আপনি পুজোর কথা বলছেন কেন?

হ্যারি বলল— রাজপুত্র কালকে সন্ধ্যেবেলা পুজোর আয়োজন হ'লে চিকামার অনেক লোক সেই পুজোর উৎসবে অংশ নিতে যাবে। চিমু সৈন্যরাও যাবে। রাজবাড়িতে থাকবে কিছু প্রহরী সৈন্য। আমরা সহজেই তাদের পরাস্ত করতে পারবো। রাজা রানীকে বন্দী করতে পারবো। রাজা রানীকে বন্দী করতে পারলে চিমু সৈন্যদের মনোবল ভেঙে যাবে। তারা সহজেই বশ্যতা স্বীকার করবে। চিকামার মানুষজন পুজোর অঙ্গনে থাকবে। অযথা নিরীহ মানুষও এই লড়াইয়ের সময় মারা পড়বে না।

হ্যারির কথাগুলো রাজপুত্র পিসকোজ কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর হেসে ডান হাত বাড়িয়ে বলল— আপনি সত্যই বুদ্ধিমান! হ্যারি হেসে পিসকোজের হাত ধরল।

—তাহ'লে কাল সকালে আমি চিকামা নগরে যাবো। মেস্তিজো বলল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়েই মেস্তিজো চিকামা নগরের দিকে চলল। পথে নিজের গায়ের পঞ্চোর এখানে ওখানে ছিঁড়ে ফেলল। মাথার চুল দাড়ি এলোমেলো করল। ও যা ভয় পেয়েছিল তাই হ'ল। চিমু সৈন্যরা ওকে বন্দী করল। হাত বেঁধে নিয়ে চলল রাজা লুপাকার কাছে। লুপাকা ওকে দেখে তো আগুন। মেস্তিজো হ্যারির শেখানো মতো সব বলল। দেখা গেল এতে কাজ হ'য়েছে। রাজা লুপাকা শুনল সব। এবার মেস্তিজো রাজার যুদ্ধজয়ের জন্য বিশেষ পুজোর কথা বলল। রাজা লুপাকা খুশি হ'ল। মেস্তিজোকে মুক্তি দিল। মেস্তিজো মুক্তি হ'ল।

মেস্তিজো সারা শহর ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যেবেলা বিশেষ পুজো ও আনন্দোৎসবের কথা ঘোষণা ক'রে বেড়াল।

দেখা গেল সত্যই ঘোষণায় কাজ হ'য়েছে। সন্ধ্যে হ'তেই পুজোর প্রাঙ্গনে ভিড় জমে গেল। রাত হতে ভিড় বাড়ল। নাচগান চলল। চিমু সৈন্যরাও দল বেঁধে এল। আনন্দ উৎসবে মেতে গেল।

ওদিকে সন্ধের পরেই তিতিকাকার আস্তানায় লড়াইয়ের তোড়জোড় শুরু হলো। আত্মগোপনকারী উনকা সৈন্যরা আস্তানার উঠোনে সারি বেধেঁ দাঁড়াল। আস্তানার বাইরে খোলা জায়গায় সশস্ত্র জড়ো হলো। সবার সম্মুখে দাঁড়ালো রাজপুত্র

পিসকোজ তার সঙ্গে হ্যারি। রাজপুত্র যাত্রা শুরু করার ইঙ্গিত দিলো। ভাইকিং ও উনকা সৈন্যরা চলল চিকামা নগরীর দিকে। আকাশে মস্ত চাঁদ। তারই ভাঙা ভাঙা আলো পড়েছে তিতিকাকা বনের এখানে ওখানে তাতে অন্ধকার কাটেনি। তারই মধ্যে দিয়ে ভাইকিংরা ও উনকা সৈন্যরা চলল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তারা চিকামা নগরীর রাস্তায় এসে উঠল। দেখা গেল পথ জনশূন্য। দোকানপাট বন্ধ। বাড়ির ঘরের আলো নেভানো। প্রায় সকলেই চলে গেছে পুজোর প্রাঙ্গণে। রাজবাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল চারজন চিমু সৈন্য উৎসব থেকে ফিরে আসছে। ওরা কাছাকাছি এসে রাজপুত্র পিসকোজ উনকা ও ভাইকিংদের দেখে হকচকিয়ে গেলো। পিছু ফিরে পালাবার চেষ্টা করতেই উনকা সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়লো। চারজনই হার স্বীকার করল। উনকা সৈন্যদের দলপতি ওদের হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাস্তার পাশে রাখলো। এবার পিসকোজের নেতৃত্বে উনকা সৈন্যরা ছুটল রাজবাড়ির দিকে। হ্যারি তাদের একজনকে থামালো। আকারে ইঙ্গিতে জানতে চাইলো কয়েদঘরটা কোথায়? সৈন্যটি ডান হাত তুলে একটা লম্বাটে পাথরের তৈরি ঘর দেখলো। তারপর ছুটল রাজবাড়ির দিকে। হ্যারি তার বন্ধুদের নিয়ে চলল। কয়েদঘরের দিকে। কয়েদঘরের সামনে এসে দেখলো দরজার দু'পাশে মশাল জ্বলছে। পাঁচজন চিমু সৈন্য কয়েদঘর পাহারা দিচ্ছে। দরজার কড়ায় একটা বড় তালা ঝুলছে। হ্যারি ভাইকিংরা পাহাদারদের ঘিরে ফেলল। পাহারাদাররা তো হতবাক। ওরা বুঝতেই পারলো না এরা কারা? কোত্থেকে এল? হ্যারি ইঙ্গিতে ওদের অস্ত্র ত্যাগ করতে বলল। ভয়ে ওদের তখন মুখ শুকিয়ে গেছে। ওরা তাড়াতাড়ি হাতের বর্শা ফেলে দিল। দড়ি দিয়ে ওদের হাত বাঁধা হলো। তারপর দরজার বাইরে বসিয়ে রাখা হলো। পাহারাদার একজনের কোমরে চাবির গোছা ঝুলছিল। হ্যারি এগিয়ে গিয়ে তার গলায় তরোয়ালের ধারালো মাথাটা ঠেকালো। ইঙ্গিতে বলল দরজা খুলে দিতে লোকটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দরজা খুলে একপাশে সরে এলো। হ্যারি কয়েদঘরের মধ্যে ঢুকে চাপাস্বরে ডাকল—

ফ্রান্সিস বিস্কো শাঙ্কো। ফ্রান্সিস দরজা খোলার শব্দে ভেবেছিল খাবার লোকেরা বোধহয় এসেছে। হ্যারি আরেকবার ডাকল ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল এতো হ্যারির গলা। বিস্কো ঘুমোচ্ছিল, ওর-ও ঘুম ভেঙে গেলো। শাঙ্কোও হ্যারির গলা শুনে চাপাস্বরে বলে উঠলো—

হ্যারি আমরা এখানে, মশালের আলোয় হ্যারি ফ্রান্সিসদের দেখতে পেলো। শুকনো ঘাস ছড়ানো মেঝের ওপর দিয়ে ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। তারপর হ্যারি তরোয়াল দিয়ে হাতের দড়ি কেটে দিলো। বিস্কো আর শাঙ্কোর হাতের দড়িও কেটে দিলো। ফ্রান্সিস বলল— তোমরা তাহলে খবর পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ, আমরা তিতিকাকা বনে এসেছিলাম। রাজপুত্র পিসকোজ তার উনকা সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজবাড়ি আক্রমণ করেছে, ওখানে বোধহয় লড়াই চলছে।

—আর সব বন্ধুরা? ফ্রান্সিস বলল।

—সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। চলো।

—তার আগে এই কয়েদঘরে যে উনকা সৈন্যরা বন্দী রয়েছে ওদের মুক্ত করতে হবে। ফ্রান্সিস অন্য বন্দীদের দিকে তাকিয়ে বলল। শাঙ্কো নিজের ঢোলা জামার মধ্যে থেকে বড় ছুরিটা বের করল। দ্রুত গিয়ে অন্য বন্দীদের হাত বাঁধা দড়ি কেটে দিল। যুদ্ধ বন্দীরা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসলো।

ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরের বাইরে এল। পেছনে অন্য সদ্যমুক্ত উনকা সৈন্যরা। ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়াল। মেস্তিজো হেসে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসের হাত ধরল।

—মেস্তিজো- আমাদের তরোয়াল তীর ধনুক কোথায় রাখা হ'য়েছে? মেস্তিজো বাঁ পাশে একটু দূরে ছোট ঘর দেখিয়ে বলল- ঐ যে অস্ত্রঘর। নিশ্চয়ই ওখানে রেখেছো ফ্রান্সিসরা অস্ত্রঘরের সামনে এল। ঘরটার দরজার সামনে মশাল জ্বলছে। দু'জন পাহারাদার বর্শা হাতে অস্ত্রঘর পাহারা দিচ্ছে। অন্ধকার ফুঁড়ে খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের আসতে দেখে ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মেস্তিজো একটু দূর থেকে বলল— অস্ত্র ত্যাগ কর নইলে মরবে। ওরা দু'জন বর্শা ছুঁড়ে ফেলে অন্ধকার মধ্য দিয়ে পালিয়ে গেল। বিস্কো একটা বর্শা তুলে দরজার তালা লাগানো লোহার আংটায় বর্শার মুখ ঢুকিয়ে প্রাণপণ চাড় দিল। কয়েকবার চাড় দিতেই একটা তালাটা খসে পড়ল। দরজা খুলে গেল। ফ্রান্সিস ঢুকল। ঘরটায় মশাল জ্বলছিল। মশালের আলোয় দেখল একপাশে ওর আর বিস্কোর তরোয়াল দু'টো রাখা। পাশে শাঙ্কোর তীর ধনুক। ফ্রান্সিস, বিস্কো ও শাঙ্কো নিজেদের অস্ত্র নিল। সদ্য মুক্তি পাওয়া উনকা সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ল দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা বর্শাগুলোর ওপর। সবাই হাতে হাতে বর্শা নিল।

বাইরে এল সবাই। হ্যারি বলল— ফ্রান্সিস রাজপুত্র পিসকোজে উনকা সৈন্যদের নিয়ে রাজবাড়ি আক্রমণ করেছে। জানি না এখনো ওখানে লড়াই চলছে কি না।

চলো আমরা রাজবাড়ি যাই। আমরা রাজপুত্র পিসকোজের হ'য়ে লড়াই করবো। লুপাকা শাঙ্কোকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। একটি তরুণ উনকাকে রাজার আদেশে আমি করুণভাবে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি। মেস্তিজোর কাছে শুনেছি রাজা লুপাকা হত্যা, অত্যাচার, লুণ্ঠন এখানে কীভাবে চালিয়েছিল। কাজেই রাজা লুপাকাকে এসবের শাস্তি পেতে হবে। চলো- প্রয়োজনে আমরা লড়াই করবো। ফ্রান্সিস বন্ধুদের তাকিয়ে এসব কথা বললো। ভাইকিং একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো -ও-হো-হো। সবাই রাজবাড়ির দিকে চলল।

রাজবাড়ির কাছে পৌঁছে দেখল উনকা সৈন্যরা রাজবাড়ি ঘিরে ফেলেছে। সবাই বর্শা হাতে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রান্সিস মেস্তিজো বলল- তুমি রাজবাড়ির মধ্যে যাও কী ঘটেছে বুঝতে পারছি না। সব জেনে এস। আমরা এখানে অপেক্ষা করছি।

মেস্তিজো দ্রুতপায়ে রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ল। সৈন্যরা পথ ছেড়ে দিল।

ফ্রান্সিসরা খোলা তরোয়াল হাতে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে মেস্তিজো ছুটতে ছুটতে এল। চিৎকার করে বলতে লাগল- ফ্রান্সিস আমাদের জয় হ'য়েছে। রাজা লুপাকা ও রানী রাজবাড়ির অন্দরবাড়ির বন্দী। রাজপুত্র পিসকোজ তোমাদের রাজবাড়ির ভেতরে আসতে অনুরোধ করেছে। ফ্রান্সিস ডাকল- হ্যারি?

—বলো।

—কী করবে এখন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল। রাজপুত্র যেতে অনুরোধ করেছে। চলো। হ্যারি বলল।

—বেশ।

মেস্তিজো ওদের পথ দেখিয়ে রাজসভায় নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা দেখল সিংহাসন শূন্য। একটা সাধারণ পাথরের আসনে রাজপুত্র পিসকোজ বসে আছে। ফ্রান্সিসরা কাছে আসতে পিসকোজ ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে এল। হেসে ফ্রান্সিসের ডান হাত জড়িয়ে ধরল। আমার বিপদে আপনারা সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। আমার পক্ষে যথেষ্ট। লড়াই শেষ হয়নি। পুজোর প্রাঙ্গনে- নগরে নানা জায়গায় চিমু সৈন্যরা ছড়িয়ে আছে। আমরা রাজবাড়ি দখল করেছি। রাজারানী। বন্দী এই সব সংবাদ ওরা ওখানে এখনো পায়নি। আমি আশঙ্কা করছি ওরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সংবাদ পাবে। তখন নিশ্চই রাজারানীকে মুক্ত করতে এখানে আসবে। তখন লড়াই হবেই রাজপুত্রের কথা শেষ হ'তে না হতেই উনকা সৈন্যদের দলপতি ছুটে রাজপুত্রের সামনে এসে দাঁড়াল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে গড় গড় ক'রে কী বলে গেল। রাজপুত্র মাথা নিচু করে একটু ভাবল। তারপর দলপতিকে কী যেন আদেশ দিল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল—ফ্রান্সিস রাজপুত্র যা আশঙ্কা করেছিল তাই হ'য়েছে। পূজা প্রাঙ্গনে রাজবাড়ি দখল ও রাজারানী বন্দী এ সংবাদ পৌঁছে গেছে। চিমু সৈন্যরা সবাই সেখানে জড়ো হ'য়েছে ওরা রাজবাড়ির দিকে আসছে। লড়াই হবেই।

ওদিকে ফ্রান্সিসরা যখনই মুক্ত হ'ল মেস্তিজো তখনই দু'জন উনকা সৈন্যকে পাঠিয়েছিল তিতিকাবনে। ওরা দুটো পাহাড়ী ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিল। তিতিকায় বনের আস্তানায় পৌঁছল ওরা। স্ত্রীলোকদের যে ঘরে মারিয়া থাকার ব্যবস্থা হ'য়েছিল সেখানে গেল ওরা। মারিয়াকে উনকা ভাষায় ফ্রান্সিসদের মুক্তিলাভের কথা বলল। কিন্তু মারিয়া ওদের উনকা ভাষা কিছুই বুঝল না। স্পেনীয় ভাষা বলতে পারে এমন কেউ সেখানে নেই। তবে সৈন্য দু'জন হেসে কথাগুলো বলেছিল। তা'তে মারিয়া বুঝল যে সংবাদ শুভ। সৈন্য দু'জনের নির্দেশমত মারিয়া একটা ঘোড়ায় উঠল। অন্য ঘোড়াটায় একজন সৈন্য উঠল। সে পথ দেখিয়ে মারিয়াকে মেস্তিজোর নির্দেশমত রাজবাড়িতে নিয়ে এল।

মারিয়া রাজবাড়ির সামনে এসে দেখল চিকামার অধিবাসীদের ভীষণ ভিড় রাজবাড়ির সামনে। সবাই আনন্দে চিৎকার হৈ হল্লা করছে। ঘোড়ায়চড়া মারিয়াকে দেখে ওরা যাওয়ার পথ ক'রে দিল। রাজবাড়ির সদর দেউড়িতে মারিয়া ঘোড়া

থেকে নামল। সঙ্গী সৈন্যটি মারিয়াকে রাজসভাগৃহে নিয়ে এল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা মারিয়াকে দেখে চিৎকার করে উঠল। ও-হো-হো। ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। মারিয়া ফ্রান্সিসকে দেখল। হাসতে হাসতে ছুটে এসে ফ্রান্সিসের বাঁ হাতটা জড়িয়ে ধরল। সুস্থ মারিয়াকে দেখে ফ্রান্সিসও খুশি। বলল- মারিয়া- লড়াই কিন্তু এখনও শেষ হয় নি। চিমু সৈন্যরা রাজবাড়ি আক্রমণ করতে আসছে। তুমি অন্তঃপুরে যাও। মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল- না- অমি তোমাদের সঙ্গেই থাকবো।

—বেশ তবে আমার বন্ধুদের পাশে থাকবে। অন্য কোথাও যাবে না।

—আচ্ছা মারিয়া বলল।

ওরা কথা বলছে তখনই বাইরে থেকে হৈ হল্লা শোনা গেল। পিসকোজ গলা চড়িয়ে বলে উঠল মেস্তিজো নিশ্চয়ই চিমু সৈন্যরা এসে গেছে। আমাদের সৈন্যরা তৈরি তো?

হ্যাঁ- আমরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। মেস্তিজো বলল- মেস্তিজো রাজপুত্রের সঙ্গে ওর যা কথা হ'ল তা ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস এবার রাজপুত্রকে বলল যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আমি কয়েকটা কথা বলবো।

—বেশ বলুন।

—দেখুন চিমু সৈন্যরা এসে গেছে। যে কোন মুহূর্তে ওরা আক্রমণ করতে পারে। যাতে আরো মানুষেব মৃত্যু না হয়, রক্তপাত না হয় তার জন্য আমি একবার চেষ্টা করতে চাই। আশা করি আপনি আমাকে সেই সুযোগ দেবেন। রাজপুত্র ভাবল। বলল—কী ভাবে?

—রাজা লুপাকা ও রানীকে তাহ'লে মুক্তি দিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—অসম্ভব। রাজপুত্র বলল।

আমি বলি সম্ভব। আজকে সুযোগ এসেছে চিমু রাজা আর মোচিকা রাজ্যের এতদিনের শত্রুতা দূর করার। ফ্রান্সিস বলল।

—কী ভাবে? রাজপুত্র বলল।

অপার মহানুভবতা দিয়ে। শুধু আপনি এইটুকু মহানুভবতা দেখান যে যাকে আপনি অনায়াসে হত্যা করতে পারবেন সেই রাজা লুপাকাকে মুক্তি দিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু এতে কি লড়াই এড়ানো যাবে- দু'রাজ্যের শত্রুতা দূর হবে? রাজপুত্র বলল।

সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনি শুধু রাজা লুপাকা আর রানীকে মুক্তি দিতে সম্মত হোন। ফ্রান্সিস বলল।

রাজপুত্র একবার মেস্তিজোর দিকে তাকাল। ফ্রান্সিসের কথাগুলো মেস্তিজোর খুব ভালো লাগল। সত্যিই তো। শুধু লড়াই হত্যা রক্তপাত কখনও মানুষের ভালো করতে পারে না। মেস্তিজো উনকা ভাষায় বলল- রাজপুত্র আপনি ফ্রান্সিসকে একটা সুযোগ দিন। হয়তো এতে আমাদের ভালোই হবে। রাজপুত্র ফ্রান্সিসকে

বলল- বেশ- রাজা লুপাকা আর রানীকে মুক্তি দেব। কিন্তু সৈন্যরা যদি তারপরেও লড়াই করতে চায়?

তা'হলে লড়াই হবে। রাজা লুপাকা আর রানীকে যাবজ্জীবন এখানে বন্দী হ'য়ে থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল বেশ দেখুন চেষ্টা করে। রাজপুত্র বলল।

ওদিকে রাজবাড়ির সামনে তখন চিমু সৈন্যরা এসে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করে বলছে রাজা রানীকে মুক্তি দাও। নইলে চিকামার সবাইকে আমরা মেরে ফেলবো।

ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে ডাকল। বলল-তুমি আমার সঙ্গে বাইরে চলো। মেস্তিজো একটু ভয় পেল। ফ্রান্সিস হেসে বলল- ভয় নেই চলো।

ওরা দুজনে বাইরে রাজবাড়ির সদর দেউড়ির কাছে এল। মশালের আলোয় দেখল চিমু সৈন্যরা বর্শা হাতে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দলপতি হুকুম দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ফ্রান্সিস এদিক ওদিক তাকাল। দেখল দেউড়ির পাশে একটা উঁচু পাথরের চৌকোনো চাঁই। ফ্রান্সিস বলল- মেস্তিজো তুমি এই পাথরের চাঁইয়ে উঠে দাঁড়াও। ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে পাথরের চাঁইতে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। মেস্তিজো চিৎকার ক'রে বলল- সবাই শান্ত হও। আমার কথা শোন। চিৎকার চ্যাঁচামেচি বন্ধ হল। এবার নিচে থেকে ফ্রান্সিস যা বলতে লাগল মেস্তিজো উনকা ভাষায় তা চিৎকার ক'রে বলতে লাগল- চিকামার অধিবাসী ভাই বোনেরা একটা লড়াইয়ের মুখোমুখি আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। একদিকে চিমু সৈন্যরা তৈরি হয়েছে রাজবাড়ি আক্রমণ ক'রে রাজা লুপাকা ও রানীকে মুক্ত করার জন্যে, অন্যদিকে উনকা সৈন্য আর আমার বীর ভাইকিং বন্ধুরা প্রস্তুত তাদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে। এই পরিস্থিতিতে আমি চিকামার ভাই বোনদের অনুরোধ করছি তোমরা এখান থেকে যে যার বাড়ি যাও। আমরা চাই না যে নিরীহ চিকামাবাসীরা এই লড়াইয়ের সময় মারা যাক বা আহত হোক মেস্তিজো থামল। চিকামাবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল। তারা আস্তে আস্তে সেই জায়গা থেকে চলে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সাধারণ লোকজন খুব সামান্য রয়েছে। এবার বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়ানো সারিবদ্ধ চিমু সৈন্যদের স্পষ্টই দেখা গেল। ফ্রান্সিসের কথা মেস্তিজো আবার চিৎকার করে বলতে লাগল আমার চিমু ভাইয়েরা আমরা এখানে বিদেশী। তবু আমরা চাই যে এই শান্তি পূর্ণ চিকামা নগরে যেন আর লড়াই না হয়। আমি রাজপুত্র পিসকোজকে অনুরোধ করেছি উনি যেন রাজা লুপাকা আর রানীকে মুক্তি দেন। তিনি সম্মত হ'য়েছেন। রাজা রানী একটু পরেই রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবেন। চিমু সৈন্য ভাইদের অনুরোধ করছি মুক্ত রাজা রানীকে নিয়ে তারা যেন নিজেদের চিমু রাজ্যে ফিরে যায়। অযথা রক্তপাত আমরা চাই না। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল—ওরা বলছে ওরা লড়াই করে রাজা রানীকে মুক্ত করবে। ফ্রান্সিস আবার মেস্তিজো মারফৎ বলতে লাগল— যদি চিমু সৈন্য ভাইয়েরা আমার এই অনুরোধ না রাখো যদি তোমরা লড়াই করতে নামো তা'হলে তোমরা কেউ জীবিত অবস্থায় চিমুরাজ্যে

ফিরে যেতে পারবে না। আমরা ভাইকিং। লড়াইয়ে যে আমরা হার স্বীকার করতে শিখিনি। এখন ভেবে দেখ তোমরা মৃত্যু চাও না জীবিত অবস্থায় রাজা রানীকে নিয়ে নিজেদের রাজ্যে ফিরে যেতে চাও? মেস্তিজো থামল। চিমু সৈন্যরা এবার চুপ করে রইল। দেখা গেল ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ফ্রান্সিসের কথা আবার মেস্তিজো বলতে লাগল- রাজা লুপাকার আদেশে তোমরা চিকিমাবাসীদের ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছিলে তা তোমরা ভালো ক'রেই জানো। রাজা লুপাকা নির্মম হৃদয়হীন। তবু রাজপুত্র পিসকোজ তাঁর অন্তরের মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সম্মত হ'য়েছেন রাজা লুপাকাকে ও রানীকে মুক্তি দিতে। এর পরেও তোমরা কি শান্ত সংযত হবে না? চিমু সৈন্যরা আস্তে আস্তে উদ্যত বর্শা নামাল। ওরা বুঝল এই অবস্থায় লড়াই করতে গেলে ওদের জীবন বিপন্ন হবে। মুক্ত রানীকে নিয়ে ফিরে যাওয়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। ওদের মনোভাব ফ্রান্সিস বুঝতে পারল। মেস্তিজোকে বলল- অন্দরে যাও। রাজপুত্রকে বলো রাজা লুপাকা আর রানীকে মুক্তি দিতে। মুক্ত রাজা রানীকে নিয়ে চিমু সৈন্যরা নিজেদের রাজ্যে চলে যাক। মেস্তিজো দ্রুতপায়ে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ পরে দুটো ছোট ঘোড়া রাজবাড়ির দেউড়িতে এনে রাখা হ'ল। রাজবাড়ি থেকে প্রথমে-রাজপুত্র পিসকোজ বেরিয়ে এল। পেছনে রাজা লুপাকা ও রানী দুজনে এসে ঘোড়া দু'টোর সামনে দাঁড়াল। রাজপুত্র তাদের ঘোড়ায় উঠে বসতে সাহায্য করল। রাজারানীকে নিয়ে ঘোড়া দুটো চিমু সৈন্যদের দিকে চলল। তখন ফ্রান্সিস মেস্তিজোর মারফৎ বলল রাজা লুপাকা রাজপুত্র পিসকোজ আপনাদের মুক্তি দিয়ে যে মহানুভবতা দেখালেন আশা করি আপনি তা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্মরণে রাখবেন। ভবিষ্যতে আর কোনদিন মোচিকা রাজ্য আক্রমণ করতে আসবেন না। আপনাদের দুই রাজ্যের মধ্যে শত্রুতা চিরদিনের জন্য দূর হোক- আমরা এই কামনা করছি। রাজা লুপাকা একবার শুধু ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর যেমন মাথা নিচু ক'রে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সেভাবেই মাথা নিচু ক'রে আস্তে আস্তে ঘোড়া চালাতে লাগল। চিমা সৈন্যরা রাজা লুপাকার জয়ধ্বনি দিল। তবে সেই জয়ধ্বনি খুব জোরালো শোনাল না। চিমু সৈন্যরা দু'ধারে সার দিয়ে দাঁড়ালো। মাঝখানে রইল ঘোড়ায় চড়া রাজা লুপাকা ও রানী। ওরা আস্তে আস্তে উত্তর মুখো চিমু রাজ্যের দিকে যাত্রা শুরু করল। কিছুক্ষণ উপস্থিত সবাই সেদিকে তাকিয়ে রইল। রাজা রানীকে নিয়ে চিমু সৈন্যরা কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল।

রাতে রাজবাড়ির অন্দরমহলে খাবার ঘরে ফ্রান্সিসরা খেতে বসল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে স্বর্ণমূর্তির সব কথা বলল। একবার চেষ্টা ক'রে খোঁজ পায়নি তাও বলল। তারপর খেতে খেতে বন্ধুদের উদ্দেশে বলল- ভাইসব-হুয়াকা দেবতার স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে আমি, বিস্কো আর শাঙ্কো এখানে এসেছিলাম। সেই স্বর্ণমূর্তি এখনও উদ্ধার করতে পারিনি। হিসেবে একটু গরমিল হচ্ছে তাই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস কয়েকদিনের মধ্যেই আমি সেই স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে পারবো। তাই বলছিলাম- তোমরা কাল সকালে জাহাজে ফিরে যাও। এখানে আমি হ্যারি আর বিস্কো থাকবো।

আমরা কয়েকদিনের মধ্যে কাজ সেরে জাহাজে ফিরে যাবো। ফ্রান্সিস আসতে মারিয়া বলে উঠল- আমিও থাকবো। ফ্রান্সিস হেসে বলল- বেশ তুমিও থাকবে। এমনিতেই ভাইকিং বন্ধুদের মন খারাপ। একটা লড়াই হ'তে হ'তে হ'ল না। ওরা আর এখানে থাকতে চাইছিল না। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল- সমুদ্রতীরে আমাদের জাহাজটা অরক্ষিত অবস্থায় আছে। কোন জলদস্যু এসে যদি জাহাজে চুরি করে নিয়ে যায় তাহ'লে আমরা এই বিদেশে ভীষণ বিপদে পড়বো। কাজেই কাল সকালেই তোমরা জাহাজে ফিরে যাও। ভাইকিং বন্ধুরা কেউ আর কোন আপত্তি করল না। ওরা নিঃশব্দে খেতে লাগল।

সেই রাতে সবাই রাজবাড়িতে অতিথি সমাদরে রইল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিসরা বাদে আর সব ভাইকিংরা সমুদ্রতীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ফ্রান্সিস, হ্যারি, মারিয়া, বিস্কো, শাঙ্কোকে নিয়ে পুরোনো আস্তানায় চলে এল। মেন্তিজো ঐ আস্তানাতেই ছিল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ফ্রান্সিস ভেড়ার চামড়ায় কালি কলম নিয়ে অঙ্ক কষতে বসল। অঙ্ক করে আর কাটাকাটি করে।

মারিয়া ফ্রান্সিসের সেই ভেড়ার চামড়ায় লেখা অঙ্কের সংখ্যা দেখে বলল 'কী ব্যাপার তুমি কি পড়াশোনা শুরু করলে এই বুড়ো বয়সে?'

ফ্রান্সিস হেসে বলল- 'মারিয়া তুমি তো জানো- পড়াশুনার সময়টা কেটেছে আমার বিচিত্র সব অভিযানে।'

-'কী যে বল ফ্রান্সিস? তোমাদের মতো মানুষ একটা জাতির গর্ব। পড়াশুনো তোমার না হয় নাই হলো।' মারিয়া বলল।

-'আজকে কিন্তু একটু দুঃখই হচ্ছে। এই দেখ একটা সাধারণ হিসেব মেলাতে পারছি না।' ফ্রান্সিস বলল।

-'ঠিক আছে আমাকে দাও। আমি মিলিয়ে দিচ্ছি।' মারিয়া বলল।

তখন ফ্রান্সিস মূর্তির কপালে উৎকীর্ণ অঙ্কের সংখ্যা, দাঁতের সংখ্যা, চার-এর পার্থক্য ধরে চার নম্বর দাঁত ভাঙা এবং কিছুই না পাওয়া সমস্ত ব্যাপারটাই বলল। মারিয়া মন দিয়ে শুনল। তারপর চামড়ায় লেখা অঙ্কের সংখ্যাগুলো দেখে বলল - 'ফ্রান্সিস, তুমি একভাবে হিসেব করেছো। হিসেবটা অন্যভাবেও হয়। তুমি পার্থক্য ধরেছো চার-এর। কিন্তু তিন-এর পার্থক্যটাই বোধ হয় ঠিক।'

-'তাহলে তিন সংখ্যার দাঁত?

-'না। কারণ চার নম্বর দাঁতে নিশ্চয়ই খোঁদল পেয়েছো?

-হ্যাঁ পেয়েছি।'

-'তাহলে সেই সঙ্গে তিন সংখ্যার দাঁতের খোঁদলটাও কাছাকাছি রয়েছে। তিন সংখ্যার দাঁতে মূর্তি লুকানো থাকলেও নিশ্চয়ই তার সামান্য অংশ হলেও দেখতে পেতে। ফ্রান্সিস তিন সংখ্যা নয়।'

-'তাহলে?' ফ্রান্সিস বেশ সমস্যায় পড়ল।

-'আচ্ছা, মূর্তির কপালে আর কোন চিহ্ন ছিল?' মারিয়া বলল।

-'না।'

-'কিন্তু আমার মনে হয় অঙ্কের সংখ্যাগুলোর কী ভাবে হিসেব হবে, মানে যোগ হবে না বিয়োগ হবে এরকম কোন ইঙ্গিত ওখানে নিশ্চয়ই আছে। রাজা কোলা নিশ্চয়ই কিছু চিহ্ন রেখেছেন।' মারিয়া বলল।

-'সেটা তাহলে আর একবার দেখতে হয়। তুমিও চলো।' ফ্রান্সিস বলল।

সবাই চলল হুয়াকার বেদীর উদ্দেশ্যে সেখানে পৌঁছে মেস্তিজো মই বেয়ে উঠতে লাগল। ওর মনে তখনও সংশয়। ভালো করে দেখতে লাগল। অঙ্কগুলো ছাড়িয়ে একটু দেখা গেল অস্পষ্ট একটা চিহ্ন। এই চিহ্নটা উনকাদের ভাষায় যোগচিহ্ন। মেস্তিজো অবাক হলো। ও মনে মনে মারিয়ার বুদ্ধির প্রশংসা করল। মই বেয়ে দ্রুতই নেমে এল। ফ্রান্সিসরা সবাই এসে ওকে ঘিরে ধরল। মেস্তিজো মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল-'রাজকুমারী মারিয়া, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। অঙ্কগুলোর পরে একটা অস্পষ্ট যোগচিহ্ন আছে।' মারিয়া খুশির চোটে লাফিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস বলল-'কিন্তু মারিয়া এখন করবে কি করে। চামড়া কালি কলম তো আনিনি।'

-'এই সামান্য হিসেবের জন্যে ওসবের প্রয়োজন নেই।' মারিয়া বলল। তারপর হুয়াকা দেবতার বেদীর সিঁড়িতে বসল। একটা লাল পাথরের টুকরো নিল। সব সংখ্যাগুলো লিখল। ফ্রান্সিসরা ওকে ঘিরে দাঁড়াল। মারিয়া সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল- 'সব সংখ্যা যোগ করলে হয় চল্লিশ। কিন্তু দাঁতের সংখ্যা ষোল। হবে না। যে সংখ্যার দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে তা ষোলোর কম কোনো সংখ্যা।' তারপর মারিয়া সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে নানাভাবে হিসেব করতে লাগল। কিন্তু নিচের সংখ্যা পেল না। ও ভাবল- আচ্ছা যদি প্রত্যেকটি পার্থক্যের সংখ্যাকে যোগ করি । ও বেদীর সিঁড়িতে এইভাবে লিখল-

০ - ৪ = ৩
৪ - ৮ = ৩
৮ - ১২ = ৩
১২ ১৬ = ৩

নিচে টান দিয়ে লিখল — ১২

ফ্রান্সিস বলল- 'তিন সংখ্যা কিভাবে পেলে।'

মারিয়া বলল- 'শূন্য থেকে প্রত্যেকটি সংখ্যা বাদ দিলে পার্থক্য হয় ৩ অঙ্কের। যেমন শূন্য বাদ ১ ২ ৩ = ৩ সংখ্যা তেমনি ৪ বাদ ৫ ৬ ৭ ৩ সংখ্যা। এভাবে পার্থক্যগুলো যোগ করেই পাই - ১২ সংখ্যা।

মারিয়া আনন্দে হাততালি দিয়ে ফেলল। চেঁচিয়ে বলল ফ্রান্সিস, বারো সংখ্যার দাঁত।

ফ্রান্সিস ডাকল 'মেস্তিজো, হাতুড়ি ছেনি নিয়ে চলো।'

দু'জনে মই বেয়ে উঠতে লাগল। মূর্তির মুখের কাছে এসে দুজনে দাঁড়াল। বিকেলের সূর্যের লালচে আলো পড়েছে মূর্তিটায়। ওদিকে নিচের প্রাঙ্গণে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। অবাক চোখে দেখছে ফ্রান্সিসদের কাণ্ড। নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে। হয়তো মূর্তিটা এভাবে নষ্ট করছে ভিনদেশিরা ওদের পছন্দ নয়।

মেস্তিজো দাঁতের ওপরের পাটি থেকে গুনে বারো সংখ্যার হাতুড়ি ছেনি চালাল। বার কয়েক হাতুড়ি ঠুকে ছেনি চালাতেই দাঁতের সামনের পাথরের আস্তরণ খুলে এল। দেখা গেল। হুয়াকা দেবতার সেই আসল স্বর্ণমূর্তি। খোঁদলে বসানো। অস্তগামী সূর্যের আলো পড়েছে সেই মূর্তির চোখে মুখে গায়ে। ঝিকিয়ে উঠছে মূর্তির গা, দু'ছোখে নীলকান্ত মণি, মাথায় কারুকাজ করা মুকুট, গায়ে অলঙ্কার। ফ্রান্সিস অবাক হয়ে দেখতে লাগল মূর্তিটা। একটু পরে ফান্সিস বলল 'মেস্তিজো, আমি বিধর্মী। তোমাদের দেবমূর্ত্তির গায়ে হাত দেব না। তুমি একা মূর্তিটা নিয়ে নামতে পারবে?

-'পারবো। কাঁধে নিয়ে নামবো। কথাটা বলে মেস্তিজো প্রথমে স্বর্ণমূর্তির সামনে কিছুক্ষণ মাথা নত করে রইল। মুখে বিড়বিড় করে কী বলল। তারপর মূর্তিটা খোঁদল থেকে বের করে কাঁধে তুলে নিল। এবার নিচে দাঁড়ানো টিকামার অধিবাসীরা মূর্তিটা দেখতে পেল। সবাই নিঃশব্দে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর মাথা নুইয়ে রইল। চারিদিকে এত লোক। কোনো শব্দ নেই কারো মুখে।

প্রথমে ফ্রান্সিস মই থেকে নেমে এল। বিস্কো আর শাঙ্কো ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস হেসে বলল- কৃতিত্ব আমার নয়,মারিয়ার। ওর অঙ্কের হিসেব ছিল নির্ভুল। মারিয়াও হেসে বলল-কিন্তু সন্ধানের সূত্র তুমিই দিয়েছিলে। সব কৃতিত্ব তোমার।' ফ্রান্সিস হাসল। কোনো কথা বলল না।

মেস্তিজো স্বর্ণমূর্তি কাঁধে নিয়ে মই থেকে নামল। ফ্রান্সিসকে বলল-' এই মূর্তি নিয়ে কী করবো এখন?'

-'তোমাদের দেবতা, সেটা তোমাদের ব্যাপার। আমার কাজ ছিল মূর্তি উদ্ধার, তা আমি করে দিয়েছি। এখন আমরা জাহাজে ফিরে যাবো।' ফ্রান্সিস বলল।

-'স্বর্ণমূর্তিটা তোমরাই নিয়ে যাও না। রাজা লুপাকার হাতে পড়লে ও হয় মূর্তিটা গলিয়ে ফেলবে নয় তো নিজেদের রাজ্যে নিয়ে যাবে।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস হেসে মাথা নেড়ে বলল- স্বর্ণমূর্তির ওপর আমাদের কোনো লোভ নেই। তোমাদের উপাস্য দেবতার মূর্তি। তোমাদেরই থাকবে। ' ওদিকে আসল স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করা হ'য়েছে এই সংবাদ যুবরাজ পিসকোজের কাছে পৌঁছল। যুবরাজ ঘোড়ায় চেপে এল। আসল স্বর্ণমূর্তি দেখে যুবরাজ খুশিতে ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। বারবার বলতে লাগল 'আপনার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।'

-'ও কথা বলবেন না' ফ্রান্সিস বলল- মানুষ হিসেবে আমি আমার কর্তব্য

করেছি মাত্র।

যুবরাজ এবার আমাদের যাবার অনুমতি দিন। আমরা দেশে ফিরবো।

-সে কী ক'রে হয় ফ্রান্সিস। আগামী পূর্ণিমা পাঁচদিন পরে। সেদিন আমার রাজ্যাভিষেক হবে। সেই আনন্দ উৎসবে আপনারা থাকবেন না তাও কি হয়?

রাজপুত্র বলল।

উপায় নেই যুবরাজ, আমরা অনেকদিন দেশ ছাড়া। আমরা কালকেই দেশের দিকে যাত্রা করবো। রাজপুত্র চুপ ক'রে রইল। কী বলবে আর।

ফ্রান্সিস এবার মেস্তিজোর দিকে তাকাল। বলল -'মেস্তিজো, মূর্তি- বেদীতে রেখে তুমি চলো আমাদের পথ দেখিয়ে সমুদ্রতীরে নিয়ে যাবে।'

মেস্তিজো স্বর্ণমূর্তিটা কাধেঁ নিয়ে বেদীতে উঠল। কাঠের মূর্তির পাশে রাখল। মাথা নুইয়ে ভক্তি জানিয়ে নেমে এল। ততক্ষণে মন্দির প্রাঙ্গণে জড়ো হওয়া উনকারা আনন্দে নাচানাচি শুরু করেছে। রাজা লুপাকাও খুশি।

সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল মেস্তিজো। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসরা দেখল চিকামাবাসীরা দলে দলে হুয়াকা দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণের দিকে চলেছে। হাতে তাদের ফুলপাতা। আনন্দে হাসছে ওরা। এতদিন পরে আসল স্বর্ণমূর্তি পাওয়া গেছে। ফ্রান্সিস এই ভেবে খুশি হলো এতগুলো মানুষের মুখে ও হাসি ফোটাতে পেরেছে।

মরুভূমির পথ নয়। অন্য পাহাড়ী পথে মেস্তিজো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওদের সমুদ্র তীরে পৌঁছে দিল। জাহাজে উঠতে উঠতে ফ্রান্সিস ডাকল-'মারিয়া।'

'বলো।'

-'এবারও আমাদের হাত শূন্য।' ফ্রান্সিস বলল।

-'তা হোক। এজন্য আমার মনে কোনো দুঃখ নেই,' মারিয়া বলল।

সমাপ্ত

চুনী পান্নার রাজমুকুট

চুনী পান্নার রাজমুকুট

ফ্রান্সিস, মারিয়া আর ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা যখন জাহাজে উঠল তখন রাত্রি নেমেছে। ফ্রান্সিস আর মারিয়া জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়াল। ওদের ঘিরে দাঁড়াল ভাইকিং বন্ধুরা। সবাই আনন্দে আত্মহারা। কেউ হেঁড়ে গলায় গান গাইছে, কেউ নাচছে। চিকামার গুপ্ত দেবমূর্তি উদ্ধার করেছে ফ্রান্সিস আর মারিয়া।

এবার ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব। আস্তে আস্তে গোলমাল থেমে গেল। সবাই চুপ করল। ফ্রান্সিস বলল—ভাইসব, গুপ্ত স্বর্ণমূর্তি আমরা উদ্ধার করেছি। আমরা সফল। তবে এর আগে মূল্যবান কিছু না কিছু নিয়ে আমরা স্বদেশে ফিরেছি। এবার আমাদের হাত শূন্য। কিন্তু আমি এজন্যে দুঃখিত নই। আমি ভালোবাসি দুঃসাহসিক অভিযান আর বুদ্ধির খেলা। সেদিক দিয়ে আমাদের অভিযান সফল। বুদ্ধির খেলাতেও আমরা জয়লাভ করেছি। এবার ভাইসব, আজ রাতটুকু বিশ্রাম করে কাল ভোরেই যাত্রা শুরু করবো স্বদেশের দিকে। ফ্রান্সিস থামতেই সব ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া চলল নিজেদের কেবিনের দিকে। অন্য ভাইকিংরাও কেউ কেউ গেল কেবিনে, কেউ কেউ জাহাজের ডেকে দল বেঁধে বসল। গল্পগুজব, ছক্কাপাঞ্জা খেলা শুরু হলো।

পরদিন ভোরে ভাইকিংরা ঘুম থেকে উঠে পড়ল। ডেকে এসে দেখল বাতাস বেশ পড়ে গেছে। শুধু পাল খাটালেই জাহাজের গতি বাড়বে না। তাই একদল চলে গেল দাঁড়ঘরে। সেখানে সারি সারি দাঁড় টানার আসনে বসল। ওদিকে ঘড়ঘড় শব্দে নোঙর তোলা হলো। পাল খাটানো শেষ হলো। দাঁড়ীরা দাঁড় টানা শুরু করল। জাহাজ চলল উত্তরমুখো, ভাইকিংদের দেশের দিকে।

মাস চারেক কেটে গেল। জাহাজ চলেছে। এর মধ্যে তিন চারটে বন্দরে জাহাজ ভেড়াতে হয়েছে। জাহাজের মেরামতির কাজ হয়েছে। খাদ্য, জল সংগ্রহ করতে হয়েছে। বার তিনেক ঝড়ের পাল্লায়ও পড়তে হয়েছে ওদের।

তখন জাহাজ ইউরোপের কাছে এসেছে। স্বদেশ আর বেশি দূরে নয়।

সেদিন বিকেল থেকেই আকাশে মেঘের জটলা দেখা গেল। সূর্য ডোবার আগেই গ্রামভাউসা বন্দর এলাকা সমুদ্র অন্ধকার হয়ে গেল। ফ্রান্সিস কেবিনঘরে শুয়েছিল। মারিয়া বিছানায় বসে রুমাল সেলাই করছিল। কাজের মধ্যেই ফ্রান্সিসের সঙ্গে গল্পও করছিল। আকাশে মেঘ জমা বাতাস পড়ে যাওয়া এসব ফ্রান্সিস মারিয়া বুঝতে পারেনি। জাহাজের নজরদার মাস্তুলের মাথায় ওর জায়গা থেকে নেমে এল। ডেক-এ বিশ্রামরত দু'তিনজন ভাইকিং-এর কাছে এল। নজরদার হাত তুলে ওদের আকাশের অবস্থা দেখাল। ওরা ভাইকিং। সমুদ্রের সঙ্গে ওদের নাড়ির টান। ওরা বুঝতে পারল ঝড় আসছে। একজন ভাইকিং ছুটল কেবিনঘরের বন্ধুদের আসন্ন ঝড়ের খবর দিতে। ঝড়ের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে সবাইকে তৈরি হতে

হবে তো। হ্যারি তখনই সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে আসছে। ভাইকিং বন্ধুটি সিঁড়ির গোড়ায় হ্যারিকে দেখল। বলল—হ্যারি শিগগির ফ্রান্সিসকে খবর দাও। সাংঘাতিক ঝড় আসছে। হ্যারিও একনজর মেঘে অন্ধকার আকাশটা দেখেই বুঝল ঝড় আসতে বেশি দেরি নেই। হ্যারি ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে। খবর শুনে ফ্রান্সিস মারিয়া দু'জনেই জাহাজের ডেক-এ উঠে এল।

ততক্ষণে জাহাজে 'সাজো' 'সাজো' রব পড়ে গেছে। ভাইকিংরা চিৎকার করে পরস্পরকে ডাকাডাকি শুরু করল। সকলে ডেক-এ এসে জড়ো হল। দু'চারজন দড়িদড়া বেয়ে উঠে পাল নামিয়ে ফেলল। দাঁড়ঘরে দাঁড়ীরা দাঁড়টানা বন্ধ করল। জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়াল সবাই। সবাই তৈরি হল ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে। ফ্রান্সিস মারিয়াকে বলল—তুমি এখানে থেকো না। কেবিনঘরে নেমে যাও। মারিয়া মাথা নাড়ল। ফ্রান্সিস বলল—ছেলেমানুষি করো না। যা বুঝছি প্রচণ্ড ঝড় আসছে। ডেক-এ থাকলে তুমি টাল সামলাতে পারবে না। আহত হবে। নিচে নেমে যাও।

—রাজকুমারী আপনি কেবিনঘরে চলে যান। এ সময় ডেক-এ থাকা বিপজ্জনক। হ্যারি বলল। মারিয়া আর আপত্তি করল না। বাধ্য মেয়ের মত সিঁড়ি দিয়ে নেমে কেবিনঘরে চলে গেল।

ওদিকে সূর্য-ঢাকা প্রায় অন্ধকার আকাশে বিদ্যুতের চোখ ধাঁধানো আঁকাবাঁকা রেখা আকাশটাকে যেন চিরে ফেলতে লাগল। তারপরই উন্মত্ত দানবের মত প্রচণ্ড বেগে ঝড় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহাজটার ওপর। বিরাট বিরাট ফেনাভরা ঢেউয়ের মাথায় জাহাজটা উঠতে লাগল পরক্ষণেই ঢেউয়ের ফাটলে নেমে যেতে লাগল। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে উত্তাল সমুদ্রের জলে কলার মোচার মত জাহাজের ওঠাপড়া চলল। শক্তহাতে হুইল ধরে জাহাজের গতি উত্তরমুখো রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল ফ্রান্সিস। কিন্তু ঝড়ের তাণ্ডবে ঝড়ো হাওয়ার প্রচণ্ড ধাক্কায় জাহাজ যে কোনদিকে দ্রুতগতিতে চলল ফ্রান্সিস তা আন্দাজ করতে পারল না। ভাইকিংরা দড়িদড়া প্রাণপণে টেনে ধরে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগল। ডেক-এর ওপর দিয়ে বিরাট বিরাট ঢেউ জাহাজের এপার থেকে ওপারে আছড়ে পড়তে লাগল। ডেক-এ জলস্রোত রইল। সব ভাইকিং ভিজে নেয়ে উঠল। চলল ঝড়ের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই।

মাস্তুলের মাথায় নজরদার মাস্তুল আঁকড়ে ধরে বসে আছে। মাস্তুল একবার এদিকে হেলছে একবার ওদিকে। কিন্তু নজরদার ওস্তাদ নাবিক। ঠিক ঐ দুলুনির মধ্যেই চুপ করে বসে আছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে—বুঝতে চেষ্টা করছে কোনদিকে ওরা যাচ্ছে। কিন্তু দেখবে কী বুঝবেই বা কী? চারদিকে অঝোর বৃষ্টিধারা আর ছিটকে-ওঠা সমুদ্রের জল একটা ঘন ধোঁয়াটে আবরণের সৃষ্টি করেছে। তার মধ্যে দিয়ে নজরদার প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তবু হঠাৎ যেন খুব অস্পষ্ট দু'পাশে দু'টি পাহাড়ি ডাঙা দেখতে পেল। ও চোখ কচলে ভালো করে দেখবার চেষ্টা করল দু'পাশের পাহাড়ি ডাঙা। কিন্তু তখন আরো জোরে বড়বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমেছে। চারদিক আরো ঝাপসা হয়ে গেল। ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় জাহাজটাও যেন

জলের ওপর ছিটকে ছিটকে গড়িয়ে চলছে। নজরদার আর কিছুই দেখতে পেল না।

আস্তে আস্ত ঝড়ের প্রচণ্ডতা কমতে লাগল। আকাশে মেঘ আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল। আকাশ বেশ পরিষ্কার হল। পশ্চিমদিগন্তে দেখা গেল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সূর্য ডুবে গেল যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে। চারদিক অন্ধকার হ'য়ে আসতে লাগল। সব ভাইকিংরা সপ্‌সপে ভেজা পোশাক নিয়ে এতক্ষণ ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্তিতে ডেক-এর এখানে ওখানে শুয়ে ছিল বসে ছিল। এখন সবাই উঠে পোশাক পাল্টাতে চলল।

রাতে পরিষ্কার আকাশে তারা ফুটল। চাঁদের আলোয় সমুদ্রের ঢেউয়ের নরম ঝিকিমিকি দেখা গেল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। একটু পরে মারিয়াও এল। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে তাকাতে একটু আশ্চর্য হয়ে বলল—হ্যারি, লক্ষ্য করেছো এখানে সমুদ্র খুব শান্ত। জলের রঙও গভীর নীল। আমরা কি অন্য কোন সমুদ্রে এসে পড়লাম? চারদিক দেখতে দেখতে হ্যারি বলল—ঠিকই বলেছো—এরকম সমুদ্র আমরা পেয়েছিলাম যেবার সোনার ঘণ্টা উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম। মারিয়া বলল—আর একটা জিনিস লক্ষ্য করো—শীত কিন্তু অনেক কম। গরমও বেশি নয়। তার মানে আমরা একটা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এসে পড়েছি।

—আপনি ঠিক কথাই বলেছেন রাজকুমারী—হ্যারি বলল—আমার মনে হয় আমরা ঠাণ্ডার দেশ ইউরোপ থেকে দূরে—বেশ দূরে চলে এসেছি।

ফ্রান্সিস বলল—চলো তো—জাহাজ চালকের কাছে যাই। ও কী বলে দেখা যাক। তিনজনেই জাহাজ চালকের কাছে এল। চালক ওর হুইল ধরে এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল—বলতে পারো ঝড়ের ধাক্কায় আমরা কোথায় চলে এসেছি? চালক মাথা নাড়ল। বলল—কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে এই শান্ত সমুদ্র দেখে গরম দেখে



বলতে পারো ঝড়ের ধাক্কায় আমরা
কোথায় চলে এসেছি?

মনে হচ্ছে আমরা পর্তুগাল বা স্পেনের কাছে আসিনি। আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। এখন যে কোন দেশ বা দ্বীপ পেলে জানতে পারবো আমরা কোথায় এসেছি। এখন কতকটা আন্দাজেই জাহাজ চালিয়ে যাচ্ছি। দেখি কোন দেশ বা দ্বীপে পৌঁছোতে পারি কিনা।

—হুঁ—এ তো চিন্তার কথা। ফ্রান্সিস চিন্তিতমুখে বলল। মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল এখন কী করবে ওরা। হ্যারি তখনই মাস্তুলের মাথার দিকে তাকিয়ে নজরদারকে গলা চড়িয়ে ডাকল—পেড্রো—একবার নেমে এসো তো। নজরদার পেড্রো—মাস্তুলে বাঁধা দড়ির মই বেয়ে নেমে এল। পেড্রো কাছে আসতে হ্যারি বলল—ডাঙা দেখতে পেলে? পেড্রো মাথা নাড়ল।

—কোথায় এসেছি বলে তোমার মনে হচ্ছে? ফ্রান্সিস বলল।

—কী করে বলবো। ঝড়ের পাল্লায় পড়ে আমরা দিক ভুল করেছি। এখন কোনদিকে যাচ্ছি কিছুই বুঝতে পারছি না। পেড্রো বলল।

—আচ্ছা পেড্রো—মারিয়া বলল—তুমি কি ঝড়ের সময় কোনদিক থেকে ঝড় বইছে কোনদিকে আমরা যাচ্ছি বুঝতে পারো নি? পেড্রো কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—ডানদিকে অর্থাৎ গরমের দেশগুলোর দিকে জাহাজ বাঁক নিয়েছিল এটা বুঝেছি।

—নজরে পড়ার মত কিছু দেখো নি? মারিয়া বলল। পেড্রো আবার ভাবতে লাগল। তারপর বলল—ঝড়ের সময় জোর হাওয়ায় ছিটোনো বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তবে আমি তখন যেন আবছা দেখেছি দু'ধারে দুটো পাহাড়ের মত উঁচু ডাঙা! পাথুরে ডাঙা।

—দু'দিকে দুটো পাথুরে উঁচু ডাঙা? কথাটা মারিয়া আপনমনে বলল। ভাবতে লাগল—কী হতে পারে ঐ দুটো ডাঙা।

—আমার দেখার ভুলও হতে পারে। পেড্রো বলল। মারিয়া কোন কথা না বলে ভাবতে লাগল। তারপর কী একটা ভেবে নিয়ে মারিয়া চমকে উঠল। বলল—ফ্রান্সিস আমরা একটা প্রণালী পেরিয়ে এসেছি। তার মানে আমরা ডানদিকে অনেকটা চলে এসেছি—গ্রীসের কাছাকাছি। ইউরোপ থেকে গ্রীসে আসতে গেলে একটা প্রণালী পেরিয়ে আসতে হয়।*

—বলো কি? তাহলে তো অনেকটা চলে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল—এবার তো ফিরতে হয়।

—আমার অনুমানটা ঠিক কিনা সেটা বুঝতে হলে কোন ডাঙায় পৌঁছোতে হবে। আগে তো কোন ডাঙা পাই—লোকজন পাই—কথা বলি—তারপর সব বুঝে নিয়ে জাহাজের গতি ঠিক করা যাবে। মারিয়া বলল।

—আমিও তাই বলি—হ্যারি বলল—এখন জাহাজ যেমন চলছে চলুক—দেখা যাক কোথায় গিয়ে ডাঙা পাই।

---

* আসলে ফ্রান্সিসদের জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ঝড়ের ধাক্কায় আজকের জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে ক্রীট দ্বীপ, গ্রীসের দিকে যাচ্ছিল।—লেখক

—পেড্রো—ফ্রান্সিস বলল—তোমার জায়গায় যাও—দিনরাত নজরদারি চালাও—দেখ ডাঙার দেখা পাও কিনা।

জাহাজ চলল।

দু'দিন পরে সকালবেলা মাস্তুলের ওপর বসে থাকা নজরদার পেড্রো চিৎকার করে উঠল—ডাঙা—ডাঙা দেখা যাচ্ছে। কথাটা ডেকে বসে থাকা ভাইকিংদের কানে গেল। সবাই জাহাজের রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসও এসে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল দূরে পাথুরে ডাঙা দেখা যাচ্ছে। টিলা আর পাথরের চাঁই ছড়িয়ে আছে এদিক ওদিক। জাহাজ আরো কাছে আসতে দেখা গেল এদিকটায় অত টিলা বা পাথরের চাঁই নেই। বন্দরমতো। দুটো জাহাজ নোঙর বাঁধা রয়েছে। জাহাজ দুটো একেবারে পাথুরে মাটির ধারেই ভাসছে। জাহাজ দুটোর মাথায় কোনো পতাকা উড়ছে না। কাছাকাছি আসতে ফ্রান্সিস ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দেখল একটা জাহাজের সামনের দিকে কালো কাঠ অনেকটা চটে উঠে গেছে। অন্য জাহাজের সঙ্গে জোর ধাক্কা লাগলে এরকম হয়। ফ্রান্সিস বুঝল—এটা যুদ্ধ জাহাজ। ততক্ষণে হ্যারি, মারিয়া আর বিস্কো ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি, একটা জাহাজ বোধহয় মালবাহী। অন্যটা মনে হচ্ছে যুদ্ধজাহাজ। ঠিক বুঝতে পারছি না এখানে আমাদের নামা উচিত হবে কি না।

হ্যারি বলল—আমরা তো আর যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। তবে ভয় কিসের? তাছাড়া আমরা সমুদ্রে পথ হারিয়েছি। এটা কোন দ্বীপ বা দেশ সেটা জানতে পারলে আমাদের পথ খুঁজে পাওয়ার সুবিধে হবে।

মারিয়া বলল—একটা ব্যাপার দেখ, দুটো জাহাজই কিন্তু জনশূন্য। কোনো পাহারাদারও নেই। অদ্ভুত ব্যাপার!

উপায় নেই। বোঝাই যাচ্ছে এটা একটা বন্দর। খোঁজখবর নিতে নামতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি জাহাজ-চালকের কাছে গেল। বলল—যতটা কাছে সম্ভব জাহাজ ভেড়াও। খোঁজখবর নেবার জন্যে কয়েকজনকে নামতে হবে।

দুটো জাহাজের পাশ দিয়ে গিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজ পাথুরে ডাঙার কাছে এসে থামল। তখনও দেখা গেল জাহাজ দুটো ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। ফ্রান্সিসদের জাহাজ থেকে কাঠের পাটাতন নামানো হলো। তীরে গিয়ে পাটাতন ঠেকল। এবার নামা হবে কিনা তাই নিয়ে ফ্রান্সিসদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো। জাহাজ-চালকও ওদের কাছে এল। বলল—আমরা প্রবল ঝড়ে ছিটকে কোথায় চলে এসেছি কিছুই বুঝতে পারছি না। কাজেই এখানে নেমে খোঁজখবর করতেই হবে। অন্তত একজন মানুষকে পেলেও জানতে পারবো জায়গাটার নাম কী? তখন দিক ঠিক করে জাহাজ চালাতে পারবো।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—হ্যারি কী করবে এখন?

হ্যারি বলল—বিস্কো কয়েকজনকে নিয়ে নামুক। বন্দর যখন তখন লোকজন নিশ্চয়ই আছে। দেখ সামনে দুটো পাথরের টিলামতো। মনে হয় ও দুটোর ওপাশে মানুষের বসতি আছে।

ঠিক আছে। বিস্কো তুমি কয়েকজনকে সঙ্গে নাও। অস্ত্র নিও না। তোমাদের

সশস্ত্র দেখলে লোকজন ভয় পেতে পারে। তাছাড়া আমরা তো লড়াই করতে যাচ্ছি না। ফ্রান্সিস বলল।

চারজন ভাইকিং বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বিস্কো পাটাতন দিয়ে হেঁটে গিয়ে তীরে নামল। তীরের ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। চারদিকে তাকিয়ে দেখতেও লাগল। কিন্তু মানুষ বা বাড়িঘর দেখতে পেল না। জাহাজ থেকে ফ্রান্সিসরা দেখল বিস্কোরা টিলা পার হয়ে নেমে গেল। আর ওদের দেখা গেল না।

ফ্রান্সিসরা জাহাজে অপেক্ষা করতে লাগল কখন বিস্কোরা ফিরে আসে।

বেলা বাড়তে লাগল। কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় হলো। কিন্তু বিস্কোরা ফিরল না। ফ্রান্সিসরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। কেউ খেতে বসল না। সবাই তীরের টিলার দিকে তাকিয়ে রইল।

বেলা আরও বাড়ল। তবু বিস্কোদের দেখা নেই। এবার ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—হ্যারি, বিস্কোরা নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছে। চলো, শাঙ্কো আর কয়েকজনকে নিয়ে আমরা নামি। বিস্কোদের খোঁজ করতেই হবে।

বেশ চলো। হ্যারি বলল।

আমিও যাবো। মারিয়া বলল।

উঁহু, ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল—আগে আমরা বিস্কোদের খোঁজ নিয়ে আসি তারপর তুমি নামবে।

কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু এগিয়ে এল। একজন বলল—ফ্রান্সিস তোমার সঙ্গে আমরাও যাবো।

বেশ, সবাই তরোয়াল নিয়ে এসো। হ্যারি যাও, আমার তরোয়ালটাও নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

তরোয়াল কোমরে গুঁজে প্রথমে ফ্রান্সিস আর হ্যারি পাথুরে মাটিতে নামল। পেছনে অন্য বন্ধুরা। তীরের ঢাল পেরিয়ে ওরা টিলাটার কাছে এল। ফ্রান্সিস চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে হেঁটে চলেছে। টিলাটা পার হতেই দেখল চারদিকে ছোট ছোট পাথরের চাঁই ছড়ানো। তারই মধ্যে বেশ কিছু পাথরের বাড়িঘর। কিন্তু পাথুরে পথে বা বাড়িঘরে কোনো লোকজন দেখা যাচ্ছে না।

ওরা টিলা থেকে ঢালু পথ বেয়ে নেমে এগিয়ে চলল বাড়িঘরগুলোর দিকে। পথের দুপাশে পাথরের খাড়া খাড়া চাঁই। তারই মধ্যে দিয়ে ওরা চলল। তখনই ফ্রান্সিস দেখল, পাথরের চাঁইগুলোর ওপাশে বেশ কিছুটা সমতল জায়গা। ঘাসে ঢাকা। সেই জায়গাটা থেকে ধোঁয়া উঠছে। ভালো করে নজর দিয়ে দেখল একটা পাথর দিয়ে তৈরি বড় উনুন। তখনও আগুন জ্বলছে। ধোঁয়া উঠছে উনুন থেকে। উনুনের ওপরে একটা লম্বা লোহার ডাণ্ডা বাঁধা। সেই লোহার ডাণ্ডায় পাঁচ সাতটা ছাল-ছাড়ানো ভেড়া ঝুলছে। ভেড়ার মাংস আগুনে ঝলসানো হচ্ছে। ফ্রান্সিস এটা দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল। মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি, আমরা বোধহয় বিপদে পড়লাম। ফ্রান্সিস দ্রুত ভাবতে লাগল কী করবে এখন। পিছু ফিরে জাহাজের দিকে ছুটবে না এগিয়ে যাবে। কিন্তু ফ্রান্সিস কোনো কিছু করারই অবকাশ পেল না। হঠাৎ ফ্রান্সিসরা দেখল রাস্তার দু'পাশের পাথরের চাঁইগুলোর আড়াল থেকে নিঃশব্দে

উঠে দাঁড়াচ্ছে সশস্ত্র সৈন্যরা। তাদের মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ, বুকে বর্ম হাতে খোলা তরোয়াল। ওদিকে লম্বাটে দুটো পাথরের ঘর থেকে সশস্ত্র সৈন্যরা বেরিয়ে আসতে লাগল। বাড়িঘরের দরজা জানালা খুলে গেল। লোকজন বেরিয়ে আসতে লাগল। এতক্ষণে যেন ঘুম ভেঙে এই অঞ্চলটা জেগে উঠল। পাথরের চাঁইগুলোর আড়াল থেকে সশস্ত্র সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে দ্রুত নেমে এল। ঘিরে দাঁড়াল ফ্রান্সিসদের। অন্য সৈন্যরাও তাদের ছাউনি থেকে বেরিয়ে এদিকে আসতে লাগল।



পাথরের চাঁইগুলোর আড়াল থেকে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াচ্ছে সশস্ত্র সৈন্যরা।

সৈন্যদের সাজসজ্জা দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল এরা দুর্ধর্ষ গ্রীক সৈন্যদের মতো যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত। এদের একজনের সঙ্গে হয়তো তরোয়ালের লড়াই চালানো যায় কিন্তু কয়েকজনের সঙ্গে লড়াই চালানো অসম্ভব। এখন ওরা তো মাত্র ছ'জন আর ঐ সুসজ্জিত সৈন্যরা সংখ্যায় একশোরও বেশি। কাজেই লড়াই করতে যাওয়া মানে মৃত্যু ডেকে আনা। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—সবাই তরোয়াল ফেলে দাও। ও নিজেই প্রথম পাথুরে রাস্তায় তরোয়াল ফেলে দিল। হ্যারি আর অন্যেরাও তরোয়াল ফেলে দিল। শাঙ্কো তীর-ধনুক ফেলে দিল। একজন সৈন্য সেই তরোয়াল তীর-ধনুক তুলে নিল। ছাউনি থেকে যে সৈন্যরা আসছিল তাদের সবার সামনে ছিল একজন দীর্ঘদেহী সৈন্য। মুখে সামান্য দাড়ি-গোঁফ। বেশ স্বাস্থ্যবান। সে ফ্রান্সিসদের সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে কী জিজ্ঞেস করল। ফ্রান্সিসের বন্ধুদের মধ্যে হ্যারি ছিল সুশিক্ষিত। ও গ্রীক ভাষা, মোটামুটি জানত। হ্যারি সেই সৈন্যদের দলপতির ভাষা একটু বুঝল। দলপতি জানতে চেয়েছিল, ওরা কারা, কোত্থেকে এসেছে। হ্যারি ভাঙা ভাঙা গ্রীক ভাষায় বলল—আমরা ভাইকিং। চিকামা নামে একটা জায়গা থেকে আমরা ফিরে আসছিলাম। সমুদ্রপথে প্রচণ্ড ঝড়ে আমরা দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে এখানে এসে পড়েছি। আমরা যুদ্ধ চাই না।

দলপতি বলল—কিছুক্ষণ আগে আমরা কয়েকজনকে বন্দী করেছি। তারাও কি তোমাদের সঙ্গে এসেছে?

হ্যাঁ তারাও ভাইকিং। আমাদের বন্ধু। কথাটা বলে হ্যারি জিজ্ঞেস করল এটা কি গ্রীকদেশ?

না, ক্রীট দ্বীপ। এই বন্দরের নাম ফালাসর্ন। পশ্চিম ক্রীটের বন্দর।

আমাদের বন্দী করা হচ্ছে কেন? আমরা তো কোনো অপরাধ করিনি।

সেসব আমাদের বিদ্রোহী নেতা এনরিকো বুঝবেন। কালকে তাঁর কাছে তোমাদের হাজির করা হবে। তিনি যা করতে বলবেন, তাই করা হবে।

এবার হ্যারি ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। দলপতির সঙ্গে যা কথা হলো সব বলল। দলপতি জিজ্ঞেস করল—তোমাদের জাহাজে আরো লোকজন আছে?

হ্যাঁ, হ্যারি বলল—তাদেরও কি বন্দী করা হবে?

হ্যাঁ সবাইকে। চলো জাহাজের দিকে। দলপতি হাত তুলে ইঙ্গিত করল। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল দলপতির কথাটা। ফ্রান্সিস বলল—ওকে বলো যে আমরা দু'জন ওদের সঙ্গে যাবো। জাহাজের বন্ধুদের আত্মসমর্পণ করতে বলবো। অযথা রক্তপাত আমরা চাই না। হ্যারি দলপতিকে সে কথা বলল। দলপতি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ফ্রান্সিস ও হ্যারি এগিয়ে এল। আট দশজন সৈন্য শাঙ্কোদের নিয়ে পেছনের ঘরবাড়ির দিকে চলে গেল।

সবার আগে ফ্রান্সিস আর হ্যারি। পেছনে দলপতি আর বিশ পঁচিশজন চলল জাহাজঘাটার দিকে। জাহাজের কাছে এসে ফ্রান্সিস দেখল মারিয়া আর অন্য ভাইকিং বন্ধুরা জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্রোহী নেতা এনরিকোর সৈন্যদল দেখেই ওরা বুঝল ফ্রান্সিসরা বন্দী হয়েছে।

ফ্রান্সিস জাহাজের কাছে এল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, আমরা বন্দী হয়েছি। সবাই জাহাজ থেকে নেমে এসো। কেউ অস্ত্র নিয়ে আসবে না। মারিয়া আর অন্য ভাইকিংরা বুঝল এখন আত্মসমর্পণ ছাড়া কোনো উপায় নেই। ওরা আস্তে আস্তে জাহাজ থেকে নেমে আসতে লাগল। সৈন্যরা সবাইকে ঘিরে দাঁড়াল। দলপতি হ্যারিকে বলল—জাহাজে ওঠো, আর কেউ আছে কিনা খুঁজে দেখব। হ্যারিকে নিয়ে দলপতি জাহাজে উঠল। রসুইঘরে দুজন ভাইকিং খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ওরা ফ্রান্সিসের কথা শুনতে পায়নি। সেই দুজনকে নিয়ে দলপতি আর হ্যারি জাহাজ থেকে নেমে এল।

দলপতি হাত তুলে সবাইকে ছোট টিলাটার দিকে হাঁটতে নির্দেশ দিল। দলপতি সবার সামনে। পেছনে ফ্রান্সিস, হ্যারি, মারিয়া আর অন্য ভাইকিংরা। ওদের ঘিরে নিয়ে সৈন্যরা চলল। যেতে যেতে মারিয়া বলল—কী ব্যাপার বলো তো। এরা কারা? ফ্রান্সিস বলল—এরা বিদ্রোহী নেতা এনরিকোর সৈন্য। এটা ক্রীট দ্বীপ। জানি না এখানকার রাজা কে? এনরিকো কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তাও জানি না। যাক গে, ওরা কালকে আমাদের এনরিকোর সামনে নিয়ে যাবে। দেখা যাক এনরিকো কী হুকুম দেয়।

টিলামতো জায়গাটা পার হয়ে বেশ কিছুটা হেঁটে এল সকলে। একটা লম্বাটে পাথরের ঘরের সামনে এসে দলপতি দাঁড়াল। ঘরটার ছাদও পাথর গেঁথে তৈরি। একটা মাত্র লোহার দরজা। সেই লোহার গরাদ দেওয়া দরজার সামনে খোলা

তরোয়াল হাতে দুজন পাহারাদার সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। দরজার গরাদের ফাঁক দিয়ে বিস্কো আর দু তিন জনের মুখ দেখা গেল। ফ্রান্সিস বুঝল এটা কয়েদঘর। খুব চিন্তায় পড়ল ফ্রান্সিস। এনরিকো যদি ওদের মুক্তি না দেয় তাহলে যে করেই হোক পালাতে হবে। সবাই দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দলপতির নির্দেশে একজন পাহারাদার সৈন্য দরজায় লাগানো বড় তালাটা খুলল। ফ্রান্সিস, মারিয়া, হ্যারিসহ সবাইয়ের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো। তারপর একে একে কয়েদঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো।

ভেতরে ঢুকে ফ্রান্সিস দেখল কয়েদঘরটা লম্বাটে ধরনের। ছাদের কাছে কয়েকটা ফোকর। মেঝেয় শুকনো ঘাস বিছানো। সেখানে বন্দীরা শুয়ে বসে আছে। বিস্কো এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস, এভাবে বন্দী হয়ে থাকার চেয়ে লড়াই করে মরা ভালো।

বিস্কো, ছেলেমানুষী করো না। দেখা যাক ওদের নেতা এনরিকো কী বলে। তারপর সময় সুয়োগমতো পালাতে হবে। এখন চুপচাপ থাকো। বিস্কো বলল—এই এনরিকো কে, এই সৈন্যরা কী করতে চায় এসব তুমি জানো?

না! ফ্রান্সিস বলল। তখন বিস্কো বলল, তুমি এদিকে এসো। এখানে একটা লোক কিছুদিন যাবৎ বন্দী হয়ে আছে। নাম কাভাল্লি। ও এখানকার অনেক খবরাখবর জানে।

চলো তো কাভাল্লির কাছে, ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারি আর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরাও এসো। বিস্কো ওদের ঘরের কোণার দিকে নিয়ে গেল। কাভাল্লি তখন ঘাসের বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। ফ্রান্সিসরা ওর সামনে এসে বলল। কাভাল্লির পরণে জোব্বামতো। মোটা কাপড়ের। ফ্রান্সিস কয়েদ ঘরের দিকে আসার সময় এরকম পোশাক পরা স্থানীয় লোকদের দেখেছে। বিস্কো ডাকল—কাভাল্লি—কাভাল্লি। কাভাল্লি চোখ মেলে তাকাল। বিস্কো ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বলল—এ ফ্রান্সিস, ও রাজকুমারী মারিয়া ও হ্যারি। এরা সবাই আমার বন্ধু। ফ্রান্সিস তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে।

কাভাল্লি, তুমি কি এই ক্রীটের লোক? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

না—পর্তুগালে আমার বাড়ি। কাভাল্লি পর্তুগীজ ভাষায় বলল—তবে এখানে এসে গ্রীকভাষাও শিখেছি।

তুমি এখানে এসেছিলে কেন? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

সে এক ইতিহাস—কথাটা বলে কাভাল্লি আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল।

তুমি ক্রীটে কবে এসেছিলে? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

প্রায় পনেরো বছর আগে। বড় অভাবের সংসার ছিল আমাদের। তাই ভাগ্য ফেরাতে একদিন দেশ ঘর ছেড়ে একটা মালবাহী জাহাজে কাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এই ক্রীট দ্বীপের উত্তরে খানিয়া বন্দর। ক্রীটের রাজধানীও খানিয়া। সেই নগরে এখানে ওখানে থাকলাম কিছুদিন। তারপর হঠাৎই খানিয়ার বিখ্যাত মোজেক শিল্পীর নজরে পড়লাম। তখন মোজেকের মিস্ত্রীর কাজ করছিলাম। সেই মোজেক শিল্পী তার নিজের বাড়িতে আমাকে রাখল। মোজেকের কাজে আমার

খুব আগ্রহ দেখে আমাকে যত্ন নিয়ে কাজ শেখাতে লাগল। কয়েক বছরের মধ্যেই আমি পাকা মিস্ত্রী হয়ে গেলাম। তখন শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাট ক্রীটে রাজত্ব করছেন। বাইজেন্টাইনরা শিল্পীমনের মানুষ। নগরে প্রাসাদে, দুর্গের দেয়ালে মেঝেয় বিচিত্র মোজেকের কাজ করাত তারা। ছবিও আঁকাত। মোজেক মিস্ত্রীর খুব চাহিদা তখন। কাভাল্লি থামল।

তারপর? হ্যারি বলল।

শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাট তখন খানিয়া দুর্গে থাকতেন। তাঁর শয়নকক্ষের দেয়াল মেঝে মোজেক করার ডাক পেলাম আমি। খুব মন দিয়ে চারজন সহকর্মী নিয়ে কাজ শুরু করলাম। সম্রাট প্রত্যেকদিন কাজ দেখতে আসতেন। তিনি নিজেও শিল্পী ছিলেন। নিজেই ভেড়ার চামড়ায় রঙ দিয়ে নকশা এঁকে দিতেন। আমরা তাই দেখে দেখে কাজ করতাম। প্রায় এক বছরে কাজ শেষ হলো। সম্রাট খুব খুশি হলেন কাজ দেখে। এবার সম্রাট নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর রাজমুকুট, পোশাক-পরিচ্ছদ, নানা কারু-কাজ করা সোনার রাজদণ্ড, হাতির দাঁতের হাতলওলা তরোয়াল, বিচিত্র রঙে মিনে করা তরোয়ালের খাপ, ছোরা, দামি পাথরের অলঙ্কারমালা এসব সেই সজ্জাকক্ষে আনিয়ে রাখলেন। সভাকক্ষের যে দেখাশুনা করতো সে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সম্রাট তাকে স্বর্ণমুদ্রা বকশিশ দিয়ে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। সজ্জাঘরের সব দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। আমিই সম্রাটকে রাজসভায় যাবার আগে পোশাক পরিয়ে দিতাম। মুকুট পরিয়ে সাজিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার ভাগ্যে সুখ শান্তি নেই।

কেন? কী হলো তারপর? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

একটু ইতিহাস বলি। কনস্ট্যান্টিনোপলে তখন চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ চলছিল। সেই যুদ্ধে হেরে গিয়ে একদল সৈন্য জাহাজে চড়ে ক্রীটে এল। তাদের নেতা ছিল বোনিফেস। সম্রাট আগেই গুপ্তচর মারফৎ খবর পেয়েছিলেন যে বোনিফেস তার সৈন্যদল নিয়ে খানিয়া আসছে। উদ্দেশ্য ক্রীট দখল করা। যা হোক, খানিয়া বন্দরে বোনিফেসের সৈন্যদের সঙ্গে সম্রাটের সৈন্যদের দুদিন ধরে যুদ্ধ হলো। সম্রাটের সৈন্যরা হেরে গেল। বোনিফেস খানিয়া দুর্গ দখল করতে এল। একটু থেমে কাভাল্লি বলতে লাগল—গভীর রাত তখন। সম্রাট আমাকে ডেকে পাঠালে। বললেন, ক্রীটের চাষীদের জোব্বামতো কিছু পোশাক এনে দিতে। ছুটে গিয়ে এনে দিলাম সেদিন। সেই পোশাক পরে সম্রাট সম্রাজ্ঞী তাঁদের একমাত্র ছেলেকে নিয়ে দুর্গের পেছনের গোপন দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন। বোধহয় সমুদ্রতীরে আগেই একটা জাহাজ এনে রাখা হয়েছিল। কাভাল্লি থামল।

তারপর বোনিফেস রাজা হলো, ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। বোনিফেস এসে প্রথমেই খোঁজ করল শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাটের ধনসম্পদের। সেসব পেলও। সম্রাটের সজ্জাকক্ষের সব মূল্যবান জিনিসই ছিল। কিন্তু পাওয়া গেল না বাইজেন্টাইন সম্রাটদের বংশানুক্রমিকভাবে ব্যবহৃত মূল্যবান মুকুটটা। ফ্রান্সিস এতক্ষণ গল্পের মতো ইতিহাস শুনছিল। নিখোঁজ রাজমুকুটের কথা শুনেই ফ্রান্সিস বেশ উৎসুক হলো। ও ভালো হয়ে বসল। বলল—সেই রাজমুকুট

কোথায় থাকতো।

ঐ সজ্জাকক্ষেই। কোণার দিকে একটা কাঁচের আধারে। কাভাল্লি বলল।

আচ্ছা—তুমি সেই রাজমুকুটই শেষ কখন দেখেছিলে? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

কাভাল্লি মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবতে ভাবতে বলল—তখন তো বোনিফেস আক্রমণ করতে আসছে সেসব নিয়েই খুব চিন্তায় ছিলাম। তবে যতদূর মনে পড়ছে সম্রাট যে দিন পালিয়ে যান তার তিন কি চার দিন আগে তিনি শেষ রাজসভায় গিয়েছিলেন। রাজসভা থেকে খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে সম্রাট ফেরেন। আমি তাঁকে পোশাক-পরিচ্ছদ পাল্টাতে সাহায্য করলাম। উনি মুকুট খুলে দিলেন। খুব মৃদুস্বরে কী বললেন বুঝলাম না। শুধু দুটো কথা বুঝলাম—সম্রাটদের ভাগ্য। আমি মুকুটটা নিয়ে কাচের আধারে রেখে দিলাম। এই পর্যন্ত আমার মনে আছে। তারপর আর রাজসভাও বসেনি, সম্রাটও সভাকক্ষে আসননি। মন্ত্রী অমাত্যদের সঙ্গে যা পরামর্শ সবই দুর্গের মন্ত্রণাকক্ষে করেছেন।

সম্রাট কি আর কখনো সেই সজ্জাকক্ষে যাননি। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল। কাভাল্লি ভাবল। হঠাৎই বোধহয় ওর মনে পড়ল। বলল—হ্যাঁ, যে রাতে উনি পালিয়ে যান সেই রাতে সজ্জাকক্ষে কিছুক্ষণের জন্য ঢুকেছিলেন। কিন্তু আমাকে ঢুকতে দেননি। আমাকে বাইরে দাঁড়াতে বলে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমি যে চাষীদের পোশাক এনে দিয়েছিলাম সেটা পরে বেরিয়ে এসেছিলেন।

সম্রাটের হাতে কিছু ছিল না? ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ ছিল। সম্রাটদের রাজমুকুটের ছবি। ওটা দেয়ালে ঝোলানো থাকতো। ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলল—তা সেই ছবিটা নিয়ে সম্রাট কী করলেন?

কাভাল্লি একটু ফুঁপিয়ে উঠল। বলল—উনি ছবিটা আমাকে দিলেন। তারপর কোনো কথা না বলে চলে গেলেন। কাভাল্লির চোখ জলে ভরে উঠল। চোখ মুছল ও।

ছবিটা কি তুমি এঁকেছিলে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

না, সম্রাট নিজেই এঁকেছিলেন। কথাটা বলেই কাভাল্লি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল—সম্রাট আমাকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। তখনও দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বারে সম্রাটের সৈন্যদের সঙ্গে বোনিফেসের সৈন্যদের লড়াই চলছে। ইচ্ছে করলে আমি সম্রাটের মূল্যবান রাজদণ্ড, তরোয়ালের খাপ, চুনী পান্না নিয়ে পালাতে পারতাম। কিন্তু পারলাম না। আমি সজ্জাকক্ষের খোলা দরজার সামনে বসে কাঁদতে লাগলাম।

তারপর?

কতক্ষণ পরে জানি না। বোনিফেসের সৈন্যদল এল। আমি ওদের পায়ের শব্দ পেয়ে সম্রাটের দেওয়া ছবিটা আমার জোব্বার নিচে লুকিয়ে ফেললাম। সৈন্যরা এসে আমাকে তুলে দাঁড় করল। আমার পরিচয় জানতে চাইল। বললাম সজ্জাকক্ষের প্রহরী আমি।

একটু পরেই বোনিফেস এল। সজ্জাকক্ষে ঢুকল। সমস্ত মূল্যবান সম্পদ রয়েছে দেখে সে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। সে রাজমুকুটটা খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথাও

রাজমুকুটটা দেখতে পেল না। সে এবার আমাকে দেখতে পেল। সৈন্যরা আমার পরিচয় দিল। বোনিফেস আমাকে ঘাড় ধরে সজ্জাকক্ষে ঢোকাল। বলল—বল, রাজমুকুট কোথায়? আমি কাচের আধারটার দিকে আঙুল বাড়িয়েই ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। কাচের আধারটা ফাঁকা। সম্রাটের মুকুট সেখানে নেই। বুঝলাম আমি সাংঘাতিক বিপদে পড়েছি। বোনিফেস নিশ্চয়ই ধরে নেবে আমিই রাজমুকুট সরিয়েছি। আতঙ্কে আমি চিৎকার করে বললাম—রাজমুকুট এই কাচের আধারেই ছিল। বোনিফেস বিশ্বাস করল না। বলল—তুই চুরি করেছিস। আমি বুঝলাম বোনিফেস আমাকে বন্দী করবে। চরম অত্যাচার চালাবে আমার ওপর। আমি দ্রুত ভাবতে লাগলাম কি করে পালানো যায়। একটা চিন্তা মাথায় খেলে গেল। বললাম—তাহলে রাজমুকুট নিশ্চয়ই সম্রাজ্ঞীর সজ্জাকক্ষে আছে। বোনিফেস দুজন সৈন্যকে বলল আমার সঙ্গে যেতে। বলল—যা নিয়ে আয় রাজমুকুট। আমি সৈন্য দু'জনকে নিয়ে চললাম। এই দুর্গের সিঁড়ি পথ ঘর সব আমার নখদর্পণে। সৈন্য দুজন তো এই প্রথম দুর্গে ঢুকল। ওরা এই দুর্গের কিছুই চেনে না। দুর্গের দেয়ালে এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। আলো-আঁধারি পথ, সিঁড়ি, ঘর। একটা বেশ অন্ধকার সিঁড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি একলাফে সিঁড়িটায় নেমে পড়লাম। সৈন্য দুজন কিছু বোঝবার আগেই সিঁড়ির নিচের অন্ধকার ঘরে দ্রুতপায়ে ঢুকে পড়লাম। সৈন্য দুজন কিছুক্ষণ চিৎকার চেঁচামেচি করল। আমাকে খুঁজল। তারপর চলে গেল। আমি দ্রুতপায়ে ছুটলাম পেছনের গোপন দরজার দিকে।



আমি একলাফে সিঁড়িটায় নেমে পড়লাম।

তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

প্রায় পাঁচ-ছ' মাস খানিয়ায় গা ঢাকা দিয়ে রইলাম। খানিয়ার বন্দর দিয়ে পালাবার উপায় নেই। বোনিফেসের সৈন্যরা বন্দর পাহারা দিচ্ছে। কোনো জাহাজ বন্দর থেকে ছাড়তে দিচ্ছে না। কোনো জাহাজ বন্দরে ভিড়তেও দিচ্ছে না। তখন আমি পশ্চিমমুখো এই ফালাসর্ন বন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম। হেঁটে ঘোড়ায়

চড়ে দিন সাতেক পরে এখানে এসে পৌঁছলাম। এই বন্দরটা তখনও অবরোধ করা হয়নি। হয়তো কোনো জাহাজ পাবো। পর্তুগাল পালাবো। কিন্তু এখানে এসে এনরিকোর সৈন্যদের হাতে ধরা পড়লাম। তারা সন্দেহ করল আমি বোনিফেসের গুপ্তচর। এখানে বন্দী করে রাখল।

আচ্ছা, এনরিকো কে? এরা বোনিফেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে কেন?

এনরিকো আগে ছিল জলদস্যু। বোনিফেস রাজা হয়েই ভেনিসের কাছে ক্রীট দ্বীপকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বাঁধা রেখেছে। এমনিতেই যে ভেনিসীয় লোকেরা এখানে ছিল তারা যথেষ্ট ধনী ছিল। এখন ক্রীট দ্বীপের ব্যবসা-বাণিজ্য ওদের হাতে চলে গেছে। ক্রীটবাসীরা এতে রাজা বোনিফেসের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়। জেনোদের নেতা এনরিকো এই বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে ক্রীটবাসীদের নেতা হয়েছে। সে তার সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছে। রাজা বোনিফেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। নানা জায়গায় দুই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ছোটখাটো লড়াই চলছে।

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—এসব এ দেশের লোকেদের ব্যাপার। আমরা এসবের মধ্যে নেই। যাকগে কাভাল্লি, তোমার কাছে নিখোঁজ রাজমুকুটের ঘটনাটা আরো কয়েকবার শুনবো। যতটুকু শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাটই রাজমুকুটের মর্যাদা রাখতে ওটা কোথাও গোপনে রেখে দিয়েছেন। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—আচ্ছা সম্রাটের আঁকা সেই রাজমুকুটের ছবিটা কি তোমার কাছে আছে? কাভাল্লি বলল—হ্যাঁ আছে। কিন্তু কাউকে সে কথা বলতে পারবে না।

না, বলবো না। ফ্রান্সিস বলল। কাভাল্লি এবার যে ঘাসের ওপর বসেছিল সেখানকার ঘাসগুলো সরাল। নিচ থেকে বার করল একটা গোটানো সাদাটে ভেড়ার চামড়া। চামড়াটা দুহাতে খুলে টান করে ধরল। দেখা গেল নানা রঙে আঁকা একটি রাজমুকুটের ছবি (ভেঁড়ার চামড়ার ছবিটা পরের পৃষ্ঠায় আছে)। ছবিটার তলায় নানারকম ফুল-পাতার নকশা। হ্যারি সেই নকশাটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে বলল—ফ্রান্সিস, ছবিটার নিচে নকশার ভেতরে ভেতরে কিছু লেখা আছে। কয়েকটা প্রাচীন গ্রীক অক্ষর পড়তে পারছি। বাকিগুলো ঠিক বুঝতে পারছি না।

যে অক্ষরগুলো তোমার চেনা তা থেকে কোনো শব্দ বুঝতে পারছো? ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি নকশার জায়গাটা ভালো করে দেখতে দেখতে বলল—শব্দটা বোধহয় 'ভাগ্য'। ফ্রান্সিস বেশ চমকে উঠল। বলল—আশ্চর্য! কাভাল্লিও সম্রাটের মুখে এই 'ভাগ্য' কথাটা শুনেছিল। তাহলে এই নকশাটার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। নিখোঁজ রাজমুকুটের কিছু হদিস হয়তো এই নকশা থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

অসম্ভব নয়। তবে একটা কথা অনায়াসে বলা যায় যে শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাট বেশ বিদ্বান ও শিল্পী ছিলেন। হ্যারি বলল। এবার মারিয়া পাতলা চামড়াটা নিয়ে ছবি নকশা দেখতে লাগল। তখনই কয়েদঘরের লোহার দরজায় শব্দ উঠল—ঠাং ঠাং। তালা খোলা হচ্ছে। কাভাল্লি তাড়াতাড়ি ছবিটা নিয়ে নিজের জোব্বার মধ্যে লুকিয়ে ফেলল।

দশজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে লোহার দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল।





দুজন দুটো বেশ বড় কাঠের পাত্র নিয়ে ঢুকল। একজন সৈন্য ঘাসের বিছানার সামনে পাথরের মেঝেয় এক ধরনের লম্বাটে পাতা পেতে দিতে লাগল। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। অনেক বেলাও হয়েছে। খুব খিদে পেয়েছে সকলেরই। সকলেই উঠে এসে খেতে বসল। পাতায় দুটো করে বেশ মোটা গোল রুটি আর দু'টুকরো ভেড়ার মাংস ও ঝোল দেওয়া হলো। হ্যারি সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল—বাঁধা হাতে খাবো কি করে?

বাঁধন খোলার হুকুম নেই, একজন সৈন্য বলল। সবাই খেতে লাগল। খিদে তো পেয়েছে। খুবই অসুবিধে হচ্ছে খেতে। তবু কেউ কিছু বলল না। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া, এরকম কয়েদঘরে থাকা, এভাবে খাওয়া, তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে।

মোটেই না। তোমরা যখন পারছো আমিই বা পারবো না কেন? মারিয়া বলল।

হ্যারি খেতে খেতে বলল—ফ্রান্সিস, নিখোঁজ রাজমুকুট খুঁজতে যাবে নাকি?

নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে এই কয়েদঘর থেকে মুক্তি পেতে হবে।

দেখি কালকে এনরিকোর সঙ্গে কথা বলে। হ্যারি বলল।

খাওয়ার পর ঘরের কোণায় একটা পাথরের চৌবাচ্চার মত জায়গায় সৈন্যরা খাবার জল ঢেলে দিল। চিনেমাটির বড় বাটি ডুবিয়ে সবাই জল খেল। সৈন্যরা লোহার দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে চলে গেল। দুজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে দরজায় পাহারা দিতে লাগল।

বিকেল হলো। ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাভাল্লির কাছে শোনা ঘটনাগুলো ভাবছিল। ও মনস্থির করে ফেলেছিল এখান থেকে ছাড়া পেলেই খানিয়া যাবে। খানিয়া দুর্গ থেকে খুঁজে বের করবে বাইজেন্টাইন সম্রাটদের নিখোঁজ রাজমুকুট। ও এবার কাভাল্লির দিকে তাকাল। দেখল কাভাল্লি বসে চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে। ফ্রান্সিস ডাকল—কাভাল্লি।

হুঁ। কাভাল্লি মৃদু শব্দ করে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

আচ্ছা এখান থেকে কীভাবে খানিয়া নগরে যাওয়া যায়?

স্থলপথে যেতে গেলে পূবের দিকে পোলিরিনা হয়ে যেতে হবে। জলপথে যেতে গেলে উত্তরে গ্রামভাউসা বন্দর হয়ে পুরমুখো যেতে হবে। কেন যাবে নাকি? কাভাল্লি বলল।

ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল—আগে তো এখান থেকে ছাড়া পাই। তারপর হ্যারিকে বলল—হ্যারি কালকে দলপতি আমাদের এনরিকোর সামনে নিয়ে যাবে। আমি তো গ্রীক ভাষা জানি না। তবু তুমি কিছু জানো। যা যা বলবে সব ভেবে রাখো।

আমার সব ভাবা হয়ে গেছে। এখন সবকিছু নির্ভর করছে এনরিকো মানুষটা কেমন তার ওপর। বিদ্রোহী নেতা—মনমেজাজ কেমন কে জানে! হ্যারি বলল।

রাত হলো। ফ্রান্সিসদের মধ্যে আর বিশেষ কোনো কথাবার্তা হলো না। খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়ল সবাই। রাত বাড়ল। ফ্রান্সিসের মাথায় নানা চিন্তা। তবু মারিয়াকে ডেকে বলল—তোমার অসুবিধে হচ্ছে বুঝি তবু আজেবাজে চিন্তা না

করে নিশ্চিন্তে ঘুমোও। শরীরটা ঠিক রাখো। একটু রাতে ফ্রান্সিসের দু'চোখ ঘুমে বুজে এলো।

পরদিন একটু বেলায় সেই লম্বা চেহারার দলপতি এল। কয়েদঘরের দরজা খোলা হলো। দলপতি সকলের দিকে তাকিয়ে হ্যারিকে খুঁজল। হ্যারি উঠে দাঁড়াল। দলপতি হ্যারিকে দেখে বলল—তুমি গ্রীক ভাষা মোটামুটি জানো বলতেও পারো। তুমি এসো।

আমার সঙ্গে আরো দুজনকে যেতে দিতে হবে।

তারা তো গ্রীক ভাষা জানে না। দলপতি বলল।

তবু আমাকে পরামর্শ তো দিতে পারবে। হ্যারি বলল।

বেশ চলো। দলপতি বলল।

দলপতির পেছনে পেছনে হ্যারি, ফ্রান্সিস আর মারিয়া কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। দুজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে ওদের পেছনে পেছনে চলল। ফ্রান্সিস একবার ভাবল হাতের বাঁধন খুলে দিতে বলবে। কিন্তু কিছু বলল না।

পাথর ছড়ানো পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে ওরা চলল। রাস্তার দুধারে পাথর গেঁথে তৈরি বাড়িঘর। স্ত্রী পুরুষরা ফ্রান্সিসদের দেখল। ওরা খুব অবাক হলো মারিয়াকে দেখে আর মারিয়ার পোশাক দেখে।

একটা ছোট টিলার ঢালে মোটামুটি পরিচ্ছন্ন একটা পাথরের বাড়ির সামনে এল ওরা। পাথরের দরজা পার হয়ে দলপতি একটা বেশ বড় ঘরে ঢুকল। পিছনে তাকিয়ে ফ্রান্সিসদেরও ঢুকতে ইঙ্গিত করল।

একটু অন্ধকারমতো ঘরটায় দেখা গেল মখমলমোড়া একটা আসনে সাধারণ অথচ দামি কাপড়ের জোব্বাপরা একজন মধ্যবয়সী লোক বসে আছে। মুখে দাড়ি গোঁফ। ফ্রান্সিস বুঝল—এই লোকটাই এনরিকো, বিদ্রোহী নেতা। এনরিকোর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লক্ষ্য করে ফ্রান্সিস বুঝল, এনরিকো ধূর্ত এবং ক্ষমতালোভী। দলপতি একটু মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে কী বলে গেল। হ্যারি আস্তে আস্তে বলল—আমাদের কথা বলছে। দলপতির কথাগুলি এনরিকো মন দিয়ে শুনল। এবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে এনরিকো বলল—তোমরা কারা?

হ্যারি গ্রীকভাষায় উত্তর দিল—আমরা ভাইকিং।

এই ক্রীট দ্বীপে এসেছো কেন? এনরিকো বলল।

আমরা জাহাজে চড়ে চিকামা থেকে ফিরছিলাম। ঝড়ে পথ হারিয়ে এখানে এসেছি। আমরা এখানে থাকতে আসিনি। আমরা কাউকে হত্যাও করিনি, লুঠপাটও করিনি। তবে আমাদের বন্দী করা হলো কেন?

তোমরা ভাইকিং এটা দলপতি জেনে তোমাদের বন্দী করেছে। তোমরা দক্ষ নাবিক। বীর যোদ্ধাও। আমার সেনাবাহিনীতে তোমাদের মতো সাহসী যোদ্ধা প্রয়োজন। রাজা বোনিফেসের নাম শুনেছো? এনরিকো বলল।

হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হলো। ও খুব সহজভাবে বলল—না।

আমি কে তা জানো? এনরিকো বলল।

না। একই ভঙ্গিতে হ্যারি বলল।

ও। তাহলে এই দ্বীপের কোনো সংবাদই তোমরা জানো না। যাকগে শোন, এই দ্বীপের রাজা এখন বোনিফেস। সে এই দ্বীপকে ভেনিসীয় বড়লোক ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আমি এনরিকো। আমার নেতৃত্বে ক্রীটবাসীরা বিদ্রোহ শুরু করেছে। রাজা বোনিফেসকে আমরা ক্রীট থেকে তাড়াবো।

হ্যারি খুব বিনীতভাবে বলল—দেখুন এসব তো আপনাদের দেশের ব্যাপার। এসবের সঙ্গে আমাদের তো কোনো সম্পর্ক নেই।

তা নেই। কিন্তু তোমাদের মতো সাহসী যোদ্ধা আমাদের চাই। তোমাদের আমার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হবে।

হ্যারি বেশ চিন্তায় পড়ল। বলল—আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে একটু কথা বলে আমাদের মতামত জানাচ্ছি। এনরিকো মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। হ্যারি ফ্রান্সিসকে সব কথা বলল। সব শুনে ফ্রান্সিস বলল—বলো যে আমরা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে দু'একদিন পরে আমাদের মতামত জানাব। হ্যারি এনরিকোকে বলল সে কথা। এনরিকো একটু ভেবে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। হ্যারি বলল—আমাদের তো কয়েদঘরেই রাখা হয়েছে। কাজেই আমাদের হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হোক।

বেশ তাই হবে, এনরিকো বলল।

মারিয়াকে দেখিয়ে হ্যারি বলল—ইনি মারিয়া, ভাইকিং দেশের রাজকুমারী। কয়েদঘরের কষ্টকর জীবন ইনি সহ্য করতে পারছেন না। এই জীবনযাপনে ইনি অভ্যস্ত নন। এঁকে আমাদের জাহাজে থাকতে অনুমতি দিন। তবে এঁকে পাহারা দেবার জন্যে সৈন্য রাখতে পারেন। তাছাড়া আমাদের এখানে ফেলে রেখে উনি একা জাহাজ চালিয়ে পালাতেও পারবেন না।

এনরিকো মন দিয়ে হ্যারির কথা শুনল। তারপর দলপতির দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিসদের হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া আর মারিয়াকে জাহাজে পাহারায় রাখার নির্দেশ দিল। দলপতি এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসদের হাতের বাঁধন খুলে দিল। এনরিকো হাত তুলে ফ্রান্সিসদের চলে যেতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা ফিরে চলল কয়েদঘরের দিকে। এনরিকো হ্যারির সব অনুরোধ মেনে নিল এই আশায় যে এই দুর্ধর্ষ ভাইকিংদের পেলে তার সৈন্যবাহিনীর শক্তি বাড়বে। ফ্রান্সিস সেটা ভালো করেই বুঝল। কিন্তু ওর দুশ্চিন্তা বাড়ল। হাতে মাত্র দুটো দিন। এর মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি এনরিকোর বাহিনীতে যোগ না দেয় তাহলে এনরিকো ওদের প্রতি আর কোনো দয়ামায়া দেখাবে না। কয়েদঘরে হাত-পা বেঁধে বন্দী করে রাখবে। মাত্র দুদিন সময় হাতে। যে করেই হোক পালাতে হবে। কিন্তু কি করে? ফ্রান্সিস সারা রাস্তা এই কথাই ভাবতে ভাবতে এল।

ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরের সামনে এল। দুজন সৈন্য এগিয়ে এসে মারিয়াকে বলল—আমাদের সঙ্গে জাহাজে চলুন। হ্যারি মারিয়াকে কথাটা বুঝিয়ে দিল। মারিয়া ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—না, আমি তোমাদের সঙ্গে এখানেই থাকবো। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—পাগলামি করো না। তুমি বাইরে মুক্ত থাকবে। বুদ্ধি করে আমাদেরও মুক্ত করার চেষ্টা করতে পারবে। কিন্তু এই কয়েদঘরে থাকলে সে আশাই থাকবে না। এই কয়েদঘরেই আমাদের তিলে তিলে মরতে হবে। মারিয়া

খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। বুঝল ফ্রান্সিসের কথাই ঠিক। ও আর আপত্তি করল না। তবু ফ্রান্সিসদের এই কষ্টকর বন্দীজীবনের কথা ভেবে মারিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল। বিষণ্ণমুখে মারিয়া দুজন সৈন্যের পাহারায় ওদের জাহাজে চলে গেল।

কয়েদঘরে ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঢুকতেই সব ভাইকিং বন্ধুরা ওদের ঘিরে ধরল। একজন সৈন্য এসে সবার হাতের বাঁধন খুলে দিল। ফ্রান্সিস সকলের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে এনরিকোর সঙ্গে ওদের যা কথাবার্তা হয়েছে সব বলল। সবশেষে বলল—ভাইসব, এনরিকোর সেনাবাহিনীতে আমরা ঢুকবো না! কোনো যুদ্ধে আমরা জড়াবো না। দুদিন সময় হাতে। দেখি এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় ভেবে বার করতে পারি কিনা। সবাই আবার ঘাসের বিছানায় গিয়ে বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল।

সারাদিন কেটে গেল। তখন সন্ধ্যে হয় হয়। হঠাৎ এনরিকোর সৈন্যদের মধ্যে খুব আনন্দ হৈ-হল্লা শুরু হলো। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—পাহারাদারদের জিজ্ঞেস কর তো কি ব্যাপার? হ্যারি কয়েদঘরের দরজার কাছে এল। গরাদের ফাঁকে মুখ চেপে জিজ্ঞেস করলো—কী হয়েছে ভাই? এত চ্যাঁচামেচি কিসের? একজন পাহারাদার বলল—খুব খুশির খবর এসেছে। লিসস-এর যুদ্ধে বোনিফেসের সৈন্যবাহিনী হেরে গেছে। সব পালিয়েছে। লিসস এখন আমাদের দখলে। হ্যারি ফিরে এসে ফ্রান্সিসকে বলল সব কথা। হ্যারির কাছে কাভাল্লিও শুনল সব কথা। বলল—লিসস দক্ষিণের একটা বন্দর। রাজধানী খানিয়া একেবারে উত্তরে। এনরিকোর খানিয়া দখল করতে এখনও অনেক দেরি।

সন্ধ্যের পরেই শুরু হলো এনরিকোর সৈন্যদের বিজয় উৎসব। পাহাড়ি পথের পাশে পাশে পাথরের চাঁইগুলোর ওপাশে যে পাথর ছড়ানো প্রান্তর সেখানে চার জায়গায় শামিয়ানা মতো টাঙানো হলো। তার নিচে পাথর এনে উনুন পাতা হলো। উনুন জ্বালানো হলো। দশ পনেরোটা ভেড়া কাটা হলো। উনুনের ওপর শিকে ভেড়ার মাংস গেঁথে পোড়ানো হতে লাগল। চলল সৈন্যদের আনন্দ হৈ-হল্লা গান আর নাচ। গাধার পিঠে চাপিয়ে আনা হলো নেশার আরকের ছোট ছোট পিপে। একটু রাতে মাংস খাওয়া, আরক খাওয়া শুরু হলো।

ফ্রান্সিসদের রাতের খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। রাত বাড়ছে। এখন দুহাত খোলা। মাথার পেছনে দুহাত রেখে ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় শুয়ে আছে। অনেক চিন্তা মাথায়। এনরিকোর হাতের মুঠি থেকে পালাতে হবে। যে করেই হোক। ফ্রান্সিস ভাবতে ভাবতে চোখ বুজল। কিন্তু ঘুম আসছে না।

রাত বাড়ল। হঠাৎ ফ্রান্সিসের খেয়াল হলো বাইরে সব চিৎকার কোলাহল একেবারে থেমে গেছে। নিস্তব্ধ চারদিক। ও কয়েদঘরের দরজার লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল। মশালের আলোয় দেখল পাহারাদার দুজন নেই। তাদের পায়ের শব্দ বা কথাবার্তা কিছুই শোনা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি উঠে বসল। কী ব্যাপার? ও একছুটে দরজার কাছে এল। বাইরের মশালের আলোয় দেখল, পাহারাদারদের একজন পাথরের সিঁড়ির উপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। মাথার উষ্ণীষ তরোয়াল মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। অন্য পাহারাদারটি বারান্দায় উপুড়

হয়ে শুয়ে আছে। তার বর্ম উষ্ণীষ দুটোই পাশে পড়ে আছে। তরোয়ালটা পায়ের কাছে মাটিতে। ওদের দুজনেরই মাথার কাছে পড়ে আছে দুটো চীনেমাটির বাটি। একটা বাটিতে কিছু নেই, অন্যটার তলায় কালো রঙের জলের মতো কী যেন রয়েছে! সৈন্য দুজন একেবারে মড়ার মতো পড়ে আছে। নড়ছেও না। প্রান্তরের দিক থেকেও কোনো শব্দ ভেসে আসছে না। চারদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। কী ব্যাপার? সবাই কি ঘুমিয়ে পড়ল? কিন্তু সবাই একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল—আশ্চর্য ব্যাপার! ফ্রান্সিস দ্রুত কাভাল্লির কাছে এল। ধাক্কা দিয়ে কাভাল্লির ঘুম ভাঙাল। কাভাল্লি উঠে বসল। চোখ ডলতে ডলতে বলল—কী ব্যাপার?

চলো তো দরজার কাছে। সৈন্যদের কোনো সাড়াশব্দ নেই। পাহারাদার দুটো মড়ার মতো পড়ে আছে।

বলো কি। কাভাল্লি ছুটে দরজার কাছে এল। গরাদের ফাঁক দিয়ে পাহারাদার দুজনকে দেখল। তারপর চীনেমাটির বাটিতে কালো রঙের তরল জিনিসটা দেখে কাভাল্লি মুখে দুহাত চেপে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। ততক্ষণে হ্যারিও উঠে এসেছে। পাহারাদারদের ঐ অবস্থা দেখে হ্যারিও অবাক। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল, কাভাল্লি হাসছ কেন? কী ব্যাপার? কাভাল্লির হাসি বন্ধ হলো। কাভাল্লি বলল—উৎসবের আনন্দে সৈন্য, পাহারাদার সবাই আরক খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গেছে।

আরক?

হ্যাঁ—ঐ যে বাটিটার তলায় একটু পড়ে আছে। কালো রঙের। ওটা পোলিরিনার আরক। কালো কুচকুচে আঙুরের রসের সঙ্গে কী সব মিশিয়ে পোলিরিনার কৃষকরা ঐ আরক বানায়। ঐ আরক এক বাটি খেলে পাঁচ-ছ ঘণ্টা কোনো হুঁশ থাকে না। খুশির ঠ্যালায় ঐ আরক খেয়ে সব সৈন্য পাহারাদার কুপোকাৎ। কাভাল্লি বলল।

তাই নাকি? ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। এই পালাবার সুযোগ। কিন্তু দরজার তালার চাবি? গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখল—সিঁড়ির ওপর যে পাহারাদারটা পড়ে আছে তার কোমরে চাবির গোছা লাগানো। এখান থেকে বেশ দূর। হাত বাড়িয়ে পাওয়া অসম্ভব। ফ্রান্সিস কয়েদঘরের চারদিকে একটা লাঠিমতো কিছু খুঁজতে লাগল! মশালের আলোয় দেখল কয়েদঘরের কোথাও লাঠিমতো কিছু নেই। বিস্কো ও আর কয়েকজন ভাইকিং উঠে এল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ওদের সব বলল। কিন্তু নিরুপায় ওরা। এই সুবর্ণ সুযোগটাকে ওরা কাজে লাগাতে পারল না। ফ্রান্সিস আক্ষেপের সঙ্গে গরাদ ধরে ঝাঁকুনি দিল। শব্দ হলো ঠং। হ্যারি ধমক দিল—ফ্রান্সিস শব্দ করো না।

সময় বয়ে চলল। ওরা গরাদের সামনে অসহায়ভাবে বসে রইল।

ওদিকে জাহাজে নিজেদের কেবিনঘরে সৈন্যদের হৈ-হল্লা শুনতে শুনতে মারিয়া ঘুমিয়ে পড়েছিল। মারিয়ার ঘুম খুব পাতলা। একটু শব্দ কানে গেলেই ওর ঘুম ভেঙে যায়। ও হঠাৎ দরজার কাছে একটা শব্দ শুনল—ধপ্। ওর ঘুম ভেঙে গেল। কী ব্যাপার? ও একবার ভাবল পাহারাদারদের ডাকে। পরক্ষণেই ভাবল দরজা খুলে দেখা যাক। মারিয়া বিছানা থেকে নেমে এল। আস্তে আস্তে দরজা

ঠেলল। দরজা খুলল না। আবার ঠেলল। কিছুটা দরজা খুলল আবার কিছুর চাপে সরে এল। মারিয়া এবার জোরে ঠেলল। একজন পাহারাদার সৈন্য দরজায় ঠেস দিয়ে চোখ বুঁজে পড়েছিল। দরজার ধাক্কায় সৈন্যটা গড়িয়ে কাঠের মেঝেয় পড়ে গেল। বেহুঁশ। মারিয়া দরজা খুলে সৈন্যটিকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে অবাক। অন্য সৈন্যটিও মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মড়ার মতো দুজনেই অনড়। শরীরে কোনো সাড় নেই। মারিয়া প্রথমে কিছুই বুঝল না। একটুক্ষণ দাঁড়াল। সৈন্য দুজন সেই একইভাবে পড়ে আছে। মারিয়া এর কারণ বুঝল না। কিন্তু ওর মন আনন্দে নেচে উঠল—মুক্তি!

মারিয়া আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। দ্রুত ভেবে নিল কী করতে হবে। এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। মারিয়া ভেবে দেখল—এই পাহারাদার দুজন যে কারণেই হোক বেহুঁশ হয়ে গেছে। কিন্তু সমুদ্রতীরে পাতা পাটাতনের ধারে অন্য সৈন্যরা থাকতে পারে। পাটাতন দিয়ে জাহাজ থেকে নামা চলবে না। সাঁতরে তীরে উঠতে হবে। কিন্তু মারিয়া পরনের পোশাকের দিকে তাকাল। পায়ের পাতা অব্দি ঝুল পোশাকটার। এটা পরে সাঁতরানো যাবে না। মারিয়া হাত বাড়িয়ে চামড়ার ঝোলাটা নিল। ঝোলা খুলে কাঁচি বের করল। তারপর হাঁটুর নিচে থেকে পোশাকের বাড়তি অংশটা কচ্‌কচ্‌ করে দ্রুত হাতে কেটে ফেলল। এবার আর সাঁতরাতে কোনো অসুবিধে হবে না!

মারিয়া আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে ডেকে উঠে এল। ছুটে মাস্তুলের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। আকাশে ভাঙা চাঁদ। মৃদু জ্যোৎস্না পড়েছে সমুদ্রে, সমুদ্রতীরের ছোট টিলাটায়। ও দেখল, কেউ কোথাও নেই। দ্রুত জাহাজের ওপাশে চলে গেল। দড়িদড়া ধরে ঝুলে পড়ল। আস্তে আস্তে সমুদ্রের জলে নামতে লাগল। হাত ছড়ে যাচ্ছে যেন। তবু মারিয়া দাঁত চেপে সহ্য করল। আস্তে আস্তে সমুদ্রের জলে নামল।

কোনোরকম শব্দ না করে জাহাজের পাশে সাঁতরে চলল। তারপর জাহাজ পাশে রেখে তীরভূমির দিকে সাঁতরে চলল। দূরত্ব বেশি নয়। তবু ও যখন জল থেকে পাথর ছড়ানো তীরে উঠল তখনও হাঁপাচ্ছে উত্তেজনায়। চারদিকে তাকাল। না, কেউ কোথাও নেই। চাঁদের অল্প আলোয় পাথরের টুকরোয় পা ফেলে ফেলে মারিয়া পাথুরে রাস্তাটায় এল। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এল। জলে ভেজা শরীরটা কেঁপে উঠল। পাথরের টুকরোর ওপর দিয়ে যতটা দ্রুত সম্ভব ও ছুটল কয়েদঘরের দিকে।

পাথর ছড়ানো রাস্তাটার ঢাল বেয়ে উঠে এসে ছোট টিলাটার কাছে পৌঁছে মারিয়া সাবধান হলো। মাথা নিচু করে আসছিল এতক্ষণ। এখন আরো নিচু হয়ে চলতে লাগল। তখনই চাঁদের মৃদু আলোয় দেখল রাস্তার পাশেই একটা পাথরের চ্যাপ্টা চাঁইয়ের ওপর দু'তিন জন এনরিকোর সৈন্য। মারিয়া ভয়ে একলাফে পিছিয়ে এল। দেখল সৈন্য ক'জন কেউ নড়ছে না। ও এবার সাহস করে এগিয়ে এল। দেখল একজন সৈন্য বসে আছে। মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে আছে। অন্য দুজন হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। পাথরের চাঁই থেকে পা ঝুলছে। মারিয়া হাঁপ ছাড়ল।

আবার মারিয়া মাথা আরো নিচু করে চলল। তখনই একবার মাথা একটু তুলে পাথরের চাঁইয়ের আড়াল থেকে পাথর ছড়ানো প্রান্তরের দিকে তাকাল। চাঁদের অল্প আলোয় দেখল—প্রান্তর জুড়ে সৈন্যরা এলোমেলো সব শুয়ে আছে। মনে হলো যেন এক দঙ্গল মৃতদেহ। কারো কোনো সাড় নেই। শামিয়ানার নিচে নিভন্ত উনুন থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দুটো গাধা চরে বেড়াচ্ছে।

মারিয়া এবার নিশ্চিন্ত হলো। মনে সাহসও পেল। তবু মাথা নিচু করে ছুটতে ছুটতে কয়েদঘরের সামনে এল।

ফ্রান্সিস, হ্যারি আর কয়েকজন তখনও গরাদ দেওয়া দরজার কাছে বসে আছে। ফ্রান্সিস বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। ও-ই প্রথম মারিয়াকে দেখল। কিন্তু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। ও চমকে উঠে দাঁড়াল। তখন মারিয়া সিঁড়িতে পড়ে থাকা পাহারাদারটিকে ডিঙিয়ে দরজার কাছে এল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল, মারিয়া। মারিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—হ্যাঁ আমি। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল, ঐ যে সৈন্যটা সিঁড়িতে পড়ে আছে—ওর কোমরে চাবির গোছা আছে। খুলে নাও। তাড়াতাড়ি। মারিয়া ঘুরে দাঁড়াল। সিঁড়িতে পড়ে থাকা পাহারাদারটির কোমর থেকে আস্তে আস্তে চাবির গোছাটা খুলে নিল। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে হ্যারিকে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে ডাকল—হ্যারি, হ্যারি। হ্যারি চোখ মেলে তাকাল। ও মশালের আলোয় মারিয়াকে দেখেই একলাফে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস ফিসফিস করে বলল—সবাইকে



দুটো চাবি পেল মারিয়া।

ডাকো। কোনো শব্দ হয় না যেন। ওদিকে মারিয়া একটার পর একটা চাবি তালায় লাগাচ্ছে। লাগছে না। সময় যাচ্ছে। উত্তেজনায় মারিয়ার হাত কাঁপছে। ভেজা কাপড়জামা গায়ে। তবু যেন ঘেমে উঠল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—তাড়াহুড়ো

করো না। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ কর। দুটো বড় চাবি পেল মারিয়া, একটা ঢোকাল, ঘোরাবার চেষ্টা করল। ঘুরল না। পরেরটা ঢুকিয়ে ঘোরাতেই কট্ করে শব্দ হলো। তালা খুলে গেল। ফ্রান্সিস দরজার গরাদ ধরেই ছিল। আস্তে আস্তে দরজাটা খুলল। অস্পষ্ট ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ উঠল লোহার দরজায়। ততক্ষণে সব ভাইকিংরা জেগে আছে। ফ্রান্সিস আর হ্যারি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস হাত তুলে সবাইকে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করল। নিজে গেল টিলাটার কাছে। চারদিকে তাড়াতাড়ি নজর বুলিয়ে নিল। কোনো সৈন্য কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। দ্রুত ছুটে এল বন্ধুদের কাছে। কাভাল্লিকে বলল—ঐ টিলার দিক ছাড়া জাহাজঘাটায় যাওয়ার অন্য কোনো রাস্তা তোমার জানা আছে?

হ্যাঁ, তবে খুব পাথর-টাথরের রাস্তা। কাভাল্লি বলল।

ঠিক আছে—ঐ রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলো আমাদের। ফ্রান্সিস বলল।

কাভাল্লি ডানদিকের ঢালের দিকে চলল। পেছনে ফ্রান্সিসরা চলল। সবাই চুপ। কেউ কোনো শব্দ করছে না। ঢাল শেষ হতে কাভাল্লি বাঁ দিকে ঘুরল। সত্যিই বড় বড় পাথরের টুকরো ছড়ানো এদিকটায়। রাস্তা বলে কিছু নেই। চলল সবাই। দু'তিনজন পাথরে পা হড়কে পড়ে গেল। কেটে ছড়ে গেল হাঁটু, পা। কিন্তু কেউ এতটুকু শব্দ করল না। মারিয়া হোঁচট খেল। পায়ের বুড়ো আঙুলটা টনটন করে উঠল। মারিয়া মুখ বুজে সহ্য করল। ছড়ানো পাথরের ওপর দিয়ে দ্রুত ছোটা যায় না। তবু যত দ্রুত সম্ভব ছুটল সবাই। বাঁ দিকে একটা ছোট চড়াই পেরোতেই ওরা দেখল সমুদ্রতীরের ঢাল। তীরে ভাসছে ওদের জাহাজ। জাহাজ থেকে পাতা পাটাতনটা তখনও সৈন্যরা তুলে রাখেনি।

পাটাতন দিয়ে সার বেঁধে দ্রুত জাহাজে উঠে পড়ল সবাই। মারিয়া কেবিনঘরে চলে গেল। ভেজা পোশাকে ওর কাঁপুনি ধরে গেছে। জাহাজে উঠতে আর দু'তিনজন বাকি। তখনই টিলার দিক থেকে কয়েকজন সৈন্যের চিৎকার ভেসে এল। ওদের তখন হুঁশ ফিরেছে বোধহয়। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—জাহাজ নোঙর করা হয়নি। দাঁড়ীরা দাঁড়ঘরে চলে যাও। কোনো শব্দ না করে দাঁড় বাইতে থাকো। আমি হুইল ধরছি।

দাঁড়ীরা দাঁড়ঘরে চলে গেল। বাকিরা জাহাজে উঠেই কাঠের পাটাতনটা তুলে নিল। টিলার দিক থেকে কয়েকজন সৈন্যকে তখন টলতে টলতে আসতে দেখা গেল। দাঁড়ীরা দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজ একটু নড়ে উঠে তীরের কাছ থেকে সরে যেতে লাগল। জলে দাঁড়ের ঘায়ের মৃদু শব্দ উঠল—ছপ্ ছপ্। ফ্রান্সিস হুইল ঘোরাল। জাহাজ গতি পেল। ভেসে চলল মাঝ সমুদ্রের দিকে। একটু পরেই ঘন কুয়াশার মধ্যে জাহাজটা ঢাকা পড়ে গেল। জাহাজ চলল উত্তরমুখো। এবার ভাইকিংরা মাস্তুলে উঠে পড়ল। দড়িদড়া টেনে পাল খুলে বেঁধে দিল। হাওয়ায় পালগুলো ফুটে উঠল। জল কেটে জাহাজ বেশ দ্রুত চলল।

ফ্রান্সিস হ্যারি বিস্কো তখনও ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। পুব আকাশে লাল রঙের ছোপ লেগেছে। সূর্য উঠতে দেরি নেই।

মারিয়া পোশাক পাল্টে ওদের কাছে এল। বলল—আমার পাহারাদার দুজন

তো উঠে বসে আছে। শাঙ্কো ওদের তরোয়াল আগেই সরিয়ে রেখেছে। ওরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। এখনও বুঝতে পারছে না কী ঘটে গেছে।

ওরা দুজন জাহাজেই থাক। সামনে কোনো বন্দরে ওদের নামিয়ে দেব। ফ্রান্সিস বলল।

পুব আকাশ আরো লাল হলো। সূর্য উঠছে। ফ্রান্সিস তাকাল সেদিকে। সমুদ্রে সূর্যোদয়ের সেই অতি পরিচিত দৃশ্য। একটু একটু উঠতে উঠতে সূর্যের নিচের দিকটা জলের সঙ্গে লেগে থাকে। একটা বড় বিন্দু যেন। একটু পরেই বিন্দুটা লাফিয়ে উঠে ওপরের গোলের সঙ্গে মিশে যায়। সূর্যোদয় দেখতে দেখতে ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনে মনে বলল—আঃ মুক্তি!

শুধু জাহাজ-চালক আর তার সাহায্যকারী দুজন ভাইকিং ছাড়া আর সবাই বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুমোল, বিশ্রাম করল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে বিকেল হয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলা ফ্রান্সিস, কাভাল্লি, হ্যারি আর মারিয়াকে নিয়ে জাহাজের ডেকে উঠে এল। ও কাভাল্লিকে বলল—আচ্ছা, রাজধানী খানিয়া বন্দরে যেতে হলে আমরা কী ভাবে যাবো?

উত্তরে একটা বন্দর পাবো—গ্রামভাউসা। ওখান থেকে পুবদিক ধরে জাহাজ চালালে আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই খানিয়া বন্দরে পৌঁছে যাবো।

গ্রামভাউসা বন্দরের কী অবস্থা জানি না। এনরিকোর সৈন্যরা হয়তো ঐ বন্দর দখল করে নিয়েছে। কাজেই ঐ বন্দরে আমরা নামবো না। খানিয়ার দিকে জাহাজ চালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস তুমি কি সত্যিই খানিয়া যাবে।

হ্যাঁ—শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাটের নিখোঁজ মুকুট খুঁজে বার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি মৃদু আপত্তির সুরে বলল—কিন্তু বন্ধুরা কি রাজী হবে? আমরা তো অনেকদিন দেশ ছাড়া!

ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি, তুমি সবাইকে ডেকে আসতে বলো। দেখি ওরা কী বলে। হ্যারি সবাইকে খবর দিতে ছুটে গেল। মারিয়ার দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া, তুমিও কি দেশে ফিরে যেতে চাও?

তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাবো। ফ্রান্সিস হেসে বলল—মারিয়া, আমি তোমার কাছ থেকে এই কথাই আশা করেছিলাম।

একটু রাতে সব ভাইকিং বন্ধুরা এসে ডেকে জড়ো হলো। ফ্রান্সিস বলতে লাগল—ভাইসব, আমি জানি তোমরা অনেকেই দেশে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছো। কিন্তু দেশে ফিরে কী হবে? সেই তো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অলস জীবন। তোমরা ভালো করেই জানো ঐ অর্থহীন সুখের একঘেয়ে জীবন আমরা চাই না। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল কাভাল্লির কাছে এই ক্রীটের কিছু ইতিহাস শুনেছি। খানিয়া দুর্গে শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাট তাঁদের বংশানুক্রমে ব্যবহৃত রাজমুকুট গোপনে রেখে দিয়েছেন। সেই ইতিহাস তোমরা কাভাল্লির কাছে শুনো। আমি

স্থির করেছি সেই নিখোঁজ রাজমুকুট উদ্ধার করবো। কাজেই আমরা এখন খানিয়া যাবো। এবার বলো তোমাদের কারো এতে আপত্তি আছে কিনা। ফ্রান্সিস থামল। ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে একটু গুঞ্জন উঠল। একজন বলল—ফ্রান্সিস ভেবে দেখ, কতদিন আমরা দেশ ছেড়ে এসেছি। খানিয়াতে গিয়ে আবার কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বো কি না—

সে সব আমি ভেবেছি। খানিয়াতে আমি যাবোই। যদি দেখি ওখানে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তাহলে ওখানে আমরা নামবো না। দেশের দিকে জাহাজ ঘোরাব। কিন্তু যদি দেখি পরিবেশ শান্তিপূর্ণ তাহলে রাজমুকুট খুঁজে বের করবো। একজন ভাইকিং বলে উঠল—কী দরকার ফ্রান্সিস, চলো না দেশেই ফিরে যাই।

বেশ, সামনেই গ্রামভাউসা বন্দর। হয়তো এখনও এনরিকোর সৈন্যরা দখল করেনি। আমি, হ্যারি আর মারিয়া বন্দরে নেমে যাবো। তোমরা জাহাজে ফিরে দেশে চলে যাও। আমরা খানিয়া যাবোই। ফ্রান্সিস বলল

ভাইকিংদের মধ্যে অনেকেই বলে উঠল—না, তোমাদের রেখে আমরা দেশে ফিরে যাবো না! তোমরা যেখানে যাবে সেখানে আমরাও যাবো!

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলে উঠল—এই তো খাঁটি ভাইকিং-এর কথা। সভা ভেঙে গেল। সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। ডেকে বসল কেউ কেউ। কেউ কেউ কেবিনঘরে চলে গেল।

মারিয়া বলল—আচ্ছা ফ্রান্সিস, তুমি কি উদ্ধার করতে পারবে সেই নিখোঁজ রাজমুকুট?

আগে খানিয়া দুর্গে যাই, সব দেখি, বুঝি। তারপর বলতে পারবো, মুকুট উদ্ধার সম্ভব কি অসম্ভব। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন বিকেলের দিকে ফ্রান্সিসদের জাহাজ গ্রামভাউসা বন্দরের কাছে এল। দূর থেকে বন্দরের রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি দেখা গেল। বন্দরটা বেশ সমতল জায়গায়। দূর থেকে ফ্রান্সিস মনোযোগ দিয়ে বন্দরটা দেখতে লাগল। দেখল রাস্তাঘাটে লোকজন চলাচল করছে। বেশ স্বাভাবিক জীবন। কোনো সৈন্য দেখতে পেল না। তার মানে এনরিকো এখনও এই বন্দরটা দখল করতে পারেনি। হ্যারি পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল—এখান থেকে দেখে যা বুঝছি এখানে এনরিকোর সৈন্যরা এখনও আসেনি। জাহাজ ভেড়াবো কি না তাই ভাবছি।

হ্যারি বলল—রসুইঘরের বন্ধুরা বলেছিল, জল, খাবার এসব কমে এসেছে। তুমি খানিয়া যেতে চাইছো। কাজেই কিছু খাদ্য, জল তো সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তাছাড়া এনরিকোর দুজন সৈন্য জাহাজে রয়েছে। ওদেরও তো নামিয়ে দিতে হবে।

ঠিক আছে। জাহাজ ভেড়ানো যাক। তবে আমরা কেউ আগে নামবো না। আগে কাভাল্লি নামবে সৈন্য দুজনকে নিয়ে। কাভাল্লি জল, খাদ্য এসবের খোঁজ নিয়ে আসবে। সেই সঙ্গে এখানকার অবস্থাটাও বুঝে আসবে। যদি কোনো বিপদে পড়ার আশঙ্কা না থাকে তবেই আমরা নামবো। ফ্রান্সিসের নির্দেশে জাহাজ তীরের কাছে আনা হলো। ওরা সমতল রাস্তা দিয়ে হেঁটে বন্দরের বসতি অঞ্চলের দিকে

চলে গেল।

ফ্রান্সিস জাহাজ-চালককে নির্দেশ দিল—তৈরি থেকো। আমি হাত তোলার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ছেড়ে দেবে। দাঁড়ীরা দাঁড়ঘরে গিয়ে দাঁড়ে হাত রেখে বসল। পালও নামানো হলো না। নোঙরও ফেলা হলো না। কাঠের পাটাতনের কাছেও দু'তিনজন ভাইকিং তৈরি হয়ে রইল। ফ্রান্সিসের নির্দেশ পেলেই পাটাতন তুলে ফেলবে।

ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া জাহাজের রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। তিনজনেই তাকিয়ে আছে বন্দরের বসতি অঞ্চলের দিকে। সবাই টান টান। তৈরি। বিপদের আঁচ পেলেই জাহাজ ছেড়ে দেবে।

প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। ফ্রান্সিস ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে এখন? তখনই দেখা গেল কাভাল্লি ফিরে আসছে। বেশ নিশ্চিন্ত মনেই হেঁটে হেঁটে আসছে। ফ্রান্সিস হাঁপ ছাড়ল—যাক, বিপদের কোনো আশঙ্কা এখানে নেই। কাভাল্লি জাহাজে উঠল, ফ্রান্সিসের কাছে এল। হেসে বলল—ভয়ের কিছু নেই। এনরিকোর সৈন্যরা এখনও এখানে আসেনি। রাজা বোনিফেসের কিছু সৈন্য এখানে আছে। খুব শান্ত এ জায়গা। আমি জল খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে এসেছি। আমার সঙ্গে লোক দিন আর কিছু স্বর্ণমুদ্রা। আমি সব নিয়ে আসছি। ফ্রান্সিস ভাইকিং বন্ধুদের ডেকে কয়েকজনকে দায়িত্ব দিল। তারা স্বর্ণমুদ্রা, খালি জলের পিপে, বস্তা-টস্তা এসব নিয়ে কাভাল্লির সঙ্গে তীরে নামল। চলল বসতি অঞ্চলের দিকে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভাইকিংরা প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার পানীয় জল নিয়ে ফিরে এল। ফ্রান্সিসরা নিশ্চিন্ত হলো।

রাতে কেবিনঘরে বিছানায় শুয়েই ফ্রান্সিস বুঝল বেশ গরম লাগছে। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করল। ঘুম আসছে না। আবার অনেক চিন্তাও আছে মাথায়। খানিয়া যেতে হবে। ওখানে এখন কী অবস্থা তাও জানি না। যদি গিয়ে দেখি বিদ্রোহী এনরিকোর সৈন্যরা ওখানে পৌঁছে গেছে। লড়াই চলছে তাহলে তো খানিয়া বন্দরে নামা চলবে না। ওখান থেকেই জাহাজ ঘোরাতে হবে স্বদেশের দিকে। এসব ভাবতে ভাবতে বেশ রাতে ঘুমিয়ে পড়ল ফ্রান্সিস।

হঠাৎ ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। একটা চাপা গরমে ও প্রায় ঘেমে উঠেছে। বিছানায় উঠে বসল ফ্রান্সিস। মোমবাতির আলোয় দেখল মারিয়া গভীর ঘুমে। ও আর মারিয়াকে ডাকল না। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠল। তারপর কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ উঠে এল। দেখল সমুদ্র শান্ত কিন্তু আকাশ খুব পরিষ্কার নয়। কেমন একটা সাদাটে ধোঁয়ার মত কুয়াশা আকাশে। চাঁদের আলোও তাই অস্পষ্ট ম্লান।

ফ্রান্সিস দেখল। ডেক-এ এখানে ওখানে কম্বলমত মোটা কাপড় পেতে কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু শুয়ে ঘুমুচ্ছে। গুমোট গরম থেকে এসে ফ্রান্সিসের ভালোই লাগল। কিন্তু হাওয়া নেই একেবারে। গ্রামভাউসার বাড়িঘরও সাদাটে কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা পড়েছে।

ফ্রান্সিস জাহাজের ডেক-এর একেবারে পেছনের দিকে এল। একটা চৌকোনো মত জায়গা রয়েছে। ফ্রান্সিস সেখানেই মাথার নিচে হাত রেখে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। তখনই মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল। আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে ফ্রান্সিস জানে না। হঠাৎ কী একটা অস্বস্তিতে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠে বসল। আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝল রাত শেষ হ'য়ে আসছে। আবার শুয়ে পড়বে কিনা ভাবছে কানে অস্পষ্ট ছলাৎ ছলাৎ জলের শব্দ পৌঁছল। এ তো জাহাজ চলার শব্দ। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। তাকাল বাইরের সমুদ্রের দিকে। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দেখল একটা জাহাজ যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ওদের জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস প্রথমে বুঝে উঠতে পারল না কী করবে। ও জাহাজটার মাস্তুলে কোন দেশের পতাকা আছে কিনা দেখল। না। কোন পতাকা উড়ছে না। জাহাজটা আরো কাছে এল! সাদাটে কুয়াশা আর অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ফ্রান্সিস দেখল জাহাজের সামনের দিকে কালো রঙের কাঠ অনেকটা চটে উঠে গিয়ে খয়েরি রঙের কাঠ বেরিয়ে আছে। এবার ফ্রান্সিস ভীষণ চমকে উঠল। এই যুদ্ধ জাহাজটাই ও ফালাসর্ন বন্দরে ভেড়ানো দেখেছিল। বিদ্রোহী এনরিকোর যুদ্ধ জাহাজটা। ঐ জাহাজে চড়েই এনরিকোর সৈন্যরা আসছে গ্রামভাউসা বন্দর দখল করতে।

ফ্রান্সিস দ্রুত মাথা নিচু করল। তারপর জাহাজের ডেক-এর কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে শুয়ে পড়ল। শরীরটা হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলল। একটু আসতেই মাস্তুলের আড়াল পেল। আস্তে আস্তে মাস্তুলের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসল। দেখল কয়েক হাত দূরেই দু'জন ভাইকিং কম্বল মত মোটা কাপড় পেতে ঘুমিয়ে আছে। তখনই দু'জনের মধ্যে একজন পাশ ফিরল। ফ্রান্সিস দেখল—বিস্কো। ফ্রান্সিস আস্তে ডাকল—বিস্কো—বিস্কো। ঘুমন্ত বিস্কোর কানে গেল না সে ডাক। ওদিকে জাহজটা আরও অনেক কাছে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস দ্রুত ডেক-এ আবার শুয়ে পড়ল। মাস্তুলের আড়াল থেকে বুক হিঁচড়ে বিস্কোর কাছে গেল। আস্তে আস্তে বিস্কোর কাঁধে ধাক্কা দিল। বিস্কোর ঘুম ভেঙে গেল। একবারে মুখের কাছে ফ্রান্সিসকে দেখেও সঠিক চিনল না। দ্রুত উঠতে গেল। ফ্রান্সিস ওর মাথা চেপে ধ'রে বলল—আমি ফ্রান্সিস। চুপ ক'রে শুয়ে থাকো। বিস্কো মাথা নামিয়ে শুয়ে পড়ল। বেশ বুঝল নিশ্চয়ই কিছু হ'য়েছে। ফ্রান্সিস ওর কানের কাছে মুখ এনে বলল—এনরিকোর সৈন্যরা গ্রামভাউসা বন্দর দখল করতে জাহাজে চড়ে আসছে। আর অল্পক্ষণ পরেই ওদের জাহাজ আমাদের জাহাজের গায়ে এসে লাগবে। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই ক'রে সবাই ক্লান্ত। ঘুমিয়ে পড়েছে। কাউকে ডাকবো না। আমাদের বন্ধুরা লড়াই যেন না করে। এনরিকোর সৈন্যরা বন্দী করতে এলে যেন বাধা না দেয়। রক্তপাত আমি চাই ন। সবাই বন্দীত্ব স্বীকার ক'রে নিও। ফ্রান্সিস থামল। একটু দম নিয়ে বলল—তুমি সবাইকে এই কথা বলো। আমি জলে নেমে যাবো। সময় ও সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করবো। তোমরা লড়াই করতে যেও না। অবস্থা বুঝে আমি যা করার করবো। আমি যাচ্ছি।

ফ্রান্সিস আবার ডেক-এর পাটাতনে বুক হিঁচড়ে হিঁচড়ে জাহাজের পেছনের

দিকে এল। ও যখন জাহাজের হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে নামতে শুরু করেছে তখনই এনরিকোর সৈন্য ভর্তি জাহাজটা ওদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। এনরিকোর সৈন্যরা ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ তুলে ফ্রান্সিসদের জাহাজে নামতে লাগল।

বিস্কো দু'হাত তুলে উঠে দাঁড়াল। খোলা তরোয়াল হাতে দু'তিনজন সৈন্য এসে বিস্কোকে ঘিরে দাঁড়াল। সেই অল্প দাড়িওলা লম্বাটে চেহারার দলপতি বিস্কোর সামনে এসে দাঁড়াল। বিস্কো বলল—আমাদের কাউকে হত্যা করবেন না? কিন্তু দলপতি বিস্কোর কথা কিছুই বুঝল না। ওদিকে সৈন্যরা খোলা তরোয়াল উঁচিয়ে সিঁড়ি বেয়ে কেবিনঘরগুলোর দিকে ছুটল। শুয়ে থাকা বসে থাকা ঘুমন্ত ভাইকিংরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বন্দী হতে লাগল, এনরিকোর সৈন্যদের হাতে। হাত বেঁধে সব ভাইকিং বন্দীদের ডেক-এ আনা হল। মারিয়াকেও হাত বেঁধে আনা হ'ল। হ্যারিও এল। বিস্কো ছুটে হ্যারির কাছে গেল। দ্রুত বলল—হ্যারি ফ্রান্সিস আত্মগোপন করেছে। ও বলেছে আমরা যেন যুদ্ধ না করি। শান্ত হ'য়ে থাকি। ফ্রান্সিস নিজেই যা করবার করবে। বিস্কো হ্যারির সঙ্গে কথা বলছে তখনই সৈন্যদের দলপতি দু'জনের দিকে এগিয়ে এল। হ্যারিকে গ্রীক ভাষায় জিজ্ঞেস করল—আমাদের নেতা এনরিকো তোমাদের আমাদের হ'য়ে যুদ্ধ করতে বলেছিল। তোমরা পালালে কেন? দেখুন—আমরা গ্রীক নই—এদেশের রাজনীতির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। রাজা বোনিফেস আমাদের কোন ক্ষতি করেন নি। তবে কেন আমরা আপনাদের যুদ্ধের সঙ্গে জড়াব? হ্যারি বেশ দৃঢ়স্বরে বলল। দলপতি কিছুক্ষণ হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বন্দী হ্যারির মুখে এরকম তেজোদৃপ্ত কথা শুনে দলপতি বেশ অবাকই হল। দলপতি যখন চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তখন হ্যারি বলল—আমাদের রাজকুমারী মারিয়াকে এভাবে বন্দী ক'রে রাখবেন না। তাঁকে তাঁদের কেবিনঘরে থাকতে দিন। আমরা কথা দিচ্ছি আমরা পালাবার চেষ্টা করবো না। দলপতি একজন সৈন্যকে ডেকে কী বলল। সৈন্যটি গিয়ে মারিয়ার হাতের বাঁধন খুলে দিল। হ্যারি একটু গলা চড়িয়ে বলল—রাজকুমারী—আপনি আপনার কেবিনঘরে চলে যান।

—কিন্তু তোমরা? মারিয়া বলল।

—আমরা বন্দীত্ব মেনে নিয়েছি। এই ডেকেই থাকবো আমরা। মারিয়া একটু ইতস্তত ক'রে বলল—ফ্রান্সিস কোথায়?

হ্যারি এবার এগিয়ে মারিয়ার কাছে গেল। নিম্নস্বরে বলল।

—ফ্রান্সিস ভালো আছে। ও আত্মগোপন করেছে। কাছাকাছিই আছে। ও বলেছে আমাদের মুক্তির উপায় করবে। এখন এই সেনাপতি ও সৈন্যরা যা বলে তাই করবেন। বিরোধিতা করবেন না।

মারিয়া আর কোন কথা না ব'লে নিজের কেবিনে চলে গেল।

এসময় দলপতি উচ্চকণ্ঠে কী আদেশ দিল সৈন্যদের। সৈন্যরা এগিয়ে এসে ভাইকিংদের ডেক-এর কাঠের পাটাতনে বসে পড়তে ইঙ্গিত করল। হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—সবাই ডেক-এ বসে পড়ো। সবাই আস্তে আস্তে বসে পড়ল। দু'একজন ভাইকিং একটু জোর গলায় বলল—ফ্রান্সিসকে দেখছি না—

সে কোথায়? হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস সুস্থ আছে। নিরাপদে আছে। শুধু এইটুকুই জেনে রাখো তোমরা। ফ্রান্সিস বলেছে—তোমরা এই সৈন্যদের সঙ্গে কোনভাবে লড়াইতে নামবে না। ওরা যেমন বলে তেমনি চলবে। তোমরা বিরোধিতা করবে না। সবাই চুপ করে হ্যারির কথা শুনল। ওরা বীরের জাতি। এইভাবে বিনা যুদ্ধে বন্দী দশা মানতে ওদের মন চাইছিল না। কিন্তু ফ্রান্সিস বলেছে। কাজেই ফ্রান্সিসের নির্দেশমত চলতে হবে। ফ্রান্সিস আত্মগোপন করেছে। মুক্ত আছে। ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই মুক্তির ব্যবস্থা করবে। ফ্রান্সিসের ওপর সে বিশ্বাস আছে।

তখন সবে সূর্য উঠছে। পুবের আকাশ লাল হ'য়ে গেছে। একটু পরে সূর্য উঠল। তবে চারদিকে কেমন সাদাটে কুয়াশার আস্তরণ থাকায় রোদ খুব উজ্জ্বল হ'ল না।

সৈন্যদের দলপতি এবার হাতের তরোয়াল উঁচিয়ে গ্রামভাউসা বন্দরের দিকে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত ক'রে চিৎকার ক'রে কী বলল। সৈন্যরা পর পর সারি বেঁধে জাহাজ থেকে নামতে লাগল। পাথুরে রাস্তা ধ'রে সৈন্যদল চলল বসতির দিকে। জাহাজে চারজন সৈন্য ভাইকিং বন্দীদের পাহারায় রইল। একজন সৈন্য রইল মারিয়ার পাহারায়।

একটু পরেই সমস্ত এলাকা থেকে লোকজনের আর্ত চিৎকার কান্নাকাটির ধ্বনি ভেসে এল। বোনিফেসের যে ক'জন সৈন্য ছিল তারা তো হার স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল। বন্দী কাভাল্লি চিৎকার ক'রে বলল—এনরিকোর সৈন্যরা জিতলে আমাদের মুক্তির কোন আশা নেই। ভাইকিং বন্দীরা শুনল। কিছু বলল না কেউ। কিন্তু কাভাল্লি ওরা যখন খাদ্য জল আনতে গিয়েছিল তখন ওখানকার বসতি ছাড়িয়ে বেশিদূর যায়নি। কিছুদূরে কিন্তু রাজা বোনিফেসের প্রায় শ'খানেক সৈন্যের ছাউনি ছিল। এটা কাভাল্লিরা জানতো না। সেই ছাউনিটা ছিল একটু দূরে একটা ঘাসে ঢাকা উপত্যকার মধ্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এনরিকোর সৈন্যরা সেই উপত্যকায় এল। এর মধ্যে বোনিফেসের সৈন্যরাও তৈরি হ'য়ে গেছে। কারণ দূর থেকে ওরা গ্রামভাউসার অধিবাসীদের আর্ত চিৎকার শুনতে পেয়েছিল।

এনরিকোর সৈন্যরা চিৎকার করতে করতে ছুটে এল উপত্যকা দিয়ে। বোনিফেসের সৈন্যরাও সশস্ত্র হ'য়ে ছাউনি থেকে বেরিয়ে এল। দুই সৈন্যদলে তুমুল লড়াই শুরু হ'ল সেই উপত্যকায়।

ওদিকে ফ্রান্সিস ওদের জাহাজের হাল ধ'রে শুধু মাথাটা জলের ওপর ঠেকিয়ে—চুপ ক'রে জলের মধ্যে ডুবে রয়েছে। ওপরে জাহাজের পাটাতনে শব্দ শুনেই ও বুঝল যে এনরিকোর সৈন্যরা ওদের জাহাজে নামল। সৈন্যদের চিৎকার চ্যাঁচামেচি দলপতির গলা চড়িয়ে সৈন্যদলের আদেশ দেওয়া এসব শুনে ফ্রান্সিস বুঝল—এনরিকোর সৈন্যরা ওদের জাহাজ দখল করেছে। ও আশঙ্কা করেছিল হয়তো ভাইকিং বন্ধুরা অস্ত্রঘর থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে বাধা দেবে লড়াই করবে। কিন্তু ও তরোয়ালের লড়াইয়ের কোন শব্দ শুনল না। বোঝা গেল—ভাইকিং বন্ধুরা লড়াইয়ের সুযোগই পায় নি। এতে ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হ'ল। রক্তপাত ও মৃত্যু এসব

ঘটল না। তখনই ও শুনল হ্যারি চিৎকার করে ওর বন্ধুদের ফ্রান্সিসের নির্দেশ জানাচ্ছে। ফ্রান্সিস আরো নিশ্চিন্ত হ'ল। ওর নির্দেশ শোনার পর আর বন্ধুরা লড়াইয়ের চেষ্টা করবে না। কিন্তু ফ্রান্সিসের মাথায় তখন চিন্তা। কী ক'রে সবাইকে মুক্ত করা যায়। মারিয়া আর সব বন্ধুরা তো নিশ্চিন্ত—ফ্রান্সিস বন্দী হয়নি। মুক্ত আছে। মুক্তির একটা ব্যবস্থা ফ্রান্সিস করবেই। সবাই মুক্তির জন্যে ওর ওপর নির্ভর ক'রে আছে একথা ভেবে ফ্রান্সিসের দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল। অথচ ভেবে পাচ্ছে না কী ক'রে ওদের মুক্ত করবে।

ফ্রান্সিস এবার শব্দ থেকে বুঝল এনরিকোর সৈন্যরা জাহাজ থেকে নেমে যাচ্ছে। হালের আড়াল থেকে দেখল সৈন্যরা সারি বেঁধে গ্রামভাউসার বসতি এলাকার দিকে যাচ্ছে। তার মানে জাহাজে পাহারাদার সৈন্য মাত্র কয়েকজনই আছে। এদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে জাহাজ নিয়ে বন্ধুদের আর মারিয়াকে নিয়ে পালাতে হবে। কিন্তু কী ক'রে? ফ্রান্সিস কাভাল্লিদের কাছে শুনেছিল এ গ্রামভাউসারে বোনিফেসের খুবই অল্প সৈন্য আছে। এনরিকোর সৈন্যদের কাছে ওরা সহজেই হার মানবে। কাজেই সৈন্যরা সকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজে ফিরে আসবে। তখন কি অত সৈন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানো যাবে? তাও জাহাজে চড়ে?

ফ্রান্সিস এসব সাতপাঁচ ভাবছে তখনই দূর থেকে চিৎকার হৈ হৈ শব্দ ভেসে এল। ফ্রান্সিস চমকে উঠল। তাহ'লে রাজা বোনিফেসের আরো সৈন্য গ্রামভাউসায় ছিল। যুদ্ধের নানা শব্দ আর্ত চিৎকার এসব শব্দ শুনে ফ্রান্সিস বুঝল জোর লড়াই বেঁধেছে। ওর মন আনন্দে নেচে উঠল।

যুদ্ধে যদি রাজা বোনিফেসের সৈন্যরা জেতে তাহ'লে তো বন্ধুদের মুক্ত করতে কোন অসুবিধেই হবে না। কিন্তু যদি এনরিকোর সৈন্যরা জেতে তাহ'লে তো মুক্তির কোন আশাই নেই। তবে একটা ক্ষীণ আশা ফ্রান্সিসের মনে জাগল হয়তো যুদ্ধে জিতলে এনরিকোর সৈন্যরা আর ওদের জাহাজে আজকে নাও ফিরতে পারে। কারণ যুদ্ধে জিতলে জাহাজ পাহারা দেবার জন্যে কয়েকজন পাহারাদারই যথেষ্ট। যদি ঐ সৈন্যরা বেশি সংখ্যায় গ্রামভাউসাতেই থেকে যায় আজ রাতে আর ওদের জাহাজে ফিরে না আসে তাহলে সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ আজ রাতের মধ্যেই কাজে লাগাতে হবে। যে ক'রে হোক বন্ধুদের মুক্ত করতে হবে। জাহাজ নিয়ে পালাতে হবে এখান থেকে। এখন রাত্রির অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। কাজেই ফ্রান্সিস সমুদ্রের জলে মুখ ভাসিয়ে জাহাজের হাল ধরে অপেক্ষা করতে লাগল।

এদিকে বেলা বাড়ছে। ভাইকিং বন্দীরা সকাল থেকে কিছু খায় নি। যে চারজন সৈন্য ওদের পাহারা দিচ্ছিল তারা জাহাজের রসুইঘরে পালা ক'রে গিয়ে খেয়ে এসেছে। ভাইকিং বন্দীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হ'ল। তারপরই ওরা একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে উঠল—ও—হো—হো। পাহারাদার সৈন্যরা তরোয়াল উঁচিয়ে এগিয়ে এল। হ্যারি দেখল বন্ধুরা উত্তেজিত। ওরা হাত বাঁধা অবস্থায় সশস্ত্র সৈন্যদের সঙ্গে লড়তে পারবে না। যদি উত্তেজিত হ'য়ে সৈন্যদের আক্রমণ ক'রে বসে তাহ'লে কয়েকজন ভাইকিং বন্ধুর মৃত্যু হবেই। হ্যারি বাঁধা দু'হাত ওপরে তুলে ভাঙা ভাঙা

গ্রীক ভাষায় চেঁচিয়ে বলল—আমরা বন্দী কিন্তু আমরা তো মানুষ। এত বেলা হ'য়েছে। আমরা কিছু খাই নি, আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করো। সৈন্যরা কী করবে বুঝে উঠতে পারলো না। ভাইকিং বন্দীরা আবার চিৎকার ক'রে উঠলো—ও—হো—হো।

এই চিৎকার গণ্ডগোলের শব্দ মারিয়ার কানে গেল। ও দ্রুত পায়ে কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে এল। একজন সৈন্য কেবিনঘরের দোরগোড়ায় পাহারা দিচ্ছিল। মারিয়া তাকে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার! এত চেঁচামেচি কীসের? পাহারাদার সৈন্যটি মারিয়ার কথা কিছুই বুঝল না। হাঁ করে তাকিয়ে রইল। মারিয়া রাগত স্বরে বলল—গ্রীক ভূত! তারপর ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। সৈন্যটি তরোয়াল বাড়িয়ে ধ'রে মারিয়ার পথ আটকাল। মারিয়া ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে সৈন্যটির দিকে তাকাল একবার। তারপর ডানহাতের এক ঝটকায় তরোয়ালের ফলা সরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। সৈন্যটি কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। পাছে মারিয়া পালিয়ে যায় তাই ও একছুটে এগিয়ে এসে মারিয়ার পেছনে পেছনে আসতে লাগল। মারিয়া ডেক-এ উঠতেই ভাইকিং বন্দীরা আবার চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো—হো। মারিয়া হ্যারির কাছে এল। বলল—কী ব্যাপার হ্যারি?

—রাজকুমারী—সকাল থেকে আমরা কিছু খাইনি । ক্ষুধার্ত আমরা। দুপুরে খাওয়া জুটবে কি না জানি না। হ্যারি বলল। মারিয়া বলল—হ্যারি আমি সব ব্যবস্থা করছি। কিন্তু আমি যে গ্রীক ভাষা জানি না। সৈন্যরা আমার কথা বুঝবে না। তুমি ওদের বুঝিয়ে বলো। হ্যারি সৈন্যদের বলল—শোন—রাজকুমারী মারিয়া আমাদের খাবার তৈরি করে দেবেন। উনি পালাবেন না। যদি তোমাদের মনে সেই সন্দেহ থাকে তাহ'লে রসুইঘরের দরজায় দু'জন পাহারাদার রাখতে পারো। এবার সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে কথা বলল। ওরা রাজি হ'ল। দু'জন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে মারিয়ার পেছনে এসে দাঁড়াল।

—কিন্তু রাকুমারী হ্যারি বলল—আপনি একা কি পারবেন এতজন লোকের রান্না করতে? আপনার খুব কষ্ট হবে।

—কিছ্ছু না—মারিয়া একটু হেসে বলল। তারপর নিচে নামার সিঁড়ির দিকে চলল। পেছনে তরোয়াল উঁচিয়ে দু'জন পাহারাদার সৈন্যও চলল।

মারিয়া দ্রুতপায়ে রসুইঘরে এল। সৈন্য দু'জন দরজায় দাঁড়াল। মারিয়া রাজকুমারী হলেও আলস্যে দিন কাটাতো না। নিজের কাপড় জামা কাচতো, কাপড় রুমাল সেলাই করতো। রাজবাড়ির বয়স্কা রাঁধুনির কাছে নানারকম খাবারের পদ রান্না করাও শিখেছিল। কিন্তু এত লোকের রান্না তো মারিয়া কোনদিন রাঁধেনি। তবুও নিজে থেকে এগিয়ে এসে এই দায়িত্ব নিল। এই বন্দী ভাইকিংদের একটাই পরিচয় ওরা ফ্রান্সিসের অন্তরঙ্গ বন্ধু

প্রথমে মারিয়া আটা, ময়দা, চিনি, আনাজপাতি, মশলা এসব কোথায় কোথায় রাখা আছে দেখে নিল। একটা বড় গামলায় ভেড়ার মাংস কেটে রাখা আছে দেখল। এবার উনুন জ্বালা। তারপর রান্না।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে রান্না শেষ হ'ল। মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। বেশ

গলা চড়িয়ে বলল—রান্না হ'য়ে গেছে। ভাইকিং বন্দীরা আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠল—ও—হো—হো। অত লোকের জন্যে রান্না করার ধকলে মারিয়ার মুখ শুকিয়ে গেছে। ও তবু হাসল।

সৈন্যরা চারজন চারজন ক'রে ভাইকিংদের পাহারা দিয়ে খাবার ঘরে নিয়ে যেতে লাগল। এইবাবে ভাইকিং বন্দীরা খেয়ে আসতে লাগল। হ্যারি সবাইকে খেতে পাঠাতে লাগল। ও খাবে সবশেষের দলে, হ্যারি এসময় উঠে দাঁড়াল। একজন সৈন্য তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল। হ্যারি বলল—খাবার আগে আমরা আমাদের দেবতাকে খাদ্য জল উৎসর্গ করে খাই। আমি দেবতাকে ডাকবো। আমাকে জাহাজের পেছন দিকে গিয়ে দেবতাকে ডাকতে হবে। সৈন্যটি কী ভাবল। তারপর তরোয়ালটা বাড়িয়ে ধ'রে যেতে বলল। হ্যারি জাহাজের পেছন দিকে হালের কাছে এল। আকেশর দিকে বাঁধা হাতদু'টো বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল—হে দেবতা—তুমি অনেকক্ষণ খাওনি। আমাদের রান্না হ'য়ে গেছে। এবার তুমি খাও। ফ্রান্সিস জলের একটু ওপরে মাথা ভাসিয়ে হ্যারির সব কথা শুনল। এত বিপদ এত চিন্তার মধ্যেও হ্যারির কথা শুনে ফ্রান্সিসের হাসি পেল।

হ্যারি ফিরে এল। পেছনে পেছনে সৈন্যটাও এল। ও এসবের কিছুই বুঝল না।

সবশেষের দলের সঙ্গে হ্যারি খেতে গেল। হ্যারি খাবার ঘরে ঢুকে মারিয়াকে গ্রীক ভাষায় বলল—আপনি তো জানেন—আমাদের দেবতাকে উৎসর্গ না ক'রে আমি কিছু খাই না। মারিয়া তো অবাক, গ্রীক ভাষা তো বোঝে না। সৈন্যরা এঁবার বুঝল সে সত্যিই হ্যারি খাবার আগে ওদের দেবতাকে খাবার উৎসর্গ করে। কিন্তু মারিয়া ফ্যাল ফ্যাল ক'রে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইল। এবার হ্যারি ওদের মাতৃভাষায় বলল—একটা পাত্রে খাবার দিন। আর এক মগ জল। আমি দেবতাকে খাবার উৎসর্গ ক'রে খেতে আসছি। মারিয়া ঠিক বুঝল না হ্যারি কী বলতে চাইছে! হ্যারি তাড়া দিল—একটু তাড়াতাড়ি করুন। মারিয়া আর কিছু না ব'লে একটা এনামেলের থালায় মাংস রুটি সব্জি রাখল। একটা মগে জলও দিল। সে সব নিয়ে হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। একজন সৈন্যও ওর পেছনে পেছনে চলল। হ্যারি খাবার জলের মগ হাতের কাছে একটা পরিষ্কার জায়গায় রাখল। খাবে ব'লে হ্যারির হাতের বাঁধন সৈন্যটি খুলে দিয়েছিল। খাবার জল রেখে হ্যারি সৈন্যটিকে বলল—ভাই—এসময় এখানে কেউ থাকবে না। আমাদের দেবতা যখন খান তখন কারো তা দেখার নিয়ম নেই। তুমি আমার সঙ্গে খাবার ঘরে চলো। সৈন্যটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। এবার হ্যারি দু'হাত তুলে গলা চড়িয়ে বলল—হে দেবতা! আপনার জন্যে এখানে খাদ্য রেখে গেলাম। আপনি এই খাদ্য পানীয় গ্রহণ ক'রে আমাদের কৃতার্থ করুন। হাত নামিয়ে হ্যারি সৈন্যটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে চলল। ডেক-এর সামনের দিকে পাহারারত সৈন্যদের বলল...ভাই তোমরা দয়া ক'রে হালের দিকে এখন যেও না। আমাদের দেবতা খাবেন এখন?

জলে মাথা ভাসিয়ে থাকা ফ্রান্সিস মনে মনে হ্যারিকে বার বার ধন্যবাদ জানাল। সত্যি ওর তখন ভীষণ খিদে পেয়েছিল। মনে মনে হ্যারির বুদ্ধিরও প্রশংসা করল।

একটু অপেক্ষা ক'রে ফ্রান্সিস ঝোলানো দড়ি ধ'রে হালের কাঠের খাঁজে পা রেখে রেখে জাহাজে উঠে এল। উবু হ'য়ে ব'সে দ্রুত খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হলে জল খেয়ে ফ্রান্সিস দ্রুত দড়ি ধ'রে হালের খাঁজ বেয়ে বেয়ে জলে নেমে এল। এখন রাতের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

ওদিকে এনরিকোর সৈন্যদের সঙ্গে ছাউনির বোনিফেসের সৈন্যদের সঙ্গে তুমুল লড়াই শেষ হবার মুখে। বোনিফেসের সৈন্যরা বীরের মত লড়াই করল। কিন্তু এনরিকোর সৈন্যদের কাছে ওরা শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল। যুদ্ধক্ষেত্রে অবশেষে নিস্তব্ধতা নেমে এল। তখন সূর্য অস্ত যেতে বেশি দেরি নেই।

রণক্লান্ত এনরিকোর সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রের এখানে ওখানে শুয়ে পড়ল। বিশ্রাম করতে লাগল। কিন্তু ক্লান্তি নেই দলপতির। সে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে সব সৈন্যদের অভিনন্দন জানাতে লাগল। সে স্থানীয় কিছু লোকজন ধ'রে নিয়ে এল। ঐ যুদ্ধক্ষেত্রেই পাথর পেতে উনুন বসানো হ'ল। বস্তায় ক'রে ময়দা আনা হ'ল আর ভেড়ার মাংস। রান্না চলল।

সন্ধ্যের পরেই রান্না শেষ হ'ল। সব সৈন্যরা খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে বোনিফেসের সৈন্যদের ছাউনিতেই শুয়ে পড়ল। সৈন্যদের দলপতি শুধু সমুদ্রতীরে এল। নিজেদের জাহাজে রইল। আরো তিন চারজন সৈন্য জাহাজের পাহারায় আগেই ছিল।

রাত বাড়ছে। জলের মধ্যে শুধু মাথাটা তুলে ফ্রান্সিস অপেক্ষা করছে। কিন্তু তখনও ভেবে পাচ্ছে না কী ক'রে বন্ধুদের মুক্ত করবে। কী ক'রে সবাইকে নিয়ে জাহাজে চড়ে পালাবে।

রাজকুমারী মারিয়া রাতের রান্নাও রাঁধল। খুবই কষ্ট হ'ল মারিয়ার। এত লোকের রান্না সহজ কথা না। কিন্তু মারিয়া মুখ বুঁজে এই কষ্ট মেনে নিল। ওর মনে শুধু এক চিন্তা—ফ্রান্সিস মুক্ত আছে। ও নিশ্চয়ই ওদের মুক্তির ব্যবস্থা করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারবে কি? যদি ওদের মুক্ত করতে গিয়ে ফ্রান্সিস নিজে ধরা পড়ে যায় তাহ'লে তো সর্বনাশ। মারিয়া এবার ডেক-এ উঠে এল। গলা চড়িয়ে বলল—রান্না হ'য়ে গেছে। খেতে এসো সবাই।

আবার চারজন চারজন ক'রে ভাইকিং বন্ধুরা খাবার ঘরে গিয়ে খেয়ে আসতে লাগল। শেষ চারজনের মধ্যে হ্যারি গেল দুপুরের মতই দেবতাকে উৎসর্গ করবে ব'লে খাদ্য জল নিয়ে জাহাজের পেছনে হালের কাছে। দেখল এঁটো থালা গ্লাস রয়েছে। হ্যারি ভীষণ খুশি হ'ল। ফ্রান্সিস তাহলে কাছাকাছিই আছে। সঙ্গের পাহারাদার সৈন্যটি এসবের কিছুই বুঝল না। ডেক-এর কাঠের মেঝেয় খাবার জল রেখে দু'হাত ওপরে তুলে বলল—হে দেবতা—আপনি খাদ্য জল গ্রহণ করেছেন এই জন্যে আমরা কৃতার্থ হয়েছি। আবার রাত্রির আহার রেখে গেলাম, গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করুন। হাত নামিয়ে হ্যারি ফিরে চলল। সৈন্যটিও ওর পেছনে পেছনে চলল।

খেতে বসে হ্যারি দেখল মারিয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মারিয়াই পরিবেশন করছে। অপেক্ষা করছে কে কী খেতে চায় তার জন্যে। হ্যারি মারিয়াকে বলল—

রাজকুমারী একটু জল দিন। মারিয়া তাড়াতাড়ি এনামেলের জগটা নিয়ে এগিয়ে এল। মারিয়া গ্লাসে জল ঢালছে তখনই হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—দেবতা খাবার খেয়েছে। জাহাজের হালের কাছেই কোথাও আছে। আনন্দে মারিয়ার মন নেচে উঠল। কিন্তু এই আনন্দ সে বাইরে প্রকাশ পেতে দিল না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'ল। আবার ভাইকিংদের হাত বেঁধে ফেলা হ'ল। সবাইকে আগের জায়গায় বসিয়ে রাখা হ'ল।

রাত বাড়ল। অনেকেই হাত বাঁধা অবস্থাতেই শুয়ে পড়ল। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়ল।

ওদিকে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে জল থেকে উঠে এল। হালের গায়ে খাঁজে খাঁজে পা রেখে ডেক-এ উঠে এল। দ্রুত খাবার খেয়ে জল খেয়ে ও আবার হাল বেয়ে সমুদ্রের জলের দিকে নামতে লাগল।

আজ আকাশ অনেক পরিষ্কার। কুয়াশা অনেক পাত্‌লা। চাঁদের আলোও উজ্জ্বল। ফ্রান্সিস হালের খাঁজে দাঁড়িয়ে একবার এনরিকোর সেনাদের যুদ্ধ জাহাজটার দিকে তাকাল। দু'জন সৈন্য জাহাজের ডেক-এ পাহারা দিচ্ছে দেখল। ডেক-এ আর কেউ নেই। হঠাৎ ফ্রান্সিসের নজর পড়ল জাহাজের সামনের দিকে। সেই জাহাজের কালো কাঠের নিচের দিকে। অনেকটা কাঠের চটা উঠে গিয়ে সাদাটে কাঠ দেখা যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে অন্য কোন জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল। আচ্ছা তখন যদি সবটা খুব্‌লে উঠে আসতো তাহ'লে তো হুড় হুড় ক'রে সমুদ্রের জল ঢুকে জাহাজটা ডুবেই যেত।

এই কথাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ফ্রান্সিসের মাথায় একটা কথা এসে ধাক্কা দিল—জাহাজটাকে ঐ জায়গায় ফুটো করতে পারলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডুবে যাবে। ফ্রান্সিস কথাটা ভাবতে ভাবতে দ্রুত জলে নেমে এল। সাবধানে হতে হবে। কিছুতেই সৈন্যদের নজরে পড়া চলবে না। ফ্রান্সিস গলা জলে ডুবে থেকে ভাবতে লাগল এখন একটা করাত চাই। হাতুড়ি বাটালি হ'লেও চলবে। কিন্তু সেসব তো ওদের জাহাজের কেবিন ঘরগুলোর শেষে এক কোণায় একটা কাঠের বড় বাক্সে রয়েছে। যে করেই হোক ঐ যন্ত্রগুলো আনতে হবে। ফ্রান্সিস অস্থির হ'য়ে পড়ল। আনতেই হবে ওগুলো। ভাবতে লাগল কী ভাবে আনা যায়।

ফ্রান্সিস আবার জল থেকে উঠে এল। ডেক-এর ওপর শুয়ে পড়ল। বুক হিঁচ্‌ড়ে হিঁচ্‌ড়ে গিয়ে মাস্তুলের পেছনে এল। দেখল চারজন সৈন্য তরোয়াল হাতে বন্দী বন্ধুদের পাহারা দিচ্ছে। ঐ সৈন্যদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না; রাতও অন্ধকার নয়। চাঁদের আলো উজ্জ্বল। ধরা পড়তে হবে। তখন মুক্তির শেষ আশাটাও থাকবে না। ফ্রান্সিস আবার হালের কাঠের খাঁজে পা রেখে রেখে জলে নেমে এল। অপেক্ষা করতে লাগল যদি হ্যারি আবার আসে।

ওদিকে মারিয়া বন্ধ কেবিনঘরে কাঠের মেঝেয় পাইচারি করছে। দ্রুত ভাবছে কী ক'রে ফ্রান্সিসের খোঁজ পাওয়া যায়। কী ক'রে ওর সঙ্গে কথা বলা যায়। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে কেবিনঘরের দরজা খুলে বাইরে এল। পাহারাদার সৈন্যটা দোরগোড়ায় মেঝেয় বসে ঝিমোচ্ছিল। দরজা

খোলার শব্দ শুনে তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াল। হাতে তরোয়াল তুলে নিল। মারিয়া সোজা ডেকে-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে চলল। এবার আর পাহারাদার বাধা দিল না। মারিয়ার পেছনে পেছনে চলল।

ডেক-এ উঠে মারিয়া চলল বন্দী ভাইকিংদের কাছে। পেছনে পাহারাদার সৈন্যটিও চলল। হ্যারি বাঁধা হাত দুটো মাথায় দিয়ে শুয়ে ছিল। ঘুম আসছে না। কীভাবে মুক্তি পাবে। ফ্রান্সিস কীভাবে ওদের এই বন্দীদশা ঘোচাবে। এসব সাত পাঁচ ভাবছিল। মারিয়া কাছে এসে দাঁড়াতে হ্যারি উঠে বসল। ঠিক বুঝল না রাজকুমারী কেন ওর কাছে এসেছে। মারিয়া বলল—হ্যারি—এই গর্দভ পাহারাদারটাকে বলো তো আমি কেবিনঘরে ঘুমুতে পারছি না। ভীষণ গরম লাগছে। আমি হালের ওখানে ডেকে-এ শোবো। ঘুমুবো। হ্যারি পাহারাদারের দিকে তাকাল। মারিয়ার কথাগুলো বুঝিয়ে ভাঙা ভাঙা গ্রীক ভাষায় বলল। পাহারাদার মাথা নেড়ে বলল—যদি জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়।

—রাজকুমারী ঠিকই বলেছেন—তুমি একটা নিরেট গর্দভ। হ্যারি বলল। পাহারাদার কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠল। তরোয়াল তুলল। হ্যারি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে বলল—

—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে শোন। রাজকুমারী যদি জলে ঝাঁপ দিয়ে পালানও—কোথায় পালাবেন? গ্রামভাউচা এখন তোমাদের দখলে। ওখানে লুকোতে পারবেন না। আর রইলো সামনের ঐ সমুদ্র। একজন স্ত্রীলোক সাঁতরে ঐ সমুদ্র পার হ'তে পারবে? বলো—। হ্যারি আস্তে আস্তে বলল। পাহারাদার এবার একটু ভাবল। অন্য পাহারাদারদের কাছে গেল। বোধহয় পরামর্শ চাইতে। ওদের সঙ্গে কথা ব'লে পাহারাদার ফিরে এল। বলল—উনি ওখানে ঘুমুতে পারেন কিন্তু আমি পাহারায় থাকবো। হ্যারি মারিয়াকে সে কথা বললো। মারিয়া বলল—

ঐ গর্দভটাকে বলো ঘুমোবার সময় ও আমার নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াতে পারবে না। তাহ'লে আমি ঘুমুতেই পারবো না। ওকে মাস্তুলের আড়ালে থাকতে হবে। হ্যারি পাহারাদারকে বলল সে কথা। পাহারাদারটা একটু ভাবল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—ঠিক আছে। হ্যারি বলল—রাজকুমারী—ও রাজি হ'য়েছে। যান শুয়ে পড়ুন তো।

মারিয়া চলল জাহাজের হালের দিকে। পেছনে সেই পাহারাদারটি। মাস্তুলের কাছে এসে মারিয়া পাহারাদারটিকে ইঙ্গিতে ওখানে দাঁড়াতে বলল। পাহারাদারটি কোন আপত্তি করল না। মাস্তুলের আড়ালেই দাঁড়াল।

'মারিয়া হালের কাছে এসে দেখল এঁটো থালা মগ পড়ে আছে। ও বুঝল ফ্রান্সিস কাছেই কোথাও আছে। মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগল—আমাদের দেবতা—আপনি খুশিমনে আমাদের দেওয়া খাদ্য জল গ্রহণ করেছেন। আমরা আনন্দিত। এবার বলুন—আর কীভাবে আমরা আপনাকে খুশি করতে পারি? ফ্রান্সিস জলে ডুবে মারিয়ার কথাগুলো শুনল। খুশিতে ওর মন নেচে উঠল। এই সুযোগ। ও ভাবল—কিন্তু মারিয়ার কাছেই যদি কোন পাহারাদার সৈন্য থাকে তাহ'লে তো ডেক-এ উঠে ওর সঙ্গে কথা বলা যাবে না। উল্টে ধরা পড়তে হবে। ফ্রান্সিস অপেক্ষা করতে লাগল মারিয়া আর কী বলে শোনার জন্যে।

তখনই মারিয়ার ফিস্ ফিস্ ক'রে বলা কথাটা ওর কানে কেল—এসো—কেউ নেই। ফ্রান্সিস আর দেরি করল না। দড়ি বেয়ে উঠে এল। ততক্ষণে মারিয়াও ডেক-এর ধারে ঝুঁকে ফ্রান্সিসকে দেখতে পেয়েছে।

ফ্রান্সিস সবটা দড়ি বেয়ে উঠলো না। ওপরে তাকিয়ে মারিয়ার ঝুঁকে-পড়া মুখ দেখল। খুব গলা চেপে ফ্রান্সিস বলল—হাতুড়ি বাটালি ছোট করাত। জল্দি। কথা কটা ব'লেই ফ্রান্সিস দ্রুত দড়ি বেয়ে জলে নেমে গেল। তারপরই ডুব দিয়ে রইল। যতটা সম্ভব দম চেপে ডুব দিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা তুলল। দেখল মারিয়া চলে গেছে। যাক্—ওর কথা পাহারাদার সৈন্যরা শুনতে পায়নি।

ওদিকে মারিয়া দ্রুত হাতে এ'টো থালা জলের মগ হাতে তুলে নিল। সে সব নিয়ে বেশ দ্রুত চলল ডেক দিয়ে। দেখল পাহারাদারটি মাস্তুলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। মারিয়া ওকে এঁটো থালা মগ ইঙ্গিতে দেখাল। ওকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ইঙ্গিত করল। পাহারাদার আর ওর পেছনে পেছনে এল না।

মারিয়া সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমেই এ'টো থালা গ্লাস দ্রুত নামিয়ে রাখল। নিজের কেবিনঘরে ঢুকল। একটা মোটা কম্বলমত কাপড় গায়ে জড়াল। মোমবাতি জ্বালল। মোমবাতি নিয়ে চলল কেবিন ঘরগুলির পরে যেখানে একটা লম্বাটে কাঠের বাক্সে জাহাজ মেরামতির যন্ত্রপাতি থাকে সেদিকে। ছুটতে পারছে না যদি মোমবাতি নিভে যায়। তখনই একটা দম্কা হাওয়া বইল। মোমবাতির শিখা নিভু-নিভু হ'ল। মারিয়া হাতের চেটোয় সঙ্গে সঙ্গে শিখা আড়াল করল। মোমবাতি নিভল না।

কোন রকম শব্দ না ক'রে মারিয়া বাক্সের ডালাটা আস্তে আস্তে খুলল। মোমবাতির আলোয় খুঁজতে লাগল হাতুড়ি বাটালি আর করাত। একটু খোঁজাখুঁজি করেই পেয়ে গেল সে সব। তিনটে জিনিসই গায়ের মোটা চাদরের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে চলল সিঁড়ির দিকে। জোরে ছুটল এবার। বেশি দেরি হ'লে পাহারাদারটির সন্দেহ হতে পারে। মোমবাতি নিভে গেল। মারিয়া মোমবাতি ফেলে দিল।

সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে এল। এবার আস্তে আস্তে হালের দিকে চলল। পাহারাদারটি বুঝল গায়ে দেবার কাপড় আনতে গিয়েছিল মারিয়া!

মারিয়া সেই জায়গায় এল। মোটা চাদরটা পেতে শুয়ে পড়ল। পাহারাদারটি এ পর্যন্ত দেখল। তারপর মাস্তুলের আড়ালে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মারিয়া আস্তে আস্তে উঠল। চারপাশ দেখে নিল। নয়—কেউ নেই। ও হালের কাছে গেল। যে দড়িটা ধ'রে ফ্রান্সিস ঝুলছিল সেই দড়িটা ধ'রে দু'বার হ্যাঁচ্কা টান দিল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে বুঝল মারিয়া এসেছে। ও আস্তে আস্তে দড়ি বেয়ে হালের মাথাটার কাছে এল। মারিয়া হাতুড়ি বাটালি করাত হাত বাড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি সেসব নিয়ে দড়ি বেয়ে নেমে এল। মারিয়া পাতা চাদরে এসে শুয়ে পড়ল। মারিয়া ভালো ক'রেই জানে আজকে ঘুম আসবে না। তবু যেন ঘুমিয়ে আছে এরকম ভঙ্গীতে চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে রইল।

এবার ফ্রান্সিস ছোট করাতটা কোমরে গুঁজল। হাতুড়ি বাটালি ঢোলা জামার বুকের কাছ দিয়ে ঢুকিয়ে রাখল। কোমরে চামড়ার বন্ধনী বাঁধা। হাতুড়ি বাটালি পেটের কাছে আটকে রইল।

ফ্রান্সিস একটু দম নিল। বেশ পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। সেই ভোর রাত

থেকে এতক্ষণ জলে ডুবে আছে। শরীর দুর্বল লাগা স্বাভাবিক। তবু দু'বার খেতে পেয়েছে বলে এখনও শরীরটা ঠিক আছে।

একটু বিশ্রাম নিল ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সাঁতার না কেটে জলে কোনরকম শব্দ না তুলে এগিয়ে চলল—এনরিকোর, সৈন্যদের যুদ্ধ জাহাজের দিকে। চাঁদের একটু উজ্জ্বল আলোয় দেখল জাহাজটার সামনের দিকে চট্‌লা-ওঠা জায়গাটা এদিকেই। একটু এগিয়ে দেখল ঐ জাহাজের একজন পাহারাদার সৈন্য রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিল। ডুব সাঁতার দিয়ে ঠিক সেই চট্‌লা-ওঠা জায়গাটার কাছে আস্তে আস্তে ভেসে উঠল। ওপরের দিকে তাকিয়ে বুঝল জাহাজের রেলিঙে একেবারে ঝুঁকে না পড়লে সৈন্যটি ওকে দেখতে পাবে না।

ফ্রান্সিস চট্‌লা-ওঠা জায়গাটায় হাত দিয়ে দেখল কাঠের চট্‌লা বেশ কিছুটা উঠেছে। তবু এত শক্ত কাঠের জাহাজের খোল ফুটো করা কম পরিশ্রমের কাজ নয়। অথচ আজকের বাকি রাতের মধ্যে একাজ সারতেই হবে। এখন সমস্যা হ'ল বাটালির মাথায় হাতুড়ি মারলে বেশ শব্দ হবে। নিঃশব্দে কীভাবে কাজ সারা যায়। ও ভেবে দেখল যদি জলের একটু নিচে চট্‌লা-ওঠা জায়গাটায় বাটালি বসিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে হাতুড়ি দিয়ে ঘা দেওয়া যায় তাহ'লে অল্প শব্দই হবে। কিন্তু হলেও সে শব্দ বাইরে শোনা যাবে না।

ফ্রান্সিস হাত দিয়ে দেখে চট্‌লা-ওঠা খোলের একটা জায়গা বেছে নিল। এখানটায় চট্‌লা বেশি উঠেছে। এবার সেখানে বাটালিটা বসিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে হাতুড়ি চালাল। বাটালির মাথায় হাতুড়ির ঘা লাগল বটে শব্দও তেমন হ'ল না। কিন্তু জলের মধ্যে দিয়ে হাতুড়ি চালানোয় ঘা-টা তেমন জোরে হ'ল না। জলের মধ্যে জিনিসের ওজন কমে যায়। তার ওপর জলের বাধা। এর সঙ্গে রয়েছে জলের ওপর শরীর ভাসিয়ে রাখার সমস্যা। কাজেই ফ্রান্সিসকে দম নিয়ে নিয়ে দফায় দফায় হাতুড়ি চালাতে হ'ল।

প্রায় এক ঘণ্টার ওপর হাতুড়ি এভাবে চালাল ফ্রান্সিস। ক্লান্তিতে ফ্রান্সিসের শরীর ভেঙে আসছে। অথচ থামবার উপায় নেই। অন্ধকার থাকতে থাকতে একাজ সারতে হবে।

আবার আধঘণ্টামত ফ্রান্সিস হাতুড়ি চালাল। এবার ঐ জায়গাটায় হাত দিয়ে দেখল প্রায় এক আঙুল মত ফুটো হ'য়েছে। এবার হাতুড়ি বাটালি কোমরে গুঁজল। বের করল করাতটা। করাতটা ছোট। মাথাটা সরু। সুবিধেই হ'ল। এবার ঐ কাটা জায়গাটায় করাত বসিয়ে ফ্রান্সিস করাতটা ঘষতে লাগল। প্রথমে করাতটা ভালো চলছিল না। আস্তে আস্তে করাতের চলাটা সহজ হ'ল। কাঠ কেটে যেতে লাগল। জলের মধ্য করাত কাঠ কাটছে। বেশি শব্দ বাইরে এল না। ফ্রান্সিসের হাত ধ'রে আসছে। ও জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। শরীরে যেন কোন সাড় নেই।

হঠাৎ পাথুরে ডাঙার দিকে একটা পাখি ডেকে উঠল। ফ্রান্সিস চম্‌কে উঠল। করাত চালানো থামিয়ে ও আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে আসছে। চাঁদের আলো অনেক ম্লান হ'য়ে গেছে। পূর্বদিকে তাকাল। ধোঁয়াটে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে একটু লাল আভামত।

ফ্রান্সিস শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে জোরে করাত চালাতে লাগল। হঠাৎ সমস্ত

করাতের মাথাটাই ঢুকে গেল। আনন্দে ফ্রান্সিস জলের মধ্যেই একটা ডিগবাজি খেল। কাটা জায়গাটায় হাত দিয়ে দেখল। জোরে জল ঢুকছে।

ফ্রান্সিস হাতুড়ি বাটালি বের করল। করাতটাও খুলে নিল। সব ফেলে দিল। তারপর পা দিয়ে জল টেনে টেনে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল ওদের জাহাজের দিকে। এখন রেলিঙে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। ওকে দেখতে পাবে না।

ওদের জাহাজের হালের কাছে পৌঁছল ও। হালের খাঁজে পা রেখে রেখে একটু উঠল। তারপর হালটায় হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল।

একটু বিশ্রাম নিয়ে ফ্রান্সিস হালের মাথার কাছে উঠে এল। উঁকি দিয়ে দেখল মারিয়া ঘুমিয়ে আছে। ফ্রান্সিস ফিস্‌ফিস্ ক'রে ডাকল—মারিয়া। মারিয়া সারারাতই জেগে ছিল। এখন একটু তন্দ্রামত এসেছিল। ফ্রান্সিসের ডাক কানে যেতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। হামাগুড়ি দিয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস ফিস ফিস ক'রে বলল—এনরিকোর জাহাজ ফুটো—ডুব্‌বে—শাঙ্কো—ছোরা—দড়ি কাটা ভোরের আগে—মুক্তি। খুব দ্রুত কথাগুলি বলে ফ্রান্সিস নেমে এল।

মারিয়া উঠে পড়ল। আস্তে আস্তে হেঁটে চলল ভাইকিং বন্দীদের দিকে। ওর পাহারাদার মাস্তুলে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছিল। মারিয়া মুখে শব্দ করল—হুঁস্। পাহারাদার হক্‌চকিয়ে উঠে দেখে সামনে মারিয়া। মারিয়া ইঙ্গিতে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল। চলল ভাইকিং বন্দীদের দিকে। আর পাহারাদার ওকে দেখল শুধু। কিছু বলল না। বাধাও দিল না।

হ্যারি শুয়ে ছিল। চোখ বুজে। সারারাত ঘুমোয়নি। পাতলা অন্ধকারের দিকে তাকাল এবার। ভোর হ'তে বেশি দেরি নেই। তখন দেখল মারিয়া ওর দিকেই আসছে। হ্যারি উঠে বসল। মারিয়া ওর কাছে এল। হ্যারির দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই বলল না। রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—দেবতা এসেছিল। ওদের জাহাজ ফুটো করেছে—কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুববে। শাঙ্কোর ছুরি। হাতের দড়ি কাটো। মুক্তি। কথা ক'টা ব'লে মারিয়া যেমন আস্তে আস্তে এসেছিল তেমনি আস্তে আস্তে চলে গেল।

হ্যারির মন খুশিতে ভরে উঠল। কিন্তু ও বাইরে সেটা প্রকাশ পেতে দিল না। হ্যারি ফিসফিস ক'রে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কোর ঘুম ভাঙল না। হ্যারি পা বাড়িয়ে শাঙ্কোর পায়ে দু'তিনটে ধাক্কা দিল। সতর্ক শাঙ্কোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল। ও আস্তে আস্তে উঠে বসল। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—এনরিকোর জাহাজের খোল কেটেছে ফ্রান্সিস। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ জাহাজ ডুববে। ছুরি বের করো। দড়ি কাটো। প্রয়োজনে লড়াই। শাঙ্কো একথা শুনে লাফিয়ে উঠতে গেল। পরক্ষণেই সাবধান হ'ল। ও হ্যারির দিকে সরে এসে শুয়ে পড়ল। হ্যারি শাঙ্কোর বুকের কাছে ঢিলে জামার মধ্যে হাত চালিয়ে ছুরিটা বের করল। শাঙ্কো ঐ ভীষণ ধারালো ছুরিটা সবসময় হাতের কাছে রাখে। ঘুমোবার সময়ও রাখে। বিপদ বুঝলেই ছুরিটা ঢোলা জামার নিচে চালান ক'রে দেয়।

এবার শাঙ্কো খুব আস্তে আস্তে দড়ি বাঁধা হাত দু'টো হ্যারির দিকে এগিয়ে ধরল। শুয়ে শুয়েই। হ্যারি দু'হাত দিয়ে ছুরিটা ধ'রে শাঙ্কোর হাতের দড়ি ঘষে ঘষে কাটতে লাগল। দু'জনেই শুয়ে আছে আর অন্ধকারও সবটা কেটে যায়নি।

পাহারাদাররা বুঝতেই পারল না। শাঙ্কোর হাতের দড়ি কেটে গেল। ও ছুরিটা নিয়ে আস্তে আস্তে ডেক-এর পাটাতনে একটু হিঁচড়ে গিয়ে বিস্কোর হাতের বাঁধন কেটে দিল। এবার বিস্কো ছুরিটা নিল। পাশের ভাইকিং-এর দড়ি কাটল। আস্তে আস্তে ছুরি একে ওকে চালান দিয়ে সবার দড়িই কাটা হ'য়ে গেল। সবশেষে কাটা হ'ল হ্যারির হাতের দড়ি।

আকাশ অনেক পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। পূব আকাশ গভীর লাল। সূর্য উঠতে দেরি নেই। হঠাৎ একজন পাহারাদার দেখল ওদের জাহাজ জলে অনেকটা নেমে গেছে। ও প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না। পরক্ষণেই বুঝল ওদের জাহাজ ডুবছে। ও চিৎকার ক'রে আর সব পাহারাদারদের ডাকল। সকলেই রেলিঙের ধারে ছুটে এল। ও চিৎকার ক'রে বোধহয় দলপতিকে ডাকতে লাগল।

চিৎকার ডাকাডাকিতে দলপতির ঘুম ভেঙে গেল। সে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে মেঝেয় পা ফেলে উঠতে গেল। দেখে চমকে উঠল, যে ওর পা হাঁটু জলে ডুবে গেছে। ও ভীষণভাবে চম্‌কে উঠল—জাহাজ ডুবছে। ও জল ঠেলে ছুটল কেবিন ঘরের দরজার দিকে। তখনই মড়্‌মড়্ শব্দ তুলে জাহাজটা ডানপাশে কাত হ'ল। কাত হ'তেই থাকল। দলপতি সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ উঠতে গিয়ে ছিট্‌কে কোমর সমান জলে গিয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে জাহাজের মধ্যে জল বাড়তে লাগল। ডুবন্ত জাহাজের পাহারাদাররা আর দলপতির খোঁজ করতে নিচে নামল না। ছুটে গেল পাতা পাটাতনের দিকে। পাটাতন তখন তীরভূমি থেকে ছিট্‌কে গিয়ে জলে ভাসছে। সৈন্যরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরে তীরের দিকে চলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজে তখন বন্ধনমুক্ত ভাইকিংরা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে উঠল—ও—হো—হো—হো। তারপর ছুটল হাতের কাছে যা পায় তাই জোগাড় করতে। ভাঙা দাঁড়ের কাঠ, শেকল, বড় বড় পেরেক, লম্বা লোহার ডাণ্ডা যে যা পেল তাই নিয়ে পাহারাদার সৈন্যদের দিকে এগিয়ে চলল। পাহারাদার সৈন্যরা হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। তারপর তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল। ভাইকিংরা চিৎকার ক'রে একসঙ্গে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তরোয়ালের ঘায়ে দু'একজন আহত হ'ল—কিন্তু—পাহারাদারদের কয়েকজনের হাত থেকে তরোয়াল ছিট্‌কে গেল। হ্যারি চিৎকার করে বলল—কাউকে মেরো না। জলে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

ভাইকিং বন্ধুদের চিৎকার কানে যেতেই ফ্রান্সিস বুঝল ওর পরিকল্পনামতই কাজ হয়েছে। তখন ও আস্তে আস্তে হালের কাঠের খাঁজে খাঁজে পা রেখে ওপরে উঠতে লাগল। কিন্তু শরীর আর চলছে না। ও ওপরের দিকে তাকাল। দেখল মারিয়া হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ও অনেক কষ্টে আরো দু'পা ধাপ উঠল। হাত বাড়িয়ে মারিয়ার হাত ধরল। মারিয়া কি আর ওকে টেনে তুলতে পারে? হয়ত টেনে একটু সাহায্য করা মাত্র। মারিয়ার হাত ধ'রে ধ'রে অনেক কষ্টে জাহাজে উঠেই ডেক-এর ওপর চিৎ হ'য়ে পড়ে গেল। ফ্রান্সিসের সারা শরীর ভেজা সপ্‌সপে মাথার ভেজা চুল কপালে এসে পড়েছে। মুখ সাদা হ'য়ে গেছে। দু'হাত থেকে রক্ত ঝরছে। হাতুড়ি বাটালি চালাতে গিয়ে করাত ঘষতে গিয়ে ওর হাত কেটে গেছে। আঙ্গুলে কালসিটে দাগ পড়ে গেছে। ফ্রান্সিস মড়ার মত চোখ বুজে পড়ে রইল। ফ্রান্সিসের এই অবস্থা দেখে মারিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস আস্তে

আস্তে চোখের পাতা খুলল। ম্লান হেসে বলল—কাঁদছো কেন? এই কথা শুনে মারিয়ার কান্না বেড়ে গেল। ফ্রান্সিস খুব ক্ষীণস্বরে বলল—শিগগির জাহাজ ছাড়তে—বলো। তারপর চোখ বুঝল।

মারিয়া এক ঝট্‌কায় উঠে দাঁড়াল। ছুটল ভাইকিং বন্ধুদের খবর দিতে। ওদিকে তখন পাহারাদার সৈন্য সবাইকে ভাইকিংরা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ওরা সমুদ্রতীরের দিকে সাঁত্‌রে চলেছে। এনরিকোর সৈন্যদের যুদ্ধ জাহাজের মাস্তুলটা তখন দেখা যাচ্ছে। বাকি সবটাই জলের নিচে।

মারিয়া ডেক-এ এসে চিৎকার ক'রে বলল—ভাইসব—ফ্রান্সিস এসেছে। হালের কাছে শুয়ে আছে। একটু অসুস্থ। ও বলল—শিগগির জাহাজ ছাড়ো। সব ভাইকিংরা আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠল—ও—হো—হো—হো। তারপর ছুটল ফ্রান্সিসকে দেখতে।

ফ্রান্সিসকে ও-রকম মড়ার মত চোখ বুঁজে শুয়ে থাকতে দেখে বন্ধুদের ভীষণ মন খারাপ হ'য়ে গেল। হ্যারি গলা চড়িয়ে চিৎকার ক'রে উঠল—এখন একমুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে চলে যাও। পাল তুলে দাও। জাহাজ চালাও যত দ্রুত সম্ভব। কয়েকজন ফ্রান্সিসকে কেবিনঘরে নিয়ে যাও। ফ্রান্সিসের সেবা শুশ্রূষার ব্যাপারে রাজকুমারী মারিয়াকে সাহায্য কর। যাও—জলদি। দু'তিন জন গিয়ে তীরের সঙ্গে লাগানো পাটাতন তুলে ফেলল। ফ্রান্সিসকে কাঁধে নিয়ে চলল কয়েকজন। কেবিনঘরে এনে শুইয়ে দিল। দাঁড়িরা ছুটল দাঁড়ঘরের দিকে। পাল খাটানো হ'ল দ্রুত হাতে। নজরদার পেড্রো মাস্তুলের মাথায় নিজের জায়গায় উঠে গেল। জলে দাঁড় পড়তে লাগল—ছপ্—ছপ্। জাহাজ চলল বাইরের সমুদ্রের দিকে।

তখন উজ্জ্বল রোদ ছড়িয়ে পড়েছে সমুদ্রের বুকে। রোদ ঝিকিয়ে উঠছে ঢেউয়ের মাথায়। আস্তে আস্তে গ্রামভাউসা বন্দর দূরে মিলিয়ে গেল।

ফ্রান্সিসকে ভেজা পোশাক পাল্টে শুকনো পোশাক পরানো হয়েছে। জাহাজের বদ্যি এসে ফ্রান্সিসের ক্ষত-বিক্ষত দু'হাতে হলুদ রঙের মলম লাগিয়ে দিয়ে গেছে। ফ্রান্সিসের জ্বালা ব্যথা কমেছে তা'তে। মারিয়া চামড়ার ব্যাগ-এ গরম জল ভ'রে নিয়ে ফ্রান্সিসের পায়ে গায়ে সেঁক দিতে লাগল। এর মধ্যে রসুইঘরে রাঁধুনি শুধু ফ্রান্সিসের জন্যে মাংস রুটি তৈরি ক'রে ফেলল। থালায় ক'রে নিয়ে এল ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে। মারিয়া ফ্রান্সিসকে ধ'রে আস্তে আস্তে বিছানায় বসিয়ে দিল। ফ্রান্সিস নিজেই গরম গরম রুটি মাংস খেতে লাগল। খাওয়া শেষ ক'রে জল খেল। তারপর শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে ফ্রান্সিসের শরীরে যেন সাড় এল। ও চুপ ক'রে শুয়ে রইল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক জাহাজ চলল। এতক্ষণ হ্যারি জাহাজ-চালকের পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। একবার মাত্র গিয়েছিল ফ্রান্সিসকে দেখতে। তখনও ফ্রান্সিস চোখ বুজে শুয়ে আছে।

বিস্কো এসে হ্যারিকে বলল—ফ্রান্সিস এখন অনেকটা সুস্থ। হ্যারি তাড়াতাড়ি ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে এল। দেখল ফ্রান্সিস বিছানায় বসে আস্তে আস্তে দু'-একটা কথা বলছে। হ্যারি এগিয়ে এল। বিছানায় বসল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর ফ্রান্সিসকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। হ্যারির সারা শরীর থর্ থর্ করে আবেগে কাঁপছে।

চোখের কোল ভিজে উঠেছে। ফ্রান্সিস দুর্বল কণ্ঠে বলল—অ্যাই—তুমিও কি মারিয়ার মত কাঁদতে শুরু করলে? এ্যাঁ? ফ্রান্সিসকে ছেড়ে দিয়ে হ্যারি হাতের উল্টোপিঠে দু'চোখ মুছল। বলল—তোমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে না তো?

—না—না। ফ্রান্সিস হাসল।

—এখন জাহাজ কোথায় যাবে মানে আমরা কোথায় যাবো? হ্যারি জানতে চাইল।

—খানিয়ায়। নিখোঁজ রাজমুকুটের সন্ধানে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা'হলে তো কাভাল্লির সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ কাভাল্লিকে ডাকো। ফ্রান্সিস একজন ভাইকিং বন্ধুকে বলল।

একটু পরেই কাভাল্লি এল। হ্যারি বলল—

—কাভাল্লি—ফ্রান্সিস বলছিল—এখন আমরা কীভাবে খ্যানিয়া যাবো?

—এখন আমাদের পূবমুখো যেতে হবে। ঝড়টড় না হ'লে আমরা তিন চারদিনের মধ্যেই ক্রীটের উত্তরে রাজধানী খানিয়ায় পৌঁছোতে পারবো। কাভাল্লি বলল।

—হ্যারি জাহাজ-চালককে বলো কাভাল্লির নির্দেশ মতো জাহাজ চালাতে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। বোঝা গেল—ফ্রান্সিসের শরীরের দুবর্লতা এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। মারিয়া বাদে সবাই ঘরের বাইরে চলে এল।

হ্যারি ও কাভাল্লি জাহাজ-চালকের কাছে এসে দাঁড়াল। কাভাল্লির নির্দেশমত জাহাজ চলল খ্যানিয়া বন্দরের উদ্দেশে।

জাহাজ চলেছে। বিদ্রোহী এনরিকোর যুদ্ধ জাহাজ ফ্রান্সিস ডুবিয়ে দিয়ে এসেছে। কাজেই এখন ভাইকিংরা নিশ্চিন্ত। এনরিকোর সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হবার কোন ভয় নেই।

এনরিকোর যুদ্ধ জাহাজ ডোবাতে গিয়ে ফ্রান্সিসকে অনেকক্ষণ কালো ঠাণ্ডা জলে মাথা ভাসিয়ে ডুবে থাকতে হয়েছে। তারপর বাটালিতে হাতুড়ি চালাতে হয়েছে। ছোট করাত চালাতে হয়েছে। হাতুড়ির ঘাও কখনও কখনও আঙ্গুলে পড়েছে। বাটালিতে করাতে দু'হাত ক্ষত-বিক্ষত হ'য়েছে। দু'তিনটি আঙ্গুল ফুলে নীল হয়ে গেছে। জাহাজ ফুটো করবার উত্তেজনায় ফ্রান্সিস তখন এসব গায়ে মাখেনি। পরে দেখেছে ক্ষতগুলো আঙ্গুল ফোলা কোনটাই কম নয়। জাহাজের বৈদ্যি ক্ষত জায়গায় আঙ্গুলে ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছে। ছেঁড়া কম্বলের টুকরো দিয়ে মোটা ব্যান্ডেজমত বেঁধে দিয়েছে। তাঁতে একটু ব্যথা জ্বালা যন্ত্রণা কমেছে। কিন্তু একদিনের মধ্যেই ঐ ক্ষত জ্বালা ফোলা আঙ্গুল ফ্রান্সিসকে বেশ কাহিল ক'রে দিল। ব্যথায় টনটনানিতে ও হাত দুটো তুলতে পারছে না। সেদিন বিকেল থেকেই ফ্রান্সিস বুঝতে পারল শরীরটা যেন আর বশে নেই। হঠাৎই ক্ষতস্থানে ফোলা আঙ্গুলে ব্যথা বাড়তে লাগল। সন্ধ্যের মধ্যেই ব্যথা প্রায় অসহ্য হ'য়ে উঠল। ফ্রান্সিস তবু কাউকে কিছু বলল না। ভাবল কমে যাবে। কিন্তু কমল না। সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। বুঝল জ্বর আসছে। ওর শীত শীত করতে লাগল। মোটা কম্বলমত কাপড়টা গায়ে ঢেকে ও বিছানায় শুয়ে পড়ল।

রাতে খাওয়ার সময় হ'ল। মারিয়া এর মধ্যে দু'একবার ডেক-এ উঠেছিল। তারপর এমব্রয়ডারি নিয়ে বসেছিল। ফ্রান্সিস এতক্ষণ বেশিরভাগ সময়ই চোখ

বুজে শুয়ে থেকেছে। তাই মারিয়া ওকে, বিশ্রাম করছে মনে করেছে। ডাকেও নি। বুঝতেও পারে নি যে ফ্রান্সিসের শরীর খারাপ।

এখন খাওয়ার সময় হ'তে ডাকল—চলো খেয়ে আসি। ফ্রান্সিস আস্তে বলল—এখানেই খাবার নিয়ে এসো। মারিয়া ভাবল সেই ভালো। ফ্রান্সিসের আর হাঁটাচলা ক'রে দরকার নেই। এখানেই বিছানাতে বসেই খেয়ে নিক।

মারিয়া কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে এল। একটু পরেই দু'প্লেট রুটি মাংসের ঝোল সব্‌জি নিয়ে এল। বিছানায় একটা পরিষ্কার কাপড় পেতে রাখল সে সব। ওদের রাঁধুনি বন্ধু কাচের গ্লাসে জল রেখে গেল। মারিয়া ডাকল—ওঠো খেয়ে নাও। ফ্রান্সিস মনে মনে হাসল। ওর শরীর যে এখন এত খারাপ এখনও মারিয়া তা জানে না। জানলে এক্ষুনি চ্যাঁচামেচি শুরু করবে।

ফ্রান্সিস উঠে বসল। স্পষ্ট বুঝল মাথাটা বেশ ঘুরছে। তবু মারিয়াকে কিছু বুঝতে না দিয়ে রুটি ছিঁড়ে মাংস খেতে শুরু করল। কিন্তু পারল না। মুখ বিষ তেতো। বমি হ'য়ে যাবে। ফ্রান্সিস শুধু জল ঢক্ ঢক্ ক'রে খেল। আর বসে থাকতে পারল না। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। মারিয়া খাওয়া শুরু করতে গিয়ে চমকে উঠল। এক ঝটকায় স'রে এসে ফ্রান্সিসের কপালে হাত দিল। বেশ গরম। প্রায় চেঁচিয়ে ব'লে উঠল—সে কি তোমার তো জ্বর এসেছে। ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ অবস্থায়ই হাসল। বলল—ও গা গরম হ'য়েছে একটু। সেরে যাবে।

মারিয়ার আর খাওয়া হ'ল না। খাবার-দাবার সরিয়ে রেখে ও ছুটল দরজার দিকে। বাইরে এসে ছুটল হ্যারির কেবিনঘরের দিকে। হ্যারি তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে সবে শুয়েছে। মারিয়া দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল—হ্যারি—হ্যারি। হ্যারি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। দেখল মারিয়া কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ও বলল—কী হয়েছে রাজকুমারী?

—ফ্রান্সিস অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। শিগগির এসো। মারিয়া আর কিছু বলতে পারল না।

—বলেন কি? চলুন। হ্যারি দ্রুত ছুটল ফ্রান্সিস আর মারিয়ার কেবিনঘরের দিকে। ছুটে বিছানার কাছে এসে দেখল ফ্রান্সিস কেমন নিস্তেজ হয়ে দু'চোখ বুজে শুয়ে আছে। হ্যারি ফ্রান্সিসের কপালে গলায় হাত রাখল। বেশ জ্বর। হ্যারি আস্তে ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস চোখ মেলে তাকাল। হ্যারি লক্ষ্য করল চোখ দু'টো বেশ লাল।

—শরীর খুব খারাপ লাগছে? হ্যারি মৃদুস্বরে বলল। ফ্রান্সিস শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলোল। হাসল। মৃদু স্বরে বলল—ও ঠিক হ'য়ে যাবে। হ্যারি আর কিছু বলল না। ও জানে ফ্রান্সিস সহজে নিজের কষ্টের কথা বলবে না। পাছে মারিয়া হ্যারি বন্ধুরা দুশ্চিন্তায় পড়ে। হ্যারি মারিয়াকে বলল—একটা ছেঁড়া কম্বলের টুকরো ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে কপালে জল পট্টি দিন। আমি বৈদ্যিকে ডেকে আনছি।

হ্যারি ছুটে বেরিয়ে গেল। মারিয়াও এদিকে ছেঁড়া কম্বলের একটা টুকরো খুঁজে বের করল। গ্লাসের জলে কম্বলের টুকরোটা ভিজিয়ে আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের কপালে চেপে ধরল। একটু আরাম লাগল ফ্রান্সিসের। ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জ্বরের চেয়েও ওকে বেশি কষ্ট দিচ্ছিল ক্ষত-বিক্ষত হাত আঙুলের যন্ত্রণা।

একটু পরেই বৈদ্যিকে সঙ্গে নিয়ে হ্যারি ফিরে এলে। বৈদ্যি ওর চিনেমাটির বোয়াম দুটো বিছানায় রাখল। এবার বিছানায় বসল। আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের দু'হাত আঙ্গুল থেকে ছেঁড়া কম্বলের পট্টিটা খুলতে লাগল। ফ্রান্সিস কঁকিয়ে উঠল। বৈদ্যি আরো সাবধান হ'ল। আস্তে আস্তে সব পট্টি খুলল। দেখল ক্ষতের জায়গাগুলো বেশ ফুলে উঠেছে। দু'টো আঙুল আরো ফুলেছে। চিন্তায় বৈদ্যির মুখ শুকিয়ে গেল। ও বুঝল গতিক ভালো নয়। ফ্রান্সিসের ঐ ক্ষতস্থান, ফোলা আঙ্গুল, বৈদ্যির চিন্তাগ্রস্ত মুখ এসব দেখে হ্যারির বুক কেঁপে উঠল। ও পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

বৈদ্যি দু'টো বোয়াম থেকে ওষুধ নিয়ে হাত ডলে মেশাল। একটু একটু জল দিয়ে মেশানো ওষুধটা চট্‌চটে করল। তারপর ক্ষতস্থানে আঙ্গুলে লাগিয়ে দিতে লাগল। ওষুধ পড়তেই ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ অবস্থায় আবার কঁকিয়ে উঠল। মারিয়া ফ্রান্সিসের কপালে হাত বোলাতে লাগল।

ওষুধ লাগানো শেষ হ'ল। ফ্রান্সিস একবারও চোখ খুলল না। নিস্তেজভাবে পড়ে রইল।

বৈদ্যি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হ্যারি বলল—কী রকম বুঝছো?

—যদি কালকে ঘাগুলো পেকে না ওঠে তাহ'লে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু জ্বর এসেছে। পেকে উঠতে পারে। এখন আমার কাছে যা ওষুধ আছে তাতে কতটা কাজ হবে জানি না। বৈদ্যি বলল।

—তা'হলে ফ্রান্সিসের বিপদ এখনও কাটেনি। হ্যারি বলল।

—না। বৈদ্যি আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—দেখি এই নতুন ওষুধে কাজ হয় কিনা।

বৈদ্যি বোয়াম নিয়ে চলে যাবার সময় বলল—জলপট্টি দিতে থেকো। জ্বর বাড়তে দিও না।

মারিয়া এবার জলের গ্লাস নিয়ে ফ্রান্সিসের শিয়রের কাছে ভালো হ'য়ে বসল। জলপট্টি দিতে লাগল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

এবার হ্যারির নজরে পড়ল খাবার পড়ে আছে। হ্যারি বলল—

—রাজকুমারী—আপনি কিছুই খাননি। খেয়ে নিন। আমি দেখছি। মারিয়া কোন কথা না বলে মাথা নাড়ল। নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগল। বোঝাই গেল এখন কিছু খাওয়ার মত মনের অবস্থা মারিয়ার নেই।

হ্যারি আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের পায়ের কাছে বিছানায় বসল। কম্বলটা দিয়ে ভালো করে ফ্রান্সিসের পাদু'টো ঢেকে দিল।

রাত বাড়তে লাগল। ফ্রান্সিসের তখন এক আচ্ছন্ন অবস্থা চলেছে। ও কোথায় আছে—এখন রাত না দিন কোন বোধই ওর নেই।

হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে হ'ল শরীরটা যেন খুব হালকা হ'য়ে গেছে। হাতের আঙ্গুলের জ্বালা যন্ত্রণা আর নেই। হালকা শরীর নিয়ে ও যেন ওর দেশের বাড়ির ফুলের বাগানে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পায়ের নিচে নরম ঘাস। দিনটা একটু কুয়াশা জড়ানো। সূর্যের আলো নিস্তেজ। হঠাৎ সদর দরজা খুলে মা বেরিয়ে এলো। কুয়াশায় অস্পষ্ট দেখাচ্ছে মাকে। তবে মা'র মুখ পোশাক মোটা'মুটি দেখা যাচ্ছে।

মা আরো এগিয়ে এলো। ওর দিকেই। সেই ছোটবেলা মার যেমন মুখ দেখতো। সেই বয়েসের মা। এবার পোশাকটা দেখা গেল। কাঁধ পর্যন্ত ঢেউ তোলা চক্‌চকে জমকালো পোশাক। এরকম পোশাক পরেই মা রাজবাড়ির উৎসবে, ভোজে, অনুষ্ঠানে যেতো। পরে অবশ্য এসব পোশাক মা কমই পরতো। রাজবাড়িতেও কম যেতো। ফ্রান্সিস ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটল মার দিকে। হঠাৎ এক ঝলক জোর হাওয়া এল। ভেজা ভেজা খুব ঘন কুয়াশা ছুটে এল। মা তখন হাসি মুখে দু'হাত সামনে ছড়িয়ে ওকে ডাকছে। ঘন কুয়াশায় মা ঢাকা পড়ে গেল। ফ্রান্সিসও হোঁচট খেয়ে ভেজা ঘাসে পড়ে গেল। ঘন কুয়াশায় সাদাটে অন্ধকারে সব ঢেকে গেল। ফ্রান্সিস আর্তস্বরে ডেকে উঠল মা। সত্যি—ফ্রান্সিসের গলা থেকে বেরিয়ে এল—মা—। ফ্রান্সিস চোখ খুলল।

মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিসের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। বলল—ফ্রান্সিস—কী হয়েছে। ফ্রান্সিস কিছু বলল না। চোখ বুজল।

মারিয়া এবার ফ্রান্সিসের জল ভেজা কপালে হাত দিল। কী গরম। জলপট্টির জল মুহূর্তে শুষে যাচ্ছে। হ্যারিও ফ্রান্সিসের 'মা' ডাক শুনে তাকিয়েছিল। মারিয়া ভয়ার্ত চোখে ওর দিকে তাকাতেই হ্যারি দ্রুত স'রে এসে ফ্রান্সিসের গলায় বুকে হাত দিল। প্রবল জ্বর। ভয়ে হ্যারির মুখ শুকিয়ে গেল। হ্যারি বলল—রাজকুমারী—জলপট্টি দিতে থাকুন। আমি বৈদ্যিকে নিয়ে আসছি।

হ্যারি বৈদ্যির কাছে যাওয়ার পথে বিস্কোর কেবিনঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে জোরে ডাকল—বিস্কো—ফ্রান্সিসের শরীর খুব খারাপ। বিস্কোর ঘুম ভেঙে গেল। ও ছুটে ঘরের বাইরে এল। তারপর ছুটল ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের দিকে। হ্যারির ডাকাডাকি ছুটোছুটি বৈদ্যির দ্রুত ছুটে আসা দু'জন একজন ক'রে সব ভাইকিংদের ঘুম ভেঙে গেল। সবাই জানল—ফ্রান্সিসের শরীর খুব খারাপ। সবাই এল ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের কাছে। ঘরের ভেতরে জায়গা কম। ঘরে পথে সবাই ভীড় ক'রে দাঁড়াল। কারো মুখে কথা নেই।

বৈদ্যি ফ্রান্সিসের গলায় বুকে হাত দিয়ে দেখল। কম্বল সরিয়ে পায়ের পাতায় হাত চেপে দেখল। তারপর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—জ্বর অতো বেড়েছে। তবে কালকের দিনটা দেখতে হবে। ব'লে কোমরের ফেট্টি থেকে একটা মোটা কাপড়ের থলে বের করল। থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দু'টো কালো বড়ি বের ক'রে মারিয়ার হাতে দিল। বলল—এখন একটা বড়ি আর ঘণ্টা চারেক পরে আর একটা বড়ি খাইয়ে দিন। জ্বর আর বাড়বে না। জ্বালা যন্ত্রণা কমবে। তবে—কথাটা আর শেষ করল না।

হ্যারি ঘরের কোণায় রাখা কাঠের পাত্র থেকে কাঠের গ্লাসে জল ভরে মারিয়াকে দিল। মারিয়া জলের গ্লাসটা নিয়ে আস্তে আস্তে ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে চোখ খুলল। মোমবাতির আলোয় মারিয়া দেখল চোখ দু'টো টকটকে লাল। মারিয়া চম্‌কে উঠল। ওর হাত কেঁপে উঠল। গ্লাস পড়ে যায় যায়। বৈদ্যি গ্লাসটা ধ'রে ফেলল। মারিয়া মাথা নিচু ক'রে ফুঁপিয়ে উঠল। বৈদ্যি মারিয়ার হাত থেকে বড়ি দু'টো নিল। ফ্রান্সিসের মুখের ওপর ঝুঁকে বলল—ফ্রান্সিস এই ওষুধটা খেয়ে নাও। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে শুকনো ঠোঁট দু'টো ফাঁক করল। বৈদ্যি মুখে জল

ঢেলে বড়িটা খাইয়ে দিল। অন্য বড়িটা হ্যারি হাত বাড়িয়ে বৈদ্যির কাছ থেকে নিয়ে নিজের কাছে রাখল।

বৈদ্যি চলে গেল। ফ্রান্সিসের সব ভাইকিং বন্ধুরা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। হ্যারি ওদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা যাও। শুয়ে পড়ো। আমি আর রাজকুমারী এখানে থাকবো। বিস্কো ব'লে উঠল—আমরা আজ রাতে কেউ ঘুমুবো না। সবাই এখানে থাকবো। হ্যারি আর কিছু বলল না। ও তো জানে বন্ধুরা ফ্রান্সিসকে কী ভালোবাসে!

হ্যারি চিন্তায় পড়ল। ওদের জাহাজের বৈদ্যি যা বলছে তাতে ওর ওপর তো আর ভরসা করা যাচ্ছে না। অথচ খানিয়া এখনও কতদূর কে জানে। ওখানে পৌঁছে ভালো বৈদ্যি দিয়ে চিকিৎসা করাবার আগেই হয় তো ফ্রান্সিস—হ্যারি আর ভাবতে পারলো না। ওর চোখ ফেটে জল এল। এত বুদ্ধিমান সাহসী শক্তিধর পুরুষ ফ্রান্সিস—এমন নিষ্পাপ ফুলের মত হৃদয়ের মানুষ ফ্রান্সিস স্বদেশ স্বজন থেকে এই বিদেশের এক সমুদ্রের বুকে ওদের অসহায় চোখের সামনে মারা যাবে? হ্যারি দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মারিয়া তো তখন থেকে মাথাই তোলে নি আর।

বিস্কো ছুটে এসে হ্যারির কাঁধে হাত রেখে আস্তে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—হ্যারি, তুমি যদি এই সাংঘাতিক বিপদের মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ো তাহলে কার ওপর আমরা ভরসা রাখবো? বিস্কো যতই বলুক হ্যারির মত অনেক ভাইকিং বন্ধুরই দু'চোখে জল দেখা গেল। বিস্কো বলল—হ্যারি আমাদের আবাল্য বন্ধু ফ্রান্সিস জীবনে কখনও কারো প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করেনি—নিজের জীবন বিপন্ন না হলে কখনও কাউকে অস্ত্রাঘাত করে নি, তার এভাবে এত করুণভাবে মৃত্যু হ'তে পারে না। অসম্ভব।

হ্যারি চোখ মুছল। সত্যিই তো। এই মুহূর্তে ভেঙে পড়লে চলবে কেন। হঠাৎ ওর কাভাল্লির কথা মনে হ'ল। চারিদিকে তাকাল হ্যারি। দেখল দরজায় হাত রেখে কাভাল্লি বিষণ্ণমুখে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারি ডাকল—কাভাল্লি এদিকে এসো। কাভাল্লি এগিয়ে এসে হ্যারির সামনে দাঁড়াল। হ্যারি বলল—

—কাভাল্লি—খানিয়া পৌঁছতে আমাদের আর ক'দিন লাগবে?

কাভাল্লি একটু ভেবে বলল—তা দিন তিন চার।

—কিন্তু ততদিন তো—হ্যারি বলল—আচ্ছা—এই সমুদ্রপথে ধারে কাছে কোন বন্দর বা দ্বীপ নেই? কাভাল্লি মাথা নিচু করে একটু ভাবল। তারপর মাথা তুলে বলল—উত্তর ক্রীটের একটি লম্বাটে অংশ এই সমুদ্রের দিকে বেরিয়ে আছে। ঠিক তার মাথায় আছে নাক্সোস নামে একটা শহর বন্দর। আমি মাত্র একবার খানিয়া থেকে নাক্সোসে এসেছিলাম। তখন নাক্সোসে রাজত্ব করছিলেন একজন ভেনিসের ডিউক—ডিউক মার্কো। মার্কো সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছি—ভেনিসের ডিউক হ'লেও উনি ক্রীট দেশীয় প্রজাদের মঙ্গলই করেছেন।

—ঠিক আছে—হ্যারি বলল—এখন বলো নাক্সোস বন্দর শহর কেমন। ওখানে ভালো চিকিৎসক পাওয়া যাবে কি না।

তা পাবেন বৈ কি। বড় বন্দর শহর। অনেক ভেনিসীয় মানুষের বাস। তারা

সুশিক্ষিত। তাদের মধ্যে ভালো চিকিৎসক নিশ্চয়ই আছে। কাভাল্লি বলল।

—এখন নাক্সোস পৌঁছতে কত সময় লাগবে? হ্যারি জানতে চাইল। কাভাল্লি আবার মাথা নিচু ক'রে কী হিসেব করল। তারপর মাথা তুলে বলল—গ্রামভাউসা থেকে বেশ দূরে চলে এসেছি আমরা। এখন জাহাজ দক্ষিণ মুখো ঘোরাতে হবে। একটু দ্রুত জাহাজ চালাতে পারলে আমরা কাল সন্ধ্যের মধ্যেই নাক্সোস পৌঁছে যাবো।

—না—না—হ্যারি বলল মাথা নেড়ে বলল—যে করেই হোক আমাদের কাল সকালের মধ্যে নাক্সোস পৌঁছতে হবে। কাভাল্লি বলল—রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এল। পারবেন অত তাড়াতাড়ি জাহাজ চালিয়ে পৌঁছতে।

—পারতেই হবে। ফ্রান্সিসকে সুচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতেই হবে। হ্যারি বলল।

এবার হ্যারি ঘরের বাইরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকাল। সবার মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিল। হ্যারি আস্তে আস্তে দু'হাত ওপরে তুলল। তারপর একটু গলা জড়িয়ে বলতে লাগল—ভাইসব—আমাদের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ফ্রান্সিস গুরুতর অসুস্থ। ওকে বাঁচাতে হ'লে এক্ষুণি যতটা সম্ভব দ্রুতবেগে দক্ষিণ মুখো জাহাজ চালাতে হবে। কাভাল্লি বলছে—নাক্সোস পৌঁছোতে কাল সন্ধ্যে হয়ে যাবে। কিন্তু আজ ফ্রান্সিস এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের নাক্সোস পৌঁছোতে হবে। সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। একটু থেমে হ্যারি বলল—ভাইসব, আমরা সময়কে জয় করবো। এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে জাহাজ চালাও। কাল সকালের মধ্যে আমাদের নাক্সোসে পৌঁছোতেই হবে। ফ্রান্সিসকে তোমরা কত ভালোবাসো আজকে তার পরীক্ষার দিন এসেছে। হ্যারি আবেগাপ্লুতস্বরে সব তুলে চিৎকার ক'রে বলে উঠল—ভাইসব—প্রাণ্তবেগে জাহাজ চালাও—সময়কে জয় করবো আমরা। হ্যারির চিৎকার কানে যেতে প্রায় অচেতন ফ্রান্সিস মাথাটা এপাশ ওপাশ ক'রে চোখ মেলে তাকাল। দুর্বলস্বরে ডাকল—মারিয়া। মারিয়া এতক্ষণ মাথা নিচু ক'রে আস্তে আস্তে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ফ্রান্সিসের ডাক কানে যেতে দ্রুত ফ্রান্সিসের মুখের ওপর ঝুঁকে ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মারিয়া বলল—ফ্রান্সিস—শরীর খুব খারাপ লাগছে? ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। আস্তে আস্তে দু'চোখ বন্ধ করল, নির্জীবের মত শুয়ে রইল। ওর মুখ থেকে গোঙানির শব্দ ভেসে আসতে লাগল। মারিয়া ফুঁপিরে কেঁদে উঠল। আবার জলপট্টি দিতে লাগল।

অন্য সময় হ'লে ভাইকিং বন্ধুরা হ্যারির কথা শুনে 'ও—হো—হো—' শব্দের চিৎকার ক'রে উঠতো। কিন্তু এই ঘরে প্রায় অজ্ঞান ফ্রান্সিসের সামনে ওরা কোন শব্দ করতে চাইল না। সবাই ছুটল যে যার কাজে। হ্যারি কাভাল্লিকে নিয়ে প্রায় ছুটে জাহাজের ডেক-এ চলে এল। দু'জনে ছুটে এল জাহাজ-চালকের কাছে। হ্যারি জাহাজ-চালককে বলল—কাভাল্লিকে এনেছি। ও যেদিকে যে পথে জাহাজ চালাতে বলে চালাও। কাভাল্লি এগিয়ে এসে জাহাজ-চালকের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

হ্যারি আকাশের দিকে তাকাল। দেখল অন্ধকার আকাশ মেঘহীন। হাজার হাজার তারা জ্বল্ জ্বল্ করছে। হাওয়া বইছে একটু কম জোরে। জাহাজের গতি বাড়াতে

হ'লে দাঁড় টানতে হবে।

ওদিকে সব ভাইকিংরা প্রচণ্ড তৎপরতায় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একদল চলে গেল দাঁড় ঘরে। দাঁড়ে হাত লাগাল। বিস্কো দুসারি দাঁড়িদের মাঝখানে দাঁড়াল। তারপর দাঁড় টানার তালে তালে বিস্কো শরীর মাথা তালে তালে দুলিয়ে শুরু করল ওদের চারণ কবিদের গান। দাঁড়িদের মধ্যে জাগল প্রচণ্ড উৎসাহ। সমুদ্রের জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ উঠল। একে কানে বাজছে দেশের কথা গানের পাগল করা সুর, অন্যদিকে অসুস্থ ফ্রান্সিসকে সকালের মধ্যেই বন্দর শহর নাক্রোসে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা। বিস্কোর গান চলল। দাঁড় বওয়া চলল—ছপ্ ছপ্ শব্দ জলে। বিস্কো হঠাৎ তালের ছন্দ বাড়িয়ে দিল। তাল মেলাতে আরো দ্রুত দাঁড় টানতে হল দাঁড়িদের। এতে ওরা খুশিই হ'ল। ওরা উৎসাহে চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো—। একজন দাঁড়ি চেঁচিয়ে বলল—বিস্কো আরো জোরে। বিস্কো গানের তাল আরো বাড়াল। দাঁড়িরা চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো। অতি দ্রুত দাঁড় পড়তে লাগল সমুদ্রের জলে। জাহাজের গতি অনেক বেড়ে গেল। বিস্কো একটু গান থামিয়ে তালের সঙ্গে দুলতে দুলতে চিৎকার ক'রে বলে উঠল—ফ্রান্সিসকে বাঁচাবো আমরা। সময়কে জয় করবো। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো—। জাহাজ চলল পূর্ণ বেগে।

ওদিকে মাস্তুলের মাথায় উঠে পড়েছে নজরদার পেড্রো। আট দশ জন ভাইকিং মাস্তুলে পালের কাঠ দড়িদড়া বেয়ে উঠে পড়েছে। সব ক'টা পাল টান টান খুলে দিল। বাড়তি দু'টো পালও লাগাচ্ছে, তখনই শুনল দাঁড় ঘর থেকে বন্ধুদের ও—হো—হো ধ্বনি। ওরাও চিৎকার করে জবাব দিল—ও—হো—হো—। বাড়তি দুটো পাল লাগানো হ'ল। সব পালগুলো ফুলে উঠল বাতাস লেগে। জাহাজের গতি আরো বাড়ল।

রাত শেষ হ'য়ে এল। পূবের আকাশে লাল রঙ ধরল। তখনই হঠাৎ দক্ষিণ মুখো বাতাস খুব জোরে ব'য়ে এল। ফুলে উঠল পালগুলো। ডেক-এ দাঁড়ানো ভাইকিংরা বাতাসের বেগ দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো—। দাঁড়ঘরে সেই ধ্বনি পৌঁছল। ওরাও চিৎকার করে সাড়া দিল। জাহাজটা যেন জল ছুঁয়ে উড়ে চলল।

আস্তে আস্তে পূব আকাশে সূর্য উঠল। নরম রোদ এসে পড়ল সমুদ্রের ঢেউয়ে জাহাজের গায়ে।

দাঁড় ঘরে তখনও চলছে পূর্ণোদ্যমে দাঁড় বাওয়া। বিস্কোর গলা ভেঙে গেছে। তালে তালে দুলতে দুলতে ওর শরীরে যেন আর সাড় নেই। তবুও ও একটু থেমে থেমে দম নিয়ে নিয়ে গেয়ে চলেছে ওদের চারণ কবিদের গান। দাঁড়িরা ঘেমে নেয়ে উঠেছে যেন। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। দম নেই যেন আর। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও থামছে না কেউ। শরীরের সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিয়ে ওরা দাঁড় বেয়ে চলেছে।

এর মধ্যে হ্যারি একবার অসুস্থ ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে গিয়েছিল। দেখল ফ্রান্সিসের শিয়রে পাথরের মূর্তির মত মারিয়া ফ্রান্সিসের ডান হাতটা কোলে নিয়ে বসে আছে। পায়ের কাছে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে বসে আছে ওদের

জাহাজের বদ্যি। বদ্যি তার জ্ঞানমত চিকিৎসার সব ব্যবস্থাই করেছে। কিন্তু তাতে বোধহয় ফ্রান্সিসের খুব একটা উপকার হয় নি। হ্যারি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দেখল ফ্রান্সিস অসহ্য ব্যথায় মাথা এপাশ ওপাশ করতে লাগল। কষ্টের গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল ফ্রান্সিসের মুখ থেকে। ফ্রান্সিসের চিরসঙ্গী হ্যারি কতবার দেখেছে কী প্রচণ্ড কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করেছে ফ্রান্সিস। আজকের কষ্ট বোধহয় এত প্রচণ্ড এত যন্ত্রণাদায়ক যে ফ্রান্সিসের মত শক্ত ধাতুতে গড়া মানুষও তা সহ্য করতে পারছে না। ফ্রান্সিসকে এত অসহায় এত ব্যথাকাতর হ্যারি কোনদিন দেখে নি। ফ্রান্সিসের এই কষ্ট হ্যারি আর দেখতে পারল না। মুখ চোখ দুহাতে চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল হ্যারি। পাছে ওর কান্নার শব্দ ফ্রান্সিস বা মারিয়ার কানে যায় এই ভয়ে এক ছুটে হ্যারি সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ উঠতে উঠতেই হ্যারি পেড্রোর খুশির চিৎকার শুনতে পেল—ডাঙা—ডাঙা দেখা যাচ্ছে। হ্যারি লাফিয়ে সিঁড়ি পার হ'য়ে ডেক-এ উঠে এল। ছুটল রেলিঙের দিকে। ততক্ষণে পালের তদারকিতে যারা পালের কাঠে বসে পাল এদিক ওদিক ঘুরিয়ে বেশি বাতাস ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল তারা চিৎকার করে উঠল—হো—ও—ও। দাড়ি ঘরেও চিৎকার উঠল—হো—ও—ও। সারা জাহাজে খুশির হাওয়া বইল। জাহাজ দ্রুত এগিয়ে চলল ডাঙার দিকে।

রেলিঙে ঝুঁকে হ্যারি দেখতে লাগল ডাঙার অবস্থা। জাহাজঘাটা এদিকটাতেই। তিনটে ছোট জাহাজ জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজঘাটার পরেই বেশ সমতল একটা পাথরকুচি ছড়ানো রাস্তা চলে গেছে।

জাহাজ আরো কাছে আসতে হ্যারি দেখল জাহাজঘাটার পরে রাস্তায় দু'খানা পাথরের বাড়িঘর। লোকজন পথে যাতায়াত করছে। দু'তিন জন সৈন্যকেও দেখল জাহাজঘাটার দিকে হেঁটে আসছে। পরনে গ্রীক সৈন্যদের মতই লোহার বর্ম উষ্ণীব।

জাহাজ চালক হালের চাকা ঘোরোতে ঘোরাতে ডাকল—হ্যারি। হ্যারি ছুটে ওর কাছে গেল। চালক বলে উঠল—শিগগির পাল গোটাতে বলো। দাঁড় বাওয়া বন্ধ করতে বলো—নইলে যে গতিতে জাহাজ ছুটছে পাথুরে জাহাজঘাটায় ধাক্কা খেয়ে জাহাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে ডেক-এর উপর দিয়ে ছুটল দাঁড়ঘরের দিকে। যেতে যেতে ওপরের দিকে পালের কাঠে খুঁটিতে বসা ভাইকিং বন্ধুদের চিৎকার করে বলতে লাগল—শিগগির পাল গোটাও—পাল গোটাও। ওরা সঙ্গে সঙ্গে পালের দড়ি ধরে টানাটানি করে পাল গুটিয়ে ফেলতে লাগল।

হ্যারি ছুটে এল দাঁড়ঘরে। দাঁড়িরা তখনও প্রাণপণে দাঁড় বেয়ে চলেছে। হ্যারি চিৎকার করে বলল—ভাইসব—ডাঙা—ডাঙায় এসে গেছি। দাঁড় বাওয়া বন্ধ কর। দাঁড়িরা দাঁড় বাওয়া বন্ধ করল। হ্যারি দেখল বিস্কোর গলা ভেঙে গেছে। তবুও ফ্যাসফ্যাসে গলায় ও গান গেয়ে চলেছে। দাঁড়িদের উৎসাহ জোগাচ্ছে। হ্যারি ছুটে বিস্কোর কাছে গেল। চেঁচিয়ে বলল—বিস্কো ডাঙা দেখা গেছে। নাক্সোস-এ পৌঁছে গেছি আমরা। বিস্কো গান থামাল। হ্যারির দিকে তাকাল। তারপর সমস্ত গা ছেড়ে দিয়ে কাঠের মেঝেয় পড় পড় হ'ল। হ্যারি দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু বিস্কোর দেহে কোন সাড় নেই। ও চোখ বুঝে আছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে। হ্যারি

বরাবরই শরীরের দিক থেকে দুর্বল। ও বিস্কোর শরীরের ভার ধ'রে রাখতে পারল না। আস্তে আস্তে বিস্কোকে কাঠের মেঝেয় শুইয়ে দিল। বিস্কো প্রচণ্ড ক্লান্তিতে চোখ বুজে হাত পা ছড়িয়ে কাঠের মেঝেয় শুয়ে রইল। হ্যারি দেখল—সব দাঁড়িরা কেউ কাঠের আসনে শুয়ে। কেউ দাঁড়ের গায়ে মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছে, কেউ কাঠের মেঝেয় শুয়ে পড়েছে। কারো শরীরে কোন সাড় নেই। সারারাত না ঘুমিয়ে এতক্ষণ একটানা প্রাণপণে দাঁড় চালিয়ে সকলেই অসহ্য ক্লান্তিতে হাত পা ছেড়ে পড়ে গেছে। ফ্রান্সিসের প্রতি এই বন্ধুদের এই গভীর ভালোবাসা দেখে হ্যারি অবাক হয়ে গেল। ও আর কাউকে ডাকল না। বিশ্রাম করুক ওরা। হ্যারি আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে এল। এতক্ষণে হ্যারি বুঝল ও নিজেও কম ক্লান্ত নয়। ডেকেই শরীর এলিয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু এখনও বিশ্রামের সময় আসে নি। আসল কাজ এখনও বাকি। ওকে ডেক-এ উঠে আসতে দেখে কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু ছুটে এল। শাঙ্কোও ছিল তার মধ্যে। বলল—হ্যারি এখন কী করবে? হ্যারি ক্লান্তস্বরে বলল—জাহাজ ঘাটে লাগলে আমি তোমাকে নিয়ে নামবো। কাভাল্লিকেও সঙ্গে নেবো। ও থাকলে সুবিধে। ও এখানকার রাজা রাজবাড়ি পথ ঘাট চেনে।

এবার হ্যারি শাঙ্কোকে বলল—শাঙ্কো—এক মুহূর্তও দেরি করা চলবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্রান্সিসের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যাও—কাভাল্লিকে ডেকে নিয়ে এসো। জলদি। শাঙ্কো ছুটে চলে গেল। একটু পরেই কাভাল্লিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল।

ততক্ষণে জাহাজের সেই দ্রুত গতি পড়ে গেছে। জাহাজ আস্তে আস্তে চলল জাহাজঘাটার দিকে। হ্যারি শাঙ্কো আর কাভাল্লি জাহাজের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল। তিনচার জন ভাইকিং বন্ধু কাঠের পাটাতনটা হাতে নিয়ে তৈরি হ'ল। আস্তে আস্তে জাহাজটা পাথুরে ঘাটটার গায়ে এসে লাগল। একটা বেশ জোরে ঝাঁকুনি খেয়ে জাহাজটা থেমে গেল। দ্রুত পাটাতন ফেলা হ'ল। ঘড়ঘড় শব্দে নোঙ্গর ফেলা হ'ল। পাটাতন দিয়ে হ্যারি ওরা দ্রুত পায়ে জাহাজঘাটায় নামল। নামতে নামতে কাভাল্লি বলল—সত্যি তোমরা বীরের জাতি। অসম্ভবকে সম্ভব করলে। এত তাড়াতাড়ি জাহাজ চালিয়ে এলে ভাবাই যায় না। হ্যারি ম্লান হেসে বলল—আমরা ভাইকিং—আমরা যা সংকল্প নি—তা ক'রে তবে ক্ষান্ত হই। মোটামুটি সমতল পাথর বাঁধানো রাস্তায় উঠতেই তিনজন সৈন্য এগিয়ে এসে ওদের থামতে ইঙ্গিত করল। হ্যারিরা দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যারি চিন্তায় পড়ল। সৈন্যরা আটকে দিলে ঝামেলায় পড়তে হবে। হ্যারি কাভাল্লিকে বলল—কাভাল্লি আমি ভালো করে গ্রীক ভাষা বলতে পারবো না। তুমি একটা কথাই ওদের বোঝাও যে আমরা ভাইকিং। জাহাজে আমাদের এক বন্ধু মরণাপন্ন। তার সুচিকিৎসার জন্যে আমরা এখানকার রাজা ডিউক মার্কোকে অনুরোধ করতে যাচ্ছি।

সৈন্য তিনজন কোমরবন্ধ থেকে তরোয়াল খুলল। হ্যারিদের ঘিরে দাঁড়াল। হ্যারিওরা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল। সৈন্যদের একজন গ্রীক ভাষায় বলল—তোমরা কারা? এখানে এসেছো কেন? এবার কাভাল্লি একটু এগিয়ে গেল সৈন্যদের দিকে। হ্যারি যা বলে দিয়েছিল তাই গড় গড় করে বলে গেল। সৈনিকদের একজন বলল—কিন্তু তোমরা বিদ্রোহী এনরিকোর গুপ্তচরও তো হ'তে পারো। এবার হ্যারি

ভাঙা ভাঙা গ্রীক ভাষায় বলল—কে বিদ্রোহী এনরিকো? আমরা এনরিকোর নামই শুনি নি। হ্যারি বুঝল এখন মিথ্যে কথা না বলে উপায় নেই। সৈন্যরা ওদের যত দেরি করিয়ে দেবে ফ্রান্সিসের বিপদ তত বাড়বে। সৈন্য তিনজন পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। হ্যারির কথা যে জন্যেই হোক ওরা বিশ্বাস করল। খোলা তরোয়াল কোমরে গুঁজে রাখল। একজন সৈন্য বলল—যাও। তবে রাজা মার্কোর রাজসভা শুরু হ'তে এখনও ঘণ্টা দু'য়েক বাকি। সৈন্য তিনজন চলে গেল। হ্যারি বলল—শাঙ্কো—যা বুঝছি—এখন রাজার সাহায্য চাইতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হবে! দু'ঘণ্টা পরে রাজা রাজসভায় আসবেন। বেশ সময় যাবে রাজাকে আমাদের আবেদন জানাতে। তিনি আমাদের আবেদনে সাড়া দেবেন কিনা তাও আগে থেকে বলা সম্ভব না। যদি সাড়া না দেন তাহলে ঘণ্টা তিনেরও বেশি সময় নষ্ট হবে। অথচ ফ্রান্সিসের শরীরের যা অবস্থা তাতে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। শাঙ্কো ভাবল কথাটা। বলল—এখন কী করবে তাহলে?

—এই নগরে একজন ভালো বৈদ্যিকে খুঁজে বের করতে হবে। হ্যারি বলল। তারপর কাভাল্লিকে বলল—কোন ভাল বৈদ্যিকে চেনো তুমি? কাভাল্লি মাথা নাড়ল।

—ঠিক আছে—চলো। হ্যারি পাথর বাঁধানো রাস্তা ধরে দ্রুত পায়ে চলল। রাস্তায় কত লোক চলাচল করছে। হ্যারির সেদিকে চোখ নেই। ও খুঁজছে একটা ওষুধের দোকান। হ্যারি দু'পাশে তাকাতে তাকাতে চলেছে। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল একটা ঝাকড়া মাথা গাছের নিচে পাথর বাঁধানো বেদীমত। তার ওপর কিছু শুক্‌নো আর টাটকা গাছ-গাছড়া। নানা রকম শুক্‌নো শেকড়বাকড়—এসব নিয়ে দু'জন লোক ব'সে আছে। দু'চারজন খরিদ্দার গাছ পাতা শেকড়বাকড় নেড়েচেড়ে দেখছে। হ্যারি দ্রুত লোক দু'টির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, জিজ্ঞেস করল—এসব কি ওষুধ তৈরির গাছ-গাছড়া? লোক দু'টি কথাটা কিছু বুঝল। মাথা নেড়ে একজন বলল, হ্যাঁ।

—এই নগরের বৈদ্যিরা এসব কেনেন—তাই না? হ্যারি বলল। লোকটি আবার মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ।

—এখানকার কোন ভালো বৈদ্যিকে চেনো? হ্যারি বলল। লোকটি মাথা নেড়ে বলল—পাসকাতোর—রাজবদ্যি।

—কোথায় থাকেন পাসকাতোর। হ্যারি জানতে চাইল। লোকটা এবার হাত নেড়ে নেড়ে কী গড় গড় ক'রে বলে গেল। হ্যারি সব কথা বুঝল না। কাভাল্লির দিকে তাকাল। কাভাল্লি—মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—বুঝেছি—পাসকাতোর মানে রাজবৈদ্যি থাকেন কাছেই। চলো আমার সঙ্গে। তিনজনে পথ দিয়ে চলল। কিছুটা যেতেই একটা মোড় পড়ল। মোড়ের ডান পাশে একটা সবুজ ঘাসে ঢাকা উপত্যকা মত। কাভাল্লি উপত্যকা দিয়ে চলল। পেছনে হ্যারি আর শাঙ্কো।

দু'পাশের উঁচু উঁচু টিলামত। তার মাঝখান দিয়ে পথ। ওরা চলল। কিছুটা যেতেই কাভাল্লি এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। একটা উঁচু পপলার গাছের নিচে পাথরের বাড়িঘর কিছু। কাভাল্লি সেদিকে চলল। একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দেখা গেল বাইরের ঘরের দরজা খোলা। কিছু লোকজন ঘরে বসে আছে। কাভাল্লি এগিয়ে গিয়ে সেই লোকজনদের সঙ্গে কথা বলল। হ্যারিদের দিকে ফিরে

তাকিয়ে বলল—এটাই রাজবৈদ্যির বাড়ি। উনি এখনি আসবেন।

হ্যারি ও শাঙ্কো ঘরটায় ঢুকল। দেখল ঘরের একদিকে—একটা পাথরের বেদীমত। তাতে পাখির পালকের আসন পাতা। আর একপাশে পাথরের তাকওলা আলমারিমত। তাতে অনেক কাঠের কৌটো রাখা। নিচের তাকে অনেক শুকনো শেকড়বাকড় রাখা। ঘরটার ওপাশের দরজা দিয়ে দেখা গেল উঠানমত। তা'তে পাথর পাতা উনুন জ্বলছে। বিরাট বড় মাটির গামলামত কী বসান। তাতে নানা গাছপাতা সেদ্ধ হচ্ছে। গামলা থেকে ধোঁয়া উঠছে। হ্যারি বুঝল—কাঠের কৌটোগুলো ওষুধের কৌটো। উনুনে জ্বাল দিয়ে ওষুধ তৈরি করা হচ্ছে।

ঘরে লম্বাটে কাঠের পাটাতন পাতা। রোগীরা বসে আছে। হ্যারি শাঙ্কো আর কাভাল্লিকে ইঙ্গিতে বসতে বলল। নিজে দাঁড়িয়ে রইল।

তখনই পাকা দাড়িগোঁফওলা একজন বৃদ্ধ আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলেন। বৃদ্ধের পরনে ঢোলা সাদা মোটা কাপড়ের জোব্বামত। কোমরে রেশম কাপড়ের বন্ধনী। হ্যারি বুঝল ইনিই রাজবৈদ্যি পাসকাতোর। হ্যারি এবার অন্য রোগীদের দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা গ্রীক ভাষায় বলল—ভাই আমাদের এক বন্ধু গুরুতর অসুস্থ। আমি আগে মাননীয় রাজবৈদ্যির সঙ্গে কথা বলবো। রোগীদের দুজন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। অন্যেরা কোন কথা বলল না।

এবার হ্যারি এগিয়ে গেল। পাসকাতোর ততক্ষণে আসনে বসেছেন। হ্যারি মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল, রাজবৈদ্য মহাশয়—আমরা বিদেশী ভাইকিং। আমাদের জাহাজে আমাদেরই এক বন্ধু ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমরা আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো যদি আপনি দয়া ক'রে আমাদের সঙ্গে জাহাজে এসে আমাদের অসুস্থ বন্ধুকে একটু দেখেন—চিকিৎসা করেন। পাসকাতোর একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—আমি বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছি। জাহাজে ওঠানামা করতে খুবই কষ্ট হবে। আপনারা যদি আপনাদের অসুস্থ বন্ধুকে এখানে আনতে পারেন তাহলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করবো। হ্যারি একটু ভাবলো কী করবে এখন? পরক্ষণেই ভাবল অন্য কোন উপায় নেই। ফ্রান্সিসকে প্রাণে বাঁচাতে হ'লে যে ভাবেই হোক ফ্রান্সিসকে এখানে আনতে হবে। ও বলল—বেশ আমরা এক্ষুণি অসুস্থ বন্ধুকে নিয়ে আসছি।

হ্যারি, শাঙ্কো আর কাভাল্লিকে ইশারায় ডেকে ঘরের বাইরে এল। হ্যারি বলল—জাহাজে চলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্রান্সিসকে এখানে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

হ্যারি রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল। শাঙ্কো ও কাভাল্লিও চলার বেগ বাড়াল।

জাহাজে উঠে হ্যারি ছুটল ফ্রান্সিস ও মারিয়ার কেবিনঘরের দিকে। ঘরে ঢুকে দেখল—ফ্রান্সিস চোখ বুজে শুয়ে আছে। কিন্তু স্থির হ'য়ে শুয়ে নেই। মাঝে মাঝেই জোরে মাথা এপাশ ওপাশ করছে। গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে কষ্টের গোঙানি। ফ্রান্সিসের শিয়রের দুপাশে ব'সে মারিয়া আর ওদের বৈদ্যি ফ্রান্সিসের দু'টো হাত কোলে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। দুঃখে বেদনায় হ্যারির বুক ভরে উঠল। ফ্রান্সিসের মত শক্ত মনের মানুষ কী প্রচণ্ড কষ্টে এই রকম মাথা নাড়ছে গোঙাচ্ছে এটা বুঝতে পেরে হ্যারি অস্থির হ'য়ে উঠল। ওর দু'চোখ জলে ভিজে

উঠল। পরক্ষণেই হ্যারি চোখ মুছে ফেলল। এখন মন দুর্বল হ'লে চলবে না। এখন অনেক কাজ।

ততক্ষণে বিস্কো আর কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু ঘরে ঢুকল। ওরা শাঙ্কোর মুখে শুনেছে অসুস্থ ফ্রান্সিসকে রাজবৈদ্যির বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। বিস্কোর শরীর এখনও দুর্বল। কিন্তু সেই দুর্বলতা ও গায়ে মাখল না। হ্যারি ডাকল—রাজকুমারী! মারিয়া আস্তে আস্তে মুখ তুলে হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারি বলল—একটু কথা ছিল। মারিয়া বিছানা থেকে উঠে হ্যারির কাছে এল। হ্যারি দেখল—মারিয়ার দু'চোখ লাল। চোখের নিচে গভীর কালি। মুখ শুকিয়ে গেছে। দু'গালের চোখের জলের দাগ। হ্যারির বুক ব্যাথায় ভ'রে উঠল। মারিয়ার মাথার চুল সারা মুখে ছড়ানো। এলোমেলো। বেদনার প্রতিমূর্তি যেন! আজ বোঝার উপায় নেই মারিয়া কত হাসিখুশি কত প্রাণবন্ত মেয়ে। হ্যারি আস্তে আস্তে মারিয়াকে সব বলল। সব শুনে মারিয়া বলল—তাহলে ফ্রান্সিসকে যে নিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু এতে ওর কষ্ট বাড়বে না তো?

—আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো ফ্রান্সিসকে সাবধানে সযত্নে নিয়ে যেতে, যাতে ওর কোন কষ্ট না হয়—বিস্কো বলল।

—বেশ। মারিয়া আর কিছু বলল না। ফিরে গিয়ে বিছানায় বসল। ফ্রান্সিসের একটা পট্টি বাঁধা হাত কোলে তুলে নিল।

ওদিকে জাহাজে সাজো সাজো রব উঠল। অসুস্থ ফ্রান্সিসকে রাজবৈদ্যের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

বিস্কো ছুটে গেল কেবিন ঘরগুলোর পেছনে। একটু অন্ধকারমত জায়গাটায় অনেকগুলো কাঠের তক্তা থাকে থাকে সাজানো। জাহাজ মেরামতের জন্যে ওগুলো লাগে। বিস্কোর সঙ্গে কয়েকজন বন্ধুও ছুটে এসেছিল। ওরা ধরাধরি ক'রে একটা লম্বাটে কাঠের তক্তা বের করল। নিয়ে এল ফ্রান্সিসের ঘরে। তক্তা মেঝেয় পেতে তার ওপর মোটা কম্বলমত পাতলা দু'টো। রাখল বালিশ। বিছানামত হ'ল। হ্যারি হাত চেপে পরীক্ষা ক'রে দেখল বেশ নরম হয়েছে। ও একটা মোটা চাদরও পেতে দিল। এবার ফ্রান্সিসকে বিছানা থেকে এনে এখানে শোয়াতে হবে। তারপর বিছানা-পাতা তক্তাটা নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে যেতে হবে রাজবৈদ্যির বাড়ি।

এবার হ্যারি ওরা চিন্তায় পড়ল। নাড়াচাড়া করতে গেলে যদি ফ্রান্সিসের কষ্ট বাড়ে। হ্যারি—কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ওদের ইতস্তত ভাব দেখে মারিয়া বলল—হ্যারি—হয়তো এভাবে নিয়ে যেতে গেলে ফ্রান্সিসের কষ্ট বাড়বে। কিন্তু এক্ষুণি তো নিয়ে যেতেই হবে। ওদের বৈদ্যি বন্ধু তখনও বিছানায় মাথা নিচু ক'রে বসেছিল। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল—যত কষ্ট হোক ফ্রান্সিসকে এক্ষুণি নিয়ে যাও। নইলে—ফুঁপিয়ে উঠে বলল—ফ্রান্সিসকে বাঁচানো যাবে না।

কথাটা শুনে হ্যারি ব'লে উঠল—রাজকুমারী—ফ্রান্সিসকে তুলে আনতে আপনি সাহায্য করুন। রাজকুমারী আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের কাঁধের নিচে হাত দিয়ে ফ্রান্সিসকে ডাকল—ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে চোখ খুলল। চোখ দু'টো লাল।—তোমাকে রাজবৈদ্যির কাছে নিয়ে যেতে হবে। ফ্রান্সিস কোন কথা না ব'লে আবার চোখ বুজল। মারিয়া ফ্রান্সিসের ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়েই বুঝেছিল প্রচণ্ড জ্বর ফ্রান্সিসের।

ফ্রান্সিস আবার মাথা দু'একবার এপাশ ওপাশ ক'রে গোঙাল।

হ্যারি ইঙ্গিতে বিস্কোকে কাঠের তক্তার বিছানাটা ধরতে বলল। দু'জনে বিছানা-পাতা তক্তাটা বিছানায় তুলে ফ্রান্সিসের পাশে রাখল। তারপর কয়েকজন ভাইকিংকে ইঙ্গিতে ডাকল। পাঁচ ছ'জন মিলে আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসকে তুলল। ফ্রান্সিস গোঙাতে লাগল। ফ্রান্সিসের অসহ্য কষ্ট বেদনার কথা ভেবে বন্ধুদের কারো কারো চোখে জল এল। হ্যারি চাপাস্বরে বলল—কেউ কেঁদো না। তোমাদের চোখে জল দেখলে ফ্রান্সিস দুর্বল হয়ে পড়বে।

আস্তে আস্তে ওরা ফ্রান্সিসকে ধ'রে বিছানাপাতা তক্তায় শুইয়ে দিল। মারিয়া ফ্রান্সিসের হাত দু'টো আস্তে আস্তে বিছানাটার দু'পাশে নামিয়ে রাখল। বোধহয় অসহ্য হাতের যন্ত্রণার জন্যেই ফ্রান্সিস চোখমুখ কুঁচকে মাথা নাড়ল। ওর গলায় গোঙানির শব্দ হল। ফ্রান্সিস একবার চোখ মেলে মারিয়া আর বন্ধুদের ঝুঁকে পরা মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কাউকেই চিনল না বোধহয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দু'চোখ বন্ধ করল। আটদশ জন ভাইকিং বন্ধু হ্যারি আর বিস্কো বিছানা-পাতা তক্তাটা এবার আস্তে তুলল। খুব সাবধানে হাতে ধরাধরি করে কেবিনঘরের বাইরে নিয়ে এল। আস্তে আস্তে ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে চলল।

সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে সযত্নে উঠে ডেক-এ এল। তারপর ধরাধরি ক'রে নিয়ে চলল কাঠের পাটাতনের দিকে। কাঠের পাটাতন তো খুব বড় হয় না। মাত্র দুজন সামনে পেছনে নামতে পারে। এবারে শাঙ্কো ছুটে এসে বিছানাটার সামনে ধরল। আর একপাশে ধরল বিস্কো। দু'জনে মিলে এবার বিছানাপাতা তক্তাটা নিয়ে পাটাতন দিয়ে নামতে লাগল। একে ফ্রান্সিসের শরীরের ভার তার ওপর সরু পাটাতন। শাঙ্কো আর বিস্কোর ভীষণ কষ্ট হ'তে লাগল। হাত দু'টো যেন ছিঁড়ে যাবে এরকম অবস্থা। কিন্তু ওরা দাঁত চেপে সেই কষ্ট সহ্য করল। আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসকে জাহাজঘাটায় নামিয়ে আনল। এবার আটদশ জন বন্ধু ছুটে এল। ওরা সবাই মিলে সেই বিছানাপাতা তক্তাটা ধরাধরি ক'রে আস্তে আস্তে সাবধানে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিস এর মধ্যে একবার মাত্র চোখ চেয়েছিল। মাথা এপাশ ওপাশ করছিল। ওর গলা থেকে বেরিয়ে এসেছিল গোঙানির শব্দ।

আস্তে আস্তে ওরা রাজবৈদ্যের বাড়ি পৌঁছল। রাজবৈদ্য সহকারী এগিয়ে এল। পাশের ঘরে একটা কাঠপাতা শয্যায় ফ্রান্সিসকে শুইয়ে দিতে ইঙ্গিত করল। বন্ধুরা সেখানে ফ্রান্সিসকে শুইয়ে দিয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেল। শয্যার পাশে বসল মারিয়া। নিশ্চল পাথরের মত বসে রইল। হ্যারি আর বিস্কো সেই ঘরে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে রাজবৈদ্য এলেন। ফ্রান্সিসের বিছানায় বসলেন। ফ্রান্সিসের কপালে গলায় হাত দিয়ে বোধহয় জ্বর কেমন দেখলেন। পায়ের কাছে কম্বল সরিয়ে পা দু'টো টিপে হাত বুলিয়ে দেখলেন। তারপর পট্টি বাঁধা হাত দুটো আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। এবার সহকারীর দিকে তাকিয়ে কী বললেন। সহকারী দ্রুত বেরিয়ে গেল। একটু পরে কালো কাঠের গামলা নিয়ে এল। তাতে গরম জল। ধোঁয়া উঠছে। সহকারী কিছু মোটা সাদা কাপড়ের টুকরো নিয়ে এল। সে সব রাজবৈদ্যকে দিল। তারপর একটা কাপড়ের ছোট্ট পুঁটুলিমত বের করল। সেটা

গরম জলে চুবিয়ে নাড়তে লাগল। বেগুনি রঙ হ'য়ে গেল জলটার।

রাজবৈদ্য বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ফ্রান্সিসের বাঁ হাতটা আস্তে আস্তে তুললেন। তারপর কিছুটা সাদা ন্যাকড়া ছিঁড়ে নিয়ে ঐ গামলার জলে চুবিয়ে ভেজালেন। সেটা হাতের পট্টির গায়ে লাগিয়ে ভেজালেন। আস্তে আস্তে পট্টিটা খুলতে লাগলেন। কিছুটা খুলতেই দগ্‌দগে ঘা মত দেখা গেল। রাজবৈদ্য এবার হ্যারির দিকে তাকালেন। মারিয়াকে দেখিয়ে আস্তে বললেন—এই ভদ্রমহিলাকে বাইরে যেতে বলুন। গ্রীক ভাষা মারিয়া বুঝল না। হ্যারি মারিয়াকে বলল—রাজকুমারী, আপনি একটু বাইরে যান। মারিয়া কোন কথা না বলে ঘরের বাইরে চলে গেল। রাজবৈদ্য সেই গামলার বেগুনী রঙের জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে ভিজিয়ে ফ্রান্সিসের দু'হাতের পট্টি আস্তে আস্তে খুলে ফেলল। দেখা গেল দু'টো হাতেই কাটা জায়গাগুলো ঘায়ের মত হ'য়ে গেছে। হাত দু'টো বেশ ফুলেও গেছে। রাজবৈদ্য সহকারীকে কী বললেন। সহকারী ছুটে গিয়ে একটা তিনকোণা পাতায় জড়ানো হলুদ রঙের আঠামত কী নিয়ে এল। রাজবৈদ্য সেই জিনিসটা থেকে কিছুটা নিয়ে আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের হাতের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে একবার মাথা তুলল। আবার মাথা নামাল বালিশের ওপর। জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। রাজবৈদ্য সমস্ত ওষুধটাই দু'হাতের ক্ষতস্থানে আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিলেন। তাকিয়ে রইলেন ফ্রান্সিসের মুখের দিকে।

কিছুক্ষণ সময় কাটল। ঘরের সবাই তাকিয়ে আছে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে। ফ্রান্সিস মাঝে মাঝেই চোখ মুখ কোঁচকাচ্ছিল। আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হ'ল। নাক মুখ কোঁচকান বন্ধ হ'ল। ফ্রান্সিস চুপ ক'রে চোখ বোজা অবস্থায় শুয়ে রইল। বোঝা গেল যেন ওর কষ্ট একটু কমল।

রাজবৈদ্য এবার শুক্‌নো মোটা সাদা কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের হাত দু'টো বেঁধে দিলেন। দুটো হাত বিছানা পেতে দিলেন। বিছানা ছেড়ে উঠলেন। হ্যারি রাজবৈদ্যর সামনে এগিয়ে এল। বলল—আমাদের বন্ধু—সুস্থ হবে তো? রাজবৈদ্য পাকা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে হাসলেন। বললেন—আর ঘণ্টা পাঁচ ছয় দেরি হ'লে আপনাদের বন্ধুকে বোধহয় বাঁচানো যেত না। যা হোক—ওষুধে কাজ হয়েছে এখন আস্তে আস্তে জ্বর কমবে। ব্যথা জ্বালা যন্ত্রণাও কমবে। বন্ধুটি সুস্থ হবে। হ্যারি রাজবৈদ্যর ডানহাতটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রাজবৈদ্য হ্যারির পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেলেন।

মারিয়া দ্রুত ঘরে ঢুকল। হ্যারিকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে মারিয়া কেমন বিহ্বলের মত ব'লে উঠল—তাহ'লে ফ্রান্সিস কি—আমাকে এই জন্যেই এখানে থাকতে দেওয়া হয় নি। হ্যারি তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—না—না রাজকুমারী। রাজবৈদ্য বলেছেন—ফ্রান্সিস সুস্থ হবে। আস্তে আস্তে ওর জ্বর কমবে জ্বালা যন্ত্রণা কমবে। ভয়ের কিছু নেই।

মারিয়া কোন কথা বলল না। আস্তে আস্তে গিয়ে ফ্রান্সিসের শিয়রের কাছে বসল। একটা হাত আস্তে আস্তে তুলে কোলে রাখল। হাত বুলোতে লাগল।

সময় কাটতে লাগল। তখনও ঘরের মধ্যে হ্যারি বিস্কো শাঙ্কো। বাইরে অন্য

বন্ধুরা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

ঘণ্টা দু'য়েক কাটল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাকাল। মারিয়া ঝুঁকে বলল—ফ্রান্সিস—এখন কেমন লাগছে? মারিয়া দেখল ফ্রান্সিসের চোখের লাল ভাবটা অনেক কম। কপালে হাত দিল। জ্বর অনেক কম। ফ্রান্সিসের চোখের দৃষ্টিও স্বাভাবিক এখন। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে বলল—একটু ভালো।

—কোনো ভয় নেই ফ্রান্সিস—রাজবৈদ্য বলেছেন তুমি ভালো হ'য়ে যাবে। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস শুক্‌নো ঠোঁটে হাসল। ক্লান্তস্বরে বলল—জল। হ্যারি ছুটে গেল। একটু পরেই একটা কাঠের পাত্রে খাবার জল নিয়ে এল। মারিয়া আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসকে জল খাইয়ে দিল। জল খেয়ে ফ্রান্সিস বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ল।

হ্যারির মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল। ও হেসে বিস্কো আর শাঙ্কোর দিকে তাকাল। ওরাও হাসল। শাঙ্কো এক লাফে ঘরের বাইরে এল। বন্ধুরা অনন্ত অনড় দাঁড়িয়ে আছে। শাঙ্কো চাপা গলায় বলল—ভাইসব—ফ্রান্সিস এখন অনেকটা সুস্থ। রাজকুমারীকে চিনতে পেরেছে। কথা বলেছে। জল খেয়েছে। সবাইয়ের মুখে হাসি ফুটল। অন্য সময় হ'লে হয়তো—ও—হো—হো ক'রে চিৎকার জুড়তো। এখন সবাই চুপ। একজন দু'জন করে ওরা বারান্দার পাথুরে মেঝেতে বসে পড়ল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। গতকাল সারা রাত ওরা শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ ক'রে জাহাজের দাঁড় বেয়েছে। এখন এই বেলা পর্যন্ত কেউ কিছু খায় নি। ক্লান্তিতে অবসাদে সবাই তখন খাওয়ার কথাও ভুলে গেছে। অবশ্য ফ্রান্সিসের অসুস্থতার কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেও পারে নি এতক্ষণ। ফ্রান্সিস সুস্থ আছে জেনে এবার ওরা নিশ্চিন্ত হ'ল। উৎকণ্ঠা কেটে গেল। এতক্ষণে ওরা বুঝতে পারল ওরা কী ভীষণ ক্লান্ত।

হ্যারি ওদের কাছে এল। বলল, ভাইসব—ফ্রান্সিস এখন অনেকটা সুস্থ। গতরাতে তোমরা অমানুষিক পরিশ্রম করে সময়কে জয় করেছিলে। তাই ফ্রান্সিসকে বাঁচাতে পারলাম আমরা। এবার জাহাজে ফিরে যাও। রাঁধুনিকে বলো রান্না করতে। তোমরা খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করো। আমি শাঙ্কো আর রাজকুমারী এখানে রইলাম। তোমরা খেতে যাও। আমরা পরে খাবো।

ভাইকিং বন্ধুরা চলে গেল জাহাজে। হ্যারি রাজবৈদ্যের কাছে গেল। বলল—আপনাকে কী করে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো—। রাজবৈদ্য হেসে হাত তুলে হ্যারিকে থামালেন। বললেন শুনুন—আপনাদের যা শরীরের অবস্থা তাতে তাঁকে টানাটানি করা তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর হবে। রোগী ঐ ঘরেই থাকবে। আমার সহকারী সব ব্যবস্থা করবে।

—তাহলে তো খুবই ভালো হয়। হ্যারি বলল—আমরা কয়েকজন এখানে থাকবো—দিন রাত—রাজকুমারী মারিয়া সেবা-শুশ্রূষা করবেন।

হ্যারি ঘরে ফিরে এল। দেখল মারিয়া ফ্রান্সিসের ডান হাতটা কোলে নিয়ে সেই একইভাবে মাথা নিচু করে বসে আছে। হ্যারি আস্তে আস্তে বলল—রাজকুমারী—রাজবৈদ্য বললেন ফ্রান্সিসেকে এই ঘরে থাকতে হবে। ওর শরীরের এই অবস্থায় ওকে জাহাজে আনা নেওয়া নাড়াচাড়া করা উচিত হবে না। আমি তাতে রাজি হয়েছি। এখন আপনি বলুন। মারিয়া মাথা নিচু করে শান্তভাবে

বলল—তোমরা যা চাইবে তা হবে। আমার মাথার ঠিক নেই। আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

—তাহলে ফ্রান্সিস এখানেই থাক। আমরা কয়েকজন পালা ক'রে এখানে থাকবো। আপনাকে সাহায্যে করবো। হ্যারি বলল। মারিয়া শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। কোন কথা বলল না।

হ্যারি ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে বলল। অপেক্ষা করতে লাগল কখন শাঙ্কো বিস্কো ওরা জাহাজ থেকে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে আসে।

বেলা বাড়তে লাগল। হ্যারি বারান্দায় পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইল। ফ্রান্সিস এখন কিছুটা সুস্থ। আর ফ্রান্সিসের জীবনের আশঙ্কা নেই—রাজবৈদ্য তো তাই বললেন, এতক্ষণে হ্যারি বুঝতে পারল—ও কতটা শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত। হ্যারি দু'চোখ বুজল। আস্তে আস্তে ঐ অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বিস্কোর ডাকে হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল। হ্যারি চোখ খুলে দেখল—বিস্কো শাঙ্কো ওরা কয়েকজন ওর পাশে এসে বসল।

হ্যারি উঠে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকল। দেখল মারিয়া ফ্রান্সিসের কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ফ্রান্সিস ঘুম ভেঙে চেয়ে আছে। হ্যারি আস্তে ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল। হ্যারি বলল—কিছু খাবে? ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। আস্তে মাথা ওঠানামা করে চাইল। হ্যারি বলল—দেখি রাজবৈদ্যর সহকারী কী বলে? হ্যারি ভেতরের উঠোন মত জায়গাটায় গেল। দেখল সহকারী যারা ওষুধ জ্বাল দিচ্ছে তাদের নির্দেশ দিচ্ছে। হ্যারি কাছে গিয়ে বলল—আমাদের বন্ধু—ফ্রান্সিস—ও এখন একটু ভালো। ও খেতে চাইছে। ওকে কী খেতে দেব? সহকারী বলল—তাঁকে তো শক্ত খাবার দেওয়া যাবে না। আমি খাবার তৈরি করিয়ে দিচ্ছি। আপনারা খাইয়ে দিন।

ঘরে এসে হ্যারি মারিয়াকে সে কথা বলল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে একজন লোক একবাটি খাবার জল নিয়ে এলো। বাটিতে একটা ছোট কাঠের হাতা রাখা। মারিয়া আস্তে আস্তে ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ ক'রে ছিল। চোখ খুলে তাকাল। মারিয়া বলল—একটু খেয়ে নাও। ফ্রান্সিস মুখ হাঁ করল। মারিয়া হাতায় ক'রে খাবার খাইয়ে দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস খাবার খেয়ে জল খেয়ে একটু যেন ভালো বোধ করতে লাগল। চোখ বন্ধ করল। হ্যারি বলল—রাজকুমারী—জাহাজে চলুন। কাল থেকে আপনি এক ফোঁটা জলও খান নি। মারিয়া মাথা নাড়ল।

—অবুঝ হবেন না রাজকুমারী। এভাবে না খেয়ে থাকলে আপনি অসুস্থ হ'য়ে পড়বেন। ফ্রান্সিস তো এখন কিছুটা সুস্থ। আসুন। হ্যারি বলল।

মারিয়া আর আপত্তি করল না। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠল। হ্যারি মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের বাইরে এল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। হ্যারি বলল—শাঙ্কো তোমরা ফ্রান্সিসের কাছে থাকো। আমরা জাহাজে খেতে যাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবো।

তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। অসুস্থ ফ্রান্সিসের ঘরে একটা মোটা মোমবাতি জ্বলছে।

ফ্রান্সিসের শিয়রে মারিয়া বসে আছে। হ্যারি শাঙ্কো মেঝেয় মোটা কম্বলমত পেড়ে বসে আছে।

সহকারীকে নিয়ে রাজবৈদ্য এলেন। ফ্রান্সিসের বিছানায় বসলেন। ফ্রান্সিস চোখ বুজে ছিল। মারিয়া মুখ নামিয়ে বলল—ফ্রান্সিস—রাজবৈদ্য এসেছেন। ফ্রান্সিস চোখ মেলে তাকাল। রাজবৈদ্য হেসে গ্রীক ভাষায় বললেন—কেমন আছেন? ফ্রান্সিস বুঝল না। হ্যারি ব'লে উঠল—ফ্রান্সিস তুমি কেমন আছো রাজবৈদ্য তাই জানতে চাইছে। ফ্রান্সিস শুকনো ঠোঁটে একটু হাসি ফুটিয়ে মাথা নেড়ে বোঝাল—ভাল। রাজবৈদ্য ফ্রানিসের কপালে গলায় পায়ে হাত দিয়ে দেখলেন। তারপর হাত দু'টো তুলে দেখলেন। ফ্রান্সিস একটু চোখ মুখ কোঁচকাল। রাজবৈদ্য সেটা লক্ষ্য করলেন। সহকারীকে মৃদুস্বরে কী বললেন। তারপর যখন চলে যাচ্ছেন হ্যারি এগিয়ে গিয়ে বলল—কেমন দেখলেন? রাজবৈদ্য পাকাদাঁড়ি গোঁফের ফাঁকে হেসে বললেন—অনেকটা ভালো। কাল সকালে আবার ওষুধ পড়বে। জ্বর ছেড়ে যাবে। জ্বালা যন্ত্রণাও অনেক কমে যাবে। তিনি চলে গেলেন। ওদিকে সহকারী কাপড়ের পুঁটুলি থেকে বড়ি বের ক'রে মারিয়াকে ইঙ্গিতে খাইয়ে দিতে বলল। ওষুধ নিয়ে ফ্রান্সিস আবার চোখ বুজে শুয়ে রইল।

রাত হ'ল। হ্যারি মারিয়া শাঙ্কো আর বন্ধুরা কয়েকজন পালা ক'রে জাহাজ থেকে খেয়ে এল। রাজবৈদ্যর সহকারী ফ্রান্সিসের খাবার দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস খাবে বলে উঠে বসতে গেল। পারল না। শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। মারিয়া ব্যস্ত হ'য়ে বলল—তোমাকে উঠতে হবে না। আমি খাইয়ে দিচ্ছি। মারিয়া ফ্রান্সিসকে খাইয়ে দিতে লাগল।

রাত বাড়তে লাগল। সেই ঘরের মেঝেয় মোটা কম্বলমত পেতে হ্যারি আর শাঙ্কো শোবে ঠিক করল। হ্যারি শুয়ে পড়ার আগে বলল—রাজকুমারী—আপনি এখন ঘুমিয়ে নিন। আমরা আছি। মারিয়া মাথা নাড়ল। হ্যারি আর শাঙ্কো শুয়ে পড়েই ঘুমিয়ে পড়ল। এত ক্লান্ত ছিল ওরা যে চোখ মেলে তাকাতে পারছিল না।

রাত শেষ হ'য়ে এসেছে তখন। হঠাৎ হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল। ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। দেখল মারিয়া বিছানায় গুটিসুটি হ'য়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। ও আর মারিয়াকে ডাকল না।

হ্যারি বসে রইল। কিছুক্ষণ পরেই বাইরে একটা পাখির ডাক শুনল। তারপর আরো দু'তিনটি পাখির ডাকে বুঝল ভোর হয়ে এসেছে।

হঠাৎ ফ্রান্সিসের অস্ফুট ডাক শুনল—মারিয়া। হ্যারি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের কাছে গেল। মারিয়ার কানে ডাকটা যায় নি। ও তখন অঘোর ঘুমুচ্ছে। ফ্রান্সিস হ্যারিকে দেখে হাসল। বলল—হ্যারি—দেখতো—মনে হচ্ছে জ্বরটা ছেড়ে গেছে। হ্যারি তাড়াতাড়ি ফ্রান্সিসের কপালে হাত রাখল। ঠাণ্ডা। আনন্দে হ্যারির চোখে জল এসে গেল। ও দু'হাতে চোখের জল মুছে ফেলল। ফ্রান্সিস হেসে দুর্বল কণ্ঠে বলল—এই—ছেলেমানুষি ক'রো না। একটু থেমে বলল—হ্যারি—যে জীবন আমরা মেনে নিয়েছি সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন স্থান নেই। আছে শুধু বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই। সংকল্প সাধনের জন্যে লড়াই। সমস্ত দুঃখ কষ্ট ব্যথা

বেদনা দাঁত চেপে সহ্য ক'রে লক্ষ্যে পৌঁছোতে হবে। এখানেই মানুষের জীবনের সার্থকতা। ফ্রান্সিস কথাগুলো ব'লে একটু হাঁপাতে লাগল। হ্যারি বলল—বেশি কথা ব'লো না ফ্রান্সিস। তোমার শরীর এখনও ভীষণ দুর্বল।

ওদের কথাবার্তাতেই বোধহয় মারিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। ও লাফিয়ে উঠে বসল। হ্যারির দিকে তাকিয়ে—আকুলস্বরে বলে উঠল—কী হ'য়েছে হ্যারি? হ্যারি হেসে বলল—ভয়ের কিছু নয়। ফ্রান্সিসের জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে।

—এ্যাঁ! মারিয়া তাড়াতাড়ি ফ্রান্সিসের কপালে হাত রাখল। গলায় হাত রাখল। তারপর দু'হাতে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—এই—কেঁদো না। সব ঠিক হ'য়ে যাবে। হ্যারি আস্তে আস্তে এসে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল। মারিয়া তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে!

তিন দিন কাটল। চারদিনের দিন ফ্রান্সিসের দু'হাতের পট্টি রাজবৈদ্যি এসে খুললেন। দেখা গেল হাতের ফোলা একেবারেই নেই। ঘাও শুকিয়ে গেছে। এর মধ্যে ফ্রান্সিস বিছানায় উঠে বসেছে। মেঝেয় একটু একটু পায়চারি করেছে। দেখেশুনে ফ্রান্সিসকে পরীক্ষা ক'রে রাজবৈদ্য পাকা দাঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—এবার আপনি আপনাদের জাহাজে ফিরে যেতে পারেন! আর কয়েকদিনের মধ্যেই আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে যাবেন। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে রাজবৈদ্যর ডান হাত আস্তে ধরল। রাজবৈদ্য সস্নেহে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

সেদিন দুপুরের একটু পরে হ্যারিওরা ফ্রান্সিসকে নিয়ে জাহাজঘাটার দিকে রওনা হ'ল। মারিয়া ফ্রান্সিসের হাত ধ'রে ওর পাশে পাশে চলল। দু'পাশে পেছনে রইল বিস্কো শাঙ্কোরা। ফ্রান্সিস বেশ আস্তে আস্তে হাঁটছিল। হ্যারি বলেছিল ফ্রান্সিসকে—তোমার শরীর দুর্বল। তুমি কাঠের তক্তায় পাতা বিছানায় বসো আমরা ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস রাজি হয় নি।

ফ্রান্সিস চলার মধ্যেই একটু থেমে থেমে চলল। জাহাজঘাটায় এল ওরা। সরু পাটাতনের ওপর দিয়ে উঠতে গিয়ে ফ্রান্সিসের মাথাটা একটু ঘুরে উঠল। টাল খেল ও। পেছন থেকে বিস্কো ফ্রান্সিসকে জোরে জড়িয়ে ধরল। সামনে উঠছিল শাঙ্কো। সেও ফ্রান্সিসকে ধরল। আস্তে আস্তে ওরা ফ্রান্সিসকে নিয়ে জাহাজে উঠল।

খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম। কয়েকদিনের মধ্যেই ফ্রান্সিস সম্পূর্ণ সুস্থ হল।

সেদিন ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা জাহাজে উৎসবের আয়োজন করল।

হ্যারি ফ্রান্সিস ও মারিয়ার কেবিনঘরে এল। দেখল—ফ্রান্সিস সেই আগের মতই প্রাণবন্ত। কী একটা কথা নিয়ে ফ্রান্সিস আর মারিয়া হাসাহাসি করছে।

—এসো হ্যারি। ফ্রান্সিস হাসতে হাসতেই বলল। হ্যারি এগিয়ে এসে বলল—ফ্রান্সিস—রাজবৈদ্য তোমাকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলেছেন। এবার তাঁকে তো তাঁর প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিতে হয়। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল—মারিয়া—চিকামা থেকে কিছু দামি জিনিস আনতে পারলে ভালো হত। একেবারে শূন্য হাতে চলে এলাম।

—তা'তে আমি মোটেই দুঃখিত নই। মারিয়া বলল। তারপর বিছানার একপাশ থেকে একটা কালো চক্‌চকে কাঠের বাক্স বের করল। বাক্স খুলে বের করল একটা মোটা সোনার চেন-এর হার। তা'তে লকেটের মত ঝুলছে একটা প্রায়

হাঁসের ডিমের মত মুক্তো। ফ্রান্সিস দেখেই চিনল। এই সবচেয়ে বড়ো মুক্তোটা ও মারিয়ার জন্যে মুক্তোর সমুদ্র থেকে এনেছিল। ফ্রান্সিস একটু মনঃক্ষুণ্ণ হ'ল। বলল—মারিয়া—এটা আমাদের স্মৃতির জিনিস।

—ঠিক—মারিয়া বলল—কিন্তু যিনি তোমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন তাঁকে তো আমার সব চেয়ে প্রিয় জিনিসটাই দিতে হবে। ফ্রান্সিস একটু চুপ ক'রে থেকে দেখে বলল—এতে তোমার কোন কষ্ট হবে না তো।

—বিন্দুমাত্র না—মারিয়া হেসে বলল—তোমার চেয়ে মূল্যবান আমার কাছে অন্য কিছুই নয়। চলো হ্যারি।

হ্যারি আর মারিয়া রাজবৈদ্যর বাড়ি এল। রাজবৈদ্যর তখন শেষ রোগীটি দেখা হ'য়ে গেছে। হ্যারি আর মারিয়াকে দেখে হেসে বসতে বললেন। ওরা বসল। রাজবৈদ্য মারিয়াকে বললেন—সেদিন আপনাকে ঘরের বাইরে চলে যেতে বলেছিলাম কেন জানেন? আপনার স্বামীর ফোলা হাতের ঘা দেখলে আপনি আতঙ্কগ্রস্ত হতেন। আপনি সহ্য করতে পারতেন না। হ্যারি রাজবৈদ্যর কথাটা মারিয়াকে বুঝিয়ে বলল। মারিয়ার মন রাজবৈদ্যর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। এবার মারিয়া বলল—আপনি এত মহৎ হৃদয়ের মানুষ। আমার স্বামীর জীবনদান করেছেন। এই ঋণ পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস দিয়েও শোধ করা যায় না। তবু আমার প্রার্থনা এই হারটি গ্রহণ করে আমাদের ধন্য করুন। এবার হ্যারি মারিয়ার কথাগুলো গ্রীক ভাষায় রাজবৈদ্যকে বোঝাল। রাজবৈদ্য কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তার আস্তে আস্তে বললেন—মা—তোমার এই শ্রদ্ধার উপহার আমি নিলাম। কয়েকদিন পরে আমার নাতনির বিবাহ। এই উপহার তাকে একজন বিদেশিনী মা'র উপহার হিসেবে দেব। হ্যারি কথাটা মারিয়াকে বুঝিয়ে বলল। মারিয়া এত খুশি হ'ল যে ওর চোখে জল এসে গেল। ও বার বার মাথা নুইয়ে রাজবৈদ্যকে শ্রদ্ধা জানাল। তারপর ওরা জাহাজে ফিরে এল। উৎসবের দিন সন্ধ্যেবেলা ভাইকিংরা যে যা কিছু ভালো পোশাক এনেছিল তাই পরল। সবাই জড়ো হলো ডেক-এ। ফ্রান্সিস এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। সবাই আনন্দ করতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিসের একটা ভালো পোশাক যে মারিয়া সঙ্গে এনেছিল সেটা ফ্রান্সিস জানতো না। রাজবাড়ির অনুষ্ঠানে যাবার পোশাক সেটা। মারিয়া সেই পোশাক বের ক'রে ফ্রান্সিসের হাতে দিল। ফ্রান্সিস তো অবাক। এসব শৌখিন জমকালো পোশাক ফ্রান্সিস কিছুতেই পরতে চায় না। ওর অস্বস্তি হয়। কিন্তু আজকে ওর রোগমুক্তির জন্যে উৎসব। কাজেই ফ্রান্সিসকে পরতে হ'ল সেই পোশাক। মারিয়াও পরল হালকা নীল রঙের গোড়ালি ঢাকা গাউন। একটু সাজগোজও করল। তারপরে দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। দেখল লাল নীল নানা রঙের কাগজ দিয়ে ডেক সাজানো হয়েছে।

হ্যারি শাঙ্কো বিস্কোরাও যা ভালো পোশাক সঙ্গে ছিল পরেছে। ফ্রান্সিস ও মারিয়া আসতেই সবাই চিৎকার করে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো—। জাহাজে যা সামান্য কিছু বাজি ছিল তাই ফাটানো হল। শুরু হ'ল নাচ গান। পেড্রো ধুলোটুলো ঝেড়ে ওর বেহালামত বাজনাটা নিয়ে এল। সেটার আটটা তারের মধ্যে দু'টোই ছিঁড়ে গেছে। পেড্রো মনের আনন্দে সেই বাজনাই বাজাতে লাগল।

রাত বাড়ল। এবার ডেক-এর একপাশে একটা কাঠের আসনে ফ্রান্সিস ও মারিয়া বসল। ওদের ঘিরে দাঁড়াল বন্ধুরা। একজন বিস্কোকে বলল—বিস্কো—তুমি সেদিন দাঁড়ঘরে গান গেয়ে আমাদের তালে তালে দাঁড় চালাতে সাহায্য করেছিল। সেই গান গাওনা ভাই। বিস্কো একটু হাসল। তারপর ওদের দেশের চারণ কবিরা যে সব গান গেয়ে গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায় সেই গান ধরল।

মাতৃভূমির গান। মাটির গান। সবাই চুপ ক'রে শুনতে লাগল। দেশ থেকে কতদূরে এক অজানা দেশের বন্দরে কানে আসছে দেশের গ্রামের মাটির গান।

বিস্কোর গান থামল। কেউ কোন কথা বলল না। দেশের কথা মনে এল। সকলেরই বেশ মন ভারি হ'য়ে গেল। মারিয়ারও মন খারাপ হয়ে গেল দেশের কথা ভেবে। ও মৃদুস্বরে ফ্রান্সিসকে বলল—ফ্রান্সিস—তোমার শরীর ভালো নেই। খানিয়া আর যাবো না। দেশে ফিরে যাই।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে হেসে বলল—না মারিয়া তা হয় না। খানিয়াতে শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাটের নিখোঁজ রাজমুকুট আমি খুঁজে বার করবোই।

কিন্তু কতদিন দেশ ছেড়ে এসেছি—মানে—মারিয়া কথাটা শেষ করতে পারল না। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল—মারিয়া—তোমরা যদি কেউ না যাও—আমি একা যাবো। কেউ আমাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারবে না। মারিয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল—না না—আমরা তোমার সঙ্গেই থাকবো। ফ্রান্সিস হেসে বলল দেশের গান শুনেছো তো—তাই তোমার মন খারাপ হ'য়ে গেছে। মন শক্ত কর।

এরপর আনন্দে উল্লাসে ভাঁটা পড়ল। আসল কথা দেশের কথা ভেবে প্রায় সবারই মন খারাপ হ'য়ে এল।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে অনেকেই কেবিনঘরে শুয়ে পড়ল। বেশ গরম লাগছিল। শাঙ্কো কম্বলমত মোটা কাপড়টা নিয়ে ডেক-এ উঠে এল। দেখল অনেকেই শুয়ে পড়েছে। শাঙ্কো জাহাজের মাথার কাছে কাপড় পেতে শুয়ে পড়ল। একসময় সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাসে ওর চোখে ঘুম জড়িয়ে এল।

তখন ভোর হয় হয়। জাহাজঘাটায় লোকজনের চিৎকার ডাকাডাকি চ্যাচামেচিতে শাঙ্কোর ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠে দাঁড়াল। দেখল জাহাজঘাটায় লোকজনের খুব ব্যস্ততা। শাঙ্কো একবার ভাবল—নেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটা কী? কিন্তু ও তো গ্রীক ভাষা জানে না। ও ছুটল জাহাজের সিঁড়ির দিকে। হ্যারির কেবিন-ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকল—হ্যারি—হ্যারি।

হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল। ও বেরিয়ে এল।

—কী হ'য়েছে।

—জাহাঘাটায় দেখলাম—সব লোকজন ছুটোছুটি ডাকাডাকি করছে। কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না।

—চলো তো। হ্যারি দ্রুত পায়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল।

ডেক-এ উঠে দেখল বেশ কিছু ভাইকিং বন্ধু জাহাজের রেলিং ধ'রে জাহাজঘাটার দিকে তাকিয়ে আছে।

হ্যারি পাটাতন দিয়ে নামতে নামতে দেখল রাজা মার্কোর প্রায় শ'খানেক সৈন্য জাহাজঘাটায় সার দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সকলেই সশস্ত্র।

হ্যারি জাহাজঘাটায় নামল। সৈন্যদের দলপতিকে খুঁজতে লাগল। দেখল দলনেতা তরোয়াল হাতে সৈন্যদের সাজাচ্ছে। হ্যারি কাছে গেল। জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে বলুন তো? দলনেতা একবার হ্যারিকে দেখল। বলল—তোমরা কে?

—আমরা ভাইকিং। ওদের জাহাজটা দেখিয়ে বলল—ঐ যে আমাদের জাহাজ।

—জাহাজ চালিয়ে শিগগির পালিয়ে যাও।

—কেন?

—বিদ্রোহী এনরিকো পোলিরিনা দখল ক'রেছে। তারপর এই নাঙ্গোস আক্রমণ করতে আসছে। অনেক কাছে চলে এসেছে। গুপ্তচর খবর এনেছে একটা যুদ্ধ জাহাজ বোঝাই সৈন্য নিয়েই এই বন্দরের দিকে আসছে। আমরা লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হচ্ছি। তোমরা পালাও। নইলে মরবে।

হ্যারি চিন্তায় পড়ল। ও দ্রুত ছুটল ওদের জাহাজের দিকে। ফ্রান্সিসকে জাহাজে ডেক-এই পেল। ততক্ষণে সবাই ডেক-এ এসে দাঁড়িয়েছে। এত হৈ চৈ সৈন্য সাজানো কেন জানবার জন্যে। হ্যারি ফ্রান্সিসকে সব কথা বলল। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবল। তারপর মাথা তুলে ডাকল—

—পেড্রো? পেড্রো এগিয়ে এল।

—শিগগির মাস্তুলে ওঠ। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখ কোন জাহাজ দেখতে পাও কিনা। পেড্রো তর্ তর্ ক'রে মাস্তুল বেয়ে উঠে গেল। একটু পরে চিৎকার করে বলল—একটা জাহাজ আসছে—। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—কত জোরে আসছে—কতক্ষণের মধ্যে এখানে এসে পৌঁছবে? পেড্রো একটুক্ষণ চুপ ক'রে বোধহয় জাহাজের গতিবেগ হিসেব করল। বলল—আর ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে এখানে পৌঁছবে।

—কোনদিক থেকে জাহাজটা আসছে? ফ্রান্সিস গলা জড়িয়ে বলল।

—বাঁ দিক থেকে। পেড্রো গলা চড়িয়ে উত্তর দিল। ফ্রান্সিস উত্তরটা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের দিকে তাকাল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব আমরা এই যুদ্ধে জড়াবো না। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। নোঙর তোল—পাল খাটাও—দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে চলে যাও। যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ চালাও—ডানদিক লক্ষ্য করে। জাহাজে সাজো সাজো রব পড়ে গেল। মাস্তুল বেয়ে দ্রুত উঠল কয়েকজন। পালের দড়ি দড়া টেনে পাল খুলে দিতে লাগল। শাঙ্কো আর বিস্কো ছুটে গিয়ে ঘর্ ঘর্ শব্দে নোঙর তুলে ফেলল। দাঁড়িরা সমুদ্রের জলে দাঁড় ফেলতে লাগল—ছপ্ ছপ্। জাহাজ ঘাট থেকে আস্তে আস্তে সরে এল। একটু দূরে আসতেই ভাইকিংরা সব পাল খুলে দিল। দাঁড়িরা জোর দিল দাঁড় টানায়। জাহাজ গতি পেল। ফ্রান্সিস ডাকল—কাভাল্লি। কাভাল্লি এগিয়ে এলো।

—এসো—তুমি চালককে সাহায্য কর। দিক ঠিক ক'রে খানিয়া বন্দরের দিকে জাহাজ চালাও। ফ্রান্সিস বলল। একটু পরেই জাহাজের গতি বাড়ল। দূরে মিলিয়ে গেল নাঙ্গোস বন্দর। জাহাজ মাঝ সমুদ্রে চলে এল।

জোর বাতাসে পালগুলো ফুলে উঠল। দাঁড় বাওয়ার ছপ্ ছপ্ শব্দ উঠল সমুদ্রে। সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে জাহাজ খানিয়ার দিকে পূর্ণবেগে চলল।

দু'দিন কাটল। বাতাস বেগবান। পালগুলো ফুলে রয়েছে। দাঁড়ও বাইতে হচ্ছে

না। নির্বিঘ্নে চলছে জাহাজ।

তিন দিনের দিন দুপুর নাগাদ দূর থেকে খানিয়া বন্দরের জাহাজ, বাড়িঘর দেখা গেল। ফ্রান্সিসরা অনেকেই জাহাজের রেলিঙে এসে দাঁড়াল। আরো কিছুটা এগিয়ে বন্দরের স্বাভাবিক কর্মব্যস্ততা নজরে পড়ল। সব খুঁটিয়ে দেখে কাভাল্লি বলল—খানিয়ার অবস্থা শান্তিপূর্ণ। ঐ দেখুন এখানে বিদেশী জাহাজও রয়েছে। ঐ একটা জাহাজ বন্দর ছেড়ে যাচ্ছে। এখন সবই স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছে। এবার ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—কী করবে হ্যারি? জাহাজ বন্দরে ভেড়াবে না কাছাকাছি কোথাও জাহাজ নোঙর করবে। সেখান থেকে নৌকায় চড়ে তীরে নামা যাবে। হ্যারি একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—দেখ, খানিয়ার দুর্গে তোমাকে যেতেই হবে, নইলে রাজমুকুট খুঁজে বার করবে কী করে? কাজেই গোপনীয়তার কোনো মানে হয় না। জাহাজঘাটাতেই জাহাজ ভেড়াবো আমরা। জাহাজঘাটা দিয়ে খানিয়ায় ঢুকবো।

বেশ। ফ্রান্সিস বলল। তারপর কাভাল্লির দিকে ফিরে বলল—কাভাল্লি তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে। কাভাল্লির চোখেমুখে দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল। ও বলল—দেখুন, বোনিফেসের সৈন্যরা আমাকে দেখলেই চিনে ফেলবে। এই সৈন্যরা অনেকেই তো বাইজেন্টাইন সম্রাটের সৈন্য ছিল। আমি কিন্তু বিপদে পড়বো তাহলে। ফ্রান্সিস বলল—কোনো ভয় নেই তোমার। রাজা বোনিফেস এখনও নিশ্চয়ই রাজমুকুট খুঁজে বার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ঐ মহামূল্যবান রাজমুকুটের জন্যে বোনিফেসের মতো লোভী লোক তো পাগল হবেই। আমরা ওরা এই দুর্বলতার সুযোগটা নেব। দেখবে তোমাকে আর বোনিফেস কোনো বিপদেই ফেলবে না।

আপনারা পারবেন আমাকে রক্ষা করতে? কাভাল্লি বলল।

নিশ্চয়ই পারবো। ফ্রান্সিস বলল—বোনিফেসের মতো ভীষণ লোভী রাজা এর আগেও দেখেছি। কাজেই এদের মতিগতি আমি ভালোই বুঝি। তুমি কিছু ভেবো না। এবার ফ্রান্সিস ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব, আমরা লুকোচুরির মধ্যে যাবো না। বন্দরেই জাহাজ ভেড়াবো। তারপর কাভাল্লিকে নিয়ে আমি, হ্যারি আর মারিয়া খানিয়া নগরে যাবো। নিখোঁজ রাজমুকুট খুঁজে বার করব। এতে কিছুদিন সময় লাগবেই। কাজেই আমরা যদি দু'একদিনের মধ্যে না ফিরি তোমরা চিন্তা করো না। রাজার সঙ্গে কথা হলে আর সবদিক থেকে আমরা নিরাপদ থাকলে আমরা কেউ এসে তোমাদের খবর দিয়ে যাবো। ফ্রান্সিস থামল। একজন ভাইকিং বন্ধু বলল—ঠিক আছে আমরা এখানে তোমাদের খবরের জন্য অপেক্ষা করবো।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ ধীরে ধীরে বন্দরে ভিড়ল। নোঙর ফেলা হলো। জাহাজঘাটা পর্যন্ত কাঠের পাটাতন ফেলা হলো। মারিয়া নিজের কেবিনে এল। মোটামুটি সাজগোজ করে নিল। ফ্রান্সিস হ্যারি তৈরি হয়ে এল। কাভাল্লি একজন ভাইকিংয়ের কাছ থেকে এক টুকরো কাপড় চাইল। ভাইকিংটি ওর কোমরের ফেট্টি থেকে কিছুটা কাপড় ছিঁড়ে দিল। কাভাল্লি সেই কাপড়ের টুকরোটা মাথা ও মুখের দুপাশে পেঁচিয়ে বাঁধল যাতে কেউ ওকে চিনতে না পারে।

তিনজনে জাহাজ থেকে নেমে এল। কাভাল্লি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল খানিয়া দুর্গের দিকে। পথে লোকজনের ভিড়। তার মধ্যে রাজা বোনিফেসের সৈন্যরাও

ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু'ধারে দোকানপাট। ঘোড়ায় টানা গাড়িও চলছে। কাভাল্লি চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগোচ্ছিল। তবু কাভাল্লি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারল না। একটা মোড়ের মাথায় দু'জন সৈন্যের মুখোমুখি পড়ে গেল। একজন সৈন্য চলেই যাচ্ছিল। অন্যজনের কিন্তু কাভাল্লির কাপড় ঢাকা দেওয়া মুখ দেখে সন্দেহ করলো। সে কাভাল্লির মুখের দিকে ভালো করে তাকাল। সন্দেহ বাড়ল। একটানে কাভাল্লির মুখের ঢাকা দেওয়া কাপড়টা খুলে ফেলল। এবার আর কাভাল্লিকে চিনতে অসুবিধা হলো না। সৈন্যটি বলল—তুমি কাভাল্লি। সম্রাটের সজ্জাকক্ষের পাহারাদার ছিলে। কাভাল্লি ভয়ে আর কথা বলতে পারল না। হ্যারি এগিয়ে এল। ভাঙা গ্রীক ভাষায় বলল—হ্যাঁ ও কাভাল্লি। ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—আমরা তিনজন ভাইকিং। আমরা ওর সঙ্গে এসেছি।

কেন?

সেসব আমরা রাজা বোনিফেসকে বলবো।

এখন তো রাজসভা শেষ হয়ে গেছে। সৈন্য বলল।

ঠিক আছে। আমদের দুর্গে নিয়ে চল। হ্যারি বলল।

দুর্গে গিয়ে কী করবে?

এবার কাভাল্লি বলল—আমি দুর্গরক্ষীদের অধিনায়কের সঙ্গে দেখা করব। তারপর রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করব।

সৈন্যটি বলল—বেশ চলো। কিন্তু কাভাল্লি, তুমি যদি আবার আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাও—

না ও পালাবে না। হ্যারি বলল।

সৈন্য দু'জন ওদের নিয়ে চলল। তারা দু'জন সঙ্গে থাকায় দুর্গদ্বার দিয়ে ওদের ঢুকতে কোনো অসুবিধে হলো না। কাভাল্লি ওদের অপেক্ষা করতে বলে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ফ্রান্সিসেরা দাঁড়িয়ে আছে। সৈন্য দুজনও। কিছুক্ষণ পরে কাভাল্লি ফিরে এল। ওর সঙ্গে একজন বেশ সুসজ্জিত মধ্যবয়স্ক লোক এল। কাভাল্লি হ্যারিকে বলল—ইনিই দুর্গরক্ষীদের অধিনায়ক।

হ্যারি বলল—দেখুন আমরা তিনজন ভাইকিং। কাভাল্লিকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এসেছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে।

কী সেই উদ্দেশ্য?

শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাটের নিখোঁজ রাজমুকুট খুঁজে বের করতে এসেছি। এইজন্য রাজা বোনিফেসের সাক্ষাৎপ্রার্থী আমরা।

অধিনায়ক একটু ভাবল। বলল—এখন কি রাজা দেখা করবেন?

আপনি শুধু রাজাকে এই সংবাদটুকু পৌঁছে দিন যে কাভাল্লিকে সঙ্গে নিয়ে তিনজন ভাইকিং এসেছে। কী জন্যে এসেছি তাও বলবেন। কপাল ভালো। অধিনায়ক রাজি হলো। কিন্তু সঙ্গের সৈন্য দু'জনকে বলল—দেখো, কাভাল্লি যেন পালাতে না পারে। অধিনায়ক দুর্গে ঢুকে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। অধিনায়ক ফিরে এল। বলল—শিগগির এসো—রাজা তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। সবাই দুর্গের মধ্যে ঢুকল। বিরাট বিরাট পাথরের খিলানওলা দরজা পার হয়ে একটা মস্তবড় কাঠের দরজার সামনে

এল ওরা। কাঠের দরজায় পেতলের ফুলপাতা আঁকা নানা কারুকাজ। সুদৃশ্য পেতলের বর্শা হাতে দুজন দ্বাররক্ষী ছিল। অধিনায়কের ইঙ্গিতে ওরা দরজা খুলে দিল।

বিরাট একটা ঘরে ঢুকল ওরা। কাভাল্লি বলল—রাজসভাগর। হ্যারি সেটা ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে বলল। ঘরের চারদিকে পেতলের মশাল দণ্ডে মশাল জ্বলছে। রাজসভাঘরের পাথরের দেয়াল ও ছাদের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস অবাক হয়ে গেল। মশাল দণ্ডের মাথায় মাথায় উজ্জ্বলরঙে আঁকা কত ছবি দেয়ালে, ছাদে। ফুল লতাপাতা মানুষ সমুদ্র পাহাড় কী অপরূপ ছবি সেসব। বাইজেন্টাইন সম্রাটদের আমলে আঁকা এইসব ছবিই বুঝিয়ে দেয় বাইজেন্টাইন সম্রাটরা কত বড় শিল্পরসিক ছিলেন। সামনেই সিংহাসন। রূপোর সিংহাসনে কত কারুকাজ। গভীর নীলরঙের মখমলমোড়া সিংহাসন। দু'পাশে আরও দুখানা রূপোর আসন। রাজ-অমাত্যদের জন্যে।

ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজসভা দেখতে লাগল। একটু পরে রাজা ঢুকল। সিংহাসনে বসল। বয়স হয়েছে রাজা বোনিফেসের। তবু হাঁটা চলা যুবকের মতো। বোনিফেস ফ্রান্সিসদের একবার দেখে নিয়ে কাভাল্লির মুখের দিকে তাকাল। বলল—তুমি কাভাল্লি? তুমি জানো বাইজেন্টাইন সম্রাটদের মুকুট কোথায় আছে?

হ্যারি আস্তে আস্তে বলল—না, কাভাল্লি জানে না। তবে আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমরা ঐ নিখোঁজ রাজমুকুট খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবো।

রাজা বোনিফেস একটু চুপ করে থেকে বলল—নিখোঁজ রাজমুকুট আমার চাই। তারপর বলল—তোমরা ভাইকিং। এ দেশের কী জানো?

ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে হ্যারি বলল—আমার এই বন্ধুটির নাম ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস সাহস আর বুদ্ধিবলে অনেক গুপ্তধন উদ্ধার করেছে। সব দেখেশুনে ও সঠিক বলতে পারবে ঐ রাজমুকুট উদ্ধার করা সম্ভব কি না। রাজা একটু ভাবল। বলল—বেশ, চেষ্টা করে দেখো। হ্যারি ফ্রান্সিসকে রাজার সঙ্গে যা কথা হলো বলল। ফ্রান্সিস ওকে বুঝিয়ে বলল আর কী কী বলতে হবে। হ্যারি বলল—আমরা কাল থেকেই খোঁজার কাজ শুরু করবো। এজন্যে আপনার কাছে অনুমতি চাইছি।

বেশ—বলো। রাজা বলল।

এক—আমার বন্ধুর দৃঢ় বিশ্বাস সেই রাজমুকুট এই দুর্গেই কোথাও আছে। কাভাল্লি এই দুর্গের সব কিছু খুব ভালোভাবে চেনে। সুতরাং আমাদের সঙ্গে কাভাল্লি সবসময় থাকবে।

আপত্তি নেই। রাজা বলল—কিন্তু কাভাল্লি পালালো তোমাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

বেশ, আমরা রাজি। দুই—এই দুর্গের সর্বত্র আমাদের যেতে দিতে হবে, বিশেষ করে আপনার সজ্জাকক্ষে। হ্যারি বলল।

যাবে, কিন্তু সঙ্গে দুজন পাহারাদার সৈন্য থাকবে। কারণ সজ্জাকক্ষে মূল্যবান অনেক কিছু রয়েছে। আর সজ্জাকক্ষে সকালে যেতে পারবে না, যাবে বিকেলে—দু'ঘণ্টার জন্যে।

তাতেই হবে। হ্যারি বলল।

রাজা সিংহাসন থেকে উঠল। ভেতরের দিকে চলে গেল। ফ্রান্সিসেরা রাজ-সভাকক্ষের বাইরে এল। দুর্গদ্বার পার হয়ে ওরা যখন রাস্তায় নামল তখন সন্ধ্যে

হয় হয়। ওরা জাহাজঘাটার দিকে চলল। রাস্তার দুপাশে এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় লোকজন দোকানপাট এসব দেখে মারিয়া বলে উঠল—ফ্রান্সিস, কাভাল্লি তো সঙ্গে আছে। চলো না নগরটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখি।

মারিয়া, আমরা বেড়াতে আসিনি। এখন অনেক চিন্তা মাথায়। ফ্রান্সিস আস্তে বলল। মারিয়ার বেড়াবার উৎসাহ আর রইল না। মন খারাপ হয়ে গেল ওর। ফ্রান্সিস বুঝল। বলল—মারিয়া, ভুলে যেও না—বিদ্রোহী এনরিকো যে কোনো মুহূর্তে এই খানিয়া আক্রমণ করতে পারে। তার আগেই আমাদের কাজ সেরে চলে যেতে হবে। তবে কথা দিচ্ছি—মুকুট খুঁজে বের করার পর যদি যুদ্ধ না লাগে, পুরো একদিন আমরা সবাই এই নগরে ঘুরে বেড়াবো। মারিয়া ফ্রান্সিসের কথার গুরুত্ব বুঝলো। বলল—ঠিক আছে, তুমি যা ভালো বুঝবে তাই হবে।

জাহাজে ফিরে এল ওরা। বন্ধুরা সব ছুটে এসে ওদের ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস রাজা বোনিফেসের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সব বলল।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর রূপোর মোমদানিতে মোম জ্বেলে ফ্রান্সিস রাজমুকুটের ছবিটা নিয়ে বিছানায় বসল। ও আগেই কাভাল্লির কাছ থেকে ছবিটা চেয়ে রেখেছিল। পাশে মারিয়াও বসল। তখনই হ্যারি এল। বলল—আলো জ্বলছে দেখে এলাম। তিনজনেই মন দিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল। একসময় হ্যারি বলে উঠল—ফ্রান্সিস, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছবিটার নিচে ঐ নকশার ফাঁকে ফাঁকে কিছু লেখা আছে। কিন্তু ভাষাটা প্রাচীন গ্রীক। আমার অত জ্ঞানগম্যি নেই। তবে তার একটা শব্দ 'ভাগ্য'। ফ্রান্সিস বলল—লেখাটার পাঠোদ্ধার করতেই হবে। তার আগে দুর্গটা ভালো করে দেখতে হবে। বিহেষ করে সজ্জাকক্ষটা। কিছুক্ষণ তিনজনে এই ব্যাপারে কথাবার্তা বলল। হ্যারি চলে গেল। ফ্রান্সিস আর মারিয়া আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সারা দুপুর ফ্রান্সিস শুয়ে বসে সময় কাটাল। বিকেলে তৈরি হয়ে মারিয়া, হ্যারি আর কাভাল্লিকে নিয়ে ফ্রান্সিস জাহাজঘাটায় নামল। ওরা দুর্গে পৌঁছল। কাভাল্লি ওদের ঘুরে ঘুরে অন্তঃপুর বাদে সমস্ত দুর্গের ঘর, বারান্দা, সিঁড়ি দেখাল। ফ্রান্সিস বেশ মনোযোগ দিয়ে সব দেখতে লাগল। বেশির ভাগ ঘরেই সৈন্যরা থাকে। দেয়ালে ছাদে অনেক জায়গাতেই ছবি আঁকা। মোজেকের কাজ। বেশিরভাগ ঘরে আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই। দেয়ালে বড় আয়না, সৈন্যদের পোশাক রাখার লম্বা বাক্স—এইসব দেখে ফ্রান্সিসের মনে হলো বাইজেন্টাইন সম্রাট পালাবার আগে কোথাও নিশ্চয়ই রাজমুকুটটা লুকিয়ে রেখে গেছেন। সেই সময় সম্রাটের দুর্গের অন্য ঘরে যাওয়ার কোনো পথ নেই। অন্তঃপুর আর সজ্জাকক্ষ—সম্রাট সে সময় ঐ দুটো জায়গাতেই গেছেন। ফ্রান্সিস কাভাল্লিকে বলল—এবার সজ্জাকক্ষে চলো। মাত্র ঘণ্টা দুয়েক ওখানে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কাভাল্লি ওদের সজ্জাকক্ষের সামনে নিয়ে এলো। দুজন পাহারাদার সৈন্য চকচকে বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরই একজন কাভাল্লিকে ও ফ্রান্সিসদের দেখে দরজা খুলে দিল। দরজার কাঠ নানারঙের নকশায় চিত্রিত। ওরা ভেতরে ঢুকল। ফ্রান্সিসের নাকে জেসমিনের মৃদু গন্ধ ভেসে এল। ঘরটির দেয়ালে মেঝেয় অতি সুন্দর মোজেকের কাজ। গাছ লতাপাতা পাখি। সামনেই বেশ বড় একটা আয়না দেয়ালে আটকানো। আয়নার সামনে পাথরের টেবিল। রেশমী কাপড়ে ঢাকা। সেই ঢাকনার কাপড়েও

নানা রঙের সুতোর কাজ। তার ওপরে সাজিয়ে রাখা রাজদণ্ড, খাপে ঢাকা তরোয়াল। তরোয়ালের খাপে দামি পাথর বসানো মীনে করা। হাতল হাতির দাঁতের। রাজদণ্ডে কত দামি পাথরের কাজ। নিরেট সোনার সেই রাজদণ্ড। কারুকাজ-করা খাপে ঢাকা ছোরা। সম্রাটের ব্যবহৃত হীরে পান্নার কত ছোট বড় হার। সোনার কাজকরা কোমরবন্ধনী। সম্রাটের দুটো পোশাকেও পাথর বসানো সোনার সরু পাতের কাজ। ফ্রান্সিসরা অবাক হয়ে এই মূল্যবান জিনিসগুলো দেখল। বোঝাই যাচ্ছে শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাট কিছুই নিয়ে যাননি। শুধু গোপনে কোথাও রেখে গেছেন রাজমুকুটটা।

ফ্রান্সিস ঘরের চারদিকে দেখতে লাগল। একপাশে একটা লম্বা কাঠের সিন্দুক। ফ্রান্সিস সিন্দুকের ডালাটা খুলল। দেখল—সম্রাটের পোশাক। সাধারণ দামি দু'ধরনের পোশাক। ফ্রান্সিস কাভাল্লিকে ডাকল। কাভাল্লি কাছে এলে বলল—এই পোশাকগুলো সব তোলে তো। কাভাল্লি সম্রাটের পোশাকগুলি তুলতে লাগল। হ্যারি আর মারিয়াও হাত লাগাল। সব পোশাক তোলা হলে দেখা গেল সিন্দুকটা ফাঁকা। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। সব পোশাক আবার রেখে দেওয়া হল। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাতেই ফ্রান্সিসের চোখে পড়ল কোণার দিকে কী যেন ঝুলছে। ও কাভাল্লিকে বলল—ওটা কী? কাভাল্লি হেসে বলল—সম্রাটের খেয়াল। একটা সোনার পাতলা পাত দিয়ে সম্রাট ফুলদানি তৈরি করিয়েছিলেন। তারপর নিজের হাতে ফুল-পাতা কেটে তৈরি করে এ ফুলদানিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সম্রাট ঐ ফুলদানিতে প্রতিদিন একটু একটু আতর ঢালতেন। বলতেন, এটা আমার ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান। একটু খেয়াল করে দেখুন এখনো জেসমিন ফুলের গন্ধ পাবেন। সত্যিই ফ্রান্সিস সেই গন্ধ পেয়েছিল। এইবার হ্যারি আর মারিয়াও জেসমিনের গন্ধ পেল। ফ্রান্সিস ঝুলন্ত ফুলদানিটার কাছে এল। দেখল—একটা গাঢ় সবুজ রেশমী কাপড়ে ফুলদানিটা ঢাকা। নানারঙের সুতোয় বোনা একটা জালমতো ছাদ থেকে ঝুলছে। তারই ভেতর ফুলদানিটা বসানো। নানারঙের কাপড় কেটে তৈরি ফুল-পাতা ফুলদানি থেকে বেরিয়ে আছে। ফ্রান্সিসরা ফুলদানিটা দেখে বেশ আশ্চর্য হলো। সম্রাটের খেয়ালের নমুনা। ফুল-পাতাগুলো এত সুন্দরভাবে কেটে তৈরি করা মনে হচ্ছে যেন সতেজ। বেগুনী ফুল সবুজ পাতা। ফ্রান্সিস ভেবে পেল না এখানে কী করে কোথায় সম্রাট রাজমুকুট লুকিয়ে রেখে গেছেন।

এবার ফ্রান্সিস সবাইকে নিয়ে সজ্জাকক্ষের বাইরে এল। একজন সৈন্য দরজাটা বন্ধ করে দিল। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকাল। বলল—অন্দরমহলে তো আমরা যেতে পারবো না। মারিয়া যাও। সব খুঁটিয়ে দেখে আসবে। বিশেষ করে সম্রাজ্ঞীর সজ্জাকক্ষটা। মারিয়া চলে গেল। ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মারিয়া ফিরে এল। বলল—অন্দরমহল ভালো করে দেখেছি। সম্রাজ্ঞীর সজ্জাকক্ষে সম্রাজ্ঞী কিছুই রেখে যাননি। সেখানে বর্তমান রানী তার পোশাকপত্র অলঙ্কার এসব রেখেছে। কিন্তু মুকুট লুকিয়ে রাখার জায়গা সেখানে নেই। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—কালকে আবার দেখতে হবে।

সবাই জাহাজে ফিরে এল। ভাইকিং বন্ধুরা শুনল, নিখোঁজ রাজমুকুট পাওয়া যায়নি।

রাতে ফ্রান্সিসরা আবার মুকুটের ছবিটা নিয়ে বসল। ফ্রান্সিস বার বার বলল—ছবিটা থেকে নিশ্চয়ই কোনো সূত্র পাওয়া যাবে। হ্যারি হতাশস্বরে বলল—ছবিটার নিচে নিশ্চয়ই কিছু লেখা আছে। কিন্তু কিছুতেই পাঠোদ্ধার করতে পারছি না। আলো জ্বলছে দেখে কাভাল্লি তখনই কেবিনঘরে ঢুকল। হ্যারি বলল—আচ্ছা কাভাল্লি, তুমি তো অনেকদিন এই খানিয়ায় ছিলে। তুমি কোনো বিদ্বান পণ্ডিত কাউকে চেন। কাভাল্লি একটু ভাবল। বলল—একজনকে জানি, প্যালিওলোগ—খুব পণ্ডিত মানুষ। সম্রাট মাঝে মাঝে তাঁকে ডেকে পাঠাতেন। কয়েকবার আমাকেও ডাকতে পাঠিয়েছেন। হ্যারি প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল—তুমি আমাদের কাল সকালেই প্যালিওলোগের বাড়ি নিয়ে চলো।

বেশ তো—নিয়ে যাবো। কাভাল্লি বলল।

পরদিন একটু বেলায় কাভাল্লি ফ্রান্সিসদের প্যালিওলোগের বাড়ি নিয়ে গেল। প্যালিওলোগ বাইরের একটা ছোট ঘরে একটা গদিওয়ালা আসনে বসেছিলেন। সামনে একটা পাথরের পাটাতন। তাতে কিছু সাদা পাতলা চামড়া রাখা, চিনেমাটির দোয়াত, পাখির বড় পালকের কলমও রয়েছে। প্যালিওলোগ বেশ বৃদ্ধ। মাথায় চুল দাড়ি গোঁফ ভুরু সব পাকা। পরনে ঢিলেঢালা জোব্বা। হ্যারি গ্রীক ভাষায় নিজের পরিচয় দিল। তারপর রাজমুকুটের ছবিটা তাঁর সমনে রাখল। বলল—ছবিটার



কোণার দিকে কী যেন ঝুলছে।

নিচে লতাপাতা ফুলের মধ্যেই নিশ্চয়ই কিছু লেখা আছে। প্রাচীন গ্রীক ভাষা। যদি আপনি পড়তেন। প্যালিওলোগ ছবিটা উঁচু করে ধরলেন। একটুক্ষণ দেখলেন। হেসে বললেন—তুমি ঠিকই ধরেছো। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় লেখা—"সম্রাটের ভাগ্য সুতোয় ঝোলে।" হ্যারি কথাটা বারবার বলল। মনে রাখল। এবার ফ্রান্সিস ও মারিয়াকে যা কথা হলো বলল। শেষে যা লেখা সেটা বলল। ফ্রান্সিসও কথাটা মনে রাখল। কিন্তু কথাটার সঙ্গে রাজমুকুটের সম্পর্ক বুঝতে পারল না। ওরা জাহাজে ফিরে এল। সারা দুপুর ফ্রান্সিস কথাটা নিয়ে ভাবল।

সেদিন বিকেলে ওরা আবার দুর্গে গেল। সম্রাটের সজ্জাকক্ষে ঢুকল ওরা। ফ্রান্সিস আবার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। ছবিটা ছিল মারিয়ার হাতে। মারিয়া ছবিটা দেখবার জন্যে চামড়ার গোটানোটা খুলে মেলে ধরল। যাঃ উল্টোমুখো হয়ে রয়েছে। মারিয়া ছবিটা সোজা করতে গিয়ে একেবারে ঝুলন্ত ফুলদানিটার দিকে তাকাল। আরে? মারিয়া চমকে উঠল। ছবিটা সোজা করল না। মিলিয়ে দেখল মুকুটটা ওল্টালে ঠিক ফুলদানির মতো দেখাচ্ছে। ঠিক তখনই ফ্রান্সিসকে গলা চড়িয়ে বলল—সম্রাটের ভাগ্য সুতোয়ে ঝোলে। কাভাল্লি, ফুলদানিটাও সুতোয় ঝুলছে। মারিয়া ছুটে ফ্রান্সিসের কাছে এল। উল্টো রাজমুকুটের ছবিটা আর ফুলদানিটা আঙুল দিয়ে দেখাল। ফ্রান্সিস একমুহূর্ত ভাবল। তারপর উত্তেজিত স্বরে বলল—কাভাল্লি ফুলদানিটা নামাও। কাভাল্লি একটা পাথরের পাটাতনের ওপর উঠে আস্তে আস্তে ফুলদানিটা সুতোর জাল থেকে খুলে নামাল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি ফুলদানিটা হাতে নিল। ভেতর থেকে ফুল পাতা তুলে নিল। দেখা গেল ছবিতে যে সোনার পালকটা মুকুটের মাথায় আঁকা আছে সেটা ফুলদানিটার মধ্যে রাখা। ফ্রান্সিস ফুল-পাতা রেখে সোনার পালকটা ভেতর থেকে তুলে নিল। আবার হাত ঢোকাল। তুলল মুকুটের পালকের ঠিক নিচেই যে রক্তপ্রবালের ছবিটা রয়েছে সেই চৌকানো রক্তপ্রবাল। তারপর আবার হাত ঢোকাল। তুলল পাতলা সোনার দোমড়ানো পাতের কিছু অংশ। সেসব মারিয়ার হাতে দিল। ফ্রান্সিস হেসে উঠল। ফুলদানিটা উঁচু করে তুলে চেঁচিয়ে বলল—মারিয়া, হ্যারি, এটাই সেই নিখোঁজ রাজমুকুট। ফ্রান্সিস এবার আস্তে আস্তে ফুলদানির গাঢ় সবুজ রঙের ঢাকনাটা খুলতে লাগল। দেখা গেল চুনী পান্না আর দামি দামি পাথর বসানো ওটার গায়ে। সেসবের চারদিকে নীল সবুজ মীনে করা। যখন সবটাই ঢাকনা খোলা হলো, দেখা গেল চুনী পান্না নীলকান্তমণি দামি পাথর বসানো রাজমুকুট। দেয়ালে আটকানো মশালের আলো পড়ল রাজমুকুটে। চুনী পান্না নীলকান্তমণি দামি পাথর সব ঝিকমিকিয়ে উঠল। আলো ঠিকরোচ্ছে। কী অপরূপ সুন্দর সেই রাজমুকুট।

কিছুক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই। অবাক হয়ে ওরা রাজমুকুটটা দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস মারিয়ার হাত থেকে শীর্ষপালকটা নিল। মুকুটের মাথায় যেখানে লাগানো ছিল সেখানে ধরল। বলল—মারিয়া ছবির মতো রক্তপ্রবালটা রাখো। সোনার পালক আর রক্তপ্রবাল রাখা হলে দেখা গেল হুবহু ছবির মতো রাজমুকুটটা। সোনার পালক, রক্তপ্রবাল মুকুটের মধ্যে রেখে দিয়ে ফ্রান্সিস বলল—শেষ বাইজেনটাইন সম্রাট শেষবারের মতো এই সজ্জাকক্ষে ঢুকেছিলেন। কাভাল্লিকে ঢুকতে দেননি। দরজা বন্ধ করে কাচের আধার থেকে মুকুটটা বের করেছেন।

সোনার পালক রক্তপ্রবাল মুকুট থেকে খুলে নিয়েছেন। মুকুটের ভেতরে রেখেছেন। এবার মুকুটের মতো ঠিক একই মাপে তৈরি করা ফুলদানিটা সুতোর জাল থেকে নামিয়েছেন। কাপড়ের ঢাকনা খুলেছেন। কাপড়ের ফুল পাতা তুলে নিয়েছেন। তারপর ঐ পাতলা সোনার চাদরে তৈরি ফুলদানিটা সহজেই দুমড়ে মুচড়ে রাজমুকুটের মধ্যে রেখেছেন। তার ওপর রেখেছেন ফুলপাতা। এবার ঢাকনায় মুকুটটা ভরে সুতোর জালে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। ফুলদানি আগেই ছিল। কাজেই কারো মনেই ফুলদানিটা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না। ফুলদানিটাকে কেউ কোনো গুরুত্বই দেবে না। কিন্তু সম্রাটের সেই লেখা কথাটা—সম্রাটের ভাগ্য সুতোয় ঝোলে—এই কথাটাই আমার দৃষ্টি টানল ঝুলন্ত ফুলদানির দিকে। তখনই মারিয়া ছবিটা উল্টো করে দেখাল। সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ঝুলন্ত ফুলদানিটাই নিখোঁজ রাজমুকুট। কাভাল্লি আস্তে আস্তে রাজমুকুটটার কাছে গেল। দুহাতে মুকুটটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। শেষ সম্রাটের স্মৃতিও কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

ওদিকে রাজমুকুট পাওয়া গেছে দেখে সজ্জাকক্ষের রক্ষীরা ছুটল রাজা বোনিফেসকে খবর দিতে। একটু পরেই রাজা বোনিফেস দ্রুতপায়ে সজ্জাকক্ষে ঢুকল। পাথরের টেবিলের ওপর মুকুটটা রেখেছিল ফ্রান্সিস। রাজা বোনিফেস মুকুটটা দু'হাতে উঁচু করে তুলে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল—হা—হা—হা। মুকুটটা হাতে নিয়ে পাগলের মতো ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে যা যা বলতে হবে বলল। রাজার কিন্তু খেয়ালই নেই যে যারা নিখোঁজ রাজমুকুট খুঁজে বের করে দিল তারা তারই সামনে দাঁড়িয়ে। হ্যারি একটু গলা চড়িয়ে বলল—রাজা, আমাদের কিছু কথা ছিল। এতক্ষণে ওদের দিকে রাজার দৃষ্টি পড়ল। রাজা বলল—হুঁ, বলো।

আমরা নিখোঁজ রাজমুকুট খুঁজে বের করে দেব বলেছিলাম, তা দিয়েছি। এবার আমাদের একটা অনুরোধ। হ্যারি বলল।

এজন্যে তোমাদের আমি কিছু দিতে পারবো না। রাজা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

আমরা কিছু চাইও না। শুধু অনুরোধ—এই সজ্জাকক্ষের দেখাশোনার দায়িত্ব যেন কাভাল্লিকেই আবার দেওয়া হয়।

কিন্তু ওকে কি বিশ্বাস করা যায়? রাজা বলল।

হ্যাঁ যায়। কাভাল্লি সৎ ও বিশ্বস্ত।

—ঠিক আছে। রাজা মাথা নাড়ল।

ফ্রান্সিস বলল—এবার চলো।

ওরা যখন দুর্গের বাইরে এসেছে তখন কাভাল্লি ছুটে এল। বলল—চলুন জাহাজঘাটা পর্যন্ত আমি যাই। আপনারা আমার জন্যে এত করলেন।

জাহাজে উঠতে উঠতে ফ্রান্সিস হেসে বলল—মারিয়া, এবারও আমাদের হাত শূন্য। মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—এ জন্যে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই।

ওরা জাহাজে উঠতেই বিস্কো শাঙ্কো আর ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে এল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—কালকে আমরা খানিয়া নগর ঘুরে বেড়িয়ে দেখবো। পরশু জাহাজ ছাড়বো। তারপর মারিয়াকে বলল—কী? খুশি তো? মারিয়া হেসে উঠল।

কাউন্ট রজারের গুপ্তধন

সেদিন সকালে খানিয়া নগর ঘুরে বেড়াবার জন্যে ভাইকিংদের মধ্যে তোড়জোড় শুরু হলো। সকালের খাবার ফ্রান্সিস আর মারিয়া কেবিনঘরে বসেই খেল। এবার মারিয়া চামড়ার দুটো বড় পেটী খুলল। ফ্রান্সিসের জন্যে যে ভালো দুটো পোশাক এনেছিল তা একটা খুঁজে বের করল। পোশাক দেখে ফ্রান্সিস হেসে বলল, এ তো তোমাদের বাড়িতে, মানে রাজবাড়িতে নাচের আসরে যাবার পোশাক।

— আমরা খানিয়া নগর ঘুরে বেড়াতে যাচ্ছি। আজকে অন্তত ভালো পোশাকটা পর। সবসময় তো ঐ লড়াইয়ের পোশাকটা পরে থাকো। মারিয়া বলল।

— মারিয়া, আমরা ভাইকিং। এটাই আমাদের উপযুক্ত পোশাক। জীবনটাই তো একটা লড়াই। ফ্রান্সিস বলল।

খুব হয়েছে। নাও পর এটা। মারিয়া হেসে বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যে হ্যারি, বিস্কো, শাঙ্কো আর অন্য সব ভাইকিংরা যে যার ভালো পোশাক পরে তৈরি হয়ে জাহাজের ডেক-এ এসে জড়ো হলো। জাহাজের জীবন বড়ো একঘেয়ে। দিনরাত চারদিকে সীমাহীন সমুদ্র। মাটির দেখা পাওয়ার জন্যে, মাটিতে নামার জন্যে ওরা আকুল হয়ে থাকে। আজকে শুধু মাটিতে নামা নয়, মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানো। যুদ্ধ নয়, শান্তির দিন আজ। ওরা সাগ্রহে ফ্রান্সিস ও মারিয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই সুন্দর পোশাক পরে ফ্রান্সিস ও মারিয়া ডেক-এ উঠে এলো। মারিয়া পরেছে হালকা গোলাপি রঙের পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা গাউন। মারিয়াকে আজকে দেখতে রাজকুমারীর মতোই লাগছে। অবশ্য দীর্ঘদিন সমুদ্রে জাহাজে থাকার জন্যে মারিয়ার গায়ের রঙ আগের মতো গোলাপি-ফর্সা নেই। একটু যেন তামাটে হয়ে গেছে। ওরা দুজনে আসতেই ভাইকিং বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল, ও হো-হো। এটা ওদের আনন্দের ধ্বনি, প্রতিজ্ঞার ধ্বনি, আবার প্রতিবাদেরও ধ্বনি।

এমন সময় দেখা গেল কাভাল্লি জাহাজের পাটাতন দিয়ে উঠে আসছে। ওকে দেখে ফ্রান্সিসরা সকলেই খুশি হলো। কাভাল্লি ফ্রান্সিসের কাছে এলো। হেসে বলল, কালকেই শুনেছি আপনারা আজ খানিয়া নগরে ঘুরে বেড়াবেন। আপনারা তো চেনেন না, তাই আমি এলাম। সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো আপনাদের।

— এ তো ভালোই হলো। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

সবার আগে জাহাজের ফেলা পাটাতন দিয়ে কাভাল্লি, ফ্রান্সিস ও মারিয়া জাহাজঘাটায় নামল। পেছনে একে একে আর সব বন্ধুরা নামল। কাভাল্লি সবাইকে নিয়ে নগরের রাস্তা দিয়ে চলল। পথের লোকজন দোকানদারেরা অনেকেই ফ্রান্সিসদের এই দলকে দেখল। তারা ভেবে পেল না এরকম পোশাকপরা লোকগুলো কোন দেশের। বিশেষ করে মহিলারা মারিয়াকে বারবার দেখতে লাগল। এরকম মেয়েদের পোশাক ওরা কখনও দেখেনি। দল

বেঁধে হৈ হৈ করে চলল ওরা।

প্রথমে কাভাল্লি ওদের নিয়ে গেল বিরাট দুর্গটায়। রাজা বোনিফেস-এর বাসস্থান আর সভাগৃহ এখানে। কাভাল্লি সবাইকে নিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকল। ফ্রান্সিস, মারিয়া, হ্যারি দুর্গটা আগেই ভালো করে দেখেছে। ওরা দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বারে বন্ধুদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

দুর্গ দেখা হলে কাভাল্লি ওদের নিয়ে চলল একটা ছোট অ্যাম্ফিথিয়েটার দেখাতে। খুব বেশি বড় নয় সেটা। চারদিকে পাথরে দেয়াল। প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকল। দেখল চারিদিকে গোল করে পাথরে বসার জায়গা। মাঝখানে গোল জায়গা। কাভাল্লি ঐ জায়গাটা দেখিয়ে বলল, এটাকে বলে এরেনা। এখানে তরোয়ালের লড়াইয়ের প্রতিযোগিতা হয়। রাতে মশালের আলোয় নাটকও অভিনীত হয়। তারপরে চলল সবাই উত্তর দিকে। দেখল ছবির মতো সুন্দর একটা হ্রদ। তারপরেই ঘাসে-ঢাকা ছোট পাহাড়। পাথর-ছড়ানো ছোট পাহাড়ি ঝর্ণা।

খানিয়া নগর খুব একটা বড়ো নয়। দুপুরের মধ্যেই প্রায় সব দেখা হয়ে গেল। ঘোরাঘুরির জন্যে বেশ খিদেও পেয়েছে সকলের। মারিয়াই প্রস্তাব দিল, এখন জাহাজে ফিরে গিয়ে রান্নাবান্নার দরকার নেই। এখানেই কোনো সরাইখানায় খেয়ে নেওয়া যাক। সব ভাইকিংরা হৈহৈ করে এই প্রস্তাবে রাজী হলো।

কাভাল্লি দুর্গের কাছে এক বড় সরাইখানায় ওদের নিয়ে গেল। এত খদ্দের পেয়ে সরাইখানার মালিক খুশিতে আটখানা। সবাই টানা কাঠের বেঞ্চিতে বসল। সামনে কাঠের টানা টেবিলমতো। খেতে দেওয়া হলো বড় বড় গোল রুটি, তরকারি আর গরম গরম ভেড়ার মাংস। সবাই ক্ষুধার্ত। হাপুস-হুপুস করে খেতে লাগল।

বিকেল নাগাদ ভাইকিংরা হৈহৈ করতে করতে জাহাজে ফিরে এল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার সময় ভাইকিংরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, এবার আর কোথাও নয়। সোজা দেশে ফিরবো। দু'একজন বলল, দেখ ফ্রান্সিস কী বলে।

রাত হলো। ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে আছে। ও ভেবে পাচ্ছে না এবার কী করবে? মারিয়া জিজ্ঞেস করল, ফ্রান্সিস, এখন কী করবে?

ফ্রান্সিস হেসে বলল, আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি। তুমি, আমার বন্ধুরা সবাই তো দেশে ফেরার জন্যে আকুল। আমার কিন্তু দেশে ফিরে অলস সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন কাটাবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে করছে না।

— এখন তো কোথাও যাবার নেই। তবে দেশে ফিরতে চাইছো না কেন? মারিয়া বলল।

— কে বলতে পারে হয়তো ফেরার পথেই কোনো রহস্যের, কোনো গুপ্তধনের সংবাদ পেয়ে গেলাম। তখন? ফ্রান্সিস বলল।

— সে তখন ভাবা যাবে। এখন দেশের দিকে জাহাজ চালাতে বলো। মারিয়া বলল।

— বেশ, তোমরা যেমন চাও। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালের খাবার খাওয়া হলো। জাহাজচালক আর নজরদার পেড্রোকে নিয়ে হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, ফ্রান্সিস, এখন কী করবে?

— তাই তো ভাবছি। ফ্রান্সিস বলল।

— আমরা অনেকদিন দেশ ছেড়ে এসেছি। সবাই দেশে ফিরতে চাইছে। পেড্রো বলল।

ঠিক আছে। ফ্রান্সিস জাহাজচালকের দিকে তাকিয়ে বলল, জাহাজ ছাড়ো দেশের দিকে। জাহাজচালক হেসে খুশিতে লাফিয়ে উঠল। পেড্রো দু'হাত তুলে হো-হো ধ্বনি তুলল। দু'জনেই ছুটল নিজেদের কাজের জায়গায়। দেশে ফেরার খবর ভাইকিংদের মধ্যে রটে গেল। সবাই হৈহৈ করে উঠল।

পেড্রো দড়ি বেয়ে মাস্তুলের মাথায় ওর বসার জায়গায় গিয়ে বসল। ঘরঘর শব্দে নোঙর তোলা হলো। কয়েকজন উঠে গেল পালের মাথায়। দড়িদড়া খুলে পালগুলো তুলে দিল। কিন্তু হাওয়ার তেমন জোর নেই। পালগুলো খুব ফুলে উঠলো না। তাই দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে নেমে গেল।

খানিয়ার জাহাজঘাটা থেকে ভাইকিংদের জাহাজ সরে এলো অনেকটা। সমুদ্রের জলে অনেকগুলো দাঁড় পড়ার শব্দ উঠল, ছপ্ — ছপ্ —

ফ্রান্সিস, মারিয়া আর হ্যারি জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে খানিয়া বন্দর দূরে মিলিয়ে গেল। চারদিকে শুধু জল। জাহাজ তখন মাঝসমুদ্রে চলে এসেছে। সমুদ্রের জলে রোদ পড়েছে। ঝলসে উঠছে শান্ত ঢেউ। শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজ বেগে ভেসে চলেছে ভাইকিংদের দেশের উদ্দেশে।

তিন-চার দিন কাটল। ঝড়বৃষ্টি নেই। ভূমধ্যসাগরের শান্ত সমুদ্র। সমুদ্রের জল গভীর নীল। ক'দিনই হাওয়া বেগে বইছে। পালগুলো ফুলে উঠেছে। জাহাজ চলেছে। ভাইকিংরা খুশি। দাঁড় বাইতে হচ্ছে না। ডেকে বসে শুয়ে ওরা বিশ্রাম করে। দল বেঁধে কয়েকজন ছক্কাপাঞ্জা খেলে। রাত হলে দেশের গল্প করে। কতদিন পরে দেশে ফিরছে ওরা। কেউ কেউ হেঁড়ে গলায় গানও ধরে।

সেদিন সন্ধ্যে হয় হয়। পশ্চিম আকাশে তখন সবে সূর্য ডুবেছে। একটা গভীর কমলা রঙের আভা সারা পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে আছে।

হঠাৎ নজরদার পেড্রো চিৎকার করে বলে উঠল, ডাঙা — ডাঙা দেখা যাচ্ছে। কথাটা ডেক-এ শুয়ে বসে থাকা ভাইকিংদের কানে গেল। ওরা ছুটে এসে রেলিং ধরে দাঁড়াল। পশ্চিম আকাশের কমলা রঙের আলোয় ওরা দেখল পশ্চিম দিকে কিছু দূরে ডাঙা। তবে সমতল নয়। ছোট ছোট উঁচু-নিচু টিলার সারি। এটা কোনো দ্বীপ না দেশ, বুঝে উঠতে পারল না ওরা। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে খবর পাঠানো হলো।

একটু পরে দু'জনে এল। সঙ্গে মারিয়া। সেই টিলার সারির রঙ কেমন বোঝা যাচ্ছে না। সন্ধ্যের নিস্তেজ আলোয় কালো কালো দেখাচ্ছে। ফ্রান্সিস ডাকল, হ্যারি।

— বলো। হ্যারি বলল।

— এটা কোনো দ্বীপ না দেশ বুঝতে পারছি না। কী করবে এখন?

দ্যাখো ফ্রান্সিস, আমরা এখন দেশে ফিরছি। এটা কোনো দ্বীপ না দেশ সেটা এখন জানার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। তবে একটা সমস্যা হচ্ছে এই, ডাঙার পাশ দিয়েই আমাদের যেতে হবে। কাজেই ডাঙায় কারা থাকে, তারা আমাদের কোনো বিপদে ফেলে কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে। হ্যারি বলল।

— তা ঠিক। ফ্রান্সিস বলল, তবে আমরা কোথায় এলাম এটাও তো জানা দরকার।

তাহলে এক কাজ কর, হ্যারি বলল, সন্ধ্যের একটু পরে আমরা কেউ নৌকোয় চড়ে ওখানে যাবো। যদি দেখি লোকজন আছে, কোনো ভয়ের কারণ নেই, তবে তাদের কাছে জেনে নেব এই জায়গাটা কী? দ্বীপ না কোনো দেশ? সেটা জানতে পারলে বুঝতে পারবো আমরা কোথায় এলাম, আমাদের দেশ কতদূর।

ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে একটু ভাবল। তারপর মাথা তুলে বলল, বেশ, আমিই যাবো।

— আমিও যাবো, মারিয়া বলে উঠল। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল, অচেনা অজানা জায়গা। দু'জনে বিপদে পড়লে তখন আমাদের উদ্ধার করতে গিয়ে আমার বন্ধুদের হয়তো লড়াইয়ে নামতে হবে। মিছিমিছি বোকার মতো রক্তক্ষয়, মৃত্যু আমি চাই না। আমি একাই যাবো।

সন্ধ্যের পরে পরেই ফ্রান্সিস দ্রুত রাতের খাবার খেয়ে নিল। কোমরে তরোয়াল গুঁজল। মারিয়া একটু ভীত স্বরে বলল, তুমি একা একা যাবে! যদি কোনো বিপদে পড়ো!

ফ্রান্সিস হেসে বলল, অত ভয় পেলে তো বাড়ি থেকেই বেরুনো যায় না। অথচ কোথায় কোন অচেনা সমুদ্রে, অজানা দেশে এসেছি আমরা. তাহলে এলাম কেন?

মারিয়া আমতা আমতা করে বলল, না, বলছিলাম — সাবধানে —

— কিচ্ছু ভেবো না। মনে সাহস আনো। ফ্রান্সিস বলল।

ডেক-এ উঠে ফ্রান্সিস রেলিঙের ধারে এল। ঝুঁকে দেখল একটা নৌকো নামানো হয়েছে। ঢেউয়ে দুলছে নৌকোটা। হ্যারি শাঙ্কো — ওরা কয়েকজন ওর কাছে এল। হ্যারির গায়ে একটা চাদরের মতো কাপড় জড়ানো। ফ্রান্সিস সেটা দেখল, কিন্তু কিছু বলল না। ওরা ফ্রান্সিসের সঙ্গী হতে চাইছিল। ফ্রান্সিস নৌকোয় নামবার জন্যে তৈরি হচ্ছে তখন হ্যারি এগিয়ে এল। বলল, ফ্রান্সিস, তুমি কি একাই যাবে?

— হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

— একটা কথা ভেবেছো? হ্যারি বলল।

— কী? ফ্রান্সিস বেশ আশ্চর্য হয়েই বলল।

— যদি ওখানে গিয়ে কোনো লোকের সঙ্গে বা লোকেদের সঙ্গে দেখা হয় তখন কী বলবে?

— বাঃ। জানতে চাইবো যে এটা কোন দ্বীপ বা কোন দেশ। ফ্রান্সিস বলল।

— তোমার কথা ওরা বুঝবে? হ্যারি হেসে বলল।

— আরে! ফ্রান্সিস প্রায় লাফিয়ে উঠল। সত্যিই তো — এটা তো ভেবে দেখিনি। ওদের ভাষা তো আমিও বুঝবো না।

সুতরাং — হ্যারি হেসে বলল, আমি কিন্তু গ্রীকভাষাটা অল্পস্বল্প বুঝি।

হ্যারি, যাও শীগগির তৈরি হয়ে এসো। তুমি না থাকলে তো —

হ্যারি গায়ের কাপড়টা খুলে বিস্কোর হাতে দিল। দেখা গেল হ্যারির কোমরে তরোয়াল গোঁজা। পোশাকটাও নতুন। বলল, চলো আমি তৈরি হয়েই এসেছি।

দু'জনে দড়ি ধরে ঝুলে ঝুলে পরপর নৌকোটার ওপর নামল। ফ্রান্সিস দাঁড় বাইতে লাগল। হ্যারি শরীরের দিক থেকে খুব সবল না। বেশি পরিশ্রম করতে পারে না। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস নৌকো চালালো ঐ টিলাগুলো লক্ষ্য করে।

বাঁকা চাঁদ রয়েছে আকাশে। কিন্তু চাঁদের আলো নিস্তেজ। অস্পষ্ট সমুদ্রের জল, টিলাগুলো দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস এটাই চাইছিল। এই আধো-আলো আধো-অন্ধকারে সমুদ্রতীরে লোকজনের অলক্ষ্যে পৌঁছুনো যাবে। সবকিছু স্বাভাবিক দেখলে তবেই লোকজনের সামনে যাওয়া যাবে। অবশ্য যদি ওখানে মানুষজন থাকে।

তীরের কাছে নৌকোটা বেয়ে নিয়ে এলো ফ্রান্সিস। দেখল এখানে সমুদ্রের জল থেকে টিলা উঠে গেছে। এখানে নামার অসুবিধে। তবু এখানেই নামতে হবে। তারপর টিলাটার মাথায় ওঠা যায় কিনা দেখতে হবে। উঠতে পারলে ওপর থেকে সহজেই চারদিক দেখা যাবে।

নৌকোটা টিলার গায়ের কাছে নিয়ে এলো ফ্রান্সিস। অন্ধকারে দু'চোখ কুঁচকে দেখতে লাগল নৌকো কোথাও ভেড়ানো যায় কিনা। পেল একটা জায়গা। গুহার মতো লম্বাটে ফাঁক একটা। ফ্রান্সিস ফাঁকের মধ্যে নৌকো ঢুকিয়ে দিল। আটকে গেল নৌকোটা।

এবার ফ্রান্সিস টিলা পাথুরে গা-টা দেখতে লাগল। খাড়ানো বেশ হেলে আছে দেখল — কিছু পাথরের চাঁই উঁচিয়ে আছে। ফ্রান্সিস বুঝল, ওগুলো ধরে ধরে ওপরে ওঠা যাবে। ফ্রান্সিস প্রথমে পাথরে একটা ওঁচানো চাঁই ধরল। তারপর পাথরের খাঁজে পা রেখে রেখে উঠতে শুরু করল। মুখ নিচু করে বলল, হ্যারি, আমি যেভাবে উঠছি, দেখে দেখে তুমিও উঠে এসো।

— পারবো? হ্যারি একটু চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল।

— কেন পারবে না! উঠতে শুরু কর। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সাবধানে উঠতে লাগল। একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নয়। খুব অস্পষ্ট চাঁদের আলো রয়েছে। পেছনে হ্যারিও উঠতে লাগল।

বেশি উঁচু না। একসময় শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ফ্রান্সিস টিলার ওপরে উঠে এল। প্রথমেই দাঁড়িয়ে পড়ল না। একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়াল থেকে সামনের দিকে তাকাল। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখল সামনে একটা ঘাসে ঢাকা প্রান্তর। তারপরে গাছপালা. কিছু কাঠপাথরের ঘরবাড়ি। ওসব ছাড়িয়ে দূরে ধু ধু দেখা যাচ্ছে জলের আভাস। ফ্রান্সিস ভাবল তাহলে এটা একটা ছোট দ্বীপ। যতদূর চোখ যায়, জনমানবের দেখা নেই। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হলো। উঠে দাঁড়ালো। তখনই হ্যারির হাঁপানো গলা শুনল, ফ্রান্সিস, হাতটা ধরো। ঘুরে দেখল হ্যারি হাত বাড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে হ্যারির হাত ধরল। তারপর হ্যারিকে টেনে তুলে নিল। হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

দু'জনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ দেখল ঐ গাছগাছালি ঘরবাড়ির দিক থেকে অনেক লোক আসছে প্রান্তরের দিকে। অনেকের হাতে জ্বলন্ত মশাল, খোলা তরোয়াল, বর্শা।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে হ্যারির ডান হাত ধরে টান দিয়েই পাথরের আড়ালে বসে পড়ল। হ্যারিও সঙ্গে সঙ্গে ওর পাশে বসে পড়ল।

ওরা পাথরের আড়াল থেকে দেখল সেই দল বেঁধে আসা লোকগুলোর সামনে একজন লোকও আসছে। বেশ দৃপ্তভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে আসছে লোকটা। বোঝা গেল ঐ লোকটাই ওদের নিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই ওদের নেতা-টেতা হবে।

ঘাসে-ঢাকা প্রান্তরে লোকগুলো দলে দলে এসে দাঁড়াল। এ প্রান্তরে পড়ে-থাকা একটা বড় পাথরখণ্ডে সেই নেতা উঠে দাঁড়াল। উপস্থিত লোকদের কথাবার্তা থেমে গেল। একজন লোক নেতার পাশে একটা জ্বলন্ত মশাল তুলে ধরে রইল। এবার সেই নেতাকে ফ্রান্সিস একটু ভালোভাবে দেখল। নেতাটি যুবক, সুন্দর সুগঠিত শরীর। বুকে লোহার বর্ম। কিন্তু মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই। মাথার লম্বা লম্বা চুল ঘাড়ের পেছনে ঝুলে পড়েছে। সমুদ্রের জোর হাওয়ায় তার মাথার চুল উড়ছে।

এবার নেতা যুবকটি গলা চড়িয়ে বলল, আমার বিদ্রোহী বন্ধুরা —

সমুদ্রের জোর হাওয়া ফ্রান্সিসদের দিকে বইছে। যুবকটির কথা কাজেই ওরা একটু অস্পষ্ট হলেও শুনতে পেল। যুবকটির কথা ফ্রান্সিস বুঝল না। হ্যারি বুঝল। আস্তে বলল, ফ্রান্সিস, যুবকটি লোল্যাতিন ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছে। এই লো ল্যাতিন ভাষাটা বেশ সহজ। আমি ভালো বুঝি একটু বলতেও পারি। তবে অক্ষর চিনি না।

এবার যুবকটি যা বলতে লাগল হ্যারি আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসকে তা বুঝিয়ে দিতে লাগল। যুবকটি বলছে, আমরা সারাসেনরা সিসিলি দ্বীপের প্রাচীন অধিবাসী। অথচ রাজা ফ্রেডারিক আমাদের সব অধিকার জমি অর্থ কেড়ে নিচ্ছে। অত্যাচারও চালাচ্ছে। রাজা ফ্রেডারিক বিদেশী নর্মানদের বংশধর। আমরা তার অধীনতা স্বীকার করবো কেন? সিসিলি আমাদের মাতৃভূমি। আমরা সিসিলি থেকে ঐ নর্মান বিদেশীকে তাড়াবো। রাজা ফ্রেডারিকের বংশবদ ভূস্বামীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দক্ষিণ সিসিলি থেকে পালিয়ে আমরা এই লিপারি দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছি। যুবকটি থামল। তারপর আবার বলতে লাগল,আমরা আজ রাতেই অন্ধকারের মধ্যে সিরাকস বন্দরে নামবো। আক্রমণ করবো ম্যামিয়েস দুর্গ। সমবেত বিদ্রোহীরা হৈহৈ করে চিৎকার করে উঠল। যুবকটি আবার বলতে লাগল, আমরা সংবাদ পেয়েছি রাজা ফ্রেডারিকের একদল সৈন্য রাজধানী পালার্মো থেকে জাহাজে চড়ে এই সিরাকস বন্দরে আসছে। উদ্দেশ্য, ম্যামিয়েস দুর্গ রক্ষা। আমরা নতুন সৈন্যদল পৌঁছবার আগেই দুর্গ দখল করবো। যুবকটি থামল। আবার চিৎকার হৈ-হল্লা খোলা তরোয়াল ঘোরানো, বর্শা উঁচিয়ে ধরা, মশাল নাচানো শুরু হলো। যুবকটি আবার বলতে লাগল, সমুদ্রতীরে আমাদের যত নৌকো আছে সব জড়ো করা হয়েছে। নৌকোয় চড়ে আমরা সিরাকস বন্দরে নামবো। তারপর দুর্গ দখলের লড়াই। লড়াইয়ে আমাদের জিততেই হবে। বক্তৃতা শেষ করে যুবকটি পাথর থেকে নেমে দাঁড়াল।

এরপর যুবকটি হেঁটে চলল সেই গাছগাছালি ঘেরা বাড়িগুলোর দিকে। বিদ্রোহীরাও হৈহৈ করতে করতে পেছনে পেছনে চলল।

ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, কী বুঝলে?

বুঝলাম এটা একটা ছোট্ট দ্বীপ, লিপারি। কাছেই সিসিলি দ্বীপ। ঐ দ্বীপের রাজা এখন ফ্রেডারিক। এই দ্বীপে যারা আশ্রয় নিয়েছে তারা সারাসেন। সিসিলির আদি অধিবাসী। রাজা ফ্রেডারিকের অনুগত কিছু ভূস্বামী এদের দ্বীপছাড়া করেছে। তদুপরি রাজা ফ্রেডারিক বিদেশী নর্মানদের বংশধর। কাজেই এই সারাসেনরা একটি যুবকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছে। আজ রাতে ওরা এই দ্বীপ থেকে নৌকোয় চড়ে গিয়ে মূল দ্বীপ সিসিলির সিরাকস বন্দরে নামবে। তারপর ম্যামিয়েস দুর্গ আক্রমণ করবে। হ্যারি বলল।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ফ্রান্সিস বলল, আমরা সিসিলি দ্বীপের কাছে এসেছি। এখানে

এখন যুদ্ধ চলবে। কাজেই আমরা এখানে নামবো না। বাঁ দিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবো।

তাই ভালো। হ্যারি বলল, এসবের সঙ্গে আমরা জড়াবো না।

এবার ফ্রান্সিস বলল, চলো জাহাজে ফিরবো। দু'জনে আগের মতোই ওঁচানো পাথর ধরে ধরে পাথরে খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে নিচে নেমে এল। দেখল নৌকোটা ঠিকই আছে। ওরা আস্তে আস্তে নৌকোয় নেমে বসল। ফ্রান্সিস দাঁড় বাইতে লাগল। নৌকো চলল জাহাজের দিকে।

দু'জনে জাহাজে উঠল। ভাইকিং বন্ধুরা ওদের ঘিরে ধরল। মারিয়াও এসে একপাশে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সব কথা বলল। তারপর বলল, আমরা সিসিলির বিদ্রোহ, যুদ্ধ এসবের সঙ্গে জড়াবো না। রাত একটু বেশি হলে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সিসিলির দক্ষিণ দিক দিয়ে জাহাজ চালিয়ে চলে যাবো। কথাটা শুনে ভাইকিং বন্ধুরা খুশিই হলো। সিসিলিতে নামা হবে না। সোজা দেশের দিকে যাওয়া যাবে।

ফ্রান্সিস কেবিনের দিকে চলল। সঙ্গে মারিয়া আসতে আসতে বলল, জানো, সিসিলি ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ। সিসিলিকে বলা হয় ভূমধ্যসাগরের উদ্যান।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল, মারিয়া -- তুমি কত পড়াশুনো করেছো? আমি কিন্তু গোমুখ্খু গোঁয়ার।

— মারিয়া বেশ দৃঢ়স্বরে বলল, না। তুমি আমাদের দেশের গর্ব, ভাইকিং জাতির গর্ব।

— ফ্রান্সিস হেসে মাথা ঝাঁকাল। কিছু বলল না।

— রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ডেক-এ উঠে এল। কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু এগিয়ে এলো। ফ্রান্সিস বলল, পাল খাটাও। এখুনি জাহাজ ছাড়বো। বন্ধুরা পালের খুঁঠে উঠে গেল। দড়িদড়া ঠিক করে পাল খুলে দিল। জাহাজচালক হুইলের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিস তাকে বলল, দিক ঠিক রেখে দেশের দিকে জাহাজ চালাও। জাহাজচালক হুইল ঘোরাল। জাহাজ ঘুরে পশ্চিমমুখো হলো। ওদিকে পালেও হাওয়া লেগেছে। জাহাজ চলল। কিন্তু বাতাসের তেমন জোর নেই। জাহাজ আস্তে আস্তে চলল। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস - হাওয়া পড়ে গেছে। দাঁড় বাইলে ভালো হতো।

— কী দরকার রাত জেগে দাঁড় বাইবার। সকাল পর্যন্ত দেখি। হাওয়ার জোর না বাড়লে তখন দেখা যাবে। এখন সবাই বিশ্রাম করুক। ঘুমিয়ে নিক। ফ্রান্সিস বলল।

জাহাজের গতি মন্থর। লিপারি দ্বীপের দক্ষিণে জাহাজ এল। তখনই দ্বীপটায় অনেক লোকের চিৎকার হৈ-হল্লা শোনা গেল। একটু পরেই দেখা গেল দ্বীপের বাড়িঘরে আগুন লেগেছে। দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশে কালো ধোঁয়া উঠছে। এবার তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দ, লোকজনের চিৎকার, কাতর আর্তনাদ, আহতের গোঙানি শোনা গেল। দ্বীপের আগুনের আভায় দ্বীপের পশ্চিমদিকে দুটো জাহাজের মাস্তুল দেখা গেল। পালগুলো গোটানো। ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, বলো তো কী ব্যাপার?

গোলমাল, আহতদের আর্তনাদ শুনে মনে হচ্ছে ফ্রেডারিকের নতুন সৈন্যরা লিপারি দ্বীপ আক্রমণ করেছে। বিদ্রোহী যুবকটি বলেছিল রাজা ফ্রেডারিকের নতুন সৈন্যদল

আসছে। তারাই জাহাজে চড়ে এসেছে। বিদ্রোহীদের ঘাঁটি এই দ্বীপটির বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে। রাজা ফ্রেডারিকের সৈন্যরা সুশিক্ষিত সৈনিক সন্দেহ নেই। বিদ্রোহীদের তো দেখেছি। তেমন অস্ত্রশস্ত্র বা শিক্ষা নেই। ওদের লড়তে হবে মনের জোরে।

- যা বুঝছি বিদ্রোহীরা হেরে গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

- তারই সম্ভবনা বেশি। হ্যারি বলল।

জাহাজ চলেছে। লিপারি দ্বীপের চিৎকার হৈ-হল্লা শুনে বিস্কো, শাঙ্কো আর কয়েকজন ভাইকিংও ডেকে উঠে এসেছে ততক্ষণে। সবাই রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রইল।

দ্বীপটায় এ সময় হঠাৎ দু-একটা জ্বলন্ত ঘর বোধহয় ধসে পড়ল। দাউ দাউ করে আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠল। ফুলকি উড়ল বেশ উঁচু পর্যন্ত। দ্বীপ থেকে ফ্রান্সিসদের জাহাজ পর্যন্ত আগুনের উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়ল। সমুদ্রের জলেও সেই আভা ছড়াল। তখনই বিস্কো চেঁচিয়ে উঠল, ফ্রান্সিস, একটা নৌকো জলে ভাসছে। ততক্ষণে সবাই সেই নৌকোটা দেখেছে। নৌকোটায় কোনো আরোহী নেই। আস্তে আস্তে ওটা ভেসে চলেছে। বিস্কো বলল, খালি নৌকো - কোনো মানুষ নেই নৌকোটায়।

আবার দ্বীপটায় জ্বলন্ত বাড়িঘর কিছু ধসে পড়ল। আগুনের ফুলকি উড়ল। আবার আগুনের আভা ছড়াল। তখনই ফ্রান্সিস দেখল - নৌকোটার মধ্যে একটা হাত উঠেই নেমে গেল। এটা হ্যারির চোখেও পড়ল। ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, পেড্রো—পেড্রো কোথায়? পেড্রো একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল, পেড্রো, মাস্তুলের মাথায় ওঠো। ভালো করে দেখোতো নৌকোটায় কোনো মানুষ আছে কিনা। পেড্রো ছুটল মাস্তুলের দিকে। ও তো নজরদার। তরতর করে মাস্তুলের মাথায় উঠে গেল। একটু পরে অমনি দ্রুত নেমে এল। বেশ হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, নৌকোটায় দুজন লোক। গলুইয়ের মধ্যে মাথা গুঁজে শুয়ে আছে। তাই আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে মরে গেছে না বেঁচে আছে বুঝলাম না।

- বেঁচে আছে। আমি হাত তুলতে দেখেছি। ফ্রান্সিস বলল।

- কী করবে এখন? হ্যারি বলল।

- যে দেশেরই হোক, মানুষ তো। ফ্রান্সিস বলল, ওদের বাঁচাতে হবে। বিস্কো, এক্ষুণি যাও। নৌকোটা টেনে নিয়ে এস। কিন্তু আমাদের নৌকোয় চড়ে যেও না। বলা যায় না হয়তো রাজা ফ্রেডারিকের সৈন্যরা এদিকে নজর রাখছে। সাঁতরে যাও।

বিস্কো জাহাজের হালের দিকে চলে গেল। ঝোলানো দড়িদড়া ধরে ধরে আস্তে সমুদ্রের জলে নামল। জলে বেশি শব্দ না করে সাঁতরে চলল নৌকোটার দিকে।

নৌকোর কাছাকাছি পৌঁছে বিস্কো ঠিক করল আগেই নৌকোর মধ্যে উঁকি দেবে না। বলা যায় না ভেতরে যে দুজন লোক আত্মগোপন করে আছে তারা হয়তো সশস্ত্র। চমকে উঠে হয়তো ওকে আক্রমণও করতে পারে। বিস্কো তো তরোয়ালই আনেনি।

বিস্কো নৌকাটার পেছন দিকে গেল। নৌকোর গায়ে হাত রেখে একটু বিশ্রাম করল। নৌকোর পেছন দিকটা লম্বাটে নয়, চ্যাপ্টামতো। এই ভূমধ্যসাগর এলাকায় এরকম নৌকোই লোকেরা ব্যবহার করে। ওখান থেকে একটা দড়ি ঝুলছিল। বিস্কো দড়িটা নিয়ে



যুবকটি ডেকের ওপর শুয়ে পড়ল।

দাঁতে চেপে ধরল। তারপর সাঁতরে চলল ওদের জাহাজের দিকে। নৌকোটাও ভেসে চলল সঙ্গে সঙ্গে।

নৌকোটা জাহাজের গায়ে এসে লাগল। এবার দেখা গেল দুজন লোক নৌকোটার গলুইয়ে শুয়ে আছে। মড়ার মতো। হ্যারি একটু গলা চড়িয়ে লো ল্যাতিন ভাষায় বলল, তোমাদের কোনো ভয় নেই। দড়ি ফেলা হচ্ছে, দড়ি ধরে ধরে উঠে এসো। লোক দুজনের মধ্যে একজন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। অল্প আলোয় দেখা গেল লোকটি বয়স্ক। মুখে কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ। লোকটি নৌকো থেকে মুখ তুলে বলল, আমি মোটামুটি সুস্থ। কিন্তু সঙ্গের যুবকটি বেশ আহত। ও দড়ি ধরে উঠতে পারবে না। এবার বিস্কো নিশ্চিন্ত হলো - লোক দুটো সশস্ত্র নয়। বিস্কো নৌকোটায় উঠল। ওদিকে শাঙ্কোরা কয়েকজন মিলে জালের মতো বাঁধা দড়ি জাহাজ থেকে নামিয়ে দিল। বিস্কো আহত যুবকটিকে ধরে তুলে বসিয়ে দিল। আহত যুবকটি কঁকিয়ে উঠল। ততক্ষণে দড়ির জাল নামানো হয়েছে। বিস্কো আস্তে আস্তে যুবকটিকে ধরে দাঁড় করাল। তারপর দড়ির জালে বসিয়ে দিল। আহত যুবকটি গোঙাতে শুরু করল। ওপর থেকে শাঙ্কোরা দড়ির জালে বসে-থাকা যুবকটিকে আস্তে আস্তে জাহাজের রেলিঙের ওপর দিয়ে তুলে এনে ডেক-এ নামাল। আহত যুবকটি দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ডেক-এই শুয়ে পড়ল। এবার জাহাজের কাঁচঢাকা চৌকোনো লণ্ঠনের আলোয় ফ্রান্সিস হ্যারি যুবকটিকে দেখেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। যুবক সেই বিদ্রোহী নেতা। ঘাড়ের ওপর ঝুলে-পড়া মাথার চুল। এখন বুকে বর্ম পরা নেই। খালি গা। হাত-কাঁধ-মুখ-কপাল ক্ষতবিক্ষত। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল, শীগগির বৈদ্যকে ডেকে আনো। ওদিকে বিস্কো আর বয়স্ক লোকটি দড়ি বেয়ে জাহাজে উঠে এসেছে। বিস্কো তাড়াহুড়োতে একটা মারাত্মক ভুল করল। যুবক আর লোকটি যে নৌকোয় ভাসছিল সেই নৌকোটা বিস্কো দড়ি দিয়ে ওদের জাহাজের গায়ে বেঁধে রেখে এল। তখন ফ্রান্সিস হ্যারিরা আহত যুবকটিকে নিয়ে ব্যস্ত। ওরা এটা লক্ষ্য করল না।

জাহাজের বৈদ্য ওষুধের ঝোলা নিয়ে এল। আহত যুবকটির ক্ষতগুলো পরীক্ষা করল। বৈদ্যকে ফ্রান্সিস বলল, কেমন দেখলে?

- তরোয়াল বর্শার ঘায়ে কেটে গেছে। বেশি রক্ত পড়েছে তাই দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভয়ের কিছু নেই। বৈদ্য ঝোলা খুলল। চিনেমাটির বোয়াম বের করল। চটচটে আঠার মতো হলুদরঙা ওষুধ ক্ষতস্থানে আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিল। যুবকটি কঁকিয়ে উঠেই শান্ত হলো। ওর মৃদু গোঙানি বন্ধ হলো। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল, একে তোমরা সাবধানে নিয়ে যাও। কোনো কেবিনে রেখো। মারিয়াকে বলো ও যেন যুবকটির দেখাশুনো করে।

শাঙ্কোরা কয়েকজন মিলে যুবকটিকে কাঁধে করে নিয়ে গেল।

বয়স্ক লোকটি তখন ডেক-এ বসে পড়েছে। বোঝা গেল ভীষণ ক্লান্ত লোকটি। ফ্রান্সিস একবার দেখল লোকটিকে। লোকটির পরনে সাধারণ চাষীর পোশাক। ফ্রান্সিস এবার হ্যারিকে মৃদুস্বরে বলল, হ্যারি চিনতে পেরেছো যুবকটিকে?

- হ্যাঁ। সেই যে বক্তৃতা দিচ্ছিল, বিদ্রোহী নেতা।

- কী করবে এখন? ফ্রান্সিস বলল।

- ও ভীষণ আহত। বিপন্নও। ওকে তো আশ্রয় দিতেই হবে। চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ না

হওয়া পর্যন্ত তো ওকে রাখতেই হবে। হ্যারি বলল।

- বুঝলাম এটা আমাদের মানবিক কর্তব্য। কিন্তু পরাজিত আহত এই বিদ্রোহী নেতাকে ফ্রেডারিকের সৈন্যরা নিশ্চয়ই খুঁজে বেড়াবে। যদি আমাদের জাহাজ খানাতল্লাশী করতে আসে? ফ্রান্সিস বলল।

- কিন্তু ওরা কী করে বুঝবে যে যুবকটি আমাদের জাহাজেই আশ্রয় নিয়েছে? হ্যারি বলল।

তা ঠিক। যাক গে, কালকের দিনটা দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

এ সময় মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল, আহত যুবকটি এখন একটু ভালো আছে। ওর সঙ্গের লোকটি কোথায়?

ফ্রান্সিস ডেক-এ বসা লোকটিকে দেখাল। মারিয়া লোকটির কাছে গেল। স্পেনীয় ভাষায় বলল, আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন? লোকটি মাথা নেড়ে স্পেনীয় ভাষায় বলল, আমি আসলে স্পেনীয়। অনেকদিন আগে জাহাজডুবি হয়ে এই সিসিলিতে এসেছিলাম। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হলো। লোকটির সঙ্গে কথা বলে সব জানা যাবে।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি লোকটির কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল, আপনার নাম কী?

- সাভোনা। লোকটি আস্তে বলল।

- ঐ যুবকটি তো বিদ্রোহী নেতা?

সাভোনা একটু আশ্চর্য হলো। বলল, - আপনারা জানলেন কী করে?

- যে ভাবেই হোক জানতে পেরেছি। যুবকটির নাম কী?

- মোরাবিত। ও আমার সন্তানের মতো। সাভোনা বলল।

- হুঁ। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল, কী হয়েছিল অল্প কথায় বলুন তো।

লোকটি বলতে লাগল, আমরা লিপারি দ্বীপ থেকে সিসিলি আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম। তার আগেই রাজা ফ্রেডারিকের সৈন্যরা দুটো জাহাজে চড়ে এল। লিপারি দ্বীপে আমাদের আক্রমণ করল। আমরা হেরে গেলাম। সৈন্যরা আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিল। ভীষণ আহত মোরাবিতকে কাঁধে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে সমুদ্রতীরে এলাম। পেয়ে গেলাম আমাদের একটা নৌকো। মোরাবিতকে নৌকোয় শুইয়ে দিয়ে আমিও পাশে শুয়ে পড়লাম যাতে রাজার সৈন্যরা আমাদের দেখতে না পায়। নৌকো সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে চলল। তারপর - লোকটি থামল।

- হুঁ। ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল, দেখুন, আমরা ভাইকিং - বিদেশী। মোরাবিত আর আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি আপনারা অসুস্থ ও বিপন্ন বলে। কিন্তু আপনাদের দেশের কোনো ব্যাপারের সঙ্গে আমরা নিজেদের জড়াতে চাই না। তাই আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অঞ্চল থেকে চলে যেতে চাইছি। কিন্তু আপনারা জাহাজে থাকলে তো আমাদেরও জাহাজ থামিয়ে অপেক্ষা করতে হয়।

সাভোনা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে। মোরাবিত কাল নাগাদ একটু সুস্থ হলে আমরা আপনাদের জাহাজ থেকে নেমে যাবো।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। শুধু শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল, জাহাজের পাল নামিয়ে নোঙর ফেলতে বলো। জাহাজ এখানেই থামিয়ে রাখতে হবে। অন্তত কাল অবধি।

মারিয়া সাভোনাকে বলল, আসুন, আপনাদের দুজনকেই খেতে দেব। সাভোনা আস্তে আস্তে উঠল। মারিয়ার সঙ্গে চলে গেল খাবার ঘরের দিকে।

রাত শেষ হয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস হ্যারি শুতে চলে গেল। ফ্রান্সিসের ঘুম আসতে একটু দেরি হলো। ওর মাথায় নানা চিন্তা।

ভোর হলো। ফ্রান্সিসদের জাহাজ থেমেই আছে। হ্যারি বরাবরই খুব ভোরে ওঠে। হ্যারি জাহাজের ডেকে উঠে এল। অনেক ভাইকিং বন্ধু ডেকের এখানে ওখানে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে।

সবে সূর্য উঠেছে। সমুদ্রে আকাশে হালকা নরম রোদ ছড়ানো। হ্যারি লিপারি দ্বীপের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল। দেখল দুটো যুদ্ধজাহাজ ওদের জাহাজের দিকে আসছে। বেশ দ্রুতই আসছে।

হ্যারি চিৎকার করে বলল, এই সবাই উঠে পড়ো। তারপরই ছুটল নিচে নামার সিঁড়ির দিকে। ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের দরজায় ঘা দিয়ে ডাকল, ফ্রান্সিস! ফ্রান্সিস!

মারিয়া জেগেই ছিল। ও ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিসও ততক্ষণে উঠে পড়েছে। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস, ডেক-এ এসো। দুটো যুদ্ধজাহাজ আমাদের জাহাজের দিকে আসছে।

বলো কি? ফ্রান্সিস বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল। ছুটল ডেক-এ সিঁড়ির দিকে।

ডেক এ তখন ভাইকিং বন্ধুরা জড়ো হয়েছে। ফ্রান্সিসকে দেখে বিস্কো বলল, ফ্রান্সিস, এখন কী করবে?

- দাঁড়াও, দেখি। ফ্রান্সিস তাকাল জাহাজ দুটোর দিকে। জাহাজ দুটো তখন অনেক কাছে চলে এসেছে। সৈন্যরা জাহাজের রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রীক সৈন্যদের মতো মাথায় শিরস্ত্রাণ, বুকে লোহার বর্ম। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হলো যে জলদস্যুর দল নয়। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা হলো - এরা কারা? ওদের জাহাজের দিকে আসছে কেন?

ফ্রান্সিস, আমরা আগেই লড়াইয়ে নামবো না - দেখি এদের উদ্দেশ্য কী? হ্যারি বলল।

- আমিও তাই ভাবছি। ফ্রান্সিস বলল।

তারপর ডেক-এ জড়ো হওয়া বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলল, ভাইসব, আমরা আগেই লড়াইয়ে জড়াবো না। এরা কারা, কী চায় আগে শুনি সব।

বন্ধুরা লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হচ্ছিল মনে মনে। ফ্রান্সিসের কথা শুনে ওরা একটু হতাশ হলো। হতাশা চাপা থাকলো না বিস্কোর কথায়। বিস্কো বলল, যদি এই সৈন্যরা নিরস্ত্র আমাদের হত্যা করে?

ফ্রান্সিস বলল, আমার এখনও তা মনে হচ্ছে না। তবু সবাই অস্ত্র আনো। অস্ত্র নিয়ে ডেক-এ একপাশে দাঁড়াও। আমার আর হ্যারির তরোয়াল দুটোও এনো।

সবাই ছুটল অস্ত্রঘরের দিকে। ভাইকিংদের ছুটোছুটিতে কথাবার্তায় মারিয়া বুঝল কিছু একটা হয়েছে। ও দ্রুতপায়ে ডেক-এ উঠে এল। ওদিকে মোরাবিতের পাশে সাভোনা ঘুমিয়েছিল। ভাইকিংদের ডাকাডাকি ছুটোছুটির শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠল। দেখল মোরাবিত তখনও ঘুমিয়ে আছে। ও মোরাবিতকে আর ডাকল না। কেবিনঘরের বাইরে এল। সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ পা রেখেই ও চমকে উঠল। রাজা ফ্রেডারিকের জাহাজ। সামনের

জাহাজের ডেকে এ দাঁড়িয়ে আছে রাজা ফ্রেডারিকের প্রধান সেনাপতি এলাইমো। সাভোনা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করল। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। ছুটল নিজেদের কেবিনের দিকে।

ওদিকে সেনাপতি এলাইমো যে জাহাজে ছিল সেই জাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ঝাঁকুনি খেয়ে দুলে উঠল। এলাইমো এক লাফে ফ্রান্সিসদের জাহাজের রেলিং ধরে ডেক এ উঠে এল। পেছনে পেছনে আরো কয়েকজন সৈন্য।

এলাইমো এগিয়ে এল ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মারিয়ার দিকে। এলাইমো দীর্ঘদেহী। বলিষ্ঠ। মুখে দাড়িগোঁফ। বেশ সযত্নে ছাঁটা। বলল, - আপনারা কারা? কোত্থেকে আসছেন? লো ল্যাতিন ভাষা। হ্যারি এক পা এগিয়ে এসে বলল, আমার ভাইকিং। ক্রীট দ্বীপ থেকে ফিরছি।

সশস্ত্র ভাইকিংদের দেখে এলাইমো মৃদু হাসল। বলল, শুনেছি আপনারা বীরের জাতি। আমাদের সঙ্গে লড়াই চান?

- না। তবে আমাদের জীবন বিপন্ন হলে লড়াইতে তো নামতেই হবে। হ্যারি বেশ দৃঢ়স্বরে বলল।

যাকগে, এলাইমো সহজভঙ্গিতে বলল, আমি এলাইমো, রাজা ফ্রেডারিকের প্রধান সেনাপতি। এক বিদ্রোহী নেতা আর তার পরামর্শদাতার খোঁজে এসেছি।

- আমরা এখানকার কাউকেই চিনি না। হ্যারি বলল।

- কিন্তু তাদের আপনারা দেখেছেন। এলাইমো বলল।

- না, দেখিনি। হ্যারি বলল।

- ঠিক আছে, রেলিঙে ঝুঁকে দেখুন তো আপনাদের জাহাজের সঙ্গে একটা নৌকো বাঁধা রয়েছে কিনা।

হ্যারি রেলিঙের কাছে গিয়ে ঝুঁকল। সর্বনাশ! বিস্কো কী সাংঘাতিক ভুল করেছে! মোরাবিতদের নৌকোটা বেঁধে রেখেছে। হ্যারি একবার বিস্কোর দিকে তাকাল। তারপর ফ্রান্সিসের কাছে এল। নিচুস্বরে সব কথা বলল।

ফ্রান্সিস বলল, দ্যাখো মিথ্যে বলে কাজ হয় কিনা।

হ্যারি এলাইমোর দিকে তাকাল। বলল, ওটা আমাদেরই নৌকো।

- অসম্ভব। ঐরকম গন্ডোলার মতো দেখতে নৌকো একমাত্র এই অঞ্চলের লোকেরাই ব্যবহার করে। এলাইমো বলল।

- খালি নৌকোটা ভাসছিল, আমরা জাহাজে বেঁধে নিয়েছি। হ্যারি বলল।

- এলাইমো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, গতরাতে অন্ধকারের মধ্যে ওরা ঐ নৌকোটায় লুকিয়ে পালিয়েছিল। কাজেই - একটু থেমে বলল, - ওরা দুজন আপনাদের জাহাজেই আশ্রয় নিয়েছে।

এবার হ্যারি ফ্রান্সিসকে নিম্নস্বরে সব বলল।

ফ্রান্সিস বুঝল এখন সব স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। ফ্রান্সিস দ্রুত হ্যারিকে বলে গেল কী বলতে হবে। হ্যারি বলল, আমরা সত্যি কথাই বলছি। কাল রাতে নৌকোয় আত্মগোপন করে যে দুজন এসেছিল তারা কারা আমরা জানি না। দুজন বিপদগ্রস্ত মানুষ।

তার মধ্যে একজন আবার গুরুতর আহত, তাই আমরা মানবিক কারণেই তাদের আশ্রয় দিয়েছি, আহতকে চিকিৎসা করিয়েছি।

— কোথায় ওরা? এলাইমো বলল।

— একটা কেবিনে। হ্যারি বলল।

— আমাকে ওদের কাছে নিয়ে চলুন। এলাইমো বলল।

— নিয়ে যাবো একটি শর্তে। আপনি ওদের হত্যা করতে পারবেন না। হ্যারি বলল।

— যদি করি। এলাইমো বলল।

— তাহলে আমরা লড়াইয়ে নামবো। হ্যারি কথাটা বলে ফ্রান্সিসকেও বলল। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করল।

এলাইমো একটু চুপ করে ভাবল। তারপর বলল, ঠিক আছে। ওদের জীবিত ধরাই রাজা ফ্রেডারিকের ইচ্ছে। ওদের রাজার কাছে নিয়ে যাবো।

— আমরাও ওদের সঙ্গে যাবো। হ্যারি বলল।

— আপনারা যাবেন কেন? এলাইমো একটু আশ্চর্য হয়ে বলল।

— যদি যাওয়ার পথে আপনারা ওদের মেরে ফেলেন। হ্যারি বলল।

এলাইমো বুঝল এরা সহজে মোরাবিত আর সাভোনাকে ছাড়বে না। ও বলল, ঠিক আছে, আপনারা ক'জন যাবেন চলুন।

— আমরা সবাই যাবো। হ্যারি বলল।

— তার মানে? এলাইমো বলল।

— মোরাবিত আর সাভোনা আমাদের জাহাজে যে কেবিনঘরে আছে সেখানেই থাকবে। আমরা মোরাবিতের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করবো। আপনাদের জাহাজের সঙ্গেই আমাদেরও জাহাজ যাবে।

এবার এলাইমো বলল, রাজা ফ্রেডারিক সিরাকস বন্দরের ম্যামিয়েস দুর্গে আছেন। সিরাকস বন্দর কাছেই। একটু থেমে বলল, কিন্তু— আপনাদের বিশ্বাস কি। আমাদের দুটো জাহাজ আপনাদের জাহাজের দুপাশে থাকবে। এভাবেই আমাদের নজরদারির মধ্যে দিয়ে আপনাদের সিরাকস বন্দরে যেতে হবে।

হ্যারি নিম্নস্বরে ফ্রান্সিসকে সব বলল। ফ্রান্সিস বলল, বলো আমরা এই প্রস্তাবে রাজী। হ্যারি সে কথাই বলল।

এলাইমো সঙ্গের জনা দশেক সৈন্যকে ফ্রান্সিসদের জাহাজে পাহারায় থাকতে হুকুম দিল। দুজন সৈন্যকে দেখিয়ে বলল, এরা মোরাবিত আর সাভোনা যে কেবিনঘরে আছে সে ঘরের সামনে পাহারা দেবে।

হ্যারি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, বেশ। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল সে কথা। মারিয়া বলল, আমি এই সৈন্য দুজনকে নিয়ে যাচ্ছি। মারিয়া হাত নেড়ে সৈন্য দুজনকে আসতে বলে নিচে নামার সিঁড়ির দিকে চলল। পেছনে খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্য দুজনও চলল। এলাইমো নিজের জাহাজে ফিরে গেল।

ফ্রান্সিসের নির্দেশে জাহাজের গুটোনো পাল তুলে দেওয়া হলো। জাহাজ চলল। দুধারে

এলাইমোর দুটো যুদ্ধজাহাজও সঙ্গে সঙ্গে চলল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নিচে মোরাবিতদের কেবিনঘরের সামনে এল। দেখল, খোলা তরোয়াল হাতে দুজন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। ও কেবিনঘরে ঢুকল। মারিয়া তখন মোরাবিতের শরীরের ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগাচ্ছে। সাভোনা চুপ করে বসে আছে। ফ্রান্সিস সাভোনার সাহায্যে মোরাবিতের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

ফ্রান্সিস বলল, এখন কেমন আছো?

মোরাবিত হেসে বলল, এখন অনেকটা ভালো আছি। কিন্তু মনে শান্তি পাচ্ছি না।

কেন? ফ্রান্সিস বলল।

আপনাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কিন্তু সেই আপনারা আমাদের জন্যে কী বিপদে পড়লেন! এর চেয়ে আমরা ধরা দিলে ভালো হতো। মোরাবিত বলল্।

তুমি এই নিয়ে ভেবো না। ফ্রান্সিস বলল।

সাভোনা বল্ল, আমরা বিদ্রোহী - প্রাণপণে লড়াই করেছি কিন্তু আমরা অস্ত্রে বা যুদ্ধবিদ্যায় রাজার সৈন্যদের সমকক্ষ নই। যদি কিছু অর্থ যোগাড় করতে পারতাম -

— ওর সঙ্গে মোরাবিতও কী বলে উঠল। সাভোনা হেসে উঠল।

— মারিয়া বলল, হাসছেন যে?

— মোরাবিত বলছে কাউন্ট রজারের গুপ্তধন ও খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে। সাভোনা হেসে বলল।

এবার ফ্রান্সিস চমকে ওদের দিকে তাকাল। বলল, কাউন্ট রজার কে? তার গুপ্তধন - মানে ব্যাপারটা কী বলুন তো?

— সাভোনা বলল, সেসব শুনে আপনাদের কী হবে?

মারিয়া বলল, ওর নাম ফ্রান্সিস। অনেক গুপ্তধনের রহস্য ও ভেদ করেছে। ওকে বলেই দেখুন না।

সাভোনা, বলুন তো কাউন্ট রজারের গুপ্তধনের ব্যাপারটা। ফ্রান্সিস বলল। তখনি হ্যারি ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলে উঠল, হ্যারি, ভালো সময়েই এসেছো। শোনো সাভোনা এক গুপ্তধনের কাহিনী বলছে।

সাভোনা আস্তে আস্তে বলতে লাগল ঃ

প্রায় একশো বছর আগের কথা। দুই নর্মান ভাই রজার ও রবার্ট সমুদ্র পথে সিসিলি এসেছিল। দু ভাই-ই ছিল দুঃসাহসী আর অত্যন্ত বলশালী। দুজনেই ছিল দস্যু। দস্যুবৃত্তি করে জমানো প্রচুর ধনসম্পদ ছিল ওদের। ক্রমে সিসিলি জয় করে রবার্ট উত্তরের আর রজার দক্ষিণের রাজা হয়ে বসল। রজার উপাধি নিল কাউন্ট। রাজা হিসেবে কাউন্ট রজার কিন্তু যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল। যা হোক, মৃত্যুর কয়েক বছর আগে কাউন্ট রজারের ধর্মে মতি হলো। খ্রীস্টধর্মগুরু পোপের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলল। পুরোনো জীর্ণ গ্রীক মঠগুলো সংস্কার করল। সিরাকস আর কাতানিয়ায় দুটো গীর্জা তৈরি করল। তারপর কাউন্ট রজার মারা গেল। উত্তরের পোলার্মো থেকে ভাই রবার্ট ছুটে এল। উদ্দেশ্য কাউন্ট রজারের ধনসম্পত্তি অধিকার করা।

দুজনেই তো অতীতে দস্যু ছিল। রবার্ট সিরাকসের রাজবাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কাউন্ট রজারের ধনসম্পত্তির কোনো হদিসই পেল না। রাজকোষের কিছু স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে রবার্ট ফিরে গেল। তারপর একশ বছর ধরে কাউন্ট রজারের বংশধরেরা, ধনী ভূস্বামীরা অনেকেই খুঁজছে। কিন্তু কেউ কাউন্ট রজারের গুপ্তধনের হদিস করতে পারেনি। সাভোনা থামল।

ফ্রান্সিস এতক্ষণ সব মন দিয়ে শুনছিল। এবার বলল, আচ্ছা, কাউন্ট রজার কি তার গুপ্তধন কোথায় রাখা হয়েছে সেসব ব্যাপারে কোনো সূত্র রেখে যায়নি?

- কিচ্ছু না। সাভোনা বলল।

- কাউন্ট রজারের মৃত্যু হয়েছিল কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

- এই সিরাকসের রাজবাড়িতে। সাভোনা বলল।

- সেই রাজবাড়ি কি সিরাকসে এখনও আছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

- না। বেশ কয়েক বছর আগে এখনকার রাজা ফ্রেডারিক সেসব ভেঙে ফেলেছিল। প্রচার করেছিল যে বেশ ভালো একটা দুর্গ তৈরি করবে। তৈরি করেছেও একটা দুর্গ, ম্যামিয়েস দুর্গ। কিন্তু আসল কারণ ছিল কাউন্ট রজারের গুপ্ত ধনভান্ডারের সন্ধান করা। কিন্তু রাজবাড়ি ভেঙে ফেলেও ফ্রেডারিক কিছুই পায়নি। সাভোনা বলল।

- তাহলে কাউন্ট রজারের তৈরি কোনো কিছুই সিরাকসে নেই? ফ্রান্সিস বলল।

- আছে। তার তৈরি গীর্জাটা। ওটা ম্যামিয়েস দুর্গের উত্তর কোনায় আছে। রাজা ফ্রেডারিক ওটার কিছু সংস্কার করেছিল। ভাঙেনি। তবে এখন ঐ গীর্জায় শুধু রাজপরিবারের মানুষদেরই প্রবেশাধিকার আছে, অন্য কারো নয়।

- তাহলে ঐ গীর্জাটা আপনি দেখেননি? ফ্রান্সিস বলল।

একটু চুপ করে থেকে সাভোনা বলল, দেখুন, আমি একসময় রাজা ফ্রেডারিকের একজন অমাত্য ছিলাম। রাজা আমার কাছ থেকে স্পেনীয়, পর্তুগীজ ভাষা শিখেছিল। কয়েকটা ভাষা জানতাম বলে রাজসভায় যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তবে সারাসেনদের ওপর অবিচার হচ্ছিল দেখে আমি সেই পদ ছেড়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের দলে চলে এসেছিলাম। ঐ গীর্জায় আমি রবিবারের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে অনেকবার গেছি।

- গীর্জাটার কিরকম সংস্কার রাজা ফ্রেডারিক করেছেন? ফ্রান্সিস বলল।

- যা কিছু সংস্কার ওপরেই হয়েছে। ভিতটা সেই কাউন্ট রজার যেমন করিয়েছিলেন তেমনি আছে। বোধহয় ভিতটায় সুন্দর মোজেকের কাজ ছিল বলেই রাজা ফ্রেডারিক ভেঙে ফেলেনি। সাভোনা বলল।

ফ্রান্সিস আর কোনো কথা বলল না। মাথা নিচু করে কাউন্ট রজারের গুপ্তধন সম্পর্কে একেবারে নীরব থাকার কারণ কী তাই ভাবতে লাগল।

- হ্যারি বলল, কী ফ্রান্সিস, কাউন্ট রজারের গুপ্তধনের অনুসন্ধান করবে নাকি?

- অবশ্যই। ফ্রান্সিস বেশ জোর দিয়ে বলল।

মারিয়া বলল, রাজবিদ্রোহীদের আমরা আশ্রয় দিয়েছি, এজন্যে রাজা ফ্রেডারিক নিশ্চয়ই চটে যাবে। আমাদের না কয়েদঘরে বন্দী করে রাখে!

- দেখা যাক। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল।

সেনাপতি এলাইমোর নির্দেশমতো ফ্রান্সিসদের জাহাজ পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল তাদের দুটো জাহাজ দুপাশ দিয়ে। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই দূরে সিরাকস বন্দর দেখা গেল। আস্তে আস্তে তিনটি জাহাজই ভিড়ল সিরাকস বন্দরের জাহাজঘাটায়।

এলাইমো ফ্রান্সিসদের জাহাজে এল। তখন ফ্রান্সিস হ্যারি ডেক-এ দাঁড়িয়েছিল। এলাইমো হ্যারিকে বলল, মোরাবিত আর সাভোনাকে নিয়ে আসুন। ওদের বন্দী করে রাজার কাছে নিয়ে যেতে হবে।

- আমরা কী করবো? হ্যারি বলল।

- রাজার হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত আপনাদের এই জাহাজে এখানেই থাকতে হবে। এলাইমো বলল। হ্যারি কথাটা ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল, বলো যে বন্দীদের সঙ্গে আমরা তিনজনও রাজার কাছে যাবো। হ্যারি বলল সে কথা।

- আপনারা যাবেন কেন? এলাইমো একটু আশ্চর্য হয়েই বলল।

- রাজা ফ্রেডারিকের সঙ্গে আমাদের কথা আছে ফ্রান্সিসের শেখানো মতো হ্যারি বলল, এলাইমো একটু ভাবল। বলল, বেশ বিদ্রোহীদের আপনারা আশ্রয় দিয়েছেন। কাজেই রাজা আজ হোক কাল হোক আপনাদের শাস্তি দেবেনই।

এলাইমোর আটজন সৈন্য যে কেবিনঘরে মোরাবিত আর সাভোনা ছিল সেই ঘরে গেল। ওদের দুহাত দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এল।

জাহাজঘাটায় দাঁড় করানো ছিল একটা সুসজ্জিত সাদা ঘোড়া। এলাইমো সেই ঘোড়ায় উঠে বসল। ঘোড়া আস্তে আস্তে চলল।

বন্দী দুজনকে মাঝখানে রেখে দুপাশে দাঁড়াল খোলা তরোয়াল হাতে আটজন সৈন্য। পেছনে ফ্রান্সিস, মারিয়া আর হ্যারি। মোরাবিত তখনও সুস্থ হয়নি। হাঁটা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ওর খুব কষ্ট হচ্ছে।

নগরে ঢুকল সবাই। সিরাকস মোটামুটি বড় একটা বন্দর-শহর। রাস্তায় লোকজনের বেশ ভিড়। সারি সারি খোলা দোকানপাট। এর মধ্যেই রটে গেছে মোরাবিত আর সাভোনাকে বন্দী করে নিয়ে আসা হচ্ছে। লোকজন যে যার কাজ ফেলে মোরাবিতকে দেখতে ছুটে এল। সাভোনা রাজ-অমাত্য ছিল। তাকে অনেকেই দেখেছে। চেনেও। কিন্তু বিদ্রোহী যুবক মোরাবিতের নামই সবাই শুনেছে। চোখে কখনও দেখেনি। তাই সবাই সাগ্রহে মোরাবিতকে দেখতে রাস্তায় ভিড় করল। ফ্রান্সিস, মারিয়া, হ্যারিকে দেখেও ওরা একটু আশ্চর্য হলো। এই ভিনদেশী লোকগুলোকে তো বন্দী করা হয়নি। তাহলে এদের দুর্গে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন?

ম্যামিয়েস দুর্গ অনেকটা জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে। উঁচু পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রধান দরজার কাছে এলাইমো ঘোড়া থেকে নামল। প্রধান ফটকটি মজবুত কাঠের। দ্বাররক্ষীরা এলাইমোকে দেখে মাথা নিচু করে সম্মান জানাল। একটু শব্দ তুলে দরজা খুলে দিল ওরা।

সবাই দুর্গের ভেতরে ঢুকল। একটা পাথরের তৈরি চত্বরের পর দুর্গের পাথরে তৈরি বাড়িঘর। চত্বর পেরিয়ে একটা বড় দরজার সামনে সবাই এল। দুজন দ্বাররক্ষী এলাইমোকে

সম্মান জানাল। এলাইমো একজন দ্বাররক্ষীকে কী বলল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। একটু পরে বেরিয়ে এলাইমোকে কী বলল। এলাইমো পেছন ফিরে হাতের ইঙ্গিতে সবাইকে ঘরে ঢুকতে বলল।

সৈন্যরা বাদে ঘরে ঢুকল সবাই। ঘরটা বেশ বড়। একটু অন্ধকার মতো। পাথরের দেয়ালের পাথর কুঁদে ফুল-লতাপাতার কাজ করা। সামনেই একটা পাথরের রঙিন কাপড়-ঢাকা আসনে রাজা ফ্রেডারিক বসে আছেন। দুপাশে লম্বাটে পাথরের কাপড়-ঢাকা আসনে কয়েকজন বসে আছেন। নিশ্চয়ই মন্ত্রী-অমাত্যরা। রাজা ফ্রেডারিকের মাথায় দামী পাথর বসানো সবুজ মীনে-করা মুকুট। রাজা মধ্যবয়স্ক। পরনে রেশমী কাপড়ের ঢিলে পোশাক। অমাত্যদের গায়েও একই রকম পোশাক।

এলাইমো মাথা নিচু করে রাজাকে সম্মান জানাল। মোরাবিত সাভোনা মাথা নোয়ালো না। ফ্রান্সিস এটা দেখে মনে মনে ওদের প্রশংসা করল। এলাইমো একনাগাড়ে কী বলে যেতে লাগল। হ্যারি মৃদুস্বরে সেসব ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে দিল। এলাইমোর কথা শেষ হলে রাজা ফ্রেডারিক মোরাবিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, - সারাসেনদের ক্ষেপিয়ে তুমি রাজবিদ্রোহী হয়েছো। তোমার ফাঁসি হবেই। এবার সাভোনার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললেন, সাভোনা, বেশ তো আমার রাজসভায় সুখে ছিলে। সে সুখ তোমার সহ্য হলো না। সব ছেড়েছুড়ে চলে গেলে। বিদ্রোহীদের পরামর্শদাতা হলে। এবার বাকি জীবন কয়েদঘরে কাটাতে হবে যে। মোরাবিত সাভোনা কোনো কথা বলল না।

এবার রাজা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। স্পেনীয় ভাষায় বলল, শুনলাম আপনারা ভাইকিং। মোরাবিত আর সাভোনাকে আশ্রয় দিয়েছেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়েছেন। কিন্তু আপনারা কি জানতেন না ওরা রাজদ্রোহী?

ফ্রান্সিস একটু মাথা ঝাঁকিয়ে সত্যি কথাই বলল, হ্যাঁ, মোরাবিত বিদ্রোহী আমরা ঘটনাক্রমে সেটা জানতাম। কিন্তু সাভোনার পরিচয় জানতাম না।

ফ্রান্সিসের কথা শুনে হ্যারি মৃদুস্বরে বলল, এটা স্বীকার করলে কেন? এতে তো আমাদের বিপদ বাড়বে।

- দেখা যাক। ফ্রান্সিসও মৃদুস্বরে বলল।

রাজা ফ্রেডারিক বললেন, আপনারা বিদেশী। তবু জেনেশুনে যখন ওদের আশ্রয় দিয়েছেন তখন আপনাদেরও বিচার হবে কয়েকদিনের মধ্যেই।

ফ্রান্সিস বলল, বেশ। তবে আপনাকে আমার কয়েকটা কথা বলার আছে।

- বলুন।

- সাভোনা এদেশের অতীত ইতিহাস ভালোই জানেন। ওঁর কাছে শুনেছি প্রায় একশো বছর আগের রাজা কাউন্ট রজার এখানে তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ কোথাও গোপনে রেখেছিলেন। আমরা স্থির করেছি সেই গুপ্তধন অনুসন্ধান করে উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

কথাটা শুনে রাজা ফ্রেডারিক বেশ আশ্চর্য হলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, প্রায় একশো বছর ধরে আমার পূর্বপুরুষরা ঐ গুপ্তধন উদ্ধারের কত চেষ্টা করেছেন। কেউ পারেননি।

আপনি বলছেন পারবেন।

- পারবোই একথা বলার সময় এখনো আসেনি। সব দেখেশুনে চিন্তাভাবনা করে তবেই পারবো কিনা সেটা বলা যাবে। তবে আমি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস রাখি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা ফ্রেডারিক অবাক চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফ্রান্সিস বলল, আপনার কাছে আমি কয়েকটা কথা জানতে চাই।

- বলুন।

- কাউন্ট রজার তাঁর রাজত্বকালে কী কী তৈরি করিয়েছিলেন?

- এখানে আর কাতানিয়ায় দুটো গীর্জা আর যে বিরাট বাড়িটা কাতানিয়ায় তৈরি করাবার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সেই বাড়িটা। তারপরই উনি মারা যান। রাজা বললেন।

- অসুস্থতার সময় কোথায় ছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

- কাতানিয়ার ঐ বাড়িটায়। অবশ্য দুদিন পরেই তাঁকে এখানে নিয়ে আসা হয়। এখানকার রাজবাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ফ্রান্সিস চুপ করে শুনল। তারপর বলল, আজকে আমরা জাহাজে ফিরে যাবো। এই দুর্গে আমাদের একটা থাকবার জন্যে ঘর দেবেন। কাল থেকে আমরা তিনজন এখানেই থাকবো। আর একটা কথা, মোরাবিত আর সাভোনা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ওঁর সাহায্য আমাদের খুবই প্রয়োজন।

- যদি সাভোনা বা মোরাবিত পালিয়ে যায়? রাজা বললেন।

- আমি তার জন্যে দায়ী থাকবো। ফ্রান্সিস বলল।

- হুঁ। রাজা মুখে শব্দ করলেন।

- আর আমরা যেন সর্বত্র অবাধে যেতে পারি, খোঁজখবর করতে পারি, কেউ যেন আমাদের বাধা না দেয় - এই আদেশ আপনি দেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

- বেশ। রাজা মাথা একটু ঝাঁকিয়ে বললেন।

এবার ফ্রান্সিস বলল, যদি গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারি তাহলে আমাদের তো বটেই, মোরাবিত আর সাভোনাকেও মুক্তি দিতে হবে।

রাজা ফ্রেডারিক একটু ভাবলেন। তারপর দুজন অমাত্যকে ইঙ্গিতে ডাকলেন। দুজন রাজার সামনে গেলেন। তিনজনের মধ্যে কী কথাবার্তা হলো। অমাত্যরা ফিরে গিয়ে নিজেদের জায়গায় বসলেন। রাজা বললেন, দেখুন, কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আপনারা উদ্ধার করতে পারবেন না। তবু আপনার শর্তে আমি রাজী হলাম। কিন্তু যদি গুপ্তধন উদ্ধার করতে না পারেন? রাজা বললেন।

- তাহলে আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের জাহাজ চালিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে দেবেন। মোরাবিত ও সাভোনার সঙ্গে আমাকে যে শাস্তি দেবেন তা আমি মাথা পেতে নেব। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসের এই শর্ত শুনে হ্যারি ভীষণভাবে চমকে উঠল। বলল, কী বলছো ফ্রান্সিস? মারিয়াও বিস্ময়ে বলে উঠল, কী সাংঘাতিক! ফ্রান্সিস গম্ভীরস্বরে বলল, অনেক ভেবেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমরা বাধা দিও না। রাজা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ফ্রান্সিসের দিকে। মোরাবিত সাভোনা ওর আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, নিজের দেশবাসীও নয়। অথচ ওদের ভাগ্যের

সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না এই বিদেশী। রাজা দুজন অমাত্যকে ডাকলেন। তাঁদের বললেন সব। এবার সবাই ফ্রান্সিসের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। সবাই নীরব। হঠাৎ সাভোনা ফুঁপিয়ে উঠল। বলল, ফ্রান্সিস, এ তুমি কী বললে! কী সাংঘাতিক শর্ত! উফ্।

- সাভোনা মোরাবিতকে ফ্রান্সিসের শর্তের কথা বুঝিয়ে বলল। মোরাবিত চিৎকার করে কী বলে উঠল।

-হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস মোরবিতও বলছে তুমি এরকম শর্ত দিও না। ফ্রান্সিস হাসল। বলল, এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

রাজা ফ্রেডারিক বললেন, ঠিক আছে। আমরা পরস্পরের শর্ত মেনে চলবো। আপনারা জাহাজে ফিরে যেতে পারেন। তবে সৈন্যদের কড়া পাহারার মধ্যে আপনাদের থাকতে হবে।

- বেশ। ফ্রান্সিস মাথা একটু ঝাঁকিয়ে বলল।

একদল সৈন্যের পাহারায় জাহাজে ফিরে এল ফ্রান্সিসরা। আসার পথে হ্যারি মারিয়া একটি কথাও বলতে পারল না। ফ্রান্সিসের শর্তের কথা ভেবে ওরা দুজনই বিমর্ষ।

জাহাজে উঠতেই সব বন্ধুরা ছুটে এসে ওদের ঘিরে ধরল। হ্যারি বলল, ভাইসব, ফ্রান্সিসকে বিশ্রাম করতে যেতে দাও। রাজকুমারীও ফ্রান্সিসের সঙ্গে যান। যা বলার আমি বলছি। ফ্রান্সিস আর মারিয়া নিজেদের ঘরে চলে গেল। হ্যারি বন্ধুদের সব বলল।

ফ্রান্সিসের শর্তের কথা শুনে বন্ধুরা ভীষণ উত্তেজিত হলো। কেউ কেউ অভিমানের সুরে বলল, ফ্রান্সিস আমাদের কিছু না জানিয়ে এভাবে জীবনের ঝুঁকি নিল! কয়েকজন উত্তেজিত স্বরে বলল, ফ্রান্সিসকে আমরা জাহাজ ছেড়ে যেতে দেব না। আজ রাতেই পাহারাদার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করে জাহাজ নিয়ে পালাবো। পাহারাদাররা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা ভাইকিংদের কথা কিছুই বুঝল না।

হ্যারি বিপদ আঁচ করল। বন্ধুরা যদি সত্যিই উত্তেজিত হয়ে লড়াইয়ে নামে তাহলে মৃত্যু রক্তক্ষয় অনিবার্য। ও গলা চড়িয়ে বলল, ওসব ভাবনা ছাড়ো। ফ্রান্সিসকে বলছি, ও তোমাদের সব বুঝিয়ে বলবে। হ্যারি চলে গেল। ফ্রান্সিস তখন নিজের কেবিনে চুপ করে শুয়ে চিন্তা করছে। অনেক চিন্তা মাথায়। হ্যারি এল। দেখল মারিয়া মাথা নিচু করে চুপ করে বসে আছে। হ্যারি বন্ধুদের মনোভাবের কথা বলল।

ফ্রান্সিস চুপ করে শুনল। তারপর বলল, রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর সবাইকে ডেক-এ জড়ো হতে বলো। আমি যা বলার বলবো।

রাতে জাহাজের ডেক এ জড়ো হলো সবাই। ফ্রান্সিস এল। সঙ্গে মারিয়া। সকলের কথাবার্তা থেমে গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলতে লাগল, - ভাইসব, ধর্ম-ভাষা মাটির ব্যবধান সত্ত্বেও আমরা এই পৃথিবীর অধিবাসী। আমাদেরএকটাই পরিচয় আমরা মানুষ। তাই মোরাবিত আমার ভাই। সাভোনা আমার পিতৃতুল্য। একটু থেমে বলল, ওদের লড়াই অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে, ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে। সেটা ওদের দেশের ব্যাপার। কিন্তু মোরাবিতের কথাই ভেবে দেখো। কী সুন্দর সুগঠিত শরীর! কত অল্প বয়েস! ওর দিকে যতবার আমি তাকিয়েছি এক অদ্ভুত স্নেহের টান বারবার অনুভব করেছি। সাভোনার কথা ভাবো। রাজার প্রিয় অমাত্য ছিলেন। যথেষ্ট

বুদ্ধিমান। চিন্তাশীল। সারাজীবন তিনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে তিনি মেনে নিয়েছেন বিদ্রোহীর কষ্টকর দুঃখময় জীবন। এমন দুটি মানুষের মৃত্যু হবে এ আমি মেনে নিতে পারিনি। কাজেই আমি আমার জীবনকে বাজি ধরেছি। আর একটু গলা চড়িয়ে ফ্রান্সিস বলল, কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আমি উদ্ধার করবোই। মোরাবিত আর সাভোনাকে আমি বাঁচাবোই। তার জন্যে যদি আমাকে বাকি সারাজীবন এই সিসিলিতে থাকতে হয় আমি থাকবো। ততদিন তো ভাই মোরাবিত, পিতৃতুল্য সাভোনা দুজনেই বেঁচে থাকবে। থামল ফ্রান্সিস। তারপর বলল, ভাইসব, আমার শর্তের সঙ্গে আমি কিন্তু তোমাদের জড়াইনি। তোমরা ইচ্ছে করলে জাহাজ নিয়ে স্বদেশে চলে যেতে পারো। এবারে বুদ্ধির লড়াই। আমার একার লড়াই।

ফ্রান্সিস থামল। কেউ কোনো কথা বলল না। মাথার ওপরে ঝকঝকে তারাভরা আকাশ। শন্‌শন্‌ সমুদ্রের হাওয়ার শব্দ। জাহাজের গায়ে ঢেউ ভেঙে পড়ছে - ছলাৎ - ছলাৎ।

হঠাৎ বিস্কোর গলা শোনা গেল - ফ্রান্সিস, তোমাকে ছেড়ে আমরা কেউ এখান থেকে এক পাও নড়বো না। শেষ পর্যন্ত তোমাকে যদি রাজা ফ্রেডারিক ফাঁসি দেন আমরা প্রত্যেকে তখন একই-সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবো। সব ভাইকিং উত্তেজিত ভঙ্গিতে দুহাত ওপরে তুলে চিৎকার করে উঠল, ও হো হো।

ফ্রান্সিসের দু চোখ ভিজে উঠল। চোখ মুছে ও ভাঙা গলায় বলল, ভাইসব, আমার বুদ্ধি চিন্তাশক্তির গভীরতার ওপর বিশ্বাস রাখো। জীবনের বাজি আমাকে লড়তে দাও। আমি কাউন্ট রজারের গুপ্তধন উদ্ধার করবোই।

সবাই আবার চিৎকার করে ধ্বনি তুলল, ও হো হো। সভা ভেঙে গেল। সবাই পরস্পর কথা বলতে বলতে চলে গেল।

পরদিন সকালেই ফ্রান্সিস মারিয়া আর হ্যারিকে নিয়ে ম্যামিয়েত্তা দুর্গে এল। দুজন সৈন্য ওদের দুর্গের একটা বড় ঘরে নিয়ে এল। ওরা দেখল, ঘরটায় শুকনো ঘাসের ওপর কাপড় ঢাকা সুন্দর বিছানা পাতা। বালিশও রয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। বিছানায় মোরাবিত শুয়ে আছে। মুখচোখ দেখে ফ্রান্সিসের মনে হল মোরাবিত এখন অনেকটা সুস্থ। সাভোনা আধশোয়া হয়ে কিছু ভাবছিল। ফ্রান্সিসদের দেখে উঠে বসল। বলল, ফ্রান্সিস, তোমাকে যতটুকু দেখেছি তাই থেকে একটা কথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি তুমি জীবনে কিছু আদর্শকে বিশ্বাস করো এবং সেই আদর্শকে রক্ষা করতে তুমি সিদ্ধান্ত নাও। তাই আমি তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনো কথা বলবো না। একটু থেমে বলল, বলো এবার তুমি কী করতে চাও?

- প্রথমেই কাউন্ট রজারের আমলের রাজবাড়ির যে অংশটা ভাঙা হয়নি সেটা দেখতে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

- বেশ চলো। সাভোনা বলল।

সাভোনার দুর্গ-এলাকা ভালো করেই চেনা। ও ওদের দুর্গের উত্তর কোনায় নিয়ে এল। দেখা গেল একটা ছোট গীর্জা। সাভোনা গীর্জাটা দেখিয়ে বলল, এটাই কাউন্ট রজারের তৈরি গীর্জা। এটার কথা তোমাদের বলেছি। ওরা গীর্জাটার সামনে এল। গীর্জার চারদিকে সুন্দর বাগান। অনেক

ফুলগাছ। গোলাপ টিউলিপ ডালিয়া আরো নাম-না-জানা ফুল ফুটে আছে। কাঠের দরজা খুলে ওরা গীর্জাটার দরজার সামনে এল। দেখল প্রবেশপথের মেঝেয় নানারঙের সুন্দর মোজেকের কাজ করা। সাভোনা বলল, এই মেঝে কিন্তু কাউন্ট রজারই তৈরি করিয়েছিল। রাজা ফ্রেডারিক এই মেঝেটা ভাঙেনি।

ওরা গীর্জার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ছোট গীর্জা। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি। দেয়ালে মাতা মেরীর ছবি। বেশ ভাবগম্ভীর শান্ত পরিবেশ। দেখা গেল মেঝেতেও মোজেকের কারুকাজ। ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখল। গীর্জা যেমন হয় তেমনি সব। জানলায় রঙিন কাচ। সকালের রোদ কাচের রঙ মেখে মেঝেয় পড়েছে। ফ্রান্সিস বেশ ভালো করেই দেখল সব।

সবাই বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস সাভোনাকে বলল, সাভোনা, কাল আমরা কাতানিয়া যাবো। আপনি ব্যবস্থা করতে পারবেন?

সাভোনা হেসে বলল, রাজা ফ্রেডারিক দুজন সৈন্যকে রেখেছে, দেখেছো তো? পাহারাদারির জন্যে ওদের কিন্তু রাখা হয়নি। আমাদের সব ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য ওদের নিযুক্ত করেছে রাজা। গুপ্তধন বলে কথা! রাজা ফ্রেডারিক এখন রাজধানীতে ফিরে যাবে না। গুপ্তধন খুঁজছো তুমি। খুব উৎসাহ রাজা ফ্রেডারিকের। রাজা এখন এখানেই থাকবে।

দিন দুয়েক কাটল। সেই ঘরেই ফ্রান্সিসদের শুয়ে বসে ঘুমিয়ে দিন কাটে।

সেদিন সকালে দুর্গের পাহারাদার সৈন্যদের মধ্যে বেশ ব্যস্ততা দেখা গেল। ফ্রান্সিস সাভোনাকে জিজ্ঞেস করল – কী ব্যাপার বলুন তো?

– মনে হচ্ছে রাজা ফ্রেডারিক দুর্গ পরিদর্শনে আসছেন। সাভোনা বলল।

– রাজা কি এরকম দুর্গ পরিদর্শন করেন নাকি? হ্যারি বলল।

– হ্যাঁ – সাভোনা বলল – আর রাজাদের এই পরিদর্শনের কাজ করা উচিতও। তা নইলে সৈন্যরা অলস হয়ে পড়ে।

একটু পরেই ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে কয়েকজনের পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজা দিয়ে ঢুকলেন রাজা ফ্রেডারিক। পেছনে দুজন অমাত্য। রাজার মাথায় মুকুট নেই। পরনে হাল্কা সবুজ রঙের ঢোলা পোশাক। পোশাকে সোনার সুতোর লতা ফুল তোলা।

রাজাকে দেখে আধশোয়া ফ্রান্সিস উঠে বসল। রাজা বললেন – গুপ্তধনের কোন হদিশ করতে পারলেন?

– না – ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল – সবে তো খোঁজা শুরু করলাম। কয়েকটা দিন যাক। সব দেখি শুনি জানি তবে তো।

– দেখুন, চেষ্টা করে। তবে এর আগেও তো কম চেষ্টা হয় নি কিন্তু কেউ কোন হদিশও করতে পারে নি।

– দেখি চেষ্টা করে। ফ্রান্সিস বললে।

এবার রাজা সাভোনা ও মোরাবিতের দিকে তাকালেন। বললেন – তোমরা আপাতত এখানেই থাকবে। কিন্তু খবর্দার – পালাবার চেষ্টা করবে না। এখন কাউন্ট রজারের গুপ্তধনের খোঁজ চলছে। দেখা যাক – কী হয়। রাজা অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।

তখনই দুর্গের ছোট গীর্জাটায় প্রার্থনার ঘন্টা বেজে উঠল - ঢং - ঢং - । ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল - সাভোনা চলুন গীর্জায় যাবো।

- কিন্তু রাজপরিবার আর অমাত্যদের পরিবারের লোক ছাড়া ঐ গীর্জায় আর কারো প্রবেশাধিকার নেই। সাভোনা বলল।

- হুঁ - তবু যেতে ইচ্ছে করছে। গীর্জার ভেতরে যাবো না আমরা। বাইরে থেকে প্রার্থনা অনুষ্ঠান যতটা পারি দেখবো শুনবো। ফ্রান্সিস বলল।

- বেশ - চলুন। সাভোনা উঠে দাঁড়াল। হ্যারি মারিয়া মোরাবিত ও উঠে দাঁড়াল। সবাই চলল দুর্গের ছোট গীর্জাটার দিকে। মোরাবিত এখন অনেকটা সুস্থ। ওর হেঁটে যেতে কোন কষ্ট হচ্ছিল না।

গীর্জাটায় তখন ধর্মযাজকের বাইবেল পাঠ চলছে। ফ্রান্সিসরা গীর্জাটায় সামনের দিকে কিছুটা দূরে পাথরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। একটু পরেই শুরু হল প্রার্থনা সংগীত। ল্যাতিন ভাষায় রচিত প্রার্থনা সংগীতের অর্থ ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া বুঝল না। সাভোনা আর মোরাবিত বুঝল। ফ্রান্সিসরা গানের অর্থ বুঝলো না কিন্তু গানের সুর বড় ভালো লাগল। সকালের উজ্জ্বল রোদে বাতাসে আকাশের নীলে ছড়িয়ে যাওয়া গানের সুর এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করল। মারিয়া অস্ফুটস্বরে বলে উঠল - অপূর্ব। ফ্রান্সিসও বলে উঠল - সুন্দর গান। সাভোনা বলল - এই গান কার রচনা জানেন? ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল।

- কাউন্ট রজারের। সাভোনা হেসে বলল।

- বলেন কি? হ্যারি বলে উঠল।

- হ্যাঁ - কাউন্ট রজারের অনেক এরকম খৃষ্টবন্দনা গীতি এই দক্ষিণ সিসিলিতে আজও গাওয়া হয়। সাভোনা বলল - তাহলে তো কাউন্ট রজার শুধু রাজাই ছিলেন না - সঙ্গীতশিল্পীও ছিলেন। মারিয়া বলল।

- সাভোনা একটু মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল।

গীর্জায় বন্দনাগীতি শেষ হল। গীর্জা থেকে স্ত্রী পুরুষরা বেরিয়ে আসতে লাগলেন। তাঁরা রাজপরিবার অমাত্যদের পরিবারের স্বজন আত্মীয়। স্ত্রীলোকদের পোশাকে কত পারিপাট্য। কত সাজসজ্জা। পুরুষরাও দামি পোশাক পরেছেন। কথাবার্তা বলতে বলতে তাঁরা দুর্গের প্রশস্ত পথ ধরে অন্দরমহলের দিকে চললেন। তাঁরা কথা বলতে বলতেও উৎসুক্যের সঙ্গে ফ্রান্সিসদের এক নজর দেখে গেলেন। বিশেষ করে মারিয়াকে। মারিয়া এতক্ষণে নিজেদের পোশাক সম্পর্কে সচেতন হল। দেখল - নিজের পোশাকটা একসময় দামি কাপড়ে তৈরি করা হয়েছিল। এখন কাপড়ের রঙ জ্বলে গিয়ে ব্যবহারে ব্যবহারে একেবারে ন্যাকড়ার মত হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসের হ্যারির পোশাকেরও এক অবস্থা। মারিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল।

ফ্রান্সিসরা ফিরে আসতে লাগল। পথে মারিয়া কতকটা আপন মনে বলল - আমাদের পোশাক আশাকের যা ছিরি হয়েছে। ওঁদের সামনে লজ্জাই করছিল। ফ্রান্সিসদের মাথায় তখন গুপ্তধনের চিন্তা। ও অন্যমনস্ক ছিল। তবু কথাটা ওর কানে গেল।

ও মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল - মারিয়া পোশাক নিয়ে লজ্জা পাওয়ার কী আছে।

আসল তো মানুষটা যে পোশাক পরে। ভালো ভালো পোশাক তো দোকানেই কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের প্রতি মমত্ববোধ নীতিবোধ মনের উদারতা এসব তো দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না। এসব অনেক কষ্টে অর্জন করতে হয়। বলো ঠিক কি না।

মারিয়া একটু চুপ ক রে থেকে বলল - তুমি এতসব ভাবো?

- নিশ্চয়ই - ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল - জীবন আমাকে অনেককিছু শিখিয়েছে মারিয়া। মারিয়া আর কোন কথা বলল না।

ওরা পাথুরে পথটার একটা বাঁকে এল। ডানদিকের পথটা দুর্গে ওদের ঘরের দিকে চলে গেছে। সোজা পথটা গেছে দুর্গের প্রধান দেউড়ির দিকে।

হঠাৎ মোরাবিত দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্রুদ্ধস্বরে কী বলতে লাগল। হ্যারি লো ল্যাতিন ভাষায় বলা কথাগুলো বুঝল। হ্যারি বলে উঠল - সর্বনাশ।

ফ্রান্সিস বলল — কী ব্যাপার হ্যারি।

মোরাবিত বলছে - ওর সহযোদ্ধারা জলে জঙ্গলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কী কষ্ট সহ্য করছে ওরা আর আমি এখানে নিশ্চিন্তে খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমোচ্ছি। আমি পালাবো।

তখনই দেখা গেল সাভোনা মোরাবিতের দুহাত ধরে কী বোঝাচ্ছে ওকে। মোরাবিত মাথা নাড়তে নাড়তে হঠাৎ এক ঝাঁকুনিতে সাভোনার হাত ছাড়িয়ে সদর দেউড়ির দিকে দ্রুত ছুটল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ওর পেছনে ছুটতে শুরু করল। ডাকতে লাগল মোরাবিত - মোরাবিত। ঠিক তখনই দুজন সৈন্য ওদিক থেকে মোড় ঘুরে মোরাবিতের সামনে এসে পড়ল। মোরাবিতকে ওরা চেনে। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য দুজন খাপ থেকে দ্রুতহাতে তরোয়াল খুলে ফেলল। তরোয়াল উঁচিয়ে দাঁড়াল। মোরাবিত দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন সৈন্য দুপা এগিয়ে এসে মোরাবিতের কাঁধ লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। মোরাবিত এক লাফে সরে এল। তরোয়ালের কোপ লাগল না। সেই সৈন্যটি তরোয়াল উঁচিয়ে ধরার আগেই মোরাবিত শুন্যে লাফিয়ে উঠে সৈন্যটির বুকে লাথি চালাল। সৈন্যটি ছিট্‌কে পাথুরে রাস্তায় পড়ে গেল। ওর হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে পড়ে গেল। মোরাবিত দ্রুত হাতে নিচু হয়ে তরোয়ালটা তুলে নিয়েই অন্য সৈন্যটির মুখোমুখি দাঁড়াল। সৈন্যটি তরোয়াল হাতে মোরাবিতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মোরাবিতের বুকে তো বর্ম নেই। তরোয়ালের ফলা ওর বুক ছুঁয়ে গেল। বুক লম্বালম্বি কেটে গেল। রক্ত বেরোলো।

মোরাবিত সৈন্যটার ওপর লাফিয়ে পড়ার আগেই ফ্রান্সিস পেছন থেকে মোরাবিত কে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। চেঁচিয়ে বলল - সাভোনা - মোরাবিতকে বলুন ও যদি সত্যি ওর মাতৃভূমিকে ভালোবাসে ওর বিদ্রোহী বন্ধুদের ভালবাসে তবে যেন এক্ষুনি অস্ত্রত্যাগ করে। সাভোনা তখনই সেখানে এসে পড়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিসের কথাগুলো ও বলল। মোরাবিত একটু শান্ত হল। তরোয়াল নামাল।

ফ্রান্সিস বলল - সাভোনা - বলো যে এখন একা এত সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া নিরেট বোকামি। ও পালাতে পারবে না বরং মৃত্যু ডেকে আনবে। তাতে না ওর মাতৃভূমির না ওর বিদ্রোহী বন্ধুদের কারো উপকারই হবে না। বরং বেঁচে থাকলে - সময় সুযোগ বুঝে ও পরে লড়াই করবে। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ।



মোরাবিত শূণ্যে লাফিয়ে উঠে সৈন্যটির বুকে লাথি মারলো।

সাভোনা দ্রুত ফ্রান্সিসের কথাগুলো বলে গেল। মোরাবিত চুপ করে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। মন দিয়ে শুনল কথাগুলো। পাথুরে পথে ছিট্‌কে পড়া সৈন্যটি আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্য সৈন্যটি তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল। ফ্রান্সিস মোরাবিতকে ছেড়ে দিয়ে দু'হাত তুলে সৈন্যটির দিকে এগিয়ে এল। চেঁচিয়ে বলল - সাভোনা মোরাবিতকে অস্ত্রত্যাগ করতে বলুন। সাভোনাও চিৎকার করে কথাটা বলল। মোরাবিত হাতের তরোয়াল ফেলে দিল। পাথুরে রাস্তায় শব্দ হল ঝনাৎ। সৈন্যটি তরোয়াল নামাল। ফ্রান্সিস মোরাবিতকে ধরে নিজেদের ঘরের দিকে চলল। পেছনে পেছনে চলল সাভোনা হ্যারি আর মারিয়া।

যেতে যেতে মোরাবিত ক্রুদ্ধভঙ্গীতে বিড় বিড় করে কী বলতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল না। ও গলা চড়িয়ে বলল - সাভোনা - মোরাবিতকে বলো - ও যেন আমার ওপর বিশ্বাস রাখে। যদি সত্যিই শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে নামতে হয় তবে আমি আর আমার বীর বন্ধুরা ওর পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করবো। মৃত্যু হলে মৃত্যুকে মেনে নেব। মোরাবিত যেন এখন আমাদের ভুল না বোঝে। সাভোনা ফ্রান্সিসের কথাগুলো মোরাবিতকে বলে গেল। মোরাবিত একবার ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। কোন কথা বলল না। শান্তভাবে হাঁটতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিসদের জাহাজে কয়েকজন ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হল। এদের মধ্যে ভেক্তর বন্ধুদের এই ক্ষোভকে কাজে লাগাল। আগের কোন অভিযানে ভেক্তর ফ্রান্সিসদের সঙ্গে আসে নি। এবারই প্রথম। ও ক্ষুব্ধ বন্ধুদের কয়েকজনকে বোঝাতে লাগল - এভাবে বিদেশ বিভুঁইয়ে দিনের পর দিন পড়ে থাকা অর্থহীন। ফ্রান্সিসরা পড়ে থাকুক। চলো - আমরা জাহাজের দখল নিয়ে দেশের দিকে জাহাজ চালাই। ফ্রান্সিসরা না হয় পরে অন্য কোন জাহাজে দেশে ফিরবে।

দু'একদিনের মধ্যে ভেক্তরের এইসব কথাবার্তা শুনে বেশ কয়েকজন বন্ধুর মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধল। জাহাজে ফ্রান্সিস আর হ্যারি নেই। বিস্কো আর শাঙ্কো এই বিক্ষোভ আঁচ করতে পারল না। ওদের তখন চিন্তা ফ্রান্সিস গুপ্তধন খুঁজে বের করতে পারল কিনা।

সেদিন দুপুর থেকেই অসহ্য গুমোট আবহাওয়া। সমুদ্রে বাতাস পড়ে গেছে। জলে শান্ত ঢেউ। গরমে ভাইকিংরা দুপুরে কেউ ঘুমুতে পারল না।

বিকেল হতে গরম একটু কমল বটে কিন্তু গুমোট ভাবটা কাটল না।

সন্ধ্যের সময় ভেক্তর বিক্ষুব্ধ বন্ধুদের জড়ো করল জাহাজের হালের দিকে। মাস্তুলের আর সিঁড়িঘরের আড়ালে পড়া জায়গাটায়। এখানে ডেক-এর ওপর ভেক্তর বিক্ষুব্ধ বন্ধুদের নিয়ে একটা ছোটখাটো সভা মত বসাল। ভেক্তর আগের কথাগুলোই বলল।

এবার একজন ভাইকিং বলল - কিন্তু - আমাদের জাহাজ তো সেনাপতি এলাইমোর দুটো জাহাজ পাহারা দিচ্ছে। আমাদের জাহাজেও রয়েছে আটজন সশস্ত্র পাহারাদার সৈন্য। এরমধ্যে আমরা জাহাজ নিয়ে পালাবো কী করে?

ভেক্তর বলল - সেসব পরিকল্পনা আমার ছকা হয়ে গেছে। তোমরা জাহাজ নিয়ে পালাতে রাজি কি না সেটা আগে বলো। প্রায় সকলেই বলে উঠল - হ্যাঁ - আমরা রাজি।

- প্রয়োজনে এলাইমোর সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হবে। বলো - তোমরা রাজি। ভেক্তর বলল।

সবাই বলে উঠলো - হ্যাঁ হ্যাঁ রাজি।

একজন ভাইকিং বলে উঠল - আমরা বহুদিন হল দেশ ছেড়ে এসেছি। এখানে ওখানে বিদেশ বিভুঁইয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর নয়। এবার দেশে ফিরবো। কোন বাধা আমরা মানবো না। প্রায় সকলেই তার কথা সমর্থন করল।

ভেক্তর বলল - আমার সঙ্গে ছজন থাকো। বাকিরা তৈরি থাকো আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ছাড়ার জন্য। যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ চালিয়ে পালাতে হবে। একটু থেমে ভেক্তর বলল এবার সবাই চলে যাও। তারপর বলল - বিস্কো শাঙ্কো যেন ঘুণাক্ষরেও আমাদের এই পরিকল্পনা জানতে না পারে। ওদের সঙ্গে অন্য যারা ফ্রান্সিসের জন্য এখানেই অপেক্ষা করতে চাইবে বা আমাদের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যাবে প্রয়োজনে তাদের আমরা বন্দী করবো। একটু থেমে ভেক্তর বলল - এখন সবাই যাও। এমন স্বাভাবিকভাবে থাকবে যেন কেউ তোমাদের সন্দেহ না করতে পারে। সভা ভেঙে গেল। সবাই চলে গেল। এবার ছজন সঙ্গীকে ভেক্তর বলল - তোমরা কাছাকাছি থাকো। প্রয়োজন পড়লেই তোমাদের যেন হাতের কাছে পাই।

ভেক্তর পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাল। দেখল আকাশে গভীর লাল রঙ ছড়িয়ে আছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ভেক্তর সেইদিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

জাহাজের কেবিন ঘরে বিস্কো শাঙ্কো আর অন্য ভাইকিংরা ভেক্তরের এই পরিকল্পনার কথা কিছুই জানতে পারল না। জানতেও পারল না ওপরে ডেক-এ জড়ো হয়ে ভেক্তর আর ভেক্তরের সঙ্গীরা কী মতলব করছে।

রাত হল। রাত বাড়তে লাগল। ভাইকিংদের রাতের খাওয়ার সময় হয়ে এল।

ভেক্তর একা ডেক থেকে নেমে এল। যতটা নিঃশব্দে সম্ভব ও এল ওদের বৈদ্যির কাছে। কেবিনঘরে যে তিনজন ভাইকিং বন্ধু ছিল তারা ভেক্তরেরই দলের লোক। বৈদ্যি বিছানায় শুয়ে ছিল। ভেক্তর বৈদ্যির পিঠে হাত চেপে বলল এই ওঠো। কথা আছে।

বৈদ্যি উঠে বসল। বলল - কে আবার অসুখে পড়ল?

ভেক্তর গলা নামিয়ে বলল। কেউ না। একটা কথা - তুমি যে ওষুধগুলো দাও তারমধ্যে বিষাক্ত ওষুধও তো আছে।

- হ্যাঁ আছে বৈকি। কাটা ঘায়ে যে হলুদ রঙের ওষুধটা লাগাই ওটা কেউ ভুলে খেয়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। বৈদ্যি বলল।

- যদি খাবারের সঙ্গে খেয়ে ফেলে? ভেক্তর জানতে চাইল।

- তবে একটু দেরি হবে মানে বিষের কাজ শুরু হলেই মারা যাবে। বৈদ্যি একটু থেমে হেসে বলল - তবে শখ করে কেউ খাবারের সঙ্গে বা জলের সঙ্গে খেতে যাবে নাকি?

- কিন্তু শত্রু মারতে তো এই ওষুধটা কাজে লাগানো যায়। ভেক্তর বলল।

- হ্যাঁ তা যায় বৈ কি? বৈদ্যি বলল। বৈদ্যির শিয়রের কাছেই কাঠের তক্তার ওপর সাজানো ওষুধের কাঁচের বোয়ামগুলোর দিকে ভেক্তর তাকালো তারপর হাত বাড়িয়ে হলুদ রঙা ওষুধের বোয়ামটা নিল। তাক থেকে কিছুটা কাগজ ছিঁড়ে নিল। বোয়ামের মুখ খুলল।

বৈদ্যি হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল - কী করছো ভেক্তর?

ভেক্তর বলল - এই ওষুধ কিছুটা নিচ্ছি। বলা যায় না যদি হঠাৎ দরকার পড়ে ভেক্তর হাত ঢুকিয়ে বেশ কিছুটা হলুদ হণ্ডা ওষুধ টুকরো কাগজটায় রাখল। তারপর বোয়াম তুলে রাখল। বৈদ্যি কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। চুপ করে রইল। ভেক্তর ওষুধটা নিয়ে কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে এল। কেবিনঘরের তিনজন ভাইকিং দেখল। কিন্তু বুঝল না কিছুই।

ভেক্তর কিছুক্ষণ পরে ডেক এ উঠে এল। সঙ্গী ছজনকে ইশারায় ডাকল। ওরা কাছে এলে ভেক্তর ওদের সঙ্গে নিয়ে এলাইমোর পাহারাদার সৈন্যদের কাছে গেল। হেসে বলল - সৈন্যভাইরা একটা কথা বলছিলাম। সৈন্যরা ওর স্পেনীয় ভাষা বুঝল না। এবার ভেক্তর হেসে হেসে হাতের ইঙ্গিতে ওদের একসঙ্গে খেতে আমন্ত্রণ জানাল। সৈন্যরা কিছুটা বলল। কেউ কেউ হাসল।

ভেক্তরের নির্দেশমত হালের কাছে ডেক-এর ওপর ততক্ষণে দুজন ভাইকিং দুসারিতে পাতা কাঠের থালায় গরম গরম রুটি ভেড়ার মাংসের ঝোল সাজিয়ে দিয়েছে। এবার এলাইমোর সৈন্যরা বুঝল। ভেক্তর হেসে ওদের খেতে আসতে বলল। সৈন্যরা খুব খুশী। খোলা তরোয়াল কোমরের খাপে ঢুকিয়ে রেখে খেতে এল। ভেক্তর হেসে হেসে ওদের একটা সারিতে বসতে বলল। সৈন্যরা খেতে বসে পড়ল। অন্য সারিটার সামনে বসল ছজন সঙ্গীসহ ভেক্তর। সবাই খাওয়া শুরু করল।

ভেক্তর খাচ্ছে কিন্তু ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে সৈন্যদের দিকে। খেতে খেতে হঠাৎ একজন সৈন্য ওয়াক তুলে বমি করবে বলে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু দুপা এগিয়েই কাঠের ডেক-এ গড়িয়ে পড়ল। অন্য একজন সৈন্য কয়েকবার ওয়াক তুলে শুয়ে পড়ল। একে একে সাতজন সৈন্যই বিষাক্ত খাবার খেয়ে মারা পড়ল। ঠিক তখনই সমুদ্রের স্তব্ধ পরিবেশে একটা শোঁ শোঁ শব্দ উঠল। পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহাজটার ওপর। কালো দেয়ালের মত ঢেউ ভেঙে পড়ল জাহাজের ডেক-এ। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল, গম্ভীরধ্বনিতে বাজ পড়ল। শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি সেইসঙ্গে মুহুর্মুহু আকাশ জুড়ে বাজ পড়া।

ভীষণ দুলছে জাহাজটা। ওর মধ্যেই ভেক্তর চেঁচিয়ে বলল - সৈন্যদের উষ্ণীষ বর্ম তরোয়াল খুলে নাও।

ওর ছজন সঙ্গী ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈন্যদের ওপর।

সৈন্যরা তখন কেউ কেউ মারা গেছে। কেউ কেউ চেতনা হারিয়েছে। তীব্র বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছে তখন। উষ্ণীষ বর্ম তরোয়াল খুলে নিয়ে ভেক্তরের সঙ্গীরা মৃত সৈন্যদের হালের দিকের রেলিঙের কাছে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল। তারপর গড়িয়ে ফেলে দিল ঝড়বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলে। ভেক্তরের সঙ্গীরা সৈন্যদের উষ্ণীষ মাথায় পরল। বর্ম বুকে বাঁধল। তরোয়াল খাপে গুঁজে রাখল। এত কান্ড দুপাশের পাহারাদার জাহাজ থেকে এলাইমোর কোন সৈন্য দেখতে পেল না। কারণ প্রচন্ড ঝড়ে দুটো জাহাজই ঢেউয়ের ধাক্কায় প্রবল বেগে উঠছে পড়ছে।

অন্ধকারে চারপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এলাইমোর পাহারাদার জাহাজদুটো বৃষ্টির ঝাপটার সাদা ধোঁয়াটে আস্তরনের মধ্যে দিয়ে ঝাপ্‌সা দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের ধাক্কায় উঠ্‌ছে পড়ছে। ভীষণভাবে এপাশে ওপাশে দুলছে। হঠাৎ কখনো বিদ্যুতের তীব্র ঝলকানিতে জাহাজ দুটো দেখা যাচ্ছে। পরক্ষণেই বৃষ্টির ঝাপটায় ধোঁয়াটে চারপাশ।



ঢেউ আছড়ে পড়ল জাহাজের ওপর।

ফ্রান্সিসদের জাহাজেও চলছে প্রচন্ড দুলুনি। কেউ ভালো করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। প্রায় সব ভাইকিংরাই সিঁড়ি দিয়ে নিচে কেবিনঘরে নেমে গেছে। ভেক্তরের দুজন সঙ্গী মাস্তুল আঁকড়ে কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে। ভেক্তর এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। ও নিজে তখনও ডেক-এ রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর তখন লক্ষ্য নোঙর তুলে জাহাজ গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া। বিদ্যুতের আলোয় ভেক্তর দুজন সঙ্গীকে দেখল। ও ডেক এর ওপর হামাগুড়ি দিয়ে কখনও গড়াতে গড়াতে ঐ সঙ্গী দুজনের কাছে এল। সঙ্গী দুজনের কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে বলতে লাগল - শিগ্‌গির নোঙর তোল। নোঙর তোল জাহাজ ছাড়ো মাঝ সমুদ্রের দিকে। জলদি - । সঙ্গী দুজন মাস্তুল ছেড়ে ডেক-এ বুক দিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্ধকারে হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলল নোঙর বাঁধা দড়ির দিকে। বেশ কসরৎ করে অনেক কষ্টে নোঙর তুলে ফেলল।

নোঙর তোলা হতেই ঝড়ের প্রচন্ড ধাক্কায় জাহাজটা কাত হয়ে যেন ছুটে চলল।

এতসব কান্ড ঘটেছে বিস্কো শাঙ্কো তার কিছুই জানে না। ওরা তখন নিজেদের কেবিনঘরে। বিস্কো বিছানায় শুয়ে আছে। শাঙ্কো ওর বিছানায় বসে বিস্কোর সঙ্গে গল্পগুজব করছে। সেই কেবিনঘরে আরো দুজন ভাইকিং বন্ধু বিছানায় বসে ছক্কা পাঞ্জা খেলছে। জাহাজ যে সমুদ্রে ভেসে চলেছে এটা জাহাজের দুলুনিতে ঝড়ের মাতনে ওরা বুঝতেও পারে নি।

কিছুক্ষণ পরেই ঝড়ের প্রচণ্ডতা কমল। আকাশে মেঘ কেটে যেতে লাগল। সমুদ্র শান্ত হতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ভাঙা অনুজ্জ্বল চাঁদটা দেখা গেল। বাতাসের বেগ অনেক কমে গেল। সমুদ্র শান্ত হল।

অন্য ভাইকিং বন্ধুদের সঙ্গে বিস্কো আর শাঙ্কো রাতের খাবার খেতে খাবার ঘরে এল। দেখল - অস্ত্র সজ্জিত ভেক্তর আর তার অনুগামি বন্ধুরা খাওয়া শেষ করে উঠছে। বিস্কো আর শাঙ্কো ওদের শিরস্ত্রান বর্ম পরা দেখে বেশ আশ্চর্য হল।

বিস্কোর সঙ্গী কয়েকজনও অবাক। ওদের কোমরে বাঁধা তরোয়ালও সোজা লম্বাটে। বাঁকা নয়।

বিস্কো এগিয়ে গিয়ে ভেক্তরকে জিজ্ঞেস করল - কী ব্যাপার? এলাইমোর সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র তোমরা পেলে কী করে?

- এলাইমোর পাহারাদার সৈন্যরা কেউ বেঁচে নেই। ভেক্তর বলল,

- তার মানে? শাঙ্কো - বলে উঠল।

- ওদের নিকেশ করা হয়েছে। ভেক্তরের পাশে দাঁড়ানো সঙ্গীটি বলল। বিস্কো চেঁচিয়ে বলে উঠল - সর্বনাশ। আমাদের দুপাশে এলাইমোর জাহাজ ঘিরে আছে। ওরা এই হত্যার কথা জানতে পারলেই আমাদের আক্রমণ করবে। তখন নিরস্ত্র আমরা কেউ বাঁচবো না। ফ্রান্সিসদেরও মেরে ফেলা হবে।

একটু থেমে বিস্কো বলল - তোমাদের কে বলেছে ওদের একেবারে প্রাণে মেরে ফেলতে?

- আমি বলেছি। ভেক্তর গম্ভীরগলায় বলল।

- এরকম একটা সাংঘাতিক কাজ করলে তুমি? শাঙ্কো বলল।

ভেক্কর বেশ ঠান্ডা মেজাজে বলল - এখন এলাইমোর দুটো পাহারাদার জাহাজ অনেক দূরে।

- তার মানে? বিস্কো বেশ আশ্চর্য হয়েই বলল।

- আমাদের জাহাজ এখন মাঝ সমুদ্রের দিকে চলেছে। ডেকএ উঠে দেখগে। ভেক্করের একজন সঙ্গী বলল।

- বলো কি? বিস্কো শাঙ্কোর মুখের দিকে তাকাল।

তারপরে দুজনেই ছুটল ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে। ডেক-এ উঠে দেখল জাহাজের পাল খাটানো হয়েছে। জোর বাতাসে খোলা পাল ফুলে উঠেছে। জাহাজ দ্রুত চলেছে ঢেউ ভেঙে। বিস্কো ভেবে পেল না এখন কী করবে। শাঙ্কোও অবাক।

তখনই ভেক্কর ওর সশস্ত্র সঙ্গীদের নিয়ে ডেক-এ উঠে বিস্কোদের কাছে এল। বিস্কো ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল - ভেক্কর - জাহাজ ফেরাও সিরাকস বন্দরের দিকে। ফ্রান্সিসদের ফেলে রেখে আমরা দেশে ফিরতে চাইনা। ভেক্কর কুটিল হাসি হাসল - ফ্রান্সিসের কথা ভুলে যাও। এখন এই জাহাজের ক্যাপ্টেন আমি। আমি যা বলবো তাই হবে। আমি হুকুম দিয়েছি জাহাজ দেশের দিকে চালাতে।

- কিন্তু - ফ্রান্সিসদের এই বিদেশ বিভুঁইয়ে ফেলে রেখে আমরা চলে যাবো? ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া - এরা কি আমাদের বন্ধু নয়? শাঙ্কো বলল।

- ফ্রান্সিসের পাগলামিকে আমরা আর প্রশ্রয় দেব না। ভেক্করের এক সঙ্গী বলল।

- কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আবিষ্কার করতে গেছে ফ্রান্সিস। এরমধ্যে পাগলামির কী দেখলে? শাঙ্কো বলল।

- ফ্রান্সিস কোনদিন এ গুপ্তধন আবিষ্কার করতে পারবে না। ভেক্কর হেসে বলল।

- ভেক্কর - বিস্কো বলল - তুমি এই অভিযানে প্রথম এসেছো। তাই জানো না ফ্রান্সিস কত শক্ত শক্ত ধাঁধার সমাধান করেছে। সোনার ঘন্টা, হাঁসের ডিমের মত মুক্তো উদ্ধার করেছে। ফ্রান্সিসের চেয়ে হয়তো বেশি বলশালী তুমি। কিন্তু ফ্রান্সিসের বুদ্ধি চিন্তা ধীশক্তির কাছে তুমি ছেলেমানুষ। সবচেয়ে বড় কথা - ফ্রান্সিস বন্ধুদের বাঁচাবার জন্যে নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত সবসময় - যে কোন মুহূর্তে। একটু থেমে বিস্কো বলল - সেই তুমি ফ্রান্সিসের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছো - কিছু বন্ধুকে ক্ষেপিয়ে-।

বিস্কো কথাটা শেষ করতে পারল না। ভেক্কর একটানে কোমর থেকে তরোয়াল খুলে বিস্কোর বুকের ওপর তরোয়ালের ডগাটা চেপে ধরল। কঠিনস্বরে বলল - এই জাহাজে যে আমার হুকুম অমান্য করবে তাকেই বন্দী করে রাখবো।

বিস্কো শাঙ্কোর পেছনে দাঁড়ানো কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু চিৎকার করে বলল - তোমার হুকুম আমরা মানবো না। আমাদের নেতা ফ্রান্সিস। ওরা এই কথা বলেই ছুটলো নিচে নামার সিঁড়ির দিকে। লক্ষ্য অস্ত্রঘর।

ওরা অস্ত্রঘরের সামনে এসে দেখল - ভেক্করের দলের দুজন ভাইকিং উষ্ণীষ বর্ম পরে খোলা তরোয়াল হাতে অস্ত্রঘর পাহারা দিচ্ছে। ওরা বুঝল ভেক্কর দল পাকিয়েছে। ওদের দেশে ফেরার লোভ দেখিয়েছে। অনেকদিন ওরা দেশ ছেড়ে এসেছে। দেশে ফেরার জন্য ওরা আকুল।

হয়ে উঠেছে। কাজেই সহজেই ভেস্তুরের দলে গিয়ে ভিড়েছে। ভুলে গেছে ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়ার কথা। যে দুজন এলাইমোর সৈন্যদের পোশাক পরে অস্ত্রঘর পাহারা দিচ্ছে তারা তো ভাইকিং ওদের সুখদুঃখের বন্ধু। ভাইয়ের মত। স্বদেশবাসী। ওদের দুজনকে কাবু করা যায়। কিন্তু তাতে রক্তপাত হবেই। ভেস্তুরের বিরোধীরা বুঝে উঠতে পারলো না এখন কী করবে। ওদিকে জাহাজ চলেছে। সিরাকস বন্দর থেকে অনেকটা চলে এসেছে। জাহাজ এখনি ফেরাতে হবে।

ফ্রান্সিসের বন্ধুরা অস্ত্রঘরের সামনে থেকে সরে এল। নিজেদের মধ্যে নিচুস্বরে কথা বলল। স্থির হল ঐ দুজন ভেস্তুরের দলের পাহারাদারকে আক্রমন করে অস্ত্রঘর দখল করতে হবে।

ওরা পরামর্শ সেরে আস্তে আস্তে অস্ত্রঘরের দিকে চলল। তারপরে একসঙ্গে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঐ দুজন পাহারাদারের ওপর। আচমকা এই আক্রমণে পাহারাদার দুজন কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। একজন তো ছিটকে কাঠের মেঝেয় পড়ে গেল। ওর হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। অন্যজন কিন্তু দ্রুত হাতে তরোয়াল চালাতে লাগল। নিরস্ত্র দু'তিনজন কাঁধে বুকে তরোয়ালের ঘা লেগে আহত হল। রক্তে ভিজে গেল ওদের শরীর। কিন্তু পাহারাদারটি ততক্ষণে কাঠের মেঝেয় ওদের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে। একজন ওর তরোয়াল ধরা হাতটা বাঁটসুদ্ধু পা দিয়ে চেপে ধরল। ও যন্ত্রনায় কঁকিয়ে উঠে তরোয়াল ছেড়ে দিল।

ওরা ভেস্তুরের দলের পাহারাদার দুজনকে অল্পক্ষণের মধ্যেই দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। অস্ত্রঘরের একপাশে ওদের ফেলে রাখল। তরোয়ালের ঘায়ে যারা আহত হয়েছিল তাদের দুজন বন্ধু নিয়ে চলল বৈদ্যির কাছে। এইপ্রথম ভাইকিং বন্ধুরা বন্ধুর রক্ত ঝরালো। ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি নিজেদের মধ্যে লড়াই হবে কোনোদিন।

ওরা এবার অস্ত্রঘর থেকে তরোয়াল বর্শা দ্রুত হাতে তুলে নিয়ে ছুটল ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে।

ডেক-এ তখন বিস্কো আর শাঙ্কোর দুহাত দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়ে গেছে। ওদের বন্ধুর দল তরোয়াল বর্শা উঁচিয়ে ছুটে এল ওদের মুক্ত করতে। ভেস্তুরের দল তো আগে থেকেই যুদ্ধসাজে তৈরি হয়ে আছে। ওরাও ভেস্তুরের নেতৃত্বে তরোয়াল উঁচিয়ে রুখে দাঁড়াল। ভাইকিংরা নিজেদের মধ্যে লড়াই-এর জন্যে প্রস্তুত তখন। লড়াই মৃত্যু রক্তপাত অনিবার্য।

বিস্কো বাঁধা দুহাত তুলে চিৎকার করে বলে উঠল - এ কী করছো? আমরা ভাইকিং এক দেশের মানুষ - ভাই আমরা - বন্ধু -। আমরা পরস্পর লড়াই করবো - ভাইয়ের রক্তে হাত রাঙাবো? দুদলই থমকে দাঁড়াল।

শাঙ্কো চিৎকার করে বলল - ভেস্তুর এবার দেখো - তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছো। আমরা যারা এতদিন পরস্পরের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম আজ সেই আমরা পরস্পরের প্রাণ নেবার জন্যে তরোয়াল ধরেছি।

- ভাইসব বিস্কো চিৎকার করে বলল - অস্ত্র নামাও।

দুদল ভাইকিংরাই একটু দ্বিধার পর বিস্কোর কথা মেনে নিল। আস্তে আস্তে তরোয়াল নামাল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শাঙ্কো ভেস্তুরের দিকে তাকিয়ে বলল - ভেস্তুর এবার বলো তোমরা কী চাও? ভেস্তুর বেশ

রাগতস্বরে বলল - তোমাদের দুজনকে আমরা নিকেশ করে দিতাম। কিন্তু তা করিনি।

- কেন? বিস্কো বলল।

- কারণ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে গেলেও তোমরা আমাদের বন্ধু।

বিস্কো দেখে বলল - এখন আর সে কথা ওঠে না। আমরা পরস্পর আর বন্ধু নেই।

- যাক গে - ভেক্তর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বাঁ হাত ঘুরিয়ে বলল - তোমাদের দুজনকে কেবিন ঘরে বন্দী করে রেখে আমরা জাহাজ চালিয়ে দেশে ফিরে যাবো।

- না - বিস্কো বলল - ফ্রান্সিসদের এইভাবে বিদেশের মাটিতে ফেলে রেখে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না, একটু থেমে বিস্কো বলল - বরং সামনের কোন বন্দরে আমরা নেমে যাবো। তারপর অন্য কোন জাহাজে চড়ে সিরাকস বন্দরে ফিরে যাবো। ফ্রান্সিসের কাজ শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবো। ফ্রান্সিস কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আবিষ্কার করবেই - এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ভেক্তর হেসে বলল - ফ্রান্সিস জীবন থাকতে সেটা পারবে না।

- দেখা যাক - শাঙ্কো বলল - যদি তার জন্যে ফ্রান্সিস সারা জীবন এই সিসিলি দ্বীপেই থাকে তাহলে আমরাও থাকবো।

- ঠিক আছে - ভেক্তর বলল - তোমাদের সামনের বন্দরেই নামিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তার আগে তোমাদের সবাইকে অস্ত্রত্যাগ করতে হবে। সব অস্ত্র অস্ত্রঘরে জমা রাখতে হবে। সেই অস্ত্রঘর একেবারে বন্ধ করে রাখা হবে যাতে তোমরা কেউ অস্ত্র হাতে নিতে না পারো।

বিস্কো শাঙ্কোর বন্ধুরা চেঁচিয়ে বলল - ঠিক আছে। কিন্তু তোমাদেরও অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে।

- না আমরা সশস্ত্রই থাকবো। ভেক্তর দৃঢ়স্বরে বলল। বিস্কো শাঙ্কোর বন্ধুরা চেঁচিয়ে উঠল - না।

বিস্কো বুঝল - বিপদ। দুদলই যেভাবে উত্তেজিত তাতে সংঘর্ষ, রক্তক্ষয় মৃত্যু অনিবার্য। বিস্কো বাঁধা দুহাত ওপরে তুলে চিৎকার করে বলে উঠল - থামো। উত্তেজিত দুদলই একটু থমকালো। উদ্যত তরোয়াল বর্শা নামালো কেউ কেউ। বিস্কো চিৎকার করে বলতে লাগল - ভাইসব - ভুলে যেও না আমরা ভাইকিং - এক জাতি আমরা - পরস্পরের ভাই।' একটু থেমে বিস্কো এবার ভেক্তরের দিকে তাকাল। বলল - ভেকতর - তুমি আমাদের কোথায় নামিয়ে এনেছো দেখ। ভাই অস্ত্র ধরেছে ভাইয়ের বিরুদ্ধে।

- তার জন্যে আমি দায়ী নই। ভেক্তর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

- না - তুমিই দায়ী - বিস্কো বেশ গলা চড়িয়ে বলল - আমাদের মত যারা জাহাজে জাহাজে দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়ায় মাটির প্রতি তাদের তীব্র আকর্ষন থাকে। আবার সেই মাটি যদি হয় স্বদেশের মাটি তাহলে সেই আকর্ষন হয়ে ওঠে আরো দুর্বার। তুমি আমার বন্ধুদের সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছো। আমাদের বন্ধুদের ক্ষেপিয়ে তুলে - বিস্কো কথাটা শেষ করতে পারলো না।

ভেক্তর এক লাফ দিয়ে ছুটে এসে বিস্কোর বুকে তরোয়ালের ডগাটা চেপে ধরল। দাঁত-চাপাস্বরে বলল - আর একটা কথা বললে তোমাকে নিকেশ করবো। বিস্কোর বন্ধুরা বুঝে উঠতে পারলো না কী করবে। ভেক্তর ওদের দিকে তাকিয়ে বলল - তোমরা হাতের অস্ত্র ফেলে দাও।

ওরা তখনও বিস্ময়বিমূঢ়। ভেক্তর চেঁচিয়ে বলল - অস্ত্রত্যাগ কর নইলে বিস্কোর প্রান যাবে। বিস্কোও বলে উঠল - অস্ত্র রেখে দাও। ওরা অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারল। ওরা বুঝল এখন লড়াইয়ে নামলে ভেক্তর প্রথমেই বিস্কোকে হত্যা করবে। ওরা আস্তে আস্তে হাতের তরোয়াল বর্শা ডেকএর ওপর ফেলে দিল। শব্দ হল ঝনাৎ - ঝন্ - ঝনাৎ।

ওদিকে পূব আকাশে সূর্য উঠেছে। ভোরের নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে সমুদ্রের নীলাভ জলে জাহাজে। সমুদ্র বেশ শান্ত।

ভেক্তর ওর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল - তোমরা চারজন বিস্কো আর শাঙ্কোকে নিয়ে যাও। একটা ঘরে ওদের দুজনকে বন্দী করে রাখো। দরজায় তালা দিয়ে সবসময় একজন পাহারা দেবে। বাকি এই অস্ত্রগুলো নিয়ে অস্ত্রঘরে রেখে দাও। দরজায় তালা দিয়ে দুজন পাহারায় থাকবে।

ভেক্তরের নির্দেশমত ওরা বিস্কো ও শাঙ্কোর সামনে এসে দাঁড়াল। বিস্কো কোন আপত্তি করল না। ক্রুদ্ধস্বরে বলল - শাঙ্কো চলো। বিস্কো নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে চলল। শাঙ্কোও চলল ওর পেছনে পেছনে। ভেক্তরের সঙ্গীরা খোলা তরোয়াল হাতে ওদের পেছনে পেছনে চলল। অন্য দুজন ডেক থেকে সমস্ত অস্ত্র তুলে নিয়ে চলল।

যেতে যেতে পেছন ফিরে বিস্কো বন্ধুদের বলল - ভেক্তরদের সঙ্গে কেউ লড়াই করতে যাবে না। সামনের কোন বন্দরে আমরা নেমে যাবো। অপেক্ষা করবো অন্য জাহাজের জন্যে। জাহাজ পেলে আমরা ফিরে যাবো সিরাকস বন্দরে। সব করতে হবে শান্তিতে। বন্ধুদের রক্তপাত মৃত্যু আমরা চাই না। বিস্কোরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। বিস্কোর কেবিনঘরে বিস্কো আর শাঙ্কোকে বন্দী করে রাখা হল। দরজায় তালা দিয়ে পাহারাদার দাঁড়াল। অস্ত্র রেখে অস্ত্রঘরেও তালা লাগানো হল।

বিস্কো বিছানায় আধশোয়া হল। ওর মাথায় তখন অনেক চিন্তা। যদি ওর দলের বন্ধুরা ভেক্তরদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামে তাহলে রক্তপাত মৃত্যু অনিবার্য। যে করে হোক এই লড়াই হতে দেওয়া চলবে না। কিন্তু এখন তো ও নিজে বন্দী। কিছু যদি ঘটে যায় ও কিছুই করতে পারবে না। ভয় আশঙ্কাটা এখানেই।

তখন বেলা হয়েছে। সমুদ্রে বাতাস পড়ে গেছে। জাহাজের পালগুলো নেতিয়ে পড়েছে। জাহাজের গতি অনেক কমে গেছে।

বাঁ দিকে লিপারি দ্বীপের তটভূমি দেখা গেল। ছোট্ট একটা বন্দর মত জায়গা থেকে একটা জাহাজ বিস্কোদের জাহাজের দিকে আসছে দেখা গেল। জাহাজ চালকের পাশেই সশস্ত্র ভেক্তর দাঁড়িয়ে ছিল। ও ঠিক বুঝল না ঐ জাহাজটা কাদের। এটাও বুঝল না জাহাজটা ওদের জাহাজ লক্ষ্য করেই আসছে কিনা। জাহাজটা ওদের জাহাজের পাশ কাটিয়ে চলে যাবে বলেই ভেক্তরের মনে হল। হয়তো তাই যেত। ঐ জাহাজটা ছিল সেনাপতি এলাইমোর সৈন্যদের। মোরাবিত আর সাভোনার বিদ্রোহী বন্ধুদের বিদ্রোহ দমন করে ওরা ফিরে আসছিল। জাহাজটা বিস্কোদের জাহাজের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

তখনই এলাইমোর সৈন্যদের দলপতি লক্ষ্য করল বিস্কোদের জাহাজে ওদেরই মত অস্ত্র পোশাকে সজ্জিত ভেক্তর আর ওর বন্ধুদের কয়েকজনকে। ওরা ঠিক বুঝল না - এরা কারা?

জাহাজে ভাইকিংদের পোশাক পরা জনা কয়েককেও ওরা দেখল। দলপতি বুঝল কিছু বিদেশীও ঐ জাহাজে আছে। দলপতির সন্দেহ বাড়ল। ও দাঁড়িদের নির্দেশ দিল দাঁড় বাইবার জন্যে। সিঁড়ি নেমে দাঁড়িরা ছুটল দাঁড় ঘরের দিকে। সারি সারি কাঠের আসনে বসে পড়ল দাঁড় তুলে নিল। সমুদ্রের জলে দাঁড় পড়তে লাগল - ছপ্ - ছপ্। জাহাজের গতি বাড়ল। দ্রুত ছুটল বিস্কোদের জাহাজ লক্ষ্য করে।

ওদিকে ভেক্তর বুঝতে পারল যে ঐ ছুটে আসা জাহাজটা যাদেরই হোক তারা ওদের জাহাজটা ধরতেই আসছে। ভেক্তর তাড়াতাড়ি চিৎকার করে বলল - দাঁড়ঘরে যাও। প্রাণপণে দাঁড় বাও। ঐ জাহাজটা আমাদের কাছে আসার আগেই আমাদের পালাতে হবে। কিন্তু ভেক্তরের দলের লোক তো বেশি নয়। তবু তারা ছুটল দাঁড়ঘরের দিকে। দাঁড় বাওয়াও শুরু হল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই এলাইমোর সৈন্যদের জাহাজ বিস্কোদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। কেঁপে উঠল দুটো জাহাজই। দলপতির সঙ্গে আট দশজন সৈন্য বিস্কোদের জাহাজে উঠে এল। দলপতি ডেক-এর ওপর দাঁড়ানো ভাইকিংদের দেখল। তখনই ভেক্তর চাপাস্বরে পাশের ভাইকিংকে বলল - শিগগির যাও। অস্ত্রঘরের আর বিস্কোদের ঘরের পাহারাদারদের এক্ষুনি ডেক-এ আসতে বল। ওরা সশস্ত্র। লড়াই হলে ওদের থাকতেই হবে। ভাইকিংটি দ্রুত পায়ে ছুটল নিচে নামার সিঁড়ির দিকে।

নিজেদের কেবিনঘরে বন্দী বিস্কো আর শাঙ্কো ঘরের বাইরে ভেক্তরের দলের লোকদের দ্রুতপায়ে ছুটোছুটির শব্দ শুনল। বুঝল - ডেক-এ কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু বুঝল না কী ঘটেছে।

তখনই ওদের কেবিনঘরের দরজায় ধাক্কা দিল কারা। দুজনেই বিছানা ছেড়ে উঠে দ্রুত দরজার কাছে এল। ওদিকে কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু দরজার তালার ওপর হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল। কয়েকটা প্রচন্ড ঘা পড়তেই তালা ভেঙে পড়ে গেল। দরজা খুলে গেল। বন্ধুরা ঘরে ঢুকল। জাহাজের বৈদ্যিও ঢুকল ওদের সঙ্গে। বিস্কোর দিকে তাকিয়ে বলল - বিস্কো - তুমি একটা সাংঘাতিক ঘটনা জানো না। বিস্কোরা ওর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

— বিস্কো- ভেক্তরের দল আমার বিযাক্ত ওযুধ খাইয়ে এলাইমোর আটজন সৈন্যকে মেরে ফেলেছে। বৈদ্যি বলল।

বিস্কো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারপর বলল — কী সাংঘাতিক। কিন্তু তুমি ওযুধ দিলে কেন?

— ভেক্তর চাইল। বলল আহত স্থানে লাগাবে। বৈদ্যি বলল।

— কী মারাত্মক ভুল করেছো ভেক্তরকে বিশ্বাস করে। বিস্কো মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল। এবার একজন ভাইকিং বন্ধু ভেক্তররা কী নৃশংস-সভাবে এলাইমোর সৈন্যদের হত্যা করেছে সে সব কথা বলল।

বিস্কো বলে উঠল -ঈস।— ভেক্তররা শেষ পর্যন্ত এই নিষ্ঠুর কাজ করল। আমরা যুদ্ধ করেছি- আমার বন্ধুরা সামনা সামনি লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু কক্ষণো এইরকম নিষ্ঠুরভাবে নিরপরাধ সৈন্যদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়ে এভাবে মারেনি। ভেক্তররা ভাইকিং জাতির কলঙ্ক।

একজন ভাইকিং বন্ধু তাড়া দিল বিস্কো শাঙ্কো ডেক-এ চলো। একদল সৈন্য জাহাজে চড়ে এসে আমাদের জাহাজে উঠেছে। মনে হচ্ছে ওরা এলাইমোর সৈন্য। শিগগির চলো!

ওরা ছুটল সিঁড়ির দিকে। ডেক-এ এসে দেখল— ভেক্তর তার দলবল নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য জাহাজের সৈন্যদের দলপতিও সঙ্গে জনা দশবারো সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে জাহাজটা ঘুরে ঘুরে দেখছে।

একটু পরেই সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে দলপতি ভেক্তরদের দিকে এগিয়ে এল। ভেক্তরের দিকে তাকিয়ে লো ল্যাটিন ভাষায় জিজ্ঞেস করল— তোমরা কে? কোত্থেকে আসছো? ভেক্তররা সেই ভাষা কিছুই বুঝল না। বিস্কোরাও বুঝল না।

তবে ভেক্তর আন্দাজে বুঝে নিয়ে বলল- আমরা ভাইকিং-ভাইকিং-সিরাকস বন্দর-সিরাকস আসছি। দলপতি এটুকু বুঝল যে ওরা বিদেশী। সিরাকস বন্দর থেকে জাহাজে চড়ে আসছে।

দলপতি লো ল্যাতিন ভাষাতেই বলল - তোমরা আমাদের অস্ত্র পোশাক কী করে পেলে? ভেক্তর কথাটা বুঝলনা। তখন দলপতি ওর নিজের শিরস্ত্রান বর্ম তরোয়াল আঙ্গুল ঠুকে দেখাতে লাগল।

এবার ভেক্তর বুঝল। ও হেসে তাড়াতাড়ি বলে উঠল — ক্রীট-ক্রীট-খানিয়া-খানিয়া। বোঝাতে চাইল ক্রীটের রাজধানী খানিয়া নগর থেকে এনেছে। দলপতি বুঝল সেটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলনা। ভেক্তরের দল বিস্কো শাঙ্কোদের দল তখনও বুঝে উঠতে পারছে না কী ঘটবে এরপরে? তবে বিস্কো বুঝল ঐ দলপতির সন্দেহ যায় নি।

হঠাৎ ভেক্তর কিছু বুঝে ওঠার আগেই দলপতি খুব দ্রুত দুপা ছুটে এসে ভেক্তরের কোমরের ঝোলানো তরোয়ালটা এক ঝটকায় খুলে নিল।

ভেক্তর চিৎকার করে বলে উঠল - বন্ধুরা - তৈরি হও। ভেক্তরের দলের ভাইকিংরা কোমরে তরোয়ালের বাঁটে হাত রাখল।

দলপতি হাতের খোলা তরোয়ালটা চোখের কাছে আনল। দেখল-তরোয়ালের বাঁটের ঠিক নিচেই একটা ট্যাড়া চিহ্ন খোদাই করা। ট্যাড়া চিহ্নের মাথায় দুটো ফুটকি। এটা রাজা ফ্রেডারিকের রাজকীয় চিহ্ন। রাজার সৈন্যদের তরোয়ালে ঐ জায়গায় এই রাজকীয় চিহ্ন খোদাই করা থাকে। দলপতির সন্দেহ এবার দৃঢ় হল। স্পষ্ট বুঝল ওদের সৈন্যদের হত্যা করে ভেক্তররা এই অস্ত্র পোশাক সংগ্রহ করেছে।

দলপতি চিৎকার ক'রে কী ব'লে উঠল। সেনাপতির সঙ্গী সৈন্যরা তরোয়াল কোষমুক্ত করল। ওপরের দিকে তুলে ধরল। উজ্জ্বল রোদ পড়ে চকচকে তরোয়ালের ফলাগুলো ঝলসে উঠল। ভেক্তরের বন্ধুরাও তরোয়াল কোষমুক্ত করল। একজন ভেক্তরের খালি হাতে একটা তরোয়াল দিল।

দলপতির জাহাজ থেকে আরো সৈন্য চিৎকার করে খোলা তরোয়াল হাতে এই জাহাজে উঠে এল।

সৈন্যরা ভেক্তরের দলের ওপর তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। অল্পক্ষণের মধ্যেই তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দে আহতের গোঙানিতে মৃত্যু-চিৎকারের

জাহাজের ডেক ভরে তুলল।

বিস্কো শাঙ্কো আর ওদের বন্ধুরা তখনও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে এই লড়াই দেখতে লাগল। হাজার হোক ওরা তো ভাইকিং। বীরের জাত। চোখের সামনে বন্ধুদের এই ভাবে আহত হ'তে মৃত্যু হ'তে দেখে ওরা স্থির থাকতে পারল না। দু'তিনজন বিস্কোর কাছে ছুটে এল। উত্তেজিত স্বরে বলল — বিস্কো -আমাদের বন্ধুরা মারা যাচ্ছে। আমরা লড়াই করবো। বিস্কো চেঁচিয়ে বলল — না — ওরা যে নির্মম কাজ করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত ওদের করতে দাও। ওদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল দলনেতার সৈন্যরা সংখ্যাই শুধু বেশি নয় যুদ্ধেও নিপুণ। শুরু হ'ল ভেক্তরের দলের হার। আসলে ভেক্তরের দলে নিপুণ ভাইকিং যোদ্ধারা বেশি ছিল না।

তখন ভেক্তর আর দলপতির মধ্যে তরোয়ালের লড়াই চলছে। এগিয়ে পিছিয়ে লড়াই চলছে। ভেক্তরের মাথায় শিরস্ত্রান। বুকে বর্ম আঁটা। ওকে তরোয়ালের ঘায়ে কাবু করতে পারছিল না দলপতি। হঠাৎ দলপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ভেক্তর। দলপতি এই হঠাৎ আক্রমন ঠেকাতে ঠেকাতে পিছিয়ে যেতে লাগল। একসময় জাহাজের রেলিঙের ওপর পিঠ রেখে তরোয়াল চালিয়ে আত্মরক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ভেক্তরের প্রবল আক্রমণের মুখে এক মুহূর্তের জন্য হার মানল। দলপতি রেলিঙের ওপর প্রায় চিৎ হয়ে পড়ল। দুজনেই তখন ভীষণ হাঁপাচ্ছে। দলপতির মাথা থেকে শিরস্ত্রান খসে পড়ল সমুদ্রের জলে। ভেক্তর এই সুযোগ ছাড়ল না। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে ও দলপতির মাথা লক্ষ্য ক'রে তরোয়াল চালল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভেক্তরের। মাস্তুলের ঝুলন্ত দড়িতে লাগল মাথার ওপর থেকে নেমে আসা তরোয়ালের কোপ। দড়ি কেটে গেল বটে। কিন্তু আচমকা বাধায় ভেক্তরের হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। দলপতি উঠে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্র ভেক্তরের গলা লক্ষ্য ক'রে সজোরে তরোয়াল চালাল। ভীষণভাবে আহত ভেক্তর সশব্দে ডেক-এর ওপর গড়িয়ে পড়ল। একটুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে স্থির হয়ে গেল।

তখনই বিস্কো চিৎকার ক'রে বলে উঠল — ভাইকিং ভাইসব — লড়াই থামাও। ভেক্তর যে পাপ করেছে তার ফল পেয়েছে। আর লড়াই নয়। ভাইকিংরা অস্ত্র নামাল। বিস্কো ব'লে উঠল — সবাই অস্ত্র ফেলে দাও। ভাইকিংরা হাতের তরোয়াল ডেক-এ ফেলে দিল। দলপতিও কী ব'লে উঠল। তার সৈন্যরাও তরোয়াল নামাল।

এবার দলপতি ক্লান্ত পায়ে আস্তে আস্তে বিস্কোর সামনে এসে দাঁড়াল। দলপতি বিস্কোর কোন কথাই বুঝতে পারেনি। তবে এটা বুঝেছিল যে বিস্কোই ওদের দলনেতা। দলনেতা বার দু'য়েক ক্লান্তস্বরে বলল —তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে?

বিস্কো বুঝল না। তবে বিস্কো ডান হাত তুলে পেছন দিকে সমুদ্র দিগন্ত দেখিয়ে বারবার বলতে লাগল— সিরাকস বন্দর — সিরাকস বন্দর। দলপতি সিরাকস কথাটা শুনে বুঝল ওরা সিরাকস বন্দরে ফিরে যেতে চায়। দলপতি মাথা ওঠানামা ক'রে বোঝার ইঙ্গিত করল।

বিস্কো ভেক্তরের দলের ভাইকিং বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলল — তোমরা যদি দেশে ফিরে যেতে চাও বলো তাহ'লে লিপারির ঐ ছোট বন্দরটায় তোমাদের নামিয়ে দেব। কোন জাহাজে উঠে তোমরা দেশে চলে যেও।

ভেক্তরের অনুগামীদের দুজন গুরুতর আহত হয়েছিল। অনেকেই মারাও গিয়েছিল। বাকিদের মধ্যে কয়েকজন বলল — না— আমরা তোমাদের ফ্রান্সিসদের ফেলে দেশে ফিরবো না। ফিরলে সবাই একসঙ্গে ফিরবো। — এই তো খাঁটি ভাইকিংদের মতো কথা। বিস্কো বলল।

দলপতি আর এলাইমোর সৈন্যরা নিজেদের জাহাজে চলে গেল।

বিস্কো জাহাজ চালকের কাছে এল। বলল— বন্দরে ফিরে যাবো। জাহাজের মুখ ঘোরানো হ'ল।

তখন দুপুর। বিস্কোদের সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। রাঁধুনি বন্ধুরা রান্না শুরু করল। ওদের দফায় দফায় খেতে খেতে বিকেল হ'য়ে গেল। ততক্ষণে সমুদ্রে জোর হাওয়ার দাপা দাপি শুরু হ'য়েছে। জাহাজের সব পাল খুলে দেওয়া হ'ল। জাহাজ দ্রুত ঢেউ ভেঙে চলল সিরাকস বন্দরের দিকে। দলপতির জাহাজটাও পেছনে পেছনে আসতে লাগল। জাহাজ যখন সিরাকস বন্দরে পৌঁছল তখন রাত হ'য়েছে। ফ্রান্সিসদের জাহাজ জাহাজঘাটায় লাগতেই ঘাট থেকে এলাইমোর পাহারাদার কয়েকজন সৈন্যের ক্রুদ্ধ চিৎকার ভেসে এল। বিস্কো শাঙ্কো রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। বিস্কো বুঝল ওদের জাহাজের দশ জন পাহারাদার যে নিখোঁজ হয়েছে এটা এলাইমোর সঙ্গী সৈন্যরা জানতে পেরেছে। ভেক্তর ঝড়ের সময় জাহাজ নিয়ে পালিয়েছিল। কাজেই ওরা ধরে নিয়েছে ভাইকিংরা ওদের সঙ্গী পাহারাদারদের হত্যা করেছে।

ঘাটে পাটাতন ফেলতেই এলাইমো সর্ব প্রথমে উঠে এল। পেছনে খোলা তরোয়াল হাতে আরো পাঁচ ছ'জন সৈন্য। সবারই মুখ থমথমে। বিস্কো বুঝল — ভীষণ সমস্যায় পড়ল ওরা। হ্যারি ছাড়া ওরা কেউই লো ল্যাতিন ভাষা জানে না। ওরা কী ক'রে এলাইমোকে সমস্ত ব্যাপারটা বলবে। কী ক'রে বোঝাবে যে ঐ দশজনকে হত্যার জন্যে ওরা দায়ী নয়। স্পেনীয় ভাষায় চেষ্টা ক'রে দেখা যাক। বিস্কো এগিয়ে এল। স্পেনীয় ভাষায় বলল আপনাদের ভাষা আমি জানিনা। আমি স্পেনীয় ভাষায় সব বুঝিয়ে বলছি।

এলাইমো গম্ভীর সুরে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল — স্পেনীয় বুঝি -ভালো বলতে পারিনা। বলো সব।

বিস্কো থেমে থেমে আস্তে আস্তে ভেক্তরের দলপাকানো — পাহারাদারদের হত্যা করা-পালানো- অন্য জাহাজের আক্রমণ ও ভেক্তর ও তার সঙ্গী অনেকের মৃত্যু-সব বলল।

এলাইমো চুপ ক'রে সব শুনল। তারপর বলল — তুমি মিথ্যা-সত্য -কী বুঝবো?

বিস্কো দুশ্চিন্তায় পড়ল। ওর ভাগ্য ভালো তখনই দলপতি র সেই জাহাজটা জাহাজঘাটায় এসে লাগল। শাঙ্কো দেখল সেটা। শাঙ্কো চেঁচিয়ে বলল— বিস্কো সেই দলপতির জাহাজ এসেছে। আমি দলপতিকে নিয়ে আসছি। শাঙ্কো দ্রুত পায়ে পাতা পাটাতনের ওপর দিয়ে ছুটল।

বিস্কো এলাইমোকে বলল — আপনার সৈন্য বাহিনীর এক দলপতি সব ঘটনা দেখেছে-জানে সে আসছে সব বলবে আপনাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দলপতিকে সঙ্গে নিয়ে শাঙ্কো ফিরে এল। শাঙ্কো তখনও হাঁপাচ্ছে। সেনাপতি এলাইমোকে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে দলপতি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। এবার এলাইমো দলপতির কাছে সব জানতে চাইল। দলপতি আস্তে আস্তে সব ঘটনা বলল। আরো বলল - সে সন্দেহ করেছিল ঐ কয়েকজন ভাইকিং তাদেরই সৈন্যদের হত্যা ক'রে অস্ত্র পোশাক

নিয়ে সশস্ত্র হয়েছিল। এটা যে সত্য তা সে এখানে এসে জানতে পেরেছে। এখানকার পাহারাদার সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলে।

এলাইমো বলল -সেই ভাইকিংরা কী ক'রে সৈন্যদের হত্যা করেছিল-কখন হত্যা করেছিল?

দলপতি মাথা নেড়ে বলল— সেটা কেউ বলতে পারছে না। বিস্কো ওদের সব কথা বুঝল না। কিন্তু এটা বুঝল যে এলাইমো জানতে চাইছে কী ক'রে কখন জাহাজে পাহারাদার ওর সৈন্যরা মারা গেল। আশঙ্কায় বিস্কোর বুক কেঁপে উঠল। ভেক্তররা নির্মম ভাবে ঐ পাহারাদারদের হত্যা করেছিল। এটা যদি এলাইমো জানতে পারে তাহ'লে এলাইমো ক্ষিপ্ত হবেই। বিস্কোদের ওপর সে প্রতিশোধ নেবেই। তার অর্থ ওদের সবাইকে আত্মরক্ষার জন্যে লড়াইএ নামতে হবে। ক'জন বাঁচবে আর ক'জনই বা জাহাজে চড়ে পালাতে পারবে?

ভাগ্য ভালো বলতে হবে। এলাইমো দলপতির দিকে তাকিয়ে বলল — এই বিদেশী ভাইকিংদের মধ্যে কারা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করেছিল চিনিয়ে দিতে পারবে।

দলপতি উপস্থিত বিস্কো শাঙ্কো আর ওদের বন্ধুদের দেখে দেখে মাথা নেড়ে বলল -না- এরা লড়াই করেনি।

— তাহলে কারা লড়াই করেছিল? এলাইমো জানতে চাইল।

— তাদের বেশিরভাগই হয় মারা গেছে নয়তো আহত হয়েছে। দু'চারজন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়েছে। দলপতি বলল।

এলাইমো এবার বিস্কোর দিকে তাকাল। বলল-আহতরা কোথায়?

বিস্কো দ্রুত ভাবল বলবে আহত কেউ নেই। সব মরে গেছে। কিন্তু এলাইমো যদি জাহাজখানা তল্লাশী করে তবে দু'জন আহত বন্ধু ধরা পড়ে যাবে। তখন মিথ্যে বলার জন্য ওদের সবাইকে বিপদে পড়তে হবে। কাজেই সত্যি কথাই বলতে হ'ল। বিস্কো বলল— আসুন।

বিস্কো নিচে নামার সিঁড়ির দিকে চলল। পেছনে এলাইমোর। তার পেছনে দলপতিসহ চার পাঁচজন সৈন্য। যে কেবিনঘরে আহত দুই ভাইকিং বন্ধু ছিল। বিস্কো সেই ঘরে ঢুকল। এলাইমো দলপতিও ঢুকল। আহত দু'জনের পরনে তখনও এলাইমোর সৈন্যদের সেই পোশাক। শুধু শিরস্ত্রাণ আর তরোয়াল নেই। একজন শুয়েই ছিল। তার উরুতে কম্বল মত কাপড়ের মোটা ফেট্টি বাঁধা। অন্যজনের বাঁ কাঁধেও ঐরকম মোটা ফেট্টি। দু'জনেই এলাইমোকে দেখে ভীষণভাবে চমকে উঠল। এলাইমো ওদের পোশাক দেখে থমকে দাঁড়াল। রাগে ওর দু'চোখ জ্বলে উঠল। এক ঝটকায় কোমর থেকে রুপালি বাঁটের তরোয়াল খুলে ফেলল। বিস্কো একলাফে এলাইমোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দু'হাত জোড়া করে বারবার বলতে লাগল— দোহাই— ওদের হত্যা করবেন না। রাজা ফ্রেডারিকের দরবারে নিয়ে চলুন। বিচার হোক ওদের। রাজা ফ্রেডারিক যা শাস্তি দেবেন মেনে নেবো। দুই আহত ভাইকিং এর মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল। এলাইমো কী ভেবে তরোয়াল কোষবদ্ধ করল। দলপতিকে কী আদেশ দিয়ে কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দলপতি ওর পাঁচজন সৈন্যকে আনতে বলল। সৈন্যরা বসে থাকা ভাইকিংকে এক হ্যাঁচকা টানে বিছানা থেকে মেঝেয় দাঁড় করাল। অন্য তিনজন সৈন্য শুয়ে থাকা ভাইকিংকে জোর ক'রে তুলে দাঁড় করাল। ওরা দু'জনেই ব্যথায় গোঙাতে লাগল।

বিস্কো দলপতিকে বার বার বলতে লাগল- ওরা ভয়ানক আহত। দুটো দিন সময় দিন।

আমরাই ওদের নিয়ে যাবো।

দলপতি সে কথা বুঝলও না। কানও দিলনা। সৈন্যদের ইঙ্গিত করল টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে। সৈন্যরাও বিন্দু মাত্র করুণা দেখাল না আহত ভাইকিংদের প্রতি। টেনে হিঁচড়ে দু'জনকে কেবিনঘর থেকে বার করল। নিয়ে চলল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি দিয়ে টেনে তুলতে গিয়ে একজন ভাইকিং এর কাটা উরুতে বাঁধা ফেট্টিটা খুলে গেল। ও চিৎকার ক'রে উঠল। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ছুটল। দু'জনের আর্তনাদে অসহ্য যন্ত্রণার জন্য কান্নায় ভরে উঠল জাহাজের ডেক। সৈন্যরা সে সবে কান দিল না। ওদের দু'জনকে টেনে হিঁচড়ে জাহাজ ঘাটায় নামাল।

অন্য ভাইকিং বন্ধুরা অসহায়ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। শাঙ্কো বলল -বিস্কো- এখন কী করবে?

— চলো— ওদের দু'জনকে একটা খুব জরুরী কথা বলতে হবে। কথাটা ব'লে বিস্কো ওদের আহত বন্ধু ও সৈন্যদের দলের দিকে ছুটল। শাঙ্কোও পেছনে পেছনে ছুটল। আহত দু'জন তখন যন্ত্রনাকাতর চিৎকার ক'রে চলেছে।

বিস্কো ছুটে ওদের কাছে এল। ওদের দেশীয় ভাষায় চিৎকার ক'রে বলল — সাবধান সৈন্যদের বিষ খাইয়ে মেরেছো— রাজার কাছে একথা কক্ষণো বলবে না। বলবে — লড়াই হ'য়েছে। কথাটা দু'তিনবার ব'লে বিস্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। দলপতি বা পাহারাদার সৈন্যরা বিস্কোর কথা কিছুই বুঝল না। ওরা বন্দী দু'জনকে টেনে নিয়ে চলল। নিস্তব্ধ রাতে পথে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত শোনা গেল বন্দী দু'জনের যন্ত্রণাকাতর চিৎকার আর্তনাদ। বড় করুণ সেই পরিবেশ!

শাঙ্কো কাছে আসতে বিস্কো বলল-চলো- এক্ষুণি ফ্রান্সিসকে সব বলতে হবে। একমাত্র ফ্রান্সিসই রাজা ফ্রেডারিককে ব'লে ওদের প্রাণে বাঁচাতে পারে।

— কিন্তু এত রাতে ফ্রান্সিসদের সঙ্গে দেখা করতে দেবে? শাঙ্কো বলল।

— উপায় নেই। দেখা করতেই হবে। চলো—দুর্গে যাবো। বিস্কো হাঁটতে শুরু করল শাঙ্কোও সঙ্গে চলল।

জনশূণ্য অন্ধকার পথ দিয়ে ওরা দ্রুত হাঁটতে লাগল দুর্গের দিকে।

ওরা দু'জনে দুর্গের প্রধান দেউড়ির সামনে এল। লোহার বিরাট দরজা বন্ধ। লোহার মোটা গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখল খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্যেরা পাহারা দিচ্ছে।

বিস্কো সৈন্যদের বলল— বিশেষ দরকারে এসেছি ভাই। আমাদের একটা অনুরোধ রাখো। দু'জন সৈন্য হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিস্কোর কথা কিছুই বুঝল না। তবু একজন গরাদের কাছে মুখ বাড়াল। বিস্কোর এতক্ষণে খেয়াল হ'ল ওরা তো ওর কোন কথাই বুঝবে না। বিস্কো এবার বার বার বলতে লাগল— সাভোনা-সাভোনা। সৈন্যটি বুঝল এরা সাভোনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সৈন্যটি আঙ্গুল তুলে আকাশ দেখিয়ে বোঝাতে চাইল অনেক রাত হ'য়ে গেছে। কিন্তু বিস্কো হাল ছাড়ল না। বার বার 'সাভোনা' 'সাভোনা' বলতে লাগল। সৈন্যটি বুঝল বিস্কোকে নিরস্ত করা যাবে না। সৈন্যটি মাথা ওঠানামা ক'রে সম্মতি জানাল। হাতের ইঙ্গিতে ওদের ওখানেই দাঁড়াতে বলল। তারপর পাথরের চত্বর পেরিয়ে চলল দুর্গের ঘরগুলোর দিকে।

অল্পক্ষণ পরেই সাভোনা এল। দরজার কাছে এসে মশালের আলোয় বিস্কোদের চিনতে

পারল। বলল-কী ব্যাপার? এত রাতে এসেছো?

— শিগগির ফ্রান্সিসকে আসতে বলুন। এরমধ্যে অনেক কান্ড ঘটে গেছে। বিস্কো বলল। সাভেনা আর কোন কথা বলল না। দুর্গের ঘরগুলোর দিকে চলে গেল।

একটু পরেই ফ্রান্সিস হ্যারি আর মারিয়া প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। দরজার কাছে এসে ফ্রান্সিস বলল-বিস্কো-কী হ'য়েছে? এ্যাঁ?

—সে অনেক কথা। সব বলছি-শোন। একটু থেমে বিস্কো ওদের দেশীয় ভাষায় আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনা বলল।

সব কথা শেষ হ'তে মারিয়া ব'লে উঠল— কী সাংঘাতিক! হ্যারি বলল-তোমরা ভেক্তরকে বাধা দিতে পারলে না?

— যখন জানলাম তখন যা ঘটার ঘটে গেছে। বিস্কো বলল। ফ্রান্সিস ঘটনা শুনতে শুনতে জোরে জোরে শ্বাস ফেলছিল। এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল— ভেক্তর আর আমার বন্ধুরা এরকম নির্মম কাণ্ড ঘটাতে পারে— স্বপ্নেও ভাবিনি। মানুষ কতটা নিচে নামলে এরকম নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে। বিস্কো বলল- ভীষণ আহত বন্ধু দু'জনকে যেভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছে—

— থামো— ফ্রান্সিস ধমকে উঠল— ঐ নৃশংস মানুষ দু'টোকে কি রাজা ফ্রেডরিকের গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে যাবে?

— তবু-ওরা যে আমাদেরই বন্ধু। ওদের প্রাণে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না? বিস্কো বলল।

—না। ফ্রান্সিস ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার ক'রে উঠল। হ্যারি মারিয়া অবাক চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে থাকল।

— রাজা ফ্রেডারিককে তুমি যদি একবার অনুরোধ করো— বিস্কো বলল।

— বিস্কো-একটা কথা জেনো- এ ভাবে কাপুরুষের মত যারা মানুষকে হত্যা করে তাদের আমি বন্ধু ব'লে স্বীকার করিনা। আমি ম'রে গেলেও ওদের জন্য প্রাণভিক্ষা চাইবো না। ওদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ওদেরই করতে দাও। ফ্রান্সিস থেমে থেমে কথাগুলো বলল। তারপর বলল— তোমরা যাও। আমি যা বললাম বন্ধুদের তা বুঝিয়ে ব'লো। কেউ যেন আমাকে ভুল না বোঝে। মারিয়া বা হ্যারি কোন কথা বলল না। ওরা ভালো ক'রেই জানে ফ্রান্সিসকে কোনভাবেই সঙ্কল্পচ্যুত করা যাবে না।

ওরা ফিরে চলল নিজেদের ঘরে।

বিস্কো মৃদুস্বরে শাঙ্কোকে বলল—ফ্রান্সিস কতকগুলো নীতি মেনে চলে। কোন অবস্থাতেই ফ্রান্সিস ওর নীতিবিরোধী কাজ মেনে নেয়না। তাই বন্ধু হ'লেও ওকে আমি শ্রদ্ধা করি।

দু'জনে মন্থরপায়ে জাহাজঘাটার দিকে চলল। এতক্ষণে ওরা বুঝতে পারল ওরা কত ক্লান্ত।

জাহাজঘাটের কাছে এসে বিস্কো হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কো বলল— কী হল বিস্কো?

বিস্কো বেশ চিন্তান্বিতস্বরে বলল — আহত বন্দী দু'জন তো আমাদেরই স্বদেশবাসী ভাই বন্ধু। জানিনা ওদের দু'জনকে কোথায় বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে। ভীষণ আহত ওরা। এলাইমোর সৈন্যেরা ওদের দু'জনকে নির্মমভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই এই টানা হ্যাঁচড়ায় ওদের শরীরের ক্ষত থেকে আরো রক্ত পড়েছে। দুর্বল হ'য়ে পড়েছে ওরা। ওদের চিকিৎসার কিছু ব্যবস্থা

হয়েছে কিনা তাও জানি না।

— ঠিকই বলেছো বিস্কো — শাঙ্কো বলল — তবু ওরা যেমন নিষ্ঠুর ভাবে এলাইমোর পাহারাদার সৈন্যদের বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে —এটাকে মোটেই মেনে নেওয়া যায় না। ওদের এই ঘৃণ্য আচরণের জন্যে যে শাস্তি ওদের পাওয়া উচিৎ তাই পাক। আমরা কী করবো বলো?

— তবু — শাঙ্কো — ভেবে দেখ — আমরা যখন দেশে ফিরবো তখন ওদের বাবা মা তো জানতে চাইবে ওদের ছেলেদের কী হয়েছে?

— রাজা ফ্রেডারিক কি ওদের মুক্তি দেবে না? শাঙ্কো জানতে চাইল।

মাথা খারাপ— বিস্কো বলল — রাজা ফ্রেডারিক যখন সব জানতে পারবে তখন ওদের প্রাণদণ্ড দেবেই। ফাঁসি ওদের হবেই। পারবে দেশে ফিরে ওদের পুত্র হারা বাবা মাকে সান্ত্বনা দিতে? কী ব'লে ওদের সান্ত্বনা দেবে?

— কী করবো বলো — যা সত্য তাই বলবো শাঙ্কো বলল।

বিস্কো জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল — না শাঙ্কো তা হয় না। ওরা যাই করুক তবু ওরা আমাদের ভাইয়ের মত — বন্ধুও। ওদের যেভাবে হোক বাঁচাতে হবে।

— কিন্তু কী ক'রে? শাঙ্কো বলল — দেখে এলে তো রাজার সৈন্যরা কীভাবে ম্যামিয়েস দুর্গ পাহারা দিচ্ছে। রাজা ও রাজপরিবারের অনেকে এখন ঐ দুর্গে আছে, তাই এত নিরাপত্তার কড়াকড়ি। পারবে ঐ কড়া পাহারার মধ্যে দিয়ে বন্ধুদের মুক্ত করতে?

— দেখি তো চেষ্টা ক'রে। বিস্কো বলল। তারপর ফিরে দাঁড়াল। বলল — চলো — ম্যামিয়েস দুর্গের মাঝে। শাঙ্কো বুঝল বিস্কোকে ফেরানো যাবে না। ও যদি সঙ্গে না যায় তাহ'লে বিস্কো একাই বন্ধুদের মুক্ত করতে যাবে। তা'তে একা বিস্কো বিপদে পড়বেই। অথচ এখন বিস্কোকে সেকথা বোঝানো যাবে না। বিস্কো শাঙ্কোর জন্য অপেক্ষা না ক'রে দ্রুত ম্যামিয়েস দুর্গের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

শাঙ্কো ডাকল— বিস্কো— দাঁড়াও। বিস্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল — তুমি যাবে, না যাবে না!

— যাবো। জাহাজ থেকে আমার তীর ধনুক নিয়ে আসছি। তুমি একটু দাঁড়াও। কথাটা বলে শাঙ্কো দৌড়ে চলল জাহাজ ঘাটের দিকে।

একটু পরেই শাঙ্কো তীর ধনুক নিয়ে এল দু'জনে চলল ম্যামিয়েস দুর্গের দিকে। দুর্গের প্রধান দেউড়ি দূর থেকে দেখল। দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জনে। আর এগোলো না। দেউড়িতে দশ পনেরোজন পাহারাদার সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে। দেউড়ির আশেপাশে সাত আটটা মশাল জ্বলছে। বেশ আলো ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

দেউড়ির কাছে যাওয়া যাবে না। ওরা রাস্তার অন্যপাশে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল। টানা পাথরের উঁচু দেয়ালের জায়গায় জায়গায় মশাল জ্বলছে। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে রইল। লক্ষ্য করল কিছুক্ষণ পর পর তিনজন সৈন্য দেয়ালে গুঁজে রাখা মশালের তলা দিয়ে খোলা তরোয়াল হাতে দেয়ালের ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে পাহারা দিচ্ছে। যদি পাথরের উঁচু দেয়াল। ডিঙোতে হয় তাহলে ওরা যখন পাহারা দিতে দিতে দূরে চলে যাবে তখনই ডিঙোতে হবে ওরা ফিরে আসার আগেই কাজ সারতে হবে।

বিস্কো বেশ নজর দিয়ে দেয়ালটা দেখতে দেখতে ফিস্ ফিস্ করে বলল— শাঙ্কো লক্ষ্য



বিস্কো বারান্দা থেকে লাফিয়ে নামলো।

করো— পাথরের দেয়ালের খোঁদলে খোঁদলে মশালগুলো বসানো আছে। আচ্ছা তীর মেরে মশালগুলো ফেলে দেওয়া যায় না? শাঙ্কো বেশ তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বুঝল যে তীর ছুঁড়ে ঠিক ঘা দিতে পারলে মশালগুলো খোঁদল থেকে ছিটকে পড়ে যাবে। কিন্তু মশালগুলো ছিট্‌কে মাটিতে পড়লেও তো নিভবে না। ধুলোটে পথে পড়ে গিয়েও নিভে যাবে কিনা সেটাই সমস্যা। না নিভে যদি অল্প অল্পও জ্বলতে থাকে তাহলেও তো ওখান দিয়ে দেয়ালের কাছে যাওয়া যাবে না। দেয়ালও টপ্‌কে পার হওয়া যাবে না। শাঙ্কো ওদিকে তাকিয়ে এসব ভাবছে তখনই দেখল সেই তিনজন প্রহরী সৈন্য মশালগুলোর নিচে দিয়ে খোলা তরোয়াল হাতে আসছে। হঠাৎ দুটো মশালের নিচে দিয়ে আসার সময় একজন প্রহরী দাঁড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কোর কানে খুব মৃদু শব্দ এল ছপ্‌। শাঙ্কো চম্‌কে বিস্কোর দিকে তাকাল। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল— বিস্কো ঐ মশাল দুটোর নিচের মাটিতে জল কাদা জমেছে।

বিস্কো কথাটা শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল তাহ'লে তো ওখানে মশালদুটো ফেলতে পারলে মশালের আগুন নিভে যাবে। অনেকটা জায়গা অন্ধকার হয়ে যাবে।

শাঙ্কো অন্ধকারে হেসে বলল— ঠিক তাই। ততক্ষণে পাহারাদাররা দূরে চলে গেছে। শাঙ্কো কাঁধে কোমরে ঝুলিয়ে রাখা ধনুকটা খুলে হাতে নিল। কাঁধের তীরের খাপ থেকে একটা তীর তুলে নিয়ে ধনুকে পরাল। ছিলা টেনে ধরে সামনের মশালটার দিকে নিশানা করল। তারপর তীর ছুঁড়ল। অন্ধকারে তীর ছুটল। কিন্তু মশালটার আগুনে লাগল না। খোঁদলটায় ঢুকে ছিটকে এসে নিচে পড়ে গেল।

বিস্কো চাপা গলায় বলল—শাঙ্কো — আবার তীর ছোঁড়ো নিশানা যেন নিখুঁত হয়। তীর নষ্ট করা চলবে না। শাঙ্কোর কেমন জেদ চেপে গেল। এবার একটু সময় নিয়ে লক্ষ্য স্থির করে তীর ছুঁড়ল। তীরটা ছুটে গিয়ে জ্বলন্ত মশালের গায়ে বিঁধে গেল। মশালটা খোঁদল থেকে ছিটকে গিয়ে নিচের জলকাদার মধ্যে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল। আবার তীর ছুঁড়ল। পরের জ্বলন্ত মশালটাও ছিটকে পড়ল নিচের জলকাদায়, সেটাও সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল। দেয়ালের কাছে অনেকটা জায়গা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। বিস্কো খুশিতে শাঙ্কোর পিঠ চাপড়াল।

দু'জনে অন্ধকারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর বিস্কো মাথা ঝুঁকিয়ে অন্ধকারে এক ছুটে রাস্তাটা পেরিয়ে দেয়ালের ধারে চলে এল। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে অন্ধকারে ও শাঙ্কোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরে শাঙ্কোও একইভাবে এক ছুটে দেয়ালের কাছে চলে এল। অন্ধকারে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দু'জনেই অল্প অল্প হাঁপাতে লাগল। বিস্কো ভালো করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল বেশ কিছুটা দূরে দুর্গের সদর দেউড়ির সামনে প্রহরী সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে। অন্ধকারে অত দূরে ওদের দেখতেই পাবে না।

এবার বিস্কো খুব ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় দেয়ালের গায়ে কয়েকটা পাথরের খাঁজ দেখল। ছোট খোঁদলও আছে-বোধহয় মশাল রাখার জন্যে। বিস্কো প্রথম খাঁজটায় পা রাখল। তারপর আস্তে আস্তে খাঁজে খাঁজে পা রেখে দেয়াল বেয়ে উঠতে লাগল। একেবারে দেয়ালের মাথার কাছে মশাল রাখার খোঁদল। খোঁদলটায় পা রেখে শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দেয়ালের মাথায় উঠে বসল। তারপর দেয়ালের ওপাশে আবার পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে দুর্গের পাথুরে চত্বরে নামল। নেমেই অন্ধকারে বসে পড়ল। শাঙ্কোও বিস্কোর মত পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে উঠতে লাগল। দেয়ালের মাথার কাছে খোঁদলটায় পা রেখে ভর দিয়ে উঠতে গিয়ে পা টা পিছলে

গেল।একটা পাথরের বড় টুকরো খসে গিয়ে নিচে পড়ে গেল। জলে কাদায় পড়ে শব্দ হ'ল থপ্। দেউড়ির একজন প্রহরীর কানে গেল শব্দটা। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হ'ল। দেয়ালে বুক চেপে অনড় দাঁড়িয়ে রইল। প্রহরীটা অন্ধকারে এদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কপালে গোল করে হাত রেখে মশালের আলো আড়াল করেও কিছুক্ষণ দেখল। কিন্তু অন্ধকারে যতটা দেখতে পেল তাতে কোনকিছুর নড়াচড়া দেখতে পেল না। নিশ্চিন্ত মনে খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিতে লাগল। শাঙ্কোও নিশ্চিন্ত হল। ও আবার সেই খোঁদলে পা রেখে শরীর ঝাঁকিয়ে দেয়াল ডিঙোল। দেয়ালের ওপাশে নেমেই বিস্কোর গা ঘেঁষে বসে পড়ল।

একটু পরে বিস্কো বলল— শাঙ্কো— দেখ— দুর্গের ঘরগুলোর জায়গায় জায়গায় মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় যা দেখছি তাতে বুঝতে পারছি ওগুলো থাকা শোয়ার ঘর। আমাদের আহত বন্ধু দু'জনকে এইসব ঘরে নিশ্চয়ই রাখা হয়নি। ওদের বন্দী করা হয়েছে। কাজেই নিশ্চয়ই রাখা হয়েছে কয়েদঘরে। এবার সেই কয়েদঘরটা খুঁজে বের করতে হবে। চলো রাত শেষ হবার আগেই ওদের মুক্ত করতে হবে। বিস্কো অন্ধকারে মাথা নিচু করে প্রায় হামাগুড়ি দিতে দিতে দুর্গের ঘরগুলোর দিকে চলল। একই ভাবে পেছনে পেছনে শাঙ্কোও চলল। দুর্গের প্রথম ঘরটার কাছাকাছি এল। মশালের আলো যতদূর গেছে তার বাইরে এসে থামল। না এসব ঘর না। বাঁ দিকে ঘুরে আবার চলল। পরপর ঘরগুলো পার হতে লাগল।একটা বড় ঘরের সামনের সিঁড়িতে দেখল অনেকগুলো মশাল জ্বলছে। প্রহরীর সংখ্যাও বেশি। তার মানে এখানে রাজা ফ্রেডারিক আছে। বিস্কোরা অন্ধকার পাথুরে চত্বর দিয়ে চলল। অন্দরমহল পার হল। তখনই দেখল পশ্চিম কোনায় দেয়ালের গা ঘেঁষে একটা লম্বাটে পাথরের ঘর। ঘরটার সামনে দরজার দুপাশে মশাল জ্বলছে। কাছাকাছি আসতে দেখল ঘরটার দরজায় লোহার গরাদে একটা বড় তালা লাগানো দরজায়। দুজন প্রহরী খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে। বিস্কো ফিস্ ফিস্ করে বলল শাঙ্কো এটাই কয়েদঘর। আহত বন্ধুদুজনকে নিশ্চয়ই এখানে কয়েদ করা হয়েছে।

—কিন্তু ওদের মুক্ত করবে কী ভাবে? দেখছো না— দুজন পাহারাদার পাহারা দিচ্ছে। শাঙ্কো বলল। তারপর বলল— তবে যদি বলো তীর ছুঁড়ে মশাল দুটো ফেলে দিতে পারি।

— কোন লাভ নেই। ওখানে জল নেই। মশাল সহজে নিভবে না। উল্টে রাজার ঘরের পাহারাদারদের নজরে পড়বে। অন্য উপায় ভাবো। বিস্কো বলল।

— দু'টোকেই তীর মেরে জখম করতে পারি। শাঙ্কো বলল।

— কী লাভ তাতে। ওরা আহত হলেই চিৎকার চাঁচামেচি শুরু করবে। তীরে আহত হয়েছে দেখলে ওরা বুঝে নেবে ধারে কাছে কোন শত্রু তীরন্দাজ আছে। সারা দুর্গএলাকা দল বেঁধে খুঁজে বেড়াবে। আমাদের তখন পালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না। তারপর সৈন্যরা প্রহরীরা আরো সাবধান হয়ে যাবে। বন্ধুদের উদ্ধার করা তখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। বিস্কো বলল।

তারপর বলল— শোন পাহারাদার দু'জনকে কাবু করতে হবে। ওদের কোমরে ঝোলানো চাবি নিয়ে দরজা খুলে বন্ধুদের মুক্ত করতে হবে। তারপর দেয়াল ডিঙিয়ে পালাতে হবে।

— কিন্তু বন্ধুরা তো বেশ আহত— পারবে ওরা? শাঙ্কো বলল।

— পারতেই হবে। নইলে ওদের ফাঁসির হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ফ্রান্সিস চেষ্টা করলে হয়তো পারতো। কিন্তু ফ্রান্সিস এরকম নৃশংস কাজকে কক্ষনো সমর্থন করবে না। বিস্কো বলল। তারপর মাথা নিচু করে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলল কয়েদ ঘরের দিকে। কয়েদ ঘরের

বারান্দায় প্রহরী দু'জন পাহারা দিচ্ছিল। অন্ধকার থেকে মাথা নিচু করে ছুটে এসে বারান্দায় উঠে বিস্কো আর শাঙ্কো ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রহরী দুজনের ওপর। দুজন প্রহরী কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুজনের মাথায় গুঁতো খেয়ে ওরা ছিটকে বারান্দায় চিৎ হয়ে পড়ে গেল। হাতের তরোয়ালও ছিটকে গেল। বিস্কো চিৎ হয়ে থাকা দু'জন প্রহরীর গলা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে দ্রুত বলল শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি খোল। মুখ বাঁধো। প্রহরী দুজন গোঙাতে লাগল। শাঙ্কো দ্রুত হাতে নিজের কোমরের ফেট্টিটা খুলল। একজন প্রহরীর মুখ চেপে পেঁচিয়ে বাঁধল। প্রহরীটা অস্পষ্ট স্বরে গোঙাতে লাগল। বিস্কোর কোমরের ফেট্টি খুলে শাঙ্কো অন্য প্রহরীটার মুখ চেপে পেঁচিয়ে বাঁধল। তারপর দু'জনেই প্রহরীদের তরোয়াল দুটো তুলে নিল।

একজন প্রহরী উঠে দাঁড়াতে গেল। শাঙ্কো তার বুকে তরোয়ালের ধারালো ডগাটা চেপে ধরে বলল— উঠতে গেলেই মরবে। মুখের বাঁধনেও হাত দেবে না। দুজন প্রহরীই ওদের দিকে চিত হয়ে শুয়ে থেকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। বিস্কো প্রহরীদের কোমরে গোঁজা চাবির থোকা খুঁজতে লাগল। সর্বনাশ। দুজনের কারো কোমরেই তো চাবির গোছা নেই। বিস্কো আর শাঙ্কো পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। যে প্রহরীর কোমরে চাবির গোছা থাকে সে গিয়েছিল অন্য প্রহরীদের সঙ্গে একটু গল্পগুজব করে সময় কাটাতে। সেই প্রহরী ঠিক তখনই বারান্দার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে তো অবাক। বিস্কো শাঙ্কো তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দুজন প্রহরী বারান্দায় পড়ে আছে। গোঙাচ্ছে। বিস্কো শাঙ্কো লাফিয়ে প্রহরীটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। তার আগেই প্রহরীটি তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে ছুটল রাজার ঘরের সামনের প্রহরীদের দিকে। চিৎকার করে বলতে লাগল শিগগির আয়- কয়েদঘরে ডাকাত পড়েছে।

— পালাও — বলেই বিস্কো বারান্দা থেকে লাফিয়ে পাথুরে চত্বরে নামল। শাঙ্কোও লাফিয়ে নামল। দুজনে প্রানপণে ছুটল পাথরের প্রাচীরের দিকে।

কিন্তু ততক্ষণে দুর্গের প্রহরীরা চিৎকার করতে করতে মশাল হাতে ছুটে আসতে শুরু করেছে। তখন প্রাচীরের পাথুরে দেয়াল মাত্র হাত পাঁচেক দূরে। বিস্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কোও দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে শাঙ্কো বলল— কী হল?

— অসম্ভব। দেয়ালের সবটা উঠতে পারবো না। সেই চেষ্টা করলে প্রহরীরা এলোপাথারি তরোয়াল চালাবে। আমরা ভীষণভাবে আহত হবো। বলা যায় না। আমাদের মেরেও ফেলতে পারে। তার চেয়ে লড়াই না করে ধরা দাও? প্রাণে তো বাঁচবো। পরে দেখা যাবে। বিস্কোর কথা শেষ হবার আগেই প্রহরীরা বিস্কোদের কাছে এসে দাঁড়াল। ওরা হাঁপাচ্ছে তখন। মশালের আলো পড়েছে বিস্কো আর শাঙ্কোর মুখে গায়ে। বিস্কো হাতের তরোয়ালটা পায়ের কাছে ফেলে দিল। পাথরের চত্বরে শাঙ্কোও তরোয়াল ফেলে দিল। শব্দ হল ঝনাৎ ঝনাৎ। দু তিন জন প্রহরী এগিয়ে এল। একজন জিজ্ঞাসা করল— তোমরা কারা? কোত্থেকে এসেছো? বিস্কোরা লো ল্যাতিন ভাষা বুঝল না। ওরা দুজনেই মাথা নাড়ল।

বিস্কো ও শাঙ্কোকে ঘিরে ধরা প্রহরীরা বুঝে উঠতে পারল না এরা কারা। দুজন প্রহরী ফ্রান্সিস হ্যারিকে গতকাল দেখেছিল। শুনেছিল ওরা ভাইকিং বিদেশী। বিস্কোদের পরনেও ফ্রান্সিসদের মত পোশাক। বুঝল এরাও ভাইকিং। ও বললংএরা ভাইকিং। বিদেশী। 'ভাইকিং' কথাটা শুনে বিস্কো আর শাঙ্কো দুজনেই মাথা ওঠানামা করে সমর্থন জানালো।

দু তিনজন প্রহরী তরোয়ালের ইঙ্গিতে কয়েদঘর দেখাল। তারপর ওদের সঙ্গে যেতে ইঙ্গি

তে জানাল। আগে আগে চলল বিস্কো আর শাঙ্কো। পেছনে প্রহরীর দল।

কয়েদঘরের বারান্দায় প্রহরী দুজন তখন উঠে বসেছে। কয়েদঘরের লোহার গরাদের দরজা খোলা হ'ল। বিস্কো আর শাঙ্কোকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল। তখন পূবআকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সূর্য উঠতে বেশি দেরি নেই।

কয়েদঘরে ঢুকে মশালের আলোয় বিস্কো আহত বন্ধু দু'জনকে খুঁজতে লাগলো। ঘরে শুকনো ঘাস ছড়ানো বিছানামত। তাতে সাত আট জন বন্দী হয়ে বসে আছে। বাইরের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে ওদের ঘুম ভেঙে গেছে। বিস্কো দেখল একেবারে বাঁ কোনায় দু'জন বন্ধুই শুয়ে আছে। বিস্কো ছুটে ওদের কাছে গেল। পেছনে শাঙ্কোও ছুটে এল। আহত এক বন্ধু আস্তে আস্তে উঠে বসল। ডান হাত ধরল। অন্যজন উঠে বসতে পারল না। বিস্কোদের দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্কো শাঙ্কো দু'জনে ওদের পাশে বসল। বন্ধুটি একটু আশ্চর্য হয়েই বলল তোমাদের বন্দী করা হ'ল কেন? রাজার সৈন্যদের মেরে ফেলার জন্যে তোমরা তো দায়ী নও।

তখন বিস্কো কীভাবে ওদের মুক্ত করার জন্যে চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়েছে সব বলল।

বন্ধুটির দু'চোখ জলে ভরে উঠল। মাথা নামিয়ে বলল তোমরা তাহলে সত্যিই আমাদের বন্ধুর মতই এখনও ভালোবাসো।

ভালোবাসি বই কি। সেই নৃশংস ঘটনার জন্যে দায়ী ভেক্তর। সেই তোমাদের ভুল বুঝিয়ে দলে টেনেছে। তোমরাও দেশে ফেরার আকুলতায় সব ভুলে গিয়ে ভেক্তর যা বলেছে তাই করেছো। তোমাদের কোন দোষ নেই। বিস্কো বলল। শুয়ে থাকা আহত বন্ধুটির দু'চোখও জলে ভিজে উঠল। ও চোখে হাত চাপা দিল।

বিস্কো আর শাঙ্কো বন্ধুদের পাশে ঘাসের বিছানায় বসল। শাঙ্কো কাঁধ থেকে ধনুক আর তূণীর খুলে পাশে রাখল। বিস্কো নিজেকে এত ক্লান্ত বোধ করছিল যে বসে থাকতে পারল না। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। ওর মাথায় তখন নানা চিন্তা। বন্ধুদের উদ্ধার করতে এসে এভাবে নিজেরাও বন্দী হয়েছে এই খবরটা ফ্রান্সিস পাবে নিশ্চয়ই। ফ্রান্সিস এতে ওদের ওপর রাগ করবে কি না কে জানে। আবার হয়তো ফ্রান্সিসরা এ খবর নাও পেতে পারে। এসব ভাবতে ভাবতে বিস্কোর একটু তন্দ্রা এল।

সকাল হ'ল। লোহার দরজা খুলে প্রহরীরা কয়েদঘরের বন্দীদের জন্যে খাবার নিয়ে এল। গোল আধপোড়া রুটি আর নানা শাকশব্জির ঝোল। বিস্কোরা হাতমুখ ধুয়ে সকালের খাবার খেতে লাগল।

ওদিকে দুর্গরক্ষীরা সাভোনাকে সকালেই জানাল যে গত রাতে দুজন ভাইকিং দুর্গের মধ্যে ধরা পড়েছে, একটু বেলায় রাজা ফ্রেডারিকের কাছে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে। বিচার হবে। সাভোনা বেশ চিন্তায় পড়ল। বুঝে উঠতে পারল না ফ্রান্সিসকে এই খবরটা দেবে কি না। কিন্তু ফ্রান্সিসকে কথাটা না জানালে পরে যদি ফ্রান্সিস জানতে পারে তবে সাভোনার ওপর বেশ মনঃক্ষুন্ন হবে। কাজেই ফ্রান্সিসকে সব জানানো উচিত। বলা যায় না। রাজা ফ্রেডারিকের বিচারে ঐ দুজনকেও হয়তো ফাঁসি কাঠে চড়ানো হবে।

সবে সকালের খাওয়া শেষ হয়েছে ফ্রান্সিসদের। তখনই সাভোনা ফ্রান্সিসদের গত রাতের ঘটনাটা আস্তে আস্তে বলল—। ফ্রান্সিস বেশ চমকে উঠল। বুঝল বিস্কো আর শাঙ্কো গতরাতে ওদের সঙ্গে কথা বলে আর জাহাজে ফিরে যায় নি। আহত বন্ধু দুজনকে মুক্ত করতে প্রহরীদের

দৃষ্টি এড়িয়ে দুর্গের মধ্যে কোন ভাবে ঢুকেছিল। হ্যারি আর মারিয়াও খবরটা শুনল। মোরাবিত ও সাভোনার কাছে সব শুনল। ওরা দুজনেই ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিসরা এখন কী করবে? দেখল— ফ্রান্সিস মাথা ঝুঁকিয়ে চুপ করে বসে আছে। খুব চিন্তায় পড়ল ফ্রান্সিস। বিস্কো শাঙ্কো দুজনেই নির্দোষ। বন্ধু দুজনকে বাঁচাতেই ওরা দুর্গের মধ্যে কোনভাবে ঢুকেছিল। কিন্তু রাজা ফ্রেডারিক কি সেটা মানবেন? হয়তো ওদের ওপর ক্রুদ্ধ হবেন। ওদের বেত মারার অথবা ফাঁসি দেওয়ার হুকুমও দিতে পারেন।

ফ্রান্সিস মুখ তুলে সাভোনাকে বলল— আপনি খোঁজ নিয়ে জানুন তো বন্দীদের কখন রাজা ফ্রেডারিকের সম্মুখে হাজির করা হবে। সাভোনা বিছানা ছেড়ে উঠল। বাইরে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বলল— ফ্রান্সিস - বন্দীদের আর অল্পক্ষণ পরেই মন্ত্রনা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হবে। রাজা আর অমাত্যরা কয়েকজন ওখানে বসেই বিচার করবেন।

তাহলে চলুন না। ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হ্যারি, মারিয়া, মোরাবিতও উঠল। সাভোনা আগে আগে চলল। পেছনে ফ্রান্সিসরা।

মন্ত্রনা কক্ষের সিঁড়ির কাছে প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে। সাভোনা এগিয়ে গেল প্রহরীদের দিকে বলল— মন্ত্রনাকক্ষে কয়েকজন বন্দীর বিচার হবে। আমরা যাবো।

প্রহরীরা মাথা নাড়ল। কারো যাবার হুকুম নেই।

সাভোনা ফিরে এসে ফ্রান্সিসদের বলল সে কথা। ফ্রান্সিসরা হতাশ হল। বন্ধুদের মুক্ত করার জন্যে একবার অন্তত চেষ্টা করা যেত। কিন্তু বিচারের সময় উপস্থিত থাকতে না পারলে কিছুই করা যাবে না। আহত বন্ধু দুজনের ফাঁসি তো হবেই বিস্কো শাঙ্কোকেও কয়েদঘরে আটকে রাখা হবে। কতদিন কে জানে। বিস্কো শাঙ্কো কোন অপরাধ করেনি তবু রাজা ফ্রেডারিক বা সেনাপতি এলাইমোর অনুমতি ছাড়া ওরা গোপনে দুর্গের মধ্যে ঢুকেছিল। বন্দী বন্ধুদের মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। এই অপরাধে কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হবেই। ফ্রান্সিস সাভোনাকে এই আশঙ্কার কথা বলল।

সাভোনা মাথা ওঠানামা করে বলল— এটা হতে পারে। রাজা ফ্রেডারিক সহজে ওদের মুক্তি দেবে না।

ফ্রান্সিস বুঝে উঠতে পারলো না কী করবে। সাভোনা নিজেই রাজবিদ্রোহী। কাজেই সেও এব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারবে না। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল।

তখনই দেখা গেল। একদল প্রহরী সৈন্য বিস্কো শাঙ্কো আর আহত দুজন ভাইকিংকে নিয়ে আসছে। সকলের সামনে আসছে সেনাপতি এলাইমো।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল— হ্যারি এলাইমোকে বুঝিয়ে বলো। একমাত্র এলাইমোই রাজা ফ্রেডারিককে বলে আমাদের মন্ত্রনাকক্ষে নিয়ে যেতে পারে।

বন্দীদের নিয়ে এলাইমো ততক্ষণে সিঁড়ির কাছে এসেছে, হ্যারি এগিয়ে গেল। বলল— মাননীয় সেনাপতি— আমাদের কিছু বলার ছিল। এলাইমো দাঁড়িয়ে পড়ল। সেনাপতি— ঐ বন্দী চারজনই আমাদের বন্ধু স্বজাতি। রাজা ফ্রেডারিক বিচারে ওদের যা শাস্তি দেবেন তাই আমরা মাথা পেতে মেনে নেব। কিন্তু বিচারের সময় শুধু ওদের কথা শুনে রাজা সন্তুষ্ট নাও হতে পারেন। সেই জন্যে বলছি যদি বিচারের সময় রাজা ফ্রেডারিক মন্ত্রণাকক্ষে আমাদের উপস্থিত থাকতে অনুমতি দেন তাহলে আমরা ওদের স্বপক্ষের বক্তব্য রাজা ফ্রেডারিককে বুঝিয়ে বলতে পারবো।

এলাইমো ফ্রান্সিস মারিয়ার মুখের দিকে তাকাল। তারপর হ্যারিকে বলল ঐ সাভোনা আর মোরাবিতের জন্যে আমি বলবো না। তবে বন্ধু হিসেবে আপনাদের কথা বলবো। যদি মহামান্য রাজা অনুমতি দেন তাহলে আপনাদের নিয়ে যাবো।

এলাইমো সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্ত্রনাকক্ষের দিকে চলে গেল। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল। চার বন্দী বন্ধুই ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে রইল। আহত বন্ধু দুজনের মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বেশি আহত বন্ধুটি ব্যথা যন্ত্রনায় গোঙাচ্ছে তখন।

অন্য বন্ধুটি কাঁদকাঁদ স্বরে বলল—ফ্রান্সিস-তুমি বিশ্বাস করো পাহারাদারদের খাবারে বিষ দেওয়া হয়েছিল এটা অন্ততঃ আমরা দুজন জানতাম না। ভেত্তর আগে আমাদের কিছুছু বলেনি। তবে রাজার সৈন্যদের সঙ্গে আমরা লড়াই করেছি ভেত্তরের নির্দেশে। তা ছাড়া ভেবেছিলাম লড়াইয়ে জিততে পারলে দেশে ফিরে যেতে পারবো। একটু থেমে বলল ফ্রান্সিস একমাত্র তুমিই আমাদের বাঁচাতে পারো। ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে বন্ধুর কথাগুলো শুনে গেল। আহত বন্ধুটি মুখে হাতচাপা দিয়ে কেঁদে উঠল।

ফ্রান্সিস এবার মুখ তুলে বিস্কো আর শাঙ্কোর দিকে তাকাল। বলল — তোমরা কেন ওদের মুক্ত করতে গেলে? কেন এভাবে বিপদ ডেকে আনলে?

বিস্কো একটু মনঃক্ষুন্নস্বরে বলল— কী করবো— তুমি ওদের ওপর এত রেগে গেলে যে-

বিস্কো— ওদের কাছে সব জেনে সময়মত ওদের মুক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতামই। তার আগেই তোমরা মাথা গরম করে ভবিষ্যতে কী হতে পারে এসব না ভেবেই বোকার মত জীবনের ঝুঁকি নিলে। ফ্রান্সিস বলল।

— ফ্রান্সিস তুমি এটাকে বোকামি বলছো? বিস্কো বেশ বিরক্তির সুরেই বলল।

— হ্যাঁ — বোকামিই করেছো — ফ্রান্সিস বলল — দুজন বন্ধুই আহত। একজনের উরু এতটা জখম যে চেয়ে দেখো ও ভালো করে দাঁড়াতেও পারছে না। পারবে এই আহত বন্ধুদের নিয়ে পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে?

— চেষ্টা তো করতাম। বিস্কো বলল।

— বেশ। ধরে নিলাম পালাতে পারতে। ওদের সঙ্গে নিয়ে কোথায় আশ্রয় নিতে? ফ্রান্সিস বলল।

— কেন? আমাদের জাহাজে? বিস্কো বলল।

—আর এক বোকামির কাজ ফ্রান্সিস একটু থেমে বলল— তখন এলাইমো আমাদের জাহাজ তল্লাশী করতোই। তোমরা ধরা পড়ে যেতে। তখন ক্রুদ্ধ রাজা ফ্রেডারিক আমাদের সবাইকে কয়েদঘরে বন্দী করে রাখতো আর সবচেয়ে মারাত্মক যে কাজ করতো সেটা হল আমাদের জাহাজের খোলা ভেঙে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতো। ফ্রান্সিস একটু থেমে বলল তখন বন্দীদশা মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের কোন উপায় থাকতো না। ধরো যদি কয়েদঘর থেকে পালাতেও পারতাম জাহাজের অভাবে আমরা এই সিসিলির বাইরে যেতে পারতাম না। আবার আমরা ধরা পড়তাম। আবার কয়েদঘরে বন্দীদশা ভোগ করতে হতো।

বিস্কো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ফ্রান্সিস আমি এতসব ভাবি নি। তুমি আমাকে মাফ করো। আজকে বুঝলাম--আমাদের মধ্যে তুমি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কেন। ফ্রান্সিস তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। হ্যারি মারিয়াও অবাক চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিসের প্রত্যেকটি কাজের পেছনে এত চিন্তা ভাবনা থাকে ওরা বেশ আশ্চর্য হল।

এলাইমো তখনই মন্ত্রণাকক্ষ থেকে বেরিয়ে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। হ্যারিকে বলল— রাজা ফ্রেডারিক অনুমতি দিয়েছেন। আপনারা মন্ত্রনাকক্ষে যেতে পারেন। তবে রাজা ফ্রেডারিক অনুমতি না দিলে আপনারা কোন কথা বলতে পারবেন না।

এলাইমোর কথাটা ফ্রান্সিসকে বলে হ্যারি বলল — তবে আর আমাদের মন্ত্রনাকক্ষে গিয়ে কী হবে।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল— এটা একটা সুযোগ। এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। রাজা ফ্রেডারিক যখন বিচারের সময় উপস্থিত থাকার অনুমতি দিয়েছেন তখন কিছু বলারও অনুমতি আমাদের দেবেন। চলোনা। দেখা যাক।

এলাইমোর নির্দেশে প্রহরীরা ততক্ষণে বন্দীদের মন্ত্রনাকক্ষে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ফ্রান্সিসরাও তারপরেই ঢুকল।

মন্ত্রনাকক্ষের ভেতরটা একটু অন্ধকারমত। পাথরের দেয়ালে আটকানো জ্বলন্ত মশালের আলোয় মোটামুটি সবই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একটা লম্বাটে শ্বেতপাথরের বড় টেবিল। তার ওপাশে রাজা ফ্রেডারিক বসে আছেন। দুপাশে তাঁর দুজন অমাত্য। রাজা ফ্রেডারিক মাথায় মীনেকরা মুকুট। গায়ে অবশ্য রাজবেশ নয়। হালকা সবুজ রঙের সাটিনের চাদর জড়ানো। পেশীবহুল হাত কাঁধ উন্মুক্ত। অমাত্যদের পরনেও একই পোশাক। শুধু সাটিনের কাপড়ের রং আলাদা।

টেবিলের এপাশে বন্দীদের দাঁড় করানো হল। ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া ঘরের আর একপাশে পাথরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

এলাইমো রাজাকে সম্মান জানিয়ে বন্দীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আছে তার বিবরণ দিতে লাগল। হ্যারি মৃদুস্বরে এলাইমোর কথাগুলো ফ্রান্সিসকে বলে দিতে লাগল। এলাইমো বলল মহামান্য রাজা—এরা সবাই জাতিতে ভাইকিং। আপনার আদেশে বন্দরে আমাদের দুটো জাহাজ ওদের জাহাজ পাহারায় ছিল। আমাদের আট জন সৈন্যও ওদের জাহাজে পাহারাদার হিসেবে ছিল। ঝড়ের সুযোগে আমাদের প্রহরীদের লড়াই করে হারিয়ে দিয়ে জাহাজ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। লিপারি দ্বীপের কাছে ওদের জাহাজ আটকানো হয়। আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে ওদের লড়াই হয়। দুপক্ষের অনেকেই মারা যায় নয়তো আহত হয়। এই আহত দুজন ভাইকিং সেই লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল। অন্য দুজন গতরাত্রে আহত বন্দী বন্ধুদের মুক্ত করতে ওরা সকলের অলক্ষে দুর্গে ঢুকেছিল। ধরা পড়েছিল। ওদের দুজনকেও এখানে হাজির করা হয়েছে। এই দুজন কি আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছিল? রাজা ফ্রেডারিক বললেন।

— না — ওরা সেই লড়াইয়ে নামেনি। এলাইমো বলল।

— ঠিক আছে। আহত দুজন এগিয়ে এসো। রাজা ফ্রেডারিক বললেন। ওরা দুজন টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

তখনই ফ্রান্সিস বলল মহামান্য রাজা — যদি আমাকে দুএকটা কথা বলতে অনুমতি দেন তবে বাধিত হবো।

রাজা ফ্রেডারিক ফ্রান্সিসের দিকে তাকালেন। বললেন — তোমরাই তো কাউন্ট রজারের



রাজার সামনে ফ্রান্সিস।

গুপ্তধন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছো?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

— ঠিক আছে। বলো তোমার কী বলার আছে। রাজা বললেন

— মহামান্য রাজা সেনাপতি এলাইমো যে লড়াইয়ের কথা বললেন এবং যে লড়াইয়ে আমাদের এই দুই বন্ধু আহত হয়েছিল সেই লড়াই হয়েছিল অনেক পরে। আপনার প্রহরী সৈন্যদের মৃত্যু হয়েছে লড়াই করতে গিয়ে না। ফ্রান্সিস বলল

— তবে? রাজা বেশ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

— বিষ প্রয়োগ করে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল,

— বলো কি? রাজা ফ্রেডারিক চমকে উঠে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

মারিয়া ফিস্‌ফিস করে বলল — ফ্রান্সিস তুমি একথা বলে দিলে কেন?

ফ্রান্সিস হাতটা একটু তুলে মারিয়াকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত করল। হ্যারি কোন কথা না বলে চুপ করে রইল। বুঝল না — যে মর্মান্তিক ঘটনাটা রাজা ফ্রেডারিক সেনাপতি এলাইমো বা অন্য কেউ জানে না সেটা ফ্রান্সিস বলতে গেল কেন।

রাজা ফ্রেডারিক অমাত্য দুজনের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বললেন। তারপর ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন-কে কীভাবে তাদের বিষ খাইয়ে মারল?

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—আমাদের এক বন্ধু ভেক্তর আমাদের জাহাজে কিছু বন্ধুদের নিয়ে দল পাকিয়েছিল। তাদের বুঝিয়েছিল আমি কাউন্ট রজারের গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবো না। তবে কেন ওরা এই বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে থাকবে? ফ্রান্সিস একটু থেমে বলল মহামান্য রাজা — আমরা জাহাজে জাহাজে দূর দূর দেশে দ্বীপে ঘুরে সমুদ্রযাত্রার একঘেয়েমির মধ্যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে মাটির প্রতি টান বিশেষ করে স্বদেশে ফেরার টান অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। কাজেই ভেক্তর এই দুর্বলতার সুযোগ নেয় এবং আমাদের কিছু বন্ধুকে ভুল বোঝায়। ফ্রান্সিস থামল।

— এখন ভেক্তর কোথায় আছে? রাজা ফ্রেডারিক জানতে চাইলেন।

— ভেক্তর লড়াই করতে গিয়ে মারা গেছে। তার দলের বন্ধুরা কেউ মারা গেছে কেউ জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। তাদেরই অবশিষ্ট দুজন আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল।

— হুঁ। বলো কী বলছিলে। রাজা ফ্রেডারিক বললেন।

— আপনার যে প্রহরী সৈন্যরা আমাদের জাহাজে থেকে পাহারা দিচ্ছিল ভেক্তর তাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে মাত্র দুজন বন্ধুকে দিয়ে। তারা কেউ আর বেঁচে নেই। আপনার প্রহরী সৈন্যদের খাদ্যে বিষ মিশিয়ে ভেক্তর আর দুজন বন্ধু তাদের হত্যা করে। এই নির্মমতা ক্ষমার অযোগ্য। ফ্রান্সিস বলল।

— ঠিক। রাজা ফ্রেডারিক মাথা একটু ঝাঁকিয়ে বললেন।

— এইবার মহামান্য রাজা আপনার সুবিচারের জন্যে কয়েকটা কথা বলছি। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল আপনি দেখলেন আমি যদি না বলে দিতাম তাহলে আপনারা কেউই জানতে পারতেন না আপনার আটজন প্রহরী সৈন্যের কী ভাবে মৃত্যু হয়েছিল। আমি অনায়াসে সেই সত্য গোপন করতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করিনি। তাহলেই আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন—

আমি যা সত্য তা বলি এবং স্বীকার করি। কোন অবস্থাতেই সত্য আমি গোপন করি না। ফ্রান্সিস থামল। রাজা ফ্রেডারিক পাশের অমাত্যদের ফ্রান্সিসের কথাগুলি লো ল্যাতিন ভাষায় বুঝিয়ে বললেন। অমাত্যরা ফ্রান্সিসদের স্পেনীয় ভাষা বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর সব শুনে রাজাকে মৃদুস্বরে কিছু বললেন।

রাজা সব শুনে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন — বেশ — আমরা তোমাকে সত্যবাদী বলে মেনে নিলাম।

তাহ'লে এবার আমি আর একটি সত্য কথা বলছি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর আঙুল তুলে আহত দুই ভাইকিং বন্ধুকে দেখিয়ে বলল — এই বন্ধু দু'জনও ভেক্তরের চাতুরীতে ভুল বুঝে ঐ দলে ভিড়েছিল এবং ভেক্তরের নির্দেশে আপনার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছিল। আহত হয়েছিল। কিন্তু আপনার প্রহরী সৈন্যদের যে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হবে এ কথা ভেক্তর ওদের কখনো বলে নি। ওরা সে কথা অন্য কোন ভাবে জানতেও পারেনি। কাজেই আমার বিনীত আবেদন এই নিরপরাধ দুই বন্ধুকে আপনি মুক্তি দিন। এমনিতে আহত হয়ে বিনা চিকিৎসায় ওরা যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করেছে। ফ্রান্সিস থামল।

রাজা ফ্রেডারিক আবার মৃদুস্বরে অমাত্যদের সঙ্গে সব জানিয়ে পরামর্শ করলেন। তারপর সেনাপতি এলাইমোর দিকে তাকিয়ে বললেন — এলাইমো — আপনি কী বলেন?

এলাইমো একটু মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল — মহামান্য রাজা — একটা কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে ইনি সত্যবাদী। এই দুজন আহত ভাইকিং আমাদের প্রহরীদের মৃত্যুর ষড়যন্ত্রে অংশ নেয় নি -- ইনি সে কথা বলেছেন এবং আমাদের এক্ষেত্রেও তাঁর কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া উচিৎ। এলাইমোর কথাগুলি হ্যারি ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে বলল।

রাজা ফ্রেডারিক আবার অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বললেন -- দেখ — এই আহত দু'জন ভাইকিং আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছে। আমাদের সৈন্যদের হত্যা করেছে না তো আহত করেছে। কাজেই শাস্তি তাদের পেতেই হবে।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল -- হ্যারি— শাস্তি মকুব করা যাবে না। বলো কী করবে।

হ্যারি মাথা নিচু করে একটু ভাবল। তারপর বলল — মহামান্য রাজা এই দুইজন আমাদের বন্ধু স্বদেশবাসী ভাইয়ের মত। তবু ওদের শাস্তি দিন এটাই আমরা চাই। যদি আপনি আমাদের অনুমতি দেন তাহলে কেমন শাস্তি দেবেন সেটা বলি।

— বলো। রাজা বললেন।

—ওদের চারজনকেই কয়েদঘরে বন্দী করে রাখুন। আহত দু'জনের কোনরকম চিকিৎসা হবে না। যদি বিনা চিকিৎসায় ওরা সুস্থ হয় তো হবে। নইলে ওদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। হ্যারি বলল।

— বেশ। কিন্তু তোমরা তো ওদের মুক্তি চাইছো। রাজা বললেন।

এবার ফ্রান্সিস বলল -- মান্যবর রাজা — যখন আমরা কাউন্ট রজারের গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবো তখন ওদের মুক্তি দেবেন — আমার এই নিবেদন।

হ্যারি নিচুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস-ভীষণ ঝুঁকি নিচ্ছো।

এ ছাড়া কোন উপায় নেই। ফ্রান্সিস মাথা নাড়তে নাড়তে বলল।

রাজা ফ্রেডারিক আবার অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপর বললেন — বেশ

তোমাদের অনুরোধই মেনে নেওয়া হ'ল। যতদিন তোমরা কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আবিষ্কার করতে না পারছো ততদিন এই চারজন কয়েদঘরে বন্দী থাকবে।

মারিয়া বলল—মহামান্য রাজা — আমার একটা নিবেদন আছে। রাজা মারিয়ার দিকে তাকালেন। বললেন

— বেশ বলো।

— এমনিতেই দুজন আহত বন্ধুর কোন চিকিৎসা হবে না। অনেক কষ্ট বেদনা ওদের সহ্য করতে হবে। কাজেই অনুরোধ কয়েদঘরের কষ্ট থেকে ওদের রেহাই দিন। মারিয়া বলল।

— কী ভাবে? রাজা বললেন।

— ওরা সবাই আমাদের জাহাজে থাকুক। প্রয়োজন আপনি ওদের জন্যে প্রহরী রাখুন। ফ্রান্সিস হ্যারি আর আমি তো এখানে আপনার দুর্গেই থাকবো। ওরা আমাদের ফেলে রেখে তো পালিয়ে যেতে পারবেনা।

রাজা ফ্রেডারিক অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন — বেশ। তবে প্রহরী থাকবে তোমাদের জাহাজে।

মারিয়া হেসে বলল—মহামান্য রাজার জয় হোক। বিচার শেষ হ'ল।

ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া বেরিয়ে এল। পেছনে পেছনে এল এলাইমো। তারপর আহত বন্ধুটিকে ধরাধরি করে বিস্কো ওরা বেরিয়ে এল। আহত বন্ধুটি তখনও দাঁত চেপে ব্যথা কষ্ট সহ্য করছে। বন্ধুটি বলল—ফ্রান্সিস—কী ব'লে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো জানি না। তুমি ফাঁসির হাত থেকে আমাদের বাঁচালে। তারপর আমাদের ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক। ফ্রান্সিস বন্ধুটির পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়ে সান্ত্বনা দিল।

পাঁচ জন প্রহরীর পাহারায় বিস্কো ওরা জাহাজঘাটার দিকে চলল। ওরা এই ভেবে আশ্বস্ত হ'ল যে কয়েদঘরের বন্ধ ঘরে ওদের বন্দীজীবন কাটাতে হবে না। বন্ধুদের মধ্যে ওদের নিজেদের জাহাজেই — বন্দী থাকতে হবে। বন্ধুদের মুখ তো দেখতে পাবো। নীল আকাশ সমুদ্র উড়ন্ত সামুদ্রিক পাখি, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত দেখতে পাবো।

হ্যারি বললে—ফ্রান্সিস—এতবড় ঝুঁকি নিলে কেন?

—কী করবো। ওদের প্রাণে বাঁচাতে এছাড়া অন্য পথ ছিল না। একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফ্রান্সিস বলল — হ্যারি মারিয়া — এবার উঠে পড়ে লাগতে হবে। কাউন্ট রজারের গুপ্তধনের হদিশ বার করতেই হবে। একটু থেমে ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল — শুধু একটা ক্ষীণ সূত্র চাই। কাউন্ট রজার নিশ্চয়ই কোন সূত্র রেখে গেছেন। সেটা যেখানে যেভাবে থাকুক তার হদিশ বার করতেই হবে।

পরদিন দুপুরেই ফ্রান্সিসদের জন্যে রাজবাড়ির একটা চার ঘোড়ার গাড়ি আনা হলো। গাড়িটা পুরোনো হলেও দেখতে সুন্দর। ফ্রান্সিসরা উঠল গাড়িটায়। গাড়িদুর্গ থেকে বেরিয়ে ছুটল কাতানিয়ার দিকে। বিকেলের মধ্যেই ওরা কাতানিয়া পৌঁছল. এটাও একটা বন্দর শহর। তবে সিরাকসের মতো অত জমজমাট নয়। সাভোনার নির্দেশে গাড়ি একটা বিরাট গীর্জার সামনে এসে থামল। গীর্জার মাথায় নানা কারুকাজ করা।

গীর্জার বড় দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে সাভোনা বলল, এই গীর্জাটাও কাউন্ট রজার তৈরি

করেছিলেন। তবে এটা সর্বসাধারণের জন্যে। ভেতরে সেই ভাবগম্ভীর পরিবেশ। ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীস্টের বড় মূর্তি। দেওয়ালে যীশুর জীবনবিষয়ক ছবি। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল এই গীর্জার মেঝেতেও মোজেকের নানা রঙদার কাজ। এসব দেখতে দেখতে একটা কথা হঠাৎই ফ্রান্সিসের মনে পড়ল, দুটো গীর্জাই কাউন্ট রজার তৈরি করিয়েছিলেন। ওপরের কাঠামো জীর্ণ হয়েছিল বলে রাজা ফ্রেডারিক ওপরের কাঠামো সংস্কার করিয়েছিলেন। কিন্তু মেঝে ভাঙা হয়নি। সংস্কারও করা হয়নি। কাজেই অক্ষত মেঝেটাই কাউন্ট রজারের নির্দেশে তৈরি। কাজেই মেঝেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবার ফ্রান্সিস খুব খুঁটিয়ে মেঝের রঙিন মোজেকের নকশাগুলো দেখতে লাগল। তবে ওর তো ছবি-আঁকিয়ের চোখ নয়। নকশাগুলোর ফুল-পাতা ঘুলিয়ে যাচ্ছে। ও মারিয়াকে বলল, মারিয়া, তুমি তো সেলাই করো, ছবি, নকশা বোঝ— এই মেঝের নকশাটা লক্ষ্য করো তো। ম্যামিয়েস দুর্গের গীর্জার মেঝেতেও নকশা দেখেছিলাম। দুটো নকশাই কি একরকম? মারিয়া কিছুক্ষণ মেঝের নকশার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মনে হচ্ছে একই রকম নয়, হবে ম্যামিয়েশের গীর্জাটা ছোট। নকশাগুলোও ছোট। এটা বড় কারণ মেঝেটাও বড়।

— হুঁ। তুমি ভালো করে নকশাগুলো দেখ। পরে ম্যামিয়েসের গীর্জার মেঝের সঙ্গে মেলাবো। ফ্রান্সিস বলল।

— ঠিক আছে। মারিয়া বলল। তারপর মেঝেটায় ঘুরে ঘুরে সব নকশা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

গীর্জার শান্ত পরিবেশ থেকে সবাই বেরিয়ে এল। সাভোনা বলল, এরকম অনেক গীর্জা বাড়িঘরে বিচিত্র স্থাপত্যরীতি দেখা যায়। রোমীয় বাইজেণ্টাইন আরবীয় আবার সিসিলির নিজস্ব রীতি সব মিলেমিশে একাকার।

হ্যারি বলল, এই অঞ্চলে মিশ্রণটা বেশী হয়েছে। ফ্রান্সিস খুব মন দিয়ে ওদের কথা শুনছিল না। ও ডুবেছিল নিজের চিন্তায়।

মারিয়া বলে উঠল, সিসিলি এলাম অথচ এট্না আগ্নেয়গিরি দেখবো না?

সাভোনা হেসে বলল, উত্তরে তাওরমিয়ার দিকে কিছুটা গেলেই এট্না আগ্নেয়গিরি ভালোভাবে দেখা যাবে।

তাই চলুন। মারিয়া খুশিতে লাফিয়ে উঠল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। দেখল, ফ্রান্সিস নিজের চিন্তায় মগ্ন। হ্যারি বলল, কী ফ্রান্সিস, এট্না দেখতে যাবে?

ফ্রান্সিস অন্যমনস্ক, ভঙ্গিতে হাসলো, বললো, চলো। মারিয়া যখন দেখতে চাইছে।

গাড়ি চলল উত্তরে তাওরমিয়ার দিকে। পথে দেখা গেল সেই একই দৃশ্য। গাধা খচ্চরের পিঠে গমের বস্তা চাপিয়ে চাষীরা চলেছে। গাধা খচ্চরের গলায় বাঁধা ঘণ্টার শব্দে চারিদিক ভরে উঠেছে। পথের দুপাশে সিট্রাস গাছ। গমের ক্ষেত, নানা শাকসবজির চাষের জমি। কিছুদূর যাওয়ার পর বাঁ দিকে হাত বাড়িয়ে সাভোনা বলে উঠল, ঐ যে এট্না আগ্নেয়গিরি। গাড়ি থামল। সবাই নেমে একটা ছোট্ট টিলায় উঠল। দেখা গেল এট্না আগ্নেয়গিরি বিকেলের আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়টা ছাই রঙের। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। চারদিকের শান্ত পরিবেশের মধ্যে এট্নার ভাবগম্ভীর রূপ দেখে ফ্রান্সিসরা অভিভূত হলো। এখন শান্ত এট্না। অতীতে কতবার

আগুন ছাই লাভা ধোঁয়া উদগীরণ করেছে! ভূমিকম্প ঘটিয়েছে। না জানি কত ঘরবাড়ি ভেঙেছে। কত মানুষ গৃহহীন হয়েছে। মারাও গেছে কত।

এবার ফেরার পালা। কাতানিয়া নগরে ওরা সন্ধ্যের আগেই ফিরে এল। সাভোনা বলল, ফ্রান্সিস এখন কোথায় যাবে?

- যে বাড়িতে কাউন্ট রজার মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

সাভোনার নির্দেশমতো গাড়ি চলল। নগরে মানুষজনের ব্যস্ততা। অনেকেই ফ্রান্সিসদের বেশ ঔৎসুক্যের সঙ্গে দেখল। ভিনদেশিগুলো রাজবাড়ির গাড়িতে যাচ্ছে। কারা এরা?

বিরাট একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামল। সবাই গাড়ি থেকে নামল। বাড়িটার সদর দরজা হাট করে খোলা। ঢুকল সবাই। বড় চত্বরটায় অশ্বশালা। অনেক ঘোড়া বাঁধা। কিছু লোক ঘোড়াগুলোর তদারকিতে ব্যস্ত। অন্যপাশে অনেক মাছধরা জাল শুকোচ্ছে। কয়েকজন বসে জাল বুনছে। ওদিকের ঘরগুলোতে অনেক পরিবারের বাসা। সাভোনা বলল, এখানে সৈন্যদের অশ্বশালা হয়েছে। ওদিকে জেলেদের বসতি। কাউন্ট রজারই নাকি ওদের এখানে বাস করার অধিকার দিয়েছিলেন। এরা পুরুষানুক্রমে সমুদ্রে মাছ ধরে।

দক্ষিণ কোনার দিকে সাভোনা চলল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। কোনায় পাথর দিয়ে তৈরি বেশ বড় একটা ঘর। ঘরটার সামনে জেলেদের পোশাক-পরা একটি লোক বসে আছে। সাভোনা লোকটার সঙ্গে কথা বলল। লোকটি উঠে গিয়ে ঘরটার তালা খুলতে লাগল। সাভোনা বলল, কাউন্ট রজারের স্মৃতিবিজড়িত এই ঘরটা এখানকার জেলেরাই দেখাশুনো করে।

তালা খোলা হলো। ঘরটায় ঢুকল সবাই। একটু অন্ধকারমতো ঘরটা। তবে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোনো আসবাবপত্র নেই। শুধু কোনায় রাখা রয়েছে একটা খাপে ঢাকা তরোয়াল, লোহার বর্ম আর শিরস্ত্রাণ। সাভোনা বলল, এই সবই নাকি কাউন্ট রজারের। ঘরটার মেঝেয় সুন্দর মোজেকের কাজ করা। ফ্রান্সিস মেঝের মোজেকের কাজ দেখতে দেখতে বলল, মারিয়া, আগের গীর্জা দুটোয় যে নকশা দেখেছিলে এগুলোও কি তেমনি, মানে একই নকশা?

মারিয়া দেখতে দেখতে বলল, না। আগের দুটোয় লতাপাতা বেশি ছিল। এটায় ফুলের সংখ্যা বেশি।

মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সাভোনা হেসে উঠে বলল, এখানেও গান? ফ্রান্সিস বলে উঠল, কী ব্যাপার সাভোনা? সাভোনা বলল, তোমাদের বলেছিলাম না কাউন্ট রজার শেষ বয়েসে খুব খ্রীস্টভক্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি কিছু ভক্তিগীতি লিখেছিলেন। সেই ভক্তিগীতিরই একটা এখানে ফুল লতাপাতা দিয়ে মোজেকের কাজের মধ্যে দিয়ে লিখিয়েছেন। অনেকদিন আগে এখানে এসেছিলাম। তখন লক্ষ্য করিনি। আজকে দেখছি একটা গান লেখা।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দুজনেই চমকে উঠল। ফ্রান্সিস বলল, পড়ে বলুন তো গানটা কী?

সাভোনা মেঝের দিকে তাকিয়ে পড়ে পড়ে বলে গেল -

কোথাও নাই শান্তি
যীশুর চরণে ক্ষান্তি
সব দুঃখ সব ভ্রান্তি।

হৃদয়ে রাখো ভক্তি।

ফ্রান্সিস মন দিয়ে শুনল সবটা। হ্যারি বলল, আমি লো ল্যাতিন ভাষা শুনলে বুঝি বলতেই কিছু পারি। কিন্তু অক্ষর খুব ভালো চিনি না। ফ্রান্সিস বলল, সাভোনা, আপনি এই গান লেখা দেখে হাসলেন কেন?

– আরে, এইরকম মেঝের মোজেকের কাজের মধ্যে কাউন্ট রজার গান লিখিয়েছেন আগের দুটো গীর্জার মেঝেতেও। আমি জানতাম গীর্জার মেঝেতেই লিখিয়েছেন। এখন দেখছি এখানেও লিখিয়েছেন।

ফ্রান্সিস বলে উঠল, ঐ গান দুটো আপনার মনে আছে?

– কেন নয়? বহুদিন ধরে বড়দিন বা গুডফ্রাইডের উৎসবের দিনে ঐ গান দুটো গাওয়া হয় এই দক্ষিণ সিসিলিতে। শুনুন গান দুটো। বলে সাভোনা চোখ বুঁজে আস্তে আস্তে গাইতে লাগল -

লোভ হিংসায় কাতর
হলুদ লাল পাথর
দূর কর এই দোসর
হৃদয় শ্বেত পাথর
যেমন যীশুর ঘর।

গান থামিয়ে সাভোনা বলল , এই গানটা লেখা আছে ম্যামিয়েস দুর্গের সেই ছোট গীর্জাটায়। ফ্রেডারিক ঐ জায়গায় দুর্গ নির্মাণের আগে ঐ গীর্জাটায় কিন্তু সব মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল। সাভোনার গানের সুর বড় সুন্দর লাগল ফ্রান্সিসদের।

মারিয়া বলল, আর একটা গান করুন না।

সাভোনা হেসে বলল, এই গানটা লেখা আছে এই কাতানিয়ায় যে বিরাট গীর্জা দেখে এলাম তার মেঝেতে। বলে সাভোনা চোখ বুঁজে আস্তে আস্তে গাইল -

নীরবে সহ যন্ত্রণা
কর যীশুর বন্দনা
ভুলে যাও সব মন্ত্রণা
হৃদয়ে পাবে সান্ত্বনা

গানের কথা এবং সুর ঘরটায় একটা সুন্দর আবহাওয়া সৃষ্টি করল। ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া তন্ময় হয়ে গেল। হঠাৎ ফ্রান্সিসের মাথায় একটা চিন্তা বিদ্যুৎচমকের মতো খেলে গেল-এই গানগুলোর মধ্যেই আছে কাউন্ট রজারের গুপ্তধনের চাবিকাঠি। থাকতেই হবে। এ ছাড়া আর কোনো সূত্র নেই।

ফ্রান্সিস খুব মনোযোগের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরের মেঝের মোজেকের কাজগুলো দেখল। এখানেই লেখা আছে গানটা। কিন্তু গুপ্তধনের সঙ্গে এই গানের কী সম্পর্ক বুঝে উঠতে পারল না। হতাশায় মাথা নেড়ে বলল,চলুন বড় গীর্জাটায় যাবো।

গাড়ি চলল। আবার বড় গীর্জাটায় ঢুকল সবাই। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দুজন ধর্মযাজক

মোমবাতি জ্বেলে দিচ্ছেন। গীর্জাঘর মোমবাতির স্নিগ্ধ আলোয় ভরে উঠল। সেই আলোয় মেঝের মোজেকের কারুকাজ বুঝতে অসুবিধা হলো না। ফ্রান্সিস বলল, সাভোনা,এখানকার গানটি মুখে বলুন।

সাভোনা আস্তে আস্তে বলল,

নীরবে সহ যন্ত্রণা
কর যীশুর বন্দনা
ভুলে যাও সব মন্ত্রণা
হৃদয়ে পাবে সান্ত্বনা

ফ্রান্সিস গানটা কয়েকবার মুখে মুখে আওড়াল। কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। এ তো ভক্তিগীতিই। এছাড়া কিছু নয়। তবে গানগুলির গুরুত্ব আছে এইজন্যে যে এগুলি কাউন্ট রজারের রচনা।

ম্যামিয়েস দুর্গে ফিরে আসতে একটু রাতই হলো। রাতের খাওয়াদাওয়ার পর সবাই শুয়ে পড়ল। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস,কিছু হদিস করতে পারলে?

না। তবে এখানকার গীর্জাটা কালকে ভালো করে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া বলল, আমার মনে হয় গানগুলোর মধ্যেই কোনো সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে।

হ্যারি বলল, আচ্ছা সাভোনা, কাউন্ট রজারের এরকম আরো গান আছে?

হ্যাঁ,আছে, তবে সেসবের এখন খুব বেশি চল নেই। গীর্জার মেঝেয় লেখা গানগুলোরই চল বেশি। প্রায় একশো বছর ধরে সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়।

ফ্রান্সিস বলল, এই গানই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই গান দুটোই সকলে জানে। গীর্জার মেঝেতেও লেখা রয়েছে। ম্যামিয়েস দুর্গের গীর্জায় তো আগে সকলেই যেতে পারতো।

আর সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস তখনও জেগে। নানা চিন্তা মাথায়। তার ওপর কাউন্ট রজারের গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য ও জীবনটাই বাজি ধরেছে। ভাবতে ভাবতেই একসময় ওর দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

গভীর রাতে হঠাৎ ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ফ্রান্সিস উঠে বসল। ঘরে মশাল জ্বলছে। তার আলোয় দেখল হ্যারি শুয়ে চোখে দু হাত চাপা দিয়ে ফোঁপাচ্ছে। ফ্রান্সিস হ্যারির গায়ে হাত রাখল। আস্তে ডাকল, হ্যারি। হ্যারির ফোঁপানি বন্ধ হলো। ফ্রান্সিস বলল, কী হয়েছে?

হ্যারি কান্নাভেজা গলায় বলল, তুমি এভাবে নিজের জীবনটাকে বাজি ধরলে? একবার কারো কথা ভাবলে না? তোমার বাবা, মারিয়া, আমরা - কারো কথা না?

ওদের কথাবার্তায় মারিয়ারও ঘুম ভেঙে গেল। মারিয়া বলে উঠল, হ্যারি, কেঁদো না। তোমাকে কাঁদতে দেখলে ফ্রান্সিসের মন দুর্বল হয়ে পড়বে। দেখ আমি তো কাঁদছি না।

সাভোনার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ওদের কথাবার্তা শুনে সাভোনা আস্তে আস্তে বলল, সত্যি তোমাদের মধ্যে এমন ভালোবাসা কমই দেখা যায়। একটু থেমে বলল, মানুষকে ভালোবাসা মানেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, সাভোনা, কাউন্ট রজারের গানটা শোনান না।

এত রাত্রে গান? সাভোনা হেসে বলল।

করুন না। হ্যারি বলল। সাভোনা শুয়েই আস্তে আস্তে গাইতে লাগল -

লোভ হিংসায় কাতর
হলুদ লাল পাথর
দূর কর এই দোসর
হৃদয় শ্বেতপাথর
যেমন যীশুর ঘর।

গান শেষ হলো। হঠাৎ ফ্রান্সিস বলল, আচ্ছা সাভোনা, লক্ষ্য করেছেন আর দুটো গানের পঙ্‌তি চারটে। শুধু এই গানটা, মানে যেটা এখানকার গীর্জার মেঝেতে লেখা সেই গানটার কিন্তু পঙ্‌ক্তি পাঁচটা।

সাভোনা একটু হিসেব করল। হেসে বলল, ঠিক বলেছো, আমি তো কোনোদিন খেয়াল করিনি।

ওদের মধ্যে আর কথাবার্তা হলো না। ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

মোরাবিত চুপ করে শুয়ে এতক্ষন সাভোনার গান শুনছিল। ওর মন একেই ভালো নেই। তার ওপর এই গানটা শুনে ওর মন আরো খারাপ হয়ে গেল। কত কাজ এখন। লিপারি দ্বীপে লড়াইয়ে হেরে গেছে ওরা। বেশ কয়েকজন বিদ্রোহী বন্ধু লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছে। ও নিজেও রাজা ফ্রেডারিকের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সাভোনা ওকে জোর করে লড়াই থেকে নিরস্ত করেছিল। ভীষণভাবে আহত ওকে অনেক কষ্টে সাভোনা প্রায় বুকে জড়িয়ে ধরে লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছিল। মোরাবিত বার বার নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেছে। বলেছে - সাভোনা বন্ধুদের এভাবে ফেলে রেখে আমি পালাবো না। সাভোনা বলেছে - মোরাবিত - তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। এই লড়াই আমরা হেরে গেছি। তুমি প্রাণ দিলেও এই লড়াই আমরা জিতবো না। কিন্তু তুমি বেঁচে থাকলে আবার আমরা বিদ্রোহ চালিয়ে যেতে পারবো। আরো দেশবাসীকে একত্র করতে পারবো। সময় সুযোগ বুঝে আবার আমরা আরো শক্তি সংগ্রহ করে রাজা ফ্রেডারিককে বিদেশী নর্মানদের অত্যাচারী ভূস্বামীদের সিসিলি থেকে তাড়াতে পারবো। কিন্তু তুমি মরে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে। তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। সাভোনা অনেক কষ্টে ওকে সমুদ্রতীরে নিয়ে আসতে পেরেছিল। তারপর নৌকোয় লুকিয়ে পালাতে পেরেছিল। কিন্তু - দুর্ভাগ্য ধরা পড়তে হল।

মোরাবিত ঘাসের বিছানায় শুয়ে শুয়ে এসব সাতপাঁচ ভাবছিল। ওর ঘুম আসছিল না। ঘরের জ্বলন্ত মশালের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই মোরাবিত সিদ্ধান্ত নিল - পালাতে হবে। সিমেতো নদীর ওপারের জঙ্গলে বিদ্রোহীদের পুরোনো আস্তানায় যাবে। আবার সব বিদ্রোহী সঙ্গীসাথীদের একত্র করবে। এলাকার আরো লোক একত্র করবে। অস্ত্র তৈরি করবে। সবাইকে তালিম দিয়ে রাজা ফ্রেডারিকের সৈন্যদের চেয়েও শক্তিশালী নিপুণ যোদ্ধা তৈরি করবে। তারপর আক্রমন করবে ম্যামিয়েস দুর্গ। অনেক কাজ - অনেক কাজ - মাথা ঝাঁকাতে

ঝাঁকাতে মোরাবিত মনে মনে বারবার বলল কথাটা।

রাত বাড়তে লাগল। মোরাবিতের চোখে ঘুম নেই। ও দুচোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে রইল।

শেষ রাতের দিকে মোরাবিতের একটু তন্দ্রামত এসেছিল। হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেল। মোরাবিত বিছানায় উঠে বসল। দেখল - সাভোনা ফ্রান্সিসরা গভীর ঘুমে। একবার ভাবল - সাভোনাকে পালাবার কথা বলি। পরক্ষণেই সাবধান হল। না - সাভোনাকে কিছু বলা চলবে না। সাভোনা কিছুতেই ওকে এভাবে জীবনের ঝুঁকি নিতে দেবে না।

মোরাবিত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পাথরের বারান্দায় মশালের আলোয় দেখল একজন সৈন্য পাথরের দেয়ালে পিঠ রেখে ঝিমুচ্ছে। মোরাবিত নিঃশব্দে দেয়ালে পিঠ ঘষে ঘষে মশালের আলোর এলাকা থেকে বাইরে অন্ধকারে নেমে এল। সদর দেউড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল চার পাঁচ জন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। এ ম্যামিয়েস দুর্গে এখন রাজা ফ্রেডারিক আছেন। কাজেই জোর পাহারার ব্যবস্থা এখন। পাহারাদারদের নজর এড়িয়ে দেউড়ি দিয়ে পালানো অসম্ভব। মোরাবিত চারদিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখতে লাগল। পাথরের উঁচু ঘেরা দেয়ালের প্রায় সব জায়গাতেই মশাল জ্বলছে। দেখতে দেখতে লক্ষ্য করল দক্ষিণ কোনায় দুটো মশাল নিবু নিবু। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। নীলচে কুয়াশাও ছড়িয়ে আছে ওদিকে।

মোরাবিত অন্ধকারে পাথর বাঁধানো চত্বরে বুক পেতে শুয়ে পড়ল। তারপর শরীর টেনে টেনে চলল ঐ দক্ষিণ কোনায় দেয়ালের দিকে। হাঁটুর বুকের ঘা তখনও সম্পূর্ন সারে নি। একটা কোনা উঁচু পাথরে হাঁটুটা ঘষটে গেল। মোরাবিত প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতে গিয়ে মুখে জোরে হাতচাপা দিল। একটু থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল। একটু পরে যন্ত্রণা একটু করল। প্রায় অন্ধকারে ডান হাঁটুর দিকে তাকিয়ে বুঝল রক্ত পড়ছে। ও মুখ বুজে যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে আবার বুক হিঁচড়ে চলল।

দেয়ালের কাছে এসে একটু বিশ্রাম নিল। ভীষণ হাঁপাচ্ছে তখন। একটু পরে হাঁপ ধরা ভাবটা কমল।

মোরাবিত উঠে দাঁড়াল। তারপর বেশ অন্ধকারে দেয়ালের পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে বেশ কষ্ট করে দেয়ালের ওপরে উঠেই ঘুরে দেয়ালের ওপাশের পাথুরে রাস্তায় লাফিয়ে নামল। দ্রুত নামতে গিয়ে ও লক্ষ্যই করে নি যে দেয়ালের বাইরেও কাছাকাছি তিন চারজন পাহারাদার খোলা তরোয়াল হাতে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। রাজা ফ্রেডারিক আছেন দুর্গে। কাজেই কড়া পাহারা চলছে।

পাথুরে রাস্তায় লাফিয়ে পড়তেই শব্দ হল। দুজন পাহারাদার সেই শব্দ শুনল। একজন চিৎকার করে উঠল - কে? দুজনেই অল্প অন্ধকারে খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে আসতে লাগল মোরাবিতের দিকে।

মোরাবিত সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পেরিয়ে পড়িমরি ছুটল সামনের অন্ধকার গলিটা লক্ষ্য করে। পাহারাদার দুজন ততক্ষণে চিৎকার করে অন্য পাহারাদারদের ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে। তারা কাছাকাছি আসার আগেই মোরাবিত গলির অন্ধকারে মিশে গেল। ছুটল প্রাণপণে। আস্তে আস্তে

পাহারাদারদের ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ হ্যারি উত্তেজিত স্বরে ডাকাডাকিতে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও দ্রুত বিছানায় উঠে বসল। হ্যারি বলল - ফ্রান্সিস - সর্বনাশ হয়েছে। মোরাবিত পালিয়ে গেছে।

- বলো কি। ফ্রান্সিস মোরাবিতের শোবার জায়গাটার দিকে তাকাল। দেখল - ফাঁকা। পাশেই সাভোনা মাথা নিচু ক'রে বসে আছে। সাভোনা চুপ করে আছে। তখনই মারিয়ারও ঘুম ভেঙে গেল। মশালের আলোয় মারিয়া এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল - ঢালা বিছানার কোথাও মোরাবিত নেই। মারিয়া বেশ ঘাবড়ে গেল। মোরাবিত পালিয়ে গিয়ে ওদের ভীষণ বিপদে ফেলে গেল।

ফ্রান্সিস কদিন যাবৎই লক্ষ্য করছিল মোরাবিত চুপ চাপ শুয়ে বসে থাকে। কে জানে কী ভাবে। কোন কথাও বলতো না। সাভোনার সঙ্গেও কথা বলতো না। ওরা বাইরে বেরুতো। মোরাবিতও ওদের সঙ্গে প্রথম দিন বেরিয়েছিল। পালাবার চেষ্টা করেছিল। ফ্রান্সিসের তৎপরতায় পারে নি। তারপর থেকেই মোরাবিত কেমন নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল। ওদের সঙ্গে বাইরেও বেরুতো না।

ফ্রান্সিস ডাকল — সাভোনা। সাভোনা মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল - মোরাবিত কেন পালালো বলতে পারবে। সাভোনা মাথা এপাশ ওপাশ করল।

- মোরাবিত তো আমাদের ভীষণ সমস্যায় ফেলে গেল। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস বলল - উপায় নেই - মোরাবিতকে ধরে নিয়ে আসতে হবে।

কিন্তু মোরাবিত কোথায় গেছে তার হদিশ পাবে কী করে? মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস বলল - সাভোনা বলুন তো মোরাবিত পালিয়ে কোথায় যেতে পারে?

সাভোনা আস্তে আস্তে বলল - ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে লিপারি দ্বীপে যায় নি। ওখানকার ঘাঁটি এলাইমো নিশ্চয়ই এতদিনে ভেঙে দিয়েছে।

- ঐ দ্বীপ ছাড়া আর কোথায় মোরাবিত আত্মগোপন করেছে বলে আপনার মনে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

- এখান থেকে মাইল দশেক দক্ষিণে আছে সিমেতো নদী। নদীর ওপারে জঙ্গলের মধ্যে আমরা প্রথম ঘাঁটি গেড়েছিলাম। পরে এলাইমোর সৈন্যদের তাড়া খেয়ে আমরা লিপারি দ্বীপে ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। লিপারিতে আমরা যুদ্ধে হেরে গেছি। তাড়া খেয়ে বিদ্রোহী বন্ধুরা নিশ্চয়ই পুরোনো আস্তানায় ফিরে এসেছে। মোরাবিত নিশ্চয়ই ঐ আস্তানায় আত্মগোপন করেছে। ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল - ঐ সিমেতো পেরিয়ে জঙ্গলের আস্তানায় যেতে হবে। পাথরের জানালা দিয়ে ফ্রান্সিস বাইরে তাকাল। দেখল - বাইরেটায় আর অন্ধকার তেমন নেই। তার মানে রাত শেষ হয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস ঘরের পাথরের মেঝেয় পায়চারি করতে লাগল।

ভোর হল। বেলা একটু বাড়ল। দুজন সৈন্য ওদের সকালের খাবার নিয়ে এল। কাঠের থালায় গোল করে কাটা রুটি আর নানা সব্জিমেশানো ঝোলমত। ফ্রান্সিসরা বিছানায় বসে খেয়ে নিল।

এঁটো থালা নিয়ে সৈন্যরা চলে গেল। ফ্রান্সিস বলল - হ্যারি - চলো সিমেতো নদীর ওপারে জঙ্গলে যাবো। মোরাবিতকে খুঁজে বের করতেই হবে। হ্যারি উঠে দাঁড়াল। কোমরবন্ধনী ভালো

করে এঁটে যাবার জন্যে তৈরি হল।

মারিয়া বলল - আমিও যাবো।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল - না মারিয়া। যদি আমরা দুজনে বিপদে পড়ি তুমি অন্ততঃ জাহাজে বন্ধুদের সে খবরটা দিতে পারবে। তুমিও আমাদের সঙ্গে গেলে সে উপায় আর থাকবে না।

সাভোনা বলল - চলো - আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই।

-না সাভোনা - ফ্রান্সিস বলল - শুধু মারিয়া একা এখানে থাকলে রাজার মনে সন্দেহ হতে পারে। মোরাবিত পালিয়েছে এটা যেন এখানে কেউ না জানে। তুমি থাকলে কারো মনে সন্দেহ জাগবে না। তুমি আর মারিয়া থাকো।

ফ্রান্সিস বলল - মারিয়া - যদি দেখ যে আমরা কাল পরশুর মধ্যে ফিরে এলাম না তাহলে জাহাজে বন্ধুদের খবর দিও। সাভোনাকে নিয়ে আমাদের খুঁজতে যেও।

গত কয়েকদিনের মত নিশ্চিন্তভঙ্গিতে ফ্রান্সিস আর হ্যারি দুর্গের সদর দেউড়ির দিকে চলল। ওরা এসময় বাইরে বেরোয় এটা পাহারাদাররা দেখেছে। ওরা কোন সন্দেহ করল না। ওদের দেখাশুনো করার জন্যে ওদের কাজে সাহায্য করার জন্যে রাজা ফ্রেডারিক যে দুজন সৈন্যকে রেখেছিলেন তারা এগিয়ে এল ফ্রান্সিসদের দিকে। হ্যারি বলল - ভাই - আজকে আর তোমাদের দরকার নেই। আজ আমরা নিজেরাই সব খোঁজ খবর করবো। গাড়িরও দরকার নেই। সৈন্য দুজন ফিরে গেল।

দুর্গের বাইরে এসে ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল - হ্যারি - জোরে পা চালাও। দুজনে দ্রুতপায়ে দক্ষিণমুখো রাস্তাটা ধরে হাঁটতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বসতি এলাকা ছেড়ে ওরা একটা পাহাড়ি এলাকায় এসে উঁচুনিচু পাহাড়ি পথ ধরে চলল।

দুপুর হল। সূর্য মাথার ওপরে । বেশ রোদের তেজ। হেঁটে চলল ওরা।

কিছু পরেই একটা পাহাড়ি গ্রাম পেল। পাথরের বাড়িঘর। ঘাসের ছাউনি। মাত্র কয়েকটা ঘরবাড়ি। একটা বাড়ির ঘরের সামনে চেস্টনাট গাছের নিচে একজন বয়স্ক লোক পাথরের ওপর বসেছিল। ফ্রান্সিস বলল - হ্যারি - জিজ্ঞেস করো তো - সিমেতো নদী কতদূরে?

হ্যারি লোকটির কাছে গেল। বলল - আচ্ছা সিমেতো নদী এখান থেকে কতদূর?

লোকটি একটু পাহাড়ি টানের ভাষায় বলল - আর বেশি দূরে না। কাছেই। তারপর ফ্রান্সিসদের পোশাক দেখে বল - মনে হচ্ছে আপনারা বিদেশী।

- হ্যাঁ আমরা ভাইকিং জাতি। হ্যারি বলল।

- এত বেলা হয়েছে - বিদেশী আপনারা - নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে লোকটি বলল। হ্যারি বলল - ফ্রান্সিস - বলছে আমরা ক্ষুধার্ত কিনা।

ফ্রান্সিস হেসে বলল - বলো যে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। হ্যারি হেসে বলল সে কথা। লোকটি পাথরের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। ঘর থেকে বৌঝি রা বেরিয়ে এল। লোকটি তাদের কী বলল। তারপর ফ্রান্সিসদের বসতে ইঙ্গিত করল।

ক্লান্ত হ্যারি চেস্টনাট গাছের ছায়ায় লম্বাটে পাথরটায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির মেয়েরা বড় পাতায় রুটি পাখির মাংসের ঝোল নিয়ে এল। ফ্রান্সিস হ্যারি হেসে মাথা ঝুঁকিয়ে ধন্যবাদ জানাল। যা খিদে পেয়েছিল। হাপুস হুপুস করে খেয়ে নিল।

খেয়ে দেয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ওরা চলল সিমেতো নদীর উদ্দেশ্যে। হাঁটতে হাঁটতে ফ্রান্সিস বলল - হ্যারি - দেখ এই যে বিদেশ বিভুঁইয়ে আমরা আতিথ্য পেলাম ক্ষুধার মুখে খাদ্য পেলাম - অচেনা অজানা মানুষের ভালবাসা পেলাম আমাদের জীবনে এর মূল্য কি কম?

হ্যারি হেসে বলল -মোটেই না।

বরং প্রায় ঘন্টাখানেক পরে ওরা সিমেতো নদীর ধারে পৌঁছল। নদীটা খুব বড় নয়। পাহাড়ি নদী। খুব স্রোত। এদিকটায় প্রচুর গাছপালা। নদীর ওপারেও ঘন বন জঙ্গল। তবে গাছপালা খুব দীর্ঘ নয়। গাছগাছালির নিচে বুনো ঘাস। লম্বা লম্বা।

এবার সমস্যা এই খরস্রোতা নদী পার হওয়া যাবে কী করে। তখনই ওরা দেখল নদীটার এপারের একটা গাছে মোটা কাছি বাঁধা। কাছিটা টেনে নিয়ে ওপারের একটা গাছে বাঁধা হয়েছে। কাছি নদীর জলের কিছু ওপরে ঝুলছে। ওরা বুঝল এই কাছি ধরে ধরেই এখানকার লোকেরা নদীটা পারাপার করে। যে প্রচণ্ড স্রোত তাতে পা ঠিক রাখা অসম্ভব। দড়ি ধরেই এই স্রোতকে ঠেকাতে হয়।

ফ্রান্সিস হ্যারি - দুহাতে দড়ি ধরে ধরে নদীর জলে নামল। নদীর জল বেশ ঠান্ডা। আস্তে আস্তে দড়ি ধরে ধরে নদীর স্রোত ধারার মধ্যে দিয়ে পেছল পাথরগুলিতে পা রেখে রেখে বেশ কসরৎ করে নদী পার হল দুজনে। দড়ি না ধরে পার হওয়া অসম্ভব। প্রচন্ড স্রোতের ধাক্কায় কোথায় ছিট্‌কে যাবে তার ঠিক নেই।

ওপারে পৌঁছে কিছুক্ষণ পরিশ্রান্ত দুজনে বিশ্রাম করল। তারপর বনের মধ্যে ঢুকল। বনের গাছপালার নিচে লম্বা লম্বা ঘাস। তার মধ্যে দিয়ে ওরা চলল।

আসার সময় সাভোনা বলে দিয়েছিল ডানদিকে ছাড়া ছাড়া তিনটে উঁচু টিলামত পড়বে। একেবারে তৃণশূণ্য টিলাটার নিচেই বিদ্রোহীদের পুরোনো আস্তানা।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি চলল। কিছুটা যেতেই ডানদিকে দেখল উঁচু টিলা একটা। টিলাটা সবুজ ঘাসে ঢাকা। এই টিলাটা নয়।

আবার চলল দুজনে। বেশ কিছুটা ঘাসের জঙ্গল ঠেলে যাবার পর দেখল ডানদিকে বেশ কিছুটাদূরে আর একটা উঁচু টিলা। আশ্চর্য। টিলাটা একেবারে তৃণশূন্য। শুধু ছাই রঙা পাথরের। বিকেলের নরম আলো টিলাটার মাথায় পড়েছে। এটার নিচেই কোথাও আছে বিদ্রোহীদের আস্তানা।

ওরা টিলাটা লক্ষ্য করে চলল। বিকেল হয়ে গেছে। গাছ গাছালির নিচে এর মধ্যেই অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। ওরা ঠাহর করে করে চলল।

হঠাৎ চারপাশের ঘাসের বনে ছড়্ ছড়্ শব্দ উঠল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল - ওদের চারপাশে ঘাসের জঙ্গলের আড়াল থেকে আট দশজন যোদ্ধা

খোলা তরোয়াল বর্শা হাতে উঠে-দাঁড়াল। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল-লড়াই নয়। আমরা সাভোনা মোরাবিতের বন্ধু। একটু থেমে আবার বলল কথাটা। ফ্রান্সিস ভেবে আশ্বস্ত হল যে সঙ্গে হ্যারিকে এনে বুদ্ধির কাজই করেছে। ও একা এলে লো ল্যাতিন ভাষা বলতে পারতো না। কাজেই প্রাণ সংশয় হত।

যোদ্ধারা অস্ত্র নামাল। ওদের মধ্যে বয়স্ক একজন এগিয়ে এল। বলল-তোমরা কারা?

—আমরা ভাইকিং। আমরা মোরাবিতের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। হ্যারি বলল।

—কেন? যোদ্ধাটি বলল।

—সেটা মোরাবিতকেই বলবো। হ্যারি বলল।

—হুঁ—এসো। যোদ্ধাটি পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল। অন্য যোদ্ধারাও চলল। পেছনে চলল ফ্রান্সিস আর হ্যারি।

ন্যাড়া উঁচু টিলারের নিচেই ওরা দেখল প্রায় আট দশটা ঘর। শুকনো ঘাসের ছাউনি। দেয়ালও শুকনো ঘাস গেঁথে গেঁথে তৈরি করা হয়েছে। ওরা ঘরগুলোর কাছে এল। বয়স্ক যোদ্ধাটি একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। একটু পরেই বেরিয়ে এসে বলল—এই ঘরে এসো।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি মাথা নিচু করে ঘরটায় ঢুকল। ঘরটায় আলো জ্বালা হয় নি। অন্ধকারে ওরা আন্দাজেই বুঝল মোটা কাপড় পাতা বিছানায় কে বসে আছে। হ্যারি ডাকল—মোরাবিত। মোরাবিত বিছানা ছেড়ে উঠল। একটু খুঁড়িয়ে কয়েক পা এসে হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিসের ডান হাতটা ধরল। ফ্রান্সিস হেসে ওর হাতে চাপ দিল। মোরাবিত এবার হ্যারির হাতও ধরল। হাতে চাপ দিল। হ্যারি বলল—তোমার হাঁটুর ঘাটা শুকোয় নি?

—শুকিয়ে এসেছিল পালাতে গিয়ে পাথরে ঘষটানি লাগে—হাঁটতে একটু অসুবিধে হচ্ছে। মোরাবিত বলল।

—তুমি বিছানায় বসো। হ্যারি বলল।

—আপনারাও বসুন। মোরাবিত বসল। মোরাবিত বলল—আপনাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করি।

—না-না—হ্যারি বলল—আমরা আসার পথে খেয়ে নিয়েছি।

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—মোরাবিতকে বলো ও পালিয়ে এল কেন?

হ্যারি সেটা মোরাবিতকে বলল।

মোরাবিত একটু চুপ করে থেকে বলল—আমারি বিদ্রোহী বন্ধুরা এখানে লিপারি দ্বীপ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—কী কষ্টের জীবন কাটাচ্ছে ওরা। এইসব জেনে বুঝেও আমি রাজার দুর্গে পেটপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাবো—অসম্ভব। তাই আমি পালিয়ে এসেছি। আবার সব বিদ্রোহীকে একত্র করবো। অস্ত্র সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যাবো। তারপর চূড়ান্ত যুদ্ধে নামবো ঐ ভিনদেশি রাজা ফ্রেডারিকের বিরুদ্ধে। হ্যারি মোরাবিতের কথাগুলো ফ্রান্সিসকে বলল।

একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—আমি যা বলছি তা তুমি মোরাবিতকে বুঝিয়ে দাও। ফ্রান্সিস বলতে লাগল-মোরাবিত-তুমি সাভোনা খাঁটি দেশপ্রেমিক এ সম্বন্ধে আমার মনে

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু আমি বলবো - তুমি এভাবে পালিয়ে এসে ভালো করো নি।

কথাটা শুনে মোরাবিতের মুখ গম্ভীর হল। একটু তিক্তকণ্ঠে ও বলল - তার মানে আমি পালিয়ে আসায় আপনারা বিপদে পড়েছেন। কথাটা বুঝে নিল ফ্রান্সিস। কথাটা ফ্রান্সিসের মনে খুব লাগল। দুঃখার্তস্বরে ও বলল শুধু আমাদের বিপদ হলে কিছু বলতাম না। সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছেন তোমাদেরই সাভোনা। - সাভোনাকেও আমরা মুক্ত করে নিয়ে আসবো। মোরাবিত বলল। কথাটা বুঝে নিয়ে ফ্রান্সিস এবার বলল - মোরাবিত - রাজা ফ্রেডারিককে আমি কী বলেছিলাম সেটা আমার ভাষা জানো না বলেই তুমি বোঝো নি। - কী বলেছিলেন আপনি? মোরাবিত বলল।

- রাজাকে বলেছিলাম যদি কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আবিষ্কার করতে না পারি তাহলে তোমাদের দুজনের সঙ্গে আমিও ফাঁসিকাঠে মৃত্যুবরণ করবো। মোরাবিতকে ফ্রান্সিসের এই সঙ্কল্পের কথা সাভোনা বলেছিলেন। কিন্তু মোরাবিত তখন বেশ অসুস্থ। সব কথা বোঝবার মত মনের অবস্থা ওর ছিল না। মোরাবিত ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। ঘরটায় তখনও আলো জ্বালা হয় নি। ফ্রান্সিসের মুখটা ও স্পষ্ট দেখতে পেল না। মোরাবিত কোন কথা বলল না। চুপ করে ফ্রান্সিসের এই সঙ্কল্পের কথা ভাবতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল - দেখ মোরাবিত - তোমাদের দেশের সমস্যা তোমরা যে ভাবে পারো মেটাও আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু আমরা এখানে রয়েছি কাউন্ট রজারের নিখোঁজ গুপ্তধন উদ্ধারের জন্যে। এখন তোমরা দুজনে পালিয়ে এলে রাজা ফ্রেডারিক আমাদের বন্দী করবেন। কারণ তোমাদের সব দায়িত্ব আমি নিয়েছি। তাহলেই বুঝতে পারছো যে কাজের জন্যে আমরা দেশে ফিরলাম না সেই কাজটাই তো ভণ্ডুল হয়ে যাবে। মাঝখান থেকে আমার বন্ধুরা আমাদের মুক্ত করতে লড়াইয়ে নামবে - অযথা রক্তপাত মৃত্যু। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল - একটু ভেবে দেখো মোরাবিত - এখন অন্ততঃ আমাকে সুযোগ দাও যাতে আমি নিশ্চিন্ত মনে গুপ্তধনের খোঁজ করতে পারি। গুপ্তধন খুঁজে বের করতে পারলে রাজা ফ্রেডারিক তোমাদের মুক্তি দিতে বাধ্য। এইশর্ত আমি রাজাকে দিয়ে আগেই করিয়ে নিয়েছি। হ্যারি ফ্রান্সিসের কথাগুলো বুঝিয়ে বলতে মোরাবিত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল - ঠিক আছে - আমি দুর্গে ফিরে যাবো। সাভোনা যা বলবেন আমি তাই করবো।

- বেশ তোমাকে আজই ফিরে যেতে হবে। এক্ষুনি। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি কথাটা বুঝিয়ে বলতেই মোরাবিত বলে উঠল - বলেন কি! আমি এখনও ভালো করে হাঁটতে পারছি না। কয়েকদিন ওষুধ বিশ্রাম -। কথাটা বুঝে নিয়ে ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল - না - তোমাকে এক্ষুনি আমাদের সঙ্গে ম্যামিয়াস দুর্গে ফিরে যেতে হবে।

- আপনি আমাকে এক্ষুণি যেতে বলছেন কেন? মোরাবিত জানতে চাইল।

- কারণ - ফ্রান্সিস বলল - তুমি পালিয়ে গেছো এটা জানাজানি হয়ে গেলে রাজা ফ্রেডারিক সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবেন। তখন সাভোনাকেও তোমরা মুক্ত করতে পারবে না। আমাদের মুক্তির আশা না হয় ছেড়েই দিলাম। মোরাবিত একটুক্ষণ ভাবল। বলল - পারবো এতটা পথ হেঁটে যেতে?

- আমাদের দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে তুমি যাবে। পথে ঘোড়ায় টানা শস্যের গাড়ি যোগাড়

করবো হয়তো একটা ঘোড়া বা খচ্চর। কোন কষ্ট হবে না তোমার। ফ্রান্সিস বুঝিয়ে বলল। মোরাবিত আর কোন কথা বলল না। বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তখনই একজন বৃদ্ধা একটা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে ছোট্ট ঘরটায় ঢুকল। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় পোঁতা লোহার চোঙে জ্বলন্ত মোমবাতিটা বসিয়ে দিল। মোরাবিত মৃদুকণ্ঠে বৃদ্ধাকে কী বলল। বৃদ্ধা মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। মোরাবিত ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল - চলুন।

ওরা ছোট্ট ঘরটার বাইরে এসে দাঁড়াল। দেখল - মোরাবিতের বিদ্রোহী বন্ধুরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। মোরাবিত সবাইকে লক্ষ্য করে কী বলতে লাগল। হ্যারি বলল - মোরাবিত ওর বন্ধুদের বলছে ওরা যেন মনোবল না হারায়। ও সাভোনাকে সঙ্গে নিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। আবার রাজা ফ্রেডারিকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে ওরা। ওদের জয় হবেই। মোরাবিতের বিদ্রোহী বন্ধুরা খোলা তরোয়াল বর্শা উঁচু করে হৈ হৈ করে উঠল।

এবার ফ্রান্সিস হ্যারি আর মোরাবিত হাঁটতে শুরু করল। মোরাবিত বেশ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল ওকে সাহায্য করতে। মোরাবিত হেসে বলল - যতটা পারি হাঁটি। না পারলে তবেই আপনাদের সাহায্য নেবো। ফ্রান্সিস হেসে মোরাবিতের কাঁধে আস্তে চাপড় দিয়ে বলল - এই তো বীরপুরুষের মত কথা।

সিমেতো নদীতে বাঁধা কাছি ধ'রে ধ'রে পার হ'তে মোরাবিতের বেশ কষ্টেই হ'ল। ফ্রান্সিস পেছন থেকে সর্বক্ষণ ওকে ধ'রে থেকে সাহায্য করল।

সিমেতো নদীর ওপারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ওদের আবার যাত্রা শুরু হ'ল।

একটা পাহাড়ি গ্রাম ছাড়াতেই উত্তর পূব কোনায় চাঁদ উঠল। আধভাঙা চাঁদ। মোটামুটি উজ্জ্বল। জ্যোৎস্না ছড়াল পাহাড়ি এলাকায় রাস্তায় দু'পাশের ফিকাস ওক গাছের মাথায়। মোরাবিত ভীষণ হাঁপাচ্ছে তখন। ফ্রান্সিস পিছিয়ে এসে মোরাবিতের বাঁ হাতটা কাঁধে তুলে নিল।

মোরাবিত হেসে বলল-সবটা যেতে পারলাম না। ফ্রান্সিসও হেসে বলল-বন্ধু লড়াইটাই বড় কথা। জেতা হারাটা বড় কথা নয়। চলো—।

রাত বাড়ল। চাঁদটা মাথার ওপর চলে এল। এত রাতে পথে গাড়ি ঘোড়া কিছুই পেল না ওরা। হেঁটেই আসতে হল সারাটা পথ।

ম্যামিয়াস দুর্গে যখন ওরা পৌঁছল তখন শেষ রাত।

মারিয়া জেগেই ছিল। ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকতেই মারিয়া ছুটে এল। ফ্রান্সিস বলল—পাহারাদার সৈন্যরা কোন সন্দেহ করে নি তো?

—না। আমি দুপুরে খাওয়ার সময় বলেছি তোমরা কাতানিয়া গেছো। কাল সকালে ফিরবে। পাহারাদাররা আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস ক্লান্তমুখে একটু হাসল—মারিয়া— তোমার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করছি।

ওদের কথাবার্তায় সাভোনার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। সাভোনা বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাড়াল। মোরাবিত প্রায় ছুটে এসে সাভোনাকে জড়িয়ে ধরল। সাভোনাও ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। মশালের আলোয় ফ্রান্সিসরা দেখল সাভোনার দু'গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। নিঃশব্দে কাঁদছে সাভোনা। মারিয়া মৃদুস্বরে বলল-ফ্রান্সিস-বোধহয় একেই বলে স্বর্গীয় দৃশ্য।

কথাটা হ্যারির কানে গেল। অভিভূত হ্যারি বলল- ঠিক বলেছেন রাজকুমারী। ফ্রান্সিস কোন কথাই বলতে পারল না।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস বলল, সাভোনা, চলুন গীর্জাটা দেখতে যাবো।

সবাই গীর্জার সামনে এল। গীর্জার সিঁড়ি দিয়ে উঠল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল, গানটা কোথায় লেখা আছে?

সাভোনা আঙুল দিয়ে মেঝেটা দেখিয়ে বলল, ফুল লতা-পাতা নকশা দিয়ে এখানেই জড়িয়ে জড়িয়ে লেখা, লোভ হিংসায় কাতর—

পড়ুন তো। ফ্রান্সিস বলল। সাভোনা পড়তে লাগল। চার পঙক্তি পড়ে বলল, আরে পাঁচের পঙক্তিটা তো এখানে লেখা নেই!

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলল, ভালো করে দেখুন মেঝের কোথাও লেখা আছে কিনা।

সাভোনা মেঝের চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল। বলল, উঁহু, এখানে তো লেখা নেই।

নিশ্চয়ই কোথাও লেখা আছে। বাইরের ছোট বারান্দায়ও তো মোজেকের কাজ আছে। চলুন তো। ফ্রান্সিস বলল।

গীর্জাঘরের দরজার বাইরে ছোট একটু বারান্দা। মেঝেয় মোজেকের কাজ। তবে খুব বেশি লতাপাতা ফুল জড়ানো নয়। এখানে দাঁড়িয়েই সাভোনা হাসল, এই এখানে লেখা—যেমন যীশুর ঘর-শেষ পঙক্তিটা।

ফ্রান্সিস ভাবল, যীশুর ঘর-তার মানে গীর্জা।

ফ্রান্সিস মেঝের উপর উবু হয়ে বসল। ফুল লতাপাতায় লেখাগুলো দেখতে লাগল। ও গভীরভাবে ভাবতে লাগল, বেশী পঙক্তিটা আলাদাভাবে এখানে লেখা কেন? ভাবতে ভাবতে যখন মেঝের এদিক ওদিক দেখছে তখনই হঠাৎ দেখল লেখাটার ঠিক ওপরেই দুটো লম্বাটে পাথর বসানো, আর ঐ দুটো পাথরকে কেন্দ্র করেই ফুল-লতাপাতার নকশা আঁকা হয়েছে। পাথর দুটো রঙিন। রঙ কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। ভালো করে দেখতেই দেখল, একটা পাথরের রঙ হলুদ, অন্যটার লাল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিসের গানের দুটো পংক্তি মনে পড়ল—

হলুদ লাল পাথর
দূর কর এই দোসর

ফ্রান্সিস দ্রুত চিন্তা করতে লাগল- এই গানটার পঙক্তির পাঁচ এবং শেষেরটা আলাদা লেখা। অন্য কোনো গানে পাথরের কথা নেই। তবে এই পাথর দুটো তো হলুদ আর লাল রঙের। তবে কত দিন আগের। রঙ অনেক ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ওপরে ছাত আছে। তাই জল ঝড়ে রঙটা একেবারে মুছে যায় নি। ফ্রান্সিস আনন্দে চিৎকার করে উঠতে গেল। কিন্তু নিজেকে সংযত করল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। হলুদ লাল পাথর দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যারি, কাউন্ট রজ্জারের গুপ্তধন পোঁতা আছে এই হলুদ লাল পাথর দুটোর নিচে।

বলো কি! হ্যারি পাথর দুটোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। মারিয়া আর সাভোনা দুজনেই পাথর দুটোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কিছুই বুঝতে পারল না।

ফ্রান্সিস বলল, সাভোনা, রাজা ফ্রেডারিককে খবর দিন। এই পাথর দুটো তুলে ফেলার

ব্যবস্থা করতে হবে।

কী করে বুঝলে যে-সাভোনা বলতে গেল। ফ্রান্সিস বলে উঠল, ভুলে যাবেন না এই গীর্জার ওপরটাই রাজা ফ্রেডারিক পুনর্নির্মাণ করিয়েছিলেন। মেঝেটা তৈরি করিয়েছিলেন কাউন্ট রজার। এটা কিন্তু আজও অক্ষত আছে।

সাভোনা আর কোনো কথা না বলে ছুটল দুর্গের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজন অমাত্যকে সঙ্গে নিয়ে রাজা ফ্রেডারিক এলেন। ফ্রান্সিসকে বললেন, আপনি কি নিশ্চিত এই লাল হলুদ পাথরের নিচেই আছে কাউন্ট রজারের গুপ্তধন?

হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল, আর শুধু একটা কথার ধাঁধা। হৃদয় শ্বেতপাথর। এই দুটো পাথর খুলে তুললে যদি একটা শ্বেতপাথর পাওয়া যায় তাহলে সব ধাঁধার সমাধান হয়ে যাবে। গানে আছে, দূর কর এই দোসর। হৃদয় শ্বেতপাথর।

রাজা ফ্রেডারিকের নির্দেশে মোজেকের কয়েকজন কারিগরকে নিয়ে আসা হলো। ওরা বাঁকানো লোহার দু-তিনরকম যন্ত্র বের করে পাথর দুটো অল্পক্ষণের মধ্যেই আলগা করে ফেলল। যখন সবাই মিলে টেনে পাথর দুটো তুলে ফেলল, দেখা গেল একটা লম্বা শ্বেতপাথর বসানো। মারিয়া খুশিতে হাততালি দিয়ে ফেলল। ফ্রান্সিস হেসে বলল, হ্যারি, সাফল্য।

এবার শ্বেতপাথরটা কারিগর কয়েকজন মিলে বেশ কসরৎ করে তুলে ফেলল। দেখা গেল একটা লম্বাটে ওক কাঠের বাক্স। তাতে সোনারুপোর লতাপাতার কাজ। এবার বাক্সটা তোলা হলো। ভারি বাক্সটা রাখা হলো মেঝেয়। রাজা ফ্রেডারিক এগিয়ে এলেন। ওপরের কাঠের ঢাকনাটা আস্তে আস্তে তুললেন। দেখা গেল অনেক সোনার ছোট ছোট চাকতি সারা বাক্সটায় ছড়ানো। সেগুলো রাজা ফ্রেডারিক কিছুটা সরাতেই দেখা গেল কতরকম দামী পাথর বসানো মিনেকরা অলঙ্কার। সোনা দিয়ে বাঁধানো আয়না। সোনার চিরুনি। সকালের রোদ পড়েছে ঐ সোনার চাকতি অলঙ্কারগুলোর ওপর। ঝিকিয়ে উঠছে সব। আয়না চিরুনি। রাজা অমাত্যরা কারিগররা সাভোনা সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ঐ মহামূল্যবান গুপ্তসম্পদের দিকে। শুধু হ্যারি ফ্রান্সিস মারিয়া খুব একটা অবাক হলো না। ফ্রান্সিসের উদ্ধার করা গুপ্তধন ওরা তো আগেও দেখেছে। তবে মারিয়া তো মেয়ে। অলঙ্কারগুলো দেখতে লাগল। কী সুন্দর গড়ন অলঙ্কারগুলোর! ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। উদগত কান্নায় ওর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস হেসে বলল, হ্যারি, এখনও কিন্তু আমাদের কিছু কাজ বাকি।

হ্যারির আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফ্রান্সিস রাজা ফ্রেডারিকের সামনে এল। বলল মহামান্য রাজা, আমি আমার কর্তব্য করেছি। এবার আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রাখুন।

রাজা ফ্রেডারিক সে কথার জবাব দিলেন না। আশ্চর্য হয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার এত আত্মবিশ্বাস!

ফ্রান্সিস হাসল। তারপর বলল, এবার তাহলে মোরাবিত আর সাভোনাকে মুক্তি দিন। রাজা আস্তে আস্তে বললেন, নিশ্চয়ই, কিন্তু তোমরা এই গুপ্তধন উদ্ধার করেছো, তোমাদেরও তো কিছু প্রাপ্য আছে। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে হাসল। বলল, এই গুপ্তধন আপনাদের দেশের, আপনাদের। আমরা কিছু নেব না। এখানকার আদিম বাসিন্দা সারাসেন জাতি, মানে মোরাবিতরা, তাদের



তালা খুলতেই ঝকমক করে উঠলো রত্নগুলো।

কল্যাণের জন্যে আমাদের যা প্রাপ্য সব দিলাম। আমার অনুরোধ, আপনি ওদের ওপর সদয় হোন। ওদের ভালোবাসুন। ওদের কল্যাণে আমাদের প্রাপ্য অংশে ব্যয় করুন। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, এবার আমরা আমাদের জাহাজে ফিরে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস মারিয়া ও হ্যারির দিকে তাকাল।

তিনজনে চলল দুর্গের দিকে। পেছন ফিরে ফ্রান্সিস দেখল সাভোনা ছুটতে ছুটতে আসছে। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে পড়ল। সাভোনা ছুটে এসে ফ্রান্সিসের দু হাত জড়িয়ে ধরল। ওর চোখে জল। সাভোনা কান্নাভেজা গলায় বলল, তুমি আমার সন্তানতুল্য। সেই তোমাকে আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তোমার মতো মানুষ আমি জীবনে দেখিনি।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, অনেক আছে সাভোনা। আমরা জানি না তাই। আচ্ছা চলি—মোরাবিতের সঙ্গে দেখা হলো না। ওকে আমার অন্তরের স্নেহ জানাবেন।

ওদিকে সমস্ত নগরে কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আবিষ্কারের কথা তভক্ষণে রটে গেছে। যে কারিগররা পাথর তুলেছিল, তারাই বাইরে এসে বলেছে।

তিনজন দুর্গের বাইরে আসতে দেখে হাজার হাজার নগরবাসী ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরাও খবর শুনে ছুটে এসেছে। ফ্রান্সিসরা দুর্গ থেকে বেরোতেই বন্ধুরা ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। আনন্দে ধ্বনি দিল—ও হো হো।

উপস্থিত নগরবাসীরা ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওরা বুঝতে পারল না একজনকে নিয়ে এত লোক মাতামাতি করছে কেন?

সমাপ্ত

যোদ্ধামূর্তি রহস্য

তখন বিকেল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ পালমা বন্দরে নোঙর ক'রে রয়েছে। ফ্রান্সিসের বীর বন্ধু ভাইকিংরা অনেকেই জাহাজের ডেক-এ উঠে এসেছে। কেউ কেউ শুয়ে বিশ্রাম করছে। অনেকেই বসে আছে। জাহাজের রেলিঙ ধ'রে তাকিয়ে দেখছে পালমা বন্দরের ব্যস্ততা। ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছাকাছি আরো তিন চারটে ভিনদেশি জাহাজ নোঙর করা। নানা দেশের পতাকা উড়ছে সেইসব জাহাজে। সেইসব জাহাজের বন্দরের কর্মীরা বাদাম তেলের পিপে তুলছে। ডুমুর খুবানির বস্তা তুলছে জাহাজঘাটা থেকে।

নিজেদের কেবিনঘরে ফ্রান্সিস বিছানায় বসে আছে কাঠের দেয়ালে পিঠের ভর রেখে। মারিয়া বিছানার একপাশে বসে সুঁচ সুতো দিয়ে নিজের একটা পোশাকের সেলাই ছিঁড়ে যাওয়া জায়গাটা সেলাই করছিল।

বিকেলের আলো কমে এসেছে। মারিয়া সেলাই বন্ধ ক'রে সবকিছু একটা চামড়ার পেটিতে তুলে রাখতে রাখতে বলল, — ফ্রান্সিস — আর কোথাও নয়। এবার দেশের দিকে জাহাজ চালাতে বলো। ফ্রান্সিসও এই কথাটাই ভাবছিল। অনেকদিন হয়ে গেল ওরা দেশ ছেড়ে এসেছে। কতদিন কত রাত কেটে গেল সমুদ্রে বিদেশের মাটিতে। বন্ধুদের মনের অবস্থা ও ভালো করেই বুঝতে পারছে। মারিয়া তো দেশে ফেরার কথা বলবেই। এতদিন ও কখনো বাবা-মাকে ছেড়ে থাকেনি। ফ্রান্সিস হ্যারি আর বন্ধুদের তো বিদেশের বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়ানো কত বিচিত্র মানুষদের জীবন ওরা দেখেছে। কখনো সরাসরি যুদ্ধে না জড়ালেও বন্দীদশার জীবন তো কাটিয়েছে। এবার ওরা তো ফিরতে চাইবেই।

ফ্রান্সিস এসব ভাবছে তখনই হ্যারি এল। ফ্রান্সিসের পাশে বসল। মারিয়া বলল, হ্যারি — বন্ধুকে বুঝিয়ে বলো এবার দেশের দিকে জাহাজ চালাতে। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস — এবার দেশেই ফিরে চলো।

— দেখ হ্যারি, — ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল — তুমি ভালো ক'রেই জানো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অলস জীবন আমাকে কোনদিন টানেনি। আমি ভালোবাসি অভিযাত্রীর জীবন। ঝড়বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা দেশ মানুষজন তাদের জীবন তাদের সঙ্গে ভালোবাসার সম্বন্ধ। হ্যারি বলল — আমি জানি ফ্রান্সিস। কিন্তু তোমার জীবন সম্পর্কে এই ধারণা যে সবাই বোঝে না। প্রায় সকলেরই ঘরমুখী মন। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল — ঠিক আছে। এখন তো আমরা ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে আছি। জাহাজ-চালককে বলো দেশের দিকে জাহাজ চালাতে।

খবরটা জাহাজে রটে গেল। বন্ধু ভাইকিংরা লেগে পড়ল দড়িদড়া বাঁধা আর পাল খাটানোর কাজে। সন্ধ্যে নাগাদ জাহাজে পাল খাটানো শেষ হ'ল। সমুদ্রে শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস ছুটেছে। ঘড় ঘড় শব্দে জাহাজের নোঙর তোলা হ'ল। নজরদার পেড্রো জাহাজের মাস্তুলে জড়ানো দড়ি বেয়ে বেয়ে মাস্তুলের মাথায় উঠে গেল। পালগুলো হাওয়ার তোড়ে ফুলে উঠল। জাহাজ চলল মাঝ সমুদ্রের দিকে।

জাহাজ চলেছে। রাতের খাওয়াদাওয়ার পর ভাইকিংরা পালা করে জাহাজ পাহারা

দিচ্ছে। আকাশে চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। বেশ দূর পর্যন্ত সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। নজরদার পেড্রো নজর রাখছে চারিদিকে। যদি হঠাৎ কখনো জলদস্যুদের জাহাজ নজরে পড়ে তবে আগে থেকেই সাবধান হওয়া যাবে।

রাতটা নির্বিঘ্নেই কাটল।

পরদিন সকালে বাতাস বেশ পড়ে গেল। জাহাজের গতিও কমে গেল। ফ্রান্সিসকে খবর দেওয়া হ'ল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে ডেক-এ উঠে এল। জাহাজচালকের কাছে এল। বলল — তোমার কি মনে হয়? বাতাসের গতি কমে গেল কেন? জাহাজের হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে জাহাজচালক বলল — চারপাশের সমুদ্রের ঢেউ দেখে বাতাসের গতি বুঝে মনে হচ্ছে আমরা এখনও ভূমধ্যসাগর এলাকার মধ্যেই আছি। এই বাতাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া গুমোট ভাব এই সব কিছু ঝড়ের পূর্বাভাস ব'লে আমার সন্দেহ হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল, — তা'হলে তো আমাদের সাবধান হতে হবে।

— ঝড়ের সঙ্গে লড়বার জন্য আমাদের তো তৈরি হতেই হবে। হ্যারি বলল। জাহাজচালক বলল; — যদি ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে ঝড় ছুটে না আসে তবে আবার বাতাসের বেগ বাড়বে, গুমোট ভাবটা, আর থাকবে না। কিন্তু ফ্রান্সিস সেই অনুমানের ওপর খুব ভরসা করতে পারল না। ও বিস্কোকে ডাকল। বিস্কো এল। ফ্রান্সিস বলল, — সবাইকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলো। ঝড়ের আশঙ্কা আছে। সব পাল গুটিয়ে ফেলে তৈরি হও সবাই।

বিস্কো জাহাজের ডেক-এর বন্ধুদের সাবধান হ'তে বলল। কেবিনঘরে গিয়ে খবর দিল সবাইকে। রসুইঘরে গিয়ে রাঁধুনি বন্ধুদের তাড়া দিল তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করার জন্য।

দুপুরের আগেই খাওয়াদাওয়া সেরে সব ভাইকিংরা তৈরি হ'তে লাগল যদি ঝড় আসে তবে ঝড়ের সঙ্গে লড়বার জন্য।

আশ্চর্য। জাহাজচালকের আশঙ্কাই সত্যি হ'ল। একটু বেলা হতেই দক্ষিণ দিক থেকে হাল্‌কা মেঘের সারি উড়ে আসতে লাগল। একটু পরেই ভারি কালো মেঘের সারি ছুটে আসতে লাগল। কালো মেঘ জমতে লাগল। সূর্য ঢাকা পড়ে গেল। তারপরই প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্ত বাতাস।

ততক্ষণে ভাইকিংরা সব পাল গুটিয়ে ফেলেছে। নজরদার পেড্রো মাস্তুলের মাথা থেকে নেমে এসেছে। মাস্তুল ঘিরে, রেলিঙের ধারে ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ভাইকিংরা। মাস্তুলের লম্বা টানা দড়ি, পাল খাটানোর কাঠে বাঁধা ঝোলানো দড়ি সব টেনে ধ'রে ভাইকিংরা ঝড়ের প্রথম প্রচণ্ড ঝাপ্টা সামলাল। জাহাজটা প্রথম ধাক্কায় কাত হ'য়ে গেলেও ভাইকিংদের অভিজ্ঞ হাতে টানা দড়ির টানে আবার সোজা হয়ে গেল। এবার মেঘের গায়ে আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের আলো চমকাতে লাগল। ঘন ঘন বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'ল মুষলধারে বৃষ্টি। মাস্তুলের টানা দড়ি, রেলিঙের দড়িদড়া, পাল খাটানো কাঠের ঝোলানো দড়ি প্রাণপণে টেনে ধরে ভাইকিংরা ঝড়ের সঙ্গে লড়তে লাগল। জাহাজের দুলুনির সঙ্গে তাল রেখে ওরা জাহাজের সঙ্গেই উঠতে পড়তে লাগল। কিন্তু কেউ নিজের জায়গা ছাড়ল না।

ফ্রান্সিসদের ভাগ্য ভালো বলতে হবে। বিকেলের আগেই ঝড় থেমে গেল। হাওয়ার বেগ কমল। আকাশে আর মেঘ নেই। পশ্চিম দিকে সূর্য নেমে এসেছে। রোদের তেজও কমে এসেছে।

ঝড়বৃষ্টি বেশিক্ষণ ছিল না। ঐটুকু সময়ই ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই ক'রে ভাইকিংরা ক্লান্ত

হ'য়ে পড়েছিল। ক্লান্তিতে ডেক-এর ওপরেই এখানে ওখানে কেউ কেউ শুয়ে পড়েছে। কেউ কেউ বসে পড়েছে।

নজরদার পেড্রো মাস্তুলের দড়িদড়ায় পা রেখে উঠতে লাগল মাস্তুলের মাথায়। নিজের জায়গায় গিয়ে বসে চারদিকে নজর রাখাই তো ওর কাজ। নিজের জায়গায় মাস্তুলের মাথায় পৌঁছোবার পর ওর নজরে পড়ল পুবদিকে পাথুরে ডাঙা। পেড্রো চেঁচিয়ে উঠল — ডাঙা — ডাঙা দেখা যাচ্ছে। ডেক-এর ওপরে যে ভাইকিংরা শুয়ে বসে ছিল তাদের কয়েকজন এসে রেলিঙ ধ'রে দাঁড়াল। ওরাও দেখল পাথুরে ডাঙা। বিস্কোও ছিল তাদের মধ্যে। ও একজন ভাইকিং বন্ধুকে বলল, — ফ্রান্সিস হ্যারিদের আসতে বলো। বন্ধুটি ছুটল সিঁড়ি দিয়ে নেমে কেবিনঘরের দিকে।

কেবিনঘরে ক্লান্ত ফ্রান্সিস শুয়ে বিশ্রাম করছিল। মারিয়া এমব্রয়ডারির কাজ করছিল। দরজায় টোকা পড়তে মারিয়া উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। ভাইকিং বন্ধুটি বলল — ফ্রান্সিস ডেক-এ এসো। পেড্রো ডাঙা দেখতে পেয়েছে। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। চলল ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে। মারিয়াও চলল পেছনে পেছনে।

ডেক-এ উঠে রেলিঙের ধারে এল ফ্রান্সিস। বিস্কো আঙুল দিয়ে পুবদিকটা দেখাল। বিকেলের আলো অনেকটা কমে এসেছে। তবু দেখা গেল উঁচুনিচু পাথুরে জমি। কিছু কাঠপাথরের বসতি এলাকাও দূরে দেখা গেল। আর পড়ন্ত রোদে দেখা গেল উঁচু মিনারের মত। শঙ্কুর আকারের। নিচের দিকটা গোল, ছড়ানো। পাথরের দেয়াল। এখানে একটা বেশ বড় খাঁড়ির মত। সমুদ্রের জল অনেকটা ভেতরে চলে গেছে।

ততক্ষণে হ্যারিও এসে পড়েছে। সবাই উৎসুক চোখে দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল — হ্যারি, কিছু বুঝতে পারছ?

— কোন দ্বীপটিপ হবে ব'লে মনে হচ্ছে। বসতি এলাকা খুব বড় নয় বলেই মনে হচ্ছে। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজটা তখনই একটু উত্তরমুখো হ'ল। এবার দেখা গেল বন্দর এলাকা। বড় খাঁড়ির মুখে জাহাজঘাটা। দু'টো জাহাজ নোঙর করা। একটা জাহাজ বড়। যুদ্ধ জাহাজ। তবে মালবহনের কাজও করে। অন্য জাহাজটা ছোট। ঝক্‌ঝকে সবুজসাদা রঙ করা। বেশ শৌখিন জাহাজ। পালগুলো গুটোনো। মাস্তুল, ডেকও রঙ করা। সবুজ রঙের মোটা দড়ির রেলিং। তা'তে ছোট ছোট পতাকা বসানো। হাওয়ায় উড়ছে পতাকাগুলো। জাহাজটার মাথায় একটা সবুজরঙের দামি কাপড়ের পতাকা উড়ছে। তা'তে কিছু একটা নকশা আঁকা। শেষ বিকেলের আলোয় ঠিক বোঝা গেল না কিসের নকশা। আলো কমে আসায় আর বিশেষ কিছু দেখা গেল না। জাহাজদু'টোয় মাত্র কয়েকজনকে দেখা গেল। তারা পাহারাদার সৈন্য না আরোহী বোঝা গেল না। ফ্রান্সিস বলল — হ্যারি, কী করবে?

— আমরা বন্দরের দিকে যাবো না। খাঁড়ির এপাশে বেশ দূরে আমাদের জাহাজ নোঙর করবো। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস বলল, বেশ। জাহাজচালককে তাই বলো। বিস্কো জাহাজ-চালককে নির্দেশ দিতে চলে গেল। মারিয়া বলল, — কিন্তু কোথায় এলাম। এটা কোন দ্বীপ না দেশ সেটা তো জানতে হবে।

— তাহলে তো আমাদের এখানে নামতে হবে। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, — হ্যারি — সেটা আমিও ভেবেছি। কিন্তু খোঁজটা নেবো কী ক'রে? হ্যারি বলল, — যা বুঝতে পারছি — ঐ জাহাজদু'টোয় যারাই থাকুক — তাদের কারো কাছ থেকে এসব জানতে গেলে বিপদ হতে পারে।

— হুঁ ঠিকই বলেছো — ফ্রান্সিস বলল, ঐ সুন্দর ঝকঝকে জাহাজটা দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে নিশ্চয়ই ওটা কোন রাজা বা ধনী ব্যবসায়ীর। তাদের কাছে কোন সাহায্য পাওয়ার আশা কম। উল্টে আমাদের ওরা জলদস্যুর দল ভেবে আক্রমণ করতে পারে। তাতে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য লড়াইয়ে নামতে হতে পারে। আমরা কোন লড়াই বা ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে যাবো না। আমাদের কোন ক্ষতি হয় এমন কিছু আমরা করবো না। হ্যারি বলল, — হ্যাঁ — আমারও তাই মত। একটু থেমে বলল — সবচেয়ে ভালো হয় — একটু রাত হ'লে নৌকায় চড়ে আমরা খাঁড়ির গায়ে গিয়ে নামবো। ধারে কাছের বাড়িগুলোর কোনটাতে গিয়ে কোথায় এলাম এটা জেনে নিয়ে চলে আসবো।

— ঠিকই বলেছো হ্যারি — এতে বিপদের আশঙ্কা কম। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ এতক্ষণে থেমে গেছে। বেশি শব্দ না ক'রে আস্তে আস্তে নোঙর ফেলা হ'ল।

সন্ধ্যে হ'ল। ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কো তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। রাতে বেরুতে হবে নৌকোয় চড়ে।

রাত হ'ল। ভাইকিং বন্ধুরা সব খাওয়াদাওয়া সেরে নিচ্ছে তখন হ্যারি এসে ওদের ব'লে গেল খাওয়াদাওয়ার পরে ওরা সবাই যেন ডেক-এ উঠে আসে ফ্রান্সিস তাদের কিছু বলবে।

খাওয়াদাওয়ার পরে সবাই জাহাজের ডেক-এ জড়ো হ'ল। একটু পরে — পোশাক পরে কোমরে তরোয়াল নিয়ে ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কো এল। মারিয়াও এল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলতে লাগল, — ভাইসব — যে ডাঙা আমরা দূরে দেখছি আমরা জানি না সেটা কোন দ্বীপ না দেশ। সেটা না জানতে পারলে আমরা কোথায় এলাম, আমাদের দেশ কতদূর এসব কিছুই বুঝতে পারবো না। তাই এসব খোঁজখবর নিতে আমি হ্যারি আর শাঙ্কোকে নিয়ে নৌকোয় চড়ে তীরে যাবো। গোপনে খোঁজখবর নিয়ে আসবো। সে কাজটা এমনভাবে সারতে হবে যাতে আমরা কোন বিপদে না পড়ি। তোমরা ঘুমোও কিন্তু কয়েকজনকে ডেক-এ সতর্কভাবে থাকতে হবে। যদি কোন বিপদে পড়ি তা'হলে যা'তে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অঞ্চল থেকে পালাতে পারি। ফ্রান্সিস থামল। তারপর হ্যারি আর শাঙ্কোকে নিয়ে চলল জাহাজের পেছন দিকে। হালের কাছে এসে ফ্রান্সিস দেখল — একটা নৌকো জলে নামানো হয়েছে। ঢেউয়ে অল্প অল্প দু'লছে নৌকোটা। প্রথমে ফ্রান্সিস তারপরে শাঙ্কো আর হ্যারি জাহাজের বড় হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে নৌকোয় নেমে ব'সে পড়ল। জাহাজের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা খুলে ফ্রান্সিস নৌকো ছেড়ে দিল। দাঁড় টানতে লাগল। ঢেউয়ের দোলায় দু'লতে দু'লতে নৌকো তীরের দিকে চলল।

জাহাজের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল মারিয়া। ফ্রান্সিসদের নৌকোটা দেখতে লাগল। ওর মন খারাপ হয়ে গেল। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে কে জানে কোন বিপদে পড়ে কিনা ফ্রান্সিসরা। কিন্তু ফ্রান্সিসকে কোনভাবেই সংকল্পচ্যুত করা যাবে না এটা মারিয়া জানে। ভয় কাকে বলে ফ্রান্সিস জানে না। ওর আত্মবিশ্বাসও প্রবল।

নৌকো চলেছে। সমুদ্র বেশ শান্ত। হাওয়ার বেগও বেশি নয়। তবু দূরবিস্তৃত সমুদ্রের শোঁ শোঁ শব্দটা শোনা যাচ্ছে।

নৌকো চলেছে। দাঁড় বাইছে ফ্রান্সিস। আর একটা দাঁড় হালের মত ধ'রে চুপ ক'রে বসে আছে শাঙ্কো নৌকোর অন্য কোনাটায়। মাঝখানে হ্যারি।

আকাশে তারার মেলা বসে গেছে। ভাঙা চাঁদ। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। তবে



অস্পষ্ট হ'লেও ফ্রান্সিস দেখল ওদের নৌকো খাঁড়িটার এপাশে তীরের কাছে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস চাঁদের আলোয় দেখে দেখে নৌকোটা খাঁড়িটায় ঢুকিয়ে দিল। তারপর তীরের কাছ দিয়ে দিয়ে নৌকো চালাতে লাগল। খাঁড়ির পার ধ'রে চলেছে উঁচু উঁচু বিরাট পাথরে চাঁই। খাঁড়ির ওপারে দেখা যাচ্ছে সেই তলামোটা মিনার মত। বেশ উঁচু। কিন্তু ওপর থেকে অনেকটা ভাঙা, যেন ধ্বস নেমেছিল। ধ্বসের মধ্যে চৌকোনো বড় বড় পাথরের চাঙ্ ছড়ানো। বোঝাই যাচ্ছে ঐ মিনারেরই ভগ্নস্তূপ। খাঁড়ি শেষে যে তলামোটা মিনারটা দেখা যাচ্ছে সেটা কিন্তু অটুট। পাথর-বাঁধানো। পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ঐ তলামোটা মিনারগুলো কি ফ্রান্সিসরা বুঝতে পারলো না।

খাঁড়ির জলে তেমন ঢেউ নেই। অল্প জ্যোৎস্নার আলোয় সবই দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস খাঁড়ির ধারের উঁচু উঁচু পাথরের চাঁইগুলোর দিকে নজর রেখে চলল যদি সমতল এলাকা পায়। সমতল এলাকাতেই বাড়িঘর থাকবে। লোকজনের বাস সেখানেই তো হবে।

দু'তিনটে পাথরের চাঁইয়ের পাশ দিয়ে খাঁড়ির জল অনেকটা ঢুকে গেছে। এখানটায় আসতেই ফ্রান্সিস দেখল পাথরের চাঁইগুলোর আড়াল থেকে একটা এদেশীয় নৌকো দ্রুত ওদের নৌকোর দিকে ছুটে আসছে। নৌকোটায় তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাতে খোলা তরোয়াল। ফ্রান্সিসরা কিছু বোঝার আগেই নৌকোটা ওদের নৌকোর গায়ে এসে লাগল। ঝাঁকুনি সামলে তিনজন সশস্ত্র লোকই ফ্রান্সিসদের নৌকোয় লাফ দিয়ে নামল। শাঙ্কো দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে তরোয়াল খুলল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল — তরোয়াল নামাও। শাঙ্কো তরোয়াল নামাল। ফ্রান্সিস পোর্তুগীজ ভাষায় বলল — আমরা বিদেশী — লড়াই চাই না। লোক তিনটি কিছুই বুঝল না। তবে তরোয়াল নিয়ে আক্রমণও করল না। নিজেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। এবার হ্যারি লো লাতিন ভাষায় ব'লে উঠল — আমরা বিদেশী — ভাইকিং — লড়াই নয় বন্ধুত্ব চাই। এবারলোক তিনজন বুঝল। ওরা তরোয়াল নামাল। আস্তে আস্তে টাল সামলে নৌকোটায় বসে পড়ল। লোকগুলোর গায়ে এখানকার জেলেদের জোব্বামত পোশাক। অল্প চাঁদের আলোয় দেখে হ্যারি বুঝল ওদের পোশাক জলে ভেজা। ওদের মধ্যে রোগা আর লম্বামত লোকটি লো ল্যাতিন ভাষায় বলল, — তোমরা বিদেশী ভাইকিং — এখানে এসেছ কেন?

— সে অনেক কথা — হ্যারি বলল, — শুধু এটুকু বলছি যে আমরা মোজারকা দ্বীপ থেকে আসছি। যাবো পোর্তুগালের দিকে। এটা কি কোনো দ্বীপ?

— হ্যাঁ। — এটা সার্দিনিয়া দ্বীপ। এটা সার্দিনিয়া দ্বীপের উত্তরের সাসারি বন্দর। কিন্তু তোমরা এখানে এসেছো কেন?

— একটু দূরে আমাদের জাহাজ নোঙর করা আছে। আমরা কোথায় এলাম তার

হদিশ জানতে এসেছি। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, জিজ্ঞেস করোতো ঐ তলামোটা মিনার মত — ওগুলো কী? ফ্রান্সিস কথাটা বলল স্পেনীয় ভাষায়। দেখা গেল লোকগুলো স্পেনীয় ভাষা বুঝল। লম্বামত লোকটা পরিষ্কার স্পেনীয় ভাষায় বলল — ওগুলো নুরাঘি। সার্দিনিয়ার অনেক জায়গায় নুরাঘি আছে।

— এগুলো কি দুর্গ? শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল। লোকটি বলল, — হ্যাঁ। — সৈন্যরা থাকে।

— তোমার নাম কি ভাই?

— দোনিয়া। লোকটি বলল।

হঠাৎ পেছন ফিরে কী দেখেই দোনিয়া এক ঝট্‌কায় উঠে দাঁড়াল। চাপাস্বরে বলে উঠল -- রাজার জাহাজ। পালাও। দোনিয়ার সঙ্গী দু'জনও উঠে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিসরা পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখল সেই সুদৃশ্য সুন্দর ছোট্ট জাহাজটা নিঃশব্দে এদিকেই আসছে। সেই জাহাজের সম্মুখে দু'টো ছোট নৌকো খুব দ্রুত আসছে। নৌকো দু'টো সাধারণ মাছধরা নৌকো না। বেশ শৌখিন সুন্দর নৌকো। নৌকো দু'টোয় প্রায় জনাদশেক সৈন্য। খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সৈন্যদের মাথায় শিরস্ত্রাণ, বুকে লোহার বর্ম আঁটা।

দোনিয়া আর তার সঙ্গী দু'জন নিজেদের নৌকোয় লাফিয়ে উঠতে গেল। নৌকোটা টাল খেল। টাল সামলাতে না পেরে একজন সঙ্গী জলে পড়ে গেল। তাকে হাত বাড়িয়ে নৌকোয় তুলতে গিয়ে দোনিয়ার দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণ সৈন্যবোঝাই নৌকো দু'টো অনেক কাছে চলে এসেছে। সৈন্যদের নৌকো থেকে কে যেন চিৎকার ক'রে বলল, — দোনিয়া — পালাবার চেষ্টা করবেন না। আজকে আপনাকে ধরা দিতেই হবে।

দোনিয়া ততক্ষণে সঙ্গীটিকে নৌকোয় তুলে ফেলেছে। দোনিয়া দেখল — রাজার নৌকো জাহাজ অনেক কাছে চলে এসেছে। এত সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। দোনিয়া পাথরের চাঁই-ওঠা তীরের দিকে তাকাল। ওর লক্ষ্য — সাঁতার দিয়ে তীরে উঠে পালানো। কিন্তু দেখল — তীরে পাথরের চাঁইয়ের ওপর খোলা তরোয়াল হাতে কয়েকজন সৈন্য এসে দাঁড়িয়েছে। বোঝা গেল সৈন্যরা আটঘাট বেঁধেই নেমেছে যাতে দোনিয়া কোনভাবেই পালাতে না পারে।

দোনিয়া বুঝল — পালাবার কোন উপায় নেই। ও কোমরে গোঁজা তরোয়াল খুলে নৌকোর গলুইয়ে ফেলে দিল। সঙ্গী দুজনও তাই করল। তারপর নৌকায় বসে পড়ল।

সৈন্যভর্তি একটা নৌকো ফ্রান্সিসদের নৌকো ছাড়িয়ে দ্রুত দোনিয়াদের নৌকোর গায়ে গিয়ে লাগল। দু'জন সৈন্য তরোয়াল কোমরের খাপে ভ'রে দোনিয়াদের নৌকোয় উঠল। নৌকো থেকে মোটা দড়ির মাথা ছুঁড়ে দেওয়া হ'ল। সৈন্য দু'জন দোনিয়ার নৌকোটার হালের কাছে দড়ি দিয়ে বাঁধল।

এদিকে অন্য নৌকোটা ফ্রান্সিসদের নৌকোর গায়ে এসে লাগল। চাঁদের অল্প আলোয় ফ্রান্সিসদের পোশাক পরিচ্ছদ দেখেই বুঝল — এরা বিদেশী।

সকলের সামনের সৈন্যটি খোলা তরোয়াল হাতে লাফিয়ে ফ্রান্সিসদের নৌকোয় উঠল। লো ল্যাতিন ভাষায় বলল — তোমরা কারা? হ্যারি উঠে দাঁড়াল। কোমর থেকে তরোয়াল খুলে নৌকোর গলুইয়ে রাখল। বলল — আমরা বিদেশী, ভাইকিং। আমরা লড়াই চাই না। আপনাদের বন্ধুত্ব চাই। সৈন্যটি খোলা তরোয়াল কোমরে গুঁজে রাখল। হাত বাড়িয়ে সৈন্যদের নৌকো থেকে বাড়িয়ে ধরা দড়ির মাথাটা নিল। ফ্রান্সিসদের নৌকোর গলুইয়ের কাঠের সঙ্গে দড়িটা বাঁধল। বলল — তোমাদেরও বন্দী করা হ'ল।

কালকে রাজা এনজিওর কাছে হাজির করা হবে তোমাদের। রাজা যা বিচার করবেন তাই করা হবে।

দু'তিনজন ফ্রান্সিসদের নৌকোতেও উঠল। এবার নৌকো দু'টো দড়ি দিয়ে বাঁধা দোনিয়া ও ফ্রান্সিসদের নৌকো টেনে বাঁধল। দোনিয়াদের নৌকোর সৈন্যটি তরোয়াল উঁচিয়ে দূরের নুরাঘিটা দেখিয়ে বলল — নুরাঘিতে টেনে নিয়ে চলো। নৌকো দু'টো আগে আগে চলল। পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা দোনিয়া ও ফ্রান্সিসদের নৌকো।

রাজার জাহাজটা দেখা গেল খাঁড়ির মুখের দিকে চলে যাচ্ছে।

দড়িবাঁধা দোনিয়া ও ফ্রান্সিসদের নৌকো দু'টো টেনে নিয়ে চলেছে সৈন্যদের নৌকো দু'টো। শাঙ্কো আস্তে আস্তে নৌকোর গলুইয়ের ধারে সরে এল। ও তখন দ্রুত ভাবছে আর দেরি করলে চলবে না। রাত থাকতে থাকতেই পালাতে হবে। জাহাজে ফিরে বন্ধুদের সব জানাতে হবে। কালকে রাজা বিচার করবে। ওদের কী শাস্তি দেবে কে জানে। ওদের কাউকে কালকে সকালেও ফিরতে না দেখলে বন্ধুরা চিন্তায় পড়ে যাবে। হয়তো ওদের খোঁজ নিতে জাহাজ চালিয়েই ওরা খাঁড়িতে ঢুকে পড়বে। রাজার জাহাজে অন্য জাহাজটায় অনেক সৈন্য আছে। হয়তো লড়াই হতে পারে। সশস্ত্র সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে বন্ধুরা হারবে। মৃত্যু হবে অনেক বন্ধুর। বন্দীও হবে অনেকে। কাজেই যে ক'রে হোক ওদের সব খবর দিয়ে সাবধান ক'রে দিতে হবে।

শাঙ্কো আরো স'রে এল। গলা নামিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে ডাকল — ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিসের কানে ডাক গেল। কিন্তু ও মাথা ঘুরিয়ে শাঙ্কোর দিকে তাকাল না। আঙুল দিয়ে বা কানটা ছুঁল। তার মানে ও ডাক কানে শুনতে পেয়েছে। মাথা ঘুরিয়ে তাকালে সৈন্য দু'জনের সন্দেহ হতে পারতো — কী কথা বলছে ওরা? শাঙ্কো আগের মতই চাপা গলায় বলল— আমি সাঁতরে পালাচ্ছি। বন্ধুদের খবর দেব। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ ভাবল। তারপর মাথা ওঠানামা ক'রে সম্মতি জানাল। তবে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল — সাবধানে।

শাঙ্কো সৈন্য দু'জনের দিকে তাকাল। দেখল সৈন্য দু'জন তখনও খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে দূরের নুরাঘিটার দিকে।

শাঙ্কো নৌকো থেকে আস্তে আস্তে দু'পা জলে নামাল। তারপর সৈন্য দু'জনের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে দু'হাতে ভর দিয়ে জলের মধ্যে শরীরটা ছেড়ে দিল। টুপ ক'রে জলে ডুবে গেল শাঙ্কো। সৈন্য দু'জন কিছুই বুঝতে পারল না।

শাঙ্কো এক ডুবে যতটা সম্ভব দূরে এসে আস্তে আস্তে মাথা ভাসাল। দেখল নৌকোগুলো অনেক দূরে চলে গেছে। শাঙ্কো জলে কোনরকম শব্দ না ক'রে আস্তে আস্তে সাঁত্‌রাতে লাগল তীরের দিকে।

কিছু পরে নৌকোগুলো নুরাঘির কাছে এল। তখনও অন্ধকার কাটেনি। দেখা গেল জলের ধারটা পাথরবাঁধানো। রাস্তা চলে গেছে ওখান থেকে নুরাঘির সদর প্রবেশপথের দিকে। প্রবেশপথের কাঠের দরজা। তার মাথায় মশাল জ্বলছে। পাথরের টানা দেওয়ালের মাথায় এখানে ওখানে আরো মশাল জ্বলছে। কয়েকজন পাহারাদার সৈন্য নুরাঘি পাহারা দিচ্ছে। তবে তাদের তরোয়াল কোষবদ্ধ।

পাথরবাঁধানো তীরে নৌকোগুলো ভিড়ল। আস্তে আস্তে সবাই নামতে লাগল। সৈন্যরা নেমে সারি দিয়ে দাঁড়াল। সৈন্যদের দলনেতা গলা চড়িয়ে বলল — সব বন্দীরা উঠে এসো। ফ্রান্সিস হ্যারি দোনিয়া তার সঙ্গী দু'জন — সবাই আস্তে আস্তে তীরে নামল।

সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে ফ্রান্সিসরা চলল নুরাঘির প্রধান ফটকের দিকে। ততক্ষণে ফটকের বড় কাঠের দরজা পাহারাদার সৈন্যরা ঠেলে খুলে দিয়েছে। রাস্তা পার হয়ে

ফ্রান্সিসরা প্রধান ফটক দিয়ে নুরাঘির ভেতরে ঢুকল।

ছোট পাথরের চত্বরের পর নুরাঘি। গোল তলাটা। অনেকগুলো ঘর। ফ্রান্সিস মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল — গোল নুরাঘি ওপরের দিকে উঠে গেছে। ওপরেও বেশ কিছু লোহার গরাদবসানো জানালা। তার মানে ওপরেও আরো ঘর আছে।

দলনেতার নির্দেশে ফ্রান্সিসদের একটা ঘরে ঢোকানো হ'ল। ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস জ্বলন্ত মশালের আলোয় দেখল ঘরটা খুব বড় নয়। পাথরের মেঝেয় শুকনো ঘাসের ওপর কাপড়পাতা বিছানা। পাঁচ ছ'জন সৈন্য ঘুমিয়ে আছে। ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢোকার শব্দে দু'একজন সৈন্যের ঘুম ভেঙে গেল। একজন উঠে বসে হাই তুলল।

ফ্রান্সিস বুঝল এটা সৈন্যাবাস। — কয়েদ ঘর নয়। ও এতে খুশি হ'ল। কয়েদঘরের বন্দীদশার হাত থেকে বাঁচা গেল। এখন দেখা যাক — রাজা ওদের কী শাস্তি দেয়।

দোনিয়া ঘাসের বিছানায় বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। বোঝা গেল — দোনিয়া খুবই ক্লান্ত। ফ্রান্সিসরাও ঘাসের বিছানায় বসল। একপাশে হ্যারি বসল। অন্যপাশে বসল দোনিয়ার সঙ্গী দু'জন।

দেখা গেল দরজায় কোন পাহারাদার নেই। তবে কিছু সশস্ত্র সৈন্য ঘোরাফেরা করছে দরজার কাছে।

রাত শেষ হ'য়ে আসছে। কিছু সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র খুলে ঘরগুলোয় ঢুকছে। বোধহয় শুয়ে বিশ্রাম করবে এখন।

ফ্রান্সিস এবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। হ্যারিকে বলল — হ্যারি শুয়ে পড়ো। বিশ্রাম কর। হ্যারিও শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বলল — শাঙ্কো পালিয়েছে। খুব বাঁচোয়া যে ওর কোন বিপদ হয়নি। মারিয়া বন্ধুরা অন্তত নিশ্চিত হবে শাঙ্কোর কাছে খবর পেয়ে যে আমাদের এখনও কোন বিপদ ঘটে নি। আমরা ভালো আছি। হ্যারি বলল — ভালোই হ'ল। শাঙ্কো খুব কায়দা ক'রে পালিয়েছে। আমি তো বুঝতেই পারিনি। একটু চুপ ক'রে থেকে হ্যারি বলল — আমরা বিপদ থেকে বাঁচবো কিনা সেটা এখন নির্ভর করছে রাজা এনজিওর মর্জি-মেজাজের ওপর।

— দেখা যাক কপালে কী আছে। ফ্রান্সিস বলল।

ওদিকে শাঙ্কো সাঁত্‌রাতে সাঁত্‌রাতে যাচ্ছে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দেখল রাজার জাহাজটা ঠিক খাঁড়ির মুখে নোঙর ক'রে আছে। শাঙ্কো বুঝল — ওদিক দিয়ে পালানো যাবে না। ও সাঁত্‌রাতে সাঁত্‌রাতে তীরের কাছে এল। দেখল, এখানে তীরের কাছটা পাথরছড়ানো মাটি। অনেকটা সমতল। ও তীরের কাছে পায়ের নিচে পাথুরে মাটি পেল। কোমরজলে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করল। ও তখনও হাঁপাচ্ছে। আস্তে আস্তে হাঁপ ধরা ভাবটা যেন কমল।

শাঙ্কো ছোট ছোট পাথরকুঁচি ছড়ানো মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে জল থেকে তীরে উঠল। ও স্থির করল পশ্চিমমুখো হেঁটে ঠিক খাঁড়ির মুখ থেকে দূরে চলে যাবে। তারপর সমুদ্রের জলে নেমে সাঁত্‌রে নিজেদের জাহাজে ফিরবে।

পাথুরে জমি পেরিয়ে বেশ একটা টানা সমতল এলাকা পেল শাঙ্কো। চলল পশ্চিমমুখো। হাঁটতে লাগল শাঙ্কো। সমতল হলেও এখানে ওখানে পাথর ছড়িয়ে আছে। কাজেই শাঙ্কোকে বেশ সাবধানেই হাঁটতে হচ্ছিল। গায়ে জলে ভেজা পোশাক। সমুদ্রের জোর হাওয়ায় শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। বেশ শীত শীত লাগছিল।

একসময় সমুদ্রের ধারে এল শাঙ্কো। দেখল খাঁড়ির মুখে রাজার জাহাজ অনেক দূরে।

শাঙ্কো পা টিপে টিপে পেছল পাথরের ওপর পা রেখে রেখে সমুদ্রের জলে নামল।

দূরে ওদের জাহাজ দেখা যাচ্ছে। শাঙ্কো ওদের জাহাজ লক্ষ্য ক'রে সাঁতরাতে লাগল।

একটু পরেই মাথার ওপর কালো আকাশের অন্ধকার কেটে যেতে লাগল। শাঙ্কো মুখ তুলে পুবদিকে তাকাল। দেখল — লালচে হ'য়ে উঠেছে। পূর্ব দিগন্তের আকাশে সূর্য উঠতে দেরি নেই।

শাঙ্কো এবার যতটা সম্ভব দ্রুত সাঁত্‌রাতে লাগল। রোদ চড়া হ'লে বিপদ হতে পারে। অনেকটা দূর হলেও রাজার জাহাজ থেকে কারো নজরে পড়ে যেতে পারে ও। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তল্লাট ছেড়ে পালাতে হবে।

শাঙ্কো সাঁত্‌রে চলল। হাত-পা যেন আর চলছে না। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। তবু শাঙ্কো গতি কমাল না। পাথরের মত ভারি হাত পা। তবু প্রাণপণে সাঁতার কেটে চলল শাঙ্কো।



পুবআকাশে সূর্য উঠল। নরম আলো ছড়ানো শান্ত সমুদ্রের জলে। রোদ চড়া হ'তে লাগল। শাঙ্কো সাঁতরে চলল।

ওদের জাহাজের কাছে যখন এল তখন রাজার জাহাজ অনেক দূরে। নজরে পড়ার সম্ভাবনা নেই। চারদিকে তাকাচ্ছে তখনই হঠাৎ দেখল জলের ওপর চলন্ত পাখনা। শাঙ্কোর বুক কেঁপে উঠল। হাঙর। জল কেটে ঘুরছে। শাঙ্কো ভালো ক'রে আবার চারিদিকে তাকাল। না। আর কোন চলন্ত পাখনা জল কেটে ছুটছে না। শাঙ্কো যখন সাঁত্‌রাতে শুরু করে তখন তরোয়ালটা কোমরে গোঁজা ছিল। কিন্তু হাত পা চালিয়ে সাঁতার কাটতে গিয়ে পায়ে খাপছাড়া খোলা তরোয়ালের খোঁচা লেগে কেটে ছড়ে যাচ্ছিল। তরোয়ালটা নানাভাবে পিঠের নিচে পোশাকে ঢুকিয়ে বুকের কাছে পোশাকে ঢুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল। এতে পরিশ্রমই বেশি হতে লাগল। তরোয়ালের খোঁচার হাত থেকে বাঁচা গেল না। কেটে যাওয়া, ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলোয় সমুদ্রের নোনা জল লেগে ভীষণ জ্বালা করছিল। তখন শাঙ্কো তরোয়ালটা ফেলে দিয়েছিল। এখন বুঝল খুব ভুল হয়েছে। হাঙরের কামড় থেকে বাঁচবার আর কোন উপায় রইল না। শাঙ্কো সাহস সঞ্চয় করল। এখন ভয় পেলে চলবে না। হাঙর যাতে দূরে দূরে স'রে যায় তার জন্যে শাঙ্কো জলে দু'পা দাপাতে দাপাতে সাঁত্‌রাতে লাগল। এতে হাঙরটা দ্রুত আক্রমণ করতে পারল না। শাঙ্কোর চারপাশে পাক খেতে লাগল। বুঝে নিচ্ছে লোকটা সশস্ত্র কিনা।

জাহাজের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল মারিয়া। সারারাত ঘুমোয় নি মারিয়া। রেলিঙের ধারে কখনো বসেছে, কখনও উঠে দাঁড়িয়েছে। দৃষ্টি খাঁড়ির মুখের দিকে। ফ্রান্সিসরা ফিরল কিনা। শাঙ্কোকে প্রথম মারিয়াই দেখতে পেল। মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ক'রে ডাকল, বিস্কো তোমরা শিগগির এসো। শাঙ্কো সাঁতরে আসছে। মারিয়ার ডাকে ডেক-এ ঘুমন্ত ভাইকিংদের ঘুম ভেঙে গেল।

মারিয়া তখনই দেখল শাঙ্কোর ঠিক ডান পাশে হাতকয়েক দূরে হাঙরের চলন্ত পাখনা। ভয়ে মারিয়ার বুক কেঁপে উঠল। মারিয়া কারো জন্যে অপেক্ষা না করে ছুটে হালের কাছে গেল। হালের কাঠের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে দ্রুত নেমে এল দড়িবাঁধা একটা নৌকোয়। দড়ি খুলে জোরে দাঁড় বাইতে লাগল।

ততক্ষণে বিস্কো ও আরো পাঁচ ছ'জন ভাইকিং রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখছে মারিয়া নৌকো চালিয়ে চলেছে শাঙ্কোর দিকে। ওরা প্রথমে বুঝল না মারিয়া এত দ্রুত নৌকোয় চড়ে যাচ্ছে কেন। তখনই হাঙরের পিঠের চলন্ত পাখনা জলের ওপর ভেসে উঠল। ওরা চমকে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। হাঙর! বিস্কো চিৎকার করে বলল, -- রাজকুমারী — হাতের দাঁড়টা জলে জোরে জোরে ফেলুন যাতে বেশিদূর পর্যন্ত জল ছিটকোয়। হাঙর তাড়াবার এসব নিয়ম মারিয়ার জানার কথা নয়। বিস্কো বার বার চিৎকার ক'রে কথাটা বলতে লাগল। মারিয়া বিস্কোর নির্দেশমত তাই করতে লাগল। সত্যি হাঙরটা দূরে সরে গেল। ততক্ষণে শাঙ্কো নৌকোর গায়ে হাত রেখেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে নৌকোর ওপরে কোমর পর্যন্ত তুলে লাফিয়ে উঠল। তারপর পা দু'টো তুলে নৌকোর গলুইয়ের মধ্যে গড়িয়ে পড়ল। একেবারে মড়ার মত পড়ে রইল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। চোখবোঁজা। মারিয়া নৌকো চালাল ওদের জাহাজ লক্ষ্য ক'রে। জাহাজ থেকে তখন সমস্ত ভাইকিংরা আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠল — ও — হো — হো —। ওরা চিৎকার ক'রে মারিয়াকে উৎসাহ দিতে লাগল।

মারিয়ার নৌকো জাহাজের গায়ে এসে লাগল। মারিয়া হালের কাছে এসে হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে জাহাজে উঠে এল। বিস্কো সঙ্গে সঙ্গে দড়িতে ঝুলে পড়ে নৌকোটায় নামল। ততক্ষণে ভাইকিং বন্ধুরা জালের মত বাঁধা দড়িদড়া নামিয়ে দিল নৌকোর ওপর। বিস্কো শাঙ্কোকে অনেক কষ্টে ধ'রে ধ'রে দাঁড় করিয়ে সেই দড়ির জালে বসিয়ে দিল। বন্ধুরা দড়ি টেনে টেনে শাঙ্কোকে জাহাজের রেলিঙের কাছে নিয়ে এল। তারপর ওকে টেনে ধরে নামিয়ে জাহাজের ডেক-এ শুইয়ে দিল। বিস্কো ততক্ষণে নৌকো থেকে জাহাজের ডেক-এ উঠে এসেছে। বিস্কো আর দু'তিনজন ভাইকিং শাঙ্কোকে কাঁধে ক'রে নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে চলল। আস্তে আস্তে ওরা শাঙ্কোকে নামিয়ে এনে ওর কেবিনঘরে নিয়ে গেল। গায়ের ভেজা পোশাক খুলে ওকে শুকনো পোশাক পরিয়ে দেওয়া হ'ল। বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হ'ল। শাঙ্কো অসাড় শুয়ে রইল। সকলের মনেই তখন প্রশ্ন -- ফ্রান্সিস হ্যারির কী হ'ল? ওরা কোথায়? কিন্তু ঐ অবস্থায় শাঙ্কোকে কিছু জিজ্ঞেস করা বৃথা। ও তখন কথাও বলতে পারছে না। ও চোখ বুঁজে তখনও হাঁপাচ্ছে। হাত পা ছড়িয়ে একইভাবে পড়ে আছে।

ভয়ে আশঙ্কায় মারিয়ার বুক কাঁপছে তখন। এতক্ষণের উত্তেজনায় যে কথা মারিয়া ভুলে গিয়েছিল সেটাই মনে পড়ল তখন। ফ্রান্সিস হ্যারির কী হয়েছে? পুরুষ ভাইকিং বন্ধুরা দুঃসাহসী। কিন্তু মারিয়া তো মেয়ে। ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বিস্কো সান্ত্বনা দিতে লাগল — কাঁদবেন না রাজকুমারী। আপনাকে কাঁদতে দেখলে শাঙ্কো আরো নিস্তেজ হ'য়ে পড়বে। মারিয়া দু'হাতে চোখ মুছে শান্ত হবার চেষ্টা করল। কিন্তু ফ্রান্সিস হ্যারির কথা মনে হতেই আবার দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠতে লাগল।

একটু পরে শাঙ্কো আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকাল। বিস্কো শাঙ্কোর মুখের ওপর ঝুঁকে চেঁচিয়ে থেমে থেমে বলল -- শাঙ্কো — ফ্রান্সিস আর হ্যারি -- ভালো থাকলে -- মাথাটা আস্তে আস্তে -- ওঠানামা করো। বিস্কো কথাটা দু'বার বলল। বিস্কোর কথা শেষ হ'তেই মারিয়া আর অন্য ভাইকিং বন্ধুরা সাগ্রহে শাঙ্কো মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। শাঙ্কো

অনেক কষ্টে একটু হাসল — তারপর আস্তে মাথা ওঠানামা করল। সবকিছু ভুলে ভাইকিং রা চিৎকার ক'রে উঠল — ওহো হো —। মারিয়া আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। নিজের কেবিনঘরে চলে এল। আস্তে আস্তে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। ফোঁপাতে লাগল। ভাইকিং বন্ধুরা আস্তে আস্তে ডেক-এ উঠে এল। ওরা তখন এই ভেবে নিশ্চিন্ত হ'ল যে ফ্রান্সিস আর হ্যারির কোন বিপদ হয়নি। ওরা ভালো আছে।

ওদিকে নুরাঘির সৈন্যদের ঘরে ঘাসের বিছানায় ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। পাশে হ্যারি তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরে দু'একটা পাখির ডাক শোনা গেল। রাত শেষ হ'য়ে এসেছে। দোনিয়া তখনও ঘুমুচ্ছে। দোনিয়ার একজন সঙ্গী শুয়ে আছে। অন্য সঙ্গীটা দু হাঁটুতে মাথা রেখে বসে আছে।

ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে ভাবছে তখনও। এরপরে ওরা কী করবে? রাজা এনজিও কী বিচার করবে কে জানে। ঠিক তখনই দোনিয়া মুখে কী বিড়বিড় ক'রে বলে পাশ ফিরল। ফ্রান্সিস দোনিয়ার দিকে তাকাল। হঠাৎই মনে হ'ল — দোনিয়া কে তা তো জানা হয়নি। সৈন্যদের দলপতি দোনিয়াকে 'আপনি' ক'রে বলছিল। তার মানে দোনিয়া সামান্য মাছ-ধরা পেশার জেলে নয়। দোনিয়ার পরিচয়টা তো পেতে হবে। উনি জেলেদের পোশাক পরে জেলেদের সঙ্গে গভীর রাতে নৌকোয় চড়ে ঘুরে বেড়ান কেন?

ফ্রান্সিস উঠে বসল। হাঁটুতে হাত রেখে মাথা পেতে বসে ছিল দোনিয়ার যে সঙ্গীটি তার হাত ধ'রে একটু টানল। লোকটা মাথা তুলল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস স্পেনীয় ভাষায় বলল, — ভাই। তুমি স্পেনীয় ভাষা জানো? লোকটি মাথা কাত ক'রে স্পেনীয় ভাষায় বলল, — হ্যাঁ — তবে কাজচলা গোছের। — আমার তা'তেই হবে — ফ্রান্সিস বলল, — আচ্ছা ভাই — দোনিয়া কে? কেনই বা তোমরা গভীর রাতে নৌকোয় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে? লোকটি বলল, — সেসব দোনিয়া জানেন। তবে দোনিয়ার কথা বলছি — শুনুন। একটু থেমে লোকটা বলতে লাগল — দোনিয়া এখানকার প্রাচীন এক অভিজাত বংশের সন্তান। কিন্তু উনি বরাবরই বংশের আভিজাত্যের ব্যাপারটা মানতেন না। উনি তিনচারটে ভাষা জানেন। লেখাপড়া নিয়েই থাকেন। অবসর সময়ে আমাদের জেলেপল্লীতে চাষীদের বাড়িতে চলে আসেন। আমাদের সুখদুঃখের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন। নিজের উচ্চ বংশ নিয়ে উনি কখনও গর্ব করেন না। অন্য অভিজাত পরিবারের বাড়িতে উনি কখনও যান না। এই সাসারির এমন-কি রাজধানী কাগলিয়ারির গরিব মানুষেরা দোনিয়াকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে।

কিন্তু গভীর রাতে নৌকোয় চড়ে এই খাঁড়ি এলাকায় ঘুরে বেড়ান কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

— দোনিয়া মাঝে মাঝেই মূল ভূখণ্ডের জেনোয়া পিসায় চলে যান। লোকে বলে উনি নাকি ওখানে পড়াশুনো করতে যান। লোকটি থামল। তারপর বলতে লাগল — মাস ছয়েক আগে তিনি হঠাৎই ফিরে আসেন। একদিন সন্ধেবেলা আমাদের জেলে পাড়ায় আসেন। আমরাও তাঁর কাছে গেলাম। উনি বললেন — একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমার কয়েকজন সাহসী সঙ্গী চাই। তোমরা আমাকে সাহায্য করবে? আমরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলাম। সেই রাতেই তিনি আমাদের দু'জন বন্ধুকে নিয়ে গেলেন। এরকম ক'রে দিন কয়েক পরে পরেই রাত হ'লে আসেন আর দু'জন করে সঙ্গী বেছে নিয়ে যান। লোকটি থামল। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগল — গত সাতদিন ধ'রে আমরা দু'জন তাঁর সঙ্গে আছি।

— কী কর তোমরা? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

-- রাত একটু বাড়লেই এই ক্যালে মানে খাঁড়ির ধারে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখা নৌকোয় চড়ে খাঁড়িটায় ঘুরে বেড়াই। এসময় দোনিয়া একটা লম্বা দড়ির মাথায় বাঁধা লোহার বড় বড় বড়শির মত কী যেন খাঁড়ির জলের নিচে ফেলে দেন। তারপর নৌকো চলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দড়িবাঁধা বঁড়শিগুলো টেনে নিয়ে চলেন। সারারাত এই বঁড়শিটানা চলে। ভোর হবার আগেই নৌকো লুকিয়ে রেখে চলে আসি আমরা।

-- কিন্তু বঁড়শি টেনে দোনিয়া কি কিছু খোঁজেন? ফ্রান্সিস বলল।

-- হ্যাঁ, একদিন রাতে আমি জানতে চাইলাম — দোনিয়া — সারা রাত জেগে বঁড়শি ফেলে আপনি কী খোঁজেন? দোনিয়া বললেন তোমরা ঠিক বুঝবে না। শুধু এটুকু জেনে রাখো আমি কয়েকটা যোদ্ধামূর্তি খুঁজছি। কথাটার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝলাম না। লোকটি থামল। ফ্রান্সিস আপন মনে বলল -- যোদ্ধামূর্তি! ফ্রান্সিস বার বার জানতে চাইল সেই যোদ্ধামূর্তি লোহার না অন্য কোন দামি ধাতুর তৈরি। লোকটি বারবারই মাথা নেড়ে বলল — সে সব আমরা কিছুই জানি না। দোনিয়া সব জানেন। তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন।

ফ্রান্সিস দোনিয়ার দিকে তাকাল। দেখল—দোনিয়ার ঘুম ভেঙে গেছে। দোনিয়া চোখ খুলে দু'হাত ওপরে তুলে হাই তুলল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসল। ফ্রান্সিস বলল--দোনিয়া - যদি কিছু মনে না করেন আপনার কাছ থেকে কয়েকটা কথা জানার ছিল। দোনিয়া ফ্রান্সিসসের দিকে তাকাল। বলল বলুন। — আপনার সঙ্গীর কাছে শুনলাম আপনি এই সার্দিনিয়ার এক অভিজাত পরিবারের মানুষ। দোনিয়া সামান্য হাসল, একটু মাথা নেড়ে বলল— অভিজাত হ'লেই সে হৃদয়বান সৎ নির্লোভি মানুষ হয় না। কত অভিজাত মানুষ দেখেছি নৃশংস, লোভী অর্থপিশাচ অত্যাচারী। বংশের আভিজাত্য নয় — একজন মানুষের পরিচয় তার কথায় ব্যবহারে মানবিকতাবোধে। দোনিয়া কথা থামিয়ে দরজার দিকে তাকাল। দেখল - বাইরে রোদ উঠেছে। তবে ঘরটার অন্ধকার এখনও সবটা কাটে নি। মশালও নেভানো হয় নি।

তখনই দু'জন সৈন্য সাধারণ পোশাকে ঘরে ঢুকল। তাদের হাতে চীনে মাটির বড় থালা বাটি। তাতে সকালের খাবার। থালায় গোল কাটারুটি, বাটিতে বিভিন্ন শাকসব্জির ঝোলমত। খাবার থালাগুলো সঙ্গীদের সামনে বিছানায় রাখল ওরা। ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকল। হ্যারি উঠে বসলো। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। সকলেরই খুব খিদে পেয়েছে তখন।

ফ্রান্সিস খেতে খেতে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, অনেক সৈন্যরা জেগে আছে। ফ্রান্সিস ভাবল সৈন্যদের সামনে দোনিয়াকে সব জিজ্ঞেস করে জানাটা ঠিক হবে না। দোনিয়াও হয়তো সব কথা বলতে চাইবে না। ফ্রান্সিসদের খাওয়া হ'য়ে গেল। একটা বড় কাঠের পাত্র থেকে ওরা জল নিল। সৈন্য দু'জন চলে যেতেই ঘর প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। বিছানার কোনার দিকে দুজন সৈন্য তখনও ঘুমুচ্ছে। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল — হ্যারি, একটা বেশ রহস্যময় ঘটনার কথা শুনেছি। পরে তোমাকে সব বলবো। ফ্রান্সিস এবার দোনিয়াকে বলল - আপনার অনেক কথাই আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে শুনেছি। কিন্তু যোদ্ধামূর্তির ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি নি। দোনিয়া চোখ খুলে বলল — আমার সঙ্গী এ ব্যাপারটা আপনাকে না বললেই ভালো হত। যাক গে, আমার শুধু একটাই প্রশ্ন — আপনার এই ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন? এবার হ্যারি বলল, — দেখুন ওর নাম ফ্রান্সিস। আমার বাল্যবন্ধু। ফ্রান্সিস এর আগে অনেক রহস্যের সমাধান করেছে। মূল্যবান সোনার ঘন্টা, গুপ্তধন ফ্রান্সিস আবিষ্কার করেছে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে। — হুঁ - তাহলে মূল্যবান ধনভাণ্ডার নিখোঁজ মূল্যবান জিনিসের প্রতি আপনার লোভ আছে। দোনিয়া বলল। — বিন্দুমাত্র না

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল। তবে আপনার আগ্রহ হয় কেন? দোনিয়া বলল। — বলতে পারেন এটা আমার এক জীবনদর্শন। আমি ভালোবাসি ঝড়বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, দেশবিদেশের মানুষের সঙ্গ, তাদের ভালোবাসা পাওয়া। স্বার্থান্ধ হয়ে কারো কোন ক্ষতি আমি কোনদিন করি নি, করবোও না। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল। হ্যারি বলল, এসব ফ্রান্সিসের মুখের কথা নয়। এসব ওর গভীর বিশ্বাসের কথা। ফ্রান্সিসের সঙ্গে মিশলেই আপনি ওকে ঠিক বুঝতে পারবেন। দোনিয়া একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল, দেখুন যোদ্ধামূর্তির ব্যাপারটা বুঝতে হলে আপনাকে এই সার্দিনিয়ার অতীত ইতিহাস একটু জানতে হবে।

— আমার অনুরোধ, আপনি সব বলুন। আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। ফ্রান্সিস বলল।

—একটা মজার কথা বলি। অতীতে গ্রীক ব্যবসায়ীরা এই সার্দিনিয়া দ্বীপের নাম দিয়েছিল ইচনুসা অর্থাৎ মানুষের পায়ের ছাপ। এই দ্বীপটি দেখতে ওরকমই। প্রায় দু'শো বছর আগের ঘটনা — দোনিয়া আস্তে আস্তে বলতে লাগল — তখন সার্দিনিয়ার রাজা প্রথম ফ্রেডারিক। স্পেনের দোনিয়া অঞ্চলের আরবীয় সুলতান মুজাহিদ সার্দিনিয়া আক্রমণ করেছিল। কয়েকটি যুদ্ধজাহাজে সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুজাহিদ প্রথমে এই সাসারি বন্দর আক্রমণ করে সহজেই এই উত্তর সার্দিনিয়া দখল করে নিয়েছিল। রাজধানী কাগ্লিয়ারি দক্ষিণ সার্দিনিয়ায়। সেখানে যতদিনে খবর পৌঁছল ততদিনে মুজাহিদ্ এই উত্তর সার্দিনিয়া সম্পূর্ণভাবে দখল করে নিয়েছিল। রাজা প্রথম ফ্রেডারিক কাগ্লিয়ারি থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে এখানে এসেছিলেন স্থলপথে। তাঁতে বেশ সময় লেগেছিল। যাহোক — মুজাহিদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ফ্রেডারিকের সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল এই সাসারিতে। যুদ্ধে ফ্রেডারিক হেরে গিয়েছিলেন। রাতের অন্ধকারে একটা ছোট জাহাজে চড়ে অনেক কষ্টে পালাতে পেরেছিলেন। তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন মূল ভূখণ্ডের জেনোয়ায়। বছরখানেক পরে জেনোয়া আর পিসার শাসকদের সহায়তায় অনেক যুদ্ধ জাহাজ ও সৈন্য নিয়ে তিনি সাসারি আক্রমণ করেছিলেন। এই যুদ্ধে মুজাহিদের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়েছিল। সেই রাতে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছিল সাসারির এই অঞ্চল দিয়ে। সেই সুযোগে মুজাহিদ একটা ছোট্ট জাহাজে চড়ে স্পেনে পালাতে পেরেছিল। এই হল ইতিহাসের ঘটনা। দোনিয়া থামল।

— আমার মনে হয় এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা নিশ্চয়ই আছে। হ্যারি বলল। মাথা একটু ঝাঁকিয়ে নিয়ে দোনিয়া বলল- ঠিক। এবার শুনুন সেটা। মুজাহিদ যখন সাসারি দখল করে তখন এখানে এই নুরাঘিটা তো ছিলই আর একটা নুরাঘি ছিল খাঁড়ির বাঁদিকের তীরে। কী কারণে জানা যায় না সেই নুরাঘিটার অর্ধেকটা ভেঙে পড়েছিল। এখন তো প্রায় ধ্বংসস্তূপ। এই নুরাঘিটা তখনও ভেঙে পড়ে নি। মুজাহিদ তার লোকজন দিয়ে এই নুরাঘিটা খুব মজবুত করেছিল। এই নুরাঘির দোতলায় সে তার রাজসভা বসাত। একেবারে ওপরের ঘরটা ছিল ফ্রেডারিক প্রতিষ্ঠিত গির্জা। এখনও সেই গির্জা আছে। গির্জায় যিশুর মূর্তি এখনও আছে। বেদীর কাছেই ছিল সাতটি ঝুলন্ত সৈন্যমূর্তি। সেই সৈন্যমূর্তিগুলোয় দু'টো রুপোর হাতলমতো দিয়ে, ঘা দিয়ে দিয়ে একজন বাদ্যকর সুন্দর সুরধ্বনি তুলতেন। গির্জার ঘন্টার কাজ করত সেই সুরধ্বনি। প্রতিদিন ভোরবেলা একজন নির্দিষ্ট বাদ্যকর এই বাজনা বাজাতেন। সেই সুরধ্বনি নিশ্চয়ই ছিল স্বর্গীয়। নিশ্চয়ই এক গভীর সান্ত্বনার পরিবেশ সৃষ্টি হত এখানে। আমাদের দুর্ভাগ্য আজকের আমরা কেউ সেই সুরধ্বনি শুনিনি। দোনিয়া থামল। — কেন বলুন তো? ফ্রান্সিস বলল।

— কারণ মুজাহিদ সেই সাতটি সৈন্যমূর্তি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল যখন সে একটা ছোট জাহাজে চড়ে পালাচ্ছিল। দানিয়া বলল।

— মূর্তিগুলো কি মূল্যবান ছিল? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

— হ্যাঁ, সবকটাই ছিল সোনার। প্রায় একফুট করে উচ্চতা ছিল মূর্তিগুলোর। শুধু পঞ্চম সৈন্যমূর্তিটি ছিল উচ্চতায় চারফুট আর শুধু ওটাই ছিল নিখাদ সোনার। কাজেই সবচেয়ে মূল্যবান। দোনিয়া বলল।

— তাহ'লে তো মুজাহিদ সেসব মূর্তি নিজের দেশেই নিয়ে চলে গেছে। হ্যারি বলল।

— এতদিন আমরাও তাই শুনে এসেছি। কিন্তু বছরখানেক আগে পিসার এক অভিজাত পরিবারের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় পড়াশুনো করবার সময় আমি একটা আরবী ভাষায় লেখা জোতিষবিদ্যার চামড়ায় তৈরি গ্রন্থে হঠাৎই একটা ছেঁড়া পাতা পাই। একটা চিঠি। আলগা চামড়ায়, লেখা। গ্রন্থটায় গুঁজেরাখা।

— কার চিঠি? ফ্রান্সিস সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

— চিঠিটা আমার পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে। বলছি শুনুন। দোনিয়া আস্তে আস্তে বলতে লাগল —

ভাই আবু —

সার্দিনিয়া অঞ্চলের সকলেই জানে সে সুলতান মুজাহিদ গির্জা হইতে সাতটি সোনার সৈন্যমূর্তি চুরি করিয়া স্পেনে লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে।

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মুজাহিদ সাসারি হইতে পলাইবার উপায় খুঁজিতেছিলেন। সুলতানের কয়েকজন দেহরক্ষী সৈন্য একটি হালভাঙা জাহাজ জোগাড় করিয়া ছিল। সেই জাহাজের পিছনে একটি নৌকা বাঁধা ছিল।

তখন গভীর রাত্রি। আমরা সকলেই সাসারির নুরাঘিতে সুলতানের সঙ্গে জাগিয়া ছিলাম। সকলেরই চিন্তা কী করিয়া সাসারির খাঁড়ি পার হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িব।

ভাগ্য ভাল। হঠাৎই সমুদ্রের উপর প্রচণ্ড ঝড় ছুটিয়া আসিয়া সাসারির বন্দর এলাকায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। সুলতান মুজাহিদ আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিলেন — এই সুযোগ। জাহাজ ছাড়। সুলতান নুরাঘি হইতে বাহির হইলেন। আমরা সুলতানের পিছনে পিছনে আসিতেছিলাম। হঠাৎ সুলতান আমাদের কয়েকজনকে বলিলেন গির্জা হইতে সমস্ত সোনার সৈন্যমূর্তিগুলি লইয়া পিছনের নৌকায় রাখ। আমরা ছুটিয়া গিয়া গির্জায় উঠিলাম। সবগুলি সৈন্যমূর্তি খুলিয়া লইয়া ছুটিতে লাগিলাম জাহাজ-ঘাটার দিকে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে কোনরকমে মূর্তিগুলি নৌকায় রাখিলাম। সুলতান এই সংবাদ পাইয়া জাহাজ চালাইতে হুকুম দিলেন।

অন্ধকারে প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে জাহাজ চলিল। দুই-পার্শ্বের পাহাড়ি এলাকা হইতে তখনও রাজা ফ্রডারিকের সৈন্যরা স্লিংএ চড়াইয়া বড় বড় পাথরের টুকরা আমাদের জাহাজ নৌকা লক্ষ্য করিয়া মাঝে মাঝেই ছুঁড়িতেছিল। একটা বড় পাথরের চাঁই আমাদের নৌকার মুখে আসিয়া পড়িল। জাহাজের সঙ্গে বাঁধা দড়ি ছিঁড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে ঝড়ের প্রবল ধাক্কায় আমাদের নৌকা কাত হইয়া ডুবিতে লাগিল। নৌকায় আমার একমাত্র সঙ্গীটিকে বার বার ডাকিয়াও কোন সাড়া পাইলাম না।

আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া অন্ধকারের ঝড়বিক্ষুব্ধ খাঁড়ির জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। আজ আর আমি জানি না কীভাবে আমি তীরে আসিয়া পৌঁছাইয়াছিলাম।

যাহা হউক, আমি সাসারিতে কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া ছিলাম। এক্ষণে আমি



পিসায় আসিয়া নিম্নলিখিত সরাইখানায় আছি। তুমি আমাদের দুইজনের পরিচিত কয়েকজনকে লইয়া আমার পত্র পাওয়ামাত্র পিসায় আস। সাসারির ঐ খাঁড়ি অঞ্চলে নৌকায় চড়িয়া সন্ধান করিতে পারিলে আমরা সাত সৈন্যমূর্তি জলের তলা হইতে উদ্ধার করিতে পারিব। মূর্তি গলাইয়া সোনা বিক্রয় করিয়া আমরা অচিরেই ধনী হইতে পারিব।

তোমরা আসিলে নিখোঁজ সাত মূর্তির সন্ধান আরম্ভ করিব।

ইতি — মুবারক।

দোনিয়া এত বড় চিঠি নির্ভুল মুখস্থ ব'লে গেল এই শুনে ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই বেশ আশ্চর্য হল। হ্যারি বলল—

— দোনিয়া, - আপনি শুধু বিদ্বান নন, জ্ঞানীও।

দোরিয়া মৃদু হাসল।

— তারপর আপনি কী করলেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

— আমিও আগ্রহী হলাম। স্থির করলাম, আমিও চেষ্টা করবো ঐ সাত স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারের জন্যে। মাসকয়েক আগে আমি সাসারিতে এলাম। গেলাম রাজধানী কাগলিয়ারিতে। রাজা এনজিওর সঙ্গে দেখা করলাম। মুবারকের চিঠির কথা বললাম না। শুধু বললাম কোন এক সূত্র থেকে আমি জানতে পেরেছি যে মুজাহিদ সাত স্বর্ণমূর্তি নিজের দেশে নিয়ে যেতে পারে নি। সাসারির খাঁড়ি অঞ্চলে যে নৌকোয় রেখে স্বর্ণমূর্তিগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেটা ঐ খাঁড়ি অঞ্চলে কোথাও ডুবে গিয়েছিল। আমার স্থির বিশ্বাস ঐ সাত মূর্তি আছে ঐ খাঁড়ি অঞ্চলেই জলের নিচে কোথাও। আপনি অনুমতি দিলে আমি সন্ধানকার্য চালাতে পারি। রাজা এনজিও তো খুশিতে আটখানা। একটুক্ষণ থামলো দোনিয়া। ফ্রান্সিস আস্তে বলল - বুঝলাম পরে রাজা সম্মতি দেন নি। দোনিয়া ম্লান হেসে বলল - আপনি বেশ বুদ্ধিমান। ঠিকই অনুমান করেছেন। একটু থেমে দোনিয়া বলতে লাগল— আসলে ছোটবেলা থেকেই সংসারের সঙ্গে আমার বিশেষ কোন সম্পর্কই ছিল না। গানবাজনা পড়াশুনা এসব নিয়েই থাকতাম। তাই স্বার্থান্ধ মানুষ কতটা নীচ হীনমনা হতে পারে এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা গড়ে ওঠে নি। যাক গে, - রাজা এনজিওর বয়স কম। রাজাকে চালায় স্পিনোলা নামে অভিজাত পরিবারের এক প্রৌঢ়। পরের বার দেখা করলাম রাজা এনজিওর সঙ্গে। আবার অনুমতি চাইলাম। রাজা এনজিও বলল - কিন্তু আপনি কি নিশ্চিত যে ঐ খাঁড়িতেই সাত সৈন্য মূর্তি নিয়ে নৌকোটা ডুবে গিয়েছিল ? বুঝলাম স্পিনোলা রাজাকে অন্যরকম বুঝিয়েছে। বললাম - আমি সন্ধানকার্য চালাবো। যদি মূর্তিগুলো না পাই তাহলে তো আমারই পণ্ডশ্রম। কতদিন ধ'রে এই সন্ধানকার্য চালাতে হবে কে জানে। আমি যদি নিশ্চিতই না হবো তাহলে বোকার মত এত

কষ্ট স্বীকার করবো কেন? এবার স্পিনোলা একটু হেসে বললেন - আচ্ছা দোনিয়া- এত কষ্ট ক'রে আপনি সোনার মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে চান কেন?

— আমাদের দেশের সম্পদ, তাই। আমি বললাম। স্পিনোলা বললেন - বুঝলাম। ধরুন ঐ মূর্তিগুলো উদ্ধার করলেন। ঐ সোনার মূর্তিগুলো বিশেষ ক'রে সবচেয়ে বড় নিরেট সোনার মূর্তিটা - অনেক মূল্য ঐ মূর্তিগুলোর। আপনি সে সব উদ্ধার ক'রে কী করবেন? বিক্রি ক'রে আরো বড়লোক হবেন? আমি বললাম, -না - আমি সেসব রাজা এনজিওকে দেব। বদলে সমমূল্যের অর্থ তিনি আমাকে দেবেন। এবার রাজা এনজিও বলল, সেই অর্থ নিয়ে আপনি কী করবেন? এবার আমি আসল কথাটা বললাম— ঐ অর্থ দিয়ে আমি এখানকার দরিদ্র জেলেদের বেশ শক্তপোক্ত নৌকো তৈরি করিয়ে দেবো, মাছধরার উন্নতমানের সাজসরঞ্জাম দেবো যাতে তারা গভীর সমুদ্রে গিয়ে নিশ্চিন্তে বেশি মাছ ধরতে পারে। উত্তর সার্দিনিয়ায় আমি ঘুরে বেড়াবে ও চাষযোগ্য জমি উদ্ধার করবো। চাষিদের চাষবাসের ভালো সরঞ্জাম কিনে দেবো যাতে তারা বেশি ফসল ফলাতে পারে। জেলে ও চাষিদের বসতি এলাকার বাড়িঘর নতুন করে তৈরি করিয়ে দেবো। চিকিৎসা আর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে দেবো যাতে দরিদ্র জেলে আর চাষিরা সুখে স্বচ্ছন্দে তাদের জীবন কাটাতে পারে। আমার স্বপ্নের কথা আশা আকাঙ্ক্ষার কথা রাজা এনজিও কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনল। স্পিনোলা হেসে উঠলেন -- এ সব আপনার মুখের কথা। মূর্তিগুলো পেলে আপনি সেসব নিয়ে সাসারি থেকে পালিয়ে জেনোয়া কি পিসায় চলে যাবেন। সেসব গালিয়ে বিক্রি করে বিদেশে গিয়ে রাজার হালে বাকি জীবন কাটাবেন। স্পিনোলার কথা শুনে দুঃখে বেদনায় চোখে জল এসে গেল। মানুষ এত নীচ হয়?

— রাজা এনজিও কী বললেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

— সেদিন কিছু বলল না। কয়েক দিন পরে আসতে বলল। গেলাম কয়েকদিন পরে। রাজা এনজিও পরিষ্কার বলল - আমরা ভেবেচিন্তে দেখলাম। শুধু আপনার মুখের কথার ওপর বিশ্বাস করে আমি অনুমতি দিতে পারবো না। আমি বললাম অত মূল্যবান মূর্তিগুলো জলের নিচে পড়ে থাকবে? আমি বেশ দুঃখের সঙ্গেই বললাম। স্পিনোলা বলে উঠলেন - আপনার অনুমান তো সত্যি নাও হ'তে পারে। মুজাহিদ হয়তো সেই মূর্তিগুলো নিয়ে নিজের দেশ স্পেনে পালিয়ে যেতে পেরেছিল। দোনিয়া থামল। হ্যারি বলল তারপর? দোনিয়া বলল - আমি নানাভাবে রাজা এনজিওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু রাজা এনজিও আমাকে কিছুতেই অনুমতি দিলনা। বুঝলাম - গোপনেই আমাকে এই সন্ধান চালাতে হবে। তাই কয়েকজন পরিচিত জেলেকে নিয়ে রাতের পর রাত জেগে নৌকোয় চড়ে সন্ধান চালাতে লাগলাম।

— তারপর? হ্যারি বলল। দোনিয়া বলল - জানি না কী ক'রে আমার এই গভীর রাতে সন্ধানের কথা স্পিনোলার কানে গেল। স্পিনোলা সঙ্গে সঙ্গে রাজা এনজিওকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলেন। তারপর রাজা এনজিওর ব্যক্তিগত জাহাজটায় রাজাকে নিয়ে এখানে এলেন। এখানকার রাজপ্রাসাদে এসে উঠলেন। নৌবাহিনীর চারজন বাছাই করা সৈন্যকে হুকুম দিলেন যে ক'রেই হোক আমাকে বন্দী করতে হবে। ঐ সৈন্যদের হাত থেকে বারকয়েক পালাতে পেরেছিলাম। গত রাতে আর পারলাম না। আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। তাই ধরা পড়তে হল। দোনিয়া থামল। ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ। তারপর হ্যারি বলল - আমরা দুঃখিত। আমাদের জন্যই আপনারা ধরা পড়লেন। দোনিয়া কোন কথা বলল না।

ফ্রান্সিস সমস্ত ঘটনাটা ভাবল। তারপর বলল - দোরিয়া আপনার অন্তঃকরণ মহৎ এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনার মত মানুষ আমি কমই দেখেছি। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল তবে আপনি কিছু ভুল করেছেন। একেবারে সাদা মনের মানুষ ব'লে রাজা এনজিওকে আপনি সব কথাই বলেছেন। স্পিনোলার মত মানুষ সেই সুযোগটাই নিয়েছেন। তবে মুবারকের চিঠির ব্যাপারটা গোপন করে খুব বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। স্পিনোলা চিঠির কথা জানতে পারলেই আপনার কাছে মূল চিঠিটা চাইতেন, আপনিও দিতেন। তখন স্পিনোলা নিজেই ঐ মূর্তি উদ্ধারের কাজে লাগতেন। আপনার সব স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেত। দোনিয়া মাথা ওঠানামা করল। বলল - আপনি ঠিকই বলেছেন। এবার ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল—

— যদি কিছু না মনে করেন তাহলে বলি।

— বলুন। দোনিয়া বলল।

— স্বর্ণমূর্তির মূল্যের সমান অর্থ দিতে আপনি রাজা এনজিওকে বলেছিলেন।

কোন কথা না বলে দোনিয়া মাথা ওঠানামা করল।

এক্ষেত্রে সমমূল্য চাওয়াটা কিন্তু ভুল হয়েছে। আপনার মত উদার মন তো সকলের নয়। স্পিনোলা এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছেন। রাজাকে বুঝিয়েছেন আপনার সমান মূল্যের অর্থ চাওয়া মানেই আপনি অর্থলোভী। হয়তো দরিদ্র জেলে চাষিদের জন্য কিছু খরচ করবেন বাকি অর্থ আপনি নিজে আত্মসাৎ করবেন। দোনিয়া একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল - হ্যাঁ - স্পিনোলা যে রকম মানুষ তাতে রাজাকে এরকম ভুল বোঝাতে পারেন।

-- সবচেয়ে ভালো হত যদি আপনি মোট মূল্যের চারভাগের একভাগ চাইতেন। তা'হলে স্পিনোলা রাজাকে আপনার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারতো না। স্পিনোলা তো বটেই রাজা এনজিও নিজেও অর্থগৃধ্নু। তিনভাগ অর্থ দিতে হবে না এই ভেবেই তাঁরা খুশি হতেন। আপনাকে অনুমতি দিতেন। ফ্রান্সিস বলল। দোনিয়া একটুক্ষণ ভাবল। বলল - তা ঠিক। কিন্তু চারভাগের একভাগ তো খুব বেশি নয়।

-- সেটা মূর্তিগুলো উদ্ধারের পর সোনা দেখে সঠিক মূল্য পেয়ে হিসেব করে বোঝা যেত। এখনো তো মূর্তিগুলো উদ্ধারই করা যায় নি। আগে নিখোঁজ মূর্তিগুলো তো উদ্ধার করুন। ফ্রান্সিস বলল।

-- দেখি আপনার কথাটা ভেবে। দোনিয়া বলল। হ্যারি বলল - দেখুন দোনিয়া - এত বড় খাঁড়িটায় শুধু ঐ দড়িবাঁধা বঁড়শিগুলো দিয়ে খুঁজে খুঁজে কি মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে পারবেন?

-- জানি না পারবো কি না। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবো। দোনিয়া বলল। ফ্রান্সিস বলল - হ্যারি ঠিকই বলেছে। অতবড় খাঁড়ির জলে কোথায় ডুবো নৌকাটা। একটা বড়শি ফেলে ফেলে খুঁজে বের করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এভাবে কতদিন আর খোঁজ চালিয়ে যেতে পারবেন। তাছাড়া আপনাকে খোঁজ চালাতে হবে রাতে। রাতের পর রাত জেগে কতদিন পারবেন?

-- কিন্তু আমাকে যে গোপনেই খোঁজ চালাতে হবে। দোরিয়া বলল।

-- ঠিক আছে। রাজা এনজিওর কাছে তো আমাদের নিয়ে যাওয়া হবেই। তখন আমি চেষ্টা করবো রাজার অনুমতি আদায় করতে। শুধু আপনি আমার অভিমতের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না। আমাকে সমর্থন করবেন। ফ্রান্সিস বলল।

— বেশ। কিন্তু আপনি কি পারবেন অনুমতি আদায় করতে? দোনিয়া বলল।

দেখি চেষ্টা করে। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি বলল - দেখ ফ্রান্সিস, আমার কেমন মনে হচ্ছে নৌকোটা সোনার মূর্তিগুলো নিয়ে খাঁড়ির কোথায় ডুবে গিয়েছিল তার কোন না কোন সূত্র মুবারক নিশ্চয়ই কোথাও যেভাবে হোক রেখে গেছে।

-- আমারও তাই বিশ্বাস। তবে সব না দেখে শুনে এখনই ঠিক বলতে পারছি না মুবারক কোথায় কীভাবে জায়গাটার হদিশ রেখে গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

-- আচ্ছা এও তো হতে পারে যে মুবারক তার বন্ধুদের সাহায্যে পরে জলের তলা থেকে মূর্তিগুলো সব তুলে নিয়ে গেছে। হ্যারি বলল।

-- আমার তা' মনে হয় না। কারণ সেই চিঠিটা মুবারক লিখেছিল তার স্বদেশের বন্ধুদের কাছে - স্পেনের দোনিয়ায়। কিন্তু চিঠিটা আমি পেয়েছি পিসায়। চিঠিটা যদি স্পেনে চলেই যেত তাহলে পিসায় চিঠিটা আমি পেতাম না। দোনিয়া বলল।

ফ্রান্সিসরা কথাবার্তা বলছে তখনই একজন সৈন্য এসে বলে গেল ওরা যেন স্নানখাওয়া সেরে নেয়।

একটু বেলায় ফ্রান্সিসদের খেতে দেওয়া হল। চিনে মাটির বড় থালায় বড় বড় দু'টো গোল রুটি। বাটিতে ভেড়ার মাংস ঝোল। ঐ ঘরেই ঘাসের বিছানায় বসে ওরা খেতে লাগল। খেতে খেতে হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস এবার কী করবে?

সেটা নির্ভর করছে রাজা এনজিও কী বলে তার ওপর। ফ্রান্সিস বলল।

-- যদি মূর্তি উদ্ধার করতে দিতে সম্মতি দেয়? হ্যারি বলল।

-- তাহলে লেগে পড়বো। ফ্রান্সিস বলল।

-- কিন্তু মারিয়া আর বন্ধুরা কি আর এই সার্দিনিয়ায় অপেক্ষা করতে চাইবে? হ্যারি বলল।

দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি আর কিছু বলল না।

ওদের খাওয়া শেষ হল। তখনই একজন বেশ মোটা দাড়িগোঁফঅলা একজন সশস্ত্র লোক ঘরে ঢুকল। তার পেছনে কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য। দোনিয়া গলা নামিয়ে আস্তে বলল - ইনিই সেনাপতি। সেনাপতি বেশ গম্ভীর ভঙ্গীতে বলল - দোনিয়া - আপনারা আর ঐ বিদেশীরা চলুন। রাজা এনজিও আপনাদের প্রাসাদে নিয়ে যেতে বলেছেন।

-- আমাদের কি বন্দী করা হবে? দোনিয়া বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল।

-- এখনো তো আপনাদের হাত পা বাঁধা হয়নি। রাজা এনজিও পরে যা হুকুম দেবেন তাই হবে। সেনাপতি বলল। নুরাঘি থেকে বেরিয়ে ফ্রান্সিসরা পাথরবাঁধানো পথ দিয়ে চলল। সামনে পেছনে খোলা তরোয়াল হাতে কয়েকজন সৈন্য। সবার সামনে সেনাপতি। সেনাপতির শিরস্ত্রাণ আর বুকে বাঁধা বর্ম পেতলের। সৈন্যদের মত লোহার নয়।

পথের দু'পাশে পাথরের বাড়িঘর। এখানে লোকের বসতি আছে। বাড়ির জানালা দরজা দোকান থেকে লোকজন ফ্রান্সিসদের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। ওরা দোনিয়াকে চেনে এটা ওদের মুখ দেখেই বোঝা গেল। ফ্রান্সিসদের চেহারা পোশাক দেখে ওরা একটু আশ্চর্য হল। এই বিদেশীদের রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন এটা ওরা বুঝে উঠতে পারল না।

পাথুরে পথ ধরে কিছুটা যেতেই একটা ঘাসেঢাকা উপত্যকামত। সেখানেই ছাই ছাই রঙের পাথরে তৈরি একটা লম্বাটে বাড়ি দেখা গেল। বেশ বড় বাড়ি। বোঝা গেল এটাই এখানকার রাজপ্রাসাদ। রাজা এনজিও এখন এখানেই আছেন।

প্রাসাদের বেশ বড় সদর দরজাটা খোলা। দরজাটা ওক কাঠের। কাঠের দরজায় কুঁদে

ছাদে পাতা ফুল লতার পাখির নকশা তোলা। দরজার দু'ধারে খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা। সকলেই মাথা একটু নুইয়ে সেনাপতিকে সম্মান জানাল।

সদর দরজাটা পার হতে একটা পাথরবাঁধানো চত্বর। তারপর একটা পাথরের তৈরি ঘর। ঘরে ঢোকার দরজার পাশে দ্বাররক্ষী দু'জন। ওদের হাতে চক্‌চকে পেতলের বর্শা। দ্বাররক্ষী দু'জনও সেনাপতিকে মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল।

চত্বর পার হচ্ছে যখন তখনই ফ্রান্সিস দোনিয়াকে জিজ্ঞেস করল -- রাজা এনজিও কি এখানেই বরাবর থাকেন?

না। রাজধানী কাগলিয়ারিতে বিরাট প্রাসাদে থাকে। আমার নিখোঁজ মূর্তি সন্ধানের খবর পেয়ে মাস তিনকে হল এখানে এসেছে। উদ্দেশ্য -- আমাকে বন্দী করা। রাজার সেনাদের হাত থেকে বার কয়েক পালিয়েছি। কাল রাতেই ধরা পড়ে গেলাম। দোনিয়া বলল।



ওরা ঘরটায় ঢুকল। প্রশস্ত ঘর। মেঝের পাথরে মোজেকের কাজ করা। লোহার গরাদ বসানো পাথরের জানালা দিয়ে রোদ পড়েছে ঘরটার একপাশে। ঘরটার শেষের দিকে এক মানুষ সমান উঁচু পিঠঅলা চেস্টনাট কাঠের সিংহাসন। তার গায়ে কুঁদে কুঁদে নানা কাজ করা। সিংহাসনের লাল ভেলভেট-ঢাকা আসনে রাজা এনজিও বসে আছে। ফ্রান্সিস দেখল রাজাকে। বয়েস বেশি নয়। ওদেরই বয়েসী। দুধেআলতায় গায়ের রঙ। মুখে দাড়িগোঁফ কামানো। মাথায় তিনকোনা-ওঠা সোনার মুকুট। গায়ে দামি কাপড়ের সোনারুপোর সুতোর কাজ করা। গলায় মুক্তোর মালা। সিংহাসনের বাঁপাশে পাথরের কয়েকটা আসন। আসনগুলো নীল ভেলভেট কাপড়ে ঢাকা। আসনে একজন প্রৌঢ় বসে আছেন। গায়ে হলুদরঙের জোব্বামতো। মাথার চুল দাড়িগোঁফ সব সাদা। ফ্রান্সিস বুঝল - ইনিই স্পিনোলা। রাজা এনজিওর পরামর্শদাতা। সম্মানিত অমাত্য।

ফ্রান্সিসদের সিংহাসনের সামনে নিয়ে আসা হল। সেনাপতি মাথা অনেকটা নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানিয়ে লো ল্যাতিন ভাষায় একটা নাগাড়ে কী বলে গেল। হ্যারি ফ্রান্সিসকে মৃদুস্বরে বলল - সেনাপতি কীভাবে আমাদের ধরা হয়েছে তার কথা বলল। আমাদের কথাও জানাল। আমরা বিদেশি এটাও বুঝেছে কিন্তু কোন দেশি তা জানেনা। রাজা এনজিও আর স্পিনোলা দু'জনেই মন দিয়ে সেনাপতির কথা শুনলেন।

রাজা দোনিয়ার দিকে তাকাল। বলল - দোনিয়া, আপনি আমার সম্মতি না নিয়ে যা করে চলেছিলেন তা'তে অন্য কেউ হ'লে তাকে কয়েদঘরে পাঠাতাম। নেহাৎ আপনি সার্দিনিয়ার এক অভিজাত বংশের সন্তান। ঐ শাস্তি আপনাকে দেব না। তবে শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। এবার স্পিনোলা গলা খাঁকারি দিল। হেসে বলল--মাননীয় রাজা মহাশয়, অভিজাত পরিবারের হলেও পরিবার পরিজনদের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই।

চাষাভুষো জেলেদের সঙ্গেই তাঁর যত সম্পর্ক। যাক--গে মনে হয় একটা শাস্তি দিলেই দোনিয়াকে শায়েস্তা করা যাবে।

-- ঠিক আছে। বলুন সেটা কী? রাজা বলল।

দোনিয়া কোনদিন এই সাসারিতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাসারিতে তাকে দেখলেই বন্দী করা হবে এবং তৎক্ষণাৎ বিনা বিচারে এখানকার কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হবে। হ্যারি ফ্রান্সিসকে সব কথাবার্তা বুঝিয়ে বলছিল। স্পিনোলা যে কত বড় ধূর্ত আর কুচক্রী স্পিনোলার বক্তব্য শুনেই ফ্রান্সিস বুঝল। দোনিয়াকে যদি সাসারিতে ঢুকতে না দেওয়া হয় তাহলে দোনিয়ার সব চেষ্টাই বানচাল হয়ে যাবে। কারণ এই সাসারির খাঁড়িতেই তো জলের তলায় রয়েছে সাত সৈন্যমূর্তি। ফ্রান্সিস এও বুঝল যে এক্ষুণি এই শাস্তিদান বন্ধ করতে হলে ওকে এগিয়ে আসতে হবে। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল -রাজাকে বলো যে আমরা স্পেনীয় ভাষায় কিছু বলতে চাই। উনি এবং স্পিনোলা যেন স্পেনীয় ভাষায় যা বলার বলেন। হ্যারি ডান হাতটা তুলে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রাজা বলল,-

হ্যাঁ। শুনলাম তোমরা বিদেশি। তোমরা কোন্ দেশের লোক এবং এখানে এসেছো কেন?

-- আমরা জাতিতে ভাইকিং। হ্যারি বলল। রাজা স্পিনোলাকে বলল - স্পিনোলা, ভাইকিংদের কথা আপনি জানেন?

হ্যাঁ, মহামান্য রাজা। এরা খুব দুঃসাহসী। জাহাজ চালনায় কোন জাতিই এদের সমকক্ষ নয়। তবে এদের দুর্নামও আছে জাহাজ লুণ্ঠনকারী বলে। স্পিনোলা বলল। হ্যারি বলল, মহামান্য রাজা, - শৌর্যেবীর্যে আমাদের সঙ্গে যারা পেরে ওঠেনা তারাই আমাদের দুর্নাম দেয়। একটু থেমে হ্যারি বলল — আমরা বীরের জাতি। বীরত্বকে মানবিকতাকে বিশ্ববাসীর ভ্রাতৃত্ববোধকে শ্রদ্ধা করি। হ্যারি ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল - এর নাম ফ্রান্সিস। আমার বাল্যবন্ধু। ফ্রান্সিস অনেক রহস্যের সমাধান করেছে। শুধু সাহসে ভর ক'রে অনেক মহামূল্যবান গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করেছে। ফ্রান্সিস আপনাকে কিছু বলতে চায় স্পেনীয় ভাষায়। আপনিও ঐ ভাষায় আপনার বক্তব্য বলুন।

-- বেশ। রাজা বলল। তারপর ফ্রান্সিসকে বলল - তোমরা এখানে এসেছো কেন? ফ্রান্সিস বলল - মহামান্য রাজা - আমরা দূর দূর দেশে ঘুরে বেড়াই। কোন গুপ্ত ধনভাণ্ডার বা নিখোঁজ মূল্যবান কিছুর সংবাদ পেলে আমরা তা উদ্ধার করি। ফ্রান্সিস বলল। স্পিনোলা হেসে বলল তারপর সেসব লুকিয়ে চুরিয়ে দেশে পাচার কর।

-- খুবই দুঃখ পেলাম মাননীয় স্পিনোলা। সৎ, নির্লোভ মানুষও যে পৃথিবীতে আছে এটা বোধহয় আপনি বিশ্বাস করেন না। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল। স্পিনোলা হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। শূন্যে ডানহাতটা ঘুরিয়ে ফ্রান্সিসের কথাটা উড়িয়ে দিলেন। ফ্রান্সিস বলল — যাকগে, - আমার একটা নিবেদন আছে।

-- বলো। রাজা বলল।

মহামান্য রাজা, ফ্রান্সিস বলতে লাগল দোনিয়ার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সাত সোনার যোদ্ধামূর্তির কথা শুনেছি। পরে আরো কিছু জানতে হবে। দোনিয়া দীর্ঘ ছ'মাস আপ্রাণ চেষ্টা করেও সেই মূর্তিগুলো জলের তলা থেকে উদ্ধার করতে পারেন নি। আমার মনে হয় - প্রায় দুশো বছর আগে ডুবে যাওয়া ঐ মূর্তিগুলি শুধুমাত্র কয়েকটা বঁড়শি ডুবিয়ে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অন্য কোন সূত্র চাই।

কোন্ সূত্র? স্পিনোলা বললেন।

--সেটা আমি এখুনি বলতে পারছি না। তার জন্যে আমার সময় প্রয়োজন। রাজা

গলল--তুমি কি সেই চেষ্টা করতে চাও নাকি?

-- তাহলে তো ভালোই হয়। স্পিনোলা বললেন।

— কিন্তু মহামান্য রাজা — আপনি অনুমতি না দিলে তো তা হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

ধরো, আমি অনুমতি দিলাম। রাজা বলল।

-- তাহলে আমি আমার স্ত্রী ও কয়েকজন বীর বন্ধুকে নিয়ে সেই মূর্তিগুলোর সন্ধান চালাবো।

মূর্তিগুলোর মোট মূল্য কত জান? স্পিনোলা বলল।

আমি সে সব জানা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কারণ মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে পারলে আমি সব মহামান্য রাজাকেই দেব। কারণ সেসব এই দেশের রাজার সম্পত্তি। ফ্রান্সিস বলল।

— তোমরা তো পারিশ্রমিক চাইবে। স্পিনোলা বললেন।

-- একটি স্বর্ণমুদ্রাও চাইবো না। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল। স্পিনোলা বেশ অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কত কষ্ট ক'রে এত মূল্যবান মূর্তিগুলি উদ্ধার করবে অথচ একটা স্বর্ণমুদ্রাও নেবে না - এরকম বোকা লোক আছে না কি? ফ্রান্সিস বলল - তবে দোনিয়া তো আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তিনি আপনাদেরই দেশবাসী। তিনি নিশ্চয়ই কিছু পারিশ্রমিক চাইতে পারেন।

-- দোনিয়া সোনার মূর্তিগুলির সমমূল্যের অর্থ চেয়েছিলেন। আমি তা দেবনা। রাজা বলল। ফ্রান্সিস বলল - ঠিক আছে। দোনিয়ার হয়ে আমি বলছি - আমরা তো কিছু নেব না শুধু দোনিয়াকে আপনারা সমমূল্যের চারভাগের এক ভাগ অর্থ দেবেন। দোনিয়া তাতেই সম্মত হবেন।

স্পিনোলা নিজের আসন থেকে উঠে রাজার কাছে গেলেন। দু'জনের চাপা গলায় কী কথাবার্তা হ'ল। স্পিনোলা নিজের আসনে ফিরে এলেন। রাজা বলল - ঠিক আছে। আমিও এই প্রস্তাবে সম্মত। স্পিনোলা বললেন, দোনিয়া, আপনি পরে বেঁকে বসবেন না তো? ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল -- মান্যবর স্পিনোল, আমরা কিন্তু এখনও অন্ধকারে। মূর্তিগুলো জলের তলায় কোথায় আছে আমরা এখনো তার বিন্দুবিসর্গও জানিনা। উদ্ধার করা তো অনেক পরের কথা। রাজা ও স্পিনোলা ফ্রান্সিসের কথা শুনে বেশ বিব্রত হ'ল। স্পিনোলা একটু কেশে নিয়ে বলল, ঠিক আছে। মহামান্য রাজা এই প্রস্তাবে তাঁর সম্মতির কথা তো আগেই জানিয়েছেন। এখন কথা হ'ল আপনারা কীভাবে সন্ধান চালাবেন।

— সে সব আমরা ভেবে স্থির করবো। ফ্রান্সিস বলতে লাগল - শুধু মহামান্য রাজাকে অনুরোধ, আপনি আমাদের একটা বেশ শক্তপোক্ত নৌকো দেবেন। আমার স্ত্রী আমাদের জাহাজেই থাকবেন। শুধু সন্ধান চালাবার সময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন। দোনিয়া সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমরা এই বন্দরঘাটিতেই থাকবো। আর সারাদিন যতক্ষণ সম্ভবখোঁজাখুজি করব। রাতে নয়। দোনিয়া রাতের অন্ধকারে গোপনে সন্ধানের কাজ চালিয়েছিলেন। সেইজন্যই ব্যর্থ হয়েছেন।

— তুমি কি মনে করো তুমি পারবে? স্পিনোলা বললেন।

— আমি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। তবে এখন না। সব জেনে দেখে শুনে তবেই আমি বলতে পারবো - এটা সম্ভব কি না। ফ্রান্সিস বলল।

-- ঠিক আছে। দেখা যাক। স্পিনোলা মাথা ওঠানামা করে বলল। ফ্রান্সিস এবার রাজাকে বলল - মহামান্য রাজা। আর একটি অনুরোধ - আপনি হুকুম জারি ক'রে দিন

আমাদের স্বাধীন চলাফেরায় কেউ যেন বাধা না দেয়।

বেশ। হুকুম জারি করা হবে। রাজা বলল। তারপর একটু ভেবে বলল - আমি তো এখানে আর বেশিদিন থাকতে পারবো না।। আমাকে রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে। তাই বলছিলাম - মূর্তিগুলো খুঁজে উদ্ধার করতে কতদিন লাগবে?

-- আমি দিন সাতেক সব দেখেশুনে মোটামুটি কতদিন লাগবে তা আপনাকে বলতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। তোমরা এবার যেতে পারো। রাজা বলল।

ফ্রান্সিসরা মাথা একটু নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানিয়ে রাজপ্রাসাদের বাইরে এল। দেখল - রাজপ্রাসাদের সামনে মোটামুটি সমতল উপত্যকাটা ঘাসে ঢাকা। সেখানে উষ্ণীষ বর্ম পরে কোমরে তরোয়াল গুঁজে প্রায় পঁচিশ তিরিশজন সৈন্য কুচকাওয়াজ করছে। ফ্রান্সিস বুঝল - গ্রীক সৈন্যদের শিক্ষাদীক্ষা রণকৌশল এখানকার সব রাজারাই গ্রহণ করেছে। ও ভাবল দেশে ফিরে গিয়ে ওদের রাজাকে এই ভাবেই সৈন্যদের যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত ক'রে তুলতে বলবে।

সেনাপতি সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখছিল। ফ্রান্সিস দোনিয়াদের দেখে এগিয়ে এল। বলল - দোনিয়া, আপনাদের জন্যে এই নুঘিয়াতেই একটা ঘর নির্দিষ্ট করেছি। আপনারা ওখানেই থাকবেন।

নুরাঘির সদর দরজার কাছে এল সবাই। ফ্রান্সিস বলল - দোনিয়া - আপনি আপনার সঙ্গীদের নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে বলুন। এখন থেকে আমরাই আপনার সঙ্গী। দোনিয়া তার সঙ্গীদের বলল - ভাই, তোমরা আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছো। এবার তোমরা ঘরে যাও। এই বিদেশী বন্ধুরা এখন থেকে আমাকে সাহায্য করবে। দেখি মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে পারি কিনা। দোনিয়া ডান হাতটা বাড়াল। সঙ্গী দু'জন তার হাতটা ধ'রে একটু মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে গেল।

সবাই নুরাঘিতে ঢুকল। সেনাপতির নির্দেশে একজন সৈন্য ওদের নিয়ে চলল। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে সবাই ওপরে উঠল। বাঁদিকে একটা ছোট ঘর। সৈন্যটি ঘরটা দেখিয়ে বলল - আপনারা এই ঘরে থাকবেন। সৈন্যটি চলে গেল।

ঘরে ঢুকল সবাই। মেঝেয় কয়েকটা কাঠের তক্তার ওপর দড়ি পেঁচিয়ে বাঁধা বিছানামত। ওপরে মোটা কাপড় পাতা। ফ্রান্সিস বাঁদিকের গরাদ আঁটা প্রায় চৌকোনো ছোট জানালাটা দিয়ে তাকাল। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। খাঁড়ি, সমুদ্র, খাঁড়ির মুখে রাজার জাহাজ। ওদের জাহাজটা অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। সমুদ্রের জোর হাওয়া ঢুকছে ঘরটায়।

ফ্রান্সিস ফিরে দাঁড়াল। ততক্ষণে বিছানায় দোনিয়া আর হ্যারি বসে পড়েছে। ফ্রান্সিসও এসে বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। মাথার পেছনে দু'হাত রেখে পাথরের ছাত দেখতে লাগল।

ঘরটা ছোট। কিন্তু তিনজনের পক্ষে খুব ছোট নয়। ফ্রান্সিস সমুদ্রের দিকে জানালাটার দিকে তাকাল। তখনই নজরে পড়ল - জানালাটার পাশে পাথুরে দেয়ালে বেশ অস্পষ্ট কী যেন লেখা। সব বিষয়েই ফ্রান্সিসের খুব কৌতূহল। ও তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। জানালার ধারে গেল। পাথুরে দেয়ালের অস্পষ্ট লেখাগুলো দেখতে দেখতে বলল - দোনিয়া, এখানে কি কিছু লেখা আছে। দোরিয়া হেসে বলল - সংগীত সুর এসব সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকলে বুঝতেন ওগুলো স্বরলিপি।

-- গানের? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

না। সুরের। একটু চুপ ক'রে থেকে দোনিয়া বলল —এখানকার রাজপ্রাসাদের মাটির নিচের ঘরে ভেড়ার চামড়ায় প্রাচীন ল্যাতিন ভাষায় লেখা কিছু ছেঁড়াখোরা গ্রন্থ পেয়েছিলাম। সে সব খুব সম্ভব এই প্রাসাদ যিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন সেই রাজা ফ্রেডারিক যত্ন ক'রে সংরক্ষণ করেছিলেন। রাজা ফ্রেডারিক সংগীতবোদ্ধা ছিলেন। সুর সঙ্গীত ভালোবাসতেন। নিজেও গ্রীক দেশীয় বীণা বাজাতে পারতেন। সেই ছিন্ন গ্রন্থগুলি থেকে সার্দিনিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্য পেয়েছিলাম। দোনিয়া থামল।

কিন্তু এই দেয়ালে লেখা স্বরলিপিগুলি কার লেখা? ফ্রান্সিস জানতে চাইল। দোনিয়া বলল বলছি। রাজা ফ্রেডারিক এই সাসারিতে খুব প্রাচীন একটা ব্রোঞ্জের সেনামূর্তি পেয়েছিলেন। অনেক ভেবে ঐ রকম সাতটি সুর বাজে এরকম সাতটি সৈন্যমূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন পিসার এক কর্মকারকে দিয়ে। তাই ওটা ছিল বড় আর নিখাদ সোনার মূর্তি। পঞ্চম সুরধ্বনিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

-- তাহ'লে ঐ সৈনামূর্তিগুলোই আমরা খুঁজে বের করবো? হ্যারি জানতে চাইল।

হ্যাঁ। দোনিয়া বলল সাতটি সুর বেজে ওঠে এরকম সেই মূর্তিগুলো ওপরের গির্জায় রাখলেন। সেগুলো বাজাবার জনো জেনোয়া থেকে এক বাদ্যকরকে এনেছিলেন। বাদ্যকর প্রথম প্রথম নাকি ভালো বাজাতে পারতেন না। আস্তে আস্তে সেই বাদ্যকর অপূর্ব সুরমূর্ছনা সৃষ্টি করতে শিখলেন। দোনিয়া থামল। তারপর বলল দেয়ালে লেখা ঐ স্বরলিপি সেই বাদ্যকরের।

-- বলেন কি ? এতো অনেকদিন আগের কথা। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ, আরো শুনলে আশ্চর্য হবেন। সেই বাদ্যকর তখন ছিলেন অন্ধ। দোনিয়া বলল। ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই চমকে দু'জনের মুখের দিকে তাকাল। দু'জনেই নির্বাক তাকিয়ে রইলো দেয়ালের গায়ে লেখা বেশ অস্পষ্ট স্বরলিপিগুলোর দিকে।

-- সেই বাদ্যকর এই ঘরেই থাকতেন। দোনিয়া বলল। ফ্রান্সিস হ্যারির চোখে মুখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর।

বিকেল হয়ে এল। ওরা তিনজনেই বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছিল। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

-- আমাদের জাহাজে যাবো। বন্ধুদের তো বোঝাতে হবে সৈন্যমূর্তির কথা, সেগুলো উদ্ধারের কথা। তার জন্যে এখানে তো থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

-- রাজকুমারী মারিয়া, বন্ধুরা রাজি হয় কিনা দেখ। হ্যারি বলল।

-- হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর দোনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল - দোনিয়া আপনিও আমাদের জাহাজে আসুন। আজ রাত্তিরে জাহাজে থাকবো আমরা। কালকে সকাল থেকে কাজে নামবো।

বেশ - চলুন। দোনিয়া রাজি হ'ল।

তিনজনে নুরাঘি থেকে বেরিয়ে এল। সামনের পাথরের ঘাটে দেখল একটা সুন্দর নৌকো বাঁধা। দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল - এটা কাল রাতের সেই রাজার নৌকো। রাতের অন্ধকারে ভালো ক'রে দেখা যায় নি। এখন দেখল নৌকোর দু'পাশে ছ'ইঞ্চি লোহা দিয়ে বাঁধানো। দু'কোনায় দু'টো শক্ত দাঁড়। নৌকোর গলুইয়ের ওপর দামি কাঠের আচ্ছাদন। তার ওপর ঘাসের গদিমত পাতা। শৌখিন নৌকো। তবে বেশ মজবুত।

একজন সৈন্য এগিয়ে এল। দোনিয়াকে বলল মহামান্য রাজা এই নৌকোটা আপনাদের ব্যবহারের জন্যে দিয়েছেন। ফ্রান্সিস নিজেদের নৌকোটা খুঁজল। দেখল, একটু

দূরে ওদের নৌকোটা আর দোনিয়ার নৌকোটা পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। ফ্রান্সিস বলল - হ্যারি, - আমাদের নৌকোটা তুমি নিয়ে এসো। আমাদের অনেক সুখদুঃখের সঙ্গী এই নৌকোটা। নতুন নৌকো পেয়ে এটাকে তো ভুলে যেতে পারি না।

সবাই ঘাটে নামল। ফ্রান্সিস রাজার নৌকোটায় উঠল। হ্যারি ওদের নৌকোয়। দোনিয়া তার নৌকোয়। দোনিয়ার নৌকোয় রয়েছে তার সেই বড় বড় বড়শিবাঁধা লম্বা দড়িটা।

ওরা নৌকো বেয়ে চলল খাঁড়ির মুখের দিকে। একটু পরই ওরা রাজার জাহাজের পাশ দিয়ে এসে সমুদ্রে পড়ল। নৌকোগুলো চালাল ওদের জাহাজ লক্ষ্য করে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে তখন। পশ্চিম আকাশ তখন লালে লাল। মধ্য আকাশে অস্তগামী সূর্যের আলো পড়েছে হালকা মেঘগুলোয়। মনে হচ্ছে যেন পাহাড় বন নদীর ছবি। নৌকো বাইতে বাইতে আকাশে এই রঙের খেলা দেখছিল ফ্রান্সিস। হঠাৎই ওর মনটা ভারি হ'য়ে উঠল। দেশের কথা বাড়ির কথা মনে পড়ল। বাড়িতে থাকলে এসময় ও বাগানের শ্বেতপাথরের আসনটায় এসে বসে। মনে পড়ল - কতদিন মার সঙ্গে ঐ আসনে বসে আকাশে তারা ফুটে উঠতে দেখেছে। অবশ্য শীতের দেশ ওদের। সবসময় আকাশে তারা দেখা যায়না। তাই যেদিন আকাশ পরিষ্কার থাকে তারা দেখা যায় সেদিন ফ্রান্সিসের খুব আনন্দ হত। মাও হেসে বলতো- দ্যাখ্ - আজ আমি তোর পাশে আছি - তাই তারা দেখতে পেলি। একদিন হঠাৎই এসময় মা বলেছিল, জানিস্ - এই পৃথিবীতে যারা মানুষের উপকার করে সব মানুষকেই ভালোবাসে কাউকে দুঃখ দেয় না, কারো ক্ষতি করে না তারা মৃত্যুর পর আকাশের এক-একটি তারা হ'য়ে যায়। ফ্রান্সিস আকাশের দিকে আবার তাকাল। অন্ধকার হ'য়ে আসছে আকাশ। তারা ফুটতে শুরু করল। ফ্রান্সিসের দাঁড়-বাওয়া হাত থেমে গেল। হ্যারি দোনিয়ার নৌকো অনেকটা এগিয়ে গেছে তখন। ফ্রান্সিসের কী হল। - ও নৌকোয় উঠে দাঁড়াল - আকাশের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে প্রায় চিৎকার ক'রে বলে উঠলো - মা - কোন্ তারাটা তুমি? মা —। সমুদ্রের বাতাসের শব্দ ঢেউয়ের শব্দের মধ্যেও হ্যারি ফ্রান্সিসের গলার শব্দ চিনল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোয় উঠে পেছন ফিরে চিৎকার ক'রে ডাকল - ফ্রান্সিস? তখন ফ্রান্সিস ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ব'সে পড়েছে। দু'হাতে মুখ ঢেকেছে। হ্যারি ভীষণ চিন্তায় পড়ল। কী হ'ল ফ্রান্সিসের। ও নৌকো ঘোরাল। ফ্রান্সিসের নৌকোর কাছে এসে দেখল - ফ্রান্সিস দু'হাতে মুখ ঢেকে নৌকোয় বসে আছে। হ্যারি তাড়াতাড়ি ফ্রান্সিসের নৌকোয় উঠতে গেল। কিন্তু হ্যারি শরীরের দিক থেকে বরাবরই দুর্বল। ও প্রায় সমুদ্রের জলে পড়ে যাচ্ছিল। ফ্রান্সিসের নজরে পড়ল সেটা। ও দ্রুত উঠে হ্যারিকে জড়িয়ে ধরল। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস, তুমি কাঁদছিলে?

-- হ্যাঁ। মার কথা মনে পড়ল হঠাৎ। ফ্রান্সিস আস্তে বলল। হ্যারি জোরে ফ্রান্সিসকে বুকে চেপে ধরল। ওর চোখেও জল।

দোনিয়াও নৌকো চালিয়ে ফিরে এল। অল্প আলোয় দুই বন্ধুকে কাঁদতে দেখল। দোনিয়া কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। ফ্রান্সিস বলল হ্যারিকে, তুমি আমার নৌকোতেই থাকো। আমাদের নৌকোটা পেছনে বেঁধে নিচ্ছি।

আবার তিনটে নৌকো চলল ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে। দোনিয়া ফ্রান্সিসকে বলল - সত্যি -আপনাদের বন্ধুত্বের গভীরতা অনুভব ক'রে আমি আশ্চর্য হলাম। ফ্রান্সিস ও হ্যারি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল শুধু। জাহাজের কাছাকাছি আসতে দেখল মারিয়া ভাইকিং বন্ধুরা জাহাজের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে ফ্রান্সিসদের আসতে

দেখে বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল -ও -হো -হো- হো। মারিয়া হাসতে হাসতে হাতের রুমাল তুলে নাড়তে লাগল। মারিয়া সকাল থেকেই জাহাজের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়েছিল। দুপুরে একবার খেতে গেছে শুধু। বিস্কোরা বারবার এসে বলেছে - রাজকুমারী - এভাবে রোদে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। মারিয়া কোন কথাই শোনেনি। অনড় দাঁড়িয়ে থেকেছে রেলিং ধ'রে।

ফ্রান্সিসরা জাহাজের ডেক-এ আসতেই বন্ধুরা ওদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরল। মারিয়া হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস দোনিয়াকে দেখিয়ে বলল, মারিয়া, ইনি দোনিয়া। এই সার্দিনিয়ার এক অভিজাত পরিবারের সন্তান। দোনিয়ার মত এমন উদার হৃদয়ের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। এবার দোনিয়াকে বলল, ইনি মারিয়া। আমাদের দেশের রাজকুমারী। আমার স্ত্রী। দোনিয়া হেসে মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল। বলল রাজকুমারী। আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি আপনি অনেকদিন জাহাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি আমার অভিজ্ঞতায় এমন কোন রাজকুমারী দেখি নি যিনি রাজপ্রাসাদের বিলাসবাহুল্যের সুখের নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে এভাবে জাহাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মারিয়া একটু হেসে বলল এই জাহাজের জীবন শুধু দুঃখকষ্টেরই নয়। কত নাম না-জানা দেশের কতরকম মানুষের সংস্পর্শে এসে যে অভিজ্ঞতা লাভ তা যেমন আনন্দের তেমনি রোমাঞ্চকরও। ফ্রান্সিস এই জীবন ভালোবাসে। তাই আমিও এই জীবন ভালোবাসি। দোনিয়া খুশির হাসি হেসে মাথা নাড়ল।

ফ্রান্সিস মারিয়া আর দোনিয়াকে নিয়ে নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে তখনই হ্যারি ছুটে এল। বলল - ফ্রান্সিস, আমাদের কী হয়েছিল মোটামুটি বন্ধুদের বলেছি। কিন্তু ওরা বারবারই জানতে চাইছে জাহাজ এখন দেশের দিকে চালানো হবে কিনা। ফ্রান্সিস একটু ভেবে বলল, এই আনন্দের মুহূর্তে কিছু বলবো না। তুমি সবাইকে রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ডেক-এ আসতে বলো। ফ্রান্সিস মারিয়া আর দোনিয়াকে নিয়ে কেবিনঘরের দিকে চলল। ওদিকে বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হ'ল। প্রায় সবারই এক কথা - আর নয়। এবার দেশের দিকে জাহাজ চালাতে হবে। আমরা অনেকদিন দেশছাড়া। শুধু বিস্কো শাঙ্কো কোন কথা বলল না। ওদের এক চিন্তা - ফ্রান্সিস এখন কী করবে? দেশে ফেরার জন্যে পাগল এই বন্ধুদের কি ফ্রান্সিস শান্ত করতে পারবে?

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর ভাইকিং বন্ধুরা জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। পরস্পর ওরা মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলছে তখনই মারিয়া আর হ্যারিকে নিয়ে ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। বন্ধুদের কথাবার্তা থেমে গেল। নিস্তব্ধ চারদিক। শুধু সমুদ্রের হাওয়ার শন্ শন্ শব্দ। ঢেউ জাহাজের গায়ে ভেঙে পড়ার মৃদু ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

আজকে চাঁদের আলো অনেকটা উজ্জ্বল। আলো পড়েছে সমুদ্রে জাহাজে ভাইকিং দের মাথায় গায়ে। ফ্রান্সিস তাকিয়ে দেখল এসবই। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, - ভাইসব। - আমি ভালো করেই জানি মাতৃভূমির টান কতটা টান। তবু বলবো মাতৃভূমির নিশ্চিন্ত সুখী অলসের জীবন আমাকে কোনদিন টানে নি। ঐ জীবনকে আমি বেঁচে থাকা ব'লে মানি না। ফ্রান্সিস থামল। তারপর আস্তে আস্তে সব ঘটনা বলল। সার্দিনিয়ার অতীত ইতিহাস, দোনিয়া, রাজা এনজিও, স্পিনোলা, সাত মূল্যবান সৈন্যমূর্তি আর সেসব উদ্ধারের সঙ্কল্প সবই বলল। তারপর বলল - কাজেই আমাদের এখানে অপেক্ষা করতেই হবে। ফ্রান্সিস থামল। একজন ভাইকিং বন্ধু বলে উঠল. - ফ্রান্সিস। - আমাদের এখানে কতদিন থাকতে হবে? ফ্রান্সিস বলল - তা তো এখনই বলতে পারবো না। সব দেখেশুনে যদি মনে করি খাঁড়ির জলে তলিয়ে যাওয়া মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে পারবো তাহ'লেই

আমরা এখানে থাকবো। আমাদের দিন পাঁচ সাতেক সময় দাও। এর মধ্যে যদি বুঝি মূর্তি উদ্ধার করা অসম্ভব তাহ'লে সেইদিনই জাহাজ দেশের দিকে চালাবো। ফ্রান্সিস থামতেই ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হ'ল। মারিয়া ফ্রান্সিসকে মৃদুস্বরে বলল - মূর্তি উদ্ধার হোক বা না হোক আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো। ফ্রান্সিস অল্প হেসে বলল, মারিয়া -ঠিক এই কথাটাই আমি এতদিন তোমার কাছ থেকে আশা করেছি। তখনও ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন চলছে। হঠাৎ হ্যারি গলা চড়িয়ে ব'লে উঠল - ভাইসব। আস্তে আস্তে গুঞ্জন থামল। হ্যারি বলল - ফ্রান্সিসের সঙ্কল্পের কথা তোমরা শুনেছো। যদি এর পরেও তোমরা দেশে ফিরে যেতে চাও যেতে পারো। আমি ফ্রান্সিস আর মারিয়া এখুনি নৌকোয় চড়ে সাসারিতে চলে যাবো। বলো, তোমরা থাকবে কি চলে যাবে? শাঙ্কো আর বিস্কো একসঙ্গে বলে উঠল - আমরা ফ্রান্সিসের সঙ্গে থাকবো। একটুক্ষণের নীরবতা। পরক্ষণেই চিৎকার ক'রে কয়েকজন বন্ধু ব'লে উঠল আমরা ফ্রান্সিসকে ফেলে যাবো না। এবার সবাই একসঙ্গে বলে উঠল - ও-হো-হো-হো। মারিয়া বুঝতে পারল - ফ্রান্সিসকে ওর বন্ধুরা কত ভালোবাসে। ও হেসে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিসও ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বন্ধুদের সংকল্পের ধ্বনি স্তিমিত হ'লে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল - আমরা কাল সকালে সাসারিতে যাবো। থাকবো ঐ নুরাঘিটায়। দিনের বেলা খাঁড়ির জলে খোঁজ করবো জলের তলায় ডুবে যাওয়া নৌকোটা আর মূর্তিগুলো। কয়েকদিন ধ'রে খাঁড়ির দু'ধারেও খোঁজ চালাবো। তার মধ্যে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেতেও পারি যার সাহায্যে নিখোঁজ মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে পারবো। কাজেই কয়েকদিন না কাটলে আমি কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারবো না। দিন কয়েক পরে আমি জাহাজে আসবো। জানাবো মূর্তিগুলো উদ্ধার করা সম্ভব কিনা। যদি বুঝি সম্ভব নয় - আমরা দেশের দিকে জাহাজ চালাবো। ফ্রান্সিস থামলো। বন্ধুরা আবার ধ্বনি তুললো -ও-হো-হো-হো। সভা ভেঙে গেল। বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে অনেকেই নেমে গেল নিজের নিজের কেবিন ঘরে যাওয়ার জন্যে। অন্য বন্ধুরা জাহাজের ডেক-এ শুয়ে পড়ল, কেউ কেউ ব'সে রইল। ফ্রান্সিস আর মারিয়া নিজেদের কেবিন ঘরে চলে এল।

পরদিন সকালের খাবার খাচ্ছে ফ্রান্সিস কেবিনঘরে বসে। মারিয়ার খাওয়া হয়ে গেছে। হ্যারিও খাওয়া সেরে এল। বলল, - ফ্রান্সিস, - তোমার সঙ্গে কে-কে যাবে? ফ্রান্সিস খেতে খেতে বলল, - মারিয়া তুমি আর বিস্কো। হ্যারি বলল শাঙ্কো আমাকে বারবার বলল ওকে যেন তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। হ্যারির কথা শেষ হ'তেই [illegible]নিয়াকে নিয়ে শাঙ্কো ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল, - শাঙ্কো, - তুমি তীর ছুঁড়তে ওস্তাদ। নিখুঁত তোমার নিশানা। কিন্তু আমরা তো লড়াই করতে যাচ্ছি না। কাজেই তোমার বদলে এবার বিস্কোকে নিয়ে যাবো। জাহাজ পাহারার দায়িত্বে থাকবে তুমি। শাঙ্কো একটুক্ষণ মাথা গোঁজ করে থেকে বলল - ফ্রান্সিস তোমার মত তো মানতেই হবে। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে ছিল তোমাদের সঙ্গে যাওয়ার। - না শাঙ্কো। - আমি সবদিক ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি দুঃখ করো না। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো আর কোন কথা বলল না।

খাওয়া শেষ ক'রে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। ও আর মারিয়া আগে থেকেই পোশাকটোশাক পরে তৈরি হ'য়ে ছিল। সবাই এবার সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে এল। বিস্কোও তৈরি হ'য়ে অপেক্ষা করছিল। ওর কোমরে তরোয়াল গোঁজা দেখে ফ্রান্সিস বলল, - বিস্কো, তরোয়াল রেখে যাও। আমরা তো এখন লড়াই করতে যাচ্ছি না। বিস্কো কোমর থেকে তরোয়াল খুলে একজন বন্ধুর হাতে দিল।

হালের কাছ থেকে দড়ির মই নামিয়ে দেওয়া হ'ল। ফ্রান্সিসরা একে একে নেমে এল। দোনিয়ার নৌকোয় ফ্রান্সিস আর দোনিয়া বসল। রাজার নৌকাটায় বসল হ্যারি মারিয়া আর বিস্কো। নৌকোর বাঁধন খুলে ফ্রান্সিসরা নৌকো বেয়ে চলল খাঁড়ির দিকে।

সমুদ্র আজ খুব শান্ত নয়। এলোমেলো জোর হাওয়া ছুটেছে। ঢেউ উঠছে। ঢেউয়ের দোলায় দোল খেতে খেতে নৌকো দু'টো চলল খাঁড়ির দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার জাহাজের কাছে এল ওরা। মারিয়া ব'লে উঠলো, দেখেছো কী সুন্দর জাহাজ! হ্যারি বলল, রাজকুমারী ওটা সার্দিনিয়ার রাজা এনজিওর জাহাজ। জাহাজের রেলিং এর কাছে তখন সৈন্যরা ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছে ফ্রান্সিসদের। বিশেষ ক'রে মারিয়াকে। ওরা বুঝে উঠতে পারল না এরকম পোশাক পরা লোকগুলো আর মেয়েটি কোন্ দেশের?

রাজার জাহাজ ছাড়িয়ে নৌকো দু'টো খাঁড়িতে ঢুকল। ফ্রান্সিস ডাকল, - দোনিয়া? দোনিয়া নৌকোর মাঝখানে চুপ ক'রে বসেছিল। দাঁড় বাইছিল ফ্রান্সিস। দোনিয়া ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল - আপনি কীভাবে এই অদ্ভুত বঁড়শিগুলো দিয়ে মূর্তিগুলো খুঁজবেন? দোনিয়া নৌকোর মাঝখানে গোল ক'রে রাখা দড়ির মুখটা বের করল। বড় বড় বঁড়শীগুলো ঐ মুখে বাঁধা। দোনিয়া বঁড়শিটা জলে নামাল। দড়ি ছাড়তে লাগল। একটু পরেই দড়ি ছাড়া বন্ধ করল। তার মানে বঁড়শিগুলো মাটি ছুঁয়েছে। ফ্রান্সিস দড়ি ছাড়ার সময় হিসেব করে বুঝল - খাঁড়িটার জল খুব গভীর নয়। ফ্রান্সিস নৌকো বেয়ে চলল। দোনিয়াও বঁড়শির দড়ি টেনে নিয়ে চলল। তার মানে জলের নিচের মাটির ওপর দিয়ে বঁড়শিগুলো চলেছে। ফ্রান্সিস বুঝল ব্যাপারটা। ও বলল - দোনিয়া - আপনি দাঁড়ে বসুন। আমি বঁড়শি টানছি। ওরা জায়গা বদল করল। ফ্রান্সিস বঁড়শি টেনে টেনে চলল। হঠাৎ কী সে লেগে বঁড়শিটা আটকে গেল। ফ্রান্সিস দড়িতে জোর ঝাঁকুনি দিল তিন চার বার। বঁড়শি আটকে রইল। ফ্রান্সিস দড়িটা ধ'রে টানতে লাগল। বঁড়শিতে আটকে কী যেন উঠে আসছে। টেনে টেনে ফ্রান্সিস বঁড়শিগুলো জলের ওপরে তুলল। দেখল একটা বঁড়শিতে লম্বা জাহাজবাঁধা কাছি আটকে আছে। কালো কাদায় কাছিটা মাখামাখি হ'য়ে আছে। ফ্রান্সিস একটু হেসে জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই জলে পচা কাছিটা ছিঁড়ে গিয়ে জলে ডুবে গেল। ফ্রান্সিস বঁড়শিগুলো জলে ফেলে আবার টেনে নিয়ে চলল। কিছুটা আসতেই আবার বঁড়শিগুলো কীসে আটকাল। আবার ফ্রান্সিস দড়ি টেনে তুলতে লাগল। জলের ওপরে উঠলে দেখা গেল বঁড়শিতে সমুদ্রের শ্যাওলা জড়ানো ঝুপড়ি ছোট গাছমত। আশ্চর্য! তা'তে কয়েকটা লাল হলুদ ফুল। ফুলগুলি অবশ্য মরা মরা। তবু সমুদ্রের নিচে এরকম ক্ষুদে ফুলের গাছ! আশ্চর্য ব্যাপার। দোনিয়া হেসে বলল - সমুদ্রের নিচে মাটিতে কাদায় নাকি এরকম ফুল-ফোটানো ক্ষুদে গুল্ম আছে। মনে হয় কে যেন ফুলের বাগান ক'রে রেখেছে।

-- আপনি দেখেছেন? ফ্রান্সিস বলল। দোনিয়া একইভাবে হেসে মাথা নেড়ে বলল, - না। আমার সব গ্রন্থ পাঠ ক'রে পাওয়া বিদ্যে।

নৌকো দু'টো নুরাঘির কাছে এল। ফ্রান্সিস আরো কয়েকবার বঁড়শি ফেলল। কিন্তু কোনকিছুতে আটকালো না। ফ্রান্সিস বলল, দোনিয়া। এই বঁড়শিগুলো দিয়ে কি মূর্তিগুলোর হদিশ করা যাবে? এত বড় খাঁড়ির জলে?

-- এছাড়া আর কোন উপায় তো এখনও ভাবতে পারিনি। তবে একটা ব্যাপার কি জানেন - সাত সাতটা মূর্তি। নিশ্চয়ই একসঙ্গে জড়িয়ে নিচের মাটিতে পড়ে নেই। বরং নৌকাডুবির সময় ছড়িয়ে পড়েছে। অন্তত একটা মূর্তিরও হদিশ পাই যদি বাকি ক'টাও

কাছাকাছিই পাবো। ফ্রান্সিস একটু ভেবে বললেন - আপনার কথাটায় যুক্তি আছে। তবে এভাবে দীর্ঘদিন ধ'রে তল্লাসি চালাতে হবে। সেটা কি শরীরে সইবে? দোনিয়া কোন কথা না বলে মাথা ওঠা নামা করল।

খাঁড়ি পার হ'য়ে নৌকো দু'টো নুরাঘির সামনের ঘাটে এসে লাগল। ফ্রান্সিসরা নামল সবাই। ঘাটে নৌকো বেঁধে সবাই নুরাঘিটায় ঢুকল। মারিয়া তো আগে এখানে আসে নি। ও অবাক হ'য়ে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওরা ওপরে উঠল। নিজেদের ঘরটায় ঢুকল। মারিয়া জানালা দিয়ে বাইরের খাঁড়ি সমুদ্র দেখতে লাগল। বিস্কো বসল না। ও মারিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরেটা দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। হ্যারি দোনিয়া বসে রইল। ফ্রান্সিস দু'হাতে মাথা রেখে শুয়ে রইল। অনেক চিন্তা। কীভাবে মূর্তি উদ্ধারের কাজ শুরু করবে তাও ভাবতে লাগল।

দুপুরে খাবারদাবার নিয়ে সাধারণ পোশাক পরা দু'জন সৈন্য ঘরে ঢুকল। চিনে মাটির থালায় গোল ক'রে কাটা রুটি মাংসের ঝোল তরিতরকারির স্যুপ। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। খেতে খেতে ফ্রান্সিসের হঠাৎ মনে হ'ল - সৈন্যমূর্তিগুলো দেখতে কেমন তা তো জানা হয়নি। ভাবল, দুশো বছর আগেকার কথা। কাজেই নিজের চোখে দেখেছে এমন লোক পাওয়া অসম্ভব। তবু খেতে খেতে দোনিয়াকে জিজ্ঞাসা করল, - আচ্ছা দোনিয়া। আপনি কি জানেন ঐ সৈন্যমূর্তিগুলো দেখতে কেমন ছিল?

-- ওপরের ঘরটা হচ্ছে গির্জা। রাজা ফ্রেডারিক ঐ গির্জাটা তৈরি করিয়েছিলেন। ওখানে গেলে একটা ছোট্ট সৈন্যমূর্তি দেখতে পাবেন। ব্রোঞ্জে তৈরি। ওটা ফ্রেডারিক নিজেই তৈরি করেছিলেন। তারপর পিসার এক কর্মকারকে নমুনা হিসেবে ওটা দিয়েছিলেন। ঐ মূর্তিটার মতই সোনার সাতটি মূর্তি সেই কর্মকার গড়িয়ে দিয়েছিল। রাজা ফ্রেডারিক মূর্তিগুলো বাজিয়ে বাজিয়ে সাতটা সুরধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশেই কর্মকার কাজ করেছিল। মূর্তি তৈরি শেষ হ'লে গির্জায় এনে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। ওপরে গির্জায় গেলে ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি আর সবই দেখতে পাবেন। দোনিয়া বলল। ততক্ষণে ফ্রান্সিসের খাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেছে। ও তাড়াতাড়ি কাঠের পাত্র থেকে জল খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, - চলুন। আর সবাই অবাক। তখনো কারও খাওয়া হয় নি। মারিয়া বলল, - আরে বাবা - আগে খেয়ে নাও তো। ফ্রান্সিস সে কথায় কান দিল না। বলল, - দোনিয়া চলুন। দোনিয়া খেতে খেতে হেসে বলল, - ঠিক আছে। আপনি সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান। গির্জাটা দেখতে থাকুন। আমরা যাচ্ছি।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা না বলে দ্রুতপায়ে ঘরের বাইরে এল। দেখল এখানেও একটা বড় গোল ঘর। পাথরের মেঝের এখানে ওখানে শুকনো ঘাসপাতা বিছানা। প্রায় পনেরো কুড়িজন সৈন্য সাধারণ পোশাকে শুয়ে বসে আছে। এই ঘরেই বোধহয় সুলতান মুজাহিদের রাজসভা বসতো। ডানহাতে দেখল ওপরে ওঠার সিঁড়ি। ও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। এই সিঁড়ির পাথরের ধাপগুলো অনেক মসৃণ। ওপরের ঘরে উঠে দেখল ঘরটা গোল। কিন্তু খুব বড় নয়। গরাদ বসানো কয়েকটা জানালা দিয়ে আলো আসছে। সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেখল সামনে একটা কাঠের বেদী। তার ওপর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর কাঠের মূর্তি। চেস্টনাট কাঠ কুঁদে কুঁদে তৈরি। বড় সুন্দর মূর্তিটি। বেদীতে সার দিয়ে মোমবাতি বসানো। কোনটাই জ্বলছে না। সমুদ্রের হাওয়ায় নিভে গেছে বোধহয়। শুধু একটা হলুদ রঙের মোটা বেশ বড় মোমবাতি জ্বলছে। বেদীটা থেকে কয়েক হাত সামনে দু'টো গোল কাঠের খুঁটিমত পোঁতা। খুঁটিতে একটা রুপোর তার টানা দিয়ে বাঁধা। তাতে

অনেকটা রুপোর ছোট ছোট শেকল ঝুলছে। ফ্রান্সিস গুনে দেখল সাতটা শেকল। মাঝখানের শেকলটা বড় আর মোটা। ফ্রান্সিস এটার কারণ বুঝল না। গির্জাঘরের চারদিক বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

কী? দেখলেন সব? পেছনে দোনিয়ার কথা শুনে ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, মারিয়া হ্যারি বিস্কোও এসেছে। ফ্রান্সিস সেই ঝোলা শেকলগুলো দেখিয়ে বলল, দোনিয়া, এখানে নিশ্চয়ই কিছু ঝোলানো থাকতো?

ঠিক ধরেছেন। নিখোঁজ সৈন্যমূর্তিগুলো ঝোলানো থাকতো। দোনিয়া বলল। তারপর বাঁদিকে পাথরের একটা তাকের দিকে যেতে যেতে বলল - এখানে আসুন। সবাই পাথরের তাকটার কাছে এসে দাঁড়াল। তাকের ওপর একটা ইঞ্চি ছয়েক মূর্তি রাখা। ব্রোঞ্জের মূর্তি। কালচে রঙ এখন। দোনিয়া মূর্তিটা দেখিয়ে বলল - রাজা ফ্রেডারিক এই মূর্তিটা ব্রোঞ্জে ঢালাই ক'রে নিজে গড়েছিলেন। বলা হয় - জমিতে চাষ করার সময় পাদিয়া নামে জায়গায় একজন কৃষক [illegible] একটা সৈন্যমূর্তি পেয়েছিল। তবে সেটা ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। রাজা ফ্রেডারিক নাকি সেই মূর্তিটার আদলে এই মূর্তিটা গড়েছিলেন। তারপরের কথা তো বলেছি। ফ্রান্সিস খুব আগ্রহের সঙ্গে মূর্তিটা দেখতে লাগল। সৈন্যমূর্তিটা দেখতে এরকম। মারিয়াই প্রথম বলল - সৈন্যটার মাথায় বাঁকানো কী ওটা? — শিরস্ত্রাণ। সিং এর মত দেখতে। হয়তো সে সময় যোদ্ধারা এরকম শিংএর মত শিরস্ত্রাণ পরতো। দোনিয়া বলল। হ্যারি বলল - এর আদলে যে সব সোনার মূর্তিগড়া হয়েছিল সেগুলো কি এর চেয়ে বড় ছিল?



— হ্যাঁ। প্রায় এক ফুট। পঞ্চম মূর্তিটা ছিল উচ্চতায় চার ফুট। সবচেয়ে বড়। দোনিয়া বলল। তারপর পাথরের তাকটার বাঁপাশ থেকে দু'টো রুপোর হাতামত বের করল। বলল - এই দুটো দিয়ে ঘা দিয়ে দিয়ে বাদ্যকর সুরধ্বনি তুলতেন। হাতামত জিনিশটা রেখে দিয়ে বলল - ফ্রান্সিস মূর্তিটার সিং দুটো লক্ষ্য করুন। দেখুন সিং দুটো পরস্পর গায়ে গায়ে লেগে আছে। যে রুপোর শেকলগুলো ঝুলছে দেখে এলেন সেগুলোর নিচের কড়ার সঙ্গে ঐ সিংএর জোড়া জায়গাটা আটকে দেওয়া ছিল। একটু থেমে দোনিয়া বলল - এবার চলুন ঝুলন্ত শেকলগুলো দেখতে।

সেই খুঁটিতে ঝোলানো শেকলগুলোর কাছে এসে দোনিয়া বলল - দেখুন সাতটা শেকলে সাতটা যোদ্ধামূর্তি ঝুলতো। লক্ষ্য করুন - পঞ্চম শেকলটা মোটা আর বড়। ওটাতেই ঝুলতো সবচেয়ে বড় মূর্তিটা। ফ্রান্সিসরা বেশ আগ্রহ নিয়েই দেখতে লাগল ঐ খুঁটি দুটো, ঝুলন্ত শেকলগুলো। মারিয়া ছোট থেকেই রাজপ্রাসাদের নৃত্য-গীতিশালায় নানা ঐকতাবাদনের অনুষ্ঠান শুনেছে। ও সহজেই কল্পনা ক'রে নিতে পারল দুশ বছর আগেকার সেই পরিবেশ - ঐ শেকলগুলোয় ঝুলছে সাতটি যোদ্ধামূর্তি। ভোরের নরম আলো ছড়িয়ে

পড়েছে বাইরের ছোট ছোট পাহাড়ে উপত্যকায় সমতলে মাটিতে ঘাসে আর এখানে এক অন্ধ বাদ্যকর মূর্তিগুলোতে ঘা দিয়ে দিয়ে গড়ে তুল্‌ছে সপ্তসুরের এক স্বর্গীয় পরিবেশ। ফ্রান্সিসরা আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে চলল। মারিয়া তখনও দাঁড়িয়ে। আত্মমগ্ন। ফ্রান্সিস আস্তে ডাকল- মারিয়া - এসো। মারিয়া একটু চমকে ফিরে তাকাল ফ্রান্সিসদের দিকে। তারপর স্বপ্নাবিষ্টের মত যেন এল নামবার সিঁড়ির কাছে। সবাই নেমে এল।

পরদিন সকাল থেকেই ফ্রান্সিসরা কাজে নেমে পড়ল। দোনিয়ার সঙ্গে বসল ফ্রান্সিস। রাজার নৌকোটায় বসল হ্যারি মারিয়া আর বিস্কো।

দোনিয়া ওর বঁড়শি টেনে টেনে চলল। দোনিয়া ক্লান্ত হয়ে পড়লে ফ্রান্সিস বঁড়শি টেনে চলল। দুপুরে নুরাঘিতে এসে খাওয়াদাওয়া সেরে আবার নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়া। বঁড়শি টানা। কিন্তু যোদ্ধামূর্তিগুলোর কোন হদিশই পাওয়া গেলনা। বিকেলে বিস্কো রাজার নৌকোয় মারিয়াকে নিয়ে জাহাজে রেখে আসে। সকালে আবার গিয়ে মারিয়াকে নিয়ে আসে।

দুদিন কাটল। কিন্তু একটা যোদ্ধামূর্তিও উদ্ধার করা গেলনা। দোনিয়ার তৈরি বঁড়শিতে উঠল জাহাজের কাদা ল্যাপটানো ভাঙা-নোঙর, জলেপচা হাতল জংধরা ঢাল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল একটা জেলে নৌকো হঠাৎ হঠাৎ ঝুঁকেপড়া পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে আড়ালে ঘুরছে। নৌকোটায় একজন জেলে। ফ্রান্সিস বুঝল স্পিনোলার ব্যবস্থা এটা। ওদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

সেদিন দুপুরবেলা। খাওয়া দাওয়া সেরে নৌকোয় এল ওরা। চলল বঁড়শি টেনে টেনে খোঁজা। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। এত বিস্তৃত খাঁড়ি। গভীরতা কম হলেও এভাবে খুঁজে বের করা কি সম্ভব? হঠাৎই ফ্রান্সিস দেখল উত্তর দিকের ধ্বসেপড়া নুরাঘিটার নিচে অনেকটা চৌকোনো একটা গহ্বরমত। ফ্রান্সিস দোনিয়াকে ঐ জায়গাটা দেখিয়ে বলল ওটা কী? দোনিয়া বলল ওটা বোধহয় নুরাঘিটায় ওঠার কোনো গোপন পথ ছিল। এখন তো নুরাঘিটার এপাশ ধ্বসে পড়েছে। পথটাও পাথরে আটকে গেছে বোধহয়। ঐ গহ্বরমত জায়গাটায় আমরা আমাদের নৌকোটা ভোর হবার আগেই লুকিয়ে রাখতাম। ফ্রান্সিস বলল—চলুন না ঐ গোপনপথটার অবস্থা দেখে আসি।
— জায়গাটা অন্ধকার আর ভীষণ পেছল পাথরের ধাপগুলো। দোনিয়া বলল।

— ঠিক আছে। দেখা যাক একবার। ফ্রান্সিস বলল। তারপর নৌকোয় উঠে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে বিস্কোকে ডাকল। - বিস্কো। বিস্কো ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস আঙুল তুলে ঐ গহ্বরমত জায়গাটা দেখিয়ে বলল - ঐ খানে যাবো আমরা। তোমরা আমাদের পেছনে পেছনে এসো।

গহ্বরমত জায়গাটায় পৌঁছল ওরা। ওটার ছাতমত ওপরটা বেশ উচুঁতে। নৌকোদুটো ঢুকে গেল। বেশ অন্ধকার ভেতরটা। অন্ধকারটা একটু সয়ে আসতে ফ্রান্সিস দেখল জলের ধারেই পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে। ফ্রান্সিস প্রায় অন্ধকারে নৌকো থেকে পাথরের সিঁড়িতে পা রাখল। শরীরে একটু ঝাঁকুনি। সাবধানে সিড়িঁতে উঠে দাঁড়াল। সত্যি - কাদা ল্যাপটানো সিঁড়িটা ভীষণ পেছল। পেছনে নৌকো থেকে মারিয়া অস্ফুটস্বরে বলল- সাবধান। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। শুধু ডানহাতটা তুলে নাড়ল। তারপর পা টিপে টিপে একটা একটা করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। কয়েকটা সিঁড়ি উঠতেই বুঝল জলকাদা আর নেই। কিন্তু ভেজাভেজা সিঁড়িগুলো। বুঝল জোয়ারের সময় এর বেশি সমুদ্রের জল ওঠে না।

আরো কটা সিঁড়ি উঠল। আর ওঠা যাবে না। চৌকোনো পাথর গড়িয়ে পড়ে সিঁড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল বাঁদিকে ভেঙেপড়া পাথরের দেয়ালের বড় ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো পড়েছে। ওখানে অন্ধকার নেই। কিন্তু ওখানে পৌঁছতে হলে এই চৌকোনো পাথরের স্তূপ পার হতে হবে। নিচে থেকে হ্যারির ডাক শোনা গেল- ফ্রান্সিস? গহ্বরমত জায়গাটায় পাথুরে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ডাকটা জোরালো শোনালো। ফ্রান্সিসও চেঁচিয়ে বলল- ভয় নেই। আমি নিরাপদ। তারপর ফ্রান্সিস গড়িয়ে পড়া চৌকোনো পাথরগুলো ভালো করে দেখে হিসেব করতে লাগল। পাঁচছ'টা পাথর সরাতে পারলেই সিঁড়ি দিয়ে উঠা যাবে।

এবার ফ্রান্সিস সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। পেছল সিঁড়ি পর্যন্ত নামল না। ওখান থেকেই বলল - হ্যারি, - বিস্কোকে উঠে আসতে বলো। তোমরা নেমো না। প্রথম তিন চারটে সিঁড়ি ভীষণ পেছল।

একটু পরেই বিস্কো উঠে এল। ও তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। কাছে এসে বলল, কী ব্যাপার?

এসো আমার সঙ্গে। ফ্রান্সিস সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। কয়েকটা সিঁড়ি উঠে ফ্রান্সিস পাথরের স্তূপ দেখাল। বলল - ঐ পাথরগুলো সরাতে হবে। বেশি না, পাঁচ ছ'টা সরাতে পরলেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা যাবে। এবার দুজনে মিলে প্রথম চৌকোনা পাথরটা ধরে ঠেলতে লাগল। নুরাঘির ভাঙা দেয়ালের পাথর। খুব ভারি নয়। আস্তে আস্তে ধরে ধরে পাথরগুলো সরিয়ে সিঁড়ির ধাপে ধাপে পেতে দিল। ফ্রান্সিস পা ফেলে ফেলে দেখল সমান পাথরগুলো নড়ছে না। শুকনো পাথর। উঠতে সুবিধেই হলো। ফ্রান্সিস ডাকল, বিস্কো উঠে এসো। বিস্কো উঠে এলো। আবার দেখল এখানে বাঁ পাশের দেয়াল ভেঙে বিরাট হাঁ হয়ে গেছে। রোদ পড়ে জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওখানে পৌঁছে ফ্রান্সিস দেখল ওপরের দিকেও সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ দেখা যাচ্ছে। তারপর পাথরের স্তূপ। ঐ জায়গাটা ধ্বস নেমে সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। আর ওঠা সম্ভব নয়।

ফ্রান্সিস বাঁ দিকের ভাঙা খোঁদলটা দিয়ে দেখল সম্পূর্ণ খাঁড়িটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকে অটুট নুরাঘিটা। খাঁড়ির মুখে রাজার জাহাজ। দূরে দূরে জেলেদের নৌকো। আরো দূরে ওদের জাহাজটা। সমুদ্র আজ অনেক শান্ত। সাদারঙের সামুদ্রিক পাখিগুলো মাথার ওপর পাক খেয়ে উড়ছে। পাখির তীক্ষ্ণ ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। বিস্কো এসে ওর পাশে দাঁড়াল। বিস্কোও বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—কী করবে এখন?

— নেমে যাবো। চলো। দোনিয়ার সঙ্গে একটু কথা বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

দু'জনে আবার নামতে লাগল। শুকনো আর ভেজা সিঁড়ির ধাপ দিয়ে নামতে অসুবিধে হল না। কিন্তু একেবারে নিচের ভীষণ পেছল সিঁড়িগুলো দিয়ে দু'জনকে সাবধানে নামতে হ'ল।

দু'জনে নৌকোয় উঠল। হ্যারি জিজ্ঞেস করল — কী দেখলে ওপরে?

— ধ্বস নেমে ভেঙেপড়া নুরাঘিটা দেখলাম। ভাঙা পাথরটাথর সিঁড়ি এসব। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ অন্ধকার সুড়ঙ্গটা থেকে ওরা নৌকো চালিয়ে বেরিয়ে এল। নৌকোর দাঁড় টানতে টানতে ফ্রান্সিস বলল-

—- দোনিয়া, আমার কেমন মনে হচ্ছে - মুবারক এখানে পরে এসেছিল আর একাই চেষ্টা করেছিল যোদ্ধামূর্তিগুলো উদ্ধার করতে।

— একা কেন ? কয়েকজন সঙ্গী নিয়েও তো আসতে পারতো। দোনিয়া বলল। ফ্রান্সিস বলল - না। আপনার মত মুবারককেও একাই এই খাঁড়ির নিচে খুঁজতে হয়েছে। কীভাবে মুবারক খুঁজেছিল বলতে পারবো না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস নৌকোটা কোথায় ডুবে গিয়েছিল মুবারক সেটা জানতো।

— কিন্তু সেই চিঠিটায় কিন্তু সেই ইঙ্গিতটা নেই। দোনিয়া বলল। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল - আচ্ছা। যেখানে নৌকো থেকে মুবারক জলে ঝাঁপ দিচ্ছে সেই জায়গাটা একবার বলুন তো। আপনার তো মুখস্থ। দোনিয়া একটু ভেবে নিয়ে বলল "জাহাজের সঙ্গে বাঁধা দড়ি ছিঁড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে ঝড়ের প্রবল ধাক্কায় আমাদের নৌকা কাত হইয়া ডুবিতে লাগিল। নৌকায় আমার একমাত্র সঙ্গীটিকে বার বার ডাকিয়াও কোন সাড়া পাইলাম না। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া অন্ধকারে ঝড়বিক্ষুব্ধ খাঁড়ির জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।

আজ আর জানি না কীভাবে আমি তীরে আসিয়া পৌঁছাইয়াছিলাম।" দোনিয়া থামল। ফ্রান্সিস বলল - দেখুন আমার কেমন বিশ্বাস জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় মুবারক নিশ্চয়ই কিছু দেখেছিল।

— কিন্তু ঐ ঝড়জলের মধ্যে ঐ অন্ধকারে মুবারক কি কিছু দেখতে পেয়েছিল? দোনিয়া বলল।

— মনে রাখবেন, ঝড় এলে মেঘে বিদ্যুৎ চমকাবেই। ঝড় থেমে যাবার পর কিন্তু কিছুক্ষণ হলেও বিদ্যুৎ চমকায়। আমার জাহাজী জীবনের অভিজ্ঞতা এ কথাই বলে। ফ্রান্সিস বলল।

দোনিয়া বলল হ্যাঁ ? জাহাজে জাহাজে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ান আপনারা। কাজেই আপনার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক বেশি। তবু বলি মুবারক কিন্তু বিদ্যুৎ চমকানোর কথা কোথাও লেখে নি।

— এটাই আমার কাছে একটু অস্বাভাবিক লাগছে। মুবারক ঝড়ের বর্ণনা করেছে সুন্দর। সব ঘটনার বর্ণনাই বাস্তব। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকানো আর বাজ পড়ার কথাটা বাদ দিয়েছে কেন বুঝলাম না। ফ্রান্সিস বলল। দোনিয়া একটু ভেবে নিয়ে মাথা ওঠানামা করে বলল - কথাটা ভাববার মত।

— আচ্ছা। - আরবিতে লেখা ঐ চিঠিটা কি আপনার কাছে আছে? ফ্রান্সিস বলল।

— হ্যাঁ আছে। দোনিয়া বলল।

— কোথায় আছে? পিসায়? ফ্রান্সিস সাগ্রহে বলল।

— না। - এখানেই আছে। দোনিয়া বলল।

— আমাকে একটু দেখাবেন? অবশ্য আমি আরবি ভাষার আ-ও জানি না। ওটা আপনিই আমার সামনে ভালো করে পড়বেন। লক্ষ্য রাখবেন শুধু ঝড়ের বর্ণনার জায়গাটা এবং ঝাঁপিয়ে পড়ার বর্ণনাটা। ফ্রান্সিস বলল।

— ঐ চিঠিটা এতবার পড়েছি। - আমি হুবহু চিঠিটাই আপনাকে বলেছি। দোরিয়া বলল।

— তবু একবার চিঠিটা আমাকে দেখতে দিন আমার অনুরোধ। ফ্রান্সিস বলল। দোনিয়া মাথা নিচু করে ভাবলো একটুক্ষণ। তারপর মাথা তুলে বলল, বেশ চলুন। দেখুন চেষ্টা করে চিঠিটা থেকে কোন সূত্র পান কিনা।

— তাহলে কোথায় নামতে হবে আমাদের? ফ্রান্সিস জানতে চাইল। দোনিয়া খাঁড়ির ডানদিকের একটা ঢালু পার আঙুল তুলে দেখাল। বলল - ওখানে নেমে আমাদের যেতে

হলো।

ফ্রান্সিস দাঁড় বাওয়া থামিয়ে পেছনের নৌকায় হ্যারিদের দিকে গলা চড়িয়ে বলল, হ্যারি নৌকো নিয়ে আমাদের পেছনে পেছনে এসো।

ঘাটের মত ঢালু জায়গাটায় ফ্রান্সিসদের নৌকো দুটো লাগল। এখানে ঢালু পারটায় পাথর বেশি নেই। সবাই নামল নৌকা থেকে। ঢালু পার দিয়ে উঠছে ওরা তখন দেখল দু'টো জেলেদের নৌকো উপুড় করে রাখা। বোধ হয় মেরামতি রঙ করার জন্যে।

পার ছাড়াতেই একটু দূরে কয়েকটা চেস্টনাট গাছের নিচে জেলেদের পাথর সাজিয়ে তোলা বাড়ি দেখা গেল। ওপরের ছাউনি শুকনো ঘাসের।

সবাই বাড়িগুলোর সামনে এল। বাড়িগুলো থেকে জেলেবৌ বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ওদের দেখতে লাগল। সমর্থ পুরুষরা তো মাছ ধরতে চলে গেছে। দুটো ঘরের সামনে এসে দোনিয়া দাঁড়াল। বাঁদিকের ঘরটা থেকে একজন বুড়ি বেরিয়ে এল। চোখ কুঁচকে দোনিয়াকে দেখে দাঁত ফোক্‌লা মুখে হাসল। দোনিয়াও হাসল। কী বলল যেন। তারপর পাশের চ্যালাকাঠের দরজাবসানো ঘরটা খুলে ঢুকল। ফ্রান্সিস ঢুকল শুধু। ছোটঘর। হ্যারিরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস দেখল একটা ঘাসের বিছানামত পাতা। বিছানায় কম্বলের মত মোটা কাপড় পাতা। ঘাস পাকিয়ে একটা বালিশমতও করা হয়েছে। বিছানার একপাশে একটা ওক কাঠের লম্বা বাক্স। তাতে লতাপাতা আঁকা রুপোর গিল্টি। বাক্সটার দিকে যেতে যেতে দোনিয়া বলল—এটাই আমার আস্তানা।

বাক্সের ডালা খুলে দোনিয়া কিছু শৌখিন পোশাকপত্র আরো কীসব সরিয়ে কয়েকটা পার্চমেন্ট কাগজ তুলে নিল। সেগুলো দেখে নিয়ে একটা কাগজ হাতে নিল। বাকিগুলো রেখে দিল। বাক্স বন্ধ করে বলল—এখানে আলো কম। পড়া যাবে না। বাইরে চলুন।

বাইরে একটা চেস্টনাট গাছের নিচে একটা লম্বাটে পাথরে এসে বসল দোনিয়া। মারিয়া হ্যারি বসল। বিস্কো দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস দোনিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। হ্যারি আস্তে বলল, ফ্রান্সিস ঐ কাগজটা কী? ফ্রান্সিস বলল,- মুবারকের সেই চিঠি।

বলো কী? হ্যারি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কাগজটার দিকে। মারিয়া আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলো না। গলা নামিয়ে হ্যারিকে বলল- কী ব্যাপার বলো তো? হ্যারি বিস্কোকেও ইঙ্গিতে কাছে ডাকল। তারপর নিম্নস্বরে সমস্ত ঘটনা বলতে লাগল।



দোনিয়া কাগজটা ফ্রান্সিসকে তুলে দেখিয়ে বলল - এটাই হল মুবারকের সেই চিঠি। ফ্রান্সিস ভালো করে দেখল কাগজটা। হরফ দেখে বুঝল আরবি ভাষা। এত পুরোনো কাগজ। হলদে হয়ে গেছে। অক্ষরগুলোও এত অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে ভালো করে বোঝাই যায় না।

এবার আপনি চিঠিটা ভালো করে পড়ুন তো। দেখুন তো কোন কথা বা পংক্তি কি আপনি বাদ দিয়ে বলেছিলেন? ফ্রান্সিস বলল। দোনিয়া চিঠিটা মনে মনে

পড়তে লাগল। পড়া শেষ করে মাথা নাড়ল। বলল - নাঃ চিঠিটা হুবহু বলেছি আমি। ফ্রান্সিস ভাবল কিছুক্ষণ। কিছু বলল না।

হ্যারির ততক্ষণে নিখোঁজ যোদ্ধামূর্তির গল্পটা বলা শেষ হয়ে গেছে। হ্যারি বলল ফ্রান্সিস কী ভাবছো?

— জানো হ্যারি, আমার কেমন মনে হচ্ছে চিঠিটায় নিশ্চয়ই কিছু লেখা বাদ গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিস দোনিয়াকে বলল—দোনিয়া-আপনি এই চিঠিটা ছাড়া আর কিছু কি ঐ গ্রন্থটাতে পান নি?

--দোনিয়া একটু ভেবে নিয়ে বলল—না—জ্যোতিষ বিদ্যার মোটা গ্রন্থ। তখন তো গ্রন্থটা পড়ার দিকেই সমস্ত মনপ্রাণ। হঠাৎই এই চিঠিটা পেয়েছিলাম। তখন আর গ্রন্থপড়ার দিকে মন থাকে নি। চিঠিটা বেশ কষ্ট করে পড়েই বুঝতে পারলাম সোনার যোদ্ধামূর্তিগুলো মুজাহিদ দেশে নিয়ে যেতে পারে নি। মূর্তিগুলো আছে আসারির এই ক্যালে মানে খাঁড়ির জলের নিচে। একটু থেমে দোনিয়া বলল—

--বেশ কিছুদিন এই চিন্তাটাই আমাকে পেয়ে বসল। পরে আর ঐ অভিজাত ভদ্রলোকের বাড়ি যাই নি। গ্রন্থটাও আর পড়া হয় নি। ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল--আমার মনে হয় ঐ গ্রন্থে আরো কিছু সূত্র পাওয়া যাবে।

--এটা তখন ভাবি নি। ধরেই নিয়েছিলাম এই চিঠির ভিত্তিতেই নিখোঁজ মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে পারবো। কিন্তু এখন বুঝছি—এতবড় খাঁড়িতে ওসব আদৌ খুঁজে পাবো কিনা। দোনিয়া বলল।

—আমি তো সে কথা আপনাকে আগেই বলেছি। ফ্রান্সিস বলল।

--আচ্ছা—হ্যারি বলল—আপনি তো চিঠিটা পিসা নগরের একজন অভিজাত ভদ্রলোকের বাড়িতে পেয়েছিলেন?

--হ্যাঁ। দোনিয়া মাথা ওঠানামা করে বলল।

--ওখানে আমাদের নিয়ে যেতে পারবেন? হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস বলল-আমিও তাই বলছিলাম। ওখানে খোঁজাখুঁজি করতে পারলে হয়তো অন্য আরও সূত্রও পেতে পারি।

--এটা আপনাদের অনুমান—তাই কিনা। দোনিয়া বলল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—তা ঠিক। তবে এখন পর্যন্ত আমরা মুবারকের চিঠি থেকে শুধু এইটুকু জানলাম যে সোনার মূর্তিগুলো এই খাঁড়ির জলের নিচেই কোথাও আছে। এই একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন প্রশ্ন—এতবড় খাঁড়ির কোথায় সেই নৌকোটা ডুবে গিয়েছিল। খাঁড়িটার জলের গভীরতা বেশি নয়। আপনার ঐ বড়শীগুলো ফেলে ফেলে টেনেটেনে খোঁজা যায় ঠিকই কিন্তু সেটা কতটা সম্ভব? দিনের পর দিন এত কষ্ট করে খুঁজেও যে নিখোঁজ মূর্তিগুলো পাবো সেটা অনিশ্চিত। কাজেই মুবারকের চিঠিটা যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেখানে একটু খোঁজুখুঁজি করতেই হবে। যদি কিছু পাওয়া যায় বা হদিশ করা যায়। দোনিয়া একটু ভাবল। তারপর বলল—বেশ। তবে তো আপনাদের পিসায় যেতে হবে।

--তা তো যেতেই হবে। হ্যারি বলল।

--ঠিক আছে। আপনারা কবে কীভাবে যাবেন ভেবে দেখুন। দোনিয়া বলল।

--সেটা আমরা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করবো। ফ্রান্সিস বলল।

নৌকোয় উঠে ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া--আমরা আমাদের জাহাজে যাবো। মারিয়া একটু আশ্চর্য হয়েই বলল—

আজকে খোঁজাখুঁজি করবে না? ফ্রান্সিস বলল--না—আমাদের একবার পিসা যেতে হবে।

সে তো মূল ভূখণ্ডে। মারিয়া বলল।

হ্যাঁ সেখানেই যেতে হবে। হ্যারি বলল।

কিন্তু তাতে তো আরো সময় নষ্ট হবে। বিস্কো বলল।

না হয়তো এই সময়টা খুবই কাজে লাগবে। ফ্রান্সিস বলল।

সেটা তাহ'লে বন্ধুদের বুঝিয়ে বলো। বিস্কো বলল।

সেইজন্যেই আমাদের জাহাজে যাচ্ছি। দেখি সব বলে। ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিসদের নিয়ে নৌকোগুলো চলল ওদের জাহাজের দিকে। নৌকোর দাঁড় টানতে টানতে বিস্কো বলল--রাজকুমারী—এসব জায়গায় দেখছি গরম খুব বেশি না। মারিয়া বলল—এটা ভূমধ্যসাগর অঞ্চল—ঠান্ডা গরম কোনটাই বেশি নয়।

জাহাজে উঠে ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল-সবাইকে ডেকএ আসতে বলো। ভাইকিং বন্ধুদের সবাইকে খবর দিল হ্যারি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাইকিং বন্ধুরা জাহাজের ডেক-এ এসে জড়ো হল। ওরা ভেবে পাচ্ছিল না ফ্রান্সিস হঠাৎ এভাবে ওদের ডাকলো কেন।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল--ভাইসব—আমরা নিখোঁজ মূর্তিগুলো উদ্ধারের জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছি। এখন একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমাদের পিসায় যেতে হবে। যে কাজে যাচ্ছি তা হোক বা নাহোক কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা ফিরে আসবো। আমাদের সঙ্গে বন্ধু দোনিয়াও থাকবেন। ফ্রান্সিস থামলো। ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। ওরা অনেকেই ভেবেছিল ফ্রান্সিস দেশের দিকে যাত্রার কথা বলবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আরো কয়েকদিন দেরি হবে। শুধু তাই নয়। ফ্রান্সিস তো এখনও যোদ্ধামূর্তিগুলোর হদিশই করতে পারে নি।

ফ্রান্সিস আবার বলতে শুরু করল—ভাইসব--তোমরা অধৈর্য হয়ো না। পিসা থেকে ফিরে এসে যা বলার আমি বলবো। ফ্রান্সিস থামলো। সভা ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস নিজের কেবিনঘরের দিকে চলল। পেছনে মারিয়া হ্যারি দোনিয়াও চলল।

কেবিনঘরে এসে ফ্রান্সিসরা বসল। ফ্রান্সিস বলল—পিসা যেতে হলে আমাদের আজকেই জাহাজ ছাড়তে হবে। দেরি করা চলবে না। তার আগে রাজা এনজিওকে খবর পাঠাতে হবে। ফ্রান্সিস দোনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল--আপনি রাজা এনজিওকে খবরটা জানাবার ব্যবস্থা করুন। জানাবেন দিন কয়েকের জন্যে আমরা পিসায় যাচ্ছি। রাজা প্রথম ফ্রেডারিকের সময়কার কিছু খবরাখবর জোগাড় করতে। ব্যস্ আর কিছু নয়। ফিরে এসে আমরা আবার সন্ধানকার্য চালাবো। দোনিয়া বলল--বেশ—আমি যাচ্ছি।

--তাহলে ফ্রান্সিস-দোনিয়া ফিরে এলেই আমরা জাহাজ ছাড়বো? হ্যারি বলল। ফ্রান্সিসের মাথা ওঠানামা করল। মারিয়া আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। বলল--আচ্ছা দোনিয়া--পিসা খুব সুন্দর নগর তাই না? দোনিয়া হেসে বলল--হ্যাঁ রাজকুমারী। এখন তো নানা চিন্তা মাথায়। পরে আপনাকে পিসা জেনিয়া এসব জায়গা সম্বন্ধে বলবো। আপনার শুনতে ভালো লাগবে।

দোনিয়া কেবিন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। একটু পরেই নৌকোয় উঠে দাঁড় টানতে টানতে দূরের নুরাঘিটার দিকে চলল।

দোনিয়া চলে যেতেই মারিয়া জাহাজের ডেকএ উঠে এল। রেলিঙ ধরে তাকিয়ে রইল দূরের নুরাঘিটার দিকে। —কখন দোনিয়া ফিরে আসবে। পিসা নগরের কথা ও

শুনেছে। না জানি কত বড় নগর কত লোকজন-কেমন তাদের জীবনযাত্রা পোশাক পরিচ্ছদ।

বিকেল হল। কিছু পরেই পশ্চিমের আকাশ লালচে হ'য়ে উঠল। কিছুটা নিস্তেজ লাল সূর্য সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় নেমে এল। তারপর ডুবে গেল। আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল।

ঐ স্বল্প অন্ধকারে মারিয়া দেখল দোনিয়া নৌকো চালিয়ে আসছে। মারিয়া খবরটা দিতে নিজের কেবিনঘরের দিকে ছুটল।

কেবিনঘরে ঢুকে দেখল—ফ্রান্সিস আধশোয়া হ'য়ে আছে। গভীরভাবে কিছু ভাবছে। হ্যারি নিশ্চুপ বসে আছে। মারিয়া ব'লে উঠল—দোনিয়া আসছে। ফ্রান্সিস উঠে বসল।

কিছুক্ষণ পরে দোনিয়া ঢুকল। বলল--রাজা এনজিওকে বললাম। রাজা আপত্তি কিছু করল না। তবে বারবার বলল যে সে মাসারিতে বেশিদিন থাকতে পারবে না। পিসা থেকে ফিরেই আমরা যেন জোর তল্লাশী চালাই।

--ঠিক আছে—ফ্রান্সিস বলল। তরপর দোনিয়াকে বলল—

--বলুন তো—পিসা কীভাবে যাবো?

--আপনাদের জাহাজে চড়েই যেতে পারবেন। দোনিয়া বলল।

--কিন্তু আমি ভাবছি—ফ্রান্সিস বলল--এতজন বন্ধুকে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। আমরা তো লড়াই করতে যাচ্ছি না। আমরা চারজন গেলেই হবে। —মারিয়া হ্যারি আপনি আর আমি।

--কিন্তু নৌকোয় চড়ে কি যাওয়া যাবে? হ্যারি বলল।

--দোনিয়া কী বলেন? ফ্রান্সিস দোনিয়ার দিকে তাকাল।

--তিনটে নৌকো তো আছে। নৌকোগুলোয় চড়ে যাওয়া অসম্ভব মনে করি না। তবে আপনাদের রাজকুমারীও তো যাবেন। ঝড়বৃষ্টি রোদ—এসব সহ্য করতে পারবেন না। সমুদ্রপথ তো কম দূর নয়। তা ছাড়া কিছু এলাকা আছে যেখানে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা ওৎ পেতে থাকে। সেক্ষেত্রে দল বেঁধে জাহাজে চড়ে যাওয়াই নিরাপদ। ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই ভাবলো দোনিয়ার কথাগুলো। হ্যারিই বলল—

--জাহাজেই চলো ফ্রান্সিস--সময়ও কম লাগবে।

--বেশ--তুমি সবাইকে বলো তৈরি হতে--যত তাড়াতাড়ি সমুদ্রযাত্রা শুরু করবো। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি চলে গেল সবাইকে খবর দিতে--জাহাজ ছাড়ার জন্যে তৈরি হতে।

একটু রাত হতেই ঘর্‌ঘর্‌ শব্দে নোঙর তোলা হল। চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। বাতাসও বেগবান। সব পাল খুলে দেওয়া হল। সমুদ্রে ছোট ছোট ঢেউয়ের গায়ে চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি। ঢেউ ভেঙে জাহাজ চলল।

ফ্রান্সিস দোনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ডেক-এ উঠে এল। জাহাজ চালক ফ্লাইজারের কাছে এল দু'জনে। জাহাজ চালক ফ্লাইজারকে ফ্রান্সিস বলল--দোনিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী জাহাজ চালাও। উনি এই অঞ্চলের মানুষ। এসব এলাকা উনি ভালোভাবেই চেনেন। দোনিয়া এগিয়ে এসে ফ্লাইজারকে কিছু নির্দেশ দিল। তারপর বলল—ভাই তোমার কোন অসুবিধে হলে আমাকে ব'লো। ফ্লাইজার হেসে মাথা ঝাঁকাল।

কয়েকদিনের মধ্যেই ফ্রান্সিসদের জাহাজ মূলভূখণ্ডের কাছে এল। সমুদ্রপথে ঝড়বৃষ্টি বা ঘন কুয়াশার পাল্লায় পড়তে হল না।

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় পিসা নগরের বন্দর দূর থেকে দেখা গেল। অনেক জাহাজ

ঘাটে নোঙর করা। কত দেশের পতাকা উড়ছে জাহাজগুলোর মাথায়। জাহাজী মানুষ মোটবাহকদের ভীড়। নগরবাসী দু'চারজন শৌখিন লোকও দেখা গেল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ বন্দরে ভিড়ল। কাঠের পাটাতন ফেলা হল। ফ্রান্সিসের বন্ধুদের আর তর সইছিল না। ছোট ছোট দল বেঁধে দু'দল নেমে গেল পিসা নগর ঘুরে বেড়িয়ে দেখার জন্যে। ফ্রান্সিস আগেই বন্ধুদের বলে দিয়েছিল--ইচ্ছে করলে ওরা নগরে ঘুরে আসতে পারে। কতদিন পরে এরকম একটা চোখ ধাঁধানো নগরে এল ওরা।

কিছু পরে দোনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস হ্যারি আর মারিয়া নেমে এল। বন্দর এলাকায় লোকজনের বেশ ভীড়। সেই ভীড়ের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিসরা বড় রাস্তায় এল। বেশ চওড়া পাথর বাঁধানো রাস্তা। সুবেশ পুরুষ মহিলারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাথর লোহা কাঠ দিয়ে তৈরি সুন্দর বাড়িঘরদোর। কয়েকটা অট্টালিকা বড় ছোট দোকানপাট। ক্রেতাসাধারণের ভীড়। ঘোড়ায় টানা সুদৃশ্য গাড়ি রাস্তায় চলছে। তাতে অভিজাতশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ বসে। স্ত্রীলোকদের পোশাক জমকালো।

দোনিয়া একটা গাড়িভাড়া করল। দু'মুখো আসনে ফ্রান্সিসরা মুখোমুখি বসল। গাড়ি চলল। পাথর বাঁধানো রাস্তায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠল—টক্-টক্-টকাস্--

কতদিন পরে এতবড় নগর দেখে সুন্দর পোশাক পরা পুরুষ মহিলাদের দেখে মারিয়ার খুব ভালো লাগল। আবার মনটা খারাপও হল নিজের দামি পোশাকটার ছেঁড়াখোরা সেলাই করা চেহারা দেখে। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে দেখল ফ্রান্সিস নগরের লোকজন বাড়িঘর কিছুই দেখছে না। সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে। নিজের বাড়িঘর কিছুই দেখছে না। সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে। নিজের চিন্তায় বিভোর। ফ্রান্সিস হ্যারির গায়ের পোশাকের অবস্থাও বেশ খারাপ। তালিও দেখা যাচ্ছে। মারিয়ার কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। কথাটা ও ফ্রান্সিসকে বলতে সাহস পেল না।

গাড়ি চলল। একসময় একটা সাদারঙের গীর্জার পাশ দিয়ে একটা ছোট রাস্তায় ঢুকল। কিছুটা যেতে দোনিয়ার নির্দেশে একটা বাড়ির পাথরের দেউড়ির সামনে থামল। ফ্রান্সিসরা নামল। দেউড়ির দরজা দামি কাঠের। কতরকম বিচিত্র রঙীন নকশা দরজায়।

আধ ভেজানো দরজা ঠেলে দোনিয়া প্রথম ঢুকল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। ছোট ছোট রঙীন বাধানো পথটা একটা দরজার সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। দু'পাশে বেশ সযত্নে তৈরি বাগান। নানা গাছে বাগানে নানারঙের ফুল ফুটে আছে। ফুলের গন্ধ আসছে বাগান থেকে।

দোনিয়া এগিয়ে গিয়ে দরজায় মৃদু টোকা দিল। দরজা খুলে গেল। দেখা গেল একজন কাফ্রি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। দোনিয়াকে দেখে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল। দোনিয়া বলল--নোবাইল আছেন কি না? কাফ্রি যুবকটি মাথা একটু কাত করে আসতে ইঙ্গিত করল। কাফ্রি যুবকটি ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। মারিয়া বেশ অবাক হয়েই চারিদিকে তাকাতে তাকাতে চলল। মারিয়া তো রাজপ্রাসাদেরই মানুষ। কিন্তু এ বাড়ির দেয়ালচিত্র, মেঝেয় বিচিত্র রঙের নক্‌শা করা গালিচা পাতা কারুকাজকরা দরজা জানালা দেখে বুঝল এত রঙ এত সাজসজ্জা ওদের প্রাসাদেও নেই।

ডানদিকের একটা খোলা দরজার সামনে যুবকটি দাঁড়িয়ে পড়ল। দোনিয়া ফ্রান্সিসদের ঢুকতে ইঙ্গিত করে নিজেও ঢুকল।

ফ্রান্সিসরা একটি সুসজ্জিত ঘরে ঢুকল। একটা লম্বাটে কাঠের আসনে একজন সাদা দাড়ি গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক বসেছিলেন। আসনে পাখির পালকে তৈরি ঝালরওয়ালা গদীমত। হাতে ধরা একটা লম্বাটে কাগজ পড়ছিলেন। ফ্রান্সিসরা ঢুকতেই ভদ্রলোক

কাগজটা পাকিয়ে রেখে একটু দ্রুতই এগিয়ে এলেন দোনিয়ার দিকে। হেসে দোনিয়াকে জড়িয়ে ধরলেন। দোনিয়া ফ্রান্সিসকে বলল—ইনি নোবাইল—শুধু ধনী বা অভিজাত নন-বিদ্বানও। ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বলল—এঁরা আমার পরম বন্ধু। জাতিতে ভাইকিং। নোবাইল হেসে এগিয়ে এলেন। ফ্রান্সিস হ্যারিকে জড়িয়ে ধরলেন। মারিয়াকে দেখিয়ে দোনিয়া বলল—ইনি ওঁদের দেশের রাজকুমারী। নোবাইল সঙ্গে সঙ্গে মাথা বেশ কিছুটা নামিয়ে ডান হাত বাড়ালেন। মারিয়া অভিজাত রীতি অনুযায়ী তাঁর হাতে হাত রাখল। নোবাইল মারিয়ার হাতে আলতো চুমু খেলেন। স্পেনীয় ভাষায় বললেন—আপনাদের শৌর্যবীর্যের কাহিনী আমরা শুনেছি। তবে এই প্রথম পরিচিত হবার সৌভাগ্য হল।

—কী যে বলেন—মারিয়া হেসে বলল—আপনারা সম্পদে জ্ঞানে গরিমায় আমাদের চেয়ে অনেক ওপরে। নোবাইল একটু মাথা ঝুঁকিয়ে হাসল। কোন কথা বলল না। দোনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন—দোনিয়া—আপনি তো জেলে চাষীদের মধ্যে থাকতে ভালোবাসেন। আমাদের এড়িয়ে চলেন। হঠাৎ আমাদের কথা মনে পড়ল।

—কারণ আছে। আপনার গ্রন্থাগারে একটু পড়াশুনো করবো।

—বেশ তো—চলুন। নোবাইল ঘর থেকে বেরিয়ে ডানদিকে চললেন। ফ্রান্সিসরাও পেছনে পেছনে চলল। কাফ্রি যুবকটি তখন আসছিল। নোবাইল মৃদুস্বরে তাকে কী বললেন। তারপর দোনিয়ার দিকে ফিরে বললেন—ও দরজা খুলে দিচ্ছে। আপনারা যান। মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি অন্দরে আমার স্ত্রীর কাছে চলুন। মারিয়া একবার নিজের পোশাকের দিকে তাকাল। অস্বস্তিবোধ করল। কিন্তু ভদ্রলোক যেভাবে বলছেন—না যাওয়াটা অভিজাতমহলের রীতিতে ভালো দেখায় না। মারিয়া নোবাইলের সঙ্গে অন্দরমহলের দিকে চলল।

দোনিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সিসরা গ্রন্থাগারে ঢুকল। দেখল—মোটা কাঠের পাটাতনের ওপর চামড়া বাঁধানো বেশ কিছু বড় বড় গ্রন্থ। একপাশে কাঠের আসনের সামনের চৌকোনো কাঠের ওপর রুপোর দোয়াতদানি। পালকের কলম। কিছু পাচমেনট কাগজও রাখা আছে।

দোনিয়া এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা তাকের কাছে গেল। একটা মোটা গ্রন্থ তুলে নিল। গ্রন্থটির মলাটে হাতে আঁকা গ্রহনক্ষত্রের ছবি। মলাট উল্টে পাতা বের করল। কালির লেখা শুকিয়ে বেশ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। দেখল গ্রন্থটি আরবী ভাষায় হাতে লেখা। গ্রন্থটির ভারি পাতা পেছন থেকে আস্তে আস্তে ওল্টাতে ওল্টাতে একটা পাতার কাছে এসে দোনিয়া বলল—মুবারকের চিঠিটা এখানেই গোঁজা ছিল। জানিনা কী করে সেই চিঠিটা এখানে এল। হ্যারি ফ্রান্সিস দু'জনেই পাতাটা দেখতে লাগল। সবই আরবী ভাষায় লেখা। হ্যারি বলল—দোনিয়া—দেখুন তো এই পাতাগুলোয় কী বিষয়ে লেখা আছে। দোনিয়া পাতাটা উল্টেপাল্টে বলল—জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়েই লেখা। অন্য কিছু নয়। ফ্রান্সিস চুপ করে ঘরে কিছুক্ষণ পায়চারি করল। তারপর দোনিয়ার কাছে এসে বলল—আচ্ছা এখানকার সব গ্রন্থই কি আপনি পড়েছেন?

—না-না। —ইচ্ছে ছিল-পড়বার। কারণ গ্রীক আর আরবী ভাষায় হাতে লেখা গ্রন্থগুলি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আগ্রহ ছিল। কিন্তু ঐ চিঠিটা পাওয়ার পর আমি মূর্তি উদ্ধারের কথাটাই ভাবলাম। নিজের জন্যে নয়। গরিব জেলে চাষীদের ভালোর জন্যই ঐ মূর্তিগুলোর বিনিময়ে অর্থসংগ্রহ করবো বলে। আসলে এই চিন্তাটাই এত পেয়ে বসল যে আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না। দোনিয়া হেসে বলল। ফ্রান্সিস বলল—সন্দেহ নেই-আপনার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। অবশ্য সিপনোলার মত মানুষেরা সেটা বুঝবে না। একটু

শেষে ফ্রান্সিস--আমার কিন্তু কেমন মনে হচ্ছে--চিঠিটা অসম্পূর্ণ। একটা কিছু বর্ণনা এর মধ্যে বাদ গেছে।

--তাহলে কি বলতে চাও যে চিঠিটার অন্য একটা নকল আছে? হ্যারি বলল।

--হ্যাঁ--মুবারক নিশ্চয়ই কোন খসড়া মত করেছিল। সেখান থেকে দেখে দেখে ভালোভাবে লিখতে গিয়ে কোন অংশ বাদ পড়ে গেছে। মুবারক আর মিলিয়ে দেখে নি। ফ্রান্সিস বলল। দোনিয়া কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল--প্রায় দু'শো বছর আগের কথা। এখন কি ওসবের কোন হদিশ করা যাবে? ফ্রান্সিস চিন্তা করতে লাগল। বলল--তা ঠিক। পরে হঠাৎ থেমে ফ্রান্সিস বলে উঠল—আচ্ছা আপনি কি সমস্ত গ্রন্থটাই পড়েছিলেন? দোনিয়া মাথা নেড়ে বলল--না—। চিঠিটা পাওয়ার পর আর পড়তে পারি নি। ফ্রান্সিস বলল--

--তাহ'লে এবার পড়ুন তো। খুব সময় লাগবে কি?

-না না। আরবী আমি আমার মাতৃভাষার মতই পড়তে পারি। দোনিয়া বলল।

তখনই নোবাইল ঘরে ঢুকলেন। বললেন--আপনাদের অসুবিধে ঘটালাম না তো? দোনিয়া হেসে বলল না না।

ঠিক আছে। আপনারা কিন্তু আমার অতিথি। দুপুরের খাওয়াটা এখানেই খেয়ে যাবেন। নোবাইল বললেন। ফ্রান্সিস হ্যারি এখানকার রীতি অনুযায়ী একটু মাথা ঝুঁকিয়ে বলল এতো আমরা সম্মানিত বোধ করবো। নোবাইল হাসলেন। বললেন—আপনাদের রাজকুমারী আবার লো ল্যাতিন জানেন না। আমাকে গিয়ে তাঁকে আবার সাহায্য করতে হবে। নইলে অন্দরমহলের মহিলাদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হ'য়ে যাবে। আমি যাচ্ছি। নোবাইল চলে গেলেন।

দোনিয়া আসনে বসে গ্রন্থটি পড়তে লাগলেন। হ্যারি পাশে বসল। ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে পায়চারি করতে লাগল। আবার দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল। দোনিয়া ডান থেকে বাঁদিকে পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে পড়তে লাগল।

হঠাৎ দোনিয়া বলে উঠল--এটা কী? ঝুঁকে পড়ল গ্রন্থটির ওপর। পাশে বসা হ্যারিও ঝুঁকল। একটা মোটা পাতা দেখিয়ে দোনিয়া বলল—এটাতে এত কাটাকুটি—জড়ানো লেখা গায়ে গায়ে লেখা—মানে খুব দ্রুত কিছু লেখা। সেইজন্যেই এত কাটাকুটি।

--জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয়ে কিছু লেখা?

--উঁহু--অন্য হাতের লেখা। ভালো করে পড়তেই পারছি না। দোনিয়া বলল।

-কষ্ট করে হলেও পড়তে থাকুন। হ্যারি বলল। দোনিয়া একটুক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে পড়তে বলল--ফ্রান্সিস--মুবারকের লেখা সেই চিঠির দু'একটা পংক্তি পড়তে পারছি। কোন সম্বোধন নেই—নিচে লেখকের নামও নেই।

--তার মানে আপনার কাছে মুবারকের যে চিঠিটা আছে এটা তারই খসড়া। ফ্রান্সিস ব'লে উঠল।

--বোঝা যাচ্ছে—ভুলেই হোক বা যেভাবেই হোক--খসড়াটা গ্রন্থটার সঙ্গে সেলাই করে বাঁধিয়ে ফেলা হয়েছে। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস মাথার চুলে আঙুল চালাল। বেশ উত্তেজিত গলায় বলল--এবার খসড়াটা সম্পূর্ণ ভালো করে পড়ুন। দোনিয়া বলল—উঁহু--পড়তে হবে না। শব্দগুলো ধ'রে ধ'রে যে জায়গাগুলো পড়া যাচ্ছে না সেগুলো বুঝে নিয়ে—লিখতে হবে। দোনিয়া গ্রন্থটি নিয়ে বসার জায়গায় গেল। সাজিয়ে রাখা একটা পার্চমেন্ট কাগজ টেনে নিল। রুপোর দোয়াতে কলম চুবিয়ে নিয়ে খসড়াটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে দেখে থেমে থেমে লিখতে লাগল।

ফ্রান্সিস অনড় দাঁড়িয়ে রইল। হ্যারিও আর বসে থাকতে পারল না। উঠে দাঁড়াল।

এসময় মারিয়া ঘরে ঢুকল। পেছনে সেই কাফ্রি যুবকটি। মারিয়া হেসে বলল--এই যে পড়ুয়ারা--গৃহকর্ত্রী তোমাদের খেতে ডাকছেন। ফ্রান্সিস অনড় দাঁড়িয়ে। কোন কথা বলল না। হ্যারি বলল—একটু পরে যাচ্ছি।

দোনিয়া মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—অনেক সময় লাগবে। চলুন—খেয়ে আসা যাক।

দোনিয়া দরজার দিকে চলল। অগত্যা হ্যারি আর ফ্রান্সিসকেও এগোতে হল। মারিয়াও চলল। ফ্রান্সিসের গম্ভীর মুখ দেখে এতক্ষনে বুঝল ফ্রান্সিসরা সেই চিঠির ব্যাপারে নিশ্চয়ই নতুন কোন সূত্র পেয়েছে। কিন্তু এই নিয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। ও জানে ফ্রান্সিস সময়মত সব বলবে।

সবাই খাবার ঘরে ঢুকল। লম্বাটে ঘর। পাথরের দেয়ালে এখানে ওখানে নানা রঙের ছবি আঁকা। কোথাও নানারঙের নক্‌শা আঁকা। মারিয়া দোনিয়া আগে দেখেছে। কিন্তু হ্যারি ফ্রান্সিস দেখে নি। হ্যারি বেশ বোকার মতই চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ছবিগুলো যীশুর জীবনের কয়েকটা ঘটনা নিয়ে আঁকা। ফ্রান্সিস কিন্তু কোনদিকে তাকিয়ে দেখল না ও সোজা খাবার টেবিলের দিকে চলল।

নোবাইল তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে খাবার টেবিলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। ফ্রান্সিসরা এলে তাঁরা বসলেন ওক কাঠের গদীওয়ালা চেয়ারে। ফ্রান্সিসরাও বসল। একটুক্ষণ পরস্পরকে পরিচিত করাবার নিয়ম মানা হল। টেবিলে ছাড়া ছাড়া রঙীন ফুলতোলা সাদা ধপ্‌ধপে ঢাকনা। খাওয়ার বাসনপত্র ছুরি কাঁটাচামচ রুপোর। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে। রাঁধুনি বুড়ি খাবার নিয়ে ঢুকল। পেছনে একটি অল্পবয়সী মেয়ে। নোবাইল নিজের মেয়ে ব'লে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

রুপোর থালায় খাবার পরিবেশন করল রাঁধুনি বুড়ি। তদারক করল নোবাইলের মেয়ে। খেতে খেতে কথাবার্তা চলল। নোবাইল দোনিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন--আপনাদের পড়াশুনো কতদূর এগোল?

--মনে হচ্ছে বিকেল নাগাদ প্রয়োজনীয় তথ্যটা পেয়ে যাবো। দোনিয়া বলল।

--আজকে থাকবেন তো? নোবাইলের স্ত্রী বললেন।

--উঁহু--এই ভাইকিং বন্ধুদের সঙ্গে এসেছি। ওঁদের সঙ্গেই থাকতে হবে। ওঁদের জাহাজেই থাকবো। দোনিয়া বলল।

ফ্রান্সিস চুপচাপ খেয়ে নিল। একটু তাড়াতাড়িই খেলো। মাথায় চিন্তা তো রয়েইছে। তার ওপর এই জাঁকজমক—এই দামি ঝক্‌ঝকে বাসনপত্র টেবিল ঢাকনা আর ধনী পরিবারের সামনে--এসব ভালো লাগছিল না। খাওয়া হয়ে গেছে অথচ অভিজাতমহলের ভদ্রতা। উঠে যেতেও পারছে না। একটু ভেবে ফ্রান্সিস নোবাইল ও তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেই ফেলল--যদি অনুমতি করেন--তাহলে আমি উঠি। নোবাইলের স্ত্রী কথাটা না বুঝেও অনুমান করলেন। বললেন--আপনি তো প্রায় কিছুই খেলেন না। লো ল্যাতিন ভাষা। হ্যারি বুঝিয়ে দিলে ফ্রান্সিস হেসে বলল--মানে—খুব একটা খিদে নেই। আমাকে মাফ করবেন। নোবাইল কোন কথা না ব'লে মাথা কাত ক'রে সম্মতি জানাল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠল। চলল গ্রন্থাগারের দিকে। গ্রন্থাগারে ঢুকে ও লেখার আসনের কাছে এল। দোনিয়া যতটুকু লিখেছে দেখল। বুঝল না কিছুই। মোটা কাঠের তাকে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে।

কিছু পরে দোনিয়ার সঙ্গে হ্যারি আর মারিয়া এল। দোনিয়া নিজের কাজে মন দিল।

ফ্রান্সিস একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। হ্যারি দোনিয়ার পাশে বসল। মারিয়া একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। এতক্ষণে মারিয়ার দিকে ফ্রান্সিসের চোখ পড়ল। ফ্রান্সিস কাছে এসে বলল--মারিয়া--আমার কেমন মনে হয়েছিল মুবারকের চিঠিটা অসম্পূর্ণ। এবার মুবারকের চিঠির একটা খসড়া পাওয়া গেছে। দোনিয়া সেই কাটাকুটি করা খসড়াটা পরিষ্কার করে লিখছে। এখন দেখা যাক খসড়াটায় কী ছিল।

সবটাই তো তোমার অনুমান, মারিয়া বলল।

তা' ঠিক। তবে খসড়াটা পাওয়া গেছে আর সেটা এখানেই পাওয়া গেছে--কাজেই আমার অনুমান কিছুটা মিলেছে। এখন বাকিটুকু। ফ্রান্সিস কথাটা ব'লে আবার কাঠের তাকে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

গ্রন্থাগার নিস্তব্ধ। কেউ কোন কথা বলছে না। দোনিয়া নিজের কাজ ক'রে যাচ্ছে। সময় বয়ে চলেছে।

হঠাৎ দোনিয়া আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। লেখা কাগজটা তুলে নিল। লেখাটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল--ফ্রান্সিস--আপনার অনুমান সত্যি! ফ্রান্সিস প্রায় লাফ দিয়ে দোনিয়ার কাছে এল। বলল—কী ব্যাপার বলুন তো। হ্যারিও উঠে দাঁড়াল। মারিয়া দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল। চিঠিটাই তো আমার মুখস্থ। সেই চিঠিতে এই ক'টা পংক্তি ছুট পড়েছে অর্থাৎ বাদ গেছে।

--সেই পংক্তিটা বলুন। অধীর আগ্রহে ফ্রান্সিস বলে উঠল। কাগজটা দেখে দেখে দোনিয়া পড়ল—"জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার মুহূর্তে বিদ্যুতের আলোয় বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়া এক ঝলক ঝাপ্‌সা দেখিলাম হাত তিরিশেক দূরে কালো পাথরের বৃষ্টিভেজা দেয়াল মত।"

পড়া শেষ হতেই ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। বলল--দেখুন—বলেছিলাম কিনা।

কিন্তু দেয়াল বলতে কোন দেয়াল বোঝাচ্ছে? দোনিয়া বলল।

কেন? ঐ ভাঙা নুরাঘিটার দেয়ালটা। ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু--ওটার দক্ষিণ দিকটা মানে খাঁড়ির দিকটা তো প্রায় ধ্বংসস্তূপ। দোনিয়া বলল।

--ভুলে যাবেন না—ঘটনাটা দু'শো বছর আগেকার। আর ঐ নুরাঘিটা নিশ্চয়ই অটুট অভগ্ন ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

--তাহলে......দোনিয়াকে কথাটা বলতে দিল না ফ্রান্সিস। নিজেই বলে উঠল--ঐ ভাঙা নুরাঘিটার হাত তিরিশেক দূরে মূর্তিশুদ্ধ নৌকোটা ডুবে গিয়েছিল। এখন আর অতবড় খাঁড়িটার তলায় খুঁজতে হবে না। অল্প জায়গাটা তো পেয়ে গেলাম। এবার আমাদের চেষ্টা পরিশ্রম। এবার হ্যারি বলল--তাহলে ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

--যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সার্দিনিয়া ফিরে যাবো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর দোনিয়াকে বলল—আপনি নোবাইলকে বলুন—আমরা এখন জাহাজে ফিরে যাবো। দোনিয়া চলে গেল। আসন থেকে ফ্রান্সিস লেখা কাগজটা তুলে মারিয়াকে দিল। বলল--এটা যত্ন করে কেবিনঘরে রেখে দিও। মারিয়া চিঠির কাগজটা নিল।

বিদায় নেবার সময় হল। ফ্রান্সিসরা বাড়ির বাইরে এল। পেছনে নোবাইল, তাঁর স্ত্রীও এলেন। নোবাইল বারবারই বললেন—অতদূর দেশ থেকে আপনারা এসেছেন। আপনাদের সঙ্গে ভালো ক'রে কথাই হল না। অনুরোধ রইল--দেশে ফেরার আগে একবার এখানে আসবেন। ফ্রান্সিস হেসে মাথা একটু ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—আপনার আপ্যায়ন আমরা ভুলবো না। কয়েকদিন থাকতে পারলে আমাদের বিশেষ করে রাজকুমারী

মারিয়ার খুবই ভালো লাগতো। কিন্তু বিশেষ একটা প্রয়োজন আমাদের। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরতে হবে।

--না-না--আপনাদের দেরি করিয়ে দেওয়াটা উচিত হবে না। নোবাইল বলল।

ফ্রান্সিস চিলতে পথটা ধরে দেউড়ির কাছে এল। দেখল--দরজা খুলে দিয়ে সেই যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস যুবকটির পিঠে হাত রেখে মাথা কাত করে বোঝাল ওরা যাচ্ছে। কাফ্রি যুবকটি এতক্ষণে হাসল। ঝকঝকে দাঁত ওর। মাথা একটু ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল।

ফ্রান্সিসরা বড় রাস্তায় এল। দোনিয়াই এদিক ওদিক ঘুরে একটা ভাড়াগাড়ি নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলল জাহাজঘাটার দিকে।

পিসা নগরের বড় বড় রাস্তা বড় বড় অট্টালিকা সুবেশ নারীপুরুষদের দেখতে দেখতে মারিয়া যেন আপনমনেই বলল—ক'টা দিন থাকা যেত না? পাশে-বসা ফ্রান্সিস হেসে বলল—মারিয়া--তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু মূর্তি উদ্ধার ছাড়া আমি এখন আর কিছুই ভাবতে পারছি না।

বিকেল নাগাদ ফ্রান্সিসরা জাহাজঘাটায় এল। ভাইকিং বন্ধুরা সবাই তখনও ফেরে নি। ফ্রান্সিসের চিন্তা হল। ও চাইছিল তাড়াতাড়ি সার্দিনিয়া ফিরে যেতে। অনেক কাজ বাকি। এত চিন্তাভাবনা করে সূত্র যখন একটা পাওয়া গেছে দেখা যাক পরীক্ষা করে। কিন্তু বন্ধুরা কতদিন পরে পিসার মত একটা জমকালো নগর দেখছে। ওদের তো সাধ হবেই ঘুরে বেড়াতে। একটু আনন্দ ফূর্তি তো করবেই।

অগত্যা কেবিনঘরে ফিরে ফ্রান্সিস কাঠের দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসল। বন্ধুদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

মারিয়া জাহাজের রেলিং ধ'রে পিসার জাহাজঘাটায় লোকজন দেখতে লাগল।

সন্ধ্যের সময় বন্ধুরা দু'জন চারজন দল মিলে ফিরে আসতে লাগল।

হ্যারি এল ফ্রান্সিসের কাছে। বলল—সবাই তো আরো দু'একদিন এখানে থাকতে চাইছে। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—অসম্ভব। সবাই ফিরলেই জাহাজ ছাড়তে হবে।

রাতের খাওয়াদাওয়ার আগেই সব ভাইকিং বন্ধুরা ফিরে এল। ফ্রান্সিসের কথা শুনল সবাই। উপায় নেই। ফ্রান্সিস বলেছে। কাজেই খুব ইচ্ছে থাকলেও এই নগরে আর থাকা যাবে না।

রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই ঘর্ ঘর্ শব্দে নোঙর তোলা হল। বাতাসের তেমন জোর নেই। পাল খাটানো হল। সব পালগুলো। কিন্তু জাহাজ ধীরে চলল। ফ্রান্সিস তখন ডেকএ উঠে এসেছে। বুঝল—জাহাজের গতি বাড়াতে হবে। ও বিস্কোকে ডেকে বলল--দাঁড় বাইতে বলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের সার্দিনিয়া পৌঁছাতে হবে।

জাহাজ চলল। সারারাত জাহাজ চলল। কিন্তু বাতাসের জোর বাড়ল না। দাঁড় টেনে যতটা জোরে চলার চলল। মাস্তুলের মাথায় নজরদার পেড্রো চারদিকে নজর রাখতে লাগল। বলা যায় না--জলদস্যুদের পাল্লায় পড়তে হতে পারে। আগে থেকে বুঝতে পারলে সাবধান হওয়া যাবে। তাছাড়া দোনিয়া বলেছে এই অঞ্চলে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের আস্তানা আছে। কাজেই চারদিকে নজর রাখা--আগে থেকে সাবধান থাকা।

পূর্ব আকাশে রঙ ফিরতে লাগল। লাল হয়ে উঠল। একটু পরেই সূর্য উঠল। সকালের নরম আলো সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর ছড়ালো। ঠান্ডা হাওয়া বইতে লাগল। কিন্তু হাওয়ার জোর বাড়ল না।

হঠাৎ পেড্রোর নজরে পড়ল পূবদিকে বেশ দূরে একটা নৌকো ভাসছে। পেড্রো

ভালোভাবে চোখ কুঁচকে দেখতে লাগল। নৌকোটার একটা ধার ভাঙা। সেদিকে দু'পা ছড়িয়ে একটা মানুষ নৌকোর গলুইয়ে মাথা রেখে শুয়ে আছে। মা মেরিও জানে না মরে গেছে না বেঁচে আছে।

পেড্রো মাস্তুল থেকে নেমে এল। ডেকএ শুয়ে থাকা কয়েকজন ভাইকিংদের মধ্যে দু'একজন মাত্র উঠে বসেছে। পেড্রো তাদের ভাঙা নৌকো আর মানুষটার কথা বলল। সবাই রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। ঘুম ভেঙে আরো কয়েকজন এসে ভীড় করে দাঁড়াল। পেড্রো চলল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে।

সব শুনে ফ্রান্সিস ডেকএ উঠে এল। ততক্ষণে হ্যারি বিস্কোরাও খবর পেল। ওরাও ডেকএ উঠে এল।

সবাই তাকিয়ে রইল আধভাঙা নৌকোটার দিকে। একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখে নিয়ে ফ্রান্সিস জাহাজচালক ফ্রাইজারের কাছে এল। ফ্রাইজারকে দূরের আধাভাঙা নৌকোটার দিকে জাহাজ চালাতে বলল। নৌকোটায় একজন মানুষ আছে। ওকে বাঁচাতে হবে।

ফ্রাইজার আস্তে আস্তে মুখ ঘোরাল। জাহাজ চলল ঐ আধভাঙা নৌকোটার দিকে। কাছাকাছি এসে ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে দেখল যে নৌকোর একটা ধার ওপরের দিকে বেশ খানিক ভেঙে গেছে। তবে নৌকোয় জল ওঠে নি। তাই ডুবে যায় নি। ঢোলা হাতা সাদাটে রঙের জোব্বামত গায়ে একটা লোক গলুইয়ে অসাড় পড়ে আছে। সর্বাঙ্গ জলে ভেজা।

ফ্রান্সিস বিস্কোকে বলল—কী ব্যাপার দেখতে। বিস্কো দড়ির মইটা জাহাজ থেকে নৌকোটার কাছে ফেলল। মই বেয়ে বেয়ে নৌকোটার ওপর নেমে এল। ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলছে নৌকোটা। ঐ দুলুনির মধ্যেই বিস্কো লোকটার নাকের সামনে হাত রাখল। ক্ষীণ শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে। বসে পরে বুকে কান ঠেকাল। মৃদু ধক্ ধক্ শব্দ। বিস্কো উঠে দাঁড়াল। রেলিঙের ধারে দাঁড়ানো ফ্রান্সিসদের হাতের ইঙ্গিতে বোঝাল—লোকটা বেঁচে আছে। দড়ির জালমত ফেলতে বলল।

জাহাজ থেকে সেটা নামিয়ে দেওয়া হল। বিস্কো বেশ কসরৎ করে লোকটাকে তুলে জালে বসিয়ে দিল। জাহাজ থেকে ভাইকিংরা ওটা ধরে টেনে টেনে তুলতে লাগল। বিস্কো দড়ির মই বেয়ে উঠে এল।

লোকটাকে প্রথমে ডেকএর ওপর শুইয়ে দেওয়া হল। তখনও লোকটা চোখ বুঁজে রয়েছে। তারপর কয়েকজন মিলে ওকে কেবিনঘরে নিয়ে গেল। ভেজা পোশাক ছাড়িয়ে শুক্‌নো পোশাক পরানো হল। বৈদ্যি ভেন লোকটার কপালে গলায় নীলমত মলম মাখিয়ে দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে টিপতে লাগল।

একটু পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লোকটা চোখ মেলে তাকাল। ভেন মুখ নিচু করে স্পেনীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করল— তুমি কে? কী হয়েছিল তোমার? লোকটা তাকিয়েই রইল। তার মানে ভাষা বোঝে নি। এবার ভেন থেমে থেমে লো ল্যাতিন ভাষায় একই কথা জিজ্ঞেস করল। এবার লো ল্যাতিন ভাষায় লোকটা বলল--জাহাজডুবি। ফ্রান্সিস ভেনকে বলল—দেখো তো—অসুখটা কেমন? মারাত্মক কিছু না। অনাহার জল তেষ্টায় কাহিল হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল ওর খাওয়া দাওয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। পরে শুনবো সব।

ভেনএর ওষুধ খেয়ে দুপুরে খেয়ে দেয়েই ইগনোতি সন্ধ্যের আগেই অনেকটা সুস্থ হল। হ্যারি ইগনোতির সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানতে পারল--রাতের ঘন কুয়াশার মধ্যে ওদের জাহাজ একটা ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ডুবে গিয়েছিল। ও নিজে একটা

ধাক্কা খেয়ে আধভাঙা নৌকোয় চড়ে কোনরকমে সমুদ্রে ভেসে পড়েছিল। কতদিন নৌকোয় ছিল সেটা ইগনোতির মনে নেই।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর সবাই শুয়ে পড়েছে। বিকেল থেকেই বাতাসের জোর বেড়েছে। দাঁড় বাইতে হচ্ছে না।

যে কেবিনঘরে ইগনোতিকে রাখা হয়েছিল সেই কেবিনঘরে চারজন ভাইকিংও ছিল। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎই কেবিনঘরের দরজায় ঠক্ করে শব্দ হতে একজন ভাইকিং এর ঘুম ভেঙে গেল। দেখল অন্ধকারে ইগনোতি দরজা বন্ধ করছে। তারপর বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। একবার ভাইকিংটি ভাবল ইগনোতিকে জিজ্ঞেস করে ও বাইরে গিয়েছিল কিনা। কিন্তু ইগনোতি তো ওর ভাষা বুঝবে না। কাজেই ভাইকিংটি পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হল। সকালের খাওয়াদাওয়া চলছে তখনই রাঁধুনি ভাইকিংটি খাবার জলের পিপের ঢাকনা খুলে দেখল জল তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। পরপর সাজানো চারটে পিপের একটিতে কম জল ছিল। ও বুঝে উঠতে পারল না জল এত কমে গেল কী করে। রান্নার জায়গার পাশে যেখানে জলের পিপেগুলো রাখা হয় সেখানে দেখা গেল জায়গাটা জলময় হয়ে গেছে। এত জল নষ্ট হল কী ক'রে? রাঁধুনি ভাইকিং ওর সাহায্যকারী ভাইকিং বন্ধুকে বলল্ সে কথা। দু'জনেই অবশিষ্ট জলের পরিমান দেখে চিন্তায় পড়ে গেল। দু'জনে পিপেগুলো তুলে তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল--পিপেগুলোয় ফুটো হয় নি। অথচ এত জল পড়ে গেল কী করে? ওরা ভেবে পেল না কী করে হল এটা।

রাঁধুনি ছুটল ফ্রান্সিসের কাছে। সকালের খাওয়ার পর সবাই তখন জল খেতে চাইছে। রাঁধুনির সাহায্যকারী একটা পিপে থেকে সবাইকে জল দিল। পিপেটা প্রায় খালি হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে রান্নাঘরে এল। পিপের ঢাকনা খুলে জলের পরিমান দেখল। চিন্তায় পড়ল ফ্রান্সিস। এখন খাবার জলে টান পড়লে তো বিপদে পড়তে হবে। এতজনের প্রয়োজনীয় জল এখন কোথায় পাওয়া যাবে? ফ্রান্সিস রাঁধুনিকে বলল--পিপের ফাটা জায়গা দিয়ে চুঁইয়ে জল পড়ে যায় নি তো। রাঁধুনি বলল--না।? কোথাও ফাটা চোখে পড়েনি। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দোনিয়ার কাছে এল। খাবার জলের সঙ্কটের কথা বলল। সব শুনে দোনিয়া বলল—এই অঞ্চলটা আমার ঠিক পরিচিত নয়। তবে আমরা বোধহয় কর্সিকা দ্বীপের কাছে এসেছি।

--কর্সিকা দ্বীপ কোনদিকে পড়বে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

--বাঁ দিকে। দোনিয়া বলল--উত্তর কর্সিকায় নামতে পারলে হয়তো খাবার জল পাওয়া যাবে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজের ডেকএ উঠে এল। জাহাজচালক ফ্লাইজারকে এসে বলল—বা দিক মানে পূবদিকে জাহাজ চালাও। কালকের মধ্যে যে করে হোক কর্সিকার উত্তরে কোথাও পৌঁছাতে হবে।

--যা জল আছে তা'তে আর ক'টা দিন যাবে না? ফ্লাইজার বলল।

--জলের তেষ্টা নিয়ে ক'দিন কাটানো যায় বলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জল জোগাড় করতে হবে। হ্যারি বলল।

--ঠিক আছে। ফ্লাইজার বলল। তারপর দু'তিনজন ভাইকিং বন্ধুকে ডেকে বলল--পাল ঘোরাও--জাহাজ বাঁদিকে ঘুরবে। বন্ধুরা মাস্তুল বেয়ে পাল খাটানোর কাঠের টানায়

ঘোরাতে লাগল। আস্তে আস্তে জাহাজের মুখ পুবমুখো হল। জাহাজ চলল।

ফ্রান্সিস দড়িদড়া ধরে পা রেখে রেখে মাস্তুলের কিছুটা ওপরে উঠল। চেঁচিয়ে ডাকল--পেড্রো। পেড্রো নিচের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—ডাঙা দেখলেই বলবে। পেড্রো চেঁচিয়ে বলল- ঠিক আছে।

ফ্রান্সিস মাস্তুল বেয়ে নেমে এল। হ্যারি বলল--দাঁড় টানতে হবে। এখন গতি বাড়াতে হবে।

তা ঠিক। কিন্তু হ্যারি—বন্ধুরা যারা দাঁড় টানবে তারা অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে। বারবার জল খেতে চাইবে। বেশি জলের চাহিদা মেটাতে এই জলটুকুও ফুরিয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বলল—সত্যি এটা আমি ভাবিনি।

কাজেই গতি বাড়াবার প্রশ্ন নেই। এখন বাতাসই একমাত্র ভরসা। ফ্রান্সিস বলল।

এবার হঠাৎই ফ্রান্সিসের মনে হল--আচ্ছা--ইগনোত্তিকে জিজ্ঞেস করে এলাকার কোথায় জল পাওয়া যাবে তার হদিশ করা যায় কিনা।

ফ্রান্সিস বলল হ্যারি চলো তো ইগনোত্তিকে জিজ্ঞেস করা যাক-- ও কোনভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে কিনা।

দু'জনে ইগনোত্তিকে যে কেবিনঘরে রাখা হয়েছে সেই ঘরে এল। দেখল—ইগনোত্তি অনেক সুস্থ এখন। তবে কথাবার্তা বলছে না। কার সঙ্গেই বা কথা বলবে। ওর কথা তো কেউ বুঝবে না।

হ্যারি ইগনোত্তিকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা ইগনোত্তি--আমরা কি কর্সিকা দ্বীপের কাছাকাছি এসেছি?

--তা তো ঠিক বলতে পারবো না তবে কর্সিকা দ্বীপের উত্তর দিকটা আমি মোটামুটি চিনি। এখানে আমি অনেকবার ব্যবসার ব্যাপারে এসেছি।

তবে তো এখানে কোথায় জল পাওয়া যাবে তাও তুমি জানো? হ্যারি বলল।

হ্যা জানি। ইগনোত্তি বলল। হ্যারি কথাগুলো ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস বলল—তাহলে এখন আমাদের কর্সিকা দ্বীপের উত্তরে পৌঁছুতে হবে।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ হল। জলের পরিমান আরো কমে গেল।

ফ্রান্সিসের চিন্তা বাড়ল। ওদিকে কোনরকমে খাওয়াদাওয়া সেরেই পেড্রো মাস্তুলের ওপরে গিয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়েছে। নজর রাখছে চারদিকে যদি ডাঙার দেখা পাওয়া যায়।

সন্ধ্যে হয়ে এল। অন্ধকার তেমন ঘন নয়। একটু পরেই পূর্ব দিগন্তের দিকে অনুজ্জ্বল চাঁদটা উজ্জ্বল হতে লাগল। চাঁদের আলো ছড়ালো সমুদ্রের বুকে।

জাহাজ চলেছে। তখনও ডাঙার দেখা নেই।

রাতের খাওয়াদাওয়ার সময় হল। এবার জলের পরিমান কমে যাওয়ার কথা ফ্রান্সিস সবাইকে জানাবে ভাবল। হ্যারিকে বলল সে কথা। হ্যারি বলল--তাহলে কি সবাইকে ডেকএ আসতে বলবো? ফ্রান্সিস বলল—বেশ—সবাইকেই তো সমস্যাটার কথাটা জানাতে হবে। হ্যারি সবাইকে খবর দিল।

আস্তে আস্তে ভাইকিং বন্ধুরা এসে ডেকএ জড়ো হল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে উঠে এল ডেকএ। বন্ধুরা তখনও পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি আসতেই চুপ করলো সবাই। ফ্রান্সিস বলতে লাগল--ভাইসব--তোমরা এরমধ্যেই নিশ্চয়ই জেনেছো যে জাহাজে জলাভাব দেখা দিয়েছে। কীভাবে জল এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল আমরা জানি না। যাহোক—সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি--জল যতটা সম্ভব কম খাবে। যেটুকু জল

আছে তা'তে যে কটা দিন সম্ভব চালাতে হবে। এই কষ্টটুকু সবাইকে স্বীকার করে নিতে হবে। ফ্রান্সিস থামল। বন্ধুদের মধ্যে একজন বলল--কিন্তু জল না খেয়ে আমাদের কতদিন আর চলবে। ফ্রান্সিস বলল--আমরা জেনেছি যে কর্সিকা দ্বীপ কাছেই। ওখানে পৌঁছাতে পারলে আমরা জল সংগ্রহ করতে পারবো। ততক্ষণ পর্যন্ত বুক দিয়ে তোমাদের কষ্ট স্বীকার করতে হবে। জলতৃষ্ণা সহ্য করতে হবে। বন্ধুরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—ও-হো-হো। সভা ভেঙ্গে গেল।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর সব ভাইকিং বন্ধুরাই অল্প করে জল খেল। কেউ কেউ খেলও না।

রাত বাড়তে লাগল। সব ভাইকিং বন্ধুরাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ও কেবিনঘরের বিছানায় এইশুয়ে পড়ছে পরক্ষণেই উঠে পড়ছে। ডেকএ উঠে আসছে। পুবদিকে তাকিয়ে থাকছে। মারিয়া লক্ষ্য করল সেটা। ডেক থেকে ফ্রান্সিস ফিরে আসতে মারিয়া জিজ্ঞেস করল--বারবার উঠে পড়ছো কেন। ফ্রান্সিস বলল—জানো তো জাহাজে পানীয় জল ফুরিয়ে আসছে। ডাঙায় পৌঁছোতেই হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

তখনই পেড্রো চেঁচিয়ে বলে উঠল—ডাঙা--ডাঙা দেখা যাচ্ছে। ডেকএ শুয়ে থাকা--কয়েকজন ভাইকিংএর কানে গেল কথাটা। ওরা রেলিঙের ধারে এল। দেখল—চাঁদের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট উঁচুনিচু ডাঙা দেখা যাচ্ছে।

একজন ভাইকিং ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে। খবর পেয়েই ফ্রান্সিস হ্যারিকে গিয়ে ডেকে তুলল। চিন্তায় হ্যারির ও ঠিক ঘুম আসছিল না। দু'জনেই ডেকএ উঠে এল। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখল উঁচুনিচু ডাঙা। কিন্তু জাহাজ কোথায় ভেড়ানো হবে। জলের হদিশ কোথায় পাওয়া যাবে? ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল সে কথা। হ্যারি বলল--এখন ইগনোতির সাহায্য নিতে হবে। ওকে ডেকে আনছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হ্যারি ইগনোতিকে ডেকে নিয়ে এল। হ্যারি বলল--ইগনোতি—ঠিক কোন জায়গাটায় নামলে আমরা খাবার জলের হদিশ পাবো? তুমি চিনে নিয়ে ঠিক জায়গাটা বের করতে পারবে? ইগনোতি তীরভূমির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল—আরো কাছে যেতে হবে। জাহাজটা আস্তে আস্তে তীরভূমির অনেকটা কাছে চলে এল। ইগনোতি তীরভূমির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল—ঐ যে টিলার মাথায়—ঝাঁকড়া গাছের জঙ্গল—ওখানটায় নামতে হবে। ওখান থেকে কিছুটা গেলেই ছোট পাহাড়ি ঢাল। ওখানে একটা ঝর্ণা আছে। হ্যারি কথাটা ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে বলল।

জাহাজটা ততক্ষণে টিলার কাছাকাছি এসেছে। জাহাজ আর যেতে পারবে না। জাহাজচালক ফ্লাইজার ততক্ষণে জাহাজ থামিয়েছে। ফ্লাইজারের কাছে এল ফ্রান্সিস। বলল--জাহাজ কি তীরে ভেড়ানো যাবে না? ফ্লাইজার বলল--এখানে জলের গভীরতা নেই। মাটিতে জাহাজ আটকে গেলেই বিপদে পড়তে হবে।

ফ্রান্সিস এসে হ্যারিকে বলল--জাহাজ আর যাবে না। নৌকোর পিপে নিয়ে জল আনতে যেতে হবে। তুমি ইগনোতিকে সেকথা বলো। হ্যারিই ইগনোতিকে কথাটা বলল। তারপর বলল—আমরা নৌকোয় চড়ে জল আনতে যাবো। তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারবে? ইগনোতি মাথা কাত করে জানাল পারবে। তারপর জাহাজটা যখন টিলার কাছে এল তখন ইগনোতি হাত দিয়ে একটা জংলা গাছের মাথা দেখাল।

এবার তিনটে পিপে একটা নৌকোয় তোলা হল। অন্য পিপেটায় এখনও সামান্য জল রয়েছে। কষ্ট ক'রে হলেও দু'একটা দিন তো যাবে। ওটা আর ওরা নেবে না ঠিক করল।

যখন ফ্রান্সিস শাঙ্কো আর হ্যারি ওদের নৌকোয় নামতে যাবে তখনই দোনিয়া এল।

দোনিয়া ইগনোতির আশ্রয় নেবার ব্যাপারটা জানতো না। তাই ইগনোতিকে ফ্রান্সিসদের সঙ্গী হতে দেখে দোনিয়া ফ্রান্সিসকে ইগনোতির কথা জিজ্ঞেস করল। ফ্রান্সিস ইগনোতির হাবুডুবি হয়ে এসে ওদের জাহাজে আশ্রয় নেওয়ার কথা বলল। দোনিয়া এবার ইগনোতির দিকে তাকাল। দেখল—এখানকার চাষিদের মতই ওর পোশাক। দোনিয়া ইগনোতির সঙ্গে কথা বলতে লাগল। একটু আঞ্চলিক ভাষার মিশেল থাকায় হ্যারি ঠিক বুঝল না। দোনিয়া কথা শেষ করে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল--লোকটার কথাবার্তা শুনলাম। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে—লোকটা ঠিক কথা বলছে না। আপনাদের বিপদ হতে পারে।

উপায় নেই দোনিয়া। জাহাজের এতগুলো মানুষের তো খাবার জল চাই। এই অচেনা অজানা জায়গায় কোথায় খুঁজে পাবো জল। একমাত্র ইগনোতিই পারে ঠিক জলের সন্ধান দিতে। ফ্রান্সিস বলল। দোনিয়া শুধু বলল--সাবধানে থাকবেন।

পিপে বসানো নৌকোটায় শাঙ্কো উঠল। অন্য নৌকোটায় ফ্রান্সিস আর হ্যারি। দাঁড় টেনে চলল ওরা। তখন চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। ঢেউয়ের ওপর চাঁদের আলো চিকচিক করছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

তীরের কাছাকাছি একটা জায়গা আঙুল তুলে দেখিয়ে ইগনোতি বলল—ঐ জায়গায় নামতে হবে। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল সেকথা। ফ্রান্সিস সেই ঢালু জায়গাটায় নৌকো লাগাল। নামল তিনজনে। বেশ ভেজা ভেজা কাদামাটি। জোয়ারের সময় বোধহয় ডুবে যায়। কাদার ওপর দিয়ে চলল তিনজনে। ফ্রান্সিস ঠিকই করেছিল আগে জলের জায়গাটার হদিশ করবে। তারপর ফিরে এসে পিপেগুলো নিয়ে যাবে।

কাদায় পা ডুবে যেতে লাগল। একটু এগোতেই আর কাদা নেই। শক্ত জমি। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল ওখান থেকে একটা সরু পায়ে চলা পথের মত। তার মানে এই পথটা দিয়ে লোকজনের যাতায়াত আছে।

একটু এগিয়েই গাছপালার জঙ্গল। অবশ্য পথটা দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। চলল ওরা। উৎরাই পড়ল। ফ্রান্সিস ভাবল—তার মানে এখানে পাহাড় টাহাড় মত আছে। পাহাড়ি এলাকায় ঝর্ণার জল পাওয়া যাবে।

উৎরাই শেষ হতেই দেখা গেল একটা পাথরের লম্বাটে ঘর। ঘরের গরাদ দেওয়া জানালায় আলো আভাস নেই। ফ্রান্সিস ঠিক বুঝল না জায়গাটা বসতি এলাকা কিনা। একটাই মাত্র ঘর। ওরা ঘরের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ ঐ ঘরটা থেকে দ্রুতপায়ে কারা ছুটে আসতে লাগল। ফ্রান্সিসরা নিরস্ত্র অবস্থায় এসেছিল। জল খুঁজতে সঙ্গে তরোয়াল আনা প্রয়োজন মনে করে নি। শাঙ্কো বিপদ আঁচ করে সঙ্গে সঙ্গে জামার ঢোলা গলার মধ্যে দিয়ে বড় ছোরাটা কোমর থেকে খুলে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল।

লোকগুলো তখন অনেক কাছে এসে পড়েছে। চাঁদের আলোয় ওদের হাতের খোলা তরোয়াল যেন ঝলসে উঠছে। ফ্রান্সিসের মনে পড়ল দোনিয়ার কথা। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। ফ্রান্সিস চাপাগলায় বলল—কেউ বাধা দিওনা।

লোকগুলো মূরজাতীয়। কাফ্রিও আছে। বিশাল বলিষ্ঠ শরীর। হ্যারি চিৎকার করে লো ল্যাতিন ভাষায় বলল--আমরা লড়াই চাই না। আমরা নিরস্ত্র। ওদিকে ইগনোতিকে দেখা গেল নিশ্চিন্তে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। যোদ্ধার দল তখন ফ্রান্সিসদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ইগনোতি ওদের কী বলল। যোদ্ধার দল তরোয়াল নামাল। তারপর ফ্রান্সিসদের পেছনে এসে ঘিরে দাঁড়াল। একজন যোদ্ধা তরোয়াল উঁচিয়ে ওদের সেই পাথরের বাড়ির দিকে যেতে ইঙ্গিত করল।

ফ্রান্সিসদের ঘিরে নিয়ে চলল সবাই। এবার ইগনোতির দিকে ফ্রান্সিসের নজর পড়ল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল--ইগনোতিকে বলো তো--ও এই অমানবিক কাজটা করল কেন। হ্যারি কথাটা ইগনোতিকে বলল। ইগনোতি কথাটার খুব একটা গুরুত্ব দিল না। আসলে ওর মতলব তো হাসিল হয়েছে। ওর কাজই হল ওদের দাস ব্যবসায়ীদের কাছে লোকজন ধরে আনা। তারজন্যে ও মূল্য পায়। সেইজন্যেই এভাবে ও মানুষ ধরার জাল ফাঁদে।

ফ্রান্সিসদের সেই ঘরে ঢোকানো হল। দেখা গেল অনেক যোদ্ধা ঘরটায় শুয়ে বসে আছে। এককোনে কাপড় ঢাকা গদিমত। একজন বেশ বলিষ্ঠ লোক শুয়ে আছে। ফ্রান্সিসদের দেখেই লোকটা উঠে বসল। যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে লো ল্যাতিন ভাষায় বলল—ভালো শিকার ধরেছিস। চড়া দামে বিকোবে। বলল—তোর পাওনা নিয়ে যাস। ইগনোতি দাঁত বের করে হাসল।

তরোয়ালের ডগা দিয়ে একরকম ঠেলেঠুলে রক্ষীর দল ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল ঘরটার বাইরে। ঘরটার বাইরে আসতেই দেখা গেল কাঠের মোটা মোটা খুঁটি পুঁতে পুঁতে মোটা লোহার জাল মত। তার মধ্যে দিয়ে হাত গলে যাবে মাথা গলবে না।

অন্ধকারে পশুর খাঁচার মত লাগছে দেখতে। একজন রক্ষী গিয়ে দুদিকের দুটো তালা খুলে ফেলল? ফ্রান্সিসদের ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। আর একটি রক্ষী এসে মোটা দড়ি দিয়ে লোহার সঙ্গে ফ্রান্সিসদের হাত বেঁধে দিল। দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

এতক্ষণে ফ্রান্সিস ভেতরটা দেখল। অন্তত জনা দশ পনেরো লোক ওদের মতই বন্দী অবস্থায় বসে আছে নয়তো লোহার খুঁটির ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। তাদের গায়ে শতছিন্ন পোশাক। তবে অধিকাংশই সুস্থদেহী। কারণটা ফ্রান্সিস অনুমান করল। ঐ বলিষ্ঠ লোকটা দাস ব্যবসায়ী। সুস্থ দাস ভালো দামে বিক্রি হবে। কাজেই সুস্থ রাখা চাই। কিছু বন্দী আবার রোগাক্রান্ত। বোঝাই যাচ্ছে—ভয়ানক অসুস্থ। অন্ধকারে এক নরকের মত দৃশ্য। পায়ের নিচে মাটি লালচে। বন্দীদের পায়ের চাপে ধূলোটে।

ফ্রান্সিসরা বসে পড়ল। বন্দীরা কাছাকাছি দেশগুলোর লোক। কাফ্রিও আছে। সংখ্যায় তারাই বেশি। ফ্রান্সিস অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বুঝল পাহারাদারের সংখ্যা অন্তত ছ'সাতজন। বোধহয় আগে কিছু বন্দী পালিয়েছিল। তাই এত কড়াকড়ি।

ওদিকে আর এক চিন্তা। জাহাজে পানীয় জল ফুরিয়ে এসেছে। ওরা তো পিপে ভরে জল নিয়ে যেতে পারলো না। কালকে থেকেই হয়তো নির্জলা কাটাতে হবে ওদের। এতগুলো মানুষ জন্তুজানোয়ারের মত শুয়ে বসে আছে। কেউ কথা বলছে না—মৃতদেহের স্তূপ যেন। নিস্তব্ধ চারদিক।

শাঙ্কো মৃদুস্বরে বলল--ফ্রান্সিস--ছোরা লুকিয়ে রেখেছি। কী করবে?--দাঁড়াও--কালকের দিনটা দেখি। কত লোকজন এদের সেটা এখনও বুঝতে পারছি না। এখানে আমরা সবাই তো নিরস্ত্র। ওদেরত সংখ্যাটা কত, অস্ত্রশস্ত্র কেমন সেটা আগে আঁচ করে নি। তারপর পালাবার ছক কষবো। ফ্রান্সিস বলল।

ভোর হল। একটা ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল। অনেক বন্দীই তখন ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। কেউ কেউ লোহার খুঁটিতে কাঁধ রেখে মুখ ঝুঁকিয়ে ঘুমিয়ে আছে তখনও।

সকালের আলো পড়ল বন্দীশালায়। এবার স্পষ্ট দেখা গেল বন্দীশালার নারকীয় পরিবেশ। কারো কারো গায়ে ছেঁড়াখোঁড়া জামা, অনেকেরই খালি গা—শুধুমাত্র কৌপিনের মত কোমরে পরা কাপড়ের টুকরো।

শাঙ্কোর পাশেই শুয়েছিল একটা বিশাল চেহারার কাফ্রি। সে ঘুম ভেঙে উঠে বসল। বিরাট এক হাই তুলল। তারপর শাঙ্কোকে নতুন মানুষ দেখে জিজ্ঞেস করল--জালে ধরা

পড়লে কী ক'রে? কথাটা বুঝল না শাঙ্কো। আঙুল দিয়ে হ্যারিকে দেখাল। লোকটা হাসল। এবার হ্যারিকে লো ল্যাতিন ভাষায় জিজ্ঞেস করল--কোথাকার লোক তোমরা? এই নরককুণ্ডে এসে জুটলে কী ক'রে? কথাটা আঞ্চলিক ভাষা মেশানো। তবে হ্যারি মোটামুটি বুঝল বলল যে ওরা ভাইকিং জাহাজে জলাভাব—ইগনোতি জলের হদিশ দিতে ওদের নিয়ে এসেছিল। ইগনোতি নামটা শুনে লোকটার মুখ কঠিন হল। কপালের শিরা ফুটে উঠল। বলল--ইগনোতি একটা নরকের কীট। সুযোগ পেলে ওটাকে আমি হাতের কাছে যা পাবো তাই দিয়ে হত্যা করবো।

ইগনোতিরই তাহ'লে এই জঘন্য কাজ? হ্যারি বলল।

হ্যাঁ। এই দরিয়া দিয়ে যে সব জাহাজ যাতায়াত করে ও মাঝে মাঝেই জাহাজডুবির গল্প ফেঁদে সেইসব জাহাজে আশ্রয় নেয়। অসহায় মুমূর্ষু মানুষকে দেখে লোকের তো করুণা হবেই। ওরা ওকে জাহাজে তুলে নেয়। এটাই হল ইগনোতির আসল কাজ। গোপনে ও জাহাজের মজুত জলভান্ডার থেকে জল ফেলে দেয়। তখন জাহাজটিতে জলের হাহাকার পড়ে যায়। তখন ও পরামর্শ দেয় কাছেই জল পাওয়া যাবে। সেই জলের হদিশ ও জানে। ওকে বিশ্বাস করে ওর দেখানো পথ দিয়ে নাবিকেরা আসে আর এই ক্রীতদাস ব্যবসায়ী সেসব লোককে এখানে বন্দী করে রাখে আর ক্রীতদাস কেনাবেচার বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। ততদিন পর্যন্ত এই বন্দীদের দেখাশুনো করে--যাতে মরে না যায় তার ব্যবস্থা করে। মরে গেলেই তো ক্ষতি। আমাদেরও সেভাবেই আনা হয়েছে এখানে। হ্যারি কথাগুলো ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিসের মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। কী সাংঘাতিক ইগনোতি লোকটা। ক্রুদ্ধস্বরে বলল--ওটাকে কায়দায় পেলে আমি নিকেশ করবো।

একটু পরেই সকালের খাবার আনা হল। একজন পাহারাদার ঠং-ঢাং শব্দে লোহার দরজা খুলে দিল। বন্দীরা উঠে বসল। অনেকে আগে থেকে বসেও ছিল।

একজন রক্ষী একরকমের লম্বা পাতা ধুলোভরা মেঝেয় পেতে দিয়ে গেল। অন্যজন গোল গোল করে কাটা রুটি পাতায় দিল। অন্যজন দিয়ে গেল আলু আনাজপাতা মেশানো ঝোলমত। দু'হাত বাঁধা অবস্থাতেই বন্দীরা দু'হাতের মুঠো দিয়ে রুটি খেতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। বুঝল বন্দীরা এভাবে খেতেই অভ্যস্ত। কিন্তু ফ্রান্সিসের এটা সহ্য হল না। ও দু'পায়ে পাতাসুদ্ধু খাবার ছিটকে ফেলল। একজন রক্ষী তেড়ে এল। ফ্রান্সিস লোহার খুঁটিতে বাঁধা হাত নিয়েও উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল--আমরা কি জানোয়ার? জানোয়ারের মত খাবার খাবো? রক্ষীটি ফ্রান্সিসের কথা বুঝল না কিন্তু ওর এই উগ্রমূর্তি দেখে একটু থমকাল। বুঝে উঠতে পারলো না কী করবে। ফ্রান্সিস রুখে দাঁড়াতে হ্যারি আর শাঙ্কোও উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে উঠল—ও--হো-হো। দেখাদেখি অন্য বন্দীরাও চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করল। রক্ষীরা বেশ ভয় পেয়ে গেল।

দাসব্যবসায়ী বোধহয় ফ্রান্সিসের চ্যাঁচামেচি শুনেই সেই বলিষ্ঠদেহী লোহার জালঘেরা জায়গাটায় এল। বলল--কী হয়েছে? রক্ষীরা ফ্রান্সিসদের বিরুদ্ধতার কথা বলল। লোকটা একটু ভাবল। বলল—ঠিক আছে--একজন একজন ক'রে হাত খুলে দিয়ে খেতে দিবি। আর অন্য রক্ষীরা তরোয়াল হাতে পাহারায় থাকবি। কথাটা বলে লোকটা চলে গেল।

এবার এক একজন বন্দীকে হাতের দড়ি খুলে খুলে খেতে দেওয়া হল। ফ্রান্সিস এবার খেল। এই খাওয়ার ব্যবস্থায় বেশ দেরি হল। সবার খাওয়া হলে এককোনের একটা বড় পিপে থেকে কাঠের পাত্রে জল ভরে এনে জল খাওয়ানো হল। অন্য রক্ষীটি প্রত্যেকের হাত খাওয়া হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দড়ি বেঁধে দিতে লাগল।

দরজার দু'টো তালা বন্ধ করে দিয়ে রক্ষীরা চলে গেল।

সময় কাটতে লাগল। ফ্রান্সিসের মাথায় চিন্তা। যখন জল খাচ্ছিল তখনই মনে পড়ছিল--মারিয়া আর বন্ধুদের তৃষ্ণার্ত মুখের কথা। তৃষ্ণার্ত হওয়া সত্ত্বেও ও সামান্য জল খেল।

পাশে আধশোয়া হ্যারি বলল—কী করবে ফ্রান্সিস?

--রাত নামার জন্যে অপেক্ষা করছি। ফ্রান্সিস বলল।

--রাতে তো পাহারাদার সৈন্যদের সংখ্যা বাড়ে। হ্যারি বলল।

--দেখি সন্ধ্যের পরে ক'জন থাকে। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরে সকালের খাওয়ার মতই ফ্রান্সিসরা একে একে খোলা হাতে খেল। বড় আকারের রুটি আর আলু আর কীসব সবজি মেশানো পাখির মাংস। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বেশ আশ্চর্যই হল—সুস্বাদু রুটি। কেক এর মত স্বাদ। ঝোলও তাই। মাংসর পরিমানও বেশি। খেতে খেতে ফ্রান্সিস মৃদু হাসল—ক্রীতদাস কেনাবেচার হাটে বিক্রি করতে গেলে সুস্থ আর বলশালী মানুষদের দাম বেশি পাওয়া যাবে। তাই এত সুখাদ্যের আয়োজন।

সন্ধ্যের আগেই আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল। সূর্যাস্তের আগেই অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। কেমন একটা ঠান্ডা হাওয়া সমুদ্রের দিক থেকে ছুটে এল। ফ্রান্সিস লোহার খুঁটিটায় শরীরের ভর রেখে কীভাবে অক্ষত অবস্থায় পালানো যায় তাই চোখ বুঁজে ভাবছিল। সমুদ্রের দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া এসে গায়ে লাগতেই ওর তন্দ্রা ছুটে গেল। বিদ্যুতের ঝলকে চোখ ঝলসানো আলোয় ও চমকে উঠল। আকাশের দিকে তাকাল। দেখল পশ্চিম আকাশ থেকে মেঘ উঠে আসছে। অল্পক্ষণের মধ্যে চারদিক ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। তারপরই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। পরক্ষণেই তুমুল বৃষ্টি শুরু হল। ফ্রান্সিস খুশিতে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল--হ্যারি--এই বৃষ্টি যীশুর আশীর্বাদ। হ্যারি ঠিক বুঝল না। বলল--একথা বলছো কেন?

--ভেবে দেখো—এই বৃষ্টি আমাদের জাহাজের ওপরও পড়ছে। সমুদ্রে বৃষ্টির জল ধ'রে রাখাটা নতুন কিছু নয়। বিস্কো ওরা নিশ্চয়ই এই জল ধরে রাখবে। তাতে সকলের সবটা জলের তেষ্টা মিটবে না। কিন্তু অন্তত কালকের দিনটা তো চালাতে পারবে। হ্যারি বলল—সত্যি একথাটা আমি ভাবিনি তো।

—এবার পালানো। ফ্রান্সিস বলল।

অন্ধকার আকাশে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সেইসঙ্গে বাজপড়ার প্রচন্ড শব্দ। লোহার জালঘেরা সেই বন্দীশালার ওপর তো কোন ছাউনি নেই। ফ্রান্সিসরা ও অন্য বন্দীরা প্রবল বৃষ্টিধারায় ভিজতে লাগল। বৃষ্টিতে এরকম জানোয়ারের মত ভিজতে ভিজতেও কিন্তু ফ্রান্সিসের মন আনন্দে ভরে উঠল। একেবারে স্নান করার মত ভিজে গেছে। ভিজতে ভিজতে এখন শীত করতে লাগল। তবু মনে আনন্দ--মারিয়া আর বন্ধুদের জল খাওয়ার সমস্যা তো আপাতত মিটলো।

বেশ কিছুক্ষণ বৃষ্টি চলল। তারপর আস্তে আস্তে থেমে গেল। পায়ে লালচে মাটি কাদার তাল হয়ে গেল। সেই কাদার মধ্যেই অনেকে গা এলিয়ে দিয়েছে। বাকিরা বসে আছে। মুখে লালচে কাদার ছিটে। গায়ে পায়ে কাদা লেপ্টে আছে। জন্তু জানোয়ারের মত দশা মানুষগুলোর, জল কাদায় ছপাৎ ছপাৎ শব্দ তুলে কেউ কেউ এদিক ওদিক চলাফেরা করছে। পরিচিতদের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলছে।

এই দৃশ্যের নির্মমতায় ফ্রান্সিস নিজেকে সংযত করতে পারল। গভীর দুঃখে বেদনায় আবার ভীষণ রাগে ওর দু'চোখ ভিজে উঠল। ও মনে মনে স্থির করে ফেলল এই নির্মমতার শোধ ও নেবে। প্রয়োজনে এদের হত্যা করবে। হাতের কাছে পেলে কাউকে রেহাই দেবে না।

রাত হচ্ছে। রাতের খাবার দেবার সময়ই পালাতে হবে--ফ্রান্সিস ভাবল। আস্তে ডাকল শাঙ্কো। শাঙ্কো ওর দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—এগিয়ে এসো। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাঁধের ওপর মাথা রাখল। ফ্রান্সিস বাঁধা দু'হাত শাঙ্কোর পোশাকের ঢোলা গলা দিয়ে ঢোকাল। ছোরাটা তুলে আনল। তারপর দু'থাবায় ছোরাটা ধরে শাঙ্কোর হাত বাঁধা দড়িতে ঘষে ঘষে দড়িটা কেটে ফেলল।

ফ্রান্সিস অপেক্ষা করতে লাগল রাতের খাবার দেবার সময়ের জন্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাতের খাবার দিতে তিনজন পাহারাদার এল। ঢং ঢাং শব্দে লোহার দরজা খুলল। ফ্রান্সিস নজর রাখল পেছনের দিকে। না, কোন সশস্ত্র রক্ষী নেই। লক্ষ্য করল মাঝের পাহারাদারটা বেশ লম্বাচওড়া। বলশালী। বাকি দুটোর সাধারণ শরীর। চাপা গলায় ফ্রান্সিস বলল--আমি মাঝেরটা শাঙ্কো বাঁ দিকেরটা হ্যারি ডানদিকেরটা-একসঙ্গে। গলা চেপে--টুঁ--শব্দটি যেন না করতে পারে। পাহারাদারদের একজনের হাতে জ্বলন্ত মশাল। সে ওটা দরজার একটা লোহার আংটায় বসিয়ে দিল।

ফ্রান্সিসরা তিনটে লোহার দন্ড ধরে রাখার ভান করে রইল। তিন পাহারাদারের মধ্যেরটির হাতে ছিল কাঠের বড় থালাটা। তাতে খাবার। সে উবু হয়ে থালাটা রাখতে যাবে তখনই ফ্রান্সিস বিদ্যুৎবেগে লোকটার থুতনিতে প্রচন্ড জোরে লাথি চালাল। জল কাদা ছিটকোল। লোকটা লাথির জোর মারে চিত হ'য়ে জলকাদার মধ্যে ছিটকে পড়ল যেন। ততক্ষণে শাঙ্কো আর হ্যারিও বাকি দু'জনের গলা চেপে ধরেছে যাতে টুঁ শব্দটিও না করতে পারে। পাহারাদার দু'জনেই ঝটকাচ্ছে গলার চাপ মুক্ত করতে। শাঙ্কো ঠিক চেপে ধরে আছে। কিন্তু হ্যারি তো বরাবরই দুর্বল শরীরের। কোনরকমে চেপে ধরে আছে। বন্দীশালার লোহার দরজার মাথায় মশাল জ্বলছে। তারই আলোয় দেখা গেল ফ্রান্সিস সেই বলশালী লোকটাকে শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে গলা চেপে ধরে আছে। লোকটা দু'হাতে ফ্রান্সিসের দুহাত চেপে গলার চাপ কমাবার চেষ্টা করছে। জলে কাদায় সবারই শরীরে তখন লালচে কাদামাটির আস্তরণ।

ঠিক তখনই তিনজন সশস্ত্র রক্ষী বন্দীশালার কাছে এল। হয়তো রাতে পাহারা দেবে বলে। মশালের আলোয় ফ্রান্সিসদের ঝটাপটি দেখে থমকে দাঁড়াল। তারপরই কোমর থেকে তরোয়াল খুলে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে এল। ফ্রান্সিস এক লাফে উঠে দাঁড়াল। তারপর প্রথমে ছুটে আসা রক্ষীটার দিকে প্রচন্ড বেগে ছুটে গিয়ে রক্ষীটা কিছু বোঝবার আগেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কুঁক করে মুখে শব্দ তুলে ছিট্‌কে গিয়ে জলকাদায় মুখ থুবড়ে পড়ল। ওর হাত থেকে তরোয়ালটা ছিটকে গেল। ফ্রান্সিস এক ঝট্‌কায় জলকাদা থেকে তরোয়ালটা তুলে নিল। তারপরই ঘুরে দাঁড়াল থমকে দাঁড়িয়ে পড়া দু'টির দিকে। মশালের আলোয় ফ্রান্সিসের জলকাদা মাখা রুদ্রমূর্তি দেখে রক্ষী দু'জন ভয় পেল ঠিকই কিন্তু ওরাও তো এরকম তরোয়ালের লড়াই অনেক লড়েছে। দু'জনই একসঙ্গে ফ্রান্সিসের দিকে লাফিয়ে এল। একজন তরোয়াল চালাল ফ্রান্সিসের গলা লক্ষ্য করে। ফ্রান্সিস দ্রুত মাথা নামিয়েই ঐ রক্ষীটার বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল। অন্যটা এগিয়ে আসতেই ফ্রান্সিস প্রচন্ড জোরে ওর তারোয়ালে নিজের তরোয়ালের ঘা মারলো। রক্ষীটির হাত থেকে তরোয়াল ছিট্‌কে গেল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘাড়ে

তরোয়ালের বাঁট দিয়ে ঘা মারল। লোকটা জলকাদার মধ্যে ঝপ শব্দ তুলে পড়ে গেল। জল কাদা ছিটকালো। কাদায় চোখ ঢেকে গেল রক্ষীটির। ওদিকে শাঙ্কো যেটাকে গলা চেপে ধরেছিল সেটার মুখ দিয়ে কোন শব্দই বেরোচ্ছিল না। কিন্তু হ্যারি যেটাকে চেপে ধরেছিল সেটার মুখ দিয়ে তখনও গো গোঁ শব্দ বেরোচ্ছিল। উপায় নেই ফ্রান্সিস ভাবল। এটাকে নিকেশ করতেই হবে। তরোয়াল চালিয়ে করলোও তাই। ফ্রান্সিস দু'তিনপা দ্রুত এগিয়ে শাঙ্কোকে বলল--ছেড়ে দাও। শাঙ্কো রক্ষীটার গলা ছেড়ে দিল। রক্ষীটা তখন মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে। ওর গলায় তরোয়ালের ফলাটা ঠেকিয়ে ফ্রান্সিস বলল--হ্যারি--ওকে বলো তো--টুঁ শব্দটি করলে ওকে মেরে ফেলব। হ্যারি তখন হাঁপাচ্ছে। মুখ নিচু ক'রে লোকটার কানের কাছে হ্যারি লো ল্যাতিন ভাষায় বলল—একেবারে শব্দ করবে না। শব্দ করলেই তোমাকে মেরে ফেলা হবে। রক্ষীটি হ্যারির কথা বুঝল। ফ্রান্সিস তরোয়াল নাচিয়ে ওকে উঠে বসতে বলল। রক্ষীটি উঠে বসল। ফ্রান্সিস আবার তরোয়াল নাচিয়ে উঠে দাঁড়াতে বলল। রক্ষীটি হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল। ওর পিঠে তরোয়াল ঠেকিয়ে ফ্রান্সিস বলল--শাঙ্কো--সব বন্দীদের দড়ি কেটে দাও। তাড়াতাড়ি। ফ্রান্সিস তরোয়ালের বাঁট দিয়ে রক্ষীটার মাথায় আঘাত করতে রক্ষীটা অজ্ঞান হয়ে গেল।

ওদিকে অন্য বন্দীরা সবাই লোহার ডান্ডায় ভর রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসদের কান্ড দেখছিল। শাঙ্কো ছুটে গিয়ে একে একে বন্দীদের হাত বাঁধা দড়ি কেটে দিতে লাগল। বন্দীরা ছাড়া পেয়ে জলকাদা ভেঙে খোলা লোহার দরজা দিয়ে মুহূর্তে উধাও।

ফ্রান্সিসরাও ছুটে বাইরের অন্ধকারে এসে পড়ল। এবার চিন্তা কোথায় পিপেসুদ্ধু নৌকো তিনটি বেঁধে রেখে এসেছিল। আকাশে তখনও বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছিল। বিদ্যুতের আলোয় দেখল ওরা পাথরের লম্বাটে ঘরটার কোনার দিকে এসেছো আর তখনই বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছিল। বিদ্যুতের আলোয় দেখল ওরা পাথরের লম্বাটে ঘরটার কোনের দিকে এসেছে। আর তখনই দেখল লম্বাটে ঘরটা থেকে কে যেন বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা দ্রুত গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল। লোকটা কাছাকাছি এসেছে তখন। ইগনোতি। বন্দীশালার দিকেই যাচ্ছে। ফ্রান্সিস ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল শাঙ্কো। শাঙ্কো মাটিতে উবু হয়ে বসল। তারপর বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গিয়ে পেছন থেকে হাত দিয়ে ইগনোতির মুখ চেপে ধরে ওর পিঠে ছোরাটা আমূল ঢুকিয়ে দিল। ইগনোতির মুখে শব্দ উঠল—ঘর। শাঙ্কো ইগনোতিকে একটুক্ষণ ধরে রইল। তারপর ছেড়ে দিল। ইগনোতি মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। দু'একবার নড়ল ওর শরীরটা তারপর স্থির হ'য়ে গেল।

ফ্রান্সিস আগে আগে ছুটল। পেছনে হ্যারি আর শাঙ্কো। ফ্রান্সিসের লক্ষ্য সমুদ্রের ধারে যাওয়া। নৌকো থেকে নেমে ওরা বেশিদূর আসে নি। কাজেই বুঝে নিতে অসুবিধে হবে না। অন্ধকারে যতটা দেখে দেখে সম্ভব ওরা দু'টো চড়াই পার হল। তখনই ফ্রান্সিসের গায়ে এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া লাগল। ফ্রান্সিসরা সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়। সমুদ্রের সঙ্গে ওদের নাড়ির যোগ। ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগতেই বুঝল--সমুদ্র কাছেই। বিদ্যুৎ চমকাল। দেখা গেল গাছগাছালি পাতলা হয়ে এসেছে। আর একটা উৎরাইতে উঠতেই কানে এল সমুদ্রের মৃদু গর্জন। ফ্রান্সিস ব'লে উঠল--এসে গেছি।

সমুদ্রের ধারে পৌঁছল ওরা। অন্ধকারে চারদিকে নজর চালাল। তখনই বিদ্যুৎ চমকাল। দেখা গেল ডানদিকে হাত পঞ্চাশেক দূরে ওদের নৌকো তিনটে ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। হঠাৎ তীরভূমির দিকে শোনা গেল রক্ষীদের চিৎকার ক'রে ডাকাডাকি হৈহল্লা ঝোপঝাড় ভাঙার শব্দ, ওরা এতক্ষনে জানতে পেরেছে বন্দীরা পালিয়ে গেছে।

আর একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে ফ্রান্সিসরা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে নৌকোগুলোর

দিকে ছুটল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি প্রায় লাফ দিয়ে নৌকোয় উঠে পড়ল। গাছের গোড়ার সঙ্গে বাধা দড়ি তিনটে শাঙ্কো দ্রুত ছোরা দিয়ে কেটে ফেলল। সেই দড়ি তিনটে নৌকোর সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেঁধে ফেলল এবং লাফিয়ে নৌকোয় উঠল। অন্ধকারে দূরে ওদের জাহাজটা আবছা ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে। দাঁড় তুলে নিল ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো। নৌকো চালাল ওদের জাহাজ লক্ষ্য করে। ততক্ষণে সমুদ্রতীরে পৌঁছে গেছে রক্ষীর দল। হৈহল্লা করছে। কিন্তু ওখানে ওদের কোন নৌকো বাঁধা নেই।

অন্ধকার সমুদ্রের ওপর দিয়ে নৌকোগুলো চলল জাহাজের দিকে। আকাশে এখনও থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

অন্ধকার সমুদ্রের ওপর দিয়ে নৌকোগুলো চলল জাহাজের দিকে। আকাশে এখনও থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

জাহাজের ডেকএ মারিয়া ঠায় দাঁড়িয়েছিল। বিস্কোরাও কয়েকজন ছিল। ফ্রান্সিসদের নৌকোগুলো অস্পষ্ট দেখল ওরা। চিৎকার ক'রে উঠল—ও--হো—হো।

আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসদের নৌকোগুলো এসে জাহাজের গায়ে লাগল। দড়ির সিঁড়ি ফেলা হল। ওরা একে একে জাহাজের ডেকএ উঠে এল। মারিয়া ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে এল। বলল--জল এনেছো? ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। ফ্রান্সিসদের জলকাদামাখা চেহারা দেখেই মারিয়া বিস্কোরা বুঝেছিল--কিছু একটা হয়েছে। ফ্রান্সিস এবার বিস্কোর দিকে তাকাল। বলল--বিস্কো বৃষ্টির জল কিছু জমাতে পেরেছো? বিস্কো বলল--সে আর বলতে। সবাই মিলে প্রায় আধ পিপে জমিয়েছি। জাহাজ ছাড়ো। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা যাবে না।—তাহ'লে আর দেরি না। —এই জলটুকু থাকতে থাকতে জলসংগ্রহ করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। কয়েকজন ভাইকিং ছুটে গেল নোঙর তুলতে জাহাজে পাল খাটাতে। ওদিকে হ্যারি তখন বন্ধুদের সব ঘটনা বলছে। দোনিয়া তখনই ডেকএ উঠে এল। হ্যারির কথাবার্তা শুনেই বুঝল—ওরা জল পায় নি। ফ্রান্সিস এবার দোনিয়াকে জিজ্ঞেস করল--আপনি তো এই এলাকা মোটামুটি চেনেন। জল কোথায় পাবো বলতে পারেন?—দেখুন—কাছাকাছি একটা ছোট্ট বন্দরমত আছে। ওখানে একটা কুয়ো আছে। অনেক জাহাজই ওখানে থেমে প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করে নেয়। কিন্তু সেটা এখনও কতদূর আমি সঠিক বলতে পারবো না। তবে সমুদ্রের তীরের ধারে ধারে জাহাজ দক্ষিণমুখে চালালে ছোট্ট বন্দরটা পাওয়া যাবে।

ফ্রান্সিস জাহাজচালক ফ্লাইজারের কাছে গেল। দোনিয়ার কথাবার্তা বলল। ফ্লাইজার মাথা ওঠানামা করল। তার মানে ও নির্দেশটা বুঝল। তীরভূমির যতটা সম্ভব কাছাকাছি দূরত্ব রেখে জাহাজ চালাতে লাগল।

ফিরে এসে দোনিয়াকে বলল—ঐ ছোট্ট বন্দরটার কোন নিশানা দিতে পারেন।

--হ্যাঁ।--সমুদ্র থেকেই একটা ডাঙা নুরাঘির মাথা দেখা যায়। ওটার রঙ কালো। দোনিয়া ও ফ্রান্সিসের পাশেই দাঁড়িয়েছিল নজরদার পেড্রো। কথাটা শুনে পেড্রো দড়িদড়া ধ'রে ধ'রে মাস্তুল বেয়ে নিজের জায়গায় উঠে গেল।

হ্যারি শাঙ্কো ততক্ষনে স্নান করে গায়ের মুখের শুকিয়ে আসা কাদা ধুতে গেল। ফ্রান্সিসও চলে গেল স্নান করে গায়ের কাদা ধুতে।

জাহাজ চলল। তখন আকাশের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পরেই পুব-আকাশে লাল আলো ছড়িয়ে সূর্য উঠল।

সূর্য তখন মাথার ওপর উঠে এসেছে। তখনও ডাঙা নুরাঘিটা নজরদার পেড্রোর চোখে পড়ল না।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই দেখা গেল ধরে রাখা বৃষ্টির জল প্রায় শেষ। ফ্রান্সিসের নির্দেশে দুপুরের খাওয়ার সময় জল খুব হিসেব করে খেল সবাই। অনেক অনুমান করা সত্ত্বেও মারিয়া কিন্তু এক ফোঁটা জলও খেল না। ফ্রান্সিস শুনল সেটা। কিন্তু কিছু বলল না।

জাহাজ চলেছে। পেড্রো নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ডাঙা নুরাঘির মাথার দেখা নেই।

সারারাত জাহাজ চলল। ফ্রান্সিস প্রায় সারারাত না ঘুমিয়ে কাটাল। মারিয়ারও এক অবস্থা। কেউ কোন কথা বলল না। ভাইকিং বন্ধুরা জলতৃষ্ণা নিয়েও কেউ ঘুমোল কেউ ঘুমোল না।

ভোর হল। বৃষ্টির ধরে রাখা জল কতটা আছে তা দেখবার জন্যে ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠতে যাবে তখনই হ্যারি ঢুকল। বলল--ফ্রান্সিস কী করবে?

--জল শেষ--এই তো। ফ্রান্সিস বলল--

--খুব সামান্য তলানি আছে। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস মাথা নিচু ক'রে কিছুক্ষণ ভাবল। মাথা তুলে বলল--বন্ধুদের মধ্যে যারা একটু দুর্বল--যারা জলতৃষ্ণা সহ্য করতে পারবে না একমাত্র তারাই অল্প জল খেতে পাবে। আর কেউ জল খাবে না। সবাইকে বলে দাও।

--কিন্তু--ক'ার জলের খুবই প্রয়োজন--মানে অসুখে মৃতপ্রায় হলে যেমন হয়--সেটা বুঝবে কী করে? হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল--বৈদ্যি ভেনকে ডাকো তো।

হ্যারি কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মারিয়া বলে উঠল--জল সংগ্রহ করা না পর্যন্ত আমি একফোঁটা জলও খাবো না।

--ধরো দিন সাতেকের আগে জল পাওয়া গেল না। সেই সাতদিন পারবে জল না খেয়ে থাকতে? ফ্রান্সিস বলল।

--নিশ্চয়ই পারবো। মারিয়া গলায় বেশ জোর দিয়ে বলল।

তখনই ভেন কেবিনঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল--ভেন--তুমি তো সব শুনেছো। ভেনই ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে বয়স্ক। চুলে দাড়িতে পাক ধরেছে। সে মাথা ওঠানামা করল। অর্থাৎ সবই জানে সে।

--ভেন--ফ্রান্সিস বলল-শুধু তুমিই যাকে জল খাওয়াতে বলবে তাকেই এই সামান্য জল থেকে জল খেতে দেওয়া হবে। কারন তুমিই ঠিক বুঝবে কাকে জল খাওয়ানো প্রয়োজন।

ভেন কোন কথা বলল না। শুধু আবার মাথা ওঠানামা করল। বুঝল--বড় কঠিন দায়িত্ব চাপলো ওর ওপর।

সকালের খাওয়া দাওয়া শেষ হল। কমবেশি তৃষ্ণার্ত সকলেই। তবু কেউ জল খেল না।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার সময় বোঝা গেল জল না খেয়ে থাকার প্রতিক্রিয়া কী? বেশ কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়ল। এই অঞ্চলে রোদের তাপ প্রখর নয়। তবু দিনের গরম তো। জলের তৃষ্ণা তো হবেই আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা তো বাড়বেই। কিন্তু সহ্য করার ক্ষমতা তো সবার সমান নয়। ভেন অসুস্থদের চোখ জিভ পরীক্ষা করছে। তখনই ফ্রান্সিস এল। বলল--ভেন--অন্য কোনভাবে জলতেষ্টা সামান্য হলেও মেটানো সম্ভব? ভেন মাথা নাড়ল। তারপর বিস্কোর দিকে তাকাল। বিস্কোর হাতে কাঠের লম্বা চোঙমত। তা'তেই বৃষ্টির শেষ জলটুকু রাখা হয়েছে। ভেন এর নির্দেশে কয়েকজনকে

পরে জল খাওয়ানো হল।

বিকেল থেকেই আরো অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ল। কেবিনঘরে ডেকএর এখানে ওখানে তারা শুয়ে পড়ে রইল। মারিয়া হ্যারি শাঙ্কোও শুয়ে পড়ে রইল। শুধু ফ্রান্সিস ডেকএর ওপর চুপ করে বসে রইল। মাঝে মাঝেই তাকাতে লাগল আকাশের দিকে-যদি মেঘের দেখা পাওয়া যায়। বিস্কো ভেনএর নির্দেশমত অসুস্থদের এক ফোঁটা দুফোঁটা করে জল খাইয়ে দিতে লাগল।

নজরদার পেড্রোকে ডাকবার জন্যে ভেন বিস্কোকে বলল। বিস্কো মাস্তুলের মাথার দিকে তাকিয়ে ডাকল--পেড্রো নেমে এসো। গলা চড়িয়েই ডাকতে গেল কিন্তু বিস্কোর গলা দিয়ে জোরে শব্দ বেরুলো না। গলা শুকিয়ে কাঠ। বিস্কো হাতে ধরা জলের চোঙটা ভেনএর হাতে দিয়ে বেশ কষ্ট করে দড়ির মই বেয়ে বেয়ে বেশ কিছুটা আস্তে আস্তে উঠল। বেশি তাড়াতাড়ি করতে গেলে পরিশ্রম হবে। জলের তেষ্টা বেড়ে যাবে। ওখান থেকেই ভাঙা গলায় ডাকল--পেড্রো। পেড্রো শুনল ডাকটা। নিচের দিকে তাকাল। দেখল ডেকএর ওপর অনেক বন্ধু চুপচাপ শুয়ে আছে। ভাগ্যি ভালো রোদের তেজ কম—বাতাসও জোরে বইছে। তাই জলতৃষ্ণা কাতর ভাইকিংরা ডেকএ শুয়ে একটু স্বস্তি পাচ্ছে।

পেড্রো এবার উঠল। আস্তে আস্তে দড়ির মই দড়ি ধরে নামতে লাগল। বিস্কো ও নেমে এল। পেড্রো ডেকএ এসে দাঁড়াল। ভেন ওকে মুখ হাঁ করতে ইঙ্গিত করল। পেড্রো মুখ হাঁ করল। ভেন কিছুটা বেশিই জল ওর মুখে ঢেলে দিল। পেড্রো জল খেয়ে আবার চলল নিজের জায়গায়। মাস্তুলের মাথায়।

সূর্য অস্ত গেল। হালকা অন্ধকার নেমে এল। একটু পরেই পূব দিগন্তে চাঁদ উঠল। চাঁদের আলো ছড়ালো সমুদ্রের জলে। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল না হলেও সমুদ্রের তীরের গাছপালা টিলা এসব দেখা যাচ্ছিল।

পেড্রো সমানে তাকিয়ে আছে সেইদিকে। যেন চোখে পলক পড়ছে না। দোনিয়া বলেছিল—একটা কালো, রঙের ভাঙা নুরাঘির মাথা দেখা যাবে। ওখানেই ছোট্ট বন্দরমত। কুয়োর জল পাওয়া যাবে ওখানে।

হঠাৎই পেড্রো চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দেখল—কয়েকটা গাছের মাথা ছাড়িয়ে কালো উঁচু গোল দেয়ালমত। পেড্রো তখনও দমবন্ধ করে তাকিয়ে আছে। জাহাজ আরো এগিয়ে যেতেই পেড্রো দেখল ভাঙা নুরাঘিটা। ও চিৎকার করে উঠল—ভাঙা নুরাঘি--ভাঙা নুরাঘি--। গলায় সেই জোর নেই। তবু কথা তো বেরিয়ে এল গলা থেকে। অস্পষ্ট হলেও ফ্রান্সিসের কানে গেল কথাটা। ও বেশ দুর্বল শরীর নিয়েও দ্রুত উঠে দাঁড়াল। বোধহয় একা ফ্রান্সিসই বারবার মেঘ দেখার আশায় আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল আর কান খাড়া রাখছিল যদি পেড্রো কিছু বলে।

ফ্রান্সিস যতটা সম্ভব দ্রুত রেলিঙের দিকে ছুটল। রেলিঙে ভর দিয়ে তীরভূমির দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট দেখল নুরাঘির ভাঙা মাথা। পেড্রো তখনও একনাগাড়ে ভাঙা গলায় ব'লে চলেছে—নুরাঘি—ভাঙা নুরাঘি। ডেকএ শুয়ে থাকা ভাইকিংরা ততক্ষণে অনেকেই উঠে পড়েছে। তারাও রেলিঙের ধারে এসে ভীড় করে দাঁড়াল। শাঙ্কোও উঠে এল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে দেখে বলল—শিগগির দোনিয়াকে ডাকো। জলদি।

একটু পরেই শাঙ্কো দোনিয়াকে নিয়ে ডেকএ উঠে এল। দোনিয়া ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস আঙুল তুলে ভাঙা নুরাঘিটা দেখাল। দোনিয়া একটুক্ষণ চেনে নিয়ে—হ্যাঁ--ওটার সামনেই একটা ছোট্ট জাহাজঘাটা মত আছে।

জাহাজ চলল। ভাঙা নুরাঘিটার কাছাকাছি আসতেই এবার চাঁদের আলোয় অনেকটা

স্পষ্ট দেখা গেল--ঘাটে একটা মালবাহী জাহাজ নোঙর করা আছে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজটা আস্তে আস্তে জাহাজঘাটায় ভিড়ল। একটা সুবিধে হল যে নৌকোয় চড়ে গিয়ে পিপেয় ভরে জল আনতে হবে না।

জাহাজঘাটার খুব কাছেই আনা গেল ফ্রান্সিসদের জাহাজটাকে। কাঠের পাটাতন ফেলা হল। জলের জায়গায় আসা গেছে এই কথাটা এর মধ্যেই সব ভাইকিংদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। মারিয়াও পেল খবরটা। বেশ দুর্বল শরীর নিয়েও মারিয়া ডেকএ উঠে এল।

এবার কারা জল আনতে যাবে তাই নিয়ে ফ্রান্সিসকে ভাবতে হল। হ্যারিকে নেওয়া যাবে না। হ্যারি তো বরাবরই দুর্বল। তারপরও জল নিতে না পেরে আরো কাহিল হয়ে পড়েছে। বিস্কোর দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল— তুমি শাঙ্কো আরও কয়েকজন সুস্থ সঙ্গী নাও আর জলের চারটে পিপেই নিয়ে এসো। যতটা সম্ভব জল নেব। আমি দোনিয়াকে নিয়ে জলের খোঁজে যাচ্ছি। তোমরা পেছনে পেছনে এসো।

পাটাতনে হেঁটে গিয়ে কিছুটা জলকাদা পার হয়ে দু'জনে উঁচু পারে উঠল। দু'ধারে এদিক ওদিক কিছু পাথরের বাড়িঘর। চাঁদের আলোয় পাথর ছড়িয়ে থাকা ধুলোটে পথ দিয়ে দু'জনে চলল। একটু এগোতেই কিছু গাছগাছালির পরেই একটা টিলার মত। তার নিচেই ছড়ানো বড় পাথর। দোনিয়াই এতক্ষণ আগে আগে যাচ্ছিল। দোনিয়া সেই কাঠের লম্বা চোঙটা নিয়ে এসেছিল। কারণ ও জানতো জল তোলার জন্যে এটা লাগবে।

দোনিয়া দু'টো চ্যাপ্টা পাথর খণ্ডের ওপর দু'পা রেখে নিচু হল। ফ্রান্সিস দেখল পাথর খণ্ড দু'টোতে মাঝখানটায় গর্ত। চাঁদের আলোয় বোঝা গেল না কতটা গভীর। দোনিয়া কাঠের চোঙটা নামাল। ছলাৎ-- জলের শব্দ উঠল। দোনিয়া কাঠের চোঙ ভরে জল তুলল। ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে ধরে বলল-- খান। গত প্রায় দিন তিনেকের মধ্যে ফ্রান্সিস খুব সামান্য জলই খেয়েছে। সেই তৃষ্ণার জল সামনে। তবু ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল— না। আপনি খান। দোনিয়াও তৃষ্ণাকাতর মুখে ম্লান হাসল। বলল— যে কারণে আপনি জল খেতে চাইছেন না একই কারণে আমিও খাবো না। তবে জল দিয়ে চোখ মুখটা ধুয়ে নিন। এটা করা খুবই প্রয়োজন। ফ্রান্সিস আপত্তি করল না। দু'জনেই ঐ জলে হাতমুখ চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিল। আঃ কী ঠাণ্ডা জল। কী শান্তি।

তখনই পিপে নিয়ে ক্লান্ত পায়ে শাঙ্কোরা এল। ওরা একটু দূর থেকে ফ্রান্সিস আর দোনিয়ার মুখ ধোয়া দেখল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ক'রে উঠল— ও— হো— হো কিন্তু সকলের গলাই তো শুকিয়ে কাঠ। তেমন জোরালো শব্দ গলা দিয়ে বেরুলো না।

ওরা এবার প্রায় ছুটে এল পিপেগুলো নিয়ে। একজন ভাইকিং বন্ধু দোনিয়ার হাত থেকে কাঠের চোঙটা প্রায় টেনে নিল। ফ্রান্সিস বাধা দিতে গিয়েও দিল না। ওখান থেকে সরে দাঁড়াল। শাঙ্কো দেখল সেটা। ভাবল ফ্রান্সিস এখন মানা করছে না তখন জল না খেয়ে উপায় কি। ওদিকে বন্ধুরা সব জল তুলে তুলে খেতে শুরু করছে। তখন ওদের আনন্দ দেখে কে। জল খাওয়া মাথায় দিয়ে ঢালা হৈ চৈ চলল। শাঙ্কোও প্রায় এক চোঙ জল খেয়ে ফেলল চোঁ চোঁ করে।

এতক্ষণে ফ্রান্সিস বলল- এবার পিপেগুলো ভরে ফেল। জাহাজে যে তৃষ্ণার্ত বন্ধুরা রয়েছে তাদের ভুলে যেও না। ভাইকিংদের হৈ হল্লা এবার বন্ধ হ'ল। পিপে এনে এনে জল ভরতে লাগল। যখন সবগুলো পিপেয় জল ভরা শেষ হল তখন সবাই হাত লাগাল। ধরাধরি করে চাঁদের আলোয় পথ দেখে দেখে চলল জাহাজের দিকে। সবার পেছনে ফ্রান্সিস আর দোনিয়া।

পাতা পাটাতন দিয়ে পিপেগুলো ধরে ধরে নিয়ে সবাই জাহাজের ডেক-এ উঠল। শাঙ্কো এতক্ষণে একটু গলা চড়িয়ে বলতে পারল— সবাই এসো— জল এনেছি। তৃষ্ণায় কাতর বন্ধুরা ছুটে এল। কাঠের চোঙে জল ভরে শাঙ্কো সবাইকে জল খাওয়াতে লাগল। আনন্দের হৈ হল্লা শুরু হল। সেই শব্দ কেবিন ঘরে গিয়েও পৌঁছল। মারিয়া আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে চলল ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে। হ্যারি তার আগেই উঠে এসেছে।

ফ্রান্সিস আর দোনিয়া একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। হ্যারি আর বিস্কো এসে ওদের কাছে দাঁড়াল। মারিয়া তখনই এল।

ভাইকিং বন্ধুরা কাঠের চোঙটায় জল ভরে মারিয়ার কাছে এল। মারিয়া ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস হেসে বলল— আমরাও খাচ্ছি তুমি খাও। মারিয়া চোঙটা থেকে আস্তে আস্তে খেতে লাগল। শুকনো গলা দিয়ে জল যেন নামতে চায় না। খুব বেশি জল মারিয়া প্রথমেই খেতে পারল না। এবার ফ্রান্সিস দোনিয়া আর বিস্কো জল খেল। মারিয়া আবার জল খেল। অল্প জল হাতে নিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে নিল। ততক্ষণে ভাইকিংদের আনন্দে হৈ হল্লা থেমে গেছে।

এবার জলের পিপেগুলো বেশ কয়েকজন ধরে ধরে নিয়ে চলল রান্না ঘরের পাশে রেখে দেওয়ার জন্যে।

রাতের খাওয়া শেষ হতেই ঘর্ ঘর্ শব্দে নোঙর তোলা হল। পাটাতন তুলে ফেলা হল। নোঙরের দড়ি আলগা হতেই জাহাজ তীরভূমি থেকে সরে আসতে লাগল। দোনিয়াকে নিয়ে ফ্রান্সিস জাহাজ চালক ফ্লাইজারের কাছে এল। দোনিয়ার নির্দেশমত ফ্লাইজার জাহাজ চালাতে লাগল সরাসরি বন্দরের উদ্দেশ্যে।

জোর বাতাসে জাহাজের পালগুলো ফুলে উঠল। সমুদ্রে উঁচু ঢেউ উঠছে না। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় চাঁদের আলো চিক্ চিক্ করছে। ভাইকিং বন্ধুরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে গেল। দাঁড় টানার আর দরকার নেই। তৃষ্ণার জল পেয়ে এখন সবাই মোটামুটি সুস্থ। তার ওপর দাঁড় টানার পরিশ্রম থেকেও মুক্তি পেয়েছে।

জাহাজ চলল। পথে ঝড়বৃষ্টির পাল্লায় পড়তে হয় নি। শুধু এক সকালে ঘন কুয়াশায় দিগ্‌ভ্রম হবার উপক্রম হয়েছিল। দোনিয়া দিক ঠিক করে জাহাজ চালক ফ্লাইজারকে জাহাজ চালাবার নির্দেশ দিয়েছিল।

দু'দিন পরেই ফ্রান্সিসদের জাহাজ সার্দিনিয়া দ্বীপের কাছে এল। সমুদ্রতীরের কাছ দিয়ে জাহাজ চলতে লাগল।

পরদিন বিকেলের দিকে দূর থেকে সাসারি বন্দর দেখা গেল। দু'টো মালবাহী জাহাজ নোঙর করা ছিল। রাজা এনজিওর শৌখিন জাহাজটার কাছে ফ্রান্সিসদের জাহাজ ভিড়ল। নোঙর করা হল।

ফ্রান্সিস আর দেরি করতে চাইছিল না। অনেক কষ্টে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া গেছে। এই সূত্রের ওপর নির্ভর করেই সোনার যোদ্ধামূর্তিগুলো উদ্ধার করতে হবে।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল— দোনিয়া আর শাঙ্কোকে খবর দাও। আমরা এখুনি নুরাঘির ঘরটায় যাবো। রাতে থাকবো। কাল সকাল থেকেই অনুসন্ধান চালাবো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'টো নৌকোয় চড়ে ফ্রান্সিসরা নুরাঘিটায় এল। ফ্রান্সিস নিজেদের ঘরে ঢুকেই বিছানায় শুয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস নিজেদের ঘরে ঢুকেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। মাথার পেছনে দু'হাত রেখে চোখ বুঁজে রইল। হ্যারি দক্ষিণের জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অস্তগামী সূর্যের আলো

পাড়েছে খাঁড়ির জলে। ছোট ছোট ঢেউ-তোলা জল কেমন লালচে হ'য়ে উঠেছে। এতক্ষণ কেউ কোন কথা বলে নি। দোনিয়া চুপ ক'রে বসেছিল। ভাবছিল ফ্রান্সিস একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পেয়েছে। কিন্তু ঐ সূত্রের ওপর নির্ভর ক'রে কি যোদ্ধামূর্তিগুলো উদ্ধার করা যাবে? দোনিয়ার মনের কথা যেন ফ্রান্সিস বুঝতে পারল। বলল - দোনিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ ভাঙা নুরাঘিটার হাত তিরিশেক দূরে নৌকোটা ডুবেছিল। কাজেই ঐ জায়গাটাকে কেন্দ্র করেই আমাদের তল্লাসি চালাতে হবে।

-- কিন্তু সেই এলাকাটাও নেহাৎ ছোট নয়। দোরিয়া বলল।

-- ঠিক। আস্তে আস্তে ঠিক জায়গাটার হদিশ পাবো। ফ্রান্সিস বলল। ওদের কথাবার্তা শুনে হ্যারি এসে বিছানায় বসল। বলল - আচ্ছা দোনিয়া - ঐ নুরাঘিটায় ধ্বস নেমেছিল কবে?

সঠিক সময়টা আমি কোথাও পাইনি। তবে অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্য থেকে হিসেব করে একটা আন্দাজ করা যায়। দোনিয়া বলল।

আন্দাজ ক'রেই বলুন না। ফ্রান্সিস বলল।

-- মানে-ঐ নুরাঘির ধ্বস নামার ব্যাপারটা নৌকোডুবিটার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে এটা আমি কোনদিন ভাবি নি। দোনিয়া বলল।

— এবার তো ভাবতেই হবে। হ্যারি বলল।

দোনিয়া আর কোন কথা না ব'লে চুপ ক'রে মাথা একটু ঝুঁকিয়ে বোধহয় হিসেবটা করতে লাগল। ফ্রান্সিস হ্যারিও চুপ ক'রে রইল।

সন্ধ্যে হল। ঘরটা অন্ধকার হ'য়ে গেল। একজন সৈন্য এসে দেয়ালের পাথরের খাঁজে বসানো মশালটা জ্বেলে দিয়ে গেল।

একসময় দোনিয়া বলল - যতদূর হিসেবে পাচ্ছি তা'তে ঐ নুরাঘির ধ্বস নেমেছিল মুজাহিদ যুদ্ধে হেরে পালিয়ে যাবার পরে।

-- কতদিন পরে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

— তা'তো সঠিক বলতে পারবো না। দোনিয়া মাথা নেড়ে বলল। হ্যারি বলল ফ্রান্সিস তোমার কি মনে হয় মুবারক যোদ্ধামূর্তি উদ্ধার করতে এসেছিল? ফ্রান্সিস গলায় বেশ জোর দিয়ে বলল - নিশ্চয়ই এসেছিল। তারপর বলল - আমার মনে হয় মুবারক বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে নি। মুবারক একাই এসেছিল আর দিনে নয় রাতে সন্ধান চালিয়েছিল।

-- রাতে কেন। দোনিয়া বলল।

-- দিনে সন্ধানের কাজ চালাতে গেলে সহজেই এখানকার লোকেদের চোখে বিশেষ ক'রে সমুদ্রে যারা মাছ ধরে সেই জেলেদের নজরে পড়ে যেত। তাছাড়া ভুলে যাবেন না - মুবারক বিদেশী ছিল। আরবি ছিল ওর মাতৃভাষা। হ্যারি বলল।

-- হুঁ - কথাটা ঠিক। দোনিয়া যেন আপনমনে বলল। কেউ আর কোন কথা বলল না।

রাতের খাওয়াদাওয়ার তখনও কিছু দেরি আছে। সেনাপতি ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকল। দোনিয়াকে বলল মহামান্য রাজা আপনাদের কাল সকালে দেখা করতে বলেছেন। দোনিয়া মাথা কাত ক'রে বলল, - বেশ। - যাবো। এবার চলে যেতে গিয়েও সেনাপতি ঘুরে দাঁড়াল। বলল আর একটা কথা। শুনলাম, আপনারা আজকে ঐ ধ্বসে পড়া নুরাঘিটায় নাকি উঠেছিলেন।

-- হ্যাঁ। - খোঁজ করতে উঠেছিলাম। হ্যারি বলল। — ভালো করেন নি,

সেনাপতি বলল। - মহামান্য রাজার জাহাজ থেকে আমাদের সৈন্যরা দেখেছে এখানকার জেলেরাও দেখেছে। এখনও ঐ নুরাঘির মাথা থেকে ধ্বস নামে। আপনারা বিপদে পড়তে পারেন। হ্যারি ফ্রান্সিসকে কথাটা বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস বলল - বলো যে আমরা এখন থেকে সাবধান হবো। তবে নুরাঘিটায় আর তার ধারে কাছে খোঁজ করতেই হবে। হ্যারি বলল সে কথা। সে আপনাদের দায়িত্ব! আমার সাবধান করার ক'রে গেলাম। কথাটা ব'লে সেনাপতি চলে গেল।

পরদিন ফ্রান্সিসদের সকালের খাওয়া শেষ হতে সেনাপতি এল। ওরা সেনাপতির সঙ্গে সাসারির রাজপ্রাসাদের দিকে চলল।

রাজা এনজিও সিংহাসনে বসে আছে। বাঁপাশের আসনে স্পিনোলা বসে আছেন। রাজা এনজিও দোনিয়াকে বললেন যোদ্ধামূর্তিগুলোর কোন হদিশ পেলেন? দোনিয়া বলল - যা বলার ফ্রান্সিস বলবেন। ফ্রান্সিস একটু এগিয়ে বলল - মান্যবর রাজা - আমরা একটু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পেয়েছি। তার ওপর নির্ভর করেই আমরা সন্ধানকার্য চালাবো। -সেই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটা কী? স্পিনোলা কুটিলদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল। ফ্রান্সিস সাবধান হ'ল। বলল সেটা যথাসময় বলবো। তবে সবটাই এখনও অনুমানের পর্যায়ে আছে। কয়েকটা দিন সন্ধান চালিয়ে তবেই সূত্রটার গুরুত্ব যাচাই করতে পারবো। কতদিন লাগবে? আমাকে তো রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে। রাজা এনজিও বলল। - কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক করে উদ্ধার করতে পারবো সেটা বলতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে। চেষ্টা চালিয়ে যান। তবে মহামান্য রাজাকে আমি বলেছি - আপনারা মিছিমিছি খাটাখাটুনি করেছেন। সেই মূল্যবান মূর্তিগুলো মুজাহিদ তার রাজ্যে নিয়ে গিয়েছে। স্পিনোলা বলল। হয়তো আপনার অনুমান সত্য। তবে আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস মূর্তিগুলো এই খাঁড়ির জলের নিচেই আছে। ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ। স্পিনোলা আর কোন কথা বলল না।

আপনারা এবার যেতে পারেন। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করুন। রাজা এনজিও বলল।

- আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। দোনিয়া বলল। সবাই মাথা একটু নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানিয়ে রাজপ্রাসাদের বাইরে চলে এল।

বিস্কো সকালেই মারিয়াকে আনতে চলে গিয়েছিল। ফ্রান্সিসরা নুরাঘির ঘাটে এসে দেখল রাজার নৌকোয় বিস্কো মারিয়া বসে আছে। হ্যারি সেই নৌকোয় উঠল। দোনিয়ার নৌকোয় উঠল ফ্রান্সিস আর মারিয়া। নৌকো চলল। সামনে ফ্রান্সিসদের নৌকো। নৌকো চলল ভাঙা নুরাঘিটার দিকে।

কাছাকাছি যখন নৌকো পৌঁছল তখন অনেকটা চৌকোনো আকারের সেই সুড়ঙ্গটা আঙুল তুলে দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল দোনিয়া - এই গোপন পথটা মুবারক যেভাবেই হোক খুঁজে বের করেছিল। এখানেই মুবারক নৌকোর সঙ্গে নিজেকেও লুকিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তখন এটার মুখে পাথুরে দেয়াল ছিল নিশ্চয়ই। গোপন পথটা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার জন্যে। ধ্বস নামার সময় সেই দেয়ালটা ভেঙে পড়েছিল। লক্ষ্য করুন সুড়ঙ্গের মত মুখটার চারপাশের পাথরগুলো ভাঙা ভাঙা।

বুঝলাম। - কিন্তু নুরাঘিটায় ধস নেমেছিল মুবারক এখানে আসার আগে না পরে? দোনিয়া বলল।

আমার মনে হয় তার আগে। ফ্রান্সিস বলল।

দু'টো নৌকোই সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকল। এখানে অন্ধকার। সুড়ঙ্গপথে যেটুকু সামান্য

আলো আসছে। অন্ধকারটা চোখে স'য়ে আসতে ফ্রান্সিস নৌকো থেকে সেই প্যাচপেচে পেছল কাদাভরা পাথরের সিঁড়িতে পা রাখল। বলল - বিস্কো তুমি আমার পেছনে পেছনে এসো। - কিন্তু সাবধান। ভীষণ পেছল। পা টিপেটিপে এসো। বিস্কোও নামছে তখনই মারিয়া বলল বিস্কো বলেছে - সেনাপতি নাকি এই নুরাঘিতে উঠতে মানা করেছে। অন্ধকার সিঁড়ি থেকে ফ্রান্সিস বলল উপায় নেই। তবে ভয় নেই। আমরা সাবধান থাকবো। অন্ধকার সুড়ঙ্গে ফ্রান্সিসের কথাগুলো বেশ জোরালো শোনালো।

অন্ধকারে ফ্রান্সিস পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। তখনই ভাবল — ভুল হয়েছে। এরপর একটা মশাল আনতে হবে।

পাঁচসাতটা সিঁড়ির পরেই আর জলাকাদা নেই। শুকনো পাথর সিঁড়িতে আগেই পেতেছিল। নিশ্চিন্তে উঠতে লাগল।

চত্বরমত জায়গাটায় আসতেই বা দিকের বিরাট খোঁদল দিয়ে আলো আসছে দেখল। এখানটায় বেশি অন্ধকার নেই।

ফ্রান্সিস সারাক্ষণ কান খাড়া রাখছিল। যদি কোন পাথর পড়ার শব্দ শোনে সাবধান হতে পারবে। চত্বরটার পরে সিঁড়িটায় উঠতে যাবে তখনই ফ্রান্সিসের কানে এল খুব মৃদু পাথর ঘষটানির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ও পাশের পাথুরে দেয়ালে শরীরটা লেপ্টে দাঁড়াল আর গলা চড়িয়ে বলল — বিস্কো, — ধ্বস -- সাবধান। বিস্কোও দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সত্যিই ওপরথেকে বেশ কয়েকটা পাথর ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে সিঁড়ির ওপর দিয়ে ধ্বসে পড়ল ছোট চত্বরটার ওপর। ফ্রান্সিসের গা ঘেঁষেই পাথরের বড় বড় চৌকোনো টুকরোগুলো গড়িয়ে পড়ল। একটা পাথর বিস্কোর পায়ের পাতায় প্রায় গড়িয়ে পড়েছিল। বিস্কো দ্রুত পা সরিয়ে নিল। ধুলোবালি উড়ল।

ধ্বস থামতে ফ্রান্সিস দু'টো পাথর ডিঙিয়ে ছোট চত্বরটায় নামতে যাবে তখনই ঐ অল্প আলোয় দেখল দু'টো পাথরে মধ্যে চৌকোনো মত কী যেন আটকে আছে। ফ্রান্সিস নিচু হ'য়ে দেখেও বুঝল না জিনিসটা কী? ও হাত বাড়িয়ে দু'টো পাথরের জোড় থেকে জিনিসটা টেনে টেনে খুলে আনল। সামান্য আলোয় দেখল চৌকোনো মত কী যেন। তামা বা পেতলের পাতের মত। জিনিসটার ওপর থেকে ধুলোবালি ময়লা হাত দিয়ে মুছে ফেলতেই বুঝল -- পেতল তামা নয় সোনা আর তাতে গোল গোল কাজ করা।

ওদিকে নিচে নৌকো থেকে হ্যারি মারিয়া ধ্বস নামার শব্দ শুনেছিল। ওরা তখন ফ্রান্সিস বিস্কোকে ডাকাডাকি শুরু করেছে। বিস্কো চেঁচিয়ে বলল — ভয় নেই, আমরা নিরাপদ।

সোনার জিনিসটায় কিছু কাজ করা আছে। ফ্রান্সিস দ্রুত ভাবতে লাগল -- সোনার এই জিনিসটা কী হতে পারে। হঠাৎ ওর মনে পড়ল গির্জায় দেখা সেই ব্রোঞ্জের ছোট যোদ্ধামূর্তিটার কথা। মূর্তিটার বাঁ হাতে ঠিক এমনি একটা ঢাল ছিল। তাহলে কি নিখোঁজ একটি যোদ্ধামূর্তির ঢাল এটা? ফ্রান্সিস চমকে উঠল। তাহলে মুবারক কি একটা মূর্তি উদ্ধার করতে পেরেছিল? ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। ঢালটা কোমরে গুঁজে রাখল। দ্রুত সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বলল — বিস্কো — নামবো চলো। দু'জনেই নামতে লাগল। পেছল সিঁড়িগুলো সাবধানে পার হ'য়ে নৌকোয় উঠল দু'জনে।

নৌকো ছেড়ে দিয়ে ফ্রান্সিস বলল -- দোনিয়া — যোদ্ধামূর্তির একটা ভাঙা ঢাল আমি পেয়েছি। দোনিয়া ভীষণ চমকে উঠে বলল -- সত্যি?

ততক্ষণে নৌকো সুড়ঙ্গটার বাইরে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস কোমরে গুঁজে রাখা ভাঙা ঢালটা বের করল। উজ্জ্বল রোদে দেখল -- ওটা ঢালই। দোনিয়া হাত বাড়িয়ে ঢালটা

নিলো। দেখতে দেখতে বলল -- আপনার অনুমান ঠিক। এটা একটা সৈন্যে মূর্তির ভাঙা ঢাল।

তার মানে আস্ত মূর্তিটা তাহ'লে যেখানে ঢালটা পেয়েছি সেখানেই কোথাও পাথরের নিচে চাপা পড়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল। দোনিয়া একটু ভেবে বলল — তার মানে অন্তত একটা মূর্তি মুবারক উদ্ধার করতে পেরেছিল। কিন্তু কোন কারণে সেটা ফেলে রেখে গেছে আর ঐ মূর্তিটা ওখানেই পাওয়া যাবে।

ফ্রান্সিস দোনিয়ার হাত থেকে ঢালটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ভাবল — ঢালটা উঁচুতে তুলে মারিয়া হ্যারি আর বিস্কোকে দেখাবে। দোনিয়া দ্রুত চারদিকে তাকাল। দেখল — খাঁড়ির পুবপারে একটা নৌকো ভাসছে। নৌকোর দু'জন জেলে ফ্রান্সিসের দিকেই তাকিয়ে আছে। দোনিয়া চাপাস্বরে ব'লে উঠল -- ফ্রান্সিস ঢালটা লুকোও। নজরদারি চলছে। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হ'ল। আলগোছে ঢালটা হাত থেকে ছেড়ে দিল। নৌকোর গলুইয়ে পড়ল ওটা। হ্যারি ওদের নৌকো থেকে গলা চড়িয়ে বলল — কী বলছিলে ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে গলা চড়িয়ে বলল -- কিছু না।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে দাঁড় টানতে লাগল। নৌকো দু'টো চলল নুরাঘির ঘাটের দিকে।

সারা নৌকাপথে ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না। ঘাটে নৌকো দুটো এসে লাগল।

। আগেই ফ্রান্সিস সোনার ঢালটা নৌকোর গলুই থেকে তুলে কোমরে গুঁজে নিয়েছিল।

নুরাঘিতে ঢোকার মুখে সদর দেউড়িতে সেনাপতির সঙ্গে দেখা। সেনাপতি দোনিয়াকে বলল হদিশ পেলেন কিছু? — তল্লাসি চালাচ্ছি-- দেখা যাক। দোনিয়া বলল।

একেবারে ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল — হ্যারি -- একটা যোদ্ধামূর্তির ভাঙা ঢাল পেয়েছি। সোনার ঢাল। হ্যারি চমকে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। মারিয়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো বলো কী?

তখনই দু'জন সৈন্য ওদের দুপুরের খাবার নিয়ে ঢুকল। ফ্রান্সিস চোখের ইশারায় হ্যারি আর মারিয়াকে চুপ ক'রে থাকতে বলল।

সবাই বিছানায় ব'সে খেতে লাগল। সবাই চুপ।

খাওয়া শেষ হ'ল। সৈন্য দুজন এঁটো থালা চিনেমাটির বাটি নিয়ে চলে গেল।

এবার ফ্রান্সিস কোমর থেকে ভাঙা ঢালটা নিয়ে মারিয়ার হাতে দিল। মারিয়া খুশিতে আত্মহারা তখন। হ্যারি আর বিস্কো ঝুঁকে পড়ে সোনার ঢালটা দেখতে লাগল।

ফ্রান্সিস এসময় যা করে তাই করল। দু'হাতের তালু মাথার নিচে রেখে শুয়ে পড়ল। দোনিয়াও ওর পাশে আধশোয়া হ'ল। ফ্রান্সিসের মাথায় তখন অনেক চিন্তা। সেই চিন্তার কথাই বলবার জন্যে ডাকল — দোনিয়া।

-- বলুন। দোনিয়া ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল।

দেখুন, -- আমার মনে হয় মুবারক একাই মূর্তিগুলো জলের তলা থেকে উদ্ধার করতে এসেছিল। ফ্রান্সিস বলল। -- আমারও তাই মনে হয়--দোনিয়া বলল -- কিন্তু ক'টা মূর্তি মুবারক উদ্ধার করতে পেরেছিল সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস বলল — আজ থাক। বিকেল হয়ে গেলে খোঁজা যাবে না। কালকে সকালে গিয়েই যে জায়গায় ঢালটা পেয়েছি সেখানে ভালো ক'রে খুঁজতে হবে। মারিয়া হ্যারি নৌকোয় থাকবে। আমরা তীরে উঠে পাথর সরিয়ে খুঁজবো। -- হুঁ -- সাবধানে খুঁজতে হবে। আজকেও তো ধ্বস নেমেছিল। আমরা নিচে থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনেছি। দোনিয়া বলল। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। চোখ বুঁজে শুয়ে রইল।

মারিয়া ঢালটা হ্যারির হাতে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে গির্জাঘরের দিকে চলল। গির্জায় ঢুকে যে কুলুঙ্গিতে ব্রোঞ্জের যে ছোট্ট মূর্তিটা ছিল সেটার কাছে গেল। মূর্তির ঢালটার কারুকাজের সঙ্গে সোনার ঢালটার কারুকাজ মনে মনে মেলাল। বুঝল — হুবহু এক। শুধু সোনার ঢালটা আকারে বড়।

ঘরে ঢুকে বলল, -- ফ্রান্সিস -- ব্রোঞ্জের মূর্তির ঢালের সঙ্গে মিলে গেছে। হুবহু এক। একইরকম কাজ। ফ্রান্সিস চোখ না খুলেই মৃদু হেসে মাথা নাড়ল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়েই নৌকায় চড়ে ফ্রান্সিসরা ভাঙা নুরাঘির দিকে চলল। অন্ধকারমত সুড়ঙ্গটায় ঢুকল। নৌকো ভেড়াল পাথরের সিঁড়ির ধারে।

ফ্রান্সিস বিস্কো আর দোনিয়া পেছল সিঁড়িতে নামল। ফ্রান্সিসের নির্দেশমত বিস্কো আগেই একটা মশাল এনে নৌকোয় রেখেছিল। কোমরে গুঁজে এনেছিল লোহার টুকরো আর চকমকি পাথর। বিস্কো মশালটা তুলে ফ্রান্সিসকে দিল। তারপর চকমকি ঠুকে মশালটায় আগুন ধরাল। এবার মশালটা হাতে নিয়ে ভীষণ পেছল সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে পা টিপে টিপে উঠতে লাগল। মশালের আলোয় সিঁড়ির ধাপগুলো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। তিনজনে সাবধানে উঠতে লাগল সেই কাদা ল্যাপটানো সিঁড়িগুলো দিয়ে।

পেছল সিঁড়ি শেষ। এবার ওঠাটা সহজ হ'ল। ফ্রান্সিস উঠতে উঠতে বলল — বি . স্কো দোনিয়া কান খাড়া রাখুন। পাথরের সামান্য নড়াচড়ার শব্দ হ'লেই দাঁড়িয়ে পড়বেন দেয়াল ঘেঁষে।

আস্তে আস্তে তিনজনেই সেই বাঁ দিকের বিরাট খোঁদলের পাশে ছোট্ট চত্বরটায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস যে পাথর দু'টোর মাঝখানে আটকে—থাকা সোনার ভাঙা ঢালটা দেখেছিল সেখানটা ভালো ক'রে দেখতে লাগল। ওখানটায় পাথরের স্তূপ যেন। কিছুক্ষণ দেখেটেখে ফ্রান্সিস বলল -- বিস্কো — মশালটা একটু ওপরে পাথরের খাঁজে বসিয়ে দাও। বিস্কো কয়েকটা ধ্বসে-পড়া পাথর ডিঙিয়ে একটা পাথরের খাঁজ বের করল। জ্বলন্ত মশালটা বসিয়ে দিল। জায়গাটা বেশ স্পষ্টই দেখা যেতে লাগল।



একটু পরে ফ্রান্সিস বলল — বিস্কো পাথরের চৌকোনো খণ্ডগুলো আস্তে আস্তে সরাতে হবে। দোনিয়া আপনিও হাত লাগান। তিনজনে মিলে আস্তে আস্তে সাবধানে পাথরগুলো সরিয়ে চত্বরের একপাশে রাখতে লাগল। পাথরগুলো ভারি। তিনজনেরই যথেষ্ট পরিশ্রম হ'তে লাগল। হাঁপাতে লাগল তিনজনেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটা অনেকটা পরিষ্কার হ'ল। কিন্তু কোন যোদ্ধামূর্তির হদিশ পাওয়া গেল না। ফ্রান্সিস বলল বসে জিরিয়ে নেওয়া যাক।

তিনজনেই সিঁড়িগুলোয় বসল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর ফ্রান্সিসই প্রথম

উঠল। ওপরের সিঁড়ি যতটা পরিষ্কার হয়েছে ততটা পর্যন্ত উঠল। তারপর কয়েকটা পাথর ডিঙিয়ে ওপরে একটা কাত হয়ে থাকা পাথরে পা রাখতেই ওখানে পাথরগুলো নাড়া খেল। আশেপাশের কয়েকটা পাথর গড়িয়ে গেল। ফ্রান্সিস ভারসাম্য হারিয়ে পড়তে পড়তে কোনরকমে উঠে দাঁড়াল। গড়ানো পাথর ডিঙিয়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ দেখল পাথরের জটলার নিচে সিঁড়িতে কী যেন পড়ে রয়েছে। জায়গাটা অন্ধকার। মশালের আলো পৌঁছোয় নি। ওদিকে পায়ের নিচে পাথর গড়িয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস পা রাখতে পারছে না। ও দ্রুত একটা গড়ানো পাথরে পায়ের ভর রেখে লাফ দিয়ে নিচের দু'টো সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে পরিষ্কার সিঁড়িতে নেমে এল। তখনও হাঁপাচ্ছে ফ্রান্সিস।

একটু দম নিয়ে ফ্রান্সিস আঙুল দিয়ে ওপর দিকটা দেখিয়ে বলল — বিস্কো — ওখানে একটা সিঁড়িতে কিছু নজরে পড়ল। ঐ পর্যন্ত পাথরগুলো সরাতে হবে। হাত লাগাও।

তিনজনে আবার পাথর নামিয়ে আনতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিঁড়ির সেই ধাপটা দেখা গেল। ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে উঠে এলো। এবার ভালোভাবেই দেখল — ধুলো পাথরের কুচির নিচে কী যেন কিছুটা বেরিয়ে আছে। ফ্রান্সিস নুয়ে পড়ে ধুলো পাথরকুচি সরিয়ে একটা টান দিতেই দেখল — সিংওয়ালা শিরস্ত্রাণ। সবটা বের করতেই দেখল সোনার যোদ্ধামূর্তি। ব্রোঞ্জের মূর্তিটার তিনগুণ। মূর্তির সোনার গাটায় কেমন কালচে ছোপ ছোপ। অনেকদিনের বৃষ্টি ধুলোবালিতে সোনালি রংটা যেন ঢাকা পড়ে গেছে। ফ্রান্সিস মূর্তিটা হাত দিয়ে তুলতে গিয়ে দেখল — ঠিক শিংএর জোড়াটায় দড়ি- বাঁধা। মূর্তি কিছুটা তুলতে বাঁধা দড়িটাও উঠল কয়েকহাত। তবে বৃষ্টির জলে পচে কালো হয়ে যাওয়া দড়িটা একটানেই ছিঁড়ে গেল। ফ্রান্সিস বুঝল — মুবারক দড়ি বেঁধেই মূর্তিটা জলের তলা থেকে তুলেছিল। ও শ্যেন দৃষ্টিতে কাছাকাছি পাথরের নিচে তাকাতে লাগল। নাঃ — আর কোন মূর্তি নেই।

নিচে থেকে বিস্কো চেঁচিয়ে বলল — কী হ'ল ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়িয়ে মূর্তিটা উঁচু করে ধরল। বিস্কো আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠল — ও — হো — হো — হো। দোনিয়াও হাসল। নিচে নৌকোয়-বসা মারিয়া আর হ্যারির কানে ভাইকিংদের এই উল্লাসধ্বনির শব্দ গিয়ে পৌঁছল। হ্যারি হেসে বলল — রাজকুমারী — ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই মূর্তিগুলোর হদিশ পেয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে বিস্কো মশাল হাতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। পেছনে ফ্রান্সিস আর দোনিয়া। ওদের ভাগ্য ভাল আজ আর ধ্বস নামেনি।

ফ্রান্সিস নৌকোয় ওঠার আগে হাত বাড়িয়ে মূর্তিটা মারিয়ার হাতে দিল। মারিয়া মূর্তিটা হাতে নিয়ে খুশিতে হেসে উঠল। তখনই লক্ষ্য করল মূর্তিটার হাতের ঢালটা নেই। তার মানে আস্ত মূর্তি একটাই। মারিয়া গায়ের পোশাকের কাপড় দিয়ে মূর্তিটার গায়ে জড়িয়ে দিল। মশালের আলোয় সোনালি রং একটু ঝিকিয়ে উঠল। হ্যারি বলল — রাজকুমারী, সুড়ঙ্গের বাইরে যাবার আগে মূর্তিটা পোশাকের নিচে লুকিয়ে রাখুন। মারিয়া তাই করল। মশাল জলে চুবিয়ে নিভিয়ে বিস্কো এসে নৌকোয় উঠল। দু'টো নৌকোই সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে খাঁড়ির জলে এল। চলল নুরাঘির দিকে।

নুরাঘির সদর দেউড়িতে আজও সেনাপতি দাঁড়িয়ে ছিল। দোনিয়াকে বলল — কতদূর এগোলেন? — আর কয়েকটা দিন যাক — দোনিয়া বলল।

ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস যথারীতি মাথার পেছনে দু'হাতের তালু রেখে শুয়ে পড়ল। সবাই বাকিরা মূর্তিটা নিয়ে দেখতে লাগল। দোনিয়াও দেখল। তারপর হাঁটুর ওপর দু'হাত রেখে তাতে মাথা গুঁজে রইল। খাওয়ার সময় হয়েছে বুঝে মারিয়া মূর্তিটা বিছানার

কোণে নিচে ঢুকিয়ে রাখল। ঢালটাও ওখানেই রেখেছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস আর শুয়ে পড়ল না। দোনিয়া বিছানায় আধশোওয়া হ'ল। হ্যারি বলল -- ফ্রান্সিস -- এবার কী করবে? ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল — দেখ -- আমার মনে হয় মুবারক ঐ একটা মূর্তিই দড়ি বেঁধে তুলতে পেরেছিল। আরগুলো তুলতে পারেনি। দোনিয়া বলল -- কী ক'রে বুঝলেন যে বাকিগুলো তুলতে পারেনি? -- আমার এটা অনুমান। ব্যাপারটা এই রকম ঘটেছিল — মুবারক একাই এখানে এসেছিল। তখন নুরাঘিটায় ধ্বস নামেনি। মুবারক গোপন পথটা দিয়ে নুরাঘির ওপরের দিকে ছোট চত্বরটায় আশ্রয় নিয়েছিল। মুবারক নৌকোর সাহায্য নেয় নি। কারণ ও ঠিক জায়গাটা বুঝতে পেরেছিল। ও পাথুরে দেয়ালের কথা যে চিঠিতে লিখে কেটে দিয়েছিল সেটা ছিল সুড়ঙ্গের সামনের দেয়ালটা। ফ্রান্সিস থামল। তারপর ভেবে নিয়ে বলতে লাগল -- মুবারক দিনের বেলা সুড়ঙ্গটা দিয়ে জলে সাঁতরে খাঁড়ির জলে আসতো। তারপর চারদিকে কোন জেলেদের নৌকো বা জাহাজ যখন দেখতো না তখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিঃশব্দে সাঁতরে দেয়াল থেকে দূরত্ব আন্দাজ ক'রে জলে ডুব দিতো। জলের নিচে মাটিতে কাদায় ডুবে যাওয়া নৌকোটা খুঁজতো। এইভাবে দিনের পর দিন খুঁজে মুবারক একটা মূর্তি পেয়েছিল। সেটাতে দড়ি বেঁধে সুড়ঙ্গে চলে এসেছিল। সুড়ঙ্গের অন্ধকার থেকে দড়ি টেনে মূর্তিটা নিয়ে এসেছিল।

-- অন্য মূর্তিগুলো দেখেছিল কী? দোনিয়া বলল।

হয়তো দেখেছিল। কিন্তু জলে ডুব দিয়ে মূর্তিতে দড়ি বাঁধতে যেটুকু দমের দরকার তাতে একটা মূর্তিতেই দড়ি বাঁধা সম্ভব। যা হোক — এ কারণেই হোক বা কোন জেলেনৌকো বা জাহাজ এসে পড়েছিল বলেই হোক মুবারক আর জলে নামে নি। ফ্রান্সিস থামল।

-- তারপর মুবারক কি আর মূর্তি তুলতে পারে নি? হ্যারি বলল। — না পারে নি ফ্রান্সিস বলল--কারণ মূর্তিটা মুবারক নুরাঘির ওপরে ঐ ছোট চত্বরটার কাছে রেখেছিল এবং সেই রাতেই নুরাঘিতে ধ্বস নেমেছিল। মুবারক নিজেকে বাঁচাবার মত সময় পায়নি। ধ্বসের পাথর ধুলোবালির সঙ্গে সে ছিটকে পড়েছিল খাঁড়ির জলে। মুবারক মারা গিয়েছিল এবং হঠাৎই। শুধু মূর্তিটাই থেকে গেল। তবে অটুট নয়। ধ্বসের পাথরের ধাক্কায় মূর্তির হাতের ঢাল ভেঙে গড়িয়ে পড়েছিল। ওটাই আমরা প্রথমে পেয়েছিলাম। ফ্রান্সিস থামল। সকলেই চুপ করে রইল। একসময় দোনিয়া বলল — তাহলে বাকি মূর্তিগুলো এবং সবচেয়ে বড় মূর্তিটা সবই এখানে জলের নিচেই আছে?

-- হ্যাঁ। আমার এটাই অনুমান। ফ্রান্সিস বলল -- তবে আজকে নয় — কালকে একটু বেলায় কড়া রোদের সময় সুড়ঙ্গ থেকে জলে নামবো। তারপর জলের নিচে যতটা সম্ভব দেখে বুঝতে পারবো। চড়া রোদে জলের নিচে অনেকটা দেখা যাবে।

পরের দিন একটু বেলায় ফ্রান্সিসরা নৌকো নিয়ে ভাঙা নুরাঘির সুড়ঙ্গমত মুখটার কাছে এল। ফ্রান্সিস জলে নামল। অনেকটা নিঃশ্বাস নিয়ে জলে ডুব দিল। নিচে হাত দশেক নামতেই দেখল ভাঙা নুরাঘিটার পাথর ছড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস দিক ঠিক রেখে খাঁড়ির মাঝখানের দিকে চলল। হিসেব করে হাত কুড়ি আসার আগেই ওর দম ফুরিয়ে এল। হাতেপায়ে জল ঠেলে ও জলের ওপরে উঠল। দোনিয়া আশ্চর্য হয়ে বলল ফ্রান্সিস এতক্ষণ জলে ডুবে থাকতে পারে? হ্যারি হেসে বলল ফ্রান্সিস মুক্তো শিকারীদের সঙ্গে থেকে জলের নিচে অনেকক্ষণ ডুবে থাকার কায়দাকানুন শিখেছে।

ফ্রান্সিস আবার ডুব দিল। জল এখানে ততটা ঘোলা নয়। রোদেরও তেজ আছে।

দেখল -- নুরাঘির ভাঙা পাথরগুলো এতদূর পর্যন্ত আসেনি। ফ্রান্সিস জায়গাটায় একবার চক্কর দিয়ে জলের ওপরে উঠল। এবার সুড়ঙ্গটার দিকে তাকাল। সুড়ঙ্গটার সমান্তরালে স'রে এল। তারপর হিসেব করে হাত দশেক স'রে স'রে একটা দূরত্ব আন্দাজ ক'রে ডুব দিল।

দ্রুত জল দু'হাত পায়ে ঠেলে নেমে এলো তলে মাটি, পাথরকুচি কাদার কাছে। বাইরের উজ্জ্বল রোদ এখানে অল্পই পৌঁছেছে। একটা চক্কর দিতেই কেমন ঝাপসা দেখল কাদামাটিতে একটা বড় নৌকোর লোহার খাঁচা অনেকটা গেঁথে আছে। লোহার খাঁচাটা হলদে কালো জং ধরা। নৌকোর কাঠ পচে গলে কাদার সঙ্গে মিশে গেছে। হঠাৎ ফ্রান্সিসের অস্পষ্ট নজরে পড়ল লোহার খাঁচার পাশে, কাদায় কী যেন উঁচু হয়ে আছে। ফ্রান্সিস ওটা ধরে টানতেই উঠে এল। আর একটা সোনার যোদ্ধামূর্তি। দম শেষ হয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস বুঝল ভারি মূর্তিটা এক হাতে নিয়ে জল ঠেলে ওঠা যাবে না। ও মূর্তিটা রেখে হাতে পায়ে জল ঠেলে দ্রুত ওপরে উঠে এল। ভুস্ ক'রে উঠে দেখল হাত কুড়ি দূরে দোনিয়ার নৌকো ভাসছে। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকল দোরিয়া। দোনিয়া ওর দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস হাত নেড়ে ডেকে বলল—এখানে আসুন। দোনিয়া দাঁড় টেনে নৌকোটা ফ্রান্সিসের কাছে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস হাঁপাচ্ছে তখনও। বলল — ঠিক এখানে নৌকোটা রাখুন। আপনার দড়ি বাঁধা বঁড়শিটা দিন। দোনিয়া নৌকোর গলুই থেকে বড়শি তুলে ফ্রান্সিসের হাতে দিল। বড়শি ঝুলিয়ে রেখে ফ্রান্সিস কিছুটা দড়ি কোমরে পেঁচিয়ে নিল। তারপর বলল — দড়ি ধরে দুটো হ্যাঁচকা টান দিলেই আপনি দড়ি টানতে শুরু করবেন। কথাটা ব'লে বেশ দম নিয়ে ফ্রান্সিস ডুব দিল। যখন



হাতে পায়ে জল ঠেলে নামছে তখন ও ভাবল -- ঐ মূর্তিটা মুবারক হয়তো মাটি কাদা থেকে তুলে রেখে এসেছিল পরে রাতে দড়ি বেঁধে তুলবে ব'লে। দুর্ভাগ্য মুবারকের। তার সুযোগ আর ওর জীবনে এল না।

ফ্রান্সিস মূর্তিটার কাছে পৌঁছল। কোমর থেকে দড়ি খুলল। মাথার সিং এর মতো শিরস্ত্রাণের মাঝখানে বঁড়শিটা আটকে ও দড়িতে দুটো হ্যাঁচকা টান দিল। দোনিয়া দড়ি টানতে লাগল। মূর্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস জলের ওপর দিকে উঠতে লাগল। জল থেকে যখন মাথা তুলল তখন দেখল বঁড়শিতে ঝোলা অবস্থায় মূর্তিটার দিকে দোনিয়া অবাক হ'য়ে তাকিয়ে আছে। হ্যারি মারিয়া দেখল সেটা। ওরা ওদের নৌকো চালিয়ে দোনিয়ার নৌকোর কাছে এল। ওরাও দেখতে লাগল মূর্তিটা। মারিয়া হাত বাড়িয়ে বঁড়শি থেকে মূর্তিটা খুলে নিয়ে নৌকোর মধ্যে রাখল। ফ্রান্সিস রাজার নৌকোটাতে উঠল। পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়ল। হাঁ ক'রে শ্বাস নিতে লাগল। অসহ্য ক্লান্তিতে শরীর নাড়াতে পারছে না। মারিয়া হ্যারি দুজনেই ফ্রান্সিসের কাছে স'রে এল। মারিয়া নিজের

ঢোলা ঘেরের পোশাক পায়ের কাছে বেশ কিছুটা ছিঁড়ে ফেলল। ফ্রান্সিসের চোখ মুখ হাত পা ঐ টুকরো কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দিতে লাগল।

আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হ'ল। ফ্রান্সিস বলল -- জানো হ্যারি - নুরাঘির পাথর ভেঙে বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। ভাগ্যি ভালো তারপরে কাদার মধ্যে মুবারকের নৌকোটা গেঁথে আছে। অন্য মূর্তিগুলো ওখানেই ছড়িয়ে আছে। যদি ওগুলো নুরাঘির ভাঙা পাথরে নিচে চাপা পড়তো তাহ'লে ওগুলো আর উদ্ধার করা যেতো কি না সন্দেহ।

-- তুমি অন্য মূর্তিগুলো দেখেছো? হ্যারি বলল।

-- না। তবে ওখানেই ছড়িয়ে আছে। বেশ খোঁজাখুঁজি করতে হবে আর কি। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া বলল -- আজকে আর তুমি নেবো না। বিস্কো নামুক। বিস্কো সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। দোরিয়ার নৌকোয় লাফিয়ে উঠল। ফ্রান্সিসের মত বঁড়শিবাঁধা দড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে নিল। তারপর জলে ঝাঁপ দিল।

বিস্কো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাতে পায়ে জল ঠেলে নিচে নেমে এল। এখানে আলো বেশ কম। সেটুকু আলোতেই বিস্কো পাথরকুচি মেশা কাদামাটির ওপর দাঁড়াল। ভাঙা নৌকোর লোহার জংধরা খাঁচাটার ধারে ধারে নিচু হয়ে কাদামাটি সরাতে লাগল। হঠাৎই কী একটা হাতে ঠেকল। জোরে হ্যাঁচকা টান দিতেই একটা কাদামাখা পেতলের সুন্দর কারুকাজ করা ভাঙা বর্শা উঠে এল। বিস্কো ওটা ফেলে দিল। আবার কাদামাটি সরাতে লাগল। কিন্তু দম ফুরিয়ে আসছে। বিস্কো কাদামাটিতে পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে জল ঠেলে উঠতে লাগল। যখন জলের মধ্যে পরিষ্কার আলোর আভাস পেল তখন ওর দম প্রায় শেষ। জলে জোরে পা চালিয়ে ও এক ধাক্কায় জলের ওপর উঠে এল। ভুস্ করে উঠেই ও হাঁ ক'রে শ্বাস নিতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। বুঝল আর একটু দেরি হ'লে বিস্কোর প্রাণসংশয় হ'ত। ও চেঁচিয়ে বলল -- বিস্কো -- উঠে এসো। একটু বিশ্রাম নিয়ে আমি নামছি। বিস্কোরা তো জাতিতে ভাইকিং। যেমন দুঃসাহসী তেমনি একরোখা। বিস্কো নৌকোয় উঠে এল না। হাত দিয়ে জল ঠেলে একটুক্ষণ দম নিল। তারপর আবার ডুব দিল। বিস্কোর কপাল ভালো. দু'হাত দিয়ে তিন চারবার কাদা সরাতেই হাতে ঠেকল একটা যোদ্ধামূর্তি। কাদামাখা যোদ্ধামূর্তিটা টেনে তুলেই বঁড়শিতে আটকাল। তারপর জলের ওপরে উঠে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল দোনিয়া -- দড়ি টানুন। দোনিয়া তৈরিই ছিল। দড়ি টানতে লাগল। লেপ্টে থাকা কাদা নিয়ে মূর্তিটা উঠে এল। দোনিয়া মূর্তিটা বঁড়শি থেকে খুলে নিয়ে নৌকোয় রাখল। দেখল হুবহু আগের মূর্তিগুলোর মতই এই মূর্তিটা। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল -- বিস্কো -- আজ থাক। আবার কালকে নামা যাবে। একদিনে সব মূর্তি তোলা যাবে না। নৌকোয় উঠে এসো। বিস্কো রাজার নৌকোয় উঠে এল। মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে নৌকোদুটো চলল নুরাঘির ঘাটের দিকে। দুটো নৌকোই পাশাপাশি চলল। দোনিয়া ডাকল ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস বলল -- বলুন।

--ঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখুন। নজরদাররা ঠিক বুঝেছে আর আমরা যে সোনার মূর্তি উদ্ধার করেছি সেটা সবাই জেনে গেছে। দোনিয়া বলল। সত্যিই তাই। দূর থেকেই ফ্রান্সিসরা দেখতে পেল ঘাটে অনেক লোক জমে গেছে।

আস্তে আস্তে নৌকো দু'টি ঘাটে লাগল। দেখা গেল সৈন্যরা তো আছেই আশেপাশের বসতি থেকেও অনেক লোক এসেছে। বৌমেয়েরা বুড়োবুড়ি আর বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল। এখানে সকলেই জানে মুজাহিদ যোদ্ধামূর্তিগুলো চুরি ক'রে পালিয়ে

গিয়েছিল। সেগুলো যে এই খাঁড়ির জলের নিচেই পড়ে ছিল এটা কেউ ভাবতেও পারে না।

ফ্রান্সিস নৌকোয় উঠে দাঁড়িয়ে বিস্কোকে বলল — বিস্কো মূর্তিদুটো উঁচু ক'রে তুলে সবাইকে দেখাও। বিস্কো মূর্তিদুটো দু'হাতে তুলে সবাইকে দেখাতে লাগল। ঘাটে অত লোক। কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। সকলেই অবাক হয়ে সেই মূর্তিদুটো দেখতে লাগল। উজ্জ্বল রোদ পড়েছে মূর্তিদুটোয়। কাদামাটিতে ময়লা মূর্তির গায়ে এখানে ওখানে সোনালি রঙটা দেখা গেল। বিস্ময়ভাব কেটে গেলে জমায়েত লোকেদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হ'ল। তারপর আনন্দোল্লাস শুরু হ'ল। নৌকো থেকে নামল সবাই।

সেনাপতি দোনিয়ার কাছে এল। বলল — মহামান্য রাজা আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। হ্যারি বলল -- আমাদের এখনও খাওয়া হয় নি। দুই বন্ধুর গায়ের পোশাক ভেজা। -- ওসব জানি না। মহামান্য রাজা আপনাদের এক্ষুণি যেতে বলেছেন। সেনাপতি গলায় বেশ জোর দিয়ে বলল। হ্যারি কথাটা ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে বলল — দু'টো মূর্তিই নিয়ে চলো।

মূর্তিহাতে বিস্কো আগে আগে চলল। সেনাপতি দু'একবার মূর্তিদুটোর দিকে বেশ লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল সেটা। বলল — বিস্কো, মূর্তিদুটো সেনাপতির হাতে দাও। বিস্কো তাই করল। গোমড়ামুখো সেনাপতি মূর্তিদুটো হাতে নিয়ে খুশিতে আটখানা। সবক'টা দাঁত বের করে হাসতে লাগল যেন সে-ই জলের তলা থেকে মূর্তিদুটো উদ্ধার করেছে। সেনাপতি মূর্তিদুটো দু'হাতে উঁচু ক'রে তুলে হাঁটতে লাগল। পেছনে পেছনে লোকের জটলাও চলল। হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে পড়ল ভাঙা মূর্তিটা ওদের ঘরে রয়েছে। বিস্কোকে বলল — বিস্কো, আমাদের আস্তানা থেকে ভাঙা মূর্তিটা নিয়ে এসো। সঙ্গে সঙ্গে মারিয়া — ফিস ফিস ক'রে বলল -- ওটা থাক না। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকাল। তারপর বলল -- মারিয়া, মূর্তিটা রাজা এনজিওর সম্পত্তি। ওটার ওপর আমাদের কোন অধিকার নেই।

-- কী সুন্দর মূর্তিটা! মারিয়া যেন আপন মনে বলল।

-- উপায় নেই। ফিরিয়ে দিতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া কয়েক পা দ্রুত হেঁটে গেল। ফ্রান্সিস বুঝল — মারিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে। ও মৃদু হেসে হাঁটতে লাগল।

রাজা এনজিও সিংহাসনেই বসে ছিল। মাথায় মুকুট গায়ে রাজকীয় পোশাক নেই। হালকা হলুদ রঙের একটা জোব্বামত গায়ে। জোব্বায় সোনালি রুপোলি সুতোর কাজ করা। বাঁ দিকের ডানদিকের দুটো আসনে স্পিনোলা আর স্পিনোলারই সঙ্গী একজন অমাত্য বসে আছেন।

সেনাপতি মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়েই মূর্তিদুটো দু'হাতে তুলে ধরল। তারপর সিংহাসনের কাছে গিয়ে একটি মূর্তি রাজাকে অন্যটি স্পিনোলাকে দিল। তখন বিস্কো এসে দাঁড়িয়েছে। সেনাপতি বিস্কোর হাত থেকে ভাঙা মূর্তিটা নিয়ে অন্য অমাত্যকে দিল।

তিনজনই পস্পরের মুখের দিকে তাকাল। এত সহজে মূর্তিগুলো উদ্ধার করা হবে আর তাঁদের হাতে আসবে এটা বোধহয় তাঁরা কল্পনাও করেন নি। রাজা এনজিও আনন্দে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মূর্তিটা দু'হাতে উঁচু করে তুললো। মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রাজা হাসতে লাগল। রাজা এনজিও সিংহাসনে আবার বসতে স্পিনোলা ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন -- কিন্তু সবচেয়ে বড় পঞ্চম মূর্তিটা কোথায়? ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল — ওটা এখনও জলের নিচেই আছে।

ঠিক আছে। স্পিনোলা এবার রাজাকে বললেন -- মহামান্য রাজা। বাকি মূর্তিগুলো

আমাদের নৌসেনা বাহিনীর বাছাই করা কয়েকজন সৈন্য তুলবে। আপনি কী বলেন?

-- বেশ তো। তবে আমার তাড়াতাড়ি চাই। রাজা বলল। ফ্রান্সিস বুঝল স্পিনোলার মতলব ভালো নয়। নিজেরা বাকি মূর্তিগুলো তুলে দোনিয়ার সমমূল্যের চারভাগের এক ভাগ অর্থ পাওয়ার দাবিটা নস্যাৎ করে দেবেন স্পিনোলা। ফ্রান্সিস রাজার দিকে তাকিয়ে বলল -- মান্যবর রাজা -- দোনিয়ার কিন্তু একটা শর্ত ছিল। — কী শর্ত বলুন তো? রাজা একটু আশ্চর্য হয়ে বলল। মূর্তিগুলো উদ্ধার করা হ'লে সেসবের সমমূল্যের অর্থের চারভাগের একভাগ দোনিয়ার প্রাপ্য হবে—ফ্রান্সিস বলল।

-- কই আমি তো মনে করতে পারছি না। রাজা বলল। ফ্রান্সিস স্পিনোলার দিকে তাকাল। বলল — স্পিনোলা সেদিন আপনারা এই শর্তে দোনিয়াকে এবং আমাদের দিনের বেলা অনুসন্ধানের কাজ চালাতে সম্মতি দিয়েছিলেন। বোধহয় আপনার মনে আছে? স্পিনোলা মাথা ঝাঁকিয়ে ব'লে উঠলো -- ঠিক আছে -- ঠিক আছে -- ওসব পরে ভাবা যাবে। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল --না — ঐ শর্তের ফয়েসলা এখনই করতে হবে। স্পিনোলা ফ্রান্সিসের দৃপ্তভঙ্গী লক্ষ্য করল। তিনি যথেষ্ট কুবুদ্ধি ধরেন। বুঝলেন ফ্রান্সিসদের সাহায্য ছাড়া বাকি মূর্তিগুলো উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কারণ ফ্রান্সিসরাই সঠিক জানে বাকি মূর্তিগুলো কোথায়। এখনই শর্ত অস্বীকার করলে এই বিদেশীরা ওদের জাহাজে দোনিয়াকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। ওদের এক্ষুনি বন্দী করা যেতে পারে। কিন্তু তাহলে উদ্ধারের কাজ পিছিয়ে যাবে। স্পিনোলা একটু গম্ভীর স্বরে বললেন -- রাজা এনজিও শর্ত রক্ষা করবেন। কিন্তু উদ্ধারকার্যে আপনাদের সাহায্য করতে হবে।

বেশ। আমরা রাজি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা অমাত্য দু'জন উঠে দাঁড়াল। স্পিনোলা ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল - কাল সকালে উদ্ধারের কাজ শুরু করবে আমাদের সৈন্যরা। আপনাদেরও সঙ্গে থাকতে হবে। রাজা স্পিনোলা ও অমাত্যকে নিয়ে অন্দরমহলের দিকে চলল।

ফ্রান্সিসরাও রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল। ওরা তখন খুবই ক্ষুধার্ত। তখনও ওদের স্নান খাওয়া হয়নি। ফ্রান্সিস বিস্কোর অবশ্য পোশাক পরেই স্নান হয়ে গেছে।

পরের দিন রাজা এনজিওর জাহাজে বাঁধা নৌকোটা চড়ে তিনজন সৈন্য এল। ফ্রান্সিসরা রাজার জন্য নৌকোটা আর দোনিয়ার নৌকোটায় চড়ে এল সেই নির্দিষ্ট জায়গাটায়। তিনটে নৌকো সেই জায়গায় একত্র হল। একজন সৈন্য নৌকোয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দোনিয়া কোথায় ডুব দিতে হবে? দোনিয়া আঙুল তুলে জায়গাটা দেখাল। সৈন্যটি অতি উৎসাহে তখনই জলে ঝাঁপ দিল।

সময় কাটতে লাগল। সবাই নৌকো থেকে ঐ জায়গার জলের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সৈন্যটির ওঠার নাম নেই। ফ্রান্সিস বলল -- হ্যারি -- এতক্ষণ আমিই জলের নিচে থাকতে পারিনা। সৈন্যটি অনভ্যস্ত নিশ্চয়ই। একটা ভুল সৈন্যটি করেছেই। মূর্তি খুঁজে পেয়ে নিশ্চয়ই এক হাতে নিয়ে উঠে আসছিল। বোকামি আর কাকে বলে। শুধু এক খোলা হাতে জল ঠেলে দ্রুত ওপরে ওঠা যায় না। নৌবাহিনীর সৈন্য। সমুদ্রের ভারি জল সম্বন্ধে এটুকু অভিজ্ঞতা-তো থাকা উচিত। দোনিয়া বলল, -- সোনার মূর্তি উদ্ধার করছে -- এই উত্তেজনায় সৈন্যটি সাবধানতার কথা গুলিয়ে ফেলেছে।

বাকি দু'জন সৈন্য পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। একজন ডুবে যাওয়া সৈন্যটার নাম ধরে ডাকল। পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝে চুপ করে গেল।

বেশ সময় কাটল। বোঝা গেল যে কারণেই হোক সৈন্যটি আর বেঁচে নেই।

তখনই দেখা গেল রাজার জাহাজটা আস্তে আস্তে এদিকে আসছে। কাছে এলে দেখা গেল সেনাপতি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সৈন্যদের একজন গলা চড়িয়ে সেনাপতিকে একজন সৈন্য কিভাবে মারা গেছে সেটা জানাল।

সেনাপতি সব শুনে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা বলেছিলেন এ খোঁজ চালাবার জন্যে আপনারা সৈন্যদের সাহায্য করবেন। ফ্রান্সিস বলল, সৈন্যটিতো আমাদের কোন সাহায্য চায়নি। ও জানতে চেয়েছিল কোথায় ডুব দেবে। আমরা তা দেখিয়ে দিয়েছি।

যাক গে। সেনাপতি বলল, এবার সাহায্য করুন।

ফ্রান্সিস নৌকোয় উঠে দাঁড়াল। সৈন্য দু'জনের দিকে তাকাল। হ্যারিকে বলল, হ্যারি -- আমি তো ওদের ভাষা জানি না। তুমি বুঝিয়ে বলো আমি যেভাবে নামছি সেভাবে ওদের নামতে হবে। মূর্তি ফেলে সেটা এই বঁড়শির একটাতে আটকে দিয়ে কোমরের দড়ি খুলে ওপরে উঠে আসতে হবে। হ্যারি লো ল্যাতিন ভাষায় সৈন্য দুজনকে সব বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস দোনিয়ার দড়িবাঁধা বঁড়শিগুলো ঝুলিয়ে নিয়ে কিছুটা দড়ি কোমরে পেঁচিয়ে নিল। তারপর জলে ঝাঁপ দিল।

জলের নিচে ভাঙা নৌকোর লোহার খাঁচাটার পাশে কাদামাটিতে একটা বঁড়শি দিয়ে খুচিয়ে দ্রুত কাদামাটি সরাতেই দুটো মূর্তি পাশাপাশি পেল। জলে কয়েক পাক খেয়ে কোমরে পাক দেওয়া দড়ি খুলল। মূর্তি দু'টোয় দুটো বড়শি আটকে দড়িতে দু'টো হ্যাঁচকা টান দিল। দোনিয়া নৌকো থেকে দড়ি টানতে লাগল। মূর্তিদুটো জলের উপরে উঠে এল। ফ্রান্সিসও ভুস্ ক'রে ভেসে উঠল। সেনাপতি একজন সৈন্যকে বলল -- মূর্তিদুটো তোমাদের নৌকোয় রাখ। সৈন্যটি হাত-বাড়িয়ে বঁড়শি থেকে মূর্তিদুটো খুলে নিজেদের নৌকোয় রাখল।

অন্য সৈন্যটি এবার দোনিয়ার হাত থেকে বঁড়শি বাঁধা দড়িটা কোমরে জড়িয়ে জলে ঝাঁপ দিল যেমন ফ্রান্সিস দেখিয়ে দিয়েছিল।

সবাই জলের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরেই দোনিয়া হাতে ধরা দড়িতে দু'টো হ্যাঁচকা টান বুঝল। দোনিয়া দড়ি টানতে লাগল। একটা মূর্তি উঠে এল। সৈন্যটিও জলে ভেসে উঠল। খুশিতে ও হাসছে তখন। মূর্তিটা রাজার নৌকোয় রাখা হ'ল আগের মতই।

ছ'টা মূর্তি উদ্ধার হ'ল। এবার সবচেয়ে বড়ো আর সবচেয়ে মূল্যবান মূর্তিটি উদ্ধার করতে হবে। সেনাপতিকে দেখা গেল খুব উৎসাহী। অন্য সৈন্যটিকে হাত পা নেড়ে কী সব ব'লে উৎসাহিত করল। সৈন্যটি দড়ি কোমরে পেঁচিয়ে নিয়ে জলে ঝাঁপ দিল।

সকলেই জলের দিকে তাকিয়ে আছে। সকলেই ভাবছে বড় মূর্তিটা কি সৈন্যটি উদ্ধার করতে পারবে? জলে কয়েকটা বুদ্বুদ উঠে ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস সেদিকে তাকাল। ও নিশ্চিত জানে সৈন্যটি পারবে না। অন্য মূর্তিগুলো ভাঙা নৌকোর লোহার খাঁচাটার আশেপাশে ছিটকে পড়েছে। তাই পাওয়া গেল। বড় মূর্তিটা নিশ্চয়ই ওগুলোর তুলনায় ভারি ছিল। ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা কম। তবু জায়গাটা ভালো ক'রে না দেখে এখনই কিছু বলা যাবে না। তবে সৈন্যটি যে এত অল্প সময়ে খুঁজে বের করতে পারবে না এটা ঠিক।

কিছু পরেই সৈন্যটি ভুস্ ক'রে জলের ওপর মাথা তুলল। হাঁপাতে হাঁপাতে দু'হাত নাড়িয়ে জানাল বড় মূর্তিটার হদিশ ও পায়নি।

সেনাপতির উৎসাহে তবু ভাঁটা পড়ল না। সেনাপতি দোনিয়ার হাত থেকে দড়িটা নিজে নিল। অন্য সৈন্যটিকে নামতে ইঙ্গিত করল। বেচারার তখনও হাঁপভাবটা যায়নি।

কিন্তু সেনাপতির হুকুম। সৈন্যটি দড়ি কোমরে পেঁচিয়ে ঝাঁপ দিল।

আবার সবার আগ্রহ উৎকণ্ঠা। কী হয়? কী হয়? কিছুক্ষণ সময় কাটল। সৈন্যটি আস্তে আস্তে জল থেকে মাথা তুলল। ও তখন সমস্ত শরীর ছেড়ে দিয়েছে অসহ্য ক্লান্তিতে। নৌকোর সৈন্যটি বেশ কসরৎ ক'র হাত বাড়িয়ে ওকে নৌকোয় তুলে নিল।

সেনাপতির এখন আর সেই উৎসাহ নেই। ওর খুব আশা ছিল বড় মূর্তিটা তোলাবার গৌরব ও একাই নেবে। সেটা হ'ল না। সেনাপতি এবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল -- আমার সৈন্যদের একটু বিশ্রাম দরকার। আপনারা এবার নামলে ভালো হয়। হ্যারি কথাটা ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। মারিয়া ভীতস্বরে বলল — এক্ষুণি আবার নামছো? ফ্রান্সিস হেসে বলল — কী করি। আমি ছাড়া কেউ পারবে না। যদি আমার অনুমান সত্য হয় তাহলে বেশিক্ষণ লাগবে না। ফ্রান্সিস জলে ঝাঁপ দিল।

জলের নিচে দ্রুত নেমে এল। ঠিক জংধরা নৌকোর খাঁচাটার মাঝখানে নামল। বঁড়শি দিয়ে দ্রুত নৌকোর মাঝখানটা খুঁড়তে লাগল। পচা কাঠ কাদা তুলে সরাতে লাগল। কিন্তু মূর্তির হদিশ নেই। পচা কাঠের টুকরো আর কাদায় কাদায় ও জায়গার জলটা কালো হয়ে গেল। দম ফুরিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না দ্রুত জলের ওপরে উঠে এল। সবাই হতাশ হ'ল। হ্যারি বুঝল ফ্রান্সিস যখন বিফল হ'ল তখন বড় মূর্তিটা উদ্ধার করা সহজ হবে না।

ফ্রান্সিস জল থেকে উঠল না। জলের ওপর মুখ তুলে হাঁপাতে লাগল। একটু পরে বলল — বিস্কো — তুমিও নামো। একা হবে না। বিস্কো সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বলল — আমি আঙুল দিয়ে যে জায়গাটা দেখিয়ে দেবো, সেই জায়গাটাই খুঁড়বে। ফ্রান্সিস ঠিক করল একটা বঁড়শি খুলে বিস্কোকে দেবে কাদামাটি খোঁড়ার জন্যে কিন্তু বড়শিগুলো এত শক্ত ক'রে বাঁধা যে দড়ি না কেটে খোলা যাবে না। শাঙ্কোর কোমরে সবসময় ছোরো থাকে। বিস্কোর তো ছোরা নেই। ফ্রান্সিস বঁড়শিগুলো জলের ওপর তুলে সেনাপতির নৌকোয় রাখল। বলল — আপনার তরোয়াল দিয়ে একটা বঁড়শি দড়ি কেটে খুলে দিন। সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে রুপোর ওপর মীনে করা তরোয়ালের বাঁট ধ'রে এক টানে তরোয়াল বের করল। ধারালো তরোয়ালের দুটো পোঁচেই দড়ি কেটে গেল। একটা বঁড়শি খুলে এল। বিস্কো নিল ওটা।

এবার দু'জনেই ডুব দিল। নৌকোর খাঁচাটার মাঝখানটা দাঁড়াল দু'জনে। ফ্রান্সিস ঠিক নৌকোর মাঝখানটা আঙুল ঠেনে দেখাল। দু'জনেই মাঝখানটা দ্রুত হাতে খুঁড়তে লাগল। পচা কাঠ কাদাটে জল ছড়িয়ে পড়তে লাগল। একটা চৌকোনো মত কাঠের পাটাতনের কোণায় হঠাৎ বিস্কোর বঁড়শিটা আটকে গেল। বিস্কো জোরে একটা হ্যাঁচ্‌কা টান দিতেই পচা কাঠ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কাদাজলের মধ্য দিয়ে বিস্কো দেখল বড় মূর্তিটা কাত হয়ে আছে। ফ্রান্সিস ঠিক পেছনেই দ্রুত হাতে খুঁড়ছে। বিস্কো ফ্রান্সিসের গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দিল। ফ্রান্সিস মুখ তুলে তাকাল। বিস্কো আঙুল দিয়ে মূর্তিটা দেখাল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে জলের ওপর দিকে আঙুল তুলে বিস্কোকে উঠে যেতে বলল। বিস্কো বুঝতে পারছিল দম ফুরিয়ে আসছে। ও হাতের বড়শিটা ফেলে দিয়ে দ্রুত হাতে পায়ে জল ঠেলে ওপরে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিসের দম বেশি। একটা বঁড়শি মূর্তিটার শিংওয়ালা শিরস্ত্রাণের মাঝখানে আটকে দাঁড়িয়ে দু'টো হ্যাঁচকা টান দিল। দড়িটা একজন সৈন্য ধরে ছিল। টান লাগতে ও সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলল সে কথা। নিয়ম না জানলেও সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে দড়িটা ধরে টান দিল। দেখল বেশ ভারি। সেনাপতি হেসে উঠল। সৈন্য দু'জনকে দড়ি ধরে টানতে বলল। তিনজনে দড়ি ধরে একসঙ্গে টানল। নৌকোর

একপাশেই তিনজন দাঁড়িয়ে তখন। নিচু হয়ে জোর দিয়ে আবার টানতেই ভারসাম্য হারিয়ে নৌকো উল্টে গেল। তিনজনেই জলে পড়ে গেল। সেনাপতির হাত থেকে দড়িও ছিটকে গেল।



ফ্রান্সিস তখনই জল থেকে ভুস করে মুখ তুলল। উল্টোনো নৌকো আর সেনাপতি ও সৈন্য দু'জনকে জলে ভেসে থাকতে দেখে বুঝল কী হয়েছে। প্রবল উত্তেজনায় উৎসাহে ভারসাম্যের কথা ভাবতেও পারে নি সেনাপতি। তাই যা হবার তাই হয়েছে। নৌকো উল্টে গেছে। ফ্রান্সিস হাত ঘুড়িয়ে হতাশার ভঙ্গী করল। ওদিকে দু'জন সৈন্য মিলে ঠেলে ঠেলে নৌকোটা সোজা করেছে। নিজেরা নৌকোয় উঠে ভুঁড়িওয়ালা সেনাপতিকে কোনরকমে টেনে নৌকোয় তুলল। সেনাপতি নৌকোর পাটাতনে শুয়ে চিৎ হয়ে হাঁপাতে লাগল। ওর মধ্যেই একবার কাত হয়ে দোরিয়াকে বলল- জিজ্ঞেস করুন বড় মূর্তিটা পেয়েছে কিনা। দোরিয়া ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করল কথাটা। ফ্রান্সিস বলল হ্যাঁ। মূর্তির শিংওয়ালা শিরস্ত্রাণে বঁড়শিটা ভালো করেই ঢ... গিয়ে এসেছি। এবার সেনাপতিমশাইকে বলুন জলের নিচে থেকে ছিটকে-পড়া দড়িটা নিয়ে আসতে। দোনিয়া সেনাপতিকে ডেকে বলল সে কথা। সেনাপতি কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে তার সৈন্য দু'জনকে জলে ডুবে দড়ির মাথাটা ধরে নিয়ে আসতে বলল। ভীষণ ক্লান্ত সৈন্য দুজন বোধহয় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে চাইল। সেনাপতি তড়াক করে উঠে বসল। কোমরে তরোয়ালের বাঁটে হাত রাখল। সৈন্য দু'জন আর কোন কথা না বলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দোনিয়ার নৌকোয় উঠে এল।

কিছু পরেই সৈন্য দুজন দড়িটার মাথাটা ধরে উঠে এল। সেনাপতির নৌকোয় উঠলো ওরা।

ফ্রান্সিস দোনিয়াকে বলল হ্যারিদের নৌকোয় চলুন। দোনিয়াকে নিয়ে ফ্রান্সিস হ্যারিদের নৌকোয় উঠল। সেনাপতিকে ইঙ্গিতে ওদের নৌকোটা কাছে আনতে বলল। দু'টো নৌকো কাছাকাছি এল। এবার ফ্রান্সিসের নির্দেশে মারিয়া হ্যারি আর দোনিয়া নৌকোটার একপাশে বসল। ওপাশে নৌকো বেশ কাত হল। অন্যপাশে দাঁড়াল বিস্কো। ফ্রান্সিস সেনাপতির নৌকোয় উঠল। সেনাপতি ও সৈন্য দু'জনকে ইঙ্গিতে নৌকোয় একধারে বসাল। নৌকো ওদিকে কাত হ'ল। আর একপাশে ফ্রান্সিস নিজে দাঁড়াল। সেনাপতির হাত থেকে দড়ির মুখটা নিল। এবার দু'নৌকোয় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস আর বিস্কো দড়ি ধরে একসঙ্গে টানতে লাগল। নৌকো দু'টো আর একপাশে কাত হ'য়ে পড়ল না। দুলতে থাকলেও সোজা রইল নৌকোদুটো ভারসাম্য থাকার জন্যে।

একসময় বঁড়শিতে গাঁথা বড় মূর্তিটা উঠে এল। মূর্তিটার গায়ে খুব কাদামাটি ময়লা লেগে নেই। তাই সোনার রঙটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে

রইল বঁড়শিতে গাঁথা মূর্তিটার দিকে। উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে রোদ পড়েছে মূর্তিটায়। সামান্য ঝিকিয়ে উঠছে মূর্তিটার এখানে ওখানে। এই দেখে সেনাপতির আর সবুর সইল না। সে লাফিয়ে উঠতে গেল। নৌকো টাল গেল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে আঙুল দেখিয়ে সেনাপতিকে বসতে বলল। সেনাপতি বাধ্য ছেলের মত বসে পড়ল। মূর্তিটা সেনাপতির নৌকোয় রেখে ফ্রান্সিস দড়িটা খুলে নিল। সৈন্য দুজন নৌকোয় দাঁড়িয়ে নাচতে লাগল। সেনাপতি মূর্তিটার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল--হা--হা--।

তিনটে নৌকো ফিরে চলল নুরাঘির ঘাটের দিকে। কালকের চেয়েও আজকে ভীড় আরো বেশী। দূর দূরান্ত থেকে পরিবার পরিজন নিয়ে চাষিরাও এসেছে। জেলে পরিবারের লোকেরা তো আছেই। সৈন্যরাও ভীড় করে দাঁড়িয়েছে।

নৌকোগুলো ঘাটে ভিড়ল। বড় মূর্তিটা সৈন্য দু'জন ধরে নিয়ে নৌকো থেকে নামল। এগিয়ে চলল রাজবাড়ির দিকে। ঠিক পেছনেই চলল সেনাপতি। দুহাতে দুটো মূর্তি ঝুলিয়ে।

ফ্রান্সিসরা চলল নুরাঘির সদর দেউড়ির দিকে। দেউড়ির কাছাকাছি আসতেই একজন সৈন্য ছুটতে ছুটতে দোনিয়ার সামনে এল। একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মহামান্য রাজা আপনাকে ডেকেছেন। দোনিয়া একবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। তারপর সৈন্যটির সঙ্গে রাজপ্রাসাদের দিকে চলে গেল।

নিজেদের ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস বিস্কো নিজেদের ভেজা পোশাক ছেড়ে মারিয়া ওদের জন্যে যে পোশাক নিয়ে এসেছিল সেই শুকনো পোশাক পরল।

কিছু পরেই দুজন সৈন্য ওদের জন্যে খাবার নিয়ে এল। ওরা খেতে বসল। কেউ কোন কথা বলল না।

খাওয়া শেষ হলে এতক্ষণে হ্যারি বলল - ফ্রান্সিস, এখন তো আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। চলো জাহাজে ফিরে যাই। ফ্রান্সিস একটু আধশোয়া হয়ে ছিল। উঠে দাঁড়াল। দেয়ালে লেখা সেই অস্পষ্ট স্বরলিপির দিকে তাকাল একবার। ততক্ষণে হ্যারিরাও উঠে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস ঘরের দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল - চলো।

নুরাঘির বাইরে ঘাটের কাছে এল ওরা। মারিয়া বলল - রাজা এনজিওর সঙ্গে একবার দেখা করবে না?

কী দরকার। রাজার স্বার্থোদ্ধার হয়ে গেছে। এখন আমাদের হয়তো চিনতেই পারবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

ওরা ওদের নৌকোয় উঠতে যাবে, দেখল দোনিয়া ছুটে আসছে। কাছে এসে দোনিয়া বলল - আপনারা চলে যাচ্ছেন?

হ্যারি হেসে বলল - হ্যাঁ। জাহাজে ফিরে যাচ্ছি।

মূর্তিগুলো হাতে পেয়ে রাজা এনজিও স্পিনোলা অমাত্যরা খুব খুশি তাই না? মারিয়া হেসে বলল। দোনিয়া হেসে বলল - খুশি বলে খুশি! নাচানাচি করাটা শুধু বাকি। একটু হেসে দোনিয়া বলল, স্পিনোলা বার বার রাজা এনজিওকে বলছিল মূর্তিগুলো রাজধানী কাগলিয়ারিতে নিয়ে যেতে। কিন্তু আশ্চর্য! রাজা এনজিও সম্মত হল না। বলল - আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা ফ্রেডারিক যে গির্জায় যে ভাবে এই মূর্তিগুলো যে কারণে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন সেখানেই মূর্তিগুলো থাকবে। স্পিনোলা যুক্তি দেখাল মূর্তিগুলো এখানে বাজাবার মত কোন বাদ্যকর নেই। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম সেই দুশো বছর আগের মত প্রতিদিন ভোরবেলা মূর্তিগুলো বাজিয়ে সুর তোলার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি নিলাম। এবার হ্যারি বলল- সত্যিই আপনাকে প্রশংসা করতেই হয়। দোনিয়া ফ্রান্সিসের

দিকে তাকিয়ে বলল - ফ্রান্সিসের চেয়ে বেশি প্রশংসা পাবার যোগ্য আমি নই। কথাটা বলে দোনিয়া ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। আবেগে ওর শরীর কাঁপতে লাগল। দুচোখ জলে ভিজে উঠল। ফ্রান্সিস একটু হেসে নিজেকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিল।

নৌকোয় গিয়ে উঠল সবাই। বিস্কো দাঁড় বাইতে লাগল। নৌকো চলল ওদের জাহাজের দিকে।

জাহাজে উঠতেই সব ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে এল। ফ্রান্সিসদের ঘিরে হৈ হৈ করতে লাগল। ওর মধ্যেই বিস্কো গলা চড়িয়ে বলল, ভাই সব ফ্রান্সিসের নেতৃত্বে আমরা জলের তলা থেকে নিখোঁজ সব যোদ্ধামূর্তিগুলো উদ্ধার করেছি। সব বন্ধুরা একসঙ্গে ধ্বনি তুলল - ও হো হো হো।

খুব ভোরে ফ্রান্সিসের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শুনলো সুন্দর সুরধ্বনি। দূর থেকে আসছে সেই সুরধ্বনি। মারিয়ারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মারিয়াও কান পেতে শুনছিল ঐ সুরলহরী। ফ্রান্সিস দ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল - মারিয়া চলো নুরাঘির ঐ গির্জাটায়। দোনিয়াই ঐ বাজনা বাজাচ্ছে।

দুজনে জাহাজে বাঁধা নৌকোটা খুলল। ফ্রান্সিস দাঁড় বাইতে লাগল। তখনই পূর্ব আকাশে লাল রঙের ছোপ লাগল। একটু পরেই সূর্য উঠল। ভোরের ঠান্ডা হাওয়া। খাঁড়ির জলে নুরাঘিদুটোয় ছড়িয়ে পড়া ভোরের নরম আলো। সমুদ্রের পাখির ডাক সমস্ত পরিবেশটা যেন মায়াময় হয়ে উঠল।

ওরা যখন নুরাঘির গির্জাটায় ঢুকল তখন দেখল গির্জাটায় কিছু জেলে চাষি জড়ো হয়েছে। দোনিয়া রুপোর হাতাটা মূর্তিগুলোর গায়ে ঠুকে ঠুকে সুরমূর্ছনা তুলছে। ফ্রান্সিস মারিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে সেই সুরমূর্ছনা শুনতে লাগল।

একসময় বাজনা থামিয়ে দোনিয়া পিছু ফিরে তাকাল। দেখল ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে। ছুটে এসে ফ্রান্সিসের ডানহাতটা দুহাতে জড়িয়ে ধরল। মারিয়া বলল - আপনি একদিনেই বেশ সুন্দর বাজাচ্ছেন। দোরিয়া হেসে বলল - ছেলেবেলা আমার এক কাকা আমাকে গ্রীসীয় বীণা বাজাতে শিখিয়েছিলেন। আমিও খুব মন দিয়ে শিখেছিলাম। সেই সুরজ্ঞানটাই আজ কাজে লেগে গেল। মারিয়া হেসে বলল, কিছু মনে না করলে বলি—

-- নিশ্চয়ই—বলুন। দোনিয়া বলল।

-- তৃতীয় সুরধ্বনিটা কিন্তু একটু বেসুরো লাগছে। মারিয়া হেসে বলল। দোনিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝুঁকিয়ে মারিয়াকে সম্মান জানিয়ে বলল - রাজকুমারী আপনার সুরজ্ঞানের প্রশংসা করছি। তৃতীয় মূর্তিটা হচ্ছে সেই ঢাল ভাঙা মূর্তিটা। তাই বেসুরো ধ্বনি তুলছে। স্বর্ণকারকে দিয়ে ঢালটা লাগিয়ে নিলেই শুদ্ধ সুর বেরোবে।

-- রাজা এনজিও কি আপনাকে অর্থমূল্য দেবেন বলেছেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

-- এখনো আমি চাই নি। ভেবেছি - আর চাইব না। এখানেই আমি বাদ্যকর হয়ে সারা জীবন থাকবো। প্রতিভোরে এই বাজনা বাজাবো। সেই অন্ধ বাদ্যকরের স্বরলিপি থেকে সুর উদ্ধার করবো। দুশো বছর আগে যেমন দূর দূর দেশ থেকে মানুষ ছুটে আসতো এই বাজনা শোনার জন্যে আমিও এমন বাজানো শিখবো যে তেমনি মানুষজন ছুটে আসবে আমার বাজনা শুনতে। বদলে কিছু অর্থদান করতে আবেদন জানাবো। সেই অর্থ আমি ব্যয় করবো সার্দিনিয়ার দরিদ্র চাসি জেলেদের কল্যাণে। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল দোনিয়া--আপনার মত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলেই বোঝা যায় পৃথিবী কত সুন্দর, মানুষ কত ভালো আর জীবন কত আনন্দের।

ফ্রান্সিস মারিয়া ঘাটে এসে নৌকোয় উঠল। নৌকো চালাতে চালাতে চারদিকে উজ্জ্বল রোদে হেসে-ওঠা প্রকৃতিকে দেখতে দেখতে ফ্রান্সিস হেসে ডাকল—মারিয়া? মারিয়া ওর দিকে তাকাল। আমার হাত এবারও শূন্য। মূল্যবান কিছুই নেই। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া আবেগআপ্লুতস্বরে বলে উঠল - আজ আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। মারিয়ার কথা শুনে ফ্রান্সিস খুব খুশি হল। হাসল।

কোন কথা না বলে ওদের জাহাজের দিকে নৌকো চালাতে লাগল। এই আনন্দের অনুভূতি ফ্রান্সিস ওর সমস্ত দেহমন দিয়ে অনুভব করতে লাগল। নৌকো চলল ওদের জাহাজের দিকে।

শেষ

রাণীর রত্ন ভাণ্ডার

রাণীর রত্নভাণ্ডার

ফ্রান্সিসদের জাহজ চলেছে ওদের দেশের দিকে। ভূমধ্যসাগরের জল শান্ত। ঢেউয়ের মাতামাতি নেই। ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা খুব খুশি। কতদিন পরে দেশের দিকে চলেছে ওরা। মারিয়া অবশ্য মুখ ফুটে কিছু বলেনি। তবে ফ্রান্সিস বেশ বুঝতে পারছিল মারিয়াও দেশে ফেরার আনন্দে অধীর। মারিয়ার দোষ নেই। ফ্রান্সিসদের মতো দেশে দেশে বিদেশ-বিভুঁইয়ের বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াবার অভ্যেস তো মারিয়ার নেই। কাজেই ওর আনন্দ হবে এ তো স্বাভাবিক।

জোর বাতাসে জাহাজের পাল ফুলে উঠেছে। বেশ দ্রুতগতিতে জাহাজ চলেছে। ভাইকিংদের দাঁড় টানতে হচ্ছে না। ডেক-এর এখানে ওখানে কেউ কেউ শুয়ে বসে আছে। কোথাও কয়েকজন জড়ো হয়ে বসে ছক্কা-পাঞ্জা খেলছে। বেশ অবসরের মেজাজ সকলের।

সেদিন দুপুর থেকে কিন্তু হাওয়া পড়ে গেল। হাওয়ায় আর সেই জোর নেই। পালগুলো নেতিয়ে পড়ল। বিকেল নাগাদ জাহাজের গতি আরও কমে গেল। সমুদ্রের চারদিকে একটা গভীর স্তব্ধতা। যেন একফোঁটা হাওয়া নেই। সমুদ্রের সোঁ সোঁ ডাকও কেমন নিস্তেজ। ভাইকিংরা ঝড়ের আশঙ্কা করল। জাহাজ-চালক ফ্লাইজারের কাছে এল বিস্কো। সঙ্গে দু'জন ভাইকিং বন্ধু। বিস্কো জাহাজ-চালককে বলল, কী ব্যাপার বলো তো? হাওয়া বন্ধ। চারদিক থমথমে।

জাহাজ-চালকের কপালে তখন চিন্তার ভাঁজ। ও শুধু বলল, ফ্রান্সিসকে ডাকো একবার।

বিস্কো বলল, তা ডাকছি। কিন্তু তোমার কি আশঙ্কা প্রচণ্ড ঝড় আসবে?

জাহাজ-চালক ফ্লাইজার শুধু বলল, ফ্রান্সিসকে খবর দাও।

বিস্কো আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। বিপদ আশঙ্কা করে ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে। একটু পরেই ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল।

ফ্লাইজারের কাছে এসে বলল, কী হয়েছে? ঝড় আসবে?

জাহাজ-চালক একবার ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, ফ্রান্সিস, সমুদ্রে চোরা স্রোত থাকে। আমরা সেই চোরা স্রোতে পড়েছি। আমার দিকজ্ঞান লোপ পেয়েছে। চোরা স্রোতের টান কাটাতে পারছি না। জাহাজ কোথায় চলেছে আমি জানি না।

সর্বনাশ! বলো কি? ফ্রান্সিস চিন্তিতস্বরে বলল।

হ্যারি জাহাজ-চালককে বলল, যদি সব দাঁড় টানা যায়?

জাহাজ-চালক ফ্লাইজার মাথা এপাশ ওপাশ করল। বলল, তাহলেও এই চোরা স্রোতের প্রচণ্ড টান থেকে জাহাজকে মুক্ত করা যাবে না। জাহাজ ডুবে যাবার ভয় নেই। কিন্তু জাহাজের গতিমুখ নিয়ন্ত্রণ করা এখন অসম্ভব।

তবে তো আমাদের এখন কিছু করার নেই। হ্যারি বলল।

হ্যাঁ, যতক্ষণ না এই চোরা টান নিস্তেজ হবে ততক্ষণ জাহাজ যেদিকে যাবে যাবে। ফ্লাইজার বলল।

এই চোরা টান কতক্ষণ চলবে? ফ্রান্সিস বলল।

জাহাজ-চালক মাথা নাড়ল। বলল, জানি না। সমুদ্রের অনেক জায়গায় এরকম চোরা টান থাকে। জাহাজকে যেন টেনে নিয়ে যায়।

ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল—জাহাজ ডুবে যাবে না। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাহাজ কোথায় কোনদিকে যাবে কে জানে। ফ্রান্সিস মুখ তুলে বলল, হ্যারি জানো, সার্দিনিয়ার ধারেকাছে কোনো দ্বীপ আছে বা মূল ভূখণ্ড কতদূর?

হ্যারি বলল, রাজকুমারী মারিয়ার ভূগোল জ্ঞান আমার চেয়ে অনেক বেশি। রাজকুমারী হয়তো বলতে পারবেন।

হুঁ, চলো, মারিয়াকে জিজ্ঞেস করি। কথাটা বলে ফ্রান্সিস নিচে নামার সিঁড়ির দিকে চলল।

দু'জনে ফ্রান্সিস ও মারিয়ার কেবিন ঘরে এল। ফ্রান্সিস দেখল মারিয়া চুপ করে শুয়ে আছে। এসময় মারিয়া কখনো শুয়ে থাকে না। ডেক-এ গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সমুদ্র আকাশ দেখে। সূর্যাস্তের রঙীন খেলা দেখে, সূর্য অস্ত গেলে কেবিনে ফিরে আসে। আজকে মারিয়া শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল, শুয়ে আছো কেন?

মারিয়া আস্তে আস্তে উঠে বসল। হেসে বলল, এক্ষুণি ডেক-এ যাবো ভেবেছিলাম। যাক গে, বিস্কো তোমাকে ডেকে নিয়ে গেল। কী হয়েছে?

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে জাহাজ-চালকের কথা, সমস্যার কথা বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মারিয়া, সার্দিনিয়ার কাছাকাছি কোনো দ্বীপ বা মুল ভূখণ্ড আছে?

মারিয়া একটু ভেবে নিয়ে বলল, সার্দিনিয়ার উত্তরে আছে কর্সিকা দ্বীপ। কিন্তু সেটা কতদূরে তা আমি জানি না।

আর মূল ভূখণ্ড? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

সেটা আরো উত্তরে—দূরে। মারিয়া বলল, এটুকুই বলতে পারি।

হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর বলল, ডেক-এ চলো। মারিয়া হেসে বলল, এতক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে বোধহয়। আজ থাক।

বেশ। ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজ-চালকের কাছে চলল।

আসলে সকাল থেকেই মারিয়ার শরীর ভালো নেই। ঘুম থেকে ওঠা পর্যন্ত মুখে একটা তেতো বিস্বাদ ভাব। সকালের খাবার ও খেতেই পারেনি। ও খাবার ঘরেই খাচ্ছিল। বিস্কো পাশে বসে খাচ্ছিল। ফ্রান্সিসের আগেই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বিস্কো বলল, রাজকুমারী, আপনি যে কিছুই খেলেন না।

মারিয়া হেসে বলল, খিদে পায়নি তেমন। রাতে বেশি করে খাবো। মারিয়া বিস্কোকেও বুঝতে দিল না যে ওর শরীর খারাপ।

দুপুরের দিকে মারিয়া বুঝতে পারল জ্বর এসেছে। গা হাত-পায়ের ব্যথাটা বেড়ে চলেছে। মাথায় টনটনানি শুরু হলো। মুখ বুঁজে মারিয়া সব সহ্য করতে লাগল। ফ্রান্সিস যতক্ষণ ঘরে রইল ততক্ষণ মারিয়া ফ্রান্সিসের ছেঁড়া পোশাক সেলাই করছিল। ফ্রান্সিস কিছু বুঝতে পারেনি। দু'একটা কথাটথা যা বলেছে স্বাভাবিকভাবেই

বলেছে। মাথার টনটনে ব্যথায় মারিয়া ছুঁচ চোখেই দেখতে পারছিল না। উল্টে মাথা নিচু করে সেলাই করতে গিয়ে মাথার ব্যথা বেড়ে যাচ্ছিল। তবু মারিয়া নিজের শরীরের কষ্ট ফ্রান্সিসকে বুঝতে দেয়নি। বিস্কো যখন ফ্রান্সিসকে ডেকে নিয়ে গেল তখন আর পারল না। শুয়ে পড়ল। তখনও অল্প অল্প কাশি হচ্ছিল। বুকে একটা হাঁপ-ধরা ভাব। মারিয়া বুঝল—বুকে কফ জমেছে। গত রাতে ডেক-এ একটু রাত পর্যন্ত ছিল। ভালো হয়নি সেটা। ঠাণ্ডা লেগেছে।

সন্ধ্যের পর থেকেই জ্বর বাড়তে লাগল। সেইসঙ্গে কাশিও বাড়ল। বুকের হাঁপ-ধরা ভাবটাও বেড়ে চলল। মারিয়া একটা মোটা গায়ের কাপড় জড়িয়ে শুয়ে রইল। সারা শরীরে ব্যথা আর শীত শীত ভাব। কাঁপুনি। মারিয়া দাঁত চেপে সব সহ্য করতে লাগল।

বেশ রাতে ফ্রান্সিস কেবিন ঘরে এল। দেখল মারিয়া কাপড় জড়িয়ে শুয়ে আছে। মারিয়া ঘুমিয়ে আছে ভেবে ফ্রান্সিস আর ডাকল না। রাঁধুনি বন্ধু মারিয়াকে রাতের খাবার খেতে ডাকতে এসেছিল। মারিয়া বলে দিয়েছিল, খিদে নেই।

হঠাৎ বুকের হাঁপ-ধরা ভাবটা বাড়তেই মারিয়া কাশতে লাগল। ও উঠে বসল। কাশতে কাশতে যেন দম বন্ধ হয়ে এল। ফ্রান্সিস দ্রুত দু'হাতে মারিয়াকে জড়িয়ে ধরল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে যেন। ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল। মারিয়া কাশছে তখনও। ফ্রান্সিস কিছু বলল না। কাশিটা কমল। মারিয়া হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে ধরে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিল। দুশ্চিন্তায় ফ্রান্সিস তখনও গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারছে না। শুধু একটু অভিমানের সুরে বলল, মারিয়া, তুমি এত অসুস্থ অথচ আমাকে একবার বললেও না।

মারিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে হেসে বলল, সর্দিজ্বর এসব—ভেবো না, সেরে যাবে। কতবার হয়েছে সেরে গেছে ভেন এর ওষুধ খেয়ে।

ফ্রান্সিস দ্রুত বিছানা থেকে নামল। বলল, বিছানা থেকে নেমো না। আমি এক্ষুণি আসছি।

ফ্রান্সিস ছুটে হ্যারির কেবিন ঘরে এল। ডাকল, হ্যারি—ওঠ শীগগির।

হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল। মোমবাতির আলোয় ফ্রান্সিসের উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেহারা দেখে হ্যারি এক লাফে বিছানা থেকে নামল। বলল, জাহাজের কিছু হয়েছে?

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল, না। মারিয়ার ভীষণ জ্বর এসেছে। তুমি বৈদ্য ভেনকে ডাকো। আমি যাচ্ছি। ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে চলে গেল। ততক্ষণে বিস্কোও উঠে পড়েছে। ফ্রান্সিসের কথাও শুনেছে। হ্যারির পেছনে পেছনে বিস্কোও ছুটল বৈদ্য বন্ধুর কাছে।

ফ্রান্সিস আর মারিয়ার কেবিন ঘরে বেশ হন্তদন্ত হয়েই ভেন ঢুকল। হাতে পুঁটলি আর চিনেমাটির বোয়াম। ভেন মারিয়ার কপালে হাত দিল। দু'চোখে আঙুল চেপে খুলে দেখল। হাতের নাড়ি টিপে চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, রাজকুমারী, পিঠটা দেখব একটু। মারিয়া একটু কষ্ট করেই উবু হয়ে শুল। মারিয়ার পিঠে বাঁ হাত পেতে ডান হাতের আঙুল দিয়ে ভেন ঠুকতে লাগল। পরীক্ষা শেষ হলো। ঘরে আর ঘরের বাইরে অল্প জায়গায় তখন ভাইকিং বন্ধুরা জড়ো হয়েছে।

ফ্রান্সিস বৈদ্যকে বলল, কী বুঝলে?

বুকে ভীষণ কফ জমেছে। কষ্টের অসুখ। ওষুধ দিচ্ছি। বৈদ্য ভেন আস্তে আস্তে বলল।

খুব কাশি হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল।

হবেই। ওষুধ পড়ুক দেখি। ভেন বোয়াম থেকে কালো আঠার মতো ওষুধ বের করতে করতে বলল। আঙুলে-তোলা ওষুধ হাতের তেলোয় ঘষে ঘষে বড়ি মতো করল। ফ্রান্সিসকে বলল, একটা বড়ি খাইয়ে দাও। জ্বর নামবে।

বিস্কো কাঠের গ্লাসে জল নিয়ে এল। ফ্রান্সিস মারিয়ার মাথার পেছনে হাত দিয়ে বলল, মারিয়া ওষুধটা খেয়ে নাও। মাথাটা তুলে ধরতে মারিয়া জলের সঙ্গে বড়িটা খেয়ে নিল। মারিয়া এতক্ষণে বুঝতে পারল—শরীর আর ওর বশে নেই। একদিনেই শরীর যেন অসাড় হয়ে গেছে। গায়ে হাতে পায়ে অসহ্য ব্যথা। জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। মাথাটা ব্যথায় টনটন করছে। ছিঁড়ে পড়ছে যেন। বুকে আবার চাপ ভাবটা বাড়তেই শুরু হলো বেদম কাশি। কাশতে কাশতে মারিয়ার শরীরটা বেঁকে যেতে লাগল। কাশি থামাতে মারিয়া বালিশে মুখ গুঁজল। কিন্তু কষ্টকর কাশিটা কমল না। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে মারিয়ার পিঠে হাত বুলোতে লাগল। মারিয়া হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল।

মারিয়ার কষ্ট দেখে ফ্রান্সিসের মতো শক্ত মনের মানুষও অস্থির হয়ে পড়ল। ভেনকে বলল, যেভাবে পারো মারিয়ার কষ্টটা কমাও।

ভেন তখন ওর কাপড়ের ঝোলা থেকে পাথরের ছোট্ট শিলনোড়া বের করেছে। বলল, দেখি। ঝোলা থেকে চারটে কালো কী ফল বের করল। দু'আঙুলে টিপে খোসাটা ভাঙল। ভেতরের সবুজ রঙের ফলগুলো বার করল। শিলনোড়া দিয়ে গুঁড়ো করল। গুঁড়ো জলে ভিজিয়ে বড় গোল করল। ওটা থেকে সবজে ওষুধগুলো টেনে খুলে হাতে পাকিয়ে চারটে বড়ি মতো করল। হ্যারির দিকে তাকিয়ে ভেন বলল, ঐ কালো বড়ি খাওয়াবার এক ঘন্টা পরে পরে এই সবুজ বড়িগুলো খাওয়াবে। হ্যারি সব বড়িগুলো নিয়ে মারিয়ার শিয়রের কাছে রাখা একটা চিনেমাটির পাত্রে রাখল।

সময় কাটতে লাগল। এক ঘন্টা সময় গেল। হ্যারি মারিয়াকে সবুজ বড়িটা খাইয়ে দিল। আবার সকলের প্রতীক্ষা। ভেনও মাথা নিচু করে বসে রইল চোখ বুঁজে। কোনো কথা বলল না।

ভোর হলো। বাইরে সাগরপাখির ডাক শোনা গেল। ভেন ফ্রান্সিস হ্যারি বিস্কোরা তো সারারাত চোখের পাতা এক করেনি। ভাইকিং বন্ধুরাও কেউ একটানা সারারাত ঘুমোয়নি। মাঝে মাঝেই এসে মারিয়ার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে বারবার খোঁজ নিয়ে গেছে।

দুপুর নাগাদ মারিয়ার শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হলো। প্রায় অজ্ঞানের মতো মারিয়া বিছানায় অসাড় হয়ে শুয়ে রইল। ফ্রান্সিস বারবার ভেনকে বলল, মারিয়া কি সুস্থ হবে না?

ভেন কোনো কথা বলল না। আবার নতুন ওষুধ তৈরি করল। ফ্রান্সিসই মারিয়ার মাথা তুলে ধরল। হ্যারি অনেক কষ্টে ওষুধটা খাওয়াল।

বিকেল হলো। ভেন মারিয়াকে পরীক্ষা করল। আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসকে বলল, জ্বর একটু কমেছে। তবে বিপদ এখনও কাটেনি। আমার জ্ঞানবুদ্ধিমতো সবরকম চেষ্টা করছি। কিন্তু কোনো ভালো বদ্যিকে আজ রাতের মধ্যেই দেখাতে হবে। নইলে—ভেন চুপ করল।

ফ্রান্সিস আর বসে থাকতে পারল না। ছুটে ডেক-এ উঠে এল। দেখল—পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ও জাহাজ-চালকের কাছে ছুটে এল। বলল, ফ্লাইজার যে করে হোক কোনো ডাঙায় আমাদের পৌঁছতেই হবে। তুমি জাহাজ আরো জোরে চালাও।

জাহাজ-চালক ফ্লাইজার একটুক্ষণ ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিসকে এরকম অস্থির হয়ে পড়তে ও কোনোদিন দেখেনি। বুঝল—সত্যি কথাটা এখন বলা উচিত হবে না। ও বলল, ফ্রান্সিস অস্থির হয়ো না। স্থির হও। আমরা আজ রাতের মধ্যেই কোনো না কোনো দ্বীপে বা দেশে পৌঁছবো তুমি রাজকুমারীর কাছে যাও। তাঁকে সাহস দাও। তুমি পাশে থাকলে রাজকুমারী মনে অনেক জোর পাবেন। তুমি যাও। আমরা যা করার করছি। ফ্রান্সিস আর কোনো কথা বলতে পারল না। নিজের কেবিনে ফিরে এল।

নজরদার পেড্রো গতকাল থেকেই একনাগাড়ে জাহাজের মাস্তুলের মাথায় ওর জায়গায় বসে আছে। শুধু খাওয়ার সময় গোগ্রাসে খেয়েই আবার নিজের জায়গায় চলে গেছে। সারারাত তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে চারদিকে যদি ডাঙা চোখে পড়ে। পরের দিনও ও নজর রাখতে লাগল।

ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুদের কারো মন ভালো নেই। ওরা শুকনো মুখে ডেক-এর এখানে ওখানে কেবিন ঘরে শুয়ে বসে সময় কাটাতে লাগল। কিছুতো করার নেই শুধু মারিয়ার সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া। শুধু শাঙ্কো রেলিঙের ধারে সারারাত দাঁড়িয়ে রইল। চারদিকে নজর রাখতে লাগল—কোনোদিকে ডাঙা দেখা যায় কিনা। কিন্তু কোথায় ডাঙা? চারদিকে শুধু জল আর জল।

সন্ধ্যের পর চাঁদ উঠল। পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়। তাই জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। এতে চারদিকে নজর রাখার সুবিধে হলো।

জাহাজ চলেছে। জাহাজ-চালক ফ্লাইজার হুইলে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে শুধু। চোরা স্রোতের টানের জোর কমেছে। কিন্তু ফ্লাইজার ভেবে পাচ্ছে না কোনদিকে জাহাজের মুখ ঘোরাবে। জাহাজ কোথায় এল তাও বুঝতে পারছে না। অগত্যা জাহাজ যেদিকে যায় যাক। ম্লান মুখে অসহায়ভাবে ও দাঁড়িয়ে রইল।

একটু রাতে হঠাৎ পেড্রোর চোখে পড়ল ডানদিকে দূরে সাদাটে কুয়াশার পাতলা আস্তরণের মধ্যে দিয়ে আগুনের ক্ষীণ আভা। পেড্রো মাস্তুলের মাথা থেকে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠল—ডাঙা—ডাঙার কাছে এসেছি আমরা। অনেক ভাইকিং বন্ধু ছুটে এল রেলিঙের ধারে। বিস্কো ছুটল ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে খবর

দিতে। জাহাজ-চালক ফ্রান্সিসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই ফ্রান্সিস আর হ্যারি ছুটে এল রেলিঙের ধারে। ওরা আলো দেখল। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারল না ওটা সমুদ্রের বুকের আলোকস্তম্ভ কিনা। একটু পরেই বুঝল—ওটা ডাঙায় আছে। ওটা নিশ্চয়ই কোনো দ্বীপ বা দেশ।

ফ্রান্সিস ফ্লাইজারের কাছে এল। বলল, যত দ্রুত সম্ভব ঐ আলো লক্ষ্য করে জাহাজ চালাও। ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, একদল দাঁড়ঘরে নেমে যাও। দাঁড় টানো। আর একদল পালের দড়িদড়া খুলে বেঁধে পাল ঠিক রাখো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ আলোর কাছে আমাদের পৌঁছতে হবে। ভাইকিং বন্ধুরা সমস্বরে হাঁক দিল—ও-হো-হো-হো। তারপর ছুটল নিজেদের কাজের জায়গায়। জাহাজের গতি বাড়ল। জাহাজ ছুটল ঐ আলো লক্ষ্য করে।

ফ্রান্সিস কেবিন ঘরের দিকে যাচ্ছে তখন হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস, একটু খোঁজখবর না নিয়ে এই বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো কি উচিত হবে। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল, হ্যারি উপায় নেই। মারিয়ার শরীরের যা অবস্থা তাতে যত দ্রুত সম্ভব ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা না করতে পারলে মারিয়াকে—আর বলতে পারল না ফ্রান্সিস। ওর গলা বুঁজে এল।

জাহাজঘাটের কাছাকাছি আসতে চাঁদের আলোয় দেখা গেল একটা বন্দর এলাকা। বেশ কয়েকটা জাহাজ নোঙর করে আছে। নানা দেশের পতাকা উড়ছে জাহাজগুলোর মাথায়। যে আলো ফ্রান্সিসরা দূর থেকে দেখেছিল সেই আলো জ্বলছে একটা বেশ উঁচু মিনারের মাথায়। যেন অনেকগুলো মশাল একসঙ্গে জ্বলছে। বোঝাই যাচ্ছে সমুদ্রে নজরদারির জন্যেই এরকম পাথর গেঁথে মিনার তৈরি করা হয়েছে।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে ছিল জাহাজের রেলিঙ ধরে। তাকিয়ে ছিল জাহাজঘাটার দিকে। তখন দেখল একটা জাহাজ দ্রুত ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে আসছে। ফ্রান্সিস জাহাজটা দেখেই বুঝল ওটা যুদ্ধজাহাজ।

ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে চিৎকার করে বলে উঠল, ভাইসব, আমরা লড়াই করবো না। কেউ তরোয়াল হাতে নেবে না। আস্তে আস্তে সব ভাইকিংরা ডেক-এ এসে দাঁড়াল। কারো মুখে কথা নেই। শুধু বিস্কো আর বৈদ্যবন্ধু ভেন রইল মারিয়ার কাছে। মারিয়া তখনও চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। জ্বর কমলেও মারিয়ার শরীরে কোনো সাড় নেই। যখন কাশি উঠছে তখনই মারিয়ার কষ্ট হচ্ছে বেশি। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে আসে যেন। বিছানায় এপাশ ওপাশে ছটফট করে। কাশি কমলে মুখ হাঁ করে হাঁপাতে থাকে।

যুদ্ধজাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। ফ্রান্সিসদের জাহাজটা জোর ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠল। যুদ্ধজাহাজ থেকে জনা দশেক সৈন্য তরোয়াল হাতে লাফ দিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেকে উঠে এল। সর্বপ্রথমে যে উঠে এল সে ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। বোঝা গেল সেই দলনেতা। বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। মুখে দাড়ি গোঁফ। লম্বা টান টান শরীর। সৈন্যদের গায়ে হাঁটুঝুল মোটা কাপড়ের পোশাক। মাথায় শিরস্ত্রাণ, গায়ে বর্ম নেই। কোমরে চামড়ার ফেট্টি।

তাতে তরোয়ালের খাপ গোঁজা।

দলনেতা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে লো ল্যাতিন ভাষায় বলল, তোমরা তো এই অঞ্চলের লোক নও। তোমরা এখানে এসেছ কেন।

হ্যারি এগিয়ে এল। ভাঙা ভাঙা লো ল্যাতিন ভাষায় বুঝিয়ে বলল, আপনার অনুমান ঠিক। আমরা বিদেশী, জাতিতে ভাইকিং আমরা। আমাদের মধ্যে একজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর চিকিৎসার জন্যে আমরা এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমরা শান্তি চাই—যুদ্ধ চাই না।

দলনেতা একটু ভাবল। তারপর বলল, শুধু তোমার মুখের কথায় বিশ্বাস নেই। আমরা জাহাজ তল্লাশী করবো। তোমরা দস্যু লুটেরার দল হতে পারো।

হ্যারি ফ্রান্সিসকে মৃদুস্বরে সব কথা বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস বলল, ওরা যা করতে চায় করুক। বাধা দিও না।

হ্যারি বলল, আপনি জাহাজ তল্লাশী করুন—আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে জেনে রাখুন আমরা জলদস্যু নই। আমরা ভাইকিং—বীরের জাতি।

দলনেতা এসব কথায় বিশেষ কান দিল না। সঙ্গের সৈন্যদের ইঙ্গিত করল জাহাজ তল্লাশীর জন্যে। চারজন সৈন্য সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। দুজন সৈন্য ডেক-এ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

হ্যারি বলল, এটা কি কোনো দ্বীপ না দেশ?

এটা কর্সিকা দ্বীপ। এই বন্দরের নাম বোনিফেসিও—কর্সিকার দক্ষিণ প্রান্তের শেষ বন্দর। এখানকার সামন্ত রাজা সিনার্কা। দলনেতা বলল।

হ্যারি সব কথা ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে বলল। তারপর দলপতিকে বলল, তল্লাশী শেষ হলেই বুঝবেন আমরা জলদস্যু বা লুটেরার দল নই। আমাদের দেশের রাজকুমারী এই জাহাজে সাংঘাতিক অসুখে মৃতপ্রায়। আমাদের বিনীত অনুরোধ—আমরা নির্দোষ প্রমাণিত হলেই যত শীগগির সম্ভব রাজকুমারীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবেন।

সে সব মাননীয় সিনার্কাকে বলবেন কাল সকালে। দলনেতা বলল।

হ্যারি বলল, না কাল সকালে নয়। আজ রাতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

দলপতি বেশ কড়া চোখে হ্যারির দিকে তাকাল। বলল, একটু পরেই সবাইকে কয়েদ ঘরে ঢুকতে হবে। তার জন্যে তৈরি হও।

হ্যারি চিৎকার করে বলে উঠল, আমাদের সবাইকে নিয়ে যান—কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু রাজকুমারীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আজ রাতেই করতে হবে। হ্যারিকে ক্রুদ্ধস্বরে এভাবে চিৎকার করে কথা বলতে ভাইকিং বন্ধুরা কখনও দেখেনি। ওরা বেশ আশ্চর্য হলো। হ্যারি ও দলপতির কথা ওরা না বুঝলেও হ্যারিকে সমর্থন জানাতে ওরা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো-হো।

ভাইকিংদের এভাবে উত্তেজিত হতে দেখে দলপতি বেশ ঘাবড়ে গেল। তবু গম্ভীরভাব বজায় রেখে বলল, মাননীয় সিনার্কা উত্তরে সারিনে গিয়েছেন বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে। উনি কাল সকালে ফিরবেন। তখন উনিই যা করবার করবেন।

হ্যারি ফ্রান্সিসকে সব কথা বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল, হ্যারি, এখন উত্তেজিত হয়ো না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব কাজ করতে হবে।

—কিন্তু ফ্রান্সিস, বৈদ্য বলেছে আজ রাতের মধ্যেই সুচিকিৎসা চাই—নতুন ওষুধ চাই। হ্যারি বলল।

জানি জানি। দেখা যাক দলপতি কী করে। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সমুদ্রের মৃদু গর্জন আর শোঁ শোঁ হাওয়ার শব্দ। যারা তল্লাশী চালাচ্ছিল তারা দলপতির কাছে এল। ওরা বলল, জাহাজে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। শুধু একজন অসুস্থ মহিলার ঘরে কিছু গয়নাগাঁটি পাওয়া গেছে। তেমন মূল্যবান কিছু জাহাজে লুকানো নেই।

দলপতি একবার মাথা ঝাঁকাল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল—এই জাহাজটা দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে বন্দরে চলো। তারপর যা করার করবো।

দলপতি নিজেদের যুদ্ধজাহাজে চলে গেল। তার সৈন্যরা কয়েকজন মিলে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ওদের যুদ্ধজাহাজের পেছনের হালের সঙ্গে শক্ত কাছি দিয়ে বাঁধল। তারপর টেনে নিয়ে চলল ফ্রান্সিসদের জাহাজটা।

শাঙ্কো, ফ্রান্সিস আর বৈদ্য ভেন-এর কথাবার্তা থেকে বুঝতে পেরেছিল আজ রাতের মধ্যেই মারিয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পারলে মারিয়ার বাঁচার আশা কম। তাই শাঙ্কো জাহাজ থেকে পালাবার উপায় ভাবতে লাগল। তখনই সৈন্যরা জাহাজের তল্লাশী সেরে দলপতিকে সব জানাচ্ছিল। শাঙ্কো দেখল—এই সুযোগ। সৈন্যরা সব দলপতিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে নজর নেই। ও আস্তে আস্তে নিজেদের দল থেকে সরে এল। গলা নামিয়ে হ্যারিকে বলল, হ্যারি আমি পালাচ্ছি। তারপর ডেক-এর ওপর নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল। দ্রুত গড়িয়ে গিয়ে মাস্তুলের পেছনে চলে এল তারপরই সিঁড়িঘর। সিঁড়িঘরের আড়ালে গড়িয়ে চলে এল পেছনে হালের কাছে। ঝোলানো দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে নেমে এল জলের ওপর। আস্তে জলে ডুবিয়ে দিল নিজেকে। দম বন্ধ করে ডুব সাঁতার দিয়ে বেশ দূরে গিয়ে আস্তে আস্তে জলের ওপর মাথা ভাসাল। দেখল, সেই সৈন্যরা কয়েকজন ওদের জাহাজের হালের সঙ্গে কাছি বাঁধছে। শাঙ্কো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—যাক সময়মতোই পালানো গেছে। আর একটু দেরি হলে ও ধরা পড়ে যেত। শাঙ্কো জলে শব্দ না তুলে আস্তে আস্তে ওদের জাহাজের পেছনে পেছনে সাঁতরে চলল।

বোনিফেসিও বন্দরের ঘাটে এসে ফ্রান্সিসদের জাহাজ লাগল। দলপতির নির্দেশে সৈন্যরা কাঠের পাটাতন ফেলল। ফ্রান্সিসরা তখনও বুঝতে পারছে না দলপতি ওদের নিয়ে কি করবে।

এবার দলপতি ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এল। পাটাতনের সামনে দাঁড়িয়ে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, সবাইকে নামতে হবে। তুমি সবাইকে নেমে আসতে বলো।

হ্যারি বলল, আপনাকে আগেই বলেছি আমাদের রাজকুমারী অত্যন্ত অসুস্থ

হয়ে পড়েছেন। তাঁকে অন্তত এই জাহাজে থাকতে দিন। পাহারা দিয়েই রাখুন।

দলপতি মাথা ঝাঁকিয়ে গলা চড়িয়ে বলে উঠল, না না—সবাইকে দুর্গে যেতে হবে। ওসব অসুখ-ফসুখ বুঝি না। হ্যারি, ফ্রান্সিসকে সব কথা বলল।

ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, এখন ওর কথা শুনে চলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ও যা বলছে তাই করতে হবে।

কিন্তু সাংঘাতিক অসুস্থ রাজকুমারীকে—

ফ্রান্সিস ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমিই মারিয়াকে নিয়ে যাবো। দলপতির আদেশ মেনে চললে হয়তো মারিয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা ঐ দলপতিই করে দেবে। দলপতি চিৎকার করে বলল, কী হলো? নামো সবাই।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল, সবাইকে নামতে বলো। আমি মারিয়াকে নিয়ে আসছি। ফ্রান্সিস নিজের কেবিনঘরের দিকে চলল।

হ্যারি এবার ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, সবাই জাহাজ থেকে নেমে এসো। আমি জানি—এভাবে আমরা কখনো বিনা লড়াইয়ে বিনা প্রতিবাদে হার স্বীকার করি না। কিন্তু আজকের অবস্থা অন্যরকম। ফ্রান্সিস বলেছে দলপতি যা বলে তাই মেনে নিতে।

ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। দলপতি হ্যারির দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, এক্ষুণি সবাইকে নামতো বলো। নইলে সব ক'জনকে আমরা মেরে ফলবো।

হ্যারি কথাটা বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল। ভাইকিংদের গুঞ্জন থামল। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস অনেক ভেবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়। ফ্রান্সিসের কথার অবাধ্য হয়ো না। এতক্ষণে ভাইকিংরা আস্তে আস্তে পাটাতন দিয়ে জাহাজঘাটায় নামতে লাগল। ওরা বুঝল রাজকুমারী অসুস্থ। তার চিকিৎসার দরকার সবার আগে।

ওদিকে ফ্রান্সিস কেবিন ঘরে ঢুকে দেখল—বৈদ্য ভেন মাথা নিচু করে মারিয়ার মাথার কাছে বসে আছে। ফ্রান্সিস বৈদ্যকে ডাকল। তারপর আস্তে আস্তে সব কথা বলল।

বৈদ্য ভেন মারিয়ার কপালে হাত দিল। গলায় হাত দিল। বলল, জ্বর বেশি নেই। কিন্তু বিপদ এখনও কাটেনি। এ অবস্থায় রাজকুমারীকে নিয়ে যাওয়া খুব ঝুঁকি।

ফ্রান্সিস বলল, উপায় নেই। এই ঝুঁকি নিতেই হবে। মাথা নিচু করে মারিয়ার মুখের কাছে মুখ এনে ফ্রান্সিস ডাকল, মারিয়া! মারিয়া কোনো সাড়া দিল না। ফ্রান্সিস আবার ডাকল, মারিয়া।

মারিয়া আস্তে আস্তে চোখ খুলল। একটু হাসার চেষ্টা করল। কোনো কথা বলতে পারল না। ফ্রান্সিস বলল, মারিয়া তোমাকে সব পরে বলবো। এখন আমাদের সবাইকে তীরে নামতে হবে। তোমাকে আমি পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাবো। যাতে তোমার কোনো কষ্ট না হয় তার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো। শুধু তুমি একটু কষ্ট হলে সহ্য কোরো। পারবে তো? মারিয়া খুব আস্তে আস্তে মাথা কাত করলো। ফ্রান্সিস অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো।

মারিয়ার কাঁধের পেছনে হাত দিয়ে মাথাটা তুলল। হাঁটুর নিচে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে মারিয়াকে বিছানা থেকে তুলল। তারপর বেশ আস্তে আস্তে দরজার দিকে চলল। পেছন না ফিরে বলল, ভেন তোমার দরকারি ওষুধগুলো আনতে ভুলো না।

মারিয়াকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ ওঠার সময় বেশ অসুবিধে হলো ফ্রান্সিসের। অনেক আস্তে অনেক সাবধানতা সত্ত্বেও ঝাঁকুনি লাগল। মারিয়ার মুখে কষ্টের শব্দ হলো—উঃ উঃ। মারিয়া কপাল কোঁচকাল। চোখ বন্ধই রইল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। আবার সাবধানে উঠতে লাগল।

কাঠের পাটাতনের সামনে এসে দেখল—বন্ধুরা আস্তে আস্তে সোজা রাস্তাটা দিয়ে চলেছে। সামনে পেছনে খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্যরা পাহারা দিয়ে চলেছে। এসময় মারিয়ার হঠাৎ কাশি উঠল। ফ্রান্সিস বেশ ঘাবড়ে গেল। কাশি হলেই মারিয়ার কষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি। কাশতে কাশতে মারিয়ার শরীরটা যেন বেঁকে যেতে লাগল। ফ্রান্সিস বহুকষ্টে মারিয়াকে ধরে থাকল। মুখ ঘুরিয়ে বৈদ্যকে ডাকল, ভেন—শীগগির এসো। বৈদ্য ভেন ছুটে এল। মারিয়ার পিঠে দুহাতের তালু চেপে ধরল। কাশি কমল। ফ্রান্সিস তবু নড়ল না। কাশি থেমে গেল। মারিয়া মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। ওর চোখমুখ কুঁচকে গেল। মারিয়ার রোগার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে, মারিয়ার কষ্ট দেখে ফ্রান্সিসের মনটা হাহাকার করে উঠল। এত কষ্টের জীবন মারিয়ার সহ্য হবে না—এটা ওর আগে ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু এখন ওসব ভাবলে মন দুর্বল হয়ে যাবে।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে পাটাতন দিয়ে নামতে লাগল। ওর চোখেমুখে তখন সংকল্পের দৃঢ়তা। আলোর মিনার ছাড়িয়ে দলপতির পেছনে পেছনে সৈন্যদের পাহারায় ফ্রান্সিসরা পাথর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে চলল। দুপাশে ছাড়া ছাড়া পাথরের বাড়িঘর নিস্তব্ধ। এত রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তার এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সবাই একটা দুর্গের সামনে এল। দুর্গের সদর দেউড়িতে অনেক মশাল জ্বলছে। পাহারাদার সৈন্যরা দলপতিকে দেখে মাথা একটু নোয়ালো। পাহারাদারের সঙ্গে কী কথা হলো। ঘড় ঘড় শব্দে বিরাট কাঠের দরজা খোলা হলো। সবাই দুর্গের মধ্যে ঢুকল। একটা পাথর বাঁধানো ছোট চত্বরের পরে একটা দরজার সামনে এসে সবাই দাঁড়াল। লোহার গরাদের দরজার মাথায় মশাল জ্বলছে। দুজন পাহারাদার সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল। দলপতির নির্দেশে একজন এগিয়ে গিয়ে দরজার তালা খুলল। ঠং ঠাং শব্দে দরজা খোলা হলো। দলপতি হ্যারিকে বলল, সবাইকে ভেতরে ঢুকতে বলো।

হ্যারি বলল, কিন্তু আমাদের রাজকুমারী ভীষণ অসুস্থ। তাঁকে অন্তত রেহাই দিন।

দলপতি মাথা নেড়ে বলল, সেসব কাল সকালে সিনার্কাকে বলবেন।

হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল সে কথা। ফ্রান্সিস বলল, আর কোনো অনুরোধ করো না। দেখা যাক কী হয়।

ঘরটা বেশ বড়। পাথুরে দেয়ালের আংটায় মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় ফ্রান্সিস দেখল ঘর জুড়ে দড়িবাঁধা শুকনো ঘাসের বিছানামতো। তার ওপর মোটা কাপড় পাতা। প্রায় দশ বারো জন লোক শুয়ে আছে তাতে। ফ্রান্সিস বুঝল—ওরা বন্দী। এটা কয়েদঘর। ও মারিয়াকে নিয়ে ডানদিকের দেয়ালের কাছে এসে বিছানায় আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল। মারিয়ার মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস মারিয়ার কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বৈদ্য ভেন মারিয়ার একপাশে বসল। হাতের পুঁটুলি রাখল পাশে। হ্যারি এসে বসল ফ্রান্সিসের কাছে। আস্তে আস্তে বলল, ফ্রান্সিস শাঙ্কো জলে নেমে পালিয়েছে।

ফ্রান্সিস বলল, শাঙ্কো কি জানে আমাদের এখানে বন্দী করা হয়েছে?

আমি জাহাজ থেকে নামার সময় গলা চড়িয়ে দুবার বলেছি—শাঙ্কো আমাদের অনুসরণ করো। হ্যারি বলল।

যাক, একজন তো বাইরে রইলো। ফ্রান্সিস ক্লান্তস্বরে বলল।

হ্যারি ঘরটার চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ভাইকিং বন্ধুরা প্রায় সবাই শুয়ে পড়েছে। কয়েকজন হাঁটুতে মাথা রেখে বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। অবশ্য কথা বলার মতো মনের অবস্থা এখন ওদের নেই। একদিকে রাজকুমারীর এই অবস্থা অন্যদিকে কাপুরুষের মতো আত্মসমর্পণ—ওরা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেছে। হ্যারিরা আসার আগে যে বন্দীরা ছিল তাদের দেখা গেল সবাই ঘুমিয়ে আছে। তাদের পরনে এই অঞ্চলের চাষীদের জোব্বামতো পোশাক। শুধু একজন পাথরের দেয়ালে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে। মশালের আলো **ওখানে** অল্পই পৌঁছেছে। হ্যারি আবছা দেখল লোকটির পরনের পোশাক একইরকম তবে রঙটা ঘন নীল। একটু দামী ভালো কাপড়ের পোশাক। লোকটির মাথার এলোমেলো বড় বড় চুল কপালে নেমে এসেছে। মুখে পাতলা দাড়ি গোঁফ। কতদিন এখানে বন্দী হয়ে আছে কে জানে। হ্যারি ওপরের দিকে তাকাল। পাথরের ছাদ। ডানদিকে ছাদের একটু নিচে মনে হলো একটা ফোকরমতো। আগে বোধহয় লোহার গরাদ বসানো জানালা ছিল। তাতে গরাদ নেই। ফোকরের জায়গাটা পাথর ভেঙে বড় হয়ে গেছে। কিন্তু এত উঁচুতে যে দেয়াল বেয়ে পৌঁছনো অসম্ভব।

হঠাৎ ফ্রান্সিস বলল, ভেন দ্যাখো তো। মনে হচ্ছে মারিয়ার জ্বরটা বেড়েছে।

ভেন এগিয়ে এল। মারিয়ার কপালে গলায় হাত চাপল। বলল, একটা ওষুধ খাওয়াতে হবে।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল, একপাত্র জলের ব্যবস্থা কর। হ্যারি উঠে দাঁড়াল। বন্ধুদের কাউকে ডাকল না। কিন্তু জল কোথায়? হ্যারি চারদিকে তাকাল। বোধহয় হ্যারিকে চারিদিকে তাকাতে দেখেই প্রায় অন্ধকার থেকে লোকটি স্পেনীয় ভাষায় বলল, আপনি কি কিছু খুঁজছেন? বেশ ভারি গলা লোকটির।

হ্যারি একটু দ্রুতই শায়িতদের ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে লোকটির কাছে এল। বলল, একজন অসুস্থকে ওষুধ খাওয়াতে হবে। জল কোথায় রাখা আছে?

লোকটি আঙুল তুলে বাঁ দিকের কোণটা দেখাল। বলল, ওখানে একটা বাড়তি

কাঠের পাত্রও আছে। হ্যারি চলল সেই দিকে। একটু পরেই কাঠের পাত্রে জল নিয়ে ফিরে এল। ভেন ততক্ষণে ওর ঝোলা থেকে ওষুধ বের করে হাতের তালুতে ঘষে ঘষে বড়ি বানিয়েছে। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মারিয়ার মাথার নিচে হাত দিল। মৃদুস্বরে বলল, মারিয়া একটা ওষুধ খেয়ে নাও। তারপর হাত দিয়ে মাথাটা একটু উঁচু করল। ভেন বড়িটা হ্যারির হাতে দিল। হ্যারি জল আর বড়িটা আস্তে আস্তে মারিয়াকে খাইয়ে দিল। মাথা নামিয়ে দিতেই মারিয়া গোঙাতে লাগল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ার মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিল। কপালে মাথায় হাত বুলোতে লাগল। আস্তে আস্তে মারিয়ার গোঙানি বন্ধ হলো।

হ্যারি চুপ করে বসেছিল। শরীর ক্লান্ত। ঘুমে চোখ বুঁজে আসছে। কিন্তু ফ্রান্সিস আর মারিয়ার দিকে চোখ পড়তে হ্যারি আর ঘুমের কথা ভাবতেই পারছিল না। হঠাৎ হ্যারি শুনল, আপনাদের মধ্যে অসুস্থ কে? হ্যারি মুখ ফিরিয়ে দেখল সেই লোকটি ওদের কাছে চলে এসেছে। হ্যারি হাত তুলে মারিয়াকে দেখাল। লোকটি বেশ আশ্চর্য হলো মারিয়াকে দেখে। বলল, ইনি তো মহিলা। তার ওপর অসুস্থ। সিনার্কার সৈন্যরা এঁকেও বন্দী করল?

হ্যারি বলল, ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী।

আপনারা বিদেশী। লোকটি বলল।

হ্যাঁ, আমরা ভাইকিং। হ্যারি বলল।

আমার নাম রোক্কা। লোকটি বলল।

ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে হ্যারি বলল, ও ফ্রান্সিস—রাজকুমারীর স্বামী। আমি হ্যারি। রোক্কা একটু মাথা নুইয়ে নিয়ে এ অঞ্চলের ভদ্রতা দেখাল। ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না। চুপ করে মাথা নিচু করে বসে রইল। হ্যারি ভাবল রোক্কার সঙ্গে কথা বলে সময় কাটানো যাবে। জেগেও থাকা যাবে।

—রোক্কা, আপনাদের এই বন্দীদশার কারণ কী?

সে অনেক কথা। শুধু এইটুকু বলি—সিনার্কা জেনো। জেনোয়ার অধিবাসীদের আমরা জেনো বলি। কর্সিকার এই দক্ষিণ অঞ্চলে সিনার্কা তার রাজত্ব কায়েম করেছে। দরিদ্র চাষী আর জেলেদের ওপর তার অত্যাচার নিপীড়নের শেষ নেই। আমরা তাই সিনার্কার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমাদের শক্ত ঘাঁটি হলো কিছু উত্তরে সারিন-এ। এখানে সব চাষী জেলেদের বিদ্রোহী করে তুলতে আমরা এসেছিলাম। সামান্য ভুলের জন্য ধরা পড়ি। মাস ছয়েক আমরা এখানে বন্দী হয়ে আছি। একবার এখান থেকে বেরুতে পারলে সিনার্কা ও তাঁর তাঁবেদার ভূস্বামীদের কর্সিকা থেকে তাড়াবো। রোক্কা থামল। তারপর মারিয়ার চিকিৎসা কী হচ্ছে, ওরা কী করে এখানে এলো, এসব নিয়ে হ্যারির সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

শাঙ্কো সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে কখনো আস্তে আস্তে সাঁতরে সমুদ্রতীরে এল। জল থেকে উঠে শাঙ্কো বাড়িঘরের আড়ালে আড়ালে রাস্তার ধারে এল। পাথুরে

দেয়ালের আড়াল থেকে দেখল—ফ্রান্সিসরা দুর্গে ঢুকল। বুঝল, এখানে নিশ্চয়ই কোনো কয়েদঘর আছে। ফ্রান্সিসদের সেখানেই বন্দী করা হলো।

শাঙ্কো কিছুদূরের একটা চেস্টনাট গাছের আড়াল থেকে চাঁদের আলোয় দুর্গটা দেখতে লাগল। কালো পাথরের দেয়ালে দেয়ালে কোথাও কোথাও ফাটল ধরা। সবুজে শ্যাওলার ছোপ। দেখে বুঝল দুর্গটা পুরনো। তবে এদিকটা সারাই করে দেউড়িতে কাঠের বিরাট দরজা বসানো হয়েছে। শাঙ্কো বুঝল এখান দিয়ে দুর্গে ঢোকা যাবে না। শাঙ্কো চলল দুর্গটার পেছন দিকে।

দুর্গটা ঘুরে শাঙ্কো দুর্গটার পেছনদিকে এল। দেখল—পেছন দিকে পাথুরে দেয়াল ভেঙে পড়েছে। দুর্গের এই ভাঙা অংশটার নিচেই একটা খাদমতো। খুব গভীর খাদ নয়। খাদটায় গাছপালার জঙ্গল। এদিকটায় দুর্গের ভাঙা পাথরের স্তূপ। সেই ভাঙা স্তূপ জমে জমে দুর্গটার প্রায় মাথার কাছে উঠে গেছে। চাঁদের আলোয় ঐ দিকে ভালো করে নজর দিয়েও কোনো প্রহরীকে দেখল না। বুঝল—এদিক দিয়ে কেউ দুর্গে ঢুকতে পারবে না বলেই এদিকটা অরক্ষিত হয়ে আছে।

এবার শাঙ্কো খাদের বড় বড় গাছগুলোর মাথা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। চাঁদের আলোয় যতটুকু দেখতে পেল তাতে বুঝতে পারল ঐ বড় বড় গাছগাছালি বেয়ে উঠে পাথরের স্তূপের কাছে যাওয়া যাবে। তারপর ভাঙা পাথরের স্তূপের ওপর দিয়ে দুর্গের অনেকটা ওপরে ওঠা যাবে।

শাঙ্কো দ্রুত কাজে নামলো। খাদটার গায়ে গায়ে পাথরের এবড়োখেবড়ো চাঁইয়ের ওপর পা রেখে রেখে একটা বেশ উঁচুতে ডালপালা ছড়ানো ওক গাছের নিচে এল। তারপর উঁচুতে ঝুঁকেপড়া ডাল দেখে হিসেব করল। গাছটায় উঠতে লাগল। ডালপালার ফাঁক-ফোঁকড় দিয়ে যেটুকু চাঁদের আলো আসছে সেই আলোই শাঙ্কোর ভরসা। একসময় ওক গাছটার মগডালে উঠে এল। ডালটা ধরে অন্য একটা মোটা ডালে পা টিপে টিপে এগোতে লাগল। দুর্গের ভাঙা পাথরের স্তূপের কাছে এল। শাঙ্কো তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। গাছটার কাণ্ড বেয়ে বেয়েও ওকে উঠতে হয়েছে অনেকটা। একটু অপেক্ষা করে দম নিল। তারপর ঐ ডালটা ছেড়ে দিয়ে পাথরের স্তূপের ওপর নেমে এল। এখানে জ্যোৎস্না উজ্জ্বল। ও সাবধানে ভাঙা পাথরে পা রেখে রেখে দুর্গের ওপর উঠতে লাগল। তখনই দেখল বাঁ দিকের পাথরের ভাঙা সিঁড়ি নেমে গেছে। ফ্রান্সিসদের কোন ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে শাঙ্কো তো জানে না তা। ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে কিছুটা নামতেই দেখল ডানহাতি একটা জানালার মতো ফোকর। তবে ভাঙা। শাঙ্কো দেখল ভাঙা সিঁড়িগুলো থেকে ফোকরটা হাত পনেরো দূরে। এই ফাঁকটা পার হবার উপায় নেই। শাঙ্কো ওখান থেকে দু'হাতের চেটো মুখের কাছে গোল করে ফোকরের দিকে মুখ এগিয়ে ডাকল, ফ্রান্সিস—হ্যারি। ফোকরের নিচের কয়েদঘরে তখন হ্যারি আর রোক্কা মৃদুস্বরে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল। ওরা সেই ডাক শুনতে পেল না। কিন্তু ফ্রান্সিস ডাকটা অস্পষ্ট শুনল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কান পাতল। হ্যারি আর রোক্কা কথা থামিয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। আবার একটু স্পষ্ট ডাক

শোনা গেল, ফ্রান্সিস—হ্যারি। হ্যারি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। চাপাস্বরে বলল, নিশ্চয়ই শাঙ্কো।

কিন্তু কোথা থেকে ডাকছে শাঙ্কো? ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল। হ্যারি আঙুল দিয়ে ছাদের কাছে ভাঙা জানালাটা দেখিয়ে বলল—ঐখান থেকে শাঙ্কো ডাকছে।

ফ্রান্সিসও দুহাতের চেটো গোল করে বলল—শাঙ্কো—আমরা এই ঘরে।

ভাঙা জানালার নিচে শাঙ্কোর কথা শোনা গেল, অপেক্ষা করো। আমি দড়ি নিয়ে আসছি। ফ্রান্সিস হ্যারি রোক্কা তিনজনেই কথাটা শুনল।

রোক্কা বলল, কে কথা বলছে?

আমাদের এক বন্ধু—শাঙ্কো। ও যদি ঐ ভাঙা জানালা দিয়ে দড়ি নামিয়ে দিতে পারে তাহলে আমরা দড়ি বেয়ে উঠে ঐ ভাঙা জানালা দিয়ে পালাতে পারবো। হ্যারি বলল।

শাঙ্কো নিশ্চিন্ত হলো—যাক ফ্রান্সিসদের পাওয়া গেছে ভাঙা জানালার নিচের ঘরটাতে। শাঙ্কো আর দাঁড়াল না। ভাঙা পাথরের স্তূপের ওপর দিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব নামতে লাগল। ওক গাছটার কাছে এসে লাফিয়ে উঠে মগডালটা ধরল। তারপর গাছ থেকে কখনও ডাল ধরে কখনও কাণ্ড বেয়ে বেয়ে দ্রুত নিচে নেমে এল। ছুটল জাহাজঘাটের দিকে। জাহাজ থেকে মোটা কাছি আনতে হবে।

রাস্তা দিয়ে নয়—শাঙ্কো বাড়িঘরদোরের আড়ালে আড়ালে গাছ ঝোপ পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে বেশ দ্রুত ছুটে এল জাহাজঘাটে। চাঁদের আলোয় দেখল—নোঙরকরা ওদের জাহাজটাকে মাঝখানে রেখে দুটো যুদ্ধজাহাজ দাড়িয়ে আছে—এখানে যুদ্ধজাহাজকে বলে ফেল্লুকা। সৈন্যদের হাঁটুঝুল কাপড়ের পোশাককে বলে কাপট। শাঙ্কো ঠিক করল ওদের জাহাজ থেকেই লম্বা কাছি আর দড়ির মই নেবে। তার আগে ফেল্লুকা দুটোর নোঙরের দড়ি কেটে দিতে হবে যাতে ফেল্লুকা দুটো বাতাসের ধাক্কায় আস্তে আস্তে গভীর সমুদ্রের দিকে চলে যায়। বাতাস সমুদ্রের দিকেই বইছে। আস্তে আস্তে ফেল্লুকা দুটো ভেসে গেলে ভেতরের সৈন্যরা বুঝতেই পারবে না।

শাঙ্কো দেখল জাহাজঘাটের এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে নজরদার মিনারের ওপারের আগুনও স্তিমিত। একটা অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে শাঙ্কো সেখান দিয়ে গুঁড়ি মেরে গিয়ে সমুদ্রের জলে নামল। জলে কোনো শব্দ না তুলে চলল বাঁদিকের ফেল্লুকার দিকে। ফেল্লুকার কাছে এসে চাঁদের আলোয় দেখল—মাত্র একজন কাপটপরা সৈন্য ডেক-এ ঘোরাফেরা করছে। শাঙ্কো জলে ডুব দিয়ে ফেল্লুকার নোঙরবাঁধা কাছিটার কাছে আস্তে জল থেকে মাথা তুলল। তারপর কোমর থেকে ছোরাটা খুলল। ধারালো ছোরার কয়েকটা পোঁচেই নোঙরের কাছি কেটে গেল। ফেল্লুকাটা আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল গভীর সমুদ্রের দিকে।

শাঙ্কো কোমরে ছোরা গুঁজে এ পাশের ফেল্লুকার দিকে নিঃশব্দে জল ঠেলে চলল। নোঙরের কাছির কাছে এল। কাছিটা দেখে ওর মনে হলো এই কাছিটাই

নিয়ে গেলে ভালো হয়। ও এই কথা ভেবে জলে ডুব দিল। কাছিটার গায়ে হাত দিয়ে দিয়ে বেশ নিচে নেমে এল। তারপর ছোরা বের করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাছিটা কাটল। কোমরে ছোরা গুঁজে আস্তে জলের ওপর মাথা তুলল। তখনই নজরে পড়ল ফেল্লুকার পেছনে হালের কাছে মইটা ঝুলছে। কাঠের ছোট ছোট ধাপবাঁধা দড়ির মইটা বেশ শক্তপোক্ত। ওদের দড়ির মইয়ের চেয়ে অনেক ভালো আর লম্বাও।

শাঙ্কো ফেল্লুকার পেছনে হালের কাছে নিঃশব্দে এল। হালের কাঠের খাঁজে খাঁজে পায়ের ভর রেখে রেখে পেছনের ডেক-এ উঠে এল। ছোরা বের করল। দ্রুত হাতে মইটা যে লম্বা দড়ির সঙ্গে বাঁধা সেটা কেটে ফেলল। নোঙরের বাঁধা কাছিটা কেটে ছোরাটা কোমরে গুঁজল। কাটা কাছির মুখটা কোমরে জড়ালো। তারপর দড়ির মইয়ের মুখের দড়িটা হাতে নিয়ে হালের মইয়ের প্রথম ফাঁকটায় বাঁ হাত গলিয়ে কাঁধে আটকে নিল। কাছির মুখটাও বাঁ হাতে ধরল। ডান হাতটা দিয়ে জল টেনে টেনে আস্তে আস্তে সাঁতরে চলল তীরের দিকে। মই আর লম্বা কাছি টেনে আনতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। তবে দূরত্ব কম বলে কিছু পরেই সব নিয়ে তীরে উঠল। কাছির সবটা কোমরে পেঁচিয়ে নিল। শাঙ্কোর শরীর দেখাল পিপের মতো। মইটা দ্রুত হাতে ভাঁজ করে করে গুটিয়ে কাঁদে ফেলে শাঙ্কো চলল সেই দুর্গের পেছন দিকে। এতক্ষণে সমুদ্রের জোর হাওয়ায় শাঙ্কোর জলে ভেজা শরীর শীত শীত করে উঠল। একবার মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। সমুদ্রের ওপর পাতলা সাদাটে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখল ফেল্লুকা দুটো অনেক দূরে ভেসে যাচ্ছে।

দুর্গের পেছনে যখন এল তখন আকাশের দিকে তাকাল—রাত শেষ হতে কত দেরি? দেখল—চাঁদ আর তারাগুলোর আলো ম্লান হয়ে এসেছে। বুঝল—রাত বেশি নেই। শাঙ্কোরা তো জাহাজে জাহাজেই ঘুরে বেড়ায়। দিন রাতের আকাশ দেখে ওরা মোটামুটি সময় হিসেব করতে পারে।

কাছি আর মই নিয়ে বেশ কসরৎ করে শাঙ্কো ওক গাছটার ডাল থেকে পাথরের স্তূপের ওপর নামল। সাবধানে পা ফেলে ফেলে ভাঙা সিঁড়িগুলোর কাছে এল। তারপর আগের মতই হাতের তেলো গোল করে ডাকল, ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

উৎকণ্ঠায় ফ্রান্সিস তখন ভাবছে—শাঙ্কো কি ওদের পালাবার উপায় বের করতে পারবে?

শাঙ্কোর ডাক শুনেই ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরের মতোই বলল, শাঙ্কো? শাঙ্কো তখন চাঁদের ম্লান আলোয় চারদিকে তাকাতে লাগল। দেখল দুটো বড় বড় পাথরের পাটাতন সিঁড়ির ওপর পড়ে আছে। শাঙ্কো মইয়ের একমুখের টানা দড়িটা দিয়ে পাথর দুটোয় পেঁচিয়ে বাঁধল। তারপর মইয়ের অন্য মুখটা দুহাতে ছুঁড়ে দিল ভাঙা-জানালার ফোকরের দিকে। কিন্তু ফোকর দিয়ে গলে গেল না মইয়ের মাথাটা। পাথরে ঠক্‌ঠক্ শব্দ তুলে নিচে গড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কো সাবধান হলো। কোনোরকম শব্দ হওয়া

চলবে না। মইয়ের মুখটা টেনে তুলল। বার কয়েক মইয়ের মাথাটা শূন্যে ঘুরিয়ে জোরে ছুঁড়ে দিল ভাঙা ফোকরটার দিকে। এবার মুখটা ফোকরের মধ্যে দিয়ে গলে গেল। শাঙ্কো মইটা ছাড়াতে লাগল। মইয়ের মাথাটা নিচে নামতে নামতে মেঝের কাছে চলে এল। তখন ফ্রান্সিস হ্যারি রোক্কা তিনজনই ছুটে এল মইয়ের কাছে। ফ্রান্সিস মইয়ের মাথাটা কয়েকবার জোরে টানল। দেখল মইটা যথেষ্ট শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। এবার ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে মারিয়ার কাছে এল। মারিয়ার কানের কাছে মুখ এনে ডাকল মারিয়া—মারিয়া। মারিয়া চোখ খুলল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—আমরা পালাব। তোমার কষ্ট হবে, কিন্তু দাঁত চেপে তোমাকে কষ্ট সহ্য করতে হবে। কোনোরকম শব্দ করবে না।

মারিয়া ঠোঁট একটু ফাঁক করে দুর্বলস্বরে বলল—আচ্ছা।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে পিঠ আর হাঁটুর কাছে ধরে ধরে ঘাসের বিছানা থেকে তুলল। তারপর মারিয়াকে বাঁ কাঁধে শুইয়ে নিল। এই ঝাঁকুনিটা যত কমই হোক আর ফ্রান্সিস সাবধান থাকা সত্ত্বেও মারিয়ার কাশি এল। শুরু হলো মারিয়ার দমবন্ধ-করা কাশি। ভেন তাড়াতাড়ি মারিয়ার পিঠে হাত দিয়ে চেপে চেপে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস এক পাও নড়ল না। মারিয়াকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের মধ্যে মারিয়া কাশলে ভয়ের কিছু নেই। মারিয়া এর আগেও কেশেছে—পাহারাদার সৈন্যরা শুনতেও পেয়েছে। কিন্তু ঐ ভাঙা জানালার কাছে উঠে কাশলেই বিপদ হবে। সেই কাশির শব্দ পাহারাদারদের কানে গেলে ওদের সন্দেহ হবেই। সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। এই কয়েদঘর থেকে মুক্তির আর কোনো আশাই থাকবে না। মারিয়ার কাশি কমল। তবু ফ্রান্সিস নড়ল না। মশালের আলোয় হ্যারি দেখল—দুচোখ বন্ধ করে ফ্রান্সিস স্থির দাঁড়িয়ে আছে। ওর ঘামে-ভেজা মুখ মশালের আলোয় চক্‌চক্ করছে। একদিকে মারিয়ার জন্যে দুশ্চিন্তা অন্যদিকে পালাবার এই সুবর্ণ সুযোগ এবং শেষ সুযোগ—ফ্রান্সিসের মনে কী ঝড়ের তোলপাড় চলছে হ্যারি সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারল। মারিয়ার কাশি বন্ধ হলো। মারিয়া মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে কাঁধে নিয়ে আস্তে আস্তে মইয়ের দিকে এগোল। মইয়ের কাঠে পা রেখে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল। ততক্ষণে ভাইকিংরা রোক্কার বিদ্রোহী বন্ধুরা সবাই দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগল ফ্রান্সিস কী অসীম ধৈর্য আর মনের জোরে সব কষ্ট সহ্য করে এক-পা এক-পা করে মই দিয়ে উঠছে। ভাইকিং বন্ধুদের কয়েকজনের চোখে জল এল। সবাই মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল—ফ্রান্সিস যেন সফল হয়।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মারিয়াকে নিয়ে উঠতে লাগল। একসময় ভাঙা জানালার ফোকরের নিচের পাথরে পা রাখল। পাথরগুলো জোড়ের জায়গায় ভেঙে গিয়ে বেশ আলগা হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস ডান পা'টা রেখেই বুঝল সেটা। পা'টা নামিয়ে আনল। হিসেব করে পায়ের চাপ দিতে হবে। জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় ও ডানদিকের জোড়া পাথরটায় ডান পা'টা রেখে পায়ের চাপ আস্তে আস্তে বাড়াতে লাগল। সাবধানে। বেশি নড়ে গেলে ভারসাম্য রাখতে পারবে না। কাঁধে প্রায় অজ্ঞান

মারিয়ার শরীরের চাপও রয়েছে। পাথরটা বেশি সরে গেলে ভারসাম্য হারিয়ে দুজনকেই ছিটকে পড়তে হবে সামনের হাতপনেরো অন্ধকার ফাঁকটার মধ্যে। তারপর অন্ধকারে নিচে কোথায় আছড়ে পড়বে। দুজনেরই মৃত্যু অবধারিত। ফ্রান্সিস মৃত্যুর চিন্তাটাকে অগ্রাহ্য করল মনে মনে। ওসব চিন্তা মনটাকে দুর্বল করে দেবে। শরীরটাকেও। এখন সবচেয়ে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস। এই অন্ধকারে ফাঁকটায় পেতে রাখা দড়ির মই দিয়ে পার হতেই হবে।

দু একবার জোরে ডান পায়ের চাপ দিল পাথরটায়। পাথরটা নড়ে উঠলেও খুলে বেরিয়ে আসার মত আলগা হয়ে যায়নি। ডান পায়ে চাপ দিয়ে ভর রেখে বাঁ দিকের পাথরটায় বাঁ পা রাখল। আস্তে। চাপ দিয়ে দেখল ওটার জোড়টা বেশ শক্ত। পাথরটা নড়লোই না। নিশ্চিন্ত হয়ে ফ্রান্সিস ওটায় বাঁ পা রেখে মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে দাঁড়াল। ওর নাক দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে তখন। কাঁধে প্রায় অচেতন মারিয়ার শরীরের ভার। আবার হাতে সময় নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে।

ফ্রান্সিস সামনের দিকে তাকাল। হাত পনেরো অন্ধকার গহ্বরমত জায়গাটার ওপর শাঙ্কো টান টান দড়ির মইটা পেতে রেখেছে। সিঁড়ির মত কাঠের ফালি বাঁধা দুটো শক্ত দড়িতে। ঐ কাঠের ফালিগুলোতে পা রেখে রেখে অন্ধকার গহ্বরমত জায়গাটা পার হলেই পাথরের সিঁড়ি। ওপরের দিকে উঠে গেছে। সিঁড়িতে শাঙ্কো হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ির ওপরটায় পাথরের দরজা। দরজার পাল্লা নেই। ভেঙে গেছে নিশ্চয়ই। ওপরে বোধহয় দুর্গের খোলা ছাদ। কারণ ওখান দিয়ে সামনের সিঁড়িতে পাথুরে দেয়ালে চাঁদের আলো কোনাকুনি পড়েছে। অতি দ্রুত ফ্রান্সিস এসব ভেবে নিল।

ফ্রান্সিস একটু দম নিল। তাকাল ঐ একফালি চাঁদের আলোটার দিকে। তাকিয়ে ওর হঠাৎ মনে হল কে যেন সাদা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। এরকম সুতোর কাজ করা পোশাক পরেও অনেকদিন যাকে গীর্জার উৎসবে যেতে দেখেছে। ফ্রান্সিসের শরীরটা একটু কেঁপে উঠল। চোখ বুঁজে অস্ফুটস্বরে ডাকল—মা। ওর মনের জোর অনেক বেড়ে গেল। ও চোখ খুলে নিচু হল। প্রায় হামা দিয়ে কাঠের ধাপগুলোয় কখনও পা রেখে কখনও হাঁটু চেপে চেপে ও অন্ধকার গহ্বরমত জায়গাটা পার হতে লাগল। পিঠে মারিয়ার নাক মুখ দিয়ে গরম শ্বাস পড়ছে। মারিয়ার শরীরও গরম। বেশ জ্বর। মারিয়া দু হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে। কিন্তু জ্বরের ঘোরে হাত আলগা হয়ে যেতে পারে। গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে। শরীরে একটা আলতো ঝাঁকুনি দিয়ে দু তিনটে ধাপ দ্রুত পার হয়েই শেষ ধাপটাও পার হল। তখনই শাঙ্কো দুহাতে ওর বাহু ধরল। পাথরের সিঁড়ির দিকে টেনে আনল। ফ্রান্সিস পাথরের সিঁড়িতে দু পা রাখল। শাঙ্কো নিচু হয়ে বসল। ফ্রান্সিস ওর কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে শাঙ্কোর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস তখন জোরে জোরে মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে অস্ফুটস্বরে ডাকল—মারিয়া। কোন উত্তর নেই। আবার ডাকল—মারিয়া।

—উঁ। মারিয়া মুখে গোঙানির মত শব্দ করল।

ফ্রান্সিস বলল—তোমার কষ্ট হয় নি তো? মারিয়া কোন কথা বলল না। এতক্ষণে ফ্রান্সিস বুঝল ওর পিঠে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। মারিয়া নিঃশব্দে কাঁদছে। পিঠের ওখানটার পোশাক ভিজে গেছে যেন।

ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। মারিয়ার কাশি উঠলে ভয়ানক বিপদ হবে। পাহারাদাররা শুনতে পারে।

শাঙ্কো তখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। ফ্রান্সিসও মারিয়াকে কাঁধে নিয়ে উঠতে লাগল। দুর্গের ছাদে উঠে শাঙ্কো এগিয়ে চলল। ফ্রান্সিসও পিছু পিছু চলল। এখানে ওখানে ভাঙা পাথরের পাটাতন ছড়িয়ে আছে। সেইগুলোর ওপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলল। অসাবধান হলে পায়ের চাপে পাথর নড়ে যেতে পারে পাও পিছলে যেতে পারে।

শাঙ্কো তো জায়গাটা চেনে। ও ফ্রান্সিসের আগেই খাদের ধারে চলে এল। এখানেই ও কাছিটা কোমর থেকে খুলে রেখেছিল। কাছির একটা মুখ টেনে বাঁধলো একটা পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে তারপর কাছিটা খাদে ঝুলিয়ে দিল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে নিয়ে ততক্ষণে এসে পড়েছে।

শাঙ্কো বলল, ফ্রান্সিস, আমিই না হয় রাজকুমারীকে কাঁধে নিয়ে নামি।

ফ্রান্সিস শুধু বলল, আমি পারবো। তারপর মারিয়াকে কাঁধে নিয়ে কাছিটা ধরল। বলল, মারিয়া এবার কষ্ট হলেও আমাকে ভালো করে আঁকড়ে ধরো। মারিয়া দুর্বল শরীরের আর কতটা জোর পাবে। তবু জোরে আঁকড়ে ধরল ফ্রান্সিসকে। ফ্রান্সিস বলল, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আরো জোরে ধরো। একটুক্ষণ। আমরা মুক্তির দোরগোড়ায়। মারিয়া আরো জোরে আঁকড়ে ধরল। ফ্রান্সিস খাদের ওখানে পাথরে পা রেখে রেখে কাছি বেয়ে বেয়ে বেশ দ্রুতই নেমে এল। বুঝল মারিয়া এত জোরে বেশিক্ষণ ধরে থাকতে পারবে না। এখানটায় পাথর কম। ম্লান চাঁদের আলোয় একটা ঘাস-ঝোপে-ঢাকা জায়গায় মারিয়াকে শুইয়ে দিল। তারপর পাশে নিজে শুয়ে পড়ল। মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল।

হাপাচ্ছে তখন কয়েদঘরে সবাই এতক্ষণ মই বেয়ে পালিয়ে যাওয়া দেখছিল। হ্যারি যখন বুঝল মারিয়াকে নিয়ে ফ্রান্সিস পালাতে পেরেছে তখন রোক্কার দিকে তাকাল। বলল, রোক্কা, ফ্রান্সিস নিরাপদে পালাতে পেরেছে। এখন আপনাকে সবার আগে পালাতে হবে। পালিয়ে গিয়ে প্রথম আপনাকে রাজকুমারীর ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এখন রাজকুমারীকে সুস্থ করে তোলার আগে পর্যন্ত আমরা কিছু ভাবতে পারছি না। আমাদের কারো মনে এখন শান্তি নেই। রোক্কা একটু ভাবল। বলল, কথাটা ঠিকই বলেছেন।

ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই অসুস্থ রাজকুমারীকে নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে। কারণ, ফ্রান্সিস এখানকার কিছুই চেনে না। হ্যারি বলল।

খুবই স্বাভাবিক। রোক্কা বলল। একটু ভেবে নিয়ে রোক্কা বলল, কিন্তু আর দেরি করা যাবে না। রোক্কা এবার দুহাত ওপরে তুলে নিঃশব্দে হাতের ইঙ্গিতে

সবাইকে কাছে আসতে বলল। সবাই এসে রোক্কাকে ঘিরে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়াল। রোক্কা লো ল্যাতিন ভাষায় নিজের দলের লোকেদের বলল, বন্ধুরা—এরা ভাইকিং —বিদেশী। এই কর্সিকা দ্বীপের কিছু ওঁরা চেনেন না। তোমরা ওঁদের আন্তরিকভাবে সাহায্য করবে এই আমার নির্দেশ। কারণ—এঁদের যেটুকু পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে নির্দ্বিধায় বলতে পার এঁরা শুধু সৎ ও বিবেকবান নন—বীর ও দুঃসাহসী। একটু থামল রোক্কা। তারপর বলল, আমাদের আর দেরি করা উচিত হবে না। তোমরা এই ভাইকিং বন্ধুদের নিয়ে বার্গ পাহাড়ে আমাদের আস্তানায় চলে যাবে। আমি পরে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। রোক্কা থামল। তারপর হ্যারিকে বলল, আপনি আপনার বন্ধুদের আবার কথাগুলো বুঝিয়ে বলে দেবেন। এবার সবাই পালাবার জন্যে তৈরি হও। বলেই রোক্কা মইটার কাছে গেল। মই বেয়ে দ্রুত উঠতে উঠতে চাপা গলায় বলল, কোনো গোলমাল যেন না হয়। হ্যারি বন্ধুদের রোক্কার নির্দেশ বুঝিয়ে বলল। রোক্কা মই বেয়ে উঠে ফাঁকের জায়গাটা পার হয়ে ভাঙা পাথরের স্তূপের ওপর এল। শাঙ্কো একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে আত্মগোপন করে চারদিকে নজর রাখছিল। এবার এগিয়ে এসে ঝোলানো কাছিটা আঙুল দিয়ে দেখাল। রোক্কা দ্রুত কাছি বেয়ে খাদে নামল। ফ্রান্সিস রোক্কাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। রোক্কা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, রাজকুমারীকে নিয়ে চলুন। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হলো। মারিয়াকে আস্তে আস্তে দুহাতে তুলে পাঁজাকোলা করে রোক্কার পেছনে পেছনে চলল। তখনই দেখল, পুব আকাশে লাল রং ধরেছে। সূর্য উঠতে দেরী নেই। চিন্তা হলো বন্ধুরা সূর্য ওঠার আগেই পালাতে পারবে কিনা। কিন্তু এখন আর ফিরে বন্ধুদের সাহায্য করার কথা ভাবতে পারল না। মারিয়ার জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। রোক্কা বসতি এলাকা এড়িয়ে ঝোপঝাড় পাথুরে এলাকা দিয়ে চলল। পেছনে মারিয়াকে নিয়ে ফ্রান্সিসও যতটা সম্ভব দ্রুত ছুটল।

প্রায় আধঘন্টা পরে রোক্কা একটা কাঠ আর পাথরে তৈরি বাড়ির পেছনে এল। পেছনে পাথরের দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের দরজা। রোক্কা দরজাটা বার কয়েক ধাক্কা দিল। দরজা খুলে গেল। সাধারণ পোশাকপরা একটি যুবক মুখ বাড়িয়ে রোক্কাকে দেখে হাসল। মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল। রোক্কা ফ্রান্সিসকে ইশারা করে ঢুকে পড়ল। ফ্রান্সিসও ঢুকল। রোক্কা দুপাশের ঘর ছাড়িয়ে টানা বারান্দা দিয়ে বাইরের ঘরটায় এল। কয়েকটা কাঠের তক্তা পেতে বিছানা করা। বালিশও আছে। রোক্কা ফ্রান্সিসকে হাতের ইঙ্গিতে মারিয়াকে শুইয়ে দিতে বলল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিল। রোক্কা যুবকটিকে বলল, শীগগির বৈদ্যমশাইকে আসতে বলো। যুবকটি ছুটে চলে গেল।

ফ্রান্সিস তক্তাপাতা বিছানায় বসল। হাঁপাতে লাগল। হঠাৎ ফ্রান্সিস মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। মারিয়া চোখ খুলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটো দারুণ লাল। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। ও বুঝে উঠতে পারল না কী করবে এখন? মারিয়া চোখ বুঁজল। অসাড় হয়ে শুয়ে রইল।

রোক্কার সঙ্গে একজন বয়স্ক লোক ঢুকলেন। তাঁর গায়ে রোক্কার মতোই দামী

পোশাক। তিনি বেশ দ্রুতই বিছানায় বসলেন। মারিয়ার কপালে হাত দিলেন। চোখ টিপে ধরে চোখের নিচটা দেখলেন। গোড়ালির কাছে হাত দিয়ে টিপে ধরলেন। রোক্কাকে বললেন, রোগীকে একটু পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দাও। লো ল্যাতিন ভাষা। ফ্রান্সিস বুঝল না। রোক্কা স্পেনীয় ভাষায় ফ্রান্সিসকে বলল কথাটা। ফ্রান্সিস মারিয়াকে ধরে আস্তে আস্তে বলল, বৈদ্যমশাই তোমাকে পরীক্ষা করবেন। একটু পাশ ফিরে শোও। মারিয়া পাশ ফিরতে গেলে ফ্রান্সিস সাহায্য করল। বৈদ্যমশাই মারিয়ার পিঠে আঙুল পেতে অন্য আঙুলে বেশ কয়েকবার ঠুকলেন। ফ্রান্সিসকে ইঙ্গিতে সোজা করে শোয়াতে বললেন। কয়েকটা নির্দেশ দিলেন। তারপর চুপ করে বসে রইলেন। কেউ কোনো কথা বলল না। একটু পরে যুবকটি একটা ছোট চিনেমাটির বাটিতে সবজে রঙের জল নিয়ে এল। তখনই মারিয়ার কাশি উঠল। আবার সেই কষ্ট, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে কাশতে কাশতে। মারিয়া মাথা এপাশ ওপাশ করতে লাগল। ফ্রান্সিস অসহায়ের মতো মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কাশি কমল। একটু পরে কাশি বন্ধ হলো। মারিয়া মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস বৈদ্যর মুখের দিকে তাকাল। দেখল বৈদ্যমশাইয়ের কপালে চিন্তার রেখা। উনি একদৃষ্টিতে মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। এবার ফ্রান্সিসকে ইঙ্গিতে ওষুধটা খাইয়ে দিতে বললেন। ফ্রান্সিস ওষুধের বাটিটা মারিয়ার মুখের কাছে এনে বলল, মারিয়া একটু কষ্ট করে এই ওষুধটা খাও। অসুখ সারবে। ফ্রান্সিস বাঁ হাতে মারিয়ার মাথাটা তুলে ধরল। মারিয়া চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ওষুধটা খেয়ে নিল। মুখ বিকৃত করল। বোঝা গেল ওষুধটা বিস্বাদ। মাথাটা বালিশে নামাল ফ্রান্সিস। বৈদ্যমশাই একটুক্ষণ বসে থেকে উঠলেন। মৃদুস্বরে ডাকলেন—কামেরাত। যুবকটি এগিয়ে এলো। কামেরাতকে কী নির্দেশ দিলেন। এবার রোক্কা জিজ্ঞেস করল, কেমন দেখলেন? বৈদ্যমশাই লো ল্যাতিন ভাষায় বললেন, নিশ্চয়ই আগে কিছু ওষুধ পড়েছিল। নইলে উনি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতেন। বৈদ্যমশাই চলে গেলেন।

উৎকণ্ঠিত ফ্রান্সিস বলল—রোক্কা, বৈদ্যমশাই কী বললেন?

রোক্কা আসল কথা না বলে একটু হেসে বলল, বললেন অসুখ সেরে যাবে। তবে কয়েকদিন ওষুধ পড়তে হবে। ফ্রান্সিস একটু আশ্বস্ত হলো। মারিয়া চোখ বন্ধ অবস্থাতেই শুয়ে রইল। ফ্রান্সিস বুঝল না মারিয়া কথাটা শুনেছে কি না।

কামেরাত একটি মোটা কাপড় নিয়ে এল। মারিয়ার গায়ে ঢাকা দিল গলা পর্যন্ত। তারপর চলে গেল। রোক্কা বলল, আমি একটু আসছি। রোক্কা চলে গেল। একা ফ্রান্সিস মারিয়ার শিয়রে বসে রইল। ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল, বন্ধুরা কেউ তো জানতেই পারল না আমরা এখানে আছি। রোক্কাকে বলতে হবে ওদের খবর দেবার জন্যে।

ওদিকে কয়েদ ঘর থেকে রোক্কার বিদ্রোহী সৈন্যরা আর ভাইকিংরা মই বেয়ে পালাতে লাগল। ভাইকিংরা দশ-পনের জন আর কয়েকজন রোক্কার বিদ্রোহী সৈন্য পালিয়েছে তখন। এত জনের নড়াচড়া মই বেয়ে ওঠায় বেশ শব্দ হতে লাগল।

তখনই দেখা গেল ভাঙা জানালা থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ল। পাথরটা মাঝের বিছানা ঘেঁষে পড়ল। আবার জোর শব্দ তুলে পাথরটা ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেল। পাহারাদার জেনো সৈন্যদের সন্দেহ হলো। ওরা লোহার দরজা খুলে দ্রুত কয়েদঘরে ঢুকল। মশালের আলোয় মই দেখেই ওরা বুঝল কিছু কয়েদী পালিয়েছে। রোক্কাও পালিয়েছে। দুজন পাহারাদার সৈন্য নিরস্ত্র ভাইকিংদের ওপর তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাইকিংরা কয়েকজন আহত হলো। অন্য সৈন্য দু'জন তরোয়াল চালিয়ে চালিয়ে মইয়ের দড়ি কেটে দিল। বাকি ভাইকিংদের আর রোক্কার বিদ্রোহী সৈন্যদের একজনের পালানো হলো না। কয়েদ ঘরে তালা লাগিয়ে পাহারাদার সৈন্যরা চলে গেল।

ভাঙা সিঁড়িটার কাছে দাঁড়িয়েছিল শাঙ্কো। কয়েদঘরে গোলমাল, পাহারাদার সৈন্যদের চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনেই বুঝল—ওরা টের পেয়েছে। বোধহয় মইয়ের দড়িও কেটে দিয়েছে। আর কারো পালানোর সম্ভাবনা নেই।

শাঙ্কো ভাঙা পাথরে পা রেখে রেখে যতটা দ্রুত সম্ভব খাদে নেমে এল। মুক্ত বন্ধুরা এসে শাঙ্কোকে জড়িয়ে ধরল। শাঙ্কো বলল, বন্ধুরা, এখনও সব বন্ধু পালাতে পারেনি। পাহারাদার সৈন্যরা টের পেয়ে মইয়ের দড়ি কেটে দিয়েছে। এক্ষুণি আমাদের জাহাজে যেতে হবে। অস্ত্র এনে লড়াই করে বাকি বন্ধুদের মুক্ত করতে হবে।

হ্যারি বলল, কিন্তু জেনো সৈন্যদের যুদ্ধজাহাজ দুটো আমাদের জাহাজের দুপাশেই রয়েছে।

শাঙ্কো একটু হেসে বলল, আমি দুটো জাহাজেরই নোঙর-বাঁধা দড়ি কেটে দিয়েছি। দুটো জাহাজই এখন মাঝ-সমুদ্রে। এখানকার পাহারাদার আর কিছু সৈন্য হয়তো এখন আছে। ওদের লড়াই করে হারাতে অসুবিধে হবে না। এই সুযোগ। আর দেরি নয়। সব জাহাজঘাটায় চলো।

ওরা দল বেঁধে ছুটল জাহাজঘাটার দিকে। শাঙ্কো যে পাথুরে মাটি ঝোপঝাড়ের এলাকা দিয়ে জাহাজঘাটায় এসেছিল সেই জায়গা দিয়েই বন্ধুদের নিয়ে চলল। বসতি এলাকা থেকে দূরে।

জাহাজঘাটায় এসে চাঁদের আলোয় দেখল সত্যি শুধু ওদের জাহাজটাই ভাসছে। জেনোদের যুদ্ধজাহাজ দুটো নেই। বোঝা গেল—ঐ দুই জাহাজের সৈন্যরা এখনও বোধহয় বুঝতে পারেনি যে ওদের জাহাজ জাহাজঘাটা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে।

শাঙ্কো হ্যারিরা দ্রুত কাঠের পাটাতন দিয়ে ওদের জাহাজে উঠল। দ্রুত ছুটল অস্ত্রঘরের দিকে।

অস্ত্রঘর থেকে তরোয়াল নিয়ে ওরা ডেক-এ উঠে এল। শাঙ্কো নিয়ে এল ওর তীর ধনুক।

জাহাজ থেকে নামতেই দেখল তিনচারজন জেনো সৈন্য জাহাজঘাটার দিকে ছুটে আসছে। ওরা বোধহয় ওদের ফেলুকা মানে যুদ্ধজাহাজ দেখতে না পেয়েই ছুটে আসছিল।

সামনেই অস্ত্র হাতে শাঙ্কোরা। শুরু হলো লড়াই। তখন চাঁদ আর তারার আলো নিস্তেজ হয়ে আসছে। ভোর হতে দেরি নেই। লড়াই চলল। বিস্কোর নিপুণ তরোয়াল চালানো দেখে জেনো সৈন্যরা বুঝল এদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনজন জেনো সৈন্য আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। গোঙাতে লাগল। শেষেরটির হাতের তরোয়াল বিস্কোর একটা জোরালো মার ঠেকাতে গিয়ে তখন ছিটকে গেছে। সেই সৈন্যটি সঙ্গে সঙ্গে ছুটল দুর্গের দিকে।

দুর্গের সামনে যখন ওরা এলো তখন সকালের রোদ পড়েছে দুর্গের কাল্চে পাথুরে গায়ে। কাছে এসে দেখল সদর দেউড়ির সামনে খোলা তরোয়াল হাতে জেনো সৈন্যরা আট-দশ জন দাঁড়িয়ে আছে। সবার সামনে সেই দলপতি। হ্যারি চিৎকার করে বলল, দাঁড়াও। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যারি বলল, শাঙ্কো, পায়ে তীর ছুঁড়ে কয়েকটাকে ঘায়েল কর। বুকে মেরো না। বন্ধুদের উদ্ধার করাই আমাদের লক্ষ্য—অকারণ নরহত্যা আমরা চাই না।

শাঙ্কো পাথুরে রাস্তায় বাঁ হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর নিশানা স্থির করে তীর ছুঁড়ল দলপতির দিকে। দলপতি তরোয়াল ফেলে দু'হাতে হাঁটু চেপে বসে পড়ল। শাঙ্কো আর একটা তীর ছুঁড়ল। ওটা দুর্গের কাঠের দরজায় গিয়ে বিঁধে গেল। আবার দ্রুতহাতে তীর ছুঁড়ল শাঙ্কো। আর একজন সৈন্যের ডান হাতে লাগল তীরটি। সে তরোয়াল ফেলে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটা চেপে ধরল। এবার জেনো সৈন্যদের মধ্যে ভয় ঢুকে গেল। ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। তারপর ছুটে পালাতে লাগল দুর্গের ডানপাশে। একটু পরেই ওদের আর দেখা গেল না। গাছগাছালির আড়াল দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল ওরা।

হ্যারি সঙ্গীদের নিয়ে ছুটে দুর্গের সদর দেউড়িতে এল। দেখল বিরাট কাঠের দরজাটা একটু খোলা। তার মানে ভেতরের কয়েদ ঘরের পাহারাদার সৈন্যরাও এসেছিল বাধা দিতে। শাঙ্কোর তীরে আহত একজন পাহারাদার সৈন্যের কোমরে ঝোলানো আংটায় কয়েদঘরের চাবি পাওয়া গেল। হ্যারি চাবি নিয়ে দরজা পার হয়ে কয়েদঘরের দিকে ছুটল। পেছনে বন্ধুরা।

কয়েদঘরের তালা খুলল হ্যারি। তারপর জোরে ধাক্কা দিয়ে লোহার দরজা খুলেই চিৎকার করে বলল-বন্ধুরা পালিয়ে এসো। বন্দী ভাইকিংরা ছুটে এল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল, তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। সবাই ছুটে দুর্গের বাইরে এল। এবার কোথায় যাবে ওরা? হ্যারি দেখল রোকার একজন বিদ্রোহী সৈন্য মাত্র মুক্ত বন্ধুদের দলে আছে। হ্যারি ছুটতে ছুটতে সেই সৈন্যটিকে লো ল্যাতিন ভাষায় বলল, রোক্কা আমাদের যেতে বলেছে তোমাদের বার্গ পাহাড়ের আস্তানায়। আমাদের সেখানে নিয়ে চলো।

সৈন্যটি বলল, রোকার নির্দেশ মানার জন্যেই আমি আগে পালাইনি। চলুন। কিন্তু সদর রাস্তা দিয়ে নয়। অন্যদিক দিয়ে যেতে হবে। সেই সৈন্যটি সবার সামনে এসে ছুটতে লাগল।



পাথর ছড়ানো অসমতল জায়গা দিয়ে, পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে গাছ-গাছালির আড়ালে আড়ালে ওরা ছুটতে লাগল বার্গ পাহাড়ের দিকে।

বেশ কিছুটা আসার পর দূর থেকে দেখল ওরা ধুলো উড়িয়ে রাস্তা দিয়ে কারা যেন আসছে। সৈন্যটি সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিকে বলল, সবাইকে ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়তে বলুন। হ্যারি একটু গলা চড়িয়ে কথাটা বলেই নিজেও একটা কাঁটাঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ল। সবাই এখানে-ওখানে ছোট ঝোপঝাড়ের আড়ালে শুয়ে পড়ল।

দূর থেকে প্রথমে সিনার্কার গাড়িটা দেখা গেল। তারপর অশ্বারোহী সৈন্যরা। পরে পদাতিক সৈন্যরা। স্পষ্ট দেখা গেল না। কিন্তু সৈন্যটি সিনার্কার গাড়ি দেখেই চিনল। সিনার্কার সৈন্যরা চলে যেতে বিদ্রোহী সৈন্যটি হ্যারিকে বলল, বোধহয় সারিনের লড়াইয়ে সিনার্কা আমাদের সৈন্যদের কাছে হেরে গেছে।

আবার ছোটা শুরু হলো। কিছুক্ষণ পরে দূরে একটা ছোট পাহাড় দেখিয়ে রোক্কার সৈন্যটি বলল, ঐ যে বার্গ পাহাড়। দেখা গেল পাহাড়টায় গাছগাছালি বিশেষ নেই। হ্যারিরা চলল ঐ বার্গ পাহাড় লক্ষ্য করে। বার্গ পাহাড়টায় নিচে এসে দেখা গেল বেশ ঘন জঙ্গল। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ফিরে গাছের নুয়ে পড়া ডালপালা সরিয়ে ওরা রোক্কার বিদ্রোহী সঙ্গীটির পেছনে পেছনে একটা বিরাট পাথরের চাঁইয়ের সামনে এল। বিদ্রোহীটি মুখ নামিয়ে কী যেন বলে উঠল। পাথরের চাঁইয়ের আড়াল থেকে দু'তিন জন যোদ্ধা তরোয়াল হাতে বেরিয়ে এল। ভাইকিংদের দেখে ওরা বেশ আশ্চর্য হল। তারপরেই হ্যারিদের সশস্ত্র দেখে ওরা থমকে দাঁড়াল। বিদ্রোহী সঙ্গীটি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ওদের কী বলল। ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে এবার হাসল। হাতের ইশারায় হ্যারিকে ডেকে ওদের পেছনে পেছনে আসতে ইঙ্গিত করল। ভাইকিংরা ওদের পেছনে পেছনে চলল। পাথরের চাঁইটার নিচে দিয়ে গুড়ি মেরে সবাই একটা বেশ বড় লম্বাটে গুহায় ঢুকল। দেখল-জনা পঁচিশেক বিদ্রোহী সৈন্য শুয়ে বসে আছে। এটাই তাহলে বিদ্রোহীদের আস্তানা। হ্যারি হাঁপাতে হাঁপাতে পাথুরে মেঝেয় বসে পড়ল। অন্য ভাইকিং বন্ধুরাও হাঁপাচ্ছে তখন। ওরাও বসে পড়ল। এই সকালেও গুহাটা কেমন অন্ধকার অন্ধকার।

ওদিকে রোক্কা যা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটল।

সেদিন সকালে কয়েকজন ভাইকিং বিদ্রোহীদের আস্তানা সেই গুহা থেকে বেরিয়ে এল। পাহারাদার বিদ্রোহী সৈন্যটি তখন সকালের খাবার খেতে গুহার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। কেউ ছিল না গুহা মুখে। ভাইকিং বা কয়েকজন বাইরে এসে গুহার মুখের কাছে বিরাট পাথরের চাঁইটার ওপর আস্তে ওঁচানো পাথর খোদলে পা রেখে রেখে চাঁইটার ওপর উঠল। চারদিকে ঝক্‌ঝকে রোদ সবই দেখতে পাচ্ছিল ওরা। বার্গপাহাড়ের মাথার দিকে সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু নিচে গভীর জঙ্গল। ওরা দেখে আশ্চর্য হল যে বড় বড় ফার্ণ গাছের সংখ্যাই এই বনে বেশি। অনেক দূরে বোনিফেসিওর পাথরের বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। দুর্গটাতো ভালোভাবেই

দেখা যাচ্ছে। তবে জাহাজঘাটা দেখা যাচ্ছে না। দুর্গের আড়ালে পড়ে গেছে। তবে অস্পষ্ট হলেও সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

ভাইকিংরা কিছু পরেই পাথরের চাঁইটা থেকে নেমে এল। গুহায় ঢুকল। হ্যারি মেঝেয় একটা মোটা কাপড় পেতে শুয়েছিল। ওদের দেখে বলল—কোথায় গিয়েছিলে। ভাইকিং বন্ধুদের একজন বলল—এই গুহার দম-বন্ধ-করা অন্ধকার ভালো লাগছিল না। তাই বাইরে গিয়েছিলাম।

—বাইরের বনটা সত্যই সুন্দর। আর একজন ভাইকিং কি বলল।

তখনই গুহার পাহারাদার ছুটে হ্যারির কাছে এল। পাহারাদার জানে যে একমাত্র হ্যারিই লো ল্যাতিন ভাষা বোঝে। পাহারাদার এসে হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল—আপনার বন্ধুরা বাইরে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। হ্যারি বলল।

পাহারাদার বলল—আপনার বন্ধুরা এটা ভালো করেনি।

—কেন বলুন তো? হ্যারি জানতে চাইল।

—সারিনের লড়াইয়ে আমাদের বিদ্রোহী দলের কাছে হেরে গিয়ে সিনার্কা ক্ষেপে আগুন হয়ে গেছে। এই বোনিফেসিও আর ধারে কাছে সব জায়গায় সব সময়ের জন্যে গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছে। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র আমরা সাবধান হয়ে গেছি। কিন্তু এসময় গুহার আস্তানা থেকে আপনার বন্ধুরা না জেনে বাইরে গেছে। যদি সিনার্কার কোন গুপ্তচরের নজরে পড়ে থাকে তবে আমরা বিপদে পড়ে যাবো। তখন এই গুহার মত ভালো আস্তানা ছেড়ে পালাতে হবে। নতুন আস্তানা খুঁজে নিতে হবে। আত্মরক্ষার সময় নাও পেতে পারি। আমাদের দলের ভীষণ ক্ষতি হতে পারে। পাহারাদার বিদ্রোহী যোদ্ধাটি বলল।

হ্যারি কিছু বলতে পারল না। কারণ যা ঘটবার ঘটে গেছে। আসলে ভাইকিং বন্ধুরা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারে নি। হ্যারি সেই কথাটাই বলল শুধু। তারপর বলল—তাহ'লে এখন তো আমাদের সব সজাগ থাকতে হবে।

—তা তো বটেই পাহারাদারটি বলল।

সারাটা দিন কিছু ঘটল না। বিকেল থেকে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল। গুহার আস্তানায় গুমোট গরমে সবাই অস্থির হয়ে উঠল। সন্ধ্যে হতেই শুরু হল ঝড়। সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। গুহার বাইরের বন এলাকার গাছগাছালির মাতামাতির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছিল না। ঐই গুপ্তচরের কাছে খবর পেয়ে সিনার্কার আদেশে তার যোদ্ধারা বিদ্রোহীদের ঐ গুহার আস্তানা ঘিরে ফেলেছিল সন্ধ্যের আগেই। ঝড়জল শুরু হতে ওরা জঙ্গল ঝোপঝাড়ে শব্দ তুলে বিরাট পাথরের চাঁইটার কাছে এল। এখানেই গুপ্তচরটি হ্যারির বন্ধুদের দেখেছিল। ঝড়জলের মধ্যেই সিনার্কার যোদ্ধারা আস্তানাটা খুঁজতে লাগল। কিছু পরে পেয়েও গেল। গাছগাছালির আড়াল থেকে সেই দলপতি ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ঝাপসা দেখল দু'জন পাহারাদার খোলা তরোয়াল হাতে গুহামুখ পাহারা দিচ্ছে। তারা ঝড়জলের শব্দের মধ্যে বুঝতেই পারে নি সিনার্কার যোদ্ধারা প্রায় গুহামুখে চলে এসেছে। ওরা পাহারা দিতে লাগল।

দলপতি চারজন যোদ্ধার কানের কাছে মুখ এনে ব'লে গেল—ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ দুই পাহারাদারকে নিকেশ করো। ঠিক তখনই আকাশে বিদ্যুৎ চম্‌কাল। সেই আলোর ঝলকানির সঙ্গে সঙ্গে চারজন সিনার্কার সৈন্য পাহারাদার দুই বিদ্রোহী যোদ্ধার ওপর ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিদ্রোহী পাহারাদার দু'জন আক্রমণ, হতেই চিৎকার করে উঠল। কিন্তু তখনই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। সেই চিৎকারের শব্দ গুহার মধ্যে বিদ্রোহীরা কেউ শুনতে পেল না। পাহারাদার দু'জন সিনার্কার যোদ্ধাদের হাতে প্রাণ হারাল।

এবার সিনার্কার যোদ্ধারা দলবেঁধে গুহার মুখে এসে দাঁড়াল। গুহার মধ্যে তখন বিদ্রোহী যোদ্ধারা ভাইকিংরা শুয়ে বসে আছে। বাইরে জলঝড়ের শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দই ওদের কানে যাচ্ছিল না।

হ্যারি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। হ্যারি বুঝেছিল ওর বন্ধুদের কোন না কোন গুপ্তচর নিশ্চয়ই দেখেছে আর সহজেই বুঝে নিয়েছে এমন জায়গা বিদেশীরা এলে কী করে? নিশ্চয়ই এখানে বিদেশীদের অথবা বিদ্রোহীদের আস্তানা আছে। এই আশঙ্কা থেকে হ্যারি ভাইকিং বন্ধুদের বলে রেখেছিল কেউ তরোয়াল হাতছাড়া করবে না। সবাই হাতের কাছে তরোয়াল রাখবে। এমনকি রাতে ঘুমোবার সময়ও।

সিনার্কার যোদ্ধারা গুহায় ঢোকামাত্র হ্যারি ঠিক বুঝতে পারল। হ্যারি গুহার মুখের দিকে তাকিয়েই বসেছিল। হ্যারি লাফিয়ে উঠল। চীৎকার করে বলে—বন্ধুরা—তৈরি হও। লড়াই।

হ্যারির কথা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাইকিং বন্ধুরা তরোয়াল হাতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবার হ্যারি লো ল্যাতিন ভাষায় বলে উঠল—বিদ্রোহী বন্ধুরা—সিনার্কার সৈন্যরা গুহায় ঢুকছে লড়াই।

সিনার্কার যোদ্ধাদের প্রথম আক্রমণের ধাক্কাটা ভাইকিংরা সামলাল। ততক্ষণে বিদ্রোহীরাও অস্ত্র হাতে নিচ্ছে। কিন্তু সবাই অস্ত্র হাতে নেবার আগেই সিনার্কার যোদ্ধাদের হাতে মারা গেল।

গুহাটা এমন কিছু বড় নয়। কাজেই তরোয়াল চালিয়ে লড়াই করতে অসুবিধে হচ্ছিল। গুহায় ততক্ষণে জোর লড়াই চলছে। এক ফাঁকে হ্যারি ছুটে গিয়ে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে একটার পর একটা মশাল মেঝেয় ফেলে দিতে লাগল। মশালগুলো মেঝেয় পড়ে যেতেই গুহাটা অন্ধকার হয়ে গেল। এবার হ্যারি চিৎকার করে বলল বন্ধুরা—গুহার পেছন দিকে ছুটে চলো। ওখানে যে পাথরখণ্ডটা রয়েছে সেটা সরিয়ে সবাই গুহার বাইরে চলে যাও। তারপর অন্ধকারে হ্যারি চেঁচিয়ে বলল—বিদ্রোহী বন্ধুরা—আমার বন্ধুরা যা করছে আপনারাও তাই করুন।

গুহাটা তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। দু'টো মশাল মেঝেতে পড়ে গিয়েও নিবু নিবু হয়ে জ্বলছিল। ভাইকিংরা দ্রুত গুহার পেছন দিকে ছুটল। বিদ্রোহী বন্ধুরাও অন্ধকারে আন্দাজে বুঝে নিয়ে ভাইকিংদের পেছনে পেছনে ছুটল। সিনার্কার যোদ্ধারা অন্ধকারে নিজেদের মধ্যেই তরোয়াল চালাতে লাগল। বুদ্ধিমান হ্যারি ওদের দেশের ভাষায় বন্ধুদের কীভাবে পালাতে হবে বলেছে। সিনার্কার সৈন্যরা কিছুই বোঝে

নি। আবার লো ল্যাতিন ভাষায় বিদ্রোহীদের শুধু বলেছে ভাইকিং বন্ধুদের অনুসরণ করতে। এটা শুনে সিনার্কার সৈন্যরা এলোপাথারি তরোয়াল চালাচ্ছে।

সবার আগে হ্যারিই গুহার শেষ মাথায় এল। অন্ধকারে দেখল—একটা বড় পাথর গুহা মুখে বসানো। হ্যারি চিৎকার করে বলল—বন্ধুরা—পাথর সরাও। ভাইকিং বন্ধুরা কয়েকজন তরোয়াল কোমরের ফেট্টিতে গুঁজে গুহার মুখের পাথরটা সরাল। এবার সবাই দ্রুত বেরিয়ে আসতে লাগল। বাইরে তখন ঝড়বৃষ্টির প্রচণ্ডতা কমে এসেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তারই আলোয় গাছ ঝোপঝাড় দেখে দেখে ভাইকিংরা আর বিদ্রোহীরা পালাতে লাগল।

বড় বড় গাছগুলো তখনও ঝড়ের বেগে মাথা নাড়ছে। বৃষ্টি কমে এসেছে। আকাশে থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। চারদিকে তাই নানারকম শব্দ আর বিদ্যুতের ঝলক। এসবের মধ্যে দিয়ে গাছ ঝোপঝাড় লতাপাতার মধ্যে দিয়ে ভাইকিংরা আর বিদ্রোহীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটল।

হঠাৎ বনজঙ্গল শেষ। সামনেই পাথুরে প্রান্তর। হ্যারি চিৎকার করে বলল—থামো। ভাইকিংরা দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখে দেখে বিদ্রোহীরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যারি বুঝেছিল সিনার্কার সৈন্যরা জাতযোদ্ধা। বিদ্রোহীরা সুদক্ষ যোদ্ধা নয়। গুহার অপরিসর জায়গায় তরোয়ালের লড়াই লড়ে বিদ্রোহীরা সিনার্কার সৈন্যদের হারাতে পারবে না। কাজেই এই অবস্থায় পালিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

বিদ্যুতের আলোয় হ্যারি গালকাটা বিদ্রোহী সৈন্যটিকে খুঁজল। এই গালকাটা বিদ্রোহীটাই ওদের পথ দেখিয়ে এনেছিল। হ্যারি দেখল সেই বিদ্রোহী সৈন্যটির বাঁ হাতে তরোয়ালের কোপ পড়েছে। তখনও বৃষ্টিভেজা বাঁ হাতটা থেকে রক্ত পড়ছে। হ্যারি তাকে বলল—এখন আর ঐ গুহায় আস্তানায় ফিরে যাওয়া যাবে না। অন্য কোথাও আস্তানা নেওয়ার জায়গা আছে? গালে কাটা দাগ বিদ্রোহীটি বলল— এই পাথুরে প্রান্তরের শেষে একটা গ্রাম মত আছে। আপাতত ওখানেই কোন বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে। এভাবে উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজে কী হবে।

—ঠিক—হ্যারি বলল—তাহ'লে ঐ গ্রামেই চলো।

পাথুরে প্রান্তরটা পেরোতে পেরোতেই ভোর হয়ে এল। বৃষ্টি থেমে গেছে তখন। মাঝে মাঝে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

গ্রামের মানুষেরা তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছে। মেঘ-ভাঙা রোদ পড়ল গ্রামটির পাথর-মাটির বাড়িগুলোয়। দাঁড়িয়ে পড়ল সেই গালকাটা বিদ্রোহীটি। কাঠের দরজায় কয়েকবার থেমে থেমে টোকা দিল। দরজা খুলে গেল। একজন মধ্যবয়স্ক লোক দরজা খুলে দাঁড়াল। তার গায়ে রোকার মতই রঙীন জোব্বামত। গালকাটা বিদ্রোহীটিকে দেখে আর অন্য বিদ্রোহী আর ভাইকিংদের দেখে লোকটি খুবই বিব্রত হল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। গালকাটা বিদ্রোহীটি বলল—আপনার কোন ভয় নেই। শুধু দুপুর পর্যন্ত আপনার বাড়িতে আমরা থাকবো। জামা কাপড় শুকিয়ে নিয়ে কিছু খাওয়াদাওয়া করে আমরা চলে যাবো। এতে আপনার কোন

বিপদ হবে না।

—বেশ—আসুন। লোকটি সরে দাঁড়াল। সবাই বাড়িটার প্রশস্ত-উঠোনে এল। ডানদিকে একটা বেশ বড় লম্বাটে ঘর। ঘরে ঢুকে দেখা গেল একপাশে—ডাঁইকরা শস্যদানা। অন্যপাশটা ফাঁকা। সেই ফাঁকা জায়গায় সবাই বসে পড়ল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। সবাই ভীষণ ক্লান্ত তখন। আহত কয়েকজনের কষ্টই বেশি হচ্ছিল।

কিছু পরে চারপাঁচজন লোক খাবার নিয়ে ঢুকল। গোল রুটি আর নানা আনাজপত্রের তরকারিমত। সবাই খেতে লাগল। খিদেও পেয়েছিল সকলের। অনেকেই আরো রুটি চেয়ে নিল।

সকাল থেকেই মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠল। বেশ চড়া রোদ। সকলে বাইরের প্রান্তরে এসে দাঁড়াল। যতটা সম্ভব পোশাক শুকিয়ে নিল।

দুপুরে পাখির মাংসের ঝোল লম্বাটে রুটি খেল সকলে। একটু বেলা হতেই সেই গালকাটা বিদ্রোহীর নির্দেশে সবাই সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। উত্তরমুখো হাঁটতে শুরু করল। কিছুদূর যেতেই ওরা দেখল বার্গ পাহাড়ের দিক থেকে কে ঘোড়ায় চড়ে আসছে।

কাছে এল সবাই দেখল ওদেরই বিদ্রোহী বন্ধু একজন। ঘোড়া থামিয়ে বন্ধুটি সেই গাল-কাটা বিদ্রোহীটির কাছে এল। বলল—আমি রোক্কার নির্দেশ তোমাদের জানাতে এসেছি। রোক্কা বলেছে তোমরা বার্গের গুহাতেই ফিরে গিয়ে আস্তানা করো। তবে এখন থেকে খুব সাবধানে সর্বক্ষণ নজরদারি চালাতে হবে যেন সিনার্কার সৈন্যদের সঙ্গে ভালো লড়াই চালানো যায়।

অগত্যা রোক্কার নির্দেশ মেনে সবাই ফিরে চলল বার্গ পাহাড়ের আস্তানার দিকে।

বেলা বাড়তে লাগল। কামারেত হাতে একটা জলের পাত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল। ইঙ্গিতে ওষুধটা মারিয়াকে দিতে হবে জানাল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মারিয়ার মাথার পেছনে হাত দিল। বলল, মারিয়া ওষুধটা খেয়ে নাও। ফ্রান্সিস মাথাটা তুলে ধরল। কামারেত মারিয়াকে একটু জল খাওয়াল। তারপর শুকনো পাতায় মোড়া দু'টো কালো রঙের বড়ি বের করল। মারিয়াকে খাইয়ে দিল। তারপর আবার জল খাওয়াল। মারিয়া পাত্রের সবটা জলই খেয়ে ফেলল। বোঝা গেল ওর যথেষ্ট জল তেষ্টা পেয়েছিল।

তখনই রোক্কা ঘরে ঢুকল। বলল, ফ্রান্সিস, আপনি ও রাজকুমারী এ বাড়িতেই থাকবেন। বেলা হলো। আপনি খেতে চলুন। ফ্রান্সিস আস্তে বলল, মারিয়া তো না খেয়ে আছে। ওকে আগে কিছু খেতে দিন। রোক্কা কামারেতকে বলল সে কথা। কামারেত কী বলে চলে গেল। রোক্কা বলল, রাজকুমারীকে এখন শক্ত খাবার খেতে দেওয়া হবে না। স্যুপ, ফলের রস এসব এই কামারেতই খেতে দেবে।

তাহলে মারিয়ার খাওয়া হোক। তারপর আমি খাবো। ফ্রান্সিস বলল। তখনই কামারেত দুটো বড় চিনেমাটির বাটি নিয়ে দ্রুত ঘরে ঢুকল। হেসে রোক্কাকে কী বলল। রোক্কা খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠল। হাসতে হাসতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে

বলল, সারিনে আমার বিদ্রোহী বন্ধুদের কাছে যুদ্ধে হেরে গেছে সিনার্কা। সিনার্কা পরাজিত সৈন্যদের নিয়ে ফিরে আসছে। কথাটা বলে রোক্কা ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল।

ফ্রান্সিসের তখন এসব ভাববার মতো মনের অবস্থা নেই। ও মারিয়াকে তখন ধরে ধরে আস্তে আস্তে উঠিয়ে বসাল। পিঠে ঘাড়ে হাত দিয়ে ধরে থাকল। ফ্রান্সিস বলল, মারিয়া, একটু খেয়ে নাও। মারিয়া বন্ধ চোখ খুলে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল মারিয়ার চোখের সেই লালচে ভাবটা নেই। গায়ের গরম ভাবটা অনেক কম। কামারেত আস্তে আস্তে মারিয়াকে স্যুপ আর ফলের রস খাইয়ে দিল। মারিয়াকে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল। মারিয়া চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল।

তখনই রাস্তায় শোনা গেল ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। লোকজনের কথাবার্তা। ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। রোক্কার পেছনে দাঁড়িয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল। একটা ছাদখোলা ঘোড়ায় টানা গাড়ি আসছে। গাড়িটা কালো রঙের। তাতে রুপোলি লতাপাতা ফুলের কাজ করা। গাড়িতে বসে আছে একজন প্রৌঢ়। মাথার কাঁচাপাকা চুল এলোমেলো। কপালে নেমে এসেছে। গায়ে বেশ দামী কাপড়ের হলুদ রঙা জোব্বামতো। বেশ ধুলো কাদা লেগে আছে পোশাকে। গম্ভীর থমথমে মুখে বসে আছে পোশাকে। রোক্কা ফিসফিস করে বলল, এখানকার সামন্তরাজা সিনার্কা। আস্তে আস্তে গাড়িটা চলে গেল। পেছনে পাঁচ ছ'টা ঘোড়ায় চড়া জেনো সৈন্য। কাপট-পরা। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মুখ-চোখ সৈন্যদের। তাদের পেছনে পদাতিক সৈন্যরা। ক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারা সব। পোশাক ছেঁড়া। ধুলো-কাদা মাখা। আস্তে আস্তে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে গেল ওরা। ফ্রান্সিস দরজার কাছ থেকে সরে এল।

বিকেল নাগাদ মারিয়ার শরীরের অবস্থা অনেকটা ভালো হলো। কামারেত এসে মারিয়াকে ওষুধ খাওয়াল। মারিয়া ওষুধ খাওয়ার সময় চোখ খুলে উঠে বসে ওষুধ খেল। কামারেত মারিয়ার কপালে গলায় হাত বুলিয়ে হেসে ফ্রান্সিসকে বলল, এখন উনি অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। ফ্রান্সিস কথাটা বুঝল না। সেই ল্যাতিন ভাষা। তবে কামারেতকে হাসতে দেখে বুঝল মারিয়া ভালো আছে। কামারেত চলে গেল। রোক্কা তখনও ফিরে আসেনি।

সন্ধ্যের সময় বৈদ্যমশাই এলেন। সঙ্গে রোক্কা আর সেই কামারেত। বৈদ্যমশাই মারিয়াকে পরীক্ষা করে রোক্কার দিকে হেসে তাকালেন। বললেন, এত তাড়াতাড়ি উনি বিপদ কাটিয়ে উঠবেন ভাবিনি। যা হোক—আর কোনো ভয় নেই। খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রাম। দু'তিন দিনের মধ্যেই উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন। রোক্কা হেসে কথাগুলো ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস আনন্দে কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। দ্রুত এগিয়ে এসে বৈদ্যমশাইয়ের ডানহাতটা নিজের দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে মাথা নোয়াল। অনেক কষ্টে চোখের জল আটকাল। তারপর মারিয়ার দিকে তাকাল। দেখল মারিয়া খুশি চোখে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

বৈদ্যমশাই মৃদুস্বরে কামারেতকে কী নির্দেশ দিলেন। তারপর চলে গেলেন।

কামারেতও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

ফ্রান্সিস এবার রোক্কাকে বলল, কিন্তু আমার বন্ধুরা কি জানে আমরা এখানে আছি?

—সব খবর তাদের দেওয়া হয়েছে। শুধু আপনাদের রাজকুমারী অনেকটা সুস্থ হয়েছেন এই খবরটাও এখনও দেওয়া হয়নি। এই খবরটা আমি দিতে যাবো। আপনারা বিদেশী। সবাইয়ের এখানে আসাটা সিনার্কার সৈন্যদের নজরে পড়লে বিপদ হবে। সারিনের যুদ্ধে হেরে ওরা রেগে আগুন হয়ে আছে। রোক্কা বলল।

তাহলে এক কাজ করুন—শুধু হ্যারি নামের আমার বন্ধুটিকে আপনি আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসুন। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। রোক্কা বলল। তারপর চলে গেল।

সন্ধ্যে হলো। কামারেত একটি রুপোর মোমবাতিদানে বসানো মোটা হলুদ রঙের জ্বলন্ত মোমবাতি ঘরে রেখে গেল। ফ্রান্সিস তখনও মারিয়ার বিছানার পাশে বসে মারিয়ার ডান হাতটা ধরে আছে। ফ্রান্সিস বুঝতে পারল জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে। বেশ স্বাভাবিকভাবেই মারিয়া দু'একটা কথা বলছে তখন।

একটু রাত হলে হ্যারিকে নিয়ে রোক্কা ঘরে ঢুকল। রোক্কাকে একা দেখে ফ্রান্সিস বলে উঠল—হ্যারিকে পেলেন না?

রোক্কা বলল—সে অনেক কথা। গত রাতেই সিনার্কার সৈন্যরা আমাদের বার্গ পাহাড়ের আস্তানার খবর পেয়েছিল। হয়তো সিনার্কার গুপ্তচরেরাই সন্ধান দিয়েছিল। সিনার্কার সৈন্যরা প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আমাদের ঘাঁটি আক্রমণ করেছিল। লড়াই হয়েছিল। তবে আমাদের বিদ্রোহীরা বুদ্ধিমানের মত অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে গুহার অন্য মুখটা দিয়ে পালাতে পেরেছিল। হ্যারি আর আপনার ভাইকিং বন্ধুদের নিয়ে আমার বিদ্রোহী বন্ধুরা উত্তর দিকে পালিয়েছে। তবে বার্গ পাহাড় এলাকায় আমার দুই বন্ধুকে রেখে এসেছি। বলে এসেছি ভাইকিংদের মধ্যে হ্যারিকে দেখলে যেন তাকে সঙ্গে নিয়ে এখানেই আসে।

—লড়াই যখন হয়েছে তখন হত আহত হয়েছে কিছু। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—তা হয়েছে। সিনার্কার সৈন্যরাও আমাদের বিদ্রোহী যোদ্ধারাও। তবে ভাইকিংরা কেউ হত আহত হয়েছে কিনা সে খবর পাইনি। রোক্কা বলল। তারপর বলল—আমার আর এক বন্ধুকে পাঠিয়েছি পলাতক বিদ্রোহীদের কাছে যেতে। আমি বলে দিয়েছি—সবাই আবার বার্গপাহাড়ের গুহার ঘাঁটিতে ফিরে আসতে। পাহারা জোরদার করতে বলেছি। যেন আবার আক্রান্ত হবার আগে যেন সবাই তৈরি থাকতে পারে। মনে হয় আমার নির্দেশ পেলে আজকে সন্ধ্যের আগে ওরা বার্গের ঘাঁটিতে ফিরে আসতে পারবে। রোক্কা বলল।

পরের দিন রাতে রোক্কা হ্যারিকে নিয়ে মারিয়ার ঘরে ঢুকল। হ্যারি ঘরে ঢুকে দেখল মারিয়া দুর্বলস্বরে ফ্রান্সিসের সঙ্গে কথা বলছে। হ্যারি এত খুশি হলো যে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস হেসে হ্যারির পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে বলল, হ্যারি, মারিয়ার বিপদ কেটে গেছে।

হ্যারি আনন্দে কোনো কথা বলতে পারল না।

হ্যারি আর রোক্কা মারিয়ার বিছানার পাশে বসল। রোক্কা বলল, রাজকুমারী এখন কেমন আছেন? মারিয়া অল্প হেসে বলল, অনেকটা ভালো।

—ভালো হতেই হবে। সারা কর্সিকায় এই বৈদ্যমশাইয়ের যে কী সুনাম আপনারা তা কল্পনাও করতে পারবেন না। রোক্কা বলল। মারিয়া একটু হেসে বলল, এই কর্সিকা দ্বীপকে পুরনো দিনের নাবিকরা বলত 'সুগন্ধির দ্বীপ'। তাই না? রোক্কা বেশ আশ্চর্য হলো। বলল, কত দূরে আপনাদের দেশ অথচ এই ছোট্ট দ্বীপটার কথাও আপনি জানেন দেখছি। আপনি সত্যিই বিদুষী। মারিয়া হেসে বলল, না-না—তেমন কি আর। আমাদের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু প্রাচীন হাতে লেখা গ্রন্থ আছে। সে সব পড়েই জেনেছি। একটু থেমে মারিয়া বলল, তবে কর্সিকার অতীত ইতিহাসে দেখা গেছে বিভিন্ন শক্তিমান জাতি শত্রু হিসেবে এই কর্সিকাকে আক্রমণ করেছে। কেউ বন্ধু হিসেবে আসেনি।

ঠিক বলেছেন—রোক্কা মাথা ওঠানামা করে বলল। তারপর বলল, কর্সিকাবাসীদের জীবনে তাই বোধহয় বন্ধুত্ব ভালোবাসার স্থানটা কম। আমাদের জীবনে মৃত্যুটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভেনদেত্তা কথাটা আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন।

হ্যাঁ—খুনোখুনির বদলা নেওয়া। মারিয়া বলল।

ঠিক। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেও এই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বংশের সবাইকে হত্যা করা এখানে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। এখানে পেশাদার কাঁদুনেরা আছে। তাদের ভাড়া করে আনা হয়। মৃতের জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে কাঁদে। কান পাতলে অনেক বাড়ি থেকে এই কান্নার শব্দ শুনতে পাবেন। আমাদের গানও তাই বোধহয় বড় বিষাদের। বড় বেদনার। সেখানে আনন্দের স্থান নেই।

সকলেই চুপ করে রইল। রোক্কার কণ্ঠস্বরে যে বেদনার সুর ছিল অভিযাত্রীদের মন স্পর্শ করল। ওরা আর কথা বলতে পারল না। রোক্কা একটু পরে বলল, একজন রানীর কাহিনী আপনাদের বলি। তাঁর নাম ইসাবেলা। প্রায় একশো বছর আগের কথা। এই দক্ষিণ কর্সিকার রাজা ছিলেন তখন দ্বিতীয় জেমস। এখানে নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের জন্যে মূল ভূখণ্ডের জেনোয়া ও পিসার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল অনেক কাল ধরে। দ্বিতীয় জেমস এই দ্বন্দ্ব মেটাবার জন্যে জেনোয়াবাসী ও পিসাবাসীদের এখানকার অনেক অংশ দিয়ে দিয়েছিলেন। সিনার্কারা ছিল জেনো মানে জেনোয়ার অধিবাসী। আজকের সিনার্কাদের পূর্বপুরুষরা তখন এখানে ঘাঁটি গাড়ে। রাজা দ্বিতীয় জেমসের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়দের এক পারিবারিক বিবাদে সিনার্কারা রাজার শত্রু আত্মীয়দের সঙ্গে গোপনে যোগ দিয়েছিল। রাজা দ্বিতীয় জেমসের রানী ইসাবেলা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন শুধু রাজার আর তাঁর জীবন নয়, তাঁদের একমাত্র কন্যারও জীবন বিপন্ন। তাছাড়া পুরুষানুক্রমে রাজা জেমস এবং রানী ইসাবেলার ছিল অতি মূল্যবান রত্নালংকার। কেউ জানে না কতগুলো অলংকার। তবে লোক-প্রচলিত কাহিনী বলে তার সংখ্যা নাকি অনেক। সিনার্কাদের ভীষণ লোভ ছিল সেই রত্নভাণ্ডারের দিকে। সেই রত্নলংকার গুলো নাকি রাখা

ছিল দামি ওক কাঠের একটা পেটিকার মধ্যে। রোক্কা থামল।

তারপর? মারিয়া বলল। রোক্কা বলতে লাগল, রানী ইসাবেলা একদিন বোনিফেসিওর ঐ দুর্গে যার নিচের কয়েদঘরে আমরা বন্দী ছিলাম—সেই দুর্গে গেলেন। ওপরের দিকের দুটি কক্ষ দেখলেন এবং সেইদিন থেকেই তাঁর নির্দেশে ঐ দুইটির একটি কক্ষে খাদ্য, আনাজপত্র এবং দীর্ঘদিনেও নষ্ট হয় না এমন ম্যাকুয়েস-দানা, সেজ আলু, জলপাই প্রচুর রাখা হলো। সেইসঙ্গে জলের বেশ বড় কয়েকটি পিপে। খুবই গোপনে বিশ্বস্ত কিছু প্রাসাদরক্ষীরা করল এসব। তারপর একদিন গভীর রাতে রানী তাঁর ঘুমন্ত কন্যাকে নিয়ে দুর্গের সেই কক্ষ দুইটির একটিতে আশ্রয় নিলেন। কথা ছিল রাজা জেমসও রাজকোষের স্বর্ণমুদ্রা একত্র করে নিয়ে পালিয়ে সেই কক্ষে আশ্রয় নেবেন। কিন্তু শেষ রাতে সিনার্কারা অর্থ দিয়ে প্রাসাদরক্ষীদের বশীভূত করে জেনো সৈন্যদের নিয়ে প্রাসাদ আক্রমণ করল। রাজা জেমস বন্দী হলেন। হয়তো তিনি প্রাণে বেঁচে যেতেন। হয়তো তাঁকে জেনোয়ায় নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখা হতো। কিন্তু ঐ যে বললাম, ভেনদেত্তা—রাজা জেমস-এর আত্মীয়রা রাজাকে হত্যা করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করল। রোক্কা থামল।

আর রানী ইসাবেলা ও রাজকুমারী? ফ্রান্সিস বলল।

রানী ইসাবেলা রাজা জেমসের মৃত্যুসংবাদ পেয়েই দুর্গরক্ষীদের আদেশ দিলেন ঐ ঘর দুটি থেকে নামার সিঁড়িটা ভেঙে ফেলতে। রক্ষীরা অবাক হয়ে গেল। ওরা বুঝল না—রানী ইচ্ছে করে কেন এভাবে নিজেকে ও রাজকুমারীকে নিয়ে স্বেচ্ছানির্বাসন নিচ্ছেন। রানী ক্রুদ্ধ হলেন। আবার জোরের সঙ্গে আদেশ দিলেন। অগত্যা দুর্গরক্ষীরা লোহার বড় বড় শাবল সংগ্রহ করে সিঁড়ির পাথরগুলোর খাঁজে খাঁজে চাড় দিয়ে সিঁড়িটা সম্পূর্ণ ভেঙে দিল। রানীও সিঁড়িতে নামার কাঠের দরজাটা চিরদিনের জন্যে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। দেখলে মনে হবে দুটি ঘরই যেন শূন্যে ঝুলছে। আপনারা পালাচ্ছিলেন, কাজেই ঘর দুটো লক্ষ্য করেননি। রোক্কা থামল।

আর সেইসব রত্নালংকারগুলো? ফ্রান্সিস বলল।

ঐ দুটো ঘরের কোথাও আছে হয়তো। রোক্কা বলল।

হয়তো বলছেন কেন? হ্যারি বলল।

একটা ঘরের একটিমাত্র গরাদ দেওয়া জানালা আছে। পশ্চিমদিকে খাড়া দুর্গের দেওয়ালের গায়ে। এত উঁচুতে যে মাটি থেকে ওখানে ওঠা অসম্ভব। কাজেই ঐ ঘর দুটোয় যাওয়া এবং খোঁজ করার কথা কেউ কল্পনাও করেনি। রোক্কা বলল।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল, দুর্গের ওপরটা যতটা দেখেছি তাতে বলতে পারি ওপর থেকে দড়ি বেয়ে নেমে বোধহয় ঐ জানালাটায় পৌঁছানো যায়। রোক্কা বলল, হ্যাঁ আমি শুনেছি পরে নাকি সিনার্কার নির্দেশে দু'জন দু'বার ওপর থেকে দড়ি বেয়ে নেমে জানালার লোহার গরাদ ভেঙে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দু'জনই জানালায় গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে রানী ইসাবেলা ছোরা মেরে দু'জনকেই ফেলে দিয়েছে নিচের পাথরের চত্বরে। দু'জনেই শেষ।

তারপরেও কি ওভাবে চেষ্টা করা হয়নি? ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ হয়েছে—অনেক বছর পরে। সেই লোকটা জানালার কাছে এসে গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল। তখনই জানালার ওপর থেকে বড় পাথরের টুকরো খসে পড়েছিল ওর মাথায়। লোকটা তীর খাওয়া পাখির মতো খসে পড়েছিল জানালা থেকে নিচের পাথরের চত্বরে। তারপরেও হয়তো লুকিয়ে-টুকিয়ে কেউ কেউ চেষ্টা করে থাকবে। হাজার হোক অত মূল্যবান রত্নভাণ্ডার। কিন্তু কেউ গরাদ ভেঙে ঢুকতে পারেনি। গরাদসহ জানালাটা এখনও অটুট আছে। রোক্কা থামল।

ফ্রান্সিসরা কেউ কোনো কথা বলল না। তিন জনেই সমস্ত ঘটনাটা ভাবছে তখন। একসময় ফ্রান্সিস বলল, দুর্গটা, জানালাটা ভালো করে দেখতে হবে। কিন্তু দেখতে গেলে তো আবার কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবে। আমরা তো বিদেশী।

পারবেন ঐ ঘর দুটোয় ঢুকতে? রোক্কা হেসে বলল।

সব দেখেটেখে ভেবে নিয়ে বলতে পারব। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে সিনার্কাকে একবার বলে দেখতে পারেন। সিনার্কা যা অর্থপিশাচ আর লোভী ও আপনাকে ঠিক খোঁজ খবরের অনুমতি দেবে। রোক্কা বলল।

হ্যারি বলল, কী ফ্রান্সিস? চেষ্টা করবে নাকি? ফ্রান্সিস হেসে একবার মারিয়ার দিকে তাকাল। বলল, হ্যারি, অনেক অভিযানেই বেরিয়েছি বাবার অনুমতি তো নয়ই—মার অনুমতিও নিইনি। আজ কিন্তু আমি হার স্বীকার করছি। মারিয়ার অনুমতি পেলে তবেই রত্নভাণ্ডারের উদ্ধারে যাব।

মারিয়া হেসে বলল, আমি জানি আমি মানা করলে তুমি মনে কী ভীষণ কষ্ট পাবে। তুমি চেষ্টা কর—আমাকে তো দু'তিন দিন বিশ্রাম নিতেই হবে। ফ্রান্সিস প্রায় লাফিয়ে উঠল—সত্যি মারিয়া, তুমি আমার মনোভাবটা খুব সহজেই বুঝতে পারো।

রোক্কা বলল, ফ্রান্সিস, আপনি চেষ্টা করুন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু লোকে ঐ ঘর দুটোকে বলে ভূতের ঘর। অনেক অর্থের প্রলোভন দেখিয়েও সিনার্কারা কাউকে ওই জানালার কাছেও পাঠাতে পারেনি। অনেকে রাতের বেলা ঐ জানালায় মোমের অস্পষ্ট আলো দেখেছে। ফ্রান্সিস হেসে বলল, ওসব ভূতেটুতে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। আমার ভয়টা একটু কমই। আসল কথা সব কিছুকেই আমি গভীরভাবে চিন্তা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে ভাবি এবং সত্য উদ্‌ঘাটন করি। সব কথাই যাচাই করে নিতে হয়।

পরদিন সকালে মারিয়া অনেকটা সুস্থ হলো। ঘরে পায়চারি করল। ফ্রান্সিস তাই দেখে বলল, মারিয়া এবার তাহলে নিশ্চিন্তমনে সিনার্কার দরবারে যেতে পারি। মারিয়া হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ। কিন্তু দুঃখ আমি যেতে পারলাম না।"

তাতে কি! কাজে লাগলে তুমি থাকবে তখন। ফ্রান্সিস বলল।

তখন গভীর-রাত। কিছুটা সুস্থ মারিয়ার কাশি অনেক কমে গেছে। শ্বাস-প্রশ্বাস অনেক স্বাভাবিক এখন। গত কয়েকদিন ধরে উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে ফ্রান্সিসের ভালো

করে ঘুমই হতো না। আজ অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। মেঝেয় একটা মোটা কাপড় বিছিয়ে নিয়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘুমিয়ে আছে। কাঠের পাটাতনের বিছানায় মারিয়া ঘুমিয়ে আছে। মোটা মোমবাতিটা জ্বলছিল।

হঠাৎ বাড়িটার-চারদিকে কোলাহল শোনা গেল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও দ্রুত উঠে বসল। ছুটে গরাদ দেওয়া জানালাটার কাছে এল। গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখল সিনার্কার সৈন্যরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজনের হাতে জ্বলন্ত মশাল। মশালের আলোয় দেখল—প্রত্যেকটি সৈন্যের হাতে খোলা তরোয়াল। ওরা চিৎকার হৈ হল্লা করছে।

হ্যারি আর মারিয়ারও তখন ঘুম ভেঙে গেছে। দুর্বল মারিয়া বিছানা থেকে নামল না। হ্যারি ছুটে এসে ফ্রান্সিসের পাশে দাঁড়াল। মারিয়া দুর্বলস্বরে বলল—কী হয়েছে ফ্রান্সিস?—সিনার্কার কিছু সৈন্য এই বাড়িটার কাছে জড়ো হয়েছে। কিন্তু ওরা কেন এসেছে জানিনা। ফ্রান্সিস মারিয়ার কাছে আসতে আসতে বলল।

তখনই সৈন্যদের প্রচণ্ড ধাক্কায় সদর দরজাটা ভেঙে পড়ল। চিৎকার আরো বাড়ল। দড়াম করে ফ্রান্সিসদের ঘরের দরজাটা খুলে গেল। কামেরাত এক লাফে ঘরে ঢুকে বলে উঠল — শিগগির পালিয়ে যান। ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জন সৈন্য ঘরে ঢুকল। সামনের সৈন্যটি কামেরাতের মাথার ওপর তরোয়াল তুলল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ডান পা তুলে সৈন্যটার বুকে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল। সৈন্যটা ছিট্‌কে দেয়ালের গায়ে গিয়ে পড়ল। ওর হাত থেকে তারোয়ালটা ছিট্‌কে গেল। পেছনের সৈন্যটি তরোয়াল হাতে কী করবে বুঝে উঠতে পারলো না। ওরা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি ওরা এভাবে আক্রান্ত হতে পারে। ছিটকে-পড়া তরোয়ালটা ফ্রান্সিস দ্রুত তুলে নিল। রুখে দাঁড়াল। মোমবাতির আলোয় ফ্রান্সিসের ঐ ইস্পাত কঠিন ভঙ্গীতে দাঁড়ানো দেখে মারিয়া আশ্চর্য হয়ে গেল। ফ্রান্সিসের এই চেহারা তো ও কখনও দেখেনি। হ্যারি কিন্তু আশ্চর্য হল না। ফ্রান্সিসের এই ক্রুদ্ধমূর্তি ও আগেও দেখেছে। সৈন্য দু'জন তখন হতবাক দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারি বলল—তোমাদের সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম ফ্রান্সিস। ওর হাতে তরোয়াল থাকলে কেউ ওর গায়ে আঁচড়টিও কাটতে পারবে না। কাজেই লড়াইয়ে যেয়ো না। হ্যারির লো ল্যাতিন ভাষা ওরা বুঝল। পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কামেরাতও অবাক তখন।

বেশ ভীতস্বরে মারিয়া বলে উঠল—ফ্রান্সিস শান্ত হও। মারিয়ার গলার স্বর কানে যেতেই ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উদ্যত তরোয়াল নামাল। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হল ফ্রান্সিস। এতক্ষণে ফ্রান্সিস বুঝল—মারিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। এই অবস্থায় লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়া বোকামি। আস্তে আস্তে হ্যারিকে বলল—কামেরাতকে জিজ্ঞেস করো তো—রোক্কা কোথায়? হ্যারি কামেরাত ফিসফিস করে বলল সে কথা। কামেরাতও ফিসফিস করে বলল—উদতবের ঘরে আত্মগোপন করে ছিলেন। এতক্ষণে বোধহয় ধরা পড়েছেন। ফ্রান্সিসকে হ্যারি বলল সে কথা। ফ্রান্সিস হাতের তরোয়ালটা মেঝেয় ফেলে দিল। ঝনাৎ শব্দ হল। মারিয়া দুর্বল শরীরে বিছানায় বসে থাকতে

পারল না। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। হাঁপাতে লাগল।

ততক্ষণে আরো কয়েকজন সৈন্য দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস সৈন্যদের দেখে বলল—হ্যারি, কামেরাতকে বলো—লড়াই নয়—আত্মসমর্পন। তাদের থেকে দু'জন ছুটে এসে ফ্রান্সিস হ্যারি আর কামেরাতকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। ওরা কেউ বাধা দিল না। সৈন্যরা মারিয়াকে বন্দী করবে কিনা বুঝে উঠতে পারল না। হ্যারি মারিয়াকে দেখিয়ে বলে উঠল—উনি মারিয়া আমাদের দেশের রাজকুমারী। রাজকুমারী অসুস্থ। তাঁকে বন্দী করলে ফল ভালো হবে না। একজন সৈন্য এগিয়ে এসে হ্যারিকে বলল—তোমাদের রাজকুমারীকে এখন ছেড়ে দেওয়া হল। ও তো অসুস্থ। পালাতে পারবে না। মাননীয় সিনার্কার হুকুম হলে পরে বন্দী করা যাবে। তোমরা চলো।

—কোথায়? হ্যারি বলল।

—গেলেই দেখতে পাবে। একজন সৈন্য বলে উঠল। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল সব কথা। ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে। ওদের কথামতই এখন চলতে হবে।

ফ্রান্সিস দরজার দিকে যেতে যেতে বলল—মারিয়া—এখানেই থেকো। তুমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হও নি, ভয় নেই—আমরা ঠিক অক্ষত শরীরে ফিরে আসবো।।

ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে হ্যারি আর কামেরাত চলল। পেছনে তরোয়াল হাতে সৈন্যরা। ফ্রান্সিসরা চলে যেতে মারিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এক নিজের শরীরের এই অবস্থা তার ওপর ফ্রান্সিসরাও বন্দী হল। নিজেকে মারিয়ার বড় অসহায় মনে হতে লাগল। কান্নায় ওর শরীর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

ফ্রান্সিসদের নিয়ে সৈন্যরা বাড়িটার বাইরে এল। দেখা গেল খোলা তরোয়াল হাতে একদল সৈন্য দাঁড়িয়ে এবং সৈন্যদলের মধ্যে পেছনে হাত-বাঁধা অবস্থায় রোক্কা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। রোক্কার গায়ের পোশাক এখানে ওখানে ছিঁড়ে গেছে। সেখানে গায়ের ক্ষত দেখা যাচ্ছে। কপালে গলায়—কানের পাশে তরোয়ালের ক্ষতগুলো থেকে রক্ত পড়ছে। রোক্কা তখনও ভেবে পাচ্ছে না সিনার্কার সৈন্যরা কীভাবে খবর পেল যে ও এই বাড়িতে আত্মগোপন করে আছে। ফ্রান্সিস দেখে নিশ্চিন্ত হল যে বৈদ্যমশাইকে বন্দী করা হয় নি। মারিয়ার চিকিৎসার কোন ব্যাঘাত হবে না। ফ্রান্সিস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ফ্রান্সিসদের রোক্কার সঙ্গে দাঁড় করানো হল। চারদিক থেকে খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্যরা ওদের ঘিরে দাঁড়াল। তাঁদেরই দলপতি বোধহয়—তরোয়াল উঁচিয়ে হাঁটতে নির্দেশ দিল। ফ্রান্সিসদের মাঝখানে রেখে সৈন্যরা হাঁটতে শুরু করল। ফ্রান্সিসরা চলল সদর রাস্তা দিয়ে।

হাঁটতে হাঁটতে ফ্রান্সিস বলল—রোক্কা—আপনি বেশ আহত। বৈদ্যমশাইকে বলে ওষুধ লাগালে পারতেন।

রোক্কা ম্লান হেসে বলল—বৈদ্যমশাই দূরের গ্রামে রোগী দেখতে গেছেন। এখানে থাকলেও সিনার্কার সৈন্যরা ওষুধ লাগাতে দিতো না। সিনার্কা আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসির হুকুম দেবে। কথাটা শুনে ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দৃঢ়স্বরে বলল—আমি বেঁচে থাকতে নয়। রোক্কা একটু আশ্চর্য হল। ফ্রান্সিস ওর স্বজন নয় স্বদেশবাসীও নয়। ফ্রান্সিসের মুখের দিকে একবার তাকাল। মৃদুস্বরে বলল—কিন্তু আপনি আমাকে বাঁচাবেন কেন? এবার ফ্রান্সিস হাঁটতে হাঁটতে বলল—কারণ আপনি মারিয়াকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। নইলে এই বিদেশ বিভুঁইয়ে মারিয়াকে আমরা বাঁচাতে পারতাম না। আমি অকৃতজ্ঞ হতে শিখি নি। রোক্কা প্রশংসার চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

ফ্রান্সিসরা চলল। সদর রাস্তার দুপাশের বাড়িঘর নিস্তব্ধ। জনশূন্য পথে শুধু সৈন্যদের পায়ের শব্দ।

রোক্কা হঠাৎ বলে উঠল—এইবার বুঝেছি। ফ্রান্সিস রোক্কার দিকে তাকাল। রোক্কা বলল—মনে আছে আপনার—সেই দরজা একটু ফাঁক করে পরাজিত সিনার্কা আর সৈন্যদের ফিরে আসা দেখছিলাম।

—হ্যাঁ। কিন্তু দরজার অতটুকু ফাঁক দিয়ে—।

রোক্কা মাথা নেড়ে বলল—না—খুশিতে মাথার ঠিক ছিল না। হঠাৎই দরজাটা একটু বেশি ফাঁক করে ফেলেছিলাম। তখনই নিশ্চয়ই সিনার্কার সৈন্যদের কেউ আমার মুখ দেখে ফেলেছিল। আমি তখন বুঝতে পারিনি। নিজের বোকামির জন্যে আবার ধরা পড়লাম।

আপনার বিদ্রোহী বন্ধুরা কি এই সংবাদ পেয়েছে? হ্যারি বলল।

রোক্কা মাথা নেড়ে বলল—না—। একমাত্র কামেরাতকে দিয়ে এই খবর পাঠাতে পারতাম। কিন্তু সেও তো বন্দী।

—তবে এই খবর কি গোপন থাকবে—নিশ্চয়ই কালকে আপনার বন্ধুরা খবর পেয়ে যাবে। হ্যারি বলল।

রোক্কা মাথা নেড়ে বলল—উঁহু—সির্নাকা অত্যন্ত ধূর্ত—ও আমার বন্দী হওয়ার খবর কিছুতেই ফাঁস হতে দেবে না। গোপনে আমাকে মেরে ফেলবে। কথাটা শুনে ফ্রান্সিস বেশ আশ্চর্য হল। বুঝল—বিদ্রোহীদের কাছে একটা যুদ্ধে হেরে গিয়ে সিনার্কা এখন আহত বাঘের মতো ক্ষেপে আছে। অনেক ভেবে চিন্তে এগোতে হবে। কোনরকমে একটা সুযোগ পেলেই রোক্কার পালাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

সৈন্যদের পাহারায় ফ্রান্সিসরা যখন সেই দুর্গের সামনে এসে পৌঁছল তখন পূব আকাশে লালচে ছোপ লেগেছে। দুর্গের কাছাকাছি গাছে গাছে পাখির ডাক শুরু হয়েছে।

দুর্গের প্রধান প্রবেশ পথের সামনেই দেখা গেল সেই দাড়িগোঁফওয়ালা শক্তসমর্থ চেহারার দলপতি দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ পায়ের হাঁটুতে মোটা কাপড়ের পট্টি বাঁধা। শাক্কোর তীরের ক্ষত এখনও শুকোয় নি।

দলপতি বেশ খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। চিৎকার করে বলল—সৈন্যরা সব দরজার কাছে সার বেঁধে দাঁড়াও। ফ্রান্সিসদের চারপাশ থেকে সৈন্যরা দ্রুত চলে গিয়ে দুর্গের কটকের সামনে সার বেঁধে দাঁড়াল। দুর্গরক্ষীরাও স্থির হয়ে দাঁড়াল। দলপতি বলতে লাগল—মাননীয় সিনার্কার হুকুম—বিদ্রোহী

নেতাকে যে বন্দী করা হয়েছে—এই সংবাদ একেবারে গোপন রাখতে হবে। কোন সাধারণ প্রজার কানে যেন এই সংবাদ না যায়। বুঝেছো? সৈন্যরা হাতের তরোয়াল আর বর্শা উঁচু করে ধরল।—নামাও। দলপতি গলা চড়িয়ে বলল। সৈন্যরা তরোয়াল বর্শা নামাল।

কয়েকজন সৈন্য দ্রুত এসে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। ঘর ঘর শব্দে ফটকের বিরাট কাঠের দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল। দলপতি ফ্রান্সিসদের দুর্গে ঢোকাতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা দরজার দিকে চলল।

পাথুরে চত্বর পার হবার সময় হ্যারি ফ্রান্সিসকে সিনার্কার হুকুমের কথা বলল। তারপর বলল—দলপতিকে বলবো আহত রোক্কার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে।

—পাগল হয়েছো—রোক্কার প্রতি সহানুভূতি চাইলে আমাদের বিপদ বেড়ে যাবে। কোন কথা বলো না। দেখা যাক কী হয়। ফ্রান্সিস বলল।

সেই কয়েদঘরের লোহার দরজা ঘটাং-ঘং শব্দে খোলা হল। ফ্রান্সিরা কয়েদঘরে ঢুকল। দেয়ালের আটকানো মশালের আলোয় দেখল তিনজন বন্দী ঘাসের দড়ি বাঁধা বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। দরজা খোলার শব্দে দুজনের ঘুম ভেঙে গেল। একজন উঠে বসল। রোক্কাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সে চম্‌কে উঠল। ছুটে এল রোক্কার কাছে। বলল—রোক্কা—আপনি বন্দী হলেন—আমরা কি হেরে গেছি?

রোক্কা বলল—না—না। আমি আমার বোকামির জন্যে ধরা পড়েছি। খুব পরিশ্রান্ত আমি। পরে কথা হবে। রোক্কা আর কোন কথা না বলে সেই ঘাসের বিছানায় বসে দড়ি বাঁধা দুহাত মাথার দিকে তুলে শুয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস হ্যারিও বিছানায় বসল। ফ্রান্সিসও কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। কামেরাতও বসল। বন্দী দু'জন কামেরাতের পাশে বসল। ওরা নিম্নস্বরে কথা বলতে লাগল। হ্যারি চুপ করে বসে রইল। ফ্রান্সিসের মাথায় তখন নানা চিন্তা। ওদিকে মারিয়া এখনও সম্পূর্ণ সেরে ওঠেনি। বন্ধুরাও জানে না ওদের বন্দীদশার কথা। যে রোক্কার জন্যে মারিয়াকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল সেই রোক্কার নিজের জীবন আজ বিপন্ন। ফ্রান্সিসের ভাবনার শেষ নেই যেন।

তখনও ফ্রান্সিসদের কিছু খাওয়া জোটে নি।

হঠাৎই দুর্গের পাহারাদারদের মধ্যে ডাকাডাকি কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল।

একটু পরেই ঠাঠাং—ঠং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল সিনার্কা। হ্যারি আস্তে বলল—ফ্রান্সিস—সিনার্কা এসেছে। ফ্রান্সিস উঠে বসল। দেখল—এখন নানা রঙের ফুলপাতা তোলা গাঢ় নীল রঙের ঢোলাহাতা দামি কাপড়ের পোশাক সিনার্কা পরে আছে। মাথার কাঁচাপাকা চুল পরিপাটি আঁচড়ানো। চোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

গম্ভীরগলায় সিনার্কা ডাকল—রোক্কা। রোক্কা চোখ খুলল। কিন্তু শুয়েই রইল। উঠে বসল না। সিনার্কা পেছনে দাঁড়ানো দলপতির দিকে তাকাল। দলপতি সঙ্গে সঙ্গে কোমরবন্ধ থেকে তরোয়াল টেনে খুলল। দু পা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে রোক্কার হাতের কনুইয়ের ওপর তরোয়ালের খোঁচা মারল। কেটে গেল জায়গাটা।

রক্ত পড়তে লাগল। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে রোক্কা উঠে বসল। কাটা জায়গাটা হাত চেপে সিনার্কার দিকে তাকাল। সিনার্কা কেঠো হাসি হেসে বলল—এই যে বিদ্রোহী নেতা—কী ভাবে মরতে চাও বলো—ফাঁসিকাঠে না তরোয়ালের কোপে না জীবন্ত কবরে ঢুকে।

রোক্কা আস্তে আস্তে বলল—আমার কাছে সব মৃত্যুই সমান। তাছাড়া—মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য মৃত্যু তো আনন্দের গৌরবের।

—এসব বড় বড় কথা শুনিয়েই বুঝি দল বাড়িয়েছো। সিনার্কার বলল।

—দল বাড়াতে হয় নি। আপনার প্রজারা আপনার অপশাসনের জন্যে মনে মনে গর্জাচ্ছিল। তবে বিচ্ছিন্নভাবে। আমি শুধু ওদের একত্র করেছি। অর্দ্ধেক কাজ আপনিই করে রেখেছিলেন। রোক্কা শান্তভাবে বলল।

—চোপ শয়তান—সিনার্কা যেন গর্জন করে উঠল।

রোক্কা আর কোন কথা বলল না। চোখ বুঁজে চুপ করে বসে রইল।

সিনার্কার পেছনেই দাঁড়িয়েছিল একজন কাঁচাপাকা চুলদাড়িওয়ালা অমাত্য। তার গায়েও দামি কাপড়ের জোব্বা মত। নিশ্চয়ই সিনার্কার পরামর্শদাতা। লোকটি এবার একটু এগিয়ে ক্রুদ্ধ সিনার্কার কানের কাছে মুখ এনে মৃদুস্বরে বলল—এখন মাথা গরম করবেন না। তারপর বলল—রোক্কাকে বন্দী করা হয়েছে এই খবর আপনি বেশিদিন গোপন রাখতে পারবেন না। আজ রাতেই রোক্কাকে জাহাজে নিয়ে গিয়ে নিকেশ করে দিন। কেউ খোঁজই পাবে না। কথাগুলো আস্তে বললেও হ্যারি কিছু কথা শুনতে পেল। বাকিটুকু আন্দাজে বুঝে নিয়ে নিজেদের দেশের ভাষায় ফ্রান্সিসকে এই কথাগুলো ফিস্‌ফিস্ করে বলে বুঝিয়ে দিল। সিনার্কা তখন মাথাটা একটু ওঠানামা করে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। বলল—তোমরা কারা? হ্যারি বলল—আপনার দলনেতা আমাদের সব কথা জানেন। সিনার্কা দলপতির দিকে তাকাল। দলপতি দুপা খুঁড়িয়ে এসে ফ্রান্সিসদের সম্পর্কে যা জানে মৃদুস্বরে বলল। সিনার্কা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে স্পেনীয় ভাষায় বলল—হুঁ—তোমরা ভাইকিং—জলদস্যুর দল—জাহাজ লুঠ করো।

—মাননীয় সিনার্কা—হ্যারি বলল—আপনার দলপতিকে জিজ্ঞেস করুন। তিনিই সব বলতে পারবেন।

তখন দলনেতা জানাল যে ভাইকিংদের জাহাজ তল্লাশী করা হয়েছিল। লুঠের জিনিসপত্র কিছু পাওয়া যায় নি।

সিনার্কা বলল—ঐ বাড়িটায় রোক্কা আত্মগোপন করেছিল। তোমরা ওখানে কী করছিলে?

—আমাদের রাজকুমারী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চিকিৎসার জন্যই—হ্যারি কথাটা শেষ করতে পারলো না। সিনার্কা বলে উঠল—বাজে কথা—তোমরা রোক্কার বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়েছিলে। তোমাদেরও রেহাই নেই।

এবার হঠাৎ ফ্রান্সিস এক লাফে উঠে দাঁড়াল। মাথা অনেকটা নুইয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একজন বিদেশীর কাছে এই সম্মান পাওয়ায় সিনার্কা বেশ খুশিই

হল। হ্যারি অবশ্য একটু অবাকই হল। ওদের দেশের রাজাকেও ফ্রান্সিস এতক্ষণ মাথা নুইয়ে সম্মান জানায় না। ফ্রান্সিস এবার আস্তে আস্তে মাথা তুলে বলল—মহামান্য রাজা—সার্দিনিয়া দ্বীপেও লোকমুখে আপনার কত প্রশংসা শুনেছি। জ্ঞানী বিচক্ষণ আর প্রজাবৎসল রাজা হিসেবে আপনার গুণগান করে এখানকার আপনার প্রজারা। আমি শুনেছি সেসব। তখন থেকেই আপনাকে একবার দর্শন করবার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে ছিল। আজ আপনাকে দর্শন করে আমার জীবন ধন্য হল। কথা শেষ করে ফ্রান্সিস আবার মাথা নিচু করে রইল। কিছুক্ষণ। এবার সিনার্কা খুশির হাসি হেসে বলল—ঠিক আছে—তুমি কি বলতে চাও বলো। ফ্রান্সিস মাথা তুলল। আঙ্গুল তুলে রোক্কাকে দেখিয়ে বলল—মহামান্য রাজা—এই লোকটা প্রবঞ্চক—ঠগবাজ। রোক্কা চম্‌কে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যারি আর কামেরাতেরও এক অবস্থা। রোক্কা কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিস বলল—মাননীয় রাজা—এই লোকটা আমাদের কয়েদ ঘর থেকে পালাবার ব্যবস্থা করেছে। আমাদের রাজকুমারীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবে বলে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাজকুমারীর মূল্যবান গয়নার বাকশো চুরি করেছে। তারপর আমাদের ঐ বাড়িতে বন্দী করে রেখেছিল।

রোক্কা ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে থেকে ম্লান হাসল—মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয়। হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসকে বাধা দিতে গেল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিয়ে বলে উঠল—চুপ করে থাকো। এমন একজন মহান রাজার বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে মৃত্যুই তাদের একমাত্র শাস্তি। কথাটা শেষ করে ফ্রান্সিস আবার মাথা নিচু করল। সিনার্কা একজন সামন্তরাজা মাত্র। তাকে একেবারে কর্সিকা দ্বীপের মহামান্য রাজার মত সম্মান দিল ফ্রান্সিস। সিনার্কা খুশিতে আটখানা। সিনার্কা সগর্বে হেসে অমাত্য দলপতি আর সৈন্যদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল—ঠিক আছে সে ব্যবস্থা হচ্ছে। এবার তুমি কী চাও বলো। ফ্রান্সিস মাথা নিচু অবস্থাতেই বলল—যদি অভয় দেন তো বলি।

—বলো—বলো। সিনার্কা খুশি হয়ে বলল। ফ্রান্সিস মাথা তুলে বলল—মহামান্য রাজা—এখানকার আপনার প্রজাদের মুখে অতীতের একটা রহস্যময় ঘটনার কথা শুনেছি।

—কোন রহস্যময় ঘটনা? সিনার্কা কপাল কুঁচকে বলল।

—রানী ইসাবেলার রত্নালংকারের পেটিকার কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। সিনার্কা মুখে শব্দ করল।

—শুনেছি এই দুর্গের ওপরের দিকে দুটি কক্ষের কোথাও ইসাবেলার সেই রত্নালংকারের পেটিকা আজও আছে।

—হ্যাঁ—বংশানুক্রমে এটা আমরা শুনে আসছি। সিনার্কা বলল। ফ্রান্সিস আবার একটু মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—

—মহামান্য রাজা আপনি যদি দয়া করে অনুমতি দেন তবে আমরা সেই রত্নভাণ্ডার উদ্ধারের জন্যে চেষ্টা করতে পারি।

—পারবে তোমরা উদ্ধার করতে? সিনার্কার কথায় বেশ আগ্রহ ফুটে উঠল। ফ্রান্সিস আবার একটু মাথা নুইয়ে বলল—মহামান্য রাজা—আপনি তো আমাদের মৃত্যুদণ্ডই দেবেন। মরার আগে একবার শেষ চেষ্টা করবার সুযোগ দিন। মরে তো যাবোই—রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করতে গিয়েই না হয় মরলাম।

—হুঁ—ওদুটো ভুতুড়ে ঘর। কয়েকজন লোক ঐ ঘরের জানালা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে মারা গেছে—তা জানো। সিনার্কা বলল।

—বললামই তো—মরে যেতে পারি জেনেই যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ দেখো চেষ্টা করে। সিনার্কা বলল।

—তাহলে মহামান্য রাজা—আপনি সবাইকে আদেশ দিন কেউ যেন আমাদের স্বাধীন চলাফেরায় বাধা না দেয়। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ—আদেশ দেওয়া হবে। সিনার্কা বলল।

—এবার একটা ঘটনা আপনাদের বলি—বোধহয় আপনারা জানেন না। ফ্রান্সিস বলল।

—কোন ঘটনা? সিনার্কা বলল।

—ঐ ঘরদুটোর একটা নক্‌শা রানী ইসাবেলা এঁকেছিলেন একটা পার্চমেন্ট কাগজে। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি? সিনার্কা অমাত্যের দিকে তাকাল। দু'জনেই অবাক।

—হয়তো মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে রানী ইসাবেলা ঐ নক্‌শায় সঠিক নিশানা দিয়েছিলেন কোথায় গোপনে রাখা হয়েছে সেই বহু মূল্যবান রত্নালংকারের পেটিকা। তারপর হয়তো নক্‌শাটা জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছিলেন।

—সেই নক্‌শা কোথায়? সিনার্কা সাগ্রহে বলে উঠল।

—সব বলছি। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—সেই নকশা অনেক হাত ঘুরে এই বিদ্রোহীদের হাতে এসেছে।

—তুমি কী করে জানলে? অমাত্যটি স্পেনীয় ভাষায় বলল।

—ঐ বাড়িটায় মানে বিদ্রোহী কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময় রোক্কা এই কথা বলেছিল। আমরা আড়াল থেকে শুনেছিলাম। বিদ্রোহীদের ঐ আস্তানাতেই কোথায় লুকোনো আছে সেই নক্‌শা। ফ্রান্সিস বলল। সিনার্কা ক্রুদ্ধদৃষ্টি রোক্কার দিকে তাকিয়ে বলল—কোথায় লুকিয়ে রেখেছো সেই নক্‌শা?

—সব মিথ্যে কথা—রোক্কা প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল—সব বানানো গপ্‌পো। ফ্রান্সিস একটু নরম গলায় বলল—মহামান্য রাজা—ঐ নকশা পেয়ে কী লাভ! আগে তো ঘর দুটোয় ঢুকতে হবে, তারপরে তো নক্‌শা মেলাতে হবে। সিনার্কা এবার সমস্যাটা বুঝতে পারল। সত্যিই তো সেই ঘরদুটোয় ঢোকাই তো সবচেয়ে বড় সমস্যা!

—হুঁ—তা ঠিক। সিনার্কা বলল। তারপর একটু ভেবে বলল—তাহলে ঐ রত্নপেটিকা উদ্ধারের উপায় কী? ফ্রান্সিস বলল—

—প্রথমে মানে আজকেই দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা ঐ বাড়িটায় মানে বিদ্রোহীদের ঐ আস্তানায় যাবো। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে নক্‌শাটা

উদ্ধার করবো।

—পারবে? সিনার্কা একটু সংশয়ের সুরে বলল।

—নিশ্চয়ই পারবো। ফ্রান্সিস গলায় বেশ জোর দিয়ে বলল।

—বেশ—তারপর? সিনার্কা বলল।

—এবার ঐ বন্ধ ঘরদুটোয় ঢোকার উপায় বের করতে হবে। এটাই আসল সমস্যা। ঘরদুটোয় ঢোকার উপায় বের করতে পারলে তখন—রোক্কাকে দেখিয়ে বলল—এই লোকটাকে নকশার রহস্য বুঝিয়ে দিতে বলবো।

—যদি না বলতে চায়? অমাত্যটি বলল।

উৎপীড়ন চালিয়ে কথা বার করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল—

—মহামান্য রাজা—নক্শার রহস্যের সমাধান একমাত্র এই লোকটাই জানে। কিন্তু সেটা ওর কাছ থেকে জেনে নেওয়ার আগেই যদি লোকটাকে মেরে ফেলেন তাহলে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে—সিনার্কা অমাত্যটিকে বলল—কী করবেন? অমাত্যটি একটু চিন্তা করে বলল—দেখুন—এই ভাইকিং যোদ্ধাটি কি বলে।

—এই বিদ্রোহী লোকটাকে এখন বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তারপর কী করতে হবে আমি মহামান্য রাজাকে সময়মত বলবো। ফ্রান্সিস বলল। অমাত্যটি এবার বলল—বেশ। কিন্তু একটা শর্ত আছে। রত্নভাণ্ডার উদ্ধার হলে সব মাননীয় সিনার্কার হাতে তুলে দিতে হবে।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—সিনার্কা দ্রুত বলে উঠল—তোমরা বিদেশী তোমাদের বিশ্বাস কি। কিন্তু এই কথাটা ভালো করে জেনে রাখো রত্নভাণ্ডার নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করা হবে।

—বেশ—ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল। তারপর বলল—এবার তাহলে আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

কামেরাতকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে সিনার্কা বলল—কিন্তু এই বিদ্রোহীটাকে মুক্তি দেওয়া হবে না। ফ্রান্সিস আবার মাথা একটু নুইয়ে বলল—এর নাম কামেরাত। ঐ বিদ্রোহীদের আস্তানাটার দেখাশুনো করতো। ও ঐ বাড়িটার সবকিছু চেনে। ওর সাহায্য খুবই প্রয়োজন।

—হুঁ—একটু ভেবে সিনার্কা বলল—কিন্তু ও যেন পালাতে না পারে।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—ওর হাতের দড়ি আরো শক্ত করে বেঁধে নিয়ে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। সিনার্কা বলল।

সিনার্কা যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল। অমাত্যটি একটু এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একটুক্ষণ। তারপর ভারি গলায় বলল—ঐ অভিশপ্ত ঘরদুটোয় ঢুকতে পারবেন? ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল—সব দেখে শুনে ভাবনা চিন্তা করে তবেই বলতে পারবো ঢোকা সম্ভব কি না।

—জানো—রানী ইসাবেলার প্রেতাত্মা একটা মোমবাতি হাতে সারারাত ঘরটায় ঘুরে বেড়ায়। আমাদের দুর্গরক্ষী সৈন্যরা আমাকে বলেছে ঐ ঘরদুটোয় নাকি পা

ঘষে ঘষে চলার অস্পষ্ট শব্দ শুনেছে। কাঠের দরজাটায় নাকি টোকা দেবার শব্দও শুনেছে। ঐ ঘরের কাছের ঘরগুলোয় যোদ্ধারা রাতে থাকতে সাহস পায় না। সেই ঘরগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। অমাত্যটি থামল। তারপর বলল—এত সব জানার পরও তুমি ঐ ঘরদুটোয় ঢুকতে যাবে? সে সাহস আছে তোমার? ফ্রান্সিস সহজভাবে বলল—আপনারা তো আমাকে আর আমার বন্ধুকে ফাঁসিই দেবেন। ফাঁসিতে মরার আগে না হয় প্রেতাত্মার হাতেই মরবো। অমাত্যটি ফ্রান্সিসের আরো কাছে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—তুমি যদি ঐ ঘরে ঢোকার চেষ্টা না কর তবে তোমাদের মুক্তির জন্যে সিনার্কাকে আমি রাজি করাবো। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—ঠিক আছে—আপনার এই করুণার কথাটা ভেবে দেখি। পরে যা বলার বলবো।

অমাত্যটি আর কিছু বলল না। সিনার্কার পেছনে পেছনে চলল। একটু পরে ঠং-ঠাং শব্দে কয়েদঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস এতক্ষণের কথাবার্তায় বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এবার ঘাসের বিছানাটায় বসল। তারপর হ্যারির পাশে শুয়ে পড়ল। হ্যারি এতক্ষণ মাথা নিচু করে নির্বাক বসেছিল। যে রোক্কার জন্যে মারিয়াকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল সেই রোক্কাকে ফ্রান্সিস 'লোকটা' 'লোকটা' বলে শুধু অপমান করল না ডাহা মিথ্যে কথা বলে সিনার্কার মত একটা অত্যাচারী শাসককে নির্লজ্জের মত তোষণ করল। ফ্রান্সিসের এই অধঃপতন দেখে দুঃখে হতাশায় হ্যারির বুক ভেঙে যেতে লাগল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে ডাকল—হ্যারি। হ্যারি ডাকটা শুনেও অনড় বসে রইল। ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাতেও ঘৃণাবোধ করল।

হঠাৎ রোক্কা হো হো করে হেসে উঠল। বলল—ভাইকিংরা—বীর, দুঃসাহসী—সৎ—বিবেকবান। পরক্ষণেই শায়িত ফ্রান্সিস আর হ্যারির দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ঘৃণাময় মুখ চোখ কুঁচকে থুতু ফেলল—থুঃ—থুঃ—।

অপমানে হ্যারির চোখ কান জ্বালা করে উঠল। দুচোখ জলে ভিজে উঠল। কিন্তু ও কাঁদতেও পারল না। ও চোখ বন্ধ করে বসে রইল।

শুনল ফ্রান্সিস খুব মৃদুস্বরে ডাকল—হ্যারি—হ্যারির আর সহ্য হল না। ও মুখ তুলে চিৎকার করে বলে উঠল—তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার—আমার ঘৃণা—হ্যারি আর বলতে পারল না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আবাল্য বন্ধু ফ্রান্সিস নিজের জাত ভাইয়ের চেয়েও যে ফ্রান্সিসকে বেশি ভালোবাসে স্বপ্নেও ভাবে নি সেই ফ্রান্সিসকে এত বড় কঠিন কথা ও বলতে পারবে। হ্যারি হাঁপাতে লাগল। রোক্কা যেভাবে ফ্রান্সিসকে অপমান করল হ্যারি কখনও ফ্রান্সিসকে এরকম অপমানিত হতে দেখেনি। হঠাৎ রোক্কা দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে একলাফে শায়িত ফ্রান্সিসের কাছে এল তারপর ডান পা চালাল ফ্রান্সিসের পেঠের ধারে। 'ওঁক' করে ফ্রান্সিসের মুখ দিয়ে শব্দ বেরিয়ে এল। লাথি খেয়ে বিছানার ওপর দুপাক ঘুরে গেল। রোক্কা চিৎকার করে বলে উঠল—অকৃতজ্ঞ —জানোয়ার। দু পা ছুটে এসে আবার পা তুলল। ফ্রান্সিস তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়াল। তারপর বাঁধা দুটো হাতের মুঠি দিয়ে রোক্কার থুতনিতে এত জোরে ঘা মারল যে রোক্কা চিৎ হয়ে ছিট্‌কে পড়ল। ঘাসের



বিছানার বাইরে। পাথুরে দেয়ালে মাথাটা ঠুকে গেল। আঁ—। একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ তুলে রোক্কা অনড় পড়ে রইল। মশালের আলোয় হ্যারি দেখল—রোক্কার কপালের কাটা জায়গাটা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। একে তরোয়ালের ঘায়ে রোক্কার শরীর ক্ষতবিক্ষত। তার ওপর এই মার খাওয়া। রোক্কা গোঙাতে লাগল। ক্রুদ্ধ কামেরাত এবার উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলে উঠল—খবরদার—চুপ করে বসে থাকো। কামেরাত কথাটার অর্থ বুঝল না। কিন্তু ফ্রান্সিসের ধমক খেয়ে ও কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। দাঁড়িয়ে রইল।

তখনই ঘট্ ঘটাং শব্দ তুলে লোহার দরজা খুলে গেল। রক্ষীরা কয়েকজন খাবার দাবার নিয়ে ঢুকল। রোক্কার অন্য তিন বিদ্রোহী বন্ধু কী ঘটল তা দেখল কেন রোক্কা এত ক্রুদ্ধ হল বুঝল না।

রোক্কা বাদে সবাই খেতে বসল। কামেরাত কোনরকমে রোক্কাকে উঠিয়ে বসাল। রোক্কার সামনেও খাবার দেওয়া হল। গোল কাটা রুটি। বেশ পোড়া। সঙ্গে আলু আনাজের ঝোল। একজন রক্ষী সকলের হাতের দড়ি খুলে দিল। সবাই খেতে লাগল।

ফ্রান্সিস এই সময় যা বরাবর বলে তাই বলল—হ্যারি—পেট পুরে খাও। খেতে ভালো না লাগলেও খাও। হ্যারির মনে পড়ে গেল অতীতের কত বন্দী জীবনের কথা। ও একটু আশ্চর্য হয়েই ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। এত কাণ্ডের মধ্যেও হ্যারি দেখল—ফ্রান্সিস নির্বিকার।

সকলের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে একজন রক্ষী ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে বলল—তোমরা দুজন মুক্ত। ফ্রান্সিস কথাটা বুঝল না। তবে দেখল রক্ষীটি অন্য সবাইয়ের দু হাত বেঁধে দিল। কিন্তু ফ্রান্সিস আর হ্যারির খোলা হাত আর বাঁধল না। এবার ফ্রান্সিস বুঝল—সিনার্কা কথা রেখেছে। ওদের মুক্তি দিয়েছে। অবশ্যই নিজের স্বার্থোদ্ধারের জন্যে—রানী ইসাবেলার রত্নভাণ্ডার যদি এরা উদ্ধার করে দিতে পারে—এই আশায়। রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারলে সিনার্কার লাভ। উদ্ধার করতে গিয়ে বিদেশিটা মরে গেলেও সিনার্কার কোন ক্ষতি নেই। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে একটু ভেবে নিল। তারপর উঠে দাঁড়াল। ডাকল—হ্যারি। হ্যারি উত্তর দিল না। চুপ করে বসে রইল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—চলো যে বাড়িতে অসুস্থ মারিয়া রয়েছে সেখানে যেতে হবে।

হ্যারি রাগতস্বরে বলে উঠল—এবার তুমি রাজকুমারীকে বন্দী করার কথা ভাবছো।

ফ্রান্সিস আগের মতই শান্তগলায় বলল—কথা বাড়িও না। সময় কম—চলো।

—না—আমি তোমার সঙ্গে যাবো না। হ্যারি মাথা নেড়ে বলল। ওরা দু'জন নিজেদের দেশের ভাষায় কথা বলছিল। রোক্কা আর অন্য বন্দীরা ওদের কথা কিছুই বুঝতে পারছিল না। তবে এটুকু বুঝল যে ফ্রান্সিস হ্যারিকে কোথাও যেতে বলছে—হ্যারি সেখানে যেতে চাইছে না।

ফ্রান্সিস এবার একটু দ্রুত রক্ষীটির কাছে গেল। তারপর রক্ষীটির কোমরে

ঝোলানো খাপ থেকে এক টানে তরোয়ালটা বের করল। রক্ষীটি চমকে উঠে বাধা দিতে গেল। ফ্রান্সিস বাঁ হাত তুলে ওকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস স্থির তাকিয়ে আছে। হ্যারি অসহায় বোধ করল। ফ্রান্সিস ওর বুকে তরোয়াল ঠেকিয়ে হুকুম করবে হ্যারি এটা কোনদিন কল্পনাও করেনি। ও বুঝল-এখন প্রতিবাদ বৃথা। ফ্রান্সিসের মাথার ঠিক নেই এখন।

হ্যারি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল—কামেরাতকে বলো আমাদের সঙ্গে যেতে। হ্যারি আর কী করে। কামেরাতকে বলল সেকথা। কামেরাত মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল—না আমি যাবো না। দ্রুত সরে এসে ফ্রান্সিস কামরাতের বুকেও তরোয়াল ঠেকাল। হ্যারিকে বলল—কামেরাতকে বলে দাও—আমাদের সঙ্গে যেতে না চাইলে ওর ভালো হবে না। হ্যারি কামেরাতকে বলল সে কথা। কামেরাত বেশ ভীত চোখে ফ্রান্সিসের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ওরা দরজার দিকে চলল। সামনে তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিস পেছনে হ্যারি আর কামেরাত। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ফ্রান্সিস একজন রক্ষীকে ইঙ্গিতে কামেরাতের হাতের দড়ি শক্ত করে বেঁধে দিতে বলল। রক্ষীটি একটা দড়ি নিয়ে এল। শক্ত করে কামেরাতের হাত বেঁধে দিল।

দুর্গের পাথুরে চত্বর পার হল ওরা। সদর দেউড়ির দ্বাররক্ষীরাও ওদের বাধা দিল না।

ওরা বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস পূবমুখে হাঁটতে শুরু করল। বিনা প্রতিবাদে হ্যারি আর কামেরাত পেছনে পেছনে চলল। তখনই চারজন সৈন্য কোমরে তরোয়াল নিয়ে ওদের পিছু পিছু চলল। পথে দোকান পাঠ খোলা। ব্যস্ত, লোকজনের চলাফেরা। ফ্রান্সিস কোনদিকে তাকাল না। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগল। রাস্তার লোকজন দেখল ওদের। ওরা একটু আশ্চর্যই হল—তরোয়াল হাতে বিদেশী ফ্রান্সিসকে আর মাথা নিচু করে চলা হ্যারিকে দেখে আশেপাশের লোকজনের মধ্যে বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি হল। এই বিদেশীদের সৈন্যরা পাহারা দিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

ফ্রান্সিস হাঁটতে হাঁটতে একবার ওপরে সূর্যের দিকে তাকিয়ে নিল। বেলা আন্দাজ করল। দুপুর এখনও। চারদিকে ঝকঝকে রোদ।

হাঁটতে হাঁটতে ফ্রান্সিস হঠাৎ হাঁটার গতি কমিয়ে হ্যারির গা ঘেঁষে চলল। নিজেদের দেশীয় ভাষায় মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি—অনেক কাজ সামনে। আমি যা বলি তাই করো—সেভাবেই চলো। বিরোধিতা ক'রো না। পেছনের একজন সৈন্যের নজরে পড়ল ফ্রান্সিস। সৈন্যটি বুঝল—ওরা কোন গোপন কথা বলছে। দায়িত্ব দেবার সময় দলপতি বারবার বলে দিয়েছে এই বিদেশীরা ভীষণ চালাক। সৈন্যটি এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ওরা একটু দূরে সরে হাঁটতে লাগল। হ্যারি তখন ভাবছে ফ্রান্সিসের এসব কথার মানে কি? তবে কি ফ্রান্সিসের এইসব বিশ্রী ব্যবহার লোক দেখানো? হ্যারি ভীষণ ধন্দে পড়ে গেল।

সেই বাড়িটির সামনে এল সবাই। একজন লম্বামত সৈন্য আধভাঙা দরজায়

ধাক্কা দিল। দু'বার ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। দেখা গেল সিনার্কার একজন সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। বোঝা গেল মারিয়াকে পাহারা দেবার জন্যেই তাকে এখানে রাখা হয়েছে। বাঁদিকের শেষ ঘরটায় অসুস্থ মারিয়া আছে। ঢোকার আগে ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—হ্যারি সৈন্যদের বলো যে এখন আমি তোমাকে আর কামেরাতকে নিয়ে রানী ইসাবেলার নক্‌শা খুঁজে বের করতে সারা বাড়ি তল্লাশী চালাবো। আরো বলো—সিনার্কা এ ব্যাপারে আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। বলেছেন এ সময় আমাদের স্বাধীন চলাফেরায় কেউ বাধা দেবে না। হ্যারি একটু চুপ ক'রে থেকে লো ল্যাতিন ভাষায় সৈন্যদের কথাগুলো বলল। সৈন্যরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ফ্রান্সিস বলল—ওদের বলো যে মারিয়ার ঘরের পাহারাদার সৈন্যকে ঐ ঘরেই থাকতে হবে। বাকিরা এখানে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের পাহারা দেবে। হ্যারি সে কথা সৈন্যদের বলল। সৈন্যরা সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস হ্যারি আর কামেরাতকে নিয়ে চলল। মারিয়ার পাহারাদার সৈন্যটি মারিয়ার ঘরের দিকে চলে গেল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিকে বলল—কামেরাতকে নিয়ে ডানদিকের বারান্দা দিয়ে চলো। তাড়াতাড়ি। হ্যারি বুঝল—ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই কিছু পরিকল্পনা নিয়েছে। ও কামেরাতের হাত ধ'রে বলল—শিগগির ডান দিকের বারান্দা দিয়ে চলো। তিনজনে প্রায় ছুটে চলল। শেষ ঘরটার দরজা ঠেলে ফ্রান্সিস ঢুকে পড়ল। পেছনে হ্যারি আর কামেরাত।

ঘরটা একটু অন্ধকার অন্ধকার। ফ্রান্সিস ঘরটায় ঢুকেই কামেরাতকে বলল—তুমি স্পেনীয় ভাষা বোঝ?

কামেরাত স্পেনীয় ভাষাতেই বলল—বুঝি—বলতে—ভালো—পারি না।

ফ্রান্সিস বলল—শিগগির আমাকে একটা কাগজ কালি কলম এনে দাও।

কামেরাত বলল—কেন?

ফ্রান্সিস একটু রেগেই বলল—প্রশ্ন করো না। যা বলছি করো।

ফ্রান্সিসের ওপর কামেরাতের রাগ তখনও পড়ে নি। মাথা নেড়ে বলল—পারবো না।

—ফ্রান্সিস দাঁত চেপে বলল—কামেরাত—সময় বেশি নেই। একটা নক্‌শা আঁকতে হবে। শিগগির।

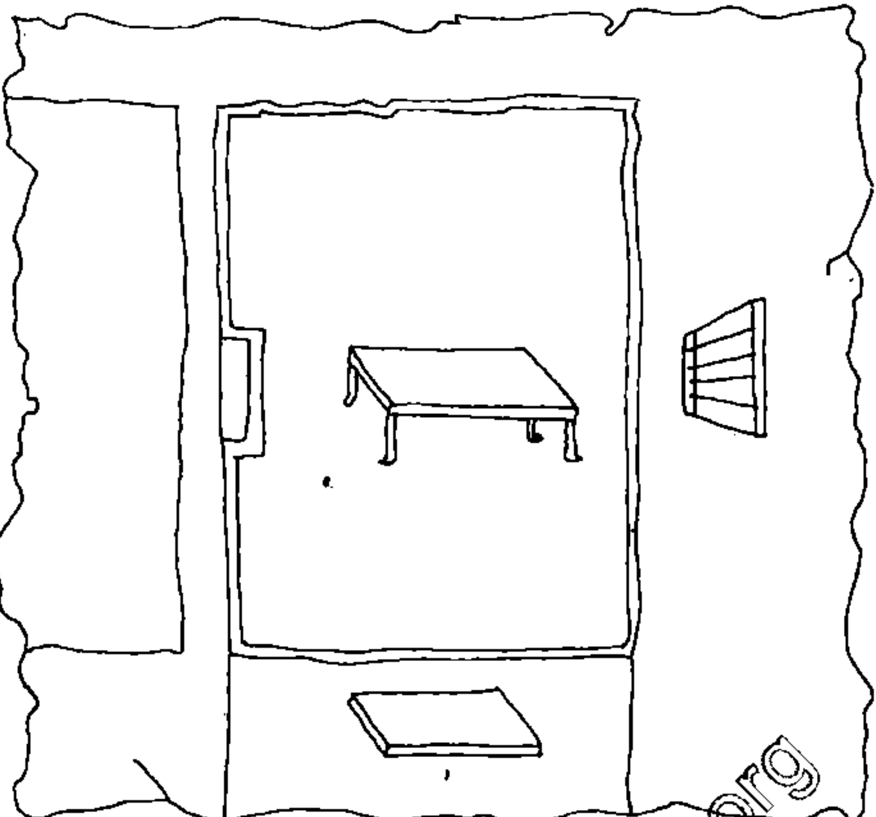
কামেরাত আবার মাথা নাড়ল।

এবার হ্যারি বলল—কামেরাত তুমি জানো না—অমাত্যের পরামর্শমত আজ রাতেই তোমাদের জাহাজে রোক্কাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হবে। কামেরাত অমাত্যের কথা শোনে নি। ও অবাক হয়ে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যারি বলল—তাড়াতাড়ি কাগজ আনো।

ফ্রান্সিস বলল—কামেরাত-এর ওপর আমাদের তোমার রোক্কার মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে। তাড়াতাড়ি—সময় কম। কামেরাত এবার ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারল। ছুটে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই একটা বড় পার্চমেণ্ট কাগজ নিয়ে এল।

হল্‌দেটে পুরোনো কাগজ। রুপোর দোয়াত আর পাখির পালক কেটে তৈরি কলম।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা নিয়ে মেঝেয় পাতলো। আলো কম। তবু কালিতে কলম ডুবিয়ে দ্রুতহাতে একটা নক্‌শামত আঁকলো। নক্‌শাটা দেখতে এরকম—



আঁকা শেষ করে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। কামেরাতকে বলল—খুব মন দিয়ে শোন। আমি মারিয়া মানে ঐ কোনার ঘরে যাকে চিকিৎসা করা হচ্ছে তাকে আমি নিয়ে আসছি। এর মধ্যে তুমি ঐ রোগীর আর রোজার চিকিৎসার জন্য ওষুধগুলো একত্র করে একটা মোটা কাপড়ে পোঁটলামত বেঁধে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। যে করে হোক একটা শস্যটানা গাড়ি জোগাড় করো। এখানে সবাইকে তুমি চেন—তুমি সহজেই এটা পারবে। গাড়ি নিয়ে কোন শব্দ না ক'রে পেছনের জংলা জায়গাটায় নিয়ে এসো। এখান থেকে মারিয়াকে নিয়ে আমি পেছনের দরজার কাছে থাকবো। তুমি মারিয়াকে গাড়িতে তুলে নেবে। ওষুধগুলো বের করে মোটা কাপড়টা দিয়ে মারিয়াকে ঢেকে দেবে যাতে কেউ ওর মুখ দেখতে না পায়। তারপর গাড়ি নিয়ে সোজা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজঘাটায় চলে যাবে। মারিয়া আমাদের জাহাজ চিনিয়ে দেবে। সেই জাহাজে মারিয়াকে নিয়ে উঠবে। ঐ জাহাজেই থাকবে। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। কথাটা একটানা শেষ করে ফ্রান্সিস একটু থেমে হাঁপানো গলায় বলল—সব কথা বুঝলে। কামেরাত মাথা দুলিয়ে এতক্ষণে হেসে বলল—বুঝেছি। ফ্রান্সিসের হাতে তখনও তরোয়ালটা

ছিল। ও তরোয়ালের ফলা ঘষে ঘষে কামেরাতের হাতে বাঁধা দড়িটা কেটে দিল। কামেরাত সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস এবার খোলা তরোয়ালটা পিঠের দিকে পোশাকের নিচে ঢুকিয়ে তরোয়ালটা এক হ্যাঁচ্‌কা টানে তুলে আনল। পিঠ লম্বালম্বি কেটে গেল। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা চোখের সামনে ধরল। দেখা গেল তরোয়ালের ফলার গায়ে রক্ত লেগে রয়েছে।

হ্যারি শিউড়ে উঠে বলল—এ কী করলে?

ফ্রান্সিস বলল—আস্তে। মারিয়ার ঘরে যাবো। এখন খুব জোরে লো ল্যাতিন ভাষায় চেঁচিয়ে কাতর আর্তনাদ করে বলো—মরে গেলাম—মরে গেলাম। তাড়াতাড়ি। হ্যারি আর দেরি করলো না। শেখানো মত আর্ত চিৎকার করে বলে উঠল—উঃ—আঁ—আঁ মরে গেলাম—মরে গেলাম।

ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল—চলো মারিয়ার ঘরে। ঐ ঘরের পাহারাদারকে বলবে—কামেরাতকে আমি মেরে ফেলেছি। কারণ কামেরাত কিছুতেই বলতে চাইছিল না—নক্‌শাটা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। চলো।

দু'জনে ছুটে এসে মারিয়ার ঘরে ঢুকল। মারিয়া বিছানায় শুয়ে ছিল। হঠাৎ ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে ঢুকতে দেখে দুর্বল শরীরেও আনন্দে উত্তেজনায় উঠে বসল। হেসে দু'হাত তুলে বলল—ফ্রান্সিস।

কিন্তু এ কোন ফ্রান্সিস? হাতে তরোয়াল। দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। মারিয়ার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। ও চিৎকার করে উঠতে গেল। দুর্বল শরীরে গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো না। পাহারাদার ফ্রান্সিসের হাতে তরোয়াল দেখে নিজেও কোমরে গোঁজা তরোয়ালের বাঁটে হাত রাখল। হ্যারি ছুটে এসে ওকে বলল—লড়াই নয়। সেই বিদ্রোহী লোকটা কিছুতেই বলছিল না রাণী ইসাবেলার নক্‌শাটা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাই সিনার্কার হুকুমে লোকটাকে মেরে ফেলা হয়েছে। পাহারাদার হ্যারির আর্ত চিৎকার শুনেছিল। তাই সন্দেহ করল না।

মারিয়া হ্যারির কথা বুঝল না। ও ফ্যাল ফ্যাল করে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইল। পাহারাদার হতবাক দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস ওদের দেশীয় ভাষায় বলল—হ্যারি—মারিয়াকে নিয়ে যাচ্ছি। সত্য না বললে একেও মেরে ফেলা হবে। কথাটা শেষ করে ফ্রান্সিস তরোয়াল কোমরে গুঁজল। তারপর—এক লাফে মারিয়ার বিছানার কাছে এল। তারপর মারিয়া কিছু বোঝার আগেই মারিয়ার মাথার চুলের মুঠি ধ'রে এক হ্যাঁচ্‌কা টানে মারিয়াকে মেঝেনে নামিয়ে আনল। চুল ধ'রে টেনে নিয়ে চলল। যন্ত্রণায় মারিয়া চোখে অন্ধকার দেখল। ওর দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। দুর্বল শরীর। মারিয়া কাঁদতে লাগল। পাহারাদার সৈন্যটি বাধা দিতে গেল। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে ওকে থামাল। বলল—এই মেয়ে লোকটা জানে রাণী ইসাবেলার নক্‌শা কোথায় গোপনে রাখা হয়েছে। যদি তার হদিশ না বলে তবে—সিনার্কা হুকুম দিয়েছেন—একেও মেরে ফেলা হবে। পাহারাদার সৈন্যটি দাঁড়িয়ে পড়ল। আর বাধা দেবার চেষ্টা করল না।

বাইরের বারান্দায় পাহারাদার সৈন্যটির চোখের বাইরে আসতেই ফ্রান্সিস মারিয়ার চুলের মুঠি-ছেড়ে দিল। তারপর মারিয়াকে পাঁজা কোলা ক'রে তুলতে গেল। মারিয়া

দুর্বল শরীরে দু'হাত ছুঁড়ে যতটা সম্ভব ফ্রান্সিসকে বাধা দিতে লাগল—আর কাঁদতে লাগল। ফ্রান্সিস ফিস্‌ফিস্ করে বলতে লাগল—মারিয়া বাধা দিও না।—বাধা দিও না—মারিয়া—শান্ত হও। কিন্তু মারিয়া সে কথায় কান দিল না। ফ্রান্সিস আবার বলল—মারিয়া আমি সেই আগের ফ্রান্সিসই আছি—যা বলছি শোন। মারিয়া ভাঙা গলায় বলে উঠল—তুমি শয়তান—খুনী। ফ্রান্সিস বুঝল মারিয়াকে এখন কিছু বলে লাভ নেই। ও আবার মারিয়ার চুলের মুঠি ধরল। মারিয়া আর্ত চিৎকার ক'রে উঠল—মা—মা—। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ার ঘাড়ের কাছে হাত দিয়ে জোরে চাপড় মারল। দুর্বল মারিয়া মুখে ওঁক্ ক'রে শব্দ তুলে অজ্ঞানের মত হ'য়ে গেল। ফ্রান্সিস এটাই চাইছিল। ও তাড়াতাড়ি মারিয়াকে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে পেছনের দরজার দিকে ছুটল।

ভেজানো দরজা পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে খুলল। দেখল জংলামত জায়গাটার কিছুটা আড়ালে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জংলামত জায়গাটায় কামেরাত গুঁড়ি মেরে বসে ছিল। ফ্রান্সিসদের দেখেই ও ছুটে এল। দুহাত বাড়িয়ে মারিয়ার প্রায় অচেতন শরীরটা পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়ে গাড়িটার দিকে ছুটল। আস্তে আস্তে মারিয়াকে গাড়িতে শুইয়ে দিল। গাড়িতে উঠল না। ঘোড়াটার মুখের কাছে লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চলল। গাড়ি চলার শব্দ কম হল। গাড়িটা কিছুদূর যেতেই ফ্রান্সিস ফিরে এল। ছুটে শেষের ঘরটায় ঢুকল। মেঝে থেকে নকশাটা তুলে নিল। কোমরে এটা গুঁজে রাখল। ঘরের বাইরে এসে ডাকল—হ্যারি। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল। তখনই দেখল তরোয়ালে কাটা ফ্রান্সিসের পিঠের দিকটার পোশাকের কাপড় রক্তে ভিজে গেছে। হ্যারি কিছু বলল না। এর মধ্যেই ফ্রান্সিস নক্‌শার কাগজটা মেঝের ধূলোয় ঘযে নিল যাতে সিনার্কা দেখে বুঝতে পারবে নক্‌শাটা পুরোনো।

দুজনে বাইরে এল। সদর দরজায় দাড়ানো সৈন্যরা কামেরাত আর মারিয়ার আর্ত চিৎকার অস্পষ্ট শুনেছে। কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিল না কী করবে।

হ্যারি তখন ফ্রান্সিসের হাত থেকে নক্‌শাটা নিয়ে উঁচু করে ধ'রে চেঁচিয়ে বলল—রাণী ইসাবেলার এই নক্‌শাটা উদ্ধার করা হয়েছে। শিগগির মহামান্য সিনার্কাকে সংবাদ পাঠাও। সৈন্যরা ভেতরের ব্যাপার কিছুই বুঝল না। ওরা শুনেছে এই বিদেশীরা নক্‌শা খুঁজে বের করতে এখানে আসবে। নক্‌শাটা তাহলে খুঁজে পেয়েছে ওরা। ওদিকে তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসের রুদ্রমূর্তি দেখে ওরা বেশ ঘাবড়েও গেল। কোন কথা না বলে ওরা দাঁড়িয়ে রইলো। হ্যারি বলল—একজন ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে মহামান্য সিনার্কাকে সংবাদটা পৌঁছে দাও। একজন ঘোড়ার খোঁজে চলে গেল। হ্যারি বলল—এবার চলো—দুর্গে যাবো আমরা।

সৈন্যদল হাঁটতে শুরু করল। তখনই মারিয়ার ঘরের পাহারাদার সৈন্যটি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। অন্য সৈন্যদের কাছে জানতে চাইল কী ব্যাপার? অন্য সৈন্যরা ওকে হ্যারির কথাটাই বুঝিয়ে বলতে বলতে চলল। পেছনে তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিস আর হ্যারি।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—সাবাস্ ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিসও চাপা

গলায় বলল—চুপ—এখনও অনেক বাকি। এবার হ্যারি বলল—তরোয়ালটা কোমরে গোঁজ।

ফ্রান্সিস তরোয়াল কোমরে গুঁজে রাখল।

সারা রাস্তা দুঁজনে আর কোন কথা বলল না পাছে সৈন্যদের মনে কোনো সন্দেহ জাগে। ফ্রান্সিসের চিন্তা পরের কাজ। হ্যারির চিন্তা-ফ্রান্সিস সফল হবে তো? ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকাল। মধ্য-আকাশ থেকে সূর্য পশ্চিম মুখো হয়েছে। ফ্রান্সিস ভুরু কুঁচকে সময়ের হিসেব করল।

ওদিকে কামেরাত শস্যটানা গাড়িতে মারিয়াকে শুইয়ে নিয়ে চলেছে। মারিয়ার শরীর ঢেকে দিয়ে ছিল একটা ফুল তোলা মোটা কাপড়ে। সেই কাপড়ে মারিয়ার মুখও ঢাকা। মারিয়া আচ্ছন্নের মত শুয়েছিল।

একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ির ঝাঁকুনি কম নয়। সেই ঝাঁকুনিতে মারিয়ার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। উঠে বসতে গেল। পারল না। একে তো অসুস্থ। তার ওপর ফ্রান্সিস ওর চুলের মুঠি ধরে যেভাবে টানাটানি করেছে তাতে মারিয়া আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। গাড়িটার চারদিকে তাকিয়ে দেখল। একপাশে একটা কাপড়ের পুঁটুলি। মারিয়া কিছুই বুঝতে পারল না। ও গাড়িতে শুয়ে আছে কেন? কার গাড়ি? চালাচ্ছেই বা কে? আর যাচ্ছেই বা কোথায়?

দুর্বলস্বরে মারিয়া বলল—আমি এখানে কেন? কিন্তু চাকার ঘট্ ঘট্ শব্দে সে কথা গাড়িচালক কামেরাতের কানে গেল না।

হঠাৎই গাড়িটা থামল। চালকের আসন থেকে কামেরাত নেমে এল। পেছনে এসে দেখল—মারিয়া মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। কামেরাত হেসে বলল—এখন শরীর কেমন লাগছে? ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষা মারিয়া বুঝল। বলল—অনেকটা ভালো। একবার ভাবল মারিয়া ফ্রান্সিসের কথা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু ফ্রান্সিস যে দুর্ব্যবহার ওর সঙ্গে করেছে তাতে ফ্রান্সিসের সন্ধান করতে ওর মন চাইল না। মারিয়ার কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। তবু বলল—আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

—আপনাদের জাহাজে। কামেরাত বলল।

—হ্যারিরা এখনও বন্দী? মারিয়া জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। কামেরাত বলল। তারপর বলল—মুখটা কাপড়ে ঢেকে শুয়ে থাকুন। সিনার্কার গুপ্তচররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনার মুখ দেখলেই ওরা সন্দেহ করবে এই বিদেশী মহিলা এখানে কেন? যাচ্ছেই বা কোথায়?

মারিয়া মুখের ওপর কাপড়টা টেনে মুখ ঢাকল। ঠিক তখনই দু'জন সৈন্য গাড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল। মুখ-ঢাকা মারিয়াকে দেখে সন্দেহ হল। কামেরাতকে জিজ্ঞেস করল—এই মহিলা কে? মুখ ঢাকা কেন? কোথায় নিয়ে যাচ্ছো একে? কামেরাত বলল—ইনি আমার স্ত্রী। বাচ্চা হবে তাই শরীর খারাপ। নিয়ে যাচ্ছি দাইমার কাছে।—হুঁ—সাবধানে নিয়ে যাও। একজন সৈন্য বলল। সৈন্য দু'জন চলে গেল।

কামেরাত আবার গাড়ি চালাতে লাগল।

এবার মারিয়া পাশ ফিরে শুতে গেল। ঢাকা কাপড়ে টান লেগে কাপড়টা কিছুটা সরে গেল। মারিয়ার গাউনটার পায়ের কাছে কিছু অংশ বেরিয়ে এল। গাড়িটা তখন সেই দুর্গের কাছাকাছি এসেছে। এসময় সিনার্কার গুপ্তচরের নজরে পড়ল গাড়িটা। গুপ্তচরটির সন্দেহ হতেই। ও ছুটে গাড়ির কাছে এল। বলল—গাড়ি থামাও। কামেরাত গাড়ি চালাতে চালাতেই বলল—কেন গাড়ি থামাবো কেন? গুপ্তচরটি ততক্ষণে মারিয়ার পায়ের কাছে গাউনের অংশটা দেখে ফেলেছে। ওর মনে সন্দেহ বাড়ল—এরকম সুতোর লেসের কাজ করা গাউনতো এখানকার মেয়েরা পরে না। গুপ্তচরটি আবার বলল—গাড়ি থামাও। কামেরাত কানেও নিল না কথাটা। যেমন গাড়ি চালাচ্ছিল চালাতে লাগল। গুপ্তচরটি চিৎকার করে দুর্গের সামনে দাঁড়ানো সৈন্যদের ডাকল—সৈন্যরা এখানে এসো। দু'তিনজন সৈন্য ছুটে এল। গুপ্তচরটি বলল—গাড়ি থামাও এবার। কামেরাত দেখল আর উপায় নেই ধরা পড়তেই হল। মারিয়াও কী হচ্ছে দেখার জন্যে মুখ থেকে কাপড় সরিয়েছে। গুপ্তচরটি বলে উঠল—এই বিদেশিনী আর তার দলের লোকেরা সব বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিয়েছে। দুটোকেই কয়েদঘরে ঢোকাও। কামেরাত গাড়ি থামাল। সৈন্যরা ওকে নেমে আসতে বলল। কামেরাত নেমে এল। সৈন্যরা মারিয়াকে উঠে বসতে বলল। মারিয়া বুঝল না। কামেরাত স্পেনীয় ভাষায় বলল—রাজকুমারী আমরা ধরা পড়েছি। ওরা আমাদের কয়েদ ঘরে বন্দী করে রাখবে। শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ে গেলাম।

মারিয়া গাড়িটায় উঠে বসল। সৈন্যরাই ধরে ধরে রাজকুমারীকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনল। কামেরাত ওষুধের পোঁটলাটা নামিয়ে নিল। দুর্গের সদর দেউড়ির দিকে যেতে যেতে কামেরাত সৈন্যদের বলল—উনি ভাইকিং দেশের রাজকুমারী—ভীষণ অসুস্থ। অন্য কোন ঘরে ওঁকে রাখুন। আমারও চিকিৎসা করতে সুবিধে হবে। দেউরিতে দলপতি ছিল। সৈন্যরা গিয়ে তাকে কথাটা বলল। দলপতি ঘাড় নেড়ে বলল—না—সিনার্কার অনুমতি না নিয়ে কিছু করা যাবে না।

অগত্যা সেই কয়েদ ঘরেই মারিয়া আর কামেরাতকে ঢোকানো হল। ঢ্যাং ঢং করে কয়েদ ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এটুকু হেঁটে এসেই মারিয়া হাঁপিয়ে পড়ল। খড় বাঁধা বিছানায় শুয়ে পড়ল। কামেরাত পাশে বসল। পুঁটুলি খুলে একটা ওষুধ বের করে মারিয়াকে খেতে দিল। ওষুধ খেয়ে মারিয়া অসাড় হয়ে শুয়ে রইল। মারিয়া এতক্ষণ বুঝল—কী দুর্বল হয়ে পড়েছে ও। কামেরাতকে বলল ও সে কথা। কামেরাত বলল—ভয়ের কিছু নেই রাজকুমারী। কয়েকটা দিন ওষুধ খেলেই আপনি আবার শরীরে জোর পাবেন। এই দুর্বলতা কেটে যাবে। একটু থেমে বলল—সমস্যা হল আপনি এই বন্দী জীবন কতটা মানিয়ে নিতে পারবেন।

—মানিয়ে নিতেই হবে। মারিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। বার বার মারিয়ার মনে হতে লাগলো—ফ্রান্সিস আর আগের মত নেই। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে ও একেবারে অসহায়।

প্রায় অন্ধকার কয়েদ ঘরটায় এই দিনের বেলাও মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় চারদিকে তাকাতে তাকাতে কামেরাত দেখল রোক্কাও শুয়ে আছে। হাতদু'টো বাঁধা।

কামেরাত তাড়াতাড়ি রোক্কার কাছে উঠে গেল। রোক্কা কামেরাতকে দেখে ম্লান হাসল। বলল—তুমিও ধরা পড়েছো?

—শুধু আমি নই—ফ্রান্সিসদের দেশের রাজকুমারীকে এ ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কামেরাত বলল। কথাটা শুনে রোক্কা একটু আশ্চর্য হল। ফ্রান্সিসতো সিনার্কাকে প্রায় দেবতার আসনে বসিয়েছে। অথচ তাদের দেশের রাজকুমারীকে বন্দী করা হল। রোক্কা এসব কিছু বলল না। শুধু বলল—কামেরাত—তোমার কাছে কিছু ওষুধ টষুধ আছে।

—সব আছে। আমার পুঁটুলিতে। সিনার্কার সৈন্যরা পুঁটুলির ভেতরের ওষুধটষুধ দেখে ছেড়ে দিয়েছে। আমি এক্ষুনি ওষুধ আনছি। কামেরাত বলল। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে এসে পুঁটুলি খুলে প্রয়োজনীয় ওষুধ বের করল। মারিয়াকে বলল রাজকুমারী রোক্কাকেও এই কয়েদ ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। মারিয়া শুনে আশ্চর্য হল। বলল—রোক্কা বন্দী। তাহলে তো তোমাদের বিদ্রোহের নেতা কে হবে।

—সে সব ঠিক হবে। রোক্কাকে তার বিদ্রোহী বন্ধুরা ঠিক মুক্ত করে নিয়ে যাবে। কামেরাত বলল।

রোক্কার কাছে এল কামেরাত। তারপর কাটা জায়গাগুল্যোয় মলম লাগিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোক্কা অনেকটা সুস্থ বোধ করল।

দুর্গের সদর দেউড়ির সামনে পৌঁছল ওরা। দেখল-এখানে ওখানে সৈন্যরা জটলা করছে। ওদের দেখে সবাই ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মানে রান্নী ইসাবেলার নক্শাটা ফ্রান্সিস উদ্ধার করেছে এই খবর সবাই জেনে গেছে।

দেউরির দরজার কাছে দলপতি দাঁড়িয়েছিল। দলপতি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফ্রান্সিসের কাছে এল। হেসে বলল—মহামান্য সিনার্কা রানী ইসাবেলার নক্শাটা দেখতে চেয়েছেন।

হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল সেটা। ফ্রান্সিস-কোমরে গোঁজা নক্শাটা বের করে হ্যারিকে দিয়ে বলল—মহামান্য সিনার্কা যেন দেখেই ফিরিয়ে দেন। আমাদের এখনই কাজে নামতে হবে। দলপতির হাতে নক্শাটা দিয়ে হ্যারি বলল সে কথা। দলপতি দু'একবার নক্শাটার এপিঠ ওপিঠ দেখল। মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝল না। নক্শাটা একজন সৈন্যের হাতে দিয়ে সিনার্কার কাছে পাঠিয়ে দিল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি বন্ধ সদর দেউড়ির কাছে এল। সৈন্যরা সরে গিয়ে ওদের যাবার জায়গা করে দিল। ঘর্ ঘর্ শব্দে দরজার একটা পাল্লা খুলে দেওয়া হল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি পাথুরে চত্বরটায় এল।

দলপতি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। হাসতে হাসতে বলল—জানেন নক্শা পেয়ে মহামান্য সিনার্কা আনন্দে সিংহাসনে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। হ্যারি বলল—তা তো হবেই। প্রায় একশো বছর আগে রানী ইসাবেলার নিজের হাতে আঁকা নক্শা পেয়েছেন। খুশী তো হবেনই। তবে নক্শা পেলেই তো আর গুপ্ত রত্নভাণ্ডার পাওয়া যাবে না। ঐ ঘর দু'টোয় আগে তো ঢুকতে হবে। নক্শা

মেলাতে হবে। তবে তো।

—তা ঠিক। দলপতি ওর বড় মাথাটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত এপাশ ওপাশ দোলাল।

দলপতি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওদের নিয়ে দুর্গের পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। একটা পরিচ্ছন্ন ঘরে ওদের নিয়ে এল। বলল—এই ঘরে আমি একা থাকি। এখন থেকে আপনারাও থাকবেন। মহামান্য সিনার্কা হুকুম দিয়েছেন আপনাদের আদর যত্নে যেন কোন অবহেলা না হয়। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল—হ্যারি-রাণী ইসাবেলার রত্নালংকারের ভাণ্ডার। সিনার্কা এখন আমাদের জন্য কতকিছু করবে।

ঘরটায় দেখা গেল পরিচ্ছন্ন দড়িবাঁধা মোটা ঘাসের বিছানা। ওপরে পরিষ্কার মোটা নক্‌শাদার কাপড় পাতা।

—আপনারা বিশ্রাম করুন। যথাসময়ে খাবার দেওয়া হবে। হেসে এই কথা বলে দলপতি চলে গেল।

ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। মাথার পেছনে দু'হাত পেতে চোখ বুঁজে শুয়ে রইল। অনেক চিন্তা মাথায়—মারিয়াকে নিয়ে কামেরাত জাহাজে উঠতে পারলো কিনা। সত্যিই রত্নালংকারের ভাণ্ডার আছে কিনা—নাকি সবটাই লোকমুখে প্রচলিত গল্প। এবার ভাবনা—কী করে রত্নভাণ্ডার পাওয়া যাবে। কী করে সবাইকে নিরাপদে জাহাজে ফিরতে পারবে।

গরাদ বসানো জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ফ্রান্সিস্ সময় অনুমান করল। আর দেরি নয়। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি বসে থেকো না। শুয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও। তারপরেই তোমাকে যেতে হবে। বার্গ পাহাড়ে বিদ্রোহীদের আস্তানায়। গিয়ে বন্ধুদের বলবে তারা যেন সদর রাস্তা নয়—ঝোপ-জঙ্গল পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে এসে জাহাজে চলে যায়। শুধু বিস্কো জাহাজে উঠবে না। তীর ধনুক নিয়ে আলোকস্তম্ভের আড়ালে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। শুধু শাঙ্কোকে তুমি এখানে নিয়ে আসবে।

কিছুক্ষণ পরে দলপতি এসে ঘরে ঢুকল। নক্‌শার কাগজটা কোমরের ফেট্টি থেকে বের করে হেসে ফ্রান্সিসকে ফেরৎ দিল। নক্‌শাটা নিয়ে ফ্রান্সিস এমনভাবে নক্‌শাটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল যেন খুব মূল্যবান কিছু দেখছে। তখনই একবার হ্যারিকে বলল—দলপতির কাছ থেকে একটা ঘোড়া চেয়ে নাও। এতটা পথ তুমি হাঁটাহাঁটি করলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়বে। এখন ক্লান্ত হওয়া চলবে না। অনেক কাজ সামনে।

হ্যারি দলপতিকে ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে বলল।—সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সঙ্গে যদি চান সৈন্যও দিতে পারি। দলপতি বলল।—না—না—আমি একাই যাবো। হ্যারি বলল।

হ্যারি উঠে দাঁড়াল। তারপর সেনাপতির পেছনে পেছনে চলল।

দুর্গের বাইরে হ্যারির জন্যে একটা তেজিয়ান ঘোড়া আনা হল। হ্যারি ঘোড়ায় চড়ে প্রথমে জাহাজঘাটার দিকে গেল। যাতে সেনাপতির মনে কোন সন্দেহ না হয়। তারপর সদর রাস্তা এড়িয়ে ঝোপজঙ্গল আর পাথুরে মাটির মধ্য দিয়ে বার্গ

পাহাড়ের দিকে ঘোড়া ছোটাল। ছোট ছোট ঝোপঝাড় পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে ঘোড়া অনায়াসে জোর কদমে ছুটল।

ঘোড়ায় চড়ে হ্যারি যখন বার্গ পাহাড়ের কাছে এল তখন সূর্য পশ্চিম আকাশের দিকে অনেকটা নেমে এসেছে। ফ্রান্সিস তাড়া দিয়েছে। কাজেই সময় নষ্ট করা চলবে না।

বার্গ পাহাড়ের সেই গুহাটার কাছে আসতেই কয়েকজন বিদ্রোহী খোলা তরোয়াল হাতে হ্যারির সামনে এসে দাঁড়াল একজন ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল। হ্যারি হেসে বলল—আমি রোক্কার লোক। ভয়ের কোন কারণ নেই। বিদ্রোহীদের মধ্যে দু'জন হ্যারিকে চিনল। ওরা জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার? হ্যারি বলল—বন্ধুদের কাছে এসেছি। —বেশ যান। একজন বিদ্রোহী বলল।

ঘোড়া থেকে নেমে হ্যারি প্রায় অন্ধকার গুহাটায় ঢুকল। বেশ বড় গুহাটা টানা চলে গেছে। বিদ্রোহীরা কেউ শুয়ে আছে কেউ বসে আছে। জ্বলন্ত মশালের আলোয় হ্যারিকে দেখে বন্ধুরা ছুটে এল। হ্যারি বলল—আমাদের এখানে আর থাকা চলবে না। ফ্রান্সিসের নির্দেশ—তোমরা সবাই বার্গ পাহাড় থেকে বেরিয়ে নির্জন ঝোপঝাড় পাথুরে জায়গা দিয়ে জাহাজঘাটায় চলে যাবে। কেউ যেন তোমাদের দেখতে না পায়। শুধু শাঙ্কোকে সঙ্গে নিয়ে আমি আগেই ঘোড়া ছুটিয়ে সেই দুর্গে গিয়ে পৌঁছবো।

—ফ্রান্সিস কোথায়? রাজকুমারী কোথায়? বিস্কো জিজ্ঞেস করল।

—রাজকুমারী এতক্ষণে বোধহয় জাহাজে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু আমাকে আর ফ্রান্সিসকে সিনার্কা বন্দী করেছে। তবে রানী ইসাবেলার রত্নভাণ্ডার উদ্ধারের লোভ দেখিয়ে সিনার্কাকে কব্জা করেছে ফ্রান্সিস। রত্নভাণ্ডার উদ্ধারের জন্যে সিনার্কা আমাদের দুজনকে বন্দী করেও মুক্তি দিয়েছে। এখন ফ্রান্সিস পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবছে।

বিদ্রোহীদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে হ্যারিকে বলল—রোক্কার সংবাদ জানেন?

—না—হ্যারি মাথা দুলিয়ে বলল—তবে রোক্কাকে শেষ দেখেছি বৈদ্যিমশাইএর বাড়িতে। মনে হয় রোক্কা ভালোই আছেন। হ্যারি আগেই ভেবে রেখেছিল—রোক্কার আবার বন্দী হওয়ার কথাটা বিদ্রোহী সঙ্গীদের বলা চলবে না। তাহলে বিদ্রোহী বন্ধুরা রোক্কাকে মুক্ত করার জন্য সেই দুর্গে যাবে। লড়াই হবে। রক্ত ঝরবে। কারণ সারিনের যুদ্ধে জয়লাভ করে এখন বিদ্রোহীদের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। তাই হ্যারি এক্ষুণি কোন লড়াইয়ে জড়িয়ে যেতে চাইছেনা। একবার লড়াই শুরু হলে রত্নভাণ্ডার উদ্ধারের কাজ অনেক পিছিয়ে যাবে। তাই হ্যারি রোক্কার বন্দী হওয়ার সংবাদটা জানালো না।

ভাইকিং বন্ধুরা সব তৈরী হয়ে গুহার বাইরে এল। হ্যারি রোক্কার এক বিদ্রোহী সঙ্গীকে অনুরোধ করল যাতে সে গোপনে বন্ধুদের জাহাজঘাটায় পৌঁছে দিতে পারে। সঙ্গীটি ভাইকিংদের নিয়ে চলল।

হ্যারি আর শাঙ্কো ঘোড়ায় উঠে ঘোড়া ছোটাল সেই দুর্গের দিকে।

দুর্গের চত্বরে তখন বেনিফেসিওর অধিবাসীরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। লোকমুখে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল যে প্রায় একশো বছর পরে এক সাহসী ভাইকিং রানী ইসাবেলার আঁকা একটা নক্‌শা পেয়েছে। সিনার্কা অনুমতি দিয়েছেন। তাই আজ সেই দুঃসাহসী ভাইকিং নক্‌শা নিয়ে রানী ইসাবেলার ঘরে ঢুকবে। রানীর রত্নপেটিকা উদ্ধার করবে। লোকের ভীড় বেড়েই চলল।

হ্যারি আর শাঙ্কো যখন ঘোড়ায় চড়ে দুর্গের সামনে এল সৈন্যেরা লোকজন সবাইকে সরিয়ে দিয়ে ওদের দুর্গের মধ্যে ঢুকতে সাহায্য করল। ওরা দুর্গ চত্বরে দাঁড়ানো ফ্রান্সিসকে দেখল সিনার্কার সঙ্গে কথা বলছে। সিনার্কা আর দু'জন অমাত্য সিনার্কার রাজকীয় গাড়িতে বসে আছে। কালো ওক কাঠের গাড়ি। তাতে রুপোলি লতাপাতা ফুল বসানো। সিনার্কা হাসছে। খুব খুশি।

হ্যারি আর শাঙ্কোকে দেখে ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। হ্যারিরা ঘোড়া থেকে নামল। ফ্রান্সিস বলল—আর সময় নষ্ট নয়। চলো। ফ্রান্সিসের পেছনে দেখা গেল দশ পনেরোজন সৈন্য। তবে তাদের হাতে অস্ত্র নেই। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—তুমি ওদের লো ল্যাতিন ভাষায় বুঝিয়ে বলো যে আমি আগে দুর্গের ছাতে উঠে যেমন ইঙ্গিত করবো সেইভাবে যেন ওরা কাজ করে। হ্যারি সেই সৈন্যদের কথাটা বুঝিয়ে বলল। সৈন্যরা মাথা নেড়ে জানাল যে ওরা বুঝেছে। সৈন্যদের দুর্গের জানালার নিচে অপেক্ষা করার জন্যে ফ্রান্সিস ইঙ্গিত করল।

এবার ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কোকে নিয়ে দুর্গের পেছনে এল।

ওরা দুর্গের পেছনের খাদটায় এল। দেখল শাঙ্কোর বাঁধা লম্বা কাছিটা তেমনি বাঁধা আছে। পড়ে থাকা দড়িটার একটা মুখ শাঙ্কো কোমরে বেঁধে নিল। কাছি বেয়ে বেয়ে তিনজনেই গাছের ডালপালা ধরে দুর্গের পেছনের স্তূপকার খসে পড়া পাথরে স্তূপের ওপর উঠে এল। পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে বাঁধা কাছিটার মুখটা ফ্রান্সিস কোমরে বেঁধে নিল। তিনজনে এবার খুব সাবধানে ভাঙা পাথরের ওপর পা রেখে রেখে চলল দুর্গের মাথার দিকে। দু'জায়গায় পাথর নড়ে গিয়ে ফ্রানসিস আর শাঙ্কো প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। পড়লে গড়িয়ে খাদের মধ্যে গিয়ে পড়তো। প্রাণে বেঁচে গেলেও হাত পা ভাঙতোই। কোনরকমে ভারসাম্য রাখল। আস্তে আস্তে তিনজন দুর্গের মাথায় উঠে এল। ফ্রান্সিস পশ্চিমদিকে তাকাল। দেখল পশ্চিমে সমুদ্রের মাথায় লাল আর কমলা রঙের খেলা চলেছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল ভীড়ে ভীড়াক্কার। সারা বোনিফেসের লোকেরাই যেন হাজির হয়েছে। হ্যারি আর শাঙ্কোও এসে নিচের ভীড় দেখল। ফ্রান্সিসদের দুর্গের ছাদে দেখে নিচের ভীড়ের মানুষেরা চিৎকার হৈ হৈ শুরু করে দিল। সিনার্কাও গাড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল ফ্রান্সিসদের দিকে।

এবার ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল দু'তিনটে বড় বড় পাথরের পাটাতন পড়ে আছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ঐ পাটাতনগুলোর সঙ্গে দড়ির মুখটা বাঁধতে বলল। তিনজনে মিলে চেপে বাঁধল দড়িটা। দড়িটার অন্য মুখটা ফ্রান্সিস দুর্গের মাথা থেকে ঝুলিয়ে দিল। দড়ির সেই মুখটা দুর্গের পাথুরে দেয়ালের গা দিয়ে ঘেঁসে এল জানালার কাছে। ফ্রান্সিস দড়িটা বার কয়েক টেনে দেখল। বেশ শক্ত

করেই বাঁধা হয়েছে।

ফ্রান্সিস দড়িটা ধরে ঝুলে পড়ল। দুর্গের পাথুরে দেয়ালের গায়ে পা রেখে রেখে নামতে লাগল। দুর্গের পাথুরে গায়ে তখনও রোদ লেগে আছে। সূর্য অস্ত যেতে তখনও দেরি আছে। পাথুরে দেয়ালে পায়ের ভর রেখে রেখে ফ্রান্সিস জানালাটার সামনে এল। কিন্তু জানালার লোহার গরাদ ধরল না। দেয়ালে পা রাখল। কারণ রোক্কা বলেছিল দু'জন লোক জানালার গরাদ ধরে টেনেছিল ঘরে ঢোকার জন্যে। জানালার মাথা থেকে আলগা পাথর খুলে পড়েছিল আর দু'জনই মাথা ফেটে মারা গিয়েছিল। ফ্রান্সিস দুপা দিয়ে দড়ি আকড়ে ধরে কোমরে বাঁধা কাছির মুখটা বের করল। খুব সন্তর্পণে আস্তে আস্তে গরাদগুলোর মধ্যে দিয়ে কাছির মুখটা ঢুকিয়ে বেশ শক্ত গেড়ো দিল। তারপর দড়ি বেয়ে বেয়ে দুর্গের মাথায় উঠে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—শাঙ্কো কাছির অন্য মুখটা নিচে ফেলে দাও। শাঙ্কো কাছির অন্য মাথাটা টেনে আনল। তারপর দুর্গের মাথা থেকে নিচে ফেলে দিল। ফ্রান্সিস তখন নিচে দাঁড়ানো সিনার্কার সেই আটদশ জন সৈন্যকে কাছিটা ধরে টানতে বলল। সৈন্যরা বুঝল—ফ্রান্সিস কাছি টেনে জানালার গরাদগুলো ভেঙে ফেলতে বলছে।

সৈন্যরা কাছির মুখটা টেনে ধরল। তারপর মুখে শব্দ করে একসঙ্গে সবাই ভীষণ জোরে টান মারল। সঙ্গে সঙ্গে জানালার মাথা থেকে বড় বড় পাথরের টুকরো বৃষ্টির মত নিচে ছিটকে পড়ল। ধূলো বালি উড়ল। পাথর পড়তে দেখে নিচের লোকজন ভয়ে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। ফ্রান্সিস বুঝল—রাণী ইসাবেলা কোনোভাবে জানালার মাথার পাথরগুলো আল্‌গা করে রেখেছিলেন যাতে কেউ যেন জানালার গরাদ ধরে দাঁড়াতে না পারে। যে দু'জন এসে গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল তারা খসে পড়া পাথরে মাথা ফেটে মারা গিয়েছিল।

আবার ফ্রান্সিস কাছি টানার জন্যে সৈন্যদের ইঙ্গিত করল। আবার সৈন্যরা মুখে শব্দ করে একসঙ্গে হ্যাঁচ্‌কা টান দিতে লাগল। বারকয়েক টানতে হঠাৎ শব্দ তুলে গরাদগুলো ভেঙে গেল। ছিট্‌কে নিচে পড়ল। সৈন্যরা দ্রুত সরে গেল। বাঁ পাশের একটা গরাদ ভাঙলো না বাঁধা ছিল না বলে।

এবার জানালা খোলা। ফ্রান্সিস আগের মতই দড়ি বেয়ে বেয়ে জানালার কাছে এসে জানালার নিচের অংশে পা রাখল। দেখল একটু কাত হয়ে অনায়াসে ঘরটায় ঢোকা যাবে। ও শরীর একটু বেঁকিয়ে কাত হয়ে আস্তে আস্তে ঘরটায় ঢুকল।

নিচে থেকে সিনার্কা অমাত্যরা সৈন্যরা ভীড় করা বোনিফোসিওর লোকেরা সাগ্রহে তাকিয়ে রইল ঐ ভাঙা জানালাটার দিকে।

চারদিক নিস্তব্ধ। কোনো শব্দ নেই ভীড়ে জটলায়। শুধু সমুদ্রের মৃদু গর্জন শোনা যাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস ভাঙা জানালাটা দিয়ে মুখ বাড়াল। নিচের ভীড়ে চিৎকার হৈ হল্লা শুরু হল। ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে ঝুলন্ত দড়িটা ধরল। তারপর বেরিয়ে এল জানালাটা দিয়ে। কিন্তু ফ্রান্সিসের হাতে কিছুই নেই। বোনিফেসিওর লোকেরা হতাশ হল। ওরা আশা করেছিল প্রায় একশো বছর যাবৎ প্রচলিত লোকগল্পে

শোনা রাণী ইসাবেলার রত্নভাণ্ডার ঐ দুঃসাহসী বিদেশীটা উদ্ধার করতে পারবে। কিন্তু ওর হাতে কোথায় সেই রত্নভাণ্ডারের পেটিকা। ছাত থেকে হ্যারি আর শাঙ্কোও দেখল—ফ্রান্সিস খালি হাতে দড়ি বেয়ে বেয়ে উঠে আসছে। ওদের মনে তখন একটাই চিন্তা—তাহ'লে ফ্রান্সিস কি এবার ব্যর্থ হলো? এই প্রথম হার স্বীকার করল?

দড়ি বেয়ে বেয়ে ফ্রান্সিস আগের মত দুর্গের ছাতে উঠে গেল। হ্যারি আর শাঙ্কো রত্নভাণ্ডারের ব্যাপারে ফ্রান্সিসকে কিছুই জিজ্ঞেস করল না। ওরা জানে ফ্রান্সিস ঠিক সময়মত সব বলবে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল—তোমরা এখানে থাকো। আমি সিনার্কার সঙ্গে একটা কাজের কথা সেরে আসি।

ফ্রান্সিস আবার ছাতের ভাঙা অংশের পাথরের পাটতনের ওপর সাবধানে পা রেখে রেখে খাদটার গাছের ডাল ধ'রে ধ'রে নেমে এল।

চলল সিনার্কার কাছে। সিনার্কা তখনও দু'জন অমাত্যকে নিয়ে গাড়িতে বসে আছে। ফ্রান্সিস তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল—মাননীয় সিনার্কা—আমি দু'টো ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও রানী ইসাবেলার রত্নপেটিকা পাইনি।

—কিন্তু তোমার কাছে তো রানী ইসাবেলার আঁকা নক্‌শাটা রয়েছে। সিনার্কা বলল।

—হ্যাঁ—কিন্তু নক্‌শাটার রহস্যের সমাধান করতে পারিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—চেষ্টা কর—দেখো—। সিনার্কা বলল।

ফ্রান্সিস এবার মাথা ঝুঁকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। সিনার্কা রাজার মত সম্মান পেয়ে খুব খুশি। বলল—কিছু বলবে?

—হ্যাঁ মহামান্য—বলছিলাম নক্‌শাটার রহস্য সমাধান জানে একমাত্র রোক্কা। যদি রোক্কাকে আমি ঐ ঘরে নিয়ে যেতে পারি তাহলেই রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করা সম্ভব। নইলে আমি একা পারবোনা। ফ্রান্সিস বলল। সিনার্কা একটুক্ষণ চিন্তা করল। একদিকে মহামূল্যবান রত্নপেটিকা অন্যদিকে রোক্কার জন্য চিন্তা—যদি সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায়। সিনার্কা বলল—রোক্কাকে সঙ্গে দিতে পারি কিন্তু যদি রোক্কা পালিয়ে যায়?

—আমরা রোক্কাকে পালাতে দেব না। ফ্রান্সিস বলল। সিনার্কা ইঙ্গিতে দলনেতাকে ডাকল। দলনেতা খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিনার্কার গাড়ির কাছে এসে মাথা একটু ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল। সিনার্কা বলল—কয়েদঘর থেকে রোক্কাকে এখানে নিয়ে এস। শুধু রোক্কাকে অন্য কোন বন্দীকে নয়। দলপতি মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে চলে গেল।

একটু পরেই রোক্কাকে নিয়ে দলপতি ফিরে এল। ফ্রান্সিস রোক্কাকে দেখেই বুঝল রোক্কা বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। কপালে মুখে খোলা হাতে তরোয়ালের কাটাগুলো ফুলে উঠেছে। দু'তিনটে কাটা জায়গায় রক্ত জমে কালচে হয়ে উঠেছে। রোক্কার হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে। ফ্রান্সিস এবার চিন্তায় পড়ল—রোক্কার সঙ্গে ও যেরকম দুর্ব্যবহার করেছে তাতে রোক্কা বোধহয় ওকে বিশ্বাসই করবে না। কাজেই ওর সঙ্গে যেতেও চাইবে না। ফ্রান্সিস বুঝতে পারল—অনেক সাবধানে ওকে এগোতে

হবে।

রোক্কা কাছে আসতে ফ্রান্সিস বলল—দেখুন রোক্কা—যে নক্‌শাটা আমি পেয়েছি সেটার সমাধান শুধু আপনিই জানেন। রোক্কা দুর্বল শরীরে যতটা পারে চেঁচিয়ে বলল—নকশাটা একেবারে জাল—মিথ্যে। ইসাবেলা ওরকম কোন নকশাই এঁকে জানালার গরাদ দিয়ে নিচে ফেলে দেন নি। ডাহা মিথ্যে এসব। ফ্রান্সিস বলল—আসলে এটা যে রত্নভাণ্ডার উদ্ধারের নির্দেশ আঁকা নকশা এটাই আপনারা বুঝতে পারেন নি।

—আপনি বুঝেছেন? অকৃতজ্ঞ ভাইকিং? গলায় বেশ জোর দিয়ে রোক্কা বলল।

—হ্যাঁ অনেকটা বুঝেছি। এবার আপনার সাহায্য চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি কোনরকম সাহায্য করবো না। রোক্কা চেঁচিয়ে বলল।

সিনার্কা সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে দলপতিকে বলল—রোক্কাকে গলায় মাথায় তরোয়ালের ঘায়ে আধমরা করে ফেল। তবেই কথা শুনবে। দলপতি তরোয়াল খুলে ছুটে এল। তখনও রোক্কার হাত বাঁধা। ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে বলল—এসবের কোন দরকার নেই। আমি রোক্কাকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি রোক্কার কাছ থেকে নকশার নির্দেশ বের করবো। আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য না করলে আমিই ওকে নিকেশ করবো। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—প্রথমে যে করেই হোক রোক্কাকে নিয়ে ঘরটায় ঢুকতে হবে।

—কিন্তু রোক্কাকে পাহারা দেবার জন্যে দু'জন সশস্ত্র সৈন্য ওর সঙ্গে থাকবে যাতে রোক্কা পালাতে না পারে। সিনার্কা বলল।

—বেশ। এবার তাহ'লে আমাদের যাবার অনুমতি দিন। ফ্রান্সিস বলল।

রোক্কাকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস দুর্গের পেছনের সেই খাদের দিকে চলল। যেতে যেতে পাহারাদার সৈন্যদের স্পেনীয় ভাষায় বলল—তোমরাও কি দুর্গের ছাতে উঠবে? দু'জন পাহারাদার সৈন্য নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হল—এরা স্পেনীয় ভাষা জানে না।

এবার ফ্রান্সিস রোক্কাকে স্পেনীয় ভাষায় বলল—প্রথমেই আমি আপনার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি তার জন্য—কথাটা বলে মাথা একটু নিচু করে বলল—আমি ক্ষমা চাইছি। একজন দেশপ্রেমিক যোদ্ধা হিসেবে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। রোক্কা বেশ আশ্চর্য হল। ফ্রান্সিস কি তাহলে তখন অভিনয় করেছিল?

রোক্কা বলল—আমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করেছিলেন কেন?

—সিনার্কার মন পাওয়ার জন্যে। আমার ঐ ব্যবহারে সিনার্কা সন্তুষ্ট হয়েছিল। আমার কথাগুলো বিশ্বাস করেছিল। তাই আজকে আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে দিল। ফ্রান্সিস বলল।

—রানী ইসাবেলার নক্‌শা কী আমি তাই জানি না। রোক্কা বলল।

ফ্রান্সিস বলল—নক্‌শাটা পুরো ধাপ্পাবাজি। নক্‌শাটা আমিই দ্রুত হাতে এঁকেছি। তারপর ধূলোবালি মেখে ময়লা করেছি যাতে সিনার্কা মনে করে নক্‌শাটা অনেক পুরোনো।

—তাহলে আমি কী করবো? রোক্কা বলল।

—আমি যখন যা বলবো আপনি তাই করবেন। ফ্রান্সিস বলল।

রোক্কা মৃদু হেসে বলল—আপনি যে সিনার্কার জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করতে চলেছেন সেই সিনার্কা আপনাদের রাজকুমারী আর কামেরাতকে কয়েদ ঘরে বন্দী করে রেখেছে। ফ্রান্সিস চম্‌কে উঠে বলল—সে কি। এসব কথা তো সিনার্কা বা দলপতি কেউ আমাকে বলে নি।

—বললে আপনি যদি আর রত্নভাণ্ডারের খোঁজে না যান। তাই এ খবর আপনার কাছে গোপন করে রাখা হয়েছে। রোক্কা বলল।

ফ্রান্সিস দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। রোক্কার পাহারাদার দুই সৈন্য ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বলে ছুটে চলল সিনার্কার গাড়ির দিকে। সিনার্কা অমাত্যরা তখন রত্নভাণ্ডারের চিন্তায় মগ্ন। সবার মনেই সংশয়—এই বিদেশীটা কি রানী ইসাবেলার রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবে?

তখনই ফ্রান্সিস সিনার্কার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল—মহামান্য রাজা—আপনি এটা কী করলেন?

—কেন? কী হয়েছে? সিনার্কা ঠিক বুঝতে না পেরে বলল।

—আপনি রাজকুমারী আর কামেরাতকে কয়েদ ঘরে বন্দী করে রেখেছেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। সিনার্কা বলল। ঠিক আছে রত্নভাণ্ডার উদ্ধার হলেই ওদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

—না মহামান্য রাজা এতে আমার উদ্যম নষ্ট হয়ে যাবে। আমার বিনীত অনুরোধ রাজকুমারী আর কামেরাতকে আমার এই প্রচেষ্টা দেখতে দিন। পাহারাদার কয়েকজন ওদের পাহারা দিক। তারপর রত্নভাণ্ডার পেলে ওদের মুক্তি দেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—আর না পেলে? সিনার্কা বলল।

—তখন আবার আমাদের বন্দী করে রাখবেন। ফ্রান্সিস বলল। সিনার্কা একটু ভেবে নিয়ে পাশে বসা অমাত্যদের সব বলল। কী কথাবার্তা হল ওদের মধ্যে ফ্রান্সিস বুঝল না। সিনার্কা এবার বলল—দলপতিকে পাঠাচ্ছি, রাজকুমারী আর কামেরাতকে নিয়ে আসতে। কিন্তু সঙ্গে প্রহরী থাকবে চারজন।

—বেশ তাহলে ওদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন মহামান্য রাজা। ফ্রান্সিস বলল। ফ্রান্সিস বার বার সিনার্কাকে মহামান্য রাজা বলছে। সিনার্কা খুশিতে আটখানা। সিনার্কা দলপতিকে ডেকে হুকুম দিল।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে মারিয়ার হাত ধরে ধরে কামেরাত এল। ফ্রান্সিস দেখল মারিয়ার চোখমুখের সেই উজ্জ্বল্য নেই। কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসের মন দুঃখার্ত হল। কিন্তু ও মন শক্ত করল। সকলের মুক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ফ্রান্সিসের পরিকল্পনার ওপর। এখন কারো কোন কষ্টের কথা ভাবতে গেলে চলবে না। সব দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হবে। কিন্তু ফ্রান্সিসকে দেখে মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল মাথা নিচু করল। ফ্রান্সিস বুঝল—মারিয়ার সঙ্গে যে ব্যবহার করতে ও বাধ্য হয়েছে তাতে মারিয়াকে এখন সামলানো মুস্কিল হবে। তাই ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বলে উঠল—মারিয়া আমাকে ক্ষমা কর। মারিয়া অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস বলল—আমি এখন যা বলছি

সেইভাবে কাজ করো। লক্ষ্মীটি এখন রাগ করে থাকার সময় নয়। আমি কামেরাতকে নির্দেশ দিতাম কিন্তু সেটা দিতে গেলে আমাকে স্পেনীয় ভাষায় দিতে হবে। সিনার্কা বা অমাত্যরা সব বুঝে নেবে। আমাদের বিপদই বাড়বে তাতে। তাই তোমাকে আমাদের মাতৃভাষায় বলছি যা কেউ বুঝবে না। ফ্রান্সিস থামল। লক্ষ্য করল মারিয়া যেন একটু শান্ত হল। ফ্রান্সিস স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। বলল—আমি যখন রোক্কাকে নিয়ে ঐ ভূতুড়ে ঘরটায় ঢুকবো তখন সবাই ঐ দিকেই তাকিয়ে থাকবে। তোমাদের পাহারাদাররাও অন্যমনস্ক হবে। ঠিক তখনই ভীড়ের মধ্যে তুমি আর কামারেত একসঙ্গে মিশে মিশে থাকবে। যখন আমরা ঘরটায় ঢুকবো তখন পাহারাদাররা অন্যমনস্ক হবেই। ঠিক তখনই তোমরা ভীড়ের মধ্যে দিয়ে পালাবে। কামেরাতকে নিয়ে জাহাজঘাটায় পালিয়ে যাবে। দু'জনেই আমাদের জাহাজে উঠবে। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। আমরা কাজ সেরে ঠিক জাহাজে ফিরবো। এই নিয়ে একেবারে দুশ্চিন্তা করবে না। তুমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নও। সাবধানে থাকবে। ব্যস্ আর কিছু বলার নেই। শুধু শেষ অনুরোধ আমার ওপর বিশ্বাস রেখো।

ফ্রান্সিস কথাটা শেষ করে মারিয়ার দিকে তাকাল। দেখল—মারিয়ার চোখেমুখে খুশির আভা। ফ্রান্সিস অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। ওরা এত কথা চারপাশের লোকেরা পাহারাদাররা সিনার্কা আর অমাত্যরা কিছুই বুঝল না।

ফ্রান্সিস রোক্কার কাছে এল। বলল চলুন। মারিয়া মৃদুস্বরে ফ্রান্সিসের সব কথা কামেরাতকে বুঝিয়ে বলল।

খাদটার কাছে এল দুজনে। ফ্রান্সিস পাহারাদার দু'জন সৈন্যের মুখের দিকে তাকাল। বুঝল—ওরা স্পেনীয় ভাষায় কথাবার্তা কিছুই বোঝে নি। ফ্রান্সিস একজন পাহারাদার সৈন্যের কোমরের খাপ থেকে এক ঝট্‌কা তরোয়ালটা খুলে নিল। অন্য সৈন্যটি সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল বের করল। ফ্রান্সিস হেসে হাত তুলে ওকে শান্ত করল। তরোয়ালটা দিয়ে রোক্কার হাতবাঁধা দড়িটা কেটে ফেলল। তরোয়াল ফিরিয়ে দিল।

ফ্রান্সিস বলল—রোক্কা—আপনাকে একটু কষ্ট করে দড়ি বেয়ে কিছুটা উঠতে হবে। পারবেন তো?

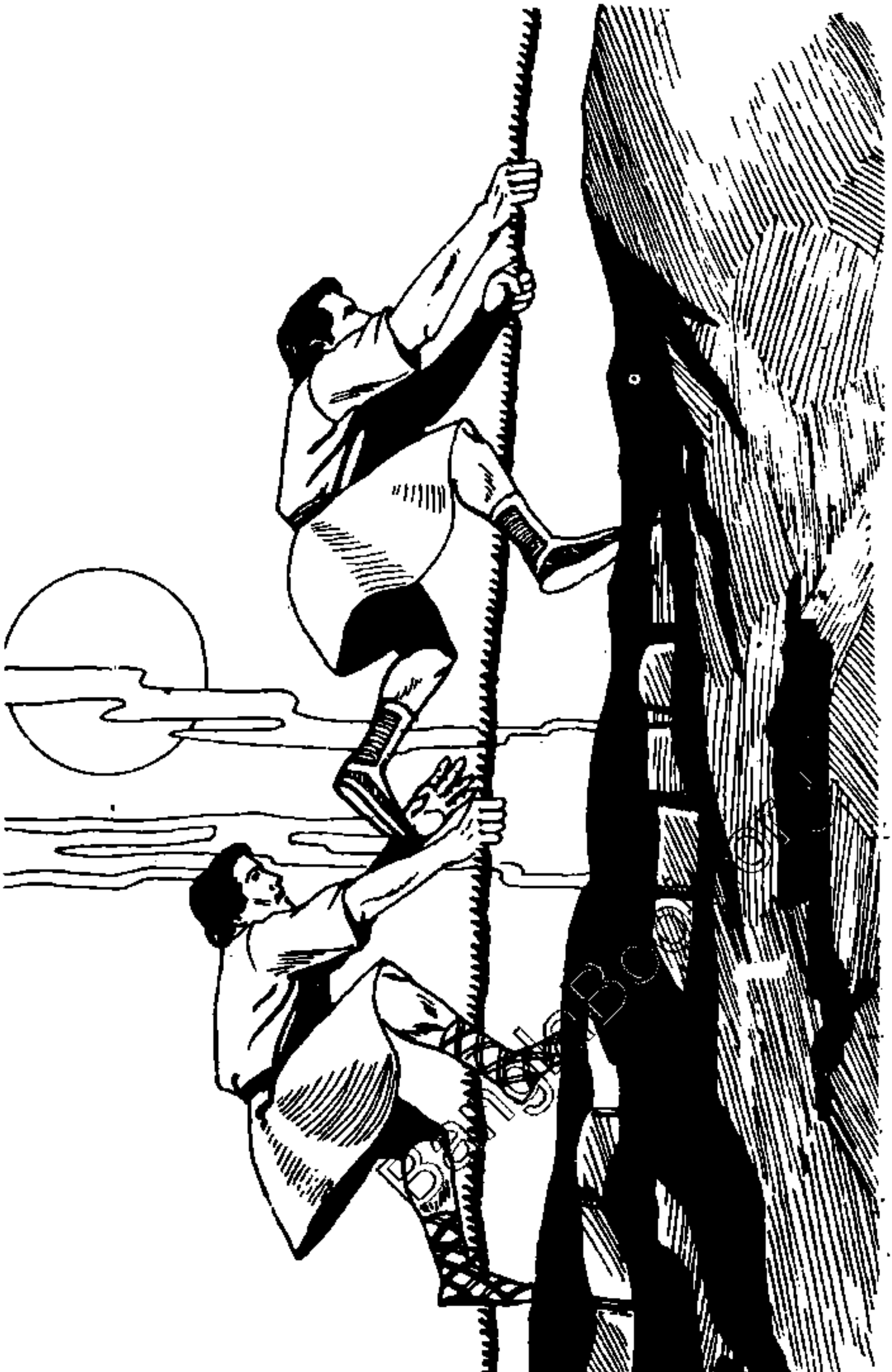
—হ্যাঁ পারবো—রোক্কা বলল—এখন আমি শরীরে মনে অনেক জোর পাচ্ছি।

দু'জনে খাদ থেকে দড়ি বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগল। অসুস্থ শরীর নিয়েও রোক্কা দমল না। দড়ি ধরে উঠতে গিয়ে দাঁত চেপে কষ্ট, কাটা জায়গার জ্বালা সহ্য করল। দড়ির ঘষ্‌টায় গালে কাটা জায়গাগুলো থেকে রক্ত পড়তে লাগল।

পাথরের ভাঙা পাটার ওপর দিয়ে সন্তর্পনে হেঁটে হেঁটে চলল দুজনে। প্রথমে ফ্রান্সিস। পেছনে রোক্কা। ওদের দেখাদেখি পাহারাদার দুজনও উঠতে লাগল। পাহারাদার দুজন বুঝল—রোক্কাকে নজরের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। তাহলে সুযোগ পেয়ে রোক্কা নিশ্চয়ই পালাবে।

সবাই দুর্গের ছাদে উঠে এল।

তখন সূর্য ডুবে গেছে। পশ্চিম আকাশের লাল কমলা রঙের আলো মিলিয়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। অন্ধকার বাড়বে। এখন মশাল চাই। নইলে



কিছুই দেখা যাবে না।—ফ্রান্সিস আর রোক্কা দুজনেই হাঁপাচ্ছে তখন।
হ্যারি এগিয়ে এসে বলল—ফ্রান্সিস—শাঙ্কো মশাল জ্বালিয়ে আনতে গেছে।
ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে হাসল—শাঙ্কো আসল কাজটাই করতে গেছে।
ওরা ছাদের ওপর বসে রইল শাঙ্কোর অপেক্ষায়।
কিছুক্ষণের মধ্যে শাঙ্কো জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ওদের কাছে এল।

এবার ফ্রান্সিস জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে দুর্গের ছাদের ধারে এল। দেখল নিচের ভীড় যেন আরো বেড়েছে। অনেক মশাল বেড়েছে। ফ্রান্সিস রোক্কাকে ডাকল। বলল—আসুন—আমরা দড়ি বেয়ে জানালাটার কাছে যাবো। তারপর ঘরটায় ঢুকবো।

—কিন্তু ঘরটার জানালায় মোটা মোটা লোহার গরাদ রয়েছে যে। রোক্কা বলল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—সব ভেঙে উপড়ে ফেলা হয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন—ঘরে ঢুকতে কোন অসুবিধে নেই।

এবার বাঁ হাতে মশাল ধরে ফ্রান্সিস দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। আস্তে আস্তে নামতে লাগল। একটু পরে রোক্কাও দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। দুজনে দড়ি ধরে ধরে নামতে লাগল। নিচে গাড়িতে বসা সিনার্কা গভীর মনোযোগ দিয়ে ফ্রান্সিসের হাতের মশাড়লের দিকে তাকিয়ে রইল। সমুদ্রের হাওয়ায় মশালের আগুন কাঁপছে। সেই কাঁপা কাঁপা আলো পড়ছে ফ্রান্সিসের মুখে। অন্ধকারে শুধু এইটুকুই দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস ডান হাত দিয়ে দড়ি ধরে ধরে আস্তে আস্তে নামছে তখন। নিচে দাঁড়ানো ভিড়ের লোকেরা ফ্রান্সিসের এই দুঃসাহসিক কাজের জন্যে মনে মনে প্রশংসা করতে লাগলো আর মশাল উচু করে নেড়ে নেড়ে ফ্রান্সিসকে উৎসাহ দিতে লাগল। ওরা ভেবে পেল না দিনের বেলা ঐ ভূতুড়ে ঘরে ঢুকতে লোকে সাহস পায় না। আর এই রাতের অন্ধকারে মাত্র একটা মশাল নিয়ে বিদেশিটা ঘরটায় ঢুকতে যাচ্ছে। বুকের পাটা আছে বলতে হবে।

বাঁ হাতে মশাল ধরে ফ্রান্সিস এবার জানালার পাথুরে জায়গাটায় বাঁ পাটা রাখল। তারপর আগে মশালটা ঘরের মধ্যে ফেলে দিল। তারপর জানালা দিয়ে ঢুকল। রোক্কাও তখন জানালাটায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঘর থেকে হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিস রোক্কাকে ধরে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। ভীড়ের মধ্যে থেকে চিৎকার হৈ হল্লা করে ফ্রান্সিসদের উৎসাহ দিতে লাগল। কামারেত বুঝল—এই সুয়োগ। ওদের পাহারাদাররাও উত্তেজনায় চ্যাচাচ্ছে। ওদের দিকে নজরই নেই। কামেরাত মারিয়াকে আস্তে আস্তে বলল—এই সুয়োগ—পালাতে হবে। বলেই কামেরাত ভীড়ে মিশে গেল। মারিয়াও ওকে অনুসরণ করল। ভীড় ছাড়িয়ে দুর্গের দেউড়ি পার হয়ে দুজনে দুর্গের বাইরে এল। কেউই ওদের লক্ষ্য করল না। সবাই তাকিয়ে আছে দুর্গের জানালাটার দিকে। দুঃসাহসী বিদেশীটা রানীর ইসাবেলার রত্নপেটিকা উদ্ধার করতে পারবে কিনা। বিদেশীটার সঙ্গে রোক্কাও যোগ দিয়েছে। দেখা যাক।

রাস্তায় নেমে মারিয়া বলল—ইস্—ফ্রান্সিস রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করল এটা আর দেখা হল না। কামেরাত বলল—উপায় নেই রাজকুমারী। এখন সবাই ঐ জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। এখনই পালানো সহজ। এবার যতটা সম্ভব দ্রুত চলুন জাহাজঘাটার দিকে। অপনাদের জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। ফ্রান্সিস তো

তাই বলেছেন।

—হ্যাঁ—মারিয়া বলল। শরীরের দুর্বলতা সত্ত্বেও মারিয়া যতটা দ্রুত সম্ভব হাঁটতে লাগল। পথ জনহীন। সবাই বোধহয় দুর্গের চত্বরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনে গিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠল।

মশালের আলোয় এখন ঘরটা অনেকটা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে। বোধহয় মশালের আলো চোখে লাগাতেই একপাল চামচিকে ঝটাঝট্ শব্দ তুলে জানালা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিস তো ঘরটা আগে দেখেছে। রোক্কা দেখে নি। তাই চারদিকে পাথরের ঘরটা দেখতে লাগল। দেখল—খাটটাও। খুব দামি ওক কাঠের তৈরি খাটটা এখন ধুলোয় ধুলোয় ধূসর। বিছানা শতছিন্ন। দেয়ালে একটা দেরাজমত। তাতে আয়না আটকানো। এখন আয়নার কাঁচ ধুলিমাখা।

দেয়ালের মশাল রাখার আংটায় ফ্রান্সিস মশালটা বসালো। তারপর ধূলিময় মেঝেতে নকশাটা পেতে উবু হয়ে দেখতে লাগল। রোক্কা তখন খাটটার দিকে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস বলে উঠল—এ ঘরটা আমার দেখা হয়ে গেছে। আপনি পাশের ঘরটায় দেখুন। কথাটা বলে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—রোক্কা—আমার জামার পেছনটা ছিঁড়ে ফেলুন তো।

—সে কি। জামা ছিঁড়বেন কেন? রোক্কা বলল। ফ্রান্সিস বলল—ঐ আয়নাটা পরিষ্কার করতে হবে। দেরাজটাও পরিষ্কার করতে হবে।

রোক্কা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের জামার পেছনদিকটা ধরে দুটো হ্যাঁচকা টান দিতেই জামাটা ছিঁড়ে গেল। আর একটানে ছেঁড়া কাপড়ের অংশটা খুলে এল। ফ্রান্সিসের জামাটা এখন শুধু সামনের দিকে রইল। ফ্রান্সিস ছেঁড়া কাপড়টা নিয়ে দেরাজের দিকে গেল। রোক্কা পাশের ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে চিঁ চিক্ চিক্ শব্দ তুলে ছুঁচো আর ইঁদুরের ছুটোছুটি শুরু হল। বোঝাই যাচ্ছে এ ঘরটা ভাঁড়ার ঘর হিসেবেই ব্যবহৃত হত। মশালের যেটুকু আলো এ ঘরটায় এসে পড়েছে তাই দেখে রোক্কার একথা মনে হল।

রোক্কা ফ্রান্সিস যে ঘরে আছে সেই ঘরে ফিরে এল। দেখল—ফ্রান্সিস ওর ছেঁড়া জামার কাপড়টা দিয়ে কী বাঁধছে। রোক্কা বলল—কী বাঁধছেন? ফ্রান্সিস হেসে বলল—রানী ইসাবেলার রত্নপেটিকা।

—সে কি! পেয়েছেন সেটা? কী করে পেলেন? রোক্কা জিজ্ঞেস করল।

—ঐ দেরাজের মধ্যে ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাকে দেখতে দেবেন না? রোক্কা সাগ্রহে বলল।

—এখন নয়—পরে। এখন ছাদে উঠতে হবে। এখানে একটা ভ্যাপসা গন্ধে গা গুলোচ্ছে। চলুন আর এখানে থাকার দরকার নেই। ফ্রান্সিস আংটা থেকে মশালটা তুলে নিয়ে বলল—রোক্কা—এবার আপনি মশালটা নিন। আমাকে তো রত্নপেটিকাটা নিতে হবে। আপনার কষ্ট হবে না তো?

—না—না। রোক্কা মশালটা নিয়ে জানালার কাছে গেল। জানালা থেকেই ডান হাতটা বাড়িয়ে ঝোলানো দড়িটা ধরল। তারপর দড়িটায় ঝুলে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে উঠতে লাগল ছাদের দিকে। নিচে তখন বহুলোকের চিৎকার শুরু

হল। কিন্তু চিৎকার থেমে গেল। রোক্কার হাতে তো রত্নপেটিকা নেই।

একটু পরেই জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিস দড়িটায় ঝুলে পড়ল। মশালের আলোয় নিচের সবাই দেখল ফ্রান্সিসের বাঁ হাতে ঝোলামত। তবে তো ওর মধ্যেই রত্নপেটিকা আছে—রানী ইসাবেলার রত্নভাণ্ডার। নিচের মানুষের হৈ হৈ চিৎকার শুরু হল। তারা হাতে ধরা মশাল ওঠাতে নামাতে লাগল। যতক্ষণ পর্যন্ত না ফ্রান্সিস দুর্গের মাথায় উঠে গেল ততক্ষণ পর্যন্ত চিৎকার হৈ হল্লা চলল। সিনার্কা আনন্দে গাড়ির ওপরেই প্রায় নেচে উঠতে লাগলেন। প্রায় একশো বছর ধরে অনেক চেষ্টা করেও কেউ ঐ ঘরে ঢুকতেই পারে নি। সেই রানী ইসাবেলার রত্নালংকারের পেটিকা এই বিদেশিটা উদ্ধার করেছে। একটা চিন্তাও হল সিনার্কার। যদি বিদেশিরা রত্নভাণ্ডার নিয়ে পালিয়ে যায়? পারবে না। দুজন সশস্ত্র সৈন্য পাহারায় রয়েছে। ওরা সাহস পাবে না।

প্রথমে রোক্কা তারপরে ফ্রান্সিস ছাদে উঠে এল। শাঙ্কো হ্যারি ছুটে এল। সৈন্য দুজনও। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—এটাই কি সেই রানী ইসাবেলার রত্নপেটিকা। ফ্রান্সিস হেসে বলল—হ্যাঁ।

—আমরা একটু দেখব না? শাঙ্কো বলল।

—না—এটা সিনার্কাদের সম্পত্তি—তাদের হাতেই এটা পৌঁছে দিতে হবে। এখন খোলা চলবে না। ফ্রান্সিস এবার হ্যারিকে বলল—হ্যারি সৈন্যদের হাতে রত্নপেটিকা দিয়ে বলো যে এটা যেন ওরা সিনার্কার হাতে পৌঁছে দেয়। হ্যারি লো ল্যাতিন ভাষায় সৈন্যদের নির্দেশটা জানাল। ফ্রান্সিস ওর জামা ছিঁড়ে তৈরি ঝোলাটা একজন সৈন্যের হাতে দিল। সৈন্যটি ঝোলাটা হাতে নিয়ে বলে উঠল—বড্ড ভারি। রোক্কা বলল—কত রত্ন কত অলঙ্কার—ভারি তো হবেই। দুই সৈন্য তখন নেমে আসার জন্যে অন্ধকারের মধ্যে ছুটল পাথরের ভাঙা পাটার ওপরে পা রেখে রেখে। দুজনে হা হা করে হাসছে। সিনার্কাকে এই রত্নপেটিকা দিতে পারলে কত ইনাম পুরস্কার পাওয়া যাবে। ওরা তখন সেই চিন্তায় মগ্ন। খেয়ালই নেই যে রোক্কাকে পাহারা দিতেই ওদের পাঠানো হয়েছে। সৈন্য দুজন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল।

এবার ফ্রান্সিস সবাইকে ডেকে বলল—আর একমুহূর্ত দেরি নয়। আমাদের যত শিগগিরি সম্ভব জাহাজঘাটায় পৌঁছতে হবে। জলদি নামো সবাই।

পাথরের পাটার ওপর দিয়ে ওরা যত দ্রুত সম্ভব ছুটে পার হল। তারপর দড়ি বেয়ে খাদে নেমে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো তুমি নিশ্চয়ই জাহাজঘাটায় পৌঁছবার জন্যে কোন দিক দিয়ে কীভাবে যেতে হবে তা জানো।

—আমার পেছনে পেছনে এসো। বলেই শাঙ্কো কিছু ঝোপঝাড়ের দিকে ছুটল। ফ্রান্সিসরাও পেছনে পেছনে ছুটল। রোক্কা বলল—সিনার্কা তো রানী ইসাবেলার রত্নপেটিকা পেয়েই গেছে। সিনার্কার আশা মিটেছে। তবে কেন পালিয়ে যাচ্ছেন? ফ্রান্সিস বলল—ঝোলাটা খুলে সিনার্কা পাবে একখণ্ড পাথর। একটাও রত্নালংকার নেই।—সেকি—রোক্কা চমকে উঠে বলল। হ্যারি শাঙ্কোও অবাক হল ফ্রান্সিসের কথা শুনে। ফ্রান্সিস বলল—পরে সব বলবো। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজে

উঠে জাহাজ ছেড়ে দিতে হবে।

ঝোপঝাড় পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে সকলে জাহাজ ঘাটার কাছে এল। জাহাজঘাটার আলোকস্তম্ভে আজ আগুন জ্বলছে না। ফ্রান্সিসরা আলোকস্তম্ভের কাছাকাছি আসতেই বিস্কো বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার? আলোকস্তম্ভে আগুন জ্বলছে না কেন? বিস্কো বলল—সিনার্কার সৈন্যদের আগুন জ্বালাতে দিই নি। দুটো সৈন্য ঘায়েল হতেই বাকিরা পালিয়েছে। শাঙ্কোর ধনুক থেকে আমি তীর ছুঁড়েছিলাম। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—শাঙ্কো আমরা যে কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারি। তুমি তীর ধনুক নিয়ে তৈরি হও। ফ্রান্সিসের কথাটা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল মশাল হাতে সিনার্কার একদল সৈন্য জাহাজঘাটার দিকে ছুটে আসছে। সবার আগে গাড়িতে চড়ে আসছে সিনার্কা নিজে। ফ্রান্সিস বুঝল—রত্নপেটিকার বদলে পাথর দেখে সিনার্কা রেগে আগুন হয়ে গেছে। ওর এখন মাথার ঠিক নেই। তাই নিজেই গাড়িতে চড়ে ফ্রান্সিসদের বাধা দিতে আসছে। সিনার্কা ধরেই নিয়েছে আসল রত্নপেটিকা ফ্রান্সিসরাই চুরি করেছে। এখন জাহাজে চড়ে পালাবে। তাই যত সৈন্য হাতের কাছে পেয়েছে তাদের নিয়েই ফ্রান্সিসদের জাহাজ আক্রমণ করতে আসছে।

শাঙ্কো তীর ছুঁড়ে মশাল হাতে সকলের সামনের সৈন্যটিকে ঘায়েল করল। সৈন্যটা মশাল ফেলে দিয়ে হাঁটু চেপে বসে পড়ল। মশালের আগুন লাগল অন্য দুজন সৈন্যের কাপটে মানে পোশাকে। তারা দুজনেই আগুন নেভাবার জন্যে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। এতে ছুটে আসা সিনার্কার সৈন্যদের গতি কমে গেল। শাঙ্কো পেছনে তাকিয়ে দেখল ফ্রান্সিসরা সবাই জাহাজে উঠে গেছে। শুধু ফ্রান্সিস তখনও জাহাজে উঠার পাটাতনের কাছে তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

শাঙ্কো এবার তীর ছুঁড়ল সিনার্কাকে লক্ষ্য করে।

নিখুঁত নিশানা। সিনার্কার কাঁধে গিয়ে লাগল তীরটা। সিনার্কা গাড়ির নরম আসনের ওপর গড়িয়ে পড়ল। সিনার্কার এই অবস্থা দেখে সৈন্যদের মনোবল ভেঙে গেল। কিছু সৈন্য পালিয়ে গেল। কিছু সৈন্য সিনার্কার গাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল।

এবার শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে ছুটে এল। ফ্রান্সিস বলল—হাত লাগাও। দুজনে কাঠের পাটাতন দিয়ে জাহাজে উঠল। দুজনে মিলে জাহাজ থেকে পাতা কাঠের পাটাতনটা তুলে ফেলল। শাঙ্কো ছুটে গিয়ে জাহাজের নোঙরটা ঘর ঘর শব্দে তুলে ফেলল। একদল ভাইকিং চলে গেল জাহাজের পাল খাটাতে। পাশেই ফেলুকা মানে যুদ্ধজাহাজে সিনার্কার কিছু সৈন্য ছিল। তারা কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিসের নির্দেশে জাহাজঘাটা থেকে জাহাজ বেরিয়ে এসে চলল মাঝ সমুদ্রের দিকে। জোর হাওয়ায় জাহাজের পাল ফুলে উঠল। জোর গতিতে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা অনেক দূর চলে এল।

ডেক-এর রেলিঙে ধরে ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজঘাটার দিকে তাকিয়ে ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে বোনিফেস বন্দর সিনার্কার যুদ্ধজাহাজ সব চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ মাঝসমুদ্রে চলে এল।

নিশ্চিন্ত হয়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিচে নামার সিঁড়ির দিকে চলল।

নিচে কেবিনঘরগুলোয় এসে যে ঘরে আহত অসুস্থ রোক্কাকে রাখা হয়েছে সেই কেবিনঘরে ঢুকল। দেখল বৈদ্য কামেরাত রোক্কার পাশে বিছানায় বসে আছে আর মারিয়া রোক্কার কাটা জায়গাগুলোতে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস বুঝল—মারিয়ার শরীর অনেকটা সেরেছে। ফ্রান্সিস কামেরাতকে বলল—রোক্কার শরীর কেমন?—অনেকটা ভালো। তবে জ্বরটা এখনও ছাড়ে নি। কালকে নাগাদ জ্বর ছেড়ে গেলে বিপদের কিছু নেই। কিন্তু জ্বর না ছাড়লে চিন্তার কথা। কামেরাত বলল।

—মারিয়া কেমন আছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—উনি এখন প্রায় সুস্থ। আর দুদিন ওষুধ পড়লে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন। কামেরাত বলল। ফ্রান্সিস ডাকল—মারিয়া। মারিয়া একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল। ফ্রান্সিস বুঝল—এখনও মারিয়ার রাগ পড়ে নি। ফ্রান্সিস ডান হাতটা আস্তে আস্তে মারিয়ার কাঁধে রাখল। মারিয়া সেই হাত নিজের হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। বলল—মারিয়া—তোমার সঙ্গে ওরকম দুর্ব্যবহার না করলে তোমাকে নিয়ে কামেরাত পালাতে পারতো না। তুমি যেরকম চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করেছিলে তাতে আমার সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যেত। কাজেই তোমাকে থামাতে হয়েছিল। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—আমাকে ক্ষমা কর। মারিয়া চুপ করে নিজের কাজ করে যেতে লাগল। ফ্রান্সিস আবার বলল—মারিয়া আমার ওপর রাগ করে থেকো না।

এবার রোক্কা বলল—রাজকুমারী—আপনি ফ্রান্সিসের ওপর রাগ করে থাকবেন না। আমার সঙ্গেও ফ্রান্সিস অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছিলেন। তখন বুঝিনি। এখন বুঝেছি ফ্রান্সিস ঠিক পরিকল্পনা করে এগিয়ে চলেন। ফ্রান্সিস আমাকে জীবনদান করেছেন। নইলে সিনার্কার ঐ কয়েদখানা থেকে কোনোদিন বেরিয়ে আসতে পারতাম না। আমার বিদ্রোহী বন্ধুরা অবশ্যই আমাকে মুক্ত করতো কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত খরচ না করে ফ্রান্সিস স্রেফ বুদ্ধির খেলায় সিনার্কাকে হারিয়ে আমাকে মুক্ত করেছে। একটু থেমে বলল—আপনি ফ্রান্সিসকে ক্ষমা করুন। উনি যা করেছেন সে সবকিছুই পরিকল্পনা মাফিক করেছেন।

হ্যারি বলল—রাজকুমারী আমিও ফ্রান্সিসকে ভুল বুঝেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি ফ্রান্সিস নিখুঁত পরিকল্পনা করে কাজে নেমেছিল। মারিয়া এবার যেন একটু নরম হল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। তারপর নিজেদের কেবিন ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। সারাটা দিন যা ধকল গেছে। ফ্রান্সিস ছেঁড়া জামাটা খুলল। তারপর ভীষণ ক্লান্তিতে চুপ করে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ফ্রান্সিস মারিয়া হ্যারি শাঙ্কো সবাই রোক্কার কেবিনঘরে জড়ো হল। রোক্কা এখন অনেকটা সুস্থ। জ্বর ছেড়ে গেছে। কামারেত বলল—রোক্কার আর কোন ভয় নেই। কাটা জায়গা থেকে রক্ত পড়ার জন্য রোক্কা যতটা দুর্বল হয়েছিল কয়েকদিনের মধ্যেই সেই দুর্বলতা কেটে যাবে।

রোক্কা বলল—ফ্রান্সিস—আপনি তো আমাকে পালঙ্কের দিকে যেতেই দিলেন কী ছিল ঐ পালঙ্কে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—সব বলছি।

হ্যারি বলে উঠল—তুমি কি রানী ইসাবেলার রত্নপেটিকা খুঁজে পেয়েছিলে?

ফ্রান্সিস হেসে বলল—হ্যাঁ। ফ্রান্সিসের কথা শুনে সবাই চমকে উঠল। শাঙ্কো বলল তবে ঐ রত্নপেটিকা নিয়ে এলে না কেন? হ্যারি কিছু বলল না। ওর কেমন মনে হল ফ্রান্সিস এবার ইচ্ছে করে হার স্বীকার করেছে।

—রত্নালংকারগুলো দেখেছিলে? মারিয়া বলল।

—না—ফ্রান্সিস বলল—তবে আমি নিশ্চিত ঐ রত্নপেটিকায় রানী ইসাবেলার সব রত্ন আর অলঙ্কার ছিল।

—ঠিক কী হয়েছিল বলো তো? হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলতে লাগলো—প্রথমবার তো আমি একাই ঘরটায় ঢুকেছিলাম। জানালা দিয়ে ঢুকে ঘরের মধ্যে মেঝেয় পা রাখলাম। প্রায় একশো বছর পরে এই ঘরের মেঝেয় বাইরের মানুষের পা পড়ল। জানালায় চেয়ে দেখলাম বাইরে বিকেলের আলো। সেই আলো জানালা দিয়ে আসছিল। সামান্য আলো। তাতে ঘরের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

অন্ধকার অন্ধকার ভাবটা চোখে একটু সয়ে এলে দেখলাম—ঘরের বাঁদিকের পাথুরে দেয়ালে লাল পাথর দিয়ে অনেকগুলো লম্বাটে দাগ। বুঝলাম—রানী ইসাবেলা এইভাবেই দিনের হিসেব রাখতেন। ডানদিকে তাকিয়ে দেখলাম—পাথরের দেয়ালে একটা কাঠের দেরাজ। একটা মাঝারি আকারের আয়না বসানো। সবকিছুর গায়ে চাপ চাপ ধুলো।

এবার দেখলাম ওদিকের দেয়ালে ঠেলে লাগানো একটা দামি ওক কাঠের পালঙ্ক। পালঙ্কের দুদিকের মাথায় উঁচু করে পেতল দিয়ে তৈরি নানা লতাপাতার নকশা। পালঙ্কের বিছানা ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে। পালক তুলো বেরিয়ে আছে। ধুলো জমে জমে পালঙ্কের কাঠ বিছানা যেন ঢাকা পড়ে গেছে। পালঙ্কের গায়ে নানা ফুললতাপাতার কাজ। কুঁদে কুঁদে তোলা। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল।

আস্তে আস্তে পালঙ্কটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছেঁড়া খোঁড়া বিছানাটার মাঝখানে একটা কাঠের পেটিকা। দামি চেষ্টনাট কাঠের পেটিকাটার গায়ে মীনে করা ফুললতা পাতা। পেটিকাটা ভালো করে দেখতে গিয়ে চমকে উঠলাম। সাদা হাড়ের ধূলিময় দুটো হাত রত্নপেটিকাটা ধরে আছে। এবার ধুলোর মধ্যে দিয়ে আন্দাজ করে বুঝলাম—দুটি কঙ্কাল। একটা বড় একটা ছোট। বুঝলাম—বড়টা রানী ইসাবেলার ছোটটি রানীর মেয়ে রাজকুমারীর। কী গভীর মমতায় দুজনে রত্নপেটিকাটা ধরে আছে। সন্দেহ নেই এই পেটিকাটাই রানী ইসাবেলার রত্নভাণ্ডার। ফ্রান্সিস থামল। উপস্থিত সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে ফ্রান্সিসের কথাগুলো শুনছিল। ফ্রান্সিস বলতে লাগল—রত্নপেটিকাটা তুলে নেব বলে হাত বাড়ালাম। কিন্তু পারলাম না পেটিকাটা তুলে নিতে। কী অপরিসীম ভালোবাসায় মমতায় মা আর মেয়ে সেই পেটিকাটা ধরে আছে। এখন আর ওরা রানী রাজকুমারী নয়। সাধারণ মানুষ—মা আর মেয়ে। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল—এক অদ্ভুত পরিবেশ। কতদিন আগের কথা। সেই সময়টাই যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মৃত্যুর সময়ও তারা রত্নপেটিকাটা হাতছাড়া করে নি। কী বলবো? আমার চোখে জল এসে গেল। আমি রত্নপেটিকাটা না নিয়েই জানালার কাছে চলে এলাম। দড়ি ধরে দুর্গের ছাতে

উঠে এলাম।

—তারপরে তো আমাকেও নিয়ে গেলেন। রোক্কা বলল।

—ওটা সিনার্কাকে ধোঁকা দেবার জন্যে জামা ছিঁড়ে সেই কাপড়ের ঝুলি তৈরি করে একটা প্রায় চৌকোনো পাথর ভরে আপনাকে নিয়ে ছাদে উঠে এলাম। সৈন্যদুটিকে ঐ পাথরটাই রত্নপেটিকা এরকম বুঝিয়ে সিনার্কার কাছে পাঠালাম। জানতাম রত্নপেটিকা পাওয়া গেছে এই আনন্দে সৈন্য দুটি রোক্কাকে পাহারা দেবার কথা ভুলে যাবে। হলও তাই। রোক্কাকে মুক্ত করে আমাদের জাহাজে নিয়ে এলাম।

সবাই নির্বাক হয়ে ফ্রান্সিসের বলা ঘটনাগুলো ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। একসময় রোক্কা আবেগে ফ্রান্সিসের ডান হাতটা জড়িয়ে ধরল। একটু কান্নাভেজা গলায় বলল—ফ্রান্সিস যদিও রত্নভাণ্ডার উদ্ধার হলো না—তবু আমি আপনার মানবতাবোধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আপনি সত্যিই সাধারণ মানুষ নন। ফ্রান্সিস হেসে বলল—কী যে বলেন। মারিয়া হেসে বলল—রোক্কা ঠিক আমাদের মনের কথাই বলেছেন। ফ্রান্সিস বলল—এখন তো রানী ইসাবেলার রত্নভাণ্ডার আপনাদের হাতের মুঠোয়। সেই রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করে আপনার দেশবাসীদের কল্যাণের কাজে লাগাবেন—এই অনুরোধ। রোক্কা বলল—আগে সিনার্কা আর ওর মোসাহেবের দলকে দক্ষিণ কর্সিকা থেকে তাড়াবো। তারপর রানী ইসাবেলা আর রাজকুমারীকে রাজকীয় সম্মানে কবর দেবার ব্যবস্থা করবো। মা মেয়ে হাত ধরাধরি করে যেভাবে আপনি দেখেছেন একই কবরে তেমনিভাবে তাঁদের শুইয়ে রাখবো। শুধু রত্ন আর রত্নালংকার বিক্রি করবার জন্য নেব। রত্নপেটিকাটি দুজনে যেভাবে শুয়ে ধরে ছিলেন সেভাবে তাঁদের হাতে রাখবো। রত্নালঙ্কার বিক্রির অর্থ দিয়ে দেশ ও দেশবাসীর কল্যানে ব্যয় করবো। আপনাদের সামনে এই প্রতিজ্ঞা করছি আমি। একটু থেমে রোক্কা বলল—এখন তো সিনার্কার সৈন্যরা আর জাহাজ আক্রমণ করতে আসবে না। নিশ্চিন্তে জাহাজটা ডাঙার কাছাকাছি নিয়ে চলুন। ভোর নাগাদ সারিন বন্দরে পৌঁছে যাবো তাহলে। সারিন আমাদের শক্ত ঘাঁটি। সব বিদ্রোহীদের একত্র করে আমরা বোনিফেস আক্রমন করবো কালকেই।

ভোর নাগাদ ফ্রান্সিসদের জাহাজ সারিন বন্দরে পৌঁছল। খুব বড় বন্দর নয়। রোক্কা আর কানারেত ফ্রান্সিসদের কাছ থেকে বিদায় নিল। কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে দুজনে নেমে গেল।

আবার ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলল। জোরালো বাতাসে ফুলে উঠলো পালগুলো। জাহাজ ঢেউ ভেঙে চলল মাঝসমুদ্রের দিকে।

সমাপ্ত

যীশুর কাঠের মূর্তি



কর্সিকা দ্বীপের বোনিফেসিও বন্দর থেকে এবার ভাইকিং বন্ধুরা ফ্রান্সিসকে দেশে ফেরার জন্য বারবার বলতে লাগল। দেশ ছেড়ে এসেছে অনেকদিন। ওরা প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু ফ্রান্সিসকে রাজী করাতে না পারলে কিছুই হবে না। বন্ধুরা মারিয়াকেও বারবার অনুরোধ করতে লাগল, রাজকুমারী—আপনি ফ্রান্সিসকে রাজী করান।

মারিয়ার নিজেরও এইসব বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে থাকতে মন চাইছিল না। তবু সাবধানে কথাটা পাড়ল। ফ্রান্সিসকে বলল, এবার দেশেই ফিরে চলো। পরে আবার না হয় সমুদ্রযাত্রায় বেরুনো যাবে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, মারিয়া, দেশের টান সকলেরই থাকে। আমারও আছে। কিন্তু দেশে ফিরে ঐ যে সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন—এ আমার ভালো লাগে না। তবু তোমাদের বিশেষ করে তোমার অনুরোধে দেশের দিকে জাহাজ চালাতেই বলছি ফ্লাইজারকে। কিন্তু আবার যদি কোনো রহস্যের সন্ধান পাই তবে আবার লেগে পড়বো।

বেশ তো—দেখাই যাক। ফেরার পথে আবার কোনো রহস্যের সন্ধান নাও তো পেতে পারো। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, দেখা যাক।

মারিয়া বলল, তোমার বন্ধুরা কেউ কেউ বলছিল পিসায় নেমে স্থলপথে দেশে ফিরে যাওয়া যায়।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল, না, না। স্থলপথে যেতে অনেক বেশি সময় লাগবে। তার ওপরে স্থলপথে বিপদ-আপদ অনেক বেশি। পরিষ্কার আকাশ আর তেজি হাওয়া পেলে জাহাজে অনেক তাড়াতাড়ি দেশে পৌঁছোনো যাবে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ তখন বন্দর থেকে অনেকটা দূরে মাঝসমুদ্রে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে ফ্লাইজারকে বলল, দিক ঠিক রেখে দেশের দিকে জাহাজ চালাও। ভাইকিং বন্ধুদের তখন আনন্দ দেখে কে। সবাই ছুটোছুটি করে সব পালগুলো টানাটানি করে দড়ি বেঁধেছেঁদে জাহাজের গতি বাড়াতে লাগল। পালগুলো যথেষ্ট হাওয়া পাচ্ছে। তবু সাত-আটজন ভাইকিং দাঁড়ঘরে নেমে এল। দাঁড় বাইতে লাগল। গতি চাই, আরো গতি। জাহাজ দ্রুত জল কেটে ঢেউ ভেঙে চলল।

তিন-চারদিন নির্বিঘ্নেই কাটল। ভাইকিংরা দেশে ফেরার চিন্তায় খুব খুশি। যার সবচেয়ে বেশি সাবধানী হওয়া উচিত ছিল সেই নজরদার পেড্রোও খুশিতে ওর কাজে ঢিলে দিল। এক রাতে মাস্তুলের মাথায় ওর নির্দিষ্ট জায়গায় বসে নজর রাখল না। ডেক-এ অন্য বন্ধুদের সঙ্গে নিজেও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ভাবল,

অল্পক্ষণ ঘুমিয়ে নজরদারির জায়গায় গিয়ে বসবে। পেড্রোর এই ভুলের জন্যে সবাইকে তার খেসারত দিতে হলো।

তখন ভোর হয় হয়। পেড্রোর ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠে বসতেই সামনে দেখল খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক কাফ্রি। পেড্রো ভয়ার্ত চোখে চারদিকে তাকাল। দেখল ওদের জাহাজের গায়ে গা লাগিয়ে আর একটা জাহাজও চলেছে। ডেক-এ যেখানে যেখানে ওর বন্ধুরা শুয়ে ঘুমুচ্ছে তাদের সকলের সামনে একজন করে খোলা তরোয়াল হাতে কাফ্রি দাঁড়িয়ে। কাফ্রিরা নিঃশব্দে ওদের ক্যারাভেল জাহাজ থেকে এই জাহাজে উঠে এসে জাহাজ দখল করে নিয়েছে।

ভোরের আধো আলো, আধো অন্ধকারে পেড্রো বোকার মতো তাকিয়ে রইল কাফ্রিটার দিকে। একবার ভাবল, চিৎকার করে সবাইকে ডাকে। কিন্তু কাফ্রিটা ওর মনোভাব বুঝতে পেরে তরোয়ালের ডগাটা পেড্রোর গলায় ঠেকিয়ে মাথা দুলিয়ে হাসল। ঐ কুচকুচে কালো মুখে সাদা দাঁতগুলো চক্‌চক্ করে উঠল।

ভোর হলো। ডেক-এ শুয়ে ঘুমিয়ে থাকা ভাইকিংদের ঘুম ভাঙতে লাগল। চোখ মেলে সবাই দেখল খোলা তরোয়াল হাতে কাফ্রি যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের সামনে। ওরা অসহায় চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল। ওদের তখন একটাই ভাবনা কেবিনঘরে বোধহয় ফ্রান্সিস হ্যারিরা নিরাপদেই আছে।

একটু পরেই ভোরের নরম আলো পড়ল সমুদ্রে জাহাজ দুটোয়। তখনই ডেকঘর থেকে একে একে উঠে আসতে লাগল ফ্রান্সিস মারিয়া হ্যারিরা। প্রত্যেকের পেছনেই কাফ্রি যোদ্ধারা। ফর্সা গা আরবীয় যোদ্ধারাও আছে তাদের মধ্যে। এত নিঃশব্দে এই কাফ্রি যোদ্ধারা জাহাজটা দখল করে ফেলল যে ভাইকিংরা এতটুকুও বুঝতে পারল না।

ফ্রান্সিসরা ডেক-এ উঠে আসতে একটি আরবীয় যোদ্ধা গ্রীক ভাষায় বলল, সবাই জাহাজের রেলিঙের ধারে সারি দিয়ে দাঁড়াও। ভাইকিংরা গ্রীক ভাষা কিছুই বুঝল না। তখন হ্যারি গলা চড়িয়ে ওদের ভাষায় কথাটা বুঝিয়ে বলল। এবার ভাইকিংরা রেলিঙের ধারে সারি বেঁধে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস একবার ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে পেড্রোকে খুঁজতে লাগল। দেখলও পেড্রোকে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে পেড্রো। ফ্রান্সিস ডাকল, পেড্রো! পেড্রো চমকে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর ছুটে এসে ফ্রান্সিসের দুই হাত জড়িয়ে ধরল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আমরা এভাবে বন্দী হবো। ফ্রান্সিস, আমার কর্তব্যে অবহেলার জন্যে আমাকে যে শাস্তি দিতে চাও, দাও।

এখন ওসব কথা অর্থহীন। এখন এরা আমাদের নিয়ে কী করবে সেই কথা ভাবো। ফ্রান্সিস বলল।

একজন আরবী সৈন্য এসে পেড্রোর পিঠে তরোয়ালের খোঁচা দিল। পেড্রো সারির মধ্যে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। দু'তিনজন ভাইকিং চিৎকার করে

বলে উঠল, ফ্রান্সিস, পেড্রোকে ফাঁসিতে লটকাও। অনেকে ছিঃ ছিঃ করতে লাগল। ফ্রান্সিস হাত তুলে সবাইকে শান্ত হয়ে থাকতে বলল। এইভাবে বিনা বাধায় বন্দী হওয়াটা ভাইকিংরা মেনে নিতে পারল না। সবাই মনে মনে গজরাতে লাগল।

তখন সকাল হয়েছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় রোদ ঝিকিয়ে উঠছে। জোর হাওয়া বইছে। সাগরপাখির তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যাচ্ছে। দু'টো জাহাজই পাশাপাশি চলেছে।

ক্যারাভেল জাহাজ থেকে এক আরবীয় যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের জাহাজের রেলিং ধরে উঠে এল। আরবী ভাষায় গলা চড়িয়ে কী বলল। যোদ্ধাদের মধ্যে বেশ তৎপরতা দেখা গেল। বোঝা গেল কেউ একজন ফ্রান্সিসদের জাহাজে আসবে এবং সে যে দলপতি এটাও বোঝা গেল।

একটু পরেই ক্যারাভেল জাহাজের ডেক-এ উঠে এল একজন আরবীয়। মাথায় কান-ঢাকা কালো বিড়ে বাঁধা পাগড়ি মতো। সে দু'একজন যোদ্ধার সাহায্যে ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিসদের সারির কাছে এল। দলপতির গোঁফ আছে। চিবুকের কাছে অল্প দাড়ি। গায়ের রং ফর্সা। শরীরটা রোগাই।

দলপতি এবার ফ্রান্সিসদের দেখে খুব খুশি হলো। দু'তিনজন যোদ্ধা অল্প মাথা ঝাঁকিয়ে খুশিমুখে হাসল। ফ্রান্সিস তখনও ভেবে পাচ্ছে না এরা কারা? ফ্রান্সিসদের দেখে দলপতির এত খুশি হবার কারণ কী?

এবার দলপতি গ্রীক ভাষায় বলল, তোমাদের দেখেই তো বুঝতে পারছি তোমরা এই ভূমধ্যসাগরের এলাকার লোক নও—তোমরা বিদেশী। এক হ্যারি বাদে ফ্রান্সিসরা কেউই কথাটার অর্থ বুঝতে পারল না। হ্যারি গ্রীক ভাষা মোটামুটি বোঝে। বলতেও পারে। হ্যারি ভাঙা ভাঙা গ্রীকভাষায় বলল, আমরা ভাইকিং। বীরের জাতি।

দলপতি এবার হ্যারির কাছে এল। হেসে বলল, হ্যাঁ তোমাদের ভাইকিং জাতির নাম আমরা শুনেছি। জাহাজ চালাতে দক্ষ তোমরা, আবার লুঠপাটও করো।

না—আমরা জলদস্যুতা করি না। হ্যারি বলল।

যাক গে—শোন—আমার নাম আল জাহিরি—আমি বণিক্‌। দলপতি বলল।

আপনার কীসের ব্যবসা? হ্যারি বলল।

মানুষ কেনাবেচা। আল জাহিরি কথাটা বলে হো হো করে হেসে উঠল। হ্যারি বুঝল—খুবই বিপদে পড়েছে ওরা। আল জাহিরির জাহাজে নিশ্চয়ই কয়েদখানা মতো আছে। সেটাতে মানুষদের বন্দী করে রাখা হয়। তারপর ক্রীতদাসদের বিকিকিনির হাটে বিক্রি করা হয়। হ্যারি বলল, বুঝেছি—আপনি আমাদের ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করবেন।

ঠিক তাই—আল জাহিরি হেসে বলল, এটাই আমার ব্যবসা।

হ্যারি দেখল, আল জাহিরির গায়ে বেশ দামী রেশমি কাপড়ের সোনালি জরি বসানো পোশাক। গলায় মুক্তোর মালা। হ্যারি একটু হেসে বলল, তাহলে আপনার ব্যবসা বেশ ভালোই চলছে?

আল জাহিরিও হাসল। বলল, হ্যাঁ—তবে এব্যার খুব ভালো দাম পাবো।

কেন? হ্যারি জানতে চাইল।

কারণ—ইউরোপীয় মানুষ আমরা কমই পাই। এবার এতগুলি যুবক ইউরোপীয়—ওঃ অনেক দাম পাবো। আল জাহিরি বলল। তারপর মারিয়াকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, এটার জন্যেই যা দাম পাবো তাতে কয়েক বছর আর মানুষ না ধরলেও চলবে।

হ্যারি বলল, মুখ সামলে কথা বলুন—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী মারিয়া। আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী।

আল জাহিরি চোখ বড় বড় করে বলল, রাজকুমারী, বাব্বা—তাহলে তো দর আরও চড়াতে হবে।

হ্যারি কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। চুপ করে রইল। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে আল জাহিরির সঙ্গে ওর যা কথাবার্তা হয়েছে সবই বলল।

সব শুনে ফ্রান্সিস গভীর চিন্তায় পড়ল। ফ্রান্সিসরা জানে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা কী নির্মম নিষ্ঠুর হয়। দয়া মায়া বলে কোনো বোধই থাকে না। বন্দী মানুষদের দেখে পশুর মতো।

আল জাহিরি চিৎকার করে বলতে লাগল, সব কটাকে আমাদের ক্যারাভেল-এ নিয়ে যাও। কয়েদখানায় বন্দী করে রাখো। তারপর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ইনি নাকি রাজকুমারী। ইনি মুক্ত থাকবেন।

হ্যারি বলে উঠল, না ইনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।

তা কি করে হয়—আল জাহিরি বলল, একে কত যত্নে রাখতে হবে। কয়েদখানায় থাকলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে। না, না—রাজকুমারী আলাদা কেবিনঘরে থাকবে।

হ্যারি ফ্রান্সিসকে কথাগুলো বুঝিয়ে বললো। অন্য ভাইকিং বন্ধুরা শুনল সে কথা। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—ও হো-হো—।

হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল, আল জাহিরি, দেখছেন তো রাজকুমারীকে আলাদা করে রাখতে কেউ রাজী নয়। রাজকুমারী আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

আল জাহিরি ভাইকিংদের ক্রুদ্ধ চেহারা আর ধ্বনি শুনে একটু ভাবনায় পড়ল। ভাইকিংরা নিরস্ত্র। ওর পাহারাদারদের হুকুম দিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিরস্ত্র ভাইকিংদের মেরে ফেলা যায়। কিন্তু তাতে কী লাভ? বরং বাঁচিয়ে রাখলে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাটে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা পাবে। শুধু রাজকুমারীকে বিক্রি করলেই হাজার কয়েক স্বর্ণমুদ্রা মিলবে। কাজেই আল জাহিরি কোনো গোলমালে যেতে চাইল

না। মারিয়াকে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল, রাজকুমারী, আপনি কি কয়েদখানার অন্ধকারে পচতে চান না কোনো কেবিনঘরে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকতে চান?

মারিয়া বলল, আমি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চাই না। আমার স্বামী আর তার বন্ধুরা যেখানে যেভাবে থাকবে আমিও সেখানে থাকবো।

কী মুশকিল—তাতে আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। ক্রীতদাসের হাটে আপনার দাম কমে যাবে যে। আল জাহিরি মাথা নেড়ে নেড়ে বলল।

সেসব আমি বুঝি না। মারিয়া বলল।

আল জাহিরির ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় কথা বিস্কো শাঙ্কোরা বুঝল। ওরা আবার একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো।

এবার আল জাহিরি বলল, আমি ব্যবসাদার লোক—মারামারি কাটাকাটির মধ্যে নেই। তোমরা সবাই ক্যারাভেলের কয়েদখানায় থাকবে। মনে থাকে যেন, পালাবার চেষ্টা করলে মরবে।

আল জাহিরি নিজেদের ক্যারাভেলে চলে গেল। কাফ্রি আর আরবী পাহারাদার এবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে গ্রীক ভাষায় চিৎকার করে বলল, ক্যারাভেলে চলো সব। কেউ চালাকি দেখাতে গেলেই মরবে।

হ্যারি ওদের দেশীয় ভাষায় কথাগুলি বন্ধুদের বুঝিয়ে বলল।

শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, না, আমাদের জাহাজ ছেড়ে আমরা যাবো না। বন্ধুরা হৈহৈ করে শাঙ্কোকে সমর্থন করল। পাহারাদার সৈন্যরা বুঝল ওরা ক্যারাভেল-এ যেতে আপত্তি করছে। ওরা খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে সৈন্যদের থামাল। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ভাইসব, আমরা ভালো করে জানি আল জাহিরি আমাদের মেরে ফেলবে না। তাতে ওর ব্যবসারই ক্ষতি। তবে নিরস্ত্র অবস্থায় লড়াইয়ে নামলে আমরা অনেকেই আহত হবো। আমি এটা চাই না। এখন লড়াই নয়। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ক্যারাভেল-এ চলো। বন্দীজীবন মেনে নাও। সময় সুযোগ বুঝে যা করবার করা যাবে। ক্যারাভেল-এ চলো সব।

ভাইকিং বন্ধুরা বুঝল যে এই অবস্থায় ফ্রান্সিসের কথাই মেনে নিতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে পাহারাদারদের নির্দেশমতো ক্যারাভেল-এ গিয়ে উঠতে লাগল।

আল জাহিরির সৈন্যদের পাহারার মধ্যে ভাইকিংরা ক্যারাভেল-এ গিয়ে উঠল। ক্যারাভেল-এর সিঁড়ি বেয়ে একেবারে নিচের কয়েদখানার সামনে এল সবাই। কয়েদখানার লোহার দরজার সামনে খোলা তরোয়াল হাতে দু'তিনজন পাহারাদার। একজন গিয়ে লোহার দরজা খুলে দিল। ঠন্‌ঠন্ শব্দে দরজা ঠেলে খুলে ভাইকিংদের

ঢোকানো হতে লাগল।

এরকম কয়েদখানা ভাইকিংরা আগেও দেখেছে। কিন্তু মারিয়া তো দেখেনি। লোহার মোটা মোটা গরাদ দেওয়া। মারিয়া এইবার প্রথম বেশ ভীত হলো। এখানে তো পশুর মতো থাকতে হবে। মারিয়া এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। ফ্রান্সিস মারিয়ার মনের অবস্থা ভালোই বুঝতে পারল। মারিয়ার হাতে চাপ দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, ভয়ের কিছু নেই। তবে কষ্ট হবে তোমার। তুমি যদি ওপরের কেবিনঘরে থাকতে চাও—

মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, না—আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকবো। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। কয়েদঘরে ঢুকে দেখল আগে থেকেও পাঁচ-ছ'জন বন্দী রয়েছে। সবাই কাফ্রি। শুধু একজন শ্বেতাঙ্গ। বোধহয় এই এলাকার লোক। জোব্বামতো চাষীদের পোশাক পরনে। একটা ব্যাপার দেখে ফ্রান্সিস খুশি হলো যে এই কয়েদঘরে ওদের হাত বেঁধে রাখা হলো না। তার কারণটাও ফ্রান্সিস ঠিক বুঝতে পারল—হাত-পা অনেকদিন বেঁধে রাখলে কড়া পড়ে যায়। ক্রীতদাস বিক্রির হাটে দাম কমে যায়। সুস্থ সবল মানুষ চাই। তবে না দাম উঠবে।

ভাইকিংদের মধ্যে কিছু বসে পড়ল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল কাঠের পাটাতনে, কেউ কেউ ছোট জায়গাতেই পায়চারি করতে লাগল।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া এককোণায় বসল। হ্যারি এসে ওদের পাশে বসল। তিনজনেই চুপচাপ বসে রইল। এমনভাবে এত দ্রুত ওরা বন্দী হয়ে যাবে এটা কল্পনাও করেনি।

কিছু পরে লোহার দরজা শব্দ তুলে খোলা হলো। তিনজন কাফ্রি খাবার নিয়ে এল। এক মস্তবড় কাঠের থালায় গোল করে কাটা রুটি। মস্তবড় গামলায় আলু টমেটোর মাংস ছড়ানো স্যুপ। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। আজ ফ্রান্সিস কিন্তু সেই কথাটা বলতে পারল না—পেট পুরে খাও—খেতে ভালো না লাগলেও খাও। সত্যিই আজ ফ্রান্সিসের মন চিন্তাভারাক্রান্ত। এই তলার ডেক-এর কয়েদখানায় থাকার অভিজ্ঞতা ওদের আছে। কিন্তু মারিয়া কি এই কষ্টের জীবন কাটাতে পারবে? তার ওপর অসুখ থেকে উঠে মারিয়া এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। হঠাৎ-ই ফ্রান্সিসের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে ও চুপ করে বসে রইল। ওর সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হলো মারিয়ার জন্যে।

একসময় বিস্কো উঠে এলো। ভালো লাগছে না। এভাবে বন্দী হওয়া স্বপ্নেও ভাবেনি। সময় কাটাবার জন্যে পুরনো বন্দীদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে বিস্কো ওদের কাছে গেল। কাফ্রি ক'জনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। সবই বৃথা। কাফ্রিগুলো যে ভাষায় কথা বলল, সে তো অবোধ্য। কথা বলার সময় ওদের অঙ্গভঙ্গি দেখে যা কিছু বুঝল সেটাও তেমন কিছু নয়। অনেকদিন আগে আল জাহিরির দল নাকি ওদের গ্রাম থেকে ধরে এনেছে। ভাগ্যে কী আছে ওরা জানে

না।

শুধু একজন শ্বেতাঙ্গ অল্পস্বল্প স্প্যানিস ভাষা বলতে পারে। তার সঙ্গেই বিস্কো কথাবার্তা বলতে লাগল। সে তার নাম বলল পারিসি। পারিসি বিস্কোকে বলল, তোমরা তো দেখছি এই ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের লোক নও। তোমারা এখানে কেন এসেছো? ধরাই বা পড়লে কীভাবে? বিস্কো তখন ওদের কথা, ফ্রান্সিসের কথা—কোন দ্বীপ থেকে ফ্রান্সিস কী উদ্ধার করেছে সবকিছুই সংক্ষেপে বলল। পারিসি বলল, আমিও একটা খুব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ উদ্ধার করেছিলাম। দিয়েছিলাম সাইপ্রাসের বর্তমান শাসক গী দ্য লুসিগনানকে। সেই গ্রন্থের প্রথম পাতায় আঁকা ছিল যীশুর একটা ছবি। এবার লুসিগনান চাইল সেই যীশুর মূর্তিটা। নিশ্চয়ই আমিই সেই মূর্তিটা লুকিয়ে রেখেছি এই সন্দেহ করে আমার ওপরে চলল অত্যাচার। পারিসি থামল।

তারপর? বিস্কো জানতে চাইল।

আমাকে আবার সেই দুরারোহ জেরস পাহাড়ে পাঠাল। আমি সুযোগ বুঝে পালালাম। চলে এলাম কেরিনিয়া বন্দরে। পর্তুগীজদের একটা জাহাজে উঠে পড়লাম। জাহাজটা তখন পর্তুগালেই যাচ্ছিল। হঠাৎই আল জাহিরি আমাদের জাহাজ আটকাল। লড়াই হলো। নৃশংস আল জাহিরি প্রায় সবাইকে মেরে ফেলল। কয়েকজন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মা মেরিই জানে হাঙরের পেটে গেল না পালাল। আমাকে আর ঐ কাফ্রি কয়েকজনকে রেহাই দিল। এরমধ্যে অবশ্য একজন কাফ্রি পালাতে গিয়ে মারা গেল। পারিসি থামল।

বিস্কো বলল, তুমি কী একটা গ্রন্থের ছবি যীশুর মূর্তি এসবের কথা বললে।

সে অনেক কথা। পারিসি বলল। বিস্কো উঠে দাঁড়াল। বলল, আমার বন্ধু ফ্রান্সিসকে নিয়ে আসছি। তুমি তাকে ব্যাপারটা বলো তো।

একটু পরেই বিস্কো, ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মারিয়াকে সেখানে নিয়ে এল। পারিসির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ফ্রান্সিস বলল, তোমার কথা বিস্কোর কাছে কিছু শুনলাম। এবার সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো তো।

পারিসি বলল, সাইপ্রাস দ্বীপের নাম শুনেছেন? ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। হ্যারি বলল—শুনেছি।

মারিয়া বলল, সাইপ্রাস ভূমধ্যসাগরের পুবদিকের শেষ দ্বীপ।

ঠিক বলেছেন। পারিসি বলল। তারপর বলল, সাইপ্রাসের একটু ইতিহাস বলি। তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ শেষ করে প্রথম রিচার্ড ফেরার পথে সাইপ্রাসে আসেন। তখনকার শাসক আইজাক কমেনাসের কাছে দাবি জানালেন, এখানে তাঁর যে জাহাজগুলো আছে সেসব আর তাঁর দেশের নাবিকদের ফেরৎ দিতে হবে। আইজাক মানল না সেই দাবি। প্রথম রিচার্ড সাইপ্রাসবাসীদের যুদ্ধে হারিয়ে সাইপ্রাস দখল করলেন। তাঁর অনুগত গী দ্য লুসিগনানকে সাইপ্রাসের শাসক নিযুক্ত করে তিনি

চলে গেলেন। গী দ্য লুসিগনানও আইজাকের মতো সাইপ্রাসবাসীদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছেন। পারিসি থামল।

আসল কথাটা বলো। ফ্রান্সিস বলল।

সেটাই বলছি—পারিসি বলল, এবার একজন প্রকৃত খ্রীস্টিয় সাধুর কথা বলি। তাঁর নাম নিওফিতস। ছোটবেলা থেকেই তিনি খ্রীস্টিয় সাধু হতে চেয়েছেন। উত্তর সাইপ্রাসের বন্দর-নগর কেরিনিয়ার কাছে এক গির্জা তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে লোকজনের ভিড়ে বিরক্ত হয়ে তিনি জেরস পাহাড়ে এক গুহায় একেবারে নির্জনে বাস করতে লাগলেন।

তারপর? হ্যারি বলল।

সাত বছর ধরে এক কষ্টকর জীবন কাটালেন তিনি। ধারেকাছের পাহাড়ি গাঁয়ের লোকেরা তাঁকে খাদ্য, পানীয়, জল দিয়ে আসতো। নিওফিতস নিজে কারো কাছে কিছু চাইতেন না। এদিকে মহান সাধুপুরুষ হিসেবে দেশবাসীর কাছে পরিচিত হন তিনি। এখন ঐ এলাকার নাম পাফোস। পাফোসের গীর্জার পাদ্রীরা নিওফিতসকে বারবার অনুরোধ জানাতে তিনি সেই গুহার আবাস ছেড়ে নিচে নেমে আসেন। শুরু হলো নিওফিতসের নতুন জীবন। খ্রীস্টিয়মণ্ডলীর কাজেকর্মে তিনিই নিয়মশৃঙ্খলা আনেন এবং এই নিয়ে তিনি বই লিখতে শুরু করেন।

ঐ বইটাই বোধহয় তুমি পেয়েছ। ফ্রান্সিস বলল।

না, কারণ তখন সবেমাত্র নিওফিতস লিখতে শুরু করেছিলেন। পারিসি বলতে লাগল, অদ্ভুত মানুষ এই নিওফিতস। এত খ্যাতি, এত জনপ্রিয়তা তাঁর সহ্য হলো না। তিনি আবার গুহাবাসী হলেন। জেরস পাহাড়ের যে গুহায় ছিলেন, এই গুহাটা সেটার চেয়েও অনেক উঁচুতে। প্রায় অসম্ভব সেই গুহায় যাওয়া। নিওফিতস কোনোভাবে সেই গুহায় গিয়ে উঠলেন। নিজেই ওখানে বসে বসে শুকনো ঘাস, গাছের ডাল দিয়ে একটা মই করলেন। প্রতিদিন সকালে সেই মই নামিয়ে দিতেন নিচের একটু সমতলমতো একটা জায়গায়। পাহাড়ি গাঁয়ের লোকেরা খাবার-টাবার রেখে আসত সেখানে। সবাই চলে গেলে নিওফিতস দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে খাবার নিতেন তারপর উঠে যেতেন। সঙ্গে সঙ্গে দড়ির মইটাও টেনে তুলে নিতেন যাতে কেউ ঐ মই বেয়ে তাঁর গুহায় যেতে না পারে, তাঁকে বিরক্ত করতে না পারে। পারিসি থামল।

তারপর? মারিয়া জিজ্ঞেস করল।

পারিসি বলতে লাগল—নিওফিতস যে খ্রীস্টমণ্ডলীর পরিচালনা পদ্ধতি নিয়ে বই লিখেছেন—এটা এখানকার সব বিশপ ধর্মযাজকরা জানতেন। তাঁরা আমাকে দায়িত্ব দিলেন—নিওফিতসের বইটা নিয়ে আসতে। একটু থেমে পারিসি বলতে লাগল, আমি অনেক কষ্টে সমতলমতো জায়গাটায় পৌঁছলাম। কিন্তু নিওফিতসের গুহায় উঠতে পারলাম না। নিচের যে সমতল জায়গায় পাহাড়ি গাঁয়ের লোকেরা

খাবার রেখে যেত, আমি সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সেখানে। কাঠকুটো জ্বেলে আমি রাত কাটাতাম। পারিসি একটু থেমে বলতে লাগল—আমি কয়েকদিন পরে পরেই দেখতাম দড়ির মই ফেলে নিওফিতস খাবার-টাবার নিয়ে যেতেন। আশ্চর্য! জলভরা পাত্র নিতেন না। বুঝলাম নিশ্চয়ই ঐ গুহার কাছে পাহাড়ি ঝর্ণা আছে। একদিন নিওফিতস মইটা তুলে নেবার আগে আমি মইয়ের সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে দিলাম। নিওফিতস সেটা বুঝলেন না। তিনি ওপরে উঠে মই টেনে তুলে নিলেন। দড়িটা ঝুলতে লাগল। পারিসি থামল।

তাহলে মই নামিয়ে তুমি তো উঠতে পারতে। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ—আমি তাই করেছিলাম। একনাগাড়ে প্রায় দিন সাতেক নিওফিতস নিচে নামলেন না। তখন তাঁর বয়েস সত্তরেরও বেশি। বুঝলাম, তিনি নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি আর অপেক্ষা না করে দড়িতে বাঁধা মইটা টেনে নামালাম। খাবার-টাবার নিয়ে মই বেয়ে সেই গুহার মুখে উঠে এলাম। বাইরে ঝকেঝকে রোদ। গুহার ভেতরটা কিন্তু অন্ধকার। আমি আস্তে আস্তে গুহার মধ্যে ঢুকলাম। অন্ধকারটা চোখে একটু সয়ে আসতে দেখলাম গুহার গায়ে মশাল বসানো। কিন্তু তখন নিভে গেছে। অস্পষ্টভাবে দেখলাম এবড়োখেবড়ো মেঝেয় মোটা কাপড়ের বিছানা। তারপরেই একটা অগ্নিকুণ্ড। কিন্তু এখন নিভে গেছে। বিছানায় অসাড় শুয়ে আছেন নিওফিতস। প্রথম দেখে বুঝলাম না বেঁচে আছেন কিনা। একটু থেমে পারিসি বলতে লাগল—আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে হাঁটুগেড়ে বসে তাঁর দুই পা চুম্বন করলাম। মোটা কাপড়ে ঢাকা একটা পা যেন একটু নড়ল। আমি তাড়াতাড়ি এসে নিওফিতসের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। দেখি নিওফিতস আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। সর্দিবসা গলায় খুব আস্তে বললেন—তুমি কে? আমি বললাম—আমি পারিসি। আপনার সেবা করতে এসেছি।

আমার সেবার প্রয়োজন নেই। সেই একইভাবে বললেন।

আমি মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে বললাম, আপনার সেবা করতে পারলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। যীশুর নামে বলছি—আমাকে এটুকু সুযোগ দিন। নিওফিতস কী ভাবলেন। তারপর কাশতে লাগলেন। আমি আস্তে আস্তে তাঁর বুকে হাত বুলোতে লাগলাম। কাশির কষ্টটা কমতে আগের মতোই মৃদুস্বরে বললেন—বইটা শেষ করতে পারিনি। বইটা শেষ করার জন্য আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। কিন্তু শরীরে জোর পাচ্ছি না। ওরকম এক মহাপুরুষের এমন অসহায় অবস্থা দেখে আমি স্থির থাকতে পারলাম না। কেঁদে ফেললাম। কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আমি আপনাকে সুস্থ করে তুলবো।

কিন্তু এই ঠাণ্ডায় এখানে তুমি থাকবে কী করে? উনি বললেন। আমি বললাম—আমার জন্য ভাববেন না। খাবার এনেছি। অনুমতি দিন—আপনাকে

যেন খাওয়াতে পারি।

বেশ। নিওফিতস বললেন। একটু থেমে পারিসি বলতে লাগল—আমি দেখলাম নিভে-যাওয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে চকমকি পাথর রয়েছে। গুহার একপাশে বেশ শুকনো ডালপালাপাতা কাঠ রয়েছে। আমি কিছু কাঠ ডালপাতা দিয়ে অগ্নিকুণ্ড সাজালাম। তারপর চকমকি ঠুকে আগুন জ্বাললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠল। সেখান থেকে আগুন নিয়ে পাথরের খাঁজে রাখা মশাল জ্বাললাম। এতক্ষণে গুহার ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। আমার কোমরের ফেট্টির কাপড়টা খুলে আগুনে গরম করে করে সেই মহাপুরুষের পায়ে-হাতে-বুকে সেঁক দিতে লাগলাম। গুহাটাও ততক্ষণে বেশ গরম হয়ে গেছে। নিওফিতস এবার অসাড় হাত পা শরীরে সাড় পেলেন। হাত-পা নাড়লেন। উঠে বসার চেষ্টা করলেন। আমি পিঠে দু'হাত জড়িয়ে আস্তে আস্তে তাঁকে বসালাম। খেতে দিলাম। উনি আস্তে আস্তে খেতে লাগলেন। আমার সেদিন যে কী আনন্দ হয়েছিল বলে বোঝাতে পারবো না। এবার জল খাওয়ানো। জল তো আমি আনিনি। পারিসি থামলো।

ধারে কাছে নিশ্চয়ই পাহাড়ি ঝর্ণা ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক তাই—পারিসি বলল, উনি বললেন, এই গুহার শেষে গিয়ে দেখ একটা পাহাড়ি ঝর্ণা পাবে। সেখান থেকে জল নিয়ে এসো। আমি গুহার শেষে এসে দেখলাম গুহার ছোট্ট মুখ। তারপরেই একটা বড় ঝর্ণা। সেই জল নিয়ে এসে নিওফিতসকে খাওয়ালাম, নিজেও খেলাম। নিওফিতস আবার শুয়ে পড়লেন। আমিও খাওয়া সেরে ঐ এবড়োখেবড়ো মেঝের একপাশে শুয়ে পড়লাম।

তারপর? হ্যারি বলল।

এ ভাবেই সেবা-শুশ্রূষা করে নিওফিতসকে অনেকটা সুস্থ করে তুললাম। উনি কাগজ-কলম নিয়ে প্রত্যেকদিনই গ্রন্থটি লিখতেন। বোধহয় শেষ হয়ে যেত লেখা। কিন্তু শীতকাল পড়তেই তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তিনি দেহরক্ষা করলেন। আমি সারারাত কাঁদলাম। তারপর সেই শেষ না হওয়া গ্রন্থটা নিয়ে নিচে নেমে এলাম।

গ্রন্থ পেয়ে তো সাইপ্রাসের শাসকের খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু কী এমন ঘটল যে তোমাকে পালাতে হলো? ফ্রান্সিস বলল।

সেটাই সমস্যা। গ্রন্থটির প্রথম পাতায় সাধু নিওফিতস যীশুর একটি কাঠের মূর্তি এঁকেছিলেন। এত জীবন্ত ছবি খুব কম দেখা যায়। এখন সাইপ্রাসের শাসক গী দ্য লুসিগনান সন্দেহ করল যে সেই কাঠের মূর্তিটা নিওফিতস সত্যি সত্যিই নিজের হাতে বানিয়েছিলেন। আমি সেটা চুরি করেছি। আমি বারবার বললাম, আমি সেই কাঠের মূর্তি চোখেই দেখিনি। লুসিগনান বলল, ঐ গ্রন্থের ভূমিকাতেই নাকি সাধু নিওফিতস ঐ মূর্তি নিজের হাতেই তৈরি করার কথা বলেছেন। কাজেই আমাকে আবার কয়েকজন সৈন্যের সঙ্গে সেই গুহায় পাঠানো হলো। আমি সুযো

বুঝে পালালাম।

ঐ কাঠের যীশুমূর্তি কি সত্যিই নিওফিতস তৈরি করেছিলেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

আমি অতদিন গুহায় ছিলাম। কোনোদিন কাঠের তৈরি যীশুমূর্তি কোথাও দেখিনি। পারিসি বলল।

আচ্ছা—ঐরকম কাঠের যীশুমূর্তি সম্পর্কে নিওফিতস কি কখনো তোমাকে কিছু বলেছিল? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

না। তবে মাঝে মাঝে যখন ঝর্ণার জলে গা ধুতে যেতেন—বলতেন যীশুও আমার সঙ্গে স্নান করবেন। পারিসি বলল।

এ কথার মানে কী? হ্যারি ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

এটা ঐ গুহা, ঝর্ণার চারপাশ ভালো করে না দেখে বলা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল।

ডঢাং ঢং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খুলল। রক্ষীরা খাবার নিয়ে ঢুকল। খাবার দেখে ভাইকিংরা একটু অবাক হলো। মাখন মাখানো কাটা গোল রুটি, শাকসব্জির জুস আর কাঠের থালাভর্তি মাংস। খুবই সুস্বাদু খাবার। সবাই পেট পুরে খেলো। ফ্রান্সিস মনে মনে হাসল—ক্রীতদাসের হাটে নীরোগ সুস্থ স্বাস্থ্যবান যুবকদের দাম বেশি। তাই সবাইকে সুস্থ রাখতে হবে। তাই কয়েদীদের জন্যে এই রাজকীয় খানা।

আল জাহিরির ক্যারাভেল জাহাজ চলেছে। পেছনে কাছি দিয়ে বাঁধা ফ্রান্সিসদের জাহাজ।

এর মধ্যে দু'বার ঝড়ের পাল্লায় পড়তে হয়েছে। ঝড়ের সময় সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় কয়েদঘরের বন্দীদের। জাহাজের প্রচণ্ড দুলুনিতে একবার কয়েদঘরের এই মাথায়, পরক্ষণেই গড়িয়ে গিয়ে ঐ মাথায়। ফ্রান্সিসরা এসবে অভ্যস্ত। কিন্তু মারিয়া তো এ জীবন কখনও কাটায়নি। ওর কষ্ট হলো সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয়বার ঝড়ের সময় জাহাজের কাঠে মাথায় ধাক্কা লেগে মারিয়া প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। এই ঝড়ের সময় ফ্রান্সিস সমস্ত শরীর দিয়ে মারিয়াকে চেপে ধরে রাখে। গড়াগড়ি খায়। মেঝেয় কাঠের দেয়ালে যা ধাক্কা লাগার ফ্রান্সিসের শরীরেই লাগে। মারিয়ার শরীর অক্ষত থাকে। তবু মাথায় লেগেছিল। অবশ্য ভেন-এর চিকিৎসায় মারিয়া সুস্থ হলো।

ক্যারাভেল আর জাহাজ চলেছে। ফ্রান্সিসদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝতে পারছে না। কয়েদঘরের রক্ষীদের কয়েকদিনই হ্যারি জিজ্ঞেস করেছে—কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের? রক্ষীরা চুপ করে নিজেদের কাজ করে যায়। কোনো কথা বলে না। একজন রক্ষী একদিন বলেছিল—আল জাহিরি কী করেন তা আগে থেকে কাউকে বলেন না। ব্যস

এইটুকুই জেনেছে ওরা।

একদিন সকালের খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা শুয়ে-বসে আছে, হঠাৎ রক্ষীদের মধ্যে খুব তৎপরতা দেখা গেল।

একটু পরেই আল জাহিরি গরাদের কাছে এসে দাঁড়াল। কাষ্ঠহাসি হেসে স্পেনীয় ভাষায় বলল—খাওয়াদাওয়া ভালো পাচ্ছো তো?

হ্যাঁ—হ্যারি বলল, কিন্তু আমরা এখনও জানি না আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

সাইপ্রাসের উত্তরে কেরিনিয়া বন্দরে। ক্রীতদাস কেনাবেচার বড় হাট বসে ওখানে। ওখানে দরে না পোষালে আবার অন্য হাটে নিয়ে যাবো। আল জাহিরি বলল।

তাহলে ক্রীতদাস হিসেবে আমাদের বিক্রি করবেনই। হ্যারি বলল।

আল জাহিরি হো হো করে হেসে উঠল—তা না হলে ভালো ভালো খাবার খাইয়ে তোমাদের এত যত্নে রেখেছি কেন।

হ্যারি আর কোনো কথা বলল না। ঐ নরপশুটার সঙ্গে ওর আর কথা বলতেও ইচ্ছে করছিল না। যা কথা হলো হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস বলল—আর কোনো কথা বলো না। এরা সব হৃদয়হীন মানুষ। কথা বলারও অযোগ্য এরা। আল জাহিরি চলে গেল।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল, ফ্রান্সিস এখান থেকে পালানোর উপায় বের কর।

হ্যারি, ফ্রান্সিস বলল, এখান থেকে পালানোর কোনো নিশ্চিত উপায় আমি ভেবে পাচ্ছি না। পালানো সম্ভব কিন্তু তাতে কিছু বন্ধুর প্রাণ যাবে, কারণ লড়াই করতেই হবে। তার চেয়েও বড় কথা মারিয়া। মারিয়া এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। লড়াইয়ে নামলে সব কিছু সারতে হবে অতি দ্রুত। মারিয়া তা পারবে না। হয়তো মারিয়ার জীবন বিপন্ন হবে। তাই আমি কী করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, পারিসিকে এখানে নিয়ে এসো।

হ্যারি পারিসিকে ডাকতে গেল। মারিয়া বলল, ফ্রান্সিস আমার জন্যেই তোমাদের এই ভোগান্তি ভুগতে হচ্ছে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, ও কথা বলছো কেন? তোমার কী দোষ?

আমার জন্যেই তো পালাতে পারছো না। মারিয়া বলল।

তোমার জন্যে নয়, লড়াই করে পালাতে গেলেই বন্ধুদের প্রাণহানি ঘটবে। এটা আমি চাই না। পালাবার অন্য কোনো উপায়ও ভাবতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

পারিসিকে সঙ্গে নিয়ে হ্যারি এল। ফ্রান্সিস বলল, আচ্ছা পারিসি, তুমি তো সাইপ্রাসের অধিবাসী। কেরিনিয়া বন্দর কেমন? খুব বড়ো বন্দর না ছোট?

খুব বড়ো বন্দর নয়। মাঝারি রকমের বন্দর-শহর। পারিসি বলল।

এখন সাইপ্রাসের শাসক তো গী দ্য লুসিগনান। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। পারিসি বলল।

নিওফিতসের গ্রন্থটি তো তুমি উদ্ধার করে গী দ্য লুসিগনানকে দিয়েছিলে। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। পারিসি মাথা ওঠানামা করে বলল।

কাঠের যীশুমূর্তিটা গী দ্য লুসিগনান তোমাকেই উদ্ধার করতে পাঠিয়েছিল আর তুমি তখন পালিয়েছিলে।

হ্যাঁ, আমি ওরকম মূর্তি ওখানে কোনোদিন দেখিনি। পারিসি বলল।

আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ওরকম একটা যীশুমূর্তি আছে। ফ্রান্সিস বলল।

হতে পারে, আমি জানি না। পারিসি বলল।

দেখ পারিসি—ফ্রান্সিস বলল, তুমি বলেছিলে ঐ গ্রন্থটির প্রথম পাতায় যীশুর যে ছবিটি দেখেছিলে সেটা খুব সুন্দর ছবি ছিল।

শুধু সুন্দর নয়—পারিসি বলল, প্রভু যীশুর ওরকম জীবন্ত ছবি আমি কোথাও দেখিনি।

এমন ছবি যিনি আঁকতে পারেন—ফ্রান্সিস বলল—তিনি কাঠ কুঁদে কুঁদে ওরকমই একটা কাঠের মূর্তিও তৈরি করতে পারেন। নিওফিতস শুধু ধর্মপ্রাণ সাধুই ছিলেন না—প্রতিভাবান শিল্পীও ছিলেন।

তা ঠিক। পারিসি ঘাড় নেড়ে বলল। এবার হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

কিছছু করার নেই—ফ্রান্সিস বলল, কেরিনিয়া পৌঁছে রাজা গী দ্য লুসিগনানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তারপর যীশুর কাঠের মূর্তি উদ্ধার করে আনবো, এই প্রস্তাব দেব।

কাঠের মূর্তিটা নিয়ে সবাই এত ভাবছে কেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। পারিসি বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, সত্যিই সেই মূর্তিটা কাঠের। কারণ নিওফিতস এত ধনবান ছিলেন না যে সোনা হীরে মানিক দিয়ে অত উঁচুতে গুহায় থেকে মূর্তি গড়বেন। কাজেই হাতের কাছে হয়তো ওক বা চেস্টনাট গাছ পেয়েছিলেন। তার ডাল কুঁদে কুঁদে মূর্তিটা গড়েছিলেন। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, পারিসি—মূর্তিটা মূল্যবান অন্য কারণে। ভেবে দেখ একজন মহান সর্বত্যাগী সাধুপুরুষ সেই মূর্তিটা তিলে তিলে গড়েছিলেন। তাহলেই বুঝতে পারছো কী পবিত্র সেই মূর্তি। এই জন্যেই গী দ্য লুসিগনান মূর্তিটা উদ্ধার করার জন্যে তোমাকে পাঠিয়েছিল। তুমি সুযোগ বুঝে পালিয়ে এলে। তারপরেও হয়তো আরো লোক পাঠানো হয়েছিল। বোধহয় কেউই মূর্তিটা উদ্ধার করতে পারেনি।

আপনি পারবেন? পারিসি বলল।

দেখি। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

একদিন ভোর ভোর সময়ে আল জাহিরির ক্যারাভেল আর ফ্রান্সিসদের জাহাজ কেরিনিয়া বন্দরে এসে ভিড়ল। ঘড় ঘড় শব্দে নোঙর ফেলার শব্দ হলো। কয়েদঘরের অনেক ভাইকিংদের ঘুম ভেঙে গেল। ফ্রান্সিসেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হ্যারিকে ডাকল, হ্যারি। হ্যারি চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল। ফ্রান্সিস বলল, আমরা বোধহয় কেরিনিয়া বন্দরে এলাম।

তাই তো মনে হচ্ছে—হ্যারি বলল, দেখি পাহারাদারদের জিজ্ঞেস করে।

দু'তিনজন পাহারাদার সকালের খাবার নিয়ে ঢুকল। ভাইকিংদের খেতে দিল। খেতে খেতে হ্যারি একজন পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করল, জাহাজ কোন্ বন্দরে ভিড়ল।

কেরিনিয়া বন্দরে। এখানে তোমাদের বিক্রি করা হবে। সবাই পেট ভরে খাও। সবাই পেট পুরে খাও শরীর ঠিক রাখো। পাহারাদারটি ঠাট্টার সুরে বলল।

ফ্রান্সিস খাওয়া থামিয়ে হ্যারিকে বলল, পাহারাদারটি ঠাট্টার সুরে কী বলল?

ও কিছু না। হ্যারি বলল।

তবু বলো। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল। হ্যারি বুঝল যে ঠাট্টার সুরে পাহারাদারটি যা বলেছে তা শুনলে ফ্রান্সিস ভীষণ রেগে যাবে। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলে উঠল, হ্যারি—বলো। এবার হ্যারি আস্তে আস্তে বলল, বলল যে এখানে তোমাদের বিক্রি করা হবে। পেট ভরে খাও শরীর ঠিক রাখো। কথাটা হ্যারি বলে শেষ করতে না করতে ফ্রান্সিস এক লাফে উঠে দাঁড়াল। ছুটে গিয়ে সেই পাহারাদারটির ঘাড়ে এক রদ্দা কষাল। পাহারাদারটি 'অঁক্' শব্দ তুলে কাঠের পাটাতনে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস পাহারাদারের কোমরে ঝোলানো তরোয়ালটা এক হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল। এসব দেখে অন্য পাহারাদাররা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল। কাঠের পাটাতনে ছিটকে পড়া পাহারাদারটি উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস ওর গলায় তরোয়ালের ধারালো ডগাটা চেপে ধরে বলল, হ্যারি, এই রসিকটি ঠাট্টা করে যা বলেছে তার জন্যে তাকে ক্ষমা চাইতে বলো।

হ্যারি দ্রুত পাহারাদারটিকে গ্রীক ভাষায় কথাটা বলল। ক্ষমা চাওয়া দূরের কথা ও চিৎকার করে বন্ধুদের ডাকল। ততক্ষণে আট-দশজন সৈন্য কয়েদঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সবার হাতেই খোলা তরোয়াল। ফ্রান্সিস ওদিকে রুদ্রমূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অস্ফুটস্বরে ফ্রান্সিস বলল, সব ক'টাকে নিকেশ করবো।

হ্যারি কথাটা শুনে ভয়ে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—ফ্রান্সিস শান্ত হও। তুমি লড়াইয়ে নামলে আমরা কেউ বাঁচবো না। মারিয়া এতক্ষণে অবাক চোখে ফ্রান্সিসের রাগের চেহারা দেখছিল। এবার হ্যারি রাজকুমারীকে বলল, আপনি ফ্রান্সিসকে শান্ত হতে বলুন।

মারিয়া বলে উঠল—ফ্রান্সিস, শান্ত হও। আমাদের কথা ভুলে যেও না। ফ্রান্সিসের দৃঢ়ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকা শরীরটা এবার নড়ল। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে তরোয়ালটা কাঠের মেঝেতে ফেলে দিল। আস্তে আস্তে বসে পড়ল। কাঠের থালাটা টেনে নিয়ে আধখাওয়া খাবার আবার খেতে লাগল।

এবার হ্যারি গ্রীক ভাষায় পাহারাদারদের বলল, তোমরা আর যাই কর, আমাদের এই বন্দীদশা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করো না। ফ্রান্সিসকে তোমরা চেন না। ওর হাতে তরোয়াল থাকলে তোমাদের মতো আট-দশজনকে একাই নিকেশ করতে পারে। কাজেই সাবধান, ফ্রান্সিসকে অনেক কষ্টে শান্ত করেছি আমরা। বাজে ঠাট্টা-রসিকতা করো না। এতক্ষণে সৈন্যরাও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝল। ওরা চলে গেল। পাহারাদাররাও এঁটো কাঠের থালা গ্লাস নিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ পাহারাদারদের মধ্যে তৎপরতা দেখা গেল। কয়েকজন সৈন্যও এল। একটু পরেই আল জাহিরি কয়েদখানার গরাদের সামনে এল। মুখে হাসির ভঙ্গী এনে স্পেনীয় ভাষায় বলল, আসার পথে তোমরা গোলমাল করোনি এজন্য ধন্যবাদ। এবার তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে ক্রীতদাস কুটিরে। বিরাট ঘর। তোমরা আরামে থাকতে পারবে। তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থাই রয়েছে ওখানে। কোনোরকম চালাকি করো না, পালাবার চেষ্টা করো না। আমার মানুষ মারতে ইচ্ছে করে না। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতেই চাই আমি।

ক্রীতদাস হিসেবে—তাই না? ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল।

আল জাহিরি আবার কাষ্ঠহাসি হাসল। বলল, কী করি। এটাই তো আমার ব্যবসা। হ্যারির ভয় হলো ফ্রান্সিস না আবার চটে যায়।

হ্যারি তাই বলল, আল জাহিরি—আপনার কথামতোই আমরা চলবো।

আল জাহিরি চলে গেল।

সেদিন তখনও রাতের খাওয়া হয়নি। ফ্রান্সিস এতক্ষণে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল। এবার উঠে বসল। ডাকল—হ্যারি? হ্যারিও আধশোয়া হয়েছিল। উঠে বসল। বলল, কী ব্যাপার? ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, ভেবে দেখলাম—পারিসি যে খ্রীস্টমূর্তির কথা বলেছে সেটা উদ্ধার করতে আমাকে দিতে হবে। কিন্তু আল জাহিরি যেতে দেবে না। ওর মতো একটা নরপশুকে আমি এজন্য অনুরোধও করবো না। যে করেই হোক পারিসিকে নিয়ে আমি একা পালাবো। পারিসি এই সাইপ্রাসের লোক। ওর সাহায্যে আমি রাজা গী দ্য লুর্সিগনানের সঙ্গে দেখা করবো। আমার বন্ধুদের মুক্তি দিতে হবে এই শর্তে যীশুর মূর্তি উদ্ধার করতে যাবো।

কিন্তু—পারিসি বলছিল ঐ গুহার এলাকায় নাকি অসম্ভব শীত। ঠাণ্ডায় ঝর্ণার জল পর্যন্ত জমে যায়। হ্যারি বলল।

সেটা শীতকালে। এখন বসন্তকাল। খুব ঠাণ্ডা পড়বে না—ফ্রান্সিস বলল, ঠাণ্ডার জন্যে ভাবি না—ভাবছি ওরকম কাঠের মূর্তি আছে কিনা। যদি থাকে

আপ্রাণ চেষ্টা করবো খুঁজে বের করতে। এছাড়া আমাদের মুক্তির কোনো আশা নেই। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে তুমি একাই পালাবে? হ্যারি বলল।

একা নয় পারিসিকেও সঙ্গে নিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর পারিসিকে কাছে আসতে বলল। পারিসিকে পালাবার পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বলল। এবার মারিয়াকে বলল, আমি আর পারিসি পালাবো। তুমি কোনোরকম দুশ্চিন্তা করো না। তুমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হওনি। দুশ্চিন্তা হলে তোমার শরীর খারাপ হবে।

না—আমি কোনোরকম দুশ্চিন্তা করবো না। তুমি সফল হও—এই কামনা করি। মারিয়া আস্তে আস্তে বলল। ফ্রান্সিস অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো।

তখন রাত হয়েছে। ঢ্যাং ঢং শব্দ করে কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। দু'জন পাহারাদার খাবার নিয়ে ঢুকল। সবাই বসে খেতে লাগল। ফ্রান্সিস আর পারিসি দরজার কাছে পায়চারি করতে করতে খেতে লাগল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস ভেজানো লোহার দরজাটা দ্রুত হাতে খুলে বাইরে চলে এল। পেছনে পারিসি। আচমকা এই ঘটনায় দরজার কাছে দাঁড়ানো দুই পাহারাদার হতবাক। ওর মধ্যে একজন ফ্রান্সিসের দিকে ছুটে এল। ও কোমর থেকে তরোয়াল খুলছে তখনি ফ্রান্সিস ওর বুকে লাথি মারল। পাহারাদার ছিটকে কয়েদঘরের মেঝেয় পড়ে গেল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। অন্য পাহারাদারটি কাছে আসার আগেই ফ্রান্সিস কাঠের থালা ছুঁড়ে মারল কাচে ঢাকা বাতিটার দিকে। কাচে ঢাকা বাতি ভেঙে চৌচির। অন্ধকার হয়ে গেল জায়গাটা। পাহারাদার অন্ধকারে ফ্রান্সিসদের দেখতে পেল না। পারিসির হাত ধরে ফ্রান্সিস ছুটল সিঁড়ির দিকে। কয়েদঘরের পাহারাদাররা চিৎকার চ্যাঁচামেচি করতে লাগল। কিন্তু সেই শব্দ ওপরে ডেক পর্যন্ত এল না। কাজেই ডেক-এ দাঁড়ানো সৈন্যরা কিছুই বুঝল না।

সিঁড়ি দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ফ্রান্সিস পারিসিকে নিয়ে উঠে এল ডেক-এ। ডেক-এর সৈন্যদের দু'একজনের হাতে তরোয়াল। বাকিরা গল্পগুজব করছে। ফ্রান্সিস আর পারিসিকে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে দেখে দু'একজন সৈন্য ছুটে এল। সৈন্যরা কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিস পারিসির হাত ধরে বলল, আমার সঙ্গে লাফ দাও। দু'জনে একসঙ্গে লাফ দিয়ে রেলিং ডিঙিয়ে ঝপাৎ করে সমুদ্রের জলে পড়ল।

সব সৈন্য পাহারাদাররা ডেক-এর ধারে এসে রেলিং ধরে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করতে লাগল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস আর পারিসি ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

ফ্রান্সিস আর পারিসি ডুব সাঁতার দিয়ে বেশ কিছুটা গিয়ে আস্তে আস্তে জলের ওপর মাথা তুলল। পেছনে তাকিয়ে দেখল ক্যারাভেল-এর ডেক-এ আল জাহিরি এসে দাঁড়িয়েছে।

ফ্রান্সিস পারিসিকে বলল, কোনোরকম শব্দ না করে আস্তে আস্তে সাঁতার

কেটে চলো। একটু দূরে গিয়ে আমরা সমুদ্রতীরে উঠবো। দু'জনেই আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তীরে পৌঁছল। পেছল পাথর বালির ওপর দিয়ে হেঁটে এসে তীরে উঠল। মাথার জল ঝাড়তে ঝাড়তে ফ্রান্সিস বলল, পারিসি, এই জলেভেজা অবস্থায় কোথাও একটু আশ্রয় তো নিতে হবে।

কিছু ভাববেন না। আমার বাড়িটা তো আছে। পারিসি বলল।

তোমার বাড়িতে কে আছে? ফ্রান্সিস বলল।

আমার বুড়ি মা। তবে বেশ কয়েক মাস তো আমি বাইরে বাইরে। মার কী অবস্থা জানি না। পারিসি বলল।

চলো তো। একটা মাথা গোঁজার আস্তানা পেলেই হলো। ফ্রান্সিস বলল।

কেরিনিয়া বন্দর-শহরের রাস্তা দিয়ে ওরা চলল। রাত হয়েছে। রাস্তা নির্জন। রাস্তার এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। বাড়িঘর অন্ধকারে ডুবে আছে। সবাই ঘুমুচ্ছে বোধহয়।

প্রায় আধঘণ্টার ওপর হাঁটতে হাঁটতে ওরা পারিসির বাড়ির দোরগোড়ায় এল। পারিসি দরজার শেকলটা দরজায় ঠুকতে ঠুকতে ডাকল—মা, মা—। বারকয়েক ডাকার পর সাড়া পাওয়া গেল। বুড়ির ভাঙা গলায় কেউ বলছে—কে রে?

আমি পারিসি—মা দরজা খুলে দাও। পারিসি বলল। ঠক্ ঠক্ শব্দে কাঠের দরজা খুলল। মোমবাতি হাতে একজন বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে। পারিসিকে দেখে ফোকলা দাঁতে হাসল। বলল, তুই কী করেছিস? রাজার সৈন্যরা তোর খোঁজে তিন-চার দিন এসেছিল।

ওসব নিয়ে ভেবো না। আমি অন্যায় কিছু করিনি। পারিসি বলল। ফ্রান্সিস, পারিসি আর ওর মার কথা গ্রীক ভাষায় বলে কিছুই বুঝছিল না। পারিসি ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে বলল। তারপর মাকে বলল—আমার এক বিদেশী বন্ধু এসেছে। আমাদের কিছু খেতে দাও।

এত রাত্রে কী দেব। ভালো পিঠে আছে—খাবি? মা বলল।

কেন খাবো না। চলো ভেতরে। খেতে দাও। পারিসি বলল। ফ্রান্সিস আর পারিসি তো আধপেটা খেয়েই পালিয়েছিল। কাজেই যখন একটা মাটির থালায় পারিসির মা পিঠে খেতে দিল তখন দু'জনেই হাপুস হুপুস করে খেয়ে নিল। জলটল খেয়ে এতক্ষণে ওদের স্বস্তি হলো। দু'জনে ভেজা পোশাক পালটাল। তারপর ঐ ঘরেই দু'জনে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে ফ্রান্সিস বলল, পারিসি—বর্তমান শাসক গী দ্য লুসিগনানের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হবে। তুমি এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা কর।

মুশকিল হয়েছে যে আমি তো জেরস পাহাড় থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

আমাকে পেলে কয়েদখানায় পাঠাবে। পারিসি বলল।

ঠিক আছে—ফ্রান্সিস বলল, আমাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি রাজসভায় চলো। তোমাকে যাতে কোনো ঝামেলা পোহাতে না হয় সে ব্যবস্থা আমি করবো।

আমাদের তো রাজধানী নিকোশিয়ায় যেতে হবে। প্যারিসি বলল।

তাই চলো। তুমি একটা চাষীদের শস্যটানা গাড়ির ব্যবস্থা কর। ফ্রান্সিস বলল।

দেখি। পারিসি এই কথা বলে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে পারিসি ফিরে এল। বলল—গাড়ি পেয়েছি। কিন্তু এতদূর পথ যেতে অর্ধ স্বর্ণমুদ্রার অর্থ চাইছে। ফ্রান্সিস বলল, পারিসি, তোমার জানাশুনো কোনো স্বর্ণকার আছে?

তা আছে। পারিসি বলল।

তাহলে গাড়িতে চড়ে আগে সেখানে চলো। আমার বিয়ের আংটিটা বন্ধক রেখে স্বর্ণমুদ্রার অঙ্ক নেব। গাড়িভাড়া দেব। ফ্রান্সিস বলল।

পারিসির মার হাতে তৈরি আরো পিঠে খেল দু'জনে। বাড়িতে তৈরি এত সুস্বাদু পিঠে ফ্রান্সিস যে কতদিন খায়নি। পিঠে খেতে খেতে ফ্রান্সিসের বারবার মার কথা মনে পড়তে লাগল।

ওরা চাষীর গাড়িতে চড়ে বসল। পথে এক স্বর্ণকারের দোকানে ঢুকল ওরা। পারিসির পরিচিত দোকানদার। আংটি বন্ধক রেখে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দিল। ফ্রান্সিস বারবার বলল, আমি কিছুদিনের মধ্যেই ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। এর মধ্যে সোনার আংটিটা গালিয়ে ফেলবেন না কিন্তু। দোকানদার মাথা নেড়ে বলল, না—না। অন্তত বছর খানেকের আগে আমরা বন্ধকী জিনিস গলাই না।

এবার নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়িতে উঠল দু'জনে। গাড়ি চলল রাজধানী নিকোশিয়ার দিকে।

ওদিকে ফ্রান্সিস আর পারিসি পালিয়ে গেছে বলে হ্যারিদের সবাইয়ের হাত বেঁধে দেওয়া হলো। হাত-বাঁধা অবস্থাতেই খাওয়া শোওয়া।

সেদিন বিকেলে ডঢাং ঢং করে কয়েদখানার লোহার দরজা খুলে গেল। ভাইকিংরা একটু আশ্চর্যই হলো। এ সময় তো দরজা খোলা হয় না।

দরজা দিয়ে ঢুকল আল জাহিরি। সঙ্গে এক রোগা লিকলিকে আরবী। বেশ ফর্সা। চিবুকে ছাঁটা দাড়ি। মাথায় লাল ফেজ টুপি পরা। দু'জন পাহারাদারকে আল জাহিরি কী বলল। তারা মারিয়ার কাছে এল। মারিয়ার হাত ধরল। মারিয়া এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল। এবার হ্যারিরা বুঝতে পারল মারিয়াকে ক্রীতদাসীর মতো ঐ শুঁটকো লোকটার কাছে বিক্রি করা হবে। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো—। সঙ্গে সঙ্গে সব ভাইকিং বন্ধুরা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল।—ও-হো-হো—। পাহারাদার দু'জন বেশ ঘাবড়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। আল জাহিরি দেখল এসব। তারপর ইঙ্গিতে

হ্যারিকে ডাকল। ঐ শুঁটকো লোকটা বোধহয় গ্রীক আর আরবি ভাষা জানে। অন্য ভাষা জানে না। তাই হ্যারিকে ডাকল আল জাহিরি।

হ্যারি এগিয়ে গিয়ে আল জাহিরির সামনে দাঁড়াল। আল জাহিরি বলল, আজ হোক, কাল হোক, তোমাদের সবাইকে বিক্রি করা হবে। তবে তোমরা বাধা দিচ্ছো কেন?

হ্যারি বলল, শুধু রাজকুমারীকে আমরা বিক্রি করতে দেব না। আমাদের সবাইকে যেদিন বিক্রি করবেন সেইদিন রাজকুমারীকে বিক্রি করতে পারবেন। তার আগে নয়। আল জাহিরি হেসে বলল, ভালো দামে বিক্রি হতো।

সে তো আপনার কেঠো হাসি দেখেই বুঝতে পারছি। হ্যারি বলল।

আল জাহিরি ব্যবসাদার। বুঝল—এত তাড়াহুড়ো করতে গেলে ঝামেলায় পড়তে হবে। ওর দরকার হ্যারিদের আর মারিয়াকে বিক্রি করা। সময় সুযোগ মতো সেটা করতে হবে। দু'চারজনকে অন্য কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই অজুহাত দেখিয়ে দফায় দফায় নিয়ে বিক্রি করতে হবে। ভাইকিংদের সংখ্যাও কমে আসবে। তখন রাজকুমারীকে বিক্রি করা হবে। কারণ তখন বাধা দেওয়ার মতো ভাইকিংরা খুব কম থাকবে। সহজেই সব মিটে যাবে।

সেই শুঁটকো মতো লোকটাকে কী বোঝাতে বোঝাতে আল জাহিরি চলে গেল।

সেদিন একটু বেলায় কয়েদঘরের দরজা ঢাং ডঢাং শব্দে খুলে গেল। সৈন্যরা কয়েদঘরে ঢুকতে লাগল। সকলের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগল। মারিয়াও বাদ গেল না। তারপর আট-দশজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে ওপরে ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির কাছে দাঁড়াল। পাহারাদাররা হ্যারিকে বলল, সবাইকে বলো—ডেক-এ উঠতে হবে। হ্যারি গলা চড়িয়ে সেই কথাই সবাইকে বলল। ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা একে একে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

প্রায় অন্ধকার কয়েদঘর থেকে বাইরের আলোয় আসতেই সবাই কিছুক্ষণ তাকাতেই পারল না। এই অভিজ্ঞতা ফ্রান্সিস আর বন্ধুদের আছে, কিন্তু মারিয়ার এই অভিজ্ঞতা নেই। মারিয়া বলে উঠল, আমি যে তাকাতেই পারছি না।

হ্যারি বলল, রাজকুমারী—কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যিই তাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরের আলোর তীব্রতা মারিয়ার চোখে সয়ে গেল। ক্যারাভেল থেকে কাঠের পাটাতন ফেলা হয়েছে। পাটাতন দিয়ে হেঁটে হেঁটে সবাই নেমে এল। সৈন্যদল ওদের ঘিরে নিয়ে চলল। যেখানে হ্যারিদের নামানো হলো সেখান থেকে কেরিনিয়া বন্দর বেশ দূরে।

কেরিনিয়া বন্দরে তখন ব্যস্ততা। বেশ কয়েকটি নানা দেশের জাহাজ ভেড়ানো আছে। দু'একটা জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। হ্যারিরা যেখানে নামল সেখানটায় দেখল দু'তিনটে লম্বাটে ঘর। ঘরগুলোর মাথায় শুকনো ঘাস আর পাতার ছাউনি।

কাফ্রি আরবী গ্রীক পাহারাদার সৈন্যরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা সবাই ঐ তিনটি কয়েদঘরের পাহারাদার।

ভাইকিংদের নিয়ে আসা হলো মাঝখানের ঘরটার সামনে। লোহার গরাদ লাগানো দরজা। দু'জন পাহারাদার তালা খুলে ঢং ডঢাং শব্দে লোহার দরজা খুলল। ওদের সেই ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। শব্দ তুলে দরজা বন্ধ করা হলো।

এই পাথরগাঁথা কয়েদঘরে ওপরের দিকে গরাদ দেওয়া দু'টো জানালা। এই দিনের বেলাও মশাল জ্বলছে। মেঝেয় শুকনো ঘাস লতাপাতা দড়ি দিয়ে বেঁধে শক্ত করা বিছানা মতো।

ভাইকিংরা কেউ বসল, কেউ শুয়ে পড়ল, কেউ কেউ পায়চারি করতে লাগল।

হ্যারি কয়েদঘরের কাঠের দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছিল। মাথায় নানান চিন্তা। ফ্রান্সিস আর পারিসি তো পালাল। ওরা নির্বিঘ্নেই পালিয়েছে। কিন্তু ওরা কী করে হ্যারিদের মুক্ত করতে পারবে সেটাই চিন্তার। হ্যারিদের একমাত্র সান্ত্বনা ফ্রান্সিস বাইরে আছে। ও মুক্ত। একটা কিছু উপায় ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই বুদ্ধি করে বের করবে। ওদিকে শাঙ্কো ভাবল—সে একা পালাবে। ক্রীতদাসের হাটে হ্যারিদের বিক্রি করার আগেই সবাইকে মুক্ত করতে হবে। এই নিয়ে শাঙ্কো ভাবতে লাগল। শেষ পর্যন্ত স্থির করল পালাতে হবে। ও হ্যারির কাছে গিয়ে বসল। মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি আমি পালাবো।

—কী করে? হ্যারি একটু আশ্চর্য হয়েই বলল।

—সে সব আমার ভাবা হয়ে গেছে। শাঙ্কো বলল।

—শাঙ্কো ভেবেচিন্তে পা ফেলো—হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস আর পারিসি পালিয়েছে। ফ্রান্সিস আমাদের মুক্তির একটা কিছু ব্যবস্থা করবেই। তার আগে তুমি পালাতে যেও না। তোমার যদি কোন বিপদ হয় ফ্রান্সিস রাগ করবে আমাদের ওপর। কেন আমরা তোমাকে বাধা দিই নি এইজন্যে। শাঙ্কো বলল—

—আমার কোন বিপদ হবে না। আমি আটঘাট বেঁধেই নামবো।

—বেশ—তোমার দায়িত্বেই তুমি এই ঝুঁকি নিচ্ছো। পরে আমাদের দোষ দিও না। হ্যারি বলল।

—আমি কাউকেই দোষ দেব না। এই ঝুঁকির পুরো দায়িত্ব একা আমার। শাঙ্কো বলল।

তখনও রাতের খাবার দেবার সময় হয়নি। শাঙ্কো হ্যারিকে বলল—রাতের খাবার দেবার সময় আমি পালাবো। এবার হ্যারি আমার জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বার কর। হ্যারি দড়িবাঁধা দু'হাত শাঙ্কোর গলার কাছে জামার মধ্যে ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করে আনল। শাঙ্কো বলল এবার আমার হাতের দড়িটা কাটো। হ্যারি জোড়া দু'হাতে ছোরা ধরে শাঙ্কোর হাত বাঁধা দড়ি ঘষে ঘষে কাটতে লাগল। ছোরাটা তো হ্যারি ভালো করে ধরতে পারছে না। ছোরা

এদিক ওদিক ঘুরে যাচ্ছে। শাঙ্কোর হাত কেটে যাচ্ছে। রক্ত বেরুচ্ছে। শাঙ্কো মুখ বুজে আছে। একসময় দড়িটা কেটে গেল। শাঙ্কো ছোরাটা নিয়ে জামার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল।

রাত হল। ঢঢাং ঢং শব্দে লোহার দরজা খুলে গেল। তিনজন পাহারাদার খাবার নিয়ে ঢুকল। লোহার দরজার বাইরে দু'জন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস আর পারিসি পালাবার পর ওরা সাবধান হয়ে গেছে। তিন পাহারাদার যখন খাবার দিতে শুরু করল শাঙ্কো একলাফে, উঠে লোহার দরজা পার হয়ে বাইরে চলে এল। তিন পাহারাদার খাবার কাঠের মেঝেয় রেখে তরোয়াল খুলে দরজার দিকে ছুটল। ততক্ষণে শাঙ্কো লোহার দরজা বাইরে থেকে কড়া টেনে বন্ধ করে দিয়েছে। তিন পাহারাদার আটকা পড়ে গেল। বাইরের খোলা তরোয়াল হাতে দু'জন সৈন্য শাঙ্কোর দিকে ছুটে এল। শাঙ্কো প্রথম সৈন্যটিকে আর তারোয়াল চালাতে দিল না। দ্রুত ছুটে এসে ওর পেটে মাথা দিয়ে ঢুঁ মারল। সৈন্যটি কাত হয়ে কাঠের মেঝেয় পড়ে গেল। হাতের তরোয়াল ছিটকে গেল। পরের সৈন্যটি তরোয়াল চালাল। শাঙ্কো মাথা নিচু করে তরোয়ালের মার এড়াল। তারপর ছুটল কাঠের সিঁড়ির দিকে। সৈন্যটিও খোলা তরোয়াল হাতে পেছনে পেছনে ছুটল। শাঙ্কো ততক্ষণে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ দ্রুত উঠে গেছে। শাঙ্কো বুঝল যে সৈন্যটি এবার চেঁচিয়ে অন্য সৈন্যদের ডাকবে। কাজেই ওর মুখ বন্ধ করতে হবে। শাঙ্কো ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপে-ওঠা সৈন্যটির মুখে গায়ের সমস্ত জোর একত্র করে লাথি মারল। সৈন্যটা চিত হয়ে সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ল। চিৎকার করে উঠতে পারল না।

এবার শাঙ্কো দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে ডেক-এ উঠে এল। সৈন্যরা কিছু বোঝার আগেই শাঙ্কো রেলিং ডিঙিয়ে এক লাফে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডুব সাঁতার দিয়ে যতটা দমে কুলোয় ততটা এগিয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে জলের ওপর মাথা তুলল। দেখল জাহাজ থেকে অনেকটা দূরেই চলে এসেছে। ডেক-এ সৈন্যদের সঙ্গে আল জাহিরি এসে দাঁড়িয়েছে। শাঙ্কো আস্তে আস্তে জলে কোনরকম শব্দ না করে নিজেদের জাহাজটার দিকে সাঁতার কেটে চলল।

একসময় জাহাজটার পেছনের দিকে এল। তারপর হালের খাঁজে পা রেখে জল থেকে উঠল। তারপর হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে ডেক-এর কাছে উঠে এল। আগেই ডেক-এ নামল না। রেলিঙের আড়াল থেকে দেখল মাত্র দু'জন সৈন্য ডেক-এ রয়েছে। একজন ডেক-এর কাঠের মেঝেয় শুয়ে আছে অন্যজন বসে আছে। শাঙ্কো ডেক-এ শুয়ে পড়ল। তারপর বুক দিয়ে চলল সিঁড়িঘরের দিকে। সিঁড়ির কাছে এসে আস্তে সিঁড়িতে পা রেখে উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারে সৈন্য দু'জন কিছুই দেখতে পেল না। ওরা আগের মতই গল্প করতে লাগল। শাঙ্কো সিঁড়ি দিয়ে কেবিনঘরে নেমে এল। নিজের কেবিনঘরে গিয়ে

শুকনো পোশাক বের করল। তখনও শাঙ্কো হাঁপাচ্ছে। জলে ভেজা পোশাক ছেড়ে শুকনো পোশাক পরে নিল। এবার খাওয়া। রাতের খাবারটা খাওয়া হয়নি। ভীষণ খিদে পেয়েছে। শাঙ্কো রসুইঘরে ঢুকল। দেখল বেশ কয়েকটা গোল রুটি আছে। দু'তিনদিনের নামে নিশ্চিন্ত। ছুরি দিয়ে গোল রুটি কেটে কেটে খেতে লাগল। খাওয়া হলে জল খেয়ে নিজের কেবিনঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমনো পর্যন্ত একটা চিন্তাই ঘুরে ঘুরে মাথায় এল—মারিয়া হ্যারিদের কীভাবে মুক্ত করা যায়? ফ্রান্সিস পালিয়েছে। আমিও পালালাম। কিন্তু বন্ধুরা সবাই তো ফ্রান্সিস বা আমার মত পালাতে পারবে না। ওদের পালাবার উপায় একটা বের করতে হবে। ফ্রান্সিস আর পারিসি পালিয়ে কী করল সেও জানি না। রাজা গী দ্য লুসিগনানের সঙ্গে ফ্রান্সিস দেখা করতে পেরেছে কি না কিছুই জানি না। যা হোক—আমিই বন্ধুদের মুক্ত করবো। তার উপায়টা ভেবে ভেবে বের করতে হবে। দেখা যাক। রাত বাড়তে শাঙ্কোর দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

সকালে ঘুম ভেঙে গেল। শাঙ্কো রসুইঘরে গিয়ে কিছু খেয়ে এল। সারাক্ষণই ভাবতে লাগল কী উপায়ে হ্যারি, মারিয়া আর বন্ধুদের মুক্ত করা যাবে। কিন্তু কোন উপায় ভেবে ভেবে স্থির করতে পারল না।

এমন সময় আল জাহিরির ক্যারাভেল জাহাজ থেকে উচ্চস্বরে কথাবার্তা ভেসে এল। শাঙ্কোর কৌতূহল হল। কী ঘটল ঐ জাহাজে।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে এল। তারপর জাহাজের পাটাতনে শুয়ে পড়ে গড়িয়ে চলে এল মাস্তুলের পেছনে। মাস্তুলের আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখল মারিয়া হ্যারিদের জাহাজ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। বোঝা গেল ওদের সমুদ্রতীরের কাছে কোন কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মারিয়া হ্যারিদের জাহাজ থেকে নামিয়ে আনা হল। সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে ওদের ঘিরে দাঁড়াল। তারপর হাঁটিয়ে নিয়ে চলল কিছুদূরে একটা লম্বাটে ঘরের দিকে। শাঙ্কো বুঝল—ঐ লম্বাটে ঘরটাই কয়েদঘর। ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট এখানেই আছে। হাতবাঁধা মারিয়া হ্যারিরা ততক্ষণে ঐ কয়েদখানায় পৌঁছে গেছে। শাঙ্কো গভীরভাবে ভাবতে লাগল—কী করবে ও? এটুকু ভেবে ভেবে বের করল যে জাহাজের বাইরে আসায় হ্যারিদের মুক্ত করা সহজ হবে। মৃত্যু রক্তপাত না ঘটিয়ে জাহাজ থেকে মুক্ত করা অসম্ভব ছিল। এখন কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল। শাঙ্কো ভেবে ভেবে স্থির করল যা করার আজ রাতেই করতে হবে। সময় নষ্ট করা চলবে না। হয়তো কাল পরশুর মধ্যেই এখানে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসবে। মারিয়া হ্যারিরা একবার বিক্রি হয়ে গেলে আর তাদের খোঁজ পাওয়া অসম্ভব। কাজেই আজ রাতেই ওদের মুক্তির জন্যে চেষ্টা করতে হবে। শাঙ্কো এরমধ্যে উপায়টা ভেবে নিল। সবকিছুই নির্ভর করছে কয়েদখানায় ক'জন পাহারাদার রাখা হয় তার ওপর।

শাঙ্কো নিজের কেবিনঘরে নেমে এল। বিছানায় শুয়ে পড়ল। ভাবতে লাগল। অনেক ভাবনা মাথায়।

দুপুরে গোল রুটি কেটে নিয়ে চিনি দিয়ে খেল। খিদের মুখে ঐ খাবারই অমৃত মনে হল।

সন্ধ্যে হল। শাঙ্কো তখনও চুপ করে বিছানায় শুয়ে রইল।

রাত হল। রাতের খাওয়া খেয়ে শাঙ্কো ওদের অস্ত্রঘরে গেল। তীর ধনুক নিল। কোমরে তরোয়াল গুঁজল। বলা যায় না যদি লড়াইয়ে নামতে হয়।

রাত বাড়তে লাগল। শাঙ্কো তখনও বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছে।

রাত গভীর হল। শাঙ্কো তীর ধনুক নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। ডেক-এ শুয়ে পড়ে গড়িয়ে মাস্তুলের আড়ালে এল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল—পাহারাদার সৈন্যরা ডেক-এর এখানে ওখানে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। যাক্ নিশ্চিন্ত।

শাঙ্কো কাঠের পাটাতন দিয়ে অন্ধকারে আস্তে আস্তে তীরে নেমে এল। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে চলল কয়েদঘরের দিকে।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কয়েদঘরের কাছে এসে দেখল কয়েদঘরে দরজার কাছে দু'তিনটে মশাল জ্বলছে। চারজন পাহারাদার পাহারা দিচ্ছে। দু'জন বসে আছে। দু'জন খোলা তরোয়াল হাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শাঙ্কো অন্ধকারে হাঁটু গেড়ে বসল। ধনুকে তীর পরাল। তারপর মশালের আলোয় নিশানা ঠিক করতে লাগল। বেশি তীর খরচ করা চলবে না। একটুক্ষণ নিশানা ঠিক করে শাঙ্কো তীর ছুঁড়ল। তীর গিয়ে লাগল খোলা তরোয়াল হাতে এক পাহারাদারের পায়ে। সে তরোয়াল ফেলে পা চেপে বসে পড়ল। অন্য তিনজন পাহারাদার চারদিকে তাকাতে লাগল। ওরা বুঝে উঠতে পারলো না কোথা থেকে তীর ছুটে এল। শাঙ্কো আবার তীর ছুঁড়ল। এই তীর একজন পাহারাদারের বুকে গিয়ে লাগল। সে উবু হয়ে দরজার কাছে মুখ থুবড়ে পড়ল। বাকি দু'জন সভয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। শাঙ্কোর পরের তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। তীরটা ঠং করে লোহার দরজায় লেগে নিচে পড়ে গেল। দু'জন পাহারাদার আর ওখানে থাকতে সাহস পেল না। দু'জনেই অন্ধকারে লাফিয়ে নেমে ছুটল নিজেদের জাহাজের দিকে। অন্ধকারে শাঙ্কো লক্ষ্য স্থির করতে পারল না। ওরা নিশ্চয়ই জাহাজে গিয়ে আল জাহিরিকে খবর দেবে। হাতে সময় কম। ধনুক পিঠে ঝুলিয়ে শাঙ্কো দ্রুত ছুটে এল। দেখল একজন পাহারাদার পা টিপে ধরে বসে আছে। অন্যজন উবু হয়ে পড়ে আছে। ওর কোমরেই শাঙ্কো দেখল চাবির গোছা। শাঙ্কো এক হ্যাঁচকা টানে চাবির গোছা নিয়ে নিল। শাঙ্কো আহত পাহারাদারকে স্পেনীয় ভাষায় বলল—একেবারে চুপ করে থাকবে। টুঁ শব্দটি করেছো কি তোমাকে শেষ করে দেব। সব কথা না বুঝলেও পাহারাদারটি বুঝল ওকে চ্যাঁচামেচি করতে

মানা করছে। ও চুপ করে হাত চেপে পায়ের রক্তপড়া বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগল।

শাঙ্কো আর দাঁড়াল না। ছুটে গেল কয়েদঘরের দরজার কাছে। বড় তালাটায় চাবি ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে দেখতে লাগল। একটা চাবি লেগে গেল। কট্ করে তালাটায় শব্দ হল। তালা খুলে গেল। শাঙ্কো বেশ শব্দ করেই দরজা খুলল যাতে সবাই সজাগ হয়। ভেতরে ঢুকে শাঙ্কো চাপা গলায় বলল—ভাইসব—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের পালাতে হবে। জলদি। ভাইকিংরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে লাগল। তারপর ছুটল দরজার দিকে। সবারই দু'হাত বাঁধা। ছুটে যেতে অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু উপায় নেই। পালাবার এই সুযোগ ছাড়া চলবে না।

সবাই কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। শাঙ্কো বলল—এখন আমরা শহরে যাবো না অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকবো।

হ্যারি বলল—বাঁদিকে কিছুদূরে একটা জঙ্গলা জায়গা দেখা যাচ্ছে। ওখানেই আমরা আশ্রয় নেব। ছোটো সবাই। সবাই ছুটল সেই জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলে ঢুকে একটা ফাঁকা জায়গামত পেল। সেখানেই বসে পড়ল সবাই। হাঁপাতে লাগল।

শাঙ্কো কোমর থেকে ছোরা বের করল। তারপর মারিয়ার হাতবাঁধা দড়ি কেটে দিল। একে একে সবাইর হাতের দড়ি কাটা হল।

হ্যারি ওপরের দিকে তাকাল। একফালি আকাশ দেখল। তারাগুলোর আলো ম্লান হয়ে আসছে। তার মানে রাত শেষ হয়ে আসছে।

কিছু পরে সূর্য উঠল। হ্যারিরা জঙ্গলের মধ্যে থাকায় সূর্য ওঠা দেখতে পেল না। ততক্ষণে পাখিদের ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেছে।

আল জাহিরির কয়েদখানা থেকে তো পালানো গেল। এবার চাই খাদ্য আর আশ্রয়। এতজনের খাদ্য আর আশ্রয় জোগাড় করা এক সমস্যা। হ্যারি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব—এবার খাদ্য আর আশ্রয় চাই। কিন্তু এতজন সবাই একসঙ্গে বাইরে বেরুনো যাবে না। আমি জনাদশেককে সঙ্গে নিয়ে বেরুবো। ফিরে এসে আবার জনা দশেককে নিয়ে যাবো। তোমরা কেউ গ্রীক ভাষা জানো না। কথা বলে আমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। এবার জনা দশেক আমার সঙ্গে চলো। হ্যারি থামল। তারপর মারিয়াকে বলল—আপনিও চলুন। মারিয়া বলল—সবাই আশ্রয় পাক তারপর আমি যাবো।—না রাজকুমারী—আপনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নি। আপনার কথা আমাকে বিশেষভাবে ভাবতে হবে। চলুন।

মারিয়া আর জনাদশেক বন্ধুকে নিয়ে হ্যারি বন থেকে বেরিয়ে এল। দেখল কিছুটা খোলা মাঠের মত। তারপর কেরিনিয়া নগরের রাস্তা।

ওরা রাস্তা দিয়ে চলল। রাস্তায় লোকজনের খুব একটা ভীড় নেই। একটা পাথরের বড় বাড়ির সামনে এসে হ্যারি বলল—দাঁড়াও সবাই। সবাই দাঁড়িয়ে

পড়ল। হ্যারি এগিয়ে গিয়ে কাঠের দরজায় বড় কড়াটা দিয়ে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ করল। একটু পরেই দরজা খুলে একজন প্রৌঢ় এসে দাঁড়ালেন। তিনি বেশ অবাক হয়েই হ্যারিদের তাকিয়ে দেখলেন। প্রৌঢ়ের গায়ে বেশ দামি পোশাক। বোঝা গেল যথেষ্ট স্বচ্ছল পরিবার। হ্যারি ভাঙাভাঙা গ্রীক ভাষায় বলল—আমরা বিদেশী—ভাইকিং। প্রৌঢ় বললেন—হ্যাঁ তোমাদের কথা আমরা শুনেছি। দক্ষ জাহাজ চালক তোমরা। দুঃসাহসী। তবে জলদস্যু বলে তোমাদের দুর্নামও আছে।

—আমাদের সঙ্গে যারা পেরে ওঠে না তারা এই দুর্নাম দেয়। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে ঠিক আছে। ওসব কথা থাক। তোমরা কী চাও? প্রৌঢ়টি বললেন।

—দেখুন—আমাদের জাহাজডুবি হয়েছে। কোনরকমে এই ক'জন প্রাণে বেঁচেছি। আপনার বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় চাই। হ্যারি বলল।

—নিশ্চয়ই—প্রৌঢ়টি বললেন—আপনারা থাকুন। আসুন। প্রৌঢ়টি দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন। প্রথমে মারিয়া পরে শাঙ্কো, বিস্কোরা কয়েকজন ঢুকল। প্রৌঢ়টি হ্যারিকে বললেন—আমার নাম অ্যান্তিকো। তোমাদের যখন যা প্রয়োজন পড়ে জানাবে।

বাইরের ঘরটায় এসে দাঁড়াল সবাই। দেখল—কাঠের তক্তায় পাতা বিছানামত। ওরা বসল। বাড়ির ভেতর থেকে একজন বয়স্কা মহিলা এঘরে এলেন। অ্যান্তিকো তাকে হ্যারিদের কথা বললেন। মহিলাটি মারিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে? গ্রীক ভাষা। মারিয়া কিছুই বুঝল না। হ্যারি বলল—উনি গ্রীক ভাষা জানেন না। আমি ওঁর পরিচয় দিচ্ছি। উনি আমাদের দেশের রাজকুমারী।

—তা রাজকুমারী রাজপ্রাসাদের আরাম স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে এভাবে বিদেশে এসেছেন কেন? মহিলাটি বললেন।

—রাজকুমারী দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন। তাঁর স্বামীও আমাদের সঙ্গে আছেন। হ্যারি বলল।

—তা রাজকুমারীর স্বামী কে? মহিলাটি বললেন।

—ওসব জেনে তোমার কী হবে? অ্যান্তিকো বললেন—ওদের জলখাবারের ব্যবস্থা কর। মহিলাটি আর কোন কথা বললেন না। বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। হ্যারি বলল—রাজকুমারী আপনারা এখানে থাকুন। আমি যাচ্ছি। অন্য বন্ধুদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। হ্যারি চলে গেল।

হ্যারি আরও দুটো বাড়িতে বন্ধুদের ভাগ ভাগ করে থাকার ব্যবস্থা করল। আশ্রয় আহার জুটল। এবার ফ্রান্সিসের আসার জন্য অপেক্ষা করা।

কিন্তু হ্যারিদের ভাগ্য খারাপই বলতে হবে। হ্যারিদের পালিয়ে যাবার খবর শুনে আল জাহিরি রেগে আগুন হয়ে গেল। কয়েদঘরের পাহারাদার ক'জনকে চাবুক মারল। মনের ঝাল মিটিয়ে এবার ভাবতে বসল কী করে বন্দীদের আবার

ধরা যায়। ফিরিয়ে আনা যায়।

খোঁজখবর করতে করতে অ্যান্তিকোর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো আল জাহিরি। আশপাশের দোকানে বাড়িতে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানল কিছু ভিনদেশি লোক অ্যান্তিকোর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। কাজেই আল জাহিরির হ্যারিদের হদিশ পেতে অসুবিধে হয়নি।

বাড়ির বাইরে আটদশজন সৈন্যকে দাঁড় করিয়ে রেখে আল জাহিরি বাড়ির দরজায় হাত ঠুকে টক্‌টক্ শব্দ করল।

একটু পরে অ্যান্তিকো দরজা খুলে দাঁড়ালেন। আল জাহিরিকে দেখে সৈন্যদের দেখে একটু অবাকই হলেন। বললেন—কী ব্যাপার?

—আপনার বাড়িতে আমার ক্রীতদাসরা পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আমি তাদের ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। আল জাহিরি বলল। অ্যান্তিকো বললেন—আমাকে তো ওরা বলেছে ওদের জাহাজডুবি হয়েছে।

—মিথ্যে কথা। ওরা আমার ক্রীতদাস। আল জাহিরি বলল।

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অ্যান্তিকো বললেন।

আল জাহিরি ঢোলা পোশাকের নিচে থেকে একটা গুটোনো পার্চমেন্ট কাগজ বের করল। অ্যান্তিকোর হাতে দিয়ে বলল—এটা রাজা গী দ্য লুসিগনানের ফরমান। এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ক্রীতদাস কেনাবেচার ফরমান আমি পেয়েছি। কাজেই পলাতক ক্রীতদাসদের বন্দী করে ধরে নিয়ে যাবার অধিকার আমার আছে।

—তা ঠিক। তবে আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে এরা। এভাবে এদের—

—কোনো কথা নয়। অ্যান্তিকোকে কথা শেষ না করতে দিয়েই আল জাহিরি বলে উঠল—আপনি সরে দাঁড়ান। আমি দেখছি।

আল জাহিরি অ্যান্তিকোকে প্রায় হঠিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল। বাইরের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। হ্যারিরাও চমকে উঠল। একেবারে দোরগোড়ায় আল জাহিরি দাঁড়িয়ে আছে। আল জাহিরি কেঠো হাসি হাসল। বলল—আমার হাত থেকে নিস্তার নেই। সব চলো কয়েদখানায়। হ্যারি বলে উঠল—না—আমরা যাবো না। আমরা আপনার ক্রীতদাস নই। এসময় অ্যান্তিকো এলেন। বললেন—তোমরা ক্রীতদাস এটা আমাকে বলোনি। হ্যারি বলে উঠল—আল জাহিরি আমাদের জাহাজ দখল করে আমাদের ধরে নিয়ে এসেছে। আমাদের অর্থের বিনিময়ে কেনেনি। তাহলে আমরা ক্রীতদাস হলাম কী করে? অ্যান্তিকো বললেন—এসব তো প্রমাণসাপেক্ষ। তাছাড়া ক্রীতদাস কেনাবেচার অধিকার দিয়ে একে রাজা গী দ্য লুসিগনান ফরমান দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কেউ বাধা দিতে পারবে না। এবার হ্যারি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে দেশীয় ভাষায় সব বলল। তারপর বলল—আমরা যাবো না। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো। আল জাহিরি এতে খুব ঘাবড়াল না। কারণ ওর হাতে রাজার ফরমান রয়েছে।

আল জাহিরি বাইরে সদর দরজার দিকে তাকিয়ে ইশারায় সৈন্যদের ডাকল। সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে এসে ঘরে ঢুকল। হ্যারি বুঝল আল জাহিরি তৈরি হয়েই এসেছে। বুঝল সশস্ত্র সৈন্যদের নিরস্ত্র অবস্থায় বাধা দেওয়া অসম্ভব। বাধা দিতে গেলে বন্ধুদের অনেকেই মারা যাবে। কাজেই ধরা দেওয়াই এখন ভালো। পরে মুক্তির উপায় ভেবে বের করতে হবে।

হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—জানি এখন ধরা দিতে আমাদের পৌরুষে বাধবে। কিন্তু উপায় নেই। আমাদের ধরা দিতেই হবে। তাহলেই আমরা সবাই বেঁচে থাকবো। পরে মুক্তির উপায় ভাববো। বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। অনেকেই এভাবে কাপুরুষের মত হার স্বীকার করতে রাজি হচ্ছিল না। হ্যারি বুঝল বিপদ। যদি বন্ধুরা মাথা গরম করে সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে এক রক্তঝরা লড়াই হবে। নিরস্ত্র বন্ধুদের অনেকেই মারা যাবে বা ভীষণ আহত হবে। তাই হ্যারি চিৎকার করে বলল—কেউ লড়াইয়ে নেমো না। আমাদের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা ফ্রান্সিস মুক্ত আছে। ফ্রান্সিস আমাদের মুক্তির কোনো পথ নিশ্চয়ই বের করবে। এখন সবাই শান্ত হও। কেউ মাথা গরম করো না। বুদ্ধিমানের মতো মাথা ঠাণ্ডা রাখো। ফ্রান্সিস থাকলে সেও ঠিক এ কথাই বলতো। এবার বন্ধুরা শান্ত হলো। বুঝল—এখন লড়াইয়ে নামা বোকামি হবে। তাছাড়া ফ্রান্সিস তো মুক্ত আছে। ফ্রান্সিসের ওপর ওদের বিশ্বাস খুবই গভীর। শুধু বিস্কো বলল—আমরা আল জাহিরির সঙ্গে ফিরে যাবো। কিন্তু আমাদের হাত বাঁধা চলবে না। আমরা কেউ পালাবার চেষ্টা করবো না। আর একটা কথা—রাজকুমারী মারিয়াকে কয়েদঘরে রাখা চলবে না। তাঁকে আমাদের জাহাজে রাখতে হবে। হ্যারি কথাগুলো আল জাহিরিকে বুঝিয়ে বলল। আল জাহিরি খুবই বুদ্ধিমান। ও দুটো শর্তেই রাজি হলো। ওর তখন চিন্তা কোনোরকমে একবার কয়েদঘরে ঢোকাতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

হ্যারি ওরা সৈন্যদের পাহারায় বাড়ির বাইরে এলো। রাস্তায় দাঁড়াল। সৈন্যরা ওদের ঘিরে দাঁড়াল। আল জাহিরি হ্যারিকে বলল—তোমাদের আরো বন্ধু আছে। তারা কোথায়?

—আমি জানি না। হ্যারি বলল।

—একসঙ্গে পালালে আর এখন বলছো জানি না। আল জাহিরি বলল।

—যে যেখানে পেরেছে আশ্রয় নিয়েছে নয় তো এ নগর থেকেই পালিয়ে গেছে। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। তাদেরও ধরবো। আল জাহিরি বলল।

—দেখুন চেষ্টা করে। হ্যারি বলল।

সবাই চলল জাহাজঘাটার দিকে। শাঙ্কো ওর তীর ধনুক নিয়ে যাচ্ছিল। একজন সৈন্য আল জাহিরির ইঙ্গিতে তীর ধনুক কেড়ে নিল।

সৈন্যদের পাহারায় হ্যারিরা যখন যাচ্ছে তখন রাস্তার লোকজন ওদের দেখতে লাগল। হয়তো ভাবল এরা কোন দেশের লোক। এদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেন।

জাহাজঘাটা থেকে একটু দূরে সেই কয়েদখানার সামনে এলো সবাই। হ্যারিদের এক এক করে ঢোকানো হতে লাগলো। সবশেষে হ্যারি ও মারিয়া। হ্যারি বলল রাজকুমারী আপনি এই কয়েদখানায় থাকবেন না। আমাদের জাহাজে আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আল জাহিরি এ ব্যবস্থায় রাজি হয়েছে। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—না—আমি তোমাদের সঙ্গে এখানেই থাকবো। হ্যারি বলল—রাজকুমারী এসময় আপনি অবুঝ হবেন না। আপনি জাহাজে থাকলে আমরা অনেক নিশ্চিন্ত থাকবো। তাছাড়া আপনাকে জাহাজে রাখার কারণ আছে। একটু থেমে হ্যারি বলল—আল জাহিরির সঙ্গে শর্ত থাকবে আপনি প্রতিদিন সকালে আর বিকেলে আমাদের এই কয়েদঘরে দেখতে আসবেন। এবার হ্যারি গলা নামিয়ে আস্তে বলল—আসার সময় আপনি গাউনের নিচে যে ক'টা তরোয়াল আনা সম্ভব আনবেন। এভাবে কিছু অস্ত্র হাতে পেলে আমরা লড়াইয়ে নামবো। আপনি এখানে থাকলে সেটা সম্ভব হবে না। কাজেই আপনি জাহাজেই থাকুন। আপনার শরীরের দুর্বলতা এখনো যায়নি। মারিয়া আর কোনো কথা বলল না। বুঝল হ্যারি ঠিকই বলেছে।

হ্যারি কয়েদঘরে ঢুকল। আল জাহিরি একজন সৈন্যকে হুকুম করল—মারিয়াকে তাদের জাহাজে রেখে আসতে। দু'জন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে মারিয়াকে তাদের জাহাজের দিকে নিয়ে চলল।

পরদিন সকালে খাওয়া-দাওয়ার পর মারিয়া পোশাক রাখার চামড়ার পেটিটা খুলল। খুঁজে খুঁজে সবচেয়ে বড় আর ঢোলা গাউনটা বের করল। গাউনটা বেশ জমকালো।

এবার মারিয়া অস্ত্রঘরে এলো। কোমরের দু'পাশে আর পেছনে—তিনটে তরোয়াল দড়ি দিয়ে শরীরের সঙ্গে বেঁধে নিল। তারপর কেবিনঘরে এসে সেই বড় গাউনটা পরল। বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় রইল না। তরোয়ালগুলো মারিয়া খাপসুদ্ধু বেঁধেছিল। তাই হাঁটতে গিয়ে তরোয়ালের খোঁচা লাগল না। তরোয়ালের খাপগুলো লাগল। তাতে কেটে ছড়ে গেল না।

সেই জমকালো গাউন পরে মারিয়া জাহাজ থেকে পাটাতন দিয়ে নেমে এলো। দু'জন সৈন্য ছুটে এসে মারিয়ার দু'পাশে খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে দাঁড়ালো। সৈন্যরা সবাই হাঁ করে মারিয়ার সেই জমকালো পোশাক দেখতে লাগলো। যেন নাচের আসরে যাচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে মারিয়া কয়েদঘরের দিকে চলল।

কয়েদঘরের দরজার কাছে এসে পাহারাদারদের ইঙ্গিতে দরজা খুলে দিতে বলল। পাহারাদার দরজার তালা খুলল। দরজা খুলে দিল। মারিয়া কয়েদঘরে

ঢুকে একপাশে ডানদিকে সরে গেল। পাহারাদাররা আর মারিয়াকে দেখতে পেল না।

মারিয়া এবার শাঙ্কোকে ডেকে বলল—আমার শরীরে তরোয়াল বাঁধা আছে। খুলে নাও। শাঙ্কো আস্তে আস্তে খাপসুদ্ধ তরোয়াল তিনটের বাঁধা দড়ি খুলে তরোয়াল বের করে আনল। তারপর দ্রুতহাতে ঘাসের বিছানার নিচে তরোয়াল তিনটে গুঁজে রাখল।

একটুপরে কিছু কথাবার্তা বলে মারিয়া চলে এলো।

এভাবে তিনদিন ধরে মারিয়া গাউনের নিচে তরোয়াল নিয়ে কয়েদঘরে আসতে লাগল। শাঙ্কো আর বিস্কো তরোয়াল লুকিয়ে রাখতে লাগল।

পরের দিন দুপুরে দুটো জাহাজ জাহাজঘাটায় এসে লাগল। হ্যারি পাহারাদারদের কথাবার্তা থেকে জানল ঐ দুটো জাহাজে শুধু ক্রীতদাসদের বিক্রির জন্যে আনা হয়েছে। কালকেই ক্রীতদাসদের কেনাবেচার হাট বসবে। একটু দূরে দুটো বাদামগাছের নিচে কাঠের পাটাতন পাতা মাচার মতো। ওখানেই ক্রীতদাসদের তোলা হয়। ক্রেতারা চারদিকে জড়ো হয়। ক্রীতদাসদের দেখেশুনে দাম হাঁকে। দরাদরির পর ক্রীতদাসদের কিনে লোকেরা নিয়ে যায়। হ্যারি বুঝল আর দেরি করা চলবে না। আজ রাতেই যা অস্ত্র পাওয়া গেছে তাই নিয়ে লড়াইতে নামতে হবে।

হ্যারি বন্ধুদের ডেকে বলল—ভাইসব—কালকে এখানে ক্রীতদাস বিকিকিনির হাট বসবে। তাই আজকে রাতেই লড়াইয়ে নামতে হবে। বেশ কিছু তরোয়াল পেয়েছি। এই নিয়েই লড়াই করতে হবে। সবাই চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো। পাহারাদার কয়েকজন লোহার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বন্দীরা চিৎকার করে ধ্বনি তুলল কেন কিছুই বুঝল না ওরা। হ্যারিরা নিজেদের মধ্যে যে কথাবার্তা বলছে তাও বুঝল না। ওরা একটুক্ষণ দেখে দরজা থেকে সরে গেল।

তখন রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। যে সৈন্যরা খাবার দিতে এসেছিল তারা চলে গেছে।

হ্যারি মৃদুস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলো। হ্যারির সামনে এসে মাথা নিচু করল। হ্যারি বাঁধা হাত দুটো শাঙ্কোর ঢোলা পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করল। ছোরাটা দিয়ে শাঙ্কোর হাতের দড়ি ঘষে ঘষে কাটতে লাগল। উত্তেজনায় ছোরার মুখ এদিক ওদিক ঘুরে যেতে লাগল। তাতে শাঙ্কোর হাত কেটে যেতে লাগল। রক্ত বেরুলো। শাঙ্কো দাঁত চেপে সব সহ্য করতে লাগলো।

একসময় দড়িটা কেটে গেল। শাঙ্কো এক হ্যাঁচকা টানে সবটা কাটা দড়ি ছিঁড়ে ফেলল। তারপর ছোরাটা হাতে নিয়ে সবার হাতের দড়ি কেটে ফেলতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সবার হাতের দড়ি কাটা হলো।

'তারপর মারিয়া যে দশ বারোটা তরোয়াল এনেছিল সেইসব তরোয়ালগুলো ঘাসের বিছানার তলা থেকে বের করে ভাইকিংরা লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হলো।

হ্যারির নির্দেশ মতো দু'তিনজন ভাইকিং কয়েদঘরের দরজার কাছে গিয়ে চ্যাঁচামেচি শুরু করল। দু'জন পাহারাদার দরজার কাছে এলো। বলতে লাগল কী হয়েছে? ভাইকিংরাও আজেবাজে বকতে লাগল। কেউ কারো কথা বুঝল না। ভাইকিংরা ইঙ্গিতে পাহারাদারদের ভেতরে আসতে বলল। পাহারাদার দরজা খুলল। তিনজন পাহারাদার খোলা তরোয়াল হাতে ভেতরে ঢুকল। সশস্ত্র ভাইকিংরা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। পাহারাদাররা ঘরে ঢুকতেই ওদের ওপর তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাহারাদাররা স্বপ্নেও ভাবেনি এরকমভাবে আক্রান্ত হবে। ওরা তরোয়াল চালিয়ে লড়াই করতে লাগল। কিন্তু ভাইকিংদের নিপুণ তরোয়াল চালানোর সামনে ওরা দাঁড়াতেই পারল না। তিনজন পাহারাদারই আহত হয়ে মেঝের পড়ে গেল। গোঙাতে লাগল।

হ্যারিওরা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে এলো। কয়েদঘরের বাইরে উঠোন মতো জায়গায় আল জাহিরির একদল সৈন্য শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল। কয়েদঘরের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে ওদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ওরা কয়েদঘরের দরজার কাছে জ্বলন্ত মশালের আলোয় দেখল হ্যারিরা খোলা তরোয়াল হাতে বেরিয়ে আসছে। সৈন্যরা পরস্পরকে ধাক্কাধাক্কি করে ঘুম ভাঙাল। তারপর খাপ থেকে তরোয়াল খুলে নিয়ে ছুটে এলো।

ভাইকিংরাও ছুটে এলো। শুরু হলো তরোয়ালের লড়াই। আল জাহিরির সৈন্যরা একটুক্ষণের মধ্যেই বুঝল—এ বড় কঠিন ঠাঁই। দুর্ধর্ষ ভাইকিংদের অভিজ্ঞ হাতের তরোয়ালের মারের কাছে ওরা একে একে হার স্বীকার করতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অর্ধেক সৈন্য আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। উঠোনমতো জায়গাটা ভরে উঠল আহত সৈন্যদের গোঙানিতে আর্ত চিৎকারে। বাকিরা প্রাণভয়ে অন্ধকারে এদিক ওদিক পালিয়ে গেল।

ওদিকে এখানে লড়াইয়ের চিৎকারে আর্তনাদে আল জাহিরির জাহাজের সৈন্যদের ঘুম ভেঙে গেল। ওরা খোলা তরোয়াল হাতে দল বেঁধে জাহাজ থেকে নেমে এলো। ভাইকিংরাও ওদের দিকে ছুটে গেল। আল জাহিরির একদল সৈন্যকে হারিয়ে ভাইকিংরা প্রত্যেকেই তরোয়াল পেয়েছে। ভাইকিংরা একবার অস্ত্র হাতে পেলে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করা সহজ কথা নয়।

দু'দল পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে হ্যারি গিয়ে দু'দলের মাঝখানে দাঁড়াল। হ্যারি দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠল—থামো। দু'দলই দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যারি আল জাহিরির সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল—সৈন্যরা—এইমাত্র তোমাদের একদল সৈন্যকে আমরা হারিয়ে দিয়ে এসেছি। আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামলে তোমাদেরও সেই দশা হবে। তার আগে বলছি—তোমরা অস্ত্রত্যাগ কর। হার

স্বীকার কর। তোমাদের জাহাজে করে তোমরা চলে যাবে। আমরা কোনো বাধা দেব না। হ্যারি একটুক্ষণের জন্যে থেমে বলল—এখন তোমরাই বিবেচনা কর কী চাও তোমরা—মৃত্যু না বেঁচে থাকা। আল জাহিরির সৈন্যদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। এসময় আল জাহিরি জাহাজের রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। চিৎকার করে ওর সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল—বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন? আক্রমণ কর। সৈন্যরা দ্বিধায় পড়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। হ্যারি চিৎকার করে বলল—সৈন্যরা—তোমরা একবার লড়াইয়ে নামলে কেউ বাঁচবে না। আল জাহিরির কথায় তোমরা বোকার মতো মরতে যাবে কেন? অস্ত্র ত্যাগ কর। আবার সৈন্যদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। ওরা সংখ্যায় বেশি হলেও লড়াইয়ে নামতে ইতস্তত করতে লাগল। হ্যারি আবার চিৎকার করে বলল—সৈন্যরা—অস্ত্র ত্যাগ কর। আল জাহিরি চিৎকার করে বলে উঠল—কাপুরুষের দল—লড়াই কর্—আক্রমণ কর্।

এবার কিছু সৈন্য তরোয়াল মাটিতে ফেলে দল থেকে সরে দাঁড়াল। বাকিরা এগিয়ে এল। মুহূর্তে ভাইকিংরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হলো লড়াই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আল জাহিরির অর্ধেকের বেশি সৈন্য হয় মারা গেল না তো আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গোঙাতে লাগল। লড়াই চলল। কিন্তু আল জাহিরির বাকি সৈন্যদের মনোবল ততক্ষণে ভেঙে গেছে। ওরা অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিল। নয়তো পালিয়ে গেল।

ভাইকিংরা ধ্বনি তুলল ও—হো—হো। লড়বার জন্যে আল জাহিরির একটি সৈন্যও আর তখন সামনে নেই।

হ্যারি দেখল—জাহাজের রেলিঙের কাছে আল জাহিরি নেই। হ্যারি চিৎকার করে বলল—শাঙ্কো শিগগিরি জাহাজে যাও। আল জাহিরি না পালিয়ে যায়।

শাঙ্কো এক ছুটে জাহাজে উঠে পড়ল। ডেক-এর কোথাও আল জাহিরিকে দেখল না। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল। কেবিনঘরের মধ্যে দেখতে লাগল। আল জাহিরি কোনো কেবিনঘরে নেই। রসুইঘরেও নেই। নিশ্চয়ই ডেক-এ কোথাও লুকিয়ে আছে। অন্ধকারে জলে নেমে পালাবার ধান্দায় আছে। শাঙ্কো দ্রুতপায়ে ডেক-এ উঠে এলো। চারদিকে খুঁজতে লাগল। তখনই অস্পষ্ট জলে সাঁতার কাটার শব্দ শুনল। শাঙ্কো জাহাজের পেছনের দিকে এলো। হালের কাছে এসে নিচে জলের দিকে তাকাল। অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখল কেউ যেন জলে সাঁতরে চলেছে তীরের দিকে। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল দাঁতে চেপে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দ্রুত সাঁতার কেটে পলায়নপর আল জাহিরির পেছনে পেছনে চলল।

কিছুক্ষণ পরে আল জাহিরি তীরে উঠল। শাঙ্কোও শ্যাওলাধরা পাথরে পা রেখে সাবধানে তীরে উঠল। অন্ধকারে আল জাহিরি ছুটে পালাতে যাবে তখনই শাঙ্কো ওর পেছনে এসে দাঁড়াল। দু'জনেই হাঁপাচ্ছে তখন।

তরোয়াল হাতে নিয়ে শাঙ্কো তরোয়ালের ডগাটা আল জাহিরির গলায় ঠেকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—পালাবার চেষ্টা করলেই মরবে। কথাটা শাঙ্কো স্পেনীয় ভাষায় বলল। আল জাহিরি এটুকু বুঝল যে আর পালাবার উপায় নেই। আল জাহিরিও তখন হাঁপাচ্ছে। শাঙ্কো বলল—তোমার সৈন্যরা কিছু মরেছে কিছু আহত হয়ে গোঙাচ্ছে কিছু পালিয়েছে। মোট কথা আল জাহিরি এখন তুমি একেবারে একা।

আল জাহিরি হঠাৎ একটু নিচু হয়ে এক হ্যাঁচকা টানে কোমরের ঝোলানো তরোয়ালটা খুলে আনল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এখন তুমিও একা। লড়ে আমাকে হারাও দেখি। শাঙ্কোও কোমর থেকে তরোয়াল বের করল। আকাশে ভাঙা চাঁদ। অনুজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দু'জনের তরোয়ালের লড়াই শুরু হলো। প্রায় অন্ধকারে দু'জনের হাঁপানোর শব্দ আর তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দ।

কিছুক্ষণ লড়েই আল জাহিরি বুঝল কেন ভাইকিংদের দুর্ধর্ষ বলা হয়। শাঙ্কোর নিপুণ তরোয়াল চালানো দেখে আল জাহিরি বুঝল ওকে সহজে হারানো যাবে না। অথচ এখন শাঙ্কোকে হারাতে না পারলে ওর আর পালিয়ে যাওয়া হবে না। আল জাহিরি প্রাণপণে লড়তে লাগল। দু'জনের নাক মুখ দিয়ে বেশ শব্দ করে শ্বাস পড়ছে। লড়াই চলল।

একসময় শাঙ্কো কয়েক পা দ্রুত পিছিয়ে গেল। আল জাহিরি এক লাফে এগিয়ে এল। শাঙ্কো এই সুযোগ কাজে লাগালো। শাঙ্কো সামনে লাফিয়ে পড়ে দ্রুত তরোয়াল চালাল। এত দ্রুত তরোয়ালের ঘা নেমে এলো যে আল জাহিরি আত্মরক্ষা করার সময় পেল না। শাঙ্কো আল জাহিরির ডানবাহুতে তরোয়ালের কোপ বসিয়ে দিল। তীব্র ব্যথায় আল জাহিরি কঁকিয়ে উঠল। হাতির দাঁতে বাঁধানো বাঁটওয়ালা তরোয়ালটা মাটিতে ফেলে বাঁ হাত দিয়ে কাটা জায়গাটা চেপে ধরল।

শাঙ্কো তরোয়ালটা তুলে নিল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—তোমাকে এক্ষুণি নিকেশ করতে পারি। কিন্তু তা করবো না। তোমাদের জাহাজের কয়েদঘরে তোমাকে বন্দী করে রাখবো। কত নিরীহ মানুষদের রক্তে আর চোখের জলে ভেজা ঐ কয়েদঘর। তোমাকে সেখানে বন্দী করে রাখা হবে। নিরীহ মানুষগুলো দিনের পর দিন কী অমানুষিক দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থেকেছে তার স্বাদ তুমিও পাও। তোমার প্রায়শ্চিত্ত হোক। আল জাহিরি অনুনয়ের সুরে বলল—আমাকে ছেড়ে দাও। কথা দিচ্ছি—আমি আর ক্রীতদাস বিক্রির ব্যবসা করবো না।

—না—শাঙ্কো বলল—তুমি অনেক রক্ত ঝরিয়েছো, অনেক চোখের জল ঝরিয়েছো। তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতেই হবে। চলো তোমাদের জাহাজে। শাঙ্কো ওর তরোয়াল আল জাহিরির পিঠে ঠেকাল। বলল চলো।

দু'জনে যখন আল জাহিরির জাহাজ থেকে ফেলা কাঠের পাটাতন দিয়ে



উঠছে তখন ভাইকিংরা নিজেদের জাহাজ থেকে উল্লাসের ধ্বনি তুলল ও—হো—হো।

সিঁড়ি বেয়ে দু'জনে নেমে কয়েদঘরের দরজার কাছে এলো। আল জাহিরি এবার কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—এই কয়েদঘরে থাকলে আমি মরে যাবো।

—তোমাকে তিলে তিলে মারবার জন্যেই এই কয়েদঘরে রাখা হবে। শাঙ্কো বলল। এবার আল জাহিরি বলল—আমার কাছে মুক্তো মণি-মাণিক্য আছে। সব তোমাকে দেব। আমাকে ছেড়ে দাও।

—ও সব লোভ আমাকে দেখিও না। ঢোকো কয়েদঘরে। কথাটা বলে শাঙ্কো আল জাহিরির পিঠে তরোয়ালের চাপ বাড়ালো। আল জাহিরি এবার কেঁদে ফেলল। বলল—আমাকে এভাবে তিল তিল করে মেরো না। বুকে তরোয়াল ঢুকিয়ে একবারে মেরে ফেলো।

—না—তোমাকে এই কয়েদঘরেই মরতে হবে। ঢোকো কয়েদঘরে। কথাটা বলে শাঙ্কো তরোয়ালের চাপ বাড়ালো। আল জাহিরি কাঁদতে কাঁদতে কয়েদঘরে ঢুকল। শাঙ্কো বাইরে থেকে লোহার দরজা বন্ধ করে দিল।

কোমরে তরোয়াল গুঁজে শাঙ্কো সিঁড়ি দিয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এলো। জাহাজের পেছন দিকে হালের কাছে এলো। দেখল এই ক্যারাভেল জাহাজের সঙ্গে ওদের জাহাজটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। শাঙ্কো কোমর থেকে ছোরা বের করল। বাঁধা দড়িটা ছোরা দিয়ে ঘষে ঘষে কেটে ফেলল। ওদের জাহাজটা হাত দশেক দূরে সরে গেল।

এবার শাঙ্কো কয়েকজন ভাইকিংকে এই জাহাজে আসতে বলল। ওরা এলো। শাঙ্কো বলল—চলো নোঙর তুলতে হবে।

কয়েকজন মিলে টেনে টেনে নোঙর তুলল। যেখানে নোঙর আটকানো থাকে সেখানে নোঙর তুলে রাখলো তারপর ক্যারাভেল জাহাজ থেকে সকলেই নেমে এসে নিজেদের জাহাজে উঠল। ক্যারাভেল জাহাজটা হাওয়ার ধাক্কায় আস্তে আস্তে মাঝ সমুদ্রের দিকে চলল। জাহাজটার নিচের কয়েদঘরে একা আল জাহিরি তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

হ্যারি জিজ্ঞেস করল—শাঙ্কো, আল জাহিরিকে কী করেছো?

—ঐ জাহাজের কয়েদঘরে বন্দী করে রেখে এসেছি। শাঙ্কো বলল।

—ভালো করেছো। নিজের জীবন দিয়ে ও বুঝুক মানুষের ওপর অত্যাচারের ফল কী? হ্যারি বলল। আল জাহিরিকে কী শাস্তি দেওয়া হয়েছে সেটা সকলেই শুনল। আনন্দে ওরা আবার চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো।

ওদিকে আল জাহিরের যে পাঁচ ছ'জন পাহারাদার সৈন্য অক্ষত দেহে পালাতে পেরেছিল তারা কয়েদঘরের পেছনের জঙ্গলটায় জড়ো হল। ওরা কয়েদঘরের আড়াল থেকে দেখেছিল একজন ভাইকিং আল জাহিরিকে ওদের জাহাজে নিয়ে

যাচ্ছে। ওদের অশঙ্কা ছিল হয়তো ওরা আল জাহিরিকে মেরে ফেলেছে। এখন দেখল আল জাহিরি বেঁচে আছে। ওদের জাহাজেই আল জাহিরিকে বন্দী করে রাখা হয়েছে—এটা বুঝল।

ওরা আরো দেখল ভাইকিং যোদ্ধাটি ওদের জাহাজ থেকে নেমে এল। ঘাট পর্যন্ত পাতা কাঠের পাটাতন তুলে ফেলল। তারপর ভাইকিংটা নিজেদের জাহাজে গিয়ে উঠল। বোঝাই গেল আল জাহিরিকে কয়েদঘরেই বন্দী করে রেখে ভাইকিংটা চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ওরা দেখল ওদের জাহাজ মাঝ সমুদ্রের দিকে ভেসে চলেছে।

একজন সৈন্য বলে উঠল—জাহাজটা চালাবার মত কেউ নেই। এভাবে ভেসে গেলে অনেক দূর চলে যাবে। আমরা আর জাহাজটার কোন খোঁজই পাবো না। কাজেই এখনি আমাদের ঐ জাহাজটায় গিয়ে উঠতে হবে।

—কিন্তু যাবো কিভাবে? একজন সৈন্য বলল।

—সাঁতার কেটে চলো। একজন সৈন্য বলল।

—না। এতদূর সাঁতরে যেতে গিয়ে হয়তো হাঙরের মুখে পড়বো। কেউ বাঁচবো না তাহলে। অন্যজন বলল।

—তাহলে এক কাজ করা যাক। জেলেপাড়ায় চলো।

ওখানে নিশ্চয়ই একটা মাছধরা নৌকো পাবো। একজন বলল। এ কথায় সবাই রাজি হল। অন্ধকারে চলল জেলেপাড়ার দিকে।

কিছুক্ষণ পরে জেলেদের বস্তী দেখল। পাথ আর কাঠের বাড়িঘরদোর। সমুদ্র তীরটা এখানে বেঁকে গেছে। সেই বাঁকে অন্ধকারেও দেখা গেল আট দশটা জেলে নৌকো জল থেকে একটু দূরে বালিয়াড়িতে তুলে রাখা হয়েছে।

সৈন্যরা পাঁচজন নৌকোগুলোর কাছে গেল। শক্তপোক্ত দেখে একটা নৌকো ওরা বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল। তারপর সমুদ্রের জলে নামাল। নৌকোতে উঠল ওরা। দাঁড় নিল একজন। অন্যজন দাঁড় হালের মত জলে রাখল। দাঁড় বাওয়া চলল। নৌকোও চলল আল জাহিরির জাহাজ লক্ষ্য করে। রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠল। ভোরের নরম আলো ছড়ালো আকাশে সমুদ্রে। ওদের ভাগ্যি ভালো যে একটা ঘন কুয়াশার আবরণে ওদের নৌকোটা ঢাকা পড়ে গেছে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজের নজরদার পেড্রো কুয়াশায় ঢাকা পড়া নৌকোটা দেখতে পেল না।

কুয়াশা ঢাকা সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ওদের নৌকো চলল আল জাহিরির জাহাজ লক্ষ্য করে। আল জাহিরির জাহাজও কুয়াশায় দেখা যাচ্ছে না। বেশ আন্দাজেই দিক ঠিক করে ওরা নৌকো বেয়ে চলল।

কিছুক্ষণ পরেই ঘন কুয়াশাঘেরা আল জাহিরির জাহাজটা ওরা দেখতে পেল।

ওরা নৌকোটা আরো দ্রুত চালাল।

একসময় জাহাজের গায়ে এসে লাগল ওদের নৌকোটা। জাহাজ থেকে ঝুলে-থাকা দড়িদড়া ধরে ওরা জাহাজটায় উঠল। দেখল ডেক-এ কেউ নেই। ওরা দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচের কেবিনঘরগুলোর সামনে এল। প্রত্যেকটি কেবিনঘর খুঁজে দেখল—আল জাহিরি কোথাও নেই। ওদের চিন্তা হল—তাহলে কি ঐ ভিনদেশি লোকেরা আল জাহিরিকে মেরে ফেলে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে? একজন পাহারাদার সৈন্য বললও সেকথা। আর একজন বলল—ওরা আল জাহিরিকে মেরে ফেলে নি। চলোতো একবার কয়েদখানাটা দেখি।

এবার সবাই ছুটল নিচের কয়েদঘরের দিকে। কয়েদঘরের গরাদের সামনে এসে দেখল কয়েদঘরে মেঝেয় দুই হাঁটুতে হাত রেখে মাথা নিচু করে আল জাহিরি বসে আছে। ওদের পায়ের শব্দে আল জাহিরি মুখ তুলে তাকাল। সৈন্যদের দেখেই ছুটে লোহার দরজার কাছে এল। চিৎকার করে বলল—শিগগিরি দরজা খোল্। আমাকে বাঁচা। সৈন্যরা দেখল দরজায় তালা লাগানো। কিন্তু চাবি কোথায়? ওরা লোহার দরজার কাছে জায়গাটা ভালো করে খুঁজল। কোথাও চাবিটা পড়েনি।

তখন একজন সৈন্য ছুটল যেখানে জাহাজ মেরামতির জন্যে হাতুড়ি গজাল থাকে।

একটা মোটা হাতুড়ি আর গজাল নিয়ে সৈন্যটি ফিরে এল। গজালটা তালার ওপর রেখে গজালটায় হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল। ও কয়েকটা হাতুড়ির ঘা মেরে আর একজনের হাতে হাতুড়িটা দিল। সে এবার হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল। লোহার গরাদের ওপাশে আল জাহিরি তখন ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে—আমাকে বাঁচা তোরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তালার জোড়াটা ভেঙে খসে পড়ল। ওরা দরজা খুলল। আল জাহিরি পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এল। চিৎকার করে বলল—ওরা আমাকে এখানে বন্দী করে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মারার ব্যবস্থা করেছিল। আমি এর শোধ তুলবো। ওদের দেশের রাজকুমারীর ওপর নজর রাখবো। একা পেলেই বন্দী করে এই জাহাজে নিয়ে আসবো। তারপর উত্তর কর্সিকায় যে ক্রীতদাস কেনাবেচার বড় হাট বসে সেখানে রাজকুমারীকে বিক্রি করে দেব। এত দাম পাবো যে বাকি জীবন আমার রাজার হালে কেটে যাবে। কথাগুলো বলে আল জাহিরি হাঁপাতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—শিগগিরি আমায় খেতে দে। খিদের জ্বালায় মরে গেলাম।

সৈন্যদের মধ্যে একজন চলে গেল রসুইঘরে। তাড়াতাড়িতে কিছু খাবার রান্না করতে লাগল।

আল জাহিরি চলল নিজের কেবিনঘরের দিকে। পেছনে চারজন সৈন্যও চলল। আল জাহিরি কেবিনঘরে ঢুকেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। সৈন্যরা দাঁড়িয়ে

রইল।

আল জাহিরি বলল—কালকে সকালেই তোরা তীরে যাবি। আমার সৈন্যরা অনেক মরেছে। তবে কিছু বেঁচেও তো আছে। তাদের খুঁজে বের করবি। এভাবেই সৈন্যসংখ্যা বাড়াতে হবে। একটু থেমে জাহিরি বলল—একজন সৈন্য সবসময় কয়েদঘরের আড়াল থেকে লক্ষ্য রাখবি ওদের রাজকুমারী নিশ্চয়ই জাহাজ থেকে নেমে একা একটু বেড়িয়ে বেড়াতে পারে। সুযোগ বুঝে রাজকুমারীকে বন্দী করতে হবে। কী? পারবি তো? চারজনেই বলল—হ্যাঁ পারবো। একজন সৈন্য বলল—রাজকুমারী ঐ ভিনদেশিদের চোখের আড়ালে গেলেই আমরা রাজকুমারীকে ধরবো। আল জাহিরি বলল—তোরা এই জাহাজে এলি কী করে? সাঁতরে?

—না—জেলেদের নৌকোয় চড়ে এসেছি। একজন সৈন্য বলল।

—এবার ঐ নৌকো করেই তীরে যা। যা যা বললাম তাই করবি। আল জাহিরি বলল।

সৈন্য চারজন চলে গেল।

তখনই রাঁধুনি সৈন্যটি কাঠের থালা বাটিতে গোল রুটি আর মাংসের ঝোল নিয়ে ঢুকল। বিছানায় রাখল। আল জাহিরি পাগলের মত খাবারের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাপুস হুপুস করে খেতে লাগল।

সৈন্য চারজন জাহাজ থেকে দড়ির মই নামিয়ে দিল। মই বেয়ে বেয়ে ওরা নৌকোয় উঠল। দাঁড় হাতে নিয়ে নৌকো চালাল তীরভূমির দিকে।

তখন ভোর হয়েছে। সকালের নরম রোদ সমুদ্রের জলের ওপর ছড়িয়েছে। কয়েদঘরের পেছনে জঙ্গলে পাখির ডাকাডাকি শুরু হয়েছে। নৌকো তীরে এসে লাগল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ থেকে নজরদার পেড্রো অস্পষ্ট নৌকোটা দেখল। কিন্তু জেলেদের নৌকো বলে ও নৌকোটাকে কোন গুরুত্ব দিল না।

আল জাহিরির জাহাজটা সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে যেখানে সমুদ্রের তীরভূমি বাঁক নিয়েছে সেখানটায় এল। এই বাঁকের জন্যেই ফ্রান্সিসদের জাহাজ থেকে নজরদার পেড্রো জাহাজটা দেখতে পাচ্ছিল না।

আল জাহিরির চার সৈন্য তীরে নামল। চলল জেলেপাড়ার দিকে। জেলেপাড়া থেকে তখন জেলেরা বেরিয়ে আসছে। নৌকো নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবে। ওরা জেলেদের জিজ্ঞেস করতে লাগল—আমাদের কয়েকজন সৈনিক বন্ধু কি তোমাদের কারো বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে? জেলেরা মথো নেড়ে বলল—না। একজন জেলে বলে উঠল—দু'জন সৈন্য আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তবে সে দু'জন তোমাদের বন্ধু কি না জানি না। একজন সৈন্য বলল—আমাদের তোমার বাড়িতে নিয়ে চলো। ঐ দু'জন সৈন্যকে দেখলেই বুঝতে পারবো আমাদের বন্ধু কি না। জেলেটি বলল—বেশ—এসো। আমি দেরি করতে পারবো না। আমাকে এখুনি নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে যেতে হবে।

—না-না। আমরা দেখলেই বুঝতে পারবো। একজন সৈন্য বলল।

জেলের পেছনে পেছনে সৈন্য চারজন চলল। জেলেটি ওদের নিজের কাঠপাথরের বাড়িতে নিয়ে এল। গলা চড়িয়ে বৌকে বলল—যে দু'জন সৈন্য আশ্রয় নিয়েছে তাদের বাইরে আসতে বলো। দু'জন সৈন্য তখন ঘরের ভেজানো দরজার আড়াল থেকে বাইরে কারা এসেছে দেখল। ওরা নিশ্চিন্ত হল। ওদেরই বন্ধু। দু'জনে বাইরে বেরিয়ে এল। ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। একজন সৈন্য বলল—এখানে দেরি করা চলবে না। অন্য বন্ধুদের খুঁজতে হবে। চলো সব।

সৈন্যরা দল বেঁধে চলল। ওরা জাহাজঘাটার দিকে গেল না। কয়েদঘরের পেছনের জঙ্গলটায় ঢুকল। বড় বড় গাছের গুঁড়ি আর লতাপাতার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে চলল ওরা। গাছের ডালপালার মধ্যে দিয়ে কোথাও কোথাও ভাঙা ভাঙা রোদ পড়েছে। ওরা আস্তে আস্তে যেতে যেতে বন্ধুদের নাম ধরে ডাকতে লাগল। হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে থেকে তিনজন বন্ধু সাড়া দিল। তারপর ওদের দিকে এগিয়ে এল। ওরা এসে বলল—আরো দু'জন কেরিনিয়া নগরে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। এবার সবাই মিলে চলল কেরিনিয়া নগরে। নগরের পথে খুব একটা ভীড় নেই। ওরা এই রাস্তা ঐ রাস্তা দিয়ে ঘুরতে লাগল। খুঁজতে লাগল দুই বন্ধুকে।

খুঁজতে খুঁজতে বেশ বেলা হল। খিদেও পেয়েছে। ওরা একটা সরাইখানায় ঢুকল খাবার খেতে। তখনই ওরা দেখল বন্ধু দু'জনও খাচ্ছে। দুই বন্ধুকে পেয়ে ওরা খুশিই হল।

খেয়েদেয়ে সবাই হাঁটতে হাঁটতে জেলেপাড়ায় এল। শুধু একজন সৈন্য কয়েদঘরের আড়ালে দাঁড়াল। মারিয়ার ওপর নজর রাখার জন্যে।

জেলেপাড়ার ঘাটে নৌকো পেল না ওরা। সবকটা নৌকো চালিয়ে জেলেরা মাছ ধরতে চলে গেছে। অগত্যা ওরা নৌকো ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

বিকেল নাগাদ জেলেরা নৌকো নিয়ে ফিরল। সৈন্যরা দুটো জেলে নৌকো জোগাড় করল। নৌকোয় চড়ে চলল আল জাহিরির জাহাজের দিকে।

সেদিন বিকেল থেকেই মারিয়া বুঝতে পারল জ্বর আসছে। শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা শুরু হল। মারিয়া চুপ করে বিছানায় শুয়ে রইল।

সন্ধ্যের সময় হ্যারি মারিয়ার কাছে এল খোঁজখবর করতে। মারিয়াকে শুয়ে থাকতে দেখে বলল—আপনার কি শরীর খারাপ?

—না-না—একটু বিশ্রাম করছি। মারিয়া বলল। হ্যারি বলল—বেশি শুয়ে থাকবেন না। এসময় তো আপনি ডেক-এ যান। এখন যান। একটু ঘুরে আসুন।

—আজকে ভালো লাগছে না। মারিয়া বলল। এবার হ্যারি চিন্তিতস্বরে বলল—ফ্রান্সিসরা ফিরল না। যীশুর মূর্তি উদ্ধার করতে পেরেছে কি না—এখন

ওরা কোথায় আছে—কী করছে কোন খবরই পাচ্ছি না।

—এতে ভাববার কী আছে। মূর্তি খুঁজে পেলেই চলে আসবে। মারিয়া বলল।

—তা ঠিক। তবু দুশ্চিন্তা হয়। হ্যারি বলল। একটু থেমে বলল—আপনি বিশ্রাম করুন আমি যাচ্ছি। হ্যারি চলে গেল।

রাতের খাবার খেল না মারিয়া। মাথা যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। জ্বর বেড়েই চলেছে। মারিয়া বুঝল—অসুখের কথা আর গোপন করা চলবে না। জ্বর বাড়তে বাড়তে ও হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে। ভেনকে খবর দিতে হয়। মারিয়া ঠিক করল ও নিজেই ভেনকে ডেকে আনবে। আর কাউকে জানতে দেবে না। যদি ভাইকিং বন্ধুরা জানতে পারে যে মারিয়া অসুস্থ তাহলে ওরা খুবই চিন্তায় পড়ে যাবে। আবার ফ্রান্সিসও এখানে নেই। ওদের দুশ্চিন্তা আরো বাড়বে।

রাত বাড়ল। মারিয়া বুঝল আর দেরি করা উচিত হবে না। মারিয়া আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠল। যে মোটা কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে ছিল সেটা গায়ে দিয়ে চলল। মাথার যন্ত্রণায় ভালো করে তাকাতে পারছে না। কানের দু'পাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে। দরজার কাছে যেতেই মাথা ঘুরে উঠল। দরজা চেপে ধরে টাল সামলাল।

একটা ঝুলন্ত কাচে-ঢাকা আলো জ্বলছে বাইরে। ঐ সামান্য আলোতেই দেখে দেখে ভেন-এর কেবিনঘরের দরজার সামনে মারিয়া এল। দরজা খোলাই ছিল। মারিয়া কেবিনঘরে ঢুকে, ডাকল—ভেন-ভেন। ভেন-এর ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠে বসল। জিজ্ঞেস করল—কে? রাজকুমারী?

—হ্যাঁ। একবার এসো তো। একটু জ্বরমত হয়েছে। মারিয়া বলল।

—সে কি! এই সেদিন অসুখ থেকে উঠলেন। ভেন বলল।

ঐ কেবিনঘরে বিস্কোও থাকে। বিস্কোর ঘুম ভেঙে গেল। বলল—রাজকুমারীর কী হয়েছে?

—একটু জ্বর হয়েছে—ওষুধ পড়লেই সেরে যাবে। মারিয়া বলল। বিস্কো বিছানা থেকে নেমে এল। বলল—চলুন আপনাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। ভেনকে বলল—ভেন—তুমি ওষুধ নিয়ে এসো। বিস্কো মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চলল মারিয়ার কেবিনঘরের দিকে। এতক্ষণ মারিয়া শরীরের ব্যথা বেদনা মাথার অসহ্য যন্ত্রণা প্রবল জ্বর অনেক কষ্টে সহ্য করছিল। আর পারল না। নিজের কেবিনঘরের দরজার কাছে এসে মাথা ঘুরে মেঝেয় পড়ে গেল। বিস্কো তো অবাক। সামান্য জ্বরে মারিয়া এতটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ও মারিয়ার পিঠে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে মারিয়াকে উঠে বসাল। তারপর মারিয়াকে পাঁজাকোলা করে তুলল। এইবার বিস্কো বুঝল—রাজকুমারীর শরীর প্রচণ্ড জ্বরে যেন পুড়ে আছে। বিস্কো আস্তে আস্তে মারিয়াকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

মারিয়ার গলা থেকে গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল। বিস্কো মারিয়ার মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ভেন ঢুকল। হাতের ওষুধের বোয়ামটা বিছানায় রাখল। মারিয়ার কপালে গলায় হাত রেখে জ্বরের তাপ দেখল। তারপর চোখ দেখল। হাতের নাড়ির গতি দেখল। তারপর মেঝেয় গিয়ে বসল। বোয়ামটা নিল। বোয়াম থেকে সবুজ রঙের আঠালো একটা ওষুধ বের করল। হাত দিয়ে চারটে বড়ি করল। বিস্কোকে বলল—জল এনে ওষুধের একটা বড়ি রাজকুমারীকে খাইয়ে দাও। বিস্কো কাঠের গ্লাসে জল এনে মারিয়াকে মৃদুস্বরে বলল—রাজকুমারী এই ওষুধটা খেয়ে নিন। এটা খেলে কষ্ট কমবে। মারিয়া তখন প্রায় অজ্ঞানের মত। বিস্কো বুঝল সেটা। তবু ওষুধটা খাওয়াতে হবেই। বিস্কো মারিয়ার পিঠে হাত রেখে মাথাটা উঁচু করল। জলের গ্লাস থেকে মুখে জল ঢালল। মারিয়া জল খেল। বিস্কো এবার একটা বড়ি খাইয়ে দিল। তারপর মারিয়াকে শুইয়ে দিল।

বিস্কো ভেনকে বলল—ভেন তুমি চলে যেও না। ভেন বলল—আমাকে এখানে সারারাতই জেগে থাকতে হবে।

—আমি হ্যারিকে ডেকে আনছি। বিস্কো বলল। তারপর দ্রুত পায়ে কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই হ্যারি এল। সঙ্গে শাঙ্কো। হ্যারি এগিয়ে গিয়ে মারিয়ার কপালে হাত রাখল। গলায় হাত রাখল। বলল—ভেন—জ্বর খুব বেশি—তাই না? ভেন বলল—হ্যাঁ। ওষুধ দিয়েছি। জ্বর কমবে।

ভেন বিছানায় বসল। মাঝে মাঝে মারিয়ার কপালে হাত দিয়ে দেখতে লাগল। হ্যারিরা মেঝেয় বসে রইল। হ্যারি ভাবছিল এই বিপদের সময় ফ্রান্সিস নেই। ফ্রান্সিস থাকলে মনে অনেক জোর পাওয়া যেত।

ততক্ষণে ভাইকিংরা খবর পেয়েছে রাজকুমারী ভীষণ অসুস্থ। ওরা কেবিনঘরের বাইরে ভীড় করল।

শেষ রাতের দিকে মারিয়াকে পরীক্ষা করে ভেন বলল—হ্যারি—জ্বর অনেকটা কমেছে। হ্যারি মারিয়ার কপালে হাত রাখল। হ্যাঁ—জ্বর অনেক কম।

ভোর হল। ভেন আর হ্যারিরা তখনও বসে আছে। রাতে কেউ আর ঘুমোয় নি।

হ্যারি ভেনকে বলল—তোমার কি মনে হয় এই ওষুধেই রাজকুমারী সুস্থ হবেন?

—তা ঠিক বলতে পারছি না। কয়েকদিন যাক—তখন বলতে পারবো। ভেন বলল।

বিকেল হতেই মারিয়ার আবার জ্বর এল। জ্বর বাড়তে লাগল। জ্বর এত বাড়ল যে মারিয়া প্রায় অজ্ঞানের মত হয়ে গেল। হ্যারি ভেনকে ডেকে নিয়ে

এল। ভেন মারিয়ার কপালে গলায় হাত দিয়ে দেখল। ভেন-এর মুখ চিন্তাকুল হল।

ভেন মেঝেয় বসল। যে ঝোলাটা এনেছিল সেটা থেকে একটা শুকনো শেকড় বের করল। তারপর বের করল দুটো পাথর। বিস্কোকে জল আনতে বলল। বিস্কো কাঠের গ্লাশে জল ভরে দিল। ভেন শেকড়টা কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখল। তারপর শেকড়টা একটা পাথরের ওপর রাখল। অন্য পাথরটা দিয়ে শেকড়টা ঘষতে লাগল। হলুদ রঙের রস বেরোতে লাগল। সেই রসটা কাঠের গ্লাশের জলের সঙ্গে মেশাল। হ্যারিকে বলল—হলুদ জলটুকু রাজকুমারীকে খাইয়ে দাও।

হ্যারি সাবধানে মারিয়ার মাথাটা দু'হাতে তুলে ধরল। আস্তে আস্তে মারিয়াকে ওঠাতে ওঠাতে বলল—রাজকুমারী—কষ্ট করে ওষুধটা খেয়ে নিন। মারিয়া দু' একবার দম নিয়ে ওষুধটা খেল। হ্যারি সাবধানে মারিয়াকে বিছানায় শুইয়ে দিল। এবার জ্বর কমে কিনা তার জন্য প্রতীক্ষা করা।

সন্ধ্যে হল। রাত বাড়তে লাগল। ভেন মাঝে মাঝেই মারিয়ার গলায় কপালে হাত দিয়ে জ্বর বাড়ছে না কমছে তা দেখতে লাগল।

একসময় ভেন হ্যারিকে বলল—আমি এখানে আছি। তোমরা গিয়ে খেয়ে এসো। হ্যারিরা খেতে গেল। কিন্তু কেউই বেশি খেতে পারল না।

ওরা কেবিনঘরে ফিরে এল।

হ্যারিরা মেঝেয় বসে রইল। কারো চোখেই ঘুম নেই।

শেষ রাতের দিকে মারিয়ার শরীর আরো খারাপ হল। জ্বর এত বাড়ল যে মারিয়া অজ্ঞান হয়ে গেল।

ভেন মারিয়ার চোখ দেখল। কপালে গলায় হাত দিয়ে দেখল। পা ও হাত চেপে দেখল। মৃদুগলায় ডাকল—হ্যারি। হ্যারির একটু তন্দ্রামত এসেছিল। ডাক কানে যেতেই ও দ্রুত ভেন-এর কাছে এল। ভেন বলল—হ্যারি আমার জ্ঞান বুদ্ধিমত চিকিৎসা আমি করেছি। আমার আর কিছু করার নেই। এখন কেরিনিয়া নগরে ভালো বৈদ্যের খোঁজ কর। তাঁকে দেখাও। এছাড়া আর কিছু করার নেই।

ভোরবেলা। মারিয়ার জ্বর একটু কমল। কষ্টও একটু কমল।

হ্যারি বিস্কোকে ডেকে বলল—চলো—ভালো বৈদ্যের খোঁজে কেরিনিয়া নগরে আমাদের যেতে হবে।

—কিন্তু বৈদ্যের খোঁজ পাবে কী করে? বিস্কো বলল।

—দেখি। যে ভদ্রলোকের বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম তাঁকেই জিজ্ঞেস করবো। চলো। হ্যারি বলল।

ওরা দু'জন জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। হ্যারি দেখল—এখানে ওখানে ভাইকিং বন্ধুরা দল বেঁধে বসে আছে। গতরাতে কেউই বোধহয় ঘুমোয় নি।

দু-একজন ভাইকিং বন্ধু হ্যারির কাছে এগিয়ে এল। বলল—হ্যারি রাজকুমারী এখন কেমন আছেন?

—ভালো না—আমরা ভালো বৈদ্যের সন্ধানে যাচ্ছি।

হ্যারি আর বিস্কো জাহাজ থেকে নেমে এল। মারিয়ার শিয়রের কাছে ভেন বসে রইল। মেঝেয় বসে রইল শাঙ্কো। ভাইকিং বন্ধুরা মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাচ্ছে। মারিয়া তখন জ্বরে অজ্ঞান।

হ্যারি আর বিস্কো অ্যান্তিকোর সামনে এল। পেতলের কড়াটা দরজায় ঠুকে শব্দ করল। দরজা খুলে গেল।

অ্যান্তিকো দাঁড়িয়ে। বললেন কী ব্যাপার? হ্যারি বলল—আমাদের দেশের রাজকুমারী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর চিকিৎসার জন্যে একজন ভালো বৈদ্যের খোঁজ দিতে পারেন?

—আমি পেশায় বৈদ্য। তোমরা রাজকুমারীকে নিয়ে এসো। আমিই চিকিৎসা করবো। কোন ভয় নেই। অ্যান্তিকো বললেন।

হ্যারি আর বিস্কো দু'জনেই নিশ্চিন্ত হল। খুশিও হল।

ওরা অ্যান্তিকোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। হ্যারি বলল—বিস্কো একটা কৃষকদের শস্যটানা গাড়ি জোগাড় করতে হবে।

দু'জনে বাজার এলাকায় এল। খুঁজে খুঁজে একটা গাড়ি পেল। ভাড়া করল গাড়িটা। গাড়িতে চেপে দু'জনে জাহাজঘাটায় এল। জাহাজে উঠল। কেবিনঘরে ঢুকে দেখল ভেন বসে আছে। ভেন বলল—বৈদ্যের খোঁজ পেলে?

—হ্যাঁ—হ্যারি বলল রাজকুমারীকে নিয়ে যাওয়া যাবে?

—হ্যাঁ—তবে সাবধানে গাড়ি করে নিয়ে যাবে। ভেন বলল।

—আমরা গাড়ির ব্যবস্থা করেছি। হ্যারি বলল।

তখন বেলা হয়েছে। হ্যারি মারিয়ার মুখের কাছে মুখ এনে বলল—রাজকুমারী ভালো চিকিৎসার জন্যে আপনাকে নিয়ে যাবো। গাড়িতে করে একটু কষ্ট হবে। সহ্য করবেন।

বিস্কো বিছানার কাছে গেল। মারিয়ার পিঠে বাঁ হাতটা রাখল। ডান হাত পায়ের নিচে দিয়ে আস্তে আস্তে মারিয়াকে তুলে পাঁজাকোলা করল। আস্তে আস্তে কেবিনঘরের বাইরে নিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ উঠে এল। পেছনে হ্যারি।

মারিয়ার দুই চোখ সোজা। এবার মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল। মারিয়ার এই কষ্ট দেখে বিস্কোও সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু মারিয়াকে সম্পূর্ণ সুস্থ করার জন্যে মারিয়াকে তো এই কষ্ট মেনে নিতেই হবে।

বিস্কো মারিয়াকে নিয়ে জাহাজ থেকে জাহাজঘাটায় পেতে রাখা কাঠের তক্তায় উঠল। একজনের যাওয়ার জন্যে তক্তা। বিস্কো সাবধানে মারিয়াকে নিয়ে তক্তায় উঠল। তারপর পা টিপ টিপ করে তক্তার ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। তক্তা শেষ।

বিস্কো জাহাজঘাটায় নামল। বিস্কোর আগেই হ্যারি একটা বড় মোটা কাপড় আর বালিশমত নিয়ে এসেছিল। সেসব ঐ গাড়িতে আগেই পেতে রেখেছিল হ্যারি।

বিস্কোকে এত সন্তর্পণে মারিয়াকে আনতে হল যে বিস্কোর দু'হাত ধরে এল। হাত দুটোয় ব্যথা করতে লাগল।

বিস্কো মারিয়াকে আস্তে আস্তে গাড়ির মধ্যে পাতা কাপড়ে শুইয়ে দিল। বালিশমত পুঁটুলিটা মাথার নিচে দিল। মারিয়ার তখনও চোখ বোঁজা। গোঙানিটা কমেছে।

হ্যারি আর বিস্কো গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ির চালককে গাড়ি চালাতে বলল। ঘর্ ঘর্ শব্দ তুলে এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি চলতে শুরু করল। গাড়ির ঝাঁকুনিতে মারিয়ার কষ্ট বাড়ল। মুখ থেকে জোরে গোঙানির শব্দ ভেসে আসতে লাগল। হ্যারি চালককে বলল—এমনভাবে গাড়ি চালাও যাতে ঝাঁকুনি কম হয়। চালক এবার আস্তে আস্তে চালাতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি অ্যান্তিকোর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। হ্যারি গাড়ি থেকে নেমে দরজার পেতলের কড়াটা দরজায় ঠুকল। দরজা খুলে দাঁড়ালেন অ্যান্তিকোর স্ত্রী। বললেন—তোমরা রোগীকে এনেছো?

—হ্যাঁ। হ্যারি বলল।

—বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও। ভদ্রমহিলা বললেন।

এবার হ্যারি আর বিস্কো দু'জনেই মারিয়াকে তুলে আস্তে আস্তে বাইরের ঘরে নিয়ে এল। ঘরে লম্বা তক্তপোষমত পাতা। ওপরে বিছানা পাতা। দু'জনে মারিয়াকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিয়ে হ্যারি বাইরে এল। চালকের দাম মেটাল। মোটা কাপড় আর বালিশ গাড়ি থেকে নিয়ে এল। মারিয়ার মাথার নিচে বালিশটা দিয়ে দিল হ্যারি। মোটা কাপড়টা একপাশে রাখল।

দু'জনে ঐ বিছানায় বসল। একটু পরেই অ্যান্তিকো এলেন। খুব মনোযোগ দিয়ে মারিয়াকে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। তারপর পাশে দাঁড়ানো স্ত্রীকে মৃদুস্বরে কিছু বললেন। স্ত্রী বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। একটু পরে একটা চিনেমাটির ছোট বোয়াম নিয়ে এলেন। অ্যান্তিকো বোয়ামের মুখ খুলে আঙ্গুল ঢুকিয়ে কালো রঙের আঠামত ওষুধ বের করলেন। মারিয়ার মুখ একটু খুলে ওষুধটা মুখে ঢুকিয়ে দিলেন। মারিয়ার চোখ মুখ কুঁচকে গেল। বোঝা গেল ওষুধটা তেতো। তবে মারিয়া ওষুধটা ফেলে দিল না। আস্তে আস্তে খেয়ে নিল।

অ্যান্তিকো বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। হ্যারিদের দিকে তাকিয়ে বললেন—আজকের রাতটা কাটলেই উনি আস্তে আস্তে সুস্থ হবেন। এখন আপনারা চলে যেতে পারেন। হ্যারি বলল—আমরা দুপুরে একবার খেতে যাবো। তারপর দুপুরের পর থেকে সারারাত এখানেই থাকবো।

—বেশ। তাহলে ভালোই হয়। রোগীকে রাতে দু'বার দুটো ওষুধ খাওয়াতে

ট

হবে। আপনারা থাকলে ওষুধ দুটো আপনারাই খাওয়াতে পারবেন। অ্যান্তিকো বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। বোয়ামটা নিয়ে অ্যান্তিকোর স্ত্রী ভেতরে চলে গেলেন।

হ্যারি আর বিস্কো বিছানার একপাশে বসে রইল।

দুশ্চিন্তায় গত রাতটা ওরা দু'চোখের পাতা এক করেনি। হ্যারির শরীর বরাবরই দুর্বল। রাত জাগার ক্লান্তিতে হ্যারির মাথা টিপ্‌টিপ্ করতে লাগল। নিজেকে বেশ দুর্বল মনে হতে লাগল। বিস্কো বুঝল সেটা। ও বলল—হ্যারি তুমি একপাশে শুয়ে ঘুমিয়ে নাও। আমি তো জেগে আছি। হ্যারি মাথা নেড়ে বলল—না। বিস্কো ধমকের সুরে বলল—পাগলামি করো না। তুমি যে শরীরের দিক থেকে খুব দুর্বল সেটা আমরা জানি। এবার তোমার কিছু হলে আমাদের বিপদই বাড়বে। কথা শোন—ঘুমিয়ে নাও। দুপুরে খেতে যাবার সময় তোমাকে ডেকে নেব। হ্যারি বুঝল—না ঘুমলে শরীরের দুর্বলতা যাবে না। হ্যারি বিছানার একপাশে শুয়ে পড়ল। চোখ দুটো জ্বালা করছে। মাথাটাও টিপ্‌টিপ্ করছে। দেখা যাক—শরীরের এই অবস্থায় ঘুম আসে কি না।

একটু পরেই হ্যারি ঘুমিয়ে পড়ল।

দুপুরে বিস্কো হ্যারির ঘুম ভাঙাল। হ্যারি উঠে বসল। চোখ কচলাল। তারপর মারিয়ার কপালে হাত রাখল গলায় হাত রাখল। জ্বর অনেক কমে গেছে। খুশির চোখে বিস্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—বিস্কো জ্বর অনেক কমে গেছে। তখনই দেখল—মারিয়ার চোখ খোলা। ওর দিকে তাকিয়ে মারিয়া দুর্বল স্বরে বলল—আমার জন্যে তোমাদের ভোগান্তির শেষ নেই।

হ্যারি বলে উঠল—ওসব নিয়ে ভাববেন না। আগে সম্পূর্ণ সুস্থ হোন। তারপরে এসব কথা ভাববেন। বিস্কো বলল—রাজকুমারী—আমরা এখন খেতে যাচ্ছি। কতটা খেতে পারবো জানি না। তবু আমাদের তো সুস্থ থাকতে হবে।

দু'জনে এবার চলল জাহাজঘাটার দিকে। জাহাজে উঠতেই বন্ধুরা ছুটে এল। হ্যারি একটু গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—রাজকুমারীর জ্বর কমেছে। এখন অনেকটা ভালো আছেন। সবাই আনন্দের ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

খাওয়া দাওয়া সেরে হ্যারি আর বিস্কো আবার অ্যান্তিকোর বাড়িতে ফিরে এল। রাজকুমারী বেশ দুর্বলস্বরে আস্তে আস্তে বলল—অ্যান্তিকোর স্ত্রী মায়ের মত আমাকে দুপুরে ফলের রস খাইয়েছেন। ওষুধও খাইয়েছেন। হ্যারি বিস্কো শুনে আশ্বস্ত হল।

ওদিকে কয়েদঘরের পেছনে থেকে আসা জাহিরির যে সৈন্যটা মারিয়ার দিকে নজর রাখছিল সে সবই দেখল। অসুস্থ মারিয়াকে গাড়িতে তোলা হল। গাড়িতে দু'জন ভাইকিং চলল। গাড়িটা যেহেতু খুব জোরে যাচ্ছিল না সৈন্যটি একটু জোরে হেঁটে গাড়ির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চলল।

অ্যান্তিকোর বাড়িতে ঢোকা এসবই সৈন্যটি দেখল। তারপর পিছু ফিরে ও

চলল জেলেপাড়ার দিকে। সমুদ্রতীরে এসে একটা জেলেনৌকোয় চড়ে ও জাহাজের দিকে চলল।

জাহাজে উঠে চলল আল জাহিরির কেবিনঘরের দিকে। আল জাহিরিকে ও সব বলল। আল জাহিরি তখন সৈন্যটিকে বলল—তুই আবার যা। শুধু লক্ষ্য রাখবি কখন ভাইকিং দু'জন নিজেদের জাহাজে খেতে যায়। ঐ সময় রাজকুমারী একা থাকবে। সেই সুযোগটাই তখন কাজে লাগাতে হবে। তুই সেই সময়ে আসবি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

সৈন্যটি এবার চলল নৌকোয় চড়ে তীরের দিকে।

অ্যান্তিকোর বাড়ির সামনে গিয়ে সৈন্যটি দাঁড়াল। নজর রাখল কখন ভাইকিং দু'জন বেরোয়।

হ্যারি গভীর রাতে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। বিস্কো একটানা জেগে রইল। অ্যান্তিকোর নির্দেশমত মারিয়াকে ওষুধ খাওয়াল।

পরদিন সকালে মারিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করল। অ্যান্তিকোর স্ত্রী মারিয়াকে ওষুধ খাইয়ে গেলেন।

কিছু পরে অ্যান্তিকো এলেন। মারিয়াকে পরীক্ষা করে দেখে হ্যারিকে বললেন—আপনাদের রাজকুমারীর বিপদ কেটে গেছে। উনি এবার আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন। হ্যারি আর বিস্কো মারিয়ার দিকে তাকিয়ে খুশির হাসি হাসল।

মারিয়া আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসল। হ্যারিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। তখনও দুর্বলতা কাটেনি।

একটু বেলায় হ্যারি আর বিস্কো খেতে চলল। ওরা রাস্তা ধরে কিছুটা যেতেই নজরদার সৈন্যটি বাজার এলাকা থেকে একটা শস্যটানা গাড়ি ভাড়া করে দ্রুত গিয়ে জেলেপাড়ায় উঠল। আল জাহিরিকে বলল—পাহারাদার দু'জন ভাইকিংই ওদের জাহাজে খেতে চলে গেছে।

আল জাহিরি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বলল—চারজন আমার সঙ্গে চল। যে নৌকোয় পাহারাদার এসেছিল সেই নৌকোয় চড়ে সবাই তীরে এল। যে গাড়িটায় পাহারাদার এসেছিল সেই গাড়িতে চড়ে ওরা দ্রুত চলল অ্যান্তিকোর বাড়ির দিকে।

অ্যান্তিকোর বাড়িতে পৌঁছে দরজায় পেতলের কড়া দিয়ে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ করল। দরজা খুলে দাঁড়ালেন অ্যান্তিকোর স্ত্রী। আল জাহিরি তাঁকে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকল। চলল বাইরের ঘরের দিকে। অ্যান্তিকোর স্ত্রী বললেন—আপনারা কারা? কী চান? আল জাহিরি হেসে বলল—আমরা আমাদের রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—কিন্তু রাজকুমারী এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। অ্যান্তিকোর স্ত্রী বললেন।

—জাহাজে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাব। আল জাহিরি বলল।

সৈন্য নিয়ে আল জাহিরি বাইরের ঘরে ঢুকল। দেখল মারিয়া বিছানায় শুয়ে আছে। আল জাহিরিকে দেখে মারিয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিছানায় উঠে বসল। বলল কী চাই তোমাদের? আল জাহিরি হেসে বলল—কোন কথা নয়। আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। যদি যেতে না চান চিৎকার চ্যাঁচামেচি করেন তাহলে বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দেব। একটু থেমে বলল—উঠে বসুন।

—আমি যাবো না। বেশ চড়া গলায় মারিয়া বলল। আল জাহিরি বলল—চ্যাঁচাতে মানা করেছি। দু'জন সৈন্যকে বলল—যা ধরে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তোল।

দু'জন সৈন্য মারিয়ার দু'হাত ধরে দাঁড় করাল। আল জাহিরি তরোয়াল বের করল। তরোয়ালের ডগা মারিয়ার পিঠে ঠেকিয়ে বলল—আর একটা কথা বলেছেন কি তরোয়াল বিঁধিয়ে দেব। মারিয়া বুঝল এখন ওকে বাঁচাবার কেউ নেই। অ্যান্তিকো বা তাঁর স্ত্রী কিছুই করতে পারবেন না। মারিয়া চুপ করে রইল। আল জাহিরি পিঠে তরোয়ালের চাপ বাড়াল। বলল—চলুন।

মারিয়া দুর্বল পায়ে হেঁটে চলল বাইরের দরজার দিকে। অ্যান্তিকো আর তাঁর স্ত্রী দু'জনে ছুটে এলেন। অ্যান্তিকো বললেন—আপনারা কারা? আল জাহিরি বলল—আমরা ভাইকিং। আমাদের রাজকুমারীকে জাহাজে নিয়ে যাচ্ছি। মারিয়া বলে উঠল—মিথ্যে কথা। অ্যান্তিকো বললেন—এই তো রাজকুমারী বলছেন আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আল জাহিরি রাগতস্বরে বলে উঠল—সত্য মিথ্যে জানি না। আমরা রাজকুমারীকে নিয়ে যাবোই। বাধা দিতে এলে আপনারা দু'জনই খতম হয়ে যাবেন।

—কিন্তু রাজকুমারীর অসুখ এখনও সম্পূর্ণ সারেনি। অ্যান্তিকো বললেন।

—আমাদের জাহাজের বৈদ্য চিকিৎসা করবে। তাতেই ভালো হয়ে যাবে। আল জাহিরি বলল।

মারিয়াকে নিয়ে আল জাহিরি বাড়ির বাইরে এল। মারিয়াকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল। সঙ্গের সৈন্যরাও গাড়িতে উঠল। আল জাহিরি গাড়িতে উঠে হুকুম দিল—জেলেপাড়ায় চল্—জল্দি।

গাড়ি চলল। দুপুর নাগাদ গাড়ি সমুদ্রতীরে জেলেপাড়ায় পৌঁছল। আল জাহিরি নিশ্চিন্ত হল যে পাহারাদার ভাইকিং দু'জন ফেরার আগেই রাজকুমারীকে নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে।

মারিয়াকে ধরে ধরে নৌকোয় তোলা হল। সবাই নৌকোয় উঠলে নৌকো বেয়ে চলল একজন সৈন্য। মারিয়া একবার ভাবল যে চ্যাঁচামেচি করে লোকজন জড়ো করে। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হবে না। কেউ ওকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। বরং তাতে আল জাহিরি ক্রুদ্ধ হবে। এরা যা নৃশংস। হয়তো তাকে মেরেও ফেলতে পারে। মারিয়া চুপ করে নৌকোয় বসে রইল।

নৌকো গিয়ে জাহাজে লাগল। হালের দিকে ঝোলা দড়ি ধরে দড়ির মই বেয়ে সবাই জাহাজে উঠে গেল। একজন সৈন্য নৌকোয় রইল। জাহাজ থেকে দড়ির জাল ফেলা হল। সেই সৈন্যটি মারিয়াকে দড়ির জালে ধরে ধরে বসিয়ে দিল। জাহাজ থেকে দড়ির জাল টেনে তোলা হল। মারিয়া ডেক-এ নামতেই আল জাহিরি বলল—রাজকুমারীকে আমার পাশের কেবিনঘরে নিয়ে যা আর বৈদ্যকে বল রাজকুমারীকে চিকিৎসা করতে।

মারিয়াকে দু'জন সৈন্য ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামাল। নির্দিষ্ট কেবিনঘরে ঢুকিয়ে দিল। দুর্বল শরীর নিয়ে মারিয়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। এলোমেলো বিছানাটায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে গোঁফ দাড়িওয়ালা জাহাজের বৈদ্য এল। মারিয়াকে পরীক্ষা করল। হেসে বলল—কিছুছু চিন্তা নেই ভালো হয়ে যাবেন। কথাটা গ্রীক ভাষায় বলল। মারিয়া কিছুই বুঝল না। বৈদ্যকে হাসতে দেখে বুঝল ও অনেকটা সুস্থ হয়েছে।

যখন মারিয়াকে গাড়ি থেকে নৌকোয় তোলা হচ্ছিল তখন জেলেরা ভীড় করে দেখছিল। ওরা বুঝতে পারছিল না এই একেবারে অন্যরকম পোশাক পরা মেয়েটি কোন্ দেশের? মারিয়াকে নিয়ে নৌকোটা চলল জাহাজের দিকে। তখনও জেলেরা জটলা করে নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে কথা বলছিল। তারপর ভীড় ভেঙে গেল। যে যার কাজে চলে গেল।

ওদিকে হ্যারি আর বিস্কো জাহাজে খাওয়া দাওয়া সেরে অ্যান্তিকোর বাড়িতে এল। দরজার কড়া ঠুকে শব্দ করতে অ্যান্তিকোর স্ত্রী দরজা খুললেন। হ্যারিদের দেখে বললেন—কী ব্যাপার বলো তো। একটা লোক কয়েকজন সৈন্য নিয়ে এসেছিল। বলল যে ওরা ভাইকিং। ওরা জোর করে রাজকুমারীকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেছে।

হ্যারি আর বিস্কো পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। হ্যারি বলল, ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে ওরা।

ততক্ষণে অ্যান্তিকোও এল। স্ত্রী যা বলেছেন উনিও তাই বললেন। হ্যারি তখনও ভাবছে এভাবে রাজকুমারীকে নিয়ে গেল কারা?

হ্যারি বলল—আচ্ছা দলনেতা লোকটা দেখতে কেমন? অ্যান্তিকো বললেন—লোকটার গায়ের রং ফর্সা। মুখের চিবুকে অল্প দাড়ি। গোঁফ আছে। মাথায় কালো বিড়ের মত পাগড়ি। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—এ আল জাহিরি।

—কিন্তু আল জাহিরিকে তো শাঙ্কো ওর জাহাজের কয়েদখানায় বন্দী করে রেখে এসেছিল। বিস্কো বলল।

—ওর পাহারাদার কিছু সৈন্য আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় পালিয়েছিল। তারাই একত্র হয়ে আল জাহিরিকে তাদের জাহাজের কয়েদঘর থেকে মুক্ত করেছে।

হ্যারি বলল।

—তাহলে তো আবার ওরা ওদের জাহাজে গিয়ে জড়ো হয়েছে। বিস্কো বলল।

—ঠিক তাই—হ্যারি বলল—এবার ঐ জাহাজটা খুঁজে বের করতে হবে।

—একটা কথা মনে হচ্ছে—বিস্কো বলল—রাজকুমারীকে যখন বন্দী করে নিয়ে গেছে তখন জাহাজটা ঘাটের কাছেই কোথাও আছে। বিস্কো বলল।

—আল জাহিরি রাজকুমারীকে বন্দী করেছে এইজন্যে যে ক্রীতদাস বিক্রির হাটে রাজকুমারীকে অনেক স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করতে পারবে। হ্যারি বলল।

—তাহলে তো এক্ষুণি সেই জাহাজটা কোথায় আছে তা খুঁজে বের করতে হয়। বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ এক্ষুণি। নইলে আল জাহিরি রাজকুমারীকে নিয়ে জাহাজ চালিয়ে চলে যাবে। হ্যারি বলল।

ওরা দু'জনে অ্যান্তিকো আর তাঁর স্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে জাহাজঘাটার দিকে চলল।

দু'জনে জাহাজে উঠতেই সব ভাইকিং বন্ধুরা এগিয়ে এল। ওরা জানতে চায় রাজকুমারী কেমন আছেন। এবার হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—রাজকুমারী অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আল জাহিরি রাজকুমারীকে বন্দী করে তার জাহাজে নিয়ে গেছে। আমাদের সবাইকে এবার সমুদ্রতীরে ছড়িয়ে পড়তে হবে। আল জাহিরির ক্যারাভেল জাহাজটা খুঁজে বের করতে হবে। তারপরে প্রয়োজনে লড়াই করে রাজকুমারীকে মুক্ত করতে হবে। হ্যারির কথা শেষ হতেই সবাই সমুদ্রতীরে নেমে এল। ছড়িয়ে পড়ে আল জাহিরির ক্যারাভেল জাহাজটা খুঁজতে লাগল।

হ্যারি গলা চড়িয়ে পেড্রোকে ডাকল। পেড্রো মাস্তুল বেয়ে দড়ি ধরে নেমে এল। হ্যারি বলল—পেড্রো—আল জাহিরির ক্যারাভেলটা দেখেছো। পেড্রো মাথা নেড়ে বলল—না। তবে বাঁ দিকে দূরে সমুদ্রতীরটা বাঁক নিয়েছে। ঐ বাঁকে যদি কোন জাহাজ থাকে তবে আমি দেখতে পাবো না। হ্যারি বলল—আমরা সমুদ্রতীর ধরে অনেকটা যাবো। বিশেষ করে দূরে যে সমুদ্রের বাঁকটা আছে সেখানে যাবো। কারণ এখান থেকে বাঁকের জন্যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হ্যারি আর বিস্কো সমুদ্রতীর ধরে চলল। যেতে যেতে জেলেপাড়া পার হয়ে এল। এখান থেকেই শুরু হয়েছে বাঁকটা। বাঁকটা ছাড়াতেই একটু দূরে দেখল আল জাহিরির ক্যারাভেল জাহাজটা নোঙর করা।

দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। দু' তিনটে নারকোল গাছের আড়ালে দাঁড়াল। আড়াল থেকে ওরা দেখল আল জাহিরির চার পাঁচজন সৈন্য জাহাজের ডেক-এ শুয়ে বসে আছে। হ্যারি বলল—রাজকুমারীকে নিশ্চয়ই এই জাহাজে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

—আমারও তাই মনে হয়। বিস্কো বলল। তারপর বলল—এখন কী করবে? হ্যারি বলল—

—আল জাহিরির জাহাজে কত সৈন্য রয়েছে আমরা সেটা সঠিক জানি না। শুধু তুমি আর আমি তিন চারজন সৈন্যের সঙ্গে লড়তে পারি। তার বেশি হলে পারবো না। আমরা দু'জন যদি এখন আক্রমণ করি তাহলে আল জাহিরি জেনে যাবে যে আমরা ওর জাহাজ খুঁজে পেয়েছি। তখন আল জাহিরি সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীকে নিয়ে জাহাজ চালিয়ে পালিয়ে যাবে। কাজেই আজ রাতে সবাই মিলে আক্রমণ করতে হবে। হ্যারি বলল।

—যদি রাজকুমারীকে এই জাহাজে না পাওয়া যায়? বিস্কো বলল। হ্যারি বলল—তখন আল জাহিরিকে বন্দী করে রাজকুমারীকে কোথায় বন্দী করে রেখেছে সেটা জানতে হবে। এখন জাহাজে ফিরে চলো। জাহাজে ফিরে হ্যারি সবাইকে ডেকে বলল—ভাইসব, আল জাহিরির জাহাজ আমরা খুঁজে পেয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আল জাহিরির ক্যারাভেলেই রাজকুমারীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। আর দেরি করা চলবে না। আজ রাতেই আমরা আল জাহিরির জাহাজ আক্রমণ করবো। সবাই রাতের খাওয়া তাড়াতাড়ি খেয়ে তৈরি থাকবে।

রাতের খাওয়াটা সবাই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল।

তিনচারজন মিলে নোঙর খুলে দিল। হ্যারির নির্দেশে জাহাজ চলল ঐ বাঁকের দিকে। চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। বেশ কিছুদূর পর্যন্ত সমুদ্র, সমুদ্রতীর দেখা যাচ্ছে।

বাঁকের কাছে এসে হ্যারিরা আল জাহিরির ক্যারাভেল দেখতে পেল না। হ্যারি আর বিস্কো যেখানে জাহাজটা দেখে গিয়েছিল সেখানে জাহাজটা নেই।

তখনই মাস্তুলের ওপর থেকে নজরদার পেড্রো চিৎকার করে বলল—হ্যারি—আল জাহিরি ক্যারাভেল জাহাজ চালিয়ে পালিয়েছে। এখনও বেশিদূর যেতে পারে নি। পিছু ধাওয়া করো। হ্যারিরা মনোযোগ দিয়ে দেখল সত্যিই ক্যারাভেলটা দ্রুত চলেছে। একটু আগে কুয়াশার জন্যে ক্যারাভেলটা ওরা দেখতে পায় নি। কুয়াশা কেটে যেতেই ক্যারাভেলটা দেখল। এবার গতি চাই। ক্যারাভেলটা ধরতে হবে। হ্যারি চিৎকার করে বলল—ভাইসব—পশ্চিম দিকে দেখো ক্যারাভেলটা পালাচ্ছে। যে করেই হোক ঐ ক্যারাভেলটাকে ধরতে হবে। একদল পাল খাটাতে উঠে যাও। সবগুলো পাল খুলে দাও। আর একদল চলে যাও দাঁড় টানতে। জাহাজের গতি বাড়াও। ঐ ক্যারাভেলটা ধরতেই হবে।

একদল দড়ি ধরে উঠলো পালগুলোর কাছে। সব পাল খুলে দিল। জোরে হাওয়া বইছে তখন। পালগুলো সব ফুলে উঠল। আর একদল দাঁড়ঘরে গেল। জলে দাঁড় পড়তে লাগল—ছপ্‌ছপ্। জাহাজের গতি অনেক বেড়ে গেল। কয়েকজন ভাইকিং এদিক ওদিক পাল ঘুরিয়ে পালে যাতে বেশি বাতাস লাগে তার ব্যবস্থা

করল। দাঁড়ঘরে দাঁড়িরাও প্রাণপাণে দাঁড় বাইতে লাগল। ক্যারাভেলের সঙ্গে হ্যারিদের জাহাজের দূরত্ব কমে আসতে লাগল। সমুদ্রের বুকে কোথাও কোথাও কুয়াশা জমেছে। মাঝে মাঝেই কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ক্যারাভেলটা। হ্যারি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ক্যারাভেল জাহাজটার দিকে। চাঁদের আলোয় দেখে বুঝল ক্যারাভেল থেকে ওদের জাহাজটা বেশি গতিতে চলছে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজটা যেন জলের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ক্যারাভেলের কাছে চলে এল হ্যারিদের জাহাজটা। হ্যারি গলা চড়িয়ে জাহাজচালক ফ্রেজারকে বলল—ক্যারাভেল জাহাজের গায়ে গায়ে লাগাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হ্যারিদের জাহাজটা ক্যারাভেল জাহাজের গায়ে লাগল। হ্যারি দেখল আল জাহিরির ক্যারাভেলের ডেক-এ পনেরোজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—তোমাদের চেয়ে আমরা সংখ্যায় বেশি। একবার লড়াইয়ে নামলে তোমরা কেউ বাঁচবে না। আল জাহিরির জন্যে তোমরা কেন মরতে যাবে। তোমরা অস্ত্র ত্যাগ করো। আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করবো না। সৈন্যরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু অস্ত্র ত্যাগ করল না।

তখনই ক্যারাভেলের ডেক-এ উঠে এল আল জাহিরি। সৈন্যদের ধমক দিয়ে বলল—এভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন—ওদের আক্রমণ কর্।

কিন্তু সৈন্যরা কেউ নড়ল না। হ্যারি বলে উঠল—আল জাহিরি তোমাদের জাহাজে আমাদের রাজকুমারীকে বন্দী করে রেখেছে।

—তোমাদের রাজকুমারীকে আমি বন্দী করে রাখিনি। আল জাহিরি গলা চড়িয়ে বলল।

—তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। রাজকুমারীকে তোমাদের জাহাজেই বন্দী করে রেখেছো।

—বললাম তো রাজকুমারীকে আমরা বন্দী করে রাখিনি। আল জাহিরি বলল। হ্যারি বলল—আবার বলছি মিথ্যে কথা বলো না। রাজকুমারী তোমাদের জাহাজেই বন্দী আছেন। রাজকুমারীকে আমাদের জাহাজে আসতে দাও। রাজকুমারী মুক্ত হলে আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করবো না। আমরা আমাদের জাহাজ চালিয়ে চলে যাবো।

—রাজকুমারী কেরিনিয়ার কয়েদখানায় রয়েছে। আল জাহিরি বলল।

—মিথ্যে কথা। তোমাকে আর তোমার সৈন্যদের বেঁচে থাকার সুযোগ দিয়েছিলাম। সেই সুযোগ কাজে লাগালে না। এবার মরার জন্যে তৈরি হও। হ্যারি বলল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—সবাই অস্ত্র হাতে নাও। এবার লড়াই। ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো। তারপর সবাই

সিঁড়ি দিয়ে নেমে অস্ত্রঘর থেকে অস্ত্র নিয়ে এল। প্রথমবারে আটদশ জন লাফিয়ে ক্যারাভেলের ডেক-এ উঠে এল। শুরু হল আল জাহিরির সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই। আবার একদল ভাইকিং লাফিয়ে ক্যারাভেল-এ উঠল। তারাও লড়াই শুরু করল। আবার একদল গিয়ে লাফিয়ে ক্যারাভেল-এ উঠল। আল জাহিরির সৈন্যরা হার স্বীকার করতে লাগল।

হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, কাউকে হত্যা করো না। আহত কর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আল জাহিরির সৈন্যরা আহত হয়ে ডেক-এর ওপর শুয়ে পড়ল। গোঙাতে লাগল।

তখনই আল জাহিরি নিচের কেবিনঘর থেকে মারিয়াকে নিয়ে ডেক-এর ওপর উঠে এল। হাতের তরোয়ালটা মারিয়ার পিঠে ঠেকিয়ে বলল—তোমরা এক্ষুণি আমার জাহাজ ছেড়ে চলে যাও। যদি না যাও রাজকুমারীর পিঠে আমি তরোয়াল ঢুকিয়ে দেব।

হ্যারি বুঝল—এই নরপশুটা এখন রাজকুমারীকে যে কোন মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারে। হ্যারি চেঁচিয়ে বলল—ভাইসব—সবাই আমাদের জাহাজে চলে এসো। আর লড়াই নয়।

ভাইকিংরা রাজকুমারীর বিপদ ভালো করেই বুঝল। সবাই লাফিয়ে নিজেদের জাহাজে ফিরে এল।

হ্যারি ইশারায় শাঙ্কোকে কাছে ডাকল। মাথা নিচু করে মৃদুস্বরে বলল—আল জাহিরি—তীরের নিশানা। শাঙ্কো কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। তারপর দ্রুত পায়ে অস্ত্রঘরে এল। তীর ধনুক নিল। নিজের কেবিনে এসে বিছানায় পাতা মোটা কাপড়টাকে গায়ে জড়াল। তীর ধনুক ঢাকা পড়ে গেল। শাঙ্কো সিঁড়ি বেয়ে উঠে ডেক-এ এল। তারপর আস্তে আস্তে মাস্তুলের পেছনে চলে এল। তারপর গা থেকে কাপড় খুলে ফেলল। ডেক-এ হাঁটু গেড়ে বসে মাস্তুলের আড়াল থেকে ধনুক তুলল। তীর পরিয়ে মাস্তুলের পাশে সরে এল। আল জাহিরিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আল জাহিরি তখন তরোয়ালের ডগাটা মারিয়ার গলায় চেপে ধরে বলে উঠল—একটু সময় দাও। আমরা এক্ষুণি জাহাজ চালিয়ে চলে যাবো। আল জাহিরি নিশ্চিন্ত হল।

শাঙ্কো তীর নিশানা করল। তারপর তীর ছুঁড়ল। নিখুঁত নিশানা। তীর গিয়ে লাগল আল জাহিরির ডান বাহুতে। ঐ হাতেই আল জাহিরি তরোয়াল ধরেছিল। আল জাহিরি আর্ত চিৎকার করে উঠল। তারপরই হাতের তরোয়াল ফেলে বাহু বাঁ হাতে চেপে ধরল। তারপর টেনে তীরটা খুলল। গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেরিয়ে এল। আল জাহিরি ডেক-এ বসে পড়ল।

হ্যারি চিৎকার করে বলল—রাজকুমারী চলে আসুন। মারিয়া দ্রুত ছুটে এল হ্যারিদের জাহাজের দিকে। বিস্কো আর কয়েকজন ভাইকিং ছুটে গিয়ে মারিয়াকে

ধরে ওদের জাহাজে নিয়ে এল। মারিয়া আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ডেক-এর ওপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। একে দুর্বল শরীর তারসঙ্গে মৃত্যুভীতি—মারিয়া এসব সহ্য করতে পারল না।

হ্যারি ডাকল—ভেন—রাজকুমারীকে দেখ। বৈদ্য ভেন এগিয়ে এল। বসে রাজকুমারীর নাড়ি দেখল। চোখ টেনে দেখল। বলল—ভয়ের কিছুই নেই। শুধু ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কেবিনঘরে নিয়ে চলো।

মারিয়াকে কেবিনঘরে ধরাধরি করে আনা হল। ভেনও নিজের কেবিনঘর থেকে ওষুধ নিয়ে এল।

হ্যারিদের জাহাজ ফিরে চলল কেরিনিয়া বন্দরের দিকে

ওদিকে ফ্রান্সিস আর পারিসি গাড়িতে চড়ে এক সন্ধ্যায় নিকোশিয়ায় পৌঁছল। রাজধানী নিকোশিয়া বেশ বড় শহর। গরীব লোকজন আছে, তেমনি ঝলমলে পোশাক পরা অভিজাত ধনীশ্রেণীর মানুষরাও আছে। নতুন শহর। সাজানোগুছানো সুন্দর শহর। কত লোক। কিন্তু ফ্রান্সিসের সেসব দিকে চোখ নেই। পারিসি বলল, রাজধানী শহর—আপনি তো আগে দেখেননি। চলুন ঘুরে ঘুরে দেখবেন। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। বলল, বন্ধুরা, মারিয়া—সবাই ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি হবে। আমার এখন এক চিন্তা কী করে সবাইকে মুক্ত করবো। অন্য কোনোদিকে তাকাবার অবকাশ নেই আমার। এবার পারিসি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝলো। কোনো কথা বলল না।

সেই রাতটা ওরা একটা সরাইখানায় কাটালো। সকালে ফ্রান্সিস বলল, গী দ্য লুসিগনানের বিচারসভা কখন বসে?

একটু বেলায়। পারিসি বলল।

তাহলে সকালের খাবার খেয়ে চলো বিচারসভায় যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

একটু বেলায় রাজার বিচারসভায় দু'জনে পৌঁছল। তখন বিচারের কাজ চলছিল। কাঠের জমকালো সিংহাসনের সবুজ কাপড়ে মোড়া আসনে গী দ্য লুসিগনান বসে ছিল। একটা বিচারের কী রায় দিল লুসিগনান। বাচ্চাকোলে এক মা হাসতে হাসতে চলে গেল। পেছনে পেছনে গেল তার স্বামীই বোধহয়।

সেনাপতি খুবই ধূর্ত। পারিসি তার নজরে পড়ল। সেনাপতি আসন থেকে উঠে লুসিগনানকে কী বলল। তারপর আঙুল তুলে পারিসিকে দেখিয়ে দ্বাররক্ষীদের হুকুম দিল পারিসিকে বন্দী করার জন্য। দ্বাররক্ষীরা ছুটে এসে পারিসিকে ধরতে গেল। ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে ওদের থামতে বলল। দ্বাররক্ষীরা দাঁড়িয়ে পড়ল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

ফ্রান্সিস পারিসিকে বলল, তুমি লুসিগনানকে বুঝিয়ে বলো যে আমি ভাইকিং, বিদেশী, বিশেষ একটা প্রয়োজনে রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমাকে

যা বলার রাজা লুসিগনান যেন স্পেনীয় ভাষায় বলে। আমি গ্রীক জানি না। এবার পারিসি ফ্রান্সিসের শেখানো কথাগুলো পর পর বলে গেল। সব শুনে গী দ্য লুসিগনান ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। স্পেনীয় ভাষায় বলল, তুমি এই সাইপ্রাস দ্বীপে এসেছো কেন?

সে অনেক কথা। শুধু এইটুকু বলি আল্ জাহিরি আমাদের জাহাজ দখল করে এখানে বন্দী করে নিয়ে এসেছে। আমাদের সকলকে সে ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করবে বলে এনেছে। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ, কেরিনিয়া বন্দরের কাছে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসে। যারা কেনাবেচা করে সেই ব্যবসায়ীরা আমার অনুমতির জন্য আমাদের প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা দেয়। তুমি একা কী করে এলে? লুসিগনান বলল।

পালিয়ে এসেছি। আমার একটা আর্জি আপনাকে জানাতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

কী আর্জি? লুসিগনান বলল।

পারিসির কাছে দেবতুল্য একজন মানুষ নিওফিতসের কথা শুনেছি। নিওফিতস খ্রীস্টান সমাজ পরিচালনার রীতি পদ্ধতি যে গ্রন্থটিতে লিখে রেখেছিলেন, সেই গ্রন্থ পারিসি আপনাদের দিয়েছে।

হ্যাঁ দিয়েছে। কিন্তু সেই গ্রন্থে যীশুর একটি মূর্তি আঁকা আছে। লুসিগনান বলল।

ফ্রান্সিস বলল, আপনাদের বিশ্বাস নিওফিতস ঐ রকম একটি কাঠের মূর্তি নিজের হাতে কাঠ কুঁদে কুঁদে তৈরি করেছিলেন। পারিসি সেটা কোনোদিন দেখেনি।

লুসিগনান বলে উঠল—পারিসি মিথ্যেবাদী।

না, না, পারিসি জানে না কোথায় আছে সেই কাঠের মূর্তি। ফ্রান্সিস বলল, ভেবে দেখুন মান্যবর রাজা—পারিসি নিওফিতসের গ্রন্থটা নিয়েও পালাতে পারতো কিন্তু সে তা করেনি। আপনাকে দিয়েছে। মূর্তি পেলে নিশ্চয়ই দিয়ে দিতো। মূর্তি চুরি করে কী লাভ ওর? তাছাড়া মূর্তি বিক্রি করতে গেলেও ধরা পড়তো।

রাজা গী দ্য লুসিগনান মাথা নেড়ে বলল, না—না—ওকে আমি আবার জেরস পাহাড়ে পাঠাবো।

বেশ। এবার আমার আর্জিটা জানাই মান্যবর রাজা—পারিসির সঙ্গে আমিও জেরস পাহাড়ের চূড়ার কাছে সেই গুহায় মূর্তি খুঁজতে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

লুসিগনান বেশ আগ্রহের সঙ্গে বলল—তুমি পারবে ঐ কাঠের মূর্তি উদ্ধার করতে?

সেটা আমি গুহা পাহাড় এসব দেখে-টেখে বলতে পারবো। এজন্যে আপনার অনুমতি চাইছি। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ তো তুমিও যাও। লুসিগনান বলল।

মাননীয় রাজা, আমার বিনীত অনুরোধ—যদি আমি সেই মূর্তিটা উদ্ধার করতে পারি তাহলে আল জাহিরির হাতে বন্দী আমাদের দেশের রাজকন্যা ও বন্ধুদের মুক্তি দিতে হবে। পারিসিকেও কোনো শাস্তি দেবেন না।

ঠিক আছে—আগে তো মূর্তিটা উদ্ধার কারো। রাজা বলল।

সেক্ষেত্রে আমার শর্তটা কিন্তু মানতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে—দেরি না করে কাজে লেগে পড়ো। রাজা লুসিগনান বলল।

আমরা আজকেই জেরস পাহাড়ের দিকে যাত্রা শুরু করবো। ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু তোমাদের পাহারা দেবার জন্যে চারজন রক্ষী যাবে। যদি তোমরা কাঠের মূর্তি নিয়ে পালিয়ে যাও। রাজা বলল।

মান্যবর রাজা, আমার স্ত্রী ও বন্ধুরা এখনও আল জাহিরির হাতে বন্দীজীবন কাটাচ্ছে—ওদের ফেলে রেখে আমি পালাতে পারি? ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ। রাজা গী দ্য লুসিগনান পাশের আসনে বসা মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে পরামর্শ করল। তারপর বলল, ঠিক আছে—অনুমতি দিলাম। কিন্তু মূর্তি উদ্ধার করে মূর্তি নিয়ে পালালে তোমাদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

সেরকম কিছু ঘটলে যে কোনো শাস্তি মেনে নেব। ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিস বলল, মাননীয় রাজা, সাধু নিওফিতসের গ্রন্থটা একবার দেখতে পারি?

গ্রন্থটি আমার গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। যদি দেখতে চাও তবে গ্রন্থাগারে যেতে হবে। লুসিগনান বলল।

আপনি অনুমতি দিলে এখুনি যেতে পারি। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ যাও। কথাটা বলে লুসিগনান একজন দ্বাররক্ষীকে ইঙ্গিতে ডাকল। মৃদুস্বরে রক্ষীকে কী নির্দেশ দিল। রক্ষীটি ফ্রান্সিসদের আসতে বলে রাজসভাঘরের বাইরের দিকে চলল। ফ্রান্সিস আর পারিসিও চলল।

রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন একটা পাথরের ঘরের সামনে এসে রক্ষীটা দাঁড়াল। কাঠের বিরাট দরজা বন্ধ। রক্ষীটা পেতলের কড়া কাঠের দরজায় ঠুকে শব্দ করল। দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল। এক টাকমাথা বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। পরনে দামী কাপড়ের আলখাল্লা মতো। বোঝা গেল ইনিই রাজার গ্রন্থাগারটির দেখাশুনো করেন। রক্ষীর সঙ্গে কথা শেষ করে তিনি হেসে ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের ভেতরে আসতে বললেন।

ফ্রান্সিসরা দরজা পেরিয়ে ঢুকল। এই দিনের বেলায়ও ঘরটা বেশ অন্ধকার। কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে। এবার গ্রন্থাগারিক গ্রীক ভাষায় কিছু বললেন। ফ্রান্সিস বুঝল না। তখন উনি পরিষ্কার স্পেনীয় ভাষায় বললেন, আপনি কি শুধু সাধু নিওফিতসের গ্রন্থটিই দেখবেন?

হ্যাঁ—ফ্রান্সিস বলল, গ্রীক ভাষায় লেখা। আমি কিছুই বুঝবো না। শুধু গ্রন্থটির প্রথম পাতায় যীশুখ্রিস্টের যে ছবিটা আছে সেটা দেখবো।

শুধু ছবিটা দেখবেন? এই কথা বলে গ্রন্থাগারিক একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে চললেন।

হ্যাঁ, রাজা গী দ্য লুসিগনানের বিশ্বাস সাধু নিওফিতস ঐ ছবির মতো একটি কাঠের মূর্তিও তৈরি করেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

অসম্ভব নয়—ছবিটা এত জীবন্ত যে অবাক হতে হয়, গ্রন্থাগারিক বললেন। কাঠের পাটাতনে রাখা আশেপাশের বড় বড় গ্রন্থগুলির পরে কোণার দিকের এক কাঠের পাটাতনের সামনে এসে গ্রন্থাগারিক বললেন, সাধু নিওফিতসের লেখা এই গ্রন্থটি।

ফ্রান্সিস মোটা চামড়া-বাঁধাই হাতে লেখা মোটা গ্রন্থটির মলাট ওল্টালো। দেখল—যীশুর ছবি আঁকা। সত্যিই ছবিটি জীবন্ত মনে হচ্ছে। পাতা উল্টে দেখল গ্রীক ভাষায় লেখা। ফান্সিস কিছুই বুঝল না। গ্রন্থাগারিক জিজ্ঞেস করল, গ্রন্থটি কী বিষয় নিয়ে লেখা?

খ্রীস্টিয় ধর্মমণ্ডলী কীভাবে পরিচালিত হবে তার নির্দেশ। সাধু নিওফিতস বেশ কয়েক বছর ধরে গুহার নির্জনতায় আশ্রয় নিয়ে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন গ্রন্থাগারিক বললেন।

কিন্তু লেখা শেষ করে যেতে পারেননি। পারিসি বলল।

হ্যাঁ, শেষ নেই। হয়তো আরো কিছু তাঁর লেখার ইচ্ছে ছিল গ্রন্থাগারিক বললেন।

ফ্রান্সিস গ্রন্থাগারিককে জিজ্ঞেস করল, আপনার কি মনে হয় সাধু নিওফিতস ঠিক এই ছবির মতো একটি কাঠের যীশুমূর্তি বানিয়েছিলেন?

তা বলতে পারবো না। তবে রাজা গী দ্য লুসিগনান বিশ্বাস করেন সাধু নিওফিতস একটা এই ছবির মতো মূর্তি গড়েছিলেন। গ্রন্থাগারিক বললেন।

কোন ঘটনার জন্যে তাঁর এই বিশ্বাস হয়েছে? ফান্সিস জানতে চাইল। গ্রন্থাগারিক তখন গ্রন্থের ছবিটা দেখিয়ে বললেন, যীশুর স্নানের জল পবিত্র—এই কথা দিয়েই পুস্তকটি শুরু হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো পুস্তকের আঁকা যীশুকে তো স্নান করানো সম্ভব নয়। তাই সাধু নিওফিতস এমনি একটা মূর্তি গড়েছিলেন, হয়তো সেই মূর্তিটিকেই স্নান করাতেন। সে জলটুকু নিশ্চয়ই পবিত্র জল। তাই আমরা বিশ্বাস করি এমনি একটি মূর্তি নিশ্চয়ই সাধু নিওফিতস তৈরি করেছিলেন এবং সেটা সেই গুহাতে বা তার আশেপাশে কোথাও আছে।

ফ্রান্সিস পারিসিকে দেখিয়ে বলল, এর নাম পারিসি। সাধু নিওফিতসের শেষ সময় পারিসি বেশ কিছুকাল তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছিল। কিন্তু পারিসিকেও তিনি কোনোদিন কোনো মূর্তির কথা বলেননি।

গ্রন্থাগারিক বললেন, এই পারিসির কথা আমরা জানি। পারিসিই এই গ্রন্থটি উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল।

ফ্রান্সিস বলল, তাই আমরা মূর্তিটা খুঁজে বের করতে জেরস পাহাড়ে যাচ্ছি।

খুব ভালো কথা। সাধু নিওফিতসের নিজের হাতে তৈরি মূর্তি তো আমাদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। যীশুর কাছে প্রার্থনা করি আপনারা সফল হোন।

ফ্রান্সিস আর পারিসি গ্রন্থাগার থেকে বেরিয়ে এল।

এবার কাজে নামা। বাইরে এসে যে চাষী গাড়ি চালিয়ে ওদের নিয়ে এসেছিল সেই গাড়ি চড়ে বাজারে এসে এক সরাইখানায় খেয়ে নিল। এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনল। পশমী পোশাক বেশি কিনল। পারিসি বারবারই ঐ গুহার এলাকায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কথা বলছিল। খাবার-দাবারও কিনল—সব গুছিয়ে দু'জনে দুই বোঁচকামতো বাঁধল। গাড়িতে রাখল। গাড়োয়ান চাষীটিকে ফ্রান্সিস পুরো একটা স্বর্ণমুদ্রা দিল। বলল, জেরস পাহাড়ের নিচে আমাদের পৌঁছে দাও। চাষী স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে খুব খুশি। ফ্রান্সিস আর পারিসি গাড়িতে উঠল। গাড়োয়ান চাষী গাড়ি চালাল জেরস পাহাড়ের উদ্দেশে।

জেরস পাহাড়ের নিচে যখন পৌঁছল তখন বিকেল। ফ্রান্সিস আর পারিসি মালপত্র নামিয়ে নিল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

দু'জনে বোঁচকা কাঁধে পাহাড়ে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য অস্ত গেল। ওরা একটা পাহাড়ি মানুষদের বস্তিতে পৌঁছল। বস্তির মানুষেরা ওদের দেখে খুশিই হলো। পারিসিকে এর আগে অনেকেই দেখেছে। জানে যে নিওফিতসের জীবনের শেষ সময় পারিসি সেই মহাপুরুষকে সেবা-শুশ্রূষা করেছে।

সেই রাতটা ওরা বস্তিতেই কাটালো।

পরদিন সকালে আবার বোঁচকা কাঁধে পাহাড়ে উঠতে লাগল। দুপুরে একটা চেস্টনাট গাছের নিচে বসে দু'জনে বোঁচকা থেকে শুকনো খাবার বের করে খেয়ে নিল। তারপর আবার উঠতে লাগল।

গত দু'দিন একটু রাস্তামতো পেয়েছে। বিকেল নাগাদ দেখল রাস্তা বলে আর কিছু নেই। পাথরের চাঙ-এর ওপর পা রেখে রেখে ওঠা। শুরু হলো কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। দু'জনেই মাথাঢাকা পশমের পোশাক পরে নিল।

সন্ধ্যে নাগাদ একটা ছোট্ট পাহাড়ি মানুষদের বস্তি পেল।

সেই বস্তিতেই খেয়েদেয়ে রাত কাটাল।

পরদিন সকাল থেকেই যাত্রা শুরু করল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার বেগ বাড়লো। গা মাথা ভালো করে গরম কাপড়ে জড়িয়ে ওরা উঠতে লাগল।

দুপুর নাগাদ একটা গুহার সামনে এল। পারিসি বলল, মহাপুরুষ নিওফিতস এই গুহাটায় প্রথমে ছিলেন। পরে আরো উঁচুতে এক গুহায় চলে যান।

ওরা গুহাটায় ঢুকল। ফ্রান্সিস গুহাটা দেখতে দেখতে বলল, আজকে বিশ্রাম নেব এখানে। রাতটা কাটিয়ে কাল আবার ওঠা শুরু করবো।

দু'জনে গুহাটার এবড়োখেবড়ো মেঝেয় কাপড় পেতে বসল। খাওয়া দাওয়া

সারল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। অনেক চিন্তা মাথায়। যীশুর মূর্তি আদৌ নিওফিতস তৈরি করেছিলেন কি না। করলে মূর্তিটা কোথায় রেখেছিলেন? আরো চিন্তা—হাতে সময় খুব কম। আল জাহিরি ক্রীতদাস ব্যবসায়ী। ও তাড়াতাড়ি মারিয়াকে, বন্ধুদের বিক্রি করে দিতে চাইবে। তার আগেই মূর্তি উদ্ধার করতে হবে। এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে কিছু খেয়ে নিয়ে আবার শুরু হলো পাহাড়ে ওঠা। এখানে গাছ-গাছালি নেই বললেই হয়। শুধু বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই। সেসবে কখনো উঠে কখনো নেমে একফালি জায়গা দিয়ে ওঠা। ঠাণ্ডার তীব্রতা বাড়তে লাগল। কখনো কুয়াশা মেঘের মতো চারদিক ঢেকে ফেলছে। এক হাত দূরে কিছু দেখা যায় না। পরক্ষণেই তীব্র হিমেল বাতাস ও কুয়াশা উড়িয়ে দিচ্ছে। রোদ দেখা যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই কুয়াশা ঢেকে ফেলেছে চারদিক। কুয়াশা আর রোদের খেলা চলছে।

দুপুরে থামল একটা বিরাট পাথরের চাঁইয়ের নিচে। খাবার বের করে খেয়ে নিল।

আবার পাহাড়ে ওঠা। বিকেলের কিছু আগে একটা বেশ বড় সমতলভূমি দেখল। কয়েকঘর পাহাড়ি লোকের বাস এখানে। ঐ সমতলভূমিতে গম ভূট্টার চাষ করে।

সমতলটুকু পেরিয়ে আসতেই দেখল উঁচুতে একটা পাহাড়ি গুহা। এই গুহার মুখটা বড়। খাড়া চড়াইয়ের মাথায় সেই গুহা।

গুহাটা দেখিয়ে পারিসি বলল, এই গুহাটাতেই সাধু নিওফিতসের সঙ্গে আমি শেষ পর্যন্ত ছিলাম। ফ্রান্সিস গুহাটা দেখতে দেখতে বলল, কিন্তু গুহাটায় উঠলে কী করে?

সেই দড়ি-মইয়ের কথা বলেছিলাম। পারিসি বলল।

কিন্তু সেটা কি আছে এখনও? ফ্রান্সিস বলল।

দেখা যাক। পারিসি বলল।

এমন সময় সেই বস্তি থেকে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। পারিসির কাছে এসে পারিসিকে দেখে হাসল। বোঝা গেল পারিসিকে চিনেছে। বৃদ্ধের মুখে বলিরেখা ফুটে উঠল। বৃদ্ধের সঙ্গে পারিসির কিছু কথা হলো। ফ্রান্সিস তার কিছুই বুঝল না। বৃদ্ধটি চলে গেল।

পারিসি ফ্রান্সিসকে নিয়ে খাড়া পাহাড়টার নিচে এল। দেখল দুটো দড়ি ঝুলছে। দড়ির মধ্যেকার কাঠের সিঁড়িগুলো খসে গেছে। দু'টো টানা দড়িই ভরসা।

দু'টো দড়ি ধরেই ওঠা যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

আজকে উঠবেন? পারিসি জিজ্ঞেস করল।

না, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কালকে সকালে উঠবো। ফ্রান্সিস বলল।

রাত হলো। পাহাড়ি বস্তির সেই বৃদ্ধটি এল। পারিসিকে হেসে কী বলল। পারিসি বলল, ফ্রান্সিস, আজ রাতে এরা অতিথি হতে বলছে।

ভালোই তো, ফ্রান্সিস বলল, তুমি বৃদ্ধকে বলো আমরা আনন্দের সঙ্গে অতিথি হবো। তবে শুধু খাবো, থাকবো না। পারিসি কথাগুলো বৃদ্ধকে বলল। বৃদ্ধ খুব খুশি।

ফ্রান্সিস আর পারিসি বোঁচকা রেখে খেতে গেল। এক বৃদ্ধা ওদের সমাদরে একফালি ঘরে বসাল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ছেলে-মেয়েরাও ফ্রান্সিসদের পেয়ে খুব খুশি। পাহাড়ি জীবনে বাইরের মানুষের সঙ্গে তো ওদের খুব কমই সাক্ষাৎ হয়। ঐ একফালি ঘরেই ওদের বসিয়ে খাওয়াল—বাড়িতে তৈরি গোল রুটি আর পাখির মাংস। ফ্রান্সিস তো পেট পুরে খেল। এ ক'দিন তো ভালো খাবার কপালে জোটেনি। পারিসিও পেট ভরে খেল।

বৃদ্ধটি বারবার ঐ একফালি ঘরেই ওদের থাকতে বলল। ফ্রান্সিস বুঝল এই ঠাণ্ডায় বৃদ্ধের পরিবারের লোকদের কষ্ট হবে। ওরা পাহাড়ি পরিবারের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এল। বড় পাথরের চাঁইটার ওপর পশুলোমের কম্বলমতো পেতে গরম পোশাক গায়ে দিয়েই ওরা শুয়ে পড়ল। শেষরাতের দিকে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জায়গায় শীতার্ত হাওয়া যেন গায়ে কামড় বসাচ্ছে। ফ্রান্সিস আর ঘুমলো না। আকাশে চাঁদের আলো উজ্জ্বল। তবে মাঝে মাঝে কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে উঁচু পাহাড়ের চুড়ো আর তিনদিকের শূন্যতায় কুয়াশার গায়ে চাঁদের আলো। সুন্দর দেখাচ্ছে। হঠাৎই ফ্রান্সিসের মনে পড়ে গেল মারিয়া আর বন্ধুদের কথা। কী কষ্টে ওদের দিন কাটছে। কুয়াশায় চাঁদের আলোর খেলা, পাহাড়ি সৌন্দর্য সবই ফ্রান্সিসের কাছে ম্লান হয়ে গেল। ও চোখ বুঁজে ঝিমোতে লাগল।

সকাল হতেই ফ্রান্সিসরা কাজে নামল। বোঁচকা পিঠে নিয়ে ফ্রান্সিসই প্রথম দড়ি দুটোর কাছে এল। ফ্রান্সিস দড়ি দুটো গায়ের জোরে টানল। যাক—দড়ি দুটো আলগা হয়নি। ওপরে কোনো পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে বাঁধা আছে বোধহয়।

প্রথমে ফ্রান্সিস একটা দড়ি ধরে দড়িটার দু'দিকে পাহাড়ের গায়ে পা রেখে রেখে গুহার মুখের কাছে উঠে এল। এবার পারিসি উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস দড়ি টেনে টেনে পারিসিও গুহার মুখে উঠে এল। দু'জনেই হাঁপাচ্ছে তখন।

এবার দু'জনে গুহায় ঢুকল। বাইরের আলো থেকে এসে অন্ধকারই লাগল গুহার ভেতরটা। আস্তে আস্তে অন্ধকারটা চোখে সয়ে এল। ফ্রান্সিস দেখল গুহাটা বেশ বড়। বাইরের তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া গুহার ভেতরে অল্পই ঢুকছে। সেইজন্যেই গুহার ভেতরটায় একটু গরমভাব।

পারিসি গুহাটার বেশ ভেতরে এল। দেখা গেল অনেকটা জায়গায় শুকনো পাতা বিছানো। জায়গাটা দেখিয়ে পারিসি বলল, এইখানে সাধু নিওফিতস শেষ

নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর সময়ও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। ধর্মতত্ত্বের কথা সেসব। আমার কি সেসব বোঝার মতো বিদ্যেবুদ্ধি আছে নাকি। তবু শুনতাম। বুঝতাম তিনি তাঁর চিন্তাভাবনাগুলো বলে আনন্দ পাচ্ছেন। পারিসি থামল। তারপর গুহার কোণার দিকে পোড়া হাঁড়ি-কুড়ি দেখিয়ে বলল, সেদিন সন্ধ্যের সময়ই সাধু নিওফিতস খেয়ে নিলেন। আমিই রান্নাবান্না করতাম। সব দিন নয়। পাহাড়ি বস্তির লোকেরা সেই দড়ির সিঁড়ির কাছে রান্নাকরা খাবার রেখে যেত। যেদিন ওসব খাবার পেতাম না সেদিন রান্না করতাম। একটু থেমে পারিসি বলতে লাগল, একটু রাতে সাধু নিওফিতস মৃদুস্বরে আমাকে ডাকলেন—পারিসি—পারিসি। আমার ঘুম ভেঙে গেল। শুনলাম উনি বলছেন—পারিসি, তুমি আমার জন্যে অনেক করেছো। এবার আমার যাবার সময় হয়েছে। দেখছো না স্বর্গের দেবদূতেরা এসেছে। আমি যাচ্ছি। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। দেখি—গুহাটা এক অপার্থিব আলোয় ভরে গেছে। আমি সেই আলোর বর্ণনা করতে পারবো না। আমি দ্রুত এসে সাধু নিওফিতসের পায়ে হাত দিলাম। বরফের মতো ঠাণ্ডা। গায়ে হাত দিলাম—ঠাণ্ডা। মুখের কাছে কান পাতলাম। শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ নেই। বুকে কান পাতলাম কোনো শব্দ নেই। আমি কেঁদে উঠলাম। সারারাত সাধু নিওফিতসের পা ধরে কাঁদলাম। একটু থেমে পারিসি বলল, সকাল হতে আমি গ্রন্থটা হাতে নিয়ে দড়ির মই বেয়ে নিচে নামলাম। একটু বেলায় পাফোসের খ্রীস্টিয় মঠের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করলাম। গ্রন্থ দিলাম। সব বললাম। তাঁরাই সাধু নিওফিতসের শেষ কাজ করলেন। পারিসি থামল। তারপর কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে মেঝের পাতা-ছড়ানো জায়গাটায় চুম্বন করল। ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না।

এবার ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে গুহাটা দেখতে লাগল। গুহাটার একেবারে পেছনে একটা বড় ফাটল মতো আছে। তারপরেই একটা ঝর্ণার জল নিচে নেমে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝল এই ঝর্ণার জলই নিওফিতস খেতেন। এই ঝর্ণার জলেই স্নান করতেন।

ফ্রান্সিস ফিরে এসে বোঁচকা খুলল। শুকনো পাতা-ছাওয়া জায়গাটায় একটা মোটা কম্বলমতো পাতল। তারপর শুয়ে পড়ল। পারিসিও বোঁচকা খুলে মোটা কাপড় পেতে বসল। ফ্রান্সিস বলল, পারিসি, এখানে মানে গুহাটার বাইরে সব জায়গাটাই তুমি দেখছো?

হ্যাঁ। পারিসি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

কী আছে বাইরে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

পাহাড়-টাহাড় যেমন হয়। এখানে ছোট ছোট কয়েকটা সীডার, চেস্টনাট গাছ আছে। পারিসি বলল।

তাহলে সাধু নিওফিতস কাঠ পেয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ, শীতের সময় আগুন জ্বালাবার জন্যে জ্বালানি কাঠও এই গুহার কোণায় জড়ো করা থাকতো। পারিসি বলল।

হুঁ—খাওয়াদাওয়ার পর এই গুহা আর চারপাশ ভালো করে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরবেলায় খোলা বোঁচকা থেকে আটা, আলু এসব বের করে পারিসি রান্না চাপিয়ে দিল।

খাওয়াদাওয়া সেরে ফ্রান্সিস গুহাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল, জ্বলন্ত মশাল হাতে। গুহাটার কঠিন পাথুরে গা। দেখবার কিছুই নেই।

একসময় ফ্রান্সিস কাঠ রাখবার জায়গাটায় এল। কাঠ, শুকনো ডালপালা সরিয়ে সরিয়ে দেখছে, তখনই হঠাৎ নজরে পড়ল একটা হাতুড়ি। ছোট হাতুড়ি। ঐ জায়গায় ডালপাতা সরাতেই দেখল দুটো বাটালি। একটা বড় একটা ছোট। ফ্রান্সিস উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ডাকল, পারিসি। পারিসি ওর কাছে এল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে হাতুড়ি আর বাটালি দুটো তুলে নিয়েছে। পারিসি কাছে এলে বলল, এসব কী বুঝতে পারছো। পারিসি মাথা নেড়ে বলল, নাঃ। ফ্রান্সিস বলল—সাধু নিওফিতস এই হাতুড়ি, বাটালি দিয়েই কাঠ কুঁদে কুঁদে প্রভু যীশুর মূর্তি গড়েছিলেন। কাজেই আমার অনুমান ঠিক। এখানেই কোথাও আছে সেই কাঠের মূর্তি।

হাতুড়ি বাটালি রেখে ফ্রান্সিস গুহার চারদিকটা মশালের আলোয় ভালো করে দেখতে লাগল। আর কিছু পেল না। তবে নিশ্চিত হলো যে কাঠের মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল।

ফ্রান্সিস মশালটা গুহায় রেখে গুহার শেষ ছোট মুখটা দিয়ে বাইরে এল। দেখল সেই ঝর্ণাটা। ফান্সিসের মনে পড়ল নিওফিতসের লেখা সেই গ্রন্থ শুরু হয়েছে যীশুর স্নানের জল পবিত্র—এই কথাটা দিয়ে। তার মানে জলের কথা বলা হয়েছে। কাজেই এই ঝর্ণার জলের গুরুত্ব বেড়ে গেল।

ফ্রান্সিস আর পারিসির একঘেয়ে সময় কাটতে লাগল। খাওয়া দাওয়া আর গুহার মধ্যে বাইরে কাঠের মূর্তির সন্ধান। একটা ব্যাপারে ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হল যে নিওফিতস তাঁর হাতে তৈরি যীশুর মূর্তির কথা কাউকে বলে যেতে পারেন নি অথবা এও হতে পারে তিনি ইচ্ছে করে কাউকে বলেন নি। যে গুহায় ছিলেন সেখানে অন্য কেউ আসেনি। পরে এই গুহায় থাকাকালীন একমাত্র পারিসিই এসেছিল। বলার ইচ্ছে থাকলে পারিসিকে বলে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি বলেন নি। কোন সূত্রও রেখে যাননি। শুধুমাত্র সেই গ্রন্থের প্রথম কথাটি—যীশুর স্নানের জল পবিত্র এই জল কথাটি নিয়েই ফ্রান্সিস বেশি ভাবছে।

সেদিন ফ্রান্সিসকে পারিসি বলল—এই ঠাণ্ডায় এই গুহায় পড়ে থেকে কী হবে। চলুন নেমে যাই।

— না—ফ্রান্সিস বলল—ইচ্ছে হলে তুমি নেমে যেতে পারো। আমি মূর্তি উদ্ধার করার জন্যে থাকবো। পারিসি বুঝল—ফ্রান্সিসকে সঙ্কল্পচ্যুত করা যাবে

না। ও আর কিছু বলল না। ফ্রান্সিস সকাল দুপুর গুহার বাইরে মূর্তি খুঁজে বেড়াতে লাগল। গুহায় গুহার ধারে কাছে ফ্রান্সিস তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল।

সেদিন সকালের খাওয়া সেরেছে ওখানেই। গুহামুখে একজন সৈন্য এসে দাঁড়াল। শিরস্ত্রাণ বর্ম নেই। কিন্তু কোমরে তরোয়াল গোঁজা। ফ্রান্সিস পারিসি দু'জনেই বেশ আশ্চর্য হল।

সৈন্যটি সটান গুহার মধ্যে ঢুকে ফ্রান্সিসদের সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস পারিসিকে বলল—বলো তো লোকটা কি সৈনিক? এখানে এসেছে কেন? পারিসি তাই জিজ্ঞাসা করল। লোকটি গ্রীক ভাষায় কী বলে গেল। পারিসি ফ্রান্সিসকে বলল—ও বলছে—ও সৈনিক। নাম আন্তো। ও নিওফিতসের হাতে তৈরি মূর্তির কথা শুনেছে। সেটা উদ্ধার করতে আমরা এসেছি তাও জানে। কৌতূহল হয়েছে ওর। তাই দেখতে এসেছে কীভাবে আমরা মূর্তিটা উদ্ধার করছি। ফ্রান্সিস এবার আন্তোকে স্পেনীয় ভাষায় বলল—তুমি স্পেনীয় ভাষা জানো?

—শুনলে বুঝতে পারি—অল্পস্বল্প বলতেও পারি। আন্তো বলল।

—তাহলে শোনো। সাধু নিওফিতস যীশুর কাঠের মূর্তি গড়েছিলেন সেটা পুরোটাই রাজা গী দ্য লুসিগনান থেকে শুরু করে সকলেরই কল্পনা। এর কোন প্রমাণ এখনও কেউ পায়নি। আমরাও পাইনি। ফ্রান্সিস বলল।

—তবে এখানে এই ঠাণ্ডায় গুহার মধ্যে আছেন কেন? আন্তো বলল।

—আর কয়েকটা দিন খোঁজাখুঁজি করবো তারপর নেমে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমিও আপনাদের সঙ্গে নেমে যাবো। আন্তো বলল। ফ্রান্সিস বুঝল—এই লোকটা পিছু ছাড়বে না। তাই বলল—

—এখানে কিন্তু খাওয়া দাওয়ার খুব কষ্ট হবে।

—আপনারা যা খাবেন তাই খাবো। আপনারা না খেয়ে থাকলে আমিও না খেয়ে থাকবো। আন্তো বলল। তারপর হাতের বড় পুঁটুলিটা দেখিয়ে বলল—অবশ্য আমি কিছু শুকনো খাবার নিয়ে এসেছি। একসঙ্গেই খাবো। ফ্রান্সিস বুঝল আন্তো আটঘাট বেঁধেই এসেছে। ওকে এড়ানো মুস্কিল। থাকুক—ক্ষতি তো করবে না।

আন্তো ফ্রান্সিসদের সঙ্গে থেকে গেল।

সেদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ফ্রান্সিস পারিসিকে বলল—সাধু নিওফিতস আগে মানে প্রথমে যে গুহাটায় ছিলেন সেটা এখনও দেখা হয়ে ওঠেনি। আজকে চলো নেমে ঐ গুহাটা দেখে আসি।

ফ্রান্সিস আর পারিসি চলল নামার দড়িটার দিকে। আন্তোও পেছনে পেছনে চলল।

গুহামুখ থেকে ঝোলানো দড়ি ধরে ধরে ওরা নিচের একফালি সমতলভূমিতে এল। তারপর উৎরাই বেয়ে নামতে লাগল। পথ বলে কিছু নেই। ওঁচানো পাথর ধরে ধরে নামা। বেশ কিছুটা নামার পর অন্য গুহাটার মুখে এল। এই গুহাটা

ওপরের গুহাটার তুলনায় ছোট।

গুহাটায় ঢুকল তিনজনে। ফ্রান্সিস দেখল ওপরের গুহার মত এই গুহাতেও শুকনো ঘাসপাতা বিছিয়ে বিছানামত করা। ফ্রান্সিস বলল—পারিসি এই গুহাটায় তুমি কখনো এসেছিলে? পারিসি মাথা নেড়ে বলল—না।

ফ্রান্সিস সঙ্গে আনা মোটা কাপড়টা ঘাসপাতার ওপর বিছিয়ে দিল। পারিসি আর আত্তো বসল। ফ্রান্সিস বসল না। ঘুরে ঘুরে গুহাটা দেখতে লাগল। গুহাটার এক কোণে পোড়া হাঁড়িকুড়ি রাখা। সাধু নিওফিতস যখন এখানে থাকতেন তখন রান্নাটান্না করতেন। এখানেও একপাশে গাছের শুকনো ডাল কাণ্ড পাতা রাখা। সাধু নিওফিতস রান্না করতেন। আগুন জ্বালাতেন। কিন্তু কোথায় কাঠের যীশু মূর্তি?

ফ্রান্সিস গাছের কাণ্ড ডালপাতা সরাল যদি কিছু পাওয়া যায়। পেলও—একটা ছোট হাতুড়ি আর ছোট বাটালি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে সাধু নিওফিতস এখানেও কাঠের কাজ করেছিলেন। যীশুর মূর্তি তৈরি করেছিলেন। তাহলে কি সাধু নিওফিতস একটার বেশি যীশু মূর্তি কাঠকুঁদে বানিয়েছিলেন? ফ্রান্সিস ভাবল—হয়তো দু'তিনটে মূর্তি সাধু নিওফিতস গড়েছিলেন। কিন্তু একটি মূর্তিও তো পাওয়া গেল না। একটি মূর্তি পাওয়া গেলেও বোঝা যেত আরো মূর্তি তৈরি হয়েছিল কিনা।

ফ্রান্সিস গুহাটার শেষের দিকে এল। দেখল একটা বড় ফাটল। ফাটলটা দিয়ে ফ্রান্সিস বাইরে বেরিয়ে এল। চারদিকে গাছ পাথর। পাহাড়ি এলাকা যেমন হয়। এদিক ওদিক কিছুদূর ঘুরে এল ফ্রান্সিস। কিন্তু কোথাও ঝর্ণা বা জলজমা কুণ্ড দেখতে পেল না। তবে সাধু নিওফিতস কোথায় স্নান করতেন? খাবার জলই বা পেতেন কোথায়?

ফ্রান্সিস গুহায় ফিরে এসে পারিসিকে সেই প্রশ্ন করল—পারিসি এখানে কাছাকাছি কোথাও ঝর্ণা বা জমা জল দেখলাম না। তাহলে সাধু নিওফিতস খাবার জল কীভাবে পেতন? স্নানই বা করতেন কোথায়? পারিসি বলল—তা তো বলতে পারবো না। আমি তো এই গুহায় কখনো থাকি নি। ফ্রান্সিস বলল—আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এখানে কোথাও ঝর্ণা বা অমনি কোনো জলের জায়গা আছে। পারিসি বলল—হতে পারে।

তিনটি পাথরে তৈরি উনুনটায় পারিসি আগুন জ্বালল। সঙ্গে যে খাবার এনেছিল তাই গরম করে সবাইকে খেতে দিল। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল—পারিসি আমরা এই গুহায় কয়েকদিন থাকবো। এখানে ঠাণ্ডাটাও অনেক কম। খেয়েদেয়ে যাও ওপরের গুহা থেকে খাবারদাবার কাপড়চোপড় নিয়ে এসো। সব এনে তুমি একবার নিচের পাহাড়ি গাঁয়ে যাবে। গাঁয়ের লোকদের অনুরোধ করবে তারা যেন দু'তিনদিন পর পর আমাদের জন্যে খাবারদাবার এই গুহার নিচের এক চিলতে সমভূমিতে রেখে যায়। এবার আত্তোকেও বলল—তুমিও যাও পারিসিকে সাহায্য করো। খাওয়া দাওয়া সেরে পারিসি আর আত্তো বেরিয়ে

গেল।

পারিসি বিকেলের মধ্যেই ওপরের গুহা থেকে সব এনে এই গুহায় জড়ো করল।

পারিসি আন্তোকে সঙ্গে নিয়ে নিচে নেমে এল। পাহাড়ি গাঁয়ের মানুষদের অনুরোধ করে এল দু'তিনদিন অন্তর অন্তর খাবারদাবার দিয়ে যেতে। কেন ও আর ফ্রান্সিস অনেক কষ্ট সহ্য করেও গুহায় পড়ে আছে তাও বলল। বলল—মহাপুরুষ নিওফিতসের নিজের হাতে গড়া কাঠের যীশুর মূর্তি উদ্ধারই আমাদের উদ্দেশ্য। তার জন্যেই এত কষ্ট সহ্য করছি। সাধু নিওফিতসের নাম শুনেই সবাই মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাল।

থাকা খাওয়ার মোটামুটি ব্যবস্থা হল। এবার মূর্তি খোঁজা।

গুহাটা ফ্রান্সিস তন্ন তন্ন করে খুঁজল। পাথরের কোন খাঁজই বাদ দিল না। কিন্তু মূর্তি নেই। কোথাও নেই। কোনো সূত্রই ফ্রান্সিসের হাতে নেই। শুধু সাধু নিওফিতসের গ্রন্থের সেই প্রথম কথাটা—যীশুর স্নানের জল পবিত্র। অথচ এখানে কোথাও জলই নেই। ওপরের গুহার পেছনে তবু একটা ছোট ঝর্ণা আছে। এখানে তাও নেই।

পরদিন সকালের খাবার খেয়েই ফ্রান্সিস বেরিয়ে এল গুহা থেকে। পাথরে পা রেখে এদিকওদিক ঘুরে বেড়াল। কিন্তু ঝর্ণা কোথাও নেই। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসল। তখনই নজরে পড়ল বাঁ দিকে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপাশটায় কুয়াশা জমছে। তারপর মনে হল ধোঁয়া। ফ্রান্সিস ভালো করে তাকিয়ে থেকে বুঝল ওটা বাষ্প। কিন্তু জল ছাড়া বাষ্প এটা ঠিক বুঝল না ফ্রান্সিস। সন্দেহ নিরসনের জন্যে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে পাথরের চাঁইটা পেরোতেই চমকে উঠল। দেখল একটা জলের কুণ্ড। তাই থেকে বাষ্প উঠেছে। তার মানে উষ্ণ প্রস্রবণ। এই উষ্ণ প্রস্রবণেই নিওফিতস স্নান করতেন। ফ্রান্সিস আরো কয়েক পা এগোতেই দেখল উষ্ণ জলের কুণ্ডে ভাসছে একটা কাঠের মূর্তি। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি। ঠিক যেমনটি ও দেখেছিল নিওফিতসের সেই পুস্তকে। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি নেমে এল। উবু হয়ে বসে জলে হাত রাখল—বেশ গরম। এবার বুকে ক্রুশ আঁকলো। তারপর হাত বাড়িয়ে কাঠের মূর্তিটা তুলে নিল। তারপর কোমরের ফেট্টিতে গুঁজল। আস্তে আস্তে চলল গুহার দিকে।

গুহায় ঢুকে ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল—পারিসি—দেখ। এই মূর্তিটাই নিওফিতস নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। পারিসি মোটা কাপড়ের বিছানায় শুয়ে ছিল। এক লাফে উঠে পড়ল। ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। ফ্রান্সিস কোমর থেকে খুলে মূর্তিটা পারিসিকে দিল। তখন আন্তোও ছুটে এসেছে। পারিসি মূর্তিটা কপালে ঠেকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল—এই মূর্তির কথা নিওফিতস আমাকে কখনও বলেন নি। নিওফিতসের হাতে তৈরি মূর্তি। কী অমূল্য সম্পদ।

পারিসি মূর্তিটা পাথরের খাঁজে বসাল। তারপর মাথা নিচু করে ক্রুশ আঁকলো। তারপর বিছানায় এসে বসল। তখন ওর ফুঁপিয়ে কান্না বন্ধ হয়েছে। ও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মূর্তিটার দিকে। আন্তোও অবাক চোখে তাকিয়ে রইল মূর্তিটার দিকে। পারিসি এবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। বলল—চলুন এবার নেমে যাই। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—না—এখন নয়। আমার কেমন বিশ্বাস নিওফিতস দুটো মূর্তি তৈরি করেছিলেন। একটা তো পেলাম। আর একটা আছে ওপরের গুহার ধারেকাছে কোথাও। ভুলে যেও না—দুটো গুহাতেই আমরা হাতুড়ি বাটালি পেয়েছি।

—তাহলে আবার ওপরের গুহায় যাবেন? পারিসি বলল।

—হ্যাঁ আর একটা মূর্তির সন্ধান করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

খাওয়াদাওয়ার পর ফ্রান্সিস সব গুছিয়ে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। পারিসি কপালে একটা কাপড়ের ফেট্টি বেঁধে তাতে মূর্তিটা গুঁজে রাখল। এতে দু'হাত খোলা রইল। পাহাড়ে ওঠার সুবিধে হল।

তিনজনে পাহাড়ের ওপরের গুহাটায় যাবার জন্যে রওনা হলো। কখনও পাথুরে টাই এ উঠে কখনও খণ্ড পাথরে পা রেখে রেখে তিনজনে ওপরের গুহার নিচের সমতল অল্প জায়গাটায় এল। তারপর ঝোলানো দড়ি বেয়ে বেয়ে প্রথমে ফ্রান্সিস উঠে এল। তারপর পারিসি আর আন্তো উঠে এল। সবাই গুহাটায় ঢুকল।

গুহায় মোটা কাপড় পেতে বিছানামতো করা হলো।

ফ্রান্সিস আর পারিসি বসল। পারিসি কপালে বাঁধা মূর্তিটা বের করে মাথার কাছে রাখল। আন্তো বসল না। বলল—যাই ঝর্ণার জলে চানটা সেরে আসি। আন্তো গুহার পেছন দিকে দিয়ে বেরিয়ে গেল। এবার পারিসি বলল—ফ্রান্সিস আমি তো নিচের পাহাড়ি গ্রামগুলোয় আমাদের খাবার দেবার কথা বলতে গিয়েছিলাম তখন শুনেছি সেনাপতি ফেলকো রাজা গী দ্য লুসিগনানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এই কেরিনিয়ার দুর্গে সে আস্তানা গেড়েছে। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে সেনাপতি ফেলকো আন্তোকে পাঠিয়েছে আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে।

—কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা নিওফিতসের হাতে-গড়া মূর্তি উদ্ধার করতে পারলাম কিনা তার খোঁজ নিতে। দেখছেন না আন্তো কেমন ছায়ার মতো আমাদের সঙ্গে থাকে। আমার একমাত্র চিন্তা আন্তো আমাদের কোনো বিপদে না ফেলে। পারিসি বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

—এই যে আন্তো হঠাৎ চান করতে চলে গেল তার কারণ কী। আন্তো এত সকালে কোনোদিন চান করে না। পারিসি বলল।

—তাহলে আন্তো কোথায় গেল? ফ্রান্সিস বলল।

—আন্তো এর মধ্যে নিচে নেমে লোক দিয়ে বিদ্রোহী সেনাপতি ফেলকোকে সংবাদ পাঠিয়েছে যে সাধু নিওফিতসের মূর্তি আমরা খুঁজে পেয়েছি। পারিসি বলল।

—তা'তে কী হল? ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা নিচে নামলেই ফেলকোর সৈন্যরা আমাদের কাছ থেকে মূর্তিটা কেড়ে নেবে। পারিসি বলল।

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। তারপর বলল—আমরা অন্য দিক দিয়ে পাহাড় থেকে নামবো। সেনাপতি ফেলকোর সৈন্যদের নজর এড়িয়ে পালাবো।

—সে চেষ্টাই করতে হবে। পারিসি বলল।

বেশ দেরি করে আন্তো ফিরে এল। হাতে খাবার। বলল—নিচে পাহাড়ি লোকেরা এই খাবার দাবার রেখেছে। আমি তাও নিয়ে এলাম।

তিনজনে খেতে লাগল। ফ্রান্সিস আর পারিসি কোনো কথা বলল না।

খুব ভোরে। তখনও সূর্য ওঠেনি। পারিসির ধাক্কায় ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল—কী ব্যাপার।

—আন্তো যীশুর মূর্তিটা নিয়ে পালিয়েছে। পারিসি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—মূর্তিটা আমি মাথার কাছে রেখে ঘুমিয়েছিলাম। ফ্রান্সিস দেখল আন্তোর শয্যা শূন্য।

পরদিন সকালের খাবার খেয়েই ফ্রান্সিস গুহার পেছনের ফাটলটা দিয়ে বাইরে এল। ঝর্ণাটার জল একনাগাড়ে শব্দ তুলে বয়ে চলেছে। ফ্রান্সিস ঝর্ণাটার পাশ দিয়ে ছোট ছোট ঝোপ, পাথরের বড় বড় টুকরোর ওপর পা রেখে রেখে উঠতে লাগল। কিছুদূরে খাড়াই ওঠার পর দেখল ঝর্ণাটা একটা ছোট্ট গুহামুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ঝোপঝাড় ধরে ধরে ফ্রান্সিস গুহামুখটায় এল। তখনই দেখল ঝর্ণাটা দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে। একটা নেমে গেছে ওদের গুহাটার পেছন দিয়ে আর একটা ধারা নেমে গেছে ডানদিক দিয়ে। ফ্রান্সিস এই নতুন ধারাটার পাশ দিয়ে নামতে নামতে দেখল ঐ জলাধার একটা কুণ্ডের মতো জায়গায় জমেছে। কুণ্ডটার নিচে কোনে ফাটলের মধ্যে দিয়ে সেই জল বেরিয়ে যাচ্ছে। এইজন্যেই কুণ্ডে বেশি জল জমছে না। কুণ্ডের চারপাশের লম্বা লম্বা ঘাস ঝোপঝাড় কুণ্ডটাকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে। ঐ ফাঁকটুকু দিয়ে তাকিয়ে ফ্রান্সিসের মনে হলো কুণ্ডের জলে কী যেন ভাসছে। ফ্রান্সিস দ্রুত নেমে এল। লম্বা লম্বা ঘাস ঝোপ সরিয়ে দেখল—একটা কাঠের মূর্তি ভাসছে। উল্টোমুখ তাই কিসের মূর্তি বুঝল না। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে বেশ কষ্ট করে মূর্তিটা তুলে আনল। এ কী? যীশুর মূর্তি। আর একটি। নিওফিতসের গ্রন্থে আঁকা ছবির সঙ্গে হুবহু মিল। তাহলে এই কাঠের মূর্তিটাও নিওফিতস নিজের হাতে গড়েছিলেন। আনন্দে ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে বলে উঠল, পারিসি আর একটি মূর্তি। ফ্রান্সিস ভক্তিভরে বুকে ক্রশ আঁকল।

এবার ফ্রান্সিস মূর্তিটা জামার সামনের গলার কাছ দিয়ে ঢুকিয়ে নিল। দু'হাত তো খোলা রাখতে হবে। নইলে পাথরে ওঠা-নামা করতে পারবে না। ফ্রান্সিস কুণ্ডের এলাকা থেকে আস্তে আস্তে উঠে আগের ঝর্ণাটার মুখে এল। তারপর ঝর্ণার ধার দিয়ে পাথর ঝোপঝাড় ধরে ধরে নিজেদের গুহার পেছনে এল। ফাটল দিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকল। দেখল, পারিসি বসে আছে। ফ্রান্সিস মূর্তিটা বের করে পারিসির চোখের সামনে ধরল। মূর্তি দেখে পারিসি অবাক হয়ে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বুকে ক্রুশ আঁকল। জলে ভেজা মূর্তির পায়ে চুম্বন করল। ফ্রান্সিস মূর্তিটা ওর বিছানায় রাখল। কয়েকদিনের পাহাড়ে ওঠার প্রচণ্ড পরিশ্রম, কষ্ট—খাওয়াও ভালো জোটেনি, নাওয়াও হয়নি—ক্লান্তিতে ফ্রান্সিস মূর্তির পায়ের কাছে মাথা রেখে শুয়ে রইল। এই অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যেও শুনল পারিসি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ঘুম ভাঙতে ফ্রান্সিস দেখল বেশ বেলা হয়েছে। পারিসি ফ্রান্সিসকে ডাকল—খেয়ে যান। ফ্রান্সিস দেখল পারিসি খাবার নিয়ে বসে আছে। তার মানে ওকে আজ রাঁধতে হয়নি। পাহাড়ি বস্তির লোকেরা সেই দড়ির নিচের সমতল মাটিতে খাবার রেখে গেছে। পারিসি দড়ি বেয়ে নেমে সেই খাবার নিয়ে এসেছে।

খাওয়াদাওয়ার পর ফ্রান্সিস বলল, পারিসি, আর এখানে থেকে লাভ নেই। চলো আজকেই নেমে যাবো।

দু'জনে আবার বিছানা কাপড় সব নিয়ে বোঁচকা বাঁধল। পারিসি কোমরের ফেট্টি খুলল। কপালের কাছে যীশুমূর্তি রেখে ফেট্টি দিয়ে বাঁধল। তারপর গুহা থেকে ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে বোঁচকা কাঁধে বেরিয়ে এল।

নামার সময় যে যে পাহাড়ি বস্তিতে ওরা আশ্রয় নিয়েছে সেখানকার সবাই যীশুর মূর্তির পা চুম্বন করেছে। পারিসি সেই মূর্তি কপালের ফেট্টির সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলেছে।

পাহাড়ের যে পথ দিয়ে লোকজন ওঠা নামা করে আর ফ্রান্সিস ও পারিসি যে পথ দিয়ে উঠে এসেছিল সেই পথ দিয়ে ফ্রান্সিস ও পারিসি নামবে না স্থির করল। নামতে লাগল পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে।

এদিক দিয়ে তো লোক চলাচল করে না। কাজেই পথ বলে কিছু এদিকে নেই। বড় বড় পাথরের চাঁই, ঝোপ জঙ্গলে পাথরের টুকরো ছড়ানো জায়গা। এসবের মধ্যে দিয়ে দু'জনে নেমে চলল। পাহাড়ের মাঝামাঝি নামতেই শুরু হল রোদের তেজ। ঐ রোদের মধ্যে দিয়েই দু'জনে নামতে লাগল। একে রাস্তা বলে কিছু নেই পাথরের চাঁই গাছের গুঁড়ি এসব ধরে ধরে নামতে হচ্ছে। দু'জনেই বেশ কাহিল হয়ে পড়ল। এক সময় ফ্রান্সিস বলল—পারিসি—কপাল থেকে মূর্তিটা নামিয়ে পোশাকের ভেতরে রাখো। ঐ মূর্তিটা ওভাবে রাখলে সহজেই

লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কার মনে কী আছে কে জানে। পারিসি মূর্তিটা খুলে পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল।

সামনে একটা গাছ। এটা পেরোলেই এবড়োখেবড়ো ঘাসে ঢাকা সমতলভূমি। পাহাড় শেষ। ফ্রান্সিস হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—পারিসি থামো। দু'জনেই গাছটার আড়ালে দাঁড়াল। দেখল একটু নিচে সমতলভূমিতে আন্তো দাঁড়িয়ে আছে। এখন শিরস্ত্রাণ বর্ম পরা। সঙ্গে চারজন অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য। পারিসি বলল—আন্তো এখানে সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

—ঠিক বুঝতে পারছি না—ফ্রান্সিস বলল—তবে কি ও জানতে পেরেছে যে আমরা আর একটি মূর্তি পেয়েছি?

—কী করবেন এখন? পারিসি বলল।

—চলো নামা যাক। দেখি আন্তোরা কী চায়। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস আর পারিসি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। কয়েকটা পাথরের চাঁইয়ে পা রেখে রেখে নিচে নেমে এল।

দু'জনে নামতেই আন্তো হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস—তুমি খুব বুদ্ধিমান। আমি ভালো করেই জানতাম যে পথ দিয়ে সবাই পাহাড়টায় ওঠানামা করে সেই পথ দিয়ে তুমি নামবে না। পাহাড়ের উল্টো দিক দিয়ে নামবে। তাই আমি সৈন্যদের নিয়ে এই উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছি। ফ্রান্সিসও হেসে বলল—তোমাকে আমরা খাদ্য দিয়েছিলাম, থাকতে দিয়েছিলাম। বিনিময়ে তুমি মূর্তি চুরি করে পালালে। তুমি যে জন্যে আমাদের গুহায় গিয়েছিলে তা তো করেছো। তবে এখন আবার আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছো কেন? আন্তো বলল—তুমি যা বুদ্ধিমান তাতে আর একটা মূর্তিও তুমি উদ্ধার করতে পেরেছো। আমরা সেটাই নিতে এসেছি।

—আর কোনো মূর্তি আমরা পাইনি। ফ্রান্সিস বলল।

—মিথ্যে কথা। আন্তো বলল। ফ্রান্সিস বলল—ঐ মূর্তিটা কী করেছো?

—সেনাপতি ফেলকোকে দিয়েছি। আন্তো বলল।

—তাহলে আর সেনাপতি অন্য মূর্তিটা চাইবেন কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—দুটো মূর্তিই তার চাই। একটা থাকবে সেনাপতির শিয়রে। অন্যটা থাকবে এই দুর্গের গীর্জায়। এবার ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বলল—আন্তো—আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের আল জাহিরি কয়েদখানায় বন্দী করে রেখেছে। এখন রাজা গী দ্য লুসিগনানকে আমি বলেছি যে মহামতি নিওফিতসের হাতে তৈরি যীশুর মূর্তি আমি উদ্ধার করে আনবো। শেষ পর্যন্ত একটা উদ্ধার করলাম। সেটা তুমি বেইমানি করে চুরি করে নিয়ে পালালে। মহামতি নিওফিতসের হাতে তৈরি আর একটি একইরকম দেখতে মূর্তি আমরা উদ্ধার করেছি। রাজার সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছে যে মূর্তি উদ্ধার করে দিলে তিনি আল জাহিরির কয়েদঘর থেকে

আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। দুটো মূর্তি উদ্ধার করেছি। অন্তত একটা মূর্তিও তো রাজাকে দিতে হবে। তা নইলে আমার বন্ধুদের, স্ত্রীর মুক্তি হবে না। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি যে কথাগুলি আমি বললাম তা সেনাপতি ফেলকোকে গিয়ে বলো। একটা মূর্তি তো পেয়েছেন আর একটা মূর্তি আর চাইবেন না।

—না—সেনাপতি ফেলকো দুটো মূর্তিই নেবেন। আন্তো বলল।

—তাহলে তো লড়াইয়ে নামতে হয়। কথাটা বলেই ফ্রান্সিস এক লাফে এগিয়ে এসে আন্তোর কোমরে ঝোলানো তরোয়ালের খাপ থেকে তরোয়ালটা এক ঝট্‌কায় খুলে নিল। তারপর খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্যদের আক্রমণের মোকাবিলা করতে দাঁড়াল। আন্তো বলল—পারিসি তুমি এখান থেকে সরে যাও। পারিসি দ্রুতপায়ে সরে গেল। আন্তো চিৎকার করে বলল—সৈন্যরা খতম করো এই ভিনদেশিটাকে। ফ্রান্সিসের রুদ্রমূর্তি দেখে সকলেই একটু ঘাবড়ে গেল। আন্তো চিৎকার করে বলে উঠল—আক্রমণ করো। ওর কাছেই নিওফিতসের মূর্তিটা রয়েছে। সেই মূর্তি আমাদের চাই। এবার চারজন সৈন্যই ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস নানা কৌশলে ওদের তরোয়ালের মার ঠেকাতে লাগল। নিজে আক্রমণ করল না। সৈন্য চারজন অল্পক্ষণের মধ্যে হাঁপাতে শুরু করল। ফ্রান্সিস তখনও সমান তেজে তরোয়াল চালিয়ে যাচ্ছে।

সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসের বুকে বর্ম নেই মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই। বেশ কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর এখনও ওর দেহ অক্ষত। সৈন্যরা বুঝল ফ্রান্সিসকে সহজে কাবু করা যাবে না।

ফ্রান্সিস বুঝল সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস এটাই চাইছিল। এবার ফ্রান্সিস আক্রমণ করল। এক সৈন্যের বাহুতে তরোয়ালের কোপ বসাল। সেই সৈন্যটা তরোয়াল ফেলে বাহু চেপে ধরল অন্য হাতে। তবু রক্ত পড়তে লাগল। একজন সৈন্যের শিরস্ত্রাণ তরোয়ালের মারে উড়িয়ে দিল। শিরস্ত্রাণ মাটিতে পড়ে গেল। এবার ফ্রান্সিস ওর মাথায় আস্তে তরোয়ালের কোপ বসাল। মাথা কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। আর একজনের পায়ে তরোয়াল চালাল। সে বেচারা দু'হাতে পা চেপে ধরে বসে পড়ল।

তরোয়াল চালানোর ফাঁকে ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল আন্তো প্রান্তর দিয়ে ছুটে চলেছে।

আহত সৈন্যরা তখন যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। দু'জন সৈন্য শুধু আহত হয়নি। দু'জন দূরে সরে গেল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—পারিসি পালাও। একথা বলেই ফ্রান্সিস ঘাসে ঢাকা প্রান্তর দিয়ে ছুটল। পেছনে পারিসি। কিছুটা ছুটে গিয়ে দেখল প্রান্তরের ওপাশ থেকে একদল সৈন্য ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস বুঝল আন্তো দুর্গে গিয়েছিল সৈন্যদের ডাকতে। দু'জনে ছুটছে তখনও। সৈন্যরা ছুটে এসে দু'জনকে



ঘিরে ফেলল। ফ্রান্সিস তরোয়াল ফেলে দিল। এখন এতজনের সঙ্গে লড়তে যাওয়া বোকামি।

আন্তো এগিয়ে এল। হাঁপতে হাঁপাতে বলল—এবার মূর্তিটা দাও। ফ্রান্সিস বলল—তোমাকে মূর্তি দেব না। আমাদের সেনাপতির কাছে নিয়ে চল। মূর্তি আমি তাকেই দেব।

—বেশ চলো। আন্তো বলল। আন্তোর সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস আর পারিসি চলল।

প্রান্তরের শেষেই দুর্গ। পাথর দিয়ে তৈরি। দুর্গের সদর দেউড়ির কাছে এল সবাই। বিরাট বন্ধ দরজা ঘর্ ঘর্ শব্দে খুলে গেল। সৈন্যদের সঙ্গে ফ্রান্সিস আর পারিসি দু'জনেই ঢুকল।

দুর্গের একটা ঘরে ওদের নিয়ে এল আন্তো। মশালের আলোয় দেখা গেল একটা পাথরের আসনে সেনাপতি ফেলকো বসে আছে। সভাঘরে শুধু ঢুকল আন্তো। পেছনে পেছনে ফ্রান্সিস আর পারিসি। আন্তো একবার মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে গ্রীক ভাষায় সব জানাল। সেনাপতি ফেলকো ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে কী বলল। ফ্রান্সিস কিছুই বুঝল না। ও বলল—আমি গ্রীক ভাষা জানি না। আপনি যা বলবার স্পেনীয় ভাষায় বলুন। এবার সেনাপতি স্পেনীয় ভাষায় বলল—দুটো যীশুর মূর্তি তুমি উদ্ধার করেছো। একটা মূর্তি আন্তো নিয়ে এসেছে। অন্যটা তোমার কাছে আছে সেটা দাও। আমি স্থির করেছি একটা মূর্তি এই দুর্গের গীর্জায় বসাবো। ফ্রান্সিস বলল—

—এ কথা সত্য যে আমি দুটো মূর্তিই উদ্ধার করেছি। এর মধ্যে একটা আমার খুবই প্রয়োজন। একটা মূর্তি রাজা লুসিগনানকে দিতে পারলে আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের মুক্ত করতে পারবো। কারণ ওরা সবাই আল জাহিরির কয়েদঘরে বন্দী হয়ে আছে। সেনাপতি ফেলকো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—ঐ রাজাকে দেওয়া চলবে না। বোধহয় তোমরা জানো যে আমি রাজা গী দ্য লুসিগনানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। রাজাকে দেওয়া চলবে না। দুটো মূর্তিই আমার চাই।

—তাহলে আপনিই তাঁদের বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করুন। ফ্রান্সিস বলল।

—না আমি তা পারবো না। আল জাহিরি প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা আমাকে দিয়েছে। তাই তাকে ক্রীতদাস কেনা বেচার হাট এখানে খুলতে দিয়েছি। সেনাপতি বলল।

—তাহলে আল জাহিরিকে বলুন ও যেন আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের মুক্তি দেয়। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি তা পারবো না। এটা ওর ব্যবসা। সেনাপতি বলল। ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। সেনাপতি বলল—মূর্তি দাও। ফ্রান্সিস অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলার দিকে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মূর্তিটা বের করল। এগিয়ে ধরল মূর্তি। সেনাপতি উঠে এগিয়ে এল। বুকে ক্রুশ এঁকে মূর্তিটা নিল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মূর্তিটার দিকে।

ফ্রান্সিস ফিরে দাঁড়াল। পারিসিকে বলল—চলো। দু'জনে সেই ঘরটা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। পারিসি বলল—মূর্তিটা এভাবে দিয়ে দিলেন?

—উপায় কি। আমাদের মাথায় শিরস্ত্রাণ তো দূরের কথা একটা ঢালও নেই। এ অবস্থায় লড়াইয়ে নামলে মৃত্যু অবধারিত। বেঁচে থাকলে সবই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—এবার কী করবেন?

—একটা সরাইখানায় থাকবো। মূর্তিটা গীর্জায় প্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। তারপর মূর্তিটা চুরি করবো।

—পারবেন চুরি করতে? পারিসি বলল।

—সব ব্যবস্থা দেখবো তবেই বলা যাবে পারবো কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

কেরিনিয়া নগরের পথ দিয়ে ফ্রান্সিস আর পারিসি চলল। কিছুদূর যেতেই রাস্তার ধারে একটা বড় সরাইখানা পেল। দু'জনে ঢুকল। এখানে বিদেশী লোকের সংখ্যাই বেশি। ঐ সরাইখানার একটা ঘরে দু'জনে আশ্রয় নিল।

তখন বিকেল। ফ্রান্সিস পারিসিকে বলল—পারিসি দুর্গে যাও। তুমি এই সাইপ্রাসের মানুষ। তোমাকে সন্দেহ করবে না। গীর্জায় প্রার্থনা করতে যাচ্ছো বললে কেউ বাধা দেবে না। গীর্জায় গিয়ে দেখবে নিওফিতসের তৈরি মূর্তিটা বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখলেই কাজে নামতে হবে। এবার দুর্গের গীর্জায় যাও। লক্ষ্য করো গীর্জায় তালা লাগানো হয় কি না।

পারিসি সরাইখানা থেকে বেরিয়ে দুর্গের গীর্জায় চলল। দুর্গের সেই সদর দেউড়ির সামনে বেশি পাহারাদার নেই। পারিসি দরজা পার হল। একজন পাহারাদার জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাচ্ছো?

—গীর্জায় প্রার্থনা করতে। পারিসি বলল।

—হুঁ—যাও। পাহারাদার আর কিছু বলল না।

গীর্জার ভেতরে তখন কিছু লোকজনের ভীড় হয়েছে। ভেতরে ঢোকার আগে পারিসি ভালো করে দরজার মোটা কড়াটা দেখল। না কোন তালা ঝুলিয়ে রাখা হয়নি। তার মানে গীর্জাটার দরজা সারারাত খোলাই থাকে। এই গীর্জায় পারিসি আগেও দু' তিনবার এসেছে। দূর থেকেই দেখল আগের মূর্তিটা বেদীতে নেই। সেখানে নিওফিতসের হাতে তৈরি মূর্তিটা বসানো হয়েছে। পারিসি যা জানতে এসেছিল তা সবই জানা হয়ে গেল। পারিসি গীর্জার আরো ভেতরে না ঢুকে বাইরে বেরিয়ে এল। চলল সরাইখানার দিকে।

ফ্রান্সিসকে সব বলল। ফ্রান্সিস খুশিতে লাফিয়ে উঠল। মূর্তিটা বেদীতে স্থাপন করা হয়েছে আর গীর্জার দরজায় তালা দেওয়া হয় না ভেজিয়ে রাখা হয়। এই দুটো তথ্য পেয়ে ফ্রান্সিস খুশি হল। বলল—পারিসি—আজ রাতেই হানা দিতে হবে।

দু'জনে সরাইখানায় ফিরে এল। সারাদিন শুয়ে বসে সময় কাটাল। কখন রাত হবে। কখন রাত গভীর হবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

এক সময় সন্ধ্যে হল। দু'জনে তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে নিল। এখন রাত গভীর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা।

রাত বাড়তে লাগল। ফ্রান্সিস একসময় বলল—এবার চলো পারিসি।

দু'জনে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এল। পথঘাট অন্ধকারে ডুবে আছে। ফ্রান্সিস অন্ধকারই চাইছিল। চলল দু'জনে। দু' চারবার জোর হাওয়া বয়ে গেল। ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকাল। একটা তারাও দেখা গেল না। ঘন মেঘে আকাশ অন্ধকার।

দুর্গের কাছাকাছি আসতে প্রথমে ছুটে এল প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস। তারপরই শুরু হল বৃষ্টি। অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। দু'জনেই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চলল। সদর দেউড়ির দিকে যাওয়া যাবে না। নিশ্চয়ই পাহারাদার রয়েছে।

ফ্রান্সিস দুর্গের পেছন দিকে চলল। তখন প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দুর্গের পেছনে বিস্তৃত বন জঙ্গল। ফ্রান্সিস দুর্গের প্রাচীর দেখতে দেখতে চলল। দুর্গপ্রাচীরে কোথাও ফাটল নেই। দেখতে দেখতে একটা জায়গা এল। বিদ্যুতের আলোয় দেখল প্রাচীরের একটা চৌকোনো পাথর দেয়াল থেকে বেরিয়ে আছে। আবার বিদ্যুৎ চমকাল। দেখল দেয়ালের মাথার কাছে দুটো পাথর আলগা। ফ্রান্সিস ঠিক করল দুর্গে ঢুকতে হলে এখান দিয়েই ঢুকতে হবে। প্রচণ্ড ঝড়জলের মধ্যে ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—পারিসি—এখান দিয়েই দেয়াল ডিঙোতে হবে। ফ্রান্সিস এরকম ঝড়জলই চাইছিল। ও মনে মনে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল।

ফ্রান্সিস খুলে ঝুলতে থাকা চৌকোনো পাথরের টুকরোটা সরিয়ে নিচে ফেলল। জায়গাটায় খোঁদলমত হল। সেটায় পা রেখে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বুকের কাছে একটা পাথরের পাটায় হাত দিয়ে বুঝল—নড়বড় করছে। ফ্রান্সিস দু'তিনবার টানতেই পাটাটা খুলে এল। ওটা নিচে ফেলে দিল। এবার সেই খোঁদলটায় পা রেখে প্রাচীরের মাথার কাছে একটা বেরিয়ে থাকা পাথরের পাটা টানাটানি করে বুঝল ওটা শক্ত আছে। ফ্রান্সিস ঐ পাটায় ঝুলে পড়ে এক ঝটকায় প্রাচীরের মাথায় উঠে বসল।

এতক্ষণে বৃষ্টি কমে এসেছে। হাওয়ার সেই তেজও আর নেই। ফ্রান্সিস প্রাচীরের গায়ে দুটো পাথরের পাটা আলগা দেখল। ও তারই একটা ঠেলে দিল। যে খোঁদলমত হল সেটাতে পা রেখে লাফ দিয়ে নেমে এল। প্রাচীরের ওপাশে তো ঘন জঙ্গল। তাই এপাশের প্রাচীরের ধারে কাছে সেনাপতি ফেলকোর কোন পাহারাদার সৈন্য নেই। অবশ্য এই ঝড়জলে কোন পাহারাদারও এদিকে থাকতে আসেনি।

এতক্ষণে বৃষ্টি আরো কমে এসেছে। হাওয়ার দাপটও কমেছে।

পাথর বাঁধানো প্রাঙ্গণ দিয়ে মাথা নিচু করে ফ্রান্সিস ছুটে চলল গীর্জাটার

দিকে। গীর্জাটা ঘুরে আসতে হবে গীর্জাটার দরজার কাছে। ফ্রান্সিস এবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখল—কোথাও মশাল জ্বলছে না। শুধু সৈন্যাবাসে মশাল জ্বলছে।

ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে পাথরের প্রাঙ্গণটা পার হয়ে গীর্জার সদর দরজার কাছে এল। দেখল দরজায় দুটো বড় কড়া লাগানো কিন্তু তালা দেওয়া নেই। ফ্রান্সিস আস্তে দরজার একটা পাট খুলল। ক্যাঁচ্ কোঁচ্। অল্প শব্দ হল। ও গীর্জার ভেতরে ঢুকল। ভেতরে দু'পাশের পাথুরে দেওয়ালে দুটো নয় একটা মশাল জ্বলছে। বেদীতে কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে। সেই আলোয় যীশুখ্রীস্টের মূর্তিটা দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস দ্রুত বেদীর কাছে ছুটে এল। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। এখন হয়তো পাহারাদাররা পাহারা দিতে বেরুবে। মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে ও বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকল। তারপর আলগোছে মূর্তিটা তুলে নিয়ে বুকের কাছে পোশাকের নিচে ঢুকিয়ে রাখল।

এবার পালানো। গীর্জার দরজার কাছে এল ফ্রান্সিস। দেখল সদর দেউড়িতে কয়েকটা মশাল জ্বলছে। ওখানে জনা কয়েক সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। ওদিক দিয়ে পালানো যাবে না।

ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে অন্ধকারে ছুটল যেখান দিয়ে ঢুকেছিল সেইদিকে। পাথরখসা খোঁদলে পা রেখে রেখে প্রচীরের মাথায় উঠে এল। তারপর নিচের ঝোপ জঙ্গলে ঝপ্ করে নেমে এল। পারিসি গলা নামিয়ে বলল—মূর্তি আনতে পেরেছেন? ফ্রান্সিস হেসে বলল—এ তো ছেলেখেলা। চলো এবার। এ তল্লাটে আর থাকবো না।

অন্ধকার পথ দিয়ে দু'জনে সরাইখানায় এল। খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জনে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বলল—পারিসি—পাফোসের মঠটা কোথায় জানো?

—জানি। এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে। পারিসি বলল।

—কালকে ঐ মঠে যাবো। অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করবো। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন দু'জনে চলল পাফোসের মঠের অধ্যক্ষের উদ্দেশে। মঠেই দু'জনে দেখা করল অধ্যক্ষের সঙ্গে। মূর্তি দেখাল। অধ্যক্ষ তো আনন্দে দিশাহারা। বললেন, পারিসি কী পরম পবিত্র মূর্তি তোমরা এনেছো, তোমরা বোধহয় জানো না। মহান পুরুষ নিওফিতসের নিজের হাতে তৈরি মূর্তি যে খ্রীস্টিয় সমাজে কী অপরিসীম মূল্যবান তা বলে বোঝাতে পারবো না।

ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে পারিসি বলল, এর নাম ফ্রান্সিস। জাতিতে ভাইকিং। ইনিই উদ্ধার করেছেন এই মূর্তি। অধ্যক্ষ তখন ফ্রাসিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, বলো তুমি কি পুরস্কার চাও।

ফ্রান্সিস বলল, আমি কোনো পুরস্কার চাই না। আপনি দয়া করে এই মঠের একজন ধর্মযাজককে আমার সঙ্গে যেতে আদেশ দিন।

তা দিচ্ছি, কিন্তু সে তোমার সঙ্গে কোথায় যাবে? অধ্যক্ষ জানতে চাইলেন।

রাজা গী দ্য লুসিগনানের রাজসভায়। রাজা লুসিগনানের সঙ্গে আমার একটা শর্ত ছিল। ধর্মযাজক যেন বলেন আমি মূর্তি উদ্ধার করেছি এবার রাজা তাঁর শর্ত রাখুন।

মঠাধ্যক্ষ বললেন—বেশ তোমাকে একজন ধর্মযাজক নিয়ে যাবেন। এই মূর্তি এখন আমরা গীর্জার পবিত্রস্থানে রাখবো। কালকে রাজধানী নিকোশিয়া যাবার আগে তোমাদের দেওয়া হবে। সেই রাতটা দু'জনে অধ্যক্ষের অতিথি হয়ে মঠেই রইল।

পরদিন সকালে মঠাধ্যক্ষ একটা বড় গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। একজন ধর্মযাজককে সঙ্গে দিলেন। সেই ধর্মযাজক মূর্তিটা দু'হাতে বুকের কাছে ধ'রে রইলেন। গাড়িতে ধর্মযাজকের পেছনে পেছনে ফ্রান্সিস, পারিসি উঠল। গাড়ি চলল রাজধানী নিকোশিয়ার দিকে।

দ্রুতগতিতে গাড়ি চলল। দুপুরের আগেই গাড়িটা নিকোশিয়া পৌঁছল। রাজপ্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তিনজনেই রাজসভায় ঢুকল। চারপাশের লোকজন প্রহরীরা সবাই মাথা নুইয়ে ধর্মযাজককে সম্মান জানাল। রাজার মন্ত্রী অমাত্যরা আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ধর্মযাজককে সম্মান জানাল। রাজাও সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধর্মযাজক হাত নেড়ে তাঁদের বসতে বললেন। সবাই বসলেন।

ধর্মযাজককে একটা আসনে বসতে দেওয়া হলো। ফ্রান্সিস আর পারিসি দাঁড়িয়ে রইল। ধর্মযাজক তাঁর বুকে ধরা যীশুর মূর্তিটা রাজাকে দেখিয়ে বললেন —রাজা—এই মূর্তিটিই মহাপুরুষ নিওফিতসের নিজের হাতে তৈরি মূর্তি। ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বললেন—এর নাম ফ্রান্সিস। এরা দুঃসাহসী ভাইকিং। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর প্রায় উপবাসে থেকে এই মূর্তিটা উদ্ধার করেছে। মহাত্মা নিওফিতসের আর একটি হাতে তৈরি মূর্তিও ফ্রান্সিস উদ্ধার করেছিল। কিন্তু আপনার বিদ্রোহী সেনাপতি ফেলকো সেটা লোক দিয়ে চুরি করিয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখেছে। রাজা বললেন—কয়েকদিনের মধ্যে ফেলকোকে পরাস্ত করে আমি ঐ মূর্তিটাও উদ্ধার করবো। ধর্মযাজক এবার ফ্রান্সিসকে বললেন—তুমি রাজাকে কী বলবে বলেছিলে সেটা বলো। ফ্রান্সিস মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে রাজাকে বলল—মহামান্য রাজা—আপনি কথা দিয়েছিলেন যে মূর্তি উদ্ধার করতে পারলে আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের আল জাহিরির হাত থেকে মুক্ত করে দেবেন। রাজা বললেন—হ্যাঁ বলেছিলাম। সমস্ত সাইপ্রাসবাসীরা আজ তোমার জন্য এক অমূল্য সম্পদের অধিকারী হল। তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। একটু থেমে বললেন—কিন্তু মুস্কিল হয়েছে আমার ভূতপূর্ব সেনাপতি ফেলকো বিদ্রোহ করে এর মধ্যে কেরিনিয়ার দুর্গ দখল করে ওর রাজত্ব কায়েম করেছে। আমার লোকজন আর এখন কেরিনিয়ায় ঢুকতে পারবে না।

—তাহলে আমার বন্ধুরা কীভাবে মুক্তি পাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কয়েকদিনের মধ্যেই আমি কেরিনিয়া আক্রমণ করে দখল করবো। তখন তোমার বন্ধুদের মুক্ত করবো। রাজা বললেন।

—ততদিনে ক্রীতদাসের হাটে হয়তো আমার স্ত্রী আর বন্ধুরা বিক্রি হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল। রাজা বললেন—সেজন্যেই আমি স্থির করলাম আমার বর্তমান সেনাপতি তোমাকে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে কেরিনিয়ার সীমান্তে রেখে আসবে। তুমি কেরিনিয়ায় ঢুকে বন্ধুদের খোঁজখবর করতে পারবে। তুমি বিদেশী। তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।

—কিন্তু আল জাহিরি আমাকে দেখলেই বন্দী করবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি যতটা সম্ভব আত্মগোপন করে কাজ সারবে। রাজা বললেন।

—বেশ তাই হবে। ফ্রান্সিস বলল। এবার রাজা বললেন—

—এবার বলো তুমি যে মূর্তি উদ্ধার করেছো তার বিনিময়ে কি চাও?

—আমি দশটি স্বর্ণমুদ্রা চাই। প্রয়োজনে আমি আংটি বন্ধক রেখেছিলাম। সেটা ছাড়াতে হবে। আর কয়েকটা দিন আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হবে। কাজেই দশটি স্বর্ণমুদ্রা আমার খুবই প্রয়োজন।

—বেশ। আর কিছু চাই? রাজা বললেন।

—না। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি একটা অমূল্য জিনিস উদ্ধার করেছো। তুমি যা খুশি চাইতে পারো। রাজা বললেন।

—না। মান্যবর রাজা আমার কিছুই চাই না। শুধু আমার বন্ধুদের মুক্তি চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। রাজা একজন প্রহরীকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন। রাজা তাকে কিছু নির্দেশ দিলেন। একটু পরেই প্রহরীটি ফিরে এসে রাজাকে দশটি স্বর্ণমুদ্রা দিল। রাজা সেই দশটি স্বর্ণমুদ্রা ফ্রান্সিসকে দিলেন।

রাজপ্রাসাদ থেকে ফ্রান্সিস ও পারিসি বেরিয়ে এল। পারিসি বলল—ফ্রান্সিস আমার কাজ তো শেষ। আমি এবার বাড়ি যাবো। আমার বুড়ি মা একা আছে।

—ঠিক আছে—তুমি যাও। আমার সঙ্গে থেকে অনেক কষ্ট সহ্য করেছো। এই কথা বলে ফ্রান্সিস পারিসির ডান হাতটা জড়িয়ে ধরল। পারিসিও হাতে জোরে চাপ দিল। তারপর চলে গেল। পারিসি ওর মার কথা বলল। তাতেই ফ্রান্সিসের নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। ওর চোখ দুটো ভিজে উঠল। চোখ মুছে তাকিয়ে দেখল সামনেই রাজবাড়ির গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে সেনাপতি বসে আছে। সেনাপতি ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসকে গাড়িতে উঠে আসতে বলল। ফ্রান্সিস গাড়িতে উঠে সেনাপতির সামনের আসনে বসল। ফ্রান্সিস বলল—কেরেনিয়া তো বেশ দূর। পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত গভীর হয়ে যাবে।

—আমিও সেটাই চাই। রাতের অন্ধকারেই তোমাকে রেখে আসবো। সেনাপতি বলল।

গাড়ি চলল কেরিনিয়া বন্দর-শহরের উদ্দেশে। কথা প্রসঙ্গে সেনাপতি বলল—এই মওকায় তুমি সোনাদানা চাইলে রাজা তাই দিতেন। ফ্রান্সিস হেসে বলল—সোনাদানার ওপর কোনো লোভ নেই আমার। আমার এখন সবচেয়ে প্রয়োজন বন্ধুদের মুক্তি। আর কিছু না। কথাটা বলেই ফ্রান্সিসের মনে পড়ল ওদের বিয়ের সেই দামি আংটিটা এক স্বর্ণকারের কাছে বন্ধক আছে। ফ্রান্সিস বলল—সেনাপতি মশাই—একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।

—বলো কী রকম সাহায্য? সেনাপতি বলল।

—একজন স্বর্ণকারের কাছে অভাবের সময় একটা আংটি বন্ধক রেখেছি। ওটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তো—স্বর্ণকারের দোকানটা কোথায় দেখিয়ে দাও। সেনাপতি বলল।

—চলুন দেখাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

দোকানটার সামনে এসে ফ্রান্সিস সেনাপতিকে দোকানটা দেখাল। সেনাপতি গাড়ি থামাতে বলল। গাড়ি থামল। সেনাপতি কোচওয়ানকে বলল—স্বর্ণকারকে ডেকে নিয়ে আয়। একটু পরেই কোচয়ানের সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে স্বর্ণকার এল। সেনাপতি ডাকছেন। ভয় তো হবেই। সেনাপতি ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল—এর একটা আংটি তোমার কাছে বন্ধক আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। স্বর্ণকার ভীতস্বরে বলল।

—ঐ আংটিটা নিয়ে এসো। সেনাপতি বলল।

—এক্ষুণি আনছি—স্বর্ণকার পড়িমরি করে ছুটল। আংটিটা নিয়ে ফিরে এল। সেনাপতি আংটিটা হাতে ফ্রান্সিসকে বলল—এটাই তোমার আংটি?

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল। সেনাপতি আংটিটা ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস আংটিটা আঙ্গুলে পরতে পরতে বলল—কিন্তু আমাকে কত দিতে হবে। সেনাপতি হাত তুলে ফ্রান্সিসকে থামাল। কোচোয়ানকে বলল—গাড়ি চালা। গাড়ি চলল।

গাড়িতে বসে ফ্রান্সিসের সঙ্গে সেনাপতির সামান্য কথাই হল।

তখন রাত গভীর। অন্ধকারে একটা বিরাট গাছের নিচে এসে সেনাপতি গাড়ি থামাতে বলল। কোচোয়ান গাড়ি থামাল। সেনাপতি বলল—এখান থেকে কেরিনিয়া শুরু হল। আমরা আর যাবো না। তুমি নেমে যাও।

ফ্রান্সিস গাড়ি থেকে নেমে এল। অন্ধকারে উত্তরমুখো কেরিনিয়া বন্দরের উদ্দেশে চলল।

কেরিনিয়া বন্দর শহরে যখন ঢুকল তখন পূব আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই সূর্য উঠল। ফ্রান্সিস আগেই জাহাজঘাটার দিকে গেল না। খুঁজে খুঁজে একটা সরাইখানায় উঠল। সকালের জলখাবার খেয়েই শুয়ে পড়ল। মাথায় চিন্তা—কীভাবে বন্ধুদের মুক্ত করবে। কে জানে এই ক'দিনের মধ্যেই মারিয়া আর বন্ধুদের আল জাহিরি ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করে দিয়েছে কিনা। এইসব ভাবতে ভাবতে রাত জাগার ক্লান্তিতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

দুপুরে ঘুম থেকে উঠে স্নান খাওয়া সারল। তারপর তৈরি হয়ে গেল। কেরিনিয়া দুর্গ জাহাজঘাটা থেকে দূরে। কাজেই বিদ্রোহী সেনাপতি ফেলকোর সৈন্যদের নজরে পড়ার সম্ভাবনা নেই। বাকি রইল আল জাহিরি আর তার সৈন্যরা। কয়েদঘরের আড়াল থেকে সব দেখতে হবে।

ফ্রান্সিস যখন জাহাজঘাটার কাছে পৌঁছল তখন বেশ বেলা হয়েছে। দূর থেকেই দেখল জাহাজঘাটায় ওদের জাহাজটা নোঙর করে আছে। আরো তিনটে জাহাজ আছে। কিন্তু আল জাহিরির জাহাজটা নেই। ফ্রান্সিসের কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল। তাহলে কি ওর বন্ধুদের ও মারিয়াকে ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করে আল জাহিরি ওর সৈন্যদের নিয়ে জাহাজ চালিয়ে চলে গেছে? ফ্রান্সিস কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারল না। সত্যি সত্যি এখানে ঠিক কী ঘটেছে।

ফ্রান্সিস বাড়িঘরের আড়ালে আড়ালে লম্বাটে কয়েদঘরটার কাছে এল। কয়েদঘরের আড়াল থেকে নজর রাখল ওদের জাহাজের ওপর। জাহাজের ডেক-এ কয়েকজন ভাইকিং শুয়ে বসে আছে এটা দেখল। আবছা আন্দাজে চিনতেও পারল না। কিন্তু ওরা বন্দী না মুক্ত এটা ঠিক বুঝল না।

বেশ কিছুক্ষণ কয়েদঘরের আড়াল থেকে ফ্রান্সিস নজর রাখল। হঠাৎ বন্ধুদের সামনে যাওয়াটা উচিত হবে না। বন্ধুদের দেখে এটা বোঝা যাচ্ছে যে ওরা বন্দী নয়। বন্দী হলে নিচে কয়েদঘরে থাকতো ওরা। ডেক-এ নয়।

ফ্রান্সিস এসব ভাবছে তখনই দেখল ধনুক-তীর কাঁধে শাঙ্কো জাহাজের পাটাতন দিয়ে নেমে আসছে। এবার ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হল যে বন্ধুরা বন্দী হয়ে নেই।

শাঙ্কো শিকারের জন্যে কয়েদঘরের ওপাশে বড় জঙ্গলটার দিকে যাচ্ছে। শাঙ্কো কয়েদঘর ছাড়িয়ে আসতেই ফ্রান্সিস ছুটে ওর সামনে গেল। ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। কাঁধের ধনুক ফেলে ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। শাঙ্কো কিছুতেই ফ্রান্সিসকে ছাড়ছে না। তখন ফ্রান্সিস ওর পিঠে আস্তে চাপড় মেরে বলল—এই শাঙ্কো—পাগলামি করো না। শাঙ্কো হাত আলগা করল। ফ্রান্সিস বলল—কী ব্যাপার বলো তো? আল জাহিরি তার জাহাজ পাহারাদার সৈন্যরা কোথায় সব?

—মাঝ সমুদ্রে নিজে একা আল জাহিরি তার জাহাজে ঘুরপাক খাচ্ছে। শাঙ্কো বলল।

—কিছুই বুঝলাম না। ফ্রান্সিস বলল। বলো—

—জাহাজে চলো সব বলছি। তার আগে বলো তুমি কি যীশুর মূর্তি উদ্ধার করতে পেরেছো? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ—একটা নয় দুটো মূর্তি। তার একটা বিদ্রোহী সেনাপতি ফেলকো চুরি করে নিয়েছে। অন্যটা আমি আর পারিসি রাজা গী দ্য লুসিগনানের হাতে দিয়েছি। শাঙ্কো চিৎকার করে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। ফ্রান্সিসও গলা মেলাল। তারপর দু'জনে ওদের জাহাজের দিকে চলল।

জাহাজের পাটাতনে ফ্রান্সিসরা পা রাখতেই ডেক-এ শুয়ে বসে থাকা ভাইকিং বন্ধুরা ওদের দেখল। ওরা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল—ফ্রান্সিস এসেছে। নিচের কেবিনঘর থেকে সবাই ছুটে এসে ডেক-এ উঠতে লাগল। হ্যারি ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। মারিয়া হাসতে হাসতে ছুটে এল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল মারিয়ার শরীরটা বেশ রোগা হয়ে গেছে। ভাবল—মারিয়াকে এই অভিযানে আনা উচিত হয়নি। ছোটবেলা থেকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আদরে মানুষ হয়েছে মারিয়া। ওর পক্ষে এত ধকল পোহানো সম্ভব নয়। ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল এখন আর ওসব ভেবে কি লাভ। ওদিকে বন্ধুরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল —ও—হো—হো।

মারিয়া হাসতে হাসতে এসে ফ্রান্সিসের একটা হাত ধরল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—এবারও আমার হাত খালি। তবে যদি আর এক সপ্তাহ এখানে অপেক্ষা করতে পারো তবে মহাত্মা নিওফিতসের নিজের হাতে তৈরি একটা যীশুর মূর্তি পেতে পারি।

—না—মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—আমরা এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরবো।

—বেশ—তোমরা যেমন চাও। ফ্রান্সিস বলল।

ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো। তারপর একদল ছুটল নোঙর তুলতে অন্যদল পাল খুলে দিতে আর একদল দাঁড়ঘরে দাঁড় টানার জন্যে। এবার দেশে ফেরা। জাহাজ চালাতে হবে যত দ্রুত সম্ভব।

হ্যারি আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসকে বলল মারিয়ার অসুস্থতার কথা আল জাহিরির সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা সবই বলল। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—এখন তোমার শরীর কেমন? মারিয়া হেসে বলল—তুমি এসেছো—আমার দুশ্চিন্তা কমল—এবার আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হবো। তুমি কিছ্ছু ভেবো না।

ততক্ষণে জাহাজের সব পাল খুলে দেওয়া হয়েছে। দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে দাঁড় টানছে। ফ্রান্সিসদের জাহাজ পূর্ণবেগে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে চলল।

এর পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি ঃ—

সোনার ঘণ্টা, হীরের পাহাড়, মুক্তোর সমুদ্র, তুষারে গুপ্তধন, রূপোর নদী, মনিমাণিক্যের জাহাজ, বিষাক্ত উপত্যকা, চিকামার দেবরক্ষী চুনীপান্নার রাজমুকুট, কাউন্ট রজারের গুপ্তধন, যোদ্ধা মূর্তি রহস্য, রাণীর রত্নভাণ্ডার

মাজোরকা দ্বীপে ফ্রান্সিস

ভূমধ্যসাগরের সবচেয়ে বড় দ্বীপ সিসিলি। ফ্রান্সিসরা জাহাজে করে ফিরছে সেই দ্বীপ থেকে। ফ্রান্সিসরা জাতিতে ভাইকিং। এই ভাইকিংরা বীরের জাতি। দুঃসাহসী নির্ভীক। জাহাজ চালাতে সুদক্ষ। সমুদ্রের ধারেই ওদের দেশ বলে সমুদ্রের সঙ্গে ওদের যেন নাড়ির যোগ। ভাইকিংদের রাজার যিনি মন্ত্রী—ফ্রান্সিস তাঁরই ছেলে। রাজার মেয়ে রাজকুমারী মারিয়া ফ্রান্সিসের স্ত্রী। হ্যারি ওর প্রাণের বন্ধু। বিস্কো, তীরন্দাজ শাঙ্কো, পেড্রো আর সব ভাইকিং বন্ধুদের নিয়ে ফ্রান্সিস মারিয়া ফিরে আসছিল নিজেদের দেশে।

ফ্রান্সিস আর ওর দুঃসাহসী বন্ধুরা কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে অসীম ধৈর্য, অটল সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিয়ে এসেছে বিরাট সোনার ঘণ্টা, হাঁসের ডিমের মতো বড় মুক্তো আরো মূল্যবান কত কিছু। চিন্তা করে বুদ্ধি খাটিয়ে নক্শা, ছড়ার সূত্র ধরে উদ্ধার করেছে গুপ্তধন-ভাণ্ডার। ফ্রান্সিসদের এই বীরত্বের কাহিনী নিয়ে ঐ দেশের চারণকবিরা গান বেঁধেছে। সারা দেশে ওরা সেই গান গেয়ে বেড়ায়।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে। নির্মেঘ আকাশ। বাতাস বেগবান। জাহাজের পালগুলো ফুলে উঠেছে। দাঁড় বাইতে হচ্ছে না ভাইকিংদের। শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে দ্রুত চলেছে ফ্রান্সিসদের জাহাজ। ওদের দেশের দিকে।

দিন তিনেক কাটল। সেদিন বিকেলবেলা। তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। মাস্তুলের ওপর নিজের জায়গায় ছিল নজরদার পেড্রো।

হঠাৎ পেড্রো চেঁচিয়ে বলল—ডাঙা—ডাঙা দেখা যাচ্ছে। জাহাজের ডেক-এ যে কয়েকজন ভাইকিং শুয়ে-বসে বিশ্রাম করছিল তাদের একজন ছুটল নিচে নামার সিঁড়ির দিকে। ফ্রান্সিসকে খবরটা দিতে হবে।

খবর পেয়ে ফ্রান্সিস, মারিয়া আর হ্যারি জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়াল। তাকাল দূর দিগন্তের দিকে। দিগন্তে সূর্যাস্তের লালচে আলো। তার নিচে ছোট ছোট টিলার মতো দেখা গেল। সে সবের রং এখন বোঝার উপায় নেই। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—কী করবে এখন? হ্যারি বলল—জায়গাটা কোন দ্বীপ না দেশ তা তো বুঝতে পারছি না। এক্ষুণি অন্ধকার নামবে। এখান থেকে আর কিছুই দেখা যাবে না।

মারিয়া বলল—কিন্তু আমরা কোথায় এলাম সেটা জানতে হলে তো নেমে খোঁজ নিতে হবে।

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর বলল—রাত হয়ে ভালোই হল। রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে নৌকো নিয়ে ডাঙায় নামবো। মানুষজন কাউকে তো পাওয়া যাবে। তা হলেই জানা যাবে আমরা কোথায় এলাম। আমাদের দেশই বা কতদূরে।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস পোশাক পরে তৈরি হল। ঢোলা হাতা হাঁটুঝুল পোশাক। কোমরে চামড়ার ফেটি। তরোয়াল গুঁজল কোমরের ফেট্টিতে। এবার

মারিয়া বলল—আমিও যাবো। ফ্রান্সিস বলে উঠল—পাগল হয়েছো। কীরকম জায়গা কীরকম লোকজন থাকে কিছুই জানি না। এ অবস্থায় তোমাকে নিয়ে যাওয়া যায়? মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—দেখ, এটা ভূমধ্যসাগর এলাকা। যতদূর জানি—এই এলাকায় কোনো বন্য জাতি বাস করে না।

ফ্রান্সিস বলল—বন্য জাতির মানুষ অনেক ভালো। তারা সভ্যজাতির মতো হিংস্র হয় না।

—তা হোক। তোমাদের ভাগ্যে যা ঘটবে আমার ভাগ্যেও তাই ঘটবে। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস বুঝল মারিয়াকে না নিয়ে গেলে দুঃখ পাবে। ভাবল—আমরা তো যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। শুধু জায়গাটার নাম জানতে যাচ্ছি। বলল—বেশ চলো।

মারিয়া খুশিতে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে দাঁড়াল।

জাহাজ থেকে দড়ি বেয়ে বেয়ে ফ্রান্সিসরা একে একে জাহাজের গায়ে বাঁধা একটা নৌকোয় নেমে এল। মারিয়া আর হ্যারি নৌকোটার মাঝখানে বসল। দাঁড় হাতে একদিকে বসল ফ্রান্সিস অন্যদিকে শাঙ্কো। শাঙ্কো তীর-ধনুক খুলে রাখল। দাঁড়টা হালের মতো ধরল। নৌকোর গতি ঠিক রাখতে হবে। জাহাজে বাঁধা দড়ি খুলে দিল ফ্রান্সিস। জাহাজের গায়ে দাঁড় দিয়ে ধাক্কা দিয়ে নৌকোটা সরিয়ে আনল। দাঁড় বাইতে লাগল। নৌকো চলল তীরভূমির দিকে।

নৌকো চলেছে। আকাশে সাদাটে মেঘের মন্থর চলাফেরা। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। সেই অল্প আলোয় কিছুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। ছোট ছোট ঢেউয়ের দোল খেতে খেতে নৌকো তীরের কাছাকাছি এল। দেখা গেল তীরের কাছে একটা জাহাজ নোঙর করা। জাহাজটার সিঁড়ির মুখে কাচঢাকা আলো জ্বলছে। তবে ডেক জনশূন্য। তীরভূমির বালিয়াড়ি টানা গিয়ে উঁচু হয়ে গেছে। কয়েকটা খুঁটিতে জাল টাঙানো। শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকটা মাছ ধরার নৌকোও আছে। ফ্রান্সিস দাঁড় টানা বন্ধ করল। বলল, হ্যারি, মনে হচ্ছে জাহাজটায় কেউ নেই। তবু এদিক দিয়ে তীরে উঠবো না।

—জাহাজটায় কোনো পতাকা উড়ছে না। কোন্ দেশের কাদের জাহাজ বোঝা যাচ্ছে না। হ্যারি জাহাজটা দেখতে দেখতে বলল।

—বাঁ দিকে ছোট টিলাটা ঘেঁষে আমরা তীরে উঠবো। ফ্রান্সিস বলল।

নৌকো বাঁ দিকে ঘোরানো হল। টিলাটার কাছে এসে দেখা গেল এবড়ো-খেবড়ো পাথরের মধ্যে দিয়ে ছোট একটা খাঁড়িমত। ফ্রান্সিস খাঁড়ির মধ্যে নৌকো ঢোকাল। একটু এগোতেই দেখা গেল সামনে বিস্তৃত বেলাভূমি। বেশ দূরে খুব অস্পষ্ট কিছু বাড়িঘর দেখা গেল। বোঝা গেল ওটা জেলেপাড়া। ফ্রান্সিস বলল, চলো, ঐ জেলেপাড়ায় গিয়ে খোঁজখবর করি। হ্যারি মাথা নেড়ে বলল, না ফ্রান্সিস। খোলা বালিয়াড়ি দিয়ে আমরা যেতে গেলে জাহাজের লোকদের নজরে পড়ে যাবো।

—কিন্তু জাহাজে তো কোন মানুষজনই দেখা গেল না। মারিয়া বলল।



—উহুঁ, তবু সাবধান হতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো বলল, এক কাজ করি। তীর-ধনুক নিয়ে আমি একা যাই। বালির ওপর দিয়ে বুক ঘষে ঘষে যাবো। জাহাজে কেউ থাকলেও দেখতে পাবে না।

—ঠিক আছে। শাঙ্কোই যাক। হ্যারি বলল। শাঙ্কো নৌকোয় উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে তীর-ধনুক নিচ্ছে তখনই মারিয়া একটু গলা চড়িয়ে উঠলো—দ্যাখো তো, কয়েকজন লোক বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ছুটে এদিকে আসছে। ফ্রান্সিসরা অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখল—একজন লোক বালির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এদিকেই আসছে। ওর পেছনেও ছুটে আসছে কয়েকজন। একটু এগিয়ে আসতেই দেখা গেল সামনের লোকটা প্রাণপণে ছুটে আসছে। ওর হাতে কোন অস্ত্র নেই। ওর পেছনে তিনজন লোক খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে আসছে। এবার ওদের চিৎকার শোনা গেল। দেখা গেল ওদের গায়ে বর্ম। সৈনিকের পোশাক পরণে। ওরা কৃষ্ণকায়। মাথার চুল কোঁকড়া। বলিষ্ঠদেহী। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এরা বোধহয় মুর সৈনিক। যে লোকটাকে ওরা আক্রমণ করেছে সে বোধহয় এ দেশীয় নিরীহ জেলে। পরণে এখানকার জেলেদের ঢোলা পোশাক। মুর সৈন্যরা জেলেটাকে হয় মেরে ফেলবে নয়তো মারাত্মকভাবে আহত করবে। জেলেটাকে বাঁচাও। ফ্রান্সিস ডাকলো—শাঙ্কো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে তীর-ধনুক তুলে নিল। ধনুকে তীর পরিয়ে ছিলা টানলো। কিন্তু নৌকোটা বেশ দুলছে। নিশানা ঠিক রাখা মুশকিল। ফ্রান্সিস বলল—মেরো না। আহত কর। শাঙ্কো তীর ছুঁড়ল। তীরটা জেলের পেছনেই প্রথম সৈন্যটির ডান কাঁধে বিঁধে গেল। সৈন্যটি তরোয়াল ফেলে দিল। বাঁ হাতে কাঁধ চেপে বালির ওপর বসে পড়ল। শাঙ্কো আর একটা তীর ছুঁড়ল। কিন্তু নিশানা ফস্‌কে গেল। আবার ছুঁড়ল। তীর বিঁধল পরের সৈন্যটির ডান পায়ের উরুতে। সেও বসে পড়ল। পরের সৈন্যটি দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিকে তাকাতে লাগল। বুঝে উঠতে পারল না, কোন্ দিক থেকে কে তীর ছুঁড়ছে। তবু ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর এগিয়ে এল না। দ্বিতীয় সৈন্যটি উরু থেকে তীরটা টেনে খুলে ফেলল। তারপর বালিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। প্রথমটিও তীর টেনে খুলে বালিতে শুয়ে পড়ল।

জেলেটি ছুটতে ছুটতে একবার পেছন ফিরে দেখল। তারপর ছুটতে ছুটতে ফ্রান্সিসদের দিকে আসতে লাগল। ফ্রান্সিসরা যে ছোট্ট খাঁড়িটায় নৌকো ঢুকিয়েছিল—সেই খাঁড়িটায় ঢুকল জেলেটা। ছুটে এসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরাতে সাঁতরাতে কিছুটা এসেই ফ্রান্সিসদের নৌকোটা দেখে হাত বাড়িয়ে নৌকোটা ধরতে গেল। ফ্রান্সিস ঝুঁকে পড়ে ওর বাড়ানো হাতটা ধরে ফেলল। লোকটা ভেবেছিল নৌকোটা খালি। ও চম্‌কে উঠে হাত ছাড়াতে গেল। ফ্রান্সিস হাতটা জোরে চেপে ধরে স্পেনীয় ভাষায় বলল—ভয় নেই—আমরা তোমার বন্ধু। লোকটা বুঝল। আর হাত ছাড়াতে চেষ্টা করল না। হ্যারি বলল—তুমি কে? লোকটা তখনও ভীষণ হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে স্পেনীয় ভাষায় বলল—আমি সালভা। আমাকে

বাঁচান।

—কোন ভয় নেই—নৌকোয় উঠে এসো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর টেনে সালভাকে নৌকোয় তুলে নিল। অল্প চাঁদের আলোয় দেখা গেল সালভার গায়ে এখানকার জেলেদেরই পোশাক তবে বুকের সামনেটা কাটা। খোলা বুকে তরোয়ালে কাটার দাগ। হাঁফাতে হাঁফাতে সালভা বলে উঠল—শিগগির নৌকো ছেড়ে দিন। ঐ সৈন্যরা এখুনি এসে পড়বে।

—ভয় নেই। দু'জন সৈন্যকে আমরা তীর ছুঁড়ে আহত করেছি।

—ওরা এক্ষুণি আসতে পারবে না। হ্যারি বলল।

—কিন্তু ওদের দুর্গ কাছেই। ওরা নিশ্চয়ই খবর দেবে। তখন আরো সৈন্য আসবে। সালভা বলল।

—হুঁ, ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর হাতের দাঁড়ে পাশের এবড়ো-খেবড়ো পাথর ঠেলে নৌকো ছোট্ট খাঁড়িটা থেকে বের করে আনল।

নৌকো চলল ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে। হ্যারি বলল—ওরা মুর সৈন্য তাই না?

—হ্যাঁ, সালভা বলল। তারপর বলল—আপনারা আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু আপনাদের পরিচয়—

—আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস নৌকো চালাতে চালাতে বলল।

—ও—আপনারা তো বীরের জাতি। এবার জানলাম—আপনাদের মনও উদার। সালভা বলল। তারপর বেশ চিন্তিত স্বরে বলল—আমি তো এখন তীরে যেতে পারবো না।

—একটু দূরেই আমাদের জাহাজ নোঙর করা আছে। তুমি ঐ জাহাজেই থাকবে। ফ্রান্সিস নৌকো চালাতে চালাতে বলল।

হ্যারি বলল—আচ্ছা সালভা—এটা কি একটা দ্বীপ না কোন দেশ?

—এটা মাজোরকা দ্বীপ—বালেরিক দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ। এই তীরভূমির নাম পালমা নোভা। এখানে জেলেদের বস্তীতে থাকি। সালভা বলল।

নৌকো চলেছে। রাত শেষ হয়ে আসছে। সমুদ্রের জল ছুঁয়ে জোর ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল। ভেজা পোশাকে সালভা দু'হাত বুকে জড়িয়ে ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল। মারিয়া লক্ষ্য করল সেটা।

যে কম্বলমত মোটা কাপড়টায় মারিয়া বসেছিল সেটা তুলে নিয়ে ও সালভার গায়ে জড়িয়ে দিল। সালভা মুখ তুলে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল। তখনই শাঙ্কো বলে উঠল—ফ্রান্সিস—আগুন। দূরে তীরভূমি ছাড়িয়ে আগুনের হল্‌কা উঠছে দেখা গেল। সালভা ফুঁপিয়ে উঠল, বলল—হা মেরী—মুর সৈন্যরা আমাকে ধরতে না পেরে আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কাঠ আর পাথরে তৈরি আমাদের বস্তীটাই পুড়িয়ে দেবে ওরা। সালভা মাথা নিচু করে ফোঁপাতে লাগল। ওদিকে দ্বীপের ধোঁয়াটে আকাশ আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠেছে।

আস্তে আস্তে নৌকো জাহাজের কাছে এল। রেলিঙ ধরে বিস্কোওরা ফ্রান্সিসদের একে একে জাহাজে তুলে নিল। ফ্রান্সিস বলল—বিস্কো, এর নাম সালভা। একে তোমাদের কেবিন-ঘরে নিয়ে যাও। শুকনো পোশাক দাও। গরম কিছু খেতে দাও। বিস্কো সালভাকে ডেকে নিল। চলল ওদের কেবিন-ঘরের দিকে। পূব দিকের আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই সূর্য উঠল।

একটু বেলায় ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙল। মারিয়া জেগেই ছিল তখন। খাবার নিয়ে এল। দু'জনে খাচ্ছে তখন হ্যারি এল। ফ্রান্সিস বলল— সালভা কেমন আছে?

—ভালো। খেয়েদেয়ে, জাহাজটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। হ্যারি বলল।

—সালভাকে একবার ডাকো তো হ্যারি। মূর সৈন্যরা ওকে আক্রমণ করেছিল কেন—সেটা জানতে হয়। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি চলে গেল। একটু পরেই সালভাকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—বসো সালভা। সালভা বিছানাতেই বসল। মারিয়া হেসে বলল—এখন কেমন আছো? সালভাও হাসল। বলল—আপনাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। ফ্রান্সিস বলল—ওসব কথা থাক। তোমাকে মূর সৈন্যরা আক্রমণ করেছিল কেন? তোমার বুকই বা তরোয়ালে কাটা কেন? সালভা একটু চুপ করে থেকে বলল—ঐ মূর সৈন্যদের রাজাই বলুন—অথবা দলপতিই বলুন—তার নাম আল আমিরি। সে কিন্তু জাতিতে মূর নয়—আরবী। দিন পনেরো আগে আল আমিরি জাহাজে চড়ে ঐ মূর সৈন্যদের নিয়ে এই পালমা মোভার দুর্গটা দখল করে নেয়।

—আগে দুর্গটা কার অধিকারে ছিল? হ্যারি বলল।

—মাজোরকার বর্তমান রাজা তৃতীয় জেমসের। আল আমিরি এমনভাবে সৈন্য দিয়ে পালমা নোভা ঘিরে রেখেছে যে রাজা জেমস এখনও জানেন না যে এই দুর্গটা আল আমিরি দখল করে নিয়েছে। একটু থেমে সালভা বলতে লাগল—আমি রামন লালের শিষ্য ছিলাম। রামন লাল আমাদের ঘরে মারা যান। তাঁর মৃতদেহ কবরের ব্যবস্থার জন্যে আমি গাড়িতে নিয়ে রাজধানী পালমায় যাচ্ছিলাম। দুর্গের কাছেই ধরা পড়লাম আল আমিরির সৈন্যদের হাতে। আল আমিরি খবর পেয়ে এল। মৃত রামন লালের জোব্বার পকেটে রামন লালের পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় খণ্ডটা পেল। সন্দেহ করল আমি প্রথম খণ্ডটা লুকিয়ে রেখেছি। চাইল প্রথম খণ্ডটা। প্রাণ বাঁচাতে বললাম বাড়িতে আছে। তিনজন সৈন্যের পাহারায় বাড়িতে এলাম। তারপর ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালালাম। ছুটলাম সমুদ্রের দিকে। ঠিক করেছিলাম নৌকোয় চড়ে পালাবো। এই বেলাভূমিতেই আমরা মানুষ। বালির ওপর দিয়ে আমাদের মত দ্রুত কেউ ছুটতে পারে না। কিন্তু সৈন্য তিনজনের নজরে পড়ে গেলাম। ওরা তরোয়াল খুলে চিৎকার করতে করতে আমাকে ধাওয়া করলো। তার পরের ঘটনা তো জানেনই। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—রামন লাল কে? তাঁর পাণ্ডুলিপি—মানে—সমস্ত ব্যাপারটা বলো তো। সালভা বলল—সে অনেক কথা। প্রথমে বলি আমি কি করে রামন লালের শিষ্য হলাম। একটু থেমে

বলতে লাগল—জেলের ছেলে আমি। কিন্তু জেলেবস্তীর অন্য ছেলেদের মত আমি ছিলাম না। ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনোর প্রতি ভীষণ আগ্রহ বোধ করতাম। এখানকার দুর্গ ছাড়িয়ে বেশ দূরে একটা ভাঙাচোরা ঘরে একজন মৌলভী থাকতেন। তাঁর কাছেই আমি আরবী ভাষা শিখতে শুরু করি। একদিন মৌলভী বললেন—আমি যা জানি সবই তোমাকে শিখিয়েছি। যদি সত্যিকারের জ্ঞান লাভ করতে চাও তাহলে রাজধানী পালমা যাও। যদি রামন লালের শিষ্যত্ব লাভ করতে পার তাহলে গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী সমস্ত শাস্ত্রেই তুমি জ্ঞানী হবে। একটু থেমে সালভা বলতে লাগল—রাজধানী পালমা গেলাম। কত দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে শিক্ষাগুরু রামন লালের নজরে পড়লাম—সে এক কাহিনী। যা হোক—শিক্ষাগুরু রামন লাল আলমুদাইনা রাজপ্রাসাদের একটি অংশে তাঁর শিষ্যদের পড়াতেন। একটু থেমে সালভা বলতে লাগল—এই রামন লালের জীবন বড় বিচিত্র। সামান্য ফাইফরমাস খাটার চাকর ছিলেন বালকবয়সে। পরে তিনি নিজের যোগ্যতায় রাজা দ্বিতীয় জেমসের রাজসভার সম্মানিত অমাত্য হয়েছিলেন। গ্রীক শাস্ত্র আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। মহাপণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজা দ্বিতীয় জেমস আরো জ্ঞানলাভের জন্যে তাঁকে সিরিয়া মিশর পূর্ব দেশেও পাঠিয়েছিলেন। বেশ কিছুকাল পরে ফিরে এলেন। পালমায় রইলেন বছর কয়েক। তারপর হঠাৎ একদিন দেশত্যাগ করলেন সব সম্মান যশ অর্থ পেছনে ফেলে। সালভা থামল।

—তারপর? হ্যারি বলল। সালভা বলল—

—রামন লাল নানা শাস্ত্র চর্চার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালকেমি অর্থাৎ অপ-রসায়নেরও চর্চা করতেন।

মারিয়া বলল—হ্যাঁ, আমাদের দেশেও কেউ কেউ এই অপ-রসায়নের চর্চা করেন। সীসা, তামা, পারদ সোনায় রূপান্তরিত করা যায় কীভাবে—এই অ্যালকেমির গবেষকরা তারই গবেষণা করেন।

—আপনি ঠিক বলেছেন। সালভা বলল—প্রথমবার রামন লাল অনেক কিছু লিখে আনেন। এটাকেই বলা হয় রামন লালের পাণ্ডুলিপির প্রথম খণ্ড। কিন্তু সেই পাণ্ডুলিপি কোথায় গোপনে রেখে তিনি দেশত্যাগ করেন এটা তিনি কাউকে জানিয়ে যাননি। সালভা থামল। ফ্রান্সিস এতক্ষণে বেশ আগ্রহ বোধ করল। বলল—এই প্রথম পাণ্ডুলিপিটা কি অনুসন্ধান করা হয়েছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—রাজা দ্বিতীয় জেমস তো বটেই, এখনকার রাজা তৃতীয় জেমসও পণ্ডিতদের দিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। কারণ, রামন লাল নাকি পণ্ডিতমহলে বলেছিলেন যে ঐ প্রথম পাণ্ডুলিপিতে তিনি অ্যালকেমির বেশ কিছু সূত্র লিখে রেখেছেন।

—হুঁ, তাহলে তো ওটা বেশ মূল্যবান। হ্যারি বলল।

—তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

—রামন লাল চলে গেলেন। আমি এখানে ফিরে এলাম। নিজে নিজেই পড়াশুনো

চালালাম। বাবার বয়েস হয়েছে। আমি মাছ ধরার কাজে বাবাকে সাহায্য করতে লাগলাম। সালভা থামল।

—রামন লালের আর কোন খবর পেলেন না? মারিয়া বলল?

—না। বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। কয়েকদিন আগের কথা। সেদিন বিকেলে নৌকো থেকে মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরবো। হঠাৎ দেখি একটা নৌকো সমুদ্রে দোল খাচ্ছে।

নৌকোটা ঠিক জেলে নৌকো না। কৌতূহল হল। নৌকো চালিয়ে ঐ নৌকোটার কাছে গেলাম। দেখি একটা কাপড় ঢাকা মাথা অল্প দেখা যাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি কাদা-ধুলো-বালিতে নোংরা কালো জোব্বা গায়ে একটি লোক শুয়ে আছে। মাথা মুখ কাপড়ে ঢাকা। নৌকোটায় উঠলাম। মুখের কাপড়ের ঢাকনা সরিয়েই ভীষণভাবে চমকে উঠলাম—এ যে আমার শিক্ষাগুরু রামন লাল। মুখের কাঁচাপাকা দাড়িতে মাথার লম্বা লম্বা চুলে রক্তের ছোপ কালো হয়ে গেছে। নাকে কপালে মুখে ক্ষত। জোব্বার হাতার বাইরে হাত দুটোয় কালশিটে দাগ। রক্তের ছোপ। তাড়াতাড়ি বুকের ওপর কান চেপে ধরলাম। নাঃ—বেঁচে আছেন। নাকের নিচে হাত রাখলাম। শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। একটা কালো রঙের দাঁড় পড়ে আছে নৌকোটায়। নৌকোটা আমার নৌকোর সঙ্গে বেঁধে তীরে নিয়ে এলাম। ছুটে এলাম বস্তীতে। কয়েকজন বন্ধুকে ডেকে নিয়ে ছুটলাম সমুদ্রের ধারে। রামন লালকে ধরাধরি করে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। মা গরম জলে মুখের গায়ের ক্ষত মুছে দিল। জল খাওয়াল। তখনও উনি চোখ বন্ধ করে আছেন। একটু থামল সালভা। তারপর বলতে লাগল—বৈদ্যির চিকিৎসায় কয়েকদিনের মধ্যে রামন লাল একটু সুস্থ হলেন। আস্তে আস্তে বললেন যে অনেক দেশ ঘুরে তিউনেসিয়ার সমুদ্র উপকূলে এসেছিলেন। ওখানকার আরবীয়রা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারছিল। কোনরকমে একটা নৌকোয় উঠে পালিয়ে আসেন। খাদ্য নেই, জল নেই। একা একা দাঁড় বেয়েছেন। দূরত্ব খুব বেশি না হলেও আহত শরীর নিয়ে মাঝে মাঝেই কষ্টে যন্ত্রণায় দাঁড় টানার পরিশ্রমে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। কথাগুলো বলতে বলতে সালভার গলা ভারি হয়ে এল। চোখ ছলছল করতে লাগল। একটু থেমে বলতে লাগল—কিন্তু উনি আর সুস্থ হলেন না। শরীরের ক্ষতগুলো বিষিয়ে উঠল। ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এদিকে আল আমিরির সৈন্যদের চোখ এড়িয়ে রামন লালকে যে রাজধানী পালমায় নিয়ে যাবো তারও উপায় নেই।

একদিন সন্ধ্যে থেকেই শ্বাসকষ্ট শুরু হল। ঐ শ্বাসকষ্টের মধ্যে ইঙ্গিতে কাগজ কলম চাইলেন। আমি তাড়াতাড়ি পার্চমেন্ট কাগজ আর উটপাখির পালকের কলমে কালি লাগিয়ে দিলাম। কাঁপা কাঁপা হাতে অনেক কষ্টে একটা নক্‌শামত কী আঁকলেন। অনেক কষ্টে ফ্যাসফেসে গলায় শুধু বললেন—আল-মু-দা-ই-লা-য়। কাঁপা কাঁপা আঙুলে নক্‌শাটা দেখালেন। শ্বাসকষ্টে পাগলের মত মাথাটা এপাশ ওপাশ করতে করতে স্থির হয়ে গেলেন। বৈদ্যি আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে চলে গেল।



আমি শিশুর মত কাঁদতে লাগলাম। সালভা থামল। ফ্রান্সিসরা কেউ কোন কথা বলল না। একটু পরে ফ্রান্সিস বলল—আলমুদাইলা কী? সালভা বলল—রাজধানী পালমার রাজপ্রাসাদের নাম।

হ্যারি বলল—ওঁর পোশাকে কিছু পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ, জোব্বার পকেটে এক গোছা পাণ্ডুলিপি। গ্রীক ভাষায় লেখা। মন শান্ত হলে পড়লাম পাণ্ডুলিপিটা। লিখেছেন কোথায় কোথায় গেছেন—বন্দী হয়েছেন—কয়েদ খেটেছেন—মানে ভ্রমণ কাহিনীর মত। সবশেষের পাতায় যেটা লিখেছিলেন—সেটা বেশ কৌতূহল জাগায়। লিখেছিলেন—আমার প্রথম পাণ্ডুলিপিতে বেশ কিছু অ্যালকেমির সূত্র আছে। সেই সূত্রগুলো নিয়ে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত অভিজ্ঞ রসায়নবিদ্‌দের সঙ্গে আলোচনা করেছি। বুঝলাম আমার সূত্রগুলো নির্ভুল। ভাবছি—ফিরে গিয়ে এসব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবো। একটু থেমে সালভা বলল—সেটা আর পারলেন না।

—তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

—দুর্বল হাতে যে নক্‌শাটা উনি এঁকেছিলেন সেটা ভালো করে দেখে আমি বুঝেছিলাম যে প্রথম পাণ্ডুলিপিটা তিনি কোথায় গোপনে রেখে গেছেন তার নির্দেশ আছে নক্‌শাটায়। কিন্তু সেই নির্দেশ আমি কিছুই বুঝলাম না। ফ্রান্সিস বেশ আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল—সেই নক্‌শাটা কোথায়?

—ওটা আমি ঘরে বালির মধ্যে পাথরের পাটাতন দিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছি। ঘর তো পুড়ে গেছে। জানি না নক্‌শাটাও পুড়ে গেছে কিনা। সালভা বলল।

—না—পোড়ে নি—মারিয়া বলল—আগুনে বালি পোড়ে না বরং বালি আগুন নেভায়। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নামল। খালি পায়ে মেঝেয় পায়চারি করতে লাগল। ওর মাথায় ঘুরছে—নক্‌শা—রামন লালের প্রথম পাণ্ডুলিপি। হ্যারি বলল—সালভার পরে কি ঘটলো বলো। সালভা বলতে লাগল—আমি কী করবো বুঝে উঠতে পারলাম না। রামন লালের মত একজন শ্রদ্ধেয় দেশবরেণ্য মানুষকে সমাধিস্থ করবো এরকম একটা অখ্যাত জায়গায়? কিছুতেই মন মানল না। পরদিন ভোরেই বন্ধুদের সাহায্যে মৃতদেহ দুটো খচ্চরে টানা শববওয়া গাড়িতে তুললাম। নিজেই চালিয়ে নিয়ে চললাম রাজধানী পালমার দিকে। দুর্গের পাশ দিয়ে রাস্তা। যাচ্ছি। কয়েকজন মূর সৈন্য ঘিরে ধরলো। ওরা কাউকে পালমা যেতে দিচ্ছে না। পাছে দুর্গ দখলের খবরটা রাজার কানে ওঠে। ওরা মৃতদেহ দেখল। ওদের মধ্যে একটি সৈন্য রামন লালকে চিনে ফেলল। ওরকম একজন খ্যাতিমান মানুষকে না চেনাই আশ্চর্য। খবর গেল দুর্গে। আল আমিরি ঘোড়ায় চড়ে এল। মৃতদেহ দেখেই চিনল। সেনাপতিও এসেছে পেছনে পেছনে। সেনাপতিকে বলল মৃতদেহের পোশাক খুঁজে দেখতে। দামী কিছু আছে কিনা। সেনাপতি খুলে নিল গলায় ঝোলানো সোনার ক্রুশটা, আঙ্গুলের হীরের আংটি। এক পকেট থেকে পূর্বদেশীয় কিছু মোহর। এবার ঝোলা পকেট থেকে বার করল পাণ্ডুলিপিটা। আল আমিরি পাণ্ডুলিপিটা

হাতে নিল। এক পাতা পড়ে আমাকে বলল—এটা পড়েছিস্ তুই? বললাম—হ্যাঁ।

—অ্যালকেমির সূত্র আছে এতে? আল আমিরি বলল। বুঝলাম আল আমিরিকে যতটা অশিক্ষিত ভেবেছিলাম সে ততটা অশিক্ষিত নয়। রামন লালের পাণ্ডুলিপিতে অ্যালকেমির সূত্র আছে এটা সে জানে। বললাম—

—জানি না। আল আমিরি তরোয়ালের হাতির দাঁতে বাঁধানো হাতলে হাত দিল। চিৎকার করে বলল—

—সত্যি কথা বল্। বললাম—শেষ পাতায় শুধু লেখা আছে যে প্রথম পাণ্ডুলিপিতে সূত্রগুলো লেখা আছে। আল আমিরি দ্রুত হাতে পাতা উলটিয়ে শেষ পাতাটা পড়ে ফেলল। বলল—প্রথম পাণ্ডুলিপি কোথায়?

—সে আমি জানি না। আমি বললাম।

—রামন লাল তোকে কোন হদিশ দিয়ে যায় নি? আল আমিরি বলল।

—না। আমি বললাম। আল আমিরি বিশ্বাস করল না।

ঝনাৎ করে তরোয়াল কোষমুক্ত করল। আমার মাথার ওপর তরোয়াল উঁচিয়ে ধরে বলল—মিথ্যে কথা। বল্—কোথায় সেই পাণ্ডুলিপি?

—আমি সত্যি জানি না। কথাটা বলতেই তরোয়ালটা রোদে ঝলসে উঠে দ্রুত আমার বুক ছুঁয়ে গেল। পোশাক কেটে গেল। বুক লম্বালম্বি কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল।

—বল্—আবার তরোয়াল তুলল আল আমিরি। বুঝলাম বাঁচতে হলে অন্য পথ নিতে হবে। বললাম—হ্যাঁ, মৃত্যুর সময় রামন লাল আমাকে একটা নক্শামত এঁকে দিয়ে গেছেন। আল আমিরি বলল—কোথায় সেটা? বললাম—আমার ঘরে রেখে এসেছি। আল আমিরি তরোয়ালের ইঙ্গিতে তিনজন সৈন্যকে বলল—তোরা ওর সঙ্গে যা। ও যা দেবে নিয়ে আসবি। ওকেও সঙ্গে নিয়ে আসবি। খবরদার—পালায় না যেন। সালভা থামল। ফ্রান্সিস পায়চারি থামিয়ে বলল—শোন সালভা—আজ রাতে তোমার পোড়া ঘরে যাবো। নক্শাটা পেলে রামন লালের প্রথম পাণ্ডুলিপিটা উদ্ধার করবো। মারিয়া বলে উঠল—কিন্তু আমরা তো দেশে ফিরবো এখন। ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়িয়ে মারিয়ার মুখের দিকে তাকাল। আস্তে বলল—ঠিক আছে। তোমরা জাহাজ নিয়ে চলে যাও। আমি, হ্যারি আর শাঙ্কো এই মাজোরকা দ্বীপে থাকবো। পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করবো। মারিয়া বুঝল—ফ্রান্সিস যা করবে স্থির করে তা করবেই। মৃদুস্বরে মারিয়া বলল—আমাকে মাফ করো ফ্রান্সিস। অনেকদিন দেশ ছাড়া তাই—আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো।

হ্যারি আর সালভা নিজেদের কেবিনে চলে গেল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে কেবিন-ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

দুপুরের দিকেই হ্যারি বুঝতে পারল—জ্বর আসছে। গতকাল থেকেই শরীরটা ভালো লাগছিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই জ্বর বাড়লো। কপালে দপ্দপানি শুরু হল। শরীরের গাঁটে গাঁটে মোচড়ানো ব্যথা। বিস্কো বা অন্য ভাইকিং বন্ধুরা তখনও

জানে না—ফ্রান্সিসের নতুন সংকল্পের কথা। বিস্কো হ্যারির কাছে জানতে এল এবার দেশের দিকে জাহাজ চালাবে কিনা। দেখল হ্যারি চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। ভাবলো—ঘুমুচ্ছে বোধহয়। বিস্কো বিছানায় বসে ডাকলো—হ্যারি? হ্যারির কোন সাড়া শব্দ নেই। বিস্কো হ্যারির কাঁধে হাত রেখে ডাকতে গেল। চমকে উঠল। হ্যারির গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে যেন। বিস্কো বিছানা থেকে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। হ্যারির কপালে গলায় হাত রাখল। ভীষণ জ্বর। একে শরীরের দিক থেকে হ্যারি বরাবরই দুর্বল। বিস্কো বেশ ঘাবড়ে গেল। তাড়াতাড়ি হ্যারিকে আস্তে ধাক্কা দিল। ডাকল—হ্যারি? হ্যারি চোখ মেলে তাকাল। দু'চোখ বেশ লাল। বিস্কো আর দাঁড়াল না। ওদের বৈদ্যি বন্ধুকে ডাকতে ছুটল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বৈদ্যি ওষুধের পুঁটুলি, একটা বোয়াম নিয়ে এল। হ্যারিকে পরীক্ষা করল। তারপর পুঁটুলি থেকে এক চিমটে লাল গুঁড়ো বের করে হ্যারিকে খাইয়ে দিল। বোয়াম থেকে কিছু কালো চট্‌চটে ওষুধ বের করে দু' হাতের তালুতে ঘষে বড়ির মত বানাল। বিস্কোর হাতে দিয়ে বলল—রেখে দাও—সন্ধ্যে রাতে একটা করে খাইয়ে দিও। বৈদ্যি পুঁটুলি বোয়াম নিয়ে চলে গেল।

একটু পরে হ্যারি চোখমুখ কুঁচকে বিস্কোর দিকে পাশ ফিরল। বলল—বিস্কো—ফ্রান্সিস এখন দেশে ফিরতে রাজি নয়। বিস্কো বেশ আশ্চর্য হল। বলল, কেন?

—সে অনেক কথা। ফ্রান্সিস বলবে সব। হ্যারি বলল। হ্যারির অসুখের কথা শুনে কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু হ্যারির কেবিনঘরে এল। একজন ছুটলো ফ্রান্সিসকে খবর দিতে। একটু পরেই ফ্রান্সিস আর মারিয়া এল। ফ্রান্সিস হ্যারির কপালে হাত দিল। বুঝল বেশ জ্বর। মারিয়াকে বলল সে কথা। মারিয়া ঘরের চারদিকে তাকাল। ছেঁড়া কাপড়-টাপড় কিছু দেখল না। তখন নিজের পোশাক থেকে কিছুটা ছিঁড়ে নিল। কাঠের গ্লাসে জল ভরে নিয়ে এল। কাপড়ের টুক্‌রো জলে ভিজিয়ে হ্যারির পাশে বসল। হ্যারির জ্বরতপ্ত কপালে জলপট্টি দিতে লাগল। বিস্কোকে বলল—দরজা সবটা খুলে দাও। আধ ভেজানো দরজা সবটা খুলে দিতেই সমুদ্রের জোর হাওয়া ঢুকল। ঘরের গুমোট ভাবটা কাটল।

দুপুরে স্নান খাওয়া সেরে ফ্রান্সিসরা আবার এল। মারিয়া জলপট্টি দিতে লাগল।

বিকেল হল। মারিয়া মাঝে মাঝে হ্যারির মাথায় গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হ্যারি চোখ খুলে তাকাল। চোখের লালাভাব অনেকটা কম। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে হ্যারি শুকনো ঠোঁটে হাসল।

—এখন কেমন বোধ করছো? হ্যারির মুখের কাছে ঝুঁকে ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—জ্বর কমেছে। ভালো লাগছে—হ্যারি আস্তে আস্তে বলল—তুমি এখন কী করবে বন্ধুদের বলো।

—ও-হ্যাঁ। ফ্রান্সিস সোজা হয়ে বসল। বিস্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—

—সব বন্ধুদের সন্ধ্যেবেলা ডেক্-এ আসতে বল। আমার কিছু বলার আছে।

—বেশ—খবর দিচ্ছি। বিস্কো বলল।

সন্ধ্যে হল। ভাইকিং বন্ধুরা ডেক্-এ এসে জমায়েত হল। ফ্রান্সিস এখন কী করবে তাই নিয়ে ওরা পরস্পর কথা বলতে লাগল। একটু পরে ফ্রান্সিস মারিয়াকে নিয়ে ডেক্-এ এল। বন্ধুদের গুঞ্জন থেমে গেল। আকাশে চাঁদ একটু উজ্জ্বল। জ্যোৎস্না পড়েছে শান্ত সমুদ্রের জলে জাহাজে। হাওয়ার তেমন জোর নেই। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—ভাইসব—সামনে যে ডাঙা দেখা যাচ্ছে—এটা একটা ছোট বন্দর—নাম পালমা নোভা। মাজরোকা দ্বীপের বন্দর। রাজধানীর নাম পালমা। সেটা দূরে। এবার ফ্রান্সিস সালভার কথা, আল আমিরির কথা, রামন লালের পাণ্ডুলিপির কথা, নক্শার কথা বলল। তারপর বলল—আমার আপন ভাইয়ের মত হ্যারি অসুস্থ। আমার মন ভালো নেই। তবু আমাকে যেতেই হবে। তোমরা হ্যারিকে দেখবে। স্থির করেছি—আমি, মারিয়া আর শাঙ্কো ঐ দ্বীপে যাবো। রামন লালের প্রথম পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করবো। ফ্রান্সিস থামল। সবাই তখন ভাবছে ফ্রান্সিসের কথাগুলো। বিস্কো বলল—কী আছে ঐ পাণ্ডুলিপিতে?

—সাধারণ সীসে দস্তা পারদকে সোনায় রূপান্তরিত করার সূত্র লেখা আছে ঐ পাণ্ডুলিপিতে। ফ্রান্সিস বলল। একজন ভাইকিং বন্ধু বলল—

—ফ্রান্সিস এটা কি সম্ভব?

—এই বিষয়টিকে বলে অ্যালকেমি অর্থাৎ অপ-রসায়ন। পাণ্ডুলিপির সূত্রগুলো পেলে প্রক্রিয়া বের করে হয়তো কোন রসায়নবিদ্ কিছু করতেও পারেন। আমার লক্ষ্য ঐ প্রথম পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করা। তারপর ঐ দ্বীপের রাজা তৃতীয় জেমসকে দিয়ে দেওয়া। অ্যালকেমি নিয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই।

—কিন্তু একটা কাগজের পাণ্ডুলিপি তো সোনা মুক্তোর মত মূল্যবান কিছু নয়। একজন ভাইকিং বন্ধু বলল।

—ঠিক। কিন্তু তোমরা তো জানো—গুপ্ত সম্পদ বা গুপ্ত পাণ্ডুলিপির ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। আমি ভালোবাসি দুর্জয় সংকল্পকে বীরত্বকে সাহসকে এবং বুদ্ধির খেলাকে। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা তিনজন কি পারবে? বিস্কো বলল।

—দেখা যাক। আমরা চলে গেলে তোমরা দিনকয়েক অপেক্ষা করো। যদি আমরা না ফিরি তাহলে আমাদের খুঁজতে দ্বীপে নামবে। ফ্রান্সিস বলল।

ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। ফ্রান্সিসরা না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। দেশের দিকে জাহাজ চালানো যাবে না। আবার এটাও ওরা ভালো করেই জানে ফ্রান্সিসকে কোনভাবেই সঙ্কল্পচ্যুত করা যাবে না। আস্তে আস্তে গুঞ্জন থামল। বিস্কো গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস আমরা তোমাদের ছেড়ে দেশে ফিরবো না। সব ভাইকিংরা সমর্থনের ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো-। ফ্রান্সিস হাসল। সভা শেষ হল। সবাই চলে যেতে লাগল। ফ্রান্সিসও মারিয়াকে নিয়ে নিজেদের কেবিন-ঘরে ফিরে এল। ফ্রান্সিসের মনে সংশয় ছিল হয়তো মূল্যহীন একটা পাণ্ডুলিপির জন্যে

বন্ধুরা অপেক্ষা করবে কিনা। ওরা তো অনেকদিন দেশ ছাড়া। কিন্তু বন্ধুরা অপেক্ষা করতে রাজি হওয়ায় ফ্রান্সিসের সংশয় দূর হল। ও খুশি হল।

রাতের খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস ওদের কেবিন-ঘরে আস্তে আস্তে পায়চারি করছে। ভাবছে—কেমন সেই রামন লালের নক্শা। কে জানে—মুমূর্ষু রামন লাল ঐ নক্শায় গুপ্ত পাণ্ডুলিপির হদিশ কিছু দিয়েছে কিনা। তখনি মেখল মারিয়া বিছানায় বসে ওর একটা গাউন কাঁচি দিয়ে কাটছে। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। বেশ আশ্চর্য হয়ে বলল—পোশাকটা কাটছ কেন? মারিয়া কাঁচি চালাতে চালাতে মুখে একটু গম্ভীরভাব এনে বলল—ফ্রান্সিস—আমরা একটা অভিযানে যাচ্ছি, নাচের আসরে যাচ্ছি না। কাজেই গাউনের ঝুলটা কেটে ছোট করছি যাতে দরকার পড়লে সহজে ছুটোছুটি করতে পারি।

—কিন্তু অমন সুন্দর দামী পোশাকটা—

—জীবন এই পোশাকের চেয়ে অনেক বেশি দামি আর অনেক সুন্দর বেঁচে থাকা। মারিয়া হেসে বলল। ফ্রান্সিসও হাসল। কিছু বলল না। একটু পরে দু'জনে অসুস্থ হ্যারিকে দেখতে গেল। হ্যারি এখন অনেকটা সুস্থ। জ্বর কমেছে। তবু অভিযানে যাবার মত সুস্থ হয়নি শরীর।

রাত একটু বাড়তে ফ্রান্সিস তৈরি হল। পোশাক পরে কোমরে চামড়ার ফেট্টিতে তরোয়াল গুঁজল। মারিয়া কাটা গাউনটা পরল। পোশাকটা না হল গাউন না হল ফ্রক। ধনুক তূনীর ঝুলিয়ে শাঙ্কো এল। ওর কোমরে একটা ধারালো ছোরা। ছোরাটা ও সবসময়ে কোমরে গুঁজে রাখে। সালভাও এল। বৈদ্যির ওষুধ লাগিয়ে ওর বুকের ক্ষতটা শুকিয়ে এসেছে।

জাহাজ থেকে ঝোলানো দড়ি ধরে ধরে নৌকোয় নামল ওরা। ফ্রান্সিস দাঁড় বাইতে লাগল। শাঙ্কো একটা দাঁড় হালের মত ধরে বসে রইল। নৌকোর ভেতরে বসল মারিয়া আর সালভা। চাঁদের আলোয় ফ্রান্সিস দেখল জাহাজের রেলিঙ ধরে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে বিস্কো আর কয়েকজন বন্ধু। আবার বন্ধুদের সঙ্গে কবে দেখা হবে। ফ্রান্সিসের মনটা একটু উদাস হল। পরক্ষণেই এসব ভাবনা মন থেকে সরাল। জোরে দাঁড় বাইতে লাগল।

একসময় তীরে পৌঁছল ওরা। আগের সেই ছোট খাড়ির মধ্যেই নৌকোটা ঢোকাল ফ্রান্সিস। একটু গিয়ে ওরা একে একে নৌকো থেকে তীরের বালিয়াড়িতে নামল। কালকে দেখা সেই জাহাজটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল—সালভা ঐ জাহাজটা কাদের?

—আল আমিরি এই জাহাজেই সৈন্য আর একদল বন্দী নিয়ে এসেছিল। সালভা একটু থেমে বলল—গভীর রাত্রে দুর্গের রাজার সৈন্যরা কিছু বোঝবার আগেই প্রচণ্ড আক্রমণ করল। রাজা জেমসের সৈন্যরা বাধা দিল। কিন্তু আল আমিরির মূর সৈন্যদের কাছে ওরা দাঁড়াতেই পারল না। মূরদের কাছে ছিল চামড়ার ফিতের গুলতির মত স্লিং। ঐ স্লিং দিয়ে পাথরের বড় বড় টুকরো ছুঁড়ে ওরা সহজেই

দুর্গের সৈন্যদের কাবু করে ফেলল। হেরে গেল রাজা জেমসের সৈন্যরা। সালভা থামল।

—জাহাজটা কালকেও দেখেছি জনশূন্য। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ, জাহাজটায় কেউ থাকে না। সবাই দুর্গে থাকে। সালভা বলল। জাহাজটা বেশ দূরে। চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সামনে সালভা। পেছনে ফ্রান্সিসরা। বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। চারপাশ নিস্তব্ধ। শুধু বাতাসের শব্দ আর সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ার মৃদু শব্দ।

ফ্রান্সিস হাঁটতে হাঁটতে জাহাজটার দিকে ভালো করে নজর বুলোল। বলল—সালভা জাহাজটায় গতরাতে দু-একটা আলো দেখেছিলাম। আজকে দেখছি সব অন্ধকার। মারিয়া বলল—গতরাতে জাহাজটা থেকে কিন্তু কোন পাটাতন তীরের বালিতে ফেলা ছিল না। আজকে একটা কাঠের পাটাতন ফেলা রয়েছে।

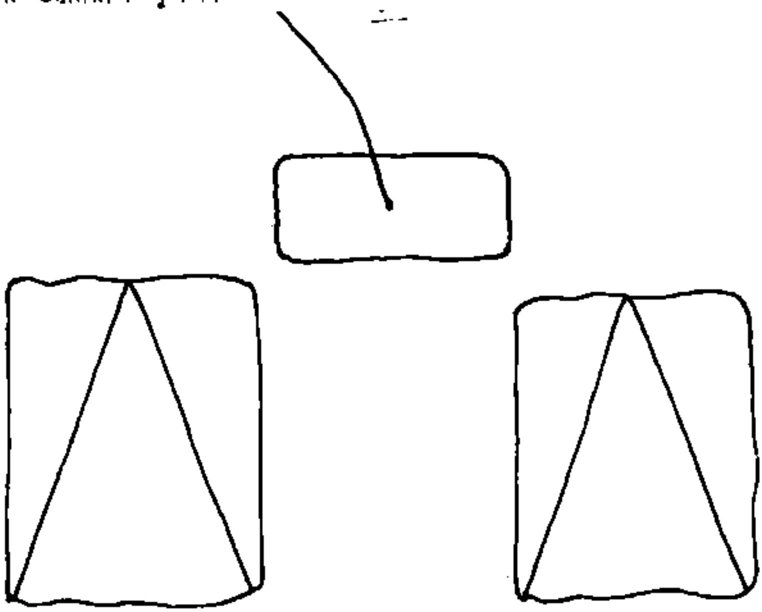
—হুঁ, দেখছি তাই। ফ্রান্সিস একটু চিন্তিতস্বরে বলল। তারপর চারদিক তাকিয়ে দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগল। নাঃ, কোথাও কোন জনপ্রাণীর দেখা নেই।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর দেখা গেল কিছু ছাড়া ছাড়া গাছগাছালি। বাতাসে গাছের পাতায় শব্দ হচ্ছে। তার নিচে পরপর কিছু পাথরের বাড়িঘর। কাছে এসে দেখা গেল সব বাড়িঘর আগুনে পোড়া। পাথর বসানো থামগুলো পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ছাত বলে কিছু নেই। সব পুড়ে গেছে। সালভা দাঁড়িয়ে পড়ল। বস্তীর পোড়া ঘরবাড়ি দেখল। তারপর এগিয়ে চলল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। কয়েকটা পোড়া বাড়িঘর পার হয়ে একটা পোড়া ঘরে ঢুকল সালভা। ফ্রান্সিসরাও ঘরটায় ঢুকল। এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে দেয়াল পুড়ে কালো হয়ে গেছে। সালভা মেঝে থেকে পোড়া কাঠের ডাল সরিয়ে উবু হয়ে বসল। বালি সরাতে লাগল। একটা পাথরের ছোট পাটাতন। তুলে ফেলল ওটা। একটা একটু ছাই-রঙা গোটানো কাগজ বের করল। হেসে বলল—যাক্ নক্শাটা পুড়ে যায়নি। নক্শাটা খুলে দেখে নিঃশব্দে ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। মাথার ওপরে ছাদ তো নেই। চাঁদের আলো পড়েছে। ফ্রান্সিস কাগজটার সবটা ছড়িয়ে দেখতে লাগল। কালিতে মোটা টানে রামন লালের নিজের হাতে আঁকা নক্শা। নক্শাটা দেখতে এরকম—

ফ্রান্সিস খুব মনোযোগ দিয়ে নক্শাটা দেখতে লাগল। মারিয়াও মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল। শাঙ্কোও এক নজর দেখে নিল। সালভা একটু হতাশ স্বরে বলল—মুমূর্ষু অবস্থায় আঁকা এই নক্শাটা দেখে রামন লালের প্রথম পাণ্ডুলিপি বের করতে পারবেন? শাঙ্কো বলল—ভাই এর-নাম ফ্রান্সিস। কত নক্শা, ছড়া ছবির অর্থ বের করেছে ফ্রান্সিস। দেখো—এটারও রহস্য ভেদ করবে। সালভা আর কিছু বলল না।

হঠাৎ রাতের নৈঃশব্দ ভেঙে দিল একটা তীক্ষ্ণ শব্দ। ভীষণ চমকে উঠে সালভা বলল—মূরসৈন্যরা আক্রমণ করার আগে মুখে এরকম শব্দ করে। হঠাৎ ধুপ্ ধাপ্ শব্দ শোনা গেল। একদল লোকের ছুটে আসার শব্দ। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে নক্শাটা

ঢোলা জামার মধ্যে গলার কাছ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। শাঙ্কোও কোমর থেকে ছোরাটা বের করে জামার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। শাঙ্কো ধনুকে তীর পরাল। ফ্রান্সিস এক ঝট্‌কায় তরোয়াল খুলল।



চাঁদের আলোয় দেখা গেল পোড়া বাড়িটার চারপাশ ঘিরে মূর সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। শাঙ্কো ধনুকে তীর পরিয়ে ছিলা টানল। লক্ষ্য সামনের মূর সৈন্যটা। ফ্রান্সিস বলল—ধনুক নামাও। ফ্রান্সিস পোড়া ঘরটা থেকে বাইরে এল। পেছনে মারিয়া শাঙ্কো আর সালভা। সালভার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস হাতের তরোয়াল বালির ওপর ফেলে দিল। কোন শব্দ হল না। শাঙ্কো ধনুক বালিতে নামিয়ে রাখল।

সৈন্যদের দল থেকে একজন লম্বামত সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। ওর চিবুকে কোঁকড়া দাড়ি। সালভাকে দেখে হলদেটে দাঁত বের করে হাসল। কালো ঘামে ভেজা শরীরে জ্যোৎস্নার আলো পড়েছে। চক্ চক্ করছে যেন। বুকে বর্ম। লোকটা আরবী ভাষায় কী বলল। সালভা মাথা নিচু করল। কোন কথা বলল না। এতক্ষণে মারিয়াকে দেখে লোকটা বেশ আশ্চর্য হল। আরো আশ্চর্য হল মারিয়ার হাঁটুর নিচে পর্যন্ত কাটা গাউনটা দেখে। সালভাকে কী জিজ্ঞেস করল। সালভা ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—জিজ্ঞেস করছে আপনারা কে? ফ্রান্সিস বলল—বলো যে আমরা ভাইকিং। আমরা লড়াই চাই না। সালভা বলল সে কথা। লোকটা সালভাকে কী বলল। তারপর তরোয়াল ঘুরিয়ে সবাইকে হাঁটবার ইঙ্গিত করল। সালভা ঐ লোকটার দিকে যেতে যেতে বলল—চলুন আমাদের দুর্গে যেতে হবে।

আগে পিছে মুর সৈন্যরা চলল। মাঝখানে ফ্রান্সিসরা। দু'পাশে ছাড়া ছাড়া গাছগাছালি। মাঝখানে ধুলোবালির পথ। হেঁটে চলল সবাই।

যেতে যেতে ফ্রান্সিসরা দেখল এখানে ওখানে কিছু পাথরের ঘরবাড়ি। মাথায় বড় বড় বুনো ঘাসের ছাউনি। চাঁদের আলোয় একটু দূরেই দেখা গেল পাথরের দুর্গের কালো মাথা। একটা ছোট টিলার ওপরে ঐ দুর্গটা। দুর্গটা ঘিরে পাথর গাঁথা প্রাচীর। বেশ উঁচু।

ডানহাতি একটা পাথর গাঁথা পথ দুর্গের সদর দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ফ্রান্সিসরা গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। দুর্গের বিরাট কাঠের দরজার একটা বড় পাল্লা ঘর্ ঘর্ শব্দ তুলে খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল সবাই।

একটা চওড়া পাথর বাঁধানো চত্বর পেরিয়ে টানা বারান্দামত। দু'পাশে পাথুরে দেয়ালের খাঁজে মশাল জ্বলছে। বারান্দা দিয়ে একটু যেতেই ডানদিকে একটা লোহার গরাদ বসানো ছোট লম্বাটে দরজা। বোঝা গেল কয়েদঘর। কয়েদঘরের পাহারাদার এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস দেখল পাহারাদারটি মুর নয়। গায়ের রং, চেহারা দেখে মনে হল এদেশীয়। একটু বয়েস হয়েছে লোকটার। সেই লম্বাটে লোকটার নির্দেশে পাহারাদার কোমর থেকে লোহার বড় গোল রিং-এর চাবির গোছা খুলল। ঘরটার বড় তালাটা খুলে লোহার দরজাটা খুলে দিল। লম্বা সৈন্যটি মারিয়ার দিকে তাকিয়ে চড়া গলায় কী বলল। মারিয়া বুঝল না। সালভা বলল—এই কয়েদ ঘরে আপনাকে থাকতে হবে। মারিয়া একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর ঘরটায় ঢুকল। ফ্রান্সিস ভাবল আপত্তি করবে। মারিয়াকে ওদের সঙ্গেই রাখতে বলবে। কিন্তু লম্বা সৈন্যটির কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল—এ লোকটি কোন ওজর আপত্তিতে কান দেবে না। তারপরের ঘরটির তালা খুলল পাহারাদারটি। শাঙ্কোর তীর-ধনুক একজন সৈন্য খুলে নিল। ফ্রান্সিসের তরোয়ালটাও সেই রেখেছে হাতে। ওদের ঘরটায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ফ্রান্সিস সালভাকে বলল—ঐ সৈন্যটিকে বলো আমাদের কয়েদ করা হল কেন? সালভা লম্বা সৈন্যটিকে বলল সে কথা। লম্বা সৈন্যটি ফ্রান্সিসের দিকে কড়া চোখে তাকাল। তারপর কী বলে উঠল। সালভা বলল—কালকে আল আমিরির দরবারে হাজির করাবে আমাদের। তারপর উনি যা করেন। ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। শুধু মারিয়া যাতে শুনতে পায় সেভাবে চেঁচিয়ে বলল—মারিয়া কোন ভয় নেই। আমরা পাশের ঘরেই আছি।

এই ঘরটা বেশ বড়। মেঝেয় শুকনো ঘাস পুরু করে বিছানো। দু'পাশের পাথরের দেয়ালে পোঁতা দুটো লোহার আঙটা থেকে লোহার শেকল ঝুলছে। শেকলের সঙ্গে বাঁধা লম্বা লম্বা দড়ি। আগে ছোট দড়ি দিয়ে ফ্রান্সিসদের হাত বাঁধা হল। তারপর শেকলের লম্বা দড়িগুলোর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল আলাদা আলাদা ভাবে। ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো সালভা ঘাসের বিছানায় বসে পড়ল। সৈন্যরা চলে গেল।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চোখ বুঁজে শুয়ে রইল। তারপর চোখ খুলল। পাথুরে দেয়ালের

আংটায় বসানো মশালের আলোয় ওপরের দিকে তাকাল। বেশ উঁচুতে পাথরের ছাদ। দু'পাশে দুটো চৌকোনো মত এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ফোকর। অনেক উঁচুতে সেই গরাদহীন ফোকর। ওটার কাছে পৌঁছোনো অসম্ভব। চারপাশে তাকিয়ে দেখল—আরো শেকলবাঁধা আংটা রয়েছে। তাতে লম্বা লম্বা দড়ি বাঁধা। বুঝল—এখানে অনেক বন্দী রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। শাঙ্কো আস্তে ডাকল—ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকাল। শাঙ্কো বলল—এখান থেকে পালানো যাবে? শুধু তো আমরা নই। রাজকুমারীও রয়েছেন।

—দেখি—আগে। ক'জন পাহারাদার সৈন্য থাকে কতক্ষণ, পরপর পাহারাদার পালটায়—কী ভাবে খেতে দেয় তারপর ভাববো। সালভাকে বলল—সালভা এখানে অনেক বন্দী রাখা হয় তাই না?

—রাজা জেমসের আমলে শত্রুপক্ষের বন্দী সৈন্যদের রাখা হত। এখন তো আল আমিরির দখলে। আল আমিরি অন্তত জনা পঁচিশেক বন্দীকে এখানে এনে রেখেছিল। দিন চার-পাঁচ আগে এক আরবী ব্যবসায়ী জাহাজ নিয়ে এসেছিল। ক্রীতদাস কেনাবেচা ওর ব্যবসা। আল আমিরি সব বন্দীকে বিক্রি করে দিয়েছিল। সালভা বলল।

—বন্দীরা কেউ এখান থেকে পালাতে পেরেছিল? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, শুনেছি তিনজন বন্দী নাকি কীভাবে দুর্গের পেছনের মরণজলা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল। শোনা যায় ওরা নাকি মরণজলাতেই মারা গেছে। সালভা বলল।

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল। বলল—মরণজলাটা কী? সালভা বলল—কে জানে কেন এই দুর্গের পেছনেই আছে একটা জলাভূমি।

—খুব বড়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না না, তবে কী করে যে এই জলায় জল আসে—কাদা থাকে মা মেরীই জানেন। বলল সালভা।

—আমি জানি। এটা পাহাড়ি এলাকা। পাথরের কোন গোপন ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল এসে জমা হয়। মাটির ভাগে মিশে কাদা তৈরি করে। ঠিক আছে বলো—ফ্রান্সিস বলল।

—জলাভূমিটা লম্বা লম্বা ঘাসে ঢাকা। ঘাসগুলো কোনদিন সবুজ হয় না। শুকনো হলুদ রঙের। কেউ এই জলার ধারে কাছে আসে না। ঘোড়া খচ্চরও এই ঘাস খেতে আসে না। দিনের আলোতেও জলাভূমির অন্ধকার ভাবটা কাটতে চায় না। কেমন ধোঁয়াটে সারা জলাভূমিটা। লোকে তাই এটাকে মরণজলা বলে। সালভা বলল।

—হুঁ, মরণজলা। ফ্রান্সিস চিন্তা করতে করতে বলল। তারপর শুয়ে পড়তে পড়তে বলল—রাত শেষ হয়ে এসেছে। ঘুমিয়ে নাও। বিশ্রাম চাই। শরীর ঠিক রাখো। শাঙ্কো আর সালভা শুয়ে পড়ল।

ঠঠাং—ঠং দরজা খোলার শব্দে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। দেখল—পাহারাদার খোলা দরজা দিয়ে ঢুকছে। হাতে একটা কাঠের বড় থালামত। তাতে গোল কাটা রুটির টুকরো। অন্য ছোট কানা উঁচু থালাটায় টুকরো আলু-ডুমুরের ঝোলমত। পাহারাদার দুটো থালা ফ্রান্সিসদের সামনে শুকনো ঘাসের ওপর রাখল। ফ্রান্সিস উঠে বসল। বাঁধা হাত উঁচু করে দেখাল। পাহারাদার মাথা নাড়ল। স্পেনীয় ভাষায় বলল—হাত খোলার হুকুম নেই। বাঁধা হাত দিয়েই খেতে হবে। শাঙ্কো লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল—পেয়েছো কী? আমরা কি কুকুর বেড়াল? পাহারাদার শাঙ্কোর দিকে তাকাল। কোন কথা বলল না। শাঙ্কোর চিৎকার করে কথা বলা শুনে দু'জন মূর সৈন্য দরজায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস আস্তে বলল—শাঙ্কো মাথা গরম করো না। খেয়ে নাও। পেটপুরে খাও। শরীর ঠিক রাখো। শাঙ্কো বসল। তিনজনে খেতে লাগল রুটি ভেঙে ভেঙে। ঝোলটা ভালোই লাগল। খেতে খেতে ফ্রান্সিস পাহারাদারটিকে বলল—ভাই, তুমি তো মূর নও। পাহারাদারটি মাথা নাড়ল।

—নাম কী তোমার? ফ্রান্সিস বলল।

—কালমা। পাহারাদারটি বলল। খাওয়া হয়ে গেছে। ঘরের কোণায় রাখা পীপে থেকে কাঠের বাটিতে জল এনে ফ্রান্সিসদের কালমা জল খাওয়াল। কালমা এঁটো থালা নিয়ে চলে গেল। ঠঙ্ ঠঙাং—দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

একটু বেলা হল। আবার দরজা খুলল কালমা। ঢুকল সেই লম্বামত লোকটা। সালভাকে কী বলল। সালভা বলল—ফ্রান্সিস, আল আমিরির কাছে আমাদের হাজির করা হবে। সবাই উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের চিন্তা—আল আমিরি কেমন লোক। সালভার ওপর রাগ আছে। কিন্তু আমাদের কী করবে? আটকে রাখবে না ছেড়ে দেবে?

লম্বা দড়িগুলো থেকে খুলে হাত বাঁধা অবস্থাতেই ফ্রান্সিসদের সামনে পেছনে খোলা তরোয়াল হাতে চারজন সৈন্য। একটু এগোতেই মারিয়ার কয়েদঘর। লোহার দরজার ফাঁক দিয়ে ফ্রান্সিস দেখল ঘাসের বিছানায় মারিয়া চুপ করে বসে আছে। ফ্রান্সিসদের পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। সালভাকে বলল—সালভা লোকটিকে বললো—মারিয়াও যাক আমাদের সঙ্গে। সালভা লোকটিকে বলল সে কথা। লোকটি মারিয়ার দিকে তাকাল। কী ভাবল। কালমাকে দরজা খুলে দিতে ইঙ্গিত করল। দরজা খোলা হল। মারিয়া বেরিয়ে এল। বাইরের আলোয় ফ্রান্সিস দেখল মারিয়ার মুখ শুকিয়ে গেছে। হয়তো রাতে ঘুম হয়নি। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে এগোল। ভাবল মারিয়াকে না আনলেই ভালো হত। অন্ধকার থেকে হঠাৎ বাইরের উজ্জ্বল রোদে এসে ফ্রান্সিসদের তাকাতে অসুবিধে হচ্ছিল। চোখ কুঁচকে তাকাতে হচ্ছিল।

বাইরের চত্বরে নামল সবাই। চলল সামনের একটা কাঠের দরজার দিকে। দরজা দিয়ে একটা বিস্তৃত ঘরে ওরা ঢুকল। দিনের বেলায়ও ঘরটা কেমন

অন্ধকার। দেয়ালে মশাল জ্বলছে। একটা পাথরের লম্বাটে আসনে রঙচঙে কাপড় পাতা। দু'পা ছড়িয়ে একটু আয়েসী ভঙ্গীতে বসে আছে আল আমিরি। বেশ ফর্সা রঙ। চিবুকে সামান্য দাড়ি। লম্বা শক্তসমর্থ চেহারা। পরণে সাধারণ সাদাকালো রঙের জোব্বামত। আল আমিরির চোখের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বুঝল—লোকটা ধূর্ত আর ক্ষমতালোভী। তার দু'পাশের ছোট আসনে দু'জন আরবীয় বৃদ্ধ বসে আছে। বোধহয় আল আমিরির পরামর্শদাতা।

ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল। লম্বা লোকটি আদাবের ভঙ্গীতে সম্মান জানিয়ে কী বলে গেল। আল আমিরি ভরাট গলায় ডাকল—সালভা? সালভা একটু মাথা নিচু করল। আল আমিরি স্পেনীয় ভাষায় বলল—তুমি খুব বেঁচে গিয়েছিলে। এবার আর তোমার বাঁচার আশা নেই। একটু থেমে বলল—

—বল্ কোথায় আছে রামনের পাণ্ডুলিপি?

—আমি সত্যি জানি না সিনির (মহাশয়)। সালভা ভীতকণ্ঠে বলল। আল আমিরি ডান দিকে তাকিয়ে আঙ্গুল নেড়ে কী ইঙ্গিত করল। একটি খালি গা বলশালী মূর কালো লম্বা চামড়ার চাবুক শপাং-শপাং—প্রচণ্ড জোরে চাবুক চালাতে লাগল সালভার গায়ে। সালভা চিৎকার করে উঠল। চোখে জল এল ওর। আল আমিরি হাত তুলল। বন্ধ হল চাবুক মারা।

—এবার বল—নইলে—আল আমিরি গলা চড়াল। সালভা যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলল। বলল—সেই পাণ্ডুলিপি কোথায় আমি জানি না। বিশ্বাস করুন—আমি সত্যি কিছু জানি না।

—তুই রামনের মৃতদেহ নিয়ে গোর দিতে যাচ্ছিলি। তুই সব জানিস্। বল্—। আল আমিরি বলে উঠল।

—না-না। সালভা জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল—আমি কিছু জানি না। আবার আঙ্গুলের ইঙ্গিত। আবার চাবুকের মার। সালভার পিঠের দিকে পোশাক ছিঁড়ে গেল। রক্ত ফুটে উঠল পোশাকে। ও যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগল। ফ্রান্সিসের আর সহ্য হল না। ও বাঁধা দু'হাত ওপরে তুলল। বলল—আমার অনুরোধ—সালভাকে চাবুক মারা বন্ধ করুন। আল আমিরি একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। বলল—তাহলে সালভার হয়ে তুই চাবুকের মার খাবি?

—আমার কথাটা আগে শুনুন। তারপর আমাকে চাবুক মারতে চান মারবেন। ফ্রান্সিস বেশ দৃঢ়স্বরে বলল।

আল আমিরি আঙ্গুল তুলল। চাবুক মারা বন্ধ হল। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে রইল। দেখল—সালভা পাথরের মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসে গোঙাচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল—রামন লাল অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় সালভাদের ঘরে স্থান পেয়েছিলেন। মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি সালভাকে একটা নক্‌শা এঁকে দিয়েছিলেন। তারপরই বাকরোধ অবস্থায় তিনি মারা যান। ফ্রান্সিস থামল। শাঙ্কোকে বলল—জামার নিচ থেকে নক্‌শাটা বের কর। শাঙ্কো বাঁধা হাত ফ্রান্সিসের গলার কাছে জামার ফাঁক দিয়ে

ঢুকিয়ে নক্‌শাটা বের করে আনল। ফ্রান্সিস নক্‌শাটা বাঁধা হাতে ধরে বলল—এই সেই নক্‌শা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রামন লাল এই নক্‌শার মধ্যে সালভাকে হদিশ দিয়ে গেছেন—প্রথম পাণ্ডুলিপিটা তিনি কোথায় গোপনে রেখে দেশত্যাগ করেছিলেন। কারণ সালভা তাঁর স্নেহাস্পদ শিষ্য ছিল। আল আমিরি একজন সৈন্যকে ইঙ্গিত করল। সৈন্যটি এসে ফ্রান্সিসের হাত থেকে নক্‌শাটা নিয়ে আল আমিরিকে দিল। আল আমিরি খুব মনোযোগ দিয়ে নক্‌শাটা দেখতে লাগল। তারপর কিছুই বুঝতে না পেরে বলল—এই নক্‌শার তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তুই কী করে বুঝলি যে এটাতে গোপন পাণ্ডুলিপির হদিশ আছে? ফ্রান্সিস বলল—

—দেখুন রামন লাল বুঝেছিলেন যে তাঁর মৃত্যু আসন্ন। তখন তাঁর বাকরোধ হয়েছে। সালভাকে যে মুখে কিছু হদিশ বলবেন তার উপায় ছিল না। প্রায় অসাড় হয়ে আসা হাতে বেশি আঁকাও সম্ভব ছিল না। তাই খুব ছোট টানে নক্‌শাটা এঁকে দিয়েছিলেন। কোথাও কোথাও টান অস্পষ্ট হয়ে গেছে। আল আমিরি নক্‌শাটা আবার দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—লক্ষ্য করুন নিচে একটা ছোট চৌকোনোর মধ্যে হয়তো একটা বিন্দু বসাতে গিয়েছিলেন বা কিছু লিখতে চেয়েছিলেন। অসাড় হয়ে আসা হাতের কলমের টান বেঁকে নেমে এসেছে। আর আঁকতে পারেননি। আল আমিরি ভালো করে নক্‌শাটা দেখতে দেখতে বলল—তোর বুদ্ধি আছে দেখছি। ফ্রান্সিস বলল—আর একটা কথা। নক্‌শাটার মধ্যে যে জায়গাটার ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই সালভার পরিচিত জায়গা। কারণ সালভাকেই তিনি হদিশটা দিয়ে গেছেন। আল আমিরি এবার একটু উঠে পাথরের আসনে ভালো করে বসল। বলল—তুই তো ভিনদেশী—পারবি এই নক্‌শার নির্দেশ বের করতে?

—এখনই সেটা বলতে পারবো না। পালমার রাজপ্রাসাদে সালভা রামন লালের কাছে বেশ কয়েক বছর পড়াশুনো করেছে। এই পড়াশুনোর জায়গাটা রামন লাল যেখানে থাকতেন—মানে সেইসব জায়গাগুলো ভালো করে দেখতে হবে। এর জন্যে সালভাকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে। ওর সাহায্য ছাড়া কিছুই করা যাবে না। ওকে নিয়েই আমাকে পালমার রাজপ্রাসাদে যেতে হবে। কারণ মৃত্যুকালে রামন লাল অনেক কষ্টে আলমুদাইলা মানে পালমার রাজপ্রাসাদের নাম বলেছিলেন।

—হুঁ। আল আমিরি একটু ভাবল। তারপর বলল—ঠিক আছে সালভা যাবে তোর সঙ্গে। তোরা পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করে গোপনে এখানে নিয়ে আসবি।

—আমি চেষ্টা করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু একটা শর্ত আছে। আল আমিরি আবার পা ছড়িয়ে বসতে বসতে বলল। ফ্রান্সিস বুঝল—আল আমিরি অত সহজে ওদের ছেড়ে দেবে না। আল আমিরি মারিয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলল—

—এ কে? ফ্রান্সিস বলল—আমাদের দেশের মাননীয়া রাজকুমারী।

—তা রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এখানে এসেছে কেন? আল আমিরি বলল।

—আমি ওঁর স্বামী। তাই আমার সঙ্গে এসেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

আল আমিরি এবার একটু ভদ্র হবার চেষ্টা করল। মুখে শব্দ করল—হুঁ। তারপর দেঁতো হাসি হেসে বলল—তোমরা যতদিন না পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে নিয়ে আসছো ততদিন তোমার স্ত্রী এখানে কয়েদঘরে বন্দী থাকবে। কী? রাজি?

ফ্রান্সিস এ ধরনের একটা কিছু আগে থেকেই আঁচ করেছিল।

ও বলল—বেশ, আমি আপনার শর্তে রাজি আছি।

মারিয়া চমকে উঠে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। বলল—

—কী বলছো তুমি? শাঙ্কোও বলে উঠল—ফ্রান্সিস—এরকম একটা সাংঘাতিক শর্তে তুমি রাজি হলে? তোমার কি মাথা খারাপ হল? ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

আল আমিরি বলল—তোমরা কালকে পালমা রওনা হবে।

এবার আর একটা শর্ত—তোমরা কাউকে বলতে পারবে না যে আমি এই পালমা নোভার দুর্গ অধিকার করে এখানেই আছি। যদি বলো—

—ঠিক আছে। আমরা বলবো না—ফ্রান্সিস বলল—এবার আমাদের বাঁধা হাত খুলে দিতে বলুন।

—না এখন নয়—কালকে যখন রওনা হবে তখন। আল আমিরি বলল। ফ্রান্সিস বলল—বেশ—কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে।

—বলো। আল আমিরি বলল। মারিয়াকে দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—

—রাজকুমারী মারিয়া কয়েদঘরের জীবনে অভ্যস্ত নন। মারিয়াকে দুর্গের অন্দরমহলে নজরবন্দী করে রাখুন—আপত্তি নেই।

—ভেবে দেখি—আল আমিরি বলল।

—সালভার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন—আমার অনুরোধ—ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। আল আমিরি মুখে শব্দ করল। ফ্রান্সিস বলল—এবার তাহলে নক্শাটা দিন। ওটা নিয়ে তো আমাকে ভাবতে হবে। আল আমিরি নক্শাটা একজন সৈন্যকে ইশারায় ডেকে দিল। ফ্রান্সিস নক্শাটা নিয়ে ফিরে দাঁড়াল। শাঙ্কো গিয়ে আহত সালভাকে বাঁধা হাতে কোনরকমে উঠে দাঁড় করাল। নিজে নিচু হয়ে বসল। দু'হাত বাঁধা সালভাকে নিজের পিঠের ওপর ভর রাখতে বলল। সেইভাবে সালভাকে প্রায় পিঠে করে নিয়ে চলল।

মূর সৈন্যদের পাহারায় ওরা ঘরের বাইরে এল। পাথুরে চত্বর দিয়ে চলল কয়েদঘরের দিকে। ফ্রান্সিস মারিয়ার থমথমে মুখের দিকে তাকাল। বুঝল—মারিয়া রাগ করেছে। হাঁটতে হাঁটতে আস্তে ডাকল—মারিয়া। মারিয়া বেশ বিরক্ত গলায় বলল—তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—সঠিক মুহূর্তে বুঝতে পারবে শর্তে রাজি হয়ে আমি ভুল করেছি না ঠিক করেছি। মাথা ঠাণ্ডা রাখো। এখন রাগারাগির সময় নয়। মারিয়া কিছু বলল না। হাঁটতে লাগল।

মারিয়া নিজের কয়েদঘরে ঢুকে পড়ল। ফ্রান্সিসরাও নিজেদের ঘরে ঢুকল। শাঙ্কো প্রায় পিঠে করে সালভাকে নিয়ে ঢুকল। সালভা দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। শুয়ে

পড়ল। কালমা দরজা বন্ধ করে দিল। ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। বাঁধা হাত মাথার নিচে রাখল। অনেক চিন্তা মাথায়।

ঠং—ঠঠাং শব্দ তুলে দরজা খুলে গেল। একজন পাকা দাড়ি গোঁফঅলা বৃদ্ধ ঢুকল। মাথায় হলদে কাপড়ের ফেট্টি। গলায় নীলরঙের পাথরের মালা। কাঁধে একটা ছোট কাপড়ের বোঁচকামত ঝোলানো। কালমা বলে উঠল—বৈদ্যি। বৈদ্যি বোঁচকা নামিয়ে বসল সালভার কাছে। সালভা উঠে বসল। বৈদ্যি ওর পিঠের দিকের পোশাকটা তুলল। দেখা গেল পিঠে চাবুকের কালশিটে দাগ। কয়েকটা জায়গা বেশ কেটে গেছে। চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। বৈদ্যি বোঁচকা থেকে একটা কাঠের ছোট বাটি বের করে রাখল। শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে জল আনতে ইঙ্গিত করল। শাঙ্কো উঠে কোণা থেকে জল নিয়ে এল। বৈদ্যি বোঁচকা থেকে একটা লাল কাপড়ের টুকরো বের করল। একটা কাঠের ছোট লম্বা কৌটো বের করল। কৌটো থেকে কীসের গুঁড়ো নিয়ে জলে ফেলল। জলটা কালো হয়ে গেল। কাপড়ের টুকরোটা সেই জলে ভিজিয়ে সালভার ক্ষতস্থানে বুলিয়ে দিতে লাগল। সালভা প্রথমে একটু কঁকিয়ে উঠল। তারপর চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ ওষুধটা লাগাল বৈদ্যি। তারপর কী বলে চলে গেল। কালমা দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে বলল—বৈদ্যি আবার সন্ধ্যেবেলা আসবে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ফ্রান্সিস নক্‌শাটা নিয়ে বসল। অনেকক্ষণ ধরে দেখে দেখে বুঝল যে জায়গাটা খুব কম টানে কাগজে আঁকা হয়েছে। সেই জায়গাটা রামন লাল আর সালভা দু'জনেরই খুব পরিচিত। জায়গাটা পালমার রাজপ্রাসাদেরই কোন জায়গা। ফ্রান্সিস ডাকল—সালভা। সালভা শোয়া অবস্থায়ই ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—সালভা তোমরা কোথায় থকতে? পড়াশুনো করতে?

—আলমুদাইনা রাজপ্রাসাদের দক্ষিণকোণে। সালভা বলল।

—রামন লালও কি ওখানেই থাকতেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ—আরো কয়েকজন পণ্ডিতও থাকতেন। সালভা বলল।

—তাঁরাও কি রামন ল্যালের মতই পণ্ডিত ছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। রামন লাল ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। দেশের লোক তাঁর নাম দিয়েছিল—ডক্টর ইলিউমিনাডো।

—তাহলে তো এ দেশের খুব সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

—নিশ্চয়ই। সালভা বলল।

'সন্ধ্যে হ'ল। বৈদ্যি আবার এসে ওষুধ দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস বলল—সালভা—এখন কেমন লাগছে? সালভা দুপুর থেকেই উঠে বসে ছিল। হেসে বলল—অনেকটা ভালো।

রাত হতেই ফ্রান্সিস বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। ঘাসের বিছানায় পায়চারি করতে লাগল। শাঙ্কো বুঝল ফ্রান্সিস পালাবার ফন্দী আঁটছে। ফ্রান্সিস লোহার দরজার

কাছে গেল। দেখল কালমা খোলা তরোয়াল হাতে বারান্দায় পাহারা দিচ্ছে। মারিয়ার ঘরের সামনেও একজন মূর পাহারাদার। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকল—

কালমা? কালমা এগিয়ে এল।

—খেতে টেতে দাও। ফ্রান্সিস বলল।

—এখনও সময় হয়নি। কালমা বলল।

—কী মুস্কিল। ভীষণ খিদে পেয়েছে যে। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। কালমা মারিয়ার ঘরের দিকে গেল। ওখানকার মূর পাহারাদারটিকে কী বলল। চলে গেল। এবার ঐ পাহারাদারটি দুটো ঘরের সামনেই খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস দেখল—মুস্কিল। এই মূরটাকে তো সরাতে হয়। ফ্রান্সিস দরজার কাছে মুখ নিয়ে নিজেদের দেশীয় ভাষায় চিৎকার করে বলল—মারিয়া শুনতে পাচ্ছো? মারিয়ার কানে ডাক পৌঁছল। ও চমকে চেঁচিয়ে বলল—

—হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। ফ্রান্সিস আবার চেঁচিয়ে বলল—

—চিৎকার কান্নাকাটি জুড়ে দাও। তাড়াতাড়ি। মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো তারপরই গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দিল। মূর পাহারাদারটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ও কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ও জাতিতে মূর। ফ্রান্সিসদের কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝল না। ও একবার ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে আর একবার মারিয়ার ঘরের সামনে ছুটোছুটি করতে লাগল। এবার ফ্রান্সিসের শেখানোমত সালভা আরবীতে বলল—শিগগির দেখ ঐ রাজকুমারীর কী হয়েছে? যদি রাজকুমারীর কিছু হয় আল আমিরি তোমার মুণ্ডু উড়িয়ে দেবে। পাহারাদারটি ছুটে গেল মারিয়ার ঘরের দিকে। এত জোরে মারিয়া কখনও চ্যাঁচায়নি। ওর গলা ভেঙে গেল। তবু চ্যাঁচাতে লাগল। কাঁদতে লাগল।

ফ্রান্সিস এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। চাপাস্বরে বলল শাঙ্কো—ছোরাটা। শাঙ্কো ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। মাথাটা নিচু করল। ফ্রান্সিস ওর পোশাকের মধ্যে দিয়ে বাঁধা হাত দুটো গলিয়ে দিয়ে ছোরাটা বের করে আনল। শাঙ্কো ওর বাঁধা হাতদুটো এগিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস বাঁধা হাতে দ্রুত শাঙ্কোর হাতবাঁধা দড়িতে ছোরাটা ঘষতে লাগল। তাড়াহুড়োয় ছোরার মুখটা এদিক ওদিক সরে যেতে লাগল। ছোরার খোঁচা লেগে শাঙ্কোর হাত কেটে ছড়ে গেল। রক্ত বেরোলো। শাঙ্কো চুপ করে রইল। দড়ি বেশ কিছুটা কেটে যেতেই শাঙ্কো এক ঝটকা টানে দড়িটা ছিঁড়ে ফেলল। খোলা হাতে ফ্রান্সিসের হাতবাঁধা দড়ি কাটতে লাগল। এবার দড়ি তাড়াতাড়ি কেটে গেল। শাঙ্কো যখন সালভার হাতের দড়ি কাটছে তখন ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলে উঠল—মারিয়া চুপ। মারিয়া কান্না চ্যাঁচামেচি থামাল। ওদিকে দু'তিন জন সৈন্য ছুটে এসেছে মারিয়ার ঘরের সামনে। ওখানকার পাহারাদারটি হড়বড় ক'রে সৈন্যদের কী বলল। ফ্রান্সিসরা লম্বা দড়ি হাতে পেঁচিয়ে চুপ করে ঘাসের বিছানায় বসে রইল। ও ঘরের পাহারাদারকে নিয়ে সৈন্য কজন ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে এল।

দেখল—কয়েদীরা শান্তভাবে বসে আছে। হাতে দড়ি বাঁধা। সৈন্য ক'জন চলে গেল। মূর পাহারাদারটি আবার খোলা তরোয়াল নিয়ে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগল।

কালমা ছোট বড় কাঠের থালায় খাবার নিয়ে এল। মারিয়ার ঘরের দরজা খুলে দিল। মূর পাহারাদারটি খাবার দিল মারিয়াকে। কালমা ফ্রান্সিসদের ঘরের দরজা খুলে খাবার নিয়ে ঢুকল। কালমার কোমরের খাপে তরোয়াল গোঁজা। নিচু হয়ে কালমা থালা নামাচ্ছে তখনই ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। কালমা সরে উঠে দাঁড়িয়েছে। শাঙ্কো এক লাফে ছুটে গিয়ে কালমার গলায় ছোরাটা চেপে ধরল। কালমা তো অবাক। ফ্রান্সিসও লাফিয়ে উঠে কালমার তরোয়ালটা এক হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল। তরোয়ালের ডগাটা কালমার গলায় চেপে ধরল। দাঁতচাপাস্বরে বলল—টুঁ শব্দটি করেছো কি মরেছো। শাঙ্কো ছোরা দিয়ে কালমার বর্মের চামড়ার ফিতে কেটে দিল। খোলা ভারি বর্মটা আস্তে আস্তে ঘাসের বিছানায় নামিয়ে রাখল যাতে কোন শব্দ না হয়। খোলা পাথরের মেঝেয় পড়লেই শব্দ হত। পাশের ঘরের মূর পাহারাদারটির কানে শব্দ পৌঁছতো।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—শাঙ্কো—কালমাকে সামলাও। ফ্রান্সিস তরোয়াল নামাল। শাঙ্কো কালমার বুকে ছোরা চেপে ধরল।

ফ্রান্সিস কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। পাথরের দেয়ালে গা ঘেঁষে মারিয়ার কয়েদঘরের দিকে চলল। আসতে আসতে দেখল সামনের চত্বরে কোন সৈন্য নেই। চত্বরের পরে কাঠের সদর দরজার কাছে মশাল জ্বলছে। তার আলোয় দেখল কয়েকজন মূর সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে।

মারিয়ার ঘরের দরজার কাছে উঁকি দিয়ে দেখল মূর পাহারাদারটি জল ঢেলে দিচ্ছে । মারিয়া আঁজলা ভবে জল খাচ্ছে। পাহারাদারটি বেশ তাগড়াই জোয়ান। ওর সঙ্গে তরোয়ালের লড়াই চালানো যাবে না। শব্দ হবেই। লড়াই করতে করতে মূর পাহারাদারটিও দরজার কাছে দাঁড়ালো। মূর সৈন্যদের চেঁচিয়ে ডাকতে পারে। না—অন্যভাবে ওকে ঘায়েল করতে হবে যাতে টুঁ শব্দটিও গলা দিয়ে না বেরোয়। দেয়ালের আংটায় আটকানো দুটো মশাল জ্বলছে। মশালের আগুন হাওয়ায় কাঁপছে। পাহারাদারটি ঘর থেকে বেরোলেই ওকে দেখে ফেলবে। ফ্রান্সিস পাথরের দেয়ালে যেন সেঁটে রইল। পাহারাদারটি মারিয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিচ্ছে তখনই ফ্রান্সিস এক লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাহারাদারটির ওপর। আচমকা প্রচণ্ড ধাক্কায় পাহারাদারটি লোহার দরজায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথার পেছনে তরোয়ালের বাঁট দিয়ে জোরে ঘা মারল। পাহারাদারটি লোহার দরজায় ঘাড় গুঁজে পড়ল। তারপর জ্ঞান হারিয়ে বারান্দায় গড়িয়ে পড়ল। আর উঠল না। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—মারিয়া। মারিয়া অবাক চোখে এই কাণ্ড দেখছিল। ডাক কানে যেতেই ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দু'জনে ছুটে এল শাঙ্কোদের ঘরে। ফ্রান্সিস হাতের ইশারায় শাঙ্কো আর সালভাকে ডাকল। কালমার

পিঠে ছোরা চেপে ধরল শাঙ্কো। বলল, চলো। ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ফ্রান্সিস আংটায় রাখা জ্বলন্ত মশালটা তুলে ছুঁড়ে ফেলল ঘাসের বিছানায়। শুকনো ঘাসে আগুন লেগে গেল।

বারান্দা দিয়ে নিঃশব্দে চলল ওরা। ফ্রান্সিস বারান্দার একটা জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে ফেলল মারিয়ার কয়েদ ঘরটায়। ও ঘরেও আগুন লেগে গেল। অজ্ঞান মূর পাহারাদারটি তখনও বারান্দায় পড়ে আছে। ওকে ডিঙিয়ে পার হ'ল সবাই। এবার ফ্রান্সিস কালমার পিঠে তরোয়ালের ডগা ঠেকিয়ে বলল—কালমা—মরণজলা দিয়ে পালাবো আমরা। মরণজলায় নিয়ে চলো। কালমা চমকে উঠল। ভয়ার্তস্বরে বলে উঠল—না-না-মরণজলা পার হতে পারবে না। মারা পড়বে।

—এখানে থাকলেও মরবো। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু—কালমা কী বলতে গেল।

—কোন কিন্তু না। —তিনজন বন্দী ঐ পথে পালিয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—পরে ওদের কেউ দেখেনি। কালমা বলল।

—পলাতকরা কি পালানোর গপ্‌পো বলে বেড়ায়। নিশ্চয়ই ওরা পালাতে পেরেছিল। তাড়াতাড়ি চলো। ফ্রান্সিস তাড়া লাগাল।

ওদিকে কয়েদঘরে ধোঁয়া আগুন ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে। মূর সৈন্যরা হৈ হৈ করে উঠল। বারান্দায় পরেই বাঁ দিকে অন্ধকার ঢালু পাথুরে জমি। ফ্রান্সিসরা সেই পাথুরে জমিতে ততক্ষণে নেমে পড়েছে। অল্প চাঁদের আলোয় ওরা দ্রুত চলেছে।

বেশ কিছুটা নেমে শুরু হল এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পাথর জংলা গাছ ঘাস ঢাকা জায়গা। কালমা সবার আগে নামতে লাগল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। ওদিকে মূর সৈন্যদের হৈ হল্লা চলছে তখন। আগুন নেভানো চলছে। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—কালমা জল্‌দি।

একটু পরেই সামনে বিরাট দেয়াল। কালো রঙের পাথরের। কালমা দেয়ালের নিচে একটা ছোট কাঠের দরজার সামনে এসে হাঁপাতে লাগল। দরজায় একটা তালা ঝুলছে। এখন হাঁপাচ্ছে সকলেই। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় কালমা চাবির গোল রিং-এ চাবি খুঁজতে লাগল। মারিয়ার দু'হাত তখনও বাঁধা। শাঙ্কো ছোরা দিয়ে তাড়াতাড়ি বাঁধা দড়ি কেটে দিল। মারিয়া মরণজলা কথাটা শুনে পর্যন্ত ভীষণ চিন্তায় পড়েছে। ও আর থাকতে না পেরে ফ্রান্সিসকে বলল—মরণজলা পার হতে পারবে?

—পারতেই হবে। নইলে এই দুর্গে পচে মরতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। কালমার দুটো চাবি লাগল না। তারপরেরটা ঢুকিয়ে চাপ দিতেই কড়াৎ—তালা খুলে গেল। শাঙ্কো ছোট দরজাটা খুলে দিল। প্রথমে শাঙ্কো ঢুকে গেল। তারপর সালভা মারিয়া। ফ্রান্সিস যখন ঢুকছে তখন শুনল কালমা বিড় বিড় করে বলছে—যীশু তোমায় রক্ষা করুন। ফ্রান্সিস একবার কামলার দিকে তাকিয়ে দরজা পার হল।

ছপ্ ছপ্ হাঁটুর নিচ অব্দি কাদাজলে ডুবে গেল সকলের। চারদিকে চাঁদের অনুজ্জ্বল আলো। এখানে অন্ধকার কাটে নি তা'তে।

ফ্রান্সিস সামনে তাকিয়ে দেখল—লম্বা লম্বা বুনো ঘাসের জঙ্গল। আশ্চর্য! ঘাসগুলো সবুজ নয়। মরা ঘাসের মত হলুদ ঘাসের বনের এখানে ওখানে ঘন কুয়াশা জমে আছে। বুনো ঘাসের জঙ্গলের উপরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সাদাটে কুয়াশা ঢাকা। বোঝাও যাচ্ছে না—এই বন কতদূর বিস্তৃত। ওদিকে দুর্গের মধ্যে মূর সৈন্যদের চিৎকার চ্যাঁচামেচি কমে এসেছে। ফ্রান্সিস বলল—সালভা—মূর সৈন্যরা কি আমাদের ধাওয়া করতে পারে?

—পাগল হয়েছেন। এই মরণজলার কথা ওরা এরমধ্যেই ভালো ক'রে জেনে গেছে। সালভা বলল।

—জলাটা কতদূর ছড়িয়ে আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—বড় রাস্তা থেকে তো বহুদিন দেখে আসছি। জলাটা ডাইনে বাঁয়ে লম্বাটে। কিন্তু পাশে কম। উত্তরমুখো গেলে পার হতে কম সময় লাগবে। সালভা বলল। ফ্রান্সিস তরোয়াল হাতে ঘাসের বনের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে গলা চড়িয়ে বলল—উত্তরমুখো চলো। আমার পেছনে পেছনে এসো। সবাই ঘাসের বনে ঢুকল।

জলকাদা ভেঙে চলল। উঁচু উঁচু ঘাসের জঙ্গলে ওরা ঢাকা পড়ে গেল। শুধু মাথার ওপরে সাদাটে মেঘের আকাশ আর অনুজ্জ্বল চাঁদ। দিক ঠিক রেখে ফ্রান্সিস এগিয়ে চলল। পেছনে মারিয়া, শাঙ্কো, সালভা। কাদাজলের নিচে পাথরকুচি রয়েছে। ওরা এগিয়ে চলল। ফ্রান্সিস তরোয়াল চালিয়ে ঘাস কাটতে কাটতে এগিয়ে যেতে লাগল। তরোয়ালের কোপে হলুদ ঘাসগুলো বেশি কাটছে না। যতখানি কাটা পড়ছে তার মধ্যে দিয়েই ওরা চলল। শুধু জলকাদা ভাঙার ছপ্‌ছপাৎ শব্দ। চারদিকে আর কোন শব্দ নেই। চারপাশের ঘাসগুলো ওদের গায়ে মুখে হাতে ঘষে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস হাতে জ্বালা অনুভব করল। চাঁদের অল্প আলোয় দেখল—ধারালো ঘাসের ঘষায় হাত আঁচড়ে গেছে। সেই জায়গাগুলোয় জ্বালা শুরু হ'ল। মারিয়া বলে উঠল—ফ্রান্সিস হাতে-মুখে ভীষণ জ্বালা করছে। শাঙ্কো সালভাও বলে উঠল—হাত-মুখ জ্বালা করছে। ফ্রান্সিস অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখল—মারিয়ার সারা মুখে ঘাসের আঁচড়ের দাগ। অল্প রক্তেরও দাগ এখানে ওখানে। হাতে-মুখে জ্বালা সহ্য করতে করতে ফ্রান্সিস বুঝল—কেন এটাকে মরণজলা বলে।

জলকাদা ঠেলে চলতে চলতে তখন ভীষণ হাঁপাচ্ছে সবাই। একদিকে পা সাবধানে ফেলতে হচ্ছে। দু'হাতে সরাতে হচ্ছে ঘাসের বাধা। তারপর প্রায় অন্ধকারে হাঁটতে হচ্ছে। তার ওপর আঁচড়কাটা হাতে-মুখে জ্বলুনি।

কতদূর এল। আরো কতদূর যেতে হবে—কিছুই বুঝতে পারছে না ওরা। মারিয়া আর সহ্য করতে পারল না। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—ফ্রান্সিস—সারা গা জ্বলে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস হাঁটতে হাঁটতে বলল—ভাবো যে, দেশের রাজধানীর পাথরবাঁধানো পরিষ্কার পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছো, দেখবে পারছো। মারিয়া মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে

নিতে এলোমেলো পা ফেলে চলল। আর পারল না। ভীষণ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল—ফ্রান্সিস আমি পড়ে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। তরোয়ালটা কোমরে গুঁজল। দু'হাত নিচু করে এক হ্যাঁচকা টানে মারিয়াকে তুলে কাঁধে শুইয়ে দিল। তারপর বাঁ হাতে মারিয়াক চেপে ধরে হাঁটতে লাগল। আস্তে আস্তে সকলেরই সারা গায়ে জ্বলুনি শুরু হল। শাঙ্কো মুখ বুঁজে সহ্য করতে লাগল। একে সালভা চাবুকের মার খেয়ে আহত। বৈদ্যির ওষুধে একটু সুস্থ হ'য়েছিল। এখন এই পরিশ্রম, সারা শরীরে জ্বলুনি। ওর মুখ থেকে গোঙানির শব্দ শোনা গেল। ফ্রান্সিস ডান হাত বাড়িয়ে সালভাকে চেপে ধরে রাখল যাতে পড়ে না যায়। সালভা এলোমেলো পা ফেলে চলল।

হঠাৎ ঘাসের জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পায়ের নিচে শক্ত পাথুরে জমি ঠেকল। সালভা অনেক কষ্টে সামনের দিকে তাকাল। ঘাসের বন শেষ। আবছা দেখল একটা ঘাসে ঢাকা টিলা। সালভা সমস্ত গায়ের শক্তি একত্র করে চিৎকার করে উঠল—ফ্রান্সিস—আমরা এসে গেছি। সামনে—টিলা।

আস্তে আস্তে হেঁটে ওরা পাথুরে জমিতে উঠল। প্রায় ভেঙে-পড়া শরীর নিয়ে টলতে টলতে গিয়ে সালভা পাথুরে জমিতে শুয়ে পড়ল। শাঙ্কোও বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে কাঁধ থেকে মারিয়াকে নামিয়ে দিল। মারিয়া শুয়ে পড়ল। চোখ বোঁজা ফ্রান্সিস মারিয়ার এই অসাড় অবস্থা দেখে চমকে উঠল। ডাকল—মারিয়া? মারিয়া চোখ মেলে তাকাল। একটু হাসল। ফ্রান্সিস হেসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে পাথুরে জমিতে বসে পড়ল। তাকিয়ে রইল মরণজলার দিকে। তারপর শুয়ে পড়ল।

পূব-আকাশ লাল হয়ে উঠল। একটু পরেই সূর্য উঠল। আস্তে আস্তে রোদের তেজ বাড়তে লাগল। এতক্ষণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে থাকা ফ্রান্সিসরা যেন শরীরে একটু সাড় পেল। প্রথমে ফ্রান্সিসই উঠে বসল। দেখল রোদ পড়েছে টিলার গায়ে মরণজলায় দূরের দুর্গের মাথায়। হাতে মুখের জ্বালাভাবটা এখনও আছে। এ যে বাড়ে নি। ও তাকাল পায়ের দিকে। প্রায় হাঁটু পর্যন্ত জলকাদায় মাখামাখি। গায়ের পোশাকেও জলকাদার ছিটে। পায়ের কালো কাদা এখনও শুকোয় নি। শাঙ্কোদের দিকে তাকাল। ওদেরও এক অবস্থা। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকল—শাঙ্কো, সালভা—ওঠো। ডাক শুনে মারিয়া উঠে বসল। একে একে শাঙ্কো আর সালভা উঠল। ফ্রান্সিস নিজের ঢোলা পোশাকটার মধ্যে ঢোলা গলা দিয়ে হাত ঢোকাল। নকশাটা বের করে আনল। যাক—নকশাটা ঠিকই আছে। জল কাদা লেগে আঁকা মুছে যায়নি।

সালভা বলল—ফ্রান্সিস—টিলাটার ওপাশে চাষীদের বসতি আছে। ফ্রান্সিস বলল—ওখানে বৈদ্যিটদ্যি পাওয়া যাবে। সবারই হাত মুখ ঘাসের ঘষায় যেভাবে আঁচড়ে গেছে। জ্বালা জ্বালাভাব। ওষুধ চাই। —খোঁজ নিয়ে দেখি। চলুন। সালভা উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসও উঠে দাঁড়াল। বলল—শাঙ্কো—মারিয়া চলো।



ওরা আস্তে আস্তে হেঁটে চলল টিলাটার পেছন দিকে। একটু এগিয়ে যেতেই দেখল কিছু গাছপালা। তারই পরে দেখা যাচ্ছে পাথরের কিছু বাড়িঘর।

ওরা বাড়িগুলোর কাছে আসতেই বাড়ির বাইরে স্ত্রীপুরুষ যারা ছিল তারা ওদের দেখল। জলকাদামাখা মানুষগুলো কোত্থেকে এল? সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কে চেঁচিয়ে বলল—কারা আসছে গো? বাড়িঘর থেকে আরো মেয়েপুরুষ বেরিয়ে এল। হঠাৎ সালভা ওদিকে ছুটতে ছুটতে ডাকল—বাবা-আ। দেখা গেল জেলেদের পোশাক পরা একজন মধ্যবয়স্ক লোক দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। সালভা ছুটে গিয়ে ওর বাবাকে জড়িয়ে ধরল। একটি ছোট ছেলে আর একটি অল্পবয়সী মেয়েও ছুটে এসে সালভাদের ঘিরে দাঁড়াল। দুটি ছেলেমেয়েই খুশির হাসি হাসছে। বোঝা গেল সালভার ভাই বোন। সালভা ওর বাবার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। ফ্রান্সিসরা এসে ওখানে দাঁড়াল। সালভা বলল—ফ্রান্সিস—আমার বাবা ভাইবোন বেঁচে আছে। মুর সৈন্যরা আমাদের বস্তীতে আগুন লাগিয়েছিল। অনেকেই পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে।

—তোমার মা? মারিয়া বলল।

—কয়েক বছর আগে মাকে হারিয়েছি। সালভা বলল।

—বাবা—এখানে কোন বৈদ্যি আছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তোরা স্নানটান করে আয়—আমি বৈদ্যিবুড়োকে ডেকে আনছি। সালভার বাবা চলে গেল।

সালভার বোনটি তখনও মারিয়ার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। মারিয়ার হাতে সারা মুখে আঁচড়ের মত দাগ। জলকাদা মাখা পোশাক। মারিয়া বেশ অস্বস্তিতে পড়ল। চলল বাড়িগুলোর পেছন দিকে। সালভা বলল—ফ্রান্সিস চলো স্নান সেরে নি। শরীরের যা অবস্থা। সালভা চলল—ঢালু উপত্যকার দিকে। ফ্রান্সিস শাঙ্কোও চলল। ওর পেছনে পেছনে নেমে আসতেই দেখল—দু'তিনটে পাথরের গা বেয়ে ছোট ঝর্ণার জল নেমে আসছে। ঝির্‌ঝির্ ঝর্ণার জল পাথর-ঘেরা একটা জায়গায় হাঁটু অব্দি জমে আছে। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো স্নান করতে লাগল। সালভার পিঠের চাবুকের ঘা তখনও তো সারে নি। সালভা হাঁটু পর্যন্ত ভালো করে ধুল। মাথায় বুকে জল দিল। ঐ যা স্নান হল ওর।

স্নান সেরে ওরা ফিরে এল। দেখল একটা ঘরের সামনে একটা পাথরের ওপর মারিয়া স্নান সেরে চাষী মেয়েদের পোশাক পরে বসে আছে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে একজন বুড়ো। হাতের একটা পুঁটুলি খুলছে। বোঝা গেল—বৈদ্যিবুড়ো। একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় বৈদ্যি একটা কাঠের বাটি ভর্তি জল তুলে নিল। পুঁটুলিটা জলে নাড়তে লাগল। আস্তে আস্তে জলের রঙ হলুদ হয়ে গেল। এবার বৈদ্যিবুড়ো ঐ পুঁটুলিটা মারিয়ার আঁচড় কাটা হাতে মুখে গলায় বুলোতে লাগল। কয়েকবার বুলোতেই মারিয়া হেসে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। —বলল—আঁচড়গুলোর জ্বালা অনেক কমে গেছে। মারিয়ার পর ফ্রান্সিসদেরও বদ্যিবুড়ো ওষুধ লাগিয়ে দিল। সবাইয়ের জ্বালা

কমে গেল। সালভা পিঠের ঘা-এর কথা বলল। পোশাক খুলে দেখাল। বৈদ্যিবুড়ো ওষুধ তৈরি করতে বসল। ওদিকে বাড়ির মেয়েরা ফ্রান্সিসদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল।

সালভাকে ওষুধ দিয়ে বৈদ্যিবুড়ো ওষুধের ঝোলা গোছাতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—সত্যি আপনার ওষুধে অনেক উপকার হল। জ্বালাভাবটা প্রায় নেই বললেই হয়। বৈদ্যিবুড়ো ফোকলামুখে হাসল। বলল—মরণজলার মত লম্বা লম্বা ঘাস এখানে অনেক জায়গায় আছে। এই ঘাস শুকিয়ে ঘরের ছাউনিতে লাগে। ঘাস কাটতে গিয়ে ধারালো ধারগুলোয় লেগে হাতমুখ নখের আঁচড়ের মত কেটে যায়। জ্বালা করে। এই ওষুধেই সেরে যায় সে সব।

—তবে মরণজলার ঐ নাম হয়েছে কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল। বৈদ্যিবুড়োর মুখ গম্ভীর হল। বলল—তোমরা ভিনদেশী জানো না। মরণজলার ঘাসের আঁচড় সেরে যায়। কিন্তু মরণজলার মারাত্মক জলেকাদায় তুমি যদি একবার পড়ে যাও—ঐ আঁচড়কাটা জায়গা বিষিয়ে উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি জ্ঞান হারাবে—তারপর—। বৈদ্যিবুড়ো চুপ করে গেল। তারপর আপনমনে হেঁটে চলে গেল। সে কি! মারিয়া ভীতমুখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ভয়ার্ত স্বরে বলল—ফ্রান্সিস—আমরা—মানে—আমরা—। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল। বলল—হ্যাঁ—আমরা বেঁচে আছি। শাঙ্কো দু'হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ল। কী সাংঘাতিক! মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে ওরা।

ফ্রান্সিসরা সেই রাতটা ঐ চাষীদের বসতিতেই কাটাল। ওদের একটা ঘর চাষীরা ছেড়ে দিয়েছিল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল সালভাকে ডেকে আনতে। সালভা এল। দেখা গেল সালভা ওর তরোয়াল কাটা চাবুকে ছেঁড়া পোশাকটা পাল্টে নতুন পোশাক পরেছে। ফ্রান্সিস বলল—সালভা তোমার শরীর এখন কেমন? সালভা বলল—এমনিতে ভালোই। তবে বৈদ্যিবুড়ো বলল—পিঠের ঘা এখনো সম্পূর্ণ সারে নি। আর দু'দিন ওষুধ পড়লেই সেরে যাবে।

—কিন্তু আমরা তো বেশি দেরি করতে পারবো না। তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরতে হবে আমাদের । বন্ধুরা চিন্তায় পড়বে নইলে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আপনারা এখন কী করবেন? জাহাজে ফিরে যাবেন? সালভা বলল।

—না না। এখন রাজধানী পালমায় যাবো।

আলিমুদাইনা রাজপ্রাসাদে রামন ল্যুলের প্রথম পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ চলুন। সালভা বলল।

—কিন্তু তুমি তো এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নও। মারিয়া বলল।

—ওষুধ নিয়ে যাবো—লাগাবো। আমি যেতে পারবো। সালভা বলল। ফ্রান্সিস

বলল—এবার বলো তো—রাজধানী পালমাতে আমরা কোন পথ দিয়ে যাবো?

—একটা তো রাস্তা, মানে বড় রাস্তা। পালমা নোভার ঐ দুর্গের পাশ দিয়েই রাস্তাটা এসে এখান থেকে একটু দূর দিয়ে সোজা রাজধানী পালমাতে চলে গেছে। সালভা বলল। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—

—কিন্তু আল আমিরির মূর সৈন্যরা নিশ্চয়ই রাস্তাটা পাহারা দিচ্ছে যাতে কেউ রাজধানীতে যেতে না পারে।

—হ্যাঁ তা বটে। ঠিক আছে আমি যাচ্ছি গোপনে খোঁজ-খবর করে আসছি। সালভা বলল। তারপর চলে গেল।

দুপুরের আগেই সালভা ফিরে এল। ও তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। বলল—দুর্গের পর থেকেই অনেকদূর রাস্তার ধারে ধারে আল আমিরির মূর সৈন্যরা ঘাঁটি গেড়েছে। ফ্রান্সিস বলল—পালমার দিকে শেষ ঘাঁটিটা কোথায়?

—কিছু দূরে—একটা কাঁঠের সাঁকোর পাশে। সালভা বলল।

—তাহলে ঐ একটা ঘাঁটি পার হতে পারলেই নিশ্চিন্ত। ফ্রান্সিস বলল। সালভা চলে গেল। মারিয়া বলল—কী করে সাঁকোটা পার হবে?

—তাই ভাবছি। ফ্রান্সিস ছোট ঘরটার মেঝেয় পায়চারি করতে করতে বলল। ফ্রান্সিস ভেবে চলেছে। হঠাৎ ও দাঁড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কো বলে উঠল—কী হল? ফ্রান্সিস বলল—সব ছক কষা হয়ে গেছে।

—শিগগির সালভাকে ডাকো। সালভাকে ডাকতে হল না? ও তখনই ডুমুরের ঝোল আর ক'টা গোল রুটি নিয়ে এল কাঠের থালায় করে। সবাই খেতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—

—সালভা—এখানে তো চাষবাস হয়?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—বেশ কিছু ক্ষেতখামার আছে এখানে। সালভা বলল।

—কী কী বেশি চাষ হয়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—ডুমুর বাদাম খুবানি এসব। সালভা বলল।

—ঐসব চাষীরা কোথায় বিক্রি করে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—এখান থেকে পালমা যাওয়ার রাস্তার ধারে কোস্তা বন্দর থেকেই এসব মেনোরকা আর্মিনিয়া চালান যায়। সালভা বলল।

—এসব ফসলটসল কী করে কোস্তায় নিয়ে যাওয়া হয়? ফ্রান্সিস বলল।

—খচ্চরের টানা গাড়িতে করে। সালভা বলল।

—বেশ বর্ধিষ্ণু চাষী—খচ্চর টানা গাড়িটাড়ি অছে।—

মালপত্র চালান দেয়—তোমার চেনা এমন কেউ আছে এখানে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সালভা বলল।

—চলো—তার সঙ্গে আমি কথা বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

খাওয়া সেরে চলল দু'জনে। একটা বাড়ির সামনে সালভা ফ্রান্সিসকে নিয়ে

এল। বাড়িটার পাশেই বেশ লম্বা একটা ঘর। সালভা বলল—এটা গুদোম ঘর, মালিক চাষী পাঁচছ'টা খচ্চরকে দানাপানি খাওয়াচ্ছিল। ওদের দিকে এগিয়ে এল। সালভা ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল—আমার বন্ধু। একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাইছে। চাষীটি ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—আপনার মালভর্তি গাড়ি নিয়ে যাবো আমরা। (কোস্তার আড়তে সব পৌঁছে দেব। চাষীটি দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে হেসে বলল—এতো ভালো কথা। মূর সৈন্যদের জ্বালায় কোন মালই পাঠাতে পারছি না। গুদোমে সব ডাঁই হয়ে জমে আছে।

—ঠিক আছে। আমরা খেয়ে দেয়ে আসছি। আপনি চারটে বস্তায় মাল ভরিয়ে রাখুন। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তো। আমার লোকই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে। চাষীটি খুশি হয়ে বলল। ফ্রান্সিস বলল—কে চালিয়ে নিয়ে যাবে সেটা পরে ঠিক করছি।

ফেরার সময় ফ্রান্সিস বলল—সালভা তোমার বাবাকে নিয়ে এসো। একটু কাজ আছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা তৈরি হয়ে গুদোম ঘরের দিকে চলল। ফ্রান্সিস দেখল মারিয়া সেই চাষী মেয়েদের ঢোলা পোশাকটাই পরে আছে। বলল—কী ব্যাপার? তোমার গাউনটা কী হল?

—ওটা সালভার বোনকে দিয়ে দিয়েছি। মারিয়া হেসে বলল। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

ফ্রান্সিস গুদোম ঘরে ঢুকে দেখল—চারটে ডুমুর বাদাম খুবানি ভর্তি বড় বস্তা রাখা হয়েছে। সালভার বাবাই এসব বস্তায় লোক এনে ভরিয়েছে। ফ্রান্সিস ঐ লোকগুলোকে চলে যেতে বলল। লোকগুলো চলে গেল। এবার ফ্রান্সিস সালভার বাবাকে বলল—দেখুন—আমরা চারজন চারটে বস্তার মধ্যে লুকোব। আমরা বস্তায় ঢোকার পর আপনি ডুমুর বাদাম এসব ঢেলে বস্তার মুখটা বেঁধে দেবেন। সালভার বাবা তো অবাক। ফ্রান্সিস বুঝিয়ে বলল—মূর সৈন্যদের শেষ ঘাঁটিটা আমাদের এভাবেই পার হতে হবে। ওরা বুঝতেই পারবে না। সালভার বাবা মাথা ঝাঁকাল। তারপর কাজে হাত লাগাল। প্রথমে একটা বস্তা থেকে ডুমুর বাদাম বের করল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে মারিয়া বস্তাটায় বসে পড়ল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। বলল—চোখ বন্ধ কর। মারিয়া মাথা নিচু করে চোখ বন্ধ করল। ফ্রান্সিস এবার ডুমুর বাদাম এসব ঢালল। বস্তা ভরে গেল।

একইভাবে শাঙ্কো আর সালভাও বস্তাবন্দী হল। এবার ফ্রান্সিস সালভার বাবাকে বলল—একটি অল্প বয়েসের ছেলেকে ডেকে আনুন যে খচ্চরের গাড়ি ভালো চালাতে পারে। কিন্তু সাবধান ছেলেটিকে আমাদের কথা বলবেন না। বলবেন এইসব মাল তোকে কোস্তের আড়তে পৌঁছে দিতে হবে। ছেলেটা এলে কাজের লোকগুলো ডেকে গাড়িটার একপাশে প্রথমে আমাকে তার ওপরে মারিয়াকে রাখবেন। সালভার পিঠের ঘা এখনও সম্পূর্ণ সারে নি। আর একপাশে শাঙ্কোর ওপর সালভাকে

রাখবেন। বুঝেছেন সমস্ত ব্যাপারটা? সালভার বাবা মাথা নেড়ে হাসল। এবার ফ্রান্সিস বস্তায় ঢুকল। সালভার বাবা ওকে বস্তাবন্দী করল।

ফ্রান্সিসের নির্দেশমত সালভার বাবা কাজের লোকদের ডেকে ওদের গাড়িতে তুলে সাজিয়ে রাখল। একটা অল্পবয়সী ছেলেকেও জোগাড় করা হল। ছেলেটির হাতে কাঠের ছোট লাঠির মাথায় চামড়া বাঁধা চাবুক দেওয়া হল। ছেলেটি খুব খুশি। গাড়িতে উঠেই চাবুক হাঁকাল খচ্চর দুটোর পিঠে। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ি চলল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে ঝাঁকুনি খেতে খেতে গাড়ি চলল। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে গাড়ি এসে উঠল সদর রাস্তায়। এবার গাড়ির ঝাঁকুনি অনেকটা কমল। শাঙ্কোর নাকে ডুমুরের বোঁটার খোঁচা লাগল। হেঁচে ফেলতে গিয়ে শাঙ্কো ডুমুরগুলোর মধ্যেই নাক চেপে ধরল। হাঁচি আটকে গেল। শাঙ্কো নিশ্চিন্ত হল। গাড়ি চলল টিকির্ টিকির্। ছেলেটির হুপাৎ হুপাৎ চাবুক চালাবার শব্দ শোনা যেতে লাগল। হঠাৎ ছেলেটি সরু গলায় জোরে গান গাইতে লাগল। গাড়িও চলেছে গানও চলেছে। মাঝে মাঝে পাথরের টুক্‌রোয় চাকা লেগে গাড়িটা লাফিয়ে উঠছে। জোর ঝাঁকুনি ফ্রান্সিসরা মুখ বুঁজে সহ্য করছে।

হঠাৎ ছেলেটির গান বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। বোঝা গেল সাঁকোর কাছে গাড়ি এসেছে। একজন পাহারাদার মূর সৈন্যের চড়া গলা শোনা গেল। কী যেন বলল। ছেলেটিও ভাঙা ভাঙা আরবী ভাষায় কী বলল। 'কোস্তা' কথাটা ফ্রান্সিস বুঝল। ছেলেটি কোস্তার আড়তে যাবার কথা বলছে। আরো কিছু কথা হল। ফ্রান্সিসের পরিকল্পনার হিসেব মিলে গেল। একে বিকেলবেলা তার ওপরে মালগাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা অল্পবয়সী চাষী ছেলে। সৈন্যদের মনে সন্দেহ হল না। গাড়ি চলতে শুরু করল। তখনই হঠাৎ একটি সৈন্য বস্তায় তরোয়ালের খোঁচা দিল। মারিয়ার হাতের ফাঁক দিয়ে তরোয়ালের ডগাটা লাগল ফ্রান্সিসের পিঠে। ফ্রান্সিস একচুল নড়ল না। বস্তার গায়ে রক্ত ফুটে ওঠার আগেই গাড়ি কিছুটা চলে এল। গাড়ি চলল।

ছেলেটার মুখের হাঃ হাঃ শব্দ আর হাতের চাবুকের শব্দ শুনতে শুনতে ফ্রান্সিসরা এগিয়ে চলল।

বেশ কিছুটা সময় গেল। ফ্রান্সিস বস্তার মধ্যে থেকে চাপা গলায় ডাকল—মারিয়া। মারিয়া মৃদু শব্দ করল—উঁ? ফ্রান্সিস তেমনি চাপা গলায় বলল—মনে হচ্ছে না যেন বাড়ির নরম পালকের বিছানায় শুয়ে আছি। মারিয়া একটু জোরেই বলে ফেলল—তোমার মুণ্ডু। ছেলেটির কানে আস্তে হলেও কথাটা পৌঁছল। ছেলেটি চম্‌কে পেছনের বস্তাগুলোর দিকে তাকাল। ঠিক বুঝল না। তবু ও ভুল শুনল কিনা বুঝতে চেঁচিয়ে বলল—কে কথা বলল? এ্যাঁ? শাঙ্কো আর নিজেকে সামলাতে পারল না। বলে উঠল—ভূত। আর কোথায় যাবে। ছেলেটি চাবুক ছুঁড়ে ফেলে একলাফে গাড়ি থেকে নেমেই রাস্তার পাশের ডুমুর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ছুট লাগাল। শাঙ্কো ছোরা দিয়ে বস্তা কিছুটা কেটে ফেলে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকল—এই

ছোঁড়া—ভয় নেই। চলে আয়। কে কার কথা শোনে। ছেলেটি ততক্ষণে ডুমুর ক্ষেত পার হয়ে ছুটে চলেছে।

শাঙ্কো ছোরা দিয়ে বস্তার অনেকটা কেটে বেরিয়ে এল। মারিয়া ফ্রান্সিস আর সালভার বস্তার মুখ বাঁধা দড়ি কেটে দিল। সবাই বস্তা থেকে বেরিয়ে হাঁফাতে লাগল। বস্তার মধ্যে এতক্ষণ আধশোয়া হয়ে থাকা। দম বন্ধ হয়ে আসছিল যেন। ততক্ষণে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। সালভা রাস্তা থেকে চাবুকটা তুলে নিয়ে চালকের জায়গায় বসল। গাড়ি চালাতে লাগল সালভা।

ফ্রান্সিস ঘুরে বসতেই মারিয়া দেখল ফ্রান্সিসের পিঠের দিকে জামাটায় রক্তের দাগ। মারিয়া বলল—তোমার পিঠটা তরোয়ালে কেটে গেছে। ফ্রান্সিস হাসল—ও কিছু না। এখন অনেক ভাবনা—এসব ভাবার সময় নেই।

সন্ধ্যের পরে কোস্তা'র কাছাকাছি এসে সালভা বলল—ফ্রান্সিস কোস্তা এসে গেছি। কী করবে এখন? ফ্রান্সিস বলল—ঐ চাষীর মালগুলো যা আছে তোমার কোন পরিচিত আড়তদারের কাছে রাখো। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে এই গাড়িতে চড়েই পালমার দিকে যাত্রা শুরু করবো।

—রাতটা বিশ্রাম নেবে না? সালভা বলল।

—উহুঁ—হাতে সময় কৈ। ফ্রান্সিস বলল।

সালভা গাড়ি থেকে নেমে গেল। কোস্তা বন্দর এলাকাটা বেশ জমজমাট। তিন-চারটে জাহাজ জাহাজঘাটায় রয়েছে। একপাশে বেশ কয়েকটা গুদোমঘরের মত। খচ্চরে টানা গাড়ি আসছে যাচ্ছে দাঁড়িয়ে আছে। মালপত্র গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে। লোকজনের ব্যস্ততা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সালভা ফিরে এল। বলল—ঠিক আড়তদারকেই পেয়েছি। লোক পাঠাচ্ছে। মাল তুলে নেবে। আড়তদারের লোকজন এল। সব মাল নিয়ে গেল আড়তে।

রাত বাড়ছে। ফ্রান্সিস বলল—খেতে চলো সব। গাড়ি থেকে নামল সবাই এদিক ওদিক খুঁজে ফ্রান্সিস একটা ছোট সরাইখানা বের করল। একটা বড় সরাইখানা ছিল। বেশ ভীড়। ফ্রান্সিস ঐ ভীড়ের সরাইখানায় গেল না।

গরম গরম গোল রুটি মুরগির মাংস পাওয়া গেল। বেশ সুস্বাদু রান্না। ফ্রান্সিসরা সবাই পেট ভরে খেল।

গাড়িতে ফিরে এল সবাই। সালভা বলল—ফ্রান্সিস সারারাত তো গাড়ি চালাতে হবে।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো আর আমিও চালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো খচ্চর দুটোকে দানাপানি খাওয়াতে হয়। সালভা বলল। তারপর গাড়ি থেকে খচ্চর দুটোকে খুলে নিয়ে চলল যেখানে লোকেরা ঘোড়া খচ্চরগুলোকে দানাপানি খাওয়াচ্ছে।

ফ্রান্সিস মারিয়া আর শাঙ্কো গাড়িতে উঠল। ওরা সালভার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

সালভা কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এল খচ্চর দুটোকে নিয়ে। গাড়িতে জুতে গেল। তারপর চালকের জায়গায় বসল। রাত বেড়েছে। সারা কোস্তা বন্দরে এখন আর লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

সালভা গাড়ি চালাতে শুরু করল। গাড়ি চলল পালমার উদ্দেশ্যে। টানা রাস্তা চলেছে। জ্যোৎস্না অনেকটা উজ্জ্বল। দু'পাশে কোথাও ক্ষেতখামার কোথাও ছোট ছোট পাথুরে টিলা। মারিয়া কিছুক্ষণ জেগে রইল। তারপর আর পারল না। গাড়ির দুলুনিতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। ও গাড়ির মধ্যে গুটিসুটি মেরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে বসেছিল। একবার চোখ খুলে ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকাল। একটু এগিয়ে এসে মারিয়ার মাথাটা নিজের ডানপায়ের উরুর ওপর তুলে নিল। মারিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমুতে লাগল। শাঙ্কো জেগেই ছিল। এবার উঠে দাঁড়াল। বলল—সালভা—তুমি একটু-বিশ্রাম করে নাও। আমি চালাচ্ছি। সালভা সরে এল। শাঙ্কো গাড়ি চালাতে লাগল। রাত শেষ হয়ে আসছে। তখন ফ্রান্সিস গাড়ি চালাচ্ছে।

পূব আকাশ লাল হয়ে উঠল। সেই লাল দিগন্তের আকাশের নিচে কিছু কালো কালো বাড়িঘরের মাথা দেখা গেল। ফ্রান্সিস বুঝল ওটাই রাজধানী পালমার বাড়িঘর। ও ঘুমন্ত সালভাকে আর ডাকল না।

• পালমা নগরে ওদের গাড়ি যখন ঢুকল তখন চারদিকে উজ্জ্বল রোদের ছড়াছড়ি। মারিয়ার ঘুম ভাঙল তখন। ও দু'পাশের বাড়িঘর দেখতে লাগল। সালভা আর শাঙ্কোও ঘুম ভেঙে উঠল। ফ্রান্সিসকে সালভা বলল—আপনি সরে আসুন আমি চালাচ্ছি।

সালভা গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—এখন কী করবেন? কোন সরাইখানায় খেয়েটেয়ে একটু বিশ্রাম করে রাজপ্রাসাদে যাবেন? ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকাল। বলল—তোমার কি একটু বিশ্রাম চাই? মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—না। ঘুমিয়ে আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

—তাহলে আলমুদাইনা রাজপ্রাসাদেই চলো। ফ্রান্সিস বলল। তখনই ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল মারিয়া সেই চাষী মেয়েদের ঢোলা পোশাকটাই পরে আছে। এখন তো রাজপ্রাসাদে যেতে হবে। রাজার সঙ্গে দেখা করতে হবে। মারিয়া ওদের দেশের রাজকুমারী। তার এই পোশাকে যাওয়া ভালো দেখাবে না। ফ্রান্সিস বলল—সালভা তুমি তো এখানে ছিলে। মহিলাদের ভালো পোশাক কোথায় পাওয়া যায় নিশ্চয়ই জানো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। যাবেন? সালভা গাড়ি থামিয়ে বলল। মারিয়া বুঝল ফ্রান্সিস কী চাইছে। মারিয়া বলল—আমার অন্য পোশাকের কোন প্রয়োজন নেই।

—কিন্তু এ দেশের রাজার সামনে এই পোশাকে—ফ্রান্সিস মৃদু আপত্তি করল। মারিয়া বলল—এটা তো এই দেশের চাষী মেয়েদেরই পোশাক। ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। সালভা গাড়ি চালাল।

পালমা নগরীতে তখন লোকজনের ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। একটু পরে ফ্রান্সিসদের গাড়ি বিরাট রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়াল।

সালভা গাড়ি থেকে নামল। চারজন দ্বাররক্ষী লোহার দরজার দু'পাশে ঝক্‌ঝকে পেতলের কারুকাজ করা বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

সালভা দ্বাররক্ষীদের সঙ্গে কী কথাবার্তা ব'লে ফিরে এল। বলল—মুস্কিল হয়েছে। বছর কয়েক আগে এখান থেকে চলে গেছি। এরা সব নতুন দ্বাররক্ষী। আমাকে চেনে না। ফ্রান্সিস বলল—রাজার দেখা পাওয়া সহজে হবে না। বলল—তাহ'লে চলো—কোন সরাইখানায় যাই। অপেক্ষা করি। তুমিও সাক্ষাতের ব্যাপারে চেষ্টা চালিয়ে যাও।

ওরা কথা বলছে তখনই দ্বাররক্ষীরা হঠাৎ বেশ তৎপর হ'ল। লোহার দরজার টানা টানা গারদের মাথাখোলা কালো রঙের গাড়ি ভেতর থেকে আসছে। একটু পরেই গাড়িটা দরজার কাছাকাছি আসতেই দ্বাররক্ষীরা দু'জন দু'দিক থেকে দরজা খুলে ধরল। গাড়ির কালো গায়ে রুপোর কাপড়ের জোব্বামত পরা এক বৃদ্ধ। সালভা বলে উঠল—আরে মন্ত্রীমশাই। সালভা ছুটে গাড়িটার কাছে গেল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলে উঠল—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়—আমার কিছু খুব প্রয়োজনীয় কথা বলার আছে। মন্ত্রীমশাই বোধহয় সালভাকে চিনলেন। আস্তে কী বললেন। গাড়ি থামল। সালভা মন্ত্রীমশাইর খুব কাছে গেল। মন্ত্রীমশাই পাকা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে হাসলেন। বললেন—কী ব্যাপার সালভা? পড়া ছেড়ে চলে গিয়েছিলে কেন? সালভা হেসে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—সব বলবো আপনাকে। তার আগে দু'টো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ আপনাকে জানাচ্ছি। মহান পুরুষ রামন লাল আমাদের কুটীরে কয়েকদিন আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মন্ত্রীমশাই চমকে আসনে উঠে বসলেন। ব'লে উঠলেন—এ কী বলছো সালভা। এতো—সাংঘাতিক খবর।

—আর একটা খবর—। মন্ত্রীমশাই সালভাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—সব শুনবো। তুমি গাড়িতে ওঠো। এক্ষুণি মাননীয় রাজাকে খবরটা দিতে হবে। সালভা ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বলল—কিন্তু আমার এই বন্ধুদের সঙ্গে আমি যেতে চাই। মন্ত্রীমশাই ফ্রান্সিসদের একবার দেখলেন। বললেন—ঠিক আছে—তুমি ওদের নিয়েই এসো। এই ব'লে উনি গাড়িচালকের দিকে তাকিয়ে বললেন—প্রাসাদে ফিরে চলো। মন্ত্রীমশাইর গাড়ি ঘুরল। সালভা হাতছানি দিয়ে ফ্রান্সিসদের ডাকল। ফ্রান্সিসরা গাড়ি থেকে নেমে এল। তারপর মন্ত্রীমশাইর গাড়ির পেছনে পেছনে ওরা সদর দেউড়ি পার হ'য়ে রাজপ্রাসাদের দিকে হেঁটে চলল। দ্বাররক্ষীরা আর বাধা দিল না।

চারদিকে পাথরের দেয়ালঘেরা বিরাট জায়গা নিয়ে রাজপ্রাসাদ। এখানে ওখানে চৌকোনো তিনকোণা ফুলের বাগান। রোদে ঝল্‌মল করছে ফোটা ফুল। বাগানের মাঝখানে ফোয়ারার পর ফোয়ারা। পাথরে বাঁধানো ঝক্‌ঝকে রাস্তা চলে গেছে প্রধান দ্বারের দিকে। চারপাশের বাগান সবুজ মখমলের মত ঘাসে ঢাকা। ছোট ছোট মাঠ দেখতে দেখতে ওরা এগিয়ে চলল সেইদিকে। প্রধান দ্বারের সামনেই

মন্ত্রীমশাই গাড়ি থেকে নামলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন ফ্রান্সিস সালভাদের জন্য।

ওরা এল। মন্ত্রীমশাই ওদের নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকলেন। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন। দ্বাররক্ষীরা সবাই পেতলের বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে। ওরা মন্ত্রীমশাইকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাতে লাগল। ডানহাতি একটা ঘরে মন্ত্রীমশাই ঢুকলেন। পেছনে ফ্রান্সিসরা।

ঘরের মাঝখানে বেশ বড় চক্‌চকে কালো পাথরের একটা গোল টেবিল। টেবিলের চারপাশে গদীঅলা ওককাঠের বাঁকা পায়ায় কারুকাজ করা চেয়ার পাতা। বোঝা গেল—এটা রাজার মন্ত্রণাকক্ষ। মন্ত্রীমশাই হাত বাড়িয়ে সবাইকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। আস্তে বললেন—সংবাদ পাঠানো হয়েছে। মাননীয় রাজা এক্ষুণি আসবেন। ফ্রান্সিসরা চেয়ারে বসল। মন্ত্রীমশাইও একটা চেয়ারে বসলেন। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে তিনি খুবই চিন্তান্বিত। সবাই চুপ করে বসে রইল।

একটু দ্রুতপায়েই রাজা তৃতীয় জেমস্‌ মন্ত্রণাকক্ষে ঢুকলেন। রাজা মধ্যবয়স্ক। মুখে ছাটা দাড়ি গোঁফ। পরণে সাধারণ পোশাক। হলুদ রঙের জোব্বামত গায়ে। বুকের কাছে সোনার সুতোয় কাজ করা জলপাই পাতার মত নক্‌শা। সবাই দাঁড়িয়ে উঠে মাথা নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানাল। রাজা সবাইকে হাতের ইঙ্গিতে বসতে ব'লে নিজে বড় চেয়ারটায় বসলেন। সবাই বসল। মন্ত্রীমশাই সালভার দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার সংবাদ জানাও। সালভা তখন রমন লালের নৌকোয় চড়ে আসা অসুস্থতা ও মৃত্যুর সংবাদ জানাল। রাজা ব'লে উঠলেন—সেই শ্রদ্ধেয় পুরুষের পবিত্র দেহ এখন কোথায়? সালভা তখন আল আমিরি কর্তৃক দুর্গ দখল—সেই সংবাদ গোপন রাখার ব্যবস্থা—রামন লালের মৃতদেহ আনার সময় ধরা পড়া—এ সব কথা বলল। সবশেষে বলল—গুরুদেবের পবিত্র দেহ আল আমিরি কী করেছে আমি জানি না। সবাই চুপ করে রইল। এবার ফ্রান্সিস একটু মাথা নুইয়ে নিয়ে বলল—মাননীয় রাজা—আপনি অনুমতি দিলে আমি দু'একটা কথা বলবো। রাজা একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকালেন। তারপর তাকালেন সালভার দিকে। সালভা বলল—মাননীয় রাজা—এর নাম ফ্রান্সিস। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী মারিয়া। বন্ধু শাঙ্কো। এঁরা জাতিতে ভাইকিং। রাজা একটু চুপ করে থেকে বললেন—ভাইকিংদের সাহস আর জাহাজ চালনায় দক্ষতার কথা আমরা শুনেছি। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন—বলো। ফ্রান্সিস বলল—মহান রামন লালের পোশাকের পকেটে ছিল তাঁর দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি। সেটা এখন আল আমিরির কাছে আছে। এই পাণ্ডুলিপি সালভা পড়েছে। এটার শেষ পাতায় রামন লাল লিখেছেন প্রথম পাণ্ডুলিপিতে তিনি অ্যালকেমির যে সূত্রগুলো লিখেছেন সেগুলো নির্ভুল। তাঁর বাসনা ছিল ফিরে এসে তিনি এই সূত্রগুলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। ফ্রান্সিস থামল। রাজা বললেন—হ্যাঁ—প্রথম পাণ্ডুলিপিটা কোথায় আছে তা আমরা খুঁজে বের করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।



—মৃত্যুর পূর্বে মহান রামন লালের বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। তাই একটা কাগজে তিনি একটা নক্‌শা এঁকে সালভাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল। তারপরে ওর পোশাকের ভিতর থেকে নক্‌শাটা বের করে রাজার দিকে এগিয়ে ধরল। রাজা বেশ আগ্রহের সঙ্গে নক্‌শাটা নিলেন। মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে বললেন—কিন্তু নক্‌শার নির্দেশটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস বলল—আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি চেষ্টা করতে পারি এই নক্‌শার নির্দেশ বের করতে। ফ্রান্সিস মুখের দিকে তাকালেন। বললেন—তুমি পারবে?

—যথাসাধ্য চেষ্টা করবো এই পর্যন্ত বলতে পারি। ফ্রান্সিস বলল। রাজা নক্‌শাটা ফিরিয়ে দিলেন। বললেন—

—বেশ। আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।

—তাহলে সালভাকে নিয়ে আমি চেষ্টা করবো। সালভাকে এই ক্ষমতা দিন যাতে সে এই রাজপ্রাসাদের সর্বত্র স্বাধীনভাবে আমাদের নিয়ে চলাফেরা করতে পারে—ফ্রান্সিস বলল। রাজা মন্ত্রীমশাইয়ের দিকে তাকালেন। বললেন—আপনি কী বলেন?

—এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর করবার জন্যে এই স্বাধীনতাটুকু তো ওদের দিতেই হবে। মন্ত্রীমশাই বললেন।

—ঠিক আছে। সেই অনুমতি দেওয়া হবে। রাজা বললেন। তারপর দ্বাররক্ষীর দিকে তাকিয়ে বললেন—সেনাপতিকে এক্ষুণি আসতে বলো। দ্বাররক্ষী মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে দ্রুত চলে গেল।

একটু পরেই সেনাপতি বেশ দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকলেন। সেনাপতি দীর্ঘকায়। বলিষ্ঠ গড়ন। সাধারণ জোব্বামত পোশাক গায়ে। কোমরের চামড়ার চওড়া কোমরবন্ধ। তাতে কোষবদ্ধ তরোয়াল ঝুলছে। সেনাপতি মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। রাজা বললেন—আপনি বোধহয় খবর রাখেন না যে মূরনেতা আল আমিরি পালমা নোভার দুর্গ দখল করে আছে। সেনাপতি বেশ চমকে উঠল। অবাক চোখে একবার রাজা আর একবার মন্ত্রীমশাই-এর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। রাজা বললেন—বসুন। সেনাপতি তাড়াতাড়ি বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। রাজা বললেন—

—একটি বড়ই শোক সংবাদ পেলাম—মহান পণ্ডিত রামন লাল দেহরক্ষা করেছেন। সেনাপতি উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রাজা আঙুলের ইঙ্গিতে তাঁকে বসতে বললেন। সেনাপতি আস্তে আস্তে চেয়ারে বসলেন। রাজা বললেন—শুনুন—সৈন্যবাহিনী নিয়ে আপনি এক্ষুণি পালমা নোভা যাত্রা করুন। দুটি কাজ আপনাকে করতে হবে। আল আমিরিকে বন্দী করে মহামতি রামন লালের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটা উদ্ধার করবেন। পাণ্ডুলিপিটা ওর কাছেই আছে। যাবার সময় একটি মূল্যবান কফিন নিয়ে যাবেন। রামন লালের পবিত্র দেহ আল আমিরি কোথায় কবরস্থ করেছে সেটা জানবেন। সেই পবিত্র দেহ কফিনে করে যথাযোগ্য

মর্যাদায় এখানে নিয়ে আসবেন। এই প্রাসাদ সংলগ্ন সমাধিভূমিতে মহান রামন লালের পবিত্র দেহ রাজকীয় প্রথায় সমাধিস্থ করা হবে।

—মাননীয় রাজা—আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে। সেনাপতি বললেন।

—এই সব কাজ আপনাকে করতে হবে কাল সূর্যোদয়ের পূর্বেই। রাজা বললেন সেনাপতি মাথা নুইয়ে বললেন—

—যথা আজ্ঞা মাননীয় রাজা। চেয়ার ছেড়ে উঠলেন সেনাপতি। তারপর মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে দ্রুতপায়ে চলে গেলেন। রাজাও উঠলেন। মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে ফ্রান্সিসরা প্রাসাদের বাইরে এল। মন্ত্রীমশাই গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

রাজপ্রাসাদ পাথরের দেয়ালে ঘেরা। দেয়ালের ওপাশেই বিস্তৃত প্রান্ত। সেনাপতি বেলোর পাথরের বাড়ি প্রান্তরের একপাশে। অন্যদিকে যোদ্ধাদের ছাউনি। ছাউনি বেশ লম্বা টানা ঘর। ছোট ছোট ঘর পরপর চলে গেছে। যোদ্ধাদের আবাসস্থল

সেনাপতি বেলো রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। প্রান্তরে এলেন। চললেন যোদ্ধাদের আবাসস্থলের দিকে। সেনাপতি বেলোকে যোদ্ধাদের ছাউনির দিকে যেতে দেখে পাহারাদার কিছু যোদ্ধা এগিয়ে এল। মাথা নিচু করে সেনাপতিকে অভিবাদন জানাল। সেনাপতি তাদের বললেন—যাও—সব যোদ্ধাদের বলো এক্ষুনি জড়ো হতে। আমি সব যোদ্ধাদের কিছু বলবো।

যোদ্ধা ক'জন ছুটে গেল যোদ্ধাদের আবাসস্থলের দিকে। কিছুক্ষণ যোদ্ধাদের মধ্যে সেনাপতির আদেশ জানানো হল। সব যোদ্ধা প্রান্তরে এসে আস্তে আস্তে সার দিয়ে দাঁড়াল। যোদ্ধাদের সামনেই একটি পাথরের বেদী। বেদীর রং কালো রাজা বা সেনাপতি যোদ্ধাদের কোন আদেশ দেবার সময় এই বেদীতে উঠে আদেশ দেন।

সেনাপতি বেদীতে উঠে দাঁড়ালেন। চারদিক নিস্তব্ধ। যোদ্ধাদের শেষপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে সেনাপতি বলতে লাগলেন—আমার বীর যোদ্ধারা—দুটো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ জানাচ্ছি। প্রথম সংবাদ হল—মহামতি রামন লাল কয়েকদিন আগে দেহত্যাগ করেছেন। সেনাপতি কথাটা বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সৈন্যদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। অনেকেই মুখে 'হায়' 'হায়' করে উঠল। গভীর শোকে অনেক সৈন্য কেঁদে ফেলল। সেনাপতি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইলেন। তারপর মাথা তুললেন। সেনাপতি হাত তুলে পোশাকের হাতাটা চোখে ঘষে চোখের জল মুছলেন। তারপর বললেন—দ্বিতীয় সংবাদ হল—কিছুদিন আগে এক আরবীয় দলনেতা আমাদের পালমা নোভার দুর্গ দখল করেছে। এই সংবাদটা যাতে রটে না যায় যাতে কেউ রাজধানী পালমায় এসে খবরটা বলতে না পারে তার জন্যে বড় রাস্তাটায় পাহারা বসিয়েছে সে। তাই এই দুটো সংবাদ এতদিন আমরা জানতে পারিনি। সেনাপতি থামলেন। তারপর বললেন—রাজার হুকুম—কালকের মধ্যে পালমা মুর্গ অধিকার করতে হবে। তারপর আরবীয় দলনেতাকে বন্দী করে নিয়ে আসতে হবে। আর একটি কাজ—মহান চিন্তানায়ক

রামন লালের নশ্বর দেহ এনে রাজপরিবারের কবরখানায় যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সমাহিত করা হবে। সেনাপতি থামলেন। তারপর বললেন—জানি, রামন লালের মৃত্যুতে আমরা শোকস্তব্ধ। কিন্তু কর্তব্য তো করতেই হবে। কাজেই সবাই তৈরি হও। আমরা সন্ধ্যেবেলা পালমা নোভার দিকে যাত্রা করবো। যেভাবেই হোক পালমা নোভা দুর্গ অধিকার করতে হবে। সেনাপতি থামলেন। তারপর পাথরের বেদী থেকে নেমে এলেন। রাজার আদেশ জানা হল। যোদ্ধাদের সমাবেশ ভেঙে গেল। যোদ্ধারা কথা বলতে বলতে তাদের আবাসস্থলের দিকে চলল। সেনাপতি বেলোও তার বাড়ির দিকে চললেন।

তখন সন্ধ্যে হয় হয়। বিস্তৃত প্রান্তরে পদাতিক বাহিনী সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সামনে ঘোড়সওয়ার বাহিনী। তারপর একটা তীরন্দাজ বাহিনী। ধব্‌ধবে সাদা ঘোড়ায় চড়ে সেনাপতি এলেন। তীরন্দাজ বাহিনী সকলের সামনে সেনাপতি এলেন। তরোয়াল কোষমুক্ত করলেন। সামনের দিকে তরোয়ালটা তুলে চিৎকার করে বললেন যাত্রা শুরু। যোদ্ধাবাহিনী যাত্রা শুরু করল।

যোদ্ধাবাহিনী নগরের রাজপথে এল। চলা শুরু করল দক্ষিণমুখো পালমা নোভার দিকে। ততক্ষণে পালমা নগরে রামন লালের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। যোদ্ধারা পালমা নোভা দুর্গ দখল করতে যাচ্ছে। আর রামন লালের নশ্বর দেহ আনতে যাচ্ছে এই সংবাদও ছড়িয়ে পড়েছে। হাজার হাজার নগরবাসী পথের দু'ধারে এসে দাঁড়াল। নগরবাসী নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল। তারা সবাই শোকস্তব্ধ। যোদ্ধাদের উৎসাহ দেবার জন্যেও কেউ ধ্বনি তুলল না। যোদ্ধারা চলল। চারদিক নিঃশব্দ। শুধু যোদ্ধাদের পায়ে চলার শব্দ। আর অনেকের ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ।

যোদ্ধাবাহিনী যখন পালমা নোভার দুর্গের কাছে এল তখন বেশ রাত হয়েছে। ওদিকে বড় রাস্তার ধারে যে নজরদারদের পাহারা রাখা হয়েছিল তারা দূর থেকে রাজা দ্বিতীয় জেমসের ঐ যোদ্ধাবাহিনী দেখে ছুটে এল দুর্গে। আল আমিরিকে সংবাদ দিল রাজা দ্বিতীয় জেমসের যোদ্ধাবাহিনী পালমা নোভা দুর্গ অধিকার করতে আসছে। আল আমিরি হুকুম দিলে সব যোদ্ধারা যেন দুর্গের চত্বরে এসে জড়ো হয়।

সব সৈন্যরা বর্ম আর শিরস্ত্রাণ পরে তরোয়াল বর্শা হাতে দুর্গের চত্বরে এসে সার বেঁধে দাঁড়াল। তীরন্দাজরাও এল।

একটু পরেই আল আমিরি এল। যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে বলল। আমরা যে এই দুর্গটা অধিকার করেছি সেটা যেমন করেই হোক রাজা জেমসের কানে উঠেছে। আমাদের এত কড়া নজরদারি সত্ত্বেও এটা কীভাবে হল জানি না। যাহোক, আর কিছুক্ষণের মধ্যে রাজার যোদ্ধাবাহিনী এসে পড়বে। আমরা দুর্গের বাইরের প্রান্তরে যুদ্ধ করবো। ঐ যোদ্ধাদের দুর্গ পর্যন্ত আসতে দেব না। কাজেই শরীরে সমস্ত শক্তি নিয়ে লড়াই চালাতে হবে। আল আমিরি থামল। মূর যোদ্ধারা মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করল। এটা ওদের যুদ্ধে নামার আগের ধ্বনি। আল আমিরি যোদ্ধাদের দুটো দলে ভাল করল। একদল বাইরের প্রান্তরে গিয়ে জড়ো হল। অন্যদল দুর্গের

মধ্যেই রইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি বেলো আর ঘোড়সওয়ার বাহিনী দুর্গের বাইরের রাস্তায় এসে থামলেন। সেনাপতি বেলো একজন ঘোড়সওয়ার সৈন্যকে বললেন—যাও—ঐ মুরবাহিনীর দলনেতা কে তা জানো আর তাকে আমার কাছে আসতে বলো। যুদ্ধের চেয়ে যদি কথা বলে সমস্যাটা মেটানো যায় সেই শেষ চেষ্টাটা করবো আমি।

ঘোড়সওয়ার সৈন্যটি দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আল আমিরির যোদ্ধাবাহিনীর কাছে এল। যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাদের দলনেতা কে? একজন যোদ্ধা বলল—আল আমিরি আমাদের দলনেতা। সেনাপতির পাঠানো যোদ্ধাটি বলল—আল আমিরিকে এখানে আসতে বলো। আমাদের সেনাপতি বেলো তার সঙ্গে কথা বলবেন। আল আমিরির এক সৈন্য বলল—যদি একা পেয়ে আমাদের দলনেতাকে মেরে ফেলে। সেনাপতির যোদ্ধা বলল—আমাদের সেনাপতিও একাই থাকবেন। আল আমিরির সৈন্যরা আর কিছু বলল না। দু'জন দুর্গের দিকে চলল আল আমিরিকে প্রস্তাবটা জানাতে।

সেনাপতি বেলোর একটু সন্দেহ ছিল আল আমিরি আসবে কিনা। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল আল আমিরি ঘোড়ায় চড়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এল। ঘোড়া ছুটিয়ে তার যোদ্ধাবাহিনীর সামনে এসে দাঁড়াল। সেনাপতি বেলো আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে আল আমিরির কাছে এসে বললেন—শুনলাম—আপনার নাম আল আমিরি। আপনি আরবীয় দলনেতা।

—ঠিকই শুনেছেন। আল আমিরি বলল।

—আপনি রাজা দ্বিতীয় জেমসের এই দুর্গ অন্যায়ভাবে দখল করে আছেন সেনপতি বললেন।

—হ্যাঁ। লড়াইয়ে রাজার যোদ্ধাদের হারিয়ে তবে দখল করেছি। আল আমিরি বলল।

—ঠিক আছে—এবার আমি রাজা জেমসের সেনাপতি বেলো আপনাকে বলছি। আপনি ভালোয় ভালোয় দুর্গ ছেড়ে দিয়ে চলে যান। সেনাপতি বললেন।

—যদি না যাই। আল আমিরি বলল।

—তাহলে যুদ্ধ হবে। আমাদের যোদ্ধাবাহিনীর যোদ্ধাদের সংখ্যা আপনার যোদ্ধাদের চেয়ে অনেক বেশি। শুধু শুধু রক্তপাত মৃত্যুকে ডেকে আনবেন না। আপনারা দুর্গ ছেড়ে চলে যান। সেনাপতি বললেন।

—না। আমরা লড়াই করবো। আল আমিরি বলল।

—আমি শেষ পর্যন্ত শান্তিতে সব মিটিয়ে নিতে চেয়েছি। আপনারা তা হতে দিলেন না। তবে যুদ্ধই হোক। সেনাপতি বললেন।

সেনাপতি নিজের যোদ্ধাবাহিনীর কাছে ফিরে এলেন। আল আমিরিও ঘোড়া ছুটিয়ে দুর্গে ঢুকল।

চাঁদের আলো অনুজ্জ্বল। দুর্গে প্রান্তরে সেই আলো ছড়িয়ে আছে। সেনাপতি বেলো নিজেরে বাহিনীর কাছে ফিরে এলেন।

দু'পক্ষের যোদ্ধাবাহিনীর অনড় অপেক্ষা চলছে। সমুদ্রের দিক থেকে জোরালো বাতাস আসছে। শাঁ শাঁ শব্দ উঠছে। একটু দূরের বন-জঙ্গলে।

সেনাপতি বেলোই প্রথম খোলা তরোয়াল মাথার ওপর তুলে চিৎকার করে বলল—আক্রমণ করো। ঘোড়সওয়ার বাহিনী ছুটল। মূর যোদ্ধারা মুখে শব্দ তুলে ঘোড়সওয়ারদের মোকাবিলায় এগিয়ে এল। ওরা ঘোড়সওয়ার বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল যুদ্ধ। ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে চাপে বেশ কিছু মূর সৈন্য আহত হল। তবু অশ্বারোহী যোদ্ধাদের শরীরে ঘোড়ার গায়ে তরোয়ালের কোপ বসাল। বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করল। কিন্তু রাজা জেমসের সুশিক্ষিত যোদ্ধাবাহিনীর সামনে মূঢ়বাহিনী আর কতক্ষণ দাঁড়াবে। তবু ওরা লড়াই করতে লাগল। প্রান্তর ভরে উঠল আর্ত চিৎকার গোঙানি আর তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দে।

এবার সেনাপতির নির্দেশে পদাতিকবাহিনী ছুটে এল। যুদ্ধে নামল। চলল যুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আল আমিরির যোদ্ধারা হার স্বীকার করতে লাগল। ওদের সংখ্যাও কমে আসতে লাগল। জীবন বিপন্ন দেখে কিছু মূর যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাল। মূর যোদ্ধাবাহিনী পরাস্ত হল। বেশ কিছু মূর যোদ্ধাকে বন্দী করাও হল। এবার সেনাপতি বেলো ঘোড়ায় চড়ে চললেন দুর্গের প্রধান প্রবেশপথের দিকে। তার পেছনে পেছনে যোদ্ধাবাহিনীও চলল।

দুর্গটা ঘিরে চারদিকে পরিখা। পরিখা জলে ভর্তি। পরিখা পার হয়ে দুর্গের পাথুরে দেয়ালের কাছে পৌঁছোতে হবে।

প্রধান প্রবেশপথে যেতে পরিখার ওপর কাঠের সেতু দিয়ে যেতে হয়।

ঘোড়ায় চড়ে সেনাপতি বেলো সেতুর কাছে এলেন। দেখলেন দুর্গের বিরাট কাঠের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজার কাছে দেয়ালে তখনও মশাল জ্বলছে। আল আমিরির কোন প্রহরী ওখানে নেই। সেনাপতি বেলো গলা চড়িয়ে যোদ্ধাদের বললেন—আমার বীর যোদ্ধারা—সেতু দিয়ে ওপারে গিয়ে দেয়ালের চারপাশ ঘিরে দাঁড়াও। যোদ্ধারা কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে পরিখার ওপরে গেল। দেয়াল ঘিরে দাঁড়াল। সেনাপতি বেলো আবার উচ্চস্বরে আদেশ দিলেন—দেয়াল ধরে ধরে ওপরে ছাদের দিকে ওঠো।

যোদ্ধারা দেয়ালের কাছে ছুটে এল। দুর্গের এবড়ো-খেবড়ো দেয়াল ধরে ধরে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। এবার শুরু হল আল আমিরির যোদ্ধাদের আক্রমণ ওরা দুর্গের ছাদ থেকে যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে তীর বর্শা ছুঁড়তে লাগল। কিছু যোদ্ধা আহত হল। মারাও গেল।

তখন সেনাপতি বেলো চিৎকার করে যোদ্ধাদের চলে আসতে বললেন পরিখার কাছে কাছে যোদ্ধাদের দাঁড়াতে বললেন। যোদ্ধারা তাই দাঁড়াল।

এবার আল আমিরির যোদ্ধারা দুর্গের ছাদ থেকে পাথরের ছোট ছোট চাঁই স্লিং-এ চড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল। স্লিং হচ্ছে কাঠের লম্বা পাটাতন। দড়ি দিয়ে পাটাতন বাঁকিয়ে তার ওপর পাথরের ছোট ছোট চাঁই রাখা হয়। দড়ির বাঁধন খুলে দিলেই বাঁকা পাটাতন প্রচণ্ড জোরে সোজা হয়। পাটাতনে রাখা পাথরের চাঁই ছিটকে গিয়ে মাটিতে দাঁড়ানো যোদ্ধাদের ওপর পড়ে। কিছু যোদ্ধা মরে কিছু আহত হয়। এভাবেই সাত আটটা স্লিং থেকে পাথরের ছোট ছোট চাঁই ছোঁড়া হতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি বেলো যোদ্ধাদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলতে লাগলেন—সবাই পরিখা সাঁতরে পার হয়ে চলে এসো। যোদ্ধারা পরিখার জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল জল গলা পর্যন্ত। কাউকে সাঁতরাতে হল না। জল ঠেলে যোদ্ধারা এপারে চলে এল। সেনাপতির হুকুমে সার বেঁধে দাঁড়াল। স্লিং থেকে ছোঁড়া পাথরের ছোট ছোট চাঁইগুলো এতদূর এল না। যোদ্ধারা এবার নিরাপদ।

সেনাপতি বেলো এই স্লিং-এর কথা শুনেছেন কিন্তু আগে কখনো দেখেননি। এবারই প্রথম দেখলেন। স্লিং-এর কর্মক্ষমতাও দেখলেন।

সেনাপতি বেলো ভেবে দেখলেন এভাবে দুর্গের বাইরে থেকে আক্রমণ করে দুর্গ দখল করা যাবে না। অন্য কোন উপায় দেখতে হবে।

ওদিকে দুর্গ থেকে পাথর ছোঁড়া বর্শা ছোঁড়া বন্ধ হল। সেনাপতি বেলোর যোদ্ধারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ততদূর পর্যন্ত স্লিলং দিয়ে ছোঁড়া ছোট পাথরের চাঁই উড়ে আসছে না।

তখন পূবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই সূর্য উঠল। ভোরের নরম আলো ছড়ালো দুর্গের গায়ে গাছগাছালির মাথায়। পাখি-পাখালির ডাক শোনা গেল।

সেনাপতির যোদ্ধারা তখন অত্যন্ত ক্লান্ত, সেই পালমা নগর থেকে হেঁটে আসা সারারাত যুদ্ধ করা। কিছু যোদ্ধা এত ধকল সইতে পারল না। ঘাসের প্রান্তরে বসে পড়ল। সেনাপতি দেখলেন কিন্তু কিছু বললেন না।

এখন যুদ্ধবিরতি চলছে। সেনাপতির আদেশে কয়েকজন যোদ্ধাকে নিয়ে রসুইকর চলল বনজঙ্গলের দিকে। গাছগাছালির আড়ালে রসুইকররা সকালের খাবার তৈরির জন্য তিনটে পাথর বসিয়ে উনুনের মত বানাল। রান্নার আয়োজন চলল।

ঘোড়ার তদারক করে যারা তাদেরই একজন সেনাপতির কাছে এল। সেনাপতি ঘোড়া থেকে নামলেন। যোদ্ধাটি ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল দানাপানি খাওয়াতে।।

সেনাপতি প্রান্তরে পড়ে-থাকা একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসলেন।

তখন বেলা হয়েছে। দুর্গ বড় সড়ক পূবদিকে বনজঙ্গল সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেনাপতি একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। ভাবতে লাগলেন কীভাবে দুর্গটা দখল করা যায়। রাতের অন্ধকারে দুর্গের দেয়াল ডিঙানো যায়। কিন্তু দুর্গের ছাদে জ্বলন্ত মশালের আলোতে যোদ্ধারা ধরা পড়ে যেতে পারে। অন্য কোন উপায়

ভেবে বের করতে হবে।

সকালের খাবার খেল সবাই। সেনাপতিও ঐ পাথরে বসেই খাবার খেলেন। খেতে খেতে সর্বক্ষণ ভেবে চললেন কীভাবে দুর্গটা দখল করা যায়।

হঠাৎই একটা উপায়ের কথা মাথায় এল। দুর্গের সদর দরজা ভেঙে ঢুকতে হবে। সেনাপতি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন কয়েকজন যোদ্ধাকে হাত তুলে ডাকলেন। যোদ্ধারা কাছে এসে মাথা একটু নিচু করে সম্মান জানাল। সেনাপতি বললেন—ঐ বনজঙ্গলের সামনে দেখ। সকলে সেদিকে তাকাল। দেখা গেল ঐ দিকে মানুষের বসতি এলাকা। পাথরের বাড়িঘরদোর। সেনাপতি বললেন—ওখানকার লোকজনের কাছ থেকে কয়েকটা কুড়ুল জোগাড় কর। চলো আমিও যাচ্ছি।

সেনাপতি ঐ জেলেদের বসতির দিকে চললেন। পেছনে কয়েকজন যোদ্ধা চলল। বসতির পাথরের বাড়িগুলোর সামনে এসে সেনাপতি দেখলেন—সব বাড়িই আগুনে পোড়া। আশেপাশে কোথাও মানুষজন নেই। সেনাপতি যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—মনে হচ্ছে এখানে বসতি ছিল। পেছনেই বনজঙ্গল। এই বসতির লোকেরা নিশ্চয়ই বনজঙ্গল থেকে কাঠকুটো জোগাড় করত। কাজেই কুড়ুল ব্যবহার করতো। নিশ্চয়ই এই পোড়া বাড়িগুলো ভালো করে খুঁজলে কুড়ুল পাওয়া যাবে। তোমরা খোঁজো। যোদ্ধারা পোড়া বাড়িগুলোয় ঢুকে কুড়ুল খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই যোদ্ধারা তিনটে কুড়ুল পেল। কুড়ুল নিয়ে ওরা সেনাপতির কাছে এল। সেনাপতি বললেন—এবার চলো বনের মধ্যে। সেনাপতি বনের দিকে চললেন। পেছনে কুঠার নিয়ে যোদ্ধারা চলল।

বনের মধ্যে সেনাপতি একটা বড় গাছ খুঁজতে লাগল। পেয়েও গেল। একটা খাড়া উঠে-যাওয়া চেস্টনাট গাছ। বেশ মোটা গাছ। সেনাপতি যোদ্ধাদের গাছটা দেখিয়ে বলল—এই গাছটা কাটো। যোদ্ধারা কুঠার নিয়ে তৈরি হল। প্রথমে দু'জন কুঠার নিয়ে তৈরি হল। প্রথমে দু'জন কুঠারের কোপ পরপর বসিয়ে গাছের গোড়াটা কাটতে লাগল। দু'জনের মধ্যে একজন পরিশ্রান্ত হল। হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। তৃতীয়জন এগিয়ে এল। এবার দু'জনে মিলে আগে পরে কুঠার চালিয়ে গাছটা কাটতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে গোড়া কাটা হয়ে গেল। আশেপাশের গাছের ডালে শব্দ তুলে কাটা গাছটা ঝপ্ করে মাটিতে পড়ল। সেনাপতি বললেন—গাছটার ডালগুলো ছেঁটে ফেল। যোদ্ধারা কুঠার চালিয়ে গাছটার ডালগুলো কেটে ফেলল। শুধু লম্বা মোটা কাণ্ডটা রইল। সেনাপতি এবার শুধু কাণ্ডটা দেখে দেখে কী হিসেব করে কাণ্ডটার ওপরের দিকে একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন—এখানটা কাটো। একজন যোদ্ধা কুঠার চালিয়ে সেটা কাটল। এবার রইল শুধু বড় লম্বা মোটা কাণ্ডটা। সেনাপতি যোদ্ধাদের বললেন—এবার এটা নিয়ে চলো।

যোদ্ধারা এবার কাটা লম্বা কাণ্ডটা কাঁধে নিয়ে চলল। ওরা সেনাপতির নির্দেশমত কাণ্ডটা নিয়ে দুর্গের প্রধান প্রবেশপথের দিকে চলল। এবার কাঠের সেতুটা পার হতে লাগল। তখনই দুর্গের ছাদ তেকে আল আমিরির যোদ্ধারা স্লিং-এ পাথর

চড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল। একটা পাথর সেতুর মধ্যে এসে পড়ল। সেতুর ঐ জায়গার কাঠটা ভেঙে জলে পড়ে গলে। সেনাপতি গলা চড়িয়ে বললেন—ঐ কাঠের কাণ্ডটা নিয়ে কুড়িজন যোদ্ধা প্রধান দেউড়ির দরজার কাছে চলে যাও। ছোটো—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

কুড়ি জন যোদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ড ঘাড়ে বসিয়ে ছুটে দেউড়ির কাঠের দরজার সামনে চলে এল। এখন আর স্লিং-এ চড়িয়ে পাথর ছুঁড়ে লাভ নেই। এত কাছে পাথর গিয়ে পড়বে না। স্লিং থেকে পাথর ছোঁড়া বন্ধ হল। শুধু তীরন্দাজরা তীর ছুঁড়তে লাগল। ওদিকে সেনাপতির হুকুমে তাঁর তীরন্দাজ বাহিনী তীর ছুঁড়তে লাগল। সেনাপতি চিৎকার করে বলল—শুধু ওদের তীরন্দাজদের মারো নয়তো আহত করো। তীরন্দাজরা নিশান ঠিক করে তীর ছুঁড়তে লাগল।

এবার সেনাপতি দ্রুতপায়ে সেতুটা পার হলেন। এলেন দুর্গের সদর দরজার কাছে। যোদ্ধাদের বললেন—এই গাছের কাণ্ডটার কুড়িজন কাঁধে নাও। তারপর ছুটে গিয়ে দুর্গের দরজায় একসঙ্গে কাণ্ডটা দিয়ে ঘা মারো। এভাবে বারবার ঘা মারো।

একজন যোদ্ধা সরু গলায় বলতে লাগল—ধাক্কা মারো একসঙ্গে। যোদ্ধারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে গাছের কাণ্ডটা একসঙ্গে ধরে কাঠের দরজার মাঝখানে ঘা মারতে লাগল। দড়াম্ দড়াম্ শব্দ হতে লাগল। কাঠের দরজাটা নড়ে উঠতে লাগল।

কুড়িজন যোদ্ধা পরিশ্রান্ত হল। হাঁপাতে লাগল। সেনাপতি তা দেখে সেতুর ওপারে জড়ো হওয়া যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বললেন—কুড়িজন চলে এসো। জল্‌দি। দৌড়ে আসবে।

কুড়িজন যোদ্ধা সেতুর ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে এল। আগের কুড়িজনকে সেনাপতি হাতের ইঙ্গিতে চলে যেতে বললেন। কুড়িজন যোদ্ধা চলে গেল।

এবার নতুন কুড়িজন যোদ্ধা কাণ্ডটা ঠেলে নিয়ে দরজায় ঘা মারতে লাগল। ঘা পড়ছে আর দরজার মাঝখানের ফাঁকটা বড় হচ্ছে। কাঠের দুটো মোটা আগল দরজার মাঝখানে এবার দেখা যাচ্ছে। আগল দুটো দেখে যোদ্ধাদের উৎসাহ বেড়ে গেল। চলল দুম দুম্ শব্দ তুলে আগলদুটোয় ঘা মারা। পরিখার ওপারে দাঁড়ানো সৈন্যরাও চিৎকার করে উৎসাহ দিতে লাগল। পর পর ঘা পড়তে লাগল বিরাট দরজাটা নড়তে লাগল।

হঠাৎ একটা ধাক্কায় কাঠের একটা আগল ভেঙে ছিটকে পড়ল। যোদ্ধারা চিৎকার করে উঠল। যোদ্ধারা হাঁপাচ্ছে তখন। সেনাপতি ওদের বলল—এবার অন্যদের ডাকছি। তোমরা যাও। ওরা বলে উঠল—না। দু' একজন বলল—একটা আগল ভেঙেছি অন্যটাও ভাঙবো। আমরাই ভাঙবো।

আবার ঘা পড়ল অন্য আগলটায় বারে বারে। যোদ্ধারা হাঁপাচ্ছে তখন। একজন যোদ্ধা বলে যেতে লাগল—ধাক্কা মারো একসঙ্গে। কাঠের আগলটা ক্রমাগত এই

ধাক্কা সামলাতে পারল না। একটা জোর ধাক্কা খেয়ে কাঠের আগলটা দু' টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল। বন্যার জলের মত যোদ্ধারা চিৎকার করতে করতে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দুর্গের ছাদ থেকে দুর্গের ঘরগুলোর আশপাশ থেকে আল আমিরির যোদ্ধারা তীর বর্শা ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু সেনাপতি যোদ্ধাদের থামাতে পারল না। দুর্গের ঘরগুলো থেকে আল আমিরির যোদ্ধারা খোলা তরোয়াল হাতে সেনাপতির যোদ্ধাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেনাপতির যোদ্ধারা তরোয়ালের লড়াই চালাল। ততক্ষণে বাইরে পরিখার ওপারে দাঁড়ানো সেনাপতির যোদ্ধারা চিৎকার করতে করতে ছুটে এল। আল আমিরির যোদ্ধারা তাদের রুখতে পারল না। আল আমীরির সৈন্যদের ঘিরে ফেলল সেনাপতির যোদ্ধারা চলল তরোয়ালের লড়াই দুর্গের চত্বরে। চত্বরটা ভরে উঠল আহতের আর্ত চিৎকারে গোঙানিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে আল আমিরির যোদ্ধারা হার স্বীকার করতে লাগল। সেনাপতির যোদ্ধারা সাহসী আর রণনিপুণ। আমিরির মূর সৈন্যরা পেরে উঠল না।

দুর্গের ঘরগুলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেনাপতি চিৎকার করে বললেন—বীর যোদ্ধারা—আর হত্যা নয়। ওরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হার স্বীকার করবে। ওদের এখন বন্দী কর। এই দুর্গে নিশ্চয়ই কয়েদঘর আছে। ওদের কয়েদঘরে ঢুকিয়ে দাও।

সেনাপতির যোদ্ধারা তার নির্দেশমত আল আমিরির যোদ্ধাদের বন্দী করতে লাগল। ওদের দু'হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলল কয়েদঘরের দিকে।

লড়াই শেষ। সেনাপতির যোদ্ধারা তখন হাঁপাচ্ছে। সেনাপতি গলা চড়িয়ে বললেন—কিছু যোদ্ধা ছাদে চলে যাও। ওখান থেকে মাঝে মাঝেই তীর বর্শা ছোঁড়া হচ্ছে। কিছু যোদ্ধা ছুটল ছাদে ওঠার সিঁড়ির দিকে। ছাদে উঠে আল আমিরির যোদ্ধাদের আক্রমণ করল। তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করল। তাদের ছাদ থেকে নামিয়ে এনে কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হল।

তখনই দেখা গেল আল আমিরি খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল। সেনাপতি দ্রুত তার সামনে এলেন। বললেন—আল আমিরি—অস্ত্র ত্যাগ করো। লড়াই শেষ হয়ে গেছে। তোমার যোদ্ধারা হয় মরেছে নয়তো আহত হয়েছে অথবা কয়েদঘরে বন্দী হয়ে আছে। তুমি একা লড়ে কী করবে?

আল আমিরি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—আমি লড়াই করবো। মরতে হয় মরবো তবু লড়াই থেকে পিছিয়ে আসবো না।

—তাহলে আমার সঙ্গেই লড়াই করো। সেনাপতি কথাটা বলেই তরোয়াল হাতে আল আমিরির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আল আমিরি কোনরকমে সেই মার আটকাল। শুরু হল আল আমিরির সঙ্গে সেনাপতির লড়াই।

তরোয়ালের লড়াইতে কেউ কম যায় না। সেনাপতির যোদ্ধারা লড়াইয়ের জায়গাটা ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াল। লড়াই দেখতে লাগল।

তরোয়ালের লড়াই চলল। সেনাপতি এগিয়ে পিছিয়ে নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাতে লাগলেন। আল আমিরিও কম যায় না। সেনাপতির মার ঠেকাতে লাগল।

আবার আক্রমণও করতে লাগল। দু'জনেই তখন হাঁপাচ্ছে। তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দ আর শ্বাস ফেলার শব্দ।

এতক্ষণ আল আমিরির তরোয়াল যত দ্রুত এদিক ওদিক ঘুরছিল এখন কিন্তু সেই দ্রুততা আর নেই। তবু হঠাৎ দ্রুত ঘুরে আল আমিরি তরোয়াল চালাল। রোদে ঝলসে উঠল তরোয়াল। সেনাপতির বাঁ বাহু ছুঁয়ে তরোয়ালের ফলা নেমে এল। পোশাকের কাপড় কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। সেনাপতি কাটা জায়গাটা দেখলেন। এবার সেনাপতি দ্রুত তরোয়াল চালাতে লাগলেন। আল আমিরি সেই তরোয়ালের মার ঠেকাতে ঠেকাতে পিছু হঠতে লাগল। সেনাপতি ওর ওপর সমান চাপ রেখে এগিয়ে চললেন। হঠাৎ সেনাপতি এত দ্রুত আর এত জোরে তরোয়াল চালালেন যে পরিশ্রান্ত আল আমিরি সেই মার ঠেকাতে পারল না। ওর হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। সেনাপতি আল আমিরির গলায় তরোয়ালের ডগাটা ঠেকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—তোমাকে মেরে ফেলার হুকুম নেই। তারপর যোদ্ধাদের বললেন—এটাকে বন্দী কর। একজন যোদ্ধা ছুটে গেল। আল আমিরির কোমরের ফেট্টি খুলে তাই দিয়ে ওর হাত বাঁধল। সেনাপতি বললেন—মহামতি রামন লালের নশ্বর দেহ কোথায় সমাধিস্থ করা হয়েছে? আল আমিরি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—দুর্গের উত্তর দিকের প্রান্তরে।

—আমাদের নিয়ে চলো। সেনাপতি বললেন। তারপর বললেন—এখানে বেলচা কোথায় থাকে? আল আমিরি বলল—আমি জানি না। রামন লালের মৃতদেহ কবর দেবার সময় আমরা কেউ যাই নি। কবর খোঁড়েটোড়ে এমন দু'জন গিয়েছিল। সেনাপতি শুধু বলল—আশ্চর্য। তারপর যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—এই দুর্গের ঘরগুলো খোঁজ। কোথাও দু-একটা বেলচা নিশ্চয়ই পাবে। যোদ্ধারা কয়েকজন বেলচা খুঁজতে গেল।

কিছু পরে তারা দুটো বেলচা নিয়ে এল। সেনাপতি আল আমিরিকে বললেন—চলো—কবরের জায়গাটা দেখিয়ে দেবে।

—সেই জায়গাটা কোথায় তা তো আমি জানি না। আল আমিরি বলল।

—তার মানে? সেনাপতি বললেন।

—কবরের সময় তো আমরা যাই নি। আল আমিরি বলল।

—ও। ঠিক আছে আমরাই খুঁজে নেব। সেনাপতি বললেন। তারপর দু'জন যোদ্ধাকে বললেন—আল আমিরিকে কয়েদখানায় বন্দী করে রাখো।

সেনাপতি দুর্গ থেকে বেরিয়ে উত্তরমুখো চললেন। তার যোদ্ধারাও নিঃশব্দে তার পেছনে পেছনে চলল। ওরা সেনাপতি আর আল আমিরির সব কথাই শুনেছে।

উত্তরের প্রান্তরে এসে সেনাপতি যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—এখানে খুঁজে দেখ তো কোথায় মাটি কাটা আছে। দু'একদিন আগেই কবর কাটা হয়েছে। সবাই এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। কবর খুঁজতে লাগল। পাওয়াও গেল। ঘাসের মধ্যে সহজেই মাটি খোঁড়া জায়গাটা দেখা গেল।

কবরের জায়গাটাতে সেনাপতি এলেন কবরের সামনে কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে দাঁড়ালেন। তারপর যে দু'জন যোদ্ধা বেলচা নিয়ে এসেছিল তাদের বললেন—কবরটা খোঁড়। কফিনটা তুলতে হবে। যোদ্ধা দু'জন বেলচা দিয়ে কবর খুঁড়তে লাগল। হাত দুয়েক খুঁড়েই কফিনটা পাওয়া গেল। একটা সস্তা দামের কাঠের কফিন। সালভার পক্ষে এর চেয়ে বেশি দামের কফিন জোগাড় করা সম্ভব ছিল না।

কফিনটা ওপরে তোলা হল। সবাই মাথায় বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল। এবার সেনাপতির নির্দেশে কয়েকজন কফিনটা কাঁধের কাছে তুলল। সবার আগে সেনাপতি কফিনটার সামনের দিকে কাঁধ দিল। তখনও সেনাপতির বাঁ বাহু থেকে রক্ত পড়ছিল। কিন্তু সেনাপতি সেটা গ্রাহ্য করল না। বাকি কয়েকজন কাঁধ দিল। সেনাপতি সেটা গ্রাহ্য করল না। বাকি কয়েকজন কাঁধ দিল। সেনাপতি কফিন নিয়ে চলল।

দুর্গের বাঁ দিকে বনজঙ্গলের কাছে পালমা থেকে আনা দামী কাঠের তৈরি সোনা-রুপোর ফুল লতা পাতার কাজ করা কফিনটা রাখা ছিল। সেই কফিনের কাছে এই কফিনটা আনা হল। নতুন কফিনটার মুখ খোলা হল। আগের কফিনের মুখটা খোলা হল। রামন লালের শায়িত মৃতদেহ বেশ কয়েকজন হাত লাগিয়ে তুলল। তারপর নতুন কফিনে আস্তে আস্তে রাখল। কফিনের মুখ বন্ধ করা হল। সেনাপতির দু'চোখে জলে ভরে গেল। যোদ্ধাদের মধ্যেও অনেকে কাঁদছিল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর সব যোদ্ধারা ঘাসের প্রান্তরে শুয়ে বসে বিশ্রাম করছিল। সেনাপতি সেখানে এলেন। গলা চড়িয়ে বললেন—বীর যোদ্ধারা—এখন সবাই বিশ্রাম কর। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা পালমা নগরের দিকে যাত্রা করবো। ভোর ভোর সময়ে পালমা পৌঁছে যাবো।

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হল। চারদিক খোলা যে গাড়িটা সেনাপতি এনেছিল সেই গাড়িতে কফিনটা রাখা হল। দুটো ঘোড়া গাড়িটা টানবে। আল আমিরিকে হাত বাঁধা অবস্থায় একটা ঘোড়ায় বসানো হল। একজন অশ্বারোহী যোদ্ধা সেই ঘোড়ায় আল আমিরির পেছনেই বসল।

একেবারে সামনে রাখা হল কফিনের গাড়িটাকে। তারপর ঘোড়ায় চড়ে সেনাপতি। তারপর অশ্বারোহী যোদ্ধারা। তারপর পদাতিক যোদ্ধারা, তীরন্দাজরা। সবশেষে বন্দী আল আমিরি।

সেনাপতি তরোয়াল কোষমুক্ত করল। রাজধানী পালমা নগরের দিকে তরোয়াল তুলে চিৎকার করে বললেন—যাত্রা শুরু।

যাত্রা শুরু হল।

আজ চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। চাঁদ মেঘেও ঢাকা পড়ছে মাঝে মাঝে। সমুদ্রের দিক থেকে জোরালো হাওয়া বইছে।

পালমা নগরে পৌঁছোবার আগেই ভোর হল।

ওদিকে রাজবাড়ি থেকে ফিরে সালভা বলল—ফ্রান্সিস এখন কী করবেন?

ফ্রান্সিস বলল—রামন লাল কোথায় থাকতেন?

ছাত্রাবাসের পাশেই শিক্ষাগুরুদের আলাদা আবাস। তারই একটিতে রামন লাল

থাকতেন। সালভা বলল।

—তা'হলে ঐ ছাত্রাবাসেই একটা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা কর। আমরা সেই ঘরেই থাকবো। ফ্রান্সিস বলল। উত্তরমুখো কিছু পাথরের ঘরের দিকে দেখিয়ে সালভা বলল—

—ছাত্রাবাস শিক্ষাগুরুদের আবাস ঐদিকে। সেইদিকে চলল ওরা। তখনি প্রাসাদের দক্ষিণ দিককার দেয়ালের ওপাশ থেকে বহু মানুষের কোলাহল ঘোড়ার ডাক শোনা গেল। সালভা বলল—ঐ দিকেই সৈন্যবাস। একটা বিরাট প্রান্তর আছে ঐদিকে। বোধহয় সৈন্যসজ্জা চলছে সেখানে।

হাঁটতে হাঁটতে উত্তরের ঘরগুলোর কাছে ওরা এল। সালভা প্রথম ঘরটার দরজায় দাঁড়াল। ফ্রান্সিসরাও এসে ওর পেছনে দাঁড়াল। দেখা গেল ছোট একটা ঘর। একপাশে পাথরের মেঝেয় কম্বলমত মোটা কাপড়ের বিছানা পাতা। বিছানায় একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। গায়ের ছাইরঙের মোটা কাপড়ের একটা অংশ ঘোমটার মত তাঁর মাথায় টানা। বৃদ্ধ একটি পাণ্ডুলিপি পড়ছেন।

সালভা গিয়ে বৃদ্ধের সামনে মেঝেয় বসল। বৃদ্ধ মুখ তুলে সালভার দিকে তাকালেন। সালভা মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। হেসে বলল—শ্রদ্ধেয় ম্যাস্ত্রো—আমাকে চিনতে পারছেন? বৃদ্ধ ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হাসলেন। কপালে মুখে বলিরেখা স্পষ্ট হল। বললেন—তুমি সালভা—তাই না? সালভা হেসে মাথা ঝাঁকাল। বলল—শ্রদ্ধেয় ম্যাস্ত্রো—মহামতি রামন লালের প্রথম পাণ্ডুলিপিটা তো এখনো পাওয়া যায় নি। ম্যাস্ত্রো মাথা নাড়লেন। সালভা ইশারায় ফ্রান্সিসকে ডাকল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে সালভা বলল—এর নাম ফ্রান্সিস। আমার বন্ধু। ম্যাস্ত্রো একবার তাকিয়ে ফ্রান্সিসকে দেখলেন। সালভা বলল—রাজা এই ফ্রান্সিসকেই দায়িত্ব দিয়েছেন ঐ পাণ্ডুলিপিটা খুঁজে বের করার জন্যে।

—ভালোই তো। ম্যাস্ত্রো বল্লেন।

—তাই ফ্রান্সিস তার বন্ধুদের নিয়ে এখানে থাকবেন। একটা ঘরের ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতে হবে। সালভা বলল।

—এ আর বেশি কথা কি। তুমি তো সবই চেনো। যে কোন একটা খালি ঘর পছন্দ করে থাকো। ম্যাস্ত্রো বললেন। একটু থেমে সালভা বলল—এবার আপনাকে একটা শোক সংবাদ জানাচ্ছি। আমাদের গুরুদেব মহামতি রামন লাল কিছুদিন আগে দেহত্যাগ করেন। ম্যাস্ত্রো কেমন বিহ্বল চোখে সালভার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—দীর্ঘদিন আমরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁর কোন খোঁজ পাই নি। কিন্তু তুমি জানলে কী করে?

—পরে সব বলবো আপনাকে। সালভা বলল। মাথা নাড়তে নাড়তে ম্যাস্ত্রো বললেন—এখানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি আমরা। আশা ছিল, যশস্বী রামন লাল ফিরে আসবেন। আমরা তাঁর সাহায্য ও পরামর্শ পাবো। আঃ বড় কষ্ট হচ্ছে। ম্যাস্ত্রো মাথা নাড়লেন। সালভা উঠে দাঁড়াল। মাথা নুইয়ে সম্মান

জানিয়ে ঘরের বাইরে এল। চলল টানা বারান্দা ধরে। ফ্রান্সিসরাও চলল। পর পর বেশ ক'টা ঘর পার হল ওরা। প্রত্যেকটাতেই ছাত্ররা রয়েছে। পাথরের বারান্দাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে একটা খালি ঘর পাওয়া গেল। ঘরটায় ঢুকল সবাই। ঘরটা বড়। কিন্তু ঘরটার মেঝেয় কোন বিছানা মত কিছু নেই। ঘরটার পাথুরে দেয়ালের ওপরের দিকে চ্যাপ্টা লোহার কয়েকটা গরাদ বসানো জানলা। ওরা ঘরটা দেখছে তখনই একটি অল্পবয়সী ছেলে এসে দরজায় দাঁড়াল। ছেলেটার মাথা ন্যাড়া। সালভা বলল—কীরে—তুই এখানে কাজ করিস?

—হ্যাঁ। কর্তা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। ছেলেটি বলল। বোঝা গেল ম্যাগ্রো পাঠিয়েছেন।

ন্যাড়া মাথা ছেলেটিই ফ্রান্সিসদের ওখানে স্নান খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল।

ঘরে এসে দেখল চারজনেরই বিছানার ব্যবস্থা হয়েছে। ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে পড়ল। তারপর ক্লান্তিতে চোখ বুজল। শাঙ্কো আর মারিয়াও বিছানায় বসল। ক্লান্ত সকলেই। সালভা বলল—আমি রাজবৈদ্যির কাছ থেকে পিঠের ওষুধটা নিয়ে আসছি। ঘা শুকিয়ে এসেছে কিন্তু টনটনানিটা যাচ্ছে না। সালভা চলে গেল।

শাঙ্কো টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ অবস্থাতেই বলল—মারিয়া—শুয়ে বিশ্রাম করো। অনেক ধকল গেছে। মারিয়া শুয়ে পড়তে পড়তে বলল— ফ্রান্সিস—পারবে পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে? চোখ না খুলেই ফ্রান্সিস বলল—আগে রামন লালের থাকার ঘর—পড়ার ঘর—পেছনের ছোট গীর্জাটা—শিক্ষাগুরুদের থাকার জায়গাগুলো—এসব দেখি—তারপর বুঝবো—পারবো কি পারবো না।

বিকেল হয়ে এল। সালভা ফিরল তখন। ওর পোশাকের পকেট থেকে একটা তামার চৌকোনো চাকতি বের করল। ফ্রান্সিসের হাতে দিয়ে বলল—পাঞ্জা। রাজা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটা দেখিয়ে যেখানে খুশি আমরা যেতে পারবো। মারিয়া হাত বাড়িয়ে পাঞ্জাটা নিল। দেখতে লাগল। শাঙ্কো দেখল। ওরা নিশ্চিন্ত হল যে এখন রাজপ্রাসাদে ঢোকবার বা বেরোবার জন্যে আর সমস্যা থাকবে না। সালভা ফ্রান্সিসকে বলল—জানেন—মহামতি রামন লালের দেহরক্ষার সংবাদে সারা নগর শোকে মুহ্যমান। বন্দরে সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। দোকানপাট বাজার হাটও বন্ধ হয়ে গেছে। পথ জনশূন্য। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ফ্রেলকে কখন সেনাপতি রামন লালের পবিত্র দেহ নিয়ে আসে। ফ্রান্সিস শুনল। কোন কথা বলল না। ওর তখন চিন্তা—নক্‌শায় কীভাবে কী নির্দেশ দিয়েছেন রামন লাল?

সন্ধ্যে হ'ল। ফ্রান্সিস তখনও চুপ করে শুয়ে ভাবছে। সালভা বলল—কী করবেন এখন?

—সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অন্ধকারে শুধু মোমবাতির আলোয় কিছু বোঝা যাবে না। আজ রাতে শুধু বিশ্রাম। কালকে সকাল থেকে কাজে লাগতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ফ্রান্সিস মোমবাতির আলোয় নক্‌শাটা দেখল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর মোমবাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

ভোর হতেই পালমার অধিবাসীরা দলে দলে এসে জড়ো হতে লাগল রাজপ্রাসাদের বাইরে। আস্তে আস্তে ভীড় বাড়তে লাগল। সকাল হতেই বহুলোক জড়ো হল। সবাই শ্রান্ত। কারো মুখে কথা নেই। এত লোক। কিন্তু কোন শব্দ নেই। শুধু এখানে ওখানে দু'চারজন বুড়োবুড়ির ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা গেল।

হঠাৎ জনারণ্যে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। দেখা গেল দূরে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সেনাপতি ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন। তাঁর পেছনে একটা ঘোড়ায়টানা গাড়িতে রাখা কাঠের কফিন। গাড়িটা চারদিক থেকে ঘিরে আসছে একদল অশ্বারোহী সৈন্য। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সৈন্যরা সবাই পরিশ্রান্ত। অপেক্ষারত নগরবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল। সবাই সেই কফিনের কাছে যেতে চায়। কিন্তু সৈন্যরা কাউকে এগোতে দিল না।

রাজা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে মন্ত্রীমশাই। পেছনে প্রাসাদরক্ষীরা। রাজা ও মন্ত্রীমশাই পায়ে হেঁটে সিংহদ্বারের কাছে এলেন। সিংহদ্বার আগেই খুলে রাখা হয়েছিল। কফিনের গাড়ি আস্তে আস্তে সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকল। রাজা আর মন্ত্রী মাথা নুইয়ে সম্মান জানালেন। সিংহদ্বারের সামনেই কফিনের গাড়িটা থামিয়ে দেওয়া হল। বন্ধ করে দেওয়া হল সিংহদ্বার। সিংহদ্বারের লোহার গরাদের ওপর মানুষের ঢল নামল। সবাই সেই কফিনটা দেখতে চায়। শেষ শ্রদ্ধা জানাতে চায় রামন লালের নশ্বর দেহকে।

ফ্রান্সিসরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই দৃশ্য দেখছিল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—বুঝলে মারিয়া—মাজোরকার মানুষরা সত্যিই রামন লালকে শুধু শ্রদ্ধাই করতো না—ভালওবাসতো।

ওদিকে বন্দী আল আমিরিকে নিয়ে যাওয়া হল সৈন্য আবাসের লাগোয়া কয়েদখানায়। উদ্ধার করা দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে সেনাপতি রাজার পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাজা প্রাসাদেই ফিরলেই পাণ্ডুলিপিটা দেবেন।

রামন লালের পবিত্র দেহ প্রাসাদ সংলগ্ন সমাধিস্থলে সমাধিস্থ করার আয়োজন চলল।

ফ্রান্সিস সালভাকে বলল—চলো—রামন লালের থাকার ঘর যেখানে ছিল সেখানে। মারিয়া শাঙ্কো এগিয়ে এল। চলল সবাই।

শিক্ষাগুরুদের বাসস্থানের এলাকায় এল ওরা। সালভা ওদের নিয়ে এল পর পর কয়েকটা আলাদা আলাদা বাড়ির কাছে। বাড়িগুলো পাথরের দেয়াল ঘেরা। কয়েকটা বাড়ির পরে একটা বাড়ির সামনে সালভা দাঁড়াল। বাড়িটার সাধারণ কাঠের দরজায় তালা ঝুলছে। সালভা পকেট থেকে চাবি বার করতে করতে বলল—শ্রদ্ধেয় ম্যাস্ত্রোর কাছ থেকে আমি চাবিটা নিয়ে রেখেছি। জানি আপনারা এখানে আসবেন। রামন লালের আবাসস্থল দেখতে চাইবেন।

দরজা খোলা হল। ভেতরে ঢুকল সবাই। সামনেই একটু বাঁধানো জায়গা। তার পরে ঘর। ওরা ঘরটার কাছে এল। দরজা ভেজানো ছিল। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। ঘরে ঢুকল সবাই। ঘরের একপাশে মেঝেয় বিছানা রয়েছে। অন্যপাশে দেয়ালে পাথরের তাক। তাতে হাতে লেখা চামড়া বাঁধানো পাণ্ডুলিপি। পরপর সাজানো। সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বোঝা গেল—নিয়মিত ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা আছে। ঘরটা বেশ বড়। পেছনের দেয়ালের ওপরের দিকে তিনটি চ্যাপ্টা লোহার গরাদ বসানো জানলামত চৌকোনো ফোকর। আলো হাওয়া আসছে। সালভা বলল—এখানেই মহামতি রামন লাল থাকতেন।

ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল। বলল—সালভা—তুমি তো অনেকবার এখানে এসেছো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ঐ যে জানলার নিচে একটা বড় চৌকোনো পাথর আর তার পাশে নিচুতে একটা পাথর ওটাই ছিল মহামতি রামনের লেখাপড়ার জায়গা। ফ্রান্সিস ওখানটায় গেল। দেখল ওপরের জানলা দিয়ে এখানে যথেষ্ট আলো আসছে। এবার ফ্রান্সিস পাথরের তাকে রাখা পাণ্ডুলিপির পাতা উল্টে দেখতে লাগল। মারিয়াকে ডেকে বলল—

—এই পাণ্ডুলিপিগুলো দেখ তো। আমার বিদ্যে তো জানো। মারিয়া এগিয়ে এল। পাতা উল্টে দেখতে লাগল। দেখে নিয়ে বলল—গ্রীক আরবী আর ল্যাতিন ভাষায় লেখা। এটুকু বুঝতে পারছি। তার বেশি বোঝার বিদ্যে আমারও নেই। সালভা বলল—এসব পুরোনো সংগ্রহের কিছু কিছু আমার পড়ার কাজে লেগেছে। দর্শন, রসায়ন আর জ্যোতির্বিদ্যার ওপরেই লেখা বেশি।

—আচ্ছা—গ্রীক ভাষায় লেখা রামন লালের কোন পাণ্ডুলিপি এখানে আছে? মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—আমিও ঠিক এই কথাটাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। সালভা সেই পাথরপাতা জায়গাটায় গেল। পাশেই পাথরের তাকটার দিকে তাকিয়ে বলল—রামন লালের নিজের পাণ্ডুলিপিগুলো সব এখানেই থাকতো। এখন দেখছি না। শ্রদ্ধেয় ম্যাস্ত্রো হয়তো বলতে পারবেন।

—চলো তো। ফ্রান্সিস বলল। ওরা বাড়ির বাইরে এল। দরজায় তালা লাগিয়ে সালভা চলল ম্যাস্ত্রোর ঘরের দিকে। যেতে যেতে সালভা বলল—শ্রদ্ধেয় ম্যাস্ত্রো এখানকার ছাত্রাবাসের দায়িত্বে আছেন। তাই শুধু উনিই ছাত্রাবাসের ঘরে থাকেন। কিন্তু ম্যাস্ত্রোর ঘরের সামনে এসে দেখল ঘরে তালা ঝুলছে। ম্যাস্ত্রো নেই। সালভা ছাত্রদের ঘরে গিয়ে জেনে এল যে রামন লালের পবিত্র দেহ সমাধিস্থ করার আয়োজনে উনি এখন ব্যস্ত।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার সময় ম্যাস্ত্রো এলেন। তখন সালভা ফ্রান্সিসকে নিয়ে গেল। ম্যাস্ত্রোকে ফ্রান্সিস বলল—মহামতি রামন লালের নিজের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি একটু দেখতে চাই। ম্যাস্ত্রো পাশের দেয়ালের তাক থেকে চারটে পাণ্ডুলিপি বের করলেন। মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো বড় বই মত বেশ মোটা ভারী। ফ্রান্সিস বইটার লেখাগুলো দেখল। তারপর মারিয়ার হাতে দিল। মারিয়াও দেখল—গ্রীক ও আরবী

ভাষায় লেখা। বাকিগুলোও দেখল ওরা। খুব পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর। ফ্রান্সিস ভাবল এমনি হাতে লেখা একটা পাণ্ডুলিপি নিখোঁজ। এখন সেটাই খুঁজে বার করতে হবে। ভরসা শুধু নক্শাটা।

ফেরার সময় সালভা বলল—দর্শনশাস্ত্র নিয়ে ঐ পাণ্ডুলিপিগুলোতে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আছে।

ওদিকে প্রাসাদসংলগ্ন রাজপরিবারের সমাধিভূমিতে রামন লালের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হচ্ছে। বহুলোক জড়ো হয়েছে সেখানে। মারিয়া বলল—ফ্রান্সিস—এরকম একটা অনুষ্ঠান তো বড়ো একটা দেখা যায় না। আমি যাবো দেখতে। ফ্রান্সিস বলল—তোমার সঙ্গে শাঙ্কোও থাক।

—তুমিও চলো না। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল।

রামন লালের পবিত্র দেহ সমাধিস্থ হওয়ার পরেও লোকের আসার বিরাম নেই। বিকেল নাগাদ সমাধিভূমি জনশূন্য হয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলা ফ্রান্সিস সালভাকে বলল—তুমি বলেছিলে এই প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে একটা ছোট গীর্জা আছে।—হ্যাঁ—শিক্ষাগুরুদের বাড়িগুলোর ওপাশে। এই গীর্জাটা ছাত্র আর শিক্ষাগুরুদের জন্যে। সালভা বলল।

—রামন লালও কি ঐ গীর্জায় উপাসনা করতে যেতেন? ফ্রান্সিস বলল।

—না। তাঁর থাকার ঘরের পাশে আছে একটা ছোট ঘর। সেখানে যীশুর মূর্তি আছে। তিনি সেই ঘরেই নিয়মিত উপাসনা করতেন। সালভার কথাটা শেষ হতেই ফ্রান্সিস সাগ্রহে বলল—এরকম একটা ঘর আছে নাকি? কিন্তু তুমি তো আমায় বলোনি।

—রামন লাল শুধু উপাসনার সময় আধঘন্টার জন্যে ঐ ঘরটায় যেতেন। সালভা বলল। ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—চলো তো আর একবার রামন লালের ঘরগুলো দেখবো।

—কিন্তু অন্ধকারে এখন—সালভা বলল।

—মোমবাতির আলোয় দেখবো। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া বলে উঠল—কোথায় ভাবলাম পালমা নগরটা আজকে সন্ধ্যেবেলা একটু ঘুরেটুরে দেখবো—তা নয় তুমি চললে বাড়িঘর দেখতে। ফ্রান্সিস হাসল। বলল—

তুমি আর শাঙ্কো যাও—ঘুরে এসো তো। শাঙ্কো বলল—তুমিও চলো না।

—না শাঙ্কো—নক্শার রহস্যটাই এখন আমার চিন্তায়—আর কিছু ভাবতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া কিন্তু নগরে বেড়াতে গেল না। ফ্রান্সিস আর সালভার পিছু পিছু চলল। শাঙ্কোও চলল সঙ্গে।

তালার চাবিটা সালভাই নিজের কাছে ম্যাস্ত্রোর কাছ থেকে চেয়ে রেখেছিল।

রামন লালের ঘরের কাছে এল সবাই। সালভা দুটো মোমদানিতে দুটো বেশ মোটা লালচে রঙের মোম এনেছিল। মোম জ্বালাল। একটা মোমদানি নিজে নিল।

আর একটা ফ্রান্সিসের হাতে দিল।

রামন লালের থাকার ঘরটা মোমবাতির আলোয় ফ্রান্সিস আবার খুঁটিয়ে দেখল। সেই ওপরের দিকে ফোকর মত জানলা। চ্যাপ্টা লোহার গরাদ বানানো। নক্‌শার রহস্যভেদে কাজে লাগবে এমন কিছুই পেল না। বলল—সালভা উপাসনার ঘরটায় চলো। সালভা আলো নিয়ে ঘরের বাঁদিকের কোণায় এল। দেখা গেল একটা ছোট সাধারণ কাঠের দরজা। সালভা কয়েকটা ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। মাথা নিচু করে সবাইকে ঘরটায় ঢুকতে হল।

মোমবাতির আলোয় ফ্রান্সিসরা দেখল অন্য ঘরগুলোর মত এই ঘরেও উঁচুতে দেয়ালের দুটো চ্যাপ্টা লোহার গরাদ বসানো চৌকোনো জানলামত। তার নিচে দেয়ালে গায়ে যীশুর কাঠের একটা মূর্তি। একটা হালকা নীল সার্টিন কাপড়ে ঢাকা চৌকোনো লম্বাটে বেদীর ওপর মূর্তিটা রাখা। মূর্তির নিচে মেঝেয় একটা পশমের আসন এখনও পাতা রয়েছে। আলো নিয়ে ফ্রান্সিস ছোট ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখল। তারপর বলল—সালভা—এই উপাসনার ঘরে কি তুমি আসতে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—কত এসেছি। সকালবেলা রামন লাল উপাসনা করতেন ঐ আসনে বসে। আমিও মাঝে মাঝে আসতাম। দেখতাম রামন লাল চোখ বুঁজে মাথা নিচু করে আসনে বসে আছেন। আমিও চুপ করে তাঁর পেছনে বসে প্রার্থনা করতাম। উপাসনা সেরে আমাকে দেখে খুশি হতেন। একটু থেমে সালভা বলল—উনি আমাকে পুত্রের মত স্নেহ করতেন। সালভার দু'চোখ জলে ভরে উঠল। ও হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। মারিয়া বলল—যীশুর মূর্তিটা কী সুন্দর। সালভা বলল—রামন লাল যখন প্রথম পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তখনই মূর্তিটা এনেছিলেন। জুডিয়ার এক গ্রাম্য মিস্ত্রির হাতে তৈরি।

ফ্রান্সিস কয়েকবার সমস্ত ঘরটা দেখল। তারপর বলল—চলো সব। সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

রাতে সবাই শুয়ে পড়েছে তখন। ফ্রান্সিস ডাকল—সালভা। সালভা ওর দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—দেখ নক্‌শাটা প্রথম দেখে আমি যা অনুমান করেছিলাম এখন সেটা আর অনুমান নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—রামন লাল নক্‌শায় যে জায়গাটা নির্দেশ করেছেন সেই জায়গাটা তোমার খুবই পরিচিত।

—কিন্তু আমি তো সেই জায়গাটা কোথায় কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। সালভা বলল।

—সেটা আমিই তোমাকে বোঝাবো। আমার মনে হচ্ছে আমি সমাধানের কাছাকাছি এসেছি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বলল—রেমনের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটা তুমি পড়েছো। সবশেষের পাতায় যা লেখা আছে তুমি কি সেদিন সেটা ঠিক ঠিক আমাকে বলতে পেরেছিলে? সালভা একটু ভেবে বলল তখন আমার যা মনের অবস্থা—ঠিক ঠিক মনে রাখা সম্ভব ছিল না।

—যা হোক—দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটা রাজার কাছে রয়েছে। কাল সকালে তুমি আমাদের রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দাও। ঐ পাণ্ডুলিপিটা আমি চাইবো।

রাজা দিলে পড়বো মানে তুমি পড়ে আমাকে অর্থ বলবে। রামন লাল ঠিক কী বলতে চেয়েছেন সেটা আমি জানতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালে সালভা রাজপ্রাসাদে গেল। একটু পরেই ফিরে এল। বলল—রাজা নিজেই তোমাকে দেখা করবার জন্যে একজন প্রহরীকে পাঠিয়েছেন।

—তাহলে তো ভালোই হল। ফ্রান্সিস বলল।

প্রহরীর সঙ্গে ফ্রান্সিসরা রাজার সাক্ষাতের জন্যে রাজপ্রাসাদের দিকে চলল। প্রহরী ফ্রান্সিসদের রাজার মন্ত্রণাকক্ষে নিয়ে এসে বসাল।

কিছু পরে রাজা এলেন। ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল। রাজা বললেন—তোমরা পাণ্ডুলিপি খোঁজার ব্যাপারে কতদূর এগিয়েছো?

—মহামান্য রাজা—ফ্রান্সিস বলল—আমরা অনেকটা এগিয়েছি।

—খুশি হলাম। রাজা বললেন। তারপর মারিয়াকে বললেন—শুনলাম তুমি নাকি রাজকুমারী?

ফ্রান্সিস বলল—হ্যাঁ মহামান্য রাজা—উনি আমাদের দেশের রাজকুমারী।

—কী আশ্চর্য তোমার পোশাক দেখে আমি ভেবেছিলাম তুমি এই দেশের গ্রামের লোক। রাজা বললেন। মারিয়া বলল—আমি এই পোশাক স্মারক হিসেবে আমাদের দেশে নিয়ে যাবো। রাজা একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—সত্যিই আমি প্রীত হলাম। এবার ফ্রান্সিস বলল—

—মাননীয় রাজা—একটা অনুরোধ ছিল।

—বলো। রাজা বললেন।

—মহামতি রামন লালের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটা কিছুক্ষণের জন্যে আমি পড়তে চাই—বিশেষ করে শেষাংশটুকু।

—বেশ তো। সালভা নিয়ে যাবে—তোমাদের পড়ে বুঝিয়ে দেবে। রাজা উঠলেন। ভেতরে গেলেন। সালভাকে রেখে ফ্রান্সিসরা চলে এল।

কিছুক্ষণ পরে সালভা ফ্রান্সিসদের ঘরে এল। হাতে রামন লালের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটা। মারিয়া হাত বাড়িয়ে নিল ওটা। গ্রীক ভাষায় লেখা। ওর বোঝার কথা নয়। ফ্রান্সিস বলল—সালভা—কালিকলমের ব্যবস্থা করতে পারো? সালভা হাসল। বলল—এটা লেখাপড়ারই পীঠস্থান। আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন। ফ্রান্সিস হাসল। মাথা নেড়ে বলল—সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম। সালভা চলে গেল। মারিয়া পাণ্ডুলিপিটা ফ্রান্সিসের হাতে দিল। একটু পরেই সালভা রূপোর দোয়াতদানি আর পালকের কলম নিয়ে এল। ফ্রান্সিসের বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস বিছানার তলা থেকে নক্‌শাটা বের করল। নক্‌শাটা মারিয়াকে দিয়ে বলল—সালভা পাণ্ডুলিপির শেষাংশটুকু স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করে বলবে তুমি নক্‌শার কাগজের পেছনে সেটা লিখবে। মারিয়া বসল। নক্‌শার উল্টোপিঠে শেষ পাতাটা বের করল। অনুবাদ করে বলতে লাগল। মারিয়া লিখতে লাগল। পাণ্ডুলিপির পার্চমেন্ট কাগজগুলো খোলা। তখনও বাঁধানো হয় নি।

লেখা শেষ হলে ফ্রান্সিস পড়তে লাগল—"গ্রীস, মিশর, মেসোপটেমিয়া আরো নানা জায়গায় ঘুরে আমি নানাভাবে যেসব জায়গার অ্যালকোমিচর্চার তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম এবং যেসব তথ্য সূত্রাকারে লিখে রেখেছিলাম সেসব আমার পরিভ্রমণকালে লেখা প্রথম পাণ্ডুলিপিতে।

এবার পরিভ্রমণে বহির্গত হবার পূর্বে সেই পাণ্ডুলিপি এক পবিত্রস্থানে গোপনে রেখে এসেছিলাম।

এবারের পরিভ্রমণকালে আমি অনেক কষ্টে কখনও জীবন বিপন্ন করে আরো তথ্য সংগ্রহ করেছি। এখন মাজোরকা ফিরে যাবো। সব তথ্য সূত্র একত্র করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবো। যদি সত্যিই আমি নিকৃষ্ট ধাতু সীসে দস্তা আর পারদ সোনায় রূপান্তরিত করতে পারি তাহলে সমস্ত সূত্র তথ্য ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাগজপত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করবো।" এই পর্যন্ত পড়ে ফ্রান্সিস আশ্চর্য হয়ে গেল। ও একবার সালভার মুখের দিকে তাকাল। মারিয়ার দিকে তাকাল। তারপর আবার পড়তে লাগল—"পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করবো যে মানুষও পারে বিপুল স্বর্ণসম্পদ সৃষ্টির অধিকার লাভ করেও তা তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যাগ করতে।"

পাণ্ডুলিপি এখানেই শেষ। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—সালভা—রামন লাল শুধু মনস্বীই ছিলেন না—মহামতিও ছিলেন। এককথায় খাঁটি মানুষ ছিলেন। তারপর মাথা নিচু করে বলল—আমি তাঁকে নতমস্তকে আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সবাই চুপ করে রইল।

একটু পরে সালভা উঠে দাঁড়াল। বলল—সৈন্যদের ছাউনিতে আল আমিরির বিচার চলছে। আমাকে যেতে হবে। আমাদের আগুনে পোড়া বস্তীর পুনর্নির্মাণের খরচ আল আমিরির কাছ থেকে আদায় করবো। সালভা চলে গেল।

ফ্রান্সিস বিছানায় আধশোয়া হ'ল। রামন লালের সংকল্পটা আবার পড়তে লাগল।

হঠাৎ দরজার কাছে কাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। শোনা গেল—ফ্রান্সিস—ফ্রান্সিস—ডাক। ফ্রান্সিস উঠে বসল। মারিয়া উঠে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকল হ্যারি। পেছনে বিস্কো। হ্যারি আর ফ্রান্সিসকে উঠতে দিল না। বসা অবস্থাতেই ফ্রান্সিসকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিসের গায়ে হাত বুলোতে লাগল। ওর দু'চোখ জলে ভরে উঠল। ফ্রান্সিস বুঝল সেটা। ধমক লাগাল—এই হ্যারি—কী ছেলেমানুষি হচ্ছে। বিস্কো তখন মারিয়াকে বলছে—দিন কয়েক আমরা অপেক্ষা করলাম। যেদিন রাতে রাজার সৈন্যবাহিনী পালমা নোভার দুর্গ দখল করল, আল আমিরিকে বন্দী করল সেদিনই আপনাদের জন্যে ভীষণ চিন্তা হল। পরদিনই এলাম। আগুনে পোড়া জেলেবস্তীতে তখন কয়েকটা পরিবার ফিরে এসেছে। সালভার কথা জিজ্ঞেস করতে ওরা সালভার বাবার কাছে আমাদের নিয়ে গেল। তার কাছেই আপনাদের সব সংবাদ পেলাম। বিস্কো থামতেই হ্যারি বলে উঠল—ফ্রান্সিস তোমরা মরণজলা পার হয়েছিলে? মারিয়া বলে উঠল—আমি তো মরেই যাচ্ছিলাম। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল—হুঁ। বলল—তারপর তোমরা জাহাজ চালিয়ে পালমা বন্দরে এলে।

হ্যারি বলল—হ্যাঁ। আজ খুব ভোরে এসেছি। জাহাজ থেকে নেমে সোজা ছুটে এলাম এখানে। জানি রামন লাল এখানে থাকতেন। তোমরা এখানেই আসবে। কিন্তু দ্বাররক্ষীরা আটকাল। ভিনদেশি আমাদের রাজপ্রাসাদে ঢুকতে দেবে না। অগত্যা প্রধান ফটকের বাইরে আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম যদি তোমরা কেউ বেরিয়ে আসো বা তোমাদের কাউকে যদি দেখতে পাই।

—সে কি—ফ্রান্সিস বলল—সেই ভোর থেকে দাঁড়িয়ে আছো। মাথা নেড়ে হ্যারি হাসল। বলল—সালভাকে প্রধান ফটকের দিকে আসতে দেখে আমরা চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিলাম। সালভা ছুটে এল। তারপর এখন—হে বন্ধু—তোমার সম্মুখে। হ্যারির বলার ভঙ্গী শুনে ফ্রান্সিস মারিয়া হেসে উঠল। ফ্রান্সিস বলল—শোন হ্যারি—এখন আমি জাহাজে যাবো না। মারিয়া আর শাঙ্কো যাক। মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—মারিয়ার পোশাকের চেহারা দেখেছো? মারিয়া বলে উঠল—পোশাক পাল্টাতে নয়। আমি জাহাজে যাবো আমার বন্ধুদের দুশ্চিন্তা দূর করতে।

কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে মারিয়া শাঙ্কো হ্যারিদের সঙ্গে জাহাজঘাটার দিকে চলে গেল।

ফ্রান্সিস রামন লালের লেখাটা পড়তে পড়তে হঠাৎ ডাকল—সালভা। সালভা দরজার কাছে সেই ন্যাড়া ছেলেটাকে বলছিল—কীরে তুই এখানে কবে থেকে কাজ করছিস্? ছেলেটা কী বলতে যাচ্ছিল ফ্রান্সিসের ডাক শুনে থেমে গেল। সালভা ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল—কী হল? ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে দরজার কাছে এল। বলল—রামন লালের উপাসনা ঘরে চলো।

—কেন? সালভা আশ্চর্য হয়ে বলল। ফ্রান্সিস বলল—

—রামন লাল তাঁর লেখায় বলেছেন—'পবিত্রস্থান'-এ তিনি পাণ্ডুলিপি গোপনে রেখে গেছেন। উপাসনা ঘরের মত পবিত্রস্থান আর কী আছে। চলো। যেতে যেতে বলল—সালভা—নক্শার রহস্যের কুয়াশা কেটে যাচ্ছে।

দু'জনে রামন লালের উপাসনা ঘরে এল। ফ্রান্সিস ঘরটার চারদিকে তাকাতে লাগল। এখন দিনের বেলা। ওপরের চ্যাপ্টা লোহার গরাদ বসানো দুটো জানলা দিয়ে ঘরটায় আলো আসছে। জানলাটা দেখতে দেখতে ফ্রান্সিস বলল—সালভা এখানকার শিক্ষাগুরুদের ঘরগুলো সব একদিকে আর সব ঘরেই এরকম জানলা আছে—তাই না?

—মনে তো হয়। লক্ষ্য করি নি তেমন। সালভা বলল।

—এখন যাও—সব ঘরে ক'টা করে জানলা আছে আর ক'টা করে গরাদ আছে দেখে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনার মাথায় বোধহয় ভূত চেপেছে। বিড় বিড় করে কথাটা বলতে বলতে সালভা চলে গেল।

কিছুক্ষণ কাটল। ফ্রান্সিস তাকিয়ে আছে যীশুর মূর্তি আর বেদীর দিকে।

সালভা ফিরে এল। বলল—তিনটে করে জানলা আর ছ'টা করে গরাদ। তাতে হলটা কী? ফ্রান্সিস বলল।

—এ ঘরে জানলা দুটো আর গরাদ পাঁচটা করে দেখ। সালভা জানলা দুটো দেখল। গরাদগুলো গুনল। পাঁচটা। বলল—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস হাতের নক্‌শাটা ওকে দেখিয়ে বলল—এই দেখ—এই দুটো জানলা আঁকা। সালভা দেখল। বলল—কিন্তু গরাদ তো পাঁচটা আঁকা নেই।

—যেটা আঁকা আছে সেটা রোমান অক্ষরে পাঁচ কিনা। দেখ ভালো করে। ফ্রান্সিস বলল। সালভা দেখে বলল—হ্যাঁ পাঁচই তো। ফ্রান্সিস বলল—

—ভুলে যেও না—রামন লাল যখন নক্‌শাটা আঁকেন তখন তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত। অসাড় হয়ে আসতে থাকা হাতে পাঁচটা দশটা টান দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাই রোমান "V" এঁকেছেন। এই ঘরের জানলার গরাদও পাঁচটা। মিলে গেল কিনা। সালভা বলে উঠল—সত্যিই তো। ফ্রান্সিস বলল—এবার শেষ সূত্র। দেখ নিচে একটা লম্বাটে চৌকোনো দাগ আছে কিনা।

—হ্যাঁ আছে তো। সালভা বলল। ফ্রান্সিস বলল—

—যীশুর মূর্তির নিচে বেদীটা কাপড়ে ঢাকা। তাই বুঝতে পারছি না ওটা পাথরের না কাঠের। তুমি কাপড়টা একটু সরিয়ে দেখ—ওটা কীসের? সালভা বেদীর সামনে গেল। বুকে ক্রুশ এঁকে মাথা নুইয়ে যীশুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আস্তে কাপড়টা কিছু সরিয়ে দেখল—লম্বাটে কাঠের দেরাজমত। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। আরও দেখল সামনেটায় কাঠের ঢাকনা মত। সালভা কাপড়টা ছেড়ে দিল। দেরাজ ঢাকা পড়ে গেল। পেছন ফিরে সালভা দেখল—ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে আছে। একটুক্ষণ। চোখ মেলে ফ্রান্সিস বলে উঠল—মহামতি রামন লাল—আপনার আশীর্বাদে আমি আপনার পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে পারলাম। সালভা তো অবাক। বলল—কিন্তু পাণ্ডুলিপি কোথায়? ফ্রান্সিস দরজার দিকে যেতে যেতে বলল—সব বলবো মহামান্য রাজাকে।

তুমি এক্ষুণি রাজাকে গিয়ে বলো তিনি যেন এখানে একবার দয়া করে আসেন। কারণ পাণ্ডুলিপি পাওয়ার অধিকারী একমাত্র তিনিই।

নিজের ঘরে ফিরে এল ওরা। ফ্রান্সিস কলমে কালি নিল। তারপর নক্‌শাটায় কী লিখতে লাগল। লেখা শেষ হলে ফ্রান্সিস সেই উপাসনা ঘরে গিয়ে রাজার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজা এলেন। সঙ্গে মন্ত্রীমশাই। পেছনে সালভা আর ম্যাস্ত্রো। ফ্রান্সিস মাথা নুইয়ে দু'জনকেই সম্মান জানাল। রাজা বললেন—পাণ্ডুলিপি কোথায়? ফ্রান্সিস রাজার হাতে নক্‌শাটা দিল। উল্টোপিঠটা দেখিয়ে বলল—মহামতি রামনের শেষ সংকল্পটা আপনি আর একবার পড়ুন—এই অনুরোধ। রাজা একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে নিয়ে অনুবাদটা পড়লেন। মন্ত্রীমশাইকে দিলেন। মন্ত্রীমশাইও পড়লেন। ফ্রান্সিস বলল—মহামতি রামনের অ্যালকেমিচর্চার আগ্রহ ছিল। কিন্তু তার শেষ সংকল্প তো জানেন। এরপরও কি প্রথম পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা আছে মাননীয় রাজা? রাজা একটু চুপ করে থেকে বললেন—দেখো—নিকৃষ্ট ধাতুকে

সোনায় রূপান্তরিত করার আগ্রহ নিয়ে আমি প্রথম পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের চেষ্টা করিনি। আমরা ধরে নিয়েছিলাম তিনি দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেই প্রথম পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের চেষ্টা করেছি।

—তাহলে—আপনিই ঐ বেদীর ঢাকনার কাপড়টি দয়া করে সরান। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে নিয়ে যীশুর মূর্তির বেদীর সামনে এলেন। মাথা নিচু করে বুকে ক্রুশ আঁকলেন। তারপর আস্তে আস্তে বেদী ঢাকা কাপড়টা সরালেন। সেই ওক কাঠের লম্বাটে দেরাজমত।

—ঢাকনাটা দয়া করে খুলুন। ফ্রান্সিস বলল। রাজা দেরাজের ঢাকনাটা আস্তে আস্তে খুললেন। ভেতরে দেখা গেল একটা মরোক্কো চামড়ায় বাঁধানো পাণ্ডুলিপি। রাজা পাণ্ডুলিপিটা আস্তে আস্তে বার করে আনলেন। সামান্য ছাইরঙা পার্চমেন্ট কাগজের পাণ্ডুলিপির পাতা ওল্টালেন। কিছুটা পড়লেন। তারপর মন্ত্রীমশাইর দিকে তাকিয়ে বললেন—হ্যাঁ—এটাই প্রথম পাণ্ডুলিপি। তারপর ফ্রান্সিসের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন—তুমি নক্‌শার সমাধান বের করলে কী করে? ফ্রান্সিস রাজার হাতে নক্‌শাটা দিয়ে বলল—মাননীয় রাজা—মহামতি রামন লাল মৃত্যুকালীন দুঃসহ কষ্টের মধ্যেও যা আঁকতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেন নি আমি সেটাই সম্পূর্ণ করে এঁকে এবং লিখে দিয়েছি। রাজা নক্‌শাটা দেখলেন—

আনন্দিত রাজা বললেন, "আমি নিজে এবং মাজোরকার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" রাজা পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঘরের বাইরে এলেন। প্রাসাদের দিকে চললেন। পেছনে মন্ত্রী।

ফ্রান্সিসরা নিজেদের ঘরে এল। তখনই সালভা ঘরে ঢুকল। বলল, "ফ্রান্সিস, আপনার বন্ধুরা জাহাজ চালিয়ে পালমা বন্দরে এসেছে। ওরা রাজপ্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করছে।"

ফ্রান্সিস বলে উঠল, "আমাদের কাজ শেষ। মারিয়া, শাঙ্কো, চলো আমাদের জাহাজে।"

ওরা রাজপ্রাসাদের বাইরে আসতে হ্যারি, বিস্কো, পেড্রো ছুটে এল। হ্যারি ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরে প্রায় কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল, "তোমাদের সব কথা আমরা শুনেছি।" বন্ধুরা আনন্দের ধ্বনি তুলল, "ও হো—হো—।" পালমার লোকেরা ওদের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। ভাইকিংরা এত আনন্দের কারণ বুঝল না।

ফ্রান্সিসরা দলবেঁধে এগিয়ে চলল জাহাজঘাটার দিকে।

নক্‌শাটা ভালো করে দেখে রাজা ফ্রান্সিসের দিকে তাকালেন। বললেন—সত্যি তুমি যথেষ্ট বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছো। তারপর রাজা মন্ত্রীমশাইকে বললেন—মহান রামন লালের পরিভ্রমণের দুটি পাণ্ডুলিপিই এই পবিত্রস্থানে রাখা হবে। ফ্রান্সিস মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—

—মহামান্য রাজা—যদি অভয় দেন তাহলে আমি বিনীতভাবে একটা অনুরোধ করছি।

—বলো। রাজা বললেন। ফ্রান্সিস বলল—সালভা দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি পড়েছে। প্রথম পাণ্ডুলিপির বিষয়ে সে জানে। সে বলেছে মহামতি রামন দেশে দেশে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা এই দুটি পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন। শুধু অ্যালকেমির তথ্য ও সূত্র আলাদা করে এই পবিত্রস্থানে রাখুন। কিন্তু তাঁর পরিভ্রমণের মূল্যবান কাহিনী থেকে এখানকার শিক্ষাগুরু ও ছাত্রদের বঞ্চিত করবেন না। মহামতি রামন লালের রচনা তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করুক এটা কি মহামান্য রাজা চান না? রাজা ফ্রান্সিসের কথাটা মন দিয়ে শুনলেন। বললেন—তোমার কথাটা ভেবে দেখবো। ফ্রান্সিস মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—মহামান্য রাজা—আমার কর্তব্য শেষ। আমাকে আমাদের জাহাজে ফিরে যেতে হবে। আপনি অনুমতি দিন। রাজা বললেন—

—আমি নিজে এবং মাজোরকার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ফ্রান্সিস মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে ঘরের বাইরে এল। সালভা ছুটে এল। বলল—চলুন—আপনাকে জাহাজঘাটায় নিয়ে যাই। ফ্রান্সিস হেসে বলল—ধন্যবাদ সালভা—আমি একাই যেতে পারবো। তুমি রাজা ও মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে থাক।

বন্দরে যখন ফ্রান্সিস পৌঁছল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। বেশ ক'টা জাহাজ রয়েছে বন্দরে। নিজেদের বহু পরিচিত অনেক সুখ-দুঃখের সঙ্গী সেই জাহাজ খুঁজে নিতে দেরি হল না।

ফ্রান্সিস যখন পাতা পাটাতন দিয়ে জাহাজে উঠছে রেলিঙে দাঁড়ানো বন্ধুরা চেঁচিয়ে বলল—ফ্রান্সিস এসেছে। মুহূর্তে বন্ধুরা অনেকে ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিস জাহাজের ডেক-এ পা ফেলা মাত্র ওরা ছুটে এল। সবাই ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরতে চায়। আনন্দের ধ্বনি তুলল ওরা—ও—হো—হো। মারিয়া আর হ্যারি ছুটে এল। মারিয়া বলল—পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে পেরেছো? ফ্রান্সিস হেসে বলল—হ্যাঁ। মারিয়া বলে উঠল—আমাকে তো থাকতেই দিলে না। ফ্রান্সিস—মারিয়া—তোমার অনেক ধকল গেছে। পরিচিত পরিবেশে তোমার বিশ্রামের দরকার ছিল। তাই তোমাকে জাহাজে পাঠিয়েছিলাম। মারিয়া আর কিছু বলল না। ফ্রান্সিস হেসে দু'হাত ছড়িয়ে বলল—মারিয়া—এবারও আমার হাত শূন্য। আমি কিছুই আনতে পারিনি। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—তাতে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। শাঙ্কো বলল—সবাই জানতে চাইছে তুমি কী করে পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করলে।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—ভাইসব—সব তোমাদের বলবো কিন্তু তার আগে আমাকে খেতে দাও। বড্ড খিদে পেয়েছে।

বন্ধুরা ফ্রান্সিসকে প্রায় পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলল।

চার্লসের স্বর্ণসম্পদ

চার্লসের স্বর্ণসম্পদ

কেরিনিয়া বন্দর ছেড়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজ এল মাঝ সমুদ্রে। এবার দেশে ফিরে যাওয়ার কথা তুলল ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা। মারিয়া মুখে কিছু না বললেও সেও যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরে যেতে চায় এটা ওর মুখ দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল।

অগত্যা ফ্রান্সিস সেদিন বিকেলে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। পেছনে মারিয়া, হ্যারি, বিস্কো। ফ্রান্সিস মুখে কিছু বলে নি। বন্ধুদের দেশে ফেরার জন্যে বার বার তাগাদা শুনে গেছে। এখন ফ্রান্সিস জাহাজ চালক ফ্রেজারকে কী নির্দেশ দেয় সবাই সেটা শোনবার জন্যে ডেক-এ এসে জড়ো হল।

ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—ফ্রেজার, দিক ঠিক করে জাহাজ দেশের দিকে চালাও। কথাটা শুনেই সব ভাইকিং বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো-। এই ধ্বনি ওদের আনন্দের প্রতিবাদের আবার সঙ্কল্পেরও ধ্বনি।

একদল উঠে গেল পাল খাটাবার কাঠের ওপরে। দড়িদড়া টেনে—পালগুলো ঠিক করে দিতেই পালগুলো ফুলে উঠল হাওয়ার তোড়ে। জাহাজ চলল দ্রুতগতিতে। দাঁড় বাইবার প্রয়োজন নেই। তবু দাঁড় বাইতে বেশ কয়েকজন ভাইকিং দাঁড়-ঘরে নেমে এসে দাঁড়ে হাত লাগাল। জাহাজের গতি আরো বাড়ল। সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে জাহাজ চলল দ্রুতগতিতে। মারিয়ার দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস হেসে বলল—কি? খুশি তো?

—ভীষণ খুশি। মারিয়া প্রায় লাফিয়ে বাচ্চা মেয়ের মত বলে উঠল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে। নির্মেঘ আকাশ। বাতাসও বেগবান। জাহাজ চলেছে দ্রুতগতিতে।

সেদিন ভোর ভোর সময়ে নজরদার পেড্রোর হাঁক শোনা গেল—ডাঙা—ডাঙা দেখা যাচ্ছে। কয়েকজন ভাইকিং জাহাজের ডেক-এ শুয়ে ছিল। একজন উঠে বসল। গলা চড়িয়ে বলল—পেড্রো ভালো করে দেখ ডাঙা বালির মাটির না পাথরের। পেড্রো চোখ কুঁচকে তাকাল। তখনই সূর্য যেন সমুদ্রের জলের ঢেউয়ের মধ্যে থেকে উঠল। রোদ ছড়াল। পেড্রো তাকিয়ে দেখতে দেখতে গলা চড়িয়ে বলল—পাথুরে ডাঙা। ঢালু হয়ে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত এসেছে। ডেক-এ বিস্কোও শুয়েছিল। ওর ঘুম ভেঙে গেল। বিস্কো উঠে দাঁড়াল। মাস্তুলের ওপরে বসে থাকা পেড্রোকে চেঁচিয়ে বলল—পেড্রো ভালো করে দেখ। আমি ফ্রান্সিসকে ডাকতে যাচ্ছি। পেড্রোও গলা চড়িয়ে বলল—কিছুক্ষেণের মধ্যে তোমরাও দেখতে পাবে।

বিস্কো চলল ফ্রান্সিসকে ডাকতে। একটু পরেই ফ্রান্সিস আর হ্যারি ডেক-এ উঠে

এল। পেছনে মারিয়া। ফ্রান্সিস রেলিঙে ভর দিয়ে ডাঙার দিকে তাকিয়ে রইল। সমুদ্রের বুকে ঘন কুয়াশা। স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস অপেক্ষা করতে লাগল—কখন কুয়াশা কেটে যায়। ওদের ভাগ্য ভাল। একটু পরেই হঠাৎ সব কুয়াশা কেটে গেল। সকালের রোদে স্পষ্ট দেখা গেল ডাঙা। পাথুরে ডাঙা। ঢালু হয়ে সমুদ্রের জল পর্যন্ত নেমে এসেছে। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল—কী করবে এখন?

—ফ্রেজারের কাছে চলো। ফ্রান্সিস বলল। তিনজনে এবার চলল জাহাজ চালক ফ্রেজারের কাছে। ওরা ফ্রেজারের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—ফ্রেজার—ডাঙা দেখা যাচ্ছে। জাহাজ কি তীরে ভেড়ানো যাবে? না নৌকো নিয়ে যেতে হবে? ফ্রেজার জাহাজের হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল—যতদূর মনে হচ্ছে—সমুদ্রের তীর পর্যন্ত জাহাজ নিয়ে যাওয়া যাবে।

—তাই নিয়ে চলো। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া একটু ভীতস্বরে বলল—এখানে নামবে নাকি?

—উপায় নেই। কোথায় এলাম এটা না জানতে পারলে কতদূরে কোনদিকে আমাদের দেশ—সেটা বুঝবো কী করে। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি বলল—রাজকুমারী—আপনার কী মনে হয়? কোথায় এলাম আমরা?

—সঠিক তো বলতে পারবো না। তবে এটুকু বুঝতে পারছি আমরা এখনও ভূমধ্যসাগর থেকে বেরোতে পারিনি। আমরা সাইপ্রাস দ্বীপ থেকে দক্ষিণ মুখে আসছি। যদি আমার হিসেব ঠিক থাকে তবে এখন যে ডাঙা দেখছি সেটা মাল্টা দ্বীপপুঞ্জের কোন দ্বীপ।

—রাজকুমারীর অনুমান সঠিক। হ্যারি বলল।

—সেটা জেনে খোঁজ না করলে জানা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল। ফ্রেজারকে বলল—ফ্রেজার, জাহাজ যদি তীর পর্যন্ত যায় তবে তীরের কাছে যাও।

—হ্যাঁ—জাহাজ তীর পর্যন্ত যাবে। ফ্রেজার বলল। তারপর তীরের দিকে জাহাজ চালাল।

দূর থেকে দেখা গেল—একটা ছোট জাহাজ তীরে ভেড়ানো আছে। বোঝাই যাচ্ছে এটা জাহাজঘাটা। এবার জাহাজঘাটার পরেই লোকজন যাওয়া আসা করছে এটা দেখা গেল। ফ্রান্সিস এবার সাবধান হল। দিনের বেলা জাহাজ ভেড়ানো ঠিক হবে না। ফ্রান্সিস বলল—ফ্রেজার—জাহাজঘাটায় এখন এই দিনের বেলা জাহাজ ভেড়ানো ঠিক হবে না। এখানকার খোঁজখবর আমরা রাতে আনতে যাবো। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—ডানদিকের ঐদিকের তীরের কাছেই ঝোপ জঙ্গল শুরু হয়েছে। আমরা সন্ধ্যেবেলা ঐদিকের তীরেই জাহাজ ভেড়াবো। এখন তো এখানেই নোঙর ফেলো। আমরা এখন আর এগোবো না।

—বেশ। ফ্রেজার বলল। তারপরে বিস্কো আর কয়েকজনকে বলল—নোঙর ফেলো। বিস্কোরা নোঙর ফেলতে গেল। ফ্রেজার আর কয়েকজন বন্ধুদের

বলল—পাল নামাও। আমরা আর এগোব না। বন্ধুরা চলল পাল নামাতে। নোঙর ফেলা হল। পাল গুটিয়ে ফেলা হল। জাহাজ থামল। ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজটা দোল খেতে লাগল।

এখন কোন কাজ নেই। ভাইকিংরা এখানে ওখানে জড়ো হয়ে গল্পগুজব করতে লাগল।

বিকেলে পশ্চিম আকাশে রঙীন মেঘ দেখা গেল। গভীর কমলা রঙের সূর্য আস্তে আস্তে সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে যেন ডুবে গেল। কিছুক্ষণ পরেই পশ্চিম আকাশের কমলা রং মিলিয়ে গেল। অন্ধকার নামল।

রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কোকে বলল—রাত গভীর হলে আমরা ডাঙায় নামবো। তৈরি হয়ে এসো। মারিয়া পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ও বলে উঠল—আমিও যাবো। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—না। তোমাকে নিয়ে যাবো না।

—আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। বিদেশ বিভুঁই। আমরা এখানকার কিছুই জানি না। যদি বিপদে পড়ি আপনি থাকলে আমাদের বিপদ বেড়ে যাবে কমবে না। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে ঠিক আছে। মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। তারপর চলে গেল।

তখন রাত গভীর। ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কোকে নিয়ে জাহাজের ডেকে উঠে এল। দেখল ফ্রেজার হুইলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জন ভাইকিং বন্ধু নোঙর তুলল। কয়েকজন ভাইকিং ফ্রেজারের নির্দেশে দাঁড়ঘরে নেমে গেল। দাঁড় বাওয়া চলল। ফ্রেজার হুইল ঘুরিয়ে জাহাজ চালাল তীরের দিকে। জাহাজটা আস্তে আস্তে সমুদ্রতীরে ভিড়ল। কাঠের পাটাতন পাতা হল। যথাসম্ভব নিঃশব্দেই সব কাজ হল।

পাটাতনের ওপর দিয়ে ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কো হেঁটে তীরে নামল। একটু মাঠমতো। তারপরই জঙ্গল শুরু হয়েছে। ওরা মাঠ পার হয়ে চলল। জোছনা উজ্জ্বল। কাছাকাছি সবই দেখা যাচ্ছে। ওরা একটু পরেই জঙ্গলে ঢুকল। বন খুব ঘন নয়। ছাড়াছাড়া গাছপালা। ঘাস-ঢাকা মাটিতে কোথাও কোথাও ভাঙা জোছনা পড়েছে। ওরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলল।

বনজঙ্গল শেষ হল। বনজঙ্গল থেকে বেরিয়ে দেখল একটা বড় রাস্তা উত্তরমুখো চলে গেছে। দুপাশে পাথর আর কাঠের বাড়ি। বসতি এলাকা।

ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে পড়ল। কোন বাড়িতে ঢুকে খোঁজ নেবে ফ্রান্সিস এরকমই ভাবছিল। তখনই হঠাৎ ডানদিকে গলিমতো একটা পথ দিয়ে জনা দশেক সৈন্য এসে হাজির হল। সৈন্যদের বুকে বর্ম মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই। ঝোলা হাতা হাঁটুঝুল ঢোলা জামা। কোমরে ফেট্টি তাতে তরোয়াল গোঁজা। প্রয়োজনে এঁদের সঙ্গে লড়া যাবে। একেবারে ফ্রান্সিসদের মুখোমুখি। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় সবই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দুদলই দাঁড়িয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত। সৈন্যরা প্রায় ফ্রান্সিসদের ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়তে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস তরোয়াল ফেলে দিল। পাথুরে মাটিতে শব্দ হল—ঝনাৎ। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি শাঙ্কো—তরোয়াল ফেলে দাও। ফ্রান্সিসদের অস্ত্র ত্যাগ করতে দেখে সৈন্যদের মধ্যে থেকে থুতনিতে ছুঁচোলো দাড়িওয়ালা একজন সর্দার গোছের সৈন্য এগিয়ে এল। গ্রীক ভাষায় বলল—তোমরা তো এখানকার লোক নও। হ্যারি বলল।

—না। আমরা ভাইকিং। বিদেশী।

—এখানে কেন এসেছো? লোকটি বলল।

—দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়ানো আমাদের নেশা। হ্যারি বলল।

সর্দার ওর সঙ্গীদের দিকে তাকাল।

তখন সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলল—তোমরা এখানে কী করে এলে?

—জাহাজে চড়ে। হ্যারি বলল।

—তোমাদের জাহাজ কোথায়? সর্দার জানতে চাইল।

—ঐ জঙ্গলের পরে সমুদ্রতীরে ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে। হ্যারি বলল।

—তোমরা এখন কোত্থেকে আসছো? সর্দার জিজ্ঞেস করল।

—সাইপ্রাস দ্বীপ থেকে। হ্যারি বলল।

—মিথ্যে কথা। সর্দার গলায় জোর দিয়ে বলল।

—ভাইকিংরা মিথ্যে কথা বলে না। হ্যারিও গলা চড়িয়ে বলল।

—তোমরা রাজা তৃতীয় পিটারের গুপ্তচর। খোঁজ নিতে এসেছো—আমাদের সৈন্য সংখ্যা কত। কোথায় কোথায় আমাদের ঘাঁটি। লোকটি বলল।

—আমি আবার বলছি। আমরা কোন রাজার গুপ্তচর নই। আমরা ভাইকিং। জাহাজে চড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। সমস্ত পৃথিবীই আমাদের ঘরবাড়ি। হ্যারি বলল।

সর্দার থুতনির ছুঁচোলো দাড়িতে কয়েকবার হাত বুলোল। তারপর বলল—যাক গে—তোমাদের বন্দী করা হল। কালকে দলপতি যা হুকুম দেবেন তাই পালিত হবে।

—কী কথা হল বলো। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি আস্তে আস্তে সর্দার যা বলল সেসব জানাল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি উপায় নেই। রাজা তৃতীয় পিটারের নাম আমরা এই প্রথম শুনলাম এসব বলেও রেহাই পাবো না। অগত্যা এখন বন্দীদশা মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। সর্দার বলল—এবার চলো। একজন সৈন্য ফ্রান্সিসদের তরোয়াল নিয়ে চলল।

সর্দার ফ্রান্সিসদের আগে রাখল। পেছনে সৈন্যরা আসতে লাগল। চাঁদের উজ্জ্বল আলোতে দেখা গেল দুপাশে নিঝুম বাড়িঘরদোর। ফ্রান্সিসরা হেঁটে চলল। ফ্রান্সিসের শুধু এক চিন্তা—ওদের যে বন্দীশালায় রাখা হবে সেটা কেমন।

কিছুক্ষণ পরে সর্দার ওদের একটা খোলা মাঠমত জায়গায় নিয়ে এল। মাঠটার

চারদিক কাঁটা তারে ঘেরা। প্রবেশদ্বারের সামনে আনা হল। প্রবেশদ্বারও কাঁটা তার পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তৈরি। সবাই প্রবেশদ্বারের সামনে এসে দাঁড়াল। দুতিনজন পাহারাদার খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছিল।

সর্দার পাহারাদারদের কী বলল। একজন পাহারাদার কোমরের ফেট্টি থেকে চাবির তোড়া বের করল। চাঁদের আলোয় তোড়ার ঠিক চাবিটা বের করল। কাঁটাতারের দরজাটা খুলল। ফ্রান্সিসদের ঠেলে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। হ্যারি জানে এ ধরনের ব্যবহার ফ্রান্সিস সহ্য করবে না। তাই গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস—সব মেনে নাও। মাথা গরম করো না। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না—রুখেও দাঁড়াল না। ওরা বন্দী শিবিরে ঢুকল। দেখল—আগেও কিছু বন্দী মাটিতে শুয়ে বসে আছে।

ফ্রান্সিসরা কাঁটাতারের বেড়ার কাছে বসল। ফ্রান্সিস ধূলোটে মাটিতে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি তুমি ঘুমিয়ে নাও। রাত জাগা তোমার সইবে না।

—কিন্তু তুমি? হ্যারি বলল।

—বাকি রাতটা জেগেই কাটাবো। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো বলল—না ফ্রান্সিস—তুমি ঘুমোও আমি জেগে থাকবো। কপালে দুহাত রেখে ফ্রান্সিস চোখ বুঁজল। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ল না। নানা চিন্তা মাথায়।

ভোর হল। সকালের উজ্জ্বল রোদ ছড়ালো কাঁটাতারে ঘেরা বন্দী শিবিরে। উত্তর দিকের জঙ্গল থেকে বিচিত্র পাখির ডাক শোনা গেল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল —যাও তো ঐ বন্দীদের সঙ্গে কথা বলে এসো। এই দলপতি কেমন লোক। ওদের বন্দী করেছে কেন—মাল্টা এখান থেকে কতদূর সব খবর নিয়ে এসো।

হ্যারি আগে থেকে বন্দীদের কাছে গেল। গ্রীক ভাষায় ওদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে হ্যারি ফিরে এল। তখনই পাহারাদারেরা সকালের খাবার নিয়ে ঢুকল। বন্দীদের বসতে বলল। সামনে একটা করে বড় পাত্র দেওয়া হল। খেতে দেওয়া হল গোল কাটা রুটি আর আলু শাক-সব্জীর ঝোল। খেতে খেতে হ্যারি বলল—ওরা প্রায় সবাই দস্যুতার জন্যে এখানে কয়েদ হয়ে আছে। এখনকার শাসক দলপতি নাকি অদ্ভুত লোক। নিজেই টহলদার সৈন্যদের সঙ্গে পাহারা দেয়। দলপতির নাম সিক্কা। মাল্টা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। হ্যারি একটু থেমে বলল—সবচেয়ে মারাত্মক খবর হল—কয়েকদিন পরেই এখানে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসবে। সুস্থ সবল বন্দীদের সেই হাটে বিক্রী করা হবে।

—বলো কি! ক্রীতদাস কেনাবেচা যারা করে তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র মানবিকতা বোধ থাকে না। তাদের কাছে ক্রীতদাসরা গরু ছাগলের মত। বোঝাই যাচ্ছে—আমরা ভয়ানক বিপদে পড়েছি। শুধু বন্দীর জীবন মেনে নেওয়া যায় কিন্তু ক্রীতদাসের জীবন মেনে নেওয়া অসম্ভব। ফ্রান্সিস বলল।

—কী বরবে এখন? হ্যারি বলল।

—পালাবার উপায় বের করতে হবে। এখানকার পাহারার ব্যবস্থা দেখে পালানোর উপায় ভাবতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

একটু বেলা হতে বন্দী শিবিরের দরজার সামনে সৈন্যদের তৎপরতা দেখা গেল। তার মানে ওদের দলনেতা সিঙ্কা হয়তো আসবে। তারই তোড়জোড় শুরু হল।

কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে গেল। একজন বৃদ্ধকে নিয়ে সিঙ্কা ঢুকল। এ কি? এ তো সেই থুতনিতে ছুঁচোলো দাড়িওয়ালা লোকটা। সিঙ্কা বুঝল ফ্রান্সিসরা একটু অবাকই হয়েছে। সিঙ্কা ফ্রান্সিসদের কাছে এল। হাসি নয়। যেন দাঁত খিঁচিয়ে বলল—এবার ক্রীতদাসের হাটে আমরা ভালো দর পাবো। এরকম বলিষ্ঠদেহী সাদা মানুষ তো সব সময় পাওয়া যায় না। ফ্রান্সিস বুঝল ওদের ক্রীতদাসের কেনাবেচার হাটে বিক্রি করা হবে। ফ্রান্সিস বসেছিল। এবার দ্রুত উঠে দাঁড়াল। স্পেনীয় ভাষায় বলল—আমাদের কেন ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করা হবে? আমাদের অপরাধ কী?

—বাঃ তোমরা তো রাজা পিটারের গুপ্তচর। তোমাদের মেরেই ফেলতাম কিন্তু তোমাদের বাঁচিয়ে রেখেছি ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করবো বলে। সিঙ্কাও স্পেনীয় ভাষায় বলল।

—আগে প্রমাণ করুন যে আমরা রাজা পিটারের গুপ্তচর। যদি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে যে শাস্তি দিতে চান দেবেন। আমরা সেই শাস্তি মেনে নেব। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের ব্যাপারে অত খোঁজখবর করা যাবে না। তোমাদের ক্রীতদাস কেনাবেচার হাটে বিক্রি করা হবে। ব্যস্—। সিঙ্কা বলল।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। মাটিতে বসে পড়ল।

সিঙ্কা দস্যুদলের কাছে গেল। বলল—তোমাদেরও বিক্রি করা হবে। সব মিলিয়ে এবার আমার ব্যবসা ভালোই হবে। সিঙ্কা খুক্ খুক্ করে হাসল। তারপর দরজার দিকে চলল। যেতে যেতে গলা চড়িয়ে বলল—এদের যত্নআত্তি করবি। ভালো খেতে দিবি। কারো যেন অসুখ না করে। সবারই একেবারে তরতাজা চেহারা চাই। তবে না ক্রীতদাস বেচাকেনার হাটে বেশি দাম পাবো।

সিঙ্কা বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হল।

ফ্রান্সিসদের বন্দীজীবন কাটতে লাগল। ফ্রান্সিস সারাক্ষণ শুয়ে থাকে আর ভাবে কীভাবে এই বন্দী শিবির থেকে পালানো যায়।

দুদিন একইভাবে কাটল।

তৃতীয় দিন। তখন ফ্রান্সিসরা সকালের খাবার খেয়েছে। ফ্রান্সিস সামান্য ঘাসধুলোর ওপর শুয়ে পড়ল। মাথায় এক চিন্তা—কী করে মুক্তি পাবো।

একটু পরে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—ওঠো আমাদের সমস্যা আরো বাড়ল। ফ্রান্সিস চোখের ওপর থেকে দুহাতের কনুই সরিয়ে তাকাল। বলল—ওকথা বলছো কেন?

—রাজকুমারী বিস্কো পেড্রো আরো কয়েকজন বন্দী হল। হ্যারি বলল।

—বলো কি? ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল। দেখল—দরজা খোলা হল। রাজকুমারী বিস্কোরা ঢুকছে। ফ্রান্সিস বলে উঠল—সর্বনাশ। আর পালাবার ভরসা নেই। ক্রীতদাসের হাটে আমরা বিক্রি হয়ে যাবো।

মারিয়ারা ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বসল।

ফ্রান্সিস রেগে বলে উঠল—তোমরা এত অধৈর্য হয়ে পড়লে কেন? মারিয়া বিস্কো—তোমরা কেন এলে?

—তোমাদের কোন খোঁজ নেই দুদিন ধরে। আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি? মারিয়া একটু কান্নাভেজা গলায় বলল।

—আমাদের খুঁজতে এসে লাভের মধ্যে আমাদের সমস্যা বাড়ালে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা তো—মারিয়া বলতে গেল। ফ্রান্সিস ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল—খুব অন্যায় করেছো। জানো দুদিন পরে এখানে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসবে। ভেবেছিলাম তার আগেই পালাবো। তোমরা ধরা পড়লে—আর কোন উপায় নেই। ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি হতে হবে।

—এর মধ্যে তো একটা উপায় বার করতে পারবে। মারিয়া বলল।

—ক্রীতদাস কেনাবেচা যারা করে তারা যে কী হৃদয়হীন তা তোমার জানা নেই। এদের কবল থেকে বাঁচতে গেলে হয় মরতে হবে নাতো সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া চুপ করে রইল তারপর কেঁদে ফেলল। বলল—তাহলে এদের আমি বলবো যে আমাকে বিক্রি করুক তোমাদের যেন মুক্তি দেয়।

—এ কথাটা তুমি বলতে পারলে? ফ্রান্সিস আস্তে বলল। মারিয়া কোন কথা না বলে কাঁদতে লাগল। হ্যারি মারিয়ার কাছে এসে বসল। বলল—রাজকুমারী আপনি কান্নাকাটি করলে আমাদের মন দুর্বল হয়ে যাবে। আপনি শান্ত হোন। ফ্রান্সিস নিশ্চয় পালাবার কোন উপায় বের করবে। শুধু আপনি ভেঙে পড়বেন না—এই অনুরোধ। মারিয়া চোখ মুছল। আস্তে আস্তে শান্ত হল।

শাঙ্কো এতক্ষণ ফ্রান্সিসদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার বলল—ফ্রান্সিস আমি আজ রাতেই পালাবো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি চমকে উঠল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—তুমি কি পাগল হলে। এই কাঁটাতারে ঘেরা বন্দীশিবির থেকে পালানো অসম্ভব বলবো না। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে।

—ফ্রান্সিস, শুধু আমিই পালাবো। বাইরে থেকে তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা

করবো। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। আমাকে বোঝাও কী করে পালাবে? ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। বলল—চলো—দেখাচ্ছি। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। দু'জনে চলল সদর দরজার দিকে।

দরজার কাছে এসে শাঙ্কো একজন পাহারাদারকে স্পেনীয় ভাষায় বলল—জল আনো। জল ফুরিয়ে গেছে। পাহারাদারটি বলে উঠল—তা কি করে হয়। সকালেই কাঠের পীপেয় জল ভরা হয়েছে।

—ঠিক আছে। তুমি দেখবে এসো। শাঙ্কো বলল। পাহারাদার দরজার তালা খুলে ঢুকল। চলল খাবার জল আছে কিনা দেখতে। অন্য পাহারাদারটি তরোয়াল উঁচিয়ে দরজা পাহারা দিতে লাগল।

শাঙ্কো মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস—দরজার দুপাশে আর ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখ শুধু তারে বাঁধা। ফ্রান্সিস পায়চারি করতে করতে লক্ষ্য করল। শাঙ্কোর কথা ঠিক। ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে। কিন্তু ওপরে হাত পাঁচেক কাঁটা- তারে ঘেরা।

—ঐটুকু পেরোতেই সাবধান হতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—তবু তুমি আহত হবেই। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। সে সব কাটাটাটা ভেন-এর ওষুধেই সেরে যাবে। কিন্তু পালাবার এই সুযোগ ছাড়া যাবে না। শাঙ্কো বলল। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। তখনই পাহারাদারটি এল। ভাঙাভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল—তোমাকে কে বলেছে যে জল নেই। পীপে ভর্তি জল।

—তাহলে কেউ মিথ্যে করে বলেছে। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো নিজেদের জায়গায় ফিরে এলো।

ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—তুমি দরজার মাথা দিয়ে পালাতে চাও। কিন্তু ঐখানে রাতে মশাল জ্বলে আর পাহারাদারেরা পাহারা দেয়। ওদের নজর এড়িয়ে উঠে পালাতে পারবে?

—ফ্রান্সিস—আকাশের দিকে তাকাও। শাঙ্কো বলল। ফ্রান্সিস কথাটার অর্থ বুঝল না। ওপরে খোলা আকাশের দিকে তাকাল। দেখল আকাশে কালো মেঘের আসা যাওয়া চলছে। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল—বৃষ্টি হবে। দরজার মাথায় রাখা মশাল নিভে যাবে। পাহারাদাররাও সৈন্যদের ছাউনিতে চলে যাবে। তখন সাধারণ তারে পা রেখে রেখে ওঠা যাবে। বাকি হাত চার-পাঁচেক কাঁটা-তার পার হতে হবে। এই বলতে চাও।

শাঙ্কো হেসে বলল—ফ্রান্সিস তোমার বুদ্ধি চিন্তার কাছে আমরা ছেলেমানুষ।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—উঁহু—শাঙ্কো—তুমি অনেক চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছো। এবার কাজটা করা। তার জন্যে এখন প্রয়োজন ঝড় বৃষ্টির। আকাশের মেঘ দেখে যা বুঝতে পারছি সন্ধ্যে নাগাদ ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে। আমরা ভাইকিং।

সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াই। ঝড়বৃষ্টির আগাম সংকেত আমরা সহজেই বুঝি।
সাবাস—শাঙ্কো।

ফ্রান্সিসদের অনুমান সত্যি হল। সন্ধ্যের পরেই আকাশ ঘন মেঘে ঢেকে গেল। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা রেখা আকাশটা যেন চিরে ফেলতে লাগল। সেই সঙ্গে বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দ।

প্রচণ্ড হাওয়ার ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্দীশিবিরের ওপরে। শুরু হল বৃষ্টি। দরজার মাথায় রাখা মশাল নিভে গেল। পাহারাদার দু'জন সৈন্যদের ছাউনিতে চলে গেল। একজন ছাউনির জানালা দিয়ে বন্দীশিবিরের দিকে নজর রাখল।

গভীর অন্ধকারে শুধু বিদ্যুতের আলো ঝলসে উঠছে যখন তখন যা মুহূর্তের জন্যে দেখা যাচ্ছে।

—ফ্রান্সিস পালাচ্ছি। এই বলে শাঙ্কো দ্রুত বন্দীশিবিরের দরজার কাছে এল।

সাধারণ তারগুলোয় পা রেখে রেখে হাত দিয়ে ধরে ধরে উঠতে লাগল। এবার কাঁটাতার পার হওয়া। এটুকু উঠতে কয়েক প্যাঁচ কাঁটাতার হাত দিয়ে ধরতে হল। পায়ে ভর নিতে হ'লো। তাতেই কাঁটাতারের খোঁচায় হাত পা জখম হল।

এ বার শুধু কাঁটা তার পার হওয়া। শাঙ্কো উঠতে লাগল। হাতে পায়ে গায়ে কাঁটাতারের কাঁটা ফুটতে লাগল। বুকে গায়েও কাঁটা ফুটতে লাগল। শাঙ্কোর পোশাক রক্তে ভিজে গেল। কানের কাছে বৃষ্টিঝরার একটানা শব্দ। অন্ধকার চোখের সামনে। শুধু বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠা। ঐ দু এক মুহূর্তে। তারপর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

শাঙ্কো মুখ বুঁজে সব যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল। একসময় ওঠা শেষ হল। এবার নামা। শাঙ্কো কাঁটা ছাড়া তার দেখে দেখে নামতে লাগল। তখনও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। শাঙ্কোকে যেই দেখল কাঁটাতারের বেড়া বেয়ে নেমে আসছে। পাহারাদার তার সৈন্যদের ছাউনির জানালা দিয়ে দেখল, সঙ্গীকে ডাকাডাকি করল। সঙ্গীকে পেল না। ওদিকে বন্দী পালাচ্ছে। পাহারাদারটি খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল। শাঙ্কোও লাফ দিয়ে মাটিতে নেমেছে পাহারাদার তখনই ওর সামনে এসে দাঁড়াল। শাঙ্কোর পোশাক ছেঁড়া খোড়া। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে উবু হয়ে পোশাকের মধ্যে হাত বাড়িয়ে ছোরাটা বের করল। পাহারাদার তরোয়াল চালাল। শাঙ্কো ছোরা দিয়ে ঠেকাল। শাঙ্কো ভালো করেই বুঝেছিল শুধু ছোরা দিয়ে পাহারাদারের আক্রমণ ঠেকানো যাবে না। শাঙ্কো দ্রুত একবার চারপাশটা দেখে নিল। বাঁদিকে একটু দূরেই দেখল জঙ্গলমত। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে ছুটল। পাহারাদারও তরোয়াল হাতে ওর পেছনে পেছনে ছুটল।

শাঙ্কো জঙ্গলে ঢুকে পড়েই দিক পাল্টে বাঁদিকে সরে গেল। দ্রুত জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। পাহারাদার তখনও জঙ্গলে শাঙ্কোকে খুঁজছে।

এবার শাঙ্কো আস্তে আস্তে জঙ্গলে ঢুকল। ডালপাতার আড়াল থেকে

পাহারাদারটির দিকে এগোতে লাগল। পাহারাদারের হাত কয়েক পেছনে এসে দাঁড়াল। শাঙ্কো একটু মাথা নিচু করে তৈরি হল। বিদ্যুৎ চমকাল। বিদ্যুতের আলোয় আন্দাজ করে পাহারাদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাতের ছোরাটা পাহারাদারের পিঠে ঢুকিয়ে দিল। পাহারাদারটি শাঙ্কোর ধাক্কা সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল। কয়েকবার নড়েচড়ে মরে গেল।

শাঙ্কো তখন হাঁ করে হাঁপাচ্ছে। মাটিতে বসে পড়ল। একটুক্ষণ হাঁপালো।

তারপর ছোরাটা কোমরে গুঁজল। পাহারাদারের পোশাক টেনে খুলল। নিজের কাঁটাতারের ঘষ্টা লেগে শতচ্ছিন্ন পোশাকটা খুলল। তারপর পাহারাদারের পোশাকটা পরল। পোশাকের মাথার কাছে কাপড়টা বেশি। ওটা দিয়ে মাথা ঢাকা যায়। শাঙ্কো পাহারাদারের তরোয়ালটা নিল।

কোমরের মোটা বেল্টটা লাগাতে লাগাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল।

তখন ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। তবে বিদ্যুৎ চমকানো বন্ধ হয় নি।

অন্ধকারের মধ্যে শাঙ্কো আস্তে আস্তে কাঁটাতারে ঘেরা বন্দীশিবিরের পেছনের দিকে এল। ফ্রান্সিসরা ঐদিকটাতেই বসেছিল। শাঙ্কো কাটাতারের বেড়ার কাছে এসে চাপা গলায় ডাকল—ফ্রান্সিস—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস বৃষ্টিভেজা মাটিতেই শুয়ে ছিল। ডাক কানে যেতেই দ্রুত উঠে বসল। পেছনদিকে তাকাল। তখনই বিদ্যুৎ চমকালো। ও শাঙ্কোকে দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি উঠে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে এল।

শাঙ্কো বলল—আমি পোশাক পাল্টেছি। তরোয়ালও পেয়েছি। এখন কী করবো?

—দলপতি সিক্কার—সৈন্যদের মধ্যে মিশে থাকো। পরশু ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসবে। তখন আমাদের তো বন্দীশিবিরের বাইরে আনা হবে। হাটে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন পালাবার উপায় ভাববো। লড়াই করে নয়। বুদ্ধি খাটিয়ে অক্ষত দেহে আমাদের পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে সব ভালো করে দেখতে হবে। একটা উপায় বের করবোই। শাঙ্কো বলল।

—কাঁটাতারে ঘষা খেয়ে তুমি খুব আহত হওনিতো? হ্যারি এগিয়ে এসে বলল।

—তা সে হয়েইছি। ও ভেনের ওষুধে সেরে যাবে। এখন কী করে পালাবো সেটা ভাবতে হবে। শাঙ্কো বলল। তারপর ও সৈন্যদের ছাউনির দিকে চলল।

রাত শেষ হয়ে এসেছে। শাঙ্কো ওপরে আকাশের দিকে তাকাল। দেখল আকাশ সাদাটে হয়ে আসছে। সূর্যোদয়ের বেশি দেরি নেই।

একটু পরেই সূর্য উঠল। আলো ছড়ালো সৈন্যদের ছাউনিতে বন্দী শিবিরে। ওপাশের জঙ্গলে পাখির ডাক শুরু হল।

শাঙ্কো সৈন্যদের ছাউনিতে এ ঘর ও ঘর দেখতে লাগল। সব ঘরেই সৈন্যদের

সংখ্যা বেশি। পশ্চিম দিকে একটা ছোট্ট ঘর দেখল। কাছে এগিয়ে এল। ঘরটায় মাত্র একজন সৈন্য আছে। শাঙ্কো ঐ ঘরটাই বেছে নিল। ঘরে আর একটা খালি লোহার খাট।

শাঙ্কো ঘরটায় ঢুকল। দেখল সৈন্যটি ঠিক তখনই ঘুম ভেঙে উঠে বসল। সৈন্যটি হাই তুলতে তুলতে শাঙ্কোকে দেখতে পেল। তারপর গ্রীক ভাষায় শাঙ্কোকে বলল—'ভাই তুমি কি কাউকে খুঁজছো?' শাঙ্কো হাসল। আঙ্গুল দিয়ে মুখ গলা দেখিয়ে আবার হাসল।

—ও বোবা কালা। সৈন্যটি বলল। শাঙ্কো হাত দিয়ে জল খাওয়ার ইঙ্গিত করল। সৈন্যটি বুঝল জলতেষ্টা পেয়েছে লোকটার। ও ঘরের কোণায় রাখা মাটির পাত্র দেখাল। শাঙ্কো গিয়ে জল খেয়ে এল।

সৈন্যটি চুপ করে বসে রইল। শাঙ্কোর সঙ্গে আর কী কথা বলবে। তবু হাত নেড়ে ইঙ্গিতে জানতে চাইল বোবা কালা লোকটা কোন দেশের কোত্থেকে এসেছে। শাঙ্কোও হেসে আঙ্গুল নেড়ে বোঝাল ও এই দেশেরই লোক। সৈন্যটি কী বুঝল কে জানে। সে চুপ করে রইল। এবার শাঙ্কো খালি লোহার খাটটা দেখিয়ে ইঙ্গিতে বোঝাল এ খাটে সে শুতে চায় থাকতে চায়। সৈন্যটি মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

সৈন্যটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শাঙ্কো তখন খালি খাটেই শুয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে। গত রাত জাগতে হয়েছে। সারা শরীরে হাতে পায়ে কাঁটাতারের খোঁচা। সেসব ঢাকতে শাঙ্কো হাত দুটো খোলা জামার পকেটে রাখল। সৈন্যটির নজরে পড়লে নিশ্চয়ই জানতে চাইবে কী করে কাটল।

কিছুক্ষণ পরে সৈন্যটি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। দু'জনের খাবারই এনেছে। ঘুমন্ত শাঙ্কোকে ডাকতে গিয়ে দেখল শাঙ্কোর কাটা ছেঁড়া হাত। ও খাবারটা শাঙ্কোর বিছানাতেই রাখল। নিজেও খেল না। শাঙ্কোর ঘুম ভাঙার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে শাঙ্কোর ঘুম ভাঙল। ও উঠে বসল। একটু সময় গেল বুঝতে যে ও এখন কোথায় আছে। সৈন্যটিকে দেখে বুঝল সব। সঙ্গে সঙ্গে ও হাত দুটো পকেটে পুরল। সৈন্যটি হেসে বলল—ঐ কাটা ছেঁড়া দাগ কি সবসময় পকেটে ঢেকে রাখতে পারবে? শাঙ্কো বোকার হাসি হাসল। সৈন্যটি ওর খাবার দেখিয়ে বলল—এবার তো হাত বের করতে হবেই। শাঙ্কো হেসে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে নিয়ে খেতে লাগল। খেতে খেতে সৈন্যটি শাঙ্কোকে ইঙ্গিতে বোঝাল—তোমার হাত মুখ এরকমভাবে কেটে ছড়ে গেল কেন? শাঙ্কো গাছে চড়ার ইঙ্গিত দিয়ে বোঝাল গাছে উঠতে গিয়ে হাত মুখ কেটে ছড়ে গেছে। সৈন্যটি মাথা নেড়ে বোঝাল ও বুঝতে পেরেছে। সৈন্যটি বেরিয়ে গেল। শাঙ্কো আবার ঘুমিয়ে নিল।

ওদিকে খোলা আকাশের নিচে বন্দীশিবিরে ফ্রান্সিসরা ঝড়বৃষ্টিতে ভিজে গেল। জল বেশি জমে নি। পূবদিকে ঢাল বেয়ে বৃষ্টির জল চলে গেছে। তবু মাটি তো

ভেজা। ফ্রান্সিসরা ভেজা মাটিতেই শুয়ে বসে রইল। ফ্রান্সিসের এরকম অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। বন্ধুরাও খুব একটা কাবু হয়নি। কিন্তু মারিয়া দুহাত বুকের কাছে নিয়ে জড়সড় হয়ে বসে রইল।

ফ্রান্সিস উঠে গিয়ে ওর জামাটা খুলে ফেলল। ভেজা জামাটা দিয়ে মারিয়ার মাথা মুখ হাত পা মুছে দিতে লাগল। বিস্কো হ্যারিও জামা খুলে মারিয়ার মাথা হাত পা মুছিয়ে দিল। মারিয়ার শরীর একটু শুকোল। আগের ঠাণ্ডা ভাবটা আর রইল না।

সকালের খাবার খাওয়া হয়ে গেছে। কাঁটাতার আর কাঠে তৈরি দরজা দিয়ে দলপতি সিক্কা ঢুকল। হেসে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—কাল রাতে তোমাদের খুব অসুবিধে হয়েছে তাই না? আমার বন্দীশিবিরটা এমনি। মাথার ওপরে খোলা আকাশ।

দলপতি সিক্কা এবার মারিয়ার দিকে তাকাল। মুখে চুক্‌চুক্ শব্দ করে বলল—আহা একে তোরা অন্য জায়গায় নিয়ে গেলি না কেন। দ্যাখ তো কী অবস্থা হয়েছে চেহারার। বেচাকেনার হাটে তো দাম পড়ে যাবে। একে অন্দরমহলে নিয়ে যা। চানটান করে নতুন পোশাক পরুক।

একজন পাহারাদার মারিয়ার দিকে এগিয়ে গেল। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। বলল—উনি আমাদের দেশের রাজকুমারী।

—তাহলে তো আরো ভালো। রাজকুমারী বলে কথা। সিক্‌কা হেসে বলল।

—আমি যাবো না। মারিয়া গলা চড়িয়ে বলে উঠল। ফ্রান্সিসও বলে উঠল—না—রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে দেব না।

হ্যারি উঠে দাঁড়াল। বলল—ফ্রান্সিস বাধা দিও না। এই নরককুণ্ডে রাজকুমারী আর একদিনের জন্যে থাকলেও অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তাতে আমাদের সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। অন্দরমহলে গিয়ে স্নান করে শুকনো পোশাক পরলেই রাজকুমারী সুস্থ থাকবেন। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বসে পড়ল। আর কোন কথা বলল না। মারিয়া মাথা নেড়ে বলে উঠল—না আমি যাবো না। হ্যারি বলল—রাজকুমারী আপনি আমাদের সকলের বিপদ ডেকে আনবেন না। আপনি যান। আপনি সুস্থ থাকুন এটাই আমরা চাই।

মারিয়া ফুঁপিয়ে উঠল। তারপর পাহারাদারের সঙ্গে চলে গেল।

দলপতি সিক্কাও বেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিসরা চুপ করে বসে রইল।

ওদিকে সৈন্যটি শাঙ্কোকে নিয়ে দুপুরের খাবার খেতে গেল। শাঙ্কোর গায়ে সিক্‌কার সৈন্যদের পোশাক। কাজেই কেউ সন্দেহ করল না। শাঙ্কো বোবা কালার অভিনয় করতে লাগল।

খেয়েদেয়ে শাঙ্কো এবার চলল সমুদ্রতীরের দিকে। যেখানে ওদের জাহাজটা রয়েছে শাঙ্কো সেখানে এল। জাহাজ থেকে পার অব্দি পাতা কাঠের পাটাতনের

ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে জাহাজে উঠল।

বন্ধুরা ছুটে এল। সবাই জানতে চায় ফ্রান্সিসদের কথা। শাঙ্কো সকলের দিকে তাকিয়ে একে একে সব ঘটনা বলে গেল।

ফ্রেজার বলল—এখন কী করবে?

—দলপতি সিক্কা ফ্রান্সিসদের ক্রীতদাসের হাটে বিক্রির জন্যে তুলবেই। এখন পালানোর কথা ভাবতে হবে। কীভাবে ফ্রান্সিসদের মুক্ত করা যায়—এসব ভাবতে হবে। তার ব্যবস্থা করতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—তুমি এখন কী করবে? ফ্রেজার বলল।

—আমি আজকের রাতটা জাহাজেই থাকবো। শাঙ্কো বলল। তারপর গায়ের পোশাকটা খুলে ফেলল। দেখা গেল ভেতরে ওদের পোশাকটাও ছিঁড়ে গেছে। বুকে পিঠে রক্তের দাগ। হাতেই সবচেয়ে দাগ বেশি। তখনও অনেক ক্ষতে রক্ত জমে আছে।

শাঙ্কো চারদিকে তাকিয়ে ভেনকে খুঁজল। ভেন এখানে নেই। শাঙ্কো ভেনের কাছে যাবে বলে এগোচ্ছে তখনই দেখা গেল ভেন ওর ওষুধপত্রের থলে নিয়ে আসছে। ভেন সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা শাঙ্কোকে বিরক্ত করো না। ওর এখন বিশ্রাম প্রয়োজন।

সবাই চলে গেল। কয়েকজন রইল। ওরা চুপ করেই রইল।

ভেন শাঙ্কোকে বলল জামা খুলে ফেল। শাঙ্কো ওদের দেশীয় পোশাকটা খুলে ফেলল। এবার ভেন বলল—নড়াচড়া করো না।

ভেন থলে থেকে দুটো কাচের বোয়াম বের করল। বোয়াম দুটো রেখে থলে থেকে পরিষ্কার ন্যাকড়া বের করল। তারপর দুটো বোয়ামেরই ওষুধে ন্যাকড়াটা ভিজিয়ে নিয়ে শাঙ্কোর কাটাছেঁড়া জায়গায় ওষুধ লাগাতে লাগল। এবার দেখা গেল শাঙ্কোর শরীর হাত পা কাঁটাতারের খোঁচায় কীভাবে কেটে গেছে। ভেন বারকয়েক ওষুধটা লাগাল। তারপর বলল—এখন পোশাক খুলেই রাখ। যাও শুয়ে পড় গে।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে উঠে নিজের কেবিনঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। জ্বালা যন্ত্রণা কমল অনেকটা।

সেই রাতটা শাঙ্কো জাহাজেই রইল।

পরদিন সকালেই সকালের খাবার খেয়ে চলল বন্দীশিবিরের দিকে। তার আগে দলপতি সিক্কার সৈন্যদের পোশাকটা পরে নিল। এখন এই পোশাকটাই ভরসা। সিক্কার সৈন্যদের চোখে ধুলো দেওয়ার এটাই বড় অস্ত্র।

অল্পক্ষণ পরেই শাঙ্কো বন্দীশিবিরের কাছে এল। দেখল এর মধ্যেই বন্দীশিবিরের বাইরে লোকজন জমে গেছে।

বন্দীশিবিরের পাশেই একটা পাথরের মঞ্চমত। তার মাঝখানে একটা গোল কাঠের থামমত। তাতে দড়ি বাঁধা। সামনেই একটা পাথরের আসনমত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দলপতি দু'জন বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে এল। বৃদ্ধ দু'জন বোধহয় তার পরামর্শদাতা।

একজন সৈন্যের পাহারায় মারিয়াকে আনা হল। মারিয়ার পোশাক এখন এ দেশীয় মেয়েদের মত পা পর্যন্ত ঢাকা ঢোলা জামা। মারিয়াকে সৈন্যটি বন্দীশিবিরে ঢোকাল।

ফ্রান্সিসরা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস মারিয়ার মুখ চোখ দেখেই বুঝল মারিয়া রাত্রে ঘুমোয় নি। ফ্রান্সিস বলল—তোমার শরীর ভালো তো? মারিয়া মাথা কাত করল।

তখনও ক্রীতদাসদের মঞ্চে তোলা হয়নি। শাঙ্কো চারদিকে নজর রেখে ঘুরতে লাগল। শাঙ্কোর পরনে সিক্কার সৈন্যদের পোশাক। কাজেই কেউ সন্দেহ করল না।

শাঙ্কো উত্তর দিকের ঝোপজঙ্গলের মধ্যে একটা বিরাট চেস্টনাট গাছ দেখতে পেল। শাঙ্কো তাড়াতাড়ি সেদিকে গেল। ঝোপজঙ্গল সরিয়ে এগিয়ে গেল। চেস্টনাট গাছটা দেখল। তারপর ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আরো এগোল। দেখলো ওখানে একটা খাদমত। খাদের পরেই সবুজ ঘাসে ঢাকা উপত্যকা। সঙ্গে সঙ্গে শাঙ্কোর পালানোর উপায় ভাবা হয়ে গেল। ও দ্রুত ছুটল সমুদ্রতীরের দিকে। ওদের জাহাজে এল। তখন শাঙ্কো মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে।

ফ্রেজার এগিয়ে এল। বলল—কী ব্যাপার শাঙ্কো?

—ফ্রান্সিসদের পালাবার উপায় বের করেছি। তুমি শিগগিরি আমাকে বেশ লম্বা মোটা কাছি দাও। ফ্রেজার ছুটে গেল ওদের কাঠ দড়ি কপিকল এসব রাখবার ঘরের দিকে।

কাছি নিয়ে ফ্রেজার একটু পরেই এল। শাঙ্কো কাছিটা কোমরে বুকে প্যাঁচালো। তারপর চলল বন্দী শিবিরের দিকে।

বন্দী শিবিরের সামনে পৌঁছে দূর থেকেই দেখল আটজন ডাকাত মূরকে সেই পাথরের বেদীতে তোলা হয়েছে। শাঙ্কো লক্ষ্য করল—মূরদের হাত পা বাঁধা হয় নি। শাঙ্কো অস্ফুট স্বরে বলে উঠল—ও—হো-হো। তাহলে ফ্রান্সিসদেরও হাত পা বাঁধা হবে না।

শাঙ্কো একটু দূরে দূরে থেকে জঙ্গলটায় ঢুকল। চেস্টনাট গাছের গুঁড়ির সঙ্গে কাছিটার একটা মুখ বাঁধল। তারপর বাকি কাছিটা খাদে ঝুলিয়ে দিল। তারপর ঝোপঝাড়ের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। দেখল অনেক লোক জড়ো হয়েছে।

তখনই ফ্রান্সিসদের আনা হল। সঙ্গে মারিয়া। ফ্রান্সিসদের হাত পা বাঁধা নয়। খুশিতে শাঙ্কোর মন নেচে উঠল। ফ্রান্সিসদের পাথরের বেদীর পাশে দাঁড় করানো হল। ফ্রান্সিস তখন ভাবছে—এইভাবে ক্রীতদাসের জীবন মেনে নেবে? কিন্তু ও তো নিরুপায়। সিক্কার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামা যেত। কিন্তু তাতে বেশ কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু মারা যেত। মারিয়াকে নিয়ে পালানো যেত না। ফ্রান্সিসের এই আশঙ্কার মধ্যেও ক্ষীণ আশা—শাঙ্কো মুক্ত আছে। ও যদি কোন উপায় বের

করে।

শাঙ্কো সিক্কার সৈন্যদের পোশাক পরে. বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। ফ্রান্সিসদের পেছন দিয়ে যাওয়া আসা করতে লাগল আর মৃদুস্বরে ওদের দেশীয় ভাষায় বলে যেতে লাগল—উত্তরে জংলার কাছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বিরাট চেস্টনাট গাছ। গাছের গুঁড়িতে আমি কাছি বেঁধে রেখেছি। কাছি ধরে ঝুলে নিচে উপত্যকায় নেমে যাবে। তারপর সমুদ্রতীরের দিকে ছুটবে। জাহাজে উঠবে।

এবার রাজকুমারী মারিয়াকে দুতিনজন সৈন্য হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল। মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলতে লাগল—না-না। তবু সৈন্যরা জোর করে মারিয়াকে নিয়ে আসতে লাগল। তখন অতলোকের গুঞ্জন থেমে গেল। শুধু ফিস্‌ফাস শোনা যেতে লাগল—রাজকুমারী—রাজকুমারী।

মারিয়া শুধু একবার তাকিয়ে নিল ফ্রান্সিসের দিকে। তারপর আর বাধা দিল না। পাথরের বেদীতে উঠল। কোনদিকে তাকাল না। শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। কাঠের থামের সঙ্গে মারিয়াকে দড়ি দিয়ে আলগা করে বাঁধা হল।

উপস্থিত খরিদ্দারদের মধ্যে দামাদামি শুরু হয়ে গেল।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—হাত দুটো পেছনে আনো। ফ্রান্সিস পেছনে হাত নিল। শাঙ্কো ওর বড় ছোরাটা ফ্রান্সিসের হাতে দিয়ে বলল—এবার কাজ হাসিল কর।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ছুটল দলপতি সিক্কা যে পাথরের আসনে বসে আছে সেইদিকে। সিক্কার সৈন্যরা কিছু বোঝবার আগেই ফ্রান্সিস সিক্কার গলায় ছোরা চেপে ধরল। দাঁতচাপা স্বরে বলল—তোমার সৈন্যদের বলো এখান থেকে চলে যেতে।

ফ্রান্সিসের এই কাণ্ড দেখে লোকজন সব পালাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটা প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল। সিক্কার কিছু সৈন্য তখনও ছিল। ফ্রান্সিস ছোরার চাপ বাড়াল। দলপতি সিক্কা বলল—বলছি—বলছি। এবার সিক্কা গলা চড়িয়ে বলল—সৈন্যরা তোমরা এখান থেকে চলে যাও। সৈন্যরা আর কি করে। দলপতির প্রাণ বিপন্ন। এখান থেকে চলে যেতেই হবে। সৈন্যরা দলবেঁধে চলে গেল।

এবার ফ্রান্সিস বিস্কোকে বলল—বিস্কো রাজকুমারীকে তুমি নিয়ে যাও। তোমরা সকলে চলে যাও উত্তরের ঐ বিরাট চেস্টনাট গাছের কাছে। গাছটায় মোটা কাছি বাঁধা আছে। কাছি ধরে নেমে একটা উপত্যকা পাবে। সেটা ধরে সমুদ্রতীরে জাহাজে চলে যাও।

সব ভাইকিং বন্ধুরা ছুটল চেস্টনাট গাছটার দিকে। বিস্কো বেদীতে উঠল। মারিয়ার গায়ে বাঁধা দড়িটা খুলে ফেলল। তারপর মারিয়াকে পাথরের বেদী থেকে নামিয়ে আনল। শরীরে অসহ্য ক্লান্তি। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—মারিয়া মনে

জোর আনো। কাছি ধরে নিচে নামতে পারলেই আমাদের মুক্তি। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। মারিয়া ফ্রান্সিসের কথা শুনে একবার থমকে দাঁড়াল তারপর হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু হাঁটতে গিয়ে শরীর ছেড়ে দিয়ে ঘাসে-ঢাকা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। বিস্কো সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে মারিয়াকে তুলে কাঁধে শুইয়ে নিল। বিস্কো যতটা সম্ভব দ্রুত পায়ে ছুটল চেস্টনাট গাছটার দিকে।

বিস্কো যখন কাছিটার কাছে এল ততক্ষণে বাকি বন্ধুরা কাছি ধরে ধরে নিচের উপত্যকায় নেমে গেছে। বিস্কো নিচু হয়ে কাছিটা ধরল। বলল—রাজকুমারী আমরা মুক্তির দোরগোড়ায়। যতটা সম্ভব জোরে আমাকে ধরে থাকুন। মারিয়া দুহাত বাড়িয়ে বিস্কোর কোমর ধরে রইল।

বিস্কো আস্তে আস্তে কাছি ধরে নামতে লাগল। একটু হাঁপানো গলায় মারিয়া বলল—ফ্রান্সিস শাঙ্কো ওরা তো এল না।

—ওদের জন্যে ভাববেন না। এখন শুধু একটাই সমস্যা—আপনাকে নিরাপদে জাহাজে নিয়ে যাওয়া। বিস্কো বলল।

বিস্কো হাঁপাতে হাঁপাতে নিচের দিকে তাকাল। দেখল—আর হাত দশেক নামলেই উপত্যকায় নামা যাবে। বিস্কো হাঁপাতে হাঁপাতে উপত্যকায় নেমে এল।

ওদিকে ফ্রান্সিস তখনও দলপতি সিক্কার গলায় ছোরা চেপে আছে।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এতক্ষণে মারিয়া আর বন্ধুরা উপত্যকায় নেমে গেছে। ওরা জায়গাটা চেনে না। এইজন্যে আমাকে এখুনি যেতে হবে। একটু থেমে বলল—ফ্রান্সিস চলো—তাড়াতাড়ি।

এবার ফ্রান্সিস দলপতি সিক্কার গলা থেকে ছোরাটা তুলে নিয়ে ছুটল চেস্টনাট গাছের দিকে। দু'জনে গাছটার নিচে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো তুমি আগে নেমে যাও। আমি পরে নামবো। কিন্তু তোমার হাত কাটাছেঁড়া। পারবে কাছি ধরে ধরে নামতে?

—আমি হাত দুটো বেশি কাজে লাগাবো না। দুই হাঁটু দিয়ে কাছি নিয়ে নেমে যাবো। আমার জন্যে ভেবো না।

—বেশ। নামো তবে। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো নামতে শুরু করল। একটু সময় নিয়ে শাঙ্কো উপত্যকায় নেমে গেল।

ফ্রান্সিস এতক্ষণ খোলা তরোয়াল হাতে আট দশ জন সৈন্য ছুটে আসছে।

এবার ফ্রান্সিস কোমরে গোঁজা ছোরাটা বের করল। গাছের সঙ্গে বাঁধা কাছিটা পোঁচ দিয়ে দিয়ে অর্ধেকটা কাটল। তারপর সৈন্যরা এসে পৌঁছুবার আগেই কাছি ধরে ধরে ফ্রান্সিস দ্রুত নেমে এল। দেখল শাঙ্কো পেছনে পেছনে অনেক দূর চলে গেছে।

ওদিকে দু'জন সৈন্য কাছি ধরে নেমে আসতে লাগল। ফ্রান্সিস কাছি ধরে প্রাণপণে হাঁচ্‌কা টান দিতে লাগল। অর্ধেক কাটা কাছিটা ছিঁড়ে গেল। সৈন্য দু'জন

ছেঁড়া কাছির সঙ্গে ছিটকে পড়ল। নিচের উপত্যকার একটা পাথরের চাঙের ওপর দু'জনে পড়ল। দু'জনেই মারা গেল।

এবার ফ্রান্সিস ছুটল হ্যারি শাঙ্কোদের দলের দিকে।



কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস বন্ধুদের কাছে এসে পৌঁছল। সবাই ধ্বনি তুলল— ও-হো--হো।

ফ্রান্সিস বলল—কাছি ছিঁড়ে দিয়ে এসেছি। দু'জন সৈন্য কাছি ছিঁড়ে পড়ে গেছে। কিন্তু ওরা হাল ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না। দলপতি সিক্কার সৈন্যরা জাহাজঘাটা পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে।

মারিয়া মুখ বুঁজে সব সহ্য করতে লাগল। ফ্রান্সিস মারিয়ার পাশে এল। ডান হাতে মারিয়াকে ধরে নিয়ে চলল।

ফ্রান্সিসরা যখন জাহাজ ঘাটায় ...ল তখন দেখল দলপতি ডি সিক্কার ... দশজন সৈন্য ছুটে আসছে। তাই দেখে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা যারা জাহাজে ছিল তারা খোলা তরোয়াল হাতে জাহাজের পাটাতন দিয়ে নেমে এল। সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লড়াই শুরু হল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে গলা চড়িয়ে বলল—আমার দলের সবাই জাহাজে উঠে যাও। লড়াই করতে যেও না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দলপতি সিক্কার সৈন্যরা হার স্বীকার করল। আহতদের ফেলে রেখে বাকিরা পালিয়ে গেল।

বিজয়ী ভাইকিংরা আনন্দে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। সব ভাইকিংরাই গলায় গলা মেলাল—ও-হো-হো-।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে ধরে ধরে কেবিনঘরে নিয়ে এল। বলল—আর কোন কথা নয়। এখন শুধু বিশ্রাম। ঘুম পেলে ঘুমিয়ে নাও। রাঁধুনি বন্ধু বলেছে রান্না সারতে দেরি হবে।

ওদিকে ডেক-এ তখন আড্ডা শুরু হয়েছে। শাঙ্কো হাত পা নেড়ে বাকি ঘটনাটা বলছে।

ভেন ওষুধের থলে নিয়ে এল। শাঙ্কোকে বলল—চুপ করো—জামাটামা খোল। শাঙ্কো গলা থামিয়ে জামাটামা খুলল। ভেন দেখল শাঙ্কোর হাত থেকে অল্প অল্প রক্ত পড়ছে। ভেন শাঙ্কোর ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিল। তারপর একটা ঝোলা

থেকে একটু ওষুধ আঙ্গুলে তুলে নিয়ে দু হাতের তেলোয় ঘষে ঘষে তিনটে বড়ি বানালো। শাঙ্কোকে বলল—দিনে একটা করে খাবে। এখন বকবকানি থামিয়ে নিজের কেবিনঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। তোমার এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। চলল নিজের কেবিনের দিকে।

সেদিন শেষ রাতে সমুদ্রে ঘন কুয়াশা পড়েছে। মাস্তুলের মাথায় বসে নজরদার পেড্রো ঐ কুয়াশার আস্তরণের মধ্যে দিয়ে চারদিকে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। একঘেয়েমির জন্যেই বটে—পেড্রোর আবার একটু তন্দ্রা এসেছিল। কতক্ষণ পেড্রো তন্দ্রায় ঢুলছে জানে না। হঠাৎই সজাগ হয়ে দেখল কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দুটো ফেলুকা অর্থাৎ যুদ্ধ জাহাজ ওদের জাহাজের দুধার দিয়ে আসছে। পেড্রো ঘাবড়ে গেলেও ভয় পেল না। জলদস্যুদের জাহাজ নয়। দুটো জাহাজেই সবুজ নীল পতাকা উড়ছে। কিন্তু পেড্রো বুঝে উঠতে পারলো না ফেলুকা দুটোর উদ্দেশ্য কী। ওরা ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আসছে না লড়াই করতে আসছে। পেড্রো চিৎকার করে বলল—ভাইসব—সাবধান। ফ্রান্সিসকে বলো দুটো যুদ্ধ জাহাজ আমাদের জাহাজের দুপাশ দিয়ে চলেছে।

ডেক-এ শোয়া দুতিনজন ভাইকিং-এর ঘুম ভেঙে গেল পেড্রোর চিৎকারে। ওরা দেখল ওদের জাহাজকে মাঝখানে রেখে দুটো যুদ্ধ জাহাজ চলেছে একই গতিতে।

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট দেখল দুটো জাহাজেই গ্রীক সৈন্যদের মত বুকে বর্ম মাথায় শিরস্ত্রাণপরা কিছু সৈন্য দুটো জাহাজেরই ডেক-এ ঘোরা ফেরা করছে।

ওরা ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে। একটু পরেই ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে ডেক-এ উঠে এল। রেলিঙের ধারে গিয়ে দাঁড়াল দু'জনে। পেছনে আরো কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু। পাশের জাহাজ থেকে একজন সৈন্য গ্রীক ভাষায় জিজ্ঞেস করল—তোমরা কারা? হ্যারি থেমে থেমে গ্রীক ভাষাতেই বলল—আমরা ভাইকিং।

—তোমরা কোথায় যাচ্ছো? সৈন্যটি জিজ্ঞেস করল।

—দেশে ফিরে যাচ্ছি। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। আমাদের দলপতি আনগেভিন তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। তোমরা জাহাজ থামাও। আমরাও জাহাজ থামাবো। সৈন্যটি বলল। হ্যারি ফ্রান্সিসকে সব বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস বলল—বলো যে আমরা তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যেতে চাই। আমরা জাহাজ থামাবো না। হ্যারি বলল সে কথা। সৈন্যটি বলল—তোমরা যদি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করো তাহলে কামানের গোলা ছুঁড়ে তোমাদের জাহাজ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল কথাটা। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—বলো যে আমরা দলপতির সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমরা জাহাজ থামাবো। হ্যারি সৈন্যটিকে বলল সে কথা।

সৈন্যটি বলল—তাহলে আমরাও জাহাজ থামাচ্ছি।

ফ্রান্সিস ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—পাল নামাও। জাহাজ থামাও। ভাইকিং বন্ধুরা পাল খাটানোর কাঠে উঠল। একে একে পালগুলো গুটিয়ে ফেলল। দাঁড়িদেরও দাঁড় টানা বন্ধ করতে বলা হল।

তিনটি জাহাজই দাঁড়িয়ে পড়ল।

তখন সকাল হয়েছে। যুদ্ধ জাহাজের সৈন্যদের মধ্যে বেশ তৎপরতা দেখা গেল। কিছু পরেই ওদের দলপতি আনগেভিন যুদ্ধ জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। তার পরণে ধর্মযাজকদের পোশাক কালো জোব্বা। মাথায় কালো কাপড়ের ঢাকনা। ফ্রান্সিসরা একটু অবাকই হল। ধর্মযাজক হয়েও আনগেভিন সৈন্য, যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে কোথায় চলেছে?

আনগেভিন দু'জন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেক-এ উঠে এল হ্যারি এগিয়ে গেল। ফ্রান্সিসরা কয়েকজন হ্যারির পেছনে পেছনে এল। হ্যারি গ্রীকভাষায় বলল—আমরা ভাইকিং। লড়াই নয় আমরা শান্তি চাই। আনগেভিন বলল—আমরা কিন্তু লড়াই চাই। তবে তোমাদের সঙ্গে নয়। তোমরা ভাইকিং। বীরের জাতি। এই যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য চাই। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল কথাগুলো। ফ্রান্সিস বলল—বলো যে আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি। কোন কারণেই কোন যুদ্ধের সঙ্গে আমরা জড়াবো না। আপনাদের সমস্যা আপনারাই মেটান। হ্যারি আনগেভিনকে বলল সে কথা।

আনগেভিন মাথা নেড়ে বলল—তা হবে না। তোমাদের আমার সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তৃতীয় পিটারের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। কথাটা হ্যারির মুখে শুনে এবার ফ্রান্সিসের চিন্তা হল। এরপর ফ্রান্সিসের শেখানো মত হ্যারি বলতে লাগল।

হ্যারি বলল—দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের ঢাল নেই লোহার বর্ম নেই লোহার শিরস্ত্রান নেই। রাজা তৃতীয় পিটারের সশস্ত্র যোদ্ধাদের সঙ্গে আমরা লড়বো কী করে।

—তোমাদের ঢাল বর্ম শিরস্ত্রান সব দেওয়া হবে। আনগেভিন বলল।

—তা সত্ত্বেও যদি আমরা যুদ্ধ না করি। ফ্রান্সিস বলল।—তাহলে কামান দেগে তোমাদের জাহাজ ধ্বংস করা হবে। আনগেভিন বলল। ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। ফ্রান্সিস যুদ্ধ জাহাজ দুটো ভালো করে দেখল। দেখল দুটো জাহাজেই কামান বসানো আছে। ইচ্ছে করলেই আনগেভিন ওদের জাহাজ ধ্বংস করতে পারে। ফ্রান্সিস বলল— আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে পরে আপনাকে জানাচ্ছি আমরা কী করবো।

—বেশ। আমি অপেক্ষা করছি। ততক্ষণ তোমাদের জাহাজও অপেক্ষা করবে। আমাদের জাহাজও দাঁড়িয়ে থাকবে। আনগেভিন বলল। তারপর দু'জন সৈন্যের সাহায্যে নিজেদের জাহাজে চলে গেল।

ফ্রান্সিস তখন হ্যারিকে বলল—সব বন্ধুকে ডেক-এ আসতে বলো। মারিয়াও যেন আসে।

সকালের খাওয়া সেরে সবাই ডেক-এ এসে জড়ো হল। ফ্রান্সিস বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে বলতে লাগল—ভাইসব—আমরা একটা গভীর সমস্যায় পড়েছি। কিছুক্ষণ আগে দুটো যুদ্ধ জাহাজের অধিকারী ও দলনেতা আনগেভিন আমাদের জাহাজে এসেছিল। সে ধর্মযাজকের পোশাক পরে অথচ যুদ্ধে মানুষের মৃত্যু রক্তক্ষয় চায়। কেন বুঝলাম না। যাহোক কাছেই মালটা দ্বীপপুঞ্জ। সেখানকার রাজা এখন তৃতীয় পিটার। তাকে যুদ্ধে হারিয়ে মালটা অধিকার করাই আনগেভিনের উদ্দেশ্য। সে চায় তার দলের হয়ে আমরা লড়াই করি। ফ্রান্সিস থামল।

—তাদের হয়ে আমরা লড়াই করতে যাবো কেন? আমরা এখন দেশে ফিরে যাবো। বিস্কো বলল।

—বিস্কো—ফ্রান্সিস বলল—আমিও ঠিক এই কথাটাই আনগেভিনকে বলেছি। উত্তরে আনগেভিন বলেছে তাহলে সে কামান দেগে আমাদের জাহাজ ধ্বংস করে দেবে। সমস্যাটা এখানেই। দেখতেই পাচ্ছো ওদের যুদ্ধ জাহাজে কামান রয়েছে। কাজেই ওরা ইচ্ছে করলে আমাদের জাহাজ ধ্বংস করতে পারে। ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল—এবার ভাইসব তোমরাই স্থির কর কী করবে। সবাই চুপ করে রইল। এরকম একটা সমস্যায় ওদের পড়তে হবে এটা ওরা স্বপ্নেও ভাবে নি।

শাঙ্কো বলে উঠল—ভাইসব—এই সমস্যার সমাধান ফ্রান্সিস আর হ্যারির ওপর ছেড়ে দাও। ওরা দু'জনে যা বলবে তাই মেনে নাও। শাঙ্কো হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল—হ্যারি তুমি কী বলো? হ্যারি একটু চুপ করে থেকে বলল—ভাইসব—খুবই গভীর সমস্যায় আমরা পড়েছি। আনগেভিনের দলে আমাদের যোগ না দিলে উপায় নেই। দু দুটো যুদ্ধ জাহাজের নজরদারি এড়িয়ে আমরা পালাতে পারবো না। পালাবার চেষ্টা করলেই জাহাজ সুদ্ধ সবাই আমরা ভীষণ বিপদে পড়বো। ওরা কামানের গোলা ছুঁড়ে আমাদের জাহাজ ধ্বংস করবে। আমরা ভীষণ বিপদে পড়বো। হ্যারি থামল। ফ্রান্সিসকে বলল—ফ্রান্সিস তুমি কী বলো?

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—আমি তোমার সঙ্গে একমত। আমরা আনগেভিনের পক্ষেই যোগ দেব। এ ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। তবে এই লড়াই আমরা করবো আত্মরক্ষামূলক। কারণ এই লড়াই থেকে আমাদের কোন লাভ নেই। আনগেভিনের লক্ষ্য তৃতীয় পিটারকে পরাজিত করে মাল্টা দখল করা এবং রাজা হওয়া। এর জন্যে আমরা কেন প্রাণ দিতে যাবো। আমরা যতটা সম্ভব শরীর বাঁচিয়ে লড়াই করবো। ফ্রান্সিস থামল।

হ্যারি সব ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—তাহ'লে ফ্রান্সিসের প্রস্তাবে তোমরা রাজি। সকলেই চুপ করে রইল। সবাই বুঝতে পারল এ ছাড়া উপায় নেই। দুদুটো যুদ্ধ জাহাজের পাহারা থেকে ওদের জাহাজ বের করে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া

সম্ভব নয়। শুধু শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস—আবার দেশে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।

ফ্রান্সিস বলল—তা ঠিক—তবে দেশে ফিরে কী হবে। যা ঘটতে যাচ্ছে সেটাও একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমার চিন্তা শুধু একটাই—আমাদের কারো যেন প্রাণহানি না ঘটে।

সভা ভেঙে গেল।

বিকেলে ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে আনগেভিনের যুদ্ধ জাহাজে গেল। আনগেভিনের কেবিনঘরে বসেই ওরা কথা বলল। ফ্রান্সিস নিজেদের সম্মতির কথা জানাল। আরো বলল—আপনারা জয়ী হলেই আমরা কিন্তু দেশের দিকে জাহাজ চালাবো।

—ঠিক আছে। আমাদের লক্ষ্য যুদ্ধে জয়লাভ করা। আনগেভিন বলল।

সন্ধ্যের পর থেকে আনগেভিনের যুদ্ধ জাহাজ দুটি সামনে চলতে লাগল পেছনে ফ্রান্সিসদের জাহাজ।

পরদিন সকালে আনগেভিনের দূত হিসেবে একজন লোক এল। হ্যারির সঙ্গে কথা বলল। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল—আনগেভিন বলে পাঠিয়েছেন যে পঁচিশটি যুদ্ধাস্ত্র অর্থাৎ বর্ম ঢাল আর শিরস্ত্রান আমাদের দেবে। এর বেশি অস্ত্র ওদের মজুত নেই। আমাদের পঁচিশজনকে যেতে বলছে ওদের যুদ্ধ জাহাজে। যুদ্ধাস্ত্র আনতে।

—চলো। আমরা নিশ্চয়ই যাবো। এরকম যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া তৃতীয় পিটারের সশস্ত্র সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করা যাবে না। তখনই ভাইকিং বন্ধুদের ফ্রান্সিস হ্যারিকে দিয়ে ডেকে পাঠাল। সবাই এলে বন্ধুদের থেকে চব্বিশজনকে বেছে নিল। তারপর দলবেঁধে চলল আনগেভিনের যুদ্ধ জাহাজে। যাবার সময় ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—তুমি লড়াইতে নামবে না। তুমি মারিয়ার সঙ্গে থাকবে।

ফ্রান্সিস বিস্কো শাঙ্কোসহ পঁচিশজন বর্ম শিরস্ত্রান ঢাল হাতে নিজেদের জাহাজে ফিরে এল। এইসব যুদ্ধাস্ত্র পেয়ে সবাই খুশি। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—হ্যারি তুমি বলে এসো যে আমাদের যে সব বন্ধুরা যুদ্ধাস্ত্র পেল না তারা লড়াই করবে না। হ্যারি সে কথা আনগেভিনকে গিয়ে বলে এল। আনগেভিন বলল—যুদ্ধ না করুক কিন্তু যুদ্ধরত সৈন্যদের সাহায্য করতে হবে। হ্যারি তাতে সম্মত হল। ফ্রান্সিসকে এসে বললও সে কথা। ফ্রান্সিস বলল— ঠিক আছে।

পরদিন দুপুর নাগাদ নজরদার পেড্রো মাস্তুলের ওপরে ওর বসার জায়গা থেকে চেঁচিয়ে বলল— ডাঙা দেখা যাচ্ছে—ডাঙা।

একটু পরেই আনগেভিন হ্যারিকে ডেকে পাঠাল। হ্যারি এলে বলল — আমরা মাল্টায় এসে গেছি। আমরা মাল্টার উত্তর দিকে নামবো। এখানেই আছে সেন্ট অ্যাঞ্জেলো দুর্গ। সেই দুর্গ আমরা পিটারের সৈন্যদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে দখল করবো। তোমার বন্ধুদের সৈন্যদের যুদ্ধের জন্যে—তৈরি হতে বলো। তৈরি হয়ে তারা যেন আমাদের দুই জাহাজে চলে আসে। তোমাদের জাহাজ তো যুদ্ধ জাহাজ

নয়। তোমাদের জাহাজ একটু দূরে থাকবে। হ্যারি জাহাজে ফিরে এসে সব ফ্রান্সিসকে বলল।

মাল্টার তীরভূমি দেখা গেল। তিনটি জাহাজই তীরভূমির কাছে এল। দেখা গেল তীরভূমিতে পাথরের চাঁই নেই। প্রায় সমতল পাথুরে রাস্তামত ঢালু হয়ে সমুদ্রে নেমে এসেছে। এতে সৈন্যদের চলাফেরার সুবিধেই হবে। যুদ্ধ জাহাজ থেকে তীর পর্যন্ত কাঠের পাটাতন পাতা হল।

আনগেভিনের নেতৃত্বে তার সৈন্যরা আর ফ্রান্সিসরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে পাতা কাঠের পাটাভন দিয়ে হেঁটে নেমে এল। পাথুরে রাস্তামত ঢালু জায়গা দিয়ে সকলেই উঠতে লাগল। রাজা তৃতীয় পিটারের কোন সৈন্যের দেখা পাওয়া গেল না। খুশিতে আনগেভিনের সৈন্যরা তরোয়াল বর্শা উঁচিয়ে হৈ হৈ করে উঠল। ওরা ভেবেছিল যুদ্ধে নামতে হবে। অথচ দেখা গেল সমুদ্র তীরে রাজা পিটারের একটা সৈন্যও নেই।

ফ্রান্সিস একটু অবাকই হল যখন দেখল বিনা বাধায় ওরা এগিয়ে চলল। কিছুটা এগোতেই এবার একটা বড় দুর্গ দেখা গেল। পাথরের দুর্গটার চারপাশ ঘিরে পাথুরে দেয়াল। আনগেভিন তার সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল—সেন্ট অ্যাঞ্জেলো দুর্গ আমরা জয় করবো। সব সৈন্যরা হৈ হৈ করে উঠল। শূন্যে তরোয়াল ঘোরাল। বর্শা ওঠাতে নামাতে লাগল।

সামনে একটু উৎরাইমত। সেটা পার হতেই দেখা গেল রাজা পিটারের সৈন্যরা দুর্গ-ঘেরা পাথুরে প্রাচীরের চারদিকে ছড়িয়ে আছে।

আনগেভিনের নেতৃত্বে সৈন্যদল এগিয়ে চলল দুর্গের দিকে। মাত্র হাত পঞ্চাশেক দূরে থাকতেই আনগেভিন চিৎকার করে হুকুম দিল — আক্রমণ করো। তার সৈন্যরা শূন্যে তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে অন্যদল বর্শা উঁচিয়ে দ্রুত ছুটে গিয়ে দুর্গরক্ষী সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসরাও তাদের পেছনে পেছনে ছুটে গেল। দুর্গের চারপাশ ভরে উঠল যুদ্ধরত সৈন্যদের অস্ত্রের ঝনঝনা রণহুংকার আর উৎসাহের ধ্বনিতে। তারপরই শোনা গেল আহতদের আর্ত চিৎকার।

লড়াই চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল রাজা পিটারের সৈন্যদের সংখ্যা কমে গেছে। যারা তবু লড়াই করছিল তারা পিছু হটতে হটতে দুর্গের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিল। আনগেভিনের সৈন্যদের হাতে দুর্গ পতনের মুখে। তীব্র লড়াই চলল। রাজা পিটারের সৈন্যরা এদিক ওদিক ছুটে পালাতে লাগল। এতে আনগেভিনের সৈন্যদের ও যুদ্ধরত ভাইকিংদের উৎসাহ দ্বিগুণ হল। রাজা পিটারের সৈন্যদের বন্দী করা হতে লাগল। এবার দুর্গের ভেতরে আশ্রয় নেয়া সৈন্যদের বন্দী করার জন্যে আনগেভিনের সৈন্যরা জলস্রোতের মত দুর্গটায় ঢুকতে লাগল। দুর্গের মধ্যেও বেশ কিছুক্ষণ লড়াই চলল। তারপর পরাজিত রাজা পিটারের সৈন্যদের বন্দী করা হল। রাখা হল দুর্গের কয়েদঘরে।

যুদ্ধ শেষ। এবার ফ্রান্সিস ওর বন্ধুদের খুঁজে খুঁজে বের করে দুর্গের একটি ঘরে নিয়ে এল। সবাই যুদ্ধ ক্লান্ত। অনেকেই শুকনো ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসের বিশ্রাম নেই। বন্ধুদের গুণে গুণে দেখল— তিনজন এখনো আসেনি। তারা যুদ্ধে মারা গেছে কিনা আহত হয়েছে সেই খোঁজে ফ্রান্সিস দুর্গের বাইরে এল।



নিহত আহত সৈন্যদের মধ্যে ফ্রান্সিস বন্ধুদের খুঁজতে লাগল। অনেক নিহত আহত সৈন্যদের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে এক আহত বন্ধুকে পেল। আহত বন্ধুটাকে তুলে দাঁড় করাল। দেখল বন্ধুটির পিঠে তরোয়ালের কোপ গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। ফ্রান্সিস ওকে বলল— তুমি একটু অপেক্ষা কর। আরো দু'জন বন্ধুর খোঁজ পাচ্ছি না। ওদের কী হয়েছে দেখি, তুমি ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর। আমিই তোমাকে দুর্গে নিয়ে যাবো। জাহাজ থেকে বৈদ্য ভেনকে এনে তোমার চিকিৎসা করাব। এই বলে আহত বন্ধুটিকে ওখানে বসিয়ে রেখে ফ্রান্সিস আর দু'জন বন্ধুকে খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের যায়গায় ঘুরে ঘুরে ফ্রান্সিস দুই বন্ধুকে পেল। কিন্তু জীবিত বা আহত নয়। যুদ্ধে দু'জনই মারা গেছে।

ফ্রান্সিসের গভীর দুঃখে চোখে জল এল। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে বন্ধু দু'জন মারা গেল। দেশে ফিরে তাদের বাবা মাকে অনেক কষ্টে শান্ত করতে হবে। ফ্রান্সিস ভাবল যুদ্ধে নামলে মৃত্যু হতেই পারে। এই নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই। বরং এখন কী কী কাজ করতে হবে সেটাই ভেবে নিল।

ফ্রান্সিস আহত বন্ধুটির কাছে ফিরে এল। ওকে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে দুর্গের দিকে নিয়ে চলল। বন্ধুটির পিঠ থেকে তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। বেশ কষ্ট করেই বন্ধুটিকে ফ্রান্সিস দুর্গে নিয়ে এল। ওরা যে ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল সেই ঘরেই আহত বন্ধুটিকে রাখল। তারপর বিস্কোকে বলল— জাহাজ থেকে ভেন হ্যারি আর মারিয়াকে এখানে নিয়ে এসো। বিস্কো চলে গেল।

ফ্রান্সিস এবার বন্ধুদের বলল— আমাদের দুই বন্ধু যুদ্ধে মারা গেছে। কথাটা শুনে সব ভাইকিংরা নিজেদের মধ্যে কথা বলা বন্ধ করল। মাথা নিচু করে সবাই মৃত বন্ধু দু'জনের স্মৃতির প্রতি ভালোবাসা জানাল।

দুর্গের ডানদিকে একটু দূরে কবরখানা। বিকেলে আনগেভিন সেখানে এল। যে

সব সৈন্য যুদ্ধে মারা গেছে তাদের কবর দেওয়া হল। ফ্রান্সিস মারিয়া হ্যারি অন্য কিছু বন্ধু তাদের মৃত দুই বন্ধুর দেহও কবর দিল।

সন্ধ্যে নামতেই সবাই দুর্গে ফিরে এল। ওদের ঘরেই ফ্রান্সিসরা এল। দেখল— বৈদ্য ভেন-এর ওষুধে আহত বন্ধুটি এখন অনেকটা ভালো হয়েছে।

একটু রাত হতে ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—হ্যারি আনগেভিনের নির্দেশ তো আমরা মেনেছি। যুদ্ধ করেছি। আনগেভিনকে সে কথা বলতে হবে— চলো।

বলবো যে যুদ্ধে জয়ও হয়েছে। এবার আমরা দেশের দিকে যাবো। সৈন্যদের জিজ্ঞেস করে দুর্গের সবচেয়ে ভালো ঘরটায় এল। দেখল—আনগেভিন কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে পাখির পালকে তৈরি বিছানায় বসে আছে। যুদ্ধজয়ের আনন্দে আনগেভিন মশগুল।

হ্যারি বলল—আনগেভিন—আপনি যুদ্ধে আমাদের সাহায্য চেয়েছিলেন। আমরা লড়াইতে অংশ নিয়েছি। আপনি সেন্ট অ্যাঞ্জেলো দুর্গ জয় করেছেন।

—হ্যাঁ—তোমাদের সাহায্য আমাদের খুব কাজে লেগেছে। তোমাদের লড়াই করা তো দেখলাম। সত্যিই তোমরা দুঃসাহসী যোদ্ধা। আনগেভিন বলল।

হ্যারি বলল— যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য করেছি। এবার আমরা আমাদের দেশের দিকে জাহাজ চালাতে চাই।

— না— আনগেভিন বলল— এখনও আমরা রাজধানী ভ্যালেত্তা জয় করতে পারি নি। ভ্যালেত্তা জয় করা পর্যন্ত তোমাদের সাহায্য চাই।

— কিন্তু এসব তো আপনাদের দেশের ব্যাপার—আপনাদের দেশের সমস্যা। এসবের সঙ্গে আমাদের জড়াচ্ছেন কেন। এই যুদ্ধেই আমরা দুই বন্ধুকে হারিয়েছি। হ্যারি বলল।

— ও সব বুঝি না— ভ্যালেত্তা দখলের লড়াইয়ে তোমাদেরও থাকতে হবে। আমরা ভ্যালেত্তা জয় করবো। আমি মাল্টার রাজা হব। তখন তোমরা ছাড়া পাবে তার আগে নয়।

আনগেভিন বলল।

হ্যারি সবকথা ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস বলল— এখন আনগেভিনের কথা মানতেই হবে সময় সুযোগ বুঝে পালাবো আমরা। ফ্রান্সিস ওদের ভাষায় বললে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দুর্গের ঘরের দিকে এলো। সবাই এগিয়ে এল কী হবে এখন জানতে। ফ্রান্সিস বলল, ভাইসব— আনগেভিন এখনই আমাদের মুক্তি দিতে রাজি নয়। রাজধানী ভ্যালেত্তা দখল না হওয়া পর্যন্ত আনগেভিনের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আমাদের থাকতে হবে। লড়াইও করতে হবে।

— আমরা লড়াই করবো না— আমরা দেশে ফিরে যাবো। শাঙ্কো বলল। কিছু ভাইকিং বন্ধু সেটা সমর্থনও করল। ফ্রান্সিস বলল— শাঙ্কো আনগেভিনকে এসব কথা আমরা বলেছি। কিন্তু আনগেভিন আমাদের চলে যেতে দেবে না। ও কোন

কথাই শুনতে রাজি নয়।

— আমরা তো এখন বন্দী নই। গভীর রাতে জাহাজ নিয়ে পালাতে পারি। ফ্রেজার বলল। ফ্রান্সিস বলল— ফ্রেজার—এখন যুদ্ধ চলছে। আনগেভিনের সৈন্যরা রাত জেগে ওদের যুদ্ধ জাহাজ পাহারা দিচ্ছে। আমরা জাহাজে চড়ে পালাতে গেলে ওরা কামান দেগে আমাদের জাহাজ ধ্বংস করে দেবে। আমরা তাহলে অনেকেই মারা যাবো। যারা বেঁচে থাকবে তারাও দেশে ফিরে যেতে পারবে না। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল— আমরা আমাদের অটুট জাহাজ নিয়ে পালাবো ঠিকই তবে সেটা সময় ও সুযোগ বুঝে।

বিকেলের দিকে ফ্রান্সিসরা খবর পেল যে কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে আনগেভিন তার সৈন্যদল নিয়ে স্থলপথে রাজধানী ভ্যালেন্তা আক্রমণ করবে। সৈন্যদলের সঙ্গে ফ্রান্সিসদেরও যেতে হবে।

সেদিন গভীর রাতে দূরে কামানের গোলার শব্দে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস হ্যারি শাঙ্কোদের ডাকল। আস্তে আস্তে সবারই ঘুম ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস বলল— মনে হচ্ছে রাজা পিটারের সৈন্যরা জলপথে লড়াই করতে এসেছে।

ততক্ষণে দুর্গে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। সব সৈন্যরা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে তৈরি হল। দু'তিনজন সৈন্য আনগেভিনের যুদ্ধ জাহাজ থেকে সংবাদ নিয়ে এসেছে— রাজা পিটারের সৈন্যরা তিনটি যুদ্ধজাহাজে এসে আনগেভিনের জাহাজ আক্রমণ করেছে।

ফ্রান্সিস বলল— শাঙ্কো তৈরি হও। কামানের গোলা ছুঁড়ে দু'পক্ষই যুদ্ধ করবে। মাঝখান থেকে আমাদের জাহাজটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ঐ জাহাজই আমাদের একমাত্র ভরসা। চলো— আমাদের জাহাজটা বাঁচাতে হবে।

শাঙ্কোকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস ঘরের বাইরে এল। দেখল তখন আনগেভিনের সৈন্যরাও ঘুম ভেঙে উঠে পড়েছে। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো অন্ধকারে উত্তর মুখো দিক ঠিক রেখে চলল। ওদিকেই সমুদ্রতীরে আনগেভিন আর ওদের জাহাজ রয়েছে।

অন্ধকার সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছল ওরা। দেখল—আনগেভিনের গোলন্দাজ বাহিনীও ওদের যুদ্ধ জাহাজ থেকে কামানের গোলা ছুঁড়ছে।

ফ্রান্সিস এবার ছুটতে শুরু ক'রে বলল— শাঙ্কো তাড়াতাড়ি চলো। আমাদের জাহাজটা কামাদের গোলার হাত থেকে বাঁচাতেই হবে। দু'জনেই ছুটতে লাগল।

সমুদ্রতীরে লাগানো কাঠের পাটাতন দিয়ে দু'জনে ওদের জাহাজে উঠে এল। ফ্রান্সিস ছুটে গেল নোঙরের দড়িটার দিকে। দু'জনে নোঙরের দড়িটা টেনে নোঙর তুলে ফেলল। তারপর একটা লম্বা কাছি নিচের কেবিনঘর থেকে শাঙ্কো নিয়ে এল ফ্রান্সিসের নির্দেশে। কাছিটার মাঝামাঝি জায়গাটা জাহাজের মাথায় বাঁধল। ফ্রান্সিস বলল— কাছির মাথাটা কোমরে বাঁধ। এই বলে নিজেও কাছিটা কোমরে বাঁধল। তারপর জাহাজের মাথার কাছ থেকে দু'জনে জলে ঝাঁপ দিল। মারিয়া অন্য

ভাইকিং বন্ধুরা জাহাজের রেলিং ধরে দেখতে লাগল— কী করে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো জাহাজটা টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

দু'জনে প্রাণপণে কাছি টেনে নিয়ে সাঁতরাতে লাগল। তখনই ফ্রান্সিস দেখল অন্ধকার আকাশে আলো ছড়িয়ে দুপক্ষের জাহাজ থেকেই কামানের গোলা ছুটে আসছে। কাছিতে টান পড়ায় ফ্রান্সিসদের জাহাজটা একটু নড়ল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো সমান টান রাখলো। জাহাজটার মুখ আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে ধ্বনি দিল—ও—হো—হো। শাঙ্কোও ধ্বনি দিল ও—হো—হো। জাহাজ থেকে বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল। এবার ফ্রান্সিসদের জাহাজ আনগেভিনের যুদ্ধ জাহাজ দু'টি থেকে অনেকটা সরে এল। তখনই একটা কামানের গোলা এসে পড়ল আনগেভিনের একটা যুদ্ধজাহাজের পেছন দিকে। পেছনের হালের কাছে আগুন ধরে গেল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ তখন বেশ দূরে চলে এসেছে। আর কিছুক্ষণ দেরি হলে ঐ আগুন ফ্রান্সিসদের জাহাজেও ছড়িয়ে পড়ত। ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো জাহাজটা আরো দূরে টেনে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিস দেখল— আনগেভিনের সৈন্যরা দড়ি বাঁধা কাঠের পাত্রে সমুদ্র থেকে জল তুলে তুলে আগুন নেভাচ্ছে। তখনও আগুন বেশি ছড়ায় নি। জল ঢালারও বিরাম নেই। ফ্রান্সিস বুঝল— আগুন নিভে যাবে। অবশ্য জাহাজের হালের জায়গায় অনেকটাই পুড়ে গেছে।

ওদিকে রাজা পিটারের একটা জাহাজে কামানের গোলায় আগুন লেগে গেছে। রাজা পিটারের সৈন্যরা অনেক চেষ্টা করেও আগুন আয়ত্তে আনতে পারল না। জাহাজটায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। বোধহয় অস্ত্র-ঘরে মজুত কামানের গোলায় আগুন ছড়িয়ে পড়ল। কামানের গোলাগুলো দুম্ দাম্ ফাটতে লাগল। আকাশে অনেক উঁচুতে আগুনের ফুল্কি উড়ল। আরো কয়েকটা গোলা ফাটল। সৈন্যরা জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনে পোড়া জাহাজটায় বাকি অংশ জলে ডুবে গেল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ওদের জাহাজটা অনেক দূরে টেনে এনেছে তখন। ওদিকে কামান দাগা শেষ হ'ল। ডেক-এ উঠে দু'জনেই শুয়ে পড়ল। দু'জনেই ভীষণ হাঁপাচ্ছে তখন। মারিয়া আর অন্য বন্ধুরা ছুটে এল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে মারিয়াকে বলল—একটু বিশ্রাম পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ফ্রান্সিস নিজের কেবিনঘরে ঢুকল। ভেজা পোশাক ছেড়ে শুকনো পোশাক পরল। শাঙ্কো নিজের কেবিনঘরে এল। দু'জনেই একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। মারিয়া আর ঘুমলো না। ফ্রান্সিসের শিয়রে বসে রইল।

সকাল হতেই রাজা পিটারের সৈন্যরা তাদের দু'টো জাহাজ থেকে নেমে আসতে লাগল। তাদের একটা জাহাজ তো গতরাতে পুড়ে গেছে। তাদের সেনাপতি মান্দোর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী চলল সেন্ট অ্যাঞ্জেলো দুর্গ অধিকার করতে। কিছু সৈন্য



চলল— আনগেভিনের একটি যুদ্ধ জাহাজ দখল করতে।

ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি ডেক-এ উঠে এল। দেখল— যুদ্ধ শুরু হতে দেরি নেই। শাঙ্কো উঠে এল। ফ্রান্সিস বলল— চলো— টেনে জাহাজটাকে ডাঙার কাছে নিয়ে যাই।

দু'জনেই দাঁরঘরে নেমে এল। দাঁড় বাইতে লাগল। একটু পরেই জাহাজটা তীরভূমির খুব কাছে এল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো কাঠের পাটাতন পেতে জাহাজ থেকে মাটিতে নেমে এল। তারপরই ছুটল দুর্গের দিকে।

ততক্ষণে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আনগেভিনের সৈন্যরা দুর্গের সামনের ময়দানে যুদ্ধ করছে রাজা পিটারের সৈন্যদলের সঙ্গে। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। উৎসাহব্যঞ্জক ধ্বনি চিৎকার, আহতের আর্তনাদে জায়গাটা ভরে উঠেছে।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো সমুদ্রতীর থেকে দুর্গের কাছে এল। দুর্গের পেছন ফিরে ঘুরে এসে-ওরা আনগেভিনের সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দিল।

যুদ্ধ চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস বুঝল—রাজা পিটারের এই সেনাবাহিনী দুর্ধর্ষ। ওরা যুদ্ধে নিপুণ।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দেখা গেল আনগেভিনের সেনাবাহিনী দুর্গের দিকে পিছু হটছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আহত। মারাও গেছে অনেক। রাজা পিটারের সৈন্যরা সমান চাপ রেখে লড়াই চালাতে লাগল।

হারের মুখে এসে দাঁড়াল আনগেভিনের সৈন্যদল। ওরা রণক্ষেত্র থেকে পালাতে লাগল। অনেকেই পিছিয়ে দুর্গে আশ্রয় নিতে লাগল।

এক সময় লড়াই করতে করতে বিস্কো ফ্রান্সিসদের পাশে এল। তলোয়ার চালাতে চালাতেই বলল—ফ্রান্সিস, দুর্গের পেছনের দরজা দিয়ে আনগেভিন পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সমুদ্রতীরে পৌঁছবার আগেই আনগেভিন ধরা পড়েছে। এখন সে সেনাপতি মান্দোর হাতে বন্দী। কথাটা শুনেই ফ্রান্সিস তরোয়াল চালানো বন্ধ করল। চিৎকার করে বলল—বন্ধুরা-ভাইসব—অস্ত্রত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রের একপাশে দু' হাত তুলে দাঁড়াও। এখন আমাদের লড়াই করা অর্থহীন। আমরা বন্দীত্ব মেনে নেব।

ফ্রান্সিসের বন্ধুরা সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল মাটিতে ফেলে দিল। বর্ম শিরস্ত্রানও মাটিতে ফেলে দিল। তারপর ফ্রান্সিসের নির্দেশে দু'হাত ওপরে তুলে রণক্ষেত্র থেকে সরে এল।

পিটারের সৈন্যরা তুমুল চিৎকার ধ্বনি তুলে দুর্গের দিকে ছুটে গেল। দলে দলে সৈন্যরা দুর্গটায় ঢুকতে লাগল। আনগেভিনের সৈন্যদের বন্দী করতে লাগল।

যুদ্ধ শেষ। আনগেভিনের যে সৈন্যরা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল তারাও হার স্বীকার করল।

ফ্রান্সিসদেরও রাজা পিটারের সৈন্যরা বন্দী করল। ওদের নিয়ে চলল দুর্গের মধ্যে। ওদের হাত বেঁধে দুর্গের চত্বরে বসিয়ে রাখা হল। ওদিকে আনগেভিনের সৈন্যদের দুর্গের ঘরে ঘরে ঢুকে মান্দোর সৈন্যরা বন্দী করতে লাগল।

এভাবে বসে থাকাটা ফ্রান্সিসের কাছে অপমানজনক মনে হল। ও হ্যারিকে বলল—রাজা পিটারের সেনাপতিকে গিয়ে বলো যে আমরা ভাইকিং। আনগেভিন আমাদের জাহাজ ডুবিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে তার দলের সঙ্গে আমাদেরও যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করেছে। হ্যারি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। সেনাপতি মান্দোর একজন সৈনিককে বলল—আমরা সেনাপতির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—সেনাপতি মান্দো এখন বিশ্রাম করছেন। সৈন্যটি বলল।

—ঠিক আছে। তুমি মান্দোকে গিয়ে বলো আমরা ভাইকিং। আমরা এখানকার লোক নই। বিশেষ প্রয়োজনে তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। হ্যারি বলল।

—বেশ-বলে দেখছি। সৈন্যটি চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সৈন্যটি ফিরে এল। বলল—তোমরাইতো ভাইকিং?

— হ্যাঁ — হ্যারি বলল।

— সেনাপতি তোমাদের দেখা করার অনুমতি দিয়েছেন। সৈন্যটি বলল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি উঠে দাঁড়াল। হাত বাঁধা অবস্থাতেই সৈন্যটার পেছনে পেছনে চলল। যেতে যেতে দেখল— যুদ্ধ শেষ। আহত সৈন্যরা গোঙাচ্ছে। আর্তনাদ করছে। আনগেভিনের জীবিত সব সৈন্যই বন্দী হয়েছে। দুর্গের চত্বরে সারি দিয়ে বসে আছে।

দুর্গের সবচেয়ে ভালো ঘরটাতে পালকের বিছানায় সেনাপতি মান্দো বসে আছে। ফ্রান্সিস আর হ্যারি মান্দোর সামনে এসে দাঁড়াল। মান্দো বলল— শুনলাম তোমরা ভাইকিং— বিদেশি। আনগেভিনের সৈন্যদের হয়ে তোমরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলে কেন?

— নিরুপায় হয়েই আমাদের যুদ্ধে অংশ নিতে হয়েছে। আনগেভিন আমাদের বন্দী করেছিল আমাদের জাহাজ আটক করেছিল। আমাদের ভয় দেখিয়েছিল যে তার সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমরা যদি রাজা পিটারের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করি তাহলে কামান দেগে আমাদের জাহাজ ধ্বংস করে দেবে। আমাদের জীবন বাঁচাতে জাহাজ বাঁচাতে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছি। তা নইলে এই যুদ্ধে আমাদের কী লাভ? আমরা যুদ্ধ চাই না—শান্তি চাই। হ্যারি বলল।

—বুঝলাম—মান্দো বলল—কিন্তু উপায় নেই। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছো কাজেই তোমাদের বন্দী হয়েই থাকতে হবে। কাল সকালে রাজা পিটার এখানে আসবেন। তিনি তোমাদের ব্যাপারে যা করতে চান করবেন। আমি কিছু করতে পারবো না।

—বেশ। তাহলে তো আমাদের আনগেভিনের সৈন্যদের মতই বন্দী হয়ে

থাকতে হবে। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। কাল আনগেস্তিনের বিচার হবে। সঙ্গে তোমাদেরও বিচার হবে। রাজা তৃতীয় পিটার যা বিচার করবেন তাই হবে। মান্দো বলল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের জায়গায় ফিরে এল। হ্যারির বন্ধুদের জানাল সেনাপতি মান্দোর সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছে। সবাই বুঝল রাজা পিটার এখন যা বলবেন তাই হবে।

রাত হল। বন্দীদের খেতে দেওয়া হল। হাত বাঁধা অবস্থাতেই সবাইকে খেতে হল।

খাওয়া দাওয়ার পর ফ্রান্সিস মাথার পেছনে দুহাত রেখে পাথুরে চত্বরে শুয়ে পড়ল। হ্যারিও আধশোয়া হল। ফ্রান্সিস একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হল যে মারিয়া জাহাজেই আছে। এই বন্দী দশা মারিয়া সহ্য করতে পারতো না।

ফ্রান্সিস খোলা আকাশের দিকে তাকাল। ভাঙা চাঁদ। জ্যোৎস্না অনুজ্জ্বল। তারা জ্বলছে। ফ্রান্সিসের ভাবনার শেষ নেই। রাজা পিটার ওদের নিয়ে কী করবেন কে জানে। যদি যুদ্ধে অংশ নেওয়ার অপরাধে ওদের কয়েদখানায় বন্দী করে রাখে তাহলে বিপদ। জাহাজে মারিয়া রয়েছে—যে বন্ধুরা অস্ত্রশস্ত্র পায় নি বলে যুদ্ধে যোগ দেয় নি তারা রয়েছে। ফ্রান্সিসরা বন্দী হলে ওরা দিশেহারা হবে—যে ভাবে হোক সবারই মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিসের দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

শেষরাতে একটা শির্ শির্ ঠাণ্ডা হাওয়ায় ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। বেশ শীত শীত করতে লাগল।

আর ঘুম আসছে না। খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই ফ্রান্সিসের বাড়ির কথা মনে হল। কোথায় সাদা ধপ্ধপে পালক—নরম বিছানা বালিশ সাজানো ঘর। জানালায় হালকা নীল পর্দা আর কোথায় এই দুর্গের পাথুরে চত্বর। পিঠের হাড়ে ব্যথা হ'য়ে গেছে। মাথার পেছনেও ব্যথা। বাকি রাতটুকু ফ্রান্সিসের আর ঘুম এল না।

সকালে দুর্গে মান্দোর সৈন্যদের মধ্যে সাজো সাজো রব। রাজা পিটারের শৌখিন জাহাজ নাকি আসতে দেখা গেছে। সৈন্যরা সব দুর্গের বিরাট কাঠের সদর দরজার সামনে সার বেঁধে দাঁড়াল। এক সারি সৈন্যের হাতে বর্শা। পেতলের বর্শায় সূর্যের আলো পড়ে ঝলকাচ্ছে।

একটু বেলায় রাজা পিটার একটা সাদা ঘোড়ায় চেপে এলেন। ঘোড়ার গায়ে মাথায় নানা রঙের সাজ। রাজা পিটারের মাথায় মুকুট নেই। পোশাক লাল রঙের জোব্বামত। তাতে সোনা রূপোর সূতোর কাজ করা। রাজা পিটারের বয়েস বেশি নয়। মুখে গোঁফ থুত্নিতে অল্প দাড়ি।

রাজা পিটারের পেছনে পেছনে এল রাজার দেহরক্ষীর দল। তাদের পরণে

বিচিত্র রঙদার পোশাক।

রাজা পিটারকে দেখে সৈন্যরা জয়ধ্বনি করল। রাজা সদর দেউড়ি দিয়ে সৈন্যদের মাথা নিচু করে অভিবাদন নিতে নিতে দুর্গে ঢুকে গেলেন। সেই পালকের বিছানা পাতা ঘরে গিয়ে রাজা বসলেন।

একটু পরেই হাত বাঁধা অবস্থায় আনগেভিনকে রাজার কাছে আনা হল। রাজা আনগেভিনকে বললেন—বেশ তো সিসিলিতে ধর্মকর্ম নিয়ে ছিলেন। হঠাৎ মাল্টার রাজা হবার শখ হল কেন?

—আপনার শাসনে সিসিলি জেনোয়ার যে সব লোক এখানে আছে তারা ক্ষুব্ধ। তারাই আপনাকে হারিয়ে মাল্টার রাজা হতে আমাদের ডেকে এনেছে। আনগেভিন বলল।

—এখন রাজা হওয়ার বদলে কয়েদঘরে পচতে হবে। রাজা হেসে বললেন। জেনে রাখুন—মাল্টার উচ্চবংশীয় মানুষেরা কিন্তু আমার বশ্যতা স্বীকার করেছে। তারা চায় আমিই যেন রাজা থাকি আর মাল্টাবাসীদের কল্যাণ করি। একটু থেমে রাজা বললেন এই আনগেভিনকে কয়েদঘরে আটক কর। তার আগে ওর পিঠে কুড়িবার চাবুক মারবে।

আনগেভিনকে নিয়ে সৈন্যরা চলে গেল।

অন্য সৈন্যদের সম্বন্ধে রাজা পিটার আদেশ দিলেন—এখানকার কয়েদঘরে যতজন আঁটে ততজনকে বন্দী করে রাখো। বাকিদের আনজুতে নিয়ে যাও। ওখানকার কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবে।

রাজার বিচার শেষ হল। তখন সেনাপতি মান্দো এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—একদল বিদেশি আনগেভিনের হ'য়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তাদের কী করা হবে।

—তাদের কাউকে নিয়ে এসো। সব শুনি আগে। রাজা বললেন। মান্দো একজন সৈন্যকে পাঠালো ফ্রান্সিসদের ডেকে আনতে।

কিছুক্ষণ পরে হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস এল। দু'জনেই মাথা একটু নুইয়ে নিয়ে শ্রদ্ধা জানাল। রাজা পিটার বললেন—শুনলাম তোমরা ভাইকিং। আনগেভিনের সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো। হ্যারি বলল—আমরা যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছি।

—কেন? রাজা পিটার বললেন।

—কারণ আনগেভিনের সৈন্যরা কিছুদিন আগে গভীর রাতে আমাদের জাহাজ দখল করেছিল। আনগেভিন সেন্ট অ্যাঞ্জেলো মানে এই দুর্গ অধিকার করতে আসছিল। আমাদের বলল তার সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই দুর্গ অধিকার করতে আমরা যেন সাহায্য করি। হ্যারি বলল।

—তোমরা অস্বীকার করলেই পারতে। রাজা পিটার বললেন।

—আমরা সে কথা বলেছিলাম। হ্যারি বলল।

—আনগেভিন কী বলল। রাজা পিটার জানতে চাইলেন।

—আনগেভিন বলেছিল মানে আমাদের ভয় দেখিয়েছিল—আমরা যুদ্ধে যোগ না দিলে সে কামান দেগে আমাদের জাহাজ ডুবিয়ে দেবে। হ্যারি বলল।

—সেই ভয়েই তোমরা আনগেভিনের সৈন্যদের সঙ্গে এসে যুদ্ধ করেছিলে।

—এবার বলো তো তোমরা এই ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে এসেছ কেন? রাজা পিটার বললেন।

—এ কথার উত্তর আমার বন্ধু ফ্রান্সিস স্পেনীয় ভাষায় দেবে। আবার বন্ধুটি গ্রীক ভাষা জানে না। এই বলে হ্যারি ফ্রান্সিসকে দেখাল। রাজা পিটার এবার স্পেনীয় ভাষায় ফ্রান্সিসকে বললেন—বলো—তোমার কী বলার আছে। ফ্রান্সিস বলতে লাগল—আমরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি। কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাছাড়া কোথাও কোনরকম গুপ্তধন গুপ্ত ঐশ্বর্যের সংবাদ পেলে আমরা তা উদ্ধার করি। সেইজন্যেই এই অঞ্চলে আসা।

—এরকম গুপ্তধন উদ্ধার করতে পেরেছো? রাজা পিটার বললেন। হ্যারি বললেন—অনেক ধন-সম্পদ আমার এই বন্ধু উদ্ধার করেছে।

—গুপ্তধন উদ্ধার করে নিজেদের দেশে নিয়ে যাও। এতো একরকম চুরি ডাকাতিই বলা যায়। রাজা পিটার বললেন। ফ্রান্সিস বললেন—আপনি এটুকু বিশ্বাস আমাদের করতে পারেন যে আমরা চোর ডাকাত নই। যত গুপ্তভাণ্ডার খুঁজে বের করেছি সবই যাদের প্রাপ্য তাদেরকেই দিয়েছি। নিজেরা একটা রুপোর মুদ্রাও নিই নি। হ্যারি বলল—আমার বন্ধু ফ্রান্সিস চিন্তা করে বুদ্ধি খাটিয়ে গুপ্তসম্পদ উদ্ধার করেছে।

রাজা পিটার একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—আমাদের এই দ্বীপেতেও একটা গুপ্তধন ভাণ্ডারের কথা আমরা জানি। সেই গুপ্তধন ভাণ্ডার আজ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও কেউ উদ্ধার করতে পারেনি। তোমরা উদ্ধার করতে পারবে? ফ্রান্সিস বলল—সব ঘটনা জেনে এবং কোথায় থাকতে পারে সেটা সেই জায়গায় গিয়ে জেনে তবেই বলতে পারবো সেই গুপ্তধনভাণ্ডার উদ্ধার করা যাবে কিনা। আপনি আগে ঘটনাটা বলুন।

একটু কেশে নিয়ে রাজা পিটার বলতে লাগলেন—খুব বেশিদিনের কথা নয়। বছর পঞ্চাশের আগে—এখান থেকে দক্ষিণদিকে আনজু নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে ছিলেন চার্লস নামে একজন ভূস্বামী। পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে চার্লস প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা অলঙ্কারের অধিকারী হয়েছিলেন। সকলেই একথা জানতো কিন্তু কেউ কখনো চোখে দেখে নি। চার্লসের স্ত্রীও জানতেন না। তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন। স্ত্রী আগেই মারা যান। চার্লস পিসায় গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি মারা যান। স্বর্ণমুদ্রা অলঙ্কার তিনি কোথায় রেখে গেছেন তাও তিনি কাউকে বলে যান নি।

—চার্লস কি কোন সূত্র রেখে যান নি? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—না—কোন সূত্র রেখে যান নি। নানা ভাবে গত পঞ্চাশ বছর ধরেই খোঁজাখুঁজি চলছে। কেউ কোন সূত্র বার করতে পারেনি। রাজা পিটার বললেন।

—তাহলে আমাকে একবার আনজু যেতে হবে। ঐ জায়গায় খোঁজ খবর করে বলতে পারবো চার্লসের ঐ ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবো কি না। ফ্রান্সিস বলল।



—ঠিক আছে। এই ব্যাপারে তোমাদের আমি সমস্ত সুযোগ সুবিধে করে দেব। দেখ—যদি উদ্ধার করতে পারো। রাজা পিটার বললেন।

এই সময় হ্যারি বলল—গ্রীকভাষায় অভিজ্ঞ একজনকে আমাদের চাই রাজা পিটার তার কাছে-বসা একজন প্রৌঢ় ব্যক্তিকে দেখিয়ে বলল—ইনি স্যাজ্জিও— পাঁচটা ভাষা ইনি অনর্গল বলতে পারেন লিখতেও পারেন। সারা মাল্টাদ্বীপে স্যাজ্জিওর মত ভাষাভিজ্ঞ বিদ্বান কেউ নেই। ফ্রান্সিস আর হ্যারি স্যাজ্জিওকে মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল। সাজ্জিও এতক্ষণ চুপ করে বিছানার একপাশে বসেছিলেন। এইবার হেসে তিনিও একটু মাথা ঝোঁকালেন। ফ্রান্সিস বলল— প্রয়োজনে আমরা স্যাজ্জিওর সাহায্য নেব।

সাজ্জিও ফ্রান্সিসদের দেশীয় ভাষায় বললেন—আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাদের সাহায্য করবো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি অবাক। তারা আবার মাথা নুইয়ে সাজ্জিওকে সম্মান জানাল।

এবার ফ্রান্সিস রাজা পিটারকে বলল—আমার বন্ধুরা এখানে বন্দী অবস্থায় রয়েছে। তাদের মুক্তি দিন এই আর্জি জানাচ্ছি।

রাজা পিটার বললেন—এসব পরে ভাবরো। আগে চার্লসের গুপ্ত ধনসম্পদ উদ্ধার করো। তারপরে তোমার বন্ধুরা মুক্তি পাবে। রাজা বললেন।

—সমুদ্রতীরে আমাদের জাহাজ রয়েছে। সেখানে আমাদের দেশের রাজকুমারী রয়েছে। কিছু বন্ধুও সেই জাহাজে রয়েছে। তাদের কী ব্যবস্থা করবেন?

রাজা পিটার সেনাপতি মান্দোকে ইশারায় ডাকলেন। দু'জনে কী কথা হল। রাজা পিটার বললেন—তোমাদের রাজকন্যা ও বন্ধুদের জাহাজেই বন্দী করা হয়েছে।

ফ্রান্সিস বললেন—মানাবর রাজা—আনগেভিনের হয়ে লড়াই করতে গিয়ে আমাদের দুই বন্ধু মারা গেছে, একজন আহতও হয়েছে। এই যুদ্ধে আমরা ইচ্ছে করে জড়াই নি। অথচ দুই বন্ধুকে হারিয়েছি। তাই অনুরোধ ঐ জাহাজেই বন্দী করে রাখুন। এখানে উন্মুক্ত আকাশের নিচে থাকতে গিয়ে হয়তো আরো বন্ধুকে হারাবো। আপনি দয়া করে আমার বন্ধুদের ঐ জাহাজেই বন্দী করে রাখুন। এতে ওদের শারীরিক ক্ষতি হবে না।

—বুঝলাম—রাজা পিটার মাথা নেড়ে বললেন—কিন্তু তোমরা যারা ধনসম্পদ খুঁজবে তোমরা তো সুযোগ বুঝে বন্দী বন্ধুদের নিয়ে জাহাজ চালিয়ে পালাতেও পারো।

ফ্রান্সিস বুঝল—রাজা পিটারের মনের সন্দেহ কিছুতেই দূর করা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে। আমার বন্ধুদের কয়েদঘরে রাখুন। মাথার ওপর একটা ঢাকা তো থাকবে।

—এবার যাতে আমরা আনজু যেতে পারি তার ব্যবস্থা হলে ভালো হয়। হ্যারি বলল। রাজা পিটার সেনাপতি মান্দোকে কাছে ডাকলেন ফ্রান্সিসদের সাহায্য করার কথা বললেন।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি মাথা একটু নুইয়ে রাজা পিটারকে সম্মান জানিয়ে দুর্গের বাইরে এল।

দুর্গের বাইরে এসে দেখল—একটা শস্যটানা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেনাপতি মান্দো গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিসরা কাছে আসতে বলল, এই গাড়োয়ান আপনাদের আনজু নিয়ে যাবে। চার্লস-এর বিরাট অট্টালিকা গীর্জা গ্রন্থাগার দেখতে পাবেন ওখানে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলল আনজুর দিকে। পথের দুপাশে গাছপালা টিলা ঝর্ণা।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস দেখ কী সুন্দর প্রকৃতি।

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—প্রকৃতি দেখার মত মনের অবস্থা আমার নেই। অনেক চিন্তা মাথায়।

বিকেল নাগাদ ফ্রান্সিসরা আনজু পৌঁছল। দু'জনে উঠল গিয়ে এক সরাইখানায়। গাড়ির গাড়োয়ানকে সঙ্গে নিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে নিল।

দু'জনে যখন চার্লস-এর অট্টালিকার সামনে এল তখন সন্ধ্যে হয় হয়। দেয়াল-ঘেরা অট্টালিকা। দেয়ালের মধ্যে প্রধান প্রবেশ পথ। ফ্রান্সিসরা প্রবেশ পথের সামনে এসে দেখল দু'জন পাহারাদার বর্শাহাতে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিসরা একজন পাহারাদারকে বেশ কষ্ট করে বোঝাল যে ওরা চার্লস-এর অট্টালিকা গীর্জা দেখতে এসেছে। একথাও বলল যে ওরা বিদেশি।

প্রহরী একজন ফ্রান্সিসদের ইশারায় সঙ্গে আসতে বলল। ফ্রান্সিস হ্যারি প্রহরীর

পেছনে পেছনে চলল। ঢুকেই বিরাট হলঘর। হলঘরের মাঝখানে শ্বেতপাথরের গোল টেবিল। চারপাশের দেয়ালে কয়েকজনের ছবি। বোঝা গেল চার্লস ও চার্লসের পূর্বপুরুষদের ছবি। প্রহরী ওদের নিয়ে হলঘরের কোনায় একটা পাথরের ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকে দেখল একটা কালো কাঠের বাঁকা পায়াওয়ালা চেয়ারে বসে আছেন টাকমাথা একজন প্রৌঢ়। প্রহরী প্রৌঢ়কে কী বলল। প্রৌঢ়টি হেসে গ্রীক ভাষায় বলল—মান্যবর চার্লসের এই অট্টালিকা গীর্জা গ্রন্থাগার এসব আমিই দেখাশুনো করি। আমার নাম গাইদা। হ্যারি ফ্রান্সিসকে কথাটা বুঝিয়ে বলল।

ফ্রান্সিস বলল—বলো যে আমরা চার্লসের গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করতে এসেছি। রাজা পিটার আমাদের অনুমতি দিয়েছেন। ওরা কথা বলছে তখনই ঘরে সাজ্জিও ঢুকলেন। হেসে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে সাজ্জিও বললেন — রাজা পিটার আপনাদের সাহায্য করবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন। দেখা গেল গাইদা চেয়ার ছেড়ে উঠে সাজ্জিওকে সম্মান জানাল।

সাজ্জিও গাইদাকে বলল—আপনি আপনার কাজ করুন। আমিই এদের সব দেখাচ্ছি। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বললেন—চলুন—আমিই আপনাদের সব দেখাচ্ছি।

তিনজনে ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘরে এল। পাথরে তৈরি হলঘরে পাথরের গায়ে কুঁদে কুঁদে ফুল লতা পাতার কাজ করা। দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির সামনে এসে সাজ্জিও বললেন—এই ছবিটা হচ্ছে মান্যবর চার্লসের ছবি। ফ্রান্সিসরা দেখল —এক প্রৌঢ়ের ছবি। সাধারণ পোশাক পরণে। মুখটা হাস্যোজ্জ্বল নয়। কেমন বিষাদময়।

ফ্রান্সিস বলল—সাজ্জিও—একটা কথা বলি। ছবিটা দেখে মাননীয় চার্লসকে কেমন বিষাদগ্রস্ত মনে হচ্ছে।

সাজ্জিও বললেন—ঠিকই ধরেছেন। এই ছবি আঁকার সময় চার্লসের এক পালিতা কন্যা মারা গিয়েছিল। তারপরই চার্লস তাঁর জাঁকজমকের জীবন ত্যাগ করে প্রায় সাধুর জীবন কাটাতে লাগলেন। একটা গির্জাঘর তৈরি করালেন। সেই গির্জাতেই তিনি যীশুর আরাধনায় বেশি সময় কাটাতেন। গির্জা চালাবার জন্যে একজন ধর্মযাজককে আনতে জেনিভা গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর শেষ ইচ্ছামত এই গীর্জার প্রাঙ্গনেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

—মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর ধনসম্পদের কথা কাউকে বলে যাননি এটাই শুনেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—এটা রহস্যময়ই থেকে গেল। তাঁর মৃত্যুর পর অনেকেই তাঁর ধনসম্পদ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে কিন্তু কেউ সেই বিপুল ধনসম্পদের হদিস করতে পারে নি। সাজ্জিও বললেন।

—মনে হয় ভালো করে খুঁজলে কোন না কোন সূত্র পাওয়া যেতই। হ্যারি বলল।

এবার সাজ্জিও হেসে বললেন—তাহলে সত্যি কথাটা বলি। প্রায় এক বছর ধরে মান্যবর চার্লসের অট্টালিকা গ্রন্থাগার গির্জা আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু কোন সূত্র পাই নি।

ফ্রান্সিস বলল—তাহলে তো আপনি অনেক কিছুই জানেন।

—তা কিছু তো জানিই। যেমন গ্রন্থগারে রক্ষিত সমস্ত গ্রন্থ আমি পড়েছি। বাসস্থান অট্টালিকা গির্জা সব জায়গা খুঁজেছি। কিন্তু সবই ব্যর্থ। সাজ্জিও বলল।

—এই খোঁজাখুঁজি কি নিজের ইচ্ছেয় করেছেন? হ্যারি বলল।

—না—মান্যবর চার্লসের ধনসম্পদের ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। রাজা পিটারের নির্দেশেই আমাকে খোঁজাখুঁজি করতে হয়েছিল রাজা পিটার বলেছিলেন মান্যবর চার্লসের গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলো সব পড়ে যদি কোন সুত্র আমি পাই সে জন্যেই আমাকে খুঁজতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

—আপনি কোন সূত্রই পান নি। হ্যারি বলল।

—না—কিছ্‌ছু না। সাজ্জিও বললেন।

কথা বলতে বলতে তিনজনে চার্লসের গ্রন্থাগারে এল। পাথরে তৈরি গ্রন্থাগারটি বেশি বড় না। গ্রন্থাগারের প্রহরী সাজ্জিওকে দেখে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল।

গ্রন্থাগারে ঢুকল তিনজনে। প্রহরী একটা মোটা হলুদ রঙের মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে গেল। ফ্রান্সিসরা দেখল— কাঠের পাটাতনের ওপর চামড়া বাঁধানো গ্রন্থ রাখা। গ্রন্থ বেশি নেই। সব মিলিয়ে আট দশটা হবে।

হ্যারি বলল—সাজ্জিও—গ্রন্থগুলো সবই কি গ্রীকভাষায় লেখা।

—না—। আরবী ভাষাযও আছে। লাতিন ভাষায়ও আছে। সাজ্জিও বললেন।

—গ্রন্থগুলো কী বিষয় নিয়ে লেখা? হ্যারি বলল।

—নানা বিষয়ে—অঙ্ক জ্যোতিষ মানুষের জীবনমৃত্যু এরকম বিভিন্ন বিষয়ে লেখা। সাজ্জিও বললেন। হ্যারি কয়েকটা গ্রন্থের পাতা উল্টে দেখল। আরবী আর গ্রীক ভাষায় লেখা।

হ্যারি বলল—গ্রন্থগুলো থেকে চার্লসের ধনসম্পদের কোন হদিশ পান নি?

—না—তবে পুরোনো গ্রীক ভাষায় লেখা একটা বাইবেল পেয়েছি। গ্রন্থটার নানা জায়গায় দাগ দেওয়া। বোঝা যায় যে মান্যবর চার্লস খুব মনোযোগ দিয়ে ঐ বাইবেলটা পড়তেন। সাজ্জিও বললেন। ফ্রান্সিস গ্রন্থাগারটা ঘুরে দেখল। সাধারণ পাথরের ঘর। মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এমন কিছু নেই।

—চলুন—গির্জাটা দেখবেন। সাজ্জিও বললেন।

গির্জাটা একটু দূরে। গির্জাটা পাথরের। তবে চুড়োটা কাঠের। তাতে ফুল পাতার কাজ।

তিনজনে গির্জায় ঢুকল। ঢুকেই ফ্রান্সিস আর হ্যারি অবাক হয়ে গেল। দেখল মানুষের মতই যীশুর মূর্তি। এত বড় যীশুর মূর্তি ওরা কখনো দেখেনি। ওক কাঠ কুঁদে কুঁদে মূর্তিটা তৈরি করা হয়েছে। ক্রুশে বিদ্ধ যীশুর মূর্তি। এত সজীব মূর্তি বড় একটা দেখা যায় না। ক্রুশের গায়ে হাত পা পেরেকে বিদ্ধ। মাথায় কাঁটার মুকুট। মুখটা একটু ঝুঁকে পড়েছে। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দু'জনেই মন্ত্রমুগ্ধের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

সাজ্জিও বললেন—মূর্তিটা দেখে একটু অবাক হয়েছেন—তাই না।

—হ্যাঁ—সত্যি এত বড় আর এত সজীব মূর্তি আমরা কখনো দেখিনি। হ্যারি বলল।

—মান্যবর চার্লসের নির্দেশেই এই মূর্তি নির্মিত হয়েছে। তিনি শুধু খ্রীস্ট ভক্তই ছিলেন না। তাঁর শিল্পবোধেরও প্রশংসা করতে হয়। সাজ্জিও বললেন।

তিনজনে বেদীর সামনে এসে দাঁড়াল। সাজ্জিও বললেন—কাঠের বেদীতে কত কারুকাজ দেখুন। সত্যিই ফ্রান্সিসরা দেখে অবাক হল কত সূক্ষ্ম কাজ কাঠের বেদীটাতে। কাঠ কুঁদে কুঁদে তোলা হয়েছে নকশা। ফুল লতা পাতা পাখি। কাঠের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম কাজ খুব কমই দেখা যায়।

হঠাৎই ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল—ফুল পাখি লতাপাতা যেখানে শেষ হয়েছে তার নিচে বাঁদিকে আর ডানদিকে কিছু যেন কথা কুঁদে তোলা। ফ্রান্সিস বলল—সাজ্জিও লক্ষ্য করেছেন বোধহয় নিচের দিকে কিছু লেখা আছে।

—আপনি ঠিকই ধরেছেন। প্রাচীন গ্রীকভাষায় লেখা বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেন্ট' থেকে দুটো উদ্ধৃতি। সাজ্জিও বললেন।

—উদ্ধৃতি দুটো কী? হ্যারি জানতে চাইল।

সাজ্জিও বললেন—

—বাঁ দিকের উদ্ধৃতিটি হচ্ছে—"দুঃখ কষ্ট ব্যথা বেদনারূপে ক্রুশ বহন যে না করে সে আমার অনুগামী হতে পারে না।"

ডানদিকে আছে—"জীবনটা কেবল খাওয়াপরা নয় তার থেকে আরো অনেক বেশি।"

ফ্রান্সিসরা বুঝল বড় গভীর অর্থময় উধৃতি দুটি। চার্লস সত্যিই একজন চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন। শুধু খ্রীস্টভক্তই ছিলেন না।

ওদিকে দুর্গের চত্বরে বন্দী শাঙ্কো বিস্কোরা ভাবছে কী করে ওখান থেকে পালানো যায়। পালিয়ে ওদের জাহাজে যাবে। বরং জাহাজেই বন্দী হয়ে থাকবে। এখানে এই উন্মুক্ত আকাশের নিচে এভাবে দিনের পর দিন থাকা চলে না। কিন্তু পালাবে ভাবলেই তো হবে না। কীভাবে পালাবে সেটাই আগে ভাবতে হবে। শাঙ্কো বিস্কোর সঙ্গে এই নিয়ে মৃদুস্বরে কথা বলছিল। শাঙ্কো বিপদ আঁচ করলেই যা করে এবারও তাই করেছে। কোমর থেকে বড় ছুরিটা বের করে ঢোলা জামার মধ্যে

ছুরিটা ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছে। প্রয়োজনের সময় বার করবে।

শাঙ্কো তাই বলল—দেখ—হাতে দড়ি কেটে ফেলা যাবে। কিন্তু দুর্গের দেয়াল ডিঙোবে কী করে? পাহারাদার সৈন্যরা তো ঘোরাফেরা করছে। ওদের একটাকে ঘায়েল করে তরোয়াল ছিনিয়ে আনা যায়। কিন্তু এত সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই—অসম্ভব।

—দেখা যাক—রাতের খাবার দেবার সময় কতজন সৈন্য থাকে। বিস্কো বলল।

রাত হয়েছে তখন। চারজন পাহারাদার সৈন্য বন্দীদের খাবার দাবার জল নিয়ে এল। হাত খোলা হবে না। সবার সামনে লম্বাটে পাতা পেতে দেওয়া হল। তাতে আধপোড়া রুটি আর সবরকম আনাজ পত্রের ঝোলমত দেওয়া হল। সঙ্গে একটা করে মুরগীর সেদ্ধ ডিম। হাত বাঁধা অবস্থাতেই সবাই খেতে লাগল। শাঙ্কো বিস্কো দু'জনেরই মনে পড়ল এরকম বন্দী অবস্থায় ফ্রান্সিসের উপদেশ—পেট পুরে খাও—খেতে ভালো না লাগলেও খাও। দু'জনেই পেট পুরে খেল। একজন পাহারাদার কাঠের জালামত জায়গায় জল নিয়ে এসেছিল। সে সবাইকে জল খাওয়াতে লাগল। শাঙ্কো সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখল। মশালের আলোয় দেখল বেশ কিছুটা দূরে সদর দেউড়িতে এখন সৈন্য সংখ্যা কম। যারা খাবার দিতে এসেছিল তারা খাবারের বড় বড় কাঠের এঁটো পাত্রগুলো নিয়ে চলে গেল। রইল শুধু যে পাহারাদারটি জল দিচ্ছিল—সে একা।

শাঙ্কো ফিস ফিস করে ডাকল—বিস্কো। বিস্কো ওর দিকে তাকাল। শাঙ্কো মাথা নিচু করে বলল—আমার পোশাকের মধ্যে থেকে ছোরাটা বের কর। বিস্কো সঙ্গে সঙ্গে শাঙ্কোর ঢোলা গলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা তুলে আনল। তারপর নিজের দড়িবাঁধা দু' হাত দিয়ে ছোরাটা ধরে শাঙ্কোর হাতের দড়ি কাটতে লাগল। ছোরার খোঁচা লেগে শাঙ্কোর হাতের কয়েকটা জায়গা কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। জ্বালা করতে লাগল। শাঙ্কো মুখ বুঁজে সহ্য করল। ছোরার ঘষা লেগে একসময় দড়িটা কেটে গেল। খোলা হাতে শাঙ্কো ছোরাটা নিয়ে বিস্কোর হাতের দড়ি কেটে ফেলল। এবার বিস্কো বাকি বন্ধুদের হাতের দড়ি কাটতে লাগল। জল দিচ্ছিল যে পাহারাদারটা সে তখন জলের পাত্র নিয়ে চলে যাচ্ছে।

শাঙ্কো তখন বিস্কোকে ছোরাটা দিল। তখন সৈন্যটি ওদের সামনে দিয়েই যাচ্ছিল। বিস্কো অন্ধকারে এক লাফে সৈন্যটার কাঁধে ঝুলে পড়ল। পেছন থেকে ছেঁড়া দড়িটা দিয়ে সৈন্যটার গলায় ফাঁসমত পরাল। তারপর দড়ি টানল। পাহারাদারটি টাল খেয়ে পাথর বাঁধানো চত্বরে পড়ে গেল। অজ্ঞান হয়ে গেল। শাঙ্কো কিছুক্ষণ চাপাগলায় বলল—ছোরাটা দাও। আমার সঙ্গে এসো।

দু'জনে হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের দেওয়ালের দিকে চলল। সদর দেউড়ির মশালের আলো এত দূর আসে নি। দেয়ালের নানা জায়গায় খোঁদলে মশাল জ্বলছে। শাঙ্কো হামাগুড়ি দিয়ে অমনি একটা জ্বলন্ত মশালের কাছে এল। বিস্কোও

এলো। দু'জনেই ভীষণ হাঁপাচ্ছে তখন। শাঙ্কো একবার দুর্গের দেউড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মশালটা নিয়েই দেয়ালের গায়ে চেপে ধরল। ধোঁয়া বেরোল। মশালটা নিভেও গেল, এবার শাঙ্কো ফিস ফিস করে বিস্কোকে ডেকে বলল—বিস্কো এসো—তোমার কাঁধে উঠে আমি দেয়াল ডিঙোবো।

—পারবে? বিস্কো বলল।

—পারবো। মশাল রাখার আর একটা খোঁদল রয়েছে ওপরে। শিগগিরি এসো। শাঙ্কো বলল। বিস্কো এগিয়ে এসে দেয়াল ঘেঁষে বসল। শাঙ্কো ওর দুকাঁধে দু'পা রেখে দাঁড়াল। দেয়াল ধরে ধরে বিস্কো আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দেয়ালের মাথায় শাঙ্কো পৌঁছাতে পারল না। তখনও হাত তিনেক বাকি। শাঙ্কো অন্ধকারে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল মশাল রাখার খোঁদলটা একটু উঁচুতে ডানদিকে রয়েছে। শাঙ্কো দেয়ালে শরীর চেপে খোঁদলটায় ডান পাটা রাখল। তখন শাঙ্কো ভীষণ হাঁপাচ্ছে। নাক মুখ দিয়ে একসঙ্গে শ্বাস টানছে। দেয়ালে শরীর চেপে খোঁদলে পায়ের চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে শাঙ্কো চেপে দেয়ালের মাথায় উঠে বসল। বিস্কো চাপা গলায় বলল—সাবাস্ শাঙ্কো। হাঁপানির ঠ্যালায় তখন শাঙ্কো কথাও বলতে পারছে না। অবশ্য এখন কথা বলার সময়ও নয়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—বিস্কো—দেয়ালের ওপাশে একটা ন্যাড়াগাছ দেখেছি আমি। আমি ঐ গাছ বেয়ে বেয়ে নেমে যাবো। আমাদের জাহাজে যাবো। মোটা দড়ি নিয়ে আসবো। ঐ গাছটায় বেঁধে দেয়ালের এপাশে দড়ির অন্য মাথাটা ফেলে দেবো। তোমরা দড়ি বেয়ে বেয়ে দেয়াল ডিঙোবে। তোমরা একজন একজন করে যখন এপাশে দড়ি ধরে নামতে থাকবে তখন দেয়ালের ওপাশে অন্যেরা দড়িটা টান করে ধরে রাখবে। তাহলেই এপারে সহজে নেমে যাবে।

শাঙ্কো এবার অন্ধকারে পা বাড়িয়ে ন্যাড়া গাছটার মগডালে শরীরের ভর রাখলো। তারপর শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাছটার কাণ্ড জড়িয়ে ধরল। দেখল—দুর্গের দেউড়িতে অনেক মশাল জ্বলছে কিন্তু সৈন্যসংখ্যা কম।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে গাছটার ডাল ধরে ধরে কাণ্ড বেয়ে মাটিতে নেমে এল। তারপর অন্ধকারেই পাথর ভরা পথটায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। হাঁপানি তখন ছেড়ে গেছে।

কিছুক্ষণ এমনি করে শুয়ে থাকায় হাঁপানি একটু কমল। এবার শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। ঐ হাঁপধরা অবস্থায় যতটা দ্রুত সম্ভব চলল ওদের জাহাজ যেখানে আছে সেই তীরভূমির দিকে।

যেখানে জাহাজটা ছিল সেখানে শাঙ্কো এল। জাহাজের কাছাকাছি আসতেই দেখল জাহাজ থেকে তীরভূমিতে পাতা পাঠের পাটাতনটা তুলে ফেলা হয়েছে। জাহাজের ডেক-এ একদল সশস্ত্র সৈন্য। দেখেই বুঝল ওরা রাজা পিটারের পাহারাদার সৈন্য। মুস্কিল হল। সোজা পথে দড়ি জোগাড় করা যাবে না। শাঙ্কো

তাই ঠিক করল নোঙরের দড়িটাই নেবে।

শাঙ্কো জলের ধারে এল। আস্তে আস্তে জলে নেমে নিঃশব্দে জল ঠেলে চলল। জাহাজের সামনের দিকে অন্ধকারে এগিয়ে এবার নোঙরের কাছিটা ধরে ডুব দিল। অনেকটা নিচে নেমে ছোরাটা কোমর থেকে খুলল। তারপর ছোরা চেপে ধরে কাছিটা পোঁচ দিয়ে কেটে ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে জলের ওপর ভেসে উঠল। এরপর জলের ওপরের কাছিটা কেটে ফেলল। এবার কাছিটা বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে নিঃশব্দে সাঁতরাতে সাঁতরাতে তীরে উঠে এল। পেছনে তাকিয়ে দেখল ওদের জাহাজটা তো এখন নোঙরহীন। হাওয়ার ধাক্কায় আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে। জাহাজে বাড়তি নোঙর থাকে যে বন্ধুরা জাহাজে বন্দী আছে তারাই নতুন নোঙর লাগাবে। এখন দুর্গ থেকে বন্ধুদের মুক্ত করাই আসল কাজ। নোঙর থেকে কাটা কাছিটা গোল করে পেঁচিয়ে নিয়ে শাঙ্কো অন্ধকারে চলল দুর্গের দিকে।

দুর্গের দেয়ালের কাছাকাছি গাছটার ওপর উঠল। গাছটার মাঝামাঝি কাণ্ডটার সঙ্গে কাছির একটা মুখ ভালো করে গেড়ো দিয়ে বাঁধল। গাছ থেকে নেমে এল। কাছির অন্য মুখটায় একটা পাথর বাঁধল। এবার সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেয়ালের ওপর দিয়ে দুর্গের ভেতরে ছুঁড়ে দিল। শাঙ্কোর ভাগ্য ভাল। পাথরটা ভেতরের চত্বরে বন্দী কারো মাথায় পড়ল না। পড়ল চত্বরের ওপর। শব্দ হল। তবে খুব জোর শব্দ নয়। বিস্কো অন্ধকারে শব্দটা লক্ষ্য করে এগিয়ে এল। পাথর বাঁধা কাছিটা দেখল। বুঝল শাঙ্কোই ছুঁড়েছে দড়ির মুখটা। বিস্কো বন্ধুদের ফিস ফিস করে বলল—শাঙ্কো কাছি ঝুলিয়ে দিয়েছে। একে একে পালাও। বন্ধুদের একজন কাছিটার কাছে এল। কাছিটা টেনে দেখে বুঝল কাছিটা দেয়ালের ওপাশের গাছটার সঙ্গে বেশ শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। বন্ধু যখন দেয়ালের কাছে গিয়ে কাছি দিয়ে বেয়ে উঠছে নিচে বিস্কো ওরা কয়েকজন কাছিটা টান টান করে টেনে ধরে রাখল। বন্ধুটি দেয়ালের মাথায় বসল। তারপর টান টান কাছিটা ধরে ধরে এগিয়ে গেল। শাঙ্কো এসে বন্ধুটিকে জড়িয়ে ধরল। মুক্তি!

এবার বিস্কো সব বন্ধুকে একে একে দেয়ালের ওপাশে পার করে দিল। তারপর আনগেভিনের সৈন্যরা কাছি টেনে ধ'রে বিস্কোকে পার করাল। এরপর নিজেরা দেয়ালে উঠে পার হতে লাগল।

বিস্কো দেয়ালের ওপর উঠে দেখেছিল দেউড়ির দিকে তাকিয়ে। সৈন্যরা দু'তিনজন জেগে আছে। তবে পাহারা দিচ্ছে না। গল্পগুজব করছে। মশাল জ্বলছে। এদিকে কারো দৃষ্টি নেই।

বিস্কো পার হতেই ভাইকিংরা এবার ছুটল জাহাজ যে দিকে বাঁধা আছে সেদিকে। অন্ধকারে ছুটে চলল সবাই।

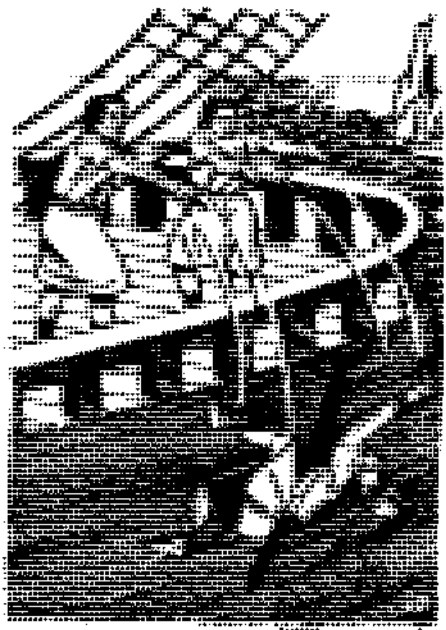
সমুদ্রতীরে পৌঁছে দেখল নোঙরহীন ওদের জাহাজটা বেশ দূরে ভেসে গেছে। শাঙ্কো বলে উঠল—সবাই সাঁতরে চলো। সমুদ্রের সঙ্গে ভাইকিংদের নাড়ির টান।

ওদের কাছে এই দূরত্বটুকু সাঁতরে যাওয়া কিছুই না।

আস্তে আস্তে জলে নামল সবাই। শাঙ্কোর হুঁশিয়ারি শোনা গেল—কোন শব্দ নয়। ভাইকিংরা নিঃশব্দে সাঁতরে চলল ওদের জাহাজের দিকে।

জাহাজের কাছাকাছি এসে বিস্কো একটু গলা চড়িয়ে বলল—আমরা রাজা পিটারের পাহারাদার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করবো না। ওদের ধরে ধরে জলে ফেলে দেব।

জাহাজের হালের কাছে এসে জড়ো হল সবাই। হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে প্রথমে শাঙ্কো উঠল। ডেক-এ নেমে এল না। হালের পাশে অপেক্ষা করতে লাগল। আস্তে আস্তে প্রায় সবাই উঠে এল। দেখল ডেক-এ চার পাঁচজন রাজা পিটারের সৈন্য ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। তবে তরোয়াল কোমরে গোঁজা।



মুহূর্তে শাঙ্কো ছুটে এসে একজন পাহারাদার সৈন্যকে রেলিঙের দিকে ঠেলে নিয়ে এক ধাক্কায় জলে ফেলে দিল। শাঙ্কোর দেখাদেখি আর সবাইও তখন ছুটে এসে বাকি পাহারাদার সৈন্যদের ঠেলে জলে ফেলে দিল।

এতে একটু হৈ চৈ হল। নিচের কেবিনঘরের অস্ত্রঘরের পাহারাদার সৈন্যরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ডেক-এ উঠে এল। তাদেরও একই দশা হল। শুধু একজন পাহারাদার সৈন্য তরোয়াল চালিয়ে শাঙ্কোর কাঁধে ঘা মারতে পেরেছিল। শাঙ্কো আঘাতের কষ্টের মধ্যেও বলে উঠল—ওকে মেরোনা—জলে ফেলে দাও। সবাই তাই করল। ওকে দোলাতে দোলাতে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এ সময় নিচের কেবিনঘর থেকে বাকি বন্ধুরা উঠে এল ডেক-এ। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। ওর আশা ছিল হয় তো ফ্রান্সিস হ্যারিও মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু দেখল মুক্ত ভাইকিংদের মধ্যে ফ্রান্সিস আর হ্যারি নেই।

ওদিকে ভেন শাঙ্কোর চিকিৎসা করতে লাগল। মারিয়াও শাঙ্কোর শুশ্রূষায় লেগে পড়ল। বিস্কো শাঙ্কোর কেবিনঘরে এল। দেখল—শাঙ্কোর কাঁধ থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে। শাঙ্কো এখন অনেকটা ভালো। ভেন আর মারিয়া শাঙ্কোর পাশে বসে আছে।

বিস্কো বলল—শাঙ্কো তুমি যেভাবে আমাদের মুক্ত করলে তা প্রশংসনীয়। শাঙ্কো হেসে বলল—এসবই আমার ফ্রান্সিসের কাছ থেকে শেখা। ফ্রান্সিস বলে—বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। কার্যকরী কোন পন্থা বের করতে হয়, তারপর সেটা কাজে লাগাও।

—ঠিক তাই—বিস্কো বলল—কিন্তু আমি ভাবছি পালিয়ে তো এলাম এবার ফ্রান্সিস আর হ্যারির না কোন বিপদ হয়। মারিয়া বলল—বিপদ আর কী হতে পারে। বড় জোর ওদের দু'জনকে বন্দী করে রাখতে পারে। তবে দু'জন তো, ফ্রান্সিস ঠিক হ্যারিকে নিয়ে পালাতে পারবে। ওদের জন্য ভেবো না। এখন আমরা কী করবো সে কথা ভাবো। শাঙ্কো বলল—আমি নোঙরের কাছি কেটে নিয়ে গেছি। আমাদের জাহাজ এখন নোঙরহীন। বিস্কো বলল—নতুন নোঙর কাছির ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু আমাদের জাহাজটা কোথায় রাখবো? শাঙ্কো বলল—বেশ কিছুটা পূবে সমুদ্রতীরে চলো। দেখা যাক—জাহাজ লুকিয়ে রাখার কোন জায়গা পাই কিনা।

বিস্কো বলল—ভোর হবার আগেই আমাদের এই তল্লাট ছেড়ে পালাতে হবে। রাজা পিটারের জাহাজগুলো থেকে বেশ দূরে। আমাদের জাহাজ যেন ওরা দেখতে না পায়। ওরা সকালেই জেনে যাবে যে আমরা পালিয়েছি। আমরা যে সব পাহারাদারকে জলে ফেলে দিয়েছি তাদের কাছেও আমাদের জাহাজের খবর পাবে তখন আমাদের জাহাজ লক্ষ্য করে কামানের গোলা ছুঁড়লেই আমরা বিপদে পড়ে যাবো। কাজেই এক্ষুনি এই তল্লাট ছেড়ে পালাতে হবে। বন্ধুদেরও এই কথা বলেছি। বিস্কো এবার ডেক-এ উঠে এল। বন্ধুদের ডেকে-এর কাছে আসতে বলল। তারপর বলল—এক্ষুনি একদল দাঁড়ঘরে চলে যাও। আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই এলাকা ছেড়ে পালাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একদল ভাইকিং দাঁড়ঘরে চলে গেল। অন্যদল পাল খুলে দিতে চলল। এবার বিস্কো জাহাজচালক ফ্রেজারকে বলল—জাহাজ পূবদিকে চালাও। ফ্রেজার হুইল ঘোরাল। বিস্কো পেড্রোকে বলল—তোমার জায়গায় উঠে যাও। লক্ষ্য রাখো তীরে কোন ঘন জঙ্গলঘেরা জায়গা পাও কিনা। পেলেই বলবে। পেড্রো মাস্তুল বেয়ে নিজের নজরদারির জায়গায় চলে গেল।

জাহাজ পুবমুখো চলল। বেশ দ্রুতই চলল।

রাত শেষ হয়ে এল। পূবদিকের আকাশ লাল হয়ে উঠল। সূর্য উঠতে দেরি নেই। পেড্রো মাস্তুলের ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল—তীরে একটা জংলা জায়গা দেখা যাচ্ছে। রেলিং ধরে বিস্কো আর মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে। বিস্কো দেখল ওখানে একটা খাঁড়ি মত। অনায়াসে জাহাজ খাঁড়িতে ঢোকানো যাবে। খাঁড়ির দুপাশে গভীর জঙ্গল। বাইরে থেকে জাহাজটাকে দেখা যাবে না।

বিস্কো গিয়ে ফ্রেজারকে বলল—জাহাজ খাঁড়িটায় ঢুকিয়ে দাও। ওখানেই

থাকবে জাহাজটা। ওখানেই আমরা ফ্রান্সিস আর হ্যারির জন্যে অপেক্ষা করবো।

জাহাজটা বেশ দ্রুতই খাঁড়িটায় ঢুকে পড়ল। তখনই সূর্য উঠল। ভোরের নিস্তেজ আলো ছড়ালো সমুদ্রের জলে। জঙ্গলটার মাথায়।

শাঙ্কোরা সারাদিন শুয়ে বসে কাটাল।

বিকেলে শাঙ্কো ভাবল—কোথায় এলাম একটু দেখে আসি।

শাঙ্কো জাহাজের পাটাতন দুটোর কাছে এল। এক ভাইকিং বন্ধুকে বলল—পাটাতনটা পাতবো চলো।

বন্ধুটি বলল—এসব জংলা জায়গা। জাহাজ থেকে নামা কি ঠিক হবে?

—আরে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে চলে আসবো। এখন তো আমাদের ফ্রান্সিস আর হ্যারির জন্যে প্রতীক্ষা করা ছাড়া কোন কাজ নেই। এসো। শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো আর বন্ধুটি মিলে জাহাজ থেকে দুটো পাটাতন ফেলল। পাটাতন দুটো পড়ল তীরের ঝোপঝাড়ের ওপর। বন্ধুটি বলল—তোমার একা নামা ঠিক হবে না। চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

শাঙ্কো আর বন্ধুটি পাতা পাটাতন দিয়ে তীরের ঝোপজঙ্গলের মধ্যে নামল। শাঙ্কো ঝোপঝাড় দু'হাতে সরিয়ে হেঁটে চলল। পেছনে বন্ধুটিও শাঙ্কোর দেখাদেখি ঝোপজঙ্গল দু'হাতে সরিয়ে সরিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ হেঁটে এগোতেই দেখল এখানে ঝোপজঙ্গল কম। বিরাট বিরাট সব গাছ।

শাঙ্কো চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে তখনই নজরে পড়ল একটা পায়ে চলা পথ উত্তরদিকের জঙ্গলে ঢুকে গেছে। শাঙ্কো আশ্চর্য হল। এরকম জায়গায় তাহলে লোকজন যাওয়া আসা করে। শাঙ্কোর বন্ধুটিও তখন অবাক। বলল—শাঙ্কো, মনে হচ্ছে এখানে লোকবসতি আছে।

—ভাবছি রাস্তাটা ধরে যাবো কিনা। শাঙ্কো বলল। বন্ধুটি চারদিকে তাকিয়ে বলল—শাঙ্কো—দেখ অন্ধকার নেমে আসছে। আর না এগিয়ে চলো জাহাজে ফিরে যাই।

—তুই একটা ভীতুর ডিম। তুই চলে যা। আমি একাই যাবো। শাঙ্কো বলল।

—না-না। বন্ধুটি বলল—শাঙ্কো জীবনের ঝুঁকি নিও না। ফিরে চলো। বন্ধুটি শাঙ্কোকে বারবার সাবধান হতে বলল। কিন্তু শাঙ্কো কথা শুনলো না। পায়েচলা পথটা ধরে এগোতে লাগল। অগত্যা বন্ধুটিও শাঙ্কোর পেছনে পেছনে চলল। একটু এগোতেই জঙ্গল শুরু হল। জঙ্গল খুব ঘন নয়। ছাড়া ছাড়া গাছপালা।

সন্ধ্যে হতে দেরি নেই। পাখপাখালি বাসায় ফিরেছে। পাখির ডাকে এলাকাটা ভরে উঠেছে।

কিছুটা এগিয়ে গেল দু'জনে। হঠাৎ শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েকটা গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একটা পাথরের বাড়ি। বন্ধুটি বলল—শাঙ্কো কী হল? শাঙ্কো

নিঃশব্দে আঙ্গুল তুলে পাথরের বাড়িটা দেখাল। বন্ধুটিও অবাক হল। এই জঙ্গলে পাথরের বাড়ি? শাঙ্কো বলল—তুমি এখানে থাকো। আমি আড়াল থেকে দেখে আসি এটা পোড়ো বাড়ি না লোকজন থাকে। বন্ধুটি দাঁড়িয়ে রইল।

শাঙ্কো গাছপালার আড়ালে আড়ালে বাড়িটার কাছে গেল। কান পাতল। অস্পষ্ট কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। শাঙ্কো বুঝল বাড়িটায় লোকজন আছে। এরা কারা? বাড়িটা পাথরের। মাথায় পাথরের ছাদ। দরজা জানালা ভাঙা। পাথরের কাল্‌চে দেয়াল এখানে ওখানে ধ্বসে পড়েছে। একটা জানালা দিয়ে মশালের আলো দেখা যাচ্ছে।

আর একবার ভালো করে চারদিক দেখে নিয়ে শাঙ্কো বন্ধুর কাছে ফিরে এল। বলল—যতটা পারলাম দেখলাম। এখানে কিছু লোক রয়েছে। তারা কারা বুঝতে পারলাম না। চলো—আর কিছু দেখার নেই।

দু'জনে ফিরে চলল। কিছুটা গিয়ে ওরা পায়েচলা পথ ছেড়ে ডানদিকের ঝোপঝাড়ে ঢুকল। গাছ ঝোপঝাড় পার হয়ে ওরা খাঁড়ির ধারে এল। দেখল ওদের জাহাজটা বেশ কিছুটা উত্তরদিকে জলে ভাসছে।

দু'জনে তীর ধরে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তীরে এল যেখানে ওদের জাহাজটা রয়েছে।

পাতা পাটাতন দিয়ে দু'জনে যখন জাহাজে উঠল তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

বিস্কো আর কয়েকজন ভাইকিং ছুটে এল। বিস্কো বলল—শাঙ্কো তোমাদের জন্যে আমাদের খুব ভাবনা হয়েছিল। কোথায় গিয়েছিলে?

—জাহাজ থেকে নেমে একটু ঘুরে ফিরে দেখছিলাম। শাঙ্কো বলল।

—কী দেখলে? শুধু ঝোপজঙ্গল? বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ ঝোপজঙ্গলের মধ্যে একটা পাথরের বাড়ি। শাঙ্কো বলল।

—বলো কি? এই ঝোপজঙ্গলের মধ্যে বাড়ি? তবে পোড়ো বাড়ি থাকতেও পারে। বিস্কো বলল।

—পোড়ো বাড়ি নয়। লোকজনও রয়েছে। শাঙ্কো বলল।

—আশ্চর্য! কারা থাকে ওখানে? বিস্কো বলল।

—সেটাই তো বুঝতে পারলাম না। শাঙ্কো বলল।

—বোধহয় চোর ডাকাতের দল। বিস্কো বলল।

—উঁহু—চোর ডাকাতরা অত গলা তুলে খোশগল্প করে না। শাঙ্কো বলল।

—কোন ভাষায় ওরা কথা বলছিল? একজন ভাইকিং জানতে চাইল?

—ওরা এখানে প্রচলিত গ্রীক ভাষাতেই কথা বলছিল। শাঙ্কো বলল।

—ভাগ্যিস তোমাদের ওরা দেখতে পায় নি। বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ আমরা গাছের আড়াল থেকে সব দেখে শুনে দ্রুত চলে এসেছি। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে ওরা কারা তা তো বোঝা গেল না।

—ওরা এই দেশেরই লোক এটা বোঝা গেল। এখন এরা আমাদের সম্পর্কে বা আমাদের জাহাজ সম্পর্কে কিছু জানে কিনা জানি না। এরা আমাদের শত্রু বা মিত্র তাও জানার উপায় নেই। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। আমরা কিন্তু এই জায়গা ছেড়ে যাবো না। বিস্কো বলল।

—দেখা যাক—আমাদের আবার কোন বিপদ হয় কি না। শাঙ্কো বলল।

ভাইকিংদের রাতের খাওয়া শেষ হল। সবাই জাহাজের ডেক-এ কেবিনঘরে ঘুমিয়ে পড়ল। শাঙ্কো, জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি। লোকজন থাকে—ওখানে যারা থাকে তারা কারা এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে শাঙ্কোর দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

তখন শেষ রাত। চাঁদের ম্লান আলোয় দেখা গেল একদল সৈন্য তীরের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এসে দাঁড়াল। তারপর পাতা কাঠের পাটাতন দিয়ে হেঁটে ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। কোনরকম শব্দ না করে চারজন সৈন্য সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে অস্ত্রঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল যাতে ভাইকিংরা কেউ অস্ত্র হাতে না পায়।

এবার সৈন্যদের সর্দার ডেক-এ ঘুমিয়ে থাকা ভাইকিংদের ঘুম ভাঙাতে বলল। সৈন্যরা ভাইকিংদের একে একে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে জাগাতে লাগল। এই ভাইকিংদের মধ্যে শাঙ্কো ঘুমিয়ে ছিল। তরোয়ালের খোঁচায় ঘুম ভেঙে সৈন্যদের দেখল। সৈন্যদের মধ্যে সৈন্যদের সর্দারকেও দেখল। গালে চিবুকে সামান্য দাড়িওয়ালা সর্দারকে দেখেই চিনল। বুঝল এরা আনগেভিনের সৈন্য। এরাই যুদ্ধে হেরে এসে জঙ্গলের মধ্যে পাথরের বাড়িটায় আশ্রয় নিয়েছে।

শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। সর্দারের কাছে গেল। বলল—তুমিই তো আলগেভিনের সৈন্যদের সর্দার?

—তাহলে চিনতে পেরেছো। সর্দার হেসে বলল।

—হ্যাঁ—কিন্তু আমাদের এভাবে বন্দী করা হচ্ছে কেন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—কারণ আমরা তোমাদের সাহায্য চাই। সর্দার বলল।

—একবার তো লড়াইয়ের সময় সাহায্য করেছি। আবার কীসের সাহায্য? শাঙ্কো বলল।

—আমরা আমাদের জাহাজটা পিটারের সৈন্যদের হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসবো। সর্দার বলল।

—আমরা আর তোমাদের সাহায্য করবো না। এসব তোমাদের সমস্যা। তোমরা নিজেরাই মিটিয়ে নাও। আমরা এখন দেশের দিকে জাহাজ চালাবো। শাঙ্কো ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল।

—না—আমাদের সঙ্গে যোগ দিন জাহাজ উদ্ধার করতে সাহায্য করতে। তারপর দেশে ফিরা যাবেন তার আগে নয়।

—আমরা তোমাদের সাহায্য করবো না। শাঙ্কো বলল।

—এটাই তোমাদের শেষ কথা? সর্দার বলল।

—হ্যাঁ—শাঙ্কো বলল।

—তাহলে তোমাদের বন্দী করে নিয়ে যাবো। আমাদের আস্তানায় তোমরা বন্দী থাকবে। সর্দার বলল।

—ঠিক আছে—আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে নিই।

—বেশ। কথা বলো।

ততক্ষণে যারা জাহাজের কেবিনঘরে ছিল তাদেরও বন্দী করে আনা হয়েছে। সবাই ডেক-এর ধারে ধারে দাঁড়িয়ে আছে। সর্দারের সৈন্যরা সবাইকে খোলা তরোয়াল হাতে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু মারিয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

শাঙ্কো বিস্কোকে ডাকল। বিস্কো কাছে এল। শাঙ্কো সর্দারের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সব বলল। তারপর বলল—এখন কী করা যায়?

—আনগেভিনের জন্যে আমরা যুদ্ধ করতে যাবো কেন? বিস্কো বলল।

—তাহলে কি আমরা বন্দী হয়েই থাকবো? শাঙ্কো বলল।

—তাই থাকবো। বিস্কো বলল।

শাঙ্কো সর্দারের কাছে ফিরে এল। বলল—আমরা বন্দী থাকবো।

—বেশ। সর্দার গলা চড়িয়ে বলল—সবাইকে হাত বেঁধে আমাদের আস্তানায় নিয়ে চলো।

—সবাইকে নয়। আমাদের দেশের রাজকুমারীকে এই জাহাজেই রাখতে হবে। বিস্কো বলল।

—না—সর্দার গলা চড়িয়ে বলল—সবাইকে আমাদের আস্তানায় বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

মারিয়া শাঙ্কোর কাছে এল। বলল—আমাকে নিয়ে ভেবো না। আমি অনায়াসেই ওখানে থাকতে পারবো।

—বেশ। শাঙ্কো বলল।

তখন ভোর হয়েছে। জঙ্গলের পাখিগুলো ডাকতে শুরু করেছে। রোদ পড়ল সমুদ্রে জঙ্গলের মাথায়।

সর্দারের সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের জাহাজের মালখানা থেকে দড়ি জোগাড় করল। ছোট ছোট করে দড়ি কেটে নিয়ে ভাইকিংদের হাত বাঁধলো। শুধু মারিয়ার হাত বাঁধা হল না।

সবাইকে তক্তার ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে তীরে আনা হল। ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সবাই চলল। সর্দারের সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিয়ে ভাইকিংদের নিয়ে চলল।

কিছুদূর এসে পায়েচলা পথটা দেখা গেল। সেই পথ দিয়ে উত্তরমুখে চলল

সবাই।

যেতে যেতে শাঙ্কো বলল—ঐ পাথরের বাড়িটায় দরজা জানালা নেই। ওদের হাত বেঁধে রাখা হবে। ভাববার কিছু নেই। ছোরা দিয়ে দড়ি কেটে মুক্ত হওয়া যাবে। তারপর ভাঙা দরজা দিয়ে পালানো যাবে। নিজেদের জাহাজে ফিরে আসা যাবে। কারণ তখন কোন পাহারাদার থাকবে না। আনগেভিনের সব সৈন্যই জাহাজ দখল করতে যাবে।

সবাই ভাঙা পাথরের বাড়ির সামনে এল। বাড়িতে ঢুকল সবাই। শাঙ্কো তখন বুঝল ও বাড়িটা ছোট ভেবেছিল। আসাল বাড়িটা বেশ বড়।

সর্দার শাঙ্কোদের নিয়ে এল একটা বেশ বড় ঘরের কাছে। শাঙ্কো দেখল ঘরটার কাঠের দরজা অটুট আছে। সর্দার দরজাটা খুলে দিল। শাঙ্কোদের ঢোকানো হল সেই ঘরটায়।

ঘরের ভেতর ঢুকে শাঙ্কো দেখল—ঘরটার কোন জানালা নেই। ওপরে ঘুলঘুলিমত। ওটা দিয়েই আলো হাওয়া আসছে।

শাঙ্কো হতাশ হল। এখান থেকে কী করে পালাবো? শাঙ্কো এবার বুঝতে পারল ফ্রান্সিস আর হ্যারি কাছে না থাকলে ওরা কতটা অসহায়।

বিছানা বলতে শুক্‌নো ঘাসপাতা মেঝেটায় বিছোনো। ভাইকিংরা কেউ বসল কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। রাতের ঘুমটা হয় নি। এখন ঘুমোনো যাবে।

কিছুক্ষণ পরে ঘরটার দরজা খুলে গেল। সর্দার ঢুকল। হেসে বলল—এখানকার এক মস্তবড় জমিদারের প্রাসাদ ছিল এটা। কোন প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে গেলে খাজনা না দিতে পারলে এই ঘরে তাদের বন্দী করে রাখা হত। এটাকে কয়েদঘরও বলতে পারো।

—এসব শুনে আমাদের লাভ? বিস্কো বলল।

—লাভ এই যে তোমরা এমন একটা ঘর থেকে কোনদিনই পালাতে পারবে না—এটা জানানোর জন্যেই এত কথা বলা। সর্দার বলল।

—ঠিক আছে। আমাদের সকালের খাবারের ব্যবস্থা কর। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ সকালের খাবার তৈরি হচ্ছে। তোমাদের জাহাজ থেকে আটা ময়দা এসব আনা হয়েছে। একটু পরেই খেতে দেওয়া হবে। সর্দার বলল।

সর্দার এবার বলল—আমাদের জাহাজ উদ্ধারের কাজে তোমরা সাহায্য করতে পারতে। এই বন্দী দশা তোমরা ইচ্ছে করেই মেনে নিলে।

—ঠিক তাই—তোমাদের আমরা কোনমতেই সাহায্য করবো না। তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমরা বন্ধুকে হারিয়েছি। আর না। শাঙ্কো বলল।

সর্দার আর কোন কথা না বলে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সকালের খাবার দেওয়া হল। পোড়া পোড়া রুটি আর আনাজের ঝোল। শাঙ্কোরা তাই খেতে লাগল।

দু'জন সৈন্য একটা জলের পীপে এনে ঘরের কোনায় রাখল। খাবার খেয়ে জল খেল সবাই। সৈন্যরা চলে গেল। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

মারিয়া ঘরের এক কোনে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল। এবার একটু গলা চড়িয়ে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো তাড়াতাড়ি মারিয়ার কাছে এল। বলল—রাজকুমারী আপনার কি কষ্ট হচ্ছে।

—না—আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না—মারিয়া বলল—আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না।

—কিছু বলবেন? শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ মারিয়া বলতে লাগল—এই আনগেভিনের সৈন্যদের সঙ্গে জাহাজ উদ্ধারে সাহায্য করার জন্যে তুমি যেতে রাজি হলে না কেন?

—এই সৈন্যদের সর্দারকে বিশ্বাস করলে আমাদের বিপদই বাড়তো শুধু। ওদের যুদ্ধ জাহাজ দখল হলে ওরা প্রথমেই আমাদের হত্যা করতো। কারণ ওদের কাছে তখন আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। শাঙ্কো বলল।

—সেটা আমিও ভেবেছি। সেক্ষেত্রে লড়াই শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে সমুদ্রের পারে উঠবে। তারপর হেঁটে আমাদের জাহাজে গিয়ে উঠবে। মারিয়া বলল। একটু ভেবে নিয়ে শাঙ্কো বলল—আমরা লড়াইয়ে নামলে আবার হয়তো বন্ধুদের কাউকে না কাউকে হারাবো।

—জানি সেটা হতে পারে। কিন্তু যদি তোমরা আত্মরক্ষামূলক লড়াই কর তাহলে আহত হওয়ার সম্ভাবনা কম। ওদিকে রাজা পিটারের পাহারাদার সৈন্য বেশি থাকবে না। জাহাজ পাহারার কাজে অল্প সৈন্যই থাকবে। তাদের হারিয়ে দেওয়া খুবই সহজ হবে। আনগেভিনের সৈন্যরা থাকবে তোমরা থাকবে—লড়াইয়ে জেতা কঠিন হবে না। মারিয়া বলল।

—তাহলে এখন আমরা কী করবো? বিস্কো বলল।

—সর্দারকে ডেকে বল—আমরা তোমাদের সাহায্য করতে রাজি আছি।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। একটু গলা চড়িয়ে বলল— ভাইসব—আনগেভিনের সর্দার আমাদের সাহায্য চেয়েছে—আমরা সর্দারকে সাহায্য করবো। ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। একজন ভাইকিং বলল—শাঙ্কো হঠাৎ মত পালটালে কেন?

—অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম—এখন এটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। শাঙ্কো বলল।

—রাজকুমারী এই প্রস্তাবটা দিয়েছেন। বিস্কো বলল।

গুঞ্জন থেমে গেল। রাজকুমারী বলেছেন। কাজেই মেনে নিতেই হবে। আর কেউ কোন কথা বলল না।

শাঙ্কো উঠে দরজার কাছে এল। আঙ্গুল ঠুকে দরজায় শব্দ করল। শাঙ্কো বলল,

তোমাদের সর্দারকে একবার আসতে বলো। খুব দরকার। দরজা বন্ধ হল।

কিছুক্ষণ পরেই সর্দার দরজা দিয়ে ঢুকল। শাঙ্কোদের কাছে এসে দাঁড়াল। হেসে বলল—তোমরা কী বলতে চাও?

—আমরা আমাদের আগেকার মত পাল্টেছি। আমরা জাহাজ উদ্ধারের কাজে তোমাদের সাহায্য করবো। শাঙ্কো বলল।

—এই তো একটা কাজের মত কাজ। তোমরা দুঃসাহসী তোমরা সঙ্গে থাকলে আমরা লড়াইয়ে জিতবই। সর্দার বলল।

—কিন্তু শর্ত রইল—লড়াই শেষ হলেই আমরা আমাদের জাহাজে ফিরে আসবো। শাঙ্কো বলল।

—বেশ। এতে আমার কোন আপত্তি নেই। সর্দার বলল।

—তোমরা জাহাজ উদ্ধার করতে কবে যাবে? বিস্কো জানতে চাইল।

—আজ রাতেই। সময় মত তোমাদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হবে।

—কিন্তু আমাদের অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে আমাদের জাহাজে। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। তোমাদের মধ্যে কয়েকজন যাও। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসো।

—তোমরা কীভাবে জাহাজ দখল করতে চাও? শাঙ্কো বলল।

—তোমাদের জাহাজটা নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু ভেবে দেখলাম জাহাজ নিয়ে গেলে ওরা সাবধান হয়ে যাবে। আমরা সমুদ্রের জলে সাঁতার কেটে যাবো। সর্দার বলল।

—তাহলে শিরস্ত্রাণ বর্ম পরে যাওয়া যাবে না। শাঙ্কো বলল।

—কেন বলো তো? সর্দার বলল।

—জলে অত ভারি জিনিস পরে সাঁতার কাটতে অসুবিধে হবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বো। শত্রুপক্ষের জাহাজে উঠে লড়াই করবো কী করে? কাজেই শুধু তরোয়াল নিয়ে আমরা যাবো। শাঙ্কো বলল।

—ঠিকই বলেছো। একটুক্ষণ ভেবে সর্দার বলল।

—আমরা তৈরি থাকবো। তুমি ডাকলেই রওনা হবো। তবে আগে আমাদের রাজকুমারীকে আমাদের জাহাজে পৌঁছে দাও। দু'জন বন্ধু সঙ্গে যাবে। তারা তিনজনেই আমাদের জাহাজে থাকবে। শাঙ্কো বলল।

—বেশ। তাহলে তৈরি থেকো। সর্দার বলল। তারপর একজন পাহারাওয়ালাকে হাতের ইশারায় ডেকে বলল—এদের ভালো ঘরটায় নিয়ে যাও। তারপর রাজকুমারী আর দু'জন বন্ধুকে তাদের জাহাজে রেখে এসো।

—বেশ। পাহারাদার শাঙ্কোদের দিকে এসে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—সবাই ওঠো। তোমাদের অন্য ঘরে যেতে হবে। সর্দার তখন চলে গেছে।

ভাইকিংরা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। পাহারাদার বলল—রাজকুমারী, এদিকে আসুন। মারিয়া এগিয়ে এল। পাহারাদার বলল—যে দু'জন রাজকুমারীর সঙ্গে

জাহাজে যাবে সেই দু'জনও এগিয়ে এসো। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—বিস্কো আর পেড্রো এগিয়ে এসো।

বিস্কো এগিয়ে এসে বলল—না শাঙ্কো—আমি লড়াইয়ে যাবো।

—পাগলামি করো না বিস্কো। তুমি রাজকুমারীর কাছে আমাদের জাহাজে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত মনে লড়াইয়ে যেতে পারবো। বিস্কো ভুলে যেও না আমরা এখনও বন্দী। বিস্কো আর কোন কথা বলল না। পেড্রো এগিয়ে এল। বিস্কোকে বলল—বিস্কো—রাজকুমারীকে ডাকো।

মারিয়াকে আর ডাকতে হল না। মারিয়া বিস্কোর কাছে এসে বলল—চলো।

বিস্কো মারিয়া আর পেড্রোকে নিয়ে কয়েদঘরের বাইরে এল। সেই পাহারাদারটি দাঁড়িয়ে ছিল। পাহারাদার ওদের দেখে হাঁটতে শুরু করল। মারিয়া বিস্কো পেড্রো পাহারাদারের পেছনে পেছনে চলল।

তখন দুপুর হয়েছে। পাহারাদার মারিয়াদের নিয়ে পায়েচলা পথটা ধরল। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে চলল।

একসময় পাহারাদার ডানদিকে ঘুরল। এখানে সেই পায়েচলা পথটা নেই। ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ওরা চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা খাঁড়িটার সামনে এল। দেখল ওদের জাহাজটা শান্ত ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলছে।

পাটাতন পাতাই ছিল। মারিয়ারা পাটাতনের ওপর দিয়ে গিয়ে জাহাজে উঠল। পাহারাদারটি চলে গেল। ঝোপঝাড় গাছের মধ্যে ওকে আর দেখা গেল না।

মারিয়া জাহাজে উঠেই বলল—বিস্কো—আগে খাবারদাবারের ব্যবস্থা কর। খিদেয় পেট জ্বলছে। পেড্রো বলল—রাজকুমারী আপনি শুয়ে বসে বিশ্রাম করুন। আমিই রান্না চাপাচ্ছি।

—তুমি পারবে? মারিয়া বলল।

—আমার বেশির ভাগ সময়ই তো কাটে মাস্তুলের মাথায়। তবু একবার গন্ধ পেলে আমি ঠিক বলে দেব আজকে কী রান্না হচ্ছে। পেড্রো বলল।

—তাই নাকি? মারিয়া এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও পেড্রোর এই গুণ শুনে হেসে ফেলল। পেড্রো হেসে বলল—রাজকুমারী আপনি যখন হাসি হাসলে আমরা যে কি খুশি হই তা বলে বোঝাতে পারবো না। কিন্তু আপনার বিষণ্ণ চিন্তাকুল মুখ দেখলে আমরা সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাই। কথাটা শুনে মারিয়া আবার হাসল।

—আপনি আপনার কেবিনঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। কথাটা বলে পেড্রো চলল রসুইঘরের দিকে।

ওদিকে ভালো ঘরটায় এসে শাঙ্কোরা দেখল ঘরে শুকনো ঘাসপাতা দড়ি দিয়ে নিপুণভাবে বেঁধে বিছানামত করা হয়েছে। তাতেই সৈন্যরা শুয়ে বসে আছে। ঘরটা বেশ বড়। ওপরে ছাদটা এখনও ভেঙে পড়েনি। অনেক খোলামেলা ঘর।

শাঙ্কোরা জায়গা করে নিয়ে বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল।

এখন কিছুই করার নেই। শুধু রাতের জন্যে প্রতীক্ষা।

রাত হল। রাতের খাওয়া তাড়াতাড়িই দেওয়া হল। এঘরে আসার সময় দু'জন পাহারাদার শাঙ্কোদের হাতে বাঁধা দড়ি কেটে দিয়েছিল। খোলা হাতেই শাঙ্কোরা রাতের খাবার খেয়ে নিল। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল। সর্দারের সৈন্যরা শাঙ্কোরা সবাই একে একে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমুলো না কেউ।

রাত গভীর হল।

তখনই সর্দার এল। সবাই উঠে দাঁড়াল। সবাই সর্দারের নির্দেশে অস্ত্রঘরে চলল। সবাই তরোয়াল নিয়ে কোমরে গুঁজল। কাউকে বর্ম শিরস্ত্রাণ পরতে দেওয়া হল না। পাথরের বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল সবাই। পায়েচলা পথটা ধরে চলল।

চাঁদের আলো উজ্জ্বল নয়। বনজঙ্গলের মাথার ফাঁক দিয়ে জ্যোছনা পড়েছে এখানে ওখানে। সমুদ্রের দিক থেকে জোর হাওয়া আসছে। হাঁটতে হাঁটতে শাঙ্কো ওদের দেশীয় ভাষায় গলা চড়িয়ে বলল—এ লড়াই আমাদের লড়াই নয়। পাকেচক্রে এই লড়াইয়ে আমরা জড়িয়ে গেছি। আমরা কাউকে আগ বাড়িয়ে হত্যা করবো না। তবে জীবন বিপন্ন হলে আত্মরক্ষার জন্যে হত্যা করতেই হবে। আমরা যথাসাধ্য সাবধানে লড়াই করবো যাতে আমরা অক্ষত থাকতে পারি। অপরপক্ষ আমাদের শত্রু নয়। কাজেই জীবন বিপন্ন করে আমরা লড়তে যাবো কেন? আমাদের প্রথম এবং শেষ কথা—আত্মরক্ষা। শাঙ্কোর কথা বুঝতে না পেরে সর্দার বলল—তোমার বন্ধুদের কী বললে?

—এই—কীভাবে লড়তে হবে। শত্রুপক্ষ বর্ম শিরস্ত্রাণ পরে লড়াই করবে। কাজেই সাবধানে লড়াই করতে হবে। এসব শাঙ্কো বলল।

—সে তো ঠিকই। সর্দার বলল।

সর্দারের সঙ্গে কথা হল না আর। সবাই নিশ্চুপ হেঁটে চলেছে ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে।

সমুদ্রের দিক থেকে জোর হাওয়া বইছে। সমুদ্রের শব্দ আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল।

একসময় সমুদ্রের তীরে পৌঁছল সবাই। অল্প জ্যোছনায় দেখল আনগেভিনের জাহাজটা বেশ দূরে সমুদ্রের জলে ভাসছে। কখনও কখনও কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে জাহাজটা।

সর্দার বলল—আমরা সমুদ্রের ধারে ধারে আরো কিছুদূর যাবো। যতটা সম্ভব জাহাজটার কাছাকাছি যাবো। তারপর জলে নেমে সাঁতরে গিয়ে জাহাজে উঠব।

এখানে সমুদ্রের সৈকতে ছোট মাপের বালিয়াড়ি অনেক দূর চলে গেছে। সবাই উঁচু তীর থেকে বালিয়াড়িতে নেমে এল। চলল বালিয়াড়ি দিয়ে।

কারো মুখে কথা নেই। একটানা সমুদ্রের বাতাস শোঁ শোঁ শব্দ তুলে ছুটে

আসছে।

একসময় ওরা জাহাজটার কাছাকাছি এল। —সাঁতরে গিয়ে জাহাজে উঠতে হবে। সর্দার বলল—কোন শব্দ যেন না হয়।

সর্দারের সৈন্যরা ভাইকিংরা জলে নামল। জলে কোনরকম শব্দ না তুলে সবাই সাঁতরে চলল জাহাজটার দিকে।

দূরত্বটা খুব কম নয়। সর্দারের সৈন্যরা হাঁপিয়ে গেল। ভাইকিংরা সমুদ্রের সঙ্গে আজন্ম পরিচিত। সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটা ওদের ছোটবেলা থেকে অভ্যেস।

কয়েকটা নীলচে কুয়াশার আস্তরণ পার হয়ে শাঙ্কোরা সবার আগে জাহাজের কাছে পৌঁছল। দেখল—কেবিনে জানলার সিঁড়ির মাথায় একটা কাচে ঢাকা লণ্ঠন। জাহাজের আর কোথাও আলো নেই।

এবার জাহাজে উঠল। শাঙ্কো জাহাজের হালের কাছে এল। দেখল কিছু দড়িদড়া ঝুলছে। শাঙ্কো হালের খাঁজে পা রেখে উঠে পড়ল। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় শাঙ্কো হাত দিয়ে ঝুলন্ত দড়িদড়া দেখাল।

এবার সবাই দড়ি ধরে ধরে জাহাজে উঠে পড়তে লাগল। হালের দিক থেকে সবাই ডেক-এর কাছে এল। দেখল পনেরো কুড়িজন রাজা পিটারের সৈন্য ডেক-এ ঘুমিয়ে আছে।

সর্দার দু'তিনজন সৈন্যকে কানের কাছে বলল—সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামো। অস্ত্রঘরের সামনে গিয়ে পাহারা দাও যাতে কেউ অস্ত্র আনতে না পারে। সৈন্য ক'জন চলে গেল।

বোঝা গেল—এই জাহাজে বেশি পাহারাদার সৈন্য রাখা হয় নি।

সর্দার হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করে বলে উঠল—সব কটাকে হত্যা কর। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ওদের দেশীয় ভাষায় বলে উঠল—কাউকে হত্যা করো না। জলে ছুঁড়ে ফেল।

রাজা পিটারের সৈন্যদের ঘুম ভেঙে গেল। ডেক-এ যারা ঘুমিয়েছিল তারা ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়াল। নিরস্ত্র তাদের ওপর সর্দারের সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজা পিটারের নিরস্ত্র সৈন্যরা অসহায় অবস্থায় মারা যেতে লাগল। আর্ত চিৎকার গোঙানি শোনা যেতে লাগল।

শাঙ্কোরা ধরে ধরে কয়েকজন সৈন্যকে জলে ছুঁড়ে ফেলল।

রাজা পিটারের সৈন্যদের কয়েকজন সিঁড়ি বেয়ে অস্ত্রঘরের কাছে ছুটে এল। দেখল—সর্দারের সৈন্যরা অস্ত্রাগার পাহারা দিচ্ছে খোলা তরোয়াল হাতে। ওরা বুঝল যে প্রাণ সংশয়। তাড়াতাড়ি ওপরে ডেক-এ উঠে এল। ততক্ষণে কেবিনঘর থেকে রাজা পিটারের সৈন্যরা ডেক-এ উঠে এল। উঠেই পড়ল আক্রমণের মুখে। সর্দারের সৈন্যরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এলোপাথারি তরোয়াল চালাতে লাগল। রাজা পিটারের সৈন্যরা অসহায় অবস্থায় মারা যেতে লাগল।



ওদিকে ভাইকিংরা রাজা পিটারের নিরস্ত্র সৈন্যদের ধরে ধরে জলে নিক্ষেপ করতে লাগল। যুদ্ধটা হল এক তরফা। নিরস্ত্র সৈন্যদের সঙ্গে সশস্ত্র সৈন্যদের লড়াই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজা পিটারের সৈন্যরা হার স্বীকার করল। ওরা দু'হাত ওপরে তুলে ডেক-এর একপাশে দাঁড়াল।

সর্দার চিৎকার করে বলে উঠল—এই ক'টাকেও হত্যা কর। রাজা পিটারের সৈন্যদের মুখ শুকিয়ে গেল। ওরা বুঝল—আর বাঁচার আশা নেই।

তখনই শাঙ্কো এক লাফে রাজা পিটারের সৈন্যদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সর্দারের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাদের নিষ্ঠুরতার নমুনা দেখেছি। এখন এই সৈন্যরা যারা আত্মসমর্পণ করেছে তাদের হত্যা করতে চাও। আমরা তা হতে দেব না। যদি রাজা পিটারের নিরস্ত্র সৈন্যদের আক্রমণ করো তবে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবো। সাহস থাকে এগিয়ে এসো।

সর্দার বুঝল—আবার এক লড়াইয়ে নামতে হবে। তাতে বিপদই বাড়বে। জাহাজ দখল করতেই ওরা এসেছিল সেটা তো হয়ে গেছে। সর্দার বলল—ঠিক আছে এদের কয়েদঘরে নিয়ে রাখো।

সর্দারের সৈন্যরা এগিয়ে এল। রাজা পিটারের সৈন্যদের ঘিরে দাঁড়াল। তারপর নিয়ে চলল নিচে নামার সিঁড়ির দিকে। রাজা পিটারের যে সৈন্যরা বেঁচেছিল তাদের সবাইকে কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হল।

এবার সর্দার আস্তে আস্তে শাঙ্কোদের কাছে এল। দেখে বলল—তোমরা এই জাহাজেই থাকবে। আরো কিছু লোক জোগাড় করে সৈন্যসংখ্যা বাড়াবো। তারপর সেন্ট অ্যাঞ্জেলা দুর্গ অধিকার করবো। আনগেভিনকে মুক্ত করবো। তোমরা আমাদের হয়ে লড়াই করবে।

—যদি লড়াই না করি? শাঙ্কো বলল।

—তাহলে তোমাদের কয়েদঘরে আটকে রাখা হবে। সর্দার বলল।

শাঙ্কো, সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে ওদের দেশের ভাষায় বলে উঠল—ভাইসব—জলে ঝাঁপিয়ে পড়ো। জলদি।

ভাইকিংরা সঙ্গে সঙ্গে কোমরে তরোয়াল গুঁজে রেলিঙ ডিঙিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। সবশেষে দলে শাঙ্কো ছিল। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—তীরের দিকে চলো। জাহাজের সর্দার আর সৈন্যরা বোকার মত তাকিয়ে রইল।

শাঙ্কো সাঁতার কাটতে লাগল। তখনই সূর্য উঠল। গাঢ় কমলা রং সূর্যের। সমুদ্রের ঢেউ-ওঠা জলে সূর্য প্রথমেই সবটা উঠল না। নিচের দিকে একটা ফোঁটামত জলের মধ্যে আটকে রইল। একটু পরে সেটা ওপরে উঠে সূর্যের সঙ্গে মিশে গেল।

শাঙ্কোরা সাঁতরে চলল তীরের দিকে।

সমুদ্রতীরে যখন শাঙ্কোরা পৌঁছল তখন সবাই হাঁপাচ্ছে। জল থেকে উঠে অপরিসর সৈকতে এসে দাঁড়াল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—এবার আমাদের জাহাজের দিকে চলো।

অপরিসর সৈকতভূমি দিয়ে শাঙ্কোরা হেঁটে চলল। কিছুটা গেল। আর সৈকতভূমি নেই। শাঙ্কোরা তীরে উঠল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ওরা ওদের জাহাজের দিকে লক্ষ্য রেখে চলল।

একসময় শাঙ্কোরা ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে ওদের জাহাজের কাছে এল। পাতা পাটাতন দিয়ে হেঁটে গিয়ে জাহাজে উঠল।

মারিয়া আর বিস্কো ছুটে এল। পেছনে পেড্রো। সবাই ধ্বনি তুলল-ও-হো-হো।

শাঙ্কোরা কেবিনঘরে চলে গেল। ভেজা পোশাক ছাড়তে।

শুকনো পোশাক পরে শাঙ্কো ডেক-এ উঠে এল। মারিয়া এগিয়ে এল। বলল—এখন কী করবে?

—আমরা জাহাজটা চালিয়ে খাঁড়ির আরো ভেতরে চলে যাব। জাহাজ লুকিয়ে রাখবো। তারপর ফ্রান্সিসদের জন্যে অপেক্ষা করবো।

শাঙ্কো সবাইর দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল—সবাই হাত লাগাও। পাল তুলে দাও। দাঁড়ঘরে দাঁড় টানতে যাও। আমরা এই খাঁড়ির আরো ভেতরে চলে যাবো যাতে আমাদের জাহাজ কারো নজরে না পড়ে।

পাল তোলা হল। দাঁড় বাওয়া চলল। জাহাজ খাঁড়ির আরো ভেতরে ভেসে চলল।

একসময় খাঁড়ির দু'ধারের গভীর বনের গাছপালা দু'পাশ থেকে ঝুঁকে পড়েছে দেখা গেল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে পেড্রোকে বলল—পেড্রো মাস্তুলে উঠে দেখ তো জাহাজটা বনজঙ্গলের আড়ালে পড়েছে কি না।

পেড্রো দ্রুত মাস্তুল বেয়ে একেবারে মাথায় উঠে গেল। চারপাশ দেখে নেমে এল। একটু হাঁপিয়ে বলল—আমাদের জাহাজটা দু'পাশের জঙ্গলে একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে। কারো নজরে পড়বে না।

জাহাজটা ওখানেই নোঙর ফেলল। এবার ফ্রান্সিসদের জন্যে প্রতীক্ষা।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি ফিরে এলেই জাহাজ ছাড়া হবে ওদের দেশের দিকে।

এখন শুধুই প্রতীক্ষা। এখন আলগেভিন আর রাজা পিটারের সৈন্যরা ওদের খোঁজ পাবে না।

ওদিকে গির্জাটা ভালো করে দেখে ফ্রান্সিস হ্যারি সাজ্জিও গির্জার বাইরে এল। সাজ্জিও বললেন—রাজা পিটার আমাদের চার্লসের প্রাসাদেই থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

—ভালোই হয়েছে। এতে আমাদের খোঁজাখুঁজির কাজ ভালোভাবেই চলবে। ফ্রান্সিস বলল।

তিনদিন কেটে গেল। ফ্রান্সিসরা চার্লসের প্রাসাদেই রইল। অঢেল সুস্বাদু খাবার। বড় পালকের শয্যায় শোয়া। ফ্রান্সিসদের সময় ভালোভাবেই কাটতে লাগল। কিন্তু ফ্রান্সিসের নজর নেই এইসব বিলাসবহুল জীবনের প্রতি। ও সর্বক্ষণ নিজের চিন্তায় বিভোর। ওর দৃঢ় বিশ্বাস চার্লস কোথাও না কোথাও গুপ্ত ধনসম্পদের সূত্র রেখে গেছেন। ওরা সেই সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না। ফ্রান্সিস প্রাসাদের সর্বত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। কিন্তু সূত্র হিসেবে কাজে লাগে এমন কিছুই খুঁজে পেল না।

গ্রন্থাগারের প্রাচীন গ্রন্থগুলো শুধু—পাতা উল্টে-ই দেখল ফ্রান্সিস। গ্রীক আরবী ভাষায় লেখা সেসব গ্রন্থ ও কী বুঝবে। শুধু প্রাচীন গ্রীক ভাষায় লেখা বাইবেলটার পাতা উল্টে ভালো করে দেখেছে—অনেক জায়গায় দাগ দেওয়া। বোঝাই যাচ্ছে—চার্লস খুব মনোযোগ দিয়ে বাইবেল পড়েছেন। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে অনেকে মনে শান্তি পান। হয়তো চার্লসও মনের শান্তি পেয়েছেন। সাজ্জিও চার্লসের শেষ দিককার জীবনের কথা বলেছেন। গির্জায় প্রার্থনা করেই সময় কাটতো তাঁর। নিশ্চয়ই যীশুর বাণীর মধ্যে তিনি সান্ত্বনা পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। পালিতা কন্যার মৃত্যুর পর তাঁর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল।

গির্জাটায় ফ্রান্সিস হ্যারি ঘুরে বেড়িয়ে দেখছিল। গির্জাটার পাথুরে দেওয়ালে কোথাও কোথাও কুঁদে কুঁদে ফুল পাতা পাখির ছবি তোলা হয়েছে। সবচেয়ে জমকালো সুন্দর কাঠের বেদীটা। ঐ বেদীতেই বসানো যীশুর মূর্তি। বেদীতে সূক্ষ্ম নক্‌শার কাজ।

ফ্রান্সিস কাঠ কুঁদে তোলা বেদীর নক্‌শাগুলো ভালো করে দেখছিল। সাধারণ নক্‌শা যেমন হয়। ফুল পাতা পাখি লতাগাছ। দেখতে দেখতে সেই লেখাটায় চোখ পড়ল। বাইবেল থেকে উধৃতি। সাজ্জিও পড়ে অর্থটা বলেছিলেন। বড় গভীর অর্থ উপদেশটির। ডানদিকেও আর একটি উধৃতি। উধৃতি দুটো দেখতে দেখতে হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে হল উধৃতি দু'টোর মাঝখানে লতাফুল পাতা দিয়ে যেন দু'টো চোখ খোদাই করা হয়েছে। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে কাছে গিয়ে দেখল সত্যিই একজোড়া চোখ। ফ্রান্সিস আঙ্গুল দিয়ে জায়গাটা দেখাল। হ্যারিও মুখ নিচু করে কাছ থেকে ভালো করে দেখে বলল—ফ্রান্সিস তোমার অনুমান ঠিক। একজোড়া চোখ খোদাই করা হয়েছে। এমনিতে দেখলে ফুল পাতালতা মনে হবে। ভালো করে দেখলে তবেই বোঝা যাবে।

ফ্রান্সিস বলল—দাঁড়াও—সাজ্জিওকে ডেকে আনি। ফ্রান্সিস চলে গেল। একটু পরে সাজ্জিওকে নিয়ে ফিরে এল।

সাজ্জিও বেদীর কাছে আসতে আসতে বলল—

—আপনারা ভুল দেখেছেন। আমি অনেকদিন এই নকশাগুলো দেখেছি। একজোড়া চোখ আমি কোনদিন দেখিনি।

—তবু—আজকে এই জায়গাটা ভালো করে দেখুন। বলে ফ্রান্সিস আঙ্গুল দিয়ে

সেই জায়গাটা দেখাল। সাজ্জিও খুব কাছে গিয়ে দেখতে দেখতে বলল— আশ্চর্য! সত্যিই একজোড়া চোখ খোদাই করা হয়েছে। কিন্তু এই চোখের সঙ্গে চার্লসের ধনসম্পদের সম্বন্ধ।

—নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ আছে—ফ্রান্সিস বলল—এবার আপনি বলুন তো এই সব কিছুই কি চার্লসের নির্দেশেই তৈরি হয়েছে?

—হ্যাঁ—চার্লসের তত্ত্বাবধানেই এই গির্জার সব কিছু নির্মিত হয়েছে। সাজ্জিও বললেন। ফ্রান্সিস বলল—এবার বলুন তো এই চোখ জোড়াকে কেন্দ্র করে কি কোন উধৃতি লেখা আছে। সাজ্জিও ভালো করে চোখ জোড়াটা দেখলেন। বললেন —না—কিছু লেখা নেই।

—ঠিক আছে—ফ্রান্সিস বলল—মানুষের চোখ নিয়ে বাইবেলে কোন বাণী আছে?

—থাকতে পারে বৈ কি। সাজ্জিও বললেন।

—তেমন কোন বাণী কি আপনার মনে আসছে? ফ্রান্সিস বলল। সাজ্জিও চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ চুপ করে বলে উঠলেন—একটি বাণী আছে।

—সেটা কী? ফ্রান্সিস জানতে চাইল। সাজ্জিও বললেন—বাণীটির অর্থ হল —"তোমার চোখই হল অন্তর আত্মার প্রদীপ। তোমার চোখের দৃষ্টি যদি নির্মল হয় তবে তোমার সমস্ত সত্তা দীপ্তিময় হবে।" সাজ্জিওর কথাটা শেষ হতেই ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলে উঠল—সাজ্জিও হ্যারি—এই বেদীর মধ্যেই আছে চার্লসের গুপ্ত ধনসম্পদ।

সাজ্জিও বলে উঠলেন—এটা আপনার কেন মনে হল?

—দেখুন সাজ্জিও—ফ্রান্সিস বলতে লাগল—আমার প্রথম থেকেই নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল—চার্লস প্রতিষ্ঠিত এই গির্জা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চার্লস তাঁর ধনসম্পদ গোপনে রেখেছেন। তিনি তার জন্যে এই গির্জাকেই বেছে নিয়েছেন। সূত্র রেখেছেন বাইবেলের তৃতীয় উধৃতির মধ্যে। সেটা তিনি এখানে লেখান নি। যাঁরা প্রকৃত যীশুভক্ত তাঁদের কারো না কারো নজরে এই চোখ দুটো পড়বেই। সঙ্গে সঙ্গে যীশুর উপদেশবাণীও মনে পড়বে। খোদাই করা জোড়া চোখের গুরুত্ব তিনি বুঝতে পারবেন। এতদিন সেটা কেউ বোঝেন নি। আজ আমরা বুঝলাম।

—তাহ'লে তো বেদী ভেঙে দেখতে হয়। সেটা সম্ভব নয়। রাজা পিটারও রাজি হবেন না। সাজ্জিও বললেন।

—বেদী ভাঙা হোক এটা চার্লসও চান নি। কাজেই তিনি সহজ পথটাই রেখেছেন।—এই খোদাই করা চোখ জোড়া। ফ্রান্সিস বলল। তারপর দুটো আঙ্গুল চোখ জোড়ায় রেখে একটু চাপ দিল। চোখ জোড়া খসে পড়ল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা চোখের ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাল। অন্ধকার। কিছুই নজরে পড়ছে না।

—কিছু দেখতে পাচ্ছেন? সাজ্জিও বললেন।

—অন্ধকারটা একটু সয়ে আসার সময় দিন। ফ্রান্সিস বলল।

সময় বয়ে চলল। ফ্রান্সিস তাকিয়েই আছে। আস্তে আস্তে ভেতরের অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতে ফ্রান্সিস আবছা একটা সোনার রত্নখচিত হারের অংশ দেখতে পেল। চোখ সরিয়ে ফ্রান্সিস বলে উঠল—সাজ্জিও—আমার অনুমান নির্ভুল। আপনি তাকিয়ে দেখুন। সাজ্জিও চোখের মত ফোকরটায় চোখ রাখলেন। অন্ধকারটা সয়ে আসতে তিনিও সেই রত্নখচিত হারের একাংশ দেখতে পেলেন। চোখ সরিয়ে এনে সাজ্জিও বললেন—ঠিক। রত্নখচিত সোনার হার। কিন্তু শুধু একটা হারই কি চার্লসের সব ধনসম্পদ।

—না—আরো আছে। এই কথা বলে ফ্রান্সিস দুটো চোখের ফোকরে আঙুল ঢুকিয়ে একটু টান দিতেই একটা লম্বাটে কাঠের অংশ উঠে এল। লম্বাটে ফোকর দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মনিমুক্তোখচিত সোনার অলঙ্কার সোনার চাকতি বেরিয়ে এসে গির্জার মেঝেয় পড়তে লাগল। সাজ্জিও এই দেখে হতবাক হয়ে সেই অলঙ্কার সোনার চাকতির দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটু পরে সম্বিত ফিরে পেয়ে ফ্রান্সিসকে বললেন—ফ্রান্সিস—আপনার অসাধারণ অনুমানশক্তির কী বলে প্রশংসা করবো বুঝতে পারছি না।

—ওসবের প্রয়োজন নেই। আপনি এখন এখানে পাহারায় থাকুন। আমরা যাচ্ছি। গাইদাকে দিয়ে রাজা পিটারের কাছে চার্লসের গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধারের কথা জানাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি আস্তে আস্তে গির্জার দরজার দিকে চলল। ওরাতো এরকম ধনসম্পদ উদ্ধার আগেও করেছে। ওরা অভ্যস্ত। তাই সাজ্জিওর মত ওরা আশ্চর্য হয়ে যায় নি।

চার্লসের প্রাসাদে এল দু'জনে। গাইদার ঘরে ঢুকে দেখল গাইদা কী লিখছে। হ্যারি বলল—গাইদা এখন সব কাজ রেখে একটা অত্যন্ত দরকারি কথা শুনুন। চার্লসের ধনসম্পদ উদ্ধার করা হয়েছে। কথাটা শুনে গাইদা হাঁ মুখ করে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—কী? বিশ্বাস হচ্ছে না?

—অ্যাঁ—না—না—মানে—গাইদা আর কথা বলতে পারল না।

—গির্জায় যান। নিজের চোখেই সব দেখুন। তারপর রাজা পিটারকে সংবাদ পাঠান। এখন এটাই আপনার কাজ। হ্যারি বলল।

গাইদা আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ছুটল ঘরের বাইরে। তারপর গির্জাটার দিকে।

গির্জায় ঢুকে দেখল বেদীর কাছে সাজ্জিও বোকার মত দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সামনে মেঝেয় পড়ে আছে বহু মূল্যবান কিছু অলঙ্কার সোনার চাকতি স্বর্ণমুদ্রা। গাইদা হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল। সাজ্জিও এবার বললেন—আপনি যান। প্রথমে কয়েকজন পাহারাদার সৈন্যকে এখানে পাঠান। তারপর মহামান্য রাজা

পিটারকে সংবাদ পাঠান যে চার্লসের ধনসম্পদ ফ্রান্সিস আবিষ্কার করেছেন। তিনি যেন যত শীঘ্র সম্ভব এখানে চলে আসেন।

তখন বিকেল। রাজা পিটার আর সেনাপতি মান্দো ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হলেন। সাজ্জিও গির্জার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাজা পিটার আর মান্দো ঘোড়া থেকে নামলেন। সাজ্জিও তাঁদের গীর্জার মধ্যে নিয়ে এলেন। সাজ্জিওর নির্দেশে পাহারাদার সৈন্যরা বেদীর ফোকর থেকে সব হীরে মুক্তো বসানো বহু মূল্যবান গয়নাগাটি সোনার মুদ্রা আর চাকতি বের করে বেদীর ওপর সাজিয়ে রেখেছিল।

রাজা পিটার বেদীর ওপর রাখা সব স্বর্ণসম্পদ অবাক চোখে দেখতে লাগলেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি চার্লসের স্বর্ণসম্পদ উদ্ধার করা যাবে।

সাজ্জিও তখন মৃদুস্বরে রাজা পিটারকে বুঝিয়ে বললেন—কী করে যীশুর একটা উপদেশকে ভিত্তি করে ফ্রান্সিস গুপ্ত স্বর্ণসম্পদ উদ্ধার করেছে। রাজা পিটার সেনাপতি মান্দোকে বললেন—যান—ফ্রান্সিসকে ডেকে আনুন।

একটু পরে হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস এল। রাজা পিটার হেসে ফ্রান্সিসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফ্রান্সিস হেসে রাজা পিটারের হাত ধরলেন। রাজা পিটার বললেন—তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কী বলে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো ভেবে পাচ্ছি না।

—তার দরকার নেই মহামান্য রাজা—হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এর আগেও অনেক গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করেছে।

—তোমরা চিন্তা করে পরিশ্রম করে এই স্বর্ণসম্পদ উদ্ধার করেছো। গুপ্ত ধনভাণ্ডারের কিছু অংশ তো তোমাদের প্রাপ্য হয়। রাজা পিটার বললেন।

—একটি স্বর্ণমুদ্রাও আমরা নেব না। এই ধনসম্পদ আপনার দেশের মানুষের। ফ্রান্সিস বলল।

—তবু বলো—তোমরা কী চাও? রাজা পিটার বললেন। —আমি আমার বন্ধুদের মুক্তি চাই। ফ্রান্সিস বলল। রাজা হেসে বললেন—তোমার অনুরোধের আগেই তোমার বন্ধুরা নিজেরাই দুর্গের দেয়াল ডিঙিয়ে পালিয়েছে।

—সে কি! কেউ মারা যায় নি তো? হ্যারি বলল। রাজা পিটার সেনাপতি মান্দোকে বললেন—আর সব খবর মান্দো বলবেন। মান্দো বলল—আপনার বন্ধুরা গভীর রাতে দুর্গ থেকে পালিয়েছে। এই সংবাদ আমরা ভোরবেলা পেয়েছিলাম। ধরেই নিয়েছিলাম সবাই নিশ্চয়ই আপনাদের জাহাজেই আশ্রয় নিয়েছে। আমরা সমুদ্রতীরে ছুটে গেলাম। কিন্তু কোথাও আপনাদের জাহাজের চিহ্নমাত্র নেই। আপনার বন্ধুরা আমাদের পাহারাদারদের সঙ্গে লড়াই করে নি। সবাইকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কাজেই তাদের মারা যাওয়া বা আহত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হল যে শাঙ্কোরা পালিয়েছে। বুদ্ধিমানের মত কোন লড়াইয়ে

নামে নি।

ফ্রান্সিস বলল—মাননীয় রাজা—আমরা ঠিক জানি আমাদের বন্ধুরা সমুদ্রের কাছাকাছি কোথাও আছে। ওরা অপেক্ষা করছে আমি চার্লসের স্বর্ণসম্পদ উদ্ধার করতে পেরেছি কিনা এটা জানতে।

—হতে পারে। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস বলল—আপনাদের সম্পদ তো উদ্ধার হল। আমরা এবার সেন্ট অ্যাঞ্জেলো দুর্গের দিকে যাবো। সমুদ্রতীরে খোঁজাখুঁজি করতে হবে।

হ্যারি বলল—মাননীয় রাজা আমাদের জন্যে যদি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন তাহ'লে খুবই উপকার হয়।

রাজা পিটার সেনাপতি মান্দোকে বললেন গাড়ির কথা।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি গির্জার দরজার দিকে চলল। সাজ্জিও ওদের পেছনে পেছনে এলেন। দরজার বাইরে আস্তে এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের হাত দুটো ধরলেন। বললেন—এত মূল্যবান সম্পদ উদ্ধার করলেন অথচ সম্পদের কিছুই দাবি করলেন না— এতে আমি অবাক হয়ে গেছি। মানুষ যখন যে ভাবে হোক ধনী হতে চায় আপনি তখন এত নির্লিপ্ত। এরকম মানুষ আমি দেখিনি। ফ্রান্সিস হেসে বলল—সাজ্জিও—আমি মুখ্খুসুখ্খু মানুষ। বাইবেল পড়ি নি। তবে কখনো সখনো বাইবেল পড়া শুনেছি। প্রভু যীশুর একটা উপদেশ আমার খুব ভালো লাগে।

—কোন উপদেশটা? সাজ্জিও বললেন।

—সেই উপদেশটা—সূচের ফুটো দিয়ে বরং উট চলে যাবে তবু ধনীরা স্বর্গে ঈশ্বরের রাজ্যে যেতে পারবে না।

—সাবাস ফ্রান্সিস—সাজ্জিও বলে উঠলেন—আপনি যীশুর উপদেশ নিজের জীবনেও মেনেছেন ঠিক চার্লসের মত।

—ঠিক। তাই আমার বরাবর মনে হয়েছে—চার্লসের স্বর্ণ সম্পদ রয়েছে তারই প্রতিষ্ঠিত এই গির্জার কোথাও। ফ্রান্সিস বলল। তারপর সাজ্জিওর হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল।

বেশ জমকালো একটা দুঘোড়ায় টানা গাড়ি এসে দাঁড়াল। বোঝাই যাচ্ছে—রাজপরিবারের গাড়ি।

গাড়িতে চড়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারি অ্যাঞ্জেলো দুর্গে যখন এসে পৌঁছল তখন বেশ রাত।

ওরা সেই রাতটা দুর্গেই কাটাল। দুর্গাধ্যক্ষ ওদের খুব আদর যত্ন করল। ততক্ষণে সারা মাল্টাই জেনে গেছে চার্লসের স্বর্ণসম্পদ উদ্ধারের কাহিনী আর ফ্রান্সিসের কথা।

পরদিন। নিজেদের ঘরেই তখন ফ্রান্সিস আর হ্যারি সকালের খাবার খাচ্ছে। গোল রুটি আর সব্জির ঝোল। তখনই একজন খ্রীস্টান সাধু দোরগোড়ায় এসে

দাঁড়াল। মুখে দাড়ি গোঁফ। সাধু বলল, 'আর্ত ক্ষুধার্ত, হ্যারি বলল—নিশ্চয়ই আসুন। যারা খাবার দিয়েছিল সেই সৈন্যদের হ্যারি আরো খাবার দিতে বলল।

তিনজনেই খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ হলে ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। বলল—হ্যারি এখন আমাদের জাহাজের খোঁজ পাবো কী করে।

—চলো—সমুদ্রতীরে যাই। খোঁজখবর করি। হ্যারি বলল।

—তাই চলো। ফ্রান্সিস উঠে বসে বলল। সাধুটি তখনও বসে আছে। ফ্রান্সিস বলল—তা সাধুবাবা—আপনার খাওয়া তো হয়েছে। এবার কী করবেন?

—আপনাদের নিয়ে যাবো। সাধু গম্ভীর মুখে বলল।

—কোথায়? হ্যারি বলল।

—আপনাদের জাহাজে। সাধু বলল একই ভঙ্গীতে।

—এ্যাঁ? হ্যারি তো চমকে উঠল। ফ্রান্সিসও। সাধুবাবা বলছে কি।

—আপনি কী করে আমাদের জাহাজের কথা জানলেন। হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—সেটা পরে জানবেন—সাধু বলল—যদি নিজেদের জাহাজে যেতে চান তাহলে এক্ষুনি আমার সঙ্গে চলুন।

—বেশ চলুন। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। হ্যারিও তৈরি।

—ঠিক তখনই দুর্গাধ্যক্ষ ঘরে ঢুকল। হেসে বলল—

—আপনাদের ঘুমুতে কোন অসুবিধা হয় নি তো?

—না না। ফ্রান্সিস বলল।

—সকালের খাবার খেয়েছেন তো? দুর্গাধ্যক্ষ বলল।

—হ্যাঁ। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ একটু বেড়াবোটেরাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন বাইরে যাবেন? দুর্গাধ্যক্ষ বলল।

—সঙ্গে লোক দেব? দুর্গাধ্যক্ষ বলল।

—না-না। ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারি বলল চলো। এবার সাধুকে দেখিয়ে হ্যারি দুর্গাধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করল—

—ইনি কে?

—তা তো জানি না। উনি গত কয়েকদিন ধরেই এখানে সকালে সন্ধ্যেয় আসছেন। খেয়েটেয়ে চলে যান। দুর্গাধ্যক্ষ বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারি আর কোন কথা বলল না। দুর্গের বাইরে চলে এল। পেছনে সেই সাধু। সাধুকে হ্যারি জিজ্ঞেস করল এবার কোন দিকে যাবো? সাধু হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল। আরে? এতো বিস্কোর গলা। বিস্কো নিজেই আবার গোঁফ দাড়ি-টান দিয়ে খুলে ফেলল। ফ্রান্সিসকে হ্যারিকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস হাসতে হাসতে বলল—এই সাধুর বেশ নিয়েছিলে কেন? বিস্কো বলল—প্রতিদিন দুবেলা দুর্গে

আসতাম তোমাদের খোঁজ নিতে। খোঁজ মানে তোমাদের কথা কাউকে জিজ্ঞেস করতাম না। শুধু দুর্গের ভিতরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। সাধুর বেশে। কাজেই কেউ কিছু বলতো না।

—আর আমাদের ভয় নেই। ফ্রান্সিস চার্লসের স্বর্ণসম্পদ উদ্ধার করেছে। হ্যারি বলল।

—তাই দুর্গাধ্যক্ষের এত আদর আপ্যায়নের ঘটা। বিস্কো বলল।

—কেন? তোমরা এই খবর পাও নি? ফ্রান্সিস বলল।

—না তাই তো এই বেশ ধরে আসতাম। বিস্কো বলল।

এবার বিস্কো ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে নিয়ে একটা বনভূমিতে ঢুকল। বেশ ঘন বন। গাছগাছালির জটলা। তারই মধ্যে দিয়ে ওরা চলল।

বনের শেষে দেখল সমুদ্রের খাঁড়ি। ওদের জাহাজে সেই খাঁড়িতে ভাসছে। তীর থেকেই বিস্কো চিৎকার করতে লাগল—ভাইসব—ফ্রান্সিস, হ্যারি ফিরে এসেছে। ফ্রান্সিস চার্লসের গুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করেছে। রাজা পিটার আর আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।

বিস্কোর চিৎকার করে কথা বলা জাহাজের বন্ধুরা শুনল। সবাই এসে ভীড় করে দাঁড়াল রেলিঙ ধরে। তার মধ্যে মারিয়াও আছে।

জাহাজ থেকে একটা নৌকা জলে ভাসানো হল। দাঁড় বাইতে বাইতে নৌকা পারের কাছে নিয়ে এল শাঙ্কো। ফ্রান্সিসরা নৌকায় উঠল। নৌকো গিয়ে জাহাজে লাগল। দড়ির মই ফেলা হল। ফ্রান্সিসরা মই বেয়ে ডেক-এ উঠে এল। জাহাজে ফ্রান্সিসকে নিয়ে হৈ হৈ পড়ে গেল। ধ্বনি উঠল—ও—হো—হো—।

মারিয়া হাসতে হাসতে এগিয়ে এল ফ্রান্সিসের দিকে। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল মারিয়ার চোখ মুখ কেমন শুকিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া তোমার শরীর ভালো আছে তো?

—বেশ ভালো। আমার জন্যে ভেবো না মারিয়া হেসে বলল।

—না— মারিয়া—তোমার শরীর ভালো নেই। তুমি যদি বলো তাহ'লে আর কোথাও আমরা নামবো না। জাহাজ চালিয়ে সোজা দেশে ফিরে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব পরে ভেবো। এখন খাবে চলো। মারিয়া বলল।

—রাজকুমারী—আমরা আনজুতে রাজার অতিথি ছিলাম। আমাদের কোন কষ্ট হয় নি। হ্যারি হেসে বলল।

ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া এবারও আমার হাত খালি। মূল্যবান কিছুই আনতে পারিনি।

—তা'তে আমার কোন দুঃখ নেই। মারিয়া বলল। জাহাজে আবার ধ্বনি উঠল—ও—হো—হো।

রূপোর চাবি

রুপোর চাবি

পরিষ্কার আকাশ। বাতাসও বেগবান। ফ্রান্সিসদের জাহাজ দ্রুতগতিতে চলেছে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে। জাহাজের পালগুলো ফুলে উঠেছে। কাজেই দাঁড় টানতে হচ্ছে না। ভাইকিংরা ডেকের এখানে-ওখানে শুয়ে বসে আছে। গোল হয়ে বসে ছক্কা-পাঞ্জা খেলছে। আর একদল বসে নিজেদের মধ্যে দেশবাড়ির গল্প করছে। সকলের মধ্যেই বেশ একটা ছুটির মেজাজ।

ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে ফ্রান্সিস বিছানায় আধশোয়া হয়ে আছে। মারিয়া সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করছে বিছানায় বসে।

হ্যারি কেবিনঘরে ঢুকল। ওকে দেখে ফ্রান্সিস উঠে বসল। হ্যারি বিছানায় বসতে বসতে বলল, ফ্রান্সিস, এবার কী করবে?

—তোমরা সবাই তো দেশে ফেরার জন্যে আকুল। কাজেই ফ্রেজারকে বলেছি উত্তরমুখো চালাও। ফ্রান্সিস বলল।

সে তো হলো, হ্যারি বলল, কিন্তু কোথায় এলাম, আমাদের দেশই বা কত দূরে কিছুই বুঝতে পারছি না।

মারিয়া বলল, দেখ হ্যারি, আমার যা জ্ঞানগম্যি তাতে বুঝেছি আমরা জিব্রালটার প্রণালী পার হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছি।

—সেটা বুঝলে কী করে? ফ্রান্সিস বলল।

—খুব সহজে। লক্ষ্য করলে বুঝবে গত ক'দিন জাহাজের দুলুনি খুব বেড়ে গেছে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলটা অনেক শান্ত। তাই জাহাজের দুলুনি খুব বেশি ছিল না। মারিয়া বলল।

—তাহলে রাজকুমারী, আমরা কি স্পেনের কাছাকাছি এসেছি? হ্যারি বলল।

—আমার তো তাই মনে হচ্ছে। তবে এই এলাকায় কোনো দ্বীপ নেই। ডাঙা পেলেই বুঝবো কোনো দ্বীপ নয়, স্পেনে এসেছি। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস বলল, একবার চলো তো ফ্রেজারের কাছে যাই। ও কী বলে শুনি।

হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো।

মারিয়া ওর সেলাই-ফোঁড়াইয়ের জিনিসপত্র একটা চামড়ার থলিতে রাখতে রাখতে বলল, আমিও যাবো। সূর্যাস্ত দেখবো।

তিনজনে একটু পরেই ডেক-এ উঠে এল। চলল জাহাজচালক ফ্রেজারের কাছে। ফ্রেজার হুইলে হাত রেখে সামনে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। ফ্রান্সিস বলল, ফ্রেজার, আমরা কোথায় এলাম সেটা কিছু আন্দাজ করতে পারছো?

—আমরা ভূমধ্যসাগর থেকে বেরিয়ে এসেছি এটা বুঝতে পারছি। কিন্তু ডাঙার দেখা না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাবে না। ফ্রেজার বলল।

—এখন তো তাহলে শুধু জাহাজ চালিয়ে যাওয়া। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রেজার বলল, উত্তর দিকটা ঠিক রেখে জাহাজ চালিয়ে যাওয়া। হ্যারি বলল।

ফ্রেজারের সঙ্গে কথা বলে তিনজনে ফিরে এসে রেলিং ধরে দাঁড়াল। পশ্চিম দিকে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সূর্যের আলোর গভীর কমলা রঙ মাঝ আকাশ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এই রং সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেও রইল। তারপর আস্তে আস্তে রঙ মুছে গেল। সন্ধ্যা নেমে এল।

সেদিন ভোর ভোর সময়ে নজরদার পেড্রোর চড়া গলা শোনা গেল, ডাঙা, ডাঙা দেখা যাচ্ছে। যে ভাইকিংরা ডেকে শুয়েছিল তারা উঠে বসল। একজন ছুটল ফ্রান্সিস হ্যারিকে খবর দিতে।

একটু পরেই ফ্রান্সিস আর হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। পেছনে মারিয়াও এল। ওরা রেলিং ধরে দাঁড়াল। ভোরের নরম রোদে উত্তর দিকে দেখা গেল একটা বন্দর। বেশ কয়েকটা জাহাজ নোঙর করে আছে। জাহাজগুলোতে নানা রঙের বিভিন্ন দেশের পতাকা উড়ছে।

ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, আমরা বন্দরে জাহাজ ভেড়াবো না। এখানেই নোঙর করবো। শুধু শাঙ্কো নৌকোয় চড়ে বন্দরে যাবে। এটা কোন দেশের কোন বন্দর, লোকজন কেমন—এসব জেনে আসবে।

ফ্রান্সিসরা কথা বলছে, তখনই দুই রাঁধুনি ভাইকিং ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল, খাদ্য আর জল ফুরিয়ে এসেছে। এই বন্দর থেকেই খাদ্য আর জল নিতে হবে। নইলে কখন ঝড়বৃষ্টিতে জাহাজ কোনদিকে চলে যাবে। আবার কোনো বন্দর পাওয়া যাবে কিনা কে জানে।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে বলল, কথাটা ঠিক। তখন অনেক ভাইকিং বন্ধু ফ্রান্সিসকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডাকল। বলল, শাঙ্কো, তুমি একা নৌকোয় চড়ে বন্দরে যাও। সব জেনে এসো। যথেষ্ট খাদ্য আর জল পাবো কিনা সেটাও জেনে এসো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কো তৈরি হয়ে নিল। দড়ির মই বেয়ে নৌকোয় নেমে নৌকো ছেড়ে দিল। শাঙ্কো শুধু ছোরাটা জামার নিচে নিয়েছে। তরোয়াল নিতে ফ্রান্সিস মানা করেছে। তাই তরোয়াল নেয়নি।

ততক্ষণে ঘরঘর শব্দে নোঙর ফেলা হয়েছে। ফ্রান্সিসদের জাহাজ থেমে রইল। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলতে লাগল।

রেলিং ধরে ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে দূরে শাঙ্কোর নৌকো আসছে দেখা গেল। ফ্রান্সিস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শাঙ্কোর নৌকোর দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবতে লাগল, আমাদের বিপদ হতে পারে এমন কিছু হলে শাঙ্কো নিশ্চয়ই নৌকোয় উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্কেত করবে। কিন্তু দেখা গেল শাঙ্কো আস্তে আস্তে ঢেউয়ের ধাক্কা বাঁচিয়ে নৌকো চালিয়ে আসছে।

জাহাজে নৌকো বেঁধে শাঙ্কো দড়ির মই বেয়ে ডেকে উঠে এল। ভাইকিং বন্ধুরা ওকে ঘিরে দাঁড়াল। একটু হাঁপাতে হাঁপাতে শাঙ্কো বলল, এটা স্পেনের দক্ষিণ ভাগ। বন্দরটার নাম ক্যামেরিনাল। এখানকার রাজার নাম গার্সিয়া। এখানে যথেষ্ট খাদ্য আর জল পেতে কোনো অসুবিধে নেই। রাজার যোদ্ধারা কেউ কেউ আমাকে দেখেছে। বুঝেছে আমি বিদেশী। তবু কিছু বলেনি।

এবার ফ্রান্সিস বলল, শাঙ্কো তুমি বিস্কো আর রাঁধুনি বন্ধুদের নিয়ে যাও। খাদ্য-জল আনার জন্যে বস্তা-পীপে সব নাও। সঙ্গে যে নৌকোটা নেবে সেটাতেই থাকবে এসব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কোরা একটা নৌকোয় চড়ে অন্য একটা নৌকো দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে ক্যামেরিনাল বন্দরের দিকে চলল।

দুপুরের একটু আগেই শাঙ্কোরা ফিরে এল। খাদ্য-জল সব রসুইঘরের পাশে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হলো। ফ্রান্সিস মনে মনে বলল, যাক—কয়েক মাসের জন্যে নিশ্চিন্ত।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ভাইকিং বন্ধুরা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, ফ্রান্সিস, এখানে পড়ে থেকে শুধু দেরিই হবে। জাহাজ বিকেলেই ছেড়ে দিতে বলো।

ফ্রান্সিস বলল, ঠিক আছে। ফ্রেজারকে গিয়ে বলো আমি বলেছি বিকেলে জাহাজ ছেড়ে দিতে।

বন্ধুরা খুশিতে ছুটল ফ্রেজারকে কথাটা বলতে।

সূর্যাস্ত হবার আগেই জাহাজের নোঙর তোলা হলো। ভাইকিংরা পালের দড়িদড়া ঠিক করল। জোর বাতাসে পালগুলো ফুলে উঠল। জাহাজ পূর্ণবেগে বড় বড় ঢেউ ভেঙে চলল।

তীরভূমির কাছ দিয়েই জাহাজ চলল।

দু' দিন পরেই জাহাজ এল কাদিজ বন্দরে। এখন ফ্রান্সিসরা অনেকটা নিশ্চিন্ত। ওরা কাদিজ বন্দরের জাহাজঘাটায় জাহাজ নোঙর করল। কাদিজ বেশ বড় বন্দর। অনেক জাহাজ জাহাজঘাটায় নোঙর করে আছে।

ফ্রান্সিস ডেক-এ দাঁড়িয়েছিল। বিস্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, এই কাদিজ বন্দর বেশ বড়। এখানে জাহাজ মেরামতি করা যাবে। দু'দিন থেকে আমাদের জাহাজের মেরামতির কাজটা সেরে নাও। এখনও এই জাহাজে চড়ে আমাদের অনেকদূর যেতে হবে।

বেশ তাই করো, ফ্রান্সিস বলল।

দু'দিন মেরামতির কাজটাজ চলল। সেদিন সন্ধেবেলা মারিয়া বলল—চলো কাদিজ নগরবন্দরটা দেখে আসি।

—অচেনা অজানা জায়গা—এখানে যাওয়া কি ঠিক হবে? ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা তো একটু ঘোরাঘুরি করবো। তারপর রাত বেশি হওয়ার আগেই চলে আসবো। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে চলো। দিনরাত শুধু সমুদ্রের জল দেখে দেখে তোমার একঘেয়ে লাগারই কথা। চলো শাঙ্কোকেও নিয়ে যাবো। তুমি তৈরি হয়ে নাও। আমি শাঙ্কোকে ডাকতে যাচ্ছি।

মারিয়া ওর ভাঙা আয়নাটা নিয়ে বসল। নিজের মুখ দেখে বুঝল—ওর মুখের দুধে আলতার রং এখন তামাটে হয়ে গেছে। মাথার চুলও জট পাকাচ্ছে। মারিয়া আয়না রেখে চলল পোশাক বের করতে। নিজের গাউনটা বের করল আবার ফ্রান্সিসের পোশাকটাও বড় চামড়ার বাক্স থেকে বের করল। গাউনটা পরল। গাউনটা একটু ঢিলে লাগল। বুঝল ওর জাহাজী জীবন ওর শরীর রোগা করে দিয়েছে। কিন্তু এসব ভেবে আর কী হবে। মারিয়া চুল আঁচড়াতে বসল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে নিয়ে কেবিন ঘরে এল। মারিয়ার সাজের বহর দেখে মুখ টিপে হাসল। কিন্তু কিছু বলল না। এই সাজ পোশাক নিয়ে রসিকতা করলে মারিয়া মনে দুঃখ পাবে। ফ্রান্সিস চুপ করে রইল।

মারিয়ার সাজগোজ শেষ হল। এবার মারিয়া ফ্রান্সিসের নতুন পোশাকটা বের করল। বলল—এই পোশাকটা পর। ফ্রান্সিস বলল—কী পাগলামো! আমরা কি নাচের আসরে যাচ্ছি নাকি?

—না—তোমাকে আজ নতুন পোশাক পরতে হবে। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস বলল—কি কাণ্ড!

—না কোনও কথা শুনবো না—তোমাকে পরতেই হবে। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে। তুমি যখন অত করে বলছো। পোশাকটা দাও। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া ফ্রান্সিসের পোশাকটা দিল। ফ্রান্সিস নিজের পোশাকের ওপরেই নতুন পোশাকটা পরল। মারিয়া ভাঙা আয়নাটা ফ্রান্সিসের মুখের সামনে ধরল। বলল—দ্যাখো—তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। ফ্রান্সিস আয়নাটায় মুখ দেখল।

—মুণ্ডু। ফ্রান্সিস মারিয়াকে আয়নাটা ফিরিয়ে দিল। এবার শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস তাহলে আমিও নতুন পোশাকটা পরে আসি।

—বেশ তো—ফ্রান্সিস বলল।

মোটামুটি একটু ফিটফাট হয়ে ফ্রান্সিস, মারিয়া আর শাঙ্কো জাহাজ থেকে নেমে এল।

ওরা দেখল রাস্তায় লোকজনের খুব একটা ভিড় নেই। ফ্রান্সিসরা একটু এগিয়েই একটা ছোট দুর্গ দেখল। দুর্গ ঘিরে পাথরের দেয়াল। তার বাইরে পরিখা। দুর্গের সদর দরজায় ওরা এল। চার পাঁচজন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। কাঠের বিরাট দরজা বন্ধ।

ওরা দুর্গটার চারদিকে একবার ঘুরে এল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। দু'তিন জায়গায়। জোরে কয়েকটা ধাক্কা দিলে ওখানকার পাথুরে দেয়াল সবটা না হলেও কিছু অংশে ধ্বস নামবে। দেয়ালের ঐ জায়গাগুলো সুরক্ষিত নয়।

সদর দেউড়ির সামনে পরিখার ওপর কাঠের সেতু। ফ্রান্সিস বলল—চলো একটু খোঁজ-খবর নেওয়া যাক। সেতু পার হয়ে ওরা সদর দরজার কাছে এল।

তখনই একজন লম্বা মত সৈন্য চড়া গলায় বলে উঠল—তোমরা কারা! ওখানেই থাকো। দরজার কাছে আসবে না। ফ্রান্সিস বলল—আমরা জাতিতে ভাইকিং। জাহাজে দেশ-বিদেশ বেড়িয়ে বেড়ানোই আমাদের কাজ। আমরা দুর্গটা দেখছি।

—তা দেখো তবে পাহারাদার সৈন্যদের ফাঁকি দিয়ে দুর্গে ঢোকার চেষ্টা করবে না। সেরকম কিছু করতে গেলে মৃত্যু নিশ্চিত। লম্বামত লোকটা বলল।

ফ্রান্সিস বুঝল ঐ লম্বামত লোকটিই দলনেতা। ফ্রান্সিস একটু এগিয়ে দলনেতার কাছে গেল। বলল—এই দুর্গটা কার? কে থাকে এই দুর্গে?

—এই দুর্গে থাকেন এখানকার আলতোয়াইফ—মানে রাজা গার্সিয়ারের প্রতিনিধি। দলনেতা বলল।

—ও। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল।

দুর্গ দেখার পর এলো সবচেয়ে ব্যস্ত এলাকায়। বেশ ভিড়। গাড়ি ঘোড়া চলছে।

ফ্রান্সিস বলল—চলো কিছু খাওয়া যাক। একটা খাবার দোকানে ওরা ঢুকল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দোকানটি। দোকানদার ফ্রান্সিসদের দেখে এগিয়ে এল। হেসে বলল—আসুন—আসুন। ফ্রান্সিসরা বসল।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে বলল—বলো কী খাবে?

মারিয়া বলল—মিষ্টি পিঠে আর পাউরুটি কেটে দিন। দোকানদার বলল—দুধ থেকে একটা বিশেষ মিষ্টি আমরা তৈরি করি। আপনাদের দেব? অনেক লোক আমাদের এই বিশেষ খাবারটি খেতে আসে।

—দিন তাহলে। শাঙ্কো বলল।

কিছু পরে কাঠের লম্বা টেবিলে পাতা পেতে খেতে দেওয়া হল। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। মারিয়া খেতে খেতে দোকানদারকে বলল—সত্যি আপনার এই খাবারটা বেশ খাওয়ার মত। আরো দুটো দিন। আমাদের তিনজনকেই। খাবার দেওয়া হল। খাবার খেয়ে তিনজনই খুশি।

খেতে খেতে ফ্রান্সিস দোকানিকে ডাকল। দোকানি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—এখানে দেখবার মত কী আছে?

—দুর্গটা দেখেছেন? দোকানদার বলল।

—হ্যাঁ দেখেছি। তবে বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। ফ্রান্সিস বলল।

—বছরে মাত্র দু'দিন বাইরের লোকেরা দুর্গের ভেতরে ঢুকে দেখার অনুমতি পায়। দোকানদার বলল।

—আর কী আছে? দেখবার মত? ফ্রান্সিস বলল।

—উত্তরের দিকে মাইল কয়েক দূরে আছে একটা বিরাট হ্রদ। এখন অন্ধকারে তো ভালো করে দেখতে পারবেন না। দোকান থেকে বেরিয়ে ফ্রান্সিস বলল—চলো

হ্রদটা দেখে আসি। ওরা একসময় হ্রদটার কাছে এল। চাঁদের আলো অনুজ্জ্বল। হ্রদের জল অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হ্রদের জলের ওপর নীলচে কুয়াশা ছড়িয়ে আছে। তাই ওপার দেখা যাচ্ছে না। চারপাশের ঝুঁকে পড়া গাছগাছালির গায়ে মাথায় কুয়াশামাখা চাঁদের নিস্প্রভ আলো—এতেই হ্রদের সৌন্দর্য বেড়ে গেছে।

এবার ফেরা। রাত বেড়েছে। ফ্রান্সিসরা ফিরে আসতে লাগল। একটা মোড়ে এল তিনজনে। ফ্রান্সিস বলল—ডানদিকের রাস্তা দিয়ে যেতে গেলে দুর্গটা ঘুরে যেতে হবে। তাতে পরিশ্রম বেশি সময়ও নষ্ট। বাঁ রাস্তাটা দিয়ে গেলেই রাস্তাটা যেভাবে গেছে দেখছি—তাতে এই রাস্তা দিয়ে গেলেই অল্পসময়ের মধ্যে জাহাজঘাটায় পৌঁছতে পারবো।

—কিন্তু এই রাস্তাটা বনের মধ্যে দিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। এই অন্ধকারে বনের মধ্যে দিয়ে যাবো? শাঙ্কো বলল।

—তাতে কী হয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি যেতে পারবো। শাঙ্কো আর আপত্তি করল না। রাস্তা কিছুদূর এসে বনের মধ্যে ঢুকে গেছে। ফ্রান্সিসরা বনে ঢুকল। এখন রাস্তাটা পায়ে চলা পথের মত সরু।

অন্ধকারেই সরু রাস্তাটায় পা টিপে টিপে চলল ওরা। অন্ধকারে চলতে চলতে হঠাৎ ফ্রান্সিস বুঝল ওরা পায়ে চলা পথটা হারিয়ে ফেলেছে। ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ওরা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—দাঁড়াও। শাঙ্কো আর মারিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বলল—

—সমস্যায় পড়লাম। আমরা পথ হারিয়েছি। কোনদিকে জাহাজঘাটা বুঝতে পারছি না।

—কী করবে এখন? শাঙ্কো বলল।

—চলো যেদিকে যাচ্ছি সেদিকেই যাই। দেখা যাক কোথায় গিয়ে পৌঁছুই। ফ্রান্সিস বলল।

তারপর তিনজনেই অন্ধকারে চলল।

হঠাৎ ঝোপেঝাড়ে শব্দ তুলে তিন চারজন লোক ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। ওদের পরনে কানঢাকা জোব্বামত পোশাকে। কোমরের ফেট্টিতে তরোয়াল গোঁজা।

একজন এগিয়ে এসে বলল—তোমরা কারা? কোথায় যাচ্ছো?

—আমরা জাতিতে ভাইকিং বিদেশী। আমরা জাহাজে চড়ে এখানে এসেছি। এই বনের মধ্যে দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি জাহাজঘাটায় পৌঁছবো এই ভেবেই এই রাস্তায় এসেছি।

—তাহলে তোমরা জাহাজঘাটায় যাবে? সেন্যাটি বলল।

—হ্যাঁ। কিন্তু মনে হচ্ছে আমরা পথ হারিয়েছি। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—তোমরা জাহাজঘাটার উল্টোদিকে যাচ্ছিলে। যাকগে—তোমরা এখানকার আলতোয়াইদের গুপ্তচর। আমাদের ব্যাপারে খোঁজখবর করতে এসেছো। ফ্রান্সিস বুঝল—ভীষণ বিপদ। ও বলে উঠল—আমাদের সঙ্গে আমাদের

দেশের রাজকুমারী আছেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমরা গুপ্তসংবাদ সংগ্রহে আসবো এত বোকা আমরা নই।

—যাক গে—তোমাদের বন্দী করা হল। আমাদের বিদ্রোহী নেতা খাতিব কাল রাতে আসবেন। উনি যদি বলেন তোমাদের ছেড়ে দিতে তাহলে তোমরা ছাড়া পাবে। এখন বন্দী থাকতে হবে। সৈন্যটি ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের আসতে বলল।

ফ্রান্সিসরা সৈন্যদের পাহারায় চলল। ঝোপঝাড় জঙ্গল দু' হাতে সরিয়ে ফ্রান্সিসরা চলল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কানের কাছে মুখ এনে মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস আমরা এই অন্ধকারে পালাতে পারি।

—মারিয়া রয়েছে। পালাবার চেষ্টা করলে ধরা পড়ে যাবো। তখন বিপদ বাড়বে। তার চেয়ে চলো—কয়েদখানা তো আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। কয়েদঘরে আটক থাকা আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। চিন্তা মারিয়াকে নিয়ে। ওর তো অত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা নেই। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলল। বনের বেশ ভেতরে ঢুকল যোদ্ধারা। তখনই অন্ধকারে দেখা গেল একটা পাথরের বাড়ি। বেশ বড়। ভাঙা বাড়ি।

যোদ্ধারা বাড়ির দরজার কাছে গেল। অন্ধকারে দেখা গেল ভাঙা পাথরের দরজা। সবাই ঘরটায় ঢুকল। ঘরটা বেশ বড়। ফ্রান্সিস ওপরে তাকিয়ে দেখল আকাশ দেখা যাচ্ছে। তারায় ভরা আকাশ। ছাদ বলে কিছু নেই।

ফ্রান্সিস দেখল অনেক যোদ্ধা। শুয়ে বসে আছে। সঙ্গের যোদ্ধাটি ফ্রান্সিসদের বলল—তোমরা এ ঘরে থাকবে। তোমাদের হাত পা বাঁধা হল না। পালাবার চেষ্টা করলে মরবে।

ফ্রান্সিস ঘরটার কোনায় দেয়াল ঘেঁষে বসল। মারিয়া শাঙ্কোও বসল—এখন কী করবে?

—বন্দী জীবন মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এখন দেখা যাক বিদ্রোহী নেতা খাতিব এসে আমাদের কী করে। এখন কিছু করা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে যোদ্ধাদের মধ্যে তিন-চারজন যোদ্ধা এসে দাঁড়াল। যোদ্ধারা সব উঠে বসল। আগত যোদ্ধাদের হাতে বড় বড় কাঁচা পাতা। একজন যোদ্ধা সকলের সামনে পাতা পেতে দিল। যোদ্ধাদের অন্য যোদ্ধাটি একটা বড় ঝুড়ি থেকে প্রত্যেক চারটে করে কাটা রুটি দিল। অন্য যোদ্ধাটি কাঠের বড় পাত্র থেকে পাখির মাংস ঝোল দিতে লাগল।

খাওয়া শুরু হল। ফ্রান্সিস বরাবর যা বলে তাই বলল—পেটপুরে খাও। ভাল না লাগলেও খাও। এতেই শরীর ভাল থাকবে। সব সময় নিজেকে তৈরি রাখো।

খাওয়া দাওয়া শেষ হল। একজন যোদ্ধা এঁটো পাতাগুলো নিয়ে গেল। ঘরের বাঁ কোনায় জলের জালাটা থেকে কাঠের গ্লাস দিয়ে জল তুলে তুলে খেল সবাই।

একজন দু'জন করে আস্তে আস্তে সবাই শুয়ে পড়ল। মেঝেয় লম্বা লম্বা শুকনো

ঘাস পাতা। তার ওপরে শোয়া।

ফ্রান্সিস ঘুমোতে পারল না। অনেক চিন্তা মাথায়। কী করে অক্ষত শরীরে পালানো যায় তার উপায় ভাবতে লাগল। ফ্রান্সিস দু'হাতের তেলোতে মাথা রেখে আকাশের দিকে তাকাল। ঘরটার ছাদ বলে তো কিছু নেই। কালো আকাশে অজস্র তারার ভিড়। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফ্রান্সিসের দেশের বাড়ির কথা মনে পড়ল। কতদূরে সেই দেশ বাড়ি। পাখির পালকে তৈরি শুভ্র বিছানা। নরম বালিশ। আঃ কী আরাম। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে ফিরে উঠে বসল। মারিয়া তখনও ঘুমোয় নি। মারিয়াও উঠে বসল। বলল—কী হল ফ্রান্সিস?—কিছু না—আজে বাজে চিন্তা। ফ্রান্সিস বলল।

—আর রাত করো না। ঘুমিয়ে পড়ো। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করলে। ততক্ষণে মারিয়াও শুয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ফ্রান্সিসরা সকালের খাবার খেল। দুপুরেও খেল। সন্ধে হল। রাত নামল। রাত বাড়তে লাগল।

বেশ রাতে বিদ্রোহী নেতা খাতিব এল। সঙ্গে আট-দশজন যোদ্ধা। ওরা পাশের ঘরটায় গিয়ে বসল।

তখনই দলপতির সেই যোদ্ধাটি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—খাতিব তোমাদের ডাকছেন।

—বেশ চলো। ফ্রান্সিস উঠে বসল। শাঙ্কো বলল—তুমি একা যাবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—তোমরা ঘুমোও। ফ্রান্সিস বলল।

ঘরের পাথরের দেয়ালের খাঁজে মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় দেখে দেখে ফ্রান্সিস পাশের ঘরে এল। দলনেতা ওকে খাতিবের কাছে নিয়ে এল। খাতিব ফ্রান্সিসকে বসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস বসল। খাতিব বলল—শুনলাম তোমরা ভাইকিং?

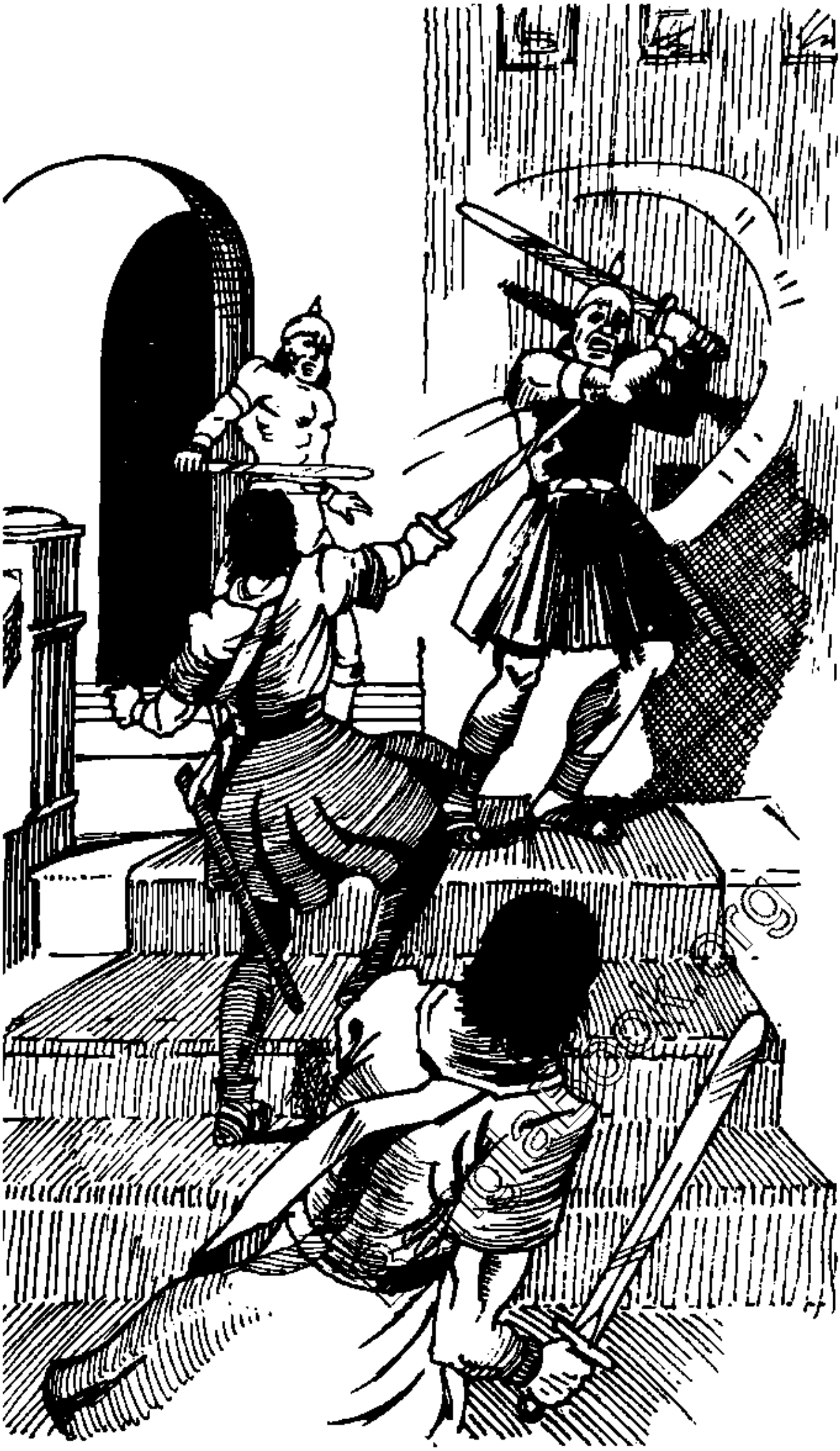
—হ্যাঁ দেশে দেশে জাহাজে চড়ে ঘুরে বেড়াই। কোনো ঝুট ঝামেলায় আমরা থাকি না। আমরা কাউকে অবিশ্বাস করি না। আমরা মনে করি সব মানুষই আমাদের বন্ধু।

—শুধু জাহাজে ঘুরে বেড়াও? খাতিব বলল।

—হ্যাঁ। তবে একটা কাজ করি। যদি কোনো দেশে দ্বীপে গুপ্তধন থাকে বুদ্ধি খাটিয়ে তা উদ্ধার করি। ফ্রান্সিস বলল।

—তারপর খুঁজে পাওয়া গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে যাও। খাতিব বলল।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আপনার মত অনেকেই আমাদের এরকম সন্দেহ করেছে। আমরা কিছু মনে করি নি। নিঃস্বার্থভাবে আমরা পরিশ্রম করে বুদ্ধি খাটিয়ে গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করি আর যাদের সেই গুপ্তধন প্রাপ্য তাদের হাতেই দিই। এটা মানুষ সহজে বিশ্বাস করে না। তারা আমাদের অবিশ্বাস



করে। তাই বলে আমরা কোনো মানুষকে বিশ্বাস করব না? আমরা সবাইকে বিশ্বাস করি। এতে কিন্তু আমরা কখনো খুব ঠকি নি।

—ঠিক আছে—খাতিব বলল—তোমার সঙ্গে কারা আছে?

—আমার একজন বন্ধু আর আমাদের দেশের রাজকুমারী। ফ্রান্সিস বলল।

—সে কি! রাজকুমারী রাজপ্রাসাদের আরাম আয়েস ছেড়ে তোমাদের সঙ্গে এলেন কেন? খাতিব জিজ্ঞেস করল।

—আমি রাজকুমারীর স্বামী। আমি যেখানে যাবো তিনিও সেখানে যাবেন। যত কষ্টকর জীবনই হোক—আমি তা মেনে নি, বলে উনিও মেনে নেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। তোমার সঙ্গী আর কেউ নেই? খাতিব জিজ্ঞেস করল।

—আছে। আমার পঁচিশ জন বন্ধু এখানকার কাদিজ জাহাজঘাটায় আমাদের জাহাজে আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি যা বললে সে সব সত্যি কিনা—আমরা খোঁজ করে দেখবো। ততদিন এখানেই বন্দী থাকতে হবে। খাতিব বলল।

এবার ফ্রান্সিস বলল—আমার সঙ্গে রাজকুমারী রয়েছেন। তিনি এই বন্দীদশায় অসুস্থ হয়ে পড়বেন। রাজকুমারীকে অন্য কোথাও রাখুন।

—দেখছি সে সব। এখন তোমরা এখানেই থাকবে। খাতিব বলল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোদের কাছে চলে এল।

শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস—কী কথা হল?

—আমাদের এখন মুক্তি দেওয়া হবে না। এখানেই বন্দী হয়ে থাকতে হবে। আমাদের খোঁজখবর নিয়ে তবে আমাদের মুক্তি দেবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো এখন এই বন্দী জীবনই চলবে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। মারিয়াকে অন্য কোথাও রাখার জন্যে অনুরোধ করলাম। খাতিব অনুরোধ রাখল না। মারিয়াকে এভাবেই থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সন্ধেবেলা খাতিব এল। খাতিব ফ্রান্সিসদের পাশের ঘরে রইল।

রাত গভীর হল। সবাই ঘুমিয়ে আছে। ফ্রান্সিসও ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃশব্দ চারদিক। শুধু কখনও কখনও রাতজাগা পাখির ডাক। হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার স্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। আলতোয়াইফের সৈন্যরা খোলা দরজা দিয়ে চিৎকার করতে করতে ঢুকল। নিরস্ত্র খাতিবের যোদ্ধাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। খাতিবের যোদ্ধারা ঘরের কোনায় জড়ো করে রাখা তরোয়াল বর্শা নেবার জন্যে ছুটে গেল। তারা অনেকেই অস্ত্রাঘাতে মেঝেয় পড়ে গেল। দু'চারজন কোনরকমে তরোয়াল বর্শা হাতে নিয়ে লড়াইয়ে নামল।

ফ্রান্সিস বুঝল এই লড়াইয়ের সময়ই পালান ভাল। কারো নজরে পড়বে না। ফ্রান্সিস শাঙ্কো আর মারিয়াকে বলল—পাশের ঘরে ঢুকে পালাতে হবে। চলো।

অন্ধকারে ওরা পাশের ঘরে এল। সেখানেও লড়াই চলছে। ফ্রান্সিসরা ঘরটা

থেকে ভাঙা দরজা পার হয়ে ছুটল। কিন্তু কিছুটা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। খোলা তরোয়াল হাতে আলতোয়াইফের সৈন্যরা এগিয়ে এল। বোঝা গেল সারা বাড়িটাই ওরা ঘিরে ফেলেছে।

একটা গাছের তলায় ফ্রান্সিসদের আনা হল। দেখা গেল আগে থেকেই কয়েকজন খাতিবের যোদ্ধাকে ওখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে। ফ্রান্সিসদেরও হাত বেঁধে ওখানে রাখা হল। আলতোয়াইফের সৈন্যরা মারিয়ার হাত বাঁধতে গিয়ে বেশ আশ্চর্য হল। মেয়েটি কে? ওখানে এল কী করে? ওরা মারিয়াকে কিছু বলল না। হাতও বাঁধল না।

ততক্ষণে লড়াই শেষ। বিদ্রোহী খাতিবের যোদ্ধারা হেরে গেল। অনেক যোদ্ধা মারা গেল। অনেক বন্দী হল। খাতিবও বন্দী হল।

ভোর হল। সূর্য উঠল। বনের ডালপাতার ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল রোদের আকাশ দেখা গেল।

আলতোয়াইফের সৈন্যরা বন্দীদের সারি দিয়ে দাঁড় করাল। তারপর হুকুম দিল—এবার চলো।

বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বন্দীরা চলল। পেছনে সৈন্যরা। সৈন্যদের দলপতি গলা চড়িয়ে বলে উঠল—কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না। পালাতে গেলে মরবে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বন্দীরা বনের বাইরে এল। দেখল আলতোয়াইফের ছোট দুর্গটার কাছে এল।

পরিখা পার হয়ে বন্দীদের দুর্গের বিরাট কাঠের দরজার সামনে আনা হল। ঘর্ ঘর্ শব্দে দরজা খুলে গেল। বন্দীরা ঢুকল। পেছনে সৈন্যরা।

দুটো টানা পাথরের ঘর। বোঝাই গেল কয়েদখানা। কাছে আসতে দেখা গেল কয়েকজন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। তরোয়াল খোলা নয়। কোষবদ্ধ।

কয়েদখানার লোহার দরজা—ঢং ঢং শব্দে খোলা হল। ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। দেখল—ঘরটায় জানলা বলে কিছু নেই। ছাদটার কোনায় ছাদ একটু ভাঙা। খোঁদলমত। ওখান দিয়েই আলো হাওয়া আসছে।

এই সকালেও দেয়ালের খাঁজে রাখা মশাল জ্বলছে। তাতে অন্ধকার ভাবটা কেটেছে। মেঝের বিছানা বলে কিছু নেই। কাঠের পাটাতন পরপর পাতা। এটাই বিছানা।

ফ্রান্সিস দরজার কাছাকাছি বসল। মারিয়া শাঙ্কোও বসল। একটু হাঁপাতে হাঁপোতে মারিয়া বলল—আমার জন্যেই তোমাদের এত ভোগান্তি। শাঙ্কো বলল—রাজকুমারী—এ সব ভাববেন না। এতে আপনার মন খারাপ হবে। সহ্যক্ষমতা কমে যাবে। দেখা যাক—আমরা মুক্তি পাই কি না। এখন শুধু মুক্তির কথা ভাবতে হবে। ফ্রান্সিস কী ভাবতে ভাবতে বলল—শাঙ্কো—আমরা যখন দুর্গটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম তখন কোনদিকের পাথরের দেয়ালের একটা জায়গা বেশ ভাঙা ছিল দেখেছিলাম। শাঙ্কো একটু ভেবে বলল—দক্ষিণ দিককার

দেয়ালটার মাঝামাঝি পাথরের পাটাগুলো খসে পড়েছে। সবটা নয়। তবে পাথরের পাটাগুলো আলগা হয়ে গেছে।

—ঠিক—ঠিক বলেছো শাঙ্কো। এখন আমার মনে পড়ছে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস চারদিকে ভালো করে দেখল। বুঝল এখান থেকে পালাতে হলে দরজা দিয়েই পালাতে হবে। ফ্রান্সিসের নজরে পড়ল দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে খাতিব বসে আছে। দু'চোখ বোঁজা। ফ্রান্সিস উঠে আস্তে আস্তে খাতিবের কাছে এল। গলা নামিয়ে বলল—খাতিব—আপনারা সাহায্য করলে আমরা এই কয়েদঘর থেকে পালাতে পারি। খাতিব চোখ খুলল। বলল—কী ভাবে?

—পাহারাদাররা যখন খাবার নিয়ে দুপুরবেলা আসবে তখন ওরা কীভাবে খেতে দেয় সেটা লক্ষ্য করতে হবে। তখনই আমি ঠিক করবো—কখন কীভাবে পালাবো।

—বেশ—উপায় ভাবুন। খাতিব বলল। ফ্রান্সিস নিজের জায়গায় চলে এল। অপেক্ষা করতে লাগল কখন দুপুরের খাবার খেতে দেয়।

দুপুরে সৈন্যরা তিনজন খাবারের ঝুড়ি হাতে আর কাঠের গামলায় ঝোল নিয়ে এল। পাহারাদার দু'জন দরজার কাছে খোলা তরোয়াল নিয়ে দাঁড়াল। দরজা খোলা হল। সৈন্যরা খাবার নিয়ে ঢুকল।

খেতে খেতে ফ্রান্সিস নিম্নস্বরে বলল—শাঙ্কো—তিনজন ঢোকে। দু'জন পাহারায় থাকে। রাতে খাবার দেবার সময় তুমি একজন পাহারাদারকে কাবু করবে আমি অন্যটাকে ধরবো। যারা খাবার দেবে তাদের সামলাবে খাতিবের যোদ্ধারা।

সন্ধের একটু পরে ফ্রান্সিস খাতিবের কাছে গেল। বলল—পরিকল্পনা ছকে ফেলেছি।

—কী পরিকল্পনা করলেন?

—খাবার দিতে তিনজন সৈন্য ঘরের মধ্যে ঢোকে। তাদের আপনারা আটকাবেন। তাদের যেভাবেই হোক এই ঘরেই বন্ধ করে রাখা হবে। ততক্ষণ আমি আর আমার বন্ধু দু'জন পহারাদারকে আহত করবো যাতে আমাদের পেছনে ছুটতে না পারে। এ সবের মধ্যেই আপনাদের আমাদের পালাতে হবে।

খাতিব মাথা ওঠানামা করে বলল— পরিকল্পনা খুবই ভালো আর কার্যকরী। দাঁড়ান আমাদের যোদ্ধাদের বলছি।

খাতিব উঠে দাঁড়াল। বলল—সবাই শোনো। খাতিবের সৈন্যরা এগিয়ে এল। খাতিব বলল—রাতে যখন তিনজন সৈন্য খাবার দিতে আসবে তখন তোমরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের কোমরে গোঁজা তরোয়াল কেড়ে নেবে। তারপর খোলা দরজা দিয়ে বাইরে এসে দরজার লোহার হুড়কো টেনে দেবে যাতে সৈন্য তিনজন পালাতে না পারে। এবার সবাই তৈরি থেক।

রাত হল। তিনজন সৈন্য খাবার নিয়ে এসে দরজায় দাঁড়াল। দু'জন পাহারাদারের একজন দরজা খুলে দিল। ঢং শব্দ তুলে দরজা খুলে গেল।

তিনজন খাবার নিয়ে ঢুকল। তখনই খাতিবের কয়েকজন যোদ্ধা সৈন্য তিনজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওদের খাবারের ঝুড়ি কাঠের গামলা সব ছিটকে গেল। ওরা কাঠের মেঝের ওপর উবু হয়ে পড়ল। খাতিবের যোদ্ধারা তিনজন সৈন্যের কোমর থেকে ঝোলানো তরোয়াল খাপ থেকে খুলে ফেলে যোদ্ধাদের একজন বলল—কেউ কোনরকম শব্দ করবে না।

ওদিকে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো খোলা তরোয়াল হাতে দু'জন সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস একজনের কাঁধে—এক রদ্দা কষাল। ওর হাত থেকে তরোয়াল খসে পড়ল। শাঙ্কো অন্যটার পেটে ঢুঁ মারল। সেই সৈন্যটি দু'হাত উঁচু করে চিৎ হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে ডাকতে যাবে তখনই পেছন ফিরে দেখল মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস মারিয়ার ডান হাত ধরে বলে উঠল—শাঙ্কো—ছোট দক্ষিণের দেয়ালের দিকে।

তিনজনে অন্ধকার মাঠে নেমে এল। তারপর ছুটল দক্ষিণদিকের দেয়ালের দিকে। খাতিব আর যোদ্ধারাও সে দিকেই ছুটল।

ফ্রান্সিস ভাঙা দেওয়ালের জায়গায় এল। লাথি মেরে কয়েকটা আলগা পাথরের পাটা ভাঙল। এখন পার হওয়া সহজ হল।

ফ্রান্সিসরা দেয়াল পার হয়ে বাইরে অন্ধকার রাস্তায় এল। ফ্রান্সিসদের দেখা-দেখি খাতিব আর খাতিবের যোদ্ধারাও ভাঙা দেয়াল পার হল। তখনই দুর্গে হৈ হৈ চিৎকার শোনা গেল। আলতোয়াইফের সৈন্যরা চিৎকার করতে লাগল—কয়েদী পালাচ্ছে। সাবধান। ধরো সবাইকে। অন্ধকার মাঠে সৈন্যরা মশাল হাতে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। ফ্রান্সিসরা কোনদিক দিয়ে পালিয়েছে সৈন্যরা অন্ধকারে তা দেখতে পায় নি।

এবার ফ্রান্সিসরা একটু সমস্যায় পড়ল। জাহাজঘাটা কোনদিকে? ফ্রান্সিস খাতিবের এক যোদ্ধাকে থামাল। বলল—জাহাজঘাটটা কোনদিকে? যোদ্ধাটি ডানহাত দক্ষিণের দিকে তুলে বলল—ঐদিকে।

ফ্রান্সিসরা দক্ষিণমুখো ছুটল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—মারিয়া ছুটতে পারবে তো?

—কিচ্ছু ভেবো না। তোমাদের মত ছুটতে না পারলেও আমি আমার মত ছুটবো।

ফ্রান্সিসরা হাঁপাতে হাঁপাতে জাহাজঘাটায় পৌঁছল।

পাটতনের ওপর দিয়ে ছুটে ওরা জাহাজে উঠল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে প্রথমেই ছুটে গেল নোঙরের কাছে। পেছনে শাঙ্কো। দু'জনে নোঙরের দড়ি টেনে টেনে তুলল। জাহাজ হাওয়ার ধাক্কায় ঘুরে যেতে লাগল। ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে জাহাজ থেকে পাতা পাটাতনটা তুলে ফেলল। জাহাজটা ঘুরে গেল।

ওদিকে মারিয়ার ডাকাডাকিতে হ্যারি বিস্কোরা জাহাজের ডেক-এ উঠে এল।

হ্যারি ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ভাইকিং বন্ধুরা উঠে আসতে লাগল। ফ্রান্সিস, মারিয়া আর শাঙ্কোকে ঘিরে দাঁড়াল। ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, আমাদের এক্ষুনি এই বন্দর থেকে পালাতে হবে। পাল খুলে দাও দাঁড়িরা দাঁড় ঘরে যাও। জাহাজ যত জোরে পারো চালাও।

ভাইকিং বন্ধুরা কাজে নেমে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যে জাহাজ মাঝ সমুদ্রে চলে এল।

তখনই পুবদিকে গভীর কমলা রঙের সূর্য উঠল। আলো ছড়ালো সমুদ্রে জাহাজে।

জাহাজ চলল।

দিন তিনেকের মাথায় ফ্রান্সিসদের জাহাজ এল হুয়েনভা বন্দরে। কাদিজ বন্দরেই এই হুয়েনভা বন্দরের নাম ওরা জেনে এসেছিল। ওরা নিশ্চিন্ত মনেই ওদের জাহাজ বন্দরে ভেড়াল। তখন সকাল। জাহাজ থেকে কাঠের তক্তা তীর পর্যন্ত পাতা হলো। কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু বন্দর শহরটা দেখতে নেমে গেল।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার সময় হয়ে গেল তখনও বন্ধুরা ফিরল না। আরো সময় গেল। দুপুর পেরিয়ে বিকেলের মুখোমুখি সময় তখন। ফ্রান্সিসরা কেউ তখনও খেল না।

বিকেলের দিকে দেখা গেল বন্ধুদের বন্দী করে একদল যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে আসছে। কেন ওর বন্ধুদের বন্দী করা হয়েছে, ফ্রান্সিস তার কোনো কারণই বুঝতে পারল না। মাথায় শিরস্ত্রাণ, বুকে বর্ম, হাতে খোলা তরোয়াল, যোদ্ধারা ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠল। ফ্রান্সিস, হ্যারি এগিয়ে গেল। যোদ্ধাদের দলনেতা সবার আগে ছিল। একটু লম্বামতো। মুখে দাড়ি-গোঁফ। দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল লোকটা চড়া মেজাজের মানুষ।

হ্যারি বলল, কী ব্যাপার বলুন তো?

দলনেতা বলল, শুনলাম তোমরা ভাইকিং। ক্যামেরিনাল বন্দর হয়ে এখানে এই হুয়েনভা বন্দরে এসেছো।

হ্যারি বলল, হ্যাঁ।

তোমরা জানো কি এই অঞ্চলের রাজা হচ্ছেন ফার্নান্দো? দলনেতা বলল।

—সেটা, আমরা কী করে জানবো? হ্যারি বলল।

—ক্যামেরিনাল অঞ্চলে এখন রাজত্ব করছে ফার্নান্দোর ভাই গার্সিয়া।

—হ্যাঁ, শুনেছি। হ্যারি বলল।

—ফার্নান্দো আর গার্সিয়ার মধ্যে ভীষণ রেষারেষি।

—ও। হ্যারি মুখে শব্দ করল।

যে কোনোদিন দুই ভাইয়ে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে।

—আমরা এসব কিছুই জানি না। হ্যারি বলল।

—তোমরা সব জানো। দলনেতা চিৎকার করে বলে উঠল।

—না, আমরা জানি না। ফ্রান্সিস বলল।

দলনেতা আবার চিৎকার করে বলে উঠল, তোমরা গার্সিয়ার গুপ্তচর। গার্সিয়া তোমাদের এখানে পাঠিয়েছে গোপনে সব খবর নিতে—আমাদের ক'টা যুদ্ধজাহাজ, সৈন্যসংখ্যা কত, কোন কোন জায়গা আমরা সুরক্ষিত রেখেছি, কোনগুলি আমাদের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা।

ফ্রান্সিস বুঝল, খুবই বিপদে পড়েছে ওরা। এই দলনেতাকে কিছু বলে লাভ নেই। দলনেতা আগেই স্থির করে ফেলেছে ফ্রান্সিসদের বন্দী করে রাখবে। কাজেই দলনেতার এখন যা মনের অবস্থা, ফ্রান্সিসরা এসব ব্যাপারে যে জড়িত নয় সেটা কিছুতেই বোঝানো যাবে না। তবু ফ্রান্সিস হাল ছাড়ল না। যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল। বলল, দেখুন, আমরা বিদেশী। আপনাদের কোনো ব্যাপারেই আমরা জড়িয়ে নেই। জড়াবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও নেই।

—আমি বিশ্বাস করি না। দলনেতা বলল।

—গুপ্তচরবৃত্তি করে আমাদের কী লাভ বলুন। হ্যারি বলল।

—গার্সিয়া তোমাদের অনেক স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছে। দলনেতা বলল।

—বেশ, আপনারা জাহাজে তল্লাশি চালিয়ে দেখুন। ফ্রান্সিস বলল।

—সে সব পরে হবে। এখন তোমাদের সবাইকে বন্দী করা হলো। দলনেতা বলল। তারপর যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বলল, এই জাহাজের কোথাও থেকে দড়ি নিয়ে আয়। টুকরো করে দড়ি কেটে সকলের হাত বাঁধ। তারপর কয়েদখানায় নিয়ে চল।

ফ্রান্সিস বলল, আমাদের কয়েদখানায় না রেখে এই জাহাজেই বন্দী করে রাখতে পারেন। আপনাদের যোদ্ধারা পাহারায় থাকবে।

—না না, তোমাদের সবাইকে কয়েদখানায় থাকতে হবে। দলনেতা মাথা নেড়ে বলল।

—তাহলে একটা অনুরোধ, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের দেশের রাজকুমারী। তিনি কয়েদখানার অত কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না। তাঁকে এই জাহাজেই বন্দী করে রাখুন। ফ্রান্সিস বলল।

দলনেতা বলল, সেসব রাজা ফার্নান্দোকে বলো।

—রাজা ফার্নান্দোকে কোথায় পাবো? ফ্রান্সিস বলল।

রাজা সেভিল্লায় আছেন। দলনেতা বলল।

সেভিল্লা কোথায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—এই হুয়েনভা থেকে মাইল কুড়ি উত্তরে। দলনেতা বলল।

—তাহলে কি আজ রাতে আমাদের সেভিল্লায় নিয়ে যাওয়া হবে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—না, কাল সকালে রওনা হবো আমরা। দলনেতা বলল।

এবার ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে হ্যারি আর শাঙ্কোর কাছে সরে এল। নিজেদের দেশীয় ভাষায় বলল, আমি পালাচ্ছি। কেউ লড়াইয়ে নামবে না। সময়-সুযোগমতো সব করবো। তোমরা এগিয়ে এসে আমাকে আড়াল করে দাঁড়াও।

ফ্রান্সিসের বন্ধুরা আস্তে আস্তে এসে ফ্রান্সিসকে আড়াল করে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ডেক-এ বসে পড়ল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে কিছুটা এসেই গড়িয়ে গিয়ে মাস্তুলের পেছনে চলে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে একটুক্ষণ দাঁড়াল। তারপর ডেক-এর ওপর শুয়ে পড়ে দ্রুত গড়িয়ে সিঁড়িঘরের পেছনে চলে এল। রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা আর ওকে দেখতে পাবে না। ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে ছুটে গিয়ে হালের কাছে এল। হাল জড়িয়ে ধরে হালের কাঠের খাঁজে খাঁজে পা রেখে জলের কাছে নেমে এল। তারপর হাল ধরে জলের মধ্যে আস্তে নিজের শরীরটা ডুবিয়ে দিল। জলে কোনো শব্দ হলো না।

ওদিকে ভাইকিং বন্ধুরা গজরাতে লাগল। ওরা এভাবে কাপুরুষের মতো বিনা যুদ্ধে বন্দীদশা মেনে নিতে পারছিল না। হ্যারি দেশীয় ভাষায় বলল, ভাইসব, ফ্রান্সিস পালিয়েছে। ও বলে গেছে আমরা যেন লড়াই না করি। সব মেনে নিই। হ্যারি থামল। তারপর বলল, ফ্রান্সিস মুক্ত। এখন আমাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। ফ্রান্সিস আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেই। ভাইকিং বন্ধুরা একটু শান্ত হলো।

ফার্নান্দোর সৈন্যরা ভাইকিংদের হাত বাঁধার জন্যে দড়ি যোগাড় করে নিয়ে এল। এবার হ্যারি দলনেতার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখুন, আমাদের বন্ধুরা ফিরে আসছে না দেখে আমরা কেউ এখনও পর্যন্ত খাইনি। আগে আমাদের খেতে দিন। তারপর যেখানে নিয়ে যেতে চান নিয়ে যাবেন।

একটু ভেবে নিয়ে দলনেতা বলল, বেশ, খেয়ে নাও। আমার সৈন্যরা পাহারায় থাকবে। কেউ পালাবার চেষ্টা করলেই মরবে।

ভাইকিংরা সিঁড়ির দিকে চলল। সৈন্যরাও পেছনে পেছনে চলল। ভাইকিংরা খেতে গেল। সৈন্যরা পাহারায় রইল।

খেতে খেতে মারিয়া বলল, হ্যারি, আমার জন্যেই তোমাদের এত কষ্ট।

হ্যারি হেসে বলল, কী যে বলেন! আপনি না থাকলেও এই রাজা ফার্নান্দোর যোদ্ধারা আমাদের বন্দী করতো। যাকগে, আপনি এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না।

খাওয়াদাওয়া সেরে হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। দেখল দলনেতা আরো সৈন্য আনিয়েছে। ভাইকিংরা ডেক-এ উঠে আসতে লাগল। সবাইকে সারি দিয়ে দাঁড় করানো হলো। তারপর তাদের দু' হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা হতে লাগল। সবার হাত বাঁধা হলো শুধু মারিয়ার হাত বাঁধা হলো না।

দলনেতা গলা চড়িয়ে ভাইকিংদের বলল, সবাই জাহাজঘাটায় গিয়ে দাঁড়াও।

হ্যারিরা একে একে পাটাতনের ওপর দিয়ে নেমে এল। রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরাও নেমে এল। হ্যারিদের ঘিরে দাঁড়াল।

দলনেতা হাত তুলে পুবদিক দেখিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, চলো। হ্যারিরা হাঁটতে শুরু করল। সৈন্যরাও ওদের দু' পাশ থেকে ঘিরে হাঁটতে লাগল।

তখন সন্ধে হয়েছে। হুয়েনভা বন্দরের রাস্তায় লোকজনের তেমন ভিড় নেই। রাস্তার এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। দু' পাশের বাড়িঘরেও আলো দেখা যাচ্ছে। বন্দী হ্যারিদের দেখে পথচলতি অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়ে দেখল ওদের।

একসময় বাড়িঘর শেষ হলো। ডানদিকে একটা প্রান্তর। সেটা পার হয়ে হ্যারিরা একটা পাথরের বাড়ির কাছে এল। বাড়িটা তেমন বড় না। দরজার কাছে মশাল জ্বলছে। হ্যারি মশালের আলোয় দেখল লোহার দরজা। তাতে তালা ঝুলছে। বুঝল আবার কয়েদঘরের বন্দীজীবন।

লোহার দরজা ঠং ঠং শব্দে খোলা হলো। হ্যারিদের ঠেলে ঠেলে ঢোকানো হলো। ঘরের মধ্যে দেয়ালের খাঁজে দুটো মশাল আটকানো। মশাল দুটো জ্বলছে। হ্যারি চারদিকে তাকাল। কয়েদঘর যেমন হয় তেমনি ঘর। ছাদের কাছে দু'দিকে দুটো ঘুলঘুলির মতো। মেঝেয় পুরু করে শুকনো ঘাসের বিছানা। হ্যারি দেখল আগে থেকেই বন্দী হয়ে আছে জনা দশেক লোক।

হ্যারি মারিয়াকে বলল, রাজকুমারী, আমার সঙ্গে আসুন। ঘরের এক কোনায় হ্যারি এল। মারিয়াকে বসতে বলল। নিজেও বসল। হ্যারির শরীর বরাবরই দুর্বল। ক্লান্তিতে সে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না। শুয়ে পড়ল। বাঁধা হাত রাখল কপালের ওপর। মারিয়া আস্তে আস্তে বলল, এ তো কষ্টের শুরু। কপালে আরও দুর্ভোগ আছে। তবে সান্ত্বনা একটাই, ফ্রান্সিস মুক্ত। ও আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারবে।

—হ্যাঁ, এখন ওটাই একমাত্র ভরসা। হ্যারি বলল।

ওদিকে ফ্রান্সিস সাঁতার কেটে সমুদ্রতীরে এল। পেছল পাথরে সাবধানে পা রেখে রেখে তীরে উঠে এল। ভেজা পোশাক নিয়েই একটা বড় পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসল। ওখান থেকে ওদের জাহাজ-ডেক, মানুষজন দেখা যাবে।

রাত হলো। ফ্রান্সিস তখনও বসে আছে। তাকিয়ে আছে ওদের জাহাজের দিকে। জাহাজের কাচঢাকা আলোয় দেখল হ্যারিদের সারি দিয়ে দাঁড় করানো হলো। তারপর হ্যারিরা হাত বাঁধা অবস্থায় জাহাজ থেকে নেমে এল। সামনে-পেছনে রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা।

ফ্রান্সিস পাথরটা থেকে উঠে দাঁড়াল। চলল বড় রাস্তার দিকে। ঝোপঝাড় । গাছগাছালি বাড়িঘর পার হয়ে সদর রাস্তায় এল। রাস্তায় এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। তারই আলোয় দেখল হ্যারিরা চলেছে। দেখল মারিয়ার হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা নয়। ফ্রান্সিস এই ভেবে আশ্বস্ত হলো যে মারিয়ার বেশি কষ্ট হবে না।

ফ্রান্সিস হ্যারিদের পেছনে কিছু দূরে থেকে হাঁটতে লাগল। হ্যারিদের কয়েদঘরে ঢোকানো পর্যন্ত সবই ফ্রান্সিস দেখল। এবার চিন্তা—কী করে বন্ধুদের মুক্ত করা

যায়।

—এখন তো কিছু করার নেই। ফ্রান্সিস বেশ দুর্বল বোধ করতে লাগল। সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি।

ফ্রান্সিস জাহাজঘাটার দিকে চলল। জাহাজঘাটায় পৌঁছে দেখল ওদের জাহাজটায় আলো জ্বালা হয়নি। ও খুব সাবধানে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। আশপাশের জাহাজগুলো থেকে আলো পড়েছে ওদের জাহাজে। সেই সামান্য আলোতে দেখল ডেক-এ কোনো পাহারাদার সৈন্য নেই। ফ্রান্সিস হাঁফ ছাড়ল। ও নিজের কেবিনঘরে নেমে এল। ভেজা পোশাক পালটাল। তারপর রসুইঘরে এল।

রসুইঘরের টেবিলে ঢাকনা দেওয়া পাত্রগুলোর ঢাকনা খুলে দেখতে লাগল ফ্রান্সিস। মশলা নুন এসব রাখা। হঠাৎ দেখল টেবিলের ধারে রাখা একটা ঢাকা দেওয়া বড় পাত্র। ফ্রান্সিস ঢাকনা খুলল। দেখল রুটি মাংস আলুভাজা পরিপাটি রাখা। রাঁধুনি ভাইকিং বন্ধুটি জানতো ফ্রান্সিস পালিয়েছে। ফ্রান্সিস অভুক্ত থাকবে। এই জাহাজে ও নিশ্চয়ই আসবে। তাই রাঁধুনি বন্ধুটি সব খাবার সাজিয়ে রেখে গেছে। একে ক্ষুধার্ত, সামনেই খাবার আর রাঁধুনি বন্ধুটির ভালোবাসা—ফ্রান্সিস আবেগে চোখ বুঁজল। মনে মনে গভীর ভালোবাসা জানাল বন্ধুটিকে। তারপর খেতে বসল। গোগ্রাসে খেতে লাগল সে। খিদে যা পেয়েছে!

ভোর হলো। হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠে বসল। দেখল বন্ধুরাও কেউ কেউ ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। মারিয়া তখনও ঘুমে। হ্যারি মারিয়ার ঘুম ভাঙাল না। ভালোমতো ঘুম আর বিশ্রাম রাজকুমারীর এখন অবশ্য প্রয়োজন।

বেলা হলো। ঢং ঢঙাস্ শব্দে কয়েদঘরের লোহার দরজা খুলে গেল। সকালের খাবার নিয়ে ঢুকল পাহারাদার সৈন্যরা। বন্দীদের হাতে বাঁধা দড়ি খুলে দেওয়া হলো। লম্বাটে সবুজ পাতায় গোল করে কাটা রুটি, আনাজের তরকারি আর মাংসের ঝোল। হ্যারি একটু অবাকই হলো—সকালের খাবারে এত কিছু! হ্যারিরা খাচ্ছে তখনই শুনল একজন পাহারাদার সৈন্য বলল, একটু পরেই তোমাদের সেভিল্লা নিয়ে যাওয়া হবে। পথে তেমন খাবার নাও জুটতে পারে। কাজেই যতটা পারো পেট পুরে খেয়ে নাও।

একটু বেলা হতেই ঢং ঢাং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। দলনেতা ভেতরে ঢুকল। গলা চড়িয়ে বলল, সবাই বেরিয়ে এসো। সবাইকে হেঁটে সেভিল্লা যেতে হবে। বাইরে গিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়াও।

হ্যারি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, চলো সবাই।

দু'জন ভাইকিং বন্ধু ঘাড় নাড়ল। একজন বলল, এখান থেকে আমরা যাবো না। এখানেই থাকবো। ফ্রান্সিস এখানে আছে। ওর সাহায্যেই আমরা মুক্ত হবো।

হ্যারি বলল, জেনো, ফ্রান্সিস সবসময় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। এখনই

বাইরে গেলে দেখবে ফ্রান্সিস বড় রাস্তায় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সেভিল্লো যাওয়ার পথে ফ্রান্সিস আত্মগোপন করে ঠিক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। হ্যারি থামল। পরে বলল, ফ্রান্সিস বলে গেছে আমরা যেন দলনেতার কথামতো চলি। এখন দলনেতার কথামতো সেভিল্লো যেতেই হবে। তার কথা না মানলে আমরাই বিপদে পড়বো।

সব বন্দী বাইরে এল। সার বেঁধে দাঁড়াল। দেখা গেল চারটে ঘোড়া আনা হয়েছে। হাতের খোলা তরোয়াল কোষবদ্ধ করে দলনেতা একটা ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। তিনজন সৈন্য বাকি তিনটে ঘোড়ায় উঠে বসল। দলনেতা তার সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা চারজন এই গুপ্তচরদের পাহারা দিয়ে সেভিল্লো নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা হুয়েনভা বন্দরে খুঁজে বের কর রাজা গার্সিয়ার গুপ্তচরদের। ধরতে পারলেই কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবে। আমি ফিরে এসে যা করার করবো।

দলনেতা ঘোড়া চালিয়ে একটু এগিয়ে গেল। তারপর হ্যারিদের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার পেছনে পেছনে এসো। হ্যারিরা এগিয়ে এল। তখনই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হ্যারিদের দেখতে দেখতে দলনেতা বলল, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল সে-ই তোমাদের নেতা। তাকে তো দেখছি না।

হ্যারি বলল, আমরা সবাই তো আছি। আপনি কার কথা বলছেন বুঝতে পারছি না।

দলপতি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, সে নিশ্চয়ই চালাকি করে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। চিন্তা নেই—আমরা ঠিক খুঁজে বের করবো। এবার চলো সবাই।

দলনেতা ঘোড়া চালাল। হ্যারিরা পেছনে পেছনে চলল। সবার পেছনে চলল তিনটি ঘোড়ায় তিনজন সৈন্য।

হুয়েনভা বন্দর শহর ছাড়িয়ে হ্যারিরা একটা টানা রাস্তায় পড়ল। বালি আর পাথরের টুকরো ছড়ানো রাস্তাটা বেশ চওড়া। এই রাস্তাটাই বোধহয় সেভিল্লা গেছে।

বেলা বাড়তে লাগল। রোদের তেজও বাড়তে লাগল। হ্যারিদের সবচেয়ে কষ্ট দিতে লাগল মাঝেমধ্যে ছুটে আসা জোর বাতাস। সঙ্গে ধুলোবালি উড়ে এসে গায়ে-মাথায় পড়ছে। এজন্যে ওদের চোখমুখ হাত দিয়ে ঢাকতে হচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। এভাবেই হ্যারিদের হাঁটতে হচ্ছে সেভিল্লার দিকে।

বেলা বাড়তে লাগল। রোদের তেজও বাড়তে লাগল। হ্যারিরা কাহিল হয়ে পড়ল। সেই সকালে খেয়েছে। তারপর এখনো পর্যন্ত একফোঁটা জলও খেতে পায়নি। সবচেয়ে কষ্ট হতে লাগল মারিয়ার। দু'হাত খোলা থাকলে কি হবে, এতক্ষণ হাঁটা, রোদের তেজ, ধুলো ওড়ানো দমকা হাওয়া—এত সব মারিয়া সহ্য

করতে পারছিল না। বেশ দুর্বল পায়ে সে হাঁটছিল। হ্যারি মারিয়ার কষ্ট বুঝতে পারল। কিন্তু মারিয়াকে কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। হ্যারি ভাবল, এক পাত্র জল খেতে পেলে মারিয়া আর বন্ধুদের কষ্ট একটু কমবে। সে দ্রুতপায়ে হেঁটে দলনেতার কাছে এল। বলল, আমাদের জলতৃষ্ণা পেয়েছে, জলের ব্যবস্থা করুন।

দলনেতা বলল, আর কিছুক্ষণ হাঁটলেই একটা গ্রাম পাওয়া যাবে। সেখানে ইঁদারা আছে। পেটভরে জল খেও।

হ্যারি কিছু বলল না। ফিরে এল বন্ধুদের কাছে। গলা চড়িয়ে বলল, ভাইসব, সামনেই একটা গ্রামে ইঁদারা আছে। জল পাওয়া যাবে।

হ্যারিরা হাঁটতে লাগল। হাঁটার গতি অনেকটা কমে গেছে। হ্যারি মারিয়াকে বলল, রাজকুমারী, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি।

মারিয়া হেসে বলল, ফ্রান্সিসও কি কম কষ্ট সহ্য করছে! ওর কথা ভেবেই আমি সব কষ্ট সহ্য করছি।

কিছুটা এগিয়েই একটা গ্রাম পাওয়া গেল। পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি ঘরদোর। পাঁচ-সাতটা বাড়ি নিয়ে গ্রাম। দলনেতার নির্দেশে হ্যারিরা গ্রামে ঢুকল। গ্রামটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা বড় ইঁদারা। গ্রামের বৌ-ঝিরা দড়ি বাঁধা কাঠের পাত্র ডুবিয়ে জল তুলছে। হ্যারিদের দেখে ওরা সরে দাঁড়াল। বিস্কো ইঁদারার ধারে গেল। কিন্তু দু'হাত তো বাঁধা! জল তুলবে কী করে! মারিয়া এগিয়ে এল। কাঠের পাত্র ইঁদারার ডুবিয়ে জল তুলতে লাগল। তৃষ্ণার্ত ভাইকিংরা দু'হাত পেতে অঞ্জলির মতো জল ধরে খেতে লাগল। গায়ে-মাথায় জল ছিটোতে লাগল। সাত-আট পাত্র জল তুলতেই মারিয়া হাঁপাতে লাগল। কয়েকজন ভাইকিং বাঁধা দু'হাত তুলে দলপতিকে বলল, আমাদের হাত খুলে দিন। রাজকুমারী একা সবাইকে জল খাওয়াতে পারবেন না। দলপতি দু'জন সৈন্যকে ইঙ্গিত করল। সৈন্য দুজন ঘোড়া থেকে নেমে ইঁদারার ধারে এল। কাঠের পাত্রে জল তুলে ভাইকিংদের জল খাওয়াল। নিজেরাও খেল।

আবার পথ চলা শুরু হলো। ছোট ছোট নুড়িপাথর আর ধুলোভর্তি রাস্তা। মাঝে মাঝেই দমকা হাওয়া বইতে লাগল। ধুলো উড়তে লাগল। হ্যারিদের তখন হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে হচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। হ্যারিদের মাঝে মাঝেই এরকম দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে বলেই চলার গতি কমে যাচ্ছে। এভাবেই চলল হ্যারিরা।

হ্যারিরা একটা জায়গায় এল। বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়া পাথরের চাই, ডান দিকে সবুজ ঘাসে-ঢাকা উপত্যকা মতো। হ্যারিরা কিছু বোঝবার আগেই একজন ভাইকিং বন্ধু চিৎকার করে বলে উঠল, আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি। কথাটা শেষ করেই বন্ধুটি দল থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর ছুটল ডান দিকের উপত্যকার ওপর দিয়ে।

দলপতি সঙ্গে সঙ্গে ভাইকিং বন্ধুর দিকে ঘোড়া ছোটাল। এতটা পথ হেঁটে হেঁটে ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত বন্ধুটি বাঁধা দু'হাত নিয়ে বেশি দূর যেতে পারল না। দলপতি ঘোড়া

ছুটিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাকে ধরে ফেলল। তরোয়াল কোষমুক্ত করে মুহূর্তে ঢুকিয়ে দিল বন্ধুটির পিঠে। বন্ধুটি মুখে একটা শব্দ করল। তারপর ঘাসে-ঢাকা জমির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল।

ঘটনাটা খুব দ্রুত ঘটে গেল। ভাইকিংদের চোখের সামনে। ওরা প্রথমে বুঝে উঠতে পারল না কী করবে। পরক্ষণেই শাঙ্কো চিৎকার করে উঠল, ও-হো-হো। সঙ্গে সঙ্গে ভাইকিং বন্ধুরাও চিৎকার করে উঠল, ও-হো-হো। প্রথমে শাঙ্কো ছুটে চলল দলপতির দিকে। পেছনে আরো কয়েকজন। হ্যারি বুঝল ভীষণ বিপদ। হ্যারি চিৎকার করে বলল, শাঙ্কো মাথা গরম করো না। কথা শোনো। বাঁধা হাত নিয়ে লড়াই হয় না। এভাবে লড়াইয়ে নামলে আমরা কেউ বাঁচবো না। ফিরে এসো।

ঘোড়ায় বসা দলপতিকে শাঙ্কো হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, আপনি আমাদের বন্ধুকে মারলেন কেন? ও তো ধরা পড়তই। তবে কেন ওকে মেরে ফেললেন?

দলপতি বলল, এইরকম মৃত্যু দেখে আর কেউ পালাতে যাবে না।

শাঙ্কো আর অন্য বন্ধুরা মৃত বন্ধুটির কাছে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তার মুখের দিকে চেয়ে কেঁদে ফেলল। অন্য বন্ধুদের চোখেও জল এল। ততক্ষণে হ্যারি ছুটে এসেছে। মৃত বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে হ্যারিও কেঁদে ফেলল। জলে-ভেজা চোখে দলপতির দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের নিরস্ত্র বন্ধুটিকে এভাবে হত্যা করলেন কেন? ও তো আপনাদের কাউকে আক্রমণ করেনি।

দলপতি বলল, ওসব বলে লাভ নেই। কাউকে পালাতে দেখলেই মেরে ফেলবো। চলো সব, দলে ঢোকো।

—না, বন্ধুটির শেষকৃত্য না করে আমরা যাবো না। হ্যারি বলল।

দলপতি খোলা তরোয়াল শূন্যে ঘুরিয়ে বলল, সবাই দলে যাও। আজ সন্ধের আগেই আমাদের সেভিল্লে পৌঁছতে হবে।

হ্যারি চেঁচিয়ে বলল, না, আমাদের মৃত বন্ধুকে ফেলে আমরা যাবো না।

সব ভাইকিং বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল, ও-হো-হো।

দলপতি ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, আমি যা বলবো তাই মানতে হবে। নইলে সবকটাকে মেরে ফেলবো।

শাঙ্কো, বিস্কো ছুটে দলনেতার সামনে এল। শাঙ্কো চিৎকার করে বলল, মারুন আমাদের।

সব ভাইকিং বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল, ও-হো-হো।

দলপতি বেশ ঘাবড়ে গেল। বুঝল, এরা এত ক্রুদ্ধ হয়েছে যে মরবে জেনেও খালি হাতে তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতেও ইতস্তত করবে না। তারা মাত্র চারজন। কেউই রেহাই পাবে না।

দলপতি ডান হাত ওঠাল। ভাইকিংদের চিৎকার-চেঁচামেচি বন্ধ হলো। দলনেতা বলল, তোমরা কী চাও?

হ্যারি বলল, আমরা আমাদের মৃত বন্ধুর শেষকৃত্য করে তবে যাবো।

—তার মানে বন্ধুকে কবর দিয়ে যাবে, এই তো? দলপতি বলল।

—হাঁ। তার আগে আমরা এখান থেকে নড়বো না। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে, কোথায় কবর দেবে দেখ। দলনেতা বলল।

ভাইকিং বন্ধুরা এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল এমন জায়গা যেখানে মাটি না খুঁড়েও পাথর চেপে সাজিয়ে কবর দেওয়া যায়। ভাইকিংরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল।

দলনেতা চিৎকার করে বলে উঠল, কেউ পালাবার চেষ্টা করলে বন্ধুর দশা হবে।

একজন ভাইকিং হ্যারিকে ডেকে বলল, হ্যারি, এই জায়গাটা দেখ তো। হ্যারি সেদিকে গেল। দেখল জায়গাটা ছোট গুহার মতো। হ্যারি ভেবে দেখল এখানে কবর দেওয়া যেতে পারে। সে শাঙ্কোদের বলল সে কথা। শাঙ্কোরা পাঁচ ছ'জন মিলে গেল বন্ধুর মৃতদেহের কাছে। দেহটা কাঁধে করে নিয়ে এসে আস্তে আস্তে গুহার কিছুটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। হাতে হাতে পাথরের বড় বড় টুকরো এনে মৃতদেহের ওপর চাপিয়ে দিল। বন্ধুর কবরের দিকে তাকিয়ে অনেকেই কেঁদে ফেলল। এই বিদেশে এক অপরিচিত পরিবেশে ওরা এক বন্ধুকে হারাল। তখনই হ্যারি শুনল ফ্রান্সিসের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, হ্যারি, তোমরা কোনো কিছুর প্রতিবাদ করো না। হ্যারি বুঝল ঐ ঝুঁকে পড়া পাথরের চাঙড়ের ওপাশ থেকেই কথাটা ভেসে এল। হ্যারি চিৎকার করে ওদের দেশীয় ভাষায় বলল, ভাইসব, ফ্রান্সিস আমাদের কাছাকাছিই আছে। কোনো ভয় নেই। ভাইকিং বন্ধুরা ধ্বনি তুলল, ও-হো-হো। দলপতি হ্যারির কথা কিছুই বুঝল না। ওরা কেন ধ্বনি তুলল তাও বুঝল না।

ফ্রান্সিস আবার চাপাস্বরে বলল—বন্ধুর মৃত্যুতে আমিও শোকাহত। কেঁদেছি। এখন তোমাদের উত্তেজিত হওয়া চলবে না। এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করে বুদ্ধি দিয়ে সব ভাবতে হবে। তারপর পালাতে হবে।

ওদিকে কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে হ্যারিরা যখন রাজা ফার্নান্দোর দলপতি ও তিনজন সৈন্যের পাহারায় সেভিল্লোর দিকে যাত্রা শুরু করল, তখন থেকেই কিছুটা দূরত্ব রেখে ফ্রান্সিসও ওদের পেছনে পেছনে আসতে লাগল।

রাস্তায় সেভিল্লো থেকে আসা লোকজন ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে আসছে দেখা গেল। এদিক থেকেও লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া যাচ্ছে।

রাস্তা দিয়ে বেশ কিছুটা আসার পর ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল একটি লোক হ্যারিদের থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে হেঁটে চলেছে। লোকটি কখনো হ্যারিদের দলের কাছে যাচ্ছে না বা ওদের পার হয়েও যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস বুঝল লোকটি ওর মতোই এই বন্দী দলকে অনুসরণ করছে। লোকটির পরনে চাষীর পোশাক। গায়ে ঢোলাহাতা জামা। ফ্রান্সিস বুঝল ঐ লোকটির কোনো বন্ধু বা আত্মীয় এই বন্দীদের মধ্যে রয়েছে। একবার ভাবল লোকটির সঙ্গে পরিচিত হবে। জানবে সে এই বন্দীদের

পেছনে পেছনে যাচ্ছে কেন। পরক্ষণেই ফ্রান্সিস ভাবল আরো কিছুদূর যাই। দেখি ও আমার মতোই বন্দীদের অনুসরণ করছে কিনা।

বন্দীর দল চলেছে। নিরাপদ দূরত্ব রেখে ফ্রান্সিসও চলেছে।

হ্যারিরা থেমে যে গ্রাম থেকে জল খেল, ফ্রান্সিসও সেখানে জল খেল। ও কিছুটা জলে মাথা ভেজাল, হাতমুখ ধুল। কাঁধে গলায় যখন জল ছিটিয়ে দিচ্ছে তখনই দেখল সেই সাদা ঢোলাহাতা জামাপরা লোকটা ইঁদারার ধারে এল। ফ্রান্সিস এবার ভালো করে লোকটাকে দেখল। লোকটা বয়েসে ফ্রান্সিসের চেয়ে ছোট। ফ্রান্সিস জল তোলার পাত্রটা লোকটির হাতে দিয়ে বলল, যা গরম, কিছুতেই তেষ্টা মিটছে না। লোকটি বলল, ঠিকই বলেছেন। চড়া রোদ, ধুলোবালির ঝাপটা, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস আর কোনো কথা বলল না। তৃষ্ণার্ত লোকটা আগে জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটাক। লোকটা প্রথমে পাত্রের জল সমস্তটাই মাথায়-ঘাড়ে ঢালল। আবার জল তুলল। কপাল-মুখ ধুয়ে ঢক ঢক করে জল খেল। আবার জল তুলে খেল। সবটা জল খেতে পারল না। জামার বোতাম খুলে গলায় বুকে জলটা ছিটিয়ে দিল।

ফ্রান্সিস এবার বলল, তুমিও কি সেভিল্লা যাচ্ছো?

—হ্যাঁ। লোকটি বলল। তারপরে ফ্রান্সিসকে আর ওর পোশাক দেখে বলল, মনে হচ্ছে তুমি বিদেশী।

—হ্যাঁ। বলল ফ্রান্সিস।

—তোমাদের দেশ কোথায়? লোকটি জিজ্ঞেস করল।

—আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি! তোমাদের জাহাজ চালানোর দক্ষতার কথা, বীরত্বের নানা কাহিনী আমরা শুনেছি।

ফ্রান্সিস বলল, চলো রাস্তায় নামি। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাবে।

বেশ, চলো। লোকটি বলল।

দু'জনে রাস্তায় এল। ফ্রান্সিস দেখল হ্যারিরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল, ভাই, একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও। কথাটা বলে ফ্রান্সিস জোরে হাঁটতে লাগল। লোকটিও ফ্রান্সিসের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে লাগল।

একটু পরেই দু'জনে বন্দীর দলের কাছাকাছি এল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটিও দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'জনেই বেশ হাঁপাচ্ছে তখন।

আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে লোকটি বলল, দেশ ছেড়ে এই স্পেনে এসেছো কেন?

—নানা দেশে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে তাই। ফ্রান্সিস বলল।

—সেভিল্লা যাচ্ছো কেন?

—দেখ, ঐ বন্দী দলে আমার ভাইকিং বন্ধুরা রয়েছে। ওদের বিচারের জন্যে সেভিল্লায় রাজা ফার্নান্দোর দরবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি যাচ্ছি যদি কোনো

উপায়ে বন্ধুদের মুক্ত করা যায় তার জন্যে।

আমার ব্যাপারটাও তাই। লোকটি বলল, তুমি বন্ধুদের উদ্ধার করতে যাচ্ছো, আমি শুধু আমার বাবাকে মুক্ত করতে যাচ্ছি।

আগে তোমার নামটা বলো, তারপর সমস্ত ঘটনাটা বলো তো। ফ্রান্সিস বলল।

লোকটি বলল, আমার নাম বারাকা। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে গেলে এই দক্ষিণ স্পেনের কিছুটা ইতিহাস তোমায় বলতে হয়। একটু থেমে বারাকা বলতে লাগল, প্রায় একশো বছর আগে এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন খলিফা ইবন আবি আমীর। তাঁর রাজত্বে রাজধানী ছিল কারডোভা। সেভিল্লা থেকে বেশ কিছুটা দূরে। খলিফা ইবন আবি আমীর কারডোভা থেকে কিছুদূরে নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। বারাকা থামল। তারপর বলতে লাগল, খলিফা বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন। আমাদের একজন পূর্বপুরুষ তাঁর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। উত্তর স্পেনের এক রাজা কারডোভা আক্রমণ করছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে খলিফা নিহত হন। তখন জয়ী রাজা খলিফার ধনভাণ্ডারের খোঁজ করেন। কিন্তু কয়েক বছর ধরে রাজা আর তাঁর অমাত্যরা পুরোনো প্রাসাদ, নতুন প্রাসাদের কোষাগার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই পাননি। বারাকা থামল।

—তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের পূর্বপুরুষ বিপদ আঁচ করে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেন। খলিফা আমীরের ধনসম্পদের খোঁজও পেল না কেউ। বারাকা থামল।

—আচ্ছা, মৃত্যুর পূর্বে খলিফা কি কাউকে বলে গিয়েছিলেন তাঁর ধনসম্পদ তিনি কোথায়, কার জন্যে রেখে যাচ্ছেন? ফ্রান্সিস বলল।

—না, খলিফা আমীর কাউকে কিছু বলে যাননি।

—কোনো চিহ্ন, কোনো-নকশা, কোনো চিঠি? ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল।

—না, ওসব কিছুই কেউ পায়নি। বারাকা বলল।

ফ্রান্সিস দ্রুত চিন্তা করতে লাগল—খলিফা আমীর কোথায় গোপনে রেখে যেতে পারেন তাঁর ধনসম্পদ? আচ্ছা, এও তো হতে পারে—ফ্রান্সিস ভাবল, ধনসম্পদ যেখানে থাকার কথা সেখানেই রেখে গেছেন অর্থাৎ রাজকোষাগারে। কিন্তু কোনো রাজপ্রাসাদের কোষাগারে? নতুন যে প্রাসাদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন, না পুরনো রাজপ্রাসাদ? ফ্রান্সিস ভেবে দেখল এটা একটা অনুমান মাত্র। সঠিক বুঝতে গেলে পুরনো নতুন দুটো রাজপ্রাসাদই খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

দু'জনে হাঁটতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল, তোমার বাবাকে বন্দী করা হয়েছে কেন?

আমাদের পূর্বপুরুষ আমীরের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। রাজা ফার্নান্দোর কেমন বিশ্বাস হয়েছে ইবন আবি আমীর নিশ্চয়ই আমাদের পূর্বপুরুষকে কোনো সঙ্কেত-নকশা বা সূত্র দিয়ে গেছেন তার গুপ্তধনের।

—সত্যি কি তোমাদের পুরুষানুক্রমে সংগৃহীত জিনিসের মধ্যে তেমন কিছু



আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—কিচ্ছু না। রাজা ফার্নান্দোর এই দলপতি আমাদের হুয়েনভার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কিছুই পায়নি। এবার সেভিল্লায় আমাদের বাড়ি তল্লাশি হবে। জানি না কিছু না পেলে বাবাকে মুক্তি দেবে কিনা। বারাকা বলল।

ফ্রান্সিস বলল, বুঝলে বারাকা, সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে চিন্তা করতে হবে। কিছু কিছু জায়গা দেখতে হবে। তবেই আমি বলতে পারবো খলিফা ইবন আবি আমীরের গুপ্ত ধনভাণ্ডারের হদিস পাওয়া যাবে কিনা।

বিকেল হলো। রোদের তেজ কমল। দলপতি হ্যারিদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিল, তোমরা বাঁ দিকের ঐ জঙ্গলটার কাছে বসে বিশ্রাম নাও। আমি একটু গ্রামটা ঘুরে আসি। হুকুমমতো হ্যারিরা রাস্তা থেকে নেমে চলল জঙ্গলটার দিকে। জঙ্গলের গাছের ছায়ায় বসল হ্যারিরা। কেউ কেউ ঘাসের জমিতে শুয়ে পড়ল। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়-পথশ্রমে ক্লান্ত হ্যারিরা বিশ্রাম করতে লাগল।

কয়েকটা কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি বাড়ি। ওটাই একটা গ্রাম। দলপতি ঐ বাড়িগুলোর কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল। প্রথম যে বাড়িটা পড়ল তার দরজায় আঙুল দিয়ে টোকা দিল। দরজা খুলে গেল। দেখা গেল একজন বুড়ি দাঁড়িয়ে। বুড়ি ফোকলা মুখে হাসল। বলল, কী চাইছেন?

দলনেতা বলল, রান্না করা কিছু খাবার আছে?

—রান্না করা খাবার তো দুপুরেই খাওয়া হয়ে গেছে। বুড়ি বলল।

—পিঠে-টিঠে এমন কিছু নেই? দলনেতা জিগ্যেস করল।

—হ্যাঁ, আছে। আজকে আমার নাতির জন্মদিন। তাই বেশ কিছু পিঠে তৈরি করেছি। গাঁয়ের লোকজনকে নেমন্তন্ন করেছি। বুড়ি বলল।

—পিঠে কোথায়? নিয়ে এসো। দলপতি বলল।

বুড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকল। একটু পরে একটা কাঠের পাত্রে পিঠে নিয়ে এল। দলনেতা আট-দশটা পিঠে ওখানে দাঁড়িয়েই খেয়ে নিল। তারপর জামার হাতার ভেতর থেকে একটা রুমাল বের করে বেশ কিছু পিঠে রুমালে বেঁধে নিল। বাড়িটার বাইরে এসে ঘোড়ায় উঠে সে আবার জঙ্গলটার কাছে ফিরে এল। এসে অন্য সৈন্যদের হাতে পিঠে-বাঁধা রুমালটা দিল। দলপতি নিজে ও সৈন্যরা পিঠে খেতে লাগল।

হ্যারিরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওদের পিঠে খাওয়া। পিঠে খাওয়া শেষ করে দলপতি হাত ঝাড়ল। হ্যারি আশা করেছিল হয়তো এক-আধটা পিঠে ওদের দেবে। হ্যারি নিজের জন্যে চায় না। ক্ষুধার্ত মারিয়ার কষ্টের কথাই ভাবছিল।

ফ্রান্সিস আর বারাকা দূর থেকে দলপতি আর সৈন্যদের পিঠে খাওয়া দেখল। বারাকা বলল, চলো ঐ বাড়িটায়। কিছু খাবার নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

ফ্রান্সিস বলল, বারাকা, আমার বন্ধুরা এখনও উপবাসী। আমি কিছু খাবো না।

তুমি খেয়ে এসো।

বারাকা তখন ক্ষুধায় অস্থির। ও ছুটল সেই বাড়িটার দিকে, যে বাড়িটায় দলপতি ঢুকেছিল। ফ্রান্সিস রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে বারাকা রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে এল। হেসে বলল, এক বুড়ি তার নাতির জন্মদিনের অনুষ্ঠানের জন্যে পিঠে তৈরি করে রেখেছিল। দলপতি অনেক পিঠে খেয়েছে, নিয়েও এসেছে। বাকি পিঠেগুলো আমিই সাবাড় করে এলাম।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। পিঠে খেয়ে পরিতৃপ্ত দলপতি ও সৈন্যরা ঘোড়ায় উঠল। দলপতি গলা চড়িয়ে বলল—এবার চলো সবাই। শাঙ্কোরা সকলেই বনের কাছে ঘাসের ওপর শুয়ে বসেছিল।

শাঙ্কো দলপতিকে বলল—আমরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। এখনও খাওয়া জোটে নি। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যাবো।

—না-না—দলপতি মাথা নেড়ে বলল—আমাদের তাড়াতাড়ি সেভিল্লানগরে পৌঁছতে হবে।

—তাহলে আপনারা আগে সেভিল্লানগরে চলে যান। আমরা পরে যাচ্ছি। বিস্কো বলল।

—ইয়ার্কি হচ্ছে—না? দলপতি বলল—এক্ষুনি তরোয়ালের এক ঘায়ে মাথা উড়িয়ে দিতে পারি।

—তা পারেন। আমাদের বন্ধুকেও মেরেছেন—এজন্যে আপনার মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। বেশ তারিয়ে তারিয়ে পিঠে খেলেন। শাঙ্কো বলল।

—ভালো করেছি—দলপতি বলল। তারপর বলল—ঠিক আছে আর আধঘণ্টা সময় দিচ্ছি। তারপর আর দেরি করা চলবে না। সেভিল্লানগরে যেতে হবে।

—বেশ—তাই হবে। শাঙ্কো বলল।

আসলে শাঙ্কো চাইছিল আরো অন্ধকার নামুক।

চারদিক অন্ধকার হয়ে এল।

এবার শাঙ্কো হ্যারির কাছে এল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল—আমার গলার কাছে জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আমার ছোরাটা বের করো। শাঙ্কো বলল—ছোরা ঘষে ঘষে আমার হাতে বাঁধা দড়িটা কাটো।

হ্যারি ছোরাটা কোনরকমে ধরে শাঙ্কোর হাতে-বাঁধা দড়িটা ঘষে ঘষে কাটতে লাগল। একটু পরেই দড়ি কেটে গেল। শাঙ্কো এবার ছোরাটা হাতে নিল। তারপর অন্ধকারের মধ্যে সবাইর হাতের দড়ি কাটল।

তখনই দলপতি চেঁচিয়ে বলে উঠল—অনেক বিশ্রাম হয়েছে—এবার ওঠো চলো।

অন্ধকারের মধ্যে শাঙ্কো বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল দলপতির ঘোড়াটার কাছে। দলপতি কিছু বোঝার আগেই শাঙ্কো ছোরার এক পোঁচে ঘোড়ার জিন-এর চামড়ার

ফিতেটা কেটে ফেলল। জিন খুলে মাটিতে পড়ে গেল। দলপতিও মাটিতে ছিটকে পড়ল। শাঙ্কো এক লাফে দলপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর দ্রুত ছোরাটা দলপতির বুকে বসিয়ে দিল। দলপতির গলা থেকে শব্দ হল—আঁক। দলপতি বারকয়েক মাথা এপাশ ওপাশ করে স্থির হয়ে গেল। দলপতি মারা গেল। ছোরাটা খুলে নিয়ে ছোরাটা ডানহাতে উঁচু করে ধরে শাঙ্কো চিৎকার করে উঠল—বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ নিলাম। ভাইকিং বন্ধুরা চিৎকার করে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো।

শাঙ্কো অন্ধকারের মধ্যে চিৎকার করে বলল—বিস্কো—ফ্রেজার—বাকি সৈন্যদের আহত কর। পালাতে দিও না। দলপতির হাত থেকে ছিটকে পড়া তরোয়ালটা বিস্কো তুলে নিল। ছুটল একজন সৈন্যের দিকে। সৈন্যটি তরোয়াল চালাবার আগেই বিস্কো সৈন্যটির উরুতে তরোয়ালের ঘা বসাল। সৈন্যটি লাফিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে গেল। আহত উরু ধরে ও গোঙাতে লাগল।

ওদিকে সাত-আটজন ভাইকিং একটা সৈন্যকে ঘিরে ফেলল। সৈন্যটি ঘোড়ার দু'পা উঁচু করাতে লাগল। ভাইকিংরা সরে সরে যেতে লাগল। এবার বিস্কো তরোয়াল হাতে ছুটে এসে ঘোড়াটার কোমরে তরোয়ালের কোপ বসাল। ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল। সৈন্যটি ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল।'

অন্য সৈন্যটি অবস্থা বেগতিক দেখে জোরে ঘোড়া ছোটাল। কয়েকজন ভাইকিংও ছুটল ঘোড়াটার পেছনে পেছনে। কিন্তু ঘোড়ার দ্রুত গতির সঙ্গে ভাইকিংরা পারবে কেন? অল্পক্ষণের মধ্যেই সৈন্যটি ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল।

অন্ধকারে হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—আমরা এখনও বিপদমুক্ত নই। যে সৈন্যটি পালিয়ে গেল সে নিশ্চয়ই সেভিল্লায় গিয়ে সংবাদ দেবে। আরও সৈন্য আমাদের আক্রমণ করতে আসবে। এখন আমরা কী করবো সেটা ভেবে ঠিক করতে হবে।

শাঙ্কো বলল—এখন আমরা তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত। বেশি দূর যেতে পারবো না। এই বনের মধ্যেই আমরা আত্মগোপন করে থাকবো।

—কিন্তু ঐ সৈন্যটি সেভিল্লা গেল। ওদের সেনাপতি সৈন্যদের নিশ্চয়ই এখানে নিয়ে আসবে। এবার ওরা চারদিকে আমাদের খুঁজে বেড়াবে। এই জঙ্গলেও ওরা নিশ্চয়ই তল্লাশি চালাবে। আমরা আবার ধরা পড়বো। হ্যারি বলল।

—কিন্তু এখন এই বনে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় দেখছি না। তারপর ভাগ্যে যা আছে হবে। শাঙ্কো বলল।

হ্যারি বলল—আমরা সারাদিন কিছু খাই নি। তিনটে ঘোড়া আমরা পেয়েছি। ঘোড়ায় চড়ে সেভিল্লা থেকেই হোক বা অন্য গ্রাম ট্রাম থেকেই হোক—কিছু খাবার আর জলের ব্যবস্থা তো করতে হয়।

—ঠিক আছে। আমি বিস্কো আর পেড্রো যাবো খাবার আর জলের খোঁজে। তোমরা বনের মধ্যে ঢুকে পড়ো। শাঙ্কো বলল।

হ্যারিরা বনের মধ্যে ঢুকে গেল। অন্ধকারে গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে চলল। বন খুব ঘন না। ছাড়া ছাড়া ওক গাছ চেস্টনাট গাছ। লতাপাতা। বড় বড় ফার্ন গাছ। একটা ফাঁকে জায়গা পেয়ে হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—তোমরা এখানেই বসো। শাঙ্কোদের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। সবাই ঘাসে ঢাকা মাটিতে বসল। কয়েকজন শুয়েও পড়ল।

হ্যারিও বসল। শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে। হ্যারি হাত পা ছেড়ে শুয়ে পড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তখনই হঠাৎ দেখল উত্তরদিকে কিছু গাছগাছালির পরেই একটা টিলামত। হ্যারি উঠে পড়ল। ডাকল—ফ্রেজার। ফ্রেজার এগিয়ে এল। হ্যারি বলল—দ্যাখো তো ওটা কী? ফ্রেজারও অন্ধকারের মধ্যে উঁচু টিলামত দেখল। বলল—মনে হচ্ছে টিলা। খুব বড় নয়।

—চলো তো—দেখে আসি। হ্যারি বলল।

—টিলা দেখে কী হবে। ফ্রেজার বলল।

—ভুলে যেও না আমরা বন্দীদশা থেকে পালিয়েছি। এখনও আমাদের জীবন নিরাপদ নয়। প্রয়োজনে লুকিয়ে আশ্রয় নিতে পারি এমন জায়গা ওটা কিনা দেখতে হবে। চলো। হ্যারি বলল।

হ্যারি আর ফ্রেজার চলল টিলাটার দিকে। কাছে এসে অন্ধকারেও দেখল টিলাটা কালো ছায়ার মত। ফ্রেজার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিলাটা দেখতে লাগল। হ্যারি টিলাটা চারদিক থেকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। পশ্চিম দিকে দেখল টিলাটির মধ্যে একটা ছোটমুখ গুহার মত। হ্যারি গুহামুখে এসে দাঁড়াল। দেখল ছোট গুহামুখ দিয়ে একজন মানুষ হামা দিয়ে ঢুকতে পারে। কিন্তু কতদূর ঢুকে যেতে পারবে তা বোঝা যাচ্ছে না। হ্যারি বলল—ফ্রেজার—গুহার ভেতরে একটু যেতে পারবে?

—এটা না পারার কী আছে। ফ্রেজার বলল। তারপর এগিয়ে গেল গুহাটার দিকে। হামা দিয়ে গুহাটার ভেতরে ঢুকল। তখনই ঝট্‌পট্‌ শব্দ তুলে একপাল চামচিকে গুহাটা থেকে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক পালাতে লাগল। প্রথমে ফ্রেজার চমকে উঠল। পরক্ষণে একটু পিছিয়ে এসে গুহা মুখটা খোলা রাখল। চামচিকেগুলোরও বেরিয়ে আসতে অসুবিধে হল না।

এবার ফ্রেজার হামা দিয়ে ঢুকল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে হামা দিয়ে চলল। হঠাৎ ওর মনে হল এখন গুহাটা বড় লাগছে। ফ্রেজার উঠে দাঁড়াল। বুঝল গুহার মুখটাই ছোট। ভেতরটা অনেক বড়।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে ফ্রেজার পাথুরে দেয়ালে হাত বুলোতে বুলোতে এগিয়ে চলল। হঠাৎ সামনে মনে হল নিরেট পাথর। ফ্রেজার হাত বাড়িয়ে দেখল এবড়ো খেবড়ো পাথরের দেয়াল যেন। ফ্রেজার বুঝল গুহাটা এখানেই শেষ।

ফ্রেজার ফিরে চলল। হামা দিয়ে গুহামুখ থেকে বের হল। তখন ও বেশ হাঁপাচ্ছে। হ্যারি এগিয়ে এল। বলল—কী দেখলে?

—কিছুই না—একটা লম্বা বড় গুহা। মুখটা ছোট হলে কি হবে ভেতরটা বেশ বড়। অনায়াসে হেঁটে এগোনো যায়। কিছুদূর গিয়ে গুহাপথ শেষ। সামনে নিরেট পাথুরে দেয়াল। ফ্রেজার বলল।

দু'জনে বন্ধুদের কাছে ফিরে এসে বসল। বন্ধুরা জানতে চাইল হ্যারিরা কোথায় গিয়েছিল। হ্যারি টিলার কথা গুহার কথা বলল।

ওদিকে শাঙ্কো বিস্কো আর পেড্রো বড় রাস্তা ধরে ঘোড়ায় চড়ে চলল। কতকটা আন্দাজেই সেভিল্লানগরের দিকে চলল।

পাশে তিনটে গ্রাম পেল। বাড়িঘর ঘোর অন্ধকার। এসব গ্রামে একসঙ্গে অত খাবার দাবার পাওয়া যাবে না।

একসময় সেভিল্লানগরে এসে ওরা পৌঁছল। নগরের নির্জন পথে পথে কোথাও কোথাও মশাল জ্বলছে। বাড়িঘরদোরে আলোর চিহ্নও নেই। সবাই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। শাঙ্কো একটা সরাইখানা খুঁজছিল। ওদের কপাল ভালো। একটা সরাইখানা পেল। সরাইখানার মধ্যে মোমবাতির আলো জ্বলছে।

ওরা সরাইখানার বন্ধ দরজার সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল। কাঠের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিল। দরজা খুলে গেল। মোমবাতির আলোয় দেখা গেল পাকা দাড়িগোঁফওয়ালা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে দাঁড়াল। শাঙ্কো এগিয়ে গেল। বলল—দেখুন—আমরা খুব দূর থেকে আসছি। আমাদের বন্ধুরা সেভিল্লার বাইরে অপেক্ষা করছে। আমরা ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত পরিশ্রান্ত। আমাদের জন্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন?

—নিশ্চয়ই পারবো। আপনারা ভেতরে আসুন। প্রৌঢ় বলল। শাঙ্কোরা সরাইখানার মধ্যে ঢুকল। দেখল—কয়েকজন লোক একতাল ময়দা ঠাসছে। রুটি হবে। এবার প্রৌঢ় বলল—আপনারা সংখ্যায় ক'জন?

—ছাব্বিশ জন। বিস্কো বলল।

—ঠিক আছে। এই ময়দা দিয়ে কালকে সকালের জন্যে রুটি তৈরি হবে। এখন আমরা দোকানের সেই খাবার করবো না। আপনাদের জন্যে রুটি করে দেব। লোকটি বলল।

—রুটির সঙ্গে মাংস করে দিতে পারেন? বিস্কো বলল।

—মাংস রাঁধতে দেরি হবে। আপনারা ক্ষুধার্ত। বেশি দেরি করা চলবে না। আলু আর আনাজপত্র দিয়ে একটা খাবার করে দিচ্ছি। এটা খুব তাড়াতাড়ি হবে।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল। তারপর তিনজনে টানা কাঠের বেঞ্চে বসল।

প্রথমে রাঁধুনিরা রুটি তৈরি করল। একটা বুনো লতা দিয়ে তৈরি বেশ বড় ঝুড়িতে রুটি রাখল। এবার আলু আনাজপত্র দিয়ে তরকারিমত করল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল তরকারির ঝোলটা কমাও। ঘোড়ার পিঠে করে নিয়ে যেতে হবে। চল্‌কে না পড়ে।

রাঁধুনিরা কিছুক্ষণ তরকারিটা ফুটিয়ে ঝোল কমিয়ে আনল।

এবার শাঙ্কো প্রৌঢ় দোকানির কাছে এল। কোমরের ফেট্টি থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে প্রৌঢ় দোকানদারকে দিল। বলল—এবার আমাদের এক পীপে জল দিন। প্রৌঢ় রাঁধুনিকে বলল—এক পীপে জলের ব্যবস্থা কর। একজন রাঁধুনি চলে গেল।

শাঙ্কো প্রৌঢ়কে বলল—ঐ রুটির ঝুড়ি তরকারি রাখার কাঠের পাত্র আর জলের পীপে—সব আমরা নিয়ে যাবো। ফেরৎ দিতে পারবো কিনা—বলতে পারছি না। তবে স্বর্ণমুদ্রা দিলাম। এতেই আপনার সবকিছুর দাম উঠে যাবে। প্রৌঢ় খুশির হাসি হাসল।

এবার রাঁধুনি জলভরা পীপে নিয়ে এল। শাঙ্কোরা দোকানের বাইরে এল।

ওরা একটা ঘোড়ার পিঠে রুটির ঝুড়িটা রাখল। বিস্কো ঘোড়াটার পিঠে উঠে রুটির ঝুড়িটা ধরল। পেড্রো নিল জলের পীপেটা। ঘোড়ার পিঠে উঠে পীপেটা বাঁ হাতে চেপে ধরে ডানহাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে রইল। শাঙ্কো অন্য ঘোড়াটায় উঠল। রাঁধুনিকে ডাকল। রাঁধুনিদের একজন এল। শাঙ্কো বলল—তরকারির কাঠের পাত্রটা তুলি দিতে। রাঁধুনি পাত্রটা শাঙ্কোর হাতে তুলে দিল।

তিনজনে খাবার আর জল নিয়ে অন্ধকারে সদর রাস্তা দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ চলার পর পেড্রো বলল—এভাবে চললে তো পৌঁছোতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

—উপায় নেই। এর চেয়ে জোরে ঘোড়া ছোটালে সব ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে আস্তে আস্তেই চলা যাক। বিস্কো বলল।

ওরা ঘোড়ার গতি বাড়াল না। ঘোড়া চলল ঠুক্ ঠুক করে।

সেভিল্লা নগর শেষ হল। তখনই আকাশে চাঁদ দেখা গেল। জোছনা অনুজ্জ্বল। সামনেই টানা রাস্তা চলে গেছে। সবকিছুই অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ওরা রাস্তা ধরে ঘোড়া চালাল। কিন্তু গতি বাড়াল না।

একটু দেরিই হল। শাঙ্কোরা সেই জঙ্গলের কাছে পৌঁছাল। ঘোড়া থেকে নামল। খাবার আর জলের পীপে নিয়ে ওরা বনে ঢুকল। খুব ঘন বন নয়। এখানে ওখানে অস্পষ্ট জ্যোছনা পড়েছে।

হঠাৎ শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—নিঃশব্দে এগোলে বন্ধুরা আমাদের শত্রু ভাবতে পারে। কাজেই হ্যারির নাম ধরে ডেকে ডেকে এগোতে হবে।

তিনজন আবার চলল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে ডাকল—হ্যারি—হ্যারি। বিস্কোও ডাকল—হ্যারি। ডাকতে ডাকতে একটু পরেই হ্যারির ডাক শুনল—শাঙ্কো—তোমরা এদিকে এসো।

হ্যারির ডাক শুনে অন্ধকারে দিক আন্দাজ করে শাঙ্কোরা হ্যারিদের কাছে এল। শাঙ্কো বলল—আগে সবাইকে জল খেতে দাও। জলের পীপেটা মাটিতে

নামিয়ে কাঠের গ্লাসগুলো বিস্কো নিল। পীপের ছিপি খুলে গ্লাস গ্লাস জল সবাইকে দিতে লাগল। তৃষ্ণার্ত ভাইকিং বন্ধুরা জল খেয়ে যেন নতুন জীবন পেল। শাঙ্কো চেঁচিয়ে বলল—সবাই শুকনো পাতা নিয়ে এসো। পাতাগুলো একত্র করে থালার মত বানাও। তারপর রুটি তরকারি নিয়ে খাও। সবাই জঙ্গলের এদিক ওদিক গিয়ে শুকনো বড় পাতা কুড়িয়ে আনল। লাইন দিয়ে বসল। হ্যারি বলল—শাঙ্কো তোমরাও খেতে বসো। আমি আর ফ্রেজার তোমাদের খেতে দিচ্ছি। তোমরা এখন ক্লান্ত।

হ্যারি আর ফ্রেজার সবাইকে রুটি তরকারি দিতে লাগল। মারিয়া কিন্তু খেতে বসল না ক্ষুধার্ত ভাইকিং বন্ধুরা খেতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলের খাওয়া হয়ে গেল। রুটি তরকারি জল খেয়ে ভাইকিং বন্ধুরা তৃপ্ত হল। গায়ে নতুন শক্তি পেল যেন। এবার মারিয়া এগিয়ে এল। বলল—হ্যারি তোমরা খেতে বসো। হ্যারি আর ফ্রেজার খেতে বসল। মারিয়া ওদের খাবার এগিয়ে দিল। দু'জন খেতে লাগল। দু'জনের খাওয়া হতে মারিয়া খেতে বসল।

খাবার ও জল খেয়ে পরিতৃপ্ত ভাইকিংরা ঘাসে ঢাকা মাটিতে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু হ্যারি জেগে রইল। ওর মন বলতে লাগল এখনও বিপদ কাটেনি। একজন সৈন্য পালিয়েছে। ও সেভিল্লা গিয়ে নিশ্চয়ই সেনাপতিকে সব কথা বলবে। সেনাপতি অনেক সৈন্য নিয়ে এই বনের ধারে চলে আসবে। দেখবে—দলপতি মারা গেছে আর দু'জন সৈন্য আহত হয়ে পড়ে আছে। সেনাপতি সবই বুঝবে। বনে ঢুকে ওদের তল্লাস করবে। ওদের পেলে সেনাপতি কোনো কথা শুনবে না। সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করবে।

এসব ভাবতে ভাবতে হ্যারির একটু তন্দ্রা এসেছিল। তখনই বনের দক্ষিণ দিকে অনেক ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেল। জেগে থাকা হ্যারি চমকে উঠল। ডাকল—শাঙ্কো—বিস্কো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। চাঁদের আলোয় দেখল—সবাই ঘুমিয়ে আছে।

শাঙ্কো বুঝল—আক্রমণ হবেই। ঘুম ভেঙে শাঙ্কো বিস্কো হ্যারির কাছে এল। শাঙ্কো বলল—হ্যারি—আমি দক্ষিণদিকে যাচ্ছি। বনের আড়াল থেকে দেখে আসি—ঘোড়ায় চড়ে কারা আসছে।

—যাও—তবে খুব সাবধানে। হ্যারি বলল।

শাঙ্কো চলে গেল। হ্যারিদের কথাবার্তার শব্দে অনেকেরই ঘুম ভেঙে গেল। মারিয়া উঠে হ্যারির কাছে গেল। বলল—কী ব্যাপার হ্যারি?

—কিছু অশ্বারোহী সৈন্য আসছে। এরা কারা জানি না। শাঙ্কো দেখতে গেছে। তবে আমার মনে হয় যে সৈন্যটি পালিয়ে গিয়েছিল সেই বোধহয় রাজার সেনাপতিকে সংবাদ দিয়েছে—আমরা লড়াইয়ে জিতেছি ওরা হেরে গেছে। আমাদের খোঁজে নিশ্চয়ই একদল অশ্বারোহী সৈন্য এসেছে।

—এখন কী করবে? মারিয়া বলল।

—দেখতে হবে—আমরা বনে আশ্রয় নিয়েছি এটা ওরা বুঝতে পেরেছে কিনা। হ্যারি বলল।

—যদি বুঝতে পারে? মারিয়া বলল।

—তাহলে আমরা টিলাটার মধ্যে যে গুহাটা আছে সেই গুহায় আশ্রয় নেব। গুহার মুখটা ছোট। প্রায় হামা দিয়ে ঢুকতে হবে। তারপরে বেশ বড়। দাঁড়িয়ে থাকা যায়। হ্যারি বলল।

—তাহলে সেই গুহাতেই চলো। মারিয়া বলল।

—আগে শাঙ্কো ফিরে আসুক। ওর কাছে সবকিছু শুনি। তারপর গুহায় আশ্রয় নেবার কথা ভাববো। হ্যারি বলল।

ওদিকে গাছের আড়ালে আড়ালে চলে শাঙ্কো বনের দক্ষিণ দিকটায় এলো। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ঐ দিকেই শোনা যাচ্ছিল।

শাঙ্কো বনের গাছের আড়ালে দাঁড়াল। গাছের ফাঁকে লুকিয়ে দেখল কাছেই প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন ঘোড় সওয়ার সৈন্য ঘোড়া থেকে নামল।

অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। আকাশ সাদাটে হয়ে গেল। বনের গাছগাছালিতে পাখির ডাক শুরু হল।

কিছু পরেই সূর্য উঠল। ঘাসে-ঢাকা প্রান্তরে বনে স্নিগ্ধ রোদ ছড়াল।

তখনও শাঙ্কো ঠিক বুঝতে পারছে না এই সৈন্যরা কারা? এরা এখানে এসেছে কেন? এদের পরনে ঢোলা হাতা জামা। বুকে বর্ম মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই। কোমরের মোটা চামড়ার কোমরবন্ধনী। তাতে তরোয়াল ঝুলছে।

তখনই ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। একজন সৈন্য ঘোড়ার গাড়িটা চালাচ্ছে। সৈন্যরা ধরাধরি করে দলপতির মৃতদেহ আর আহত দুই সৈন্যকে গাড়িতে তুলল। গাড়ি চলে গেল।

এইবার শাঙ্কো বুঝতে পারল সেই পলাতক সৈন্যটিই খবর দিয়েছে। তাই রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা শাঙ্কোদের খোঁজে এসেছে। একজন মোটা গোঁফওয়ালা লোক হাত নেড়ে নেড়ে নির্দেশ দিচ্ছিল। বোঝা গেল এই লোকটাই সেনাপতি।

শাঙ্কো আর দাঁড়াল না। বন্ধুদের খবর দিতে হয়।

শাঙ্কো বনের মধ্যে দিয়ে ছুটল। হ্যারিদের কাছে এসে বলল রাজা ফার্নান্দোর সেনাপতি এসেছে। দলপতি আর আহত দুই সৈন্যকে নিয়ে গেছে। যে ঘোড়া তিনটে আমরা পেয়েছিলাম বনের ধারেই ঐ ঘোড়া তিনটে বেঁধে রেখে এসেছিলাম। এতক্ষণে ওরা নিশ্চয়ই ঘোড়া তিনটে পেয়েছে। বুঝেছে আমরা বেশিদূর যেতে পারি নি। এই বনে আমরা আশ্রয় নিয়েছি এই সন্দেহ ওদের হবেই। কাজেই দেরি না করে এই বন ছেড়ে পালাতে হবে। শাঙ্কো থামল।

—কিন্তু কোন দিক দিয়ে পালাবো? হ্যারি বলল।

—ওরা রয়েছে বনের দক্ষিণ দিকে। আমরা উত্তর দিক দিয়ে পালাবো। এক্ষুনি পালাতে হবে। শাঙ্কো বলল।

সবাই উঠে দাঁড়াল। সবার সামনে শাঙ্কো। ওই নিয়ে চলল ভাইকিং বন্ধুদের। মারিয়ার সঙ্গে হ্যারি চলছিল। দ্রুতই ছুটল সবাই। সাবধানে ছুটতে হচ্ছে গাছগাছালির মধ্য দিয়ে।

উত্তরের দিকের বনভূমি শেষ হল। শাঙ্কো ইঙ্গিতে সবাইকে থামতে বলল। একটা গাছের আড়াল থেকে দেখল দশ-বারো জন অশ্বারোহী সৈন্য উত্তর দিকটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

শাঙ্কো চিন্তায় পড়ে গেল। উত্তর দিকটায় পাহারা রাখা হয়েছে যখন তখন পূব পশ্চিমেও পাহারা রাখা হয়েছে। পালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। শাঙ্কো হ্যারির কাছে এল। বলল—হ্যারি—আমরা খুবই বিপদে পড়লাম। কোন দিক দিয়েই আর পালাতে পারবো না। বনটা ঘিরে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে আছে।

—এই বনের প্রায় মাঝামাঝি একটা টিলা। টিলার মধ্যে একটা গুহা আছে। সেখানে আমরা আশ্রয় নিতে পারি। এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। হ্যারি বলল।

—তাহলে সবাই সেই গুহায় চলো। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল।

সবাই ফিরে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই টিলাটার কাছে এল। পেড্রো জলের পীপেটা কাঁধে নিয়ে আসছিল। এবার পীপে মাটিতে নামিয়ে কাঠের গ্লাসে সবাইকে জল খাওয়াল।

তারপর শাঙ্কো এগিয়ে এল। একজন একজন করে হামাগুড়ি দিয়ে গুহাটার মধ্যে ঢুকতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে গুহার মধ্যে ঢুকে গেল। হ্যারি মারিয়ার পেছনে পেছনে ঢুকল। গুহার মুখের কাছেই মারিয়াকে বসাল। নিজেও বসল। শাঙ্কো গুহার মুখেই দাঁড়িয়ে রইল।

সময় বয়ে চলল। শাঙ্কোরা শুধু পাখির ডাক কিচিরমিচির শুনতে পাচ্ছিল।

বেলা বাড়তে লাগল। গুহার মধ্যে আশ্রয় নেওয়া ভাইকিংরা গুহার পাথুরে এবড়ো খেবড়ো দেয়ালে পিঠ রেখে বসে আছে। বাইরে কী হচ্ছে ওরা জানে না। সবাই চুপচাপ বসে আছে।

গুহার গরমে সবাই কমবেশি ঘামছে। কপালের ঘাম নেমে আসছে চোখ পর্যন্ত। ঘাম মুছছে আর অপেক্ষা করছে কখন এই দমবন্ধকরা গুহার বাইরে যাবে।

গুহার মুখে শাঙ্কো সতর্কভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। কান খেতে শব্দ শুনছে। শাঙ্কো ধরেই নিয়েছিল রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা বনের মধ্যে তল্লাশি চালাবে। কিন্তু তেমন কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎই শাঙ্কোর কানে এল চড়্চড়্ শব্দ। শব্দটা অস্পষ্ট। শাঙ্কো গুহার মধ্যে মুখ বাড়িয়ে ডাকল—হ্যারি—একবার এখানে এসো তো।

হ্যারি অন্ধকারে আস্তে আস্তে গুহার মুখে এসে দাঁড়াল। শাঙ্কো বলল—কান পেতে শোন তো কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হ্যারি কান পাতল। তারপর চমকে উঠে বলল—শাঙ্কো—আমরা ভীষণ বিপদে পড়লাম।

—কী হয়েছে? কীসের শব্দ? শাঙ্কো বলল। হ্যারি ভীতস্বরে বলল—সৈন্যরা

বনে আগুন লাগিয়েছে। কাঁচা পাতা পুড়ছে। চড়্‌বড়্‌ শব্দ হচ্ছে।

—সর্বনাশ। শাঙ্কো বলে উঠল। তারপর হ্যারিকে বলল—কী করবে এখন?

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি বনের পশ্চিম দিকে যাও আর বিস্কো থাক পুবদিকে। দেখে এসো ঐ দুই দিকেও আগুন লাগিয়েছে কি না।

শাঙ্কো আর বিস্কো এক মুহূর্ত দেরি করল না। ছুটে বেরিয়ে গেল।

মারিয়া এগিয়ে এল। বলল—হ্যারি কী হয়েছে?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে শব্দটব্দ শুনে মনে হচ্ছে সৈন্যরা বনে আগুন লাগিয়েছে। আমাদের পুড়িয়ে মারবে। হ্যারি বলল।

—কী সাংঘাতিক! এখন কী করবে? মারিয়া বলল।

—পালাবার পথ খুঁজতে হবে। শাঙ্কো আর বিস্কো গেছে খোঁজখবর করতে। হ্যারি বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কো আর বিস্কো ফিরে এল। বলল—পুব পশ্চিম দু'দিকেই আগুন লাগানো হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আগুনের বেড়াজালে পড়ে যাবো। মৃত্যু সুনিশ্চিত।

হ্যারি মুখ নিচু করে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর গলা চড়িয়ে বলল— ভাইসব —আমরা সাংঘাতিক বিপদে পড়েছি। জানি না কী করে এই বিপদ থেকে বাঁচবো। রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা এই বনের চারধারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। চারদিক থেকে আগুন এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। এমন একটা অবস্থায় আমরা যে ছুটে পালাবো তারও কোনো উপায় নেই। এবার তোমরা কী করতে চাও বলো। হ্যারি বলল।

—আমরা আগুনের মধ্যে দিয়ে পালাতে পারি। একজন ভাইকিং বলল।

—অসম্ভব। হ্যারি বলল। শাঙ্কো বলল—হ্যারি—আমরা এই গুহায় লুকিয়ে থাকতে পারি। আগুন নিভে গেলে পালাবো।

শাঙ্কো ঠিক বলেছে। বিস্কো বলল।

হ্যারি বলল—আমিও এই উপায়ই ভেবেছি। এ ছাড়া অন্য কোনভাবে আমরা বাঁচতে পারবো না।

—কিন্তু এই গুহার চারপাশে যখন আগুন এগিয়ে আসবে তখন অসহ্য গরমে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়বো। বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ। এদিকটাও আমি ভেবেছি। আর একটা কথাও ভাবতে হবে। চারপাশের আগুন একই সময়ে এই গুহাটার বাইরে আসবে না। আগুন আসবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। কাজেই আমাদের আগুনের উত্তাপ সহ্য করতে হবে দফায় দফায়। সেটা আমরা পারবো। হ্যারি বলল।

—হ্যারি—একটা কথা ভেবেছো? শাঙ্কো বলল।

—কী কথা? হ্যারি বলল।

—লক্ষ্য করে দেখ—এই টিলাটার গায়ে কোনো গাছগাছালি নেই। গাছগাছালি

লতাপাতা ঝোপ রয়েছে প্রায় পঁচিশ তিরিশ হাত দূরে। অতদূরের আগুন আমাদের খুব ক্ষতি করতে পারবে না। শাঙ্কো বলল।

হ্যারি বলল—তবু আগুনের হলকা এই টিলার গায়ে এসে লাগবেই। প্রচণ্ড উত্তাপ আমাদের সহ্য করতে হবে। হ্যারি বলল। কেউ কোনো কথা বলল না।

বিপদের গুরুত্ব বুঝে সবাই চুপ করে রইল। হ্যারি বলল—আগুনের হল্কা সহ্য করতে হবে দফায় দফায়। কী পারবে সহ্য করতে? ভাইকিং বন্ধুরা আস্তে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। হ্যারি বলল—আজ আমাদের সহ্য-শক্তির পরীক্ষা। আগুন নিভে গেলেই আমরা গুহা থেকে বেরিয়ে আসবো। ফার্নান্দোর সৈন্যরা ধরেই নেবে আমরা আগুনে পুড়ে মরেছি। আগুনের মধ্যে ওরা আর আসবে না দেখতে আমরা বেঁচে আছি না মরে গেছি। রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা চলে গেলেই আমরা মুক্ত।

—তাহলে উপায় নেই—আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা আগুনের হল্কা সবই সহ্য করতে হবে। একজন ভাইকিং বলল।

—হ্যাঁ—হ্যারি বলল। আরো বলল—আগুন শুকনো গাছপালা লতা ঝোপ পাবে না। কাঁচা গাছপালা লতা ঝোপের আগুন খুব ভয়ঙ্কর হয় না। এটাও মেরির আশীর্বাদ। সবাই মনস্থির করে প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করার জন্যে তৈরি হও। এই উত্তাপ সহ্য করতে পারলেই আমাদের মুক্তি।

সবাই চুপ করে বসে রইল।

এবার কাঁচা গাছের পাতা পোড়ার চট্‌চট্ শব্দ শোনা গেল। অনেক স্পষ্ট। সবাই বুঝল—আগুন এই টিলাটার চারপাশে চলে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একদিকে আগুন ছড়াল। আগুনের হল্কা গুহার মধ্যে ঢুকল। সবাই চুপ করে উত্তাপ সহ্য করতে লাগল। চারপাশে আগুন এগিয়ে এল গুহাটার দিকে। এবার আগুনের হল্কা প্রচণ্ড বেড়ে গেল। সবাই দর্ দর্ করে ঘামতে লাগল। কিন্তু কেউ কোনো শব্দ করল না।

হঠাৎ গুহার অন্ধকারে মারিয়ার গোঙানি শোনা গেল। শাঙ্কো বন্ধুদের ঠেলে ঠেলে সরিয়ে মারিয়ার কাছে এল। বলল—রাজকুমারী—আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? মারিয়া কথা বলতে পারল না। তারপরে অস্ফুটস্বরে বলল—জ-অ-ল। শাঙ্কো বিস্কোকে ডাকল। বলল—পীপে থেকে এক গ্লাস জল দাও। বিস্কো অন্ধকারে পীপেটা খুঁজে পেল। একটা কাঠের গ্লাসও। গ্লাসে জল ঢেলে বিস্কো শাঙ্কোর দিকে গ্লাসটা এগিয়ে বলল—নাও। শাঙ্কো জলের গ্লাসটা অন্ধকারে হাতড়ে নিল। মারিয়ার হাতে জলের গ্লাসটা দিয়ে বলল—রাজকুমারী জল খান। মারিয়া দুর্বল হাতে গ্লাসটা ধরল। হাতে কোন সাড় নেই যেন। মারিয়া গ্লাসটা ধরে থাকতে পারল না। হাত কাঁপতে কাঁপতে জলসুদ্ধু গ্লাসটা গুহার মেঝেয় পড়ে গেল। মারিয়ার মুখ থেকে আর্তস্বর বেরিয়ে এল। বিস্কো তাড়াতাড়ি আর এক গ্লাস জল ভরে এগিয়ে ধরল। এবার হ্যারি অন্ধকারের মধ্যেই হাত বাড়িয়ে বলল—আমাকে জলের গ্লাসটা



দাও। বিস্কো হ্যারির হাতে জল দিল। অন্ধকারে কিছুটা আন্দাজে হ্যারি মারিয়ার কাছে এল। প্রথমে মারিয়ার মাথাটা ধরে আস্তে আস্তে ওঠাল। মারিয়াকে পাথরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসাল। হ্যারি আস্তে ডাকল—রাজকুমারী? প্রথম ডাকে মারিয়া সাড়া দিল না। হ্যারি আবার ডাকল—রাজকুমারী? এবার বোধহয় মারিয়া হ্যারির ডাক শুনতে পেল। দুর্বল কণ্ঠে বলল—জ-অ-ল। হ্যারি অন্ধকারেই মারিয়ার মাথাটা ধরল। হ্যারি মাথা থেকে হাত ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে এল। কপাল ভুরু নাম মুখে এসে আঙ্গুল রাখল। আস্তে বলল—রাজকুমারী, মুখ হাঁ করুন, আমি জল ঢেলে দিচ্ছি। মারিয়া মুখ হাঁ করল। হ্যারি আঙ্গুল দিয়ে মারিয়ার মুখের হাঁ-তে আস্তে আস্তে অল্প করে জল ঢালতে লাগল। মারিয়া জল খেল। আবার পাথরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে গা ছেড়ে দিয়ে বসে রইল।

বাইরে আগুনে হাওয়া হ্যারিদের গুহার মুখে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। হ্যারিরা সকলেই দাঁত চেপে প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করতে লাগল। আগুনের হল্‌কা ঢুকতে লাগল গুহার মুখ দিয়ে। মুখ হাত পা যেন ঝল্‌সে যেতে লাগল।

হঠাৎ হ্যারি মারিয়ার মৃদুস্বরে ডাক শুনল। মারিয়া কেমন যেন হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে থেমে বলল—হ্যারি—আমি—এই—অসহ্য গরমে—শ্বাস নিতে—পারছি—না। আমার শ্বাসরোধ হয়ে আসছে।

হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বলল—বলেন কি। মারিয়া বলল—আমি মরি—ক্ষতি নেই। তোমরা গুহা থেকে বেরিয়ে ধরা দিও না।

হ্যারি একটু গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, রাজকুমারী সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে এক্ষুনি গুহার বাইরে নিয়ে যেতে হবে। রাজকুমারীর জীবন বাঁচাতে আমাদের ধরা দিতে হবে।

শাঙ্কো বলল—আমরা তাতে রাজি। এবার রাজকুমারীকে গুহার বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

শাঙ্কো অন্ধকারে আন্দাজ করে করে মারিয়ার কাছে এল। অন্ধকারে মারিয়ার ঘাড়ের নিচে ডান হাত রাখল। বাঁ হাতে হাঁটুর কাছটা ধরল। তারপর রাজকুমারীকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে অন্ধকার গুহার মুখে এল। তারপর রাজকুমারীকে পাথুরে মেঝেয় আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল।

হঠাৎ একঝলক হাওয়া গুহার মুখে ঢুকল। হাওয়ায় সেই প্রচণ্ড উত্তাপটা আর নেই। কিন্তু মারিয়ার হাঁপধরা ভাবটা একেবারে কমল না। শাঙ্কো বলল—রাজকুমারী—আপনাকে এবার একা হামাগুড়ি দিয়ে গুহার বাইরে বেরোতে হবে।

মারিয়া আস্তে আস্তে উঠে বসল। মৃদুস্বরে থেমে থেমে বলল—এখন আমার শরীর ভালো লাগছে। তোমরা আমার জন্য ধরা দিও না।

—আপনি অসুস্থ হয়েছেন। বাইরে গেলে আপনি ভালোভাবে নিশ্বাস নিতে পারবেন। আপনি সুস্থ হবেন। শাঙ্কো বলল।

—আমি বাইরে বেরোলে তোমরা সবাই তো ধরা পড়ে যাবে। আবার সেই

বন্দীজীবন। মারিয়া আস্তে আস্তে বলল। তখনও মারিয়ার হাঁপধরা ভাবটা যায় নি।

—আপনি আমাদের জন্য ভাববেন না। ধরা পড়লেও আবার বন্দী হলেও ফ্রান্সিস মুক্ত আছে। ফ্রান্সিস ঠিক একটা উপায় বের করবে যাতে আমরা আবার মুক্তি পাবো।

মারিয়া আর কোনো কথা বলল না। হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে গুহার মুখটা পার হল। মারিয়ার পেছনে একে একে সবাই বেরিয়ে এল। এটুকু পেরোবার পরিশ্রমেও মারিয়া কাহিল হয়ে পড়ল। আগুনের মত গরম গুহামুখে একটা পাথরে মারিয়া বসে পড়ল। মাথা ঝাঁকিয়ে জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে লাগল। হ্যারি সেটা দেখে বুঝল গুহার ভেতরে থাকলে মারিয়াকে বাঁচানো যেত না। ঠিক সময়েই মারিয়াকে বাইরে আনা গেছে।

বাইরে তখন জঙ্গল পুড়ে সব সাফ। দক্ষিণ দিকে রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা জড়ো হয়ে এতক্ষণ আগুন দেখছিল। সব জঙ্গল পুড়ে যেতে ফার্নান্দোর সেনাপতি ও সৈন্যরা হ্যারিদের দেখতে পেল। ওরা ধরেই নিয়েছিল জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করা ভাইকিংরাও পুড়ে মরেছে। তাই তারা বেশ আশ্চর্য হল। আগুনের এত উত্তাপের মধ্যে গুহার মধ্যে থেকে ওরা কী করে বাঁচল।

হ্যারি দু'হাত ওপরে তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গী দেখাল। রাজা ফার্নান্দোর সেনাপতি দেখল সেটা।

আগুন তখনও একেবারে নিভে যায় নি। এখানে ওখানে তখনও ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। সেনাপতি একটা ঘোড়ায় উঠল। পোড়া জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে হ্যারিদের কাছে এল।

একটু হাঁপধরা গলায় বলল—তোমরা আমাদের দলনেতাকে হত্যা করেছো। কয়েকজনকে আহত করেছো। সেভিল্লায় রাজা ফার্নান্দোর রাজদরবারে তোমাদের বিচার হবে। তোমরা সবাই বন্দী হলে।

হ্যারি বলল—আপনাদের দলপতি আমাদের এক বন্ধুকে বিনা কারণে হত্যা করেছিল। আমরা তার বদলা নিয়েছি। সেনাপতি বলল—সে সবের বিচার হবে।

হ্যারি বলল—তাহলে এখন আমরা কী করবো? ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমরা অবসন্ন। আগে আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করুন। তারপর আমাদের নিয়ে যা করবার করবেন।

—এখনও আগুন সম্পূর্ণ নেভে নি। আগে আগুন নিভুক। এখনই এই পোড়া বন পার হয়ে তোমরা যেতে পারবে না। সেনাপতি বলল।

—তাহলে তো আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হয়। বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ—আগুন একেবারে নিভে গেলে তোমরা পোড়া বন পার হতে পারবে। সেনাপতি বলল। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে পোড়া বন পার হয়ে সৈন্যদের কাছে ফিরে গেল।

হ্যারিরা উত্তপ্ত পাথরে বসে রইল। মারিয়া এখন অনেকটা সুস্থ। ওদের আর

পালাবার উপায় রইল না।

সন্ধ্যে হয়ে গেল। অন্ধকার নামল। হ্যারি বলল—এবার চলো—পোড়া জঙ্গল পার হয়ে যাই।

—এখনই? বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ—হ্যারি বলল—এখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। পোড়া বনের কোথাও আগুন জ্বলা থাকলে সহজেই আমাদের নজরে পড়বে। এখনই পোড়াবন পেরুতে হবে। চলো।

ভাইকিংরা এখানে ওখানে বসেছিল। হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—পোড়া বন পার হয়ে চলো। দেখে দেখে—সাবধানে।

ভাইকিংরা সবাই উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কো হ্যারিকে বলল—এই অন্ধকারে আমরা তো পালিয়ে যেতে পারি।

হ্যারি বলল—বনের চারপাশ ঘিরে রেখেছে সৈন্যরা। আমাদের পালাবার উপায় নেই। তখনই বনের চারপাশে মশাল জ্বলে উঠল। উত্তরমুখো মশালের আলোর দিকে লক্ষ্য রেখে হ্যারিরা এগোতে লাগল। পোড়া ছাই পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। উড়ছে।

একসময় হ্যারিরা সেনাপতির সামনে এসে দাঁড়াল। সেনাপতি হুকুম দিল—এদের দু'পাশ থেকে ঘিরে নিয়ে চলো। অশ্বারোহী সৈন্যরা হ্যারিদের দু'পাশে দাঁড়াল। সামনে রইল ঘোড়ার পিঠে সেনাপতি। তারপরেই দু'টো মশাল হাতে দুজন। সবাই রওনা হল।

মশালের যেটুকু আলো তারই সাহায্যে হ্যারিরা চলল। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হতে লাগল মারিয়ার। ঐ প্রচণ্ড উত্তপ্ত গুহায় মারিয়া অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। তারপরে এখন হেঁটে যেতে হচ্ছে। মারিয়ার পাশে পাশেই হ্যারি হাঁটছিল। হ্যারি বুঝল মারিয়ার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

হ্যারি কিছুটা দূরে ছুটে গিয়ে সেনাপতির সামনে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—আমার একটা কথা ছিল।

—সেনাপতি ঘোড়ার পিঠে বসা থেকে বলল—বলো।

আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের দেশের রাজকুমারী।

—হ্যাঁ হ্যাঁ একটি মেয়েকে তোমাদের সঙ্গে দেখলাম। সে তো রোদেপোড়া একেবারে তামাটে গায়ের রং। পরেছেও এক অদ্ভুত পোশাক। সেই মেয়েটিই তোমাদের রাজকুমারী। সেনাপতি হেসে উঠল। এই অপমানজনক কথা শুনে হ্যারির গা পিত্তি জ্বলে গেল। হ্যারির আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু উপায় নেই। রাজকুমারী এত কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না। তাই মাথা ঠাণ্ডা রেখেই বলল—আপনাদের তো অনেক ঘোড়া। একটা ঘোড়া যদি রাজকুমারীকে নিয়ে যাবার জন্যে দেন তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব।

—বন্দীকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় না। সেনাপতি বলল।

—এই নিয়মটা পুরুষ বন্দীদের পক্ষে প্রযোজ্য। কিন্তু খুবই অসুস্থ কোনো নারী বন্দীর ক্ষেত্রে এই নিয়ম নেই। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। সেনাপতি একজন ঘোড়সওয়ার সৈন্যকে নেমে আসতে বলল। সৈন্যটি ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল। হ্যারি মারিয়ার কাছে গেল। বলল—রাজকুমারী আপনি একা ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারবেন?

—আমি ঘোড়ায় চড়তে জানি। কিন্তু আমার এখন শরীরের যা অবস্থা সাহস পাচ্ছি না। মারিয়া বলল। হ্যারি শাঙ্কোকে ডাকল। বলল—তুমি ঘোড়ায় চড়ে রাজকুমারীকে নিয়ে যাও।

—বেশ। শাঙ্কো এগিয়ে এল। শাঙ্কো লাফিয়ে ঘোড়াটার পিঠে উঠল। তারপর বলল—হ্যারি তোমরা রাজকুমারীকে তুলে আমার সামনে বসিয়ে দাও। হ্যারি বিস্কোরা কয়েকজন মারিয়াকে তুলে ঘোড়ায় বসিয়ে দিল। শাঙ্কো মারিয়াকে বাঁ হাতে ধরে রেখে ঘোড়া চালাতে শুরু করল।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক চলার পর হ্যারিরা সেভিল্লা নগরে পৌঁছল। রাস্তার দু'পাশে বাড়িঘর দোর। এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। বাড়িগুলোর জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

হ্যারিদের কয়েদঘরের সামনে নিয়ে আসা হল। কয়েদঘরের পাহারাদার দু'জন এগিয়ে এল। অন্য পাহারাদারটি ঢং-ঢং শব্দে লোহার দরজা খুলল। ভাইকিংরা সবাই ঢুকল। শাঙ্কো মারিয়াকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে নিয়ে এল। মারিয়া এলোমেলো পা ফেলে কয়েদঘরের দরজার দিকে চলল। তাই দেখে হ্যারি দ্রুত সেনাপতির কাছে গেল। বলল—আমাদের রাজকুমারী খুবই অসুস্থ। তাকে যদি রাজার অন্দরমহলে নজরবন্দী রাখা হয় তাহলে খুবই ভালো হয়। কয়েদঘরের ঐ পরিবেশে তিনি আরো অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

—আমার কিছু করার নেই। রাজাজ্ঞায় তোমাদের বন্দী করেছি। এখন কালকে রাজদরবারে রাজা ফার্নান্দো যে আদেশ দেবেন তাই প্রতিপালিত হবে। সেনাপতি বলল।

হ্যারি বন্ধুদের কাছে ফিরে এল। এক এক করে ভাইকিংরা কয়েদঘরে ঢুকতে লাগল।

কয়েদঘরে জানালা বলে কিছু নেই। সেই উঁচুতে দু'দিকে দুটো বড় খোঁদল। ঐ খোঁদল দুটোই জানালা। কয়েদঘরের পাথুরে দেয়ালের গর্তে দুটো মশাল রাখা হয়েছে। সেই মশালের আলোয় হ্যারি ঘরটা ভালো করে দেখল। পালাবার উপায় নেই।

মেঝেয় শুকনো ঘাস পাতার বিছানা। ভাইকিংরা কেউ কেউ বসল কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। পাথুরে দেয়ালের গায়ে মারিয়াকে হ্যারি ঠেস দিয়ে বসাল। তারপর চলল জলের খোঁজে। এককোনায় দেখল বেশ বড় একটা পীপে। হ্যারি পীপের ঢাকনা খুলে দেখল জল ভরা। ও বন্ধুদের ডেকে বলল—এখানে যথেষ্ট জল আছে।

তোমরা জল খাও।

হ্যারির কথা শুনে ভাইকিংরা উঠে দাঁড়াল। সবাই জল খেতে এল। বেশ ভিড় হয়ে গেল। পীপের পাশে রাখা কাঠের গ্লাস দিয়ে জল তুলে সবাই খেতে লাগল। কয়েকজন জল খেল আর জল তুলে ঘাড়ে মাথায় ঢালল। তৃষ্ণার জল পেয়ে সবাই বাঁচল যেন।

ভিড় কমলে হ্যারি পীপেটার কাছে গেল। কাঠের গ্লাসে জল ভরে নিয়ে এল মারিয়ার কাছে। মারিয়া ঢক ঢক করে জল খেয়ে নিল। আরও জল নিয়ে এল। মারিয়া খেল। বাকি জলটা মাথায় কপালে ঢালল। মারিয়া এতক্ষনে একটু সুস্থ বোধ করল।

হ্যারি এবার পরপর তিন গ্লাস জল খেল। তারপর চলল দরজার দিকে। লোহার গরাদে মুখ চেপে ডাকল—পাহারাদার—ও পাহারাদার। একজন পাহারাদার এগিয়ে এল। হ্যারি বলল—আমরা খুবই ক্ষুধার্ত। আমাদের খাবারের ব্যবস্থা কর। পাহারাদার কোনো কথা না বলে চলে গেল। এ রকম অভব্য ব্যবহার পেয়ে হ্যারির মাথায় রক্ত চড়ে গেল। হ্যারি সহজে রেগে যায় না। এখন ভীষণ রাগ হল ওর। হ্যারি লোহার দরজায় ঝাঁকুনি দিল। ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠল। আবার ঝাঁকুনি দিয়ে চলল। বন্ধুরা অবাক। হ্যারির মত ঠাণ্ডামাথার মানুষ রেগে গেছে। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। ওরা হ্যারির কাছে এল। বিস্কো বলল—হ্যারি কী ব্যাপার?

—ঐ একটা পাহারাদারকে ডেকে খেতে দিতে বললাম—লোকটা কোনো কথাই শুনল না। একটাও কথা না বলে চলে গেল। হ্যারি বলল।

—দাঁড়াও—দেখাচ্ছি মজা। শাঙ্কো বলল। তারপর সবাইকে ডেকে বলল—ভাইসব—এই লোহার দরজা সবাই মিলে ঝাঁকাও। সবাই দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। একসঙ্গে দরজাটা ধরে ঝাঁকাতে লাগল। প্রচণ্ড শব্দ উঠল। দু'জন পাহারাদারই ছুটে এল। এক পাহারাদার আবার নাকি সুরে কথা বলে। সে চ্যাঁচাতে লাগল—কীঁ হঁচ্ছে? কীঁ হঁচ্ছে। চলল দরজা ঝাঁকানো। একজন পাহারাদার এবার লোহার মোটা গরাদের ফাঁক দিয়ে তরোয়ালের খোঁচা দিতে লাগল। দু'জন ভাইকিং ঘায়েল হল। শাঙ্কো চেঁচিয়ে বলল—ভাইসব—দরজা থেকে সরে এসো। সবাই দ্রুত পিছিয়ে গেল। দরজায় ধাক্কা বন্ধ হল।

হ্যারি শরীরের দিক থেকে বরাবরই দুর্বল। অতক্ষণ আগুন-ঘেরা গুহায় থাকা পথ হাঁটা এত ধকল হ্যারি সহ্য করতে পারল না। শুকনো ঘাসপাতার বিছানায় হাত পা ছেড়ে শুয়ে পড়ল। ওর মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বের হতে লাগল। মারিয়াই প্রথম শুনল সেটা। মারিয়া তাড়াতাড়ি হ্যারির কাছে এল। বসে পড়ল। হ্যারির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মারিয়া ডাকল—শাঙ্কো—এ দিকে এসো। শাঙ্কো কাছে এল। মারিয়া বলল—হ্যারি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। শিগগির জল নিয়ে এসো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে জলের জালার কাছে গেল। এক গ্লাস জল নিয়ে ফিরে এল। গ্লাসটা নিয়ে মারিয়া মুখ নিচু করে বলল—হ্যারি খাবার জল। আস্তে আস্তে

ঢালছি। খেয়ে নাও। হ্যারি আস্তে আস্তে মুখ খুলল। মারিয়া অল্প অল্প করে হ্যারির মুখে জল ঢালতে লাগল। হ্যারি জল খেতে লাগল। গ্লাসের জল শেষ হল। শাঙ্কো আবার জল নিয়ে এল। মারিয়া আধ গ্লাস জল খাওয়াল। বাকি জলে হ্যারির কপাল চোখ ধুইয়ে দিল।

একটু পরে হ্যারি চোখ মেলে তাকাল। গোঙানির শব্দ বন্ধ হল। মারিয়া ঝুঁকে পড়ে বলল—হ্যারি এখন কেমন লাগছে?

হ্যারি অল্প হাসল। আস্তে বলল—ভালো লাগছে। মারিয়া ও অন্য বন্ধুরা এতক্ষণে হাসল।

শাঙ্কো বিছানায় উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ভাইসব—সারাদিন আমরা কিছু খাই নি। ক্ষুধায় আমাদের শরীর টলছে। রাতের খাবার আমরা এখুনি খাবো। ভাইকিং বন্ধুরা হৈ হৈ করে শাঙ্কোর কথা সমর্থন করল।

এবার শাঙ্কো লোহার দরজার কাছে এল। দেখল এখন চারজন পাহারাদার পাহারা দিচ্ছে। সেই থুতনিতে দাড়িওয়ালা পাহারাদারটিও আছে। শাঙ্কো তাকেই বলল—ও ভাই—আমদের খিদে পেয়েছে। খেতে দাও। দাড়িওয়ালা পাহারাদারটি কথাটা কানেই তুলল না। শাঙ্কো আবার বলল। পাহারাদারটি কোনো কথাই বলল না।

ততক্ষণে কয়েকজন ভাইকিং উঠে এসে শাঙ্কোর পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে ছিল নজরদার পেড্রো। পেড্রো বন্ধুদের পেছনে লাগতে ওস্তাদ। পেড্রো দেখল ব্যাপারটা। ও প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে বলল—এই ছাগলদাড়ি। চিৎকার শুনে পাহারাদার দু'জন দাঁড়িয়ে পড়ল। আরো কয়েকজন ভাইকিং দরজার কাছে এল।

দাড়িওয়ালা পাহারাদারটি তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল। নাকিসুরে বলল—কেঁ? কেঁ বঁলেছে কঁথাটা? পেড্রো এগিয়ে এসে নাকিসুরে বলল—আঁমি—আঁমি বঁলেছি কঁথাটা।

পাহারাদারটি একবার সঙ্গীদের দিকে আর একবার পেড্রোর দিকে তাকাতে লাগল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

এবার পেড্রো নাকিসুরে বলল—এঁই ব্যাঁটা ছাঁগলদাঁড়ি খেঁতে দে তাঁড়াতাঁড়ি। এবার ভাইকিংরা কয়েকজন পেড্রোর সঙ্গে গলা মেলাল—এঁই ব্যাঁটা ছাঁগলদাঁড়ি—খেঁতে দেঁ তাঁড়াতাঁড়ি। আস্তে আস্তে সব ভাইকিংরা দরজায় এসে ভিড় করল। সমস্বরে বলতে লাগল—এঁই ব্যাঁটা ছাঁগলদাঁড়ি—খেঁতে দেঁ তাঁড়াতাঁড়ি।

এবারে দাড়িওয়ালা পাহারাদারটি বলল—দাঁড়াও—দেঁখাচ্ছি মঁজা। ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটল। ভাইকিংরাও চুপ করল।

কিছু পরে দেখা গেল সেনাপতি আসছে। সঙ্গে সেই পাহারাদার।

ওরা লোহার দরজার সামনে এল।

সেনাপতি বলল—আমাদের প্রহরীকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছো কেন?

—খিদের জ্বালায়। শাঙ্কো বলল।

—তার মানে? সেনাপতি বলল।

হুয়েনভা থেকে এই সেভিল্লায় হাত বাঁধা অবস্থায় আমাদের হাঁটিয়ে আনা হয়েছে। আমরা তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত। এখানে খাবার জল পেয়েছি। কিন্তু এখনও খাবার পাই নি। আপনার প্রহরীকে এই কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও আমাদের কথা কানেও তুলল না। বিস্কো বলল।

সেনাপতি একটু ভাবল। তারপর বলল—তোমাদের রাতের খাবার এখনই দেওয়া হবে। কোনরকম গোলমাল পাকালে চাবুক খেতে হবে। মনে থাকে যেন।

সেনাপতি দরজার কাছ থেকে সরে গেল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। দলপতি চলল তার পেছনে পেছনে। ভাইকিংরাও গিয়ে বিছানায় বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল।

দাড়িওয়ালা পাহারাদারের জায়গায় অন্য এক পাহারাদারকে দেখা গেল।

সেনাপতির হুকুমেই বোধহয় হ্যারিদের তাড়াতাড়ি খেতে দেওয়া হল। খাবার খেয়ে হ্যারিরা শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিস আর বারাকা গাছের আড়াল থেকে হ্যারিদের দেখছিল। হ্যারিরা তখন বনের পাশের ঘাস-ঢাকা প্রান্তরে শুয়েবসে বিশ্রাম করছিল।

বারাকা বলল—এখন এখানে থেকে কোনো লাভ নেই। তোমার বন্ধুদের এখন মুক্ত করা যাবে না। তাই বলছিলাম চলো আমরা সেভিল্লা নগরে চলে যাই। ওখানে কয়েদঘরের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করি। দলপতি নিশ্চয়ই ওদের কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবে। ফ্রান্সিসও ভেবে দেখলো এখন কিছুতেই বন্ধুদের মারিয়াকে মুক্ত করা যাবে না। বরং সেভিল্লা নগরে গিয়ে কয়েদঘরের কাছে অপেক্ষা করা ভাল। কয়েদঘরের পাহারাদারদের পাহারা দেওয়ার নিয়ম জানা যাবে হ্যারিদের কীভাবে মুক্ত করা যায় তাও ভেবে ঠিক করা যাবে। ফ্রান্সিস বলল—চলো—আমরা আগেই চলে যাই।

ফ্রান্সিস আর বারাকা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চলল সেভিল্লা নগরের দিকে।

সেভিল্লা নগরে যখন এসে পৌঁছল তখন সন্ধে হয়েছে। সদর রাস্তায় কোথাও কোথাও মশাল জ্বলছে। বাড়িঘরদোরে মোমবাতির আলো।

বারাকা কয়েদঘরের কাছে ফ্রান্সিসকে নিয়ে এল। কয়েদঘরের দরজায় দুটো মশাল জ্বলছে। দু'জন সশস্ত্র পাহারাদার খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস কয়েদঘরের সামনে মাঠটায় বসল। বারাকাও ওর পাশে বসল।

সময় বয়ে চলল। কিন্তু হ্যারিদের দেখা নেই।

বারাকা বলল—চলো—তোমার বন্ধুদের আসার আগে আমরা কিছু খেয়ে আসি গে। ফ্রান্সিস হেসে মাথা নাড়ল। বলল—বন্ধুরা এখনও উপবাসী। আমি কী করে খাবো? ওরা আসুক—এখানে খাবার থাক্ জলটল থাক্—তবেই আমি খেতে যাবো।

বারাকা একটু আশ্চর্যই হল। বলল—তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তুমিও উপোস করে থাকবে?

—হ্যাঁ—আমি এখন কিছু খাবো না। তুমি খেয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল। বারাকা কী ভাবল। বলল—না তোমার বন্ধুরা না খাওয়া পর্যন্ত আমিও কিছু খাবো না।

দু'জনে মাঠটায় বসে রইল।

রাত বাড়তে লাগল। বন্ধুদের দেখা নেই।

একসময়ে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—বারাকা এখানে বসে থেকে বন্ধুদের খোঁজ পাওয়া যাবে না। আমাদের সেই বনের কাছে যেতে হবে। ঐ বনের ধারেই বন্ধুরা বিশ্রাম করছিল।

—বেশ চলো। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে হুয়েনভা থেকে হেঁটে এখানে এসেছি। আবার হাঁটবে? বারাকা বলল।

—উপায় নেই। বন্ধুরা কোথায় আছে কেমন আছে এটা না জানা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি বন্ধুদের জন্যে খুব ভাবো—তাই না? বারাকা বলল।

—বন্ধুরাও আমার জন্যে ভাবে। ফ্রান্সিস বলল। বারাকা উঠে দাঁড়াল। বলল—চলো তাহলে।

দু'জন সদর রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। বেশ রাত হয়েছে। রাস্তাঘাট নির্জন।

একসময় ফ্রান্সিস বলল—বারাকা—তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। তুমি এখানে খেয়ে নিতে পারো।

—না। বারাকা মাথা নেড়ে বলল—তুমি তোমার বন্ধুরা যখন খাবে আমিও তখন খাবো।

নগর ছাড়িয়ে দু'জনে চলল সেই বনভূমির দিকে।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর দু'জনে সেই বনভূমির কাছে এল।

অন্ধকারে যতটা দেখল তাতে বুঝল বন্ধুরা এখানে নেই। তবে ওরা গেল কোথায়?

হঠাৎই গোঙানি শুনল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। গোঙানির শব্দটা যেদিক থেকে আসছিল ফ্রান্সিস অন্ধকারে সেইদিকে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস দেখল অন্ধকারে কে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস কাছে গেল। এবার অন্ধকারে দেখে ও বুঝল লোকটি রাজা ফার্নান্দোর সৈন্য।

ফ্রান্সিস মাটিতে বসল। সৈন্যটিকে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার ভাই? তুমি আহত হয়েছো। এখানে কি লড়াই হয়েছে? সৈন্যটি জিজ্ঞেস করল—তুমি কে?

—আমি ভাইকিং। আমার বন্ধুদেরই তোমরা বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিলে। তারা কোথায়? তাদের কী হয়েছে? তোমরা কি আমার নিরস্ত্র বন্ধুদের মেরে ফেলেছো? সৈন্যটি মাথা নেড়ে বলল—না। তোমার বন্ধুরাই দলপতিকে হত্যা করে আমাদের আহত করে গেছে। শুধু একজন সৈন্যই পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

—আমার বন্ধুরা কোথায়?

—তা জানি না। অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ে নি। সৈন্যটি বলল—ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—তাহলে তোমাদের মধ্যে যে সৈন্যটি পালাতে পেরেছিল সে নিশ্চয়ই সেনাপতিকে এই সংবাদ দেবে। সেনাপতিও সৈন্য নিয়ে আমাদের বন্ধুদের খুঁজতে আসবে।

—আর এসে কী হবে? সবাই পালিয়ে গেছে। সৈন্যটি বলল।

—কোনদিকে পালালো?

—কাঁধে তরোয়ালের ঘা লেগেছে। এই অবস্থায় আমি আমার কথাই ভাবছি—কতক্ষণে ওষুধ পড়বে—আমি অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবো। আর কারো কথা ভাবি নি। সৈন্যটি বলল।

ফ্রান্সিস বলল—বারাকা—বন্ধুরা নিশ্চয়ই হুয়েনভা বন্দরে আমাদের জাহাজে চলে গেছে। আমার ফেরার জন্যে ওরা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে। চলো আমাদের হুয়েনভা বন্দরে যেতে হবে।

—বেশ—চলো। আবার সেই হেঁটে। আমি তো তবু কিছু খেয়েছি পেটপুরে, জলও খেয়েছি। তুমি তো নির্জলা উপোসী। পারবে হেঁটে যেতে। বারাকা বলল।

—নিশ্চয়ই পারবো। পারতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি বন্ধুদের খুব ভালোবাসো—তাই না? বারাকা বলল।

—হ্যাঁ—প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। ওরাও আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। ফ্রান্সিস বলল।

এবার দু'জনে চলল হুয়েনভা বন্দরের দিকে। যখন ওরা হুয়েনভা বন্দরে পৌঁছল তখন ভোর হল। ফ্রান্সিসের চোখে রোদ পড়তে চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। রোদ ছড়াল চারদিকে।

ফ্রান্সিস বেশ ছুটেই ওদের জাহাজের কাছে এল। ও হাঁপাচ্ছে তখন। জাহাজ জনশূন্য। কেউ কোথাও নেই। তার মানে বন্ধুরা জাহাজে ফেরে নি। তবে কোথায় গেল ওরা?

জাহাজের মাস্তুলের আড়াল থেকে কে যেন মুখ বাড়াল। তাহলে একজন তো আছে। বন্ধুটি মাস্তুলের আড়াল থেকে আবার মুখ বার করল। আরে! এ তো ভেন।

ফ্রান্সিস বারাকাকে ডাকল—চলো—জাহাজে উঠবো। দু'জনে পাতা কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে জাহাজে উঠল।

ভেন মাস্তুলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস ভেনকে জড়িয়ে ধরল। বলল—ভেন—তোমার খোঁজ রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা পায় নি।

—আমি আটা ময়দার বস্তার পেছনে লুকিয়েছিলাম। আমাকে তাই ধরতে পারে নি। ভেন হেসে বলল। ওরা ডেক-এ বসল।

এবার ফ্রান্সিস ভেনকে সব ঘটনা বলল। শেষে বলল—এখনও বন্ধুদের কোনো খোঁজ পেলাম না। এবার সেই বনের ধারে যেতে হবে। বনেও ঢুকতে হবে। হয়তো

হ্যারিরা বনে আশ্রয় নিয়েছে।

—ঠিক আছে। তাই যাও। তার আগে উপোসী তুমি কিছু খেয়ে যাও। ভেন বলল।

—অসম্ভব। বন্ধুরা মারিয়া কেউ খায় নি এখনও। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস—আমি একজন চিকিৎসক। আমি বলছি—এই উপোসে থাকা আর এইসব দুশ্চিন্তা তোমার দেহের ক্ষতিই করবে। তুমি এতে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তুমি অসুস্থ হলে আমরা দিশেহারা হয়ে যাবো। একটু থেমে ভেন বলল—ফ্রান্সিস কথা শোন। তোমাকে সুস্থ থাকতেই হবে। খেতে এসো। আমার খাবার তৈরিই আছে। তোমরা খাবে এসো।

তিনজনেই খাবার ঘরে এল। ভেন দু'জনকে কাঠের থালা গ্লাস দিল। খাবার দিল। জল দিল। ফ্রান্সিস পরপর তিন গ্লাস জল খেল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—ভেন—এতক্ষণে আমি বুঝতে পারছি আমি কতখানি তৃষ্ণার্ত আর ক্ষুধার্ত। ভেন বলল—ফ্রান্সিস—আমরা সবাই তোমার নির্দেশেই চলি। সেই তোমাকে এখন সুস্থ সবল থাকতে হবে। নাও খেতে শুরু কর। মোটা রুটি আর মাংসের ঝোল। ফ্রান্সিস হাপুস্ হাপুস্ খেতে লাগল। বারাকাও সমান আগ্রহে খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস বলল—তোমার খাবার আমাদের দিলে।

—তাতে কি? আমি রেঁধে নেব। ভেন বলল—তোমাকে এই বিপদের সময় সুস্থ থাকতে হবে সবল থাকতে হবে।

তিনজনে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। তারপর পাতা পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে তীরে উঠল।

এবার দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে চলল সেভিল্লার দিকে। একসময় বারাকা বলল—তোমার বন্ধুরা কোথায় আছে বলে তোমার ধারণা।

—ঐ বনে। ওরা দলপতির সৈন্যদের লড়াইয়ে হারিয়ে ঐ বনেই আত্মগোপন করে আছে। এটা আমি আগে ভাবিনি। এখন ভাবছি। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার কী মনে হয়? তোমার বন্ধুরা ঐ বনে লুকিয়ে আছে এই সংবাদটা কি সেনাপতি পেয়েছে? বারাকা বলল।

—নিশ্চয়ই পেয়েছে আর এতক্ষণে সেই বনভূমিতে তল্লাশি শুরু করেছে। বন্ধুরা ধরা পড়বেই। আমি ধরে নিয়েছিলাম ওরা লড়াইয়ে জিতেই জাহাজে ফিরে আসবে। কিন্তু ওরা তা করে নি। ফ্রান্সিস বলল।

—এটা তো বোকামির কাজ হল। বারাকা বলল।

ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল—বারাকা—আমরা পরস্পরকে ভাইয়ের মত ভালোবাসি। আমাকে না নিয়ে ওরা জাহাজে ফিরবেই না।

—তোমাদের মধ্যে এত বন্ধুপ্রীতি? বারাকা বলল। ফ্রান্সিস হাসল।

দু'জনে রাস্তার এমন একটা জায়গায় এল যেখান থেকে ঐ বনটা দেখা যায়।

সেখানে এসে দু'জনে দেখল বনের মাথায় ধোঁয়ার কুণ্ডুলি। তার মানে বনে আগুন লাগানো হয়েছে। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে বলল—কি মর্মান্তিক। তারপর দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বলল—বারাকা তাড়াতাড়ি এসো। বারাকা গতি বাড়াল। ও ভেবে আশ্চর্য হল—সেই কাল রাত থেকে ওরা হাঁটতে শুরু করেছে। এখনও হাঁটছে। অথচ ফ্রান্সিসের এখনও কোনো ক্লান্তি নেই কোনো কষ্ট নেই। সটান হেঁটে চলেছে। শুধু ওর জোরে-জোরে শ্বাস পড়ছে।

দু'জনে দূর থেকে দেখল সেই জ্বলন্ত বনটা ঘিরে রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা দাঁড়িয়ে আছে। কিছু অশ্বারোহী সৈন্যও রয়েছে। সেনানায়ক ঘোড়ায় চড়ে বনের আগুনের খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

আশেপাশের গ্রাম থেকেও লোকজন আগুন দেখতে এসেছে। তারা গোল হয়ে সৈন্যদের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস আর বারাকা তাদের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে রইল।

আগুন উঁচুতে উঠল। কাঁচা গাছগাছালি লতাপাতা ঝোপ পুড়ছে। জোর চট্ চট্ শব্দ উঠেছে। শুকনো বন নয়। তাই আগুন খুব একটা তেজি আগুন নয়।

কিছুক্ষণ সময় গেল। ফ্রান্সিস এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আগুনের দিকে।

হঠাৎ বারাকা লক্ষ্য করল—ফ্রান্সিসের দু' চোখ জলে ভিজে উঠেছে। ফ্রান্সিস জামার হাতা দিয়ে দু'চোখ মুছল। অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলল—যদি আমার একজন বন্ধুও পুড়ে মরে তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি প্রথমে সেনাপতিকে আর পরে রাজা ফার্নান্দোকে আমি হত্যা করবো। তাতে যদি আমার জীবন যায়—পরোয়া নেই।

আস্তে আস্তে আগুনের তেজ কমে আসতে লাগল। গাঢ় ধোঁয়া উঠতে লাগল আকাশের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আগুন নিভু নিভু হল। এখানে ওখানে তখনও আগুন। ধোঁয়া উঠছে।

তখনই ফ্রান্সিসের চোখে পড়ল টিলাটা। টিলাটার গায়ে আগুনের কালচে দাগ। ফ্রান্সিস তখন পায়চারি করতে লাগল। আগুন আরও নিভে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এখনও ঐ ছাইচাপা আগুন পার হয়ে দেখতে যাওয়া যাবে না।

তখনই ফ্রান্সিস দেখল হ্যারি টিলাটার সামনে এসে দাঁড়াল। পেছনে শাঙ্কো মারিয়াকে ধরে ধরে একটা পাথরের চাঙ-এর ওপর বসাল। হ্যারি দু'হাত ওপরে তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গী করল।

ফ্রান্সিস জীবিত মারিয়া হ্যারিদের দেখে চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো। সেই ধ্বনি অবশ্য হ্যারিরা শুনতে পেল না।

ফ্রান্সিস বারাকাকে বলল—চলো—মাঠটায় বসি।

দু'জনে এসে মাঠটায় বসলো।

তখন সন্ধে হয়েছে। চারদিকে সৈন্যরা মশাল জ্বালল।

হ্যারিরা পোড়া বনের ছাইয়ের ওপর দিয়ে সাবধানে এল। আত্মসমর্পণ করল। সেনাপতির নির্দেশে হ্যারিদের দু'পাশে ঘিরে নিয়ে সবাই চলল সেভিল্লার দিকে। অন্ধকারে পেছনে পেছনে ফ্রান্সিস আর বারাকাও চলল।

সেভিল্লা নগর পৌঁছল সবাই।

হ্যারিদের কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হল।

ফ্রান্সিসরা অন্ধকারে মাঠে বসে রইল।

রাত বাড়ল।

হ্যারিদের যখন খেতে দেওয়া হল তখন ফ্রান্সিস বলল—বারাকা এবার তোমাদের বাড়িতে নিয়ে চলো।

চলো। বারাকা বলল। দু'জনে রাস্তায় এল। চলল পুবমুখো।

দু'জনে যখন বারাকার বাড়িতে পৌঁছল, অন্ধকারের মধ্যেও দেখে ফ্রান্সিস বুঝল বাড়িটা বেশ বড়। কাঠ আর পাথরে তৈরি। কাঠের দরজাটার সামনে এসে বারাকা দাঁড়াল। তারপর দরজায় আঙুল ঠুকে শব্দ করল। একটু পরেই দরজা খুলে গেল। বড় জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির মুখেচোখে স্পষ্ট দুশ্চিন্তার ছাপ। বারাকাকে দেখে ও বলে উঠল, দাদা, বাবা ছাড়া পেল না?

—না। বারাকা দরজা পার হয়ে বলল, ফ্রান্সিস, এসো।

ফ্রান্সিসকে নিয়ে বারাকা ভেতরের ঘরে এল। দেখল এক শুভ্রশয্যায় একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন। বারাকা বলল, মা, বাবাকে এই সেভিল্লায় আনা হয়েছে।

—তাহলে এই বাড়িটাও তল্লাশি করা হবে। মা বললেন।

—হ্যাঁ। এসব তল্লাশি খোঁজখবরের পর হয়তো রাজা ফার্নান্দো বাবাকে মুক্তি দেবেন। বারাকা বলল।

—হ্যাঁ, এখন শুধু অপেক্ষা করে থাকা। মা বললেন।

ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বারাকা বলল, মা, এর নাম ফ্রান্সিস। আমার বন্ধু। মা একটু শুকনো হাসি হেসে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালেন। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। মা বললে, আমার যা মনের অবস্থা, মানে, তোমার সঙ্গে—কথা বলা মানে—

ঠিক আছে, ফ্রান্সিস বলে উঠল, পরে কথা হবে।

দু'জনে বারাকার ঘরে এল। বারাকা একটা আবলুশ কাঠের গদিওয়ালা চেয়ার দেখিয়ে বলল, বসো। তখনই বারাকার বোন মোমবাতি হাতে ঘরে ঢুকল। একটা ছ' কোনা টেবিলের ওপর রুপোর বাতিদানে মোমবাতিটা রেখে বলল, দাদা, বাবার মুক্তির ব্যবস্থা কী করবি?

—দেখি। বারাকা বলল। বারাকার বোন চলে গেল।

ফ্রান্সিস বলল, বারাকা, যা বুঝতে পারছি, তোমার বাবাকে আর আমার বন্ধুদের কাল সকালেই ফার্নান্দোর সামনে হাজির করানো হবে। ওদের কথা শোনার পরেই আমি রাজার সঙ্গে কথা বলতে চাই। সেটা কী করে হবে বুঝতে পারছি না।

বারাকা বলল, সে ব্যবস্থা করা যাবে। রাজদরবারের নাজির আমার খুবই

পরিচিত। একটা স্বর্ণমুদ্রা দিলেই সে রাজার সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করে দেবে।

—কিন্তু আমার কাছে তো স্বর্ণমুদ্রা নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—সে আমি দেব'খন। বারাকা বলল।

—তাহলে এখুনি চল। নাজিরকে কাল সকালে হয়তো পাবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—চলো তাহলে। কিন্তু তার আগে কিছু খেয়ে নিই। সারাদিন তুমি না খেয়ে আছ। বলে বারাকা বোনকে ডেকে তাদের খাবার দিতে বলল।

খাওয়া শেষ করে ফ্রান্সিস বলল, আচ্ছা বারাকা, তোমার একটা পোশাক দাও তো। দেখি আমার গায়ে ঠিক লাগে কিনা।

—বেশ তো। বারাকা আলমারি খুলে ফ্রান্সিসকে ঢোলাহাতা পোশাক দিল। ফ্রান্সিস নিজের পোশাকের ওপরেই পরল সেটা। মোটামুটি লেগে গেল।

দু'জনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তার এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। সেসবের আলো রাস্তায় যতটা পড়েছে তাই দেখে চলল দু'জনে।

নাজিরের বাড়িতে এল ওরা। নাজিরের মূর চাকর দরজা খুলে ফ্রান্সিসদের বাইরের ঘরে বসাল।

একটু পরেই নাজির এল। নাজিরের সাদা দাড়ি-গোঁফ। মাথায় পাতলা কাপড়ের টুপিমতো। তিনি গদি-আঁটা চেয়ারে বসতেই ফ্রান্সিস বলল, আমি যাতে রাজা ফার্নান্দোর সঙ্গে কথা বলতে পারি, আপনি দয়া করে সেই ব্যবস্থাটা করে দেবেন? নাজির রাজী হলো। বারাকার স্বর্ণমুদ্রাও নিল। ফ্রান্সিসের পোশাক দেখে বুঝল ফ্রান্সিস এখানকারই লোক।

পরদিন সকালে দলপতি কয়েদখানায় এল। হ্যারিদের বলল, তোমরা কয়েকজন এসো। বারাকার বাবাকেও আসতে বলল।

হ্যারি, মারিয়া আর বিস্কো চলল রাজপ্রাসাদের দিকে। বারাকার বাবাও চললেন। দু'পাশে দু'দল সৈন্যও চলল।

রাজদরবারে তখন অমাত্যরা বসেছেন। নাজির বিচারের ব্যাপারটা লিখবে বলে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছে। হ্যারিরা এসে দাঁড়াল।

একটু পরেই রাজা ফার্নান্দো দরবারে এলেন। নাজির প্রথমে বারাকার বাবাকে ডাকল। রাজা ফার্নান্দো বললেন, খলিফা ইবন আমীরের গোপন ধনভাণ্ডারের হদিস নিশ্চয়ই আপনাদের পরিবারের কোনো কিছুর মধ্যে আছে। আপনাদের সেভিল্লর বাড়ি তল্লাশি করতে হবে। আরো কিছু জায়গা দেখতে হবে। এখনও বন্দী থাকতে হবে।

এবার দলপতি হ্যারিদের নিয়ে এগিয়ে এল। দলপতি মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে হ্যারিদের গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ প্রকাশ করল। হ্যারির দিকে তাকিয়ে রাজা ফার্নান্দো বললেন, এই অভিযোগের উত্তরে তোমরা কী বলতে

চাও বলো।

হ্যারি এগিয়ে এল। মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল। বলল, মাননীয় রাজা, আমরা ক্যামেরিনাল বন্দর শহরে আমাদের জাহাজ থামিয়েছিলাম জল, খাদ্য সংগ্রহের জন্যে। শুনেছিলাম ঐ অঞ্চলের রাজা গার্সিয়া। এর বেশি আর কিছুই আমরা জানি না।

—ঠিক আছে, হুয়েনভা বন্দর শহরে লোক পাঠানো হবে। খোঁজ নেওয়া হবে আমার ভাই রাজা গার্সিয়া তোমাদের গুপ্তচরবৃত্তির জন্যে পাঠিয়েছিল কিনা। এখন কয়েদঘরে থাকতে হবে। রাজা বললেন।

এবার হ্যারি মৃদুস্বরে বলল, রাজকুমারী, আপনাকে রাজঅন্তঃপুরে রাখার কথা বলি?

মারিয়া মাথা নেড়ে বলল, না, আমি তোমাদের সঙ্গে থাকবো।

হ্যারি বলল, দোহাই, আমার ব্যবস্থাটা মেনে নিন। আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাদের বিপদের শেষ থাকবে না। অনুরোধ করছি, যা বলছি শুনুন।

রাজা ফার্নান্দো বললেন, তোমাদের আর কিছু বলার আছে?

হ্যারি মারিয়াকে দেখিয়ে বলল, ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। কয়েদঘরের কষ্টকর জীবন ইনি সহ্য করতে পারবেন না। বিনীত প্রার্থনা, রাজকুমারীকে অন্তঃপুরে রাখা হোক।

রাজা ফার্নান্দো দলপতির দিকে তাকালেন। বললেন, এই রাজকুমারীকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও। পরিচারিকাদের বলো এঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিতে।

দলনেতা মারিয়ার কাছে এসে বলল, আমার সঙ্গে আসুন।

ঠিক তখনই নাজির ফ্রান্সিসকে নাম ধরে ডাকল। মারিয়া চমকে পেছন ফিরে তাকাল। হ্যারি, বিস্কোও তাকাল এদেশের পোশাক পরা ফ্রান্সিসের দিকে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে তাদের দেশীয় ভাষায় বলল, আমাকে চেনো না, সবাই স্বাভাবিক থাকো। ভয় নেই।

রাজা ফার্নান্দো ফ্রান্সিসকে বললেন, বলো, তোমার কী বলার আছে।

ফ্রান্সিস একটু মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল, মহামান্য রাজা, আমি শুনেছি যে একশো বছর আগে খলিফা ইবন আবি আমীর এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। এক যুদ্ধে যাবার সময় বা তারও আগে তাঁর বিপুল ধনসম্পত্তি তিনি যে কোথায় লুকিয়ে রাখেন তা কাউকে বলে জাননি। তাঁর গুপ্ত ধনভাণ্ডার নিশ্চয়ই তারপর কোনো কোনো রাজা খুঁজেছিলেন। কিন্তু কেউই তার হদিস পাননি।

—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই শুনেছো। রাজা বললেন।

—এখন মাননীয় রাজা আমাকে যদি কিছুদিন সময় দেন তাহলে সবরকম খোঁজখবর করে আমি ঐ গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধারের চেষ্টা করব। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি কি জানো আমিও খোঁজখবর চালাচ্ছি? রাজা বললেন।

—জানি মান্যবর রাজা। শুধু আমাকে একবার সুযোগ দিন, এই অনুরোধ।

—বেশ। রাজা ফার্নান্দো বললেন।

ফ্রান্সিস বলল, আর একটা অনুরোধ আমাদের স্বাধীন চলাফেরায় কেউ যেন বাধা না দেয়।

—বেশ, তোমাকে রাজপাঞ্জা দেওয়া হবে। রাজা বললেন।

দলপতি হ্যারিদের নিয়ে চলে গেল। ফ্রান্সিস বারাকার সঙ্গে প্রাসাদের বাইরে এল। চলল তার বাড়ির দিকে। পথে কিছুটা যেতেই ফ্রান্সিস দেখল পেছনে ঘোড়ায় চড়ে দলনেতা আসছে। দলনেতা ফ্রান্সিসদের সামনে এসে ঘোড়া থামাল। কোমর থেকে গোলমতো একটা পিতলের চাকতি বের করে বারাকার হাতে দিল। বলল, রাজা তোমাদের এই রাজপাঞ্জা দিয়েছেন। দলনেতা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর ফ্রান্সিস বলল, বারাকা, আমি সময় নষ্ট করতে পারবো না। এখনই কারডোভা চলো। আজকে থেকেই কাজে নামবো।

—বেশ, চলো। বারাকা বলল।

—কারডোভা কি খুব বেশি দূরে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—তা একটু দূরে বৈকি। তবে আমাদের আস্তাবল থেকে দুটো ঘোড়া নেব।

—তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই। ফ্রান্সিস বলল।

বারাকা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে বলল, ঘোড়া তৈরি। চলো।

বারাকাদের বাড়ির বাইরে দু'জনে এল। দেখল একজন সহিস দুটো ঘোড়া নিয়ে এসেছে।

দু'জনে ঘোড়ায় উঠল। বারাকা আর ফ্রান্সিস চলল কারডোভার দিকে।

বিকেল নাগাদ দু'জনে কারডোভা পৌঁছল। কারডোভা একসময় রাজধানী ছিল। কাজেই রাস্তার দু'পাশে অনেক বাড়িঘর। যথেষ্ট লোকবসতি এখানে। রাস্তায় বেশ ভিড়। ফ্রান্সিস বলল, বারাকা, আমার শহরটা দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি খলিফা ইবন আমীরের তৈরি নতুন রাজপ্রাসাদে, তারপর পুরনো রাজপ্রাসাদে নিয়ে চলো।

বারাকা প্রথমে নতুন রাজপ্রাসাদে এল। ঘোড়া থেকে নামল দু'জনে। একটা প্রান্তরের মধ্যে পাথরের প্রাচীর ঘেরা প্রাসাদটি। প্রাচীরটার অনেক জায়গাতেই ভাঙন ধরেছে।

দু'জনে প্রধান ফটকে এল। প্রহরীরা ওদের আটকাল। বারাকা রাজপাঞ্জা দেখাল। প্রহরীরা সরে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকল দু'জনে। কিছুটা পাথর-বাঁধানো চত্বর পেরিয়ে প্রাসাদ। ওটা পার হতে হতে বারাকা বলল, এখানে আলতোয়াইফ থাকেন। তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে হবে।

প্রাসাদে প্রবেশের দরজার কাছে প্রহরীরা পাহারায় রয়েছে। তাদের রাজপাঞ্জা দেখিয়ে বারাকা বলল, আলতোয়াইফের সঙ্গে দেখা করবো। তাঁকে খবর দাও।

একজন দ্বাররক্ষী প্রাসাদে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, আসুন আপনারা। সদর দরজার পরেই একটা পাথরের ঘর। ঘরের মাঝখানে শ্বেত-

পাথরের গোল টেবিল। আবলুশ কাঠের গদি-আঁটা চেয়ার টেবিল ঘিরে। ফ্রান্সিসরা বসল।

একটু পরেই ঢোলাহাতা দামী কাপড়ের জোব্বা পরা আলতোয়াইফ ঢুকলেন। ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল। নিজে বসে ফ্রান্সিসদের বসতে ইঙ্গিত করলেন। ফ্রান্সিসরা বসল।

বারাকা বলল, ফ্রান্সিস, তোমার যা বলার বলো।

ফ্রান্সিস বলল, মাননীয় মহাশয়, খলিফা ইবন আবি আমীর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বিপুল ধনভাণ্ডারের কোনো হদিস কাউকে দিয়ে যাননি। আমরা সেই গোপন ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছি। এই প্রাসাদেই খলিফা মৃত্যুর পূর্বে ছিলেন। কাজেই এই প্রাসাদের কোথাও খলিফা কোনো চিহ্ন বা নকশা রেখে গেছেন কিনা সেটাই আমরা খুঁজে দেখতে এসেছি। এজন্যে আপনার সাহায্য চাই।

—অন্দরমহল বাদে আপনারা সারা প্রাসাদই খুঁজে দেখতে পারেন। তবে শুনেছি খলিফার ধনসম্পদ অনেকেই খুঁজেছে। কেউ হদিস করতে পারেনি। আলতোয়াইফ বললেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। অন্দরের দিকে চলে গেলেন।

ফ্রান্সিস আর বারাকা এবার প্রাসাদের ঘরগুলো দেখতে লাগল। কোনো ঘরে অস্ত্রশস্ত্র রাখা, কোনো ঘরে বেশ কয়েকটা লোহার সিন্দুক রাখা। প্রায় একশো বছর আগে তৈরি প্রাসাদের বেশ কয়েকটা ঘর এখন ভঙা পাথরের স্তূপ। সেখানে ফ্রান্সিস পাথরের স্তূপের পাথর তুলে সরাতে লাগল। বারাকাও হাত লাগাল। পাথরের স্তূপ সরিয়ে ওরা দেখল গোপন জায়গা বলে কিছু নেই।

আর একবার সব দেখেশুনে দু'জনে বাইরের ঘরে এসে বসল। ফ্রান্সিস বলল, বুঝেছো বারাকা, এই প্রাসাদে গোপনীয় জায়গা বলতে কিছু পাওয়া গেল না। লোহার সিন্দুক যে ক'টা আছে সবই খোলা হয়েছে। কাঠের আলমারিগুলোও দেখা হয়েছে। এবার পুরনো প্রাসাদে চলো।

ঘোড়ায় চড়ে দু'জনে পুরনো প্রাসাদে এল। এখন নামেই প্রাসাদ। কয়েকটা পাথরের থাম শুধু দাঁড়িয়ে আছে। আর সব জায়গাতেই পাথরের স্তূপ।

ঘোড়া থেকে নেমে এল দু'জন। ফ্রান্সিস পাথরের পাটা ছড়ানো জায়গায় এদিক-ওদিক লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল। বোঝা গেল ধ্বংসের হাত থেকে কোনো ঘর বাঁচেনি। স্তূপের আকারে পাথরের পাটা ছড়িয়ে থাকায় বোঝাও যাচ্ছে না কোথায় কোথায় ঘর ছিল। সে-সব ঘর দেখতে গেলে আগে সব পাথরের পাটার স্তূপ সরাতে হবে। তার জন্য লোক চাই অন্তত পঞ্চাশ জন। তবেই পাথরের স্তূপ সরানো সম্ভব।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়েছে তখন। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাবে না। দু'জনে ঘোড়ায় উঠল। ফ্রান্সিস বলল, বারাকা, এবার রাতের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কর।

বারাকা জানাল, আমার জানাশুনো একটা সরাইখানা আছে বাজার এলাকায়। সেখানে চলো।

ফ্রান্সিস বলল, তার আগে আতোয়াইফের সঙ্গে দেখা করে আসি চলো।

ওরা নতুন প্রাসাদে এল। ভেতরে দ্বাররক্ষীদের একজনকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে ফ্রান্সিসরা বাইরের ঘরে বসল। একটু পরে আলতোয়াইফ এলেন। ফ্রান্সিস বলল, মাননীয় মহাশয়, আপনার কাছে একটু সাহায্য চাই।

—বলো কী সাহায্য চাও।

—এখানে কি বন্দীশালা আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ, একটা ছোট কয়েদঘর আছে। সেখানে এখন কয়েকজন বন্দী আছে।

—আজ রাতেই আপনি সেভিল্লায় পাঠান। রাজা ফার্নান্দোকে অনুরোধ করুন কাল সকালে যেন সেভিল্লার বন্দীশালা থেকে জনা পঞ্চাশেক বন্দী এখানে পাঠিয়ে দেন।

—কেন বলো তো?

—এখানে পুরনো প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ সরাতে হবে। ধ্বংসস্তূপ সরাতে পারলে মেঝেগুলো দেখে মোটামুটি আন্দাজ করা যাবে কোথায় কোথায় ঘর ছিল। এটা জানা খুবই দরকার।

—বেশ, লোক পাঠাচ্ছি। আলতোয়াইফ বললেন।

ঘোড়া চালিয়ে দু'জনে বারাকার জানাশুনো সরাইখানায় এল। রাতে খেয়েদেয়ে দু'জনে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসের মাথায় অনেক চিন্তা। ও ইচ্ছে করেই সেভিল্লা থেকে বন্দী বন্ধুদের এখানে আনার ব্যবস্থা করল। এখন চিন্তা গুপ্ত ধনসম্পদ ঐ ভাঙা প্রাসাদে পাওয়া যাবে কিনা।

পরের দিন একটু বেলাতেই ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙল। দেখল বারাকার ঘুম তখনও ভাঙেনি। ফ্রান্সিস ধাক্কা দিয়ে ওকে তুলল। সরাইখানায় সকালের খাবার খেয়েই ওরা ঘোড়ায় উঠল। চলল নতুন রাজপ্রাসাদের দিকে।

ফ্রান্সিস দূর থেকেই দেখল প্রাসাদের সামনের প্রান্তরে কিছু লোক বসে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু এগিয়ে এসে পোশাক দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল হ্যারিদের আনা হয়েছে। ফ্রান্সিস বারাকাকে বলল, এই বন্দীদের মধ্যে তোমার কারা আছেন?

না। বারাকা বলল।

ফ্রান্সিস বুঝল হঠাৎ হ্যারিদের সামনে হাজির হলে ওরা চমকে উঠবে। হৈ হৈ করবে। সেটা এই মুহূর্তে বিপদ ডেকে আনতে পারে। ও তাই বারাকাকে বলল, বারাকা, তুমি ঐ বন্দীদের সমানে যাও। বলবে, এদেশীয় একজন লোক নাম ফ্রান্সিস, তোমাদের কিছু কাজের কথা বলবে। তোমরা চুপ করে শুনবে।

বারাকা হ্যারিদের সামনে এসে ফ্রান্সিসের শেখানো কথাগুলো বলল। ফ্রান্সিস ঘোড়ায় চড়ে হ্যারিদের সামনে আসার সময় বেশ জোরে ওদের দেশীয় ভাষায় বলল, মনে রাখবে তোমরা কেউ আমাকে চেনো না।

হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল, সবাই চুপ। কোনো কথা নয়।

ফ্রান্সিস এবার বলতে লাগল, এখান থেকে কিছুদূরে কারডোভা। ওখানে একটা

পুরনো রাজপ্রাসাদ আছে। এখন পাথরের স্তূপ। সেই পাথরের স্তূপ সরিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এই তোমাদের কাজ। সকালের খাবার খেয়ে আমরা কারডোভা যাবো।

সকালের খাবারের ব্যবস্থা দেখছিল দলপতি। ফ্রান্সিস বারাকাকে বলল, যে ক'টা বেলচা যোগাড় করতে পার, নিয়ে এসো। সকালের খাবার খেয়ে সবাই তৈরি হলো।

সকলের সামনে চলল ঘোড়ায় চড়ে দলপতি। বন্দীদের দু'পাশে প্রায় জনা দশেক অশ্বারহী সৈন্য। হঠাৎ ফ্রান্সিস হ্যারির সামনে এসে ঘোড়া থামাল। নিজে দ্রুত নেমে এসে হ্যারিকে তুলে দিল ঘোড়ার পিঠে। ফ্রান্সিস চুপ করে থাকতে বলেছে তাই হ্যারিও কোনো কথা বলল না। আস্তে আস্তে ঘোড়া চালাল। ফ্রান্সিস সবার পেছনে হাঁটতে লাগল।

একটু বেলায় সবাই ভাঙা প্রাসাদের সামনে এল। ফ্রান্সিস দলপতিকে বলল, সকলের হাতের বাঁধন খুলে দিন। নইলে পাথর সরাবে কী করে! দলপতি একজন সৈন্যকে বলল সব বন্দীর হাতের বাঁধন খুলে দিতে।

ফ্রান্সিস চারদিকে নজর বোলাতে বোলাতে দেখল ভাঙা স্তূপের পরে বেশ বড় একটা গর্ত মতো। বোঝা গেল এখানে একটা জলাশয় ছিল। এখন শুকনো। ঐ জায়গাটা দেখিয়ে ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল, পাথরের আস্ত বা ভাঙা পাটাগুলো এই গর্তটায় ফেল। সবাই কাজ শুরু কর। ততক্ষণে বারাকা পাঁচটা বেলচা নিয়ে এসেছে।

সব বন্দীরা কাজে নামল। পাঁচজনকে বেলচা দেওয়া হলো। ওরা ভাঙা পাথরের টুকরো একটা জায়গায় জড়ো করতে লাগল। বাকিরা হাত লাগাল পাথরের পাটা সরাতে। ফ্রান্সিস আর বারাকাও কাজে নামল। চলল পাথর ঠোকাঠুকির শব্দ। এলাকার কৌতূহলী লোকজন এসে ঘিরে দাঁড়াল। চারদিকে অশ্বারোহী সৈন্যরা নজর রাখতে লাগল যাতে কোনো বন্দী পালাতে না পারে।

সূর্য মাথার ওপরে। চড়া রোদের মধ্যে বন্দীরা কাজ করতে লাগল। এবার ফ্রান্সিস দলপতির কাছে এসে বলল, এদের দুপুরের খাবার তো দিতে হয়।

দলপতি বলল, আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি। একটু পরেই খাবার নিয়ে এখানকার কয়েদঘরের প্রহরীরা আসবে।

যাক! নিশ্চিত হলাম। ফ্রান্সিস বলল।

দলপতি এবার একটু হেসে বলল, রাজা ফার্নান্দো হুকুম দিয়েছেন গুপ্তধন উদ্ধারের ব্যাপারে তোমাকে যেন সবসময় সাহায্য করা হয়।

ভালো, তবে এতে দায়িত্বটা বেড়ে গেল। ফ্রান্সিস বলল।

একটু পরেই কয়েকজন প্রহরী খাবার নিয়ে এল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে বন্দীরা সবাই পাশের প্রান্তরে খেতে বসে গেল। ফ্রান্সিস, বারাকা, দলনেতা, সৈন্যরাও খেতে বসল। লম্বাটে পাতায় গোল করে কাটা রুটি, আনাজের ঝোল, পাখির মাংস

খেতে দেওয়া হলো।

খাওয়াদাওয়ার পর শুরু হলো পাথর সরানোর কাজ।

বিকেল হলো। ফ্রান্সিস সব ঘুরে ঘরে দেখতে লাগল। ভাঙা দেয়ালের অংশ, পাথরের চৌকোনা মেঝে দেখে বুঝল ঘরগুলো কোথায় ছিল। ফ্রান্সিসের উদ্দেশ্য ছিল—রাজকোষাগার খুঁজে বের করা। দেখল অর্ধেকেরও বেশি জায়গা থেকে পাথর সরানো হয়েছে। কালকের মধ্যেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন ঘরগুলোর মেঝে দেখে আন্দাজ করা যাবে কোথায় কোথায় ঘর ছিল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, আজকের মতো এখানেই কাজ শেষ। সবাই বসে জিরিয়ে নাও।

সন্ধের আগেই সবাই ফিরে চলল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে ঘোড়ায় চড়িয়ে দিল। নিজে আর সব বন্দীর সঙ্গে হেঁটে চলল।

দলপতি সব বন্দীকে নিয়ে চলল ওখানকার কয়েদঘরটার দিকে। ফ্রান্সিস আর বারাকা সরাইখানায় ফিরে এল।

পরদিন আবার পাথর সরানোর কাজ চলল। দুপুরে খাবার খেতে বন্দীরা কাজ থামাল। তারপর আবার শুরু হলো কাজ—পাথর ঠোকাঠুকির শব্দ।

বিকেলের আগেই পাথরের স্তূপ সরানো শেষ হলো। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, এবার সবাই বিশ্রাম কর। বন্দীরা যে যেখানে পারল বসে পড়ল। বিশ্রাম করতে লাগল।

ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখতে লাগল। প্রথমে দেখল বড় ঘরটা। বোঝা গেল এটাই ছিল রাজদরবার। অন্য ঘরগুলোও দেখল। কোনটা মন্ত্রণাকক্ষ, কোনটা অস্ত্রশস্ত্র রাখার ঘর, অন্তঃপুরের ঘর কোনগুলো তাও বুঝে নিল। দু'কোণায় দুটো ঘরের কোনটা মহাফেজখানা কোনটা রাজকোষাগার সেটা বুঝতে পারল না।

আলো কমে এসেছে। ফ্রান্সিস উঠে এল। এখন ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

বন্দীদের নিয়ে সবাই চলল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে ঘোড়ায় উঠিয়ে নিজে হেঁটে চলল পাশে পাশে। হ্যারি মৃদুস্বরে ওদের দেশের ভাষায় বলল, ফ্রান্সিস, তুমি যা খুঁজছো তার কিছু হদিস পেয়েছো?

ফ্রান্সিসও গলা নামিয়ে বলল, বলতে পারো সাফল্যের দোরগোড়ায়।

এখানকার কয়েদঘরটা এত ছোট যে আমরা ভালো করে ঘুমুতে পারছি না।

আজকের রাতটা কোনোরকমে কষ্ট করে থাকো। কালকে সব ঠিক হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল। সেইদিন রাতেই হ্যারিদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। কয়েদঘরে রাখা হল।

পরের দিন সকালেই ফ্রান্সিস আর বারাকা ঘোড়া ছুটিয়ে ভাঙা প্রাসাদে এল।

ফ্রান্সিস পাথরে ভর রেখে নিচে নেমে এল। দুকোনার ঘর দুটোর মেঝে দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল কোন ঘরটা ছিল রাজকোষাগার। হিসেব করতে গিয়ে দেখল পুবকোনার ঘরটাই প্রধান প্রবেশপথ থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে।

তাহলে এটাই ছিল রাজকোষাগার।

ফ্রান্সিস ভাঙা ঘরের পাথরের মেঝেয় পায়চারি করতে লাগল। ভাবতে লাগল এই ঘরেই একশো বছর আগে ইবন আবি আমীর তাঁর অর্থসম্পদ রাখতেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি সেসব কোথায় রেখে যান তা কাউকে জানিয়ে যেতে পারেননি। নাকি ইচ্ছে করেই জানাননি!

ফ্রান্সিস পায়চারি করছে। হঠাৎ মনে হলো একটা পাথরের পাটা কেমন নড়ে উঠল। ফ্রান্সিস এবার আস্তে হাঁটতে লাগল। নড়ে-ওঠা পাটার ওপর দাঁড়াল। পায়ের চাপ এদিক-ওদিক করল। বুঝল পাটাটা নড়ছে। হিসেব করে দেখল—ঠিক মেঝের মাঝখানের পাটাটা নড়ছে। পাশের পাটাটায় পায়ের চাপ দিল। ওটাও নড়ছে। তবে পাশেরটার চেয়ে কম। ফ্রান্সিস বারাকাকে ডেকে বলল, দ্যাখো তো এই দুটো পাটা নড়ছে কিনা। বারাকা এসে দাঁড়াল ঐ দুটো পাটার ওপর। পা চাপল। তারপর বলল, সত্যি দুটো নড়ছে। একটা বেশি, অন্যটা কম।

ফ্রান্সিস বলল, বারাকা, এই দুটো পাটাই কুড়ুল চালিয়ে তুলতে হবে। তুমি যে ক'টা কুড়ুল পাও নিয়ে এসো। কয়েকজন শক্তসমর্থ লোকও নিয়ে এসো। বলবে এখানে একটা কাজ করতে হবে। বদলে মজুরি পাবে।

বারাকা খাদ থেকে উঠে চলে গেল। ফ্রান্সিস ভালো করে নড়া পাটা দুটো দেখতে লাগল। পাটা দুটো বারবার নড়িয়ে বুঝল দুটো পাটাই পরে বসানো হয়েছে। এটা করা হয়েছে গোপনে একটা কিছু রাখার জন্যে।

বারাকা ফিরে এল। সঙ্গে কুড়ুল হাতে পাঁচটি যুবককেও নিয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস ঐ যুবকদের পাথরের পাটাটা তুলতে বলল। দু'-তিনজন মিলে পাটা দুটো নাড়িয়ে নাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করল। পারল না। ফ্রান্সিস বলল, কুড়ুলের ঘা মেরে পাটা দুটো ভাঙো। তারপর টুকরোগুলো সরিয়ে ফেল। পাঁচ জনে পরপর কুড়ুলের ঘা মারল। পাথরের পাটা ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গেল। ওরা টুকরোগুলো সরালো। ফ্রান্সিস হাঁটু গেড়ে বসে দেখল লোহার পাত মতো। যুবকদের বলল, অন্য পাটাটাও ভাঙো। যুবকদের আরো দুটো পাটা কুড়ুল মেরে ভাঙাল। ভাঙা পাথরগুলো তুলে সরিয়ে রাখল। এবার ফ্রান্সিস লোহার জিনিসটা পুরো দেখতে পেল। বুঝল এটা একটা লোহার সিন্দুক। যুবকদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা সিন্দুকটা তুলে আনো। ওরা আরো কয়েকটা পাটা ভেঙে গর্তটা বড় করল। তারপর সবাই হাত লাগিয়ে সিন্দুকটা আস্তে আস্তে তুলে এনে মেঝেয় রাখল।

ফ্রান্সিস ঝুঁকে পড়ে সিন্দুকটা দেখতে লাগল। সিন্দুকটা সাধারণ সিন্দুকের মতোই। রঙটা কালো। সিন্দুকটার সামনে-পেছনে দেখতে একই রকম। দু'পাশেই দুটো হাতল আছে। ফ্রান্সিস বুঝল সাধারণ সিন্দুকের মতো দেখতে হলেও এই সিন্দুকটা নির্দেশমতো তৈরি হয়েছে। সিন্দুকটার সামনে বা পেছনে কোথাও চাবির ফুটো নেই। ফ্রান্সিস বেশ আশ্চর্য হলো। বুঝল এই সিন্দুকে মূল্যবান কিছু নিশ্চয়ই আছে। তাই এই ব্যবস্থা।

ফ্রান্সিস যুবকদের দু'ভাগে ভাগ করল। নিজে আর বারাকাও হাত লাগাল। দু'দলে ভাগ হয়ে ফ্রান্সিসরা দু'দিকের হাতল ধরে প্রচণ্ড জোরে টানল। সিন্দুকের ডালা খুলল না। এরকম কয়েকবারই টানা হলো। কিন্তু সিন্দুকের ডালা খুলল না।

ফ্রান্সিস মেঝেয় বসে পড়ল। সিন্দুকটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল বিশেষভাবে তৈরি সিন্দুকটা যাতে খোলা না যায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই কীভাবে সিন্দুকটা খুলবে সেটা আগে বুঝতে হবে।

তখন বেশ বেলা হয়েছে। বারাকা বলল, ফ্রান্সিস, এবার খেতে চলো।

ফ্রান্সিস চিন্তিতস্বরে বলল, আমি খাবো না তুমি আর ঐ যুবকরা খেয়ে এসো।

—তুমিও এসো। উপবাসে থাকলে তোমার কষ্ট হবে। বারাকা বলল।

—আমার অভ্যেস আছে। তোমরা যাও।

বারাকারা খেতে চলে গেল।

ফ্রান্সিস সিন্দুকটার পাশে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ লক্ষ্য করল একদিকের ডালার ধারে ওপর থেকে নিচে একটা লোহার পাত বসানো। ভালো করে দেখে বুঝল পাতটা পরে বসানো হয়েছে। সিন্দুকের অন্যদিকে এরকম পাত বসানো নেই। ফ্রান্সিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেই লোহার পাতটা দেখতে লাগল। বুঝল ছেনি-হাতুড়ি হলে লোহার লম্বা পাতটা খুলে ফেলা যাবে।

বারাকা আর যুবকরা ফিরে এল। ফ্রান্সিস যুবকদের বলল, ছেনি-হাতুড়ি আনতে পারবে কেউ?

একটি যুবক বলল, আমি আনতে পারবো।

ফ্রান্সিস বলল, তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। এতক্ষণে ফ্রান্সিস খাদের ওপরের দিকে তাকাল। দেখল খাদ ঘিরে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। ওরা দেখছে ফ্রান্সিস কী করছে।

যুবকটি ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে এলে ফ্রান্সিস লোহার পাতের খাঁজে ছেনি বসিয়ে হাতুড়ি চালাল। আশ্চর্য! একটা ঘা পড়তেই লোহার লম্বাটে পাতটা সরে গেল। এতক্ষণে ফ্রান্সিস হাসল। বারাকার দিকে তাকিয়ে বলল, বারাকা, আমার অনুমান সত্যি হতে চলেছে। লোহার লম্বা পাতটা উঠে এলেই সিন্দুকের রহস্যটা বোঝা যাবে।

ফ্রান্সিস আবার হাতুড়ি চালাল। লোহার লম্বা পাতটা আরো খুলল। পরপর দু'-তিনটে হাতুড়ির ঘায়ে লোহার পাতটা উঠে এল। দেখা গেল একটা রুপোর চাবি সিন্দুকের গায়ে আটকানো। তার নিচেই একটা চাবির ফুটো। ফ্রান্সিস চাবিটা খুলে নিল। তারপর ফুটোয় চাবিটা ঢোকাল। ডানের দিকে চাপ দিয়ে ঘোরাতেই কট করে একটা শব্দ হলো। সিন্দুকের ডালা খুলে গেল। ডালাটা আটকাবার আগেই চারটে স্বর্ণমুদ্রা পাথরের মেঝেয় পড়ল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ডালাটা সজোরে চেপে বন্ধ করল। যাতে আর কিছু দামী জিনিস বেরিয়ে না আসে। চাবি ঘুরিয়ে ডালা বন্ধ করে সে চারটে সোনার চাকতি কোমরে গুঁজল। খাদের ওপরে তাকিয়ে দেখল

অনেক লোক জমে গেছে। দু'-তিনজন লোক ফ্রান্সিসের কাছে এল। একজন বলল, সিন্দুক থেকে সোনার চাকতি পড়ল দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওর সঙ্গীরাও বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরাও দেখেছি।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, ভাই, ওগুলো স্বর্ণমুদ্রা। আমার কোমরের ফেট্টি থেকে কী করে খুলে পড়ে গেছে। তোমরা সেই স্বর্ণমুদ্রাই দেখেছো। ওরা ঠিক বিশ্বাস করল না। তবে এই সোনার চাকতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। চারপাশের কিছু লোক এগিয়ে এল। জটলা চলল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে ডাকল, বারাকা, কাছে এসো। বারাকা কাছে এল। ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল, তুমি ঘোড়ায় চড়ে এক্ষুণি আলতোয়াইফের কাছে যাও। বলবে, আমরা আমীরের গুপ্তধন আবিষ্কার করেছি। উনি যত শীঘ্র সম্ভব একদল সৈন্য নিয়ে যেন এখানে আসেন। যাও—জলদি।

ফ্রান্সিস সিন্দুকটার পাশে মেঝেয় বসে পড়ল। চাবিটা সিন্দুকের নিচে ঠেলে দিল। যে ভয়টা ফ্রান্সিস করছিল, এখন ঘটনা সেদিকেই মোড় নিল। সিন্দুকটা থেকে সোনার চাকতি বেরিয়েছে—খবরটা দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। চার পাঁচ জনের একটি দল খাদে নেমে ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। একজন বলল, আমরা দেখছি তুমি চাবি দিয়ে সিন্দুকটা খুলেছিলে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, ভুল দেখেছিলে, চাবিটা লাগেইনি।

অন্যজন বলল, আমরা দেখেছি সিন্দুক থেকে সোনার চাকতি গড়িয়ে পড়েছে।

ফ্রান্সিস আবার হেসে বলল, ভুল দেখেছো। আমার কোমরের ফেট্টি থেকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা পড়ে গিয়েছিল।

আর একজন বলল, তুমি চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলেছিলে?

না, সেই চাবিতে সিন্দুক খোলেনি। ফ্রান্সিস বলল।

আর একজন চড়া গলায় বলল, ঠিক আছে, তুমি চাবিটা দাও, আমরা দেখবো সেই চাবিতে সিন্দুক খোলে কিনা।

ফ্রান্সিস এরকম কিছু আগেই আন্দাজ করেছিল। হেসে বলল, সেই চাবি তো আমার কাছে নেই। এখানকার আলতোয়াইফের কাছে লোক মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছি।

চড়া মেজাজের লোকটি বলল, না। তুমি মিথ্যে কথা বলছো। চাবিটা তোমার কাছেই আছে।

ফ্রান্সিস দু' হাত তুলে হেসে বলল, ঠিক আছে, আমাকে তল্লাশি কর।

চড়া মেজাজের লোকটি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসের পোশাক, কোমর সব দেখল। চাবি পাওয়া গেল না। ফ্রান্সিস আগেই ভেবেছিল জড়ো হওয়া লোকগুলো যদি চাবি পেয়ে সিন্দুক খোলে, সব ধনভাণ্ডার অল্পক্ষণের মধ্যেই লুঠ হয়ে যাবে। নিরস্ত্র ফ্রান্সিস কিছুই করতে পারবে না।

ফ্রান্সিস বারবার রাস্তার দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু আলতোয়াইফ আসছেন

না। এবার দলে দলে লোকজন খাদে নেমে আসতে লাগল। সিন্দুকটার গায়ে হাত দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস কাউকে বাধা দিল না। বাধা দিলে ওদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে, নিশ্চয়ই সিন্দুকের মধ্যে দামী কিছু আছে।

ফ্রান্সিস তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। হঠাৎ দেখল ধূলো উড়ছে। অশ্বারোহী সৈন্যদল আসছে। সামনে আলতোয়াইফ আর বারাকা।

সবাই খাদের কাছে এসে থামল। আলতোয়াইফ খাদে নেমে ফ্রান্সিসের কাছে এলেন। সিন্দুকটা দেখিয়ে বললেন, এটাতে কি গুপ্তধন আছে?

ফ্রান্সিস বলল, ঠিক বলতে পারবো না। সিন্দুকটা আপনার প্রাসাদে গিয়ে খুলতে হবে। তখন দেখা যাবে এই সিন্দুকেই গুপ্তধন রাখা হয়েছিল কিনা।

—আমার মনে হয় এই সিন্দুকের মধ্যে কিছু পুরনো দলিল-দস্তাবেজ আছে। আলতোয়াইফ বললেন।

—তাও হতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

আলতোয়াইফ সৈন্যদের দলনেতাকে ডাকলেন। সে কাছে এলে বললেন, একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি যোগাড় কর। এই সিন্দুকটা গাড়িতে তুলে আমার প্রাসাদে নিয়ে এসো। সিন্দুকটা মহাফেজখানায় রাখবে।

আলতোয়াইফ এসে ঘোড়ায় উঠলেন। ফ্রান্সিসরাও এসে ঘোড়ায় উঠল। কিছু সৈন্য দলনেতার কাছে রইল, সিন্দুক গাড়িতে তুলে নিয়ে আসবে বলে।

সবাই চলল নতুন প্রাসাদের দিকে।

সন্ধের আগেই সিন্দুকটা এনে মহাফেজখানায় রাখা হলো। ফ্রান্সিস আর বারাকা প্রাসাদের বাইরের ঘরটায় বসেছিল। সিন্দুক রাখার পর ফ্রান্সিস বারাকাকে বলল, আলতোয়াইফকে বলো আমি তাঁর সামনেই সিন্দুকটা খুলব। বারাকা একজন দ্বাররক্ষী মারফৎ এই আর্জি জানাল আলতোয়াইফকে। দ্বাররক্ষী কিছুক্ষণ পরে এসে বলল, উনি তোমাদের মহাফেজখানায় যেতে বলেছেন।

ফ্রান্সিস আর বারাকা মহাফেজখানায় চলল। ফ্রান্সিস চাবিটা সিন্দুকের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। একসময় সকলের অলক্ষ্যে চাবিটা তুলে নিয়ে কোমরে গুঁজে রেখেছিল।

ওরা মহাফেজখানায় এল। মশালের আলোয় দেখল আলতোয়াইফ দাঁড়িয়ে আছেন। ফ্রান্সিসদের দেখে বললেন, সিন্দুক খোলার জন্যে এত তাড়াহুড়ো করছো কেন?

ফ্রান্সিস এবার কোমরের ফেট্টি থেকে চারটে সোনার চাকতি খুলে আলতোয়াইফের দিকে এগিয়ে ধরল। আলতোয়াইফ বেশ চমকে উঠলেন। ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকালেন।

ফ্রান্সিস বলল, এই সোনার চাকতিগুলো ঐ সিন্দুক থেকেই গড়িয়ে পড়েছিল।

আলতোয়াইফ সোনার চাকতি ক'টা হাতে নিলেন। মনোযোগ দিয়ে দেখলেন।

ফ্রান্সিস বলল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সিন্দুকেই গোপনে রাখা হয়েছিল ইবন

আবি আমীরের ধনভাণ্ডার।

আলতোয়াইফ সায় দিয়ে বললেন, আমার এখন তাই মনে হচ্ছে। এবার সিন্দুকটা খোল তো।

ফ্রান্সিস সিন্দুকের সামনে এল।

সিন্দুকের ফুটোয় চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাল। কিছু সোনার চাকতি নিচে ডালার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। এবার ফ্রান্সিস এক হ্যাঁচকা টানে ডালাটা খুলে ফেলল। মুঠো মুঠো সোনার চাকতি মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল।

মশালের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল সোনার চাকতিগুলো। সিন্দুকের নিচের তাকটায় চেপে ভরা ছিল চাকতিগুলো। এবার ওপরের তাকেও দেখা গেল হীরে, মণিমুক্তোর কত অলংকার। মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল মণি-মাণিক্যগুলো। তিনজনেই হাঁ করে তাকিয়ে রইল সেই দিকে।

কিছু পরে আলতোয়াইফ বললেন, সিন্দুক বন্ধ কর। ফ্রান্সিস আর বারাকা মেঝে থেকে সোনার চাকতিগুলো তুলে সিন্দুকে চেপে চেপে ভরল। তারপর ফ্রান্সিস সিন্দুকের ডালা বন্ধ করে রুপোর চাবিটা আলতোয়াইফকে দিল। বলল, মাননীয় মহাশয়, কাজের সুবিধের জন্য আমি এই দেশের পোশাক পরে আছি। আসলে জাতিতে আমি ভাইকিং। আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের নিয়ে ক্যামেরিনাল বন্দর শহর হয়ে গুয়েনভা বন্দরে জাহাজ চালিয়ে এসেছিলাম। সেখানে আমাদের বন্দী করা হয়। রাজা ফার্নান্দো সন্দেহ করেছিলেন আমরা তাঁর ভাই ক্যামেরিনালের রাজা গার্সিয়ার গুপ্তচর। আমার বন্ধুদের সেভিল্লা নগরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল, রাজা ফার্নান্দোর অনুমতি নিয়ে আমি ইবন আমীরের গুপ্তধন উদ্ধার করেছি। এবার আমার স্ত্রী আর বন্ধুদের মুক্তির ব্যবস্থা আপনি করুন।

বারাকা বলল, এই ইবন আমীরের গুপ্তধনের হদিস আমার বাবা জানেন, এই সন্দেহে আমার বাবাকেও সেভিল্লায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। আপনি তাঁরও মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

আলতোয়াইফ বললেন, কাল ভোরে এই সিন্দুকের গুপ্ত ধনভাণ্ডার নিয়ে আমি সেভিল্লায় যাবো। রাজা ফার্নান্দোকে দেব ধনসম্পদ আর তোমাদের কথা বলবো।

পরের দিন ভোরে আলতোয়াইফের সঙ্গে ফ্রান্সিস আর বারাকা ঘোড়ায় চড়ে চলল। ঘোড়ায় টানা গাড়িতে সিন্দুকটাও নিয়ে চলল।

তখনও রাজদরবার শুরু হয়নি। আলতোয়াইফের নির্দেশে সিন্দুকটা রাজদরবারের মাঝখানে রাখা হলো।

রাজা ফার্নান্দো রাজদরবারে এলেন। সিংহাসনে বসে আলতোয়াইফকে তাঁর সামনে আসার অনুমতি দিলেন। আলতোয়াইফ সামনে এগিয়ে গিয়ে রাজাকে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজা ফার্নান্দো বললেন, আপনার পাঠানো দূত মারফৎ কাল রাতেই আমি জানতে পেরেছি ইবন আবি আমীরের গুপ্ত

ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করা হয়েছে।

আলতোয়াইফ পেছন ফিরে ফ্রান্সিসকে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলেন। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে দাঁড়াল। আলতোয়াইফ ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বললেন, এই যুবকটিই নিজের বুদ্ধিকৌশলে গুপ্তধন আবিষ্কার করেছে।

রাজা ফ্রান্সিসকে বললেন, বলো এর পুরস্কার হিসেবে তুমি কী চাও, এই গুপ্ত সম্পদের কিছু অংশ যদি তুমি চাও অবশ্যই তা পাবে।

ফ্রান্সিস বলল, মহামান্য রাজা, আমি অর্থসম্পদ চাই না। আমি চাই আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের মুক্তি দেওয়া হোক। বারাকার বাবাকেও মুক্তি দেওয়া হোক।

রাজা ফার্নান্দো সেনাপতিকে ডাকলেন। কিছু আদেশও দিলেন। সেনাপতি ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল, আমার সঙ্গে এসো।

তখন আলতোয়াইফ সিন্দুকটা খুলছেন। রাজ-দরবারের সবাই গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে সিন্দুকটার দিকে।

সেনাপতি বন্দীশালার সামনে এল। ফ্রান্সিসকে বলল, তোমার বন্ধুদের বলো বেরিয়ে আসতে। সেনাপতির ইঙ্গিতে প্রহরীরা বন্দীশালার লোহার দরজা ঢং ঢং শব্দে খুলে দিল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, ভাইসব, তোমরা মুক্ত। বাইরে এসো।

ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে বাইরে এল। প্রহরীরা ওদের হাতের বাঁধন কেটে দিতে লাগল। ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল, ও-হো-হো।

দেখা গেল রাজপ্রাসাদের দিক থেকে একজন পরিচারিকা মারিয়াকে নিয়ে আসছে। মারিয়ার আর তর সইছিল না। মারিয়া হাসতে হাসতে প্রান্তরটা ছুটে পার হয়ে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। তখনও হাঁপাচ্ছে, মারিয়াকে সুস্থ দেখে ফ্রান্সিস খুশি হলো।

মারিয়া আসতেই আবার ভাইকিংদের ধ্বনি উঠল—ও-হো-হো। ফ্রান্সিস বলল—এবার শুয়েনভা চলো—আমাদের জাহাজে।

ভাঙা আয়নার রহস্য

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে। বাতাসের তেমন জোর নেই। পালগুলো প্রায় নেতিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া ছুটে আসছে। তখনই পালগুলো ফুলে উঠছে। পরক্ষণেই আগের মত।

বেশ কিছুক্ষণ আগে পশ্চিম দিগন্তে গভীর কমলা রঙের সূর্য অস্ত গেছে। আকাশে লাল-আলো ছিল ছড়িয়ে। এখন সব অন্ধকার। আকাশে ভাঙা চাঁদ। জ্যোৎস্না খুব উজ্জ্বল নয়।

তীরভূমির কাছ দিয়ে জাহাজ চলেছে। ভাইকিংরা ডেক-এর এখানে ওখানে শুয়ে বসে ছিল। জাহাজের গতি বেশ কমে গেছে। হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। দেখল জাহাজের শ্লথগতি। ও সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল। চলল ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরের দিকে। কেবিন ঘরের সামনে এসে হ্যারি দরজায় টোকা দিল। মারিয়া দরজা খুলে দাঁড়াল। বলল—কী ব্যাপার হ্যারি!

—সমস্যায় পড়েছি। ফ্রান্সিস ডাকল—হ্যারি ভেতরে এসো। হ্যারি কেবিন ঘরে ঢুকল। বলল—বাতাস একেবারে পড়ে গেছে। সব পাল নেতিয়ে পড়েছে। জাহাজের গতি কমে গেছে। কী করবে বলো।

—আমি বিকেলে ডেক-এ গিয়েছিলাম। দেখেছি সব। হাওয়ার গতি না বেড়ে ওঠা পর্যন্ত এভাবেই যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দাঁড় টানলে জাহাজের গতি বাড়তো। হ্যারি বলল।

—থাক না। বন্ধুরা একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসুক। গল্পটল্প করুক। গভীর রাতের দিকে দেখো বাতাসের গতি বাড়বে। অনেকবারই এমন হতে দেখেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে দেখা যাক। হ্যারি বলল। ও ডেক-এ উঠে এল। মাস্তুলে ঠেসান দিয়ে বসল। অপেক্ষা করতে লাগল কখন বাতাসের বেগ বাড়ে।

মাস্তলের মাথায় বসেছিল নজরদার পেড্রো। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। তাই পেড্রোকে চোখ কুঁচকে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হচ্ছিল।

হঠাৎ দেখল তীরভূমি দিয়ে মশাল হাতে কারা ছুটে আসছে। পেড্রো চোখ কুঁচকে স্থির তাকিয়ে রইল কিন্তু চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ঠিক বুঝল না ওরা কারা।

পেড্রো গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—তীরভূমি দিয়ে একদল লোক ছুটে আসছে আমাদের জাহাজের দিকে। ফ্রান্সিসকে খবর দাও।

হঠাৎ তখনই মেঘ সরে গেল। চাঁদের আলো অনেকটা স্পষ্ট হল। পেড্রো দেখল যারা মশাল হাতে ছুটে আসছে তারা সংখ্যায় পাঁচজন। সবাই সশস্ত্র যোদ্ধা।

ততক্ষণে ফ্রান্সিসদের কাছে খবর পৌঁছে গেছে। ফ্রান্সিস ও মারিয়া জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। রেলিং ধরে তাকিয়ে রইল। সত্যি পাঁচজন সশস্ত্র সৈন্য আসছে। হাত নেড়ে কী বলছে। ওদের কথা ক্ষীণভাবে শোনা গেল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস ওরা পোর্তুগীজ ভাষায় কথা বলছে। জাহাজ থামাতে বলছে। কী করবে?

—তাই ভাবছি। তবে এটা বোঝা গেল যে আমরা পোর্তুগালে এসেছি। ফ্রান্সিসদের ঘিরে ভাইকিংরা দাঁড়িয়ে ছিল। শাঙ্কো বলল—

—ফ্রান্সিস—মাত্র তো পাঁচজন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ওদের হারিয়ে দিতে পারবো।

—না শাঙ্কো—আমি লড়াই চাই না। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি বলল—এক কাজ কর—ওদের জাহাজে উঠতে দাও। ওরা কী বলতে চায় শুনি। তারপর যা করার করবো।

—বেশ—ফ্রেজারকে বলো জাহাজ তীরভূমিতে নিতে। পাটাতনও পেতে দাও।

ফ্রেজার ফ্রান্সিসের নির্দেশমত জাহাজ তীরে ভেড়াল। পাটাতন ফেলা হল। সৈন্যরা পাটাতন দিয়ে জাহাজে উঠল। তার আগে বালিয়াড়িতে ওরা মশাল পুঁতে রাখল।

পাঁচজন জাহাজে উঠতে ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। হ্যারিও সঙ্গে গেল। ওদের মধ্যে একজন সর্দার গোছের লোক ভাঙাভাঙা পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—তোমরা কারা? এখানে এসেছো কেন? তোমাদের দেখেই বুঝতে পারছি তোমরা বিদেশী। তোমাদের দেশ কোথায়?

একগাদা প্রশ্নের উত্তরে হ্যারি বলল—আমরা জাতিতে ভাইকিং। পশ্চিমে য়ুরোপের সমুদ্রতীরে আমাদের দেশ।

—তোমরা জলদস্যু হতে পারো। হ্যারি ক্রুদ্ধস্বরে বলল—কী দেখে আমাদের জলদস্যু বলে সন্দেহ করছো?

—তোমরা এতজন জোয়ান। একসঙ্গে জাহাজে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো। জাহাজ লুঠ করা তোমাদের পক্ষে খুবই সহজ কাজ। লোকটা বলল।

তখনই মারিয়া ফ্রান্সিসদের কাছে এসে দাঁড়াল। হ্যারি আঙুল তুলে মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। কোন দেশের রাজকুমারী জলদস্যুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় শুনেছো কখনো?

—না—এরকম শুনিনি। লোকটা বলল।

—তবে? হ্যারি বলল।

—তাহলে তোমরা রানি উরাকার গুপ্তচর।

—রানি উরাকার নাম আমরা জন্মেও শুনিনি। তাছাড়া তোমাদের রাজারানির কোন ব্যাপারে আমরা নেই। আমরা দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াই। সবার সঙ্গে সহৃদয় সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করি। যদি কোথাও

গুপ্তধনের সংবাদ পাই আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে তা উদ্ধার করি। তারপর সেখানকার শাসককে দিয়ে দিই। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা তাতে ভাগ বসাও। সর্দারটা বলল।

—না। একটা তামার মুদ্রাও আমরা নিই নি। হ্যারি বলল।

সর্দার গোছের লোকটা দাঁত বের করে হেসে সঙ্গীদের দিকে তাকাল। সঙ্গীরাও হাসল। লোকটা বলল—তোমরা কত কষ্টে গুপ্তধন উদ্ধার কর আর তার এককণাও নাও না—এটা বিশ্বাস হচ্ছে না।

—খুবই স্বাভাবিক। আমরা চোর ডাকাত জোচ্চোরদেরই বেশি দেখি। মানুষ যে অন্যরকমও হয়—মানুষ যে সৎও হয়, হৃদয়বানও হয়, সত্যবাদীও হয় এটা আমরা সহজে বিশ্বাস করতে পারি না। হ্যারি বলল।

—যাকগে। তোমাদের বন্দী করা হল। সর্দার বলল।

—কেন? আমরা তো কোন অপরাধ করিনি। হ্যারি বলল।

—সেসব বুঝি না। সর্দার বলল।

—আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি। আমাদের বাধা দিও না। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা কি আমাদের সঙ্গে লড়াই করবে? সর্দার বলল।

—না। লড়াই মৃত্যু রক্তপাত এসব আমরা চাই না। হ্যারি বলল।

—কাপুরুষ। সর্দার হেসে উঠে বলল।

শাঙ্কো এগিয়ে এসে নিজেদের দেশের ভাষায় বলল—ফ্রান্সিস আমরা বিনাযুদ্ধে এভাবে বন্দী হবো না। আমরা লড়াই করবো। অন্য ভাইকিং বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো।

সৈন্য কজন একটু ঘাবড়াল।

ফ্রান্সিস বলল—ভাইসব। শান্ত হও। সময় সুযোগমত লড়াই করবো। এখানে ধারেকাছে সেনানিবাস থাকা অসম্ভব নয়। একবার লড়াইয়ে নামলে এরা দু-একজন মারা যাবে দু-একজন পালাবে। সেনানিবাসে এই সংবাদ পৌঁছোলে কত না সৈন্য ছুটে আসবে কে জানে। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—দেখ—বাতাস পড়ে গেছে। শুধু দাঁড় বেয়ে আমরা বেশিদূর যেতে পারবো না। ধরা পড়ে যাবো। তখন লড়াই মানেই আমাদের মৃত্যু। কাজেই আগে সব শুনি। হ্যারি ওদের কাছে শোনো তো এখানকার রাজা কে? রানি উরাকা কে? কী জন্যে ওরা আমাদের রানি উরাকার গুপ্তচর বলে ভাবছে?

হ্যারি জিজ্ঞেস করল—তোমাদের রাজার নাম কি?

—মহামান্য গঞ্জালেস। সর্দার বলল।

—রানি উরাকা কোথাকার রানি? হ্যারি জানতে চাইল।

—আমরা যেখানে আছি এটা রানি উরাকার দেশের সীমা। এখান থেকে কিছু দূরে গেলে রানি উরাকার দুর্গ দেখতে পাবে। যান তো—এসব বলে কী হবে। তোমরা সব জেনেই এখানে এসেছো। রানি উরাকা তোমাদের পাঠিয়েছে। মহামান্য গঞ্জালেসের সৈন্যসংখ্যা কত? তাঁর সেনানিবাস কোথায়? এসব খবর

সংগ্রহের জন্যেই তোমাদের পাঠানো হয়েছে। এখন ধরা পড়ে অন্যরকম কথা বলছো যেন কিছুই জানো না। সর্দার বলল।

—আমরা আগেও বলেছি এখনও বলছি—রানি উরাকার নামও আমরা কোনদিন শুনিনি। তোমাদের কাছেই প্রথম শুনলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক গে—তোমাদের বন্দী করা হল। সর্দার বলল।

ওদিকে শাঙ্কো বিস্কোরা দল বাঁধল। অস্ত্রঘর থেকে তরোয়াল সকলের অলক্ষ্যে এনে সিঁড়িঘরের পেছনে এসে দাঁড়াল। সৈন্যরা যখন ফ্রান্সিসদের বন্দী করতে এগিয়ে এল তখন শাঙ্কোরা সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতর্কিত এই আক্রমণে সৈন্যরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ওরা কোমরের অসিকোষ থেকে তরোয়াল বের করল। ততক্ষণে দুজন সৈন্য শাঙ্কোদের তরোয়ালের মার খেয়ে ডেক-এ পড়ে গেছে। শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। রাজা গঞ্জালেসের সৈন্যরা এল উষ্ণীষ পরা। ভাইকিংদের তো সেসব নেই। সামনা সামনিই লড়াই চলল। কিছুক্ষণ লড়াই করেই সৈন্যরা বুঝল শাঙ্কোরা তরোয়াল চালাতে কত দক্ষ।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি বাধা দেবার সময় পেল না। এখন দুজনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—আমরা বিপদে পড়লাম। শাঙ্কোরা মাথা গরম করে আমাদের বিপদ ডেকে আনলো। দুজন ভাইকিং আহত হয়ে ডেক-এ পড়ে গেল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব লড়াই করো না। লড়াই বন্ধ কর। নইলে আমরা বিপদে পড়বো। এখনও কেউ মারা যায় নি। আর কিছুক্ষণ লড়াই চালাল উভয়পক্ষের কেউ না কেউ মারা যাবে। তার আগে লড়াই থামাও।

ভাইকিংরা লড়াই থামাল। সবাই অস্ত্র ত্যাগ করল। সৈন্যরাও অস্ত্র নামাল। সবাই হাঁপাচ্ছে তখন। শাঙ্কোরা রাজা গঞ্জালেসের দুজন সৈন্যকে রেলিংয়ের ওপর দিয়ে জলে ছুঁড়ে ফেলল।

আহত সৈন্যদের নিয়ে রাজা গঞ্জালেসের সৈন্যরা জাহাজের পাটাতন দিয়ে তীরে নেমে এল। জলে যে দুজন সৈন্যকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল তারাও দলের সঙ্গে জুটল। সর্দার গোছের সৈন্যটি তরোয়াল উঁচিয়ে বলল—এর ফল তোমাদের ভুগতে হবে।

তীরের বালিয়াড়ি পার হয়ে ঘাসের প্রান্তর পেরিয়ে ওরা দক্ষিণমুখো চলল। তখনই সূর্য উঠল। রোদ ছড়াল সমুদ্রে ফ্রান্সিসদের জাহাজ তীরভূমির গাছ-গাছালির মাথায় সবুজ প্রান্তরে। দেখা গেল দূরে সৈন্যরা যাচ্ছে। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস তুমি বলাতেই আমরা অস্ত্র ত্যাগ করলাম। আর কিছুক্ষণ সময় পেলে ওদের হারিয়ে দিতে পারতাম।

—তা পারতে। লড়াইয়ের সময় মাথা উত্তেজিত থাকে। দু-একজন সৈন্য নিশ্চয়ই মারা পড়ত। আমাদের অপরাধ বেশি হত। ওরা আমাদের বন্দী করতে এসেছিল। আমাদের ওরা আক্রমণ করেনি।

হ্যারি বলল—যা হবার হয়ে গেছে। এখন ফ্রান্সিস কী করবেন?

—এক্ষুনি নোঙর তোল। জাহাজ ছাড়ো। দাঁড় টানো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এ তল্লাট ছেড়ে পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ভাইকিংরা কাজে নেমে পড়ল। জাহাজের গুটিয়ে রাখা পালগুলো খুলে দিল। পালগুলো অল্প ফুলে উঠল। কারণ বাতাস এসে গেছে। নোঙর তোলা হল। একজন দাঁড়ঘরে চলে গেল। দাঁড়টানা শুরু হল। জাহাজ চলল।

মাস্তুলের মাথায় বসা নজরদার পেড্রো গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস, ঘোড়ায় চড়ে কারা আসছে, ধুলো উড়িয়ে খুব দ্রুত আসছে।

দক্ষিণ দিক থেকে তাই না? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। পেড্রো বলল।

—এখন কী করবে ফ্রান্সিস? হ্যারি বলল।

—ধরা দেব। উপায় নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—একবারে লড়াই না করে? হ্যারি বলল।

—এখন তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেখ—কত সৈন্য আসছে। ঘোড়ায় চড়ে আসছে মাত্র কয়েকজন। পেছনে তাকিয়ে দেখ। পদাতিক সৈন্য কত! ফ্রান্সিস বলল।

আবার বন্দীজীবন। হ্যারি বলল।

—বন্দীদশা মেনে নেব। সময় সুযোগ মত পালাবো। এছাড়া কোন উপায় নেই। ফ্রান্সিস বলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অশ্বারোহীরা কাছে এসে পড়ল। তাদের গলায় বর্মে উষ্ণীষে রোদ পড়েছে। চক্‌চক্ করছে।

অশ্বারোহীরা তীরের কাছে নামল। একজন দীর্ঘদেহী যোদ্ধা ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এল বালিয়াড়িতে। গলা চড়িয়ে বলল—জাহাজ থামাও।

—আমরা জাহাজ থামিয়েছি। নোঙর ফেলেছি। হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল।

—পাটাতন ফেলো। শাঙ্কোরা পাটাতন পেতে দিল। দীর্ঘদেহী পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে জাহাজে উঠল। চারদিকে তাকিয়ে ভাইকিংদের দেখল। তারপর বলল— তোমরা বলেছো তোমরা ভাইকিং। দেশ ঘুরতে বেরিয়েছো। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না।

—কী করলে তবে বুঝবেন যে আমাদের বিশ্বাস করা চলে? হ্যারি বলল।

—সে-সব পরে হবে। আমি এই দেশের সেনাপতি। মহামান্য রাজা গঞ্জালেস আসছেন। তিনি কী বলেন শোন।

তখন দেখা গেল দাড়ি গোঁফওয়ালা একজন মোটা লোক ঘোড়া থেকে নামলেন। তীরের দিকে এগিয়ে এলেন। বালিয়াড়িতে নামলেন। কোন কথা না বলে পাতা পাটাতন দিয়ে হেঁটে জাহাজে উঠে এলেন। তার পরনে কালো জোব্বামত পোশাক। তাতে রূপোলি সুতোর সূক্ষ্ম কারুকাজ। মাথায় ঢেউখেলানো সোনার রাজমুকুট। সকালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে। কোমরে

চামড়ার মোটা ফেট্টি। তাতে হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা তরোয়াল ঝুলছে। গঞ্জালেস জাহাজে উঠে তাকিয়ে তাকিয়ে জাহাজটা দেখলেন। ভাইকিংদের দেখলেন। একবার জোরে কাশলেন। তারপর বেশ ভারি গলায় বললেন—তোমরা আমার সৈন্যদের আহত করেছো। আমার একজন সৈন্যও যদি মারা যেত তোমাদের সবকটাকে তাহলে কেটে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতাম। তোমরা নিজেদের ভাইকিং বলে পরিচয় দিয়েছো' পোশাক নয় তোমাদের চেহারা দেখে বুঝতে পারছি তোমরা বিদেশী। তোমরা ভাইকিং। কিন্তু—গঞ্জালেস থামলেন। তারপর বলতে লাগলেন—এখন এখানে যুদ্ধের তোড়জোড় চলছে। রানি উরাকা আমাদের দেশ আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছে। আমরাও তৈরি হচ্ছি। যুদ্ধ হবেই। এইসময় তোমরা এখানে এসেছো কেন?

—আমরা ইচ্ছে করে এখানে আসিনি। আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাচ্ছি। হ্যারি বলল।

—কিন্তু আমাদের তো বিশ্বাস হচ্ছে না। রানি উরাকা গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্যে তোমাদের এখানে পাঠিয়েছে। রাজা বললেন।

—কিন্তু আমরা একবারও জাহাজ থেকে নামিনি। তাহলে কী করে আমরা গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করবো। হ্যারি বলল।

—সে-সব বুঝি না। তোমাদের বন্দী করা হল। রাজা গঞ্জালেস বললেন।

—এটা অন্যায়। আপনারা কোন প্রমাণ ছাড়াই আমাদের গুপ্তচর ভেবেছেন। সন্দেহের বশে আমাদের বন্দী করছেন। আমরা এখানে এসে রানি উরাকা এবং আপনার নাম প্রথম জানলাম। হ্যারি থামল। এবার ফ্রান্সিস ভাঙা ভাঙা পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—রানী উরাকার হয়ে আমরা কেন গুপ্তচরবৃত্তি করতে যাবো? তাতে আমাদের কী লাভ?

—হয়তো সোনার চাকতি দেবে। রাজা হেসে কাশলেন। তারপর বললেন— হয়তো এমনি কোন বন্দোবস্ত হয়েছে। তোমাদের যা হাল দেখছি। সোনার লোভ তোমরা সামলাতে পারোনি।

—আপনি আমাদের সঠিক পরিচয় জানেন না। অনেক মূল্যবান গুপ্তধন আমরা উদ্ধার করেছি। সেই গুপ্তধনের যিনি মালিক তাঁকেই আমরা গুপ্তধনের ভাণ্ডার দিয়ে দিয়েছি। এক টুকরো সোনা বা হীরে আমরা নিইনি। হ্যারি বলল।

—তোমরা বলছো কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। রাজা বললেন।

তখনই মারিয়া মাস্তুলের পেছন থেকে সামনে এল। রাজা গঞ্জালেস মারিয়াকে দেখে বেশ অবাক হলেন। বললেন এ কে?

—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজকুমারী এইভাবে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে? তোমাদের সঙ্গে? এর স্বামী কোথায়? রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

—আমিই রাজকুমারীর স্বামী। রাজকুমারী মারিয়াও আমাদের মত অ্যাডভেঞ্চার অভিযান ভালোবাসেন। তাই আমাদের সঙ্গে এসেছেন।

—অবাক কাণ্ড। চোখ বড় বড় করে রাজা গঞ্জালেস বললেন।

হ্যারি হেসে বলল—হ্যাঁ কিছু কিছু অবাক কাণ্ড তো সংসারে ঘটে।

—যাক গে। রাজা গঞ্জালেস সেনাপতিকে ইসারায় ডাকলেন। সেনাপতি কাছে এগিয়ে এল। রাজা বললেন—সবাইকে বন্দী করে নিয়ে চলো। রানি উরাকার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এরা বন্দী থাকবে।

—একটা অনুরোধ ছিল। হ্যারি বলল। রাজা হ্যারির মুখের দিকে তাকালেন। বললেন কী কথা?

—আমাদের রাজকুমারীকে আপনার অন্দর মহলে রাখুন। আমাদের তো আপনার বনী নিবাসে রাখা হবে। রাজকুমারী অত কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না। হ্যারি বলল।

—দেখি ভেবে। রাজা গঞ্জালেস জাহাজ থেকে নামলেন। চললেন নিজের ঘোড়াটার দিকে। ঘোড়াটায় উঠলেন। ঘোড়া ছোটালেন ঘাসে ঢাকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে।

সেনাপতি এগিয়ে এল। বলল—তোমাদের হাত বাঁধা হবে না। সেই সুবিধে নিয়ে কেউ পালাবার চেষ্টা করতে গেলে তাকে মরতে হবে। এবার চলো। ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নামতে লাগল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস—আমি পালাবো।

—পারবে না। একে দিনের বেলা তার ওপর সেনাপতিকে লক্ষ্য কর চারদিকে নজর রেখে চলেছে? ফ্রান্সিস বলল।

—আবার তো বন্দীর জীবন। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা ওঠা-নামা করল।

—আমরা আর পালাতে পারবো না। শাঙ্কো বলল।

—দাঁড়াও। কোথায় আমাদের রাখা হয়। পাহারার ব্যবস্থা কী হয় এসব দেখে ভেবেচিন্তে পালাবার উপায় বার করা হবে। এক্ষুনি পালাবার সময় বা উপায় নয়। ফ্রান্সিস বলল।

পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে তিরিশ চল্লিশজন রইল। বাকিরা চলে গেল। ঐ তিরিশ চল্লিশজন সৈন্য ফ্রান্সিসদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল।

ফ্রান্সিসরা যেতে যেতে দেখল জমিতে চাষীরা চাষ করছে। বাড়িঘর। কাঠের ওপর মাটি লেপা ছাত। বাড়িগুলো পাথরের। বাড়িগুলো থেকে লোকজন বেরিয়ে আসছে। বন্দী ফ্রান্সিসদের দেখছে। মেয়েরা মারিয়াকে হাঁ করে দেখছে। ওরা বুঝতে পেরেছে বন্দীরা বিদেশী।

একমানুষ উঁচু পাথরের দেয়ালঘেরা শহর। এটাই বোধহয় রাজধানী। রাস্তা দিয়ে চলেছে। দুপাশে দোকান টোকান। পথে খুব ভিড় নয়। এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি চলেছে। হাঁটতে হাঁটতে ফ্রান্সিসরা একটা লম্বাটে বড় বাড়ির সামনে এল। সেনাপতি হাত তুলে সবাইকে থামতে ইঙ্গিত করল। এতবড় বাড়ি। নিশ্চয়ই রাজবাড়ি।

সেনাপতি বাড়িটার পূবকোণায় গেল। সেখানে একটা ঘরের সামনে এল। দেখা গেল তিন-চারজন পাহারাদার সৈন্য। খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে। সেনাপতি কারারক্ষীদের ইশারা করল। একজন রক্ষী কোমরে গোঁজা একটা বড় চাবির রিং বের করল। লোহার দরজার সামনে গেল। দেখা গেল একটা বড় তালা ঝুলছে। পাহারাদার চাবি লাগিয়ে তালাটা খুলে ফেলল। ঢং ঢাং শব্দে লোহার দরজাটা খুলল।

সেনাপতি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসদের ঘরটায় ঢোকার জন্যে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা ঢুকতে লাগল। হ্যারি সেনাপতিকে বলল—আমাদের মধ্যে দুজন আহত বন্ধু আছে। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

—ব্যবস্থাটা তোমরা করলেই পারতে। সেনাপতি বলল।

—সে সময় পাইনি। আর একটা কথা। হ্যারি বলল।

—কী? সেনাপতি বলল।

—সকাল থেকে আমরা কিছু খাইনি। আমাদের তাড়াতাড়ি খেতে দিন। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে—দেখছি। সেনাপতি বলল।

হ্যারি ঘরটায় ঢুকল। বোঝাই গেল কয়েদঘর। বাইরের চড়া আলো থেকে বেশ অন্ধকার অন্ধকার ঘরটায় প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। একেবারে ওপরে দুপাশের দেয়ালের গায়ে জানালা। ওখান দিয়েই যা একটু আলো আসছে। মেঝেয় পাতা গাছের ছাল দিয়ে তৈরি পাটির মত। বসে আছে শুয়ে আছে বন্ধুরা। একপাশে ফ্রান্সিস দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। পাশে মারিয়া। তার পাশে শাঙ্কোরা।

হ্যারি এসে সেখানে বসল। মারিয়া ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—তোমাদের জীবনের অর্ধেকটাই কেটে গেল কয়েদঘরে থেকে থেকে। হ্যারি হাসল। বলল—আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি দেখ তো ভেন ওর ওষুধপত্র এনেছে কিনা।

—কেন বলো তো। হ্যারি বলল।

—দুই বন্ধু আহত। তাদের তো ওষুধ চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি সেনাপতিকে ওষুধের কথা বলেছি। হ্যারি বলল।

—মনে হয় না ওরা দেবে। ওদের সৈন্যদের সঙ্গে লড়তে গিয়েই তো আমার বন্ধুরা আহত হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক। আমি খাবারও তাড়াতাড়ি দিতে বলেছি। হ্যারি বলল।

—ভালোই করেছো, সকাল থেকে কেউ কিছু খেতে পারেনি। ফ্রান্সিস বলল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ভাইকিংরা কেউ কোন কথা বলছে না। শুয়ে বসে আছে। অন্ধকার এখন সকলের চোখেই সয়ে এসেছে।

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি?

হ্যারি বলল—বল।

—ওরা ওষুধ দেবে না। ভেনকে ডাকো। হ্যারি উঠে দাঁড়াল। তাকিয়ে তাকিয়ে ভেনকে খুঁজল। দেখল ডান কানায় ভেন বসে আছে। হ্যারি বন্ধুদের জন্য ফিরে ভেন-এর কাছে এল। দেখল—ভেন আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে দুচোখ বন্ধ। হ্যারি ডাকল, ভেন—ভেন। ভেন চোখ মেলে তাকাল। হ্যারি বলল—আমাদের দুই বন্ধু তো আহত। তুমি কি কিছু ওষুধ এনেছো? ভেন ফোকলা দাঁতে হেসে কোমরের ফেট্টি থেকে দুটো কাপড়ের থলে বের করল। হ্যারি হেসে বলল—সাবাস ভেন। ওদের ওষুধ দাও।

—এখানে আসতে বলো। এক পাত্র জল যেন নিয়ে আসে। ভেন বলল।

হ্যারি বন্ধুদের মধ্যে আহত বন্ধু দুজনকে খুঁজে বের করল। বলল—ভেন ওষুধ এনেছে। আমাদের জন্যে মাটির জালায় জল রাখা আছে আর একটা পাত্রও থাকতে পারে। ওটাতে জল ভরে নিয়ে যেও।

দুই বন্ধু উঠল। একজনের পায়ে তরোয়ালের ঘা লেগেছে অন্যজনের ঘা লেগেছে হাতে। দুজনে জলের পাত্র নিয়ে ভেন-এর কাছে চলল।

ভেন থলে থেকে কালো রঙের গুঁড়ো বের করল। সামান্য জল ঢেলে দুহাতের চেটোয় ঘষতে ঘষতে একটা বড়ির মত করল। ঐভাবে আরো একটা বড়ি তৈরি করল। দুজনকে খেতে দিল। দুজনে খেল। এবার ভেন আর একটা থলে থেকে হলুদ রঙের গুঁড়ো বের করল। দুজনের কাটা জায়গায় হলুদ রঙের গুঁড়ো আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিল। ক্ষত জ্বালা করে উঠল। তারপর এতক্ষণের যন্ত্রণা কমে আসতে লাগল। দুজনে নিজেদের জায়গায় ফিরে গেল।

তখনই ঢ্যাং ঢ্যাঢাং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। দুজন পাহারাদার খোলা তরোয়াল হাতে ঢুকল। দরজার কাছে দুদিকে দুজন দাঁড়াল।

একজন লোক কাঠের বড় থালা নিয়ে ঢুকল। তাতে গোল কাটা রুটি আর একজন বড় ডেকচি নিয়ে ঢুকল। আর একজন একগাদা পাতা হাতে ঢুকল। সে দ্রুত হাতে পাতাগুলো সব বন্দীদের সামনে পেতে দিল। রুটি আর নানা সব্জির তরকারি। সঙ্গে অল্প ঝোল দেওয়া হল।

ভাইকিংরা সবাই বেশ ক্ষুধার্ত। গপ্‌গপ্‌ করে সব নিয়ে খেয়ে নিল। অনেকেই দুবার চেয়ে নিয়ে খেল।

মারিয়ার শরীরটা ভালো লাগছিল না। বেশি খেতেও পারল না। ফ্রান্সিস সেটা লক্ষ্য করে বলল—কী ব্যাপার? খাচ্ছো না?

—খিদে নেই। রাতে বেশি করে খাবো। মারিয়া বলল।

—উঁহু। মনে হচ্ছে তোমার শরীর ভালো নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। আমার শরীর ভালো আছে। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। খেতে লাগল। বন্দীদের খাওয়া শেষ হল। সবাই জল খেল। ফ্রান্সিস মারিয়ার জন্যে খাবার জল নিয়ে এল। মারিয়া খেল।

মারিয়া আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যেবেলা মারিয়া বুঝল জ্বর এসেছে। শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা। গা মোচড়াচ্ছে যেন।

রাতে মারিয়া কিছুই খেতে পারল না। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি মারিয়ার কপালে হাত রাখল। বেশ গরম। বলল—তোমার তো জ্বর হয়েছে।

—ও কিছু না। কালকে সকালেই দেখবে জ্বর ছেড়ে গেছে। ফ্রান্সিস কিছু বলল না। মারিয়ার মাথা নিজের কোলে নিয়ে বসে রইল। মারিয়া ঝিম মেরে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে গুঙিয়ে উঠছে। মাথা এপাশ ওপাশ করছে।

ফ্রান্সিস ডাকল—হ্যারি। হ্যারি এগিয়ে এল। বলল কী ব্যাপার?

—মারিয়ার জ্বর এসেছে। মনে হচ্ছে জ্বর বেড়েছে। তুমি ভেনকে ডাকো। একটু পরেই ভেন এল। মারিয়ার গলায় কপালে হাত দিয়ে দেখল। চোখের নিচে দেখল। বলল—ফ্রান্সিস রাজকুমারীর বেশ জ্বর। মনে হয় রাতে বাড়তে পারে। যাতে জ্বর না বাড়ে তার জন্যে এই বড়িটা এখন আর ঘণ্টা দুয়েক পরে আর একটা খাইয়ে দাও। ভেন ওখানেই বসে রইল। সেই আসনপিঁড়ি হয়ে। ফ্রান্সিস মারিয়াকে একটা বড়ি খাইয়ে দিল।

শেষ রাতের দিকে মারিয়া চোখ বড় বড় করে তাকাল। ফ্রান্সিস তখনও মারিয়ার মাথা কোলে রেখেছে। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। বলল—মারিয়া—মারিয়া। শরীর খারাপ লাগছে? মারিয়া এপাশ ওপাশ কয়েকবার তাকাল। তারপর থেমে থেমে বলতে লাগল—ঘরটা —এত অন্ধকার—ঐ তো সমুদ্র—আমি সমুদ্রে সাঁতার—সূর্য ডুবে যাচ্ছে—টুপ করে—বাতাস ভেজা ভেজা—বৃষ্টি হয়েছে—। ফ্রান্সিস মুখ নিচু করে ডাকল—মারিয়া—মারিয়া—কী বলছো এসব। হ্যারি দেয়ালের পাথরের খাঁজ থেকে মশাল তুলে এনে মারিয়ার কাছে দাঁড়াল। এবার মারিয়ার মুখটা অনেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস ভেনকে ডাকল। ভেন চোখ খুলে তাকাল। আবার মারিয়াকে ভালো করে দেখল। বলল—ফ্রান্সিস—আর একটা ওষুধ দিচ্ছি। এতেও জ্বর না কমলে আর কিছু করার নেই। সব ওষুধ তো আমি আনতে পারিনি।

ভেন অন্য একটা ছোট থলে কোমরের ফেট্টি থেকে বের করল। একটা বড়ি বের করল। বড়িটা হাতে নিয়ে মারিয়ার মুখের ওপর ঝুঁকে বলল—রাজকুমারী, এই বড়িটা চুষে চুষে খেয়ে নিন। জ্বর কমবে। মারিয়া গোঙাতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—বড়িটা আমাকে দাও। বড়িটা নিয়ে মারিয়াকে বলল—মারিয়া—মুখ খোলো—ওষুধ মুখে নাও। মারিয়া চোখ বুঁজে গোঙাতে লাগল। মুখ হাঁ করল না।

ভেন বড়িটা নিল। তারপর মারিয়ার মুখের দাঁতের পাটি ডান হাতের আঙ্গুলের চাপে খুলে বড়িটা ফেলে দিল। মারিয়া হঠাৎ চোখ মেলে তাকাল। বড় বড় চোখ করে চারদিকে তাকিয়ে নিল। তারপর ভাঙা গলায় বলল—তোমরা

কারা? এঁ্যা? কারা সব? কী চাও তোমরা? কে আমাকে ডাকছে? কে—কে—কে? নিস্তেজ হয়ে মারিয়া দু-চোখ বন্ধ করে চুপ করে পড়ে রইল। মারিয়ার রোগার্ত ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস ফুঁপিয়ে উঠল। হ্যারি শুনল সেটা। নিচু হয়ে ফ্রান্সিসের পিঠে হাত রেখে মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস অস্থির হয়ে পড়ো না।

ফ্রান্সিস ভেনকে মৃদুস্বরে বলল—ভেন আমাদের জাহাজে গেলে তুমি মারিয়াকে ওষুধ দিয়ে সুস্থ করে তুলতে পারবে?

—আমার মনে হয় পারবো। ভেন বলল।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। ছুটে গেল লোহার দরজার কাছে। চিৎকার করে ডাকল— পাহারাদার—পাহারাদার—কাছে এসো। তখন দুজন পাহারাদার পাহারা দিচ্ছিল। ফ্রান্সিসের ডাক তারা শুনলেও না শোনার ভান করে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগল। ফ্রান্সিস দুহাতে লোহার দরজা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করে বলল—এদিকে এসো। দরজায় জোর শব্দ উঠল—ঝন্ ঝন্স-ন্।

একজন পাহারাদার এগিয়ে এল। বলল—কী ব্যাপার?

আমাদের রাজকুমারী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তোমাদের সেনাপতিকে ডাকো। ফ্রান্সিস বলল।

—সেনাপতি তোমার চাকর নাকি যে ডাকলেই আসবে। পাহারাদারটি বলল।

ফ্রান্সিস আবার লোহার দরজায় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—সেনাপতিকে ডাকো। রক্ষীদুজন নির্বিকারভাবে তরোয়াল উঁচিয়ে পাহারা দিতে লাগল। লোহার দরজার শব্দে ফ্রান্সিসের চিৎকারে ভাইকিংদের ঘুম ভেঙে গেল। সকলে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ততক্ষণে ওরা জেনে গেছে মারিয়া গুরুতর অসুস্থ। তখন ফ্রান্সিস একটু দূরে সরে এসে ছুটে গিয়ে লোহার দরজার ওপর পিঠ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দরজায় প্রচণ্ড শব্দ উঠল। ভাইকিং বন্ধুরা ধ্বনি দিল—ও-হো-হো। রক্ষীরা বেশ ঘাবড়ে গেল। লোকটা লোহার দরজা ভেঙে ফেলবে নাকি! একজন রক্ষী এগিয়ে এল। বলল—কী চাও তুমি?

সেনাপতিকে ডাকো। আমি কথা বলব। ফ্রান্সিস বলল।

—এত রাতে? ঘুমিয়ে পড়েছে। রক্ষী বলল।

—কোন কথা শুনতে চাই না। ঘুম ভাঙিয়ে সেনাপতিকে নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি কী চাও বলোতো? আবার রক্ষীটি বলল।

—তোমাদের নয়—সেনাপতিকে বলবো। সেনাপতিকে নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন ডাকাডাকি করলে সেনাপতি রেগে যাবেন। রক্ষীটি বলল।

—আমি কিছু শুনতে চাই না। সেনাপতিকে এখানে নিয়ে এসো। কথাটা বলে ফ্রান্সিস আবার পিঠ এগিয়ে লোহার দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবার

প্রচণ্ড শব্দ উঠল।

কারারক্ষী দুজন নিজেদের মধ্যে কথা বলল। তারপর একজন রক্ষী বলল—ঠিক আছে। যদি সেনাপতি না আসতে চান আমাদের তখন কিছু করার নেই।

—গিয়ে বলবে—বন্দী ভাইকিংদের সঙ্গে যে রাজকুমারী রয়েছেন তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এক্ষুনি তাঁর চিকিৎসার দরকার। সেনাপতি যেন আসে। ফ্রান্সিস বলল।

একজন রক্ষী চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল। সঙ্গে সেনাপতি। সেনাপতি লোহার দরজার ওপার থেকে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—কী ব্যাপার?

—আমাদের রাজকুমারী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমাদের বৈদ্য তাঁর চিকিৎসা করবেন। কিন্তু বৈদ্য প্রয়োজনীয় ওষুধ জাহাজে রেখে এসেছেন। রাজকুমারী আর বৈদ্যকে আমাদের জাহাজে যেতে দিতে হবে। ওখানেই রাজকুমারীর চিকিৎসা হবে।

—আমরা এখানে বৈদ্যকে ডেক-এ পাঠাচ্ছি। সেনাপতি বলল।

—না—আমাদের বৈদ্যই চিকিৎসা করবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। তাহলে তোমরা তিনজন জাহাজে যেতে চাও। সেনাপতি বলল।

—হ্যাঁ। রাজকুমারীর চিকিৎসার জন্য। ফ্রান্সিস বলল।

যদি এই সুযোগে তুমি জাহাজ চালিয়ে পালিয়ে যাও। সেনাপতি বলল।

—আমাদের পাহারা দিক আপনার সৈন্যরা। রাজকুমারী সুস্থ হলেই আমরা এখানে চলে আসবো। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবল। তারপর মুখ তুলে বলল—বেশ। আমি কিন্তু রাজার অনুমতি ছাড়াই তোমাদের যেতে দিচ্ছি। কালকে রাজসভায় এসে সব তোমাকে বলতে হবে। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করে আমি সম্মতি দিয়েছি—একথাও বলতে হবে।

—বেশ বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি কারারক্ষীর একজনকে বলল—দরজা খুলে দাও। দরজা খোলা হল। সেনাপতি বলল—তোমরা বেরিয়ে এসো।

ফ্রান্সিস রাজকুমারীর কাছে গেল। ভেনকে বলল—আমরা আমাদের জাহাজে রাজকুমারীকে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে। ভেন বলল—বেশ। তারপর উঠে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ বুঁজে ফেলল। মারিয়াকে কি বাঁচানো যাবে? হ্যারি এতক্ষণ মশাল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল— ফ্রান্সিস—ভেঙে পড়ো না। বিপদের সময় তুমিই তো আমাদের সাহস দাও। আজ তোমাকে নিজেরই মন শক্ত করতে হবে। ভেবো না ফ্রান্সিস—রাজকুমারী ঠিক সুস্থ হবেন। তোমরা যাও।

ফ্রান্সিস আর একবার মারিয়ার মুখের দিকে তাকাল। তারপর মারিয়াকে দুহাতে তুলে পেটের কাছে নিয়ে এল। পাঁজাকোলা করে দরজার কাছে নিয়ে এল। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে এল। পেছনে ভেন। তিনজন কারারক্ষী খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিস আর ভেন-এর পাশে দাঁড়াল। দুজন ফ্রান্সিসের দুপাশে। একজন ভেন-এর পাশে।

সেনাপতি গলা চড়িয়ে বলল—কোনরকম চালাকি করতে দেখলে তিনটেকেই মেরে ফেলবি।

ভেন সেনাপতিকে বলল—একটা শস্যটানা গাড়ি পেলে ভালো হতো। সেনাপতি বলল—এত রাতে গাড়ি পাওয়া যাবে না। তাহলে কাল সকালে যাও।

—কিছু ভেবো না ভেন। আমি মারিয়াকে ঠিক নিয়ে যেতে পারবো। চলো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা চলল। আজকে জ্যোৎস্না কিছুটা উজ্জ্বল। দুপাশের গাছগাছালিতে হাওয়া বয়ে যাওয়ার শব্দ। ফ্রান্সিস আর ভেন চলল।

হঠাৎ মারিয়ার মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে মারিয়াকে কাঁধে তুলে নিল। গোঙানি বন্ধ হল।

ওরা চলল। ফ্রান্সিসরা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এসে পড়ল। সমুদ্র কাছেই। মাঝে মাঝেই জোর হাওয়া ছুটে আসতে লাগল সমুদ্রের দিক থেকে। ঘর্মাক্ত ফ্রান্সিস একটু আরাম পেল। ফ্রান্সিসরা সমুদ্রতীরে পৌঁছল। বালিয়াড়িতে নামল। তারপর চলল জাহাজের দিকে। ফেলা পাটাতনের ওপর দিয়ে সবাই জাহাজে উঠে এল। ফ্রান্সিস রক্ষীদের বলল —তোমরা যেখানে খুশি দাঁড়িয়ে বসে পাহারা দিতে পারো। আমরা কেবিনঘরে আছি।

ফ্রান্সিস নিজের কেবিনঘরে ঢুকল। অন্ধকারে সাবধানে ঢুকতে হল। বিছানার কাছে এসে ফ্রান্সিস মারিয়াকে আস্তে আস্তে কাঁধ থেকে নামাল। তারপর বিছানায় শুইয়ে দিল আস্তে আস্তে। ভেন ততক্ষণে নিজের কেবিনে চলে গেছে।

অন্ধকারে ফ্রান্সিস মোটা মোমবাতিটা জ্বালল। মারিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখতেই চমকে উঠল। দেখল মারিয়া স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ফ্রান্সিস ছুটে মারিয়ার কাছে এল। বলল—মারিয়া—এখন কেমন আছো? মারিয়া কোন কথা না বলে একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস চিৎকার করে ডাকল—ভেন— তাড়াতাড়ি এসো। বিছানায় বসল। মারিয়ার মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

ভেন ছুটে এল। হাতে দুটো বোয়াম। কাপড়ের থলি থেকে বের করল খল নুড়ি। মেঝেয় বসল। ফ্রান্সিসকে বলল—কাঠের গ্লাশে জল দাও। তারপর মারিয়ার কাছে গেল। কপালে গলায় হাত রাখল। চোখে দেখল। মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস জ্বর একটু কমেছে।

করল। খলে ঢালল। ফ্রান্সিস কাঠের গ্লাশে জল দিয়ে গেল। ভেন খলটায় কয়েক ফোঁটা জল ঢালল। তারপর নুড়ি দিয়ে ঘষতে লাগল। কিছুক্ষণ ঘষার পর খলটা মারিয়ার কাছে নিয়ে গেল। মৃদুস্বরে বলল—রাজকুমারী—এই খলের ওষুধটা চেটে খেয়ে নিন। মারিয়ার কোন সাড়াশব্দ নেই।

ভেন বিছানা থেকে নেমে এল। পুঁটুলি থেকে একটা গাছের শেকড় বের করল। শেকড়টা মারিয়ার নাকের কাছে কয়েকবার ধরল। চোখ মুখ কুঁচকে মারিয়া চোখ মেলে তাকাল। ভেন আস্তে বলল

—এই খলটা থেকে ওষুধটা চেটে খেয়ে নিন। মারিয়ার মুখের কাছে খলটা এগিয়ে ধরল ভেন। মারিয়া আস্তে আস্তে চেটে চেটে ওষুধটা খেয়ে নিল। তারপর চোখ বুঁজল।

তখন বাইরে ভোর হয়েছে। নিস্তেজ রোদ ছড়িয়েছে সমুদ্রে ফ্রান্সিসদের জাহাজে। সামুদ্রিক পাখির তীক্ষ্ণ ডাক কানে এল।

ভেন বলল—ফ্রান্সিস—এখন তো কিছু খেতে হয়।

—আমার ক্ষুধাও পাচ্ছে না তেষ্টাও পাচ্ছে না। ফ্রান্সিস বলল।

—না ফ্রান্সিস—এ সময়ে তোমাকে সুস্থ থাকতেই হবে। দাঁড়াও—আমি রুটি ভেজে আনছি। তুমি রাজকুমারীর কাছে থাকো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেন রুটি আলুসেদ্ধ নিয়ে এল। একটা থালা ফ্রান্সিসকে দিল। অন্যটা নিজে নিল। ফ্রান্সিস থালার দিকে তাকিয়ে বলল—ভেন—মারিয়া এখনও কিছু খায়নি। আমি খাবো না।

—ফ্রান্সিস—পাগলামি কোরো না। এই অসুখে তো উপোষ থাকতেই হবে। ভেবো না। আজকের দিনটা দেখি। মনে হয় কালকে সকালের মধ্যেই জ্বরটা ছেড়ে যাবে। তখন রাজকুমারীকে সহজপাচ্য কিছু খেতে দেব। নাও—খাও।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে খেতে লাগল। ভেন খেতে খেতে বলল—দুপুরে আর রাতে দুটো ওষুধ পড়বে। রাজকুমারীর জ্বরের কষ্ট কমবে।

জলটল খেয়ে ভেন বলল—ফ্রান্সিস—তোমাকে অনেক ধকল পোহাতে হয়েছে। এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।

—অসম্ভব। ঘুম আসবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। চুপ করে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকো। দেখবে ঘুম এসেছে। ভেন বলল।

—দেখি। তার আগে মারিয়াকে একবার দেখ। ফ্রান্সিস বলল।

ভেন মারিয়ার হাত দেখল। কপালে গলায় হাত দিয়ে দেখল। বলল—জ্বর অনেক কম। দেখবে রাতের দিকে জ্বর আরো কমে গেছে। রাতে অন্য দুটো ওষুধ খাওয়াতে হবে। তুমি ঘুমোও।

ফ্রান্সিস মারিয়ার পাশে শুয়ে পড়ল। চোখ বুঁজল। চোখ দুটো কেমন জ্বালাজ্বালা করছে। ভাবতে লাগল—মারিয়া সুস্থ হলে কয়েদঘর থেকে পালানোর ছক কষতে হবে। ও বুঝে উঠতে পারল না—রাজা গঞ্জালেস ওদের

নিয়ে কী করতে চায়। এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মারিয়ার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠা। তারপর অন্য ভাবনা।

হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে পড়ল সেনাপতি নিজের দায়িত্বে ওদের ছেড়ে দিয়েছিল। এখন রাজাকে সেই কথা বলে সেনাপতিকে দায়মুক্ত করতে হবে।

ফ্রান্সিস উঠে বসল। ভেন বলল—কী হল?

আমার এখন শুয়ে থাকার উপায় নেই। আমাকে রাজা গঞ্জালেসের কাছে যেতে হবে। আমরা মারিয়াকে নিয়ে বিপদগ্রস্ত। তাই সেনাপতি আমাদের কারারক্ষীদের পাহারায়, জাহাজে আসতে দিয়েছিল। সেনাপতির কোন দোষ নেই।

বিছানা থেকে নেমে ফ্রান্সিস মারিয়ার কপালে হাত দিল। জ্বরটা কমই মনে হচ্ছে। বলল—আমি যাচ্ছি ভেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবো। মারিয়াকে দুপুরে কিছু খেতে দেওয়া যায় কিনা দেখ।

ফ্রান্সিস সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ উঠে এল। দুজন কারারক্ষী ছুটে এল। ফ্রান্সিস বলল—পালাচ্ছি না। তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

ফ্রান্সিস তীর পর্যন্ত পাতা কাঠের পাটাতন ওপর হেঁটে নামল। পেছনে দুজন কারারক্ষীও এল। ওদের তরোয়াল এখন কোষবদ্ধ।

অনেকটা পথ হেঁটে হেঁটে ওরা রাজধানী দামিলায় এসে পৌঁছল। ফ্রান্সিস প্রথমে কয়েদঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। বন্দী ভাইকিংরা ফ্রান্সিসকে দেখে দরজার কাছে ভিড় জমালো।

ভাইসব রাজকুমারী এখন অনেকটা ভালো আছেন। আমি এখন রাজসভায় যাচ্ছি। রাজা গঞ্জালেসকে কয়েকটা কথা বলার আছে। আমি তোমাদের কাছে আবার আসছি। রাজার সঙ্গে কী কথা হল জানিয়ে যাবো। তারপর জাহাজে ফিরে যাবো।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, রাজকুমারী কেমন আছেন?

—কিছুটা ভালো। তাই তো ভেনকে রেখে আমি এলাম।

ফ্রান্সিস এবার ফিরে দাঁড়িয়ে একজন কারারক্ষীকে বলল—আমাকে রাজা গঞ্জালেসের দরবারে নিয়ে চল।

তিনজনে চলল। কিছুটা যেতেই একটা বিরাট বাড়ি দেখা গেল। কারারক্ষী বলল—ওটাই রাজপ্রাসাদ। উত্তরদিকের দরজাটা দিয়ে রাজসভায় যেতে হবে।

তিনজনে ঐ দরজা দিয়ে ঢুকল। সামনে বেশ বড় একটা পাথরের ঘর। দুপাশে গোটা কয়েক জানালার মত। একেবারে শেষের দিকে পাথরের সিংহাসন। সিংহাসনে পাথর কুঁদে ফুল লতা পাতার নকশা। সিংহাসনে একটা লাল গদীমত পাতা। রাজা গঞ্জালেস বসে আছেন। পরনে সার্টিনের জোব্বামত। তাতে সোনারূপোর সুতোর কারুকাজ করা। মাথায় আজ অন্যরকম মুকুট। সোনার মুকুটে নানা দামি পাথরের মধ্যে মিনে করা। দুপাশে কয়েকজন বৃদ্ধ বসে আছেন। বোঝা গেল ওঁরা মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ। তাঁদের পরনেও দামি

কাপড়ের জোব্বামত। তাঁরা পাথরের ছোট ছোট আসনে বসে আছেন।

সামনে দাঁড়িয়ে বিচারপ্রার্থীরা।

একটা বিচার চলছিল। রাজা গঞ্জালেস সব শুনে কাছেই বসা অমাত্যের সঙ্গে কী পরামর্শ করলেন। তারপর রায় দিলেন। বাদী বিবাদীরা চলে গেল।

ফ্রান্সিস একটু এগিয়ে গিয়ে সেনাপতির কাছে এল। মৃদুস্বরে বলল—মহামান্য রাজাকে আমি দু একটা কথা বলতে চাই।

—ঠিক আছে। সেনাপতি বলল।

তখন কোন বিচার চলছিল না। সেনাপতি নিজের আসন থেকে উঠে রাজাকে মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে বলল—মাননীয় রাজা—এই ভাইকিং যুবকটি কিছু বলতে চায়। কথাটা বলে সেনাপতি ফ্রান্সিসকে দেখাল।

ফ্রান্সিস মাথা একটু নিচু করে সম্মান জানিয়ে বলল—মহামান্য রাজা—অনুমতি দিলে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই।

—হুঁ বলো। গম্ভীর গলায় রাজা গঞ্জালেস বললেন।

—প্রথমে বলি আমাদের বন্দীশালায় রাখা হয়েছে। আমাদের দেশের রাজকুমারীও আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি গতকাল রাতে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা সেনাপতিকে অনুরোধ করাতে তিনি অসুস্থ রাজকুমারীকে নিয়ে আমাদের জাহাজে যেতে অনুমতি দেন। অবশ্য তিনজন কারারক্ষী আমাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের বৈদ্যের চিকিৎসায় রাজকুমারী এখন কিছুটা সুস্থ হয়েছেন। আপনার সেনাপতি এজন্যে কাল আপনার অনুমতি নিতে পারেন নি। কারণ তখন গভীর রাত। সেনাপতির এই উপকারের কথা আমরা জীবনেও ভুলবো না। ফ্রান্সিস থামল।

রাজা ডাকলেন—সেনাপতি। সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—এই ভাইকিং যুবকটি যা বলল—তা সত্যি? গঞ্জালেস বললেন।

—হ্যাঁ মহামান্য রাজা। সেনাপতি বলল।

—বন্দীদের চিকিৎসার দায়িত্ব আমাদের নয়। ভবিষ্যতে কাউকে এই সুবিধে দেবেন না। গঞ্জালেস বললেন।

—যথা আজ্ঞা মহামান্য রাজা। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিস বলল—আমাকে ক্ষমা করবেন—একটা কথা না বলে পারছি না।

—হুঁ। রাজা মুখে শব্দ করলেন।

—বন্দীরা অপরাধী হলেও মানুষ। বিচারের পরে যে শাস্তি দেবেন তা তাদের প্রাপ্য। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত তাদের অসুখ করলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা তো রাজার কর্তব্য।

—আমি অন্যরকম রাজা। এসব মানি না। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস বুঝল—এই রাজাকে বলে লাভ নেই। এই অত্যাচারী নির্মম রাজা মানবিকতার কথা কানেই তুলবে না। সুতরাং এই নিয়ে কিছু বলতে যাওয়া

কথার অপচয় মাত্র।

ফ্রান্সিস এবার বলল—মাননীয় রাজা—আমার আর একটা কথা বলার আছে।

বলো। রাজা বললেন।

আমাদের কেন বন্দী করে রাখা হয়েছে তা বুঝতে পারছি না। আমরা তো কোন অপরাধ করিনি। ফ্রান্সিস বলল।

ওসব বলে লাভ নেই। তোমরা রানি উরাকার গুপ্তচর হয়ে এখানে এসেছো। খোঁজ খবর চলছে। যদি এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ না পাওয়া যায় তবে তোমরা ছাড়া পাবে। রাজা বললেন।

বেশ। ফ্রান্সিস বলল।

আর একটা কথা। তোমরা বলিষ্ঠদেহী অসি চালনায় দক্ষ এবং ভীষণ সাহসী। রানি উরাকার সঙ্গে যুদ্ধে তোমাদের দরকার পড়বে। রাজা বললেন।

আমরা রানি উরাকার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবো কেন? রানি উরাকা তো আমাদের শত্রু নয়। ফ্রান্সিস বলল।

আমি ওসব বুঝি না। আমার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিশে যুদ্ধ করতে হবে রানি উরাকার বিরুদ্ধে। যদি তাতে সম্মত না হও তাহলে ঐ কয়েদখানায় পচে মরতে হবে। যুদ্ধের খুব বেশি দেরি নেই। রানি উরাকা যে কোন মুহূর্তে আমাদের দেশ আক্রমণ করতে পারে। আমরা সেকথা ভেবেই সৈন্যবাহিনীকে তৈরি করছি। রাজা বললেন।

এসব আপনাদের দেশের ব্যাপার। এর সঙ্গে আমাদের জড়াচ্ছেন কেন? ফ্রান্সিস বলল।

সবই বলেছি। এবার তোমাদের সিদ্ধান্ত। অবশ্য তোমরা রানি উরাকার গুপ্তচর নও তার প্রমাণ পেলেই তোমাদের আমাদের সৈন্যবাহিনীতে নেব। রাজা বললেন।

-ঠিক আছে। আপনারা খোঁজখবর করুন। ফ্রান্সিস বলল।

মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে ফ্রান্সিস পিছিয়ে এল।

রাজসভার কাজ চলল।

ফ্রান্সিস কয়েদঘরের কাছে এল। লোহার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বন্ধুরা ছুটে এল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—আমরা খুবই বিপদে পড়েছি। রাজা গঞ্জালেস বলছেন—আমরা যে রানি উরাকার গুপ্তচর নই এ বিষয়ে তাঁরা খোঁজখবর করছেন। কিন্তু বিপদ এতেও কাটেনি। যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে আমরা গুপ্তচর নই তাহলে আমাদের সৈন্যবাহিনীতে নেওয়া হবে। রানি উরাকার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। ফ্রান্সিস থামল।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, রাজা গঞ্জালেস আমাদের কোন যুক্তিই শুনবেন না— এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তাই আমাদের শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

—আমিও তাই বলছিলাম। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ডানহাতটা তুলে বলল— ভাইসব—আমি জাহাজে ফিরে যাচ্ছি। কালকে আবার আসবো। তোমরা রাজকুমারীর নিরাময় কামনা কর।

ফ্রান্সিস কয়েদঘরের বারান্দা থেকে সামনের মাঠটায় নামল। চলল সমুদ্রতীরের দিকে। আজকে অন্য কারারক্ষী দুজন ফ্রান্সিসের পাশে পাশে চলল।

কিছুদূর আসার পর ডানদিকে একটা জঙ্গলমত পড়ল। ফ্রান্সিস ঐ দিকে যেতে লাগল। একজন রক্ষী বলল—ঐ দিকে কোথায় যাচ্ছো?

—এখান থেকে একটা ছোট রাস্তা আছে। খুব তাড়াতাড়ি জাহাজঘাটে যাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস একটা খাদের কাছে এল। খাদ থেকে গজিয়ে ওঠা একটা বড় গাছ দেখল। ঐ গাছটার ডালপালা মাথা খাদের ওপরে উঠে এসেছে। পাহারাদার দুজন কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিস ঐ গাছের মগডাল লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। মটাস্ করে গাছটার ওপরের কটা ডাল ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস নিচে পড়তে লাগল। ডাল ভেঙে ভেঙে নিচে এসে পড়ল। বুক পিঠ কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল রক্ষী দুজন নিচু হয়ে দেখছে। ওরা তো এই কাণ্ড দেখে হতবাক।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। তারপর খাদ দিয়ে ছুটল সমুদ্রতীরের দিকে। রক্ষী দুজন বেশ ঘুরে খাদটায় নামল। গাছটার কাছে এল। এদিকে ওদিকে ঝোপ জঙ্গলে ফ্রান্সিসকে খুঁজল। কিন্তু ফ্রান্সিসকে পেল না। ওরা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। দুজনে রাজবাড়ির দিকে ছুটল। ফ্রান্সিসের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা সেনাপতিকে বলতে হবে।

ফ্রান্সিস খাদের মধ্য দিয়ে গাছ ঝোপের আড়ালে আড়ালে বেশ ঘুরে চলে এল। দেখল সামনেই সমুদ্র। ওদের জাহাজটা তীরের কাছেই ভাসছে। ফ্রান্সিস প্রথমেই জাহাজে উঠল না। একটা পাথরের আড়ালে বসল। প্রান্তরের দিকটা দেখতে লাগল।

একটু পরেই দেখল—প্রান্তর দিয়ে লাল ধুলো উড়িয়ে ঘোড়ায় চড়ে কে আসছে। একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখতেই চিনল—সেনাপতি ঘোড়ায় চড়ে আসছে। তাহলে ফ্রান্সিস যে পালিয়েছে এই খবর সেনাপতি পেয়েছে।

সেনাপতি ঘোড়া থেকে নামল। কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে গিয়ে জাহাজে উঠল।

ওদিকে দুজন কারারক্ষী প্রান্তর দিয়ে ছুটে আসছে দেখা গেল। ওরা জাহাজের পাটাতনের কাছে দাঁড়িয়ে ভীষণ হাঁপাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি জাহাজ থেকে নেমে এল। রক্ষী দুজনকে বলল—ওদের সর্দার এখানে আসেনি। ওরা মাত্র দুজন জাহাজে রয়েছে। তোরা এখানে পাহারায় থাক। ওদের সর্দার এলেই পাকড়াবি।

সেনাপতি ঘোড়ায় উঠে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল।



পাতা পাটাতন দিয়ে দুই কারারক্ষী জাহাজে উঠল। ডেক-এ ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। কারারক্ষী দুজনের নজর এড়িয়ে সমুদ্রের ধারে এল। তারপর কোনরকম শব্দ না করে জলে নামল। এক ডুব সাঁতারে অনেক দূরে গিয়ে নিঃশব্দে ভেসে উঠল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিয়ে আবার ডুব দিল। উঠল জাহাজের গা ঘেঁষে। মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো তোলার সময় ফ্রান্সিস ওদের দেশের মুক্তো শিকারীদের কাছ থেকে বেশিক্ষণ জলে ডুবে থাকার নিয়মটা শিখে নিয়েছিল। সেটা কাজে লাগল।

জাহাজের হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে ও জাহাজে উঠে এল। সিঁড়িঘরের আড়াল থেকে দেখল কারারক্ষী দুজন জাহাজের সামনের দিকে পাহারা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস সিঁড়িঘরের আড়ালে আড়ালে সিঁড়িঘরের মুখের কাছে এল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল। দুই কারারক্ষী মাস্তুলের আড়ালে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস সেই সুযোগে সিঁড়িঘরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নিচে নেমে এল।

নিজেদের কেবিনঘরে ঢুকল। দেখল—ভেন চোখ বুঁজে আসনপিঁড়ি হয়ে মেঝেয় বসে আছে। বিছানায় মারিয়া শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস আস্তে ভেন-এর কাছে গেল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল—ভেন, রাজকুমারী কেমন আছেন? ভেন চমকে উঠে বলল— কে? কে? ফ্রান্সিস ভেন-এর মুখ চেপে ধরল। বলল—ভেন কোন শব্দ করবে না। আমি ফ্রান্সিস। ভেন বলল—ও—তাই বলো। রাজকুমারী এখন অনেকটা সুস্থ। বোধহয় ঘুমুচ্ছেন।

ফ্রান্সিস বলল—আমি জলে ভেজা পোশাক পাল্টাচ্ছি। ফ্রান্সিসের গলার শব্দ মারিয়ার কানে গেল। মারিয়া চোখ মেলে তাকাল। ফ্রান্সিসের আর পোশাক ছাড়া হল না। ও মারিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল—মারিয়া—এখন কেমন আছো? মারিয়া শুকনো মুখে হেসে বলল—অনেকটা ভালো। ভেন তো এখন আমাকে পাতলা সুজির ঝোল খেতে দেবে বলছে। ফ্রান্সিস হাসল—তবে তো বেশ ভালো আছো তুমি। মারিয়ার দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনেই ফ্রান্সিস বুঝল মারিয়া এখনও দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ফ্রান্সিস একটা শুকনো জামা বের করে ভেজা জামাটা ছাড়ল। তখনই মারিয়া দেখল ফ্রান্সিসের সারা শরীরে কাটাছেঁড়ার দাগ। দু তিনটে বড় ক্ষত থেকে তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। মারিয়া দুর্বলস্বরে বলে উঠল—তোমার সারা শরীরে এত কাটাছড়া কেন? ফ্রান্সিস হেসে ওর গাছের মাথায় ঝাঁপ দিয়ে পালাবার ঘটনাটা বলল। তারপর ভেনকে বলল—ভেন তোমার ওষুধপত্র আছে?

—আমি নিয়ে আসছি।

একটু পরেই ভেন ফিরে এল। হাতে একটা বোয়াম। কাঠের কুঁজো থেকে জল নিয়ে হাতে অল্প একটু ঢালল। বোয়াম থেকে নীল রঙের গুঁড়ো নিল। জলে

মেশাল। একটা আটা আটা জিনিস তৈরি হল। ভেন ফ্রান্সিসের কাটাছড়া জায়গায় আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিল। ওষুধ লাগাতেই ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। বলল

ভেন ভীষণ জ্বালা করছে।

একটু পরেই আর জ্বালা যন্ত্রণা থাকবে না। সত্যিই তাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই জায়গাগুলো ঠাণ্ডা লাগল।

ফ্রান্সিস শুকনো পোশাক পরল। বলল—ভেন—সেনাপতি এসেছিল। কী বলল সে?

কী আর বলবে? এসে দ্যাখে এক বুড়ো আর একটি মেয়ে। বলল তোমাদের দলনেতা এখানে এসেছিল? আমি বললাম—এখানে কেউ আসেনি। বিশ্বাস করল না তবে আর কিছু বললও না। চলে গেল।

উ আমার খোঁজ ঠিক চালিয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া দুর্বলকণ্ঠে বলল—এখন কী করবে?

আমি বাইরেই থাকব। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আর কিছু ভাবতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস এসে বিছানায় বসল। মারিয়ার মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। মারিয়া চোখ বুঁজে শুয়ে রইল।

ভেন উঠে দাঁড়াল। বলল—বেলা হয়েছে। এখন খেয়ে নাও।

ভেন একটু পরে একটা বাটি নিয়ে ঢুকল। মারিয়ার কাছে এসে বলল—নাও চুমুক দিয়ে খেয়ে নাও। মারিয়াকে ফ্রান্সিস ধরে ধরে বসিয়ে দিল। মারিয়া আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে সুজির ঝোলটা খেয়ে নিল। ভেন কাঠের গ্লাশে জল ভরে খাইয়ে দিল। মারিয়া জল খেল। হেসে বলল—ভেন—তুমি এত ভালো তৈরি করেছো। ভেন ফোকলা দাঁতে হাসল। বলল—জাহাজে কী বা থাকে যে ভালো রাঁধবো। সেই তো এক মাংসের ঝোল।

মারিয়া শুয়ে পড়ল। এবার ভেন আর ফ্রান্সিস চলল খাবার ঘরে বসে খেতে। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল—ভেন—মারিয়ার জ্বর তো সম্পূর্ণ সারেনি।

ঠিকই ধরেছো। কিন্তু রাজকুমারীকে কিছু বলো না। বলবে—জ্বর ছেড়ে গেছে। তুমি এখন সুস্থ। ভেন বলল।

—কিন্তু সত্যি সুস্থ হবে কবে? ফ্রান্সিস বলল।

—আর কয়েকটা দিন লাগবে। ওষুধে কাজ হয়েছে—এটাই সুলক্ষণ। এবার তুমি ভাবো কী করবে। ভেন বলল।

—হুঁ—ওটাই ভাবছি এখন। ফ্রান্সিস বসল।

হঠাৎ সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল। কারা আসছে। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে নেমে কাঠের তক্তায় তৈরি বিছানার নিচে ঢুকে গেল। মারিয়া দেখল ঘরের কোনায় ফ্রান্সিসের ভেজা পোশাক রাখা। মারিয়া যত দ্রুত সম্ভব বিছানা থেকে নেমে পোশাকগুলো থেকে টিপে জল বের করতে লাগল।

কারারক্ষী দুজন ঢুকল। হাতে খোলা তরোয়াল। দুজনেই ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখল। মারিয়াকে দেখল ভেজা পোশাক চিপছে। একজন বলল—এই ভেজা পোশাক কার?

—আমার। ভেন হেসে বলল।

—এত বেলায় চান করলে? কারারক্ষী বলল।

—আমি অনেক সময় সন্ধেবেলাও চান করি। ভেন বলল।

—হুঁ। একজন রক্ষী চলে গেল খাওয়ার ঘরে। ফিরে এসে বলল—খাবার ঘরে দেখলাম দুটো এঁটো থালা। দুজন খেয়েছে।

—আমি আর ভেন খেয়েছি। মারিয়া ভেজা পোশাক নিয়ে বাইরে যেতে যেতে বলল।

—যাক গে—তোমাদের দলনেতা কী নাম যেন ওর?

—ফ্রান্সিস। ভেন বলল।

—হ্যাঁ ফ্রান্সিস। ও এলেই আমাদের খবর দেবে।

—নিশ্চয়ই। ভেন হেসে বলল।

—ওকে ধরতে পারলেই কয়েদঘরে ঢোকানো হবে। রক্ষী বলল।

—বটেই তো। ভেন আবার হেসে বলল।

—বলা যায় না হয়তো রাজা গঞ্জালেস ওকে মৃত্যুগুহায় ঢুকিয়ে দেবে।

—মৃত্যুগুহা? সে আবার কী? ভেন জানতে চাইল।

—মৃত্যুগুহা কী জানো না। কারারক্ষী বলল।

—না। না শুনলে কী করে জানবো। ভেন বলল।

রক্ষীটি তরোয়াল কোষবদ্ধ করে বলল—তবে শোন। কয়েদঘরের পেছনেই দেখবে একটা বড় খাদ। প্রায় এখান অব্দি খাদটা রয়েছে। এই খাদের গায়েই একটা টিলা। সেই টিলায় আছে একটা গুহামত। সেই গুহায় থাকে নররাক্ষস। মানুষ ওখানে গেলেই মেরে ফেলে। ঐ গুহার ধারে কাছেও কেউ যায় না। কারারক্ষী বলল।

—কিন্তু রাজা গঞ্জালেসের তো কত সৈন্য। নররাক্ষসকে মেরে ফেললেই হয়। ভেন বলল।

—নররাক্ষসকে মারা অত সোজা নয়। গুহাটায় একজনের বেশি কেউ ঢুকতে পারবে না। রক্ষী বলল।

—তাহলে দফায় দফায় ঢুকবে একজন একজন করে। ভেন বলল।

—হ্যাঁ যা শুনেছি বলছি। গুহার ভেতরটা নাকি বড়।

কয়েকজন মানুষ দাঁড়াতে পারে। রক্ষী বলল।

—সেই কয়েকজন নররাক্ষসকে মেরে ফেলতে পারে। ভেন বলল।

—অত সহজ নয়। লোক ঢুকলেই নররাক্ষস একটা পাথরের ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেই ফাটলে ঢুকে আর নররাক্ষসকে আক্রমণ করা যায় না। কারারক্ষী বলল।

—কেন? তরোয়াল বা বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে নররাক্ষসকে মারা যায়। ভেন বলল।

—উঁহু। নররাক্ষস যেখানে ঢুকে পড়ে সেটা একটা লম্বা ফাটল। তরবারি তো নাই বর্শাও অতদূর পর্যন্ত যায় না। তবে কথা হল রাজা গঞ্জালেস সেই নররাক্ষসকে মারতে চান না। বরং বাঁচিয়ে রাখতে চান। রক্ষী বলল।

কেন বলো তো? ভেন জানতে চাইল।

যে ফাটলের মধ্যে নররাক্ষস লুকিয়ে পড়ে তাতে আছে হীরে মনি মুক্তোর ভাণ্ডার। নররাক্ষস সেই ভাণ্ডার পাহারা দেয়। এই নররাক্ষসকে পাহারাদার হিসেবে রেখেছিল গঞ্জালেসের পিতা। পাশের রাজ্য সেতুবলের সঙ্গে এই দামিলা রাজ্যের লড়াই চলে আসছে অনেকদিন থেকে। তাই গঞ্জালেসের পিতা এইভাবে তাঁর সঞ্চিত ধনভাণ্ডার লুকিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। গঞ্জালেসের তাই নররাক্ষসকে পাঁঠা ভেড়া খরগোস এসব প্রতিদিন সকালে গুহার মুখে রেখে আসার জন্যে লোক রেখেছিল। রক্ষী বলল।

তাহলে তো ঐ কাঁচা মাংসই নররাক্ষস খায়। ভেন বলল।

হ্যাঁ। আর ধনভাণ্ডার পাহারা দেয়। রক্ষী বলল।

এই গুপ্তধনের খবর কি সবাই জানে? ভেন জানতে চাইল।

—হ্যাঁ—টিলার ঢালের দিকে কেউ যায় না। রক্ষী বলল।

—কেউ কি নররাক্ষসকে দেখেছে? ভেন বলল।

হ্যাঁ মাত্র কয়েকজন। তারাই এসে রটিয়েছে যে নররাক্ষস প্রচণ্ড শক্তিমান শূন্যে উড়তে পারে, হাতের ঘায়ে—বড় বড় পাথরের চাঁই ভাঙতে পারে। রক্ষী বলল।

এসব বিশ্বাস করা যায় না। ভেন বলল।

নানা লোকের নানা মত। কারারক্ষী থামল। তারপর বলতে লাগল—তোমাদের দলনেতাকে বলো ও যেন রাজার কাছে ধরা দেয়। রাজা গঞ্জালেস তাহলে কঠিন শাস্তি দেবেন না। শুধু কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবেন। কিন্তু যদি সে ধরা না দেয় আর হঠাৎ ধরা পড়ে যায় তবে মৃত্যুগুহায় তাকে ঢোকানো হবে। একবার ঢোকানো হলে জীবিত অবস্থায় আর ফিরে আসতে পারবে না। রক্ষী বলল।

—বুঝলাম—সাংঘাতিক শাস্তি। ভেন মাথা এপাশ ওপাশ করতে করতে বলল।

—আচ্ছা—একটা কথা। ভেন বলল।

—বলো। রক্ষী বলল।

—রানি উরাকার সঙ্গে কি গঞ্জালেসের লড়াই হবে? ভেন জানতে চাইল।

—অবস্থা যা দেখতে পাচ্ছি—লড়াই হবেই। রক্ষী বলল।

—কে জিতবে? ভেন বলল।

—রানি উরাকার জেতার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। রক্ষী বলল।

—কারণ? ভেন বলল।

—রানির অনেক সৈন্য। যুদ্ধজাহাজ আছে। আমাদের রাজা গঞ্জালেস লিসবনে গিয়ে জাহাজ বরাত দিয়ে এসেছেন। শুনলাম কয়েকদিনের মধ্যে সেই জাহাজ আসবে। রক্ষী বলল।

—তাহলে বেশ লড়াই টড়াই হবে। ভেন বলল।

—মনে তো হয়। যাক গে—চলি। আমরা ডেক-এ আছি। তোমাদের দলনেতা এলে আমার কথাগুলো বলো। রক্ষী বলল।

—নিশ্চয়ই বলবো। ভেন বলল।

রক্ষীটি চলে গেল।

ফ্রান্সিস পাটাতনের নিচের থেকে বেরিয়ে এল। ও সবই শুনেছে। বলল—ভেন— মারিয়া তোমরা কী বল? ধরা দেব?

—দেখ ফ্রান্সিস—মারিয়া বলল—একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু হবে রানি ইরাকা আর রাজা গঞ্জালেসের মধ্যে। রাজা গঞ্জালেস চাইবে ওর পৈতৃক ধনসম্পদ যাতে ওর কাছেই থাকে। সেইজন্যে পাহারাদাররা নররাক্ষসের হাত থেকে ঐ ধনসম্পদ উদ্ধার করতে চাইবে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এ কাজটা এই রাজ্যের কেউই পারবে না। তুমি সেই কাজটা করে দেবে বলো তাহলে রাজা গঞ্জালেস সহজেই রাজি হবে। কারণ যুদ্ধের ফলাফল কী হবে তা কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। গুঞ্জালেসের কারারক্ষী যা বলে গেল তাতে পরিষ্কার রাজা গঞ্জালেস যুদ্ধে হেরে যাবে। হেরে গেলে নিজের রাজত্বও যাবে পৈতৃক ধনভাণ্ডারও হারাতে হবে। কাজেই যুদ্ধের আগেই গঞ্জালেস পৈতৃক ধনভাণ্ডার উদ্ধার করে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে চাইবে। মরিয়া বলল।

—ঠিকই বলেছো। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা গঞ্জালেস এখন পৈতৃক ধনভাণ্ডার উদ্ধার করাতে চাইবে। তুমি রাজা গঞ্জালেসকে গিয়ে বলো যে তুমি নররাক্ষসের কাছ থেকে ধনভাণ্ডার উদ্ধার করে দিতে পারবে। মারিয়া বলল।

—হুঁ—এই কাজটা করা খুবই কঠিন। ফ্রান্সিস বলল।

—অবশ্যই এই কাজে রাজি হওয়ার ঝুঁকি আছে। না পারলে কিন্তু আমাদের বিপদ বাড়বে। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ—ঠিকই বলেছো। তারপর ফ্রান্সিস বলল—আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। নইলে শরীরে জোর পাবো না।

ফ্রান্সিস হ্যারির ঘরে চলে গেল। বিছানা পাতাই ছিল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। বন্ধুদের কথা ভাবতে লাগল। কী করে সবাইকে মুক্ত করা যায়। মারিয়ার অসুখটা সেরে গেছে দেখে ফ্রান্সিস অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। এসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন বিকেল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও মারিয়ার কাছে এল। দেখল

মারিয়া ঘুমুচ্ছে। ভেন মেঝেয় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে।

ফ্রান্সিস ডাকল—ভেন মারিয়াকে ওষুধ দিয়েছো।

—হুঁ।

ওর শরীর কেমন দেখলে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে। রাজকুমারী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ভেন বলল।

বাঁচালে। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

ফ্রান্সিসদের কথাবার্তায় মারিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। ও আস্তে আস্তে উঠে বসল। বলল— ফ্রান্সিস—সূর্যাস্ত হয়ে গেছে?

না। কিছুক্ষণ দেরি আছে। ফ্রান্সিস বলল।

ভেন—ফ্রান্সিস তো যেতে পারবে না। তুমি আমাকে ডেক-এ নিয়ে চলো। সূর্যাস্ত দেখবো। মারিয়া বলল।

ভেন উঠে দাঁড়াল—চলুন। তবে খুব সাবধানে হাঁটতে হবে। আমি বুড়ো মানুষ। আপনাকে শক্ত করে ধরে থাকতে পারবো না।

ঠিক আছে। আমি শরীরে কিছু জোর পাচ্ছি। চলো। মারিয়া বলল।

মারিয়া উঠে বসল। তারপর বিছানা থেকে আস্তে আস্তে নেমে এল। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া তোমার কষ্ট হবে। যেও না।

না না একনাগাড়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে কারো ইচ্ছে করে? আমার জন্যে ভেবো না। মারিয়া বলল।

ভেন মারিয়ার হাত ধরল। দুজনে আস্তে আস্তে দরজার দিকে চলল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসে রইল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে মারিয়া দু'একবার সিঁড়ির ধাপ ভুল করল। ভেন হাত ধরে মারিয়াকে ঠিক রাখল।

দুজনে যখন ডেক-এ উঠে এল তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। দুজনে ডেক-এ উঠে রেলিঙের দিকে এগোতে লাগল। রক্ষীরা জাহাজের সামনের দিকে পাহারা দিচ্ছিল। ওরা মারিয়া আর ভেনকে দেখল। কিছু বলল না।

পশ্চিম আকাশটা তখন গোলাপি। সূর্যের রঙ গাঢ় গোলাপি। আস্তে আস্তে গোল সূর্য নিচে নামতে লাগল। পশ্চিম আকাশে তখন গোলাপি রঙের প্লাবন। জলের ঢেউগুলোও গোলাপি রঙীন।

আস্তে আস্তে সূর্য টুপ করে যেন সমুদ্রের জলে ডুবে গেল। পশ্চিম আকাশে অনেকক্ষণ লেগে রইল গোলাপি রং। তারপর আস্তে আস্তে আকাশ কালো হয়ে গেল। রুপোলি চাঁদ দেখা গেল।

মারিয়া আর ভেন আস্তে আস্তে নিচে কেবিনঘরে নেমে এল। মারিয়া তখন একটু হাঁপাচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল—শুয়ে পড়ো। মারিয়া বিছানায় বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। বোঝা গেল শরীরের দুর্বলতাটা আছে এখনও।

ফ্রান্সিস পোশাক পরে তৈরি হল। বলল—ভেন—একটা উপায় বের করো তো। এভাবে জলে নেমে ডুবসাঁতার দিয়ে যেতে হবে— এ তো পারা যায় না।

ভেন বলল—দাঁড়াও। আগে খেয়ে নাও। দুজনে খাবার ঘরে এল। বিকেলের খাওয়া সেরে নিল।

দুজনে মারিয়ার কাছে এল। মারিয়া অভিমানের সুরে বলল—ভেন আমার খিদে পেয়েছে।

—ঠিক আছে! আপনার খাবার তৈরি করছি। ভেন বলল। তারপর ফ্রান্সিসকে বলল তুমি কাঠের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি একটা মতলব ঠাউরেছি।

ভেন চলে গেল। একটু পরে সিঁড়িতে ভারি জুতোর শব্দ উঠল। কারারক্ষীরা আসছে। ফ্রান্সিস কাঠের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

ভেন রক্ষীদের খাবার ঘরে নিয়ে গেল। তারপর নিজেদের দেশের ভাষায় গলা চড়িয়ে বলল—পলায়ন। ফ্রান্সিস আর মারিয়া পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। বোঝাই যাচ্ছে ভেন রক্ষী দুজনকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছে। খাবার ঘর থেকে ভেন-এর জোর গলার শব্দ ভেসে আসছে—কী কাণ্ড! মাত্র এইটুকু খেলেন। খান— খান —তৃপ্তি করে খান। আমার রান্নার হাত খুব খারাপ না।

ফ্রান্সিস এবার হেসে ফেলল। মারিয়াও হাসছে। ফ্রান্সিস আর মারিয়া দেরি করল না। পাটাতনের নিচে থেকে ওর তরোয়ালটা বের করে কোমরে ঝোলাল। কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে এল। সিঁড়িতে কোনরকম শব্দ না করে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল। ডেক-এ উঠে এল।

দ্রুতপায়ে পাতা পাটতনে নেমে জোরে হেঁটে বালিয়াড়িতে নেমে এল। উঁচু পাড়ে উঠে চলল কয়েদঘরের দিকে।

তখন রাত হয়ে গেছে। কয়েদঘরের লোহার দরজার দুপাশে টানা পাথরের বারান্দায় মশাল জ্বলছে। ফ্রান্সিস কয়েদঘরের পেছনে এল। কী করে সাথীদের জানাবে যে সে মুক্ত আর মারিয়াও অনেকটা সুস্থ।

জায়গাটা একটা মাঠের মত। তারপরেই টানা খাদ। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। সেই আলোতেই দেখা যাচ্ছে খাদটা আর ওপাশের টিলাটা। ঐ টিলাতেই একটা গুহায় নাকি থাকে এক নররাক্ষস। নিস্তাগুর পাহারা দেয়। ওখানে যাবে বলেই ফ্রান্সিস তরোয়াল নিয়ে এসেছে। সেই নররাক্ষস কেমন শক্তিশালী সেটা একটু দেখতে হয়। আর হ্যাঁ এই রাতেই।

খোলা জায়গাটায় ফ্রান্সিস পায়চারি করতে লাগল। কীভাবে বন্দী বন্ধুদের কাছে খবর পৌঁছানো যায়।

চাঁদের আলোয় দেখল মাঠমত জায়গাটায় ছোট ছোট নুড়ি পাথর ছড়ানো। একটা উপায় মনে এল। ও নিচু হয়ে কয়েকটা নুড়ি তুলে নিল। তারপর কয়েদঘরের উঁচু জানালার ফোকরটা দেখল। নিশানা করে একটা নুড়ি ছুঁড়ল। নুড়িটা এক বন্ধুর পিঠে লাগল। ও জানালার ফোকরের দিকে তাকাল। কিন্তু ওখান থেকে নুড়ি খসে আসবে কী করে। ও কিছু বলল না। এবার আর একটা নুড়ি এক বন্ধুর মাথায় লাগল। বন্ধুটি চেঁচিয়ে উঠল—নুড়ি ছুঁড়ছে কে? আগের

বন্ধুটিও বলল আমারও পিঠে পড়েছে একটা। বন্ধুদের মধ্যে কথা শুরু হল।

ফ্রান্সিস আর একটা নুড়ি ছুঁড়ল। এবার লাগল হ্যারির কাঁধে। হ্যারি চিৎকার করে বলল—ভাইসব—ফ্রান্সিস ছুঁড়ছে এই নুড়িগুলো। ফ্রান্সিস মুক্ত। সবাই ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। ফ্রান্সিস হাসল—যাক বন্ধুরা বুঝতে পেরেছে যে ও মুক্ত।

হ্যারি শাঙ্কোকে বলল—ঐ জানালার দিকে মুখ বার করে বল — রাজকুমারী কেমন আছেন? শাঙ্কো মুখের কাছে দুহাতের চেটো গোল করে ওদের দেশীয় ভাষায় বলল—রাজকুমারী কেমন আছেন? ফ্রান্সিস বাইরে থেকে গলা চড়িয়ে বলল— ভালো। ভাইকিং বন্ধুরা নিশ্চিন্ত হল।

ফ্রান্সিসের উচ্চস্বরে বলা কথাটা শুনে কয়েদঘরের সামনে থেকে একজন কারারক্ষী ছুটে এল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে খাদের ধারের একটা গাছের গোড়া ধরে খাদে ঝুলে পড়েছে। কারারক্ষীটি এসে এদিক ওদিক বারকয়েক তাকাল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। ওর মনে হল ও ভুল শুনেছে। ও চলে গেল।

ফ্রান্সিস গাছের গোড়া ধরে উঠে এল। দেখল খাদ যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে জংলা গাছপালা। ও ঐদিকেই চলল। জংলা গাছপালার কাছে এল। গাছপালার মধ্যে দিয়ে খাদের ঢালটার কাছে এল। ও ঢাল বেয়ে নামতে লাগল। ডানপাশে একটু দূরেই টিলাটা উঠে গেছে। টানা খাদের মধ্যে ছোট ছোট গাছ জংলা ঝোপ।

ঝোপ জঙ্গল ঠেলে ফ্রান্সিস চলল। চাঁদের আলোয় টিলার এবড়ো খেবড়ো গা দেখতে দেখতে চলল। কয়েকটা ফাটল দেখল। দুটো বড় গুহার মুখ দেখল। কিন্তু বৃদ্ধা বলেছিল ছোট গুহার মধ্যে নররাক্ষস থাকে। হঠাৎ একটা ছোট গুহা দেখল। হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকা যায় এমন।

ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল খুলল। তরোয়াল খুলে গুহাটার দিকে যাচ্ছে তখনই পেছনে শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ কানে এল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল উঁচিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। দেখল একটা মানুষের মত কিছু ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। চাঁদের আলোয় এক ঝলক দেখল—বড় বড় ধূসর রঙের চুল মাথায়। দাড়ি গোঁফে মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। সারা শরীরে বড় বড় কালো লোম। চোখ দুটো বড় বড়। তাতে হিংস্রতা। বড় বড় দাঁত। বোধহয় হাসছে। ফ্রান্সিসের চিন্তায় খেলে গেল—নররাক্ষস! ফ্রান্সিস কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নররাক্ষসের গলা লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। কিন্তু নররাক্ষস দ্রুত ঘুরে যাওয়ায় তরোয়ালের ঘা লাগল না। নররাক্ষস মুখে শব্দ করল—ওঁক্। নররাক্ষস সঙ্গে সঙ্গে তরোয়ালের ফলাটা দুহাতে চেপে ধরল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচকা টান মারল। তরোয়াল খুলে এল। নিশ্চয়ই নররাক্ষসের আঙ্গুল কাটা পড়েছে। নররাক্ষস হাত দুটো চোখের সামনে আনল। ফ্রান্সিস দেখল দুটো আঙ্গুল কাটা পড়েছে। নররাক্ষস গোঙাতে গোঙাতে ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটল। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা মাটিতে বসিয়ে হাঁপাতে লাগল। সতর্ক দৃষ্টিতে

চারদিকে তাকাতে লাগল। যদি নররাক্ষস ফিরে আসে। বেশ কিছুক্ষণ কাটল। নররাক্ষস আর ফিরে এলো না।

ফ্রান্সিস বুঝল সামনের ছোট গুহাটাতেই নররাক্ষস থাকে। আহত নররাক্ষসটা বোধহয় গুহায় ঢোকেনি। অন্যদিকে চলে গেছে।

ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। একটা গাছের গুঁড়ি কাণ্ড বেয়ে গাছের মাথায় উঠল। ওখান থেকে ডাল ধরে ঝুঁকে খাদের ওপাশের মাটিতে নেমে এল। তরোয়াল কোমরে গুঁজল। চলল সমুদ্রতীরের দিকে।

সমুদ্রতীরে এসে চিন্তা হল জাহাজে ওঠা নিয়ে। আবার জলে নেমে ভিজে জাহাজে উঠতে ইচ্ছে হল না। একটা কাজ তো ওকে করতেই হবে—সেটা হল রাজা গঞ্জালেসের সঙ্গে দেখা করে নররাক্ষসকে মেরে ধনসম্পদ উদ্ধার করবার কথা বলতে হবে। বিনিময়ে বন্ধুদের মুক্তি।

কাজেই এই দুই কারারক্ষীকে এখন তাড়াতে হবে।

ফ্রান্সিস সোজা বালিয়াড়ি পার হয়ে পাতা পাটাতনের কাছে এল। দুই কারারক্ষী ফ্রান্সিসকে দেখেই চিনল। দুজনে লাফিয়ে উঠল। কোমর থেকে তারোয়াল খুলল। ভাইকিংদের দলনেতাকে পাওয়া গেছে। একে বন্দী করতে পারলে সেনাপতি ওদের পিঠ চাপড়াবে।

ফ্রান্সিস জাহাজে উঠতেই দুজনে তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল। ফ্রান্সিস দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা কাছাকাছি আসতেই বলল—তোমরা কি লড়াই চাও?

—হ্যাঁ—লড়াই করে তোমাকে হারিয়ে তোমাকে বন্দী করে নিয়ে যাবো। একজন কারারক্ষী বলল।

—কী দরকার লড়াইয়ে। আমি নিজেই কাল সকালে রাজা গঞ্জালেসের রাজদরবারে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব বুঝি না। সেনাপতির হুকুম জীবিত বা মৃত তোমাকে তাঁর কাছে হাজির করতে হবে। রক্ষীরা বলল।

—বাবা—সেনাপতি দারুণ ফরমান দিয়েছে তো। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

একজন রক্ষী তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্রান্সিসের সামনে লাফিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বলল— আমাকে তরোয়ালটা খুলতে দাও ভাই।

—খোলো তরোয়াল। কারারক্ষীটি বলল।

—শেষবার বলছি—লড়াই বন্ধ করো। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না আমরা তোমাকে লড়াইয়ে হারিয়ে বন্দী করে নিয়ে যাবো। রক্ষী বলল।

—ও। বেশ তাহলে লড়াই-ই হোক। ফ্রান্সিস বলল।

ওদিকে এখানকার জোরে জোরে কথাবার্তা শুনে ভেন ডেক-এ উঠে এল। ও রক্ষীদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা কি পাগল—ফ্রান্সিসের সঙ্গে তরোয়ালের লড়াই করতে চাও?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ চাই। রক্ষীরা বলল।

—ফ্রান্সিস মেরে ফেলো না। একটু রয়ে সয়ে তরোয়াল চালিও। ভেন ফ্রান্সিসকে বলল।

ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল খুলল। একজন রক্ষী ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর ফ্রান্সিসের ওপরে তরোয়াল চালাল। ফ্রান্সিস মারটা ঠেকাল। অন্যজনও তরোয়াল চালাল। ফ্রান্সিস ওর মারও ঠেকাল। ওরা লাফালাফি করে তারোয়াল চালাতে লাগল। ফ্রান্সিসও ওদের মার ঠেকিয়ে চলল। ওরা হাঁফাতে লাগল। এবার ফ্রান্সিস একজন রক্ষীর তরোয়ালে এমন ঘা মারল যে তরোয়াল ছিটকে নিচের বালিয়াড়িতে গিয়ে পড়ল। সেই রক্ষী হাঁ করে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস ওর গলায় তরোয়াল ঠেকিয়ে বলল —আরো লড়াই করার ইচ্ছে আছে।

অন্য রক্ষীটি এই দেখে কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ফ্রান্সিস দ্রুত তরোয়াল চালাল। রক্ষীটি পিছিয়ে গেল। ফ্রান্সিস তরোয়াল চালিয়ে চালিয়ে ওকে রেলিঙের ধারে নিয়ে এল। তারপর দ্রুত তরোয়াল চালিয়ে ওর পোশাকের বুকের দিকটা লম্বালম্বি কেটে দিল। কিছুটা কেটেও গেল। রক্ত পড়তে লাগল। রক্ষীটি হাঁপাতে লাগল।

—বাছাধনরা এবার বাড়ি যাও। ভেন বলল।

ফ্রান্সিস বুকের কাছে পোশাক কাটা রক্ষীটির হাত থেকে তরোয়াল খুলে নিয়ে জলে ফেলে দিল। তারপর ওকে দুহাতে তুলে ধরে জলে ফেলে দিল। বলল —যা তরোয়াল খোঁজ গে।

একটু হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল—ভেন—মারিয়া কেমন আছে?

—খুব ভালো। রাতে ডিমসেদ্ধ খেতে চেয়েছে। ভেন বলল।

—না না—কটা দিন খাওয়া দাওয়াটা মানে তোমরা যাকে সহজপাচ্য বল তাই খাওয়াও। ফ্রান্সিস বলল।

—এসব আমার হাতে ছেড়ে দাও। চলো। ভেন বলল।

জাহাজ থেকে ওরা দেখল দুই কারারক্ষী বালিয়াড়ি পার হয়ে তীরের প্রান্তরে উঠল। ফ্রান্সিস ভাবল—ওরা নিশ্চয়ই গিয়ে সেনাপতিকে সব বলবে। সেনাপতিও আমার খোঁজে এখানে আসবে। আবার ঝামেলা। যাকগে—যা হবার হবে। কালকে সকালে রাজা গঞ্জালেসের সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

একটু অন্যমনস্কভাবেই ফ্রান্সিস খাওয়া দাওয়া সারল। মারিয়া এখন অনেকটা সুস্থ। ভেন কিন্তু মারিয়াকে অল্পসেদ্ধ ডিম খেতে দিল। ফ্রান্সিস কিছু বলল না। ভেন রাজবৈদ্যের শিষ্য ছিল। ও যা ভালো বোঝে করুক।

বেশ রাত তখন। হঠাৎ ডেক-এ অনেক পায়ের শব্দ। ভেনই প্রথম শব্দটা শুনতে পেল। ও উঠে পড়ল। নিচে নামার সিঁড়ির কাছে এল। দেখল কিছু সশস্ত্র সৈন্যের সঙ্গে বোধহয় সেনাপতিই নামছে। ভেনকে দেখে জিজ্ঞেস করল—ফ্রান্সিস কোথায়?

ভেন বলল—আসুন। সবাই ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। সেনাপতি দরজায় ধাক্কা দিল।

ফ্রান্সিসের কানেও শব্দ গেছে। ও উঠে পড়েছে ততক্ষণে। মারিয়ারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বলল কী ব্যাপার?

—সেনাপতি এসেছে—আমায় বন্দী করবে বোধহয়? ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি পালাও। মারিয়া বলল।

—দেরি হয়ে গেছে—পালানো যাবে না। ফ্রান্সিস বলল। দরজায় তখনও ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে। ফ্রান্সিস বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে এগোল। দরজা খুলে দাঁড়াল।

সেনাপতি বলল—তাহলে পালাওনি।

—পালাবার তো কোন কারণ ঘটেনি। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার দুই কারারক্ষীকে তুমি আহত করেছো। সেনাপতি বলল।

—মেরে তো ফেলিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আর দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কথা বলতে পারতে না।

তার আগেই—যাক গে—তুমি কি আমাদের সঙ্গে তরোয়ালের লড়াই চালাতে চাও। আমার দুজন তরোয়াল দক্ষ সৈন্যকে এনেছি। তুমি লড়বে?

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—না।

—না লড়েই পরাজয় স্বীকার করলে। সেনাপতি বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা কাত করে বলল।

সেনাপতি হাসল। বলল—তবে যে শুনি ভাইকিংরা বীর দুঃসাহসী। তরোয়াল চালনায় দক্ষ।

—সেটা যথাসময়ে যথাস্থানে প্রমাণ পাবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—থাক গে—তোমাকে বন্দী করা হল। সেনাপতি বলল।

—তাহলে তো আমাকে কয়েদঘরে গিয়ে থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—অবশ্যই। সেনাপতি বলল। তারপর মারিয়াকে আর ভেনকে দেখিয়ে বলল—এরাও তো বন্দী ছিল।

—হ্যাঁ—রাজকুমারী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাই তাঁকে চিকিৎসার জন্যে এখানে আনা হয়েছিল। ঐ বৃদ্ধ ভেন—আমাদের চিকিৎসক—বৈদ্য। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। এরা এখানেই থাকুক। তুমি চলো। সেনাপতি বলল।

—এখুনি? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কোন ব্যাপারে দেরি করা আমি পছন্দ করি না। সেনাপতি বলল।

—ঠিক আছে। চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি দরজার দিকে এগোল। ফ্রান্সিস পেছনে। পিছু ফিরে ফ্রান্সিস মারিয়াকে বলল—দুশ্চিন্তা করো না। আমরা মুক্তি পাবোই। মারিয়া স্থির বিছানায় বসে রইল। সবাই চলে গেলে মারিয়া বালিশে মুখ চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে

কেঁদে উঠল।

সেনাপতি ফ্রান্সিসকে নিয়ে জাহাজ থেকে নামল। সঙ্গের তিনজন ঘোড়সওয়ার সৈন্যও নামল।

বালিয়াড়ি পার হয়ে ঘাসের প্রান্তরে এল। একজন সৈন্য তিনটি ঘোড়ার লাগাম ধরেছিল।

সবাই ঘোড়াগুলোর দিকে এল। সেনাপতি নিজের ঘোড়ায় উঠল। সৈন্য দুজনও ঘোড়ায় উঠল। সেনাপতি ফ্রান্সিসকে বলল—তুমি একজনের পেছনে বসো। ফ্রান্সিস একজন সৈন্যের পেছনে বসল। তিনটি ঘোড়া ছুটল।

ফ্রান্সিস ওপরে তাকাল। আকাশ অনেকটা সাদাটে হয়ে এসেছে। ভোর হতে দেরি নেই। রাজধানী দামিলা পৌঁছোবার আগেই সূর্য উঠল। রোদ ছড়াল দুপাশে জঙ্গলের মাথায় প্রান্তরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা সকলে দামিলা পৌঁছল। সেনাপতি ঘোড়া চালিয়ে কয়েদঘরের সামনে এল। পাহারারত এক রক্ষীকে ডাকল। রক্ষী এগিয়ে এল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়েছে। ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে সেনাপতি বলল—এটাকে কয়েদঘরে ঢোকা। রক্ষীটি একটা বড় চাবি নিয়ে কয়েদঘরের তালা খুলল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। নিজেই কয়েদঘরে ঢুকল।

ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে যারা জেগে উঠেছিল তারা ফ্রান্সিসকে ঢুকতে দেখে অবাক। ওরা তখন ভাবছিল ফ্রান্সিস মুক্ত থাকলে তবু পালাবার আশা ছিল। কিন্তু এখন তো সেই আশা আর রইল না। তবু ফ্রান্সিসকে দেখে ঘুম ভেঙে গেল। সবাই ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো-। বাকি বন্ধুদের ঘুম ভেঙে গেল। সবাই ধ্বনি তুলল—ও হো হো।

ফ্রান্সিস হেসে হ্যারির পাশে গিয়ে বসল। হ্যারি জিজ্ঞেস করল—ফ্রান্সিস, তুমি ধরা দিলে কেন? সব বন্ধুরা তখন বসে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসকে ঘিরে ধরেছে।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সব ঘটনা বলল। হ্যারি জিজ্ঞেস করল এখন কী করবে।

রাজা গঞ্জালেসের সঙ্গে দেখা করবো। বলবো যদি আমাকে আর আমার বন্ধুদের মুক্তি দেন তাহলে ঐ নররাক্ষসের হাত থেকে আপনার পৈতৃক ধনসম্পদ উদ্ধার করে দিতে পারি। দেখি রাজা গঞ্জালেস কী বলে। ফ্রান্সিস বলল।

কিছু পরেই ঢাং ঢ্যাং শব্দে দরজা খুলে গেল। সকালের খাবার দিতে দুজন সৈন্য ঢুকল। প্রত্যেকের সামনে পাতা পেতে গোল রুটি আর তরকারির ঝোল দিল। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ হলে সৈন্য দুজন চলে গেল। শব্দ তুলে দরজা বন্ধ হল। ফ্রান্সিস লোহার দরজার সামনে গেল। একজন রক্ষীকে বলল—আমি সেনাপতির সঙ্গে কথা বলবো। সেনাপতিকে ডাকো।

—উনি এখন বিশ্রাম করছেন। ডাকা যাবে না। রক্ষীটি বলল।

ফ্রান্সিস লোহার দরজা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল নিকুচি করেছে বিশ্রামের। তুমি ডাকো। ফ্রান্সিসের চড়া গলা শুনে বন্ধুরা এগিয়ে এল। একসঙ্গে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো-

রক্ষীটি বেশ ভীত হল। অন্য রক্ষীটি এগিয়ে এল। সব শুনে বলল—দরজা ধাক্কানো বন্ধ কর। আমি সেনাপতিকে ডেক-এ আনছি।

রক্ষীটি চলে গেল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরাও ফিরে গেল নিজের নিজের জায়গায়। কিছু বসল, কিছু শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি এল। লোহার দরজার সামনে এসে বলল—কী ব্যাপার? তোমরা নাকি হৈ চৈ করছো। লোহার দরজা ভেঙে ফেলতে চাইছো?

ফ্রান্সিস উঠে এল। বলল—আপনার সঙ্গে আমার খুবই প্রয়োজন। তাই একজন রক্ষীকে বললাম—আপনাকে ডেক-এ দেওয়ার জন্য। ও শুনল না কথা। তাই আমার ক্রুদ্ধ বন্ধুরা ধ্বনি তুলেছে। দরজায় ধাক্কা দিয়েছে।

—যাক গে—শান্ত হয়ে না থাকলে কিন্তু সবাইকে বেত মারা হবে। সেনাপতি বলল।

—খুব ভালো কথা—ফ্রান্সিস বলল—তারপর বলল—রাজসভা বসলে আমি রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কেন? সেনাপতি বলল।

—আমার কয়েকটা জরুরী কথা বলার আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজার সামনে আজেবাজে বকবে না। সেনাপতি বলল।

—আজেবাজে নয়। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। রাজসভা বসলে তোমাকে আমার সৈন্যরাই এসে নিয়ে যাবে। সেনাপতি বলল।

—অনেক ধন্যবাদ। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি চলে গেল। রক্ষীরা পাহারা দিতে লাগল।

একটু বেলায় দুজন সৈন্য কয়েদঘরের সামনে এল। লোহার দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বলল—ফ্রান্সিস কে?

ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। বলল—আমি।

—সেনাপতি তোমাকে রাজদরবারে নিয়ে যেতে বলেছেন। একজন সৈন্য বলল।

—চলো ভাই। আমি তৈরি। ফ্রান্সিস বলল।

ঢং ঢটাং শব্দে দরজা খোলা হল। ফ্রান্সিস বেরিয়ে এল। সৈন্য দুজনের সঙ্গে চলল রাজবাড়ির দিকে।

ফ্রান্সিস রাজসভায় এল। তখন বিচার চলছে। সেনাপতির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বলল—আমাকে কথা বলার সুযোগ দেবেন।

—দাঁড়াও—দেখছি। সেনাপতি বলল।

বিচারটা শেষ হল। সেনাপতি একটু এগিয়ে গিয়ে মাথা একটু নিচু করে

সম্মান জানাল। তারপর বলল—একদল ভাইকিংকে আমরা কয়েদঘরে বন্দী করে রেখেছি। তাদের যে দলনেতা ফ্রান্সিস সে আপনাকে কিছু বলতে চায়।

বেশ। এগিয়ে আসুক। রাজা গঞ্জালেস বললেন।

ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। মাথা একটু নিচু করে সম্মান জানিয়ে বলল—মহারাজ আমি শুনেছি—উত্তরের টিলার নিচে দিয়ে এটা শুকনো খাদ চলে গেছে। ওখানে একটা ছোট গুহায় নররাক্ষস থাকে।

হ্যাঁ থাকে। রাজা বললেন।

আপনার পিতা মূল্যবান বেশ কিছু ধনসম্পদ—ঐ গুহায় রেখে নররাক্ষসকে পাহারাদার হিসেবে রেখেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। কিন্তু নররাক্ষস এখন আর ঐ ধনসম্পদের পাহারাদার হিসেবে থাকতে চাইছে না। ধনসম্পদের মালিক হতে চাইছে। রাজা বললেন।

নররাক্ষসকে হত্যা করে আপনার পৈতৃক ধনসম্পদ উদ্ধার করতে পারেন। ফ্রান্সিস বলল।

সেই চেষ্টা করেছি। অন্তত পাঁচজনকে নররাক্ষস হত্যা করেছে। তারপরে আর কেউ যেতে চাইছে না। রাজা বললেন।

আমি গতকাল দুপুরে ঐ গুহার কাছে গিয়েছিলাম। নররাক্ষসকে দেখেছি। ও আক্রমণ করার আগেই তরোয়ালে দিয়ে ওর দুটো আঙুল কেটে ফেলেছি। ও তখন পালিয়ে যায়। ফ্রান্সিস বলল।

সে কি! তোমার ভয় করল না? রাজা বললেন।

ভয়ের কী আছে। ও তো আমাদের মতই মানুষ। ওকে দেখতে বীভৎস। কাঁচা মাংস খায়। ফ্রান্সিস বলল।

তুমি পারবে ঐ নররাক্ষসকে হত্যা করতে? আমার পৈতৃক সম্পদ উদ্ধার করতে? রাজা বললেন।

হ্যাঁ পারবো। একা নয়। সঙ্গে দুই বন্ধুও থাকবে। ফ্রান্সিস বলল।

চেষ্টা করে দেখ। রাজা বললেন।

—এবার আমার একটা শর্তের কথা বলি। ফ্রান্সিস বলল।

বলো কী শর্ত? রাজা বললেন।

আপনি এখন আমার বন্দী বন্ধুদের মুক্তি দিন। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা একপাশে বসা বৃদ্ধ মন্ত্রীকে বললেন—মন্ত্রীমশাই আমি এই প্রস্তাবে রাজি হব?

—না। আগে ঐ যুবক নররাক্ষসকে হত্যা করে আপনার ধনসম্পদ উদ্ধার করে দিক। তারপর ওর বন্ধুদের মুক্তি দেওয়া হবে। মন্ত্রী বললেন।

ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে একটু ভাবল। তারপর মাথা তুলে বলল—বেশ। তখনই মুক্তি দেবেন। তবে আমাকে আর আমার দুই বন্ধুকে মুক্তি দিতে হবে। অস্ত্র দিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা সেনাপতির দিকে তাকালেন। বললেন—এদের তিনজনকে মুক্তি দিন

আর অস্ত্র বর্ম ওরা যা চায় দিন।

ফ্রান্সিস রাজা গঞ্জালেসকে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজাসভার বাইরে এল। সেনাপতি ওর সঙ্গে এল। দুজনে চলল কয়েদঘরের দিকে।

সেনাপতি কয়েদঘরের রক্ষীদের আদেশ করল—এই যুবক যে দুজন বন্ধুর মুক্তি চাইবে তাদের মুক্তি দাও। তারপর অস্ত্রঘরে গিয়ে ওরা যা যা অস্ত্র চায়—দেবে।

সেনাপতি বলল—কবে যাবে নররাক্ষসের গুহায়?

—আজ দুপুরে খেয়েদেয়ে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ—নররাক্ষসদের সঙ্গে লড়তে পারো কিনা। ওকে মেরে ফেলার সাধ্য কারো নেই। খুব বেশি হলে ওকে আহত করতে পারো। কিন্তু সেটা করতে গিয়েও তোমাদের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সেনাপতি বলল।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—নররাক্ষসকে আমরা হত্যা করবো। রাজা গঞ্জালেসের পৈতৃক সম্পদ উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ—দেখা যাক। সেনাপতি বলল।

সেনাপতি চলে গেল। ফ্রান্সিস রক্ষীকে বলল—আমরা দুপুরের খাওয়া খেয়ে যাবো। তখন আমাদের মুক্তি দিয়ো। অস্ত্রঘরেও তখন যাবো।

রক্ষী দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিস ঢুকল। বন্ধুরা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বসল। বলল—খাওয়া হয়ে গেলে আমি শাঙ্কো আর বিস্কো নররাক্ষসকে নিকেশ করতে যাবো। তোমরা আমাদের সাফল্য কামনা কর। হ্যারি আস্তে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো-। বন্ধুরাও একসঙ্গে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো-।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস বলল—আমি তোমাদের মুক্তি চেয়েছিলাম। কিন্তু বাদ সাধলেন মন্ত্রীমশাই। তিনি বললেন—নররাক্ষসকে হত্যা করতে পারলে আমার বন্ধুদের মুক্তি দেওয়া হবে।

ফ্রান্সিস রক্ষীকে ডাকল। রক্ষী দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিস শাঙ্কো বিস্কো বেরিয়ে এল। রক্ষী ওদের নিয়ে চলল অস্ত্রাগারে।

অস্ত্রাগারের সামনেও রক্ষীদের পাহারা। কয়েদঘরের রক্ষী ওদের কাছে গেল। বলল—সেনাপতির হুকুম—এই তিনজন যা যা চায় তা এদের দিতে হবে। রক্ষী অস্ত্রাগারের দরজা খুলে দিল। তিনজনে অস্ত্রাগারে ঢুকল। তিনজনেই তরোয়াল নিল। বর্ম শিরস্ত্রাণ নিল। পরল সেসব। একটা মশাল আর চকমকি পাথর নিল। তারপর তরোয়াল কোমরে গুঁজে বেরিয়ে এল। অস্ত্রাগারের রক্ষী বলল—তোমরা কার সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছো?

—নররাক্ষসের সঙ্গে। বিস্কো বলল।

—বলো কি। রক্ষী বলে উঠল। রক্ষীদের একজন বলল—তোমাদের প্রাণটা বেঘোরে যাবে। আজ পর্যন্ত কেউ নররাক্ষসকে আহতও করতে পারেনি।

—আমি ওর দুটো আঙুল কেটে দিয়েছি। গিয়ে দেখে আসতে পারো। ফ্রান্সিস বলল।

—এ অসম্ভব। রক্ষী বলল।

—আমরা অসম্ভবকেই সম্ভব করি। আমরা ভাইকিং। শাঙ্কো বলল। সব পাহারা অবাক চোখে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে রইল।

তিনজনে চলল খাদের দিকে। খাদের একেবারে শেষে এসে ঢাল দিয়ে নামল। তারপর খাদ দিয়ে চলল। খাদে জংলা গাছ ঝোপ কয়েকটা বড় গাছ। তিনজনে চলল। সামনে ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিস গতকালের দেখা ছোট গুহাটার সামনে এল। বলল—নররাক্ষস নিশ্চয়ই এই গুহাটায় থাকে। গুহা দেখে বিস্কো বলল—আমাদের তো শুয়ে পড়ে ঢুকতে হবে।

—হ্যাঁ। নররাক্ষসকে ডাকাডাকি করা যাক। বেরিয়ে এলে লড়াইটা এখানেই হতে পারে। শাঙ্কো বলল।

তিনজনে গুহার মুখে এসে ডাকতে লাগল—নররাক্ষস বেরিয়ে আয়। তোর সঙ্গে আমরা লড়তে এসেছি। সাহস থাকে তো গুহা থেকে বেরিয়ে আয়।

কিছুক্ষণ সময় গেল। নররাক্ষস বেরিয়ে এল না। ফ্রান্সিস বলল—ও বেরিয়ে আসবে না। এটা বোঝা যাচ্ছে। যাকগে—আমাদেরই ঢুকতে হবে। তার আগে দুটো কাজ। একটা লম্বা গাছের ডাল চাই। আর মশালটা জ্বালতে হবে।

ফ্রান্সিস দেখল কিছু দূরে একটা ওক গাছ। বলল—ভুলে কুড়ুলটা আনা হয়নি। তরোয়ালের কোপ দিয়ে ডালটা কাটতে হবে। চলো।

ওক গাছটা থেকে একটা লম্বা ডাল বেছে নিল। তিনজনে গাছে বেয়ে বেয়ে উঠল। ডালটার কাছে এল। তরোয়ালের ঘা মারতে লাগল ডালটার গোড়ায়। খুব মোটা ডাল নয়। তিনটি তরোয়ালের পরপর কয়েকটা কোপে ডালটা কেটে গেল। নিচে ঝোপ ঝাড়ে পড়ল।

তিনজনে নেমে এল। গুহার মুখের কাছে এল। চকমকি ঠুকে বিস্কো মশালটায় আগুন লাগাল। ফ্রান্সিস মশালটা হাতে নিয়ে বলল—চলো।

গুহার মুখে ফ্রান্সিস প্রায় শুয়ে পড়ল। তারপর গুহাটায় ঢুকে গেল। একটু যেতেই দেখল গুহাটা বেশ বড়। ফ্রান্সিস মশালের আলোয় চারপাশ দেখতে লাগল। এবড়ো খেবড়ো পাথরের গা। ফ্রান্সিস কাটা ডালটা টেনে নিল। ততক্ষণে বিস্কো শাঙ্কো ঢুকে পড়েছে। এতক্ষণে দুর্গন্ধে তিনজনেরই গা গুলিয়ে উঠল।

হঠাৎ ওরা দেখল পাথুরে গায়ে একটা বড় ফাটলের মত। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে নররাক্ষস। ফ্রান্সিস চিৎকার করে উঠল—সাবধান। গুহার পাথরে পাথরে কথাটা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। নররাক্ষসকে প্রথম দেখেছিল ফ্রান্সিসই। এবার শাঙ্কো দেখল। ফ্রান্সিস আগেই তরোয়াল কোমরের ফেট্টি থেকে খুলে বের করেছে। শাঙ্কো আর বিস্কোও এবার তরোয়াল খুলল।

নররাক্ষস হো হো করে হেসে উঠল। গুহাটায় সেই হাসি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

নররাক্ষস গুহার গায়ের একটা বড় ফাটল দিয়ে ছোট গুহায় ঢুকে গেল। ফ্রান্সিস বলল—ঐ ছোট গুহাটায় নররাক্ষস ঢুকে পড়ে বলেই কেউ ওকে সামনা সামনি লড়াইয়ে নামাতে পারে না। ঐ গুহাটায় ঢুকতে গিয়েই বোধহয় এর আগে যারা নররাক্ষসকে হত্যা করতে এসেছিল তারা নিজেরাই মারা পড়েছে। ঐ গুহায় আমরা এখন ঢুকবো না।

ফ্রান্সিস গাছের লম্বা ডালটা টেনে নিল। ফ্রান্সিস বলল—হাত লাগাও। তিনজনে মিলে লম্বা ডালটা ছোট গুহাটায় ঢোকাল। তারপর ডালটা ঘোরাতে লাগল। এই ডালটা তরোয়াল বা বর্শা নয়। অনেকদূর গেল ডালটা। ডালের খোঁচা খেয়ে উত্যক্ত করতে লাগল নররাক্ষসকে। নররাক্ষস আর লুকিয়ে আক্রমণ করতে পারল না। গুহা থেকে কুঠার হাতে বেরিয়ে এল। কুঠারটা বেশ বড়। অত্যন্ত ধারালো মুখটায় মশালের আলো পড়ে চক্‌চক্ করছে।

নররাক্ষস কুঠার হাতে ফ্রান্সিসদের সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিস্কো সরে যেতে গিয়েও পারল না। কুঠারের মুখটা বিস্কোর কাঁধ ছুঁয়ে গেল। অনেকটা কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—বিস্কো পেছনে সরে যাও। বিস্কো পেছনে সরে গেল। এবার ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাতে লাগল। শাঙ্কোও তরোয়াল উঁচিয়ে আঘাত করার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিস তরোয়াল চালিয়ে কুঠারের সঙ্গে লড়তে লাগল। অত্যন্ত শক্তিধর নররাক্ষস অনায়াসে ঐ ভারি কুঠারটা ঘোরাতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝতে পারল বেশিক্ষণ লড়াই চালাতে পারবে না।

ফ্রান্সিস হঠাৎ লাফ দিয়ে নররাক্ষসের সামনে গিয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে বসে পড়ল। নররাক্ষস কুঠার চালাল। কিন্তু কুঠার ঘুরে গেল ফ্রান্সিসের মাথার ওপর দিয়ে। এই সুযোগটাই পেতে চাইছিল ফ্রান্সিস। ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তরোয়ালের কোপ বসাল নররাক্ষসের ডান কাঁধে। তরোয়ালটা গেঁথে গেল যেন। রক্ত ছুটল। নররাক্ষস কুঠার চালানো থামল। ফ্রান্সিসদের মন পড়ল নররাক্ষসের দুটো আঙুলও কেটে দিয়েছিল। ও বুঝতে পারছিল নররাক্ষস কুঠারটা খুব শক্ত করে ধরতে পারছে না। শরীরে জোরটাও কমে এসেছে।

নররাক্ষসের গা রক্তাক্ত হয়ে গেল। ওদিকে শাঙ্কো তখন সুযোগ খুঁজছে। পেয়েও গেল সুযোগ। নররাক্ষস তখন কুঠার মাথার ওপর তুলে ধরেছে। শাঙ্কো বিদ্যুৎগতিতে দুপা এগিয়ে তরোয়ালের কোপ বসাল নররাক্ষসের পায়ে। পা কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। নররাক্ষস হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে নররাক্ষসের মাথায় সজোরে তরোয়ালের কোপ বসাল। মাথা কেটে গেল। রক্ত বেরোলো। রক্তধারা নররাক্ষসের চোখে মুখে নেমে এল।

নররাক্ষস চিৎকার করে উঠল। ঐ প্রচণ্ড চিৎকারে গুহাটা যেন কেঁপে উঠল। এক মুহূর্ত বিস্কো ভাবল। তারপর ছুটে এসে নররাক্ষসের বুকে তরোয়াল



প্রচণ্ড জোরে ঢুকিয়ে দিল। তরোয়ালটা আর বের করল না। তরোয়ালটা বুকে বিঁধে রইল। নররাক্ষস গুহার মেঝেয় পড়ে গেল। এপাশ ওপাশ গড়াতে লাগল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল।

ফ্রান্সিস ও শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। দজনেই ভীষণ হাঁপাতে লাগল।

নররাক্ষস গোঙাতে লাগল। নররাক্ষস মাথাটা এপাশ ওপাশ করতে লাগল। তারপর স্থির হয়ে গেল। নররাক্ষস মারা গেল।

ফ্রান্সিস একটা পাথরের চাঙের ওপর বসল। বিস্কো পাশে বসল। ফ্রান্সিস বিস্কোর কাটা জায়গাটা দেখল। তখনও রক্ত পড়ছে। ফ্রান্সিস কোমরের কাপড়ের ফেট্টিটা খুলল। লম্বা করে এক ফালি ছিঁড়ল। বিস্কোর আঘাতের জায়গাটা ভালো করে বেঁধে দিল। ব্যথাটা কমল বিস্কোর।

শাঙ্কো তখন নররাক্ষসের গুহাটা দেখছিল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—এই গুহাটায় একজন ঢুকতে পারবে?

ফ্রান্সিস বলল—ঐ গুহাতেই রয়েছে রাজা গঞ্জালেসের পৈতৃক ধনভাণ্ডার। ওসব বের করে আনতে হবে। কিন্তু মশাল নিয়ে ঢোকা যাবে না।

ফ্রান্সিস তরোয়ালটা বিস্কোর হাতে দিল। ছোট গুহাটার কাছে গেল। মাথা ঢুকিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকতে লাগল। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধকারে আরো ঢুকল। অন্ধকারে হাতে কী যেন ঠেকল। আরো ঢুকে জিনিসটা হাত দিয়ে দেখে বুঝল একটা বাক্স। লম্বাটে।

ফ্রান্সিস বাক্সের কড়াটা ধরে টানতে টানতে অন্ধকারে নিয়ে চলল গুহার মুখের দিকে। গুহার মুখ দিয়ে ফ্রান্সিস শুয়ে শুয়ে বেরিয়ে এল। বাক্সটা উঁচু কর ধরে নেমে এল। দেখা গেল একটা পেতলের বাক্স। বাক্সটা সারা গায়ে লাল নীল সবুজ মিনে করা। তারই মধ্যে মধ্যে হীরের টুকরো বসানো। ফ্রান্সিস বাক্সটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল কোন চাবির ফুটো নেই। তাহলে টানা আছে। ও একপিঠের ঢাকাটা ঠ্যালা দিল। টানা পরে খুলে গেল। মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল সোনার কত বিচিত্র গয়না গাঁটি। সে সবের নিচে দেখল হীরে মণি-মাণিক্য। শাঙ্কো বিস্কোও দেখল। যাক্। রাজা গঞ্জালেসের পৈতৃক ধনরত্ন উদ্ধার করা গেছে। এবার মুক্তি।

ওরা একে একে গুহা থেক গড়িয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে এল। এবার ঝোপ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলল যেখানে এই খাদটা শুরু হয়েছে সেইদিকে। ওদের গায়ের পোশাকে গুহার লালচে ধূলোর আস্তরণ ওরা ঝাড়ল ধূলো উড়ল। কিন্তু পোশাক পরিষ্কার হল না। খাদের শেষে এসে ওরা যখন উঠে এল দেখল রাজা গঞ্জালেস মন্ত্রী ও সেনাপতি দাঁড়িয়ে আছেন। ফ্রান্সিস রাজা গঞ্জালেসের কাছে গেল। বাক্সটা রাজাকে দিল। রাজা গঞ্জালেসের মুখে হাসি আর ধরে না। তাড়াতাড়ি টানা খুলল। দেখল গয়না গাঁটি মণি রত্ন।

ফ্রান্সিস বলল—মাননীয় রাজা এবার তাহলে আমার বন্ধুদের মুক্তি দিন। আমরা জাহাজে ফিরে যাবো। রাজা সেনাপতিকে বললেন—ওদের ছেড়ে দাও।

এবার রাজা ফ্রান্সিসকে বলল—নররাক্ষসকে কি হত্যা করতে পেরেছো।

—হ্যাঁ। নররাক্ষস ঐ গুহাতেই মরে পড়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতির সঙ্গে ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরের সামনে এল। সেনাপতি একজন রক্ষীকে বলল—সবাইকে মুক্তি দাও। কারারক্ষী দরজা খুলে দিল। ভাইকিংরা বেরিয়ে এল। ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো-।

ফ্রান্সিসের তখন চিন্তা মারিয়া সুস্থ আছে তো? তাই ও আর দেরি করতে চাইল না। শাঙ্কো তখন বন্ধুদের বলছে নররাক্ষসকে কী করে ওরা হত্যা করল তার ঘটনা।

এবার সবাই রওনা হল জাহাজঘাটার দিকে।

সন্ধ্যার সময় ওরা জাহাজঘাটায় এল। জাহাজে উঠল সবাই। তখন সবাই আনন্দে মাতোয়ারা।

ফ্রান্সিস দেখল মারিয়া জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এসে দেখল মারিয়া অনেকটা সুস্থ। ফ্রান্সিস বলল—সূর্যাস্ত তো দেখেছো?

হ্যাঁ। মারিয়া হেসে বলল।

এবার কেবিনে চলো। শুয়ে বিশ্রাম করবে। ফ্রান্সিস বলল।

সারাদিন শুয়ে থাকতে ভালো লাগে নাকি। মারিয়া বলল।

রাজা গঞ্জালেসের পৈতৃক ধনভাণ্ডার কী করে উদ্ধার করলাম সেই গল্প শোনাবে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ চলো। মারিয়া বলল।

দুজনে কেবিনঘরে এল। ফ্রান্সিস গায়ের পোশাকটা খুলে ফেলল। দেখল গায়েও লালচে ধুলো লেগেছে। বলল—দাঁড়াও—একটু গা ধুয়ে আসি।

ও বেরোতে যাবে তখনই ভেন ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল—ভেন—মারিয়া এখন কেমন আছে?

সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে শরীরের দুর্বলতাটা কাটতে একটু সময় লাগবে। ভেন বলল।

দুর্বলতা কাটাবার ওষুধ দিয়েছো তো? ফ্রান্সিস বলল।

দিয়েছি। রাজকুমারী খান না। ভেন বলল।

কেন? ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকাল। মারিয়া বিছানায় হাতের তেলো দিয়ে চাপড় মেরে বলে উঠল—হা ভগবান! সে যে কী তেতো তা তুমি কখনাও করতে পারবে না।

—ঠিক আছে—ঐ ওষুধ আমিও খাবো। তাহলে তো তোমার খেতে আপত্তি নেই? ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তুমি—মানে—মারিয়া কথাটা শেষ করতে পারল না।

—হ্যাঁ। খাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। আমিও খাবো। মারিয়া বলল।

ভেন দুজনের কথা শুনছিল আর মৃদু মৃদু হাসছিল।

পরদিন ভোরে লোকজনের কথাবার্তায় ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখল—মারিয়া বসে আছে।

—কী ব্যাপার বলো তো?

—রাজা গঞ্জালেসের নতুন জাহাজ এসে এখানে নোঙর করেছে। দামিলা থেকে লোক আসছে তো আসছেই। শুনে এলাম—রাজা গঞ্জালেস আর রানি নাকি জাহাজ দেখতে আসবেন।

ফ্রান্সিস হাত মুখ ধুয়ে ডেক-এ উঠে এল। দেখল একটা ঝক্‌ঝকে নতুন জাহাজ ওদের জাহাজের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজটায় কামান আছে। ও এবার নিজেদের জাহাজটার দিকে তাকাল। কী বিশ্রী। জাহাজের রং বিবর্ণ। খোলটার কত জায়গায় যে রং চটে গেছে। পালগুলোয় কালো কালো ছোট তালি মারা। ফ্রান্সিস পরক্ষণেই ভাবলো—হোক হতচ্ছাড়া চেহারা। কত সুখদুঃখের স্মৃতি এই জাহাজের সঙ্গে জড়িত। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে গিয়ে মাস্তুলটা জড়িয়ে ধরল।

সকালের খাবার খাচ্ছে তখনই শোনা গেল লোকজনের উচ্চকণ্ঠে বলা কথা—রাজা রানী আসছেন—রাজারানী আসছেন।

ভাইকিংরা ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিস মারিয়াও এল। হ্যারি এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস—যুদ্ধ অবধারিত। কয়েকদিন পরেও হতে পারে আবার আজকালের মধ্যেও শুরু হতে পারে।—তার আগেই আমরা জাহাজ চালিয়ে চলে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

দুই ঘোড়ায় টানা রাজার গাড়ি এসে দাঁড়াল। রাজা গঞ্জালেস ও রানি গাড়ি থেকে নামলেন। রাজা হাসিমুখে তাকিয়ে রইলেন নতুন জাহাজটার দিকে। রানিও জাহাজটা দেখে মুগ্ধ। মন্ত্রী ও সেনাপতি রাজার কাছে এলেন। মাননীয় রাজা—সেনাপতি বলল জাহাজটায় উঠে ভালো করে দেখুন।

কাঠের পাটাতন ফেলাই ছিল। রাজা বেশ সাবধানে পাটাতন পার হয়ে জাহাজে উঠলেন। রানী আর মন্ত্রী ঐ পাটাতনে পা ফেলে যেতে পারবে না এটা বোঝাই গেল। দুজনে তীরে রইলেন।

রাজা গঞ্জালেস জাহাজটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। খুব খুশি হলেন।

রাজা সেনাপতিকে বললেন—জাহাজে দুটো কামান রাখা হয়েছে। আমাদের এখন গোলন্দাজ বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। গোলা বারুদ কিনতে হবে। সেনাপতি বলল—

—হ্যাঁ মহারাজ এটা করতে হবে আর করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। কারণ রানি উরাকা যে কোন সময় আপনার রাজত্ব আক্রমণ করতে পারে। কথাটা শুনে রাজা মাথা ওঠানামা করলেন। বোঝা গেল—এই আশঙ্কার কথা তিনি বোঝেন।

জাহাজটার মাস্তুল পাল দাঁড়টানা ঘর সবই দেখলেন রাজা। তারপর নেমে এলেন। প্রজাদের ভিড় থেকে ধ্বনি উঠল—রাজা রানি দীর্ঘজীবী হোন। রানি

হাত তুলে হাসলেন।

রাজা রানি গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। গাড়ি চলল রাজপ্রাসাদের দিকে।

ভাইকিংরা জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে এসব দেখল।

এবার হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—

—এখন আমরা কী করবো?

—ফ্রেজারকে বলো দেশের দিকে জাহাজ চালাতে। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব—ফ্রান্সিস বলেছে এখন জাহাজ দেশের দিকে যাবে। ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো। হ্যারি বলল—পাল খুলে দাও। বাতাস পড়ে গেছে। দাঁড় টানতে যাও। নোঙর তোল।

ঘর ঘর্ শব্দে নোঙর তোলা হল। কয়েকজন ভাইকিং মাস্তুল বেয়ে কিছুটা উঠে পালের কাঠের ওপর দাঁড়াল। গোটানো পাল খুলে দড়ি দিয়ে বাঁধল। পালগুলো ফুলে উঠল। তবে হাওয়ার খুব জোর নেই।

বাকি আটজন ভাইকিং তখন দাঁড়ঘরে গিয়ে দাঁড় টানতে লাগল। সমুদ্রের জলে শব্দ উঠল—ছপ্ ছপ্ ছপ্।

জাহাজ মোটামুটি জোরে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে চলল।

বিকেলে আবার জোর বাতাস ছুটল। জাহাজ দ্রুত ছুটল। ভাইকিংরা খুব খুশি। আর দাঁড় টানতে হচ্ছে না। নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছে। সকলের মনেই প্রশ্ন—স্বদেশ আর কতদূর?

জাহাজ তীরের কাছ দিয়েই চলেছে। তীরের গাছপালা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সূর্যাস্ত দেখতে মারিয়া তখন ডেক-এ উঠে এসেছে। তাকিয়ে রয়েছে পশ্চিম আকাশের দিকে। হ্যারি এগিয়ে এল। বলল—রাজকুমারী ফ্রান্সিসকে রাজি করান যাতে ও স্বদেশের দিকেই জাহাজ চালায়।

—আমি তো কতবার বলেছি—আর নয়। এবার স্বদেশে ফেরো। কিন্তু ও কোন কথা শুনলে তো।

আস্তে আস্তে সূর্য পশ্চিম দিগন্তের জলের ঢেউয়ের মধ্যে যেন ডুবে গেল। পশ্চিম দিগন্তে লালচে আভা ছড়িয়ে রইল। তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল। আকাশে চাঁদের আলো উজ্জ্বল হল। তারা দেখা গেল। মারিয়া নিজের কেবিনে চলে গেল।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর হ্যারি ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে এল। দেখল—ফ্রান্সিস বিছানায় আধশোয়া। মারিয়া বিছানায় বসে ছেঁড়া কাপড় জামা সেলাই ফোঁড়াই করছে। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, এখন কী করবে?

—জাহাজ দেশের দিকে চলুক। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া বলল—তুমি তো আবার কোনও গুপ্তধনের খোঁজ পাবে। ব্যস্—ছুটলে সেই গুপ্তধন উদ্ধার করতে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—ঐসব কাজের জন্যেই তো দেশ ছেড়ে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হ্যারি আর কোন কথা বলল না। নিজের কেবিনঘরে চলে এল।

রাত গভীর তখন। কালো আকাশে ভাঙা চাঁদ। জ্যোৎস্না উজ্জ্বল নয়। অজস্র

তারা জ্বলজ্বল করছে। সমুদ্র আকাশ বেশ অন্ধকার।

মাস্তুলের মাথায় নিজের বসবার জায়গাটিতে নজরদার পেড্রো বসেছিল। চারদিকে নজর রাখছিল। তীরভূমি নজরে পড়ে কিনা। জলদস্যুদের জাহাজ আসছে কিনা। কিছুক্ষণ থেকেই পেড্রো দেখছিল প্রায় অন্ধকার সমুদ্রে ওদের জাহাজের কাছ দিয়ে একই গতিতে চলেছে ছায়ার মত একটা জাহাজ। পেড্রো এবার ঝুঁকে পড়ে সেই জাহাজটা দেখল ভালো করে। জাহাজটার মাথায় একটা পাতাকা উড়ছে। কিন্তু কোন দেশের পাতাকা তা বোঝা গেল না। তবে এটা বুঝল যে ওটা জলদস্যুদের জাহাজ নয়। তাহলেই হল।

প্রথমে পেড্রোর একটু তন্দ্রামত এল। তারপর ঘুম। পেড্রো ঘুমিয়ে পড়ল।

আসলে ঐ জাহাজটা ছিল জলদস্যুদের জাহাজ। প্রায় অন্ধকার সমুদ্রে জলদস্যুরা নৌকো জলে নামাতে লাগল। নৌকোয় চড়ে দলে দলে জলদস্যুরা ফ্রান্সিসদের জাহাজে এসে উঠতে লাগল নিঃশব্দে। পেড্রো তখন গভীর ঘুমে। জলদস্যুরা হালের কাছে জমায়েত হতে লাগল।

নিজেদের জাহাজ থেকে পাখি ডাকার সঙ্কেত ভেসে এল। ওরা এবার খোলা তরোয়াল হাতে ডেক-এর ওপর উঠে আসতে লাগল। ডেক-এর ওপর নিঃশব্দে চলাফেরা করতে লাগল।

একজন জলদস্যু মাস্তুল বেয়ে ঘুমন্ত পেড্রোর কাছে এল। পেড্রোর গলায় তরোয়ালের ডগা ঠেকিয়ে খোঁচা দিল। পেড্রো ধড়মড় কর উঠে দাঁড়াতে গেল। তখনই দেখল ওর গলায় তরোয়ালের ডগা ঠেকিয়ে রয়েছে এক জলদস্যু। ইয়া গোঁফ ইয়া জুলপি। জলদস্যুটি আস্তে বলল—নেমে এসো। কোন শব্দ নয়। পেড্রো আর কী করে। জলদস্যুদের হাত থেকে বাঁচতেই ওর নজরদারি। সেই ওর সামনেই খোলা তরোয়াল সাক্ষাৎ এক জলদস্যু। পেড্রো মাস্তুল বেয়ে নামতে লাগল। পেচনে খোলা তরোয়াল হাতে জলদস্যুটিও নামতে লাগল।

ওদিকে অন্য জলদস্যুরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে কেবিনঘরের সামনে এল। কয়েকজন ফ্রান্সিসদের অস্ত্রঘরের সামনে এল। দেখল তরোয়াল হাতে একজন ভাইকিং অস্ত্রঘর পাহারা দিচ্ছে।

পাহারাদার ভাইকিংটি কিছু বোঝার আগেই আক্রান্ত হল। ডান হাতে তরোয়ালের কোপ পড়ল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। পাহারাদারটি জলদস্যুদের হাতে বন্দী হল। দুজন জলদস্যু অস্ত্রঘরের পাহারায় দাঁড়িয়ে গেল।

ওদিকে অন্য জলদস্যুরা কেবিনঘরে ঢুকে ঢুকে ভাইকিংদের গায়ে আস্তে জোরে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে জাগাতে লাগল। ঘুম ভেঙে ভাইকিংরা দেখল—খোলা তরোয়াল হাতে জলদস্যুরা দাঁড়িয়ে। ওরই মধ্য একজন ভাইকিং জলদস্যুদের নজর এড়িয়ে অস্ত্রঘরের সামনে এল। দেখল—অস্ত্রঘরের সামনে পাহারা দিচ্ছে খোলা তরোয়াল হাতে দুজন জলদস্যু। ওরা হতাশা হল। খালি হাতে লড়াই করতে গেলে জীবন সংশয় হবে। ওরা জলদস্যুদের নজরে পড়ে গেল। বন্দী হল।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। সূর্য ওঠেনি। ভাইকিংদের সবাইকে ডেক-এ নিয়ে এল জলদস্যুরা। জলদস্যুরা ভাইকিংদের মধ্যে মারিয়াকে দেখে বেশ অবাকই হল। মারিয়াকে একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখল।

সূর্য উঠল। রোদ ছড়াল। কালো আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস হ্যারিও বন্দী। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। হ্যারি বলল — ফ্রান্সিস, আবার জলদস্যুদের পাল্লায় পড়লাম। পেড্রো আবার আমাদের বিপদে ফেলল। এখন এদের হাত থেকে কী করে উদ্ধার পাবো।

হ্যারি, মন খারাপ করো না। উপায় একটা হবেই। আমাদের নিয়ে ওরা কী করবে সেটা আগে বুঝি। তারপর ফন্দি করে পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ থামানো হল। জলদস্যুদের জাহাজও থামল।

এক সর্দারগোছের জলদস্যু ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। বলল — তোমাদের মধ্যে সর্দার কে?

আমি। ফ্রান্সিস বলল।

চলো — গ্যাব্রিয়েল এর কাছে। জলদস্যুটি বলল।

হ্যাঁ চলো — আমার এক বন্ধুও যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

জলদস্যুটা একটু ভেবে বলল—বেশ আসুক।

ফ্রান্সিসরা ঢেউ-এর ধাক্কায় দোল খাওয়া দুটো জাহাজের মধ্যের ফাঁকটুকু সাবধানে পার হয়ে গ্যাব্রিয়েল-এর জাহাজে এল।

সর্দার জলদস্যুটির নির্দেশে ফ্রান্সিসরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা কেবিনঘরের দরজার সামনে এল। দরজা বন্ধ। সর্দারটি দরজায় টোকা দিল। ভেতর থেকে গম্ভীর গলা শোনা গেল — আয়। সর্দার দরজা খুলে ফ্রান্সিসদের ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা ঢুকল। দেখল বিছানায় বসে আছে একটা মোটা লোক। মুখে দাড়ি গোঁফ। বিছানাটায় পরার কাপড় চোপড় সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বোধহয় লোকটার কোন পোশাকই পছন্দ হয়নি। তাই ছুঁড়ে ফেলেছে। লোকটার গা খালি। বোঝা গেল এই লোকটিই দস্যুদলের নেতা—গ্যাব্রিয়েল।

গ্যাব্রিয়েল কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝে নিতে চাইছে ফ্রান্সিসরা ভয় পেয়েছে কিনা। তারপর হো—হো—করে হেসে উঠল। বলল— আমি ভেবেছিলাম তোমাদের জাহাজ লুঠ করবো। তা একে তোমরা ভিনদেশী লোক আবার দরিদ্র। ছেঁড়াখোঁড়া কীসব পোশাক পরে আছো। দেখলেই ভিখিরি বলে মনে হয়।

—এজন্যে আমরা বিন্দুমাত্র লজ্জিত নই। হ্যারি বলল।

গ্যাব্রিয়েল আবার হেসে উঠল। বলল—থাকতো এসব—এসব তোমাদের ব্যাপার। কিন্তু আমার যে একটা জাহাজ খুবই দরকার—তার কী করবো?

—আপনি তো যথেষ্ট ধনী। একটা জাহাজ কিনে নিন। ফ্রান্সিস বলল।

—উঁহু—আমি জাহাজ কিনবো না। তোমাদের শক্তপোক্ত জাহাজটা আমি নেব। আবার গ্যাব্রিয়েল হেসে উঠল।

হাসতে হাসতে বলল—ঐ একটা জিনিসই তোমাদের কাছে আছে যা কেড়ে নিয়ে আমাদের লাভ হবে। ফ্রান্সিস ও হ্যারি মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। হ্যারি বলল— আপনার কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

গ্যারিয়েল হেসে উঠল। বলল—এতো জলের মতো সোজা কথা। তোমাদের এখানে কোথাও নামিয়ে দেব। তারপর তোমাদের জাহাজটা আমরা নিয়ে চলে যাবো। এবার বুঝলে?

—বুঝলাম। কিন্তু তা অসম্ভব। আমরা জাহাজ দেব না। ফ্রান্সিস বলল।

গ্যাব্রিয়েল এবার আরও জোরে হেসে উঠল। বলল—তোমার কথা শুনে এত হাসি আসছে মানে—তাহলে তো তোমাদের খালি হাতে আমাদের সঙ্গে লড়তে হয়। লড়াই হলে তোমরা কেউ বেঁচে থাকবে? অ্যাঁ?

ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—পরোয়া করি না কতজন বাঁচবো কতজন মরবো। আমরা আমাদের জাহাজ নিতে দেব না।

হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস মাথা গরম করো না। তাতে আমাদের বিপদই বাড়বে। এবার গ্যাব্রিয়েল গম্ভীর গলায় বলল—তাহলে তো উপায় নেই। তোমাদের সবাইকে খতম করে জাহাজ কেড়ে নিতে হবে।

হ্যারি বলল—তার দরকার নেই। আমরা এমনিতেই আপনাকে জাহাজ দিয়ে দেব।

—এই তো একটা বুদ্ধিমানের মত কথা। গ্যাব্রিয়েল বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—এ কী বলছেন?

—আমি ঠিকই বলেছি। পরে এই নিয়ে কথা হবে। এখন নয়। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। কত দুঃখকষ্ট কত আনন্দ উল্লাস জড়িয়ে আছে ওই জাহাজটার সঙ্গে। সেটা দিয়ে দেব? বিনা যুদ্ধে? কিন্তু এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে জাহাজটা দিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ফ্রান্সিস মাথাটা আস্তে ঝাঁকিয়ে বলল—ঠিক আছে। আমরা কথা বলে নিই।

—বেশ তো—সব দিক ভেবেচিন্তে দেখবে আমার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে তোমাদের উপায় নেই। গ্যাব্রিয়েল বলল।

হ্যারি গ্যাব্রিয়েলকে জিজ্ঞেস করল—এ জায়গাটা কি পোর্তুগালের মধ্যে।

—হ্যাঁ। এখানে সেতুবল নামে একটা ছোট্ট বন্দর আছে। ওরই কাছাকাছি তোমাদের নামিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তোমাদের জাহাজ নিয়ে আমরা চলে যাবো। কথাটা বলে গ্যাব্রিয়েল হেসে উঠল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি কোনও কথা বলল না। দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজেদের জাহাজে ফিরে এল। ডেক-এ এসে দাঁড়াল। মারিয়া এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস জলদস্যুদের নেতা কী বলল?

হ্যারি বলল—ওরা আমাদের এই জাহাজ থেকে কোথাও নামিয়ে দিয়ে এই জাহাজ নিয়ে চলে যাবে।

—বলো কি? মারিয়া বিস্ময়ে বলে উঠল। সারি দিয়ে দাঁড়ানো ভাইকিংরা

মারিয়ার দিকে তাকাল। কিন্তু ঠিক বুঝল না জলদস্যুদের নেতা কী বলেছে।

এবার হ্যারি ওদের দেশীয় ভাষায় গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, জলদস্যুদের নেতা গ্যাব্রিয়েল আমাদের এখানে এই পোর্তুগাল দেশের একটা অংশে সমুদ্রতীরে কোথাও নামিয়ে দিয়ে আমাদের জাহাজ চালিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। ওরা বুঝল ওদের অস্ত্রহীন অসহায় অবস্থা। তবু দু একজন বলে উঠল—ফ্রান্সিস, তুমি বলো আমরা এক্ষুনি লড়াইয়ে নামবো। হ্যাঁ—নিরস্ত্র অবস্থাতেই। জলদস্যুদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমরা লড়াই চালাবো।

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—ভাইসব, আমি সবদিক ভেবেছি। আমাদের জাহাজটা আমাদের কতটা প্রিয়, কতটা ভালোবাসার তোমরা জানো। কিন্তু আজ আমরা অসহায় দর্শকমাত্র। কিছু করার নেই। যে দুঃখজনক ঘটনাটা ঘটতে চলেছে সেটা মেনে নাও। এটা আমার অনুরোধ।

সবাই চুপ করে রইল। নিজেদের নিরুপায় অবস্থাটা সকলেই বুঝতে পারল।

দুপুরে রাঁধুনি বন্ধুরা রান্নাবান্না সারল। অবশ্য তিনজন জলদস্যু ওদের পাহারায় ছিল।

জাহাজের ডেক এই ভাইকিংদের খেতে দেওয়া হল। হ্যারি কিছুই খেতে পারছিল না। একবার ফুঁপিয়ে উঠল। পাশে-বসা ফ্রান্সিস বাঁ হাতটা হ্যারির কাঁধে রাখল। বলল—হ্যারি এসব নিয়ে ভেবো না। পেট পুরে খাও। গায়ের জোর রাখো।

বিকেলের দিকে গ্যাব্রিয়েল ফ্রান্সিসদের জাহাজে এল। সেই দরাজ হাসি হাসতে লাগল। হ্যারির মনে হল লোকটা বোধহয় হাসতে হাসতে নরহত্যা করতে পারে।

গ্যাব্রিয়েল গলা চড়িয়ে বলল—আজ রাতেই তোমাদের তীরে নামিয়ে দেওয়া হবে। মুক্তি! তাই না? গ্যাব্রিয়েল হেসে উঠল।

হ্যারি বলল—না—রাতের অন্ধকারে আমরা কোথাও নামব না। এটা আমাদের কাছে অচেনা দেশ। কাল সকালে আমরা নামবো। গ্যাব্রিয়েল হেসে উঠল—বলছিলাম রাতে নামলে একটা রাত আগে মুক্তি পেতে। তাছাড়া এখানে দিন কয়েকের মধ্যেই রানি উরাকার সঙ্গে রাজা গঞ্জালেস-এর যুদ্ধ শুরু হবে। এসময় দিনের বেলা আমাদের দেখলে রানি উরাকার সৈন্যরা আমাদের গুপ্তচর ভেবে বন্দী করতে পারে।

হ্যারি বলল—না—আমরা কাল সকালেই নামবো।

গ্যাব্রিয়েল হো হো করে হেসে উঠল। বলল—বেশ। তাই হবে। গ্যাব্রিয়েল গলা চড়িয়ে নিজের দলের যোদ্ধাদের বলল—খুব সাবধানে পাহারা দিবি। কেউ যেন পালাতে না পারে। কাউকে জলে ঝাঁপ দিয়ে পালাতে দিবি না। আর একটা কথা—দুটো জাহাজই থামিয়ে রাখ। কাল সকালে চালাবি। যেখানে থামাতে বলবো সেখানে থামাবি।

গ্যাব্রিয়েল চলে গেল নিজেদের জাহাজে।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিসরা সকালের খাবার খেল। ওদিকে কয়েকজন জলদস্যু ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ওদের জাহাজের পেছনে কাছি দিয়ে বাঁধল। জলদস্যুরাই দাঁড় বেয়ে জাহাজ দুটো আস্তে আস্তে চালিয়ে নিয়ে চলল তীরভূমির দিকে।

তীরভূমির কাছাকাছি এসে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা থামানো হল। কাঠের পাটাতন ফেলা হল। ফ্রান্সিসরা নামবার জন্য তৈরি হল। ওরা নামছে তখন গ্যাব্রিয়েল নিজের জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়াল। হাসতে হাসতে হাত নাড়তে থাকল। বলে উঠল— বন্ধুগণ—চিরবিদায়।

হ্যারি একটু চমকাল। গ্যাব্রিয়েল চিরবিদায় কথাটা বলল কেন? পরক্ষণেই ভাবল গ্যাব্রিয়েল একটা নরঘাতক জলদস্যু। ওর বিদ্যেবুদ্ধি মতই কথাটা বলেছে।

মারিয়া অনেকক্ষণ থেকেই রুমালে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। পাটাতন দিয়ে নামার সময় জোরে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস পেছনেই ছিল। কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিসের নিজের চোখও ভিজে উঠেছে তখন।

ভাইকিংরা সবাই তীরে নামতে লাগল। সবাই নামলে জলদস্যুরা কাঠের পাটাতন তুলে নিল। দুটো জাহাজই তীর থেকে দূরে ভেসে যেতে লাগল।

তীর থেকে উঠে ফ্রান্সিসরা দেখল চারদিকে কোন জনবসতি নেই। কিছু জংলা গাছের এলাকা ছাড়িয়ে ওরা এল। দেখল—ছাইরঙা মাটি। ওখানে আসতেই এক ভাইকিং বন্ধু পায়ের পাতায় হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—ফ্রান্সিস—সাপ।

এতক্ষণ সবাই দেখল সেই সাপের আড্ডা। কত বিচিত্র বর্ণের ছোট বড় সাপ ঐ এবড়ো খেবড়ো ছাইরঙা মাটির ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকালের রোদ লেগে সাপগুলোর গায়ের আঁশ চক্‌চক্ করছে। কিছু সাপ গর্তেও ঢুকে আছে। তখনই আবার আর এক ভাইকিং বন্ধু চিৎকার করে উঠল। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। দুই বন্ধুকে কাঁধে নিয়ে ছুটে এলাকাটা পার হয়ে যাও।

ভাইকিংরা দুই বন্ধুকে কাঁধে তুলে নিয়ে এক ছুটে এলাকাটা পার হয়ে গেল। সবাই ততক্ষণে ছুটে ঐ সাপের আড্ডা পার হয়ে একটা ঘাসে-ঢাকা প্রান্তরে এসে দাঁড়াল। সবাই হাঁপাচ্ছে তখন।

সাপে-কাটা দুই বন্ধুকে কাঁধ থেকে নামিয়ে প্রান্তরের ঘাসে বসিয়ে দেওয়া হল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। কোমর থেকে ছোরাটা বের করল। ঘাসের ওপর বসল। এক বন্ধুর সাপে কাটা পা-টা ধরল। তারপর কামড়ানোর জায়গাটা ছোরা দিয়ে একটু চিরে ধরল। তারপর ঐ জায়গাটায় মুখ দিয়ে চুষতে লাগল। চুষল আর থু থু করে রক্ত ফেলে দিল। বারতিনেক এরকম করে অন্য বন্ধুর কাছে গেল। একইভাবে কাটা জায়গাটা চিরে চুষতে লাগল। থুতু রক্ত ফেলতে

লাগল। তারপর চোষা বন্ধ করল। শাঙ্কো ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। হাঁপাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে দুই বন্ধু সুস্থ হল। বোঝা গেল শাঙ্কোর থুতুর সঙ্গে সাপের বিষ বেরিয়ে গেছে।

ঐ ঘাসের প্রান্তরে ভাইকিংরা বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—ঐ জলদস্যু গ্যাব্রিয়েল আমাদের রাতে ওখানে নামিয়ে দিতে চেয়েছিল। রাতে ঐ সাপের আস্তানা পার হতে গেলে আমরা কেউ হয়তো বাঁচতাম না। গ্যাব্রিয়েল কেন আমাদের লক্ষ্য করে 'চিরবিদায়' কথাটা বলেছিল এখন সেটা বুঝতে পারছি।

বেলা বাড়তে লাগল। দুপুর হল। এবার সবাই বুঝতে পারল খিদে পেয়েছে। খাবার চাই। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস কী করবে এখন? সকলেই তো তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—এখানকার ছোট বন্দরটা সেতুবল—সেখানে চলো। ঐদিকে লোকজনের বসতি আছে। একটা সরাইখানা হয়তো পাবো।

ভাইকিংরা সবাই উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস পূবমুখো হাঁটতে লাগল। পেছনে ভাইকিং বন্ধুরা।

কিছুদূর যেতেই ভাইকিংরা একটা রাস্তা পেল। সেই রাস্তা ধরেই ওরা চলল। সেতুবল জাহাজঘাটায় যখন পৌঁছল তখন দুপুর সবাই কম-বেশি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর।

সেতুবলের বসতি এলাকায় এল ওরা। ফ্রান্সিস বলল—সবাই না গিয়ে আমি একা যাচ্ছি। একটা সরাইখানা পাই কিনা দেখি।

ফ্রান্সিস বন্দরের দিকে চলল। রাস্তার দুদিকেই বাড়িঘর দোর। ফ্রান্সিস সব দেখতে দেখতে চলল। তখনই দেখল একটা সরাইখানার মতো দোকান। ছোট দোকান। ফ্রান্সিস দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল। দোকানের মালিক এগিয়ে এল। বলল—কিছু খাবেন? ফ্রান্সিস বলল—পঁচিশ তিরিশজন লোকের জন্যে আপনি রুটি মাংস রান্না করতে পারবেন?

তা পারবো। তবে একটু সময় লাগবে। দোকানি বলল।

লাগুক। আপনি সব জোগাড় টোগাড় করুন। আমি বন্ধুদের নিয়ে আসতে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের কাছে এল। বলল—চলো সব। একটা ছোট সরাইখানা মত পাওয়া গেছে। আমি রান্নার জোগাড় করতে বলে এসেছি। তোমরা চলো।

সবাই ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে চলল। ঐ সরাইখানায় এল। দোকানি এসে ফ্রান্সিসকে বলল—যদি কিছু অগ্রিম দেন তাহলে বড় ভালো হয়।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডাকল। সব শুনে শাঙ্কো ওর কোমরের ফেট্টি থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে দিল। দোকানি স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে খুব খুশি।

ফ্রান্সিস বন্ধু রাঁধুনি দুজনকে বলল—তোমরাও একটু হাত লাগাও। ঐ

রোগাপটকা চেহারার দোকানি এতজনের রান্না একা পারবে না। রাঁধুনি বন্ধুরা দোকানিকে সাহায্য করতে গেল। রান্নার আয়োজন শুরু হল।

দোকানটা ছোট। সকলের বসার জায়গা হল না। কিছু দোকানের ভেতরে বসল। কিছু পাশের মাঠমত জায়গাটায় বসল।

সন্ধ্যের মধ্যেই ফ্রান্সিসদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। সবাই দোকান থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস দোকানির কাছে এল। আর একটা স্বর্ণমুদ্রা দিল। দোকানি আরো খুশি হল। ফ্রান্সিস বলল—এখানে এখন কোন রাজা রাজত্ব করছেন?

—রাজা নয়—রানি। রাজা আলফনসোর মেয়ে উরাকা এখন রানি। দোকানি বলল।

—জাহাজঘাটা কোনদিকে? হ্যারি জানতে চাইল। দোকানি দক্ষিণদিক দেখিয়ে বলল—ঐদিকে।

ফ্রান্সিসরা দিক ঠিক করে হাঁটতে লাগল। রাস্তার লোকজন ফ্রান্সিসদের দেখে বেশ অবাক হল। ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা বিদেশী পোশাক-পরা লোকগুলো কোথা থেকে এল? ময়লা ছেঁড়া পোশাক-পরা মারিয়াকে দেখেই লোকজন আশ্চর্য হল বেশি।

ফ্রান্সিসরা চলল জাহাজঘাটার দিকে। জাহাজঘাটার কাছাকাছি পৌঁছতেই হঠাৎ একদল সৈন্য ফ্রান্সিসদের ঘিরে ফেলল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—কেউ বাধা দিও না। ভাইকিংরা দাঁড়িয়ে পড়ল। তখনই ঘোড়ায় চড়ে একজন বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ এল। সৈন্যরা মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল। বোঝা গেল—অশ্বারোহী সেনাপতি।

রাস্তার লোকজনদের মধ্যে তখন হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে। সেনাপতি ডান হাত তুলে গলা চড়িয়ে বলল—আপনারা দূরে চলে যান। কোন ভয় নেই। লোকজনের ভয় ত্রাস একটু কমল। আস্তে আস্তে লোকজন চলে যেতে লাগল। কৌতূহলী কিছু লোক থেকে গেল। কী ব্যাপার দেখে যাবে।

বড় গোঁফওয়ালা সেনাপতি ঘোড়া থেকে নেমে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—তোমাদের দলনেতা কে?

—আমি। কথাটা বলে ফ্রান্সিস এগিয়ে এল।

—তোমরা কোন দেশের লোক? সেনাপতি জিজ্ঞেস করল।

—আমরা জাতিতে ভাইকিং। এখানে বেড়াতে এসেছি। হ্যারি বলল।

—ও। আমরা শুনেছি ভাইকিংরা খুব দুঃসাহসী জাতি। জাহাজ চালাতে ওস্তাদ। সেনাপতি বলল। ফ্রান্সিসরা চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না। সেনাপতি বলল— কাল এখানে রানি উরাকা আসবেন। কাল এখানে তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা হবে। তোমরা বিদেশি। তোমাদের বিশ্বাস কী? কালকের প্রতিযোগিতা চলাকালীন তোমরা কী গণ্ডগোল পাকাবে—কে জানে। তাই তোমাদের বন্দী করা হল। তোমাদের আজ ও কালকের দুই রাত বন্দী হয়ে থাকতে হবে। রানি উরাকা চলে গেলে তোমাদের মুক্তি দেওয়া হবে।

—কিন্তু আমরা তো কোন অপরাধ করিনি। হ্যারি বলল।

—না-তা করোনি। কিন্তু রানির নিরাপত্তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। সেনাপতি বলল।

—দেখুন আমরা কিছুদিন আগে রাজা গঞ্জালেস-এর রাজত্বের রাজধানী দামিল গিয়েছিলাম। জানতে গিয়েছিলাম আমরা কোথায় এসেছি। রাজা গঞ্জালেসের সৈন্যরা আমাদের বন্দি করল। ওরা বলল—তোমরা রানি উরাকার গুপ্তচর। আমরা বিদেশি। গুপ্তচরবৃত্তি করে আমাদের কী লাভ। তাদের সেনাপতিকে সেইকথা বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কী রাজা গঞ্জালেস কী সেনাপতি কেউই আমাদের কথা বিশ্বাস করল না। কয়েকদিন কয়েদঘরে কাটাতে হল।

—মুক্তি পেলে কী করে? সেনাপতি জানতে চাইল।

—সে অনেক ব্যাপার। সংক্ষেপে বলি—রাজা গঞ্জালেস-এর পৈতৃক ধনভাণ্ডার লুকোনো ছিল একটা গুহায়। গুহার পাহারাদার ছিল বীভৎস দেখতে এক নররাক্ষস। তাকে হত্যা করে আমরা সেই ধনভাণ্ডার উদ্ধার করে দিয়েছিলাম। তাই আমরা ছাড়া পেয়েছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আমরা তোমাদের কয়েদখানায় রাখবো না। তবে দুরাত সেনাদের ঘরে থাকতে হবে। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিস জিজ্ঞাস করল—কালকে যে প্রতিযোগিতা হবে তাতে কী পুরস্কার দেওয়া হবে?

—সোনার তীর ধনুক। সেনাপতি বলল।

—আমরা কালকের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবো? ফ্রান্সিস বলল।

—তা পারবে। কিন্তু প্রতিযোগিতার জায়গা থেকে তোমরা তো পালিয়েও যেতে পারো। সেনাপতি বলল।

—এটা একটা কথা হল? আমার স্ত্রী আমার বন্ধুদের ফেলে রেখে আমরা পালিয়ে যাবো?

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। তীর তো গোল চাকতিতেই লাগাতে পারবে না। মাঝখানে লাগানো তো দূরস্থান। ইচ্ছে হয়েছে ইচ্ছে মেটাও। তোমাদের একজনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতার পরেই তাকে দুর্গে ফিরে আসতে হবে। সেনাপতি বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি ঘোড়ায় চড়ে বসল। তরোয়াল ঘুরিয়ে ডানদিকে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিল। সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের চলবার ইঙ্গিত করল। সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের প্রায় ঘিরে নিয়ে চলল। দূর থেকে পাথরের ছোট দুর্গটা দেখা গেল।

সবাই যখন দুর্গদ্বারে পৌঁছল তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সকলেই দুর্গে ঢুকল। সেনাপতি তরোয়াল তুলে একটা ঘর দেখাল। বলল—ঐ ঘরে এদের বন্দী করে রাখো। সেনাপতি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

ঘরটায় ঢুকল ফ্রান্সিসরা। দেখল কয়েকজন লোক ঘরের ঘাসপাতা বাঁধা বিছানায় শুয়ে বসে আছে। বোঝা গেল তাঁরা সৈন্য। ফ্রান্সিসদের সৈন্যাবাসেই রাখা হল।

ফ্রান্সিসরা বিছানায় বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল।

এতক্ষণে ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে ভালো করে তাকাল। মাথার চুল উসকোখুস্কো। মুখ শুকিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। মারিয়াকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া যাক—এই ভেবে ফ্রান্সিস মারিয়ার কাছে গেল। বসল। বলল—মারিয়া তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

মারিয়া হাসল। মাথা নাড়ল—না।

—তুমি যদি চাও তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে তোমাকে আর হ্যারিকে আমাদের দেশের দিকে যাচ্ছে এমন কোন জাহাজে তুলে দিতে পারি। আমাদের এত কষ্টের জীবন তুমি সহ্য করতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—না—আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকবো। এক সঙ্গে দেশে ফিরবো। আমার জন্যে ভেবো না। তুমি যেখানে যেভাবে থাকবে আমিও সেইখানে সেভাবেই থাকবো। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। বড় ক্লান্তি সারা শরীরে। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে চোখের ওপর হাত ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। উঠল—একেবারে যখন খেতে দেওয়া হল।

পরের দিন ভোর থেকেই সাজো সাজো রব। এলাকার মানুষদের মধ্যে খুশির জোয়ার। রানি উরাকা আসছেন। সৈন্যরা যুদ্ধের সাজ পরল। রাস্তার দুপাশে সারি দিয়ে দাঁড়াল। সেনাপতি ওর জবরজং পোশাকটা পরে ঘোড়ায় চড়ে সব দেখাশুনো করতে লাগল। এখন রানি উরাকার জন্যে প্রতীক্ষা।

কিছুক্ষণ পরে রানি উরাকা সাদা ধব্‌ধবে একটা ঘোড়ায় চড়ে এলেন। পেছনে পেছনে এল রাজবাড়ির গাড়ি। তাতে কয়েকজন অমাত্য বসে আছেন।

রানির মাথায় হীরে বসানো সোনার মুকুট। গলায় বড় বড় মুক্তোর মালা। রোদ লেগে ঝিকিয়ে উঠছে। রানির সোনা-রুপোর সুতোয় কাজ করা পোশাক। জনতার ভিড়ের মধ্যে ধ্বনি উঠল—রানি উরাকার জয় হোক। রানি খুশি হয়ে হেসে হাত নাড়লেন।

প্রান্তরের একপাশে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। সামিয়ানার নিচে রানির বসবার আসন। আরো কয়েকটা আসন রাখা হয়েছে। অমাত্যরা সেখানে এস বসলেন। রানি একটু পরে নিজের আসনে বসলেন। একটু বেলা হতেই দুর্গের পাশের প্রান্তরে লোক জড়ো হতে লাগল। এক প্রান্তে একটা কাঠের খুঁটিতে বাঁধা হল একটা গোল শক্ত কাগজের বৃত্ত। একটু পরপর বৃত্তগুলো ছোট হতে হতে কেন্দ্রে এসে শেষ হয়েছে। তীর ঐ গোলগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে লাগাতে হবে।

ওদিকে সেনাপতি কথা রাখল। শাঙ্কোকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে অনুমতি দেওয়া হল। শাঙ্কো তীর ধনুক চাইল। পেলও। তখনই শাঙ্কোর চোখে প্রায় জল এল। নিজেদের জাহাজে গুছিয়ে রাখা তীরধনুকের কথা মনে পড়ল।

প্রতিযোগিতা শুরু হল। একে একে পনেরোজন প্রতিযোগী তীর ছুঁড়ল। কোন তীরই কেন্দ্রবিন্দুতে লাগল না। এবার এল ঐ দেশের সেরা তীরন্দাজ। তার ছোঁড়া তীর কেন্দ্রবিন্দুর কাছে লাগল। এবার শাঙ্কোর পালা। শাঙ্কো তীর ধনুক নিল। নিশানা ঠিক করে তীর ছুঁড়ল। শাঙ্কোর তীরও কেন্দ্রবিন্দুতে লাগল না। সেরা তীরন্দাজের তীরের কাছে লাগল।

আর এক দফা তীর ছোঁড়ার কথা সেনাপতি বলল। পনেরোজন তীরন্দাজী তীর ছুঁড়ল। কোনটাই কেন্দ্রবিন্দুতে লাগল না। এবার সেরা তীরন্দাজী এগিয়ে এল। শাঙ্কোর দিকে একবার তাকাল। তারপর ধনুকের ছিলায় তীর বসাল। নিশানা দেখে তীর ছুঁড়ল। তীরটি কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে বিঁধল। সমস্ত প্রান্তর ভরে উঠল দর্শকদের আনন্দধ্বনিতে।

এবারা শাঙ্কো এগিয়ে এল। ধনুক ধরে ছিলায় তীর পরাল। হাওয়াটা আন্দাজ করল। তারপর আস্তে আস্তে ছিলাটা টেনে নিয়ে তীর ছুঁড়ল। তীরটা আগের সেরা তীরন্দাজীর কেন্দ্রবিন্দুতে গেঁথে যাওয়া তীরটা দুফালি করে কেন্দ্রবিন্দুতে ঢুকে পড়ল। প্রথমে দর্শকরা বুঝল না। শাঙ্কো এগিয়ে গিয়ে প্রথমে ওর তীরটা তুলল। তারপর দোফালা হওয়া সেরা তীরন্দাজীর তীরটি তুলল। এবার সবাই বুঝল যে শাঙ্কোর তীর সেরা তীরন্দাজীর তীর ফালা করে কেন্দ্রে ঢুকে পড়েছে। দর্শক জনতা আনন্দধ্বনি করল।

এবার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। রানির সোনার তীর ধনুক হাতে নিলেন। শাঙ্কো গিয়ে রানির সামনে দাঁড়াল। রানি শাঙ্কোকে সোনার তীরধনুক দিলেন। শাঙ্কো মাথা পেতে নিল। তারপর মৃদুস্বরে বলল—মাননীয়া রানি—আপনার কাছে আমার একটা আর্জি ছিল।

রানি মৃদুস্বরে বললেন—পরে তোমার কথা শুনবো। অন্য পুরস্কার দেওয়া চলল। এ অনুষ্ঠানটা শেষ হলে রানি সেনাপতিকে ডেক-এ পাঠালেন। সেনাপতি এসে বললেন—যে যুবকটি তীর চালনায় প্রথম হয়েছে তাকে ডেক-এ আনুন। সেনাপতি এগিয়ে গেল। লোকজনের ভিড় তখন অনেক কমে গেছে। শাঙ্কো চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সেনাপতি কাছে এসে বলল—তুমি এসো। রানি ডাকছেন।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে রানির সামনে এসে দাঁড়াল। রানি বললেন—তুমি কী কথা বলতে চেয়েছিলে?

শাঙ্কো বলল—মাননীয়া রানি—আমরা জাতিতে ভাইকিং। জাহাজে চড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই আর গুপ্তধন খুঁজে বার করি। আমরা কোন বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারি এই আশঙ্কায় সেনাপতি মহাশয় আমাদের দুর্গে বন্দী করে রেখেছেন।

—কথাটা সত্যি? রানি সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললেন। সেনাপতি বলল—

—হ্যাঁ মাননীয়া রানি—তবে হাত পা বেঁধে রাখিনি। ওদের বলেছি আপনি

রাজধানীতে ফিরে গেলেই ওদের মুক্তি দেব। সেনাপতি বলল।

—মাননীয়া রানি—আমরা এখনই মুক্তি চাই। শাঙ্কো বলল।

রানি বললেন—তোমার মত একজন দুর্ধর্ষ তীরন্দাজের অনুরোধ আমি কি রক্ষা না করে পারি। রানি সেনাপতির দিকে তাকালেন। বললেন—ভাইকিংদের মুক্তি দিন। ওরা যেমন খুশি চলাফেরা করুক।

সেনাপতি মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে চলে এল। ঘোড়ায় চড়ল। দুর্গের দিকে ঘোড়া ছোটাল।

দুর্গে এসে সেনাপতি ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—মাননীয়া রানি তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন। এখন তোমরা যেখানে খুশি যেতে পারো।

ফ্রান্সিস বলল—তীরন্দাজী প্রতিযোগিতায় কে প্রথম হল?

—তোমাদের যে বন্ধুটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো—।

সেনাপতি মৃদু হাসল। তারপর ঘরের বাইরে এসে ঘোড়ায় উঠল।

শাঙ্কো এল। সবাই শাঙ্কোকে ঘিরে দাঁড়াল। আনন্দে ওরা হৈ হল্লা শুরু করল। শাঙ্কো সোনার তীরধনুকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বলল—এটা মনে হচ্ছে খাঁটি সোনার। এটা পাবে বলেই আমি শাঙ্কোকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পাঠিয়েছিলাম এই তীরধনুক বিক্রি করে জাহাজ কিনবো। তারপর ঐ জাহাজে চড়ে দেশে ফেরা।

ফ্রান্সিসরা যখন সেতুবল বন্দরে এল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বন্দর এলাকায় একটা বড় সরাইখানা পেল। ফ্রান্সিস সরাইখানাটায় ঢুকল। মালিক একটা কাঠের আসনে বসেছিল। মালিক মাঝবয়সী। ঢোলাহাতা জোব্বামত পরে আছে। ফ্রান্সিস মালিকের কাছে গেল। বলল—আমরা জাতিতে ভাইকিং। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো আমাদের নেশা। আপনার সরাইখানায় আমরা আজ রাতে খাবো থাকবো।

—বেশ। মালিক বলল।

—ক'টা স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে? ফ্রান্সিস বলল।

—দুটো স্বর্ণমুদ্রা দেবেন। মালিক বলল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডাকল। বলল—দুটো স্বর্ণমুদ্রা মালিককে দাও। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে দুটো স্বর্ণমুদ্রা বের করে মালিককে দিল। তারপর সবাইকে সরাইখানায় আসতে বলল। কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু এসে কাঠের তক্তাপাতা বিছানায় বসল। কিছু ভাইকিং সরাইখানার ধারে একটু মাঠমত জায়গায় গিয়ে বসল।

ফ্রান্সিস সরাইখানার মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। তখনই মাকিল বলল—বোঝাই যাচ্ছে আপনারা বিদেশী। আপনারা এখানে এলেন কী করে?

—জাহাজে চড়ে। ফ্রান্সিস বলল।

—জাহাজটা কি বন্দরে রেখে এসেছেন? মালিক বলল।

—না—আমাদের জাহাজ চুরি হয়ে গেছে। একদল জলদস্যু এই কাণ্ড করেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—জলদস্যুদের নেতার নাম জানেন? মালিক বলল।

—হ্যাঁ—গ্যাব্রিয়েল। ফ্রান্সিস বলল।

—উরি বাবা—গ্যাব্রিয়েল তো সাংঘাতিক জলদস্যু। ও হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে। আপনাদের খুব ভাগ্যি যে আপনারা প্রাণে বেঁচে আছেন। মালিক বলল।

—হুঁ। আমরা ওদের খুঁজে বের করবো। আমাদের জাহাজ উদ্ধার করবো। তাই একটা জাহাজ কিনবো স্থির করেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা তো আলফানের জাহাজ কিনতে পারেন। মালিক বলল।

—আলফান কে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—আলফান একজন মূর ব্যবসায়ী। ওর বাড়ি এখানেই। ব্যবসা চালাতে জাহাজ নিয়ে এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়ায়। ইদানিং আলফানের খুব অর্থকষ্ট যাচ্ছে। তাই জাহাজ বিক্রি করছে।

তাহলে তো আলফানের সঙ্গে কথা বলতে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস সরাইখানার বাইরে এল।

এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকল—হ্যারি এদিকে এসো। হ্যারি এগিয়ে এল। বলল—

-কী ব্যাপার?

শোনো সোনার ধনুক তীরটা তোমার কাছেই আছে তো?

হ্যাঁ। হ্যারি বলল।

-চলো জাহাজঘাটায় যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন বলো তো? হ্যারি বলল।

—সারইখানার মালিক বলল—আলফান নামে এক মূর ব্যবসায়ী তার একটি জাহাজ বিক্রি করবে। দেখা যাক জাহাজটা কেমন। কত দাম বলে। ফ্রান্সিস বলল।

—চলো। হ্যারি বলল।

জাহাজঘাটায় পৌঁছে দেখল বেশ কয়েকটা জাহাজ নোঙর করে আছে। জ্যোৎস্না খুব উজ্জ্বল। সমুদ্রতীরের ঢাল বেয়ে নামল দুজনে।

পাতা পাতাটন দিয়ে প্রথম জাহাজটায় উঠল ওরা। একজন নাবিক রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল—আরফানের জাহাজ কোনটা? নাবিকটি আঙ্গুল দিয়ে শেষ জাহাজটা।

ফ্রান্সিসরা শেষ জাহাজটায় উঠল। 'দেখল একজন বয়স্কলোক জাহাজের ডেক পার হয়ে এগিয়ে এল। কাছে আসতে জ্যোৎস্নায় দেখা গেল তার মাথার চুল কোঁকড়া। থুতনিতে দাড়ি। বেশ বলিষ্ঠ দেহ। বলল—আপনারা কী চান?

—আপনার নামই কি আলফান? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

আলফান মাথা ওঠা নামা করল। ফ্রান্সিস বলল—একটু দূরে এক সরাইখানা- ওয়ালা আমাদের বলল যে আপনি নাকি একটা জাহাজ বিক্রি করবেন।

—হ্যাঁ—আলফান বলল।

—শুনুন—হ্যারি বলল—আমাদের জাহাজ চুরি হয়ে গেছে আর এই বিদেশে বিভুঁয়ে বেশ কয়েকদিন কাটছে আমাদের।

—বুঝতে পারছি—আপনারা বিদেশি। আলফান বলল।

—হ্যাঁ—হ্যারি বলল।

—আসুন—জাহাজটা দেখুন। আলফান বলল।

আলফান পাটাতন দিয়ে নেমে এল। পেছনে ফ্রান্সিস আর হ্যারি। ফ্রান্সিসের কানে এল মারিয়ার ডাক—ফ্রান্সিস—আমরাও এসেছি। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল মারিয়া আর শাঙ্কো আসছে। কাছে এসে মারিয়া হেসে বলল—তোমরা জাহাজঘাটায় এসেছো শুনে আমরাও এলাম। শাঙ্কো বলল—কী ব্যাপার ফ্রান্সিস?

—একটা জাহাজ কিনবো। সেটা দেখতে যাচ্ছি। চলো।

পাটাতন পাতা দিয়ে আলফান পাশের ছোট জাহাজটার ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিসরাও উঠল।

কেবিনে নামবার সিঁড়ির কাছে একটা কাচঢাকা আলো জ্বলছিল। আলফান আলোটা তুলে নিল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল। ফ্রান্সিসরাও নামল। দুটো বেশ বড় কেবিনঘর। আলফান বলল—ডানদিকের ঘরটায় বাবা থাকতেন। বাঁ দিকের ঘরটা ছিল শোবার আর সাজগোজ করার ঘর। বাবা বেশ শৌখিন ছিলেন। দেশ বিদেশের সুগন্ধি এঘরে রাখতেন। আমি সে সব এখন আমার ঘরে রেখেছি। শুধু রয়ে গেছে ঐ আয়নাটা। আলফান সেই ঘরটায় ঢুকল। ফ্রান্সিসরাও ঢুকল। কাঠের দেওয়ালে টানা পাটাতন। সেই পাটাতনে আটকানো একটা বেশ বড় ডিম্বাকৃতির আয়না। আয়নাটার মাঝ বরাবর ফাটা।

—আপনার বাবা তো এই আয়না ব্যবহার করতেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। দিনরাতের মধ্যে কতবার যে মাথার চুল আঁচড়াতেন। আলফান বলল।

কাচঢাকা আলোয় সব দেখতে দেখতে হ্যারি বলল।

—আপনি বোধহয় এই ছোট জাহাজটা বেশি ব্যবহার করেন না।

—না। তবে মাঝে মাঝে রাতে থাকতে আমি। আলফান বলল।

এবার ফ্রান্সিসরা কাঠের তক্তাপাতা বিছানা রান্নাঘর আর একটা ছোট কেবিনঘর সব দেখল। বোঝাই যাচ্ছে খুব শৌখিন ছিল এই ছোট জাহাজটা।

সবাই ওপরের ডেক-এ উঠে এল। মারিয়া ফ্রান্সিসকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—খুব সুন্দর জাহাজটা। এটা কেন।

ফ্রান্সিস হাসল। মৃদুস্বরে বলল—আগে দরদস্তুর হোক।

আলফান কাচঢাকা আলোটা টাঙিয়ে রাখল। হ্যারি বলল—

—দেখুন—আপনার এই জাহাজটা অপছন্দের কোন কারণ নেই। কিন্তু আমাদের আর্থিক ক্ষমতা বেশি নেই। আমরা বহুদিন দেশছাড়া। কাজেই জাহাজটার উপযুক্ত মূল্য হিসেবে এই সোনার তীরধনুক দিতে পারি। স্বর্ণমুদ্রা আমাদের কাছে বেশি নেই। কথাটা বলে হ্যারি কাপড়ে প্যাঁচানো সোনার তীরধনুকটা বের করে। আলফানকে দিল।

আলফান তীরধনুকটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। বলল—কতটা আসল সোনা আছে এটাতে?

—তা কী করে বলবো। তাহলে কোনও স্বর্ণকারকে দেখাতে হয়। হ্যারি বলল।

আলফান বলল—আমি বলি কি এটা আমার কাছে থাক। আপনারা কালকে আসুন। আমি এর মধ্যে আমার জানাশুনো এক স্বর্ণকারকে দেখিয়ে নেব।

—না। আমরা এটা হাতছাড়া করবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আমাকে বিশ্বাস করছেন না। আলফান বলল।

ফ্রান্সিস বলল—দেখুন আমি কাউকেই অবিশ্বাস করতে চাই না। কিন্তু বিশ্বাস করে ঠকেছি। তবু আমি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাই নি। একটু থেমে বলল—আপনি তীরধনুক রাখলেন। কালকে এসে যখন চাইব তখন তো আপনি তীরধনুকের কথা অস্বীকার করতে পারেন। আমরা বিদেশী। আমাদের কথা কে বিশ্বাস করবে? আপনি এই অঞ্চলের ধনী ব্যবসায়ী। আপনার ক্ষমতা আমাদের অনেক বেশি। এই সোনার তীরধনুক আপনার কাছে কিছুই না। কিন্তু আমাদের বাঁচা মরা নির্ভর করছে এই মূল্যের ওপর। হ্যারি বলল—একটা কথা বলছি। আলফান—আপনি তো এই অঞ্চলের মানুষ। ব্যবসায়ী। নিশ্চয়ই আপনার পরিচিত কোন স্বর্ণকার এখানে আছে।

—তা আছে। আলফান বলল।

—তাহলে—এখন তো রাত বেশি হয়নি। চলুন না তার দোকানে। হ্যারি বলল। আলফান একটু ভাবল। পরে বলল—যাবেন—চলুন।

সবাই সমুদ্রতীর থেকে রাস্তায় উঠে এল। একটা বাজার এলাকায় এল। দোকানে দোকানে কাচঢাকা বাতি জ্বলছে। লোকজনের তেমন ভিড় নেই। সবাই চলল।

বেশ কিছুটা এসে আলফান একটা দোকানে ঢুকল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। দোকানে বসার জায়গা কম। মারিয়া আর হ্যারিকে বসিয়ে ফ্রান্সিস শাঙ্কো দাঁড়িয়ে রইল।

দেখেই বোঝা যাচ্ছে স্বর্ণকারের দোকান। কাঠের অলমারিতে বেশকিছু গয়না গাঁটি রাখা। কর্মচারীরা সোনার কাজ করছে প্রদীপ জ্বেলে।

মালিক একটা উঁচু জায়গায় বসেছিল।

আলফানকে দেখে দোকানের মালিক উঠে দাঁড়াল। হেসে বলল—আসুন—আসুন। আপনি এলেন। খবর পাঠালে আমিই যেতাম। আলফান হ্যারির হাত থেকে সোনার তীরধনুকটা নিল। মালিকের হাতে দিয়ে বলল—দেখুন তো এটা আসল সোনার কিনা। মালিক হাত বাড়িয়ে নিল। বসল। হাত বাড়িয়ে একটা কালো পাথর বের করল। পাথরটা কষ্টিপাথর। প্রথমে তীর পরে ধনুকটা কষ্টিপাথরে ঘষল। পাথরের গায়ে সোনালি দাগ দেখল। মাথা তুলে বলল—খাদ আছে তবে আসল সোনাই বেশি।

আলফান বলল—ধরুন এ দুটো গালিয়ে সোনার চাকতি করা হল। কটা চাকতি হবে? একটুক্ষণ ভাবল মালিক। তারপর বলল—সাত আটটা চাকতি হবে।

—ঠিক আছে। এই দুটো রেখে দাও। আমাকে চাকতি গড়ে দেবে। আরফান বলল।

ফেরার পথে আলফান বলল—আপনারা কালকেই জাহাজটা নিতে পারেন। দাম তো আমি পেয়ে গেলাম।

ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় ফিরে এল। সব ভাইকিংরা ফ্রান্সিসদের ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস সব ঘটনা বলল। ভাইকিংরা আনন্দে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো—।

মারিয়া হেসে বলল—কী সুন্দর জাহাজটা।

—এবার দেশের দিকে—তাই না। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—বাঃ এটা কি আমি একা চাইছি? তোমার কি দেশে ফেরার ইচ্ছে নেই? মারিয়া বলল।

—আছে বৈকি। কিন্তু ওখানে নিশ্চিন্ত অলস জীবনে যাওয়ার ইচ্ছে আমার একেবারেই নেই। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়েই ফ্রান্সিস চলল জাহাজঘাটার দিকে। সকলেই আনন্দে অধীর। যা-হোক একটা জাহাজ পাওয়া গেছে। এবার দেশে ফেরা।

আলফান ওর বড় জাহাজটার ডেক-এ দাঁড়িয়েছিল।

ফ্রান্সিস আলফানের কাছে গেল। আলফান বলল—এবার জাহাজটা বুঝে নিন আপনারা। তবে জাহাজটার ডেক দেওয়াল কেবিনঘর সবকিছুই পরিষ্কার করতে হবে। তার জন্যে লোক লাগলে আমি দেবো।

—দরকার পড়বে না। আমারাই সাফটাফ করবো। তবে সাফটাফ করতে গেলে যেসব জিনিস লাগে সেসব আমাদের দেবেন, তা হলেই হবে। হ্যারি বলল।

আলফান সেসব নিজের জাহাজ থেকে এনে দিল। ভাইকিং বন্ধুরা ঝাঁটা বুরুশ বালতি নিয়ে জাহাজটা পরিষ্কার করতে লেগে পড়ল। মারিয়ার নির্দেশেই কাজ হতে লাগল।

শাঙ্কো আর বিস্কো বন্দরের বাজারে গেল। আটা ময়দা চিনি এমনি সব খাওয়ার জিনিস বেশি করে কিনে নিয়ে এল।

ফ্রেজার আর পেড্রো সঙ্গে আর কয়েকজনকে নিয়ে গেল বন্দরে। দুটো পিপে ভর্তি করে খাবার জল নিয়ে এল।

বিকেলের মধ্যেই জাহাজটার চেহারা ফিরে গেল।

পেড্রো জাহাজের কোনাখামচি থেকে তিনটে কাচঢাকা আলো বের করল। তেল ভরে রাখল।

এ সময়ে আলফান ফ্রান্সিসদের জাহাজে এল। চারদিক দেখে টেখে বলল—বাঃ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছেন।

আলফান ওর খাবার সাজঘরে এল। সঙ্গে ফ্রান্সিস। আলফান চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল—এ ঘরটাও বেশ পরিষ্কার করেছেন। বাবার সাজঘর ছিল এটা। ফ্রান্সিস বলল—

—একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম।

—কী ব্যাপার? আলফান বলল।

—আপনি এই ঘরটা একইভাবে রেখে দিয়েছেন।

—হ্যাঁ। শুধু সুগন্ধি তেল, সেন্ট, আতর এসব আমার কাছে রেখেছি। আলফান বলল।

—এই ঘরটা কি তাহলে আপনার বাবার আমলে যেমন ছিল তেমনি আছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। আলফান বলল।

—কেন বলুন তো? ফ্রান্সিস বলল।

একটু চুপ করে থেকে আলফান বলল বাবার সৃষ্টিটা আমি বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছি।

—আপনি আপনার বাবাকে খুব ভালোবাসতেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। বাবার স্মৃতিবিজড়িত এই ঘরটায় মাঝে মাঝে আসি। বসি। বাবার কথা ভাবি। আলফান বলল।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। আয়নাটার কাছে গেল। আয়নাটা দেখল। বলল—আলফান, এই আয়নাটা যেভাবে লাগানো হয়েছে তাতে শুধু লম্বা চেহারার মানুষই এই আয়নায় মুখ দেখতে পারবে।

আলফান হেসে বলল—না, আয়নাটা নামানো ওঠানো যায়। আলফান এসে আয়নাটা ধরল। তারপর আস্তে আস্তে আয়নাটা অর্ধেকটা নামাল আবার অর্ধেকটা ওঠাল। আবার অর্ধেকটা সম্পূর্ণ ঘোরাল না। বলল—এইবার আপনার মুখ দেখতে পারবেন। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। দেখল ওর মুখ দেখা যাচ্ছে। ফাটা আয়না সত্ত্বেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সবকিছু। সন্দেহ নেই দামি কাচের আয়না।

—এই আয়নাটা কি আপনার বাবার আমলে যেমন ছিল তেমেনই আছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ—একইভাবে আছে। আলফান বলল।

—এই ঘরের সবকিছুই তো এখান থেকে সরিয়েছেন। এই আয়নাটা

সরাননি কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—অন্তত একটা বাবার স্মৃতিচিহ্ন থাক এখানে। এজন্যে। আলফান বলল।

যাবার সময় আলফান বলল—আপনারা কবে জাহাজ ছাড়বেন।

—কাল সকালেই। ফ্রান্সিস বলল।

—জাহাজটার অনেককিছুই কিন্তু মেরামত করতে হবে। আলফান বলল।

—সেসব আমরা লিসবন বন্দরে করাবো। ফ্রান্সিস বলল।

সেদিন রাতে এই ছোট জাহাজে শুতে অনেকেরই অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু কোনও ভাইকিং বন্ধু এই নিয়ে ফ্রান্সিসকে একটা কথাও বলল না। সব অসুবিধে মেনে নিল।

পরদিন সকালের খাবার খাওয়া হলে জাহাজ নোঙর তুলে ছাড়া হল। বেগবান বাতাস। পালগুলো ফুলে উঠল।

জাহাজ দ্রুতগতিতে চলল।

ফ্রান্সিস সেই সাজঘরটায় এল। ওর কেমন মনে হল আলফান যে ঘরটা একই রকম রেখেছে তার পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। শুধু বাবার স্মৃতি নয়—

আলফান কিছু ভেঙে বলেনি। হ্যারি ঘরটায় ঢুকল। বলল—কী দেখছো?

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—এই ঘরটায় নিশ্চয়ই গোপনীয় কিছু আছে।

—তোমার এরকম কথা মনে হল কেন? হ্যারি বলল।

—আলফান যে এই ঘরটার কিছুই পালটায় নি তার পেছনে কোনও একটা কারণ আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা কী? হ্যারি জানতে চাইল।

—তাই তো বুঝতে পারছি না। এই ঘরটা আলফান ওর বাবার আমলের মতোই রেখেছে। কারণ এতে ওরপক্ষে সব খোঁজা সুবিধে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী খুঁজবে? হ্যারি বলল।

—নিশ্চয়ই গোপনে রাখা এমন কিছু। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো আলফান বহুদিন খুঁজেছে। কিছুই পায়নি। হ্যারি বলল।

—না পায়নি। তাই হতাশ হয়ে জাহাজটা বিক্রি করল। ফ্রান্সিস বলল।

—হতে পারে। হ্যারি বলল।

—হ্যারি—চলোঁ সবকিছু ভালো করে দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে ঘরটার বোনাটোনা সব দেখল। লুকিয়ে রাখা কিছুই খুঁজে পেল না।

ফ্রান্সিস আয়নাটার সামনে এল। আয়নাটা ঘুরিয়ে নিজের মুখ দেখল। আরও ঘোরাল। কাঠের দেওয়াল। কাঠের ছাত দেখল। আবার দেওয়াল। দেওয়ালের পরে মেঝে। ফ্রান্সিস আয়না ঘোরানো বন্ধ করে বলল—হ্যারি এই আয়নাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তখনকার মত দুজনে চলে এল।

একদিন কাটল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ ঢেউ ভেঙে চলেছে।

আকাশ নির্মেঘ। চারদিকে ঝল্‌মল্‌ রোদ। পালে জোর হাওয়া। ভাইকিংদের দাঁড় টানতে হচ্ছে না। ডেক-এর এখানে ওখানে ওরা শুয়ে বসে আছে। গল্প গুজব করছে।

সেদিন দুপুরে ফ্রান্সিস সেই সাজঘরে এল। এই কেবিনঘরে নিশ্চয়ই রহস্যময় কিছু আছে। আলফান সেটা বলেনি। ফ্রান্সিসের কেমন একটা বিশ্বাস এটা।

ফ্রান্সিস আয়নাটার কাছে এল। আয়নাটা আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগল। সেই কাঠের ছাত, দেওয়াল মেঝে আয়নায় দেখা যাচ্ছে। দুচারবার ঘুরিয়ে থামতেই হঠাৎ ফ্রান্সিসের নজরে পড়ল আয়নায় দেখা যাচ্ছে ছাত আর দেওয়ালের জোড়ের কাছে একটা লম্বাটে কাঠের ছোট তক্তামতো। ফ্রান্সিস আয়নার দিকে তাকিয়ে রইলো। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেই তক্তার গায়ে খুঁড়ে খুঁড়ে কিছু লেখা। ফ্রান্সিস পেছন ফিরল। সেই কাঠের তক্তার গায়ে কি লেখা? ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। লেখাটা কী বুঝতে পারল না। ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকতে গেল। হ্যারিকে নিয়ে এল। ঐ লেখাটা দেখাল। হ্যারিও অবাক।

হ্যারি বলল—কাছে উঠে গেলে বোঝা যাবে কী লেখা।

ফ্রান্সিস ছুটল শাঙ্কো আর বিস্কোকে ডাকতে।

শাঙ্কো বিস্কো এল। অন্য ভাইকিং বন্ধুরাও ঘরের দরজার কাছে ভিড় করল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—

—খুঁজে পেতে দ্যাখো একাট মইটই পাও কি না। না পেলে জাহাজে যে কাঠ রাখা আছে তাই দিয়ে একটা মই বানাও।

শাঙ্কো আর বিস্কো চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ছোট মই তৈরি করে আনল। মই পাতা হল। মই দিয়ে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে লেখাটার সামনে গেল। কোন ভাষায় লেখা কিছুই বুঝল না। ও নেমে এল। হ্যারিকে উঠতে বলল। হ্যারি মই বেয়ে লেখাটার কাছে এল। লেখাটা দেখতে দেখতে বলল—পোর্তুগীজ ভাষায় কিছু লেখা। তবে উল্টো করে লেখা। আয়নায় দ্যাখো, সোজা পড়া যাবে। বলো, আমি এখানে মিলিয়ে দিচ্ছি।

ফ্রান্সিস আয়নায় লেখাটা পড়ে পড়ে বলল—আয়না তোমার ভাগ্য গড়ে দেবে।

হ্যারি বলল—ঠিক এটাই লেখা আছে ঐ লম্বাটে কাঠের তক্তায়।

ফ্রান্সিস চোখ বুঁজল। ভাবল। চোখ খুলে বলে উঠল—এই তক্তাটা খুলতে হবে। খুলতে পারলে পাওয়া যাবে আলফানের বাবার ধনসম্পদ। হ্যারি ততক্ষণে নেমে এসেছে। ফ্রান্সিস মই বেয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে বলল— একটা পেরেক তোলা হাতুড়ি দাও। শ্যাঙ্কো ছুটল। খুঁজে খুঁজে কাঠ রাখার ঘরে হাতুড়ি পেল। এনে ফ্রান্সিসকে দিল।

ফ্রান্সিস তক্তার গায়ে পোঁতা পেরেক খুলতে লাগল। একপাশের দুটো পেরেক খুলতেই তক্তাটা আলগা হল। সঙ্গে সঙ্গে ঝর্‌ঝর করে সোনার চাকতি

পড়তে লাগল কাঠের মেঝের ওপর। টুং টাং শব্দ হতে লাগল। ফ্রান্সিস বাকি দুটো পেরেকও খুলে ফেলল। সব সোনার চাকতি পড়ে গেল।

ভাইকিং বন্ধুরা ধ্বনি তুললো—ও—হো—হো।

ফ্রান্সিস নেমে এল। বলল—একটা দড়ির বস্তা আনতে। আনা হল বস্তা। সব সোনার চাকতি ঐ বস্তাটায় রাখা হল। ভাইকিংরা আনন্দে হৈ হৈ শুরু করেছে তখন।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—এই সোনার দাবিদার আলফান। কিন্তু সে এখানে নেই। জাহাজ ঘুরিয়ে ফিরে গিয়ে আলফানকে ওর পৈতৃক সম্পদ দেব তাও সম্ভব নয়। কাজেই এই সোনার মালিক এখন আমরা। লিসবনে পৌঁছে দুটো কাজ করতে হবে এই সোনা দিয়ে। একটা ভালো জাহাজ কিনবো। তারপর লিসবন বন্দর শহরে নিজেদের পোশাক কিনবো। গ্যাব্রিয়েল ঠিকই বলেছিল—আমরা যেন ভিখিরি হয়ে গেছি। ফ্রান্সিস বলল।

দিন চারেক পরে ফ্রান্সিসরা পোর্তুগালের রাজধানী বন্দর শহর লিসবনে এসে পৌঁছল।

সবে ভোর হয়েছে তখন। বেশ কুয়াশায় ঢাকা লিসবন শহর। বন্দরে কত জাহাজ। জাহাজগুলোর মাথায় কত দেশের পতাকা উড়ছে। কিছু জাহাজ জাহাজঘাটায় রয়েছে। আর কিছু জাহাজ বন্দর থেকে একটু দূরে দূরে নোঙর ফেলে ভাসছিল।

হ্যারি ডেক-এ দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ কিছুদূরে দুটো জাহাজকে দেখল। একটা জাহাজ দেখতে ঠিক ওদের জাহাজের মত। কতদিন যে ওদের ঐ জাহাজে কেটেছে। কুয়াশায় ঢেকে গেল জাহাজ দুটো। হ্যারি দ্রুত পায়ে ছুটে গেল জাহাজ চালক ফ্রেজারের কাছে। বলল—

—ফ্রেজার—জাহাজ থামাও। এক্ষুনি।

ফ্রেজার জাহাজ থামাল। হ্যারি ছুটল ফ্রান্সিসকে ডাকতে। ফ্রান্সিসের সঙ্গে মারিয়াও ডেক-এ উঠে এল।

হ্যারি হাত পঞ্চাশেক দূরে দুটো জাহাজ দেখল। তখনই কুয়াশা কেটে গেল। স্পষ্ট দেখা গেল জাহাজ দুটো। নিজেদের জাহাজটা দেখেই ফ্রান্সিস চিনল। আনন্দে চিৎকার করে উঠতে গিয়ে থেমে গেল।

ততক্ষণে ওদের জাহাজটা যে দেখা গেছে সেটা সব ভাইকিং বন্ধুরা জানল। সবাই জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—ভাইসব—সামনের জাহাজটা গ্যাব্রিয়েলের। পেছনে বাঁধা জাহাজটা আমাদের। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গ্যাব্রিয়েল আমাদের জাহাজ বিক্রি করতেই এখানে এসেছে। এখনও খদ্দের পায়নি। অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমরা অপেক্ষা করবো না। আজ রাতেই আমাদের অভিযান।

সেদিন রাতে ভাইকিংরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। রাত একটু গভীর হতে সবাই ডেক-এ এসে দাঁড়াল। ভাইকিংরা নিরস্ত্র। জলদস্যুরা সশস্ত্র। একটা অসম

লড়াই।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—আমরা ঐ জলদস্যুদের সঙ্গে খালি হাতে লড়াই করতে পারবো না। ওরা নরপশু। ওদের মনে দয়ামায়া বলে কিছু নেই। কাজেই আমরা মুখোমুখি লড়াইয়ে যাবো না। আমরা আমাদের জাহাজের পেছন দিয়ে উঠবো। পাহারাদার জলদস্যুদের বুদ্ধিবলে হারিয়ে জাহাজ উদ্ধার করবো। জাহাজ চালিয়ে পালাবো। ফ্রান্সিস থামলো।

ফ্রেজার বলল—আমি এই জাহাজটা আমাদের জাহাজের ঠিক পেছনে গিয়ে থামব। হালের খাঁজে পা রেখে রেখে শাঙ্কো জাহাজে উঠবে। দড়ির মই ফেলে দেবে। আমরা সবাই উঠবো। তারপর লড়াই পাহারাদার জলদস্যুদের সঙ্গে।

ফ্রেজার জাহাজের হুইল ধরল। আস্তে আস্তে জাহাজ পেছোতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট জাহাজটা ফ্রেজার ওদের জাহাজের ঠিক পেছনে আনল।

শাঙ্কো ওদের জাহাজের ঝুলন্ত দড়িদড়া ধরে হালের খাঁজে পা রেখে রেখে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। সিঁড়ি ঘরের আড়ালে দাঁড়াল। তার আগে দড়ির মইটা নামিয়ে দিল। মই বেয়ে ফ্রান্সিস হ্যারি উঠে এল। ডেক-এ গড়িয়ে গিয়ে ওরা সিঁড়িঘরের পেছনে চলে এল। উঠে দাঁড়াল। সিঁড়িঘরের আড়াল থেকে ডেক-এর দিকে মাস্তুলের দিকে তাকাল। কুয়াশায় অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখল চারজন জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে ডেক-এ ঘোরাঘুরি করছে।

ওদিকে ফ্রান্সিসের দেখাদেখি চার-পাঁচজন ভাইকিং বন্ধু ডেক-এর পাটাতনে গড়িয়ে গিয়ে ফ্রান্সিসের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস আস্তে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো এগিয়ে গেলো। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল—ডেক-এর শেষের দিকে যে দুটো জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে বসে আছে তার মধ্যে বাঁ দিকেরটা তোমার ডানদিকেরটা আমার। ফ্রান্সিস থামল। তারপর আস্তে বিস্কোকে ডাকল। বলল—যে দুটো জলদস্যু খোলা তরোয়াল । কানে বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দ। ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। তারপর ছুটে ডেক পার হয়ে গিয়ে ডানদিকের জনদস্যুটার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। এই হঠাৎ আক্রমণে জলদস্যুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ও পেছনে উল্টে পড়ল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা দ্রুত হাতে তুলে নিয়ে জলদস্যুটার বুকে ঢুকিয়ে দিল। ওদিকে শাঙ্কোও অন্য জলদস্যুটার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে।

এবার অন্য জলদস্যু চারজন অন্য ভাইকিংদের হাতে মারা গেল।

শাঙ্কো দ্রুত পায়ে জাহাজের সামনে এল। জলদস্যুদের জাহাজটার সঙ্গে মোটা কাছিতে বাঁধা ওদের জাহাজটা শাঙ্কো ছোরা বের করল। ছোরা দিয়ে ঘষে ঘষে কাছিটা কেটে ফেলল। ওদের জাহাজটা আস্তে আস্তে হাত কুড়ি-পঁচিশ সরে এল।

ওদিকে নিচের অস্ত্রঘরে দুজন জলদস্যু অস্ত্রঘর পাহারা দিচ্ছিল। হাতে খোলা তরোয়াল। সেই দুটোকে বিস্কো আর অন্য দুইজন ভাইকিং মোকাবিলা করল।

অন্ধকার থেকে দ্রুত ছুটে গিয়ে বিস্কো একটা জলদস্যুর মাথায় ভাঙা দাঁড় দিয়ে ঘা মারল। ঐ জলদস্যু আর উঠল না। অন্য জলদস্যুটার হাতে ভাঙা দাঁড়ের ঘা মারতে হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। ওটাকে ধরে আর শুয়ে থাকা জলদস্যু দুটিকে বিস্কোরা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

নিজেদের জাহাজটা বেশি দূরে সরে আসার পর ভাইকিংরা ধ্বনি দিল—ও-হো-হো।

পেড্রো ছুটে গিয়ে মাস্তুলটাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। কয়েকজন ভাইকিং আনন্দে ডেক-এ গড়াগড়ি খেতে লাগল। একজন ভাইকিং বন্ধু ডেক-এর কাঠে জুতো ঠুকে ঠুকে তাল দিতে লাগল। আরও কয়েকজন ভাইকিং তালে তালে হাত-পা ছুঁড়ে নাচতে লাগল।

সম্রাটের রাজকোষ

হুয়েনভা বন্দর শহর। ফ্রান্সিসদের জাহাজ তীরে ভেড়ানো। ফ্রান্সিস বলেই রেখেছে পরদিন ওরা নিজেদের দেশের দিকে জাহাজ চালাবে। ভাইকিংরা খুব খুশি। কতদিন পর দেশে ফেরা। নিজেদের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা কত মূল্যবান ধনসম্পদ কত বুদ্ধি খাটিয়ে ফ্রান্সিস উদ্ধার করেছে। কতবার ওরা মৃত্যু মুখ থেকে ফিরে এসেছে। বিশেষ করে ফ্রান্সিস হ্যারি শাঙ্কো আর বিস্কো সব কাহিনী ওরা দেশবাসীকে বলবে।

মানুষের সঙ্গে যেমনি লড়াই করেছে তেমনি প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গেও লড়াই করেছে। কতবার ঝড়ের প্রচণ্ড শক্তিশালী ঝাপটায় ওদের জাহাজ ডুবতে ডুবতে উঠে পড়েছে ঢেউয়ের মাথায়। সমুদ্রের জলে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে ওরা বেঁচে গেছে।

সেদিন গভীর রাত। জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্র। ঢেউয়ের মাথায় চাঁদের আলো নাচছে।

মাস্তুলের মাথায় বসে থাকা নজরদার পেড্রোর একটু তন্দ্রামত এসেছিল। তন্দ্রা-ভাবটা চলছিল পেড্রোর। হঠাৎ ধড়ফড় করে জেগে উঠল। একবার চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছে তখনই দেখল দক্ষিণ দিক থেকে দুটো জাহাজ আসছে বন্দরের দিকে। দেখল—একটা যুদ্ধ জাহাজ আর একটা শৌখিন ছোট জাহাজ।

পেড্রো লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিচের জাহাজের ডেক-এর দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—সাবধান, দুটো জাহাজ আসছে এদিকে। ফ্রান্সিসকে খবর দাও। দু' চারজন ভাইকিং ডেক-এ ঘুমিয়েছিল। দুজনের ঘুম ভেঙে গেল পেড্রোর ডাকে। পেড্রোর কথা শুনল। উঠে দাঁড়াল। ছুটলো ফ্রান্সিসকে খবর দিতে।

একটু পরেই ফ্রান্সিস আর হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। পেছনে মারিয়া।

মাস্তুলের ওপর থেকে গলা চড়িয়ে পেড্রো বলল—দক্ষিণ দিকে দ্যাখো। ফ্রান্সিসরা দেখল দ্যাটো জাহাজ এই হুয়েনভা বন্দরের দিকেই আসছে। একটা যুদ্ধ জাহাজ। একটা শৌখিন জাহাজ।

—কী করবে ফ্রান্সিস? হ্যারি বলল।

—বুঝতে পারছি না জাহাজ দুটো এত গভীর রাতে এদিকে এই হুয়েনভা বন্দরে আসছে কেন?

—ফ্রান্সিস আমি নিশ্চিত ওরা লড়াই করতে আসছে। এই হুয়েনভা থেকে রাজধানী সেভিল পর্যন্ত রাজা ফার্নান্দোর রাজত্ব। যারা আসছে তারা লড়াই করে হুয়েনভা বন্দর দখল করবে। হ্যারি বলল।

দুটো জাহাজ খুব দ্রুতবেগে আসছে। তত্ক্ষণে ঐ জাহাজ দুটো অনেক কাছে

এসে পড়েছে। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি জাহাজচালক ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—ফ্রেজার—জানি না কেন দুটো জাহাজ এই হয়েনভা বন্দরে আসছে। এরা কারা আমরা জানি না। কিন্তু এই সমুদ্রতীরের জাহাজ ঘাটায় আমরা থাকবো না। জাহাজ ছাড়ো। যতটা সম্ভব মাঝ সমুদ্রের দিকে জাহাজ নিয়ে চলো। এখানে এখন থাকা বিপজ্জনক।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ আরব সমুদ্রের দিকে সরে এল। ফ্রান্সিসরা দেখল দুটো জাহাজ থেকেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যরা দলে দলে নেমে এল। এত সৈন্য। কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। চারদিক নিঃশব্দ। শুধু সমুদ্রের শোঁ শোঁ হাওয়ার শব্দ। আর তীরে ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ।

সৈন্যরা যুদ্ধ জাহাজ থেকে নেমে আসতে লাগল। যতটা সম্ভব জুতোয় কোনরকম শব্দ না তুলে ওরা নেমে আসতে লাগল। পরপর। তারপর রাস্তায় উঠে সারি বেঁধে দাঁড়াল। সেনাপতি নামল জাহাজ থেকে। একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটু গলা চড়িয়ে বলল—সৈন্যবাহিনী—এখান থেকে পাঁচশো হাত দূরে ডানদিকে রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যদের সৈন্যাবাস। নিঃশব্দে ঐ সৈন্যাবাসে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ঐ সৈন্যদের প্রস্তুত হবার সময় দেওয়া চলবে না। তারপর নিরস্ত্র ওদের হত্যা করতে হবে। চলো সব।

সৈন্যদল ছুটল। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ওরা সৈন্যাবাসের কাছে গেল। সৈন্যাবাসে কোন সাড়াশব্দ নেই। ওরা সৈন্যাবাসে ঢুকে দেখল—একজন সৈন্যও নেই। ওরা প্রত্যেকটি ঘর দেখল। কোন ঘরে কোন সৈন্য নেই।

ওরা বাইরে এল। চাঁদের আলোয় পূবদিকে তাকিয়ে দেখল ওখানকার প্রান্তরে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ দুই সৈন্যবাহিনীই স্থির দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রাজা রিকার্ডো তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রান্তরের দিকে ফার্নান্দোর সৈন্যবাহিনীর দিকে ছুটে গেল রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যবাহিনীও ছুটে এল। দুই সৈন্যবাহিনী পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল লড়াই।

ফ্রান্সিস তাদের জাহাজ থেকে শুনতে পেল তলোয়ারের ঠোকাঠুকির শব্দ। সৈন্যদের যুদ্ধকালীন চিৎকার আহতদের গোঙানির শব্দ। লড়াই চলল।

নজরদার পেড্রো গলা চড়িয়ে বলল—একটা লোক আমাদের জাহাজের দিকে সাঁতরে আসছে। এবার ফ্রান্সিসরাও উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় দেখতে পেল একটা লোক দ্রুত সাঁতরে আসছে। ফ্রান্সিসদের জাহাজের হাল ধরে একটু বিশ্রাম নিল লোকটা। তারপর হাল বেয়ে বেয়ে ওপরে ডেক-এ উঠে এল। ডেক-এর ওপর শুয়ে পড়ল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। ভাইকিংরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখতে লাগল। ওরা বুঝে উঠতে পারল না—লোকটা কে? তবে পরনে এদেশীয় লোকেদের পোশাক।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি এবার লোকটার কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—এবার উঠে

বসো। লোকটা আস্তে আস্তে বসল। ফ্রান্সিস বলল—তুমি কে? আর কোথাও না গিয়ে আমাদের জাহাজে এলে কেন?

—আপনারা বিদেশী। তাই নির্ভয়ে এলাম। জানি এখানে কোন বিপদ নেই। লোকটা বলল।

—তুমি বুঝলে কী করে যে আমরা বিদেশী? হ্যারি বলল।

—জাহাজের গড়ন দেখে। আমাদের দেশের জাহাজের সঙ্গে প্রায় কোন মিলই নেই। লোকটি বলল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—

—তুমি বেশ বুদ্ধিমান। তোমার নাম কী?

—আলখাতিব। আমি সোনীয়। লোকটা বলল।

—তুমি কোত্থেকে এলে? হ্যারি বলল।

—রাজা ফার্নান্দোর কয়েদঘর থেকে। আলখাতিব বলল।

—কী করে পালালে? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—এখান থেকে বেশ কিছু দূরে ক্যামেরিনাল বন্দর। আলখাতিব বলল।

—হ্যাঁ সেই বন্দর শহরে আমরা থামি নি। পার হয়ে এখানে এসেছি। হ্যারি বলল।

—ঐ ক্যামেরিনাল এলাকার রাজা—রিকার্ডো। এই রিকার্ডো জাহাজে তার সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছে ফার্নান্দোকে হারাতে। সেভিল অঞ্চল দখল করতে। আলখাতিব বলল।

—ও! তাহলে দুই রাজার লড়াই? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আর একটা মজার ব্যাপার কি জানেন? রিকার্ডো ফার্নান্দোর বড় ভাই। দুই ভাইয়ের লড়াই লেগেই আছে। রিকার্ডোর সৈন্যরা সৈন্যাবাসে আক্রমণ করেছিল। কয়েদঘরের চারপাশে লড়াই চলছিল। আমরা কুড়ি পঁচিশজন বন্দী ধাক্কা দিয়ে দিয়ে লোহার দরজা ভেঙে পালিয়েছি। আলখাতিব বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—যাও—আলখাতিবকে শুকনো পোশাক দাও। ওর থাকার ব্যবস্থা কর। আলখাতিব শাঙ্কোর সঙ্গে চলে গেল। অনেক ভাইকিং গিয়ে শুয়ে পড়ল। ডেক-এ দাঁড়িয়ে রইল ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মারিয়া। কেউ কেউ ডেক-এ বসে রইল। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল যুদ্ধের ফলাফল জানতে।

ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকাল। তারাগুলোর উজ্জ্বলতা কমে আসছে। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। আকাশ সাদাটে হয়ে আসছে। পূবদিকের দিগন্তে কমলা রং ফুটে উঠল। সূর্য উঠতে দেরি নেই।

যুদ্ধের উন্মাদনা থিতিয়ে এসেছে। সৈন্যদের হৈ হৈ চিৎকার থেমে গেছে। তবে আহতদের আর্তনাদ গোঙানি এখনও শোনা যাচ্ছে।

ভোর হল। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগল। সূর্যের স্নিগ্ধ আলো ছড়াল সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায় দূরে তীরভূমির গাছপালায়। ফ্রান্সিস

বলল—হ্যারি—এই পৃথিবী কত সুন্দর। ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত এই আলো এই বাতাস। নির্দয় মানুষেরা এই পরিবেশেও পরস্পর হানাহানি করে। আহত হয়ে মরে। আশ্চর্য!

তখন একটু বেলা হয়েছে। সকালের খাবার নিয়ে ফ্রান্সিস হ্যারি আর মারিয়া ডেক-এ এল। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তাকিয়ে রইল তীরভূমির দিকে। আল-খাতিবও ফ্রান্সিসদের সঙ্গে দাঁড়াল।

ওরা অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ দেখল রিকার্ডোর সৈন্যরা দলে দলে ছুটে আসছে। ওদের জাহাজে উঠে আসছে। ফ্রান্সিস বলল—আলখাতিব—রিকার্ডোর সৈন্যরা কি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসছে?

—হ্যাঁ। যুদ্ধে রাজা রিকার্ডো মনে হয় হেরে গেছেন। আলখাতিব বলল। তখনই দেখা গেল একটা ঘোড়ার পিঠে কে বসে আছে। তাকে ঘিরে সৈন্যরা জাহাজঘাটার দিকে আসছে। আলখাতিব বলে উঠল—যা ভেবেছি তাই। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে রাজা রিকার্ডো। বোধহয় আহত। ঐ দেখুন—আরো সৈন্য আসছে। আহতদের কাঁধে করে নিয়ে আসছে।

রাজা রিকার্ডোকে সৈন্যরা ধরাধরি করে জাহাজে উঠতে সাহায্য করল। রাজা রিকার্ডোকে জাহাজে তোলা হল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের নোঙর তোলা হল। পরিশ্রান্ত, আহত সৈন্যদের তখনও আনা হচ্ছিল। কিন্তু তাদের তীরে রেখেই জাহাজ চলতে শুরু করল। যুদ্ধ করে ক্লান্ত আহত সৈন্যদের কথা রাজা রিকার্ডো একবারও ভাবলো না। জাহাজঘাটায় শুইয়ে রাখা আহত সৈন্যদের আর্তনাদে গোঙানিতে ভরে উঠল জাহাজঘাটা। কিন্তু রাজা রিকার্ডোর জাহাজ ফিরল না। মাঝ সমুদ্রের দিকে আসতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—মনে আছে সেই রাজা হুয়েমাক-এর কথা। আহত তৃষ্ণার্ত সৈন্যদের সঙ্গে রাজা হুয়েমাক রাত্রি জেগে তাদের চিকিৎসা ও জলপানের ব্যবস্থা করেছিলেন। সভ্যদেশের রাজা হয়ে রিকার্ডো তার সৈন্যদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। আহত সৈন্যদের শত্রু সৈন্যদের রাজা ফার্দিনান্দোর দয়ার ওপর ছেড়ে দিয়ে এল। যুদ্ধজয়ী রাজা ফার্নান্দো ঐ পরিত্যক্ত সৈন্যদের হত্যাও করতে পারে। হত্যা না করলেও বন্দী করে রেখে দেবে। কয়েদঘরের জঘন্য পরিবেশে তিলে তিলে মরবে ওরা।

ফ্রান্সিসরা দেখল জাহাজঘাটা থেকে রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা সমুদ্রতীর ধরে এদিক ওদিক পালাচ্ছে।

রাজা রিকার্ডোর শৌখিন জাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছাকাছি এল। অন্য যুদ্ধ জাহাজটা এল পেছনে পেছনে। শৌখিন জাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের খুব কাছে এল। ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া তখনও ওদের জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি—ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না। রাজা রিকার্ডোর শৌখিন জাহাজ আমাদের জাহাজের কাছে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা রিকার্ডোর শৌখিন জাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের

গায়ে আস্তে ধাক্কা দিয়ে থেমে গেল। ফ্রান্সিসরা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ফ্রান্সিস একবার ভাবল দ্রুত জাহাজ চালিয়ে চলে যাই। তাহলে রাজা রিকার্ডোর যুদ্ধ-জাহাজ ওদের ধাওয়া করে ধরে ফেলবে। ওদের নিশ্চয়ই বন্দী করবে। আবার শুরু হবে বন্দীজীবন। তার চেয়ে দেখা যাক না রাজা রিকার্ডো কী বলে—কী করে।

রাজা রিকার্ডোর শৌখিন জাহাজ থেকে রোগা লম্বা চেহারার একজন সশস্ত্র লোক ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এল। সঙ্গে তিন চারজন সৈন্যও এল। রোগা লম্বা সৈন্যটি বলল—তোমাদের দলনেতা কে?

—আমি। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল।

—তোমরা বিদেশী? লোকটি বলল।

—হ্যাঁ—আমরা ভাইকিং। দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপ ঘুরে বেড়ানো আমাদের নেশা। কোথাও কোন গুপ্তধনের খোঁজ পেলে আমরা তা উদ্ধার করি। ফ্রান্সিস বলল।

—উদ্ধার করে সেই গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে যাও। লোকটি বলল।

—আপনি কিন্তু তার কোন প্রমাণ পান নি। মিথ্যে সন্দেহ। ফ্রান্সিস বলল।

লম্বা রোগা লোকটি বলল—যাক গে ওসব। আমি রাজা রিকোর্ডোর সেনাপতি। লোকটি বলল। ফ্রান্সিস একটু আশ্চর্যই হল—এই লম্বা রোগা তালপাতার সেপাই রাজা রিকার্ডোর সেনাপতি? এবার সেনাপতি বলল—

—তোমাদের বন্দী করা হল।

—কেন? কোন অপরাধে? হ্যারি বলল।

—আমরা প্রায় নিঃশব্দে খুব সতর্কতার সঙ্গে রাজা ফার্নান্দোর সেনানিবাস আক্রমণ করতে গিয়েছিলাম। দেখলাম রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যবাহিনীর একজন সৈন্যও সেনানিবাসে নেই। সশস্ত্র সৈন্যরা সামনের প্রান্তরের শেষে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সেনাপতি বলল।

—ওঁরা নিশ্চয়ই আপনাদের আক্রমণের সংবাদ আগে থেকে ওদের জানিয়েছিল। হ্যারি বলল। সেনাপতি ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। বলল—ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছি। ওরা কী করে আমাদের আক্রমণের সংবাদ জানল?

—হয়তো তাদের নিয়োগ করা কোন গুপ্তচর আগেভাগে খবরটা জেনে ওদের জানায়। ফ্রান্সিস বলল। সেনাপতি আবার ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল—হ্যাঁ—সেই গুপ্তচর হবে তোমরা? ফ্রান্সিস হ্যারি কোন কথা বলতে পারল না। ওরা দুজনে অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। হ্যারি বলল—

—আমরাই যে সেই গুপ্তচর তার প্রমাণ আপনারা কীভাবে পেলেন?

—রাজা রিকার্ডোই প্রথমে বুঝতে পারেন। আমাদের জাহাজ দুটো যখন তীরে ভিড়ল তোমরা তোমাদের জাহাজ মাঝ সমুদ্রের দিকে এখানে চলে এলে। সেনাপতি বলল।

—আমরা যুদ্ধে জড়াতে চাইনি। ফ্রান্সিস বলল।

—গুপ্তচরবৃত্তি কি যুদ্ধে জড়ানো না? সেনাপতি বলল।

—নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাদের মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। গুপ্তচরবৃত্তি করে আমাদের কী লাভ? ফ্রান্সিস বলল।

—প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা। সেনাপতি বলল। ফ্রান্সিস রাগস্বরে গলা চড়িয়ে বলল—না —আমরা গুপ্তচরবৃত্তি করি নি। আমরা এই প্রথম রাজা ফার্নান্দো আর রাজা রিকার্ডোর লড়াইর খবর জানলাম। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি একটু চুপ করে থেকে বলল—তাহলে শোন—লড়াই শুরুর পরে আমাদের জাহাজের নজরদার একটা লোককে সমুদ্রে সাঁতরে গিয়ে তোমাদের জাহাজে উঠতে দেখেছে।

—হ্যাঁ—একজন এ দেশীয় লোক—নাম আলখাতিব আমাদের জাহাজে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাকে দিয়েই তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করিয়েছো। সেনাপতি বলল।

—ঠিক আছে। আলখাতিবকে ডাকছি। ওকেই জিজ্ঞেস করুন। ফ্রান্সিস কথাটা শেষ করে বিস্কোর দিতে তাকাল। বলল—আল খাতিবকে নিয়ে এসো।

বিস্কো কিছুক্ষণের মধ্যেই আলখাতিবকে নিয়ে এল।

ফ্রান্সিস বলল—খাতিব বলো তো তুমি কি আগে আমাদের কখনো দেখেছো।

—না। আলখাতিব মাথা নেড়ে বলল।

সেনাপতি বলল—শোন্—তুই আগে থেকেই এদের চিন্‌তিস। এদের কথামতই তুই গুপ্তচরের কাজ করতিস।

আলখাতিব ভীত মুখে বলে উঠল—না—না—আমি এদের আজকেই প্রথম দেখলাম।

—তুই কোথায় থাকিস? সেনাপতি বলল।

—এই হুয়েনভা নগরে। আমাদের বাড়িঘর তৈরির পৈতৃক ব্যবসা।

—তুই সমুদ্র সাঁতরে এই জাহাজে এসে উঠলি কেন? সেনাপতি বলল।

—এরা বিদেশী বলে। এখানে বিপদে পড়বো না বলে। আলখাতিব বলল।

—বিপদের কথা ভেবেছিলি কেন? সেনাপতি বলল।

—এখানে রাজা ফার্নান্দোর কয়েদঘরে আমি বেশ কয়েক বছর বন্দী হয়ে ছিলাম। আজকে লড়াইয়ের ডামাডোলে কয়েদঘরের লোহার দরজা ভেঙে আমরা যারা বন্দী ছিলাম সবাই পালিয়েছি। আলখাতিব বলল।

—তোকে বন্দী করা হয়েছিল কেন? সেনাপতি বলল।

—সে অনেক কথা। আলখাতিব বলল।

—তবু অল্প কথায় বল্। সেনাপতি বলল।

একটু থেমে আলখাতিব বলতে লাগল—সেভিলে প্রায় দেড়শ বছর আগে মাডিস নামে এক রোমান সম্রাট রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজ্য আক্রান্ত হতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁর রাজকোষের বহু মূল্যবান পাথর সোনার চাকতি এসব জিরাল্ডা

টাওয়ারে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এই জিরাল্ডা টাওয়ার তিনিই নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি আমার প্রপিতামহের মোনক্কার সাহায্য নিয়েছিলেন। আমরা বংশানুক্রমিক সেই গল্প শুনে আসছি। মোনক্কা ছিলেন স্থপতি—বাড়িঘর তৈরি করতেন।

—হুঁ। তারপর? সেনাপতি মাথা ওঠানামা করে বলল।

—রাজা ফার্নান্দোর এক মন্ত্রী জানতো সেটা। ঐ মন্ত্রীই রাজাকে বলে আমাকে বন্দী করায়। চাবুক মেরে আমার কাছ থেকে জানতে চায় এই রাজকোষ গোপনে রাখার ব্যাপারে আমি কিছু জানি কি-না। আমি বললাম আমি এসবের কিছুই জানি না। মন্ত্রী সেকথা মানলে না। আমাকে কয়েদঘরে বন্দী করল। আজকের লড়াইয়ের ডামাডোলের মধ্যে কয়েদঘর থেকে পালালাম।

—হুঁ। যাক তোমাকে রাজা রিকার্ডোর কাছে যেতে হবে।

—আমরা? ফ্রান্সিস বলল।

—আর হ্যাঁ—ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাকেও যেতে হবে।

—বেশ যাবো। সঙ্গে আমার এক বন্ধুও যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ—চলো। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজের সঙ্গে শৌখিন জাহাজটার দূরত্ব মাত্র তিন হাত। সেনাপতি আর সঙ্গের দুজন সৈন্য লাফিয়ে আগে শৌখিন জাহাজটায় উঠল। ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কো পরে উঠল। সবশেষে আলখাতিব।

ওরা রাজা রিকার্ডোর শয়নকক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল। একপাট দরজা বন্ধ। সেনাপতি দরজায় টোকা দিল।

—ভেতরে এসো। রাজা রিকার্ডোর গম্ভীর গলা শোনা গেল।

সেনাপতি দরজা খুলল। ভেতরে ঢুকল। ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের ঢুকতে বলল।

ফ্রান্সিসরা ভেতরে ঢুকল। দেখল—রাজা রিকার্ডো একটা সুসজ্জিত বিছানায় বসে আছেন। রাজার বাহুতে পট্টি বাধা। বোঝাই যাচ্ছে যুদ্ধে আহত হয়েছেন। গায়ে একটা ফুলতোলা দামি কাপড় জড়ানো। সেনাপতি মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—মহারাজ—এই তিনজনেই গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে জড়িত। ফ্রান্সিস বলে উঠল—মিথ্যে কথা।

—তোমরা বিদেশী? রাজা রিকার্ডো বললেন। রাজার বেশ ভারি গলা।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—কোথায় দেশ তোমাদের? রাজা বললেন।

—আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—তোমাদের কথা শুনেছি। বীর জাতি। একটু থেমে বললেন—কিন্তু একটা কথা আমাকে বোঝাও তো। আমরা নিঃশব্দে রাজা ফার্দিনান্দোর সৈন্যাবাস আক্রমণ করতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি সৈন্যাবাসে কোন সৈন্য নেই। তারা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রান্তরের শেষে দাঁড়িয়ে আছে। এটা কী করে হল?

—ওরা আগে খবর পেয়েছিল বোধহয়। হ্যারি বলল।

—বোধহয় না। নিশ্চয়ই কোন গুপ্তচর আগেভাগে আমাদের আক্রমণের কথা তাদের জানিয়েছিল। রাজা বললেন।

—হতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—হতে পারে নয়। তাই হয়েছে। তোমরাই আগেভাগে আমাদের আক্রমণের কথা ফার্নান্দোকে জানিয়েছো। রাজা রিকার্ডো বললেন।

—কিন্তু আমাদের কী স্বার্থে? ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা বিদেশী। তোমাদের অর্থাভাব থাকবেই। অর্থের লোভে তোমরা এই কাজ করেছো। তোমাদের সুবিধে হল তোমরা বিদেশী। কাজ সেরে প্রাপ্য অর্থ নিয়ে জাহাজ চালিয়ে চলে যাবে আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। রাজা রিকার্ডো বললেন।

—তা তো আমরা করি নি। আমরা সবাই এখনও এ তল্লাট ছেড়ে পালাই নি। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তীর থেকে দূরে গিয়ে তোমাদের জাহাজ নোঙর করেছো। রাজা বললেন।

—আমরা যুদ্ধে জড়াতে চাই নি। হ্যারি বলল।

—কিন্তু আমার যুদ্ধ জাহাজ এই হুয়েনভা বন্দরে আসবে যুদ্ধ করার জন্যে— এই সংবাদটা তোমরা আগেই ফার্নান্দোকে জানিয়েছো। রাজা বললেন।

—এসব মিথ্যে অপবাদ। হ্যারি বলল।

রিকার্ডো চিৎকার করে বল উঠল—থামো। তারপর সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললেন—সবকটাকে বেত মারুন।

সেনাপতি ছুটে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই একজন পাহারাদারকে নিয়ে কেবিনে ঢুকলো। তার হাতে চাবুক জড়ানো। রিকার্ডো প্রথমে আলখাতিবকে দেখিয়ে বলল—আগে এটাকে মার। গুপ্তচরবৃত্তির শাস্তিটা আগে ওটাকে বুঝিয়ে দে। পাহারদার এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস ডানহাত তুলে চিৎকার করে বলে উঠল— আমাদের অন্যায়ভাবে চাবুক মারা হচ্ছে। চাবুকের মার খাবার মত কোন কাজ আমরা করি নি। রাজা রিকার্ডো এক ঝটকায় উঠে পড়লেন। গা থেকে চাদরটা খসে পড়ল। খালি গায়ে দ্রুত পাহারাদারের কাছে এলেন। চাবুকটা কেড়ে নিয়ে এলোপাথারি ফ্রান্সিসদের গায়ে চাবুক মারতে লাগলেন। ফ্রান্সিস হ্যারিকে আড়াল করে দাঁড়াল। এই চাবুকের মার ব্যারি সহ্য করতে পারবে না। চাবুকের মার চলল। আলখাতিব সহ্য করতে পারল না। আর্তনাদ করে উঠল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো নিঃশব্দে মার খেতে লাগল। রাজা রিকার্ডো এক সময় চাবুক ফেলে দিয়ে হাঁপাতে লাগলেন। বাঁ বাহুতে তরোয়ালের কোপ পড়েছে। আহত। বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কাজেই আল্পক্ষণের মধ্যেই রাজা রিকার্ডো চাবুক মারা বন্ধ করলেন। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললেন—সব কটাকে বন্দী করুন। আমার রাজ্যে নিয়ে চলুন। চাবুকের মারের জন্যে পিঠ জ্বলে যাচ্ছে

ফ্রান্সিসদের। আন্দাজে বুঝল—পিঠে রক্ত বেরিয়েছে। চাবুক পিঠ কেটে বসে গেছে। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে মার খেয়েছে। এবার চোখ খুলে বলল—

—আমার বন্ধুদের কী হবে?

—আমার যুদ্ধ জাহাজের একেবারে নিচে আছে ছোট কয়েদঘর। সবাইকে সেখানে রাখা হবে। রাজ বললেন।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—হ্যারি—তুমি ভালো আছো তো।

—তুমি তো আমাকে চাবুকের মার খেতেও দাওনি। সব মার নিজে গায়ে নিয়েছো। হ্যারি বলল।

—শাঙ্কো? ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল।

—আমি ভালো আছি। শাঙ্কো বলল।

—জ্বালা যন্ত্রণা। ফ্রান্সিস বলল।

—তা তো হবেই। কিন্তু আমি সহ্য করছি। আমার জন্যে ভেবো না। শাঙ্কো বলল।

তখনই একজন সৈন্য ছুটতে ছুটতে কেবিনঘরে ঢুকল। রাজা রিকার্ডোকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—একদল বিদেশী আমাদের যুদ্ধ জাহাজ আক্রমণ করেছে। তখনই বাইরে হৈ হল্লা চিৎকার আহতের আর্তনাদ শোনা গেল। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে চেলে বলল—হ্যারি—সর্বনাশ হল। এই অবস্থায় বোকার মত লড়াইয়ে নেমেছে।

রাজা রিকার্ডো চিৎকার করে বলল—যারা সুস্থ আছে তাদের লড়াইয়ে নামতে বলো। হোক লড়াই।

—একটু ধৈর্য ধরতে পারল না। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল।

—হা ঈশ্বর—ওরা এটা কী করল। শাঙ্কো বলল।

রাজা রিকার্ডো বলল—যাও তোমাদের বন্ধুদের লড়াই বন্ধ করতে বলো।

—বেশ—আমরা যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

রিকার্ডোর শৌখিন জাহাজ থেকে ফ্রান্সিসরা রিকার্ডোর যুদ্ধ জাহাজে উঠে এল। দেখল ভাইকিংদের সঙ্গে রিকার্ডোর সৈন্যদের জোর লড়াই চলছে জাহাজের ডেক-এ। ফ্রান্সিস দুহাতে চেটো গোল করে মুখের কাছে এনে চিৎকার করে বলল—ভাইসব—লড়াই থামাও। তখন বিস্কোকে দেখল ফ্রান্সিস। বিস্কো তরোয়াল চালাতে চালাতে বলল—আমরা শুনেছি—তোমাদের চাবুক মারা হয়েছে। তার বদলা নিচ্ছি। ফ্রান্সিস আবার চিৎকার করে বলল—বিস্কো ফ্রেজার—তোমরা লড়াই থামাও। আমার কথা শোন। বদলা নেবার সময় এখন নয়।

আস্তে আস্তে লড়াই থেমে গেল। ডেক-এ শোনা গেল আহতদের আর্তনাদ গোঙানি। ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। বলল—বিস্কো শাঙ্কো তোমরা দেখ আমাদের বন্ধুদের কী অবস্থা। শাঙ্কো বিস্কো আহত বন্ধুদের খুঁজে খুঁজে নিয়ে এল ডেক-এ। দেখা গেল তিনজন ভাইকিং বন্ধু মারা গেছে। তিনটি বন্ধুর মৃতদেহ ডেক-এ রাখা

হল। ফ্রান্সিসরা তাদের ঘিরে দাঁড়াল। ভাইকিং বন্ধুরা কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিসের চোখেও জল। কত সুখ আনন্দ দুঃখের বন্ধু এরা তিনজন। ভেনকে ডাকা হল। মারিয়াও ততক্ষণে লড়াই থেমে গেছে দেখে যুদ্ধ জাহাজের ডেক-এ এসেছে। মৃত বন্ধুদের দেখে মারিয়া চিৎকার করে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস দেখল। কিছু বলল না।

ততক্ষণে ভেন এসে গেছে। ওর জোব্বামত পোশাকের পকেট থেকে একটা ছেঁড়াখোঁড়া বাইবেল বের করল। একটা পাতা খুলে একটু পড়ল। বলল—আমেন। সবাই মৃদুস্বরে বলল, আমেন।

তিনটি মৃতদেহ পর পর তুলে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করা হল। বন্ধুরা কিছুক্ষণ নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল।

ফ্রান্সিস এতক্ষণে লক্ষ্য করল যে রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস বুঝল একটু বেচাল হলে এরা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সেনাপতি ভেন-এর কাছে গেল। বলল—আমাদেরও সাতজন সৈন্য মারা গেছে। তাদের শেষকৃত্যটা আপনি করুন।

—চলুন। ভেন বলল।

ভেনকে সেনাপতি নিয়ে ডেক-এর শেষদিকে এল। দেখা গেল সাতটা মৃতদেহ পড়ে আছে। ভেন জোব্বামত পোশাকের পকেট থেকে ছেঁড়াখোঁড়া বাইবেলটা বের করল। আধপাতা পড়ল। অন্য সৈন্যরা মৃতদেহগুলি পরপর সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। এতগুলি মৃত মানুষ। সবাই জলে নিক্ষিপ্ত হল। নিজের বন্ধুদের জন্যে তো বটেই শত্রু-পক্ষর মৃত সৈন্যদের জন্যেও ফ্রান্সিসের চোখ ভিজে উঠল।

সেনাপতি ফ্রান্সিসের কাছে এল। মৃদুস্বরে বলল—

—রাজা রিকার্ডো তোমাদের কী শাস্তি দিয়েছেন তা তুমি জানো?

—হ্যাঁ জানি। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার বন্ধুদের সেটা বলো। সেনাপতি বলল।

এবার ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব—রাজা রিকার্ডো বলেছে এই জাহাজের নিচের দিকে একটা কয়েদঘর মত আছে। আমাদের সেখানে বন্দী করে রাখবে যাতে আমরা পালাতে না পারি। স্যামেরিনালে রাজা রিকার্ডোর রাজত্ব। সেখানে আমাদের বন্দী করে রাখা হবে। ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস আমরা এভাবে বন্দীদশা মেনে নেব?

—এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অসময়ে লড়াইয়ের ফল তো দেখলে—তিনজন প্রিয়বন্ধুকে হারালাম। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি তাড়া লাগাল—এবার সবাই সিঁড়ির দিকে চলো। নিচে নামতে হবে। ভাইকিংরা আর কেউ কিছু বলল না। সিঁড়িঘরের দিকে চলল। ফ্রান্সিস সেনাপতিকে বলল—দেখুন—একটা অনুরোধ ছিল।

—সেনাপতি বলল—বলো।



ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। কয়েদ-ঘরের কষ্ট ইনি সহ্য করতে পারবেন না। এঁকে কোন কেবিনঘরে রাখুন।

—দেখি—রাজাকে বলে। সেনাপতি বলল।

মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—না—না। আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকবো।

—মারিয়া—জাহাজের নিচের কয়েদঘরে কী অমানুষিক কষ্ট তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি কাছেই ছিল। বলল—ফ্রান্সিস ঠিক কথাই বলেছেন রাজকুমারী। আমাদের সঙ্গে আপনার থাকা চলবে না।

মারিয়া আর কোন কথা বলল না।

সেনাপতি চলে গেল শৌখিন জাহাজটায়। রাজার সঙ্গে কথা বলে এল। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল উনি রাজকুমারীকে দেখতে চান কথা বলতে চান।

—বেশ তো—চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—না। রাজামশাই একা কথা বলতে চান। সেনাপতি বলল।

—বেশ—রাজকুমারীকে নিয়ে যান। ফ্রান্সিস বলল।

কয়েকজন সৈন্যসহ সেনাপতি শৌখিন জাহাজের ডেকটা কাছাকাছি আনল। মারিয়াকে বলল—উঠে যান। মারিয়া দুই জাহাজের অলী ফাঁকটা ডিঙিয়ে গেল। তারপর সেনাপতির পেছনে পেছনে চলল।

মারিয়াকে রাজার কেবিনঘরে পৌঁছে দিয়ে সেনাপতি চলে এল। রাজা রিকার্ডোর কেবিনঘরটা মারিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। মারিয়া রাজপ্রাসাদে বড় হয়েছে। এসব ওর কাছে নতুন কিছু নয়। ও অবাক হল না। যেমন ফ্রান্সিসরা হয়েছিল।

রাজা রিকার্ডো হেসে বললেন—শুনলাম তুমি নাকি রাজকুমারী।

—হ্যাঁ। মারিয়া বলল।

—কোন দেশের? রাজা বললেন।

—ভাইকিং দেশের। মারিয়া বলল।

—তা রাজপ্রাসাদ আর সেখানকার আরাম আয়েস ছেড়ে এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?

—আমার স্বামীর ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে। মারিয়া বলল।

—যাবেন? রাজা বললেন।

—এইভাবে দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন আমার স্বামী। আমিও তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। মারিয়া বলল।

—ও। এসব এক ধরনের পাগলামি। রাজা বললেন।

—বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হবে। মারিয়া বলল।

—তোমার ভালো লাগে এসব? রাজা বললেন।

—নিশ্চয়ই। মারিয়া বলল।

—যাক গে—এসব কথা। একটু থেমে রাজা রিকার্ডো বললেন—

—তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দামি দামি গয়নাগাঁটি আছে? আঙুলের আংটিটা দেখিয়ে মারিয়া বলল—শুধু এই আংটিটা ছাড়া আমার কোন গয়নাগাঁটি নেই।

—উঁহু—তুমি মিথ্যে কথা বলছো। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। আপনি তল্লাশি করান। মারিয়া বলল।

—তোমাদের জাহাজে তল্লাশি তো হবেই। রাজা বললেন।

—তাহলে তো সবই জানবেন। মারিয়া বলল।

—তোমার স্বামীর নাম কী? রাজা বললেন।

—ফ্রান্সিস। মারিয়া বলল।

—আমার হাতে আজ চাবুকের মার খেয়েছে। রাজা বললেন।

—হ্যাঁ। মারি মাথা ওঠানামা করে বলল।

—ঠিক আছে। তোমাদের দুজনকে আলাদা কেবিনঘরে দেওয়া হবে। রাজা বললেন।

—দুজন নয়—একজন। মারিয়া বলল।

—তার মানে? রাজা বললেন।

—শুধু আমি থাকবো। ফ্রান্সিস থাকবে না। মারিয়া বলল।

—সে কি ঐ কয়েদঘরে থাকবে নাকি? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ বন্ধুদের সঙ্গে ফ্রান্সিস ঐ কয়েদঘরেই থাকবে। মারিয়া বলল।

—ও। তাহলে তুমি একাই থাকবে? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ।

দরজায় দ্বারী ছিল পাহারায়। গায়ে যোদ্ধাদের বেশ। হাতে পেতলের ঝক্‌ঝকে বর্শা। রাজা রিকার্ডো তুড়ি দিল। দ্বারী এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে দাঁড়াল। রাজা বললেন—সেনাপতিকে ডাক। দ্বারী চলে গেল। একটু পরেই সেনাপতি এল। রাজা বললেন—

—এই রাজকুমারী যে কেবিনঘরে থাকতো সেই ঘরটায় তল্লাশি চালাও। নিশ্চয়ই সোনাদানা দামি পাথর টাথর পাওয়া যাবে। কী বলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এরা গুপ্তধনও খুঁজে বেড়ায়। কাজেই এদের কেবিনঘরে মূল্যবান কিছু পাওয়া যাবেই। সেনাপতি বলল।

—হুঁ। তাহলে আপনি যান আর তল্লাশি চালান আর এই রাজকুমারীকে একটা কেবিনঘরে রাখবেন। রাজা বললেন।

সেনাপতি মাথা নুইয়ে বলল—ঠিক আছে। আপনার হুকুমমত সব কাজ হবে।

মারিয়াকে নিয়ে সেনাপতি বেরিয়ে আসছে তখন মারিয়া ঘরটা আর একবার ভালো করে দেখল। ভাবল—আমাদের প্রাসাদে বাবার মন্ত্রণাকক্ষও এর চেয়ে সুন্দর। তবে রাজা রিকার্ডো বড়লোক সন্দেহ নেই। ওদিকে ভেন যুদ্ধে আহত বন্ধুদের চিকিৎসা করতে শুরু করল। ভালো ওষুধ পেয়েছে। তাই ভাবল—সবাইকে সুস্থ করা যাবে। মারিয়া সেনাপতি যুদ্ধ জাহাজে ফিরে এল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল।

বলল— রাজা কী বললেন?

ঐ রাজার কেমন ধারণা হয়েছে আমার কেবিনে মূল্যবান কিছু গোপন রাস্তা আছে। সেনাপতিকে হুকুম দিয়েছে সেসব খুঁজে বের করতে। আমি আঙুলের একটি আংটি দেখিয়ে যখন বললাম — এই আংটি ছাড়া আমার কাছে দামি কিছু নেই। কথাটা শুনে রাজা যেভাবে তাকালে তাতে বুঝলাম কথাটা উনি বিশ্বাস করেন নি। মরুক গে।

রাজকুমারীকে এনে যখন তার জন্যে নির্দিষ্ট কেবিনঘরে রাখা হল তখন মারিয়ার নিজেকে বড় একা মনে হল। কিন্তু উপায় নেই। রাজা রিকার্ডোর সন্দেহের এখনও নিরসন হয় নি। এখনও তার বিশ্বাস ফ্রান্সিস হ্যারি আর আলখাতিব গুপ্তচরবৃত্তি করেছে। এই গুপ্তচরদের বিশেষ করে আলখাতিবের আগাম খবরের জন্যেই তাকে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে।

ওদিকে সেনাপতি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—আমার সঙ্গে চলো তোমাদের কেবিনঘরগুলো তল্লাশি চালাবো।

—শুধু আমার আর রাজকুমারীর কেবিনঘরটা তল্লাশি নিলে হত না? ফ্রান্সিস বলল।

—না আমরা সব কেবিনঘর দেখবো। সেনাপতি বলল।

—বেশ। চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—আমিও যাবো। হ্যারি বলল। সেনাপতি হ্যারির দিকে তাকাল। বলল — বেশ তো চলো।

তিনজনে যুদ্ধজাহাজ থেকে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এল। সেনাপতি একে একে খালি কেবিনঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। দামি কিছুই পেল না। ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করল—তোমার আর রাজকুমারীর কেবিনঘর কোনটা? ফ্রান্সিস ওর আর রাজকুমারীর কেবিনঘরটা দেখাল। সেনাপতি সেদিকে চলল। ফ্রান্সিস তখন উত্তেজনায় একটু কেঁপে কেঁপে উঠেছে। মারিয়ার চামড়ার ব্যাগে সোনার অনেক চাকতি রাখা আছে। মারিয়া তো সেসব সরাবার সময়ও পায়নি। ধরা পড়তেই হবে। রাজা রিকার্ডো সব নিয়ে নেবে। হাসবে। উল্লসিত হবে। ভালো দাঁও মারা গেছে। যে ভাবে হোক যখন ওরা মুক্তো হবে তখন হাতে একটা সোনার চাকতিও থাকবে না। এসব ভাবতে ভাবতে নিজের কেবিনঘরে ঢুকল। সেনাপতি হ্যারিও ঢুকল।

সেনাপতি কাপড় চোপড় সরিয়ে খুঁজতে লাগল। দুটো লম্বাটে ছোট বাক্সও পেল। একটাতে দেখল সেলাই ফোঁড়াইয়ের সরঞ্জাম। অন্য বাক্সটায় বোতাম পিন এসব রয়েছে।

কিন্তু সেনাপতি হাল ছাড়ল না। মারিয়ার ব্যাগগুলি খুলে খুলে দেখতে লাগল। বড় বড় ব্যাগগুলোর নতুন পুরোনো পোশাক। সেই পোশাকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ সেনাপতি তল্লাশি চালান। দামি বলতে পেল—

হাতলে সোনারুপোর কাজ করা দুটো চিরুনি। দুটো চিরুনিই সেনাপতি নিল।

— ও দুটো চিরুনি রাজকুমারীর। চিরুনি দুটো রেখে দিল। হ্যারি বলল।

—বা। এতে সোনারুপোর কাজ করা। কাজেই দামি। রাজাকে দিতে হবে। একেবারে খালি হাতে রাজার কাছে গেলে রাজা যাচ্ছেতাই বলে আমাকে অপমান করবে। সেই আপমানের হাত থেকে তো বাঁচা যাবে। সেনাপতি বলল।

—তাহলে নিয়ে যান। ফ্রান্সিস বলল।

তিনজনে যুদ্ধজাহাজে ফিরে এল। সেনাপতি রাজা রিকার্ডোর কাছে চলল। ফ্রান্সিস জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। বলল—মারিয়া সোনার চাকতিগুলো দামি পাথরগুলো কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। সেসব রাজা রিকার্ডোর হাতে পড়ল না - আমরা বেঁচে গেলাম।

—দেখতে হবে না ফ্রান্সিস, এ রাজকুমারীর কাজ। উনি দারুর বুদ্ধিমতি। হ্যারি বলল।

দুজনে খুঁজে খুঁজে মারিয়ার কেবিনঘরে এল। ফ্রান্সিস বলল—ঘরটা কেমন? মারিয়া বলল — একটা যুদ্ধ জাহাজ আর কত বিলাসী আয়োজন থাকে। যা আছে তার সমস্তই অধিকার নিতে হবে। এবার হ্যারি গলা নামিয়ে বলল—রাজকুমারী— রাজা রিকার্ডোর সেনাপতি আমাদের জাহাজে আপনার আর ফ্রান্সিসের ঘরে তন্নতন্ন করে খুঁজছে।

—কিচ্ছু পায় নি এই তো। মারিয়া দেখে বলল।

—হ্যাঁ শুধু আপনার চিরুনি দুটো পেয়েছে। ঐ দুটোতে তো সোনারুপোর কাজ আছে। তাই নিয়েছে। হ্যারি বলল।

—চিরুনি দুটো ফেরৎ নিতে হবে। মারিয়া বলল।

—কিন্তু আমাদের সোনার চাকতিগুলো—ফ্রান্সিস বলতে গেল। মারিয়া হেসে ফ্রান্সিসকে হাত তুলে থামাল। ডান পায়ের কাছে গাউনটা তুলল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দেখল—একটা কাপড়ের ব্যাগমত পায়ের সঙ্গে ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

—এটা তো—হ্যারি বলতে গেল।

—হ্যাঁ কাপড়ের ব্যাগ। এর মধ্যেই ঠেসে ভরা আছে সোনার চাকতিগুলো আর মণি-মাণিক্য দামি পাথর—আর সব দামি জিনিস। মারিয়া বলল।

আশ্চর্য! ফ্রান্সিস আর হ্যারি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ফ্রান্সিস বলল—তুমি কখন—মানে—

—রাজা রিকার্ডোর জাহাজ আমাদের জাহাজের দিকে আসছে দেখেই বুঝলাম আমরা বিপদে পড়লাম। রাজা রিকার্ডো সোনার খোঁজে আমাদের জাহাজ তল্লাশি করবেই। তখনই এই ব্যবস্থা করলাম। ফ্রান্সিস হেসে বলল—তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।

সেনাপতি এসে দাঁড়াল। বলল—তোমরা এখানে? কয়েদঘরে চলো।

ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া দুশ্চিন্তা করো না, ভয় পেয়ো না। আমরা মুক্তো হবোই।

দুজনে সেনাপতির সঙ্গে হেঁটে চলল। সিঁড়ি ঘরের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগল। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে বলল—হ্যারি আবার সেই বন্দি জীবন, বিনা অপরাধে।

—রাজা রিকার্ডোর সন্দেহ অত সহজে যাবে না। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ—কপালে ভোগান্তি আছে। ফ্রান্সিস বলল।

নিচে যে ঘরটার সামনে এসে ওরা দাঁড়াল সেখানে এই দিনের বেলাও অন্ধকার অন্ধকার একটা কাচ-ঢাকা মোমবাতি জ্বলছে। তাতেই যতটুকু অন্ধকার কেটে গেছে। মোটা লোহার গরাদ দেওয়া ঘর। দুজন পাহারাদার পাহারা দিচ্ছিল। তাদের একজনকে সেনাপতি ইঙ্গিত করল। সে কোমরে ঝোলানো চাবির গোছা থেকে চাবি নিয়ে ঘরের দরজা খুলল। শব্দ হল ঢ—অং। সেনাপতি বলল—ভেতরে ঢোক। ফ্রান্সিস একবার চারদিকে তাকাল? আর কেউ নেই। শুধু পাহারাদার দুজন আর সেনাপতি। কয়েদঘরের দরজা খোলা। একবার যদি নিজেদের ডাক দেয়। দরজা খোলা পেয়ে ওরা অনায়াসে ছুটে আসতে পারে। সেনাপতি আর দুজন পাহারাদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। পাহারাদার দুজন আর সেনাপতিকে উল্টে কয়েদঘরে ঢুকিয়ে দরজায় তালা দিয়ে, অনায়াসে ওরা পালাতে পারে। ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলল অসম্ভব। তাহলে মারিয়াকে ফেলে পালাতে হয়। মারিয়ার নিরাপত্তার জন্যে ওরা মনের দিক থেকে দুর্বল।

খোলা দরজা দিয়ে ফ্রান্সিসরা ঢুকল। শব্দ তুলে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শুয়ে বসে থাকা ভাইকিংরা চেয়ে দেখল। শুধু বিস্কো উঠে এল। বলল—ফ্রান্সিস—পালাবার সব রাস্তাই বন্ধ। তা ছাড়া ওসব ভেবেও লাভ নেই। রাজকুমারীকে ফেলে রেখে তো পালাতে পারবে না।

—দেখা যাক। সময় বুঝে সবদিক ভেবে মারিয়াকে নিয়ে পালাবো। এখন জাহাজ তো যাবে রাজা রিকার্ডোর রাজ্যের দিকে। রাজধানী ক্যামেরিনাই বন্দর শহরে জাহাজ ভিড়বে। জাহাজ থেকে আমাদের নামিয়ে ক্যামেরিন্যার কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হবে। ওখানকার পাহাড়ের ব্যবস্থাটা দেখবো। মারিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পালাবার সময় মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে পালাতে পারি।

ওদিকে রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ওদের যুদ্ধজাহাজের হালের সঙ্গে কাছি দিয়ে বাঁধলো। রাজা রিকার্ডো সেনাপতিকে হুকুম দিল জাহাজ ছাড়বার জন্য।

কিছুক্ষণ পর যুদ্ধজানের নোঙর তোলা হল। শৌখিন জাহাজের নোঙরও তোলা হল। তার পাল খুলে দেওয়া হল।

জনা দশেক সৈন্য দাঁড়ঘরে নেমে এল। সমুদ্রের জলে দাঁড় টানার শব্দ হল — ছলাৎ-ছলাৎ-ছপ্‌ছপ্।

জাহাজ তিনটি চলল।

সারারাত জাহাজ চলল।

ভোর হয় হয়। তখন জাহাজ তিনটি ক্যামেরিনাল বন্দর শহরের জাহাজঘাটায় পৌঁছল।

রাজা রিকার্ডো যুদ্ধে হেরে গেছে। এই দুঃসংবাদ রাজা রিকার্ডোর রাজধানীতে আগেই পৌঁছে গেছে।

সূর্য উঠলো। দলে দলে ক্যামেরিনালের অধিবাসীরা জাহাজঘাটায় জমায়েত হতে লাগল। রাজা রিকার্ডো শৌখিন জাহাজ থেকে নামলেন। প্রাসাদের মধ্যে কোন আনন্দের হৈ-হল্লা নেই। সবাই চুপচাপ। রাজা রিকার্ডো একটা খয়েরী রঙের ঘোড়ায় চেপে রাজপ্রাসাদের দিকে ঘোড়া ছোটালেন।

কিছুক্ষণ পরে যুদ্ধ জাহাজ থেকে সৈন্যরা একে একে নামল। জাহাজঘাটায় সৈন্যরা কয়েকজন ঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়ে এল। এই গাড়িগুলোয় চাষীরা শস্য নিয়ে যায়। আটদশজন আহত সৈন্যকে সৈন্যরা ধরাধরি করে নামাল। তারপর ঐ গাড়িগুলোয় শুইয়ে দিল বসিয়ে দিল। আহত সৈন্যদের নিয়ে গাড়িগুলো আস্তে আস্তে সৈন্যাবাসের দিকে চলল।

আটজন সৈন্য এবার কয়েদঘরের সামনে এল। প্রত্যেকের হাতেই চার-পাঁচ হাত দড়ি. কয়েদঘরের লোহার দরজা খোলা হল। একজন একজন করে ভাইকিংদের কয়েদঘরের বাইরে নিয়ে আসা হতে লাগল। তারপর দড়ি দিয়ে হাত বাঁধা হতে লাগল। একজন একজন করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ডেক-এ নিয়ে আসা হতে লাগল।

ফ্রান্সিস হাত বাঁধা অবস্থায় ডেক-এ উঠে এল। দেখল—মারিয়া চুপ করে ডেক-এর একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিসরা পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে. জাহাজঘাটে নামতে লাগল। ওদের পেছনে মারিয়াও নামল।

এবার বেশ কয়েকজন সৈন্য ফ্রান্সিসদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিস দেখল—ক্যামেরিনাল বন্দর শহরটা খুব বড় না। লোকবসতিও খুব একটা বেশি নয়। কিন্তু বাড়িঘরদোর বেশ সাজানো গোছানো। সামনেই চাররাস্তার মোড়ে ফুলের বাগান। অজস্র ফুল আছে। মাঝখানে এক পরীর মূর্তি। শ্বেতপাথরের। পরী ঝারি থেকে জল ঢালছে। জমা জল থেকে ফোয়ারা। বেশ উঁচু পর্যন্ত ফোয়ারার জল উঠছে।

ফ্রান্সিসরা রাস্তা দিয়ে চলল। বিদেশী পোশাক পরা দুহাত দড়ি দিয়ে বাঁধা। চারপাশের লোকজন ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। বোঝাই যাচ্ছে বিদেশী। কিন্তু ওদের বন্দী করা হল কেন? ওদের বোধহয় কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হবে।

এর মধ্যেই সূর্য আকাশে উঠে এসেছে। চড়া রোদ। ফ্রান্সিসদের অসহ্য গরমের মধ্যে হাঁটতে হচ্ছে। খাওয়া এখনও জোটে নি। ফ্রান্সিস দেখল মারিয়া ওদের পেছনে পেছনে আসছে। মাথা ঢেকে বড় রুমাল বেঁধে নিয়েছে মারিয়া।

সৈন্যাবাসের সামনের মাঠটায় এল ওরা। পাহারাদার সৈন্যরা ওদের দক্ষিণ দিককার একটা পাথরের ঘরের দিকে নিয়ে চলল।

ঘরটার সামনে এসে সবাই দাঁড়াল। দুজন সৈন্য গেল ঘরটার লোহার দরজার

দিকে। একটু পরেই ফিরে এল। গলা চড়িয়ে বলল—সবাই এই কয়েদঘরে ঢোকো। ফ্রান্সিসরা এগিয়ে গিয়ে দেখল লোহার দরজা খোলা। দুজন পাহারাদার সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে। একজন চাবির গোদা হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে রইল। অন্য বন্ধুরা একে একে কয়েদঘরে ঢুকতে লাগল। হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—

—রাজকুমারী মারিয়াকে বন্দী করে কোথায় রাখা হবে?

—এই নিয়ে কথা বলতে হবে। তাই দাঁড়িয়ে আছি।

—রাজা রিকার্ডোর অন্দরমহলে রাজকুমারীকে রাখতে বলো। হ্যারি বলল।

—তাই বলবো। কিন্তু সেনাপতি রাজি হবে কিনা তাই ভাবছি। সৈন্যরা তাড়া দিল। হ্যারি কয়েদঘরে ঢুকে পড়ল। ফ্রান্সিস তখনও দাঁড়িয়ে আছে। দুজন সৈন্য ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এই বিদেশী ভূত—দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ফ্রান্সিসের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ভাবল—এই সৈন্যটাকে আমি খালি হাতেই নিকেশ করতে পারি। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করল। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। ফ্রান্সিস সৈন্যটাকে বলল—তোদের সেনাপতির সঙ্গে কথা বলবো। তাই দাঁড়িয়ে আছি। সেনাপতি কোথায়?

—সেনাপতি তোর চাকর নাকি—ডাকলেই আসবে। একজন সৈন্য বলল।

—আমরাই কি তোদের চাকর নাকি। ফ্রান্সিস বলল।

—চাকর ছাড়া কি। সৈন্যরা বলল।

—তবে রে। কথাটা বলেই ফ্রান্সিস সৈন্যটির কোষবদ্ধ তরোয়ালটা দ্রুত হাতে এক ঝটকায় খুলে আনল। তরোয়ালটা উঁচিয়ে বলল—তুইও একটা তরোয়াল নে। দু তিনজন সৈন্য তরোয়াল কোষমুক্ত করে ছুটে এল। ফ্রান্সিসের তখন রুদ্রমূর্তি। তরোয়াল উঁচিয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। লড়াই শুরু হয় হয়। মারিয়া ছুটে এল। চিৎকার করে বলল—ফ্রান্সিস—রেগে যেও না। মাথা ঠাণ্ডা কর। আমাদের বিপদ বাড়িও না। তরোয়াল ফেলে দাও। ফ্রান্সিসের অনড় শরীরটা নড়ল। তরোয়ালটা ছুঁড়ে ফেলল। সৈন্যরাও তরোয়াল কোষবদ্ধ করল।

একজন সৈন্য ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—কী ব্যাপার বলো তো? ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। সেনাপতিকে অনুরোধ করবো একে যেন রাজ-অন্তঃপুরে রাখা হয়।

—কিন্তু সেনাপতি তো এখন নিজের বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করছেন। যুদ্ধে হেরে গিয়ে সেনাপতির এখন মন খারাপ। উনি এখন কিছু শুনতে চাইবেন না। সৈন্যটি বলল।

—তাহলে আমাকে পাহারা দিয়ে সেনাপতির বাড়িতে নিয়ে চল। আমাদের সমস্যাটা বুঝিয়ে বললে—উনি শুনবেন। উনি হয়তো রাজিও হবেন। সৈন্যটি একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—চলো। দেখা যাক।

মারিয়া তখন একটা কাঠের বাটিভর্তি জল নিয়ে এল। ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে

ধরল। ফ্রান্সিস হাসল। মারিয়াও হাসল। নিশ্চিন্ত হল যে, ফ্রান্সিসের মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে। ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে এটা ফ্রান্সিস বুঝল জল দেখে। বাটিমুখে ঠেকিয়ে ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়ে নিল। বাটিটা মারিয়াকে ফিরিয়ে দিল। মারিয়া বলল—আমিও খাবো।

—বেশ চলো। ফ্রান্সিস বলল। ঐ বাটিটা ছিল কয়েদঘরের। একজন সৈন্যকে মারিয়া ফিরিয়ে দিল। তারপর চলল ফ্রান্সিসের সঙ্গে। সেই সৈন্যটিই ফ্রান্সিস ও মারিয়াকে নিয়ে যাবার জন্যে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—তুমি একা যেও না। আরো দুতিনজন সৈন্য সঙ্গে নাও। নইলে তুমি একা আমাদের নিয়ে যাচ্ছো—সেনাপতি এটা ভালো চোখে দেখবে না।

—তাও তো বটে। সেনাপতি রেগে গেলে বিপদে পড়বো। সৈন্যটি। তখন আরও তিন সঙ্গীকে সঙ্গে নিল। সবাই চলল সেনাপতির বাড়ির দিকে।

ওদিকে লোহার গরাদের মধ্যে দিয়ে বন্ধুরা দেখছিল ফ্রান্সিস-মারিয়া যাচ্ছে। হ্যারি বলল— ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই সেনাপতির কাছে যাচ্ছে।

—কেন? শাঙ্কো বলল।

—রাজকুমারীর খাবার ব্যবস্থা করতে। হ্যারি বলল।

—ফ্রান্সিস কী চায়? শাঙ্কো বলল।

—ফ্রান্সিস চায় রাজকুমারী রাজা রিকার্ডোর অন্তঃপুরে থাকুক। হ্যারি বলল।

—দেখ—সেনাপতি রাজি হয় কিনা দেখ। শাঙ্কো বলল।

—মনে হয় রাজি হবে। হ্যারি বলল।

ওরা ফ্রান্সিসের চলে যাওয়া দেখতে লাগল।

তিনজন সৈন্যসহ ফ্রান্সিস মারিয়া সেনাপতির আবাসের সামনে এল। দেখল একজন প্রহরী পেতলের বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে। সৈন্যটি ঐ প্রহরীর কাছে গিয়ে কী বলল। বোধহয় সেনাপতির সঙ্গে দেখা করবে এরকম কিছু বলল। প্রহরীটি ইঙ্গিতে ওদের অপেক্ষা করতে বলে বাড়িটার প্রধান দরজার সামনে গেল। বিরাট দরজা ওক কাঠের। সেই কাঠ কুঁদে কুঁদে নানা নকশা আঁকা।

দরজা খুলে প্রহরীটি ভেতরে গেল। কিছু পরে বেরিয়ে এল। বলল—এসো। দু'জন সৈন্য বাইরে রইল। ফ্রান্সিস ও মারিয়া সৈন্যটির সঙ্গে ভেতরে ঢুকল।

একটা ঘর। ঘরের দুদিকে দুটো জানালা। তাতেও ঘরটার অন্ধকার অন্ধকার ভাবটা কাটেনি। ঘরের মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের গোল টেবিল। টেবিলের চারপাশে চারটে চেয়ার ওক কাঠের। পায়াগুলোও বাঁকা। বসার জায়গায় সাটিন কাপড় ঢাকা। তার নিচে পাখির পালকের গদী। ঘরের দেয়ালে পালিশ করা রঙিন ছবি আঁকা। ফ্রান্সিস বসল। একটু পরেই সেনাপতি ঢুকল। পরণে সাধারণ পোশাক। ঢোলা হাতা হলুদ জামা। তাতে নীল সুতোর কাজ করা।

সেনাপতি ঢুকতে ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়িয়েছিল। সেনাপতি হাতের ইঙ্গিতে ওদের বসতে বলল। দুজনে বসল। সেনাপতি ফ্রান্সিস আর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে

বলল—তোমরা এসেছো কেন?

—আমাদের একটা কথা বলার ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি সেই সৈন্যটার দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি একা এই দুজনকে নিয়ে এলে কেন? তুমি তো জানো এরা বন্দী।

—আজ্ঞে বাইরে আমার দুজন সঙ্গী রয়েছে। সৈন্যটি বলল।

—হুঁ। সেনাপতি মুখে শব্দ করল। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা কী বলতে চাও বলো।

—একটা নিবেদন আছে আমাদের। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। সেনাপতি বলল।

মারিয়াকে দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী।

—হুঁ। সেনাপতি মুখে শব্দ করল। বলল—তোমরা কী বলতে চাও বলো।

ফ্রান্সিস বলল—বলছিলাম যে কয়েদঘরে আমাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে সেখানে ইনি থাকতে পারবেন না। ঐ পরিবেশ এর সহ্য হবে না।

—হুঁ। তারপর?

—যদি রাজকুমারীকে রাজ-অন্তঃপুরে থাকতে অনুমতি দেন তাহলে আমরা উপকৃত হব।

সেনাপতি মাথার চুলে একবার আঙুল বুলিয়ে বলল—কিন্তু এই অনুমতি তো আমি দিতে পারি না। রাজা অনুমতি দেবেন। আমাকে রাজার কাছে যেতে হবে। তোমরা বসো। আমি রাজা মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে আসছি। তবে তোমাদের অনুরোধ রাখবেন কিনা বলতে পারছি না। কারণ যুদ্ধে হেরে গিয়ে রাজার মন মেজাজ ভালো নেই। তবু তোমাদের কথা বলবো। তারপর দেখা যাক।

সেনাপতি উঠে দাঁড়ালো তারপর খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে সেনাপতি ফিরে এল। চেয়ারে বসে বলল—রাজা সম্মতি দিয়েছেন। তোমাদের রাজকুমারীকে অন্তঃপুরে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। একমাত্র দিনের বেলা রাজকুমারী সকালে ও বিকেলে তোমাদের মোট দুবার দেখতে যেতে পারবেন। ফ্রান্সিস মারিয়া দুজনেই খুশি।

সেনাপতি চেয়ার ছেড়ে উঠল। ফ্রান্সিস মারিয়াও উঠে দাঁড়াল। সেনাপতি সৈন্যটিকে বলল—ওদের রাজকুমারীকে তুমি অন্দরমহলে পৌঁছে দিও।

ফ্রান্সিস ও মারিয়া সেনাপতির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

সৈন্যটি এবার মারিয়াকে বলল—আপনি আমার সঙ্গে চলুন। মারিয়া ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—দিনে দুবার তোমাদের দেখতে যাবো।

—তাতেই হবে। আমাদের জন্যে ভেবো না। তুমি নিজে ভালো থেকো। ফ্রান্সিস বলল।

কিছুটা এসে সৈন্যটি মারিয়াকে বলল—আমার সঙ্গে আসুন। সৈন্যটির সঙ্গে

মারিয়া চলে গেল।

রাজা-অন্তঃপুরে ঢোকার দরজাটার সামনে এসে সৈন্যটি ও মারিয়া দাঁড়াল। কালো দরজায় নানা রঙীন চিত্র। মারিয়া চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তাতেই একজন পরিচারিকা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। সৈন্যটি পরিচারিকাটির দিকে এগিয়ে গেল। বলল—শোন—রাজার হুকুম—এই রাজকুমারী অন্তঃপুরে বন্দী থাকবে। নজর রাখবে পালাতে না পারে। এঁর স্বামী আর তার বন্ধুরা কয়েদঘরে বন্দী হয়ে আছে। ইনি সকালে ও বিকেলে দুবার কয়েদঘরে যেতে পারবেন। তোমরা কেউ সঙ্গে করে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। সাবধান পালাতে দেবে না।

—আসুন। পরিচারিকার সঙ্গে মারিয়া রাজঅন্তঃপুরে ঢুকল। মারিয়া দেখল—মেঝে শ্বেতপাথরের। পাথরের দেয়ালে নানা রঙের ছবি আঁকা। পরিচারিকারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু এগোতেই কানে এল বীণার সুরেলা বাজনা। যত এগোচ্ছে বাজনা তত স্পষ্ট হচ্ছে। কী সুন্দর সুরঝংকার। মারিয়া গানবাজনা কম শোনেনি। ও রাজপ্রাসাদের একটা ঘরই আছে নানা বাজনার। মারিয়ার অদ্ভুত ভালো লাগল। মারিয়া যে ঘরে বাজনার আসর বসেছে সেখানে এল।

একটি সুসজ্জিত বিছানায় বসে এক মহিলা তন্ময় হয়ে গ্রীক-বীণা বাজাচ্ছেন। চোখ বুঁজে বাজাচ্ছেন। তাই মারিয়াকে দেখলেন না। সহচরীরা গোল হয়ে বসে বীণার বাজনা শুনছে। মারিয়াও একপাশে বসে পড়ল।

বাজনা চলল।

একসময় বাজনা থামল। মারিয়ার তখন কান্না পাচ্ছে। এত সুন্দর বাজনা। আবার নিজেদের প্রাসাদেও তো বাজনা শুনেছে। সে কথাটাই মনে পড়তে মারিয়ার দুচোখ জলে ভরে উঠল।

মারিয়ার দিকে মহিলাটি তাকালো। যে পরিচারিকাটি মারিয়াকে নিয়ে এসেছিল সে মহিলাটিকে বলল—রাণিমা। রাণি ফিরে তাকালেন।

পরিচারিকা মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—রাণিমা—ইনি এক দেশের রাজকুমারী। এখানে এসে বন্দী হয়েছেন। মাননীয় রাজা এঁকে অন্তঃপুরে থাকতে বলেছেন।

রাণি হেসে বললেন—তোমার নাম কী?

—মারিয়া।

—তুমি কোনদেশের রাজকুমারী? রাণি বললেন।

—ভাইকিং দেশের। মারিয়া বলল।

—তুমি বন্দী হলে কেন? রাণি বললেন।

—আপনি তো জানেন রাজা রিকার্ডো রাজা ফার্নান্দোর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেছেন। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ শুনেছি। রাণি বললেন।

—আমরা জাহাজ চালিয়ে হুয়েনভা বন্দরে এসেছিলাম। মারিয়া বলল।

—আমরা মানে কারা? রাণি বললেন।

—আমি আমার স্বামী আর তার বন্ধুরা। মারিয়া বলল।

—ও। তারপর? রাণি বললেন।

—যুদ্ধে হেরে যাওয়ায় রাজা রিকার্ডোর কেমন সন্দেহ হয় আমরা গুপ্তচর। আমরাই আগেভাগে রাজা ফার্নান্দোকে এই আক্রমণের কথা বলে দিয়েছি। মারিয়া বলল।

—তোমরা কি তাই করেছো? রাণি বললেন।

—না। আমরা এ দেশের কাউকে চিনি না, জায়গাও চিনি না।

—ও। তোমার স্বামী আর বন্ধুদের সঙ্গে তোমাকেও বন্দী করা হয়েছে। রাণি বললেন।

—হ্যাঁ। তবে আমাকে কয়েদঘরে থাকতে হয়নি। রাজা রিকার্ডো আমাকে অন্তঃপুরে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। মারিয়া বলল।

—হুঁ। তাহলে তুমি বন্দী? রাণি বললেন।

—হ্যাঁ। আমরা দেশে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম তখনই গুপ্তচর এই বদনাম দিয়ে আমাদের বন্দী করা হয়েছে। মারিয়া বলল।

—তোমরা ভাইংকিং জাতি। রাণি বললেন।

—হ্যাঁ। তোমরা বীর নির্ভীক। জাহাজ চালাতে ওস্তাদ তাই তো? রাণি বলল।

—হ্যাঁ— লোক তাই বলে। মারিয়া বলল।

—জিপসি কাদের বলে জানো তো? রাণি বলল।

—হ্যাঁ—জিপসিদের নিজেদের দেশ বলে কিছু নেই। যাযাবর—দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। মারিয়া বলল।

—গতমাসে একদল জিপসি এসেছিল। একটি জিপসি মেয়ে, এক ভাইকিং যুবকের দুঃসাহসী অভিযানের কাহিনী নিয়ে রচিত গান শুনিয়ে গিয়েছে। রাণি বললেন।

—সেই ভাইকিং যুবকের নাম ফ্রান্সিস। তাই না? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। তুমি চেনো তাকে? রাণি বললেন।

—ফ্রান্সিস আমার স্বামী। মারিয়া বলল।

—সেকি! ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের তাহলে এখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে? রাণি বললেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মারিয়া বলল।

—ও। রাণি থামলেন। তারপর বললেন—রাজার মনটন এখন ভালো নেই। ভাই ফার্নান্দোর কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন। আহতও হয়েছেন। কয়েকটা দিন যাক। রাজা একটু সুস্থ হলে তোমাদের মুক্তির কথা বলবো।

—ঠিক আছে। মারিয়া বলল। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

মারিয়া অন্দরমহলেই রয়ে গেল। পরিচারক পরিচারিকারা মারিয়াকে যত্নেই রাখল। রাণিও মারিয়াকে একেবারে বান্ধবীর মত মেনে নিল। মারিয়া সুখেই রইল।

কিন্তু ফ্রান্সিসদের জন্য দুর্ভাবনা কিছুতেই যেতে চায় না। সুসজ্জিত টেবিল ঝকঝকে কাঁটা চামচ থালা প্লেট। সুস্বাদু খাবার। এসবের মধ্যেও মারিয়ার মন বিষণ্ণ। ফ্রান্সিসরা না জানি কী অখাদ্য খাচ্ছে। কেমন আছে ওরা।

রাণি প্রতিদিন সকালে রাজা রিকার্ডোকে দেখতে যান। মারিয়াও সঙ্গে যায়। রাজা উঠে বিছানায় বসে থাকেন। রাণি এলে খুশি হন। মারিয়ার সঙ্গেও দু একটা কথা বলেন। কিন্তু মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। রাণি রাজাকে সান্ত্বনা দেন সুস্থ হন আবার যুদ্ধে নেমো। তোমার জয় হবেই। রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—

—না। আমার আর যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা নেই।

—অত হতাশ হয়ে পড়ো না। রাণি বলেন।

রাজা চুপচাপ থাকেন। মারিয়াকে বলেন—রাজকুমারী তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

—না—না। আমি ভালোভাবেই আছি। মারিয়া বলে।

সেদিন এরকমই কথা প্রসঙ্গে মারিয়া বলল—

—মহামান্য রাজা—একটা প্রার্থনা ছিল।

—বলো।

—আমার স্বামী আর তার বন্ধুদের আপনি সন্দেহের বশে কয়েদ করে রেখেছেন। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ—ওরা সত্যিই গুপ্তচরের কাজ করেছিল কিনা সেটা নিয়ে সেনাপতি তদন্ত করছে। যদি তোমার স্বামী ও বন্ধুরা নির্দোষ প্রমাণিত হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে—আপনার সিদ্ধান্ত। এই নিয়ে কিছু বলার নেই। মারিয়া আস্তে আস্তে বলল।

সেদিন যে লোকটি রাজার ক্ষতস্থান ধুইয়ে ওষুধ দিয়ে পট্টি বেঁধে দেয়—সে এল। মারিয়া ওর কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে রাজার ক্ষতে ওষুধ লাগিয়ে নিপুণ হাতে পট্টি বেঁধে দিল। যে লোকটি পট্টি বাঁধে সে হেসে বলল—আপনি আমার চেয়ে ভালো পারেন। মারিয়া হেসে বলল—এসব ছোটবেলায় মা আমাকে শিখিয়েছেন। মা আমাকে ছোট্ট খাটো জ্বর সর্দি ব্যথার ওষুধও শিখিয়েছেন। রাজাও খুশি হলেন। মারিয়ার ব্যান্ডেজ বাঁধায় অনেকটা আরাম পেলেন। বললেন—তুমিই আমার পট্টি বেঁধে দেবে প্রত্যেকদিন।

এটা মারিয়ার প্রতিদিনের কাজ হল। মারিয়া মোটেই বিরক্ত হল না। ও সাগ্রহেই কাজটা করতে লাগল। ফ্রান্সিসের মুক্তির কথা মারিয়া আর বলে নি।

রাজা নিজে থেকেই ফ্রান্সিসদের মুক্তি দেবে তার জন্যেই মারিয়া অপেক্ষা করতে লাগল।

মারিয়া সারাদিনে দুবেলা ফ্রান্সিসদের কয়েদঘরের সামনে আসে। মারিয়ার শরীর ভালো আছে জেনে ফ্রান্সিস খুশি হয়। দুজনে কয়েদঘরের দরজার কাছে

কথাবার্তা বলে। এ সময় পাহারাদাররা কিছুটা সরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ফ্রান্সিস আর মারিয়া কথা বলে। মারিয়া বলে তোমরা কেমন আছো?

—কয়েদঘরে বন্দীরা যেমন থাকে—তেমনি আছি। অখাদ্য খাবার, হাত ছড়িয়ে শোবার উপায় নেই। অতিরিক্ত গরম ঘাম জলতেষ্টা এসব নিয়ে ভালোই আছি। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া বলে—আর আমি পালঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছি নানা সুস্বাদু খাবার খাচ্ছি।

—যাকগে আমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। সময় সুযোগমত ঠিক পালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা বলেছে—সেনাপতি সব খোঁজখবর নিচ্ছে তোমাদের ব্যাপারে। তোমরা বিশেষ করে আলখাতিবকে সেনাপতি গুপ্তচর প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ—তাই সব ভোগান্তি ভুগছি আমরা। ফ্রান্সিস বলল।

—বলছিলাম—রাজাকে কি আবার তোমাদের মুক্তি দেবার কথা বলবো? মারিয়া বলল।

—কোন লাভ নেই। আগে তো একবার বলেছো। কোন লাভ হয়নি। ছেড়ে দাও—যা হবার হবে। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া এবার হ্যারি শাঙ্কোদের ডেকে কথা বলে। তারপর চলে আসে।

সেদিন মধ্যরাত। আকাশে চাঁদ অনুজ্জ্বল। ক্যামেরিনালের জাহাজঘাট জনশূন্য। ছ'সাতটা জাহাজ কম করে নোঙর করে আছে। জাহাজগুলোয় কাচঢাকা আলো জ্বলছে। সমুদ্রের জল ঝলাৎ ঝলাৎ শব্দে তীরভূমিতে ভেঙে পড়ছে। সমুদ্রের জলের ওপর এখানে ওখানে নীল কুয়াশার জটলা।

কুয়াশার জটলার মধ্যে দিয়ে দুটো যুদ্ধজাহাজ আস্তে আস্তে তীরে এসে ভিড়লো। যুদ্ধজাহাজ দুটো রাজা ফার্নান্দোর। দুটো পাটাতন ফেলা হল। একটা পাটাতন পাশে হাত পাঁচেক। অন্যটা সাধারণ মাপের। বোঝা গেল মোটা পাটাতন দিয়ে ঘোড়া নামানো হবে।

প্রথমে একটা ধবধবে সাদা ঘোড়া নামানো হল। রাজা ফার্নান্দো জাহাজ থেকে বেরিয়ে এলো। পাটাতন দিয়ে হেঁটে তীরে উঠলেন। পেছনে সেনাপতি।

এবার সশস্ত্র সৈন্যরা পাটাতন দিয়ে হেঁটে পার হয়ে তীরের ওপরের রাস্তায় এসে সারিবদ্ধ বেঁধে দাঁড়াল।

সাদা ঘোড়াটাকে তীরের পরেই উঁচু রাস্তাটায় এলেন দাঁড় করিয়ে রাখা হল। রাজা ফার্নান্দো সেখানে এলেন সাদা ঘোড়াটায় উঠলেন।

চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু জলে ঢেউয়ের শব্দ আর শন্ শন্ বাতাসের শব্দ।

আরো দুটো ঘোড়া নামানো হল। সে ঘোড়া দুটোয় চড়ল সেনাপতি আর একজন রাজার দেহরক্ষী।

রাজা তরোয়াল উঁচিয়ে আক্রমণের ইঙ্গিত করল। সব সৈন্য আস্তে আস্তে খাপ

থেকে তরোয়াল খুলল যাতে কোনরকম শব্দ না হয়।

রাজা উত্তর মুখে ঘোড়া আস্তে আস্তে চালালেন। সৈন্যরাও পেছনে পেছনে চলল। এত সৈন্যের চলা। একটু শব্দ হল।

রাজা রিকার্ডো সৈন্যদের সৈন্যাবাসে পৌঁছতে দেরি হল না। রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা তখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে।

হঠাৎ রাজা ফার্নান্দো তরোয়াল তুলে সৈন্যাবাস দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে তার সৈন্যবাহিনী রজা রিকার্ডোর সৈন্যদের আবাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের হৈ হৈ চিৎকারে রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা ঘুম থেকে উঠে পড়ল। দেখল রাজা ফার্নান্দোর সশস্ত্র সৈন্যরা তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। পালাবার পথ নেই। দু-একজন পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু ফার্নান্দোর সৈন্যদের হাতে মারা পড়ল।

এবার শুরু হল একপেশে লড়াই। রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা মারা পড়তে লাগল। শুরু হল চিৎকার আর্তনাদ গোঙানি মৃত্যু। অস্ত্রহীন রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা পালাতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিসরা জেগে উঠেছে। সবাই কয়েদঘরের লোহার দরজার সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। অল্প আলোয় দেখল রাজা ফার্নান্দোর সশস্ত্র সৈন্যরা নিরস্ত্র। নিরস্ত্র রাজা রিকার্ডোর সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা নিরস্ত্র। তারা মরতে লাগল।

কয়েদঘরের পাহারাদার সৈন্যদের ওপর রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা লড়াই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাহারাদার তিনজন সশস্ত্র। ওরা লড়াই চালাল। কিন্তু পারল না। দুজন ওখানেই মারা গেল। অন্য পাহারাদারটি গুরুতর জখম হয়ে কয়েদঘরের দরজার সামনে গড়িয়ে পড়ল। সেই পাহারাদারের কোমরেই গোঁজা আছে চাবির বড় রিংটা। ফ্রান্সিস এটাই চাইছিল। কয়েদঘরের দরজার দুপাশে মশাল জ্বলছিল। তারই আলোয় ফ্রান্সিস দেখল আহত পাহারাদারটি পাথরের বারান্দায় পড়ে আছে। ফ্রান্সিস লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়াল। আহত পাহারাদারের বুক পর্যন্ত হাত গেল। কিন্তু চাবির বড় রিংটা কোমরে গোঁজা। ফ্রান্সিস মেঝেয় শুয়ে পড়ল। তারপর পা বাড়াল পাহারাদারের কোমরে গোঁজা চাবির রিংএর দিকে। আস্তে আস্তে ডানপাটা বাড়াতে বাড়াতে চাবির রিংএর কাছে আনল। বুকে পায়ের বুড়ো আঙুলটা রিংএর মধ্যে গলিয়ে জোরে টান দিল। চাবির রিংটা ঝাঁকুনি খেয়ে সরে এল। কিন্তু পড়ে গেল না। ফ্রান্সিস তখন হাঁপাচ্ছে। ওদের সকলের মুক্তি নির্ভর করছে ঐ চাবির রিংএর ওপর। ফ্রান্সিস আবার পা বাড়াল। আবার রিংএর মধ্যে পা ঢুকিয়ে ঝাঁকুনি দিল। চাবির রিংটা কোমর থেকে খসে পাথুরে বারান্দায় পড়ে গেল। ঝং করে শব্দ হল। কিন্তু সৈন্যরা লড়াইয়ে ব্যস্ত। শব্দটা কারো কানে গেল না।

ফ্রান্সিস পা দিয়ে টেনে টেনে চাবির রিংটা কয়েদঘরের দরজার কাছে আনল। তারপর হাত দিয়ে টেনে কাছে আনল। হাত বাড়িয়ে কয়েদঘরের চাবিটা খুঁজতে

লাগল। কিন্তু বারান্দার মশালের আলোয় দেখেও বুঝল না কোনটা কয়েদঘরের চাবি। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস আমাকে রিংটা দাও। ফ্রান্সিস রিংটা হ্যারির দিকে সরিয়ে দিল। হ্যারি খুব মনোযোগ দিয়ে চাবিগুলো একটা একটা করে সরিয়ে সরিয়ে চাবি খুঁজতে লাগল। মশালের আলোয় দেখল একটা লম্বা চাবি বেশ পরিষ্কার। বাকি চাবিগুলো কেমন ময়লা। কোন কোনটা আবার জংধরা। হ্যারি চাবিটা এগিয়ে আনল। বলল—ফ্রান্সিস—এই চাবি দেখো—কেমন পরিষ্কার। তার মানে এই চাবিটা নিয়মিত ব্যবহৃত হয়। তাই ময়লা জমে নি। এটাই কয়েদঘরের তালার চাবি। ফ্রান্সিস চাবিটা নিল। কয়েদঘরের দরজাটা ফাঁক ফাঁক লোহার গরাদ দিয়ে তৈরি।

ফ্রান্সিস চাবিটা নিয়ে দরজার তালার কাছে এল। গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে চাবিটা তালার মধ্যে ঢোকাল। একটু চাপ দিয়ে জোরে মোচড় দিতেই তালাটা শব্দ করে খুলে গেল। ভাইকিংরা মৃদুস্বরে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো।

সবাই কয়েদঘরের বাইরে চলে এল। আগে যারা বন্দী ছিল তারা কয়েদঘর থেকে বেরিয়েই এদিক ওদিক ছুটে পালাল।

ফ্রান্সিস বলে উঠল—ভাইসব, তোমরা আমাদের জাহাজে ফিরে যাও। আমি মারিয়াকে নিয়ে যাচ্ছি। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, তুমি জানো না রাজকুমারী এখন কোথায়?

—না, জানি না। তবে খুঁজে বের করতে হবে। লড়াইর শেষে ফার্নান্দোর সৈন্যরা নিশ্চয়ই রিকার্ডোর প্রাসাদ লুঠ করবে। তার আগেই আমি মারিয়াকে নিয়ে পালিয়ে জাহাজে যাবো।

—বেশ। তাই করো। আমরা জাহাজে ফিরে যাচ্ছি। হ্যারি বলল।

—দল বেঁধে যেও না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাও। বোঝাই যাচ্ছে রাজা রিকার্ডোর সৈন্যরা হেরে গেছে। এখন রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা বিশ্রাম করবে। এই সুযোগে পালাও। রাজা ফার্নান্দোর হাতে ধরা পড়লে বলবে রাজা রিকার্ডো আমাদের কয়েদঘরে বন্দী করে রেখেছিল। মুক্তি পেয়ে আমরা এখন আমাদের জাহাজে ফিরে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

ভাইকিংরা সামনের প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর চলল জাহাজঘাটের দিকে।

ফ্রান্সিস চলল রাজপ্রাসাদের দিকে। ফ্রান্সিস প্রান্তরে নামল। চারপাশে তাকিয়ে দেখল পূবদিকে কিছু সৈন্য চলাফেরা করছে।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমদিকে ঘুরে দাঁড়াল। দ্রুতপায়ে চলল রাজা রিকার্ডোর প্রাসাদের দিকে। প্রাসাদের কাছে এসে ফ্রান্সিস প্রাসাদের সিংহদ্বারের দিকে গেল না। দূর থেকে দেখল সিংহদ্বারের সম্মুখে রাজা ফার্নান্দোর সেনাপতি আর রাজার দেহরক্ষী দুটো ঘোড়ায় চড়ে সিংহদ্বার পারাহা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস পেছনের দরজার দিকে গেল। রাজা রিকার্ডো পালালে পেছনের দরজা দিয়েই পালাবে।

ফ্রান্সিস পেছনের দরজার কাছাকাছি আসতেই দেখল দরজা খুলে গেল রাজবাড়ির গাড়ি বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস সমস্যায় পড়ল। মারিয়া কি এই গাড়িতেই আছে? ফ্রান্সিস দ্রুত ভাবতে লাগল কী করবে এখন?

গাড়িটার দরজা জানালা বন্ধ। ফ্রান্সিস স্থির করল এই গাড়িটাই ধরতে হবে। ও গাড়িটার পেছনে পেছনে ছুটল। ততক্ষণে রাজা ফার্নান্দোর সেনাপতি আর দেহরক্ষী গাড়িটা দেখতে পেয়েছে। ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে এল। ফ্রান্সিস দ্রুত ছুটে গিয়ে দেহরক্ষীর ঘোড়ার রেকাবে রাখা বাঁপাটা ধরে মুচড়ে দিল। দেহরক্ষী ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস এবার পা ধরে প্রাণপণে হ্যাঁচ্‌কা টান দিল। দেহরক্ষী হুড়মুড় করে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। পায়ের ব্যথায় কোঁকাতে লাগল। ফ্রান্সিস দ্রুত ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। ঘোড়া চালাল রাজা রিকার্ডোর গাড়ির পেছনে।

ফ্রান্সিসের সামনে ঘোড়ায় ছুটে চলেছে সেনাপতি। তার পেছনে ফ্রান্সিস ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। সেনাপতির হাতে খোলা তরোয়াল। বুকে বর্ম। মাথায় শিরস্ত্রাণ। ফ্রান্সিস নিরস্ত্র। শুধু নিরস্ত্র নয়। কয়েদঘরে কিছুদিন কাটিয়ে আর ঐ অখাদ্য খাবার খেয়ে শরীরও দুর্বল।

ফ্রান্সিস দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে সেনাপতির চলন্ত ঘোড়ার পাশে এল। সেনাপতি ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। ফ্রান্সিস দ্রুত সরে গেল। এবার ফ্রান্সিস সেনাপতিকে ছাড়িয়ে গাড়িটার কাছে এল। তখনও ফ্রান্সিসের মনে দ্বন্দ্ব। মারিয়া কি এই গাড়িতে আছে না প্রাসাদেই রয়ে গেছে।

চলন্ত গাড়ির পাশে এল ফ্রান্সিস। গাড়ির দরজা জানালা বন্ধ। ফ্রান্সিস হাঁপাচ্ছে তখন। গলা চড়িয়ে ডাকল—মারিয়া। গাড়ির ভেতর থেকে মারিয়াও গলা চড়িয়ে ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিসের মুখে হাসি ছুটল। ওর আন্দাজই ঠিক। ফ্রান্সিস মনে অনেক জোর পেল। যাক্—মারিয়া সুস্থ আছে। এতক্ষণে রিকার্ডোর প্রাসাদ নিশ্চয়ই আক্রান্ত হয়েছে। অন্তঃপুরেও লুঠ চলছে। মারিয়া ওখানে থাকলে বেঁচে থাকতো কিনা সন্দেহ।

ফ্রান্সিস পিছিয়ে এল। সেনাপতিকে তাড়াতে হবে। সেনাপতির কাছে এসে ঘোড়া চালাতে লাগল। দেখল সেনাপতি তরোয়াল কোষে ধরে রেখেছে। ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা চাবুকটা বের করেছে। ফ্রান্সিস কাছাকাছি আসতেই সেনাপতি চাবুক হাঁকাল। ফ্রান্সিসের পিঠে চাবুকের মার লাগল। পিঠটা জ্বালা করে উঠল। সেনাপতি আবার চাবুক চালাল। এবার চাবুকের মারটা লাগল গলার কাছে। গলার কাছে জ্বালা কর উঠল। চাবুকের পরের মারটা ফ্রান্সিসের গায়ে লাগল না। কারণ ফ্রান্সিস তখন অনেকটা সরে গেছে। সেনাপতি ডান হাতে চাবুক ঘোরাতে লাগল। আবার চাবুক হাঁকল। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে চাবুকটা ধরে ফেলল। তারপর সেনাপতি কিছু বোঝার আগেই চাবুকটা চেপে ধরে শরীরের সব শক্তি নিয়ে মারল হ্যাঁচ্‌কা টান। সেনাপতি ঘোড়ার পিঠে টাল খেল। ফ্রান্সিস আবার সজোরে মারল টান।

সেনাপতি ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। ঘোড়া ছুটিয়ে চলল।

রাজা রিকার্ডোর গাড়ির পাশে এল।

তখনই ফ্রান্সিস দেখল একদল সৈন্য ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস দেখেই বুঝল ফার্নান্দোর সৈন্য ওরা। রাজা রিকার্ডোর সৈন্যাবাসের ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া জোগাড় করেছে। তারপর ঘোড়া চালিয়ে রাজা রিকার্ডোকে ধরতে আসছে। ফ্রান্সিস বুঝল গাড়ির গতি বাড়াতে না পারলে ধরা পড়তে হবে।

ফ্রান্সিস একটু এগিয়ে কোচম্যানকে ইঙ্গিতে নেমে আসতে বলল। কোচম্যান চলন্ত গাড়ি থেকে এখানে ওখানে পা রেখে নেমে আসতে ফ্রান্সিস তাকে নিজের ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল। নিজে গাড়ির পাদানিতে পা রেখে তারপর কোচম্যানের মত কয়েকটা জায়গায় পা ফেলে ফেলে কোচম্যানের আসনের কাছে এল। আসনে বসেই কোচম্যানের রেখে যাওয়া চাবুকটা ধরল। ততক্ষণে ফ্রান্সিসের গাড়ির গতি কমে গেছে। ফ্রান্সিস ঘোড়া দুটোর পিঠে চাবুক মেরে বলে উঠল— তুমি ভাই যেভাবে পারো পালাও, কোচম্যান বাঁদিকে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল। তারপর প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাল।

ফ্রান্সিস একবার পেছন দিকে তাকাল। দেখল ফার্নান্দোর সৈন্যরা ছুটে আসছে। ওরা অনেকটা এগিয়ে এসেছে। তখনই দেখল সৈন্যদের আগে রাজা ফার্নান্দো নিজে ঘোড়া চালাচ্ছে। ফ্রান্সিস স্থির করল ধরা দেবে না।

ফ্রান্সিস কোচম্যানের পাদানির ওপর ভর রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ঘোড়া দুটোর পিঠে চাবুক মেরে চলল। গাড়ির গতি বাড়ল। একটু পরেই দেখল— নিজেদের গাড়িটা অনেকটা এগিয়ে এসেছে। আবার চাবুক মারতে লাগল। গাড়িটা আরো এগিয়ে গেল। ফার্নান্দো বেশ পেছনে পড়ে গেছে।

তখনই ডানদিকে একটা টিলামত দেখা গেল। টিলাটার মাথা ন্যাড়া। টিলার নিচে ছাড়া ছাড়া ছোট ছোট জংলা গাছ। তারপরেই উঁচু উঁচু গাছ টিলার তলা পর্যন্ত বিস্তৃত।

ফ্রান্সিস দ্রুত গাড়ি ডানদিকে ঘোরাল। ছোট ছোট গাছপালার ওপর দিয়ে গাড়ি চলল। বড় বড় গাছগুলো আসতেই ফ্রান্সিস গাড়ি থামাল। তারপর সন্তর্পণে গাড়ি চালিয়ে কয়েকটা বড় গাছের আড়ালে এসে গাড়ি থামাল।

কোচওয়ানের জায়গা থেকে নেমে এল। গাড়ির বন্ধ জানালার কাছে এসে গলা চড়িয়ে বলল—মানবের রাজা—রাজা ফার্নান্দো কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আমাদের পিছু ধাওয়া করছে। আমি গাড়িটা একটা উঁচু টিলার আড়ালে এক জঙ্গলে এনেছি। মনে হয় ওদের দৃষ্টি এড়াতে পারবো। রাজা একটু ভগ্ন গলায় বলল—গাড়ি চালিয়ে ওদের নাগাল থেকে পালানো যায় না।

ফ্রান্সিস বলল—না। আমাদের গাড়ির ঘোড়া দুটো খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ওরা তো শুধু ঘোড়া চালিয়ে আসছে। আমাদের ঘোড়া দুটোকে একটা গাড়ি আর

আরোহীদের টেনে আনতে হয়েছে।

—হুঁ। মনে হয় আমরা ওদের হাত থেকে পালাতে পারবো না। রাজা বললেন।

—সেইজন্যেই এইভাবে আড়াল নিয়ে এড়াবার চেষ্টা করলাম। এখন দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরে রাজা ফার্নান্দো আর পাঁচজন সৈন্য টিলার কাছে এল। সম্মুখে তাকিয়ে দেখল পাথর ছড়ানো রাস্তা সোজা চলে গেছে। রাজা রিকার্ডোর গাড়িটা বেপাত্তা।

ফার্নান্দো ঘোড়া থামালেন। সৈন্যরাও ঘোড়া থামাল। ফার্নান্দো বললেন—এভাবে একটা গাড়ি আরোহীসমেত শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে না। ওরা এখানে কোথাও গাড়িসুদ্ধু নিজেরাও গা ঢাকা দিয়েছে। টিলার ওপাশটা খোঁজ।

সৈন্যরা ঘোড়া থেকে নামল। চলল টিলার পেছন দিকে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুঁজল। টিলাটার ঠিক নিচেই ঘন বনটায় ঢুকতে পারল না। এত ঘন জঙ্গল। ওরা ফিরে এল। রাজাকে এসে বলল সব।

এবার রাজা ফার্নান্দো ঘোড়া থেকে নামলেন। তরোয়াল বের করলেন। তরোয়ালটা উঁচিয়ে ধরে প্রথমে ছোট ছোট গাছের ডালপালা কেটে কেটে এগিয়ে গেলেন টিলাটার নিচের জঙ্গলের দিকে। পেছনে পাঁচজন সৈন্য। বড় বড় গাছের গুঁড়ি কাণ্ড ডালপালা সব মিলিয়ে বেশ ঘন বন।

আর ঢোকা গেল না। রাজা ফার্নান্দো তবু ঐ জায়গারই আশেপাশে খুঁজতে লাগলেন।

তখনই হঠাৎ ঘোড়ার মৃদু ডাক শোনা গেল। রাজা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কান পেতে রইল। আবার ঘোড়ার ডাক। আগের চেয়ে একটু জোরে। বাঁদিক থেকে ডাক শোনা গেল।

রাজা ফার্নান্দো সঙ্গে সঙ্গে বাঁদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তরোয়াল লতাপাতা ডাল কাটার জন্যে খোলাই ছিল। খোলা তরোয়াল নিয়ে ফার্নান্দো ঘোড়ার ডাকের দিক স্থির করে চলল। সৈন্য পাঁচজনও চলল। ফার্নান্দো সাবধান হলেও পায়ের নিচে শুক্‌নো ডালপাতা ভাঙার শব্দ হতে লাগল।

হঠাৎ গাড়ি চলার শব্দ হল। ফার্নান্দো চিৎকার করে বললেন—গাড়ি আটকাও। ফার্নান্দোর সঙ্গে পাঁচজন সৈন্যও ছুটল।

একটু এগোতেই দেখল গাড়িটা জোরে চালাবার চেষ্টা করছে কোচওয়ান। সৈন্যরা ছুটে গিয়ে গাড়ির চাকা ধরে দেখল। গাড়ি থেমে গেল।

রাজা ফার্নান্দো এগিয়ে গেলেন। গাড়ির দরজা খোলার ইঙ্গিত করলেন। একজন সৈন্য ছুটে গিয়ে গাড়ির জানালা খুলতে চেষ্টা করল। পারল না। সঙ্গী সৈন্য দুজন এগিয়ে এল। তার মানে ওরা জানালা ভেঙে ফেলবে।

ফ্রান্সিস কোচওয়ানের আসন থেকে নিচে নেমে এল। বলল—জানালা ভাঙবেন

না। আমি খোলবার ব্যবস্থা করছি। সৈন্য তিনজন দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস বন্ধ জানালার গায়ে মুখ নিয়ে বলল—মান্যবর রাজা—আমরা ধরা পড়ে গেছি। একটা ঘোড়া ডেকে উঠেছিল বলে। যাকগে—রাজা ফার্নান্দো সামনেই কয়েকজন সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা ধরা পড়ে গেছি। আপনারা জানালা খুলে দিন।

একটু পরেই জানালা খুলে গেল। দেখা গেল রাজা রিকার্ডো রাণি রাজকুমারী আর মারিয়া গাড়িতে বসে আছে।

রাজা ফার্নান্দো গাড়ির জানালার কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন—রিকার্ডো—আজকে তোর নিস্তার নেই। নেমে আয়। শুধু দুজনের লড়াই। দেখা যাক কে বাঁচে কে মরে। রিকার্ডো দুর্বলকণ্ঠে বললেন—আমি আহত। আমাকে সুস্থ হতে দে। তারপর যেখানে খুশি আমাকে ডাকলেই একা লড়তে যাবো।

—না—না। আজকেই ফয়েসলা হবে। ফার্নান্দো খোলা তরোয়াল ঘুরিয়ে বললেন—বাইরে আয়।

রাণী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। মারিয়া রাজকুমারীকে কোলে বসান। রাজা রিকার্ডো আস্তে আস্তে উঠলেন। গাড়ি থেকে নেমে এলেন।

রাজা রিকার্ডোর মাথায় মুকুট নেই। কাঁচাপাকা লম্বা লম্বা চুল কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে। মাথার পেছনের লম্বা চুল নেমে এসেছে ঘাড় পর্যন্ত। চোখ দুটো লালচে। ঘুমুতে পারেন নি বলে অথবা কেঁদেছেন—নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে।

রাজা ফার্নান্দো চেয়ে চেয়ে দেখলেন। পট্টি বাঁধা জায়গাটা দেখলেন। তারপর বললেন তরোয়াল বের কর। আজ দুজনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। রিকার্ডো আস্তে আস্তে কোমরের খাপ থেকে তরোয়াল বের করলেন।

রাজা ফার্নান্দো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রিকার্ডো কোনরকমে মার্‌টা ঠেকালেন তরোয়াল দিয়ে।

হঠাৎ ফ্রান্সিস ছুটে এসে দুজনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। ফার্নান্দো একটু অবাকই হলেন। বললেন—দ্বন্দ্বযুদ্ধ হচ্ছে। তুমি সরে যাও। ফ্রান্সিস ফার্নান্দোকে আস্তে আস্তে বলল—মান্যবর রাজা—এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলাফল কী হবে তা এখানে উপস্থিত সবাই জানে। দ্বন্দ্বযুদ্ধ বলে নিজের মনকে আপনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন। একে সুযোগ বুঝে হত্যা করা বলা যায়। যে মানুষটা তরোয়াল পর্যন্ত তুলতে পারছেন না আপনি তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমেছেন। এটা অমানবিক।

—তুমি সরে যাও। দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলবে। ফার্নান্দো বললেন।

—হ্যাঁ দ্বন্দ্বযুদ্ধই চলবে। তবে রাজা ফার্নান্দোর জায়গায় লড়বো আমি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা ফার্নান্দো হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন—তার আগে আমার দেহরক্ষীদের সঙ্গে লড়ো। তারপর আমার সঙ্গে লড়বে।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—আমার দেহরক্ষীরা কিন্তু সাধারণ সৈন্য নয়। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারাই আমার দেহরক্ষী হয়। রাজা ফার্নান্দো বললেন।

—পরোয়া নেই। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

তখনই মারিয়া চিৎকার করে ডাকল—ফ্রান্সিস—শান্ত হও।

—উপায় নেই মারিয়া। একজন আহত মানুষকে খুন করা চোখে দেখি কী করে। ভেবো না—আমি জয়ী হবোই। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসের চারপাশে পাঁচজন দেহরক্ষী খোলা তরোয়াল নিয়ে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস রিকার্ডোকে গিয়ে বলল—

—মান্যবর—আপনার তরোয়ালটা দিন।

—কিন্তু তুমি আমার জন্যে—

—হ্যাঁ—আপনার জন্যেই লড়বো।

রাজা রিকার্ডো তরোবারিটা ফ্রান্সিসকে দিলেন। কিছু বললেন না। মাথা ঝুঁকিয়ে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে এদিক ওদিক নাড়লেন।

ফ্রান্সিস তরোয়ালটা নিয়ে একটুক্ষণ চোখ বুঁজে রইল। তারপর চোখ খুলে তৈরি হয়ে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের তখন অন্য চেহারা। রুখে দাঁড়াল ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিসের সে এক রুদ্রমূর্তি।

শুরু হল তরোয়ালের যুদ্ধ। ফ্রান্সিস বিদ্যুৎবেগে ঘুরে ঘুরে দেহরক্ষীদের সঙ্গে তরোয়ালের লড়াই চালাল। একজন দেহরক্ষী সুযোগ বুঝে ফ্রান্সিসের বুক লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। সরে আসতে গিয়েও তরোয়ালটা ফ্রান্সিসের বুকের ওপর দিয়ে ঘেঁষে গেল। জামা কেটে গেল। শরীরেও কেটে গেল। রক্ত বেরিয়ে এল। জামা খোলা। ফ্রান্সিস মুহূর্তে সেই দেহরক্ষীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রক্ত দেখে ফ্রান্সিসের মাথায় যেন খুন চেপে গেল। প্রচণ্ড জোরে তরোয়াল চালাল। দেহরক্ষীর ঘাড়ের ওপর পড়ল সেই মার। দেহরক্ষী উবু হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এপাশ ওপাশ করতে লাগল।

এবার দুজন দেহরক্ষী ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস তৈরি ছিল।

দ্রুত হাতে তরোয়াল চালাল। একজনের হাত কেটে গেল। ও বসে পড়ল হাত থেকে তরোয়াল খসে পড়ে গেল। অন্যজনের পিঠে তরোয়াল গভীরভাবে বসে গেল। সে উবু হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

রাজা ফার্নান্দো গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন থামো।

ফ্রান্সিস তরোয়াল নামাল। বাকি দুজন দেহরক্ষী ভীতমুখে সরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস তখন মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে।

ফার্নান্দো তরোয়াল কোষবদ্ধ করলেন। গলা চড়িয়ে বললেন—আমার সিদ্ধান্ত আমি জানাচ্ছি।

রিকার্ডোকে সেভিল নিয়ে যাবো। একটা কয়েদঘরে সারা জীবনের জন্য বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

—আর রাণি ও রাজকুমার? ফ্রান্সিস বলল।

—তারা এখানকার প্রাসাদে থাকবে। তাদের সঙ্গে তো আমার শত্রুতা নেই। ফার্নান্দো বললেন।

রাণিমা গলা চড়িয়ে বললেন—আমি রাজপ্রাসাদে থাকবো না। ছেলেকে নিয়ে আমি স্বামীর সঙ্গে থাকবো। যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন।

রাজা ফার্নান্দো দুহাত ছড়িয়ে হতাশার ভঙ্গি করলেন। বললেন, ঠিক আছে আপনি যা চান তাই হবে। আপনারা এখন প্রাসাদে ফিরে যান। কালকে সেভিলে ফিরে যাবার সময় রিকার্ডোকে নিয়ে যাবো।

রাণিমা বললেন, আমরাও যাবো।

—বেশ যাবেন। তারপর দুই আহত দেহরক্ষীকে বললেন তোমরা এখানকার কৃষকদের বাড়িতে যাও। একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি জোগাড় করো। আহতদের নিয়ে ক্যামেরিনালে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

রাজা ফার্নান্দো ধরধরে সাদা ঘোড়াটার রেকাবে পা রেখে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়লেন। তারপর ঘোড়া ছোটালেন ক্যামেরিনালের দিকে।

রাজা রিকার্ডো আস্তে আস্তে রাজবাড়ির গাড়িতে উঠলেন। রাণি কোন কথা বললেন না, বার বার চোখ মুছলেন. মারিয়া রাজকুমারকে জড়িয়ে ধরে রইল।

ফ্রান্সিস কোচওয়ানের জায়গায় উঠে বসল। তারপর ঘোড়া দুটোর পিঠে চাবুক মারল। ঘোড়া দুটো ছুটল। গাড়ি কিছুটা দ্রুতই চলল। ওর গাড়ি চালানো দেখে রাজা রিকার্ডো বললেন ফ্রান্সিস বোধহয় একসময় কোচওয়ানের কাজ করেছে। ফ্রান্সিস এবার ঘোড়াদুটোর এপাশে ওপাশে চাবুক হাঁকড়ালো। গাড়িটা আরো দ্রুতগতিতে ছুটল।

একসময় ফ্রান্সিস দেখল একজন অশ্বারোহী ওদের গাড়ির দিকে ছুটে আসছে। কাছাকাছি আসতে ফ্রান্সিস চিনল—এই গাড়ির কোচওয়ান। ফ্রান্সিস হেসে গলা চড়িয়ে বলল, —তাহলে বেঁচে আছো। কোচওয়ান হেসে বলল—হ্যাঁ। গোড়া নিয়ে একটা তুলাক্ষেতে ঢুকে পড়েছিলাম। যাব তো—রাজারাণি কেমন আছেন?

—ভালো। তবে আর বোধহয় ভালো থাকতে পারবেন না। রাজা ফার্নান্দো রাজা রিকার্ডোকে সেভিলে নিয়ে গিয়ে চিরদিনের জন্য কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবে বলেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—বলেন কি? কোচওয়ান বলল।

—হ্যাঁ-এটাই রাজা ফার্নান্দোর পরিকল্পনা। যাকগে সবই শুনবে জানবে। এখন ভাই তুমি কিছুক্ষণ গাড়ি চালাও। গাড়িতে গিয়ে উঠে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবো। বড় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। ফ্রান্সিস গাড়ির গতি কমাল। কোচওয়ান ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়াটার গলার সাজে একটা দড়ির মুখ বাঁধল। তারপর দড়ির অন্য মুখটা গাড়ির পেছনে বাঁধল। ঘোড়াটা গাড়িটার সঙ্গে সঙ্গে চলল।

কোচওয়ান গাড়িটা উঠল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে নেমে পাদানিতে পা রেখেছে।

গাড়ির দরজায় টোকা দিয়ে ঢাকল মারিয়া। গাড়ির ভিতর থেকে মারিয়া বলল—বলো। দরজা খোল। আমি গাড়ির ভেতরে বসবো। খুব ক্লান্ত আমি। ফ্রান্সিস বলল।

গাড়ির দরজা খুলে গেল। ফ্রান্সিস ভেতরে ঢুকে মারিয়ার পাশে বসল। দেখল রাজা রিকার্ডো গম্ভীর মুখে বসে আছেন। চোখ দুটো লাল। বোঝা গেল—উনি কেঁদেছেন। রাণি তো কেঁদে কেঁদেই চলেছেন। কিশোর রাজকুমার কিছুই বুঝতে পারছে না—এখন কী করবে। ছোট রাজকুমার মারিয়ার গা ঘেঁষে বসে আছে। মারিয়া মাঝে মাঝে ওর কপালে গালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস নিম্নস্বরে বলল—মাননীয় রাজা—এখন আর গাড়ির দরজা জানালা বন্ধ রেখে কী হবে? জানালা খুলে দেব?

—দাও। রাজা রিকার্ডোর গম্ভীর কণ্ঠস্বর। মারিয়া জানালাগুলো খুলে দিল। একটা শীতার্ত হাওয়া ছুটে এল। গাড়ির মধ্যে আর গুমট ভাবটা রইল না।

—মহামান্য রাজা—এখন আপনি কী করবেন? ফ্রান্সিস বলল? রাজা রিকার্ডো একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। দেখলেন তাঁকে ও রাণীকে দেখা লোকজন ছুটে আসছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালেন। বললেন—আমার ছোট ভাই ফার্নান্দো তো আমার ভাগ্য নির্ধারণ করে গেছে। আমাকে —আর মাননীয় রাণি রাজকুমার? রাণি বলে উঠলেন—আমরাও রাজার সঙ্গে ঐ বন্দীশালায় থাকবো। যতদিন বাঁচবো ততদিন।

রাজপ্রাসাদের প্রশস্ত পাথর বাঁধানো চত্বরে গাড়ি এসে দাঁড়াল।

রাজা রাণি রাজকুমার নামল। রাজাপ্রাসাদের কয়েকজন পরিচায়ক এগিয়ে এল। রাজা রিকার্ডো কোনদিকে না তাকিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। নিজের শয়ন কক্ষে গিয়ে বিছানায় বসলেন। বাঁ হাড়ের কাটা জায়গাটার ব্যথা আরও বেড়েছে। কিন্তু তিনি রাজ্যবদ্যিকে ডেকে পাঠালেন না। ব্যথা বেদনা সহ্য করতে লাগলেন।

রাণি রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে নিজের শয়নকক্ষের দিকে যাচ্ছেন তখনই সব পরিচায়িকারা দল বেঁধে এল। ওরা বলল—রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা তাদের এখানকার ঘরগুলোতে বন্দী করে রেখেছিলেন। দিন তিনেক তাদের শুধু জল খেতে দেওয়া হয়েছিল। তিন দিন ওরা না স্নান না খাওয়া। ওদের ঘর থেকে বেরোবার হুকুম ছিল না।

তিন দিন পর ওদের ওপর শাসন একটু শিথিল হল।

পরিচারিকাদের স্নান করতে দেওয়া হয় খেতে দেওয়া হয়। তিন দিনের বন্দী দশা থেকে ওরা মুক্তি পায়। রাজা রাণি আর রাজকুমারকে ফিরে পেয়ে রাজ-প্রাসাদের পরিচারক পরিচারিকারা খুব খুশি। আনন্দে তারা প্রায় নাচানাচি শুরু করল। কিন্তু যখন শুনল রাজাকে রাজা ফার্নান্দো সেভিলে নিয়ে গিয়ে চিরজীবনের জন্যে বন্দী করে রাখবে তখন তাদের কষ্টে বুক ভেঙ্গে গেল। সেই বন্দীশালায় রাণি ও তাঁর ছেলেকে নিয়ে থাকবেন এটাও তারা শুনল। ওরা ভেবেছিল রাজা রাণি

রাজকুমার ফিরে এলেন। ওরা সেই উপলক্ষে আনন্দ উৎসব করবে। এখন এসব জেনে ওরা মনমরা হয়ে গেল।

ওদিকে রাজা ফার্নান্দোর হুকুমে সেনাপতিসহ সব সৈন্যরা প্রান্তরে সমবেত হল।

রাজা ফার্নান্দো এলেন। পরণে যুদ্ধের পোশাক নয়। ঢোলা হাতা গভীর রঙের আলখাল্লা মত। গলায় ঝুলছে মুক্তোর মালা। আর কোন অলঙ্কার নেই।

সৈন্যরা তাঁকে দেখে তাঁর নামে জয়ধ্বনি করল। রাজা ফার্নান্দো ডালা চড়িয়ে বলতে লাগলেন—আমার দেশপ্রেমিক সৈনিকরা—যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে। এখন তোমাদের যা করণীয় তা বলছি। আমি কাল সকালে রিকার্ডোর শৌখিন জাহাজে চড়ে দেশে ফিরে যাব। একটা যুদ্ধজাহাজ আমার সঙ্গে যাবে। তাতে অর্ধেক সৈন্যদল যাবে। বাকিরা এখানে থাকবে। আমি চলে গেলে আমাদের সেনাপতির হাতে আমার সব ক্ষমতা দিয়ে যাবো। সেনাপতিই আমার প্রতিনিধিরূপে এখানে রাজত্ব করবে। তোমরা তার হুকুম মেনে চলবে। রিকার্ডোর আহত সৈন্যদের এখানকার সৈন্যাবাসে রাখা হয়েছে। চিকিৎসা চলছে। বাকিরা তিনটি কয়েদঘরে বন্দী হয়ে আছে। এখন না পরে ভেবে দেখছি তাদের নিয়ে কী করা যায়। রাজা ফার্নান্দো থামলেন। তারপরে আবার বলতে লাগলেন—গুপ্তচরেরা খবর এনেছে মালাগার শাসনকর্তা ভিসিলভা এই ক্যামেরিনাল আক্রমণ করার জন্যে সৈন্য বাহিনীকে তৈরি করছেন। কাজেই আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে। একটু থেমে বলতে লাগলেন—এক সপ্তাহের মধ্যে শৌখিন জাহাজটা ফিরে আসবে। রিকার্ডোকে বন্দী করে সেভিল নিয়ে যাবে। সেখানে তাঁকে কয়েদঘরে সারা জীবনের জন্যে বন্দী করে রাখা হবে। আজ যে আদেশগুলি দিয়ে গেলাম তাই তোমাদের পালন করতে হবে। রাজা ফার্নান্দো থামলেন। সৈন্যরা মুক্তকণ্ঠে রাজা ফার্নন্দোর জয়ধ্বনি দিল।

পরদিন সকালে জাহাজঘাটে রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা জড় হল। সেনাপতি ঘোড়া চড়ে সব তদারকি করছে। সেনাপতি সৈন্যদের দুটো ভাগ করল। একদল ফার্নান্দোর সঙ্গে সেভিল ফিরে যাবে। অন্যদল এখানে থাকবে।

একটু বেলা হতে রাজা ফার্নান্দো ঘোড়ায় চড়ে জাহাজঘাটে এলেন। সৈন্যরা তার জয়ধ্বনি করল। রাজা ফার্নান্দো হাত নেড়ে সৈন্যদের উৎসাহিত করলেন। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে শৌখিন জাহাজ থেকে পাতা পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে জাহাজে উঠলেন। যে সৈন্যরা সেভিল দিয়ে যাবে তারাও পাতা পাটাতনের উপর দিয়ে হেঁটে যুদ্ধজাহাজটায় উঠল।

কিছুপরে দুটো জাহাজই যাত্রা শুরু করল। সেদিন জোরে বাতাস বইছিল। জাহাজদুটোর পালগুলো সেই হাওয়ায় দ্রুত চলল সমুদ্রের জলের মাথায় বিন্দুর মত হয়ে গেল। তারপরই দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। ফার্নান্দোর সৈন্যরা তখনও ঘাটে দাঁড়িয়ে রইল। সেনাপতির উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—সৈন্যাবাসে ফিরে চলো। সৈন্যরা সারি বেঁধে দাঁড়াল। তারপর চলল সৈন্যাবাসের দিকে।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা দেখল। ফার্নান্দোর সৈন্যরা যখন সার বেঁধে ফিরে এল ওরাও তখন ফিরে এল রাজপ্রাসাদে। ওখানেই একটা ঘরে ওরা আশ্রয় নিয়েছে।

পরদিন সকালেই দুজন সৈন্য নিয়ে সেনাপতি এসে হাজির। দরজায় ধাক্কা দিল সঙ্গী সৈন্যদের একজন চেঁচিয়ে বলল—এই বিদেশী ভূতেরা—দরজা খোল্।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোর আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দরজায় ধাক্কা দেওয়া চলল। শাঙ্কো উঠল। আস্তে আস্তে গিয়ে দরজা খুলল। সেনাপতি আর সৈন্যরা হুড়মুড় করে ঢুকল। সেনাপতি বলল—চলো—তোমরা বন্দী। তোমাদের কয়েদঘরে থাকতে হবে। ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—আর কতবার কয়েদঘরে ঢুকবো। আমরা যাবো না।

—তার মানে? সেনাপতি বলল।

—আমরা এখানেই থাকবো। শাঙ্কো বলল।

—এখন এখানে আমার কথাই আদেশ তা জানো? সেনাপতি বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। ফ্রান্সিস বলল—রাজা ফার্নান্দো আপনাকে এখানকার শাসনকর্তা করে গেছে। কিন্তু সেটা আপনাদের সৈন্যদের ওপরে এখানকার অধিবাসীদের ওপরে। আমরা বিদেশী। আমাদের ওপর আপনার হুকুম চলবে না।

—কী বললে? সেনাপতি চেঁচিয়ে বলল। তারপর সৈন্যদুজনের দিকে তাকিয়ে বলল—এদের কয়েদখানায় নিয়ে যাও।

সৈন্য দুজন এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস একজন সৈন্যের বর্মের চামড়ার ফিতে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল। বর্ম মেঝেয় পড়ে গেল। সৈন্যটি অসহায়ভাবে সেনাপতির দিকে তাকাল। সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে তরবারি কোষমুক্ত করল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস—ঝামেলা বাড়িও না। চলো কয়েদখানায়। যা বলছে শোনো।

—বেশ—চলো। দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সেনাপতি চলল কয়েদখানার দিকে। প্রহরীরা দরজা খুলল। ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢোকাল। সেনাপতি তরোয়াল কোষবদ্ধ করল।

ফ্রান্সিসদের একঘেয়ে দিন কাটতে লাগল।

ওদিকে রাজা রিকার্ডোর দিন কাটতে লাগল গভীর দুঃখে-বেদনায়। তাঁকে রাজপ্রাসাদে তাঁর ঘরেই থাকতে দেওয়া হয়েছে। হাত বাঁধা নেই। তবু রিকার্ডোর মনে শান্তি নেই। কাঁধের ঘা খুবই কষ্ট দিয়েছে তাঁকে। এখন সুস্থ। কাটা ঘা সেরে গেছে।

রাজা রিকার্ডো বিছানায় চুপ করে বসে ভাবেন। ভাবেন আর ভাবেন। সেভিলে নিয়ে গেলে চিরজীবনের বন্দীদশা। এখানেই বা কম কি। তাঁর কাছে কারো আসার হুকুম নেই। এই হুকুম সেনাপতির। রিকার্ডো মুক্তির উপায় ভাবতে লাগলেন। উত্তরের পাহাড়ি এলাকায় তলেদোবাসীরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। রাজা ফার্নান্দো হঠাৎই আক্রমণ করেছিল। তাই তিনি তলেদোদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন নি।

তাদের সাহায্য সহযোগিতা পেলে হয়তো আবার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। কিন্তু কিভাবে যোগাযোগ করবেন? এখন তো তিনি বন্দী। তাঁর কাছে কারো আসার হুকুম নেই। রাণি পর্যন্ত আসতে পারেন সারাজীবনে একবার। সেনাপতির কড়া হুকুম।

হঠাৎই মনে পড়ল ফ্রান্সিসের কথা। ঋজু দেহ। বলিষ্ঠ যুবক। ওর সাহায্য পেলে তলেদোদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। কিন্তু যুবকটি এখন কোথায়? রাজা রিকার্ডো এসব ভাবছেন তখনই রাণি ঘরে ঢুকলেন। বিছানায় এসে বসলেন। রিকার্ডো বললেন— জানো একটা উপায়ের কথা ভাবছি। সফল হলে ফার্নান্দোর সৈন্যদের যুদ্ধে হারিয়ে আমি মুক্ত হতে পারবো।

—উপায়টা কী? রাণি বললেন।

—উত্তরদিকে তলেদো উপজাতিরা থাকে। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ওরা। ওদের নিয়ে যুদ্ধে নামতে পারলে জয় সুনিশ্চিত। রাজা বললেন।

—কিন্তু তুমি তো বন্দী। ওদের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করবে? রাণি বললেন।

—একটি যুবক। ভাইকিং ওরা। আমাদের উদ্ধার করল। রাজা বললেন।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওর নাম ফ্রান্সিস। ওদেশের রাজকুমারীই তো ফ্রান্সিসের স্ত্রী—মারিয়া। রাণি বললেন।

—তাই নাকি। তাহলে তো ভালোই হল। এই মারিয়াকে বলো ও যে ভাবেই হোক ফ্রান্সিসের সঙ্গে যেন যোগাযোগ করে। রাজা বললেন।

—আচ্ছা বলবো। রাণি বললেন।

নিজের শয্যাকক্ষে এসে রাণি একজন পরিচারিকাকে পাঠালেন মারিয়াকে ডেকে আনতে। কিছু পরে মারিয়া এল। রাণি রাজার সব কথা বললে। তারপর বললেন— ফ্রান্সিস এখন কোথায় তুমি জানো?

—না। তবে ফ্রান্সিসকে আর কোথাও পাওয়া না গেলে বুঝতে হবে কয়েদঘরে আছে। মারিয়া বলল।

—তাহলে সেখানেই একবার খোঁজ কর। রাণি বললেন।

—দেখি। মারিয়া বলল।

—ফ্রান্সিসকে বলো আমাদের দেশে উত্তরদিকে তলেদো বলে একটা পাহাড়ি জায়গা আছে। তলেদোর অধিবাসীরা বীর যোদ্ধা। ওরা রাজা রিকার্ডোকে শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে। রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা গভীর রাতে আক্রমণ করেছিল। তখন আমাদের সৈন্যরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। রাজা রিকার্ডো যদি তলেদোদের সংবাদ পাঠাবার সময় পেতেন তাহলে যুদ্ধের ফল অন্যরকম হত। আমরা জয়ী হতাম। থাকগে—মারিয়া, তুমি ফ্রান্সিসের খোঁজ খবর করো।

—দেখি চেষ্টা করে কোন খবর পাই কি না। মারিয়া বলল।

সকালের খাবার খেয়ে মারিয়া একজন পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদের

বাইরে এল। চলল সৈন্যাবাসের দিকে। সৈন্যাবাসের সামনে আসতে একজন প্রহরী এগিয়ে এল। বলল—

—আপনারা এখানে কেন?

—কাজ আছে। মারিয়া বলল।

—কার সঙ্গে কাজ? প্রহরী বলল।

—সেনাপতির সঙ্গে। মারিয়া বলল।

—দাঁড়ান। সেনাপতিকে কী বলবো? প্রহরী বলল।

—বলবেন যে ভাইকিং দেশের রাজকুমারী দেখা করতে এসেছেন। মারিয়া বলল। প্রহরীটি একটা ছোট ঘরের দিকে চলল। ঘরটায় ঢুকল। একটু পরে বেরিয়ে এল। মারিয়াদের কাছে এসে বলল—আপনি যান।

মারিয়া ঘরটায় ঢুকল। দেখল রোগা সেনাপতি একটা কালো কাঠের বাঁকা পায়ের চেয়ারে বসে আছে। সামনে একটা পাথর বাঁধানো ছোট টেবিল। তাতে কিছু কাগজপত্র। ওপাশে একটা খালি চেয়ার। সেনাপতি ইঙ্গিতে বসতে বলল। মারিয়া চেয়ারটায় বসল। সেনাপতি বলল—কী ব্যাপার?

—ব্যাপার এমন কিছু নয়। আমার স্বামী ফ্রান্সিস—সে এখন কোথায়? মারিয়া বলল।

—গুপ্তচরের যেখানে জায়গা হয়—কয়েদখানায়। সেনাপতি বলল।

—ফ্রান্সিস বা আমরা কেউ গুপ্তচর নই। যাকগে—ফ্রান্সিসের সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই। মারিয়া বলল।

—কেন? সেনাপতি বলল।

—আমাদের সোনার চাকতিগুলো আমাদের জাহাজের কোথায় আছে সেটা জানতে চাইব। ফ্রান্সিস ছাড়া আর কেউ এটা জানে না। মারিয়া বলল।

—হুঁ। সেনাপতি মাথা ওঠাল নামালো। তারপর বলল—এতে আমার আপত্তি নেই। প্রহরীকে সঙ্গে দিচ্ছি। ওর সামনে আপনারা কথা বলবেন। বুঝতেই পারছেন এখন আমাদের অনেক সতর্ক থাকতে হচ্ছে। কথাটা শেষ করে প্রহরীকে ডাকলেন। সব নির্দেশ বুঝিয়ে দিল।

প্রহরী আগে আগে চলল। পেছনে মারিয়া আর পরিচারিকা। মারিয়া তখন ভেবে চলেছে—কীভাবে প্রহরীটাকে এড়ানো যায়। ও গলা নামিয়ে সমস্যার কথাটা পরিচারিকাকে বলল। বলল—ঐ প্রহরীকে যেভাবে পারো একটু দূরে সরাবে যাতে আমরা ভালোভাবে সব কথা বলতে পারি। পরিচারিকাটি খুবই চালাক। হেসে বলল—আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমিই ওকে জব্দ করবো।

তিন চারটে কয়েদঘর ছাড়িয়ে প্রহরী একটা কয়েদঘরের সামনে এসে হাজির হল।

পাহারাদারের একজনকে বলল—ঐ যে বিদেশী ভূতটা—ওটা কি এখানে আছে?

—হ্যাঁ। পাহারাদার বলল।

—ডাকো তো ওকে। সৈন্যটি বলল।

লোহার গরাদের ফাঁকে মুখ রেখে পাহারাদার ডাকল—এই বিদেশী ভূত তোকে ডাকছে। ততক্ষণে দরজার কাছে ভিড় জমে গেছে। অবাক হয়ে সবাই মারিয়াকে দেখছে। মারিয়ার খুব অস্বস্তি হতে লাগল।

ফ্রান্সিস একটু পরেই লোহার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। প্রহরীটি এগিয়ে আসতে যাবে তখনই পরিচারিকাটি প্রহরীটির প্রায় পথ আটকে দাঁড়াল। বলল—আচ্ছা আপনার দেশ কোথায় বলুন তো?

—কেন বলুন তো? প্রহরী বলল।

—মানে—আমার মনে হচ্ছে আপনাকে আপনার গ্রামে দেখেছি। পরিচারিকাটি বলল।

—ও। আমাদের বাড়ি মার্সিয়ার হিস্তাল গ্রামে—

পরিচারিকাটি হেসে উঠে হাততালি দিল। প্রহরীটিও হেসে উঠল।

মারিয়া এক নজর ব্যাপারটা দেখে নিল। তারপর নিম্নস্বরে বলল—উত্তরদিকে তলেদো নামে এক উপজাতি বাস করে। তারা যুদ্ধে নিপুণ। তেমনি সাহসী। তারা রাজা রিকার্ডোকে ভালোবাসে ভক্তিও করে। রাজা রিকার্ডো এদের এনে যুদ্ধে লাগাতে পারেন নি। যুদ্ধে হেরে যান তিনি।

—ও। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল।

—এখন রাজা রিকার্ডো বললেন—তোমার কাছে এসে একথা বলতো রাজা চাইছেন যদি তুমি কোনভাবে তলেদো উপজাতিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো আর ওদের এখানে আনতে পারো তাহলে এখানে আবার লড়াই হবে। রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা হেরে যাবে।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ করে রইল। ভাবল। বলল—এটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। কিন্তু তার আগে তো এই কয়েদখানা থেকে মুক্তি চাই।

—হ্যাঁ—তোমাকে এখান থেকে পালাতে হবে। মারিয়া বলল।

—আগে সেই চেষ্টাটা করি। তুমি রাজাকে বলো গে আমি এখান থেকে পালাবার উপায়টা ভাবছি। যদি শেষ পর্যন্ত পালাতে পারি আমি তলেদোদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো। আবার লড়াই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই প্রাসাদের প্রহরী মারিয়ার কাছে এল। বলল—আপনার কথা হয়েছে?

—হ্যাঁ—মারিয়া বলল।

—তাহলে এবার আপনাকে ফিরে যেতে হবে। প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে। চলো। মারিয়া বলল।

মারিয়া আর কোন কথা ফ্রান্সিসকে বলল না। পরিচারিকাটি এল। মারিয়া ওর সঙ্গে প্রাসাদে ফিরে এল। রাণিমাকে সব কথা বলল। রাণিমা যেন একটু আশার আলো দেখলেন।

সন্ধ্যেবেলা রাণি রাজার শয়নকক্ষে এলেন। ফ্রান্সিসের সব কথা বললেন। রাজা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—যুবকটি বলশালী। সাহসী। ও যদি ওর বন্ধুদের নিয়ে আমার হয়ে লড়াইয়ে নামে তবে ফার্নান্দোর সৈন্যরা হার স্বীকার করতে বাধ্য। রাজা বললেন।

—এখন তুমি একটা কাজ করো। ফার্নান্দোর সেনাপতিকে অনুরোধ করো উনি যেন ফ্রান্সিসকে মুক্তি দেন। রাণি বললেন।

—অসম্ভব। আমি রাজা। রাজা হয়ে আমি একজন সেনাপতিকে অনুরোধ করতে পারি না। রাজা বললেন।

—তাহলে ফ্রান্সিসকে কয়েদঘর থেকে পালাতে হয়। কিন্তু সেটা খুবই কঠিন। রাণি বললেন।

—দিন কয়েক থাক। দেখা যাক ফ্রান্সিস পালাতে পারে কিনা। রাজা বললেন।

—হ্যাঁ—এখন আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া অন্যকিছু করণীয় নেই। রাণি বললেন।

ওদিকে ফ্রান্সিস মারিয়ার সঙ্গে কথা বলে নিজের জায়গায় এলো। দেয়ালে ঠেসান দিয় বসল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসের পাশে বসে বলল—রাজকুমারী এসেছিলেন কেন? কী কথা হল? ফ্রান্সিস সব কথা বলল। শাঙ্কো বলল—এখন তো আমরা বন্দী। এখন আমরা কী করতে পারি।

—হ্যাঁ—সে কথাই তো বললাম। তবে যা বুঝতে পারছি এখান থেকে পালাবার একটা উপায় বার করতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আচ্ছা ফ্রান্সিস—আমরা যদি সেনাপতিকে বলি—আপনি তো যুদ্ধে জিতে গেছেন। রাজার মতই এখন আপনি ক্ষমতাধর। আমাদের দুজনকে মুক্তি দিন। আমরা আমাদের জাহাজে চলে যাবো। রাজকুমারীকে নিয়ে আমরা দেশের দিকে জাহাজ চালিয়ে চলে যাবো।

—কী বলছো শাঙ্কো? ঐ তালপাতার সেপাইয়ের কাছে মাথা নোয়াবো? ফ্রান্সিস বলল।

—কার্যসিদ্ধির জন্য নানারকম চাল দিতে হয়। এও একটা চাল। এ চাল লাগলে ভালো না লাগলেও ক্ষতি নেই। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ভাবল। তারপর বলল—

—আগে পালাবার উপায়টা ভাবতে হবে। এটা যখন বুঝবো যে পালাবার কোন উপায় নেই তখন সেনাপতির সঙ্গে দেখা করে মুক্তি চাইতে যাবো। তার আগে নয়। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ—তাই করো। শাঙ্কো বলল।

ওদিকে মারিয়া রাণি মারফৎ ফ্রান্সিসের সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছে রাজাকে জানাল। সব শুনে রাজা রিকার্ডো কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—

—ফ্রান্সিসকে না পেলে কোন কাজই হবে না।

—ঠিক আছে। অরাগে দেখ ফ্রান্সিস কয়েদঘর থেকে পালাতে পারে কি না। না পারলে এখন অন্যরকম কিছু ভাবা যাবে। রাণি বললেন।

ওদিকে ফ্রান্সিস কয়েদঘর থেকে পালাবার উপায় ভাবতে লাগল। কিন্তু কোনটাই মনমত হচ্ছে না। ও চাইছিল এমনভাবে পালাবে যাতে নরহত্যা না হয়। কিন্তু দু' একজন পাহারাদারকে না হত্যা করলে পালানো যাবে না। কিন্তু ফ্রান্সিস অন্যভাবে ভাবতে লাগল। পাহারাদার কাউকে না মেরে পালাতে হবে।

শাঙ্কোও ভাবে। কিন্তু কুলকিনারা কিছু পায় না।

ফ্রান্সিস ও শাঙ্কো বাদে আর সবাই রিকার্ডোর সৈন্য। পালাবার কথা ওরাও ফ্রান্সিসদের বলে। কিন্তু কেউই কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না।

সেদিন রাজা রিকার্ডোর কয়েকজন সৈন্য ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—পেছনের দেয়ালে একটা পাথর নড়ে গেছে। দেখতো সেটাকে খুলে ফেলা যায় কিনা। ফ্রান্সিস আধশোয়া ছিল। লাফিয়ে উঠল। বলল—শাঙ্কো চলো তো।

কয়েকজন সৈন্যের সঙ্গে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো পেছনের দেয়ালের কাছে এল। সৈন্যরা পাথরের পাটাটা দেখাল। শাঙ্কো পাটাটার গায়ে হাত রাখল। ধাক্কা দিল। সত্যিই একটু নড়ে উঠেছে। এবার জোরে ধাক্কা দিল। পাটাটা আরো নাড়ল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে শাঙ্কো বলল—এটা খুলে ফেলা যাবে। একটু সময় লাগবে।

—তাই করো। যত সময় লাগুক। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো ঢোলা জামার নিচে থেকে ওর ছোরাটি বের করল। তারপর পাথরের পাটাটার খাঁজে খাঁজে ছোরার মাথা ঢুকিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাথরের পাটাটা অনেকটা আলগা হয়ে গেল। শাঙ্কো ছোরাটা ফ্রান্সিসকে দিল। হাঁপাতে লাগল। এবার ফ্রান্সিস পাথরের খাঁজে বন্দীরা মুক্তির আলো দেখতে পেল। তিন চারজন একসঙ্গে পাথরের পাটাটায় ধাক্কা দিল। পাথরের পাটাটা একটু শব্দ করেই খসে পড়ল। এবার দেয়াল ভাঙার ব্যাপারটা সহজ হল। একজনের পরে একজন বাকি পাটায় ধাক্কা দিতে লাগল। আলগা হয়ে পাথরের পাটা খসে পড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাঁকাটা বড় হল। রিকার্ডোর সৈন্যরা হাঁক দিয়ে গেল এদিক ওদিক ছুটে পালিয়ে গেল। কয়েদঘর শূন্য হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কো কয়েদঘরের বাইরে এল। দুজনে এক ছুটে দূরে চলে এল। দুজনে একছুটে দূরে চলে এল। শুনল—ফার্নান্দোর সৈন্যরা চিৎকার চ্যাঁচামেচি করছে। এতক্ষণে ওরা জানতে পেরেছে যে কয়েদঘর থেকে সব বন্দী পালিয়ে গেছে।

শাঙ্কো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—কী করবে এখন?

—উত্তরদিকে চলো। তলেদো উপজাতিদের গ্রামে যাবো। রাজা রিকার্ডোকে ওর নাকি খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে। ওরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। ওদের এখানে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের বন্ধুদেরও নিয়ে আসতে হবে। তারপর ফার্নান্দোর সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই। ফ্রান্সিস বলল।

—ফার্নান্দোর সৈন্যরাও তো সংখ্যায় কম নয়।

—অর্ধেক চলে গেছে। বাকিদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামলে ওরা হার স্বীকার করতে বাধ্য হবে। ফ্রান্সিস বলল।

উত্তরদিকে প্রান্তরের পরেই শুরু হয়েছে জঙ্গল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো জঙ্গলে ঢুকল। বনতল খুব একটা অন্ধকার নয়। ভাঙা ভাঙা জ্যোৎস্না পড়েছে। গাছপালা খুব ঘন নয়।

দুজনে চলল বনের মধ্যে দিয়ে।

বনজঙ্গল শেষ। একটু দূরে ওরা একটা পায়ে চলা পথ দেখতে পেল। সেই পথটা ধরে দুজনে চলল।

ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ সাদাটে হয়ে এসেছে। তার মানে ভোর হতে দেরি নেই।

সূর্য উঠল। ভোরের রোদ পড়ল পায়ে চলা পথটার ওপর। ওরা দুজনে হেঁটে কিছুটা এগোতেই সামনে দেখল এখানে ওখানে কিছু বাড়িঘরদোর। মাটি মেশানো দেয়াল ছাউনি।

ফ্রান্সিসরা প্রথমেই যে বাড়িটা ছিল সেখানে এল। বাড়ির বাইরে একটি স্বাস্থ্যবান যুবক বাড়ির লাগোয়া ক্ষেতে গাছগুলোয় জলটল দিচ্ছিল। ফ্রান্সিস তাকে ডাকল। যুবকটি বিদেশী লোক দেখে একটু অবাকই হল। হাতের বালতিটা রেখে ফ্রান্সিসদের কাছে এল।

—তোমরা তো তলেদো জাতি? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। যুবকটি বলল।

—তোমাদের গ্রামের মোড়লের সঙ্গে দেখা করবো। তুমি আমাদের নিয়ে যেতে পারবে? ফ্রান্সিস বলল।

—কি ব্যাপার বলুন তো? যুবকটি বলল।

—সেটা তোমাদের মোড়লকে বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। চলো। যুবকটি বলল।

যুবকটি আগে আগে চলল। ফ্রান্সিসরা পেছনে। রাস্তার ধারের বাড়িঘর থেকে লোকজন ওদের দেখতে লাগল। ওরা বোধহয় ভাবছিল এই বিদেশীগুলো কোত্থেকে এলো? এখানে কী করতে এসেছে?

একটা বড় বাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। যুবকটি বলল—এটাই মোড়লের বাড়ি। বাড়ির বাইরে লাঠি হাতে একজন পাহারাদার বসেছিল। যুবকটি এগিয়ে গিয়ে পাহারাদারকে কী বলল। পাহারাদার বাড়ির ভেতরে চলে গেল। একটু পরে বেরিয়ে এল। বাইরের ঘরের দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। মাটিতে একটা নানা রঙের সুতোর কাজ করা মোটা কাপড় বিছানো। যুবকটি বলল—বসো। ফ্রান্সিস শাঙ্কো ঐ কাপড়ের ওপর বসল।

একটু পরেই মোড়ল ঘরে ঢুকল। মোড়ল বয়স্ক লোক। শরীরের বাঁধুনি দেখেই

বোঝা যাচ্ছে যৌবনে সুদেহী পুরুষ ছিল। মোড়ল মোটা কাপড়টায় বসল। বলল—

—আপনারা তো বিদেশী?

—হ্যাঁ—আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। আপনারা আমার কাছে এসেছেন কেন? মোড়ল জানতে চাইল।

—কয়েকদিন আগে সেভিলের রাজা ফার্নান্দো ক্যামেরিনাল আক্রমণ করে। ক্যামেরিনালের রাজা রিকোর্ডো লড়াইয়ে হেরে গেছেন। এখন তাঁর প্রাসাদে তিনি বন্দী। ফ্রান্সিস বলল।

—সে কি। এই লড়াইয়ের কেন খবরই তো আমরা জানতাম না। মোড়ল বলল।

—এখন রাজা রিকার্ডো চাইছেন তাঁর দেশ থেকে শত্রুদের তাড়াতে। সেইজন্যে উনি আপনাদের সাহায্য চেয়েছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা নিশ্চয়ই লড়াইয়ে নামবো। রাজা রিকার্ডোকে আমরা শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি। মোড়ল বলল।

—তাহলে আর দেরি না করে আজ সন্ধ্যাবেলা আপনার সাহসী যোদ্ধাদের নিয়ে যাত্রা শুরু করি। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। মোড়ল বলল। তারপর যুবকটির দিকে তাকিয়ে কয়েকজন যোদ্ধার নাম করে তার সঙ্গে দেখা করতে বলল।

ফ্রান্সিসরা বাড়ির বাইরে এল। যুবকটি ফ্রান্সিসদের নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। একটা ঘরে ফ্রান্সিসদের থাকবার ব্যবস্থা করল। ঘরটার মেঝেয় নানা কাজ করা মোটা চাদর বিছানো। ফ্রান্সিসরা বসল। একটু পরে ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। চোখ বুঁজে বলল—শাঙ্কো—এবার আমাদের বন্ধুদের কী করে খবর পাঠাবে?

—তুমি ভেবো না। আমি ঠিক ওদের খবর দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাতে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করবো। শাঙ্কো বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। ফ্রান্সিস বলল।

কিছুক্ষণ পরে একটা বাচ্চা মেয়ে একটা চিনেমাটির বাটি নিয়ে ঢুকল। মেঝেয় রাখল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো বাটি দুটো নিয়ে খাবার খেতে লাগল। যবের ছাতুতে তৈরি সুস্বাদু খাবার। একে গত কয়েকদিন কয়েদঘরের অখাদ্য খাবার আর আজকে এতটা হেঁটে আসা দুজনের খিদেয় পেট জ্বলছিল। মুহূর্তে খেয়ে নিল।

পরদিন। দুপুরের খাওয়া খেয়ে শাঙ্কো চলে গেল। জাহাজ থেকে বন্ধুদের আনতে হবে।

সন্ধ্যের মধ্যেই ফ্রান্সিসরা রাতের খাবার খেয়ে নিল। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন তলেদো সেনা এসে মোড়লের বাড়ির সামনে জড়ো হল। বর্ম শিরস্ত্রাণ পরা। কটিদেশে তরোয়াল ঝুলছে। বোঝা গেল লড়াইতে ওরা পটু। প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ।

মোড়ল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। সব কথাবার্তা থেমে গেল। মোড়ল দুহাত

তুলে বলতে লাগল—রাজা রিকার্ডো ছোট ভাই ফার্নান্দোর কাছে লড়াইয়ে হেরে গেছেন। এখন তিনি বন্দী ফার্নান্দোর সেনাপতির হাতে। রাজা রিকার্ডো, রাণি ও রাজপুত্রকে মুক্ত করতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে সেনাপতি তাঁদের মুক্তি দেবে না। লড়াই করে সেনাপতিসহ অন্য সৈন্যদের লড়াইয়ে হারিয়ে রাজা রাণি আর রাজপুত্রকে মুক্ত করতে হবে। লড়াইয়ে জয়ী হয়ে তোমরা ফিরে এসো। তোমাদের শৌর্য বীর্যের প্রতি আমি বিশ্বাস রাখি। ভাইকিংরা বিদেশী। তবু রাজারাণির মুক্তির জন্যে তারা তোমাদের দলে থেকে লড়াই করবে। মোড়ল থামল। তরোয়াল কোষমুক্ত করে উঁচু করে তুলে ধরে তলেদোরা চিৎকার করে উঠল। তারপর তরোয়াল কোষবদ্ধ করল। এবার যুদ্ধযাত্রা।

ফ্রান্সিস সকলের সামনে দাঁড়াল। বলল—আমিই তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমি সেনাপতির কয়েদঘরে বন্দী ছিলাম। কাজেই সেনাপতির সৈন্যদের কোথায় কোথায় মোতয়েন করা হয়েছে আমি জানি। সেনাপতির সেনা শিবির কোথায় কোথায় তা আমি জানি। সৈন্যাবাসের আগে আছে একটা বিস্তৃত প্রান্তর। তারপরেই বনজঙ্গল। আমরা এখন যাত্রা শুরু করলে মধ্যরাত নাগাদ ঐ বনজঙ্গলের আড়ালে পৌঁছতে পারবো। সেনাপতির নিদ্রিত সৈন্যদের আমরা আক্রমণ করবো। এবার চলো।

তলেদো সেনাদের নিয়ে ফ্রান্সিস যাত্রা শুরু করল।

ফ্রান্সিসের হিসেবটাই ঠিক ছিল। ওরা যখন বনের শেষপ্রান্তে এসে গাছগাছালির আড়ালে দাঁড়াল তখন বেশ রাত।

ওদিকে শাঙ্কো ক্যামেরিনাল নগর থেকে দূরে দূরে ঘুরে জাহাজঘাটার কাছে এল। দেখল সেনাপতির যুদ্ধ জাহাজ জলে ভাসছে। চাঁদের আবছা আলোয় দেখল বেশ দূরে ওদের জাহাজটা নোঙর করা।

শাঙ্কো কোন শব্দ না তুলে আস্তে আস্তে সমুদ্রের জলে নামল। তারপর নিঃশব্দে সাঁতরে চলল ওদের জাহাজের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজের হালটা ধরল। তখন শাঙ্কো বেশ হাঁপাচ্ছে। জাহাজের দড়িদড়া ধরে হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে জাহাজে উঠল।

ডেক-এ আট দশজন ভাইকিং ঘুমিয়ে। শাঙ্কো গিয়ে ওদের কয়েকজনকে ধাক্কা দিয়ে বলল—খুব ঘুমিয়েছো এবার ওঠ। ভাইকিংরা ধড়ফড় করে উঠে বসল। শাঙ্কো বলল—অস্ত্রঘরে যাও। অস্ত্র নিয়ে তৈরি হও। আজ লড়াই।

বন্ধুরা উঠে ছুটল অস্ত্রঘরের দিকে। হ্যারির কেবিনঘরে ঢুকে শাঙ্কো হ্যারিকে সব বলল। হ্যারি বলল—কিন্তু ফ্রান্সিস কেন লড়াই করতে চাইছে বুঝলাম না। শাঙ্কো বলল—সেনাপতি যেভাবে রাজপ্রাসাদ পাহারার ব্যবস্থা করেছে তাতে কারো পালাবার উপায় নেই। রাজা রাণি রাজপুত্র আর বিশেষ করে মারিয়ার মুক্তির জন্যে আমাদের লড়াইতে নামতেই হবে।

—ঠিক আছে। কিন্তু আমরা যাবো কীভাবে? সদর রাস্তা ধরে যাওয়া চলবে না। সশস্ত্র আমাদের যেতে দেখলে সেনাপতি জানতে পারবেই। তাহলে ওখানেই লড়াই

শুরু হয়ে যাবে। শাঙ্কো বলল।

—না-না। সে সব আমি আর ফ্রান্সিস ভেবেছি।

সেনাপতির সৈন্যাবাসের সামনেই বিরাট প্রান্তর। তারপর একটা বন। আমরা সেই বনের আড়ালে আড়ালে বনের প্রান্তে চলে আসবো। ওখান থেকে গভীর রাতে আমরা রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যদের ছাউনিতে ঝাঁপিয়ে পড়বো। ঘুমন্ত সৈন্যরা ঘুম ভেঙে উঠে তরোয়াল হাতে নেবার সময়ও পাবে না। হ্যারি বলল।

—ঠিক পরিকল্পনা। কিন্তু ঐ বনের প্রান্তে আমরা যাবো কি করে? জাহাজ চালিয়ে তীরে নিয়ে গিয়ে—শাঙ্কো বলল।

—অসম্ভব। আমরা জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে নামবো। তারপর নিঃশব্দে সাঁতরে বেশ কিছুটা গিয়ে তীরে উঠব। তারপর রাজপ্রাসাদকে ডাইনে রেখে আমরা হাঁটবো উত্তর মুখে। বেশ কিছুটা গেলেই বন পাবো। বনের আড়ালে আড়ালে ফ্রান্সিসদের কাছে চলে যাবো।

—ফ্রান্সিসদের মানে? ফ্রান্সিস তো একা। হ্যারি বলল।

—না—উত্তরদিকে তলেদো নামে একদল উপজাতি থাকে। তারা রাজা রিকার্ডোকে খুব শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে। আমরা ওদের সঙ্গে নিয়ে লড়াইয়ে নামবো।

—তাহলে তো তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বেরোতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ—এটা তুমি বন্ধুদের বলে দাও। হ্যারি বলল।

বন্ধুরা হ্যারির কাছে সব শুনলো। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে সবাই তৈরি হল। জাহাজে রইল শুধু ওদের বৈদ্য ভেন। আর সবাই তরোয়াল কোমরের ফেট্টিতে গুঁজে জাহাজের হালে পা রেখে রেখে সমুদ্রের জলে নামল।

শাঙ্কো একটু গলা চড়িয়ে বলল—তোমরা সবাই আমার পেছনে পেছনে এসো।

শাঙ্কো নিঃশব্দে সাঁতার কাটতে লাগল। পেছনে আর সবাই। শাঙ্কো লক্ষ্য ঠিক করে নিল। জাহাজঘাট থেকে বেশ দূরে তীরভূমির একটা জায়গা বেছে নিল। আকাশে ভাঙা চাঁদ। জ্যোৎস্না উজ্জ্বল নয়। পরিষ্কার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তার ওপর সমুদ্রের বুকে কুয়াশা। সমুদ্রের জোর হাওয়ায় কখনো কখনো কুয়াশা ছড়িয়ে যাচ্ছে। তখনই তীরভূমি দেখা যাচ্ছে।

শাঙ্কোরা তীরভূমিতে উঠল। সবাই হাঁপাচ্ছে তখন। ওখান থেকে আবছা রাজা ফার্নান্দোর জাহাজ দেখা যাচ্ছে।

শাঙ্কোর পেছনে পেছনে বন্ধুরা গাড়িঘোড়া সদর রাস্তা পার হল। ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে রাজপ্রাসাদের ঘেরা দেয়াল দেখল। রাজপ্রাসাদ পার হয়ে একটা ছোট মাঠমত। তারপরেই শুরু হয়েছে বনাঞ্চল।

শাঙ্কোরা বনে ঢুকল। শাঙ্কো তখন ভাবছে ফ্রান্সিসরা এসে পৌঁছেছে কিনা। বনের ফাঁক দিয়ে শাঙ্কো দেখল ডানদিকে প্রান্তর শুরু হয়েছে। শাঙ্কোরা হাঁটতে লাগল।

এবার বনের আড়াল থেকে শাঙ্কো দেখল প্রান্তরের ওপাশে সৈন্যাবাস। এখান থেকে আক্রমণ করা সহজ।

কিন্তু ফ্রান্সিসরা কোথায়? শাঙ্কো বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব—তোমরা আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে এসো।

—একথা কেন বলছো? বিস্কো বলল।

—আমরা নিঃশব্দে ফ্রান্সিসদের দিকে গেলে ওরা আমাদের শত্রু মনে করতে পারে। তরোয়াল নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। শাঙ্কো বলল।

কিছুটা গিয়ে শাঙ্কো একটু গলা চড়িয়ে ডাকল—ফ্রান্সিস ফ্রান্সিস। উত্তর নেই। শাঙ্কো যেতে যেতে আবার ডাকল—ফ্রান্সিস। বনজঙ্গলের মধ্য থেকে ফ্রান্সিসের গলা শোনা গেল—শাঙ্কো? ফ্রান্সিসরা জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তলেদোরাও এল। দুদল একত্র হল।

এবার আক্রমণ। সবাই তরোয়াল কোষমুক্ত করল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—যোদ্ধারা। অযথা নরহত্যা করবে না। জীবন বিপন্ন হলে তবেই নরহত্যা করবে। চলো।

সবাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। তারপর প্রান্তরের অস্পষ্ট চাঁদের আলোর মধ্য দিয়ে সৈন্যাবাসের দিকে ছুটতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সৈন্যাবাসের কাছে এল। তারপর লাথি দিয়ে দরজাগুলো ভাঙতে লাগল। ঘরের ভেতরে ঢুকতে লাগল। দরজা ভাঙার শব্দে রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। কিছুই করার নেই। অস্ত্রঘরে যাবারও উপায় নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা বন্দী হল। ফ্রান্সিসরা ওদের প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল। কিন্তু সেনাপতি কোথায়? ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে লাগল। তৎক্ষনাৎ দেখল সেনাপতি প্রান্তরের মধ্য দিয়ে ছুটছে।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতির পিছু ধাওয়া করল। আরও দুজন তলেদো সেনা ফ্রান্সিসের পিছু পিছু ছুটল।

বনজঙ্গলে পৌঁছোবার আগেই সেনাপতি ফ্রান্সিসের হাতে ধরা পড়ল। তলেদো সৈন্যরাও এসে পৌঁছেছে। সেনাপতির হাতে তরোয়াল নেই। ফ্রান্সিস একজন তলেদো সেনার হাত থেকে তরোয়াল নিয়ে সেনাপতির দিকে ছুঁড়ে দিল। তরোয়াল মাটিতে পড়ল। বলল—অস্ত্র দিলাম। লড়াই করো। দুজনেই হাঁপাচ্ছে তখন। মাটি থেকে তরোয়াল তুলে সেনাপতি ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস একটু সরে গিয়ে তরোয়ালের প্রথম মারটা সামলাল। তারপর আক্রমণ করল। দুজনের তরোয়ালের লড়াই চলল। ফ্রান্সিসের দ্রুত আক্রমণের মুখে সেনাপতির নিজেকে অসহায় মনে হল। তরোয়ালে কাটা হাত কাঁধ মুখ থেকে রক্ত ঝরছে। লড়াই চলল।

হঠাৎ একজন তলেদো সৈন্য সেনাপতির দিকে ছুটে গেল। ফ্রান্সিস বাধা দেবার আগেই সৈন্যটি সেনাপতির বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল। সেনাপতি তরোয়াল

ফেলে দুহাত তুলে পেছনে গড়িয়ে পড়ল। কয়েকবার হাঁ করে শ্বাস নিয়ে মারা গেল।

ফ্রান্সিস বেশ রেগে গেল। তলেদো সৈন্যটির কাছে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—তোমার আগেই আমি সেনাপতিকে হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু করি নি। চেষ্টা করেছি সেনাপতিকে হার স্বীকার করাতে। যুদ্ধযাত্রার আগেই আমি বলেছিলাম বিনা কারণে আমরা নরহত্যা করব না। তুমি তাই করলে?

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সেনাবাসের দিকে ফিরে এল। সেনাপতির সৈন্যদের তখন হাতে দড়ি বেঁধে কয়েদঘরে ঢোকানো হচ্ছে।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—কী করবে এখন?—রাজা রিকার্ডোর কাছে যাবো। তাঁর জয়ের সংবাদ জানাবো। তারপর মারিয়াকে নিয়ে চলে আসবো। জাহাজে ফিরে এসে জাহাজ চালাবো দেশের দিকে।

সব বন্ধুদের ডেকে এনে একত্র করা হল। সবাই চলল রাজপ্রাসাদের দিকে।

রাজপ্রাসাদের সামনে যখন ওরা এল তখন ভোর হয়ে গেছে। রাজা রিকার্ডোর জয়ের সংবাদ তখন সারা ক্যামেরিনালে ছড়িয়ে পড়েছে। দলে দলে প্রজারা আসতে লাগল রাজপ্রাসাদের দিকে।

ফ্রান্সিসরা রাজপ্রাসাদের সামনে এল। দেখল সদর দেউড়ি বন্ধ। প্রাসাদের সীমাঘেরা পাথরের দেয়ালের পরেই প্রজারা দাঁড়িয়ে আছে।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—সমস্যায় পড়া গেল।

—হ্যাঁ। ভেতরেই তো যাওয়া যাবে না এখন। ফ্রান্সিস বলল।

—তারপর যুদ্ধে জয়ী রাজা এখন প্রজাদের দর্শন দেবেন। এতেও কম সময় যাবে না। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিসরা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করল। রাজা রিকার্ডো দুর্গ হাত তুলে প্রজাদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। প্রজারা রাজার জয়ধ্বনি করল।

আস্তে আস্তে প্রজারা চলে যেতে লাগল। প্রাসাদের চারপাশের ভিড় কমে গেল।

ফ্রান্সিস সদর দেউড়িতে এল। প্রহরীকে ফ্রান্সিস বলল—ভাই—আমাদের একবার ভেতরে যেতেই হবে।

—কেন বলুন তো? প্রহরী বলল।

—দেখতেই পাচ্ছো আমরা বিদেশী। আমাদের দেশের রাজকুমারী প্রাসাদে আছেন। আমরা তাঁকে নিতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—তার জন্যে রাজার হুকুম লাগবে। প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে—আমরা রাজার কাছে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—মাত্র দুজন আসুন। কথাটা বলে প্রহরী দরজা খুলে দিল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঢুকল। পাথর বাঁধা ছোট পথটা ধরে ওরা প্রাসাদের প্রথম ঘরটার সামনে এল। দরজায় দুজন প্রহরী। হাতে পেতলের বর্শা। ঝক্‌ঝক্‌ করছে। ফ্রান্সিস মনে মনে হাসল। এত যে যুদ্ধ হল তখন কোথায় ছিল এরা। ফ্রান্সিস



প্রহরীকে বলল—রাজা রিকার্ডোকে গিয়ে বলো দুজন ভাইকিং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। প্রহরী চলে গেল। একটু পরেই এল। বলল—আপনারা এ ঘরে বসুন। রাজা আসছেন।

ফ্রান্সিস হ্যারি ঘরটায় ঢুকল। দেখল ঘরটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরের মাঝখানে একটা শ্বেতপাথর বাঁধানো বড় টেবিল। টেবিলটার চারপাশে চেয়ার পাতা। চেয়ারের গদী পাখির পালকের।

ফ্রান্সিসরা বসল। রাজা রিকার্ডো ঢুকলেন। হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন। ফ্রান্সিস হ্যারি উঠে দাঁড়াল। রাজা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের হাতটা ধরলেন। হাতটা ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন—আমি সব শুনেছি। আপনারা আমার দেশ শত্রু মুক্ত করলেন এজন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

—ও কথা বলবেন না। তলেদোরাও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। ওদের সহায়তা পেয়েই আমরা যুদ্ধে জয়ী হলাম।

—তবু আপনারা তো এদেশবাসী নন। এখানে কে রাজা হল কে হল না এসবের সঙ্গে আপনাদের তো কোন সম্পর্ক নেই। তবু আমার হয়ে লড়াই তো করেছেন।

—মাননীয় রাজা একটা কথা বলছিলাম।

—বলুন।

—আমাদের দেশের রাজকুমারী আপনাদের অন্দরমহলে রয়েছেন। আমরা তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—বেশ তো। রাজা আস্তে হাততালি দিলেন। প্রহরী দুজন প্রায় ছুটে এল।

—অন্তঃপুরে রাণি থাকে খবর পাঠাও। একজন বিদেশীনী রাজকুমারী অন্তঃপুরে রয়েছেন। তাঁকে এই ঘরে যেন পাঠানো হয়।

কিছুক্ষণ পরে একজন পরিচারিকার সঙ্গে মারিয়া ঘরটায় ঢুকল। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে দেখে হাসল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল—মারিয়ার চোখমুখ কেমন শুকনো। চোখের নিচে কালি। মারিয়া এই কদিনেই বেশ রোগা হয়ে গেছে। মারিয়ার মুখটাও কেমন বিষণ্ণ।

রাজা রিকার্ডো আর একবার ফ্রান্সিসদের ধন্যবাদ জানালো।

ফ্রান্সিসরা প্রাসাদের বাইরে এল। সদর দেউড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। তখন ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া—তোমার শরীর বেশ খারাপ হয়ে গেছে। আর না এবার দেশে ফিরে যাবো। মারিয়া হেসে বলল—আবার খোঁজাখুঁজি করার কিছু পেলে দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভুলে যাবে।

—ঐ তো এক জ্বালা। কী যে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার জন্যে ভেবো না। আমি ভালো আছি। মারিয়া বলল।

—তোমাকে সঙ্গে আনা ভালো হয়নি। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক উল্টো। আমার যে কী আনন্দ হয়—কত বিচিত্র দেশ কত বিচিত্র মানুষ। রাজবাড়ির ঘরে পড়ে থাকলে এ জীবনেও দেখা হত না। আমি এসে খুশি

হয়েছি। শরীরের ভালো মন্দ লেগেই থাকে। একটু বিশ্রাম পেলেই আমার শরীর ভালো হয়ে যাবে। মারিয়া বলল।

—না। ভেনকে বলতে হবে ও যেন এখানকার কোন কবিরাজের কাছ থেকে ভালো ভালো ওষুধ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। বিশেষ করে তোমাকে চিকিৎসার জন্যে।

—আমার কোন অসুখ নেই। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে—সেটা ভেন বুঝবে। ফ্রান্সিস বলল।

প্রাসাদের বাইরে আনতে বন্ধুরা ছুটে এল। আনন্দে ওরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

এবার সবাই জাহাজঘাটের দিকে চলল।

জাহাজে উঠে ফ্রান্সিস প্রথমেই ভেন-এর কেবিনঘরে গেল। ভেন আধশোয়া হয়ে ছিল। ফ্রান্সিসকে দেখে উঠে বসল। ফ্রান্সিস বলল—ভেন—তোমার ওষুধ টষুধ নিশ্চয়ই শেষ হয়ে এসেছে।

—হ্যাঁ কিছু ওষুধ জোগাড় করতে হবে। ভেন বলল।

—তাহলে এক কাজ করো। দুপুরে খেয়ে দেয়ে তীরে নামো। দুএকজন কবিরাজকে খুঁজে বের কর। দরকারি ওষুধ তাদের কাছ থেকে নাও। শাঙ্কোর কাছ থেকে দশটা স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

—স্বর্ণমুদ্রা লাগবে না। ভেন বলল।

—না লাগলে নিজের কাছেই রেখে দেবে। আবার আর এক বন্দরে পৌঁছলে সেখানেও ওষুধ জোগাড় করবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। ভেন বলল।

—শোন ভেন তোমার ওষুধ সংগ্রহের জন্যে আমরা এখানে দুদিন থাকবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো খুবই ভালো হয়। ভেন বলল।

দুপুরের খাবার খেয়ে নিয়ে ভেন তীরভূমিতে নামল। তারপর সদর রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল উত্তরমুখো। খোঁজ করতে করতে তিনজন কবিরাজের ঠিকানা পেল। ভেন বেরুলো তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

ফ্রান্সিসরা দুদিন ক্যামেরিনাল বন্দর শহরে রইল। ভেনও খুব ছুটোছুটি করে ওষুধ জোগাড় করল।

এবার যাত্রা। জাহাজের নোঙর তোলা হল। গোটানো পাল খুলে দেওয়া হল। বাতাস পড়ে গেছে। দাঁড়ঘরে গেল কয়েকজন। দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজ দ্রুত চলল সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে।

সেদিন দুপুরবেলা। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে হ্যারি আর শাঙ্কো এল। গল্পগুজব চলল। মারিয়াও যোগ দিল।

আলখাতিব ঢুকল। ফ্রান্সিস খাতিবকে ওর বিছানায় বসতে বলল। আলখাতিব বিছানায় বসল। তারপর বলল—আপনারা তো জাহাজ চালিয়ে চলে যাবেন।

আমি কী করবো? ফ্রান্সিস বলল—তুমি এখানেই থাকবে।

—কিন্তু দৈবাৎ যদি রাজা ফার্নান্দোর গুপ্তচরের নজরে পড়ে যাই তাহলে ফাঁসির হাত থেকে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আলখাতিব বলল।

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল— আচ্ছা খাতিব—কিছুদিন আগে তুমি এক রোমান সম্রাটের কথা বলেছিলে। জিরাল্ডা টাওয়ারের কোথাও সম্রাট মাতিস তাঁর রাজভাণ্ডার লুকিয়ে রেখেছিলেন। ব্যাপারটা কী বলো তো। তোমার প্রপিতামহ নাকি জানতো কোথায় মাতিস ধনসম্পদ রেখেছিল। খাতিব একটু চুপ করে থেমে বলল—সে অনেক কথা। সে সব আপনার শুনে কী হবে। —সেটা আমরা বুঝব। তুমি বলো। হ্যারি বলল।

আলখাতিব একটু থেমে বলতে লাগল—সেভিল বন্দর শহরে প্রায় দেড়শো বছর আগে একজন রোমান সম্রাট মাতিস রাজত্ব করতেন। তিনি সেভিলে জিরাল্ডা টাওয়ার নির্মাণ করে ছিলেন। সেই টাওয়ার নির্মাণ করাবার সময় আমার এক পূর্বপুরুষ সোনিক্কা রাজমিস্ত্রির কাজ করেছিলেন। খাতিব থামল।

—তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ সময়ে খলিফা আনমন সুরে সেভিল আক্রমণ করতে এসেছিল। গুপ্তচর মারফৎ এই খবর পেয়ে সম্রাট মাতিস স্থির করলেন রাজকোষ জিরাল্ডা টাওয়ারের মধ্যে কোথা গোপনে রেখে দেবেন।

সেইদিনই রাতে আমার পূর্বপুরুষ সোনিক্কা আর একজন রাজমিস্ত্রিকে রাজপ্রাসাদে ডেকে পাঠালেন। সেই রাতে দুজনকে নানা সুস্বাদু খাবার খাওয়ালেন। পেটপুরে খেল দুজনে। তারপর পাখির পালকে তৈরি বিছানায় দুজনে শুল। কী সুন্দর ঘর। পাথরের দেয়ালে পাখি লতা পাতা ফুলের কাজ করা। ঘরের এক কোণায় কী জ্বলছে। ধূয়ো ছড়াচ্ছে। কী সুন্দর গন্ধ।

দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

গভীর রাতে দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল সম্রাটের ডাকে। দুজনে বিছানায় উঠে বসল। বিছানা থেকে নেমে এল। সম্রাট সোনিক্কার হাতে দিলে একটা চামড়ার বড় থলি। সোনিক্কা ওটা কাঁধে করে নিয়ে নিল। সম্রাট বললেন আমার সঙ্গে এসো।

সম্রাটের সঙ্গে দুজনে প্রাসাদের বাইরে এল।

সম্রাট হাঁটতে লাগলেন জিরাল্ডা টাওয়ারের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে বললেন—সব দ্বারী প্রতিহারীকে ছুটি দিয়েছি। আমি যা তোমাদের দিয়ে করাব না সেটা আমি গোপনে করতে চাইছি।

সোনিক্কা দেখল প্রাসাদের দরজায় বড় দেউড়ির কাছে কোথাও কোন প্রহরী নেই।

রাত্রি জ্যোৎস্নালোকিত। সবই অনেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

তিনজনে জিরাল্ডো টাওয়ারের নিচে এসে দাঁড়াল। সম্রাট সোনিক্কাকে নিয়ে টাওয়ারের প্রথম সিঁড়ির কাছে এলেন। সিঁড়ির ওপরে কয়েকটা পাথরের পাটা

রাখা। সম্রাট বললেন অন্য মিস্ত্রিটাকে—তুমি বেশ শক্তসমর্থ। এই পাথরের পাটা নিয়ে টাওয়ারের মাথায় উঠতে হবে। তুমি যথেষ্ট বলশালী। তুমি পারবে। পাটাতনগুলো নাও। ঐ রাজমিস্ত্রি পাটাতনগুলো নিল। মাথার ওপর পাটাতনগুলো চাপিয়ে মিস্ত্রি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

—তুমি এতসব জানলে কী করে? হ্যারি বলল।

—আমরা বংশপরম্পরায় এই ঘটনাটি শুনে আসছি। আমাদের পূর্বপুরুষ সোনিক্কা নিশ্চয়ই এই ঘটনা বংশের কাউকে বলেছিলেন। সেটাই আমাদের বংশের মানুষদের মধ্যে গল্পকথার মত চলে আসছে। খাতিব বলল।

—তারপর বলো। হ্যারি বলল।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তিনজনে উঠতে লাগলেন। টাওয়ারের জায়গায় জায়গায় তো জানালার মত চৌকো ফোকর। এখানে চাঁদের আলো পড়েছে।

সম্রাট সামনে। পেছনে অন্য মিস্ত্রিটি। শেষে সোনিক্কা। তিনি আগে অন্ধকারে চামড়ার বড় থলিটার মুখ খুলে ফেলেছিলেন। এবার থলিতে হাত ঢোকালেন। একমুঠো কী যেন তুলে আনলেন। চাঁদের আলোয় দেখলেন—হীরে মণিমাণিক্য। রেখে দিলেন সেসব। মহূর্তে বুঝলেন এসব রাজকোষ থেকে আনা। এই জিরাল্ডা মিনারের কোথাও লুকিয়ে রাখার জন্যে সম্রাট এনেছেন। দুজন মিস্ত্রির সাহায্যে তিনি এটা করবেন। তারপর বুদ্ধিমানেরা যা করে তাই করবেন। সোনিক্কা আর অন্য মিস্ত্রিটাকে হত্যা করবেন।

—সোনিক্কা পালালেন—তাই না? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। সোনিক্কা থলিটা সিঁড়িতে রেখে ফিরে দাঁড়ালেন। সম্রাটের সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ল। সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে সোনিক্কাকে বললেন—পালাবার চেষ্টা করবে না। কিন্তু সোনিক্কা ততক্ষণে কয়েকটা সিঁড়ি শেষে এসেছেন। সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল কোষমুক্ত করলেন। অন্ধকারেই তরোয়াল চালালেন। সেই তরোয়ালে ঘা সোনিক্কার পিঠে পড়ল। আহত সোনিক্কা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। সম্রাটও কয়েকটা সিঁড়ি দ্রুতপায়ে নেমে এলেন। সোনিক্কা ততক্ষণে মিনারের বাইরে চলে এসেছেন। পাগলের মত ছুটতে লাগলেন। সম্রাট বুঝলেন সোনিক্কাকে ধরা যাবে না। তিনি টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। দেখলেন সোনিক্কা সদর দেউড়ির মাথায় উঠে পড়েছেন। সান্ত্রী প্রহরী কেউ নেই যে সোনিক্কার পিছু ধাওয়া করবে।

সম্রাট টাওয়ারে ফিরে এলেন।

হ্যারি বলল—তাহলে বোঝা যাচ্ছে সম্রাট তাঁর রাজকোষ কোথায় গোপনে বানালেন সেটা তোমার পূর্বপুরুষ সোনিক্কা দেখতে পান নি।

—না। খাতিব বলল—তবে অন্য রাজমিস্ত্রিটি রাজকোষ কোথায় গোপনে রাখা হল সেটা জানতো কারণ ও নিজেই কাজটা করেছিল। কিন্তু সেই রাজমিস্ত্রিটিকে পরে কেউ কোনদিন দ্যাখেনি। তার মানে সম্রাট তাকে হত্যা করেছিলেন।

—কিন্তু রাজা তোমাকে বন্দী করে রেখেছিল কেন ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা ফার্নান্দোর মন্ত্রীর বংশের সঙ্গে আমাদের বংশের শত্রুতা অনেকদিন যাবৎ চলে আসছে। সেই সেনাপতিই রাজাকে বলেছিল যে আমাদের পরিবারের লোকেরা জানে—রোমান সম্রাট কোথায় তাঁর রাজকোষ গোপনে রেখেছিলেন। রাজা ফার্নান্দোর সৈন্য আমাকে বন্দী করে রাজার সভা ঘরে নিয়ে এল। সেনাপতিটি যখন সেনাপতি হল তখনই আমি জানতাম আমাদের পরিবারের ওপর অত্যাচার শুরু হবে। তাই বাবা আর ঠাকুর্দাকে হুয়েনভায় নিয়ে গিয়েছিলাম। এক আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। সৈন্যরা বাবা আর ঠাকুর্দাকে পায় নি।

—তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা ফার্নন্দো আমার কাছে জানতে চাইলেন আমার কোন পূর্বপুরুষ সম্রাট মাতিসের রাজকোষ কোথায় লুকিয়ে রাখা হল তা জেনেছিল কিনা। আমি বললাম—রাজকোষ জিরাল্ডা টাওয়ারের কোথাও গোপনে রাখা হয়েছে এটা আমার পূর্বপুরষ সোনিক্কা জানতে পারেন নি। সোনিক্কা জিরাল্ডা টাওয়ারে ওঠার আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাজা ফার্নান্দো সেটা বিশ্বাস করলেন না। কয়েদঘরে রেখে আমার ওপর ভীষণ অত্যাচার চলল। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আমি মিথ্যে করে বললাম যে আমার পূর্বপুরুষ সোনিক্কা মৃত্যুর সময় বলে গিয়েছিলেন যে সম্রাট মাতিসের গুপ্তধন জিরাল্ডা টাওয়ারের সিঁড়ির ধাপে পুঁতে রাখা হয়েছে। কথাটা বলে আমি অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচলাম। কিন্তু আমার বিপদ কাটল না। রাজা ফার্নান্দো তাঁর শ'পাঁচেক সৈন্যকে লাগালেন জিরাল্ডা টাওয়ারের সব সিঁড়ি ভেঙে ফেলার জন্যে। আমাকে মুক্তি দেওয়া হল।

—কিন্তু রোমান সম্রাটের কোষাগার পাওয়া গেল না—এই তো? ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—হ্যাঁ। আমি হুয়েনভা বন্দর শহরে পালিয়ে গিয়েছিলাম। ক্রুদ্ধ রাজা ফার্নান্দো আমাকে ধরবার জন্যে গুপ্তচর লাগাল। আমি ধরা পড়লাম। আবার কয়েদখানায় ঢোকানো হল আমাকে। আলখাতিব থামল।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।

ভেন ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল—ভেন দরকারি ওষুধটষুধ পেয়েছো?

—হ্যাঁ।

—তাহলে কাল সকালেই জাহাজ ছাড়তে হবে। হ্যারিকে বলল—

—হ্যারি সবাইকে ডেক-এ আসতে বলো। আমার কিছু কথা বলার আছে।

হ্যারি ঘর থেকে বেরিয়ে সবাইকে খবর দিতে চলল।

কিছুক্ষণ পরে হ্যারি ফিরে এল। বলল—ফ্রান্সিস সবাই এসেছে। তুমি চলো।

ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া জাহাজের ডেক-এ উঠে এল।

ডেক-এ বন্ধুরা সব জড়ো হয়েছে। ফ্রান্সিস কী বলে শুনতে এসেছে। ফ্রান্সিস একবার চারদিকে তাকিয়ে নিল। গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—ভাইসব—আমরা

এখন হুয়েনভা বন্দর শহরে যাবো। ওখান থেকে যাবো সেভিলে। প্রায় দেড়শ বছর আগে এক রোমান সম্রাট মাতিস জিরাল্ডা টাওয়ারের কোথাও তাঁর রাজকোষ গোপনে রেখে গেছেন সেটা আমি উদ্ধার করবো। ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। শাঙ্কো একটু গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস আমরা অনেকদিন দেশছাড়া। এখানে পড়ে না থেকে চলো এবার দেশে ফিরে যাই। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল—শাঙ্কো তোমরা ভালো করেই জানো আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত মুক্ত করা যায় না। আর কোন বন্ধু কিছু বলল না। ফ্রান্সিস বলল—সেভিলে যাবো আমি হ্যারি আর বিস্কো। গুপ্ত রাজকোষ খুঁজবো। তোমরা এখানে হুয়েনভা বন্দরে থাকবে।

সভা ভঙ্গ হল। ভাইকিং বন্ধুরা কেউ কেউ নিজেদের কেবিনঘরে ফিরে গেল। কেউ কেউ ডেকএ শুয়ে বসে রইল।

কেবিনঘরে ফিরে মারিয়া বলল—তুমি কি দেশে ফিরতে চাও?

—না চাই না। এভাবে দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে জীবনটা কাটাতে চাই।

—আমি তা চাই না। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস মনে ব্যথা পেল। বলল—মারিয়া, তুমি যদি দেশে ফিরে যেতে চাও আমি তার ব্যবস্থা করে দেব।

মারিয়া ফুঁপিয়ে উঠল। বলল—আমার ভুল হয়েছে আমাকে মাফ কর। আমি ফিরে যাবো না। তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাবো। ফ্রান্সিস হাসল। বলল—ঘরের বাইরের জীবন আমাদের অনেক কিছু শেখায়। হিংসা দ্বেষ থেকে মুক্তি দেয় আমাদের। যাকগে—তুমি যদি সেভিলে যেতে চাও যেতে পারো।

—হ্যাঁ আমি যাবো। মারিয়া বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালে জলখাবার খেয়ে ফ্রেজার জাহাজ ছাড়ার জন্যে তৈরি হল। গুটানো পাল সব খুলে দেওয়া হল। হাওয়া উদ্দাম। পালগুলো ফুলে উঠল। জোরগতিতে জাহাজ মাঝ সমুদ্রের দিকে চলল।

বিকেল নাগাদ ফ্রান্সিসদের জাহাজ হুয়েনভা বন্দর শহরের কাছে এল। ফ্রান্সিস হ্যারি জাহাজের রেলিং ধরে জাহাজঘাটের দিকে তাকিয়েছিল। জাহাজঘাটায় রাজা ফার্নান্দোর দুটো যুদ্ধজাহাজ নোঙর করে আছে।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস জাহাজঘাটে জাহাজ নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমরা রাজা ফার্নান্দোর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এখন আমরা বাঘের মুখে।

—কিছ্ছু ভেবো না হ্যারি। আমার কাছে মহাস্ত্র আছে। সব রাজারাই সেই অস্ত্রে ঘায়েল হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—মহাস্ত্রটা কী? হ্যারি বলল।

—রোমান সম্রাট মাতিসের গুপ্তধন ভাণ্ডার। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তোমাকে সে ক্ষেত্রে সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতেই হবে।

—ঠিক। কিন্তু যদি কোন ব্যাপারটা জটিল গুপ্তভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবে না তবে রাতের অন্ধকারে পালাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে চলো জাহাজ জাহাজঘাটেই লাগাই। দেখা যাক কী হয়। হ্যারি বলল।

দূর থেকে ফ্রান্সিস আর হ্যারি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগল। যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই হল। রাজা ফার্নান্দোর দুই যুদ্ধ জাহাজেই সৈন্যদের ছুটোছুটি দেখল—

—ফ্রান্সিস আমরা ধরা পড়ে গেছি। হ্যারি বলল।

—সেটা জেনেই এখানে এসেছি। দেখা যাক রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা কী করে। ফ্রান্সিস বলল।

তীরভূমির খুব কাছে এসে ফ্রান্সিসদের জাহাজ থামল। নোঙর ফেলা হল। কাঠের পাটাতন ফেলা হল না।

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দেখা গেল তীরভূমি দিয়ে কয়েকজন রাজা ফার্নান্দোর সৈন্য ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে আসছে।

সামনের লোকটিকে দেখে বোঝা গেল নতুন সেনাপতি। ওরা ফ্রান্সিসদের জাহাজের সামনে এসে দাঁড়াল। একজন সৈন্য চেঁচিয়ে বলল—এ দেশের সেনাপতি এসেছেন। পাটাতন ফ্যালো। ফ্রান্সিস বলল—বিস্কো যা বলছে তা কর। বিস্কো পাটাতন ফেলল। সেনাপতি দলবল নিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে পড়ল। নতুন সেনাপতির চেহারা আগের সেনাপতির বিপরীত। ঠোঁটের ওপর মোটা গোঁফ। গোবদা গোবদা শরীর। কুত্কুতে চোখ। জাহাজে উঠে বলল তোমাদের দলনেতা কে?

ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। বলল আমি।

—তোমাদের সবাইকে বন্দী করা হল। কয়েদঘরে থাকতে হবে তোমাদের। নতুন সেনাপতি বলল।

—বেশ। আপত্তি নেই। কয়েদঘরে থাকবো আমরা। কিন্তু কাল সকালে রাজা ফার্নান্দোর কাছে আমাদের যেতে দেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? সেনাপতি বলল।

—সেটা আমি রাজা ফার্নান্দোকেই বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

—না। আগে আমাকে বলবে। সব শুনে আমি অনুমতি দিলে তবেই রাজার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করবো। নতুন সেনাপতি বলল।

—বেশ শুনুন—প্রায় দেড়শো বছর আগে এক রোমান সম্রাট শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে তাঁর রোজকোষের সব মূল্যবান অলঙ্কার পাথর সোনার চামচ জিরাল্ডার টাওয়ারের কোথাও গোপনে রেখেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ এই ঘটনার কথা আমি শুনেছি। পরে এখানকার রাজারা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেই মূল্যবান ধনসম্পদ উদ্ধার করতে পারে নি। নতুন সেনাপতি বলল।

—আমিও চেষ্টা করবোই ঐ ধনসম্পদ উদ্ধার করতে। ফ্রান্সিস বলল।

নতুন সেনাপতি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল। বলল—হাতিঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল। ফ্রান্সিসও সঙ্গে সঙ্গে জোরে হো হো করে হেসে উঠল। সেনাপতি হাসি থামিয়ে কড়াচোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর বলল—ঠিক

আছে। রাজা ফার্নান্দোর সঙ্গে তোমার কথা বলিয়ে দেবো।—কালকে সকালে রাজসভায়।

—খুব ভালো কথা। শাঙ্কো বলল।

—নাও—এবার কয়েকখানায় চলো। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিসরা দল বেঁধে চলল। সঙ্গে মারিয়া। ওদের ঘিরে নিয়ে চলল সৈন্যরা সেনাপতির পাশেই হাঁটছিল শাঙ্কো। শাঙ্কো বলল—আবার সেনাপতি যে ছিল সে তো তালপাতার সেপাই। হ্যাঁ—সেনাপতি হলে তার চেহারা আমার মতই হওয়া চাই। সেনাপতি ঠোঁটের ফাঁকে হাসল। তারপর শাঙ্কোর মন্তব্যটা সবাই শুনল কিনা সেটা চারদিকে তাকিয়ে যাচাই করে নিল। বোঝা গেল কাদের কয়েকটির সৈন্য শাঙ্কোর মন্তব্য শুনেছে। সেনাপতি একবার গোঁফে তা দিল।

সন্ধ্যে নাগাদ ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরের সামনে পৌঁছল। কয়েদঘরের দরজার দুপাশে মশাল জ্বলছে। দুজন পাহারাদার পাহারা দিচ্ছে।

ঢং ঢং শব্দ তুলে দরজা খোলা হল। শাঙ্কো সেনাপতির কাছে গেল। বলল—দেখুন মহামান্য সেনাপতি আমাদের দেশের রাজকুমারী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এই কয়েদঘরে থাকতে তাঁর খুবই কষ্ট হবে।

—কী করা যাবে—আলাদা রাখার হুকুম না হলে তো—সেনাপতি যায় না।

—কী যে বলেন—আপনার হুকুম কি কিছু কম? মহামান্য—আপনি শুধু পাহারাদারকে বলুন রাজকুমারীকে রাজা ফার্নান্দোর অন্দরমহলে রেখে আসতে—ওরা শুনতে বাধ্য। আপনাকে ওরা যমের মত ভয় করে। সেনাপতি দাঁত বের করে হাসল। বলল—হ্যাঁ তা করে।

—তবে আর ভাবছেন কেন? শাঙ্কো বলল।

—না ভাবছি রাজা যদি জানেন—

—শুধু তো একটা রাত। কালকেই তো তোমার হুকুম জানা যাবে। শাঙ্কো বলল।

—তা বটে—এক রাতের জন্যে—সেনাপতি কথাটা শেষ করল।

—তাই তো বলছি—আপনার ক্ষমতা কি কিছু কম? শাঙ্কো বলল। সেনাপতি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল। বলল—দেখছি।

শাঙ্কো মারিয়ার ইশারায় কয়েদঘরে ঢুকতে মানা করল। মারিয়া কয়েদঘরে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

সেনাপতি রাজপ্রাসাদের দিকে চলল। সঙ্গে কয়েকজন সৈন্য।

কিছুপরে দুজন সৈন্য এল। মারিয়াকে বলল আপনিই তো রাজকুমারী।

—হ্যাঁ। মারিয়া মাথা ওঠানামা করল।

—আমাদের সঙ্গে আসুন। আপনি প্রাসাদের অন্দর মহলে থাকবেন। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—না আমি এখানেই থাকবো।

ফ্রান্সিসরা দরজা ধরে কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্রান্সিস মারিয়ার কথা শুনল।

বলে উঠল—মারিয়া পাগলামি করো না। এই পরিবেশে এক রাত থাকলেই তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। শাঙ্কো বলল—আমাদের জন্যে ভাববেন না। এসবে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আপনি অন্তঃপুরে যান।

মারিয়া আর কিছু বলল না। সৈন্য দুজনের সঙ্গে একটা ঘাসে-ঢাকা প্রান্তর দিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে চলে গেল।

কয়েদঘরে ফ্রান্সিস দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। হ্যারি শাঙ্কো আলখাতিব দুপাশে বসে আছে। আলখাতিব বলল—ভাগ্যিস আগের শুটকো সেনাপতিটা, মারা গেছে। নইলে আমাকে ঠিক চিনতো। আমার বিপদ বাড়তো।

তখনই বিস্কো ফ্রান্সিসের কাছে উঠে এল। মৃদুস্বরে বলল—আপনি এভাবে বন্দীদশা মেনে নেওয়াতে কিছু বন্ধু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে।

—এটা তো ভালো কথা নয়। কথাটা বলে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাই সব—আমি অযথা রক্তপাত মৃত্যু থেকে তোমাদের বাঁচাবার জন্যেই ধরা দিয়েছি। ওদের দুজাহাজ বোঝাই সৈন্য। এদিকে আমরা কজন মাত্র। লড়াইয়ে নামলে আমরা শুকনো পাতার মতো উড়ে যেতাম। আমি সবদিক ভেবেই এই বন্দীদশা মেনে নিয়েছি। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—কালকে রাজা ফার্নান্দোর দরবারে যাচ্ছি। অর্থ সম্পদের লোভ রাজা গরিব সবারই সমান। বরং রাজাদের এই লোভ আরো বেশি। দেখা যাক কাল কী হয়।

পরদিন ফ্রান্সিসরা সকালের খাবার খাচ্ছে তখন সেনাপতি এল। বলল—খেয়েটেয়ে চলো রাজসভায় তবে এতজনকে যেতে হবে না। তোমাদের শুধু দলপতি গেলেই চলবে।

—আমি একা যাবো না—দুজন বন্ধুকেই নিয়ে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। তাই যেও। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কো রাজসভা ঘরে গিয়ে পৌঁছল। ঘরটা একটু অন্ধকার মতো। দেয়ালে আটকানো মশাল জ্বলছে। আর একটা বিচার চলছিল। রাজা ফার্নান্দো একটা কাঠের সিংহাসনে বসে আছেন। সিংহাসনের গদীটা নীল ভেলভেটের কাপড়ে ঢাকা। রাজা ফার্নান্দোর বেশ বয়েস হয়েছে। মাথার পাকা চুলের ওপর সবুজ মিনে করা মুক্তো বসানো সোনার মুকুট। মুখে পাকা দাড়ি গোঁফ।

তখন একটা বিচার চলছিল। বিচার শেষ হল। যে দু'জন বিচার চাইতে এসেছিল তাদের একজন হাতের উল্টোপিঠে চোখের জল মুছতে মুছতে গেল। অন্যজন হাসছিল। সে কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে সভাঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার সেনাপতি ফ্রান্সিসদের এগিয়ে আসতে ইশারা করল। ফ্রান্সিসরা এগিয়ে এসে মাথা একটু নিচু করে রাজাকে সম্মান জানিয়ে দাঁড়াল। সেনাপতি বলতে লাগল কী করে সে ফ্রান্সিসদের বন্দী করেছে।

—ওদের কী বলে আপনার সন্দেহ হয়? রাজা সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করলেন।

—ওরা ভাইকিং ভাই কিংবা জলদস্যু। ওদের জাহাজে তল্লাশী চালালে অনেক

সোনাদানা চুনীপান্না পাওয়া যাবে। সেনাপতি বলল। এবার ফ্রান্সিস বলল—মহামান্য রাজা—ইচ্ছে করলে সেনাপতিমশাই আমাদের জাহাজে তল্লাশী চালাতে পারেন। কিন্তু শুধু সন্দেহ করে আমাদের বন্দী করতে পারেন না।

—সেটা পরে দেখছি। এখন কয়েদঘরে থাকতে হবে। রাজা বললেন।

এবার ফ্রান্সিস খাতিবকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—এগিয়ে যাও। কোন ভয় নেই।

খাতিব রাজসিংহাসনের দিকে একটু এগিয়ে গেল। খাতিব রাজার নজরে পড়ল। রাজা গলা চড়িয়ে বললেন—কি নিজে থেকেই ধরা দিতে এসেছো?

খাতিব কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মাথা তুলে বলল—মাননীয় রাজা—আমি যা জেনেছিলাম যা শুনেছিলাম সবই আপনাকে বলেছি।

—না-না-তুই মিথ্যে কথা বলেছিস। তুই সব জানিস্। রাজা বললেন।

এবার ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে বলল—মান্যবর রাজা! আমরা জাতিতে ভাইকিং। আমরা বেশ পরিশ্রম করে বুদ্ধি খাটিয়ে নানা গুপ্তধন সম্পদ উদ্ধার করেছি। রাজা ফার্নান্দো সাগ্রহে বললেন—সত্যি! তোমরা কি রোমান সম্রাট মাতসের গুপ্ত রাজকোষ উদ্ধার করতে পারবে?

—সব কিছু দেখে শুনে খোঁজখবর করে তবে বলতে পারবো সেই ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবো কি না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ—দ্যাখো চেষ্টা করে। রাজা বললেন।

—এবার কয়েকটা অনুরোধ। আমার বন্ধুরা কয়েদঘরে বন্দী। তাদের মুক্তি দিতে হবে। ওরা আমাদের জাহাজে ফিরে যাবে।

—বেশ। তারপর? রাজা বললেন।

—এই রাজপ্রাসাদেই একটা ঘর আমাদের চারবন্ধুকে দিতে হবে। এতে আমাদের কাজ করার সুবিধে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তোমাদের থাকবার ঘর দেওয়া হবে। রাজা বললেন।

—আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের দেশের রাজকুমারী। তাঁকে অন্দরমহলে থাকতে দিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তিনি অন্দরমহলেই থাকবেন। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিসরা রাজসভা থেকে বেরিয়ে আসছে তখনই দেখল একটু দূরে মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে একজন পরিচারিকা। ফ্রান্সিস মারিয়ার কাছে গেল। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—না, না আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকবো।

—তা হয় না মারিয়া। তার চেয়ে তুমি যখন খুশি আমাদের ঘরে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। কথাটা বলে মারিয়া পরিচারিকাটির সঙ্গে চলে গেল।

প্রাসাদের বাইরে আসতে একজন রাজসভার প্রহরী পেতলের বর্শা হাতে ওদের কাছে এল।

—চলুন—আপনাদের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছি।

দ্বারীর সঙ্গে ওরা চলল। প্রাসাদের দক্ষিণ কোণায় প্রহরী একটা তালাবন্ধ ঘরের তালা খুলল। ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকল। পাথর আর কাঠ দিয়ে ঘরটা তৈরি। ঘরটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মেঝেয় কাঠের বড় তক্তার ওপর বিছানাপত্র পাতা। ফ্রান্সিস ঘরে ঢুকেই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। হ্যারি প্রহরীকে বলল—খাবার সময় আমাদের ডেকো। প্রহরীটি মাথা ওঠানামা করে চলে গেল।

এবার হ্যারিও বসল। শাঙ্কো ঘরে আস্তে আস্তে পায়চারি করতে লাগল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস তোমার কি মনে হয়? রোমান সম্রাট মাতিসের রাজকোষ ঐ জিরাল্ডা টাওয়ারেই আছে? ফ্রান্সিস শুয়ে শুয়েই বলল—নিশ্চয় আছে। সেই গভীর রাতে সম্রাট ঐ টাওয়ারে গিয়েছিলেন কোষাগার গোপনে লুকিয়ে রাখার জন্য। খাতিবের প্রপিতামহকে আর একজন মিস্ত্রিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। লক্ষ্য কর সম্রাট মাতিস অন্য কাউকে নিয়ে যান নি। নিয়ে গেলেন দুজন অভিজ্ঞ রাজ মিস্ত্রিকে। কাজেই ঐ টাওয়ারের কোথাও রাজকোষ লুকোবার জায়গা ওদের দিয়ে করিয়ে নিয়ে রাজকোষ লুকিয়ে রেখেছিলেন।

হ্যারি বলল—কিন্তু ঐ টাওয়ারের সব সিঁড়িই তো ভেঙে ফেলা হয়েছে। উঠবে কী করে?

—হ্যারী, বেশি ভাবতে পারছি না। ভীষণ খিদে পেয়েছে। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন প্রসাদরক্ষী ফ্রান্সিসদের খেতে ডাকল। প্রাসাদরক্ষী ফ্রান্সিসদের প্রাসাদের খাবার ঘরেই নিয়ে এল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। টেবিলে ফিকে নীল রঙের কাপড়ের ঢাকনা। প্লেট ছুরি কাটা চামচ ঝক্‌ঝক্ করছে। তখনই মারিয়া ঢুকল। বলল—আমি বলেছি যে দিনের বেলার খাবার আমি তোমাদের সঙ্গে খাবো। খেতে বলে মারিয়ার মনে পড়ল ওদের প্রাসাদের খাবার ঘরের কথা। মারিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল। ও গম্ভীর মুখে খেতে লাগল। পাশেই খেতে খেতে ফ্রান্সিস বুঝল সেটা কিছু বলল না।

হঠাৎ মারিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকাল। মারিয়া তখন হাতের উল্টো পিঠে চাখ মুছছে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—মারিয়া আমাদের জীবনটাই এমনি। কখনও বারোয়ারি অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ কখনও কয়েদখানার নোংরা পরিবেশ কখনও এইরকম সাজানো গোছানো সুন্দর ঝকঝকে পরিবেশ। আমাদের জীবনে দুটোই সত্যি। একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—কেঁদো না। আমার মন দুর্বল করে দিও না। মারিয়া চোখের জল মুছতে মুছতে হাসল। বলল—আর কাঁদবো না।

খেয়ে দেয়ে ফ্রান্সিসরা ঘরে ফিরল। মারিয়া অন্দর মহলে চলে গেল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। বলল—অনেকদিন এত সুস্বাদু খাবার খাই নি। হ্যারি বলল—ভালো খাবারের স্বাদই ভুলে গিয়েছিলাম। হ্যারি আর শাঙ্কো বসল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস উঠে বসল। বলল—বলেছিলাম না পেটপুরে খেলেই আমার

বুদ্ধি খুলবে।

হ্যারি হেসে বলল—তোমার বুদ্ধি কী বলছে?

ফ্রান্সিস হেসে বলল—বুদ্ধি বলছে এখনও তোমার ভাবনার শেষ হয় নি। আরো ভাবো।

ওরা যখন কথাবার্তা বলছে তখনই সেই প্রহরীটি এল। বলল—সেনাপতি মশাই আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না জানতে।

ফ্রান্সিস বলল—গিয়ে বলো যে আমাদের খুবই অসুবিধে হচ্ছে। উনি যেন একবার আসেন। প্রহরীটি চলে গেল।

একটু পরে সেনাপতি বেশ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এল। বলল—আপনাদের কী অসুবিধে হচ্ছে?

—বিশেষ কিছু না। আমাদের এবার দুটো জিনিস চাই। বেশ লম্বা একগাছা কাছি নয় তো দড়ি। শক্ত দড়ি। ধরে ওঠানামা করা যায় এমনি। অন্যটা হল একটা বড় লাঠি মত। এটা কাঠের টুকরোয় জোড় দিয়ে করা যায়। ফ্রান্সিস বলল।

—কাছি বা দড়ি দেখছি পাওয়া যায় কি না। তবে লাঠির মত যেটা করতে বলছেন সেটা আমাদের কাঠের মিস্ত্রিকে বলুন সে তৈরি করে দেবে। আর কিছু? প্রহরীটি বলল।

—না শুধু এই। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি চলে গেল।

একটু পরে কাঠের মিস্ত্রি এল।

ফ্রান্সিস তাকে বলল—তুমি তো ঐ জিরাল্ডা মিনারটা দেখেছো।

—হ্যাঁ ও তো ছেলোবেলা থেকে দেখে আসছি। মিস্ত্রি হেসে বলল।

—ঐ মিনারের ঠিক মাঝামাঝি পর্যন্ত ওঠে এরকম একটা লাঠি তৈরি করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

মিস্ত্রি একটু ভেবে নিয়ে বলল—তা করা যাবে।

—তাহলে আজকেই লেগে পড়ো কাল দুপুর নাগাদ ওটা আমার চাই। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন দুপুর নাগাদ মিস্ত্রি এল। বলল দেখে নিন কাঠের লাঠিটা ঠিক বানানো হল কিনা। ফ্রান্সিসরা ঘরে থেকে বেরিয়ে এল। দেখল লম্বা কাঠ জোড়া দিয়ে দিয়ে বেশ বড় একটা কাঠের লাঠি মিস্ত্রি তৈরি করে প্রাসাদের চত্বরে রেখেছে। ফ্রান্সিস দেখল। টাওয়ার আর তার কাছেই চেস্টনাট গাছের উচ্চতাটা হিসেব করল। বলল—ঠিক আছে। তারপর লাঠিটার মাথা দেখিয়ে মিস্ত্রিকে বলল—ঐ চেস্টনাট গাছটা থেকে গুলতির মত জোড়া ডাল কেটে আন। তারপর সেটাকে লাঠির মাথায় পেরেক দিয়ে ঠুকে গুলতির মত কাটা ডালটা লাগিয়ে দাও।

মিস্ত্রি চলল টাওয়ারের কাছে অনেকটা উঁচু চেস্টনাট গাছটার দিকে। ডাল কেটে এনে গুলিতর মত লাঠির মাথায় লাগিয়ে দিল।

এমন সম দেখা গেল চারজন সৈন্য একটা দড়ির কুণ্ডুলি নিয়ে আসছে। সেটা জিরান্ডা টাওয়ারের নিচে রাখা হল।

দুপুরের খাওয়া সেরে ফ্রান্সিসরা টাওয়ারের নিচে এল। মারিয়াও অন্দরমহল থেকে এল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—শোন—আমি গাছটার মগ ডালে উঠি। তোমরা আন আমাকে লাঠিটা দেবে। লাঠিটার মাথায় গুলতি মত জায়গায় দড়ির একটা মুখ আটকে দেবে। আর দড়ির মাথায় পাথরের ছোট চাঙ বেঁধে দেবে। আমি গাছে উঠছি?

ফ্রান্সিস চেস্টনাট গাছের কাণ্ড ধরে ধরে উঠল। তারপর খুব সহজেই ডাল ধরে ধরে একেবারে মগডালে উঠে গেল। এবার নিচে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল—শাঙ্কো, দড়ির একটা মুখ দাও।

শাঙ্কো তৈরি ছিল। লাঠির মাথায় গুলতির মুখটাতে দড়ির একটা মুখ আটকাল। তারপর হ্যারি আর মারিয়ার সাহায্যে লাঠিটা গাছের মগডাল পর্যন্ত তুলল। ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে লাটিঠা ধরল। দড়ি পরানো অবস্থায় ও লাঠিটা টাওয়ারের মাথার কাছে তুলল। তারপর একটা ঝাঁকুনি দিতেই লাঠির মাথা থেকে দড়িবাঁধা পাথরের চাঙরটা টাওয়ারের মধ্যে পাথরের দেওয়ালে ঘা খেয়ে নিচে পড়ে গেল। টাওয়ারে গম্ভীর শব্দ উঠল ঢাং-ঢাং।

ফ্রান্সিস চেস্টনাট গাছ থেকে মেঝে এল। টাওয়ারের মধ্যে ঢুকল। দড়ি বাঁধা পাথরটা পড়ে আছে। হ্যারিরা এগিয়ে এল। হ্যারি হেসে বলে উঠল—সাবাস্ ফ্রান্সিস। মারিয়া হেসে বলল—তোমার মাথায় এতও আসে।

এবার ফ্রান্সিস দড়ির মুখ থেকে পাথরের চাঙরটা খুলে ফেলল। তারপর দড়িটা টানতে লাগল। একসময় টাওয়ারের মাথা থেকে চেস্টনাট গাছ পর্যন্ত দড়িটা টানটান হয়ে গেল। ফ্রান্সিস দড়ি ধরে টান দিল বার কয়েক। দেখা গেল চেস্টনাট গাছের কাণ্ডে বাঁধা দড়িটা টাওয়ারের মুখ দিয়ে নেমে বেশ শক্ত হল টান টান হয়ে আছে।

ফ্রান্সিস এবার দড়ি টেনে ধরে উঠতে লাগল। টাওয়ারের দেয়ালের গায়ে সারা জানালার মত চৌকোণো ফোকর আছে মাঝে মাঝে। চৌকোনা ফোকরে গরাদ নেই। ওগুলো থেকে কিছু আলো টাওয়ারের ভেতরে আসছে। তবু টাওয়ারের ভেতরের অন্ধকার কাটে নি।

ফ্রান্সিস উঠতে লাগল।

ওদিকে রোমান সম্রাট মাতিসের গুপ্ত কোষাগার একজন বিদেশী উদ্ধার করার চেষ্টা করছে—এই খবর রটে গেল। দলে দলে লোকজন এসে টাওয়ারের নিচে দাঁড়াল। ততক্ষণে রাজা ফার্নান্দোও এসেছেন। প্রাসাদ থেকে একটা আবলুস কাঠের আসন নিয়ে আসা হল। রাজা ফার্নান্দো বসলেন তাতে। দুজন অমাত্য রাজাসনের দুপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

ফ্রান্সিস টাওয়ারে আস্তে আস্তে উঠে ওপরে উঠে পড়ল। টাওয়ারের মাথায় বসে দড়িটা ধরে থাকল। নিচের দর্শকরা মহা উৎসাহে হাততালি দিল। এবার

আসল কাজ। ফ্রান্সিস টাওয়ারের মুখটায় উঠে দাঁড়াল। দেখল—পাথরের গোল মুখটা। সিঁড়িগুলো ভেঙে ফেলেও কোষাগার পাওয়া যায় নি। তাহলে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে রাজকোষ? ফ্রান্সিস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল গোল মুখটা। দেখল ওপরে একটা পাথরের ধাপ আছে। সম্রাট মাতিস এখানে কোথাও রাজকোষ লুকিয়ে রেখেছেন। এ সিঁড়িগুলো ভেঙে ফেলেও কোথাও রাজকোষ পাওয়া যায় নি। ফ্রান্সিস পাথরের ধাপটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। অল্প আলোতেও ফ্রান্সিস হঠাৎ দেখল পাথরের ধাপটায় তিন রঙের তিনটি পাথরের পাটা—কালো কষ্টিপাথর, শ্বেতপাথর আর হলদেটে রঙের পাথরের তিনটি পাটা। মিনারে যদি নকশা করার উদ্দেশ্য হত তাহলে বাইরের দিকে করা হত। ভেতরের নকশা কে দেখতে আসবে?

ফ্রান্সিস তিন রঙের পাথরের পাটায় হাত বুলোল। বুঝল এই পাথর তিনটি পরে গাঁথা হয়েছে। আগের তিনটি পাথর খুলে ফেলে সেখানে এই তিনরঙা পাথরের পাটা গেঁথে রাখা হয়েছে। জোড়ে মেলে নি। তাই তিনটি পাথরই একটু বেরিয়ে আছে। এই তিনটি পাথর খুলতে পারলে সম্রাটের গুপ্ত ধনভাণ্ডার দেখা যাবে। এখানে ছাড়া অন্য কোথাও গুপ্ত রাজকোষ রাখা হয়নি।

এবার তিনটি পাথর খুলে ফেলতে হবে। নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে রোমান সম্রাট মাতিসের গুপ্ত রাজকোষ। ফ্রান্সিস টাওয়ারের মাথায় বসল। কোন রকমে হাত বাড়িয়ে কষ্টিপাথরটা টানল। কয়েকবার হ্যাঁচকা টান দিতে পাথরটা একটু নড়ল। ওরকম শুধু টানাটানি করে ঐ তিনটি পাথর খুলে ফেলা যাবে না।

নিচের দিকে মুখ নামিয়ে ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো—ও—ও। ডাকের শব্দটা টাওয়ারের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হল। শাঙ্কো নিচে থেকে বলল—বলো—শুনছি।

ফ্রান্সিস কথাটা শুনতে পেল। বলল—একটা কুড়ুল নিয়ে এখানে উঠে এসো।

একটু পরেই একটা কুড়ুল কোমরে গুঁজে দড়ি বেয়ে বেয়ে শাঙ্কো উঠে এল। শাঙ্কোর হাত থেকে ফ্রান্সিস কুড়ুলটা নিল। দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। দড়িতে দুপা জড়িয়ে একটু আলগা হয়ে কষ্টিপাথরে কুড়ুলের ঘা মারল। কুড়ুলের ঘায়ে মিনারে শব্দ উঠল—গম্—গম্।

ফ্রান্সিস আরো কয়েকবার ঘা মারলো। কষ্টিপাথরটা ভাঙল না। ক্লান্ত ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো কুড়ুলটা নাও। মনে হচ্ছে কষ্টিপাথরটা ভাঙা যাবে না। ঠিক খাঁজে খাঁজে মারো। শাঙ্কো কুড়ুল নিল। দড়িতে পা জড়িয়ে ভারসাম্য রেখে কষ্টিপাথরটার খাঁজে খাঁজে কুড়ুলের ঘা মারতে লাগল। কষ্টিপাথরটার একটা কোণা ভেঙে পড়ল। আরো কটা ঘা মারতে কষ্টিপাথরের অর্ধেকটা ভেঙে পড়ে গেল। খোঁদল হল। খোঁদলের মধ্যে দেখা গেল রূপোর সুতোয় প্যাঁচানো একটি দড়ি। শাঙ্কো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—ফ্রান্সিস—একটা দড়িমত দেখা যাচ্ছে। —তুমি উঠে এসো। আমি দেখছি। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো উঠে এল। মিনারের মুখে বসল। ফ্রান্সিস বলল—কষ্টিপাথর ভেঙেছে।

এখন বাকি দুটো পাথর সহজেই বের করা যাবে।

এবার ফ্রান্সিস দড়ি ধরে ঝুলে কষ্টিপাথরটায় কটা কুড়ুলের ঘা মারতেই কষ্টিপাথর ভেঙে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাল। দেখল একটা দড়ি। দড়িটা রূপোর সূতোর কাজ করা। ফ্রান্সিস দড়িটা ধরে টানল। কিন্তু দড়িটা বেরিয়ে এল না। ওটার পরেই শ্বেতপাথরের পাটা। ফ্রান্সিস সেটায় কুড়ুলের ঘা মারতে লাগল। শ্বেতপাথরটার মাঝামাঝি ভেঙে পড়ে গেল। দেখা গেল একটা বড় চামড়ার থলির মুখ।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—সম্রাট মাতিসের গুপ্ত কোষাগার আমাদের সামনে। ফ্রান্সিসের কথাটা টাওয়ারের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হল। নিচে দাঁড়ানো লোকেদের কানেও গেল রাজাও শুনলেন। মারিয়া রাজার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। মারিয়া হেসে দুহাত তুলে বলে উঠল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস শ্বেতপাথরের বাকি অংশটা ভেঙে ফেলল। বড় ক্লান্ত লাগছে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো হলদেটে পাথরটা ভাঙো। ফ্রান্সিস মিনারের মুখটায় উঠে বসল। শাঙ্কো দড়ি ধরল। পা দিয়ে দড়িটা জড়িয়ে হলদেটে পাথরটায় কুড়ুলের ঘা মারতে লাগল। সেটাও ভেঙে গেল। দেখা গেল একটা সুদৃশ্য চামড়ার বড় থলি। মুখটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। ফ্রান্সিস থলেটা ধরে জোরে হ্যাঁচকা টান দিল। হলদেটে পাথরের বাকিটা ভেঙে পড়ে গেল। শাঙ্কো বলে উঠল—সাবাস ফ্রান্সিস। দুজনে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। নিচে মারিয়াও ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো টাওয়ারের মাথায় বসল। ফ্রান্সিস থলেটার দড়ি আলগা করে হাত ঢোকাল। একমুঠো তুলে আনল। মণিমুক্তো হীরের টুকরো। বিকেলের নিস্তেজ আলোতে সব ঝিকিয়ে উঠল।

ফ্রান্সিস সব থলেতে রেখে দিল। বলল—শাঙ্কো চলো নামি।

দুজনে দড়ি ধরে ধরে নেমে এল।

চামড়ার থলে হাতে ফ্রান্সিস নেমে আসতেই হ্যারি হাসতে হাসতে ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। হ্যারি আর শাঙ্কো ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো।

ফ্রান্সিস রাজা ফার্নান্দোর দিকে এগিয়ে গেল। থলিটা রাজাকে দিল। রাজা মুখ বাঁধা দড়িটা খুলে থলিটার মুখ খুলল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলেন একমুঠো মণিমাণিক্য। সেগুলো রোদ লেগে ঝিকমিক করতে লাগল।

রাজা এবার ফ্রান্সিসকে বললেন—তোমরাই সম্রাট মাতিসের রাজকোষ উদ্ধার করেছো। বলো—তোমরা কী চাও?

ফ্রান্সিস হেসে বলল—মান্যবর রাজা—আমরা কিছুই চাই না। শুধু বলি—আপনার প্রজাদের কল্যাণে এই ধনসম্পদ ব্যয় করুন। এটাই আমাদের অনুরোধ।

ফ্রান্সিসরা রাজা ফার্নান্দোর কাছ থেকে বিদায় নিল। চলল হুয়েনভা বন্দরের দিকে যেখানে ওদের বন্ধুরা আর ওদের জাহাজ আছে।

রত্নহার উদ্ধারে ফ্রান্সিস

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে ওদের দেশের দিকে। ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা খুব খুশি। আকাশে মেঘ নেই। জোর বাতাস বইছে। ভাইকিংরা সব পাল খুলে দিয়েছে। বেগবান বাতাসে পালগুলো যেন বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে। খুব দ্রুত গতিতে জাহাজ ঢেউ ভেঙে চলেছে। এখন আর দাঁড় বাইতে হচ্ছে না। ভাইকিংরা জাহাজের এখানে-ওখানে দল বেঁধে বসেছে। ছক্কা-পাঞ্জা খেলছে। গল্পগুজব করছে। বেশিরভাগই দেশের কথা। দেশের আত্মীয়স্বজন অবাক হয়ে শুনবে ওদের এই অভিযানের বিচিত্র কাহিনী। এসব নিয়েই কথা হচ্ছে।

তখন বিকেল হয়েছে। সূর্য অস্ত যায়নি। পশ্চিম আকাশে তখন সূর্য অনেকটাই ঢলে পড়েছে। হঠাৎই মাস্তুলের মাথা থেকে নজরদার পেড্রোর চিৎকার করে বলা কথাটা শোনা গেল। "ভাইসব, সাবধান। ঝড় আসছে।" পেড্রো দড়িদড়া ধরে দ্রুত মাস্তুল বেয়ে নামতে লাগল। বিস্কো ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে।

একটু পরেই ফ্রান্সিস ডেকে উঠে এল। পেড্রো ফ্রান্সিসের কাছে এল। পেড্রো তখনও হাঁফাচ্ছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "ফ্রান্সিস, ঝড় আসছে। ওপর থেকে দেখলাম দক্ষিণ দিকে কালো মেঘ জমেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় উঠবে।"

পেড্রো জাহাজের অভিজ্ঞ নজরদার। ওর অনুমান ঠিকই হবে। ঝড় আসার আর একটা লক্ষণও দেখা গেল। বাতাস পড়ে গেছে। পালগুলো নেতিয়ে পড়েছে।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, "ভাইসব, ঝড় আসছে। ডেকে এসে নিজের নিজের জায়গা নাও। পাল নামিয়ে ফেলো। ঝড়ের মোকাবিলা করতে সবাই তৈরি হও।"

ভাইকিংরা ডেকে কিছুটা অন্তর অন্তর পালের খুঁটির দড়িদড়া ধরল। ঝড়ের সময় দাঁড় বেয়ে কোনও লাভ নেই। তাই দাঁড়ঘরে কেউ গেল না। ডেকে তৈরি হয়ে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস জাহাজ চালক ফ্রেজারের কাছে এল। বলল, "ঝড়ের মেঘ উঠেছে। আর কিছুক্ষণ মধ্যেই ঝড় আসবে। তুমি তৈরি তো?"

ফ্রেজার বলল, "হুইল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি দিক ঠিক রাখতে চেষ্টা করব। ঝড়ের ধাক্কায় জানি না কতটা সফল হব।"

ফ্রান্সিস বলল, "এটা ভূমধ্যসাগর এলাকা। এখানে কয়েকবার ঝড়ের মুখে পড়েছি। দেখেছি এখানে প্রচণ্ড ঝড় হয় না। তবু তৈরি হও। দিক ঠিক রাখো।"

দু'জনে যখন কথা বলছে তখনই হঠাৎ বাতাস বইতে শুরু করল। গুমোট ভাবটা আর রইল না। বাতাসের জোর বাড়তে লাগল। ঘন কালো মেঘ দক্ষিণের আকাশ থেকে মধ্য আকাশের দিকে উঠে আসতে লাগল। পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢাকা পড়ে গেল। অন্ধকার নেমে এল। কালো মেঘের মধ্যে শুরু হল আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠা। সেই সঙ্গে বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দ। সমুদ্রের জলে বড় বড় ঢেউ তুলে ঝড় ছুটে এল। ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসদের জাহাজের ওপর। ঝড়ের ধাক্কায় ফ্রান্সিসদের জাহাজ বেগে দুলতে লাগল। ঝোড়ো বাতাসে জলের ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ডেকে। ভাইকিংরা দড়িদড়া টেনে ধরে জাহাজকে সোজা রাখার চেষ্টা করতে লাগল। অল্প অল্প বৃষ্টির পর এখন শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি পড়া। জাহাজ কখনও ঢেউয়ের মাথায় উঠে পড়তে লাগল। তারপরেই দুই ঢেউয়ের মধ্যে নিচে নেমে আসতে লাগল। জাহাজের এই ওঠাপড়ার সঙ্গে ভাইকিংরা জাহাজকে সোজা রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

ফ্রান্সিসদের সৌভাগ্য বলতে হবে। কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টি কমে এল। তারপর থেমে গেল। বাতাসের বেগও কমতে লাগল। আকাশে ধোঁয়ার মতো কালো মেঘ উত্তরমুখো উড়ে যেতে লাগল। তারপরেই আকাশে আর মেঘ নেই। ফুলের মতো তারা ফুটতে লাগল। আধভাঙ্গা চাঁদ থেকে উজ্জ্বল আলো সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে পড়ল।

এতক্ষণ ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে ভাইকিংরা অবসন্ন হল। সপ্‌সপে ভেজা পোশাক গায়ে তারা ডেকে বসে রইল কয়েকজন। বাকিরা ডেকে শুয়ে রইল। জলে ভেজা পোশাক গায়ে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে জাহাজ চালক ফ্রেজারের কাছে এল। বলল, "ফ্রেজার, আমাদের দিক ভুল হয়নি তো?"

"ঝোড়ো বাতাস আর ঢেউয়ের ধাক্কায় দিক ঠিক রাখতে পারিনি। একবার এদিকে আর একবার ওদিকে জাহাজটা যেন ছিটকে পড়েছে। দিকটিক সব গুলিয়ে গেছে।" ফ্রেজার বলল।

"তা হলে এখন কী করবে?" ফ্রান্সিস বলল।

"জাহাজ যে মুখো চলছে চলুক। দ্বীপ বা দেশ যাই হোক সেখানে পৌঁছতে হবে। তবেই দেখেশুনে দিক ঠিক করতে পারব।" ফ্রেজার বলল।

"বেশ, জাহাজ চলুক। দেখা যাক কোনও দ্বীপ বা দেশে পৌঁছনো যায় কিনা।" ফ্রান্সিস বলল। তারপর কেবিনঘরে যাবে বলে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল।

হ্যারি এগিয়ে এল। সঙ্গে আরও কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু। হ্যারি বলল, "এখন কী করবে?"

ফ্রেজারের সঙ্গে যা কথা হল সেসব ফ্রান্সিস বলল। তারপর বলল, "এখন আমাদের কিছুই করবার নেই। জাহাজ যেমন চলেছে চলুক।"

সন্ধে হল। নজরদার পেড্রো মাস্তুলের মাথায় ওর বসার জায়গায় বসে আছে। চারদিকে নজর রাখছে কোনওদিকে ডাঙা দেখা যায় কিনা। আবার নজর রাখছে জলদস্যুদের জাহাজ আসছে কিনা তার দিকেও।

রাত হল। চাঁদের উজ্জ্বল আলো সমুদ্রে ছড়াল। সমুদ্র বেশ দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সাদাটে কুয়াশা নেমে এলে অবশ্য বেশি দূর পর্যন্ত দেখা যায় না। কুয়াশার অস্পষ্টতার মধ্যে দিয়েও পেড্রোর নজরে পড়ল ডাঙা। ও চিৎকার করে বলে উঠল, "ডাঙা, ডাঙা দেখা যাচ্ছে।" কথাটা কানে যেতেই ডেকের ওপর যারা শুয়ে বসে ছিল তার উঠে দাঁড়াল। জাহাজের রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। ডাঙা তখন অনেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের ধারে কোনও টিলা বা ছোট পাহাড় নেই। সমতলভূমি সমুদ্র থেকে উঠে গেছে। দুটো জাহাজ নোঙর করে আছে দেখা গেল।

ততক্ষণে ফ্রান্সিস হ্যারি ডেকে উঠে এসেছে। সঙ্গে মারিয়া। হ্যারি জাহাজ দুটো দেখতে দেখতে বলল, "একটা যুদ্ধজাহাজ, অন্যটা মালবাহী জাহাজ।"

ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী করবে এখন?"

ফ্রান্সিস বলল, "ফ্রেজারকে জাহাজ থামাতে বলো।" একজন ভাইকিং-বন্ধু ফ্রেজারকে সে-কথা বলতে গেল।

ডেকে জড়ো হওয়া বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল, "ভাইসব, আমরা ওই জাহাজঘাটায় এখন জাহাজ ভেড়াব না। অচেনা অজানা জায়গা। সব আগে দেখেশুনে তারপর যা করবার করব। এখন জাহাজ এখানেই নোঙর করো। পরে ভাবব কী করা যায়।"

ততক্ষণে জাহাজ থেমে গেছে। ঘরঘর শব্দে নোঙর ফেলা হল। থেমে থাকা জাহাজ ঢেউয়ের ধাক্কায় দোল খেতে লাগল। হ্যারি বলল, "ডাঙায় জাহাজ না ভেড়ালেও কোথায় এলাম তা তো জানতে হবে।"

ফ্রান্সিস বলল, "এজন্যেই রাত একটু বাড়লে তুমি, শাঙ্কো আর আমি আমাদের নৌকোয় চড়ে ওখানে যাব। লোকজনদের জিজ্ঞেস করে জানব, এই জায়গাটা কি কোনও দ্বীপ না দেশ। এটা জানতে পারলে আমাদের দেশ কতদূর সেটা বুঝতে পারব। এবার চলো রাতের খাওয়া খেয়ে নিই।"

মারিয়া বলল, "এখানে কারা থাকে, কী রকম মানুষ তারা, সেসব তো তোমরা কিছুই জানো না।"

ফ্রান্সিস বলল, "উপায় নেই, এই ঝুঁকিটুকু নিতেই হবে।"

ফ্রান্সিসরা রাতের খাওয়া একটু আগেই খেয়ে নিল। ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কোকে বলল, "তোমরা এখন শুয়ে বিশ্রাম করে নাও। আমি সময়মতো তোমাদের ডাকব।"

রাত বাড়তে লাগল। তখন মধ্যরাত্রি। ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠল। কোমরের ফেট্টিটা ভাল করে বাঁধল। তরোয়াল ঝোলাল। মোমের আলোয়

দেখল মারিয়া উঠে বসেছে। ফ্রান্সিস বলল, "তুমি রাত জেগো না। ঘুমিয়ে পড়ো।"

মারিয়া ম্লান হেসে বলল, "তোমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে যাচ্ছ, আর আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোব, এটা কি হয়?"

ফ্রান্সিস বলল, "যাতে বিপদে না পড়ি তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তুমি এসব নিয়ে ভেবো না।"

ফ্রান্সিস তৈরি হয়ে কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে এল। চলল হ্যারি আর শাঙ্কোকে ডাকতে। হ্যারি তরোয়াল নিল। শাঙ্কো নিল তীরধনুক। তিনজনে জাহাজের ডেকে উঠে এল। সমুদ্র থেকে একটা ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে এসে ওদের গায়ে লাগল।

ফ্রান্সিসের শরীরটা একটু কেঁপে উঠল। অত রাতেও বেশ কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। হালের কাছে দড়ির মই বেয়ে হ্যারি আর শাঙ্কো ছোট নৌকোটায় নেমে এল। ফ্রান্সিস নামবার আগে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, "কোনও ভয় নেই, আমরা নিরাপদেই ফিরে আসব। এখন থেকে ফ্রেজারের কথামতোই তোমরা চলবে।"

ফ্রান্সিস নৌকোয় নেমে দাঁড় তুলে নিল। শাঙ্কো জাহাজে বাঁধা নৌকোয় দড়িটা খুলে দিল। একটা পাক খেল নৌকোটা। ফ্রান্সিস ডাঙার দিকে লক্ষ্য রেখে দাঁড় বাইতে লাগল।

চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। সমুদ্রে ঢেউয়ের মাথায় সেই আলো নাচছে। নৌকো চলেছে তীরের দিকে। সমুদ্রে কখনও কুয়াশা জমছে, কখনও জোর হাওয়া কুয়াশা উড়িয়ে দিচ্ছে।

তীরের কাছে এসে ফ্রান্সিস দেখল, বন্দর, জাহাজ বেশ দূরে। কুয়াশার আস্তরণের মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

নৌকো তীরে লাগল। তিনজনে নৌকো থেকে নামল। তীর এদিকটা ঢালু। তিনজনে ঠেলে নৌকোর অর্ধেকটা তীরে তুলে রাখল, যাতে ভেসে না যায়। ঢালু তীর দিয়ে ওরা উঠে এল। দেখল, বিস্তৃত প্রান্তর। এদিকে বাড়িঘর নেই। বাড়িঘর সব বন্দরের দিকে। প্রান্তরের শেষে ঝোপজঙ্গল। ফ্রান্সিস বলল, "চলো, ওই বন্দরের দিকে—ওই বাড়িঘরের দিকে।"

তিনজনে চলল। ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। হেঁটে চলল ওরা। বনজঙ্গলের কাছাকাছি আসতেই শুনল, অস্ত্রের ঝনঝন শব্দ। বনজঙ্গলের মধ্য থেকে চারজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে দ্রুত পায়ে ফ্রান্সিসদের সামনে এসে দাঁড়াল। জ্যোৎস্নায় দেখা গেল, ওদের মাথায় শিরস্ত্রাণ, গায়ে বর্ম, হাতে খোলা তরোয়াল। ফ্রান্সিস বুঝল, এরা আরবি সৈন্য। ফ্রান্সিসরা কিছু বোঝার আগেই সৈন্য চারজন ফ্রান্সিসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দ্রুত হাতে তারোয়াল খুলল। সৈন্যদের প্রথম আক্রমণটা ঠেকাল।

এবার শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। শাঙ্কো তার আগেই কয়েক পা পেছনে সরে এল।

ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাতে চালাতে বলল, "শাঙ্কো, মেরো না, আহত করো।" শাঙ্কো ততক্ষণে ধনুকে তীর পরিয়েছে। হ্যারির সঙ্গে লড়াই করছে যে সৈন্যটা, শাঙ্কো তাকেই নিশানা করল। হ্যারির শরীর দুর্বল। ও বেশিক্ষণ লড়তে পারবে না। শাঙ্কো তীর ছুড়ল। সৈন্যটার ডান হাতে তীরটা বিঁধে গেল। তরোয়াল ফেলে সৈন্যটি মাটিতে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস তখন তিনজন সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করছে। ফ্রান্সিসদের মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই, গায়ে বর্মও নেই। শুধু মনের জোরে ফ্রান্সিস লড়াই করতে লাগল। ততক্ষণে শাঙ্কো আরও একটা তীর ছুড়েছে। তীরটা লাগল যুদ্ধরত এক সৈন্যের পায়ে। সৈন্যটি মাটির ওপর বসে পড়ল। বাকি দু'জনের একজনকে ফ্রান্সিস এবার ঘায়েল করল। তরোয়ালের কোপে তারা হাত কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। তখন দু'জন সৈন্য গলা ছেড়ে চিৎকার করে কী বলে উঠল। আরবি ভাষা। ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না।

ফ্রান্সিস দেখল, বনজঙ্গলের দিক থেকে প্রায় পনেরো-বিশজন সৈন্য ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস লড়াই থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁফাতে লাগল। সৈন্যটিও আর ফ্রান্সিসকে আক্রমণ করল না। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল।

সেই সৈন্যরা ছুটে এসে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে একজন সর্দার গোছের সৈন্য ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল, "তোমরা কারা?" ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না।

হ্যারি স্পেনীয় ভাষায় বলল, "স্পেনীয় ভাষায় বলুন।"

সেই সৈন্যটি এবার ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্পেনীয় ভাষায় বলল, "তোমাদের পরিচয় কী? তোমরা কোত্থেকে এসেছ?"

হ্যারি বলল, "আমরা ভাইকিং। অনেক দূরে আমাদের দেশ।"

"সে তো তোমাদের দেখে, পোশাক দেখে বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু তোমরা আমাদের সৈন্যদের মারলে কেন?"

ফ্রান্সিস বলল, "আপনার সৈন্যরা এসেই আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আত্মরক্ষার জন্যেই আমাদের লড়তে হয়েছে। নইলে এখানে আমাদের মৃতদেহ পড়ে থাকত।"

"তোমাদের বার্বারদের গুপ্তচর ভেবেই আমাদের সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।" সর্দারটি বলল।

"বার্বার কারা আমরা জানি না।" হ্যারি বলল।

"যাকগে," সর্দারটি বলল, "আমাদের তিনজন সৈন্যকে তোমরা আহত করেছ। তোমাদের বন্দি করা হল।"

"আমরা আক্রান্ত হয়েই আক্রমণ করেছি।" হ্যারি বলল।

"এসব কালকে আমাদের শন্ত মিনকে বোলো। তিনি বিচার করে যা হুকুম

দেবেন তাই আমাদের মানতে হবে।" সর্দারটি বলল। তারপর হাত তুলে বন্দরের দিকটা দেখিয়ে বলল, "চলো সব।" ফ্রান্সিসদের নিয়ে সব সৈন্য চলল।

যেতে যেতে হ্যারি সেই সর্দারকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কি কোনও দ্বীপ না দেশ।"

সর্দার বলল, "দ্বীপ নয়, এটা উত্তর আফ্রিকা। আমাদের ভাষায় নাম আল-মেঘারি। বার্বাররা এই দেশকে আলজিরিয়া বলে।"

"এই বন্দর শহরের নাম কী?" শাঙ্কো বলল।

"সিউতা", সর্দারটি বলল।

সিউতার পথে নামল সবাই। চলল পুবমুখো। দু'পাশে বাড়িঘরদোরে কোথাও আলো নেই। সবাই ঘুমিয়ে। অন্ধকার পথে ওরা চলল।

একটা লম্বাটে পাথরে তৈরি ঘরের সামনে এসে সর্দার দাঁড়াল। ফ্রান্সিস দেখেই বুঝল এই ঘরটাই কয়েদঘর। ঘরটার লোহার দরজার দু'পাশে মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় দেখা গেল দু'জন পাহারাদার সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে। সর্দারটি এগিয়ে গেল। পাহারাদারদের কী বলল। একজন পাহারাদার কোমরে ঝোলানো চাবির থোকা থেকে একটা চাবি বের করল। তালা খুলল। ঢাং-ঢন শব্দ তুলে লোহার দরজাটা খুলে দিল। সর্দারটি ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢোকার ইঙ্গিত করল। ওরা মাথা নিচু করে কয়েদঘরে ঢুকল। আবার শব্দ তুলে লোহার দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে দুটো মশাল জ্বলছে। সেই আলোতে ফ্রান্সিস দেখল ঘরটা লম্বামতো। কয়েদঘর যেমন হয় এই ঘরটাও তেমনই। ছাদটা কাঠ আর শুকনো লম্বা লম্বা ঘাসে তৈরি। অনেক ওপরে দুটো জানলা। জানলায় শিক বলে কিছু নেই। খোঁদল বললেই হয়। মেঝেয় দড়িদড়া দিয়ে শুকনো ঘাস বেঁধে বিছানা করা। তাতে একপাশে আট-দশজন লোক শুয়ে ঘুমোচ্ছে। দরজা খোলার শব্দে দু'-একজনের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারা ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল, আগের বন্দিদের হাত বাঁধা নয়। ও নিশ্চিন্ত হল যে, ওদেরও হাত বাঁধা হবে না।

হ্যারি আর শাঙ্কো ক্লান্তিতে বিছানায় বসেই শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বসল। শুয়ে পড়ল না। ওর কানে পাখির ডাক ভেসে এল। বাইরে ভোর হল বোধ হয়। সূর্য উঠতে দেরি নেই। তখনই ফ্রান্সিস মৃদু গোঙানির শব্দ শুনল। কে গোঙাচ্ছে? ফ্রান্সিস তাকাল সেইদিকে। দেখল একটা লোক। এখানকার লোকেদের মতো ঢোলা হাতা জোব্বামতো পরা। বিছানার বাইরে পাথরের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে। হাত দুটো ঝুলে পড়েছে। মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। একটু থেমে আবার গোঙাতে লাগল লোকটা।

ফ্রান্সিসের কেমন কৌতূহল হল। ভাবল কে লোকটা? এরকম গোঙাচ্ছে কেন? কে মেরেছে ওকে? ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ঘাসের বিছানা থেকে নেমে



লোকটার পাশে গিয়ে পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। দেখল লোকটার গায়ে জামা বলে কিছু নেই। লোকটা গোঙানি থামিয়ে মুখ তুলে ফ্রান্সিসকে দেখল। ফ্রান্সিস দেখল লোকটার মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ। মাথায় উড়ো-উড়ো কাঁচাপাকা চুল। লোকটা এবার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "নতুন আমদানি।" আরবি ভাষা। ফ্রান্সিস বুঝল না। স্পেনীয় ভাষায় বলল, "আমি আরবি ভাষা জানি না।"

লোকটা এবার স্পেনীয় ভাষায় বলল, "অল্পস্বল্প জানি।"

ফ্রান্সিস বলল, "তুমি গোঙাচ্ছ। তোমার কি শরীর খারাপ?"

"চাবুকের ঘা খেয়ে কি লোকের শরীর ভাল হয়?" লোকটা বলল।

"তা তো বটেই।" ফ্রান্সিস বলল, "কিন্তু তুমি তো ওই ঘাসের বিছানায় গিয়ে শুতে পারো।"

লোকটা দেওয়াল থেকে আস্তে আস্তে পিঠটা তুলে বলল, "আমার পিঠটা দ্যাখো।" মশালের আলোয় লোকটার পিঠের অবস্থা দেখে ফ্রান্সিস চমকে উঠল। সারা পিঠে চাবুক মারার দাগ। দু'-এক জায়গায় চাবুক কেটে বসে গেছে। রক্ত জমে আছে।

ফ্রান্সিস বুঝল পিঠে এরকম ঘা আর দাগ নিয়ে ঘাসের বিছানায় শোয়া অসম্ভব। ফ্রান্সিস বলল, "তোমাকে কে এরকম নির্দয়ভাবে চাবুক মেরেছে! কেনই বা মেরেছে?"

"সে অনেক কথা?" লোকটা আস্তে আস্তে বলল।

"তোমার নাম কী?" ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

"আমার নাম জিতা।" লোকটা বলল।

"এবার সব খুলে বলো তো।" ফ্রান্সিস বলল।

"কী হবে এসব শুনে! তুমিও তো আমার মতোই বন্দি।" জিতা বলল।

"আমি তোমাকে এই বন্দিজীবন থেকে মুক্তি দেব।" ফ্রান্সিস বলল।

জিতা চমকে উঠে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে ভাল করে তাকাল। বলল "মিনের এই কয়েদঘর থেকে পালানো অসম্ভব!"

"ঠিক আছে, সেটা পরে ভাবা যাবে।" ফ্রান্সিস বলল।

একটু থেমে বলল, "এই মিন কে? আমাকে সব বলো। তোমার কোনও ভয় নেই।" জিতা বলতে শুরু করল, "প্রায় দুশো বছর আগের কথা। এই মেঘারিব-এ রাজত্ব করতেন এক বার্বার জাতির রানি তুহিনা। এক আরব দলনেতা বেনি এই দেশ আক্রমণ করল।" একটু থেমে জিতা বলল, "এবার আমাদের কথা বলি। আমরা জিতা পরিবার বংশানুক্রমে বৈদ্য চিকিৎসক। আর এক চিকিৎসক পরিবার এই সিউতাতে আছে। বেন্দিতো পরিবার। রানি তুহিনা যুদ্ধে ভীষণ আহত হলেন। সৈন্যরা তাঁকে নিয়ে যায় অয়েস পাহাড়ে রানির দুর্গে। সেই দুর্গে রানির চিকিৎসার জন্যে আমাদের পূর্বপুরুষ জিতাকে নিয়ে

যাওয়া হয়। অন্য চিকিৎসক বেন্দিতো পরিবারের পূর্বপুরুষকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দু'জন বৈদ্যই রানির চিকিৎসা করেছিল। কিন্তু রানির তখন শেষ অবস্থা। মৃত্যুর আগে রানি তুহিনা সবাইকে ঘরের বাইরে যেতে বললেন। সবাই বেরিয়ে গেল। তখন রানি অতি কষ্টে গলা থেকে দুটো রত্নহার খুললেন। একটা দিলেন আমাদের পূর্বপুরুষকে, অন্যটা দিলেন বেন্দিতোর পূর্বপুরুষকে। দুটো রত্নহারই দেখতে একরকম, শুধু একটা রত্নহারে লকেট আছে। সেটা আমাদের পূর্বপুরুষকে দিয়ে রানি অতিকষ্টে বলেছিলেন, চিহ্ন দিলাম, বুদ্ধি খাটান, অলঙ্কার অমূল্য।

"বেন্দিতো পরিবারের পূর্বপুরুষকে কিছু বলার আগেই রানি তুহিনার মৃত্যু হয়।" জিতা থামল। তারপর বলল, "সেই থেকে আমাদের পরিবারের সঙ্গে বেন্দিতো পরিবারের শত্রুতা। ওদের রত্নহারে লকেটটা ছিল না। তারপর বার্বার, মুর, আরবীয় অনেকেই এখানে রাজত্ব করে গেছে। কেউ রানি তুহিনার অলঙ্কারের গোপন ভাণ্ডার উদ্ধারের চেষ্টা করেনি। এখন আরবি দলনেতা মিনকে আমাদের চিরশত্রু বেন্দিতো পরিবারের লোকেরা বুঝিয়েছে যে, রানি তুহিনার দেওয়া লকেটসহ রত্নহার আমাদের কাছে আছে। লকেটে গুপ্ত অলঙ্কার ভাণ্ডারের চিহ্ন আছে, যা দেখে সেই ভাণ্ডার উদ্ধার করা যাবে।" জিতা থামল। একটু হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "এতসব তোমাকে বলে কী হবে!"

"ঠিক আছে। অনুমান থেকে আমি বলছি—ওই লকেটসহ রত্নহার কোথায়, মিন তোমার কাছ থেকে সব জানতে চেয়ে চাবুক মারছে।" ফ্রান্সিস বলল। "ঠিক তাই। মিন আমার বাবা-মার ওপরেও অত্যাচার করেছে। আমি কিছুতেই সেই লকেটসহ রত্নহার দেব না।" জিতা থামল।

ফ্রান্সিস বলল, "আমার শুধু একটাই প্রশ্ন, লকেটসহ রত্নহারটা এখন কোথায় আছে?"

"সেটা জেনে তোমার কী লাভ?" জিতা বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, "আমি অনেক গুপ্তধন উদ্ধার করেছি। সব জানলে এটাও উদ্ধার করতে পারব।"

জিতা কথাটা শুনে আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল, "তুমি পারবে?"

"আগে সব জানি, শুনি, তারপর বলতে পারব।" ফ্রান্সিস বলল।

জিতা একবার চারদিকে তাকিয়ে নিল। তখন সকাল হয়েছে। আগে যারা বন্দি ছিল তারা অনেকেই উঠে বসেছে। কেউ কেউ ওপরে দু' হাত উঠিয়ে হাই তুলছে। জিতা ফিসফিস করে বলল, "রত্নহারটা আমার কোমরের ফেট্টিতে সেলাই করে রেখেছি।"

"ঠিক আছে।" ফ্রান্সিস দেখল হ্যারি আর শাঙ্কোর ঘুম ভেঙেছে। দু'জনে বসে আছে। ফ্রান্সিস আঙুল নেড়ে ইশারায় ওদের কাছে আসতে ডাকল।

হ্যারি আর শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এসে বসল। ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল,

"আমার পাশে যে লোকটাকে দেখছ তার নাম জিতা। ও কোমরের ফেট্টি থেকে একটা লকেটসহ রত্নহার খুলে দেখাবে। সবাই ওকে ঘিরে বোসো।"

তিনজনই এবার জিতাকে ঘিরে বসল। এবার জিতা কী করছে কয়েদঘরের কেউ দেখতে পাবে না। জিতা একটু ইতস্তত করল। বলল, "রত্নহারটা তোমাদের দেখালে আমার কোনও বিপদ হবে না তো?"

ফ্রান্সিস বলল, "কথা দিচ্ছি তোমার কোনও বিপদ হলে আমরা তোমাকে রক্ষা করব। দেরি কোরো না, বেলা বাড়ছে।"

এবার জিতা কোমরের ফেট্টির মধ্যে আঙুল চেপে বলল, "এখানটায় আছে। কিন্তু সেলাই করা। সুতো কাটতে হবে।" শাঙ্কো জামার গলার দিক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। সুতো কেটে রত্নহারটা বের করা হল। ফ্রান্সিস রত্নহারটা বাঁ হাতের তেলোয় রাখল।

রত্নহারটা দেখতে দেখতে ফ্রান্সিস বলল, "হ্যারি, এই লকেটের নকশাটা ভাল করে দেখে রাখো।"

হ্যারি বলল, "মিনে করা চারটে ফুলের পাপড়ি। নীল মিনে করা। মাঝখানে রক্তপ্রবাল।"

ঢং ঢঢাং, দরজা খোলার শব্দ হল। ফ্রান্সিস দ্রুত রত্নহারটা জিতার হাতে দিয়ে বলল, "কোমরে গুঁজে রাখো।"

পাহারাদাররা সকালের খাবার নিয়ে ঢুকল। গোল করে কাটা রুটি আর নানা সবজির ঝোলমতো। ফ্রান্সিসরা যখন খাচ্ছে তখনই সেই দলের সর্দার ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। বলল, "খাওয়ার পর তোমাদের শাসক মিনের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। জিতা তুমিও যাবে।"

খাওয়া শেষ হল। সর্দার ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের উঠে আসতে বলল। ফ্রান্সিসরা সর্দারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা খোলা হল। ফ্রান্সিসরা সর্দারের পেছনে পেছনে কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। চলল সর্দারের পেছনে পেছনে। তখনই ফ্রান্সিস [illegible]ল কয়েদঘরের পেছনে একটু দূর থেকেই বনজঙ্গল শুরু হয়েছে। তাই ভোরে পাখির ডাক শুনেছিল।

একটু পরেই ফ্রান্সিসরা পাথর বাঁধানো একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সর্দার ভেতরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা ভেতরে ঢুকল। দেখল একটা বড় কালো পাথরের টেবিল। টেবিলের ওপাশে একটা বাঁকা পায়াওয়ালা চেয়ারে বসে আছে মধ্যবয়স্ক একজন লোক। তার থুতনিতে অল্প দাড়ি। মাথায় বিড়েমতো সাদা কাপড়ের ঢাকা। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ঘরটা অন্ধকার অন্ধকার। মশাল জ্বলছে।

ফ্রান্সিস এসব দেখছে, ততক্ষণে সর্দার ফ্রান্সিসদের সম্পর্কে যা জানে সব বলে চলেছে। সর্দার থামল। মিন দু'-একবার মাথা নেড়ে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে স্পেনীয় ভাষায় বলল, "তোমাদের কয়েদঘরে থাকতে হবে। আমার

লোক যাবে। তোমাদের জাহাজ খানাতল্লাশি করা হবে। দেখা হবে তোমরা জলদস্যু লুঠেরার দল কিনা।"

ফ্রান্সিস বলে উঠল, "আমরা জলদস্যু, লুঠেরা নই। আমরা ভাইকিং জাতি। যারা শৌর্যে-বীর্যে আমাদের সঙ্গে পেরে ওঠে না তারাই আমাদের বদনাম দেয়।"

"ঠিক আছে তোমাদের কথা বিবেচনা করা হবে।" মিন বলল।

জিতা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এবার জিতার দিকে তাকিয়ে মিন বলল, "জিতা আর কত চাবুকের ঘা খাবে। চাবুক খেতে খেতে তুমি তো মরেই যাবে। যদি বাঁচতে চাও তো বলো লকেট ঝোলানো সেই রানি তুহিনার রত্নহারটা কোথায়?" জিতা কোনও কথা বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মিন দরজার কাছে দাঁড়ানো এক রক্ষীকে ইঙ্গিত করল। রক্ষী চাবুক হাতে এগিয়ে এল। মিনের ইঙ্গিতে জিতার গায়ে চাবুকের ঘা মারল। জিতার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। জিতার মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস বুঝল—আর দু'-একদিন এরকম মার খেলে জিতা বাঁচবে না। ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে বলল, "শাসক মিন দয়া করে চাবুক মারা বন্ধ করুন। আমি জানি সেই রত্নহার কোথায় আছে।" মিন বেশ চমকে উঠল। বলল, "তুমি কী করে জানলে? কোথায় সেই রত্নহার?"

"আপনাকে দেব সেই রত্নহার। কিন্তু তার আগে কথা দিন রত্নহার পেলে আপনি জিতাকে মুক্তি দেবেন।" ফ্রান্সিস বলল।

"সেসব পরে। আগে তো হারটা পাই।" মিন বলল।

"বেশ," ফ্রান্সিস বলল। তারপর জিতার কাছে গিয়ে বলল, "জিতা, রত্নহারটা বের করো।"

"না। তুমি বিশ্বাসঘাতক।" জিতা চেঁচিয়ে বলল।

ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল, "আমাকে এখন যা খুশি বলতে পারো। কিন্তু হারটা দিয়ে দাও।" জিতা কোমরের ফেট্টি থেকে হারটা বের করে ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস হারটা উঁচু করে হাতে তুলে মিনকে দেখিয়ে বলল, "এই নিন রত্নহার, লকেট ঝোলানো।"

মিন টেবিলের ওপাশ থেকে ছুটে এসে হারটা নিল। হারটা দেখতে দেখতে হা হা করে হাসতে লাগল।

ফ্রান্সিস বলল, "আপনি বলেছিলেন হারটা পেলে জিতাকে মুক্তি দেবেন।"

"তোমাদের কাউকে মুক্তি দেওয়া হবে না। আগে রানি তুহিনার গুপ্ত সম্পদ উদ্ধার করি—তারপর ভাবা যাবে।" একটু থেমে ডাকল—"এই সর্দার।" সর্দার এগিয়ে এল। মিন বলল, "যা, এগুলোকে কয়েদঘরে ঢুকিয়ে দে।" সর্দার এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসদের ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসদের নিয়ে সর্দার কয়েকজন সৈন্যের সঙ্গে চলল কয়েদঘরের দিকে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল, "ফ্রান্সিস, রত্নহারটা মিনাকে দিয়ে দেওয়া কি ঠিক হল?"

"উপায় কী বলো। আর দিনদুয়েক চাবুক খেলেই জিতা মারা যেত।" ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি জিতার দিকে তাকাল। দেখল জিতা দেওয়ালে পিঠ দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

ফ্রান্সিস বলল, "মিন রত্নহারটা পেয়েছে বটে, কিন্তু রত্নহারের লকেটে যে নকশাটা রয়েছে সেটা কোনওদিনই বুঝবে না।" একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, "আচ্ছা হ্যারি, লকেটটায় কী নকশাটা ছিল বলো তো!"

হ্যারি বলল, "একটা ফুল। চারটে পাপড়ি। মাঝখানে একটা রক্তপ্রবাল। ফুলগুলো নীল রঙের মিনে করা। পেছনটা সবুজ।"

"ঠিক বলেছ।" ফ্রান্সিস বলল, "এই চার পাপড়িওয়ালা ফুলটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চলো তো জিতার কাছে বসি গে।" দু'জনে জিতার কাছে এসে বসল।

ফ্রান্সিস জিতাকে একটু ধাক্কা দিয়ে ডাকল, "জিতা।" জিতা মুখ তুলে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল, "আচ্ছা জিতা—ওই লকেটে ঝোলানো রত্নহারটা পুরুষানুক্রমে তোমাদের গয়নাগাঁটির সঙ্গেই ছিল। তোমাদের পূর্বপুরুষ কেউ কি ওই লকেটের নকশাটা নিয়ে রানি তুহিনার গুপ্ত রত্নভাণ্ডার খোঁজেনি।"

জিতা মাথা নাড়ল, "না। তবে আমি প্রায় কুড়ি বছর ধরে ওই ফুলের নকশাটা নিয়ে ভেবেছি। কিন্তু কোনও কূলকিনারা পাইনি। বছর কয়েক আগে অরেস পাহাড়ের মধ্যে যে দুর্গ আছে সেখানে দেখলাম দেওয়ালে খুদে আঁকা হয়েছে লকেটের ফুলের মতো ফুল।"

"বলো কী!" ফ্রান্সিস চমকে সোজা হয়ে বসল।

"হ্যাঁ, দেখেছি সেই ফুলের নকশা," জিতা বলল, "কিন্তু সেই নকশায় ফুলের পাপড়ি তিনটে। কিন্তু লকেটে আছে চারটে পাপড়ি।" ফ্রান্সিস চুপ করে একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, "আচ্ছা তুমি বলেছিলে রানি তুহিনার মৃত্যু হয়েছিল ওই দুর্গে।"

"হ্যাঁ, পুরুষানুক্রমে আমরা ওটাই শুনে এসেছি।" জিতা বলল।

"আচ্ছা, অরেস পাহাড়ের দুর্গ কোথায়?" ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

"এই কয়েদঘরের পেছনে যে বনজঙ্গল শুরু হয়েছে সেই বনজঙ্গলের মাঝবরাবর রয়েছে সেই দুর্গ। শুনে আশ্চর্য হবে সেই দুর্গ মানুষের হাতে গড়া নয়, প্রকৃতির খেয়ালে তৈরি। দেখলে বুঝবে।" জিতা বলল।

হ্যারি বলল, "অবাক কাণ্ড।" ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল, "ফুলের রহস্যের সমাধান আছে ওই দুর্গেই।"

"তা হলে তো ওই দুর্গে যেতে হবে।" হ্যারি বলল।

"হ্যাঁ এবার এখান থেকে পালানোর উপায়টা ভাবতে হবে।" ফ্রান্সিস বলল। তারপর ফ্রান্সিস গিয়ে ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল না। দু'চোখ বুজে পালানোর পরিকল্পনা ছকতে লাগল।

তখন রাতের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে। পাহারাদাররা তখন ঢঢাং ঢং শব্দ তুলে দরজা বন্ধ করে বারান্দায় পাহারা দিতে শুরু করেছে।

রাত বাড়তে লাগল। একসময় ফ্রান্সিস বিছানা থেকে উঠল। লোহার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল দু'জন পাহারাদার বারান্দায় বসে আছে। ভাল করে চারদিক দেখে বুঝল আজ পাহারাদার দু'জনই। দূরে মিনের বাড়ির সামনে কিছু সৈন্যের জটলা।

ফ্রান্সিস ফিরে এসে জিতার কাছে এল। ঠেলে জিতার ঘুম ভাঙাল। জিতা বলে উঠল, "কী ব্যাপার?" ফ্রান্সিস মুখে আঙুল ছোঁয়াল। বলল, "আস্তে। যা বলছি তাই করো।"

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল, "আমার সঙ্গে এসো।" ফ্রান্সিস চলল ঘরের কোনার দিকে, যেখানে বার্বার বন্দিরা ঘুমিয়ে আছে সেইদিকে। সেখানে এসে জিতাকে বলল, "ওদের ঘুম ভাঙাও। সাবধান, কেউ যেন চেঁচামেচি না করে। তারপর আমি যা বলব তুমি আরবি ভাষায় ওদের বুঝিয়ে বলবে।"

দু'জনে বার্বার বন্দিদের ঠেলেঠুলে ঘুম ভাঙাতে লাগল। ফ্রান্সিস জিতাকে বলল, "বলো যে, কেউ যেন চেঁচামেচি না করে।"

যাদের ঘুম ভেঙে গেল, উঠেও বসল কেউ কেউ। জিতা ফিসফিস করে তাদের বলতে লাগল, "সবাই চুপ করে থাকো। কেউ কোনও কথা বোলো না।"

এবার ফ্রান্সিস বলল, "খাবার জলের পিপেগুলো নাও। ওই পুব কোনা থেকে বিছানায় জল ছিটিয়ে দাও। জল একবারে বেশি ঢেলে দেবে না। আমি বিছানার পুব দিকটাতে মশাল ছুড়ে ফেলে আগুন লাগাব।"

জিতা কথাগুলো আরবি ভাষায় ওদের বুঝিয়ে বলল।

ফ্রান্সিস সবশেষে বলল, 'দরজা যখন খোলা পাবে। তখন যে যেদিকে খুশি পালিয়ে যেও।"

জিতা সব বুঝিয়ে বলল।

বার্বার বন্দিদের তখন ঘুম ভেঙে গেছে। ওরা সব শুনল। তারপর ফ্রান্সিসের নির্দেশমতো জলের পিপেগুলো ধরাধরি করে নিয়ে এল। ঘাসের বিছানায় জল ছিটোতে লাগল। সব জল ছেটানো হলে ফ্রান্সিস যেখানে মশাল জ্বলছে সেখানে এল। মশালটা পাথরের খাঁজ থেকে তুলে নিয়ে পূর্ব দিকের কোণে ছুড়ে দিল। ঘাসের বিছানায় আগুন লাগল। কিন্তু আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল না। ঘাস ভেজা থাকায় আগুনের চেয়ে ধোঁয়াই হল বেশি। সেই ধোঁয়ায় কয়েদঘর ঢেকে গেল।

এবার ফ্রান্সিস বলে উঠল, "সবাই চেঁচিয়ে বলো, আগুন, আগুন।" জিতো ফ্রান্সিসের কথাটা বলল।

সবাই চিৎকার করে বলে উঠল, "আগুন, আগুন।"

পাহারাদার দু'জন ছুটে দরজার কাছে এল। ওরা ধোঁয়া দেখল। তেমন আগুন দেখল না। ভালভাবে দেখার জন্য একজন পাহারাদার অন্যজনকে বলল, "চল তো দেখি কী ব্যাপার।"

দু'জনে তালা খুলে দরজা দিয়ে ঢুকল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল, "শাঙ্কো।"

শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে একজন পাহারাদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্যটির ওপর ফ্রান্সিস। পাহারাদার দু'জনেই ঘাসের বিছানার ওপর চিত হয়ে পড়ে গেল। হাতের তরোয়াল ছিটকে গেল। ওদিকে খোলা দরজা দিয়ে বার্বাররা পালাতে শুরু করল।

কয়েদঘরের চিৎকার চেঁচামেচি মিনের বাড়ির সামনে সৈন্যদের কানে গেল। তারা তরোয়াল উঁচিয়ে বর্শা তুলে এদিকে আসতে লাগল। বার্বাররা তখন এদিক ওদিক দিয়ে পালাচ্ছে। সৈন্যরা তাদের পিছু ধাওয়া করল।

এবার ফ্রান্সিস, হ্যারি আর শাঙ্কো ছুটে বাইরের বারান্দায় এল। তারপর বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটল পেছনের বনজঙ্গলের দিকে। ঠিক তখনই কয়েদঘরের পেছন থেকে ছুটে এল দু'জন সৈন্য। একজনের হাতে খোলা তরোয়াল, অন্যজনের হাতে বর্শা। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় সবই দেখা যাচ্ছে। বনের প্রথম গাছটার কাছাকাছি ফ্রান্সিসরা ছুটে এসেছে তখন। পেছনের সৈন্যটি বর্শা ছুঁড়ে মারল। বর্শাটা শাঙ্কোর বাঁ পায়ের হাঁটুতে লেগে পড়ে গেল। শাঙ্কো থমকে দাঁড়াল। দেখল হাঁটুর কাছে বেশ কিছু জায়গা কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে। ফ্রান্সিস ছুটে এসে শাঙ্কোকে ধরল। শাঙ্কো খোঁড়াতে খোঁড়াতে বনের দিকে ছুটল। তরোয়াল হাতে সৈন্যটি ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দ্রুত সরে গেল। সৈন্যটা উবু হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে তরোয়ালটা তুলে নিল। সৈন্য দু'জনের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হল। তখনই শাঙ্কো বলে উঠল, "ফ্রান্সিস, আরও সৈন্য আসছে, পালাও।"

ফ্রান্সিস চাঁদের আলোয় দেখল—খোলা তরোয়াল হাতে চার-পাঁচজন সৈন্য ঘাসের প্রান্তর দিয়ে ছুটে আসছে।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে পিছু ফিরল। তরোয়াল ফেলে দিয়ে শাঙ্কোর কাঁধে হাত দিয়ে নিয়ে চলল। জিতাও সুস্থ নয়। দু'জনকে প্রায় নিজের গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে ফ্রান্সিস চলল। বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

গভীর বন নয়। ছাড়া ছাড়া গাছপালা, ঝোপঝাড়, লতাপাতা। ফ্রান্সিস অনেক কষ্টে দু'জনকে ধরে ধরে নিয়ে ছুটতে লাগল। পেছনে সৈন্যদের হইহল্লা শোনা যাচ্ছে। সৈন্যদের সঙ্গে দূরত্ব কমে আসছে।

ফ্রান্সিস বুঝল, এই গতিতে ছুটলে সৈন্যরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের ধরে ফেলবে। দৌড়োতেও অসুবিধা হচ্ছে। পায়ের গোড়ালি পচা পাতার স্তূপে ডুবে যাচ্ছে। ছাড়া ছাড়া গাছপালা। চাঁদের উজ্জ্বল আলো পড়েছে এখানে ওখানে। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে তাকাতে ছুটছে। পেছনে সৈন্যদের হইহল্লা কানে আসছে।

হঠাৎই ফ্রান্সিস দেখল ডানধারে কিছুদূরে একটা পাথরের টিলা। টিলার পেছনে আত্মগোপন করা যাবে। ফ্রান্সিস সেদিকেই ছুটল। টিলা ঘুরে ওপাশে গিয়ে দেখল, টিলায় একটা গুহামতো। গুহার মুখের কাছে এসে দেখল, গুহাটা খুব বড় নয়। তবে ওরা চারজন পরপর ঢুকে বসতে পারবে। ফ্রান্সিস তখন ভীষণ হাঁফাচ্ছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "ছুটে পালাতে গেলে আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ে যাব। এই গুহায় আশ্রয় নিতে হবে। সাবধানে লুকিয়ে থাকতে হবে।"

ফ্রান্সিস প্রথমে জিতাকে ধরে ধরে গুহায় ঢোকাল। জিতা তখন মুখ হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। শাঙ্কো হাঁফাচ্ছে। ও নিজে নিজেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে গুহায় ঢুকল। হ্যারিও ঢুকল। এবার ফ্রান্সিস ঢোকার আগে কান পাতল। সৈন্যদের হাঁকডাক খুব কাছেই শোনা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়েই রইল। শুনল সৈন্যদের চিৎকার। হাঁকডাক ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

ফ্রান্সিস গুহায় ঢুকে শুয়ে পড়ল। হ্যারি আর জিতা আগেই শুয়ে পড়েছে। শাঙ্কো বসে হাঁটুর কাটা জায়গাটা দেখছে। তখনও রক্ত পড়ছে।

জিতা চোখ বুজে টানা টানা সুরে বলল, "তোমার কাটার ওষুধ—আমার পিঠের ঘা... সব চিকিৎসার ওষুধ... আমি জোগাড় করে... আনব... আমাকে একটু... বিশ্রাম করতে দাও।"

পুব আকাশে লালচে রং ছড়ানো। একটু পরেই সূর্য উঠল। বনের গাছগাছালিতে নরম রোদ ছড়াল। পাখির ডাক শোনা গেল। গুহার মুখেও রোদ পড়ল। গুহাটার ধুলোটে মেঝেয় ফ্রান্সিসরা তখনও ঘুমোচ্ছে।

সকাল হল। পাখির ডাকাডাকিতে প্রথমে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠে বসল। শাঙ্কোও উঠল। পায়ের দিকে তাকাল। কাটা জায়গাটা থেকে আর রক্ত পড়ছে না। যে রক্ত পড়েছিল সেটাই জমে কালচে হয়ে আছে। জিতাও উঠে বসল। বলল, "তোমরা অপেক্ষা করো। আমি ওষুধ, খাবার নিয়ে আসছি।"

ফ্রান্সিস বলল, "আমি সঙ্গে যাব?"

"না, না, এখন আমার শরীর অনেকটা ভাল লাগছে।"

জিতা বলল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গুহার মুখ থেকে আস্তে-আস্তে নেমে এল। বনের গাছগাছালির নিচে দিয়ে জিতা চলে গেল। ফ্রান্সিস, শাঙ্কো আর হ্যারি অপেক্ষা করতে লাগল।

বেলা বাড়ল। জিতা ফিরে এল। ওর কোমরে লতাপাতা জড়িয়ে বাঁধা। হাতে একটা তরমুজ।

গুহায় এসে জিতা বলল, "এই বনের বাঁ দিকে বালি এলাকা। স্থানীয় লোকরা সেখানে তরমুজের চাষ করে। একটা পাকা দেখে তরমুজ নিয়ে এলাম। আগে সবাই তরমুজ খেয়ে নাও।"

শাঙ্কো জামার নিচে হাত ঢুকিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। তরমুজ কেটে সবাইকে ভাগ করে দিল। ওরা তরমুজ খেতে লাগল। খাওয়ার পালা চুকল। জিতা কোমরে জড়ানো লতাপাতা আস্তে আস্তে খুলল। তারপর শাঙ্কোকে তিনটে পাতা দিল। বলল, "মুখে ভরে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে করো। একটু তেতো লাগবে।" শাঙ্কো পাতা তিনটে মুখে পুরল। দাঁত দিয়ে চিবোল। সত্যিই তেতো। চিবনো পাতার ছিবড়ে বের করল। জিতা সেটা নিয়ে শাঙ্কোর হাঁটুর কাটা জায়গাটায় আস্তে আস্তে টিপে টিপে লাগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কাটা জায়গাটায় যন্ত্রণা শুরু হল। শাঙ্কো মুখে শব্দ করল, উঃ।

"একটু পরেই আরাম লাগবে।" জিতা বলল। তারপর দুটো পাতা শাঙ্কোর কাটা জায়গায় আস্তে চেপে ধরে লতা দিয়ে বেঁধে দিল। একটু পরে সত্যিই শাঙ্কোর যন্ত্রণা কমে গেল। এবার জিতাও কয়েকটা পাতা চিবোল। ছিবড়ে বের করে ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সেই ছিবড়ে জিতার পিঠে চাবুকে কাটা জায়গাটা বসিয়ে দিল।

চারজন চুপচাপ গুহার মুখে বসে রইল।

এক সময় ফ্রান্সিস বলল, "জিতা, অরেস পাহাড়ের দুর্গটা কতদূর?"

জিতা বলল, "আমরা সেই দুর্গের কাছাকাছি চলে এসেছি।"

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল, "তা হলে দুর্গেই আমরা আশ্রয় নেব। আমার স্থির বিশ্বাস রানি তুহিনার ধনরত্নের ভাণ্ডার ওই দুর্গেই কোথাও আছে।"

"বেশ চলো।" জিতা উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস, শাঙ্কোও উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ধরে ধরে গুহা থেকে মাটিতে নামিয়ে আনল। জিতা উত্তরমুখো হাঁটতে লাগল। পেছনে ফ্রান্সিস, শাঙ্কো আর হ্যারি চলল।

দুপুর নাগাদ ফ্রান্সিসরা অরেস পাহাড়ের নিচে এসে দাঁড়াল। পাহাড়টা খুব উঁচু নয়। জিতা কয়েকটা এবড়োখেবড়ো পাথরের ধাপমতো পার হয়ে একটা গুহার সামনে এল। ফ্রান্সিস, হ্যারি আর শাঙ্কোও এসে দাঁড়াল। কিন্তু গুহার মুখটা গোল নয়, চৌকোনো মতো। জিতা তার মধ্যে ঢুকল। পেছনে পেছনে ফ্রান্সিসরাও ঢুকল। কিছুদূর এগোতেই অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। যেতে যেতে জিতা বলল, "পরে মশাল আনতে হবে। এবার তোমরা একটুক্ষণ দাঁড়াও। অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতে দাও। তারপরে অস্পষ্ট হলেও সব দেখতে পাবে।"

ফ্রান্সিসরা অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সত্যি, তারপরে ওরা দু'পাশের এবড়োখেবড়ো পাথরের দেওয়াল আবছা আবছা দেখতে পেল। জিতা বলল,

"এবার এগিয়ে চলো। কিছুটা এগোতেই দেখল ডাইনে-বাঁয়ে দুটো ঘরের মতো, চৌকোনো নয়, গোল। বাঁদিকের ঘরমতো জায়গায় জিতা ঢুকল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। জিতা পেছন ফিরে বলল, "দ্যাখো, গোলমতো দরজার ওপরে দেওয়ালে তিন পাপড়ির ফুল।" ফ্রান্সিসও ফিরে তাকাল। আবছা দেখল, তিন পাপড়ির ফুল পাথরে কুঁদে তোলা। হুবহু লকেটের ফুলের মতো। শুধু একটা পাপড়ি নেই।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে জিতা আবার গুহাপথে চলল। আবার ডাইনে-বাঁয়ে ঘরের মতো। সেই ঘরের মতো জায়গাটার দরজার মাথায় দেখা গেল, সেই তিন পাপড়ির ফুল। এখানে গুহাপথ দু'পাশে চলে গেছে। সেইদিকে তাকিয়ে হ্যারি বলল, "আশ্চর্য! প্রকৃতি নিজেই একটা দুর্গ তৈরি করেছে।"

ওরা এখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। অসুস্থ জিতা, শাঙ্কো ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সুস্থ হ্যারি আর ফ্রান্সিসও ক্লান্ত তখন। ফ্রান্সিস বলল, "জিতা, মেঝেয় ধুলো পাথরকুচি নেই এমন একটা জায়গায় নিয়ে চলো।"

"তিন পাপড়ির ফুল খোদাই করা অন্য ঘরগুলো দেখবে না?" জিতা বলল।

"সেসব পরে হবে। এখন আমরা সবাই ক্লান্ত। খাদ্য চাই, বিশ্রাম চাই।" ফ্রান্সিস বলল।

"তা হলে রানি তুহিনার শয়নকক্ষে চলো।" জিতা বলল।

জিতা ডানদিকের গুহাপথ দিয়ে চলল। পেছন পেছন ফ্রান্সিসরাও চলল। কিছুদূর গিয়ে বাঁদিকে একটা ঘরের মতো দেখল। সেটায় ঢুকল সবাই। এই ঘরমতো জায়গায় মেঝেটা অনেকটা পরিষ্কার, মসৃণও। ফ্রান্সিস পাথরের মেঝেয় বসে পড়ল। জিতা আর শাঙ্কো মেঝেতেই শুয়ে পড়ল। হ্যারিও ক্লান্তিতে বসে পড়ল। জিতা টেনে টেনে বলল, "লোকে বলে—এটা নাকি রানি তুহিনার শয়নকক্ষ ছিল। এই কক্ষেই নাকি রানি তুহিনার মৃত্যু হয়েছিল।" অন্ধকারেই ফ্রান্সিস ঘরটা ভাল করে দেখল। বুঝল, মশাল বা মোমবাতি না হলে ঘরটা ভালভাবে দেখা যাবে না।

বেশ কিছুক্ষণ সবাই শুয়ে-বসে বিশ্রাম করল। একসময় জিতা উঠে দাঁড়াল। বলল, "এখন তোমরা কী করবে?"

ফ্রান্সিস বলল, "আমরা এখন এই দুর্গের মতো জায়গাটাতেই থাকব। বাইরে থাকলে মিনের সৈন্যদের নজরে পড়ে যেতে পারি। তা ছাড়া রানি তুহিনার গুপ্ত ভাণ্ডার তো এখানেই রয়েছে। তা তো খুঁজে বের করতে হবে। কাজেই কয়েকদিনের খাবারদাবার, জল, মশাল, চকমকি পাথর এসব তো লাগবে। দুটো কুড়ুলও আনতে হবে।"

"ঠিক বলেছ," জিতা বলল, "কিন্তু এসব কিনতে তো মুদ্রা লাগবে।" শাঙ্কো উঠে বসল। কোমরের ফেট্টিতে গোঁজা দুটো স্বর্ণমুদ্রা ফ্রান্সিসের দিকে

এগিয়ে ধরল। মুদ্রা দুটো নিয়ে ফ্রান্সিস বলল, "সাবাস শাঙ্কো।"

ফ্রান্সিস আর জিতা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চলল গুহাপথ ধরে।

কাটা পায়ের যন্ত্রণা, ব্যথা নিয়ে শাঙ্কো শুয়ে রইল। হ্যারি শরীরের দিক থেকে বরাবরই দুর্বল। ক্লান্তিতে উত্তরদিকের দেওয়ালটায় ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে রইল। এই দেওয়ালটা এবড়োখেবড়ো নয়। বেশ মসৃণ।

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে ফ্রান্সিস আর জিতা ফিরে এল। প্রয়োজনীয় সবই নিয়ে এসেছে ওরা। জিতা লতাপাতা এনেছিল। পাতা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে করে শাঙ্কোর কাটা জায়গায় আর নিজের পিঠে লাগল। তারপর তিনটে পাথর পেতে উনুন করল। বয়ে আনা কাঠকুটো উনুনে ঢোকাল। চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাল। রান্না শুরু করল। পাথরের দেওয়ালের খাঁজে রাখা ছিল একটা নেভানো মশাল।

ফ্রান্সিস মশালটা নিয়ে উনুনের আগুন থেকে মশালটা জ্বেলে নিল। হ্যারিকে বলল, "চলো কয়েকটা গাছের ডাল কেটে আনি।' ফ্রান্সিস মশালটা হ্যারির হাতে দিল। নিজে কুড়ুলটা নিল।

গুহাপথ দিয়ে হেঁটে দু'জনে মুখের কাছে এল। বাইরে তখন দুপুর। গুহামুখে পাথরের খাঁজে মশালটা গুঁজে রেখে দু'জনে বনের মধ্যে ঢুকল।

খুঁজে খুঁজে কয়েকটা লম্বা ডাল ফ্রান্সিস কুড়ুল দিয়ে কাটল। তারপর মোটা শুকনো আর কাঁচা লতাগাছ দড়ির মতো পাকিয়ে নিল। দু'জনে ডালগুলো, লতাগাছ নিয়ে গুহার মুখে ফিরে এল।

মাটিতে ঝরে পড়া কিছু গোল গোল বড় পাতাও নিল হ্যারি। গুহামুখে এসে মশালটা নিল। তারপর সে গুহাপথ দিয়ে চলল। রানির শয়নকক্ষে এসে দেখল—মশাল জ্বলছে। রান্না হয়ে গেছে। হ্যারি যে শুকনো গোল গোল পাতাগুলো এনেছিল সেসব পেতে দিল। আরও কিছু পাতা রেখে দিল। সকলেই ক্ষুধার্ত তখন। পাতায় দেওয়া হল আটার মোটা মোটা পোড়া রুটি আর বুনো আলু আর সেদ্ধ করা শাকসব্জি। সকলেই পেটপুরে তাই খেল।

খাওয়া সেরে ফ্রান্সিস ওই ঘরের মেঝেতেই শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে ভাবতে লাগল এই দুর্গে কোথায় রানি তুহিনা তাঁর অলঙ্কারের পেটিকা গোপনে লুকিয়ে রেখেছেন? মৃত্যুশয্যায় তিনি জিতার পূর্বপুরুষকে লকেটসহ রত্নহার দিয়েছিলেন। রানি নাকি রত্নহার দিয়ে বলেছিলেন, চিহ্ন দিলাম, বুদ্ধি খাটাস—অলঙ্কার—অমূল্য। ফ্রান্সিস ভাবল, রানির অলঙ্কারের পেটিকা নিশ্চয়ই এই দুর্গে কোথাও গোপনে রাখা হয়েছে।

ফ্রান্সিসের একটু তন্দ্রমতো এসেছিল। তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। ফ্রান্সিস উঠে বসল। তারপর কুড়ুলটা নিয়ে এল যেখানে লম্বা গাছের ডাল দুটো রাখা হয়েছে সেখানে। লম্বা ডাল দুটো পাশাপাশি রাখল। এবার দুটো ডাল কেটে ছোট ছোট ফালি করল। তারপর ফালিগুলো লম্বা ডাল দুটোয় রেখে রেখে বুনো লতা

দিয়ে বাঁধতে লাগল। শাঙ্কো, হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। হ্যারি বলল, "মই বানাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, তোমরাও হাত লাগাও।" হ্যারিকে বলল। তিনজনে মিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা লম্বা মই বানিয়ে ফেলল।

ফ্রান্সিস এই ঘরটার চারদিকে তাকাল। আশ্চর্য! এই ঘরের কোনও দেওয়ালেই তিন পাপড়ির ফুল খোদাই করা নেই। ফ্রান্সিস মই কাঁধে নিল। কুড়ুলটা শাঙ্কো হাতে নিল। ফ্রান্সিস বলল, "না শাঙ্কো, তুমি বিশ্রাম করো। বেশি হাঁটাহাঁটি করলে আবার রক্ত পড়া শুরু হতে পারে। বরং হ্যারি আসুক।"

ফ্রান্সিস মই কাঁধে চলল। পেছনে হ্যারি মশাল আর কুড়ুল হাতে চলল। একটা ঘরে ঢুকল। দেখল, পাথরের দেওয়ালে তিন পাপড়ির ফুল খোদাই করা। ফ্রাসিস সেই দেওয়ালে মই পাতল। তারপরে হ্যারির হাত থেকে কুড়ুলটা নিয়ে মই বেয়ে বেয়ে ফুলটার কাছে চলে এল। তিন পাপড়ির ফুলটা ভালভাবে দেখল। বুঝল, আলাদা কোনও পাথরের পাটায় ফুলের নকশা কুঁদে তুলে এখানে বসানো হয়নি। পাথরের একবোখেবড়ো দেওয়ালেই কুঁদে কুঁদে নকশাটা তোলা হয়েছে।

এবার ফ্রান্সিস ফুলের নকশার ওপর কুড়ুল চালাল। বেশ কয়েকবার কুড়ুলের ঘা মারল নকশাটার ওপর। নাঃ, ফাঁপা শব্দ হচ্ছে না। বোঝা গেল, ফুলের নকশাটা কঠিন পাথরের দেওয়ালে কুঁদে কুঁদে তোলা হয়েছে। ফ্রান্সিসের কুড়ুলের ঘা খেয়ে নকশার দুটো পাপড়ি ভেঙ্গে গেছে। ফ্রান্সিস ভাবল, "নাঃ, এখানে কঠিন পাথরের মধ্যে কোনও খোঁদল নেই। কাজেই এখানে রানি তুহিনার গুপ্ত সম্পদ নেই।"

মই থেকে নেমে ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল, "ভেবেছিলাম তিন ফুলের নকশা যেখানে খোদাই, রানি তুহিনার অলঙ্কারের পেটিকা সেখানে রাখা হয়েছে। দেখছি অনুমান ভুল।"

"তা হলে অন্য ফুলের নকশা দেখে লাভ কী?" হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল, "না, না, প্রত্যেকটি তিন ফুলের নকশায় ঘা মেরে দেখতে হবে।" দু'জনে চলল অন্য ঘরে। এভাবে সবক'টা ঘরে যেখানে তিন ফুলের নকশা খোদাই করা আছে, সব ক'টাতেই কুড়ুলের ঘা মেরে ফ্রান্সিস বুঝল, কোনওটার পেছনেই ফাঁপা খোঁদল নেই। কাজেই রানি তুহিনার অলঙ্কার পেটিকা ওসব জায়গায় নেই।

দু'জনে রানির শয়নকক্ষে ফিরে এল। জিতা আর শাঙ্কো তখন বসে আছে। শাঙ্কো বলল, "ফ্রান্সিস, কিছু হদিস করতে পারলে?"

"নাঃ। তবে সারা দুর্গটাই ভালভাবে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে কোথায় খোদাই করা তিন ফুলের নকশা আছে!" ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস মই, কুড়ুল রেখে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। ক্লান্ত হ্যারি ওর পাশে বসল।

ফ্রান্সিস চোখ বুজে ভাবতে লাগল রানি তুহিনা মৃত্যুর সময় বলেছিলেন, চিহ্ন দিলাম, বুদ্ধি খাটাস। চিহ্ন বলতে তো লকেটের চার পাপড়ির ফুলের নকশাটাই বোঝাচ্ছে। কিন্তু চিহ্ন হিসেবে পেলাম তিন পাপড়ির ফুলের নকশা। পাথুরে দেওয়াল কুঁদে তোলা ওই নকশাগুলোয় কুড়ুলের ঘা মেরে দেখেছি ওগুলোর পেছনে ফাঁপা কিছু নেই। অলঙ্কারের পেটিকা তো ওসব ফাঁপা জায়গায় থাকারই সম্ভাবনা বেশি।

জিতা হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল, "কী হল জিতা?" জিতা আস্তে আস্তে বলল, "গুহাপথে এই দুর্গে কারা ঢুকেছে?"

"বলো কী!" হ্যারি বলে উঠল।

"হ্যাঁ, এই দুর্গে তো আমি অনেকদিন এসেছি, থেকেছি। রানি তুহিনার গুপ্ত অলঙ্কারের ভাণ্ডারের খোঁজ করেছি। এই গুহার দুর্গে কোনও জায়গায় একটু শব্দ হলেই তা প্রতিধ্বনি হয় সারা দুর্গের পাথরের দেওয়ালে দেওয়ালে।"

"তুমি কি তেমন শব্দ পেয়েছ?" ফ্রান্সিস বলল।

"হ্যাঁ, তোমরাও কান পাতো, প্রতিধ্বনির শব্দ শুনতে পারবে।" জিতা বলল।

ফ্রান্সিসরা কান পাতল। খুব ক্ষীণ শব্দ শুনল। পায়ে চলার শব্দ। ফ্রান্সিস বলল, "শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু কে বা কারা এখানে ঢুকল?"

"খুবই সহজ।" জিতা বলল, "যার কবজা থেকে তোমরা বুদ্ধি খাটিয়ে পালিয়েছ।"

"তার মানে মিন।" হ্যারি বলল।

"হ্যাঁ, ওর সৈন্যরাই আমাদের পিছু ধাওয়া করেছিল।" জিতা বলল।

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। বলল, "আমাদের পালাতে হবে।"

জিতা মাথা এপাশ ওপাশ করে বলল, "পালানোর কোনও উপায় নেই। এই দুর্গ থেকে ঢোকার আর বেরনোর গুহাপথ একটাই। অন্য কোনও পথ নেই।"

"তা হলে তো আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হয়।" ফ্রান্সিস বলল।

"ঠিক আছে। আমরা অপেক্ষা করব।" হ্যারি বলল।

শাঙ্কো বলল, "আচ্ছা জিতা, এখানে আত্মগোপন করে থাকা যায় এমন কোনও জায়গা নেই।" জিতা মাথা নেড়ে বলল, "না, সব ঘরের সঙ্গে গুহাপথের যোগ আছে।"

হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস একটা কথা ভেবেছ?"

"যদি মিন তার সৈন্যদের নিয়ে আসে, আর যদি আমাদের হত্যা করতে আসে, তা হলে নিরস্ত্র আমাদের মৃত্যু ছাড়া গতি নেই।"

"তা ঠিক," ফ্রান্সিস বলল, "তবে মিনের সামনে লোভনীয় প্রস্তাব দেব। তখন মিন আমাদের একেবারে মেরে ফেলবে না। এখন দেখা যাক, কে বা কারা আসছে।"

চারজনেই কান পাতল। এবার কয়েকজন লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল। পদধ্বনি এগিয়ে আসতে লাগল। গুহাপথের পাথুরে দেওয়ালে মশালের আলো পড়ল। সেই আলো এগিয়ে আসতে লাগল। রানি তুহিনার শয়নকক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল মিন। সঙ্গে দশ-পনেরোজন সৈন্য। মিনের ঘর্মাক্ত মুখে মশালের আলো কাঁপছে।

ফ্রান্সিস উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, "আমরা নিরস্ত্র। আপনি ইচ্ছে করলেই আমাদের হত্যা করতে পারেন। আমরা বাধা দেওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করতে পারব না।"

মিন একটু হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "তোমরা কয়েদঘর থেকে পালালে কেন?"

"নিজেদের জীবন রক্ষা করতে।" ফ্রান্সিস বলল।

"এখনই তোমাদের জীবন শেষ করে দিতে পারি, তা জানো?" মিন বলল।

"সে কথা তো আগেই বললাম।" ফ্রান্সিস বলল।

"না, তোমাদের হত্যা করব না। তোমাদের বাঁচিয়ে রাখব। ক্রীতদাস কেনাবেচার ব্যবসায়ীরা আসে। তাদের হাতে তুলে দেব। ভাল দাম পাওয়া যাবে।" মিন বলল।

ফ্রান্সিস বলল, "রানি তুহিনার যে রত্নহার আপনি পেয়েছেন তার লকেটে রানি যে নকশা মিনে করিয়েছেন সেটার সমাধান করতে পারলেই রানির অলঙ্কার ভাণ্ডার উদ্ধার করা যাবে।"

"এ-কথা আমার দুই পণ্ডিতও বলেছে।" মিন বলল।

"তাঁরা কি সমাধান করতে পেরেছেন।" ফ্রান্সিস বলল।

"না, তবে সমাধান করতে পারবে।" মিন বলল।

"তা হলে তো ভালই। তবে আমাদের যদি বন্দি না করেন, তবে আমরা রানির গুপ্তভাণ্ডার উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারি।" ফ্রান্সিস বলল।

"কোনও প্রয়োজন নেই। আমার পণ্ডিতেরাই পারবে।" পণ্ডিতেরা পঞ্চাশজন সৈন্য নিয়ে রানি তুহিনার ভগ্ন প্রাসাদের পাথর সরাচ্ছে। দিনকয়েক লাগবে সব ধ্বংসস্তূপ সরাতে। তারপর পণ্ডিতরা ওখানে রানির ভাঙ্গা সভাঘরে রানির অন্তঃপুরের ঘরগুলোয় অনুসন্ধান চালাবে। মনে হয় রানির গুপ্তভাণ্ডার ওরা সন্ধান করতে পারবে।" মিন বলল। তারপর সর্দারের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই সবক'টাকে নিয়ে চল্। কয়েদঘরে আটকে রাখবি।"

সর্দার এগিয়ে এল। সৈন্যদের আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল। সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। সর্দার বলল, "সবাইকে নিয়ে চল।"

ফ্রান্সিসরা চলা শুরু করল। ফ্রান্সিস বলল, "হ্যারি, মিন আমার প্রস্তাবে সাড়া দিল না। পণ্ডিতদের ওপরেই ওর বিশ্বাস বেশি। পণ্ডিতেরা ভাঙ্গা প্রাসাদে কিছুই পাবে না।"

“এখন কী করবে?”

“বন্দিদশা মেনে নেব। আমার বন্ধুরা তো মুক্ত রয়েছে। ওদের কাছে আমাদের বন্দিদশার কথাটা পৌঁছে দিতে হবে। ওরাই যা করার করবে।” ফ্রান্সিস বলল।

“তা হলে তো মিনের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হবে।” হ্যারি বলল।

“প্রয়োজনে লড়াই তো হবেই। তবে মিনের সৈন্যদের মাথায় থাকবে শিরস্ত্রাণ বুকে বর্ম। আমার বন্ধুদের সেসব থাকবে না। তাই লড়াইটা যদি হয় তা হলে আমাদের পক্ষে কঠিনই হবে।” ফ্রান্সিস বলল।

গুহাপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সবাই বাইরে এসে দাঁড়াল।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মিনের ঘোড়া দাঁড়িয়েছিল। মিন সর্দারকে ডেকে কিছু বলল। তারপর ঘোড়ায় চড়ে ছোটাল সিউতার দিকে।

এবার সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের চারদিক ঘিরে নিয়ে চলল। ছাড়া ছাড়া গাছের বনের মধ্যে দিয়ে সবাই চলল। হেঁটে যেতে সবচেয়ে কষ্ট হতে লাগল শাঙ্কোর। তখনও ওর পায়ের ঘা শুকোয়নি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে ওকে।

ফ্রান্সিস সর্দারের কাছে এল। সর্দার কিছু বুঝে ওঠার আগেই ফ্রান্সিস ওর খাপ থেকে এক হ্যাঁচকা টানে তরোয়ালটা খুলে আনল। অমনই দু'তিনজন সৈন্য তরোয়াল খুলে ছুটে এল। ফ্রান্সিস বাঁ হাতটা তুলে ওদের শান্ত থাকতে বলল। একটা লম্বা ডালওয়ালা গাছের কাছে গেল। তরোয়ালের এক কোপে একটা লম্বা ডাল কাটল। ডালটার পাতা ছেঁটে শাঙ্কোকে দিল। শাঙ্কো ভর দেওয়ার মতো ডালটা পেয়ে খুশি হল। ডালে ভর দিয়ে হাঁটতে ওর কষ্ট কম হল। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা সর্দারকে ফিরিয়ে দিল।

বন পার হওয়ার আগেই সন্ধে নামল। অন্ধকারে চলল ওরা। একটু পরেই গাছের ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল চাঁদের আলো পড়ল ঘাসে ঢাকা মাটিতে।

বন শেষ হল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল সিউতার বাড়িঘর। সর্দার ফ্রান্সিসদের নিয়ে এল কয়েদঘরের সামনে। পাহারাদার ঢং ঢঢাং শব্দ তুলে লোহার দরজা খুলল। ফ্রান্সিসদের প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিল। গাছের ডালে ভর দিয়ে চলা শাঙ্কো সেই ধাক্কায় একেবারে ছিটকে পড়ল মেঝের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস পেছন ফিরে সৈন্যদের একজনকে জামা ধরে টেনে এনে ঘরে ঢোকাল। তখনও দরজা বন্ধ হয়নি। তিন-চারজন সৈন্য সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে তরোয়াল খুলে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হল। হ্যারি দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, “ফ্রান্সিস, শান্ত হও।” ফ্রান্সিস এক মুহূর্ত ভাবল। তারপরে সৈন্যটির জামা ছেড়ে দিল। ততক্ষণে শাঙ্কো উঠে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ধরে ধরে ঘাসের বিছানায় বসিয়ে দিল। পাহারাদাররা ঠং শব্দ করে দরজা বন্ধ করল। তালা লাগাল।

দুটো মশাল জ্বলছে, তবু ঘরের এদিকে-ওদিকে অন্ধকার কাটেনি। এমনই অন্ধকার কোণ থেকে একজন লোক ফ্রান্সিসের দিকে আসতে লাগল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসতে যাবে, তখনই লোকটা ডাকল, "ফ্রান্সিস।"

ফ্রান্সিস মুখ ফেরাতেই দেখল, বিস্কো সামনে দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস অবাক! সে বলে উঠল, "বিস্কো, তোমরা বন্দি হলে কী করে?"

"সব বলছি, তার আগে এদিকে এসো। রাজকুমারী মারিয়া ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন।" বিস্কো বলল। তারপরের ঘরের ডানদিকে চলল। ততক্ষণে হারি আর শাঙ্কো উঠে দাঁড়িয়েছে। সবাই চলল বিস্কোর পেছনে পেছনে। দেওয়ালের কাছে গিয়ে দেখল, পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মারিয়া চোখ বুঁজে বসে আছে। মারিয়ার কাছে পাঁচজন বন্ধু বসে আছে। মারিয়ার চোখমুখ শুকনো। মাথার চুলও উসকোখুসকো। মারিয়া বেশ রোগা হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসের মন কেঁদে উঠল। ও দ্রুত বসে মারিয়ার ডান হাতটা ধরল। না, গা গরম নয়। ফ্রান্সিস আস্তে ডাকল, "মারিয়া।"

মারিয়া চোখ মেলে তাকাল। ফ্রান্সিসকে দেখে মারিয়া ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল, "তোমরাও বন্দি হলে?"

"হ্যাঁ, পালিয়েছিলাম কিন্তু পরে ধরা পড়েছি। ওসব পরে শুনবে। তোমার শরীর ভাল তো?"

মারিয়া হেসে বলল, "তুমি এসেছ। এবার আমি একেবারে ভাল হয়ে যাব।"

ফ্রান্সিস বিস্কোর দিকে তাকাল। বলল, "তোমরা ধরা পড়লে কী করে?"

বিস্কো বলল, "প্রায় তিনদিন হতে চলল তোমরা ফিরে এলে না। তখন রাজকুমারী বললেন, চলো, আমরা কয়েকজন গিয়ে গোপনে ফ্রান্সিসদের খোঁজ করি। আমরা পাঁচজন আর একটা নৌকোয় চড়ে সমুদ্রতীরে এলাম। দেখলাম তোমাদের নৌকোটা মাটিতে তোলা আছে। বুঝলাম তোমরা এখানেই নেমেছিলে। রাজকুমারী মানা করেছিলেন তাই আমরা তরোয়াল নিইনি।" বিস্কো থামল। তারপর বলতে লাগল, "বন্দরের কাছাকাছি একটা বাড়ির সামনে এলাম। ডাকাডাকি করলাম। একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। বৃদ্ধের কাছেই জানলাম, এটা আলজিরিয়া আর এই বন্দর শহরটির নাম সিউতা। বৃদ্ধের কাছে জানতে চাইলাম এখানে সে কয়েকজন বিদেশিকে দেখেছে কিনা। বৃদ্ধটি বলতে পারল না। অগত্যা আমরা খুঁজতে লাগলাম কয়েদঘরটা কোথায়? আমরা ঝোপজঙ্গলের আড়ালে আড়ালে এখানে এলাম। এই বাড়িটা দেখে বুঝলাম, এটাই কয়েদঘর।" বিস্কো থামল। তারপর বলতে লাগল, "একটা ঝোপের আড়ালে সবাইকে রেখে আমি একা এই কয়েদঘরের পেছনে এলাম। আমাদের দেশীয় ভাষায় চিৎকার করে বললাম, ফ্রান্সিস তোমরা কি বন্দি? তখন বেশ রাত। আমার কথা বলা বেশ জোরেই শোনাল। কিন্তু তোমাদের কোনও উত্তর

পেলাম না। ওখান থেকে পালিয়ে আসতে গিয়ে পারলাম না। আমরা পাঁচজনই ধরা পড়ে গেলাম।" বিস্কো চুপ করল।

ফ্রান্সিস বলল, "তোমাদের এভাবে আসা উচিত হয়নি।" মারিয়াকে বলল, "তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন। নিজেই চলে এলে। যাকগে, কালকে মিনকে বলে তোমার জাহাজে থাকার ব্যবস্থা করব। তবে মনে হয় না মিন রাজি হবে।" ততক্ষণে হ্যারি আর শাঙ্কোও সেখানে এসে বসে পড়েছে। হ্যারি বন্ধুদের কাছে বলতে লাগল কী ঘটেছে এখানে।

তখন রাত হয়েছে। ঢঢাং শব্দে দরজা খুলল। পাহারাদাররা খাবার নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা নিঃশব্দে খেয়ে নিল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস পাহারাদারকে বলল, "সর্দারের সঙ্গে কথা আছে। সর্দারকে নিয়ে এসো।"

একটু পরেই সর্দার এল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। এখানকার এই কষ্টকর জীবন উনি সহ্য করতে পারবেন না। রাজকুমারীকে আমাদের জাহাজে বন্দি করে রাখো।"

"ঠিক আছে, এসব শাসক মিনকে বলবে। তিনি যা চাইবেন তাই হবে।" সর্দার কথাটা বলে চলে গেল।

তিনদিন কেটে গেল। কয়েদঘর পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থায় কড়াকড়ি হল। আটজন প্রহরী রাখা হল। ফ্রান্সিস কিছুটা হতাশই হল। এত কড়া পাহারা এড়িয়ে পালানো অসম্ভব মনে হল। শুধু ফ্রান্সিস একা হলে হয়তো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালানো যেত। কিন্তু মারিয়া হ্যারিদের নিয়ে পালাতে গেলে কেউ বাঁচবে না। এসব ভেবে ফ্রান্সিস খুব চিন্তায় পড়ল। ঘাসের বিছানায় শুয়ে ফ্রান্সিস এরকম সাত-পাঁচ ভাবছিল। হ্যারি কাছে এসে বসল। বলল, "ফ্রান্সিস, কী করবে এখন?"

"কিছুই করার নেই। এই কয়েদঘর থেকে সবাইকে নিয়ে পালানো অসম্ভব।" ফ্রান্সিস বলল।

"হুঁ, যেরকম পাহারা বসিয়েছে।" হ্যারি বলল।

"একমাত্র আশা, জাহাজ থেকে আমরা ফিরছি না দেখে বন্ধুরা যদি আসে। বন্ধুরা এলেও এই শিরস্ত্রাণ বর্মপরা সশস্ত্র সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করে কি আমাদের বন্ধুরা পারবে?" ফ্রান্সিস বলল।

"এ-কথা সত্যি। কিছু বন্ধুর মৃত্যু হবেই। সৈন্যরা সুশিক্ষিত, সশস্ত্র। তুলনায় আমাদের বন্ধুদের একমাত্র অস্ত্র তরোয়াল। শাঙ্কো থাকলে তবু তীরধনুক কাজে লাগাতে পারত।" হ্যারি বলল।

মারিয়া পাশেই বসেছিল। বলল, "জাহাজের বন্ধুরা নিশ্চয়ই একটাই চিন্তা করবে মুক্ত হবো কী করে?

ফ্রান্সিসদের আরবী শাসক মিনের কয়েদখানায় একঘেয়ে দিন কাটাতে লাগল। ফ্রান্সিস প্রায় সারাদিনই ঘাসের বিছানায় শুয়ে থাকে। কত পরিকল্পনা

করে পালানোর জন্যে। কিন্তু হিসেব করতে গিয়ে বোঝে সে সব পরিকল্পনা কার্যকরী হবে না। আরো বিপদ হয়েছে যে ফ্রান্সিসরা একবার পালিয়েছিল। কাজেই মিন কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছে। কয়েদঘরের সামনে সাঁরা দিনরাত চারজন করে প্রহরী মোতায়েন থাকে। তাদের হাতে থাকে খোলা তরবারি। রাতে বাড়তি আরো দু'জন সশস্ত্র সৈন্য কয়েদঘরের সামনের মাঠে ঘুরে বেড়ায়।

ফ্রান্সিসদের সঙ্গে আট-দশজন বার্বার জাতির লোক বন্দী ছিল। সেদিন রাঁধুনিরা খাবার নিয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দুজন বার্বার বন্দী দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যাতে দরজা খোলা অবস্থায় থাকে আর ওরা পালাতে পারে। কিন্তু প্রহরীরা খুবই তৎপরতার সঙ্গে লোহার দরজা বন্ধ করে দেয়। তাই বার্বার বন্দী দু'জন পালাতে পারল না।

একজন প্রহরী চলে গেল। ফ্রান্সিস ভাবল হয়তো দু'জন বার্বারের কোন শাস্তি হবে না। কিন্তু ফ্রান্সিস ভুল ভেবেছিল। কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি এল। হাতে চাবুক। প্রহরী দরজা খুলে দিল। সেনাপতি কয়েদঘরে ঢুকল। যে প্রহরীটি সেনাপতিকে খবর দিয়েছিল সে এগিয়ে গিয়ে সেই দু'জন বার্বারকে দেখিয়ে দিল। সেনাপতি বার্বার দু'জনকে সামনে এগিয়ে আসতে বলল। বার্বার দু'জন বুঝল কপালে দুঃখ আছে। দু'জন এগিয়ে গেল। সেনাপতি একটাকে সরিয়ে দিয়ে অন্যটার গায়ে চাবুক মারতে লাগল। বার্বারটি চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। সেনাপতির তখন চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। হাঁপাচ্ছে। তবু চাবুকের মার বন্ধ করল না। হাঁফাতে হাঁফাতে সেনাপতি পরেরটাকে ধরল। তারপর চাবুক মারতে লাগল। এই বার্বারটি কাঁদল না। মুখ বন্ধ করে চাবুকের মার খেতে লাগল। একটুক্ষণ পরে পরিশ্রান্ত সেনাপতি থামল। চাবুকটা পাকাতে পাকাতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'' আজকে এই পর্যন্ত। আবার পালাবার চেষ্টা করলে চাবুক মেরে মেরে নরকে পাঠাবো।

সেনাপতি এবার চারদিকে সব বন্দীদের দিকে তাকিয়ে বলল—পালাতে চেষ্টা করলে সবার কাপালেই চাবুকের মার জুটবে। সেনাপতি চাবুকটা একজন প্রহরীকে দিল। বলল—''রেখে দে।'' তারপর চলে গেল।

পরদিন রাতে চাবুকের মার খাওয়া একজন বার্বার বন্দীর প্রচণ্ড জ্বর এল। ওর সঙ্গীদের একজন ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল— ''আমাদের যে সঙ্গীটি চাবুকের মার খেয়েছে তার ভীষণ জ্বর এসেছে। একবার দেখে যান।'' — ''জ্বর আসাটা ভাল কথা নয়। কিন্তু আমি তো বৈদ্য নই। তবু চলো—দেখি।''

ফ্রান্সিস অসুস্থ বন্দীটির কাছে এল। কপালে গলায় হাত দিয়ে দেখল। বুঝল ভীষণ জ্বর এসেছে। ফ্রান্সিস কী বলবে কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ভেন তো আমাদের সঙ্গে নেই। কে চিকিৎসা করবে এই বার্বার বন্দীটির? ফ্রান্সিস ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসল। জিতাকে মারিয়াকে ঐ অসুস্থ বার্বার

বন্দীটির কথা বলল। জিতা বলল—আমি এর ওযুধ জানি কিন্তু আমি তো বন্দী। মারিয়া মুখ নিচু করে ফ্রান্সিসের সব কথা শুনল। তারপর নিজের পোশাকের ঝুলের দিক থেকে আধহাত খানেক কাপড় ছিড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে চলল যেখানে পীজের মধ্যে খাবার জল রাখা হয়েছে সেখানে। একটা কাঠের গ্লাশ নিল। জল ঢেলে নিয়ে চলল সেই বন্দীটির দিকে।

মারিয়া বন্দীটির পাশে বসল কপালে হাত দিয়ে বুঝল ভীষণ গরম। জলের গ্লাশটা রাখল। তারপর ছেঁড়া কাপড়টা জলে ভিজিয়ে নিল। বন্দীটির কপালে জলে ভেজা ছেঁড়া কাপড়টা আস্তে চেপে ধরে রইল। কিছুক্ষণ রেখে আবার তুলল। একটু পরে আবার ভেজা কাপড়টা কপালে রাখল। মারিয়া প্রায় আধঘণ্টা ধরে এইভাবে জলপট্টি লাগাল। পরে কপাল মুছে কপালে হাত রাখল। কপালের গরম ভাবটা অনেকটা কম লাগল। এই অসুস্থ বন্দীটির সঙ্গে আর একজনকে যে চাবুক মারা হয়েছিল সে কিন্তু চুপ করে অসুস্থ বন্ধুটির পাশে বসে। জ্বালা যন্ত্রণা মুখ বুঁজে সহ্য করতে লাগল। মারিয়া তাকে বলল —আপনার বন্ধুটির জ্বর বেশ কিছুটা কমেছে।

—কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো—বার্বার যুবকটি বলল।

—সে সব পরে জানাবেন। এখন আপনার বন্ধুটি কিভাবে সুস্থ হবে সেই চেষ্টা করতে হবে।

মারিয়া ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বসল। ফ্রান্সিস বলল—ঐ বার্বার যুবকটি কেমন আছে?

—ভালো না। প্রচণ্ড জ্বর ছিল। কপালে জলপট্টি দিয়ে কিছুটা জ্বর কমিয়েছি। আরও জলপট্টি দিতে হবে। মারিয়া বলল।

—তাই দিও। ফ্রান্সিস বলল।

রাতের খাওয়ার পর মারিয়া সেই অসুস্থ বার্বার যুবকটির কাছে এল। যুবকটির কপালে জলপট্টি দিতে লাগল।

একটু বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে মারিয়া সারারাত জলপট্টি দিল। ভোরের দিকে জ্বর কমল। কিন্তু জ্বর সেরে গেল না।

মারিয়া ফ্রান্সিসদের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—

—কেমন আছে যুবকটি?

—জ্বর ছাড়েনি। তবে জ্বর কমেছে। মারিয়া বলল।

দুপুরবেলা যুবকটির জ্বর আবার বাড়ল। মারিয়া শুয়েছিল। সারারাত জেগেছিল। একটু ঘুম ঘুম ভাব এসেছিল। সেই ভাবটা কেটে গেল একজন বার্বার বন্দীর ডাকে। মারিয়া চোখ মেলে তাকাল। বার্বার বন্দীটি বলল—আবার ওর জ্বর বেড়েছে। বন্ধুটি ভুল বকছে। আপনি যদি একবার আসেন।

ফ্রান্সিস উঠে বসল। বলল—মারিয়া—চলো—তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।

দুজনে অসুস্থ বন্দীটির কাছে এল। বন্দীটি তখন প্রলাপ বকছে। বলছে—যে আমাকে চাবুক মেরেছে—কে সে? সেনাপতি আবার কে? মার মার সেনাপতিকে—আমি বাড়ি যাবো—কে ডাকছে? বাবা? আমি ভালো আছি—একটু জ্বর হয়েছে—সেরে যাবে। হ্যাঁ—পিঠে অসহ্য ব্যথা। মাঝে মাঝে সেই ব্যথা—হাত পা বুকে ছড়িয়ে যাচ্ছে—আমি বাড়ি যাবো—।

ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকাল। তারপর অসুস্থ যুবকটির কপালে হাত রাখল। গলায় বুকে হাত বুলোল। মৃদুস্বরে বলল—শরীরটা আগুনের মত গরম। তুমি এখানে থাকো। জলপট্টি দাও। জ্বরটা কমাও। নইলে—। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

মারিয়া কাঠের গ্লাশে জল নিয়ে এল। ছেঁড়া কাপড়টা জলে ভিজিয়ে যুবকটির কপালে চেপে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস উঠল। চলে এল নিজেদের জায়গায়। জিতাকে বলল অসুস্থ যুবকটির কথা। জিতা মন দিয়ে শুনল। তারপর বলল—যদি কালকেও জ্বর না সারে তবে জানবে যুবকটির বাঁচার আশা নেই।

পরদিনও যুবকটির জ্বর ছাড়ল না। মারিয়া কিছুক্ষণ পরপরই জলপট্টি দিতে লাগল। কিন্তু জ্বর কমার নাম নেই। সেই সঙ্গে যুবকটি সারা শরীর মোচড়াতে লাগল আর কিছুক্ষণ পরপরই প্রলাপ বকতে লাগল।

মারিয়া যুবকটির কষ্ট দেখতে পারছিল না। ও ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—তোমরা থাকতে যুবকটি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে? ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া সেনাপতির চাবুকের মার খেয়েই যুবকটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেই সেনাপতিকে ডেকে আনিয়ে অনায়াসে হত্যা করা যায়। কিন্তু তাহলে আমাকেও মরতে হবে। কাজেই সেটা করা যাবে না। সেনাপতিকে ডাকিয়ে আনতে পারি। সে কী বলবে তাও আমি জানি। সে বলবে কয়েদ ঘর থেকে পালাতে গেলে এই যুবকটির মতই অবস্থা হবে আমাদের।

যাক গে—আমি সেনাপতিকে খবর পাঠাচ্ছি।

ফ্রান্সিস উঠে দরজার কাছে গেল। একজন প্রহরীকে ডাকল। বলল—ভাই সেনাপতিকে খবর দাও। উনি যেন এখানে একবার আসেন। একজন বার্বার যুবকের শরীরের অবস্থা খুব খারাপ।

—কার কথা বলছো? প্রহরটি বলল।

—যে যুবকটিকে সেনাপতি চাবুক মেরেছে তার শরীর খুব খারাপ। ফ্রান্সিস বলল।

—খুব ভালো হয়েছে—পালাতে গিয়েছিল কেন? প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিসের রাগে মাথায় রক্ত উঠে গেল। তবু ফ্রান্সিস শান্তস্বরে বলল—ভাই যুবকটি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেনাপতিকে খবর দাও।

—পারবো না। প্রহরীটি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল। ফ্রান্সিস পরপর তিনজন প্রহরীকে একই অনুরোধ করল। চতুর্থ প্রহরীটিকেও একই অনুরোধ করল।

চতুর্থ প্রহরীটি বলল—সেনাপতিকে ডেকে নিয়ে এসে কিছুই হবে না। উনি বলবেন—যা করেছি ঠিক করেছি। মরলে আমি কী করবো? সেনাপতিকে ডেকে কোন লাভ নেই।

—লাভ লোকসানটা আমরা বুঝবো। তুমি খবর দিয়ে আসতে বল। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ—যাচ্ছি। প্রহরীটি বলল।

প্রহরী বারান্দা থেকে মাঠে নামল। তারপর চলল সেনাপতির বাড়ির দিকে।

ফ্রান্সিস বাকি তিনজন প্রহরীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্তস্বরে বলল—তোমাদের ভাই বলে একটা অনুরোধ করেছিলাম। তোমরা শুনলে না। অনুরোধ রাখলে না। তোমাদের তিনজনকে হত্যা করা আমার কাছে কিছুই না। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে তাহলে আমার বন্ধুদের বিপদ বাড়বে। কারণ তাহলে আমাকেও মরতে হবে। কিন্তু আমি এখন মরতে রাজি নই। আমাকে এখন বেঁচে থাকতেই হবে।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি এল। সেনাপতির মুখ দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল সেনাপতি ক্রুদ্ধ। কয়েদঘরের দরজা খোলা হল। সেনাপতি ঘরে ঢুকল। চারদিকে বন্দীদের দিকে তাকিয়ে বলল—কী হয়েছে? কী বলতে চাও তোমরা? সবাই শুয়ে বসেছিল। কেউ কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—মাননীয় সেনাপতি মহাশয়—গত পরশু যে দুজন বার্বার বন্দীকে আপনি চাবুক মেরেছিলেন—তাদের একজন গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বোধহয় বাঁচবে না। তার চিকিৎসার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করছি।

—কই সেই বন্দী? সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিস ঘরের কোনার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল—ঐ দিকে যান। দেখতে পাবেন।

সেনাপতি সেদিকে গেল। মারিয়া তখন যুবকটির কপালে জলপট্টি দিচ্ছিল। সেনাপতি অসুস্থ যুবকটিকে দেখল। নিচু হয়ে নিজীব উবু হয়ে শুয়ে থাকা বার্বার যুবকটির কপালে গায়ে হাত দিল। বুঝল—প্রচণ্ড জ্বর হয়েছে। গা পুড়ে যাচ্ছে। সেনাপতি মাথা তুলে বলল—কয়েদঘর থেকে পালাবার শাস্তি এটা। আমার কিছু করার নেই।

ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে। শুধু ওর জন্যে একজন বৈদ্য পাঠান।

—না। সেনাপতি চেঁচিয়ে উঠল—এভাবেই মরুক। ফ্রান্সিস বসা অবস্থা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিও উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের হাত ধরল। গলা চড়িয়ে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ছুটে এল। ফ্রান্সিসকে ধরল। ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—ক্রুদ্ধ হয়ো না। নিরস্ত্র আমরা। বিপদ হতে পারে।

ফ্রান্সিস দাঁত চাপাস্বরে বলল---এই কয়েদঘর থেকে কোনদিন মুক্তি পেলে তোমাকে আমি যখন যে অবস্থায় পাবো তোমাকে আমি হত্যা করবো। এই আমার প্রতিজ্ঞা।

সেনাপতি একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিস চোখ মুছতে মুছতে বসে পড়ল। হ্যারি আর শাঙ্কো ফ্রান্সিসের পাশে বসল। কেউ কোন কথা বলল না।

মারিয়া ছুটে এল। বলল—ফ্রান্সিস এখন কী করবে?—সবই তো শুনলে। যুবকটিকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে। আমরা কিছুই করতে পারবো না।

মারিয়া বসে পড়ল। তারপর দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিসরা কেউই কোন কথা বলল না।

তখন গভীর রাত। যুবকটি শরীর এপাশ ওপাশ করে মোচড়াচ্ছে। ফ্রান্সিস আর মারিয়া পাশে বসে আছে। মারিয়া যুবকটির কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ যুবকটি উঠে বসল। অস্ফুটস্বরে কী বলল। তারপর বিছানায় পড়ে গেল। শরীরের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। যুবকটি মারা গেল। মারিয়া মৃত যুবকটির মুখের দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ফ্রান্সিস শাঙ্কো হ্যারি মাথা নিচু করে রইল। ওদের চোখেও জল। আজ ওরা অক্ষম। যুবকটিকে বাঁচাতে পারল না।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে এল। একজন প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বলল—শুনে যাও। প্রহরীটি এগিয়ে এল। বলল, কী ব্যাপার?

—একজন বার্বার বন্দী মারা গেছে। তাকে কবর দেবার ব্যবস্থা কর। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো সেনাপতিকে খবরটা জানাতে হয়। প্রহরীটি বলল।

—যাও। জানিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

প্রহরীটি চলে গেল। ফ্রান্সিস ফিরে এসে বসল। ফ্রান্সিসরা কেউ কোন কথা বলছে না। চুপ করে আছে।

কিছু পরে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি। হ্যারি ওর দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—একটা সম্ভাবনার কথা ভাবছি। যদি সেনাপতি মৃতদেহ কবর দেবার দায়িত্ব আমাদের দেয় তাহলে আমরা বাইরে যেতে পারবো। সুযোগ বুঝে পালাতেও পারবো।

—কিন্তু রাজকুমারীকে রেখে আমরা কী করে পালাবো? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ—এই একটা ভুল আমরা করেছি। মারিয়াকে আমাদের জাহাজে গিয়ে রাখতে মিনকে বলেছিলাম। পরে ঐ ব্যাপারে আর চেষ্টা করিনি। ঐ ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে।

প্রহরীটি ফিরে এল। দরজার কাছে এসে বলল—সেনাপতি বললেন—কয়েদী মারা গেলে অন্য কয়েদীর দল মৃতদেহ কবর দেবে। তোমাদের মধ্যেই সাতজনকে ছাড়া হবে। তারাই ঐ থর্ন বনে গিয়ে মৃতদেহ কবর দেবে। তোমাদের মধ্যে সাতজন এগিয়ে এসো। ফ্রান্সিস যা ভেবেছিল তাই হল। ফ্রান্সিস শেষ চেষ্টা করল। প্রহরীকে বলল—আমাদের রাজকুমারীও আমাদের সঙ্গে যাবে।

—না। রাজকুমারীকে ছাড়া চলবে না। রাজকুমারী পালিয়ে গেলে আমাদের গর্দান যাবে। তাছাড়া রাজকুমারী এখানে বন্দী আছে বলেই তোমরা আমাদের কব্জায় আছো।

হ্যারি বলল—একটা কফিন তো লাগবে। একজন পাদ্রীকেও তো চাই। —তোমরা কয়েকজন এসো। কফিন আনতে হবে। পাদ্রী ফাদ্রী এই রাতে আর পাওয়া যাবে না। জিতা ঘুমোয়নি। প্রহরীর কথাটা ওর কানে গেল। জিতা গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস পাদ্রীর কাজ আমিই করবো। পাদ্রীরা বাইবেলের যে জায়গাটা বলে সেই জায়গাটা আমার মুখস্থ। বাইবেলও লাগবে না।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোরা যখন কয়েদঘর থেকে বেরোচ্ছে তখন কয়েকজন বার্বার বন্দী এগিয়ে এল। বলল—আপনারা আমাদের বন্ধুর জন্যে যা করেছেন তা তো আমরা দেখেছি। আপনারা বিশ্রাম করুন। আমরা যাচ্ছি।

কথাটা প্রহরীর কানে গেল। প্রহরীটি বলল—না। তোমাদের ছাড়া যাবে না। তোমরা যাবে না। বার্বার সৈন্যটি বলল—আমরা আমাদের বন্ধুকে কবরও দিতে পারবো না?

—না। এই ভাইকিংরা সব করবে। ফ্রান্সিস বার্বারদের দিকে তাকিয়ে বলল—

—তোমরা নাই বা যেতে পারলে। আমরা সব করবো। তোমাদের চিন্তার কিছু নেই।

প্রহরীরা গুনে গুনে সাতজন ভাইকিংকে কয়েদঘর থেকে বেরোতে দিল। ফ্রান্সিস প্রহরীদের বলল—আর একজনকে যেতে হবে। পাদ্রীর কাজ করবে।

—বেশ। যে পাদ্রীর কাজ করবে তাকে ডাকো। প্রহরীটি বলল।

—জিতা। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকল। জিতা কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—জিতা তুমিও চলো। পাদ্রীর কাজ করবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে চলো। সর্দারটি বলল।

তিনজন প্রহরীও খোলা তরোয়াল হাতে ওদের সামনে যেতে লাগল। এক সর্দারগোছের প্রহরী বলল—প্রথমে আমরা কফিন আনবো। এত লোকের দরকার নেই। কয়েকজন ভাইকিং কয়েদঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাকিরা চাঁদের আলোয় প্রান্তরের ওপর দিয়ে চলল। দু'জন সৈন্য দুটো মশাল নিয়েছে। শুধু তাদের হাতেই তরোয়াল নেই। প্রাসাদের এক কোনায়

একটা ঘর। তালাবদ্ধ। সর্দারটি কোমরের চামড়ার বন্ধনি থেকে চাবি বের করল। দরজা খোলা হল।

ঘরটার ভেতরে ঢুকল সবাই। মশালের আলোয় দেখা গেল অনেক কফিন ছিটিয়ে ছড়িয়ে রাখা। সৈন্যরা কফিনগুলো থেকে একটা কফিন বের করল। কফিনের কাঠ ভেঙ্গে গেছে। আবার খোঁজ শুরু হল। ফ্রান্সিসরাও হাত লাগাল। একটা মোটামুটি ভালো কফিন পাওয়া গেল। শাঙ্কো খুঁজে বের করল সেটা।

কফিনটা নিয়ে বাইরে এলো সবাই। ঘরটায় তালা ঝুলল। সবাই ফিরে চলল কয়েদঘরের দিকে।

প্রান্তর পার হয়ে সকলে কয়েদঘরের সামনে এল। কয়েদঘরের সামনে এসে সর্দার বলল—কফিন বারান্দায় রাখো। মড়া বের করে কফিনে রাখো। ফ্রান্সিসরা কয়েকজন যুবকটির মৃতদেহ কয়েদঘর থেকে নিয়ে এল। কফিনে শুইয়ে দিল।

সর্দারটি জোর গলায় বলল—কফিন থর্ন বনের দিকে নিয়ে চলো।

ফ্রান্সিসরা কফিন কাঁধে নিল। চলল বনের দিকে। তখনই দুটো বেলচা নিয়ে একজন সৈন্য ছুটে এল। হাঁপাচ্ছে তখন।

সকলে কিছু পরে বনভূমির কাছে পৌঁছল। সর্দার বলল—বনে ঢোক। সবাই কফিনটা নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকল।

গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে কফিন কাঁধে চলল সবাই। অন্ধকার খুব একটা বেশি নয়। ছাড়া ছাড়া গাছ-গাছালি বলে কোথাও কোথাও মাটিতে গাছের গায় চাঁদের ভাঙ্গা আলো পড়েছে।

কিছুদূর গিয়ে সর্দার বলল—থামো। সেখানেই দাঁড়াল সবাই। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সর্দার একটা বুনো গাছের তলায় দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—এখানে কবর খোঁড়।

ফ্রান্সিস সৈন্যের হাত থেকে বেলচাটা নিল। এগিয়ে গিয়ে গাছটার কাছে মাটিতে বেলচা চেপে ঢোকাল। আর এক ভাইকিং বন্ধু অন্য বেলচাটা নিল। মাটি খুঁড়তে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ খোঁড়া চলল। শাঙ্কো বিস্কোও হাত লাগাল।

একটা বড় গর্ত হল। ফ্রান্সিসরা কয়েকজন মিলে কফিনটা গর্তের কাছে নিয়ে এল। দু'জন ভাইকিং গর্তটায় নামল। ওপর থেকে ফ্রান্সিসরা কফিনটা আস্তে আস্তে ধরে ধরে গর্তটায় নামাল। দুই বন্ধু নিচ থেকে ধরে ধরে কফিনটা গর্তের মধ্যে নামাল।

দুই বন্ধু উঠে এল। গর্তটা ঘিরে দাঁড়াল সবাই। জিতা মৃদুস্বরে বাইবেল থেকে গরগর করে মুখস্থ বলে গেল। কবরে মাটি ফেলা শুরু হল। ফ্রান্সিসরা আগে একমুঠো করে মাটি কবরে ফেলল। তারপর সবাই মাটি ফেলল। এবার বেলচা দিয়ে মাটি ফেলতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে কবরের গর্ত মাটিতে ঢেকে গেল। বিস্কো একটা গাছের লম্বা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এল। ডালটা ভেঙ্গে দু'টুকরো করল। বুনোলতাও সঙ্গে এনেছিল। বুনো লতা দিয়ে ক্রুশের মত দুটো ডালকে বাঁধল। তারপর কবরের ওপর চেপে বসিয়ে দিল।

সর্দারের গলা শোনা গেল—ফিরে চলো কয়েদখানায়। সবাই ফিরে চলল।

যখন ঘাসে-ঢাকা প্রান্তরে এল তখন সূর্য উঠছে। ওরা প্রান্তর পার হতে হতেই সূর্য উঠল। ভোরের সূর্যালোক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বনের পাখির ডাকাডাকি এখান থেকেও কানে আসছে। ফ্রান্সিস মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। ঝক্ঝকে নীল আকাশ। সাদা হালকা মেঘ উড়ছে। ওর মনে হল পৃথিবী কত সুন্দর! এরমধ্যে মানুষের মৃত্যুর কথা ভাবতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু মনে পড়ল কিছুক্ষণ আগে এক মৃতদেহ কবর দিয়ে এলাম। মানুষের হাতে মানুষের মৃত্যু। আরবী শাসক মিন কী নিষ্ঠুর। তারই হাতে চাবুকের ঘা খেয়ে একজন তরতাজা যুবক মারা গেল। কথাটা ভাবতেই ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। ফ্রান্সিস হাতের উল্টোপিঠে চোখ মুছে নিল।

কয়েদঘরে ফিরে এল ফ্রান্সিসরা।

দেখল হাঁটুতে মুখ গুঁজে অন্য যুবকটি কাঁদছে। এই যুবকটিকেও চাবুক মারা হয়েছিল। কিন্তু ওর সামান্য জ্বর হয়েছিল। জ্বর কমেও গিয়েছিল। মৃত বন্ধুর জন্যে·ও মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কাঁদতে লাগল।

ফ্রান্সিস ওর পাশে বসল। যুবকটির কাঁধে হাত রেখে মৃদুস্বরে বলল—কেঁদো না—তোমার বন্ধুর মৃত্যুর জন্যে যে দায়ী সেই শাসক মিনকে হত্যা করার সংকল্প নাও। কেঁদো না। মনকে শক্ত কর। প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকো। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। হ্যারি মারিয়ার কাছে গিয়ে বসল।

সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। একটাই চিন্তা কী করে জাহাজের বন্ধুদের কাছে খবর পাঠানো যায় যে মিনের কয়েদখানায় তারা বন্দী। ফ্রেজারবাই বা কী করে ওদের খোঁজ পাবে! কিভাবে ওদের মুক্ত করতে পারবে?

শাসক মিন কথা রাখল না। মারিয়াকে জাহাজে নিয়ে রাখল না। এই কয়েদঘরেই মারিয়াকে থাকতে হচ্ছে। ভালো করে খাওয়া নেই ঘুম নেই—এত কষ্ট মারিয়া সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু এই নিয়ে মারিয়া ফ্রান্সিসকে কিছুই বলল না। ফ্রান্সিস প্রতিদিনই দেখছে মারিয়ার মুখ শুকনো। চোখের নিচে কালি। মাথার চুলে জট পাকিয়ে গেছে। সবই বুঝতে পারছে ফ্রান্সিস কিন্তু উপায় নেই। সবই সহ্য করতে হবে।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। শেষ চেষ্টা। দেখা যাক শাসক মিন মারিয়াকে ওদের জাহাজে রাখার ব্যবস্থা করে কিনা।

ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। লোহার দরজা ধরে ঝাঁকুনি দিল। এক প্রহরী এগিয়ে এল। বলল—কী হয়েছে।

—শাসক মিনকে এখানে আসতে বলো। ফ্রান্সিস বলল।

—শাসক মিন তোমার চাকর না। প্রহরীটি বলল।

—আমাদের মুক্তি দাও—তোমাদের শাসক মিনকে আমার চাকর বানিয়ে ছাড়বো। যাক তো—তুমি গিয়ে বলো যে ভাইকিং সর্দার কিছু বলতে চাইছে।

—আমি বলতে যাবো না। প্রহরীটি মুখ ঘুরিয়ে বলল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে লোহার দরজা ঝাঁকাতে লাগল। ভাইকিং বন্ধুরাও এগিয়ে এল। একসঙ্গে কয়েকজন ফ্রান্সিসের সঙ্গে মিলে দরজা ঝাঁকাতে লাগল। সবাই দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। চলল দরজা ঝাঁকানো।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—তুমি যদি শাসক মিনকে খবর না দাও তবে আমরা সারারাত ধরে দরজা ঝাঁকাবো। প্রহরীটি ছুটোছুটি করতে লাগল। বুঝে উঠতে পারল না কী করবে? অন্য প্রহরীদেরও এক অবস্থা। জোর ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ওরা দিশেহারা।

তখন একজন প্রহরী উঁচু গলায় বলল—আমরা শাসক মিনকে খবর দিচ্ছি তোমরা শব্দ থামাও। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ঝাঁকুনি বন্ধ কর। প্রচণ্ড একঘেয়ে শব্দ বন্ধ হল।

সেই প্রহরীটি চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে শাসক মিন এল। কয়েদঘরের দরজার কাছে এসে বলল—তোমরা কী আরম্ভ করেছো।

—এটা করলাম বলেই একজন পাহারাদার আপনাকে ডেকে আনতে রাজি হল।

—কী বলতে চাও বলো। মিন বলল।

—আপনি আমাদের দেশের রাজকুমারীকে আমাদের জাহাজে রাখবেন বলেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—কতজনকে কত কথাই তো বলি। সবসময় কি সেসব কথা মনে থাকে। মিন বলল।

—আপনি রাজী না হলে আমরা আবার দরজা ঝাঁকানো শুরু করবো, শাঙ্কো বলল।

—দাঁড়াও দাঁড়াও। মিন বেশ ঘাবড়ে গেল।

—তাহলে বলুন। হ্যারি বলল।

—বেশ তো রাজকুমারী কখন যেতে চান বলুন আমি প্রহরী সঙ্গে দিয়ে পাঠাচ্ছি। মিন বলল।

—রাজকুমারী দ্রুত উঠে দাঁড়ান। চড়া গলায় বলল—আপনার মত নৃশংস নির্দয় মানুষের কাছে আমি কক্ষনো অনুরোধ জানাবো না। জাহাজের যুগের জীবন আমি চাই না।

—মারিয়া কী বলছো তুমি? এখানে থাকলে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। ফ্রান্সিস বলল।

—অসুখ হলে মরে যাবো তাও ভালো এই খুনীর কাছে কিছু চাইব না। একটু পরে বলল—ফ্রান্সিস আজকে আমি তোমার কথাও শুনবো না। মারিয়া বলল।

—মারিয়া —শান্ত হও—সবদিক ভেবে দেখো। ফ্রান্সিস বলল।

—না আমি জাহাজে যাবো না। এখানেই থাকবো। মারিয়া বলল। মিন অল্প হাসল। বলল—দেখছো তো রাজকুমারী নিজেই যেতে চাইছে না। আমার আর কিছু করার নেই।

মিন চলে গেল। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইল। মারিয়া এসে ওর পাশে বসল। ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রাখল। মৃদুস্বরে বলল-তুমি আমার ওপর রাগ করেছো—তাই না। ফ্রান্সিস হেসে মুখ তুলল। বলল—পাগল—আমি তোমার ওপর রাগ করতে পারি? আমি তোমার শরীরের কথা ভেবেই এই প্রস্তাব করেছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—এখন মহা সমস্যায় পড়লাম। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কী করে পালাতে পারবো বুঝতে পারছি না। ততদিনে তুমি যদি অসুস্থ হয়ে পড় তাহলে বিপদ বাড়বে। তাই তোমাকে জাহাজে রাখার ব্যবস্থা করতে চাইছিলাম। আর একটা উদ্দেশ্যে ছিল—তুমি জাহাজে গিয়ে থাকলে আমরা সহজেই পালাতে পারবো। —তাহলে মিনকে বল—আমি আমাদের জাহাজে থাকতে রাজি হয়েছি। —না—এই জঘন্য চরিত্রের নরপশুটাকে আর অনুরোধ করবো না। শুধু তুমি সুস্থ থাকলেই আমি পালাবার পরিকল্পনা বেশ চিন্তা করে করতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাই করো। মারিয়া বলল।

ওদিকে জাহাজের বন্ধুরা অস্থির হয়ে উঠেছে। কী করবে ওরা বুঝে উঠতে পারছে না। ফ্রান্সিস, হ্যারি, শাঙ্কো, বিস্কো কেউ নেই। এই অবস্থায় ফ্রেজার এগিয়ে এল। পেড্রোকে বলল, "যাও সকলকে ডেকে উঠে আসতে বলো।" পেড্রো নিচে নেমে সবাইকে খবরটা দিল।

তখন একটু রাত হয়েছে সবাই এসে ডেকে জড়ো হল। ফ্রেজার সকলকে সম্বোধন করে বলল, "ভাইসব, আমাদের আজ দিশেহারা অবস্থা। বুঝে উঠতে পারছি না এখন আমরা কী করব। প্রথমে গেল ফ্রান্সিস। পরে বিস্কোরা। সাতদিন হতে চলল ওরা কেউ ফিরে এল না। আমাদের কোনও খবরও পাঠাতে পারল না। এখন এই একটা সম্ভাবনার কথাই মনে আসছে। সেটা হল, তারা সবাই বন্দি হয়েছে। এটা কী দেশ বা দ্বীপ আমরা জানি না। এখানে কারা থাকে, তাদের রাজাই বা কে আমরা কিছুই জানি না।" একটু থেমে ফ্রেজার

বলতে লাগল, "বলতে আমার মন ভেঙ্গে যাচ্ছে তবু বলি, তবে কি ফ্রান্সিসরা কেউ জীবিত নেই?"

ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। একজন ভাইকিং বলল, "ফ্রেজার, এতটা আশঙ্কা করো না। ওরা নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। হয়তো মুক্তো নয়—বন্দি।"

বয়স্ক বৈদ্য ভেন বলল, "আমরা এখনও বিনা কারণে কোনও লড়াইয়ে জড়িয়ে যাইনি। আজকে আমাদের লড়াইয়ে নামতে হবেই, যদিও জানি ফ্রান্সিসরা বন্দি হয়ে আছে।"

এবার ফ্রেজার বলল, "ভাইসব, আমাদের সামনে আজ দুটো কাজ আছে। এক, ফ্রান্সিসদের ফেরার আশা নেই দেখে আমরা জাহাজ চালিয়ে চলে যেতে পারি। দুই, তীরে নেমে ফ্রান্সিসদের খোঁজ করতে পারি। বলো—তোমরা কী চাও?"

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, "আমরা এখান থেকে নড়ব না। ভেন বলল আমরা তীরে নামব। ফ্রান্সিসদের খোঁজ করব। খোঁঝ করতে গিয়ে যদি লড়াইতে নামতে হয় আমরা লড়াইয়ে নামব।"

ফ্রেজার বলল, "আমিও ঠিক এটাই চাইছিলাম। আমরা যে ফ্রান্সিসদের পরম বন্ধু, এটা প্রমাণ করবার সময় এসেছে।"

একজন ভাইকিং বলল, "একটা জিনিস আমরা দেখেছি যে, এই অঞ্চলের সৈন্যরা সুশিক্ষিত আর শিরস্ত্রাণে, বর্মে সশস্ত্র। এরকম সৈন্যদের সঙ্গে যদি আমাদের লড়তে হয় আমরা কি লড়তে পারব?"

ফ্রেজার বলল, "কথাটা ঠিক। তবে আমরা লড়ব বন্ধুদের বাঁচাবার জন্যে। এখানেই আমরা মনের জোর বেশি পাব। দেখা যাক, যদি ওরকম এক অসম লড়াই লড়তে হয় লড়ব।" একটু থেমে ফ্রেজার বলল, "সবাই তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া খেয়ে নাও। রাত একটু গভীর হলে আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তীরে নামব। ফ্রান্সিসদের মুক্ত করার জন্যে যা করার করব।" সভা ভেঙ্গে গেল। কেউ কেউ কেবিনঘরে চলে গেল, কেউ কেউ ডেকে বসল। দু'-চারজন ডেকেই শুয়ে পড়ল।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর সকলেই তরোয়াল নিয়ে তৈরি হল। ডেকে উঠে এল। ফ্রেজারও এল। পেড্রোকে ডেকে বলল, "সমুদ্রতীরে যাও। নৌকো দুটো নিয়ে এসো।" পেড্রো রেলিং টপকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর সাঁতার কেটে চলল তীরের দিকে।

আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ। চাঁদের আলো পড়েছে সমুদ্রের জলে, ঢেউয়ের মাথায়। চিকচিক করছে। কোথাও সাদাটে কুয়াশার জটলা। তার মধ্যে দিয়েই পেড্রো সাঁতরে চলল। জাহাজঘাটা অনেক দূরে। ওখান থেকে কারও নজরে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

পেড্রো তীরের কাছে এল। দেখল, ওদের দুটো নৌকোই তীরে ঠেলে তোলা আছে। পেড্রো তীরে উঠল। একটা নৌকোর দড়ি দিয়ে অন্য নৌকোটার সঙ্গে বাঁধল। তারপর ঠেলে দুটো নৌকো জলে নামাল। একটা নৌকোয় উঠল। দাঁড় নৌকোটার গলুইয়ে রাখা ছিল। দাঁড়টা তুলে নিল। দাঁড় বাইতে লাগল। দুটো নৌকোই চলল ভাইকিংদের জাহাজের দিকে। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে নৌকো দুটো জোরেই চলল।

দাঁড় বেয়ে পেড্রো নৌকো দুটো জাহাজের গায়ে এসে লাগাল। দড়ির মই বেয়ে ডেকে উঠে এল। তখন পেড্রো হাঁফাচ্ছে। ও নিজের কেবিনঘরের দিকে চলল। ভেজা পোশাক পালটাতে হবে।

রাত গভীর হল। ফ্রেজার উঁচু গলায় বলল, "এবার চলো ভাইকিংরা।" দড়ির মই বেয়ে নৌকোয় নামতে লাগল। দুটো নৌকো ভরে গেল। নৌকো দুটো আস্তে আস্তে তীরের দিকে চলল।

তীরে এসে নৌকো লাগল। সবাই তীরে নামল। পেড্রো বলল, "কেউ দাঁড়িয়ে থেকো না নজরে পড়ে যাবে। সবাই বসে পড়ো।" সবাই বালি মেশানো মাটিতে বসে পড়ল।

পেড্রো আবার দুটো নৌকো চালিয়ে চলল জাহাজের দিকে। নৌকো দুটো জাহাজে লাগল। জাহাজ থেকে ফ্রেজার আর বাকি ভাইকিংরা নেমে এল। নৌকো দুটো এবার চলল তীরের দিকে। নৌকো তীরে ভিড়ল। সবাই নেমে দাঁড়াল। পেড্রো ওদের বসে পড়তে বলল। ওরা বসে পড়ল। দুই বন্ধুকে ডেকে নিয়ে পেড্রো নৌকো দুটো ঠেলে মাটিতে তুলে রাখল।

ফ্রেজার জাহাজঘাটার দিকে তাকাল। জাহাজঘাটা বেশ দূরে। ওদের যেতে হবে জাহাজঘাটার কাছে। দেখা যাচ্ছে ওদিকেই জনবসতি। এখানে দেখা যাচ্ছে বালিমাটি ঢাকা ঘাসের প্রান্তর। বেশ দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রান্তরে ফুটফুটে জোছনা। ফ্রেজার প্রান্তরের ওপর দিয়ে জনবসতি এলাকার দিকে চলল। পেছনে ভাইকিং বন্ধুরা। কেউ কোনও কথা বলছে না। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে চলেছে সবাই।

বসতি এলাকায় এল ওরা। একটা পাথরের দেওয়ালওলা বাড়ির পেছনে এল সবাই। ফ্রেজার বলল, "এই বাড়ির পেছনে তোমরা অপেক্ষা করো। আমি খোঁজখবর নিয়ে আসছি।"

সবাই সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রেজার সেই বাড়িটার সামনে এল। দু'দিকে তাকিয়ে বুঝল, এটা সদর রাস্তা। জাহাজঘাটা থেকে এসে দূরে চলে গেছে।

ফ্রেজার বাড়িটার বারান্দায় উঠে দরজার কাছে এল। দেখল দরজাটা হাঁ করে খোলা। ফ্রেজার বুঝল বাড়িটা পোড়ো বাড়ি। তবু দরজাটায় বার দুয়েক শব্দ করল। কারও সাড়াশব্দ নেই।

ফ্রেজার রাস্তায় নামল। জোছনায় যতদূর দেখা যাচ্ছে লোকজন নেই। ফ্রেজার আর একটা বাড়ির সামনে এল। বারান্দা পার হয়ে দরজার সামনে

এল। দরজায় হাত দিয়ে শব্দ করল। কোনও সাড়াশব্দ নেই। আবার ধাক্কা দিল। ভেতর থেকে বুড়ির গলায় শোনা গেল, "কে?"

কথাটা আরবি ভাষায় বলা। ফ্রেজার আন্দাজে বুঝল। গলা নামিয়ে বলল, "একটু আসুন। কথা আছে।"

একটু পরে দরজাটা খুলে গেল। একজন বয়স্কা মহিলা এসে দাঁড়াল। ফ্রেজার বলল, "আপনি স্পেনীয় ভাষা বোঝেন?"

মহিলাটি মাথা কাত করে বললেন, "অল্প, অল্প।"

ফ্রেজার বলল, "তাতেই হবে।" থেমে বলল, এখানে কয়েদঘরটা কোথায়?"

মহিলাটি হাত তুলে কিছুদূরে একটা ঝুপসি পাতার গাছ দেখিয়ে বললেন, "ওই গাছ—বাঁ দিক—একটু দূর—কয়েদখানা।" মহিলাটি দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ফ্রেজার বন্ধুদের কাছে ফিরে এল। বন্ধুদের বলল, 'কয়েদঘর কোথায় জেনেছি। আগে দেখতে হবে ফ্রান্সিসরা কয়েদখানায় বন্দি হয়ে আছে কিনা। যদি না থাকে তা হলে অন্য জায়গাগুলো দেখতে হবে।"

বৃদ্ধা হদিশ বলে ঘরে ঢুকে গেল। ফ্রেজাররাও ঘুরে দাঁড়াল কদেকঘরের দিকে যাবে বলে। হঠাৎ বৃদ্ধার বাড়ির দরজাটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল। আটদশজন সশস্ত্র সৈন্য বেরিয়ে এল। বারান্দা থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নামল। ফ্রেজারদের ঘিরে দাঁড়াল। ফ্রেজার অবাক। সৈন্যদের হাতে খোলা তরোয়াল। ফ্রেজার একবার পেছন ফিরে তাকাল। বন্ধুরাও অবাক। ফ্রেজার কী ব্যাপার বুঝে উঠতে পারল না। আত্মরক্ষার জন্যে ফ্রেজার তরবারি কোষমুক্ত করল। বন্ধুরাও তরবারি খুলল। ভেন দুহাত তুলে বলে উঠল —ফ্রেজার ওরা সংখ্যায় বেশি। লড়াইয়ে নামলে আমরা কেউ বাঁচবো না। মাথা ঠাণ্ডা কর। ওরা কী বলে শোনা যাক। ভেন-এর কথামত বন্ধুরা তরোয়াল কোষবদ্ধ করল। এখন শুধু অপেক্ষা করা। সৈন্যরা ওদের নিয়ে কী করবে তাই দেখা।

সশস্ত্র সৈন্যদের দল থেকে একজন এগিয়ে এল। তার মুখে চাপ দাড়ি গোঁফ। আদেশের স্বরে বলল—তরোয়াল ফেলে দাও। ফ্রেজাররা তরোয়াল খুলে রাস্তায় ফেলল। খোলা তরোয়ালের ডগাটা ভেন-এর বুকে ঠেকিয়ে দাড়ি গোঁফ বলল—এ্যাই বুড়ো—তোরা কোত্থেকে এসেছিস্?

—আমরা ভাইকিংদের দেশ থেকে এসেছি। আমরা ভাইকিং । দেশ দ্বীপ ঘুরে বেড়াই। কোন গুপ্তধনের সংবাদ পেলে সেই গুপ্তধন বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করি।

—তারপর সেই উদ্ধার করা গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে যাস্। সৈন্যটি বলল।

ভেন বলল—এই অভিযোগ অন্যায়। উদ্ধার করা গুপ্তধন সেই সেই দেশের রাজার হাতে তুলে দিয়েছি আমরা। একটা স্বর্ণমুদ্রাও আমরা নিই নি।

—রানি তুহিনার গুপ্তধন আছে এখানে। খুঁজবি নাকি? দাড়ি গোঁফ বলল।

এবার ফ্রেজার বলল—আমাদের দলনেতা কিছুদিন এখানকার শাসক মিনের কারাগারে হয়তো বন্দী। তাদের মুক্তি করতে পারলে এবং শাসক মিন যদি বলে তবে আমরা খুঁজবো।

—শাসক মিন কী করবে জানি না। আমরা কিন্তু মিনের সৈন্য নই। আমরা রানি ঈশাকার সৈন্য। মিনের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা। লড়াই হবে দিন আট দশ পরে। আমরা জাতিতে বার্বার। শাসক মিন আরবীয়। লড়াই হবেই। যাক গেবনের বাইরে বেশিক্ষণ থাকা চলবে না। একটু গলা চড়িয়ে বলল—মিনের সৈন্যরা যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। সবাই বনে ঢুকে পড়। তার আগে এই বিদেশি ভূতদের অস্ত্র কেড়ে নাও। দু'জন সৈন্য এসে ফ্রেজারদের পথের ওপর ফেলে দেওয়া তরোয়ালগুলি তুলে নিল।

ফ্রেজারদের নিয়ে দাড়ি গোঁফওয়ালা সর্দার বনের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর ফ্রেজারদের নিয়ে চলল। খুব একটা গভীর বন নয়। চাঁদের ভাঙ্গা আলো এখানে ওখানে পড়েছে। পথ বলে কিছু নেই। শুকনো ভাঙ্গা ডাল পাতায় শব্দ তুলে ফ্রেজাররা চলল।

বেশ কিছু পরে বনভূমি শেষ হল। ফ্রেজাররা দেখল একটা সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ মত। তারপরেই পাথরের বাড়িঘরদোর। ফ্রেজাররা মাঠ পার হয়ে বাড়ি ঘরের কাছে এল। একটা পাথর বাঁধানো রাস্তায় এসে উঠলো। বাড়িঘরে আলো জ্বলছে না। নিস্তব্ধ চারদিক। পথ জনশূন্য। রাস্তা দিয়ে কিছুটা যেতেই একটা পাথরের লম্বাটে বাড়ি পড়ল। বাড়িটা অন্য সব বাড়ি থেকে অনেক বড়। বাড়িটার সামনে আসতে দাড়ি গোঁফওয়ালা সর্দার ডান হাতটা উঁচু করে বলল—থামো।

সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল।

সর্দার একটা ঘরের দরজার কাছে গেল। বাড়ি টার সদর দরজা একটু দূরে। সদর দরজার দুপাশে পরপর ঘর। সর্দার দরজার কাছে গিয়ে কী বলল। দুজন পাহারাদারের একজন কোমর থেকে চাবির গোছা বের করল। একটা বড় ঘরের দরজার তালা খুলল। শক্ত কাঠের দরজাটা খুলে ধরল। সর্দার ফ্রেজারদের তাকিয়ে বলল—সবাই এই ঘরে ঢোকো। ফ্রেজাররা একে একে ঘরে ঢুকল। ঘরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পাথুরে দেয়ালের মধ্যে গর্ত। তাতে দুপাশে দুটো মশাল জ্বলছে। মেঝেয় শুকনো ঘাসের বিছানা। দড়ি দিয়ে বিছানাটা শক্ত করে বাঁধা। তার ওপর একটা মোটা কাপড় পাতা।

সর্দার বলল—এই বাড়িটা হচ্ছে রানি ঈশিকার প্রাসাদের লাগোয়া কয়েদঘর। আরামেই থাকবে। সর্দার হো হো করে হেসে উঠল। ফ্রেজার হাসির মানেটা ঠিক বুঝল না।

ঘুরে ঢুকে ভাইকিংরা কেউ কেউ শুয়ে পড়ল কেউ কেউ বসল। শুধু ফ্রেজার বসল না। ঘরটায় পায়চারি করতে লাগল।

কিছু পরে ফ্রেজার ভেনের দিকে তাকিয়ে বলল—ভেন এখন কী করবো বলো।

—কিছু তো করার দেখছি না। বন্দীদশা মেনে নিতেই হবে। তাছাড়া আমরা নিরস্ত্র। আমাদের তরোয়াল কেড়ে নেওয়া হয়েছে। লড়াই করার প্রশ্নই নেই। ভেন বলল।

—এখন রানি ঈশিকা কী বলে সেটাই শোনার। কালকে আমাদের রানির দরবারে নিয়ে যাবে মনে হয়। রানির কথা থেকেই বুঝতে পারবো আমাদের মুক্তির ব্যাপারে সে কী ভাবছে। ফ্রেজার বলল।

—তাহলে রানি যদি বলে আমাদের বন্দী হয়েই থাকতে হবে? পেড্রো বলল।

—তাহলে বন্দীই থাকতে হবে। ফ্রেজার বলল।

একটা কথা ভাববার—ভেন বলল—আমাদের বন্দী করে রেখে রানির কী লাভ?

—রানির কথা থেকেই সেটা বোঝা যাবে। ফ্রেজার বলল। তারপর বিছানায় বসল।

বাইরে প্রাসাদ সংলগ্ন বাগান থেকে পাখির ডাক কিচিরমিচির ভেসে এল। ভাইকিংদের কারো কারো ঘুম ভেঙ্গে গেল। ফ্রেজারের ঘুম ভেঙ্গে গেছে আগেই। চোখ বুঁজে সমস্যার কথাটাই ভাবছে। ফ্রান্সিস নেই হ্যারি নেই শাঙ্কো বিস্কো কেউ নেই। অন্তত ফ্রান্সিস থাকলে সমস্যার সমাধান ভাবতে পারতো। আজকে ওরা একেবারে অসহায়। না, ফ্রেজার মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসল। ফ্রান্সিসরা বেঁচে থাকলে কোথায় আছে অথবা ওদের হত্যা করা হয়েছে কিনা এসব জানতে পারলেও মনে জোর পাওয়া যেতো। কিন্তু ফ্রান্সিসদের সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। একেবারে অন্ধকার। ফ্রেজার এসব সাত পাঁচ ভাবতে লাগল।

শব্দ করে কাঠের বড় দরজাটা খুলে গেল। প্রহরীরা সকলের খাবার নিয়ে ঢুকল।

ফ্রেজার খুব মনোযোগ দিয়ে প্রহরীরা কিভাবে খাবার দিচ্ছে অন্য প্রহরীরা তখন কী করছে দেখতে লাগল। দেখল প্রহরীরা যখন খাবার দিচ্ছে অপেক্ষা করছে ওদের খাওয়া হয়ে যাওয়া পর্যন্ত, প্রহরী দুজন চুপ করে ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে ফ্রেজারদের খাওয়া দেখছে। বাইরের চারজন প্রহরী দরজা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছে। ফ্রেজারদের দিকে নজর নেই। ফ্রেজার সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে লাগল খেতে খেতে ভাবতেও লাগল—কিভাবে কখন পালাতে হবে। ভেবে দেখল খাওয়ার সময়ই পালাতে হবে। এবার কী ভাবে

পালাবে সেটা ভাবতে লাগল।

ফ্রেজারদের খাওয়া হয়ে গেল। প্রহরীরা গামলা কাঠের বড় রেকাবি কাঠের বড় হাতা এসব জিনিস নিয়ে চলে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

একটু বেলা হল। কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। সেনাপতি ঢুকল। মাথায় উষ্ণীষ। গাল পর্যন্ত জুলাপ। ইয়া বড় গোঁফ। বুকে বর্ম।

ঘরে ঢুকেই বাজখাঁই গলায় বলে উঠল—এখানে বাইকিং দেশের লোক কারা?

—আমরা। ফ্রেজার উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে ভাইকিং বন্ধুরাও উঠে দাঁড়াল।

—বাঃ তোমরা তো বেশ তাগড়াই জোয়ান। রানি ঈশিকা এরকম জোয়ানই তো চান। সেনাপতি বলল।

—আমাদের মত জোয়ান চান কেন? ভেন বলল।

—আছে—আছে—কারণ আছে। পরে বুঝবে। যাক গে—তোমরা দু'তিনজন বাইরে এসো। রানি ঈশিকার দরবারে যেতে হবে। সর্দার বলল।

—কেন যেতে হবে? ফ্রেজার বলল।

—তোমাদের বিচার হবে। সেনাপতি হা হা করে হেসে উঠল।

—ঠিক আছে। চলুন। ফ্রেজার বলল। তারপর ভেনকে ডেকে বলল—চলো তুমি আর আমি যাবো।

সেনাপতি কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের মাঠে এল। পেছনে ফ্রেজার আর ভেন। চলল দুজনে। প্রাসাদের শেষের দিকে রানি ঈশিকার দরবার কক্ষ। সেনাপতি ফ্রেজারদের সেই ঘরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ফ্রেজার আর ভেন সেই ঘরে ঢুকল। দুইদিকে কয়েকটা জানালা থাকা সত্ত্বেও ঘরের ভেতরের অন্ধকার ভাবটা সম্পূর্ণ কাটে নি।

ফ্রেজার দেখল রানি ঈশিকা একটা পাথরের সিংহাসনে বসে আছে। আসলে গভীর নীল রঙের গদি আঁটা। ডানদিকে মন্ত্রী বসে আছে। রানির বয়েস হয়েছে। মুখে বলি রেখা। একটা বড় মুক্তো বসানো মুকুট মাথায়। মুকুটে মনিমানিক্য বসানো। মীনে করা। ঢোলা হাতা পোশাক সোনারুপোর কাজ করা। হাতে একটা দণ্ড। তাতেও মনি-মানিক্যের কাজ।

ফ্রেজাররা যখন পৌঁছল তখন রানির দরবারে একটা বিচার চলছিল। রানি একটু মাথা নুইয়ে অভিযোগকারী ও অভিযুক্তের বক্তব্য গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনল। সব শুনে রায়দান করল। অভিযোগকারী মাথা নুইয়ে রানিকে সম্মান জানিয়ে চলে গেল। অভিযুক্তের দুহাত ধরে দুজন সৈন্য নিয়ে গেল।

এবার সেনাপতি রানির সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেল। মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—মাননীয় রানি—আমার একটা অভিযোগ ছিল।

—বলুন। রানি বলল।

ফ্রেজারকে দেখিয়ে বলল—এরা জাহাজে চড়ে আপনার রাজত্বে এসেছে। এরা জাতিতে ভাইকিং। বিদেশী। ওদের থর্ন বনভূমিতে ধরা হয়েছে। ওরা

বলছে ওরা বন্ধুদের খুঁজতে এখানে এসেছে। কিন্তু আমার মনে হয় এরা শাসক মিনের গুপ্তচর। আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবরাখবর নিতে এসেছে। এখন আপনার বিচার।

রানি ফ্রেজার আর ভেন-এর দিকে তাকাল। বলল—

—তোমরা এই দেশে এসেছো কেন?

—আমরা জাহাজে চড়ে দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াই। এ ছাড়া যদি কোথাও গুপ্তধন ভাণ্ডারের বা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছুর সন্ধান পাই তাহলে বুদ্ধি খাটিয়ে সেইসব আমরা উদ্ধার করি। এর বদলে আমরা একটা স্বর্ণমুদ্রাও নিই না।

—বলো কি। অবশ্য তোমরা চুরি করলে কে আর ধরতে যাচ্ছে।

—আমরা চোর নই। ফ্রেজার বলল।

—তাহলে জলদস্যু। রানি বলল।

—না—আমরা তাও নই। আপনাদের সন্দেহ হলে আমাদের জাহাজে তল্লাসী করুন। শুধু খাদ্যসংগ্রহের জন্যে আমরা কিছু স্বর্ণমুদ্রা রেখেছি। বাঁচতে তো হবে। ফ্রেজার বলল।

—কিন্তু সেনাপতি যে বললেন তোমরা শাসক মিনের গুপ্তধন—তার কী হবে? রানি বলল।

—মিছে বদনাম দেওয়া হচ্ছে। আমরা গুপ্তচরগিরি করতে যাব কেন? এই দেশ এখানকার জনসাধারণ তাদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক। আজ এখানে আছি। কাল জাহাজ চালিয়ে চলে যাবো অন্য দেশে। আপনি বা শাসক মিনের সঙ্গে আমাদের স্বার্থ জড়িত নয় তবে কেন আমরা গুপ্তচরবৃত্তি করতে যাবো। ফ্রেজার বলল।

—যাক গে—তোমরা কত জন বন্দী হয়ে আছো? রানি বলল।

—সাতজন। ফ্রেজার বলল।

— সবাই কি তোমার বয়সী। রানি বলল।

—হ্যাঁ, শুধু এই ভেন—আমাদের বৈদ্য—এর বয়স বেশি। আর কী জানতে চান বলুন? ফ্রেজার বলল।

—দাঁড়াও—দাঁড়াও—রানী বলল। শোন—আমার এখন খুব অর্থাভাব চলছে। মাথায় লড়াইয়ের চিন্তা—তার জন্যেও আমার খরচ টানতে হচ্ছে। পেরে উঠছি না। সেইজন্যেই ভেবেছি কিছুদিনের মধ্যেই সমুদ্রতীরে ক্রীতদাস বেচাকেনার হাট বসবে। তোমাদের মত জোয়ানদের বিক্রী করতে পারলে ভালো দাম পাবো। আমার অর্থাভাব মিটবে।

ফ্রেজার চমকে উঠল। এই কথাটা ও একবারও ভাবে নি। ও ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ল। ও জানে বলে লাভ নেই। রানি এখন অর্থ কিভাবে পাওয়া যাবে সেই চিন্তায় বিভোর। তবু ফ্রেজার বলল—দেখুন—শাসক মিন আর

আপনাদের সম্পর্ক খুব খারাপ। কিছুদিনের মধ্যেই লড়াই হবে। এদিকে ক্রীতদাসের হাট বসবে সমুদ্রতীরে। হয় আপনার রাজত্বে নয় তো মিনের রাজত্বে। কিন্তু আপনারা তো পরস্পরের শত্রু। ক্রীতদাসের হাটে অন্যদের নিয়ে যাবেন কী করে?

এতক্ষণে রানি হাসল। বলল—ক্রীতদাসের হাট মাত্র তিনদিন চলে। সে সময় আমরা আমাদের বিবাদ ভুলে থাকি। আমরা আর ধারেকাছের দেশগুলো থেকেও রাজারা হাটে আসে। ক্রীতদাস কেনা বেচা চলে। একটা দিন কারোর সঙ্গে কারোর শত্রুতা করতে নেই।

—বাঃ—ফ্রেজার হেসে বলে উঠল—তিনদিনের জন্যে আপনারা শত্রুতা ভুলে যান। বরাবরের জন্যে শত্রুতা ভুলতে পারেন না কেন?

—সেটা সম্ভব নয়। আমাদের মধ্যে লড়াই লাগবেই। মিনও যুদ্ধ চায়, আমিও যুদ্ধ চাই। রানি বলল।

—আমাদের মুক্তি দিলে আপনাকে আমরা অর্থ দেব। ফ্রেজার বলল।

রানি হেসে উঠলেন—তোমরা তো গরীব ভিখিরি। তোমরা অর্থ দেবে কোত্থেকে।

—আমাদের একবার চেষ্টা করতে দিন। ফ্রেজার বলল।

—না—না। তোমাদের মুক্তি দিলে আমার সব পরিকল্পনাই মার খাবে। আমার অর্থ সমস্যাও মিটবে না। আসলে ক্রীতদাসের হাট যখন বসে আমরা কয়েদঘরে আটক থাকা সব বন্দীকেই ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করে দিই। এই নিয়ম বরাবর চলে আসছে। রানি বলল।

—এই নিয়মটা ভালো কি মন্দ—তা বোধহয় কোনদিন ভেবে দেখেন নি। ভেন বলল।

—না —না—এতে ভাববার কী আছে। নিয়মটা চলে আসছে—চলে আসছে। রানি বলল।

—আপনি একজন নারী। নারী হয়ে এরকম একটা অমানুষিক কাজ করেন কী করে। আপনার কি বিবেক বলে কিছু নেই? ভেন বলল।

রানি ঈশিকা জোরে হেসে উঠল। বলল—ক্রীতদাস না থাকলে কি চলে। চাষাবাদ বাগান করা সেসবের দেখাশুনো—ক্রীতদাসের। এতসব কাজ ক্রীতদাসরা ছাড়া কারা করবে।

—তাহলে আপনি স্থির করে ফেলেছেন—আমাদের ক্রীতদাসের হাটে বিক্রী করবেন। ফ্রেজার বলল।

—হ্যাঁ। কাজেই তোমাদের মুক্তি নেই। রানি বলল।

—বেশ। ফ্রেজার বলল। সেনাপতির পেছনে পেছনে ফ্রেজাররা দরবার কক্ষথেকে বেরিয়ে আসছে তখনই একজন সৈন্য এসে সেনাপতিকে কী বলল।

সেনাপতি ফ্রেজারদের দিকে তাকিয়ে বলল—রানি তোমাদের ডেকেছেন। দরবারে চলো।

ভেন ও ফ্রেজাররা আবার দরবার কক্ষে ফিরে এল। রানির সামনে এসে দাঁড়াতে রানি বলল—তোমাদের নাম কী?

—আমি ফ্রেজার, আমার সঙ্গী ভেন। ফ্রেজার বলল। রানি বলল—তোমাদের মুক্তির উপায় আছে। ফ্রেজার কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না।

—শোন—তোমরা যদি শাসক মিনের রাজত্বে গিয়ে ওদের যুদ্ধের পরিকল্পনা কী সেটা জেনে আসতে পারো তাহলে তোমাদের মুক্তি দেওয়া হবে। ফ্রেজার চুপ করে রইল। দ্রুত ভাবতে লাগল—কী করবো? গুপ্তচরবৃত্তি অত্যন্ত গর্হিত কাজ নিচু কাজ। এটা করা যাবে না।

—কী হল? রানি বলল।

—একটু ভাবতে সময় দিন। ফ্রেজার বলল।

—বেশ ভাবো। রানি বলল।

ফ্রেজার কিছুক্ষণ ভাবল। ভেবে দেখল—শাসক মিনের রাজত্বে আমাদের যেতেই হবে। ফ্রান্সিসরা নিশ্চয়ই ওখানে বন্দী হয়ে আছে। বন্দী না হলেও ওরা কোথায় কিভাবে আছে সেটা জানা যাবে। সেটা জানলেই পরে কী করবো তা স্থির করা যাবে। কিন্তু কয়েদঘরে পড়ে থাকলে কিছুই জানা যাবে না। ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি হয়ে যেতে হবে।

ভেন এ সময় বলল—ফ্রেজার আমরা গুপ্তচরবৃত্তি করবো না।

ফ্রেজার মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—ভেন —ঐ গোঁ ধরে বসে থাকলে আমাদের ক্ষতিই হবে। আমি পরে সব বুঝিয়ে বলবো। এখন রানি যে প্রস্তাব দিল সেটা গ্রহণ করা যাক।

—ঠিক আছে। তুমি যা ভালো বোঝ করো। ভেন বলল।

ফ্রেজার রানির দিকে তাকিয়ে বলল—মহামান্যা রানি—আপনি যে প্রস্তাব দিলেন সেটা আমরা গ্রহণ করলাম। আমাকে আর ভেনকে মুক্তির আদেশ দিন। আমরা মুক্তি পেলে-থর্ন বনভূমির মধ্যে দিয়ে শাসক মিনের রাজত্বে যাবো। যুদ্ধের গোপন খবর জোগাড় করে ফিরে আসবো।

—আর তোমাদের বন্ধুদেরও মুক্ত করে আনবো। তোমাদের সবাইকে ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করতে পারলে আমার আর কোন অভাব থাকবে না। রানি বলল।

—কিন্তু আমরা এরকম কথা দিতে পারি না। বন্ধুরা যদি বন্দী হয়ে থাকে তবে তাদের মুক্ত করতে পারবো এরকম কথা বলে লাভ নেই। কারণ বন্ধুরা কী ভাবে কোথায় আছে আমরা এখনও জানি না। ফ্রেজার বলল।

—ঠিক আছে-তোমরা দু জন থাকলেই চলবে। রানি বলল।

—তাহলে দেরি না করে তোমরা এখনই বেরিয়ে পড়। রানি বলল।

—না—আমরা কয়েদঘরে যাবো এখন। বন্ধুদের সব বুঝিয়ে বলবো। তারপর থর্ন বনভূমির দিকে যাত্রা করবো। ফ্রেজার বলল।

—বেশ—তাই করো। আমি সেনাপতিকে সেই আদেশই দিচ্ছি। রানি বলল।

রানি সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলল—সেনাপতি —এই দু'জনকে আমি শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিচ্ছি। এরা শাসক মিনের রাজত্বে গিয়ে কী কাজ করতে বলেছি তা তো শুনেছেন। আপনি সেভাবেই কাজ করুন।

রানিকে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে সবাই দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল।

সেনাপতি ফ্রেজারদের নিয়ে কয়েদঘরে এল। পাহারাদার দুজনকে ডেকে বলল—দ্যাখো—এই দুজন বন্দীকে রানি শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিয়েছেন। এরা যখন মুক্তি চাইবে তখনই মুক্তি দেবে।

সেনাপতি চলে গেল। ফ্রেজাররা কয়েদঘরে ঢুকল। বন্ধুরা কয়েকজন উঠে দাঁড়াল। বলল—ফ্রেজার রানির সঙ্গে কী কথা হল?

—সব বলছি। ফ্রেজার বলল। তারপর বন্ধুদের লক্ষ্য করে বলল—ভাই সব—আমি খুব সমস্যায় পড়েছি; রানি আমাকে আর ভেনকে মুক্তি দিয়েছে কিন্তু শর্তসাপেক্ষে। শাসক মিনের রাজত্বে গিয়ে তাদের যুদ্ধ পরিকল্পনার গোপন খবর আমাদের নিয়ে আসতে হবে।

—এ তো গুপ্তচরের কাজ। এক ভাইকিং বন্ধু বলে উঠল।

—হ্যাঁ—গুপ্তচরবৃত্তি। এখন আমি সেই প্রস্তাবে রাজি হয়েছি।

একজন ভাইকিং বন্ধু বলে উঠল।—বলো কি।

ফ্রেজার বলল—হ্যাঁ, আমরা রাজি হয়েছি। একটু থেমে ফ্রেজার বলল—ভাইসব —ভেবে দেখ। ফ্রান্সিসরা কোথায় কী অবস্থায় আছে আমরা কিছুই জানি না। আবার আমরা এখানে কয়েদঘরে পড়ে আছি। আমাদের এখন দিশেহারা অবস্থা। কাজেই অন্তত আমি আর ভেন মুক্ত হয়ে ফ্রান্সিসদের খোঁজখবর করতে পারবো। তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থাও করতে পারবো। যত শিগগির সম্ভব এটা করতে হবে। রানি ঈশিকা স্থির করে রেখেছে জাহাজঘাটায় যে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসবে সেখানে আমাদের সবাইকে বিক্রি করবে। আমরা সবাই যুবক এক ভেন বাদে—কাজেই আমরা ভালো দামে বিকোবো। অর্থাৎ রানি আমাদের জন্যে ভালো দর পাবে। ফ্রেজার থামল। তারপর বলতে লাগল—কাজেই বেশি দিন আমাদের হাতে নেই। এর মধ্যেই আমাদের পালাতে হবে। কাজেই আমি আর ভেন এ অবস্থায় কয়েকদঘরের বাইরে থাকতে পারলে পালাবার ব্যবস্থা করতে পারবো, ফ্রান্সিসদের খোঁজখবরও নিতে পারবো। বন্দী হয়ে এখানে পড়ে থেকে কিছুই করতে পারবো না। তাই গুপ্তচরবৃত্তির কাজ আমাদের করতে হবে। আমরা এখন নিরুপায়।

ভাইকিং বন্ধুরা কোন কথা বলল না। সবাই বুঝতে পারল ভবিষ্যতের কথা ভেবে এ ছাড়া অন্যকিছু করার উপায় নেই। যদি ফ্রেজাররা মুক্ত থাকে তাহলে

সবদিক থেকেই মঙ্গল। ফ্রেজার বাইরে থেকে ফ্রান্সিসদের খোঁজখবর করতে পারবে আবার ওদের মুক্তির জন্যেও চেষ্টা করতে পারবে। কাজেই ফ্রেজারের সিদ্ধান্ত ওরা মেনে নিল।

দুপুর তখন। ঢং ঢং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। খাবার নিয়ে ঢুকল কয়েকজন পাহারাদার। দেওয়া হল গোল করে কাটা রুটি পাখির মাংসের ঝোল শাকসব্‌জি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাইকিংদের খাওয়া হয়ে গেল। পাহারাদাররা কাঠের থালা বাটি রেকাবি এসব নিয়ে চলে গেল। হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেজার এসে ঘাসের বিছানা রাখল। অনেক চিন্তা ওর মাথায়। তখনই ভাবলো—ফ্রান্সিসদের খোঁজখবর যুদ্ধের গোপন খবর এসব করতে হলে এই বিদেশী পোশাকে চলবে না। এদেশী পোশাক চাই।

ফ্রেজার উঠে দরজার কাছে এল। একজন পাহারাদারকে ডাকল। পাহারাদার এল। ফ্রেজার বলল—সেনাপতিকে একবার ডেকে দাও। জরুরী কথা আছে। পাহারাদারটি চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি এল। ফ্রেজার বলল—দেখুন যে কাজে আমরা যাচ্ছি তা সুষ্ঠভাবে করতে গেলে আমাদের এই বিদেশী পোশাক চলবে না। আপনি দুজোড়া ঢোলা হাতা পোশাক দিন। এ দেশের লোকেরা যেমন পরে।

—তাহলে তো পোশাক তৈরি করাতে হয়। সেনাপতি বলল।

—না না—আমাদের পুরোনো পোশাক দিন ছেঁড়াখোড়া হলে আরো ভালো। ফ্রেজার বলল।

—বেশ দেখছি। পেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেনাপতি বলল। তারপর চলে গেল।

ফ্রেজার অপেক্ষা করতে লাগল। এই কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে কী কী করবে তাও ভাবতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন পাহারাদার দুটো ছেঁড়া পোশাক নিয়ে এল। পোশাক দেখে ফ্রেজার খুশি। ফ্রেজার একটা পোশাক ভেনকে দিল। অন্যটা নিয়ে ভাইকিংদের পোশাকেরা ওপরেই পরে নিল। দেখাদেখি ভেনও তাই করল।

ফ্রেজার আর ভেন দরজার কাছে এল। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাই সব—আমরা আজ সকলেই বিপদগ্রস্ত। হতাশ হয়ো না। মিছিমিছি তোমাদের রক্তপাত মৃত্যু আমি চাই না। আমার ওপরে ভরসা রাখো। সময়মত সব হবে। সব বিপদ আপদ কাটিয়ে আমরা দেশের দিকে জাহাজ ভাসাবো। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন। ফ্রেজারের কথামত এক প্রহরী ওদের দু'জনের জন্যে দুটো তরোয়াল এনে দিল।

ততক্ষণে এক পাহারাদার দরজা খুলে দিয়েছে। ফ্রেজার আর ভেন কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। সামনের ঘাসে ঢাকা প্রান্তর পার হয়ে চলল থর্ন বনভূমির দিকে।

দুজনে থর্ন বনভূমিতে ঢুকল। বেশ ঘন গাছপালা। পথ বলে তো কিছু নেই। গাছগাছালির জটলার মধ্যে দিয়ে ওরা চলল। মাঝে মাঝে বুনো লতায় পা আটকে যাচ্ছে। তরোয়ালের কোপে লতাগাছ কেটে ফেলে দুজনে চলল।

গাছের মোটা গুঁড়ি লতাগাছ এসব নজরে রেখে ওদের যেতে হচ্ছে। বেশ অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সাবধানে পা রেখে রেখে যেতে হচ্ছে ওদের। বনে লতাগাছে পা জড়িয়ে যেতে পারে। ভীষণ পেছল গাছের গুঁড়িতে পা পিছলে পড়ে যেতে পারে। হঠাৎ সেই বনভূমি অনেক পাতলা হয়ে এল। ছাড়া ছাড়া গাছপালা। এখানে অন্ধকারও অনেকটা কেটে গেছে। অনেকটা অস্পষ্ট গাছপালা। গাছের মোটা মোটা গুড়ি আর দেখা যাচ্ছে না। গাছের গুঁড়িগুলো আর বড় নয়। সাধারণ উচ্চতার গাছ সব।

গাছের গুঁড়িগুলো আর বড় নয়।

ছাড়া ছাড়া গাছের বনটা পার হতে দুজনে আর দেরি করতে চাইল না। বনের মধ্যে যতটা দ্রুত যাওয়া যায় সেইভাবে চলল। গাছপালার মধ্যে দিয়ে ছোটা সহজ নয়। ওদের দেরি হতে লাগল। ফ্রেজার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটতে গেল। ভেন বাধা দিচ্ছিল। বলছিল—ফ্রেজার অত দ্রুত ছুটো না। এতে আমরা পথ ভুলতে পারি। একবার এখানে পথ ভুল হলে আমাদের ভোগান্তির একশেষ হবে। কাজেই দেখে শুনে চলো। দেরি হোক ক্ষতি নেই। লক্ষ্য করতে হবে ঠিক উত্তরমুখো যাচ্ছি কিনা।

—কিন্তু এই ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দিক হারানো অসম্ভব কিছু না।

—ভেন আমি জাহাজ চালাই। দিক ঠিক রাখা আমার পক্ষে সহজসাধ্য। ফ্রেজার বলল।

—সে তোমার সমুদ্রের বুকে। এখানে বন গাছপালা ওপরে ভালো করে আকাশ দেখা যাচ্ছে না। এসব দিকভ্রান্তি ঘটাতে পারে। ভেন বলল।

—হুঁ। সেটা একটা সমস্যা বটে। যাকগে—অনেকটা এলাম কিন্তু এখনও বন শেষ হল না। ফ্রেজার বলল।

—আমাদের দিক ভুল হল না তো? ফ্রেজার বলল।

—কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে থর্ন বনটা কি এদিকেও বিস্তৃত? ভেন বলল।

—অসম্ভব নয়। হয়তো আমরা এখনও থর্ন বনের মাঝামাঝি এসেছি। আগে যেতে হবে। ভেন বলল।

—দাঁড়াও দাঁড়াও। ফ্রেজার বলল। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের দিকে আঙুল তুলল।

দুজনেই দেখল একটা টিলামত। ওখানেও টিলার চারপাশে গাছগাছালি। বনের মতই জায়গাটা। ফ্রেজার বলল—ঐ টিলাটার চারপাশেই বন। তবে কি এটাই শাসক মিনের রাজ্য?

—ওখানে পৌঁছে সেটা দেখতে হবে। ভেন বলল।

—কিন্তু ওখানে গিয়ে সেটা কীভাবে জানবো? তবে একটা বাঁচোয়া আমাদের পরনে এদেশীয় পোশাক। প্রথমেই আমাদের বিদেশি বলে মনে হবে না। ফ্রেজার বলল।

দুজনেই এবার গতি কমাল। বন শেষ। দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। গাছের আড়ালে। সামনেই দেখা গেল একটা মাঠমত। সেখানে সশস্ত্র সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করছে।

—এরাই কি শাসক মিনের সৈন্য? এটাই কি তাহলে শাসক মিনের রাজত্ব?

—ভেন মাথা নাড়তে নাড়তে বলল—উঁহু—শাসক মিনের যোদ্ধারা এত কম হতে পারে না।

—কিন্তু শাসক মিনের কত সৈন্য তা তো আমরা জানি না। তবে মাঠের ডানদিকে দেখা যাচ্ছে দুটো সৈন্যাবাস। সুতরাং ধরেই নিতে হয় শাসক মিনের সৈন্যসংখ্যা কম। ফ্রেজার বলল।

এখন কী করবে? ভেন বলল।

খবর জোগাড় করা—কবে নাগাদ শাসক মিন রানি ঈশিতার রাজ্য আক্রমণ করবে। সৈন্যসংখ্যা কত—এসব খবর জোগাড় করতে হবে। ফ্রেজার বলল।

—চলো—ঐ টিলার নিচে নিশ্চয়ই বসতি আছে। ওখানেই শাসক মিনের রাজবাড়িও হয়তো রয়েছে। ভেন বলল।

এটা ভাবছো কী করে? ভেন বলল।

খুব সহজে। এখানে শুধু সেনাপতি আর যোদ্ধাদের থাকার জায়গা। ফ্রেজার বলল।

—চলো—সব আগে দেখি। ভেন বলল।

দুজনে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। গাছ বুনো ঝোপের আড়ালে আড়ালে চলল সৈন্যাবাসের বাড়ি ছাড়িয়ে পেছনে টিলাটার দিকে।

দুজনে কিছুটা এগিয়ে দেখল একটা রাস্তামত। সোজা চলে গেছে টিলাটার দিকে।

এবারে হল সমস্যা। রাস্তায় নামলেই এখানকার লোকজনেরা ওদের দুজনকে দেখতে পাবে। বলা যায় না কেউ কেউ হয়তো ওদের দুজনকে বিদেশি বলে ধরে নিতে পারবে। সৈন্যদের খবর দেবে। আবার বন্দীদশা।

ফ্রেজার ভাবল এসব সমস্যা তো থাকবেই। এসব ব্যাপার ঘটবেই। সেটা না ঘটিয়ে কী করে খবর সংগ্রহ করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

—এখন এই দিনের বেলা না বেরুনোই ভালো। ভেন বলল।

—কিন্তু এখন তো খাবার ব্যবস্থা করতে হয়। না খেয়ে কতক্ষণ থাকা যায়? ফ্রেজার বলল।

—ঠিক আছে—ভেন বলল—আমি খাবার জোগাড়ে যাচ্ছি তুমি এই গাছের আড়াল থেকে বেরিও না।

—কিন্তু তুমি আবার বিপদে পড়বে না তো? ফ্রেজার বলল।

—আরে আমার মত বুড়ো হাবড়াকে কেউ কিছু বলবে না। তোমাদের পক্ষে যাওয়াই বিপদ। তো ফ্রেজার কিছু অর্থ তো দিতে হবে। ফ্রেজার কোমরের ফেট্টি থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করল। বলল—এটা দেবে আর বলবে যে আমরা কয়েকদিন এখানে খাবো। প্রয়োজনে থাকবোও।

ভেন চলে গেল। রাস্তায় লোকজন বেশি নেই। ভেন হেঁটে চলল। দেখল যত ঘরবাড়ি সব এদিকেই। এখান থেকে সৈন্যাবাস বেশি দূরে নয়।

যেতে যেতে দুএকজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল সরাইখানা কোথায়।

ভেন একটা সরাইখানার সামনে এল। সরাইখানার মালিককে বলল—আমি আর আমার এক বন্ধু খাবো। কিন্তু বন্ধুটি অসুস্থ। আসতে পারবে না। আমি এখান থেকে নিয়েই যাবো। বন্ধুটির জন্যে খাবার নিয়ে যাবো। দিতে পারবেন?

—কেন নয়। পাতাটাতা দিয়ে বেঁধে দেব। সরাই মালিক বলল।

—তাহলে তো খুব ভালো হয়। ভেন বলল।

ভেন এসে টানা তক্তাটায় বসল। একটু পরেই সরাইখানাওয়ালা কাজের ছেলেটিকে বলল ভেনকে খাবার দেবার জন্যে।

একটু পরেই ছেলেটি কাটা রুটি মাংস সবজি দিয়ে গেল। ভেন বুঝল—বড় খিদে পেয়েছে। চেখে খাওয়ার ধৈর্য নেই। হাপুস হুপুস খেতে লাগল।

কিছুক্ষণ খাওয়ার পর ভেন বলল—আপনার দোকানে থাকার ব্যবস্থা আছে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। পাতবার তুলোর গদীমত বালিশ সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আপনি থাকবেন? সরাইখানার মালিক বলল।

—সেটা এখনও ঠিক করি নি। রাতে খেতে এসে বলবো। ভেন বলল।

খেতে খেতে ভেন বলল—আচ্ছা—এটা তো আরবী শাসক মিনের রাজ্য?

—না—না। মালিক বলল।

—বলেন কি। ভেন হাঁ করে সরাইওয়ালার দিকে তাকিয়ে রইল।

সরাইওয়ালা বলতে লাগল—শাসক মিনের রাজত্ব হল উত্তর দিকে। এখানকার শাসক ওয়াজির্মো। ভেন আর কোন কথা বলল না। বুঝল—সব কষ্টই বৃথা গেল। আবার যেতে হবে শাসক মিনের রাজত্বে। বোঝা যাচ্ছে থর্ন বনের উত্তর দিকে মিনের রাজত্ব। এটা থর্ন বনের পূবদিক। ভেন বলল—রাজা ওয়াজির্মোর রাজবাড়িটা কোথায়?

—কাছেই। ঐ টিলাটার নিচে। মালিক বলল।

—শাসক ওয়াজির্মো কেমন লোক? সরাইওয়ালা ভেনের কাছে এল।

গলা নামিয়ে বলল—রাস্তার গুণ্ডা রাজা হয়েছে। কে জানে কত মানুষ হত্যা করে ওয়াজির্মো রাজা হয়েছে। সাধারণ মানুষ শাসক ওয়াজির্মোর ওপর খুব রেগে আছে। কিন্তু কী করবে? ক্ষমতা তো শাসক ওয়াজির্মোর হাতে।

—ও।

তখনই রাস্তা দিয়ে ওয়াজির্মোর সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে গেল।

—এখানে যুদ্ধের আয়োজন চলছে। ভেন বলল।

—হ্যাঁ। রানি ঈশিতার রাজ্য ওয়াজির্মো দখল করতে যুদ্ধের আয়োজন করছে। মালিক বলল।

—যা দেখলাম—শাসক ওয়াজির্মোর সৈন্যসংখ্যা খুবই কম।

—কিন্তু উপায় নেই। শাসক ওয়াজির্মো প্রত্যেক দিন সকালে বিকেলে সৈনাদের কুচকাওয়াজ দেখে। প্রজাদের সামনে বক্তৃতা দেয়। প্রজাদের উৎসাহিত করে রানি ঈশিতার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে। মালিক বলল।

—প্রজাসাধারণ কি উৎসাহিত হয়েছে? ভেন বলল।

—না না। কিন্তু উপায় নেই। সেনাপতিটি রাজ্যের সর্বত্র নজর রাখছে কয়েকজন বিশেষ সেনাদের সাহায্যে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলে অনেকে মারা গেছে। যেমন রাজা ওয়াজির্মো তেমনি তার সেনাপতি। দুজনের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা চলে কে কত হিংস্র তার প্রমাণ দেওয়ার। কিন্তু শাসক ওয়াজির্মোকে চটাতে কেউ সাহস পায় না। মন্ত্রীও বৃদ্ধ। চুপ করে থাকে। মালিক বলল।

—বিকেলে রাজবাড়িটা দেখবো। ভেন বলল।

—দেখলে অবাক হবেন। এই তল্লাটে এত বড় প্রাসাদ নেই। এত অর্থব্যয়ে কোন রাজা বা রানি অট্টালিকা করতে পারে নি। ঐ প্রাসাদের অর্থ আমরাই দিয়েছি। মালিক বলল।

—তাহলে আপনাদের খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। ভেন বলল।

—সে তো বটেই। মালিক বলল।

ভেন উঠে দাঁড়াল। মালিক পাতায় জড়ানো খাবার ভেনকে দিল। খাবার নিয়ে ভেন বলল—চলি ভাই। আমি আর আমার বন্ধু সন্ধ্যেবেলা আসবো।

ভেন আস্তে আস্তে হেঁটে সেই গাছটার কাছে এল। ফ্রেজার গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। খাবার নিয়ে ঘাসে ঢাকা মাটিতে বসল। খেতে লাগল। ভেন চুপ করে বসে রইল। ক্ষুধার্ত মানুষটা খেয়ে তৃপ্ত হোক। ভেন কোন কথা বলল না। খেতে খেতে ফ্রেজার বলল—কী খবর এনেছো বলো।

—বলছি তুমি খেয়ে নাও। ভেন বলল।

ফ্রেজারের খাওয়া শেষ হল। ভেন ওর পাশে বসল।

—জল তো খাওয়া হল না। ভেন বলল।

—পরে খাবো। তুমি কী খবর আনলে বলো।

—ফ্রেজার —আমরা ভুল করে অন্য এক দেশে এসেছি। ভেন বলল।

—তার মানে? ফ্রেজার ভেন-এর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

—আমরা শাসক ওয়াজিমোর রাজত্বে এসেছি—পথ ভুলে। ভেন বলল।

—বলো কি! তাহলে বনভূমিতেই আমরা পথ হারিয়েছিলাম। ফ্রেজার বলল।

—বনের মধ্যে পথ কোথায়? আমরা দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছিলাম। ভেন বলল।

—তাহলে এখন কী করবো? ফ্রেজার বলল।

এবার ভেন আস্তে আস্তে বেশ কিছুক্ষণ সরাইওয়ালার কাছে যা-যা শুনেছিল সে সব বলল। সব শুনে ফ্রেজার বলল—তাহলে এখানে থেকে কী হবে?

—হবে। আমি সরাইওয়ালাকে বলে খাবার ব্যবস্থা করেছি। সন্ধ্যে হলে সেখানে যাবো। ভেন বলল।

—কিন্তু এখানে থাকতে চাইছো কেন? ফ্রেজার বলল।

—দেখ ফ্রেজার—আমরা রানিকে বলেছি আমরা গুপ্তচর হয়ে শাসক মিনের রাজ্যে যাবো—যুদ্ধের গোপন খবর নিয়ে আসবো। তার সঙ্গে এই শাসক ওয়াজিমোর যুদ্ধ প্রস্তুতির খবরও নিয়ে গিয়ে জানাবো। আমার মনে হয় রাণি এই শাসক ওয়াজিমো—যে তার রাজ্য আক্রমণ করবে এই সংবাদটা জানে না। এখন এইখানে থেকে আমরা যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু গোপন খবর সংগ্রহ করবো। তারপর ফিরে গিয়ে রানি ঈশিতাকে জানাবো। দুটো রাজ্যের দুটো সংবাদ রানিকে জানাতে পারলে রানি নিশ্চয়ই খুশি হয়ে আমাদের মুক্তি দেবে। অন্য কোনভাবে মুক্তি পাবো না। ভেন বলল।

ফ্রেজার কিছুক্ষণ ভাবলো তারপর বলল—ভেন—তোমার কথা ঠিক। দু দুটো গোপন সংবাদ দিতে পারলে রাণি নিশ্চয়ই আমাদের মুক্তি দেবে।

—ভেবে দেখ—বাধ্য হয়ে আমরা গুপ্তচরবৃত্তির মত হীন কাজ করছি। আমরা নিরুপায়। যেভাবেই হোক এই পথটা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ভেন বলল।

—কিন্তু প্রথমে তো দিক ভুল করে এখানেই এসে পড়েছি। এবার এখান থেকে শাসক ওয়াজিমো কীভাবে রানি ঈশিতার দেশ আক্রমণ করার পরিকল্পনা নিচ্ছে এটা জেনে রানিকে সাবধান করে দিতে পারলে রানি খুব খুশি হবে। আমরাও মুক্তি পাবো। ফ্রেজার বলল।

—তাহলে এখন কী করবে? ভেন বলল।

—এখানেই সরাইখানায় থাকবো ঘুরে ঘুরে খবর সংগ্রহ করবো। ফ্রেজার বলল।

—কিন্তু যদি ধরা পড়ি তাহলে কিন্তু মরতে হবে। ভেন বলল।

—যাতে মরতে না হয় সেইমত কাজে নামতে হবে। ফ্রেজার বলল।

—দেখা যাক গুপ্তচরবৃত্তিতে আমরা কতটা সফল হই। ভেন বলল।

সন্ধ্যে হয়ে এল। ফ্রেজার আর ভেন গাছতলায় বসে রইল। যখন সন্ধ্যের পর রাত হল তখন দুজনে উঠে দাঁড়াল। রাস্তায় নামল। হাঁটতে হাঁটতে সরাইখানাটার সামনে এল।

ওরা এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সরাইখানায় ঢুকল। সরাইখানায় বেশ ভিড়। ভিড় কাটিয়ে ভেন সরাইওয়ালার কাছে গেল।

বলল—চিনতে পারছেন?

মোমবাতির আলোয় ভেনকে দেখে সরাইওয়ালা চিনল।

—নিশ্চয়ই। একটা কাজের ছেলেকে সরাইওয়ালা ডাকল। ছেলেটি এলে বলল—যা—দুটো বিছানা পেতে দে। ছেলেটি পেছনের দিকে চলল। লম্বা ঘর। তার ওপর লম্বা ফুল লতাপাতা আঁকা মোটা কাপড়। ছেলেটি বালিশ রেখে চাদরটা টেনে তুলে ঠিক করে দিল। চলে গেল।

ভেন শুয়ে পড়ল। বলল—অত ভিড়ে আমরা খেতে যাবো না। রাত হোক। পরে খাবো। ফ্রেজার উঠল। বসে রইল।

কিছুক্ষণের মধ্যে আরো দুজন লোক এল। ছেলেটি তাদেরও বিছানা বালিশ ঠিক করে দিয়ে চলে গেল।

—ফ্রেজার? ভেন বলল।

—বলো।

—দেখ—এখনি কিছু দরকারি কথা সেরে ফেলি। পরে ভিড় বাড়বে।

—বলো। কথাটা বলে ফ্রেজার ভেনের মুখের দিকে ঝুঁকে বসল।

—কীভাবে খবরটবর জোগাড় করবে? ভেন বলল।

—দেখ—আমি যা ভেবেছি বলছি। একটু থেমে ফ্রেজার বলল—রাজবাড়িতে মন্ত্রণাকক্ষটা কোথায় সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

—কক্ষটি নিশ্চয়ই রাজবাড়ির মধ্যেই কোথাও আছে। ভেন বলল।

—তা তো বটেই। কিন্তু সেই ঘরটা রাজবাড়ির কোথায়? ফ্রেজার বলল।

—রাজবাড়িতে না গেলে জানা যাবে না। ভেন বলল।

—তাহলে কালকে সকালে চলো। রাজবাড়ির মধ্যে যেতে হবে। ফ্রেজার বলল।

—প্রধান প্রবেশ পথে নিশ্চয়ই প্রহরীরা থাকবে। ভেন বলল।

—থাকবে তো বটেই। ওদের ধোঁকা দিতে হবে। সেইসঙ্গে মন্ত্রণাকক্ষটি কোথায় তাও জানতে হবে। ফ্রেজার বলল।

সে রাতটা কাটল। বেশ ভিড় হল সরাইখানায়। কিন্তু ফ্রেজার আর ভেন এর বিশেষ অসুবিধে হয় নি। কিন্তু নানা চিন্তা তো মাথায়। ভালোভাবে ঘুমুতে পারেনি। একটু বেশি রাতেই দুজন ঘুমোতে পেরেছিল। কাজেই একটু বেলায় দুজনের ঘুম ভাঙল।

প্রাতরাশ খেয়ে দুজনে তৈরি হল। তরোয়াল নিল না।

বেলা বাড়ল। দুজনে চলল রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে। বেশ হাঁটতে হল। রাজবাড়ির সামনে এল। সত্যি বেশ অর্থব্যয় করে বাড়িটা নির্মাণ করা হয়েছে। দামি পাথর আর শ্বেতপাথর দিয়ে তৈরি। সদর দেউড়িতে প্রহরী আছে চারজন। চারজনের হাতেই পেতলের ঝক্‌ঝকে বর্শা। কোমরে তরোয়াল।

ফ্রেজার আর ভেন সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। সদর দরজা বন্ধ। দুজনে এল লোহার গরাদে তৈরি সদর প্রবেশ দ্বারে। ফ্রেজাররা গরাদের ফাঁক দিয়ে রাজবাড়ির ভেতরটা দেখতে লাগল। সদর দেউড়ির পরেই বেশ বড় দুটো ফুল বাগান। তারপরেই রাজবাড়ি। দুটো বাগানের মধ্যে দুটো ফোয়ারা।

ফ্রেজার একজন প্রহরীকে বলল—আচ্ছা আমরা ভেতরে ঢুকে রাজবাড়ি দেখতে পারিনা?

—না। ভেতরে যাওয়ার অনুমতি আনতে হবে সেনাপতির কাছ থেকে।

—আমরা ভেতরটা দেখতে চাই। সেনাপতিকে কোথায় পাবো? ফ্রেজার বলল।

—ঐ যে শুধু কাঠে তৈরি বাড়িটা—প্রহরী আঙ্গুল দিয়ে দেখাল—ঐ বাড়িটার পরেই দামি পাথরের বাড়িটা। সেনাপতির বাড়ি ওটাই। প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রেজার বলল।

দুজনে সদর রাস্তায় এল। চলল সেনাপতির বাড়ির দিকে। কাঠের বাড়িটার পরেই সেনাপতির বাড়ি।

সেনাপতির বাড়ির দরজায় দুজন সশস্ত্র প্রহরী। ফ্রেজার একজন প্রহরীকে বলল—সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে চাই। সেনাপতি দেখা করতে দেবেন কিনা এটা জানতে পারলে ভালো হত।

—দেখছি। একজন প্রহরী বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। একটু পরে প্রহরীটা ফিরে এল। বলল—বাইরের ঘরে অপেক্ষা কর। সেনাপতি আসবেন।

প্রহরী দরজা খুলে ধরল। ফ্রেজাররা বাইরের ঘরে ঢুকল। মোটামুটি সাজানো গুছোনো ঘরটা।

দুজনে কালো কাঠের চেয়ারে বসল। একটু পরেই সেনাপতি ঘরে ঢুকল। গদিপাতা চেয়ারটায় বসল। ফ্রেজারদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা বিদেশি।

—হ্যাঁ—আমরা ভাইকিং। ফ্রেজার বলল।

—হুঁ—তা আমার কাছে কী মনে করে? সেনাপতি বলল।

—আমরা রাজবাড়িটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখতে চাই। তাই আপনার অনুমতি চাই। ফ্রেজার বলল।

—হঠাৎ রাজবাড়ি দেখার শখ হল কেন? সেনাপতি বলল।

—রাজা ওয়াজিমোর রাজপ্রাসাদ নাকি এত সুন্দর যে লিসবনেও এত সুন্দর অট্টালিকা নেই। ফ্রেজার বলল।

—হ্যাঁ। কথাটা মিথ্যে শোনো নি। যাকগে—আমি একঘণ্টার সময় দিচ্ছি। তার বেশি থাকতে পারবে না। সেনাপতি বলল।

—এক ঘণ্টাই যথেষ্ট। ভেন বলল।

পাথরের টেবিলের ওপর থেকে সেনাপতি একটা পার্চমেন্ট কাগজ নিল। পাখির পালকে তৈরি কলমটা হাতে নিল। রুপোর দোয়াতদানে কলমটা ডুবিয়ে নিল। লিখতে লাগল। লেখা হলে কাগজটা ফ্রেজারের হাতে দিল।

দুজনে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ফেরার পথে দুজনে শাসক ওয়াজিমোর প্রাসাদের সামনে এল। দেউড়ির কাছে গেল। একজন প্রহরীকে ডাকল। প্রহরী কাছে এলে সেনাপতির অনুমতিপত্রটা দেখাল। প্রহরী অনুমতিপত্রটা নিয়ে আরেকজন প্রহরীর কাছে গেল। তার হাতে দিল। বোঝা গেল ঐ প্রহরীটিই এদের দলপতি।

প্রহরীটি অনুমতিপত্রটি হাতে নিয়ে ফ্রেজারদের কাছে এল। বলল—সেনাপতি এক ঘণ্টার সময় দিয়েছেন। তোমরা কখন দেখতে যাবে?

—এখনই যাবো। ফ্রেজার বলল।

—বেশ। এই বলে সে একজন প্রহরীকে ডাকল। প্রহরীটি এলে তাকে বলল—এই দুজনকে রাজবাড়িটা দেখিয়ে আনো। সময়—এক ঘণ্টা।

প্রহরীটি ফ্রেজারদের কাছে এল। বলল—চলুন। প্রহরীটির বয়েস কম। পোশাক টোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

প্রহরীটি চলল রাজবাড়ির দিকে। পেছনে ফ্রেজার আর ভেন। যেতে যেতে ফ্রেজার ভাবল—রাজবাড়ির মন্ত্রণাকক্ষটা কোথায় সেটা জানাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু আগেই মন্ত্রণাকক্ষটা কোথায় জানতে চাই এ সব বলা যাবে না। সময় বুঝে বলবো।

মূল রাজবাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। প্রহরীটি বলল—আগে পশ্চিমটা দেখে আসি। সেইদিকে চলল। পেছনে ফ্রেজার আর ভেন।

একটা বড় ঘরের কাছে প্রহরী বলল—এটা হচ্ছে পড়াশুনোর জন্যে ঘর। বড় বড় পণ্ডিতরা থাকে। আর একটা লম্বাটে ঘর দেখিয়ে বলল—এখানে ছাত্ররা থাকে। তারই পাশে একটা মাঠমত। এখানে খেলাধুলো হয়।

কিছু পরে—রাজবাড়ির মধ্যেই একটা বড় ঘর দেখিয়ে প্রহরীটি বলল—এটা হচ্ছে অস্ত্রাগার। দেখা গেল চারজন প্রহরী ঘরটা পাহারা দিচ্ছে। হাতে খোলা তরোয়াল।

রাজবাড়িটার দক্ষিণ কোণায় একটা ছোট ঘর দেখিয়ে বলল—এটা মন্ত্রণাকক্ষ। ফ্রেজার এই ঘরটাই খুঁজছিল।

—এখানে তো কোন প্রহরী নেই। ফ্রেজার বলল।

—থাকে যখন এই কক্ষে রাজা মন্ত্রী সেনাপতি দুজন অমাত্য এসে বসেন। এখানে দেশ শাসন যুদ্ধ আর্থিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রহরী বলল।

—এই মন্ত্রণাসভা কখন বসে। ফ্রেজার জানতে চাইল।

—সাধারণত সন্ধ্যের পরে। প্রহরীটি বলল।

— প্রত্যেকদিনই কি বসেন সবাই। ফ্রেজার বলল।

—প্রায় প্রত্যেকদিন। তবে প্রতি সোমবার আলোচনা সভা বসবেই। সেদিন বেশ রাত পর্যন্ত সভা চলে। প্রহরীটি দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—আপনি এত কথা জানতে চাইছেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেজার সতর্ক হল। বলল—দেখুন— এখানকার কয়েকটি দেশ নিয়ে আমি পড়াশুনো করেছি। এবার দেখতে বেরিয়েছি। রানি ঈশিতা আর সেউতার শাসক মিনের রাজত্বে গেছি। সব সংবাদ সংগ্রহ করেছি। এবার এখানে এসেছি। এইসব এলাকার আর্থিক অবস্থা কেমন সেটা লিখতে গিয়ে আরো তথ্য চাই। আমি এসব নিয়েই পড়াশুনো করি লিখি।

—ও। তাই বলুন। এখানে আর বিশেষ কিছু দেখার নেই। প্রহরীটি বলল।

—সৈন্যাবাসটা কোথায়? ভেন বলল।

—সেটা দক্ষিণ দিক দেখিয়ে বলল—রাজবাড়ির দেয়ালের ওপাশে বিরাট মাঠ রয়েছে—সেখানেই সৈন্যদের আসন।

—ঠিক আছে—ফ্রেজার বলল—তাহলে আর কিছু দেখার নেই।

—একটা ছোট চিড়িয়াখানা আছে। প্রহরীটি বলল।

—না—না। অনেক দেখা হয়েছে। ফ্রেজার বলল—চলো ভেন।

দুজনে সদর দেউড়িতে এল। প্রহরীটিকে ধন্যবাদ দিয়ে দরজার গায়ে হাত রাখল। প্রহরীটি এসে ঠেলে দরজাটা খুলে দিল।

দুজনে সদর রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

ফ্রেজাররা যখন সরাইখানায় ফিরল তখন বেশ বেলা হয়েছে। সরাই মালিক একটু দ্রুতই ওদের কাছে এল। বলল—কোথায় গিয়েছিলেন?

—রাজবাড়িটা দেখে এলাম। ভেন বলল। তারপর বলল—সেনাপতি অনুমতি দিল।

—বোধহয় আমাদের বিদেশি দেখে সেনাপতির দয়া হয়েছিল। এক ঘণ্টার জন্যে রাজবাড়ি দেখতে অনুমতি দিয়েছিলেন। ফ্রেজার বলল।

সরাই মালিক সজোরে বলে উঠল—আরে—আমাকে তো বলবেন!

—কেন বলুন তো? ভেন বলল।

—রাজবাড়ির এক পাহারাদার ইগর আমার খদ্দের। আমার দোকানে সপ্তাহে দু'তিনদিন আসবেই। খেয়ে যাবেই। মালিক বলল।

—ও। ফ্রেজার বলল—তাহলে উনি তো ভালোভাবে —

মালিক ফ্রেজারকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল—আপনাদের সব দেখাতো।

—যাক গে—দেখা তো হয়েছে। ভেন বলল।

ফ্রেজার তখন চিন্তামগ্ন। দ্রুত ভাবছে ঐ প্রহরীর মারফৎই গোপন সংবাদ বের করা যাবে। তাই বলল—আচ্ছা ইগর কি আজকে খেতে আসবেন?

—আসবেন বই কি। ইগরের স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে। ইগরের রান্নার বালাই নেই। দুবেলা আমার এখানেই খাচ্ছে। মালিক বলল।

—রাতে কখন খেতে আসে? ফ্রেজার বলল।

—তার ঠিক নেই। মালিক বলল।

—এলে আমাদের কথা একটু বলবেন। বলবেন যে আমরা ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। ফ্রেজার বলল।

—নিশ্চয়ই বলবো। মালিক বলল। মালিক চলে গেল।

দুজনে পেছনের ঘরটায় এল।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে ফ্রেজার আর ভেন বিছানার ওপর এসে বসল। ফ্রেজার শুয়ে পড়ল। ভেন বসে রইল। একটু পরে ভেন বলল—ফ্রেজার পারবে ইগরের সঙ্গে কথা বলে গোপন সংবাদ বের করতে?

-চেষ্টা তো করি। দেখা যাক। ফ্রেজার বলল।

বিকেলের দিকে দুজনে জায়গাটা দেখতে বেরুলো। ছোট নগর। জনসংখ্যা খুব বেশি নয়। তবে রাস্তাঘাট দোকান বাজার বেশ পরিচ্ছন্ন।

ফ্রেজার প্রায় কিছুই দেখছে না। নানা চিন্তা মাথায়? ফ্রান্সিসরা কোথায়? ওরা লড়াইটড়াইয়ে নেমে পড়েছে কিনা। তবে ভরসা ঐ ফ্রান্সিস। বোকার মত কোন কাজ ফ্রান্সিস করবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফ্রেজার। আবার কবে আমাদের সবাইর সঙ্গে সবাইর দেখা হবে। এসব ভাবতে ভাবতে হটাৎই মনে পড়ল রাজবাড়িতে শাসক ওয়াজিমোর স্থাপিত স্কুল, ছেলেদের বাড়ি এসবের কথা। সরাইখানার মালিক যা বলেছিল। তার সঙ্গে শাসক ওয়াজিমোর কাজের কোন মিল নেই। সরাইওয়ালা অসৎ। সে মানুষের সদ্‌গুণ দেখতে পায় না। মানুষের নামে কুৎসা রটাতে সে ভালোবাসে। যাক গে—তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকা খাওয়া। চলে গেলেই তার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ।

ফ্রেজাররা সন্ধ্যের কিছু পরেই খেয়ে নিল। নিজেদের জায়গায় শুয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

তখন একটু বেশি রাত হয়েছে। হঠাৎ ফ্রেজাররা শুনল চড়া গলার হাসি। সেইসঙ্গে সরাইওয়ালার বিগলিত সুরে বলা—আসুন —আসুন ইগর।

—খেতে দাও। চড়া গলা ইগরের।

ভেন কাঠের বিছানা থেকে নামল। দোকানঘরের পেছন দিককার দরজার কাছে এল। দেখল ইগরকে। বেশ স্বাস্থ্যবান লম্বা চওড়া চেহারা। ভেন চলে এল। বিছানায় বসতে বসতে বলল—প্রহরীর যেমন চেহারা হওয়া উচিত তেমনি চেহারা।

—এখন আমাদের প্রস্তাব শুনে কী বলে দেখি। ফ্রেজার বলল।

ফ্রেজাররা অপেক্ষা করতে লাগল।

ইগরের খাওয়া হল। ইগর বারপাঁচেক মাংস রুটি চাইল। সরাইমালিক ফ্রেজার আর ভেন-এর কাছে এল। বলল—আপনাদের কথা বলেছি। ইগর আসছে এখানে। কথাবার্তা বলবেন।

কিছু পরে ইগর এসে ফ্রেজারদের বিছানার সামনে দাঁড়াল। বেশ ভারি গলায় বলল—কী ব্যাপার বলুন তো?

—একটা বিশেষ জরুরী কথা আছে। আপনি বসুন। ভেন বলল।

—বসলে কাঠের পাটাতন ভেঙে যাবে। দাঁড়িয়েই কথা বলবো। ইগর বলল।

—আমি আগেই বলেছি আমার বন্ধুদের বাঁচাবার জন্যেই একটি প্রস্তাব আপনার কাছে রাখবো। ফ্রেজার বলল।

—ঠিক আছে বলুন। ইগর বলল।

ফ্রেজার বলতে লাগল—আমরা ভাইকিং বিদেশি। আমরা একটা জাহাজে চড়ে দেশ দ্বীপ ঘুরে ঘুরে বেড়াই। গুপ্তধনের খবর পেলে আমরা খুঁজে বের করি। যার বা যাদের সেটা প্রাপ্য তাদের নিয়ে আমরা জাহাজ ভাসাই। অন্য দেশে অন্য দ্বীপে যাই।

—বলেন কি! গুপ্তধন আবিষ্কার করেন তার ভাগও নেন না—এ কখনও হয় নাকি। আপনারা তো বোকা। ইগর বলল।

হ্যাঁ লোকে তাই ভাবে। যাকগে—এখানে আমরা জাহাজে চড়ে এসেছি। অনেকদিন আগে এখানকার এক রাজা ওভিড্রেো সাত হাত লম্বা একটা খাঁটি সোনার তরবারি তৈরি করিয়েছিলেন। তিনি মৃত্যুর আগে কাউকে বলে যান নি সেই সোনার তরবারি তিনি কোথায় রেখে গেছেন। ফ্রেজার বলল।

—বলুন। ইগর বলল।

—একটা নকশা আমরা পেয়েছিলাম। হঠাৎই। সেটা দেখে দেখে আমরা গুপ্ত তরবারির হদিশ পাবো বলে আশা করছি। এখন আমার বন্ধুরা রাজা মিনের কয়েদঘরে বন্দী রানি ঈশিতা আমাদের ও আমাদের বন্ধুদের কারারুদ্ধ করেছে।

—হুঁ। বলে যান। ইগর বলল।

—এখন রানি ঈশিতা আমাকে আর এই বন্ধুকে একটি শর্তে মুক্তি দিয়েছে। শর্তটি হল—শাসক মিনএর যুদ্ধ পরিকল্পনার ব্যবস্থা জেনে রানিকে বলতে হবে। অর্থাৎ গুপ্তচরের নীচ কাজ।

—তারপর? ইগর বলল।

—আমরা দুজনে বেরিয়েছিলাম শাসক মিনের দেশে যাবো বলে। কিন্তু আমরা পথ ভুলে এই দেশে চলে এসেছি। ফ্রেজার বলল।

—এখন কী করতে চান? ইগর বলল।

—আপনাদের শাসক ওয়াজিমোও রানি ঈশিতার সঙ্গে যুদ্ধের তোড়জোড় শুরু করেছেন। আপনি কি এটা জানেন? ফ্রেজার বলল।

—নিশ্চয়ই জানি। প্রহরী হলেও আমাদের যুদ্ধ করতে হয়। যাকগে—এখন আপনারা আমার সঙ্গে কী কথা বলতে চান? ইগর বলল।

—দুভাবে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন। এক—আপনার প্রহরীর পোশাকটা আমাকে ধার দিতে পারেন—একরাতের জন্যে। দুই—আপনি নিজে কাজটা করতে পারেন।

—ঠিক বুঝলাম না। ইগর বলল।

—আপনার পোশাক পরে আমি শাসক ওয়াজিমোর গোপন আলোচনা শুনতে পারি। অন্যপথ—আপনি নিজে শাসক ওয়াজিমোর যুদ্ধ পরিকল্পনা শুনতে পাবেন পরে আমাদের সেটা জানাতে পারেন। দুটি দেশের যুদ্ধ পরিকল্পনা জানতে পারলে রানি ঈশিতা খুশি হয়ে আমাদের মুক্তি দেবে। ফ্রেজার বলল।

—সেটা হতে পারে। যাহোক—আমার কাছে আপনারা কী চান? ইগর বলল।

—একটু আগেই তো বললাম আপনি আমাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারেন। ফ্রেজার বলল।

—পোশাক পরে কাজ করার বিপদ অনেক। আমিও জড়িয়ে যাবো। মনে হয় মন্ত্রণাকক্ষের কথাবার্তা সিদ্ধান্ত সবই আমি আড়াল থেকে শুনে জানতে পারি। পরে আপনাদের বলতেও পারি। ইগর বলল।

—দেখুন—গুপ্তচরবৃত্তি অত্যন্ত নিম্নস্তরের কাজ। এটা আমরা জানি। কিন্তু আমি আর আমাদের বন্ধুদের চিরজীবন কাটবে কয়েদঘরে এটা ভাবলে আমি সত্যি চোখের জল ফেলি। ফ্রেজার বলল।

—ওঃ। ব্যাপারটা খুবই দুঃখের বেদনার। ইগর বলল।

—আরো একটা সম্ভাবনার কথা বলি। রানি ঈশিতা আমাদের বলেছে যে কিছুদিনের মধ্যে ওখানকার সমুদ্রতীরে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসবে। আমরা যদি শাসক মিনের যুদ্ধের পরিকল্পনা ঐ হাটবসার আগে রানিকে বলতে না পারি তবে আমাদের ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করে দেবে। শাসক মিন আর রানি ঈশিতার দয়ামায়া বলে কিছু নেই। এই মৃত্যু আর ক্রীতদাস হওয়া থেকে আপনিই আমাদের রক্ষা করতে পারেন। ফ্রেজার বলল। কিন্তু কোনদিন শাসক ওয়াজিমো এসব নিয়ে কথা বলবেন তাতো আগে থেকে জানতে পারবোনা। ইগর বলল।

—আমি শুনেছি প্রতি সোমবার মন্ত্রণাকক্ষে শাসক ওয়াজিমো আর মন্ত্রী সেনাপতিরা বসে। দু'একজন অমাত্যও থাকেন। আপনাকে শুধু সোমবারের পাহারার কাজ করতে হবে। ফ্রেজার বলল।

—ঠিক আছে—দেখছি। কালকেই তো সোমবার। ইগর বলল।

—আপনি একটু চেষ্টা করলেই এই কাজটা করতে পারবেন। ফ্রেজার বলল।

ইগর আস্তে আস্তে চলে গেল।

ফ্রেজার বলে উঠল—এখন যদি ফ্রান্সিস থাকতো আমরা কত নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

—ওসব ভেবে কী হবে। দায়িত্ব আমাদের ওপর পড়েছে সেটা পালন করার দায়িত্বও আমাদের। ভেন বলল।

পরের দিনটা শুধু কী হয় কী হয় ভেবেই ফ্রেজারের আর ভেন-এর সময় কাটল।

সন্ধ্যে পর্যন্ত সরাইখানাতেই থাকল। একটু রাত হতেই দুজনে বেরোল। হাঁটতে হাঁটতে রাজবাড়ির সামনে এল। একটা গাছের নিচে দুজনে দাঁড়াল।

বেশ রাত হল। সেনাপতি মন্ত্রী অমাত্যরা ঘোড়ার গাড়ি চেপে চলে গেল।

এবার ইগর বেরোবে।

দুজনে সদর দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। রাত বাড়তে লাগল।

ইগর আর অন্য প্রহরীরা সাধারণ পোশাকে বেরিয়ে এল।

—চলো। বলি এবার। ভেন বলল।

—না ভেন। এখন নয়। ওর সহকর্মীদের সামনে কোন কথা নয়। ফ্রেজার বলল।

দুজনে ইগরদের পেছনে পেছনে চলল।

একজন দুজন করে ইগরের সহকর্মীরা চলে গেল। রইল একজন সহকর্মী।

—এখন কী করবে? ভেন বলল।

—ইগর একা না হওয়া পর্যন্ত আমরা ওর কাছে যাবনা। ফ্রেজার বলল।

সরাইখানার কাছাকাছি এসে একজন সহকর্মী চলে গেল। একা ইগরের সঙ্গে কথা বলা যায়। ভেন বলল—এখুনি কথা বলা যায়।

—না ভেন। অত অধৈর্য হয়ো না। ফ্রেজার বলল।

ইগর সরাইখানায় ঢুকল। মালিক ছুটে এল। ঘাড় কাত করে বলতে লাগল—আসুন—আসুন। একটু দেরি হল আসতে।

—হুঁ। সেই দুজন লোক কোথায়? ইগর বলল।

—ওঁরা তো বেরিয়ে গেছেন। মালিক বলল।

—বেরিয়ে গেছেন? ইগর কথাটা বলে দরজার দিকে তাকাল। দেখল দুজন দাঁড়িয়ে আছে।

ইগর কোন কথা না বলে ভেতরে ঢুকল। ফ্রেজারদের বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল।

দুজনে এসে ইগরের সামনে দাঁড়াল।

ইগর একবার দুজনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল—শাসক ওয়াজিমো সেনাপতি মন্ত্রীরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে—সেটা আমি একটা কাগজে লিখে নিয়ে এসেছি। ইগর বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। ফ্রেজারকে দিল।

ফ্রেজার কাগজটা মোমবাতির কাছে নিয়ে গেল। পড়তে লাগল—

প্রথমে আমরা রানি ঈশিতার দেশ আক্রমণ করবো। ঈশিতার সৈন্যবল কম। আমরা অতর্কিতে আক্রমণ করবো। রানিকে সৈন্য সাজাবার সময়ই দেব না। কিন্তু আমরা সামনাসামনি আক্রমণ করবো না। চোরাগোপ্তা আক্রমণ করবো। রানির আবাসে গিয়ে রানিকেই বন্দী করবো। তাহলেই সৈন্যদল হতাশ হবে। তখন তাদের বন্দী করা হবে। এই আক্রমণে প্রথমেই সেনাপতি যাবে কিনা সেটা পরে আলোচনা করে স্থির করতে হবে।

ফ্রেজার হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে ইগরকে জড়িয়ে ধরল। বলল—আমার প্রায় পনেরোজন বন্ধুকে আপনি বাঁচালেন।

—দেখুন গিয়ে রানি ঈশিতা কী বলে দেখুন। ইগর বলল। তারপর চলে গেল।

ফ্রেজার আনন্দে ভেন-এর হাত জড়িয়ে ধরল। বলল—ভেন—আর এক মুহূর্তও নয়। আমরা এক্ষুণি রওনা দেব। থর্ন বনের মধ্যে দিয়ে যাবো। চলো।

অল্পক্ষণের মধ্যে পোশাক কাপড়টাপর সব গুছিয়ে নিয়ে সরাইখানা থেকে বেরোবে বলে দরজার কাছে এল। সরাইওয়ালা এগিয়ে এল। দরজার তালা খুলে দিল।

দুজনে বেরিয়ে এল। ভেন কোমর থেকে একটা ছোট সোনার চাকতি বের করে সরাইওয়ালাকে দিল। সরাইওয়ালা খুশির হাসি হাসল।

থর্নবনের মধ্যে দিয়ে দুজন আস্তে আস্তে যেতে লাগল। অনেকটা এসেছে দুজনে।

তখনই গাছপালার ফাঁক দিয়ে ফ্রেজারের নজর পড়ল একটা ছোট কুঁড়েঘর।

তখনই গাছপালার ফাঁক দিয়ে ফ্রেজারের নজরে পড়ল একটা ছোট কুঁড়েঘর। ওরা কুঁড়েঘরটার কাছে এল। ফালি কাঠের দরজা। দেখল দরজা বন্ধ। ফ্রেজার দরজার কাছে গেল। আঙুল ঠুকে শব্দ করল। দরজা খুলে গেল। দুজনে দেখল—এক পাকা দাড়ি গোঁফওয়ালা বৃদ্ধ।

বেশ শান্ত সৌম্য চেহারা। বৃদ্ধ জিগ্যেস করল—কে তোমরা? কী চাও।

আমরা ভাইকিং বিদেশী। জাহাজে চড়ে আমরা এসেছি। কিছু বন্ধু জাহাজ থেকে এখানে এসেছিল। খাদ্য আর জল নিয়ে যেতে। কিন্তু তারা আজও জাহাজে ফেরেনি। এখন কোথায় আছে অথবা অন্য কোথাও চলে গেছে কিনা সেই খোঁজেই আমরা এসেছি।

—তোমরা এখন কোথায় যাবে? বৃদ্ধ জানতে চাইল।

—শাসক মিনের রাজ্যে। ফ্রেজার বলল।

—সে তো এই থর্ন বনভূমির মধ্যে ওপাশে কিনারা দিয়ে যেতে পার তো। বৃদ্ধ বলল।

—না। আমরা বনভূমির মধ্যে দিয়েই যাবো। লুকিয়ে যাবো। ফ্রেজার বলল।

—বেশ যাও। কিন্তু নিশানা হারিও না। যদি নিশানা হারাও তবে এই বনভূমিতেই ঘুরে বেড়াতে হবে। বন থেকে বেরোবার পথ পাবে না। বৃদ্ধটি বলল।

—না—না। আমরা নিশানা ঠিক রাখবো। ফ্রেজার বলল।

বৃদ্ধটি বলল—এই দুই রাজ্যের মধ্যে লড়াই আর থামল না। রানি ঈশিকার পিতা যখন রাজা ছিলেন অনেক চেষ্টা করেছিলেন দুই রাজ্যের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে। কিন্তু এই শাসক মিনের পূর্বেকার রাজা রাজি হয়নি। বরং বিনা কারণে লড়াই বাঁধিয়ে বসল। এরকম লড়াই-এ শুধু সৈন্যদের সাধারণ মানুষদের প্রাণ যায়। এইসব লড়াইয়ের সময় সবচেয়ে বিপদ হয় আমার। দুই রাজ্যেরই সীমা হল এই থর্ন বনভূমি। দুপক্ষের সৈন্যরা বনের মধ্যে ঢোকে। দুই দলে লড়াই চলে এই বনভূমিতে। যে দল জেতে তারা অন্য রাজ্যের মালিকানা পায়। লড়াই থামে। কিন্তু সে আর কতদিন। আবার লড়াই শুরু হয়। রাজ্য ফিরে পাবার লড়াই। এভাবেই এখানকার দুই রাজ্যের মধ্যে লড়াই চলছে দীর্ঘদিন ধরে। আমি লড়াইয়ের সময় শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি আমার কত কষ্টে রোয়া ফুলফলের গাছ সৈন্যদের দাপাদাপিতে গোড়া থেকে উপড়ে যায় । কিছুই বলার নেই। রাজাদের রাজ্য বাড়াবার লিপ্সা নির্দয় মানসিকতা শুধু মৃত্যুই ডেকে আনে। রাজারা অক্ষত থাকেন। মরে সাধারণ সৈন্যরা। এত হত্যা এত রক্তপাত তবু কারো চৈতন্য হয় না।

—ঠিকই বলেছেন। এমন সব রাজাদের অভাব নেই যারা দাম্ভিক নির্মম স্বার্থান্ধ। প্রজাদের মঙ্গলসাধনের কথা তারা কখনো ভাবেই না। আরবীয় শাসক মিনকে এখনো দেখিনি কিন্তু রানি ঈশিকার পরিচয় পেয়েছি। অত্যন্ত ঘৃণ্য তার মনোভাব। এখানের জাহাজঘাটায় নাকি ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসে। সেসময় তিনি কয়েদঘরে আটক করা বন্দীদের ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করেন। তাঁর বিবেকে বাঁধে না। ভেন বলল।

—রানি ঈশিকার নির্মমতার অনেক খবরই আমি জানি। কিন্তু তাঁকে সংযত করার উপায় আমি জানি না। অবশ্য উনি আমার মত বনবাসী এক বৃদ্ধের কথা শুনতে যাবেন কেন। বৃদ্ধ বলল।

—উনি বলেন এখন ওর নাকি খুব অর্থাভাব চলছে তাই ক্রীতদাস হিসেবে বন্দীদের বিক্রি করবেন। ফ্রেজার বলল।

—হ্যাঁ। নিষ্ঠুর নির্মম কাজ যারা করেন তারা সবসময়ই যুক্তি দেখান। ইনিও তাই। বৃদ্ধ বলল।

বৃদ্ধ তারপর বলল—তাহলে আরবীয় শাসক মিনের রাজত্বে যাবে?

—হ্যাঁ। বন্ধুদের যদি বন্দীশালায় পাই তাহলে আর কোথাও যাবো না। না পেলে যে করে হোক বন্ধুদের খবর পেতেই হবে। খবর পাবোই। তারপর বন্ধুদের নিয়ে পালাবো। জাহাজঘাটায় যাবো। জাহাজ উঠে দেশের দিকে যাত্রা করবো। ফ্রেজার বলল।

—বেশ। তোমাদের সাফল্য কামনা করছি। যীশু তোমাদের রক্ষা করুন। বৃদ্ধ বলল।

দু'জনে কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এল। চলল মিনের রাজ্যের দিকে। বনের মধ্যে কিছুটা যেতেই আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। গাছ গাছালির ডালপাতার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে আকাশ যেটুকু দেখল তাতে ফ্রেজার বুঝল ঝড় আসবে।

ফ্রেজার বলল—ভেন—ছোটো। দুজনে গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে ছুটল। সশব্দে বাজ পড়তে লাগল। ঝড়ের হাওয়ায় গাছগুলো মাথা ঝাঁকাতে লাগল। শুকনো ডালপাতা ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে ধুলোবালি উড়ল। দু'জন চোখ কুঁচকে ছুটলো। একটু পরেই নামল বৃষ্টি। গাছের ডালপাতায় বৃষ্টি পড়ার চট্‌চট শব্দ। তার মধ্যে দিয়েই দুজনে ছুটল। কিন্তু জোরে ছুটতে পারছে না। নিচুগাছের বৃষ্টি ভেজা কাণ্ডে পা পিছলে যাচ্ছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রেজার বলল—বুঝলে ভেন—ঝড় আমাদের উপকারই করল। ভেনও হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—

এ কথা বলছো কেন?

এই ঝড় জলের মধ্যে শাসক মিনের সৈন্যরা বনভূমি ছেড়ে পালাতে ব্যস্ত থাকবে। আমরাও নির্বিঘ্নে শাসক মিনের রাজত্বে গিয়ে পৌঁছতে পারবো। ফ্রেজার বলল।

রানি ঈশিকার সৈন্যরাও আর এদিকে আসবে না ভেন বলল।

ঠিক তাই। সুতরাং আমরা নিরাপদ। ফ্রেজার বলল।

তাই তো মনে হচ্ছে। ভেন বলল।

হঠাৎই বন শেষ। সামনে বিস্তৃত ঘাসে ঢাকা প্রান্তর।

তখন বেশ রাত হয়েছে। প্রান্তরের পরেই রাজপথ। দুজনে প্রান্তরে নামল। আকাশের মেঘলা ভাবটা তখনও যায়নি। চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে মেঘে।

বেশ অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দুজনে রাজপথে উঠল। এবার কয়েদঘরটা খুঁজে বের করা। দুজনে রাজপথ ধরে সমুদ্রের দিকে জাহাজঘাটের দিকে আসতে লাগল। বুড়োটা বলেছিল একটা রূপালি গাছের পাশের রাস্তা ধরে গেলে কয়েদখানা পাওয়া যাবে।

তখন হাওয়ার জোর থাকলেও বৃষ্টি কমে গেছে। টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে।

হঠাৎ অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ওরা দেখল একদল মিনের সৈন্য পুবমুখো যাচ্ছে। ফ্রেজার দ্রুত ভেন-এর হাত ধরে পথের পাশের মোটা গাছটার পেছনে গিয়ে লুকোল।

অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ভালো দেখা যাচ্ছে না। ওর মধ্যেই পুবদিকে খুব আবছা তিন-চারটে লম্বাটে ঘর দেখা গেল। সৈন্যরা সেই ঘরগুলোর একটাতে ঢুকে গেল।

ফ্রেজার বলল—ভেন—ঐ ঘরে নিশ্চয়ই কিছু হবে। হয় সভাটভা হবে নয়তো শাসক মিনের কোন নির্দেশ সৈন্যদের জানানো হবে।

—বলো কি! এতো বাঘের গুহায় ঢোকা। ভেন বলল।

—আমরা গুপ্তচর হয়েই এসেছি। কাজেই ভয়ে পিছোলো চলবে না। খবর সংগ্রহ করতেই হবে। চলো। ফ্রেজার বলল।

মাটিতে বুক পা ঘেষে ঘেষে দুজনে চলল সৈন্যাবাসের দিকে। আকাশে চাঁদ ঢাকা মেঘ। খুব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চারদিকে। সৈন্যরা যে ঘরটায় আলো জ্বলছিল সেই ঘরটার পেছনে এসে ওরা দাঁড়াল। জানালা মাত্র একটা। তারই নিচে দুজনে বসল। ঘরের ভেতরে সৈন্যরা চুপচাপ।

হঠাৎ সৈন্যরা বোধহয় বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শব্দ হল। বসল। সেনাপতির উঁচু গলা শোনা গেল—যে কারণে তোমাদের ডাকা হয়েছে সেটা বলছি। রানি ঈশিকার সৈন্যসংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশি। তাই তিউনোশিয়া থেকে আরও সৈন্য আনার ব্যবস্থা করেছি। সেই সৈন্যদল এলেই আমরা একটু গুছিয়ে নিয়ে রানি ঈশাকার দেশ আক্রমণ করবো। সেই সৈন্যদল এখানে আশা পর্যন্ত তোমরা খাওদাও বিশ্রাম কর। তারপরেই যুদ্ধ। এবার তোমরা যাও। বিশ্রাম কর গে।

সৈন্যরা উঠে দাঁড়াল। তারপর নিজেদের ঘরে ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পরেই সৈন্যদের কথাবার্তা থেমে গেল। সবাই শুয়ে পড়ল : চারিদিক নিস্তব্ধ হল। শুধু গাছের পাতা কাঁপিয়ে হাওয়া চলার শব্দ।

সেই ঘরের পেছন থেকে ওরা আস্তে আস্তে সরে এল। তারপর প্রান্তরে বুক পেতে শুয়ে পড়ল। বুক হাঁটু ঘষতে ঘষতে চলল রাস্তার দিকে। এভাবে বেশ কিছুদূর এসে দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। পোশাকে জলকাদা লেগেছে।

—এখন কী করবে? ভেন বলল।

—সেই বৃদ্ধের ঘরে আশ্রয় নেওয়া যায়। ভেন বলল।

—ঠিক আছে। তাই চলো। ফ্রেজার বলল।

দুজনে বৃষ্টিভেজা বনভূমি দিয়ে চলল। ফ্রেজার জাহাজ চালনায় দক্ষ। ও ঠিক দিক নির্ণয় করে চলল। বড় বড় গাছের ডালপাতার ফাঁক দিয়ে যতটা আকাশ দেখা যাচ্ছে তারই ওপর নির্ভর করে আর আশেপাশের গাছপালা দেখে দেখে ফ্রেজাররা চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধের ঘরটা দেখতে পেল। ভেন পাথরের বারান্দায় উঠে বন্ধ দরজায় টোকা দিল। একটু পরে দরজা খুলে গেল। বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ হেসে বলল—এসো এসো। বাইরে বোধহয় বৃষ্টি কমেছে।

—হ্যাঁ। বৃষ্টি থেমে গেছে। ভেন বলল।

—ভেতরে এসো। বৃদ্ধ বলল।

দুজনে অন্ধকার ঘরে ঢুকল। বৃদ্ধ একটা মশাল জ্বালল। ফ্রেজারদের চেহারা-

মাখা পোশাক দেখে বলল—তোমরা কি আছাড় টাছার খেয়েছিলে।

—হ্যাঁ। ফ্রেজার বলল—বুঝলেন—একেবারে কাদার মধ্যে।

দুজনে ওপরের এদেশীয় পোশাক খুলল। নিজেদের দেশীয় পোশাক আর খুলল না। ঘরে একটা কাঠের পাটাতন পাতা। তাতে মোটা সুতোয় কাজ করা মোটা কাপড় পাতা। বৃদ্ধ বলল—কোথায় যে তোমাদের শুতে দি।

—পাথরের মেঝেতেই শোব। কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে। ফ্রেজার বলল।

—ঘরে কিছু ফলমূল আছে। খাও। বৃদ্ধ বলল।

—বলছিলাম আর কিছু নেই? ভেন বলল।

—হ্যাঁ। আটা চিনি এসব আছে। কিন্তু—

—ব্যস্। আমি উনুন পাতছি। কাঠকুটো আছে তো?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। বৃদ্ধ বলল।

—তাহলে তিনটে বড় পাথর নিয়ে আসছি। কথাটা বলে ভেন ঘরের বাইরে চলে গেল।

বৃদ্ধ বলল—তোমরা পরিশ্রান্ত। এই কাঠের পাটাতনে বসে বিশ্রাম কর।

—মেঝেতেই বসছি। এসবে আমরা অভ্যস্ত। ফ্রেজার মেঝেতে বসে পড়ল।

ভেন পাথর নিয়ে ফিরে এল। তিনটে পাথর বসিয়ে উনুন মত বানাল। মশালের আগুন দিয়ে কাঠকুটো জ্বেলে উনুনে দিল। বৃদ্ধ গিয়ে পাটাতনে বসল।

—কিছু মনে করবেন না—আপনার ঘুম ভাঙ্গালাম। ফ্রেজার বলল।

—কী যে বলো। তোমরা আমার অতিথি। আমার এই ভাঙ্গা ঘরে তোমরা যে আতিথ্য গ্রহণ করেছো এতেই আমি ধন্য। বৃদ্ধ বলল।

ফ্রেজার মেঝেয় শুয়ে পড়ল। একটু তন্দ্রামত এল। ভেন-এর রান্না চলল।

ভেনের রান্না হল। দুজনে হাপুস হুপুস করে চিনিমাখা রুটি খেল।

তারপর দুজনে মেঝেয় শুয়ে পড়ল।

সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙ্গল দুজনের। হাত মুখ ধুয়ে ওরা গত রাতের বাড়তি রুটি খেল।

এবার ফ্রেজার সমস্যায় পড়ল কী করবে এখন? বলল—ভেন—এখন কী করবে?

—দেখ ফ্রেজার—ফ্রান্সিসদের খোঁজ করতে গেলে গভীর রাতে যেতে হবে। অত রাতে কোথায় খুঁজবো? তার চাইতে আমি যেটা ভাবছি বলছি। একটু থেমে ভেন বলল—ফ্রান্সিসদের কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে কিনা এটা বুঝতে হলে একটা কথা ভাবছি। রাজকুমারীকে ফ্রান্সিস কয়েদঘরে রাখতে দেবে না। নিশ্চয়ই রাজকুমারীকে জাহাজে থাকার ব্যবস্থা করবে। ফ্রান্সিসের কথায় শাসক মিন নিশ্চয়ই রাজি হবে। এটা মিনের কাছেও সুবিধার মনে হবে।

রাজকুমারী জাহাজে বন্দী হয়ে থাকলে ফ্রান্সিসরা আর পালাতে পারবে না।

—হ্যাঁ এটা ঠিক বলেছো। ফ্রেজার বলল।

—তাহলে ফ্রান্সিসদের খোঁজে এখনই না গিয়ে আমাদের জাহাজে চলো। ওখানে রাজকুমারীকে পাবো। সব জানতে পারবো। ফ্রান্সিসরা কেমন আছে, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিনা পালাবার কী উপায় ভাবছে—এসব জানতে পারবো রাজকুমারীর কাছ থেকে। ভেন বলল।

—ঠিক আছে। চলো আমাদের জাহাজেই যাওয়া যাক। ফ্রেজার বলল।

বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুজনে ওদের জাহাজ যেখানে নোঙর করে আছে সেই সমুদ্রে তীরভূমির দিকে চলল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুজনে সমুদ্রতীরে পৌঁছল। দেখল জাহাজ নোঙর করাই আছে। তীরভূমিতে ওদের দুটো নৌকো বেলভূমিতে তোলা আছে।

একটা নৌকোতে ওরা উঠে বসল। দাঁড় নৌকোর গলুই থেকে তুলে নিল ফ্রেজার। নৌকো চালাল জাহাজের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকো গিয়ে জাহাজের গায়ে ভিড়ল। দুজনে জাহাজে উঠল। ওদের রাঁধুনি পিত্তান ছুটে এল। ফ্রেজারকে জড়িয়ে ধরল। বলল—আর সবাই কোথায়? রাজকুমারী কোথায়?

—সেই খোঁজেই তো এখানে এলাম। ফ্রেজার বলল।

—কেউ তো জাহাজে ফেরে নি। পিত্তান বলল।

—তাহলে রাজকুমারীকে জাহাজে রাখা হয়নি। তবে রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন? ভেন বলল।

—তা তো বলতে পারবো না। পিত্তান বলল।

—যাক গে—পিত্তান আমাদের খেতে দাও। ভেন বলল।

—ঠিক আছে। তোমরা বিশ্রাম কর। আধ ঘণ্টার মধ্যে তোমাদের খেতে দেব। পিত্তান বলল।

পিত্তান আধ ঘণ্টার মধ্যে রুটি মাংসের ঝোল রেঁধে দিল। ফ্রেজার আর ভেন খেতে শুরু করল। দুজনে কোন কথা না বলে খেতে লাগল। বারদুয়েক আরো রুটি মাংস চেয়ে খেল। খাওয়া শেষ।

এইবার দুজনে বুঝল—কী ক্লান্ত ওরা। ফ্রেজার কেবিনঘরে এসেই শুয়ে পড়ল। ভেন কিছুক্ষণ পিত্তানের সঙ্গে গল্পগুজব করল। তারপর কেবিনঘরে এসে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

দুজনে সন্ধে পর্যন্ত ঘুমোল।

তারপর তিনজনেই ডেক-এ উঠে এল। তাকিয়ে রইল তীরভূমির দিকে। ফ্রান্সিসরা কেউ এলো কিনা। কিন্তু তীরভূমি জনশূন্য। তিনজনে কেবিনঘরে ফিরে এল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে তিনজনে ডেক-এ উঠে এল। তীরভূমির দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস বা অন্য কোন বন্ধুদের দেখা গেল না। ফ্রেজার

ভেবে পেল না কোথায় ফ্রান্সিসদের খোঁজ করবে।

সন্ধেবেলায়ও ওরা ডেক-এ উঠে তাকিয়ে রইল সমুদ্রতীরের দিকে। কেউ এল না।

ভেন বলল—ফ্রেজার এখন কী করবে?

—আমাদের দুজনকে তো রানি ঈশিকার কয়েদঘরে ফিরে যেতেই হবে। যে খবরটা মিন-এর সৈন্যাবাসে পেয়েছি সে খবরটা রানি ঈশিকাকে তো দিতেই হবে। দেখা যাক সেই খবর পেয়ে রানি খুশি হয়ে আমাদের মুক্তি দেয় কিনা।

—অসম্ভব। রানি অর্থ পিশাচিনী। সেই অর্থ যে পথেই আসুক না। ভেন বলল।

—হুঁ। দেখা যাক। রানি মুক্তি না দিলে মুক্তির ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। ফ্রেজার বলল।

রানির কয়েদখানা থেকে পালাতে পারবে? ভেন বলল।

চেষ্টা তো করতে হবে? ফ্রেজার বলল।

চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা না মারা যাই। ভেন বলল।

আমরা যাতে না মরি অথচ মুক্তি পাই সেটাই করতে হবে। উপায় একটা হবেই। আর দেরি নয়। দুপুরে খেয়েই রানির রাজত্বের দিকে চলো। ফ্রেজার বলল।

বেশ। পিত্তানকে সঙ্গে নেবে? ভেন বলল।

না না। পিত্তান জাহাজেই থাক। জাহাজ দেখাশুনোর জন্যে তো একজনকে থাকতেই হবে। ফ্রেজার বলল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে তৈরি হয়ে ফ্রেজার আর ভেন জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। ভেন দু'তিনটে ওষুধের শিশি নিয়ে নিল। জাহাজ থেকে দড়ির মই দিয়ে নৌকোর ওপর নেমে এল। জাহাজের রেলিঙে ঝুঁকে পিত্তান হাত নাড়ল। ফ্রেজার নৌকো চালাচ্ছিল। ভেন হাত নাড়ল।

সমুদ্রতীর বেশি দূরে নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকো তীরে ভিড়ল। নৌকো ওরা অনেকটা উপরে টেনে তুলে রাখল। তারপর চলল। রানি ঈশিকার রাজত্বের দিকে।

বনভূমি পার হয়ে যখন ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে পৌঁছল তখন বিকেল হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরেই সূর্য ডুবে গেল। দুজনে রানি ঈশিকার বন্দীঘরের সামনে পৌঁছল।

দুজনে কয়েদঘরের দরজার কাছে পৌঁছল। প্রহরী দুজন এগিয়ে এল। বলল—রানির হুকুম তোমরা ফিরলেই যেন তাঁর সঙ্গে দেখা কর।

তাহলে চলো রানির কাছে। ভেন বলল।

একজন প্রহরী বারান্দা থেকে মাটিতে নামল। চলল রানির মন্ত্রণাকক্ষের

দিকে। মন্ত্রণাকক্ষের সামনে এসে দুজনকে দাঁড়াতে বলে প্রহরীটি ঘরে ঢুকল।

কিছু পরে ফিরে এসে বলল—চলো। প্রহরীর সঙ্গে দুজনে মন্ত্রণাকক্ষে ঢুকল।

ঘরে একটা বড় শ্বেতপাথরের টেবিল। টেবিলের চারপাশে বাঁকা পায়া ওককাঠের চেয়ার। তাতে গদীপাতা।

ফ্রেজার আর ভেন বসল। প্রহরী ভেতরে চলে গেল।

কিছু পরে প্রহরীটি ফিরে এল। বলল—রানিমা আসছেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে রানি ঘরে ঢুকল। দুজনে চেয়ার ছেড়ে উঠে সম্মান জানাল। রানি বসল। বসল দুজনে। বলল—তোমরাই তো ভাইকিং?

—হ্যাঁ। ভেন বলল।

—তোমাদের দুজনকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। রানি বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রেজার বলল।

—কী গুপ্ত সংবাদ আনলে শুনি। রানি বলল।

ফ্রেজার সেই সৈন্যাবাসে সেনাপতির কথা জানাল।

—ও। তাহলে ওরা আরো সেনা সংগ্রহ করে আক্রমণ চালাবে। খুব ভালো খবর এনেছো। আমরা কিছু সময় পেলাম। আমরাও বিদেশ থেকে সৈন্য আনাবো। একটু থেমে রানি বলল—আর কোন সংবাদ?

—না। আর কোন সংবাদ জানতে পারিনি। ফ্রেজার বলল।

রানি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ফ্রেজাররাও উঠে দাঁড়াল। ফ্রেজার বলল—মাননীয়া রানি—গোপন সংবাদ এনেছি। তাহলে এবার আমাদের মুক্তি দিন।

—না—না। তোমাদের তো হাটে বিক্রি করবো। রানি বলল।

—কিন্তু আমাদের তো কোন দোষ নেই। ভেন বলল।

—বিনা অনুমতিতে তোমরা আমার রাজত্বে ঢুকেছো। এটাই তোমাদের অপরাধ। রানি বলল।

রানি দরজার দিকে এগোল। বোঝা গেল রানি যা বলবার বলে দিয়েছে। তার অন্যথা হবে না। প্লেজার বুঝল মুক্তির আশা নেই।

ফ্রেজারের খুবই মন খারাপ হলো। তাদের মুক্তির আর কোন আশাই রহিল না। একমাত্র পথ বুদ্ধি করে পালানো। সেক্ষেত্রেও দু-একজন বন্ধুর হয়তো প্রাণ যাবে। ফ্রেজার এমন সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে প্রহরীর সঙ্গে কয়েদখানায় ফিরে এল।

দুজনে কয়েদখানায় ঢুকতেই বন্ধুরা এগিয়ে এল। তাদের চোখে মুখে একটা জিজ্ঞাসা আমরা মুক্তি পাবো তো? ফ্রেজার আস্তে আস্তে সব ঘটনা বলল। সব শেষে বলল—যা বুঝলাম তাতে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া মুক্তির আশা নেই। ভেবেছিলাম মিন-এর রাজত্বে গিয়ে গোপন খবরটা রানিকে দিলেই রানি

আমাদের মুক্তি দেবে। এখন বুঝতে পারছি রানি আমাদের মুক্তি দেবে না। লড়াই শুরু হলে আমাদের জোর করে লড়াইয়ে নামাবে। রানির হয়ে আমাদের লড়তে হবে।

—আমরা লড়াইয়ে নামবো না। একজন ভাইকিং বলল।

—আমাদের বাধ্য করবে। ভেন বলল।

—ফ্রেজার এখন তাহলে আমরা কী করবো? একজন ভাইকিং বলল।

—অপেক্ষা করবো। তারপর সুযোগ পেলেই পালাবো। ফ্রেজার বলল।

—তাহলে তো আমাদের এখন সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। পেড্রো বলল।

—হ্যাঁ, ফ্রেজার বলল।

ফ্রেজার মোটা কাপড়ের বিছানায় বসল। মাথায় চিন্তা—কী করে পালাবো। এমনভাবে পালাতে হবে যেন আমাদের কেউ মরে না যায়, আহত না হয়। ভেন বিছানায় শুয়ে পড়ল। এত ক্লান্ত ওর শরীর।

কয়েকদিন একঘেয়ে কাটল। ভাইকিং বন্দীদের মধ্যে হতাশা দেখা দিল। এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি নেই। এরকমই ভাবতে লাগল ওরা। ওরা ফ্রেজারকে বলে বলে—আমাদের মুক্তির ব্যাপারটা ভেবো ফ্রেজার।

আমি শুধু মুক্তির কথাই ভাবছি। তার জন্যে প্রহরীদের কাজকর্মের দিকেও লক্ষ্য রাখছি। এখন সময় আর সুযোগ। ফ্রেজার বলে। বন্ধুরাও চুপ করে যায়। ওরা ভাবে ফ্রেজার মুক্তির পরিকল্পনা করছে। ফ্রেজার নিশ্চয়ই একটা উপায় বের করতে পারবে।

সেদিন দুপুরে হঠাৎ আকাশে মেঘ করল। আকাশ যেন ফালা ফালা করে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সন্ধের দিকে নামল বৃষ্টি। হাওয়ার তেজও বেড়ে গেল। শুরু হল ঝড় আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি।

প্রহরীরা খাবার নিয়ে কখন আসে ফ্রেজার তারই অপেক্ষা করতে লাগল। এবার ফ্রেজার সবাইকে কাছে ডাকল। ভাইকিং বন্ধুরা ফ্রেজারকে ঘিরে বসল।

ফ্রেজার বলতে লাগল—মোট তিনজন প্রহরী আমাদের খাবার নিয়ে ভেতরে ঢোকে। আমাদের খাওয়া হয়ে গেলে তিনজন এঁটো থালা বাটি নিয়ে চলে যায়। তিনজন যখন ঢোকে তখন দরজা খোলা থাকে। চারজন সৈন্য তখন দরজার সামনে থাকে। ফ্রেজার থামল। তারপর বলতে লাগল—আমরা ততক্ষণ অপেক্ষা করবো না। তিন প্রহরী যখনই খাবার নিয়ে ঢুকবে তখনই আমরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। গরম ঝোল ওদের চোখে ছুঁড়ে ফেল। ওরা তখন চোখের জ্বালার অস্থির হয়ে যাবে। তখন দরজা খোলা। আমরা এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসে পেছনের ঐ বনভূমির দিকে ছুটবো।

বাইরের চারজন প্রহরী কিছু বোঝার আগেই দ্রুত বনের দিকে ছুটবো। প্রচণ্ড বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে ওরা প্রহরীরা আমাদের হদিশ করতে পারবে

না। ওর মধ্যেও যদি কোন প্রহরী আমাদের মধ্যে কাউকে ধরে ফেলে তাহলে আমি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে ছুটবো। এই হল পরিকল্পনা। এখন এই পরিকল্পনা মত কাজ করা। তোমাদের কারো কিছু বলার থাকলে বলো। কেউ কোন কথা বলল না।

রাত বাড়তে লাগল। ঝড়বৃষ্টি সমানে চলেছে।

একসময় প্রহরী তিনজন খাবার নিয়ে দরজা খুলে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচজন ভাইকিং প্রহরীদের মধ্যে যে ঝোলের মস্ত বড় কাঠের গামলটা নিয়ে ঢুকল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝোলের গামলাটা কেড়ে নিল। তারপর দ্রুত হাতে তিনজনের মুখে ঝোল ছিটিয়ে দিল। তিনজনই চোখে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়ল। খাবার দাবার সব ছিটকে পড়ল মেঝেয়। তিনজনের তখন চোখ জ্বলছে।

ফ্রেজার ছুটে দরজা পার হল। বাইরের প্রহরীরা কিছু বোঝার আগেই জড় বৃষ্টির মধ্যে ভাইকিংরা সিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমেই ছুটল বনভূমির দিকে।

একজন ভাইকিং বৃষ্টিভেজা মাটিতে আছড়ে নেমে পড়ল। একজন প্রহরী কতকটা আন্দাজেই খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল। দলের সামনে পেছনে ছিল ফ্রেজার। অন্ধকার অস্পষ্ট দেখল ভাইকিং বন্ধুকে। ফিরে দাঁড়িয়ে ফ্রেজার ছুটে এসে বন্ধুকে তুলল। তারপর দুজনেই ছুটল। তখনই বিদ্যুৎ চমকাল। একজন প্রহরী ফ্রেজার আর ফ্রেজারের বন্ধুকে দেখল। খোলা তরোয়াল হাতে জোরে আসতে লাগল। ফ্রেজার হঠাৎ ওর সামনে হামা দিয়ে বসে পড়ল। অন্ধকারে প্রহরীটি ফ্রেজারের গায়ে পা বেঁধে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। হাত থেকে তরোয়ালও ছিটকে গেল।

ফ্রেজার বন্ধুকে নিয়ে প্রাণপণে ছুটল। একটু পরেই বনভূমির শুরু। বন্ধুরা আগেই বনে ঢুকে পড়েছে। ফ্রেজার আর ওর বন্ধু বনভূমিতে ঢুকে পড়ল।

বনভূমিতে একটানা বৃষ্টি পড়ার শব্দ।

কিছু পরে ফ্রেজার বলল— ভাইসব—এখন আর ছুটে চলার দরকার নেই। সাবধানে চলো। সবাই আমার পেছনে পেছনে এসো।

ঐ বৃষ্টি আর বনের অন্ধকারের মধ্যে ফ্রেজার সেই বৃদ্ধের বাড়ির সাম্‌নে এসে হাজির হল। দরজায় টোকা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

দরজা খুলে গেল। বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে ফ্রেজারকে চিনতে পারল না। ফ্রেজার বলল—কিছুদিন আগে আমি আর আমার বন্ধু আপনার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আপনার মনে আছে বোধহয়।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে আছে বৈকি। তোমরা ভাইকিং। তাই না। বৃদ্ধা বলল।

—হ্যাঁ। আমি বন্ধুদের নিয়ে এসেছি। এখানে রাতটা থাকবো। ফ্রেজার বলল।

—নিশ্চয়ই। এসো। বৃদ্ধা বলল।

ভাইকিংরা বৃদ্ধের ঘরের বারান্দায় উঠে দাঁড়াল। তারপর গায়ের পোশাক খুলে গা মাথা মুছতে লাগল।

বৃদ্ধা চকমকি পাথর ঠুকে মশাল জ্বালাল। এতক্ষণ পরে আলো দেখে ভাইকিংরা খুশি হল। অন্ধকার থেকে আলোয়। ভাইকিংরা ঐ ছোট্ট ঘরের মেঝেতে বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। তখনও কেউ কেউ ওরা হাঁপাচ্ছে।

ফ্রেজার বৃদ্ধের কাছে এল। বলল—যে কোন কারণেই হোক আমাদের আজকের রাতের খাওয়া জোটেনি। আমাদের খেতে দেবার মত কিছু আছে?

—এই বনভূমির বাইরে শহরে গ্রামে যারা থাকে তারা আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তারা খাবার জিনিসটিনিস দিয়ে যায়। আজ সকালেই এক ধনী ব্যবসায়ী এসেছিলেন। দু'বস্তা আটা চিনি আনাজপাতি ফলটল দিয়ে গেছেন। এনেছেন ফেরাতে তো পারি না। আমার আর কতটুকু লাগে।

—যদি দয়া করে ওখান থেকে কিছু দেন তাহলে আমাদের ক্ষুধা মেটে। ফ্রেজার বলল।

—নিশ্চয়ই। রান্নার উনুন আছে। আপনাদের কেউ রান্নার লোক আছে। বৃদ্ধা বলল।

—হ্যাঁ আছে। আপনার শুকনো কাঠ আছে?

—হ্যাঁ। পেছনের চিলতে ঘরটায় আছে।

—ঠিক আছে। আপনি দেখিয়ে দিন।

—যে রাঁধবে তাকে আসতে বল।

ফ্রেজার ভেনকে ডাকল। বলল সব। ভেন বলল—আগের বার তো আমিই রেঁধেছিলাম।

ভেন সব দেখেটেখে এল। ফ্রেজারকে বলল—খাবার কী আছে আমি জানি। কম কম করে খেলে আমাদের হয়ে যাবে।

—তুমি রান্না শুরু কর। যেটুকু খেতে পারি তাতেই হবে। ফ্রেজার বলল।

ভেন দেখল ওর হাতের মশালটা ছাড়া আর একটা মশাল দরজার ওপরে রয়েছে।

ভাইকিংরা সারা ঘরের মেঝেয় শুয়ে পড়ল। ঘুমও এল।

একটা দুটো পাখির ডাক শোনা গেল।

রাত শেষ।

ভোর হল।

তখনও কেউ কেউ ওঠেনি।

সকাল হতে সবাই উঠল।

ফ্রেজার বলল—ভাইসব। আমাদের এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমরা বন্দর শহর সিউতাতে আরবীয় শাসক মিন-এর রাজত্বে যাবো। ওখানে ফ্রান্সিসদের খোঁজ করতে হবে।

এবার ফ্রেজাররা নিঃশব্দে চলল ওই ঝুপসি পাতার গাছটার দিকে। গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। বাঁ দিকে আবার চলল। চিলতে রাস্তাটা ধরে কিছুটা উঁচু-নিচু জমি পার হয়েই কয়েদঘরটা দেখা গেল। কয়েদঘরের লোহার দরজায় দুটো মশাল জ্বলছে। আলোয় দেখা গেল সাত-আটজন পাহারাদার দাঁড়িয়ে বসে আছে। ডানপাশে ঘাসে ঢাকা একটা মাটির ঢিবি। ফ্রেজার ফিসফিস বরে বলল, "সবাই ঢিবিটার পেছনে বোসো।" সবাই ঢিবিটার পেছনে গিয়ে বসল। এবার ফ্রেজার ভাবতে লাগল কিভাবে ওই পাহারাদারদের কাবু করা যায়, ছুটে গিয়ে ওদের সামনাসামনি আক্রমণ করা যায়। কিন্তু ওদের মাথায় শিরস্ত্রাণ, বুকে বর্ম। সামনা সামনি আক্রান্ত হলে ওরা লড়াইয়ের জন্যে নিজেদের তৈরি করার সময় পাবে। ফ্রেজার বুঝল, এই সময়টুকু ওদের দেওয়া চলবে না। আক্রমণ করতে হবে অতর্কিতে, হঠাৎ যাতে ওরা তৈরি হওয়াব সময় না পা পায়।

ফ্রেজার দেখল, কয়েদঘরের পেছনে কিছুটা পরেই বনজঙ্গল শুরু হয়েছে। ওইদিক দিয়েই কয়েদঘরের পেছনে চলে যেতে হবে। ওখান দিয়েই আক্রমণ করতে হবে।

ফ্রেজার ডানদিকে বনজঙ্গলের দিকে সবাইকে যেতে ইঙ্গিত করল। সবাই সেদিকে চলল। ওদিক দিয়ে ঘুরে ওরা কয়েদঘরের ঠিক পেছনে চলে এল। সবাই অল্প হাঁফাচ্ছে তখন। ফ্রেজার সবাইকে একসঙ্গে জড়ো হতে বলল। সবাই একত্র হল গোল হয়ে। ফ্রেজার মৃদুস্বরে বলল, "হঠাৎ আক্রমণ করেই সৈন্যদের ডান বাহু জখম করতে হবে। তা হলেই ওরা তরোয়াল চালাতে পারবে না। বিদ্যুৎগতিতে এই কাজ সারতে হবে। তবেই ওরা হার স্বীকার করতে বাধ্য হবে। শিরস্ত্রাণ আর বর্ম কোনও কাজেই লাগবে না।" পেড্রোকে ডেকে ফ্রেজার বলল, "পেড্রো তোর কাজ হল ছুটে গিয়ে মশাল দুটো মাটিতে ফেলে দিবি। পা দিয়ে চেপে আগুন নিভিয়ে দিবি। বারান্দা অন্ধকার হয়ে যাবে।" অন্ধকারে আমাদেরই সুবিধে হবে। একটু থেমে ফ্রেজার বলল, "সবাই তরোয়াল খোলো। কিন্তু শব্দ না হয়।"

এবার সবাই আস্তে আস্তে তরোয়াল খুলে তৈরি হল। একজন ভাইকং বন্ধু বলল, "ফ্রেজার, যদি এই কয়েদঘরে ফ্রান্সিসরা না থাকে, সেটা আগে না জেনে জীবনের ঝুঁকি নেব কেন?"

ফ্রেজার বলল, "ফ্রান্সিসদের খোঁজে যেখানেই যাবে সেখানেই জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে। এবারে কথা নয়, কাজ। একসঙ্গে সবাই পাহারাদারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। ওরা আমাদের চেয়ে সংখ্যায় কম।"

কয়েদঘরের অন্ধকার পেছন দিক দিয়ে দ্রুত এসে ভাইকিংরা প্রহরীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পেড্রো ছুটে এসে মশাল দুটো পাথরের খাঁজ থেকে তরোয়ালের খোঁচায় নামিয়ে পা দিয়ে চেপে নিভিয়ে দিল। অন্ধকার হয়ে গেল



বারান্দাটা। আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় প্রহরীরা হকচকিয়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ততক্ষণে পাঁচজন প্রহরী বাহুতে তরোয়ালের ঘা খেয়ে খাপ থেকে তরোয়াল খুলতেই পারল না। খোলা তরোয়াল ছিল মাত্র দু'জন প্রহরীর হাতে। এদের দু'জনের ওপর প্রায় অন্ধকারে তিন-চারজন ভাইকিং ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জন প্রহরীই মেঝের ওপর চিত হয়ে পড়ল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। লড়াই শেষ। প্রহারীরা অনেকেই গোঙাতে লাগল। ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল, "ও—হো—হো।" যুদ্ধজয়ের চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে কয়েদঘর থেকেও চিৎকার উঠল, "ও—হো—হো।" তা হলে ফ্রান্সিসরা এই কয়েদঘরেই বন্দি হয়ে আছে। ভাইকিংরা হইহই করে উঠল।

ফ্রান্সিস ফ্রেজারদের আক্রমণের সময় থেকেই দরজার লোহার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন পেড্রো মশাল নিভিয়ে দিয়েছে। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারছিল না আক্রমণকারী কারা। চাঁদের অস্পষ্ট যেটুকু আলো আসছিল তাতেই ফ্রান্সিস বুঝল, আক্রমণ করেছে ভাইকিং বন্ধুরা। ততক্ষণে মারিয়া, হ্যারিরা সবাই এসে জড়ো হয়েছে দরজার কাছে।

লড়াই শেষ হতেই ভাইকিংদের যুদ্ধজয়ের ধ্বনি উঠল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকল। "ফ্রেজার।" ফ্রেজার কয়েদঘরের দরজার কাছে ছুটে এল। ফ্রান্সিস পাহারাদারদের একজনকে দেখিয়ে বলল, "ওকে ধরো। ওর কোমরে চাবির গোছা আছে। ওকে দরজা খুলে দিতে বলো। তাড়াতাড়ি করো। মিনের বাড়ি থেকে, সেনা ছাউনি থেকে সৈন্যরা হইচই, গোলমাল নিশ্চয়ই শুনেছে। এক্ষুনি ছুটে আসবে। তাড়াতাড়ি।"

ফ্রেজার ছুটে গিয়ে চাবিওয়ালা প্রহরীটিকে ধরল। বলল, "তালা খুলে দাও।" "আমি তালা খুলব না।" প্রহরীটি বলল।

"ঠিক আছে, চাবিটা দাও।" ফ্রেজার বলল।

"আমাকে না মেরে চাবি পাবে না।" প্রহরীটি বলল।

"তা হলে মরো।" কথাটা বলে ফ্রেজার প্রহরীটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রহরীটি ফ্রেজারের প্রথম আক্রমণটা ঠেকাল। এবার দু'জনের তরোয়ালের লড়াই চলল। এগিয়ে-পিছিয়ে ফ্রেজার নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাতে লাগল। প্রহরীটির তখন দম ফুরিয়ে এসেছে। ও মুখ হাঁ করে হাঁফাতে লাগল। তেমন জোরে আর তরোয়াল চালাতে পারছে না।

ফ্রেজার হঠাৎই প্রহরীটির মার এড়িয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্রুত তরোয়ালের কোপ মারল ওর কাঁধ লক্ষ্য করে। প্রহরীটি সেই মার ঠেকাতে পারল না। ফ্রেজারের তরোয়াল পাহারাদারটির ডান কাঁধে বিঁধে গেল। তরোয়াল তুলে নিল ফ্রেজার। পাহারাদারটির কাঁধ থেকে রক্ত পড়তে লাগল। পাহারাদারটি ক্ষতস্থানে হাত চেপে ধরে বসে পড়ল। ফ্রেজার ওর কোমর থেকে চাবির থোকাটা খুলে নিল। দরজার কাছে এগিয়ে এল। দরজার কাছে

তখন ভাইকিং বন্ধুদের ভিড়। ফ্রেজার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গিয়ে দরজার তালায় চাবি ঢোকাল। ঘোরাল। তালা খুলল না। ফ্রান্সিস বলল, "সবচেয়ে বড় চাবিটা লাগবে।" ফ্রেজার দরজা খুলে ধরল। ফ্রান্সিসরা সবাই দ্রুত বেরিয়ে এল। কিছু বার্বার সৈন্যও বেরিয়ে এসে পালিয়ে গেল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ভাইসব, এখনও লড়াই শেষ হয়নি। ওই দেখো মিনের সৈন্যরা ছুটে আসছে।

চাঁদের আলোয় দেখা গেল মিনের সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে আসছে। পনেরো-কুড়িজন সৈন্য।

মারিয়া শাঙ্কো ছাড়া সকলে প্রহরীদের হাতে থেকে কেড়ে নেওয়া তরোয়াল নিয়ে তৈরি হল। অনেকে মিনের পরাজিত সৈন্যদের শিরস্ত্রাণ, বর্ম খুলে নিয়ে নিজেরা পরেছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, "ভাইসব,—আমরা এগিয়ে যাব না। ওরা প্রান্তরটা পার হয়ে আসুক। এতে ওরা ক্লান্ত হবে। তাতে আমাদেরই সুবিধে হবে।"

সৈন্যরা বলল, "ফ্রান্সিস,। আমি বন্ধুদের বলেছি ওই শিরস্ত্রাণ আর বর্ম সৈন্যদের সুযোগ বুঝে বাহুতে তরোয়াল চালাতে।"

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "তুমি ঠিক বলেছ। কথাটা বন্ধুদের আর একবার মনে করিয়ে দাও।" কথাটা ফ্রেজার আবার গলা চড়িয়ে বলল।

সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে আসতে লাগল। সবচেয়ে আগে সেই সেনাপতি। বিস্তৃত ঘাসের প্রান্তরটা পার হয়ে আসতে সত্যিই ওরা বেশ পরিশ্রান্ত হল। হাঁফাতে হাঁফাতে ফ্রান্সিসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শুরু হল লড়াই। বেশিরভাগ ভাইকিং শিরস্ত্রাণ বর্ম পরেছিল। কাজেই সৈন্যরা ওদের সহজে কাবু করতে পারল না। প্রচণ্ড লড়াই চলল। ফ্রান্সিস একা চারজন সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। সৈন্যদের তরোয়ালের ঘায়ে ফ্রান্সিসের জামা অনেক জায়গায় কেটে গেল। শরীরেও লাগল। রক্ত পড়তে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল, সৈন্যদের মাথায় তরোয়াল চালিয়ে লাভ নেই। কাজেই ও একটু সুযোগ পেলেই সৈন্যরা বাহু হাত লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাতে লাগল। এতে সৈন্যরা আহত হতে লাগল। আহত হাত থেকে তরোয়াল ফেলে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস তখন অন্য সৈন্যদের দিকে ধেয়ে গেল। লড়াই চালাতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিনের সৈন্যরা হার স্বীকার করতে লাগল। হঠাৎ সেই সময় সেনাপতি ফ্রান্সিসের একেবারে সামনে এসে পড়ল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতিকে আক্রমণ করল। দু'জনের তরোয়ালের লড়াই জমে উঠল। দু'জনেই নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাতে লাগল। ততক্ষণে আহত সৈন্যরা পালাতে শুরু করেছে। ভাইকিংরা লড়াই থামিয়ে দু'জনের তরোয়ালের লড়াই দেখতে লাগল। লড়াই চালাতে চালাতে ফ্রান্সিস চাপা গলায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—বলেছিলাম সুযোগ পেলেই তোমাকে আমি হত্যা করবো। আজ সেই সুযোগ এসেছে। বুঝল বর্ম শিরস্ত্রাণ পরা সেনাপতিকে সহজে কাবু করা যাবে না। ঠিক করল

সেনাপতির মাথার শিরস্ত্রাণটিকে ফেলে দিতে হবে। ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাতে চালাতে তক্কে তক্কে রইল। সুযোগ এসে গেল। সেনাপতি একটু অন্যমনস্ক হয়েছে তখন। ফ্রান্সিস বিদ্যুৎগতিতে শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে সেনাপতির মাথা লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। শিরস্ত্রাণের বন্ধনি ছিঁড়ে গেল। শিরস্ত্রাণ ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়ল। ফ্রান্সিস আর সেনাপতিকে আত্মরক্ষার সুযোগ দিল না। দ্রুত সেনাপতির মাথায় তরোয়ালের কোপ বসাল। সেনাপতির হাতের তরোয়াল ফেলে দিয়ে দু'হাতে মাথা চেপে ধরল। তারপর বসে পড়ল।

ফ্রান্সিস সেনাপতির বুকে গলায় তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল।

লড়াই শেষ। ফ্রান্সিস হাঁফাতে হাঁফাতে জিতার কাছে এল। বলল, "জিতা, মিনের কি আরও সৈন্য এখানে আছে?"

"হ্যাঁ। রানি তুহিনার প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ সারানোর কাজে তাদের লাগানো হয়েছে। দুই পণ্ডিতকে সাহায্য করছে তারা।"

"হুঁ—সেই সৈন্যরা আসার আগেই আমাদের প্রায় সবাইকে জাহাজে ফিরে যেতে হবে।" পরিশ্রান্ত ভাইকিংরা কেউ কেউ প্রান্তরের ঘাসে বসে পড়েছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল "ভাইসব, শুধু আমি শাঙ্কো হ্যারি আর জিতা এখানে থাকব। রানি তুহিনার দুর্গের সন্ধান করব। রানির গুপ্তভাণ্ডার উদ্ধার করব।"

যে ভাইকিংরা বসে পড়েছিল তারা উঠে দাঁড়াল। লড়াইয়ে আহতদের ওরা ধরে ধরে নিয়ে চলল। সবাই চলল জাহাজঘাটার দিকে।

তখন সূর্য উঠেছে। রোদ ছড়িয়ে পড়েছে বনে, কয়েদঘরের মাথায়। বনজঙ্গলের মাথায়।

হ্যারিকে ডেকে ফ্রান্সিস বলল,"চলো, রানি তুহিনার দুর্গে যাই।"

চারজনে বনের মধ্যে দিয়ে চলল রানি তুহিনার দুর্গের দিকে। যখন দুর্গে এসে পৌঁছল তখন বেলা হয়েছে। দুর্গের প্রবেশ পথেই একটা মশাল রাখা ছিল। মশালটা ফ্রান্সিস তুলে নিল। গুহাপথে ঢুকল চারজন।

রানির শয়নকক্ষে ঢুকল। দেখল, যা কিছু ওরা রেখে গিয়েছিল, সবই আছে। জিতা উনুনের কাছে গিয়ে রান্নার উদ্যোগ করতে লাগল।

ফ্রান্সিস মেঝেয় বসল। তারপর ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ল। চিত হয়ে শুল। দেখল, ওপরে। পাথরের ছাদ। প্রকৃতির হাতে তৈরি ছাদ। পাশ ফিরে তাকাল। পাথরের দেওয়ালগুলো দেখল। তখনই উত্তরদিকের দেওয়ালটার দিকে চোখ পড়ল। সত্যিই আশ্চর্য! উত্তরদিকের দেওয়ালটা অনেকটা মসৃণ। এটাও প্রকৃতির আর-এক খেয়াল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিন্তাও মাথায় খেলে গেল, এ ঘরের কোনও দেওয়ালেই তিন পাপড়ির ফুল খোদাই করা নেই। আবার ফ্রান্সিসের চোখ পড়ল উত্তরদিককার অনেকটা মসৃণ দেওয়ালের দিকে। প্রকৃতির হাতে এত মসৃণ একটা দেওয়াল তৈরি হতে পারে? যদি তা না হয় তবে এখানেই যারা

পাস করে গেছে তারা দেওয়ালটি ছেনি দিয়ে যতটা সম্ভব মসৃণ করেছে। কিন্তু তারা অন্য দেওয়ালগুলো মসৃণ করল না কেন?

ফ্রান্সিস এসব ভাবছে তখনই হ্যারি ওই মসৃণ দেওয়ালে ফ্রান্সিসের মইটা ঠেকা দিয়ে রাখছিল। বোধহয় ভাল করে ঠেকা দিতে পারেনি। তাই হ্যারি ঘুরে দাঁড়াতেই মইটা দেওয়ালে লেগে মেঝেয় পড়ে গেল। ফ্রান্সিস দেখল, দেওয়ালে মইয়ের ঘষায় একটা অস্পষ্ট দাগ হয়েছে। পাথরে দাগ?

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছুটে গেল দেওয়ালটার কাছে। মইয়ের ঘষায় দাগ লাগা জায়গাটা দেখল। চিৎকার করে বলে উঠল, "হ্যারি, শাঙ্কো, এই দেওয়ালে মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। তাই এত মসৃণ।" ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে কুড়ুলটা নিয়ে নিয়ে এল। দেওয়ালটায় কুড়ুলের ঘা মারল। মাটির চাঙড়া উঠে এল। আবার ঘা মারল। বেশ কিছু গুঁড়ো মাটি ঝরে পড়ল।

সেই জায়গায় পাথরের দেওয়ালের অংশ দেখা গেল। হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস, তবে কি রানি তুহিনার আমলেই এই মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল?"

"ঠিক তাই।" ফ্রান্সিস বলল।

"কিন্তু কেন দেওয়া হয়েছিল?" হ্যারি বলল।

"খুব সহজ—অন্য তিনটে দেওয়াল ছেড়ে দিয়ে এই উত্তরের দেওয়ালেই মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল কিছু জিনিস লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে।" ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি লাফিয়ে উঠল। বলল, "রানি তুহিনা চার পাপড়ির ফুলের নকশা গোপন রাখার জন্যই এটা করেছিলেন।"

"ঠিক বলেছ।" ফ্রান্সিস বলল। তারপর দেওয়ালটার নিচের দিকে কুড়ুলের ঘা মারতে লাগল। মাটি ছিটকে পড়তে লাগল। পাথরের দেওয়াল দেখা যেতে লাগল। যতদূর হাত যায় ততদূর পর্যন্ত ফ্রান্সিস মাটির পলেস্তারা খসিয়ে দিল। কিন্তু পাথরের দেওয়ালে কিছুই দেখা গেল না। ফ্রান্সিস হাঁফাতে লাগল। এবার হ্যারিও কুড়ুল চালিয়ে অনেকটা মাটি খসাল।

একটু বিশ্রাম নিয়ে এবার ফ্রান্সিস মইটা দেওয়ালে রাখল। অন্য সব ঘরে দেওয়ালের একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় তিন পাপড়ি ফুলের নকশা কুঁদে তোলা হয়েছে। এবার ফ্রান্সিস ওই নির্দিষ্ট উচ্চতা হিসেব করে কুড়ুল চালাতে লাগল।

মাটি খসে পড়তে লাগল। হঠাৎই দেখা গেল, সেই ফুলের পাপড়ি। ফ্রান্সিস এবার সাবধানে মাটি খসাল। ফুটে উঠল চার পাপড়ির ফুলের নকশা।

মইয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ হাঁফাতে লাগল। মেঝেয় হ্যারি, শাঙ্কো আর জিতা গভীর আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কিছু সময় গেল। এবার ফ্রান্সিস জোরে কুড়ুল চালাল ওই নকশাটার ওপর। নকশাটা খানখান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। একটা প্রায় চৌকোনো ফোঁকর দেখা গেল। ফ্রান্সিস কুড়ুল ঠুকে ফোঁকরটা বড় করল। মশালের আলো এখানে

পৌঁছোয়নি। কাজেই ভেতরে কী আছে দেখা গেল না।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ফোকরের ভেতরে হাত ঢোকাল। হাতে ঠেকল একটা লম্বামতো কাঠের বাক্স। ও বুঝল, ওটা অলঙ্কার রাখার পেটিকা।

আস্তে আস্তে ফ্রান্সিস পেটিকা বাইরে নিয়ে এল। হ্যারি আর শাঙ্কো চিৎকার করে উঠল, "ও হো হো।" ওদের আনন্দের ধ্বনি।

ফ্রান্সিস মই রেখে আস্তে আস্তে নেমে এল। শাঙ্কো গিয়ে মশালটা নামিয়ে আনল।

মশালের আলোয় দেখা গেল পেটিকার গায়ে ধুলোর আস্তরণ পড়ে গেছে। ফ্রান্সিস আস্তে আতে ঢাকনাটা খুলল। দেখা গেল পেটিকায় কত রকমের অলঙ্কার। প্রায় দুশো বছর আগেকার অলঙ্কার। ধুলো ময়লা লেগেছে। তাই মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল না অলঙ্কারগুলো। তবু কত মূল্যবান রানি তুহিনার অলঙ্কারগুলো। পেটিকাটাও কী সুন্দর! কালো কাঠের পেটিকা। তার গায়ে সোনা-রুপোর লতাপাতা, ফুলের নকশা।

হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস। এখন এই অলঙ্কারগুলো কী করবে?"

"জিতাকে দেব। ওদেরই দেশের এক রানির সম্পদ এসব। জিতাই পাবে।" ফ্রান্সিস বলল।

জিতা বলল, "এত সম্পদ পেলে আমার দুঃখদুর্দশার জীবন শেষ হবে, এটা ঠিক। কিন্তু ফ্রান্সিস যদি এই সম্পদ আবিষ্কার করত তবে তো আমি কিছুই পেতাম না। তাই বলছি ফ্রান্সিস, তুমি যতটা চাও ততটাই নাও, বাকিগুলো আমি নেব।"

হ্যারি বলল, "না। বরং সব অলঙ্কার দু'ভাগে ভাগ করে দু'জনে নাও।"

জিতা মাথা নেড়ে বলল, "বেশ।" তারপর কোমরের ফেট্টি খুলে মেঝেয় পাতল। পেটিকা থেকে সব অলঙ্কার ঢালা হল। হ্যারি, জিতাকেই ভাগ করতে বলল। সব দু'ভাগ হল।

ফ্রান্সিস বলল, "জিতা, এই গয়নাগুলোর ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। আগের কয়েকটা অভিযানে আমি কিছুই আমার স্ত্রীকে এনে দিতে পারিনি। তাই আমার অংশ পেটিকায় ভরে তাকে দেব। খুব খুশি হবে সে।"

এবার নিজেদের জাহাজে ফেরা। ফ্রান্সিস জিতাকে বলল, "তুমি এই বনের বাইরে আমাদের নিয়ে চলো। বড় রাস্তায় গিয়ে একটা ফসল-টানা গাড়ি জোগাড় করে দেবে, যাতে আমরা জাহাজঘাটে যেতে পারি।

জিতা মশাল হাতে গুহাপথ দিয়ে চলল, পেছনে ফ্রান্সিসরা। ওরা যখন বাইরে এল, রাত হয়েছে। চাঁদের ম্লান আলোর মধ্যে দিয়ে সবাই চলল।

একসময় বড় রাস্তায় এল। জিতা গ্রামে গিয়ে কৃষকদের গাড়ি আর একজন গাড়োয়ানকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা গাড়িতে উঠল। ফ্রান্সিস জিতার ফেট্টির কাপড় কিছুটা নিল। পেটিকাটা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখল।

জিতা হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। একটু কান্নাভেজা গলায় বলল,

"কোনওদিন ভাবিনি আমার দুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচবে। ফ্রান্সিস তুমি আমাকে নতুন জীবন দিলে।" ফ্রান্সিসস মৃদু হেসে জিতার হাতে চাপ দিয়ে হাত সরিয়ে নিল। ফ্রান্সিসদের গাড়ি চলল জাহাজঘাটার দিকে।

ফ্রান্সিস পথ দেখিয়ে গাড়িটা নিয়ে এল জাহাজঘাটা থেকে দূরে যেখানে ওরা নৌকোটা পারে তুলে রেখে গেছে, সেখানে। ফ্রান্সিস ভাবল, নৌকোটা তো পাওয়া যাবে না। মাছ-ধরিয়েদের পাড়া থেকে নৌকো আনতে হবে। কিন্তু আশ্চর্য, পারে এসে দেখল ওদের নৌকোটা রয়েছে।

ওরা চিৎকার করে উঠল, "ও হো—হো—।"

নৌকোয় উঠল ওরা। নৌকো চলল ওদের জাহাজের দিকে।

একসময় ওদের নৌকো ওদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। ততক্ষণে ভাইকিং বন্ধুদের আনন্দের চিৎকার, হাসি শুরু হয়ে গেছে।

ফ্রান্সিসরা জাহাজে উঠে এল। সবাই ছুটে এল ওদের কাছে। মারিয়াও ছুটে এল হাসতে হাসতে। ফ্রান্সিস কাপড়ে প্যাঁচানো পেটিকাটা মারিয়ার হাতে দিল। মারিয়া আর ভাইকিং বন্ধুরা তখনও বুঝতে পারল না ওটা কী। মারিয়া প্যাঁচানো কাপড়টা খুলছিল না। ফ্রান্সিসই বলল, "কাপড়টা খুলে কী আছে দ্যাখো।"

মারিয়া প্যাঁচানো কাপড়টা খুলে পেটিকা দেখে হাঁ হয়ে গেল। ফ্রান্সিস হেসে বলল, "পেটিকাটা খোলো।" মারিয়া খুলল সেটা। পেটিকায় অলঙ্কার। কত বিচিত্র আকার সে সবের। বাইরের ঝিকিয়ে উঠছে অলঙ্কারগুলো। অত অলঙ্কার দেখে মারিয়া হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ফ্রান্সিসের দিকে। ফ্রান্সিস বলল, "মারিয়া, এবার কিন্তু আমার হাত শূন্য নয়।"

মারিয়া হেসে বলল, "তোমার হাত শূন্য থাকলেও আমার কোনও দুঃখ থাকত না। তোমরা অক্ষত ফিরে এসেছ, এটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া।" ওদিকে ভাইকিং বন্ধুরা শাঙ্কোকে ঘিরে ধরেছে। শাঙ্কো হাত-পা নেড়ে তখন রানি তুইনার অলঙ্কারের পেটিকা উদ্ধারের ঘটনাটা বলছে।

রাজা ওভিড্ডোর তরবারি

তখন সবে ভোর হয়েছে। ফ্রান্সিসদের জাহাজের চারপাশে কুয়াশার আস্তরণ। নজরদার পেড্রো মাস্তুলের ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "ডাঙা দেখতে পাচ্ছি। কুয়াশা না কাটলে আর কিছু দেখা যাবে না।"

ঘুম-ভাঙা চোখে কয়েকজন ভাইকিং কেবিনঘর থেকে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। তখনই হঠাৎ একটা জোর হাওয়ায় সমুদ্রের ওপর ছড়ানো কুয়াশার আস্তরণ সরে গেল। পেড্রো চেঁচিয়ে বলল, "বন্দর, একটা ছোট বন্দর দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিসকে ডাকো।"

ভাইকিংদের কয়েকজন ছুটে সিঁড়ি বেয়ে একটা কেবিনঘরের দরজার সামনে এল। এই কেবিনঘরে ফ্রান্সিস আর মারিয়া থাকে। দরজায় আঙুল ঠুকে একজন ভাইকিং গলা চড়িয়ে বলল, "ফ্রান্সিস, একটা ছোট বন্দরের কাছে এসেছি আমরা। এবার কী করব?"

দরজা খুলে গেল। ফ্রান্সিস বলল, "চলো। আগে সব দেখি।"

ফ্রান্সিসরা ডেকে উঠে এল। ফ্রান্সিস জাহাজ চালক ফ্রেজারের কাছে এল। বলল, "ফ্রেজার, জাহাজ এখনই ওই বন্দরে ভিড়িও না। সবকিছু দেখেশুনে তারপর এগোব।" ফ্রেজার জাহাজ ঘোরাল।

মারিয়া আর হ্যারি এল। হ্যারি রেলিঙে ঝুঁকে বন্দরটা দেখল। বলল, "ফ্রান্সিস, একটু ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে। লক্ষ্য করো যে দুটো জাহাজ বন্দরে ভেড়ানো, সেই দুটো জাহাজই যুদ্ধজাহাজ। ব্যবসায়ীদের জাহাজ নয়। তার মানে এই এলাকায় বোধ হয় যুদ্ধের আয়োজন চলছে। কাজেই জাহাজ এখানেই থামালে ভাল হয়।"

"কথাটা ঠিকই বলেছ।" ফ্রান্সিস বলল। তারপর ফ্রেজারকে বলল, "জাহাজ এখানেই থামাও।" তারপর শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল, "শাঙ্কো, এখানেই নোঙর ফেলো। আমরা আর এগোব না।"

ঘরঘর শব্দে নোঙর ফেলা হল। জাহাজ দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কো আর বিস্কো তৈরি হল। ফ্রান্সিস তলোয়ার সঙ্গে নিতে নিষেধ করলে। শাঙ্কো আর বিস্কো দড়িতে বেঁধে দুটো পিপে ছোট নৌকোটায় নামাল। তারপর নিজেরাই নামল। নৌকো চালাল তীরভূমির দিকে। জাহাজঘাটার দিকে গেল না।

নির্বিঘ্নেই তীরে পৌঁছল। তারপর নৌকো থেকে পিপে দুটো নিয়ে চলল খাওয়ার জলের সন্ধানে। প্রথমে জানতে হবে খাওয়ার জল কোথায় পাওয়া যাবে। যাচ্ছে ওরা যখন তখন দেখতে পেল একটা বিরাট প্রান্তরের মধ্যে মাত্র একটা বাড়ি। ধারেকাছে আর কোনও বাড়ি নেই।

দু'জনে বাড়িটার কাছে এল। বন্ধ দরজায় আঙুল ঠুকল। দরজা খুলে গেল। এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন। শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল, "এখানে জল কোথায় পাব বলতে পারেন?"

বৃদ্ধ একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আপনারা বিদেশি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু বিদেশি বলে কি আমাদের জলতেষ্টা পায় না?" শাঙ্কো বলল।

বৃদ্ধ বললেন, "সে-কথা নয়। এটা পোর্তুগালের মধ্যে। এখানকার রাজা অপর্তো। উত্তরে আছে লরুল্লা। রাজার নাম ভিলিয়ান। সেটা উত্তর স্পেনের মধ্যে। এই দুই রাজ্যে চলছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। এই সময় বিদেশি আপনাদের বিপদ হতে পারে।"

শাঙ্কো বুঝল জল জোগাড় করা বেশ কষ্ট হবে। বৃদ্ধটি আঙুল তুলে উত্তর দিকটা দেখিয়ে বললেন, "ওইদিকেই বন্দর এলাকা। ওই এলাকা পার হয়ে দেখবেন একটা উঁচু টিলা। তার নীচে আছে ঝরনা। সেই ঝরনার জলই আমরা খাই।

"ঠিক আছে। দেখি জল আনতে পারি কি না।" শাঙ্কো বলল।

দু'জনে চলল বন্দর এলাকার দিকে। যেতে যেতে শাঙ্কো বলল, "এই বন্দর এলাকাটাই এড়াতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হল না। এখান দিয়েই যেতে হবে ঝরনাটায়।"

বন্দর এলাকায় এল। দেখল, বেশ ব্যস্ত এলাকা। দোকানপাট। বাড়িঘর। রাস্তায় বেশ লোকজন। একজন লোক বাজার টাজার করে যাচ্ছিল। শাঙ্কো তাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা এখানে ঝরনাটা কোথায়?" লোকটি আঙুল তুলে টিলাটা দেখাল।

দু'জনে টিলার দিকে চলল। টিলাটার নীচে পৌঁছবার আগেই চারজন সৈন্য ওদের দিকে ছুটে এল। দু'জনকে ঘিরে দাঁড়াল। দাড়ি গোঁফওয়ালা সৈন্যটি বলল, "দাঁড়াও।" শাঙ্কোরা দাঁড়িয়ে পড়ল। সৈন্যটি বলল, "তোমাদের পরিচয়?"

"আমরা ভাইকিং।" শাঙ্কো বলল।

"এখানে কী করে এলে?" সৈন্যটি বলল।

"জাহাজ চালিয়ে এসেছি।" বিস্কো বলল।

"তোমরা লরুল্লার রাজা ভিলিয়ানের গুপ্তচর।"

"আমরা লরুল্লা, রাজা ভিলিয়ান, এসব নাম এই প্রথম শুনলাম।" শাঙ্কো বলল।

"সেসব বুঝি না। তোমাদের বন্দি করা হল।" সৈন্যটি বলল।

"আমাদের জাহাজে জলের অভাব হয়েছে। আমরা জল নিয়ে যেতে এসেছি। তাই পিপে এনেছি।" শাঙ্কো বলল।

"ওসব অজুহাত শুনব না। চলো।" সৈন্যটি বলল।

"পিপে দুটো?" বিস্কো বলল।

"এই দোকানে রেখে যাও।" সৈন্যটি বলল। তারপর কাছের দোকানটার

দোকানিকে ডাকল। দোকানি তো ভয়ে সারা। তাড়াতাড়ি ছুটে এল। সঙ্গে ওর কর্মচারী। সৈন্যটি বলল, "এই পিপে দুটো তোমাদের দোকানে রাখো।" দোকানদার আর তার কর্মচারী মিলে পিপে দুটো নিয়ে গেল।

সৈন্যটি বলল, "আমাদের সঙ্গে এসো। পালাবার চেষ্টা করবে না।" সৈন্যটি চলল।

একটু যেতেই সৈন্যটির সঙ্গী দু'জন বলল, "আমরা টিলার নীচে নজর রাখতে যাচ্ছি। তোমরা যাও।" দু'জন সৈন্য চলে গেল। গোঁফদাড়িওয়ালা সৈন্যটি আর তার সঙ্গীটি চলল।

যেতে যেতে শাঙ্কো মৃদুস্বরে ওদের দেশের ভাষায় বলল, "বিস্কো, দাড়িওয়ালা আমার। চিমসেটা তোমার।" কিছুটা যেতেই দেখা গেল একটা মোড়। শাঙ্কো আবার বলল, "ডান দিকের গলিটা দিয়ে।" গোঁফদাড়িওয়ালা সৈন্যটি গলা চড়িয়ে বলল, "কী বলছ তোমরা?"

"যিশুর নাম নিচ্ছি।" শাঙ্কো বলল।

গোঁফদাড়িওয়ালা খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল। শাঙ্কো হঠাৎ পেট চেপে বসে পড়ল। গোঁফদাড়িওয়ালা এগিয়ে আসছে, তখনই শাঙ্কো দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে দাড়িওয়ালার পেটে মাথা দিয়ে লাগাল এক গুঁতো। দাড়িওয়ালা দু'হাত তুলে রাস্তায় চিৎ হয়ে পড়ে গেল। বিস্কো অন্যটির পায়ে এমনভাবে নিজের পা জড়িয়ে টান মারল যে, সেই সৈন্যটিও রাস্তায় পড়ে গেল। বিস্কো পা দিয়ে ল্যাং মারতে ওস্তাদ। বন্ধুদের এভাবে ফেলে দেয়। দুজনেরই হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল।

"জলদি।" শাঙ্কো কথাটা বলেই ডান দিকের গলিতে ঢুকে পড়ল। পেছনে বিস্কো। দু'জনে ছুটল।

সেনা দু'জন উঠে দাঁড়াল। তাদের সারা গায়ে ধুলোবালি লেগেছে। দাড়িওয়ালার দাড়িতেও ধুলো লেগেছে। দু'জনে গা থেকে ধুলো ঝাড়তে লাগল। তারপর গলিটায় ঢুকে শাঙ্কোদের ধরতে ছুটল। তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে।

শাঙ্কোরা ছুটছে তখন। একটু পরে বাঁ দিকে একটা পোড়ো বাড়ি দেখল। দরজা হাট করে খোলা। দু'জনেই খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। শাঙ্কো দরজা বন্ধ করে দিল। দরজার খিলটা আধ ভাঙা। শাঙ্কো ঐ খিলটা চেপে ধরে রইল। দু'জনে কিছুক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। হাঁফাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই দেখল, গোঁফদাড়িওয়ালা সৈন্যটি তার সঙ্গীকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলে গেল। দুজনে নিশ্চিত। বাড়িটার ছাত ভেঙে পড়েছে। পাথরের দেওয়ালে, থামে বুনো গাছ জন্মেছে। সামনের আধ-ভাঙা ঘরটায় দু'জনে ঢুকল। দেখল ঘরটার দরজা-জানালার চিহ্ন নেই। শুধু একটা জানলা অর্ধেকটা ভাঙা। লোহার ফ্রেম সবটা ভেঙে পড়েনি। ঘরটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা খাট। খাটটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে একসময়ে খাটটা শৌখিন খাট ছিল। এখনও কাঠের গায়ে ফুল-লতাপাতার কাজ করা। খাটটার ওপরে জমা ধুলোটুলো ঝেড়ে নিয়ে দু'জনে বসল।

বেশ বেলা হয়েছে। খিদেয় পেট জ্বলছে। কিন্তু ওরা বাইরে বেরোতে সাহস পাচ্ছে না। খাওয়ার ব্যবস্থা করতেই হবে।'' শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। বলল, ''বিস্কো, আমি খাবার কিনে আনছি।''

''আবার ওই দাড়িওয়ালার পাল্লায় পড়বে।'' বিস্কো বলল।

''না, না। দেখি চেষ্টা করে।'' শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো ভাঙা বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। চলল সদর রাস্তার দিকে। সদর রাস্তায় এসে হাঁটতে লাগল পুবমুখে। কিছুটা যায় আর চারপাশের লোকজন দেখে। সৈন্য দেখলেই কোনও দোকানে ঢুকে পড়ছে। সৈন্যরা চলে গেলেই বেরিয়ে আসছে। কপাল ভাল বলতে হবে, একটা ছোট সরাইখানা দেখল। ও ঢুকে পড়ল। একটা লোক রুটি তৈরি করছে। দোকানের মালিক একটা কাঠের বাক্স সামনে নিয়ে বসে আছে। শাঙ্কো রুটি, আলু আর নানা শাকের তৈরি তরকারি চাইল। যে-লোকটা রুটি তৈরি করছিল সে এগিয়ে এল। দুটো গোল পাতায় ভরে দিল রুটি-তরকারি। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি আলগা করে ভাঙানি মুদ্রা দিল মালিককে। খাবার নিয়ে চলে এল ভাঙা বাড়িটায়। দু'জনে রুটি-তরকারি খেল। যা খিদে পেয়েছিল! কিন্তু জল নেই। জল খাওয়া হল না।

শাঙ্কো ভাঙ্গা খাটে শুয়ে পড়ল। রাত না হলে এখন আর কিছু করার নেই। রাত একটু বাড়লেই পালাবে। শাঙ্কো চোখ বুজে শুয়ে রইল। মাঝে মাঝে চোখ খুলছে। মাথার ওপর ভাঙ্গা ছাত দেখছে। আকাশ দেখছে। দেওয়াল দেখছে। কবেকার বাড়ি কে জানে! কারা থাকত এই বাড়িতে? পায়া ভাঙা খাটটা দেখে মনে হয় কোনও অবস্থাপন্ন পরিবারই এই বাড়িতে থাকত।

ঘরের এদিক ওদিক দেখতে দেখতে শাঙ্কো হঠাৎই দেখল—পূবদিকের একটা জানালা প্রায় অটুট। অন্য জানলাগুলোর অস্তিত্বই নেই। জানালার জায়গাগুলোয় ফোকর। ভাঙা পাথর। সবগুলো জানলা ভাঙা। একটা জানলার ফ্রেম কী করে এতটা অটুট রইল। শাঙ্কো খাট থেকে উঠল।

জানালাটার কাছে এল। জানালার কাছে এসে দেখল জানালার ফ্রেমটা লোহা দিয়ে তৈরি। শাঙ্কো দুহাতে জানলাটা ধরে টান দিল। ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু জানালার ফ্রেম ভাঙা গেল না। শাঙ্কো হাল ছাড়ল না। অন্যসব জানালা নিশ্চয়ই কাঠের তৈরি ছিল। শুধু এটাই কেন লোহার ফ্রেমের? নিশ্চয়ই এর কোন কারণ আছে।

শাঙ্কো এবার শক্ত হাতে জানালার ফ্রেমটা ঝাঁকাতে লাগল। হঠাৎই জানলার নিচের দিকে ফ্রেমের অংশটা ভেঙে বেরিয়ে এল। ঝর ঝর ক'রে পাথরের কুচি পড়ল। শাঙ্কো তখন হাঁপাচ্ছে। ফ্রেমের ভাঙা অংশটা ফেলে দিল। দেখল সেখানে একটা টানা গর্তমত। তার মধ্যে একটা পার্চমেন্ট কাগজ। শাঙ্কো একটু অবাকই হল। কীসের কাগজ এটা? কাগজটা হলদে হয়ে গেছে। শাঙ্কো আস্তে আস্তে গোটানো কাগজটা ওর ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে আনল। গোল করে পাকানো কাগজটা আস্তে আস্তে খুলল। দেখল কাগজটার ওপর দিকে কী যেন লেখা। এক নজর দেখেই বুঝল লেখাটা পুরোনো স্পেনীয় ভাষায় লেখা।

লেখাটার মাথায় লেখা রাজা ওভিড্ডোর তরবারি। শাঙ্কো কাগজটা ওল্টাল। দেখল একটা নকশা।

শাঙ্কো কাগজটা নিয়ে খাটে এসে বসল। বিস্কো বলল—কী ব্যাপার? কাগজটা কী?

—কাগজটার একপিঠে একটা বিবৃতিমত লেখা। অন্যপিঠে একটা নকশা আঁকা।

—কীরকম নক্শা?

শাঙ্কো বিস্কোকে কাগজটা দেখাল। বিস্কো কিছুই বুঝল না।

—গুপ্তধনের সন্ধান টন্ধান এই নকশায় আঁকা হয়েছে—এটাই আমার বিশ্বাস।

—ঠিক আছে। আগে বিবৃতিটা পড়ি। এটা পড়লে অনেক কিছু জানা যাবে। শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো থেমে থেমে পড়তে লাগল—

লিসবনের শহরতলিতে আমাদের বাড়ি। দারিদ্র্য আর অভাব ছিল আমাদের নিত্যসঙ্গী। আমি তাহা সহ্য করিতে পারিলাম না। ভাগ্যান্বেষণে বহির্বিশ্বে বাহির হইয়া পড়িলাম। নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। তারপর এই ভিগোনগরে আসিলাম। আশ্রয় পাইলাম। তখনই শুনিলাম রাজা ওভিড্ডোর লুক্কায়িত সাত হাত লম্বা নিরেট সোনায় তৈয়ারি তরবারির কথা। লোকমুখে শুনিলাম, সাত হাত লম্বা সেই তরবারির কোষে নাকি মহামূল্যবান হীরামুক্তা চুনিপান্না বসানো। সম্পূর্ণ কোষটি মিনে করা। লোকমুখে আরও শুনিলাম যে, সেই তরবারি এখানকার টিলায় নাকি গুপ্তভাবে রাখা হইয়াছে। আমি সেই তরবারির সন্ধানে জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়া আজ আমি বৃদ্ধ অথর্ব। আমার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে। একবার ভাবিলাম নকশাটি ছিঁড়িয়া ফেলি, পুড়াইয়া ফেলি। কিন্তু রাখিলাম এই আশায়, যদি কেহ রাজা ওভিড্ডোর তরবারি খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে।

নকশা সম্পর্কে বলি, উহা আমি টিলার পশ্চিমদিককার গুহায় পাইয়াছিলাম। ইহাতে সেই গুহা, টিলা এবং টিলার নীচে চেস্টনাটগাছের জঙ্গল অঙ্কিত আছে। একটি মৃত গাছের শুষ্ক কাণ্ডও অঙ্কিত আছে। ইহার অর্থ বুঝি নাই।

পড়া শেষ হল। শাঙ্কো কাগজটা বিস্কোকে পড়তে দিল। বিস্কো মনোযোগ দিয়ে নকশাটা দেখতে লাগল।

দু'জনে খাটে বসে রইল।

রাত হল। রাত বাড়তে লাগল। এবার কিছু খেতে হয়। শাঙ্কো আবার সেই সরাইখানা থেকে খাবার নিয়ে এল। দু'জনে খেল।

দু'জনে খাটে শুল। শাঙ্কো ভাবতে লাগল এখন কী করে জাহাজে ফেরা যায়। ফ্রান্সিসকে এই লেখা আর নকশাটা দিতে হবে। এসব ভাবতে ভাবতে শাঙ্কো ঘুমিয়ে পড়ল। বিস্কো তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওদিকে শাঙ্কো আর বিস্কো জাহাজে না ফেরায় ভাইকিংরা বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ল। ফ্রান্সিস রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারল না। মাঝে-মাঝেই ডেকে উঠে আসতে লাগল। কিন্তু ওরা দু'জন ফিরল না। মারিয়া বলল, "ফ্রান্সিস, অত দুশ্চিন্তা করছ কেন? শাঙ্কোদের কোনও বিপদ হয়নি। বড়জোর এখানকার কয়েদখানায় বন্দি হয়ে আছে। তুমি কাল সকালে যাও। কয়েদখানা খুঁজে বের করে ওদের কোনও হদিস পাও কিনা দ্যাখো।

"হ্যাঁ, কাল সকালে তো যেতেই হবে। খোঁজ করতেই হবে।" ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালে বন্ধুরা কয়েকজন ফ্রান্সিসের কাছে এল। শাঙ্কো আর বিস্কো সম্বন্ধে তাদের আশঙ্কার কথা জানাল। ফ্রান্সিস সকালের খাবার খেতে খেতে বলল, "কিছু ভেবো না। আমি এক্ষুণি বেরোচ্ছি। ওদের ঠিক খুঁজে বের কর।" বন্ধুরা চলে গেল।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মারিয়া, লিসবনে যে এ-দেশের পোশাকটা কিনেছিলাম ওটা বের করে দাও।"

"ওই পোশাক দিয়ে কী হবে?" মারিয়া বলল।

"হবে, হবে। তুমি দাও পোশাকটা।" ফ্রান্সিস বলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস ওই পোশাকটা পরে নিল। তারপর ডেকে উঠে এল। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "ভাইসব, আমি শাঙ্কো আর বিস্কোর খোঁজে যাচ্ছি। তোমরা কেউ তীরভূমিতে যাবে না।"

ফ্রান্সিস দড়ি ধরে ধরে ওদের ছোট নৌকোটায় নামল। জাহাজে বাঁধা দড়ি খুলে নৌকো ছেড়ে দিল। দেখল শাঙ্কোরা যে নৌকো চড়ে এসেছিল সেটা তীরে ভেড়ানো রয়েছে। কিন্তু নৌকোয় পিপে দুটো নেই।

ফ্রান্সিস এবার এক কাণ্ড করল। তীরভূমি থেকে ধুলোবালি নিজের মাথায়, মুখে, গায়ের পোশাকে ছিটিয়ে দিল। এক খ্যাপাটে মানুষের মতো চেহারা হল ওর।

প্রান্তর পার হয়ে জাহাজঘাটার কাছে বড় রাস্তাটায় এল। তারপরে দু' হাত তুলে বলতে লাগল, "হে শাঙ্কো, হে বিস্কো, দেখা দাও।" রাস্তায় একটু যায় আর দাঁড়িয়ে পড়ে গলা ছেড়ে বলে, "হে শাঙ্কো, হে বিস্কো দেখা দাও।" অলক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসের ওপর সকলের নজর পড়ল। রাস্তার পথচারীরা, দোকানটোকানে কেনাবেচায় ব্যস্ত মানুষেরা অবাক হয়ে ফ্রান্সিসকে দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস সেইভাবে বলেই চলেছে, "হে শাঙ্কো, হে বিস্কো দেখা দাও।"

ফ্রান্সিসের গায়ে এ-দেশের পোশাক দেখে ফ্রান্সিসকে কেউ বিদেশি বলে চিনতে পারল না। ফ্রান্সিস দু'হাত ওপরে তুলে বলে চলল, "হে শাঙ্কো-হে বিস্কো দেখা দাও।" এইভাবে যেতে যেতে ফ্রান্সিস ভাবল, গলিগুলোর মধ্যে ঢুকেও বলতে হবে। এবার ফ্রান্সিস গলিতে ঢুকল। চেঁচিয়ে বলতে লাগল। একটা গলি শেষ করে ডান দিকের গলিতে ঢুকল। একটু এগিয়েই দু'হাত তুলে বলতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে পোড়ো বাড়িটার কাছে এল। চিৎকার করে বলল, "হে

শাঙ্কো, হে বিস্কো, দেখা দাও।''

ঘরের মধ্যে শাঙ্কো আর বিস্কো চমকে উঠল। লাফিয়ে উঠল। ফ্রান্সিসের গলা। শাঙ্কো দরজার কাছে ছুটে এল। দরজা একটু ফাঁক করে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস কাছাকাছি আসতেই শাঙ্কো দেশীয় ভাষায় বলে উঠল, ''আমরা এখানে।'' ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে দরজার কাছে এল। তারপর এক ঝলক এদিক-ওদিক দেখে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে দিল। দরজায় কোন খিল নেই। শাঙ্কো বিস্কো ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। তিনজনই আনন্দে উদ্বেল। কিন্তু জোরে কথা বলতে পারছে না। দরজার পরেই রাস্তা। লোকজন যাচ্ছে আসছে।

তিনজনে বড় ঘরটায় এল। খাটে বসল। শাঙ্কো সৈন্যদের হাতে ধরা পড়া, পালানো, সব ঘটনাই বলল। তারপর বলল, ''ফ্রান্সিস, এবার তো জাহাজে ফিরতে হয়। কী করবে?''

''এখন কিছু নয়। খাওদাও, বিশ্রাম করো। রাতে জাহাজে ফিরতে হবে।'' ফ্রান্সিস বলল। তারপরে মাথার চুল, পোশাক থেকে ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলতে লাগল। ফ্রান্সিসই এক সরাইখানা থেকে খাবার কিনে আনল। দুপুরের খাওয়া হল। ফ্রান্সিস আবার বেরোল। সরাইখানার মালিকের কাছ থেকে এক হাঁড়ি জল নিয়ে এলো। শাঙ্কোরা এতক্ষণে জল খেতে পেল।

এবার শাঙ্কো সেই লেখাটা আর নকশাটার কাগজটা ফ্রান্সিসকে দিল। শাঙ্কো ওসব কীভাবে পেয়েছে তা বলল।

ফ্রান্সিস খাটে শুয়ে পড়ল। প্রথমে লেখাটা পড়ল। তারপর নকশাটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল। বলল, ''শাঙ্কো, নকশায় দুটো জিনিস লক্ষ্য করো। এক, টিলার গায়ে গুহা; আর দুই, জঙ্গলের মধ্যে একটা শুকনো গাছ। ওই টিলার গুহাতেই লোকটি নকশাটা পেয়েছিল। এখন দেখতে হবে মরা শুকনো গাছটার কোনও গুরুত্ব আছে কি না।''

''তা হলে তো ওই বনে যেতে হয়।'' বিস্কো বলল।

''তাই যেতে হবে। রাজা ওভিড্ডোর তরবারি ওখানেই কোথাও আছে, মানে রাজা ওভিড্ডো গোপনে রেখে গেছেন।'' ফ্রান্সিস বলল।

''ওই জঙ্গলে এত খোঁজাখুঁজি করা সম্ভব?'' শাঙ্কো বলল।

''সেটা ওই জঙ্গলে না গিয়ে বলতে পারছি না।'' ফ্রান্সিস বলল।

সন্ধে হল। ফ্রান্সিস বলল, ''এখন নয়। গভীর রাতে জাহাজে ফিরতে হবে।''

রাতের খাবার ফ্রান্সিসই নিয়ে এল। ওর পোশাক দেখে কেউ বিদেশি বলে ভাবতেই পারল না।

রাত গভীর হল। নিস্তব্ধ রাত।

একসময় ফ্রান্সিসরা খাট থেকে নামল। তৈরি হল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দরজা খুলে রাস্তায় উঠল। রাস্তা জনশূন্য। ফ্রান্সিস বলল, ''রাস্তা দিয়ে যাওয়া চলবে না। ওখানে এখন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। সৈন্যরা সজাগ এখন। নিশ্চয়ই পাহারা জোরদার করা হয়েছে। আমরা ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাব। ধরা

পড়ার সম্ভাবনা কম।''

রাস্তা পার হয়ে ফ্রান্সিসরা বুনো ঝোপজঙ্গলে ঢুকল। চাঁদের আলো উজ্জ্বল। ঝোপজঙ্গল মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তিনজনে চলল।

যখন জাহাজঘাটার কাছে এল, তিনজনেই হাঁপাচ্ছে। নিজেদের জাহাজ লক্ষ্য করে তীরভূমিতে হেঁটে হেঁটে আসতে দেখল ওদের নৌকো দুটো জলে ভাসছে। তিনজনেই নৌকোয় উঠল। দাঁড় টেনে চলল নিজেদের জাহাজের দিকে। নৌকো দুটো জাহাজের গায়ে লাগল। ফ্রান্সিসরা হালের কাছে দড়িদড়া ধরে ডেকে উঠে এল। মাস্তুলের ওপর থেকে নজরদার পেড্রো চেঁচিয়ে বলল, ''ফ্রান্সিসরা এসেছে, ফ্রান্সিসরা এসেছে।''

মারিয়া খুব দুশ্চিন্তায় ছিল। তখনও ঘুমোতে পারেনি। পেড্রোর ডাক শুনে মারিয়া ছুটল সিঁড়ির দিকে। ডেক-এ উঠে এসে ফ্রান্সিসদের দেখল। ওদিকে ভাইকিং বন্ধুরাও ছুটে এল। ফ্রান্সিসরা ফিরে এসেছে। সবাই খুশি।

পরদিন সকালে রাঁধুনি বন্ধু ফ্রান্সিসের কাছে এল। খাওয়ার জল খুব বেশি নেই। জল আনতে হবে। ফ্রান্সিস ডেকে উঠে এল। শাঙ্কো আর বিস্কোকে বলল, ''তোমরা জল আনতে গিয়েছিলে। পিপে দুটো কী হল।'' শাঙ্কো তখন সবই বলল।

''ওই দোকানটা চিনতে পারবে?'' ফ্রান্সিস বলল।

''হ্যাঁ, হ্যাঁ।'' শাঙ্কো বলল।

''তা হলে এখন চলো। তোমার সবচেয়ে ছেঁড়া যে জামাটা আছে সেটা পরে এসো।'' ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস এ-দেশের পোশাকটা পরল। শাঙ্কো ওর ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকটা পরে নিল।

দু'জনে নৌকো বেয়ে তীরে এল। সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল, ''বেশ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটো।'' শাঙ্কো সেভাবেই হাঁটতে লাগল। দোকানটার সামনে এল। শাঙ্কো দোকানদারকে দেখিয়ে দিল। ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে শাঙ্কোকে দেখিয়ে বলল, ''একে চিনতে পারেন?''

দোকানদার একটুক্ষণ শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ''হ্যাঁ, হ্যাঁ, সৈন্যরা ধরে এনেছিল।''

''ওর এক বন্ধুও ছিল?'' ফ্রান্সিস বলল।

''হ্যাঁ।'' দোকানি বলল।

''এরা দুটো জলের পিপে রেখে গেছে।''

''হ্যাঁ, হ্যাঁ।'' দোকানদার দোকানের ভেতর থেকে পিপে দুটো বের করে দিল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো পিপে দুটো নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল, ''খাবার জল কোথায় পাওয়া যাবে সেটা জেনেছিলে?''

''হ্যাঁ, ওই টিলাটার নীচে নাকি ঝরনা আছে।'' শাঙ্কো বলল।

"ঠিক আছে। চলো সেখানে।" ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে চলল টিলাটার দিকে। দুজনের হাতে দুটো পিপে। দূর থেকে দেখল টিলাটা। ন্যাড়া মাথা টিলা। কিছুক্ষণের মধ্যেই টিলাটার নিচে পৌঁছল। দেখল টিলাটার নিচে কিছু গাছগাছালি আছে। তারই মধ্যে দিয়ে ঝরনার জল পড়ছে। জলধারাটা খুব বেশি জোরে পড়ছে না। মাটির হাঁড়ি কাঠের গামলা নিয়ে বেশ কিছু লোক জল নিতে এসেছে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। তারপর ফ্রান্সিসরা পিপে বসাল। জল ভরল। বেশ কিছু লোক ফ্রান্সিসদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। সহজেই বুঝল — ওরা বিদেশি। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো খাবার জল নিয়ে জাহাজে ফিরে এল। হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস, জলের সমস্যাটা তো মিটল। এবার জাহাজ চলুক দেশের দিকে।"

ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল, "আজকের রাতটা এখানেই থাকতে হবে।"

"ব্যাপার কী বলো তো?"

"রাজা ওভিড্ডোর তরবারি খুঁজে বের করতে হবে।"

হ্যারি দু'হাত ছড়িয়ে বলল, "ব্যস, হয়ে গেল!"

ফ্রান্সিস হেসে বলল, "আমার কেবিনঘরে এসো। সব বলছি। নকশাটাও দেখবে।"

দু'জনে ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে এল। ফ্রান্সিস লেখাটা দেখাল। নকশা দেখাল। সব বলল। শাঙ্কোরা কীভাবে নকশাটা পেয়েছে তাও বলল। হ্যারি বলল, "হুঁ। তা হলে কখন তরবারি খুঁজতে যাবে?"

"আজ রাতেই।" ফ্রান্সিস বলল।

রাত হল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডেকে পাঠাল। শাঙ্কো এল। ফ্রান্সিস বলল, "তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। বিশ্রাম করো। তুমি আর আমি টিলার নীচের জঙ্গলে যাব। রাজা ওভিড্ডোর তরবারি উদ্ধার করব। তুমি দুটো মশাল, চকমকি পাথর নেবে।"

রাত বাড়ল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস তৈরি হল। নকশাটা কোমরের ফেট্টিতে জড়িয়ে রাখল। তারপর দু'জনে জাহাজের ডেকে উঠে এল।

সময়টা বোধ হয় শুক্লপক্ষের কোনও রাত। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদের আলো। দু'জনে নৌকোয় নামল। ফ্রান্সিস নৌকো বেয়ে চলল তীরভূমির দিকে। তীরে পৌঁছল। চলল টিলার দিকে।

কপাল ভাল। পাহারাদার সৈন্যদের হাতে ধরা পড়তে হল না। সদর রাস্তাটায় সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছিল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো তখন একটা বাড়ির পেছনে আড়াল নিল। সৈন্যরা কিছুক্ষণ ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করল। তারপর উত্তর দিকে চলে গেল। সেই সময় ফ্রান্সিসরা রাস্তা পার হল।

টিলার তলায় দাঁড়িয়ে দেখল, ওখানে বুনো চেস্টনাট গাছের জঙ্গল।

ফ্রান্সিসরা জঙ্গলে ঢুকল। চেস্টনাট গাছগুলো ছাড়া-ছাড়া। তাই অনেক জায়গাতেই চাঁদের আলো পড়েছে। তবু ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে মশাল জ্বালতে বলল।

শাঙ্কো চকমকি ঠুকে দুটো মশাল জ্বালল। ফ্রান্সিস বলল, "শাঙ্কো, লক্ষ্য রাখো কোনও শুকনো মরা গাছ পাও কিনা।"

দু'জনেই বুনো লতাগাছ আর ঝোপের মধ্যে দিয়ে খুঁজতে লাগল শুকনো মরা গাছটা। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখল একটা শুকনো গাছের কাণ্ড। চারপাশে সব সজীব গাছ। ওই গাছটাই শুধু মরা শুকনো।

ফ্রান্সিস হাতের মশালটা একটা গাছের নিচু ডালে আটকে সেই গাছটার কাছে এল। গাছটার কাণ্ডে হাত দিল। কিছুটা ছাল উঠে এল।

এইবার ফ্রান্সিসের চিন্তা হল, খুঁজে খুঁজে মরা গাছটা তো পাওয়া গেল। কিন্তু রাজা ওভিড্ডোর তরবারির সঙ্গে এই গাছটার সম্পর্ক কী? এই মরা গাছটার মধ্যেই কি তরবারিটা ঢোকানো আছে? গাছটার ভেতরটা কি ফাঁপা? তা হলে সেটা দেখতে হয়। ফ্রান্সিস বলল, "শাঙ্কো, মশাল রেখে এসো। মরা কাণ্ডটায় ধাক্কা দিতে হবে।"

শাঙ্কোও হাতের মশালটা মাটিতে পুঁতে ফ্রান্সিসের কাছে এল। দু'জনে মিলে কাণ্ডটায় ধাক্কা দিতে লাগল। গাছটা নড়তে লাগল। কিন্তু ভেঙে পড়লো না।

শাঙ্কো বলল, "দাঁড়াও ফ্রান্সিস, আমি জাহাজ থেকে একটা বেলচা নিয়ে আসছি।"

"কিন্তু পাহারাদাররা যদি এখনও থাকে?" ফ্রান্সিস বলল।

"আমি সাবধানে যাব, সাবধানে আসব। তুমি ভেবো না।"

শাঙ্কো লতাপাতা, ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়ল। চাঁদের আলোয় দেখল পাহারাদার সৈন্যরা বেশ দূরে, ওরা বোধ হয় সেনা-আবাসে ফিরে যাচ্ছে। আর একদল আসবে।

শাঙ্কো দ্রুত পায় হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তা পার হল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল নৌকো রাখার জায়গার দিকে।

ফ্রান্সিস ঘাসের উপর বসে রইল। একটু পরেই মরা গাছটায় পিঠ ঠেকিয়ে আরাম করে বসল। বেলচা না আনলে এখন আর কিছু করার নেই। ফ্রান্সিসের একটু তন্দ্রামত এল। ট্রি ট্রি করে একটা রাতজাগা পাখি ডেকেই চলেছে।

হঠাৎ পট্‌পট্‌ শব্দে ফ্রান্সিসের তন্দ্রাভাবটা কেটে গেল। ও পেছন ফিরে তাকাল। দেখল—শাঙ্কোর রেখে যাওয়া মশালটা মাটিতে পড়ে গেছে। মশালের আগুন থেকে ঝরা পাতার মধ্যে আগুন লেগে গেছে। আগুন বাড়তে লাগল।

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। একটা নিচু গাছ থেকে পাতাশুদ্ধ ডাল ভাঙল। সেই ডালটা দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আগুন বেড়েই চলল। সেইসঙ্গে ধোঁয়া উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল সে ভীষণ বিপদে পড়ে গেছে। রাজা অপর্তোর সৈন্যরা ধোঁয়া দেখতে পাবে। কী ব্যাপার? অবশ্য তার আগেই দেখতে ছুটে আসবে। পালাতে হবে।

ফ্রান্সিস পেছন ফিরে পালাবার জন্যে ছুটল। কিন্তু কয়েকটা গাছ পেরোতেই দেখল—সামনে রাজা অপর্তোর সৈন্যরা দল বেঁধে আসছে। ফ্রান্সিস বুঝল—পালানো অসম্ভব। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। দাড়িগোঁফওয়ালা একটা সৈন্য

ফ্রান্সিসের সামনে এসে দাঁড়াল। একটু হেসে বলল—তুমি পালাচ্ছিলে?

—হ্যাঁ।

—পারবে এত সৈন্যদের বন্ধনী থেকে পালাতে? গোঁফদাড়ি বলল।

—চেষ্টা করতাম। ফ্রান্সিস বলল।

—মরতে। দাড়িগোঁফ হেসে বলল।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। দাড়িগোঁফ জিজ্ঞেস করল—

—এত রাতে তুমি এখানে কী করছিলে?

—চেস্টনাট গাছের ফল কুড়োচ্ছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—কাল সকালে কুড়োতে পারতে। দাড়িগোঁফ বলল।

—দেরি হয়ে যেত। কাল সকালের মধ্যেই লোকে সব ফল কুড়িয়ে নিত। ফ্রান্সিস বলল।

—থাক গে—তুমি নিজেও জানো যে তুমি মিথ্যে কথা বলছো। আমাদের হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই। এটুকু বলে গলা চড়িয়ে বলল—চলো।

—কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

—সৈন্যাবাসে—বাকি রাতটুকু ওখানেই থাকবে। কালকে সকালে রাজা অপর্তোর রাজসভায় যাবে। রাজা অপর্তো নিশ্চয়ই তোমাকে শাস্তি দেবেন। দাড়িগোঁফ বলল।

—আমার অপরাধ? ফ্রান্সিস চড়া গলায় বলল।

—তুমি গুপ্তচর। রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের রণকৌশল জানার চেষ্টা করছো। দাড়িগোঁফ বলল।

—আমার লাভ? ফ্রান্সিস বলল।

—বিনিময়ে প্রচুর অর্থ পাও লেকল্যার রাজা ভিলিয়ানের কাছ থেকে। দাড়িগোঁফ বলল।

—রাজা ভিলিয়ান আমার মত এক নগণ্য বিদেশির কথা বিশ্বাস করবেন কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—ভিলিয়ানই তোমাকে পাঠিয়েছে। নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেই পাঠিয়েছে। দাড়িগোঁফ বলল।

—আমি রাজা ভিলিয়ানের নাম এই প্রথম শুনলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—বাজে কথা। চলো। কালকে রাজা অপর্তোর রাজসভায় যা বলতে চাও বলো। বলা যায় না—রাজা অপর্তো তোমাকে মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারেন। গোঁফদাড়ি বলল।

দাড়িগোঁফ আর দাঁড়াল না। সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল—এটাকে নিয়ে আয়।

কয়েকজন ফ্রান্সিসকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর ফ্রান্সিসকে নিয়ে চলল।

চেস্টনাটের বন শেষ হল। সবাই বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

দাড়িগোঁফ বলল—পাঁচজন ওটাকে নিয়ে যা। সৈন্য আবাসে রাখবি। দুজন নজরে রাখবি যেন পালাতে না পারে।

পাঁচজন সৈন্য ফ্রান্সিসকে নিয়ে চলল। দাড়িগোঁফের নির্দেশমত ফ্রান্সিসকে

সৈন্যাবাসের দিকে নিয়ে চলল।

ওদিকে শাঙ্কো জাহাজ থেকে বেলচা নিয়ে এল। বড় রাস্তা পার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, দেখল ফ্রান্সিসকে বন্দী করে কয়েকজন রাজা অপর্তোর সৈন্য চেস্টনাট গাছের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। পেছনে পেছনে আরো সৈন্য জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। চলল জাহাজঘাটের দিকে।

পাঁচজন সৈন্য ফ্রান্সিসকে নিয়ে রাজবাড়ির দিকে চলল। উত্তরমুখো।

শাঙ্কো কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। এখন ফ্রান্সিসকে উদ্ধার করতে লড়াইয়ে একা নেমে কিছুই করতে পারবে না। তার জন্যে বন্ধুদের সাহায্য দরকার। শাঙ্কো ভাবল আগে দেখি ফ্রান্সিসকে ওরা কোথায় বন্দী করে রাখে। সেই জেনে ওরা ফ্রান্সিসকে মুক্ত করতে চেষ্টা করবে।

আকাশে চাঁদের আলো উজ্জ্বল। বেশ কিছুদূর পর্যন্ত সবই দেখা যাচ্ছে। গাছগাছালির আড়ালে আড়ালে শাঙ্কো চলল বন্দী ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে।

ফ্রান্সিসকে নিয়ে সৈন্যরা এল সৈন্য আবাসের সামনে। তারপর ফ্রান্সিসকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিল।

দূর থেকে শাঙ্কো সবই দেখল। কিন্তু বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে এখন। শাঙ্কো একটা গাছের নিচে বসল। পূবের আকাশে লালচে আলো ফুটে উঠল। অল্পক্ষণ পরেই সূর্য উঠল। শাঙ্কো তাকিয়ে রইল সেই দিকে। এখন দিশেহারা। একদিকে ফ্রান্সিস বন্দী। অন্যদিকে জাহাজে মারিয়া, বন্ধুরা, তারাও উদ্বিগ্ন। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর কোন খবর নেই।

শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। মারিয়া ও বন্ধুদের উৎকণ্ঠা দূর করতে হবে। তারপর ভাববে কী করবে।

বেলচাটা কাঁধে নিয়ে শাঙ্কো সদর রাস্তা এড়িয়ে ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলল। একে গায়ে বিদেশি পোশাক তার ওপর হাতে বেলচা। সহজেই রাজা অপর্তোর সৈন্যদের চোখে পড়ে যাবে। আমি যাই বলে বোঝাই না কেন ওরা আমাকে ছাড়বে না। আমার বন্দী জীবন। ফ্রান্সিস যে ঘরে বন্দী হয়ে আছে। ওকে যে সেই ঘরেই বন্দী করে রাখবে তার কোন মানে নেই। হয়তো অন্য ঘরে বন্দী করবে। ফ্রান্সিসের ঘরে বন্দী করে রাখলে তবু দুজনে মিলে পালাবার পরিকল্পনা করতে পারতো। কিন্তু একা বন্দী হলে পালাতে গিয়ে ধরাও পড়তে পারি। একবার ধরা পড়লে মুক্তির কোন আশা নেই। মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়।

জংলা ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে শাঙ্কো হাঁটতে লাগল। গা হাত পা কাঁটা ঝোপের ঘষায় কেটে গেল। হাত পা জ্বালা করতে লাগল। কিন্তু শাঙ্কো দমল না। কাঁটা ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই চলল।

বেলা বাড়ছে। শাঙ্কো ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজে পৌঁছোতে হবে। শাঙ্কো দ্রুত চলল। এতে সারা গা হাত পা কাঁটাগাছে কেটে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল। শাঙ্কো মুখ বুঁজে যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল।

সমুদ্রতীরে যখন পৌঁছল তখন বেশ বেলা হয়েছে। শাঙ্কো বালিয়াড়িতে

নামল। দেখল নৌকোটা জলের কাছে ডাঙায় তোলা আছে। শাঙ্কো নৌকোটা টেনে টেনে জলের ওপর আনল। দেখল গলুইয়ে বৈঠেটা রয়েছে। শাঙ্কো বেলচাটা নৌকোয় রাখল। তারপর নৌকোটাকে এক ধাক্কায় সমুদ্রের জলে নামিয়ে বৈঠে বাইতে লাগল। নৌকো চলল জাহাজের দিকে।

জাহাজের কাছে আসতে ভাইকিং বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। শাঙ্কো নৌকোটা জাহাজের গায়ে ভেড়াল। দড়ি দিয়ে নৌকোটা বাঁধল জাহাজের সঙ্গে। ঝোলানো দড়িদড়া ধরে ধরে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল।

ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে এসে শাঙ্কোকে ঘিরে দাঁড়াল। সকলেরই এক প্রশ্ন—ফ্রান্সিস কোথায়? ও এলো না কেন?

শাঙ্কো আস্তে আস্তে সব ঘটনাই বলল। ফ্রান্সিস বন্দী শুনে বন্ধুদের মন খারাপ হল। একপাশে মারিয়া দাঁড়িয়েছিল। শুনল সব। কিন্তু কোন কথা বলল না। রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। তীরভূমির দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ ছলছল করছে।

হ্যারি এগিয়ে এল। বলল—রাজকুমারী আপনি চিন্তা করবেন না—মন খারাপ করবেন না। আর কয়েকটা দিন যেতে দিন। ফ্রান্সিস ঠিক বন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে আসবে। আমাদের বড় সান্ত্বনা যে ফ্রান্সিস একা। একা ফ্রান্সিসকে কেউ বন্দী করে রাখতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মারিয়া কিছু বলল না। তীরভূমির দিকে তাকিয়ে রইল।

ওদিকে পরদিন সকালে বন্দী ফ্রান্সিসকে খেতে দেওয়া হল দুটো পোড়া রুটি আর আনাজের ঝোল গোলমত। ফ্রান্সিস খেয়ে নিল। দাড়িগোঁফ ঢুকল। বলল—চলো। তোমাকে রাজা অপর্তোর রাজসভায় যেতে হবে।

—বেশ। চলুন। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল।

দুজনে চলল রাজার রাজসভায়। এদিকে ওদিকে পাথরের ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে একটা বড় বাড়িতে ঢুকল দুজনে। বাড়ির দরজায় দুজন সশস্ত্র প্রহরী। দুজনে ঘরটায় ঢুকল। ফ্রান্সিস দেখল—ঘরের দক্ষিণ দিকে রাজসিংহাসনে রাজা অপর্তো বসে আছে। সিংহাসনটা কাঠের। আসল পাখির পালকে তৈরি। নীলাভ সাটিন কাপড়ে ঢাকা। একপাশে বৃদ্ধ মন্ত্রী। অন্যপাশে সেনাপতি আর অমাত্যরা।

বিচার চলছিল। দাড়িগোঁফ বলল—তুমি আমার সঙ্গে এসো। সে কিছুদূর এগিয়ে গেল। ফ্রান্সিসও পেছনে পেছনে এল।

আর একটা বিচার আরম্ভ হল। দাড়িগোঁফ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস রাজসভার চারদিক দেখতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিচার শেষ হল। দাড়িগোঁফ একটু এগিয়ে গেল। রাজা অপর্তোর নজরে পড়ল। রাজা অপর্তো বলল—তোমার কিছু বলার আছে? দাড়িগোঁফ মাথা একবার একটু নুইয়ে মাথা তুলল। ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে যা যা ঘটেছে সব বলল। রাজা ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা ভাইকিং—বিদেশি। আমার রাজ্যে এসেছ গুপ্তচর হয়ে।

—কাদের গুপ্তচর হয়ে এসেছি? ফ্রান্সিস বলল।

—খুবই সহজ। লরুল্লার রাজা ভিলিয়ানের হয়ে। রাজা বলল।

—আমি রাজা ভিলিয়ানের নাম এই প্রথম শুনলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি বুদ্ধিমান। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তুমি মিথ্যে বলছো। রাজা বলল।

—আমি যা সত্য তাই বলছি। খুব দৃঢ়স্বরে ফ্রান্সিস বলল।

—উঁহু। কিছু লুকোবার চেষ্টা করছো। রাজা বলল।

—আমার লুকোনোর কিছু নেই। যা সত্য তাই বললাম। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি শুধু ফল কুড়োবার জন্যে চেস্টনাটের জঙ্গলে যাওনি। আমাদের যুদ্ধ আয়োজনের সংবাদ রাজা ভিলিয়ানকে পৌঁছে দেওয়ার কাজ তুমি নিয়েছো। রাজা বলল।

—মিথ্যে অপবাদ। আমি কেন গুপ্তচরবৃত্তি করতে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—অনেক অর্থ পাবে সেই লোভে। রাজা বলল।

—আমার সেই লোভ নেই। অনেক মূল্যবান গুপ্তধন আমি আবিষ্কার করেছি। কিন্তু সেই কাজের জন্যে একটা স্বর্ণমুদ্রাও আমি নিই নি। আমি এখনও বলছি— আমি নির্দোষ। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা অপর্তো ক্রুদ্ধ হল। বলল—থামো—তুমি দোষী কি নির্দোষ তার বিচার পরে হবে। ততদিন তুমি সৈন্যাবাসে বন্দী থাকবে। বাইরের জগতের সঙ্গে তোমার কোন যোগ থাকবে না। রাজা বলল।

—আমাকে অন্যায়ভাবে বন্দী করে রাখা হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাকে যে হত্যা করা হয়নি—এটাই যথেষ্ট। রাজা বলল।

—বিনা প্রমাণে? ফ্রান্সিস বলল।

—প্রমাণের দরকার নেই। আমার হুকুমই প্রমাণ। রাজা বলল।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। বুঝল রাজা অপর্তোর কাছে ন্যায় বিচার পাওয়া অসম্ভব। বিনা বিচারে বন্দীদের হত্যা করা রাজা অপর্তোর কাছে কোন অপরাধই নয়। এর কাছে প্রমাণ টমানের কথা বলা অর্থহীন। রাজা অপর্তো রগচটা লোক। বেশি কথা বললে হয়তো বিরক্ত হয়ে ফাঁসির হুকুমও দিয়ে বসতে পারে।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল।

রাজসভার কাজ শেষ হল। রাজা অপর্তো উঠে দাঁড়াল। মন্ত্রী অমাত্য সেনাপতি আর প্রজারাও উঠে দাঁড়াল। রাজা অপর্তো সভা থেকে চলে গেল।

দাড়িগোঁফ ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এবার চলো। ফ্রান্সিস দেখল বৃদ্ধ মন্ত্রীমশাই বেরোবার দরজার দিকে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস দাড়িগোঁফকে বলল—আমি মন্ত্রীমশাইর সঙ্গে কথা বলবো।

—মন্ত্রীমশাই তোমাকে মুক্তি দিতে পারবে না। দাড়িগোঁফ বলল।

—না—অন্য ব্যাপারে মন্ত্রীমশাইর সঙ্গে কথা বলবো।

—বেশ। যাও। পালাবার চেষ্টা করবে না। গোঁফদাড়ি বলল।

ফ্রান্সিস মন্ত্রীমশাইর সামনে এসে দাঁড়াল। বলল—মন্ত্রীমশাই? মন্ত্রীমশাই দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—কী ব্যাপার?

—কয়েকটা ঘটনা জানতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। মন্ত্রী বলল।

—আচ্ছা রাজা ওভিড্ডো কে ছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—প্রায় দেড়শো বছর আগে এখানকার রাজা ছিলেন। মন্ত্রী বলল।

—তিনি কি খুব ধনী ছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। শুনেছি—খুব খেয়ালি রাজা ছিলেন। ধনী ছিলেন তো বটেই। একটা প্রায় সাত হাত লম্বা তরোয়াল তৈরি করিয়েছিলেন। নিরেট সোনায় তৈরি। রাজবাড়ির কর্মকারেরা ঐ তরোয়াল তৈরি করেছিল। তরোয়ালের কোষের গায়ে হীরে মুক্তো মণিমাণিক্য গাঁথা ছিল। মন্ত্রী বলল।

—এটা কী করে জানলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—খেয়ালি রাজা ছিলেন তো। তরোয়াল তৈরি হবার পর সেটা প্রজাসাধারণের দেখার জন্যে একটা লম্বা কাঠের আসনে তরোয়ালটা রেখে রাজবাড়ির চত্বরে রেখেছিলেন। তরোয়ালের সামনে প্রজাদের ভিড় লেগেই থাকতো। সন্ধ্যে হলে তরোয়ালটা প্রাসাদের ভেতরে অস্ত্রাগারে রেখে দেওয়া হত। মন্ত্রী বলল।

—সেই তরবারিটার কী হল? রাজা ওভিড্ডো মারা যাবার পর আর কেউ ঐ তরবারি চোখে দেখে নি? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—মারা যাবার কিছুদিন আগে তরবারিটা অস্ত্রাগার থেকে বের করা বন্ধ হল। তারপর সেই তরবারি যে কোথায় কিভাবে ওভিড্ডো লুকিয়ে রাখলেন কেউ সেটা জানতে পারে নি। মন্ত্রী একটু থেমে বলল। রাজা ওভিড্ডোর পর তো আরো রাজা রাজত্ব করেছেন। তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কেউ খুঁজে পান নি।

ফ্রান্সিস আড়চোখে তাকিয়ে দেখল দাড়িগোঁফ একটু দূরে দুই পাহারাদারের সঙ্গে কথা বলছে। এই সুযোগ। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে নকশাটা বের করল। মন্ত্রীমশাইকে দেখাল শুধু নকশাটা। মন্ত্রীমশাই নকশাটা দেখে বলল—কীসের নকশা?

—রাজা ওভিড্ডো এই নকশাটা রেখে গিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—এতে দেখা যাচ্ছে পুরোনো নকশা। মন্ত্রী বলল।

—এটা দেখে আপনি কিছু বুঝতে পারছেন? ফ্রান্সিস বলল।

মন্ত্রীমশাই মাথা নেড়ে বলল—উঁহু। কিছুই বুঝতে পারছি না।

—ভালো করে দেখুন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ দেখছি তো একটা টিলা একটা গুহামত গাছপালা।

—কী গাছ? ফ্রান্সিস বলল।

—বলতে পারবো না। মন্ত্রী বলল।

—আচ্ছা একটা মরা গাছ আছে লক্ষ্য করেছেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। মন্ত্রীমশাই নকশাটা ফ্রান্সিসকে ফেরৎ দিয়ে বলল—মা মেরিই জানেন এই নকশার অর্থ কী? ফ্রান্সিস নকশাটা কোমরের ফেট্রিতে রেখে দিল।

ফ্রান্সিস সিংহাসনের বেদী থেকে নেমে এল। দাড়িগোঁফ এগিয়ে এল। বলল—কী? ছাড়া পাবার কিছু উপায় দেখলে?

—না। আমি অন্য বিষয়ে কথা বলেছি। ফ্রান্সিস বলল।

দাড়িগোঁফ আর একজন সৈন্য ফ্রান্সিসকে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিস তখন ভাবছে মন্ত্রীমশাইও নকশার কিছুঁ বুঝল না। বলতেও পারল না কিছু। শুধু জানা গেল বছর একশো দেড়শো আগে এখানে রাজত্ব করত ওভিড্ডো নামে এক খামখেয়ালি রাজা। নিরেট সোনা দিয়ে একটা তরবারি বানিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর থেকে আর সেই সোনার তরবারি খুঁজে পাওয়া যায়নি। খামখেয়ালি রাজা ওভিড্ডো কোথায় কীভাবে তরবারিটি গোপনে রেখে গেছে কেউ জানে না। তারপরে যারা রাজত্ব করেছে তাদের কেউ কেউ সোনার তরবারি খুঁজেছে। কিন্তু পায়নি।

ফ্রান্সিসকে পাহারা দিয়ে দাড়িগোঁফ আর অন্য সৈন্যটি সৈন্যাবাসে ওর ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল।

সেদিন বিকেলে শাঙ্কো হ্যারির কেবিন ঘরে এল। বিছানায় বসল। বলল—হ্যারি আমি আজ রাতে সমুদ্রতীরে নামবো। বেলচাটাও সঙ্গে নেব। ঐ চেস্টনাটের জঙ্গলে যাবো। দেখি রাজা ওভিড্ডোর তরবারির কোন হদিশ করতে পারি কি না।

—কিন্তু ঐ জঙ্গলেই তো ফ্রান্সিস রাজা অপর্তোর সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েছে। এখনও বন্দী রয়েছে। হ্যারি বলল।

—ফ্রান্সিসকে নিয়ে ভেবো না। ও একা। অতি সহজেই পালাতে পারবে। আমি অতি সাবধানে যাবো। পাহারাদার সৈন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে একবার চেস্টনাটের জঙ্গলে ঢুকতে পারলেই আর ভয় নেই। শাঙ্কো বলল।

—ফ্রান্সিস নেই তার ওপর তুমি যদি বন্দী হও? আমাদের দুশ্চিন্তার শেষ থাকবে না। তুমি যেও না। হ্যারি বলল।

—হ্যারি ঐ তরবারিটার খোঁজ করতেই হবে। কিচ্ছু ভেবো না। বিপদ দেখলেই এক ছুটে সমুদ্রের ধারে চলে যাবো। তারপর সমুদ্রে নেমে পড়বো। নিঃশব্দে সাঁতরে আমাদের এই জাহাজে চলে আসবো। শাঙ্কো বলল।

—দেখ—যদি পারো। তবে তুমিও বন্দী হলে আমরা অসহায় হয়ে পড়বো। হ্যারি বলল।

—কিচ্ছু ভেবো না। শাঙ্কো বলল।

রাত একটু বাড়তেই শাঙ্কো বেলচাটা নিয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। দেখল হ্যারি দাঁড়িয়ে আছে। শাঙ্কো জাহাজের হালের দিকে গেল। দড়ির মইটা নামাল। বেলচাটা এক হাতে ঘাড়ে তুলে মইয়ের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। নৌকোয় উঠল। অনুজ্জ্বল চাঁদের আলোয় হ্যারির দিকে চেয়ে হাত নাড়ল। নৌকো ছেড়ে দিল।

জ্যোৎস্না খুব উজ্জ্বল নয়। সমুদ্রেও জলের ওপরে কুয়াশার নীলচে আস্তরন

মত। শাঙ্কো কুয়াশার আস্তরনের মধ্যে দিয়ে নৌকো চালাল। একটু বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

শাঙ্কো বৈঠে চালাল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকো তীরভূমিতে পৌঁছল। নৌকো থেকে নেমে নৌকো থেকে বেলচা তুলে নিল। নৌকোটা ঠেলে বালিয়াড়িতে এনে রাখল।

বেলচাটা কাঁধে নিয়ে শাঙ্কো চলল বুনো চেস্টনাট গাছের জঙ্গল লক্ষ্য করে। ঝোপঝাপের মধ্যে দিয়ে শাঙ্কো চলল। সদর রাস্তার কাছে এল। সাবধানে ঝোপের আড়াল থেকে সদর রাস্তার দিকে তাকাল। দেখল রাজা অপর্তোর একদল সৈন্য সারি বেঁধে জাহাজঘাটের দিকে চলেছে। কারো মুখে কথা নেই। ধুপ্ ধুপ্ পায়ের শব্দ হচ্ছে শুধু। সবার হাতে খোলা তরোয়াল। যুদ্ধের আবহাওয়া এখানে। তাই দিনরাত পাহারা চলেছে।

শাঙ্কো ভাবল এ সময়ে গোপনে কোন কাজ করা যাবে না। ভাবল—আমরা নকশা পেয়েছি। সোনার তরবারি কোথায় থাকতে পারে তারও একটা অনুমান করতে পেরেছি। এখন দরকার কাজে নামা।

একটু পরেই দেখল জাহাজঘাট থেকে একদল সৈন্য রাজবাড়ির দিকে চলেছে। ধুলোঢাকা পথে ওদের পায়ের শব্দ উঠছে ধুপ্ ধুপ্।

শাঙ্কো অপেক্ষা করতে লাগল। রাস্তার দুই দিকে তাকিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত দেখল। না। আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শাঙ্কো রাস্তায় শুয়ে পড়ল। তারপর হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলল। পথ শেষ। শাঙ্কো দ্রুত উঠে দাঁড়িয়েই এক ছুট দিল চেস্টনাট গাছের জঙ্গলের দিকে। কাঁধে বেলচা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চেস্টনাট গাছের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে আস্তে আস্তে চলল। অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্না। তার ওপর জঙ্গল। জ্যোৎস্না পড়ছেও কম। ওর মধ্যেই সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলল।

জঙ্গলের এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সেই মরা গাছটার কাছে এল। দূর থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখল একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে গাছটার কাছে। গাছটাকে ধরে গাছের গোড়ায় যেন কিছু ঢালছে। শাঙ্কো এক ছুটে গিয়ে লোকটার সামনে দাঁড়াল। লোকটা চম্‌কে উঠল। শাঙ্কো দেখল লোকটি বৃদ্ধ। গায়ে এইদেশীয় ঢোলাহাত জামা। হাতে একটা কাঠের পাত্র। বৃদ্ধটি কাঠের পাত্রটা সরিয়ে আনল। শাঙ্কো বৃদ্ধটির কাছে গিয়ে বলল—আপনি কে? ভাঙা ভাঙা গলায় বৃদ্ধটি বলল—আমি একজন বৈদ্য।

—এখানে মরা গাছটার গোড়ায় কী ঢালছিলেন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—ওষুধ। বৈদ্য বলল।

—কী ওষুধ? শাঙ্কো বলল।

—সেটা বললেও আপনি বুঝবেন না। তবু বলি ওষুধটার নাম উজিমা—গ্রীক শব্দ। অর্থ—জীবন। বৃদ্ধ বৈদ্য বলল।

—ঐ ওষুধ ঢাললেন কেন? শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল।

—যাতে গাছটা বেঁচে থাকে। বৃদ্ধ বলল।

—গাছটা তো মরে গেছে। শাঙ্কো বলল।

—না। একেবারে মরে যায় নি। ওষুধ পেলে কোনদিন মরবে না। বৈদ্য বলল।

—কেন ওষুধ দিচ্ছিলেন? শাঙ্কো বলল।

—আমরা বংশপরম্পরায় এই কাজটা করে আসছি। অবশ্যই গভীর রাতে এসে ওষুধটা দি। বৃদ্ধ বৈদ্য বলল।

—ওষুধ কি প্রতিদিন দিয়ে থাকেন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—না। মাসে একবার। বৃদ্ধ বলল।

—তাতে কি গাছটা বেঁচে যাবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। বৈদ্য বলল।

—বেশ। কিন্তু গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন কেন? শাঙ্কো বলল।

—সে অনেক কথা। যখন রাজা ওভিড্ডো এখানে রাজত্ব করতেন—তখন আমাদের পূর্বপুরুষ একজন রাজা ওভিড্ডোকে কঠিন ব্যাধি থেকে চিকিৎসা করে সুস্থ করেছিলেন। রাজা সুস্থ হয়ে একদিন গভীর রাতে আমাদের পূর্বপুরুষ চিকিৎসককে একা এখানে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন—আপনি কি এই গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন? আমাদের পূর্বপুরুষ বলেছিলেন—একটা ওষুধ আমি আবিষ্কার করেছি সেটা মাসে একবার করে এই গাছটার গোঁড়ায় দিলে গাছটি মরবে না। বৃদ্ধ বলল।

—তবে মানুষের ওপরও কি ওষুধটা প্রয়োগ করা যায় না? শাঙ্কো বলল।

—না। এটা শুধু গাছকেই চিরজীবী করতে পারে। বৃদ্ধ বলল।

—আচ্ছা—ওষুধ দিয়ে এই গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখার পেছনে কি রাজা ওভিড্ডোর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—বলতে পারবো না। বৃদ্ধ বলল।

—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গাছটা মরে গেছে। শাঙ্কো বলল।

—না। মরে যায় নি। আপনার বেলচাটা দিয়ে গাছটার কাণ্ডে জোরে খোঁচা দিন। বৃদ্ধ বলল।

শাঙ্কো বেলচাটা দিয়ে গাছটায় জোরে খোঁচা দিল। একটু পরে শাঙ্কো খোঁচা দেওয়া জায়গাটায় আঙ্গুল দিয়ে ঘষল। দেখল ভেজা ভেজা। কী যেন লেগেছে। গাছের রস। তাহলে তো গাছটা বেঁচে আছে। এ তো অকল্পনীয়।

—দেখলেন তো গাছটা এখনও জীবিত। বৃদ্ধ বৈদ্য বলল।

—হ্যাঁ। তাই তো দেখছি। শাঙ্কো বলল।

হঠাৎ নিস্তব্ধ বনটায় ঝরাপাতা ভাঙার শব্দ হল। শাঙ্কো আর বৃদ্ধটি চমকে উঠল। শাঙ্কো একটা ঝোপে বেলচাটা ছুঁড়ে ফেলে ছুটল পশ্চিমদিক লক্ষ্য করে। বৃদ্ধটি পালাতে গিয়ে আর পারল না। রাজা অপর্তোর সৈন্যরা ওকে ঘিরে ধরল।

দাড়িগোঁফওয়ালা সেই দলনেতা এগিয়ে এল। বলল—তুমি কে?

—আমি একজন কবিরাজ। এখানেই থাকি। বৃদ্ধ বলল।

—এখানে কী করছো? দাড়িগোঁফ জিজ্ঞেস করল।

—আমার এক বন্ধু আমাকে গভীর রাতে এখানে আসতে বলেছিল। বৃদ্ধ বলল।

—কেন?

—তা জানি না। বৃদ্ধ বলল।

—বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল? দাড়িগোঁফ জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা এসে পড়ায় বন্ধুটি পালিয়েছে। বৃদ্ধটি বলল।

—ঠিক আছে। আপনাকে বন্দী করা হল। দাড়িগোঁফ বলল।

—কিন্তু আমি তো কোন অপরাধ করি নি। বৃদ্ধ কবিরাজ বলল।

—এখন আমরা লড়াইয়ের মুখে। এসময় গভীর রাতে—আপনার বন্ধু এই জঙ্গলে এসব সন্দেহজনক ব্যাপার। কে জানে। হয়তো শত্রুপক্ষকে নির্দেশ দিতে এসেছিলেন। দাড়িগোঁফ বলল।

—দোহাই—আমি গুপ্তচর নই। বৃদ্ধ কবিরাজ বলল।

—সে সব পরে দেখা যাবে। চলুন। দাড়িগোঁফ বলল।

দাড়িগোঁফ দলনেতা বলল—চলো সব। ওরা ওর পেছনে পেছনে চলল।

ওদিকে শাঙ্কো চেস্টনাট গাছের জঙ্গলের মধ্যে যথাসাধ্য দ্রুত ছুটল সমুদ্রের দিকে।

শাঙ্কো হাঁপাতে হাঁপাতে দূরবিস্তৃত সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছল। দেখল চাঁদের আলো অস্পষ্ট। সমুদ্রে ঢেউও তেমন নেই। খুবই শান্ত সমুদ্র। হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। বন্দরের দিকে তাকাল। দেখল দুটো জাহাজ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওদের জাহাজ দেখা যাচ্ছে না।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে সমুদ্রে নামল। তারপর ছোট জলের ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে সাঁতার কেটে চলল।

দূর দিয়ে রাজা অপর্তোর যুদ্ধ জাহাজ পার হল। এবার ওদের জাহাজটা দেখা গেল।

শাঙ্কো সাঁতরে চলল। সাঁতরে এসে নিজেদের জাহাজের হালটা ধরল। হাঁপাতে লাগল। মুখ হাঁ করে। পূব আকাশে তখন সূর্য উঠছে।

শাঙ্কো হালের খাঁজে পা রেখে রেখে জাহাজে উঠল।

জাহাজের ডেক-এ চারপাশে বন্ধু ঘুমিয়েছিল। তাদের মধ্যে দুতিনজন শাঙ্কোকে দেখে এগিয়ে এল। বলল—কী ব্যাপার শাঙ্কো। একজন বলল—তুমি কি স্নান করলে?

—মুণ্ডু। শোন্—হ্যারিকে এখানে আসতে বল্। একজন চলে গেল হ্যারিকে ডাকতে। একটু পরেই হ্যারি এল। শাঙ্কোর ঐ অবস্থা দেখে বলল—

—কী ব্যাপার শাঙ্কো? জলে নেমেছিলে কেন?

শাঙ্কো আস্তে আস্তে সব বলল। হ্যারি বলল—খুব বেঁচে গেছো। যাক গে—বোঝা যাচ্ছে—ঐ মরা গাছটার গুরুত্ব আছে। এখন চাই ফ্রান্সিসের মুক্তি।

ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

হ্যারি—কয়েকটা ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না। সব গাছ ছেড়ে মরা গাছটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন? রাজা ওভিড্ডো কেন গাছটার গোড়ায় ওষুধ ঢালার ব্যবস্থা করেছিল। ঐ বৈদ্যরা বংশানুক্রমে ঐ মরা গাছটার গোড়ায় ওষুধ দিয়ে আসছে কেন? মরা গাছটা বেঁচে আছে এটাও একটা রহস্য। সত্যিই কি ওষুধে এখনও কাজ হচ্ছে? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ শাঙ্কো — আমার মনেও এই প্রশ্নগুলো আসছে। হ্যারি বলল। এখন আর এসব ভেবে কী লাভ? ফ্রান্সিসকে মুক্ত করে এখন দেশের দিকে জাহাজ চালাতে হবে। এ ছাড়া এখন আর কিছুই করণীয় নেই। হ্যারি বলল।

দু'দিন কেটে গেল। ফ্রান্সিস এলো না। হয়তো পালাতে গিয়ে আবার ধরা পড়েছে। ভাইকিং বন্ধুরা দুশ্চিন্তায় পড়ল। বিস্কো কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে হ্যারির কাছে এল। বলল—তুমি রাজি হলে আমরা কয়েকজন ফ্রান্সিসের খোঁজে যেতে পারি।

—না না—হ্যারি বলল—শাঙ্কো অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছে। তোমরাও বন্দী হলে আমরা বিপদে পড়ে যাবো। তার চেয়ে ফ্রান্সিসের জন্য আমরা অপেক্ষা করবো।

আরো একদিন কাটল। ফ্রান্সিস এল না।

সেদিন গভীর রাত। নজরদার পেড্রো গা এলিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে নজরদারের বসার আসনে বসেছিল। একটু তন্দ্রামতই এসেছিল। সমুদ্রের উত্তাল বাতাস সত্ত্বেও নিচে দুএকজনের গলার শব্দ শুনল! পেড্রোর তন্দ্রা ভেঙে গেল। ও নিচের দিকে তাকাল। সর্বনাশ! ও দেখল একটা যুদ্ধ জাহাজ ওদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। ঐ জাহাজ থেকে যুদ্ধসাজ পরা সৈন্যরা ওদের জাহাজে উঠে আসছে।

পেড্রো সঙ্গে সঙ্গে মাস্তুল বেয়ে নামতে গেল। দেখল একজন সৈন্য ওর আসন ধরে উঠে দাঁড়াল। হাতে খোলা তরোয়াল। সৈন্যটি বলল—নেমে এসো। একটা কথা জোরে বললে তুমি মরবে।

পেড্রো আস্তে আস্তে নেমে এল। দেখল—একদল সৈন্য ডেক-এ জড়ো হয়েছে। পেড্রোকে ডেক-এর একপাশে বসিয়ে রাখা হল।

সৈন্যরা সব প্রথমে অস্ত্রঘরে ছুটে গেল। দুজন ভাইকিং প্রহরীকে আহত করল। ওখানে চারজন সৈন্য অস্ত্রঘর পাহারা দিতে লাগল।

সৈন্যরা কেবিনঘরে ঢুকে ঢুকে নিদ্রিত ভাইকিংদের তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে ঘুম ভাঙাল। ভাইকিংরা চমকে জেগে উঠে দেখল খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্যরা। কিছু করার নেই। খালি হাতে লড়াই চলে না। একজন ভাইকিং ঘর থেকে পালাল। গেল অস্ত্রঘরের কাছে। দেখল চারজন সৈন্য অস্ত্রঘর পাহারা দিচ্ছে।

ওদিকে ভাইকিংরা ডেক-এ উঠে এলেই ডেক-এর একপাশে তাদের বসিয়ে

দেওয়া হতে লাগল। মারিয়াকেও বসিয়ে দেওয়া হল।

একজন সৈন্য ওদের জাহাজে সেনাপতিকে খবর দিতে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি ভাইকিংদের জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। সেনাপতির দশাসই চেহারা। ইয়া গোঁফ। মাথার চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। কানের নিচে তরোয়ালের কাটা দাগ।

সেনাপতি ডেক-এর এপার ওপার পায়চারি করল। হ্যারিদের কাছে এসে দাঁড়াল। তখন হ্যারি উঠে দাঁড়াল। সৈন্যরা ছুটে এল। সেনাপতি হাত তুলে ওদের থামাল। হ্যারি বলল—আমরা জানিনা। আপনারা কারা?

সেনাপতি দাঁত বের করে হাসল। বলল—আমরা নরুল্লার রাজা ভিলিয়ানের সৈন্য। আমি সেনাপতি। তোমাদের কাউকে একটু বেচাল দেখলে মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।

একটু থেমে সেনাপতি বলল—তোমরা তো দেখছি বিদেশী। তোমরা কারা? এখানে এসেছো কেন?

—আমরা বিদেশী। আমরা ভাইকিং। দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াই আর কোন গুপ্তধনের কথা শুনলে সেটা বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করি।

—এখানেও শুনেছি রাজা ওভিড্ডোর একটা সোনার তরবারি আর তার খাপ রাখা আছে। তোমরা খুঁজবে নাকি? কথাটা বলেই সেনাপতি হো হো করে হেসে উঠল। সৈন্যরাও কেউ কেউ হাসল।

—যাক গে ওসব গুপ্তধনটনের কথা। তোমাদের দলপতি কে? সেনাপতি বলল।

হ্যারি এগিয়ে এসে বলল—এখন আমিই দলপতি। আসল দলপতি যে সে রাজা অপর্তোর হাতে বন্দী।

—শোন সেনাপতি বলতে লাগল—আমরা রাজা অপর্তোর এই দেশ দখল করতে এসেছি। কেউ কি নিজের সম্পত্তি ছাড়ে? ছাড়ে না। রাজা অপর্তোও ছাড়বে না। কাজেই যুদ্ধ হবে। আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। সেনাপতি থামল।

—এ সবের সঙ্গে আমাদের কী যোগ? আমরা তো কারো পক্ষ হয়েই যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। হ্যারি বলল।

—কেন? আমাদের হয়ে তোমরা যুদ্ধ করতে পারো। সেনাপতি বলল।

—না। আমরা কোন দেশেই যাবো না। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। সে সব পরে দেখা যাবে। এখন এই যুদ্ধের জন্যে আরো জাহাজের প্রয়োজন। মাত্র দুটো জাহাজ নিয়ে এসেছি। অনেক সৈন্যকে ভিগোতে রেখে আসতে হয়েছে। সেই সৈন্যদের নিয়ে আসবো। এখনই তোমাদের জাহাজটা আমরা নেব। জাহাজ চালিয়ে ভিগোতে যাবো। আরো সৈন্য নিয়ে ফিরে আসবো। সেনাপতি বলল।

—ঠিক বুঝলাম না। হ্যারি বলল।

—এ তো জলের মত সহজ। তোমাদের জাহাজ আরো সৈন্য আনতে ভিগো

যাবে। তোমরাই চালিয়ে যাবে। আমাদের এক দলপতি তোমাদের সঙ্গে যাবে। তারপর ভিগো থেকে সৈন্য নিয়ে এই জাহাজে ফিরে আসবে। ব্যস। সেনাপতি বলল।

—কিন্তু আমাদের দলপতি এখনো রাজা অপর্তোর সৈন্যাবাসে বন্দী। সে যেকোন মুহূর্তে এখানে আসতে পারে। হ্যারি বলল।

—পালিয়ে? সেনাপতি বলল।

—হ্যাঁ। হ্যারি বলল।

—অত সহজে পালাতে পারবে না। সেনাপতি বলল।

—সহজ কঠিন যে অবস্থাই হোক না—সে পালাবে। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। তাতে কী হল? সেনাপতি বলল।

—সে এসে আমাদের না দেখলে দুশ্চিন্তায় পড়বে। হ্যারি বলল।

তার ব্যবস্থাও আমরা করবো। আমি তো রয়েইছি। জাহাজ ভর্তি সৈন্য রয়েছে। আমরাই তাকে তোমাদের কথা বলবো। তাহলেই সে নিশ্চিন্ত হবে। কী? ঠিক আছে? হ্যারি কিছুক্ষণ ভাবলো। শাঙ্কোকে বলল—কী করবে?

—এ ছাড়া তো কোন পথ দেখছি না। শাঙ্কো বলল।

—ভেন তুমি কী বল? হ্যারি ভেন-এর মতামত চাইল।

—দ্যাখ হ্যারি এখানে যে কোন মুহূর্তে লড়াই লেগে যেতে পারে। এখন এখানে থাকাটা খুবই বিপজ্জনক। ভিগোতে যেতে আসতে কত আর সময় লাগবে। ভেন বলল।

—বেশ। সেনাপতির দিকে তাকিয়ে হ্যারি বলল—ঠিক আছে। আমরা যাবো।

—এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা। তাহলে দেরি না করে কালকে সকালেই তোমাদের জাহাজ ছাড়ো। আর একটা কথা। দূরত্ব আর কুয়াশার জন্যে রাজা অপর্তোর সৈন্যরা আমাদের অবস্থান কিছু বুঝতে পারছে না। কুয়াশা কেটে গেলেই আমাদের দেখতে পাবে। আমাদের আর তোমাদের জাহাজ এখনই বেশ দূরে নিয়ে যেতে হবে। রাজা অপর্তোর সৈন্যদের নজরের বাইরে তোমরা নোঙর ফেলো। সেনাপতি বলল।

সেনাপতি নিজেদের জাহাজে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সেনাপতির জাহাজ দুটো গভীর সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। হ্যারি ফ্রেজারকে বলল—ওদের পেছনে পেছনে চলো। ফ্রেজার সেই হিসেবেই জাহাজ চালাতে লাগল।

অনেকটা দূরে গিয়ে সেনাপতির জাহাজ দুটো থামল। হ্যারিও জাহাজ দুটোর পাশে নিজেদের জাহাজ লাগাতে বলল। ফ্রেজার জাহাজ লাগাল।

একটু পরেই ভোর হল। হ্যারি তখনও জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে চেয়ে দেখল—কুয়াশা সরে গেলেও তীরভূমি দেখা যাচ্ছে না।

হ্যারিরা সকালের খাবার খাচ্ছে তখনই দলপতি মারফত সেনাপতি জানিয়ে

দিল যে দুপুরের খাওয়া খেয়ে হ্যারিদের জাহাজ ছাড়তে হবে।

দুপুরের খাওয়া হলে দলপতি এসে বলল—এখন তোমাদের জাহাজ ছাড়ো। মারিয়া হ্যারির কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিসের কোন বিপদ হবে না তো? হ্যারি বলল—চিন্তা করবেন না রাজকুমারী' আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে আসবো। তাছাড়া আপনি যাতে এখানেই সেনাপতির জাহাজে থাকতে পারেন তাঁর ব্যবস্থা করছি।

হ্যারি দলপতির কাছে এল। বলল—আমি সেনাপতির সঙ্গে একটা জরুরী কথা বলবো।

—কী জরুরী কথা?

—সেটা তাকেই বলবো?

—বেশ। খোঁজ নিচ্ছি। দলপতি কথাটা বলে ওদের জাহাজের একজন সৈন্যকে বলল—দেখতো সেনাপতি কী করছেন। সৈন্যটা চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বলল—সেনাপতি বিছানায় বসে আছেন।

—তার মানে তাঁর বিশ্রাম করা হয়ে গেছে। দলপতি বলল। তারপর হ্যারিকে আসতে বলল।

দুজনে সেনাপতির জাহাজে গেল। সেনাপতির কেবিন ঘরের সামনে এসে আস্তে দরজায় টোকা দিল। সেনাপতির গুরুগম্ভীর গলা শোনা গেল—কে?

—আমি দলপতি।

—এসো। সেনাপতি বলল।

দুজনে কেবিনঘরে ঢুকল। সেনাপতি দলপতির দিকে তাকিয়ে বলল—কী ব্যাপার।

হ্যারিকে দেখিয়ে দলপতি বলল—এই ভাইকিং আপনাকে কিছু বলতে চায়।

—বলো। সেনাপতি হ্যারির দিকে তাকাল।

—বলছিলাম আমাদের সঙ্গে দেশের রাজকুমারী রয়েছেন। তাঁকে ভিগোতে নিয়ে যাবো না। তিনি আপনাদের জাহাজেই এখানে থাকবেন। আপনি এই অনুমতিটা দিন। হ্যারি বলল।

—বেশ। থাকবে। সেনাপতি বলল।

—আপনাকে যে কী বলে—হ্যারি বলতে গেল। সেনাপতি থামিয়ে দিয়ে বলল—যাও—তাকে আমাদের জাহাজে নিয়ে এসো। মারিয়াকে সেনাপতির জাহাজে নিয়ে আসতে সমস্যা হল। প্রথমে মারিয়া নিজেদের জাহাজ ছেড়ে আসতে চাইল না। হ্যারি আর ভেন অনেক করে বলেও মারিয়াকে রাজি করাতে পারছিল না। তখন ভেন বলল—এখানে জাহাজে থাকলে ফ্রান্সিস প্রথমে আপনাকেই দেখবে। ও কত খুশি হবে। এবার মারিয়া রাজি হল। দুটো জাহাজের মাঝখানে দুটো পাটাতন ফেলা হল। শাঙ্কো মারিয়াকে পাঁজকোলা করে পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে সেনাপতির জাহাজে এল। মারিয়াকে নামিয়ে দিল। সেনাপতির জাহাজ এল। জাহাজ ছাড়ার উদ্যোগ আয়োজন চলল। পাল

দড়িদড়া সব দেখে নেওয়া হল। দলপতির সঙ্গে চারজন সশস্ত্র সৈন্য হ্যারিদের জাহাজে এল।

জাহাজ ছাড়া হল। বাতাস বেগবান। পালগুলো ফুলে উঠল। এখন আর দাঁড় বাইতে হবে না। আকাশও নির্মেঘ। জাহাজ বেশ জোরেই সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে চলল। হ্যারি জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। কোথায় যাচ্ছি। বিপদ হবে না তো, এসব ভাবতে লাগল।

একদিন দুপুর নাগাদ জাহাজ ভিগো নগরের জাহাজঘাটায় পৌঁছল। দূর থেকে শহরটা দেখে হ্যারিরা খুব খুশি। কতদিন পরে মাটিতে হাঁটবে। লোকজন দোকানপাট দেখবে। শহরের ভিড়ে ঘুরে বেড়াবে। রাতে আলোর রোশনাই দেখবে।

জাহাজ ঘাটে ভিড়ল। দলপতি এগিয়ে এল। বলল—সবাই নামো।

সবাই জাহাজ থেকে নামল। তারপর গিয়ে দাঁড়াল। দলপতি এগিয়ে এল। বলল—তোমরা সার বেঁধে চলো। হঠাৎ আরো জনাদশেক সশস্ত্র সৈন্য কোথা থেকে এল। হ্যারিদের ঘিরে দাঁড়াল। ভেন ইশারায় হ্যারিকে কাছে ডাকল। হ্যারি ভেন-এর কাছে এল। ভেন বলল—হ্যারি আমরা বোধহয় বিপদে পড়লাম।

—তা কেন। আমরা তো বন্দী। এভাবেই তো নিয়ে যাবে। হ্যারি বলল। মাথা নেড়ে ভেন বলল—আমাদের পাহারা দেবার জন্যে এত সৈন্যের কি প্রয়োজন আছে?

—ঠিক বুঝতে পারছিনা—এত সৈন্য কেন? হ্যারি বলল।

—তার মানে কিছু একটা ঘটবে যার জন্যে আমরা বিদ্রোহী হতে পারি। তাই এত সৈন্য। ভেন বলল।

হ্যারি ভাবল। বলল—ভেন—আমি যেন এখন বুঝতে পারছি ঐ দলপতির কথা না শুনলেই হত।

—তারও তো উপায় ছিল না হ্যারি। ভেন বলল।

—না। উপায় ছিল। আমরা বলতে পারতাম যে আমরা যাব না। আপনারা জাহাজ নিয়ে যান। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ এটাই করা উচিত ছিল। যাক গে—দেখি এরা আমাদের নিয়ে কী করে। ভেন বলল।

হ্যারিরা চলেছে। এই ভর দুপুরেও রাস্তায় বেশ লোকজন। হ্যারিরা যেমন রাস্তার লোকজন দেখছে তেমনি রাস্তার লোকজনও হ্যারিদের দেখছে। লোকেরা ভাবছে কারা এই বিদেশী। সৈন্যরা ঘিরে এদের নিয়ে যাচ্ছে কেন? কোথায় যাচ্ছে?

একটা বেশ বড় পাথরের বাড়ির সামনে হ্যারিদের থামতে বলা হল। বাড়িটার তুলনায় প্রবেশ দ্বার খুবই ছোট। একজন একজন করে ঢোকা যায়। প্রবেশ দ্বারের দুপাশে চার পাঁচজন প্রহরী। হাতে বর্শা। কোমরে তরোয়াল গোঁজা।

হ্যারি ঘুরে দাঁড়াল। দলপতির কাছে গেল। বলল—এটা কয়েদখানা। আমরা

এখানে এসে কয়েদখানায় থাকবো সেনাপতির সঙ্গে তো তেমনি কথা হয় নি।

—আমি নিরুপায়। এটা সেনাপতির হুকুম। দলপতি বলল। হ্যারি দুহাত তুলে চিৎকার করে বলল—আমরা এই কয়েদখানায় ঢুকবো না। আমাদের সরাইখানায় রাখা হোক। ভাইকিং বন্ধুরাও ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝতে পারলো। ভাইকিংরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। ভাইকিংদের ক্রুদ্ধ চেহারা দেখে দলপতি একটু ঘাবড়ে গেল। হ্যারি উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল। বন্ধুরাও ওর পেছনে এসে দাঁড়াল। বিস্কো চিৎকার করে বলে উঠল—এই বাড়িতে আমরা ঢুকবো না। আমাদের কোন সরাইখানায় নিয়ে যেতে হবে। শুরু হল হৈ হল্লা। হ্যারিরা তখন সারি ভেঙে ফেলেছে। সেনাপতি গলা চড়িয়ে বলল—সবাইকে ঘিরে রাখো। সৈন্যরা পরস্পর হাত ধরে হ্যারিদের আটকে রাখল। দলপতি দু'হাত ওপরে তুলে চিৎকার করে বলল—তোমরা শোন। এটা সেনাপতির হুকুম। আমাকে মানতেই হবে। যদি না মানি তাহলে আমাকে মরতে হবে। তোমরা কি চাও আমার মৃত্যু হোক। আমি তো তোমাদের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করি নি।

হৈ হল্লা কমল। হ্যারি ভেনকে বলল—ফ্রান্সিস নেই। আমি কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না।

—বাধা দিয়ে লাভ নেই। ওরা সংখ্যায় বেশি। তার ওপর আমরা নিরস্ত্র। ওরা যদি তরোয়াল চালায় আমরা কেউ বাঁচবো না। বন্দী জীবন মেনে নাও। এখন এটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। হ্যারিও সেটা বুঝতে পারছিল। জাহাজঘাটা থেকে আরো যে সৈন্য ওদের সঙ্গে এলো এটাও সেনাপতির ধূর্তামি।

হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব। এখন এভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে আমরাই বিপদে পড়বো। আমরা নিরস্ত্র নিরুপায়। এখন বন্দীদশা মেনে নাও। আমার অনুরোধ শান্ত হও। সময় ও সুযোগ নিশ্চয়ই আসবে। তার জন্যে বেঁচে থাকতে হবে। সশস্ত্র সৈন্যরা যদি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমরা কেউ বাঁচবো না। হৈ হট্টগোল থেমে গেল।

ভাইকিংরা আস্তে আস্তে লোহার দরজা দিয়ে ঢুকতে লাগল। ঢোকার আগে শাঙ্কো জোর গলায় বলে উঠল—সেনাপতি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। হ্যারি জোরে বলে উঠল—শাঙ্কো—শান্ত হও। মাথা গরম করো না।

সবাই ভেতরে ঢোকার পর হ্যারি ঢুকল। একটা চত্বরমত পার হয়ে সারি সারি ঘর। প্রত্যেকটি ঘরের সম্মুখে প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ঘরটি ছেড়ে তৃতীয় ঘরটার সামনে এল সবাই। দলপতি দাঁড়াতে হুকুম দিল। ভাইকিংরা দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রহরী চাবি দিয়ে দরজা খুলল। বেশ শব্দ করে দরজাটা খুলল। ভাইকিংরা ঘরটায় ঢুকল। ঘরটা বেশ বড়। কাঠ পাথর আর ঘাস দিয়ে তৈরি ছাতের কাছাকাছি দুদিকে দুটো জানালা। জানালা দুটোতে গরাদ নেই। মেঝেয় একটা মোটা কাপড় পাতা। কাপড়টায় সুতোর কাজ করা। দুদিকের দুটো পাথুরে দেয়ালে দুটো আংটায় লাগানো আছে দুটো মশাল। তার একটা এই

দিনের বেলাতেও জ্বলছে।

মেঝেয় শুয়ে ছিল তিনজন বন্দী। হ্যারিদের দেখে দুজন উঠে বসল। হ্যারিরা ততক্ষণে বসে পড়েছে। পুরোনো বন্দীদের একজন বলল—তোমরা কারা? দেখে তো মনে হচ্ছে তোমরা বিদেশি।

হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো। আমরা ভাইকিং দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। কথাটা বলে হ্যারি মোটা কাপড়টায় শুয়ে পড়ল মাথার পেছনে দুহাতের তেলো রাখল। তারপর চোখ বুঁজল। অনেক কিছু ভাবতে হচ্ছে। ফ্রান্সিস এখনও মুক্তি পেল না। পালাতেও পারল না। রাজকুমারী রইলেন সেনাপতির জাহাজে। ওরা নিজেরা এখানে বন্দী হয়ে রইল। এটা অপ্রত্যাশিত। এখান থেকে মুক্তি পাবো কবে। হয় তো এখানেই সবাই এক এক করে মরবো। ফ্রান্সিস, রাজকুমারীর সঙ্গে হয়তো আর দেখাই হবে না।

হ্যারি চোখ খুলল। তাকিয়ে রইল ছাতের দিকে। কাঠ পাথর আর শুকনো লম্বা লম্বা ঘাসে তৈরি ছাতটা। তারপর তাকালো জানালা দুটোর দিকে। জানালা পর্যন্ত উঠতে পারলে গরাদহীন জানালা দিয়ে পালানো সম্ভব। সেটা কীভাবে সম্ভব?

শাঙ্কো এসে হ্যারির কাছে বসল। ওপরের দুটো খোঁদল দেখিয়ে বলল—হ্যারি যদি ঐ খোঁদলটার কাছে কোনরকমে পৌঁছানো যায় তবে আমরা মুক্ত হতে পারবো। হ্যারি খোঁদল দুটো ভালো করে দেখল মেঝে থেকে খোঁদল দুটোর উচ্চতা হিসেব করল। বলল—হ্যাঁ এটা সম্ভব। কিন্তু অত উঁচুতে পৌঁছোতে পারলে তবে তো।

—হুঁ—অত উঁচুতে পৌঁছোনোটাই আসল সমস্যা। শাঙ্কো বলল।

—আগে সেটাই ভাবো। হ্যারি বলল।

—হুঁ ভাবছি। শাঙ্কো থামল। তারপর বলল—হ্যারি, প্রথমেই চাই একগাছা দড়ি।

—এখানে দড়ি পাবে কি করে? হ্যারি বলল।

—পাবো। শোন হ্যারি—আমরা নিজেদের মধ্যে মারপিট শুরু করব। গোলমাল থামাতে প্রহরীরা নিশ্চই ঘরের মধ্যে ঢুকবে। আমরা তবু মারপিট চালিয়ে যাবো। প্রহরী থামাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমরা থামবো না। ওরা দলপতিকে খবর দেবে। দলপতি আসবে। জানতে চাইবে এরকম মারামারির কারণ কী? তুমি দলপতিকে বলবে এরা সবাই গুণ্ডা খুনে। সবাইকে দড়ি দিয়ে বাঁধুন। আবার মারপিট শুরু করবো। দলপতি প্রহরীদের দড়ি এনে বাঁধতে বলবে। প্রহরী দড়ি কেটে ছোট করে হাত বাঁধবে। এইবার হল বুদ্ধির খেলা। তুমি প্রহরীদের বলবে বাঁধা হাতের মধ্যে দিয়ে একটা লম্বা দড়ি ঢুকিয়ে দাও। সবাই একসঙ্গে বন্দী হয়ে থাকবে। আর মারপিট করতে পারবে না। ঐ দড়ির সঙ্গে একটা পাথরের টুকরো বেঁধে কড়িকাঠের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে দড়ি নিয়ে আসবো। এবার দড়ি বেয়ে উঠে ঐ খোঁদল দিয়ে বাইরে যাওয়া আর পালানো। হ্যারি

শাঙ্কোর পরিকল্পনা ভেবে দেখল। হাসল। বলল—সাবাস শাঙ্কো। তুমি ফ্রান্সিসের মতই সমস্যার সমাধান করতে শিখেছো। দেখ চেষ্টা করে।

শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। ফিসফিস করে বলল—ভাইসব—কাছে এসো। সবাই শাঙ্কোর কাছে এল।

আমি এখান থেকে পালাবার জন্যে একটা পরিকল্পনা করেছি। হ্যারিকে বলেছি। সেই পরিকল্পনা তোমাদের বলি। একমাত্র এই ভাবেই পালানো সম্ভব। শাঙ্কো থামল। তার পর হ্যারিকে যেমন বলেছিল তেমন করে চাপা গলায় সব বলে গেল। শাঙ্কোর কথা শেষ হলে ভাইকিং বন্ধুরা মৃদুস্বরে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

শাঙ্কো বসল। বলল—হ্যারি, এবার সময়টা ঠিক করো। হ্যারি বলল—দিনে তো পারা যাবেই না। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর।

—আজকেই, বলল শাঙ্কো।

—বেশ আজকেই পালাবো। হ্যারি বলল।

দিন শেষ হল। রাতে হ্যারিদের খেতে দেওয়া হল। খাওয়া শেষ করে সবাই শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বাদে। শাঙ্কো তখনও ঐ পরিকল্পনাটা ভাবছে। সম্ভাব্য ঘটনাও ভাবছে। মোট কথা শাঙ্কো সবদিক ভেবে স্থির সঙ্কল্পে এল।

তখন বেশ রাত। হঠাৎ কয়েদঘরে হৈ চৈ শুরু হল। প্রথমেই শাঙ্কোরা রাজা অপর্তোর যে ক'জন সৈন্য বন্দী ছিল তাদের ওপর চড়াও হল। রাজা অপর্তোর সৈন্যরা অবাক। শুরু হল ধাক্কাধাক্কি। ভাইকিংরা নিজেদের মধ্যেও মারপিট শুরু করল।

তিনজন প্রহরী ছুটে এল। দরজার কাছে দাঁড়াল। মারামারি দেখল। গলা চড়িয়ে বলল প্রহরীরা—মারামারি থামাও নইলে আমি দলপতিকে খবর দিতে যাচ্ছি। হ্যারি চাপা গলায় বলল—চালাও। ভাইকিংরা চিৎকার করতে করতে পরস্পরের ঘাড়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল।

তিন প্রহরী সমস্যায় পড়ল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। একজন ছুটল দলপতির বাড়ির দিকে। মারামারি গোলমাল কিছুটা থামল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দলপতি এল। আবার চিৎকার চ্যাঁচামেচি জোরে শুরু হল। দলপতি গলা চড়িয়ে বলল—এসব মারপিট এখানে চলবে না। থামো সব। কে কার কথা শোনে। হ্যারি বন্ধুদের কাছে এসে আস্তে বলে গেল—কয়েকজন মেঝেয় পড়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে তিন জন ভাইকিং পর পর মেঝেয় পড়ে গেল। দলপতি প্রহরীদের দরজা খুলতে বলল। দরজা খোলা হল। দলপতি এগিয়ে গেল। চীৎকার করে বলে উঠল—এ সব গুণ্ডামি বন্ধ কর। নইলে চাবুকের মার খাবে।

মারামারি হৈহল্লা আরও বেড়ে গেল। হ্যারি দলপতির কাছে গেল। বলল—যদি আমার কথা শোনেন তো বলি।

—বলো। দলপতি বলল।

—এরা সবাই গুণ্ডা খুনে। এদের হাত বেঁধে দিন। তাহলে আর মারামারি করতে পারবে না।

—ঠিক আছে। তাই করছি। সেনাপতি বলল। তারপর প্রহরীদের ডাকল। প্রহরীরা দলপতির কাছে এগিয়ে গেল। দলপতি বলল—সব কটার হাত বাঁধ। যদি তার পরেও মারামারি করে সবকটাকে চাবুক মার। কেউ যেন বাদ না যায়।

দলপতি চলে গেল।

এবার হ্যারি প্রহরীদের বলল—শক্ত দড়ি এনে বাঁধো সবকটাকে।

দুজন প্রহরী দড়ি আনতে ছুটল। একটু পরে লম্বা দড়ি আনল। দড়ি দিয়ে হ্যারি ভাইকিং বন্দীদের দুহাত বাঁধতে লাগল। রাজা অপর্তোর বন্দী সৈন্যরাও বাদ গেল না। দড়ি বাঁধা হলে হ্যারির হাতও প্রহরীরা দড়ি দিয়ে বাঁধল। হ্যারি দেশীয় ভাষায় বলল—গণ্ডগোল কমাও। ভাইকিংরা চুপচাপ মেঝেয় পাতা কাপড়ে বসে পড়ল।

হ্যারি প্রহরীদের বলল—ভাই একটা কাজ কর। প্রত্যেক দড়ি বাঁধা হাতের মধ্যে দিয়ে একটা লম্বা শক্ত দড়ি ঢুকিয়ে দাও। সবাই বাঁধা পড়ে যাবে। গণ্ডগোল কমবে।

প্রহরীরা তাই করল। এবার সব চুপ।

প্রহরীরা বেরিয়ে গেল। বাইরের বারান্দায় গিয়ে পাহারা দিতে লাগল।

রাতের খাওয়া দাওয়া মিটল। প্রহরীরা এঁটো কাঠের বাসন গ্লাশ নিয়ে চলে গেল। শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। গলার ঢোলা ফাঁক দিয়ে হাত ঢোকাল। ছোরাটা বের করল। তারপর সবাইর হাত বাঁধা দড়ি কেটে দিল। রাত বেশি হতে লাগল। ভাইকিংরা সবাই চুপচাপ শুয়ে রইল।

গভীর রাত তখন। শাঙ্কো আবার উঠে বসল তারপর লম্বা দড়িটার একমাথা থেকে টেনে টেনে সবটা খুলে নিল। লম্বা দড়ির একটা মাথায় পাথরের টুকরো বাঁধল। তারপর দড়িটা দোলাতে লাগল। একবার বেশি জোরে দুলিয়ে নিয়ে পরের দিকে কড়িকাঠ লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। মাথাটা কড়িকাঠের আর ছাদের মধ্যে দিয়ে দিয়ে পাথর বাঁধা মুখটা নিচে পড়ে গেল। শাঙ্কো দড়ির মুখটা এবার কোমরে বেঁধে নিল। বন্ধুরা দড়ির অন্য মুখটা টেনে ধরল। শাঙ্কো এবার দড়ি ধরে ধরে আস্তে আস্তে উঠে কড়িকাঠটা ধরল। তারপর ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে চলল খোঁদলটার দিকে। তখনই হঠাৎ কড়িকাঠের কাঠটায় মচ্ করে শব্দ হল। শাঙ্কো সাবধান হল। খুব আস্তে আস্তে ঝুলতে ঝুলতে খোঁদলটার কাছে এল। তারপর মাথাটা খোঁদলে ঢুকিয়ে দিয়ে পার হল। ওধারে গিয়ে এবার থামতে লাগল। ঘরে তখন কয়েকজন বন্ধু দড়িটা টেনে ধরে রাখল। শাঙ্কো আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে এল। একবার দাঁড়িয়ে চারদিক দেখল। একটা মাঠমত জায়গা পরে পাথরের বাড়িঘর। কোন বাড়িঘরেই আলো নেই। শাঙ্কো কোমরের বাঁধা দড়ি খুলল।

এবার প্রথমে দড়ি ধরে উঠতে লাগল ভেন। বেশ কসরৎ করেই ভেন

খোঁদলে গিয়ে পৌঁছল। তারপর মাথা ঢুকিয়ে খোঁদলের বাইরে চলে এল। শাঙ্কো দড়িটা টেনে ধরে রইল। ভেন আস্তে আস্তে নেমে এল। ভেন তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। রাজা অপর্তোর বন্দী সৈন্যরা একে একে বেরিয়ে এল কয়েদঘর থেকে। একইভাবে সবাই কয়েদঘরের বাইরে চলে এল। শাঙ্কো বলল—জাহাজঘাটে যাওয়ার রাস্তাটা কোনদিকে বুঝতে পারছি না।

—আমাদের দক্ষিণমুখে যেতে হবে। হ্যারি বলল। তারপর সেদিকে হাঁটতে লাগল। চাঁদের আলো খুব বেশি উজ্জ্বল নয়। সেই অনুজ্জ্বল আলোতে হ্যারিরা এগিয়ে চলল। মিনিট দশ পনেরো হাঁটার পরই বাঁ দিকে দেখল বড় রাস্তা। চলেছে দক্ষিণমুখো। হ্যারি ঐ দিকেই চলল।

হ্যারিদের ভাগ্য ভালো। পথে কোন সৈন্যের সঙ্গে দেখা হল না। দেখা হলে ভাগ্যে ভোগান্তি ছিল।

হ্যারিরা যখন জনশূন্য পথ দিয়ে এসে জাহাজঘাটে পৌঁছল তখন পূব আকাশে লাল ছোপ ধরেছে। কিছু পরেই সূর্য উঠল।

হ্যারি যে ভয়টা পেয়েছিল তাই হল। জাহাজঘাটায় এসে ওরা দেখল ওদের জাহাজটা নেই। আট দশটা জাহাজ রয়েছে এই বন্দর শহরে। কিন্তু ওদের জাহাজটা নেই।

হ্যারিরা সমস্ত জাহাজঘাটা এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখল। কিন্তু কোথায় ওদের জাহাজ? হ্যারি জাহাজঘাটার পাথরের ঘাটে বসে পড়ল। বন্ধুরাও কেউ কেউ দাঁড়িয়ে রইল কেউ কেউ বসল। হ্যারি মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর মুখ তুলে বলল—উপায় নেই। এখানেই একটা জাহাজ কিনতে হবে।

কিন্তু বিক্রি করবে এমন জাহাজ কি এখানে পাওয়া যাবে? শাঙ্কো বলল।

—চেষ্টা তো করতে হবে। তারপর দেখা যাক। হ্যারি বলল। বন্ধুরাও এই প্রস্তাবে সম্মত হল। তখন হ্যারি শাঙ্কোকে বলল—শাঙ্কো তোমার কাছে ক'টা সোনার চাকতি আছে বলো। শাঙ্কো একবার আড় চোখে এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দেখে নিল। তারপর ফেট্টি থেকে সোনার চাকতিগুলো বার করে গুনল। বলল—একশ চল্লিশটা স্বর্ণমুদ্রা আছে।

—দেখা যাক যারা বিক্রি করবে তারা কত চায়। হ্যারি বলল। হ্যারি উঠে দাঁড়াল। বলল—সবাই দল বেঁধে বেরুলে সহজেই রাজা ভিত্তোরিয়ানের সৈন্যদের চোখে পড়ে যাবো। তা ছাড়া এতক্ষণে পাহারাদাররা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে আমরা পালিয়েছি। কাজেই সবাই এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়। আমি আর শাঙ্কো একসঙ্গে থাকবো। জাহাজ কেনার জন্যে ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করবো। তারপর জাহাজ পাই বা না পাই সবাই এখানে আসবো। ঠিক এক ঘণ্টা পরে তোমরাও একে একে এই ঘাটে আসবে। একসঙ্গে নয়। এইভাবে দল বেঁধেও থাকবো না। তোমরা এলে শাঙ্কো তোমাদের কাছাকাছি এসে জাহাজ কেনা হয়েছে কিনা সেটা ফিস ফিস করে বলবে। না কেনা হলে এখন কী করবো সেটাও শাঙ্কো বলে দেবে।

সবাই ছড়িয়ে পড়ল। হ্যারি তীরে বাঁধা জাহাজগুলোয় উঠতে লাগল। বলতে

লাগল—জাহাজটা বিক্রি করবেন কিনা। জাহাজের ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে বলল—না। অন্য জাহাজ দেখুন। প্রায় সব কটা জাহাজেই হ্যারি গেল। কিনতে চাইল। কেউ রাজি হল না।

একটা জায়গায় দেখল সমুদ্রের জল খাঁড়ির মত একটা জায়গায় ঢুকে গেছে। সেখানে জলে ভাসছে একটা ছোট জাহাজ।

—চলো শাঙ্কো—এই ছোট জাহাজটাও দেখা যাক। হ্যারি বলল।

দুজনে তীরে রাখা পাটাতনটা দিয়ে জাহাজে উঠল। তিনজন নাবিক ডেকটা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছিল। ওদের একজনকে হ্যারি বলল—এই জাহাজের মালিকের সঙ্গে দেখা করবো।

—মালিক কে আমরা জানি না। আমাদের ক্যাপ্টেনই সব। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

হ্যারিরা কথা বলছে তখনই ক্যাপ্টেন ওদের দেখল। ক্যাপ্টেন কাছে এল। বেশ ভারি গলায় বলল—আপনাদের পরিচয়?

—আমরা ভাইকিং। দেশে দ্বীপে ঘুরে বেড়াই। হ্যারি বলল।

—ও। ক্যাপ্টেন চিবুকের কাঁচাপাকা দাড়ি চুলকে বলল—আপনারা এই দেশে এসেছেন কেন।

—অল্প কথায় তা বলা যাবে না আসার কারণ—আপনারা যদি এই জাহাজটা বিক্রি করেন আমরা কিনতে পারি। শাঙ্কো বলল।

—দেখুন—ক্যাপ্টেন বলল—এই জাহাজটা আমরা বিক্রি করবো। তারপর লিসবনে চলে যাবো। ক্যাপ্টেন বলল।

—তাহলে আপনারা বিক্রি করবেন? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। অনেক ভেবেই স্থির করেছি জাহাজটা বিক্রী করে দেব। ক্যাপ্টেন বলল।

—কটা সোনার চাকতি লাগবে? হ্যারি বলল।

—সেটা পরে বলছি। আগে জাহাজটা ঘুরে দেখুন। ক্যাপ্টেন বলল।

—ঠিক আছে। হ্যারি বলল।

হ্যারি শাঙ্কোকে নিয়ে জাহাজটা ঘুরে ঘুরে দেখল। খুব দামি জাহাজ নয়। তবে মোটামুটি সব ব্যবস্থাই আছে। জাহাজের ডেক কেবিনঘর স্নানঘর খুবই নিকৃষ্টমানের। ভাইকিংদের ছেলেবেলা থেকেই দুটো জিনিস দেখে শেখে —এক সমুদ্র দুই জাহাজ নৌকো। ওদের অর্থ বেশি নেই। কাজেই উচ্চমানের জাহাজের দাম দেওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই ছোট জাহাজটা কেনার চেষ্টা করল। এসব ভেবে হ্যারি স্থির করল এই জাহাজটাই কিনবে।

দুজনে জাহাজ দেখে ক্যাপ্টেনের কাছে এল। ক্যাপ্টেন বলল—কেমন দেখলেন জাহাজটা?

—ভালো। এখন আসল কথা কত সোনার চাকতিতে বিক্রি করবেন? হ্যারি বলল।

—আপনারা কীসে দাম দেবেন? ক্যাপ্টেন বলল,

—আমাদের কাছে স্থানীয় মুদ্রা নেই। এই সোনার চাকতিগুলো আছে। কথাটা বলে শাঙ্কোর দিকে তাকাল। শাঙ্কো ফেট্টির ভাঁজ খুলে দুটো স্বর্ণমুদ্রা বের করল। সোনার চাকতি দেখে ক্যাপ্টেনের চোখ দুটো লোভে চিক্‌চিক্ করে উঠল।

—ঠিক আছে। দশটা চাকতি দেবেন। ক্যাপ্টেন বলল।

—অত পারবো না। আটটা সোনার চাকতি দেব। শাঙ্কো বলল।

—এত কমে কি হয়? ক্যাপ্টেন হেসে বলল।

—এর বেশি আমরা দিতে পারবো না। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে—একটা সোনার চাকতি কম দিন। মানে—নটা সোনার চাকতি দিন। ক্যাপ্টেন বলল।

হ্যারি আর কথা বাড়াল না। শাঙ্কোকে ইঙ্গিত করল। শাঙ্কো গুনে গুনে ন'টা সোনার চাকতি ক্যাপ্টেনকে দিল।

—আপনারা কবে এই জাহাজে আসবেন? ক্যাপ্টেন বলল।

—আমরা বলতে গেলে এসেই গেছি। হ্যারি বলল।

তার মানে? ক্যাপ্টেন বলল।

এখন আমরা এই জাহাজেই থাকবো। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। আমরা নেমে যাচ্ছি। ক্যাপ্টেন বলল।

ক্যাপ্টেন ওর কেবিনঘরে ঢুকল। সব গুছিয়ে গাছিয়ে একটু পরেই বাক্স প্যাঁটরা হাতে বেরিয়ে এল। তিনজন নাবিককে ডাকল। প্রত্যেককে কিছু মুদ্রা দিল। তারপর পাটাতন দিয়ে নেমে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সদর রাস্তার ভিড়ে মিশে গেল।

হ্যারি বলল—শাঙ্কো এবার বন্ধুদের ডেকে নিয়ে এসো। শাঙ্কো জাহাজঘাটের দিকে চলল। সেখানে গিয়ে দেখল মাত্র কয়েকজন বন্ধু বসে আছে।

শাঙ্কো বন্ধুদের বলল—জাহাজ কেনা হয়ে গেছে। আঙুল দিয়ে খাঁড়িমত জায়গাটা দেখাল। বলল—ওখানেই জাহাজটা দেখতে পাবেন। যে ক'জন এসেছিল তারা চলে গেল।

শাঙ্কো বসল। অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর পর ভাইকিং বন্ধুরা আসতে লাগল। শাঙ্কো তাদের জাহাজকেনার কথা জানাল। জাহাজটা কোথায় রয়েছে তাও আঙুল দিয়ে দেখাল। শাঙ্কো আরো বলল—একসঙ্গে যেও না। এক এক করে যাও।

শাঙ্কো হিসেব করে দেখল—আর দুজন বাকি। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই দু'জনও এল। শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। বলল—একসঙ্গে না। ছাড়া ছাড়া এসো। শাঙ্কো জাহাজের দিকে চলল।

সব ভাইকিংরা জাহাজে এসে উঠল এক এক করে। হোক ছোট তবু জাহাজ দেখে সবাই খুশি। হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—জাহাজটায় বেশি খাবার জল নেই। আটা ময়দা চিনিও আনতে হবে। শাঙ্কো, আর একজনকে নিয়ে খাবার

জিনিসগুলো কিনে আনো। অন্য দুজন যাও, জলের পিপে নিয়ে যাও। জল ভরে আনো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজন খাবার জল নিয়ে ফিরে এল। শাঙ্কোরা আটা ময়দা এসব কিনে আনল। সব মজুত করা হল। রাঁধুনি রান্না সারল। দুপুর নাগাদ সবাই খেল। খাওয়া শেষ হতে বিকেল হয়ে গেল।

সবাই কেবিনঘরে জাহাজের ডেক-এ শুয়ে বসে বিশ্রাম করছে তখনই হঠাৎ দুজন রাজা ভিলিয়নের সৈন্য তীরে এসে দাঁড়াল। তারপর জাহাজের পাতা পাটাতন দিয়ে জাহাজে উঠে এল। দু'জন সৈন্য জাহাজে উঠে আসছে তখনই হ্যারি নিজেদের দেশীয় ভাষায় বলে উঠল—জাহাজ ছাড়ো—পালাতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ভাইকিংরা জাহাজের পালগুলো খুলে দিল। পালগুলো বেগবান বাতাস পেয়ে ফুলে উঠল। সৈন্য দু'জন তরোয়াল খুলে এগিয়ে এল। চিৎকার করে বলল—তোমাদের দলনেতা কে? হ্যারি এগিয়ে এল।

—তুমিই দলনেতা? একজন সৈন্য বলল।

—হ্যাঁ। হ্যারি বলল।

—তোমরা আমাদের কয়েদঘরে বন্দী ছিলে? সৈন্যটি বলল।

—ঠিক মনে করতে পারছি না। শাঙ্কো বলল।

—তোমরা কয়েদঘর থেকে ঘুলঘুলি দিয়ে পালিয়েছো। সৈন্যটি বলল।

শাঙ্কো গলা চড়িয়ে ওদের দেশীয় ভাষায় বলল—নোঙর তোল—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাবো। একজন সৈন্য বলল—কী? তোমরা পাহারাদারদের ধোঁকা দিয়ে পালিয়েছো। তাই কিনা?

ততক্ষণে জাহাজটা তীরভূমি থেকে অনেকটা চলে এসেছে। একজন সৈন্য এতক্ষণে সেটা দেখতে পেয়ে বলে উঠল—জাহাজ থামাও। ভাইকিংরা কেউ কিছু বলল না। জাহাজ আরো দূরে চলে এল। হ্যারিরা চুপ। হঠাৎ সৈন্যটি হ্যারির সামনে এসে দাঁড়াল। হাতের খোলা তরোয়ালটা হ্যারির গলায় ঠেকিয়ে বলল—জাহাজ থামাও নইলে মরবে। শাঙ্কো বলে উঠল—ভাই—এদিকে এসো।

—কেন? হ্যারির গলা থেকে তরোয়াল না সরিয়ে বলল সৈন্যটি।

—একটা গোপন কথা আছে। শাঙ্কো বলল।

—ওখান থেকেই বলো। সৈন্যটি বলল।

—তা বলা যাবে না। জাহাজের এদিকটায় এসে দেখ। সৈন্যটি শাঙ্কোর কাছে এল। শাঙ্কো বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এসে সৈন্যটিকে ল্যাঙ্ মারল। সৈন্যটি পাক খেয়ে ডেক-এর ওপর গড়িয়ে পড়ল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। শাঙ্কো দ্রুতহাতে তরোয়ালটা তুলে নিল। সৈন্যটি আস্তে আস্তে উঠে বসল। উঠে দাঁড়াল। অন্য সৈন্যটি এবার শাঙ্কোর দিকে খোলা তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল।

শাঙ্কো বলল—এখন আমার হাতেও তরোয়াল।

—বেশ তো। লড়াই হবে। সৈন্যটি আক্রমণোদ্যত হল। শাঙ্কো বলল—



—আক্রমণ করার আগেই তুমি খতম হয়ে যাবে। ভালো কথা বলছি শোন—জাহাজ এখনও তীরের কাছেই আছে। প্রাণে বাঁচতে চাও তো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ো। সাঁতরে তীরে গিয়ে ওঠো।

—না। আমরা লড়বো। সৈন্যটি বলল।

—তাহলে দেখো। লড়াই হোক। শাঙ্কো বলল।

সৈন্যটি তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। শাঙ্কো দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। তরোয়াল চালাল। সৈন্যটির ডান বাহু লম্বালম্বি কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। সৈন্যটি বসে পড়ল। কিন্তু হার মানল না। উঠে দাঁড়াল। তরোয়াল উঁচিয়ে এগিয়ে এল। শাঙ্কো এক লাফে এগিয়ে এসে ওর তরোয়ালে নিজের তরোয়াল দিয়ে এত জোরে ঘা মারল যে সৈন্যটির হাতের তরোয়াল ছিটকে গেল। শাঙ্কো এবার এসে সৈন্যটির পেট জড়িয়ে ধরল। তারপর ওকে এক ধাক্কায় রেলিঙের গায়ে ফেলল। তারপর কোমর ধরে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে দিল। সৈন্যটি কাটা হাত নিয়ে কোনরকমে সাঁতরে চলল জাহাজঘাটের দিকে। শাঙ্কো ঘুরে দাঁড়াল। অন্য সৈন্যটির দিকে তাকাল। সৈন্যটি তখন ভয়ে কাঁপছে। শাঙ্কো বলল—এবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ো। সৈন্যটি আর কোনদিকে না তাকিয়ে রেলিঙ্ থেকে সোজা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাহাজঘাটের দিকে সাঁতরে চলল দুজনেই।

হ্যারিদের জাহাজ চলল। ফ্রেজার জাহাজ চালাচ্ছিল। ওর মনের খুঁতখুঁতানি যায় না। এত ছোট জাহাজ চালিয়ে কোন আনন্দ নেই।

পরদিন দুপুর নাগাদ জাহাজ রাজা অপর্তোর রাজ্যের জাহাজঘাটের কাছে এল। দূর থেকে হ্যারিরা দেখল জাহাজঘাটে জোর লড়াই চলছে। হ্যারিরা দূর থেকেই অস্পষ্ট শুনতে পেল সৈন্যদের চীৎকার ধ্বনি হৈ হৈ। হ্যারি ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—আমরা বেশ দূরে থাকবো। এখানেই নোঙর ফেলো। ঘর্ ঘর্ শব্দে নোঙর ফেলা হল।

ওদিকে রাজা অপর্তোর সৈন্যদের আবাসে ফ্রান্সিসের একঘেয়ে দিন কাটতে লাগল। ঘরটায় সৈন্যরা থাকে। তারা ফ্রান্সিসকে বলে—যুদ্ধ শেষ না হলে তোমার মুক্তির আশা নেই। তাই ফ্রান্সিসও দিন গোনে। কতদিন কেটেছে এখানে। ফ্রান্সিস সেই নক্‌শা আর লেখার কাগজটা সাবধানে রাখে। সবসময় নকশার কাগজটা কোমরের ফেট্টির মধ্যে গুঁজে রাখে। দু-চারজন সৈন্য ফ্রান্সিসের কাছে আসে। ও নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে এইসব বলে। কিতান নামে একটা সৈন্যের সঙ্গে ফ্রান্সিসের খুব ভাব হয়েছে। কিতানই ফ্রান্সিসকে সব খবর দেয়। আর কয়েকদিনের মধ্যেই যে লড়াই হবে কিতান এ বিষয়ে নিশ্চিত।

কয়েকদিন পরে সকালবেলা। সমুদ্রতীরে ভেড়ানো জাহাজ থেকে রাজা অপর্তোর সৈন্যরা দেখল—দূর থেকে তিনটি জাহাজ আসছে। তারমধ্যে একটা সাধারণ জাহাজ। বাকি দুইটি যুদ্ধ জাহাজ। রাজার সৈন্যাবাসে সেই সংবাদ পৌঁছল। সেনাপতি ছুটে এল। বলল সবাই তৈরি হও। সেনানিবাসে সাজো

সাজো রব উঠল। সৈন্যরা তরোয়াল নিল। শিরস্ত্রাণ বর্ম পরে সৈন্যাবাস থেকে বেরিয়ে এসে সামনের বড় মাঠটায় একত্র হল। সার বেঁধে দাঁড়াল। সেনাপতি এল। সৈন্যরা সামনে দাঁড়াল। একটু পরেই রাজা অপর্তো এল। সেনাপতি চিৎকার করে বলল—

—আমাদের মহান রাজা অপর্তো এসেছেন। সবাই রাজার জয়ধ্বনি করো। সৈন্যরা চীৎকার করে ধ্বনি দিল—মহান রাজা অপর্তো দীর্ঘজীবী হোন।

এবার রাজা অপর্তো গলা চড়িয়ে বলল—আমাদের বীর সৈন্যরা —নরুল্লার রাজা আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। তোমরা শৌর্যে বীর্যে অন্য কোন দেশের চেয়ে কম নও। নরুল্লার রাজা ভিলিয়ানকে পরাস্ত কর। ওদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও। রাজা থামল। সৈন্যরা আবার ধ্বনি দিল—মহান রাজা অপর্তো দীর্ঘজীবী হোন।

রাজা অপর্তো দুজন অমাত্যর সঙ্গে চলে গেল। সেনাপতির নির্দেশে একদল সৈন্য তীরলগ্ন জাহাজে গিয়ে উঠল। সেই জাহাজ থেকে পরে অন্য জাহাজটায় উঠল। তখনই রাজা ভিলিয়ানের প্রথম জাহাজটা রাজা অপর্তোর জাহাজের গায়ে এসে লাগল। রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যরা তৈরি হল। কিছু সৈন্য লাফিয়ে রাজা অপর্তোর জাহাজে উঠে এল। শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। চীৎকার আহতদের আর্তনাদ গোঙানিতে ভরে উঠল এলাকাটা।

জোর লড়াই শুরু হল। রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যরা প্রথম ধাক্কায় হেরে গেল। আহত সৈন্যরা নিজেদের জাহাজে চলে গেল।

এবার রাজা অপর্তোর সেনাপতি সমুদ্রতীরের কাছে এসে চিৎকার করে হুকুম দিল—সবাই মাঠে নেমে এসো। এবার মাঠে লড়াই হবে।

রাজা অপর্তোর সৈন্যরা তাদের দুটো জাহাজ থেকেই পাতা পাটাতন দিয়ে সমুদ্রতীরে উঠে আসতে লাগল। উঠে এসে সার বেঁধে দাঁড়াল।

রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যরা জাহাজ থেকে নেমে সেই মাঠে চলে এল। এবার লড়াই চলল বিস্তৃত প্রান্তরে।

ফ্রান্সিস যে ঘরে বন্দী ছিল সেই ঘরের সৈন্যরা সেনাপতির হুকুম শুনে বেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিস একা। কিন্তু যে খবরটা দিয়ে চলে গেল সে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। সব সৈন্য বেরিয়ে গেলে ঘরটার দরজা তালা দিয়ে আটকে রেখে গেল।

ফ্রান্সিস চুপ করে বসেছিল। বুঝল এই সুযোগ। পালাবার এমন সুযোগ পরে নাও আসতে পারে।

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। কান পাতল—রাজা অপর্তোর বক্তৃতা শুনল। বুঝল কিছুক্ষণের মধ্যেই লড়াই শুরু হবে। ফ্রান্সিস বাইরে লাগানো তালাটা হাত বাড়িয়ে দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে দেখল—তালাটা বেশ শক্ত তালা। তালা ভাঙা যাবে না। কড়াটা ভাঙতে হবে।

ফ্রান্সিস কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে ছুটে এসে তালাকড়ার জায়গাটায় লাথি মারল।

তালা ভাঙল না। কড়াও খুলল না। ফ্রান্সিস আবার লাথি মারল। তালা বা কড়া খুলল না। এবার ফ্রান্সিস গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় লাথি মেরে চলল।

হঠাৎ কড়া ভেঙে ছিটকে গেল। দরজা খুলে গেল।

ফ্রান্সিস এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ছুটে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল। ঠিক তখনই একজন রাঁধুনি এল। ফ্রান্সিসকে দেখে বলল—কী ব্যাপার? পালাচ্ছো নাকি?

—না—না। মরণপণ লড়াই করতে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

—খুব ভালো কথা। রাঁধুনি চলে গেল।

এই সুযোগ। বন্দীদশা থেকে তো পালাতে পারল। কিন্তু খাব কী? ফ্রান্সিস পায়ে পায়ে রসুই ঘরে এল। দেখল থরে থরে সাজানো সুস্বাদু গোল রুটি। ঘরে কোন রাঁধুনি নেই। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে চারটে রুটি ঢোলা জামার গলার কাছ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। রুটিগুলো পেটের কাছে গিয়ে ফেট্টিতে আটকে রইল।

এবার ফ্রান্সিস এক ছুটে সৈন্যাবাসের বাইরে এল। একটা মোটা ওকগাছের পেছনে দাঁড়াল। গাছের আড়াল থেকে দেখল জাহাজগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যদের সঙ্গে রাজা অপর্তোর সৈন্যদের । সমস্ত এলাকা জুড়ে চলেছে মরণোন্মুখ সৈন্যদের আর্ত চিৎকার গোঙানি। দু'দলেরই সৈন্যরা চিৎকার করছে। তরোয়াল চালিয়ে উভয়পক্ষের সৈন্যরা লড়াই করতে লাগল। ফ্রান্সিসেরও ইচ্ছে হল একটা তরোয়াল পেলে লড়াইতে নামা যেত। কিন্তু কার হয়ে লড়বো —কথাটা ভেবে ফ্রান্সিস মনে মনে হাসল।

ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে ছুটল সমুদ্রতীরের দিকে। সমুদ্রের দিক থেকে জোর বাতাস ছুটছে। ধূলো বালি উড়ছে। ফ্রান্সিস চোখ কুঁচকে ছুটল।

সমুদ্রতীরে পৌঁছল। বালির ওপর বসল। দূর থেকে দেখল জাহাজঘাটে তখনও লড়াই চলছে। ও সমুদ্রের দিকে তাকাল। দেখল সবকটা জাহাজই সমুদ্রতীরে ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে। ফ্রান্সিস দূরে তাকাল। নাঃ, ওদের জাহাজটা নেই। অনেক দূরে ছোট্ট একটা জাহাজ আবছা দেখল। কিন্তু সেটা ওদের জাহাজ নয়।

জাহাজঘাটায় জাহাজগুলো পালা করে দেখতে গিয়ে ওদের জাহাজটা দেখল। ওদের জাহাজ লড়াইয়ে কেন? ফ্রান্সিস কিছুই বুঝতে পারল না। হ্যারিরা বোকার মত লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে।

কী করবে ফ্রান্সিস বুঝে উঠতে পারল না। হ্যারিরা খুব বোকার মত কাজ করেছে। অথবা এও হতে পারে রাজা অপর্তোই ওদের বাধ্য করেছে লড়াইয়ে নামার জন্যে। ওরা মারিয়াকেই বা কোথায় রেখেছে। ওরা সবাই কি আমাদের জাহাজেই আছে? এরকম নানা চিন্তা ফ্রান্সিসের মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল।

ফ্রান্সিস সমুদ্রের দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখল। দূরের জাহাজটা যুদ্ধ জাহাজ নয়। ঐ ছোট্ট জাহাজে যারা রয়েছে তারা যুদ্ধে যোগ দেয় নি। কে জানে ওটা কাদের জাহাজ? ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল—এখন আমার প্রধান কর্তব্য মারিয়া আর বন্ধুদের সন্ধান করা। ওরা কোথায় থাকতে পারে। ভেবে

পাচ্ছিনা—ওরা কি যুদ্ধে কারো পক্ষ নিয়েছিল? আমাদের জাহাজটা তীরে ভেড়ানো আছে। হয়তো ওরা আমাদের জাহাজেই রয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের এই ডামাডোলে নিশ্চয়ই আমাদের জাহাজটাকেও কাজে লাগানো হয়েছে। তাহলে হয়তো মারিয়াকে বন্ধুদের জাহাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হয়তো ওদের তীরভূমির কোথাও নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ওদের জাহাজে না যেতে পারলে কিছুই বোঝা যাবে না।

বিকেলের দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে চিৎকার হৈ হৈ শোনা গেল না। তার মানে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এখন কারা জয়লাভ করল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

বিকেলের দিকেই বোঝা গেল। রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যদের বন্দী করা হতে লাগল। ওরই মধ্যে এব্যর রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যরা একটা জাহাজে উঠে জাহাজ ছেড়ে দিল। রাজা অপর্তোর সৈন্যরা বাধা দেবার আগেই জাহাজটা বেশ দূরে ভেসে গেল। জাহাজের সব পাল খুলে দেওয়া হল। জাহাজ বেশ গতি পেল। বোধহয় ওরা দাঁড়ও বাইছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজ গভীর সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছল। রাজা অপর্তোর সৈন্যরা আর ওদের তাড়া করল না।

রাজা অপর্তোর সৈন্যরা যুদ্ধজয়ের আনন্দে মেতে উঠল। খাওয়া দাওয়া হৈ হৈ চলল সৈন্যদের মধ্যে।

একটু রাত হতেই হৈ হৈ থেমে গেল। যুদ্ধক্ষেত্র যেন শুনশান। নিস্তব্ধ চারিদিক। শুধু সমুদ্রের ঢেউ ভেঙ্গে পড়ার একটানা শব্দ।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বুকের কাছে জামার ভেতর থেকে একটা গোল করে কাটা রুটিটা বের করল। বসল। রুটি খেতে খেতে ভাবতে লাগল ও কী করবে এখন? প্রথমে আমাদের জাহাজে তো যাই, দেখি কিছু হদিশ পাই কিনা—মারিয়ার বন্ধুদের।

আজ গভীর রাত। রুটির শেষ টুকরোটা চিবুতে চিবুতে ফ্রান্সিস সমুদ্রের জলে নামল। গলা পর্যন্ত জলে এসে নিঃশব্দে সাঁতার কাটতে লাগল। আকাশের চাঁদ অনুজ্জ্বল। তবু কিছুদূর পর্যন্ত সব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস সাঁতরে চলল জাহাজ ঘাটের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজঘাটের কাছে এলে জাহাজগুলো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস জলে শব্দ না করে ওদের জাহাজের কাছে এলো। হালটা ধরল। হাঁপাচ্ছিল। একটু থেমে দম নিল।

হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে জাহাজে উঠল। কিন্তু প্রথমেই ডেক-এ নামল না। হালের আড়াল থেকে ডেক-এর দিকে তাকাল। দেখল ডেক-এ দুজন সৈন্য শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস নিঃশব্দে ওদের কাছে এল। দেখল—দুজনই মারাত্মক আহত। জায়গাটায় শুকনো রক্ত ছড়িয়ে আছে। সৈন্যদের পোশাক দেখে বুঝল এরা নরুল্লার রাজা ভিলিয়ানের সৈন্য।

ফ্রান্সিস আস্তে সরে এল। সিঁড়িঘরের কাছে এল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে এল। প্রথম কেবিনঘরটা দেখল। আস্তে দরজা খুলল। কেউ নেই। পরেরটাতেও কেউ নেই। ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। তাহলে তো এই জাহাজে

বন্ধুরা কেউ নেই।

এবার নিজের কেবিনঘরের সামনে এল। দরজা বন্ধ। ফ্রান্সিস আশান্বিত হল। তাহলে মারিয়া নিশ্চয়ই এই ঘরে আছে। ফ্রান্সিস দরজা টোকা দিল। সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ার গলা শুনল—কে? ফ্রান্সিস কিছু বলল না। এতক্ষণে যেন সহজে শ্বাস নিতে পারছে। দরজাটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অল্পক্ষণ। আবার মারিয়ার কিছুটা ভীত কণ্ঠস্বর—কে ওখানে? ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—আমি ফ্রান্সিস।

মারিয়া চমকে উঠল। বলল—

—ত্—তুমি? মারিয়া ছুটে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ বুঁজল। দুই গালে দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস ঘরের মৃদু আলোয় দেখল সেটা। ফ্রান্সিস মারিয়ার কাঁধে হাত রাখল। মৃদুস্বরে বলল—কেঁদোনা। এই তো আমি এসেছি।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসাল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল মারিয়ার মাথার চুল উস্কোখুস্কো চোখমুখ শুকনো। মারিয়ার শরীরের এই অবস্থা দেখে ফ্রান্সিসের মন যেন কেঁদে উঠল। মৃদুস্বরে বলল—মারিয়া তোমাকে এইসব দুঃসাহসিক কাজে না আনলেই বোধহয় ভালো হত। মারিয়া ম্লান হাসল। বলল—আমিই তো জোর করে তোমার সঙ্গে এসেছি। তোমার কোন দোষ নেই।

—তবু। মন মানে না। ফ্রান্সিস বলল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—এবার কাজের কথা বলো। হ্যারিরা কোথায়?

মারিয়া আস্তে আস্তে সব বলল। সবশেষে বলল হ্যারিরা আমাদের এই জাহাজ নিয়ে নরুল্লার রাজা ভিলিয়ানের রাজধানী ভিগো গিয়েছিল। আমাকে এখানেই সেনাপতির জাহাজে রেখে গিয়েছিল। তারপর আমি আর কিছুই জানি না।

—ওরা বেঁচে আছে তো? ফ্রান্সিস কতকটা আপনমনেই বলল।

—না—না। বেঁচে আছে বৈকি। তুমি এই নিয়ে ভেবোনা। মারিয়া বলল।

—মারিয়া খাবার দাবার কিছু আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়ই কিছু আছে। আমি প্রতিদিনই বেশি করে রাঁধছি। আশা যদি তুমি আসো। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে। খেতে দাও। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল—

—ভেজা পোশাক ছাড়ো। আমি আসছি।

ভেজা পোশাকে এতক্ষণে শরীরটা শির্ শির্ করতে লাগল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টাল। শুকনো পোশাক পরে শির্ শির ভাবটা কেটে গেল।

মারিয়া চিনে মাটির থালায় রুটি মাংসের ঝোল নিয়ে এল। তারপর কাঠের

গ্লাশে জল দিল। ফ্রান্সিস গ্লাশটা নিয়ে সবটুকু জল খেয়ে ফেলল। মারিয়া আরও এক গ্লাশ জল দিল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে খেতে লাগল। খাচ্ছে আর ভাবছে হ্যারিদের কথা। কোথায় আছে ওরা?

—এখন কী করবে? মারিয়া বলল।

—সেটাই তো ভাবনা। ওরা জাহাজে চড়ে রাজা ভিলিয়ানের রাজ্যে গিয়েছিল। তুমি তো এইটুকুই জানো।

—হ্যাঁ। কিন্তু —মারিয়া লাফিয়ে উঠল—মনে পড়েছে আমাদের জাহাজটা কদিন পরেই ফিরে এসেছিল এখানে।

—হ্যারিরা সেই জাহাজে ফেরে নি—এই তো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। তুমি কী করে বুঝলে? মারিয়া বলল।

—এইসব সেনাপতি-টতি অনেক দেখেছি। নিজেদের ভীষণ ক্ষমতাধর প্রমাণের জন্যে সব করতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে এখন কী করবে? মারিয়া বলল।

—রাজা ভিলিয়ানের রাজ্যের ভিগো নগরে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—সেকি! এই জাহাজ চালিয়ে যাবো মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা দুজন? মারিয়া বলল।

—না—আমরা চারজন। ফ্রান্সিস বলল।

—আর দুজন কোত্থেকে পাবে? মারিয়া জানতে চাইল।

—ওপরের ডেক-এ দুজন রাজা ভিলিয়ানের সৈন্য আহত অবস্থায় রয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—ওরা কি আমাদের কোনভাবে সাহায্য করতে পারবে? মারিয়া বলল।

—দু-একদিনের মধ্যে যতটা সাহায্য পাবো ততটাই নেবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি কী করবো? মারিয়া বলল।

—রান্না করবে খেতে দেবে। আর সেলাই ফোঁড়াই করবে। ফ্রান্সিস বলল।

—না, প্রয়োজনে আমি তরোয়াল নিয়ে লড়াই করবো। মারিয়া বলল।

—দোহাই—লড়াইর ময়দানে তোমাকে আমি দেখতে চাই না। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি প্রায় প্রতিদিন তরোয়াল চালানো অভ্যেস করি। মারিয়া বলল।

—শিখেছো কার কাছে? ফ্রান্সিস বলল।

—শাঙ্কো। মারিয়া বলল।

—শাঙ্কোটা তোমার মাথাটি খেয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমিই শাঙ্কোকে বলেছি শেখাতে। মারিয়া বলল।

—ও প্রথমে আপত্তি করেছিল। আমি শুনি নি। ও তোমার কথাও বলেছিল। আমি বলেছি তোমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। আমিই তোমাকে বোঝাবো।

মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে বাবা,। তুমি তরোয়াল চালানো শেখ, লড়াই করো। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে আমি ত লড়তে পারবো। মারিয়া বলল।

—তা পারবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বলল—ঐ আহত দুজন সৈন্যকে কে খেতে দেয়?

—আমিই খেতে দিই। তবে ওষুধ তো আর পড়ছে না। জানি না—কী করে শরীরের কাটাগুলো সারবে। মারিয়া বলল।

—ভেন থাকলে চিকিৎসা হত। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস। এখন কী করবে? মারিয়া বলল।

—রাজা ভিলিয়ানের রাজ্য ভিগোতে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া চোখ বড় বড় করে বলল—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই ক'জন আমরা এত বড় একটা জাহাজ চালিয়ে ভিগো নগরে যেতে পারবো?

—পারবো। জাহাজের পালগুলো খাটিয়ে দেব। সবকটা পাল। জোর বাতাস পেলে জাহাজ দ্রুত চলবে। আমাদের কিছুই করার থাকবে না। জাহাজ আপনি চলবে। শুধু হুইল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিকটা ঠিক রাখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া কী বলতে গেল। ফ্রান্সিস ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওকে থামিয়ে দিল। ফ্রান্সিস ফিসফিস করে বলল—ডেক-এ কাদের চলাফেরার শব্দ শুনছি। মারিয়া কান পাতল—হ্যাঁ জুতোর শব্দ।

হঠাৎ কার কান্না আর্তনাদ শোনা গেল। সেই সঙ্গে উচ্চ হাসি। তারপরে আরেকজনের গোঙানি শোনা গেল। সমুদ্রে কিছু পড়ার শব্দ শুনল ফ্রান্সিস। আবার হাসি শোনা গেল।

ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—আহত সৈন্য দুজনকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হল। মারিয়া দু'হাতে বুক চেপে ফুঁপিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—কেঁদো না। আমি যদি —মারিয়া ফ্রান্সিসের হাত চেপে ধরল—না—না। ওরা কতজন আছে কে জানে।

—যতজনই থাক আমি সবকটাকে নিকেশ করবো। মারাত্মকভাবে আহত দুই সৈন্যকে জলে ছুঁড়ে ফেলা। কী নির্মম।

—না—না। যেও না। মারিয়া গলা চেপে বলল।

—না মারিয়া। আমি যাবোই। দরকার একটা তরোয়াল। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। মারিয়া বুঝল ফ্রান্সিসকে আটকানো যাবে না। ফ্রান্সিস চলল ওদের অস্ত্রঘরের দিকে। অস্ত্রঘরের দরজা খোলা। ফ্রান্সিস ঘরে ঢুকে অন্ধকারে দেখেই বুঝল—খুব বেশি অস্ত্র নেই। ওরই মধ্যে বেছে নিল একটা তরোয়াল। তুলে আনল। চলল ওপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে।

আস্তে আস্তে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে উঠল। সিঁড়ির শেষে সিঁড়িঘরে উঠে

দাঁড়াল। দেখল যুদ্ধজয়ী রাজা অপর্তোর দুজন সৈন্য ডেক-এ বসে আছে। হাত খালি। তরোয়াল কোমরবন্ধে খাপে রাখা।

ফ্রান্সিসকে দেখেই দুজন সৈন্য লাফিয়ে উঠল। তরোয়াল কোষমুক্ত করল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল—আহত সৈন্য দুজন কোথায়?

—জলে ফেলে দিয়েছি। একজন কথাটা বলে হেসে উঠল। অন্যজন বলল, আমাদের আর লড়াইও করতে হয়নি হত্যা করতেও হয়নি।

—সোজা পথে ঝামেলা মিটিয়ে দিয়েছো। ফ্রান্সিস বলল। দুজনেই জোরে হেসে উঠল।

—এবার আমার সঙ্গেও যে ঝামেলা মেটাতে হয়। ফ্রান্সিস খাপ থেকে তরোয়াল খুলল।

—তুমি কি আমাদের সঙ্গে লড়বে? একজন সৈন্য বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করে বলল।

ফ্রান্সিস তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে গেল। একজন সৈন্য তরোয়াল তুলে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস এক পা সরিয়ে নিল। তারপর দ্রুত তরোয়াল চালাল। সৈন্যটি কোন রকমে সেই মার ঠেকালো। সৈন্যটি এবার ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে গেল। শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। অল্পক্ষণের মধ্যেই সৈন্যটির হাতের তরোয়াল ছিটকে গেল। ও ডেক-এ বসে পড়ল। মুখ হাঁ করে হাসতে লাগল। ফ্রান্সিস ঐ অবস্থাতেই তরোয়াল চালাল। সৈন্যটির গলায় লাগল তরোয়ালের কোপ। সৈন্যটি উপুড় হয়ে ডেক-এর ওপরে পড়ে গেল। আর উঠে দাঁড়াতে পারল না।

ফ্রান্সিস এবার অন্য সৈন্যটির দিকে তাকাল। ক্রুদ্ধস্বরে বলল—পারবে আমার সঙ্গে লড়ে। সৈন্যটি ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। ফ্রান্সিস বলল—তোমরা দু'জন সৈন্যকে আহত দেখেও জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমার হাতে একজন মারা যায়। তুমিও রেহাই পাবে না। সৈন্যটি তরোয়াল ডেক-এর ওপর ফেলে দিয়ে সিঁড়িঘরের দিকে ছুটল। ফ্রান্সিস ওর চেয়ে দ্রুত দৌড়ে এসে সৈন্যটির সামনে এসে দাঁড়াল। মৃত্যুভয়ে সৈন্যটির তখন মুখ সাদা হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল—আমি নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করি না। তুমি যাও তরোয়াল হাতে নাও। সৈন্যটি আস্তে আস্তে গিয়ে তরোয়াল তুলে হাতে নিল। ফ্রান্সিস সৈন্যটির সামনে এল। বলল—এবার আমার সঙ্গে লড়ো।

ফ্রান্সিস তরোয়াল তুলে এগিয়ে গেল। তরোয়াল চালাল। সৈন্যটি মার ঠেকাল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সৈন্যটির দম ফুরিয়ে গেল। ও কোনরকমে ফ্রান্সিসের মার ঠেকাতে লাগল। ফ্রান্সিস প্রচণ্ড জোরে তরোয়াল চালাল। সৈন্যটি যে মার ঠেকাতে পারল না। ওর হাত থেকে তরোয়াল ছিট্‌কে গেল। ও চিৎ হয়ে ডেক-এর ওপর পড়ে গেল। মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল— মারাত্মক আহত দুজন সৈন্যকে দেখে তোমাদের মায়া হল না। বিনা দোষে ওদের জলে ছুঁড়ে ফেললে। ঠিক ঐভাবে আমিও তোমাদের দুজনকে

জলে ছুঁড়ে ফেলবো।

কথাটা বলে ফ্রান্সিস সৈন্যটির বুকে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল। সৈন্যটি মাথা এপাশ ওপাশ করতে লাগল। ফ্রান্সিস তরোয়াল বের করে নিয়ে কোমরে গুঁজল। তারপর সৈন্যটিকে কাঁধে তুলে নিল। সৈন্যটি অনুনয় করতে লাগল—জলে ফেলো না। জলে ফেলো না। ফ্রান্সিস সে কথা শুনল না। রেলিঙে উঠিয়ে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিল। তারপর অন্য আহত সৈন্যটিকে একই ভাবে জলে ফেলে দিল।

ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়িঘরের দিকে চলল। দেখল মারিয়া সিঁড়িঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। মারিয়া সবই দেখেছে। কিন্তু কিছুই বলল না।

কেবিন ঘরে এল। মারিয়াও এল। বলল—এখন কী করবে?

—এখানে থাকা চলবে না। তুমি নোঙরটা তোলো। পারবে তো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ পারবো। মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—তাহলে যাও। আমি পালগুলো খুলে দিচ্ছি। এখন যে জোরে বাতাস বইছে পাল ভালো হাওয়া পাবে। যাও।

মারিয়া নোঙরের কাছে এল। তারপর নোঙরের কাছি ধরে আস্তে আস্তে টানতে লাগল। নোঙরটা উঠে আসতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মারিয়া নোঙর তুলে ফেলল। হাঁপাতে লাগল।

ডেক-এ এসে দেখল ফ্রান্সিস এর মধ্যেই সব পাল খুলে দিয়েছে। বাতাসের তোড়ে পালগুলো ফুলে গেছে। জাহাজও গতি পেয়েছে। বেশ জোরেই চলছে।

ফ্রান্সিস গেল হুইল-এর কাছে এল। হুইল ঘোরাতে লাগল। জাহাজ চলল।

মারিয়া চলল রসুইঘরের দিকে। রান্না বসাল।

ফ্রান্সিস দিক ঠিক করে হুইলটা একটা কড়ার সঙ্গে আটকাল। তারপর ডেক-এ শুয়ে পড়ল। আকাশের দিকে তাকাল। ঝক্‌ঝকে নীল আকাশ। মাঝে মাঝে সাদা মেঘ উড়ে আসছে। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজল। এখন আকাশ দেখার সময় নয়। বন্ধুদের যে কোথায় খুঁজবে বুঝে উঠতে পারছে না। তাই মাথায় চিন্তা।

রাজা ভিলিয়ানের সেনাপতি নিশ্চয়ই হ্যারিদের ভিগোতে বন্দী করে রেখেছিল। তা না হলে ওদের ফিরিয়ে আনল না কেন? হ্যারিরা বন্দী হয়ে ছিল। নিশ্চয়ই পালাতে পারে নি। তাহলে তো ভিগো নগরে গিয়ে কয়েদ খানায় খোঁজ করতে হয়। যদি সেখানে হ্যারি শাঙ্কোদের না পাই তাহলে বুঝবে যে ওরা অন্য কোথাও আছে।

মারিয়া এল। বলল—খাবে এসো। ফ্রান্সিস উঠে বসল। দেখল জাহাজ বেশ দ্রুত গতিতেই চলেছে। হুইলের সঙ্গে কড়াটায় আটকানো। হাত দিয়ে দেখল ভালোভাবেই আটকানো আছে। ফ্রান্সিস সিঁড়িঘরের দিকে চলল। একবার সমুদ্রের চারদিকে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেক দূরে একটা ছোট্ট জাহাজ। যুদ্ধের সময় আমি কি ঐ জাহাজটাই দেখেছিলাম? এখন জাহাজটা আবার দেখা যাচ্ছে। ঐ জাহাজটা কি আমাদের জাহাজকেই অনুসরণ করছে?

কিন্তু বিনা কারণে আমাদের অনুসরণ করবে কেন? ফ্রান্সিস এবার সবদিকেই তাকিয়ে নিল। না আর কোন জাহাজ দেখা যাচ্ছে না।

খেতে বসে ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

—কী ব্যাপার? মারিয়া বলল।

—ডেক-এ উঠে দেখে এসো একটা ছোট্ট জাহাজ আমাদের অনুসরণ করছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী যে বলো। ছোট্ট জাহাজটা আমাদের অনুসরণ করবে কেন? মারিয়া বলল।

—নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী কারণ? মারিয়া বলল।

—সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি তো। মারিয়া বলল।

মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। চারদিকে তাকাল। দূরে দেখল—একটা ছোট্ট জাহাজ আসছে। এখান থেকে অবশ্য জাহাজের লোকজন দেখা যাচ্ছে না। শুধু ছোট্ট জাহাজটাই দেখা যাচ্ছে। জাহাজটায় কোন নিশানও উড়ছে না। কে জানে কোন দেশের জাহাজ।

মারিয়া ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—ছোট্ট জাহাজটা দেখলাম। লোকজন দেখা গেল না। মনে হয় আমাদের অনুসরণ করছে। দূরত্বটা বেশ বেশি। কাছে গেলে অবশ্য ডেক-এ কারা আছে বোঝা যেত।

ওদিকে ভিগো নগরের জাহাজঘাট থেকে হ্যারিদের নতুন কেনা জাহাজটা ছাড়ল। চলল রাজা অপর্তোর দেশের দিকে। ফ্রান্সিস মারিয়াকে নিশ্চয়ই ওখানে পাওয়া যাবে। এই জাহাজের ছোট্ট মাস্তুলটার মাথায় নজরদারির জন্যে কোন আসন রাখা নেই। নজরদার পেড্রোর মন খারাপ। ও মাস্তুলের গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর নজরদারির কাজ করতে লাগল।

হ্যারিদের জাহাজ চলেছে। ছোট্ট জাহাজ। হুইলটাও ছোট। ফ্রেজারেরও মন খারাপ। এই ছোট্ট জাহাজ চালিয়ে যাওয়া। ফ্রেজারের মনে পড়ল ওদের বড় জাহাজটার কথা।

হ্যারিদের জাহাজ চলেছে। ভাইকিং বন্ধুদের মন খারাপ। এখনও ফ্রান্সিস রাজকুমারীর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

একদিন পরে হ্যারিদের জাহাজ রাজা অপর্তোর রাজ্যের বন্দরের কাছে পৌঁছল। হ্যারি ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—অনেক দূরে জাহাজ থামাও।

ফ্রেজার বেশ দূরে জাহাজ থামাল।

ভাইকিংরা জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়াল। হ্যারিরা দেখল রাজা ভিলিয়ান আর রাজা অপর্তোর সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেছে। জাহাজগুলোর ডেক-এ দুপক্ষের সৈন্যদের লড়াই চলছে। উভয়পক্ষের সৈন্যদের চিৎকার রণধ্বনি

আর্তনাদ এত দূরেও শোনা যেতে লাগল।

ঐ জাহাজগুলোর মধ্যেই রয়েছে হ্যারিদের জাহাজ। সেই জাহাজেও এতক্ষণ লড়াই চলেছিল। এখন লড়াই ছড়িয়ে গেল জাহাজের বাইরে—সবুজ ঘাসের প্রান্তরে।

হ্যারি ভেবে পাচ্ছে না এখন কী করবে। একটা কথা বুঝল যে এখন এই যুদ্ধের ডামাডোলে ফ্রান্সিসদের খোঁজ করা যাবে না। এখন শুধু অপেক্ষা করা।

পরদিন শাঙ্কোরা বুঝতে পারল যুদ্ধ শেষ হয়েছে। সৈন্যদের পোশাক দেখে হ্যারি বুঝল রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যরা হেরে গেছে। ঐ সৈন্যদের প্রান্তরে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করানো হল। হাতে দড়ি বাঁধা হল। তার আগে রাজা ভিলিয়ানের সৈন্যরা অনেকে পালিয়ে গেল। সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরাতে সাঁতরাতে পালিয়ে গেল।

হ্যারি নজরদার পেড্রোকে বলল—ভাল করে নজর রাখবে চারদিকে। বিশেষ করে ঐ ঘাটে আমাদের জাহাজটা নোঙর করে আছে। আর দু' একটা দিন যাক। তারপর আমাদের জাহাজটা নিয়ে পালাবো।

পরদিন কাটল। রাত হল। চাঁদের আলো অনেকটা উজ্জ্বল। পেড্রো হঠাৎ দেখল ওদের জাহাজটা ঘাট থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে। পেড্রো সঙ্গে সঙ্গে ছুটল হ্যারির কাছে। হ্যারির কেবিনঘর খোলা ছিল।

পেড্রো হ্যারির বিছানার কাছে চলে এল। ডাকল—হ্যারি—হ্যারি। হ্যারি চোখ খুলে উঠে বসল—কী ব্যাপার?

—আমাদের জাহাজটা তীরের কাছে ছিল। পেড্রো বলল।

—হ্যাঁ। হ্যারি বলল।

—জাহাজটা তীর থেকে বেশ দূরে আস্তে আস্তে ভেসে আসছে। পেড্রো বলল।

—তার মানে জাহাজে চড়ে সৈন্যটি পালাচ্ছে। হ্যারি বলল।

—তা হতে পারে। তুমি চলো। পেড্রো বলল।

—যাবো তো বটেই। আমরা ঐ জাহাজটার পিছু ছাড়বো না। চলো। হ্যারি বলল।

দুজনে ডেক-এ উঠে এল। একটু আবছা দেখা যাচ্ছে, জাহাজের সব পাল খুলে দেওয়া হয়েছে। বেশ জোরে জাহাজ চলেছে সমুদ্রের ওপর দিয়ে।

—পেড্রো—শিগগির যাও। শাঙ্কো বিস্কোদের ডাকো। আমরা এক্ষুনি জাহাজ ছাড়বো।

পেড্রো ছুটে চলল সিঁড়িঘরের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে নামল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কো বিস্কো আর কিছু বন্ধু ডেক-এ উঠে এল।

হ্যারি অঙ্গুলে দিয়ে দূরের চলন্ত জাহাজটা দেখাল।

হ্যারি বলল—আমাদের জাহাজটা কে বা কারা উত্তর দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

—কী করবে এখন? শাঙ্কো বলল।

—জাহাজটাকে দূর থেকে অনুসরণ করব, হ্যারি বলল।

—তাহলে তো এখুনি আমাদের জাহাজ ছাড়তে হয়। বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো বিস্কো তোমরা এক্ষুনি জাহাজ ছাড়ো। সব পাল খুলে দাও। যত দ্রুত বেগে সম্ভব জাহাজ চালাও। ঐ জাহাজকে অনুসরণ করো—দূর থেকে।

ওদিকে সেদিন বিকেলে ফ্রান্সিস বলল—আজই চলো কয়েদখানায় যাবো। বন্ধুদের খোঁজ করবো। দেরি করবো না। দুজনেই এই দেশীয় পোশাক পরবো।

কিছু পরে তীরে নামল। রাস্তায় বেশ ভিড়। দোকানপাটে বেশ ভিড়। কেনাকাটা চলছে। মারিয়ার মন খুশিতে ভরে উঠল।

ফ্রান্সিস এসব দেখছে না। হ্যারি শাঙ্কোদের দেখা না হওয়া পর্যন্ত মনে শান্তি নেই। লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে ওরা কয়েদঘরের সামনে এল। দেখল ছোট সদর দরজায় তিনজন কারারক্ষী খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। একজন কারারক্ষীকে বলল—এই কয়েদখানার যিনি অধ্যক্ষ তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলবো। কারারক্ষী বলল—দাঁড়ান—আমি খবর দিয়ে আসছি।

—বলবেন যে একজন ভাইকিং কথা বলবেন।

—ঠিক আছে। কারারক্ষী চলে গেল।

—মারিয়া ফিস্‌ফিস্ করে বলল—ফ্রান্সিস আমরা ভাইকিং, দেখা করতে এসেছি এটা বললে কেন?

—এটা তো বলতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

কারারক্ষী ফিরে এসে বলল—ভেতরে গিয়ে ডানদিকে একটা বড় ঘর দেখবে। সেখানেই অধ্যক্ষ বসেন। আপনারা যান।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া ঢুকল। ডানদিকের ঘরটার সামনে এল। ঘরে ঢুকল। দেখল কারা অধ্যক্ষ একটা শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপাশে বসে আছে। টেবিলের এপাশে একটা লম্বাটে সিটের আসন। ফ্রান্সিসরা সেখানে বসল। অধ্যক্ষ বলল—

—এদেশি পোশাক পরেছো বটে—কিন্তু তোমরা বিদেশী সেটা বোঝা যাচ্ছে।

—হ্যাঁ—আমরা জাতিতে ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—বল কী বলতে চাও? অধ্যক্ষ বলল।

—এই কয়েদঘরে আমাদের দেশের কেউ বন্দী আছে কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

—কিছুদিন আগে একদল ভাইকিংকে আমরা বন্দী করে এখানে রেখেছিলাম। অধ্যক্ষ বলল।

—এখনও আছে ওরা? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না। খুব বুদ্ধি খাটিয়ে পালিয়েছে। অধ্যক্ষ বলল।

—এটা কতদিন আগের কথা? ফ্রান্সিস বলল।

—হবে—দিন দশ-পনেরো আগে। অধ্যক্ষ বলল।

—ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। অধ্যক্ষের নজরে পড়ল তা।

—অধ্যক্ষ বলল—খবরটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছো মনে হচ্ছে।

—ওরা আমাদের বন্ধু। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার বন্ধুরা পালিয়েছে—তোমরা পালাওনি?

—কথাটার মানে? ফ্রান্সিস বলল।

অধ্যক্ষ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে ডাকল—রক্ষীরা কে আছিস? দুজন কারারক্ষী ছুটে এল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—মারিয়া, চালে ভুল হয়ে গেছে। অধ্যক্ষ বলল—কিছুদিন আগে একজন ভাইকিং এখান থেকে পালিয়েছিল— মনে আছে?

—হ্যাঁ। কারারক্ষী একজন বলল। ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে দেখিয়ে অধ্যক্ষ বলল—এই দু'জন তাদেরই বন্ধু। এদের কয়েদঘরে ঢোকা।

কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—এসবের মানে কী? আমাদের বন্দী করবেন কেন?

—বন্ধুদের হয়ে তোমরা কয়েদ খাটবে।

—আমরা রাজি বন্ধুদের হয়ে কয়েদ খাটতে। কিন্তু সেটা কতদিন?

—সেটা বলবেন রাজা ভিলিয়ান। তবে যুদ্ধে হেরে গিয়ে রাজা মশায়ের মন মেজাজ ভালো নেই। কতদিনের সাজা দেবে কে জানে। অধ্যক্ষ বলল। আসনে বসল।

কারারক্ষী দুজন এগিয়ে এল। মারিয়া বলল—ফ্রান্সিস—তাহলে আবার করারাবাস।

—উপায় নেই। তবে বন্ধুদের হয়ে কারাবাস করছি—এটাই আমার সান্ত্বনা। চলো আমরা যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস ও মারিয়া কারারক্ষীদের পেছনে পেছনে চলল।

একটা ঘরের সামনে এল সবাই। একজন কারারক্ষী চাবির তোড়া থেকে চাবি বের করল। দরজা খুলল। ফ্রান্সিস ও মারিয়া ঢুকল। ঘর অন্ধকার। কারারক্ষী একজন চকমকি পাথর ঘষে আগুন জ্বালল। মশাল জ্বালল। কারারক্ষী দুজন চলে গেল।

এবার ফ্রান্সিস ঘরের মোটা নকশা আঁকা চাদরটার ওপরে শুয়ে পড়ল। মারিয়াও বসল। দেখতে লাগল চারিদিক। শক্ত পাথরের দেওয়াল। ওপর দিকে দুটো জানালা মত। গরাদ নেই।

মারিয়া বলল—তুমি তো বন্দী মেনে নিলে। এখন কতদিন এখানে পচতে হয় কে জানে!

—কালকে তো রাজসভায় নিয়ে যাবে। দেখা যাক রাজা ভিলিয়ান কী বলে। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি অনেকদিনের জন্যে বন্দী করে রাখে তবে কী করবে? মারিয়া বলল।

—তবে পালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে? মারিয়া বলল।

—পারতে হবে। সমস্যা একটাই—তোমাকে কী করে সঙ্গে নেব। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার জন্যে ভেবো না। তুমি মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে যাও এটাই আমি চাই, মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—এটা একটা কথা হল? এই বিদেশ বিভুঁইয়ে তোমাকে একলা রেখে পালিয়ে যাবো? এসব কখনো ভাববে না। আমার ভালো লাগে না। মারিয়া বলল—তুমি রাগ করো না। এসব তোমাকে আর বলবো না।

ফ্রান্সিস কিছু বলল না। চোখ বুঁজে শুয়ে রইল।

রাতে দুজন কারারক্ষী খাবার দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস খেতে খেতে বলল—পেট পুরে খাও। ভালো না লাগলেও খাও। এই কথাটা ফ্রান্সিস বন্দীদশার সময় সবাইকে বলে। পাখির মাংস আর আনাজের ঝোল।

খাওয়া শেষ করে ফ্রান্সিস আবার শুয়ে পড়ল। মারিয়াও কিছুক্ষণ বসে থেকে শুয়ে পড়ল।

গভীর রাত তখন। ফ্রান্সিসের ঘুম আসে নি। নানা চিন্তা মাথায়। মৃদুস্বরে ডাকল—মারিয়া? মারিয়া বলল—বলো।

—সে কি? তুমি এখনও ঘুমোও নি? ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি ঘুমোও নি আর আমি নাক ডাকিয়ে ঘুমোবো। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে। আমি ঘুমুচ্ছি। এবার তুমিও ঘুমোও। ফ্রান্সিস বলল।

একসময় দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালের খাওয়াটা শেষ হতেই দুজন কারারক্ষী এল। বলল—

—চলো—রাজসভায় যেতে হবে।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া উঠে দাঁড়াল। ঘরের বাইরে এল। দেখল কারার অধ্যক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। অধ্যক্ষ ফ্রান্সিসদের দেখে হাঁটতে লাগল। সদর দরজার বাইরে এলো সবাই। অধ্যক্ষও ফ্রান্সিসদের সঙ্গে হেঁটে চলল। সঙ্গে সঙ্গে দুজন কারারক্ষী।

পথে অনেকেই দেখল দুজন বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু বন্দীরা কোন দেশের তা কেউ বুঝল না। যদিও বন্দী দুজন এ দেশীয় পোশাকে তবু মুখ দেখে গায়ের রং দেখে বোঝা যাচ্ছে ওরা দুজন বিদেশী।

সবাই হাঁটতে হাঁটতে একটা লম্বাটে বেশ বড় পাথরের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দেখল—প্রবেশ পথে পাথরের তোরণ। তাতে কুঁদে কুঁদে মশাল লতা পাতা পাল তোলা। দুজন রক্ষী দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে লোহার বর্শা। ফ্রান্সিস বুঝল—এটাই রাজবাড়ি। রক্ষীরা অধ্যক্ষকে মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল।

সবাই রাজসভাঘরে ঢুকল। এর মধ্যেই রাজসভায় বেশ ভিড়। লম্বাটে ঘরটার মাঝামাঝি রাজসভা। রাজা ভিলিয়ান তখনও আসে নি। ফ্রান্সিস দেখল—দুটো

সিংহাসন। ও ঠিক বুঝলো না আর একটি ছোট সিংহাসন কার জন্যে।

অল্প কিছু পরে রাজা ভিলিয়ান ঢুকল। পেছনে রানি। বড় সিংহাসনটায় রাজা বসল। ছোটটায় রানি বসল। উপস্থিত সবাই উঠে দাঁড়িয়ে রাজারানিকে সম্মান জানাল।

রাজার মুখ বিমর্ষ। বোঝাই গেল যুদ্ধে পরাজয়টা রাজা মেনে নিতে পারে নি। রানির কিন্তু হাসিমুখ। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ছেলেমানুষের মত হাসছে।

দুটো বিচারের পর কারা অধ্যক্ষ মাথা নুইয়ে রাজারানিকে সম্মান জানিয়ে বলল—মহামান্য রাজা আমার একটা নিবেদন ছিল।

—বলো। রাজা বলল।

ফ্রান্সিস ও মারিয়াকে দেখিয়ে অধ্যক্ষ বলল—এরা দুজন জাতিতে ভাইকিং। দিন সাত আট আগে-এর বেশ কয়েকজন বন্ধুকে বন্দী করা হয়েছিল। আপনি তাদের গুপ্তচর সন্দেহ ছয়মাস কারাবাসের হুকুম দিয়েছিলেন।

—হুঁ। বলো। রাজা বলল।

—দিন আট-দশ আগে ওরা কারাকক্ষের জানালা দিয়ে বেরিয়ে পালিয়ে গেছে। এখন এরা বন্ধুদের খোঁজে আমার কাছে এসেছিল। আমি আপনার কাছে আনলাম। এখন ওদের কী শাস্তি দেবেন দিন।

—এদেরও ছমাস কারাবাস। রাজা বলল।

—মাননীয় রাজা—এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি—আমার মনে হয়—এদের গুপ্তচরবৃত্তির জন্যেই আমরা যুদ্ধে হেরে গেছি। অধ্যক্ষ বলল।

—ঠিক—ঠিক। এদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলাম। রাজা বলল।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল—মাননীয় রাজা এতো নিষ্ঠুর হবেন না। ভেবে দেখুন—আমরা বিদেশি ভাইকিং আপনাদের দেশে আমাদের কী স্বার্থ। গুপ্তচরবৃত্তির মত ঘৃণ্য কাজ আমরা করি না।

—না—না। রায় দেওয়া হয়ে গেছে। রাজা বলল।

এবার রানি মারিয়াকে জিজ্ঞেস করল—

—তোমার নাম কী?

—মারিয়া।

—তোমার স্বামী কোথায়?

মারিয়া ফ্রান্সিসকে আঙ্গুল তুলে দেখাল।

রানি হেসে উঠল—বাঃ কী মজা। সারাজীবন একটা ঘরে শুধু তোমরা দু'জন। এক সঙ্গে।

ফ্রান্সিস বলল—মাননীয়া রানি—মারিয়া আমাদের দেশের রাজকুমারী।

—বলো কি! রাজকুমারী? অ্যাঁ? কিন্তু চেহারা দেখে তো সেটা মনে হচ্ছে না।

—আমরা দীর্ঘদিন নানা দ্বীপে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। রোদ বৃষ্টি ঝড় অসহ্য



গরম আবার ঠাণ্ডা—এতসবের ধকল পুইয়ে শরীর ঠিক রাখা যায় না। চেহারায় তার প্রভাব পড়ে।

—তা ঠিক। যাকগে তোমাদের মত গুপ্তচরদের এরকম শাস্তিই হওয়া উচিত। রাজা ঠিক শাস্তিই দিয়েছেন। রানি হেসে বলল।

রাগে ফ্রান্সিসের বুক ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। নাক দিয়ে জোরে শ্বাস পড়তে লাগল। মারিয়া ভয়ে বলে উঠল।—ফ্রান্সিস—শান্ত হও। ভাগ্যে যা আছে মেনে নাও। ফ্রান্সিস —শোন—

ফ্রান্সিস রাজা রানিকে কোনরকম সম্মান না জানিয়েই পেছন ফিরে সভাঘরের দরজার দিকে হাঁটতে লাগল। অধ্যক্ষের গলা শোনা গেল—দ্যাখ্ দ্যাখ্—পালিয়ে না যায়। দুজন কারারক্ষী ছুটে এল। ফ্রান্সিস পেছন ফিরে দাঁড়াল। অধ্যক্ষের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার জন্যেই আমাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। শোন—আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে খুন করবো।

অধ্যক্ষ বেশ ভয় পেল। বলল—এই তোরা একে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল্। এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মারিয়া এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। বলল—ফ্রান্সিস শান্ত হও।

সবাই কারাগারে এল। ফ্রান্সিস আর মারিয়া যে ঘরে ছিল সেদিকে চলল। কারা অধ্যক্ষ এগিয়ে এল। হেসে বলল—তোমাদের তো অনেকদিন থাকতে হবে। তাই চার নম্বর ঘরটাতে তোমাদের রাখবো। শুকনো ঘাসের পুরু বিছানা। ঘরটা রোদ পায় বলে একটু গরমও। তাছাড়া তোমরা আর যা চাইবে পাবে। মারিয়া গলা চড়িয়ে বলল—থাক—আমাদের সুবিধে দেখতে হবে না। যা ঘরে আছি আমরা সেঘরেই থাকবো।

কিন্তু আপনাদের তো কষ্ট হবে। কত বছর থাকতে হবে। অধ্যক্ষ হেসে বলল। কথাটা শেষ হতেই ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ছুটে গিয়ে অধ্যক্ষের গলার কাছে জামাটা চেপে ধরল। তারপর ফ্রান্সিস এক হ্যাঁচকা টানে উচুঁতে তুলল। অধ্যক্ষ বলে উঠল—এ্যাই ধর একে। তরোয়াল চালা। দুজন কারারক্ষক তরবারি কোষমুক্ত করল। মারিয়া গিয়ে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। বলল—ফ্রান্সিস—শান্ত হও। এভাবে আমাদের বিপদ বাড়বে। রক্ষী দুজন তরোয়াল উঁচিয়ে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস দেখল সেও তো নিরস্ত্র। ও অধ্যক্ষকে এক হ্যাঁচ্‌কা টানে মাটিতে নামাল। মুঠো ছেড়ে দিল। অধ্যক্ষ মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। বলল—তোরা সাবধান। এই বন্দী যেন কখনও বাইরে আসতে না পারে।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া কারাকক্ষে ঢুকল। মারিয়া ঘাসের বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস পায়চারি করতে লাগল। ঘরের তালাবন্ধ করল একজন প্রহরী।

মারিয়া হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। বলল—বসো। ফ্রান্সিস চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মারিয়া আবার বলল—শান্ত হয়ে বসো। ফ্রান্সিস বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। দাঁত চাপাস্বরে বলল—মারিয়া—তুমি যদি না থাকতে আমি রাজা

রানি আর ঐ কারার অধ্যক্ষকে মেরে ফেলতাম।

—আমি জানি—আমার জন্যেই তোমাদের এত কষ্ট। মারিয়া ফুঁপিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। মারিয়ার কাঁধে দু'হাত রেখে বলল—

—মারিয়া—কেঁদো না। এভাবে কথাটা বলা উচিত হয়নি। তোমাকে কাঁদতে দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না। তুমি কেঁদো না। মারিয়া চোখ মুছল। আর কাঁদল না।

ফ্রান্সিস আর মারিয়ার দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছে তখনই কারার অধ্যক্ষ ঢুকল। কারারক্ষীরা তাকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। অধ্যক্ষ মারিয়াকে বলল—আপনিই তো রাজকুমারী?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে ডাকছেন কেন? মারিয়া বলল।

—আমি না। রানিমা চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছেন। আপনাকে রানিমার কাছে যেতে হবে। উনি আপনাকে ডেকেছেন। অধ্যক্ষ বলল।

—আমি যাবো না। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল।

—তার মানে? রানিমা স্বয়ং লোক পাঠিয়েছেন আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে আর আপনি বলছেন যাবো না?

—কী কারণে মারিয়াকে ডেকে পাঠিয়েছেন সেটা কি জানানো হয়েছে? ফ্রান্সিস বলল।

—না—সেসব আমি জানি না। রানিমাও ঐ ব্যাপারে কিছু লেখেন নি। অধ্যক্ষ বলল।

—তাহলে কারণটা আপনি জেনে আসুন তারপর কারণের গুরুত্ব বুঝে মারিয়া যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ওরে বাবা—রানিমার কাছে কে কারণ জানতে যাবে। অধ্যক্ষ বলল।

—কেন? আপনি যাবেন? মারিয়া বলল।

—আমি? মরে যাবো। মরে যাবো কি আমি মরে গেছি। অধ্যক্ষ বলল।

—কী আর হবে—যান। অধ্যক্ষ বলল।

অধ্যক্ষ চিৎকার করে বলল—আমাকে বেত মারা হবে। তারপর চাকরি থেকে বরখাস্ত।

—তাহলে তো আপনার খুবই বিপদ দেখছি। ফ্রান্সিস বলল।

—বিপদ বলে বিপদ। আমি শেষ—খতম। অধ্যক্ষ বলল।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। ব্যাপারটা ভালো জমেছে। গলা নামিয়ে ফ্রান্সিস বলল।

অধ্যক্ষ এবার হাত জোড় করে মারিয়াকে বলল—রাজকুমারী শিগগিরি যান। এতে আপনাদের দুজনেরই উপকার হবে। কথাটা ফ্রান্সিসকে আগ্রহী করল। মনে মনে ভাবল—মারিয়া যাক। গিয়ে দেখুন রানি কী বলতে চান। হয়তো আমাদের মুক্তিও দিতে পারে।

ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া যাও—রানি কী বলে সেটা শুনে এসো।

—রানির চোখে আমি কুটিল দৃষ্টি দেখেছি। উনি ভালো মানুষ নন। মারিয়া বলল।

—সংসারে ক'জন আর ভালো মানুষ আছে। এই যে অধ্যক্ষ—জঘন্য প্রকৃতির মানুষ। এর সঙ্গেও তো আমাদের কথা বলতে হয়। যাও—জেনে এসো রানি কী বলতে চান? ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। মারিয়া উঠে দাঁড়াল। বলল—আমাকে কে নিয়ে যাবে?

—আমার কাজের ঘরে এক মহিলা বসে আছে সেই নিয়ে যাবে। চলুন।

দুজনে কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। অধ্যক্ষের কাজের ঘরে এলো। মারিয়া দেখল একজন বয়স্কা মহিলা। অধ্যক্ষ তার দিকে তাকিয়ে বলল-এই যে রাজকুমারী মারিয়া। এঁকে নিয়ে যাও।

মহিলাটি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মারিয়া পেছনে পেছনে বেরিয়ে এল।

সদর রাস্তায় এলো। মারিয়া চারদিকে উৎসুক চোখ মেলে লোকজন বাজার বাড়িঘর দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে রাজবাড়িতে পৌঁছল। স্ত্রীলোকটি রাজবাড়ির পেছন দিকে এল। টানা পাথরের দেয়াল। মহিলাটি পাথরের দেয়ালের মধ্যে একটা কাঠের দরজায় হাত দিয়ে টুক্ টুক্ শব্দ করল। দরজা খুলে গেল। দেখা গেল একজন স্ত্রীলোক পেতলের বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝা গেল অন্তঃপুরে পাহারা দেয়। মারিয়ারা ঢুকতেই স্ত্রীলোকটি দরজা বন্ধ করে দিল।

এক পরিচারিকার সঙ্গে মারিয়া চলল। পরপর কয়েকটি বাগান। কত ফুল ফুটে আছে। ফুলের গন্ধ নাকে লাগল। কে জানে কোন ফুলের গন্ধ। দুটো ফোয়ারা আছে। তারপর একটা চারকোনা চত্বর। তারপরেই পাথরের দরজা। এখানে কেউ পাহারা দিচ্ছে না।

দুজনে ঢুকল। দুধারের দেয়ালে ছবি বসানো। মারিয়া বুঝল এসব অতীতের রাজা রানিদের ছবি। দুজনে এগিয়ে চলল। দুধারে ঘর। পালঙ্কের পালকের বিছানায় শুয়ে আছে বসে আছে কথাবার্তা বলছেন রানির সহচারীরা। এখানে সুগন্ধি কিছু দেওয়া হয়েছে। সুন্দর গন্ধ। সকলেই মারিয়াকে ঔৎসুক্যের সঙ্গে দেখতে লাগল।

এবার ডানদিকে একেবারে আলাদা দুটো ঘর। এখানে মেঝে মোজেক করা। স্ত্রীলোকটি বলল—দাঁড়ান। রানিমা কোন ঘরে আছেন দেখে আসছি। স্ত্রীলোকটি চলে গেল। মারিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। মারিয়াদেরও দেশে প্রাসাদ আছে। কাজেই এরকম অন্দরমহলও আছে। সেটাও বা এর চেয়ে কম কি। হঠাৎ মারিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ওদের প্রাসাদের কথা মনে পড়ল। ফ্রান্সিসদের সাজানো গোছানো বাড়ির কথা মনে পড়ল। চোখে জল এল। মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে চোখ মুছল। এসব বেশি ভাবলে মন খারাপ হবে। ফ্রান্সিসও এটা পছন্দ করে না।

কিছু পরে পরিচারিকাটি ফিরে এল। বলল—চলুন—রানিমা সাজঘরে

আছেন।

কিছুটা এগিয়েই ডানদিকে একটা ঘর। দরজায় মোটা কাপড়ের পর্দা। সুচিত্রিত।

পর্দা সরিয়ে ঢুকল। দেখল একটা বেশ বড় ঘর। একটা খাট রয়েছে মাঝখানে। রানি খাটে বসে আছে। পরিচারিকারা রানিকে সাজাচ্ছে। রানির পরনে ঢোলা হাতা সাধারণ পোশাক। মারিয়া মনে মনে হাসল। দামি ভালো কাপড়টা এখনও পরানো হয়নি। গয়নাগাটিও এখনও পরানো হয়নি।

রানি মারিয়াকে দেখে বলল—তুমি তো মারিয়া?

—হ্যাঁ। মারিয়া মাথা কাত করে বলল।

—এখানেই বসো। রানি বলল।

মারিয়া খাটে বসল। রানি বলল—ভালো হয়ে বসো। মারিয়া বলল—ঠিক আছে।

—আর বলো কেন। মাঝে মাঝেই মন্ত্রী সেনাপতি বড় বড় ব্যবসাদারের বাড়িতে নাচগানের আসর বসে। যেতে হয়। আচ্ছা—তোমরা তো শুনলাম পশ্চিম য়ুরোপের অধিবাসী। তোমরা তো ভালো সাজসজ্জা জানো। রানি বলল।

—ঐ আর কি। মারিয়া হেসে বলল।

—দ্যাখো তো আমার মুখের সাজ ঠিক আছে? রানি বলল।

মারিয়া রানীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর বলল—আপনার ভুরুটা একটু মোটা হয়ে গেছে।

রানি সামনে বসা পরিচারিকাকে বলল—ভুরুটা ঠিক করে দে। পরিচারিকা ভুরুটা ধারগুলো মুছে মুছে সরু করল। রানির সামনে আয়না ধরা হল। নিজের মুখ দেখে রানি মহা খুশি।

—মারিয়া—তুমি এখানেই থাকো। আমাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেবে। রানি বলল।

—মাননীয়া রানি—তা হয় না। আমার স্বামী কয়েদ খাটছে। মারিয়া বলল।

—হুঁ। একটু সমস্যা। যাহোক আমি তোমার স্বামীর শাস্তি মুকুব করিয়ে দেবো। রানি বলল।

—না। আমি কয়েদঘরেই থাকবো। মারিয়া বলল।

মারিয়া কিছুতেই ভুলতে পারছে না। এই রানিই রাজসভায় বলেছিল ঠিক শাস্তি হয়েছে। একটা বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠল। দয়ামায়া বলে কোন বোধই এই রানির নেই। তাকে সাজগোজ করাতে আমি আসবো কেন। এই রানির সঙ্গে কী সম্পর্ক আমাদের?

—তাহলে তুমি এখানে থাকবে না? রানি একটু রেগেই বলল।

—না। আপনিই তো রাজদরবারে আমাদের গুপ্তচর বলাকে সমর্থন করেছিলেন। আপনি অনায়াসে পারতেন; আমাদের যে অন্যায় শাস্তি রাজা দিয়েছিলেন সেটা মকুব করাতে। মারিয়া বলল।

—এবার মকুব করাবো। তবে দু'এক বছর না গেলে পারবো না। রানি

বলল।

—ততদিন তো আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। মারিয়া বলল।

—তা তো হবেই। রানি বলল।

—আমার স্বামী ঐ কয়েদঘরেই থাকবেন বলেছেন। তবে যাবজ্জীবন নয়। মারিয়া বলল।

—তাহলে কী করবে? রানি বলল।

—পালাবে। মারিয়া বলল।

—পালাবে? রানি বলল।

—অনায়াসে। মারিয়া বলল।

—আমাদের কত কারারক্ষী আছে জানো? কারা অধ্যক্ষও আছে। রানি বলল।

—আপনাদের যত কারারক্ষীই থাকুক আমার স্বামীকে বন্দী করে রাখতে পারবে না। মারিয়া বলল।

—তাহলে তো আর দেরি করা কেন? কাল পরশুই পালিয়ে যাক। রানি বলল।

—সেটা অনায়াসেই পারতো তার বুদ্ধি দিয়ে। কিন্তু সমস্যা হলাম আমি। আমাকে রেখে পালিয়ে যেতে তো পারবে না। মারিয়া বলল।

—যাক গে—ওসব কথা। তুমি কয়েদঘরেই থাকো। দরকার পড়লে তোমাকে ডাকবো। রানি বলল।

—বেশ। মারিয়া বলল।

রানি তখন একজন পরিচালিকাকে ডাকল। বলল—যা সদর দরজায় একজন প্রহরীকে গিয়ে বল, ও যেন একে কয়েদঘরের অধ্যক্ষের কাছে নিয়ে যায়। যা—

পরিচারিকা চলে গেল।

—রাজকন্যা বলে তোমার একটু গোপন গর্ব আছে। রানি বলল।

— না—আমি রাজকন্যা বলে নয়। ফ্রান্সিসের মত স্বামী পেয়েছি বলে আমি গর্বিত। মারিয়া বলল।

পরিচারিকা এল। বলল—রানিমা প্রহরীকে বলেছি। এখন এই রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে হবে।

—বেশ। নিয়ে যা। একটু থেমে রানি বলল—আমাকে সাজগোজ করানোর কাজটা বোধহয় অপমানজনক মনে হয়েছে তোমার। রানি বলল।

—না। ইচ্ছে হলে আমি প্রায় সব কাজই নিজের কাজ বলে মনে করি। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে—ঠিক আছে। ডাকলে এসো। রানি বলল।

—আমি এখনও ঠিক করতে পারিনি—আসবো কি আসবো না। মারিয়া বলল।

—ভেবে দেখ। রানি বলল।

মারিয়া পরিচারিকার সঙ্গে অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এল। প্রহরীটিকে ডেকে পরিচারিকা চলে গেল। প্রহরী এগিয়ে এল। বলল—চলুন।

তখন রাত হয়েছে। সদর রাস্তায় লোকজনের ভিড়। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কয়েদঘরে সারাদিন গরমের মধ্যে কাটিয়ে মারিয়ার বাতাসটা ভালো লাগল। বাইরে আলো দোকানপাটও ভালো লাগল। আর কোনদিন মুক্তি পাবে কি না। মারিয়া আকাশের দিকে তাকাল। ভাঙা চাঁদ। লক্ষ তারার ভিড়। এত সুন্দর পৃথিবী আর এক অন্ধ কুঠুরিতে আমরা পড়ে আছি। অল্পক্ষণের জন্যে হলেও আমি তো বাইরে আসতে পারলাম। ফ্রান্সিস অন্ধ কূপেই রইল। এসব ভাবতে গিয়ে মারিয়ার চোখে জল এল। মারিয়া হাত দিয়ে চোখ মুছল।

কয়েদখানায় পৌঁছে দিয়ে প্রহরীটি চলে গেল। মারিয়া ঢুকতেই অধ্যক্ষ তার ঘর থেকে ছুটে এল। হেঁ হেঁ করে হেসে বলল—রাজকুমারী—রানিমা কী বললেন।

—তেমন কিছু নয়। মারিয়া বলল।

—তবু? অধ্যক্ষ বলল।

মারিয়া চুপ করে রইল।

—বলুন না। আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি তো? অধ্যক্ষ বলল।

—উনি কি আপনাকে চেনেন? মারিয়া বলল।

—না—তা চেনেন না। অধ্যক্ষ বলল।

—তাহলে আর আপনার ভয় কিসের। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ—তাই তো। অধ্যক্ষ হেসে বলল।

ঐ লোকটার সঙ্গে কথা বলতে মারিয়ার বিশ্রী লাগছিল। কয়েদঘরের দরজা খোলা হল। মারিয়া ঢুকল। ফ্রান্সিস শুয়েছিল। উঠে বসল। মারিয়া বসল।

—কী ব্যাপার বলো তো? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

মারিয়া আস্তে আস্তে সব কথা বলল। ফ্রান্সিস বলল—এ তো অদ্ভুত ব্যাপার। সাজসজ্জা করাবার জন্যে তোমাকে যেতে বলেছে!

—আসলে এদেশিয় মেয়েরা তো সাজগোজের ব্যাপারটা বোঝে না। এমন করে রানির ভুরুতে কালো রং করেছে যেন দুটো মোটা জোঁক আটকে আছে। মারিয়া বলল।

—হুঁ। মজার ব্যাপার। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—আসলে রানি চান যুরোপের মেয়েরা যারা নতুন নতুন সাজসজ্জা করতে পারে তাদেরই সে চায়।

—তাহলে কী করবে? ফ্রান্সিস বলল।

—যেদিন নাচ বা গানের আসরে রানিকে যেতে হবে সেদিন লোক পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে যাবেন। মারিয়া বলল।

—তুমি সেদিন যাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। যাবো। রানি কথায় কথায় একটা কথা বলেছে যে দু'এক বছরের

মধ্যে আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবে। মারিয়া বলল।

—আমরা তার অনেক আগেই পালাবো। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া একটা কথা ভাবছি।

—কী কথা? মারিয়া বলল।

—তুমি রাজবাড়িতেই রানির মহলে থাকো। ফ্রান্সিস বলল।

—রানির মহলে থাকবো? এখানে থাকলে অসুবিধেটা কোথায়? মারিয়া বলল।

—মারিয়া—তোমার শরীরটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। এসব কয়েদখানা তোমার থাকার জায়গা না। ফ্রান্সিস বলল।

—না—আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—অবুঝ হয়ো না মারিয়া। আমাদের তো আয়না দেখার সুযোগ নেই—কাজেই তোমার শরীর কতটা খারাপ হয়েছে জানো না। বুঝতেও পারছো না। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি এখানে একা থাকবে? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ একাই থাকবো। তাতে আমার পালাবার সুবিধে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তাহলে কালকেই রানিকে খবর পাঠাবো যে আমি দেখা করতে চাই। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। কালকেই দেখা কর। ফ্রান্সিস বলল।

গভীর রাত পর্যন্ত ফ্রান্সিস ঘুমোতে পারল না। বোধহয় মারিয়াও ঘুমোয় নি। এক সময়ে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালের খাবার খেয়ে মারিয়া একজন প্রহরীকে কারার অধ্যক্ষের কাছে পাঠাল। বলল—বলো তো—আমি রানির সঙ্গে কথা বলতে যাবো। প্রহরীটি চলে গেল।

একটু পরেই অধ্যক্ষ মশাই প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। বলল—কী ব্যাপার? কী ব্যাপার?

—ব্যাপার তেমন কিছু নয়। আমি রানির সঙ্গে দেখা করবো। আপনি কোন প্রহরীকে আমার সঙ্গে পাঠান। মারিয়া বলল।

—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার একটা কথা ছিল। অধ্যক্ষ বলল।

—কী কথা। অধ্যক্ষ বলল। রানি যদি জানতে চান আমি অধ্যক্ষের কাজ কেমন করছি তাহলে অবশ্যই আমার কাজের প্রশংসা করবেন।

—আপনি মিছি মিছি ভয় পাচ্ছেন। মারিয়া বলল।

—না—না। আমার কথা উঠলে অবশ্যই বলবেন। অধ্যক্ষ বলল।

—ঠিক আছে, বলবো। এখন কোন প্রহরীকে পাঠান। মারিয়া বলল।

—আমি এক্ষুনি পাঠাচ্ছি। অধ্যক্ষ বলল। তারপর হাততালি দিয়ে একজন প্রহরীকে ডাকল। প্রহরীটি এলো।

—তুমি রাজবাড়ি যাও। অন্দরমহলে কোন পরিচালিকাকে দিয়ে রানিকে

বলো যে বন্দিনী ভাইকিং রাজকুমারী রানির সঙ্গে দেখা করতে চান। যাও। অধ্যক্ষ বলল।

প্রহরীটি রাজবাড়ি গেল। ওখানকার এক প্রহরীকে বলল—

—ভাই রানিকে একটা খবর পাঠাও।

—কী খবর?

—বলো যে কয়েদঘরে বন্দিনী রাজকুমারী রানির সঙ্গে দেখা করতে চান।

—বেশ। প্রহরীটি চলে গেল।

কিছু পরে প্রহরীটি ফিরে এল। বলল—রানিমা রাজকুমারীকে দেখা করবার অনুমতি দিয়েছেন।

তখন বেলা পড়ে এসেছে। একজন পরিচারিকা এল। অধ্যক্ষ পরিচারিকাকে দেখে আসন থেকে লাফিয়ে উঠল। বলল—রানিমা কি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

—না। রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

—ও। তাহলে আমার কথা কিছু বলেনি। পরিচারিকাটি বলল—না।

—ও। অধ্যক্ষ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে এল। একজন প্রহরীকে ইঙ্গিতে বোঝাল দরজা খুলে দাও।

প্রহরীটি দরজা খুলে দিল। মারিয়া দরজার কাছে এসে পিছু ফিরে ফ্রান্সিসকে বলল—তুমি দুশ্চিন্তা করো না। আমি ভালোই থাকবো।

পরিচারিকার সঙ্গে মারিয়া কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এল।

এবার ফ্রান্সিস পালাবার পরিকল্পনা করতে বসল। শুকনো ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। রানী মারিয়াকে অন্তঃপুরে থাকতে বলবেন কিনা তার ঠিক নেই। দেখা যাক রানি কী করেন? মারিয়াকে মহলে থাকতে বলবেন না কয়েদঘরে ফেরৎ পাঠান। আজকের রাতটা থাক। কালকে রাতে খাওয়ার পর পালাবো।

রাতটা কাটল। ফ্রান্সিস ভালো করে বুঝতে পারেনি। অনেক চিন্তা মাথায়। হ্যারিরা কোথায় আছে? ওরা কি রাজা অপর্তোর রাজ্যেই থেকে গেছে না এই ভিগোনগরে এসেছে। একটা স্বস্তি—হ্যারিরা কেউ এখানে কয়েদঘরে বন্দী হয়ে নেই। ওরা মুক্ত।

সন্ধের কিছু পরেই ফ্রান্সিস একজন প্রহরীকে ডাকল। বলল, আমাকে একটু তাড়াতাড়ি যেতে দেবে। প্রহরীটি একটু রসিকতা করে বলল —কেন? কেন নাচগানের আসরে যাবেন।

না আমি কয়েদঘরের বাইরে যাবো? ফ্রান্সিস বলল।

—পারবেন এখান থেকে বেরুতে? প্রহরীটা বলল।

—অনায়াসে। আমার ছক ভাবা হয়ে গেছে। এখন কাজে নামা। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে পড়ল, পালানো আর তার পরের কাজগুলো ভাবতে

লাগল। সবচেয়ে মুশকিল হবে মারিয়াকে অন্দরমহল থেকে বাইরে নিয়ে আসা। তার জন্যে কী করতে হবে সে সব ভাবতে লাগল।

ঢং ঢং-প্রহরী দরজা খুলে খাবার আনল। দরজাটা আধ ভেজানো। ফ্রান্সিস আর চোখে দেখল—দুজন ঘরে ঢুকেছে দুজন ঘরের বাইরে পাহারা দিচ্ছে।

হঠাৎ ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়িয়েই মাটির ভাঁড় রাখা তরকারি ঝোলটা একজন প্রহরীর মুখে চোখে ছিটিয়ে দিল। প্রহরীটা মেঝেয় পড়ে গেল। এবার যে প্রহরীটা কাটা রুটি কাঠের থালায় নিয়ে আসছিল সেই থালাটা তুলে ফ্রান্সিস প্রহরীর চোখ মুখে চাপা দিল। প্রহরীটি বসে পড়ল। তার কোমরে গুঁজে রাখা তরোয়ালটা ফ্রান্সিস এক টানে তুলে নিল। ছুটল বাইরের দিকে। বাইরে এসে দেখল-আরো দুজন প্রহরী খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস ছুটে এসে একজন প্রহরীর খোলা তরোয়ালে এত জোরে তরোয়াল চালাল যে—তরোয়াল ছিটকে গেল।

ইতিমধ্যে ভেতরের প্রহরীর কয়জন ছুটে আসতে লাগল।

ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। এক ছুটে রাস্তার ওপাশে গেল। তারপর এক লাফ দিয়ে নর্দমাটা পার হল। তারপর ঝোপ জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ফ্রান্সিস এত দ্রুত কাজ সারল প্রহরীরা বোকা বনে গেল। ওরা তৈরি হওয়ার কোন সুযোগই পেল না। সেই নর্দমা লাফিয়ে পার হল কয়েকজন প্রহরী। জংলা ঝোপের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে কাঁটা গাছ সরিয়ে সরিয়ে যেতে লাগল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে বিস্তীর্ণ এক ঘাসে-ঢাকা প্রান্তর দিয়ে ছুটল। লক্ষ্য-রাজবাড়ি। তরোয়ালটা ফেলে দিল না। কোমরে গুঁজে রাখল। আজকে চাঁদের আলো অনেকটা উজ্জ্বল। চারপাশে সবই ভালো দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস ছুটে চলল। একটু খুঁজতেই হল। পেয়ে গেল রাজবাড়ি।

রাজবাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বারে এল। দূর থেকে দেখল প্রবেশদ্বারের মাথায় অনেকগুলো মশাল জ্বলছে। প্রায় আট-দশজন সশস্ত্র প্রহরী রাজবাড়ি পাহারা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস বুঝল এখান দিয়ে রাজবাড়িতে ঢোকা অসম্ভব।

ফ্রান্সিস পেছন দিকে চলল। কয়েকটা ফুলবাগান আর ফোয়ারার পরে রাজবাড়ির দেওয়াল। দেওয়াল খুব উঁচু নয়। দেওয়ালে ওঠা যাবে। রাজবাড়িতে ঢোকাও যাবে।

দেওয়ালে একটা কাঠের দরজা। তার মানে এদিক দিয়ে রাজবাড়ির অন্দরমহলে যাওয়া যায়। ফ্রান্সিস বুঝল দেওয়াল টপকে ভেতরে যেতে হবে। তারপর মারিয়াকে খোঁজা।

ফ্রান্সিস দেওয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল। কাঠের দরজার গায়ে চ্যাপ্টা লোহার দণ্ড। ফ্রান্সিস দরজার ওপরের দিকে তাকাল সহজেই ওঠা যাবে।

এবার ফ্রান্সিস লোহার চ্যাপ্টা দণ্ডগুলোর ওপর পা রেখে রেখে দরজার মাথায় উঠে এল। তারপর দরজার ওপাশে লোহার চ্যাপ্টা দণ্ডগুলোর ওপর পা রেখে রেখে নিচে চলে এল। একটু হাঁপাচ্ছিল ফ্রান্সিস। দরজাটায় ভিতর থেকে তালা লাগানো।

চাবিটা তালাটার ফুটোয় লাগানো। ফ্রান্সিস তালাটা খুলে ফেলল।

এবার চলল অন্দরমহলের দিকে। দেখল প্রথম দরজাটা কাঠের। ফ্রান্সিস দরজাটা ধরে আস্তে টানল কয়েকবার। এবার ভেতর থেকে তালা লাগানো।

ফ্রান্সিস এপাশ ওপাশে তাকিয়ে দেখল বেশ কটা জানালা আছে। একটা জানালার কাছে এল। জানালায় লোহার কাজ করা। জানালাটা কাঠের। ফ্রান্সিস জানালাটা ধরে আস্তে চাপ দিয়ে নিজের দিকে টানল। জানালার পাল্লা খুলে গেল। আর কোন বাধা নেই। ফ্রান্সিস জানালার খোলা পাল্লা ধরে এক লাফে জানালাটায় উঠল। তারপর পা বাড়িয়ে নিঃশব্দে ঘরটায় নামল। মোমের আলোয় দেখল—রাজবাড়ির পরিচারিকারা ঘুমিয়ে আছে।

যাতে কোন শব্দ না হয় ওদের ঘুম না ভাঙে—ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ঘরটা পার হল। দরজার কাছে এল। পরিচারিকাদের সঙ্গে এখানে মারিয়া থাকবে না, নিশ্চয়ই মারিয়াকে আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছে।

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল বাঁ দিকে। টানা বারান্দার মত চলে গেছে। দুদিকে পরপর ঘর।

ফ্রান্সিস পরের ঘরটায় ঢুকল আরো কয়েকজন পরিচারিকা ঘুমিয়ে আছে। মারিয়া এখানে নেই।

এবার অন্য ঘরটায় ঢুকল। পরিপাটি সাজানো গোছানো ঘর। মাঝখানে একটা অবশ্য বড় খাট। দেখল রানি ঘুমিয়ে আছে। বাতাসে সুগন্ধ। একটা কাচঢাকা মৃদু আলো। ঘরটা শুধু রানিরই।

পরের ঘরটা দেখল—বেশ সাজানো গুছানো। কাচে ঢাকা আলো জ্বলছে। রানির সহচরীদের সঙ্গে মারিয়া ঘুমিয়ে আছে।

ফ্রান্সিস এতক্ষণে স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে পা ফেলে মারিয়ার কাছে এল। আস্তে কাঁধে ধাক্কা দিল। মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাকাল। অল্প আলোয় ফ্রান্সিসকে দেখল। দ্রুত উঠে বসল। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে দরজাটা দেখাল। মারিয়া উঠে দাঁড়াল। পোশাক গুছিয়ে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। দুজনে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

এবার মারিয়াই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

রাজবাড়ির পেছনের দরজাটার কাছে এল। দরজায় তালা ঝুলছে। মারিয়া তাড়াতাড়ি পাশে রাখা একটা কাঠের বাক্সে হাত ঢুকিয়ে খুঁজে বলল—চাবিটা নেই। কয়েকদিন আগে দুজন পরিচারিকা রাতে এই দরজা খুলে পালিয়েছে। তাই এত কড়াকড়ি।

—ঠিক আছে। দেওয়াল ডিঙিয়ে যাব। এসো।

ফ্রান্সিস নিচু হয়ে দুটো হাত বাড়িয়ে বলল—হাত দুটোয় দু' পা রাখো। মারিয়া কোনরকমে দুটো হাতে পা রাখল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে তুলতে লাগল। বলল—দরজাটায় ভর রাখো।

একটু পরেই মারিয়া দরজার ওপরে উঠে এল। এবার ফ্রান্সিস দরজায় পা

রেখে দরজার ওপরে উঠল। তারপরে অনুজ্জ্বল জোৎস্নায় দেখল দরজার গায়ে চ্যাপ্টা লোহা লাগানো। ফ্রান্সিস বলল—ওগুলোর ওপর পা দিয়ে নেমে আসবে। আমি দাঁড়াচ্ছি।

ফ্রান্সিস নামল। এবার দু হাত বাড়িয়ে বলল—নেমে এসো। মারিয়া পা রেখে নামল কিছুটা। তারপরেই নামতে গিয়ে পা পিছলে গেল। মারিয়া পড়ে যাচ্ছিল। ফ্রান্সিস নিচে থেকে ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। মারিয়া আস্তে আস্তে নেমে এল।

দুজনে নেমেই ছুটল। রাজার বাড়ির এলাকা থেকে সদর রাস্তায় এসে উঠল।

এবার ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। দুজনেই হাঁপাচ্ছে তখন। ফ্রান্সিস বলল—এখন দৌড়ে যাওয়া ঠিক নয়। একে তো আমরা বিদেশি তার ওপর দৌড়ে যাচ্ছি দেখলে যে কারো সন্দেহ হবে। আমরা বিপদে পড়বো। অর্থাৎ আবার কয়েদঘর।

এবার দুজনে হাঁটতে লাগল জাহাজঘাটার দিকে।

একটু পরে পূব আকাশে থালার মত কমলা রঙের সূর্য উঠল। চারদিকে আলো ছড়াল।

ফ্রান্সিস দূর থেকে দেখল কয়েদখানার দুই রক্ষী আসছে। ও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। চাপাস্বরে বলল—তুমি আমার কাছে থেকে সরে যাও। দুই রক্ষী।

মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল। কিন্তু ফ্রান্সিসরা ধরা পড়ে গেল। সৈন্য দুজন ছুটতে ছুটতে এল। ফ্রান্সিস বুঝল পারলো পালানো যাবে না। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজে পালাতে পারতো। তাহলে মারিয়াকে ধরতো ওরা। তাহলে ফ্রান্সিস দারুণ সমস্যায় পড়তো।

রক্ষী দুজন ফ্রান্সিস আর মারিয়ার কাছে এল। একজন রক্ষী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—তোমরা দুজন কয়েদ খাটছিলে।

—হ্যাঁ। তাতে কী হল? ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা পালিয়েছিলে। রক্ষী বলল।

—আমি পালাই নি। রাজরানি আমাকে অন্দরমহলে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। মারিয়া বলল।

—বেশ। কিন্তু তুমি? রক্ষী ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল।

—হ্যাঁ আমি পালিয়েছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন পালিয়েছিলে? রক্ষী বলল।

—সে তুমি বুঝবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক গে—তোমরা দুজনেই কয়েদখানায় চলো। একজন রক্ষী বলল।

—আমরা যাবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তরোয়ালের ঘা খেয়ে মরবে। অন্য রক্ষীটি বলল।

—ঠিক আছে তরোয়াল চালাও। ফ্রান্সিস বলল।

দুজন রক্ষী তরোয়াল কোষমুক্ত করল।

ফ্রান্সিস তরোয়াল খুলে মারিয়ার হাতে দিল। মৃদুস্বরে বলল—আজকে

তোমার পরীক্ষা। মারিয়া ঘাবড়াল না। তরোয়ালটা ভালো করে ধরে রুখে দাঁড়াল।

একজন সৈন্য বলল—এ তো মেয়ে। এর সঙ্গে লড়াই করতে গেলে ও তো মরে যাবে।

—কথা রাখো। তরোয়াল চালাও। মারিয়া বলল। রক্ষী তরোয়াল নিয়ে মারিয়াকে আক্রমণ করল। মারিয়া মার ঠেকাল। তারপর নিজে তরোয়াল চালাল। রক্ষীটি ঠেকালেন। শুরু হল লড়াই। ফ্রান্সিস লক্ষ্য রাখল মারিয়া যাতে আহত না হয়। লড়াই জমে উঠল। রক্ষীটি কিছুতেই মারিয়াকে হারাতে পারছে না। তরোয়ালে ঘায়ে মারিয়ার কাঁধের জামা কেটে গেছে। কিন্তু মারিয়া ভ্রূক্ষেপ করল না। তরোয়াল চালাতে লাগল।

ফ্রান্সিস চড়া গলায় বলে উঠল—এবার থামো। রক্ষীটি আর মারিয়া দুজনেই লড়াই থামাল। দুজনেই হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—একজন মেয়েকে তুমি হারাতে পারলে না। আমার সঙ্গে কী লড়বে?

অন্য রক্ষীটি এবার ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হল। ফ্রান্সিস দ্রুত মারিয়ার হাত থেকে তরোয়ালটা নিল। শুরু হল ফ্রান্সিসের সঙ্গে ঐ রক্ষীটির লড়াই।

এই সকালেও ফ্রান্সিসদের ঘিরে মানুষের জটলা হল। চলল লড়াই। রক্ষীটি একটু পরেই বুঝতে পারল কার পাল্লায় পড়েছে। ফ্রান্সিস ঠিকই করেছিল সৈন্যটির শরীরে আঘাত করবে না। ওর দম ফুরিয়ে দেবে। সৈন্যটি আর তরোয়ালই তুলতে পারবে না। কিছুক্ষণ পরে তাই হল। সৈন্যটি মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস ওর বর্মের চামড়ার ফিতে কেটে দিল। বর্ম খুলে পড়ল। সৈন্যটি দাঁড়িয়ে পড়ল।

—আর লড়াইয়ের ইচ্ছে আছে? ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। সৈন্যটি কিছু বলল না। মুখ নিচু করে হাঁপাতে লাগল।

ফ্রান্সিস কোমরে তরোয়াল গুঁজতে গুঁজতে বলল—এখন এখান থেকে চলে যাও। আমরা তোমাদের বা তোমাদের দেশের কোন ক্ষতি করিনি। করবোও না। আমরা কিছুক্ষণ পরেই জাহাজ ছাড়বো। তাহলে তোমরা আবার কেন আমাদের বন্দী করতে চাইছো। বিনা দোষে আমাদের কেন কয়েদ করা হবে? যাকগে—তোমরা কারা অধ্যক্ষকে গিয়ে বলো আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। মিছিমিছি রক্তপাত আমি চাই না। তোমার বন্ধুটিকে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারতাম কিন্তু আমি করিনি।

ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—চলো।

দুজনে জাহাজ ঘাটের দিকে চলল। রক্ষী দুজন আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে গেল।

জাহাজঘাটায় এল। দেখল যেখানে ওদের জাহাজটা নোঙর করে রেখে গিয়েছিল সেখানেই আছে। চুরি হয়ে যায় নি। ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

দুজনে পাতা পাটাতন দিয়ে হেঁটে গিয়ে জাহাজে উঠল। কোন লোককে

দেখল না। নিচে কেবিনঘরে ফ্রান্সিসরা ঢুকল। দেখল কে একজন বিছানায় শুয়ে রয়েছে। বোধহয় ঘুমিয়ে আছে।

ফ্রান্সিস কিছু বলল না। অন্য ঘরগুলোতে দেখল আরো তিনজন বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ফ্রান্সিস প্রথম ঘরটায় এলো। তরোয়াল খুলল। লোকটার বুকের ওপর দিয়ে তরোয়াল চেপে টেনে নিল। জামা কেটে দো-ফাল ও লাফিয়ে উঠে বসল। কাটা জায়গা থেকে রক্ত পড়তে লাগল। লোকটা বলল—তুমি আমার জামা কেটে দিলে কেন?

—শুধু জামা কেটেছে। এবার পালাও। নইলে এবার বুকে তরোয়াল বসাবো। লোকটা একটু ভয় পেলেও বেশ চেঁচিয়ে বলল—এই জাহাজ আমাদের।

—আমাদের মানে? ফ্রান্সিস বলল।

—অন্য ঘরে আমার দুই বন্ধু আছে।

—ও। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখলাম ওদের। সত্যি—ওদেরও তো দেখতে হয়। ফ্রান্সিস বলল। তারপর চলল অন্য দুটির কাছে।

ঘরটায় ঢুকে দেখল—একজন হাই তুলে উঠে বসল। লোকটার নাকে জরুল। অন্যজন ঘুমে তখনও শুয়ে।

ফ্রান্সিস দেখে যে হাই তুলছিল সেই লোকটিকে বলল—তুমি কে হে? আমাদের জাহাজে উঠেছো?

—সত্যি—অন্যায় হয়ে গেছে। তা আপনাদের রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। লোকটি হেসে বলল।

—কোন অসুবিধে হয়নি তো? ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি কে হে? এত কথা জানতে চাইছো? জড়ুল বলল।

—আমি যে এই জাহাজের মালিক। ফ্রান্সিস বলল।

—এ্যাঁ? লোকটা বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। তারপর বলল—বাঃ! আমরা কত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কিনলাম সেই জাহাজ তোমার হয়ে গেল? জড়ুল বলল।

—বিক্রি করেছিল কে? ফ্রান্সিস বলল।

—সুলেমান। ঐ যে মোড় ওখানে বিরাট দোকান সুলেমানের। একজন বলল।

—আচ্ছা—দেখছি। তোমরা উঠে রাস্তায় এসো। ফ্রান্সিস বলল।

যে লোকটা ঘুমোচ্ছিল, সে ততক্ষণে উঠে পড়েছে। ফ্রান্সিসদের কথাবার্তা শুনছে।

—এবার চলো। ফ্রান্সিস বলল।

—কোথায় যাবো? ঘুম ভেঙে ওঠা লোকটা বলল।

—সুলেমানের কাছে। ফ্রান্সিস বলল।

—সুলেমানের কাছে যাবো কেন? লোকটি বলল।

—তোমরা ঐ সুলেমানের সামনে গিয়ে বলবে যে সুলেমানের কাছ থেকে

তোমরা জাহাজটা কিনেছো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা যাব না। আমরা এই জাহাজেই থাকবো। জড়ুল বলল।

ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে। তোমরা এসো আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। যদি সুলেমানের কাছে তোমরা না যাও তাহলে এই যে তরোয়ালটা দেখছো তাই দিয়ে তিন বন্ধুর গলা কাটবো।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া বাইরে এল। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া তুমি জাহাজেই থাকো।

—না-না। সুলেমানকে কী করে সামলাও তা দেখবো।

—বেশ চলো।

দুজনে তীরে উঠল। তিনজনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে তিন বন্ধু এল।

সবাই চলল মোড়ের দিকে।

সুলেমানের বিরাট দোকানের সামনে এল। ফ্রান্সিস বলল—চলো সুলেমানকে দেখিয়ে দাও। একজন এগিয়ে গেল। ফ্রান্সিসও চলল। লোকটা পেছনে একটা টেবিলের কাছে গেল। টেবিলের ওপর ছোট কার্পেট। তার ওপর বসে আছে এক মধ্যবয়স্ক লোক। খুব ফর্সা সুলেমান। থুতনিতে অল্প দাড়ি। চোখে ধূর্ত দৃষ্টি। লোকটি ফ্রান্সিসকে বলল—

—ইনিই সুলেমান।

ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। বলল—আপনি জাহাজটা কার কাছ থেকে কিনেছেন?

—তা আমি আপনাকে বলবো কেন? সুলেমান বলল।

—আমি আবার ঐ জাহাজটা এদের কাছ থেকে কিনতে চাইছি। কত স্বর্ণমুদ্রায় কিনেছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—কিনেছিলাম একজন সওদাগরের কাছ থেকে। তাকে তো এখন পাওয়া যাবে না। সুলেমান বলল।

—আপনি আদৌ জাহাজটা কেনেন নি। মুফতে পেয়েছেন। মানে চুরি করেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—কে বলে আমি চোর? সুলেমান টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—আমি বলছি। যাক গে—এই যে তিনজন কিনেছে তাদের বলুন জাহাজটা আপনার নয়। আর ওদের স্বর্ণমুদ্রাগুলো ফিরিয়ে দিন।

—বা—জাহাজটা আমার। সুলেমান বেশ গলা চড়িয়ে বলল।

ফ্রান্সিস এক লাফে এগিয়ে গিয়ে সুলেমানের গলা চেপে ধরল। সুলেমান এই হঠাৎ আক্রমণে মেঝেয় কার্পেটে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস সুলেমানের গলায় চাপ দিল। বলল—বল্ ধোঁকাবাজ—ঐ জাহাজ তোর নয়।

—না। আমার জাহাজ। সুলেমান বলল।

ফ্রান্সিস গলায় চাপ বাড়াল। বলল—এখনও বল্ ঐ জাহাজের মালিক তুই

না। বল্—নইলে গলা টিপে মেরে ফেলবো। সুলেমানের গলা বুঁজে এল। ও হাঁসফাঁস করতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—এবার সত্যি কথাটা বল্।

—জাহাজটা আমার নয়।

—বল কী দেখে জাহাজটা নিয়েছিলি?

—কিছুদিন নজর রাখলাম।—দেখলাম কেউ জাহাজটায় থাকে না। আমি নিয়ে নিলাম। সুলেমান বলল।

ফ্রান্সিস তিনজন লোকের দিকে তাকাল। বলল—এইবার তোমাদের বিশ্বাস হল? ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। সুলেমান তখনও গলায় হাত বুলোচ্ছে।

ফ্রান্সিস দোকান থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে তখন বেশ ভিড় জমে গেছে। লোকেরা তখন সেই রক্ষী দুজনকে ডেকে নিয়ে এল। দুই কারারক্ষী ছুটে এল। ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে দেখল। একজন রক্ষী বলল—তুমি যে বললে তোমরা চলে যাচ্ছো।

—জাহাজের মালিকানা নিয়ে গোলমাল করল এই সুলেমান। অগত্যা তাকে গলা টিপে ধরতে হল। তখন সত্যি কথাটা বলল। ফ্রান্সিস বলল।

রক্ষী দুজন আর কিছু বলল না। চলে গেল।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া জাহাজে এল। দুজনে নিজেদের কেবিনঘরে ঢুকল। সব এলোমেলো। মারিয়া বলল—সব ঘরের ধুলো ময়লা দূর করতে সময় লাগবে। আমি হাত লাগাচ্ছি। তুমি ততক্ষণ রসুইঘরে দেখে এসো খাবার জল আটা চিনি ময়দা এসব আছে কিনা।

ফ্রান্সিস সব দেখেশুনে ফিরে এল কেবিনঘরে। দেখল মারিয়া একটা ঝাঁটা দিয়ে সব পরিষ্কার করছে।

—আটা-ময়দা চিনির মধ্যে চিনিটা বেশি আছে। কিন্তু আটা ময়দা সাফ। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো সেসব আনতে যেতে হবে। মারিয়া বলল।

—কিন্তু আমার কাছে তো একটাই স্বর্ণমুদ্রা আছে। তাই দিয়ে সব কেনা যাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—ভেবো না। আমার কাছে আছে। মারিয়া বলল। তার পরে কোমরবন্ধনীতে চেপে রাখা একটা ছোট চামড়ার ব্যাগমত বের করল। ওটা থেকে পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসেছিল। উঠতে যাবে তখনই বাইরে থেকে ডাক শুনল—ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলল—মারিয়া এতো হ্যারির গলা। এক লাফ দিয়ে ফ্রান্সিস দরজার কাছে এল। টান মেরে দরজা খুলে ফেলল।

দেখল ঘরের কাঠের দেওয়ালে দু হাত রেখে হাতে মুখ চেপে হ্যারি ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ফ্রান্সিস কিছু বলার আগেই হ্যারি ফ্রান্সিসকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। কান্নায় হ্যারির শরীর ফুলে উঠতে লাগল।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে ধরে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। বিছানায় বসিয়ে দিল।

মারিয়া বলল—হ্যারি—তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? তোমাদের খুঁজে খুঁজেও কোন হদিশ পেলাম না। তারপর মারিয়া সব ঘটনা বলল। হ্যারি বলল—আমরাও তোমাদের খুঁজে বেড়িয়েছি।

—তুমি কি এই জাহাজটা দেখে ফ্রান্সিস এখানে আছে ভেবেছিলে।

—না। ফ্রান্সিসকে আমি আগেই দেখেছি। তখন ফ্রান্সিস একজন দোকানদারের গলা চেপে ধরেছিল।

—তখন তুমি ওখানেই ছিলে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিসের কয়েক হাত পেছনে। তখন আমি মুখ চোখে কাপড় চাপা দিয়ে কেঁদেছি। তারপরে এখানে এলাম। এবার বন্ধুদের খবর দিতে যাবো। হ্যারি বলল।

—তোমরা জাহাজ পেলে কোথায়? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—এখানেই কিনেছি। রাজা অপর্তোর দেশে যাবো বলে। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। বন্ধুদের খবর দাও। ফ্রান্সিস বলল।

—সবাইকে একসঙ্গে আসতে দেব না। এখানকার কয়েদঘর থেকে আমরা পালিয়েছিলাম। তাই একসঙ্গে এতজন বিদেশি—সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সৈন্যও হয়তো আসতে পারে।

—ঠিক আছে—তোমরা একজন দুজনকে পাঠাও। কথাবার্তা হবে। এইভাবে সকলের সঙ্গেই কথাবার্তা হবে। এখানে যতক্ষণ থাকবো আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

হ্যারি চলে গেল। একটু পরেই হ্যারি আর শাঙ্কো ঢুকল। শাঙ্কো ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। চোখে জল।

—ফ্রান্সিস—তোমাদের দেখবার জন্যে বন্ধুদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে। শাঙ্কো বলল।

তারপর দফায় দফায় বন্ধুরা এল। ফ্রান্সিসদের দেখে খুশি।

সবাই ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে দেখে গেল। হ্যারিরা নিজেদের ছোট জাহাজটায় চলে গেল।

সন্ধে হল। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া—আমি ঐ জাহাজে যাচ্ছি।

—আমিও যাবো। মারিয়া বলল।

—পরে যেও ফ্রান্সিস বলল।

—না—না। এই জাহাজে আমি একা পড়ে থাকবো?

—আমার ফিরে আসতে কতক্ষণ আর লাগবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে—একাই যাও। মারিয়া বলল।

—এটা তো রাগের কথা হল। তুমি না বললে আমি যাই কী করে? ফ্রান্সিস বলল।

—না। আমি আর কিছু বলবো না। তুমি যাও। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—এই ভিগো নগরে থাকা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

—তুমি ঘুরে এসো। আমি পরে যাবো। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস জাহাজের বাইরে এল। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়ে ছোট জাহাজটার কাছে গেল। তারপর পাতা পাটাতন দিয়ে জাহাজে উঠল। হ্যারি একটা ছোট কেবিন ঘরে ফ্রান্সিসকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—এখন একটা কাজের কথায় আসি। আমাদের জাহাজে আধবস্তা চিনি ছাড়া কিচ্ছু নেই। আটা ময়দা চিনিও কিনে আনতে হবে। আর দুজন যাও পিপে দুটোয় জল ভরে নিয়ে এসো।

ফ্রান্সিসের কথামত কয়েকজন ভাইকিং কাজে নেমে পড়ল।

ফ্রান্সিস হ্যারিদের বলল—দুটো জাহাজই একসঙ্গে ছাড়বো না। প্রথমে বড় জাহাজটা ছাড়বো। তার এক ঘণ্টা পরে ছোট জাহাজটা ছাড়বো। গভীর সমুদ্রে গিয়ে প্রায় সবাই বড় জাহাজে চলে আসবে। মাত্র তিন চারজন ছোট জাহাজে থাকবে। ফ্রান্সিস বলল।

—জাহাজ চালিয়ে কোথায় যাবো আমরা? হ্যারি বলল।

—আমরা রাজা অপর্তোর দেশে যাবো! ফ্রান্সিস বলল।

—তা কেন? আমরা তো ঐ দেশে না গিয়ে স্বদেশেও ফিরে যেতে পারি। হ্যারি বলল।

—ঠিক এই কথাটাই বলতে আমি এসেছি। মাত্র একটা দিনের জন্যে অনায়াসে ঐ রাজ্যে থাকতে পারি। নকশা দেখে রাজা ওভিড্ডোর তরবারি উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। একটা দিন আমরা ওখানে থাকবো। সেই দিন ও রাত্রের মধ্যে ওভিড্ডোর তরবারি উদ্ধার করতে পারলে তো ভালোই। কিন্তু যদি ব্যর্থ হই তাহলে তার পরদিনই আমরা জাহাজ ছাড়বো। হ্যারি বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল।

বড় জাহাজই অনেকটা দূরে এল। গভীর সমুদ্রে থামল। বেশ কিছুক্ষণ পরে বড় জাহাজটা এল। এবার ছোট জাহাজ থেকে বড় জাহাজে যাওয়া। ছোট জাহাজটা গিয়ে বড় জাহাজের গায়ে লাগলো। ঢেউয়ের দুলুনির মধ্যে দিয়ে বড় জাহাজের ডেক-এ এক এক করে ভাইকিংরা উঠে এল।

দুটো জাহাজই চলল। বড় জাহাজটা চালাচ্ছিল ফ্রেজার। ও শাঙ্কোকে ডেকে বলল—তোমরা দাঁড়ঘরে যাও। জাহাজটার গতি বাড়াতে হবে। শাঙ্কো হ্যারিকে গিয়ে বলল। হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব জাহাজের গতি বাড়াতে হবে। দাঁড়ঘরে যাও।

ভাইকিং বন্ধুরা একে একে দাঁড়ঘরে নেমে গেল। দাঁড় টানতে লাগল। জাহাজের গতি বাড়ল।

শাঙ্কো রেলিঙ ধরে ছোট জাহাজে বন্ধুদের ডেকে চলল—বাতাস পড়ে গেছে। তোমরা দাঁড় টানো। জাহাজের গতি বাড়াও। ছোট জাহাজের ভাইকিংরাও দাঁড়ঘরে গেল। দাঁড় বাইতে লাগল।

দুটো জাহাজই বেশ দ্রুতগতিতে চলল।

পরদিন বিকেলে জাহাজ রাজা অপর্তোর রাজ্যে পৌঁছল। দূর থেকে দেখা

গেল ছোট বন্দরটায় তিনটে জাহাজ রয়েছে। ওর মধ্যে একটা জাহাজ রাজা ভিলিয়ানের। এখন রাজা অপর্তোর দখলে।

ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—ফ্রেজার জাহাজ তীরের কাছে নিয়ে যেও না। দূরেই রাখো। ফ্রেজার জাহাজের গতি কমাল। তারপর আস্তে আস্তে জাহাজটা থামাল। ছোট জাহাজটাও শাঙ্কোর চেঁচিয়ে বলা কথা শুনে থামাল।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—আজকে রাতেই তো যাবে?

—হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে নিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আমিই তোমাকে ডাকতে যাবো। শাঙ্কো বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস চলুন।

সন্ধের পরে পরেই শাঙ্কো রাতের খাবার খেয়ে নিল। ফ্রান্সিস একটু পরে খেল।

কেবিন ঘরে গিয়ে পোশাক পরে নিল। কোমরে তরোয়াল গুঁজল। তারপর বিছানায় বসে শাঙ্কোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

—আজ রাতে যাচ্ছো? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। হ্যারি বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। আজ রাতটা আমাকে সময় দিয়েছে। আজ রাতে রাজা ওভিড্ডোর তরবারি উদ্ধার করতে হবে।

—তার মানে আজ রাতেই শেষ চেষ্টা করতে হবে। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—নকশাটা সঙ্গে নিয়েছো? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার প্রথমে গুহাটা দেখতে হবে। তারপর চেস্টনাট গাছের বনভূমি।

কিছুপরে শাঙ্কো তৈরি হয়ে এল। বলল—মশাল নেবো?

—দরকার নেই। আজকে জোছনা উজ্জ্বল। দুজনে চলল জাহাজের পেছন দিকে। সেখানে দড়ির মইটা রাখা আছে। দুজনে দড়ির মইটা নিচে একটা নৌকোর ওপর নামিয়ে দিল। তারপর প্রথমে ফ্রান্সিস পরে শাঙ্কো নৌকোটায় নামল। মই ছেড়ে দিল।

দুজনে নৌকোয় নামল। দড়ির মইটা ওপরে উঠছে দেখে দু'জনেই দেখল হ্যারি মইটা ওপরে তুলে নিল।

ফ্রান্সিস দাঁড় বেয়ে চলল। আজ আকাশে জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। কিছুটা পর্যন্ত ভালোই দেখা যাচ্ছে।

তীরভূমিতে পৌঁছল। নৌকো বালিয়াড়িতে তুলে রাখল। বন্দরের কাছে এসে দুজনে ঝোপ জঙ্গলে ঢুকল। কিছুদূর গিয়ে দেখল রাস্তার ওপাশেই বুনো চেস্টনাট গাছের জঙ্গল।

ফ্রান্সিস আস্তে বলল—চলো—রাস্তাটা পার হই। দুজনে সদর রাস্তায় এল। দুদিকে তাকিয়ে দেখল সৈন্য বা পাহারাদার কেউ নেই। ফ্রান্সিস বলল—জলদি। দুজনেই দ্রুত সদর রাস্তাটা পার হল।

টিলার নিচে ফ্রান্সিস দাঁড়াল। বলল—টিলার গুহাটা দেখতে হবে।

—চলো। শাঙ্কো বলল। ফ্রান্সিস নকশাটা বের করল। চাঁদের আলোয় দেখে নিল। গুহাটা পশ্চিমমুখী। দুজনে টিলাটায় উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস হিসেব করে পশ্চিমের ঢাল ধরে উঠতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গুহার মুখে এসে পৌঁছল। চাঁদের আলো তো গুহার ভেতরে ঢোকে নি। তাই অন্ধকার ভেতরটা। শাঙ্কো বলল—দাঁড়াও। আমি ঢুকছি।

শাঙ্কো বুকের পোশাকের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা তুলে নিল। ডানহাতে ছোরাটা ধরে আস্তে আস্তে অন্ধকার গুহাটায় ঢুক... গল। একটু দূর পর্যন্ত মোটামুটি দেখা গেল। তারপরই একেবারে অন্ধকার। তার মধ্যে দিয়ে দুজনে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল।

গুহার মুখটাতে পাথরের টুকরো ছিল। ভেতরটা মোটামুটি পরিষ্কার। আবার কিছুটা যেতেই শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস এখানেই গুহা শেষ। ফ্রান্সিস হাত দিয়ে পাথুরে দেয়ালটা পেল। দেয়ালটায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কোষের পাথুরে দেওয়ালটা দেখল। না—দেয়ালে মাত্র দুটো খোঁদল মত। খোঁদলে হাত দিল। ফাঁকা। কিছু নেই। ফ্রান্সিস ভাবল—এরকম কোন খোঁদলেই নকশার কাগজটা ছিল। ফ্রান্সিস ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—শাঙ্কো—অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা যাবে না। কাল সকালে যদি সময় পাই আসবো। চলো।

দুজনে অন্ধকারে আস্তে আস্তে গুহার মুখে চলে এল। গুহার মুখ থেকে জোছনা পাওয়া গেল। নামতে লাগল দুজনে। টিলা থেকে নামল। বুনো চেস্টনাট গাছের জঙ্গলে ঢুকল।

জোছনা উজ্জ্বল। তাই সবকিছুই মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দুজনে মরা গাছটা খুঁজতে লাগল। পেয়েও গেল।

—শাঙ্কো—তুমি তো আগে এসেছিলে। বেলচা এনেছিলে?

—এনেছিলাম। কিন্তু রাজা অপর্তোর সৈন্যদের হাতে প্রায় ধরা পড়েছিলাম। তখন বেলচা এনেছিলাম। পালাবার আগে বেলচাটা ঐ কোনটায় ফেলে গেছি। দেখি খুঁজে। শাঙ্কো সেদিকে চলল। ঝোপে খুঁজতে খুঁজতে বেলচাটা পেল। তুলে আনল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। তারপর সেই বৃদ্ধ কবিরাজের কথা বলল। ফ্রান্সিস একটু আশ্চর্য হল।

শাঙ্কো মরা গাছটার গোড়ায় বেলচা দিয়ে মাটি তুলতে লাগল। কিছুক্ষণ মাটি তোলার পর গাছের গোড়াটা বেরিয়ে এল। দুজনেই আশ্চর্য হল। দেখল শেকড়। ফ্রান্সিস বলল—নকশাতেও শেকড় আঁকা আছে।

গাছটার গোড়া অনেকটা আলগা হল। দুজনে মিলে গাছটাকে কাত করল এপাশে। তারপর ওপাশে। গাছটা মাটি থেকে আলগা হয়ে গেল। এবার দুজনে মিলে গাছটাকে টানতে লাগল। আস্তে আস্তে গাছটা উঠে এল। গাছটা পাশে রেখে দিয়ে এবার যে গর্তটা হয়েছিল সেটা দেখতে লাগল ফ্রান্সিস। ও ভাবল—সোনার তরবারি কি এখানেই আছে?

ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—তোমার কী মনে হয়? সোনার তরবারি কি

এখানেই আছে?

—ফ্রান্সিস—গর্তটা আরো নিচে বাড়ানো যাক। আরও নিচে কী আছে দেখা যাব।

—ঠিক বলেছো। চলো গর্তটা নিচের দিকে বাড়াই।

শাঙ্কো বেলচা দিয়ে মাটি তুলতে লাগল। একটু পরে ফ্রান্সিস বেলচা চালাতে লাগল।

হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ হল—টং। ধাতব শব্দ। ফ্রান্সিস বলে উঠল—শাঙ্কো—নিশ্চয়ই তরবারিটা। আরো খুঁড়তে হবে। এবার শাঙ্কো বেলচাটা নিল। খুঁড়তে লাগল। একটা হাতল বেরিয়ে এলো।

শাঙ্কো গর্তে নেমে হাতলটা ধরল। চাঁদের আলোয় দেখাই যাচ্ছে সোনার হাতল। শাঙ্কো হাতলটা ধরে টানতে লাগল। খাপের মধ্যে রাখা বোধহয়। শাঙ্কো ভাবল।

ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো আমাকেও টানতে দাও। দেখাই যাচ্ছে সোনার হাতল। ফ্রান্সিস নামল। হাতলটা ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল। তরোয়ালটা যেন অনেকটা নড়ল। ফ্রান্সিস আবার দুটো হ্যাঁচকা টান দিল। তরবারি উঠে এল। চাঁদের আলোতেই তরোয়ালটা ঝিকিয়ে উঠল। নিরেট সোনায় তৈরি তরবারি। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে ধ্বনি দিল—ও—হো—হো। শাঙ্কোও চাপা গলায় ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। হাত সাতেক লম্বা তরবারিটা।

তরবারিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—এবার খাপটা তুলতে হবে।

ফ্রান্সিস উঠে এল। শাঙ্কো নামল। মাটি সরাতেই দেখা গেল খাপটা। শাঙ্কো খাপটা বার কয়েক এদিক ওদিক সরাতেই খাপটা বেশ আলগা হল। শাঙ্কো খাপ ধরে বারকয়েক হ্যাঁচকা টান দিতেই খাপটা উঠে এল।

চাঁদের আলোয় ওরা দেখল এক আশ্চর্য সুন্দর তরোয়ালের খাপ। সোনার ওপর কত মণিমাণিক্য বসানো। সুন্দর মিনে করা। চাঁদের আলোয় সব মণিমাণিক্যগুলো এখানে ওখানে ঝিক দিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো এরকম গুপ্তধন আগেও উদ্ধার করেছে। এসব ওদের চোখ সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এরকম সূক্ষ্ম কারুকাজ করা তরবারির খাপ ওরা আগে কখনও দেখে নি।

ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো পালাও। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা চলবে না। জলদি। ভারি তরবারিটা ফ্রান্সিস নিল। খাপটা শাঙ্কো কাঁধে নিল।

বুনো চেস্টনাট গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটে থেমে ওরা দুজনে বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে। ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। আকাশ সাদাটে। সদর রাস্তায় ওঠার আগে পশ্চিমদিকে তাকিয়ে দেখল। না—কোন সৈন্য নেই। দুজনে দ্রুত সদর রাস্তাটা পার হল। তারপর চলল নৌকোর খোঁজে। বালিয়াড়িতে তুলে রাখা নৌকোটার কাছে এল। প্রায় ছুটে আসতে হয়েছে। দুজনেই হাঁপাচ্ছে তখন।

দুজনে নৌকোয় উঠল। ফ্রান্সিস দাঁড় টানতে লাগল।

সূর্য উঠল। আলো ছড়িয়ে পড়ল। যে তিনচারজন ভাইকিং ডেকে দাঁড়িয়ে ছিল তারা ফ্রান্সিসদের দেখল। চেঁচিয়ে বলে উঠল—ফ্রান্সিস শাঙ্কো এসেছে। ডেকএ হ্যারি আর মারিয়া এসে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো হালের কাছে এল। বন্ধুরা ওপর থেকে দড়ির মইটা ঝুলিয়ে দিল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ওপরে উঠে এল। বন্ধুদের চেঁচামেচি থেমে গেল। ওরা তখন নির্বাক। দেখতে লাগল তরবারিটা আর তার খাপ। রোদ লেগে তরবারির খাপে বসানো হীরে মুক্তো চুনিপান্না থেকে আশ্চর্য আলোর ঝলকানি দেখা গেল। সোনার তরবারি রোদে ঝলসে উঠল। কারও মুখে কথা নেই।

কিছু পরে মারিয়া ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো-। এবার ভাইকিংরা সংবিৎ ফিরে পেল। চিৎকার ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। ভাইকিংরা কেউ হেঁড়ে গলায় গান ধরল। কেউ নাচতে লাগল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাই সব—পরে আনন্দ করবো এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—জাহাজ ছাড়ো। রাজা অপর্তো রাজা ওভিড্ডোর তরবারি আমরা পেয়েছি এটা জানলে আমরা ভীষণ বিপদে পড়বো। সবাই লেগে পড়ো। হাওয়ার তেমন জোর নেই। কিছু বন্ধু দাঁড় ঘরে যাও। দাঁড় টানো। সব পাল খুলে দাও।

ভাইকিংরা নিজেদের কাজে নামল। দ্রুত নোঙর তোলা হল। পাল খুলে দেওয়া হল। জলে উঠল ছপ্‌ছপ্ দাঁড়ের শব্দ।

জাহাজ শান্ত সমুদ্রে ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে চলল পূর্ণ বেগে।

চিচেন ইতজায় ফ্রান্সিস



চিচেন ইতজায় ফ্রান্সিস

একটা নিঃসঙ্গ জাহাজ চলেছে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে। জাহাজটা স্পেনীয় জলদস্যুদলের জাহাজ।

সূর্য অস্ত গেছে বেশ কিছুক্ষণ। এখন অন্ধকার রাত্রি। আকাশে উজ্জ্বল তারার ভিড়। অমাবস্যার কাছাকাছি। কাজেই অন্ধকার চারদিক।

জলদস্যুদের মধ্যে আলস্য। আলফান্সো এই জলদস্যুদের দলে ভিড়তে বাধ্য হয়েছে। আলফান্সো একটা পোর্তুগিজ জাহাজে চড়ে যাচ্ছিল দক্ষিণদিকের কোনও দেশের দিকে। ওর যাওয়াটা উদ্দেশ্যহীন। দেশে থাকতে ও ছিল খুবই গরিব চর্মকার। হাড়ভাঙা খাটুনি। কিন্তু রোজগারে সংসার চলে না। তাই আলফান্সো অনেক ভেবে ঠিক করল সুদূর দক্ষিণ দিকে এমন কিছু দেশ আছে যেখানে সোনা দিয়ে তৈরি সাঁকো আছে। সে দেশের সর্বত্র সোনার ছড়াছড়ি। লোকমুখে শোনা এই স্বর্ণসাম্রাজ্যের কাহিনী কতটা সত্য ও জানে না। কিন্তু এই সোনার হাতছানিতে ও দেশ ঘরবাড়ি ছেড়ে দক্ষিণমুখো যাচ্ছে এমন একটা জাহাজে উঠে বসল। যে করেই হোক সেই স্বর্ণসাম্রাজ্যে পৌঁছতে হবে।

আলফান্সো জাহাজের ডেকে শুয়ে ছিল। অন্ধকার নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে ও নিজের ভবিষ্যতের কথাই ভাবছিল।

হঠাৎ কানে এল মাস্তুলের ওপর বসে থাকা নজরদারের চিৎকার, "সাবধান জলদস্যুদের জাহাজ, সাবধান, সবাই তৈরি হও।"

জাহাজে সাড়া পড়ে গেল। সবাই ছুটল নীচের অস্ত্রঘরের দিকে। তরোয়াল হাতে ওরা দল বেঁধে ডেকে উঠে এল। জলদস্যুদের জাহাজটা তখনই আলফান্সোদের জাহাজের গায়ে এসে ধাক্কা দিল। খোলা তরোয়াল হাতে চিৎকার করতে করতে জলদস্যুরা আলফান্সোদের জাহাজের ডেকে উঠে আসতে লাগল। শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। জলদস্যুরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। ওদের মনে দয়ামায়ার স্থান নেই। নির্মম নৃশংস ওরা।

তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দ, আহতদের আর্তনাদ গোঙানির শব্দে জাহাজ ভরে উঠল।

আলফান্সোও তরোয়াল নিয়ে লড়াই করছিল এক জলদস্যুর সঙ্গে। হঠাৎ ওই জলদস্যু ওর তরোয়ালে নিজের তরোয়ালটার এত জোরে ঘা মারল যে আলফান্সোর তরোয়ালটা হাত থেকে ছিটকে গেল। অন্ধকারেও আলফান্সো দেখল জলদস্যুটা দাঁত বের করে হাসছে। নিরস্ত্র আলফান্সোর মাথা লক্ষ্য করে তরোয়ালটা চালাল জলদস্যুটা। আলফান্সো দ্রুত মাথা নিচু করল। তরোয়ালের

কোপ পড়ল বাঁ কাঁধে। আলফান্সো বাঁ কাঁধে ডান হাত চাপা দিয়ে বসে পড়ল। জলদস্যুটা অবশ্য ততক্ষণে আলফান্সোদের এক নাবিকের তরোয়ালের ঘায়ে ডেকে ছিটকে পড়েছে। আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না।

আলফান্সো আস্তে-আস্তে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে নিজেদের কেবিনঘরে ফিরে এল। ততক্ষণে লড়াই থেমে গেছে। দু'পক্ষেরই আহতদের আর্তনাদে গোঙানিতে চারদিক ভরে উঠেছে।

আলফান্সোদের জাহাজের যাত্রী নাবিকরা লড়াইয়ে হেরে গেল।

জলদস্যুরা আহত যাত্রীদের নাবিকদের রেলিঙের ওপর দিয়ে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। ওরা নিজেদের দলের মৃত লোকদেরও জলে ছুঁড়ে ফেলল।

পূবদিকের আকাশে কমলা রঙ ছড়াল। কিছুক্ষণ পরেই সূর্য উঠল। ভোরের নিস্তেজ রোদ ছড়ালো সমুদ্রের জলে জাহাজে।

এবার জলদস্যুদের দলপতি আলফান্সোদের জাহাজে উঠে এল। মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ। বেশ তেল চক্চকে। মোম দিয়ে গোঁফের ডগা ছুঁচলো করা। গায়ে দামি কাপড়ের জোব্বামতো। কোমরে চামড়ার মোটা বল্টের মতো একটা জিনিস। তাতে তরোয়াল ঝুলছে। তরোয়ালের বাঁট হাতির দাঁতের।

এসেই হুকুম দিল, "এই জাহাজে যারা বেঁচে আছে তাদের আমার কাছে নিয়ে এসো।" জলদস্যুরা খুঁজে খুঁজে জীবিত ও আহত মিলিয়ে প্রায় তিরিশজনকে দস্যুদলপতির সামনে নিয়ে এল। তার মধ্যে আলফান্সোও ছিল। জলদস্যুপতি বলল, "তোমাদের আর হত্যা করা হবে না। আহতদের চিকিৎসা করে সুস্থ করা হবে। আমার দলে এখন বড় লোকাভাব। তোমরা আমার দলে আসবে। আমার আদেশমতো চলবে। ডাকাতি করে লুঠপাট করে যা পাব তার ভাগ তোমরাও পাবে।"

এসময় আলফান্সোদের জাহাজের ক্যাপ্টেন এগিয়ে এল। বলল, "আমরা যদি তোমার দলে যোগ না দিই?"

"তাহলে সবাইকে মরতে হবে।" জলদস্যুসর্দার বলল।

"আমরা মরব তবু জলদস্যুতা করব না।" ক্যাপ্টেন বলল।

"দস্যুসর্দার হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, "মিছিমিছি কেন মরতে যাবে। তার চাইতে আমার দলে এলে সবকিছু পাবে আবার নগদ অর্থও পাবে।"

"না, আমরা তোমার দলে যাব না।" ক্যাপ্টেন বলল।

"তাহলে তো তোমাদের এখন মেরে ফেলতে হয়। খুব বাজে কাজ। আমি এসব নরহত্যা-টত্যা একেবারেই পছন্দ করি না। কিন্তু উপায় নেই। কখনও লোকের ঔদ্ধত্য দেখলে হত্যা করতেই হয়।" একটু থেমে দস্যুসর্দার বলল, "এবার তোমরা কে কে আমার দলে আসতে চাও হাত তুলে দাঁড়াও।" অনেকেই হাত তুলে জলদস্যুদের সর্দারের দিকে এগিয়ে গেল। তাদের মধ্যে আহত আলফান্সোও আছে। ও বেশ ভেবেই দস্যুদলে যোগ দিতে রাজি হল। বাড়ি

ফিরলে তো সেই অভাব, অনটন, উপবাস। তার চেয়ে জলদস্যুদের দলে যাওয়া অনেক ভাল। খেতে পরতে পাবে। লুটের মালের বিক্রির ভাগের অর্থ পাবে। বেশ সুখেই দিন কাটবে।

দেখা গেল আলফান্সোদের প্রায় অর্ধেক জাহাজি দস্যুদলে ঢুকল।

দস্যুসর্দার বলল, "সামনে যে বন্দর পড়বে সেখানে এই জাহাজের সব মালপত্র বিক্রি করা হবে। অবশ্যই জলের দামে। আমাদের খুব তাড়াতাড়ি অর্থের প্রয়োজন। তারপর অর্থ ভাগ বাঁটোয়ারা হবে। আমাদের সময় কম।"

এবার জলদস্যুসর্দার জলদস্যুদের দিকে তাকিয়ে বলল, "যাও, এই জাহাজে যা পাও লুঠ করে আমাদের জাহাজে নিয়ে যাও।"

জলদস্যুরা আলফান্সোদের জাহাজে তল্লাশি শুরু করল। পেল প্রচুর ভেড়ার চামড়া, আয়না, আলকাতরা। সব মাথায় করে নিয়ে ওদের জলদস্যুদের জাহাজে নিয়ে গেল। যারা জলদস্যুদের দলে যাবে বলে হাত তুলেছিল তারা সবাই ওই জাহাজে চলে গেল। আলফান্সোও গেল। জলদস্যুদের জাহাজ আস্তে আস্তে সরে গেল। তারপর সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে চলল দক্ষিণমুখো।

লুঠ হয়ে যাওয়া জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজ চালককে উত্তর দিকে জাহাজ চালাতে বলল।

জলদস্যুদের জাহাজে আলফান্সোর নতুন জীবন শুরু হল। জলদস্যুদের খুব নিয়ম মেনে চলতে হয়। এদিক ওদিক হলে চাবুক মারা হয়। কখনও বা একেবারে মেরে ফেলা হয়। তাই সবাই সর্দারের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। দিন আট দশের মধ্যেই আলফান্সো সুস্থ হল। ওর চিকিৎসা করল জলদস্যুদলের বৈদ্য। কয়েকদিন পরে আলফান্সোদের জাহাজ থেকে দেখা গেল একটা জাহাজ আসছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যাত্রিবাহী জাহাজ। জাহাজের মাথায় উড়ছে ফরাসি দেশের পতাকা। আলফান্সোদের জাহাজ ছুটল ওই জাহাজের দিকে। তৎক্ষণে আলফান্সোদের জাহাজের মাথা থেকে নরওয়ে দেশের পতাকা নামিয়ে জলদস্যুদের মড়ার খুলি আর মানুষের হাড় আঁকা কালো পতাকা তুলে দেওয়া হল। যাত্রীবাহী জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে চিৎকার আর কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। নির্মম জলদস্যুদের হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে সব সোনাদানার, হীরে-জহরতের গয়নাগাঁটি ওদের দিয়ে দিতে হবে। না দিতে চাইলে তরোয়ালের ঘায়ে মরতে হবে।

তখন দুপুর। সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যাত্রীবাহী জাহাজটার চালক জাহাজের গতি বাড়িয়ে দিল। কিন্তু জলদস্যুদের জাহাজচালক অনেক অভিজ্ঞ ওস্তাদ। ও ওদের জাহাজটা বড় করে একটা পাক খাইয়ে যাত্রীবাহী জাহাজটার সামনে চলে এল। জাহাজটা নিয়ে এল যাত্রিবাহী জাহাজটার গায়ে। দলে দলে জলদস্যুরা খোলা তরোয়াল হাতে উঠে পড়তে লাগল যাত্রিবাহী জাহাজটাতে। শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। যাত্রীবাহী জাহাজের প্রহরীরা যা লড়তে লাগল। যাত্রীরা তত দক্ষ নয় তরোয়াল চালনায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রিবাহী জাহাজের যাত্রীরা হার স্বীকার করল।

জলদস্যুরা আহত সঙ্গীদের নিজেদের জাহাজে নিয়ে গেল। উভয়পক্ষেরই যারা লড়াইতে মারা গেল তাদের সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হল।

এবার জীবিত যাত্রীদের ডেকে দাঁড় করানো হল। একপাশে মহিলা যাত্রীরা। অন্যদিকে পুরুষ যাত্রীরা।

সেই জাহাজে জলদস্যুসর্দার উঠে এল। হো হো করে কিছুক্ষণ হাসল। তারপর বলল, "এইসব লড়াইটড়াই বাঁচা-মরা আমার একেবারেই ভাল লাগে না।" আবার হাসল। বলল, "সবচেয়ে ভাল হয় তোমাদের কাছে মূল্যবান যা কিছু আছে আমাদের দিয়ে দাও। তাহলেই মরে যাওয়া বা ঘায়েল হয়ে যাওয়া কোনওটাই হয় না।"

"যদি আমরা সেসব না দিই?" একজন যাত্রী বলল। দস্যুসর্দার যাত্রীদের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বলল,—"কথাটা কে বলল, কে বলল?"

যাত্রীটি এগিয়ে এল। বলল—"আমি বলেছি।" দস্যুসর্দার হাসতে লাগল। হাসতে হাসতেই বলল,—"তোরা কে আছিস, এটাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেল।" দুজন জলদস্যু ছুটে এল। যাত্রীকে চেপে ডেকে শুইয়ে দিল। তারপর একজন দু'পা আর একজন দু'হাত ধরে দোলাতে লাগল। তারপর রেলিঙ ডিঙিয়ে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলল।

যাত্রীরা আর কেউ কোনও কথা বলল না। সর্দার হেসে বলল—"আমি এরকমই। আমার কথা অমান্য করলে হয় তরোয়ালের ঘায়ে মৃত্যু, নয়তো সমুদ্রশয্যা। যাক্‌গে, মহিলা যাত্রীদের বলছি আমার লোক তোমাদের কাছে একটা বড় রুমাল নিয়ে যাচ্ছে। সব গয়নাগাঁটি খুলে ওই রুমালে ফেলে দাও।"

মহিলাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করল না। দু'জন জলদস্যু মহিলা যাত্রীদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দু'জনে একটা বড় নকশা আঁকা রুমাল মহিলা যাত্রীদের সামনে নিয়ে এল। মহিলারা বুঝল এই জলদস্যুদের সর্দার ওদের যে কোন সময়ে মেরে ফেলতে পারে। তারা কেউ কোন কথা বলল না। হাত গলা কানের মূল্যবান অলঙ্কার খুলে রুমালে ফেলে দিতে লাগল। সর্দার জোরে হেসে উঠে বলল, "দ্যাখো কেমন নিঃশব্দে সবকিছু ঘটে যাচ্ছে। আমি ঠিক এটাই চাই।" দস্যুসর্দার নিজের জাহাজে চলে গেল।

জলদস্যুরা পুরুষ যাত্রীদের কাছ থেকে গিনি আংটি সব নিল।

এবার জলদস্যুরা হানা দিল কেবিনঘরগুলোতে। যে যা পেল নিল। মূল্যবান সবই সর্দারের কাছে জমা দিতে হবে। কিন্তু শৌখিন পোশাক টোশাক সর্দার নেয় না। এগুলো দস্যুদলের প্রাপ্য।

বিকেল নাগাদ জলদস্যুদের জাহাজ ওই তল্লাট ছেড়ে চলে গেল। জাহাজের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আলফান্‌সো সব দেখল। আলফান্‌সো তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। কাজেই সঙ্গীরা ওকে লড়াই করতে ডাকেনি।

আলফান্‌সো সম্পূর্ণ সুস্থ হল। শুধু বাঁ হাতের জোরটা আগের মতো রইল না। মৃত্যুর কালো দরজা থেকে ফিরে এসেছে আলফান্‌সো। এতেই খুশি ও।

তারপর কত জাহাজ লুঠ দেখল। শুধু দেখল না, সর্দারের হুকুমে তাতে অংশও নিতে হল। আত্মরক্ষার জন্যে নরহত্যাও করতে হল। লুঠের ভাগ পায়। খাদ্য পায়। কখনও কোন বন্দরে ওদের জাহাজ ভেড়ে। জাহাজের মাথায় সেই দেশেরই পতাকা ওড়ে। ওরা যে জলদস্যু, জাহাজটা যে জলদস্যুদের এটা অনেকেই বোঝে না। সাধারণ যাত্রীবাহী জাহাজ মনে করে। ওরা বন্দর শহরে নামে। সঞ্চিত অর্থ দিয়ে পেটভরে খায়, পোশাক কেনে, বন্দর শহরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। মুক্ত জীবনের স্বাদ পায়। এভাবেই আলফান্সোর দিন কাটছিল।

এক গভীর রাতে সমুদ্রে ঝড় উঠল। প্রচণ্ড জোরে ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল আলফান্সোদের জাহাজের ওপর। রাতের আকাশ যেন ফালা ফালা হয়ে যেতে লাগল বিদ্যুৎ রেখায়। সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি।

আলফান্সোরা জাহাজের মাস্তুলের পালের দড়িদড়া টেনে ধরে জাহাজটা ডুবে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে লাগল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। মাস্তুলটা প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে পড়ল। জাহাজটা মাঝামাঝি ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেল। আলফান্সো বুঝল ভাঙা জাহাজে থাকলে জাহাজের নিচে চাপা পড়ে যাবে। তখনই বিদ্যুতের আলোয় একঝলক দেখল সমুদ্রতীরের গাছগাছালি। তাই ডুবন্ত জাহাজ থেকে ও উত্তাল সমুদ্রের বিরাট বিরাট ঢেউয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আবার বিদ্যুৎ চমকালো। সাঁতরাতে সাঁতরাতে দেখল তীরে বনজঙ্গল। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আলফান্সো সাঁতরাতে লাগল। ওই বিরাট বিরাট ঢেউয়ের মধ্যে সাঁতরানো অসম্ভব। ওরই মধ্যে আলফান্সো শরীর ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল।

ঝোড়ো হাওয়ার দাপট কমল। বৃষ্টিও কমল। আলফান্সো দেখল তীর খুব দূরে নয়। ও প্রাণপণে সাঁতার কেটে তীরের দিকে চলল। কিছুটা সাঁতরে যেতেই পায়ের নীচে বেলেমাটি ঠেকল। আলফান্সো আনন্দে মাটিতে পা রেখে লাফিয়ে উঠল। চলল তীরের মাটির দিকে। তীরে উঠে মুখ হাঁ করে হাঁপাতে হাঁপাতে আলফান্সো মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। আর হাঁটার শক্তি নেই। শুয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগল। দেখল ঝড় থেমেছে। বৃষ্টি আর নেই। আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তারা জ্বলছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

পূব আকাশে লালচে রং ফুটে উঠল। সূর্য উঠল। ভোরের রোদে চারদিক দেখা যাচ্ছে। আলফান্সো মাথা ঘুরিয়ে দেখল; ওর মাথার কাছে একজন জলদস্যু উবু হয়ে পড়ে আছে। আলফান্সো বেশ কষ্টে উঠে এগিয়ে গেল। দস্যুবন্ধুকে ধরে তুলল। বন্ধুটি আলফান্সোকে চোখ খুলে দেখল। তারপর হাসল। উঠে বসল।

আলফান্সো বলল, "এখানে শুয়ে থেকে কী হবে? চলো খাবার-টাবার পাওয়া যায় কিনা দেখি।" বন্ধুটি উঠে দাঁড়াল। চলল ঢালু তীরের মাটির দিকে। আলফান্সো চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। অন্য কোনও জলদস্যুকে দেখতে পেল না। ওখানে উঠে দেখল জঙ্গল সামনে। জনবসতি দেখল না। হয়তো জঙ্গল পার হতে পারলে লোকালয় পাওয়া যাবে।

দু'জনে জঙ্গলে ঢুকল। খুব ঘন বন নয়। ছাড়া ছাড়া গাছপালা। তারই মধ্যে দিয়ে দু'জন চলল। কিছুদূর যাওয়ার পরই বনজঙ্গল শেষ। একটা জলা জায়গা। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা টিলা। হয়তো ওখানে মানুষের বসতি আছে। এই ভেবে আলফান্সো জলদস্যু বন্ধুকে বলল, "ওই টিলাটা লক্ষ্য করে চলো। দেখা যাক লোকজনের বসতি পাওয়া যায় কিনা।"

দু'জনে জলা জায়গাটায় নামল। জল তেমন বেশি নয়। নিচটা কেমন যেন পেছল পেছল। ওরা পা দিয়ে জল ঠেলে ঠেলে চলল।

হঠাৎ বন্ধুটি বলে উঠল, পায়ে কী যেন লেগেছে। আলফান্সো নিচু হয়ে দেখল দুটো আঙ্গুলের মতো মোটা জোঁক। বন্ধুটির পা কামড়ে ধরে আছে। রক্ত বেরোচ্ছে। আলফান্সো চিৎকার করে বলল, "পালাও।" দু'জনে ছুটে চলল জলাভূমিটা পার হতে। বন্ধুটি পারল না। প্রচুর রক্তক্ষরণের জন্যে বন্দুটির শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ও পিছল মাটিতে ছুটতে পারল না। পা পিছলে পড়ে গেল। আলফান্সো তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। ও বুঝতেও পারে নি যে বন্ধুটি পা পিছলে পড়ে গেছে।

জলাভূমির পরেই পাথুরে ডাঙা। আলফান্সো ডাঙায় উঠে নিশ্চিন্ত হল। ভয়ে ও তখন কাঁপছে। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল বন্ধুটি জলায় পড়ে আছে। আলফান্সো তখন মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে হঠাৎ ওর বাঁ পায়ের গোড়ালিটা সুড়সুড় করে উঠল। আলফান্সো তাকিয়ে দেখল একটা একবিঘত লম্বা জোঁক গোড়ালিতে কামড় বসাবার চেষ্টা করছে। আলফান্সো এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। বারকয়েক পা ছুঁড়ে জোঁকটাকে ফেলবার চেষ্টা করল। জোঁক লেগে রইল। তখনও কামড় বসাতে পারেনি। আলফান্সো একটা পাথরের বড় টুকরো তুলে নিল মাটি থেকে। তারপর জোঁকটার মাথায় পাথরটা ঠুকতে লাগল। কয়েকবার ঠোকার পরও জোঁকটা খসে পড়ল না। আলফান্সো আবার ঠুকতে লাগল। ওর গোড়ালির ওই জায়গাটা ছেঁচে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। গোড়ালি ব্যথায় টনটন করতে লাগল। একটা জোরে ঘা মারতে জোঁকটা খসে পড়ল। আলফান্সো সঙ্গে সঙ্গে এই জায়গা ছেড়ে দ্রুত ছুটল। আর এক মুহূর্তও এখানে নয়।

আলফান্সো মাটিতে শুয়ে পড়ল। চোখ বুঁজে বিশ্রাম করল কিছুক্ষণ।

তখন বেলা হয়েছে। আলফান্সো উঠে দাঁড়াল। খাদ্য চাই, আশ্রয় চাই। ও টিলাটার দিকে চলল। টিলাটার কাছাকাছি পৌঁছে দেখল টিলাটার নিচে একটা বাড়ি। বাড়িটার থামগুলো কাঠের তৈরি। দেওয়ালগুলো চুনাপাথরের, চাল খড়ের। বাড়ির দেওয়ালে নানারকমের কারুকাজ—গাছ, ফুল, লতাপাতা আঁকা। বাড়ির লোকেরা আলফান্সোকে কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগল। একজনকে বাড়ির মালিক বলে আলফান্সোর মনে হল। মালিক আলফান্সোর দিকে এগিয়ে এল। তলতেক ভাষায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? এখানে কী করে এলে?" আলফান্সো সেই কথা কিছুই বুঝল না। ও স্পেনীয় ভাষায় বলল—"এই জায়গাটার নাম কী?" লোকটিও কিছুই বুঝল না। আলফান্সো আকার ইঙ্গিতে

বোঝাল জায়গাটার নাম কি? লোকটা আন্দাজে বুঝল। বলল, "তুলাম।" চারপাশের আরও কয়েকটা বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে এল। আলফান্সোকে প্রায় ঘিরে ধরল। আলফান্সো ভাবল বলে জাহাজডুবি হয়ে ও এখানে এসেছে। সঙ্গের বন্ধু জোঁকের কামড়ে মারা গেছে। আমার পোশাক এখনও ভিজে। খিদেও পেয়েছে। আলফান্সো হাত পা নেড়ে মুখের চোখের ভঙ্গি করে এসব বোঝাতে চাইল। দেখল কিছু লোক মোটামুটি বুঝেছে। ওরা কয়েকজন ছুটে নিজেদের বাড়িতে গেল। একটু পরেই ওরা গতরাতের বাড়তি খাবার নিয়ে এল চিনেমাটির পাত্রে। একজন একটা জলের পাত্রে ভরা জল নিয়ে এল। দু'জন ঝোলা জোব্বা নিয়ে এল। প্যান্টের মতো পোশাকও নিয়ে এল।

আলফান্সো এতক্ষণ পরে হাসল। লোকেরাও হাসল। ও আগে পোশাক পাল্টাল। ভেজা পোশাকে এতক্ষণ থাকতে হয়েছে। জলেভেজা শরীরে কাঁপুনি ধরল। ভেজা পোশাক এতক্ষণ পরে ছাড়তে পেরে আলফান্সো যেন প্রাণ ফিরে পেল।

এবার খাওয়া। আলফান্সো খাবারের বড় পাত্রটা নিল। তারপর খিদের জ্বালায় না থেমে একনাগাড়ে খেতে লাগল। একটুক্ষণের মধ্যেই সব খাবার শেষ। ওকে ঘিরে থাকা লোকজন খুশি হল। আলফান্সো হাসল। ইঙ্গিতে বোঝাল ও একটু শুয়ে বিশ্রাম নিতে চায়। যার বাড়িতে আলফান্সো প্রথম গিয়েছিল সেই লোকটি এগিয়ে এল। হাতের ইঙ্গিতে বাড়িতে ঢুকতে বলল। আলফান্সো বাড়িটার ভেতরে একটা ঘরে ঢুকলো। ঘরটা বেশ বড়। একপাশে বিছানামতো পাতা। লোকটা ওই বিছানা দেখাল। আলফান্সো হেসে লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিছানাটায় শুয়ে পড়ল। বাইরে লোকজন যে যার নিজের নিজের বাড়িতে চলে গেল। আলফান্সো অল্পক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

কয়েকদিন তুলামে থেকে আলফান্সো রওনা হলো চিচেন ইতজা নগরের দিকে। পথে এদেশের লোকদের খেতখামার দেখল। মেজ ম্যাওইর খেত, তুলোর খেতও আছে। পুরুষদের পোশাক জোব্বার মতো। কোমরে মোটা কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। মেয়েরা পরে নানা রঙিন সুতোয় কাজ করা পোশাক।

বেশ কয়েকদিন হেঁটে আলফান্সো চিচেন ইতজা নগরে এসে পৌঁছল।

এই ঘটনার প্রায় পনেরো বছর পরের কাহিনী।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে। বাতাস বেগবান। পালগুলো ফুলে উঠেছে। ঢেউ ভেঙে ফ্রান্সিসদের জাহাজ বেশ দ্রুতগতিতেই চলেছে। ভাইকিংরা শুয়ে, বসে, গল্প করে সময় কাটাচ্ছে।

সেদিন বিকেলের দিকে নজরদার পেড্রো মাস্তুলের মাথায় নিজের জায়গায় বসেছিল। হঠাৎ দেখল দক্ষিণদিক থেকে গভীর কালো মেঘ মাঝ আকাশের দিকে উঠে আসছে। পেড্রো চিৎকার করে বলল, "ভাইসব, ফ্রান্সিসকে ডাকো। প্রচণ্ড ঝড় আসছে।" ভাইকিংরা সব উঠে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকালো। সত্যিই আকাশ মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। তখনই পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকারে ঢেকে গেল সবকিছু। শাঙ্কো ছুটল ফ্রান্সিসকে ডাকতে।

ফ্রান্সিস ডেকে উঠে এল। আকাশের অবস্থা দেখেই বুঝল ঝড় আসছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, "ভাইসব, ঝড় আসছে। সবাই তৈরি হও।" ভাইকিংরা পাল গুটিয়ে ফেলল। পালের দড়ি টেনে ধরে সবাই তৈরি হল। পেড্রো মাস্তুলের মাথা থেকে নেমে এল। মাস্তুলের গায়ে জড়ানো দড়িদড়া ধরল কিছু ভাইকিং।

সমুদ্রের বুক অন্ধকার করে প্রচণ্ড হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসদের জাহাজের ওপর। শুরু হল মেঘের গর্জন। বিদ্যুতের তীব্র আঁকাবাঁকা আলো আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি।

ভাইকিংরা ঝোড়ো বাতাসে কাত হয়ে যাওয়া জাহাজ দড়ি ধরে টেনে সোজা করতে লাগল। বিরাট বিরাট ঢেউ ডেকের ওপর আছড়ে পড়তে লাগল।

ভাইকিংরা আধঘণ্টা ধরে ঝড়ের সঙ্গে লড়ে জাহাজ ডুবতে দিল না।

হাওয়ার তীব্রতা কমে গেল। আকাশ পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। তারা উঠল।

যেন জলে স্নান করে উঠেছে ভাইকিংরা। ডেকের এখানে ওখানে ওরা শুয়ে রইল। তখনও হাঁপাচ্ছে সবাই।

গায়ে জলে ভেজা পোশাক নিয়ে ফ্রান্সিস জাহাজ চালক ফ্রেজারের কাছে এল। বলল, "জাহাজ কোনদিকে চালাচ্ছ?"

"উত্তরমুখো চালাব ভেবেছিলাম কিন্তু ঝড়ের ধাক্কায় কোথায় ছিটকে এসেছে বুঝতে পারছি না।" ফ্রেজার বলল।

"তা হলে কি সমুদ্রে আমরা দিক হারালাম?" ফ্রান্সিস বলল।

"তাই তো মনে হচ্ছে। তাই ভাবছি হুইল আর ঘোরাবো না। জাহাজ যেদিকে যায় যাক।" ফ্রেজার বলল।

"অগত্যা। উপায় কী?" ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, "আমাদের জাহাজের দিক ভুল হয়নি তো?"

"হ্যাঁ, তাই হয়েছে।" ফ্রান্সিস বলল। ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। ফ্রান্সিস বলল, "ধৈর্য হারিও না। আমরা ঝড়ে জলে তো ডুবে মরিনি। বেঁচে আছি। নিশ্চয়ই কোথাও-না কোথাও গিয়ে জাহাজ তীরে ভিড়বে।"

জাহাজ চলল। পেড্রো মাস্তুলের মাথায় বসে চারদিকে নজর রাখতে লাগল। কিন্তু ডাঙার দেখা নেই। ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে সেই আনন্দ উচ্ছ্বাস নেই। সকলেরই ভাবনা—এ আমরা কোথায় চলেছি? কোনওদিন কি কোনও সমুদ্রতীরে পৌঁছতে পারব? না কি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জাহাজেই মারা যাব? মারিয়া ফ্রান্সিসকে বলল, "সবাই কেমন মুষড়ে হয়ে গেছে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাব কী করে?"

"নিশ্চয়ই উদ্ধার পাব। মনকে শক্ত করো। হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই।" ফ্রান্সিস বলল।

"সবাই তো আর তোমার মতো নয়।" মারিয়া বলল।

সাতদিন কেটে গেল। ডাঙার দেখা নেই। ভাইকিংরা ভীষণ মুষড়ে পড়ল।

সেদিন খুব ভোরে নজরদার পেড্রো দূরে ডাঙামতো দেখল। কিন্তু পরক্ষণেই তা কুয়াশায় ঢেকে গেল। পেড্রো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কুয়াশা সরে যেতেই সকালের রোদে দেখল সমুদ্রতীরের বালিয়াড়ি, গাছপালা। পেড্রো গলা চড়িয়ে বলল, "ভাইসব, ডাঙা। ডাঙা দেখা যাচ্ছে।"

ভাইকিংরা ডেকে উঠে এল। রেলিং ধরে দাঁড়াল। দেখল সমুদ্রতীরে গাছগাছালি। সবাই ধ্বনি তুলল, ও-হো-হো। ফ্রান্সিস, মারিয়া, হ্যারিও ডেকে উঠে এল। সমুদ্রতীর দেখল। হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস, এখন কী করবে?"

"তাই ভাবছি।" ফ্রান্সিস বলল।

"তা হলে আজ রাতেই নৌকোয় চড়ে তীরভূমিতে চলো। দেখা যাক লোকজনের দেখা পাই কি না। জিজ্ঞেস করে তা হলে জানা যাবে কোথায় এলাম।" হ্যারি বলল।

"বেশ চলো।" ফ্রান্সিস বলল।

সেদিন রাতে ফ্রান্সিস, শাঙ্কো আর হ্যারি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল।

রাত গভীর হতে ওরা তৈরি হয়ে জাহাজের হালের কাছে এল। ফ্রান্সিস, হ্যারি কোনও অস্ত্র নেয়নি। শুধু শাঙ্কো নিয়েছে জামার তলায় রাখা ছোরাটা।

হালে বাঁধা দড়িদড়া ধরে তিনজন ওদের একটা ছোট নৌকোয় নেমে দাঁড়াল। তারপর ফ্রান্সিস নেমে আসতে ওরা নৌকোয় বসল। ফ্রান্সিস দড়িটা হাতে নিল। তারপর নৌকো খুলে দাঁড় বাইতে লাগল। নৌকো চলল তীরভূমির দিকে। চারদিক নিকষ কালো। কোথাও জ্যোৎস্নার চিহ্নমাত্র নেই। শুধু আকাশে জ্বলছে লক্ষ লক্ষ তারা। ওই তারাগুলির ক্ষীণ আলোয় যা কিছু দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের জল ছুঁয়ে হাওয়া বইছে। তাতেই যা একটু ঠাণ্ডা লাগছে। সমুদ্র শান্ত। নৌকো চলল।

নৌকো তীরের কাছাকাছি এল। অন্ধকারে ফ্রান্সিস তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাল তীরভূমির দিকে। ঢালে বালিয়াড়ি। কিন্তু যতটা সম্ভব দেখতে পাচ্ছে তাতে কোথাও কোনও বাড়িঘর দেখতে পেল না।

একটা ধাক্কা খেয়ে নৌকোটা তীরে লাগল।

তিনজনে নেমে এল। শাঙ্কো নৌকোটা তীরে অনেকটা তুলে রাখল যাতে জোয়ারে ভেসে না যায়।

বালিয়াড়ি পেরিয়ে তীরে উঠে দেখল একটা রাস্তা চলে গেছে। ফ্রান্সিস বলল, "হ্যারি, মনে হচ্ছে এখানে লোকজনের যাতায়াত আছে।"

"হ্যাঁ, সেটা বোঝা যাচ্ছে। মনে হয় ধারেকাছে জনবসতি আছে। চলো, দেখা যাক।" হ্যারি বলল।

অন্ধকারে আন্দাজেই ওরা চলল এই রাস্তা ধরে। সমুদ্রের জোরালো হাওয়ায় রাস্তার ধুলো উড়ছে। ওরা তার মধ্যে দিয়েই চলল।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর প্রথমেই একটা পাথরের বাড়ি দেখল। তারপরেই দেখল সারি সারি ঘরদোর। সবই অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "চলো, সামনের ওই বাড়িটায় যাই। একটা বড় বাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়ালো। কাঠের মোটা থাম চুনাপাথর আর চালে শুকনো ঘাস দিয়ে বাড়িটা তৈরি।

ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে দরজায় আঙুল দিয়ে ঠকঠক শব্দ করল। ভেতরে কোনও সাড়া নেই। আবার ফ্রান্সিস ঠকঠক করল। ভেতর থেকে কারও কথা শোনা গেল। কথাটা ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না। ওরা দাঁড়িয়ে রইল।

দরজা খোলার শব্দ হল। এক বৃদ্ধ মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিসদের দেখে বেশ অবাকই হলেন। এই বিদেশি পোশাকপরা লোকগুলো এখানে এল কী করে? বৃদ্ধ বলল, "তোমরা কী চাও?" ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না।

হ্যারি বুকে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "আমরা ভাইকিং।" বৃদ্ধটি শুধু ভাইকিং শব্দটা বুঝলেন। তখনই ঘরের ভেতর থেকে এক যুবক এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। ভাইকিং কথাটা সে শুনল। বুঝল এই নবাগতরা ভাইকিং। গায়ে তো বিদেশী পোশাক। তবু যুবকটির সন্দেহ গেল না। এত রাতে এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে কী জন্য? এরা নিশ্চয়ই মায়াপানদের পাঠানো গুপ্তচর। যুবকটি আর দাঁড়াল না। আস্তে-আস্তে রাস্তায় নামল। চলল পুবমুখো। একটু যেতেই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। এবার হ্যারি মাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বোঝাল জায়গার নাম কি? বৃদ্ধটি ইঙ্গিত বুঝলেন। বললেন, "তুলাম, তুলাম।" বুকে হাত দিয়ে বললেন, "য়ুকাতান, য়ুকাতান।" তার মানে এরা য়ুকাতান জাতি। বৃদ্ধটি এবার দু'হাত আড়াআড়ি রেখে বোঝালেন, যুদ্ধ, লড়াই। হ্যারি বুঝল সেটা। ফ্রান্সিসকে বলল, "ফ্রান্সিস এরা হচ্ছে য়ুকাতান জাতি। এদের লড়াই চলছে মায়াপান উপজাতিদের সঙ্গে।"

বৃদ্ধটি আর কোনও কথা না বলে ঘরে ঢুকে গেলেন। ফ্রান্সিস হঠাৎ বুঝতে পারল, সামনে বিপদ। যুবকটি আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেল ঠিকই। কিন্তু ওদের চোখের আড়ালে যুবকটি নিশ্চয়ই ছুটে গেছে য়ুকাতান যোদ্ধাদের খবর দিতে যে, আমরা মায়াপানদের গুপ্তচর। ফ্রান্সিস বলে উঠল, "হ্যারি, শাঙ্কো, জাহাজের দিকে ছোটো।"

তিনজনেই লাফিয়ে রাস্তায় নামল। তারপর সমুদ্রতীরের দিকে ছুটল।

তখন অন্ধকার কেটে গেছে। পূব আকাশ কুয়াশা ঢাকা। লাল রঙের আভা।

তিনজন ছুটছে তখন। হঠাৎ শুনল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। পেছনে তাকিয়ে দেখল—দুটো ঘোড়া ছুটিয়ে দু'জন যোদ্ধা আসছে। হাতে বর্শা। গায়ে মোটা কাপড়ের পোশাক। পোশাকে লাল-নীল রঙের সুতোর কাজ করা।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ছুটে লাভ নেই। উলটে আমাদের ওপর লোকেদের সন্দেহ বাড়বে। হয়তো বর্শা ছুঁড়ে আমাদের হত্যা করতে পারে।"

তিনজনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। অশ্বারোহী দু'জন সৈন্য ফ্রান্সিসদের কাছে এসে থামল। যোদ্ধা দু'জন নামল। বর্শা হাতে এগিয়ে এল। ওদের নিজেদের ভাষায় কী জিজ্ঞেস করল। ভাইকিং কথাটা শুনে ফ্রান্সিস বুঝল। ও মাথা ওঠানামা করলো। যোদ্ধা দু'জন আরও কিছু জিজ্ঞেস করল। ফ্রান্সিস তার কিছুই বুঝল না।

এবার একজন যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের পুবদিকে আঙুল তুলে দেখাল। ইঙ্গিতে বলল, ওইদিকে ওদের পেছন পেছন যেতে। ফ্রান্সিস কিছুই না বোঝার ভান করল। এক যোদ্ধা তার হাতের বর্শার ফলাটা দিয়ে ফ্রান্সিসকে খোঁচা দিল। ফ্রান্সিস বুঝল—বর্শার ফলাটা ওর পিঠ কেটে দিয়েছে। নিশ্চয়ই রক্ত বেরোচ্ছে। হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস বেশি চটে গেলে হয়তো বর্শা বুকে ঢুকিয়ে দেবে। তার চাইতে ওরা যেভাবে চাইছে আমরা সেইভাবেই চলব।" যোদ্ধাদের ইঙ্গিতে ফ্রান্সিস পুবমুখো হাঁটতে শুরু করলো। ওর পেছনে পেছনে হ্যারি আর শাঙ্কোও চলল।

ওরা তিনজন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। তখন সকাল। দু'পাশের বাড়িঘর থেকে লোকজন কাজে বেরিয়ে পড়েছে। তারা অবাক হয়ে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। বাজারের কাছে ভিড় বাড়ল। যোদ্ধা দু'জন ঘোড়া থেকে নামল। এই ভিড়ের মধ্যে বন্দিরা পালিয়ে যেতে পারে। ঘোড়ার সামনের দিকে ফ্রান্সিসদের আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা ঘোড়াদুটোর সামনে এলো। যোদ্ধাদের একজন হাঁটতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা হাঁটতে লাগল। সামনে একজন যোদ্ধা লাগাম ধরে একটা ঘোড়াকে নিয়ে চলল। পেছনে আর একজন ঘোড়ার লাগাম ধরে চলল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সকলে একটা লম্বাটে ঘরের কাছে এল। সামনে বিরাট প্রান্তর। সবুজ ঘাসে ঢাকা। লম্বাটে ঘর দেখে ফ্রান্সিস বুঝল কয়েদঘর। আবার বন্দিদশা।

লম্বাটে ঘরটার কাছে এসে দাঁড়াল সবাই। ফ্রান্সিস দেখল, ঘরের দরজাটা লোহার। দরজায় বড় তালা ঝুলছে। দরজার বাইরে বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে দু'জন পাহারাদার। কোমরে তরোয়াল। তাদেরই একজনকে একজন যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে কী বলল। পাহারাদার তালা খুলল লম্বা চাবি দিয়ে।

ফ্রান্সিসদের প্রায় টেনে ঘরে ঢোকানো হল। যোদ্ধাদের একজন পাহারাদারদের কী বলল। তারপর ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল।

লম্বাটে ঘরটার একদিকে এই কয়েদঘর। ফ্রান্সিসদের ঢোকানো হল। ফ্রান্সিসরা দেখল চার-পাঁচজন বন্দি রয়েছে। কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ বসে আছে। দু'জন শুয়ে আছে। মেঝেটা পাথরের, তার ওপর শুকনো ঘাসপাতা ছড়ানো। এটাই বিছানা।

আগে যে বন্দিরা জেগে ছিল তারা বেশ অবাক চোখে ফ্রান্সিসদের দিকে চেয়ে রইল। ফ্রান্সিসরা বসে পড়ল।

শাঙ্কো শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, "ফ্রান্সিস, মাত্র দু'জন যোদ্ধা ছিল—লড়াইয়ে নামলেও ওরা হেরে যেত।"

" তা হয়তো যেত। কিন্তু তারপর? বাইরে তাকিয়ে দ্যাখো প্রান্তরের শেষে লম্বা ঘরগুলো। ওটা সৈন্যনিবাস। তাদের কাছে নিশ্চয়ই খবর পৌঁছত। আমরা সমুদ্রতীরে পৌঁছে জাহাজ চালাবার আগেই ওরা ঘোড়ায় চেপে সমুদ্রতীরে পৌঁছত। আমাদের জাহাজ দখল করত। এক অসম লড়াইয়ে আমাদের প্রাণ দিতে হত। তার চেয়ে এটাই ভাল হল। এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবই। কিন্তু তার জন্য সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হবে। হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। ফ্রান্সিসের ওপর শাঙ্কোর অগাধ বিশ্বাস। ফ্রান্সিস একটা উপায় বের করবেই।

দুপুরে কয়েদঘরের দরজা খোলা হল। দু-তিনজন সৈন্য ঢুকল। একজনের হাতে কাঠের বেশ বড় রেকাবি। অন্যজনের হাতে একটা বেশ বড় হাঁড়ি। আর একজনের হাতে গোল গোল পাতা। সে পাতাগুলো ফ্রান্সিসদের সামনে পেতে দিতে লাগল। পাতায় দেওয়া হল নানা সবজি, আলুর ঝোল। আর গোল গোল করে কাটা কাটা রুটি। সবাই খেতে লাগল। দু'জন প্রহরী দরজায় দাঁড়িয়ে রইল।

ফ্রান্সিসদের খাওয়া শেষ হল। সবাই ঘরের কোণায় রাখা মাটির জালা থেকে জল তুলে খেল।

ফ্রান্সিস শুকনো ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। হ্যারি, শাঙ্কো বসে রইল। ফ্রান্সিস চোখে আড়াআড়িভাবে হাত রেখে শুয়ে রইল। ও গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল, কীভাবে এই কয়েদঘর থেকে পালাবে। কিন্তু কোনও পরিকল্পনাই কাজে লাগবে বলে ওর মনে হল না। ও অন্য উপায় ভাবতে লাগল।

রাত কাটল। মুক্তির কোনও আশা দেখছে না ফ্রান্সিস। সকালের খাবার নিয়ে সৈন্যরা কয়েদঘরে ঢুকল। বন্দিদের খাওয়া চলছে, তখন গোঁফদাড়িওয়ালা একজন ঢুকল। সৈন্যরা, প্রহরীরা মাথা ঝুঁকিয়ে সেই লোকটিকে সম্মান জানাল। বোঝা গেল ওই লোকটি সেনাপতি।

সেনাপতি তলতেক ভাষায় কী সব বলে গেল, ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না। শুধু একটা কথা বুঝল, রাজা তুতজ! ওই দেশীয় বন্দিরা জলটল খেয়ে দরজার কাছে সারি দিয়ে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসরাও গিয়ে সারিতে দাঁড়াল। সেনাপতি দেখল কিন্তু কোনও কথা বলল না।

ঘর থেকে বন্দিরা বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসরাও ওদের পেছনে পেছনে বেরিয়ে এল। সবাই সারি দিয়ে হেঁটে চলল একটা বেশ বড় পাথর বাঁধান বাড়ির দিকে। পেছনে সেনাপতি। সঙ্গে চার-পাঁচজন সৈন্য। সবাই সেই বাড়িটায় ঢুকল। ঘরটা অন্ধকার-অন্ধকার। ফ্রান্সিস কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। অন্ধকার ভাবটা অল্পক্ষণের মধ্যেই চোখে সয়ে গেল। ফ্রান্সিস দেখল একটা পাথরের সিংহাসনে রাজা তুতজ বসে আছে। সিংহাসনের গায়ে নানা জায়গায় মণিমাণিক্য গাঁথা। রাজার দু'পাশে দুটো কাঠের আসনে বসে আছে দুই বৃদ্ধ। বোঝা গেল মন্ত্রী ও অমাত্য।

রাজা তুতজ বয়স্ক লোক। ঢোলা হাতা জামা পরে আছে। পোশাকে সুতোর কারুকাজ। মাথায় কাপড়ের টুপিমতো। পাকানো গোঁফ।

সেনাপতি মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে তলতেক ভাষায় একনাগাড়ে কী বলে গেল। রাজা তুতজ ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। কিছু বলল। ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না। এবার আসনে বসা অমাত্যটি ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল, "তোমরা কে? এখানে এসেছ কেন?"

ফ্রান্সিস আশ্বস্ত হল, যাক, ভাঙা ভাঙা বললেও একজন স্পেনীয় ভাষা জানা লোক পাওয়া গেছে।

"আমরা জাতিতে ভাইকিং। বিভিন্ন দেশে, দ্বীপে আমরা ঘুরে বেড়াই আমাদের জাহাজ নিয়ে। গুপ্তধনের কথা শুনলে তা উদ্ধার করি। সেই গুপ্তধনের মালিককে তা দিয়ে দিই। একটা স্বর্ণমুদ্রাও আমরা নিই না।" হ্যারি বলল।

অমাত্য হ্যারির কথাগুলি রাজা তুতজকে বলল। রাজা আবার কী বলল। সেটা অমাত্য বলল—"দেশের পশ্চিমদিকে মায়পানদের রাজ্য—শত্রু—তোমরা গুপ্তচর।"

ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল, "এটা মিথ্যে। আমরা কারও গুপ্তচর নই।" রাজা তুতজের কথা এবার অমাত্য স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করে দিতে লাগল।

রাজা তুতজ বলল, 'বলছিলে তোমরা গুপ্তধন উদ্ধার করেছ। পারবে রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন ভাণ্ডার উদ্ধার করতে?"

ফ্রান্সিস বলল, "সেই গুপ্তধন কোথায় আছে বলুন। আমরা যা দেখতে চাই, যেখানে যেতে চাই তার অনুমতি দিন আমরা রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন উদ্ধার করব।"

"বৃথা চেষ্টা। পারবে না। অবশ্য মায়াপানদের দেশের চিচেন ইতজাতেও রাজা হুনাকমিনের ধনসম্পদ লুকানো আছে।" রাজা তুতজ বলল।

"এখানকার গুপ্তধনই আমরা খুঁজব। এখানে কোথায় আছে সেটা?" ফ্রান্সিস বলল।

"সঠিক কেউ বলতে পারবে না। তবে এখানকার মন্দিরে কোথাও আছে—এটাই আমাদের বিশ্বাস।" রাজা তুতজ বলল।

"ঠিক আছে। আমাদের মুক্তি দিন। আমরা গুপ্তধন খুঁজব।"

"বেশ, তোমাদের মুক্তি দেওয়া হল। সেনাপতি তোমাদের কাল সৈন্যাবাসে থাকতে দেবেন।" রাজা তুতজ বললেন।

এবার রাজা তুতজ হেসে উঠল। ফ্রান্সিস এবার লক্ষ্য করল রাজা তুতজের কুতকুতে চোখ। চোখের চাউনিটাও অত্যন্ত ক্ষুরধার। চোখমুখ দেখে বোঝা দায় লোকটা মনে মনে ঠিক কী চাইছে? রাজা তুতজ হাসি থামিয়ে বলল, "তোমরা ফিরে এসে বলো—গুপ্তধনের কোনও হদিস পেলে কি না।"

"নিশ্চয়ই বলব।" ফ্রান্সিস বলল।

"তবে মন্দিরের গর্ভগৃহটা বড় ছোট। একটু বড় হলে ভাল হত।"

ফ্রান্সিস কোনও কথা বলল না, রাজা তুতজ আবার হেসে উঠল।

ফ্রান্সিস বুঝল না রাজা তুতজ বারবার হেসে উঠছে কেন? লোকটার কি অন্য মতলব আছে?

ফ্রান্সিসরা সভাগৃহের বাইরে এল। একজন সৈন্য এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের ইশারায় পেছনে পেছনে হাঁটতে বলল। ফ্রান্সিসরা সৈন্যটার পেছনে পেছনে চলল। বিস্তৃত প্রান্তর পার হয়ে লম্বা ঘরগুলোর সামনে এল। সৈন্যটি একটা ঘরের দরজা খুলে ওদের ঢুকতে বলল। ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। ঘরটার মেঝেয় ঘাসপাতা দড়ি দিয়ে বাঁধা বিছানা। তাতে সুতোর কাজ করা চাদর পাতা। সৈন্যটি ইঙ্গিতে বিছানাটা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। ফ্রান্সিসরা বিছানায় বসল। আরও দু'জন সৈন্যকে দেখল শুয়ে আছে। ফ্রান্সিসও শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে ভাবতে লাগল—ব্যাপারটা কি এত সহজ? মন্দিরের গর্ভগৃহে গুপ্তধন আছে এটা যদি সকলের জানাই থাকবে তা হলে এতদিনেও তা উদ্ধার করা হল না কেন? এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গোপনীয় কিছু আছে। যাক গে, কালকে গর্ভগৃহ দেখলেই বোঝা যাবে কোনও কিছু ওদের কাছে গোপন করা হয়েছে কি না। ওদিকে আর এক চিন্তা মারিয়া আর বন্ধুরা। ওরা বোধ হয় চিন্তায় পড়েছে—ফ্রান্সিসদের ফিরে আসতে দেরি হচ্ছে কেন?

পরদিন সকালের খাবার ওরা খেয়ে উঠেছে তখন। দু'জন সৈন্য বর্শা হাতে ওদের কাছে এল। তলতেক ভাষায় কী বলল। হ্যারি বারবার বলল, ''মন্দির, মন্দির। সৈন্যটি মাথা ওঠানামা করল। তারপর ঘরের বাইরে আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস, হ্যারি আর শাঙ্কো ঘরের বাইরে এল।

দু'জন সৈন্য হাতে বর্শা নিয়ে প্রান্তরে নামল। ওদের একজনের হাতে একটা নেভানো মশাল।

ফ্রান্সিসরা ওদের পেছনে পেছনে চলল। ফ্রান্সিস তখনও ভেবে চলেছে এসবের পেছনে রাজা তুতজের কোনও অসৎ ইচ্ছা আছে কি না। ওদের বিপদে ফেলাই রাজা তুতজের ইচ্ছে কি না।

কিছু দূরে একটা টিলা দেখা গেল, তারই নীচে মন্দিরটা। তিনকোনা মন্দির। মন্দিরের সামনে থাক থাক সিঁড়ি উঠে গেছে। দু'পাশে পাথরের দেওয়াল। মন্দিরটা পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

সবাই সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। সৈন্য দু'জন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিসদের আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। দু'পাশের চুনাপাথরের দেওয়ালে পাথর কুঁদে পাখি ফুল লতাপাতার নকশা। সব রঙিন। এই পিরামিড-মন্দিরে অতীতের মৃত রাজাদের সমাধি দেওয়া হয়। এখানে সেই মৃত রাজাদের পুজো হয়।

সৈন্য দু'জন এবার সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। একটু নামতেই অন্ধকারের মধ্যে ওরা এসে পড়ল। সৈন্যটা চকমকি ঠুকে মশাল জ্বালল। মশালের কাঁপা কাঁপা আলোয় সিঁড়ি দেখা যেতে লাগল।



সবাই নেমে চলল। বেশ কিছুক্ষণ পরে সিঁড়ি শেষ হল। সামনে পাথরের দরজা। খোলা। সকলে দরজা পার হল। আবার ছোট ছোট সিঁড়ি।। আরও নীচে নামল সবাই। একটা চৌকোনো ঘরে এসে সিঁড়িটা শেষ হল। ফ্রান্সিসরা অসহ্য গরমে ঘামতে লাগল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি জামা খুলে ফেলল। শাঙ্কো জামা খুলল না। জামা খুললে ছোরাটা লুকিয়ে রাখা যাবে না।

চৌকোনো ঘরটা দেখিয়ে সৈন্যদের একজন ইঙ্গিত করল ঘরটায় নামতে। ঘরটার মেঝেয় বাসি ফুলপাতা ছড়ানো। ফ্রান্সিস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশটা দেখল। কোথাও কোনও ফাঁকফোকর নেই। মেঝেটা তেলতেলে। মশালের আলোয় পড়ে চকচক করছে। ফ্রান্সিস এর কোনও কারণ বুঝল না।

হ্যারি মেঝেয় নামেনি। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্রান্সিস হঠাৎ ওপরের দিকে তাকাল। মশালের আলোয় দেখা যাচ্ছে পাথরের ছাদ। চোখ নামাতে গিয়ে দেখল মশাল হাতে সৈন্যটি হাসছে। ফ্রান্সিস ভাবল, সৈন্যটি হাসছে কেন?

তখনই ওই সৈন্যটি হাতের মশাল ঘরটার মেঝেয় ছুঁড়ে দিল। দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। ধোঁয়া উঠল। আগুন ছড়াতে লাগল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে চিৎকার করে বলল, "শাঙ্কো, উঠে পড়ো সিঁড়িতে।" সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই ধোঁয়া কেটে গিয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ল মেঝেয়। সৈন্য দু'জন এবার হ্যারিকে বর্শা দিয়ে খোঁচা দিয়ে ইঙ্গিত করল আগুন-জ্বলা মেঝেতে নামতে। ফ্রান্সিস এক ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই সৈন্যটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সৈন্যটি বর্শা ছোড়ার অবকাশ পেল না। ফ্রান্সিস ওকে এক জোর ধাক্কা দিল। সৈন্যটি সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে মেঝের আগুনে পড়ে গেল। আর্তনাদ করে উঠল। অন্য সৈন্যটি শাঙ্কোর দিকে বর্শা ছুঁড়ল। শাঙ্কো জামার তলা থেকে ছোরাটা বার করে সৈন্যটির বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। শূন্যে পাক খেয়ে ছোরাটা সৈন্যটির বুকে বিঁধে গেল। সৈন্যটি দু'হাতে ছোরাটা টেনে বার করল। ছোরাটা সিঁড়ির ওপর রেখে সৈন্যটি সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কো এক ছুটে গিয়ে ছোরাটা তুলে নিল।

ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল, "হ্যারি, শাঙ্কো, ওপরের দিকে চলো, জলদি।"

তিনজনে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। কিছুটা উঠেই দেখল সব অন্ধকার। মেঝেয় জ্বালা আগুনের আলো এতদূরে এসে পৌঁছয়নি। অন্ধকারেই ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। অন্ধকারে হ্যারি কয়েকবার পা ফসকে সিঁড়ির ওপর পড়ে গেল। ফ্রান্সিস অন্ধকারেই হ্যারিকে তুলে দাঁড় করাল। তারপর আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

ওরা যখন মন্দিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তখন বিকেল। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল, "হ্যারি, শাঙ্কো ওই জঙ্গলটার দিকে ছোটো।"

বেশ কিছু দূরে একটা জঙ্গল শুরু হয়েছে। তিনজনে সেদিকে ছুটল। কিছুটা গিয়ে ফ্রান্সিস বলল, "এখানে আমাদের থাকা চলবে না। একটা সৈন্যকে মেরেছি, আর একটাকে আহত করেছি। রাজা তুতজ আমাদের ধরতে পারলে

মেরে ফেলবে। কাজেই ওই বনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢুকে পড়তে হবে। তারপর দেখা যাক বনের শেষে কী আছে।''

তিনজনে ছুটছে। মুখ হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে। হ্যারির শরীর বরাবরই দুর্বল। ও বেশ পিছিয়ে পড়ছে। ফ্রান্সিস একটু পিছিয়ে পড়ে হ্যারিকে উৎসাহ দিচ্ছে। শাখনও গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ছুটছে।

ওরা জঙ্গলটায় ঢুকে পড়ল। কয়েকটা গাছগাছালি পার হয়ে হ্যারি দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা গাছের কাণ্ডে ভর রেখে দাঁড়াল। ভীষণ হাঁফাতে লাগল। ফ্রান্সিস, শাঙ্কো হ্যারির কাছে এল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছুটা সবুজ ঘাসের জমির ওপর বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। হ্যারি আর শাঙ্কো সেখানে বসে পড়ল। তিনজনেই হাঁপাতে লাগল।

ফ্রান্সিস বলল, ''শাঙ্কো, বনের আড়াল থেকে দেখে এসো তো রাজা ওড়জের সৈন্য আমাদের খোঁজে এদিকে আসছে কি না।'' শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে বনের শেষ দুটো গাছের আড়ালে দাঁড়াল। দেখল দূরে লোকজন নিজেদের কাজ করছে। ছোট ছোট দোকানে কেনাকাটা করছে। ধারেকাছে কোথাও কোনও সৈন্য নেই।

শাঙ্কো ফিরে আসবে বলে পা বাড়িয়েছে তখনই দেখল চার-পাঁচজন সৈন্য বর্শা হাতে জঙ্গলের দিকে ছুটে আসছে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় বর্শার ধারালো মুখগুলো চকচক করছে।

শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়াল। ছুটে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল, ''ফ্রান্সিস, চার-পাঁচজন সৈন্য ছুটে আসছে এই বনের দিকে।''

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। বলল, ''বনটা বোধহয় গভীর বন। গাছের গুঁড়ির জটলার মধ্যে দিয়ে ছুটতে হবে। কাজেই জোরে ছুটতে পারব না। কিন্তু এখানে থাকা নিরাপদ নয়। ছোটো।''

তিনজনে আবার ছুটতে লাগল। কিছুটা যেতেই গভীর বন শুরু হল। গাছের গুঁড়িতে শেকড়বাকড়ের মধ্যে দিয়ে ছোটা অসম্ভব। তবু যতটা দ্রুত সম্ভব ওরা চলল। অন্ধকার বনের তলে কোথাও কোথাও রোদের টুকরো দেখা যাচ্ছে। সারাদিন স্নান-খাওয়া নেই, তারপর অতটা ছুটে আসা। ওরা ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে হ্যারি আর চলতেই পারছিল না।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, ''আর যাব না এখন। আমরা এখন সৈন্যদের নাগালের বাইরে।''

ওরা ওখানেই বসে পড়ল। হাঁফাতে লাগল। ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল ওরা। শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। এ-গাছের মাথা ও-গাছের মাথা দেখতে লাগল। প্রায় অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তার মধ্যেই ও দেখল, ডানদিককার গাছটার মাথায় বেশ কিছু হলুদ রঙের পাকা ফল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল। সেই গাছটার কাণ্ড বেয়ে বেয়ে গাছটায় উঠল। ডালপালার মধ্যে দিয়ে আস্তে-আস্তে গাছটার মাথায় উঠে গেল। ডালপালার মধ্যে দিয়ে বেশ কিছু পাকা ফল

ঝুলছে। শাঙ্কো কোমর থেকে ছোরাটা বার করল। তারপর ডালটার গোড়াটায় ছোরার কয়েকটা ঘা মারল। ডাল কেটে গেল। এদিকে ওদিকে আরও পাকা ফল। কী গাছ কী ফল কিছুই বুঝল না। ওখানে বসেই একটা পাকা ফলে কামড় বসাল। আশ্চর্য! কী মিষ্টি! কী স্বাদ! শাঙ্কো ফলটা খেতে খেতে অন্য ফলগুলো নিয়ে নেমে এল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ফল ছিঁড়ে নিয়ে খেতে লাগল। খুব সুস্বাদু ফল। শাঙ্কো বলল, ''গাছে উঠছি। আরও কিছু ফল নিয়ে আসছি।'' শাঙ্কো আবার গাছে উঠল। কয়েকটা ফলসহ গাছের ডাল কেটে নিয়ে নীচে নেমে এল। সবাই ফল খেতে লাগল। খিদেটা কিছুটা মিটল।

এবারে বন থেকে বেরোন। ফ্রান্সিস বলল, ''চলো, আমরা উত্তরদিকে লক্ষ্য করে যেতে থাকি। দেখা যাক বনের বাইরে যেতে পারি কি না।''

আবার অন্ধকারে চলা শুরু হল। জল তেষ্টায় ওরা তখন কাহিল। কিছু দূর যেতেই একটা ডোবামতো পেল। অন্ধকারে বোঝাই গেল না—ওই ডোবার জল কেমন। তখন আর সেসব ভাববার সময় নেই। ইচ্ছেও নেই। তিনজনেই আঁজলাভরে জল তুলে খেতে লাগল। শুকনো জিভে মুখে যেন এতক্ষণে সাড় এল। ফ্রান্সিস উবু হয়ে বসে মাথাটা জলে ডোবাল, জল খেল। তারপর ঘাড়ে মাথায় জল ছেটালো। হ্যারি আর শাঙ্কোও তাই করল। এতক্ষণে শরীরটা যেন ঠাণ্ডা হল।

তারপর আবার চলা।

অন্ধকারে সাবধানে গাছের শেকড়বাকড়ে পা ফেলতে হচ্ছে। কাজেই চলার গতি কমে আসছে।

হঠাৎ ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছনে শুকনো ডালপালা ভাঙার শব্দ। ফ্রান্সিস হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে শব্দটা থেমে গেল। হ্যারি বলল, ''ফ্রান্সিস শব্দটা আমিও শুনেছি। নিশ্চয়ই কেউ আমাদের অনুসরণ করছে।'' ফ্রান্সিসরা আবার হাঁটতে লাগল। পেছনে আবার শব্দ। শুকনো ডালপাতা ভাঙার শব্দ। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কো ছোরাটা কোমর থেকে খুলে হাতে নিল। আবার চলল ওরা। আবার শব্দ।

এবার শব্দটা অনেক কাছে। ফ্রান্সিস হঠাৎ পেছনদিকে ঘুরে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল, ''কে আমাদের অনুসরণ করছ। সাহস থাকে আমাদের সামনে এসো।''

পেছনের অন্ধকার থেকে কার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ''আমি আলফান্‌সো, স্পেনীয়, আমি আপনাদের কোনও ক্ষতি করব না। আপনাদের বন্ধুত্ব চাই।''

''সামনে এসো।'' ফ্রান্সিস বলল। পেছনের অন্ধকার গাছগাছালির আড়াল থেকে আলফান্‌সো বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের সামনে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে মোটামুটি দেখা গেল মুখে গোঁফদাড়ি ভর্তি এক বয়স্ক লোক। মাথার কাঁচাপাকা চুল বড় বড়, এলোমেলো, ঘাড় ছাপিয়ে নেমে এসেছে।

''নাম তো শুনলাম আলফান্‌সো। আমাদের অনুসরণ করছ কেন?'' ফ্রান্সিস বলল।

আলফান্‌সো বলল, "সে অনেক কাহিনী আমার জীবনের। আপনারা যখন হেঁটে এসে বনে ঢুকলেন তখন থেকেই আপনাদের পেছন পেছন আসছি। আপনারা স্পেনীয় ভাষায় কথা বলছিলেন। শুনে এত ভাল লাগল। আঃ, কতদিন মাতৃভাষা শুনিনি—বলিওনি। আপনাদের পরিচয় জানতে ইচ্ছে করছে।"

হ্যারি বলল, "আমরা জাতিতে ভাইকিং। তবে নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়া আমরা পোর্তুগিজ স্পেনীয় ভাষা জানি।" তারপর হ্যারি আস্তে-আস্তে নিজেদের দেশে দ্বীপে ঘুরে বেড়ানো গুপ্তধন আবিষ্কার সংক্ষেপে বলে গেল। আলফান্‌সো বলে উঠল, আপনারা রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবেন?"

"সব না জেনে, না বুঝে বলি কী করে?" ফ্রান্সিস বলল।

"আমরা এই বনের উত্তরপ্রান্তে এসে গেছি। আর কিছুক্ষণ হাঁটলে বনের শেষে এক বড় প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছব। আগে সেখানে চলুন। ওখানে খাবার জোগাড় করব। খেয়েটেয়ে সব বলব।"

ফ্রান্সিসরা আর কিছু বলল না। নীরবে হাঁটতে লাগল।

সত্যিই আধঘণ্টার মধ্যে ওরা বনের শেষে এসে উপস্থিত হল।

অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ঘাসে ঢাকা প্রায় অন্ধকার প্রান্তরটা দেখা গেল। আলফান্‌সো বলল, "চলুন, আমার এক পরিচিত বুড়িমার বাড়ি আছে। সেখানে আশ্রয়, খাওয়া দুটোই জুটবে।"

ওরা প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে উত্তরমুখো চলল। ততক্ষণে আকাশের অন্ধকার কেটে গেছে। পুবদিকের আকাশ লালচে হয়েছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

একটু পরেই সূর্য উঠল। ফ্রান্সিস সেদিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগল। মনে মনে ভাবল, কী সুন্দর সূর্যোদয়। সমুদ্রে সূর্যোদয় তো কত দেখেছে। এই উন্মুখ প্রান্তরের পরে এরকম সূর্যোদয় কোনওদিন দেখেনি। মারিয়া এই দৃশ্য দেখলে খুশিতে নেচে উঠত। মারিয়া আর বন্ধুরা জাহাজে রয়েছে। একথা ভাবতেই ফ্রান্সিসের মন খারাপ হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফ্রান্সিস হাঁটতে লাগল। ওসব ভাবতে গেলে মন দুর্বল হয়ে পড়বে।

ঘাসে ঢাকা প্রান্তর শেষ হল। কিছু ঘরবাড়ি দেখা গেল। সকালের উজ্জ্বল রোদ পড়েছে বাড়িঘরে। গাছগাছালিতে বিস্তৃত প্রান্তরে বাড়িগুলি চুনাপাথর আর কাঠে তৈরি। একটা ছোট রাস্তায় ওরা ঢুকল। কয়েকটা বাড়ির পরে একটা বেশ পুরনো বাড়ির সামনে এল ওরা। আলফান্‌সো বাড়িটার দরজায় কয়েকবার ধাক্কা দিল। ভেতর থেকে কে যেন সাড়া দিল। কী বলল, ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না। বাড়ির দরজা খুলে গেল। দেখা গেল এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে। তিনি এগিয়ে এসে আল্‌ফানসোকে জড়িয়ে ধরলেন। আলফান্‌সো কী বলে উঠল, বৃদ্ধা ফোকলা দাঁতে হাসলেন। কী যেন বললেন, আল্‌ফানসো ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে কী বলল। বৃদ্ধা চোখমুখ কুঁচকে হেসে উঠলেন। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে ভেতরে আসতে ইঙ্গিত করলেন। সবাই বাড়িটাতে ঢুকল।

সামনের ঘরটাতে ঢোকবার জন্য বৃদ্ধা ইঙ্গিত করলেন। সবাই ঘরটায় ঢুকল। দেখল মেঝের শুকনো ঘাস বুনে বুনে বিছানামতো করা হয়েছে, সেটা পাতা। ঢাকা কাপড়টায় নানা রঙের লতাপাতা সেলাই করে তোলা। সবাই বসল। আলফান্‌সো বলল, "মজার ব্যাপার শুনুন। এই বৃদ্ধার একটি ছেলে যৌবনে মারা গিয়েছিল। আমার নাক চোখ মুখ ঠিক তার মৃত ছেলের মতো, বৃদ্ধা বলেছিল। তাই আমাকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসে। শুধু থাকা-খাওয়া নয় আমাকে অর্থ সাহায্যও করে। এদিকে কোনও কারণে এলে এই বৃদ্ধা মার কাছে আমাকে আসতেই হয়। বৃদ্ধা মা আমাকে কত যত্ন আত্তি করে। নিজের ছেলের মতো ভালবাসে।"

গতকাল খাওয়া জোটেনি। জলও খেতে পারেনি। রাত কেটেছে নিদ্রাহীন। ফ্রান্সিসরা বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। হ্যারি বরাবরই দুর্বল। ও এত ধকল সইতে পারল না। না খেয়েই অসহ্য ক্লান্তিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস, শাঙ্কো হ্যারিকে আর ডাকল না। ঘুমোক।

একটু বেলায় বৃদ্ধা এলেন। আলফান্‌সোকে ডাকলেন। ওদের চিনেমাটির থালায় গোল চাকা চাকা রুটি, শাকসবজির ঝোল খেতে দিলেন। শাঙ্কো হ্যারিকে ডাকল, "হ্যারি, ওঠো খেয়ে নাও।" হ্যারি উঠে বসল।

ওরা চারজন খেয়ে নিল। খাওয়া দাওয়া সেরে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চোখ বুজল। নানা ভাবনা মাথায়। জাহাজে মারিয়া কেমন আছে, বন্ধুরা কেমন আছে। আমরা তো পালাতে গিয়ে এখানে এসে পড়লাম!

বিকেল নাগাদ সকলের ঘুম ভাঙল। ফ্রান্সিস শুয়ে থেকেই আলফান্‌সোকে বলল, "তুমি তো স্পেন দেশের লোক। তুমি এখানে এলে কী করে?"

তখন আলফান্‌সো ওর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলল। তারপর বলতে লাগল, "আমি তুলাম নগরে এসে পৌঁছেছিলাম। সেখানে বেশ কিছুদিন ছিলাম। তার মধ্যে তলতেক ভাষাটা শিখে নিয়েছিলাম। আমার ঢোলা জামাটার হাঁটু অবধি ঝুল ছিল। কোমরের তলায় তরোয়ালটা ঝুলিয়ে রাখতাম। জাহাজে কালো রং করা হয়। এক ধরনের ফল জলে সেদ্ধ করে এই রং পাওয়া যায়। আমি সেটা দিয়েই তরোয়ালটা রং করলাম। এখানকার লোকেরা জীবনে কখনও তরোয়াল দেখেনি। আমিও রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ তরোয়ালটার ওপর ঝুঁকে মাথা নোয়াতাম। বিড়বিড় করে কিছু বলতাম। আবার হাঁটতে থাকতাম। লোকেরা ধরে নিল তরোয়ালটা কোনও দেবমূর্তি।। একটা পবিত্র জিনিস।

"দিন আমার ভালই কাটছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ভাল রইল না। রাজা তুতজ আমাকে রাজসভায় ডেকে পাঠাল।

"গেলাম রাজসভায়। রাজা তুতজ খুব হেসেটেসে বলল, 'তোমরা বিদেশী। আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।' আমি চুপ করে রইলাম আরও কী বলে শোনার জন্য। রাজা তুতজ বলল 'রাজা হুনাকমিনের নাম শুনেছ?"

"শুনেছি। এখানে এসে।" আমি বললাম।

"এখানকার মন্দিরের গর্ভগৃহে তার ধনসম্পত্তি গোপনে রাখা আছে এটা শুনেছ?" রাজা তুতজ বলল।

"শুনেছি, তবে পরিষ্কার বুঝিনি।" আমি বললাম।

"এখন সব বুঝবে ওই গর্ভগৃহে গুপ্তধন খুঁজতে গেলে।" রাজা তুতজ বলল।

"কিন্তু মাননীয় রাজা, একটা কথা বুঝতে পারছি না। যদি আপনারা জানেনই যে ওই গর্ভগৃহে গুপ্তধন আছে তবে তার খোঁজ করেননি কেন?"

"আমার লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে কিন্তু পায়নি।"

"তবে আমি কী করে পারব?" আমি বললাম।

"বললাম তো, তোমরা বিদেশী, খুব বুদ্ধি তোমাদের'। রাজা তুতুজ বলল।

"বেশ দেখি গর্ভগৃহে নেমে।" আমি বললাম।

"পরের দিন নামলাম গর্ভগৃহে।"

ফ্রান্সিস হেসে বলল, "তারপর গর্ভগৃহের মেঝেয় সঙ্গের পাহারাদার মশাল ছুঁড়ে ফেলল। আগুন জ্বলে উঠল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমাদেরও নামতে বলেছিল?" আলফান্সো বলল।

"হ্যাঁ, পাহারাদার সৈন্য দু'জনকে কাবু করে আমরা পালিয়ে এসেছি।" ফ্রান্সিস বলল।

"ঠিক, ঠিক। আমিও তাই করে এখানে পালিয়ে এসেছি।" আলফান্সো বলল।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সত্যিই কি অতীতের বীর রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন ওখানে আছে?"

"না। তুলামের মন্দিরে নেই। আছে চিচেন ইতজার মন্দিরে।" আলফান্সো বলল।

"সেটা তুমি কী করে বুঝলে?" ফ্রান্সিস বলল।

একটু চুপ করে থেকে আলফান্সো বলল, "তোমাদের এসব বলে কী হবে। তোমরা কি পারবে হুনাকমিনের গুপ্তভাণ্ডার খুঁজে বের করতে?" ফ্রান্সিস হাসল। বলল, "তুমি আগে সমস্ত ব্যাপারটা বলো। সব দেখি, শুনি, তবেই বুঝতে পারব সেই গুপ্তধন উদ্ধার করা যাবে কি না।"

"সব বলছি। কিন্তু তার আগে আমাকে কথা দাও যে হুনাকমিনের গুপ্তধন উদ্ধার হলে আমাকে ভাগ দিতে হবে।" আলফান্সো বলল।

"আগে উদ্ধার তো হোক।" হ্যারি বলল।

"না। আমি তার আগেই বাটোয়ারা চাই। আমি অর্ধেক নেব।" আলফান্সো বলল।

"অর্ধেক কেন? সবটাই নিও।" ফ্রান্সিস বলল।

আলফান্সো লাফিয়ে উঠলো, "অ্যাঁ! ঠিক তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবার তুমি এই ব্যাপারে যা যা জানো বলো।" ফ্রান্সিস বলল।

"তোমাদের তো বলেছি আমি জলদস্যুদের জাহাজে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তারপর এই দেশে আসা। এই দেশে এসে আমি কী করলাম সেটা বলি। কীভাবে নকশাটা পেলাম সে-কথাও বলি।" একটু থেমে আলফান্সো বলতে লাগল, "এখানে তুলাম বন্দরশহরে এলাম। বেশ মনোযোগ দিয়ে এখানকার তলতেক ভাষা আরও ভাল করে শিখলাম। তারপরে রাজা তুতজ আমাকে লোভ দেখিয়ে গর্ভগৃহে পাঠাল। আমি পালালাম। চললাম চিচেন ইতজার দিকে। যাওয়ার পথে এই কোবানগরে এলাম। বুড়িমাকে পেলাম। বেশ আদরযত্নে মাস কয়েক রইলাম।"

আলফান্সো একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "এখানকার ইতিহাস জানলাম। এই দেশটার পুবদিকে বাস করে মায়াপানরা। পশ্চিমদিকে চিচেন ইতজা। রাজা হুনাকমিনের সঙ্গে মায়পানদের যুদ্ধ হয়েছিল। মায়পানরা হেরে যায়। হুনাকমিন চিচেন ইতজার মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কী সুন্দর মন্দির। ওখানে গেলে দেখতে পাবেন।" আলফান্সো থামল।

"আলফান্সো কোনও একটা গোপন কিছু তুমি জান। সেটা বলো।" হ্যারি বলল।

"হ্যাঁ, এবার সেটাই বলব। এই কোবা থেকে আমাকে পালাতে হল। এখানকার গোষ্ঠীপতি আমাকে ডেকে পাঠাল। গোষ্ঠীপতি জিজ্ঞেস করল, "শুনেছি তুমি বিদেশী। এখানে এসেছ কেন?"

"ভাগ্যক্রমে। জলদস্যুদের জাহাজ থেকে পালিয়ে আমি এখানে এসেছি। আবার ভাগ্যক্রমে এখানে আহার, বাসস্থান পেয়েছি।' আমি বললাম।

"উঁহু, তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তুমি চিচেন ইতজার রাজা পোকানের গুপ্তচর।" গোষ্ঠীপতি বলল।

"আমি তলতেক ভাষাটা মোটামুটি শিখেছি। তাই আপনাকে বলছি, আপনিই ভেবে দেখুন, গুপ্তচরবৃত্তি আমি কেন করতে যাব। আমি বিদেশী। আপনাদের এই দেশে হঠাৎই এসেছি।" আমি বললাম।

"বাজে কথা বলছ।" গোষ্ঠীপতি দু'জন পাহারাদারকে ইঙ্গিতে ডাকল। ওরা আমার দু'হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলল। বুঝলাম, হাজার চেষ্টা করেও গোষ্ঠীপতির সন্দেহ আমি দূর করতে পারব না। তাই দুর্ভাগ্য মেনে নিলাম।

"পাহারাদার দু'জন আমাকে একটা তালা লাগানো ঘরের সামনে নিয়ে এল। তালা খুলে আমাকে ওরা ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিল।

"আমার বন্দীজীবন শুরু হল। আমি পালাবার ছক কষতে লাগলাম। ও-ঘরে আরও দু-তিনজন বন্দী ছিল। জঘন্য খাবার খেতে দিত। বমি উঠে আসে। মনে পড়ল বুড়িমার কথা। কী সুস্বাদু খাবার খেতে পেয়েছি। শুকনো ঘাসের নরম বিছানায় শুয়েছি। ঘুমিয়েছি।" আলফান্সো থামল।

ফ্রান্সিস বলল, "তারপর? তুমি পালাতে পারলে?"

"হ্যাঁ। আমি লক্ষ্য করলাম যে দু'জন পাহারাদার খাবার নিয়ে আসে। হাতে বর্শা থাকে না, ওদের পেছনে থাকে দু'জন। দু'জনের হাতেই কাঠের বর্শা। লোহার ছুঁচলো মুখ। আমি অন্য বন্দিদের বললাম, শোনো, আমি পাহারাদারদের বলব যে আজ একটু রাতে আমরা খাব।" বন্দিদের একজন বলল, কেন?

"আমি পালাবার ছক কষে ফেলেছি। আমরা সবাই পালাব।" আমি বললাম।

রাত হল। আমি একজন পাহারাদারকে ডাকলাম। ও এল। বললাম, "আজ একটু রাতে খাব আমরা।"

"কেন?" পাহারাদার বলল।

"আমাদের খিদে নেই।" কথাটা বলে আমি বন্দিদের দিকে তাকালাম, ওরাও বলে উঠল, 'আমরাও পরে খাব।'

"বেশ।" পাহারাদার চলে গেল।

রাত বাড়ল।

"এবার পাহারাদাররা খাবার নিয়ে এল। দরজা খোলা হল। দু'জন বড় কাঠের পাত্রে সবজি, ঝোল নিয়ে এল। অন্যজনের হাতে রুটি রাখা কাঠের বড় রেকাবি। দরজার কাছ থেকে একজন পাহারাদার এগিয়ে এল। বর্শাটা পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম। সবজি ঝোলের বড় কাঠের পাত্রটা তুলে নিয়ে দরজায় দাঁড়ানো একজন পাহারাদারের মাথায় ঢেলে দিলাম। পাহারাদার দু'হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে মেঝেয় বসে পড়ল। অন্য পাহারাদার কিছু বোঝার আগেই আমি খোলা দরজা দিয়ে দ্রুত ছুটে বাইরে চলে এলাম। অন্ধকারে দৌড় দিলাম প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে। পেছনে শুনলাম পাহারাদারদের চ্যাঁচামেচি। আমি ততক্ষণে ধরাছোঁয়ার বাইরে। অন্য বন্দিরাও ততক্ষণে পালিয়ে গেছে।

আলফান্‌সো থামল। তারপর আবার বলতে লাগল, "বুড়িমার এই বাড়িতে কয়েকদিন আত্মগোপন করে রইলাম। তারপর একদিন ভোরে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চললাম চিচেন ইতজার উদ্দেশ্যে। বড় সড়ক এড়িয়ে জংলা জায়গা দিয়ে চললাম। দিনটা সেদিন একটু মেঘলা ছিল। কাজেই হাঁটতে কষ্ট হয়নি।

"সন্ধের সময় চিচেন ইতজা পৌঁছলাম। শরীর ক্ষুধাতৃষ্ণা আর ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়ছে। দুপুরে একটা গ্রামের বাড়িতে চারটে মাংসের বড়া খেয়েছিলাম। তাতে খিদে মেটেনি, বরং বেড়ে গেছে।

"খুঁজতে খুঁজতে একটা ছোট সরাইখানা পেলাম। এখন এখানেই আশ্রয় নিতে হবে। সরাইখানার মালিক আমাকে দেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। বেশ কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে মাথা একটু ঝুঁকিয়ে বলল, "কী খাবেন বলুন?"

"মাংস রুটি। এক্ষুনি চাই।" আমি বললাম।

"এক্ষুণি দেওয়া হবে। আপনি পেছনের ঘরে একটু বিশ্রাম নিন।" আমি পেছনের ঘরে ঢুকলাম। দেখি একটা মোটা মোমবাতি জ্বলছে। মেঝেয় কাঠের

পাটাতনে বসলাম। বসে থাকতে পারলাম না। শুয়ে পড়লাম। সরাইখানার একটি অল্পবয়সী ছেলে একটা কাঠের পাত্রে জল নিয়ে এল। আমাকে দিল। আমি উঠে বসে সেই কাঠের পাত্রের সব জল খেয়ে ফেললাম। মুখ-গলার শুকনো ভাবটা কাটলো। তখন বুঝলাম—আমার কী জলতেষ্টা না পেয়েছিল! পাত্রটা ফিরিয়ে দিলাম। ছেলেটি চলে গেল। আমি আবার শুয়ে পড়লাম।

"কিছুক্ষণ পরে ছেলেটি আমাকে গরম গরম রুটি আর মাংস দিয়ে গেল। আমি উঠে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পর পর আরও একপাত্র মাংস-রুটি নিয়ে জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম।

"ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। পাখির ডাক শুনলাম। উঠে বসলাম। শরীরের আর ক্লান্তভাব নেই।" আলফান্‌সো থামল।

"তারপর?"

"তারপর আমি ওই সরাইখানাতেই রইলাম। বেশ কিছুদিন। ঘুরে ঘুরে নগরটা দেখলাম। বেশ সাজানো-গোছানো শহর। অনেক ফুলের বাগান। রাস্তায় লোকজনের বেশ ভিড়। দোকানে দোকানে কাচ ঢাকা আলো। পথে দু-একজনকে জিজ্ঞেস করে করে চিচেন ইতজা মন্দিরের সামনে এলাম। মন্দিরের চারপাশে জলে ঘেরা। একেবারে সামনেই সিঁড়ি। সোজা উঠে গেছে মন্দিরের প্রায় মাথা পর্যন্ত। একটা সাঁকো মতো পার হয়ে মন্দিরের চত্বরে উঠতে হয়। সাঁকো পার হয়ে মন্দিরের চত্বরে এলাম। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। মন্দিরের প্রায় মাথার কাছাকাছি এসে সিঁড়িটা নীচে নেমে গেছে। মন্দিরের মাথায় একটা বড় একটা ছোট ঘরমতো। চারদিকে তাকিয়ে দেখে বুঝলাম ওই দুটো ছোট ঘরে ওঠার মতো সিঁড়ি নেই। ওখানে কেউ উঠতে পারবে না। তা হলে কি ওখানে ওঠা যায় না? এবার ঢাল সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলাম, চুনাপাথরে তৈরি দেওয়ালে ফুল, পাখি কুঁদে কুঁদে তোলা। নীচে নেমেই যাচ্ছি যেন এই সিঁড়ির শেষ নেই। ততক্ষণে চারদিকে অন্ধকার জমা হয়ে গেছে। কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। সিঁড়িগুলোতে আন্দাজে পা ফেলতে হচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। মশালের আলো ছাড়া এখানে কিছুই দেখা যাবে না, আমি ফিরে দাঁড়ালাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। কালকে আবার আসব। একটা মশাল ভাল করে তেলে ভিজিয়ে আনতে হবে।"

"তা হলে পরদিনও গিয়েছিলে?" ফ্রান্সিস বলল।

"হ্যাঁ, মশাল নিয়ে। আস্তে-আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। একটু পরেই সব অন্ধকার। মশাল জ্বালালাম। তিনদিকে পাথুরে দেওয়াল মতো। সিঁড়ি দেখতে দেখতে নামতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখলাম সিঁড়ি শেষ। একটা চৌকোনো ঘর। এবড়োখেবড়ো পাথরের দেওয়াল। চৌকোনো ঘরটার চারদিকে দেখলাম চুনাপাথরের আর বালির নয়টি পুরুষ মূর্তি। বুঝলাম মায়া ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত রাত্রির নয় দেবতার মূর্তি। ঘরের মাঝখানে ফুল, লতাপাতার স্তূপ। বোধ হয় এ দেশবাসিরা দেবতাদের পুজো করেছে?" আলফান্‌সো থামল।

"তুমি ওইটুকুই দেখেছিলে?" হ্যারি বলল।

"শুধু ওইটুকুই নয়। ওই ছোট ঘরটার নীচেই রয়েছে আবার সিঁড়ি। ফুল, পাতা সরাতেই দেখলাম সেই সিঁড়ি। মশাল হাতে নামতে লাগলাম। মশালের আলো খুব কাঁপছে না। বুঝলাম এখানে বেশি বাতাস ঢুকছে না। ফুল, পাতা, সরিয়ে দিয়ে সিঁড়িতে পা রাখলাম। এবারের সিঁড়িগুলো তত বড় নয়। বেশ দেখেশুনে নামতে হচ্ছিল। নামতে লাগলাম। খুব স্যাবধানে নামতে হচ্ছিল বলে চলার গতি কমে গিয়েছিল।" আলফান্‌সো থামল।

শুধু ফ্রান্সিস বলল, "তারপর?" আর সবাই চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে আলফান্‌সো বলতে লাগল, "পরে দেখি আগের মতোই চৌকোনো একটা ঘর। তবে খুব ছোট। মেঝেয় রাখা একটা কফিন মতো। কফিনের ঢাকনা আর খুললাম না। বুঝলাম ওই কফিনে রয়েছে মিশরের মমির মতো কোনও রাজার মমি। হতে পারে সেই রাজা হুনাকমিন। মশালটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে দেখলাম। এবড়োখেবড়ো পাথুরে দেওয়াল। চুনাপাথর মেশানো। এখানেই কি রাজা হুনাকমিন তাঁর ধনসম্পদ সব গুপ্তভাবে রেখে গেছেন? বারকয়েক চারদিক দেখে নিয়ে সিঁড়ির কাছে এলাম। একটু অপেক্ষা করলাম। তারপর আস্তে-আস্তে ওপরে উঠতে লাগলাম। নয় দেবতার ঘরটাও খুব ভাল করে দেখলাম। সেই চুনাপাথর মেশান এবড়োখেবড়ো দেওয়াল। বুঝলাম— এখানে রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন নেই। মানুষের হাতে তৈরি এই গুহায় সকলেই আসতে পারে। কাজেই দীর্ঘকাল ধরে মানুষ এখানে পুজো দিতে এসেছে। রাজা হুনাককেও শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে। এখানকার গোপনীয়তা কিছু নেই। এখানে রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন থাকলে বহু আগেই তা আবিষ্কার হয়ে যেত। তাই আমার কেমন বিশ্বাস হল রাজা হুনাকমিনের ধনসম্পদ অন্য কোথাও গোপনে রাখা হয়েছে। এই গর্ভগৃহে নয়। এখনও মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। অন্য কোথাও যা দেখবার তা দেখলাম। তারপর আমি আস্তে-আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম।" আলফান্‌সো থামল।

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস, কী ভাবছ?" ফ্রান্সিস হেসে বলল, "রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন উদ্ধার।"

"আপনি পারবেন?" আলফান্‌সো একটু অবাক হয়ে বলল।

"সেটা ঠিক এক্ষুনি বলতে পারছি না। চিচেন ইতজায় যাই, সব দেখি, শুনি, জানি, তখনই বলতে পারব এটা সম্ভব কি না। অর্থাৎ রাজা হুনাকমিনের গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করা যাবে কি না।"

"অসম্ভব। পারবেন না।" আলফান্‌সো বলল।

"বললাম তো, সব আগে দেখিটেখি, তারপর বলা যাবে অসম্ভব না সম্ভব।" ফ্রান্সিস বলল।

"বেশ, চলুন, সব জানুন, দেখুন।" আলফান্‌সো বলল।

তখন সন্ধে হয়ে গেছে। আলফান্সোর বুড়িমা একটা কাঠের বড় রেকাবি নিয়ে ঘরে ঢুকল। রেকাবিতে রাখা বড় বড় মাংসের পিঠে। ফ্রান্সিসরা খুব খুশি। পিঠে তুলে নিয়ে খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ হলে ফ্রান্সিস বলল, ''চলো, কোবা নগরটা কেমন দেখে আসি। আলফান্সোই আমাদের দেখাবে সব।''

ওরা তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চলল নগর দেখতে। ছোট নগর। লোকজনের খুব ভিড় নেই।

আলফান্সো বলল, ''চলো, আগে মন্দিরটা দেখি।''

আলফান্সোর নির্দেশমতো চলল ওরা। বড় সড়কের ধারেই দেখল মন্দিরটা। খুবই ছোট মন্দির। দুটো সিঁড়ি সোজা ওপর দিকে উঠে গেছে। মাথায় একটা ছোট ঘরমতো।

ফ্রান্সিসরা ঘুরে ঘুরে দেখল। তখন তো রাত। মশালের আলোয় যতটুকু দেখবার দেখল।

ওরা যখন ফিরে আসছে, তখন একটা ঘটনা ঘটল। আলফান্সো একটু পিছিয়ে পড়েছিল। দুটো লোক ওর দু'পাশে এসে দাঁড়াল। আলফান্সোও দাঁড়িয়ে পড়ল। অল্প আলোয় আলফান্সো দেখেই চিনল, সাইল, সঙ্গের লোকটা একটা গুন্ডা। অর্থ পেলে সব করতে রাজি। আলফান্সো বলল, ''কী চাও তোমরা?''

সাইল একটু হেসে বলল, ''চিচেন ইতজার এক সরাইখানায় একটা বয়স্ক লোক এসেছিল। তোমাকে একটা নকশা দিয়েছিল।''

''নকশা-টকশা কিছু না, চিচেন ইতজার মন্দিরের হাতে আঁকা ছবি।'' আমি বললাম।

''ঠিক আছে। যদি ওটা নকশা না হয় তা হলে আমাকে দিয়ে দাও।'' সাইল বলল।

''দিতে তো পারতাম। কিন্তু আমার কাছে তো ওটা নেই।'' আলফান্সো বলল।

''কোথায় আছে নকশাটা?'' সাইল বলল।

''সেই সরাইখানার মালিকের কাছে রেখে এসেছি। কী আর হবে ওই ছবি দিয়ে।'' আলফান্সো বলল।

''তুমি মিথ্যে কথা বলছ। ওই সরাইখানায় আমরা গিয়েছিলাম।'' সরাইখানার মালিক বলল, ''আমি ওই ছবির ব্যাপারে কিছুই জানি না।''

''ও মিথ্যে বলেছে।'' আলফান্সো বলল।

''বেশ, কাল সকালে চিচেন ইতজা চলো। সেই সরাইখানায় আমরা কালকে যাব। তুমিই মিথ্যে বলছ না সরাইখানার মালিক মিথ্যে বলেছে সেটা বোঝা যাবে।'' সাইল বলল।

''চলো, দেখা যাক।'' আলফান্সো বলল।

''এখন নয়, কাল সকালে যাব আমরা।'' সাইল বলল।

"আচ্ছা, আমি এখন তা হলে আমার আস্তানায় যাই।" আলফান্সো বলল।

"না, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে।" গুণ্ডাটা বলল।

"কোথায়?" আলফান্সো বলল।

"গেলেই দেখতে পাবে। তুমি আজ রাতের মতো আমাদের বন্দি হিসেবে থাকবে। কালকে আমাদের সঙ্গে চিচেন ইতজায় যাবে।"

গুণ্ডাটা শেষে বলল, "আমাদের কথামতো না চললে শেষ করে দেব।"

"বেশ আমি যাব।" আলফান্সো বলল।

সাইল আর গুণ্ডাটার সঙ্গে আলফান্সো চলল।

ওদিকে বেশ কিছুটা গিয়ে শাঙ্কো বলে উঠল, "আলফান্সো কোথায়?"

ফ্রান্সিস আর হ্যারি এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। আলফান্সো নেই। ওরা রাস্তায় এদিকে ওদিকে ঘুরে এল। না। আলফান্সো নেই।

ফ্রান্সিস বলল, "আলফান্সো অনেকদিন এ-দেশে আছে। এই কোবা নগরও ওর খুবই পরিচিত। আমরা হারিয়ে গেলে বিপদ ছিল।"

"আমার মনে হয় আলফান্সো বুড়িমার আস্তানায় চলে গেছে। চলো, আমরাও ওখানে যাই।" হ্যারি বলল।

চারদিকে তাকাতে-তাকাতে ফ্রান্সিস বলল, "বুড়িমার বাড়িটা যে কোথায় আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না।"

হ্যারি বলল, "আমার মনে আছে। সামনের মোড়টার বাঁদিকের রাস্তাটা ধরে যেতে হবে। দেখতে থাকো কোনও বড় একটা ডুমুর গাছ পাও কি না। ওই ডুমুর গাছের গায়েই বুড়িমার বাড়ি।"

"ডুমুর গাছ তো অনেক জায়গাতেই থাকতে পারে।" শাঙ্কো বলল।

"তা পারে। কিন্তু এতদূর ঘুরে এলাম, একটাও ডুমুর গাছ দেখিনি।" হ্যারি বলল।

"ঠিক আছে। ওই রাস্তা ধরেই চলো। দেখা যাক, ডুমুর গাছ পাই কি না।" ফ্রান্সিস বলল।

ওরা বাঁ দিকের রাস্তাটাই ধরল। বেশ কিছুটা যেতেই বাঁ দিকে একটা বড় ডুমুর গাছ দেখা গেল। হ্যারি হেসে বলল, "দ্যাখো, ডুমুর গাছটার গায়েই বুড়িমার বাড়ি।"

শাঙ্কো গিয়ে দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে গেল। বুড়িমা দাঁড়িয়ে আছেন। বুড়িমা ফোকলা মুখে হেসে বললেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য রেঁধেছি। তোমরা বাইরে কোথাও যাবে না।"

তলতেক ভাষা। ফ্রান্সিস ঠিক বুঝল না। হ্যারি কিছুটা আন্দাজ করে মাথা নাড়ল। বুড়িমা এটাকে সম্মতি ধরে নিয়ে হাসতে লাগলেন।

ফ্রান্সিসরা এসে বিছানায় বসল। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল, "বিপদ আসছে। আলফান্সো আমাদের সঙ্গে নেই। বুড়িমা ফ্রান্সিসদের সবাইকে দেখতে দেখতে বললেন, "আমার ছেলে কই?"

হ্যারি হাতের ইঙ্গিতে বোঝাল আলফান্সো আসছে। বৃদ্ধা আর কিছু বললেন না। চলে গেলেন।

রাত হল। খাওয়ার সময় হল। আলফান্সো তখনও ফিরল না। আলফান্সোর বুড়িমা ঘর-বার করতে লাগলেন।

হ্যারি হাতের, চোখের ইঙ্গিতে বোঝাতে লাগল আল্ফানসো আসবে। বুড়িমা ইঙ্গিতটা বুঝলেন। কিন্তু আর একটু রাত বাড়তেই বুড়িমার কান্না শুরু হল।

ফ্রান্সিস বলল, "এখন তো সরাইখানাও খোলা পাব না। আজকে রাতের মতো খাওয়া জুটবে না, শুয়ে পড়ো।" বুড়িমার ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না চলতেই লাগল।

ফ্রান্সিসরা ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বুড়ির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার একঘেয়ে শব্দ আর খালি পেট। ঘুম আর আসবে না।

ওদিকে সাইল আর গুণ্ডাটা আলফান্সোকে একটা বাড়িতে নিয়ে এল। পাথর আর কাঠের ভাঙাচোরা বাড়ি। বাইরের ঘরটায় ওরা ঢুকল। শুকনো ঘাসে তৈরি বিছানা। ওরা বসল বিছানায়।

সাইল বলল, "আলফান্সো, আমি সবই দেখেছি। সেই নকশাটা পেয়ে তুমি খুশিতে আত্মহারা। আমি ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। বুড়োর সব কথা শুনিনি। কিন্তু যেটুকু শুনেছি তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটা কোনও গুপ্তধনের নকশা।"

"ঠিক আছে। তুমি তো বললে বিশ্বাস করবে না। ছবি আঁকা কাগজটা দেখে কিছু বুঝলে কি না সেটা ভেবে দ্যাখো। ওটা চিচেন ইতজার ছবি ছাড়া কিছুই না।"

গুণ্ডাটা উঠে দাঁড়াল। বলল, "সাইল, চল, খেয়ে আসি। ভীষণ খিদে পেয়েছে।" তিনজনে ঘরে তালা দিয়ে খেতে বেরোল।

রাস্তায় যেতে যেতে আলফান্সো একটা উপায় ভাবল। সেইমতো করলও। ও একপাশে ছিল। অন্যপাশে গুণ্ডাটা আর সাইল। আলফান্সো হঠাৎ বসে পড়ল। গুণ্ডাটা আর সাইল নিচু হয়ে দেখতে গেল কী হয়েছে। আলফান্সো সঙ্গে-সঙ্গে দু'জনকে জোরে ধাক্কা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দু'জনে দু'পাশে ছিটকে পড়ল। আলফান্সো দ্রুতবেগে ডান দিকের অন্ধকার গলিটায় ঢুকে পড়ল। সাইল আর গুণ্ডাটার "ধর, ধর" চিৎকার শুনতে পেল। আলফান্সো এবার অন্য একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। পেছনে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। ও ছুটল বুড়িমার বাড়ির দিকে।

ফ্রান্সিসের বারেবারে ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। হঠাৎ শুনল দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ। ফ্রান্সিস দ্রুত বিছানায় উঠে বসল। আস্তে-আস্তে দরজার কাছে গেল। মৃদুস্বরে বলল, "কে?"

"আমি, আমি আলফান্সো।"

ফ্রান্সিস দরজা খুলে দিল। আলফান্সো ঘরে ঢুকল। ও হাঁফাচ্ছে। দরজা খোলার শব্দে হ্যারি আর শাঙ্কোর ঘুমও ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস আলফান্সোকে

বলল, "ভাই, তুমি আগে তোমার বুড়িমার কাছে যাও। তোমার বুড়িমা এখনও বোধহয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।"

আলফান্সো বাড়ির ভেতরে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল, "যাক, বাঁচা গেল। বুড়িমা এবার কান্না বন্ধ করবেন।"

একটু পরেই বুড়িমা ফ্রান্সিসদের ঘরে এলেন। একগাল হেসে বললেন, "তোমরা এখন ঘুমিয়ে পড়বে না। আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

খাওয়াদাওয়ার পর ফ্রান্সিস বলল, "আলফান্সো তোমার কী হয়েছিল?"

"সব ঘটনা না বললে ঠিক বুঝবে না।" আলফান্সো বলল।

"আমারও মনে একটা খট্‌কা আছে। তুমি সব কথা আমাদের বলোনি।"

আলফান্সো বলল, "এবার সব বলছি। বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমি সে সময় চিচেন ইতজায় একটা সরাইখানায় ছিলাম। সেই সময় সাইল নামে একটা লোকও আমার ঠিক পাশেই ঘুমোত। আমাদের দু'জনের মিলটা ভাল হল। সাইলেরও ত্রিসংসারে কেউ নেই। আমারও সেই অবস্থা।" আলফান্সো থামল।

"তারপর?" হ্যারি বলল।

"একদিন গভীর রাতে হঠাৎ দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনলাম। সরাইখানার মালিক দরজা খুলে দিল। অন্ধকারে কিছুই দেখেছিলাম না। শুধু গোঙানির শব্দ। সরাইখানার মালিক মোটা মোমবাতিটা জ্বালল। দেখি একজন বয়স্ক লোক। বুক দিয়ে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে মেঝের ওপর দিয়ে আসছে। সারা গায়ে মাথায় ধুলো জমে আছে। পোশাকে রক্তের দাগ। অবাক হয়ে ভাবলাম এই বয়সে লোকটা মারপিট করতে গেছে নাকি।

"মোমের আলোয় দেখলাম, লোকটার বাঁ পা রক্তমাখা। লোকটার গোঙানি চলল। ভাবলাম এর এক্ষুণি চিকিৎসার প্রয়োজন। সরাইখানার মালিক বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে। সাইলও ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। আমি সরাইখানার মালিককে বললাম, "আমি এই জায়গাটা ভাল চিনি না। ধারে কাছে কোথায় একজন বৈদ্যকে পাব?"

"রাস্তায় নেমে ডান দিকে দেখবেন একটা মাঠমতো। ওই মাঠের শেষেই একটা বিরাট গাছ। গাছটার ধারেই একটা বাড়ি। ওখানেই একজন বৈদ্য থাকেন। এই শেষ রাত। আসবে কি?" মালিক বলল।

"দেখা যাক।" এই বলে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। একটু গিয়েই মাঠ পেলাম। ঝাঁকড়া মাথা বিরাট গাছ। পেছনের বাড়িটায় গিয়ে টোকা দিলাম। ভেতরে কোনও শব্দ নেই। আবার জোরে টোকা দিলাম। ভেতর থেকে কেউ বলল, "কে?"

"খুব বিপদে পড়ে এসেছি। বৈদ্যমশাইকে একটু আসতে বলুন।"

"একটু পরেই দরজা খুলে গেল। এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। মুখে দাড়ি গোঁফ। বললাম, "বড় রাস্তায় যে সরাইখানাটা আছে আপনাকে দয়া করে সেখানে একবার যেতে হবে।"

"কিন্তু এত রাতে—মানে—"

"দয়া করে চলুন। লোকটির বাঁ পা বোধহয় ভেঙে গেছে। শরীরের অনেক জায়গায় আঘাত।" আমি বললাম।

"হুঁ। আসছি।" বৈদ্য বললেন।

ওষুধের থলেটা নিয়ে বৈদ্য অল্পক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এলেন। আমার সঙ্গে চললেন।

"আমরা সরাইখানায় ঢুকলাম। বৈদ্য ভীষণ আহত লোকটির কাছে বসলেন। পায়ের দিকের পোশাকটা কিছুটা তুললেন। মোমবাতির আলোয় দেখা গেল, পাটা মুচড়ে গেছে। তখনও রক্ত পড়ছে, তবে অল্প। বৈদ্য লোকটির পরনের ঢোলা হাতা জামা তুলে দেখলেন। লোকটির গোঙানি তখনও থামেনি। বৈদ্য ওর চোখ বুক কোমর দেখলেন। আমাকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। মৃদু স্বরে বললেন, "বোধ হয় কোনও উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গেছে। একটা পা ভেঙে গেছে। অন্য পা-টা মচকে গেছে। দাঁড়াতে পারবে না। মাথার পেছনেও ভীষণ লেগেছে। কী চিকিৎসা করব বলুন। এ বাঁচবে না।" আমি বললাম, 'তবু আপনি যতটা করার করুন।'

"বেশ।" বৈদ্য কাপড়ের পোঁটলা থেকে ওষুধ বের করলেন। দুটো ছোট বোয়ামও বের করলেন। বোয়াম থেকে কী একটা কালো রঙের জিনিস তুলে দু'হাতের তেলো দিয়ে চেপে চেপে দুটো বড়ি করলেন। আমার হাতে দিলেন। বললেন, "দুটোই খাইয়ে দিন।" লোকটির দুই চোয়াল চেপে ধরে বললাম, "ওষুধটা খেয়ে নিন।" লোকটি খেল। বৈদ্য একটা কাপড়ের টুকরো চাইলেন। সরাইখানার মালিক এনে দিলেন। বৈদ্য আহত লোকটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্ত মুছে দিলেন। তারপর বললেন, 'অল্প জল দিন।' মালিক কাঠের গ্লাসে জল নিয়ে এলেন। বৈদ্য ঝোলা থেকে একমুঠো হলুদের গুঁড়ো বের করলেন। একটু একটু করে মিশিয়ে একটা লেই করলেন। ভাঙা কাটা জায়গাগুলোতে আস্তে-আস্তে লাগিয়ে দিলেন। লোকটি এবার নড়েচড়ে উঠল। একটু পরেই তার গোঙানি বন্ধ হল। বৈদ্য আরও ওষুধ আমাকে দিলেন। পরে খাওয়াতে হবে। লাগাতে হবে।

"বৈদ্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি কোমরের ফেট্টি থেকে কিছু অর্থ বের করে বৈদ্যকে দিলাম। বৈদ্য চলে গেলেন। আমি লোকটার পাশে বসে রইলাম। বৈদ্য বলে গেছেন বাঁচার কোনও আশা নেই। তবু মরার সময় যাতে যন্ত্রণা না ভোগ করতে হয় তার জন্যই বৈদ্যকে ডেকে এনেছিলাম।

'সাইল এতক্ষণে উঠে আমার কাছে এল। বলল, 'মিছিমিছি এত কিছু করছেন কেন? এ তো বাঁচবে না।'

"তবু চেষ্টা করা। দেখি।"

"বাইরে পাখির ডাক শুনলাম। ভোর হয়েছে। আমি বসে বসেই একটু ঘুমিয়ে নিলাম। ঘুম ভেঙে দেখি লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। স্থির দৃষ্টিতে। একটু চমকে উঠলাম। বললাম, 'এখন কেমন আছেন?'

"লোকটি ভাঙা গলায় বলল, 'একটু ভাল।' তারপর ভাঙা ভাঙা বলতে লাগল, 'আপনি—আমার জন্য এত করছেন—।' বাধা দিয়ে বললাম, 'এটুকু মানুষ হিসেবে আমার করা উচিত। নইলে, একটা জানোয়ারের সঙ্গে আমার তফাৎ কোথায়?' লোকটি আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করল।

"লোকটিকে সকালের খাবার খাওয়ালাম। ওষুধও খাওয়ালাম। দুপুরেও খাওয়ালাম।

"সন্ধের দিকে মনে হল লোকটি গায়ে একটু জোর পেয়েছে। পাশ ফিরে শুল।

"পরের দিন দুপুরে লোকটির জ্বর এল। সাইলকে বললাম, 'সাইল, তুমি এর পাশে বোসো। আমি বৈদ্যর কাছে যাচ্ছি।'

বৈদ্যকে পেলাম না। কোনও রোগীর বাড়িতে গেছেন।

"সন্ধের দিকে জ্বর বাড়ল। আমি সাইলকে বসিয়ে রেখে বৈদ্যর কাছে গেলাম। জ্বর শুনে বৈদ্য বললেন, 'লক্ষণটা ভাল নয়। তবু আমার সাধ্যমতো করছি।' একটা ওষুধ তৈরি করে দিলেন। তিনটি বড়ি।

ফিরে এসে লোকটিকে একটা বড়ি খাওয়ালাম।

সন্ধের পর জ্বর বোধ হয় একটু কমল।"

"আমি আবার কোমরে ফেট্টি থেকে চেপে চেপে একটু কাপড় ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে কপালে দিতে লাগলাম। লোকটির বোধ হয় ভাল লাগল। চুপ করে শুয়ে রইল।

"গভীর রাত তখন। সাইলকে বললাম, 'তুমি ভাই লোকটির কপালে আমার এই জলেভেজা ন্যাকড়াটা চেপে-চেপে লাগাও। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। দু'রাত টানা ঘুমোতে পারিনি।'

"সাইল লোকটির কাছে বসল। কপালে জলপট্টি দিতে লাগল। আমি একপাশে শুয়ে কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

"যখন ঘুম ভাঙল তখন শেষ রাত। দেখলাম সাইলও লোকটির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। আমি সাইলকে আস্তে ধাক্কা দিয়ে ওর ঘুম ভাঙালাম। পরে ভেবে দেখেছি সাইলের ঘুম না ভাঙানোই উচিত ছিল। সাইল উঠে বসল।

"তখনই দেখি লোকটা কী যেন বলছে। আমি লোকটার মুখের কাছে কান পাতলাম। লোকটা বলছে, ভাই তুমি কে জানি না। কিন্তু আমাকে সুস্থ করে তুলতে যা কষ্ট স্বীকার করেছ তার জন্য আমি তোমার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ রইলাম।"

'ওসব নিয়ে ভাববেন না। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন এটাই আমি চাই।' লোকটি একটু দম নিল। তারপর আস্তে-আস্তে বলতে লাগল, 'আমি তোমাকে রাজা হুনাকমিনের গোপন ধনভাণ্ডারের হদিস দেব।'

'ঠিক বুঝলাম না।' আমি বললাম।

'বলছি সব, তা হলেই বুঝতে পারবে।' একটু দম নিয়ে লোকটি বলতে লাগল রাজা হুনাকমিনের আমলের কথা। 'আমার প্রপিতামহ রাজা হুনাকমিনের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মৃত্যুর আগে রাজা আমার প্রপিতামহকে একটা নকশা দিয়ে যান। আমাদের পারিবারিক গয়নাগাঁটি যে বাক্সটায় থাকত প্রপিতামহ সেই বাক্সে নকশাটা রেখে দিয়েছিলেন। আমার পূর্বপুরুষের হাতে হয়তো নকশাটা পড়েছিল কিন্তু তাঁরা এটার গুরুত্ব দেননি। ধরে নিয়েছিলেন এটা উদ্ভট কিছু।' লোকটি থামল।

'আপনার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। এখন কথা বলবেন না।' আমি বললাম।

'উপায় নেই, এখনই বলতে হবে। মৃত্যু আমার শিয়রে।' একটু থেমে দম নিয়ে লোকটি বলতে লাগল, 'একদিন মা ওই বাক্সটা খুলে কী গয়নাটয়না বোধহয় খুঁজছিলেন। তখন আমি ওখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখনই আমার নজরে পড়ল নকশাটা। বেশ কৌতূহল হল। কী ওটা? আমি মাকে বলে নকশাটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলাম। আশ্চর্য! চিচেন ইতজার একপাশের ছবি। আমি মা'র কাছে নকশাটা চাইলাম।'

''তুই এটা নিয়ে কী করবি? মা বললেন।''

''আমার কাছে রেখে দেব। আমি বললাম।''

''কেন? মা বললেন।''

''জিনিসটা কী পড়ে দেখব। আমি বললাম।''

''এর আগেও তোর বাবা ঠাকুর্দারা এই নকশাটা দেখেছিলেন। তাঁরা কিছুই বুঝতে না পেরে রেখে দিয়েছিলেন। এখন তুই কি বুঝবি ওসব?'' মা বললেন।

''দেখি না চেষ্টা করে।'' আমি বললাম।

''তা হলে নে তোর কাছে রাখ।'' মা বললেন। লোকটি থামল। বেশ হাঁফাচ্ছে তখন। 'তারপর থেকে নকশাটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আমি বুঝেছিলাম এই নকশাটা কোনও গুপ্তধনের নকশা। সেই গুপ্তধন রাখা আছে চিচেন ইতজায়। এটাও বুঝলাম এই গুপ্তধন রাজা হুনাকমিনের।

''তারপর?'' ফ্রান্সিস বলল।

''আমি নকশাটা মিলিয়ে-মিলিয়ে চিচেন ইতজা মন্দিরের মধ্যে নানাভাবে খুঁজতে লাগলাম।'' বয়স্ক লোকটি বলল।

''বুঝতে পারলেন কিছু?'' আমি বললাম।

''হ্যাঁ এটুকু বুঝলাম। চিচেন ইতজার ডানদিনের অংশটা আঁকা হয়েছে এখানে। চিচেন ইতজার দুটো গর্ভগৃহই তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কোথাও নকশার মিল পেলাম না।''

"লোকটি থামল। লোকটি মুখ হাঁ করে জল খেতে চাইল। আমি ঘরের কোণার দিকে রাখা মাটির জালা থেকে কাঠের গ্লাসে জল এনে দিলাম। লোকটি জল খেল।

"তারপর?" আমি বললাম।

"একটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে কাজে নামলাম। কিন্তু যুবকটি আমার সঙ্গে প্রতারণা করল। আমাকে ফেলে দিল। তাই আমার এই দশা। আমি তবু জলের কাছে পড়লাম। সেই যুবকটি ছিটকে পড়ল একেবারে পাথুরে চত্বরে। সঙ্গে-সঙ্গে মারা গেল।" একটু থেমে বলল, "আমি প্রায় হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে এখানে এলাম।"

"নকশাটা কোথায়?" আমি জানতে চাইলাম।

"লোকটি কোনও কথা না বলে কোমরের ফেট্টির দিকে হাত বাড়াল। ফেট্টিটা খুলতে চাইল।

"কিন্তু দুর্বল আঙুলে পারল না খুলতে। আমিই ফেট্টি থেকে টেনে টেনে নকশাটা বের করলাম। লোকটি ক্লান্তস্বরে বলল, "তোমাকেই দিলাম। দ্যাখো চেষ্টা করে যদি রাজা হুনাকমিনের গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারো।" একটু থেমে বয়স্ক লোকটি বলতে লাগল, "নকশাটা আমি আমার ফেট্টি জড়িয়ে রাখলাম। 'এতক্ষণে আমি দেখলাম সাইল আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ও সব দেখেছে, শুনেছে। গুপ্তধনের লোভে ও এখন আমাকে খুন পর্যন্ত করতে পারে। আমি সাবধান হলাম। সাইলকে কখনও দৃষ্টির বাইরে যেতে দিলাম না।'

"বাইরে সূর্য উঠল। পাখপাখালির ডাক শোনা গেল। ভোর হয়েছে। লোকটি কাঁপা-কাঁপা হাতে আমার হাত দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। তারপর মাথাটা এপাশ-ওপাশ করতে-করতে মারা গেল। আমি কেঁদে ফেললাম।"

আলফান্সো থামল। সকলেই চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস বলল, "আলফান্সো, তোমার নকশাটা একটু দেখতে পারি?"

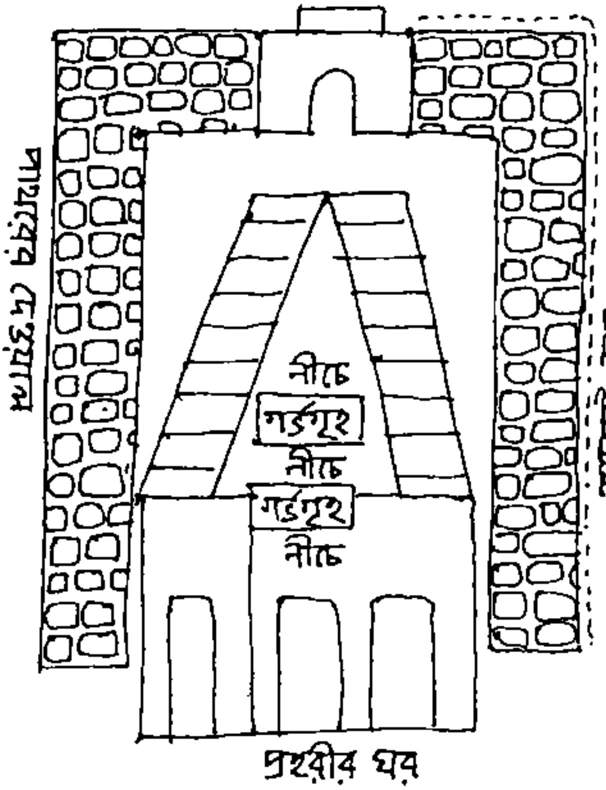
"তা দেখাচ্ছি। তবে তোমরা তিনজন। জোর করে আমার নকশাটা নিয়ে নিতে পারো।"

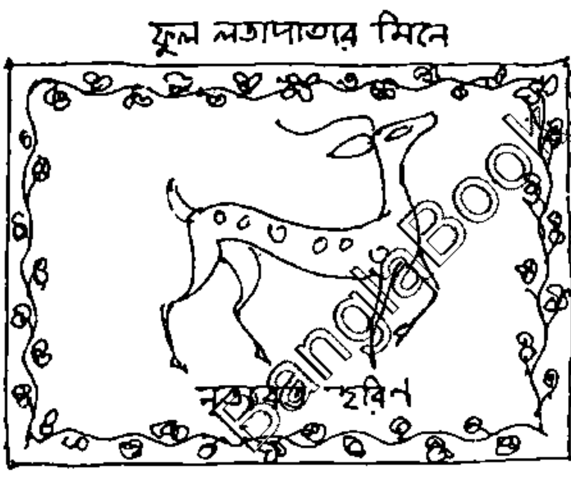
ফ্রান্সিস বলল, "আমাদের কি এতটা খারাপ লোক বলে মনে হয়?"

"না, না।" আলফান্সো বলল, "আমার কোমরের ফেট্টিতে সেলাই করে রেখেছি। সাবধানে খুলতে হবে।"

শাঙ্কো ওর ছোরাটা বের করল। আলফান্সো চমকে উঠল। ফ্রান্সিস হেসে বলল, "আমাদের এখনও বিশ্বাস করতে পারছ না?"

আলফান্সো আর কিছু বলল না। শাঙ্কো আলফান্সোর কোমরের ফেট্টিটা একটু আলগা করল। দেখল নকশাটা কাপড়ের সঙ্গে সেলাই করা। ও ছোরার মুখ দিয়ে সেলাই করা সুতোটা আস্তে-আস্তে কাটতে লাগল। শাঙ্কো সন্তর্পণে নকশাটা বের করল। ভাঁজ খুলে আস্তে আস্তে মেঝেয় মেলে ধরল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি এগিয়ে এল। নকশাটা দেখল। নকশাটা এরকম—


পাহাড়ের দেওয়াল
নীচে
গর্ভগৃহ
নীচে
গর্ভগৃহ
নীচে
প্রহরীর ঘর


ফুল লতাপাতার মিনে
হরিণ

ফ্রান্সিস আর হ্যারি বেশ কিছুক্ষণ ধরে নকশাটা দেখল। তারপর ফ্রান্সিস বলল, "আচ্ছা আলফান্সো, তুমি তো চিচেন ইতজার দুটো গর্ভগৃহ দেখেছ?"

"হ্যাঁ, একটাতে রয়েছে নয়টি দেবমূর্তি। অন্যটায় রাজা হুনাকমিনের কাঠের কফিনের মতো।"

"তা হলে আরও একবার আমরা দেখব। কোন সূত্র পাই কি না দেখি।" ফ্রান্সিস বলল।

"বেশ।" আলফান্সো বলল।

"সেই লোকটি তোমাকে বলেছিল যে আমরা উঠছিলাম। উঠছিলাম মানে কোথায় উঠছিল?" ফ্রান্সিস বলল।

"হয়তো সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিল।" আলফান্সো বলল।

"সিঁড়ি দিয়ে উঠে মাথার দুটো ঘরে যাওয়া যায় না। নকশাটা দ্যাখো"

আলফান্সো নকশাটা ভাল করে দেখল। ঠিক। সিঁড়িটা অনেকটা উঠে নেমে গেছে গর্ভগৃহের দিকে। সিঁড়ির মাথা থেকে ঘর দুটো বেশ দূরে।

"তা হলে ওরা সিঁড়ি কোথায় পেল?" আলফান্সো বলল।

"হুঁ, ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।" হ্যারি বলল।

"যাকগে, আগে চিচেন ইতজা মন্দিরটা দেখি।" ফ্রান্সিস বলল।

"তা হলে ওই দুটো ছোট ঘরেই কি গুপ্তধন রাখা হয়েছে?" আলফান্সো বলল।

"এখনই সেটা বলা যাচ্ছে না। গিয়ে আগে ভাল করে সব দেখি।" ফ্রান্সিস বলল।

"তা হলে কি কালকেই চিচেন ইতজা যাবে?" হ্যারি বলল।

"হ্যাঁ আর দেরি করা চলবে না। বন্ধুরা আমাদের জন্য চিন্তায় পড়বে।" ফ্রান্সিস বলল।

আলফান্সো বুড়িমাকে বলল, "ওরা সকাল-সকাল চিচেন ইতজায় যাবে।"

বুড়িমা সকালের মধ্যেই রুটি সবজির ঝোল বেঁধে দিলেন। এদিকে আলফান্সোকে বুড়িমা কিছুতেই যেতে দেবে না। বুড়িমা কোন কথাই শুনবেন না। ফ্রান্সিস অনেক কথাটথা বলে চেষ্টা করল বুড়িমাকে শান্ত করতে। কিন্তু বুড়িমা নাছোড়বান্দা। সেই থেকে আলফান্সোর হাত ধরে রইলেন। এইবার হ্যারি এগিয়ে এল। বলল, "বুড়িমা, আলফান্সো আমাদের সঙ্গে না গেলে একটা খুব দরকারি কাজ হবে না। আপনি ওকে আটকালে ওর খুব ক্ষতি হবে।" বুড়িমা একটু শান্ত হলেন। আলফান্সোর হাত ছেড়ে দিলেন। হ্যারি বলল, "আপনি কিছু ভাববেন না। দিন চারেকের মধ্যেই আলফান্সোকে নিয়ে আপনার কাছে আসবো।" বুড়িমা আর কোন কথা বললেন না। আলফান্সো তলতেক ভাষায় অনুবাদ করে বুড়িমাকে বুঝিয়ে বলল। বুড়িমা আর কিছু বললেন না। তবে বারবার চোখ মুছতে লাগলেন।

রওনা হতে একটু বেলাই হল। ফ্রান্সিস বলল, ‘‘আলফান্‌সো একটা শস্যটানা গাড়ি পাওয়া যাবে?’’

‘‘খোঁজ করতে হবে।’’ আলফান্‌সো কয়েকটা বাড়ির দিকে গেল। এক কৃষকের বাড়ির বাইরে একটা ঘোড়ায় টানা শস্যটানার গাড়ি পেল। কৃষকের সঙ্গে কথাটথা বলে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল, ‘‘আমি তাকে অর্থ দিয়ে এসেছি। লোকটি একজন গাড়োয়ান দেবে বলেছে।’’ কিছু পরে একটা শস্যটানা গাড়ি চালিয়ে এক রোগাটে চেহারার গাড়োয়ান এল। ফ্রান্সিস বলল, ‘‘রোগাপটকা গাড়োয়ান কি চিচেন ইতজা পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবে?’’

‘‘যাক্‌গে, যা পাওয়া গেছে।’’ ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা গাড়িতে উঠল। গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়িটায় কিছু গমগাছের শুকনো পাতা ছড়ানো ছিল। ফ্রান্সিসরা তার ওপরই বসল।

গাড়ি চলল। একটা ঘোড়া আর কত জোরে গাড়ি টানবে? তাই টিকির-টিকির করে গাড়ি চলল।

দুপুর নাগাদ একটা বর্ধিষ্ণু গ্রামে এসে ওরা পৌঁছল। খিদেয় জলতেষ্টায় বেশ কাতর ফ্রান্সিসরা তখন। গাড়ি থেকে নেমে গ্রামের মধ্যে ঢুকল ওরা। এক বর্ধিষ্ণু কৃষকের বাড়ি পেল ওরা। ফ্রান্সিসদের কথা তো এখানে কেউ বুঝবে না। তাই আলফান্‌সো এগিয়ে গেল কৃষকের দিকে। ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে কী যেন বলল। কৃষকটি হেসে ফ্রান্সিসদের হাতছানি দিয়ে ডাকল। বাড়ির বাইরের ঘরটায় কৃষকের পিছু-পিছু ওরা ঢুকল। চুন-বালি মিশিয়ে কাঠের কাঠামোয় বাড়িটা তৈরি হয়েছে। ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকল। কাঠের পাটাতন পেতে চৌকি মতো করা। তাতেই বসল ওরা। কৃষকের একজন কাজের লোক দরজায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল, ‘‘আলফান্‌সো লোকটিকে খাবার জল আনতে বলো।’’

একটু পরেই একটা বড় চিনেমাটির পাত্রে জল আনল লোকটি। ফ্রান্সিসরা চিনেমাটির বড় গ্লাসে জল খেল। এতক্ষণে তৃষ্ণা মিটল। কৃষক এসে আলফান্‌সোর সঙ্গে কী সব কথাবার্তা বলতে লাগল।

কিছু পরে সেই কাজের লোকটি এসে কৃষককে কী বলল। কৃষক আলফান্‌সোকে কী বলল। আলফান্‌সো ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘‘আপনারা ভেতর বাড়িতে খাবেন, না এই ঘরে খাবেন?’’

‘‘এখানেই খাব। আর বলো যে, খাবারটা তাড়াতাড়ি দেওয়া হোক।’’ কৃষক আলফান্‌সোর কাছে ফ্রান্সিসদের কথা বুঝে নিয়ে হেসে কী বলল। আলফান্‌সো বলল, ‘‘তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা হচ্ছে।’’

কিছু পরে ফ্রান্সিসদের চিনেমাটির থালায় খেতে দেওয়া হল। কাটা রুটি, নানা আনাজ দিয়ে তৈরি তরকারি আর মাংস। খিদের জ্বালায় ফ্রান্সিসরা হাপুস-হুপুস খেতে লাগল।

খাওয়াদাওয়া শেষ হল। এবার চিচেন ইতজা যাওয়া। সবাই ঘোড়ায়-টানা গাড়িটায় উঠল। গাড়োয়ান গাড়ি ছাড়ল। মাটির ওপর ছোট ছোট পাথর ফেলে

রাস্তা তৈরি হয়েছে। ঝাঁকুনিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। একসময় হ্যারি বলল, "এর চেয়ে হেঁটে গেলে ভাল হত।" প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে গাড়ি চলল।

সন্ধ্যা নাগাদ ওরা চিচেন ইতজা পৌঁছল। চিচেন ইতজা বেশ বড় নগর। রাস্তায় মানুষের ভিড়। দোকানপাটে কাচে ঢাকা আলো জ্বলছে। নগরটা বেশ সরগরম।

গাড়ি থেকে নেমে কেউ আর হাঁটতে পারছে না তখন। ঘাড়ে, কোমরে, পায়ে আড়ষ্ট ভাব। ফ্রান্সিস বলল, "আলফান্সো তোমার জানা শোনা কোনও সরাইখানা আছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন নিয়ে যাচ্ছি।" আলফান্সো বলল।

বড় রাস্তাটা ধরে চলল ওরা। কিছু দূর যেতে ডানদিকে সরাইখানাটা পাওয়া গেল। সরাইখানায় বেশ ভিড়। মালিক সামনে একটা কাঠের বাক্স রেখে বসে আছেন। আলফান্সো গিয়ে মালিকের সামনে দাঁড়াল। মালিক হেসে কী বলে উঠলেন। আলফান্সোও হাসল। দু'জনে কিছুক্ষণ হেসে হেসে নানা কথা বলল। ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না। এবার আলফান্সো ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে কী বলল। মালিক কী বললেন। মাথা নাড়লেন। আলফান্সো ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল, "মালিক বলছে কালকে রাতে এখানে নাকি নাচ-গানের আসর বসবে। দূর দূর জায়গা থেকে মানুষজন এসেছে। সব সরাইখানা ভর্তি। তবে এই মালিকের ভাইয়ের একটা ছোট সরাইখানা আছে। ওটা একটু দূরে। ওখানে জায়গা পাওয়া যাবে।"

"তা হলে ওখানেই চলো।" ফ্রান্সিস বলল।

ওরা আলফান্সোর নির্দেশমতো চলল। রাস্তায় বেশ ভিড়। সেই ভিড় ছাড়িয়ে একটা ছোট গলিতে ঢুকল ওরা। কিছুটা যেতেই পেল সেই সরাইখানাটা। ফ্রান্সিস বলল, "আলফান্সো, ওই মালিকের ভাইকে জিজ্ঞেস করো তো কিসের উৎসব কালকে?"

আলফান্সো সরাইখানায় কাঠের আসনে বসা ভাইকে দেখল। আলফান্সো মালিকের ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলল। ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল "ভাই বলছে— চারজনের জায়গা হবে। কালকে পূর্ণিমা। বছরের এই দিনে এখানে নগরের একটু বাইরে কোপান নামের মাঠে এই উৎসব হয়। নাচ, গান, খানা চলে গভীর রাত পর্যন্ত।"

"ভালই হল। কালকের রাতটা আমরা কাজে লাগাতে পারব।" ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল।

"তা হলে কাল রাতেই গুপ্তধনের জন্য চেষ্টা করবে?" হ্যারি বলল।

"হ্যাঁ।" ফ্রান্সিস বলল।

"ঠিক বুঝলাম না।" হ্যারি বলল।

"শোনো, সেই আহত লোকটি বলেছিল, সিঁড়ি থেকে ও আর তার সঙ্গী এক যুবক ছিটকে পড়ছিল। কালকে চিচেন ইতজায় যেতে হবে। সারাদিন

ওখানেই থাকব। সব ভাল করে দেখতে হবে। একটা সূত্র নিশ্চয়ই পাব। সেটা ভেবে নিয়ে কাজে নামতে হবে।" ফ্রান্সিস বলল।

"গুপ্তধন আবিষ্কারের আগে রাজার সঙ্গে কথা বলে তাঁর অনুমতি নেবে না?" হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল, "হ্যারি, এই প্রথম আমি অন্যরকম ভাবছি। গুপ্তধনের হদিস খুঁজতে তো কয়েকদিন যাবে। তার মধ্যে উদ্ধার করা গুপ্তধন রাজাকে না দিয়ে কাকে দেওয়া যায় সেটা ভেবে দেখব।"

"এ তো চুরি হয়ে গেল ফ্রান্সিস।" হ্যারি বলল।

"না। যার খুবই প্রয়োজন তাকে দেব। তা হলে তো চুরির দায় নিতে হবে না।"

"দেখো ভেবে কী করবে।" হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস বলল, "হ্যারি শাঙ্কো চলো চিচেন ইতজা মন্দিরটা দেখে আসি।"

"এই অন্ধকারে?" শাঙ্কো বলল।

"আরে বাবা—প্রাথমিক ভাবে তো কিছু দেখা যাবে। কালকে সকালে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাব।" ফ্রান্সিস বলল।

"—বেশ চলো।" শাঙ্কো বলল।

আলফান্‌সো মালিককে গিয়ে বলে এল, "আমরা একটু শহর দেখতে বেরোচ্ছি। ফিরতে একটু দেরি হতে পারে। খাবার রাখবেন।"

চারজনে সরাইখানা থেকে বেরোল। বাইরে এসে দেখল, ভিড় অনেকটা কমেছে। চারজন চলল চিচেন ইতজা মন্দিরের দিকে। যেতে যেতে আলফান্‌সো বলল, "পূর্ণিমা রাতের উৎসবে যোগ দিতে দূরের নগর গ্রাম থেকে অনেক লোক এখানে আসে। সেইজন্যই এত ভিড়।"

চারজনে ইতজা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল। পূর্ণিমার আগের রাত। কাজেই উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় চারদিক মোটামুটি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। উঁচু মন্দিরটায় জ্যোৎস্না পড়েছে। চূড়ো, সিঁড়ি, ঘরটা দেখা যাচ্ছে। ঢোকার মুখে দুটো পাশাপাশি ঘর। ঘর দুটোর সামনে দাঁড়িয়ে লোহার ফলা লাগানো বর্শা হাতে দু'জন প্রহরী। ফ্রান্সিস বলল, "আল্‌ফানসো, আমার সঙ্গে এসো।" আলফান্‌সো এগিয়ে এল। আলফান্‌সো মারফৎ ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল, "এটাই কি চিচেন ইতজার মন্দির?"

"হ্যাঁ। দেখেই তো বোঝা উচিত। এতবড় মন্দির এখানে কোথাও নেই।" প্রহরী বলল।

"ও। তা আমরা একটু ঘুরে দেখতে পারি?" ফ্রান্সিস বলল।

"না। রাতে কারও ঢোকার হুকুম নেই।" প্রহরী বলল।

"একটু দেখেই চলে আসতাম।" ফ্রান্সিস বলল।

"না।" প্রহরীর মুখে দাড়িগোঁফ। গোঁফ মুচড়ে বলল, "কাল সকালে এসো।"

"বেশ তাই আসব। তবে একটা কথা বলি, লোকে বলে এই মন্দিরে নাকি রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন আছে।"

"লোকে তো কত কথাই বলে।" প্রহরী বলল।

"আগে কি সেই গুপ্তধন খোঁজা হয়নি।" ফ্রান্সিস বলল।

"হয়েছে। আগের দু'জন রাজার মন্ত্রী আর সেনাপতি রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন খুঁজেছিলেন।"

"পায়নি।" ফ্রান্সিস বলল।

"না, না।" প্রহরী মাথা এপাশ ওপাশ করে বলল।

"তাঁরা কোথায় খুঁজেছিলেন?"

"এই মন্দিরেই খুঁজেছিলেন। এতসব জানতে চাইছেন কেন?" প্রহরী বলল।

"আমরা বিদেশী।" ফ্রান্সিস বলল।

"সে তো চেহারা আর পোশাকই বলছে।" প্রহরী বলল।

"দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই আমরা। এমনই সব গুপ্তধন-টুপ্তধনের কথা শুনলে খুঁজিটুঁজি।" ফ্রান্সিস বলল।

"তা হলে তো রাজার অনুমতি নিতে হবে।" প্রহরী বলল।

"সেসব আমরা করব।" ফ্রান্সিস বলল।

"রাজার অনুমতি নিয়ে এসো। যদি অনুমতি পাও তখন জানতে পারবে আগে কারা কীভাবে গুপ্তধন খুঁজেছিলেন।" প্রহরী বলল।

"তা তো বটেই। আচ্ছা ভাই, তোমাদের অনেক ধন্যবাদ।" ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় ফিরে এল। ফ্রান্সিস শুকনো ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। হ্যারি, শাঙ্কো আর আলফান্সো বসল। হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস, আমরা বিদেশী, গুপ্তধন খুঁজে বের করি—এসব ওই প্রহরীদের বলা ঠিক হয়নি।"

ফ্রান্সিস বলল, "হ্যারি, আমি প্রথম থেকেই ভেবে রেখেছি যে, রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন খুঁজে পেলে এখানকার রাজাকে জানাব না। সেই গুপ্তধন আমরা কিছু নেব। বাকিটা কী করব, এখনও ভেবে ঠিক করতে পারিনি। কাজেই প্রহরীরা আমাদের সম্বন্ধে কী ভাবল না ভাবল এ ব্যাপারে আমি বেপরোয়া। কারণ ওই প্রহরীদেরই বন্দি করে আমরা গুপ্তধন খুঁজব। কাজেই ভুল আমি করিনি। বরং একটা কাজের কথা আমরা জানলাম ইতিপূর্বে অতীতের এক রাজা ও এক মন্ত্রী গুপ্তধন খুঁজেছিলেন। তাঁরাও ভেবেছিলেন গুপ্তধন এই মন্দিরেই আছে। কীভাবে তাঁরা গুপ্তধন খুঁজেছিলেন এটা জানা গেল না। তবু কয়েকবার খোঁজা হয়েছে। তার মানে গুপ্তধন সহজে পাওয়া যাবে না। নানাভাবে চেষ্টা করতে হবে। প্রহরীদের সঙ্গে কথা বলে এইটুকু লাভ হল আমাদের।"

"তা হলে এবার গুপ্তধন পেলে তা চুরি করবে?" হ্যারি বলল।

"হ্যাঁ। মণিমাণিক্য সোনাদানা যা পাব সব বিক্রি করব। আর একটু আগেই তো বললাম সেই অর্থ আমরা কীভাবে ভাগ করব।"

"অর্ধেক গুপ্তধন নিয়ে কী করবে তুমি?"

"আমাদের আর্থিক সমস্যা মেটাবো। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে আমাদের রাজাকে দেব।"

"ঠিক আছে।" হ্যারি বলল। আড়মোড়া ভেঙে শাঙ্কো বলল, "ফ্রান্সিস, ভীষণ খিদে পেয়েছে। ঘুমও পেয়েছে। চলো খাওয়াটা সেরে আসি।"

"বেশ চলো।" ফ্রান্সিস বলল।

পাশের ঘরটা খাবার ঘর। ফ্রান্সিসরা এসে দেখল সরাইখানায় যারা আশ্রয় নিয়েচে তারা অনেকেই খেতে বসেছে। ফ্রান্সিসরা একপাশে বসল। সরাইখানার লোকে ফ্রান্সিসদের সামনে বেশ বড় গোল শুকনো পাতা রেখে গেল। এবার খাবার দেওয়া হতে লাগল। ফ্রান্সিসরা খিদের জ্বালায় গোগ্রাসে খেতে লাগল।

খাওয়াদাওয়া সেরে ফ্রান্সিসরা নিজেদের জায়গায় এল। হ্যারি, শাঙ্কো শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বসে রইল। আলফান্‌সোকে বলল, "আলফান্‌সো, ঘুমিয়ে পড়ো না তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

আলফান্‌সো কিছু বুঝল না। উঠে বসে রইল।

একটু পরে ফ্রান্সিস ডাকল, "আলফান্‌সো।"

—"বলুন।" আলফান্‌সো বলল।

—"আমি তোমার সম্বন্ধে সব কথা জানতে চাই। আমাকে মিথ্যে বলবে না। যা সত্য তাই বলবে।" ফ্রান্সিস বলল।

—"বেশ, কিন্তু কী ব্যাপারে—মানে—" বলতে গিয়ে আলফান্‌সো থেমে গেল।

—"বলছি।" ফ্রান্সিস বলল। তারপর একটু থেমে বলল, "তোমার দেশের বাড়ির অবস্থা কেমন?"

—"অবস্থা বলতে কী বোঝাচ্ছেন?" আলফান্‌সো বলল।

—"আর্থিক অবস্থা। তুমি সব ছেড়েছুড়ে জাহাজে চাকরী নিলে কেন?" ফ্রান্সিস বলল।

—"সে অনেক কথা ফ্রান্সিস।" আলফান্‌সো বলল।

—"শুনুন তাহলে", আলফান্‌সো আস্তে আস্তে বলতে লাগল, "খুব দরিদ্রের ঘরে আমার জন্ম। ছেলেবেলায় মাকে হারিয়ে ছিলাম। আমার কোনও ভাইবোন ছিল না। আমি আর বাবা থাকতাম লিসবন বন্দরের কাছে ঘুপচি ঘরে। বাবা সেই ভোরে উঠে দু'জনের রান্না করত। নিজের ভাগের খাবার খেয়ে চলে যেত আর আমি সারা সকাল সারা দুপুর রাস্তায়, ডকে খেলে বেড়াতাম।" আলফান্‌সো থামল। তারপর বলতে লাগল, "বাবা কাজ করতেন বন্দর এলাকায়। মালপত্র ওঠানো নামানোর কাজ। বড় পরিশ্রমের কাজ। সন্ধ্যের মুখে কাজ থেকে ফিরে এলে বাবার ক্লান্ত মুখখানা দেখতাম। বাবা তখন মড়ার মত শতচ্ছিন্ন বিছানায় শুয়ে থাকত। রাতে আর রান্না হত না। দোকান থেকে একটা বড় রুটি আর ঝোল কিনে আনতাম। তাই খেয়ে রাত কাটত।" আলফান্‌সো একটু চুপ করে থেকে বলল—"এমনিতে আমি দুঃখটুঃখ

বড় একটা গায়ে মাখতাম না। কিন্তু সমবয়সী ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে দেখলে আমার ভীষণ মনখারাপ হয়ে যেত। ধরে নিতাম পড়াশুনা আমার কপালে নেই।'' আলফান্সো চুপ করে রইল। তারপর বলতে লাগল, ''একদিন বাবা কাজ থেকে ফিরে বললেন,

—''কালকে তোকে স্কুলে ভর্তি করে দেব। কী? পড়াশুনা করবি তো?''

আমি বললাম, ''বাবা প্রতি মাসে স্কুলের মাইনে দিতে গেলে তো আমাদের একবেলা উপোস করে থাকতে হবে।''

—''না রে। জাহাজের এক মালিক আমার কাজকর্ম দেখে খুশি হয়ে বেশ কিছু অর্থ আমাকে দিয়েছে। অন্তত বছর কয়েক তোর পড়াশুনা চালাতে পারব। আমি একটু বিশ্রাম করে নিই। তারপর তোকে পণ্ডিত কস্টিল্লোর কাছে নিয়ে যাব।'' আলফান্সো থামল। তারপর বলতে লাগল, ''সন্ধ্যের একটু পরে বাবা আমাকে নিয়ে কস্টেল্লোর কাছে গেলেন। কস্টেল্লো বললেন, ''তোমার ছেলেকে ভর্তি করে নেব। কিন্তু ও তো রাস্তায় রাস্তায় খেলে বেড়ায়, পড়াশোনা করবে কখন?'' বাবা আমার দিকে তাকালে। বাবা কিছু বলার আগে আমি বললাম, ''স্কুলে ভর্তি হলে আমি আর এভাবে ঘুরে বেড়াব না। সব ছাত্রের মতো আমিও পড়াশোনা করব।'' একটু থেমে আলফান্সো বলতে লাগল, ''স্কুলে ভর্তি হলাম। খুব মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করলাম। মাস কয়েক পর ক্লাসের পরীক্ষার ফল বেরোল। আমি সেই পরীক্ষায় প্রথম হলাম। বাবা তো আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরে রইলেন। পড়াশোনায় আমার উন্নতি দেখে পণ্ডিত কস্টেল্লো আমাকে ছেলের মতো ভালোবাসতেন। বছরচারেক পড়তে পেরেছিলাম, হঠাৎ একদিন বাবা মারা গেলেন। আর পড়াশোনা হল না। দু'বেলা খাবারই জোটে না—এই অবস্থা।''

একটু চুপ করে থেকে আলফান্সো বলতে লাগল, ''একদিন সকালে আমার জামাটামা বইটই সব পোঁটলা বেঁধে জাহাজঘাটায় এলাম। এ জাহাজে সে জাহাজে কাজ খুঁজতে খুঁজতে একটা জাহাজ পেলাম। সেখানে জাহাজ ধোয়ামোছা রান্নাঘরে কাজে সহায়তা করা এসব কাজের চাকরি পেলাম। সেই জাহাজ দেশ বিদেশের মালপত্র আমদানি রফতানির কাজ করে। কত দেশে ঘুরলাম। তারপরের কথা তো বলেছি।''

ফ্রান্সিস বলল, ''আলফান্সো, যেসব পড়ার বই নিয়ে বেরিয়েছিলে সে সব বই আর আছে?''

—''হ্যাঁ, বুক দিয়ে আগলে রেখেছি সেসব বই। জাহাজ যখন দেশে ফিরে আসতো তখন আরও বই কিনতাম। সব আছে।'' আলফান্সো বলল।

—''কিন্তু সেসব বই রেখে কী হবে?'' ফ্রান্সিস বলল।

—''যদি কখনও সুযোগ পাই, কিছু বেশি অর্থ জমাতে পারি তো দেশে ফিরে একটা স্কুল খুলব বন্দর এলাকায়। স্থানীয় দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করব।'' আলফান্সো বলল।

—"পারবে স্কুল চালাতে?" হ্যারি বলল।

—"নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু অর্থাভাব বেশি হলে হাল ছেড়ে দিতে হবে। আমার সেই ভয়। আমি তো ভিখিরি।" আলফান্সো বলল।

—"তুমি সব পাবে, অর্থ সাহায্য ভবিষ্যতের জন্যে অর্থ ও নিরাপত্তা মানে কেউ তোমাকে বাধা দেবে না—তুমি নিশ্চিন্তে তোমার খুশিমতো তোমার কাজ করে যাবে।" ফ্রান্সিস বলল।

—"তাহলে তো আমি—মানে—আমি আমার সমস্ত জীবন শিক্ষাদানে ব্যয় করব।" আলফান্সো বলল।

—"ঠিক আছে। তুমি প্রয়োজনে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য পাবে। কিন্তু তোমাকে স্কুল করতে হবে তোমার দেশে নয়, এখানে।" ফ্রান্সিস বলল।

—"এখানে!" আলফান্সো অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস বলল, "হ্যাঁ এখানে তুমি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তোমার মাতৃভাষা স্পেনীয় ভাষা শেখাবে। তলতেক ভাষা তুমি ভালই শিখেছ। সেই ভাষার লিখিত রূপ দেবে। সেই ভাষায় বই লিখবে—কী? পারবে তো?"

আলফান্সো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মাথা নিচু। তারপর মাথা তুলল। ফ্রান্সিস দেখল আলফান্সোর চোখে জল। আলফান্সো কান্নাভেজা গলায় বলল, "ছেলেবেলা থেকেই আমার স্বপ্ন আমি শিক্ষকতা করব। ভাবিনি কোনওদিন সেই স্বপ্ন সার্থক হবে।"

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। বলল, "আলফান্সো ঘুমোও। রাত হয়েছে।"

আলফান্সো শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম আসছে না। ফ্রান্সিসের সাহায্য পেলে ও সবকিছু করতে পারবে। কিন্তু ফ্রান্সিস কী সাহায্য করবে তা বলেনি। একটু বেশি রাতে আলফান্সো ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন একটু সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া সারল ফ্রান্সিসরা। তারপর চলল চিচেন ইত্জার মন্দিরে। মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। প্রহরী দু'জন বর্শা হাতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকজন ঢুকছে বেরোচ্ছে অবাধে। প্রহরী দু'জন কাউকে বাধা দিচ্ছে না।

ফ্রান্সিসরাও ঢুকল। সামনেই সিঁড়ি বেয়ে উঠল ওরা। সিঁড়ি অনেকটা উঠে নীচে নেমে গেছে। ফ্রান্সিস সেখানে এসে আলফান্সোকে বলল—"তুমি তো নীচের গর্ভগৃহ, নয় রাত্রির দেবতার মূর্তি, রাজা হুনাকমিনের কফিন সবই দেখেছ।"

—"হ্যাঁ, সে সব আমি আপনাদের বলেছি।" আলফান্সো বলল।

—"কিন্তু সেসব জায়গায় কোথাও রাজা হুনাকমিনের গুপ্ত ধনসম্পদ গুপ্তভাবে রাখা আছে এমন কিছু লক্ষ্য করো নি?" ফ্রান্সিস বলল।

—"ন্নাঃ! দ্যাখো এত লোকজন প্রতিদিন ওইসব গর্ভগৃহে যাচ্ছে কারও না কারও নজরে নিশ্চয়ই কিছু পড়তো।" আলফান্সো বলল।

—"হুঁ।" ফ্রান্সিস সিঁড়িটা যেখানে বাঁক নিয়ে নীচে নেমে গেছে সেখানটায় দাঁড়াল। চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। মন্দিরের মাথায় রয়েছে দুটো কুঠুরি। একটা বড় তার ওপর আর একটা ছোট। এখান থেকে এই দুটো কুঠুরির দূরত্ব হবে ন'দশ হাত। কাজেই এখান থেকে ওই কুঠুরি দুটোয় যাওয়া অসম্ভব। কাজেই সেই প্রৌঢ় লোকটি তাদের দু'জনের সিঁড়ি থেকে ছিটকে পড়ার কথা বলেছিল সেই সিঁড়ি এই সিঁড়ি নয়। কিন্তু অন্য কোনও সিঁড়ি ফ্রান্সিসের চোখে পড়ল না। তারা কোন সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল? ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে লাগল। বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেও লাগল। তখনই দেখল মন্দিরের একপাশে চুনাপাথর বালি এসব দিয়ে গাঁথা একটা পাথরের দেওয়াল। দেওয়ালটা উঠে গেছে একবারে মন্দিরের মাথার কাছে। সেই দেওয়াল থেকে দুটো অংশ সোজা বেরিয়ে ওই দুটো কুঠুরির নীচে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওপাশেও একটা দেওয়াল উঠেছে। তারও একটা অংশে গিয়ে মিশেছে কুঠুরি দুটোর নীচে। ফ্রান্সিস বুঝল ওই দুটো বর্ধিত অংশ দুটো কুঠুরি দুটোর ভারসাম্য রক্ষা করছে? কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওই কুঠুরি দুটোয় যাওয়া। মিস্ত্রিরা কী করে অত উঁচুতে উঠে গিয়ে কুঠুরি দুটো তৈরি করেছিল? নিশ্চয়ই কুঠুরিতে যাওয়ার জন্য কোনও উপায় ছিল। ফ্রান্সিস ভাল করে দেখল। দু'পাশ থেকে দুটো পাথরের টানা দেওয়াল। তার ওপরই ওই দুটো কুঠুরি। তা হলে পাথরের দেওয়ালের মাথা থেকে ওই টানা পর্যন্ত উঠতে হবে। তারপর টানা ধরে যেতে হবে ওই কুঠুরিতে। রাজা হুনাকমিনের ধনসম্পদ কি ওখানেই গোপনে রাখা হয়েছে? কিন্তু ওখানে যাওয়ার কোনও উপায়ই তো নেই।"

ফ্রান্সিস বলল, "হ্যারি, আমি একটু চারদিক ঘুরে দেখছি। তোমরা এখানেই থাকো।"

শাঙ্কো বলল, "না ফ্রান্সিস তোমাকে একা ছাড়ব না। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

—"বেশ চলো।" ফ্রান্সিস বলল।

খাওয়ার পরে ফ্রান্সিসরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল। তারপর ফ্রান্সিস সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। মন্দিরটার চারদিক একবার ঘুরে এল। কিন্তু কোনও সিঁড়ি পেল না। অথচ সেই বয়স্ক লোকটি বলেছিল এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে সঙ্গী তাকে ধাক্কা মেরেছিল। ছিটকে পড়ে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে পড়ে যুবকটিও মারা যায়।

ফ্রান্সিস মন্দির থেকে কিছুটা দূরে সরে এল। শাঙ্কোও এল। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে নকশাটা বের করল। মন্দিরের সঙ্গে মেলাতে লাগল। দেখল সবই মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ওরা কীভাবে ওঠবার চেষ্টা করেছিল তার কোনও নির্দেশ নকশাটায় নেই। ফ্রান্সিস নকশা দেখিয়ে শাঙ্কোকে সেই কথা বলল। তারপর নকশাটা শাঙ্কোকে দিয়ে বলল, "দ্যাখো তো, ওপরের কুঠুরিদুটোতে যাওয়ার কোনও নির্দেশ নকশাটায় আছে কি না।"

"হ্যারি থাকলে ভাল হত। ও পারত। আমি অতশত বুঝি না। হ্যারিকে ডেকে আনছি।" শাঙ্কো চলে গেল। ফ্রান্সিস নকশাটা দেখতে লাগল। এখানে লোকজনের ভিড় কম।

হ্যারি এল। নকশাটা হাতে নিল। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ হ্যারি বলে উঠল, "ফ্রান্সিস, দ্যাখো তো এটা কিসের দাগ?"

"দাগ? দেখি তো।" ফ্রান্সিস নকশাটা হাতে নিল। হ্যারি ডান দিকের দেওয়ালের গা ঘেঁষে একটা খুব অস্পষ্ট রেখা দেওয়ালের গায়ে গায়ে ওপরের দিকে উঠে গিয়ে বাঁ দিকে বেঁকে কুঠুরি দুটোয় গিয়ে শেষ হয়েছে।"

হ্যারি বলল, "এই রেখাটার অর্থ বুঝতে পারলে?"

"না।" ফ্রান্সিস ভাবতে ভাবতে বলল।

"এটার অর্থ হল দেওয়াল ধরে ধরে ওপরে উঠতে হবে।"

ফ্রান্সিস বলে উঠল, "হ্যারি, এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। দেওয়ালের পাথর ভেঙে ভেঙে সিঁড়ির মতো করে আস্তে আস্তে উঠে যেতে হবে। শেষে বাঁদিকে গিয়ে ওই কুঠুরি দুটোয় ঢুকতে হবে। আমি নিশ্চিত ওই কুঠুরি দুটোতেই রয়েছে রাজা হুনাকমিনের গুপ্ত ধনভাণ্ডার। ওই বয়স্ক লোকটি এইভাবে বানানো সিঁড়ির কথাই বলেছিল।"

"এবার কী করবে?" শাঙ্কো বলল।

"চলো ডানদিকের দেওয়ালটা ভাল করে দেখা যাক।" ফ্রান্সিস বলল।

দু'জনে ডান দিকের দেওয়ালের কাছে এল। দেখল দেওয়ালের বেশ কিছু উঁচু পর্যন্ত জংলা গাছপালায় ঢাকা। ফ্রান্সিস গাছটাছ সরাল। দেখল—দেওয়ালের গোড়া থেকে বেশ কিছু উঁচু পর্যন্ত এক হাত অন্তর অন্তর ভাঙা খোঁদল। ওই খোঁদলগুলোয় পা রেখে রেখে অনায়াসে ওপরে ওঠা যায়। সিঁড়ির মতো। ওই বয়স্ক লোকটি এই সিঁড়ির কথাই বলেছিল।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল, "শাঙ্কো, সরাইখানার মালিকের কাছ থেকে হাতপাঁচেক শক্ত দড়ি নিয়ে এসো তো।" শাঙ্কো মালিকের কাছে গেল। বেশ লম্বা দড়ি নিয়ে এল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর ছোরাটা দিয়ে দড়িটা দু'টুকরো করল। রেখে দিল।

"কখন যাবে?" হ্যারি বলল।

"সন্ধের পরে। সারারাত সময় পাব। তবু কাজটা দ্রুত করতে হবে।" ফ্রান্সিস বলল।

"ফ্রান্সিস, আগে যেমন গুপ্তধন উদ্ধারের আগে সেই রাজ্যের রাজার সম্মতি নিতে, এবার কিন্তু তা করছ না।" শাঙ্কো বলল।

"উপায় নেই শাঙ্কো। এভাবে বলতে গেলে রাজা আমাদের কয়েদঘরে ঢোকাতে পারে। কাজেই এবার সেসব না করে লুকিয়ে গোপনে গুপ্তধন উদ্ধার করব।"

ফ্রান্সিসরা সকলে সরাইখানায় ফিরে আসছে তখনই দেখল ঘোড়ার গাড়িতে লোকজন শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পায়ে হেঁটেও চলে যাচ্ছে অনেকে। ফ্রান্সিসরা অবাক। একজন লোককে হ্যারি ধরল। বলল—ভাই আপনারা চলে যাচ্ছেন কেন? লোকটি বলল—রাজকুমারের অসুখ। রাজকুমার সম্পূর্ণ সুস্থ হলে তবেই পূর্ণিমা উৎসব হবে।

ফ্রান্সিস হ্যারিদের দিকে তাকিয়ে বলল, পূর্ণিমা উৎসব এখন বিশ বাঁও জলে। কবে রাজকুমার সম্পূর্ণ সুস্থ হবে কে জানে? ততদিন উৎসব বন্ধ।

ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় এল। সরাইখানার মালিক বলল—দেখুন কী কাণ্ড। রাজকুমারের অসুখ করেছে সব উৎসব বন্ধ। হ্যারি বলল—এই পূর্ণিমা উৎসব কতদিন হয়ে আসছে?

—অনেকদিন থেকে। দু'তিনদিন ধরে উৎসবের জায়গা সাজানো হয়। বেশ বড় মঞ্চও হয়। রাজকুমার রাজকুমারীকে নিয়ে রাজরাণী আসেন। সারারাত ধরে গানবাজনা নাচ চলে। দর্শক শ্রোতারা যেন পাগল হয়ে যায়। কী আনন্দ। কী উল্লাস। এখন সব গেল। কবে রাজকুমার সুস্থ হবে। কবে পূর্ণিমা উৎসব হবে সেসব ঝুলে গেল।

সরাইখানাগুলো ফাঁকা হয়ে গেল। কত লোক চলে গেল। এইসময় সরাইখানাগুলো। কত অর্থ লাভ করে। এখন কী হবে কে জানে।

ফ্রান্সিসরা ঘরে এসে টানা বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস পড়তে পড়তে মৃদুস্বরে বলল—'হ্যারি আজকের উৎসবের দিনটাতেই ভেবেছিলাম কাজে নামবো—সব পিছিয়ে গেল।

—দিনটা ভালোই বেছেছিলে। কিন্তু তুমি কি নকশাটার অর্থ বের করতে পেরেছো। হ্যারি বলল।

—প্রায়। এখন নকশার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা। তখনই বুঝবো আমি নকশার অর্থটা ঠিক বুঝেছি কি বুঝিনি। কাজটা শুরু করলেই বুঝবো আমি নকশার নির্দেশ বুঝলাম কি বুঝলাম না।

—তাহলে এখন তুমি কী করবে?

—এই সরাইখানাতেই থাকবো। যতদিন না রাজপুত্র সুস্থ হয় ততদিন।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসদের কথা শুনছিল। এবার বলল—আচ্ছা ফ্রান্সিস তুমি পূর্ণিমা উৎসবের রাতটাই বেছে নিতে চাইলে কেন?

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—নকশার নির্দেশ অনুযায়ী দেয়ালের পাথর ভাঙতে হবে। কিন্তু সব পাথর একই সময় ভাঙা হবে না। আস্তে আস্তে ভাঙতে হবে। নকশাটা তো এখন বের করা চলবে না। অন্য সময় তোমাকে নকশা থেকে বুঝিয়ে দিতাম মন্দিরের ওপর দিকের ঘর দুটোও দেখতে হবে। ঘর দুটো প্রায় ঝুলে আছে। কাজ শুরু করলেই মনে হয় ভেঙে পড়বে। কাজেই পাথরভাঙা ঘর ভেঙে পড়া এত শব্দ ধারেকাছের লোকজনের কানে যাবেই।

উৎসবের দিন বাড়িতে বড় কেউ থাকবে না। সবাই তখন নাচগানের উৎসবে। কাজেই তখন কারও কিছু কিছু ভাঙাটাঙার কাজ চালানো যাবে। তাই পূর্ণিমা উৎসবের রাতটাকেই বেছেছি। সবদিক থেকে সুবিধাজনক। এখন সমস্ত কাজই পিছিয়ে গেল।

—সাবাস ফ্রান্সিস। সমস্ত ব্যাপারটাই সহজে বুঝিয়ে দিলে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—শাঙ্কো আমার কথাটাতো জানো—শুধু কব্জির জোরে লড়াই হয় না বুদ্ধির জোরও লাগে।

ফ্রান্সিসরা ফিরে আসছে। রাস্তায় দেখল ঘোড়ায়টানা গাড়িতে বোঝাই হয়ে লোকজন নগর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দু'একজন কাঁদছেও। সত্যিই তো অনেক আশা করে এসেছিল—নাচগান দেখবে শুনবে সারারাত আনন্দ করবে ফুর্তি করবে। সব বন্ধ হয়ে গেল। এখন রাজপুত্রের সুস্থ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে থাকা। দূর দূর জায়গা থেকে লোকজন এসেছিল। আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে সবাই ফিরে যাচ্ছে নিজের ঘরবাড়িতে।

ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় দেওয়া ঘাসের বিছানায় আধশোয়া হয়ে কথা বলছিল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এখন তো বেশ কয়েকদিন বেকার হয়ে বসে থাকতে হবে। কিছুই করবার নেই। তারপর বলল—আচ্ছা ফ্রান্সিস রাজপুত্রের চিকিৎসার জন্যে আমরা তো আমাদের চিকিৎসক ভেনকে নিয়ে আসতে পারি। ফ্রান্সিস বলল—সম্ভাবনা নয়। এখন তুলামে গিয়ে জাহাজঘাটায় নোঙর করা আমাদের জাহাজে যেতে হবে। ভেনকে এতটা পথ নিয়ে আসতে হবে। ততদিনে হয়তো রাজপুত্রের অসুখ বেড়ে গেল। অবশ্য দুটো ঘোড়া পেলে আমি দু'একদিনের মধ্যেই ভেনকে নিয়ে আসতে পারি। কিন্তু ভুলে যেও না হ্যারি—আমরা বিদেশী। রাজা আমাদের বিশ্বাস করবে না। ভেনকে চিকিৎসা করতে দেবে না। কাজেই আমরা আগ বাড়িয়ে কিছু করবো না। আমাদের কোন সমস্যার সৃষ্টি করবো না। হ্যারি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—তুমি ঠিকই বলেছো। আসলে আমি চাইছিলাম রাজকুমারের সুচিকিৎসা হোক রাজকুমার দ্রুত সুস্থ হোক। ভেন সেটা পারবে।

শাঙ্কো বলল—রাজবৈদ্য নিশ্চয়ই আছে। তিনিই চিকিৎসা করুন। রাজা বিদেশী ভেনকে চিকিৎসা করতে অনুমতি দেবে না। কাজেই সে চেষ্টা না করাই ভালো।

ফ্রান্সিসরা এসব কথাবার্তা বলছে তখন সরাইখানার মালিক ঘরে ঢুকল। বলল—রান্না হয়ে গেছে। আপনারা খেতে বসুন। ফ্রান্সিস তড়াক করে উঠে বসল। বলল—হ্যারি ভীষণ খিদে। আর রাত করবো না। খেতে বসো। ফ্রান্সিসরা বসে পড়ল। মালিক আর দুটো মোম জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। পরিচারক এসে ফ্রান্সিসদের সামনে গোল গোল শুকনো পাতা পেতে দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল—কী খাওয়াবে ভাই?

—আজ মাংস হয়েছে।

—বেঁচে থাকুক সরাইওয়ালা। একটু তাড়াতাড়ি দাও। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসের কথা টথা শুনে হ্যারি হাসল। বলল—ফ্রান্সিস তুমি দিনকে দিন পেটুক হচ্ছো।

—ক'দিন আর বাঁচবো। ফ্রান্সিস গম্ভীরমুখে বলল। হ্যারি হো হো করে হেসে উঠল।

সবাইর খাওয়া হল। হাতমুখ ধুয়ে ফ্রান্সিসরা বিছানায় বসল। ওখানে মোটা কাপড় পাতা। ওটাই বিছানা। ওখানেই শোয়া ঘুমোনো।

ফ্রান্সিসরা নিজেদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা বলল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমোবার আগে হ্যারি বলল—বেশ কিছুদিন আমরা জাহাজ ছেড়ে এসেছি। রাজকুমারী আর বন্ধুদের কথা বড় বেশি মনে পড়ছে।

—ওসব নিয়ে ভেবো না। মন দুর্ব্বল হবে। এখন গুপ্ত ধনভাণ্ডার ছাড়া অন্য কিছু ভেবো না। ফ্রান্সিস বলল।

তখন সবে ভোর হয়েছে। হঠাৎ সরাইখানার দরজা ধাক্কা দেবার শব্দ শোনা গেল। ফ্রান্সিস হ্যারি উঠে বসল। আবার দরজায় ধাক্কা। এবার বেশি জোরে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ও মালিকমশাই দেখুন তো কী ব্যাপার। মালিক কাশতে কাশতে এল। আবার ধাক্কা। মালিক গলা চড়িয়ে বলল—যাচ্ছি।

মালিক দরজা খুলল। ঢুকল দুজন। মাইল আর ওর এক সঙ্গী রবার্ট মালিক ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বিড় বিড় করে বলল—এদের একজন রবার্ট। এখানকার কুখ্যাত গুণ্ডা। মানুষ মারতে ওর হাত কাঁপে না। সঙ্গে সাইল। আর এক চীজ। মালিক সরে গেল।

সাইল ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। আলফানসো দ্রুত উঠে দাঁড়াল। সাইল বলল—পালাবার চেষ্টা করবে না। আমার বন্ধু—রবার্ট—ছোরা চালাতে ওর মতো এই নগরে আর কেউ নেই। ভয়ে আলফানসোর মুখ শুকিয়ে গেল। ও বলল—তোমরা এসেছো কেন?

সাইল বলল)নকশাটা নিতে এসেছি।

—আমি তো বলেছি সেই সরাইখানার মালিকের কাছে আমি রেখে দিয়েছিলাম। আলফানসো বলল।

—সেই মালিক বলছে কোনরকম নকশা বা ছবি কেউ তাকে দেয় নি। সাইল বলল।

—মালিক মিথ্যে কথা বলছে। আলফানসো বলল।

—ঠিক আছে। এক্ষুণি তুমি আমাদের সঙ্গে চলো। ঐ মালিকের কাছে যাবো। সাইল বলল।

—আমি যাবো না। আলফানসো বললো, সাইল রবার্টকে ইঙ্গিত করল। সাইল কোমর থেকে ছোরা বের করল। ছুটে এসে আলফানসোর গলায় ছোরাটা চেপে ধরল। শাঙ্কো দ্রুত উঠে দাঁড়ালো। এক ঝটকায় তরোয়ালটা

খুলল। রবার্টের বুকের ওপর তরোয়ালটা টেনে নিল। জামাটা দোফালি হয়ে গেল। দেখা গেল বুক কেটে রক্ত বেরুচ্ছে। রবার্ট ঘাবড়ে গেল। দু'তিন পা পিছিয়ে এল। শাঙ্কো সাইলের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার জামাটাও কেটে দেব? সাইল সঙ্গে সঙ্গে দু'পা পিছিয়ে গেল। ওরা কখনও তরোয়াল দেখে নি। চ্যাপ্টানো কালো রঙের লাঠিটা যে এত ধারালো তা ওরা কল্পনাও করেনি। রবার্ট ছোরাটা কোমরে গুঁজল। তারপর দুজনে ছুটে পাললো।

—আলফানসো নকশাটা কোথায় রেখেছো?

—আমি রেখে দিয়েছি। শাঙ্কো বলল।

—ওটা আলফানসোকে দিয়ে দাও। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে নকশাটা বের করে আলফানসোকে দিলে। আলফানসো ওটা কোমরের ফেট্টিতে রেখে দিল। ফ্রান্সিস বলল—আলফানসো, এবার সাইল আর ঐ গুণ্ডাটা তোমাকে ধরলে নকশাটা দিয়ে দেবে।

—বলেন কি। তাহলে তো ওরা—

—জীবনেও গুপ্তধন খুঁজে বের করতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু আপনাকে তো নকশার নির্দেশ মানতে হবে। আলফানসো বলল।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—আমার কাছে নকশাটার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। আমার সব ভাবা হয়ে গেছে। এখন শুধুই কাজে নামা।

—তাহলে আপনি কি নকশা ছাড়াই গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবেন? আলফানসো বলল।

—এখন পর্যন্ত পারবো ভাবছি। তবে কাজে নেমে কিছু কাজ এগিয়ে বুঝতে পারবো গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবো কি না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আপনার আর নকশাটার দরকার নেই? আলফানসো বলল।

—না। তুমি সাইলদের নকশাটা দিয়ে দিও। তোমাকে একা পেলে ওরা তোমার ক্ষতি করতে পারে। তার আগেই নকশাটা দিয়ে দিও। ফ্রান্সিস বলল।

সকালের খাবার খেতে খেতে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস তাহলে তো এখন আমাদের কিছুই করণীয় নেই।

—না। শুধু শুয়ে বসে সময় কাটানো। রাজকুমারের রোগমুক্তির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসদের একঘেঁয়ে দিন কাটতে লাগল। এরমধ্যে দু'দিন ওরা চিচেন ইতজায় গেল। ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে সব দেখল—সিঁড়ি দিয়ে উঠল নামল। সব দেখেই সে ফিরে এল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—পারবে রাজা হনাকমিনের গুপ্তধন উদ্ধার করতে?

—অবশ্যই পারবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ফ্রান্সিস দৃঢ়কণ্ঠে বলল।

—কিন্তু নকশাটা যদি আলফানসো জীবন বাঁচাতে ওদের দিয়ে দেয়। তাহলে তুমি কোন অসুবিধেয় পড়বে না?

—এখন পর্যন্ত ভাবছি কোন অসুবিধে হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

বিকেল হলে ফ্রান্সিসরা বেড়াতে বের হয়। নগরে ঘুরে বেড়ায়। রাজপ্রাসাদ দেখে বিখ্যাত রাজউদ্যান দেখে। সন্ধ্যে নাগাদ সরাইখানায় ফিরে আসে।

দিন পাঁচেক কেটে গেল। সেদিন রাজপ্রাসাদের সম্মুখ দিয়ে ওরা আসছে দেখল প্রাসাদে ঢোকবার প্রধান দরজার সামনে লোকজনের ভিড়। প্রাসাদ রক্ষীদের সামনে লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস চলো তো কী ব্যাপার দেখি। ফ্রান্সিসরা প্রাসাদ রক্ষীদের কাছে এল। তখনই গোমড়ামুখো রক্ষীদের দেখল—হাসছে। বেশ খুশি। ফ্রান্সিস একজনকে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার ভাই?

—শোনেননি? রাজপুত্র সম্পূর্ণ সুস্থ। রাজা জানিয়েছেন পূর্ণিমা উৎসব হবে। তবে দিনটা এখনও স্থির করেন নি। দিনটা জানার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি। ফ্রান্সিসরা সবাই শুনল ব্যাপারটা। ফ্রান্সিস বলল—আমরা এখানে অপেক্ষা করবো। পূর্ণিমা উৎসবের দিনটা জেনে যাবো।

ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল। ভিড় বাড়তে লাগল। একসময় ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি তোমার সরাইখানায় চলে যাও। আমি খবরটা জেনে আসছি। হ্যারি আর শাঙ্কো চলে গেল। ফ্রান্সিস এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করল কিছুক্ষণ। একজন লোককে ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—রাজার আদেশ কী করে জানবো?

লোকটি আঙ্গুল দিয়ে একটা চৌকোনো পাথর দেখাল। ফ্রান্সিস সেইদিকে গেল। দেখল পাথরের দেয়ালে একটা কষ্টিপাথর গেঁথে দেওয়া। প্রধান প্রবেশপথের আলো এখানে এসেছে। আট দশজন লোক কষ্টিপাথরের লেখাটা পড়ছে। লেখাটা স্পেনীয় ভাষায় লেখা। তলতেক ভাষায় কোন লিপি বা লিখিত রূপ নেই। ফ্রান্সিস পড়তে লাগল—ঈশ্বরের কৃপায় রাজপুত্র সুস্থ হয়েছে। পূর্ণিমা উৎসবের দিন ঘোষিত হবে।

ফ্রান্সিস লেখাটা সবে পড়ে শেষ করেছে একটা বলিষ্ঠ হাত পেছন থেকে ফ্রান্সিসের গলা পেঁচিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস দু'হাত দিয়ে গলায় চেপে ধরা হাতটা খুলতে চেষ্টা করতে লাগল। এইভাবে কিছুক্ষণ চলল। দুজনেই হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল রবার্ট ওরা গলা পেঁচিয়ে ধরে আছে। সঙ্গে সাইল। সাইল ফ্রান্সিসের হাত দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধল। এবার দুজন ফ্রান্সিসকে টেনে নিয়ে চলল। ভিড়ের দু'একজন জানতে চাইল—কী ব্যাপার? সাইল গলা চড়িয়ে বলল—লোকটা চোর। তাই ধরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস এই অভিযোগের কোন জবাব দিতে পারল না। রবার্ট ওর গলা চেপে আছে।

ওরা ফ্রান্সিসকে টেনে নিয়ে চলল। রোগাটে চেহারার রবার্টের হাত লোহার মতো শক্ত। ফ্রান্সিস নানাভাবে চেষ্টা করেও গলা ধরা হাতটা সরাতে পারল না।

প্রাসাদের উদ্যানের কাছে এল সাইলরা। একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিসকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলা হল। সবাই গাড়িতে বসে পড়ল। গাড়ি চলল। পাথুরে রাস্তায় টক্ টক্ শব্দ উঠল। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ।

গাড়ি বেশ কিছুটা পথ যেতে রবার্ট হাতের চাপ কমাল। ফ্রান্সিস হাঁপানো গলায় বললো—আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

—আমাদের আস্তানায়। সাইল বলল।

—কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—একমাত্র তুমিই নকশাটার নির্দেশ বুঝতে পেরেছো। তোমরা বার কয়েকবার চিচেন ইতজায় গেছ। আমরা সর্বক্ষণ তোমাকে নজরে রেখেছিলাম। তুমি নকশার নির্দেশ মেনে সব দেখেছো। আমরা নিশ্চিত তুমিই নকশাটার অর্থ ও নির্দেশ বুঝতে পেরেছো।

—আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি মিথ্যে কথা বলছো। সাইল গলা চড়িয়ে বলল।

—এই ব্যাপারে আমি কোন কথাই বলবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাকে বলতে বাধ্য করবো। দাঁত চাপাস্বরে সাইল বলল।

—আমাকে বাধ্য করার চেষ্টা করো না। সে চেষ্টা করলে তোমরা দুজনেই নরকে যাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। দেখা যাবে কে নরকে যায়! সাইল বলল।

গাড়ি একটা পাথরে টিলার সামনে এসে থামল। রবার্ট গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল—তোমার গলা ছেড়ে দিলাম। চ্যাঁচামেচি করবে না।

টিলাটার পাশ দিয়ে ওরা চলল। কিছুদূর গিয়ে দেখা গেল একটা বাগান মতো। সবাই বাগানটায় ঢুকল। বাগানের পরেই টিলার মধ্যে একট গুহামত। তার মুখটা এমন ছোট যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে। রবার্ট হামা দিয়ে চলে।

ফ্রান্সিসদেরও হামা দিয়ে ঢুকতে হল। গুহার মধ্যে তখন অন্ধকার সাইল অন্ধকার খুঁজে খুঁজে একটা মোমবাতি বের করে চকমকি ঠুকে আলো জ্বালল। মোমবাতির আলো ছড়াল।

ফ্রান্সিস বলল—তেষ্টা পেয়েছে। জল দাও। সাইল একটা বড় চামড়ার থলি আনল। মাটির গ্লাসে জল ঢেলে ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস জল খেল। গুহার মেঝেয় একটা মোটা কাপড় পাতা। এটাই বিছানা। রবার্ট শুয়ে পড়ল।

এবার ফ্রান্সিস বলল—তোমরা আমার এভাবে ধরে আনলে কেন?

—নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। সাইল বলল।

—সেটাই তো জানতে চাইছি। ফ্রান্সিস বলল।

—যারা রাজা হুনাকমিনের ধন ভাণ্ডার খুঁজেছে আর এখনও যারা খুঁজছে তুমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। আমার বিশ্বাস তুমি রাজা হুনাকমিনের গোপনে রাখা ধনভাণ্ডারের খোঁজ পেয়েছো। সাইল বলল।

—অত সোজা। নকশাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি কিন্তু ধনভাণ্ডারের হদিশ পাই নি। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি মিথ্যে কথা বলছো। সাইল বলল।

—যদি খোঁজ পেতাম তাহলে কবে সব ধনভাণ্ডার নিয়ে পালাতাম।

—সেসব বুঝি না। তোমার মুক্তি নেই। তোমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে। সাইল বলল।

—আমাকে বাদ দাও। যে সরাইখানায় আলফানসো আছে সেখানে যাও। নকশাটা চাইলেই পেয়ে যাবে। সেটা এনে দেখে বুঝে তোমরাই ধন ভাণ্ডার উদ্ধার কর। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের সেই সাধ্য নেই। একমাত্র তুমিই পারবে ঐ ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে। সাইল বলল।

—তোমার সঙ্গী ঐ গুণ্ডাটাকে—ফ্রান্সিস কথাটা শেষ করতে পারল না। রবার্ট লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। কোমর থেকে একটা বড় ছোরা এক ঝটকায় বের করল। চড়া গলায় বলল—আর একবার আমাকে গুণ্ডা বললে তোমার পেট ফাঁসিয়ে দেব।

—রাগ কর কেন? তুমি যা আমি তাই বলেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—আবার? রবার্ট চেঁচিয়ে বলল।

—ঠিক আছে। আর এসব নিয়ে কথা বলবো না। কিন্তু আমাকে যে তোমরা ভীষণ বিপদে ফেললে। ফ্রান্সিস বলল।

—কীসের বিপদ? সাইল বলল।

—আমার একদল বন্ধু পড়ে রইল তুলামের জাহাজঘাটায়। বাকি দু'জন পড়ে রইল এক সরাইখানায়। কবে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে, কবে তোমাদের হাত থেকে রেহাই পাবো। সব জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—সব হবে। বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে পারবে। তার আগে রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। সাইল বলল।

—তাই তো তোমাকে ধরে এনেছি। সাইল বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। বেশ রাত হয়েছে। সাইল উঠে দাঁড়াল। মোমবাতিটা নিয়ে কোনার দিকে গেল। মোমবাতি রেখে জমানো খড় গাছপালার শুকনো ডাল নিয়ে পাথরের উনুনে মোমবাতি দিয়ে আগুন লাগাল। উনুন ধরতে ধরতে সাইল বস্তা থেকে আটা ময়দা বার করল। আটা ময়দা ঠাসলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই রুটি বানাল। আলু শিমের তরকারি দুপুরেই করা ছিল বোধহয়।

সাইল গলা চড়িয়ে ডাকল—ফ্রান্সিস, রবার্ট খাবার তৈরি। বসে পড়। ফ্রান্সিস আর রবার্ট বিছানা থেকে উঠল। রান্নার জায়গায় এল। সাইল লম্বাটে শুকনো পাতা পাতল। রুটি তরকারি দিল। ফ্রান্সিস প্রায় হাপুস হুপুস করে খেতে লাগল। খিদেও পেয়েছে। একেবারে রাক্ষুসে ক্ষিদে। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল—আমি একটু বেশি খাই। সাইল সেটা ভালোভাবেই বুঝল। কিছু বলল না। ফ্রান্সিস আড়চোখে তাকিয়ে দেখল মাত্র কয়েকটা রুটি পড়ে আছে লোহার তাওয়ায়। ফ্রান্সিস আর রুটি চাইল না। তরকারি শেষ।

ফ্রান্সিস আর রবার্ট হাতমুখ ধুয়ে এসে বিছানায় বসল। ওদিকে সাইলকে মাত্র তিনটে রুটি তরকারি ছাড়াই খেতে হল।

আর একটু রাত বাড়তেই ওরা ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ও চুপ করে শুয়ে রইল। ঘণ্টা দুয়েক সময় পরে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠল। মোমবাতি বোধহয় সাইল নিভিয়ে দিয়েছে। গভীর অন্ধকারে ফ্রান্সিস শুধু গুহার মুখটা দেখতে পাচ্ছিল। সেইদিক লক্ষ্য রেখে ফ্রান্সিস দু'পা যেতেই রবার্টের গলা শুনল।

—চুপ করে শুয়ে পড়ো গে। আমি যতক্ষণ খুশি জাগতে পারি, যতক্ষণ খুশি ঘুমুতে পারি। আমার চোখেকে ফাঁকি দিতে পারবে না। যাও।

ফ্রান্সিস বুঝল—এভাবে পালানো যাবে না। অন্য ছক কেটে পালাতে হবে। ফ্রান্সিস ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। নানা চিন্তা মাথায়। ফ্রান্সিস মনকে শান্ত করল। আস্তে আস্তে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালের জলখাবার খেয়ে রবার্ট বলল—আমি আলফানসোর কাছ থেকে নকশাটা আনতে যাচ্ছি। ভালো কথা—ফ্রান্সিস নকশাটা এখন কার কাছে আছে?

—আমার বন্ধু শাঙ্কোর কাছে। ফ্রান্সিস বলল।

—শাঙ্কো কি ভালোয় ভালোয় দেবে না আমাকে ছুরি চালাতে হবে।

—না ভালোয় ভালোয় তোমাকে দেবে। আমি বলেছি এইকথা বলবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। রবার্ট বলল।

গুহার মুখের দিকে যেতে যেতে রবার্ট বলল—সাইল, একে সাবধানে পাহারা দেবে। এ কিন্তু ভীষণ চালাক। সবসময় চোখে চোখে রাখবে। হঠাৎ রবার্ট ফিরে এল। সাইলের কানে কানে বলল—আমার শিয়রে দিনের বিছানার নিচে একটা ছোরা আছে। দরকারে কাজে লাগাবে।

রবার্ট গুহা থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

এবার ফ্রান্সিস বলল—আমাকে এভাবে আটকে রেখেছো কেন?

—দরকার আছে। সাইল বলল।

—তোমরা আমার কাছে কী চাও? ফ্রান্সিস বলল।

—খুব সামান্য জিনিস—রাজা হুনাকমিনের গুপ্ত ধনভাণ্ডারের হদিশ। সাইল বলল।

—আমি ওসব ভাণ্ডারের কী জানি। ফ্রান্সিস বলল।

—একমাত্র তুমিই জানো। সাইল বলল।

—তাহলে আমাকে পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কোনভাবেই পালাতে পারবে না। সাইল বলল।

—দেখি। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

সাইল আস্তে আস্তে গিয়ে গুহার মুখে দাঁড়াল—একটা পাথরের আড়ালে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একটা অল্পবয়সী ছেলে সাইলের কাছে এল। কী কথা হল দুজনে। সাইল ফেট্টি থেকে বোধহয় দাম বের করে দিল।

সাইল গুহার ভেতরে এসে বিছানায় বসল। কোনার রান্না করার জায়গাটায় রান্নার আয়োজন করতে লাগল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রবার্ট ফিরে এল। গুহার মুখ থেকে দ্রুত ছুটে এল। ফ্রান্সিস বুঝল—সাইল রবার্ট এই গুহায় গোপনে আশ্রয় নিয়েছে। এটাই ওদের গোপন আস্তানা।

রবার্ট ঢুকতেই সাইল বলে উঠল—রবার্ট—নকশা পেলে?

—নকশা না দিয়ে যাবে কোথায়? মানে ছোরা টোরা দেখাতে হয় নি। রবার্ট বুঝতেই পারেনি যে শাঙ্কো যে নকশাটা দিয়েছে সেটা নকল। আসলটা রয়েছে হ্যারির কাছে।

—নকশাটা দাও। সাইল বলল। রবার্ট কোমরে গোঁজা নকশাটা বের করে দিল। সাইল খুব মনোযোগ দিয়ে নকশাটা দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। সাইলের নজরে পড়ল সেটা। সাইল বলল—হাসছো কেন?

—কেউই যেখানে থৈ পাচ্ছে না সেখানে তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছো যেন নকশাটার অর্থ বুঝে ফেলেছো। ফ্রান্সিস বলল।

—মন দিয়ে নকশাটা দেখছিলাম আর কি। অবশ্য নকশার অর্থ বোঝবার জন্যে তুমিই তো আছো। সাইল বলল।

—আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। প্রথমেই চিন্তা তুলামেও এমনি একটা মন্দির আছে। এখন বুঝতে হবে এই নকশায় যে মন্দির মতো আঁকা হয়েছে সেটা তো তুলামের মন্দিরও হতে পারে। ফ্রান্সিস বলল। সাইল একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—আচ্ছা, নকশায় কোথাকার মন্দিরটা আঁকা আছে বলে তুমি মনে কর?

—এখানকার মন্দিরটা তুলামের মন্দিরের চাইতে অনেক বড়। কিন্তু মন্দির দুটো দেখতে একরকম। তুমি তো রাজা।

—হ্যাঁ সাইল বলল।

—তাই এবার প্রশ্ন কোন মন্দিরটা খুঁজবে? ফ্রান্সিস বলল।

সাইল চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। একটা কাজ করা যাক—তুলামের মন্দিরটা একবার খোঁজাখুঁজি করা যাক। দেখি হদিশ পাই কিনা। ফ্রান্সিস একবার ভাবল ওদের অভিজ্ঞতার কথা বলবে। পরক্ষণেই ভাবল আমি যা জানি বলি। তারপরেও যদি যেতে চায় মন্দিরটা দেখতে যায় তার দায়িত্ব সাইল আর রবার্টের। তবু ফ্রান্সিস ওদের সাবধান করে দিতে বলল—ঐ মন্দিরের নিচে গর্ভগৃহ আছে। তাতে আগুন জ্বলে।

—সবসময়? সাইল জানতে চাইল।

—না। আগুন জ্বললো না। কিছু পড়লেই দপ করে জ্বলে ওঠে। আগুন ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গর্ভগৃহটি। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা তার আগেই খোঁজা শেষ করবো। সাইল বলল।

—পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা নাকি ভাইকিং। খুব বীর নাকি তোমরা। এইটুকু ব্যাপারেই ভয় পেয়ে গেলে? সাইল হেসে বলল।

—ঠিক আছে। চলো। তবে তোমাদের কিছু ক্ষতি হলে আমাকে দোষ দিও না। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাকে দোষ দেব না। তুমি রাজা হুনাকমিনের গুপ্তভাণ্ডারের সন্ধান দাও তাহলেই হবে। সাইল বলল।

—বদলে আমাকে কী দেবে? ফ্রান্সিস বলল।

—আগে পাইতো তারপর দেওয়ার প্রশ্ন। সাইল বলল।

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—না। আগে সেটা ঠিক করে নিতে হবে।

—বেশ তা করা যাবে। সাইল বলল।

—উঁহু—আমাকে আগে কথা দাও। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে গুপ্ত ধনভাণ্ডার তিনটে ভাগ করা হবে। আমরা তিনজনে এক ভাগ করে নেব। সাইল বলল।

—হ্যাঁ এইবার আমি রাজি। এখন বলো—তুলামের মন্দিরে খুঁজতে যাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। সাইল বলল। এবার রবার্টকে বলল—তুলামে যাবে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলো। রবার্ট বলল।

—তাহলে কালকে সকালেই খেয়েদেয়ে তুলামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বো। সাইল বলল।

দুপুরের মধ্যে সাইলের রান্না হয়ে গেল। সাইল ফ্রান্সিসকে একটা পাহাড়ি ঝর্ণায় নিয়ে গেল। ঐ ঝর্ণার জলে স্নান সারল ওরা।

বিকেলে তিনজন বেড়াতে বেরুলো। কিছুক্ষণ রাজপ্রাসাদ বাগানটাগান দেখল। তাড়াতাড়িই আস্তানায় ফিরে এল। এসময় ফ্রান্সিস রাজপ্রাসাদের

দেওয়াল দেখে এল। এখনও রাজা পূর্ণিমা উৎসবের দিনক্ষণ ঘোষণা করেন নি। রাজা এখনও ঐ উৎসবের ব্যাপারে মনস্থির করেন নি।

অন্ধকারের মধ্যেই তিনজন গুহায় ঢুকল। ভেতরের দিকে যেতে লাগল সবাই। কিন্তু নিকষ অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারের মধ্যেই সাইল চকমকি ঠুকে মোমবাতি জ্বালল।

কিছুক্ষণ পরে সাইল রান্না করতে শুরু করল। ফ্রান্সিস এর মধ্যে পালাবার ছক কষতে লাগল। কিন্তু রবার্ট গুণ্ডা খুনে। মানুষ মারতে ওদের হাত কাঁপে না। রবার্ট সবসময়ই সজাগ। ওর দৃষ্টি এড়ানো প্রায় অসম্ভব।

খাওয়া দাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসের ঘুম আসছে না। শুধু ভাবনা মারিয়া, বন্ধুরা কেমন আছে। ওরা ফ্রান্সিসের হঠাৎ বেপাত্তা হওয়ার খবর পেয়েছে কিনা। পেলে ওরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে।

রাত গভীর হল। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। অন্ধকারে ও উঠে বসল। আস্তে আস্তে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে গুহার মুখের দিকে চলল। কিন্তু যখন রবার্টের পায়ের কাছ দিয়ে ও যাচ্ছে তখনই রবার্টের ভারি গলা শুনল—ঘুমোও তো—নইলে ছুরি খেয়ে মরবে।

হতাশ ফ্রান্সিস ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ওদিকে হ্যারি আর শাঙ্কো ফ্রান্সিসদের না ফেরার জন্যে চিন্তায় পড়ল। সরাইখানায় রাতের খাওয়ার সময় হয়ে গেল। সরাইখানার সকলের খাওয়া হয়ে গেল। হ্যারিরা তখনও ফ্রান্সিসদের জন্য অপেক্ষা করছে। সরাইখানার লোক দু'তিনবার এসে খেয়ে নিতে বলল। হ্যারি বলল—আমাদের বন্ধু এখনও ফেরে নি। বন্ধু এলে তবে খাবো।

রাত গভীর হল। হ্যারি, শাঙ্কো তখনও খেল না। সরাইখানার কাজের লোকেরা সবাই শুয়ে পড়ল। ঘরের মোমবাতি নিভিয়ে দেওয়া হল। অন্ধকারে হ্যারি আর শাঙ্কো চুপ করে শুয়ে রইল। ওদের আর খাওয়া হল না।

পাখির ডাক শোনা গেল। রাত শেষ। হ্যারি আর শাঙ্কো তখনও জেগে। দুজনের আর ঘুম হল না।

সকাল হল। সরাইখানার লোক ওদের সকালের খাবার দিতে এল। হ্যারি আর শাঙ্কো মাথা নাড়ল। লোকটি বলল—আপনারা কাল থেকে কিছু খান নি।

—বন্ধু ফিরলে খাবো। হ্যারি বলল।

—বন্ধু হয়তো অন্য কোথাও গেছে। ফিরতে দেরি হচ্ছে। আপনারা কি ততদিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকবেন? লোকটি বলল।

—দেখি। হ্যারি বলল। লোকটা চলে গেল।

দুজনে হাতমুখ ধুয়ে এল। হ্যারি বলল—শাঙ্কো চলো রাজপ্রাসাদের সামনে যাই। ফ্রান্সিস ওখানেই ছিল। আমরা চলে এসেছিলাম।

—চলো। শাঙ্কো বলল। উঠে দাঁড়াল। হ্যারিও উঠল।

দুজনে রাজপ্রাসাদের দিকে চলল। রাস্তায় লোকজন যে যার কাজ করছে। হ্যারি এই লোকজনের মধ্যে ফ্রান্সিসকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় ফ্রান্সিস? হ্যারি হতাশ হল। শাঙ্কোর মনে একটা আশঙ্কা ছড়াল—ফ্রান্সিসকে কেউ মেরে ফেলে নি তো? হ্যারিকে বলল সে কথা। হ্যারি একটু ভেবে বলল—এটা কী করে হবে? এই বিদেশে কারো সঙ্গে তো আমাদের শত্রুতা নেই। আমার মনে হয় ফ্রান্সিসকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

—কে বা কারা ফ্রান্সিসকে বন্দী করবে? শাঙ্কো বলল।

—সেটাই তো ঠিক বুঝতে পারছি না। হ্যারি বলল।

দুজনে রাজপ্রাসাদের সামনে এল। এই সকালেও এখানে লোকজন জড়ো হয়েছে। বোধহয় দেখতে যে পূর্ণিমা উৎসব সম্পর্কে রাজা কোন বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন কি না। ওরা দেখল পাথুরে গায়ে রাজার সেই পুরোনো বিজ্ঞপ্তিটাই রয়েছে। ফ্রান্সিস এখানে এসেছিল। ফ্রান্সিস ওদের চলে যেতে বলেছিল। ওরা চলে গিয়েছিল। সেইদিন থেকে ফ্রান্সিস নিরুদ্দেশ। হ্যারি ও শাঙ্কো চারদিকের লোকজন দেখতে লাগল। কিন্তু ফ্রান্সিস নেই। শাঙ্কো বলল—হ্যারি—ফ্রান্সিস একাই চিচেন ইতজায় গিয়ে রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন খুঁজছে না তো।

—না—না। মনে আছে তোমার ফ্রান্সিস বলেছিল পূর্ণিমা উৎসবের দিন ফ্রান্সিস ঐ গুপ্তধন উদ্ধার করতে যাবে।

—হ্যাঁ ফ্রান্সিস বলেছিল বটে। শাঙ্কো বলল।

কিছুক্ষণ পরে হ্যারি বলল—এখানে ফ্রান্সিসকে পাবো না। ভাবছি—চিচেন ইতজায় যাবো কি না।

—তাই চলো। একবার তো দেখি।

দুজনে চিচেন ইতজার দিকে চলল। গত কয়েকদিনের মতো রাস্তায় মানুষের ভিড় নেই। তখন পূর্ণিমা উৎসবে অনেক লোক এসেছিল। রাজকুমারের অসুখের জন্যে পূর্ণিমা উৎসব বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় সবাই চলে গেছে। এজন্যেই রাস্তায় লোকজনের তেমন ভিড় নেই।

চিচেন ইতজায় এল ওরা। হ্যারি চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। এই মন্দিরে কিন্তু মানুষের ভিড় আছে।

শাঙ্কোকে নিয়ে হ্যারি মন্দিরের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। কত লোক উঠছে নামছে। কিন্তু কোথায় ফ্রান্সিস? দুজনে গর্ভগৃহেও নামল। আবার উঠে এল। ওরা বুঝল এভাবে খুঁজে লাভ নেই। ফ্রান্সিসের যদি শারীরিক কোন ক্ষতি না হয়ে থাকে তবে ও নিজেই এদিকে আসবে। তবু মন মানে না। দুজনে ফ্রান্সিসকে খুঁজতে খুঁজতে সরাইখানায় ফিরে এল। সরাইওয়ালার দেওয়া বিছানায় বসল। বিছানা মানে শুকনো ঘাস ভেতরে। বাইরে একটা মোটা কাপড়।

শাঙ্কো বলল—হ্যারি। কাল রাত থেকে না খেয়ে আছি। চল—কিছু খাওয়া যাক।

—ফ্রান্সিসকে না দেখা পর্যন্ত আমি খাবো না। হ্যারি বলল।

—পাগলামি করো না হ্যারি। ফ্রান্সিসকে খুঁজতে হলে আমাদের সুস্থ থাকতে হবে। অনাহারে দুর্বল শরীর নিয়ে আমরা কিছুই করতে পারবো না। কথাটা ভেবে দেখ। শাঙ্কো বলল।

হ্যারি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললো—বন্দী দশায় ফ্রান্সিস বলতো —পেট ভরে খাও। খেতে ভালো না লাগলেও খাও। শরীরটা চাঙ্গা রাখো।

—আমিও তাই খেয়েটেয়ে সুস্থ থাকার কথা বলছিলাম। বুঝে দেখ—রাজবাড়ি গেলাম চিচেন ইতজায় গেলাম এখন ফিরে আসছি—শরীর একটু দুর্বল লাগছে না?

হ্যারি বলল—হ্যাঁ। ঠিকই বলেছো। শরীর বেশ দুর্বল লাগছে।

—কাজেই পেট পুরে খেতে হবে। আবার সন্ধ্যেবেলা বেরোতে হবে। ফ্রান্সিসকে খোঁজা চলবে। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। দুপুর থেকে আমরা খাওয়াদাওয়া করবো। আমাদের সুস্থ থাকতে হবে। হ্যারি বলল।

সরাইখানার মালিক এল। হেসে হেসে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল— গতকাল রাতে—খান নি। সকালেও খান নি। রান্না ভাল হয়নি?

—রান্না ঠিক আছে। আমাদের এক প্রাণের বন্ধুর কোন হদিশ পাচ্ছি না। সে নিজের থেকেও ফিরে আসেনি—তার জন্যেই আমরা খাই নি। হ্যারি বলল।

—কী করে বন্ধুটি হারালো? সরাইখানার মালিক জানতে চাইলো।

—গত সন্ধ্যায়—রাজবাড়ির সামনে আমরা গিয়েছিলাম কবে রাজা পূর্ণিমা উৎসব করতে কোন বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন কিনা সেটা দেখতে। আমরা তেমন কোন বিজ্ঞপ্তি দেখলাম না। রাত হল। বন্ধুটি বলল—তোমরা সরাইখানায় চলে যাও আমি অপেক্ষা করি। দেখি—বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল কিনা। আমি পরে যাচ্ছি। একটু থেমে হ্যারি বলল—

আমরা দুজনে ফিরে এলাম। বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাতে গেলাম না। সারারাত ঘুমুতেও পারি নি। বন্ধু ফিরল না। আজও রাজবাড়ির কাছে চিচেন ইতজায় বন্ধুকে খুঁজে বেড়ালাম। বন্ধুকে পেলাম না।

সরাইখানার মালিক মাথা এপাশ ওপাশ করে বলল—সত্যি এটা তো খুবই দুশ্চিন্তার ব্যাপার।

শাঙ্কো বলল—আজ থেকে আমরা খাবো। শরীর সুস্থ রাখতে হবে।

হ্যারি বলল—আর এক সমস্যা। তুলামের জাহাজঘাটায় আমাদের জাহাজ রয়েছে। বত্রিশজন বন্ধু রয়েছে। তারা এখনও বন্ধুর নিঁখোজ হয়ে যাবার খবর জানে না। তারাও আমরা ফিরলাম না দেখে ভীষণ চিন্তায় পড়বে।

—তাহলে এখন কী করবেন? মালিক বলল।

—সেটাই ভেবে ঠিক করতে পারছি না। হ্যারি বলল।

—আমি বলি কি— একজন জাহাজে যান। বন্ধু নিখোঁজ এই সংবাদটা জানান। আরো কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে আসুন।

হ্যারি মাথা নিচু করে ভাবল। তারপর শাঙ্কোকে বলল—

—শাঙ্কো কী করবে?

—ঠিক আছে। আমরা একটু ভেবে দেখি। শাঙ্কো বলল সরাইখানার মালিক চলে গেল।

সেদিন বিকেলে ফ্রান্সিসরা রুটি, মধু খেল। সাইল কয়েকটা থলি নিল। আটা-ময়দা তরিতরকারি এসব কিনে আনতে তৈরি হল। ফ্রান্সিস বলল—সাইল— রাজপ্রাসাদের সামনের পাথুরে দেওয়ালে রাজার বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে কিনা দেখো তো?

—কীসের বিজ্ঞপ্তি? সাইল বলল।

—পূর্ণিমা উৎসব কবে হবে তারা জানিয়েছেন কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ দেখবো। সাইল চলে গেল।

রবার্ট পাহারায় রইল। রবার্ট দুপুরের খাওয়াদাওয়া করার পর সেই যে পাতলা কম্বলের ওপর শুয়েছে আর ওঠার নাম নেই।

সন্ধ্যা নামল। অন্ধকার গুহায় ফ্রান্সিস বসে রইল। রবার্ট শুয়ে রইল।

একসময় ফ্রান্সিস বলল—রবার্ট। একটু গাত্রোত্থান কর— মানে ওঠ। মোমবাতিটা জ্বালাও।

—আমি অন্ধকারেও দেখতে পাই। রবার্ট বলল।

—আমি তো তোমার মতো বেড়াল নই। অন্ধকার আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। ফ্রান্সিস বলল।

—সাইল এসে মোমবাতি জ্বাললো। ততক্ষণ অন্ধকারে বসে থাকো। রবার্ট বলল।

—বেশ। অন্ধকার থাকলে ভালো— আমার পালানোর সুবিধে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেঘোরে ছোরা খেয়ে মরবে। রবার্ট বলল।

—হুঁ। তুমি জবরদস্ত পাহারাদার। ফ্রান্সিস বলল।

রবার্ট কোন কথা বলল না। জোরে একবার শ্বাস ফেলে পাশ ফিরল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরকারি জিনিস নিয়ে সাইল ফিরল।

ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—রাজার বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে?

—না। রাজপুত্র সুস্থ হয়েছে সেই বিজ্ঞপ্তিটাই সাঁটা আছে। সাইল বলল।

—শুভ সংবাদ। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—ওকথা বলছ কেন? সাইল জানতে চাইল।

—আছে আছে। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করে বলল।

একটু রাত হতে সাইল রাঁধতে বসল। রাঁধতে রাঁধতে বলল—তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। কাল সকাল সকাল খেয়ে বেরুবো আমরা।

—তাহলে তুলমের মন্দির দেখতে যাচ্ছো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। সাইল বলল।

তখন রাত গভীর। ফ্রান্সিস তখনও ঘুমোয়নি। আবার পালানোর জন্যে তৈরি হল। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে গুহামুখের দিকে চলল। অন্ধকারে সাইলকে ছাড়াল। রবার্টকে ছাড়িয়ে যেতেই রবার্টের মোটা গলা শুনল—ফ্রান্সিস মিছিমিছি মৃত্যুকে ডেকে এনো না। রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন খুঁজে বের করতে আমাদের সাহায্য কর। গুপ্তধন পেলেই তোমার মুক্তি।

ফ্রান্সিস নিজের জায়গায় ফিরে এল। বলল—রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন কোথায় আমি জানি না।

—নকশায় নির্দেশ আছে। একমাত্র তুমিই সেই নির্দেশ বুঝে গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবে। কাজেই আমাদের হাত থেকে তোমার মুক্তি নেই। পালাবার চেষ্টা করো না। ছোরা তোমার হৃৎপিণ্ড ভেদ করবে। তুমি মারা যাবে। রবার্ট থেমে থেমে বলল।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরে সাইল রবার্টের কথাবার্তায় ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙল। ঝর্ণার জলে হাত মুখ ধুতে যাচ্ছে রবার্ট পেছন পেছন এল।

গুহায় ফিরে দেখল সাইল খেতে দিয়েছে। রুটি আর কলা, আধখানা আপেল। সাইল বলল—ফ্রান্সিস খাবার খেয়ে নিয়ে তৈরি হও। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা তৈরি হল। ফ্রান্সিসকে একটা ঝোলা দেওয়া হল। রবার্ট আর সাইল ঝোলায় রান্নার বাসনটাসন নিল। গুহা থেকে বেরিয়ে এল। চলল পূবমুখো। কিছুক্ষণের মধ্যেই শহর ছাড়িয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে এল। রোদ বেশ চড়া। রোদের তেজ সহ্য করে ওরা চলল।

শেষ দুপুরে একটা ছোট বসতিতে এল। এখন খাওয়া। সাইল বলল— চল দেখি কারো বাড়িতে খেতে পারি কিনা।

একটা দোকানের সামনে এল। সাইল দোকানদারের কাছে গেল। বলল—আমরা বেশ দূর থেকে আসছি। আমাদের কিছু খেতে দিতে পারেন? দোকানদার বলল—দেখি—স্ত্রীকে রাজি করাতে হবে। একটা পাটাতন দেখিয়ে বলল আপনারা বসুন। ফ্রান্সিসরা বসল। এতদূর হেঁটে শরীর বিশ্রাম চাইছিল।

কিন্তু সাইল বলল—এত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়লে চলবে না। আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।

দোকানদার এল। হেসে বলল—আমাদের তো রান্না খাওয়া হয়ে গেছে। আপনারা বিশ্রাম করুন। কিছুক্ষণের মধ্যে রান্না হয়ে যাবে। আপনারা কি ততক্ষণ এখানেই বিশ্রাম করবেন না ভেতরবাড়িতে বিছানায় বিশ্রাম করবেন? সাইল ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—আমরা ভেতরবাড়িতে যাব। শোবো। শুধু বসে থেকে বিশ্রাম হয় না।

—ঠিক আছে। আসুন। দোকানদারের পেছনে পেছনে ওরা ভেতরবাড়িতে ঢুকল। একটা ঘরের দরজা খুলে দোকানদার ফ্রান্সিসদের অপেক্ষা করতে বলল।

ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকে দেখল মেঝেয় বিছানা পাতা। শুকনো ঘাসপাতার বিছানা। ফ্রান্সিসরা আস্তে আস্তে বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। সাইলও শুয়ে পড়ল। কিন্তু রবার্ট শুয়ে পড়ল না। বসে রইল।

কেউ কোন কথা বলছিল না। এত খিদে পেয়েছে যে কেউ কথা বলতে পারছে না।

ঘণ্টাখানেক পরে একটি অল্পবয়স্ক মেয়ে এল। হাতে গোল গোল বড় পাতা। ওদের সামনে মেঝেয় পাতাগুলো দিল। একটু পরে দোকানদারের স্ত্রী ঢুকল। হাতে কাঠের বড় বেকারি। তাতে রুটি রাখা। দোকানদারের স্ত্রী রুটি পাতায় দিতে লাগল। ফ্রান্সিস শুধু রুটিই খেতে লাগল। দেখাদেখি সাইল আর রবার্টও শুধু রুটি খেতে লাগল। দোকানদারের স্ত্রী এবার কাঠের গামলায় শাকসব্জির ঝোল নিয়ে এল। পাতায় দিল। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটি মাংস নিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের ঝোলসহ মাংস দিল। তিনজন গোগ্রাসে খেতে লাগল। আর এক দফা রুটি দেওয়া হল। ফ্রান্সিস আরো দুখানা রুটি চাইল। স্ত্রীলোকটি হেসে মাথা এপাশ ওপাশ করে বলল—আর রুটি নেই। যদি বলেন তাহলে রুটি করে দিতে পারি।

—ঠিক আছে। আমরা আর থাকবো না। চলে যাবো। ফ্রান্সিস বলল। তিনজনেই উঠে দাঁড়াল। মেয়েটি হাতমুখ ধোবার জল দিল। জল খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে ফ্রান্সিসরা বাড়ির বাইরে এল। দোকানদারের কাছে গিয়ে ফ্রান্সিস বলল—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমরা ভাল খেয়েছি। রবার্ট বলল—আর বসা নয়। চলো সব।

দোকানের বাইরে গিয়ে ওরা আবার পূবমুখো হাঁটতে লাগল।

বিকেল হল। যেতে যেতে সন্ধ্যে হল। একটা জঙ্গলের কাছে পৌঁছল ওরা। সাইল থামল। ফ্রান্সিস, রবার্টও থামল। সাইল বলল—চলো—এখানেই রাতের খাওয়া খাবো, শোবো, ঘুমোবো।

একটা বিরাট গাছের গোড়ায় এসে সাইল ওর পোটলা থেকে বাসনটাসন রাখল। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝোলাটোলা রাখল। সাইল বলল—এখন

সবচেয়ে জরুরী কাজটা করতে হবে। একটা ঝর্ণাটর্ণা খুঁজে বের করতে হবে। জল না হলে কিছুই রান্না করা যাবে না। একটা ঝর্ণার খোঁজে বনে ঢুকতে হবে।

—তাহলে তো তোমাকে যেতে হয়। রবার্ট বলল।

—আমি যেতে পারি। এসব আমার অভ্যেস আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তুমি যাবে না। রবার্ট বলল।

—আমি যাচ্ছি। সাইল বলল। তারপর বাসনের ঝোলা থেকে একটা একটু বড় কাঠের পাত্র বের করল। সেটা হাতে নিয়ে সাইল জঙ্গলে ঢুকল।

ফ্রান্সিস গাছের নিচে বসল। রবার্টও ওর পাশে বসল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল—রবার্ট কিছুতেই ফ্রান্সিসকে চোখের আড়ালে যেতে দিচ্ছে না। দুজনে বসে রইল অন্ধকারে। ফ্রান্সিস পালাবার ছক কষতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সাইল কাঠের বড় বাটিটা ভর্তি জল নিয়ে এল। বগলে শুকনো ডালটাল নিয়ে এল। বলল—এই জলটা আমরা খাই। আমাদের নিশ্চয়স তেষ্টা পেয়েছে। বাটিটা ধরে ধরে তিনজনে জলটা খেয়ে নিল। সাইল শুকনো ডালটাল রাখল। রবার্টকে বলল—আমি আবার জল আনতে যাচ্ছি। রবার্টকে বলল—তিনটে পাথর এনে উনুন বানাও।

সাইল ঘটি নিয়ে চলে গেল। রবার্ট অন্ধকারের মধ্যে গাছতলাটার একটু দূরে থেকে তিনটে বড় পাথর আনল। উনুন বানাল।

সাইল জল নিয়ে এল। পাত্র বের করে আটা মাখতে লাগল। বলল—রবার্ট উনুন চকমকি দিয়ে জ্বালাও। রবার্ট অন্ধকারে হাতের আন্দাজে ঝোলা থেকে চকমকি পাথর বের করল। শুকনো ডালটাল আর শুকনো পাতা নিয়ে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালল।

অল্পক্ষণের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। সাইল উনুনে একটা লোহার চ্যাপ্টামত পাত্র বসাল। মোমবাতি বের করল। উনুনের আগুন থেকে মোমবাতি জ্বালল। জোর বাতাস নেই। মোমবাতি একেবারে নিভে গেল না। তবে মোমবাতির শিখা নড়তে লাগল মাঝে মাঝে। সাইল রুটি বানাতে লাগল। মোমবাতির আলোয় দেখতে দেখতে পনেরোখানা রুটি বানাল। বলল—যাও বড় পাতা নিয়ে এসো। রবার্ট অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে কয়েকটি পাতা পেল। নিয়ে এল। সাইল মধুর পাত্রটা বের করল। বলল—বসে পড়। ফ্রান্সিস আর রবার্ট পাতা সামনে নিয়ে বসল। সাইল ওদের পাতায় রুটি দিল। তারপর মধুর পাত্র থেকে মধু ঢেলে দিল। মোমবাতির মৃদু আলোয় দেখে দেখে রুটি খেতে লাগল। ঐ মধুমাখা রুটি ফ্রান্সিসের কাছে যে কী সুস্বাদু লাগল! এবার সাইলও খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ। সাইল যে জলটুকু বাঁচাতে পেরেছিল সেই জল ওরা ভাগ করে খেল। খিদে মিটল।

এবার শুয়ে পড়া। তিনজনেই গাছের নিচেই শুকনো পাতা জড়ো করে তার ওপর শুয়ে পড়ল। পরিশ্রান্ত ওরা একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হল। ফ্রান্সিসদের ঘুম ভাঙল। সাইল বলল—আর দেরি করবো না। সকালের খাওয়া খেয়েই বেরিয়ে পড়বো। আজকেই তুলামে পৌঁছবো।

গতরাতের বাসি রুটি মধু খেল। তারপর আটার ঝোলা, বাসনটাসনের ঝোলা নিয়ে চলল ওরা।

দুপুরে এক চাষীর বাড়িতে খেল। তারপর শেষ বিকেলে ওরা তুলামে পৌঁছল। ওরা খুঁজে খুঁজে একটা সরাইখানায় এল। দরদাম করে সরাইখানার পাতা বিছানায় ওরা বসল।

ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে পড়ল। সাইলও আধশোয়া হল। রবার্ট বসে রইল। ফ্রান্সিস বলল—এখন তো রাজা তুতজের সঙ্গে দেখা করা যাবে না। কাল সকালে রাজসভায় গিয়ে কথা বলতে হবে। কাজেই আজ রাতে খাওয়া ও বিশ্রাম।

রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল ওরা।

পরদিন তৈরি হয়ে ওরা রাজবাড়ির দিকে চলল। তখনই ফ্রান্সিস দেখল বেশ কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ি পশ্চিমমুখো চলেছে। আরোহীরা আনন্দে হৈ হৈ করছে। এরা কি তবে পূর্ণিমা উৎসবে যাচ্ছে?

একটা গাড়িতে লোক তোলা হচ্ছিল। ফ্রান্সিস কাছে একজন যুবককে জিজ্ঞেস করল—আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

—পূর্ণিমা উৎসবে।

—পূর্ণিমা উৎসব কবে?

—পরশু। যুবকটি গাড়িতে উঠে পড়ল।

ফ্রান্সিস বেশ উত্তেজনা বোধ করল। আমাকে আজকেই পালাতে হবে।

পরদিন সকালে ওরা রাজা তুতজের রাজসভায় গেল। রাজা তুতজ সিংহাসনে বসে আছেন। বিচার চলছে। ফ্রান্সিস সবকিছুই তাড়াতাড়ি সারতে চাইছিল। মাত্র একটা দিন হাতে।

একটু পরেই একজন বন্দীকে নিয়ে সেনাপতি রাজসভায় এল। ফ্রান্সিস সাইলকে বলল—তুমি সেনাপতিকে বল যে আমি রাজাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। সাইল আস্তে আস্তে সেনাপতির কাছে গেল। বলল—আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ রাজাকে দিতে চাই। —কী সংবাদ? সেনাপতি বলল।

—আমরা রাজাকে রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধনের একটা নকশা দিতে চাই।

—বলো কি? ঠিক তো? সেনাপতি বলল।

—হ্যাঁ।

-দেখছি। সেনাপতি হেঁটে হেঁটে রাজার পাশের আসনে বসা মন্ত্রীর কাছে গেল। এসব বলল। একটু পরেই সেনাপতি ফ্রান্সিসদের এগিয়ে আসতে বলল।

ফ্রান্সিসরা এগিয়ে গেল। রাজা ফ্রান্সিসকে দেখে বললেন—তুমি তো ভাইকিং। দুজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলে। তারপর পালিয়ে ছিলে।

—হ্যাঁ মান্যবর। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের কাছে রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধনের নকশা আছে? রাজা বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল। তারপর সাইলকে নকশা দিতে বলল। সাইল নকশা বের করে দিল। ফ্রান্সিস রাজাকে দিল। রাজা মন্ত্রী দুজনেই ঝুঁকে পড়ে নকশাটা দেখতে লাগল।

—এটা ভুতুড়ে নকশা নয় তো? রাজা বললেন।

—না। আপনি আমাদের অনুমতি দিন। এখানকার মন্দিরে আমরা গুপ্তধন খুঁজে বের করবো। সাইল বলল।

—পারবে? রাজা বলল।

—নকশা পেয়েছি কাজেই কোন অসুবিধা হবে না। সাইল বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। রাজা বলল।

—আপনি দুজন প্রহরী দিন। কিন্তু তারা গর্ভগৃহে নামতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। নকশাটা আমার কাছেই থাকবে। রাজা বলল।

—কোন অসুবিধে নেই। তাহলে আমরা গুপ্তধন খুঁজতে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। তুতজ মুখে শব্দ করল।

ওরা রাজবাড়ির বাইরে এল। ফ্রান্সিস বলল—আমরা এখনই খুঁজতে যাবো। আমি সময় নষ্ট করতে পারবো না। তোমরা আমাকে একা ছেড়ে দিলে আমিই খুঁজতে যেতাম। তোমরা সরাইখানায় খেয়ে টেয়ে আসতে পারতে।

—তোমাকে একা ছাড়া হবে না। রবার্ট বলল।

—বেশ চলো। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই দুজন প্রহরী ওদের কাছে এল। বলল—সেনাপতি আপনাদের সাহায্য করতে বলেছেন। তাই আমরা এসেছি। চলুন। দুজন প্রহরীর হাতে দুটো নেভানো মশাল।

—আমাদের একটা মশাল লাগবে। ফ্রান্সিস বলল।

—পাবেন। প্রহরী বলল।

ওরা মন্দিরের সামনে এল। সিঁড়ির কাছে এল। ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে প্রহরীদের বলল—একটা মশাল জ্বেলে দাও। প্রহরীটি চকমকি পাথর ঠুকে মশাল জ্বালিয়ে দিল।

এবার তিনজনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল! তারপরই সিঁড়ি নেমে গেছে। ওরা নামতে লাগল। সিঁড়ি অন্ধকার হয়ে গেল। এখন মশালের আলোতে দেখে দেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

সিঁড়ি শেষ। সেই চৌকোনো ঘরটি। ফ্রান্সিস সাইলকে মশালটা দিয়ে বলল— মশালটা ধরো। কিন্তু সাবধানে আগুনের একটা ফুলকিও যেন মেঝেয় না পড়ে। যদি পড়ে ধোঁয়া আর আগুনে আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত।

ফ্রান্সিস মশালের আলোতে ঘরটা ভাল করে দেখতে লাগল। হঠাৎ দেখল পাথরের একটা জোড়ের মধ্যে একটু ফাঁক রয়েছে। ফ্রান্সিস পাথরটায় ধাক্কা দিল। পাথরটা নড়ল। আবার জোরে ধাক্কা দিল। পাথর দুটো বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস পাথর দুটো খুলে রাখল। তারপর নিচু হয়ে ঐ খোঁদলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস এবার হাত বাড়িয়ে বলল—মশালটা দাও। এই ফোঁকরের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসো।

ফ্রান্সিস জ্বলন্ত মশাল তুলল। দেখল একটা বড় ঘর। ঘরভর্তি কঙ্কাল। শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে। সাহসী ফ্রান্সিসও একটু ঘাবড়ে গেল। অত কঙ্কাল দেখে সাইল আর রবার্ট ভয়ে শিউরে উঠল।

ফ্রান্সিস মশাল হাতে ঘরটা দেখতে লাগল। ফ্রান্সিসের কেমন মনে হল এই ঘর থেকে বেরোবার পথ নিশ্চয়ই আছে। ও দেয়ালগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস দেয়ালগুলো ধাক্কাতে লাগল। হঠাৎ একটা দেয়ালের অংশ নড়ে উঠলো। ফ্রান্সিস জোরে ঠেলা দিল। পাথরের অংশ খুলে গেল। বাইরে রোদ। ফ্রান্সিস ভেবে নিল এইবার পালাতে হবে। ও বাইরে আসছে তখনই রবার্ট ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস এক ঝটকায় ওকে ফেলে দিল। রবার্ট কোমর থেকে ছোরা বের করল। ফ্রান্সিস হাতের মশালটা দিয়ে রবার্টের মুখে জোরে এক ঘা লাগাল। রবার্টের হাত থেকে ছোরাটা খসে পড়ল। ও মুখ চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল। সাইল তখন বেরিয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস মশাল ছুঁড়ে ফেলে বনভূমির দিকে ছুটতে লাগল।

একবার পেছনে তাকিয়ে দেখল দুই প্রহরী ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস গতি বাড়াল। দুই প্রহরী কাছে আসার অনেক আগে ফ্রান্সিস বনভূমিতে ঢুকে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস কয়েকটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল সাইল ও রবার্টকে প্রহরীরা নিয়ে চলেছে। বোধহয় কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবে।

এবার ফ্রান্সিস হাঁটতে হাঁটতে বন পার হতে লাগল। বনতল বেশ অন্ধকার। সাবধানে পা ফেলে হাঁটতে হচ্ছে। তারই মধ্যে যতটা দ্রুত হাঁটা যায় ততটা দ্রুতই ফ্রান্সিস হাঁটতে লাগল। পূর্ণিমা উৎসবের দিনে রাতের আগে চিচেন ইতজায় পৌঁছুতে হবে।

ভীষণ পেছল গাছের গোড়ায় আছাড় খেল কয়েকবার। তবু ফ্রান্সিস থামল না। যতটা দ্রুত সম্ভব চলল।

বনভূমি শেষ। সামনেই বিস্তৃত প্রান্তর। বাঁদিকের রাস্তায় এল। রাস্তার দু'ধারে দেখতে দেখতে চলল বুড়িমার বাড়ির উদ্দেশ্যে। খুঁজে খুঁজে বুড়িমার

পাড়ি পেল। হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস দরজায় ধাক্কা দিল। ভেতরে কোন সাড়া নেই। এবার জোরে ধাক্কা দিল। দরজাটা নড়ে গেল।

—যাচ্ছি। বুড়িমার গলা দরজা খুলল। ফ্রান্সিস দেখে বলল—বুড়িমা, আমাকে চিনতে পারছেন? বুড়িমা কিছুক্ষণ ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল— চিনতে পারছি। আমার ছেলের বন্ধু। ছেলের সঙ্গে এসেছিল। একটু থেমে বলল—আচ্ছা আমার ছেলে এখন কোথায়?

—চিচেন ইতজায়। ও সুস্থ। আনন্দে আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখা হলে তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো। বুড়িমা বলল।

—আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আপনার ছেলেকে গেলেই ধরে নিয়ে আসবো। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

বুড়িমা বলল—এসো। ফ্রান্সিস ঘরে ঢুকল। পাতা বিছানায় বসল। বলল—বুড়িমা, একটা কথা।

—কী কথা?

—বলছিলাম, রাজা তুতজের প্রহরীদের হাত থেকে আমি পালিয়ে এসেছি। বিকেল হয়ে এলো। এখনও একটা বাসি রুটি একটু মধু খেয়ে আছি। আপনি যদি একটু খেতে দিতেন।

—দেব বৈ কি। বল তো তোমাকে রেঁধে খাওয়াতে পারি। তুমি আমার ছেলের বন্ধু।

—তাহলে আমাকে কিছু খেতে দিন। আমার হাতে সময় কম। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। বস। বুড়িমা বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বুড়িমা একটা কাঠের থালা নিয়ে এল। ফ্রান্সিসের দিকে থালাটা এগিয়ে ধরে বলল—এই সামান্য খাবারই আছে।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস কাঠের থালাটা নিল। দেখল—বেশ কিছু মাংসর বড়া আর হাতে তৈরি কেক।

ফ্রান্সিস গোগ্রাসে খেতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব শেষ। বুড়িমা জলের ঘটি দিল। ফ্রান্সিস ঢক্ ঢক্ করে জল খেল। বলল—বুড়িমা আর কিছু বড়া হবে? রাস্তায় খেতাম।

—খাও না। বুড়িমা বলল।

—আপনি?

—রান্না করে খাব।

—ফ্রান্সিস বলল—একটা কাপড়ের টুকরোয় বেঁধে দেবেন।

বুড়িমা চলে গেল। একটু পরেই কাপড়ের থলেতে মাংসের বড়া বেঁধে নিয়ে এল। ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস ওটা কোমরের ফেট্টিতে গুঁজে রাখল।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—বুড়িমা আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো—

—ধন্যবাদের দরকার নেই। তুমি আমার ছেলেকে নিয়ে এসো। বুড়িমা বলল।

ফ্রান্সিস রাস্তায় এসে দাঁড়াল। রাস্তায় তেমন ভিড় নেই। ঘোড়ায় টানা গাড়ি যাচ্ছে আসছে। একটা গাড়িতে দেখল খুবই ভিড়। গাড়িটা থামল। ঘোড়াটাকে জল, ছোলা খাওয়ানো হচ্ছে। তখনই ফ্রান্সিস একজনকে জিজ্ঞেস করল—আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

—চিচেন ইতজা—পূর্ণিমা উৎসবে।

—দেখুন আমার ভাড়া দেবার ক্ষমতা নেই। আমাকে নিয়ে যাবেন?

—বিনি ভাড়ায়? পাগল? আমরা দুদিন আগেই ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। কত লোককে নেওয়া হল না—জায়গা নেই বলে। আর বিনা ভাড়ায় যেতে চাইছেন? লোকটি বলল। ফ্রান্সিস সরে এল। হাঁটতে লাগল।

রাত হল। ফ্রান্সিস সমানে হেঁটে চলল। রাত হয়েছে। মাংসের বড়া শেষ। ফ্রান্সিস অন্ধকারে হেঁটে চলল। জল তেষ্টা পেয়েছে। বেশ খিদেও পেয়েছে।

একটা মোড়ে স্ত্রীলোক কয়েকজনের ভিড়। ফ্রান্সিস কাছে এল। দেখল একটা বড় ইদারা। একজন স্ত্রীলোক একটা লোহার পাত্রে জল তুলতে লাগল। দড়ি বাঁধা পাত্রটি ওপরে তুলল। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। মুখের কাছে হাত পাতল। স্ত্রীলোকটি ফ্রান্সিসকে জল খেতে দিল। ফ্রান্সিস জল খেল। জল নিয়ে চোখ মুখে ঝাপটা দিল। মুখ তুলল। তেষ্টা মিটল।

ফ্রান্সিস হাঁটতে লাগল। এতক্ষণ আকাশে মেঘ ছিল। চাঁদ ঢেকে পড়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ বৃষ্টিও হল। ফ্রান্সিস বড় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বৃষ্টি থেমে যেতেই আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ দেখা গেল। চারদিকে চাঁদের আলো। সব কিছু রাস্তা বাড়িঘর গাছপালা সব পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল। ফ্রান্সিস আনন্দে দু'হাত তুলে ওদের ভঙ্গিতে শিস দিল—ও—হো—হো।

এবার আর একটা মোড়ে এল। একটা দোকানে বেশ ভিড়। ফ্রান্সিস দোকানটায় ঢুকল। দেখল শরতের দোকান। দোকানের দুদিকে দুটো বেঞ্চি মতো কাঠের পাটাতন রাখা। ফ্রান্সিস বসে পড়ল।

দোকান মালিক কাঠের গ্লাসে সরবৎ দিচ্ছে। ফ্রান্সিসও একটা গ্লাস নিল। সরবৎ খেতে লাগল। কী কী মিশিয়ে সরবৎ তৈরি সেটা তো জানার উপায় নেই। তবে শরবৎটা খেয়ে গায়ে বেশ জোর পেল। হাঁটার ক্লান্তিটা কমে গেল। ফ্রান্সিস বেরোতে গেল। দোকানের মালিক হাত পাতল। ফ্রান্সিস বলল—আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলছি। একটা গুণ্ডার জন্যে আমি বন্ধুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এক বন্ধুর কাছে অর্থ দামী জিনিস থাকে। আমার কাছে এখন রাজার একটা মুদ্রা নেই। আমি দাম দিতে পারবো না।

মালিক জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল—না—না। যেভাবে পারো দাম দাও।

সেত্যি বলছি আমার থলি শূন্য।

—আমি সেসব বুঝি না দাম দাও। নইলে তোমাকে বেঁধে রাখা হবে। কাল সকালে শাস্ত্রী এলে তোমাকে ধরিয়ে দেব।

ফ্রান্সিস হো হো করে হেসে উঠল। যারা খাচ্ছিল তারা অনেকেই ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে দেখল।

একজন লম্বামতো লোক ফ্রান্সিসের কাছে এগিয়ে এল। সে মালিককে বলল—কী হয়েছে?

—দেখুন না এই লোকটা শরবৎ-এর দাম না দিয়ে পালাতে চাইছে। ফ্রান্সিস মালিকের সামনে এগিয়ে এল। দাঁত চাপা স্বরে বলল—মিথ্যে বলো না। আমি পালাতে চেষ্টা করি নি। মালিক ফ্রান্সিসের চোখের দিকে তাকিয়ে বেশ ঘাবড়ে গেল। চুপ করে রইল। লম্বা লোকটি কোমর থেকে একটা ভেলভেটের থলে বের করল। বলল—কত পাওনা হয়েছে আপনার?

—দুই মুদ্রা।

—এই নিন। লম্বা লোকটি মুদ্রা দিয়ে বলল—আর একটি কথাও নয়। চলে যান এখান থেকে। মালিক প্রায় দৌড়ে চলে গেল। লম্বা লোকটি ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে এল। মোমবাতির আলোয় ফ্রান্সিস দেখল—ভদ্রলোকের গায়ে বেশ দামী পোশাক। লোকটি ফ্রান্সিসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল ইউবেক। ফ্রান্সিসও হাতটা ধরে বলল—ফ্রান্সিস। দুজনে করমর্দন করল।

—আসুন একটু কথা বলি। ইউবেক বলল। দুজনে কাঠের পাটাতনে বসল। ইউবেক বলল—আপনি বিদেশী। এখানে এলেন—কী জন্যে?

—সে আরেক কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—তবু একটু শুনি।

ফ্রান্সিস অল্প কথায় নিজেদের দল বেঁধে দেশে দেশে ঘোরা, গুপ্তধন আবিষ্কার এসব বলল।

—আপনি কোথায় যাবেন? ইউবেক বলল।

—চিচেন ইতজা—পূর্ণিমা উৎসবে। ফ্রান্সিস বলল।

—সে তো আমরাও যাচ্ছি। আমরা ঘোড়ার গাড়ি চড়ে যাচ্ছি। গাড়োয়ানকে বলে দেখি আর একজনকে নিয়ে যাওয়া যাবে কি না। চলুন।

দুজনেই উঠল। ইউবেক বলল—আপনি তখন হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন কেন? ফ্রান্সিস হেসে বলল—কত কত বহুমূল্যবান অলঙ্কার সোনার চাকতি একটা বিরাট সোনার ঘণ্টা—এসব গুপ্তধন আমি বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করেছি। আর আজ আমার পকেটে একটা তামার মুদ্রাও নেই।

—যাক গে এই নিয়ে দুঃখ করবেন না। আমরা এবার যাবো। ইউবেক গলা চড়িয়ে বলল—বন্ধুরা—গাড়িতে এসো। ইউবেক-এর বন্ধুরা দোকান থেকে বেরিয়ে এল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল একটা দুই ঘোড়া টানার গাড়ি দাঁড়িয়ে। ইউবেক-এর বন্ধুরা গাড়িতে উঠতে লাগল। ইউবেক ফ্রান্সিসকে নিয়ে গাড়োয়ানের কাছে গেল। ডাকল—বিভান?

—বলুন স্যার। বিভান বলল।

—আমাদের গাড়িতে একজন লোক নেয়া যেতে পারে? ইউবেক বলল।

—গাড়ির ভেতরে আর জায়গা হবে না। উনি আমার পেছনে বসতে পারেন। তবে বেশ কষ্ট হবে।

—আমি ওভাবে যেতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

ইউবেক আর বন্ধুরা গাড়িতে উঠল। ফ্রান্সিস বিভানের পেছনে টানা কাঠের ওপর বসল।

বিভান মুখে শব্দ করে চাবুক মারল। তখনই বিভানের কনুই ফ্রান্সিসের পাঁজরায় গুঁতো দিল।

ফ্রান্সিস বুঝল—বিভান যতবার চাবুক মারবে আবার একটু গুঁতো খেতে হবে। ফ্রান্সিস পরেরবার একটু কাত হয়ে গুঁতো এড়াল। এটা বারবারই হতে লাগল।

রাস্তায় গাছগাছালিতে জোৎস্না ছড়ানো। ঘোড়ার ক্ষুরের টক্ টক্ শব্দ। নিশাচর পাখি গাছের ডালের মধ্যে দিয়ে উড়ে গেল। আনন্দে ফ্রান্সিসের মন ভরে গেল।

বাকি রাতটা না ঘুমিয়েই কাটল। অবশ্য এমন একটা জায়গায় ফ্রান্সিসকে বসতে হয়েছে যেখানে ঘুমোনো অসম্ভব।

পূবদিকের আকাশে কমলা রং ধরল। একটু পরেই সূর্য উঠল। ভোরের স্নিগ্ধ আলো ছড়াল। ঠাণ্ডা বাতাস বইল।

গাড়ি যখন চিচেন ইতজায় পৌঁছল তখন বিকেল। একটা সরাইখানার সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। ফ্রান্সিস নামল। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। কোমর, পা যেন অসাড় হয়ে গেছে।

ইউবেকের কাছে এল ফ্রান্সিস। অনেক ধন্যবাদ জানাল। ইউবেক বলল, আমাদের সঙ্গে খাবেন চলুন।

—উপায় নেই। আমাকে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুদের কাছে যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস দ্রুত হাঁটতে লাগল। কোমরে পায়ের ব্যথাটা কমে গেছে। রাস্তায় বেশ ভিড়। আজকে রাতেই পূর্ণিমা উৎসব।

সরাইখানার সামনে এল ফ্রান্সিস। তখনও হাঁপাচ্ছে। দরজা থেকেই গলা চড়িয়ে ডাকল—হ্যারি—শাঙ্কো। হ্যারি, শাঙ্কো শুয়ে ছিল। দুজনেই উঠে

ফ্রান্সিসের দিকে ছুটে এল। হ্যারি ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। শাঙ্কোরও সেই অবস্থা।

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—শক্ত হও। শাঙ্কো মালিককে বলো তো কিছু খেতে দিতে পারবে কিনা। শাঙ্কো চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বলল—তরকারি আছে। মাংস নেই, মাংসের ঝোল আছে।

—ঠিক আছে। ওসব থাকলেই হবে। আমায় খেতে দিতে বল। ফ্রান্সিস বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস খেয়ে নিল। এতক্ষণে মাথা শরীর যেন শান্ত হল।

ফ্রান্সিস বলল—আমি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেব। একটু রাত হলেই চিচেন ইতজায় যাবো। কাজে নামবো। ফ্রান্সিস গায়ের জামাটা খুলে সরাইখানার বিছানায় শুয়ে পড়ল। শরীর এত ক্লান্ত প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে উঠল। কিন্তু বিছানা থেকে উঠল না। শুয়ে রইল।

"তোমার কি বিশ্বাস যে, ওই দুটো ছোট্ট কুঠুরিতেই গুপ্তধন আছে?" হ্যারি বলল।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যাকগে—একটা সূত্র তো পেলাম নকশাটায়। দেখা যাক, পাই কি না। না পেলে আবার চেষ্টা করতে হবে। দেখতে হবে, অন্য কোনও উপায়ে গুপ্তধনের হদিস করা যায় কিনা।" ফ্রান্সিস বলল।

সন্ধে হওয়ার আগেই দেখা গেল রাস্তায় লোকজনের ভিড় বাড়ছে। ভিড় চলেছে পূর্ণিমা উৎসবের নাচগানের আসরে।

ফ্রান্সিস শুয়ে শুয়ে ভাবছে কীভাবে সমস্ত কাজটা সারবে।

কিছু পরে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল, "চলো সব। আজকে রাতের মধ্যেই গুপ্তধন খুঁজে বের করতে হবে। আজকের রাতটাও ভাল পেয়েছি। এক—পূর্ণচাঁদের আলো, দুই—বহু লোক পূর্ণিমা উৎসবে যাবে। নগর প্রায় জনমানবশূন্য হয়ে যাবে। সারারাত। এই দুটো সুবিধেকে কাজে লাগাতে হবে।"

দড়ি দুটো কোমরে বেঁধে নিয়ে ফ্রান্সিসরা সরাইখানার বাইরে এল। চলল চিচেন ইতজার মন্দিরের দিকে।

চাঁদের আলোয় মন্দিরের সামনে এসে দেখল বড় দরজাটা খোলা। তারপর চত্বরে বর্শা হাতে দুই প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। মন্দিরে কোনও জনপ্রাণী নেই। একেবারে শূন্য।

ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল, "শাঙ্কো, ডান দিকের দাড়িওয়ালা আমার বাঁদিকেরটা তোমার। দু'জন প্রহরী চত্বরে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে।"

দেওয়ালের আড়ালে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো প্রহরী দু'জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রহরী একজনের হাতে বর্শা রইল কিন্তু অন্যজনের বর্শা ছিটকে গেল। দু'জনেই মন্দির চত্বরে পড়ে গেল। প্রহরী

দু'জনের কোমরের ফেট্টি খুলে নিল ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো। যার হাতে বর্শা ছিল তার হাতটা শাঙ্কো পা দিয়ে চেপে ধরল। প্রহরীটি বর্শা ছেড়ে দিল। এবার ফেট্টি দিয়ে দু'জনের মুখ বাঁধা হল। প্রহরী দু'জন চেঁচিয়ে ওঠারও সময় পায়নি—এত দ্রুত দু'জনের কোমরের ফেট্টি চেপে বাঁধা হল মুখ। তারপরে কাটা দড়ি দিয়ে দু'জনের হাত বাঁধা হল। একজন প্রহরী মুখে গোঁ গোঁ শব্দ করছিল। ফ্রান্সিস তার মুখে জোরে এক চড় কষাল। গোঙানি বন্ধ হয়ে গেল।

এবার প্রহরী দু'জনকে তাদের থাকার ঘরের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। একটা ঘরের দরজা খুলে দু'জনকে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ফ্রান্সিস একজন প্রহরীর ফেট্টি খোলার সময় ঘরের চাবিটা পড়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সিস সেটা তুলে নিজের কোমরের ফেট্টিতে রেখেছিল।

এবার সেই চাবি দিয়ে ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে ফ্রান্সিসরা মন্দিরের ডান দিকের দেওয়ালের কাছে এল। তখনই ফ্রান্সিস বলে উঠল, ''হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে। আসার সময় একটা কুড়ুল আনতে ভুলে গেছি। কিন্তু দেরি করা যাবে না। শাঙ্কো একটা কুড়ুল নিয়ে এসো। নইলে সব চেষ্টা বৃথা।''

শাঙ্কো প্রহরীদের ঘরের কাছে এল। প্রহরীদের নিশ্চয়ই এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হয়। তা হলে কাঠকুটো জোগাড় করতে হয়। কাঠ কাটতেও হয়। তার মানে কুড়ুল লাগে।

শাঙ্কো প্রহরীদের যে ঘরে আটকে রাখা হয়েছে তার পাশের ঘরটার দোরগোড়ায় এল। ঘরটার বারান্দায় চাঁদের উজ্জ্বল আলো পড়েছে। সেই উজ্জ্বল আলোয় ঘরের অন্ধকার অনেকটা দূরীভূত হয়েছে। শাঙ্কো ঘরে ঢুকল। দেখল—একপাশে কাঠটাঠ রাখা। শাঙ্কো কাঠগুলোর কাছে এল। দেখল পাশেই একটা কুড়ুল পড়ে আছে। শাঙ্কো কুড়ুলটা তুলে নিল। বাইরে এল। দেখল, কুড়ুলটা ছোট। কিন্তু মুখটা বেশ ধারালো। শাঙ্কো ফিরে এল।

ফ্রান্সিস কুড়ুলটা নিল। কুড়ুলটা ছোট হয়ে ভাল হয়েছে।

এবার ফ্রান্সিস জংলা গাছ ঝোপের মধ্যে দিয়ে দেওয়ালের কাছে এল। দেওয়ালের নীচের দিকে পাথরের পাটা ভেঙে পা রাখার ব্যবস্থা সেই বয়স্ক লোকটি করে রেখেছিল।

ফ্রান্সিস খোঁদলে পা রেখে রেখে অনেকটা উঠে এল। এই খোঁদলগুলো সেই বয়স্ক লোকটি কুড়ুল চালিয়ে ভেঙে ভেঙে করেছিল। এবার ফ্রান্সিস চাঁদের আলোয় দেখে দেখে পাথরের পাটায় কুড়ুল চালিয়ে খুলে ফেলতে লাগল। আর সব লোকজন পূর্ণিমার উৎসবে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অস্পষ্ট গানবাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কুড়ুল চালাবার শব্দ আর কে শুনবে বন্দি প্রহরী দু'জন ছাড়া।

আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিস উঠতে লাগল। একটা-দুটো পাথরের পাটা খসিয়ে ফ্রান্সিস নীচে ফেলে দিচ্ছে। ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্রান্সিস দেওয়ালের মাথায় উঠে গেল। নীচে দাঁড়ানো হ্যারি, শাঙ্কো, আলফান্সো তাকিয়ে আছে ফ্রান্সিসের দিকে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় ফ্রান্সিসকে ওরা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

এবার ফ্রান্সিস দেওয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে কুঠুরিতে যাওয়ার কাঠের আর গুঁড়ো পাথরচুন দিয়ে তৈরি লম্বা অংশটা দেখল। এখান থেকে সাঁকোর মতো ওটার ওপর দিয়ে হেঁটে কুঠুরি দুটোয় যাওয়া যাবে।

ফ্রান্সিস চারদিক ভাল করে দেখে নিল। না—কুঠুরিতে যাওয়ার অন্য কোনও পথ নেই। ফ্রান্সিস সেই পাটাতন দিয়ে তৈরি পথটায় ডান পা রাখল। পা দিয়ে চাপ দিয়ে বুঝল দীর্ঘদিনের রোদ বৃষ্টি জলে পাটাতনটা বেশ নরম হয়ে গেছে। পায়ের চাপ দিলে দোল খাচ্ছে ওই পাটাতনটা।

ফ্রান্সিস চাঁদের আলোয় সব দেখতে পাচ্ছিল। পা-টা তুলে এনে নিচু হয়ে হাত রাখল ওই পাটাতনে। স্পষ্ট বুঝল পাটাতনটা পড়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস হাত তুলে নিয়ে এবার আবার বাঁ-পাটা রাখল। চাপ দিয়ে দাঁড়াতে গেল। পাটাতনটায় কড়কড় শব্দ হল। ফ্রান্সিস বুঝল ওই পাটাতনে একটু বেশি চাপ পড়লে ভেঙে পড়বে।

ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে নকল নকশাটা বের করল। হ্যারি নকশাটা নকল করে রেখেছিল। ভাল করে দেখল—ওই অস্পষ্ট রেখাটা কুঠুরির দিকেই যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে তা অসম্ভব। হয়তো পাথরকুচি চুন বালি জল মিশিয়ে দেওয়া আস্তরণটা আগে শক্ত ছিল। কিন্তু এখন রোদ বৃষ্টিতে পাটাতনটা নরম হয়ে গেছে। অল্প ধাক্কায় ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফ্রান্সিস কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। হ্যারিদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে মনস্থির করতে পারত। কিন্তু এখন তার উপায় নেই। পাটাতন ভেঙে গেলে কুঠুরি দুটোও ভেঙে পড়বে। সেই ভগ্নস্তূপেই খুঁজতে হবে রাজা হুনাকিমিনের গুপ্ত ধনভাণ্ডার।

এবার ফ্রান্সিস নীচের দিকে তাকাল। দেখল শাঙ্কো ওরা ডান দিকের দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে ফ্রান্সিসের দিকে। কুঠুরি ভেঙে পড়লে ওদের কিছু হবে না। তবু সাবধানের মার নেই। ফ্রান্সিস দু'হাতের তালু গোল করে নীচের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে নিজেদের ভাষায় বলে উঠল,"কুঠুরি ভেঙে পড়বে। সাবধান।" হ্যারিরা আরও সরে গেল।

পাটাতনের কাছে এসে দাঁড়াল ফ্রান্সিস। ডান পা নামিয়ে পাটাতনে পায়ের চাপ দিতে লাগল। দু-চারবার জোরে পায়ের চাপ দিতেই কুঠুরি দুটো সশব্দে ভেঙে পড়ল সিঁড়ির ওপর। চারদিকে নৈঃশব্দের মাঝখানে বেশ জোরালো শোনাল শব্দটা। চুনের গুঁড়ো ছড়িয়ে গেল। সাদা আস্তরণ সৃষ্টি করল। হ্যারিরা চুনের সাদাটে আস্তরণ উড়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ফ্রান্সিস যত দ্রুত সম্ভব নেমে এল।

সাদা চুনের আস্তরণ উড়ে গেল। এবার সকলে ধ্বংসস্তূপের কাছে এল। চাঁদের আলোয় দেখতে লাগল যদি গুপ্তধনের কিছু নজরে পড়ে। কিন্তু চুনাপাথর বালি ছাড়া কিছু নেই।

শাঙ্কো বলল, "ফ্রান্সিস ওই কুঠুরি দুটোর কোনওটাতে গুপ্তধন ছিল না।"

"না, না" ফ্রান্সিস বলল, "এখনও সেটা প্রমাণিত হয়নি। সব পাথরটাথর সরাও।"

সকলে হাত লাগাল। ধুলো-পাথর ভাঙা কাঠ সরিয়ে দেখতে লাগল। এক জায়গায় প্রায় আধখানা দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। শাঙ্কো দেওয়ালটা বেশ গায়ের জোর খাটিয়ে তুলে ফেলল। তখনই দেখা গেল একটা লম্বাটে বাক্স। গুঁড়ো চুনের মধ্যে। শাঙ্কো বলে উঠল, "ফ্রান্সিস, এই বাক্সটা দ্যাখো।" ফ্রান্সিস ছুটে এল। বাক্সটা দেখে বলল, "রাজা হুনাকমিনের এই গুপ্তভাণ্ডার এখন আমাদের হাতে।" ফ্রান্সিস কোমর থেকে ফেট্টিটা খুলল। বাক্সটার গায়ে লেগে থাকা চুনের ধুলো মুছল। দেখা গেল কালো কাঠের বাক্সটার গায়ে সোনার মিনে করা ফুল, লতা-পাতা। মাঝখানে নৃত্যরত হরিণ। রাস্তায় লোকজনের কথাবার্তা শোনা গেল। উৎসব শেষ। সকলে বাড়ি ফিরছে। ফ্রান্সিস ফেট্টির কাপড়টা দিয়ে বাক্সটা জড়াল। তারপর চাপাস্বরে বলল, "আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। চলো সব।"

ওরা মন্দিরের চত্বর পার হচ্ছে তখনই প্রহরীদের একজনের চাপা কথা শুনতে পেল, "বাঁচাও, বাঁচাও।"

ওরা দ্রুত ছুটে এসে রাস্তায় উঠল। বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল সরাইখানার দিকে। এখন সড়কপথ জনশূন্য নয়। উৎসব থেকে লোকজন ফিরছে। কথাবার্তায় খুশির ধ্বনিতে ভরে উঠেছে বড় রাস্তাটা।

গুপ্তধনের বাক্সটা ফ্রান্সিস ফেট্টির কাপড় চাপা দিয়ে নিয়ে চলেছে।

ভোর ভোর ওরা সরাইখানায় পৌঁছল। নিজেদের জায়গায় এসে বসল। হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস, তুমি কি নিশ্চিত যে গুপ্তধন এই কাঠের বাক্সটাতেই আছে?"

"আমি নিশ্চিত—এই বাক্সটাতেই রাজা হুনাকমিন তাঁর গুপ্তধন রেখে গেছেন। নকশায় দ্যাখো এক নৃত্যরতা হরিণের ছবি আছে। বাক্সের ওপরেও সেই ছবিটাই মিনে করে করা।"

"এখন বাক্সটা কি খুলবে?" হ্যারি বলল।

"না, এখানে নয়। তুলাম যাব—আমাদের জাহাজে উঠব, তারপর।" আলফান্‌সো বলল, "আমার একটা কথা ছিল। আমাকে বলেছিলেন—"

ফ্রান্সিস বলে উঠল, "ঠিক, ঠিক। আমার মনেই ছিল না। হ্যাঁ। হ্যারি আলফান্‌সো নতুন করে জীবন শুরু করুক, ওইজন্যই আমি ওকে গুপ্তধনের কিছু অংশ দেব।"



"তা হলে তো বাক্স খুলতেই হয়।" হ্যারি বলল।

"ঠিক আছে।" কথাটা বলে ফ্রান্সিস ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে দেখল। উৎসব শেষ। অনেক লোক চলে গেছে। পাঁচ-ছ'জন লোক এদিক-ওদিক শুয়ে-বসে আছে। ফ্রান্সিস বলল, "এখন খোলা যাবে। কিন্তু আসল জিনিসটাই তো নেই। বাক্সটার চাবি কোথায়?"

শাঙ্কো বলল, "উপায় নেই ফ্রান্সিস, বাক্সটা ভাঙতে হবে।"

"বুঝলাম, কিন্তু কীভাবে ভাঙবে।" ফ্রান্সিস বলল।

"একটা সরু লম্বা পেরেক চাই। তা হলেই তালাটা ভাঙা যাবে।" শাঙ্কো বলল।

"তা হলে সেইরকম একটা পেরেক জোগাড় করো।" ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি বলল, "শাঙ্কো, বাক্সটা এখানে ভাঙা উচিত হবে না। এখানে লোক কম থাকলেও বাক্স ভাঙা আর ভাঙা বাক্স থেকে সোনা, মণি-মাণিক্য বের হলে এই কয়েকজনের নজরে পড়বেই। দৃশ্যটা সাধারণ দৃশ্য থাকবে না। অত দামী দামী জিনিস, এরাই হয়তো আমাদের কাবু করে সব মূল্যবান জিনিস নিয়ে পালাতে পারে।"

"তা হলে তুমি কী বলো?" ফ্রান্সিস বলল।

"এই সরাইখানার পেছনেও দু-একটি ঘর আছে। রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘর। এখন সকালের খাবার তৈরি হচ্ছে। রাঁধুনিরা সব রান্নাঘরে। ভাঁড়ার ঘর ফাঁকা। ওখানে গিয়ে বাক্স ভাঙতে হবে। তা হলে আর কারও কিছু সন্দেহ হবে না। সবচেয়ে বড় কথা, মূল্যবান কিছুই কারও নজরে যেন না পড়ে।" ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল, "হ্যারি ধন্যবাদ। এতটা আমি ভাবিনি। তা হলে শাঙ্কো—যাও। রাঁধুনিদের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করো। সেই সঙ্গে পেরেকের খোঁজটাও করো।"

শাঙ্কো চলে গেল। পেছনে রান্নাঘরে এল। দেখল দু'জন খাবার তৈরি করছে। একজন সেসব কাঠের গামলায় তুলছে।

শাঙ্কো সেই পরিবেশনকারীকে বলল, "আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল।"

"বলুন।" লোকটি বলল।

"আপনাদের পাশের ভাঁড়ার ঘরে তো কেউ নেই এখন?" শাঙ্কো বলল।

"না। কেন বলুন তো?" লোকটি বলল।

"একটা বাক্স আমাদের সঙ্গে ছিল। তার চাবিটা খুঁজে পাচ্ছি না। কাজেই বাক্সটা ভাঙতে হবে। আপনাদের ভাঁড়ার ঘরে বাক্সটা নিয়ে গিয়ে তালা ভাঙব। এখন আপনারা যদি অনুমতি দেন।"

শাঙ্কোর এত সম্মান দিয়ে কথা বলায় রাঁধুনি খুব খুশি। বলল, "যান না।"

"তখন ওই ঘরে কেউ যাবে না তো?" শাঙ্কো বলল।

"না। কেউ যাবে না।" লোকটি বলল।

"আচ্ছা, আপনারা তো কখনও বস্তাটস্তা সেলাই করেন। সেইরকম সূচ আছে আপনাদের কাছে?" শাঙ্কো বলল।

"ওরকম দুটো সূচ আছে আমাদের।" লোকটি বলল।

"তার একটা পাব?" শাঙ্কো বলল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভাঁড়ার ঘরের কাঠের তাকের ওপর আছে।" লোকটি বলল।

"ঠিক আছে। তা হলে আমাদের বাক্সটা নিয়ে আসছি।" শাঙ্কো বলল।

"আসুন।" রাঁধুনি বলল।

শাঙ্কো এসে সব বলল। ফ্রান্সিস হেসে বলল, "শাবাশ শাঙ্কো।"

সকলে ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলল। শাঙ্কো কাপড় জড়ানো বাক্সটা নিয়ে চলল।

ভাঁড়ার ঘর এই সকালেও একটু অন্ধকার-অন্ধকার। শাঙ্কো তাকটায় হাত দিয়ে খুঁজল। দুটো সরু সূঁচ পেল। দু-তিনটে কাঠের পাটাতনের ওপর আটা-ময়দা এসবের বস্তা রাখা। শাঙ্কো সেই পাটাতনের ওপর বাক্সটা রাখল। তারপর চাবির ফুটোয় সূঁচটা ঢুকিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাতে লাগল। কিন্তু বাক্স খুলল না। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর হাত থেকে সূচটা নিল। ঘোরাতে লাগল। কিন্তু তালা খুলল না। ফ্রান্সিস বলল, "এভাবে খোলা যাবে না। ভেতরের তলাটা ভাঙতে হবে। তার জন্য লম্বা পেরেক, হাতুড়ি চাই। শাঙ্কো, দ্যাখো একটা হাতুড়ি, পেরেকের ব্যবস্থা করতে পারো কি না।"

শাঙ্কো আবার সেই রাঁধুনির কাছে গেল। দেখল সেই রাঁধুনি নেই। অন্য রাঁধুনি বলল, "ও সকালের খাবার দিচ্ছে। কিছু পরে আসবে।"

শাঙ্কো ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল, "বাক্সটা নিয়ে চলো সকালের খাবারটা খেয়ে আসি। তারপর তো হাতে যথেষ্ট সময় থাকবে।"

সকলে সকালের খাবার খেতে এল। খাওয়ার পর ওরা চলল পেছনের ভাঁড়ার ঘরের দিকে। শাঙ্কো চলল সরাইখানার মালিকের কাছে। হাতুড়ি, পেরেক চাই। মালিক বলল কিছু পেরেক একটা কাঠের বাক্সে ছিল। হাতুড়িও ছিল। কিন্তু এখন কোথায় সেগুলো সে জানে না। খুঁজতে হবে।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল সব। ফ্রান্সিস বলল, "তা হলে হাতুড়ি, পেরেক খোঁজা যাক।"

শাঙ্কো চারদিকে যখন তাকিয়ে দেখছে, তখনই নজরে পড়ল কুড়ুলটা। পাশেই কাঠের চ্যালা রাখা। শাঙ্কো ছুটে কুড়ুলটা নিয়ে এল।

ফ্রান্সিস বলল, "কী হলো?"

"কুড়ুল দিয়ে বাক্সটার তালার জায়গাটা ভেঙে ফেলব।" শাঙ্কো কথাটা বলে বাক্সটা মাটির মেঝেয় রাখল। তারপর কয়েকটা চ্যালাকাঠ নিয়ে এল। কুড়ুল দিয়ে কাটতে লাগল। আলফান্‌সো বলল, "আপনি কী করছেন?" শাঙ্কো কোনও কথা বলল না। হ্যারি ব্যাপারটা বুঝতে পারল না।

ফ্রান্সিস বলে উঠল, "শাবাশ শাঙ্কো।"

"আর ব্যাপারটা কী?" হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, "শাঙ্কো কাঠের বাক্সে কুড়ুল চালাবার আগে কাঠ কাটছে। সবাই কাঠ কাটছে এইটাই বুঝবে। তার মধ্যেই শাঙ্কো বাক্সটায় কুড়ুলের ঘা বসাবে। সকলে ভাববে কাঠই কাটা হচ্ছে। অন্য কিছু নয়।" ফ্রান্সিসের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাঙ্কো কাঠের বাক্সের চাবির ছিদ্রের ফুটোটার ওপর জোরে কুড়ুল চালাল। বাক্সটার ডালাটা ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে বাক্সটার ভাঙা ডালাটা তুলতে গেল। তখন সকলে ভাঙা বাক্সটার কাছে এল।

ফ্রান্সিস ভাঙা ডালাটা টান দিতেই উঠে এল। মণিমাণিক্যে ভর্তি ভাঙা বাক্সটা। কতরকম গয়না, অলঙ্কার। সেগুলো থেকে হীরের দ্যুতি বের হচ্ছে। ফ্রান্সিস ওপর থেকে বিচিত্র নকশার গয়নাগাঁটিগুলো নামিয়ে রাখল। সেসবের নীচেই অনেক স্বর্ণমুদ্রা।

সেই অতি মূল্যবান অলঙ্কার, মিনে করা ছোট্ট ছুরির বাঁট, সোনার ফ্রেমে বাঁধানো আয়না এসব দেখে আলফান্‌সোর চোখ তখন ছানাবড়া। এত মূল্যবান জিনিস! ফ্রান্সিস, হ্যারি, শাঙ্কোর কাছে এরকম ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। কাজেই ওরা অবাক হল না।

ফ্রান্সিস বলল, "হ্যারি, শাঙ্কো এসব এখানেই ভাগ করে আমরা নিয়ে যাব। কী বলো?"

"বাক্স ঢেকে রাখো।" হ্যারি বলল।

"শুধু বাক্স ঢেকে রাখা নয়। একেবারে এখানেই সব সেরে নিই। এ রকম শূন্য ঘর এখানে আর কোথাও পাব না।" ফ্রান্সিস বলল।

"ঠিক আছে। যা করার তাড়াতাড়ি করো।" হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস বাক্স থেকে সোনার মুদ্রাগুলো সব তুলতে তুলতে বলল, "হ্যারি তোমার কোমরের ফেট্টিটা খুলে পাতো।" হ্যারি ফেট্টি খুলে পাতল। ফ্রান্সিস সোনার মুদ্রাগুলো সেই কাপড়ে ঢালল। তারপর কাপড়টা পেঁচিয়ে নিয়ে তার মধ্যে সোনার মুদ্রাগুলো বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিল।"

"আলফান্‌সো, আমরা এখন চলে যাব। আমরা আর দেরি করতে পারব না। তুমি কাঠের বাক্সে অলঙ্কারগুলো ভরে কোমরের ফেট্টি খুলে তাতে বেঁধে নাও। বাক্সটা এখানেই রেখে দাও।" ফ্রান্সিস বলল।

"কিন্তু বাক্সটার গায়ে সোনার গিল্টিগুলো রয়েছে।" আলফান্সো বলল।

"বেশি লোভ কোরো না। যাক্‌গে, তোমাকে কেন এত অলঙ্কার দিলাম এবং এসব নিয়ে তুমি কী করবে তা আমি আগেই তোমাকে বলেছি। তুমিও রাজি হয়েছ। কথার খেলাপ কোরো না।" ফ্রান্সিস বলল।

"না ফ্রান্সিস। আপনার সব নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।" আলফান্সো বলল।

"ফ্রান্সিস, এখন কী করবে?" হ্যারি বলল।

"দুপুরের খাওয়াটা খেয়ে সমুদ্রতীরের তুলাম নগরের দিকে রওনা হব। বন্ধুরা নিশ্চয়ই আমাদের কোনও খবর না পেয়ে চিন্তায় পড়েছে।

ফ্রান্সিসরা দুপুরের খাওয়া খেল। স্বর্ণমুদ্রায় ভরা পুঁটুলিটা হ্যারির কাছ থেকে নিল। শাঙ্কোকে দিয়ে বলল, "কোমরে পেঁচিয়ে নাও।" শাঙ্কো পুঁটুলিটা লম্বা করে কোমরে বেঁধে নিল।

ফ্রান্সিস বলল, "আলফান্সো, বাক্সটা এখানে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি কোমরের ফেট্টিটা খুলে বাক্সটাও জড়িয়ে নাও। কেউ যেন না দ্যাখে। তারপর তোমাকে কী করতে হবে বলেছি।"

আলফান্সো ফ্রান্সিসের ডান হাতটা জড়িয়ে ধরল। কান্না-ভেজা গলায় বলল, "আপনি আমাকে নতুন জীবন দান করলেন। এই জীবনই আমি ছেলেবেলা থেকে কামনা করেছি। আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব জানি না।"

ফ্রান্সিস হেসে আলফান্সোর পিঠে আস্তে চাপড় দিল। বলল, "তা হলে আলফান্সো, আমরা জাহাজে বন্ধুদের কাছে ফিরে যাচ্ছি। চলি।"

ফ্রান্সিস, হ্যারি, শাঙ্কো সরাইখানার পাওনা মিটিয়ে রাস্তায় নামল। আলফান্সো তখনই তাড়াতাড়ি ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল, "আপনাদের অতটা পথ হেঁটে যেতে কষ্ট হবে। আমি একটা শস্যটানা গাড়ি নিয়ে আসছি। আপনারা অপেক্ষা করুন।"

ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে পড়ল। আলফান্সো ডানদিকের গলিপথে ঢুকল। কিছুক্ষণ পরে ও একটা শস্যটানা গাড়িতে চড়ে এল। গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাড়া ঠিক করে দিল।

ফ্রান্সিসরা গাড়িটাতে উঠল। এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি চলল কোবা নগরের দিকে।

ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে ওরা কোবা নগরে পৌঁছল। সেখানে এক সরাইখানায় রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে একটা গাড়ি ভাড়া করে চলল তুলাম নগরের দিকে।

বিকেলের দিকে তুলাম নগরে পৌঁছল। জাহাজঘাটায় এল। দূর থেকে বন্ধুরা ফ্রান্সিসদের দেখতে পেল। অনেকটা ছুটে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো।

সকলে জাহাজে উঠল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, "ভাইসব, এবার আমি বাধ্য হয়ে গুপ্তধনের অংশ নিয়েছি। বাকিটা একজন বিশ্বস্ত লোককে দিয়েছি। এবার চলো আমাদের মাতৃভূমির দিকে।"

বন্ধুরা সঙ্গে সঙ্গে পাল খাটাতে চলল। ঘড়ঘড় শব্দে নোঙর তোলা হল। জাহাজ চলল। জোর বাতাসে পালগুলো ফুলে উঠল। দাঁড় টানার প্রয়োজন নেই। সমুদ্রের জলের ঢেউ ভেঙে জাহাজ চলল।

পাথরের ফুলদানি



পাথরের ফুলদানি

গতকাল গভীর রাতে পেড্রো সমুদ্রতীর দেখেছিল। কয়েক মাস পর ওরা ডাঙার খোঁজ পেল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা খুশিতে তখন লাফালাফি করছে। ফ্রান্সিসেরও ঘুম ভেঙে গেল। মারিয়াও খুশি। বলল—ডাঙা দেখা গেছে। ঐ ডাঙায় যারা থাকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে জানা যাবে আমরা কোথায় এলাম। আমাদের দেশই বা কতদূরে।

—হ্যাঁ। তা জানা যাবে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বিছানা থেকে উঠে বলল—কিন্তু অজানা জায়গায় নামা বিপজ্জনক।

—সেই ভয় পেলে তো কিছুই করা যায় না। মারিয়া বলল।

তখনই দরজায় টোকা দেবার শব্দ হল। ফ্রান্সিস দরজা খুলল। হ্যারি দাঁড়িয়ে। হ্যারি হেসে বলল—ডাঙা দেখা গেছে। এখন এটাই ভাববার যে আমরা এখানে নামবো কি না।

ফ্রান্সিস বলল—নেমে লোকজনের দেখা পেলে তবে তো বুঝতে পারবো কোথায় এলাম।

—তা তো বটেই—ফ্রান্সিস বলল—এখন ভোর হয়ে আসছে। তৈরি হয়ে যেতে যেতে সকাল হয়ে যাবে। তখন ঐ ডাঙায় যাওয়া বিপজ্জনক।

—তবে তো কাল রাত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। হ্যারি বলল।

—তাই হবে। কাল রাত বাড়লে আমরা যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। হ্যারি মারিয়াকে বলল—রাজকুমারী—কয়েক মাস ধরে আপনি নিশ্চয়ই খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন।

—দুশ্চিন্তা হয় না? চারদিকে শুধু জল আর জল। মাটির দেখা নেই। এটা ভালো লাগে? রাজকুমারী মারিয়া বলল।

—তা তো বটেই। যাক গে—ডাঙার খোঁজ পাওয়া গেছে। এটাই বড় কথা। চলি।

হ্যারি চলে গেল। ফ্রান্সিস এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মারিয়াও নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হল। সকালের খাওয়া দাওয়া চলল। তখনই রাঁধুনী হ্যারির কাছে এল। হ্যারি বলল—কী ব্যাপার?

—ব্যাপার বড় চিন্তার। রাঁধুনী বলল।

—চিন্তার? কী হয়েছে? হ্যারি বলল।

—খাবার জল ফুরিয়ে এসেছে। দু'একদিনের মধ্যেই খাবার জল ফুরিয়ে যাবে। রাঁধুনি বলল।

—বলো কি। হ্যারি বেশ চিন্তায় পড়ল। বলল—দেখি। ফ্রান্সিসকে বলছি।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরের সামনে এল। দরজায় টোকা দিল। ফ্রান্সিস একটা থালায় সকালের খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে বলল—দরজা খোলা। হ্যারি ঘরে ঢুকল। বলল—ফ্রান্সিস—ভীষণ সমস্যায় পড়লাম।

—কেন? কি হয়েছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—রাঁধুনী বলে গেল—খাবার জল ফুরিয়ে আসছে হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল—জল কম খেতে হবে। একটু পরেই আমাদের ডাঙায় নামতে হবে। খাবার জলের খোঁজ করতে হবে। জল আনতে হবে।

—এই দিনের বেলাই যাবে? হ্যারি বলল।

—তাই যেতে হবে। উপায় নেই। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলবে না।

—দিনের বেলা যাবো? বিপদে পড়বো না তো? হ্যারি বলল।

—দেখা যাক। বিপদ হতে পারে। তার মোকাবিলা করবো। তরোয়ালের লড়াই এ নামতে হলে নামবো। তবে সবই করতে হবে খুব হিসেব করে। অবস্থা বুঝে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে দেরি করে কি লাভ। এখুনি চলো। হ্যারি বলল।

—তুমি আর শাঙ্কো তৈরি হও। আমি আসছি। ফ্রান্সিস বলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস তরোয়াল কোমরে ঝুলিয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। ততক্ষণে হ্যারি শাঙ্কো উঠে এসেছে।

ভাইকিং বন্ধুরা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—খাবার জল ফুরিয়ে গেছে। আমরা খাবার জল আনতে যাচ্ছি। বিপদ আপদ হতে পারে। কিন্তু আমি তার পরোয়া করছি না। আমাদের যদি ফিরতে দেরি হয় তোমরা দুশ্চিন্তা করো না।

ওদিকে শাঙ্কো দুটো জলের পীপে জাহাজের দড়ি দড়া ধরে ধরে ছোট নৌকোয় তুলেছে। ফ্রান্সিস হ্যারি হালের দিকে আসছে তখন হ্যারি আস্তে বলল—ফ্রান্সিস রাজকুমারীকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে যাও। ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। মারিয়া পেছনে পেছনে আসছিল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। মারিয়াকে বলল—মারিয়া দুশ্চিন্তা করো না। আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

দড়ির মই হালের কাছে নিচে নামিয়ে দেওয়া হল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি মইয়ের সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে ছোট নৌকোটায় নেমে এল। শাঙ্কো নৌকোটার বাঁধা দড়ি খুলে দিল। নৌকোটা জাহাজের গা থেকে সরে এল। শাঙ্কো বৈঠা বাইতে লাগল। নৌকো তীরভূমির দিকে চলল।

ফ্রান্সিস ডাঙার দিকটা চোখ কুঁচকে দেখতে লাগল। রোদ বেশ চড়া। ডাঙার বাঁপাশে দেখল শুধু বালি। মাটি নেই। ডানপাশে মাটি দেখল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে নরম মাটি নয়। বেশ শক্ত মাটি। ঘরবাড়ি বা লোকজন দেখা গেল না। ফ্রান্সিসের

তখন একটাই চিন্তা—এখানে তো নামবো কিন্তু এখানে খাবার জল পাবো তো? তখনই দেখল ডানদিকে একটা টিলার মত।

শাঙ্কো নৌকো তীরে ভেড়াল। তিনজনেই নামল। শাঙ্কো বৈঠা রেখে নৌকোটা টেনে তীরের বেশ কিছু ওপরে নিয়ে এসে রাখল। যদি খুব জোর জোয়ারও আসে নৌকোটা ভেসে যাবে না।

এবার তিনজনে খালি জলের পীপে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিস বলল—বাঁ দিকটা মনে হচ্ছে মরুভূমি। ডানদিকে ঐ টিলাটার দিকে চল। তিনজনে দুটো পীপে নিয়ে চলল।

ওরা টিলার কাছে এল। ছোট টিলা। শুকনো খটখটে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার টিলার নিচটা—কিছু ওপাশে ছোট বুনো গাছ ফার্ণ গাছ। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—হ্যারি—এখানে জল আছে। টিলার ওপাশে চল। ওরা টিলাটা ঘুরে ওপাশে আসছে তখন খুব মৃদু জল পড়ার আওয়াজ শুনল। কাছাকাছি আসতেই দেখল টিলার মাঝামাঝি জায়গা থেকে জল বেরোচ্ছে। ঝর্ণা। জল নিচে পড়ে পড়ে গর্ত হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো গর্ত মত জায়গাটাতে পীপে বসাও। তবে খুব বেশি জল পড়ছে না। পীপে ভরতে সময় লাগবে।

শাঙ্কো গর্তটায় পীপে বসাল। পীপেয় জল পড়তে লাগল। শাঙ্কো ওখানে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি টিলার ছায়ায় বসে রইল।

একটা পীপে ভরে গেল। শাঙ্কো পীপেটা ধরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁধে তুলে নিল। নিজেদের নোঙর করা জাহাজের দিকে চলল। ফ্রান্সিস অন্য পীপেটা বসাল। পীপেটা ধরে রেখে ঝর্ণার জল ভরতে লাগল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। তখনও পীপেটা জলে ভরে নি। ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল—হ্যারি আমরা বোধহয় বিপদে পড়লাম। পেছনের জংলা ডালপাতা ভাঙবার শব্দ হল। পাঁচ-ছ'জন ইনকা যোদ্ধা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে ঘিরে দাঁড়াল। যোদ্ধাদের মাথায় ফেট্টির মতো বাঁধা, তাতে নানা পাখির পালক গোঁজা। যোদ্ধাদের পরনে নানা রঙের পোশাক। তাতে রঙীন সুতোর কাজ করা। মাথায় লম্বা চুল। বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। তখনই ফ্রান্সিসের পীপেটা ভরে গেছে।

ইন্‌কা যোদ্ধাদের দলনেতা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস আর হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা কারা? কোত্থেকে এখানে এসেছো? হ্যারি বলল—আমরা ভাইকিং। আমাদের জাহাজে চড়ে আমরা নানা দেশ ঘুরে বেড়াই। গুপ্তধনের কথা শুনলে আমরা সেই গুপ্তধন উদ্ধার করি।

—তারপর গুপ্তধন নিয়ে পালাও। দলনেতা বলল।

—এই অভিযোগ মিথ্যে। ফ্রান্সিস বলল।

এবার দলপতি তরোয়াল কোষবদ্ধ করল। বলল—তোমাদের তরোয়ালও ফেলে দাও। ফ্রান্সিস আর হ্যারি তরোয়াল রেখে দিল বালির উপর। দলপতি বলল—এখন বলো তো, এখানে কেন এসেছো?

—আমাদের জাহাজে পানীয় জল ফুরিয়ে গেছে। এখানে ঝর্ণা থেকে জল নেব বলে এসেছিলাম। আমাদের কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—যা হোক—তোমাদের বন্দী করা হল। দলপতি বলল।

—আমরা তো কোন অপরাধ করি নি। তাছাড়া আমাদের জাহাজে আমাদের বন্ধুরা সব তৃষ্ণার্ত। তাদের জন্যে এই জলভরা পীপে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এটা জাহাজে পৌঁছে দিয়ে আমি চলে আসবো। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি পালাও? দলপতি বলল।

—আমার বন্ধু হ্যারি রইল। বন্ধুকে ফেলে তো পালাতে পারবো না।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—শাঙ্কো আসছে। শাঙ্কো আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। বুঝল ওরা বন্দী হল।

—শাঙ্কো তরোয়াল ফেলে দাও। শাঙ্কো ওদের কাছে এল। তরোয়াল কোমরের ফেট্টি থেকে বের করে বালির ওপর ফেলে দিল। দলপতি একজন ইনকা সৈন্যকে ইঙ্গিত করল। সেই সৈন্যটি তরোয়ালগুলো তুলে নিল। নিজের কোমরে প্যাঁচানো দড়ি খুলল। তরোয়ালগুলি বেঁধে ঝুলিয়ে নিল।

—তাহলে আমি জলের পীপেটা জাহাজে রেখে আসছি। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি যদি আর না ফেরো? দলপতি বলল।

—দুই বন্ধুকে ফেলে পালাবো? ফ্রান্সিস বলল।

—তা পারো। দলপতি বলল।

—আমাদের বন্ধুত্ব অত ঠুনকো নয়! যাক গে বেলা বাড়ছে। আমি যাচ্ছি।

—তুমি যদি না ফেরো তাহলে তোমার বন্ধুদের এখানেই হত্যা করা হবে। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি শাঙ্কো আমি জলের পীপে পৌঁছে দিয়ে আসছি। শাঙ্কো ওদের দেশী ভাষায় বলল—বন্ধুদের এনে লড়াই করতে পারি। এরা ছয় জন।

—না। ঐ দেখ। ঘোড়ায় চড়ে ইন্‌কা যোদ্ধারা আসছে। মানে সৈন্যাবাস কাছেই আছে।

দলপতি ফ্রান্সিসকে বলল—বেলা বাড়ছে। জল নিয়ে যাও। তারপর ফিরে এসো।

ফ্রান্সিস দেখল ঘোড়ায় চড়ে ইন্‌কা যোদ্ধারা এদিকেই আসছে। ফ্রান্সিস পীপেটা কাঁধে তুলে নিল। চলল ওদের জাহাজের দিকে।

টিলার পাশেই কয়েকটা পাথরের খণ্ড পড়ে ছিল। হ্যারি তার একটাতে বসল। শাঙ্কোও পাশে বসল। যোদ্ধারাও কয়েকজন পাথরে বসল। এখানে ঝর্ণাটা আছে বলে পাথরগুলো খুব গরম নয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস নৌকো চালিয়ে তীরে উঠল। নৌকোও পারের ওপর দিকে টেনে এনে রাখল।

ফ্রান্সিস হ্যারিদের কাছে এসেছে তখনই সাত আটজন অশ্বারোহী যোদ্ধা ওখানে এল। টিলাটার ওধারে যোদ্ধারা বসেছিল। অশ্বারোহী যোদ্ধারা ওখানে এল। অশ্বারোহীদের মধ্যে সবচেয়ে সামনে আসছে একজন একটা ধবধবে সাদা ঘোড়ায় চড়ে।

যোদ্ধারা উঠে পরপর দাঁড়াল। বোঝা গেল অশ্বারোহী যোদ্ধাদের মধ্যে ঐ লোকটিই সেনাপতি। গায়ে সুতীর কাজ করা পোশাক। কপালে নীল রঙের ফেট্টি। তাতে পাখির পালক গোঁজা। কোমরে কোষবদ্ধ তরবারি। তারা সংখ্যায়-সাত আটজন। তারা আগের যোদ্ধাদের সামনে এল। সেনাপতি দলনেতাকে বলল—কাপাকের কোন খোঁজ পেলে? যোদ্ধারা মাথা নুইয়ে সেনাপতিকে সম্মান জানাল। দলপতি বলল—না। আমরা চারদিকে খোঁজখবর নিচ্ছি।

—হ্যাঁ। তল্লাশী চালিয়ে যাও। সেনাপতি বলল। তারপর ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বলল—এরা কারা?

—এরা ভাইকিং। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। গুপ্তধন আবিষ্কার করে।

—ও। ওদের বন্দী করে রাখো। ভাইকিংরা জলদস্যু। সেনাপতি বলল।

—এ আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা। যারা শৌর্যে বীর্যে আমাদের সঙ্গে পারে না তারা এসব কুৎসা রটনা করে। হ্যারি বলল।

—তোমাদের কয়েদঘরেই থাকতে হবে। সেনাপতি বলল।

—কিন্তু কেন? আমরা কী অপরাধ করেছি? ফ্রান্সিস বলল।

—সেসব বিচার করবেন রাজা পাচাকুটি। সেনাপতি বলল।

সেনাপতি আর যোদ্ধারা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

ফ্রান্সিস দলপতির দিকে তাকিয়ে বলল—আমাদের কী হবে?

দলপতি বলল—তোমরা তো বন্দী। আমাদের সঙ্গে যাবে রাজধানী কুজকোয়। রাজা পাচাকুটির রাজসভায় তোমাদের যেতে হবে। তারপরে বন্দী জীবন মেনে নিতে হবে। ফ্রান্সিস চড়া গলায় বলল—আমাদের কী পেয়েছো? তোমাদের দাস?

—বেশি মেজাজ দেখিও না। জানো তোমাদের এক্ষুনি খতম করতে পারি। দলনেতা বলল।

—আমাদের লড়াই করার সুযোগ না দিয়ে পারবে। কিন্তু যদি আমাদের হাতে তরোয়াল দাও—তোমরা ধূলোর মতো উড়ে যাবে। আমাদের হাতে তরোয়াল থাকলে স্বয়ং শয়তানও আমাদের ভয় করে। তোমরা তো শিশু। ফ্রান্সিস বলল। ফ্রান্সিসের কথা শেষ হবার আগেই শাঙ্কো বলে উঠল—ফ্রান্সিস—লড়াই। যে সৈন্যের হাতে দড়িবাঁধা ওদের তিনটে তরোয়াল ছিল শাঙ্কো সেই সৈন্যটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সৈন্যটি ছিটকে পড়ে গেল। শাঙ্কো অতি দ্রুত একটা তরোয়াল খুলে ফ্রান্সিসের দিকে ছুঁড়ে দিল। ফ্রান্সিস তরোয়ালের হাতলটা ধরে ফেলল। শাঙ্কো নিজেও একটা তরোয়াল নিল। অন্যটা হ্যারিকে দিল। ওদিকে সৈন্যরাও তখন তরোয়াল কোষমুক্ত করেছে।

শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। ফ্রান্সিস দলপতির সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। তরোয়াল চালাতে চালাতে বলল—তোমরা অস্ত্র ত্যাগ কর। নইলে মরবে। জাহাজ থেকে যদি আমার বন্ধুরা আসে তোমরা কেউ বাঁচবে না। এখনও বলছি অস্ত্র ত্যাগ কর। আমরা জাহাজে ফিরে যাব। কিন্তু দলপতি তাতে কর্ণপাত করল না। তরোয়াল চালাতে লাগল। এবার ফ্রান্সিস তরোয়াল পেছন দিক থেকে ঘুরিয়ে এনে দলপতির

তরোয়ালে এত জোরে ঘা মারল যে দলপতির হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। ও বালির ওপর পড়ে গেল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে তরোয়ালের গা-টা দলপতির গলায় ঠেকিয়ে বলল—বাঁচতে চাও না মরতে? সেনাপতি হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল। অন্য সৈন্যরাও লড়াই থামাল। দলপতি বলল—চল। অন্য সৈন্যরা তরোয়াল খাপে ঢুকিয়ে দলপতির পেছনে পেছনে চলল। মরুভূমির ওপর দিয়ে ওরা হেঁটে চলে গেল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি জাহাজে চল। তিনজনে সমুদ্রের দিকে নামতে লাগল। হ্যারির বাঁ কাঁধে তরোয়াল ছুঁয়ে গেছে। হ্যারি অল্পই আহত হয়েছে। তার কাঁধের কাছে পোশাক রক্তে ভিজে গেছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর শরীরও অক্ষত নেই। শরীরে তরোয়ালের ফলায় কেটেটেটে গেছে।

তিনজনে নৌকোটার কাছে এল। নৌকো জলে নামাল। উঠে বসল। শাঙ্কো বৈঠা বাইতে লাগল। নৌকো জাহাজের দিকে চলল।

জাহাজ থেকে দড়ির মই ফেলা হল। ফ্রান্সিসরা জাহাজে উঠে এল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে ভেন-এর কাছে এল। বলল—হ্যারির কাঁধ বর্শায় কেটে গেছে। ওষুধ দাও। ফ্রান্সিস চলে এল। ভেন হ্যারির জন্যে ওষুধ তৈরি করতে লাগল।

নিজের কেবিনঘরে ঢুকতে মারিয়া এগিয়ে এল। বর্শায় কেটে গেছে। নিশ্চয়ই তরোয়ালের লড়াই করেছো।

—আমাদের জীবনটাই তো এরকম। শুধু লড়াই। ফ্রান্সিস পোশাক খুলতে খুলতে বলল।

—না। তুমি আর তরোয়াল ধরতে পারবে না। মারিয়া বলল।

—এটা একটা কথা হল। বেঁচে থাকতে গেলে লড়াই করতেই হবে। কখনও বুদ্ধির লড়াই। কখনও শরীরের লড়াই। এই লড়াইয়ের মধ্যেই আমাদের বাঁচতে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তুমি আর লড়াইয়ের মধ্যে যাবে না। মারিয়া বলল।

—মারিয়া—তুমি তো এতদিনে আমাকে বুঝেছো। আমি সব লড়াই থামিয়ে গুপ্তধন আবিষ্কার না করে থাকবো কী করে? ফ্রান্সিস বলল।

—না। আমার ভয় করে। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস হো হো করে হেসে উঠল। বলল—এতে ভয় পাওয়ার কী আছে। চার পাঁচজনের সঙ্গে একা লড়তে গেলে একটু চিন্তা হয় বৈকি। তখন লড়াইয়ের কৌশলটা পাল্টাতে হয়। তবে আমি ভয় পাই না। একটু থেমে বলল —মারিয়া তুমি তো কখনও এত দুর্বল হও নি। হঠাৎ এত দুশ্চিন্তায় পড়লে কেন?

—না। দেশে ফিরে চল। মারিয়া বলল।

—দেশে ফিরে তো সেই খাও দাও ঘুমোও। এক নিশ্চিন্ত জীবন। এই জীবনকে মেনে নেওয়া আমার চরিত্রবিরোধী। আমি কক্ষনো মেনে নিতে পারবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—বয়েস তো হচ্ছে। মারিয়া বলল।

—যতদিন পারবো—ঘুরে বেড়াবো—এ দেশ ও দেশ দ্বীপ দেশ। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস তোমার এবার বিশ্রাম নেওয়া উচিত। মারিয়া বলল।

—অসম্ভব। আমার জীবনে বিশ্রাম বলে কিছু নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—কথা শোন। এবার দেশে চলো। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে—তোমরা ফিরে যাও। আমার বন্ধুদের মধ্যে যারা আমার সঙ্গে থাকতে চায় তারা থাকবে। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তোমাকে এই বিদেশে ফেলে রেখে আমি যাব না। মারিয়া বলল।

—আমিও সেটাই চাই। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বলল—খিদেয় পেট জ্বলছে। ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কোকে নিয়ে রান্নাঘরে এল। রাঁধুনি বন্ধুরা অতি দ্রুত ফ্রান্সিসদের খেতে দিল।

খেয়ে দেয়ে ফ্রান্সিসরা যে যার কেবিনে চলে গেল। ফ্রান্সিসও ওর কেবিনঘরে এল। তারপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। মারিয়া একটা ন্যাকড়া হাতে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস যখন পোশাক ছাড়ছে তখন দেখেছে ফ্রান্সিসের কাঁধে পিঠে তরোয়ালের কাটার দাগ। মারিয়া ভেন-এর কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এসেছে। মারিয়া ফ্রান্সিসের গায়ে সেই ওষুধ লাগানো ন্যাকড়াটা চেপে চেপে ধরতে লাগল। সেইসব কাটা জায়গাগুলো ভীষণ জ্বালা করে উঠল। ফ্রানিস মুখে শব্দ করল—আ-আ। ফ্রান্সিসের গায়ে ওষুধ দেওয়া হলে মারিয়া হ্যারি শাঙ্কোর কাছেও গিয়ে ওষুধ লাগিয়ে এল। হ্যারির কেবিনঘরে গিয়ে দেখল—ভেন হ্যারির ডান কাঁধে ন্যাকড়া বাঁধছে। মারিয়া ভেনকে বলল—খুব বেশি কেটেছে?

—তেমন কিছু নয়। তবে নিয়মিত ওষুধ লাগাতে হবে। সাতদিন একেবারে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। ভেন বলল।

—ভেন, আপনি ওষুধ খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে গেছেন তো? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ, হ্যারিকে সব নির্দেশ দিয়েছি। ভেন বলল। তারপর দুটো ওষুধের বোয়াম কাপড়ের ঝোলা হামান-দিস্তা নিয়ে ভেন চলে গেল।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর বিস্কো কেবিনঘরে এল। বেশ গরম পড়েছে। কেবিনঘরে থাকা চলবে না। ও একটা মোটা কাপড়ের চাদর নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ উঠে এল। জোর হাওয়া বইছে। বিস্কো মাস্তুলের কাছে চাদরটা পাতল। তারপর শুয়ে পড়ল। আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘ। আধখানা চাঁদ আকাশে। বিস্কো চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল। চাঁদটা কখনো মেঘে ঢাকা পড়ছে। বেশ অন্ধকার তখন। মেঘ সরে যেতেই চাঁদ বেরিয়ে আসছে। তখন আলো। চাঁদ আবার মেঘে ঢাকা পড়ছে। বিস্কো চাঁদ আর মেঘের খেলা দেখতে লাগল। তারপর পাশ ফিরে শুল। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বিস্কোর মত সাত আটজন ভাইকিং ডেক-এ ঘুমোচ্ছিল।

হঠাৎ একটা জোর শব্দ হতে বিস্কোর ঘুম ভেঙে গেল। বিস্কো এদিক ওদিক তাকালো। ভাবতে লাগল শব্দটা কোনদিকে হয়েছে? তখনই আবার শব্দ হল। বিস্কো এবার বুঝল শব্দ হয়েছে হালের দিকে। বিস্কো আস্তে আস্তে উঠে বসল। আস্তে আস্তে

পা ফেলে চলল হালের দিকে। হালের কাছে আসতেই দেখল গায়ে চাদর জড়ানো একটা লোক তখনই হাল থেকে জাহাজের ডেক-এ নামল। প্রায় অন্ধকারেই বিস্কো দেখল লোকটির কোমরে গোঁজা তরোয়াল। বিস্কো সাবধান হল। ভাবল ঐ লোকটা তরোয়াল বের করবার আগেই বিস্কো লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটা সাবধান হবার সুযোগই পেল না। চিৎ হয়ে ডেক-এর ওপর গড়িয়ে পড়ল। বিস্কো দ্রুত লোকটার কোমর থেকে তরোয়ালটা বের করে নিল। লোকটা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। বিস্কো বলল— তুমি কে? লোকটি ভাঙা গলায় বলল—দোহাই। তরোয়াল চালাবেন না। আমি সব বলছি।

—বেশ বলো। বিস্কো তরোয়াল নামিয়ে বলল। লোকটার গায়ে ইনকাদের পোষাক। বেশ ধূলো মাখা, মলিন।

বিস্কোদের কথাবার্তায় দুজন ভাইকিং বন্ধুর ঘুম ভেঙে গেল। দুজন বিস্কোদের কাছে এল। দেখল বিস্কো তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বিস্কো এক বন্ধুকে বলল—যাও ফ্রান্সিসকে ডেকে নিয়ে এসো। বন্ধুটি ছুটে গেল। একটু পরেই ফ্রান্সিস এল। বিস্কোকে বলল—কী ব্যাপার?

—এই লোকটা লুকিয়ে আমাদের জাহাজে উঠেছে। বিস্কো বলল।

ফ্রান্সিস লোকটার দিকে তাকাল। বলল, তুমি তো ইনকা?

—হ্যাঁ। লোকটা মাথা ওঠানামা করল।

—তুমি আমাদের জাহাজে এসেছো কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—আশ্রয় নিতে। লোকটি বলল।

—কেন? অন্য কোনখানে আশ্রয় নিতে পারতে। ফ্রান্সিস বলল।

—না। কোন ইনকার বাড়িতে আশ্রয় নেবার উপায় নেই। লোকটি বলল।

—কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—সব বলছি। তার আগে আমাকে খেতে দিন। দুদিন যাবৎ না খেয়ে আছি। লোকটি বলল।

ফ্রান্সিস বিস্কোকে বলল—একে আমাদের রসুইঘরে নিয়ে যাও। পেট ভরে খেতে দাও। তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার নাম কি?

—কাপাক বলেই ডাকবেন। কাপাক বলল।

—বেশ। যাও। আমি তোমার ফেরার জন্যে অপেক্ষা করছি। ফ্রান্সিস বলল।

কাপাক খেতে গেল। তখনই হ্যারি এল। বলল—ফ্রান্সিস কী ব্যাপার?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। একজন ইনকা আমাদের জাহাজে লুকিয়ে উঠেছে। আমাদের কাছে আশ্রয় চায়। ও যেন বলতে চাইছে কোন ইনকা ওকে আশ্রয় দেবে না। কারণটা ও এখনও বলেনি। দুদিন না খেয়ে আছে। তাই আগে খেতে পাঠালাম। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখা যাক—কথা বলে। হ্যারি বলল।

কিছুক্ষণ পরে বিস্কো কাপাককে নিয়ে এল। ফ্রান্সিসকে বলল কাপাক প্রায় তিনজনের খাবার খেয়েছে। বোঝাগেল ও সত্যিই খুব ক্ষুধার্ত ছিল।

ফ্রান্সিস বলল—কাপাক এবার তোমার পরিচয়টা দাও।

কাপাক বলতে লাগল—পেরুর বর্তমান রাজা পাচাকুটি। আমি তার ভাই।

—বলো কি? রাজার ভাই—তোমার এই দুর্দশা কেন? কোথাও থাকা, খাওয়ার জায়গা পাচ্ছো না! ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো তো। ফ্রান্সিস বলল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কাপাক বলল—বড়ভাই আমাকে কিছু যোদ্ধার সঙ্গে পাঠিয়েছিল— তিতিকানা হ্রদের চারপাশে যে উপজাতিরা বাস করত তাদের যুদ্ধে হারিয়ে ঐ অঞ্চল ইনকা সাম্রাজ্যের মধ্যে আনতে। আমি যোদ্ধাদের নিয়ে তিতিকানা অঞ্চলে গেলাম। সেখানকার সব উপজাতিদের যুদ্ধে হারিয়ে দিলাম। অঞ্চলটা আনলাম ইন্‌কা সাম্রাজ্যের মধ্যে। উপজাতি সর্দারদের বন্দী করলাম। তিতিকানা অঞ্চলে একজন ইনকা আর কিছু সৈন্য রেখে আমরা ফিরে আসছিলাম। তখন কয়েকজন সৈন্য আমাকে মাজোর্কা নগরের কথা বলল। মাজোর্কা নগরের কথা আমি আগেও শুনেছিলাম। সৈন্য কয়েকজন বলল—তারা খবর পেয়েছে মাজোর্কার রাজা কুয়েক হুয়া এখন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ওখানে অরাজকতা চলছে। মন্ত্রী আর সেনাপতির মধ্যে মনোমালিন্য চলছে। সৈন্যরাও বুঝতে পারছে না কার হুকুম তারা মানবে—মন্ত্রীর না সেনাপতির? এই ডামাডোলের মধ্যে আমরা সহজেই মাজোর্কা জয় করতে পারব। আমি কিছুক্ষণ ভাবলাম। একটাই কথা ভাবলাম আমার দাদা মাজোর্কা জয় করতে বলে নি। বলেছিল তিতিকানা হ্রদের চারপাশের উপজাতিদের যুদ্ধে হারিয়ে রাজধানী কুজকোতে ফিরতে হবে। মাজোর্কা জয়ের নির্দেশ দাদা দেয় নি। তবু আমি ভাবলাম—যদি মাজোর্কা জয় করে আসি তাহলে দাদা বোধহয় মনঃক্ষুণ্ণ হবে না। ইনকাদের সাম্রাজ্যও তো বাড়বে এতে। কাজেই আমি সৈন্যদের নিয়ে যাত্রা করলাম মাজোর্কার দিকে। মারাত্মক ভুল করলাম। তখনও বুঝিনি এর ফল কী হবে।

—রাজা তখনও অসুস্থ? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। আমরা খুব সহজেই মাজোর্কার সৈন্যদের হারিয়ে দিলাম। রাজপথের পাহারাদাররা পালিয়ে গেছে। মাজোর্কার লোকজন রাস্তায় নেই বললেই চলে। সবাই নিজেদের বাড়ির ভেতরে। আমরা বিনা বাধায় রাজবাড়ির সামনে এলাম। দেউড়ির বড় দরজাটা হাঁ করে খোলা।

আটদশজন রাজরক্ষী তরোয়াল উঁচিয়ে আমাদের দিকে ছুটে এল। আমি চাইনি আরো লড়াই হোক। তাই আমি চিৎকার করে ওদের বললাম— মিছিমিছি মরতে আসছো কেন? সমস্ত মাজোর্কা আমাদের অধীনে এখন। তোমরা অস্ত্র ত্যাগ কর। বিনা কারণে আর তোমাদের হত্যা করবো না। ওরা বুঝল ওরা পরাস্ত হয়েছে। এখন লড়াই করতে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। ওরা অস্ত্র ত্যাগ করল।

—তারপর? হ্যারি জানতে চাইল।

—বলছি। কাপাক বলল। একটু চুপ করে থেকে কাপাক বলতে লাগল—

তখন সকাল হয়েছে। পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। রোদ ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

—আমরা রাজবাড়িতে ঢুকলাম। সব পাহারাদার পালিয়েছে। বাইরের মন্ত্রণা ঘর পার হয়ে অন্তঃপুরে ঢুকলাম। একটা কাঠের বড় শয্যায় একজন গলা পর্যন্ত চাদরে

ঢেকে শুয়ে আছেন। তার মাথার কাছে বসে আছেন একজন মহিলা। বুঝলাম এরাই রাজা আর রাণী। আমি বললাম—আপনারাই বোধহয় রাজা কুয়েক হুয়া আর রাণী।

অসুস্থ রাজা আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। বললেন—আপনি ঠিকই বুঝেছেন। এখন আপনারা কি চান?

—আমি আপনাদের বন্দী করতাম। কিন্তু যা শুনেছিলাম তা ঠিক। আপনি গুরুতর অসুস্থ। আমি বললাম।

—হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। আমার পুত্র কন্যাকে অন্যত্র রেখেছি। আপনি আমাদের হত্যা করতে পারেন।

আমি খোলা তরোয়াল কোষবদ্ধ করলাম। আমার সঙ্গীরাও তরোয়াল কোষবদ্ধ করল।

রাজা ক্ষীণস্বরে বললেন—ওষুধটা দাও। রাণী বিছানা থেকে উঠলেন। একটা চিনেমাটির গ্লাসে জল নিয়ে ওষুধের বড়িটা নিয়ে এগিয়ে এলেন। রাজাকে ওষুধ খাওয়ালেন।

আমি বললাম—মাননীয় রাজা আপনি অসুস্থ। আপনি এখানেই থাকবেন। ওষুধ খেয়ে সুস্থ হবার পর আপনাকে মাজোর্কা ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটা আমার কথা বললাম। আমাদের রাজা পাচাকুটি এরপরে যা স্থির করবেন সেটাই করতে হবে। তবে আপনাদের গায়ে হাত দেওয়া হবে না এটা জেনে রাখুন। রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মুখে দাড়ি গোঁফ চোখ দুটো কোটরে। সারা মুখ সাদাটে রক্তহীন। বুঝলাম রাজার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। ভাবছি কী করবো এখন।

রাজা কুয়েক হুয়া আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। বুঝলাম একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। অস্বস্তি হচ্ছিল। তাই বললাম—আপনি অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? কাপাক থামল।

এসময় ফ্রান্সিস বলল—কাপাক আপনাকে তুমি করে বলা উচিত হয়নি। মাফ করবেন।

—না—না তাতে কী হয়েছে? কাপাক হেসে বলল।

হ্যারি বলল—আপনি কী যেন বলছিলেন।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—কাপাক বলল। তারপর বলতে লাগল—আমার কথা শুনে রাজা কুয়েক হুয়া আমাকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। আমি রাজার কাছে গেলাম। রাজা ফিস ফিস করে কী বললেন আমি ঠিক বুঝলাম না। রাজা বুঝল সেটা। আমাকে মাথা নামাতে ইঙ্গিত করল। আমি রাজার মুখের উপর ঝুঁকলাম। রাজা বললেন—আপনার সঙ্গের সৈন্যদের এখান থেকে দূরে যেতে বলুন। একটা খুব দরকারি কথা আপনাকে বলব। আমি সঙ্গের সৈন্যদের বললাম—তোমরা যাও। আমি আসছি। সৈন্যরা বেরিয়ে গেল।

রাণী ভেতরের ঘরে গিয়েছিলেন। তখনই রাণী ঘরে ঢুকলেন। রাজার শিয়রে গিয়ে বসলেন।

একটা কথা বলি।—রাজা বললেন।

—কী কথা। রাণী বললেন।

—পুরুষানুক্রমে যে নক্সাটা গয়নার বাক্সে পড়ে আছে সেটা এঁকে দেব। রাজা বললেন।

—উনি কি পারবেন নক্সাটা ঠিক বুঝতে? রাণী বললেন।

—দেখা যাক। একটু থেমে বললেন—তাহলে নক্সাটা বের করে দাও। রাণী উঠে দাঁড়ালেন। রাজার মাথার বালিশের নিচে হাত ঢোকালেন। একটা চামড়ার ছোট্ট ব্যাগমত বের করলেন। রাজার হাতে দিলেন। রাজা ওটা হাতে নিলেন। ব্যাগটা আমাকে দিলেন। আমি ছোট্ট ব্যাগটা খুললাম। দেখি একটা গোল বিবর্ধক কাঁচ রয়েছে একটা খোপে। অন্য খোপ থেকে বেরুলো একটা নক্সাটা ছোট্ট চৌকোনো পার্চমেণ্টের শক্ত কাগজ।

—ঐ কাগজে একটা নকশা আঁকা আছে। রাজা বললেন। আমি দেখেটেখে কিছুই বুঝলাম না।

—ঐ বিবর্ধক কাঁচটা দিয়ে নক্সাটা দেখুন। রাজা বললেন।

একটু থেমে কাপাক বলল—আমি বিবর্ধক কাঁচটা দিয়ে দেখলাম—তাসের মতো চৌকোনো কাগজটার চারদিকে সোজা দাগ। চারদিকে চারটে করে ফুলদানি তাতে ফোটা ফুল বুঝলাম এই নকশার অর্থ বের করতে আমার সময় লাগবে। বললাম—তাহলে এই নকশাটা আমাকে দিলেন?

—হ্যাঁ। আমার ঠাকুর্দার হাত থেকে বাবা পেয়েছিলেন। ঠাকুর্দা বলেছিলেন নক্সা দিলাম। এর অর্থ বের করতে পারলে তুমি প্রচুর হীরে মণি মুক্তোর অলংকার পাবে। সোনা রূপো তো পাবেই। রাজা হাঁপাতে লাগলেন। আমি বললাম—আমি বুঝেছি। আর কথা বলবেন না। আমি চলি। আপনি বিশ্রাম করুন। আমি চলে এলাম।

ঘোড়ায় চড়ে সমস্ত মাজোর্কা ঘুরলাম। রাজার তৈরি সৈন্যাবাস ফাঁকা। কেউ নেই। আমি আমার সৈন্যদের সৈন্যাবাসে আসতে খবর পাঠালাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে সৈন্যরা এল। আমি একটা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। নক্সাটা কোমরে গোঁজা। বের করলাম। বিবর্ধক কাঁচ দিয়ে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় নক্সাটা বেশ কিছুক্ষণ দেখলাম। কিন্তু প্রায় কিছুই বুঝলাম না।

—ঠিক আছে—নক্সাটা পরে দেখছি। তারপর কী করলেন? ফ্রান্সিস বলল।

রাতের খাবার খেয়ে ঘরে এলাম। ক্লান্ত শরীর। শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এল। আচ্ছা—নকশাটা বোঝাচ্ছে রাজা কুয়েক হুয়ার ঠাকুর্দার ধনসম্পদ কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন? যদি গোপনেই রাখলেন তবে ছেলেকে মানে রাজা কুয়েক হুয়াকের বাবাকে বললেন না কেন? না-না। কাল সকালে একবার রাজার কাছে যেতে হবে। আরো কিছু জানার আছে। কথা বলা থামিয়ে কাপাক বলল—আপনাদের শুনতে একঘেয়ে লাগছে নিশ্চয়ই।

—না—না। ফ্রান্সিস বলল—আপনি বলুন।

কাপাক বলতে লাগল—আমি পরদিন সকালে রাজা কুয়েক হুয়ার কাছে গেলাম। সঙ্গে ঈগরকে নিয়ে গেলাম। রাজার শয়নঘরে ঢুকলাম। দেখি রাজা উঠে বসেছেন। রাণী তাঁকে সকালের খাবার খাইয়ে দিচ্ছেন।

—তা হলে আমি যাই। পরে আসবো। আমি বললাম।

—না—না। রাজা মুখ মুছতে মুছতে বললেন—বসুন। আমার হয়ে গেছে।

দেয়ালের কাছে রাখা আসনে দু'জন বসল। এবার আমি বললাম—একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না।

—কোন কথা? রাজা বললেন।

—আপনার ঠাকুর্দা ধনসম্পদ গোপনে রেখেছিলেন কেন? আমি জানতে চাইলাম।

—এই মাজোর্কার নদীর ওপারে থাকে দুতিন গোষ্ঠীর বুনোমানুষরা। দুটি গোষ্ঠী সভ্য হয়েছে কিন্তু একটি গোষ্ঠী এখনও বুনো স্বভাবের। এরা মাঝে মাঝে এই মাজোর্কা নগরে এসে লুঠপাট করে পালিয়ে যায়। তাই এদের হাত থেকে বাঁচাতে ঠাকুর্দা গোপনে ধনসম্পদ রেখেছিলেন পরে পিতাকে বলে যাবেন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু ঐ বুনোমানুষদের সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি গুরুতর আহত হন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যান। বাবাকে কিছু বলে যেতে পারেন নি। আমিও অবশ্য ঐ ধনসম্পদের আশা ছেড়ে দিয়েছি।

—তা কেন? আমি দেখছি। আমি বললাম। কাপাক বলল।

—দেখুন চেষ্টা করে। রাজা বললেন।

আমি বললাম—আপনার প্রাসাদরক্ষীরা কোথায় গেল?

—এই রাজবাড়ির পেছনদিকে একটা বড় ঘর আছে। ওটাই দ্বাররক্ষীদের থাকবার ঘর। ওরা বোধহয় বেরোতে সাহস পাচ্ছে না।

—ঠিক আছে। আমি ওদের ভরসা দিচ্ছি। আমি বললাম। রাজবাড়ি থেকে বাইরে এলাম। তারপর রাজবাড়ির পেছনে গেলাম। রাজার রক্ষীদের বললাম—কাজে যাও। কোন ভয় নেই। বিস্তৃত মাঠ পার হয়ে আমরা নগরে এলাম। ঈগরকে বললাম—গলা চড়িয়ে বলে দে আপনারা যে যার বাড়িতে চলে আসুন। আর লড়াই হবে না। ঈগর আমার কথাগুলো জোরে চেঁচিয়ে বলল। লোকজন আস্তে আস্তে ফিরে আসতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই প্রচার চালালাম তারপর আস্তানায় ফিরে এলাম।

—তারপর? হ্যারি বলল।

—বিকেলের দিকে আমি ঈগরকে নিয়ে নদীর দিকে গেলাম। তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। দেখলাম নদীটি বেশ নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে। ঢেউ নেই তেমন। তবে আন্দাজে বোঝা যাচ্ছে বেশ স্রোত আছে। হঠাৎই দেখলাম একটা নৌকো নদীতে দোল খাচ্ছে। আমি ভীষণভাবে চমকে উঠলাম—বুনোমানুষ! জোরে বললাম—ঈগর পালা। আমার কথা শেষ হওয়ামাত্র পিঠে বর্শার খোঁচা খেলাম। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ছোটার চেষ্টা করলাম না। ছুটতে গেলে বর্শা পিঠে ঢুকে যাবে। ঈগর প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—বুনোমানুষ।

—চুপ করে ওরা যেমন নির্দেশ দেয় সেভাবেই চলো। আমি বললাম।

চারপাঁচজন বুনোমানুষ বর্শা হাতে পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। একটা বুনোমানুষ আমাদের কাছে এসে কী বলল। কিছুই বুঝলাম না। বুনোমানুষদের দেখলাম। সারা গায়ে লোম। মুখে লালচে দাড়ি গোঁফ। মাথায় ঝাঁকড়া লাল চুল। যে আমার পিঠে বর্শার মুখটা চেপে ধরেছিল সেই বর্শার মুখটা জোরে চেপে ধরল। বুনোমানুষরা তখন হাঁটতে শুরু করেছে। নদীর ঢালু পার দিয়ে আমরা নামতে লাগলাম। আমরা দুজনে কখনও কখনও হোঁচট খাচ্ছি। কিন্তু বুনোমানুষরা সোজা চলেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নয়। আকাশে ভাঙা চাঁদ। এই আবছা আলোতেও চারদিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

ওরা ঠেলে নৌকোয় ওঠালো। সারাক্ষণ পিঠে বর্শার মুখ চেপে ধরা। সবাই নৌকোয় উঠল। ওরা এমনভাবে বসল দাঁড়ালো সহজে সবাই এঁটে গেল। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে নৌকো চলল। নদীর জল ছুঁয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইল। একজন বৈঠা বাইতে লাগল।

ওপারে নৌকো এসে লাগলো। সবাই আস্তে আস্তে নেমে এল। আমার পিঠে বর্শার খোঁচা। আমি আর ঈগর চললাম। আবছা দেখলাম ঈগরের পিঠেও একজন বর্শা চেপে ধরে আছে। নদীর ওপারে উঠে গাছগাছালি পার হয়ে একটা উঠোনের মত জায়গায় এলাম। আমি শুধু চারদিকে নজর রেখে যাচ্ছি কীভাবে পালাবো। একটা কথা বুঝলাম না বুনোমানুষরা আমাদের ধরল কেন? আমাদের নিয়ে ওরা কী করবে?

ওরা উঠোনের একপাশে আমাদের দাঁড় করাল। প্রথমে একজন হাতে দড়ি নিয়ে এল। ঈগরের হাত বাঁধল। আমার কাছে আসতেই আমি ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলাম। বুনোমানুষরা হকচকিয়ে গেল। আমি দুহাত নেড়ে বার বার কেঁদে উঠতে লাগলাম। বুনোমানুষরা হো হো করে হাসতে লাগল। আমি বাঁ হাতের কনুইটা বার বার দেখাতে লাগলাম। বুনোমানুষটা কী ভাবল জানি না। আমার হাত বাঁধলো না।

ওরা উঠোনের মাঝখানে আগুন জ্বালল। আগুনটা ঘিরে ওদের নাচ শুরু হল। দুটো কাঠ ঠুকে তাল দিতে লাগল কয়েকজন। নাচ চলল। রাত গভীর হল। আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নজর রাখছি। বুনোমানুষরা কে কী করছে।

একসময় দেখলাম একজন বুনোমানুষ একগাদা শুকনো কাঠ অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিল। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। এবার বুনোমানুষটা ঈগরের কাছে এল। ঈগরের হাতে বাঁধন আর একটা দড়ি বাঁধাল। আমি চিৎকার করে বললাম—ঈগর পালাও। আমি কাছেই দাঁড়ানো এক বুনোমানুষের হাত থেকে বর্শাটা এক ঝাঁকুনি দিয়ে কেড়ে নিলাম। বললাম—ঈগর ছোটো। দুজনে ছুটতে শুরু করেছি তখনই একটা বর্শা এসে সামনের একটা গাছের গায়ে গেঁথে গেল। ঈগর সঙ্গে সঙ্গে বর্শাটা খুলে নিয়ে ছুটল। আমরা বুনোমানুষদের ছাড়িয়ে যেতে পারছিলাম না। খুবই স্বাভাবিক। বুনোমানুষরা এই জঙ্গলেই থাকে। গাছের বাধা দ্রুত পার হয়ে ওরা ছুটতে

অভ্যস্ত। আমি তবু হাল ছাড়লাম না। দু'একটা বর্শা আমাদের সামনে পেছনে পড়তে লাগল। সেই বর্শা খুঁজে বের করতে গিয়ে ওরা পিছিয়ে পড়ছিল।

হঠাৎ সামনে নদী। আমি চিৎকার করে বললাম—ঈগর—নৌকো। দুজনে নদীর পারে এসে গড়ানো পাথরের গায়ে বসে পড়লাম। দুজনেই দ্রুত গড়িয়ে চললাম। এইসময়ে একটা বর্শা আমার কাঁধ কেটে বেরিয়ে গেল। আমি দ্রুত পেছনে ফিরে এক বুনোমানুষের বুকে হাতের বর্শাটা ঢুকিয়ে দিলাম। বুনো মানুষটা হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গেল। আমি ঈগরের হাতের বাঁধনটা খুলে দিলাম। ঢালু পার দিয়ে গড়াতে গড়াতে নৌকোটার সামনে এসে আমরা থামলাম। এই সময় একটা বর্শা ঈগরের হাঁটুর নিচে লেগে পড়ে গেল। আবছা অন্ধকারে দেখলাম রক্ত পড়ছে। ঈগরের হাত ধরে লাফিয়ে নৌকোয় উঠলাম। নৌকোর গলুইয়ে বৈঠা রাখা। বৈঠা নিয়ে বাইতে লাগলাম। নৌকো বেশ কিছুটা চলে এসেছে তখন জলে শব্দ শুনলাম। বৈঠা চালাতে চালাতে দেখলাম দুজন বুনোমানুষ বর্শা নিয়ে সাঁতার দিয়ে আসছে। আমাদের কাছাকাছি এসে একজন আমার দিকে বর্শা ছুঁড়ল। আমি দ্রুত মাথা নোয়ালাম। বর্শাটা আমার মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে জলে পড়ল। আর একটা বুনোমানুষ বর্শা হাতে আমাদের কাছে সাঁতরে এল। ও বর্শা ছোঁড়ার আগেই আমি বৈঠাটা ওর কান লক্ষ্য করে যত জোরে সম্ভব চালালাম। বুনোমানুষটি আর্ত চিৎকার করে জলে ডুবে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই নৌকোটা তীরে এসে লাগল। আমরা দুজন লাফ দিয়ে নামলাম। তারপর পাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম।

তখনই সূর্য উঠল। ভোরের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়ল। স্পষ্ট হল আকাশ নদী গাছপালা।

একটু থেমে কাপাক বলল—একটা বিনীত অনুরোধ—ঈগর হালে বসে আছে। তাকে উঠে আসতে অনুমতি দিন। শাঙ্কো বলল—আমি যাচ্ছি। শাঙ্কো চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঈগরকে সঙ্গে নিয়ে এল। ঈগরের গায়ে সব পোশাক জলে ভেজা।

ফ্রান্সিস বলল—আগে আপনারা ভেজা পোশাক ছাড়ুন।

—আসুন। শাঙ্কো বলল। দুজন শাঙ্কোর পিছু পিছু গেল।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস একটা কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—কী কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—ওরা রাজধানী কুজকোতে না গিয়ে এই বন্দরে এল কেন?

—হ্যাঁ। আমার মনে হয় রাজধানী কুজকোয় ওঁরা থাকতে পারে নি। আবার ওঁরাই কুজকোতে না গিয়ে এখানে এল কেন? উদ্দেশ্য একটা বিদেশী জাহাজে চড়ে দেশত্যাগ। ওঁরা আর এই পেরুতে কোনদিন ফিরে আসবে না। তবে ওরা দুজনে দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন বোঝা যাচ্ছে না। ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সব জানতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। ফ্রান্সিসরা ডেক-এ বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কাপাকরা এল। পরনে ভাইকিংদের পোশাক। দুজন বসল। ফ্রান্সিস বলল—কাপাক আপনারা রাজধানী কুজকোতে ফিরে গেলেন না কেন?

—তাহলে বলি—কাপাক বলতে লাগল—কয়েকটি অঞ্চল বাদে প্রায় সারা পেরু অঞ্চল আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পাচাকুটির অধীন। কথা প্রসঙ্গে একদিন রাজা পাচাকুটি আমাকে বললেন—তিতিকানা হ্রদের চারপাশের অঞ্চল জয় করতে হবে। আমাদের অধীনে আনতে হবে। ইনকা সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত করতে হবে। কাপাক একটু থেমে বলতে লাগল—কিছু সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমি যুদ্ধযাত্রা করলাম। তিতিকানা হ্রদের তিনদিককার দেশগুলো সহজেই জয় করলাম। কিন্তু একটি রাজ্য অধিকার করতে বেশ লড়াই করতে হল।

যা হোক সব যুদ্ধ জেতা রাজ্যে একজন করে নির্ভীক সৈন্যদের রাজা করে দিয়ে আমি কুজকো ফিরে চললাম। পথে কয়েকজন সৈন্য আর এই ঈগর আমাকে বলল—কিছুদূরে একটি নগরী আছে মাজোর্কা। ফলে ফুলে সুশোভিত এই নগরের সবই সুন্দর। অন্য দুতিনজন সৈন্যও বলল ঐ সুন্দর নগরীর কথা।

সেদিন সকালে সব সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললাম—আমরা এখন দেশে ফিরে যাবো না। মাজোর্কা নগর আমরা যুদ্ধ করে জয় করবো। ইন্‌কা সাম্রাজ্যের অধীনে আনবো। কাজেই আমরা এখন মাজোর্কা জয় করতে যাবো। এখন দেশে ফিরবো না? সৈন্যরা অস্ত্র উঁচুতে তুলে আমাকে সমর্থন জানালো।

আমরা মাজোর্কার দিকে যাত্রা শুরু করলাম। দিন দুয়েকের মধ্যে মাজোর্কা পৌঁছলাম। শুনলাম রাজা কুয়েক হুয়া অসুস্থ। যা হোক আমরা প্রায় বিনা বাধায় মাজোর্কা দখল করলাম।

ফেরার সময় কুজকোর কাছাকাছি এসে ঈগরকে পাঠালাম আমাদের কীভাবে অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছে এটা জানতে।

ঈগর বিরসমুখে ফিরে এল। বলল—রাজার অনুমতি না নিয়ে মাজোর্কা দখল করার জন্যে আপনাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। রাজাজ্ঞা। সবাইকে মানতে হবে। আপনি কুজকো ঢুকলেই বিপদে পড়বেন।

—ঈগর আমাদের পালাতে হবে। তৈরি হও। কথাটা বলে চারদিকে তাকাতে লাগলাম।

তখন রাস্তার পাশে একটা খোলা মাঠে বাঁধুনিরা রান্নার আয়োজন করছে। সবাই ঘোড়া থেকে নেমেছে। মাঠের একদিকে আপেল গাছের সারি। ঈগরকে ইঙ্গিত করে ঐ বাগানের আড়ালে গেলাম। ঈগরও এল। আমি বললাম— ঈগর আমার পেছনে। আমি আপেল বাগানের পরেই একটা পায়ে চলা পথ পেলাম। দুজনে ঘোড়া ছোটালাম। গ্রামটাম পেলাম না।

বেশ কিছুক্ষণ ঘোড়া ছুটিয়ে একটা গ্রামের কাছে থামলাম। খাওয়া তো হয়নি। খুব খিদে পেয়েছে। আপেলের বাগান থেকে তিনটি পাকা আপেল নিয়ে এসেছিলাম। দুজনে তাই খেলাম।

প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘোড়া ছোটালাম। একটা গ্রামে এলাম। গ্রাম চার পাঁচটা পাথরের বাড়ি। কাছাকাছি বেশ কটা খামার। দেখে খুশি হলাম। এই গ্রামের লোকদের অবস্থা ভালই। খাওয়াতো শুধু আমাদের খাওয়া নয়। ঘোড়া দুটোকেও জল ছোলা খাওয়াতে হচ্ছিল। ঠিক করলাম আয়াচুচো গিয়ে ঘোড়া দুটো বিক্রি করে দেব। ওখানে ঘোড়া কেনাবেচার হাট বসে। গ্রামে সব ঘরের দরজাই কালো পাথরের। একটা বাড়ি দেখলাম সাদা পাথরের। সাদা পাথরের দাম বেশি।

ঘোড়া থেকে নেমে সাদা দরজার সামনে এলাম। আঙ্গুলঠুকে শব্দ করলাম। আর একবার ঠুকতেই দরজা খুলে গেল। দেখি একজন বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়ে। বললাম—খুব সমস্যায় পড়ে আপনাদের সাহায্য চাইতে এসেছি। মাজোর্কা থেকে আসছি। যাবো আয়াচুচো শহরে। এক বুড়ো বেরিয়ে এল। বলল—আপনারা কারা? কোথায় যাবেন? বুঝলাম আমাদের কথা বারবার বলতে হবে। কারণ বুঝলাম বুড়ো লোকটি কালা। অনেক কষ্টে ঘরে আসার অনুমতি পেলাম।

ভেতরের একটা ছোট ঘরে আমাদের বসতে বলল। আমরা মেঝেতে বসে রইলাম। মেঝের শুকনো ঘাস বিছানো। দড়ি দিয়ে বাঁধা বসে আরামই পেলাম। সন্ধ্যে হয় গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকার ঘরে মহিলাটি একটা জ্বলন্ত মোমবাতি রেখে গেল। তাতেই ঘরের চারধার যা দেখতে পাচ্ছিলাম।

সেই দুটো আপেল খাওয়ার পর থেকে উপোস করে আছি। খিদেয় প্রায় নেতিয়ে পড়লাম। ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ বাইরের দরজা খোলার শব্দ। কে ঢুকল। বয়স্কা মহিলাটির ছেলেই হবে। যে ঢুকল সে মার সঙ্গেই কথা বলছিল। মা সবই বলল।

ছেলেটি আমাদের ঘরে ঢুকল। আমাদের এক ঝলক দেখল। বলল—আপনারা কারা? কোত্থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন?

কাপাক বলল—ঈগর তুই সামলা। ঈগর আস্তে আস্তে আমাদের কথা বলল। শেষে বলল—আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত। আগে খেতে দিন। তারপরে যা বলার বলবো।

—বেশ। যুবকটি বলল। তারপর বলতে বলতে চলল—মা—রান্না কদ্দুর? ওদের খেতে দাও। সারাদিন না খেয়ে আছে। মার কথাও শুনলাম—আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রাতের রান্না হয়ে যাবে। ওদের একটু অপেক্ষা করতে বল।

আমরা আর কোন কথা বললাম না। দুজনেই শুয়ে রইলাম। খেতে খেতে একটু রাতই হল। যুবকটি এল। কিছু কথাবার্তা হল। আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে গোল রুটির সঙ্গে আলুসেদ্ধ খেয়ে ঘোড়ায় উঠলাম। ঘোড়া ছোটালাম আয়াচুচোর দিকে।

কাপাক থামল। ফ্রান্সিস বলল—তুমি অনেকক্ষণ কথা বলছো। একটু দম নাও। তুমি কুজকো গেলে না কেন সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি।

—হ্যাঁ। আপনি বুঝেছেন। আপনাদেরও একঘেয়ে লাগছে বোধহয়।

—না-না। আপনি বলুন। হ্যারি বলল।

কাপাক বলতে লাগল—পরদিন সকালেই ঘোড়া ছোটালাম আয়াচুচোর দিকে। সন্ধ্যের আগেই আয়াচুচো পৌঁছলাম। সারাদিন খাওয়া জোটে নি। খিদে তৃষ্ণায় দুজনেই কাতর।

আয়াচুচো একটা ছোট শহর তবে লোকজনের সংখ্যা ভালোই। পাথরের বাড়িঘর। খুঁজে খুঁজে একটা ছোট সরাইখানা পেলাম। সেদিনের মত ঘোড়া বেচাকেনা হাটটা দেখে এলাম। এখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। হাট ভেঙে গেছে।

রাতটা সরাইখানায় কাটালাম।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে ঘোড়া দুটো নিয়ে চললাম ঘোড়া বেচাকেনার হাটে। লোকজনের বেশ ভিড়। ঘোড়া থেকে নামলাম। দুতিনজন প্রায় ছুটে এল। একজন বলল—আমাকে কিছু মুদ্রা দিন। আমি ঘোড়াদুটো ভাল দামে বিক্রি করিয়ে দেব। বাকিরাও একই কথা বলল। আমি বললাম—বেশ— আগে বিক্রি কর—তারপর তোমাকে যা দেবার দেব। ওরা রাজি হল। এখন কাকে বিক্রি করতে দেব—এই নিয়ে ওদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। যে লোকটি আমার কাছে প্রথম এসেছিল তাকেই বিক্রি করতে দেব। আমি বললাম। ঝগড়া মিটল।

ঘোড়া দুটো দেখে লোকটি বলল—জিন বসার আসন পাদানি এসব বিক্রি করবেন কেন। নিজের কাছে রেখে দিন।

—কোন দরকার নেই। তুমিই নাও। আমি বললাম।

—বেশ। লোকটা এক গাল হেসে বলল।

লোকটা ঘোড়া দুটো নিয়ে হাটে ঢুকল।

আমরা ঘাসের জমির ওপর বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে লোকটি এল। দুই কাঁধে ঝুলছে ঘোড়ার সাজ সরঞ্জাম। কোমরের খুঁট থেকে সোনার মুদ্রা বের করল। হেসে বলল—ভাল দামে বিক্রি করেছি। নিন দাম। আমি সোনার মুদ্রাগুলো নিলাম। একটা সোনার মুদ্রা লোকটিকে দিলাম। লোকটি খুব খুশি।

লোকটি চলে গেল। আমরা সরাইখানায় ফিরে এলাম। সেই রাতটা ঐ সরাইখানায় কাটিয়ে পরদিন সকালেই এই পিসকো বন্দরে এলাম। দেখলাম দুতিনটে জাহাজ নোঙর ফেলে জলে ভাসছে। জাহাজের মাথায় যার যার দেশের পতাকা উড়ছে। তিনটে জাহাজেরই পতাকা দেখলাম। একটা ইংরেজদের অন্যটা ফরাসীদের। আপনাদের জাহাজে দেখলাম ডেনমার্কের পতাকা। অবশ্য আপনাদের দেশের পতাকা চিনতে বেশ কষ্টই হল। আমরা ঠিক করলাম এই জাহাজেই আমরা উঠবো। ডেনমার্ক অনেক দূরের দেশ। তবে আমাদের দেশের কাছে।

একটু রাত হতে আমরা জলে সাঁতার কেটে আপনাদের জাহাজে এলাম। তারপর তো আমরা কী করেছি আপনাদের দেখা।

—আপনাদের সব কথাই শুনলাম। একটু পরে ফ্রান্সিস বলল। তারপর বলল—আমাদের জাহাজে থাকবেন, খাবেন আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে কিছু খরচ দেবেন। আমরা খুব একটা বড়লোক নই।

—নিশ্চয়ই দেব। তা আপনারা আপনাদের দেশের দিকে কবে যাচ্ছেন? কাপাক বলল।

—সেটা এখনও স্থির করিনি। মাজোর্কার রাজা আপনাদের একটা নক্সা দিয়েছেন। আপনি নক্সাটা একটু দেখতে দিন।

—নিশ্চয়ই। কথাটা বলে কাপাক কোমরের খুঁট থেকে নক্সাটা বের করল। ফ্রান্সিসের হাতে দিল।

ফ্রান্সিস বিবর্ধক কাঁচটা নিয়ে নকশাটা দেখতে লাগল।

নক্সাটা এরকম—

খুঁজে খুঁজে একটা সরাইখানা পেলাম। ছোট সরাইখানা। সরাইওয়ালাকে বললাম—আমাদের কথা বলতে—কষ্ট হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি পারেন খেতে দিন।

—কী খাবেন?

—মাংস রুটি। ব্যস আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। ঈগর বলল।

সরাইওয়ালার একজন লোক আমাদের ঘরটায় ঢুকতে বলল। ঢুকলাম এটাই শোবার ঘর। ঘাসপাতা বাঁধা বিছানা। মাথার বালিশ বলে কিছু নেই। কিন্তু আর অত ভাববার সময় নেই। হাতমুখ ধুয়ে এসে শুয়ে পড়লাম। আরো দু'জন লোকও ছিল।

ভোর হল। সরাইওয়ালাকে বললাম—ঘণ্টা খানেকের মধ্যে খেতে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। চিনেমাটির থালা গ্লাসে জল কাজের ছেলেটি রেখে গেল। আমরা বসে পড়লাম। রাঁধুনি গোল করে কাটা রুটি আর আলু সবজির ঝোল দিল। তারপর মুর্গীর মাংস দিয়ে গেল। আমরা হাপুসহুপুস খেতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি খেতে লাগলাম। পেট ভরে খেতে হবে। রাঁধুনি আরো রুটি দিতে এসে বলল—আস্তে খান। গলায় লাগবে। কে কার কথা শোনে। আমরা সমান গতিতে খেয়ে চললাম।

আজকেই পিসকো যাবো।

—ঠিক আছে। ঈগর বলল।

তৈরি হয়ে আমরা এই পিসকো বন্দরের দিকে আসতে লাগলাম। দুপুর তখন। চড়া রোদ গরম বাতাস। বেশ কাহিল হয়ে পড়লাম। এক গরীব চাষীর বাড়িতে বসার জায়গা পেলাম। এত খিদে পেয়েছে তখন যে ভদ্রতা অভদ্রতা বিচার করতে পারছিলাম না। বললাম—আমরা খুব ক্ষুধার্ত। কিছু খেতে দিতে পারেন? চাষীর বৌ তাড়াতাড়ি আমাদের জন্যে কয়েকটা রুটি করল। আর আলুভাজা। আমরা গোগ্রাসে তাই খেলাম।

আর বিশ্রাম করলাম না। যাত্রা করলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পিসকো বন্দরে এসে বিদেশি জাহাজের খোঁজ করা। তারপর সেই জাহাজে চড়ে বিদেশে পালিয়ে যাওয়া। রাত হয়ে গেলে জাহাজের পতাকা দেখতে পাবো না। তাই দ্রুতএসে বিকেল নাগাদ এই পিসকো বন্দরে এলাম। খুঁজে খুঁজে আপনাদের জাহাজটা দেখলাম।

জাহাজঘাটায় রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর আমরা অন্ধকার সমুদ্রে সাঁতরে সাঁতরে আপনাদের জাহাজে উঠলাম। ঈগর হালে বসে রইল। আমি এলাম।

দেখলাম আপনারা ভালো মানুষ। বিদেশী আপনারা। তবু আপনাদের ব্যবহারে কথাবার্তায় খুবই ভালো লাগল। ঈগরকে খবর পাঠিয়ে আনালাম।

আমাদের সব কথাই আপনাদের বললাম। আমরা দস্যুও নই চোরও নই। এখন আপনাদের বিবেচনা আপনারা আমাদের আশ্রয় দেবেন কিনা। ফ্রান্সিস বলল—আপনাদের খাদ্য আশ্রয় দুটিই দেওয়া হবে। হ্যারি বলল—বুঝতে পারছি আপনারা সৎ ও নির্ভীক। আপনারা আমাদের জাহাজেই থাকবেন। একটু পরে কাপাক বলল—কী বলে যে আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাবো বুঝতে পারছি না।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—নক্সাটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। নক্সাটা নিয়ে আমি দু'একদিন ভাববো। তারপর আপনাকে ফেরৎ দেব।

—ঠিক আছে—কাপাক বলল—আপনার কি মনে হয় এই গুপ্তধন উদ্ধার করা যাবে? কাপাক বলল।

—এখনই বলতে পারছি না। রাজবাড়িতে যাই। সব দেখে টেখে বুঝতে পারবো গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবো কিনা। আসল কথা হল নক্সাটার নির্দেশ মেনে এগোতে হবে। তার জন্যে একটু সময় লাগবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আপনি কি মাজোর্কা যাবেন? কাপাক বলল।

—নিশ্চয়ই যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদেরও যেতে ইচ্ছে করছে। কাপাক বলল।

—যাবেন। রাজা কুয়েক হুয়া আপনাকেই নক্সাটা দিয়েছেন। কাজেই নকশা দেখে গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারলে সেটা আপনারই প্রাপ্য। আমরা শুধু উদ্ধার করে দেব। তারপর রাজা কুয়েক হুয়া ও আপনি গুপ্তধন নিয়ে যা করার করবেন। ফ্রান্সিস বলল—

—আপনারা গুপ্তধন নেবেন না? কাপাক জানতে চাইল।

—না আমরা বুদ্ধির লড়াই পছন্দ করি। ভালো লাগে নকশার নির্দেশ বোঝা আর সেই অনুযায়ী ধীরে ধীরে এগিয়ে গুপ্তধন উদ্ধার করা। ফ্রান্সিস বলল।

—এতেই আপনারা খুশি? কাপাক বলল।

—হ্যাঁ। গুপ্তধন ও সম্পদের ওপর আমাদের কোন লোভ নেই। আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে গুপ্তধন উদ্ধার করে যার প্রাপ্য তাকে দিয়েই আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ করি।

—আপনাদের মত এরকম মানুষ আছে? কাপাক বলল।

—আছে—আছে। তাদের সন্ধান পাননি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস নকশাটা নিয়ে নিজের ঘরে এল। দেখল মারিয়া ছুঁচসুতো নিয়ে কী কাজ করছে। ফ্রান্সিস বিছানায় বসল। নক্সাটা বের করে দেখতে লাগল। মারিয়া বলে উঠল—আবার নক্সা? হায় যীশু!

—শোন শোন। অতীতের এক রাজার হাতে আঁকা এই নক্সাটা। ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয় গুপ্তধনের ব্যাপার আছে। মারিয়া বলল।

—অবশ্যই আছে। নইলে আমি দেখতে নেব কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—কোন দেশের কোন রাজার গুপ্তধন? মারিয়া বলল।

—এই দেশটার নাম পেরু। উত্তরে এক রাজ্য আছে। নাম মাজোর্কা। সেখানকার রাজার নাম কুয়েক হুয়া। তাঁর পিতামহ তাঁর ধনসম্পদ গোপনে রেখেছিলেন। ঐ রাজ্যের পরে একটা নদীর ওপারেই থাকে বুনো লোকদের রাজ্য। এরা যখন খুশি তখন দলবেঁধে মাজোর্কায় আসে। বাধা দেবার আগেই যা পায় চুরি করে নিয়ে যায়। এখন বর্তমান রাজার পিতামহ তাই তাঁর ধনসম্পদ একটা গোপন জায়গায় রেখেছিলেন। বুনোদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় তিনি মারা যান। বর্তমান রাজা কুয়েক হুয়াকে কিছু বলে যেতে পারেন নি। এখন রাজা একজনকে নক্সাটা দিয়েছেন যদি তিনি এই নক্সার অর্থোদ্ধার করতে পারেন। আমি তার কাছ থেকে নক্সাটা নিয়েছি। ফ্রান্সিস বলল।

—বুঝলাম। আবার গুপ্তধন উদ্ধারে নামবে। মারিয়া বলল।

—অবশ্যই নামবো। আমাকে তো জানো এইসব নক্সার অর্থ খুঁজে খুঁজে উদ্ধার করার মধ্যে আমি সবচাইতে আনন্দ পাই। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু দেশে ফেরার কী হবে? কতদিন বাবা মাকে দেখি নি। তুমি এসব বোঝো না। মারিয়া বলল।

—বুঝি। আমার তো মা নেই। বাবার জন্যেই চিন্তা হয়। কিন্তু এভাবে এসব ভাবলে মন দুর্বল হয়ে যায়। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ তা হয়। মন দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু এই ভাবনা ছাড়তেও পারি না। মারিয়া বলল।

—সেটাই করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া একটু রাগতস্বরেই বলল—আমি দেশে ফিরে যাব।

ফ্রান্সিস মারিয়ার মুখের দিকে তাকাল। দেখল মারিয়ার মুখটা কেমন লালচে হয়ে উঠেছে। তার মানে মারিয়া বেশ রেগে গেছে।

—তাহলে—ফ্রান্সিস বলল—এই পিসকো বন্দরে খোঁজ নিই।

—কেন? মারিয়া বলল।

—আমাদের দেশের দিকে যাবে এমন কোন জাহাজ পাই কিনা।

—তার মানে? মারিয়া বলল।

—তোমাকে আর কয়েকজন বন্ধুকে সেই জাহাজে তুলে দেব। তোমরা দেশে ফিরে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আর তুমি? মারিয়া বলল।

—আমার জীবন যেমন চলছে তেমনি চলবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি তোমাকে এই বিদেশ বিভুঁইয়ে রেখে চলে যাবো? মারিয়া বলল।

—তাছাড়া তো উপায় দেখছি না। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস বুঝতে পারল না—কী বলবে? মারিয়ার কাঁধে হাত রেখে বলল— মারিয়া কেঁদো না।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মারিয়া বলল—আমি এই বিদেশে তোমাকে ফেলে যাব—এটা তুমি ভাবলে কী করে?

—ঠিক আছে। ঠিক আছে। কথাটা তুলে নিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি যেদিন দেশে ফিরবো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবো। আর যদি না ফিরি—মারিয়া আর বলতে পারল না।

—আহা—ফ্রান্সিস বলল—আজেবাজে ভাবনা ছাড়ো তো। দুজনের সকালের খাবারটা নিয়ে এসো। বড্ড খিদে পেয়েছে।

মারিয়া উঠে দাঁড়াল। খাবার আনতে চলল।

ফ্রান্সিস গভীর মনোযোগ দিয়ে নক্সাটা দেখতে লাগল। যে ছোট্ট ব্যাগটায় নক্সাটা রাখা তার চামড়াটা শক্ত। বুনো শেয়ালের চামড়া নিশ্চয়ই। নকশার কাগজটাও চামড়া মেশানো পার্চমেণ্ট কাগজের।

মারিয়া খাবার আনল। দুজনে খেতে লাগল। মারিয়া নক্সাটা নিল। দেখতে দেখতে বলল—নকশাটার রহস্য বুঝতে পেরেছো?

—ভাবছি। দেখ—তিনটি চৌকোনো কিছু। বুঝলাম—তিনটে ঘর। কারণ মাঝখানে খাটের মত চৌকোনো কিছু। ওগুলো বিছানা বালিশ। প্রত্যেক ঘরেরই চারকোণায় ছোট কিছু আছে। ওগুলো কী ঠিক বুঝতে পারছি না। বেশ ভাবাচ্ছে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মারিয়া বলল—তিনটে ঘর। একটা একটু বড় আর একটা তার থেকে ছোট আর একটা সেটার থেকেও ছোট ঘর ছোট এই তো মনে হচ্ছে—বিছানা বালিশ।

—হ্যাঁ। শোবার ঘরই কারণ মাঝখানটায় খাটের মত চৌকোনো বিছানা আছে। বালিশও আছে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর নকশাটা যেন দেখে বলল—প্রত্যেকটি ঘরের চারকোণায় কী আছে বোঝা যাচ্ছে না।

মারিয়া নক্সার ওপর ঝুঁকে পড়ল। মুখ তুলে বলল—ঘরের চার কোণায় রয়েছে চারটি ফুলদানি। একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—

—পাথরের বড় বড় ফুলদানি। তুমি ঠিক ধরেছো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বলল—কিন্তু ঘরগুলো কোথায় আছে?

—সেটা জানতে হোলে খোঁজখবর করতে হবে। মারিয়া বলল।

—আমার মনে হয় এই ঘরগুলো হয় কুজকো বা মাজোর্কার রাজবাড়িতে আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা হতে পারে। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস ঘরটার বাইরে এল। দেখল এক ভাইকিং বন্ধু শুকনো কাপড় চোপড় নিয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল—ভাই হ্যারিকে একটু ডেকে দাও।

ফ্রান্সিস এসে বিছানায় বসল। একটু পরেই হ্যারি এল।

—ডাকছো কেন? হ্যারি জানতে চাইল।

ফ্রান্সিস নক্সাটা হ্যারির হাতে দিল। বলল—নক্সায় আঁকা চিহ্নগুলো দেখে আমি আর মারিয়া কিছু সিদ্ধান্তে এসেছি। এবার তুমি কী বল—তাই শুনবো।

নক্সাটা হাতে নিয়ে হ্যারি দেখতে লাগল। কিছু পরে বলল—ছোট বড় মিলিয়ে তিনটি শোবার ঘর। বিছানা বালিশ রয়েছে। হ্যারি বলল।

—অন্য কিছুও তো হতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তিনটিই শোবার ঘর। বালিশ থাকবে এটাই ঠিক বোঝা যাচ্ছে।

—এই ঘর তিনটের কোথায় থাকতে পারে? ফ্রান্সিস বলল।

—মনে হয় রাজবাড়িতে। হ্যারি বলল।

—কোন্ রাজবাড়িতে? ফ্রান্সিস বলল।

—এই কুজকো অথবা মাজোর্কার রাজবাড়িতে। হ্যারি বলল।

—এটা কাপাক ঠিক বলতে পারবে। এখন প্রত্যেকটি ঘরের ঠিক চারদিকে চারটে কী আঁকা? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

হ্যারি নক্সাটা দেখতে দেখতে একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—ঐ চারটে জিনিস ছোট ফুলদানি। পাথরের।

—হ্যারি—আমরাও ঐ সিদ্ধান্তেই এসেছি। ফ্রান্সিস হেসে বলল। তারপর বলল—হ্যারি কাপাককে ডেকে আনো। কাপাক কী বলে দেখা যাক।

হ্যারি বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কাপাককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল।

ফ্রান্সিস কাপাককে বিছানাতেই বসতে বলল। কাপাক বসল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। কাপাক বেশ আশ্চর্য হল। বলল—আপনাদের তো ছন্নছাড়া এক জীবন। ইনি আপনাদের সেই জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছেন?

—হ্যাঁ পেরেছি। মারিয়া বলল—সব জেনেশুনেই এসেছি। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা দেশে ফিরবো।

—সে তো খুব আনন্দের কথা। কাপাক বলল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—কাপাক—আপনার কাছে কয়েকটা বিষয়ে জানতে চাই।

—বেশ। বলুন কী জানতে চান? কাপাক বলল।

—এখন মাজোর্কার রাজা কে? ফ্রান্সিস বলল।

—কুয়েক হুয়া। কাপাক বলল।

—তাঁর সঙ্গে আপনার খুব হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। রাজা আমাকে খুব পছন্দ করতেন। আমারও রাজাকে ভালো লাগত। কাপাক বলল।

—রাজা আপনাকে গুপ্তধনের নক্সা দিয়েছিলেন? এটা আপনাকে বিশ্বাস করেই দিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়ই। কাপাক বলল।

—রাজবাড়িতে ক'টা ঘর? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—কোন ঘরের কথা জানতে চাইছেন? কাপাক বলল।

—ধরুন রাজার শয়নকক্ষে রাণী ও ছেলেমেয়েদের ঘর। আরও একটা ঘর থাকতে পারে। কাপাক বলল—আর একটা ঘর দেখিনি।

—আপনি শুধু দুটো ঘর দেখেছেন? ফ্রান্সিস বলল।

—প্রথমে রাজার ঘরটাই ধরুন। সেখানে কি চারদিকে চারটে ফুলদানি আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ আছে। কাপাক বলল।

—দুটো ঘরেই? ফ্রান্সিস বলল।

—তা বলতে পারবো না। কাপাক বলল।

—এটা তো জানতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা হলে রাজবাড়ি গিয়ে জানতে হবে। কাপাক বলল।

—হ্যাঁ রাজার বাড়ি ভালোভাবে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—নক্সাটা দেখে বুঝে এসব কথা বলছেন বোধহয়। কাপাক বলল।

—হ্যাঁ। নকশাটার ঘরগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঠিক আছে। আপনাকে বিরক্ত করলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। বরং আমার মনে আশা জাগছে যে আপনি এই নক্সার ধাঁধা বুঝবেন। গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবেন। কাপাক বলল।

—আপনাদের শুভেচ্ছা নিয়ে চেষ্টা করে দেখব। ফ্রান্সিস বলল।

কাপাক চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে ফ্রান্সিস বলল—আর দেরি করবো না। হ্যারি—কাল রাতেই রওনা হব।

—প্রথমে কোথায় যাবে? হ্যারি জানতে চাইল।

—মাজোর্কা। রাজা কুয়েক হুয়ার সঙ্গে দেখা করবো। আরো কিছু জানার আছে। তারপর কাজে নামা। ফ্রান্সিস বলল। একটু চুপ করে থেকে হ্যারি বলল— তোমার কি দৃঢ় বিশ্বাস গুপ্তধন এই রাজবাড়িতেই আছে।

—হ্যাঁ। তবে রাজবাড়িতে গিয়ে সব বুঝতে পারব। ততদিন অপেক্ষা কর। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই শাঙ্কো ঢুকল। বলল—ফ্রান্সিস তুমি কালকেই মাজোর্কা যাচ্ছ।

—হ্যাঁ—ফ্রান্সিস হেসে মাথা ওঠানামা করল। তারপর বলল শাঙ্কো—তুমি এখনও সুস্থ নও। তোমাকে আর হ্যারিকে নিয়ে যাবো না। শুধু বিস্কো আমার সঙ্গে থাকবে। হ্যারি আর শাঙ্কো কোন কথা বলল না। এসব ব্যাপারে ফ্রান্সিসের কথাই শেষ কথা। এসব ক্ষেত্রে ওরা ফ্রান্সিসের কথাই মেনে নেয়।

হ্যারি শাঙ্কো ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মারিয়া বলল—শুধু একজন নিয়ে যাবে?

—উপায় নেই। হ্যারির তো জান—সহ্যশক্তি কম। ওকে সঙ্গে নেওয়া মানে ওকে কষ্ট দেওয়া। শাঙ্কোর অসুখ এখনও সারে নি। ভেনকে বলেছিলাম শাঙ্কোকে নিয়ে যাবো? ভেন বলেছে—শাঙ্কোর সুস্থ হতে এখনও এক সপ্তাহ লাগবে। কাজেই শাঙ্কোকে সঙ্গে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। ফ্রান্সিস বলল।

—ওরা মনে দুঃখ পেল। মারিয়া বলল।

—এতে দুঃখ পাওয়ার কী আছে? অন্য কোন অভিযানে নিয়ে যাবো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না।

পরদিন ফ্রান্সিস বিস্কোকে সঙ্গে নিল। কাপাক আর ঈগরও এল। চারজনে চলল আয়াচুচোতে ঘোড়া কিনতে।

ভর দুপুরে আয়াচুচোতে পৌঁছল। দরাদরি করে দুটো তেজি ঘোড়া কিনল। এবার ঘোড়ার সাজ। একটু দূরেই সারি সারি ঘোড়ার সাজের দোকান। ফ্রান্সিস প্রয়োজনীয় সব সাজই কিনল। দোকানি নিজেই সাজ পরিয়ে দিল।

খুব গরম পড়েছে। জিভ শুকিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস একটা সরবতের দোকানে এল। সরবৎ খেল সবাই। এবার ফেরা। ঘোড়ায় চড়ে ফেরা।

ফ্রান্সিস আর বিস্কো একটা ঘোড়ায় উঠল। অন্য ঘোড়াটায় কাপাক আর ঈগর চড়ল। ওরা ঘোড়া ছোটাল।

সন্ধ্যের আগেই পিসকো বন্দরে পৌঁছল।

পরদিন থেকে ফ্রান্সিস আর কাপাক ঘোড়া ছুটিয়ে ছুটিয়ে মোটামুটি অভ্যেসটা ঝালিয়ে নিল। এক ঘোড়ায় দুজন। সেটা অভ্যেস করিয়ে নিল। সেদিন সকাল থেকেই ফ্রান্সিসরা ব্যস্ত। সব গোছগাছ করে নেওয়া বড় ঝোলা ব্যাগে শুকনো খাবারও নিল। চামড়ার ব্যাগে জল নিল। তরোয়াল দড়ি নিল। কখন কোনটার প্রয়োজন পড়ে।

কাপাক আর ঈগর আগে পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে সমুদ্রতীরে উঠল। বিস্কোও চলল পাতা পাটাতনের দিকে। ফ্রান্সিস তখন মারিয়াকে সান্ত্বনা দিচ্ছে—কিছ্ছু ভেবো না—দিন কুড়ি পঁচিশের মধ্যে আমরা ফিরবো। মারিয়া একটু ফুঁপিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস বলল—কান্নাকাটি করো না। আমার মন দুর্বল করে দিও না। মারিয়া শান্ত হল চোখ মুছল।

—হাসো। ফ্রান্সিস প্রায় আদেশের মত বলল।

মারিয়া ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে হাসল। ফ্রান্সিসও হাসল।

ফ্রান্সিস পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে সমুদ্রতীরে উঠল। দুজন দুজন করে দুটো ঘোড়ায় উঠল ফ্রান্সিসরা।

তারপর ঘোড়া ছোটাল। লক্ষ্য—মাজোর্কা। দুপুরে ঘোড়া থামিয়ে কিছু শুকনো খাবার ওরা খেয়ে নিল। তারপর আবার চলল।

সন্ধ্যে হল। রাত হল। আকাশে গোল চাঁদ দেখা গেল। জ্যোৎস্নায় সবকিছুই দেখা যাচ্ছিল। তবে স্পষ্ট নয়। পথ দেখা যাচ্ছিল। দুটো ঘোড়া ছুটে চলল।

একটু রাত হল। ফ্রান্সিস ঘোড়া থামাল। বলল—আর নয়। এখানেই ঘোড়া থামাও। ফ্রান্সিস ডানপাশে একটা পুকুর দেখল। ফ্রান্সিস পুকুরটার কাছে এসে ঘোড়া থামাল। কাপাকও ঘোড়া থামাল।

বিস্কো শুকনো গাছের ডালপাতার জোগাড় করল। ঈগর ওকে সাহায্য করল। তিনটি পাথর বসিয়ে উনুন করা হল। পুকুরের জল এনে রান্না চলল। ফ্রান্সিস

পুকুরপারের ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। বলল—বিস্কো—আজ তরকারিটা তুমিই কর। পরে রুটি করার সময় আমাকে ডেকো।

রান্না চলল। ছোট ব্যাগে আলুটালু ছিল—বিস্কো এনেছিল। সেসব দিয়ে তরকারি মত হল। সবশেষে রুটি। ফ্রান্সিস উঠে এল।

—ফ্রান্সিস—তুমি শুয়ে বিশ্রাম কর।

—বেশ। কিন্তু—ফ্রান্সিস বলতে গেল।

—কোন কিন্তু নয়। তুমি যাও। বিস্কো বলল।

—তুমি যখন বলছো। ফ্রান্সিস ফিরে এসে আবার ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল।

রাতের খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস বলল—রাতে আর ঘোড়ায় চড়বো না। কাল সকালে রওনা দেব। আজ এখানেই রাত কাটাবো। তাই হল। মোটা কাপড় ঘাসের ওপর পেতে বিছানা হল। ওরা শুয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিসের ঘুম আসতে দেরি হল। একটা সূত্র—রাজবাড়ির খাট। শোবার ঘর। আর পাথরের ফুলদানি। কিন্তু তিন নম্বর ঘরটায় এখনও যাওয়া হয় নি। আরো কিছু সূত্রের প্রয়োজন। এসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

সবাই ভোরে উঠল। রাতের কিছু রুটি বিস্কো রেখে দিয়েছিল। সকালের খাবার হিসেবে ঐ রুটিই মধু মিশিয়ে খাওয়া হল।

তারপর ঘোড়ার পিঠে উঠল সবাই। ঘোড়া ছোটাল মাজোর্কার দিকে।

তখন ভর দুপুর। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে লাগল। দেখল চারদিকেই বুনোগাছের ঝোপঝাড়। পুকুরও দেখল না। শুধু চারদিকে নজর রেখে চলল।

তখনই হঠাৎ বাঁপাশের গাছপালা থেকে ঘোড়ার ডাক শোনা গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আমরা বিপদে পড়লাম। ফ্রান্সিসের কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁদিকের জংলা গাছপালা থেকে ঘোড়ায় বসা সৈন্যরা বেরিয়ে এল। প্রায় পনেরজন সওয়ারি নিয়ে ঘোড়াগুলো পথের ওপর এল। ফ্রান্সিসরা ঘোড়া থামাল।

সবচেয়ে সামনের অশ্বারোহী ঘোড়া নিয়ে ফ্রান্সিসদের সামনে এল। কাপাকের কাছে এসে ঘোড়া দাঁড় করাল। হেসে বলল—অশুভ। এগারো দিন আমরা এখানে ঘাঁটি গেড়ে অপেক্ষা করছিলাম। জেনেছিলাম—আপনি মাজোর্কা যাবেন। কাজেই এই মোড়ে অপেক্ষা করছি। কুজবাই যান অথবা মাজোর্কাই যান এই মোড়ে আপনাকে আসতেই হবে।

—তুমি সেনাপতি হয়েছো? কাপাক জানতে চাইল।

সেনাপতি হেসে বলল—রাজা আমাকে দায়িত্ব দিলেন। আমিও দায়িত্ব নিলাম।

কাপাক চিৎকার করে বলল—তোমার মত একটা ডাহা চোরকে দাদা সেনাপতি করলেন?

সেনাপতি কোন কথা না বলে তরোয়াল বের করল। কাপাক তরোয়াল বের করার আগেই সেনাপতি কাপাকের ওপর তরোয়াল চালাল। ফ্রান্সিস এরকমই ঘটবে বলে আঁচ করেছিল। ফ্রান্সিস তরোয়ালের খাপে তরোয়ালের হাতলে হাত দিয়ে ধরে রেখেছিল। ও দ্রুত তরোয়াল খুলে সেনাপতির তরোয়ালে ঘা মারল। সেনাপতির

তরোয়াল প্রায় ছিটকে যাচ্ছিল। কোনভাবে সামলাল। ফ্রান্সিস বলল—আমি লড়াই চাই না। সেনাপতি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এই চারজনকেই বন্দী কর। হাত বাঁধ। তারপর বলল—ঘোড়া থেকে নামো সব।

ফ্রান্সিসই নামল। বিস্কোকেও বলল নেমে আসতে। তারপর কাপাককে বলল—নেমে আসুন। ওরা সংখ্যায় বেশি। লড়াই চলবে না। সেনাপতি গলা চড়িয়ে বলল—নামুন। আপনাদের হেঁটে কুজকো যেতে হবে। কাপাক আর কোন কথা বলল না। ঈগরকে নামতে বলে নিজে ঘোড়া থেকে নামল। ফ্রান্সিসদের দুহাত পেছনে নিয়ে দুজন সৈন্য দড়ি দিয়ে বাঁধল। পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় ফ্রান্সিসরা হেঁটে চলল। ফ্রান্সিসদের ঘোড়া দুটোয় চারজন পদাতিক সৈন্য উঠল।

সেনাপতি তরোয়াল উঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল—কুজকো। সবার আগে একটা সাদা খয়েরি ঘোড়ার পিঠে সেনাপতি। তারপরে কিছু অশ্বারোহী সৈন্য। কিছু পদাতিক সৈন্য। পেছনে ফ্রান্সিসরা। ওদের পরে খোলা তরোয়াল হাতে কিছু পদাতিক সৈন্য।

শেষ বিকেলে ফ্রান্সিসরা কুজকো পৌঁছল। প্রধান প্রবেশ পথ দিয়ে ওরা নগরে ঢুকল। কিছু প্রহরী রয়েছে। সেনাপতিকে দেখে ওরা মাথা নিচু করে সম্মান জানাল।

ফ্রান্সিসরা নগরে ঢুকল। পথে বেশ ভিড়। অনেক লোক কেনাকাটা করছে। এদিকে ওদিকে ঘুরছে। অনেকেই সেনাপতির মিছিল দেখল। ওরা কাপাককে বন্দী অবস্থায় দেখে বেশ অবাক হল। ফ্রান্সিস আর বিস্কোকে ওদের দেশীয় পোশাকে দেখে লোকেরা নানা কথা বলতে লাগল। কাপাক মাথা নিচু করে হেঁটে চলল। কোনদিকে তাকাল না।

সদর রাস্তা দিয়ে ফ্রান্সিসদের মিছিল চলল। ফ্রান্সিস বিস্কো এই প্রথম ইন্‌কাদের রাজধানী কুজকো দেখল। সত্যি বেশ সাজানো গোছানো শহর। সদর রাস্তার ধার দিয়ে ফুলের গাছ। ফুল ফুটে আছে। মাঝে মাঝেই সদর রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাগানে জলের ফোয়ারা। শেষ বিকেলের আলোয় খুব সুন্দর বাগান ঝর্ণা বাড়িঘর দেখা গেল।

ওরা ফ্রান্সিসরা একটা বড় মাঠ দেখল। মাঠের পাশে লম্বাটে বাড়ি। বিস্কো বলল—সৈন্যাবাস। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল—হুঁ।

মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে ফ্রান্সিসরা এল লম্বাটে ঘরগুলোর একটা ঘরের সামনে। দুজন মশালবাহী সৈন্য ঘরের তালাটা খুলে দিল। ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকল। মেঝে জুড়ে একটাই ঘাসপাতার বিছানা। ফ্রান্সিস বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। কাপাক ফ্রান্সিসের পাশে এসে বসল। বলল—এটা কিন্তু সৈন্যাবাস। আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে মাচু পিচু নামের পাহাড়ে। ওখানে কয়েকটা গুহা আছে। গুহাতে কুজকোর গরীব মানুষজন থাকে। তারই মধ্যে একটা গুহায় কয়েদঘর। আমাদের সেখানে রাখা হবে।

—আজ রাতেই আমাদের নিয়ে যাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কিছু খেতে দেওয়া হবে। তারপর। কাপাক বলল।

কিছু পরে দু'জন সৈন্য একটা বড় কাঠের গামলায় মাংসের বড়া নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। শরীর এত ক্লান্ত যে ফ্রান্সিসের খেতেই ইচ্ছে করছিল না। বিস্কো খেতে খেতে বুঝল সেটা। বলল—ফ্রান্সিস পেট পুরে খাও।

ফ্রান্সিস বলল—সারা রাস্তা এই গরমে ধূলো রোদ—খিদেটাই মরে গেছে যেন।

—তাহলেও খাও। আবার কখন খাবার জুটবে—মা মেরিই জানে। বিস্কো বলল।

—হুঁ—শরীর ঠিক রাখতে হবে। ফ্রান্সিস খেতে খেতে বলল।

ফ্রান্সিসের খাওয়া শেষ হল। জল খাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা একটু ধাতস্থ হল। শরীরে একটু জোরও পেল। ক্লান্ত ভাবটা কমল।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি এল। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—কী? ভালো আছ তোমরা?

—ওসব কথা অর্থহীন। আমাদের কয়েদখানায় নিয়ে চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—সে তো নেবই। তবে শরীরের অবস্থা এখন কেমন সেটাই জানতে চাইছিলাম। সেনাপতি বলল।

—এই নিয়ে আর কথা বলবেন না। ধূলো প্রচণ্ড রোদ আর ধূলো ওড়ানো বাতাস এসবের মধ্যে দিয়ে এলে লোকে যেরকম থাকে আমরা তেমনি আছি। এখন কয়েদ ঘরে নিয়ে চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা পাচাকুটির হুকুম এখনও পাইনি। রাজা এখানে একবার আসতেও পারেন। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিসরা কেউ কোন কথা বলল না।

কিছুক্ষণ পরে সৈন্যদের মধ্যে বেশ ব্যস্ততা দেখা গেল। সেনাপতির উচ্চস্বরে বলা কথা শোনা গেল—

—সবাই ঘরে ঢোক। বাইরের মাঠে থাকবে না। সব সৈন্য ঘরে ঢুকে পড়ল। মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে রাজা পাচাকুটি এলেন। ধবধবে সাদা একটা ঘোড়ায় চড়ে। পেছনে তিনচারজন রাজার দেহরক্ষী।

রাজা ঘোড়া থেকে নামলেন। দেহরক্ষীরা নামল না। সেনাপতি রাজাকে ফ্রান্সিসদের ঘরে নিয়ে এল। রাজা ঘরে ঢুকে একবার চারদিকে চোখ বুলোলেন। ফ্রান্সিসরা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার রাজা কাপাকের দিকে তাকালেন। একটু পরে বললেন—কাপাক তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করেছো। তোমাকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

—দাদা—আমি জেনেশুনে এই ভুল করিনি। তখন ভেবেছিলাম সুন্দর নগরী মাজোর্কা যদি জয় করতে পারি তাহলে তোমার রাজত্বের সীমাও বাড়বে। আবার একটা সুন্দর নগরীও তোমার অধিকারে আসবে। কাপাক বলল।

—ওসব আমি শুনতে চাই না। আমার নির্দেশ অমান্য করেছো এটাই তোমার অপরাধ। রাজা পাচাকুটি বললেন।

—কিন্তু আমি যা করেছি তোমার জন্যেই করেছি। এ ব্যাপারে আমার কোন স্বার্থ ছিল না। কাপাক বলল।

—কে জানে? কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ তোমার ছিল কিনা। রাজা বললেন।

একটু থেমে কাপাক বলল—কত যুদ্ধে জয়ী হয়ে তোমার সাম্রাজ্য বাড়িয়েছি। আজকে একটা সামান্য ভুলের জন্যে আমাকে হত্যা করবে?

—ওসব কথা তুলে লাভ নেই। ফাঁসি তোমার হবেই। রাজা বললেন।

এতক্ষণে রাজা পাচাকুচির নজর পড়ল ফ্রান্সিসদের ওপর। রাজা সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করলেন—এরা কারা?

—বিদেশী। কাপাকোর সঙ্গী সব। সেনাপতি বলল।

—তোমরা কোন দেশের লোক। রাজা জিজ্ঞেস করলো।

—আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—এখানে কী জন্যে এসেছো? চুরি ডাকাতির মতলব নেই তো? রাজা বললেন।

—ভাইকিংরা চুরি ডাকাতি করে না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে এই দেশে এসেছো কেন? রাজা বললেন।

একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—মাজোর্কার রাজা কুয়েক হুয়া তাঁদের পারিবারিক সম্পদের সঙ্গে একটি নক্সা পেয়েছিলেন। তাঁর পিতামহের আঁকা নকশাটিতে তাঁদের ধন সম্পদের নিশানা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজা কুয়েক হুয়ার পিতা নক্সার অর্থ বের করতে পারেন নি। ওখানকার বুনো মানুষদের সঙ্গে লড়াইয়ে রাজা কুয়েক হুয়ার পিতামহ হঠাৎই মারা যান। নক্সা সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলে যেতে পারেন নি। রাজা কুয়েক হুয়ার পিতা অনেক চেষ্টা করেও গুপ্ত ধনভাণ্ডারের হদিশ করতে পারেন নি। কুয়েক হুয়া নিজেও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেন নি। হতাশ হয়ে তিনি কাপাককে নক্সাটা দিয়ে দেন। কাপাকও পারে নি। নক্সাটা আমি পেলাম। এই ব্যাপারে আমরা মাজোর্কা যাচ্ছিলাম। পথে আপনার সেনাপতি আমাকে বন্দী করেন। সবই আপনাকে বললাম। আমাদের একটাই কথা—আমরা বন্দী হওয়ার মত কোন অপরাধ করি নি।

রাজা পাচাকুচি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—নক্সাটা তোমার কাছে আছে?

—হ্যাঁ। কাপাক বলল।

—আমাকে দাও। রাজা বললেন।

—কিন্তু—যদি মাজোর্কার রাজবাড়িতে খোঁজ করার সুযোগ পাই—

—ঐ সুযোগ তুমি কোনদিনই পাবে না। গুহার কয়েদখানায় থেকে থেকেই একদিন মারা যাবে। কাজেই ওটা আমাকেই দাও। রাজা বললেন।

—বেশ এই নিন। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টির মধ্যে থেকে নক্সাটা বের করল। রাজার দিকে বাড়িয়ে ধরল। রাজা খপ্ করে যেন কেড়ে নিলেন। বললেন—মন্ত্রীমশাইকে দেব। মন্ত্রীমশাই অত্যন্ত বুদ্ধিমান। এই নক্সার রহস্য উনি অনায়াসে ভেদ করতে পারবেন।

এবার ফ্রান্সিস বলল—আপনি তো নক্সা পেলেন। এবার আমাদের ছেড়ে দিন।

—না-না—রাজা মাথা নাড়লেন—তোমরা গুপ্তধন চুরি করতে এসেছো তোমাদের ছাড়া হবে না। কাপাক বলল—দাদা—আমি অপরাধ করেছি— নিজের অজান্তে—আমাকে শাস্তি দাও, এরা বিদেশী, এদের কেন বন্দী করে রাখা হবে?

—তোমার সঙ্গী তাই। কাউকে ছাড়া হবে না। রাজা বললেন।

রাজা ঘরের বাইরে গেলেন। সাদা ঘোড়াটায় উঠলেন। পেছন্ পেছন সেনাপতি ঘোড়াটায় উঠলেন। দুজনে ঘোড়া চালালেন। পেছনে কয়েকজন দেহরক্ষী, অশ্বারোহী সৈন্য।

ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে পড়ল। বিস্কো বলল—

—ফ্রান্সিস এটা কী করলে?

—কী করলাম? ফ্রান্সিস বলল।

—নক্সাটা দিয়ে দিলে? বিস্কো বলল।

—ওটা নকল। আসলটা হ্যারির কাছে আছে। ঐ নিয়েই সন্তুষ্ট হল। নইলে কাপাকের সঙ্গে আমাদেরও ফাঁসিতে ঝোলাত। রাজামশাই অত্যন্ত নিচুমনা মানুষ।

—ঠিকই বলেছেন। ও আমার দাদা। তবু আমি ওকে ঘৃণা করি। ওর সঙ্গে মতের মিল না হলেই ঝোলাও ফাঁসিতে। ওর হুকুমে ইতিপূর্বে দুজন মন্ত্রী ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে। সেনাপতি মরেছে তিন জন। আমিই সবচেয়ে বেশিদিন সেনাপতি ছিলাম। এখন তো আমাকে ঝোলাবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। ভাই বলে রেহাই নেই।

ঘরের কোণায় রাখা মোমবাতিটার দিকে ফ্রান্সিস তাকিয়ে রইল। মাথায় চিন্তা। কবে নাগাদ ফিরতে পারবে। জাহাজে মারিয়া, বন্ধুরা নিশ্চয়ই খুব চিন্তায় পড়ে গেছে। ফ্রান্সিসের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ফ্রান্সিসের চোখ জ্বালা করে উঠল। ও চোখ বন্ধ করল।

হঠাৎ কারর কথায় ও চোখ খুলল। দেখল একজন সৈন্য ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সৈন্যটি বলল—চলো সব। কয়েদখানায় চল।

ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল। ঘরের বাইরে এল। ছ'সাতজন সৈন্য আগে পিছে দাঁড়াল। চলল সবাই। রাস্তায় লোকজন চলাচল করছে। আকাশে চাঁদ আছে কি না ফ্রান্সিস তাকাল। চাঁদ কুয়াশা-ঢাকা চারদিক অন্ধকার রাস্তার লোকেরা ফ্রান্সিসদের দেখল।

নগরের পেছন দিককার দরজার কাছে এল। দরজায় সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। সৈন্যটি প্রহরীদের কি বলল। প্রহরীরা সরে গেল। নগরের পেছন দিককার দরজা খুলে গেল। ফ্রান্সিসরা দরজা দিয়ে বাইরে এল। ওরা চলল।

এই অন্ধকারেও ফ্রান্সিস দেখল উত্তরদিকে একটা পাহাড়ের মত। খুব উঁচু নয়। এই রাস্তা গেছে ঐ পাহাড়ের দিকে। নগর ছাড়িয়ে এই রাস্তাটা পাথর ছড়ানো। এবড়ো খেবড়ো। হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। ফ্রান্সিসরা ঐ রাস্তা দিয়েই চলল।

পাহাড়ের নিচে এসে দেখল কয়েকটা গুহা। গুহার মুখে মশাল জ্বলছে। একটা গুহার মুখ বেশ বড়। গুহার মুখে দুপাশে দুটো মশাল জ্বলছে। চারজন প্রহরী তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিসরা গুহার মুখে এল। দেখল গুহায় একটু এগিয়েই পাথরে পোঁতা লোহার গরাদ। তাতে একটা ছোট দরজা, এক প্রহরী এগিয়ে এসে দরজার তালা খুলে দিয়ে ফ্রান্সিসদের ইঙ্গিতে ঢুকতে বলল। ফ্রান্সিসরা ঢুকল। একটু দূরে গুহার ভেতরের দিককার আর একটা গরাদ পোঁতা জায়গা। ঐ দুটি গরাদের মধ্যেই যতখানি জায়গা তাই বন্দীরা পাবে।

ফ্রান্সিস দেখল মেঝেয় ঘাসের বিছানা। ফ্রান্সিস দেখেই বুঝল শুয়েও বিশ্রাম করা যাবে না। পাথরকুচি ছড়িয়ে আছে। বসলে শুলে পাথরের কুচি ফুটবে। সেই অবস্থাতেই ফ্রান্সিস শুয়ে রইল। বিস্কোরাও বসল। দেখল—পেছনের দিকে একটা মাটির জালা। নিশ্চয়ই জল আছে ওটাতে। ও উঠে জালাটার কাছে গেল। জালার মুখ-ঢাকা কাঠটা সরাল। দেখল জল। ও পাশে রাখা একটা কাচের গ্লাশমত পেল। ও গ্লাশ ডুবিয়ে পরপর তিনবার জল ভরে খেল। ফিরে এসে ফ্রান্সিসকে বলল—যাও। জল আছে ওখানে। ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল—একটা পাত্রে করে এনে দাও। বিস্কো বুঝল ফ্রান্সিস খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ও গিয়ে গ্লাশের মত পাত্রটায় জল ভরে নিয়ে এসে ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিসও পরপর তিনবার জল খেল। কাপাকরাও জল খেল।

ফ্রান্সিস চুপচাপ শুয়ে রইল। অনেক চিন্তা মাথায়। রাজা কুয়েক হুয়ার গুপ্তধন। এই বন্দীদশা। কবে ছাড়া পাবে তার কোন ঠিক নেই। দেরি করা চলবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজে ফিরতে হবে।

একটু রাত্রে ফ্রান্সিসদের খাবার এল। দুজন সৈন্য ফ্রান্সিসদের সামনে প্রত্যেককে পাতা দিল। তারপর পোড়া রুটি আর তরিতরকারির ঝোল। ফ্রান্সিস চেয়ে চেয়ে নিয়ে নিল। বলল—বিস্কো পেট পুরে খাও। চেয়ে চেয়ে খাও। শরীর ঠিক রাখো। এটা বন্দী জীবনে ফ্রান্সিস বন্ধুদের বলে থাকে।

খাওয়া শেষ। রক্ষীরা চলে গেল। জল খেয়ে ফ্রান্সিস বলল—কাপাক আগেই শোবেন না। সবাই বিছানাটা তুলুন। বিছানাটা তোলা হল। ফ্রান্সিস এঁটো পাতাগুলি দিয়ে জায়গাটা থেকে পাথরের কুচিগুলো সরালো। তারপর বিছানা পাতা হল। এবার আর পাথরকুচি বিঁধছে না। ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু সকালেই ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙল। ও উঠে বসল। ও বাইরের দিকে তাকাল। দেখল—চারজনের জায়গায় দু'জন প্রহরী। আর দুজন বোধহয় খাবার আনবে। ও লক্ষ্য করল দুই প্রহরী নিজেদের মধ্যে কী নিয়ে কথা বলছে।

হঠাৎই কুজকো নগরের দিক নগর থেকে চিৎকার হৈ-হল্লার শব্দ ভেসে এল। ফ্রান্সিস বলল—কাপাক—কীসের শব্দ বলুন তো! কাপাক বলল—কুজকো নগরী আক্রান্ত।

—তার মানে? কারা আক্রমণ করল? ফ্রান্সিস বলল।

—পাশের রাজ্যের সঙ্গে এই কুজকো রাজ্যের ঝগড়া চলছে বহুদিন ধরে। বর্তমান রাজারাও লড়াইতে জড়িয়ে গেছে। লড়াই চলছে।

—তাহলে আমরা কী করবো? ফ্রান্সিস বলল।

—অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। কাপাক বলল।

ফ্রান্সিসরা চুপচাপ শুয়ে বসে রইল। ওদিকে অস্পষ্ট চিৎকার আর্তনাদ গোঙানির শব্দ আসতে লাগল।

বেলা বাড়তে লাগল। সকালের খাবার এল না। কাপাক গরাদের কাছে গেল। গরাদের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে বলল—

—কী ভাই? আমাদের খাবারের কী হল?

প্রহরী ঘুরে দাঁড়াল। বলল—আমাদেরও খাবার জোটে নি।

—কারণ কী? ফ্রান্সিস বলল।

—রাঁধতে টাঁধতে দেরি হচ্ছে আর কি। প্রহরী বলল।

—সত্যি কথাটা বল ভাই। পাশের রাজ্যের রাজা কুজকো অধিকার করতে এসেছে। দাদার সৈন্যরা লড়াই চালাচ্ছে। রাঁধুনীও লড়াইতে গেছে। কাপাক বলল।

প্রহরী সাদামাটা গলায় বলল—কতকটা ঐরকমই ব্যাপার।

—তোমার বন্ধুকে দেখছি না। কী ব্যাপার? ফ্রান্সিস বলল।

—খাওয়ার ব্যবস্থা করতে গেছে। প্রহরী বলল।

—তাহলে খাবার পাওয়া যাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—দেখা যাক। প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। পরে কাপাকের কাছে গেল। বলল—মাত্র একজন প্রহরী। ওকে সহজেই কাবু করা যায়। কী বলেন?

—হ্যাঁ। যায়। একটু অপেক্ষা করুন। দেখা যাক অন্য প্রহরীটা আসে কি না।

—কিন্তু সেইজন্য অপেক্ষা করতে যাব কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। কাপাক উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে গরাদে হাত চেপে দাঁড়াল। বলল—ভাই একটু দেখবে?

—কী দেখবো? প্রহরী বলল।

—আমার চোখে কী পড়েছে। কাপাক বলল।

—তোমার বন্ধুদের বলো না। প্রহরী বলল।

—এই অন্ধকারে ওরা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কাপাক বলল।

—আমিই কি দেখতে পাবো? প্রহরী বলল।

—আহা—তুমি দেখতেই পাবে একথা বলছি না। তবু দেখ।

প্রহরী হাতে বর্শা রেখে এগিয়ে এল। কাপাক গরাদের মধ্যে দিয়ে মাথাটা বের করল। বলল—দেখ। প্রহরী এগিয়ে এল। কাপাকের কাছে এল। মাথা নিচু করে চোখ দেখতে গেল তখনই কাপাক গরাদ দিয়ে হাত বাড়িয়ে প্রহরীর ঘাড় চেপে ধরল। প্রহরী মাথা নাড়তে লাগল। চেষ্টা করল সরে যেতে। কিন্তু পারল না। এবার ফ্রান্সিসরা গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বের করে প্রহরীর গলা মাথা চেপে রাখল। প্রহরী ওর মাথাটা টেনে নিতে চাইল। কিন্তু একটু পরেই বুঝল—এদের হাত ছাড়ানো যাবে না। অসম্ভব।

এবার ফ্রান্সিস বলল—চাবি বের কর। দরজার তালা খুলে দাও।

—চাবি আমার কাছে নেই। প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিস ওর গালে মুখে একটা চড় মারল।

—না। আমার কাছে নেই। প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিস আবার চড় কষাল। প্রহরী বুঝল চাবি না দিলে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। ও কোমরের গোঁজা চাবির থোকাটা বের করল। ফ্রান্সিস ওর হাত থেকে চাবির থোকাটা নিয়ে নিল। কাপাক প্রহরীর গলা চেপে ধরল। টেনে নিয়ে চলল দরজার

দিকে। দরজার সামনে এসে বলল—এইবার দরজার তালা খুলে দাও। প্রহরী ঘাড় কোমর সরিয়ে নিতে চেষ্টা করল। আবার ফ্রান্সিস প্রহরীর মুখে চড় মারল। প্রহরী গালে হাত বুলোতে বুলোতে চাবির তোড়াটা ফ্রান্সিসের কাছ থেকে নিল। চাবিটা বের করে কয়েদগুহার তালা খুলে দিল। ফ্রান্সিসরা বেরিয়ে এল। পুরোনো বন্দীরাও বেরুল। বেরিয়ে এসেই ছুটতে শুরু করল। তারপর ওরা কী করল। বন্দীদের আর দেখা গেল না।

কাপাক পাথুরে রাস্তায় নামল। বলল, এটাই একমাত্র রাস্তা বের হবার। চলুন। ফ্রান্সিসরা কাপাকের নির্দেশমতই চলল। কুজকো নগরের যত কাছে আসছে ফ্রান্সিসরা লড়াই এর শব্দ শুনতে লাগল। কিছুক্ষণ আগের থেকে এখন অনেক স্পষ্ট যুদ্ধের চিৎকার গোঙানি শোনা যাচ্ছে।

বোঝাই গেল লড়াই-এ জিগির চিৎকারে অনেক ভাঁটা পড়েছে। এখন আহতদের কান্না গোঙানি শোনা যাচ্ছে। পেছনের প্রবেশপথে মাত্র একটা মশাল জ্বলছে। প্রহরী কেউ নেই। ফ্রান্সিস বলল—এখন কী করা যায়। কাপাক বলল— অনেক বেলা হয়েছে সকাল থেকে না খেয়ে আছি। নগরের মধ্যে ঢোকা যাক। কিছু খাবার জোটে কিনা দেখা যাক।

—এখন তার আগে তো জানতে হবে কে জিতলো কে হারলো। ফ্রান্সিস বলল।

—ওটা নগরে ঢুকলেই বোঝা যাবে। কাপাক বলল।

—এখন খিদেটা না খেতে পেয়ে আরো বেড়েছে। প্রথমেই খেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক। কাপাক বলল।

এবার ফ্রান্সিসরা প্রবেশ পথ ধরে এল। প্রবেশ পথের ধারে কাছে প্রহরীরা নেই। একটু এগোতেই লড়াইয়ের ভয়াবহয়তা দেখা গেল। সৈন্যরা মরে পড়ে আছে। সৈন্যাবাসের সামনের মাঠটায় মৃতরা পড়ে আছে। আহতেরা আর্তনাদ করে উঠছে। অনেক ঘোড়া মরে পড়ে আছে। নয় তো আহত হয়ে মাঠে কাতরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে। একজন আহত সৈন্যকে কাপাক জিজ্ঞেস করল—ভাই রাগ করবেন না! বলুন তো কে জয়ী হল? সৈন্যটি আস্তে আস্তে বলল—

—পামার রাজ্যের রাজা চিমোর ইনকা হেরে গেছে।

—তুমি কোন রাজার যোদ্ধা?—পাচাকুচি না চিমোর ইনকার দেশের?

—আমি রাজা পাচাকুচির দেহরক্ষী।

ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—লড়াই কি এখনও চলছে?

—বসতি অঞ্চলে চিমোর ইনকার সৈন্যরা এখনো লড়াই করে যাচ্ছে। এরাই বেঁচে থাকা শেষ যোদ্ধা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মরবে নয়তো বন্দী হবে। দেহরক্ষী বলল।

ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে আছে তখনই দেখল এক বৃদ্ধ আর একজন যুবক আহত সৈন্যদের কাটা জায়গায় ঝোলা থেকে ওষুধ বের করে লাগাচ্ছে। বেশ বোঝা গেল বৃদ্ধ রাজবৈদ্য। যুবকটি তাঁর সহকারী। তাঁরা ঘুরে ঘুরে আহতদের ওষুধ দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস বলল—কাপাক এখন এখানে বসে থেকে লাভ নেই। প্রথমে খাবার চাই। খাওয়ার শেষে আমরা আর অপেক্ষা না করে মাজোর্কার দিকে রওনা হব। সবাই এসো। চলো।

সবাই একত্র হল। ফ্রান্সিস আর কাপাক সকলের সামনে। দল বেঁধে চলল সব। হাঁটতে হাঁটতে ফ্রান্সিস বলল—বিস্কো ঈগর—কোন সরাইখানা দেখলে বলবে।

—কিন্তু লড়াইয়ের এই ডামাডোলের মধ্যে কোন সরাইখানা কেউ খুলবে? বিস্কো বলল।

—এখন খুলবে। মানে দরজা আধভেজানো রাখবে। সবাই তো আর যুদ্ধে নামে নি। সকাল থেকে কারো কারো বাড়িতে রান্না হয় নি। সারা সকাল থেকে অনেকের উল্লাস চলছে। তারা তো খাবার খুঁজবে। খাবার পাবে সরাইখানায়। সরাইখানার মালিকরা তা ভালো করেই জানে। ওরা ব্যবসায়ী। ঠিক লুকিয়ে চুরিয়ে খাবার বিক্রি করবে। একটা বটগাছের তলায় একটা সরাইখানা দেখল বিস্কো। ফ্রান্সিসকে দেখাল। ফ্রান্সিস বলল—কাপাক চলুন। ফ্রান্সিস কাছে এসে ভেজানো দরজায় টোকা দিল। কোন সাড়া নেই। আবার টোকা দিল। ভেজানো দরজা খুলে গেল। সবটা নয়। বোধহয় সরাইখানার রাঁধুনি বা কাজের লোক মুখ বাড়াল। কাপাক এগিয়ে গেল। বলল—লড়াইয়ের জন্যে আমরা খেতে পারিনি। এখন ভীষণ খিদে। খেতে দাও। লোকটি দু'একবার গাঁইগুই করল। ফ্রান্সিস বলল—আমরা কিন্তু রাজা পাচাকুচির সৈন্য। আমাদের জয় হয়েছে। কাজেই—

—না-না। ভেতরে আসুন। লোকটা বলল।

লোকটি দরজাটা আরো কিছুটা খুলল। ফ্রান্সিসরা কাত হয়ে ঢুকে পড়ল। টানা একটা কাঠের পাটাতনে বসল। তখনই মালিক এল। হেসে বলল —আপনাদের কথা রাইট বলেছে। লড়াই চললে কী হবে? লোকের পেটের খিদে তো মিটবে না। তাই আমি লুকিয়ে চুরিয়ে ক্ষুধার্ত মানুষদের খাবার দিচ্ছি।

—সত্যি আপনি প্রশংসনীয় কাজ করছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—যতটা পারি আর কি। সরাইওয়ালা হেসে বলল।

—এবার আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। কাপাক বলল।

মালিক ডাকল—রবার্ট?

রবার্ট এগিয়ে এল।

—রান্না কতদূর? এঁরা অভুক্ত। সরাইওয়ালা বলল।

—রুটি হয়ে গেছে। তরকারিটা ফুটছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ে যাবে। রবার্ট বলল।

—মাংসের ব্যবস্থা করেছো? মালিক বলল।

—না—মাংস জোগাড় করতে পারলাম না। রবার্ট বলল।

ফ্রান্সিস বলল—রবার্ট আমাদের রুটি দিয়ে যাও।

—শুধু রুটি? রবার্ট জানতে চাইল।

—হ্যাঁ সঙ্গে পেঁয়াজ আর নুন। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা সবাই নুন পেঁয়াজ আর রুটি খাবেন? রবার্ট আবার বলল।

—না। তবে কেউ খেতে চাইলে খাবে। যা বললাম নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

রবার্ট অবাক চোখে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চলে গেল।

মালিক বলল—রবার্ট তো বলে গেল ঝোলটা তাড়াতাড়িই হবে।

—ঠিক আছে। আমাকে আমার ইচ্ছেমত খেতে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। মালিক হেসে বলল। তারপর চলে গেল।

রবার্ট খান চারেক রুটি আর পেঁয়াজ নিয়ে এল। ফ্রান্সিসের সামনে একটা পাতা পেতে দিল। তাতে রাখল সব। ফ্রান্সিস রুটি খেতে লাগল। পেঁয়াজটা কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল। খেতে খেতে ডাকল—রবার্ট। রবার্ট এল।

—দুটো টমেটো দিয়ে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

রবার্ট টমেটো দিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস নির্বিকার মুখে সবই খেতে লাগল। ফ্রান্সিসের খাওয়া তখনও শেষ হয়নি। রবার্ট সবজির তরকারি দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস খেয়ে চলল। এবার রবার্ট অন্যদের খাবার দিতে লাগল। বিস্কোরা খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ। হাতমুখ ধুয়ে ফ্রান্সিসরা এসে পাটাতনে বসল। কিছুক্ষণ ওরা চুপ করে বসে রইল। একসময় কাপাক বলল—ফ্রান্সিস আমাদের এখানকার কাজ হয়ে গেছে। এখন মাজোর্কা যেতে হবে। আর দেরি করা ঠিক নয়।

—বেশ চলুন। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। আর সবাইও উঠে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস দাম মেটাল। তারপর সবাই রাস্তায় এল। ফ্রান্সিস মাজোর্কার দিকটা বুঝে নিল। বলল—আমাদের পূবমুখো যেতে হবে।

যেতে যেতে দেখল—রাস্তায় বাড়িঘরের সামনে অস্ত্রাঘাতে নিহত মানুষেরা পড়ে আছে। রাস্তায় কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সবাই বেশ ভীত, সন্ত্রস্ত।

সদর দেউড়ির কাছে এল ওরা। দেখল দরজার কাছে অনেক মৃতদেহ পড়ে আছে।

—থামবেন না। দ্রুত সদর দেউড়ি পার হয়ে যাবেন। কাপাক মৃদুস্বরে বলল। কিন্তু সবাই শুনতে পেল। ওরা দ্রুতপায়ে খোলা দেউড়ি পার হয়ে গেল। দু'তিনজন দ্বাররক্ষী ছিল। তারা বাধা দিল না। তাদের হাতে অস্ত্রও ছিল না। বোধহয় আহত।

বাইরে এসে ফ্রান্সিস বলল—কাপাক—দুটো ঘোড়া চাই। মাজোর্কা বেশ দূর।

—হ্যাঁ। হেঁটে গেলে থেমে থেমে যেতে হবে। দেরি হবে। কাপাক বলল।

—দেরি করা চলবে না। জাহাজে আমার বন্ধুরা সব রয়েছে। ওরা আমাদের জন্যে চিন্তায় আছে। আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

—তাহলে ঘোড়া জোগাড় করতে হয়। কাপাক বলল।

—চেষ্টা করতে হবে। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে লাগল। তখনই দেখল একটু দূরে একটা শিশু গাছে তিনটে ঘোড়া বাঁধা। ফ্রান্সিস গলা চেপে বলল— কাপাক দেখেছেন তো?

—হ্যাঁ। কিন্তু ঘোড়াগুলোর গায়ে গলায় কোন সাজ পরানো নেই।

—কিন্তু একটা লাগাম পরানো আছে। বসার আসন টাসনের কথা এখন ভাববেন না। চলুন।

ফ্রান্সিসরা ঘোড়াগুলোর কাছে এল। শেষ বিকেলের আলো আছে। সবই দেখা যাচ্ছে।

কাপাক বলল—আগে আপনারা দুজন যান। আমরা পরে উঠব।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বিস্কোকে সঙ্গে নিয়ে একটা ঘোড়ার কাছে এল। দেখল ঘোড়াগুলোর গলায় লাগাম মত পরানো দড়ি। ঐ দড়ি গাছের সঙ্গে বাঁধা। ফ্রান্সিস বলল—বিস্কো গাছে বাঁধা দড়ি কাটো। বিস্কো বলল— কাপাক আপনাদের ঘোড়ার দড়ি কেটে দিলাম। আপনারা উঠুন। কাপাক লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ল। ঈগরও এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে পেছন দিকে কাপাকের পেট জড়িয়ে ধরল।

ফ্রান্সিস আর কাপাক ঘোড়া চালাতে লাগল। বসার আসন নেই, পা দানি নেই। এভাবেই ফ্রান্সিসরা ঘোড়া চালাতে লাগল। মাঝে মাঝে ফ্রান্সিসদের ঘোড়া জোরে ছুটতে শুরু করে। বেশ করে ঘোড়া দুটোকে সামলাতে হচ্ছে। দুদিন পরে তৃতীয় দিন সন্ধ্যেবেলা ওরা মাজোর্কা পৌঁছল।

কিছুক্ষণ পরে কাপাক বলল—আমরা এসে গেছি রাজবাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। সদর দেউড়ির দুপাশে দুটো বিরাট মশাল জ্বলছে। দুটো থামের ওপর রয়েছে সেই মশাল দুটো। মোটা কাপড়ের পলতে। তেলে চুবিয়ে সেই মোটা পলতেতে আগুন জ্বালানো হয়। চারদিকে বেশ উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ লড়াইয়ের শব্দ। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—রাজবাড়ির সদর দেউড়ির কাছে লড়াই শুরু হয়েছে। মানুষের চিৎকার তরোয়ালে তরোয়ালে ঠোকাঠুকির শব্দ। শোনা গেল আহতদের গোঙানি। কান্না। ফ্রান্সিস বলল— কার সঙ্গে কার লড়াই হচ্ছে আমরা তা বুঝতে পারছি না। যাদের মধ্যেই লড়াই হোক আমরা কোন দলে যাবো না। লড়াই থামা পর্যন্ত চলো। বাঁ দিকে ঐ বড় ঝোপটার দিকে। ওখানেই আশ্রয় নেব আমরা।

ফ্রান্সিসরা বড় ঝোপটায় ঢুকল। ঝোপের মধ্যে তেমন চাঁদের আলো পড়েনি। ওর মধ্যেই কিছুটা ঝোপ জঙ্গল পরেই দেখা গেল কিছুটা খোলা জায়গা। ফ্রান্সিস বলল—আমরা এখানে থেকে লড়াইর শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। তারপর লড়াই শেষে রাজবাড়ি যাবো।

—কাদের সঙ্গে কাদের যুদ্ধ একেবারেই বোঝা গেল না। যা হোক দেখা যাক। বিস্কো বলল।

ফ্রান্সিসরা ঐ খোলা জায়গাটুকুতে বসল। চাঁদের আলো অনুজ্জ্বল। ফ্রান্সিস ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। তখন আকাশে চাঁদ আর সাদা মেঘের খেলা চলেছে। চাঁদ সাদা মেঘে চাপা পড়েছে। মেঘ সরে যেতেই আবার চাঁদ ।

ওদিকে রাজবাড়ির দিকে শোনা গেল সমবেত ধ্বনি—পাচাকুটি—দীর্ঘজীবী হোন। এবার কাপাক বলল—দাদা আবার এই মাজোর্কা জয় করল। আমি জয়

করেছিলাম। বেশ কিছু সৈন্য পালিয়ে গিয়েছিল। হয়তো ওরাই দাদার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছে। দাদার নামে জয়ধ্বনি উঠছে। দাদার সাম্রাজ্য আরো কিছুটা বাড়ল। কতজনের প্রাণ গেল কে জানে। একটু থেমে বলল—এখনকার সেনাপতি অত্যন্ত নির্মম, নিষ্ঠুর। নির্বিচারে নরহত্যা ওর কাছে খুব মজার খেলা। সে অন্য পক্ষের সৈন্যদের বন্দী করে না হত্যা করে। এতেই তার আনন্দ।

সৈন্যদের হৈ হল্লা শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে হৈ হল্লা বন্ধ হল।

ওদিকে সেনাপতি দুজন রক্ষী নিয়ে রাজবাড়ির দরজার কাছে এল। দেখল দরজা খোলা। ধারে কাছে কেউ নেই। সেনাপতি হো হো করে হেসে উঠল। রক্ষীদের বলল—সব পালিয়েছে। চল। প্রথম মন্ত্রণা কক্ষটায় এল। একটা গোল ওক কাঠের টেবিল। চারপাশে বাঁকা পায়াওয়ালা চেয়ার। একপাশের পাথরের দেওয়ালে একটা মশাল জ্বলছে।

ভেতরের ঘরের দরজা খুলে একটি পরিচারিকা বেরিয়ে এল। বলল— আপনারা কি রাজামশাইর কাছে যাবেন?

—হ্যাঁ। সেনাপতি বলল।

—তাহলে এই ঘরে আসুন পরিচারিকা চলল।

সেনাপতিরা পরিচারিকার পিছু পিছু পরের ঘরটায় এল। দেখল বিছানায় রাজা কুয়েক হয়া শুয়ে আছেন। রাজা অসুস্থ এটা ওরা শুনেছিল। রাজার মাথার কাছে রাণী বসে আছেন।

রাজা একটু ওঠার চেষ্টা করলেন। রাণী রাজার পিঠে হাত দিয়ে তুললেন। ঘাড়ে পিঠে মোটা বালিশ রাখলেন। রাজা স্বস্তি পেলেন। রাজা বললেন—আসুন। আপনার পরিচয়টা জানলে—সেনাপতি রাজাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—আমি রাজা পোচাকুচির সেনাপতি। আপনি অসুস্থ এটা আমরা শুনেছি। তবে এতটা অসুস্থ বুঝতে পারিনি।

আপনাদের তো তেমন কোন লড়াই করতে হয়নি। আমার সৈন্যরা এই আকস্মিক আক্রমণে বোধহয় দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। তাই পালিয়েছিল। রাজা বললেন।

—না। ওরা সহজে হার স্বীকার করে নি। শেষ শক্তিটুকু দিয়ে লড়েছে। যথার্থ বীর ওরা। অনেকেই পরাজয় সহ্য করতে না পেরে পেটে তরোয়াল ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সেনাপতি বলল।

—কেন এসব করতে গেল? রাজা বললেন।

—আপনাকে ওরা দেবতার মত শ্রদ্ধা করে। আপনার জয় হল না। এই পরাজয় ওরা মেনে নিতে পারে নি। সেনাপতি বলল।

—হয়তো তাই। রাজা দুর্বলকণ্ঠে বললেন।

সেনাপতি সঙ্গের এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিকে দেখাল।

রাজা একটু মাথা নামালেন। নতুন রাজাও মাথা একটু নুইয়ে ভদ্রতা দেখাল।

—এখন মাজোর্কার রাজা আর আপনি নন—ইনি—হয়ার্কই এখন রাজসিংহাসনে বসবেন। সেনাপতি বলল।

—খুব ভালো কথা। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রজারা খুবই চিন্তায় পড়ল। আমিও রাজকার্য ঠিকভাবে চালাতে পারছিলাম না। আমিও একজন নতুন সুস্থ রাজা চাইছিলাম। এখন আপনারা নিজেরাই যখন আমাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চাইছেন তখন আমি খুশিই হয়েছি। প্রজারা একজন নতুন রাজা পাবে। সত্যি বলতে কি—এভাবে রাজা হয়ে থেকে প্রজা সাধারণের কোন উপকারই করতে পারবো না। রাজা বললেন।

—এখন আপনাদের তো রাজবাড়ি ছাড়তে হবে। সেনাপতি বলল।

রাণী বলে উঠলেন—তাহলে আমরা কোথায় থাকবো?

—আপনারা কি এই মাজোর্কাতেই থাকতে চান? সেনাপতি জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। আমরা মাজোর্কা ছেড়ে অন্য কোথাও থাকবো না। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। সেই ব্যবস্থাই হবে। তবে আপনারা রাজার ব্যবহৃত রাজদণ্ড পতাকা পোশাক টোশাক নিয়ে যেতে পারবেন না। ওসব নতুন রাজাকে দেওয়া হবে। সেনাপতি বেশ গম্ভীর গলায় বলল। রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বেশ ক্লান্তস্বরে বললেন—আমি ওসব কিছুই নেব না। তবে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আপনাকে বলছি। একটু থেমে বললেন—আমি পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে একটা গয়নার বাক্স পেয়েছিলাম। ওটার মধ্যে একটা নকশা পেয়েছিলাম। ওটা আমার রাজবৈদ্যকে দেখিয়েছিলাম। উনি নকশাটা নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। দেখে টেখে ফেরত দিলেন। উনিও বললেন—এই নকশা বোঝা অসম্ভব।

—ঐ নক্‌শা এখন কোথায়? সেনাপতি বলল।

—দুজন ভাইকিং আমার বাড়িতে এসেছিল। নক্সাটা তাদেরই দিয়েছি।

সেনাপতি একটু গলা চড়িয়ে বলল—কেন আপনি ওদের নক্সা দিলেন?

—যোগাযোগের ব্যাপার। আমি পরিচিত অপরিচিত সবাইকেই ঐ নকশার কথা বলে থাকি। এই ভাইকিংদেরও বলেছিলাম। ওরা বেশ আগ্রহের সঙ্গে নক্সাটা নিয়েছিল। বলেছিল কয়েকদিন ভালো করে দেখে ফেরৎ দেবে। রাজা বললেন।

—নক্সা দেবার আর লোক পেলেন না? ওরা নকশা নিয়ে এতক্ষণে ওদের জাহাজে চেপে অনেক দূরে চলে গেছে। সেনাপতি বলল।

—না-না। নিশ্চয়ই ফেরৎ দেবে। এই নক্সার রহস্য কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। রাজা বললেন।

—যাক গে। নাও যদি বলে যায় তাহলে এই মাজোর্কায় থেকে নক্সার গুপ্তধন খোঁজাখুঁজি করবে। পেলে আর এক মুহূর্তও এখানে থাকবে না। সেনাপতি বলল।

—দেখা যাক। রাজা বললেন।

—নক্সাটায় কি গুপ্তধন কোথায় রাখা হয়েছে তার নির্দেশ আছে? সেনাপতি জানতে চাইল।

—না। তেমনভাবে তেমন কিছু তো সূত্র নেই।—রাজা বললেন।

সেনাপতি একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর চারদিক দেখে নিয়ে বলল—এই ঘরে তো চারটে ফুলদানি আছে। ফুল রাখা আছে। মনে হয় পাথরের।

—হ্যাঁ কালো পাথরের। ও পাশে আরও দুটো ঘর আছে। একটায় ছেলেমেয়েকে নিয়ে রাণী থাকেন। অন্য ঘরটা বন্ধই থাকে। অতিথি আত্মীয়রা এলে থাকেন। রাজা বললেন।

—সব ঘরেই ফুলদানি আছে? সেনাপতি জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। সর্বমোট বারোটা ফুলদানি আছে।

সেনাপতি একটু ভাবল। তারপর বলল—সহজে এই ধাঁধা বোঝা যাবে না। পরে ভাবব।

সেনাপতি নতুন রাজা হুয়ার্কের দিকে তাকাল। বলল—মাননীয় রাজা, চলুন।

সবাই রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। চলল নিজেদের আস্তানায়। সেনাপতির সৈন্যরা এর মধ্যেই রাজা কুয়েক হুয়ার সৈন্যদের তাড়িয়ে দিয়ে ওদের থাকার ঘরগুলোর দখল নিয়েছে। হৈ-হল্লোড় চলছে। যুদ্ধে জেতার আনন্দ।

ওদিকে সন্ধ্যে হল। ফ্রান্সিসদের চিন্তা হল রাতের খাবারের কী হবে। ফ্রান্সিস কাপাককে বলল সে কথা। কাপাক বলল—সৈন্যবাহিনীতে যে আমার রক্ষী ছিল তার মারফৎ খাবার জোগাড় করতে পারব।

একটু রাত হতে ফ্রান্সিস বলল—কাপাক আমি রাজা কুয়েক হুয়ার কাছে যাচ্ছি। নক্সাটার অর্থ বুঝতে রাজার মতামত জানা খুবই প্রয়োজন। আমি কথা বলে রাজার কাছ থেকে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারি।

কাপাক বলল—দেখুন যুদ্ধ শেষ হয়েছে। সেনাপতি এখনও দু'একদিন সাধারণ মানুষদের চলাফেরায় সাবধান করা হবে। এইসব কড়াকড়ির মধ্যে আপনি গ্রেপ্তার হতে পারেন।

—তাহলে আজ নয়। কাল রাতে যাবো। কালকের মধ্যে সেনাপতি অনেক সৈন্য কুজকো পাঠিয়ে দেবে। লড়াই তো শেষ। ফ্রান্সিস বলল। রাতটা ফ্রান্সিসরা প্রায় উপবাস করে রইল। ফ্রান্সিসের আনা একটা রুটি পাতায় করে খেল। ভোর হল। একটু বেলা হতে ফ্রান্সিস বলল—কাপাক একবার চেষ্টা করে দেখি রাজবাড়ির রাঁধুনির কাছ থেকে খাবার জোগাড় করতে পারি কি না।

ফ্রান্সিস ঝোপজঙ্গল থেকে বেরুলো। পেছন দিক দিয়ে রাজবাড়িতে ঢুকল। একেবারে রসুইঘরে চলে এল।

রাঁধুনি অবাক। বলল—আপনি কে?

—আমি বিদেশী। ভীষণ খিদে পেয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ কোণায় বসে খেয়ে যান। রাঁধুনী বলল।

—আমার আরো তিনজন বন্ধু রয়েছে। ওরা না খেলে আমি খাই কী করে।

—তাহলে ঐ তিনজনকেও নিয়ে আসুন। খেয়ে যান। রাঁধুনী বলল।

ফ্রান্সিস বলে উঠল অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। বন্ধুদের আনতে যাচ্ছি।

ফ্রান্সিস ফিরে এল। কাপাকদের বলল সব কথা। কাপাক বলল—এইটা একটা ভাল কাজ করেছেন। বলতে গেলে খাওয়ার সমস্যা মিটল।

সবাই ঝোপজঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। রাজবাড়ির দেয়ালের আড়াল দিয়ে তারা এল। রসুইঘরে ঢুকল। একপাশে কাঠের তক্তায় বসল। কাজের লোকটি ওদের সামনে খাবার দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস বলল—ভদ্রতা দেখাবেন না। প্রাণের আনন্দে খেয়ে যান। কাপাক সবচেয়ে বেশি খেল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—আপনার কাছে আমরা ছেলেমানুষ। কাপাকও হেসে খেতে লাগল।

—প্রাণে যতটা চায় খেয়ে যাও। এটাই আমার কথা। যাহোক—এবার জঙ্গলে চলো।

চারজনে ঝোপজঙ্গলের সেই জায়গাটায় ফিরে এল।

দিন কাটল। রাত হল। ফ্রান্সিস বলল—কাপাক—আমি রাজার কাছে যাচ্ছি। কতকগুলো তথ্য রাজার কাছ থেকে পাবো কিনা দেখি।

—হুঁ। কিন্তু সাবধানে যাবেন। রাজার বাড়ির সদর দেউড়িতে প্রাসাদরক্ষীরা থাকতে পারে। কাপাক বলল।

—সেটা ভেবেছি। ভাবছি ঈগরের পোশাকটা পরে যাই। বিদেশী পোশাক পড়লে বিপদ হতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তো। জামা খুলতে খুলতে ঈগর বলল। ফ্রান্সিসও জামাকাপড় খুলল। দুজনেই পোশক পাল্টালো।

ফ্রান্সিস চলল রাজবাড়ির দিকে। আকাশে ভাঙা চাঁদ। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। তবে চারপাশ মোটামুটি দেখা যাচ্ছে।

রাজবাড়ির সামনে এল ফ্রান্সিস। সদর দেউড়িতে দেখল মাত্র দুজন প্রহরী। একজন বর্শা হাতে পাথর বাঁধানো জায়গায় বসে আছে। অন্যজন এদিক ওদিক ঘুরছে।

ফ্রান্সিস ওদের সামনে গেল। একজন এগিয়ে এল।

—কোথায় যাবেন?

—রাজামশাইর সঙ্গে কথা বলতে। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজামশাই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। দ্বাররক্ষী বলল।

—না। রাজামশাই একটু বেশি রাতেই ঘুমান। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনি সেটা জানেন? রক্ষী বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করে বলল।

—আপনি কোথা থেকে আসছেন? বসে থাকা প্রহরী বলল।

—কুজকো থেকে। ফ্রান্সিস বলল।

— ঠিক আছে যান। এখন তো উনি আর রাজা নন। দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরী বলল।

—আমার কাছে উনি এখনও রাজা। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনি যেমন বোঝেন। যান। বসে থাকা দ্বাররক্ষী বলল।

বাইরের মন্ত্রণাকক্ষ পার হয়ে ফ্রান্সিস রাজার শয়নকক্ষে ঢুকল। দেখল রাজা বিছানায় শুয়ে আছেন। মাথার কাছে রাণী বসে আছেন।

ফ্রান্সিসকে দেখে রাজা ম্লান হাসলেন।

—এখন কেমন আছেন? রাণীর দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল।

—একই রকম। কখনও কষ্ট কমছে কখনও বাড়ছে। রাণী বললেন।

এবার ফ্রান্সিস রাজাকে বলল—আপনি কাপাককে যে নকশাটা দিয়েছেন সেটা আমি দেখেছি। নকশার পেছনে দুটো পংক্তি লেখা আছে। আমি পড়তে পারি নি। লেখাটা কী যদি বলেন।

—প্রাচীন স্পেনীয় ভাষায় লেখা—হোক না কালো পাথর

ফুলদানি বড় সুন্দর।

সবচেয়ে ভালো সাদা পাথরের ফুলদানি।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবল। মাথা তুলে বলল—এখানে তো তিনটে ঘর। তিনটে ঘরেই কি পাথরের ফুলদানি রাখা আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। রাজা বললেন।

—ফ্রান্সিস বলল—তাহলে তিনটে ঘরে সব মিলিয়ে বারোটা ফুলদানি আছে।

একটা কথা—একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—কাপাক ছাড়া আর কাউকে আপনার নকশা দেখতে দিয়েছিলেন?

—একজন কবিরাজকে। তিনি আমার চিকিৎসা করতেন। রাজা বললেন।

—করতেন বলছেন। এখন কি আপনাকে চিকিৎসা করেন না? ফ্রান্সিস বলল। তারপর বলল—

—নকশাটা কি উনি ফেরৎ দিয়েছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—না। রাজা মাথা নেড়ে বললেন।

—এখন যে নকশাটা আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—নকল করে রেখেছি। রাজা বললেন।

—কবিরাজ মশাই নকশা নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেলেন।

—আপনি তাঁর খোঁজখবর করেছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কিন্তু তাঁর কোনরকম হদিশই পাই নি। রাজা বললেন।

—উনি কোথায় থাকতেন? ফ্রান্সিস বলল।

—কুজকো। ঘোড়ায় চড়ে আসতেন। রাজা বললেন।

—বয়েস কম? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না। মধ্যবয়স্ক। আপনি এত কথা জানতে চাইছেন কেন? রাজা বললেন।

—এসবের সঙ্গে আপনার পিতামহের রাখা গুপ্তধনের হদিশ বের করব। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবেন? রাজা বললেন।

—সেই জন্যেই তো আপনার কাছ থেকে সব জানতে চাইছি। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখুন চেষ্টা করে। রাজা বললেন।

তখনই একজন পাচাকুচির সৈন্য ঘরে ঢুকল। বলল—মাননীয় রাজা— সেনাপতি এসেছেন। রাজা বললেন—নিয়ে এসো।

রাজা ভালোভাবে উঠে বসলেন। রাণী রাজার কাঁধ ধরে রইলেন। সেনাপতি ঢুকল। সেই দাম্ভিক ভঙ্গী। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে দরজার দিকে যাচ্ছিল। সেনাপতির নজরে পড়ল। বলল—

—তুমি এদেশীয় পোশাক পরেছো। কিছু চুরির ধান্ধা। সেনাপতি বলল।

—আমরা চোর নই। ফ্রান্সিস বলল।

—না। মহাপুরুষ। সঙ্গের দুজন সৈন্যকে বলল—এই ধর তো বিদেশী ভূতটাকে। সেনাপতি বলল।

সৈন্য দুজন ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে প্রথম সৈন্যটির চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুঁষি মারল। সৈন্যটি উল্টে গিয়ে মেঝেয় পড়ল। অন্যটিকে পায়ে পা ঠেকিয়ে জোরে পা ঘোরাল। সৈন্যটিও মেঝের ওপর চিৎ হয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস দ্রুত বাইরের ঘরে এল। তারপর মন্ত্রণাকক্ষটি পার হয়ে সদর দেউড়িতে এল। সঙ্গে দেউড়ির আলোর বাইরে ছুটে এল। প্রহরী দু'জন চিৎকার করে উঠল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস অন্ধকারে মিশে গেছে।

ফ্রান্সিস রাজবাড়ির তিনটে ঘর ভালো করে দেখতে চেয়েছিল। সেটা আর হলো না।

ফ্রান্সিস নদীর ধারে এল। জোর হাওয়া ছুটেছে। ফ্রান্সিসের ঘামে ভেজা গা জুড়োল।

হঠাৎ একটা খেজুর গাছের পেছন থেকে চারপাঁচজন বুনো মানুষ ছুটে এসে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস এই আক্রমণের জন্যে তৈরি ছিল না। নিজেকে সামলাতে পারল না। মাটিতে পড়ে গেল। বুনোরা সবাই মিলে ফ্রান্সিসকে শক্ত হাতে চেপে রইল। নদীর ঢালে নিয়ে এল। ফ্রান্সিসকে ঢাল দিয়ে নামিয়ে নৌকোয় বসিয়ে দিল। বৈঠা দিয়ে একজন নৌকো চালাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওপারে পৌঁছল। ফ্রান্সিস বার তিনেক জিজ্ঞেস করল—আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? কেউ কোন কথা বলল না।

নৌকো থেকে নেমে বুনোরা ফ্রান্সিসকে নিয়ে চলল। এতক্ষণ তবু নিস্তেজ জ্যোৎস্নায় কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিল। এখন বনের মধ্যে ঢুকে চারদিক অন্ধকার।

কিছুক্ষণ পরে বুনোরা ফ্রান্সিসকে ওদের বসতি এলাকায় নিয়ে এল। একটা বেশ বড় উঠোনের মত। চারপাশে বাড়ি ঘর। কেউ কেউ ঘর থেকে মুখ বের করে ফ্রান্সিসকে দেখল।

ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলল—আবার কয়েদঘর। আবার বন্দীদশা।

কিন্তু আশ্চর্য। ফ্রান্সিসকে ওরা একটা গাছের ডালে তৈরি ঘরে নিয়ে এল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। ঘরে একটা তেলের আলো জ্বলছিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একজন প্রহরী। হাতে বর্শা।

কিছুক্ষণ পরে দ্বাররক্ষী গলা চড়িয়ে বলল—রাজা আসছেন। তাঁকে সম্মান জানাও।

রাজা ঢুকল। বেশ দশাসই চেহারা। মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকতে হল। মাথায় লাল মোটা কাপড়ের ফেট্টি। তাতে বিচিত্র রঙের পাখির পালক গোঁজা। গলায় লালরঙের পাথরের মালা। মাথায় বড় বড় চুল। বেণীর মত বাঁধা।

দ্বাররক্ষী মাথা একটু নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানাল। রাজা বলল—আমাদের পুরোহিত আমাদের জানিয়েছে যে বর্তমান রাজা অর্থাৎ আমি আর রাজা থাকতে পারব না। নতুন রাজা আসবে দক্ষিণ দিক থেকে। তার গায়ের রঙ হবে সাদা। লম্বা লম্বা চুল। পরনে থাকবে বিদেশী পোশাক। তরোয়াল চালাতে অত্যন্ত দক্ষ। রাজা থামলেন।

—কিন্তু আমি রাজা হব কী করে? ফ্রান্সিস বলল।

—আমরাই আপনাকে রাজা করব। রাজা বলল।

—কিন্তু আমি তো রাজা হতে চাই না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আপনাকে বন্দী করা হবে। থাকতে দেওয়া হবে কয়েদখানায়। ফ্রাসিস কিছু বলল না। চুপ করে রইল। বুঝল এই বুনোদের হাত থেকে মুক্তি নেই। ওরা ওকে নিয়ে যা খুশি করুক। ও আপত্তি করবে না। পাথরকুচি দিয়ে মেঝে তৈরি হয়েছে। তার ওপর বিছানা। বেশ পুরু বিছানা। এক বিশেষ নরম ঘাসে তৈরি।

ফ্রান্সিস বিছানায় বসল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। রাজা চলে গেল। রাজার সঙ্গে যারা এসেছিল তারাও চলে গেল।

কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। বিছানায় শুয়ে পড়ল। মারিয়া আর বন্ধুদের কথা মনে এল। এখানে এইভাবে রাজা হয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ঠিক করল বুনোরা যা করতে বলবে তাই ও করবে। বুনোদের চটাবে না। ওদের কথামতো না চললে ওর মৃত্যু হতে পারে। কাজেই বুনোরা যা করছে করুক ও সবই মেনে নেবে।

রাত বাড়ল। দরজা খোলা হল। তিনচারজন বুনো মানুষ ঘরে ঢুকল। মেঝের একপাশে আসন পাতল। কোন গাছের পাতা বড় গোল পাতা পাতল। জলভরা কাঠের গ্লাশ রাখল। তেলের আলোটা বসবার জায়গার কাছে রাখল। একজন বুনো সৈন্য ফ্রান্সিসকে খাবারের জায়গায় এসে বসতে ইঙ্গিত করল।

ফ্রান্সিস উঠল। খেতে বসল। গোল রুটি, পাখির মাংস, তারপর ঝোলের মত কিছু। ফ্রান্সিস খেতে লাগল। মাংসটাই সবচেয়ে ভালো লাগছিল। ওটাই দুবার চেয়ে খেল।

খাওয়া শেষ। ফ্রান্সিস বিছানায় ফিরে এল। অনেক চিন্তা মাথায়। সেসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরে ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে। এখানে এত পাখি? ফ্রান্সিস হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় এসে বসল। দুজন রক্ষী খাবার নিয়ে এল। কাঠের থালায় পোড়া রুটি কয়েকটা। একটা বাঁশের ছোট চোঙে কী এক তরল জিনিস।

খিদেও পেয়েছে বেশ। ফ্রান্সিস বেশ দ্রুতই খেতে লাগল। খাওয়া শেষ।

রক্ষীরা চলে গেল। দুপুরে মাংসের সঙ্গে রুটি। আরো কিছু লতাপাতা দিয়ে রান্না করা খাবার। সেসবও খেল।

সন্ধেয় ফ্রান্সিসকে এনে উঠোনের একপাশে বসান হল। সিংহাসন ফাঁকা। বুনোরা ঢোলের মত একটা বাদ্যযন্ত্র এনে বাজাতে শুরু করল। উঠোনে স্ত্রীপুরুষ নাচতে নাচতে এল। সেইসঙ্গে তীক্ষ্ণস্বরে গান।

নাচগান চলছে তখন আগের রাজা এল। একপাশে বসল। নাচগান কিছুক্ষণ চলল। তারপর নাচিয়েরা চলে গেল।

এবার আগের রাজা উঠে দাঁড়াল। গলায় বেশ জোর দিয়ে বলতে লাগল—আমাদের রাজপুরোহিত স্বপ্নের মধ্যে দেখেছে এক যুবক দক্ষিণ দিক থেকে এসেছে। সেই যুবকের রাজা হবার সমস্ত লক্ষণই পুরোহিত দেখেছে। সেই যুবকই হবে আমাদের রাজা। সব লক্ষণ মিলে গেছে।

এই পর্যন্ত বলে রাজা ফ্রান্সিসের দিকে হাত বাড়াল।

ফ্রান্সিস আগের রাজার হাত ধরল। আগের রাজা বলল—উঠে আসুন। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। পুরোহিতের নির্দেশমত আমরা এই যুবককেই রাজা বলে মেনে নিলাম। বুনোরা হৈ হৈ করে উঠল। হাতের বর্শা ওঠানামা করতে লাগল। আগের রাজা বলতে লাগল—প্রজা সাধারণ—এই নতুন রাজাকে তোমরা মেনে নেবে। এই বলে আগের রাজা ফ্রান্সিসকে আস্তে ধরে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। আবার ধ্বনি উঠল—নতুন রাজা—বেঁচে থাকুন। বেশ হৈ চৈ চলল। আগের রাজা দুহাত ওপরে ওঠালো। গণ্ডগোল থেমে গেল।

পুরোহিত এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসের সামনে এসে কীসব বিড়বিড় করে বলতে লাগল। তারপর ফ্রান্সিসের মাথায় ফুল রাখল। হাত সরিয়ে নিতে ফুলগুলো পড়ে গেল। আরো কিছুক্ষণ পরে পুরোহিত মন্ত্র পড়তে পড়তে কী যেন বলল। ফ্রান্সিসের অস্বস্তি লাগছিল। চুপ করে বসে থাকতেও পারছে না আবার কিছু বলতেও পারছে না। সিংহাসন থেকে উঠে যেতেও পারছে না।

ফ্রান্সিসের কাছে এসে পুরোহিত গলা নামিয়ে বলতে লাগল, আগের রাজা কিছুতেই ক্ষমতা ছাড়ছিলেন না। মন্ত্রী অমাত্যরা আমাকে দায়িত্ব দিলেন নতুন রাজা খুঁজে বের করুন। আমি আমাদের দেবতা আরুজুবার কাছে জানতে চেয়েছিলাম নতুন রাজাকে কীভাবে পাব। আমাদের দেবতা আরুজুবা বললেন— তোর কাছে পুজোর জন্যে যে পবিত্র জল আছে তাতে নতুন রাজার ছবি ফুটে উঠবে। আমি পবিত্র জলে আপনার ছবি দেখলাম। সৈন্যদের হুকুম দিলাম আপনাকে ধরে আনতে।

—কিন্তু আমি রাজা হব না। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবেন না পালিয়ে যেতে। রাজা হয়েই আপনাকে এখানে থাকতে হবে। পুরোহিত বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

পুরোহিত চলে গেল। সমবেত জনতার মধ্যে মাঝে মাঝেই ধ্বনি উঠল— নতুন রাজা—দীর্ঘজীবী হোন। ভিড় কমতে লাগল। সেনাপতি এসে বলল— মাননীয় রাজা—চলুন বিশ্রাম করবেন।

ফ্রান্সিস সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াল। মন্ত্রী ও সেনাপতিও উঠল। ফ্রান্সিস চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। উপায় ভাবতে লাগল কেমন করে পালানো যায়। বুনোরা নতুন রাজার জয়ধ্বনি করল। একজন যোদ্ধা সামনে আর একজন পেছনে। প্রহরী দু'জন ফ্রান্সিসকে রাজগৃহে নিয়ে এল।

ফ্রান্সিসের জন্যে কিছু পরে প্রহরী দুজন খাবার নিয়ে এল। বেশ খিদে পেয়েছে। অন্যসময় হলে ও হাপুসহুপুস খেতো। কিন্তু এখন রাজা। এখন রাজার মতো আচরণ করতে হবে। এখন সবাই তার আচরণ ব্যবহার এসব দেখবে। কাজেই এখন যা খুশি তা করা চলবে না।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে খেতে লাগল। একজন প্রহরীকে হাতের ইশারায় ডাকল। প্রহরীটি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—

—তোমার নাম কি? প্রহরীটি খুব খুশি। রাজাকে সম্মান দিয়ে একটু মাথা নিচু করল। তারপর বলল—বেচুয়া।

—হুঁ। তুমি কি সারারাত আমাকে পাহারা দাও? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আমি একা নই। সঙ্গে আর একজন থাকে। বেচুয়া বলল।

—এত পাহারার কি দরকার? ফ্রান্সিস বলল।

—মাননীয় রাজা—আপনার জানার কথা নয়। উত্তরে পাহাড়ী এলাকায় একটা দেশ আছে। ওখানে কালো পাহাড়ীদের দেশ। ওরা মাঝে মাঝেই আমাদের আক্রমণ করে। আমাদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। পালিয়ে যায়। কিন্তু এরকম আক্রমণ বন্ধ রাখে না। ওদের লক্ষ্য শুধু আমাদের রাজাকে হত্যা করা। তাই আপনাকে সবসময় পাহারাদাররা পাহারা দিয়ে রাখে। বেচুয়া বলল।

—হুঁ। দেখছি। এত পাহারা দিয়ে আমাকে আটকেই রাখা হয়। এই পাহারার ব্যবস্থা করেছেন কারা? ফ্রান্সিস বলল।

—মন্ত্রীমশাই, সেনাপতি আর অমাত্যরা। বেচুয়া বলল।

—ঠিক আছে। কিন্তু আমি এত পাহারা টাহারা পছন্দ করি না। সবসময় মনে হয় আমি যেন বন্দী হয়ে আছি। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের যেমন হুকুম। আপনি মন্ত্রীমশাইকে বলে দেখুন। বেচুয়া বলল।

—তুমি বললে কালো পাহাড়ী। ওরা কারা? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—ঐ কালো পাহাড়ীদের গায়ের রং কালো। উত্তরে যে পাহাড়টা মাচিপিচুলাম ওখানেই ওদের রাজত্ব। ওদের গায়ের রং কালো। তাই আমরা কালোপাহাড়ী বলি। বেচুয়া বলল।

—ওরা বুঝি মাঝে মাঝেই আক্রমণ করে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। উদ্দেশ্য তো বললাম—আমাদের রাজাকে মেরে ফেলা। বেচুয়া বলল।

—তাতে ওদের কি লাভ? ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা তাহলে আমাদের মধ্যে মারামারি করব। এই দেশে অশান্তির আগুন জ্বলবে। আমরা দুর্বল হয়ে পড়বো।

তখন ওরা সহজেই এই রাজ্যজয় করতে পারবে। এই দেখুন না—আমাদের আগের রাজা কী বলশালী। তাকেও ওরা বন্দী করেছিল। ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমরাও ওদের চেয়ে দ্রুতবেগে ছুটে গিয়ে রাজাকে উদ্ধার করেছিলাম। রাজা সুস্থ হলেন কিন্তু বাঁহাতটা শুকিয়ে গেল। ওরা রাজার বামবাহুতে বড় ছোরা বসিয়েছিল। আস্তে আস্তে ঐ জায়গাটা দুর্বল হয়ে পড়ল। সেই রাজার বাঁ হাত অকেজো হয়ে গেল। কে জানে ছোরার মুখে বিষাক্ত কিছু মেশানো হয়েছিল কিনা? বেচুয়া বলল।

পরের দিন রাতে ফ্রান্সিস খেয়ে শুয়ে পড়ল। মাংসটা কোন পাখির অথবা জীবজন্তুর এটা বুঝতে পারল না। কিন্তু খুব সুস্বাদু লাগল। ফ্রান্সিস চেয়ে খেলো।

শুয়ে শুয়ে একটা চিন্তাই ওকে বড় বিচলিত করছিল। জাহাজে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। উপায়ও নেই। সবসময়ই কাছে কাছে কোন না কোন প্রহরী।

ফ্রান্সিস এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ গভীর রাতে বুনোদের চিৎকার হৈ হল্লা। ফ্রান্সিস শুয়ে থেকে বুঝতে পারল—লড়াই শুরু হয়েছে। বুনোদের পায়ের শব্দ শুনে বুঝল—বুনোরা ছুটে যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস দেখল—ঘরের দরজায় দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না। ঘরের মশাল নেভানো হয়েছে। মন্ত্রীমশাই ছুটতে ছুটতে অন্ধকার ঘরে ঢুকলেন। অন্ধকারেই বললেন—মান্যবর রাজা—আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

—কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

—রক্ষী আপনাকে নিয়ে যাবে। আপনি কালকে পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন। লড়াই থেমে গেলে আপনাকে আবার এই ঘরে নিয়ে আসা হবে। মন্ত্রী ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

রক্ষী দুজন ঘরে ঢুকল। বেচুয়া বলল—মাননীয় রাজা—শিগগির তৈরি হন। আমাদের অন্য জায়গায় যেতে হবে।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—মশালটা জ্বালো। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বেচুয়া মশালটা জ্বালল। ফ্রান্সিস আজ পোশাক পাল্টাল না। রাজার পোশাক যা পরনে ছিল তাই পরে নিয়েই দরজার দিকে চলল। ফ্রান্সিসের পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুজন প্রহরীও। এবার বেচুয়া বলল—মাননীয় রাজা আপনি আমার পেছনে পেছনে আসুন। ফ্রান্সিস তাই চলল। কিছু দূরেই হৈ-হৈ চিৎকার গোঙানি। জোর লড়াই চলছে।

বনের তলায় অন্ধকার। তবে গাছের পাতা ডালের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাভাঙা টুকরোর মত পড়েছে। তাতে অন্ধকার কাটে নি। অবশ্য মোটামুটি একটু আধটু দেখেটেখে পা ফেলে যাই।

ফ্রান্সিসের হঠাৎ মনে হল—এখন বাইরের পরিবেশ। যে কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে। তরোয়ালটা সঙ্গে থাকলে মনে অনেক জোর পাওয়া যায়। ফ্রান্সিস ডাকল—বেচুয়া!

—বলুন।

—আমার তরোয়ালটা কোথায় রাখা হয়েছে? ফ্রান্সিস বলল।

—আপনার ঘরে। বেচুয়া বলল।

—তাহলে তরোয়ালটা নিয়ে এসো। এখন একেবারে নিরস্ত্র থাকা বিপজ্জনক। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। বেচুয়া চলে যাচ্ছে তখন প্রহরীটি বলল—কোথাও দাঁড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। আমরা যে গুহায় যাবো বেচুয়া তুমিও সেখানে চলে এস।

—ঠিক আছে। বেচুয়া চলে গেল। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল যেন।

ফ্রান্সিসরা চলল। প্রহরীটি পিছু পিছু চলল।

একটা টিলার সামনে এল ওরা। একজন প্রহরী এগিয়ে গেল। অল্প জ্যোৎস্নায় দেখা গেল একটা গুহার মুখ। মুখে বড় পাথর চাপা দেওয়া। প্রহরীটি বলল—এই পাথরটা সরাতে হবে। একা পারবো না। আপনি আসুন। একজন প্রহরী বলল।

এবার দুজনে গুহামুখের পাথরটা ধাক্কা দিতে লাগল। পাথরটা নড়ল। আরো বার কয়েক ধাক্কা দিতেই পাথরটা একপাশে সরে গেল। ঢোকার মত জায়গা হল। দুজনে গুহাটায় ঢুকল।

নীরন্ধ্র অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। প্রহরীটি বলল—আপনি আমার হাত ধরে আসুন। দুজন অন্ধকারে চলল। কিছুটা এসে প্রহরীটি বলল—এখানে বসুন। ফ্রান্সিস হাত দিয়ে দেখল একটা পাথরের পাটামত। ফ্রান্সিস বসল। প্রহরীটি বসল।

বেশ গরম লাগছে। আস্তে আস্তে গরমটা সহনীয় হল। এখন বেচুয়ার জন্যে অপেক্ষা।

দুজনেই চুপ করে বসে রইল। চোখে অন্ধকারটা সয়ে এল। ফ্রান্সিস অস্পষ্ট দেখল পাথরের লম্বা পাটাটায় বিছানা মত কাপড় পাতা। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। এখন চিন্তা হল বেচুয়ার জন্যে ও নির্বিঘ্নে আসতে পারবে কিনা।

কিছুক্ষণ পরে দূর থেকে বেচুয়ার ডাকই মনে হল। প্রহরীটি গুহার মুখের দিকে দ্রুত ছুটে গেল। ফ্রান্সিসও পেছনে পেছনে ছুটল। গুহার মুখে পাথরের আড়াল থেকে দুজনে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দেখল—বেচুয়া টলতে টলতে আসছে। ওর হাতে বর্শাটা নেই। হাতে একটা তরোয়াল। তখনই ফ্রান্সিসরা ভালো করে দেখল বেচুয়ার পিঠে একটা বর্শা বেঁধা। বেচুয়া আর বেশি দূর আসতে পারল না। উবু হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

প্রহরীটি ছুটে বেচুয়ার কাছে গেল। এক হ্যাঁচকা টানে বর্শাটা বের করল। রক্ত বেরোতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল বেচুয়ার ডান হাতে তরোয়ালটা ধরা। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে তরোয়ালটা তুলে নিল।

তখনই বন থেকে চার পাঁচজন যোদ্ধা বেরিয়ে এল। ওদের গায়ের রং কালো। ফ্রান্সিস বুঝল এরাই কালো পাহাড়ি। বুনোদের নতুন রাজাকে ধরতে এসেছে।

ওরা ফ্রান্সিসের গায়ে রাজার পোশাক দেখেই চিনল। উল্লাসে ওরা চিৎকার করে উঠল। ছুটে এল ফ্রান্সিসের সামনে। প্রথম যোদ্ধাটি ফ্রান্সিসের দিকে বর্শা ছুঁড়ল। ফ্রান্সিস দ্রুত সরে গেল। যোদ্ধাটির হাতে বর্শা নেই। ফ্রান্সিস লাফিয়ে সামনে গিয়ে



যোদ্ধাটির বুকে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল। যোদ্ধাটি চিৎ হয়ে পাথুরে মাটিতে পড়ে গেল। আর একজন বর্শা হাতে এগিয়ে এল। প্রহরীটি ফ্রান্সিসকে বলল—আপনি যাবেন না—আমি যাচ্ছি। প্রহরীটি একজন যোদ্ধাকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল। নিখুঁত নিশানা। বর্শাটা বুকে ঢুকে গেল। যোদ্ধাটি মাটিতে পড়ে গেল।

এবার ফ্রান্সিস তরোয়াল হাতে যোদ্ধাদের দিকে ছুটে এল। যোদ্ধারা পালাতে শুরু করল। সব যোদ্ধারা যখন বনে ঢুকে পড়ল তখন ফ্রান্সিস ফিরে এল। বেচুয়ার কাছে এসে প্রহরীটিকে বলল চলো। ওকে গুহায় নিয়ে যাবো। বিস্কো সব সময় ফ্রান্সিসের কাছাকাছি আছে।

দুজনে বেচুয়াকে ধরাধরি করে গুহার ভেতরে নিয়ে এল। পাথরের ওপর বিছানায় শুইয়ে দিল। প্রহরীটি রাখা জল নিয়ে এল। ফ্রান্সিস বেচুয়ার চোখেমুখে জল দিল। প্রহরীটি চকমকি পাথর ঠুকে মশাল জ্বালল। চারদিকে আলো ছড়ালো।

ফ্রান্সিস এতক্ষণে বুঝল—বেশ খিদে পেয়েছে। কিন্তু খাবার এখন কোথায় পাওয়া যাবে? বিস্কো এল। বলল—ফ্রান্সিস—একটু যে ঘুমিয়ে নেব তারও উপায় নেই। খালি পেটে ঘুমও আসছে না।

—উপায় নেই। এখন বাইরে লড়াই চলছে। বাইরে বেরোনো যাবে না। অপেক্ষা করতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লড়াই থেমে যাবে। তখন খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে ফ্রান্সিস বলল।

রাত শেষ। পাখির ডাক শোনা গেল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ বেচুয়ার গোঙানি শোনা গেল। ফ্রান্সিস উঠে গিয়ে বেচুয়ার পাশে বসল। বলল—বেচুয়া শরীর খারাপ লাগছে?

—হ্যাঁ। শরীর অসম্ভব দুর্বল লাগছে। মাথা ঘুরে ঘুরে উঠছে। কথাটা আস্তে আস্তে বলে বেচুয়া বলল—আমি—বোধহয় বাঁচবো না।

—এইসব আজেবাজে চিন্তাকে প্রশ্রয় দিও না। নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ভাববে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর হাত বাড়িয়ে বলল—দেখি তো জ্বরটা কেমন? ফ্রান্সিস বেচুয়ার হাতে নাড়ি টিপে দেখল। গাল গলায় উত্তাপ দেখল। বেশ জ্বর এখন।

ফ্রান্সিস বলল—জ্বর আছে এখনও। তবে একটু ওষুধ টষুধ পড়লে তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। ততক্ষণে একটু জ্বর বাড়ল।

ফ্রান্সিস বলল—একটু কষ্ট সহ্য কর। বেচুয়া আর কথা বলল না। দু চোখ বুঁজে শুয়ে রইল।

এইবার খাদ্য চাই। ফ্রান্সিস কীভাবে খাদ্য জোগাড় করবে ভেবে পেল না। প্রহরী ফ্রান্সিসকে বলল সেকথা। প্রহরীটি বলল—একটু দূরে এক জমিদার থাকে। তাঁর বাড়ি থেকে খাবার চুরি করতে হবে।

—তার মানে আমাদের সারাদিনই না খেয়ে থাকতে হবে। একটাই বাঁচোয়া জলভরা পীপে আছে দুটো। সারাদিনই জল খেতে হবে। তাতে খিদেটা বেশ চাপা পড়ে যাবে। বিস্কো বলল।

দুপুরে প্রহরীটি বনজঙ্গল থেকে কিছু ফল নিয়ে এল। তাই ভাগ করে সবাই খেল।

সারা দিনটা গেল। সন্ধ্যে থেকেই বেচুয়ার গোঙানিটা শুরু হল। বোঝাই যাচ্ছে—বেচুয়া ভীষণ কষ্ট সহ্য করছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে। ফ্রান্সিস ভাবল যে বর্শায় বেচুয়া আহত হয়েছিল সেটার মাথায় বিষ মাখানো ছিল।

রাত বাড়তে লাগল। বেচুয়ার গোঙানি থেমে গেছে। বোধহয় আর গোঙানি করবার শক্তিও অবশিষ্ট নেই।

সকাল থেকে এই রাত পর্যন্ত ফ্রান্সিসরা শুধু জল খেয়ে। খাবার জোগাড় করতে বিস্কো আর প্রহরীটি একটু রাতে বেরুলো। নিচু দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকল। জ্যোৎস্না খুব উজ্জ্বল নয়। দেখেশুনে পা ফেলতে হচ্ছিল।

রসুই ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করা। অল্প আলোয় দেখল একটা তালা লাগানো। বিস্কোরা দেখল লোহার বড় তালা। বিস্কো বার কয়েক চেষ্টা করল খুলতে। কিন্তু পারল না।

বিস্কো বের করল ছোরার মুখটা তারপর তালার গর্তে ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দিতে লাগল। তারপর চাপ বাড়াল। শব্দ করে তালাটা ভেঙে গেল। একটু শব্দ হল।

ফ্রান্সিসরা চুপ করে দাঁড়িল রইল না। কারো ঘুম ভাঙে নি। ফ্রান্সিসরা রসুইঘরে ঢুকল। কাঠের ডেকচিতে রাখা ছিল মাংস। ফ্রান্সিস ডেকচিটা তুলে নিল। কেক রুটি সবই নিল দুজন।

দরজা ভেজিয়ে পাঁচিল টপকে বাইরে বেরিয়ে এল।

গুহায় ফিরে এল। বেচুয়া বাদে সবাই খাবার ভাগ করে নিয়ে খেতে লাগল। প্রায় দুদিন উপবাস। ফ্রান্সিস খাবারের দিকে চেয়ে রইল। খিদেটাই মারা গেছে। উপায় নেই। খাবার যেমনই লাগুক সব খাবার খেতে হবে। ফ্রান্সিস খেতে লাগল।

শেষ রাতের দিকে বেচুয়া সমস্ত শরীর মোচড়াতে লাগল। মুখে গোঁ গোঁ শব্দ করছে। সবাই বেচুয়ার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল।

হঠাৎ বেচুয়ার শরীর স্থির হয়ে গেল। বেচুয়া মারা গেল। ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এবার বেচুয়াকে কবর দেওয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সূর্য ওঠার আগেই কবর দিতে হবে। লড়াইয়ের ফলাফল কী তা ওরা এখনও জানে না। রাজা পাচাকুচি যদি জয়ী হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকা ছেড়ে পালাতে হবে। যদি রাজা কুয়েক হুয়ার জয় হয় তাহলে নিশ্চিন্ত। কবরে দিয়ে সবাই মাজোর্কার উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

বেচুয়ার শরীর এখানেই কোথাও কবর দিতে হবে।

বিস্কো আর প্রহরীটি জমিদার বাড়ির পেছনে এল। দেওয়াল। ওরা দুজনেই দেয়াল টপকে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। দুজনে রসুইঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। দেখল তিনজন রাঁধুনি। এমন সময় বাড়ির কাজের স্ত্রীলোকটি ওখানে কাজে এল। বিস্কোদের দেখে গলা চড়িয়ে বলল—তোমরা কে গা? প্রহরীটি গলা চেপে বলল—তরোয়াল দিয়ে নাক কেটে দেবো। স্ত্রীলোকটি 'ও মাগো' বলে বড়ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

এবার বিস্কো গলার নিচে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করল। ছুটে গিয়ে এক রাঁধুনির গলায় গিয়ে ছোরা ঠেকাল। বলল—একটু হাত নাড়লেই তুমি ভবের পার। অন্য দুই রাঁধুনিও কী বলবে বলে কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। বিস্কো তিনজনকেই ছোরাটা দেখাল। তারপর বলল—আমরা ডাকাত না। অবস্থা বিপাকে আমরা দুদিন যাবৎ না খেয়ে আছি। কাল রাতে তোমাদের এই রসুইঘর থেকে খাবার চুরি করে নিয়ে গেছি। আজকেও নেবো। একটু থেমে বিস্কো বলল—রুটির থালা ভর্তি করে রুটি দাও কেক থাকলে দাও আর মাংসের হাঁড়িটা দাও। নইলে তোমাদের তিনজনের একজন মরবেই। এক্ষুনি।

রাঁধুনিরা নিজেদের বিপদ বুঝল। ওরা মাটির থালা মাংসের হাঁড়ি দিয়ে দিল।

বিস্কো চাপা সুরে বলল—পালাও। তারপর খাবার নিয়ে ছুটল পেছনের দেওয়ালের দিকে। দেয়ালটা পার হয়ে বাইরের বাগানে এল তারপর ছুটল বড় রাস্তার দিকে।

দুপুরে ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা খাওয়ার ব্যাপারে আর দেরি করল না।

এবার কবর দেওয়া। পেছনের একটা ঘরে ফ্রান্সিস এল। খুঁজে খুঁজে দুটো বেলচা পেল। দুটো কাঠের পাটাতন পেল। একটা বড় আর একটা ছোট। ও গলা চড়িয়ে ডাকল—বিস্কো, এদিকে এসো। বিস্কো এল। বলল কী ব্যাপার?

—এই লম্বা পাটাতনটায় বেচুয়াকে শুইয়ে দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

—উপায় কি। এখানে কফিন কোথায় পাবো। বিস্কো বলল।

—এখন কবরের জায়গা খোঁজা। চলো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে গুহার বাইরে এল। প্রহরীটিকে বলল—তুমি থাক। আমরা কবরের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।

দুজনে বেরিয়ে এল। দেখল সামনেই একটা উপত্যকার মত। সবুজ ঘাসে ঢাকা। ফ্রান্সিস বলল—বেচুয়াকে কবর দিতে বেশি দূর যেতে পারব না। কাজেই এই উপত্যকা নরম মাটির। এখানেই কবর দেব।

দুজনে গুহায় ফিরে এল। ফ্রান্সিস প্রহরীটিকে সব বলল। তারপর কাঠের পাটাতনে বেচুয়াকে শুইয়ে নিয়ে চলল কবরের জায়গায়। একপাশে মৃতদেহ রেখে বেলচা দিয়ে ফ্রান্সিস আর বিস্কো মাটি খুঁড়তে লাগল। একটা লম্বাটে গর্ত মত হল।

তখন ভোর হয়েছে। ফ্রান্সিসরা আর দেরি করল না। গর্তে কাঠের পাটাতনসহ বেচুয়ার মৃতদেহ নামিয়ে দিল। তারপর ওরা কবরে মাটি ফেলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্ত বুঁজে গেল মাটিতে।

সবাই গুহায় ফিরে এল। ফ্রান্সিস পাথরের ওপর কাপড়ের বিছানায় শুল। গলা চড়িয়ে বলল—এবার খাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে?

—ঐ মহিলার রসুই ঘর থেকে খাবার আনা। বিস্কো বলল।

—তাহলে প্রহরী আর বিস্কো যাও। আমি ভীষণ দুর্বল বোধ করছি। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি বিশ্রাম কর। আমরা যাচ্ছি। বিস্কো বলল। তারপর দুজনে গুহা থেকে বেরিয়ে এল।

আবার জমিদারের রাঁধুনীদের ছোরা দেখিয়ে খাবার নিয়ে পালিয়ে এল। আবার ঐ খাবার খেল। প্রহরীও খেল।

সেই রাত কাটল। ফ্রান্সিসরা কালোদের সঙ্গে পাচাকুচির লড়াইয়ে কারা জিতল তা জানা গেল না।

ফ্রান্সিস প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি তো আগে আমাদের পাহারা দিতে।

—হ্যাঁ রাজার হুকুম। প্রহরী বলল।

—কিন্তু মুস্কিল হয়েছে আমরা আর এখানে পড়ে থাকবো না। আজকেই চলে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আমাকে হত্যা করে যেতে পারেন। প্রহরী বলল।

—তোমাকে আহত করেই পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক বুঝলাম না। প্রহরী বলল।

—আমি তোমার পায়ে আর পিঠে আস্তে তরোয়াল চালিয়ে কেটে দেব। তোমার সেনাপতিকে বলতে পারবে তোমাকে আহত করে আমরা পালিয়েছি।

—হ্যাঁ। তা হতে পারে। প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিস তরবারিটা কোষমুক্ত করল। প্রহরীর বাঁ পায়ে ডান পায়ে তরোয়াল দিয়ে একটু আস্তে ঘষে দিল। পিঠেও তরোয়াল কাটল। পা কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল।

—তাহলে চলি। ফ্রান্সিস বলল। গায়ে রাজার পোশাকটা রয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বিস্কো ঘোড়ায় চড়ে মাজোর্কা নগরে এল।

দুজনে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল লোকজন দাঁড়িয়ে পরে ওর রাজবেশ দেখছে। বুঝল এরকম হলে বিপদ।

হাতের কাছে একটা দর্জির দোকানে গেল। দুজনে দোকানে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল—আমার জামা বানিয়ে দিন। এক্ষুনি। দর্জি বেশি অর্থ চাইল। বিস্কো কোমরের ফেট্টিতে রাখা একটা সোনার চাকতি বের করে দিল। দর্জি খুব খুশি। বলল—আপনি বসুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বানিয়ে দিচ্ছি।

দর্জি জামা সেলাই করতে লাগল। ফ্রান্সিস বিস্কো বসে রইল। পোশাক সেলাই হয়ে গেল। ফ্রান্সিস রাজবেশ ছেড়ে নতুন পোশাক পড়ল। রাজবেশটাও নিল। দামটাম চুকিয়ে ওরা রাস্তায় এল।

—এখন কী করবে? বিস্কো বলল।

—দুটো কাজ। এক ঝোপজঙ্গলে হ্যারিদের রেখে গিয়েছিলাম সেইখানে খোঁজ করতে যেতে হবে। দুই—রাজা কুয়েকগ্মার কাছে যেতে হবে। এখন কোন কাজটা আগে করবো সেটাই ভাবছি।

—দেখ এই দুপুরে রাজার কাছে যাওয়া ঠিক নয়। বোধহয় অসুস্থ রাজা দেখাই করবেন না। তার চেয়ে হ্যারিদের খোঁজ করাই ভালো। আমাদের দেখে ওরা নিশ্চিন্ত হবে। আমরাও ওদের কোন বিপদ হয়নি জেনে খুশি হব। বিস্কো বলল।

—ঠিক আছে। তাহলে জংলা জায়গাটায় চলো। জঙ্গলে দুজনেই ঢুকল। ফাঁকা জায়গাটায় এল। হয়তো দেখা হবে। না। কেউ নেই। এদিক ওদিক দেখছে তখনই

দেখল একটা জংলা গাছের ডালে একটা বড় কাগজ ঝুলছে। ফ্রান্সিস ছুটে গেল। কাগজটা ঐ গাছেরই সঙ্গে আটকানো। কাগজটা নিয়ে ফ্রান্সিস পড়ল—ফ্রান্সিস এখানে উত্তরে একটা বেশ বড় পোশাক টোশাকের দোকান আছে। তার উল্টোদিকের রাস্তার একটু ভেতরে একটা সরাইখানা পাবে। আমরা ওখানেই আছি।—হ্যারি।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—বিস্কো ওদের হদিশ পেয়েছি। কাগজটা বিস্কোকে দিল। বিস্কো পড়ে বলল—তাহলে ঐ দোকানের খোঁজে চল।

—হ্যাঁ। যেতে তো হবেই।

দুজনে উত্তরমুখো চলল। খুঁজতে খুঁজতে পোশাকের দোকানটা পেল। ঠিক তার উল্টোদিকে একটা বড় দোকান। ওটাই পোশাকের দোকান। রাস্তার উল্টোদিকে একটা সরাইখানা।

ফ্রান্সিস বিস্কোর দিকে তাকিয়ে হাসল। বিস্কোও হাসল। দু'জনে ছুটে রাস্তা পার হয়ে সরাইখানার সামনে এল। খোলা দরজা দিয়ে দেখল হ্যারিকে। হ্যারি পায়চারি করছে।

—হ্যারি? ফ্রান্সিস ডাকল। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। হ্যারির চোখে জল। ফ্রান্সিস ধমকের সুরে বলল— অ্যাই—কাঁদবে না। ততক্ষণে সবাই এসে ফ্রান্সিসকে ঘিরে দাঁড়াল। সকলেই হাসছে। বিস্কো ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। সবাই চিৎকার করে ধ্বনি তুলল—ও —হো—হো।

ভেতরের একটা ঘর থেকে মারিয়া বেরিয়ে এল। শুকনো মুখ। মাথার চুল অবিন্যস্ত। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে হেসে এগিয়ে এল।

ওদিকে বিস্কো সকলকে বলতে লাগল ওরা কী কী করেছে—সেসব।

কিছু পরে ফ্রান্সিস আর বিস্কো খেয়ে নিল। ফ্রান্সিস মারিয়া আর বন্ধুদের অক্ষত দেহে দেখে খুব নিশ্চিন্ত হল।

বিকেলের দিকে ফ্রান্সিস মারিয়া আর হ্যারিকে ডাকল। ওরা ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—রাজা কুয়েক হুয়ার কাছে যাব। তোমরাও চলো।

—রাজা কুয়েক হুয়া নিশ্চয়ই নিজের রাজবাড়িতেই আছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—কোথাও চলে যেতেও পারেন। হ্যারি বলল।

—না। উনি অসুস্থ। যেখানে যাবেন দেখেশুনে যাবেন। সেখানে চিকিৎসার সুবিধে আছে কিনা। এসব দেখেটেখে যাবেন।

—তাহলে তোমার কী মনে হয়? উনি এখনও রাজবাড়ি ছেড়ে যান নি? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ—আমার তাই মনে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন কী করবে? হ্যারি জানতে চাইল।

—আমার মনে হচ্ছে রাজার সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করা দরকার। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? মারিয়া বলল।

—সেই নক্সাটা ফিরিয়ে দিতে হবে। তারপর তাঁর পিতামহের ধন সম্পদ খুঁজে বের করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তার মানে আরো দু'তিনদিন। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ—তাও লাগতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া কোন কথা না বলে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—মারিয়া খুবই উদ্বেগের মধ্যে আছেন। তাকে সাহস দাও।

ফ্রান্সিস মারিয়ার ঘরে ঢুকল। দেখল মারিয়া বিষণ্ণমুখে বিছানায় বসে আছে। কাছে এসে ফ্রান্সিস বলল—

—আমি তো এসেছি। এখন তোমার দুশ্চিন্তা থাকার কথা নয়?

—দুশ্চিন্তা আমার কোনদিন যাবে না। মারিয়া আস্তে আস্তে বলল।

একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া—তুমি এতদিন আমার সঙ্গে থেকে নিশ্চয়ই বুঝেছো যে আমি এক অন্যরকমের জীবন কাটাই। বাড়িতে নিশ্চিন্ত সুখের জীবন আমার জীবন নয়। তুমি যদি আমার জীবনটাই মেনে নাও তাহলে আমি খুশী হব। তুমি যদি আমার জীবনটা মেনে নিতে না পারো তবে বলো আমি তোমাকে দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেবো।

—না। বেশ জোরেই বলল মারিয়া। তারপর ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল। ফ্রান্সিস হেসে ওর হাতটা ধরল। মারিয়া একটু অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলল—মৃত্যু পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো। কোন শক্তি আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

ফ্রান্সিস মারিয়ার হাতটা জড়িয়ে ধরে হেসে বলল—তোমার কাছ থেকে ঠিক এই কথাটাই আশা করেছিলাম। যা হোক—তৈরি হয়ে নাও। আমরা রাজা কুয়েক হুয়ার কাছে যাবো। কথা আছে। তুমি হ্যারিও যাবে।

কিছু পরে ফ্রান্সিস মারিয়া আর হ্যারি তৈরি হয়ে নিল।

রাজা কুয়েক হুয়ার রাজবাড়ির সামনে ওরা। প্রবেশপথে কোন দ্বাররক্ষী নেই। মন্ত্রণাকক্ষ পার হচ্ছে তখনই একজন রক্ষী এল। বলল—আপনারা মাননীয় রাজার সঙ্গে দেখা করবেন?

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

—একটু দাঁড়ান। দ্বাররক্ষী বলল।

রক্ষী ঘরের ভেতরে চলে গেল। একটু পরে বেরিয়ে এসে বলল—আসুন।

ফ্রান্সিসরা রাজার শয়নকক্ষে ঢুকল। দেখল রাজা শুয়ে আছেন। শিয়রে রাণী বসে আছেন। একটি মেয়ে রাজার কপালে হাত বুলোচ্ছে। ফ্রান্সিস রাণীর দিকে তাকিয়ে বলল—রাণীমা—মাননীয় রাজার শরীর কেমন আছে?

—খুব ভাল না। রাণী বললেন।

রাজা চোখ বুঁজে ছিলেন। এবার চোখ খুলে ফ্রান্সিসদের দেখে বললেন— ও আপনারা এসেছেন। বসুন।

খাটের কাছে দুটো কাঠের আসন রাখা। মারিয়া হ্যারি বসল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে রইল। এবার বলল—মাননীয় রাজা আপনাকে বিরক্ত করছি।

—ও কিছু না। বলুন। রাজা বললেন।

—আপনার পিতামহ তাঁর সম্পদ কোথায় রেখে গেছেন তার কথা একটা নক্সায় এঁকে রেখেছিলেন। ঐ নক্সাটা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। আমি মোটামুটি আঁচ করতে পেরেছি সেই সম্পদ কোথায় আছে। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

—আপনি খুঁজে পেয়েছেন? রাজা জানতে চাইলেন।

—না। এখনও পাই নি। তবে পাবো আশা করছি। আমি এই ঘরটা দেখেছি! অন্দরে আরো ঘর রয়েছে তো?

—হ্যাঁ। রাজা বললেন।

—ঐ দুটো ঘরে কে থাকেন?

—আমার স্ত্রী। ছেলেমেয়ে একটা ঘরে থাকেন। রাজা বললেন।

—আর একটা ঘরে? ফ্রান্সিস বলল।

—ওটা আমাদের অতিথিঘর বলতে পারেন। পরিচিত আত্মীয়স্বজন এলে থাকেন। রাজা বললেন।

—সব ঘরেই পাথরের ফুলদানি আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আমার ঠাকুর্দার শখ ছিল ফুলের। নানা রঙের ফুল তিনি পছন্দ করতেন। এই ফুলদানিগুলো তিনিই লোক রেখে করিয়েছিলেন। রাজা বললেন।

—প্রতিটি ফুলদানিতেই ফুল রাখা হয়? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। একজন মালী আছে। মালী প্রতিদিন ভোরে তাজা ফুল এনে রাখে ফুলদানীগুলোতে। রাজা বললেন।

—এবার একটা অনুরোধ। ভেতরের ঘরগুলো যদি দেখতে দেন। ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়ই। মেয়েকে বললেন—অন্য ঘরদুটো ফ্রান্সিস সাহেবকে দেখিয়ে দে।

আন্না উঠে দাঁড়াল। রাজার বালিশের তলা থেকে একটা চাবি নিয়ে বলল—আসুন।

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি তোমরা থাকো। আমি যাচ্ছি।

আন্নার সঙ্গে প্রথম ঘরটায় গেল ফ্রান্সিস। ঘরে ঢুকল। কাঁচ-ঢাকা আলো ঘরটায়। সবই মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বড় বিছানা একটায়। অন্যটা ছোট বিছানা। বড়টায় বোধহয় ভাইবোনেরা থাকে। ছোটটায় রাণী।

ফ্রান্সিস ফুলদানিগুলো এক এক করে দেখতে লাগল। চারটে ফুলদানি। তাতে ফুল রাখা। ফ্রান্সিস দেখল প্রত্যেকটি ফুলদানিই বসানো আছে হাত তিনেক মোটা কাঠের ওপর। প্রত্যেকটি একইভাবে রাখা। কালো পাথরের সব ফুলদানি।

এবার ফ্রান্সিস বলল—আন্না তোমাদের অতিথিঘর কি খোলা?

—না। চাবি এনেছি। আন্না বলল।

অতিথি ঘরের সামনে এল ফ্রান্সিস। তালা ঝুলছে। আন্না তালা খুলল। বলল একটু দাঁড়ান আলো আনছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আন্না একটা হলুদরঙের মোটা মোমবাতি নিয়ে এল।

ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল। একই রকম ঘর। তবে একটু বেশি সাজানো গুছনো। খাটের ওপর ফুলপাতা আঁকা মোটা একটা চাদর। বালিশ।

এবার ফ্রান্সিস ফুলদানিগুলো দেখতে লাগল। সেই গোল কাঠের পাটা তিন হাত মত এবং তার ওপর ফুলদানি রাখা। হঠাৎ ফ্রান্সিসের চোখে পড়ল পুবদিকের ফুলদানিটা। ও ফুলদানিটার কাছে গেল। ভালো করে দেখল ফুলদানির দুটো পাতা ভাঙা। ফুলদানিগুলো ফুলের পাতার ফুলের মত তৈরি করা। ভাঙা জায়গায় দেখল সাদাটে। ফ্রান্সিস হাত দিয়ে দেখল কালো রঙ উঠে এল। দেখা গেল সাদাটে পাথর। এই একটাই সাদা পাথরের। কালো রং করে রাখা।

ফ্রান্সিস ভাঙা পাতা দুটো দেখতে ল্যাগল। তারপর ফুলদানিটা তুলল। গোল কাঠের ছোট্ট স্তম্ভ। ভেতরে কুঁদে একটা গর্তমত রাখা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস বলে উঠল—থলি রাখা ছিল চুরি হয়ে গেছে। আন্না বলল—কী বললেন যেন।

—না-না। ও কিছু না। চলো তোমার বাবার কাছে।

ফ্রান্সিস বলল—,আন্না চল। দুজনে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস রাজার কাছে এল। বলল—মাননীয় রাজা—মণিমানিক্য অলঙ্কার রাখা ছিল যে থলিটায় সেটা চুরি হয়ে গেছে।

—বলেন কী? রাজা উঠতে গেলেন। রাণী শুইয়ে দিলেন। বললেন—একেবারে উত্তেজিত হবেন না।

—এখন প্রশ্ন কে চুরি করল? ফ্রান্সিস বলল।

—আপনি কি নিশ্চিত গুপ্তভাবে রাখা মূল্যবান সবই চুরি হয়ে গেছে? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ। এবার আপনাকে কিছু পুরোনো ঘটনা মনে করতে হবে। যেমন— ঐ অতিথি ঘরে আপনার অনাত্মীয় মানে যারা আপনার আত্মীয় নন তেমন কাউকে থাকতে দিয়েছিলেন?

—সবাই তো রাতে থাকতো না। তবে অনাত্মীয় বলতে যাদের বোঝায় তাদের দুজনের কথা মনে পড়ছে—এক—বাবার এক প্রিয় বন্ধু। বড্ড বক বক করতেন। দুদিন ছিলেন। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। আর একজন আমার বৈদ্য— কবিরাজ। বেশিদিনের কথা নয়। মাস দুতিন আগে আমাকে সেদিন দেখতে এসেছিলেন। আমাকে দেখে যেতে তাঁর দেরি হয়ে গিয়েছিল। বাইরে ঝড় বৃষ্টি চলছিল। রাতের খাওয়া খেলেন। অতিথিঘরে রইলেন। পরদিন সকালে চলে গেলেন।

—আর? ফ্রান্সিস আরও জানতে চাইল।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান মনে পড়েছে। দিন কয়েক পরে ঐ কবিরাজ আবার এলেন। সেদিন তাঁর আসার কথা নয়। উনি আমাকে দেখলেন। ওষুধও পাল্টালেন না। রাত হয়ে গিয়েছিল। তিনি ঐ অতিথি আবাসে থাকলেন। কিন্তু ভোরবেলা কখন চলে গেছেন কেউ জানে না। শুধু মালী নাকি দেখেছিল।

—এঁরা ছাড়া আর কেউ? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—মনে পড়ছে না। রাজা বললেন।

—ইদানীং মানে মাস কয়েকের মধ্যে? ফ্রান্সিস বলল।

—না। আর কেউ অতিথিঘরে থাকেন নি।

এবার ফ্রান্সিস বলল—ঐ বকরবকর ভদ্রলোক—আপনার বাবার বন্ধু—আর কবিরাজের ঠিকানা চাই। দিতে পারবেন?

রাজা রাণীকে বললেন—বালিশের তলা থেকে মোটা বইটা বের কর তো?

রাণী বালিশের তলা থেকে মোটা বইটা বের করে রাজাকে দিলেন। রাজা নোট বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন—বাবার বন্ধুর নিজের হাতে তাঁর ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন। তিনি—রাজা থেমে গেলেন। বললেন— পেয়েছি। ফ্রান্সিস আন্নাকে বললেন—এক টুকরো কাগজ আর কালি কলম নিয়ে এস। আমাকে ঠিকানা দুটো লিখে দাও। আন্না ভেতরের ঘরে চলে গেল।

—পেয়েছি, পেয়েছি। কবিরাজের ঠিকানাও পেয়েছি। রাজা বললেন।

আন্না কাগজ কলম নিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—ঠিকানা দুটো আমাকে লিখে দাও। আন্না ঠিকানা লিখে দিল।

ঠিকানা লেখা কাগজটা ফ্রান্সিস পড়ল। বলল—কবিরাজ কুজকোতে থাকেন। প্রথমে তাঁকেই খুঁজবো তারপর আপনার পিতার বন্ধুকে খুঁজবো। কিন্তু উনি থাকেন চিলিতে। বেশ দূর। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—তাহলে আমরা আজ চলি। আমি কালকেই কুজকো যাচ্ছি।

—ভালো। দেখুন গুপ্তধন উদ্ধার করা যায় কিনা। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস দেরি করতে চাইল না। জাহাজের বন্ধুরা নিশ্চয়ই ওদের জন্যে চিন্তান্বিত।

সকালে খেয়েই ফ্রান্সিস বলল—বিস্কো—রাজকুমারী রইলেন। একটু সাবধানে থেকো। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবো।

তিনজনে খেতে বসল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো খেয়ে উঠেই তিনটে ঘোড়া ভাড়া করে আনবে।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো ঘাড় কাত করে বলল।

খাওয়া হল। শাঙ্কো ঘোড়া ভাড়া করতে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কো তিনটে ঘোড়া নিয়ে এল।

ফ্রান্সিসরা তৈরি হয়ে ঘোড়ায় উঠল। তিনটি ঘোড়া সওয়ারি নিয়ে ছুটল কুজকোর দিকে।

শেষ দুপুরে কুজকো পৌঁছল। একটা মাঠের ওপর এল ওরা। অনেক ঘোড়া রয়েছে। ঘোড়া থেকে নেমে ফ্রান্সিস চলল ঘোড়ার মালিকের কাছে। নির্দেশমত পেলও তাকে। ঘোড়া জমা দিল। পরে ফিরে যাওয়ার অগ্রিমটাও লোকটাকে দিয়ে রাখল।

খিদে পেয়েছে। কিন্তু এখন খাওয়া নয়। যে কাজে এসেছে সেটা আগে করতে হবে।

ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে কাগজটা বের করল। প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে গীর্জাটা। তার বাঁদিকের ছোট রাস্তা ধরে এগোতে হবে। চার্চের রাস্তা শেষ হতেই বাঁদিকের প্রথম বাড়িটা। রাজা কুয়েক হুয়ার এটাই নির্দেশ ছিল।

গীর্জা ছাড়িয়েই বাড়িটার সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। দেখা গেল নতুন ঝকমকে একটা বাড়ি। অথচ রাজা বলেছিলেন বেশ পুরোন বাড়ি।



ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—অলঙ্কার বিক্রি করে কবিরাজ এখন ধনী। বাড়িটি কেমন নক্সারমত তৈরি। হ্যারি হাসল।

ওরা সদর দরজার কাছে এল। একটা দড়িমতো ঝুলছে। ফ্রান্সিস দড়িটা নিচে টানল। বাড়ির ভেতরে সুরেলা আওয়াজ হল। একটু পরে একটা কাজের লোক এল। হ্যারি বলল—কবিরাজ মশাই আছেন?

—হ্যাঁ আছেন। কিন্তু বিকেলবেলা রোগী দেখেন না।

—ঠিক আছে। আমরা ঘুরে আসছি। হ্যারি বলল।

—আচ্ছা লোকটি দরজা বন্ধ করে দিল।

রাস্তায় এল ওরা। ফ্রান্সিস বলল—আমাদের একটা সুবিধে হল। এই ফাঁকে চলো খেয়ে নি।

কুজকো বেশ বড় শহর। ইনকা সাম্রাজ্যের রাজধানী। রাস্তায় ভিড়ও বেশ।

একটু খুঁজতেই একটা ভালো সরাইখানা পেল। ঢুকল ওরা। হ্যারি মাংস মোটা রুটির জন্য বলল। খুব তাড়াতাড়িই খাবার এল। খেতে খেতে হ্যারি বলল—আচ্ছা ফ্রান্সিস তুমি কোন অকাট্য যুক্তি পেয়েছো যে কবিরাজ চুরি করেছে বলছো।

—আমার সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হয়েছে যখন শুনলাম কবিরাজ যেদিন চলে যান তখন খুব ভোরেই তিনি চলে এসেছিলেন। তারপর তিনচারমাস কেটে গেছে কবিরাজ আর যান নি। কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ এই প্রশ্ন উঠতে পারে। এখন কবিরাজকে নিয়ে কী করবে?

—কবিরাজ গুপ্তধন চুরি করেছে এই সত্যটা ওকে স্বীকার করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি স্বীকার না করে? হ্যারি বলল।

—তবে রাজা কুয়েক হুয়া অবশ্য এখন আর রাজা নন—তবুও তাকে দিয়ে রাজা পাচাকুচির দরবারে নালিশ করাবো।

—তাতে কাজ হবে? শাঙ্কো বলল।

—হতে পারে আবার নাও হতে পারে। আমরা গুপ্তধনের হদিশ দেব। বাকি উদ্ধার করার দায়িত্ব আমাদের নয়। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। দেখ। হ্যারি বলল।

বিকেলে ওরা কবিরাজের বাড়িতে গেল। সেই লোকটি বাঁ পাশের ঘরটায় ফ্রান্সিসদের বসাল। আরো লোক বসে আছে।

লোকটি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এখানে নাম লিখিয়ে বসুন। ফ্রান্সিস দেখল একটা কাঠের আসনে একজন কর্মী কালিকলম নিয়ে বসে আছে। সে নাম ডাকছে।

ফ্রান্সিস লোকটির কাছে গেল। নাম লেখাল।

ফ্রান্সিসরা বসে আছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে লোকটি ফ্রান্সিসের নাম ডাকল।

ফ্রান্সিস কবিরাজের ঘরে ঢুকল। কবিরাজকে দেখল। কবিরাজকে দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল লোকটা ভীষণ ধূর্ত। এই লোকটার পক্ষে চুরি করা অসম্ভব নয়। চোখদুটোর তীব্র দৃষ্টি। কিন্তু মুখ ভাবলেশহীন।

—আপনাকে বিদেশী বলে মনে হচ্ছে। কবিরাজ একটু হেসে বললেন।

—হ্যাঁ আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। তা আপনার কী কষ্ট? কবিরাজ বললেন।

—কষ্টের কথা বলতে আসিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—তার মানে? কবিরাজ বললেন। অল্প হাসলেন।

—আপনি রাজা কুয়েক হুয়াকের চিকিৎসা করেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কবিরাজ বললেন।

—আচ্ছা—রাজা তাঁর পিতামহের গুপ্তধনের কথা আপনাকে বলেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। এই গুপ্তধনের কথা অনেককেই বলতেন। এটা বলে বোধহয় তিনি আনন্দ পেতেন।

—যাই হোক—একদিন জলঝড়ে আপনি এই কুজকোয় ফিরতে পারেন নি। রাজার অতিথি ঘরে ছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কবিরাজ বললেন।

—রাজা আপনাকে একটা নক্সা দেখিয়েছিলেন। ওটাতে গুপ্তধনের হদিশ ছিল। কিন্তু কেউ ওটার সমাধান ভেবে পায় নি। যা হোক—আপনি শোবার সময় নক্সাটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে বললেন—এখানকার তিনটি শয়নঘরের নক্সাটা আঁকা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—নকশাটা দেখলে তাই মনে হয়। কবিরাজ বললেন।

—আপনি অতিথিঘরটার ফুলদানিগুলো তুলে তুলে দেখেছিলেন গুপ্তধন রয়েছে কিনা। হঠাৎই পেয়ে যান একটা থলি। থলি দেখে এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে পাথরের ফুলের দুটো পাপড়ি ভেঙে ফ্যালেন। থলিটা খুলতে গিয়ে খোলেননি। সেই রাতে ঐ পর্যন্ত। ফ্রান্সিস বলল।

—এসব কী বলছেন আপনি? কোথায় গুপ্তধন কোথায় থলিটলি এসব—মানে কি? কবিরাজ বললেন।

ফ্রান্সিস আগের মতই বলতে লাগল—পরে যেদিন রোগী দেখার কথা নয়—সেইদিন গেলেন। অতিথিঘরে রইলেন। ভোরের দিকে থলিটা নিয়ে প্রায় পালিয়ে এলেন। কারো সঙ্গে দেখা না করেই চলে এসেছিলেন। একমাত্র মালী আপনাকে দেখেছিল।

কবিরাজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—এসব মিথ্যে অপবাদ।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বলল—আমরা বিদেশী। এক জায়গায় তো বেশিদিন থাকি না। যদি থাকতাম তাহলে আপনাকে কয়েদখানায় ঢোকাতাম।

—বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও। কবিরাজ বললেন। ফ্রান্সিস বলল—

আমি মাজোর্কা যাচ্ছি। রাজা কুয়েক হুয়াকে সব বলবো। উনি যদি আপনার নামে রাজা পাচাকুচির রাজদরবারে নালিশ করেন—শেষ পর্যন্ত আপনাকে সব স্বীকার করতে হবে। রাজা কুয়েক হুয়ার মত একজন উদারমনা মানুষকে ঠকালেন—এটাই

দুঃখের। কবিরাজ তখনও চ্যাঁচাচ্ছেন—বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও। নাম লেখার লোকটি ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিসের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস লোকটার ঘাড়ে এক রদ্দা কষাল। লোকটি মেঝেয় বসে পড়ল।

ফ্রান্সিস বাইরে এল। হ্যারি ছুটে এল—ফ্রান্সিস তোমাকে মারধোর করে নি তো?

—দূর। দুঃখ কী জানো—কবিরাজকে কান ঘেঁষে মাথায় এক রদ্দা কষালে ভালো হত। ফ্রান্সিস বলল।

—চল—চল। আর নয়। হ্যারি বলল।

তিনজনে কবিরাজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

জাহাজে ওঠার সময় হয়ে আসছে। দুপুরে খাওয়ার সময় শাঙ্কো প্রস্তাব দিয়ে বলল—ফ্রান্সিস—আমাদের তো জাহাজে ফেরার সময় এসে গেছে। এখন আমাদের কিছু স্বর্ণমুদ্রা দাও। বাজারে গিয়ে দরকারী জিনিস টিনিস কিনে আনি।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস হেসে বলল। মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—মারিয়া তুমিও যাবে। মারিয়া একটু চুপ করে থেকে বলল—আমারও কিছু কেনাকাটা ছিল। কিন্তু সকাল থেকে মাথার বাঁ পাশে ভীষণ ব্যথা শুরু হয়েছে। কখনও কমছে কখনও বাড়ছে। আমি যেতে পারবো না।

—ঠিক আছে। রাজকুমারী বিশ্রাম নিন। আমরা যাবো। তবে খুব বেশি ঘোরাঘুরি করবো না। তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো। হ্যারি বলল। কেউ কিছু বলল না।

খাওয়া শেষ। ঘরে এসে সবাই পোশাক পাল্টাতে লাগল। মারিয়া ফ্রান্সিসকে বলল—তুমি কিছু কিনবে না। তুমি আর আমি কাল সকালে বেরিয়ে আমাদের দুজনের জিনিসপত্র কিনবো।

—কী কিনবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—সেটা কাল সকালে ভাবা যাবে। মারিয়া বলল।

—তাহলে আজ আমি খাবো না। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া বলল—কেন। বন্ধুর সঙ্গে তুমিও যাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসরা তৈরি হল। হ্যারি বলল—রাজকুমারীকে একা রেখে যাওয়া চলবে না। বিস্কো এখানে থাকবে। ও কালকে ফ্রান্সিসদের সঙ্গে যাবে।

ফ্রান্সিস সবাইকে দুটো করে স্বর্ণমুদ্রা দিল। সকলেই খুশি।

পড়ন্ত বিকেলে ফ্রান্সিসরা কেনাকাটা করতে বাজারের দিকে চলল।

সরাইখানার বাইরে দাঁড়িয়ে বিস্কো দেখল সেটা। মারিয়া ঘর থেকে বেরোয় নি। বিস্কো নিজেদের ঘরের দিকে চলল। ওর একটু অভিমান হয়েছিল। ওকে ফ্রান্সিসরা নিয়ে গেল না।

বিস্কো বিছানায় শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

মারিয়া বিছানায় শুয়েছিল। মাথার যন্ত্রণাটা একটু কমেছে। একা একা শুয়ে আছে। ভালো লাগল না।

সরাইখানার বাইরে এসে দাঁড়াল। রাস্তার লোকজন গাড়িঘোড়া মানুষের ব্যস্ততা এসব দেখতে লাগল। আবার একঘেঁয়ে লাগছে। ঘর থেকে আসবে কিনা ভাবছে

তখনই এক ঘোড়াসওয়ার ঠিক ওর সামনে এসে ঘোড়াটাকে দাঁড় করালো। মারিয়া আরোহীর দিকে তাকাল। লোকটার লম্বা লম্বা চুল। কপালে একটা লাল ফেট্টি বাঁধা। গাল পর্যন্ত জুলপি। কুৎকুতে চোখ। দেখেই কেমন গুণ্ডা গুণ্ডা মনে হল।

লোকটা ঘোড়াটা মারিয়ার আরো কাছে আনল। মারিয়া কিছু বোঝবার আগেই নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে মারিয়ার কোমর ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ঘোড়ার ওপর তুলে নিল। সামনে বসিয়ে ঘোড়া ছোটাল উত্তরমুখো। রাস্তার লোকজন যারা দেখল তারা হৈ হৈ করে উঠল। তারপর ঘটনাটা দেখেছে এমন লোকেদের দুজন ছুটল ঘোড়সওয়ারকে ধরতে। কিন্তু তেজি ঘোড়ার গতির সঙ্গে তারা পারবে কেন। হাল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। ততক্ষণে ঘোড়া সওয়ারসহ অনেক দূরে।

বিস্কোর ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ বাইরের একটা হৈ হৈ চিৎকার শুনল। ও উঠল। কী ব্যাপার দেখতে হয়। ও আস্তে আস্তে বাইরে এল। তখন অনেক লোক জমে গেছে। একজনকে জিজ্ঞেস করল কী ব্যাপার? লোকটি বলল— একটা গুণ্ডা ঘোড়ায় চড়ে এসে একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল। এরকম হতে পারে। বিস্কো কিছু মনে করল না। নিজের ঘরে চলে আসছে তখনই দেখল মারিয়ার ঘরের দরজা হাট করে খোলা। বিস্কো দ্রুত ঘরে ঢুকল। ঘর শূন্য। রাজকুমারী নেই।

বিস্কো এক ছুটে বাইরে এল। তখনও কয়েকজন মিলে—এমনি সব ঘটনা নিয়ে বলাবলি করছিল। বিস্কো গিয়ে জিজ্ঞেস করল আপনারা দেখেছেন?

—আমাদের চোখের সামনে সমস্ত ব্যাপারটা ঘটেছিল। একজন বলল।

—বিস্কো—মেয়েটি কি পোশাক পরেছিল?

—বিদেশী পোশাক। একজন বলল।

—তাহলে মেয়েটি বিদেশী? বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আর একজন ঘাড় কাত করে বলল।

বিস্কো অস্ফুটস্বরে বলে উঠল তাহলে রাজকুমারী।

বিস্কো নিজের ঘরে ফিরে এল। কথা ছিল আমি রাজকুমারীর পাহারায় থাকবো। সেই আমি গর্ধভের মত ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি যদি রাজকুমারীকে বলে রাখতাম আমার ঘুম পাচ্ছে। আপনি আমাকে না বলে সরাইখানার বাইরে যাবেন না। তাহলে রাজকুমারী নিশ্চয়ই বাইরে যেতেন না। এই ঘটনাটাও ঘটত না।

বিস্কো একা ঘরে চুপ করে বসে রইল। ফ্রান্সিসরা এলে কী বলবো? রাজকুমারীকে একটা গুণ্ডা ঘোড়ায় তুলে নিয়ে গেছে। আমারই অসতর্কতার জন্যেই এটা ঘটল। বিস্কো ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল। আমার এই গাফিলতি ফ্রান্সিসরা মেনে নেবে না।

বিস্কো বসে থাকতে পারল না। আবার বাইরে এল। একজন বয়স্ক লোক তখনই সরাইখানায় ঢুকছিল। বিস্কোকে দেখে বলল—শুনছেন?

বিস্কো দাঁড়িয়ে পড়ল।

—শুনলাম মেয়েটি নাকি—স্বামী ও বন্ধুদের সঙ্গে এদিকে বেড়াতে এসেছেন। বৃদ্ধ বললেন।

—হ্যাঁ। বিস্কো মাথা ওঠানামা করল।

—ঘটনাটার মধ্যে একটু ভাববার ব্যাপার আছে। কারণ যে উঠিয়ে নিয়ে গেছে সে এখানকার কুখ্যাত গুণ্ডা। তাই এসব নিয়ে কেউ বেশি কথা বলছে না। এবার গলা নামিয়ে লোকটা বলল—একটা কুখ্যাত গুণ্ডা ধরে নিয়ে গেছে। ঠিক আছে। কিন্তু গুণ্ডা মিছিমিছি একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে যাবে কেন? মশাই এই ঘটনার মধ্যে বেশ জটিলতা আছে।

—আমারও তাই মনে হয়। বিস্কো বলল।

লোকটি একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—

—কেউ গুণ্ডাটাকে লাগিয়েছে। অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে।

—আমিও সেটাই ভাবছি। বিস্কো বলল।

—আপনারা তো বিদেশী। বৃদ্ধ বললেন।

—হ্যাঁ।

—কার সঙ্গে আপনাদের কী হয়েছে যে গুণ্ডা লাগিয়ে আপনাদের শায়েস্তা করতে চাইছে। বৃদ্ধ বললেন।

—কী জানি। কিছুই বুঝতে পারছি না। বিস্কো বলল।

—খোঁজ নিয়ে দেখুন আপনাদের কেউ এ দেশের কাউকে চটিয়েছেন? বৃদ্ধ বললেন।

বিস্কো কিছু বলল না।

—বলুন ঠিক বলেছি কিনা। বৃদ্ধ বললেন।

—কী জানি বুঝতে পারছি না। বিস্কো বলল।

—ঐ মহিলাকে ফেরৎ পেতে বেশ কিছু অর্থব্যয় করতে হবে। লোকটি বলল।

—দেখা যাক। বিস্কো বলল। তারপর নিজের ঘরে চলে এল। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল ফ্রান্সিসদের জন্যে। বিস্কো সরাইখানার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঢোকার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। রাস্তার লোকজন গাড়ি ঘোড়া ওপর ওপর দেখতে লাগল। আসলে ওর চিন্তা যা হয়েছে হয়েছে। কিন্তু রাজকুমারীকে কি করে উদ্ধার করবে।

ফ্রান্সিসদের ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। ওরা বিস্কোকে সরাইখানার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ফ্রান্সিস বলল—কী ব্যাপার? এখানে দাঁড়িয়ে আছো? ঘরে চলো।

—চলো। সকলেই ওদের ঘরে এল। কেনার জিনিস রাখল। সকলেই কে কী কিনল তাই নিয়ে কথা বলতে লাগল। পরস্পরকে কেনা জিনিস দেখাতে লাগল।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেবার জন্যে সাদা ভালুকের চামড়ায় তৈরি পোশাকটা নিল। চলল। বিস্কো বলল—ফ্রান্সিস। একটা কথা ছিল। ফ্রান্সিস ফিরে দাঁড়াল। বলল, কী কথা?

—ঘণ্টা খানেক আগে এই শহরের এক গুণ্ডা ঘোড়ায় চড়ে এসে রাজকুমারীকে অপহরণ করেছে। বিস্কো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

—বলো কি। সমস্ত ঘটনাটা বলো তো। আমাদের ঘরে এসো। হ্যারি তখনই এল। বলল—

—ফ্রান্সিস পোশাক রাজকুমারীর পছন্দ হয়েছে তো?

—হ্যারি চলো কথা আছে। ফ্রান্সিস আস্তে বলল।

তিনজনে ওদের ঘরে ঢুকল। দেখল পছন্দের জিনিস কেনাকাটা করে সবাই আনন্দে আত্মহারা। জোরে জোরে কথা বলছে। ফ্রান্সিস বিরক্ত হল। বলল— আস্তে কথা বল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস কী ব্যাপার বলো তো?

—কিছুক্ষণ আগে একটা গুণ্ডা মারিয়াকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল, সবাই চুপ করে রইল। ফ্রান্সিস বলল—বিস্কো তুমি যতটা এই ঘটনা জেনেছো বলো।

—বেশ। এবার বিস্কো আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনাটা যা জেনেছে বলল।

শাঙ্কো বলে উঠল—বিস্কো—তুমি এতটা দায়িত্ব বোধহীন নও। আজকে কী হল তোমার। রাজকুমারীর সব তুমি দেখাশুনো করবে এই ভরসায় তোমার হেফাজতে রাজকুমারীকে রেখে গেছিলাম আমরা। এ তুমি কী করলে?

হ্যারি বলল—বিস্কো—এখন তোমাকে কিছু বলা বৃথা। ভুল যা হবার হয়ে গেছে। বিস্কো সবই বলেছে। তারই ওপর ভিত্তি করে রাজকুমারীকে খুঁজতে হবে। এবার ফ্রান্সিস কিছু বলো। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—প্রথমে দেখতে হবে এখানে কার সঙ্গে বা কাদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা জন্মেছে।

—আমরা আগ বাড়িয়ে তো কারুর ক্ষতি করি নি। হ্যারি বলল।

—তবু শত্রুতা জন্মেছে। রাজা কুয়েক হুয়ার নক্সা আমরা পেয়েছি। খোঁজাখুঁজি করে আমরাই প্রথম বলেছি যে গুপ্ত ধনভাণ্ডার চুরি হয়ে গেছে এবং চুরি করেছে রাজার চিকিৎসক মানে কবিরাজ মশাই। কবিরাজের সঙ্গে আমাদের সামনাসামনি কথা হয়েছে এবং তিনিই যে গুপ্তধন চুরি করেছেন এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। এইবার কবিরাজ আমাদের এদেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টায় নামল। প্রথমেই মারিয়াকে অপহরণ করে আমাদের মনোবল ভাঙতে চাইলেন। উনি বোঝাতে চাইলেন—আমরা কত অসহায় আর উনি কত শক্তিধর। আমাদের ভোগাবেন। সেটা সহজেই পারবেন কারণ আমরা বিদেশী, আমাদের স্বপক্ষে কেউ দাঁড়াবেন না। কাজেই আমাদের ওপর চাপ বাড়াবেন এবং আমাদের এই দেশ ত্যাগ করতে আমাদের বাধ্য করবেন।

—কী ভাবে? শাঙ্কো বলল।

—রাজকুমারীকে অপহরণ করে। এ জন্যে আমাকে অথবা আমাদের বন্ধুকে অপহরণ করাবেন। সুতরাং আমরা পেরু ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হব। সকলে চুপ করে রইল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এই বিষয়ে ঠিক বলেছে। আমার তো মনে হয় আমরা যদি এখন কবিরাজের কাছে গিয়ে বলি—আমাদের রাজকুমারীকে মুক্তি দিন আমরা রাজকুমারীকে নিয়ে চলে যাই। কবিরাজ সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীকে মুক্তি দেবে। সবাই হ্যারির কথা শুনল। হ্যারি ঠিকই বলেছে।

এবার ফ্রান্সিস বলল—রাজকুমারীর সন্ধান পেতে আমাদের সারা শহর খুঁজে দেখতে হবে। তার আগে কবিরাজের বাড়ি যাবো। কথায় কথায় কিছু সূত্র পেতে পারি। আমরা কবিরাজকে স্পষ্ট বলব—আপনি আমাদের জব্দ করতে রাজকুমারীকে

হরণ করিয়েছেন। কবিরাজের মনোভাবটা কী দাঁড়ায় সেটা বোঝা যাবে। কবিরাজের বাড়ি চলো।

সবাই কবিরাজের বাড়ির দিকে চলল।

কবিরাজের বাড়ির সামনে এল। দেখল একজন দারোয়ান বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে পেতলের বর্শা। ফ্রান্সিস ওর কাছে গেল। দারোয়ানকে দেখল—সন্দেহ নেই দারোয়ান বলিষ্ঠ। ফ্রান্সিস বলল—আমরা কবিরাজমশাইর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—তবে ভেতরে প্রথম ঘরটায় যান। দারোয়ান বলল।

ফ্রান্সিসরা সেই ঘরে ঢুকল। দেখল বেশ বড় ঘর। দেয়াল আলমারি ভর্তি অনেক কাঁচের বোয়াম। ফরাস পাতা। ফরাসে তিন চারজন লোক বসে রয়েছে। বোধহয় চিকিৎসার জন্য এসেছে।

ফ্রান্সিসরাও বসল। তখনই একজন লোক ঘরে ঢুকল। গলায় ঝোলানো একটা মুক্তো বসানো সোনার হার। লোকটার মাথার চুল বড় বড়। পরনে সিল্কের পোশাক। বলল—নতুন কে এলেন—নাম বলুন। কথাটা বলে যুবকটি কোমরে গোঁজা ছোট নোটবই মত বের করল। টেবিলের কাছে গিয়ে বলল— নতুন কে বা কারা এসেছেন বলুন। ফ্রান্সিস ফরাস থেকে উঠে দাঁড়াল। বলল— আমরা নতুন এসেছি।

—রোগীর নাম বলুন। যুবকটি বলল।

—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। যুবকটি নাম লিখতে লিখতে মুখে শব্দ করল—হুঁ।

—আপনার সমস্যা কি? যুবক বলল।

—কাঁধে ভীষণ ব্যথা। ওষুধ নিতে এসেছি। রোগীটি বলল।

—আগে কবিরাজমশাই আপনাকে পরীক্ষা করে দেখবেন তারপর ওষুধ দেবেন। যুবকটি বলল।

—কবিরাজ কখন দেখবেন? নোটবই লিখতে লিখতে বলল।

—উনি আয়াচুচো গেছেন। তিনি এসে বলবেন।

—কখন ফিরবেন? হ্যারি বলল।

—তার কিছু ঠিক নেই। অপেক্ষা করুন। যুবকটি বলল।

—এতো মুস্কিলের কথা। শাঙ্কো বলল।

—উপায় নেই। অপেক্ষা করুন। যুবকটি ভেতরে ঢুকে গেল। দুপুর থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। খিদে জলতেষ্টা পাচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল—খিদেও পেয়েছে, জলতেষ্টাও পেয়েছে। এ দুটোর ব্যবস্থা করতে হয়।

ফ্রান্সিস ভেতরের দরজায় গিয়ে আঙ্গুল ঠুকলো। যুবকটি বেরিয়ে এল। বলল—কী ব্যাপার?

—আমরা অনেকক্ষণ না খেয়ে আছি। কিছু খেতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—এটা কি সরাইখানা? যান জল পাঠিয়ে দিচ্ছি।



একটু পরে বাড়ির কাজের লোক একটা জলভরা মাটির হাঁড়ি নিয়ে এল। হাতে কাচের গ্লাস। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—কে কে জল খাবেন খেয়ে যান।

হ্যারি, শাঙ্কো জল খেয়ে এল। যারা আগে এসেছিল তার মধ্যেও দুজন জল খেয়ে গেল। ফ্রান্সিস হাঁড়ি গ্লাস ফেরৎ দিল।

সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত। দুজন লোক রোগী নিয়ে চলে গেল। ফ্রান্সিসরা বসে রইল।

যুবকটি এল। কোনার টেবিল চেয়ারে বসল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। একে একটু টোকা দিয়ে দেখা যাক। ফ্রান্সিস যুবকটির কাছে এল। যুবকটি বোধহয় ঝিমোচ্ছিল। ফ্রান্সিস সামনের টেবিলে আঙ্গুল ঠুকলো। যুবকটি ধড়ফড়িয়ে উঠল। বলল—আ আ—মানে আপনি কি চান?

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কবিরাজমশাইর দেখা পেতে চাই।

—অসুখটা কি?

—আমাদের কারো কোন অসুখ নেই।

—বলেন কী? তাহলে এসেছেন কেন?

—কবিরাজমশাইর সঙ্গে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে।

—কী এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা?

—আছে—আছে।

—তার মানে?

একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—শুনুন—আমরা ভাইকিং। জাহাজ চালিয়ে দেশ বিদেশে যাই। গুপ্তধন উদ্ধার করি। বদলে একটা স্বর্ণমুদ্রাও নিই না।

—আশ্চর্য তো।

—হ্যাঁ। আমরা এমনিই। একটু থেমে বলল—মাজোর্কার রাজবাড়িতে আছে অতীতের রাজার গুপ্তধন। সেটাই আমরা নক্সা দেখে বুঝে নিয়ে উদ্ধারের চেষ্টা করেছি। কিন্তু ঐ গুপ্তধন আমাদের আগেই কেউ উদ্ধার করে পালিয়েছে।

—আপনারা বুঝতে পেরেছেন কে গুপ্তধন চুরি করেছে?

—হ্যাঁ। আমাদের স্থির বিশ্বাস গুপ্তধন চুরি করেছেন আপনাদের কবিরাজমশাই।

যুবকটি হকচকিয়ে গেল। বলে উঠল—আন্দাজে আমাদের কবিরাজ মশাইর ওপরে দোষ চাপাচ্ছেন।

—আরো আছে—ফ্রান্সিস বলল—আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের দেশের রাজকুমারী। আজ দুপুরের দিকে এক ঘোড়সওয়ার এসে রাজকুমারীকে হরণ করেছে।

—ডাকাত টাকাত হবে।

—না। একটা কুখ্যাত গুণ্ডা। যদি তার লুঠ করারই উদ্দেশ্য হত তাহলে সে ঘরে ঢুকে সোনার চাকতি দামি পাথর লুঠ করে নিত। কিন্তু সে তা করে নি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রাজকুমারীকে হরণ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। এই ঘটনার সঙ্গে কবিরাজমশাইর যোগ আছে।

—কী আজেবাজে বলছেন। যুবকটি বলল।

—যা সত্য তাই বলছি।

—যত সব বাজে কথা। যুবকটি গলা চড়িয়ে বলল। শাঙ্কো যুবকটির গলার ওপর দিয়ে বলল—এই বিরাট বাড়িটা আমাদের খুঁজতে দেবেন?

—কী খুঁজবেন?

—রাজকুমারীকে—আমাদের রাজকুমারীকে।

—সব পাগলের দল।

—এদের পাল্লায় পড়ে আমি না পাগল হয়ে যাই।

—আমরা সেটাই চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনাদের সাহস তো কম নয়। কবিরাজমশাইকে চোর বলছেন। কবিরাজমশাইর কোন ক্ষতি আপনারা করতে পারবেন না। যুবকটি বলল।

—রাজা পাচাকুচির দরবারে আমরা কবিরাজের মুখোশ খুলে দেব।

—কবিরাজমশাইর কত সম্মান আপনারা জানেন না। কোনভাবেই তাঁকে অপদস্ত করতে পারবেন না। বাড়ি যান।

—বাড়ি নয়। সরাইখানা।

—তাহলে সেখানেই যান।

—আমরা কবিরাজমশাইর সঙ্গে দেখা না করে যাব না। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা এখানেই থাকবো। শাঙ্কো বলল।

—ভালো হয় আপনাদের চলে যাওয়া।

—আমাদের ভাল আমরাই বুঝবো।

যুবকটি হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। জোরে ডাকল—ফ্রেডি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদেহী এক ঝাঁকড়াচুলো লোক ঘরে ঢুকল।

ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে যুবকটি বলল—এরা কবিরাজমশাইকে অপমান করবে বলে এসেছে। এদের তাড়িয়ে দে। ফ্রেডি ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। ছোট কুৎকুতে চোখে। তারপর কোমরে গোঁজা তরোয়াল খুলল। ফ্রান্সিসও তরোয়াল খুলল। লক্ষ্য করল ফ্রেডির তরোয়ালটা লম্বায় ওর তরোয়ালের চেয়ে বেশি লম্বা। ফ্রান্সিসের একটু চিন্তা হল। কীভাবে আত্মরক্ষা করবে কীভাবে লড়াই চালাবে তার ছক মনে মনে কষে নিল। শাঙ্কো আর বিস্কোও তরোয়াল খুলল। ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে ওদের মানা করল।

ফ্রেডি একলাফে ফ্রান্সিসের সামনে চলে এল। হাতে খোলা তরোয়াল। ফ্রান্সিস সরে যেতে পারল না। ফ্রেডির তরোয়াল সোজা নেমে এল ফ্রান্সিসের মাথার ওপর। ফ্রান্সিস দ্রুত নিজের তরোয়াল দিয়ে নেমে আসা তরোয়ালটাকে ঠেকাল। তবু ফ্রান্সিস অক্ষত থাকলো না। ফ্রেডির তরোয়াল ওর কাঁধ কেটে নামল। রক্ত বেরিয়ে এল। রক্ত দেখে ফ্রান্সিস প্রচণ্ড রেগে গেল। ফ্রেডির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রেডি মার ঠেকাবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। ফ্রান্সিসের তরোয়াল সোজা নেমে এসে ঘা মারল ফ্রেডির বাম বাহুতে। তরোয়াল বাহুতে অনেকটা ঢুকে গেল। ফ্রেডি তরোয়াল ফেলে দিল। ডান হাত দিয়ে বাম বাহুটা চেপে ধরল। ফ্রান্সিসও তরোয়াল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস তরোয়ালের এক কোপে এখন ফ্রেডিকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু ও এবার শান্ত হল। তরোয়াল কোষবদ্ধ করল।

শাঙ্কো ততক্ষণে কোমরের ফেট্টি ছিঁড়ে নিয়ে এল। ফ্রান্সিসের কাটা জায়গায় চেপে বেঁধে দিল। রক্ত পড়া বন্ধ হল।

—ফ্রেডি যাও—যুবকটি বলল।

ফ্রেডি উঠে দাঁড়াল। তরোয়াল কোষবদ্ধ করল। তারপর বাড়ির ভেতরে চলে গেল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে ধরে নিয়ে ফরাসে বসাল। ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই বাইরে ঘোড়ার ডাক শোনা গেল। একটা গাড়ি ঢোকার শব্দ হল। যুবকটি প্রায় ছুটে গেল বাইরের দরজার দিকে।

কবিরাজ ঢুকলেন। একবার ফ্রান্সিসদের ওপর দিয়ে চোখ বোলালেন। কবিরাজের পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা সিল্কের পোশাক। মাথায় হলদে রঙের টুপিমতো, গলায় মুক্তোর মালা। ঘরটায় একটা সুগন্ধ ছড়াল। দাড়ি গোঁফ কামানো। গায়ের রং লালচে।

কবিরাজ ভেতরে চলে গেলেন।

যুবকটি ফরাসের তাকিয়া ঠিকঠাক করল। ওষুধ বোঝাই তাকগুলোতে শিশি বোতল রূপোর কৌটো—এসব গোছগাছ করল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কবিরাজ ঘরে এলেন। পাতা ফরাসের একপাশে কয়েকটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলেন। যুবক ফ্রান্সিসের নাম ডাকলেন। ফ্রান্সিস হাত ঘুরিয়ে বলল আমি সবশেষে। যুবকটি অন্য রোগীকে ডাকল।

কবিরাজ রোগী দেখতে লাগলেন। ওষুধ দিতে লাগলেন। যুবকটি ওষুধ তৈরি করতে লাগল। দিতে লাগল।

রোগী দেখা শেষ হল। রোগীরা চলে গেল। কবিরাজ এবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকালেন। বললেন—আপনাদের মধ্যে রোগী কে?

—আমরা সবাই সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে অনেকক্ষণ না খেয়ে আছি তাই শরীরটা দুর্বল লাগছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? কবিরাজ বলল।

—আপনার সঙ্গে দেখা করবো বলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা তো রোগী নন। তবে আমার কাছে এসেছেন কেন? কবিরাজ বলল।

—আপনার সঙ্গে কথা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী কথা? কবিরাজ বলল।

—আজ যে সরাইখানায় আমরা আছি সেখান থেকে এক অশ্বারোহী গুণ্ডা আমাদের রাজকুমারীকে অপহরণ করেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। কবিরাজ মুখে শব্দ করলেন।

—বোঝা যাচ্ছে কারো নির্দেশে অর্থের বিনিময়ে গুণ্ডাটা এই কাজ করেছে। এখন প্রশ্ন কার নির্দেশে এটা ঘটেছে? ফ্রান্সিস বলল।

—কার নির্দেশে? কবিরাজ জানতে চাইল।

—আপনার নির্দেশে। ফ্রান্সিস বলল।

কবিরাজমশাই বেশ চমকে উঠলেন। তারপর সহজভঙ্গীতে বললেন—আমি এসব ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমাকে এসবের সঙ্গে জড়াচ্ছেন কেন? কবিরাজ বলল।

—না জড়িয়ে উপায় নেই বলে। ফ্রান্সিস বলল।

—তার মানে? কবিরাজ বললেন।

—মাজোর্কার রাজা কুয়েক হুয়া পিতামহের রাখা একটা নক্সা পেয়েছিলেন। নক্সাটার গুপ্তধনের অবস্থিতির নির্দেশ আছে। আপনি বেশ চিন্তাভাবনা করে গুপ্তধন আবিষ্কার করেছিলেন। একদিন রাজাকে দেখে যদিও সেদিন আপনার যাওয়ার কথা ছিল না—আপনি অতিথি ঘরে ছিলেন। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—গভীর রাতে একটা থলেতে রাখা বহুমূল্যবান গুপ্তধন বের করে নিজের থলেতে ভরে নিয়ে খুব ভোরে রাজবাড়ি থেকে চলে এসেছিলেন। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—কীভাবে আপনি গুপ্তধন চুরি করেছিলেন সবই বললাম। ফ্রান্সিস বলল।

কবিরাজ বলে উঠলেন—সব মিথ্যে অভিযোগ।

—একটি বর্ণও মিথ্যে নয়। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস বলল—আপনার এই প্রাসাদের মত বাড়ি শুধু কবিরাজী করে হয় না। এর জন্যে যথেষ্ট ধনসম্পদ লাগে। সেই ধনসম্পদ আবিষ্কার করে আপনি রাজা কুয়েক হুয়াকে কিছু বলেন নি। রাজার চিকিৎসাও আর করেন নি। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—প্রয়োজন নেই বলে যাই নি। কবিরাজ বললেন।

—তা তো বটেই। কার্যোদ্ধার হয়ে গেছে। কাজেই অসুস্থ রাজাকে আর দেখতে যান নি। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা আমার খুশি। কবিরাজ বললেন।

—তা তো বটেই। এবার ফ্রান্সিস বলল—আপনার বিরুদ্ধে আমাদের আরো অভিযোগ আছে।

—আমি আর শুনতে চাই না। কবিরাজ বলল।

—আপনাকে শুনতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনাদের তাড়াতে হবে। এবার যুবকটি বলল।

ফ্রেডিকে ডাকো তো। কবিরাজ বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—আপনার ফ্রেডি এখন বিছানায় শুয়ে গোঙাচ্ছে।

—তার মানে? কবিরাজ বললেন।

—তার মানে আমি বলছি। ফ্রান্সিস যুবকটিকে দেখিয়ে বলল—ইনি আমাকে শায়েস্তা করার জন্যে ফ্রেডিকে দিয়ে আমাদের তাড়াতে চেয়েছিলেন। ফ্রেডির সঙ্গে কাজেই আমাদের তরোয়ালের লড়াই হয়েছিল। ফ্রেডি হেরে গিয়েছিল। আমি তাকে হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করিনি। বাহুতে তরোয়ালের ঘা খেয়ে ফ্রেডি আহত হয়েছে মাত্র।

—ও। আপনারা অনেক দূর এগিয়েছেন। কবিরাজ বললেন।

—হ্যাঁ। এবার আমাদের রাজকুমারীকে মুক্তি দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি এই ব্যাপারে কিছুই জানি না। কবিরাজ বললেন।

—উঁহু। এই ব্যাপারটার সঙ্গে আপনি জড়িত। আপনি সব জানেন। রাজকুমারীকে আমরা উদ্ধার করবই। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ সেই চেষ্টাই করুন। কবিরাজ যেন খেঁকিয়ে উঠলেন।

—হ্যাঁ তাই করছি। তবে আপনাকেও আমরা ছাড়ছি না। তার জন্যে এখানে যদি থাকতে হয়—থাকবো। ফ্রান্সিস একটু থেমে বলল—আমরাও যাচ্ছি।

ফ্রান্সিস কবিরাজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে হ্যারি বলল—এখন কী করবে?

—কবিরাজের এই বাড়ির ওপর নজর রাখতে হবে আমাদের। পালা করে নজর রাখতে হবে। কে বা কারা যাচ্ছে কারা আসছে—আমাদের সব দেখতে হবে। থাক গোপনে কথা হবে। এখন জলতেষ্টা পেয়েছে, খিদেও পেয়েছে। সরাইখানায় চল।

—তার আগে এখানে একটা কাজ আছে।

—কী কাজ? শাঙ্কো বলল।

—কবিরাজের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে ঐ দেখ একটা ফুলের দোকান। দোকানটায় এসো। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিসরা ঐ ফুলের দোকানে এল। ফুলওয়ালা ওদের দিকে এগিয়ে এল। বলল—খুব কম দামে ফুল পাবেন।

হ্যারি বলল—আমরা ফুল কিনতে আসিনি। একটা ব্যাপারে কথা আছে আপনার সঙ্গে।

—কী কথা? ফুলওয়ালা বলল।

জানলার ধারের জায়গাটা দেখিয়ে হ্যারি বলল—এখানে তো কিছু থাকে না।

—না। ফুলওয়ালা বলল।

—আপনি রাত্রে দোকানে থাকেন? হ্যারি জানতে চাইল।

—না বাড়িতে থাকি। আমার বাড়ি এখান থেকে ধরুন গে—

ফুলওয়ালাকে থামিয়ে দিয়ে হ্যারি বলল—এবার আপনাকে একটা অনুরোধ—ঐ জায়গাটুকুতে আমরা একটা চৌকি পাতব। দিনে রাতে আমরা একজন একজন করে থাকবো।

—কেন বলুন তো? ফুলওয়ালা বলল।

—সেটাই এখন বলতে পারব না। কয়েকদিন পরে সময়মত বলব। হ্যারি বলল। তারপর শাঙ্কোর দিকে হাত বাড়াল। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা সোনার চাকতি বের করে দিল। হ্যারি সোনার চাকতিটা ফুলওয়ালার দিকে বাড়িয়ে ধরল। ফুলওয়ালা অবাক। বলল—মানে—আমি ঠিক—ওকে থামিয়ে দিয়ে হ্যারি বলল—এটা রাখুন। সময়মত আপনাকে সব বলা হবে। তার আগে কোন প্রশ্ন করবেন না। ফুলওয়ালা সোনার চাকতি পেয়ে খুব খুশি। হ্যারি বলল—একটা

কাঠের তক্তা ওখানে রাখবেন। আমরা আসবো বসবো। রাত্রেও থাকবো। আমরাই রাত্রে আপনার পাহারাদারের কাজ করবো।

—ঠিক আছে।—ঠিক আছে। ফুলওয়ালা হাসতে হাসতে বলল।

—এখন চলি। আজ সন্ধ্যে থেকে আমাদের লোক আসবে থাকবে। ঠিক আছে। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। ঠিক আছে। ফুলওয়ালা একগাল হাসল।

ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় এল। ওরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। ঘরে এসে বসল সবাই। ফ্রান্সিস পাহারার জন্যে সবাইকে দায়িত্ব দিল। বলল—সকালে আমি যাবো। দুপুরে বিস্কো। সন্ধ্যে থেকে রাত—হ্যারি। তারপর—শাঙ্কো বলে উঠল—রাত থেকে সারারাত আমি। কাজ ভাগ করে দেওয়া হল। এবার কাজে নামা।

সন্ধ্যেবেলা হ্যারি ফুলের দোকানে গেল। দেখল ফুলওয়ালা ব্যবস্থা করেছে। একটা উঁচু পাটাতন এনে রেখেছে। ফুলওয়ালা হেসে বলল—আসুন—আসুন। হ্যারি গিয়ে পাটাতনটায় বসল। সামনেই একটা ছোট জানলা। জানলা দিয়ে কবিরাজের বাড়ির রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া সবই দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে ভালো নজরদারি চলবে। হঠাৎই দেখল কবিরাজের দারোয়ান বাড়ির বাইরে এল। একটু এদিক ওদিক ঘুরে ভেতরে চলে গেল। তাহলে আমাদের খুব সাবধানে নজর রাখতে হবে।

হ্যারি পাটাতনে আধশোয়া হল। বাইরে নজর রাখল। কবিরাজের বাড়ির রাস্তা গাড়ি ঘোড়া লোকজন দেখতে লাগল।

একটু রাতের দিকে হঠাৎ দেখল কবিরাজের বাড়ি থেকে একটা চারঘোড়ায় টানা গাড়ি বেরিয়ে এল। রাস্তায় এল। তারপর দ্রুত রাস্তা দিয়ে ছুটল। গাড়িতে দুজন লোককে দেখল। একজন কবিরাজ অন্যজনকে চিনল না। দুজনেই সন্ধ্যেবেলার শৌখিন পোশাক পরেছে।

এইবার হ্যারি ভাবল—কবিরাজ গাড়ি ছাড়া বেরুবে না। গাড়ি ছাড়া কবিরাজকে অনুসরণ করা যাবে না। একটা গাড়ি চাই।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো এল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি কেমন নজর রেখেছিলে?

—ভালোই নজর রেখেছি। কিন্তু সমস্যা আছে একটা। কবিরাজ গাড়ি ছাড়া বেরোয় না। আজকে কিছুক্ষণ আগে কবিরাজ আর একজন গাড়িতে বসেছিল। চলে গেল। কেন কাকে কোথায় নিয়ে গেল কিছুই বুঝলাম না।

—হ্যাঁ এই সমস্যাটা হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাই বলছিলাম আমরাও একটা ঘোড়ার গাড়ি সারা দিন রাতের জন্য ভাড়া করে রাখি। তাহলে সহজে কবিরাজের গাড়ি অনুসরণ করতে পারি। তাহলে কবিরাজ কোথায় গেল জানতে পারবো। হ্যারি বলল।

—দাঁড়াও ঐ বেস্টনাট গাছের নীচে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। চলো কথা বলে আসি। ফ্রান্সিস বলল।

ওরা বেস্টনাট গাছের নীচে এল। গাড়োয়ান গাড়ির মধ্যে বসার জায়গায় শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস ডাকল—ও ভাই শুনছো?

গাড়োয়ানের ঘুম ভেঙে গেল। ও ধড়ফড় করে উঠে বসল। হ্যারি বলল—

—ভাই বাইরে এসো। কথা আছে। গাড়োয়ান গাড়ি থেকে নামল।

ফ্রান্সিস বলল—কয়েকদিনের জন্যে তোমার গাড়িটা আমরা ভাড়া করবো। তুমি রাজি কিনা বল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ভাড়া খাটবো। কিন্তু কোনসময় আর কতদিন।

—ধরো কাল থেকে পাঁচদিন।

—সারা দিন?

—হ্যাঁ—সারা দিনরাত।

—ঠিক আছে।

—আজ এখন থেকেই। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। গাড়োয়ান মাথা ওঠানামা করল।

তখনই কবিরাজের বাড়ির সদর দেউড়িতে একটা দুই ঘোড়াটানা গাড়ি এসে থামল। দারোয়ান দরজা খুলে দিল। গাড়িতে দুজনে বসে আছে। একজন স্ত্রীলোক। গাড়ি বাইরে রেখে ওরা নামল। কবিরাজের বাড়িতে ঢুকল।

তখনই শাঙ্কো এল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে সব বলল। গাড়োয়ানকে কিছু দিতে বলল। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা সোনার ছোট চাকতি বের করে গাড়োয়ানকে দিল। গাড়োয়ান খুব খুশি।

শাঙ্কো বলল—তোমরা একটা গাড়িতে যাদের দেখলে তার মধ্যে রাজকুমারী নেই তো?

—না নেই। হ্যারি বলল।

এবার ফ্রান্সিস বলল—এবার কবিরাজের গাড়ি অনুসরণ করা যাবে। তবে গাড়িতে বসে সারা দিনরাত নজর রাখা যাবে না। কবিরাজের দারোয়ানের মনে সন্দেহ হতে পারে। মাঝে মাঝে গাড়িটা চড়ে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে আনতে হবে।

—ফুলের দোকান থেকেও নজর রাখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—শাঙ্কো গাড়োয়ানের কাছে এসে বলল—শোন ভাই। আমি এই ফুলের দোকানে থাকবো। কোন গাড়িকে অনুসরণ করতে হবে তোমাকে ডাকবো। তুমি সবসময় তৈরি থাকবে।

গাড়োয়ান মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

—তাহলে—শাঙ্কো আমরা যাচ্ছি। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরা যেভাবে আটঘাট বেঁধে এগোচ্ছি রাজকুমারীকে ঠিক উদ্ধার করবো। শাঙ্কো আস্তে বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারি চলে গেল।

শাঙ্কো ফুলের দোকানে ঢুকল। ফুলওয়ালা হেসে বলল—আসুন আসুন। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

শাঙ্কো কাঠের পাটাতনটা একটু ডানদিকে ঠেলে রাখল। জানলা দিয়ে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে যে গাড়িটি এসেছিল একজন সুসজ্জিত পুরুষ আর এক স্ত্রীলোক সেও সুসজ্জিতা এসে সেই গাড়িতে উঠল। গাড়ি ছাড়ল। চলল পূবমুখো।

শাঙ্কো পাটাতনে আধশোয়া হল।

রাত বাড়তে লাগল।

একটু রাতেই কবিরাজের গাড়ি এল। দরোয়ান বড় দরজাটা খুলে দিল। গাড়ি ভেতরে ঢুকল। শাঙ্কো দেখল—কবিরাজ একা। তার সঙ্গীটি আসেনি।

শাঙ্কো তারপর সারা রাত পাটাতনে শুয়ে বসে সময় কাটাতে লাগল।

সেইরাতে আর কেউ কবিরাজের বাড়ির বাইরে বেরোল না—ঢুকলোও না।

ভোর হল। ফ্রান্সিস হ্যারি এল। শাঙ্কোকে বলল—মারিয়াকে দেখলে?

—না। শাঙ্কো বলল।

—ভোগাবে। কবিরাজ জানে আমরাই একমাত্র ওর গুপ্তধন চুরির ব্যাপারটা জানি। কাজেই যেমন করে হোক আমাদের এ দেশ ছাড়তে বাধ্য করবে। আমরা মারিয়াকে উদ্ধারের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকবো কাজেই রাজা বা মন্ত্রীকে তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে সময় পাব না। আমাদের একমাত্র কাজ হবে মারিয়াকে উদ্ধার করা। কাজেই মারিয়াকে বন্দী করে রেখে আমাদের মুখ বন্ধ করতে চায়। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে রাজা বা অমাত্যদের কাউকে আমরা কিছু বলতে সাহস পাব না। যদি বলতে যাই রাজকুমারীর বন্দীদশার কথা তাহলে কবিরাজ রাজকুমারীকে হত্যা করতে পারে। কবিরাজ সাংঘাতিক লোক। কাজেই খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে। হ্যারি বলল।

শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

—নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে। মারিয়ার কোন হদিশ করতেই হবে। প্রয়োজনে কবিরাজের বাড়িতেও ঢুকবো। মারিয়াকে খুঁজে বের করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যারি বলল—রাজকুমারীকে অন্য কোথাও রাখতে পারে?

—হ্যাঁ। পারে। তাই কবিরাজের গাড়ির পেছনে আমাদের গাড়ি চালাতে হবে। একটা সূত্র নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

কবিরাজের বাড়ির দিকে ফ্রান্সিসরা নজরদারি চালাল।

কোথাও বেরোল না। তার যত যাওয়া আসা সন্ধ্যে থেকে রাত পর্যন্ত। সেদিন সন্ধ্যের কিছু পরে কবিরাজ গাড়িতে চেপে বের হল। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল ঘোড়ার গাড়ির দিকে। গাড়োয়ান নিজের জায়গায় বসে ঝিমোচ্ছিল। হ্যারি এসে বলল—ভাই —জলদি গাড়ি চালাও। হ্যারি উঠে বসতে বসতে গাড়োয়ান গাড়ি চালাল।

হ্যারি সীট থেকে উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আস্তে বলল—সামনের গাড়িটার পেছনে পেছনে চালাও। দরজা বন্ধ করে হ্যারি সীটে বসল।

দুটো গাড়িই চলল।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর কবিরাজদের গাড়িটা একটা বড় বাড়ির সামনে এল। দাঁড়াল। হ্যারি গাড়োয়ানকে আস্তে গাড়ি থামাতে বলল। একটু দূরে হ্যারির গাড়ি থামল।

হ্যারি মুখ বাড়িয়ে দেখল—কবিরাজ নামল। সঙ্গে একজন মহিলাও নামল। বাড়ির বাইরের আলোতে দেখে বুঝল রাজকুমারী নয়।

কবিরাজ আর মহিলাটি বাড়িতে ঢুকে গেল।

হ্যারি অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরে ভাবল এটা কার বাড়ি সেটা জানা যাক।

হ্যারি গাড়ি থেকে নেমে এল। দেখল চারিদিক অন্ধকার। একমাত্র ঐ বাড়িটার বাইরের ফটকে আলো আছে। সেই আলোতেই দেখল সামনে এক পোশাকের দোকান। হ্যারি দোকানে ঢুকল। একজন যুবক হাসিমুখে এগিয়ে এল। হ্যারি বলল—আমি পোশাক কিনবো না। একটা কথা জানতে এলাম—

—বলুন— কী কথা? লোকটি বলল।

হ্যারি বাড়িটা দেখিয়ে বলল—এটা কার বাড়ি?

—মাননীয় সেনাপতির বাড়ি।

—ও। ঠিক আছে।

হ্যারি দোকানের বাইরে এল। হ্যারি বুঝল—কবিরাজ আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। যদি বিদেশীরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাই সেনাপতিকে ভুল বোঝাবে। ফ্রান্সিসদের অভিযোগ ধোপে টিকবে না।

ফিরে এসে হ্যারি গাড়িতে বসল।

কবিরাজ ও মহিলাটি বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে এল। গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলল। পেছনে হ্যারির গাড়িও চলেছে।

কবিরাজের গাড়ি পুবমুখো চলল। পেছনে হ্যারির গাড়িও চলল।

একটা বেশ বড় বাড়ির সামনে এসে কবিরাজের গাড়ি থামল।

কবিরাজ আর মহিলাটি নামল। বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

হ্যারি গাড়ি থেকে নামল। একটু এদিক ওদিক ঘুরছে তখনই একজন লোককে আসতে দেখল। হ্যারি বলল—একটা কথা বলছিলাম।

—বলুন। লোকটি বলল।

—এই বাড়িটা কার বাড়ি?

—ও। এটা তো মাননীয় মন্ত্রীমশাইয়ের বাড়ি।

—ও। হ্যারি মুখে শব্দ করল। ফিরে এসে গাড়িতে বসল। তাহলে বোঝা যাচ্ছে কবিরাজই গুণ্ডা লাগিয়ে রাজকুমারীকে অপহরণ করিয়েছে। এবার মন্ত্রী ও সেনাপতিকে হাতে রাখছে। গুপ্তধন চুরি রাজকুমারীকে অপহরণ এইসব নিয়ে কথা উঠলে মন্ত্রী ও সেনাপতিই তাকে রক্ষা করবে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কবিরাজ ও মহিলাটি বেরিয়ে এল। গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলল। পেছনে হ্যারির গাড়ি।

কবিরাজ আর কোথাও গেল না। সোজা বাড়ি ফিরে এল। হ্যারিও ফিরে এল।

কবিরাজের গাড়ি তার বাড়িতে ঢুকে গেল। হ্যারি কিছুদূরে গিয়ে গাড়ি থামাল। গাড়ি থেকে নামল।

ফুলের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। তবে দোকানের তালার চাবি ফুলওয়ালা ফ্রান্সিসদের দিয়ে রেখেছিল। হ্যারি তালা খুলে দোকানে ঢুকল। পাতা পাটাতনে বসল। তারপর শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ বাইরে শাঙ্কোর গলা শুনল—হ্যারি। হ্যারি দোকানের দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো এসেছে।

হ্যারি—কী খবর বলো। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি ওর অভিজ্ঞতার কথা বলল। তারপর বলল—এখন আমার মনে হয়, কবিরাজই নিজের বাড়িতে রাজকুমারীকে বন্দী করে রেখেছে।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আমি কবিরাজের বাড়িতে ঢুকবো। মারিয়াকে খুঁজবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মারিয়াকে কবিরাজ নিজের বাড়িতেই বন্দী করে রেখেছে।

—আজ রাতেই যাবে? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ আজ রাতেই। আমি একাই যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—না, না শাঙ্কোকে নিয়ে যাও। হ্যারি বলল।

—যদি মারিয়াকে পাই তাহলে ওকে নিয়ে পালিয়ে আসতে হবে। তখন একা মারিয়াকে নিয়ে পালাতে কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু শাঙ্কো গেলে একটা বাড়তি দায়িত্ব।

শাঙ্কো বলল—ঠিক আছে ফ্রান্সিস তুমি যা সুবিধেজনক মনে হবে তাই কর।

ফ্রান্সিস কোমরের তরোয়ালটা ভালো করে কোমরে গুঁজল। তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে এল।

ফ্রান্সিস বড় রাস্তাটা পার হল। আকাশে আধ ভাঙা চাঁদ। তাই জ্যোৎস্না খুব উজ্জ্বল নয়। কবিরাজের বাড়ির পেছনদিকে গেল। দেখল এখানেও একটা প্রবেশদ্বার লোহার তৈরি। ফ্রান্সিস প্রবেশদ্বারের কাছে গেল। দেখল। ওঠা যাবে। পারও হওয়া যাবে।

এবার আস্তে আস্তে প্রবেশদ্বারে উঠতে লাগল। প্রবেশদ্বারের মাথায় চড়ল। লোহায় ঘষা লেগে ফ্রান্সিসের হাতে পায়ে কিছু জায়গা কেটে গেল। যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু ফ্রান্সিস আমল দিল না। একটা বাগানে লাফ দিয়ে পড়ল। বাগানের গাছগাছালিতে জায়গাটা বেশ অন্ধকার।

ফ্রান্সিস সামনের দিকে তাকাল। পাথরে তৈরি খাড়া দোতলা। ফ্রান্সিস বাগানের মধ্যে দিয়ে সদর দরজায় এল। ফ্রান্সিস আস্তে দরজাটা ধাক্কা দিল। দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। ফ্রান্সিস দেখল এটা কবিরাজের রোগী দেখার ঘর। কিছুটা এগোতেই একটা দরজা। ভেজানো। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে দরজাটা একটু খুলল। দেখল এটা রাঁধুনীদের ঘর। দুজন শুয়ে আছে। একজন বাড়ির আলোতে মাথায় চিরুনি চালাচ্ছে।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সরে এল। সামনেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। ফ্রান্সিস দোতলায় উঠতে লাগল। দোতলায় উঠে দেখল—পরপর তিনটে ঘর।

প্রথমে ফ্রান্সিস প্রথম ঘরের সামনে এল। দরজা বন্ধ। একটু এগিয়েই একটা জানালা। আধখোলা। ফ্রান্সিস দেখল—ঘরটি সুন্দর সুসজ্জিত। মেঝেয় কার্পেট পাতা। দুটো বিছানা। দুজন শুয়ে আছে। অঘোরে ঘুমচ্ছে। কবিরাজ ও তার পত্নী।

ফ্রান্সিস আরো এগোল। আবার একটা ঘর। ফ্রান্সিস দেখল দরজাটা একটু ফাঁক। ফ্রান্সিস আঙ্গুল দিয়ে দরজার ফাঁক বাড়াল। তখনই একেবারে মুখোমুখি এক গুণ্ডার। গুণ্ডাটা জল খাচ্ছিল। ফ্রান্সিসকে দেখে লাফিয়ে উঠল। সেইসঙ্গে চিৎকার—কে? কে? ওখানে? আর এক গুণ্ডা ঘুমিয়ে ছিল। আগের গুণ্ডার চিৎকার শুনে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস ভাবল—পালাবো। পরক্ষণেই ভাবল মারিয়া এই বাড়িতেই আছে কিনা সেটা জানতে হয়।

ততক্ষণে দুই গুণ্ডা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসও তরোয়াল খুলল। এক গুণ্ডা বলল—তুই কী চাস?

ফ্রান্সিস বলল—তোদের মুণ্ডু।

—তবে রে। একটা গুণ্ডা চেঁচিয়ে বলল।

—আয় তোরা তো কবিরাজমশাইর পোষা গুণ্ডা। তোরা এখানে বহাল তবিয়তে আছিস।

দুটো গুণ্ডাই ফ্রান্সিসকে আক্রমণ করল। ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে ওদের মার ঠেকাতে লাগল। আক্রমণ করল না। তরোয়ালের লড়াই চলল।

ফ্র্যান্সিস শেষ ঘরটার কাছে এল। উচ্চস্বরে তরোয়াল চালাতে চালাতে ডাকল—মারিয়া—মারিয়া। ঘরটা থেকে কোন শব্দ শুনল না। লড়াই চালাতে চালাতে ফ্রান্সিস আবার হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকল—মারিয়া। মারিয়া। বন্ধ ঘরটা থেকে মারিয়ার দুর্বল গলা শোনা গেল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এবার গুণ্ডাদুটোকে আহত করতে হয়। ফ্রান্সিস এবার একজন গুণ্ডাকে আক্রমণ করল। এতক্ষণ ফ্রান্সিস তরোয়ালের মার ঠেকিয়ে যাচ্ছিল। তাই গুণ্ডারাও ভেবেছিল—ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাতে জানে না।

ফ্রান্সিস প্রথমেই মাথায় কালো কাপড়ের ফেট্টি বাঁধাকে ধরল। ও প্রায় লাফিয়ে এসে মাথায় ফেট্টি বাঁধার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কালো ফেট্টি কিছু বোঝবার আগেই ফ্রান্সিস ওর ডান কাঁধে তরোয়ালের কোপ বসাল। তরোয়াল বসে গেল। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা খুলে নিল। কালো ফেট্টি গুণ্ডা বাঁ হাত দিয়ে ডান কাঁধটা ধরে বসে পড়ল।

অন্য গুণ্ডাটার সঙ্গে ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ লড়ল। তারপর অতি দ্রুত একটা পাক খেয়ে প্রচণ্ড জোরে তরোয়াল চালাল। গুণ্ডাটার উরুতে তরোয়ালের ঘা পড়ল। ও বসে পড়ল।

ফ্রান্সিস হাঁপাতে লাগল। তখনই বারান্দার অন্ধকার কোনার দিক থেকে কবিরাজের গম্ভীর গলা শুনল।

—তাইলে বর্শার এই মার সামলাও। কবিরাজ বর্শা ছুঁড়লেন। ফ্রান্সিস মাথা নামাতে নামাতে বর্শাটা ওর ঘাড় ছুঁয়ে গেল। কাটা জায়গা থেকে রক্ত পড়তে লাগল। ফ্রান্সিস বর্শাটা তুলে নিল। বলল—এইবার আপনি সামলান। ফ্রান্সিস দেহের সমস্ত

শক্তি নিয়ে বর্শা ছুঁড়ল। অন্ধকারের মধ্যেও নিখুঁত নিশানা। বর্শাটা কবিরাজের বুকে গেঁথে গেল। কবিরাজ উল্টে মেঝেয় পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ মাথা এপাশ ওপাশ করতে করতে মারা গেল।

দুই গুণ্ডা তখন মেঝেয় শুয়ে আছে। একজন গোঙাচ্ছে। অন্যটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে চেষ্টা করছে।

ফ্রান্সিস ওদের কাছে এল। তরোয়াল কোমরে গুঁজতে গুঁজতে। মাথায় কালো ফেট্টিওয়ালাকে বলল—যদি বাঁচতে চাও ঐ ঘরের চাবিটা দাও। কালো ফেট্টিওয়ালা বলল—আমার কাছে নেই। ফ্রান্সিস অন্যটিকে বলল—চাবি কোথায়?

—আমি জানি না।

—তাহলে তো উপায় নেই তোমাদের দুজনকেই হত্যা করতে হয়।

ফ্রান্সিস তরোয়ালের ডগাটা কালো ফেট্টিওয়ালার গলায় ঠেকাল। বলল— চাবি দাও। নইলে মরবে।

ফ্রান্সিস তরোয়ালের চাপ বাড়াল। বলল—তাহলে তুমি মরতে চাও। বেশ—ফ্রান্সিস তরোয়ালটা কালো ফেট্টির গলায় কিছুটা ঢোকাল। কালো ফেট্টি দুহাত তুলে বলল—দিচ্ছি। আমাকে ছেড়ে দিন।

—আগে চাবি চাই। ফ্রান্সিস বলল।

কালো ফেট্টি কোমর থেকে একটা চাবির গোছা বের করল।

দেখে দেখে ফ্রান্সিসকে চাবিটা দেখাল? ফ্রান্সিস চাবির গোছাটা নিয়ে শেষ ঘরটার কাছে গেল। গলা চড়িয়ে বলল—মারিয়া—আমরা এসেছি। দরজা খুলে দিচ্ছি।

ফ্রান্সিস দরজা খুলে দিল। মারিয়া কেঁদে ফেলল। —এখন কান্না নয়। চলো।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে হাত ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামাল। সদর দরজার কাছে এল। দারোয়ান হাঁ হাঁ মুখে শব্দ করতে করতে ফ্রান্সিসদের সামনে এল। বর্শা তুলল। তোমরা চোর।

—তোমার প্রভু কবিরাজমশাই অনেক বড় চোর। ফ্রান্সিস বলল—দরজাটা খুলে দাও।

—না। আমি দরজা খুলবো না।

—মিছিমিছি কথা বাড়াচ্ছো। বাড়ির দোতলায় ওঠ। দেখবে কবিরাজ মারা গেছে গুণ্ডা দুটো এখনও গোঙাচ্ছে।

—না। আমি দরজা খুলবো না।

—অগত্যা তোমাকে একটু আহত করতে হয়। ফ্রান্সিস তরোয়াল খুলল। দারোয়ান বর্শা তুলল। তখনই ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাল। বর্শা দু'টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল।

—এবারে দরজা খোল। ফ্রান্সিস বেশ কড়া গলায় বলল।

দারোয়ান এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল। ও তখনও ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে রইল। অবাক লাগল ওর বর্শাটা এত হালকা?

মারিয়ার হাত ধরে ফ্রান্সিস রাস্তায় এল। ফুলের দোকান থেকে হ্যারি শাঙ্কোরা ছুটে এল। হ্যারি মারিয়াকে বলল—রাজকুমারী আপনি সুস্থ আছেন তো?

—না। জ্বরটরে ভুগেছি। তবে এখন আমার শরীর ভালো হয়ে যাবে। রাজকুমারী একটু ম্লান হেসে বলল।

ফ্রান্সিসরা যখন সরাইখানায় ফিরে এল তখন ভোর হয় হয়। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া তুমি ঘুমিয়ে নাও। মারিয়া চলে গেল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি তুমি যতক্ষণ পারো ঘুমিয়ে নাও। সবাই যতটা পারো ঘুমোও, বিশ্রাম নাও। আমি আর শাঙ্কো ঘোড়াভাড়া করতে যাচ্ছি। তিনটে ঘোড়াতেই আমাদের হয়ে যাবে। একটু বেলায় খেয়ে নেবো। তারপর ঘোড়া চালিয়ে সন্ধ্যে নাগাদ আয়াচুচো পৌঁছবো। রাতটা বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা। সারারাত ঘোড়া চালাবো। সকালে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেল নাগাদ পিসকো বন্দরে পৌঁছব।

ফ্রান্সিসের নির্দেশ মেনে সবাই যখন পিসকো বন্দরে পৌঁছল সূর্য ডোবে ডোবে।

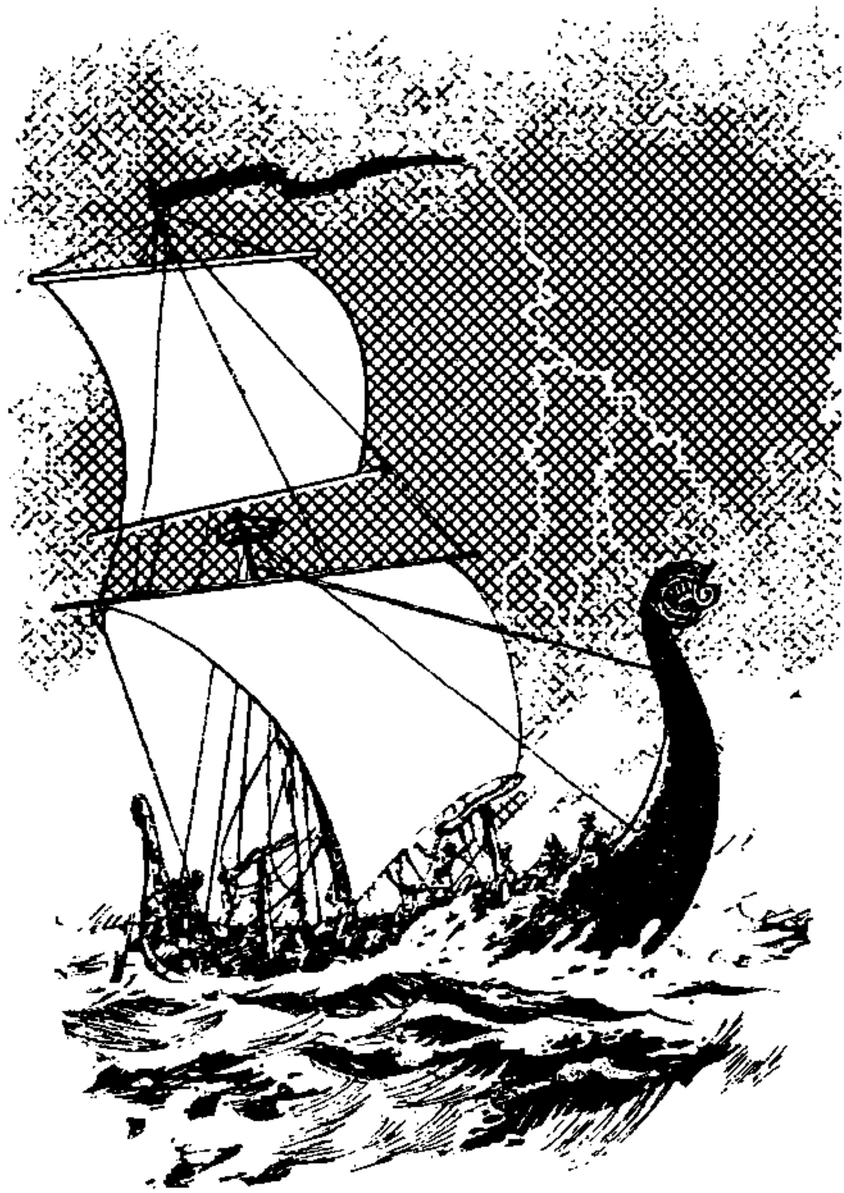
জাহাজঘাটায় ভাইকিং বন্ধুরা কয়েকজন জাহাজের রেলিং ধরে গল্পগুজব করছিল। একজন ভাইকিং ঘোড়ায় চড়ে আসা ফ্রান্সিসদের দূর থেকে দেখল। ও চিৎকার করে বলল—ভাইসব ফ্রান্সিসরা আসছে।

ফ্রান্সিসরা জাহাজঘাটায় এল। বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—এবারও আমার হাত শূন্য।

—তোমরা অক্ষত ফিরে এসেছো এতেই আমরা খুশি। ভেন বলল।

—০—

স্বর্ন খনির রহস্য



স্বর্ন খনির রহস্য

এখন দুপুর। ফ্রান্সিসরা সবেমাত্র খাওয়া-দাওয়া সেরেছে তখন। আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে। জাহাজ চলেছে। মেঘ দেখেই পেড্রো বুঝল প্রচণ্ড ঝড় আসছে। পেড্রো মাস্তুলের মাথা থেকে নেমে এল। ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস শুয়ে ছিল। ফ্রান্সিস বলল—পেড্রো কী হয়েছে?

—প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি আসছে। তুমি ডেক-এ এসো।

—চলো। ফ্রান্সিস উঠে পড়ল। দ্রুতপায়ে ছুটল। ডেকে-এ উঠে এল। ভাইকিং বন্ধুরা এখন ডেক-এ দাঁড়িয়ে আছে। বাতাস পড়ে গেছে। চারদিকের সমুদ্রে প্রায় অন্ধকার নেমে এসেছে। ফ্রান্সিস সমুদ্রের চারদিক দেখে নিল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব ঝড়বৃষ্টি আসছে। পাল নামাও। তারপর ডেক-এ এসে ঝড়ের মোকাবিলা কর।

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতেই ভাইকিং বন্ধুরা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একদল দড়িদড়া খুলে পাল নামাতে লাগল। চারপাঁচজন মাস্তুলে বাঁধা দড়িদড়া খুলতে লাগল। অনেকটা করে দড়ির প্যাঁচ খুলে এল। সেই মোটা দড়িগুলো ধরে কিছু ভাইকিং তৈরি হয়ে দাঁড়াল।

কয়েকজন দাঁড়ঘরে গেল। দাঁড়গুলো আসনের সঙ্গে বেঁধে রেখে এল। ঝড়ের ধাক্কায় দাঁড়গুলো ভাঙবে না।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। যেন কালো আকাশটাকে চিরে ফেলছে।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ তুলে ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসদের জাহাজের ওপর। ফেনিল জল ডেক-এর ওপর দিয়ে গিয়ে অন্যপাশে পড়তে লাগল। তার সঙ্গেই বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি শুরু হল। একটু পরেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল।

ডেক-এর ওপর দিয়ে কোনওরকমে হেঁটে ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে এল। ফ্রেজার হুইল এদিক ওদিক ঘোরাতে ঘোরাতে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল।

ফ্রান্সিস হুইল ধরে দাঁড়ানো জাহাজ চালক ফ্রেজারকে বলল—সাবধান—জাহাজ যেন ডোবে না। কথাটা এই প্রচণ্ড ঝড়ে ফ্রেজার শুনতে পেল না। ফ্রান্সিস বুঝল সেটা। ফ্রান্সিস এবার ফ্রেজারের কানের কাছে মুখ এনে কথাটা আবার বলল। ফ্রেজার হাতটা একটু উঠিয়ে বলল—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস কথাটা শুনল না। কিন্তু বুঝতে পারল।

ডেক-এর ওপর দাঁড়িয়ে কয়েকজন ভাইকিং মাস্তুলে বাঁধা মোটা মোটা দড়িদড়া টেনে ধরে রইল। ওরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—জাহাজ ডুবতে দেবে না।

কিছুক্ষণ পরে বাতাসের বেগ কমল। তারপরেই বৃষ্টি কমল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাওয়ার সেই তেজ আর রইল না।

ভাইকিংরা ডেক-এর ওপর পড়ে আছে। সারা গা ভেজা যেন চান করেছে। একজন দু'জন করে সবাই উঠে দাঁড়াতে লাগল। ফ্রান্সিসও মাস্তুলে টানা কাছিতে হাত লাগিয়েছিল। ওরও অবস্থা বন্ধুদের মতই, ফ্রান্সিস কেবিনঘরের দিকে চলল। জাহাজ একটা দ্বীপের কাছে চলে এসেছে।

সন্ধ্যের পরে হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস তখন বিছানায় আধশোয়া। মারিয়া কীসব সেলাই করছিল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

—কোথায় এলাম এটা সবকিছুর আগে জানা দরকার। নইলে হিসেবে গণ্ডগোল হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা তো ঠিকই। তাহলে আজকে তো আর তীরে নামছো না। হ্যারি বলল।

—না। আজকের রাতটা কাটুক। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তাহলে কালকে খোঁজ নিতে যাবে। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে কথা বলে সব জানতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটাই ভাল হবে। চলি। হ্যারি চলে গেল।

পরের দিন সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে বসল। তখনই মারিয়া বলল—তুমি কী স্থির করেছো?

—কী স্থির করেছি সেটা বলার সময় এখনো আসেনি। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া একটু অভিমানভরে বলল—তুমি তো আমাকে আগে থেকে কিছু বলো না।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—এ তোমার অনর্থক অনুযোগ, অভিমান। তোমাকে না জানিয়ে কোন কাজ আমি করি?

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে করো। মারিয়া বলল।

—এ তোমার ভুল বোঝা। এসব নিয়ে মিছিমিছি মন খারাপ করো না। আমি যা ঠিক করি তা আমাদের ভালর জন্যেই। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই এক ভাইকিং বন্ধু খাবার নিয়ে এল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খাবার খেয়ে নিল। তারপর বাইরে এল। ডেক-এ শাঙ্কোকে দেখল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো —তোমার সকালের খাবার হয়েছে?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। এখন কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—সেটাই ভাবছিলাম। যাকগে—চলো তীরে নামি। খোঁজখবর করি। ফ্রান্সিস বলল।

—দিনের বেলাই যাবে? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। রাতে নামলে বিপদে পড়তে পারি। ফ্রান্সিস বলল।

—আর কাকে নেবে? শাঙ্কো বলল।

—হ্যারি এখনও যথেষ্ট দুর্বল। ভাবছি বিস্কোকে নিয়ে যাবো।

বিস্কোকে একবার ডাকো তো। ফ্রান্সিস বলল।

একটু পরেই বিস্কো এল।

—বিস্কো—শোন—আমরা তীরে নামবো। জানতে হবে আমরা কোথায় এলাম। তুমি আর শাঙ্কো আমার সঙ্গে থাকবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। বিস্কো মাথা কাত করে চলল।

—দু'জনেই তৈরি হয়ে এসো। তরোয়াল তীরধনুক সঙ্গে নিও না।

শাঙ্কো আর বিস্কো চলে গেল।

ফ্রান্সিসও তৈরি হল।

মারিয়া বলল—এখানে কি নামতেই হবে?

—উপায় নেই। সঠিক জানতে চাই আমরা কোথায় এলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—বিপদ তো হতে পারে। মারিয়া বলল।

—নিশ্চয়ই বিপদ আছে। কিন্তু জীবনের ঝুঁকিটা নিতেই হবে। নইলে সত্যটা জানবো কী করে? ভয় নেই আমরা সাবধানে থাকবো।

শাঙ্কো আর বিস্কো এল। তিনজন ডেক-এ উঠে এল।

তিনজনে জাহাজের দড়ির সিঁড়ি বেয়ে একটা নৌকোয় নামল। শাঙ্কো নৌকোর দড়ি খুলে জাহাজের গায়ে ধাক্কা দিয়ে নৌকো সরিয়ে আনল। তারপর তীরভূমি লক্ষ্য করে নৌকোর দাঁড় বাইতে লাগল।

তীরে পৌঁছল। আর একটা ছোট জাহাজও নোঙর ফেলে আছে। জাহাজের মাথায় উড়ছে পর্তুগালের পতাকা।

যেখানে নামল সেখানে একটু উঠেই পায়ে চলা পথের মতো দেখল। দুপাশে ঝোপ জঙ্গল।

শাঙ্কো নৌকোটা তীরভূমিতে তুলে রাখল। জোয়ার এলে নৌকোটা আর ভেসে যাবে না।

ওরা চলল। পাখির বিচিত্র সব ডাক। রোদও চড়া নয়। হাঁটতে ভালোই লাগছিল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস দেখল দুতিনজন লোক জলাজঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের দেখে ওরা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দেখে বুঝল লোকগুলো এখানে কোন বিদেশিকে দেখবে এটা বোধহয় কল্পনাও করেনি।

ওরা থেমে আছে। ফ্রান্সিস বুঝল ওরা ছুটে পালাবার জন্যে তৈরি। ফ্রান্সিস আস্তে বলল—শাঙ্কো— ছোট। অন্তত একটাকে ধর। তখনই তিনজন বাঁ দিকে দৌড় দিল। শাঙ্কো ওদের চেয়েও দ্রুত ছুটে পেছনেরটাকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে পড়ে গেল। শাঙ্কো লোকটার হাত ধরল। লোকটাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

লোকটা হাঁপাচ্ছে তখন। শাঙ্কোও হাঁপাতে লাগল।

ফ্রান্সিস ওদের কাছে এল। লোকটাকে দেখল। ওর গায়ে মোটা সুতোয় তৈরি পোশাক পরে আছে। মুখচোখে ভয়।

ফ্রান্সিস বলল—ভয় নেই। আমরা তোমার কোন ক্ষতি করবো না। থেমে বলল— এই জায়গার নাম কী?

—গ্যালিগস।

—এটা কোন দেশ?

লোকটি মাথা এপাশ ওপাশ করল। ফ্রান্সিস বুঝল লোকটি দেশের নাম বলতে পারবে না। অতটা জ্ঞানবুদ্ধি ওর নেই। এবার শাঙ্কো বলল—তোমাদের রাজার নাম কী?

—আত্তারিয়া। লোকটি বলল।

—উনি কোথায় থাকেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—ঐখানে উদিয়া পাহাড়ের নিচে। লোকটি বলল।

ফ্রান্সিসরা কথা বলছে তখনই পেছনের ছোট টিলাটার মাথায় পাঁচ ছ'জন যোদ্ধাকে দেখল। তাদের হাতে বর্শা। ফ্রান্সিস বুঝল—বিপদ। গলা চড়িয়ে বলল— শাঙ্কো বিস্কো পালাও।

ফ্রান্সিসরা দ্রুতপায়ে সমুদ্রতীরের দিকে ছুটল। তখনই দেখল সমুদ্রতীরের দিক থেকে কয়েকজন যোদ্ধা উঠে আসছে। দুদিক থেকে ফ্রান্সিসরা আটকে গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ডানদিকে। কিন্তু ওরা ডানদিকে দৌড়োতে যাবে তখনই দেখল ডানদিকের জংলা গাছের জঙ্গল থেকে কয়েকজন যোদ্ধা এগিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আমরা ধরা পড়ে গেছি। পালাবার চেষ্টা করো না। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক

যোদ্ধারা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসদের ঘিরে ফেলল। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল। টিলার দিক থেকে একজন ন্যাড়ামাথা বলিষ্ঠ লোক এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বুঝল এ-ই দলপতি। দলপতির হাতে একটা লোহার বর্শা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ ভারী।

—তোমরা বিদেশী? দলপতি জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—এই দেশে এসেছো কেন? দলপতি জিজ্ঞেস করল।

—বলতে পারেন বেড়াতে। শাঙ্কো বলল।



—তোমরা জানো—পাহাড়ের ওপারের রাজ্যের রাজা হুয়াল্পারের সঙ্গে আমাদের লড়াই আর কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে। দলপতি বলল।

—না। এখানে আমাদের জাহাজে চড়ে এসেছি ঘণ্টাখানেক হল। ফ্রান্সিস বলল।

—বিশ্বাস করতে পারলাম না। রাজা হুয়াল্পার গুপ্তচর তোমরা। দলপতি বলল।

এই রাজ্যে আমরা যুদ্ধের জন্যে কী সব ব্যবস্থা নিচ্ছি এটাই তোমরা গোপনে জানতে এসেছো। দলপতি বেশ গলা চড়িয়ে বলল।

ফ্রান্সিস গলায় বেশ জোর দিয়ে বলল—আমরা গুপ্তচর নই। আমরা বিদেশি। জাহাজে চড়ে এসেছি। যদি গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খবর পাই তাহলে আমরা থাকবো যতদিন না গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারছি। গুপ্তধন উদ্ধার করে গুপ্তধন যার বা যাদের পাওনা তাদের হতে দিয়ে চলে যাবো। এছাড়া এখানে আসার অন্য কোন কারণ নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা বিশ্বাস করি না। দলপতি বলল।

—তাহলে আমরা নাচার। আপনি যা ভাববার ভেবে নিন। ফ্রান্সিস বলল।

—সব কটাকে বন্দী কর। দলপতি হুকুম দিল।

একজন যোদ্ধা এগিয়ে এল। হাতে দড়ি। প্রথমে ফ্রান্সিসের হাতে দড়ি বাঁধল। ফ্রান্সিস কোন আপত্তি করল না। বরং বলল—আপত্তি করো না। এর সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে। শাঙ্কো বিস্কোর হাতও দড়ি দিয়ে বাঁধা হল।

দলপতির নির্দেশে ছোট পাহাড়টার দিকে চলল সবাই। পাহাড়ের নিচে পৌঁছে ফ্রান্সিসরা দেখল চামড়ার তাঁবু মত। তাঁবুগুলো অনেকটা জায়গা জুড়ে। ফ্রান্সিসদের দেখতেই বোধহয় তাঁবুগুলো থেকে মেয়েরা শিশুরা বেরিয়ে এল।

একটা তাঁবুর কাছে এল সবাই। দলপতি ফ্রান্সিসদের বলল—এইখানে তোমরা বন্দী হ'য়ে থাকবে। যতদিন রাজা বলবেন ততদিন। এবার তাঁবুটায় ঢোক। ফ্রান্সিসরা তাঁবুতে ঢুকল। মোটামুটি প্রশস্ত। টান হয়ে শুলে তাঁবুর বাইরে পা চলে যাবে। তবে তিনজন এঁটে যাবে। রান্নার জিনিসপত্র উনুন এসব রাখা নেই। তবে তিনজন এঁটে যাবে। বন্দীদের জন্যেই রাখা হয়েছে। একটা কাঠের পাটা মেঝেয় পাতা। ওটার ওপরেই তিনজনকে বসতে বলা হল।

—জল খাবো। বিস্কো বসতে বসতে বলল। একজন আঙ্গুল দিয়ে কোণার দিকে দেখাল। বিস্কো ওখানে গেল। দেখল একটা চামড়ার থলিতে জল রাখা। ও থলিতে মুখ চেপে জল খেল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোও জল খেল।

—তোমাদের খাবার আসছে। খেয়ে দেয়ে আমাদের রাজা আতাুরিয়ার কাছে যেতে হবে। তোমাদের কী শাস্তি দেওয়া হবে সেটা রাজাই জানাবেন। দলপতি আর কয়েকজন চলে গেল। দু'জন পাহারায় রইল।

কিছুক্ষণ পরে খাবার এল। দু'জন লোক নিয়ে এল। বড় পাতা পেতে দেওয়া হল। তাতে খাবার দেওয়া হল। ফ্রান্সিস বলল—পেট পুরে খাও। ভালো না লাগলেও খাও। তিনজনে চেয়ে চেয়ে খেল। লোকেরা চলে গেল।

বিকেল হল। দলপতি একাই এল। বলল—চল আমাদের রাজার কাছে যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল—খাওয়ার সময়ও আমাদের হাতের বাঁধন খোলা হল না। বাঁধা দু'হাত নিয়ে খাওয়া যায়? এখনও বাঁধন খোলা হল না।

দলপতি ফ্রান্সিসদের হাতের দড়ি একটা ধারালো ছোট কুঠার দিয়ে কেটে দিল। তাঁবুর বাইরে এল ওরা। দলপতির পেছনে পেছনে চলল।

এলাকার মাঝখানে বেশ বড় একটা তাঁবু। তাঁবুর সামনে এল ওরা। দলপতি তাঁবুর ভাঁজকরা চামড়া সরিয়ে ভেতরে তাকাল। বলল—মাননীয় রাজা—গুপ্তচরদের এনেছি।

—ভেতরে এসো। রাজার বেশ ভারী গলা। দলপতি ফ্রান্সিসদের তাঁবুতে ঢোকবার জন্যে ইঙ্গিত করল।

ফ্রান্সিসরা তাঁবুতে ঢুকল। বড় তাঁবু তাই মেঝেও বড়। একপাশে রাজা আত্তারিয়া কাঠের আসনে বসে আছেন। চোখ নাক মুখ সুন্দর। সুগঠিত দেহ। গলায় নানা রঙের ছোট ছোট পাথর। রাজা বসবার ইঙ্গিত করলেন। ফ্রান্সিসরা বসল।

রাজা বললেন—তোমরা বিদেশি। তবে কেন গুপ্তচরবৃত্তিতে জড়িয়ে গেলে।

—মান্যবর রাজা—ফ্রান্সিস বলল—এটা আমরা বুঝতে পারছি না কে বা কারা আমাদের গুপ্তচর বলে ধরে নিল। মাত্র একরাত হল আমরা এই গ্যালিগসে এসেছি। যে দেশকে আমরা জীবনে কোনদিন দেখি নি সেখানে এসে গুপ্তচরবৃত্তি করতে যাব কেন? কী লাভ আমাদের? আমরা গুপ্তধনের খোঁজখবর নিয়ে চলে যাবো। গুপ্তধনের খোঁজ পেলে থাকবো। গুপ্তধন খুঁজে আবিষ্কার করব। এর বাইরে আমরা কোন কাজ করি না। এখানকার লড়াইয়ে আমরা জড়াতে যাবো কেন?

—অর্থ—অর্থ—প্রচুর অর্থ পাবেন সেই লোভে। রাজা বললেন।

—মাননীয় রাজা—আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না কী অপরিসীম মূল্যবান গুপ্তধন আমরা আবিষ্কার করেছি। তার সামান্য অংশ আমরা আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনে নিয়েছি। কাজেই আমাদের অর্থাভাব নেই। আমরা যথেষ্ট ধনী। সামান্য অর্থের বিনিময়ে গুপ্তচরবৃত্তি করবো আমরা এতটা নীচ নই। রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—তোমাদের কথা শুনলাম। তবে লড়াইয়ের আগে তোমাদের মুক্তি দেওয়া হবে না। ঐ তাঁবুতেই তোমাদের থাকতে হবে। শাঙ্কো বলল—

—সমুদ্রতীরে আমাদের জাহাজ রয়েছে। আমরা বন্দী হয়ে থাকলে বন্ধুরা আমাদের খোঁজে আসবে। তখন আপনার যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই হওয়া অসম্ভব নয়। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের যোদ্ধারা তোমাদের মুক্ত করতে আসুক—হোক লড়াই—দেখা যাক কী হয়। রাজা বললেন।

—মাননীয় রাজা—সেক্ষেত্রে আপনার দুটো লড়াই চালাতে হবে। হুয়াল্লার সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ একদিকে, অন্যদিকে আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে। এরকম লড়াই কি আপনি চালিয়ে যেতে পারবেন?

রাজা একটু ভেবে নিয়ে বললেন—দু' জায়গাতেই আমরা লড়াই চালাবো।

—আপনারা হেরে যাবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। দেখা যাক। রাজা বললেন।

—আপনারা তরোয়ালের নামই শোনেনি। এই যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে বন্ধুরা লড়াইয়ে নামবে। আপনার যোদ্ধারা এই যুদ্ধাস্ত্রের সামনে শুধু বর্শা নিয়ে দাঁড়াতেই পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। রাজা মুখে শব্দ করলেন। ফ্রান্সিস বলল—তার চাইতে আমাদের মুক্তি দিন— আমরা আমাদের জাহাজে ফিরে যাই।

—না। তোমাদের বন্দী হয়ে থাকতে হবে। রাজা বললেন—রাজা যোদ্ধাকে ইঙ্গিত করলেন ডান হাত তুলে। যোদ্ধা এগিয়ে বলল—চল সব।

ফ্রান্সিসরা তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল। চলল তাঁবুর কয়েদখানার দিকে। তাঁবুতে ঢুকে ফ্রান্সিসরা বসল। শাঙ্কো বলল—পালাবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বোঝো ফ্রান্সিস এখানে লোহার গরাদ নেই।

—হুঁ। কিন্তু পাহারাদারদের দেখে বুঝেছি এরা ভীষণ সতর্ক। পালানো সহজ হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটাই ভেবে উপায় ঠিক কর। বিস্কো বলল।

—কাজটা হল—এখান থেকে যতদূর সম্ভব জোরে ছুটে জঙ্গলে ঢুকে পড়তে হবে। শাঙ্কো বলল।

—সেক্ষেত্রে প্রহরীরা বর্শা ছুঁড়ে মারবে। অল্প আলোতেও ওদের দৃষ্টি চলে। কাজেই নিখুঁত নিশানায় ওরা বর্শা ছুঁড়তে পারবে। আমরা মারাত্মক আহত হব অথবা মারা যাবো। কাজেই অপেক্ষা কর। দেখা যাক রাজা আত্তারিয়া আর হুয়াল্লার সঙ্গে লড়াইটা কবে লাগে। যোদ্ধারা লড়াই নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। আমরা সহজেই পালাতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

প্রহরী রাতের খাবার নিয়ে এল। গোল রুটি আর কী পাখির মাংস। ক্ষুধার্ত দুজনেই গপ্‌গপ্ করে খেল। খাওয়া শেষ। প্রহরী চলে গেল।

তিনি দিন কাটল। ফ্রান্সিসরা ফিরছে না। মারিয়া আর বন্ধুরা চিন্তায় পড়ল। শুধু জায়গাটা কী সেটা জানতে গেছে। এইজন্যে এতদিন লাগার কথা নয়। মারিয়ার শুকনো মুখ চোখ দেখে হ্যারি খুব দুশ্চিন্তায় পড়ল। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। বৈদ্য ভেন বয়েসে ফ্রান্সিসদের চেয়ে বড়। ভেনই মারিয়া হ্যারিকে সান্ত্বনা দেয়—কিচ্ছু ভেবো না—ফ্রান্সিসকে আটকে রাখার সাধ্য কারো নেই। হ্যারি একটু সান্ত্বনা পায়। মারিয়া কিছু বলে না।

দিন কয়েক কেটে গেল। ফ্রান্সিসদের পালানো হল না। ওরা গভীর রাতে উঠে দেখেছে প্রহরীরা বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে। এরা কি রাতে ঘুমোয় না?

সেদিন শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস—চলো একবার পালাবার চেষ্টা করে দেখি।

—লাভ নেই। উপরন্তু মরে যাব অথবা আহত হবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আবার পালিয়েও যেতে পারি—অক্ষত। শাঙ্কো বলল।

—কতদিন এখানে পড়ে থাকবো? বিস্কো বলল।

—বেশ। চেষ্টা করে দেখা যাক্। ফ্রান্সিস বলল।

সেদিন রাতের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিসরা শুয়ে পড়ল না। বসে রইল।

রাত গভীর হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো একবার আকাশটা দেখো তো। চাঁদের আলো কেমন? তাঁবুর বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখল শাঙ্কো। বলল—জ্যোৎস্না আছে। তবে খুব উজ্জ্বল নয়। কুয়াশাঢাকা।

—ঠিক আছে। তৈরি হও। পেছনের জঙ্গলটার দিকে ছুটতে হবে। একবার জঙ্গলে ঢুকতে পারলে—নিশ্চিন্ত। ফ্রান্সিস বলল।

তিনজন উঠে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎই তিনজনে পেছনের জঙ্গলের দিকে ছুটল। প্রহরীরা কতটা সজাগ বোঝা গেল সেটা। দুজন প্রহরী ফ্রান্সিসদের পেছনে ছুটতে ছুটতে একজন বর্শা ছুঁড়ল ফ্রান্সিসদের লক্ষ্য করে। বর্শাটা ফ্রান্সিসের মাথায় প্রায় লেগেছিল। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে ফেলল। বর্শাটা সামনে মাটিতে গেঁথে গেল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল।

আবার বর্শা ছুটে এসে শাঙ্কোর ডান পা ছুঁয়ে মাটিতে পড়ল। মাটিতে গেঁথে গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—শাঙ্কো থেমে যাও। শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। বিস্কো ছুটে চলেছে। মাটিতে গাঁথা বর্শা তুলে নিয়ে মারতে প্রহরীটি দেরি করল। বর্শা ছোঁড়ার আগেই বিস্কো জঙ্গলের প্রথম গাছটা পেরিয়ে গেল। জঙ্গলে ঢুকে গেল। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—বিস্কো—কেউ যেন না আসে। লড়াই নয়।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো নিজেদের কয়েদ তাঁবুতে ফিরে চলল। প্রহরীরাও সঙ্গে সঙ্গে চলল।

দুজনে ফিরে তাঁবুতে ঢুকল। দুজনেই হাঁপাচ্ছে তখন। তাঁবুর মধ্যে ঢুকে ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বসে রইল। ফ্রান্সিস বলল—মুস্কিল হল প্রহরীরা

এখন আমাদের ওপর নজরদারি বাড়াবে। অন্য উপায় ভাবতে হবে। আর ক'টা দিন থাকি। সুযোগ সুবিধেমত পালাবো।

এক সকালে রাজা আভারিয়া ফ্রান্সিসদের ডেকে পাঠাল। দলপতি ফ্রান্সিসদের তাঁবুতে এল। বলল—তোমরা এসো। রাজা ডাকছেন।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো সবে সকালের খাওয়া খেয়েছে তখন। চলল দুজনে।

দুজনে রাজার তাঁবুর সামনে এল। দলপতি ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা তাঁবুতে ঢুকল। একটা কাপড়ের গদীতে রাজা বসে আছেন। দুজনকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। ফ্রান্সিস শাঙ্কো বসল। রাজা বললেন—

—সেদিন তোমাদের কথা শুনে মনে হল তোমরা কিছু গুপ্তধন উদ্ধার করেছো। রাজা আভারিয়া বললেন।

—হ্যাঁ। তা করেছি। ফ্রান্সিস বলল।

একটু চুপ করে থেকে রাজা বললেন—এই উদিন্না পাহাড়ে একটা সোনার খনিমত আছে। অনেক সোনার পিণ্ড মত আছে। একজন জংলি রাজা কোনভাবে সেই খনির হদিশ জানতো। তার মৃতদেহের কাছ থেকে আমার ঠাকুর্দা একটা গুটোনো চামড়া পেয়েছিল। তাতে নকশা আঁকা। ঠাকুর্দা জংলিটার সৎকার করেছিলেন। তারপর সেই নকশাটা নিয়ে আসেন। রাজা থামলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন। তারপর থেকে ঐ নকশাটা আমাদের পরিবারের কাঠের ছোট বাক্সে ওটা রাখা ছিল। বাবা দু'একবার চেষ্টা করে নকশাটার সাহায্যে এই উদিন্না পাহাড়ে সোনার খনি আবিষ্কারের জন্যে। কিন্তু পারেন নি। রাজা থামলেন।

তারপর বললেন—আমি নিজেও চেষ্টা করেছি। নকশাটা দেখে দেখে আন্দাজে সোনার খনি খুঁজেছিলাম। কিন্তু কয়েক বছর পরে হতাশ হয়ে খনি খোঁজা ছেড়ে দিয়েছিলাম। রাজা থামলেন।

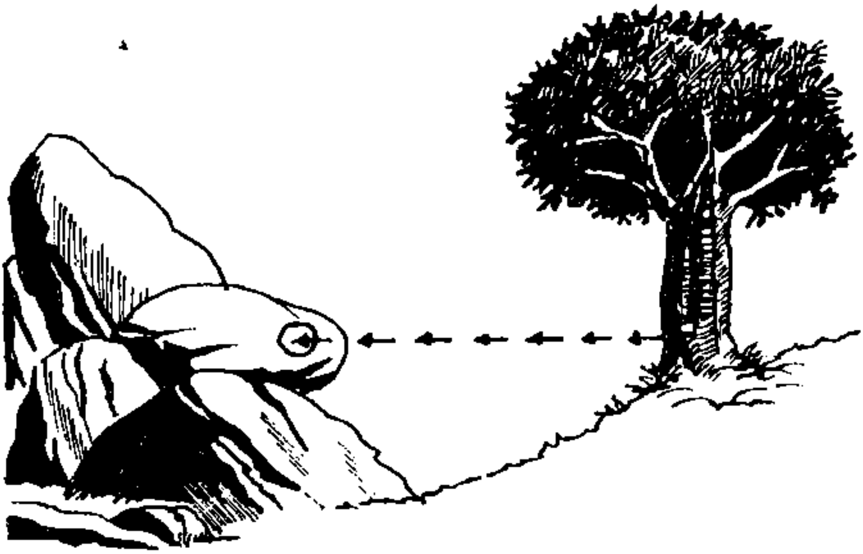
—তাহলে ঐ নকশাটা এখনও আপনার কাছেই আছে। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। রাজা মাথা ওঠানামা করলেন।

—নকশাটা একটু দেখবো? ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের নকশাটা দেখাবো বলেই ডেকে পাঠিয়েছি। এই কথা বলে রাজা কোণার দিকে হাত বাড়ালেন। একটা ছোট কালো কাঠের বাক্স বের করলেন। বাক্সটা এনে একটু চাপ দিয়ে বাক্সটা খুললেন। সকালের আলোয় সবই দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা পাথর বসানো আংটি সবুজ পাথরের হার একটা সোনার ছোট ছোরা বেশ কয়েকটা রঙিন পাথর। সব অলংকারের নিচে থেকে এক টুকরো সাদা চামড়া বের করলেন। ফ্রান্সিসকে দিলেন। ফ্রান্সিস নকশাটার

ওপর ঝুঁকে পড়ল। গায় সবুজ রঙে চামড়ায় আনাড়ি হাতে কিছু আঁকা। নকশাটা এরকম—



ফ্রান্সিস খুব মন দিয়ে নকশাটা দেখল। বুঝল এই নকশার সঙ্গে এই উদিন্না পাহাড়ের যোগ আছে।

—আপনার পিতা কি এই উদিন্না পাহাড়েই সোনার খনি আছে—এটা ভেবেছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কারণ বাবা বলেছিলেন, পিতামহ বলেছিলেন এই উদিন্নার পাহাড়ের নিচেই জংলির মৃতদেহ দেখেছিলেন। তার কোমরের ফেট্টি থেকেই নকশাটা পেয়েছিলেন। রাজা বললেন।

—তাহলে এই উদিন্না পাহাড়েই রয়েছে সোনার খনি। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের তাই বিশ্বাস। রাজা আত্তারিয়া বললেন।

—আর খোঁজাখুঁজি করলেন না কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

রাজা একটু থেমে বললেন—উত্তরের রাজা হুয়াল্লা আমাদের যোদ্ধাদের পাহাড়ের ওপরে উঠতে দেয় না। বদলে আমার যোদ্ধারাও ওদের দেখলে তাড়িয়ে দেয়।

—রাজা হুয়াল্লা কি সোনার খনির কথা জানে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ জানে। তাই পাহাড়ের অধিকার নিয়ে কিন্তু আমার পিতার সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলছে। রাজা আত্তারিয়া বললেন।

—আপনার পক্ষেই সোনার খনি খুঁজে বের করা সম্ভব। কারণ আপনার কাছে একটা নকশা রয়েছে। রাজা হুয়াল্লার হাতে কিছুই নেই। তাকে খুঁজতে হলে আন্দাজে খুঁজতে হবে। এই উদিন্না পাহাড় তন্ন তন্ন করে খোঁজা প্রায়

অসম্ভব। কাজেই উদ্ভাবত্র রাজা ওয়াল্লার পক্ষে সোনার খনি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। একটু থেমে রাজা বললেন----তাহলে তুমি নকশাটা নিয়ে যাও। ভালো করে দেখে আমাকে ফেরৎ দিও। নকশাটা যেন নষ্ট না হয়। সাবধানে রাখবে। দেখবে। বুঝবে। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস বিস্কো উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস নকাটাটা নিল। বলল—বেশ ভাল করে নকশাটা দেখতে হবে। ততদিন—

—তোমার কাছেই থাক। এই নকশা থেকে চেষ্টা কর যাতে সোনার খনিটা আবিষ্কার করা যায়।

ফ্রান্সিস শাঙ্কো নিজেদের তাঁবুতে ফিরে এল। নকশাটা নিয়ে ফ্রান্সিস বিছানায় আধশোয়া হল।

দুপুরের খাওয়ার পরও ফ্রান্সিস নকশাটা নানাভাবে দেখতে লাগল। শাঙ্কোও নকশাটা নিয়ে দেখল।

সন্ধেবেলা নকশাটা রেখে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—নকশাটা দেখে তোমার কী মনে হল।

—এই আঁকাবাঁকাটা কী বুঝতে পারছি না। শাঙ্কো বলল।

—ওটা একটা পাতাঝরা গাছ। নকশাটা যখন আঁকা হয় তখন গাছটা চারাগাছ ছিল। এখন নিশ্চয়ই বড় হয়েছে। গাছটা খুঁজে বের করতে হবে। তারপর বল। ফ্রান্সিস বলল।

—বাঁদিকে কীসব যেন উপুর করা রয়েছে। শাঙ্কো বলল।

—ওসব পাথর। তারমানেই ওটা পাহাড়ের নিচের ভাগ। ওটা যদি বাড়াতে থাকো পাহাড় পাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কত বড় পাহাড়? শাঙ্কো বলল।

—এটা উদিল্লা পাহাড়। সোনার খনি আছে এই পাহাড়ে। কিন্তু কোথায় সেটা জেনেছিল এক জংলি মানুষ। কিন্তু সেও মারা যায়।

রাজা আত্তারিয়ার পিতামহ ঐ মৃত জংলির কাছ থেকে কিছুই জানতে পারে নি। জংলিটা কোথা থেকে কী করে নকশাটা পেয়েছিল এটা এক রহস্য। ফ্রান্সিস বলল।

—একটা ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না। শাঙ্কো বলল।

—কোন্ ব্যাপার? ফ্রান্সিস বলল।

—লক্ষ্য করে দেখ—একটা পাথরের ওপরে একটা গোল চিহ্ন। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ। দেখছি। ফ্রান্সিস বলল।

—ওটা কী? শাঙ্কো বলল।

—একটা নিশানা। পাথরগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কোন্ পাথরে ঐ চিহ্ন দেখা যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার কি তাই মনে হয়। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। রহস্য সমাধানে ঐ গোল দাগটার অর্থ বুঝতে হবে। দেখতে হবে কোন পাথরের গায়ে ঐ চিহ্নটা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—এই চিহ্ন কি পাওয়া যাবে? শাঙ্কো বলল।

—নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। না পেলে খুঁজতে হবে। এই গোল চিহ্নটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখা যাক। শাঙ্কো বলল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস বলল—চল—রাজার সঙ্গে কথা বলে আসি।

—কী কথা? শাঙ্কো বলল।

—মুক্তি চাই—তা নাইলে কিছুই করা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। রাজার কাছে চলল। দলপতি আসছিল। বলল—কোথায় যাচ্ছো?

—রাজার সঙ্গে কথা বলতে। শাঙ্কো বলল।

—তোমরা বন্দী। দলপতি বলল।

—পাহারাদার কিছু বলল না। শাঙ্কো বলল।

—উঁহু। আমাকে না বলে কোথাও যাবে না। চল। দলপতি বলল।

রাজা আত্তারিয়া গদীতে আধশোয়া। গদীটা বোধহয় ভালো শুকনো ঘাসে করা। দুজনকে দেখে রাজা উঠে বসলেন।

—কী ব্যাপার? রাজা বললেন।

—সোনার খনি খুঁজে বের করার দায়িত্ব যদি আমাদের দেন তাহলে আমাদের বন্দী করে রাখা চলবে না। কারণ সেক্ষেত্রে ইচ্ছেমত যে কোন সময় যে কোন জায়গায় যাওয়া যাবে না। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আত্তারিয়া একটু ভাবলেন। তারপর বললেন—এর আগেও এক শ্বেতাঙ্গকে খোঁজ করতে বলেছিলাম। তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। দিন কুড়ি পরে উধাও। ভাগ্যিস নকশাটা আমার কাছেই ছিল। নইলে ওটাও উধাও হয়ে যেত। একটু থেমে রাজা বললেন—এখন প্রশ্ন তোমাদের একেবারে ছেড়ে দিলে ঐ ব্যাপারই ঘটতে পারে কিনা।

—আমরা বিশেষ করে এই উদিন্না পাহাড়েরই ধারে কাছে থাকবো। দূরে কোথাও গিয়ে বোধহয় লাভ হবে না। সোনার খনি এই পাহাড়েই আছে। ফ্রান্সিস বলল।

— যাক গে। তোমাদের ছেড়েই দেওয়া হল। তবে দুজন প্রহরী তোমাদের ওপর নজর রাখবে। পালাতে গেলেই তোমাদের হত্যা করা হবে। বুঝেছো? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ। আমরা পালাবো না। সমস্ত সময়টাই কাটাবো সোনার খনির অনুসন্ধানে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। রাজা বললেন।

শাঙ্কো বলল—আমার আমাদের তাঁবুতে খুবই অসুবিধের মধ্যে আছি। শুনলাম আরো দুজনকে ধরা হয়েছে। আমাদের তাঁবুতেই তাদের রাখা হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের খুবই অসুবিধে হবে। শুধু আমাদের জন্যে একটা তাঁবুর ব্যবস্থা করুন। শাঙ্কো বলল।

—বেশ। করা হবে। অনেক সুবিধে তোমাদের দেওয়া হচ্ছে। কাজের কাজটা করা চাই। রাজা বললেন।

—ভাববেন না। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা বুঝতে পারবো গুপ্ত খনি আবিষ্কার করতে পারবো কি না। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। রাজা মাথা নেড়ে বললেন।

রাজা দলপতিকে ডাকল। দলপতি এল। রাজা বললেন—এই দুজনকে থাকবার জন্যে ভালো জায়গা দাও। ভালো খাবার-টাবার দাও।

—ঠিক আছে। সেনাপতি মাথা নিচু করে বলল।

ফ্রান্সিসরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। দলপতি এসে বলল—আমার সঙ্গে চলো। তোমাদের জন্যে একটা ভালো জায়গা দেখছি। হাঁটতে হাঁটতে এক কোণায় চলে এল দলপতি। একটা তাঁবুর কাছে এল।

দলপতি বলল—এখানে আমরা কয়েকজন থাকতাম। এখন একা আমার এক বন্ধু থাকে। তাকে চলে যেতে বলব। তোমরাই শুধু থাকবে।

ফ্রান্সিসরা তাঁবুটায় ঢুকল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মেঝেয় পাতা বিছানাটাও বেশ মোটা। শুকনো ঘাসের। বোঝাই যাচ্ছে।

—এবার ভালো জায়গা পেলে তো। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো বিছানায় বসল। বেশ নরম। ফ্রান্সিস আধশোয়া হল। মাথায় চিন্তা কী করে সোনার খনিটা খুঁজে বের করবে। অবশ্য কাজে নামলে তখনই বোঝা যাবে আমরা সফল হব কিনা।

তাঁবুর ফাঁক দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে দলপতি হেসে বলল—

—তোমরা সোনার খনি খুঁজে বের করতে পারবে না। আগেও কেউ পারে নি।

—সব জেনেটেনে বুঝবো—পারবো কি পারবো না। শাঙ্কো বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। স্বাধীনভাবে থাকার হুকুম তো পেয়েই গেছ।

—হুঁ। শাঙ্কো মুখে শব্দ করল। দলপতি চলে গেল।

ফ্রান্সিস বলল—খাওয়ার সময় হয়েছে। চলো আজ দুপুর থেকেই কাজে নামি। জাহাজে মারিয়া আর বন্ধুদের খুব একটা দুশ্চিন্তা হবে না এখানে কয়েকদিন থাকলেও। বিস্কো তো গেছে। ওর কাছেই সব শুনবে। নিশ্চিন্ত হবে।

—কিন্তু আমরা গুপ্তসোনার খনি খুঁজছি এটা কিন্তু বিস্কো জেনে যেতে পারে নি। আমরা কেন ফিরতে দেরি করছি এটা ওরা জানতে পারে নি। ওদের চিন্তা হবেই। শাঙ্কো বলল।

দুপুরে খেতে দেওয়া হল। রুটি আনাজের তরকারির মত আর মাংস। বোঝা যাচ্ছে পাখির মাংস। কিন্তু কোন্ পাখির মাংস সেটা আর জানা হল না। দুজনেই পেটপুরে খেল।

একটু বিশ্রাম করে দুজনে তাঁবু থেকে বেরোল। হাঁটতে শুরু করল উদিন্না পাহাড়ের দিকে। খুব একটা কাছে নয়। পাহাড়টা দেখে যতটা কাছে মনে হচ্ছিল হেঁটে যেতে গিয়ে বুঝল মোটেই তত কাছে নয়।

উদিন্না পাহাড়ের পাদদেশেই যা সবুজের সমারোহ। পাহাড়ের মাঝামাঝি থেকেই রুক্ষ ধুলোটে রঙের পাথর। ফ্রান্সিস বলল—নক্‌শার চারাগাছটিকে আগে খুঁজে পেতে হবে।

—চারাগাছটা আর চারাগাছ নেই। এখন মহীরুহ—বিরাট গাছ। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। সেটা হিসেবে রাখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে পাহাড়ের ঠিক পাদদেশ দিয়ে চলল। লক্ষ্য একটা বড় গাছ। দুজনে পাহাড়ের গা ঘেঁষে মাথা তুলে দাঁড়ানো বড় গাছ খুঁজতে খুঁজতে চলল।

এরকম দুটো গাছ ওরা পেল। ফ্রান্সিস গাছের কাণ্ড বেয়ে উঠে একটা ডাল ভেঙে রাখল। আর একটা গাছেরই ডাল ভাঙল।

তখন শেষ বিকেল। দুজনেই বেশ ক্লান্ত। বেশ জলতেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু এখানে কোথায় জল?

হঠাৎ পেছনের ঝোপজঙ্গলে খস্‌খস্ শব্দ উঠল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। মৃদুস্বরে বলল—শাঙ্কো—আমরা বিপদে পড়লাম। ফ্রান্সিসের কথা শেষ হয়েছে মাত্র পেছনে বেশ জোরে সর্‌সর্ শব্দ উঠল। মুহূর্তে চারপাঁচজন যোদ্ধা বর্শা হাতে ছুটে এল। ফ্রান্সিস দুহাত তুলে বলল—আমরা বিদেশি ভাইকিং। তোমাদের ঝগড়া লড়াইয়ের মধ্যে আমরা নেই।

যোদ্ধারা আস্তে আস্তে বর্শা নামাল। এই যোদ্ধাদের পোশাক অন্যরকম। ওরা ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। বর্শা নামানো।

ফ্রান্সিস বলল—ভাই তোমরা কোন্ রাজার যোদ্ধা?

—উত্তরের হুয়াল্পা রাজার যোদ্ধা আমরা। আমরা উদিন্না পাহাড়ের নিচে পাহারা দিই।

—কেন পাহারা দাও? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—এই উদিন্না পাহাড়ের কোথাও রয়েছে সোনার খনি। দলপতি যোদ্ধা বলল।

—এটা কি সত্যি? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ সত্যি। আমরা দক্ষিণ দিকটা পাহারা দিই না। ওটা দক্ষিণের রাজা আত্তারিয়ার যোদ্ধারা পাহারা দেয়। তোমরা উত্তরে এসেছো কেন? একজন বলল।

—এমনি। আমরা অনেক দেশে গেছি। কত ভালো ভালো মানুষ দেখেছি। আবার নৃশংস মানুষও দেখেছি। তবু সব মিলিয়ে পৃথিবীটা কী সুন্দর। এইজন্যেই মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখবো বলে এখানে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা আর কিছু কর না? দলপতি যোদ্ধা বলল।

—হ্যাঁ গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খোঁজ পেলে বুদ্ধি খাটিয়ে তা উদ্ধার করি। ফ্রান্সিস বলল।

—তারপর ধনসম্পদ নিয়ে পালিয়ে যাও। যোদ্ধাটি বলল।

—এ কথাটা অনেকের মুখে শুনেছি। তারা আমাদের বিশ্বাস করে নি। এই নিয়ে কিছু বলবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ বোঝা গেল। দলপতি বলল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল—এদের হাতে দড়ি বাঁধো।

—তাহলে আমরা বন্দী হলাম। কোন অপরাধ না করে। শাঙ্কো বলল।

—রাজা হুয়াল্পা তোমাদের বিচার করবেন। রাজা যা বিচার করবেন তাই তোমাদের মেনে নিতে হবে। দলপতি বলল।

—কখন বিচার হবে? শাঙ্কো বলল।

—কাল সকালে রাজসভায়। দলপতি বলল। তারপর যোদ্ধাদের হুকুম দিল—এই বিদেশি দুজনকে নিয়ে চল। হাত বাঁধা অবস্থায় ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোকে ওরা নিয়ে চলল।

উত্তর দিকে বেশ কিছুটা হেঁটে রাজা হুয়াল্পার দেশে এল। নগরটি একটু বড়ই মনে হল ফ্রান্সিসের কাছে। লোকজনের ভিড় আছে। সন্ধ্যে হয়েছে। দোকানে বাড়িতে কাঁচঢাকা আলো যতটুকু আলো ছড়াচ্ছে।

নগরের মধ্যে দিয়ে হাঁটিয়ে দুজনকে কয়েদখানার কাছে নিয়ে আসা হল। দলপতির নির্দেশে প্রহরীরা লোহার দরজা খুলল। ফ্রান্সিসদের ভেতরে ঢোকানো হল। একটু জোর খাটাল দুজন যোদ্ধা। ফ্রান্সিস একবার ওদের মুখের দিকে তাকাল। শাঙ্কো বুঝল ফ্রান্সিস ক্রুদ্ধ হয়েছে। ও বলে উঠল—ফ্রান্সিস ভাই

সংযত হও। ফ্রান্সিস ঘরের এক কোণায় চলে এল। ছড়ানো শুকনো ঘাসপাতার ওপর শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো পাশে বসল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—শাঙ্কো জীবনের কত দিন কয়েদঘরে কেটে গেল—হিসেব করিনি।

—তুমি তো এরকম জীবনই চাও। শাঙ্কো বলল।

—অবশ্যই চাই। এজন্যে আমার কোন দুঃখ নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস তুমি আমাদের মত নও। অন্যরকম। শাঙ্কো বলল।

—হবে। এসব ভাবিনি কোনদিন। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার খুব খিদে পেয়েছে। শাঙ্কো বলল।

—আমারও। পাহারাদারদের বলে দেখতো? ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি। শাঙ্কো উঠে লোহার দরজার কাছে গেল। বর্শা হাতে এক পাহারাদারকে হাতের ইঙ্গিতে ডাকল। প্রথম পাহারাদারটা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। অন্য একজনকে ডাকল। সে এগিয়ে এল। বলল—

—কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

—আমরা দু'জন এইমাত্র এলাম। খুব খিদে পেয়েছে আমাদের। শাঙ্কো বলল।

—সেই রাতে খাবে। এখন নয়। পাহারাদার বলল।

—এটা রাজার হুকুম বোধহয়। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। পাহারাদারটি বলল।

—উনি রাজা মানুষ। খিদে ব্যাপারটা কী উনি জানবেন কী করে। যাকগে—তুমি কিছু রুটি চিনি আনো। শাঙ্কো বলল।

—আমি পারবো না। নিয়ম ভাঙলে আমি বিপদে পড়ে যাবো। প্রহরীটি বলল।

—লুকিয়ে চুরিয়ে খাবার দিতে পারো। অবশ্য তোমার যদি ইচ্ছে হয়। শাঙ্কো বলল।

পাহারাদার বর্শা হাতে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছিল। এবার থামল। তারপর শাঙ্কোর মুখের দিকে তাকাল। কী ভাবল। দরজার কাছেই দুটো মশাল জ্বলছিল। পাহারাদারটি আলো থেকে আস্তে সরে গেল। অন্ধকার বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল। হাতে পাতায় জড়ানো রুটি আর চিনি। সঙ্গের পাহারাদার দরজা থেকে সরে যেতেই ও দ্রুত দরজার কাছে এল। তখনও শাঙ্কো দাঁড়িয়ে ছিল। ও শাঙ্কোকে খাবার দিয়েই সরে এল।

শাঙ্কোও পাতায় মোড়ানো রুটি চিনি নিয়ে নিল। পেছন ফিরে ফ্রান্সিসের কাছে এল। এখানে ঘরের কোণায় মশালের আলো তেমন জোরালো নয়। শাঙ্কো আর ফ্রান্সিস রুটি ভাগ করে চিনি দিয়ে খেতে লাগল। একটু আড়াল দিয়ে।

খাওয়া শেষ হল। আর এক কোণায় বড় জালায় রাখা জল তুলে তুলে খেল। খিদেটা একটু কমল।

শাঙ্কো উঠে দরজার কাছে এল। সেই প্রহরীর হাত ধরল। দুজনেই হাসল। শাঙ্কো ফিরে এল। ফ্রান্সিসের পাশে বসল।

রাতের খাওয়া সেরে ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো তখনও বসে আছে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো ভেবে দেখলাম আগেই পালাবার কথা ভাববো না। চলো দেখি কালকে রাজা হুয়াল্লা কী বলে। নকশাটা দেখালে হুয়াল্লা একেবারে লাফিয়ে উঠবে। সোনার খনি বলে কথা।

—তাহলে রাজা হুয়াল্লা কি আমাদের ছেড়ে দেবে? শাঙ্কো বলল।

—উল্টোটা—আমাদের অন্য ভালো ঘরে থাকতে দেবে। প্রত্যেক দিনই খবর নেবে আমরা কতদূর এগোলাম।

—নক্‌শাটা তো নিয়ে নিতে পারে। শাঙ্কো বলল।

—নক্‌শাটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে অর্থাৎ চোখ বুঁজলেই নকশাটা দেখতে পাই। ফ্রান্সিস বলল।

—তবে তো আমাদের এখানেই থাকতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—যে কদিন থাকবো রাজার হালে থাকবো। সোনার খনির লোভ—কেউ মাথা ঠিক রাখতে পারে না। রাজা হুয়াল্লাও পারবে না।

—কালকে তো আমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাবে। দেখা যাক কী করে রাজা। শাঙ্কো বলল।

পরদিন বেশ ভোরেই ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙল। দেখল শাঙ্কো চুপ করে বসে আছে। ফ্রান্সিস হেসে বলল—কী হল? এত তাড়াতাড়ি উঠলে?

—ঘুম আসছিল না। নানা কথা ভাবছিলাম। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস উঠে বসল। বলল—চিন্তা তো হবেই। আমরা এখানে বন্দী হয়ে পড়ে আছি, মারিয়া বন্ধুরা জাহাজে। আমাদের ফেরার প্রতীক্ষা করছে। শাঙ্কো ভেবো না সব ঠিক হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

সকালে খাওয়াদাওয়ার পরেই দলপতি লোহার দরজার কাছে এল। পাহারাদার দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকে দলপতি ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—রাজসভায় চল। তোমাদের বিচার হবে।

ফ্রান্সিস ও শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। দলপতির পেছনে পেছনে বাইরে এল। সবাই চলল একটা বড় বাড়ির দিকে।

—ঐ বড় বাড়িটা বোধহয় রাজবাড়ি। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। দলপতি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

রাজার সভাঘরে ঢুকল সবাই। একটা কাঠের সিংহাসনে রাজা হুয়াল্লা বসে আছেন। পাশে মন্ত্রী অমাত্যরা বসে আছেন। একটু পাশে সেনাপতি বসেছেন।

বিচার চলছিল। রাজা হুয়াল্পা এক পক্ষকে শাস্তি দিলেন। বিচারপ্রার্থীরা চলে গেল।

দলপতি সেনাপতিকে গিয়ে কিছু বলল। তখনও রাজা কাউকে ডাকেননি। সেনাপতি রাজার কাছে এসে কী বলল। রাজা গলা চড়িয়ে বলল—বিদেশিরা এসো। দলপতি ফ্রান্সিসদের এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা এগিয়ে এল। রাজা ফ্রান্সিসদের দেখে বললেন—তোমরা কোন্ দেশ থেকে এসেছো?

—আমরা ভাইকিংদের দেশ থেকে আসছি। শাঙ্কো বলল।

—এখানে কেন এসেছো? রাজা হুয়াল্পা বললেন।

—দেশ দেখতে, মানুষ দেখতে, প্রকৃতি দেখতে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাতে কী লাভ? রাজা একটু হেসে বললেন।

—লাভক্ষতির কথা আমরা ভাবি না। এইসঙ্গে অবশ্য অন্য একটা কাজও আমরা করি। কোন দেশে গুপ্তধনভাণ্ডারের খোঁজ পেলে আমরা সেই গুপ্তধনভাণ্ডার বুদ্ধি খাটিয়ে খুঁজে বের করি। ফ্রান্সিস বলল।

—তারপর সেই ধনভাণ্ডার নিয়ে নিজেদের দেশে পালিয়ে যাও। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

—তা এখানে কি কোন গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছো? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ। এই উদিন্না পাহাড়েই আছে সোনার খনি। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা কী করে জানলে? রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

—রাজা আত্তারিয়ার কাছ থেকে। ফ্রান্সিস বলল।

—সেই সোনার খনি কী ভাবে উদ্ধার করা যায় তা জেনেছো? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ জেনেছি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা হুয়াল্পা সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—সত্যি?

—হ্যাঁ সত্যি। ফ্রান্সিস ঘাড় কাত করে বলল।

—সেই সোনার খনি আবিষ্কারের জন্যে কোন উপায় পেয়েছো? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ পেয়েছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কী পেয়েছো? রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে নকশাটা বের করে মেলে ধরল।

রাজা হুয়াল্পা প্রায় ছুটে এসে নকশাটা প্রায় কেড়ে নিলেন।

রাজা হুয়াল্পা হা হা করে হেসে উঠলেন। গলা চড়িয়ে বললেন—এই নকশা তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।

—বেশ। কিন্তু শুধু নকশা পেলে কী হবে। নকশার অর্থ তো বের করতে হবে। নকশার রহস্যটা তো ভেদ করতে হবে। রাজা হুয়াল্পা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—তোমরা কি নকশাটার অর্থ বের করতে পেরেছো? রাজা সিংহাসনে বসলেন।

—এখনও সবই অনুমান। প্রকৃত রহস্যটা এখনও ভেদ করতে পারিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—তা নকশাটা আমার কাছে থাক। আমার মন্ত্রী, অমাত্যরা রয়েছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই নকশার অর্থটা ভেদ করতে পারবেন। রাজা বললেন।

—এইসঙ্গে আমি বলি আমাদের দুজনকেও অনুমতি দিন নকশার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তোমরাও চেষ্টা কর। মোট কথা সোনার খনি আমার চাই-ই চাই। রাজা গলা চড়িয়ে বললেন।

—তাহলে আমাদের এই অনুমতি দিন—আমরা যখন যেখানে খুশি যেতে পারবো। নকশার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গেলে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তো। আমি সেনাপতিকে বলে দেব। রাজা বললেন।

রাজা হুয়াল্পা সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আজ আর আমি বিচারের করব না। সবাই চলে যাও।

বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। রাজার হুকুম। মানতেই হবে। সবাই আস্তে আস্তে সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সভার পরিবেশ শান্ত হল। রাজা তখন মন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে নকশা দেখতে লাগলেন। মন্ত্রী নিবিষ্ট মনে নকশাটা দেখতে লাগলেন। রাজার নির্দেশে দুজন অমাত্যও মন্ত্রীর কাছে এলেন নকশা দেখতে লাগলেন। ফ্রান্সিস রাজাকে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলল—নকশাটা তো দিয়ে দিয়েছি। তাহলে আমরা এখন যাবো?

—বেশ। যাও। রাজা বললেন।

—কিন্তু কোথায় যাবো? কয়েদখানায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না-না। তোমরা সৈন্যাবাসে থাকবে। ওখানে তোমাদের নজরে রাখা যাবে। রাজা এবার সেনাপতির দিকে তাকালেন। বললেন—সেনাপতি এই দু'জন বন্দীর থাকার জন্যে সৈন্যাবাসের একটা ভালো ঘর দিন। লক্ষ্য রাখবেন যেন পালাতে না পারে।

সেনাপতি মাথা নিচু করে মাথা তুলল। ফ্রান্সিসদের ইঙ্গিত করল পেছনে পেছনে আসার জন্যে।

ফ্রান্সিসরা সেনাপতির পেছনে পেছনে চলল। সৈন্যাবাসে বেশ ভাল ঘর দেওয়া হল ওদের। সেনাপতি বলল—এই ঘরে থাকতে তোমাদের অসুবিধে হবে না। প্রয়োজনে আমার কাছে এসো। সেনাপতি চলে গেল।

লম্বা লম্বা শুকনো ঘাস আর কোন গাছের ছোবড়া দিয়ে তৈরি বেশ পরিপাটি বিছানা।

ফ্রান্সিস ঘরটায় ঢুকেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো হেসে বলল—ফ্রান্সিস—তোমার এই এক রকম। বিছানা পেলেই শুয়ে পড়।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গভীর চিন্তা করা চলে না। এইজন্যে চাই বিছানা আর সময়। এখানে দুটোই পাবো বলে ভরসা করছি। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরের খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস বলল—বেশ বেলা হয়ে গেছে। আজকে আর উদিন্না পাহাড় দেখতে যাবো না। আজ শুধু বিশ্রাম আর চিন্তা। কালকে থেকে কাজ শুরু করবো।

—মনে হয় উদিন্না পাহাড়টাকে বোধহয় দুই রাজা ভাগ করে রেখেছে। উত্তরের রাজা হুয়াল্লার অধীন। দক্ষিণদিকটা রাজা আত্তারিয়ার এলাকা। দুই রাজাই এই ভাগ মেনে নিয়েছে বোধহয়। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ। তাহলে দুই রাজার কাছ থেকেই অনুমতি নিতে হবে। দুই রাজাই যদি অনুমতি দেয় তাহলে অনেক সমস্যার হাত থেকে বাঁচা যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ কথা বলে। শাঙ্কো বলল।

পরের দিন দুপুরে ফ্রান্সিসরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। তারপর চলল। প্রথমে উত্তর দিক থেকে যাবে ফ্রান্সিস এটা ভেবে রেখেছিল।

হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে উদিন্না পাহাড়ের উত্তরে পৌঁছল।

ফ্রান্সিস বলল—প্রথমে দক্ষিণ দিক থেকে দেখেছি একটা বড় ওক গাছ। ঐ গাছটার একটা ডাল ভেঙে রেখেছি যাতে পরে বুঝতে পারি।

উত্তরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলল। খুঁজতে লাগল একটা গাছ। পেল একটা বড় চেস্টনাট গাছ। ফ্রান্সিস গাছটায় উঠে একটা ডাল ভেঙে রাখল।

গাছ থেকে নেমেই দেখল মন্ত্রী আর সেনাপতি কয়েকজন যোদ্ধার সঙ্গে আসছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। মন্ত্রী ওদের কাছে এল। জিজ্ঞেস করল— তোমরাও খোঁজাখুঁজি করছো।

—নকশাটাতে যে ইঙ্গিত পেয়েছি সেটাই সম্বল করে সোনার খনি উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কিছু তথ্য-টথ্য পেলে? মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

—তেমন কিছু না। ফ্রান্সিস বলল।

—আচ্ছা—একটা কথা জানার আছে। মন্ত্রী নকশাটা মেলে ধরে বললেন—

—এই আঁকাবাঁকা জিনিসটা কী?

—আপনার কী মনে হয়? ফ্রান্সিস বলল।

—এটাও একটা নক্‌শা। কিন্তু এই দুর্বোধ্য নকশা ঠিক কী বলছে বুঝতে পারছি না। মন্ত্রী বললেন।

—এটা বড় নকশার একটা অংশ। ফ্রান্সিস বলল।

—পাহাড়টা বুঝেছি। কিন্তু এই নকশাটা বুঝতে পারছি না। মন্ত্রী বললেন।

ফ্রান্সিস সাবধান হল। ভাবল—ওটা যে একটা চারাগাছ একথা বললে মন্ত্রীর সন্দেহ হবে। ধরে নেবে আমরা অনেকটা অর্থোদ্ধার করতে পেরেছি। আমরা বিপদে পড়বো।

ফ্রান্সিস বলল—ঐ ছোট নকশাটা আমরাও বুঝিনি তবে বুঝতে চেষ্টা করছি— ওটা নিয়ে ভাবছি।

—ঠিক আছে—মন্ত্রী বললেন—তোমরা তোমাদের মত খোঁজ আমরা আমাদের মত খুঁজি। হয়তো আমরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হব। মন্ত্রী বললেন।

—তাহলে তো সব চুকেই গেল। ফ্রান্সিস বলল।

—চলি। মন্ত্রীমশাই কথাটা বলে হাঁটতে শুরু করলেন।

ফ্রান্সিস শাঙ্কো আবার পাহাড়ের গা ঘেঁষে গাছ খুঁজতে লাগল।

আর একটা শিশুগাছ পেল। শাঙ্কো গাছটার একটা ডাল ভেঙে চলে এল। ফ্রান্সিস বলল—

—এই গাছটা পাহাড়ের দক্ষিণাংশে। তার মানে রাজা আত্তাদিয়ার রাজত্বের মধ্যে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা আসছে তখনই আত্তারিয়ার সেনাপতিকে আসতে দেখল। ও বুঝল ওরা দক্ষিণাংশে চলে এসেছে।

সেনাপতি কাছে এল। ফ্রান্সিসকে দেখে বলল—তোমরা রাজা হুয়াল্লার রাজত্ব থেকে চলে গেছ। তোমরা আমাদের রাজা আত্তারিয়ার হয়ে সোনার খনি খুঁজলে না।

—আমরা রাজা আত্তারিয়া আর রাজা হুয়াল্লা দুজনের জন্যেই সোনার খনি খুঁজব। ফ্রান্সিস বলল।

—দুই রাজাকেই সন্তুষ্ট করতে পারবে? সেনাপতি বলল।

—দেখি। সোনার খনি আবিষ্কারের আশায় আছি। আবিষ্কার করতে পারলে তখন দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা ফিরে এল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস গুপ্ত সোনার খনির কিছু হদিশ করতে পারলে?

—গাছ আর পাহাড় এই দুটো ঠিক ঠিক বুঝতে পারলে সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—খুঁজবো—সোনার খনি। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার কিন্তু কখনও কখনও মনে হচ্ছে এই নকশা একটা কাঁচা হাতে আঁকা ছবি। অর্থহীন। শাঙ্কো বলল।

—আমি এটা মানতে রাজি নই। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস নকশাটা বের করল এটা আসল নকশা নয়। ফ্রান্সিস নকল করে রেখেছে এটা। মশালের আলোয় নকশাটা বোঝাতে লাগল। বলল—দুটো জিনিস লক্ষ্য কর। একটা চারা গাছ—নিষপত্র মানে পাতা ঝরা গাছ। দ্বিতীয়টা হল—একটা পাথরের পাটায় গোল চিহ্ন। বোঝাই যাচ্ছে পাথর কুঁদে কুঁদে এই গোল দাগটা করা হয়েছে।

—গোল দাগটা অর্থহীন। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে তো পুরো নকশাটাই অর্থহীন হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—যাই বল—এটা একটা ভূতুড়ে নকশা। শাঙ্কো বলল।

—আমার তা মনে হয় না। কিছুটা এগোই তখন বুঝতে পারবো। এটা ভূতুড়ে নকশা না অর্থ আছে এমন নকশা। ফ্রান্সিস বলল।

—হবে হয়তো। শাঙ্কো বলল।

—এখন ঘুমোও। কালকে খোঁজাখুঁজি আছে। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বিছানায় দুচারবার এপাশ-ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিসরা সবেমাত্র সকালের খাবার খেয়েছে সেনাপতি ঢুকল। বলল—মাননীয় রাজা হয়াল্লা তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন চল।

—হঠাৎ রাজা ডেকে পাঠালেন—কী ব্যাপার বলুন তো। শাঙ্কো বলল।

—রাজা হয়াল্লা কেন তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন—আমি জানি না। তবে এখন থেকে তোমরা কয়েদঘরে থাকবে এই খবরটা আমাকে জানানো হয়েছে। আমি এইটুকুই জানি—দেরি না—চল। সেনাপতি বলল।

—কী অপরাধ করলাম—বলতে বলতে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কোও উঠল।

সেনাপতির পেছনে পেছনে ওরা চলল রাজবাড়ির দিকে।

রাজার রাজসভায় এল তিনজনে। তখন বিচার চলছিল। রাজা ফ্রান্সিসদের দেখল। কিছু বলল না। বিচারের রায় দিলেন রাজা। তারপর গলা চড়িয়ে বললেন— আজকে আর বিচার হবে না। সভা এখানেই শেষ।

রাজসভা থেকে লোকেরা চলে যেতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সভায় রইল রাজা মন্ত্রী অমাত্য আর প্রহরীরা। আর রইল সেনাপতি ও ফ্রান্সিসরা।

—তোমাদের কয়েদঘরে পাঠানো হবে। মন্ত্রী বললেন।

—কেন? কী অপরাধ করেছি আমরা? শাঙ্কো বলল।

এবার রাজা হুয়াল্লা বললেন—উত্তর দিকে এক ছোট দেশে আমার এক বন্ধু ওখানকার রাজা। ওখানে গৃহযুদ্ধ চলছে। বন্ধু যোদ্ধা চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছে। ওখানে একশ যোদ্ধা পাঠিয়েছি আট দশদিন আগে। ঠিক এই সময়ই রাজা আত্তারিয়া আমার দেশ আক্রমণ করতে তৈরি হচ্ছে। আত্তারিয়া কী করে জেনেছে যে আমার যোদ্ধা সংখ্যা কমে গেছে। এটা নিশ্চয়ই তোমাদের কাজ। তোমরাই আত্তারিয়াকে খবরটা জানিয়েছো। রাজা আত্তারিয়া এই সুযোগটাই খুঁজছিল। তোমাদের জন্যই রাজা আত্তারিয়া আমার দেশ আক্রমণ করার জন্য তৈরি হয়েছে। বন্ধুকে পাঠানো যোদ্ধারা ফিরে আসার আগেই আত্তারিয়া আক্রমণ করবে।

—আপনি আমাদের ভুল বুঝেছেন। এসব ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের কোনরকম যোগ নেই। একশ যোদ্ধা পাঠিয়েছেন এটা আপনার মুখ থেকেই প্রথম জানলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—মিথ্যে কথা। সব মিথ্যে। তোমরা সব জানো। রাজা বললেন।

—আমাদের বিশ্বাস করুন। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তোমাদের আমি বিশ্বাস করি না। হুয়াল্লা কথাটা বলে সেনাপতির দিকে তাকালেন। বললেন—এই দুই গুপ্তচরকে কয়েদখানায় ঢোকাও। সেনাপতি এগিয়ে এল।

একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—কিন্তু সোনার খনির অনুসন্ধান করা—। ফ্রান্সিসদের কথাটা শেষ হবার আগেই রাজা হুয়াল্লা যেন গর্জন করে উঠলেন সোনার খনি—মিথ্যে—আমাকে ভুল বোঝানো হয়েছে। রাজা মন্ত্রীর দিকে হাত বাড়াল। মন্ত্রী নকশাটা রাজাকে দিল। রাজা নকশাটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললেন।

—তাহলে তো আমাদের আর এই দেশে থাকার কোন অর্থ হয় না। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ কিছুদিন দণ্ডভোগের পর তোমরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে—আমার হুকুম। রাজা হুয়াল্লা বললেন।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকাল। তারপর আস্তে বলল—

—মাননীয় রাজা আপনি আমাদের মিথ্যে সন্দেহ করে আমাদের দুঃখ দিলেন। সোনার খনি মিথ্যে নয়। আমাকে অনুসন্ধান করতে দিলে আমি সোনার খনি উদ্ধার করে দেখাতাম আপনাকে ভুল বোঝাইনি। এই উদিন্না পাহাড়েই আছে সোনার খনি।

—ওসব বলে লাভ নেই। তোমাদের দণ্ডভোগ করতেই হবে। রাজা বললেন।

সেনাপতি ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল—চল।

ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরের দরজার কাছে এল। সেনাপতি ইঙ্গিত করল। প্রহরী দরজা খুলে দিল। লোহার দরজা ঢংঢং শব্দে খুলে গেল। ফ্রান্সিসরা ঢুকল। দুজনে পাথরের দেওয়ালে পিঠ রেখে বসল। কেউ কোন কথা বলল না।

রাতের খাবার একটু তাড়াতাড়িই এল। ফ্রান্সিসরা খেয়ে নিল।

দুজনেই ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস পালাতে হবে।

—সে তো হবেই। কিন্তু কয়েকটা দিন অপেক্ষা করি। রাজা আত্তারিয়া এই দেশ আক্রমণ করবেই। আমরা লড়াইয়ের ডামাডোলের মধ্যে পালিয়ে যাবো।

—পালিয়ে কোথায় যাবে? জাহাজঘাটে? শাঙ্কো বলল।

—না। রাজা আত্তারিয়ার রাজত্বে লুকিয়ে থাকবো। তারপর নকশার অর্থ বের করে সোনার খনির হদিশ বের করব। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো আরো কিছুদিন এখানে থাকতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। তা তো হবে। আমি নিশ্চিত নকশাটা সত্যি। ভূতুড়ে নকশা নয়। ফ্রান্সিস বলল।

—অল্প দিনের মধ্যেই সোনার খনি উদ্ধার করতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো—এখন ঘুমোও। শরীর সুস্থ রাখতে হবে। অসুস্থ হয়ে পড়লে সব মাটি। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস আবার শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বসে ছিল। বলল—ফ্রান্সিস কী করবে এখন?

—সোনার খনি খুঁজবো। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা হুয়াল্লা তো তোমার দেওয়া নকশা ছিঁড়ে ফেলল।

—তাতে কী? আমার মনে নকশা অমলিন। মনে করলেই চোখের সামনে ভাসে। সোনার খনি আমি আবিষ্কার করবই। শুধু সময়ের অপেক্ষা। একটু পরে বলল—

এরপরেও আমি খোঁজ চালিয়ে যাবো।

—দুই রাজা কি এখনও তোমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করবে? শাঙ্কো বলল।

—হুয়াল্লা চটেছে। আত্তারিয়া আমাকে সুযোগ দেবে। সোনার লোভ কিন্তু সাংঘাতিক। এই লোভ কেউ এড়াতে পারে না। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—সোনার খনির কথা ভুলে যাও। চলো দেশে ফিরি।

—আগেও বলেছি। এখনও বলছি দেশে এখনই ফেরার ইচ্ছে আমার নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক গে—তুমি যা ভালো বোঝো। শাঙ্কো বলল।

—এখন শুধু বিশ্রাম কর। ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু ওদের কপালে বিশ্রাম ছিল না। স্বয়ং সেনাপতি কয়েদঘরে এসে হাজির হল। ঢডাং ঢং শব্দ তুলে লোহার দরজা খুলে গেল। সেনাপতি ঢুকল। ফ্রান্সিসদের কাছে এল। গলা চড়িয়ে বলল—মহামান্য রাজা তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। চল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। সেনাপতির পেছনে পেছনে চলল।

মাঠ পার হয়ে রাজবাড়িতে এল। ওরা দেখল আজ রাজসভায় ভিড় নেই। বিচার চলছে। ওরা অপেক্ষা করতে লাগল।

বিচারের কাজ শেষ হল। সবাই চলে গেল। রাজা হুয়াল্লা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকালেন। বললেন, আমি নিশ্চিত যে তোমরা রাজা আত্তারিয়াকে আমাদের রণসজ্জা যোদ্ধাবাহিনী সম্পর্কে সব খবর পৌঁছে দিয়েছো।

—আপনি ভুল কথা বলছেন। আসন্ন লড়াই সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা যাই বল তোমরা যে গুপ্তচরের কাজ করেছো এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। রাজা বললেন।

—তাহলে তো আমাদের মুক্তির কোন আশাই নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা দুজন যে এখনও বেঁচে আছো তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। রাজা বললেন।

—তার প্রয়োজন নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? রাজা বললেন।

—কারণ আমরা গুপ্তচরের মত নিন্দনীয় কাজ করিনি—করবোও না। ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব কথা বলে কী লাভ? এই কাজটা করার জন্যে তোমাদের মুক্তি দেওয়া হবে। সোনার খনি খুঁজতে দেওয়া হবে।

—গুপ্তখনি পেলে যতটা সোনা পাবো তার অর্ধেক তোমাদের দেওয়া হবে। রাজা ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফ্রান্সিস আস্তে বলল—শাঙ্কো কী করবে?

—মুক্তি তো পাবো। তারপরে দেখা যাক। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে বলল—গুপ্তচরের কাজ আমরা কখনও করিনি। কিন্তু আজ এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আমাদের মুক্তির প্রশ্ন। আমরা এখন মনেপ্রাণে চাইছি মুক্তি আর সোনার খনি খুঁজে বের করার কাজ।

—ঠিক আছে। দুটোই পাবে। তাহলে তোমরা আজই যাও। আজই রাতে। দেরি করো না। আমি দুটি কথা জানতে চাই। কোনদিন আত্তারিয়া আক্রমণ করবে আর কবে আক্রমণ করবে।

—বেশ। আমরা এখন সৈন্যাবাসে থাকবার জন্যে যে ঘর পেয়েছিলাম সেই ঘরটায় আমাদের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস পড়ে আছে। সে সব নেব। তারপর রাজা আত্তারিয়ার রাজ্যে যাবো।

—বেশ। তাহলে আমাদের সঙ্গে এসো। সেনাপতি বলল।

সেনাপতির পেছনে পেছনে ওরা কয়েদঘর থেকে বাইরে এল। মাঠ পার হয়ে চলল। সেনাপতি চলে গেল। সঙ্গের এক প্রহরী আগের ঘরটার সামনে এল। দরজার তালা খুলে দিল।

ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকল। প্রহরী বলল—কিছু প্রয়োজন পড়লে জানাবেন। প্রহরী চলে গেল। বিছানায় বসে শাঙ্কো বলল—কখন রওনা হবে?

—আজ রাতে। খাওয়া-দাওয়ার পর। ফ্রান্সিস বলল।

—ভাবছি কী করে খবরটা বের করবে। শাঙ্কো বলল।

—দেখি চেষ্টা করে। দলপতিকে জিজ্ঞেস করবো ভাবছি। ফ্রান্সিস বলল।

—দলপতি যাতে বলে তার চেষ্টা করতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ। ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে। দেখা যাক—খবরটা জানা যায় কিনা।

রাতের খাওয়া হল। একটু বিছানায় শুয়ে নিয়ে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল— শাঙ্কো—চল।

দুজনে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন গভীর রাত। আকাশে ভাঙা চাঁদ। জ্যোৎস্না উজ্জ্বল নয়। চারপাশ বেশ অন্ধকার। ওরা হাঁটতে লাগল।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। ভালোই লাগছিল হাঁটতে।

ভোর ভোর সময়ে গ্যালিগাস পৌঁছল। তখনও রাস্তায় তেমন লোক চলাচল শুরু হয় নি। ফ্রান্সিস বলল—চল—একটা সরাইখানা খুঁজি। দিনকয়েক থাকতে হবে।

কিছুদূর হাঁটতেই ডানদিকে একটা সরাইখানা দেখতে পেল। ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় ঢুকল। মালিক হেসে বলল—আসুন—আসুন। সব রকম খাবারের ব্যবস্থা আছে।

ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় ঢুকল। মালিক পেছনে পেছনে এল।

—আমরা হাতমুখ ধুয়ে আসছি। সকালের খাবার পাঠিয়ে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—অবশ্যই—অবশ্যই। মালিক হেসে বলল।

—শুনুন—এখানে আমরা দু'চারদিন থাকবো। ব্যবসার কাজে।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। মালিক মাথা ঝাঁকাল।

—কেনাকাটার ব্যাপার—বুঝলেন তো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। মালিক আবার মাথা ঝাঁকাল।

—ঠিক আছে আপনি যান। খাবার পাঠিয়ে দিন। সরাইওলা চলে গেল।

ফ্রান্সিস দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসল। বলল—শাঙ্কো আজ থেকেই কাজ শুরু করি। দেরি করবো না।

—দুপুরের খাবার খেয়েই চল। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ চল। প্রথমে সৈন্যাবাসের এলাকায় চল। কোন যোদ্ধাকে একা পেলে ভেতরের খবরটা নিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ চল। শাঙ্কো বলল—তবে আরো কয়েকটা উপায় ভেবে রাখো। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ—হুঁ ভেবেছি। চল—এই উপায়টা কাজে লাগে কিনা দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজার যোদ্ধাদের আবাস রাজবাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। দুজনে অল্পক্ষণেই সেখানে পৌঁছল। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

মাঠে যোদ্ধারা ব্যায়াম ট্যায়াম করছিল। আবাস ফাঁকা। সব যোদ্ধাই মাঠে। ফ্রান্সিসরা আবাসের বাইরে একটা শিশুগাছের নীচে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছু পরে ব্যায়াম শিক্ষাদান ও যোদ্ধাদের অংশগ্রহণ শেষ হল। কিছু যোদ্ধা আবাসের বাইরে এল। বাইরে একটামাত্র মিষ্টির দোকান। যোদ্ধারা দোকানে ঢুকল। গলা চড়িয়ে দু'তিন জন খাবার খেতে চাইল।

—জলদি চল। ফ্রান্সিস আস্তে বলল। তারপর চলল মিষ্টির দোকানের দিকে।

ফ্রান্সিসরা দোকানে ঢুকল। কিন্তু জায়গা নেই। বাইরে বেরিয়ে এল। একজন যোদ্ধা খাবার বাইরে এনে খাচ্ছিল। ফ্রান্সিস তার কাছে গেল। হেসে উঠে যোদ্ধাটার পিঠে চাপড় মারল।

—তুই সৈন্যদলে আছিস? যোদ্ধা ফ্রান্সিসের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস বলল—আমাকে চিনতে পাচ্ছিস্ না। যোদ্ধা শুধু তাকিয়ে রইল। হাসি থামিয়ে বলল—না। আমার ভুল হয়েছে। ঠিক আপনার মত দেখতে আমার এক বন্ধু আছে। আপনাকে ভুল করে—কিছু মনে করবেন না।

ফ্রান্সিসের কাণ্ড দেখে শাঙ্কো অনেক কষ্টে হাসি চাপল। ফ্রান্সিস যোদ্ধাকে বলল—আচ্ছা আপনাদের কি রোজই ব্যায়াম করতে হয়?

—দু'বেলা। যোদ্ধাটি বলল।

—কিন্তু ধরুন যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন। তখনও ব্যায়াম করতে হয়? ফ্রান্সিস বলল।

—না। তখন তো যুদ্ধাস্ত্র চালানো। ব্যায়ামের সময় কই। যোদ্ধাটি বলল।

—কোথায় কখন যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন সেটা কি আপনারা রওনা হওয়ার দিন জানলেন—না আগে থেকেই জানেন। ফ্রান্সিস বলল।

—তার ঠিক নেই। তবে আগে থেকে আমরা সেনাপতির ব্যস্ততা দেখে বুঝি। যোদ্ধাটি বলল।

—কোথায় লড়াই করতে যেতে হবে সেটা আগে থাকতে জানেন? ফ্রান্সিস বলল।

—মোটামুটি একটা ধারণা হয়। যোদ্ধাটি বলল।

—এই যে উত্তরের রাজা হুয়াল্লার সঙ্গে আপনাদের লড়াই হবে সেটা কি জানেন? ফ্রান্সিস বলল।

যোদ্ধা ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—আপনি কী করে জানলেন?

—রাজা হুয়াল্লার রাজ্যে বেড়াতে গিয়েছিলাম সেখানেই জেনেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছেন। যোদ্ধাটি বলল।

—কিন্তু সমস্যা আপনারা কবে কখন লড়াইয়ে নামছেন সেটা তো ঐ রাজ্যের যোদ্ধারা জানে না। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। আভাসে কিছু শুনেছেন কী? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আসছে সোমবার রাতে রাজা হুয়াল্লার রাজ্য আক্রমণ করা হবে। যোদ্ধাটি বলল।

—জোর লড়াই হবে তাই না? ফ্রান্সিস বলল।

—তা তো বটেই। যোদ্ধাটি বলল।

—আপনারা কি জানেন রাজা হুয়াল্লা তার এক বন্ধু রাজাকে একশোজন সৈন্য ধার দিয়েছেন। ফ্রান্সিস বলল।

যোদ্ধা এবার একটু হাসল। বলল—আমরা জানি। তাই আক্রমণের জন্য এই সময়টা বেছে নেওয়া হয়েছে।

—অনেক ধন্যবাদ ভাই। আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি। লড়াই লাগবে সেটা জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াতে পারবো। তাই এত কিছু জানতে চাইছি। আবার ধন্যবাদ। চলি। ফ্রান্সিস একটু পা চালিয়ে চলল বড় রাস্তার দিকে। শাঙ্কোও ছুটে এসে পাশে দাঁড়াল।

—এত জোরে হাঁটার কী হল? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—ওদের সেনাপতি মাঠে এসেছে। যোদ্ধাদের কিছু নির্দেশ-টির্দেশ দেবে বোধহয়। সৈন্যদের মধ্যে আমাদের দেখলেই বিপদ। সেনাপতির তখন সন্দেহ হতে পারে। কাজেই পালাও।

দুজন খুব দ্রুত হেঁটে বড় রাস্তায় এল। এবার আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। দুজনে শেষ বিকেলে সরাইখানায় পৌঁছল।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। সরাইখানার রাঁধুনি মাংসের বড়া দিয়ে গেল। দুজনে হাপুস হুপুস খেল। বেশ খিদে পেয়েছিল।

—এখন কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—রাজা হুয়াল্পার রাজত্বে যাবো। যে সব খবর সংগ্রহ করেছি সেসব জানালে রাজা হুয়াল্পা খুব খুশি হবে। আমাদের মুক্তি দেবে। সোনার খনি খুঁজতে আমাদের সাহায্য করবে। কারণ সোনার লোভ। খুব কম মানুষই এই লোভ সামলাতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে কয়েকটা দিন এখানে থাকবে? শাঙ্কো বলল।

—না না। আজ রাতেই রওনা হব। মারিয়া বন্ধুরা জাহাজঘাটায় আছে। আমাদের জন্যে খুবই চিন্তা করছে। সব কাজ দ্রুত সারতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে শুয়ে পড়ল। শেষ রাতে রওনা দেবে রাজা হুয়াল্পার রাজ্যের দিকে। কিন্তু সেটা হল না।

সরাইখানার দরজায় কারা চাপড় দিচ্ছে। সরাইওয়ালার গলা শোনা গেল—যা—ই। সরাইখানার মালিক দরজা খুলে দিল। অল্প আলোয় দেখল—স্বয়ং সেনাপতি দাঁড়িয়ে।

মালিক হতবাক। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে বলল—আসুন—আসুন। কী সৌভাগ্য আমার।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। দেশের গণ্যমান্য কেউ একজন এসেছে বোঝা গেল কিন্তু সে কে তা বোঝা গেল না। ততক্ষণে সেনাপতির সঙ্গে আসা যোদ্ধারা তল্লাশী শুরু করেছে। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দ্রুত পেছনের দরজার দিকে ছুটল। দেখল পেছনের দরজা আটকপাটি বন্ধ। যোদ্ধারা ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসরা বাধা দিল না। এরকম নিরস্ত্র অবস্থায় বাধা দিতে যাওয়া মানে মৃত্যু।

যোদ্ধারা ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। সেনাপতি ফ্রান্সিসদের দেখে বলল—অ—তোমরা। রাজাকে আর আমাদের যোদ্ধাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিলে।

—আমরা পালাই নি। রাজা হুয়াল্পার যোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়েছিলাম। কয়েকদিন কয়েদখানায় কাটাতে হয়েছিল। শাঙ্কো বলল।

—এখানেও কয়েদখানায় থাকতে হবে। অবশ্যই মাননীয় রাজা যদি তোমাদের মুক্তি দেন—সেটা আলাদা কথা। সেনাপতি বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

—যে নকশাটা তুমি দিয়েছো—সেটা আমরা খুব মনোযোগের সঙ্গে তা দেখেছি। বুঝেছি—ওটা জাল নকশা। তুমি আমাদের ধোঁকা দিয়েছো। সেনাপতি বলল।



—আমি বলছি নকশাটা জাল না। আমি সেটা প্রমাণও করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা আন্তারিয়া বোধহয় তোমাকে সেই সুযোগ দেবে না। সেনাপতি বলল।

—সেই ক্ষেত্রে আমরা জাহাজে ফিরে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—সেই সুযোগটাও তোমাদের হয়তো দেওয়া হবে না। সেনাপতি বলল।

হাতে তরোয়াল থাকলে আমি শয়তানকেও ভয় করি না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে, আগে দেখা যাক রাজা তোমাদের কি শাস্তি দেন। সেনাপতি বলল।

—আমরা কোন অন্যায় করিনি অপরাধ করিনি যে আমাদের শাস্তি দেবেন। শাঙ্কো বলল।

রাস্তার একটা মোড়ের কাছে এসে সেনাপতি বলল—

—আমাকে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমি যাচ্ছি।

সেনাপতি দলপতির দিকে তাকিয়ে বলল—এদের কয়েদখানায় ঢোকাবি। কাল রাজসভায় এদের আনা হবে। সাবধান—পালিয়ে না যায়।

সেনাপতি ডানদিকের রাস্তার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এবার ফ্রান্সিস শাঙ্কোর কাছে সরে এল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল—সামনে দেখ। একটা বিরাট শিশুগাছ। জায়গাটায় অন্ধকার বেশি। লাফ দিয়ে পালাব। রাজা হুয়াল্লার কাছে যাব। লড়াইয়ের ব্যাপারে আমরা যা জেনেছি সব বলবে। পেছন থেকে দলপতি বলল—ফিস্ ফিস্ করে কী কথা হচ্ছে?

—আমার বিয়ের ব্যাপারে। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে বলতে পারো। বিয়ে বলে কথা। দলপতি হেসে বলল।

দুজনেরই হাত বাঁধা। সবাই তখন শিশুগাছের কাছে এসেছে। শাঙ্কো দুহাত তুলে রাস্তা থেকে লাফ দিয়ে শিশুগাছটার গোড়ায় গিয়ে পড়ল।

তখনই দলপতি শাঙ্কোকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল।

বর্শাটা গাছটার গায়ে বিঁধে গেল। শাঙ্কো ততক্ষণে জংলা গাছের জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে।

দলপতির নির্দেশমত এক প্রহরী গিয়ে বর্শাটা গাছের গা থেকে খুলে আনল।

দলপতি গলা চড়িয়ে বলল—সব সাবধান। এরা কিন্তু ধুরন্ধর। সুযোগ পেলেই পালাবে।

ভোর হল। তখনও ফ্রান্সিসরা চলেছে।

বেশ বেলায় কয়েদঘরের সামনে পৌঁছল। সেই প্রহরীরা এগিয়ে আসা। সেই ঢড়াংঢং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খোলা হল। সেই বন্দী জীবন। কিছুই করার নেই। তবে ফ্রান্সিস ভাবে পালানোর ফন্দী নকশার অর্থ এসব ভাবব।

একটু বেলায় খাওয়াদাওয়া হল। সারা সন্ধ্যে দরজার ফাঁক দিয়ে মাঠের সবুজ ঘাসের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাটাল। একটা চিন্তা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। সেটা হল শাঙ্কোর কথা। পালাতে পেরেছে। কিন্তু পরের কাজগুলো করতে পেরেছে কিনা। রাজা হুয়াল্লাকে সব কথা বলতে পেরেছে কিনা কোথাও আশ্রয় পেয়েছে কিনা। ফ্রান্সিস ভাবল—এখানে তো লড়াই শুরু হবে সামনের সোমবার। লড়াইয়ের সময় মারামারি কাটাকাটি চলবে। সেই সুযোগে ও হুয়াল্লার রাজত্বে চলে যাবে। শাঙ্কোকে খুঁজে বের করবে। তারপর দু'জনে মিলে সোনার খনি আবিষ্কার করবে।

পরদিন একটু সকালের খাবার খাচ্ছে তখনই দলপতি কয়েদঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিসের কাছে গিয়ে বলল—তোমার এক বন্ধু তো পালিয়েছে। তুমি কী করবে?

—রাজা হুয়াল্লার সঙ্গে কথা বলে স্থির করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। যাকগে তুমি রাজসভায় চল। দলপতি বলল।

—চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

মাঠ পার হয়ে রাজবাড়িতে এল দুজনে। রাজসভায় ঢুকল। তখন বিচারের কাজ চলছে। ফ্রান্সিস বার বার চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। শাঙ্কোকে দেখতে পেল না। ভেবে পেল না শাঙ্কো কোথায় আছে? শাঙ্কো পালিয়েছে। বন্দী হলে কয়েদঘরেই থাকতে হত। মনে হয় শাঙ্কো যে অবশ্য প্রয়োজনীয় খবর রাজা হুয়াল্লাকে দিয়েছে তাতেই ও ধরা পড়লেও মুক্তি পেয়েছে।

ফ্রান্সিসের ডাক পড়ল। সেনাপতি ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল—এই বিদেশী গুপ্তখনি সম্পর্কে বেশ কিছু জানে। একে বন্দী করতে হবে। ওর কথা ফাঁস হয়ে গেলে সোনার খনি কোনদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

—মাননীয় রাজা—যে সব সংবাদ আপনি জানতে চেয়ে আমাদের পাঠিয়েছিলেন সেই সংবাদ আমার বন্ধু দিয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ দিয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। সেইজন্য তোমার বন্ধুকে যোদ্ধাদের আবাসে রেখেছি। রাজা বললেন।

—আমি বন্ধুর কাছে যেতে পারি। ফ্রান্সিস বলল।

—দুজনে একত্র হলে পালাবে। রাজা বললেন।

—না। পালাবো না। পালাতে হলে অনেক আগেই পালাতাম। ফ্রান্সিস বলল।

কিছু পরে ফ্রান্সিসকে দলপতি কয়েদঘরে নিয়ে এল।

ওদিকে শাঙ্কো তো পালাল। জংলা গাছপালা দুহাতে সরিয়ে সরিয়ে শাঙ্কো একটু দূরেই চলে এল। কান পাতল। দলপতির দল থেকে কারো কোন কথা শুনতে পেল না।

জংলা গাছ সরিয়ে সরিয়ে এল। শরীরের অনেক জায়গা ছড়ে গেছে। দু এক জায়গা কেটেও গেছে।

দুদিকে ভালো করে দেখে শাঙ্কো রাস্তায় নামল।

চলল। আজ আর রাজার সঙ্গে দেখা করা যাবে না। কাল সকালে দেখা করবে রাজসভায় নয়। অন্য কোন ঘরে। লড়াইয়ের যে খবর ও এনেছে সেটা অত্যন্ত গোপনে রাজাকে জানাতে হবে।

একটা সরাইখানা খুঁজতে লাগল। পেয়েও গেল। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি আলগা করে তিনটি স্বর্ণমুদ্রা পেল। যাক দিন কয়েক বেশ চলে যাবে।

ও সরাইখানায় ঢুকল। যে ছোকরা খাবার টাবার দিচ্ছিল। তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। ছোকরাটা এল। শাঙ্কো কাঠের পাটাতনে বসল। দু'পাত্র জল খেয়ে মালিকের কাছে গেল। মালিক হাসিমুখে বলল—আপনি কি—

—হ্যাঁ। থাকবো। খাবো। কতদিন থাকবো সেটা পরে জানাবো।

—ঠিক আছে—ঠিক আছে। সরাইওয়ালা হেসে বলল।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পরে শুয়ে পড়ল। কালকে আসল কাজটা করতে হবে অর্থাৎ লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো দিতে হবে রাজা হুয়াল্লাকে। রাজা কী করে দেখা যাক।

পরদিন। সকালের খাবার খেয়ে চলল রাজবাড়ির দিকে। যখন রাজসভায় ঢুকছে তখনই দেখল সেনাপতি আসছে। শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। সেনাপতি কাছে আসতে শাঙ্কো বলল—মাননীয় সেনাপতি—একটা কথা ছিল। সেনাপতি শাঙ্কোর দিকে তাকাল। চিনল। বলল—তুমি একা। বন্ধু কোথায়?

—ওর সঙ্গে এখনও আমার দেখা হয় নি। শাঙ্কো বলল।

—কিছু বলবে? সেনাপতি বলল।

—গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা কথা রাজাকে বলবো। এই রাজসভায় যেসব বলা যাবে না। অন্য কোন জায়গায় হলে ভালো হয়। শাঙ্কো বলল।

—কোন ব্যাপারে? সেনাপতি বলল।

—লড়াইয়ের ব্যাপারে। শাঙ্কো বলল।

—ও। আমাকে বলা যাবে না? সেনাপতি বলল।

—না। সর্বপ্রথম ব্যাপারটা রাজাকে বলতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—বেশ। অপেক্ষা করো। সভা শেষ হলে রাজাকে মন্ত্রণাঘরে নিয়ে যাবো। সেখানে এসে তুমি তোমার কথা ব'লো। সেনাপতি বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল।

সেনাপতি চলে গেল। শাঙ্কো দাঁড়িয়ে রইল।

রাজসভার কাজ শেষ হল। রাজা আসন থেকে উঠলেন। তখনই সেনাপতি রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। কিছু বলল।

রাজা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। রাজা বাইরের দিকে মন্ত্রণাকক্ষে এলেন। বসলেন।

সেনাপতি শাঙ্কোকে নিয়ে ঢুকল। সেনাপতি আবলুস কাঠের তৈরি আসনে বসল। রাজা শাঙ্কোকে ইঙ্গিতে বসতে বলল।

শাঙ্কো বুঝে উঠতে পারছে না কীভাবে কথা শুরু করবে। ফ্রান্সিস হ্যারির অভাব বেশ অনুভব করছিল। রাজা বলল—

—রাজা আত্তারিয়া সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়েছে এ খবর আমরা জানি। তুমি আর কী সংবাদ এনেছো? রাজা বললেন।

—আগামী সোমবার রাতে রাজা আত্তারিয়া আপনার দেশ আক্রমণ করবে। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ। হাতে সময় নেই। আর কী খবর এনেছো? রাজা বললেন।

—আপনি যে একশ যোদ্ধাকে অন্যত্র পাঠিয়েছেন এটা রাজা আত্তারিয়া জানেন। শাঙ্কো বলল।

—আর তাই লড়াইয়ের জন্যে এই সময়টা বেচেছে। রাজা বললেন।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো মাথা ওঠানামা করল।

রাজা সেনাপতির মুখের দিকে তাকালেন। বললেন—আপনি তো রাজা আত্তারিয়ার আক্রমণের দিন কাল সবই জানলেন। আজ থেকেই লড়াই-এর জন্য যোদ্ধাদের তৈরি করুন।

—নিশ্চয়ই। আজ দুপুর থেকে লড়াইয়ের জন্য যোদ্ধাদের তৈরি করার কাজ শুরু করবো। সেনাপতি বলল। রাজা একটু ভেবে বললেন।

—তোমার নাম কী?

—শাঙ্কো। শাঙ্কো বলল।

—তোমাকে কিন্তু সৈন্যাবাসে থাকতে হবে। তোমার দেওয়া সংবাদ যদি সত্যি হয় তবে তোমাকে অনেক কিছু দেওয়া হবে। আর যদি মিথ্যে হয় তাহলে তোমাকে সারাজীবন কয়েদঘরে থাকতে হবে। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে।—শাঙ্কো বলল।

রাজা উঠে দাঁড়ালেন। রাজা রাজবাড়িতে চলে গেলে শাঙ্কো সেনাপতির সঙ্গে বাইরের মাঠে এল। একজন যোদ্ধা আবাসের দিকে যাচ্ছিল। সেনাপতি ইশারায় ডাকল। যোদ্ধাটি একটু মাথা নুইয়ে কাছে এল। সেনাপতি বলল—তোমাদের দলপতিকে এখানে আসতে বল। যোদ্ধাটি চলে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দলপতি ছুটতে ছুটতে এল। একবার মাথা নুইয়ে সেনাপতির সামনে এসে দাঁড়াল। তখনও হাঁপাচ্ছে। সেনাপতি শাঙ্কোকে দেখিয়ে বলল—এ বিদেশি। ওর এক বন্ধুও আছে। যাকগে—একে থাকবার জন্যে একটা ঘর দাও। দেখো যেন ওর কোন অসুবিধে না হয়।

—ঠিক আছে। দলপতি মাথা নুইয়ে বলল।

সেনাপতি চলে গেল। দলপতি শাঙ্কোকে বলল—চল। এদিকে ওদিকে দেখে টেখে দলপতি একটা ভাল ঘরেই শাঙ্কোকে থাকতে বলল। সেনাপতি চলে গেল।

শাঙ্কো ঘরে ঢুকে কাঠের পাটাতনে বসল। প্রথম চিন্তাটাই হল—ফ্রান্সিস কোথায়? ও তো বন্দী হল। সোমবার লড়াই শুরু হলে তবেই ওর সংবাদ সঠিক হবে। তখন নিশ্চয় ওকে আর ফ্রান্সিসকে মুক্তি দেওয়া হবে।

আবার অন্য দিকটাও ভাবা যায়। সোমবার রাতে আক্রমণ না হলে শাঙ্কোকে চিরজীবনের জন্যে কয়েদঘরে থাকতে হবে। তার চেয়ে মৃত্যুও ভালো। শাঙ্কো ভাবল ওকে ধরার আগেই ও পালাবে। লড়াই গোলমালে কে আর ওকে বন্দী করতে আসবে। তখন যে যার জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত। কে আর ওর দিকে নজর দেবে? তবু ওর মন থেকে ভয় গেল না। কী হবে কে জানে।

ফ্রান্সিস কয়েদঘরে আছে—এটা শাঙ্কো শুনেছে। এবার ফ্রান্সিসের সঙ্গে একবার কথা বলতে হয়। এবার এরা কী করবে? ফ্রান্সিস কী ভেবেছে জানতে পারবে। ও নিজের কথাও বলতে পারবে।

পাহারাদার খাবার নিয়ে এল। খাবার খেতে খেতে শাঙ্কো বলল—একবার দলপতিকে ডেকে দাও না।

—এই রাতে উনি আসবেনই না। পাহারাদার বলল।

—তবু বল ভাই যে আমি তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো খাওয়া শেষ করল। পাহারাদার চলে যাচ্ছে তখন শাঙ্কো আর একবার দলপতিকে ডেকে দেওয়ার কথাটা বলল।

শাঙ্কো শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। যদি দলপতি আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝল দলপতি আসবে না। বৃথা প্রতীক্ষা। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে শাঙ্কো ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালের খাবার খাওয়া হয়েছে তখনই দলপতি এলো। বলল—কী ব্যাপার আমার সঙ্গে তুমি দেখা করতে চেয়েছো কেন?

—আমাকে একটা অনুমতি দিতেই হবে। শাঙ্কো বলল।

—কীসের অনুমতি। দলপতি বলল।

—আমার এক বন্ধু কয়েদঘরে রয়েছে। বন্দী। শাঙ্কো বলল।

—ও। হ্যাঁ, হ্যাঁ একজন বিদেশী আছে বটে। দলপতি বলল।

—বন্ধুর সঙ্গে আমি কথা বলবো। অল্পক্ষণ। শাঙ্কো বলল।

—কী নিয়ে কথা বলবে। দলপতি বলল।

—কবে এখান থেকে চলে যাবো। গ্যালিগস বন্দর শহরে আমাদের জাহাজ নোঙর করে আছে। আমাদের জাহাজে যাবো। তারপর স্বদেশের দিকে যাত্রা শুরু করব। শাঙ্কো বলল।

—আগে দেখ—রাজা কী বলেন। তুমি না হয় ছাড়া আছো কিন্তু তোমার বন্ধু তো কয়েদঘরে। ও তো ছাড়া পাবে না। সেনাপতি বলল।

—বন্ধুকে মুক্তি দিতে রাজাকে রাজি করাবো। শাঙ্কো বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। দলপতি বলল।

—এবার আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দিন। শাঙ্কো বলল। দলপতি মাথা নিচু করে কী ভাবল। মাথা তুলে বলল—এরকম অনুমতি দেওয়া খুবই বিপজ্জনক। আমি তোমাদের দেখা করতে অনুমতি দিয়েছি এটা জানাজানি হলে আমি বিপদে পড়বো। সবচেয়ে ভালো হয় প্রহরীদের একজন—নিমতা রাত বারোটার পর একা থাকে। নিমতাকে যদি রাজি করাতে পার তাহলে ও তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। এ ছাড়া অন্য কোনভাবে হবে না। দলপতি বলল।

—ঠিক আছে। আজকেই নিমতার সঙ্গে কথা বলবো। শাঙ্কো বলল।

—দেখ বলে। দলপতি চলে গেল।

শাঙ্কো নিজের ঘরে এল। কী ভাবে নিমতাকে পাওয়া যাবে? বিছানায় শুয়ে পড়ল শাঙ্কো। ভাবতে লাগল কীভাবে নিমতার সঙ্গে কথা বলবে।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর শাঙ্কো শুয়ে পড়ল। একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। শাঙ্কো ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম এল না।

রাত গভীর হচ্ছে। শাঙ্কো মাঝে মাঝেই উঠে দরজায় এসে দাঁড়াতে লাগল। নিমতা কখন একা হয়।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে বাইরে এসে দেখল নিমতা একা কয়েদঘরের সামনে বর্শা হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শাঙ্কো একরকম ছুটে এল নিমতার কাছে। নিমতা শাঙ্কোকে দেখে অবাক—এত রাতে কে এল রে বাবা। পরক্ষণেই বুঝল বিদেশী লোকটা এসেছে। নিমতা বলল— কী ব্যাপার? এত রাতে এখানে এসেছো কেন? শাঙ্কো ডাকল—

—নিমতা?

—হুঁ বল। নিমতা বলল।

—আমার এক প্রাণের বন্ধু এইখানে বন্দী হয়ে আছে। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ। নিমতা মুখে শব্দ করল।

—তার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই। শাঙ্কো বলল।

—দলপতির লিখিত হুকুম এনেছো? নিমতা বলল।

—না। শাঙ্কো বলল।

—তবে তো দেখা হবে না। নিমতা বলল।

—বলছি—নিমতা—ভাই তুমি এ কাজ না পারলে আর কেউ পারবে না। রাজা তোমার কথায় ওঠেন বসেন। শাঙ্কো বলল।

—এটা কোত্থেকে শুনলে? নিমতা বলল।

—এসব সবাই জানে। শাঙ্কো বলল।

—তা হতে পারে। অনেক ব্যাপারেই রাজা হুয়াল্পা আমার সঙ্গে কথা বলেন। এই যে শোনা যাচ্ছে রাজা আত্তারিয়া আমাদের দেশ আক্রমণ করবে এই নিয়েও রাজা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। নিমতা বলল।

—তাহলে ভাই তুমি অনুমতিটা দাও। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ। বারান্দায় এসে দাঁড়াও। সাবধান—এই ব্যাপারটা পাঁচকান না হয়।

শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠে দাঁড়াল।

—নাম কী? নিমতা বলল।

—ফ্রান্সিস। শাঙ্কো বলল।

—ও। এবার গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস নামে কে আছো—দরজার কাছে এসো।

ফ্রান্সিস তখনও জেগে। রাতের ঘুমটা কমে গেছে। নিমতার ডাক শুনেই ও তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এল। মশালের আলোয় শাঙ্কোকে দেখে ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওঃ একটা সাংঘাতিক দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচলাম।

—বেশিক্ষণ কথা বলা যাবে না। শাঙ্কো বলল।

—তুমি কী করে বন্দীদশা এড়িয়ে গেলে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—লড়াইয়ের ব্যাপারে সংবাদ দিলাম। রাজা হুয়াল্পা খুব খুশি। আমাকে ভালোভাবে যোদ্ধাদের আবাসে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছেন। শাঙ্কো বলল।

—বলেছো—সোমবার রাতে আত্তারিয়া আক্রমণ করবে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—সে সব বলেই বন্দীদশা এড়াতে পারলাম। শাঙ্কো বলল।

—সময় হয়ে গেছে—সময় হয়ে গেছে—নিমতা কথাটা বলতে বলতে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল। দরজায় লোহার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে শাঙ্কো হাত বাড়াল। ফ্রান্সিস ওর হাত চেপে ধরল। দু'জন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। শাঙ্কোর দু'চোখ জলে ভরে উঠল। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। বলল—শাঙ্কো—মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ো না। মন শক্ত কর।

—সময় হয়ে গেছে—সময় হয়ে গেছে—বলতে বলতে নিমতা তখনও পায়চারি করতে লাগল।

—ফ্রান্সিস—যাচ্ছি। খুবই দুশ্চিন্তায় আছি। সোমবার রাতে যদি রাজা আত্তারিয়া আক্রমণ না করে তাহলে মিথ্যে কথা বলার জন্যে রাজা হুয়াল্পা আমাকে ফাঁসি পর্যন্ত দিতে পারে। শাঙ্কো বলল।

—যদি আক্রমণ না করে তুমি পালিয়ে যেও। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—উত্তরের ভিসিয়াভো রাজ্যে চলে যাবো।

তাহলে চলি ফ্রান্সিস। শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো বারান্দা থেকে নেমে এল। চলল নিজের ঘরের দিকে। ফ্রান্সিস নিজের জায়গায় এসে শুয়ে পড়ল।

সোমবার এল। শাঙ্কো দুশ্চিন্তায়। কী হবে কে জানে। রাজা আন্তারিয়া তার যোদ্ধাবাহিনীকে নিয়ে রাজা হুয়াল্লার দেশ আক্রমণ করে কিনা এখন সেইটেই দেখার।

সারাদিন কাটল। সন্ধ্যে থেকে যোদ্ধাদের তোড়জোড় শুরু হল। লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হল যোদ্ধারা।

ওর মধ্যেই ভাগ ভাগ করে যোদ্ধারা খেয়ে এল। শাঙ্কোও খেয়ে নিল।

রাত বাড়তে লাগল।

শাঙ্কো শুতে পারল না। একটা চেয়ে পাওয়া বর্শা হাতে নিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। তারপর ক্লান্ত হয়ে বিছানায় বসে পড়ল।

বেশ কিছু পরে ভোর হল। পাখির ডাক শোনা গেল।

শাঙ্কোর একটু তন্দ্রামত এসেছিল। পাখির ডাক শুনে লাফ দিয়ে উঠল। বাইরে তাকিয়ে দেখল সেনাপতি ঘোড়ায় চেপে এসেছে। গলা চড়িয়ে সার বাঁধা যোদ্ধাদের বলল—তোমরা সেনা ছাউনিতে গিয়ে বিশ্রাম কর। তবে খালি হাতে থেকো না। সঙ্গে বর্শা রাখবে। তরোয়ালও কোমরে ঝোলানো থাকবে যাতে আক্রান্ত হলে আমরা লড়তে পারি। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সেনাপতি বলল—তোমাদের তরোয়াল চালানো শেখা হয়েছে বর্শা আর তরোয়াল দুটোই কাজে লাগবে। যাও। সেনাপতি থামল।

শাঙ্কো এবার তৈরি হতে লাগল। বাইরের দিকে চোখ রেখে কাপড়জামা বদলাল। দেখল—সকালের খাবার নিয়ে দুজন পাহারাদার আসছে।

শাঙ্কো আর দাঁড়াল না। আস্তে আস্তে মাঠ পার হল। রাস্তায় আসতেই শাঙ্কো খুব দ্রুত হাঁটতে লাগল। এক নজর পেছনে তাকিয়ে দেখল ওর ঘরের সামনে কোন যোদ্ধাই দাঁড়িয়ে নেই। ঠিক তখনই দেখল সেনাপতি ওর ঘরের সামনে এসেছে। সঙ্গে দু'জন যোদ্ধা।

শাঙ্কো প্রায় ছুটে চলল। একনাগাড়ে হাঁটতে লাগল। একবারও থামল না।

দুপুর হতে শাঙ্কো একটা ছোট শহরমত জায়গায় এল। খাবারের দোকান হাতের কাছেই পেল। দোকানে ঢুকে বসল। কাজের ছেলেটা এল। শাঙ্কো রুটি মাংসের বড়া চাইল। ছেলেটি খাবার নিয়ে এল। ও পরপর দু গ্লাশ জল খেল। তারপর খাবার খেতে লাগল। খাবার শেষ। শাঙ্কো আরো খাবার চাইল। ছেলেটি দিয়ে গেল। সেটাও খেয়ে ফেলার পর ঢক্ ঢক্ করে আরো দু'গ্লাশ

জল খেল। এবার উঠে দাঁড়াল। দোকান মালিকের কাছে এল। একটা সোনার চাকতি দিল। দোকান মালিক সোনার চাকরি রেখে ফেরৎ মুদ্রা দিল। বলল—আবার আসবেন। শাঙ্কো বলল—হ্যাঁ আসবো। এবার বলুন তো সামনে কোন রাজ্য আছে।

—ডিসিয়াডো।

—হেঁটে কতক্ষণে ওখানে পৌঁছবো? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—রাত হয়ে যাবে।

—হুঁ।

শাঙ্কো রাস্তায় নামল। এতদূর দ্রুতগতি রেখে হেঁটে এসে খুবই ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। হাঁটতে লাগল তবু।

যখন ডিসিয়াডো পৌঁছল, তখন বেশ রাত। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে একটা সরাইখানা পেল। সরাইখানায় ঢুকল। মালিক একটা পাটাতনে বসে আছে। হেসে বলল—আসুন।

—খাবো থাকবো। শাঙ্কো বলল। তারপর পাটাতনে বসল। মালিক উঠে দাঁড়াল।

—একটু খোঁজ নিয়ে আসি কেমন খাবার আছে। মালিক বলল। তারপর উঠে দাঁড়াল। ভেতরে চলে গেল। ফিরে এসে বলল—মাংস বেশি নেই। তরিতরকারির খাবার যা আছে বোধহয় আপনার হয়ে যাবে।

—আমি কোথায় থাকবো দেখিয়ে দিন। শাঙ্কো বলল।

মালিক শাঙ্কোকে নিয়ে পেছনের ঘরে এল। প্রায় ছ'সাতজন লোক পাটাতনে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। মালিক বলল—

—যেখানে খুশি শোবেন।

—হুঁ। আমি হাত মুখ ধুতে যাচ্ছি। এসেই যেন খাবার পাই। শাঙ্কো বলল।

—নিশ্চয়ই পাবেন। মালিক দেখে বলল।

পেছনে জলের জায়গাটা মালিক শাঙ্কোকে দেখিয়ে দিয়েই চলে গেল।

শাঙ্কো বেশ ভালো করে হাতমুখ ধুলো। মুখে গলায় ধূলোয় ঢাকা ছিল যেন। শাঙ্কো আস্তে আস্তে ফিরে এল।

—আসুন—আসুন। মালিক একটা পাটাতন দেখিয়ে দিল। শাঙ্কো খেতে বসল। রুটির সঙ্গে মাংস খুব কমই দিল। শাঙ্কো ওসব আর ভাবল না। খেতে লাগল। এক দফা শেষ করে আবার খাবার চাইল। মাংস নেই। তরকারিমত জিনিস খেতে দিল। শাঙ্কো সেটাই গপ্ গপ্ খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ। মালিক ওকে যে শোবার জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছিল—সেখানেই শাঙ্কো এল। তারপর শুয়ে পড়ল।

লোকজনের কথাবার্তায় ওর ঘুম ভাঙল। শাঙ্কো উঠে বসল। হাতমুখ ধুয়ে সকালের খাবার খেতে খেতে মালিকের কাছে এল। বলল—এটাই তো ডিসিয়াডো দেশ।

—হ্যাঁ। আপনি কোত্থেকে এসেছেন? সরাইওয়ালা জানতে চাইল।

—য়ুরোপ থেকে। শাঙ্কো বলল।

—বলেন কি? সরাইওয়ালা চমকে উঠল।

—আমরা নতুন নতুন জায়গায় যেতে ভালোবাসি। বিশেষ করে গুপ্তধনটনের খোঁজ পেলে আমরা তা উদ্ধার করি। এরকম জীবনই আমরা ভালোবাসি। শাঙ্কো বলল।

—ও। তা আপনি একাই—সরাইওয়ালা বলতে গেল তার আগেই শাঙ্কো বলল—

—না-না। আমার বন্ধুরাও আছে। গ্যালিভাস বন্দরে আমাদের জাহাজ নোঙর করে আছে। আমরা গেলেই জাহাজ ভাসাবো স্বদেশের দিকে।

—ও। সরাইখানার মালিকের হাঁ মুখ বন্ধ হল।

ঘাসপাতার বিছানায় শুয়ে শাঙ্কো ভাবতে লাগল কী করবে এখন। রাজা আত্তারিয়া বা রাজা হুয়াল্পার দেশে যাওয়া অসম্ভব। আমাকে ধরতে পারলে ফাঁসিও দিতে পারে। একমাত্র উপায় পালিয়ে পালিয়ে গ্যালিগাস যাওয়া। কিন্তু ফ্রান্সিস মুক্তি পেলেই সব ভাবা যাবে। এখন জাহাজে ফিরে যাওয়ার চেয়েও প্রয়োজন উদিন্না পাহাড়ের সোনার খনি উদ্ধার করা। এই খনি আবিষ্কার না করে ফ্রান্সিস এক পাও যাবে না। তবে ফ্রান্সিসের অভিমত কী সেটা জানা না গেলে কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। এখন সামনে একটাই কাজ—ফ্রান্সিসকে কয়েদঘর থেকে মুক্ত করা। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব? ফ্রান্সিস অবশ্য একটা চেষ্টা করে মুক্তি আদায় করতে পারবে। শাঙ্কো জোরে একটা শ্বাস ছাড়ল। ও দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

সকালের খাওয়া খেয়ে শাঙ্কো তৈরি হল। রাজা রাজসভা সব দেখে আসি। শাঙ্কো মালিকের কাছে এল। বলল—রাজসভা দেখতে যাবো। কী করে যাবো?

—এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যান। যেতে যেতে ডানদিকে তাকাতে তাকাতে যাবেন—দেখবেন একটা মধুবিক্রির দোকান। থামবেন। দেখবেন কাঠ আর পাথরের তৈরি একটা বড় বাড়ি। ওটাই রাজবাড়ি।

যাই সব দেখেশুনে আসি। শাঙ্কো বলল। তারপর রাস্তায় এলো। মালিকের নির্দেশমত চলল। বেশ কিছুটা আসার পর দেখল একটা মধুর দোকান। বেশ ভিড় দোকানে।

এবার শাঙ্কো দোকানের উল্টোদিকে তাকাল। ঠিক। কাঠপাথর আর শুকনো ঘাসের ছাউনি। ও চলল। রাজসভার ফটকের কাছে দু'জন বর্শাধারী প্রহরী।

রাজসভাঘরে ঢুকতে যাবে তখনই একজন প্রহরী হাত বাড়িয়ে শাঙ্কোকে আটকালো। বলল—তুমি বিদেশী। এখানে কী চাই?

—আমি রাজসভা দেখতে এসেছি।

—হুঁ। যাও। প্রহরী ওকে ছেড়ে দিল।

শাঙ্কো রাজসভার কাছে এল। রাজার বিচার করা চলছে। রাজা একটু বয়স্ক। গায়ে ঢোলা আলখাল্লার মত দামি কাপড়ে তৈরি। গলায় দামি ছোট ছোট পাথর। মাঝখানে একটা মুক্তো বসানো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজসভার কাজ শেষ হল। শাঙ্কো চলল সদর দরজার দিকে। তখনই দেখল একজন প্রহরী ছুটে এল শাঙ্কোর কাছে।

—এই বিদেশী—প্রহরী ডাকল। শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রহরীটা বলল—

—চল। মাননীয় রাজা ডাকছেন।

শাঙ্কো অবাক। এখানে তো সরাইওয়ালা ছাড়া আমাকে কেউ দেখেই নি। সেখানে স্বয়ং রাজা ওকে ডাকবে এতো কল্পনাই করা যায় না। শাঙ্কো বলল—চল।

রাজা ব্রাপেন-এর সামনে এসে শাঙ্কো মাথা একটু নোয়াল।

—তুমি বিদেশি? রাজা ব্রাপেন জিজ্ঞেস করলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নাম শাঙ্কো। শাঙ্কো বলল।

—তুমি কি এখানে একা এসেছো? রাজা বললেন।

—না। আমার বন্ধুরাও আছে। শাঙ্কো বলল।

—কী মতলব নিয়ে এসেছো? রাজা বললেন।

—আমরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেই ভালোবাসি। আর একটা কাজ আমরা করি কোন গুপ্তধনের খবর পেলে আমরা সেই গুপ্তধন উদ্ধার করি।

—হুঁ। শোন আমার গুপ্তচরেরা ছড়িয়ে আছে। তাদের মারফৎ সব খবরই আমি পাই। যেমন—গতরাতে তুমি একটা সরাইখানায় ছিলে। তার কাছেও বলেছো যে তোমরা গুপ্তধন খোঁজো। তেমন খবর পেলেই তোমরা তা উদ্ধার করতে লাগো। ঠিক কিনা?

শাঙ্কো একটু অবাক হল। রাজা তাহলে ওদের খবরও জানে। বলল—

—হ্যাঁ। আপনি ঠিকই বলেছেন। শাঙ্কো বলল।

—তোমরা উদিন্না পাহাড়ের সোনার খনি আবিষ্কার করার চেষ্টায় আছো। রাজা বললেন।

—হ্যাঁ—রাজা আত্তারিয়া এই খোঁজাখুঁজির ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবেন। শাঙ্কো বলল।

—সেই জন্যেই তোমাকে আমাদের কয়েদখনায় বন্দী করে রাখবো। রাজা বললেন।

—আমার বন্ধুরা তো আছে। শাঙ্কো বলল।

—আমি তাদের জানতেও দেব না। কেউ বুঝতেও পারবে না যে তুমি আসলে বন্দী। রাজা বললেন।

—ঠিক বুঝলাম না। শাঙ্কো বলল।

—মানে তুমি সকাল থেকে সারাদিন এখানে ওখানে নির্দেশমত কাজ করবে। সন্ধ্যে হলেই কয়েদখানায় তোমাকে ঢোকানো হবে। রাজা বললেন।

—তারপর? শাঙ্কো বলল।

—কেউ বুঝতেও পারবে না তুমি বন্দী। রাজা বললেন।

—আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন কেন? শাঙ্কো বলল।

—না-না। তোমাকে মরতে দেওয়া হবে না। জীবিত তোমাকেই আমার প্রয়োজন। রাজা বললেন।

—আমি তো সোনার খনি সম্পর্কে কিছুই জানি না। শাঙ্কো বলল।

—জানবে। তোমাকে সময় আর সুযোগ দেওয়া হবে। রাজা বললেন।

শাঙ্কো কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

—সোনার খনি সম্পর্কে কী জানতে পেরেছো? রাজা বললেন।

—এটা আমার এক প্রাণের বন্ধু ফ্রান্সিস সব জানে ও। শাঙ্কো বলল।

—সে কোথায়? রাজা বললেন।

—রাজা হুয়াল্লার কয়েদঘরে। শাঙ্কো বলল।

—তোমাদের ফ্রান্সিসকে এখানে আনার ব্যবস্থা করছি। রাজা বললেন।

—পারবেন? শাঙ্কো বলল।

রাজা হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—কয়েদঘরের প্রহরীরা সব যীশু না। একটা সোনার আধখানা চাকতি দিলেই তোমার বন্ধু মুক্তি পাবে। আমি সেই ব্যবস্থা করছি। তুমি যদি চাও তোমার বন্ধুকে প্রহরী এখানে পৌঁছে দিয়ে যাবে। রাজা বললেন।

—না—না। ও একা এলেই হবে। আপনার রাজত্বে আসতে পারলেই হল। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। তাই হবে। তোমার বন্ধু আসুক। তারপর গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য তোমাদের কাজে নামতে হবে। রাজা বললেন।

—বেশ। তবে আমার ঐ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেই আমি আমাদের মত বলবো। শাঙ্কো বলল।

—খুব ভালো কথা।

রাজা ব্রাপেন আস্তে দুহাত দিয়ে শব্দ করলেন। একজন ন্যাড়ামাথা লোক রাজার কাছে এল। মাথা একবার নুইয়ে সম্মান জানাল।

—শোন—রাজা বললেন—এ একজন গুপ্তচর। অনেক কঠিন কঠিন কাজ করেছে। এবার ওকে বল তোমার বন্ধু কোন কয়েদঘরে বন্দী হয়ে আছে। দেখতে কেমন পোশাক কেমন এসব বলে দাও।

শাঙ্কো সব বলল। গুপ্তচর মাথা নেড়ে বলল—ঠিক আছে।

গুপ্তচর রাজা ব্রাপেনকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে চলে গেল।

শাঙ্কো অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। ও নিজে এখানে পড়ে আছে। ফ্রান্সিস একা। সহজে পালাতে পারবে না। সময় লাগবে। আর জাহাজে ফিরতে দেরি করা চলবে না। রাজকুমারী, বন্ধুরা দুশ্চিন্তায় পড়বে। যা হোক—এখন তো এই রাজা ব্রাপেন ফ্রান্সিসকে মুক্ত করিয়ে আনতে পারে কিনা দেখি।

ওদিকে দু'দিন পরে ফ্রান্সিস রাতে কয়েদঘরে শুয়ে আছে। রাত বাড়ছে। ওর ঘুম আসছে না এখন মাঝে মাঝেই ওর বিনিদ্র রাত কাটে।

রাত গভীর। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। হঠাৎ দেখল এক পাহারাদার আস্তে দরজা খুলল। পাহারাদার সোজা ওর কাছেই এল। মুখ নুইয়ে বলল—তুমিই তো ফ্রান্সিস?

—হ্যাঁ। কেন? কী ব্যাপার? ফ্রান্সিস বলল।

—আমার পেছনে পেছনে এসো। কোনরকম শব্দ করবে না।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। পাহারাদারের পেছনে পেছনে দরজার কাছে এল। পাহারাদারটি আস্তে দরজা খুলে দিল। দুজনে বাইরে এল। পাহারাদার বলল—কোনরকম শব্দ না করে পালিয়ে যাও। ও দেখল একজন পাহারাদার পাথরের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুচোখ বোঁজা।

ফ্রান্সিস বারান্দা থেকে নিচে নামল। তারপর দ্রুত প্রায় ছুটে চলল মাঠের শেষের দিকে। জ্যোৎস্না কুয়াশা ঢাকা। তার জন্যে আশপাশ সব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

মাঠ ছাড়িয়ে রাস্তায় এল। ফ্রান্সিস বেশ হাঁপাচ্ছে তখন।

একসময় থামল। ভীষণ হাঁপাতে লাগল।

তখনই দেখল সেই প্রহরী ছুটে আসছে। গলা চড়িয়ে বলল—ভয় পাবে না। আমি বন্ধু।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে রইল। প্রহরী কাছে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—তুমি বিভাদাভিয়া যাবে। ঐখানে তোমার এক বন্ধু আছে।

—নাম কী? শাঙ্কো?

—তা জানি না। বিভাদাভিয়া যেতে হলে এই রাস্তা দিয়ে যাবে। এই একটা রাস্তাই সোজা গেলে বিভাদাভিয়া পাবে। এই রাস্তা ওখানেই শেষ। প্রহরী চলে গেল।

ফ্রান্সিস হাঁটতে লাগল।

যেতে যেতেই ভোর হল।

রোদ ছড়ালো। চারদিক আলোয় আলোময় হয়ে উঠল। চারদিকে টানা শস্যক্ষেত। চাষীদের বাড়িঘরদোর।

দুপুর হল। খিদেও পেয়েছে। জল তেষ্টাও পেয়েছে। এক চাষীর বাড়ির সামনে এল। দরজায় আস্তে শব্দ করল। ভেতর থেকে কে বলল—কে?

—আসুন। কথা হবে। ফ্রান্সিস বলল। দরজা খুলে গেল। এক মহিলা দাঁড়িয়ে। বলল—বলুন—কী কাজে এসেছেন।

—আমি বেশ দূর থেকে হেঁটে আসছি। যাবো বিভাদাভিয়া। বড্ড খিদে পেয়েছে। যদি—

—আসুন—আসুন। আপনি আমাদের অতিথি। মহিলাটি সরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস ঢুকল। দরজা বন্ধ করে মহিলাটি এসে বলল—এই ঘরে আসুন। একটা ঘরে ফ্রান্সিস ঢুকল। কাঠের পাটাতন পাতা।

—শুয়ে বিশ্রাম করুন। মহিলাটি চলে গেল।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সারারাত হেঁটেছে পরিশ্রম হবেই। একটা চিন্তা হল। আমি কত হাজার মাইল পার হয়ে এখানে এসেছি। কত রকম মানুষ দেখলাম। কত মানুষ আমাকে অতিথি বলে সাদরে গ্রহণ করেছে। দ্বীপ দেশ এর পার্থক্য আছে কিন্তু মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি দয়াহীন কুচক্রী মানুষ যেমন আছে তাদের চেয়ে হাজারগুণ ভালো মানুষেরাও আছে।

কিছুক্ষণ পরে মহিলাটি ফ্রান্সিসকে খেতে দিল। এক গোঁফওয়ালা মধ্যবয়সী লোক ঘরে ঢুকল। বলল—পেট পুরে খাবেন। পাতে যেন কিচ্ছু পড়ে না থাকে। ফ্রান্সিস হেসে বলল—আমি খুব ক্ষুধার্ত। আমাকে পেট পুরে খেতেই হবে।

খাওয়া শেষ। মহিলাটি বলল এবার একটু শুয়ে বিশ্রাম করে এখানেই থাকুন রাতটা।

—উপায় নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে বিভাদাভিয়াতে পৌঁছুতে হবে। আচ্ছা—চলি। ভদ্রলোক বললেন—ফেরার পথে এখানে খেয়ে যাবেন।

—ঠিক আছে।

ফ্রান্সিস বাড়ির বাইরে এল। আবার হাঁটা। পরের দিনটাও পথে কাটল। সন্ধ্যের সময় বিভাদাভিয়ায় পৌঁছল। নগরে ঢুকছে তখনই একজন ওর কাছে এল। বলল—আপনি বিদেশি? ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—হ্যাঁ।

—আপনি ফ্রান্সিস?

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—শাঙ্কো আপনার বন্ধু? লোকটি বলল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—শাঙ্কো কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

—আমার সঙ্গে আসুন। লোকটি বলল।

—আপনি কে? মানে—ফ্রান্সিস বলল।

—ভয়ের কিছু নেই। আপনি আমাদের রাজা ব্রাপেন-এর অতিথি। লোকটি বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

একসময় দুজনে বড় মাঠটায় এল। চলল কয়েদঘরের দিকে। কয়েদঘরের কাছাকাছি পৌঁছতেই শাঙ্কো চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো। ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। দুজনের চোখেই জল।

রাজা ব্রাপেন-এর কাছে খবর পৌঁছল। রাজা ব্রাপেন ঘোড়ায় চড়ে এলেন। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে ঘোড়া থামালেন। শাঙ্কোকে বললেন—

—কী? তোমার বন্ধুকে পেয়েছো?

—হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। শাঙ্কো বলল।

—আর কী চাও? রাজা ব্রাপেন জানতে চাইলেন।

—যোদ্ধাদের আবাসে আমাদের জন্যে একটা ঘর দিন। শাঙ্কো বলল।

—বেশ। আর কী চাও? রাজা ব্রাপেন জানতে চাইলেন।

—এখন কিছু চাইবার নেই। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জানাবো সব।

—বেশ। রাজা ব্রাপেন বিরাট মাঠটা পার হয়ে চলে গেলেন রাজবাড়ির দিকে। শাঙ্কো বলল।

দলপতিকে শাঙ্কো দেখল। দলপতি এগিয়ে এসে বলল—এবার তোমাদের একটা ঘর দিতে হবে। আমার সঙ্গে এসো।

দলপতি মাঠ পার হতে লাগল। পেছনে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো। দলপতি একটা ঘর দেখিয়ে বলল—এটাই তোমাদের ঘর। দলপতি চলে গেল।

ঘরে ঢুকল দুজনে। মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। ঘাসের বিছানায় বসল দুজনে। শাঙ্কো আস্তে আস্তে ওর সব কথা বলল। ফ্রান্সিস বলল—আমার তো কয়েদঘরে দিনরাত কেটেছে। বলবার মত তেমন কিছু নেই। তবে ঠিক বুঝছি না এই রাজা ব্রাপেন আমাকে নিয়ে এল কেন?

—আমি বলেছিলাম তাই।

—আমার মনে হয় রাজার নিশ্চয়ই কিছু কাজ আছে যেজন্যে আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে।

—হ্যাঁ রাজা ব্রাপেনের লক্ষ্য—সোনার খনি দখল করা। ফ্রান্সিস বলল।

—এখনও তো সোনার খনির হদিশই পাওয়া গেল না। এখনই তার দখল চাই? শাঙ্কো বলল।

—সোনার লোভ—বুঝতেই পারছো। এখন আমরা কী করবো? ফ্রান্সিস থামল। তারপরে বলল—

—সমস্ত ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে—এরকম—সোনার খনি উদ্ধার করতে চাইছে—এই রাজা ব্রাপেন আর হুয়াল্লা আর আত্তারিয়া। কিন্তু আমরা একটা নকশা পেয়েছি। একমাত্র রাজা হুয়াল্লাই আমাদের কাছ থেকে নকল নকশাটা পেয়েছে। অন্য দুজন কোন খোঁজই জানে না। ওরা চায় আমরা উদ্ধার করি আর সোনার খনি ওদের দিয়ে দিই। খনি উদ্ধার করতে পারলে কোন রাজাকে খনির অধিকার দেব জানি না। তখন এই ব্যাপারটা নিয়ে সাংঘাতিক সমস্যা দেখা দেবে।

—তাহলে তুমি কীভাবে সমস্যার মোকাবিলা করবে। কোন পথে সমস্যাটার সমাধান করবে।

—ঠিক আছে—ঠিক কর কোন রাজার জন্যে আমরা খনি অনুসন্ধান করতে যাবো? ফ্রান্সিস বলল।

—খনি উদ্ধার করে এই রাজা ব্রাপেনকেই দাও।

—কিন্তু খনিটা রয়েছে উদিন্না পাহাড়ে। ঐ পাহাড়ের দক্ষিণভাগের রাজা আত্তারিয়া আর রাজা হুয়াল্লা উত্তরভাগের রাজা। এই রাজা ব্রাপেন উদিন্না পাহাড়ের থেকে বেশ দূরে রাজত্ব করেন। সোনার খনি উদ্ধার করে যদি এই রাজা ব্রাপেনকে দিই—এই রাজা ব্রাপেনকে হুয়াল্লার রাজত্বের মধ্যে দিয়ে আসতে হবে। রাজা হুয়াল্লা এই রাজা ব্রাপেনকে আসতেই দেবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—তা ঠিক। সোনার লোভ। শাঙ্কো বলল। একটু হেসে ফ্রান্সিস বলল—সমস্যার শেষ এখানেও নয়। আগে চল—খনি উদ্ধার করি। তারপর অবস্থাই বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে।

কিছু পরে দুজন প্রহরী খাবার নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা পেট পুরে খেল।

সন্ধ্যের সময় রাজা ব্রাপেন এলেন। ঘোড়ায় চড়ে। ঘোড়া থেকে নেমে ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকলেন। ফ্রান্সিস শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। রাজা ব্রাপেন বললেন—কী? তোমরা শলাপরামর্শ করেছো?

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—কী সিদ্ধান্তে এসেছো? রাজা ব্রাপেন জানতে চাইলেন।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল—আমরা স্থির করেছি যে সোনার খনির সন্ধান শুধু আপনাকে দেব।

—আরো তো দুই রাজা রয়েছে। ব্রাপেন বললেন।

—সোনার খনি উদ্ধারে তাদের কাছে কোন সাহায্য চাইবো না।

—সেটা সম্ভব নয়। উদিন্না পাহাড় ঐ দুই রাজা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে। রাজা ব্রাপেন বললেন।

—বলতে চাইছি—ঐ দুই রাজার অগোচরে আমরা সোনার খনি খুঁজবো উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তা কি পারবে? রাজা বললেন।

—আমরা রাতের বেলা খুঁজবো। কেউ জানতেও পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। ব্রাপেন ঘর থেকে চলে যেতে যেতে বললেন—সেনাপতিকে বলা আছে। উনি তোমাদের সবরকমভাবে সাহায্য করবেন।

—ধন্যবাদ আপনাকে। শাঙ্কো বলল। রাজা ব্রাপেন চলে গেলেন।

ফ্রান্সিস বিছানায় বসল। শাঙ্কোও বসল। এবার শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস।

—বল?

—এভাবে আগে থেকেই বলে সোনার খনির মালিকানা রাজা ব্রাপেনকে দিয়ে দিলে? শাঙ্কো বলল।

—উপায় নেই। ব্রাপেন আমাদের সব ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। তাঁকেই সোনার খনির অবস্থান জানাবো। সোনার খনির উদ্ধারের পর কাকে মালিকানা দেব এই নিয়ে অনেক ভাবতে হবে। সেই ভাবনাটা আগেই শেষ করে রাখলাম। এখন বুঝে শুনে এগোতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

—সমস্যাটা আছে একটা। সোনার খনি আছে উদিন্না পাহাড়ে। ঐ পাহাড়ের রাজা দুজন—আত্তারিয়া আর হুয়াল্লা। ব্রাপেন নিজে। সোনার খনির রহস্য মিটে গেলেও ব্রাপেন সব জেনেও কিছু করতে পারবে না। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। এটা ঠিক। কিন্তু সোনার খনির হদিশ পেয়ে ব্রাপেন রাজা হুয়াল্লার রাজত্ব আক্রমণ করবে। হুয়াল্লাকে যুদ্ধে হারাতে পারলে সোনার খনি ব্রাপেনের হাতের মুঠোয় এসে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি জেতে তবে তো। শাঙ্কো বলল।

—আছে আছে আরও পথ আছে। ব্রাপেন হুয়াল্লার সঙ্গের দল করবে। লক্ষ্য দুজনে মিলে রাজা আত্তারিয়ার রাজত্ব দখল করা। তখন সোনার খনি হাতে এসে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—সব জেনে হুয়াল্লা ঠিক সোনার খনির ভাগ চাইবে। তখনই হবে সমস্যা। দুই রাজার মধ্যে লড়াইও লেগে যেতে পারে। শাঙ্কো বলল।

—সেটা দুই রাজার ব্যাপার। ততদিন আমরা এখানে বসে থাকবো না। নিজেরা সব মিটিয়ে নিলে ভাল। তা না হলে লড়াই চলবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। শাঙ্কোও শুয়ে পড়ল।

—আসল কথা তো খনি উদ্ধার। তারপর অন্যসব কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—তা তো বটেই। এখন সোনার খনির খোঁজে নামতে হবে। আর দেরি করবো না। কালকেই চলো। দুপুরে খেয়েদেয়ে রওনা দেব। শাঙ্কো বলল। তারপর বলল—

—কয়েকটা দরকারি জিনিস তো নিতে হবে।

—হ্যাঁ। মোটা দড়ি দুটো তেলেভেজা মশাল চকমকি পাথর। ফ্রান্সিস বলল। রাতের অন্ধকারে আমাদের সব কাজ সারতে হবে।

—একটা শস্যটানা গাড়ি পেলে ভালো হয়। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। যাওয়া আসার ভাড়া দিলে মনে হয় ওরকম গাড়ি পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে দুজনে বেরুলো দড়িটড়ি কিনতে। সেসব কেনা হল। এবার একটা শস্যটানা গাড়ি। বাজারের কাছেই দেখল ওরকম দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কো গাড়োয়ানের কাছে গেল। গাড়োয়ান একজন এগিয়ে এল।

ফ্রান্সিস বলল—শোন ভাই আমরা দুজন আজ দুপুরে উদিন্না পাহাড়ে যাবো। তুমি নিয়ে যেতে পারবে?

—অতদূর যাবো। আমাকে আবার ফিরতে হবে তো। গাড়োয়ান বলল।

—তোমাকে যাওয়া আসার ভাড়া দেব। শাঙ্কো বলল।

গাড়োয়ানটি হেসে বলল—যাবো। তবে রাস্তায় খাওয়া দাওয়া—

—সব পাবে। একটা সোনার চাকতি দেব। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে আপনারা কখন আসবেন? গাড়োয়ান জানতে চাইল।

—দুপুরে খেয়ে দেয়ে। তুমি এখানে চলে এসো।

—ঠিক আছে। গাড়োয়ান মাথা কাত করে বলল।

দুজনে সৈন্যাবাসে ফিরে এল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দুপুরের খাওয়াটা তাড়াতাড়ি করল। দরকারি সব জিনিস নিল। সৈন্যদের ব্যবহারের জন্যে একটা চামড়ার থলি দেওয়া হয়। শাঙ্কো সেটাই দলপতির কাছে চাইল। দলপতি ওরকম থলি পাঠিয়ে দিল। থলিতে ভরা হল সব।

তখনই দলপতি ঘরে ঢুকল। বলল—তাহলে আপনারা যাচ্ছেন।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো বলল।

—কীভাবে যাচ্ছেন? দলপতি জানতে চাইল।

—রাজা হুয়াল্পার রাজত্বের মধ্যে দিয়ে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে কীসব খনিটনির কথা শুনলাম সেখানে যাবেন না? দলপতি জানতে চাইল।

—ন্নাঃ! এখন তো নয়। দেখি পরে সময় পেলে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে চলল বাজারের দিকে। বাজারে এসে দেখল গাড়োয়ান গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখে হাসল।

আগে গাড়িতে চামড়ার থলিটা রাখল। তারপর দু'জনে গাড়িতে উঠল। ফ্রান্সিস বলল—এরকম গাড়িতে একবার চড়বার প্রয়োজন পড়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে মনে হল গায়ের হাড়টার যেন খুলে গেছে।

—এটা তো শস্যটানা গাড়ি। এই গাড়িতে একমাত্র শস্যই থাকে। সেখানে মানুষ চড়লে তো বিপত্তি হবেই।

গাড়োয়ান গাড়ি ছেড়ে দিল। খোয়া ফেলা রাস্তা দিয়ে ঠকাম্‌ঠক্ শব্দ করতে করতে গাড়ি চলল।

সন্ধ্যের মুখে। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস—একটু নেমে দাঁড়াই। গায়ের সব হাড় ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ফ্রান্সিস হেসে উঠল। এখনও অনেকটা যেতে হবে। হয়তো আর নামাই হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—না না। রয়ে সয়ে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে যাবো। শাঙ্কো বলল।

—দেখা যাক কোন বাজার টাজার পাই কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই গাড়িটা একটা বাজারের কাছে এল। দুচারটে দোকান। সব দোকানে মোটা মোমবাতি জ্বলছে। শাঙ্কো বলল—গাড়োয়ান ভাই দেখো তো খাবারটাবার কিছু পাওয়া যায় কিনা।

গাড়োয়ান গাড়ি থামাল। নেমে খোঁজ নিতে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বলল—গোল কাটা রুটি আর মাংসের বড়া পাওয়া যাচ্ছে।

শাঙ্কো কোমর থেকে একটা ছোট সোনার চাকতি বের করল। গাড়োয়ানকে বলল—ছটা রুটি আর ছটা মাংসের বড়া আনো।

তিনজনেরই খিদে পেয়েছে বেশ। গাড়োয়ান পাতায় করে খাবার নিয়ে এলো। তিনজনেই গোগ্রাসে খেতে লাগল। শাঙ্কো নিচে নেমে ঘুরে ঘুরে খাবার খেল।

আবার গাড়ি চলল।

রাত হল।

ফ্রান্সিস বলল—রাত বেশি হবার আগেই খেয়ে নিতে হবে। বেশি রাত হলে কোথাও দোকান খোলা পাবো না।

গাড়ি চলল।

ফ্রান্সিস গাড়োয়ানকে বলল—ও ভাই—একটু নজর রেখো—কোথাও বাজার-টাজার দেখতে পাও কিনা।

গাড়ি চলল।

গাড়োয়ান বলল—সামনেই বেশ বড় বাজার।

—থামাও। শাঙ্কো বলল।

গাড়ি থামল। তিনজনেই নামল। বেশ বড় খাবারের দোকান পেল। দোকানে ঢুকল। বেশ ভিড়। একটা পাটাতনে বসল। দুটো করে সেদ্ধ ডিম আর মাখন দিয়ে ভাজা রুটি। সুস্বাদু খাবার। তিনজনেই পেট পুরে খেল।

সবাই গাড়িতে উঠল। আবার গাড়ি চলল।

সারারাত গাড়ি চলল। ঘোড়াটাকে খেতে দেওয়া হল।

পরের দিন দুপুর নাগাদ গাড়ি রাজা হয়াল্লার রাজত্বে পৌঁছল। ফ্রান্সিস দুপুরের খাওয়া খেয়ে এই গাড়িতেই উদিন্না পাহাড়ের তলায় যেতে চাইল। কিন্তু শাঙ্কো বলল—রেহাই দাও ভাই। আমি বাকি রাস্তা হেঁটে যাবো।

—বেশ তাই চলো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস গাড়ি থামাল। নামল দুজনে। ফ্রান্সিস গাড়োয়ানকে প্রাপ্য মূল্য দিল। গাড়োয়ান গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

দুজনে সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলল। বেশ বেলা হয়েছে। খিদেও পেয়েছে।

একটা বেশ বড় সরাইখানা পেল। ঢুকল দুজনে। সরাইওয়ালা ওদের দেখে বলল—আসুন। ভালো খাবেন, ভালো থাকবেন।

ওদের পাটাতনে জায়গা দেখিয়ে সরাইওয়ালা বলল—এখানে বিশ্রাম করুন। খাবেন তো?

—নিশ্চয়ই। একটু তাড়াতাড়ি। শাঙ্কো বলল।

দুজনে বসল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিসদের তাড়াতাড়িই খেতে দেওয়া হল।

দুজনেই পেট পুরে খেল।

পাটাতনে দুজনে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে শুয়েছিল। হঠাৎই চোখ খুলল। বলল—শাঙ্কো।

—বলো।

—এত ছুটোছুটি করছি। সোনার খনি খুঁজে পাবো? ফ্রান্সিস বলল।

—চেষ্টা তো করি। দেখা যাক। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

ঘরে নতুন একজন ঢুকল। শাঙ্কো মোমবাতির আলোয় দেখল রাজা ব্রাপেনের দলপতি। ব্যবসায়ীর পোশাকে। ফ্রান্সিস তখনও চোখ বুঁজে আছে। দেখে নি। শাঙ্কো দ্রুত উঠে বসল। দলপতি হেসে বলল—

—আমিও এখানে উঠেছি। দলপতির গলা শুনে ফ্রান্সিস চোখ খুলল। দলপতিকে দেখে ফ্রান্সিসও অবাক। দলপতি পাটাতনের বিছানায় বসল। বলল—সেনাপতিরই আসার কথা ছিল। উনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাকে আসতে হল।

—আপনি কেন এসেছেন? শুয়ে থেকেই ফ্রান্সিস বলল—

—মাননীয় রাজা বললেন—তোমাদের সঙ্গে থেকে তোমাদের সাহায্য করতে। দলপতি বলল।

—আমাদের সাহায্যের দরকার নেই। শাঙ্কো বলল।

—এ কি একটা কথা হল। আপনারা কত কষ্ট করে খনি আবিষ্কার করতে এসেছেন। আপনাদের সাহায্য না করলে চলে। দলপতি বলল।

—বলছি তো আমাদের আপনার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। ব্যাপারটা হল আপনারা আপনাদের কাজ করবেন। আমি শুধু দেখবো। খনি আবিষ্কার হলে কীভাবে সেটা করলেন এটা জেনে রাখা। আপনারাই বলেছেন খনির মালিকানা আমাদের মহামান্য রাজা ব্রাপেনকে দেবেন। দলপতি বলল।

—হ্যাঁ। বলেছি। সে কথা আমরা রাখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তবে আমাকে কেন সরিয়ে দিতে চাইছেন? দলপতি বলল।

—ঠিক আছে। চলুন আমাদের সঙ্গে। কিন্তু কোন কারণেই আমাদের বিরক্ত করবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

—না—না। আমি গাছের গুঁড়ির মত চুপ করে থাকবো। আমার শুধু জানার দরকার কীভাবে উদ্ধার করলেন। দলপতি বলল।

—হুঁ। যা বললাম, মনে রাখবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়ই। দলপতি বেশ জোর দিয়ে বলল।

এবার দলপতি বলল—আমার ঘোড়াটার দানা পানির ব্যবস্থাটা করে আসি। দলপতি চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল।

ফ্রান্সিস ও শাঙ্কো আর কোন কথা বলল না। দলপতি ভুঁড়ি ফুলিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। একটু পরেই নাক ডাকতে শুরু করল।

ফ্রান্সিস উঠে বসল। শাঙ্কোও উঠে বসল। ফ্রান্সিস বলল—এই অশ্বডিম্ব তো ঘুম থেকে উঠবেই না।

—আমি ঘুমোই নি। দলপতির ভাঙা গলা শোনা গেল।

ফ্রান্সিসরা হতবাক।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো আবার শুয়ে পড়ল। দলপতির নাক ডাকা বন্ধ হয়েছে।

ঘণ্টা খানেক পরে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো উঠে বসল। তৈরি হতে লাগল। কী করে দলপতি বুঝল সেটা। সে উঠে বসল। বলল—এখনই যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। শাঙ্কো বলল।

—দলপতি উঠে দাঁড়াল।

—কোথায় যাবেন? দলপতি বলল।

—আপনাকে বলেছি না যে চুপ করে থাকবেন। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে—ঠিক আছে। দলপতি মাথা এপাশ করে বলল।

শাঙ্কো চামড়ার থলিটা নিল। তিনজনে চলল। প্রায় দু'ঘণ্টা হাঁটার পর উদিন্না পাহাড়ের নিচে এল। রাস্তায় নেমেই ফ্রান্সিস লক্ষ্য করেছে চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। চারদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো ঘুরে দেখতে হবে কোন কোন গাছের ডাল আমি ভেঙে রেখেছি। ওরা খুঁজতে শুরু করল। পেল একটা বড় গাছ। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর থলে থেকে দড়ি বের করল। শাঙ্কোকে বলল—দড়িটার এক কোণা গাছটার কাণ্ডে জড়াও। শাঙ্কো তাই করল। ফ্রান্সিস দড়ির অন্য মুখ টেনে নিয়ে চলল। পাহাড়ের গায়ের পাথরের স্তূপের ওপর রাখল। কিন্তু এখানে ছোট ছোট পাথরই বেশি।

ফ্রান্সিস ফিরে এসে বলল—এখানে পাথরের চাঁই নেই। সবই ছোট পাথরের টুকরো।

ফ্রান্সিসরা আবার চলল পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে।

আবার চলা শুরু করল দুজনে। পেছনে দলপতি। দলপতি বুঝে উঠতে পারছে না ওরা এটা কী করছে। তবু কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে রইল।

আর একটা ডালভাঙা গাছ পাওয়া গেল। চেস্টনাট গাছ। গাছটার কাণ্ডে শাঙ্কো দড়ি ধরল। অন্য মুখটা নিয়ে ফ্রান্সিস পাহাড়ের ধারে হেঁটে হেঁটে উঠতে লাগল। তখনই ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল বেশ কয়েকটা বড় বড় পাথরের চাঁই আছে। ফ্রান্সিস দড়ির মুখটা নিয়ে প্রথমে পাথরের চাঁইয়ের ওপর উঠল। দড়িটা টান করে ধরে প্রথম পাথরের চাঁই পেল দুটো। তার প্রথমটায় একবার ধরল। কিন্তু দড়িটা বেঁকে যাচ্ছে। ঠিক সোজা সমান হচ্ছে না। আর কিছুটা উঠল। দেখল একটা ছোট চাঁই। দড়িটা সোজা করল ফ্রান্সিস। দড়িটা টানা লম্বালম্বি হল। এই চাঁইটা একেবারে চেস্টনাট গাছের সঙ্গে লম্বালম্বি।

তখনই ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। শাঙ্কো দলপতিকে ধরে টেনে গাছের আড়ালে নিয়ে গেল। ফ্রান্সিস পাথরের চাঁইটার ওপর শুয়ে পড়ল।

রাজা হুয়াল্পার দু'জন পাহারাদার ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল।

ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল—বোধহয় পাথরের চাঁইটা পেয়েছি। এখানে এসো। শাঙ্কো দড়ি নিয়ে এল। দলপতি এসে ওদের পেছনে দাঁড়াল। ঔৎসুক্য চেপে রাখতে পারল না। বলে ফেলল—শুধু তো দড়ি টানাটানি করছেন। সোনার খনি কোথায়? ফ্রান্সিস শাঙ্কো কোন কথা বলল না।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো পাথরের চাঁইয়ের খাঁজে ধরে পাথরের চাঁইটা তুলতে লাগল। কিছুটা তুললও। কিন্তু ছেড়ে দিতে হল। বেশ ভারি। এবার শাঙ্কো দলপতিকে বলল—হাত লাগান। দলপতি এগিয়ে এল। এবার তিনজনে মিলে চাঁইটা তুলতে লাগল। আস্তে আস্তে চাঁইটা উল্টে যেতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—একসঙ্গে টানো। সময় নিয়ে গলা একটু নামিয়ে বলে উঠল—ওল্টাও। পাথরের চাঁইটার ওপরে গোল চিহ্ন কুঁদে তোলা নেই।

তিনজনেই কমবেশি হাঁপাতে লাগল। শাঙ্কো বলল—আমাদের হিসেবে ভুল হয়ে গেছে।

—কোন জায়গায় ভুল হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী ভুল হয়েছে? শাঙ্কো বলল।

—সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—আবার দড়িটা গাছ থেকে লম্বালম্বি টানি। দেখা যাক কোন পাথরের চাঁইয়ের মাথায় দড়িটা লাগছে কিনা।

—বেশ। দেখ। শাঙ্কো বলল।

আবার গাছটা থেকে দড়ি টানা হল। আবার সেই উল্টে ফেলা পাথরের চাঁইয়ে এসে লাগল। কিন্তু সেই পাথরের বুকে কোন চিহ্ন নেই। ফ্রান্সিস বলে উঠল— নকশা দেখেই ভেবেছিলাম গাছ আর পাথরের চাঁইয়ের মধ্যে যোগ আছে। এছাড়া অন্য কোনভাবেই খনিতে পৌঁছোনো যাবে না।

—গাছটা কি আমরা ঠিক চিনেছি? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। নকশায় আঁকা হয়েছে একটা ছোট গাছ। কতদিন আগের কথা কে জানে। ছোট গাছটি আর ছোট নেই। অনেক বড় হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল। এবার দলনেতা বলল—এইসব এলাকায় দেখেছি এক ধরনের গাছ আছে যাদের বাড় নেই। ঐ পাঁচ ছয় হাত। তার বেশি কখনও বাড়ে না।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবল। তারপর মুখ তুলে বলল—সেই বামন গাছ কি এখানেও আছে?

—নিশ্চয়ই আছে। এই অঞ্চলেই আছে। অন্য কোথাও ঐ বামন গাছ দেখি নি। দলপতি বলল।

—আবার সব নতুন করে ভাবতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—অমনি বামন গাছ তো এখানেও থাকতে পারে। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস বলল—নিশ্চয়ই আছে। নকশায় একটা চারাগাছের মত গাছ আছে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর চাঁইয়ের ওপর দিয়ে নামতে নামতে বলল—চল সেই বামন গাছ খুঁজতে হবে।

তিনজনেই পাথরের চাঁই থেকে নেমে এল। পাহাড়ের ধার দিয়ে বামন গাছ খুঁজতে লাগল। একটা ছোট গাছ পেল। ফ্রান্সিস দলপতিকে জিজ্ঞেস করল—এটা কি বামন গাছ?

দলপতি দেখেটেখে বলল—না। আরো দেখুন।

চলল বামন গাছের খোঁজ। একটা ছোট গাছ একটু দূর থেকে দেখে শাঙ্কো বলে উঠল—ঐ যে বামন গাছ। রাস্তার ধারে।

ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। গাছটা দেখল। এবার নিশ্চিত হল। এটা একটা বামন গাছ। পাতা ঝরে গেছে। শুকনো ডালগুলো উঁচিয়ে আছে। ফ্রান্সিস একবার চোখ বুঁজল। চোখ খুলে বলল—নকশায় ঠিক এরকম গাছই আঁকা। শাঙ্কোকে ডেকে বলল—এই গাছটায় দড়ির একটা দিক ধর। শাঙ্কো তাই করল। ফ্রান্সিস দড়ি টেনে নিয়ে চলল। পাহাড়ের ধারে উঠল। মাত্র একটা বড় পাথরের চাঁই পেল। বাকি সব ছোট ছোট পাথরের টুকরো।

ফ্রান্সিস পাথরের চাঁইটা ঘুরে ঘুরে দেখল। তারপর দড়িটা রেখে পাথরের চাঁইটায় হাত লাগাল। শাঙ্কোও হাত লাগাল। দুজনে চাঁইটা ওঠাবার চেষ্টা করল। পারল না। একটু উঠেই চাঁইটা পড়ে গেল।

দলপতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

শাঙ্কো দলপতিকে বলল—আসুন। হাত লাগান। হাতে ধুলো না লাগিয়ে সোনার খনি পাবেন তা হয় না। দলপতি এল। এবার তিনজনে মিলে পাথরের চাঁইটা টানল। আস্তে আস্তে পাথরের চাঁইটা শব্দ করে উঠে গেল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল স্পষ্ট কুঁদে-তোলা দাগ। ঠিক চিহ্নটা পাওয়া গেল।

এবার ফ্রান্সিস চামড়ার ঝোলা থেকে চকমকি পাথর বের করল। একটা মশালও বের করল। অন্য মশালটা শাঙ্কোকে দিল। বেশ হাওয়া বইছিল। তার মধ্যেই ফ্রান্সিস চক্‌মকি ঠুকে আগুন জ্বালল। মশাল জ্বলে উঠল। শাঙ্কোর হাতের মশালটাতেও আগুন ধরিয়ে দিল।

ফ্রান্সিস দড়ির এক মাথা কোমরে বাঁধল। তারপর জ্বলন্ত মশালটা গুহার অন্ধকার গর্তে ছুঁড়ে দিল। একটু ভেতরে মশালটা পড়ল। দেখা গেল গুহামত। একজন মানুষ ঢুকতে পারে এরকম গুহা।

ফ্রান্সিস গুহামুখ দিয়ে নামতে লাগল। মশালটার কাছে পৌঁছে আবার মশালটা ছুঁড়ল। মশালটা পড়ে গেল। ফ্রান্সিস বুঝল মশালটা নিচে কোথাও পড়ে গেল। নিশ্চয়ই নিচে গহ্বরমত কিছু আছে। ফ্রান্সিস বুক দিয়ে প্রায় হিঁচড়ে টেনে চলল। বুকে পিঠে এবড়ো খেবড়ো পাথরের গা লাগছে। কেটেও গেছে বোধহয়।

কিছুটা এগোতেই দেখল গুহা। নিচে একটা গোলামত জায়গা। মশালটা ওখানেই পড়েছে। ফ্রান্সিস গুহামুখ থেকে বেরিয়ে গোলমত জায়গাটায় নামল। বেশি নিচে নয়।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ হাঁপালো। ততক্ষণে শাঙ্কোও নেমে এল। দলপতি নামল না। অবশ্য দলপতি ওর ভুঁড়ি আর মোটা শরীর নিয়ে গুহার মধ্যে দিয়ে আসতে পারতো না। তাই ও নিজেই সাহস করে নামেনি।

দুজনে জ্বলন্ত মশাল তুলে ধরল। দেখা গেল ডানপাশে একটা বড় ঘরের মত জায়গা। দুজনে মশাল নিয়ে সেখানে ঢুকল। দেখল একপাশে স্তূপীকৃত পিণ্ডের মত। একটা পিণ্ড তুলে নিল ফ্রান্সিস। একটা পিণ্ড তুলল। মশালের আলোয় পাথরের গায়ে সোনালি গুঁড়ো চিক্ চিক্ করে উঠল। বুঝল—পাথরের গায়ে গুঁড়ো সোনা। এইসব পাথরের গায়ের সোনা পাথর গালিয়ে বের করা হয়।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—শাঙ্কো এইসব পাথর গালালেই সোনা পাওয়া যাবে।

পাথরের স্তূপ দেখে ডানদিকে ঘুরল। দেখল সোনার পিণ্ড ডাঁই করে রাখা। মশালের আলো পড়তে পিণ্ডমত সোনা চিক্‌চিক্ করে উঠল।

শাঙ্কো হেসে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। ফ্রান্সিস বলে উঠল—কী পাগলামি করছো। এখানে সামান্য শব্দ হলেও ওপরে শোনা যাবে।

—এখন কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—ওপরে উঠবো।

—এত সোনা—নেবে না? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। জামা খোল। জামায় যতগুলি পিণ্ড নেওয়া যায় ততটাই নাও।

দুজনে জামা খুলল। সোনার পিণ্ডমত যা পাওয়া গেল তাই খোলা জামায় বেঁধে দিন।

দুজনে মশাল নিয়ে গুহামুখের দিকে চলল। মশাল ছুঁড়ে দিয়ে প্রথমে ফ্রান্সিস গুহায় ঢুকল। মশালের কাছে গিয়ে আবার ছুঁড়ে দিল মশালটা। সেই আলোয় বুক পিঠ বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল। গায়ে জামা নেই। এবড়ো খেবড়ো পাথরের ঘষা খেল। কেটে গেল পিঠ বুক। রক্ত পড়তে লাগল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দুজনেরই এক হাল।

গুহামুখ থেকে দুজনে বেরিয়ে এল। দেখল ওল্টানো পাথরে দলপতি বসে আছে। ওরা উঠতেই দলপতি এগিয়ে এল। বলল—সোনার খনি পেয়েছেন?

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। সোনার একটা পিণ্ড জামার পুঁটুলি থেকে বের করে দলপতিকে দিল। চাঁদের আলোয় সোনার পিণ্ডটা ঝিক্‌মিক্ করে উঠল। দলপতির মুখ হাঁ।

ফ্রান্সিস বলল—এখানেই পিণ্ডগুলো চামড়ার ঝোলায় ঢেলে রাখা। দুজনেই চামড়ার ঝোলায় সব সোনার পিণ্ড ঢেলে রাখল। ফ্রান্সিস একটা সোনার পিণ্ড দলপতিকে দিল। বলল—জামার ভেতরে রাখুন। দলপতি খুশিতে লাফিয়ে উঠল।

—এবার পাথরের চাঁই ওল্টাতে হবে। হাত লাগাও। ফ্রান্সিস বলল।

তিনজনে পাথরের চাঁইটা ঠেলে তুলে গুহামুখে উল্টে রাখল। গোল দাগটা ঢাকা পড়ে গেল।

ফ্রান্সিস দলপতিকে বোঝাল—গুহার মুখটা পাথরের চাঁই দিয়ে ঢেকে দিলাম। গোল দাগটা দেখা যাবে না। আমরা ঐ গুহামুখ থেকে গুহা পার হলাম। বেশ সরু গুহা। তবে বুক দিয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে যাওয়া যাবে। তারপরেই একটা বড় জায়গা। একটা বেশ বড় ঘরের মত। প্রথমে পাওয়া যাবে স্তূপীকৃত সোনা মেশানো পাথর। সেইগুলো আর এক দফা গলালে সোনা পাওয়া যাবে। অঢেল সোনা।

ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল—বাঁদিকে একটা ঘরমত পাবেন। ওখানে পাথরগুলো থেকে সোনার পিণ্ড তৈরি করে রাখা হয়েছে। স্তূপীকৃত পড়ে রয়েছে সেইখান থেকে আমরা কিছু সোনার পিণ্ড নিয়েছি। এখানে অসংখ্য সোনার পিণ্ড পাবেন। এই হল সোনার খনির রহস্য।

দলপতি মুখ হাঁ করে শুনল।

—সরাইখানায় চলো। ফ্রান্সিস বলল। ভোর হল। ভোরের নিস্তেজ রোদ ছড়ানো চারপাশে। একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল।

ফ্রান্সিস গাছটার কাণ্ড থেকে বাঁধা মোটা দড়িটা খুলে নিয়ে ঐ গাছটার তলাতেই বসল। চকমকি পাথর মশাল সব গাছটার নিচে রেখে দিল। তারপর গাছটার একটা ভাঙা ডাল দেখিয়ে বলল—একটা ডালভাঙা গাছ। এটা দেখলেই বুঝবেন এখানেই আছে সোনার খনি। একটু হেসে বলল—

—চলো—সরাইখানায় যাবো।

তিনজনে চলল শহরের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরে এলো।

সরাইখানায় উঠল।

সকালের খাবার খেতে খেতে শাঙ্কো দলপতির দিকে তাকিয়ে বলল—এখন আপনি কী করবেন?

—দুপুরের খাবার খেয়ে আমি আমার রাজত্বে চলে যাবো। এখানে কী কী করেছি গুপ্ত সোনার খনি আপনারা কীভাবে পেলেন—সেসব মহামান্য রাজাকে বলবো। তারপর মহামান্য রাজা যা করতে চান করবেন। আমার কর্তব্য এইটুকুই ছিল। তা আমি পালন করেছি। দলপতি বলল।

ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো—আমরা কী করবো। যে কাজটা করবো বলে স্থির করেছিলাম তা তো হয়ে গেল।

—চলো আমরাও দুপুর নাগাদ বেরিয়ে পড়ি। একটা শস্যটানা গাড়ি পেলে ভালো হত। খুব তাড়াতাড়িই গ্যালিগস বন্দর শহরে পৌঁছে যেতাম।

—না-না, মাফ কর ফ্রান্সিস। শস্যটানার গাড়িতে আমি আর উঠছি না। কী অবস্থা হয়েছিল আমার। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—ঠিক আছে—হেঁটে চল। কিন্তু অনেক দেরি হবে পৌঁছোতে।

—হোক। গাড়িতে যাবো না। শাঙ্কো বলল।

—বেশ বাবা তাই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরের খাওয়া খেল তিনজনে। ফ্রান্সিসরা একটু শুয়ে বসে বিশ্রাম করল। দলপতি আর বসল না। নিজের দেশের দিকে রওনা হল। ঘোড়াটা এক ছোকরা নিয়ে এল। সেনাপতি তাকে কিছু মূল্য দিল।

—আপনার রাজাকে বলবেন সোনা বিক্রি করে উনি অনেক অর্থ পাবেন। ঐ সব অর্থ দিয়ে গরীব প্রজাদের উন্নতির জন্য ব্যয় করবেন। দলপতি হেসে বলল—বলবো। দলপতি ঘোড়ায় উঠলেন। উত্তরমুখো ঘোড়া ছোটাল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্রান্সিসরাও তৈরি হল। সব গোছগাছ করে রাস্তায় এলো। শেষ দুপুরে রওনা হল গ্যালিগস বন্দর শহরের দিকে।

বেশ রাত তখন। ফ্রান্সিসদের ভাগ্য ভাল। একটা ছোট বাজারমত পেল। একটি দোকানে রুটি মধু পেল। দুজনে পেট পুরে রুটি খেল। দারুণ খিদে পেয়েছিল। খিদে মিটল। রাতের খাওয়াটা হয়ে গেল। খেয়েটেয়ে শাঙ্কো বলল—চলো দেখি— রাতে কোথাও থাকার জায়গা পাওয়া যায় কিনা। এই দোকান সেই দোকানে জিজ্ঞেস করল। একজন দোকানদার বলল—একটু দূরে একটা ওক গাছের নিচে একটা মাংস ডিমের দোকান আছে। ওরা কিছু মূল্যের বিনিময়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। গিয়ে দেখুন।

মুরগী ডিমের দোকান খুঁজে পেল। দোকানদারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দোকানদারের চেহারা লিকলিকে। কিন্তু গলার স্বর গম্ভীর। বলল—কী চান? মুরগী না ডিম।

—আমরা কিছুই চাই না। শুনলাম আপনার কাছে নাকি খালি ঘরটর আছে। অর্থের বিনিময়ে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা রাত কাটাবার জায়গা পাচ্ছেন না—এই তো। দোকানি বলল।

—হ্যাঁ। মড়ার মত ঘুমোবো। কারো কোন অসুবিধার সৃষ্টি করি না।

—ঘুমের মধ্যে নাক ডাকো? দোকানি বলল।

—না। শাঙ্কো মাথা নাড়ল।

—বলছেন। কিন্তু নাক ডাকলেই বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। দোকানি বলল।

—বেশ তো। শাঙ্কো হেসে বলল।

—তাহলে আসুন। দোকানি বলল।

দোকানদার দোকানের পেছনে এল। দোকানের লাগোয়া একটা ঘর। বুনো খড়ে তৈরি।

ঘরের মধ্যে ঢুকল দোকানি। মোমবাতির আলোয় দেখা গেল তিন চারজন লোক শুয়ে বসে আছে। ওপাশটা খালি। ওখানে দুটো কাঠের পাটাতন পাতা। জায়গাটা দেখল। দোকানদার গম্ভীর গলায় বলল—এই জায়গাটায় থাকবেন। ভাড়াটা আগে দিন। দুটো লোক ভাড়া না দিয়ে শেষ রাতে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে আমি অগ্রিম নেওয়া শুরু করেছি।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল। কোমরের ফেট্টি থেকে দুটো ছোট সোনার চাকতি বের করল। দোকানিকে দিল। দোকানি খুব খুশি। সাধারণত রুপোর চাকতি দেয় সব। এ একেবারে সোনার চাকতি। দোকানি চলে গেল।

ঘরের মেঝেয় রাখা কয়েকটা কাঠের পাটাতন। দুজনে পাটাতনের ওপর বসল। তারপরে ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল।

ওরা কিছুক্ষণ পরে দোকানির কাছ থেকে জল চেয়ে খেল। তারপর শুয়ে পড়ল।

দুজনেই অত্যন্ত ক্লান্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল ফ্রান্সিসের। শাঙ্কো তখনও ঘুমিয়ে। ফ্রান্সিস আর ওকে ডাকল না। ঘুমোক। কিছুক্ষণ পরে শাঙ্কোর ঘুম ভাঙল। উঠে বসল। হাতমুখ ধুল দুজনে। তারপর সকালের খাবার খেতে চলল। সামনের দোকানেই পেল মাছভাজা আর আধ হাত লাঠির মতো রুটি। দুজনে বেশ ভালোই খেল।

ওরা আর দাঁড়াল না। মুরগীর দোকান থেকে জিনিসপত্র নিয়েই এসেছিল। দুজনে চলা শুরু করল। দুপুরে এক চাষীর বাড়িতে অতিথি হল। পেট পুরে রুটি আনাজের ঝোল খেল।

সন্ধ্যেবেলা। ফ্রান্সিস বলল—একটু রাতে বাজার টাজার গেলে রাতের খাওয়া খাবো। তারপর সারারাত হাঁটবো। রাতে যাবার কোন সমস্যা হবে না।

—শরীর অত ধকল সহ্য করতে পারবে? শাঙ্কো বলল।

—খুব পারবে। জাহাজে পৌঁছে পাক্কা দুই দিন শুধু খাবো আর ঘুমুবো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে যখন গ্যালিগস বন্দর শহরে পৌঁছল তখন বেশ রাত। দুজনে জাহাজঘাটায় এল। ওদের জাহাজটা যেখানে দেখে গিয়েছিল সেখানেই আছে।

জাহাজের কাছে এসে দেখল পাটাতন তুলে রাখা হয়েছে। সমুদ্রের পার থেকে শাঙ্কো দুহাতের চেটো গোল করে ডাকল—হ্যারি, বিস্কো। জাহাজে কারো কোনো সাড়া নেই। আবার ডাকলো। সাড়া নেই। শাঙ্কো পথ থেকে একটা ইটের টুকরো তুলে জাহাজ লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। জাহাজের গায়ে লেগে ঢিলটা জলে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস বলল—দাঁড়াও—জাহাজের ডেক-এ ঢিল ফেলতে হবে। রাত হয়েছে। গরমের দিন। কেউ না কেউ ডেক-এ নিশ্চয়ই শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস ঢিল তুলে ছুঁড়ল। ঠিক ডেক-এই পড়ল ঢিলটা। কারো গায়ে লেগেছে নিশ্চয়ই। কার চিৎকার শুনল—কে রে ঢিল ছোঁড়ে।

শাঙ্কো চিৎকার করে বলল—রেলিঙের ধারে আয়। নইলে আবার ঢিল ছুঁড়বো।

ভাইকিং বন্ধুদের কয়েকজন রেলিং-এর কাছে এল। শাঙ্কো আবার চিৎকার করে বলল—ফ্রান্সিস আর আমি এসেছি। পাটাতন পেতে দে।

এইবার ভাইকিংরা বুঝল ফ্রান্সিস শাঙ্কো ফিরে এসেছে। ওরা চিৎকার করে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। জাহাজের রেলিং-এর ধারে ভিড় করে দাঁড়ালো ওরা। পাটাতন পেতে দেওয়া হল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো পাটাতন দিয়ে হেঁটে ডেক-এ উঠে এল। আবার ধ্বনি উঠল—ও—হো—হো।

বন্ধুরা কেউ কেউ ছুটে এসে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোকে জড়িয়ে ধরল।

মারিয়া ফ্রান্সিসের কাছে এল। মুখ চোখ শুকনো। চোখের নিচে কালচে ভাব। শরীরও কিছুটা শীর্ণ। ফ্রান্সিস সবই দেখল। বলল—আমি অভিযানে বের হলে তুমি যদি ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করে ফেল তাহলে আমাকে তো এখন দেশে ফিরে যেতে হয়।

—আর দুশ্চিন্তা করবো না। এখন থেকে মন শক্ত করবো। মারিয়া আস্তে বলল।

দুজনে কেবিনঘরের দিকে চলল। ফ্রান্সিস যেতে যেতে রাঁধুনি বন্ধুকে পেল। বলল—প্রায় উপোস করে আছি। যা হোক কিছু খেতে দাও। শাঙ্কোকেও দিও।

ওদিকে শাঙ্কো তখন বন্ধুদের কাছে হাত পা নেড়ে ওদের স্বর্ণখনি অভিজ্ঞতার কথা বলছে।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া নিজেদের কেবিনঘরে এল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসল। বলল—একবার শাঙ্কোর কাছ থেকে চামড়ার ঝোলাটা নিয়ে এসো তো। মারিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

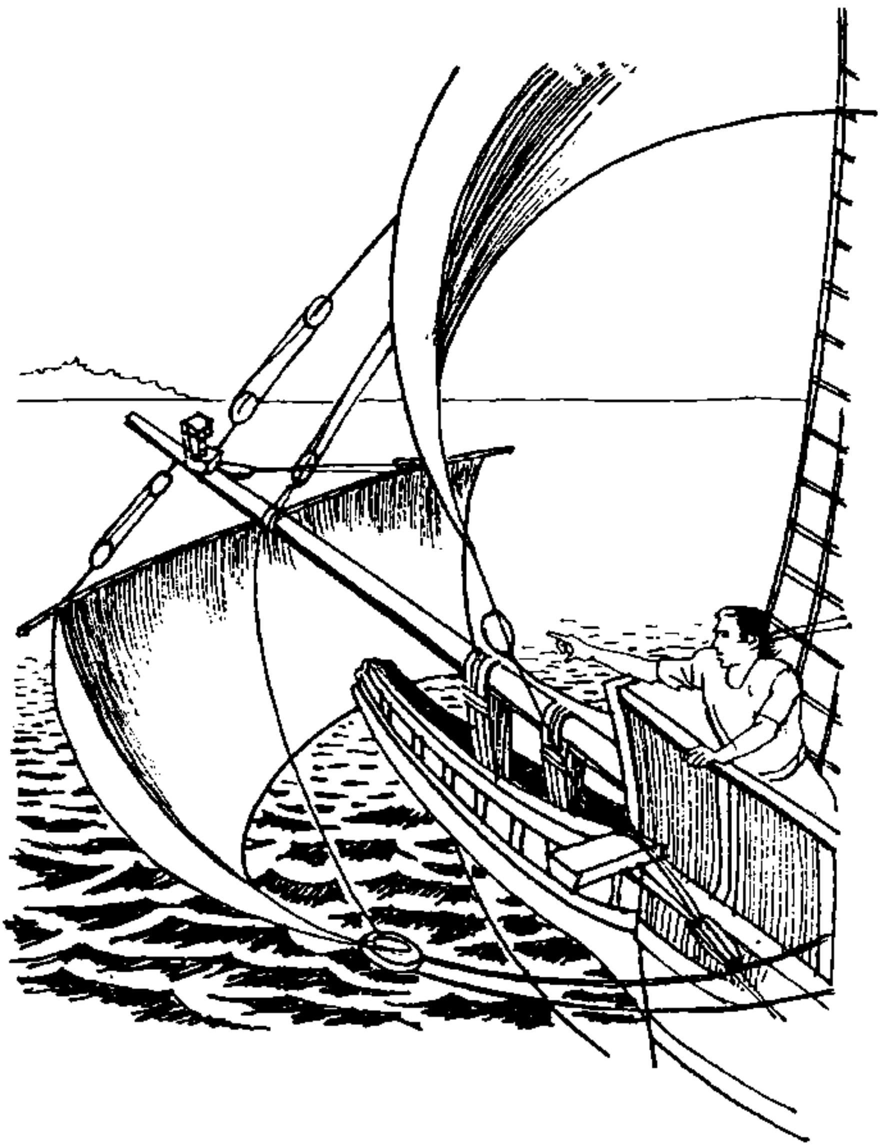
একটু পরে ঝোলাটা নিয়ে এল। ফ্রান্সিস হাত ঢুকিয়ে একটা সোনার পিণ্ড তুলল। মারিয়া অবাক হল না। এরকম গুপ্তধন ও আগেও দেখেছে। ফ্রান্সিস বলল—এই স্বর্ণভাণ্ডারের কে মালিক জানতে পারিনি। কাজেই কিছু সোনার পিণ্ড আমরা নিয়ে এলাম।

—কীভাবে আবিষ্কার করলে?

—সেটা শোন। আসলে ওটা ছিল সোনার খনি। সোনার গুঁড়ো মেশানো পাথর গালিয়ে সোনা বের করা হত।

তারপরে ফ্রান্সিস সোনার খনির কথা বলতে লাগল। মারিয়া সেই উদ্ধারের কাহিনী শুনতে লাগল।

হীরক সিন্দুকের সন্ধানে



হীরক সিন্দুকের সন্ধানে

তখন সকাল হয়েছে। নজরদার পেড্রো মাস্তুলের মাথায় ওর জায়গা ছেড়ে নিচে নেমে এল। চলল ফ্রান্সিসের কাছে।

পেড্রো ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের দরজায় টোকা দিল। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়েই বলল—এসো। পেড্রো ঢুকল। বলল—ফ্রান্সিস—একটা অদ্ভুত ঘটনা।

—কী ঘটনা? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—এরকম ঘটনা। ভয়ের কথা।

—সোজা বল না বাপু—ঘটনাটা কী?

—এখানে ছোট্ট বন্দর মত দেখলাম।

—আরো জাহাজ নোঙর করে আছে?

—হ্যাঁ। তবে একটা মাত্র জাহাজ।

—বেশ এবার বলো।

—কী আর বলবো। অদ্ভুত ঘটনা।

ফ্রান্সিস এবার সত্যিই রেগে গেল। গম্ভীর স্বরে বলল—এখনও বলো অদ্ভুত ঘটনাটা কী? নইলে বিদেয় হও।

—মাস্তুল থেকে দেখলাম একটা ছোট জাহাজ নোঙর করা আছে। অদ্ভুত ব্যাপারটা হল জাহাজটায় জনপ্রাণী নেই। মানুষ তো দূরের কথা একটা ঘোড়াও নেই।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল—হয়তো বন্দরে নেমে খেতে টেতে গেছে।

—আমি ঘণ্টা পাঁচেক এক নাগাড়ে নজর রেখেছি। কেউ জাহাজটায় উঠলোও না নামলোও না।

—হ্যাঁ, এটা একটু ভাববার কথা। ফ্রান্সিস বলল—তবে ভয় পাওয়ার মত কিছু নয়।

—তাহলে কী করবে এখন? পেড্রো বলল।

—ঐ জাহাজটায় যেতে হবে। কী ব্যাপার সেটা জানতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কে কে যাবে? পেড্রো জানতে চাইল।

—হ্যারি আর শাঙ্কোকে ডাকো। ওরাই যাবে। জাহাজের লোকদের সঙ্গে কথা বলবে—জানবে আমরা কোথায় এলাম।

পেড্রো হ্যারি আর শাঙ্কোকে ডাকতে গেল।

একটু পরেই হ্যারি আর শাঙ্কো এল। হ্যারি বলল,

—কী ব্যাপার ফ্রান্সিস?

—পেড্রো একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছে। তীরের কাছে একটা জাহাজ নোঙর করে আছে। পেড্রো দেখেছে জাহাজটা থেকে কোন মানুষ বেরোয় নি, ঢোকেও নি। জাহাজে কোন জনপ্রাণী নেই।

হ্যারি ব্যাপারটা ভাবল। বলল—ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুতই। এখন আমরা কী করবো?

—জাহাজটায় যেতে হবে। লোকজন আছে কিনা দেখতে হবে। যদি কাউকে পাওয়া যায়। তাহলে বুঝতে পারবো দেশের দিকে যাচ্ছি কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কোকে নিয়ে যাবো। হ্যারি বলল।

—তাই যাও। এখনই যাও। দেরি করো না। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এই ব্যাপারটা কী হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। জাহাজটায় গিয়ে উঠলেই সঠিক জানা যাবে—রহস্যটা কী।—ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কোকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। হ্যারি বলল।

কিছু পরে হ্যারি আর শাঙ্কো তৈরি হয়ে এল। দড়ির মই দিয়ে ছোট নৌকোয় নামল। শাঙ্কো নৌকো চালাল জাহাজটার দিকে।

জাহাজটার কাছে আসতে বেশি দেরি হল না। শাঙ্কো নৌকোটা জাহাজের গায়ে লাগাল। হালের কাছে দড়ি ধরে শাঙ্কো আগে উঠল। পেছনে উঠল হ্যারি।

জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। সবকিছুই মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হ্যারি দেখল জাহাজের মাথায় পোর্তুগালের পতাকা উড়ছে। তার মানে পর্তুগীজদের জাহাজ।

প্রথমে হ্যারি জাহাজটার ডেকে উঠে এল। হ্যারি আশ্চর্য এক দৃশ্য দেখল। জাহাজের ডেক-এ পাঁচ-সাতজন জাহাজী শুয়ে আছে। শাঙ্কোও উঠে এসে এই দৃশ্য দেখল। দুজনেই অবাক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সবাই মৃত। মৃত জাহাজীদের গায়ে পোর্তুগীজ পোশাক। বোঝা যাচ্ছে সবাই পোর্তুগীজ। কিন্তু ওদের শরীরে কোথাও অস্ত্রাঘাত নেই। শাঙ্কো মৃতদেহগুলোর কাছে গেল। না। ওদের গায়ে কোথাও রক্ত লেগে নেই। তাহলে ওরা কিভাবে মারা গেল?

হ্যারি বলল—শাঙ্কো—বোঝা যাচ্ছে না এরা কিভাবে মারা গেল! আশ্চর্য ব্যাপার।

—এখন কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—চলো। তীরে নামি। লোকজনের দেখা পাই কিনা। হ্যারি বলল।

হ্যারি আর শাঙ্কো জাহাজ থেকে নৌকোয় নামল। একটু এগিয়ে তীরভূমিতে এল। চলল পায়ে চলা পথ ধরে। হাঁটতে হাঁটতে হ্যারি বলল—শাঙ্কো—একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো?

—কী? শাঙ্কো বলল।

—এই মৃতদের সবারই মুখচোখ খুব ফোলা। এর কারণ বুঝছি না। হ্যারি বলল।

—যে অসুখে ওরা মারা গেছে, সেটা একই অসুখ। শাঙ্কো বলল।

হ্যারি বলল—এখন জানা দরকার ঐ প্রাণঘাতী অসুখটা কী?

পায়ে চলা রাস্তাটা বনভূমিতে ঢুকেছে। ওরা বনে ঢুকল। এতদূর আসার সময় কোন ঘরবাড়ি দেখল না।

বন থেকে বেরিয়ে এসে সামনেই দেখল দু'তিনটে পাথরের বাড়ি। ওপরে শুকনো গাছের আচ্ছাদন।

সামনের প্রথম বাড়িটার কাছে গেল ওরা। দরজায় টোকা দিল। কিন্তু ভেতরে কোন সাড়াশব্দ নেই। শাঙ্কো আবার টোকা দিল। ভেতর থেকে কোন সারা শব্দ পাওয়া গেল না।

হ্যারি এগিয়ে এসে দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। আলোছায়ার মধ্যে দিয়ে দেখল—বিছানায় দুজন নারী পুরুষ শুয়ে আছে। একটা ছেলেও পাশে শুয়ে আছে। দেখে বোঝা গেল—এরা সবাই মৃত। হ্যারি কাছে গিয়ে দেখল—সবারই মুখ ফোলা। তাহলে জাহাজে আর এখানে সবাই একই অসুখে মারা গেছে।

দুজনে বেরিয়ে এল। হ্যারি বলল—চলো ঐ বাড়িটায় যাই। অন্য একটা বাড়িতে ওরা এল। দরজা খোলা। দেখল তিনটি বড় মানুষ আর একটি শিশু মরে পড়ে আছে। এদেরও মুখচোখ ফোলা। কী অসুখ হয়েছিল এদের? হ্যারি ভাবল। শাঙ্কোকে বললোও কথাটা।

আরও কয়েকটা পাথরের বাড়ি এদিকে ওদিকে আছে। হ্যারি বলল—শাঙ্কো কী করবে?

—বোঝাই যাচ্ছে—এক মারাত্মক অসুখে এখানে থাকতো যারা তারা সবাই মারা গেছে।

—ঠিক। যে বাড়িতেই যাবো সেখানেই মৃত মানুষ দেখবো। চলো জাহাজে ফিরি। ওরা ঘরের বাইরে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তখনই ঘরটার অন্ধকার কোণা থেকে একটা বড় আকারের মাছি উড়ে এল। হ্যারির ঘাড়ে বসল। হ্যারি মাছিটাকে দেখল। মাছিটার সারা শরীর গভীর নীল। পাখা কালো। হ্যারি হাত দিয়ে মাছিটা তাড়াতে গেলে তখনই মাছিটা হুল ফোটাল। ছুঁচ ফোটার মত লাগল। হ্যারির ঐ হুল ফোটানো জায়গাটা অবশ হয়ে গেল। হ্যারি চেঁচিয়ে

বলল—শাঙ্কো জলদি। পালাও। হ্যারি এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মাছিটা শাঙ্কোর দিকে দ্রুত উড়ে এল। শাঙ্কো এক লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে এল। দেখল মাছিটা অন্ধকার কোণায় উড়ে যাচ্ছে।

—পা চালাও। হ্যারি বলল। দুজনে ছুটে চলল সমুদ্রতীরের দিকে।

নৌকো বেয়ে ওরা জাহাজে উঠল। ফ্রান্সিস রেলিঙে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। সঙ্গে মারিয়া। হ্যারি আর শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। দুজনেই একটু হাঁফাচ্ছে তখন। হ্যারি যা যা ঘটেছে বলল। অবশেষে বলল—পেটটা নীল, পাখা কালো এরকম মাছি আমি কখনও দেখিনি। এগুলোর হুলও আছে। আমাকে ঘাড়ের কাছে হুল ফুটিয়েছে। জায়গাটা অসাড় হয়ে গেছে।

—এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার। তুমি এখন কেমন বোধ করছো? ফ্রান্সিস বলল।

—অসাড় ভাবটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। ভীষণ দুর্বল লাগছে। ফ্রান্সিস পাশে দাঁড়ানো বিস্কোকে বলল—ভেনকে ডেকে আনো। একটু পরেই ভেন এল। হ্যারিকে জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে ওর শরীরটা টিপে টিপে দেখল। নাড়ি টিপে দেখল। বলল—হ্যারির শরীর গরম। জ্বর আসছে। কথা হচ্ছে; তখনই হ্যারি আস্তে আস্তে ডেক-এ বসে পড়ল।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। হ্যারিকে কেবিনঘরে জড়িয়ে ধরে নিয়ে চলল। ভেনকে বলল—ভেন কেবিনঘরে চল। হ্যারিকে ওষুধ দাও।

ভেন বলল—ওষুধ নিয়ে আসছি।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো হ্যারিকে ধরে ধরে ওর কেবিনঘরে নিয়ে এল।

হ্যারি আর বসে থাকতে পারল না। শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসরা কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ঐ কেবিনঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল। মারিয়াও ছিল তাদের মধ্যে।

ভেন ওর ওষুধের বোয়াম পুঁটুলি এসব নিয়ে এল। ভেনকে মাছির হুলের কথা বলা হয়নি। হ্যারি বুঝল ভেনকে এটা জানানো দরকার। হ্যারি বলল—ভেন একটা বাড়িতে ঢুকেছিলাম। অন্ধকার কোণা থেকে একটা বেশ বড় নীলরঙের মাছি উড়ে এসে আমাকে হুল ফুটিয়েছিল।

—এটা তো আগে বলোনি। ভেন বলল।

—বিশেষ গুরুত্ব দিই নি। হ্যারি বলল।

—না-না। ওটাই আসল কথা। এই জ্বর দুর্বলতার কারণ ঐ নীলমাছি।

ভেন কিছুক্ষণের মধ্যেই ওষুধ বানাল। ফ্রান্সিসকে বলল—তিনটে বড়ি দিলাম। এখন একটা খাইয়ে দাও অন্য দুটি দুপুর রাতে খাওয়াবে। মারিয়া এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসকে বলল—ওষুধ আমাকে দাও। আমি খাওয়াবো। ফ্রান্সিস মারিয়াকে বড়ি তিনটি দিল।

মারিয়া জল এনে একটা হলুদ রঙের বড়ি হ্যারিকে খাওয়াল। হ্যারির কপালে গলায় হাত দিয়ে দেখে বলল—জ্বর আছে।

ভেন চেটে খাওয়ার জন্যে মারিয়াকে ওযুধ দিল। তারপর বলল—হ্যারির মাথায় জল দিতে হবে। জ্বর কমাবার জন্যে। মারিয়া বলল—বালতি আর বড় গ্লাশ জোগাড় করতে।

ভেন বেশ আস্তে বলল—ফ্রান্সিস বাইরে এসো। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। দেখল—হ্যারি চোখ বুঁজে শুয়ে আছে।

ঘরের বাইরে এসে ভেন বলল—হ্যারিকে মারাত্মক নীলমাছি হুল ফুটিয়েছে। হ্যারির বাঁচবার আশা নেই।

—বলো কি? ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল।

—হ্যারিরা জাহাজে, বাড়িতে মৃত মানুষ দেখেছে; সবাই এই নীলমাছির হুল ফোটানোর জন্যে মারা গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস দু'হাতে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে উঠল। ভেন বলল—একটা ব্যাপার বলা যায় যে হ্যারিকে একটা নীলমাছি একবারই হুল ফুটিয়েছে দুবার হুল ফোটালে এতক্ষণে মারা যেত। হ্যারির ওযুধগুলো খাইও। এখন ওষুধ কতটা কাজ করে তাই দেখার।

—তবে কি হ্যারি সুস্থ হবে?

—দেখা যাক। আমার কয়েকটা কথা জানার আছে। তুমি শাঙ্কোকে পাঠিয়ে দাও। মুখ চোখ মুছে যাও। তুমি কেঁদেছো এটা হ্যারি যেন না বুঝতে পারে। যা বললাম তা কাউকে বলবে না। বিশেষ করে রাজকুমারীকে তো বলবেই না।

ফ্রান্সিস চলে গেল। একটু পরেই শাঙ্কো এল। বলল, তুমি আমাকে—

—হ্যাঁ। তোমার কাছ থেকে কিছু জানার আছে।

—বেশ। বলো। শাঙ্কো বলল।

—মাছিটা হ্যারির শরীরের কোথায় হুল ফুটিয়েছিল? ভেন জানতে চাইল।

—ঘাড়ে। শাঙ্কো বলল।

—একবারই তো হুল ফুটিয়েছিল? ভেন বলল।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো বলল।

—দুবার নয়? সে আবার জানতে চাইল।

—না। শাঙ্কো বলল।

—মাছিটা কোথা থেকে এসেছিল? ভেন জানতে চাইল।

—ঘরটার অন্ধকার কোণা থেকে। শাঙ্কো বলল।

—তার মানে মাছিটা অন্ধকারে ছিল। ভেন বলল।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো বলল।

—হুল ফোটানোর পর হ্যারি কী বলেছিল? ভেন জানতে চাইল।

—ঘাড়টা যেন অবশ হয়ে গেল। হ্যারি বলেছিল। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ বুঝলাম। ভেনের মুখ গম্ভীর হল।

ভেন হ্যারির কেবিনঘরে ঢুকল। বলল—ফ্রান্সিস একটু বাইরে এসো। ফ্রান্সিস ঘরের বাইরে এল। ভেন বলল—আমার যা সন্দেহ হয়েছিল তাই ঘটেছে। এক ধরনের মাছি আছে। প্রাণঘাতী মাছি। মানুষের গায়ে দুবার হুল ফুটোলে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই মাছিগুলো দিনের বেলায় অন্ধকার জায়গায় থাকে। সন্ধ্যের বেশ পরে—অন্ধকার জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। প্রায় সারা রাত উড়ে বেড়ায়। মানুষ, ঘোড়ার গায়ে হুল ফুটিয়ে দেয়। তাতে মানুষ ঘোড়া মারা যায়। ভোর হতেই বনের মধ্যে অন্ধকার জায়গায় লুকিয়ে থাকে। একটু থেমে বলল—হ্যারিরা যে জাহাজটায় জাহাজীদের মৃত দেখে এসেছে লোকজনের বাড়িতেও মৃত মানুষ দেখে এসেছে তারা সবাই এই মাছিদের হুল ফোটানোর জন্যে মারা গেছে। একটু থেমে ভেন বলল—আমাদের একমাত্র হ্যারি ছাড়া আর কারো গায়ে হুল ফোটাতে পারে নি। আমরা এখনও নিরাপদ। তুমি যত শিগগির সম্ভব জাহাজ ছাড়ো। এই তল্লাট ছেড়ে পালাও।

—ঠিক আছে। আমি বলছি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস ঘরের সামনে দাঁড়ানো এক বন্ধুকে বলল—ভাই তুমি সবাইকে খবর দাও যেন সবাই ডেক-এ আসে। বন্ধুটি চলে গেল।

কিছু পরে শাঙ্কো এল। বলল—ফ্রান্সিস চলো। সবাই এসেছে। মারিয়া এগিয়ে এসে বলল—আমি যাবো?

—না তুমি হ্যারিকে দেখ। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। দেখল বন্ধুরা এসেছে। ফ্রান্সিস বলতে লাগল—ভাইসব—আমরা একটা সাংঘাতিক সমস্যায় পড়েছি। এই অঞ্চলে এক ধরনের হুলওয়ালা নীল রঙের মাছি আছে। মানুষের শরীরে এরা হুল ফোটায়। একবার কামড়ালে মানুষ বাঁচে। কিন্তু দুবার কামড়ালে তার মৃত্যু অবধারিত। আমাদের বন্ধু হ্যারিকে সেই মাছি একবার হুল ফুটিয়েছে। হ্যারি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এই মাছিরা দিনের বেলা অন্ধকার জায়গায় আত্মগোপন করে থাকে। সন্ধ্যে হলেই বেরোয়। ফ্রান্সিস থামল।

তারপর বলল—কাজেই আমরা স্থির করেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এই তল্লাট ছেড়ে পালাবো। রাত্রি হয়ে এসেছে। চান খাওয়া সেরে আমরা জাহাজ চালাবো। দেখি—কোন বন্দর পাই কিনা। ফ্রান্সিস চুপ করল। বন্ধুরা সবাই চলে গেল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—তা হলে পালানোটাই স্থির করলে?

—এ ছাড়া কোন উপায় নেই। খাওয়া দাওয়া হলেই জাহাজ ছেড়ে দাও। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল। পেড্রো মাস্তুলের মাথায় উঠে গেল। দাঁড়ঘরে দাঁড়িরা গিয়ে লম্বা বৈঠায় হাত লাগাল। সব পাল খুলে দেওয়া হল। জাহাজ কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্রুত চলতে লাগল।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে দেখতে এল। মারিয়া হ্যারির কপাল থেকে জল-পট্টিটা খুলে রাখল। ফ্রান্সিসকে বলল—ভেন বলেছে—লক্ষণ খুব ভাল। হ্যারির জ্বর অনেক কমে গেছে। তবে এখনও সম্পূর্ণ ছেড়ে যায় নি। তবে কমের দিকে। হ্যারি ডান হাতটা ফ্রান্সিসের দিকে বাড়াল। ফ্রান্সিস ওর হাতটা জড়িয়ে ধরল। হ্যারি শুকনো মুখে অল্প হাসল। ফ্রান্সিস বলল—

—কিছ্ছু ভেব না। ভেন আমাকে বলেছে তুমি তাড়াতাড়িই সুস্থ হবে। ভেন-এর ওষুধ কাজ করছে।

—ফ্রান্সিস—কী ভয়ানক জায়গা থেকে আমরা পালিয়ে আসতে পেরেছি। মারিয়া বলল।

—সেটা বলতে। খুব বেঁচে গেছি আমরা। এখন হ্যারি সুস্থ হলেই নিশ্চিন্ত হবো। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি একবার মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, রাজকুমারী যে আমার জন্যে কতকিছু করছেন—এ জন্যে—

—ওসব থাক। হ্যারি তুমি ভালো হয়ে উঠবেই। আমার মন বলছে। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি মৃদু হাসল। বন্ধুদের শুভেচ্ছায় হয়তো ও সুস্থ হবে। হ্যারি এটাই ভাবে।

সেদিন ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে। হঠাৎ হ্যারির আবার জ্বর এলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভীষণ প্রচণ্ড জ্বর এল।

ফ্রান্সিসের কাছে খবর গেল। ফ্রান্সিস ছুটে এল। হ্যারির কপালে গলায় হাত বুলিয়ে যেন বুঝতে পারল—ভীষণ জ্বর। হ্যারি কেমন আচ্ছন্নের মত শুয়ে রইল। ফ্রান্সিস ভেনকে ডেকে পাঠাল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভেন ওর ওষুধপত্র নিয়ে চলে এল। হ্যারির মুখ গলা দেখল। নাড়ি দেখল। বিড়বিড় করে বলল—মারাত্মক সময়টা কেটে গেছে। এখন তো সুস্থ হওয়ার কথা।

ভেন বসে ওষুধ তৈরি করতে লাগল। মারিয়াকে ওষুধ বুঝিয়ে দিল। কখন কোনটা খেতে হবে বলল। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখল এক কোনায় শাঙ্কো বসে আছে। নিজে উঠে শাঙ্কোর কাছে এল। বলল—বাইরে এসো। শাঙ্কো ভেন-এর পেছনে পেছনে বাইরে এল। ভেন গলা নামিয়ে বলল,

—হ্যারির অবস্থা ভালো নয়। ফ্রান্সিসকে ডাকো। আমি এখানে দাঁড়ালাম।

শাঙ্কো দ্রুত ছুটে গেল। একটু পরেই ফ্রান্সিসকে সঙ্গে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—ভেন কী হয়েছে?

—হ্যারির অবস্থা ভালো নয়। নাক মুখ ফুলতে শুরু করেছে। যতদূর আমার বিদ্যেয় কুলোয় করেছি। এখন একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে দেখাতে হবে।

—কিন্তু এখন এখানে কোথায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক পাবো? পাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—উপায় নেই। সামনেই যে বন্দর পাবে সেখানে খুঁজে নিতে হবে। কালকে সকালের মধ্যেই কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে দেখাও। আমার যা সাধ্য আমি করেছি। ভেন বলল।

—তাহলে ভেন আজ রাতের মধ্যেই যে করে হোক কোন বন্দরে পৌঁছতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। দেরি করো না। জাহাজ চালাও। আমি ওষুধ তৈরি করতে যাচ্ছি। ভেন চলে গেল।

ফ্রান্সিসের পিঠে আলগা চাপড় মেরে ভেন চলে গেল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—সবাইকে ডেক-এ আসতে বল। আমি কিছু বলবো। শাঙ্কো দ্রুত চলে গেল। বন্ধুদের ফ্রান্সিসের কথা বলল।

অল্পক্ষণের মধ্যে বন্ধুরা সব ডেক-এ উঠে এল। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ। জ্যোৎস্না পড়েছে সমুদ্রের বড় বড় ঢেউয়ের ওপর। ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটেছে।

ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল—ভাইসব। আমরা খুবই বিপদে পড়েছি। হ্যারির আবার জ্বর এসেছে। ভীষণ জ্বর। ভেন চিকিৎসা করছে। ভেন কিছুক্ষণ আগে আমাকে বলল—যদি কাল সকালের মধ্যে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে না পাওয়া যায় তবে হ্যারি—ফ্রান্সিস দুহাতে চোখ বন্ধ করল। একটু ফুঁপিয়ে উঠল। বলল—তবে হ্যারি বাঁচবে না।

শ্রোতা বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। বিস্কো বলল—তাহলে এখন আমরা কী করবো?

—যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ চালিয়ে একটা বন্দরে পৌঁছতে হবে। তারপর হ্যারির ভাল চিকিৎসা কালকে সকালের মধ্যে। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—একজন দাঁড় টানতে চলে যাও। অন্যদল দড়ি পাল খুলে দিয়ে পালগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেশি করে বাতাস ধরাবে। পেড্রো—ফ্রান্সিস থামল। দেখল পেড্রো মাস্তুল বেয়ে উঠছে। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল।

সব ভাইকিংরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো—।

সবাই কাজের জায়গায় চলে গেল। একদল পাল ঠিক করতে লাগল। আর কয়েকজন হাল ঠিক রাখল। অন্য দল দাঁড়ঘরে চলে গেল।

ফ্রান্সিস জাহাজচালক ফ্রেজারের কাছে এল।

বলল—ফ্রেজার—জাহাজ যাতে চূড়ান্ত গতিতে যায় তার ব্যবস্থা করেছি। এবার তোমার কাজ—যে ভাবে পারো জাহাজের গতি বাড়াও। ফ্রেজার মাথা কাত করে বলল—ঠিক আছে।

তখন আস্তে আস্তে জাহাজের গতি বাড়তে লাগল। বেগবান বাতাসে পালগুলো ফুলে উঠল। জাহাজ পূর্ণগতিতে চলল।

শাঙ্কো দাঁড়িদের ঘরে এল। দেখল বন্ধুরা প্রাণপণে দাঁড় টানছে। দুসারি দাঁড়িদের মাঝখানে গিয়ে শাঙ্কো দাঁড়াল। তারপর হাততালি দিয়ে দিয়ে শরীর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো—। ওপরে ডেক থেকে ভেসে এল—ও—হো—হো— ধ্বনি।

জাহাজের গতি অনেক বেড়ে গেল।

দাঁড়ঘরে শাঙ্কো তখন দাঁড় টানার দ্রুত ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে শরীর দোলাতে লাগল। আর মুখে শব্দ করতে লাগল—ও—হো—ও—হো। মাস্তুলের মাথায় বসে থাকা পেড্রো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক দেখতে লাগল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বল। সমুদ্রের বুকের অনেক দূর দেখা যাচ্ছে। আজ সমুদ্রের বুকে কুয়াশা কম।

দ্রুতগতিতে জাহাজ চলল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—একজন একজন করে খেয়ে এসো। জাহাজের গতি যেন কমে না।

গভীর রাত তখন। দাঁড়িরা কেউ কেউ পরিশ্রমে কাতর হয়ে শুয়ে পড়ছে। সেখানে অন্যেরা এসে বসছে। দাঁড় বাওয়া চলছে। ওদিকে পাল টেনে টেনে মুখ ঘুরিয়ে বাতাস বেশি আসছে পালে। ফ্রেজার হইল ঘুরিয়ে চলেছে।

রাত শেষ হয়ে আসছে। আকাশ সাদাটে হয়ে গেছে। তারাগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস সারা জাহাজ ঘুরে ঘুরে বন্ধুদের উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে।

পূব আকাশে লাল রঙের ছোপ।

মাস্তুলের ওপর থেকে পেড্রো চেঁচিয়ে বলল—ডাঙা দেখা যাচ্ছে, ডাঙা। জাহাজে ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো—। ওদের আনন্দের ধ্বনি।

সূর্য উঠল। ভোরের আলো সমুদ্রে জাহাজে ছড়াল। দূরে ডাঙা দেখা গেল।

ফ্রান্সিস দাঁড় ঘরে এল। দেখল বন্ধুরা কেউ কেউ ঘরের মধ্যেই শুয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—দাঁড় বাওয়া আস্তে করো। জাহাজ ডাঙায় গিয়ে ধাক্কা মারতে পারে।

জাহাজের গতি কমল। আস্তে আস্তে গিয়ে জাহাজঘাটায় গিয়ে থামল।

শাঙ্কো জাহাজ থেকে পার পর্যন্ত কাঠের তক্তা পেতে দিল। ফ্রান্সিস তক্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে নামবার সময় বলল—শাঙ্কো—আমি আগে চিকিৎসক খুঁজে বের করছি। তোমরা ততক্ষণ অপেক্ষা করো।

ফ্রান্সিস পারে নামল। বেশ বড় বন্দর। আট দশটা জাহাজ নোঙর করে আছে। চারদিকে তাকাল একবার। কোন দিকে কোথায় যাবে চিকিৎসকের খোঁজে এটা বুঝে উঠতে পারছিল না।

রাস্তার ধারের দোকানপাট খুলে গেছে। লোকজনের ভিড় বাড়ছে। ফ্রান্সিস এদিন-ওদিক ঘুরতে লাগল। এক প্রৌঢ় ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করল—এখানে ভাল চিকিৎসক কোথায় পাবো? ভদ্রলোক ফ্রান্সিসের মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে

রইল। বুঝল—ফ্রান্সিস বিদেশি। ভদ্রলোক হাত তুলে বললেন—ঐ যে চেস্টনাট গাছটা দেখছেন—তার পাশেই একটা ওষুধের দোকান আছে। ওরা বলতে পারবে।

ফ্রান্সিস চেস্টনাট গাছটা দেখল। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দেখল—সাইনবোর্ড—ওষুধের দোকান। ফ্রান্সিস দোকানে ঢুকল। এক যুবক বসে আছে।

ফ্রান্সিস বলল—বলছিলাম—এখানে চিকিৎসক পাবো।

—হ্যাঁ পাবেন বই কি।

—তিনি কোথায়?

—বাড়িতে আছেন। ঘণ্টাখানেক পরে আসবেন।

—আমার রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। আমি এক্ষুনি তাঁকে দেখাতে চাই। তাঁর বাড়িটা কোথায় বলুন।

—দেখুন গিয়ে কথা বলে। যুবকটি বলল—তারপর আঙ্গুল তুলে একটা ছোট গীর্জা দেখাল। বলল—ঐ গীর্জার পেছনেই চিকিৎসকের বাড়ি।

—খুব উপকার করলেন। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ছুটল গীর্জার দিকে।

গীর্জার সামনে এল। পেছনে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে। সেটা ধরে গীর্জার পেছনে এল। দেখল একটা কাঠের কাঠ পাথরের বাড়ি। ফ্রান্সিস বন্ধ দরজায় টোকা দিল একবার। ভেতরে কারু সাড়াশব্দ নেই। আবার ঠুকলো।

—কে? একজনের গম্ভীর গলা শুনল।

—আমি চিকিৎসকের কাছে এসেছি। তাঁকে বড় দরকার। ফ্রান্সিস বলল।

দরজা খুলে গেল। একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। পাকা দাড়ি গোঁফ। বললেন—আমিই চিকিৎসক। বলুন।

—আমরা জাতিতে ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। নাম শুনেছি। চিকিৎসক বললেন।

—আমরা জাহাজে এসেছি। আমার বন্ধু খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপনি তাঁকে বাঁচান। ফ্রান্সিস বলল।

—কী করে অসুস্থ হল? চিকিৎসক বললেন।

—আমি বন্ধুকে নিয়ে আসতে যাবো। বন্ধুকে এনে সব বলবো। এখন কোথায় আপনাকে দেখাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—দোকানে নিয়ে আসুন। ঘণ্টাখানেক পরে। চিকিৎসক বললেন।

—না-না-না। আমরা এখানেই নিয়ে আসছি। দেরি করতে সাহস পাচ্ছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। আসুন। চিকিৎসক বলল।

—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস ফিরে দাঁড়াল। তারপর রাস্তার মানুষের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ছুটল জাহাজঘাটার দিকে।

জাহাজে উঠল। দেখল বন্ধুরা সব দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল— চিকিৎসক পেয়েছি। তোমরা একটা দুহাত পাশে এরকম একটা কাঠের তক্তা নিয়ে এসো।

ছুটতে ছুটতে হ্যারির কেবিনঘরে এল। দেখল মারিয়া জলভেজা ন্যাকড়া হ্যারির কপালে আলগোছে চেপে ধরে আছে।

—জ্বর কমেছে? ফ্রান্সিস বলল।

—কিছুটা কমেছে। মারিয়া বলল।

মারিয়া ফ্রান্সিসের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল—নাকমুখ ফুলে যাচ্ছে।

—ঠিক আছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। তুমি জাহাজেই থাকো। তোমার মুখ চোখ—কয়েক রাত জেগে আছো। হ্যারিকে শুশ্রূষা করছো।

—আমার জন্যে ভেবো না। তুমি শিগগির চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাও। মারিয়া বলল।

শাঙ্কো বিস্কোরা কয়েকজন ঘরে ঢুকল। হাতে করে নিয়ে এসেছে চওড়া কাঠের পাটাতন। ওরা পাটাতনটা বিছানার কাছে নিয়ে এল। দু'তিনজন হ্যারিকে ধরে এনে পাটাতনে শুইয়ে দিল। তারপর তুলে কাঁধে নিয়ে হাতে ধরে পাটাতনটা তুলে বাইরে এল। ফ্রান্সিস হ্যারির মুখের দিকে তাকাল। অবিন্যস্ত মাথার চুল। চোখ দুটো কোটরে। হ্যারি চোখ বুঁজে আছে। ফ্রান্সিস তাকিয়ে থাকতে পারল না। আবাল্য বন্ধু—কত সুখ দুঃখের স্মৃতি। ফ্রান্সিস অনেক কষ্টে কান্না চাপল।

হ্যারিকে নিয়ে ফ্রান্সিসরা ডেক-এ এলো। তারপর কাঠের পাটাতনে শোওয়া হ্যারিকে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘাটে নামল।

রাস্তার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিসরা চলল।

ফ্রান্সিস বলল—একটু তাড়াতাড়ি চল। শাঙ্কোরা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত চলল।

গীর্জার পেছনে চিকিৎসকের বাড়ির সামনে এল। দরজায় আঙ্গুল ঠুকল। একটা অল্পবয়সী ছেলে দরজা খুলল।

—তোমার কর্তা কোথায়?

—আসছেন। আপনারা এই ঘরে আসুন। ছেলেটি পাশের ঘরটায় এল। ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। দেখল মেঝেয় কয়েকটা কাঠের পাটাতন পাতা তার ওপর শুকনো ঘাসের বিছানা। ওরা হ্যারিকে ধরাধরি করে ঐ বিছানায় শুইয়ে দিল।

ফ্রান্সিসরা কেউ কেউ ঘরের বাইরে গেল। শাঙ্কো বিস্কো দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস বিছানার পাশে রাখা একটা কাঠের আসনে বসল।

হ্যারি দুর্বলকণ্ঠে ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি হ্যারির মুখের ওপর ঝুঁকল। বলল—হ্যারি—কেমন আছো? হ্যারি দম নিয়ে নিয়ে বলল—আমি— বাঁচবো না।

ফ্রান্সিস আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিসের দুচোখে জলধারা নামল। শাঙ্কো ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরে বলল— ফ্রান্সিস—ফ্রান্সিস তুমি কেঁদো না। ফ্রান্সিস হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখের জল মুছল।

তখনই চিকিৎসক ঢুকলেন। পরনে জোব্বা। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বন্ধুরা দরজায় এসে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে চিকিৎসক বললেন—কিভাবে অসুখ হল এটা বলবেন বলেছিলেন। এখন বলুন।

ফ্রান্সিস বলল—জাহাজে চড়ে আমরা আসছিলাম। একটা জায়গায় এলাম। সমুদ্রতীর। একটা জাহাজ নোঙর করে আছে। দেখলাম। আশ্চর্য—জাহাজের সব মানুষ মরে পড়ে আছে। এই রোগী আর একজন বন্ধু তীরে এসেছিল। একটা বন পার হয়ে দুটো পাথরের বাড়ি দেখেছি। দুজনে বাড়ি দুটোয় গিয়ে দেখেছিল সব লোকজন ঘরে মরে পড়ে আছে। তখনই ঘরের অন্ধকার কোনা থেকে কয়েকটা নীলরঙের বড় বড় মাছি আমার এই বন্ধুর ঘাড়ে হুলমত ফুটিয়ে দেয়। জাহাজে ফিরে এসে বন্ধুটি অসুস্থ হয়ে পড়ে।

—ক'বার হুল ফুটিয়েছিল। চিকিৎসক জিজ্ঞেস করলেন।

—একবার। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। চিকিৎসক বললেন—আশা আছে।

ফ্রান্সিস প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল—আমার বন্ধুটি বাঁচবে তো।

—হ্যাঁ। বাঁচবে। চিকিৎসক বললেন। তারপর গলা চরিয়ে ডাকলেন—

—হিবু? ছেলেটি এসে দাঁড়াল। চিকিৎসক তাকে কয়েকটা ওষুধ আনতে বললেন। ফ্রান্সিসরা ঐ ওষুধের নাম জীবনেও শোনে নি।

একটু পরে হিবু দুটো বোয়াম আর একটা পুটুলি নিয়ে এল। একটা ছোট পাথরের পাটা আর হামান দিস্তা। একটু পরে একটা কাঠের গ্লাশে জল নিয়ে এল। চিকিৎসক ওষুধ তৈরি করতে লাগলেন। গোল শুকনো ফল হামান দিস্তায় গুঁড়ো করে বড়ি বানালেন। হিবু সাহায্য করতে লাগল। চিকিৎসক হিবুকে দুটো বড়ি একসঙ্গে খাওয়াতে দিলেন। হিবু হ্যারির মুখের কাছে এল। হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাশটা এনে বলল—দুটো বড়ি খেয়ে নিন। হ্যারির কোন সাড়া নেই।

—আপনারা তো বন্ধু। ডেকে ওষুধটা খাওয়ান।

ফ্রান্সিস হিবুর কাছে থেকে বড়ি দুটো নিল। হ্যারির মুখের কাছে মুখ এনে ডাকল—হ্যারি! হ্যারি চুপ। কোন কথা নেই। ফ্রান্সিস বার তিনেক ডাকতে হ্যারি চোখ মেলে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—এই বড়ি দুটো খেয়ে নাও। হাঁ কর, আমি জল ঢেলে দিচ্ছি। বড়ি দুটো খেয়ে নাও। চিকিৎসক বলেছেন তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। হ্যারি কিছু বলল না। মুখ হাঁ করল। ফ্রান্সিস মুখে জল ঢালল। পর

পর দুটো বড়ি মুখে দিল। হ্যারি খেয়ে নিল। এতক্ষণে ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

এবার চিকিৎসক হিবুকে সব বুঝিয়ে দিল। কাঠের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। শাঙ্কো কোমরে গোঁজা একটা সোনার চাকতি বের করে চিকিৎসকের হাতে দিল। চিকিৎসক নিয়ে জোব্বার পকেটে রাখলেন। ফ্রান্সিস বলল—দয়া করে আমার বন্ধুকে একটু অভয় দিয়ে যান। ও খুবই ভেঙে পড়েছে।

—হুঁ। চিকিৎসক মুখে শব্দ করলেন।

—হ্যারি—হ্যারি—চিকিৎসক কী বলছেন শোন।

ফ্রান্সিস বলল—নীল মাছির হুল ফোটানোর কথা।

—রোগীর চোখ মুখ ফোলা দেখেই বুঝতে পেরেছি। চিকিৎসক বললেন। চিকিৎসক এবার হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার বিপদ কেটে যাবে। আপনি সুস্থ হবেন। হ্যারি ম্লান হাসল। চিকিৎসক বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। হিবু নিজের কাজ করে চলল।

এবার হিবু বসে বসে ওষুধ বানাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ওষুধ তৈরি করল। বোঝা গেল এই ওষুধ তৈরির কাজটা ও ভালোই শিখেছে। শাঙ্কো হাত বাড়িয়ে ওষুধগুলো নিল।

হিবু—ফ্রান্সিস বলল—তোমার কাজ তো হয়েছে এবার আমাদের সঙ্গে আমাদের জাহাজে এসো।

—না—না। আমার কত কাজ। হিবু মাথা নেড়ে বলল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ইঙ্গিত করল। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা ছোট স্বর্ণমুদ্রা বের করে হিবুর দিকে বাড়াল। হিবু ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর বলল—এই সোনার চাকতি আমাকে দিচ্ছেন কেন?

—চিকিৎসককে আমরা তাঁর প্রাপ্য দিয়ে থাকি। তোমাকেও দিলাম।

এবার হিবু সোনার চাকতিটা নিল। বলল—আমি আসছি। ও বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

কিছু পরে পোশাক পাল্টে এল হিবু। বলল—চলুন। কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি চলে আসব।

শাঙ্কোরা হ্যারির পাটাতনটা ধরল। আস্তে আস্তে তুলে কাঁধে নিল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তা দিয়ে চলল। ফ্রান্সিসদের বিদেশী পোশাক দেখে কেউ কেউ চেয়ে চেয়ে দেখল।

পথে আসতে আসতে ফ্রান্সিস বলল—হিবু এই বন্দরের নাম কি?

—ভালপেরাইসো বন্দর। সংক্ষেপে বলি প্যারাইসো।

—এটা কোন্ দেশ?

—চিলি।

ফ্রান্সিস আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। হ্যারিকে নিয়ে সবাই জাহাজঘাটায়

এল। হ্যারিকে নিয়ে সাবধানে জাহাজে উঠল। মারিয়া আর সব বন্ধুরা ছুটে এল। ফ্রান্সিস মারিয়া আর বন্ধুদের বলল—চিকিৎসক ওষুধ দিয়েছে। বলেছে হ্যারির অসুখ সেরে যাবে। ভয়ের কিছু নেই।

মারিয়া কেঁদে ফেলল। ফ্রান্সিস এসে সান্ত্বনা দিল। বলল—রাত জেগে জেগে তোমার শরীরের অবস্থা খারাপ হয়েছে। এসব নিয়ে আর ভেবো না। দেখ এই ছেলেটি হিবু নাম—চিকিৎসকের ওষুধ বানায়।

—এই বাচ্চা ছেলেটা? মারিয়া হেসে বলল।

—হ্যাঁ। তারপর ফ্রান্সিস বলল—হিবু—তুমি কখনও কোন রাজকুমারী দেখেছো?

—না—না। তবে গল্পের বইয়ে ছবি দেখেছি। কী সুন্দর দেখতে। কী সুন্দর মাথার চুল। কী সুন্দর মুকুট পরা। হিবু বলল।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—ইনিও আমাদের দেশের রাজকুমারী। মারিয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল—না—না|না। ফ্রান্সিস একবার মারিয়ার দিকে তাকাল। মারিয়া মাথা নিচু করে আছে। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া —হিবুকে যে জন্য এনেছি সেটা কর আগে। হ্যারির ঘরে চল।

তিনজনে হ্যারির ঘরে এল। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া—হিবুর কাছ থেকে ওষুধটা কখন কবার খেতে হবে এসব বুঝে নাও।

—ওষুধগুলো বের করুন। হিবু বলল। শাঙ্কো ওষুধগুলো নিয়ে এল। হিবু বলল কতটা ওষুধ খাওয়াতে হবে। কয়বার খাওয়াতে হবে এসব মারিয়াকে বোঝাল। মারিয়া ওষুধগুলো নিজের কাছে রাখল।

ফ্রান্সিস হ্যারির কাছে এল। হ্যারি তখন তাকিয়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি একটু ভালো লাগছে?

—ঠিক—কিছুই—বুঝতে—পারছি না। হ্যারি দুর্বল কণ্ঠে বলল।

—ওষুধ পড়বে। কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি সুস্থ হবে। দুশ্চিন্তা করো না।

—না—চিন্তা করে—কী হবে। যা হবার তাতো হবেই। হ্যারি আস্তে আস্তে বলল।

এবার হিবু বলল—এখানে আমার কাজ হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি।

—বেশ যাও। দরকার হলে তোমাকে যেন পাই। শাঙ্কো বলল।

—তা পাবেন বৈকি। তারপর হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল—ঠিক সময়ে ওষুধ পড়েছে। প্রথমে আপনার মুখ ফুলে যাওয়াটা কমে যাবে। তারপর আর কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সেরে যাবেন। হিবু কেবিন ঘরের বাইরে এল। শাঙ্কো সঙ্গে এল। জাহাজঘাটায় নামিয়ে দিয়ে শাঙ্কো বলল—এই জায়গার নাম তো প্যারাইসো বন্দর।

—হ্যাঁ। হিবু মাথা কাত করে বলল।

—আর কোন নগর আছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। উত্তর দিকে সান্তিয়াগো নগর। পূবে তালকানগর।

—অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। শাঙ্কো বলল।

হিবু জাহাজ থেকে নেমে লোকজনের ভিড়ে হারিয়ে গেল।

শাঙ্কো ভাবছিল। এখন ওরা কি করবে? শাঙ্কোর নিজেকে খুব দুর্বল বলে মনে হতে লাগল। আমরা এখানেই থাকবো কি দেশের দিকে জাহাজ চালাবো—এটা ফ্রান্সিস হ্যারির কাছ থেকে জানতে হয়। কিন্তু ফ্রান্সিসদের কাছে যেতে পারল না। দুর্বল শরীর নিয়ে নিজের কেবিনঘরে এল। খাবার সময় বলব। এখন থাক।

শাঙ্কো বিছানায় শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। পাশের বিছানা থেকে এক ভাইকিং বন্ধু ডাকল—শাঙ্কো—শাঙ্কো। শাঙ্কো জাগল না। বন্ধুটি আর শাঙ্কোকে জাগাবার চেষ্টা করল না।

বেলা বাড়ল। বন্ধুটি স্নান সেরে এল। এসে দেখল—শাঙ্কো বিছানায় বসে আছে। বন্ধুটি বলল—যাও স্নান সেরে এসো। খেতে যাবে তো?

—আমি স্নান করবো না। শাঙ্কো বলল।

—খাবে তো? বন্ধুটি বলল।

—হ্যাঁ—খাবো।

—তাহলে—হাতমুখ ধুয়ে খেতে চলো। বন্ধুটি বলল।

—না আমি স্নান করে খেতে যাবো। শাঙ্কো বলল।

—বেশ তাই কর। তবে দেরি করো না। বন্ধুটি বলল।

—একটা কথা বলছি। শাঙ্কো বলল।

—কী? বন্ধুটি বলল।

—ভাবছি—আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা হ্যারিই দেখতো। আজ হ্যারি অসুস্থ।

—তুমিই তো বলছিলে চিন্তার কিছু নেই। হ্যারি সুস্থ হবে। একটু সময় লাগবে এই যা।

শাঙ্কো স্নান করতে চলল। কিছুক্ষণ পরে স্নান করে এল। জামাটামা পাল্টে মাথার চুল আঁচড়ে খেতে চলল।

তখন বিকেল। শাঙ্কো হ্যারিদের ঘরে এল। দেখল—মারিয়া হ্যারির মাথার কাছে বসে আছে। হ্যারিকে হাওয়া করছে। শাঙ্কো মারিয়ার দিকে তাকাল। ভাল করে রাজকুমারীকে দেখল—রাজকুমারীর গায়ে দুধে আলতা রংটা নেই। কেমন তামাটে হয়ে গেছে।

ফ্রান্সিস ঘরে পায়চারী করছে। বিস্কো দাঁড়িয়ে আছে।

শাঙ্কো দেখল—হ্যারি চলে গেছে। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল।

বলল—একটা কথা ছিল।

—বল। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—পায়চারি করতে করতে এতক্ষণ সেই কথাই ভাবছিলাম। শাঙ্কো তুমি কী করতে চাও বল। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি আর কী বলবো। শাঙ্কো বলল।

—তোমার মতটাই বলবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি আর এখানে পড়ে থাকতে রাজি নই। শাঙ্কো বলল।

—আমি আর হ্যারি ছাড়া আর সবাই দেশের দিকে যেতে চায়। ফ্রান্সিস বলল।

—খুবই স্বাভাবিক। এতদিন হয়ে গেল। শাঙ্কো বলল।

—যাত্রা শুরুর আগে প্রতিবারই আমি বলেছি—সমুদ্রপথে চরম সমস্যায় পড়তে পারি আমরা। খাদ্য নেই, জল নেই। তখন হতাশ হওয়া চলবে না। 'দেশে চল' 'দেশে চল' বলে ঘ্যানঘ্যান করতে পারবে না। দাঁত চেপে সব সহ্য করতে হবে। যারা সব সহ্য করে থাকতে চাইবে তারাই থাকবে। যারা দেশে চলে যেতে চাইবে তাদের কোন বন্দরে নামিয়ে দেব। স্বর্ণমুদ্রা দেব যাতে তাদের পথে কোন অর্থকষ্টে পড়তে না হয়। বল—এর বেশি আমি কী করতে পারি। ফ্রান্সিস থামল। বলল—রাতে খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে সবাইকে ডেক-এ উঠে আসতে বল। আমি কিছু বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল। তারপর হ্যারির কাছে এল। হ্যারির ডান হাতটা জড়িয়ে ধরল। বলল—হ্যারি তোমার কষ্ট কমেছে? দুর্বলস্বরে হ্যারি বলল—কিছুটা কমেছে ওষুধ খেয়ে।

—কিছ্ছু ভেবো না। দিন কয়েকের মধ্যেই সুস্থ হবে। তবে শরীরের দুর্বলতাটা আস্তে আস্তে যাবে। শাঙ্কো বলল।

—দেখি। হ্যারি পাশ ফিরতে চেষ্টা করল। মারিয়া ঝুঁকে পড়ে হ্যারির পিঠটা আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে দিল। হ্যারি কাত হয়ে শুল।

ভাইকিং বন্ধুরা সব ডেক-এ এসে জড়ো হল। একটু পরে ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে দেখাশুনার জন্যে মারিয়াকে রেখে এসেছে।

আকাশে চাঁদ অনুজ্জ্বল। ছেঁড়া কাপড়ের মত ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ উত্তরমুখি সার বেঁধে উড়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস বলতে শুরু করল—ভাইসব—হ্যারি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এ দেশীয় চিকিৎসককে দেখানো হয়েছে। চিকিৎসকের দেওয়া ওষুধ হ্যারিকে খাওয়ানো হচ্ছে। চিকিৎসক বলেছেন—তাঁর ওষুধ নিয়মিত খেলে হ্যারি অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ হবে। তবে ঘাড়ের জোরটা কমে যাবে। তাতে কিছু ক্ষতি মেনে নিতে হবে। কিন্তু হ্যারি বাঁচল তো। ফ্রান্সিস থামল। সবাই চুপ করে ফ্রান্সিসের কথা শুনতে লাগল। ফ্রান্সিস আবার বলতে শুরু করল—হ্যারি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই বন্দর শহর প্যারাইসো ছেড়ে যাবো না। মাঝ সমুদ্র দিয়ে যেতে যেতে হ্যারি যদি আবার অসুস্থ হয় তাহলে ভেন ওকে বাঁচাতে পারবে না। তখন অন্য চিকিৎসকও

পাওয়া যাবে না। অসহায় আমরা দেখবো হ্যারি আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। ফ্রান্সিস থামল। বন্ধুরা নিশ্চুপ—। কানে লাগছে শুধু সমুদ্রের শোঁ শোঁ শব্দ। ফ্রান্সিস বলল—তাহলে হ্যারি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকবো। বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। তারপর চলে গেল। কোন নতুন বন্দরে এসে ফ্রান্সিস মারিয়া অন্য বন্ধুরা শহর দেখতে বেরোয়। বেশ রাত পর্যন্ত ছোট ছোট দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। তারপর জাহাজে ফিরে আসে।

আজ কিন্তু কোন বন্ধু জাহাজ থেকে নামল না। কেউ তীরে নামবার কথা বলল না। অসুস্থ হ্যারির জন্যে সবাই উৎকণ্ঠিত। কিছুই ভালো লাগছে না তাদের।

চিকিৎসকের ওষুধ খেয়ে তিন চারদিনের মধ্যে হ্যারি অনেকটা সুস্থ হল। ফ্রান্সিস উৎফুল্ল হল—যাক্ হ্যারির বিপদ কেটে গেছে।

সেদিন ডেক-এ নাচ গানের আসর বসল। হ্যারিও শাঙ্কোর কাঁধে ভর রেখে ওরা আস্তে আস্তে ডেক-এ উঠে এল। সবাই দেখল—হ্যারি আস্তে আস্তে এসে আসরে বসল। সবাই ও—হো—হো ধ্বনি তুলল। ডেক-এ বেশ কিছুটা গোল জায়গা ঘিরে ভাইকিংরা বসল।

প্রথমে বিস্কো এল। বিস্কো হাসির গল্প বলতে ওস্তাদ। কত হাসির গল্প যে ও জানে। কয়েকজন বন্ধু গলা চড়িয়ে বলল—বিস্কো প্রথমে হাসির গল্প। বিস্কো মাথা নেড়ে বলল—বেশ। তারপর গল্প বলতে লাগল—এক সার্কাস পার্টিতে একটা গাধা ছিল। মজার খেলা দেখাত। কিন্তু সার্কাস মালিক গাধার ওপর তেমন নজর রাখতো না। কাজেই অনেক সময় গাধাটাকে খেতেও দেওয়া হত না। এরকম মাঝে মাঝেই হত। খিদের জ্বালায় গাধাটা রাতে ঘুমুতে পারতো না। ওকে এত অবহেলা সহ্য করেও ঐ সার্কাস পার্টিতে থাকতে হতো। ঘোড়া ভালুকরা গাধাটাকে বলত—তুই এত কষ্ট করে এই সার্কাস পার্টিতে পড়ে আছিস কেন? গাধা চুপ করে থাকতো। একদিন দুটো কুকুর ওকে বলল—এই দল থেকে চলে যা।

—না, না। এখানে আমাকে থাকতেই হবে। ঐ দ্যাখ—মালিকের মেয়ে তারের ওপর দিয়ে হাঁটা অভ্যেস করছে। মালিক মেয়েটিকে বলে—যদি পা ফস্‌কে পড়ে যাস তবে এই গাধাটার সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। ভাই—একদিন না একদিন পা ফস্‌কাবেই। সেই দিনের জন্যেই আমি মার খেয়ে খেয়ে এই সার্কাস দলে পড়ে আছি।

তুমুল হাসি আর হাততালিতে ভরে উঠল জাহাজের ডেক। এবার গান। এক বন্ধু এগিয়ে এল। সঙ্গে একটা পীপে হাতে নিয়ে আর এক বন্ধু এল। গান শুরু হল। পীপের দুপাশে হাতে চাপড় দিয়ে বাজনা বাজল। গান জমে উঠল। হাততালি দিল শ্রোতা বন্ধুরা।

এবার সেই গায়ক বন্ধুটি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস—রাজকুমারীকে একটা গান গাইতে বল। ফ্রান্সিস বলল—কী বকছো। মারিয়া গাইতে জানে নাকি?

—জানে।—তুমি জানো না। আমরা রাজকুমারীর গান শুনেছি। বন্ধুটি বলল।

—ঠিক আছে। বলে দেখি। তোমরা মারিয়াকে বলো—আমি ডাকছি। ওরা চলে গেল। একটু পরে মারিয়া এল।

—কী ব্যাপার? আমাকে ডেকে পাঠালে কেন? মারিয়া এসে বলল।

—আমার বন্ধুরা খুব ধরেছে আমাকে। ওরা তোমার গান শুনতে চায়।

—একসময় গাইতাম। এখন আর গাই না। মারিয়া বলল।

—যা পারো গাও। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। মারিয়া বলল।

মারিয়া মাঝখানের গোল জায়গাটায় দাঁড়াল। তারপর গান গাইতে শুরু করল। ফ্রান্সিস বেশ চমকে উঠল—মারিয়ার এত সুন্দর গলা। সঙ্গে পীপেয় চাপড় মেরে তাল রাখল এক বন্ধু। গানটা যেন কোথায় শুনেছে ফ্রান্সিস। একটু পরে ফ্রান্সিসের মনে পড়ল—ওরা আইসল্যাণ্ড গিয়েছিল। সেখানে এক উৎসবে চাষী মেয়েরা এই গান গেয়েছিল। বলা যায় আইসল্যাণ্ডের গান।

মারিয়ার গান শেষ হল। বন্ধুরা কয়েকজন আনন্দে লাফাতে লাগল। সেইসঙ্গে হাততালি। মারিয়াকে আরো দুটি গাইতে হল। তুমুল হর্ষধ্বনি শোনা গেল।

গানের আসর শেষ হল। বন্ধুরা নিজেদের কেবিনে চলে গেল। শাঙ্কো হ্যারিকে ধরে নিয়ে গেল।

কেবিনঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া তুমি এত সুন্দর গান গাও আমি জানতেই পারিনি।

—তোমার সামনে আমি কখনো গাই নি। তাই।

—এখন থেকে গাইবে। আমি মাঝে মাঝে তোমার গান শুনবো।

—বেশ। মারিয়া হেসে বলল।

পরদিন সকালে বন্ধুরা কয়েকজন ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে এল। শাঙ্কোও ওদের সঙ্গে ছিল। ফ্রান্সিস বলল—কী ব্যাপার?

শাঙ্কো বলল—আমরা পোশাক তৈরি করাব। তুমি কিছু সোনার চাকতি দাও।

বেশ তো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর মারিয়াকে বলল—বন্ধুদের সোনার চাকতি দাও। মারিয়া বিছানার এক কোনে এল। হাত নামাল। একটা কাঠের বাক্স বের করল। চাবি নিয়ে বাক্সটা খুলল। বিছানা থেকে নেমে এল। শাঙ্কোদের একটা একটা করে সোনার চাকতি দিল। তারপর তিনটে চাকতি নিয়ে রাখল।

ভাইকিং বন্ধুরা খুব খুশি। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস আমরা এই দেশীয় পোশাক বানাব। তুমিও আমার সঙ্গে চলো। ফ্রান্সিস হ্যারি আর মারিয়ার দিকে তাকাল। দুজনেই নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে।

—মারিয়া—তুমি আর হ্যারি থাকো। আমরা যাচ্ছি। তোমার জন্যে পোশাক কিনে আনবো। হ্যারির শরীরের কয়েকটা মাপ নিয়ে যাচ্ছি। দর্জি ঠিক সেই পোশাক বানাতে পারবে।

ফ্রান্সিসরা তৈরি হয়ে জাহাজ থেকে জাহাজঘাটায় নামল। রাস্তায় বেশ ভিড়। ওরা একটা দর্জির দোকান খুঁজে পেল। দোকানে ঢুকল। দোকানের মালিক খুব খুশি। এত খদ্দের। এবার দর্জিকে কাপড় দেখাতে বলল। দর্জিরা দেখাল নানা রঙের কাপড়। ওর মধ্যেই ফ্রান্সিস পেল সবুজ রঙের কাপড়। কাপড়টা তুলে সবাইকে দেখাল। সকলেরই পছন্দ হল।

এবার ফ্রান্সিস মালিকের কাছে এল। কাপড়টা দেখিয়ে বলল—আমাদের মাপ অনুযায়ী এ দেশের পোশাক বানিয়ে দিন। তৈরি জামা বিকেলের মধ্যে চাই।

—এত তাড়াতাড়ি—।

ফ্রান্সিস কোমড় থেকে সোনার চাকতি দেখাল। মালিককে দিল।

মালিক খুব খুশি। বলল—কোন অসুবিধে নেই। দু'জন বেশি লোক রাখতে হবে।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস হ্যারির মাপটা দিল। বলল—এই মাপের হবে।

—বেশ। মালিক মাথা দুলিয়ে বলল।

ফ্রান্সিসরা দোকান থেকে বেরিয়ে এল। বলল, চলো—মারিয়ার জন্যে একটা গাউন কিনবো। সবাই রাস্তা দিয়ে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বেশ বড় জামাকাপড়ের দোকান দেখল।

ফ্রান্সিসরা দোকানে ঢুকল। দোকানের মালিক হাসিমুখে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস তৈরি হওয়া ঝোলানো গাউনগুলো দেখতে লাগল। কত রঙের কত রকমের গাউন ঝুলছে। ফ্রান্সিস গাউনগুলো দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে একটা হলুদ রঙের মধ্যে নীলফুল এইরকম একটা গাউন দেখল। দোকানের কর্মচারীকে গাউনটা নামিয়ে দিতে বলল। কর্মচারী ঐ গাউনটা নামাল। ফ্রান্সিস—দেখতে দেখতে বলল —শাঙ্কো—দেখ তো এই গাউনটা তোমাদের কেমন লাগছে। শাঙ্কো বলল—তোমার পছন্দ, আমাদেরও ভালো লেগেছে। রাজকুমারীকে খুবই সুন্দর দেখাবে। অন্য দুই তিনজন বন্ধুও বলল সেকথা। ফ্রান্সিস ঐ গাউনটা কিনল। একজন কর্মচারী একটা পেস্টবোর্ডের বাক্সের মধ্যে গাউনটা ভরে ফ্রান্সিসকে দিল।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সবাই জাহাজে ফিরে এল। ফ্রান্সিস হ্যারির কেবিনঘরের দিকে চলল। অন্য বন্ধুরা নিজেদের কেবিনঘরে চলে গেল।

হ্যারির কেবিনঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—কেমন আছো?

—ভালো। তোমরা শহরে ঘুরে এলে?

—হ্যাঁ। সকলের পোশাক তৈরির জন্যে একজন দর্জির দোকানের মালিককে বলে এলাম। হ্যারির পাশেই মারিয়া বসে আছে।

ফ্রান্সিস এবার মারিয়ার দিকে পেস্টবোর্ডের বাক্সটা এগিয়ে ধরল। হেসে বলল—খোল। মারিয়া বাক্সটা খুলল। গাউনটা ঝুলিয়ে ধরল।

—পছন্দ হয়েছে? ফ্রান্সিস বলল।

—ভালোই হয়েছে। তবে অল্পবয়সী মেয়েদের ভালো মানাবে। আমার মত বুড়িকে ততটা মানাবে না। মারিয়া বলল

—তুমি এখনও বুড়ি হও নি। এটা অনায়াসে পরতে পার। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। তুমি এনেছো—নিশ্চয়ই পারবো। মারিয়া বলল।

ভাইকিংরা খুব খুশি। নতুন পোশাক পরবে। বিকেল হওয়ার আগেই শাঙ্কো কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে দর্জির দোকানে এল। দোকানের মালিক হেসে বলল—আপনাদের পোশাক হয়ে গেছে। কাপড়ের একটা বড় বোঁচকার মত এক কর্মচারী নিয়ে এল। শাঙ্কো দাম মিটিয়ে দিতে গেল। দু'জন বন্ধু বোঁচকাটা ধরে রইল। শাঙ্কো ফিরে এল। বোঁচকা নিয়ে জাহাজে ফিরে এল।

ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে বোঁচকা নিয়ে টানাটানি চলল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—একটু ধৈর্য ধর। শাঙ্কোই যার যা পোশাক একে একে বার করে দিল। খুশি হয়ে সবাই নতুন পোশাক পরতে নিজেদের কেবিনঘরে চলে গেল।

নতুন জামাটামা পরে ভাইকিংরা খুব খুশি। ওরা ডেক-এ উঠে এল। শাঙ্কোরা কয়েকজন ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—রাজকুমারীও আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবেন।

ফ্রান্সিস বলল—আমি হ্যাঁ না বলবো না। তোমরা রাজকুমারীকে বলে দেখ

তখনই মারিয়া ঘরে ঢুকল। হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল—হ্যারি এখন কেমন আছো?

—খুব ভাল। আজকে দুপুরে এই ঘরে হাঁটাচলা করেছি। শরীরের দুর্বলতা অনেকটা কেটে গেছে। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল—আমাদের একটা কথা ছিল।

—বল। মারিয়া বলল।

—আপনিও নতুন পোশাক পরে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে চলুন। শাঙ্কোরা বলল।

—তাহলে হ্যারিকে দেখবে কে? মারিয়া বলল।

—ফ্রান্সিস দেখবে। শাঙ্কো বলল।

মারিয়া ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি হ্যারিকে দেখবে?

—এখন হ্যারি অনেকটা সুস্থ। আমিই ওকে দেখবো। শাঙ্কোরা বলছে—যাও বেড়িয়ে এসো।

—বেশ—। তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো। মারিয়ার সম্মতি পেয়ে শাঙ্কোরা খুব খুশি।

—তোমরা কোথায় বেড়াতে যাবে? মারিয়া শাঙ্কোকে বলল।

—সাস্তিয়াগো নগরে। শাঙ্কো বলল।

—সে তো বেশ দূর। মারিয়া বলল।

—সান্তিয়াগোতে বেশিক্ষণ থাকবো না। তাড়াতাড়িই ফিরবো। শাঙ্কো বলল।

মারিয়া নিজের কেবিনে গেল।

কিছু পরে মারিয়া নতুন পোশাকটা পরে হ্যারির ঘরে এল। ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে হাসল। ফ্রান্সিসও হাসল। বলল—ঠিক পরতে পেরেছো।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। মারিয়া বলল।

—তোমাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে এই পোশাকে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে যাই। মারিয়া বলল।

—যাও। তাড়াতাড়িই ফিরবে। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। সব ভাইকিং গলা চড়িয়ে ধ্বনি তুলল ও—হো—হো।

সবাই পাটাতনে পা রেখে রেখে হেঁটে তীরে উঠল। শুরু হল চলা। মারিয়া শাঙ্কোকে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো এগিয়ে এল।

মারিয়া বলল—যাচ্ছো তো—সান্তিয়াগো কোথায় কতদূর জানো।

—হ্যাঁ এক এদেশী লোকের কাছে খোঁজ নিয়েছি। খুব বেশি দূরে নয়। আর প্যারাইসোর এই রাস্তা ধরে গেলেই সান্তিয়াগো পৌঁছোনো যাবে।

পথচলা শুরু হল। শেষ বিকেলের রোদ বেশ সহনীয়। ওরা চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্যারাইসো পার হয়ে উন্মুক্ত ক্ষেতখামারের এলাকায় এল। শাঙ্কোরা চলল। একটা গ্রাম দেখল। কয়েকটা বাড়ি ধরে গ্রাম। গ্রামের মেয়েরা কপিকলের সাহায্যে ইঁদারা থেকে জল তুলছে। শাঙ্কোরা চলল।

সূর্য অস্ত গেল। চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

শাঙ্কোরা হাঁটছে। আকাশে আধভাঙা চাঁদ উজ্জ্বল হল। চারিদিকে চাঁদের আলো ছড়াল। শাঙ্কো আনন্দে শিস দিল।

—তোমার এত আনন্দের কারণ কী? বিস্কো শাঙ্কোকে বলল।

—চাঁদের আলো পেলাম। ভাগ্য ভাল কিনা বলো। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। চাঁদের আলোর কথা ভেবে আমরা বেরোই নি। এখন রাস্তার উঁচুনিচু গর্তটর্ত দেখে হাঁটতে পারবো।

শাঙ্কোরা হাঁটতে লাগল। বিস্কো ওর দেশের গান ধরল। ভাইকিংরা ধ্বনি দিল—ও—হো—হো—।

আর কিছুদূর যেতেই সান্তিয়াগো নগরের আলো দেখা গেল। শাঙ্কোরা আরো জোরে পা চালাল।

সান্তিয়াগো নগরে ঢুকল। বেশ সাজানো গোছানো শহর। রাস্তায় ভিড়। ঐ ভিড়ের মধ্যে দিয়ে শাঙ্কোরা ঘুরে ঘুরে শহরটা দেখতে লাগল। রাজা আজপার অট্টালিকা দেখে মারিয়া হাততালি দিল। মারিয়া খুব খুশি। কতদিন পরে এরকম অট্টালিকা দেখল।

হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত শাঙ্কোরা রাজপ্রাসাদের ধারে সুন্দর বাগান দেখল। কত ফুল ফুটে আছে। মারিয়া বলল—উঃ। আর হাঁটতে পারছি না। চলো এই বাগানে বসি। ওরা বাগানে ঢুকল। পাহারাদার লাঠি হাতে ছুটে এল। গলা চড়িয়ে বলল—রাতে বাগানে বসা যাবে না। শাঙ্কো পাহারাদারের কাছে এল। কোমর থেকে একটা রুপোর চাকতি বের করে পাহারাদারের হাতে দিল। পাহারাদার রুপোর চাকতিটা কোমরে গুঁজে বলল—

—আরও চাকতি দাও। এবার শাঙ্কো পাহারাদারের মাথার টুপি তুলে আনল। বলল—এই টুপি তুমি পাবে না।

—না—না—আমার টুপি দাও। পাহারাদার বলল।

—দিচ্ছি। কিন্তু আর চাকতি চাইবে না। শাঙ্কো বলল।

—বেশ—বেশ। তোমরা বস। পাহারাদার হাত বাড়াল। শাঙ্কো টুপি ফিরিয়ে দিল।

এবার সবাই পাথরের আসনে বসল। এতদূর হাঁটা। শাঙ্কো মারিয়াকে বলল— রাজকুমারী আপনার খুব কষ্ট হল।

—মোটেই না। আমি ঠিক আছি। আমার জন্যে ভেবো না। মারিয়া বলল।

বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। শরীর যেন জুরিয়ে গেল। কেউ কোন কথা বলল না।

বেশ কিছুক্ষণ শাঙ্কোরা বিশ্রাম করল। এত হাঁটাহাঁটি। শাঙ্কো বলল— রাজকুমারী আপনার খুবই কষ্ট হয়েছে।

—আমি এখনও আরো হাঁটতে পারি। মারিয়া বলল।

—তাহলে এবার শেষবারের মতো দু'পাক ঘুরে আসি। তারপর কোন সরাইখানায় রাতের খাওয়া আর থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

সবাই উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কো বলল—পুব দিকটায় আমরা এখনও যাই নি। ঐ দিকে চলো।

ওরা পুবমুখে চলল। বেশ বড় বড় পাথর আর শুকনো ঘাসের ছাওয়া বাড়ি। কে জানে কাদের এই বাড়ি। নিশ্চয়ই মন্ত্রী-টন্ত্রীর। কিছু দূরেই একট মস্ত বড় মাঠ। হয়তো এখানে খেলা টেলা হয় মেলাও বসে। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। আর কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি হল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—আর ঘুরে বেড়ানো নয়। এক ভাইকিং বন্ধু বলে উঠল,—খিদেয় পেট জ্বলছে।

বিস্কো বলে উঠল—শাঙ্কো ঐ যে একসারি গাছ। বেশ কয়েকটা দোকান। ওখানে সরাইখানা পাওয়া যাবে। চল।

বিস্কোর অনুমান ঠিক। ওখানে দুটো সরাইখানা পাওয়া গেল। শাঙ্কোকে বলল— দুই সরাইখানার মালিককে দেখ ভালো করে। ওরা দাঁড়িয়ে আছে। তখনই প্রথম সরাইখানার মালিক ওর এক কর্মচারীকে বকতে বকতে তার গালে চড় কষাল। শাঙ্কো বলল—এই সরাইখানার মালিক রগচটা। ওর দোকানে যাবো না। এবার পরের সরাইখানাটায় এল। দাড়ি গোঁফওয়ালা মালিক হাসিমুখে এগিয়ে এল। বলল—আসুন—থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থাই ভাল। শাঙ্কো বলল—এই সরাইখানায় এসো। সবাই সরাইখানায় ঢুকল। পেছনে দেখল এক মস্তবড় জালায় জল রাখা। ওঁরা হাতমুখ ধুয়ে ঢালাও বিছানায় বসল।

মালিক এল। হাসিমুখে বলল—আপনারা কি এখন খাবেন?

—আমরা ক্ষুধার্ত। এখনই খাবো। শাঙ্কো বলল।

—সে ব্যবস্থা করছি। মালিক চলে গেল।

মিনিট পনেরোর মধ্যে কাজের লোকেরা শাঙ্কোদের সামনে চিনেমাটির থালা রেখে গেল। তারপর চিনেমাটির বড় বাটি রেখে গেল। বাটিতে গরম মুর্গির মাংস। থালায় দিল চারখানা গরম রুটি। শাঙ্কোরা খেতে শুরু করল। বেশ সুস্বাদু মাংসের ঝোল। সবাই বেশ ভালোই খেল। মালিকের মুখে হাসি নেই। শাঙ্কো মালিকের কাছে গেল। হাসল। কোমরের ফেট্টিতে রাখা দুটো সোনার চাকতি বের করল। মালিক অবাক। তাকিয়ে আছে। শাঙ্কো সোনার চাকতি দুটো দিল। বলল,

—কী খুশি তো?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—মালিক মাথা নাড়তে নাড়তে বলল।

—আমরা একটু বেশি খেয়ে ফেলেছি। খিদে তো। শাঙ্কো বলল।

—না—না। তাতে কি? মালিক বলল। তারপর গলা নামিয়ে বলল—এখনও তো পাঁচজন খেতে বাকি। আবার রান্না চাপানো হয়েছে। তারা দুতিনদিন ধরে এখানে আছে। তাদের তো আর না খাইয়ে রাখতে পারি না।

—তা তো বটেই। শাঙ্কো বলল।

রাতের খাওয়া হলে। ক্লান্ত বিস্কোরা বেশ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হল। শাঙ্কোর ঘুম ভাঙল। পাখির ডাক শোনা গেল। শাঙ্কো মারিয়ার আলাদা ঘরে এল। দেখল মারিয়া প্রাতরাশ খাচ্ছে। শাঙ্কো বলল—রাজকুমারী আমরা এখন কী করবো?

—প্যারাইসো বন্দর শহরে ফিরে যাবো। শহর দেখা ঘুরে বেড়ানো সবই তো হয়ে গেছে।

—ঠিক আছে। একটা কথা বলছিলাম—আমরা এখানে দুপুরের খাবার খেয়ে রওনা দেব। শাঙ্কো বলল।

—এটা ঠিক করেছো কেন? মারিয়া বলল।

—সকালের সামান্য খাবার খেয়ে সারা পথ হাঁটতে হবে। দুপুর নাগাদ প্যারাইসো পৌঁছব। তখন সরাইখানায় সবারই খাওয়া হয়ে যাবে। আমাদের জন্যে আবার রান্না করতে সরাইওয়ালা রাজি হবে কিনা সন্দেহ। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে। দুপুরের খাওয়া খেয়ে যাবো। সবাইকে বলে দাও।

শাঙ্কো বিস্কোর কাছে গেল। রাজকুমারীর সঙ্গে যা কথা হয়েছে বলল।

বিস্কো রাজি হল। বলল—এইভাবে গেলেই আমরা কোন সমস্যায় পড়ব না। শাঙ্কো সব বন্ধুদের বলল। সবাই রাজি হল।

দুপুরের খাওয়া শাঙ্কোরা তাড়াতাড়িই খেয়ে নিল। সবাই তৈরি হয়ে যাত্রা শুরু করল প্যারাইসো বন্দর শহরের দিকে।

রোদের তেজ কম। মাঝে মাঝে সূর্য উড়ন্ত মেঘে ঢাকা পড়ছিল। মেঘ সরে যেতেই রোদ।

কালো রঙের মাটির রাস্তা। হাওয়ায় ধুলো উড়ছে মাঝে মাঝেই। রাস্তায় ঝরে পড়ছে গাছের পাতা।

শাঙ্কোরা চলল। শাঙ্কো একবার দুবার মারিয়ার কাছে এল। বলল—আপনার কষ্ট হচ্ছে না তো?

—না—না। মারিয়া হেসে বলছে—আমি ঠিক আছি। আমার জন্যে ভেবো না।

সন্ধ্যে হল। অন্ধকার নামল। শাঙ্কোরা হেঁটে চলেছে। একটা মোড়ে এসে দেখল— একটা অশ্বত্থগাছের নিচে আলো জ্বেলে কয়েকটা দোকানে কেনাকাটা চলছে। বিস্কো তাড়াতাড়ি গেল। দেখল—মাংসের বড়া বিক্রি হচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি শাঙ্কোর কাছে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—মাংসের বড়া বিক্রি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি চল। ভাইকিংরা দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল। শাঙ্কো সবার জন্যে বড়া কিনতে চাইল। কিন্তু বড়াওয়ালা বলল—অত বড়া নেই। শাঙ্কো যা আছে তাই চাইল। দোকানি শাঙ্কোদের মাংসের বড়া আর কটা রুটি দিল। ভাইকিংরা সবাই খাবার পেল না। যারা পেল বড়া ভেঙে খেল। রুটি অবশ্য বেশিই ছিল। ভাইকিংরা তাই খেল। সামনেই একটা ইঁদারা। শাঙ্কোরা জল খেল। তারপর হাঁটা।

কিছুদূর যেতে হঠাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। আর কিছুদূর এগোতে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সেইসঙ্গে বাজ পড়ার শব্দ।

শাঙ্কোরা জাহাজী। সমুদ্রের সঙ্গে ওদের নাড়ির যোগ। বিদ্যুতের আলো দেখে শাঙ্কো আন্দাজ করল আর অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে। শাঙ্কো জোরে বলল—ভাইসব—ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে। তার আগেই ডানদিকের জঙ্গলে

ঢুকে পড়। এখানে কোন বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না। আশ্রয় নেবার হলে বনের মধ্যে ঢুকতে হবে।

এতক্ষণ বাতাস খুব আস্তে বইছিল। হঠাৎ সেই বাতাসও বন্ধ হয়ে গেল।

শাঙ্কোই প্রথমে ডানদিকের বনে ঢুকে পড়ল। তারপর সকলেই যখন ছুটে আসছে প্রচণ্ড ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবাই বনে ঢুকে পড়ল।

বৃষ্টি শুরু হল। গাছের পাতায় চট্ চট্ শব্দ হতে লাগল। তারপর সেই শব্দ আর শোনা গেল না। ততক্ষণে গাছের পাতা ভিজে গেছে।

অন্ধকারে শাঙ্কোরা দাঁড়িয়ে রইল। প্রচণ্ড ঝড়ের হাওয়া বইছে। গাছগাছালি মাথা দোলাচ্ছে। বাতাসের শন্‌শন শব্দ। ঝড় বৃষ্টি চলল।

বিস্কো হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় দেখল চারপাঁচজন প্রহরী বন্দীদের নিয়ে যাচ্ছে। বারবার বিদ্যুতের আলোয় দেখল বন্দীদের দল থেকে একজন খুব দ্রুত বেরিয়ে এল। দুজন প্রহরী খোলা তরোয়াল নিয়ে ছুটে এল। কয়েদীটি এক লাফে রাস্তা থেকে বনের গাছের কাছে চলে এল। প্রহরীরা থেমে গেল। বন্দী কয়েদী সঙ্গে সঙ্গে বড় গাছের আড়ালে চলে এল। বিদ্যুতের আলো চমকালেই সেই আলো অন্ধকার বনে খোলা তরোয়াল হাতে প্রহরীরা নিজেদের দলে ফিরে গেল। ওরা চলল। প্রহরীরা কয়েদীদের চেঁচিয়ে বলল—কেউ পালাবার চেষ্টা করলে মরবে। কয়েদীদের নিয়ে প্রহরীরা চলে গেল।

বৃষ্টি থামল। শাঙ্কো অন্ধকারে সেই কয়েদীদের কাছে গেল। আন্দাজে কয়েদী কোথায় আছে বুঝে নিল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল— আমরা ভাইকিং। বিদেশী। আমাদের জন্যে ভয় পেও না। একটু পরে শাঙ্কো বুঝল কয়েদীটি হেঁটে হেঁটে ওদের দিকেই আসছে। একটু পরে কয়েদীটি শাঙ্কোর কাছে এল। অন্ধকারে শাঙ্কো দেখল—কয়েদীটি বড় রোগা। যেন অনেকদিন না খেয়ে আছে। শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল,

—তুমি কে?

—আমি তানাকা। এখনকার মানুষ। পুবদিকে কিছু দূরে একটি রাজ্য তানাকা। ওখানেই আমার ঘরবাড়ি।

একটু থেমে বলল—বৃষ্টি মনে হয় কমেছে। এখন এখানে থাকলে গাছের তলা থেকে জল পড়বে বেশি। বেশি ভিজে যাবো। বনের বাইরে চলুন।

তানাকা আর শাঙ্কোরা বনের বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। বৃষ্টি একেবারে থেমে যায় নি। টিপটিপ পড়ছিল। তানাকা শাঙ্কোকে বলল—আপনারা কারা? বিদেশী নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ—আমরা ভাইকিং। আমরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসি। শাঙ্কো মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—উনি আমাদের দেশের রাজকুমারী।

—আপনারা এরকম বেড়ান—কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই?

—ঠিক উদ্দেশ্যহীন নয়। কোথাও কোথাও আমরা গুপ্তধনের কথা শুনলে তা বুদ্ধি খাটিয়ে খুঁজে আবিষ্কার করি। শাঙ্কো বলল।

—গুপ্তধন নিয়ে যান। তানাকা বলল।

—না। যে আসল মালিক তাকে দিয়ে দিই। নিজেরা একটা মুদ্রাও নিই না। শাঙ্কো বলল। তানাকা বেশ অবাকই হল। ও ঠিক বিশ্বাস করল না। আবার এই নিয়ে কোন কথাও বলল না।

এতক্ষণ তানাকার হাতের দড়ি খোলা হয়নি। শাঙ্কো দেখল সেটা। ও নিজের জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করল। তানাকার হাতের দড়িটাকে ছোরা দিয়ে কেটে দিল। তানাকা হাতের কব্জিদুটোয় হাত বুলোতে লাগল।

সূর্য উঠেছে কিছুক্ষণ আগে। এবার ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। সবার পোশাক ভেজামাথা থেকে টপ্ টপ্ করে জমা জল পড়ছিল এতক্ষণ। সবাই ভিজে ঢোল। এক ভাইকিং বন্ধু এতক্ষণে বলল—সুন্দর জামাটামা পরা আমাদের কপালে নেই। যাও বা পেলাম জলকাদায় এক কদাকার চেহারা নিয়েছে। এবার আরো দু-তিনজন ভাইকিং বলল—মাথা গা সব ভিজে একশা। দুর্ভাগ্য—দুর্ভাগ্য। হাঁটতে হাঁটতে আরো কয়েকজন বলল—রাস্তায় কাদা জমে গেছে। কাদা ছিটকোচ্ছে। নতুন পোশাক দেখাচ্ছে যেন তিরিশ বছরের পোশাক।

বেলা বাড়তে লাগল। সবাই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। কিন্তু কোথায় জুটবে সরাইখানা। চলছে সবাই। হঠাৎ তানাকা গলা তুলে বলল—ঐ ওক গাছটার নিচেই রয়েছে একটা সরাইখানা।

চলল সবাই। সত্যিই দুটো ঘর। পাথর আর শুকনো ঘাস দিয়ে তৈরি।

সবাই সরাইখানার সামনে এসে থামল। মালিক কাঠের পাটাতনে বসে আছে। এত খরিদ্দার দেখে খুব খুশি।

—আসেন, আসেন। মালিক একগাল হেসে বলল। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে এল।

শাঙ্কোরা ঘরের ভেতর ঢুকল। পাটাতন পাতা। তার ওপরেই শাঙ্কোরা বসল। সবাই জল খেল। কেউ কেউ রান্নার বড় উনুনের কাছে এসে বসল। জামাটামা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় শুকিয়ে নেওয়া।

শাঙ্কো মালিকের কাছে এল। বলল—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের খেতে দিন। বেশি দেরি করলে ময়দা আটা চিনির জলে ঢেলে খেয়ে নেব। মালিক আঁতকে উঠল।

—না—না। দেখছি দেখছি। মালিক কথাটা বলে রাঁধুনিদের কাছে গেল। ফিস্ ফিস্ করে বলল—তাড়াতাড়ি রুটি মাংস রেঁধে দাও। নইলে ভাঁড়ার ঘরে রাখা আটা ময়দা, চিনি সব লুঠ করবে। তাড়াতাড়ি করো।

রাঁধুনিরা খুব তাড়াতাড়ি রুটি মাংস রাঁধল। মালিক শাঙ্কোদের কাছে এসে হেসে বলল—আপনাদের খাবার আসছে। আপনারা খেতে বসুন।

শাঙ্কোরা সার দিয়ে বসল। পদ্মপাতা দেওয়া হল। তারপর রুটি আর মাংস। কেউ জানতে চাইল না এটা কিসের মাংস। পাতে পড়ামাত্র ওরা হাপুস হুপুস খেতে লাগল। শাঙ্কো বারকয়েক মারিয়াকে জিজ্ঞেস করেছে শরীর ভালো আছে কিনা। মারিয়া হেসে বলেছে আমার জন্যে ভেবো না।

খাওয়া শেষ। জল খেয়ে উঠল সবাই। শাঙ্কো সোনার চাকতি দিয়ে দাম মেটালো। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—চল সবাই।

শাঙ্কোরা চলল। একটা মোড়ে এসে দাঁড়াল সবাই। শাঙ্কো দেখল একটা রাস্তা সোজা চলে গেছে অন্যটা ডানদিকে মোড় নিয়েছে। তানাকা শাঙ্কোর কাছে এগিয়ে এল। বলল—সোজা রাস্তা চলে গেছে তানাকার দিকে। ডানদিকের রাস্তাটা গেছে প্যারাইসো। এখন আপনারা কোথায় যাবেন?

—প্যারাইসো বন্দরের কাছে।

—তাহলে ডানদিকের রাস্তাটা ধরে চলতে হবে।

—হুঁ। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—ডান দিকের রাস্তা দিয়ে আমরা যাবো। চলো সব।

ডানদিকের রাস্তা ধরে চলল সবাই।

মাথার ওপর সূর্য যেন আগুন ছড়াচ্ছে। পেট ভরা আছে। এতেই ওরা তৃপ্ত। রোদের তীব্রতা ওদের কাহিল করতে পারল না। বেশ জোরেই হাঁটতে লাগল সবাই।

শাঙ্কো তানাকার কাছে এল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তানাকা বলল—এবার তোমার কথা বলো তো। কী করেছিলে যে বন্দী হলে?

—সে অনেক কথা। তানাকা বলল।

—বল—শুনি। শাঙ্কো বলল।

—দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য। তানাকা বলল।

—বেশ তো। দুঃখের কথাটাই শুনি। শাঙ্কো বলল।

একটু থেমে তানাকা বলতে লাগল—তানাকা রাজ্যেই আমার জন্ম। তাই আমি নিজেই আমার নাম রেখেছি তানাকা। পড়াশুনো বেশি করতে পারি নি। বাবা ছিলেন হীরের গয়না তৈরিতে ওস্তাদ।

সান্তিয়াগো আর অন্য দেশ থেকে বাবার কাছে লোক আসতো হীরের গয়না তৈরি করার জন্যে। বাবার হাতের কাজ ছিল নিখুঁত। তানাকার বাজারের মধ্যে আছে বাবার দোকান। স্কুল পালিয়ে আমি বাবার দোকানে এসে বসে থাকতাম। পড়াশুনোর প্রতি আমার কোন আগ্রহই ছিল না। বাবাও বুঝল সেটা। বাবা বললেন—কী আর করবি। হীরের কাজই শেখ। বাবা হাতে ধরে আমাকে হীরের কাজ শেখাতে লাগলেন। আমার বাবা আমার কাজ দেখে

বললেন—ভালো। তাহলে হীরের সঙ্গে সোনা রুপোর কাজও শেখ। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে হীরে সোনা রুপোর কাজও শিখলাম। বাবার কাজে সাহায্য করি। আবার শুধু নিজেও গয়না টয়না তৈরি করতে লাগলাম।

তানাকা থামল। তারপর বলতে লাগল—আসলি হীরে সোনা এক নজর দেখেই আমি চিনে ফেলতাম। বাবা আমার এই গুণটার খুব প্রশংসা করলেন। বললেন—আমিও তোর মত এত তাড়াতাড়ি হীরে সোনা চিনতে পারি না। বাবা মাঝে মাঝে শুধু আমাকেই একটা গয়না তৈরির দায়িত্ব দিতে লাগলেন। আমিও গয়নাগুলো নিখুঁতভাবে করতে লাগলাম।

একটু থেমে তানাকা বলতে লাগল—এইসময় আমার এক বন্ধু জুটল—আরোনাস নাম। ও দোকানে আসতো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওর সঙ্গে গল্পটল্প করতাম। মাঝে মাঝে আরোনাসের সঙ্গে দোকানের কাজ শেষ করে দোকান থেকে বাইরে আসতাম। বাবা আপত্তি করতেন না। তানাকা থামল। শাঙ্কো কিছু বলল না। তানাকা বলতে শুরু করল—

এক দুপুরে আরোনাস একটু আগেই আমাকে দোকানের বাইরে নিয়ে এল। বলল—চল্—আজকে মন্ত্রীমশাইর বাড়ি যাবো।

—তোকে নেমন্তন্ন করেছে? আমি বললাম।

—না না। আমি নিজে থেকেই যাচ্ছি। আরোনাস বলল।

—কী জন্যে যাচ্ছিস? আমি বললাম।

—আছে—আছে। চল—দেখবি। আরোনাস শুধু এই কথাটাই বলল।

দুজনে মন্ত্রীমশাই-র বেশ বড় বাড়িটার সামনে এলাম। চারদিকে পাথরের দেয়াল। খুব উঁচু নয়। আরোনাস বলল—দেওয়াল পার হতে পারবি তো?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমি বললাম। কিন্তু এভাবে না বলে কয়ে—

—উপায় নেই। বিনা কারণে কেউ তোকে এমনি এমনি থলিভর্তি সোনার চাকতি দিয়ে যাবে না। আরোনাস বলল।

—ঠিক আছে। পার হ। আমি বললাম।

দুজনে দেওয়াল পার হলাম। একটা বড় বাগান। ফলফুলের গাছ। আরোনাসের পেছনে পেছনে মাথা নিচু করে একটা বড় আপেল গাছের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি তখনও জানি না ওখানে কেন দাঁড়িয়ে গেলাম। ওখান থেকে কাচের জানালা দিয়ে ঘরটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে আছি। কিছু পরে রাজার এক পেয়াদা এল। দরজায় শব্দ করল। মন্ত্রীমশাই নিজেই দরজা খুলে দিলেন। বাড়ির পাহারাদার বোধহয় অন্য কাজে গেছে। পেয়াদা কোমর থেকে একটা ভেলভেট কাপড়ের থলিমত বের করল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে মন্ত্রীমশাইর হাতে দিল। আরোনাস ফিস্ ফিস্ করে বলল—পেছনে চল্। জলদি।

দুজনে দ্রুতপায়ে বাড়ির পেছনে এলাম। একটা মোটাগাছের আড়াল থেকে দেখলাম একটা ঘর। শোবার ঘর। মন্ত্রীমশাই সেই ঘরে এলেন। একটা আবলুশ

কাঠের আলমারি। মন্ত্রীমশাই আলমারির দরজাটা খুললেন। থলিটা পরের তাকে রাখলেন। তারপর চলে গেলেন। আলমারিটা বন্ধও করলেন না। বোধহয় পরে থলিটা কোথাও রাখবেন।

এবার আরোনাস ফিস্‌ফিস্ করে বলল—তুই পেছনের গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়া। দাঁড়িয়েই থাকবি। আমি কথামত গেট-এ গিয়ে দাঁড়ালাম। শুনলাম দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ। একটি কাজের স্ত্রীলোক দরজা খুলে বেরিয়ে এল। আরোনাস আমাকে দেখিয়ে কী বলল। স্ত্রীলোকটি আমার কাছে আসতে লাগল। তখনই দেখলাম আরোনাস খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে দ্রুত ঢুকে পড়ল। আর অল্প সময়ের মধ্যে বেরিয়ে এল। স্ত্রীলোকটি তখন আমার সামনে আসছে। আরোনাস মুহূর্তের মধ্যে শোবার ঘরের দরজা ভেজিয়ে ছুটে এল আমাদের কাছে। স্ত্রীলোকটি তখন আমাকে জিজ্ঞেস করছে—এই দরজা দিয়ে এলেন কেন? বড় দরজায় যান। আরোনাস ছুটে এল। চাপা গলায় বলল—পালা। ছোট। আমিও আরোনাসের পেছনে পেছনে ছুটলাম। কাজের স্ত্রীলোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

রাস্তায় নেমেই আরোনাস বলল—এবার স্বাভাবিকভাবে হাঁট। সব হিসেবমত করেছি। আর ভয়ের কিছু নেই।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে আরোনাসের বাড়ি এলাম। আরোনাস কী একটা লোহার মত লম্বা কাঠি বের করল। দরজাটার ফাঁকে ঢোকাল। দরজা খুলে গেল। দুজনে ভেতরে ঢুকলাম। তখনও আমরা হাঁপাচ্ছি। যীশু বাঁচিয়েছেন। ঠিক সময় পালাতে পেরেছি।

আরোনাস জামার গলার কাছ দিয়ে হাত ঢোকাল। থলিটা বের করল। সোনার চাকতিগুলো বিছানায় ছড়াল। গুনল। বলল—মন্ত্রীমশাই আমাদের টিকিও ছুঁতে পারবে না। আমাদের কামাইটা আজ ভালোই হল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম— চলি রে।

—দাঁড়া—এই সার্টিনের থলিটা নিয়ে যা। আরোনাস বলল।

—না—না। আমি বললাম।

—নিয়ে যা। অনেক কাজে লাগবে। আরোনাস বলল।

কেমন লোভ হল। জিনিসটা দেখতেও সুন্দর। থলিটা নিলাম। বাড়িতে আর আনলাম না। দোকানেই রেখে দিলাম।

—ওটাই ভুল করেছো—শাঙ্কো বলল—চুরির জিনিস রাখাও অপরাধ।

—সেটা পরে বুঝলাম।

—হুঁ। তারপর বলো। শাঙ্কো বলল।

—বেশ কিছুদিন কাটল। মন্ত্রীর বাড়িতে চুরি। হৈ-চৈ পড়ে গেল। সে সব চাপাও পড়ল।

আরোনাস মাঝে মাঝেই আসে। একটা কথা ভালোই বুঝলাম—আরোনাস পাকা চোর। আমি ওর সঙ্গে যেতে না চাইলেও ও প্রায় জোর করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে লাগল। তখন ও বলছিল—আমি চুরি টুরি করা ছেড়ে দিয়েছি। চল্ এমনি ঘুরে টুরে আসি।

কিছুদিন গেল। আরোনাস একদিন বলল,—তোর বাবা তো হীরের কাজের নাম করা কারিগর। কত রাজা-রাজড়া তাঁকে দিয়ে গয়নাটয়না বানায়।

—হ্যাঁ। এসব কাজে বাবার সুনাম আছে। আমি বললাম।

—শুনেছি—আট দশ মাস আগে এখানকার রাজা ব্রাপেন নাকি একটা হীরে দিয়েছে ভেঙে গয়না বানাতে।

—হ্যাঁ। ঐ কাজে এখনও আমরা হাত দিতে পারিনি।

—রাজা কী দিয়েছে? আরোনাস বলল।

—একখণ্ড তিনকোনা হীরে। ওটাই ভেঙ্গে দুটো গয়না গড়াতে হবে। আমি বললাম।

—তোর বাবা হীরেটা কোথায় রেখেছে? আরোনাস বলল।

—দোকানের লোহার সিন্দুকে। আরোনাসকে আমি বললাম।

—ওটার চাবি তোর বাবার কাছেই থাকে। আরোনাস বলল।

—নিশ্চয়ই। আমি বললাম।

—উনি চাবিটা কোথায় রাখেন? আরোনাস বলল।

—সে অনেক ব্যাপার।

—তার মানে? আরোনাস বলল।

—একটা ছোট্ট রুপোর শেকলের মধ্যে চাবিটা থাকে। আমি বললাম।

—সে কি। ঐ নিয়েই স্নান খাওয়া শোওয়া? আরোনাস বলল।

—হ্যাঁ। শুধু রোববার বাবা ঘুম থেকে উঠে ওটা আমাদের এক ছোট্ট যীশুর মূর্তির বেদীতে ঢুকিয়ে রাখে। আমি. বললাম।

—তারপর—সোমবার সকালে কোমরে পরেন। আরোনাস বলল।

—তাহলে রোববার সারা দিন রাত ওটা ঐ বেদীতেই থাকে। আরোনাস বলল।

—হ্যাঁ। কিন্তু এত কথা জানতে চাইছো কেন? আমি বললাম।

—কারণ আছে। আমার এক দাদা পেরুর রাজধানী লিসা থেকে এক খণ্ড হীরে কিনে এনেছে। আমাকে বলল—বড় দামী হীরে। বাড়িতে সিন্দুক-টিন্দুক নেই। সিন্দুক আছে এমন কারুর সঙ্গে তোর জানাশোনা আছে? আমি তোদের কথা বললাম। ঐ হীরেটা আমি তোদের সিন্দুকে রাখবো। আরোনাস বলল।

—কিন্তু বাবা বোধহয় রাজি হবেন না। আমি বললাম।

—আরে বাবা দিন পনেরোর মামলা। দাদা দিন পনেরো পরে চলে যাবে। তখন নিয়ে যাবে। আরোনাস বলল।

—ঠিক আছে। কিন্তু পনেরো দিনের মধ্যে নিতে হবে। আমি বললাম।

—নিশ্চয়ই। এখন আমি বলছিলাম তুই তোর বাবাকে এই নিয়ে কিছু বলবি না। আরোনাস বলল।

—বেশ। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

—তাহলে সামনের রোববার দুপুরে তুই চাবিটা নিয়ে আয়। হীরেটা দোকানের সিন্দুকে রেখে দেব। চাবি আগের জায়গায় রেখে আসবি। এইজন্যে আমি তোকে একটা স্বর্ণমুদ্রা দেব। আরোনাস বলল।

—বেশ। আমি বললাম।

—তবে পরশু রোববার। দুপুরের সময় তোদের দোকানের সামনে আমি দাঁড়িয়ে থাকবো। আরোনাস বলল।

—বেশ। স্বর্ণমুদ্রাটা? আমি বললাম।

—কাজ সেরে দেব। আরোনাস বলল।

তানাকা থামল। তারপর আবার বলতে লাগল—সেই রোববার চাবি নিয়ে এলাম। দোকান খুলে সিন্দুকের কাছে গেলাম। সিন্দুক খুললাম। আরোনাস বলল— ওপরের জানলাটা খুলে দে। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমি জানলা খুললাম। আরোনাস বলল—জানালা বন্ধ করে দে। কাজ হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম হীরেটা কত বড়? আমি জানতে চাইলাম।

—বেশি বড় না। তোদের যেটা আছে—তেমনি বড়। আরোনাস বলল।

দুজনে দোকানের বাইরে এলাম।

—তারপর? শাঙ্কো বলল।

—কী আর বলবো। তানাকার রাজা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দেশে যান। ঐদিনের পরেই খবর পেলাম—রাজা ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে এসেছেন। শোভাযাত্রা করে রাজা প্রাসাদে ফিরলেন।

কয়েকদিন পরে সেনাপতি ঘোড়ায় চড়ে এলেন। দোকানে ঢুকলেন। বাবা উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে সেনাপতিকে সম্মান জানালেন। সেনাপতি বললেন— রাণিমা আগে দেওয়া হীরের খণ্ডটা থেকে গয়না করতে বলেছেন। আপনাকে কাল রাজপ্রাসাদে যেতে হবে। রাণিমা নক্শা তৈরি করেছেন। সেরকম অলঙ্কারই আপনাকে করতে হবে। বাবা মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন—ঠিক আছে।

সেনাপতি কোমর বন্ধনী থেকে একটা গভীর নীল রঙের রুমাল বের করলেন। রুমালের ভাঁজ খুলে বললেন—এই হীরেটা নিন। রেখে দিন। রাণিমা পরে কিভাবে তৈরি করবেন তার নক্শা দেবেন।

বাবা আবার বললেন—ঠিক আছে।

সেনাপতি চলে গেলেন। বাবা সিন্দুক খুলে হীরেটা রেখে দিলেন। সিন্দুকটা বন্ধ করলেন। তখনও আমরা বুঝিনি আমাদের কী সর্বনাশ হয়ে গেছে।

—তারপর? শাঙ্কো বলল।

বাবা পরদিন রাজবাড়িতে গেলেন। বড় দরজার এক প্রহরী বাবাকে দেখে বলল—আপনিই তো মণিকার?

—হ্যাঁ।

—রাণিমার সঙ্গে দেখা করতে চলুন। প্রহরী বাবাকে নিয়ে অন্দরমহলের কাছে নিয়ে এল। অন্দরমহলের প্রহরী বাবাকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বাবাকে ভেতরে নিয়ে গেল। বাবা তো অবাক হয়ে চারদিকের সাজসজ্জা দেখছিলেন। একটা ঘরে দেখলেন রাণিমা একটা সিংহমুখওয়ালা আসনে বসে আছেন। বাবাকে বসতে বললেন। বাবা একটা ছোট আসনে বসলেন। রাণিমা একজন পরিচারিকাকে বললেন—নক্‌শাটা নিয়ে আয় তো। পরিচারিকা একটা পার্চমেণ্ট কাগজ নিয়ে এল। কাগজটা বাবার হাতে দিয়ে বললেন—দেখুন নকশাটা কেমন করেছি। বাবা দেখে টেখে বললেন—কিছু এদিক-ওদিক করে হীরে দিয়ে করা যাবে।

—নক্‌শা নিয়ে যান। এই নকশামত করবেন।

বাবা ফিরে এলেন। তখন দুপুর। আমি দোকান খুলে বসে আছি। বাবা এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে চাবি বের করে সিন্দুকটা খুললেন। চিৎকার করে বলে উঠলেন— রাণিমার হীরেটা কোথায়? আমি লাফিয়ে উঠলাম। ছুটে এসে দেখি আগের হীরের খণ্ডটা নেই। সেখানে একটা কাচের ডেলা। হাতে নিয়ে দেখে বুঝলাম কাচের ডেলা। বাবা তখনও চিৎকার করছেন—সর্বনাশ হয়ে গেল। রাণিমা আমাকে ফাঁসি দেবেন। তাঁর হীরের খণ্ডটা চুরি হয়ে গেছে।

আমি সবই বুঝলাম তখন। আরোনাসের হাত সাফাই—কোন সন্দেহ নেই। আমি বললাম—বাবা—আমি দেখছি। তুমি বাড়ি যাও। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করো।

আমি দোকানের বাইরে এলাম। প্রায় ছুটে এলাম আরোনাসের বাড়িতে। দরজা বন্ধ। দরজায় জোরে টোকা দিলাম। এক বুড়ি হয়তো আরোনাসের মা এসে দাঁড়াল। আমি হাঁপাচ্ছি তখন। বললাম—আরোনাস কোথায়?

—তুমি কে? আরোনাসের মা বলল।

—সেসব পরে বলছি। আরোনাস কোথায় বলুন। আমি বললাম।

—আরোনাস সান্তিয়াগোতে—ওর পিসির বাড়ি বেড়াতে গেছে।

—সেই পিসির বাড়ি কোথায়? আমি জানতে চাইলাম।

—তা তো ঠিক বলতে পারবো না। আরোনাসের মা বলল।

—আপনাদের আত্মীয় তার ঠিকানা জানেন না? আমি বললাম।

—আহা—কী যেন নাম গীর্জাটার—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে— নর্থ গীর্জার কাছে।

—পিসেমশাইর নাম? আমি জানতে চাইলাম।

—ভিক্টর। আরোনাসের মা বলল।

—ঠিক আছে। আমি বললাম।

আমি আর বাড়ি ফিরলাম না। কোমরের ফেট্টি থেকে বেশ কয়েকটা রুপোর মুদ্রা পেলাম। এই সম্বল করে সান্তিয়াগোর দিকে চললাম।

সন্ধে হল। আমি চললাম। রাতে এক সরাইখানায় কিছু খেয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম। সারারাত হাঁটলাম। পরদিন দুপুরবেলা সান্তিয়াগো পৌঁছলাম। খুঁজে খুঁজে নর্থ গীর্জার সামনে এলাম। কাছাকাছি একটা দর্জির দোকান পেলাম। দর্জিকে জিজ্ঞেস করলাম—ভিক্টরের বাড়ি কোনটা? সে আঙ্গুল দিয়ে একটা বাড়ি দেখাল। সেই বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। দরজায় টোকা দিলাম। ভেতরে কোন সাড়া নেই। আবার আঙ্গুল ঠুকলাম। একটু জোরে। শব্দ করে দরজা খুলে গেল। এক মধ্যবয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে। বুঝলাম—ভিক্টর।

বলল—কাকে চাই?

—তানাকায় আপনাদের কোন আত্মীয় থাকে? আমি জানতে চাইলাম।

—হ্যাঁ। ভিক্টর বলল।

—তাহলে আরোনাস তো আপনার আত্মীয়। আমি বললাম।

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো। ভিক্টর বলল।

—পরে বলছি। আরোনাস আপনাদের কাছে বেড়াতে এসেছে। আমি বললাম।

—হ্যাঁ। ভিক্টর বলল।

—আরোনাসকে ডেকে দিন। আমি বললাম।

ভিক্টর একটা ঘরের দিকে যেতে যেতে ডাকল—আরোনাস—আরোনাস। কোন উত্তর নেই। একটা ঘরের দরজা দিয়ে মুখ গলিয়ে দেখে ফিরে দাঁড়াল। বলল— আরোনাসকে একটু আগেও আমি দেখে গেছি। ও কোথাও গেছে বোধহয়। ও নেই। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এতদূর এসে সব আশার শেষ? এটাই ভাবলাম। তবু জিজ্ঞেস করলাম—আরোনাস কোথায় যেতে পারে?

—যায় তো কয়েকটা জায়গায়। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলুন তো। ভিক্টর বলল।

আমি আস্তে আস্তে সব কথা বললাম। তারপর বললাম—বাবার সাংঘাতিক বিপদের কথা।

—আপনি কি নিশ্চিত যে আরোনাসই ঐ হীরের খণ্ডটা চুরি করেছে। ভিক্টর বলল।

—হ্যাঁ। নিশ্চিত। আপনারা জানেন না আরোনাস কত বড় চোর। আমি বললাম।

—না—না এ বিশ্বাস করা যায় না। ভিক্টর বলল।

—যাক্ গে—আপনার বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে আমি ভাবছি না। আমি আরোনাসকে পেতে চাই। কোথায় পাবো ওকে? আমি বললাম।

—তা কী করে বলি। ভিক্টর বলল।

—তবু দু-একটা জায়গা বলুন। আমি বললাম।

—গীর্জার পেছনে একটা শরীরচর্চার ঘর আছে। ওখানে ও যায়। ভিক্টর বলল।

—বেশ। আর একটা? আমি বললাম।

—মোড়ের মাথায় রুটির দোকান আছে। সেখানে ওর দু'একজন বন্ধু আছে। ভিক্টর বলল।

—ঠিক আছে। আমি বললাম।

আমি গীর্জার পেছনে এলাম। একটা ঘরও পেলাম। দেখি বেশ কয়েকজন যুবক ঘরে বাইরে দাঁড়িয়ে বসে আছে। আমি তাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। আরোনাস নেই। তাদের কাছে আমি গেলাম। বললাম—আপনারা আরোনাসকে দেখেছেন?

—এসেছিল। চলে গেছে। একজন বলল। আমার কেমন সন্দেহ হল ওরা মিথ্যে কথা বলছে। তাহলে আরোনাস জানতে পেরেছে যে আমি এসেছি। চললাম রুটি তৈরির কারখানার দিকে।। পেলাম দোকানটা।

মালিক একটা উঁচু পাটাতনে বসে। কয়েকজন যুবকও বসে আছে। ওদের একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আরোনাস কি এখানে এসেছিল?

—না। ও আসে নি। একজন বলল। আর একজন বলল—কী ব্যাপার বলুন তো? ওকে খুঁজছেন কেন?

—ও আমার বন্ধু ছিল। আমি বললাম।

—বন্ধু ছিল বলছেন। এখন কি বন্ধু নয়? একজন বলল।

—না। ও চোর। বিশ্বাসঘাতক। বললাম। কথা না বাড়িয়ে চলে এলাম।

তখন বিকেল হয়ে গেছে। সারাদিন না খেয়ে আছি। এবার ঠিক করলাম—ওকে পিসির বাড়িতেই ধরবো।

একটা সরাইখানায় ঢুকলাম। রূপার মুদ্রা দিয়ে খেলাম। সরাইখানায় শুয়ে রইলাম। ঠিক করলাম—একটু রাতে পিসির বাড়ি যাবো। এখন বিশ্রাম করি। শুয়ে রইলাম। দুচোখ জ্বালা করছে। ঘুম আসবে না। চুপ করে শুয়ে রইলাম। ভাবলাম একটু বেশি রাতে যেতে হবে।

রাতের খাওয়া হল। একটু শুয়ে থেকে উঠলাম। আরোনাসের পিসির বাড়ির দিকে চললাম।

অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে ওর পিসির বাড়ি এলাম। দরজায় আঙ্গুল ঠুকলাম। ভিতরে শব্দ হল। তারপর চুপ। এবার জোরে আঙ্গুল ঠুকলাম। সশব্দে দরজা খুলে গেল। কে আমার বুকে জোরে ধাক্কা দিল। আমি ছিটকে

মাটিতে পড়লাম। এ নিশ্চয়ই আরোনাস। জ্যোৎস্নার মৃদু আলোতে দেখলাম আরোনাস ছুটে পালাচ্ছে। আমিও ওর পেছনে ছুটলাম।

ছুটতে ছুটতে চারটে রাস্তার মোড়ে এলাম। এবার ডাকলাম—আরোনাস দাঁড়া। আরোনাস দাঁড়াল না। ছুটতে লাগল। এবার আমি প্রাণপণে দৌড়ে আরোনাসের ঠিক পেছনে এলাম। এক লাফ দিয়ে ওকে ধরে ফেললাম। ঘাড়ে পিঠে জোরে দুই ধাক্কায় আরোনাসকে রাস্তায় ফেলে দিলাম। ও চিৎ হয়ে গেল। আমি ওর গলা চেপে ধরতে গেলাম। বললাম হীরে ফেরত দে। ও এক হ্যাঁচকা টানে কোমর থেকে ছোরা বের করল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। সাবধান হলাম।

তখনই দুই পাহারাদার ছুটে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এই লোকটি আমাকে খুন করতে চাইছে। একে ধরুন। একজন পাহারাদার আরোনাসের হাতে- ধরা ছোরা দিতে ইঙ্গিত করল। আরোনাস ছোরা দিল। এক পাহারাদার বলল— দুজনেই চলো।

তোমাদের কয়েদখানায় ঢোকানো হবে।

—আমি কোন দোষ করি নি। ও আরোনাস আমার হীরে চুরি করেছে। আমি হীরেটা ফেরত চাই। আমি বললাম।

—ঠিক আছে। কালকে সব শোনা যাবে। বিচারও হবে। এখন দুজনেই চল। পাহারাদার কোমর থেকে দড়ি বের করল।

তানাকা থামল। তারপর বলল—বুঝলাম আমি আরোনাসের কাছ থেকে হীরেটা উদ্ধার করতে পারব না। পাহারাদারদের কিছুতেই বোঝাতে পারবো না যে আমার হীরেটা ওই চুরি করেছে। ওটা আদায় করবার জন্যেই ওর পেছনে ছুটে এসেছি। ওকে ধরেছি। পাহারাদার কোন কথা বলল না।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। সবাই কয়েদঘরে এলাম। পাথরের টানা বাড়ি একটা। সেই বাড়ির একটা ঘরের সামনে আমরা এলাম। লোহার দরজা একজন প্রহরী খুলে দিল। ভেতরে ঢুকলাম আমরা দুজন।

মশালের আলোয় দেখলাম শক্ত পাথরে গাঁথা দেয়াল মেঝে। দেখলাম আরও তিন-চারজন বন্দী রয়েছে। শুকনো লম্বা ঘাসের বিছানা। বিছানায় শুয়ে পড়লাম। রাত জেগেছি মাথা টন্ টন্ করছে। তানাকা বলতে লাগল—

সকাল হল। দুজন প্রহরী সকালের খাবার নিয়ে ঢুকল। প্রত্যেকের হাতে বড় পাতা দিল। দু'টো করে পোড়া রুটি আর দু-তিনরকম আনাজপত্রের ঝোল। ভীষণ খিদে। অল্পক্ষণেই খেয়ে ফেলে পাতা এগিয়ে ধরলাম। বললাম—আরো দাও। প্রহরী বলল—আর একবার পাবে। ব্যাস্।

—তাই দাও। আমি বললাম—পেট ভরে খেলাম।

একটু বেলায় প্রহরীদের ওপরওয়ালা এল। মুখে গোঁফ দাড়ি। প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করল—তুই কে? আমি আমার কথা বললাম। তারপরে সবাইকে জিজ্ঞেস করল—বাড়ি কোথায়। প্রহরীরা সকলের অপরাধের কথা

বলল। ওপরওয়ালা গোঁফ চুলকে বলল—দেখছি চারজনের বাড়ি তানাকায়। ঐ চারটাকে হাতে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবি তানাকা সীমান্তে। ওদের তানাকার পাহারাদারদের হাতে তুলে দিবি। দেখিস পালিয়ে না যায়। আমি বললাম—আমার একটা আর্জি ছিল।

—বল্। ওপরওয়ালা ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল। আরোনাসকে দেখিয়ে বললাম—এই লোকটা আরোনাস আমাকে বোকা বানিয়ে একটা হীরের খণ্ড চুরি করেছে।

—বলো কি। তা হীরে পেলি কোথায়? বড় পাহারাদার জানতে চাইল।

—আমার বাবা হীরের গয়নাগাঁটি তৈরি করে। আমি বললাম।

—ও। তা এসব বিচার তোদের দেশের রাজা করবে। তোদের বিচারের ঝামেলা আমরা নেব না।

প্রহরীদের কর্তা চলে গেলেন।

—তারপর? শাঙ্কো বলল।

—ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পালালাম। এবার আমার একটাই চিন্তা বাবার কোন বিপদ হয়নি তো?

শাঙ্কো বলল—এখন কী করবে?

—অপেক্ষা করবো। আরোনাস মুক্তি পেলেই ওকে ধরে হীরের খণ্ড আদায় করে ছাড়বো।

শেষ বিকেলে শাঙ্কোরা প্যারাইসো পৌঁছল। হৈ হৈ করে জাহাজে উঠল। ফ্রান্সিস হাসিমুখে এগিয়ে এল। সবাইকে নির্বিঘ্নে ফিরতে দেখে ফ্রান্সিস খুশি। মারিয়াকে বলল—কোন সমস্যায় পড়োনি তো?

—না—না। মারিয়া হেসে বলল। ফ্রান্সিস তানাকাকে দেখে বলল—এই যুবক কে?

—আমি সব বলছি। তার আগে বিকেলের খাবারটা খেয়ে নিই তানাকা বলল।

—ঠিক—ঠিক। আমি একটু বেশি কৌতূহল দেখিয়ে ফেলেছি। তোমরা খেয়ে নাও। ফ্রান্সিস বলল। তারপর রসুইঘরে গিয়ে রাঁধুনি বন্ধুদের বলল—একটু তাড়াতাড়ি খাবার তৈরি কর। শাঙ্কোরা খুব ক্ষুধার্ত।

শাঙ্কোরা অনেকেই হ্যারির ঘরে এসে হ্যারিকে দেখে গেল। হ্যারি এখন একেবারে সুস্থ। বন্ধুদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করল। সকলেই খুশি হল—হ্যারির অসুখ সেরে গেছে।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডেকে পাঠাল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে এল। ফ্রান্সিস বলল—তানাকাকে ডেকে আনো। শাঙ্কো তানাকাকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস তানাকাকে বিছানায় বসতে বলল। মারিয়া বিছানার কোনায় বসল। ফ্রান্সিস বলল—তানাকা তোমার পরিচয় দিয়ে বল তুমি আমাদের কাছে আশ্রয় নিচ্ছো কেন। তানাকা শাঙ্কোকে যা বলেছিল তাই বিস্তারিত বলল।

ফ্রান্সিস বলল—তুমি কি নিশ্চিত যে আরোনাসই হীরের খণ্ডটা চুরি করেছে?

—হ্যাঁ। এতে কোন ভুল নেই।

—হীরের খণ্ডটা নেই এটা প্রথমে কে দ্যাখে। তুমি না তোমার বাবা? ফ্রান্সিস বলল।

—বাবা। রাণিমার গয়না তৈরি করবে বলে বাবা সিন্দুকটা খোলেন। তখনই দেখলেন হীরের খণ্ডটা নেই।

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। পরে বলল—তানাকা আমি আর শাঙ্কো তোমাদের দেশে যাবো। অন্য কিছু দেশেও যাবো। একটু থেমে বলল—অন্য দেশেরও রাণিরা রাজকুমারীরা নিশ্চয়ই তোমার বাবার কাছে গয়না গড়াতে দেন।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ।

—তাই তোমাদের দেশে আগে যাবো। কিছু খোঁজখবর করবো। তারপর অন্য দেশে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস এতো মাস দুয়েকের ধাক্কা। শাঙ্কো বলল।

—না—না। অত সময় লাগবে না। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া বলল—অত খোঁজখবরের কী দরকার?

—দরকার আছে। যাক গে—শাঙ্কো কালকে দুটো ঘোড়া ভাড়া করতে হবে। আমরা কয়েকটা জায়গায় যাবো।

—আমি আপনাদের সঙ্গে তানাকা যেতে চাই। তানাকা বলল।

—ঠিক আছে। তোমার বাবার দোকানটা দেখা যাবে।

আমাদের বাড়িটাও দেখতে পারবেন। তানাকা বলল।

—না। তোমাদের দোকানটাই দেখতে হবে। ভালো কথা—তোমাদের দোকানে যে সিন্দুকটা আছে তোমার বাবা ঐ সিন্দুকেই তো সব হীরে জহরত রাখতেন।

—হ্যাঁ। বাড়িতে কোথাও রাখতেন না। তানাকা বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

সকালের খাবার খেয়েই তিনজনে জাহাজ থেকে নামতে তৈরি হল। মারিয়া একপাশে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিস মারিয়ার কাছে গেল। নিম্নস্বরে বলল—কোন চিন্তা করো না। আমরা দুজনে অক্ষত দেহে ফিরে আসবো। মারিয়া মুখ নিচু করল। কোন কথা বলল না।

জাহাজঘাটার কাছে একটা মাঠ মত। সেখানে দুটো ঘোড়া একটা চেস্টনাট গাছের সঙ্গে বাঁধা। একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। শাঙ্কো ঐ লোকটার কাছে এল। ফ্রান্সিসরাও এল। শাঙ্কো লোকটিকে একটা সোনার চাকতি দিল। আঙুল দিয়ে নিজেদের জাহাজটা দেখিয়ে বলল—দিন পাঁচ সাত পরে ঐ জাহাজে

আমাদের পাবে। ঘোড়া দুটো এই গাছের সঙ্গেই বেঁধে রাখবো। ফ্রান্সিসরা আর দেরি করল না। তিনজনে ঘোড়ায় চড়ল। আরোনাস শাঙ্কোর ঘোড়ায় উঠল। ওরা ঘোড়া ছোটাল।—তানাকা দেশের উদ্দেশ্যে।

রোদের তেজটা একটু কম। ফ্রান্সিসদের খুব একটা কষ্ট হল না।

দুপুরে একটা ছোট গ্রামে এল। ফ্রান্সিস ঘোড়া থামাল। শাঙ্কো বলল—থামলে কেন?

—দুপুর হল। কিছু তো খেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখা যাক কোন বাড়িতে খাবার জোটে কিনা? এখানে তো আর সরাইখানা নেই। শাঙ্কো বলল।

সামনে একটা বাড়ি দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—আগে এই বাড়িটায় চলো।

তিনজনে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসই বন্ধ দরজায় টোকা দিল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। একজন বয়স্ক মানুষ দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস বলল—দেখুন— আমরা প্যারাইসো বন্দর শহর থেকে আসছি। যাবো তানাকা। এত বেলায় খুবই ক্ষুধার্ত আমরা। যদি কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

—নিশ্চয়ই। আসুন—আসুন। বয়স্ক মানুষটি দরজার পাল্লাটা আরো খুলে বলল।

তিনজনে ভেতরে ঢুকল। পাটাতনের ওপর শুকনো ঘাসপাতার বিছানা। তিনজনেই বসল। ততক্ষণে দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়ে ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসদের দেখছে। ফ্রান্সিস একটা বাচ্চা মেয়েকে ডাকল। যা হোক একটু সাহস করে মেয়েটি ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস নাম জিজ্ঞেস করল। নাম বলল মেরেটি। মেয়েটির ভাইও সাহস পেয়ে এগিয়ে এল।

তখনই বাড়ির কর্ত্রী এল। বলল—আপনারা এসেছেন আমাদের বাড়িতে এটা অত্যন্ত আনন্দের। কিন্তু আমাদের তো দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছে কাজেই আপনাদের জন্যে রাঁধতে হবে। কিছু দেরি হবে।

—কোন সমস্যা নেই। আমরা ততক্ষণ অপেক্ষা করবো। ফ্রান্সিস বলল। কর্ত্রী ছেলেমেয়েকে নিয়ে চলে গেল।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বলল—এতক্ষণ ঘোড়ায় চড়ে হাতপায়ে খিল ধরে গেছে। শাঙ্কোও শুয়ে পড়ল। তানাকা বসে রইল।

শেষ বিকেলে ফ্রান্সিসদের খেতে দেওয়া হল। তিনজনেই তখন ক্ষুধায় কাতর। পাতে খাবার পড়তেই খেয়ে নিল ফ্রান্সিসরা। খাওয়া শেষ। কর্ত্রী এসে বলল—আপনাদের পেট ভরেছে তো?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। বোধহয় একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছি। শাঙ্কো বলল।

আবার ফ্রান্সিসরা ঘোড়ায় উঠল। ঘোড়া চলল তানাকার দিকে।

বেশ রাতে তানাকা পৌঁছল। তানাকা বলল—এই রাতে আর কোথায় যাবেন? আমাদের বাড়িতেই চলুন। ফ্রান্সিস বলল—বেশ চলো।

তানাকাদের বাড়ির সামনে এসে ওরা ঘোড়া থেকে নামল।

তানাকা এগিয়ে গেল। দরজায় ধাক্কা দিল। কয়েকবার ধাক্কা দেওয়া হল। একটি নারীকণ্ঠ শোনা গেল—আসছি।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। স্ত্রীলোকটির হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি। তানাকা বলল—মা—বাবা কেমন আছে?

—ভেতরে আয় বলছি। কিন্তু এঁরা কারা? তানাকার মা বলল।

—আমার বন্ধু। বিদেশি। রাতে খাবে থাকবে। তানাকা বলল।

—ও। আয়।

মোমবাতির আলোয় ছোট্ট উঠোনমত পার হল। সামনে ঘর দেখল। তানাকা ঘরের দরজা খুলল। মার হাত থেকে মোমবাতিটা নিয়ে উঁচু পাটাতনে রাখল। ফ্রান্সিস শাঙ্কো কাঠের পাটাতনে বসল। তানাকা বলল—আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা দেখি। ঘোড়াদুটোকেও তো খাওয়াতে হবে। তানাকা বেরিয়ে গেল।

এবার ফ্রান্সিস নিম্নস্বরে বলল—শাঙ্কো—একটা ব্যাপারে আমার সন্দেহ যাচ্ছে না।

—কোন ব্যাপারে? শাঙ্কো বলল।

—তানাকার বাবা মনে হয় সৎ ব্যবসায়ী নয়। তবে এটা এখনো আমার অনুমান। এখন কয়েকটা দেশে যেতে হবে। বার্বার মানে তানাকার বাবা আর কোন কোন রাজ্য থেকে হীরের গয়না গড়িয়ে দেবার নির্দেশ পেয়েছিলেন এটা জানলেই সিদ্ধান্তে আসা যাবে।

তানাকা ঘরে ঢুকল। বলল—মা রান্না বসিয়ে দিয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রান্না হয়ে যাবে।

ফ্রান্সিস বলল—তানাকা তোমাদের দোকান তো বাজার এলাকায়।

—হ্যাঁ।

—কালকে একবার দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তো। একটু থেমে তানাকা বলল—এই তানাকা রাজ্যের রাজা বাবাকে বন্দী করে রেখেছে। রাণিমা বলেছেন—যেখান থেকে হোক হীরে জোগাড় করে গয়না গড়িয়ে দিতে হবে। তানাকা বলল।

—কিন্তু তোমার বাবাকে মুক্তি না দিলে উনি কী করে গয়না গড়বেন? ফ্রান্সিস বলল।

—সেসব কথা বলতেই কাল রাজসভায় যাবো। তানাকা বলল।

—বেশ। আমরাও যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা কেন যাবেন? তানাকা জানতে চাইল।

—সেনাপতির সঙ্গে কিছু কথা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। তানাকা মুখে শব্দ করল।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো রাজসভায় গেল।

—বাবার মুক্তির ব্যাপারে কিছু বলবেন না? তানাকা বলল।

—না। আগেই নয়। পরে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো রাজসভায় এল। বেশ ভিড়। রাণী একটা কাঠের সিংহাসনে বসে আছেন। বিচার চলছে। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস সেনাপতিকে আগেই দেখেছে। তক্কে তক্কে রইল কখন সেনাপতি রাজসভার বাইরে আসে।

কিছু পরেই হঠাৎ সেনাপতি রাজসভার বাইরে এলেন। সৈন্যাবাসের দিকে চললেন। ফ্রান্সিস প্রায় ছুটে সেনাপতির কাছে এল। সেনাপতি দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন—কী ব্যাপার।

—মাননীয় সেনাপতি—আপনাকে একটা কথা বলার ছিল।

—তোমাদের দেখে তো মনে হচ্ছে—বিদেশি। সেনাপতি বলল।

—হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং। একটা কথা জানতে এলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। সেনাপতি বলল।

—বার্বার যিনি রাণীর গয়নাগাঁটি গড়েন তিনি রাণীর পাঠানো হীরে হারিয়ে ফেলেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কঠোর শাস্তি হবে বার্বারের। সেনাপতি বলল।

—আচ্ছা বার্বার কি এর আগেও হীরের খণ্ড হারিয়েছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আবার হারানো—রাণীমা খুব রেগে গেছেন। সেনাপতি বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই পেছন থেকে তানাকা ছুটে এল। সেনাপতিকে বলল—মাননীয় সেনাপতি। বার্বার আমার বাবা। তাকে কি মুক্তি দেওয়া হবে না?

—এখন না। কিছু শাস্তি ভোগ করুক আগে। সেনাপতি বললেন।

—বাবা হীরেটা হারিয়ে ফেলেছেন। তানাকা বলল।

—ওসব বলে পার পাওয়া যাবে না। রাণিমা রেগে আগুন হয়ে আছেন। বার্বার যে হীরের খণ্ডটা কিভাবে হারাল—এটাই আমিরা বুঝতে পারছি না।

সেনাপতি আর কিছু বললেন না। সৈন্যাবাসের দিকে হাঁটতে লাগলেন। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে পড়ল। তিনজনেই ফিরে আসছে তখন ফ্রান্সিস বলল—তানাকা তোমাকে আসতে মানা করেছিলাম।

—বাবার জন্যে আমার চিন্তা হয় না? আমি চুপচাপ বসে থাকতে পারি? তানাকা বলল।

—তোমার বাবার খবরও আমি নিতাম। ফ্রান্সিস বলল—যাক্ গে—তুমি আমার ঘোড়া দুটোকে জল আর খাবার দিয়েছো?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—দিয়েছি। আপনাদের ঘোড়া দুটি এখন তরতাজা। তানাকা বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল।

রাজবাড়ির কাছে এসে ফ্রান্সিস বলল—চলো তোমাদের দোকানটা দেখবো।

—চলুন।

বাজার এলাকায় এল ওরা। দোকানপাট পার হয়ে চলল। একটা বন্ধ দোকানের সামনে এসে তানাকা বলল—এটাই আমাদের দোকান। দোকানের দরজায় তালা লাগানো। ফ্রান্সিস বলল—তানাকা দোকানের চাবিটা কই?

—বাবার কাছে।

—তাহলে দোকান খুলবে কী করে?

—দোকানের পেছনে একটা ছোট্ট দরজা আছে। ওটার চাবি আমার কাছে আছে। চলুন পেছনের দরজা দিয়েই ঢুকবো।

তিনজনে দোকানের পেছনে এল। ফ্রান্সিস দেখল একটা ছোট্ট দরজা। দরজায় তালা ঝুলছে।

—তানাকা—ফ্রান্সিস বলল—এই দরজাটা বোধহয় বেশি ব্যবহার করা হয় না।

—হ্যাঁ। এই দরজা দিয়ে যাওয়া আসা খুব কমই হয়। তানাকা বলল।

—দরজাটা খোলো। ফ্রান্সিস বলল।

তানাকা কোমর থেকে চাবির গোছা বের করল। খুঁজে খুঁজে পেছনের দরজাটার চাবিটা বের করল। তালায় চাবিটা ঢোকালো। মোচড় দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

তিনজনে ঢুকল। ঘরটায় দুপুরের আলো আঁধারি। সামনের ঘরে এল। ফ্রান্সিস সিন্দুকটা দেখল। বেশ বড়। ভারি লোহায় তৈরি।

ফ্রান্সিস সিন্দুকটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখল। বলল—

—এই সিন্দুকের চাবিটা তো তোমার কাছে নেই।

—না। তানাকা মাথা এপাশ-ওপাশ করল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস ভালো করে চারদিক তাকিয়ে দেখল।

—একটা কথা। তোমার এক বন্ধু আছে। সে নাকি তোমাকে বোকা বানিয়ে সিন্দুক থেকে হীরে চুরি করেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আরোনাস যে একটা পাকা চোর আমি সেটা বুঝতে পারিনি। তানাকা বলল।

—তুমি ওর খোঁজ পেয়েছো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। পেয়েছি। সান্তিয়াগোর কয়েদঘরে আমরা দুজনেই ছিলাম। কিন্তু কী করবো? হাতে তো কোন অস্ত্র নেই। তাই ওকে খুন করতে পারি নি। তানাকা বলল।

—বলো কি। খুন করতে চেয়েছিলে? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। কিন্তু ভেবে দেখলাম ওকে মেরে ফেললে হীরেটার কোন খোঁজই পাওয়া যাবে না। এখানকার কয়েদঘর থেকে যেদিন ছাড়া পাবে সেইদিনই

ওকে চেপে ধরবো হীরের খণ্ড কোথায় রেখেছিস্ বল্। আদায় করে ছাড়বো। তানাকা বলল।

—বুঝলাম। সে তো ওকে দেখতে পারলে। তার আগে আরোনাসের বিরুদ্ধে তুমি রাজার কাছে বিচার চাও। দ্যাখো কী হয়। আরোনাস তো কয়েদঘরেই আছে। প্রহরীদের ওকে খুঁজে বেড়াতে হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি। তানাকা মাথা নাড়ল।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। পেছনের দরজা দিয়ে তিনজনে বেরিয়ে এল।

তানাকার বাড়িতে এল। ফ্রান্সিস তানাকাকে বলল—ঘোড়া দুটোকে একটু দানাপানির ব্যবস্থা করো।

—ভাববেন না। সে সব দেখা হবে। তানাকা বলল।

রাতে খেয়েদেয়ে ফ্রান্সিস, শাঙ্কো শুয়ে পড়ল।

শাঙ্কো বলল—তুমি ঠিক কী করতে চাইছো?

ফ্রান্সিস বলল—বার্বার কোন কোন রাজবাড়িতে হীরের গয়না করার নির্দেশ পেয়েছিল সেই রাজবাড়িতে যাবো। রাণীমাদের কাছে হারিয়ে গেছে, চুরি হয়ে গেছে বলে কান্নাকাটি করে পার পেয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বার্বার মানে তানাকার বাবা হীরের খণ্ড চুরি করেছে। এই ব্যাপারটা যাচাই করে দেখবো।

—এতে বার্বার তো আরো বিপদে পড়বে। শাঙ্কো বলল।

—উপায় কি! চোরের চোরামি তো মেনে নেওয়া যায় না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। এখন তুমি সবদিক দেখে শুনে এগোও। শাঙ্কো বলল।

পরদিন। সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ঘোড়া ছোটাল সান্তিয়াগোর দিকে। পথে এক চাষীর বাড়িতে আশ্রয় নিল। খেল। তারপর আবার ঘোড়া ছোটাল।

শেষ বিকেলে সান্তিয়াগোতে পৌঁছল। ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে ফ্রান্সিসরা দেখল বেশ বড় নগর। রাস্তাঘাটে বেশ লোকজনের ভিড়। যেতে যেতে একটা সরাইখানা দেখল। ঘোড়া থামাল। দুজনে ঘোড়া থেকে নামল। সরাইখানার দিকে চলল। সরাইওয়ালা হাসিমুখে বারবার বলতে লাগল—আসুন—আসুন।

—ঘোড়ার খাবার জল দানা পাওয়া যাবে তো? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। কত লোক ঘোড়ায় চড়ে আসে। সব ব্যবস্থা আছে আমার। সরাইওয়ালা কাকে ডাকল। দেখা গেল একটি কিশোর এগিয়ে এল। সরাইওয়ালা বলল—ঘোড়া দুটো নিয়ে যা। দানাপানি খাওয়া। কিশোরটি বেশ অভ্যস্ত হাতে ঘোড়া দুটোকে পেছনে নিয়ে গেল।

ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় ঢুকল। খিদে, ক্লান্তি।

পাটাতন পাতা। তার ওপর শুকনো ঘাসপাতার বিছানা। দুজনেই শুয়ে পড়ল। দুজনেই চুপ করে শুয়ে রইল।

কিছু পরে সেই তরুণ ছেলেটি দুটো কাঠের থালায় বিকেলের খাবার নিয়ে ঢুকল। ফ্রান্সিস ও শাঙ্কোর হাতে থালা দিয়ে চলে গেল।

ফ্রান্সিস খেতে খেতে বলল—আজকের দিনটা কাজে লাগাতে পারলাম না। কাল সকালে কাজে নামতে হবে। ওরা শুয়ে এসব কথাবার্তা বলছে তখন চার-পাঁচজন লোক চেঁচিয়ে কথা বলতে বলতে সরাইখানায় ঢুকল। প্রত্যেকের কোমরেই তরোয়াল গোঁজা। ওরা ফ্রান্সিসদের শুয়ে থাকা দেখল। একজন ঝুঁকে পড়ে ফ্রান্সিসদের দেখল। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—আরে—দুটোই বিদেশী ভূত। সবাই হৈ হৈ করে উঠল। ফ্রান্সিস বা শাঙ্কো কোন কথা বলল না। একজন এগিয়ে এসে বলল—তোরা এখানে শুয়ে আছিস কেন? এটা আমাদের জায়গা। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—সরে এস। দুজনেই বেশ সরে গেল। ওরা কেউ বসল, কেউ শুয়ে পড়ল। একজন ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোদের দেশ কোথায় রে?

—আমরা ভাইকিং। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে তোরা তো জলদস্যু!

ফ্রান্সিস লোকটার কথা শেষ হওয়ামাত্র তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। তরোয়াল কোষমুক্ত করল। দাঁতচাপা স্বরে বলল—ঐ কথাটা ফিরিয়ে নাও।

শাঙ্কোও উঠে দাঁড়াল। তরোয়াল খুলল। যে লোকটা জলদস্যু বলেছিল সে ফ্রান্সিসদের এই রুদ্ররূপ দেখে বেশ ভয়ই পেল। ওর বন্ধুরাও দুজন তরোয়াল খুলল। ফ্রান্সিস বলল—কথাটা ফিরিয়ে নাও। বলো যে আমি ভুল বলেছি। বলো। ঐ লোকটা চুপ করে রইল। ওর কথার জন্যে এরকম একটা কিছু হবে ও ভাবতে পারে নি। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—একজন একজন করে আয়। আজ তোদের সবাইকে নিকেশ করবো। একজন তরোয়াল তুলে সামনে এল। ফ্রান্সিস ওর তরোয়ালে নিজের তরোয়ালটা এত জোরে ঘা মারল যে লোকটার হাত থেকে তরোয়ালটা ছিটকে গেল। লোকটা হাঁ মুখে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস অনায়াসে লোকটার কাঁধে তরোয়ালের কোপ বসাতে পারতো কিন্তু ফ্রান্সিস তা করল না। অন্যজন তরোয়াল নিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে এল। শাঙ্কো তার মোকাবিলা করল। শাঙ্কো দ্রুতগতিতে ঐ লোকটার হাতের কব্জিতে তরোয়াল দিয়ে ঘা মারল। ওর হাত থেকে তরোয়াল খসে পড়ে গেল। শাঙ্কো তরোয়াল তুলতে গিয়েও তুলল না।

সরাইখানার মালিক ছুটে এল। দুহাত তুলে বলল—আপনারা এভাবে মারামারি করবেন না। আমার দোকানের বদনাম হবে।

অন্য লোকগুলো চুপ করে বসে রইল। ফ্রান্সিস তখনও তরোয়াল কোষবদ্ধ করেনি। দাঁতচাপা স্বরে বলল—যে লোকটা আমাদের বদনাম দিয়েছো সে এগিয়ে এসো। তরোয়াল আনো। লোকটা বুঝল এ বড় কঠিন ঠাঁই। এঁটে ওঠা

যাবে না। লোকটা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—ঠিক আছে—ঠিক আছে। আমি কথাটা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

—পথে এসো। কথাটা বলে ফ্রান্সিস তরোয়াল কোষবদ্ধ করল। সরাইওয়ালা তখনও বলে চলেছে—এখানে খুন-টুন হলে আমার দোকানের বদনাম হবে। আপনারা শান্ত হোন। ওদের মধ্যে একজন বলল—ঠিক আছে—আর কিছু হবে না। সরাইওয়ালা মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল। লোকগুলোও শান্ত হল। থেকে থেকে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো রাজার দরবারে এল। রাজবাড়িটা প্রাসাদের মত। ওরা দেখল দরজায় দাড়ি গোঁফওয়ালা একজন প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে পেতলের বর্শা। বর্শার মুখটা লোহার।

ফ্রান্সিসরা দরজা পার হতে যাচ্ছে তখনই একজন প্রহরী এগিয়ে এল। বলল— তোমাদের দেখে তো বিদেশি বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ। আমরা বিদেশি। আমরা ভাইকিং। শাঙ্কো বলল।

—এখানে এসেছো কেন? প্রহরী জিজ্ঞেস করল।

—মাননীয় সেনাপতির সঙ্গে দেখা করবো। শাঙ্কো বলল।

—কেন? প্রহরী বলল।

—কথা আছে। শাঙ্কো বলল।

—কী কথা? প্রহরী জানতে চাইল।

—সেটা সেনাপতিকেই বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। প্রহরীটি ভেতরের দিকে মুখ তুলে বলল—রবিন—এখানে শোন। অন্য একজন প্রহরী এগিয়ে এল। বলল—কী হয়েছে?

—এই দুজন বিদেশি সেনাপতির সঙ্গে দেখা করবে। তুই এদের নিয়ে যা। রবিন ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—এসো।

প্রহরীটি ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোকে রাজসভার কাছে নিয়ে এল। বেশ কিছু বিচারপ্রার্থী জড়ো হয়েছে। রাজামশাই সিংহাসনে বসে আছেন। বিচার চলছে। রাজার একপাশে মন্ত্রী অমাত্যরা বসে আছেন। অন্য পাশে সেনাপতি আর দু-একজন উচ্চপদাধিকারী। রবিন আঙ্গুল দেখিয়ে সেনাপতিকে দেখাল। বলল—উনিই সেনাপতি। সভার কাজ হয়ে গেলে কথা বলবেন। তবে একটা কথা বলে রাখি সেনাপতি কিন্তু ভীষণ রগচটা। চটে গিয়ে এর আগে বেশ কয়েকজনকে চড় মেরেছেন।

রবিন চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা সভার কাজকর্ম দেখতে লাগল। কতক্ষণে সভা শেষ হবে তার চিন্তা।

সভার কাজ চলল।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে সভা শেষ হল।

রাজা অন্দরমহলে চলে গেলেন। লোকজন বেরিয়ে আসতে লাগল। মন্ত্রী-অমাত্যরা বেরিয়ে আসতে লাগলেন। সেনাপতিও আসছিল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। মাথা একটু নুইয়ে সেনাপতির সামনে দাঁড়াল। সেনাপতি ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোকে দেখে বললেন—দেখে তো মনে হচ্ছে তোমরা এই রাজ্যের মানুষ না।

—ঠিকই ধরেছেন। আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। শুনেছি তোমরা খুব সাহসী যোদ্ধা। জাহাজ চালনায় দক্ষ। সেনাপতি বলল।

—আপনি ঠিকই শুনেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার কাছে কেন? সেনাপতি জানতে চাইলেন।

—একটা খবর জানতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কী খবর?

—এখানকার রাণিমা কি কখনও তানাকার একজন বিখ্যাত হীরের মণিকার বার্বারের কাছ থেকে হীরের গয়না করিয়েছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—আমি কি অন্দরমহলের খবর রাখি নাকি। সেনাপতি বললেন।

—না—মানে, যদি জানেন—ফ্রান্সিস বলল।

—আমি এসবের কিছুই জানি না। সেনাপতি মাথা এপাশ-ওপাশ করে বলল।

—মানে বলছিলাম—ফ্রান্সিস বলতে গেল।

—এবার গালে চড় মারবো। বেরো, এখান থেকে। সেনাপতি ক্ষেপে গিয়ে বলল। তারপর চলে গেলেন।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

শাঙ্কো বলল—এই খবরটা অন্য কার কাছ থেকে পাবো?

—সেটাই ভাবছি। দাঁড়াও—একবার প্রহরী রবিনকে বলে দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

প্রধান প্রবেশপথের সামনে রবিনকে পাওয়া গেল।

ফ্রান্সিস বলল—ভাই রবিন তোমার কাছ থেকে একটা খবর জানতে চাই।

—কী খবর? রবিন বলল।

—অন্দরমহল থেকে একটা খবর এনে দিতে পারো? ফ্রান্সিস বলল।

—চেষ্টা করে দেখতে পারি। রবিন বলল।

—ব্যাপারটা হল তানাকায় একজন নামকরা জহুরী আছে। নাম বার্বার। এখানকার রাণিমা তাঁকে কোন হীরের গয়না গড়তে দিয়েছিলেন কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি খবরটা আনি তাহলে আমাকে কী দেবে? রবিন হেসে বলল।

—একটা সোনার চাকতি। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি চেষ্টা করে। রবিন বলল।

—আর একটা খুব দরকারি খবর চাই এইসঙ্গে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী খবর? রবিন বলল।

—বার্বার রাণিমার দেওয়া হীরের খণ্ড হারিয়ে ফেলেছিল কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

—এটা আবার কী খবর! রবিন বলল।

—খবরটা আমাদের খুব প্রয়োজন। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। রবিন বলল।

রবিন সভাঘর ছাড়িয়ে অন্দরমহলের দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে রবিন ফিরে এল। সঙ্গে আর একজন প্রহরী। রবিন বলল—ও অন্দরমহলে রাণিমার ফাইফরমাস খাটে। ও ব্যাপারটা জানে বলল। সেই প্রহরীকে ফ্রান্সিস বলল—ভাই একটা খুব দরকারী কথা জানতে চাইছি।

—কী দরকারী কথা? প্রহরী বলল।

—তানাকা দেশে বার্বার নামে একজন জহুরী আছে। হীরের গয়না গড়তে খুব ওস্তাদ। তাঁকে দেখেছো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। তানাকা থেকে আসতো। আমি রাণিমার কাছে নিয়ে গেছি। প্রহরী বলল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। এখন জানতে চাইছি বার্বারকে গয়না গড়ার জন্যে যে হীরের খণ্ডটা দেওয়া হয়েছিল সেটা কি বার্বারের কাছে হারিয়েছিল অথবা চুরি হয়েছিল? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—এরকমই ব্যাপারটা হয়েছিল। বার্বার কেঁদেকেটে বলেছিল হীরের খণ্ডটা হারিয়ে গেছে। যা হোক—রাণিমা কিছু বলেন নি। নতুন হীরের খণ্ড দিয়েছিলেন। প্রহরী বলল।

—এটাই জানতে চাইছিলাম। ভাই অনেক ধন্যবাদ। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কোর দিকে তাকাল। শাঙ্কো কোমর থেকে একটা সোনার চাকতি বের করল।

ফ্রান্সিস বলল—দুজনকে দুটো দাও। শাঙ্কো আর একটা সোনার চাকতি বের করল। প্রহরী দুজনকে দিল। দুই প্রহরীই খুশি।

রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। ঘোড়ায় চড়ে উঠল। নেমে সরাইখানায় এল। দেখল সেই গুণ্ডার দল চলে গেছে।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা শুতে এল।

ফ্রান্সিস বলল—ধারে কাছে কোন কোন রাজ্য আছে তা জানতে হবে। তানাকার কাছে দুটো নাম পেয়েছিলাম। সে তো দেখাও হল—জানাও হল। এবার আরো কয়েকটা দেশের নাম জানতে হবে। ভালো কথা। সরাইওয়ালাই বলতে পারবে। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। সরাইওয়ালার কাছে এল। সরাইওয়ালা আলো জ্বেলে মাথা নিচু করে মুদ্রা গুনছিল।

ফ্রান্সিস বলল—একটা কথা বলছিলাম।

—বলুন। সরাইওয়ালা মুখ তুলে হেসে বলল।

—ধারে কাছে কয়েকটা দেশের নাম কী?

—ঐ তো কাকোয়াম্বো লা সেরিনা। সরাইওয়ালা বলল। ফ্রান্সিস ওকে জিজ্ঞেস করে রাজ্য দুটিতে যেতে হলে কোন দিকে যেতে হবে এসব ভালো করে জেনে নিল।

পরের দিন সকালের খাবার খেয়ে দুজনে ঘোড়ায় উঠল। দিক ঠিক করে ঘোড়া ছোটাল।

দুপুর হল। গরম হাওয়া ছুটেছে।

জলতেষ্টা পেয়েছে, খিদেও পেয়েছে। এবার খাবার জোগাড় করতে হয়। একটা গ্রামমত দেখল। কয়েকটা পাথরের বাড়ি। ঘোড়া থামালো।

ফ্রান্সিস বলল—চলো দেখা যাক।

একটা বাড়ির বাইরের ঘরে গাছের ডাল দিয়ে তৈরি দরজা খোলা। শাঙ্কো খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল একজন বৃদ্ধ একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে ঘাসপাতায় তৈরি বিছানায় বসে আছে। শাঙ্কোকে দেখে বৃদ্ধটি বলল—আপনি কে? কি চান? শাঙ্কো বলল—আমরা বিদেশি। লা মেরিনা দেশে যাবো। আমরা খুবই ক্ষুধার্ত। যদি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেন তাহলে আমাদের খুবই উপকার হয়।

—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। বৃদ্ধ ছেলেটিকে কোলে নিয়ে বলল—আপনারা বসুন। বাড়ির মেয়েদের বলছি। বৃদ্ধ একটু গলা চড়িয়ে বোধহয় কাউকে ডাকলেন। একটি বৌ ঢুকল। বাচ্চাটি প্রায় লাফিয়ে মেয়েটির কোলে গেল। বোঝাই যাচ্ছে বৌটি বৃদ্ধের ছেলের বৌ। বৃদ্ধটি এবার বলল—এরা দুজন লা মেরিনা যাবেন। এখানে তো আর সরাইখানা নেই। কাজেই ক্ষুধার্ত দুজন আমাদের এখানে খেতে চাইছেন। বৌটি ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোর দিকে তাকাল। বলল—আমাদের তো খাওয়া হয়ে গেছে। আপনাদের জন্যে রেঁধে দিচ্ছি। আপনারা বসুন। আমরা তাড়াতাড়ি রেঁধে দিচ্ছি। ফ্রান্সিস বাচ্চাটার দিকে দুহাত বাড়াল। আশ্চর্য। বাচ্চাটি ফ্রান্সিসের হাতে প্রায় ঝুঁকে পড়ল। ফ্রান্সিস কোলে নিল। ওর মা চলে গেল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—শাঙ্কো কে ভালো মানুষ আর কে নয় এটা শিশুরা ঠিক বুঝতে পারে। তাই সব লোকের আদরেই ওরা সাড়া দেয় না। ওরা যাচাই করে নেয়।

ফ্রান্সিস বাচ্চাটিকে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে ধরল। বৃদ্ধ বাচ্চাটিকে কোলে নিল।

ফ্রান্সিসরা মেঝের পাটাতনে বসল। বৃদ্ধও নাতি কোলে ফ্রান্সিসদের পাশে বসলেন। বৃদ্ধটি ফ্রান্সিস ও শাঙ্কোর পরিচয়-টরিচয় জানতে চাইলেন। কথাবার্তা চলল। ফ্রান্সিস আধশোয়া হল। খুব ক্লান্ত লাগছে নিজেকে।

এমন সময় একটি যুবক ঘরে ঢুকল। জামাকাপড়ে ধুলোবালি লেগে। ফ্রান্সিসদের দেখে বলল—আপনারা কে? বৃদ্ধ বলে উঠলেন—এরা বিদেশি। লা মেরিনা যাবে। এখন এখানে আর কোথায় খাবার পাবে। তাই আমাদের অতিথি হয়েছে।

যুবকটি হাসল। বলল—নিশ্চয়ই। আপনাদের খাবার তৈরি হচ্ছে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। যুবকটি বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস—তুমি কী প্রমাণ করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছো?

—বার্বার যে অসৎ এটা আমি প্রমাণ করতে চাই।

—কী লাভ? তাছাড়া এখনো প্রমাণ করতে পারো নি।

—আর দুটো দেশ—লা মেরিনা আর কাকোয়াম্বোয় খোঁজ করা হয়নি। দেখবে ঐ দেশ দুটিতেও আমরা একই তথ্য পাবো—দু জায়গাতেই বার্বার হীরে চুরির অথবা হারিয়ে যাওয়ার গল্প ফেঁদেছে। তারপর নতুন করে নতুন হীরে দিয়ে গয়না গড়েছে। প্রথম দেওয়া হীরের খণ্ডটি নিজে রেখে দিয়েছে।

—কোথায় রেখেছে? শাঙ্কো বলল।

—বাড়িতে অথবা দোকানে। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি এতসব করতে যাবে কেন? শাঙ্কো বলল।

—আগেই বলেছি বার্বার যে অসৎ এটা প্রমাণ করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—এরা এ দেশের মানুষ। এরা যেমন বুঝবে করবে। আমরা তার সঙ্গে জড়াবো কেন। ওদিকে রাজকুমারী, বন্ধুরা নিশ্চয়ই চিন্তায় পড়েছে। শাঙ্কো বলল। একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো যে জীবন আমরা বেছে নিয়েছি সেখানে দুশ্চিন্তার কোনো স্থান নেই। যে কোন সময় আমাদের মৃত্যু হতে পারে এটা প্রথমেই ধরে নিতে হবে। জীবনকে আমরা এরকমই বলে মেনে নিয়েছি। কাজেই এখানে দুশ্চিন্তার কোন স্থান নেই।

—তোমার মত মনের জোর তো সকলের নেই। তাই তারা দুশ্চিন্তা ভোগ করে। শাঙ্কো বলল।

—যাক্—আমার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দুটো দেশ বাকি। তারপরেই প্যারাইসোতে আমাদের জাহাজে ফিরে যাবো।

—ঠিক আছে। তুমি যা করতে চাও করো। শাঙ্কো বলল।

যুবকটি ঘরের দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে বলল—আপনাদের খাবার তৈরি। আপনারা আসুন।

ফ্রান্সিসরা বিছানা থেকে উঠল। বাড়ির ভেতরে ঢুকল। ভেতরে একটা ছোট উঠোন মত। চারপাশে ঘর।

যুবকটি উঠোনে দুটো লম্বা বড় পাতা পেতে দিল। ফ্রান্সিসরা পাতাগুলোর সামনে বসল। ফ্রান্সিস শাঙ্কো খেতে বসল। কাঠের গ্লাশে জল ভরা ছিল। শাঙ্কো

গ্লাশের সবটা জল ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নিল। এইবার বুঝতে পারল কী জলতেষ্টা পেয়েছিল।

যুবকটির স্ত্রী খাবার নিয়ে এল। গোল রুটি আর তরকারি মত দিল। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। সুস্বাদু লাগল। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা অল্পক্ষণের মধ্যেই খেয়ে নিল। বৌটি আরও রুটি তরকারি দিল। পেট কিছুটা ভরেছে। এবার ফ্রান্সিসরা আস্তে আস্তে খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ। হাত মুখ ধুয়ে মুছে বাইরের ঘরে ওরা এল। বিছানায় বসল। যুবকটি এল। হেসে বলল—পেট ভরেছে তো?

শাঙ্কো হেসে বলল—পেট পুরে খেয়েছি। ফ্রান্সিস বলল—অনেক উপকার করলেন। আর একটা অনুরোধ—ঘোড়া দুটোর জন্যে যদি দানাপানির ব্যবস্থা করে দেন। ওরাও তো ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত।

—কিচ্ছু ভাববেন না। আমার এক বন্ধু আছে। ঘোড়া কেনাবেচা করে। ওর বড় আস্তাবল আছে। ওকে ডেকে আনছি। আপনাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল। যুবকটি বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে যুবকটি ওরই সমবয়সী একজন যুবককে নিয়ে এল। বন্ধুটি অভ্যস্ত হাতে ঘোড়া দুটোর লাগাম ধরে নিয়ে চলল।

ফ্রান্সিস ভাবল—একটা বড় সমস্যার সমাধান হল। ঘোড়া দুটো দানাপানি পাবে। দম নিয়ে ছুটতে পারবে।

বিকেল হল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। বৃদ্ধ ও যুবকটিকে বারবার ধন্যবাদ দিল।

এবার ঘোড়ায় চড়ল। ফ্রান্সিস যুবকটিকে ডাকল। যুবকটি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—কাকোয়াম্বো দেশটিতে কী করে যাবো?

—এই যে রাস্তাটা, এটা সোজা চলে গেছে কাকোয়াম্বো। এখন তো শেষ বিকেল। কাকোয়াম্বো পৌঁছতে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে যাবে। আজকের রাতটা আমাদের বাড়িতে থেকে কাল সকালে গেলে পারতেন।

—উপায় নেই ভাই। আমাদের জাহাজ পারাহিসো বন্দরে নোঙর করে আছে। সেই জাহাজে আমার বন্ধুরা রয়েছে। তাই এখানকার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে জাহাজে ফিরে যাবো।

—আপনারা কায়াকোম্বো যাচ্ছেন তো?

—হ্যাঁ, কেন বলোতো? ফ্রান্সিস বলল।

—কায়াকোম্বোর রাজা আরকানিয়া খুব ধূর্ত আর নৃশংস। প্রজাদের সামান্য কারণে ফাঁসি দিয়ে থাকেন এবং ঐ ফাঁসি নিজে দেন। এজন্যে কোন ফাঁসুড়ে নেই। আবার তরোয়াল দিয়ে হত্যাও করেন। কাজেই খুব সাবধানে চলবেন। যুবকটি বলল।

—খুব উপকার করলে ভাই। আমরা সাবধানে চলবো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে ঘোড়া চালাল।

দুজনের ভাগ্য ভাল যে এক জায়গায় ছোট শহরে সরাইখানা পেয়েছিল। তাই দুপুরের খাওয়াটা সন্ধেবেলা সারতে পেরেছে।

কাকোয়াম্বো পৌঁছতে বেশ রাতই হল। বেশ বড় শহর। তবে এই রাতে রাস্তাঘাটে খুব একটা ভিড় নেই। সদর রাস্তা দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে চলল। দুজনেই একটা সরাইখানা খুঁজছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা সরাইখানা খুঁজে পেল। সরাইখানার সামনে ঘোড়া থামাল। ঘোড়া থেকে নামল। শাঙ্কো ঘোড়া দুটোর লাগাম ধরে রইল।

ফ্রান্সিস সরাইওয়ালার কাছে গেল। সরাইওয়ালা নতুন খদ্দের পেয়ে খুব খুশি। এই শহরে লোকজন আসা খুব কমে গেছে। দুজন তো পাওয়া গেল। কাছে এসে ফ্রান্সিস বলল—আমরা দুজন থাকবো।

—বেশ তো, বেশ তো। সরাইওয়ালা বলল।

—কোন ঘরে থাকবো? শাঙ্কো বলল।

—একটাই তো ঘর। কোন অসুবিধে হবে না। সরাইওয়ালা বলল।

—রাতের খাওয়ার ব্যবস্থাটা একটু জলদি করুন। শাঙ্কো বলল।

—নিশ্চয়ই। আমি বলে দিচ্ছি। সরাইওয়ালা পেছন দিকে চলে গেল।

ফ্রান্সিস বলল—চল। পেছনের ঘরে। দুজনে পেছনের ঘরে এল। সরাইখানার ব্যবস্থা যা হয়। শুকনো ঘাসপাতার ঢালাও বিছানা। কয়েকটা বালিশ। ফ্রান্সিস ঢালাও বিছানায় শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়াতে হয়।

ফ্রান্সিস বলল—সরাইওয়ালাকে বল। ওর এই সরাইখানায় তো অশ্বারোহী মানুষও আসে। তাকে তো সেই ব্যবস্থা রাখতে হয়। নিজেকে বড়ই ক্লান্ত মনে হচ্ছে। একটু বিশ্রাম নেবো।

—ঠিক আছে। আমিই দেখছি। শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো বাইরের ঘরে এল। সরাইওয়ালার সামনে এসে দাঁড়াল। সরাইওয়ালা মাথা নিচু করে হিসেবনিকেশ দেখছিল। এবার মুখ তুলল। শাঙ্কোকে দেখে বলল— কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

—তা হচ্ছে। শাঙ্কো বলল।

—ম্-মানে? সরাইওয়ালা থমকে গেল।

—আমরা দুজন ঘোড়ায় চড়ে এসেছি। ঘোড়াদুটো এখনও দানাপানি পায় নি।

—ও—এই কথা। আসুন। সরাইওয়ালা বলল।

সরাইওয়ালা শাঙ্কোকে সরাইয়ের পেছনে নিয়ে এল। আবছা চাঁদের আলোয় দেখল—ঘোড়া দুটো একটা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা।



—আপনাদের ঘোড়াকে দানাপানিও দেওয়া হয়েছে। সরাইওয়ালা বলল।

—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। শাঙ্কো বলল।

—না—না। সে কি কথা। এটা তো আমার কর্তব্য। সরাইওয়ালা বলল। শাঙ্কো সরাইখানায় ঢুকল। নিজের জায়গায় বসে সরাইওয়ালা বলল—একটা কথা ছিল।

শাঙ্কো বলল—বলুন।

—ম্-মানে—এখানকার নিয়ম—আগেভাগে দাম দিয়ে দেওয়া।

—কেন? পরে দিলে ক্ষতি কি? শাঙ্কো বলল।

—না-না। এ দেশে এটাই চলে। সরাইওয়ালা বলল।

শাঙ্কো বুঝল যুবকটি ঠিক কথাই বলেছিল। শাঙ্কো বলল—বেশ। বলুন কত দিতে হবে?

—আপনি কিভাবে দেবেন? সরাইওয়ালা বলল।

—সোনার চাকতি দিয়ে। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে একটা বড় চাকতি আর একটা ছোট চাকতি। সরাইওয়ালা বলল।

—বেশ। শাঙ্কো বলল। তারপর কোমরের ফেট্টিতে গোঁজা সোনার একটা চাকতি বের করল। সরাইওয়ালাকে দিল। সরাইওয়ালা হেসে বলল—ঘোড়ার দানাপানি, দেখাশুনো। আর আধখানা একটা ছোট চাকতি। শাঙ্কো তাই দিল।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। সরাইওয়ালার কথা বলল। দুজনেই হাসতে লাগল।

খাওয়ার ডাক পড়ল। গরম গরম মাংস, রুটি। খিদের জ্বালায় হাপুস হুপুস খেতে লাগল দুজনে। রুটি কম পড়ে গেল। দুজনে আর খেতে চাইল না। ফ্রান্সিসদের খাওয়া দেখে দুই পরিবেশনকারীর মুখ হাঁ।

খাওয়া শেষ। শাঙ্কো একজন পরিবেশনকারীকে বলল—আরো আট-দশখানা রুটি খেতে পারতাম। পরিবেশনকারী চুপ করে শাঙ্কো আর ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস সরাইওয়ালার কাছে এল। বলল—আপনাকে একটা উপকার করতে হবে।

—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—সরাইওয়ালা হেসে বলল।

—আমরা রাজবাড়ি যাচ্ছি। হেঁটে যাবো। ঘোড়ায় চড়ে যাবো না। আপনি ঘোড়াদুটোকে কিছু দানাপানি খাওয়াবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়। তবে আধখানা চাকতি দিতে হবে। সরাইওয়ালা বলল।

—ফিরে এসে দেব। শাঙ্কো বলল।

—না। এখন দিতে হবে। সরাইওয়ালা বলল।

—বেশ। শাঙ্কো আধখানা চাকতি বের করে দিল।

রাজবাড়িতে আসতে অসুবিধে হল না। রাজবাড়ি বলে কথা। সবাই চেনে।

দুজনে রাজবাড়ির সামনে এল। সিংহদ্বারে বর্শাহাতে দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিসরা ভেতরে ঢুকল। এবার রাজসভার দরজার কাছে এল। ঢুকতে যাবে তখন একজন প্রহরী এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। ফ্রান্সিস বলল—আমরা সেনাপতির সঙ্গে দেখা করবো।

—তোমরা বিদেশি। রাজসভায় ঢুকতে পারবে না। প্রহরী বলল।

—রাজসভায় ঢুকবো না। সভার বাইরে সেনাপতির সঙ্গে কথা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা যেতে পারবে না। প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিস পিছিয়ে এল না।

বলল—আমাদের যেতেই হবে।

—দাঁড়াও। প্রহরী বর্শা তুলে ফ্রান্সিসের মাথা লক্ষ্য করে চালাল। ফ্রান্সিস তৈরিই ছিল। মুহূর্তে মাথা পিছিয়ে নিল। বর্শার ঘা পড়ল ফ্রান্সিসের ডান বাহুতে। ফ্রান্সিস বাঁ বাহুটা ডান হাতে চেপে ধরল। ব্যথাটা ছড়াল সারা শরীরে। ফ্রান্সিস দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল। তারপর তরোয়াল কোষমুক্ত করল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিসের হাত চেপে ধরল। বলল—ফ্রান্সিস শান্ত হও। এখন লড়াইয়ে নামলে বাঁচবো না। দেখ আরো কয়েকজন প্রহরী ছুটে আসছে। আমাদের গায়ে মাথায় তরোয়াল চালাতে পারবে। আমাদের জীবন বিপন্ন হবে। শান্ত হও ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিস প্রহরীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এবার দৃষ্টি সরাল। শাঙ্কোর দিকে একবার তাকিয়ে তরোয়াল কোমরে গুঁজল।

এইসবের জন্যে কিছু শব্দটব্দ হল। শাঙ্কো দেখল সভার অনেকগুলো লোক ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। বিচার চলায় বিঘ্ন দেখা দিল। রাজা বিরক্ত হলেন। বিচার থামিয়ে প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলল—কী ব্যাপার? কী হচ্ছে ওখানে?

প্রহরী রাজার দিকে এগিয়ে গেল। মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে বলল—দুজন বিদেশি আপনাদের কাছে আসতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ওরা বলছে—আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

—ওদের নিয়ে এসো। রাজা বললেন।

প্রহরী দরজার কাছে এল। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—মহামান্য রাজা ডাকছেন। এসো।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো এগিয়ে গেল। রাজাকে মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে ফ্রান্সিস বলল—আমরা ভাইকিং। এখানে বেড়াতে এসেছি।

—এতদূর এলে?

—অন্য একটা কাজও আমরা করি। কোন দেশে গুপ্তধনের কথা জানতে পারলে গুপ্তধন খুঁজে উদ্ধার করি। গুপ্তধন সেই দেশের রাজাকে দিয়ে আমাদের জাহাজে চড়ে আবার অন্য দেশে যাই। এটাই আমাদের কাজ।

—কিন্তু গুপ্তধন উদ্ধার করে পালিয়েও তো যেতে পারো। রাজা বললেন।

—না। আমরা উদ্ধার করা গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে যাই না। যার ধনসম্পদ তাকে দিয়ে দিই। আমরা প্রতারণা করি না। ফ্রান্সিস বলল।

—এরকম মানুষ তোমরা? বিশ্বাস হয় না। রাজা হেসে বললেন।

—দেখেন নি কাউকে। তাই বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক্ গে—তোমরা কোথা থেকে আসছো? রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

—প্যারাইসো থেকে। ওখানে জাহাজঘাটায় আমাদের জাহাজ রয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। কী জন্যে এখানে এসেছো?

—তাহলে একটু খুলে বলতে হয়। তানাকাতে বার্বার নামে একজন জহুরী থাকে। আপনি বোধহয় নাম শুনেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—না। বলে যাও। রাজা বললেন।

—সেই বার্বার এখানে বেশ কয়েকটি দেশের রাণিদের জন্যে বা রাজকুমারীদের জন্যে হীরের গয়না তৈরি করে দিয়েছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—জানি না। হতে পারে। রাজা বললেন।

—এখন এই বার্বার এখানেও হীরের গয়না গড়াবার ডাক পেয়েছিল কিনা সেটা জানতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কে কোথায় কার জন্য গয়না গড়াচ্ছে এটা জেনে তোমাদের কী লাভ? রাজা বললেন।

—আমাদের আর্থিক লাভ কিছুই নেই। তবে এই থেকে একটা কথা জানা যাবে বলে আমাদের ধারণা। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আরকানিয়া হঠাৎ সিংহাসন থেকে উঠলো। তারপর সিংহাসনের চারপাশে ঘুরে এল। রাজা দাঁড়িয়ে রইলেন কাজেই মন্ত্রী সেনাপতি অমাত্যরাও উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের আসনের চারপাশে ঘুরে এল। সিংহাসনে রাজা আরকানিয়া বসলেন। সবাই বসল।

—কী কথা জানতে চাও? রাজা বললেন।

—গয়না গড়ার আগে বার্বার বলেছে কিনা সেই হীরকখণ্ড হারিয়ে গেছে কিংবা চুরি হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আরকানিয়া সিংহাসন থেকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পড়লেন। মন্ত্রী, অমাত্যরাও উঠে দাঁড়ালন। রাজা বললেন—সব মিথ্যে কথা। তোমরা প্যারাইসো দেশের গুপ্তচর। আর কিছুদিনের মধ্যেই আমরা প্যারাইসো আক্রমণ করবো। খুব জমবে লড়াইটা। তোমরা লুকিয়ে জানতে এসেছো—আমরা কিভাবে যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছি। কোন দিক দিয়ে আমরা আক্রমণ করবো। কবে আক্রমণ করবো এসব তথ্য জানতেই প্যারাইসো থেকে তোমরা এসেছো। রাজা আরকানিয়া সিংহাসনের চারধারে ঘুরে এসে সিংহাসনে বসলেন। মন্ত্রী,

সেনাপতি, অমাত্যরাও তাই করলেন। সিংহাসনে বসে রাজা আরকানিয়া বললেন—

—তোমাদের বন্দী করা হল।

—কিন্তু আমরা বিদেশি। অল্পদিন হল এখানে এসেছি। আমরা কাউকেই চিনি না এই দেশের কিছুই জানি না। তাছাড়া গুপ্তচরবৃত্তি করতে যাবো কেন? কী লাভ আমাদের? ফ্রান্সিস বলল।

—সোনার চাকতি পাবে। তারপর জাহাজে চড়ে পালাবে। রাজা বললেন।

—আমাদের যথেষ্ট সোনার চাকতি আছে। আমরা এই কাজ করতে যাবো কেন? ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আবার হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। মন্ত্রী, অমাত্যরাও উঠে দাঁড়াল। রাজা সেনাপতির দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললেন—কয়েদখানা। রাজা বসে পড়লেন আর সবাই বসলেন। ফ্রান্সিস বুঝল এই পাগল রাজাকে কিছুই বোঝানো যাবে না। যা হচ্ছে তাই মেনে নিতে হবে।

ততক্ষণে সেনাপতি উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রহরীদের ইঙ্গিত করল। চারজন প্রহরী এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের হাতে দড়ি বাঁধল। সবাই রাজসভা থেকে নেমে এল। প্রহরীরা ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। রাজসভার লোকজন তাকিয়ে দেখল। বোঝাই যাচ্ছে বন্দীরা বিদেশি। কেউ ভেবে পেল না পাগল রাজা ওদের বন্দী করল কেন।

ফ্রান্সিসদের সদর রাস্তায় নিয়ে আসা হল। তারপর নিয়ে চলল—কয়েদখানার দিকে। রাস্তার লোকজন ফ্রান্সিসদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। এই বিদেশিদের বন্দী করা হয়েছে কেন?

ফ্রান্সিসদের একটা পাহাড়ের নিচে আনা হল। দেখা গেল—বেশ কিছু জায়গা নিয়ে কাঁটাতারের বেড়া। তার মধ্যে কাঠ পাথরের কয়েকটা বাড়ি। একটা বাড়ি বেশ বড়। ঘেরা জায়গা জুড়ে ফুলের গাছ। দু-একটা ফ্রান্সিসদের চেনা যেমন গোলাপ টিউলিপ সান ফ্লাওয়ার—ক্রিসেনথেমাম। কিছু লোক ফুলগুলোর পরিচর্যা করছে। বোঝাই গেল কয়েদী ওরা।

সর্দার প্রহরী কাঁটাতারের পাশ দিয়ে হেঁটে দরজার কাছে এল। কার নাম ধরে ডাকল। তারপর কোমরে গোঁজা চাবিটা বের করল। ওদিকে একজন কয়েদী এগিয়ে এল। তারও হাতে চাবি। প্রথমে সর্দার প্রহরী বাইরের দিককার তালায় চাবি ঢোকাল। মোচড় দিল। মৃদু কট্ শব্দ তুলে তালাটা খুলে গেল। এবার ওপাশে কয়েদী এগিয়ে এসে চাবি দিয়ে ওপাশের তালা খুলে দিল। এইবার দরজা সম্পূর্ণ খুলে গেল। সর্দারসহ সবাই ঢুকল। ভেতর দিককার দরজায় আবার তালা লাগাল কয়েদীটি। বাইরের তালায় চাবি ঢুকিয়ে বন্দী করল।

সর্দার প্রহরী ফ্রান্সিসকে বলল—এটাই কয়েদখানা। আমরা পাহারাদার। কয়েদখানার মাঝখানে এত ফুলের সমারোহ ফ্রান্সিসরা বুঝতেও পারে নি। প্রহরীরা বড় ঘরটায় চলে গেল। সর্দার ফ্রান্সিসকে বলল—ঐ যে ঘরগুলো দেখছো— ওখানকার একটা ঘরে তোমাদের থাকতে হবে। যাও।

ফ্রান্সিসরা প্রথম ঘরটায় ঢুকল। দেখল কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি ঘরটা বেশ বড়ই। দরজায় তালাচাবির ব্যাপার নেই। ঘরে কেউ নেই! চারদিকে মাটির ওপর শুকনো ঘাস আর পাতা দিয়ে তৈরি বিছানামত।

তখনই কয়েকজন কয়েদী ঢুকল। হাতে মাটি লেগে আছে। তাহলে এরাই ফুলগাছের পরিচর্যা করছিল? একজন এগিয়ে এল। বলল—তোমরা কয়েদী হলে আমাদের মত? কী করেছিলে তোমরা? চুরি না খুন? ফ্রান্সিস বলল—আমরা একটা খবর জানার জন্যে এই রাজ্যে এসেছিলাম।

—কিন্তু তোমরা তো বিদেশি। বোধহয় ঐ জন্যেই তোমাদের কয়েদখানায় ঢোকানো হয়েছে।

—সেটা তো একটা কারণ বটেই। তা ছাড়া আরও কারণ আছে। এই কাকোয়াম্বোর সঙ্গে প্যারাইসো দেশের অল্পদিনের মধ্যেই লড়াই বাঁধবে। আমরা বিদেশি গুপ্তচর বলে সন্দেহ করে এখানকার পাগলা রাজা আরকানিয়া আমাদের কয়েদ করেছে।

—তাহলে তোমরা এখানে এলে কেন? আর একজন কয়েদী বলল।

ফ্রান্সিস বার্বারের কথা—তাঁর হীরে চুরির কথা সব বলল। তারপর বলল—আমাদের মিথ্যে বদনাম দিয়ে পাগলা রাজা আরকানিয়া আমাদের কয়েদখানায় ঢুকিয়েছে।

—রাজা আরকানিয়াকে পাগলা রাজা বলছো কেন?

—পাগলা না হলে কেউ কাঁটাতারে ঘেরা কয়েদখানা করে? কয়েদখানার মধ্যে বাগান করে? কয়েদখানার চাবি থাকে কয়েদীর কাছে।

দুতিনজন কয়েদী হেসে উঠল। একজন বলল—তাহলে তুমিও পাগলা রাজাকে চিনেছো। পাগলা রাজার আরো কাণ্ডকারখানা আছে। যাক গে—সবেমাত্র এলে। তাই রেহাই পেলে। কাল ভোর থেকেই কাজে ডেকে নিয়ে যাবে। বাগান পরিচর্যার কাজ চলছে এখন। আমাদের সঙ্গে ঐ কাজেই লাগতে হবে।

এমন সময় ঘরে ঢুকলো সর্দার প্রহরী। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা কোথায় থাকতে চাও?

—এই ঘরেই। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে ঐ দক্ষিণ কোনায় তোমাদের বিছানা করে দেওয়া হবে। তোমরা আমার সঙ্গে এসো। সর্দার দরজার দিকে চলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো সর্দারের পেছনে পেছনে চলল।

প্রহরীদের ঘরে ঢুকল। কোনার একটা পাশে স্তূপীকৃত শুকনো ঘাস পাতা। ডাঁই করে রাখা। সর্দার বলল—এখান থেকে ঘাসপাতা নিয়ে নিজেদের বিছানা তৈরি করো।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ঘাসপাতা দফায় দফায় নিয়ে এসে বিছানা তৈরি করল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বসে রইল।

দু'দিন কাটল। ফ্রান্সিসের এক চিন্তা—এই অদ্ভুত কয়েদখানা থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কেমন করে। সব চিন্তাভাবনা গুলিয়ে যাচ্ছে।

সেদিন সর্দার এসে বলে গেল—রাজা আরকানিয়া কয়েদখানা দেখতে আসবেন।

সকাল গেল। বিকেলও গেল। রাত হল। ফ্রান্সিসদের খুব তাড়াতাড়ি খেতে দেওয়া হল। কয়েদীরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল না। বসে রইল। ফ্রান্সিস একজন কয়েদীকে বলল—রাজা তো আর আসবে না।

—হুঁ। পাগলা রাজা নাম হয়েছে কি সাধে। ঘুমিয়ে পড়ো না। রাজা ঘুমুচ্ছে দেখলে ভীষণ রেগে যায়। বলে—আমার আসার খবর আগেই দেওয়া হয়েছে। গভীর রাতেও আসতে পারি। তোমরা শুয়ে পড়লে কেন। ওঠ। সবাই উঠে দাঁড়ায়। রাজা ইঙ্গিত করে—বসো। সবাই বসে পড়ে। কথাগুলো শাঙ্কোও শুনল। বলল—রাজাটা একেবারে বেহেড একটা। একজন কয়েদী বলছিল এসব সত্ত্বেও পাগল রাজা ভালো।

গভীর রাত তখন। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু প্রহরীদের ঘরে মশালের আলো। কয়েদীদের ঘরেই মশাল জ্বলছে।

হঠাৎ প্রহরীদের ছুটোছুটির শব্দ শোনা গেল।

রাজা আরকানিয়া ঘোড়ায় চেপে এলেন। পেছনে দুজন অশ্বারোহী। সবাই দরজার কাছে থামল। সর্দার প্রহরী ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। ঘোড়া থেকে নেমে রাজা আস্তে আস্তে দরজা পার হয়ে কয়েদীদের ঘরের সামনে এলেন।

তারপর কয়েদীদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রথমেই ফ্রান্সিসদের ঘরটা পেলেন। নিজেই ভেজানো দরজা খুলে ঢুকলেন। মশালের আলোয় দেখলেন সব কয়েদী উঠে দাঁড়িয়েছে। রাজা ফ্রান্সিসদের সামনে এসে বললেন—তোমরা গুপ্তচর। কঠিন শাস্তি হবে তোমাদের।

—আমরা নির্দোষ। আপনার দেশের কোন ক্ষতি করতে আমরা আসি নি। আমরা বিদেশি। আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই নেই।

—আছে—আছে। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। তোমরা আমার রাজত্বে এলে কেন? রাজা বললেন।

—যদি শোনেন তাহলে বলি? ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস তখন আস্তে আস্তে হীরের খণ্ড চুরির ব্যাপারটা বলল। তারপর বলল— গয়না গড়তে একখণ্ড হীরে এই বার্বারকে দিয়েছিলো কিনা। বার্বার হীরের খণ্ডটা হারিয়ে গেছে এরকম কথা বলে অন্য হীরের খণ্ড নিয়ে গিয়েছিল কিনা। শুধু এইটুকু জানতে আপনার রাজত্বে এসেছিলাম। আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

—হুঁ। বানিয়ে টানিয়ে ভালোই বললে। কিন্তু আমাকে অত সহজে বোকা বানানো যাবে না। তোমাদের বিচার হবে। রাজা বললেন, তারপর অন্য কয়েদীদের কাছে গেলেন।

আশ্চর্য! কয়েদীদের নাম ধরে ডাকলেন। কয়েদীরা একে একে রাজার কাছে আসতে লাগল। কার কী অপরাধ তাও বললেন। ক' বছরের সাজা হয়েছে তাও বললেন।

এবার রাজা প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বললেন—খুব সাবধানে পাহারা দেবে যেন কেউ পালাতে না পারে।

রাজা কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘোড়ায় উঠলেন। সঙ্গের দুজন অশ্বারোহীও ঘোড়ায় চড়ল। রাজা ঘোড়া ছোটালেন রাজবাড়ির দিকে।

পাগলা রাজা আবার এল কয়েকদিন পরে। সঙ্গে সেনাপতি আর বেশ বেঁটে একজন লোক। তালা খুলে দেওয়া হল। রাজা সেনাপতি আর বেঁটে লোকটি ঢুকলেন। প্রহরী সর্দারকে বলল—সব কয়েদীদের এখানে আসতে বল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব কয়েদী জড় হল।

রাজা সর্দার প্রহরীকে বললেন, বাগানে ফুল এত কম কেন?

—মান্যবর রাজা—এটা শীতকাল। কাজেই ফুলের সংখ্যা কম। তবে ঝরে গেলেও দক্ষিণ দিকটায় খুব ফুল ফুটেছে। রাজা বেঁটে লোকটার দিকে তাকাল। বলল— মনে হয় খুব বেশি ফুল পাবেন না।

—ঠিক আছে। যা দেখছি তাতে কাজ চলে যাবে। বেঁটে লোকটি বলল।

—তাহলে দেখুন। রাজা বললেন।

বেঁটে লোকটি একটু গলা চড়িয়ে বলল—তোমরা সবাই প্রত্যেকটি গাছ থেকে একটি করে ফুল নিয়ে খাবে। বুঝতে হবে কোন ফুল খেয়ে তোমাদের শরীরের ক্লান্তিভাব চলে গেছে। এখন অনায়াস হেঁটে অন্য রাজ্যে চলে যেতে পারবে। মন উৎফুল্ল থাকবে। বর্শা ছুঁড়তে পারবে বেশ দূরে। লক্ষ্যভেদ করতে পারবে। এই অবস্থাটা বেশ কিছুদিন চলবে। তারপরে আবার ফুল খেতে হবে। বেঁটে ভদ্রলোকটি থামলেন। তারপরে বললেন—তোমরা ফুল খেতে থাকো। কয়েদীরা ফুল গাছের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবাই ফুল খেতে লাগল।

ফুল খাওয়া শেষ। এখন দেখা হবে কার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস ছুট লাগাল। প্রহরীদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ইশারা করল। শাঙ্কো লাফিয়ে উঠল। তারপর দুজন কয়েদীর

ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল মারামারি। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুঁষোঘুঁষি শুরু হল। বেঁটে চেঁচিয়ে বলল—থামো—থামো। শাঙ্কো থামল। বেঁটে প্রথমে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি তো দেখছি বিদেশি।

—বিদেশি বলে কি ফুল কাজ করবে না? ফ্রান্সিস বলল।

—না-না তা করবে। তুমি কোন ফুল খেয়েছিলে? বেঁটে বলল।

—সূর্যমুখী ফুল। ফ্রান্সিস বলল।

এবার বেঁটে জিজ্ঞেস করল শাঙ্কোকে—তুমি?

—চন্দ্রমল্লিকা ফুল। শাঙ্কো বলল।

রাজার দিকে তাকিয়ে বেঁটে বলল—এই দুটি ফুল অনেককে খাইয়ে দেখেছি কোন সতেজভাব হয়নি। কিন্তু এখানে হয়েছে তার কারণ মাটি। আপনার এই এলাকায় মাটি খুব ভাল। তাই অন্তত দুজনের মধ্যে দ্রুত ভালো প্রতিক্রিয়া হয়েছে। চন্দ্রমল্লিকা আর সূর্যমুখীর চাষ বাড়ান। আপনার সৈন্যদের খাওয়ান। সৈন্যরা বিদেশি সৈন্যদের সঙ্গে সিংহের মত লড়বে।

—হ্যাঁ। যা বুঝছি দুটো ফুলেরই চাষ বাড়াতে হবে। রাজা বললেন।

—ঠিক তাই। বেঁটে বলল।

রাজা, বেঁটে আর সেনাপতি ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। ফ্রান্সিস হেসে উঠল। শাঙ্কোও হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়ে অবস্থা। কয়েদীরা ঠিক বুঝল না ওদের হাসির কারণ কী।

দুদিন পরে পাগল রাজা আর বেঁটে এল। এবার মাঝরাতে না। দিনের বেলাই এল। সামনের দুটো ঘোড়ায় রাজা আর বেঁটে। আর একটি ঘোড়ায় সেনাপতি।

রাজা ও বেঁটে কাঁটাতারের প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকল। সেনাপতি বেশ জোরে বলল—মাননীয় রাজা এসেছেন। তোমরা এই দেবদারু গাছের নিচে এসে দাঁড়াও। প্রহরীরাও এসো।

কিছুক্ষণের মধ্যে সব কয়েদীরা প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল। প্রহরীরা এসেও দাঁড়াল। রাজা বলল—তোমরা সূর্যমুখী ফুল খেয়েছিলে? কয়েকজন কয়েদী মাথা কাত করে বলল খেয়েছি। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—কী করে খাবো। কে বা কারা বাগানের সব সূর্যমুখী ফুলের গাছ শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলেছে।

—সে কি। এতো সাংঘাতিক অপরাধ। রাজা বললেন।

—অবশ্যই অপরাধ। বেঁটে বলল।

রাজা সব কয়েদীদের দিকে তাকাল। সবাই চুপ। পাগলা রাজা আরো চটে গেল। বলতেই হবে কে কাণ্ডটা করেছিস্।

সবাই চুপ। সেনাপতি এগিয়ে এল। রাজাকে কানে কানে কী বলল। রাজা কান সরিয়ে বললেন—এক-এক করে এগিয়ে এসো। একজন একজন করে

এগিয়ে আসতে লাগল আর রাজা তাদের হাত দেখতে লাগলেন। একজন কয়েদীকে পেলেন। তার হাত মাটিমাখা।

রাজা বললেন—সেনাপতি এটাকে ধরুন। সেনাপতি ছুটে এসে কয়েদীটিকে সরিয়ে নিল। রাজা আবার কয়েদীদের হাত দেখতে লাগলেন। এবার ফ্রান্সিস ধরা পড়ল। রাজা চেঁচিয়ে বললেন—এই বিদেশিটার হাতে মাটি ধুলো। ফ্রান্সিস বলল— মহামান্য রাজা উপড়ে-ফেলা সূর্যমুখী পাঁচটা গাছ আমি পুঁততে পেরেছি। তাই হাতে ধূলা মাটি লেগেছে।

—খুব ভালো—খুব ভালো। পাগলা রাজা চেঁচিয়ে বলল।

আবার হাত দেখা শুরু হল। আবার একজনকে পাওয়া গেল। দুজনকে দেখিয়ে রাজা সর্দার প্রহরীকে বললেন—এদের কী শাস্তি হবে তা তো জানিস। ঐ দুটোকে সেই শাস্তি দে।

সর্দার প্রহরী এগিয়ে এল। পেছনে আরো কয়েকজন প্রহরীও এল।

ওরা দুই কয়েদীদের নিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে নিয়ে গেল। রাজা চেঁচিয়ে— ছুঁড়ে ফ্যাল্। দুজন প্রহরী ঐ কয়েদীদের দুজনকে ধরে কাঁটাতারের বেড়ার ওপর ছুঁড়ে দিল। কয়েদী দুজন উঠে এলো। আবার ধাক্কা দিয়ে ফেলন কাঁটাতারের ওপর। এইভাবে কিছুক্ষণ ছোঁড়া তোলা চলল। কয়েদী দুজন কাঁদতে লাগল। সমস্ত শরীর দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। পোশাক রক্তাক্ত।

রাজা হাত তুললেন। শাস্তি বন্ধ হল। কয়েদী দুজন আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে অন্য কয়েদীদের কাছে এল তখনও সারা গা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে।

রাজা এবার হাসলেন। বললেন—সেনাপতি।

—বলুন।

—এই শাস্তিটা কেমন বের করেছি বলুন তো? রাজা বললেন।

—তুলনা নেই। কেউ ভাবতেই পারবে না। সেনাপতি বলল।

তিনজনে কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এল। ঘোড়ায় চড়ল। রাজপ্রাসাদের দিকে চলল। রাজা যেতে যেতে বললেন—জানেন এই শাস্তির ব্যাপারটা নিয়ে ভাবি। ঘুমোবার আগে এই এক চিন্তা আমার। কেটে ফেলা হল, ফাঁসি দেওয়া হল— এসব তো আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। আমি চাই নতুন কিছু। আর কেউ যা ভাবতেই পারবে না।

—আমিও ভাবি বুঝলেন। ভাবি কী করে মানুষকে উজ্জীবিত করা যায়। নতুন নতুন সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যেমন এখন ফুল নিয়ে ভাবছি—পরে ফল নিয়ে ভাববো। বেঁটে বলল।

—ঠিক বলেছেন। রাজা হেসে বললেন।

আহত দুই কয়েদীকে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিল। আহত দুজন তখনও গোঙাচ্ছে। গুরুতর আহত ওরা। ফ্রান্সিস প্রহরীদের ঘরে এল। সর্দার প্রহরীকে বলল—কাটাছেঁড়ার ওষুধ আছে?

সর্দার প্রহরী বলল—আছে। কিন্তু রাজা আহতদের জন্যে ওষুধ দিতে বলে যান নি। কাজেই আমি দিতে পারবো না।

ফ্রান্সিস এক লাফে এগিয়ে সর্দার প্রহরীর গলা চেপে ধরল। সর্দার প্রহরী মাটিতে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস দাঁত চাপা স্বরে বলল, ওষুধ না দিলে তোমাকে আমি খুন করবো আর সেটা করতে গিয়ে আমি মরে যেতে রাজি। বল—কী করবে?

ঘরে আরো তিনজন প্রহরী ছিল। তিনজনই তরোয়াল খুলে এগিয়ে এল। একজন বলল—সর্দারকে ছেড়ে দাও।

—না। আহত কয়েদীর জন্য ওষুধ চেয়েছিলাম। সর্দার ওষুধ থাকা সত্ত্বেও দেবে না বলছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী করবো। রাজা হুকুম না দিলে আমাদের কিছু করার নেই। এক প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিস সর্দারকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সর্দারও উঠল।

ফ্রান্সিস বলল—নিয়ম আছে। আবার মানবতার খাতিরে নিয়ম ভঙ্গও তো হতে পারে।

—সেটা অবশ্য আলাদা কথা। সর্দার প্রহরী বলল।

—ঐ আলাদা কথাটাই আমি বলছিলাম। কয়েদী দুজনের কী অবস্থা হয়েছে তোমরা দেখেছো। ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব আমরা অনেকদিন দেখে আসছি। একজন প্রহরী বলল।

—কখনও প্রতিবাদ করো নি। ফ্রান্সিস বলল।

—না। আমাদেরই মেরে ফেলবে। অন্য এক প্রহরী বলল।

—কিন্তু আমি প্রতিবাদ করবো। আমাকে রাজার কাছে যেতে দাও। আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাকে রাজার কাছে যেতে দেব না। তুমি রাজার কাছে গেলে প্রতিবাদ করলে মরে যেতে পারো। অন্য প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে। আমি যাবো না। ওষুধ দাও। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি যাও। আমি যাচ্ছি। সর্দার প্রহরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

ফ্রান্সিস ওর ঘরে এল। আহতদের একজন ফ্রান্সিসদের ঘরের। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে কয়েদীটির কাছে এল। পোশাক কিছু সরিয়ে দেখল—কী সাংঘাতিকভাবে শরীর কেটে কেটে গেছে। কয়েদীটি গোঁঙাচ্ছিল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল— সর্দার প্রহরী ওষুধ নিয়ে আসছে। একটু সহ্য করো কয়েদীটির গোঁঙানি বন্ধ হল।

তখনই সর্দার প্রহরী ঘরে ঢুকল। হাতে একদলা তুলো আর একটা বোতল। সর্দার কয়েদীটির কাছে গিয়ে বলল—ওষুধ লাগালে জ্বালাযন্ত্রণা হবে। কিছুক্ষণ। সহ্য করো।

সর্দার বোতল থেকে ওষুধ নিয়ে কয়েদীটির শরীরের কাটা জায়গাগুলিতে লাগাতে লাগল। কয়েদীটি প্রথমে জোরে গুঙিয়ে উঠল। একটু পরে শান্ত হল। সর্দার ওর সারা গায়ে ওষুধ লাগিয়ে দিল।

সর্দার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসকে বলল—ও যেন দিন দুয়েক চান না করে। কালকে আবার ওষুধ লাগিয়ে দেব। দু-তিনদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবে। সর্দার চলে গেল।

ফ্রান্সিস নিজের বিছানায় গেল। শাঙ্কো আস্তে ডাকল—ফ্রান্সিস। আহত লোকটা বাঁচবে তো?

—সর্দার তো বলল এই ওষুধেই সারবে। দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি কি পাগলা রাজাকে সত্যি কথা বলেছিলে? শাঙ্কো বলল।

—মাথা খারাপ। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি গাছগুলো নিয়ে কী করেছিলে? শাঙ্কো বলল।

—সব গোড়াশুদ্ধ তুলে একপাশে রেখে দিয়েছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—প্রহরীরা দেখে নি? শাঙ্কো বলল।

—ওরা তখন নিজেদের মধ্যে তাস খেলায় মগ্ন। ফ্রান্সিস বলল।

রাত হল। খাবার সময় হল। রাঁধুনিরা খাবার নিয়ে এল। ফ্রান্সিস নিজের খাবারটা শাঙ্কোকে দেখতে বলল। নিজে আহত কয়েদীদের কাছে গেল। কয়েদীকে খাইয়ে দিল। তারপর নিজের বিছানায় এসে শাঙ্কোর হাত থেকে খাবার নিল। খেতে লাগল।

রাতে শুয়ে পড়ল। এখন শুধু এখান থেকে পালাবার চিন্তা। কিভাবে পালাবে?

কয়েকদিন কাটল। আহত কয়েদীটি সুস্থ হল। সর্দার প্রহরী ঢুকল। আহত কয়েদীটির বিছানার কাছে এল। আহত কয়েদীটিকে জিজ্ঞেস করল—কেমন আছো ভাই?

—অনেক ভালো আছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি ওষুধ না দিলে আমি মারা যেতাম।

ফ্রান্সিস বলল—ওষুধ না দিলে সর্দারকে মরতে হত।

হঠাৎই ফ্রান্সিসের মনে হল—সর্দার প্রহরী কেমন যেন দুঃখভারাক্রান্ত। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—আমার বিছানার কাছে একটু আসবে?

—চলো। দু'জনে ফ্রান্সিসের বিছানার কাছে এল। ফ্রান্সিস ইশারায় শাঙ্কোকে ডাকল।

ফ্রান্সিস সর্দার প্রহরীকে ওর বিছানায় বসতে বলল। সর্দার প্রহরী মাথা নাড়ল। দুজনে সর্দারের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—কারণ জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার মনে খুব দুঃখ-বেদনা আছে। সর্দার ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। বলল, হ্যাঁ আছে। রাজা আরকানিয়া যে কয়েদীদের কী নির্মম

শাস্তি দেয় তা কল্পনাও করতে পারবে না। ও পশুদের চেয়েও হিংস্র। রাজা ওপরে ওপরে পাগলাটে ভাব দেখায় কিন্তু আসলে ও একটা সুস্থ মানুষ। সবাইকে দেখায় ও পাগলাটে। আসলে ও খুব বুদ্ধিমান মানুষ। ওর হুকুমে কয়েদীদের ওপর কী সাংঘাতিক অত্যাচার করতে হয়েছে সে কথা ভাবলে আমার চোখে জল আসে। কিন্তু পরক্ষণেই সাবধান হয়ে যাই অন্য প্রহরীরা যেন না দেখে ফেলে। এইভাবেই দিন কাটছে আমার। কাঁদতে পারি না।

—আহত কয়েদীটিকে যে ওষুধ দিয়েছো এটা জানতে পারলে—ফ্রান্সিস বলল।

—আমার অবধারিত মৃত্যু। একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—আমরা দুজন পালাতে চাই।

—আমিও পালাতে চাই।

ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল। বুঝল না সর্দারের কথাটা সত্যি না মিথ্যে।

ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল—তোমার পালাতে অসুবিধে কোথায়। চলে গেলেই হল।

—রাজার চোখ সবদিকে। আমি পালালে রাজা আমার পেছনে ঘাতক লেলিয়ে দেবে। ঘাতক আমাকে যেখানে পাবে হত্যা করবে। ফ্রান্সিস শাঙ্কো চুপ করে রইল।

একটু পরে ফ্রান্সিস বলল—তোমার সমস্যার কথা জানলাম। আমরা পালালে রাজা আর আমাদের নিয়ে ভাববে না। ফ্রান্সিস বলল।

—লোকটা কী নৃশংস তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।

—দেখ সর্দার আমাদের পালাতেই হবে। আজ অথবা কাল। কী করে পালাবো সেটাই বুঝতে পারছি না।

—সত্যিই পালাতে চাও?

—নিশ্চয়ই।

—ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করে দেব। শুধু ধরা পড়লে আমার কথা বলবে না।

—তাহলে তুমি আগে কোন কোন কয়েদীকে পালাতে সাহায্য করেছো।

—যদি পালাতে সাহায্য না করতাম তাহলে নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করা হতো। সর্দার বলল।

—ঠিক আছে। কবে পালাতে সাহায্য করবে? ফ্রান্সিস বলল।

—শোন—এই কাকোয়াম্বো সমুদ্রের কাছে। তাই এ সময়টায় এখানে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হয়। তেমনি এক রাতে তোমরা তৈরি থেকো! ঠিক সময় আমি ডাকবো—জাহাজী? তোমরা চলে আসবে ঘরের বাইরে। তারপর কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে পালানো।

—কাঁটাতারের বেড়া পার হবো কিভাবে? শাঙ্কো বলল।

—সে সবের ব্যবস্থা তখন দেখবে—সর্দার বলল।

—তুমি এ ভাবেই অনেককে পালাতে সাহায্য করেছো নিশ্চয়ই। ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব কথা থাক। তোমরা তৈরি? সর্দার বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

সেদিন গভীর রাতে বাইরে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি চলছে। হঠাৎ শুধু শুনল—জাহাজী।

বাইরে এসো। সর্দার প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো বাইরে এল। কী ঝড়ের ঝাপটা যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি। গভীর অন্ধকার বাইরে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তাতেই যা দেখা যাচ্ছে।

সর্দার প্রহরীর পেছনে পেছনে ফুল বাগানের এক কোনার দিকে এলো ওরা। সর্দার প্রহরী দুজনকে কাছে আসতে বলল। কোনার কাঁটাতারের কাছে এসে সর্দার দুহাত দিয়ে কাঁটাতারে টান দিল। কাঁটাতার আস্তে আস্তে সরে গেল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো যত তাড়াতাড়ি পারো বেড়িয়ে এসো।

দুজনে কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে গলে গেল। দুজনেরই হাতে পিঠে কাঁটাতারের খোঁচা লাগল। বেশ জোরে। কিন্তু তখন আর ওসব ভাববার সময় নেই। দেখবারও সময় নেই।

কাঁটাতার পার হয়ে ফ্রান্সিস সর্দার প্রহরীর দিকে হাত বাড়াল। সর্দার ওর বাড়ানো হাত ধরল। চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল।

দুজনে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছুটল। বিদ্যুতের আলোয় ওরা একটা প্রান্তরের মতো দেখল। ছুটল তার ওপর দিয়ে। কিছুদূর এসে দেখল একটা টানা বড় রাস্তা। দুজনে রাস্তায় উঠে ছুটতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ ছোটার পর পথের দুপাশে বাড়িঘর দেখল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—শাঙ্কো—আশ্রয় চাই। আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি।

তখন বৃষ্টি একটু কমের দিকে। কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ার বিরাম নেই।

একটা বাড়ির সামনে এল। বিদ্যুতের আলোয় দেখল বেশ বড় বাড়ি। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সদর দরজার সামনে এল। জোরে দরজায় ধাক্কা দিল। ভেতরে কোন সাড়াশব্দ নেই। আবার ধাক্কা দিল। খটাস্ শব্দ তুলে দরজা খুলে গেল। একজন যুবক দাঁড়িয়ে। শাঙ্কো বলল—দেখুন—ঝড়বৃষ্টিতে আটকে পড়ে গেছি। একটু থাকবার জায়গা দেবেন?

—নিশ্চয়ই। আসুন। যুবকটি বলল।

ভেজা পোশাকে ফ্রান্সিস ও শাঙ্কো ঘরে ঢুকল। খেয়েদেয়ে ফ্রান্সিস যুবকটিকে বলল—তোমরা আমাদের যত্ন করে খেতে দিয়ে থাকতে দিয়েছো। তোমাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ রইলাম।



—না—না। এ কী বলছেন? এটা মানুষ হিসেবে আমাদের কর্তব্য। যুবকটি চলে গেল।

রাত একটু গভীর হতে দুজনে উঠে পড়ল। বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল—এখন ঠিক কর প্রথমে কোথায় যাবে?

—প্রথমে তানাকার খোঁজ করতে হবে। ওর বাবা কোথায় সেটাও জানতে হবে। শাঙ্কো বলল। দুজনে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল।

যখন তানাকা পৌঁছল তখন ভোর হয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। খুঁজে খুঁজে একটা সরাইখানা দেখল। ওরা সরাইখানায় ঢুকল। মালিক হাসিমুখে এগিয়ে এল। মালিক দুটো লাভের কথা ভাবল—এরা তো বিদেশি। খুব সহজেই জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেখাবে। এরা অন্য কোথাও যাবে না। এই সরাইখানাতেই থাকবে। থাকা খাওয়ার জন্যে বেশি অর্থ চাইবে। এরা যা দাম চাইবে তাই দেবে। এ বিষয়ে সরাইওয়ালা নিশ্চিন্ত।

সরাইওয়ালা পেছনের ঘরে এল। ফ্রান্সিসরাও চলল। ঘরটা দেখিয়ে সরাইওয়ালা বলল—এখানেই থাকবেন। আরামে থাকবেন। এখন সকালের খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সকালের খাবার খেয়ে দুজনে চলল তানাকাদের বাড়ি। সব খবরাখবর জানা যাবে।

তানাকাদের বাড়ির সামনে এল। দরজা বন্ধ। ফ্রান্সিস দরজায় ধাক্কা দিল। একজন বয়স্ক মানুষের গলা শুনল—কে?

—আমরা। তানাকার বন্ধু। দরজাটা খুলুন। শাঙ্কো বলল।

তানাকার মা বেরিয়ে এল। তানাকার মা বলল—

—তোমরা কে বাবা?

—তানাকাকে ডাকুন। ও সব বলবে। শাঙ্কো বলল।

—কিন্তু তানাকাকে তো দিন সাতআট আগে পাঁচ-ছজন গুণ্ডা এসে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।

—কোথায় নিয়ে গেছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—তাতো জানি না।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে আস্তে বলল—যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হয়েছে। তানাকার বন্ধু আরোনাস এবার সক্রিয় হয়েছে। তানাকাকে নিয়ে সেই বন্ধুর দল কাজে নেমেছে। ও আরো বলল—তানাকাকে কয়েদঘর থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ও এই ক'দিন বোধহয় বাড়িতেই ছিল। বাবা বার্বার কয়েদখানায়। ওকেই সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল। শাঙ্কো তানাকার মাকে জিজ্ঞেস করল—তাহলে তানাকাকে গুণ্ডারা কোথায় রেখেছে আপনি জানেন না।

—না।

—তানাকা এক বন্ধুর কথা আমাকে বলেছিল। কী যেন নাম—ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ করে ভাবতে ভাবতে চোখ খুলল—হ্যাঁ আরোনাস। আরোনাসের বাড়ি ওদের দোকানের কাছে। ওখানে গিয়ে খোঁজখবর করতে হবে। চল।

ওরা তানাকাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

রাস্তা ধরে চলল বাজারের দিকে। তানাকাদের দোকানে দেখল ঘরে কাচঢাকা আলো। তারই আলোতে কয়েকটা কাঠের পাটাতন দেখল। একটা বড় পাটাতনে বিছানা পাতা। বোধহয় যুবকটি এখানে শুয়েছিল। ওদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—

—দাঁড়ান—আপনাদের শুকনো পোশাক এনে দিই। যুবকটি ভেতরে চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল। দুজনেই গায়ের পোশাক খুলতে লাগল। সব ভিজে ঢোল।

কিছু পরে যুবকটি এল। হাতে শুকনো কাপড় জামা। ফ্রান্সিসরা ভেজা জামাকাপড় একটা কাঠের পাটাতনের ওপর রাখল। শুকনো পোশাক পরল। মাথার চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালিয়ে চুল পাট করল।

এতক্ষণে ফ্রান্সিসরা বুঝতে পারল ওরা কী পরিশ্রান্ত! যুবকটি বলল—এবার শুয়ে পড়ুন। রাত আর বেশি নেই।

ফ্রান্সিস বলল—কিন্তু আপনি জানতে চাইলেন না আমরা কোথা থেকে আসছি কোথায় যাবো।

—কী দরকার। যুবকটি হেসে বলল—আপনারা ঝড়-বৃষ্টিতে আটকা পড়েছেন। আপনাদের সাহায্য করতে হবে। ব্যস্—এর চেয়ে বেশী জেনে কী হবে?

ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে পড়ল। বলল—আমরা সবাই যদি এরকম হতাম? আমাদের কত প্রশ্ন কত অনুসন্ধিৎসা? পথিক হয়তো অনেকদূর হেঁটে এসেছে। কোথায় তাকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করবে তা নয় হাজারটা প্রশ্ন—কী নাম? জাত কী? কোত্থেকে আসছেন? দেশ কোথায়? বেচারি পথিকের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

দুজনে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস অস্পষ্ট পাখির গান শুনল। তার মানে রাত শেষ হয়ে এসেছে। দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙতে বেলাই হল। ফ্রান্সিসরা তাড়াতাড়ি উঠে বসল। দেখল কোনার দিকে একটা কাঠের পীপে। শাঙ্কো পীপেটার কাছে গেল। দেখল পীপে ভর্তি জল। পাশে একটা কাঠের পাত্র। শাঙ্কো জল তুলে মুখ হাত ধুল। ফ্রান্সিসও নেমে এসে হাতমুখ ধুচ্ছে তখনই যুবকটি ঘরে ঢুকল। পেছনে কাজের লোকের হাতে একটা কাঠের থালা। তাতে খাবার রাখা। কাজের লোকটি খাবারের থালা বিছানায় রাখল। ফ্রান্সিসরা তখন ক্ষুধার্ত। তাড়াতাড়ি খেতে শুরু করল।

যুবকটি ঘরে ঢুকল। হেসে বলল—মা বলছিলেন—আপনারা আজকে এখানে থাকুন। ওরকম ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এসেছেন। আপনাদের কোনো কষ্ট হবে না।

—আমাদের থাকবার উপায় নেই। তবে পোশাক তো এখনও শুকোয়নি। ঐ পোশাকের জন্যেই আমাদের আজকের দিনটা থাকতে হবে।

—তাহলে মাকে বলে আসি আপনারা থাকবেন। যুবকটি চলে গেল।

সারাটা দিন ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে কাটালো। একটু বেলায় যুবকটির মেয়ে এল। ফ্রান্সিস মেয়েটির সঙ্গে কথাটথা বলল। ফ্রান্সিস ওদের মুক্তোর সমুদ্রের গল্প ছোট্ট করে বলল। মেয়েটি খুব খুশি। আরো গল্প শুনতে চাইল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো ওকে গল্প শোনাও। অগত্যা শাঙ্কো ওকে হীরের পাহাড়ের গল্প বলল।

রাতে খাওয়ার ডাক পড়ল। এই ঘরেই পাটাতনের ওপর ফ্রান্সিসদের খেতে দেওয়া হল। দুজনেই পেট পুরে খেল। আবার কখন খাবার জুটবে কে জানে।

রাতের খাওয়া খাচ্ছে। তখনই ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো পোশাক শুকিয়ে গেছে। কাজেই আর দেরি নয়।

রাতেই চলতে শুরু করবো। আর দেরি করা ঠিক হবে না।

ওরা খাচ্ছে তখনই যুবকটি এল। বলল—রান্না কেমন হয়েছে?

—খুব ভালো। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস বলল—বলছিলাম আমরা একটু পরেই বিশ্রাম নিয়ে চলে যাবো।

—আজ রাতটা থেকে গেলে হত না। যুবকটি বলল।

—আমরা নিরুপায়। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। কত যত্ন করে খাওয়ালেন শুতে দিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—না না। এতো মানুষ হিসেবে আমাদের কর্তব্য।

খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল দুজনে। তারপর উঠে দাঁড়াল। বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। বড় রাস্তায় উঠল। দিক ঠিক করে নিয়ে হাঁটতে লাগল। রাত শেষ হল। ভোর হল। তখনও ওরা হেঁটে চলেছে।

বেশ বেলায় এক গ্রামে এল। গ্রাম মানে গোটা পাঁচ সাতটা কাঠ আর পাথরে গাঁথা বাড়ি ঘর। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো এখানেই খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ওরা একটা বাড়ির কাছে এল। দেখল দরজা বন্ধ। অন্য একটা বাড়ির দরজা দেখল হাট করে খোলা। ফ্রান্সিস বলল—এই বাড়ির লোকেরা অতিথিবৎসল। চলো এখানেই দেখি।

দুজনে খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। একটা অল্পবয়সী ছেলে তখনই বেরিয়ে এল। শাঙ্কো বলল—তোমার বাবা-মা কোথায়?

—ভেতরে।

—বাবাকে একটু ডেকে নিয়ে এসো।

—ছেলেটা বাবা বাবা বলে ডাকতে ডাকতে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

একটু পরেই একজন রোগামত লোক বেরিয়ে এল। খোলা দরজার কাছে এল। ফ্রান্সিসদের দিকে একবার তাকিয়ে বুঝল ওরা বিদেশি। ভদ্রলোক বললেন—আপনারা তো বিদেশি? আমার কাছে কিসের দরকার?

—আমরা খুব ক্ষুধার্ত আর পরিশ্রান্ত। আমাদের কিছু খেতে দিতে পারেন? শাঙ্কো বলল।

—নিশ্চয়ই। পারবো। আপনারা অতিথি। ঘরে আসুন।

ভদ্রলোকের পেছনে পেছনে ফ্রান্সিসরা গেল। একটা ছোট ঘরে ঢুকল সবাই। দুটো জানলা বন্ধ থাকায় ঘরটা অন্ধকার অন্ধকার লাগছিল। ভদ্রলোক দুটো জানলা খুলে দিল। দেখা গেল একটা কাঠের পাটাতনে ঘাসপাতার বিছানা। ভদ্রলোক বলল—এটা আমাদের অতিথি ঘর। আত্মীয়-স্বজন বা অতিথি এলে তাদের এই ঘরেই রাখা হয়। বসুন। বিশ্রাম করুন। জলটল খান। আপনাদের জন্যে খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। ভদ্রলোক চলে গেল।

দুইহাতে দুই গ্লাশ জল নিয়ে ছেলেটা এল। জল খেয়ে ফ্রান্সিস ওকে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। ছেলেটি কিভাবে পড়াশুনো চালায়। কখন পড়তে যায়, কখন আসে। যিনি পড়ান তিনি কোথায় থাকেন—এখানে বৃষ্টি কেমন হয়— ফ্রান্সিস এমনি সব প্রশ্ন করতে লাগল। ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান। খুব দ্রুত সবকিছু প্রশ্নের জবাব দিল। ফ্রান্সিস খুব খুশি হল।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকল। হেসে বলল—কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। আপনাদের জন্যে রান্না চাপানো হয়েছে।

বাকি রাস্তা পার হয়ে দুজনে বাজারে এল।

দেখল তানাকাদের দোকান সামনে। দোকানের দরজা বন্ধ। শাঙ্কো কয়েকবার দরজায় শব্দ করল। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই।

—চল। বোঝাই যাচ্ছে বার্বারকে যেদিন ধরে নিয়ে গেল সেদিন থেকেই এই দোকান বন্ধ। পরে এখানে আসতে হবে। এখন চল।

দুজনে চলল বাজার ছাড়িয়ে।

*　　　　*　　　　*

দিন কয়েক আগের ঘটনা। সান্তিয়াগোতে তানাকা আর আরোনাস মারামারি করছিল বলে ধরা পড়েছিল। দুজনকেই তানাকার কাছে সান্তিয়াগোর প্রহরীরা দুজনকে ছেড়ে দিয়েছিল। তানাকা রাজ্যে ঢুকতে দুজনকেই বন্দী করা হল। তানাকার প্রহরীরা দুজনকেই কয়েদঘরে ঢোকাল।

সেদিন রাতে তানাকার ঘুম আসছিল না। উঠে পড়ল। মশালের আলোয় আরোনাসকে দেখল।

ওদিকে সান্তিয়াগোর কারাগার থেকে আরোনাস ছাড়া পেল। যাবার সময় তানাকা আরোনাসের সামনে এল। বলল—তুমি আমার কাছ থেকে ছাড়া পাবে না।

—যা—যা। তুই আমার কী করবি? আরোনাস খেঁকিয়ে বলে উঠল।

—সেটা দেখবি। তানাকা বলল। তানাকা আর কিছু বলল না। তানাকাদের কয়েকজনকে তানাকার কয়েদঘরে পাঠানো হচ্ছিল। ঝড়বৃষ্টিতে তানাকা পালাল। পথে সঙ্গী হিসেবে ফ্রান্সিসদের পেল। দেশে ফিরে এল।

তার পরদিনই। বেশ রাত তখন। তানাকার ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে দরজায় লাথি মারছে কে? তানাকা বিছানা ছেড়ে উঠে দরজার কাছে এল। ভেতর থেকেই বলল—আপনারা কে?

—আমি আরোনাস। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—কী কথা?

—দরজা খোল—এভাবে কথা হয়?

—কাল সকালে এসো।

—তখন বড্ড দেরি হয়ে যাবে। দরজা খোল।

—তুমি কি একা?

—হ্যাঁ।

তানাকা দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচজন লোক তানাকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তানাকাকে ধরে বাড়ির বাইরে নিয়ে এল। একজন তানাকার মুখ চেপে ধরেছিল। তানাকা মুখে একটা শব্দও করতে পারে নি।

আরোনাসের দল তানাকাকে রাস্তা দিয়ে প্রায় টেনে নিয়ে চলল।

তানাকার মুখ থেকে চেপে ধরা হাতটা গুণ্ডাটা সরিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তানাকা চিৎকার করে উঠল। ঠিক মানুষের চিৎকারের মতো না। ভাঙা গলায় চিৎকার। আরোনাস ছুটে এল। চড়া গলায় বলল—আর একটা শব্দ করলে মেরে ফেলবো। আস্তে আস্তে চল্।

—আমাকে এভাবে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? তানাকা বলল। গলা ঠোঁটে ব্যথা করছে।

—আমাদের ডেরায় তোকে নিয়ে যাচ্ছি। আরোনাস বলল।

—ওখানে কী হবে?

—তোর বাবার অনেক হীরের অলংকার আছে—আস্ত হীরের খণ্ডও আছে— সেসব আমাদের চাই। আরোনাস বলল।

—ঠিক। একজন গুণ্ডা বলে উঠল।

—কিন্তু আমাকে মেরে ফেললে কি তা পাবে? তানাকা বলল।

—তোকে এখন মারবো না। যখন দরকার পড়বে তখন মারবো। আরোনাস বলল।

—এখন যখন মারছো না তখন আমায় বাড়ি যেতে দাও। তানাকা বলল।

—সেটি হবে না। এখন এখানেই থাকতে হবে। আরোনাস বলল।

—তাতে তোমাদের কী লাভ? তানাকা বলল।

—লাভ আছে বৈকি। হীরের খণ্ড হীরের অলংকার—এসব তো মিলবে।

—সে তো দোকানের মধ্যে। একেবারে বন্ধ লোহার সিন্দুকে।

সিন্দুক ভাঙার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আমার ঠাকুর্দার আমলে ওস্তাদ কামার পেলিলি তৈরি করে দিয়েছিল। কারো ক্ষমতা নেই চাবি ছাড়া অন্য কোনোভাবে সিন্দুক খুলবে।

—দেখা যাক। আরোনাস বলল।

তানাকাকে ওরা একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিল। এই দিনের বেলাও ঘর প্রায় অন্ধকার। জানালা কাঠ দিয়ে বন্ধ করা। একটা মাত্র দরজা তালা লাগানো। ঐ ঘরেই তানাকাকে আটকে রাখা হল। দরজায় তালা লাগিয়ে আরোনাস চলে গেল।

তানাকা মেঝেয় রাখা কাঠের পাটাতনে শুয়ে পড়ল। ভাবতে লাগল কী করে পালানো যায়।

আরোনাসও ওদের ঘরে বসে ভাবছিল কী করে বার্বারের কাছ থেকে চাবিটা আদায় করা যায়।

অনেক ভেবে তানাকা ঠিক করল বাবার কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে আসবে এটা বললে আরোনাসরা ওকে মুক্তি দেবে। চাবি আদায়ের জন্যে তানাকার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। কিন্তু ও কিছুতেই চাবি হাতছাড়া করবে না। ও পালিয়ে যাবে। মধ্যরাত পর্যন্ত এইসব ভাবতে ভাবতে তানাকা ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালের খাবার খেয়ে ও আরোনাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছু পরে আরোনাস ফিরল। তানাকা আরোনাসকে ডাকল। আরোনাস ওর কাছে এল।

—কী ব্যাপার? আরোনাস বলল।

—একটা কথা বলছিলাম।

—বলো। আরোনাস বলল।

—ভাবছি কয়েদঘরে গিয়ে বাবার খোঁজ করি। তানাকা বলল।

—খুব ভালো কথা। আরোনাস বলল।

—জিজ্ঞেস করে জেনে নেব বাবা কোথায় সিন্দুকের চাবিটা রেখেছেন। তানাকা বলল।

—বাঃ। এই তো বুদ্ধি খুলেছে। আরোনাস হেসে বলল।

—এই সকালেই যেতে হবে। এ সময়েই বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে দেয়। তানাকা বলল।

—হ্যাঁ জানি। আরোনাস একটু জোর গলায় ওর একজন বন্ধুকে ডাকল। বন্ধু এল।

—চল্—কয়েদখানায় যাবো। আরোনাস বলল।

—হঠাৎ? সঙ্গীটি বলল।

—দরকার আছে। আরোনাস বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজন তৈরি হল।

কয়েদঘরের সামনে এল। সর্দার প্রহরীর কাছে এল। তানাকা বলল—একটা কথা ছিল।

—বলো। সর্দার প্রহরী গোঁফ মুচড়ে বলল। সর্দার প্রহরী বলল—

—আমার বাবা। হীরের গয়না গড়াতে বাবার সমকক্ষ কেউ নেই। তানাকা বলল।

—আচ্ছা। সর্দার প্রহরী বলল।

—বাবাকে মাননীয় রাজা সাজা দিয়েছেন। বাবা এই কয়েদখানায় বন্দী হয়ে আছেন। আমি বাবার সঙ্গে একটা জরুরী বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই। এখন আপনি যদি অনুমতি দেন। সর্দার প্রহরী বলল—খুব দরকার?

—হ্যাঁ। তানাকা বলল।

—ঠিক আছে। আধ চাকতি সোনা। তোমার বাবার তো সোনা হীরে নিয়ে কারবার।

—হ্যাঁ। একটু থেমে তানাকা বলল—আমার কাছে তো এখন কিছু নেই। এই সোনার আংটিটা নিন।

—ঠিক আছে। তাই দাও। সর্দার বলল।

তানাকা আঙুল থেকে আংটি খুলে দিল। সর্দার প্রহরী একবার দেখে নিয়ে আঙুলে পরল। তারপর একজন পাহারাদারকে ইঙ্গিতে ডাকল। পাহারাদারটি এগিয়ে এল। সর্দার বলল—কয়েদীর নামটা যেন কী?

—বার্বার। তানাকা বলল।

—হ্যাঁ। বার্বারকে বারান্দায় নিয়ে আয়। সর্দার প্রহরী বলল।

পাহারাদার চলে গেল। একটু পরে বার্বার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সেনাপতি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বার্বারকে বলল—তুমি কেমন আছো বাবা?

—ঐ চলছে আর কি। বার্বার বলল।

—তুমি কবে ছাড়া পাবে? তানাকা বলল।

—কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কবে রাণির আমার ওপর রাগ কমবে। ততদিন মুক্তির কোন আশা নেই। বার্বার বললেন। একটু থেমে তানাকা বলল—একটা দরকারি কথা বলছিলাম।

—বল্। বার্বার বললেন।

—তোমার সিন্দুকের চাবিটা যদি দাও। তানাকা বলল।

—তুই চাবি নিয়ে কী করবি? বার্বার জানতে চাইল।

—সিন্দুক কতদিন পাহারা দেব। তানাকা বলল।

আরোনাসদের দেখিয়ে বার্বার বললেন—এরা কারা?

—আমার বন্ধু। তানাকা বলল।

—ও। যাক্ তো—চাবি দেব না। বার্বার বলল।

—তাহলে কোনদিন আস্ত সিন্দুকটাই চুরি হয়ে যাবে। সিন্দুক ভেঙে সব হীরের খণ্ড, হীরের অলংকার আছে সব চুরি হয়ে যাবে। তানাকা বলল।

বার্বার একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর তানাকার ডান হাতটা ধরলেন। ছেড়ে দিলেন। বললেন—আমি এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তানাকা বুঝল—বাবা চাবিটা ওর হাতে দিয়েছেন। এ জায়গায় বেশ অন্ধকার। আরোনাসরা কিছুই বুঝতে পারল না। বার্বার চলে গেল।

ওরা চলে আসছে তখনই আরোনাস বলল—তাহলে তোমার বাবা সিন্দুকের চাবিটা দেবে না।

—তাই তো বলছেন। তানাকা বলল।

—তাহলে সিন্দুকটা ভাঙতে হবে। আরোনাস বলল।

—শেষ পর্যন্ত তাই করতে হবে। তানাকা বলল।

অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে তানাকা চাবিটা কোমরের ফেট্টিতে গুঁজে নিল। ভাবল বাবা ভালো করেই জানেন আমি হীরের খণ্ড হয়তো একটা পাবো। আর হীরের অলংকার? বাবা বেশ চিন্তা করেই আরোনাসদের সামনে চাবিটা দিলেন না। ওদের দেখে বাবার ভালো লাগে নি।

তিনজনে আস্তানায় ফিরে এল। কাঠের পাটাতনে বসতে বসতে তানাকা ডাকল—আরোনাস?

—বল্।

—আমি তোমাদের বাবার কাছে নিয়ে গেছি। আমি এর বেশি আর কি করতে পারি। তানাকা বলল।

—হুঁ। আরোনাস মুখে শব্দ করল।

—তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও। তানাকা বলল।

—এবার সিন্দুকটা ভাঙবার চেষ্টা করতে হবে। আরোনাস বলল।

—তাই করো। কিন্তু আমাকে মুক্তি দাও। তানাকা বলল।

—তাই ভাবছি। আরোনাস বলল।

—তুমি তো একটা হীরের খণ্ড পেয়েছো মানে চুরি করেছো। তানাকা বলল।

—ভালো করেছি। আরোনাস বলল।

—ঠিক। তুমি যে একটা হাড়কাটা চোর সেটা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমাকে দোকান খুলে ব্যবসা চালিয়ে যেতে হবে। তানাকা বলল।

—বেশ। তুই যা। আরোনাস বলল।

তানাকা ঘর থেকে বাইরে এল। ও প্রায় দৌড়ে চলল।

বাড়ি এসে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিল। মার গলা শুনল—আসছি। মা দরজা খুলতে তানাকা বাড়িতে ঢুকল। মা বলল—

—এই ক'দিন কোথায় ছিলি?

—এক বন্ধুর বাড়িতে। তানাকা বলল।

—আমাদের একটা খবর দিবি তো। মা বলল।

তানাকা কিছু বলল না। নিজের ঘরটায় ঢুকল।

সেদিন ফ্রান্সিস শাঙ্কো বাজারে কিছু কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিল। বাজারের কাছে হঠাৎ তানাকার সঙ্গে দেখা। ফ্রান্সিস বলল—তানাকা কোথায় গিয়েছিলে?

—সে অনেক কথা। তানাকা বলল।

—বলো তো শুনি। ফ্রান্সিস বলল।

তানাকা সংক্ষেপে ওর কথা বলল।

—তাহলে তোমার বাবা তোমাকে সিন্দুকের চাবি দেয়নি। ফ্রান্সিস বলল।

তানাকা একটু চুপ করে থেকে বলল—তোমাদের সত্যি কথাটা বলবো?

—বলো। তোমার যদি আপত্তি না থাকে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তানাকা বলল—আমার বন্ধুদের কাছ থেকে লুকিয়ে বাবা আমাকে চাবিটা দিয়েছে।

—তাহলে তোমার সমস্যা তো মিটে গেল। সিন্দুক খুলেছিলে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কিছু হীরের গয়নাগাঁটি পেয়েছি।

—হীরের খণ্ড পাও নি? ফ্রান্সিস বলল।

—না। অবশ্য আমার এক চোর বন্ধু আরোনাস হীরের খণ্ড চুরি করেছিল।

ফ্রান্সিস বলল—তানাকা তোমাদের দোকানে চল। তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে।

—বেশ। আমাদের দোকানে চলুন। তানাকা বলল।

তিনজনে তানাকাদের দোকানে এল। তানাকা তালাটা খুলল। দরজা খুলল। দুটো জানালাও খুলল। এবার দোকানের ভেতরটা ভালোই দেখা যাচ্ছে। দোকানে মাঝখানে চটের মতো মোটা কাপড় পাতা।

ফ্রান্সিসরা বসল। ফ্রান্সিস লোহার সিন্দুকটার দিকে দেখল। বেশ শক্ত সিন্দুক। সম্পূর্ণ লোহার। কাজেই বেশ ভারি।

ফ্রান্সিস বলল—তানাকা কিছু মনে কোরো না। তোমার বাবা সৎ মানুষ নন। আমরা ধারে কাছের সব রাজবাড়িতে খোঁজখবর নিয়েছি।

তানাকা বেশ মনক্ষুন্ন হল। বলল—ফ্রান্সিস আপনি বাবাকে চোর বলছেন।

—ঠিক চোর বলছি না। বলতে পারি ঠগ। প্রতারক। তবে যাদের জন্য গয়না গড়িয়েছিলেন তাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর আমরা নিয়েছি। প্রত্যেক রানী, রাজকুমারীরা একটা কথা বলেছেন, বার্বারকে তারা যে হীরের খণ্ড দিয়েছেন তাদের সবাইকেই বলেছেন—হীরের খণ্ড হারিয়ে গেছে বা চুরি হয়েছে। আমার

প্রশ্ন দু-একটা ক্ষেত্রে হয়তো হারিয়ে যেতে পারে বা চুরি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে এরকম হবে কেন? একটু রাগতস্বরে তানাকা বলল—

—বেশ ধরে নিলাম বাবা হীরকখণ্ড চুরি করেছেন। তাহলে হীরের খণ্ডগুলো যাবে কোথায়?

—তোমাদের বাড়িতে এই দোকানে খোঁজ করলেই ঐ হীরকখণ্ডগুলোর হদিশ মিলবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো বাড়ি আর দোকান ভাল করে দেখতে হয়। তানাকা বলল।

—তাই করতে হবে। কিছু একটা হদিশ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে সিন্দুকটা খুলি। তানাকা বলল।

ফ্রান্সিস বলল—খোল। আমরা দেখবো।

তানাকা উঠে দাঁড়াল। সিন্দুকটার কাছে গেল। কোমরে গোঁজা চাবিটা বের করল। সিন্দুক খুলল। ফ্রান্সিস শাঙ্কো এগিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস সিন্দুকটার সামনে উবু হয়ে বসল। এক নজরে সবকিছু দেখল।

—সিন্দুকে রাখা হীরের গয়নাগুলো তুমি নিয়ে গেছ। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। তানাকা বলল।

—হীরের খণ্ড পাও নি? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না। তবে কাচের ডেলা পেয়েছি। আমার এক চোর বন্ধু আরোনাস কাচের ডেলা রেখে হীরের খণ্ড চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। তানাকা বলল।

—বুঝলাম। ফ্রান্সিস বলল। তারপরে সিন্দুকের মধ্যে হাত বাড়িয়ে হাত দিয়ে দুপাশে দেখল।

—বুঝলেন তো। আমার বাবা চোর নয়। তানাকা বলল।

—আমি এখনো বলছি তোমার বাবা সৎপথে অর্থ আয় করেন নি। কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস খোলা সিন্দুকের মধ্যে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে সব দিক দেখল কিছুই নেই।

ফ্রান্সিস এবার উঠে সিন্দুকের পিছনে গেল। সিন্দুকের পিছনে টানা লোহার মোটা পাত। ফ্রান্সিস ফিরে আসছে তখনই ভাবল—ভেতরে কোনো গোপন জায়গা থাকতে পারে।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—একটা হাত পাঁচেকের দড়ি আনো। শাঙ্কো তানাকার কাছ থেকে দড়ি নিয়ে এল। ফ্রান্সিস সিন্দুকটা বাইরে থেকে মাপল। তারপর সিন্দুকের মধ্যে ঐভাবে মাপল। দেখল আঙুল পাঁচেক কম। ফ্রান্সিস চট করে উঠে দাঁড়াল।

তানাকা বলল—দেখলেন? সব ঠিক আছে।

—না। ঠিক নেই। সিন্দুকের মধ্যে একটা চোরা কুঠুরিও আছে।

—কোথায় চোরা কুঠুরি। সব বাজে কথা। তানাকা বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর সিন্দুকের মধ্যে আবার মুখ ঢুকিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ দেখল—পেছনে লোহার পাতে একটা ছিদ্র। ফ্রান্সিস ছিদ্রটায় আঙুল ঢোকাল। তারপর হ্যাঁচকা টান দিল। সিন্দুকের পেছনের মাঝামাঝি লোহার পাত সরে গেল।

মাথাটা একবার বের করে বলল—তানাকা আমি মিথ্যে দোষারোপ করিনি। এই দেখ। ফ্রান্সিস আবার সিন্দুক থেকে মাথা বের করল। লোহার পাতটা পকেটের মত লাগানো। ফ্রান্সিস তাতে হাত ঢোকালো—একটা হীরের খণ্ড পেল। বার করল। তানাকা বলল—আশ্চর্য। বাবা তো আমায় কখনো এই খাপের কথা বলেনি।

ফ্রান্সিস পরপর পাঁচটি হীরের খণ্ড বের করল। তানাকা হীরের খণ্ড নিতে হাত বাড়াল। ফ্রান্সিস ওকে সরিয়ে দিল। এই হীরের খণ্ডগুলোর মালিক যারা তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

—বেশ। আমিই ফিরিয়ে দেব। তানাকা বলল।

—তুমি এই মূল্যবান হীরে ফিরিয়ে দেবে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আমি কথা দিচ্ছি। শুধু এই ব্যাপারটা যেন পাঁচকান না হয়। পাগলা রাজা আরকানিয়ার কানে গেলে হীরের খণ্ডগুলো তো যাবেই আর চুরি করার জন্যে বাবাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। তানাকা বলল।

কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—কী করবো?

—এই হীরের খণ্ডগুলো আমরা নেবো না। তানাকার বাবা এইগুলো মিথ্যে কথা বলে চুরি করেছে। এইগুলো তো চোরাই সম্পত্তি। চোরাই সম্পত্তি হলেও এগুলো তানাকারই প্রাপ্য। ওকেই দাও। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে তানাকা তোমাকেই দিলাম। মাত্র একটা হীরের খণ্ড রেখে বাকিগুলো যার যার প্রাপ্য দিয়ে দেবে। কথা দাও।

—আমি একটা খণ্ডের জায়গায় দুটো খণ্ড চাইছি।

—বেশ তাই নাও। তোমার কথার খেলাপ হয় না যেন। ফ্রান্সিস বলল।

—না না। যীশুর দিব্যি—আপনারা যে নির্দেশ দিয়েছেন আমি তাই করবো। তানাকা বলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দোকানের বাইরে এল। তানাকা দোকান থেকে একটা চামড়ার বস্তায় হীরেগুলো রাখল। সিন্দুক বন্ধ করল। বাইরে এল। ফ্রান্সিসকে বলল। আপনারা আমার বাবাকে প্রাণে বাঁচালেন।

—তবে তোমার বাবা কিন্তু সৎ ছিলেন না। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস এবার জাহাজে যেতে হবে। একটু দ্রুত হাঁটতে হবে।

দুজনে বেশ দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। পথেই বিস্কো আর অন্য বন্ধুরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে দেখল। বিস্কো ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

—তোমাদের খুঁজতে রাজবাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলাম। কয়েকদিন ধরেই আমরা তোমাদের খুঁজতে এসেছি। বিস্কো বলল।

—মারিয়া খুব রেগে গেছে—তাই না? ফ্রান্সিস বলল।

—রাজকুমারী তো মনের ভাব বেশি প্রকাশই করেন না। তবে আমরা কেউ কেউ দেখেছি—রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। বিস্কো বলল।

—আমি ফিরে এসেছি এটা দেখেই মারিয়া শান্ত হবে। চলো সব। ফ্রান্সিস বলল।

জাহাজ থেকে ফ্রান্সিসদের দেখতে পেয়ে বন্ধুরা জাহাজ থেকে ধ্বনি তুলল— ও—হো—হো।

ফ্রান্সিসরা জাহাজে উঠল। মারিয়া বিরসমুখে ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এবার দেশে ফের।

ফ্রান্সিস হেসে উঠল। বলল—কী হবে দেশে ফিরে। এই তো বেশ দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—না। আমি দেশে ফিরবো।

—ঠিক আছে। দেখা যাক।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে নিয়ে নিজেদের কেবিনঘরের দিকে চলল। বন্ধুরা কেউ কেউ ডেক-এ বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল।

—ঃ—

শায়িত দেবতাদের মন্দির



মাস্তুলের ওপর থেকে নজরদার পেড্রো অনেক আগেই জানিয়েছিল ফ্রান্সিসদের জাহাজ একটা বন্দরের কাছে এসেছে।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। মারিয়া সূর্যাস্ত দেখছিল। প্রতিদিন জাহাজের ডেকে এসে মারিয়া সূর্যাস্ত দেখে। সমুদ্রে বিরাট বিরাট ঢেউ। তারই মাথায় সূর্য নেমে এসেছে। পশ্চিম দিককার আকাশে কত রঙ ফুটে উঠছে। সূর্যকে ঘিরে লাল আলোর বলয় যেন। আস্তে আস্তে সেই আলো মিলিয়ে গেল। নামল অন্ধকার।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। সঙ্গে শাঙ্কো। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস, এখন কী করবে? বন্দরে জাহাজ ভেড়াবে, নাকি বন্দর ছাড়িয়ে চলে যাবে?

ঠিক বুঝতে পারছি না কোথায় এলাম। এটা তো সবার আগে জানা দরকার। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে তো বন্দরে গিয়ে জাহাজ নোঙর করতে হয়।

তাই করব। তারপর বন্দরে নেমে খোঁজখবর নেব। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে ফ্রেজারকে গিয়ে বলি। হ্যারি বলল।

যাও।

কিছু পরে ফ্রেজার এল। বলল, ফ্রান্সিস, এখন কী করবে?

জাহাজ বন্দরের কাছে নিয়ে চল। নোঙর কর। জাহাজ থেকে নেমে এই বন্দরের নাম জানতে হবে। এটা কোনো দ্বীপ না দেশ জানতে হবে। তাহলেই বুঝব আমরা কোথায় এলাম। এখান থেকে আমাদের দেশই বা কতদূর!

বেশ। জাহাজ নোঙর করছি। ফ্রেজার বলল।

ফ্রেজার জাহাজের গোল হুইল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জাহাজটা জাহাজঘাটার কাছে নিয়ে এল। নোঙর করল।

সন্ধ্যের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে পাতা কাঠের পাটাতন দিয়ে হেঁটে জাহাজঘাটায় উঠল।

বন্দরটা খুব ছোট না। বেশ কয়েকটা জাহাজ নোঙর করে আছে। চাঁদের আলো উজ্জ্বল। সেই আলোয় দেখল—বাজার মতো এলাকা। ফলটল, জামাকাপড়, দড়ি, পালের কাপড় বিক্রি হচ্ছে।

কাছের দোকানের সামনে এল। দোকানিকে ভাঙা ভাঙা তলতেক ভাষায়

বলল, এই দেশের নাম কী? দোকানি বুঝল না। বলল, বুঝতে পারছি না। এবার হ্যারি হাত-মুখ নেড়ে বোঝাল এই জায়গার নাম কী? এবার দোকানি বুঝল। বলল, আলকাবা। কিন্তু শুধু এইটুকু জেনে তো আন্দাজ করা যাবে না ইউরোপ কতদূর।

কিছুক্ষণ বাজার এলাকায় ঘোরাঘুরি করে দুজনে জাহাজে ফিরে এল। বন্ধুরা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল, বিশেষ কিছু খবর পেলাম না। শুধু জানলাম এ দেশের নাম আলকাবা। মা মেরিই জানেন ইউরোপ থেকে কতদূরে আছি আমরা।

এখানেই ঘোরাঘুরি করি। নিশ্চয়ই হদিস পাব। তখন দেশের দিকে যাত্রা করবো। হ্যারি বলল।

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো। ফ্রান্সিস কেবিনঘরে এল। মারিয়া বলল, তাহলে কী ঠিক করলে।

এই এলাকায় ঘোরাঘুরি করে জানতে হবে ইউরোপ কোনদিকে। এখান থেকে কতদূর? তারপর দিক ঠিক করে নিয়ে জাহাজ চালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো আর ওর দু'তিনজন বন্ধু ডেকে উঠে এল। ওখানেই শুয়ে পড়ল। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ, জোর হাওয়া ছুটেছে। শাঙ্কোরা ঘুমিয়ে পড়ল।

শেষ রাতের দিকে হঠাৎ কিসের শব্দে শাঙ্কোর ঘুম ভেঙে গেল। ও কান খাড়া করল। হালের দিকে অস্পষ্ট শব্দ। শাঙ্কো নিঃশব্দে সিঁড়িঘরের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। একটু পরেই দেখল হাঁটুঝুল চিত্রবিচিত্র আলখাল্লা মতো পরা একজন বয়স্ক লোক নীচে নামার সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে। নিঃশব্দে। লোকটির আলখাল্লা ভেজা নয়। তাহলে বয়স্ক লোকটি নৌকোয় চড়ে এসেছে।

শাঙ্কো দ্রুতপায়ে এসে লোকটির সামনে দাঁড়াল। লোকটি বেশ চমকেই উঠল। শাঙ্কো বলল, আপনি কে?

লোকটি আস্তে আস্তে বলল, আমি রাজপুরোহিত পিরেল্লো।

আমাদের জাহাজে কীভাবে এলেন?

গাছের গুড়ি কুঁদে বানানো আমার নৌকোয় চড়ে।

কেন এলেন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

তোমরা কারা? পিরেল্লো জিগ্যেস করলেন।

আমরা ভাইকিং। শাঙ্কো বলল।

আমি তোমাদের জাহাজটা দেখেছিলাম। কোনো পতাকা উড়ছে না। বুঝলাম তোমরা দূর দেশের মানুষ। আমিও সেটাই চেয়েছিলাম। আমি ঠিক করেছি কাছাকাছি নয়, দূরের কোন দেশে চলে যাব। পিরেল্লো বললেন।

আপনি রাজপুরোহিত। কত সম্মান আপনার। দেশের লোক আপনাকে কত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তবে কেন দেশত্যাগ করতে চাইছেন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

সে অনেক কথা। পিরেল্লো বললেন।

ততক্ষণে শাঙ্কো আর রাজপুরোহিতকে ঘিরে কয়েকজন ভাইকিং বন্ধুও দাঁড়িয়েছে। রাজপুরোহিত বললেন, তোমাদের দলনেতা কে? তার সঙ্গে কথা বলব।

ঠিক আছে। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমাদের দলনেতাকে নিয়ে আসছি।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের সামনে এল। দরজায় টোকা দিল।

কে? ফ্রান্সিসের গলা।

ফ্রান্সিস, একটু এসো। এদেশের রাজপুরোহিত আমাদের জাহাজে এসেছেন তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

আসছি।

ফ্রান্সিস কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে এল। পেছনে মারিয়াও এল।

ডেকে উঠে এল দুজনে। আসবার সময় শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে রাজপুরোহিতের সঙ্গে যা কথা হয়েছে তা বলল।

ফ্রান্সিস রাজপুরোহিত পিরেল্লোর সামনে এসে দাঁড়াল।

আপনার কথা বন্ধুর মুখে শুনলাম। আপনি কী চান, স্পষ্ট করে বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

আমি আপনাদের জাহাজে আশ্রয় চাইছি।

কেন?

আমি সাতটি দেবতার মূর্তি চুরি করে এনেছি। এই আলকাবা দেশ থেকে পালাতে চাই। মূর্তিগুলো গালালে প্রচুর সোনা পাব। তাই দিয়ে আরামে বাকি জীবনটা নিজের দেশ পর্তুগালে কাটাতে পারব।

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল, সেই সাতটি দেবতার মূর্তি কোথায়?

আমার নৌকোয় রেখেছি। পিরেল্লো বললেন।

ঠিক আছে। বিস্কোকে বলল, যাও তো মূর্তিগুলো নিয়ে এসো।

বিস্কো চলে গেল। পিরেল্লো বললেন, তাহলে এই সুযোগে আপনি আমার মূর্তিগুলো নিয়ে নেবেন মানে চুরি করবেন।

ফ্রান্সিস রেগে গেল, চোর আপনি। কোনো চোরকে আমরা আমাদের জাহাজে আশ্রয় দিই না।

তাহলে আমার মূর্তিগুলো রেখে আমাকে তাড়িয়ে দেবেন?

আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করব না। এই মূর্তির সঠিক মালিক আলকাবার রাজা। মূর্তিগুলো তাঁকেই দিয়ে দেব। আর আপনি মূর্তিগুলো চুরি করেছেন এটাও বলব। তারপর রাজা যা করার করবেন।

বিস্কো একটা বোঁচকা কাঁধে করে ফিলে এল।

তখন ভোর হয়েছে। সূর্যের আলো পড়েছে জাহাজে, সমুদ্রের জলে, আকাশে। চারদিক ঝলমল করছে।

ফ্রান্সিস বোঁচকা থেকে একটা মূর্তি বের করল। কী সুন্দর মূর্তি। ফ্রান্সিসরা অবাক হয়ে দেখল মূর্তির মাথায় মুকুট, গায়ে নানারকম কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরি আলখাল্লা। বাকি মূর্তিগুলো আর খোলা হল না।

ফ্রান্সিস রাজপুরোহিতকে জিগ্যেস করল, বলুন, এখন আপনি কী করতে চান?

এই সাতটি মূর্তি নিয়ে আপনাদের জাহাজে চড়ে পালাব।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল, হ্যারি কী করবে বল।

হ্যারি বলল, দেখুন রাজপুরোহিত, আমরা আগেই বলেছি কোনো চোরকে আমরা আশ্রয় দিই না। আপনাকেও আশ্রয় দেওয়া হবে না। আপনি একটু ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলছেন। আপনি এ দেশের অধিবাসী নন। তাহলে আপনি কি করে এখানে এলেন? আর কিভাবেই বা রাজপুরোহিত হলেন?

আপনার অনুমান ঠিক। আমি পর্তুগীজ। দাস-ব্যবসায়ীদের হাতে ধরা পড়েছিলাম। এক দুঃসহ পরিবেশে জাহাজের নীচের খোলে বন্দী হয়ে ছিলাম। আমাদের দলনেতার নির্দেশে এক রাতে আমরা বিদ্রোহ করলাম। লোহার গরাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম একসঙ্গে। একটা লোহার গরাদ আমাদের চাপে নড়ে গেল। ঐ গরাদের ওপরেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলাম। গরাদটা খুলে গেল। আমরা নিরস্ত্র। দাস-ব্যবসায়ীর রক্ষীরা আমাদের আটকাতে চেষ্টা করল। আমরা ওদের হাত থেকে তরোয়াল ছিনিয়ে নিলাম। ওদের সঙ্গে লড়াই করলাম। অনেক রক্ষী মারা গেল। আমাদের মধ্যেও অনেকের মৃত্যু হল। আমি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। রাতের অন্ধকারে সাঁতরাতে-সাঁতরাতে তীরে এলাম। একটু থেমে আমার বলতে লাগলেন, তীরভূমির চারদিকে তাকিয়ে অন্য বন্দীদের কাউকে দেখতে পেলাম না। আমি বালিয়াড়ির ওপর শুয়ে রইলাম। ক্রমে ভোর হল। চারদিকে আলো ছড়াল। বারবার চারপাশে দেখলাম। সঙ্গীরা বোধহয় দূরে কোথাও তীরে উঠেছে। যাই হোক, এভাবেই আমি আফ্রিকায় এলাম।

পিরেল্লো থামলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের শুরু করলেন, বেলা বাড়ল। জন-বসতিতে এলাম। খিদেয় পেট জ্বলছে। এক পাত্র জলও খেতে পারিনি। একটা ঘর দেখলাম। অন্যরকম। নারকেলপাতার ছাউনি। দেয়াল কাঠ কেটে তৈরি। মেঝে মাটির।

ঘরটার দরজায় টোকা দিলাম। পর্তুগীজ ভাষায় বললাম, আমি খুব ক্ষুধার্ত। কিছু খেতে দিন। একবার দু'বার বললাম। ভিতর থেকে গম্ভীর গলায় কে পর্তুগীজ ভাষায় বললেন, চলে এসো। দরজা খোলা।

আমি ঘরটায় ঢুকলাম। অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতে দেখি একজন বয়স্ক লোক গাছের ডাল কেটে তৈরি বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার চুল, দাড়ি, গোঁফ সব সাদা। লোকটি বলল, ডানদিকে দেখ একটা টেবিল। তাতে খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। যতটা খেতে পারো খাও।

কথামতো আমি টেবিলটার কাছে গেলাম। সেটাও বিছানার মতো গাছের ডাল কেটে করা। তার ওপর ঢাকা দেওয়া কয়েকটি মাটির পাত্র। ঢাকনা খুলে দেখলাম কিছু রুটি। অন্যটায় মাছের ঝোল। অন্য দুটো পাত্রে ভাজা-টাজা।

আমি খেতে বসে গেলাম। খাচ্ছি, তখন বৃদ্ধ বললেন, তুমি পর্তুগীজ?

হ্যাঁ।

এখানে কি করে এলে?

আমি তাঁকে সব বললাম। ক্রীতদাস বেচাকেনার হাটে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আমরা কি করে পালিয়ে এসেছি শুনে উনি বললেন, এখানে থাকবে স্থির করেছো?

হ্যাঁ। উপায় কী?

কিন্তু তুমি তো পর্তুগীজ। এখানকার ভাষা জানো না। কী করবে তুমি?

আসার সময় দু'পাশে দেখেছি তুলার খেত। সে সব খেতেই কোনো কাজ নেব। আমি বললাম।

দরকার নেই। একটা কথা, তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি?

নিশ্চয়ই পারেন। আমি বললাম।

তাহলে শোন, আমি রাজপুরোহিত হোমক। তুমি আমার সহকারী হিসেবে কার করবে? রাজি?

হ্যাঁ, রাজি। আমি সাগ্রহে উত্তর দিলাম।

হোমক আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠলেন। বললেন, তুমি এখানকার পূজিত সাতটি দেবতার কথা জানো না?

না। আমি বললাম।

ঠিক আছে। আমি সব শিখিয়ে-পড়িয়ে নেব। আমি মন্দিরে তাঁদের পুজো করতে যাচ্ছি। তুমি এখানেই থাকবে। খিদে পেলে আরো খাবে। আমি কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসছি।

হোমক বেরিয়ে গেলেন।

তারপর? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

তারপর হোমকের শিষ্য হয়ে আমি তাঁকে পুজোর সময় সাহায্য করতে লাগলাম। আমার থাকা-খাওয়ার কোনো অসুবিধেই আর হল না। আমার পুরোহিতের কাজ শেখা হয়ে গেল। হঠাৎ হোমক অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আমিই পুজোর কাজ চালাতে লাগলাম। রাজবৈদ্য হোমকের চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁকে সুস্থ করতে পারলেন না। রাজ পুরোহিত হোমক মারা গেলেন।

এবার এখানকার রাজা কানবহনা আমাকে রাজপুরোহিত করলেন। প্রতিদিন রাজপুরোহিতের কাজ করে আমার বেশ ভালোই দিন কাটছিল।

ফ্রান্সিস বলল, এই সাতটি দেবতারই পুজো করতেন আপনি?

হ্যাঁ। রাজপুরোহিতের সব দায়িত্বই আমি পালন করতাম। একটা কথা বলা

হয়নি। যে রাতে হোমক মারা যান সেই রাতে হঠাৎই আমাকে হাতের ইশারায় বিছানার কাছে যেতে বললেন। আমি গেলাম। উনি আমাকে কান পাততে বললেন। আমি মাথা নিচু করলাম। থেমে থেমে উনি বললেন, আমার লতাপাতায় তৈরি বাক্সটায় একটা চামড়ার টুকরো পাবে। তাতে অতীতের এক রাজা—রাজা হানম, যিনি এই মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন তিনি প্রাচীন স্প্যানিশ ভাষায় লিখে গেছেন একটা ছড়া।

ছড়াটা মনে আছে আপনার? ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল।

হ্যাঁ। পিরেল্লো বললেন।

শোনান তো ছড়াটা। ফ্রান্সিস বলল।

পিরেল্লো বললেন ঃ

ছোট্ট সাজের ঘরে
রেখেছি বড় আদরে।
ধনসম্পদ কার তরে?
বুদ্ধিমান উদ্ধার করে।
বোকারা হা-হুতাশ করে।

ফ্রান্সিস বলল, সহজ ছড়া। ধনসম্পদের কথা বলা হয়েছে। সেই গুপ্ত ধনসম্পদ উদ্ধারের জন্যে এই ছড়াটা খুব কাজে লাগবে বলেই মনে হয়।

আমারও তাই মনে হয়। পিরেল্লো বললেন।

এই ছড়াটা পাওয়ার পর আপনি কি পুজোর ঘরে, সাজঘরে খোঁজাখুঁজি করেছিলেন?

হ্যাঁ। কিন্তু কোনো হদিস করতে পারিনি। পিরেল্লো বললেন।

আপনি দেবতার মূর্তি চুরি করে পালাতে চাইছেন কেন? হ্যারি বলল।

কতদিন এই বিদেশে পড়ে আছি। ভালো লাগছিল না। শুধু পর্তুগাল চলে যেতে মন চাইছিল।

দেবতার মূর্তিগুলো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন কেন? ফ্রান্সিস বলল।

মূর্তিগুলো নিখাদ সোনায় তৈরি। বিক্রি করলে খুব ভালো দাম পাবো এই আশায়। পিরেল্লো বললেন।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল, এঁকে নিয়ে কী করবে?

এখানকার রাজা কানবহনার কাছে এঁকে নিয়ে চল। দেবতার মূর্তির কথা বলব। মূর্তিগুলো পেলে রাজা যা করতে চাইবেন করবেন। এ দেশের যা বিচার তাই-ই হবে। একটা চোরের সঙ্গে আমরা কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। হ্যারি বলল।

তাহলে সকালের খাবার খেয়ে রাজসভায় চলো। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে, তাই চলো। হ্যারি বলল।

খাওয়া-দাওয়ার পর হ্যারি পিরেল্লোকে বলল, আমাদের রাজসভায় নিয়ে চলুন।

পিরেল্লো হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, এই দেশের যা আইন তাতে যে অপরাধ আমি করেছি তার জন্য ফাঁসি দেওয়া হবে। আমাকে রাজার কাছে নিয়ে যাবেন না।

এছাড়া উপায় নেই। হ্যারি বলল। পিরেল্লো কাঁদতে লাগলেন।

পিরেল্লো দেবতার মূর্তি-বোঝাই পোঁটলাটা কাঁধে নিলেন। ফ্রান্সিস, হ্যারি আর শ্যাঙ্কো এগিয়ে এল।

দড়ির মই বেয়ে চারজনে জাহাজের সঙ্গে বেঁধে রাখা ছোট্ট নৌকোয় নেমে বসল। ফ্রান্সিস বৈঠা বাইতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকো তীরে পৌঁছল।

তীরে উঠল সবাই। পিরেল্লো পশ্চিমমুখে হাঁটতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ওরা রাজবাড়ির সামনে এল।

রাজবাড়ির সামনে বেশ ভিড়। ফ্রান্সিসরা বিচারসভার ঘরের সামনে এল। ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বলল, আমাদের ভেতরে নিয়ে চলুন।

দরজায় পেতলের বর্শা হাতে দুই প্রহরী দাঁড়িয়ে। ওরা পিরেল্লোকে দেখে মাথা একটু নোয়াল। পিরেল্লো ওদের সঙ্গে কথা বলে ফ্রান্সিসদের বললেন, আসুন।

চারজনে রাজসভায় ঢুকল। পাথর দিয়ে তৈরি ঘরের ভেতরটা বেশ অন্ধকার অন্ধকার। রাজা কাঠের সিংহাসনে বসে আছেন। সিংহাসনের গদিটা পাখির পালক দিয়ে তৈরি। দু'পাশে মন্ত্রী, সেনাপতি ও অমাত্যরা। পিরেল্লো তখন প্রায় কাঁদতে শুরু করেছেন। চাপা গলায় বারবার বলছেন, আমাকে চলে যেতে দিন। নইলে আমাকে রাজা মৃত্যুদণ্ড দেবেন।

উপায় নেই। অভিযুক্ত হলেও রাজা আপনাকে মুক্তি দেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

অসম্ভব। আমার নিশ্চিত মৃত্যু। পিরেল্লো বললেন।

দেখা যাক। তবে মূর্তিগুলো ফেরৎ পেলে রাজা খুশিই হবেন। হয়তো আপনাকে সাধারণ শাস্তি দেবেন।

না-না। আমাকে মরতে হবে। পিরেল্লো কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেন।

বললাম তো দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি ডাকল, ফ্রান্সিস।

বলো।

দেখ এই আলকাবা দেশ আমাদের কাছে বিদেশ। এখানে কে কী চুরি করল সে-সব ব্যাপারে আমরা জড়াব কেন?

তাই বলে একটা চোরকে জেনে-শুনে পালাতে দেব? ফ্রান্সিস বলল।

এ-ব্যাপারে আমাদের না জড়ানোই ভালো। তুমি পিরেল্লোকে ছেড়ে দাও। উনি যেখানে যেতে চান যান।

ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বলল, আপনিও এটাই চান?

হ্যাঁ। একবার আমার ব্যাপারটা রাজার কানে গেলে আমার রেহাই নেই।

আপনি যে মূর্তিগুলো চুরি করেছেন সে-সব ঠিক জায়গায় রেখে দেবেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

নিশ্চয়ই রেখে দেবো। পিরেল্লো বললেন।

আমাদের ধোঁকা দিয়ে মূর্তি নিয়ে পালাবেন না তো? হ্যারি বলল।

না-না। আপনারা যা বলবেন আমি তাই শুনবো।

ঠিক আছে। এবার আমি রাজার সঙ্গে কথা বলবো। আপনি ব্যবস্থা করে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

দেখছি। বলে পিরেল্লো এগিয়ে গেলেন। একজন বৃদ্ধ অমাত্যের কাছে গিয়ে মুখ নিচু করে কী বললেন। বৃদ্ধ অমাত্যটি আসন থেকে উঠে রাজার কাছে গেলেন। রাজাকে কী বললেন। রাজা মাথা নেড়ে সায় দিলেন। যিনি বিচারপ্রার্থীদের নাম ডাকছিলেন বৃদ্ধ অমাত্য তাঁকে ডেকে কিছু বললেন। তিনি এবার ডাকলেন, রাজপুরোহিত যাঁদের নিয়ে এই সভায় এসেছেন তাঁরা এগিয়ে আসুন।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি রাজার কাছে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা মাথা একটু নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানাল। রাজা খুশি হলেন। বললেন, শুনলাম তোমরা বিদেশী।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা জাতিতে ভাইকিং। আপনার রাজপুরোহিতের সঙ্গে আমাদের হঠাৎই পরিচয় হয়েছে। তিনি জানালেন আপনাদের এক মন্দিরে নীচের ঘরে রাজা হানম ধনসম্পদ গোপনে রেখে গেছেন।

হুঁ। আমাদের বংশের অনেকেই সেই ধনভাণ্ডার খুঁজেছিলেন। কিন্তু কেউ উদ্ধার করতে পারেননি।

পিরেল্লোর গুরুদেব রাজপুরোহিত হোমক মৃত্যুর পূর্বে পিরেল্লোকে চামড়ার ওপর লেখা একটা ছড়া দিয়ে গিয়েছিলেন।

পিরেল্লো তো এ-কথা আমাদের বলেননি। রাজা পিরেল্লোর দিকে তাকিয়ে বললেন।

মান্যবর রাজা, আমি ঐ ছড়াটার কোনো গুরুত্ব দিইনি। পিরেল্লো বললেন।

ঠিক আছে। তোমরা কী বলতে চাও। রাজা ফ্রান্সিসকে জিগ্যেস করলেন।

আমাদের যদি আপনার রাজত্বের যেখানে খুশি যাওয়ার অনুমতি দেন তবে আমরা সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবো।

বলো কি! রাজা বেশ আশ্চর্য হলেন। বললেন, তোমরা পারবে?

এখনই খুব জোর দিয়ে বলতে পারছি না। এক সপ্তাহের মধ্যে সব দেখেশুনে বিচার-বিবেচনা করে সঠিক বলতে পারব ঐ ধনসম্পদ উদ্ধার করতে পারব কি না। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ, সেই চেষ্টা কর, আর তোমাদের স্বাধীন গতিবিধির জন্যে সেনাপতিকে বলে দিচ্ছি। রাজা বললেন।

মহামান্য রাজা, আর একটা নিবেদন। ফ্রান্সিস বলল।

বলো কী নিবেদন। রাজা জানতে চাইলেন।

আলকাবা বন্দরে আমাদের জাহাজ নোঙর করে আছে। অতদূর থেকে যাতায়াত করা অসুবিধেজনক। এখানে আপনার প্রাসাদে যদি একটা ঘরে আমাদের থাকতে দেন তাহলে খুবই ভালো হয়। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। রাজা বললেন। তারপর ইশারায় সেনাপতিকে ডাকলেন। সেনাপতি আসন ছেড়ে দ্রুত রাজার কাছে এলেন। রাজা ফ্রান্সিসদের ব্যাপারে সেনাপতিকে সব বললেন। সেনাপতি রাজার কথা শুনে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বললে আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

ফ্রান্সিসরা আবার রাজাকে সম্মান জানিয়ে রাজসভা থেকে বেরিয়ে এল। রাজবাড়ির বাইরে বিরাট মাঠ, কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য সেই মাঠে ঘোড়া চালানো অভ্যেস করছিল। সেনাপতি একজনকে ডাকলেন। সৈনিকটি কাছে এলে সেনাপতি বললেন। এই তিনজন ভাইকিং-এর থাকবার মতো একটা ভালো ঘর দেখ। এদের সেখানে নিয়ে যাও। সেনাপতি রাজপুরোহিত পিরেল্লোকে বললেন, আপনার তো কোনো ঘরের প্রয়োজন নেই।

না-না। আমার থাকা-খাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই। পিরেল্লো বললেন।

যাও। সেনাপতি বলল।

সৈন্যটি ফ্রান্সিসদের একটা ঘরের সামনে নিয়ে এল। বলল, এই ঘরটা খুবই ভালো। এখানেই আপনারা থাকবেন।

ফ্রান্সিস, শাঙ্কো ও হ্যারি ঘরটায় ঢুকল। সত্যিই বেশ খোলামেলা সুন্দর ঘর। মেঝেয় খড়ের বিছানা। ফ্রান্সিস বসে পড়ল। শাঙ্কো, হ্যারিও বসল। সৈন্যটি বলল, খাওয়ার সময় আপনাদের ডেকে নিয়ে যাবো। মাননীয় সেনাপতি আমাকেই দায়িত্ব দিয়েছেন আপনাদের দেখাশোনার জন্যে। কোনো প্রয়োজন পড়লে আমাকে ডাকবেন।

সৈন্যটি চলে গেল।

এতক্ষণ পিরেল্লো দেবমূর্তি ভরা বোঁচকাটা কাঁধে নিয়ে ফ্রান্সিসদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। ওঁর ভয় ফ্রান্সিস না সেনাপতিকে বলে দেয় যে তিনি চোর। দেবমূর্তি চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিলেন। দেখলেন ফ্রান্সিস কাউকে কিছু বলল না।

এবার ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বলল, দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা যাব মন্দিরে। দেবমূর্তিগুলো যেখানে ছিল সেখানেই রাখা হবে।

কী, রাজি তো? শাঙ্কো বলল।

হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই চলুন। পিরেল্লো বললেন।

দুপুরের খাবার খেয়ে দরজা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এল সবাই।

মন্দিরে চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

চলুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি। পিরেল্লো বললেন।

পিরেল্লো পুবমুখো চললেন। সবাই যেতে লাগল। রাজারবাড়ির চৌহদ্দি

ছাড়িয়ে ওরা হাঁটতে লাগল। সূর্যের আলো চড়া। ওরা ঘেমেনেয়ে উঠল। কিন্তু যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। হ্যারি জিজ্ঞেস করল—ও ঠাকুরমশাই আর কতদূর যেতে হবে?

—আর একটুখানি। যে বলটা দেখা যাচ্ছে—ওটার মধ্যেই মন্দির।

হাঁটতে হাঁটতে বনের কাছে এল ওরা। ঘন ঘন গাছপালা নয়, বেশ ছাড়া ছাড়া গাছগাছালি। বনের মধ্যে ঢুকল সবই। সূর্যাস্ত হতে বেশী দেরি নেই। বনের নীচে অন্ধকার জমেছে।

—মন্দির কোথায়? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—এই সামনেই। পিরেল্লো বললেন।

হঠাৎ সামনেই দেখা গেল গাছ কেটে এক উঠোনমতো জায়গা। চারধারে বাড়িঘর। পাতায় ছাওয়া। গাছের কাটা ডাল দিয়ে তৈরি বাড়ি। উঠোনমতো জায়গায় গাছের ছাল বিছোনো। তার ওপর এক বৃদ্ধ বসে আছে। হঠাৎ পিয়েল্লো গলা চড়িয়ে কী বলে উঠল। বাড়িঘর থেকে বন থেকে বেশ কিছু লোক ছুটে এল। তারা ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি—পিরেল্লো বিশ্বাসঘাতক।

পিরেল্লো গাছের ছালের ওপর বসা লোকটির কাছে গেলেন। কী কথাবার্তা বলল দুজনে। ফ্রান্সিসরা দেখল—লোকগুলোর চেহারা একটু অদ্ভুত। মাথায় টানটান বাঁধা চুল। গালে লালচে রঙের দাড়ি গোঁফ। চোখগুলো বেশ গোল গোল। কারো কারো হাতে বর্শা।

পিরেল্লো ফ্রান্সিসদের কাছে এল। সেই মাটিতে বসা লোকটিকে দেখিয়ে বলল—উনিই এদের দলপতি। এরা বুনো। ভীষণ হিংস্র। আমার ওপরে খুব ভক্তি।

—তাহলে এখানে মন্দির নেই। শাঙ্কো বলল।

পিরেল্লো দাঁত বের করে হাসল। বলল—না। আপনাদের চারপাঁচদিন এখানে আটকে রাখার জন্য এনেছি। আমি কথাবার্তা শুনেই বুঝতে পেরেছি শুধু আপনারা আপনাদের রাজা হানমের গুপ্তসম্পদ খুঁজে বের করতে পারবেন। কাজেই আপনাদের কোনভাবে গুপ্তধন উদ্ধারের সুযোগ দেওয়া হবে না। আমিই দুজন ভক্ত নিয়ে ঐ গুপ্তধন উদ্ধার করবো।

—ভালো কথা। ফ্রান্সিস বলল—আপনারাই যদি উদ্ধার করতে পারেন তাহলে আমাদের ওপর সেই ভার দিতে চাইছিলেন কেন?

—বাজিয়ে দেখছিলাম। পিরেল্লো হেসে বললেন।

—কী দেখলেন। হ্যারি বলল।

—আপনারা গর্দভ।

—তা ঠিক। নইলে জানা নেই। শুনো নেই আপনাকে বিশ্বাস করে বসলাম।

—আমরা মানুষকে বিশ্বাস করে থাকি। আমরা ইচ্ছে করলে আপনাকে

ফাঁসিতে ঝোলাতে পারতাম। কিন্তু আমরা করিনি। কারণ আপনি চোর হলেও আমাদের আশ্রয়প্রার্থী। তাই আপনাকে বাঁচালাম।

—যাই হোক—গুপ্তধন আপনি উদ্ধার করতে পারবেন না। অত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি আপনার নেই। তবু দেখুন চেষ্টা করে। শাঙ্কো বলল।

—চেষ্টা তো করি। দেখি। এবার তোমাদের কয়েদঘরে ঢোকানো হবে। পিরেল্লো বললেন। পিরেল্লো বুনোদের ভাষায় কী বললেন গলা তুলে। কয়েকজন যোদ্ধা এগিয়ে এল। দাঁড়াল ফ্রান্সিসদের সামনে। ওরা ইঙ্গিত করল কয়েদঘরে ঢোকার জন্যে। শাঙ্কো বলল—কী করবে ফ্রান্সিস?

—যা করতে বলছ কর। সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা এগিয়ে চলল যোদ্ধাদের নির্দেশমতো। কয়েদঘরের কাছাকাছি এসেছে তখন বোঁচকা কাঁধে পিরেল্লো ওদের কাছে এল। হেসে বলল—এবার রাজা হানমের গুপ্তধনের স্বপ্ন দেখোগে। ঐ স্বপ্ন দেখতে দেখতেই একদিন মরে যাবে। গুপ্তধন আর পাওয়া যাবে না।

ফ্র্যান্সিসরা কিছু বলল না। শাঙ্কো এক কাণ্ড করল। ও পিরেল্লোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিরোল্লোর বোঁচকা এক হ্যাঁচকা টানে নিয়ে নিল। বোঁচকা ছুঁড়ে ফেলল কয়েদঘরের মধ্যে। পিরেল্লো পর্তুগীজ ভাষায় চিৎকার করে—চোর, চোর—আমার বোঁচকা চুরি করেছে। যোদ্ধারা কয়েদঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। পিরেল্লোর কথা ওরা কিছুই বুঝল না।

এবার পিরেল্লো নিজেই কয়েদঘরের সামনে এল। বারবার বলতে লাগল—আমার বোঁচকা ফিরিয়ে দাও।

—তার আগে আমি দলপতির সঙ্গে কথা বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। দলপতি এই উঠোনেই গাছের বাকলের বিছানায় দিনরাত শুয়ে থাকে। অবশ্য কখনও কখনও উঠে বসে। সে অল্পক্ষণ। তারপরেই শুয়ে পড়ে।

—দলপতি কোথাও যায় না? হ্যারি জানতে চাইল।

—দলপতি যখন বসে থাকে তখনই আমাকে কথা বলিয়ে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তার আগে আমার বোঁচকাটা দাও। পিরেল্লো বলল।

—না। আগে দলপতির সঙ্গে কথাবার্তা, তারপর। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তারপর—পিরেল্লো বললেন।

—হ্যাঁ, তারপর যা কিছু ঘটুক। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরে খাবার দিল অন্য লোকেরা এনে। একটা বড় শুকনো পাতায় রুটির মতো কিছু সঙ্গে তারকারি আর পুঁটি মাছের মতো মাছ। বরাবরের মতো ফ্রান্সিস

বলল—পেটপুরে খাও। খেতে ভালো না লাগলেও খাও। শরীরের শক্তি ঠিক রাখো।

খাওয়া শেষ। ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল কখন দলপতি উঠে বসে। একসময় দেখল উঠানের বিছানা ছেড়ে দলপতি উঠে বসেছে। পিরেল্লো কাছেই ছিল। ছুটে কয়েদঘরের সামনে এল। বলল, দলপতি উঠে বসেছে। চলো। একজন পাহারাদারকে বলল—দরজা খুলে দাও। পাহারাদার দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিস আস্তে বলল—হ্যারি থাকো। শাঙ্কো বোঁচকা নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।

দুজনে কয়েদঘরের বাইরে এল। শাঙ্কোর মাথায় বোঁচকা। পিরেল্লো ছুটে এল। বলল—বোঁচকাটা আমাকে দাও। শাঙ্কো এক ধাক্কায় ওকে সরিয়ে দিল। পিরেল্লো তবু পিছু ছাড়ল না।

তিনজনেই দলপতির কাছে এল। পিরেল্লো মুখ নিচু করে দলপতিকে কী বলল। দলপতি মুখ তুলে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। কিছু বলল। কিন্তু ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝতে পারল না। পিরেল্লোকে বলল—আপনি দলপতিকে কী বললেন। উনিই বা আমাকে কী বললেন?

—আমি বললাম—তোমরা চোর। আমার বোঁচকা নিয়ে পালাবার জন্যে চেষ্টা করছো।

এই সময় একজন দাড়ি গোঁফ কাটা লোক এল। উঠোনে এসে দাঁড়াল। তারপর দলপতির পাশে এসে বসল। দলপতিকে কী বলল। দলপতি মাথা ঝাঁকাল। দলপতি আর আগত লোকটি কথাবার্তা বলতে লাগল। পিরেল্লোকে দেখে বলল—ভাঙা ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায়। লোকটি বলল—কী ব্যাপার পুরুতমশাই। আপনি এখানে কেন?

—আমি সমস্যায় পড়েছি। পিরেল্লো প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন।

—কী সমস্যা? লোকটি বলল।

ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বলল—এরা আমার বোঁচকা চুরি করেছে।

ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে লোকটি বলল—আপনারা—চুরি—পুরুতমশাই বলছেন।

—আমরা চুরি করিনি। কেড়ে নিয়েছি। শাঙ্কো বলল।

—কিন্তু কেন? লোকটি বলল।

—আমরা চুরি করা জিনিস কেড়ে নিয়েছি। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে—পুরুতমশাই—চুরি—।

বাজে কথা—মিত্তাল। আমি চুরি করিনি।

রাজামশাই আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে দিয়েছেন। পিরেল্লো বললেন।

ফ্রান্সিস বলল—অসম্ভব। শায়িত দেবতাদের মূর্তি কখনো রাজা বিকিয়ে দেবেন না। পিরেল্লো চুরি করেছেন।

—সেই মূর্তিগুলো কোথায়? মিত্তাল জানতে চাইল।

—শাঙ্কো—মূর্তি বের কর। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো বোঁচকা খুলে একটা মূর্তি বের করল। ফ্রান্সিস সেটা নিয়ে মিত্তালকে দিল। দলপতিও মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল। মিত্তাল মূর্তিটা কপালে ঠেকাল। দলপতির হাতে দিল। দলপতিও মূর্তিটা কপালে ঠেকাল। তারপর মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল। সোনার জিনিস সম্পর্কে দলপতির কোন ধারণাই নেই। দলপতি মিত্তালকে কী বলল। মিত্তালও দলপতিকে কিছু বলল। ফ্রান্সিসরা বুঝল না।

—এটা আপনাদের উচিৎ হয়নি। মিত্তাল বলল।

পিরেল্লো বলল—আমি তো বললাম, রাজা আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে এই মূর্তিগুলো আমাকে দিয়েছেন।

—এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? যেখানে হাজার হাজার দেশবাসীরা পুতপবিত্র দেবমূর্তিগুলো পুজো করে নৈবেদ্য দেয়। সেই দেবমূর্তিগুলো রাজা কামবহ্না আপনাকে পুরস্কারস্বরূপ দেবেন—এটা অসম্ভব। তাছাড়া আমাদের জাহাজে যখন আশ্রয় নিতে এসেছিলেন তখন মূর্তি চুরি করেছেন একথাই বলেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা বিদেশী। মূর্তিচুরির কথা তোমরা জানলেও কোন ক্ষতি নেই—এই ভেবে তোমাদের বলেছি। মিত্তাল বলল—যাহোক পুরুতমশাই। মূর্তিগুলো স্বস্থানে রেখে আসুন। চুরি ধরা পড়লে রাজা নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি শুরু করবেন। প্রথমেই সন্দেহ করবেন আপনাকে। আপনার খোঁজ শুরু হবে। চুরির দায় আপনার ঘাড়ে চাপবে। তখন ধরা পড়লে আপনার নির্ঘাৎ ফাঁসি হবে।

—ঠিক আছে। তাহলে মিত্তাল এখন আমি কী করব? পিরেল্লো জানতে চাইল।

—চুরির ব্যাপারে কোন কথা কাউকে বলবেন না। দেবমূর্তিগুলো স্বস্থানে রেখে দেবেন। মিত্তাল বলল।

—ঠিক আছে। পিরেল্লো বলল।

স্থির হল পরদিন সকালে পিরেল্লোকে নিয়ে ফ্রান্সিসরা রওনা হবে রাজধানীর উদ্দেশ্যে।

সন্ধ্যে হল। ফ্রান্সিসরা বিকেলের খাবার খেল। দলপতি একজন যোদ্ধাকে বলল ফ্রান্সিসদের একটা ঘরে রাখতে। কথাটা ফ্রান্সিসদের বুঝিয়ে বলল পিরেল্লো। ভালো একটা ঘরে ফ্রান্সিসদের নিয়ে এল দুই যোদ্ধা। পিরেল্লোও ওদের সঙ্গে থাকতে এল।

ঘরে ঢুকতে যাবে তখনই অল্প অন্ধকারে শাঙ্কো দেখল কোনার দিকে কয়েকটি কলাগাছে পাকা কলার কাঁদি ঝুলছে। শাঙ্কো ছুটে গিয়ে ওর ছোরা দিয়ে একটা কাঁদির অর্দ্ধেক কাটল। সেই কাঁদি ওরা বোঁচকার ওপরে রাখল। যারা দেখবে তারা ভাববে বোঁচকায় কলা আছে। কারুর মনে কোন সন্দেহ হবে না। নিশ্চিন্তে চলাফেরা করা যাবে।

রাতের খাওয়ার সময় ফ্রান্সিসদের যোদ্ধারা ডেকে নিয়ে গেল। ঘরটায় ঢুকে ফ্রান্সিসরা বুঝল এটা রান্না করার ও খাওয়ার ঘর।

ফ্রান্সিসদের শোয়ার ব্যবস্থা হল একটা ঘরে। ফ্রান্সিসরা খেয়েদেয়ে এসে ঐ ঘরে শুয়ে পড়ল। তখনও বর্শা হাতে যোদ্ধারা বাড়িঘর পাহারা দিতে লাগল। ফ্রান্সিস ওদের এত সতর্কভাবে পাহারা দেবার কী অর্থ বুঝল না। এত সাবধানতার কী কারণ বুঝল না।

তখন রাত গভীর। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু একদল যোদ্ধা ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে।

হঠাৎ যোদ্ধাদের একটা ধ্বনি—আ—আ—আ। শোনা গেল তারপরেই অন্য একদলের চিৎকার। ফ্রান্সিসদের ঘুম ভেঙে গেল। ওরা উঠে বসল। ফ্রান্সিস বলল—পিরেল্লো—বাইরে চিৎকার চেঁচামেচির কারণ কী? পিরেল্লো উঠে বসল। বলল—পেছনেই ইরা নদী। নদীর ওপারে থাকে আর এক বুনো মানুষেরা। ওদের সঙ্গে এপারের বুনোদের ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। শুধু ঝগড়াঝাঁটি নয়। লড়াইও চলে। নদীর ওপারের বুনোরা আক্রমণ করেছে। লড়াই চলছে। মানুষের চিৎকার গোঙানি শোনা যাচ্ছে। ফ্রান্সিসকে হ্যারি বলল—কী করবে?

—এখন ঘর থেকে বেরুলে বিপজ্জনক। আমরা বিদেশী। কোন দলের সঙ্গে আমাদের মিতালি নেই—একথা বলতে হবে। এখন দেখা যাক কারা জেতে। ফ্রান্সিস বলল।

—নদীর ওপারের বুনোরা দুর্ধর্ষ। ওদের হারানো মুস্কিল। পিরেল্লো বললেন।

লড়াই চলল। সেই সঙ্গে চিৎকার গোঙানি জোরে শ্বাস ফেলার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ লড়াই চলল। তারপর আস্তে আস্তে পরিবেশ শান্ত হল। শুধু আহতদের আর্তস্বর শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ ফ্রান্সিসদের ঘরের বন্ধ দরজাটায় দমাদম লাথি শোনা গেল। আবার এক দফা লাথি মারা শুরু হতেই অর্দ্ধেকটা দরজা ভেঙে পড়ল। মশাল হাতে দুজন যোদ্ধা ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। মশালের আলোয় ফ্রান্সিসদের দেখল। ফ্রান্সিসদের দেখে থমকে গেল। এই বিদেশী ভূতগুলি এখানে এল কী করে! আরও দুতিনজন যোদ্ধা ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস পিরেল্লোর দিকে তাকাল। দেখল, পিরেল্লোর মুখ শুকিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল—পিরেল্লো কী ব্যাপার?

—ওরা নদীর এপারের বুনোদের দলপতিকে খুঁজছে। নদীর ওপারের বুনোদের জয় হয়েছে।

একজন যোদ্ধা এগিয়ে এসে মুখ বেঁকিয়ে কী বলল।

—পিরেল্লো? ফ্রান্সিস বলল।

পিরেল্লো বলল—জানতে চাইছে তোমরা এখানে কী করে এলে?

—বলো যে জাহাজ চালিয়ে এসেছি। পিরেল্লো বলল সেটা। এবার পিরেল্লো মারফৎ কথা চলল।

—তোমরা এখানে কেন এসেছো? লোকটি বলল।

—বেড়াতে, দেশ দেখতে। ফ্রান্সিস বলল।

—হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় তোমরা রাজা হানমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার চুরি করতে এসেছো। লোকটি বলল।

—যাক গে—তোমরা ইরানদীর ওপারে আমাদের রাজ্যে বন্দী থাকবে। লোকটা বলল। পিরেল্লোর দিকে তাকিয়ে বলল—আপনাকে চিনি। আপনি অলিকাস দেশের রাজ পুরোহিত। আপনাকে বন্দী করা হবে না।

—না-না। আমাকেও বন্দী কর। পিরেল্লো বলল। আরো বলল—আমি এই বিদেশীদের সঙ্গেই থাকবো।

—বেশ থাকবেন। লোকটি বলল। তবে বন্দীর মতো নয়। দুজন যোদ্ধা ঘরে ঢুকল। লোকটি মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে কী বলল। লোকটিও কী বলল। পিরেল্লো মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস, এই লোকটা নতুন দলপতি। আগের দলপতিকে আমি চিনতাম। এরা লড়াইয়ে জিতেছে। এ পারের দলপতি কিছু যোদ্ধাসহ পালিয়েছে। তাদের ধরবার জন্যে ওপারের যোদ্ধারা ছুটোছুটি করছে। লক্ষ্য করে দেখ ইরা নদীর এপারে যারা থাকে তারা গোঁফ দাড়ি কামায় না। নদীর ওপারে যারা থাকে তারা গোঁফ দাড়ি কামায়।

দলপতি গলা চড়িয়ে হুকুম করল—এদের সবাইকে বন্দী করে নিয়ে চল। যোদ্ধারা কয়েকজন এগিয়ে এল ছোট দড়ি হাতে। দলপতি পিরেল্লোকে বন্দী করতে মানা করল।

ফ্রান্সিসদের ঘরের বাইরে আনা হল। ফ্রান্সিস মৃত ও আহত এপারের যোদ্ধাদের দেখল। ওদের মধ্যে জীবিত আহতদের বন্দী করা হল। পিরেল্লো ছাড়া ফ্রান্সিসদের হাতও বাঁধা হল। ফ্রান্সিস মনে মনে ভাবল—আবার কষ্টের দিন দুঃখের দিন শুরু হল। কবে মুক্তি পাওয়া যাবে কে জানে। এরা মুক্তি দেবে সে আশা নেই। নিজেদের মুক্তির ব্যবস্থা নিজেদেরই করে নিতে হবে।

দুজন যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। আহত বন্দীদেরও নিয়ে যাচ্ছে ওরা। কিছু পাথর কাঠের বাড়ি। লম্বা লম্বা শুকনো ঘাসের ছাউনি বাড়ি এ রাস্তার দুপাশে। বাড়িগুলোর ধারে কাছে কেউ নেই। বেশ দূরে হেঁটে আসতে হয়েছে। পূব আকাশে লাল আভা। একটু পরেই সূর্য উঠল। ফ্রান্সিসদের বড় ভালো লাগে সূর্যোদয়। কিন্তু আজ ভালো লাগল না। বন্দীদশা বন্ধুদের জন্যে মারিয়ার জন্য দুশ্চিন্তা। ভালো লাগছিল না কিছু।

নদীর ওপারের বুনোরা ফ্রান্সিসদের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধল। শুধু পিরেল্লোর হাত বাঁধা হল না। ওরা লড়াইয়ে আহতদের সঙ্গে নিল না। তবে ওদের আহত যোদ্ধাদের মোটা কাপড়ে চাপিয়ে নিয়ে চলল।

সবাই ইরা নদীর ধারে যখন পৌঁছল তখন রোদের তাপ বাড়ছে।

ইরা নদী ছোট নদী। তবে স্রোতের টান আছে। নদীতীরে দুটো লম্বাটে

নৌকো। নৌকো দুটোয় দুজন মাঝি বসে আছে। ঢালু তীর দিয়ে সবাই নৌকোর কাছে এল। নৌকোয় উঠতে লাগল। শাঙ্কো উঠতে গিয়ে সমস্যায় পড়ল। কানের কাছে শুনল পিরেল্লোর কথা—দুহাতই বাধা। তুমি ওটা নিয়ে যেতে পারবে না। আমাকে দাও। শাঙ্কোর এবার পিরেল্লোর দিকে তাকাল। তারপর পাশে বসা যোদ্ধাদের ইঙ্গিতে জানাল বোঁচকাটা নিতে ওর অসুবিধে হচ্ছে। যদি সে নেয় তবে ও সহজে যেতে পারবে। যোদ্ধাটি কিছু বলল না। বোঁচকাটা নিল।

নৌকো পরপারে পৌঁছাল। এবার নামবার পালা। আস্তে আস্তে সবাই নেমে এল। হাত বাঁধা অবস্থায় নৌকোয় ওঠা নামা অত্যন্ত কষ্টকর। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি—তোমাকে সাহায্য করবো।

—পারবে না। তোমারও তো হাত বাঁধা। ভেবো না। ঢালু নদীতীর দিয়ে উঠতে পারবে।

—দেখ চেষ্টা করে। তুমি আমার পাশেই থাকবে। দুজনে চলল। বুনোরা অনায়াসে নদীর উঁচু তীরে উঠে গেল অল্পক্ষণের মধ্যে।

হঠাৎ হ্যারির পা ধুলো মাটিতে একটু ঢুকে গেল। হ্যারি আর দাঁড়াতে পারল না। ধুলো মাটিতে পড়ে গেল। ঢালু তীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। নদীর জলের কাছাকাছি এসে বুনো ঘাসের ঝোপের মধ্যে পড়ে নেমে গেল। বুনো যোদ্ধারা হেসে উঠল। ফ্রান্সিস নীচে নেমে চলল। হ্যারির কাছে এসে হ্যারির হাত ধরল। হাত টেনে বলল—চলো—আমাদের উঠতে হবে। চলো। হ্যারির কোমরে হাত ধরে কিসে বলল—ওঠো। হ্যারি আস্তে আস্তে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিসও হ্যারির কোমরে চাপ দিয়ে হ্যারিকে উঠতে সাহায্য করতে লাগল। দুজনে তীরে উঠে এল। সবাই নদীতীরে জড়ো হল। দলপতির আদেশ হল। চলল সবাই।

বুনোদের গ্রামে এল। সেই কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি বাড়িঘর। ফ্রান্সিসদের আসতে দেখে ওরা অবাক হয়ে গেল। ওরা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। দরজায় জানালায় ওরা এসে দেখতে লাগল ফ্রান্সিসদের।

ফ্রান্সিসরা হাঁটতে হাঁটতে একটা বড় উঠোনমতো জায়গায় এল। জায়গাটার মধ্যে একটা বিরাট শিশু গাছের নীচে একটা বড় কাঠের আসন। দলপতি গিয়ে আসনটায় বসল। একটু হাঁপাতে লাগল। তারপর গলা চড়িয়ে আদেশ দিল কিছু। চার-পাঁচজন যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের দিকে এল। ওরা ফ্রান্সিসদের অন্য জায়গায় নিয়ে এল। এসময় পিরেল্লো এগিয়ে এল। দলপতিকে কিছু বলল। আঙ্গুল তুলে শাঙ্কোর হাতের বোঁচকাটা দেখাল। দলপতি আঙুল তুলে ইশারায় শাঙ্কোকে তার কাছে আসতে বলল। শাঙ্কো বুঝল সেটা। শাঙ্কো এগিয়ে দলপতির কাছে গেল। বোঁচকাটা দেখিয়ে পিরেল্লো দলপতিকে বললো। দলপতি হাত তুলে মাথা ওঠানাম করল।

—দলপতি কি বলছে? শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল পিয়েল্লোকে।

হেসে বলল—আমার জিনিস আমাকে ফেরৎ দেওয়া হবে।

—না। সব জিনিস আমার। শাঙ্কো বলল।

—তুমি চোর। পিরেল্লো বলল।

—এইবার জিজ্ঞেস করি দলপতি যদি বোঁচকার ভেতর কী আছে সেটা দেখতে চায় তখন আপনি কী বলবেন? শাঙ্কো বলল।

—অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ মানে—পিরেল্লো—বলতে গিয়ে থেমে গেল।

—সোনার দেবমূর্তিগুলো দেখতে চাইলে আপনি বিপদে পড়বেন। আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে পুরোহিত হিসেবে থাকায় আপনি অতি সহজে দেবমূর্তিগুলো চুরি করেছেন। কারণ সেটা আপনার পক্ষেই সম্ভব। পিরেল্লো ঘাবড়ে গেল। সত্যিই তো—দেবমূর্তিগুলো দেখলে দলপতির মনে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে।

—তা ঠিক। পিরেল্লো বলল।

এবার দলপতি শাঙ্কোকে জিজ্ঞেস করল—তুমি কি এই বোঁচকাটা পিরেল্লোর কাছ থেকে চুরি করেছো?

—না। এই বোঁচকা আমার। শাঙ্কো বলল।

—রাজ পুরোহিত—ওতো বলছে এই বোঁচকা ওর। দলপতি বলল।

—তাহলে পিয়েল্লোকে জিজ্ঞেস করল। উনি বলুন বোঁচকায় কি কি জিনিস আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—রাজপুরোহিত বলুন তো আপনার বোঁচকায় কী কী জিনিস আছে। দলপতি বলল।

—আমি রাজপুরোহিত হিসেবে কাজ করে যা অর্থ সঞ্চয় করেছি এই বোঁচকায় রেখেছি। পিরেল্লো বলল।

এবার দলপতি শাঙ্কোকে জিজ্ঞেস করল তুমি বলো তো কী আছে বোঁচকায়?

—দামি কিছুই নয়। পুরনো কাপড়চোপড় আর একহাত্ত পিঠে আর গোটা দশেক আপেল। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। দেখা যাবে। দলপতি একজন যোদ্ধাকে ইঙ্গিত করল। যোদ্ধাটি বর্শাটা মাটিতে রাখল। তারপর বোঁচকাটা শাঙ্কোর হাত থেকে নিয়ে খুলতে লাগল।

কাপড়ে জড়ানো সোনার মূর্তিগুলো দেখা গেল।

—রাজপুরোহিত—দলপতি পিরেল্লোকে জিজ্ঞেস করল—এই মূর্তিগুলো কি সোনার?

—আসল সোনার। পিরেল্লো বলল।

—অ্যাঁ? বলেন কী! দলপতি হাঁ করে দেবমূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

—ঠিকই বলেছি। পিরেল্লো বলল।

দলপতি দ্রুত একটা মূর্তি তুলে নিল। মূর্তিটার পোশাক খুলে ফেলল। বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল মূর্তিটার দিকে। তারপর হো হো করে হেসে উঠল।

চারপাশে দাঁড়ানো যোদ্ধারাও হাসল। দলপতি যোদ্ধাটিকে বলল—ক'টা মূর্তি আছে দ্যাখতো। যোদ্ধাটি গুণে গুণে বলল—

—সাতটা।

—আমার কাঠের সিন্দুকে রেখে আয়। দলপতি বলল।

—আজ্ঞে চাবি? যোদ্ধাটি বলল।

—ওটা খোলাই থাকে। যোদ্ধাটি চলে গেল।

দলপতি এবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা দুজনেই মিথ্যে বলেছো। তোমাদের কয়েদ করবো।

—আমি মিথ্যে বলেছিলাম আপনার শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে। শাঙ্কো বলল।

—আমাকেও বন্দী থাকতে হবে? পিরেল্লো বলল।

—হ্যাঁ আপনিও। দলপতি বলল।

দলপতি পাহারাদারদের বলল—যা, এই চারজনকেই কয়েদঘরে বন্দী করে রাখ।

—কয়েদঘরে বন্দী হওয়ার মতো কোন কাজ করিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—সে সব বিচার পরে হবে। দলপতি বলল। শাঙ্কো কিছুটা এগিয়ে এসে বলল—মূর্তিগুলো তো নিলেন। মূর্তিদের পোশাকগুলো আমাকে দিন।

—বেশ। দলপতি একজন যোদ্ধাকে ডাকল। বলল—ঐ পোশাকের বোঁচকাটা একে দে।

যোদ্ধাটি ডাঁই করে রাখা পোশাকগুলো শাঙ্কোকে দিল। কয়েকজন প্রহরী এগিয়ে এল ফ্রান্সিসদের দিকে। মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল ওদের সঙ্গে যাবার জন্যে। ফ্রান্সিসরা চলল কয়েদঘরের দিকে।

চারজনে কয়েদঘরে ঢুকল। প্রহরী বাইরে থেকে দরজার হুড়কোটা আটকে দিল।

ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। শুকনো লম্বা লম্বা ঘাসের বিছানামতো। আর সবাই বসল। হ্যারি ডাকল—ফ্রান্সিস?

—বলো।

—এখন কী করবে? হ্যারি বলল।

—দলপতির মাথা কাটবো। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—ইয়ার্কি করো না। কী করবে এখন তা ভেবেছো? হ্যারি বলল।

—ভাবছি। ভাবা এখনও শেষ হয়নি। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো অপেক্ষা করতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—সে তো বটেই। ফ্রান্সিস পিরেল্লোর দিকে তাকাল। বলল—পিরেল্লো আপনি কী বলেন?

—কোন ব্যাপারে? পিরেল্লো বলল।

এখান থেকে পালানোর ব্যাপারে ফ্রান্সিস বলল।

—অসম্ভব। এখান থেকে পালানো যাবে না। চেষ্টা করে লাভ নেই। বরং সেটা বিপজ্জনক হবে। পালাতে গেলে ওরা বর্শা বুকে ঢুকিয়ে দেবে। কাজেই চুপ করে থাকুন। কী হয় দেখুন। তবে দেখে আর ভেবে কী হবে। পিরেল্লো বলল।

—হবে। এরা কীভাবে পাহারা দেয়। কতজন এক‌একবার পাহারা দেয়। কেমন করে খেতে দেয় এসব দেখতে হবে। সব দেখে টেখে পালানোর উপায় ভাবতে হবে এবং সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখুন চেষ্টা করে। পিরেল্লো ঠোঁট উলটে বলল।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। হ্যারিও শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চমকে উঠে বলল—হ্যারি শরীর ভালো আছে তো?

—ঐ একটু—হ্যারি বলল।

—কী হয়েছে বলো। ফ্রান্সিস বলল।

—শরীরটা একটু দুর্বল লাগছে। তোমরা আমার জন্যে ভেবো না। হ্যারি বলল।

—ওষুধটষুধ সঙ্গে রেখেছো তো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ—ভেন আমাকে ওষুধ দিয়ে রেখেছে।—হ্যারি বলল।

—তাহলে সময়মতো ওষুধ খেও। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। একটু জল খাবো। হ্যারি একটু দুর্বল স্বরে বলল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ঘরটার কোনার দিকে গেল। মশালের আলো এতদূর ভালোভাবে এসে পৌঁছয়নি। শাঙ্কো কাঠের গ্লাসে জল নিয়ে এল। হ্যারি এক গ্লাস জল খেয়ে আবার চাইল। শাঙ্কো আবার জল নিয়ে এল। হ্যারি খেল। তারপর জোরে শ্বাস ফেলল।

শাঙ্কো নিজের জায়গায় এল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস উঠে বসল। ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ওর দিকে তাকাল।

ফ্রান্সিস বলল—মূর্তিগুলো পরানো কাপড়চোপড়গুলো কোথায়?

—গ্রামপতির ঘরেই পড়ে আছে। আমি আনি নি। শাঙ্কো বলল।

—খুব ভুল করেছো। এখন ঐ টুকরো কাপড়গুলো খুব দরকার। ফ্রান্সিস ডাকল—পিরেল্লো। পিরেল্লো বললেন—বলুন।

—দেবমূর্তিতে পরানো কাপড়গুলো কোথায় জানেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ গ্রামপতির ঘরে। পিরেল্লো বললেন।

—এখন আপনি আর শাঙ্কো গ্রামপতির ঘরে যান। গিয়ে গ্রামপতিকে বুঝিয়েসুজিয়ে কাপড়গুলো নিয়ে আসুন। ফ্রান্সিস বলল।

পিরেল্লো উঠতে উঠতে বলল—কাপড়গুলো কোথায় ফেলেই দিয়েছে কি না কে জানে।

—গিয়ে দেখুন তো। ফ্রান্সিস বলল।

পিরেল্লো দরজার কাছে এল। পেছনে শাঙ্কো। গাছের ডাল কেটে তৈরি দরজার কাছে এল। পিরেল্লো প্রহরীকে ডাকল। প্রহরী এল। পিরেল্লো কী বলল। একটু পরেই দরজা খুলে গেল। পিরেল্লো আর শাঙ্কো ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দুজন যোদ্ধা ওদের দুপাশে দাঁড়াল। ওরা চলল গ্রামপতির ঘরের দিকে।

ঘরের সামনে এল দুজনে। গ্রামপতির ঘরের সামনে দুজন প্রহরী। হাতে বর্শা। পিরেল্লো ওদের কী বলল। একজন ঘরের দরজার কাছে গেল। দরজায় শব্দ করল। ভেতর থেকে গম্ভীর গলা শোনা গেল।—কে? প্রহরীটি কিছু বলল। একটু পরে দরজা খুলে গেল। গ্রামপতি দরজার কাছে এল। বলল—এসে নিয়ে যাও। শাঙ্কো ছুটে ঘরে ঢুকল। মশালের আলোয় দেখল কাপড়গুলো ঘরের এক কোণায় স্তূপাকার করে রাখা। শাঙ্কো প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ঐ কাপড়ের স্তূপের ওপর। দ্রুতহাতে কাপড়গুলো বের করতে লাগল আর কোমরে পাঁচ্যাতে লাগল। গ্রামপতি দেখল সেটা। কিন্তু কিছু বলল না। যখন শেষ হল শাঙ্কোর কাছে তখন গ্রামপতি বলল—কী করবে এই কাটা কাপড় দিয়ে?

—খুবই পবিত্র এই পোষাক। যথাস্থানে কাপড়গুলো রেখে দেওয়া হবে। নতুন পোশাক পরানো হবে। সেই উপলক্ষে খুব আনন্দ উৎসব হয় ঐ দেশে। পিরেল্লো বলল।

গ্রামপতি মুখে শব্দ করল—হুঁ।

সাত দেবতার পোশাকের কাপড় নিয়ে ওরা কয়েদঘরে ফিরে এল। পিরেল্লো হেসে বললেন—কী হবে এসব নিয়ে?

—সময়মতো দেখবেন। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো নিজের কোমর থেকে কাপড়গুলো খুলে খুলে একত্র করল। এক জায়গায় রেখে দিল।

কেউ কোন কথা বলছে না। দুপুরে পাহারাদাররা খাবার নিয়ে এলো। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল দুজন প্রহরী ওদের খাবার নিয়ে আসে। একজন বাইরে পাহারায় থাকে। প্রহরীরা ডেকচিতে মাংস, বড় লোহার থালায় রুটি আর একটা ছোট মাটির হাঁড়িতে ডালপাতা আর বুনো আলুর তরকারি। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বরাবর যা বলে তাই বলল—পেট পুরে খাও। রান্না ভালো না লাগলেও খাও।

খাওয়া শেষ। প্রহরীরা এঁটো থালাটালা নিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যে হল। ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে আছে। সবাই চুপ। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস কিছু ভাবলে?

—আমার সব ছক হয়ে গেছে। এবার কাজে নামা। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো মৃদুস্বরে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। হ্যারিও সঙ্গে যোগ দিল। ফ্রান্সিস হাসল। বলল—সিদ্ধান্ত নিলাম কাল রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর পালাবো।

—আজ রাতেও তো পালানো যায়। পিরেল্লো বলল।

—না। শুধু পালানো নয়। মূর্তিগুলো নিয়ে পালাতে হবে। তার জন্য একটু ভেবেচিন্তে এগোতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

অন্যেরা একটু তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়েও পড়ল। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ওর একটা চিন্তা কী করে রাজা হানমের গুপ্তধন খুঁজে বের করবে। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজে ফেরা।

পরের দিনটা একইভাবে কাটল। চুপচাপ ঘাসের বিছানায় শুয়ে বসে।

সন্ধ্যে হল। রাত হল। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—কিছু কাপড় নিয়ে দড়ির মতো পাকাও। প্রহরীর, গ্রামপতির মুখ বাঁধতে হবে।

রাত একটু গভীর হল। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। ওর দেখাদেখি আর সবাই উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বলল—দেখুন প্রহরী ক'জন?

—দু'জন? ফ্রান্সিস বলল—এদের নিয়ম অনুযায়ী থাকার কথা ছিল একজনের। গতরাতেই পাহারায় ছিল একজন। যাক গে—ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা দু'জনকে অকেজো করে দিতে পারবো। শাঙ্কো বলল।

—শাঙ্কো। শোন। পাহারাদার দুজনকেই ডাকা হবে। ওরা দরজা একটু খোলার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা প্রচণ্ড জোরে মুখের ওপর ধাক্কা দেব। বুঝতেই পারছো কী হবে তাহলে। অন্যটাকেও কাছে আসতে বলবো। কাছে এলে আমি মারবো ধাক্কা আর তুমি ওর মুখ বেঁধে দেবে। সব কাপড় সঙ্গে নাও। কখন কোন কাজে লাগবে বলা যায় না। একটু থেমে বলল—পিরেল্লো আপনি একজন প্রহরীকে ডাকুন।

পিরেল্লো দরজার কাছে গেল। ওদের ভাষায় গলা চড়িয়ে কী বলল। একজন এগিয়ে দরজার কাছে এল। ফ্রান্সিস ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল—ভেতরে আসতে বলুন। পিরেল্লো বলল সেটা।—ভেতরে এসো।

একজন প্রহরী ঘরের ভেতরে আসার জন্যে দরজার কাছে এল। হুড়কো খুলতেই ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দরজাটা প্রচণ্ড জোরে প্রহরীর নাকে মুখে লাগল। নাক দিয়ে রক্ত ছুটল। ও নাক ধরে ছিটকে চিৎ হয়ে পড়ল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ বেঁধে ফেলল। প্রহরীটির মুখ থেকে গোঁ গোঁ শব্দ বেরোতে লাগল। শাঙ্কো ছিটকে পড়া বর্শাটা নিয়ে ওর গলায় চেপে ধরল। প্রহরীটির গলার শব্দ বন্ধ হল। শাঙ্কো ওর হাত দুটোও বেঁধে ফেলল। ওদিকে ফ্রান্সিস আহত প্রহরীর বর্শাটা নিয়ে অন্য প্রহরীটির দিকে এগিয়ে চলল। প্রহরীটি হাতের বর্শাটা বাড়িয়ে ফ্রান্সিসের গায়ে লাগাবার জন্যে চেষ্টা করল। ফ্রান্সিস বর্শার ধাক্কায় প্রহরীটির হাতের বর্শাটা সরে গেল। শুরু হল বর্শার লড়াই। প্রহরীটি শূন্যে বর্শাটা ঘোরাতে ঘোরাতে দ্রুত নামিয়ে এনে ফ্রান্সিসের বুকে বেঁধাতে চেষ্টা করল। কিন্তু ফ্রান্সিস তার আগেই সাবধান হয়ে গেছে। বর্শাটা ঘুরিয়ে সরে এসেছে। এবার ফ্রান্সিস প্রহরীটির উরু লক্ষ্য করে বর্শা চালাল। বর্শাটা প্রহরীটির ডানপায়ের উরুতে বিঁধে গেল। ও বর্শা ফেলে

উরু চেপে ধরল। ফ্রান্সিস ওর নিজের বর্শাটঠা টেনে নিয়ে এল। প্রহরীটি মাটিতে পড়ে গেল। ওর মুখ থেকে আর্তস্বর বেরোবার আগেই শাঙ্কো ওর মুখে কাপড় চেপে ধরল। তারপর মুখ বেঁধে ফেলল। হাতদুটো পেছনে নিয়ে বেঁধে ফেলল। সব ঐ সাজের কাপড় দিয়েই করল।

ফ্রান্সিস হাত তুলে নিঃশব্দে গ্রামপতির বাড়িটা দেখাল। তারপর ছুটল সেই দিকে। গ্রামপতির ঘরের দরজার সম্মুখে এসে প্রায় সবাই হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল—গ্রামপতিকে ডাকুন। বলবেন জরুরি কথা আছে।

পিরেল্লো এগিয়ে এসে দরজায় শব্দ করল। ভেতর থেকে গম্ভীর কথা শোনা গেল—কে? পিরেল্লো বলল—আমি পিরেল্লো। রাজপুরোহিত।

—তা এত রাতে?

—আপনার সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। পিরেল্লো বলল।

—হুঁ। একটু পরেই বোঝা গেল গ্রামপতি দরজার কাছে এসেছে। দরজা একটু খুলল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গ্রামপতি ছিটকে মাটির মেঝেয় পড়ে গেল। শাঙ্কো ছুটে গিয়ে গ্রামপ্রধানের মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলল। হাতও বাঁধল। গ্রামপতি আস্তে-আস্তে গোঙাতে লাগল।

ততক্ষণে ফ্রান্সিস কাঠের আলমারির পাল্লা খুলে ফেলেছে। সাজিয়ে রাখা দেবমূর্তিগুলো শাঙ্কোকে দিল। শাঙ্কো কাপড়ের মধ্যে মূর্তিগুলো লুকিয়ে ফেলল।

ফ্রান্সিস অস্ফুট স্বরে বলল—এবার পালাও।

চারজন বাইরে এল। ফ্রান্সিস গলা চেপে বলল—পিরেল্লো—কোন দিকে যাবো? উত্তর দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বলল—এই দিকে।

চারজনই উত্তরমুখো ছুটল। চাঁদের আলোয় ফ্রান্সিস দেখল একটা বনাঞ্চল। তখনও দূরে দেখল গ্রামপতির যোদ্ধারা মশাল হাতে ফ্রান্সিসদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। হৈ হৈ করছে।

ফ্রান্সিসরা বনে ঢুকে পড়ল। আর ধরা পড়ার ভয় নেই। বনের গাছপালা খুব ঘন নয়, ছাড়া ছাড়া। ওর মধ্যে দিয়েই ফ্রান্সিসরা যতটা দ্রুত দৌড়োনো সম্ভব ততটা জোরে ছুটল।

বনটা খুব বেশি বড় নয়। একসময় বন শেষ। সামনেই একটা বেশ বড় ছড়ানো পাথরের আর ঘাসের প্রান্তর।

ফ্রান্সিসরা হাঁটতে লাগল।

হঠাৎ হ্যারি অস্পষ্টস্বরে ডাকল—ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। দেখল হ্যারি মাটিতে পড়ে যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস ছুটে এসে হ্যারিকে ধরল। কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। হ্যারি ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে হ্যারিকে কাঁধে তুলে নিল। তারপর হাঁটতে লাগল। পিরেল্লো বলল—আমরা এসে গেছি। বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস শ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল—ওখানেই আশ্রয় নেব। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস এবার আমি নিচ্ছি। ও দুহাত ছড়িয়ে হ্যারিকে ধরল। তারপর আস্তে আস্তে কাঁধে রাখল। তখন সকাল হয়ে গেছে।

প্রথম বাড়িটার সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। কিছু কাচ্চা বাচ্চা ওদের ঘিরে দাঁড়াল। এক মহিলা বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। কী বলল। ফ্রান্সিসরা বুঝল না। পিরেল্লোও কীসব বলল। মহিলাটি পাশের ঘরটা দেখিয়ে কী বলল। তারপর ঐ ঘরটার কাছে এল। কোমর থেকে চাবির বড় একটা থোকা বের করল। ওটাতে অনেক চাবি। মহিলাটি দেখে দেখে একটা চাবি বের করল। চাবিটা দিয়ে দরজা খুলল।

ফ্রান্সিসরা ঘরের ভেতরে ঢুকল। মেঝে মাটির। তার ওপর ঘাসপাতা দিয়ে তৈরি একটা বিছানামতো। শাঙ্কো আর ফ্রান্সিস হ্যারিকে ধরাধরি করে ঘাসের বিছানার ওপর শুইয়ে দিল। হ্যারির গোঙানি বাড়ল। ফ্রান্সিস কী করবে বুঝতে পারছে না। পিরেল্লো বলল—আপনাদের বন্ধুর এরকম হয়?

—হ্যাঁ। হঠাৎই অজ্ঞানমতো হয়ে যায়। শাঙ্কো বলল।

—অনেক দেরিতে জ্ঞান ফিরে পান? পিরেল্লো বলল।

—হ্যাঁ। তখন আগের ঘটনার কিছুই মনে করতে পারে না। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা যে বন্দরে জাহাজ থামিয়েছেন সেই বন্দর এলাকাতেই থাকেন এক সাধু। তাঁর ওষুধ খেয়ে এক অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। কারো ভাঙা পা জোড়া লেগেছে।

—আপনি নিজে দেখেছেন তেমন কিছু? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না-না। লোকমুখে শুনেছি। পিরেল্লো বলল।

—এসবের কোনো গুরুত্ব নেই। লোক ঠকানো ব্যবসা। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুর কেটে গেলে। খাওয়ার ডাক পড়ল না। অবশ্য ফ্রান্সিসদের খিদেই পাচ্ছিল না।

শেষ দুপুরে হ্যারি চোখ মেলে তাকাল। গোঙানি বন্ধ হয়েছে তার আগেই। হ্যারি আস্তে আস্তে ওর কোমরের ফেট্টি থেকে একটা কাঠের কৌটো বের করল। কৌটোর মুখ খুলতে খুলতে বলল—শাঙ্কো এক গ্লাশ জল আনো। শাঙ্কো ছুটে গিয়ে কাঠের গ্লাশে করে জল নিয়ে এল। হ্যারি কৌটো থেকে একটা গুলি বের করল। আস্তে আস্তে খেয়ে নিল।

তখন বিকেল হয়ে এসেছে। গৃহকর্তা এসে বলল—আপনারা কোন দেশ থেকে এসেছেন? ভদ্রলোক খুবই অমায়িক। ফ্রান্সিস বলল—আমরা ভাইকিং। পশ্চিম ইউরোপ থেকে এসেছি। পিরেল্লোকে দেখিয়ে বলল—ইনি কোন দেশ থেকে এসেছেন?

—খেতে আসুন। বড় দেরি হয়ে গেল। মানে নতুন করে রান্না চাপাতে হল। কিছু মনে করবেন না।

সবাই উঠে দাঁড়াল। হ্যারিও উঠতে যাবে। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—তুমি এই ঘরেই যাও। বেশি নড়াচড়া করো না।

—বেশ। হ্যারি বসে রইল।

—হ্যারি পেট ভরে খেও। তারপর একটু পায়চারি করো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা ওপাশের ঘরে ঢুকল। দেখল মাটির মেঝেয় পরপর একটা করে লম্বাটে পাতা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ফ্রান্সিসরা খেতে বসল। গৃহকর্ত্রী আর তার মেয়ে খাবার পরিবেশন করতে লাগল। গৃহকর্তা এবার বললেন—এত বেলায় বেশি রান্না করা গেল না। আমরা মুরগী পুষি। তাই—

—খেতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? শাঙ্কো বলে উঠল—মাংস হয়েছে, আলুভাজা হয়েছে—ব্যস্ আর কী লাগে।

খেয়েদেয়ে ওরা হ্যারির কাছে এল। হ্যারি আরও একটা বড়ি খেল। হ্যারি অনেকটা সুস্থ এখন। হ্যারি ঘরেই খেয়েছে। গৃহকর্ত্রী নিজেই হ্যারির খাবার এনে দিয়েছে।

এবার শোওয়া। চারজনের পক্ষে ঘরটা ছোটই। এরকম ছোট জায়গায় থাকা ফ্রান্সিসদের অভ্যেস আছে। পিরেল্লোর একটু অসুবিধে হল। পিরেল্লো কিছু বলল না। চেপেচুপে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস ডাকল—পিরেল্লো?

—বলুন।

—এই রাজ্যের রাজার নাম কী?

—মুজার্তা।

—লোক কেমন?

—চিন্তা করতে পারবেন না—কী অমায়িক এই রাজা মুজার্তা। অনেক রাজাই তো দেখেছি—মুজার্তার মতো এমন সহৃদয় পরোপকারী প্রজাবৎসল রাজা আমি দেখিনি। প্রজাদের নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসেন। প্রজারাও তাঁকে দেবতার মতো মানে। পিরেল্লো বলল।

—তাহলে তো রাজা মুজার্তাকে একবার দেখতে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—চলুন। কাল সকালে রাজসভায়। পিরেল্লো বলল।

—ঠিক আছে। যাবো। ফ্রান্সিস বলল। এবার হ্যারিকে বলল—হ্যারি, তুমি পারবে যেতে?

—আমি আর যাবো না। এখানেই থাকবো। হ্যারি বলল।

—বেশ। তুমি যদি চাও আমরা একজন তোমার সঙ্গে থাকতে পারি। শাঙ্কো বলল।

—না-না। আমি একাই থাকতে পারবো। হ্যারি বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল।

সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। রাজা হানমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করতে দেবতার জন্যে সময় চাই। আবার শায়িত

দেবতাদের মন্দিরে যেতে হবে ফিরতে দেরি হলে জাহাজের বন্ধুরা, মারিয়া ভাবতো। এইসব চিন্তা করতে করতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু বেলাতেই ফ্রান্সিসদের ঘুম ভাঙল। হাতমুখ ধুয়ে এল সবাই। সকালের খাবার দিয়ে গেল কর্তা নিজেই। তিনকোণা রুটি আর সব্জির ঝোল।

সবাই খেল। এবারে রাজবাড়ি যাওয়া। হ্যারি শুয়ে রইল। ওরা তিনজন চলল রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে।

রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দুধারে বাড়ি। কাঠ আর পাথরের। লোকজন খুব বেশি নয়। ওরা হঠাৎ বাজনার শব্দ শুনল। একটা মোড়ে পীপের একদিকে চামড়া ঢাকা। অন্য পাশ খোলা। তাই দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে দু'তিনজন পুরুষ। একদঙ্গল ছেলেমেয়ে বাজনার তালে তালে নাচছে। ফ্রান্সিস বলল—এরা নাচছে কেন পিরেল্লো?

—আনন্দে। এই দেশে গান-বাজনা লেগেই আছে। কখনও কখনও সারারাত নাচগান চলে। গৃহকর্তা বললেন।

—তাহলে এরা সুখী। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ রাজা মুজার্তার প্রজারা সুখী। কোন অসুবিধে কোন সমস্যা নেই এদের। পিরেল্লো বললেন।

ডানহাতি দেখা গেল বহুদূর বিস্তৃত তুলোর ক্ষেত।

ফ্রান্সিস বলল—এখানে খুব ভালো তুলা চাষ হয়।

—হ্যাঁ। তুলোই প্রধান আয়ের পথ। পিরেল্লো বলল।

এবার পিরেল্লো আঙুল তুলে রাজবাড়ি দেখাল। কাঠপাথরে তৈরি রাজবাড়ি। তবে সাধারণ বাড়ির চেয়ে বেশ বড়। প্রবেশদ্বারে লোকজনের জটলা। সেখানে ফ্রান্সিসরা এসে দাঁড়াল। ঝকঝকে বর্শা হাতে প্রহরী। ফ্রান্সিসদের দেখে একটু অবাকই হল। বোঝাই যাচ্ছে বিদেশী। প্রহরী সবাইকে ঢুকতে দিচ্ছে না। পিরেল্লো এগিয়ে গিয়ে প্রহরীকে কী বলল। প্রহরী ঘাড় নাড়ল। পিরেল্লো ফ্রান্সিসদের ইশারায় ডাকল।

ফ্রান্সিসরা এবার সহজেই ভেতরে ঢুকল। দেখল বেশ ভিড়। দফায় দফায় দর্শনার্থী প্রজাদের ঢোকানো হচ্ছে। একদফা ভিড় চলে যেতেই ফ্রান্সিসরা ভালোভাবে রাজা মুজার্তাকে দেখল। রোগা লম্বা মুখে দাড়ি গোঁফ। কাঠের সিংহাসনে বসে আছেন। সিংহাসনে ফুলতোলা মোটা কাপড়ে ঢাকা। রাজা মাঝে মাঝে হাত নাড়ছেন। দর্শনার্থীরা আনন্দে চিৎকার করে রাজার জয়ধ্বনি দিচ্ছে। ফ্রান্সিসরা দেখল কোন বিচারপ্রার্থী কেউ নেই। হয়তো এ দেশে কোন অপরাধ হয় না। হয়তো ঝগড়া-বিবাদ হয় না।

এক দফা দর্শনার্থীরা বেরিয়ে যেতেই রাজা মুজার্তা ফ্রান্সিসদের দেখল। রাজা সঙ্গে সঙ্গে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। দ্রুতপায়ে হাসিমুখে ফ্রান্সিসদের কাছে এলেন। ফ্রান্সিসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর শাঙ্কোকে তারপর পিরেল্লোকে বললেন—আসুন রাজপুরোহিত।

রাজা বললেন—আপনাদের তিনজন আসার কথা।

—হ্যাঁ। আমরা তিনজনই। একজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারেননি। শাঙ্কো বলল।

আসনের কাছে এসে বললেন—আপনারা বসুন। তিনটি আসনই রাখা ছিল। ফ্রান্সিসরা বসল। রাজা বলতে লাগলেন—পিরেল্লো স্পেনীয় ভাষায় তা বলতে লাগলেন। রাজা বললেন—বেশ কয়েকবছর আগের কথা। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম। একটা পাহাড়। গাছ-গাছালি ঘাসে সব সবুজ। পাহাড়ের সবই সবুজ এটা হয় না। কিন্তু স্বপ্নে দেখেছিলাম আমি যেন পাহাড় থেকে নামছিলাম। হঠাৎ মেঘশূন্য আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। একবার দুবার তিনবার। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আমার সামনে তিনজন শ্বেতাঙ্গ। একজন শ্বেতাঙ্গ বললেন—প্রজাদের নিজের ছেলের মতো ভালোবাসবেন। দ্বিতীয়জন বললেন—নিজের প্রাণরক্ষার জন্যে যুদ্ধ করবেন। অন্যথায় নয়। তৃতীয়জন বললেন—আপনার রাজত্বে দারিদ্র্য যেন না থাকে। তিন পুরুষ পাহাড়ের চূড়ার দিকে হেঁটে চললেন। কিছুক্ষণ তাঁদের দেখলাম। তারপর তাঁরা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন।

সবাই চুপ করে রইলেন। ফ্রান্সিস বলল—সেই তিনপুরুষ যে আমরাই সেটা বুঝলেন কী করে?

—স্বপ্নে যতটা দেখেছিলাম তাতে আপনাদের সঙ্গে মিল আছে। রাজা বললেন।

আবার একদফা দর্শনার্থীদের ছাড়া হল। রাজসভার কাছে আবার ভিড় হল। রাজার জয়ধ্বনি চলল। রাজাও হাত নেড়ে দর্শনার্থীদের উৎসাহিত করতে লাগলেন।

আর একদফা দর্শন দিয়ে রাজা মুজার্তো প্রহরীদের আর কাউকে ঢুকতে মানা করে দিলেন। সভাঘর আস্তে আস্তে নিঃশব্দ হল।

এবার রাজা মুজার্তো ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বললেন—বেশ শান্তিতেই ছিলাম। প্রজাদের অভাব-অভিযোগ জেনে সে সব দূর করতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পাহাড়ের ওপারে একটা রাজ্য আছে। রাজার নাম জুদেবা। অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির মানুষ। ও দেশে প্রজাদের অনেক কষ্টে দিন কাটে। এই রাজা জুদেবা নরহত্যা ছাড়া কিছু বোঝে না। সারা রাজ্যে চর ঘুরে বেড়ায়। কেউ রাজা জুদেবের বিরুদ্ধে একটি কথা বললে তাকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে আসে। তার ওপর শুরু হয় নির্মম অত্যাচার। তাই সবাই মুখ বুঁজে থাকে। একটু থেমে বলতে লাগলেন—রাজা জুদেবা বার তিনেক আমার রাজ্য আক্রমণ করেছে। আমার প্রজারা প্রাণপণ লড়াই করে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার দেশপ্রেমিক কিছু যোদ্ধাও মারা গেছে। আমার লোকজনেরা সংবাদ নিয়ে এসেছে আজ অথবা কালকে রাজা জুদেবা আমার রাজ্য আক্রমণ করবে। তাই বড় চিন্তায় আছি।

—আপনার যোদ্ধাদের একত্র করেছেন তো? পিরেল্লো বলল।

—হ্যাঁ। আমার যোদ্ধাদের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস। আমাকে বাঁচাবার জন্য ওরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে লড়াই চালাবে। কিন্তু আমার দুঃখ যে বেশ কিছু প্রজা মারা যাবে, আহত হবে। তাই আমি যুদ্ধ চাই না। রাজা জুদেবাকে বলব—আমি হার স্বীকার করলাম।

—কিন্তু আপনার ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে আপনাকে তো যুদ্ধ করতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিকই বলেছেন। রাজা মুজার্তো বললেন—আমরা এখন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। তবে আমরা সমস্যায় আছি। আমার রাজত্বের উত্তরভাগে দুর্ধর্ষ লড়িয়ে সৈন্য ছিল। কিন্তু ভূমিকম্পে সেই লড়িয়ে সৈন্যরা অনেক মারা পড়েছে কিছুদিন আগে। রাজা জুদেবা সেই খবর জানে। আমরা যে হীনবল হয়ে পড়েছি সেটা বুঝে লড়াই করতে আসছে। সাধারণ সৈন্যদের নিয়ে আমরা যতটা পারি লড়বো। এখন পর্যন্ত ভেবে রেখেছি আমরা হার স্বীকার করবো না। রাজা মুজার্তো বললেন।

—হ্যাঁ। লড়াইয়ে মনের জোরটাই বড় কথা। কথাটা বলে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কোও উঠল। ফ্রান্সিস বলল—আমরা বিদেশী। আপনাদের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে পারি না। তবু আপনার মতো রাজার জন্য প্রয়োজনে আমরা লড়বো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো ভালোই। রাজা মুজার্তো বললেন।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো মাথা একটু নুইয়ে রাজাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সভাঘরের দরজার দিকে চলল। ফ্রান্সিস বাইরে এসে দেখল ডানদিকে বিরাট প্রান্তর। পাহাড়ের কাছে তাই প্রস্তরাকীর্ণ। চাষ হয় না। ফ্রান্সিস বুঝল লড়াইটা এখানেই হবে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো রাজা জুদেবার সঙ্গে লড়াইটা এখানেই হবে। রাজা মুজার্তোকে তার দেশবাসী পিতার মতো শ্রদ্ধা করে, বন্ধুর মতো ভালোবাসে। কাজেই রাজা মুজার্তোকে হারানো মুশকিল।

—তাহলে লড়াই তো হবেই। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ—কোন সন্দেহ নেই। ফ্রান্সিস বলল।

হাঁটতে হাঁটতে ফ্রান্সিসরা যে বাড়িটাতে আশ্রয় নিয়েছে সেখানে এল। হ্যারি বলল—তোমাদের ফিরতে বেশ দেরি হল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসল। তারপর হ্যারিকে সব বলল। হ্যারি বলল—এরকম একজন রাজা তাকে আমাদের সাহায্য করা উচিত।

—কিন্তু কীভাবে সাহায্য করবো? ফ্রান্সিস বলল।

—তাঁর স্বপক্ষে লড়াই করে। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে তো বন্ধুদের এখানে নিয়ে আসতে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি বলি কি আগেই বন্ধুদের নিয়ে আসার প্রয়োজন নেই। লড়াই হোক। যদি রাজা মুজার্তো হেরে যায় তখন আমরা সাহায্য করবো। শাঙ্কো বলল।

—শাঙ্কো ঠিকই বলেছে। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। তবে আমাদের এখানে কয়েকটা দিন থাকতেই হবে। হ্যারি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। আমি অনেকটা সুস্থ। হ্যারি বলল।

—উঁহু—তোমার এখনও কয়েকটা দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। ফ্রান্সিস বলল।

সেদিন সকালে রাজা জুদেবা আক্রমণ করল। রাজবাড়ির সামনে বিরাট প্রান্তরে দু'দলে লড়াই শুরু হল। চিৎকার হৈ-হল্লা। আহতদের আর্তনাদ গোঙানি ফ্রান্সিসরা সবই শুনতে পারছিল। দুপুরবেলা বাড়ির মালিক এসে জানিয়ে গেল রাজা মুজার্তা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিচ্ছে। রাজা মুজার্তার সৈন্যরা ভালোই লড়ছিল। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ফ্রান্সিস বলল—এখন কী করবে হ্যারি?

—এই বাড়িতেই শাঙ্কোদের জন্য অপেক্ষা করবো। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল। হ্যারি বলল—কোথায় যাচ্ছো?

—বাইরেটা দেখে আসি। নৃশংস রাজা জুদেবার সৈন্যরা নিশ্চয়ই পরাজিত রাজার প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। রাজা জুদেবার সৈন্যদের কয়েকটাকে খতম করে আসি। অবশ্য শেষ লড়াই এখনও বাকি। ফ্রান্সিস বলল।

—যা করবে সাবধানে করো। ভুলে যেও না—আমরা বিদেশী। দু'পক্ষের কোন সৈন্যই আমাদের বুঝবে না। হত্যা করতে চাইবে। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস হাত নেড়ে বলল। ফ্রান্সিস বাড়ির মধ্যে গেল। গৃহকর্তার স্ত্রীকে গিয়ে বলল—আমাকে কিছু কাঠকয়লা দিন।

উনি কিছুই বুঝলেন না। ফ্রান্সিস এবার উনুন দেখে উনুনের নীচে জমে থাকা কাঠকয়লা দেখলো। এবার উনি বুঝলেন। উনুনের নীচ থেকে কিছু কাঠকয়লা এনে ফ্রান্সিসকে দিলেন। উনি বুঝতে পারলেন না এখন এই বিকেলে কাঠকয়লা দিয়ে ফ্রান্সিসরা কী করবে।

ফ্রান্সিস হ্যারির কাছে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে মুঠো-মুঠো কাঠকয়লা এনে ফ্রান্সিসকে দিলেন। উনি বুঝতে পারলেন না এখন এই বিকেলে কাঠকয়লা দিয়ে ফ্রান্সিসরা কী করবে।

ফ্রান্সিস হ্যারির কাছে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে মুখে কাঠকয়লা ঘষল। মুখটা কালো গুঁড়ো দেখতে লাগল। এইভাবে গায়ের রঙ লুকিয়ে বাইরের রাস্তায় এলো। বাড়িগুলোর আড়ালে আড়ালে উত্তরের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চলল। জানতে হবে রাজা মুজার্তা কোথায় আশ্রয় নিয়েছেন। অবশ্য এখন সেটা জানা খুব মুশকিল। বলা যায় অসম্ভব। কোথায় এখন আত্মগোপন করলেন সেটা আগে জানতে হবে।

ফ্রান্সিস চলেছে। এখান থেকে ওখান থেকে মানুষের গোঙানি চিৎকার কান্না সবই শুনতে পারছিল। হঠাৎ দেখল দু'তিনজন রাজা মুজার্তার সৈন্য পালিয়ে



বর্ষাধারী সৈন্যদের আক্রমণ ফ্রান্সিস দ্রুতভাবে মোকাবিলা করল

গেল। ফ্রান্সিস বলল বোঝাই যাচ্ছে রাজাকে না দেখে ওরা ভীত হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় একমাত্র রাজাই ওদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

একটা বিরাট গাছের কাছে এল। নীচেটা পাথর বাঁধানো। ফ্রান্সিস বসল বাঁধানো পাথরে। ওর মন বলল ও নিরাপদে নেই। এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই দুজন রাজা জুদেবার সৈন্য গাছের আড়াল থেকে ফ্রান্সিসের সামনে এল। কাঠকয়লা মাখা মুখ দেখে ওরা বুঝে উঠতে পারল না লোকটা কোন দেশের। একজনের হাতে বর্শা, অন্যজনের হাতে ছোরা। বর্শাধারী সৈন্যরা ওদের ভাষায় বলল—তুমি কে? কোত্থেকে এসেছো?

ফ্রান্সিস দুই কান মুখ দেখাল। বোঝালো বোবা। কানেও শুনতে পায় না। সৈন্যদের কেমন মনে হল ফ্রান্সিস কালোদেশের লোক। ফ্রান্সিস নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করল—ও অন্য দেশ থেকে এসেছে। বর্শাধারী বলল—এখন এই দেশে যুদ্ধকালীন অবস্থা চলছে। এর মধ্যে তুমি এসেছো কেন? ফ্রান্সিস কিছুই বুঝল না। জোরে মাথা নাড়তে লাগল। বর্শাধারী যোদ্ধাটি এবার ফ্রান্সিসকে মেরে ফেলতে চাইল। ও ওর দুচোখ দেখে ফ্রান্সিস সেটা বুঝতে পারল। ফ্রান্সিস সজাগ হল। সৈন্যটি বর্শার ফলাটা ফ্রান্সিসের বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। ফ্রান্সিস দ্রুত সরে গিয়ে বর্শার হাতলের দিকটা ধরে ফেলল। ফ্রান্সিস স্পেনীয় ভাষায় বলল—তুমি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে। কাজেই তোমাকে ছাড়া হবে না। এইবার মর। তখন ফ্রান্সিসের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। বর্শাটা ধরে সৈন্যটির বুক লক্ষ্য করে বর্শাটা ছুঁড়ল। যোদ্ধাটি লাফিয়ে উঠল। বর্শাটা ওর পেটে ঢুকে গেল। সৈন্যটি কাতরাতে কাতরাতে বর্শাটা টেনে বের করতে গেল। কিন্তু বর্শা বের করতে পারল না। বর্শাটা ধরে ও মাটিতে পড়ে গেল।

এবার বড় ছোরা হাতে অন্য সৈন্যটি ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দ্রুত সরে গেল। সৈন্যটি ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দ্রুত সরে গেল। সৈন্যটি ফ্রান্সিসকে ধরতে পারল না। মাটিতে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস ওর ছোরাসুদ্ধ হাতটা পা দিয়ে চেপে ধরল। সৈন্যটি ছোরাটা বের করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। সৈন্যটি এপাশ ওপাশ করতে লাগল। ফ্রান্সিস অতি দ্রুত ছোরাটা বের করল। তারপর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করল না সোজা সৈন্যটির গলায় বসিয়ে দিল। সৈন্যটি চিৎকার করে উঠল। তারপর ও আর কোন শব্দ করতে পারল না। তারপর হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস ছোরাটা কোমরে গুঁজল। বর্শাটা হাতে নিল। চলল পাহাড়ের নীচের প্রান্তরটার দিকে। হঠাৎ দেখল রাজা জুদেবার একদল সৈন্য আসছে। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় গাছের আড়ালে চলে এল। সৈন্যরা চলে গেল। ফ্রান্সিস এবার হ্যারির কাছে চলে এল।

হ্যারি চুপ করে শুয়েছিল। ফ্রান্সিস একটু উদ্বিগ্ন হল। বলল—এখন তোমার শরীর কেমন?

—এখনো একেবারে সুস্থ নই। শরীরের দুর্বলতাটা আছেই। হ্যারি বলল।

—তুমি বিশ্রাম করো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর সেই দুই সৈন্যের কথা বলল। পিরেল্লো চুপ করে বসেছিল। এবার বললো—যাক দুটোকে তো মেরেছেন। এভাবেই ওদের মারতে হবে।

সেদিন বিকেলেই বাড়ির কর্তা একটা শস্যটানার গাড়ি নিয়ে এল। শাঙ্কো আর হ্যারি তৈরিই ছিল। দুজনে গিয়ে গাড়িটার কাছে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস তখন পিরেল্লোকে নিয়ে এল। বলল—এই দু'জন যাবে আলকাবার বন্দরে। পিরেল্লো বুঝিয়ে বলল সেটা। গাড়োয়ান মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল সে বুঝেছে। সেই সঙ্গে বলল—**বড় দূর**।

—তোমাকে একটা সোনার চাকতি দেব। শাঙ্কো বলল।

—বেশ। গাড়োয়ান হাসল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো এই গাড়িটা ছেড়ে দিও না। আলকাবা থেকে গাড়ি জোগাড় করে এই গাড়িটিকেও নিয়ে চলে এসো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমি খুব চিন্তায় থাকবো।

পিরেল্লো বলল, গাড়োয়ানকে বলুন কিছু খড় জোড়াড় করে আনতে। পিরেল্লো গাড়োয়ানকে বলল সেটা। গাড়োয়ান গাড়ি থেকে নেমে এল। একটু পরেই একগাদা খড় নিয়ে এল। সেই খড় গাড়ির ভেতরে বিছিয়ে দিল। শাঙ্কো কিছুটা খড় তুলে একপাশে বেশি করে রাখল। বলল—হ্যারি তুমি এখানে বসো। হ্যারি তাই বসল। শাঙ্কো গাড়ি ছেড়ে দিতে বলল। গাড়োয়ান কিছুই বুঝল না। শাঙ্কো হাত নেড়ে বোঝাল। গাড়োয়ান গাড়ি ছেড়ে দিল।

ঘরে ফিরে ফ্রান্সিস বিছানায় বসল। গৃহকর্তা ভেতরে চলে গেল। অনেক চিন্তা এখন ফ্রান্সিসের মাথায়। সবচেয়ে বড় চিন্তা হ্যারির জন্যে। শস্যটানা গাড়িতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে যাওয়া—হ্যারি না ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপর লড়াইয়ের চিন্তা। রাজা জুবেদার সৈন্যরা ভালো যোদ্ধা কি না। রাজা জুবেদা মানুষটাই বা কেমন। শেষ কথা হল একটাই—রাজা জুবেদার সৈন্যদের হার স্বীকার করতে হবে। এখন শুধু প্রতীক্ষা—ভাইকিং বন্ধুদের জন্যে।

বাড়ির কর্তা ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকল। বলল—আমাদের রাজা হেরে গেলেন—এটা যে কী বেদনার আমি বলে বোঝাতে পারবো না।

—ফ্রান্সিস বলল—আচ্ছা, রাজা মুজার্তা কোথায় আত্মগোপন করেছেন?

—কী হবে তা শুনে। আপনারা তো মাত্র তিনজন। গৃহকর্তা বলল।

—অপেক্ষা করুন তিনজন তিরিশজন হবে। আপনি আমাকে রাজা মুজার্তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারেন?

—কী হবে রাজার সঙ্গে কথা বলে। গৃহকর্তা বলল।

—সব ব্যাপারেই আপনি এত হতাশ হয়ে পড়ছেন কেন? ফ্রান্সিস বলল। রাজা জুবেদা আজকে জিতেছেন। সময় এলে আমরা পরের লড়াইয়ে জিতবো। ফ্রান্সিস বলল।

—জানি না আপনি কী করে যুদ্ধে জেতার আশা করছেন। গৃহকর্তা বলল।

সেসব পরে দেখা যাবে। আপনি আমাকে নিয়ে চলুন।

রাজা কোথায় আত্মগোপন করেছেন? ফ্রান্সিস আবার বলল।

—এক অমাত্যের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। গৃহকর্তা বললেন।

—আপনি তো অমাত্যের বাড়ি চেনেন। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—চিনি বৈকি। রাজার চিঠি ফরমান এসব অমাত্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমার কাজ। গৃহকর্তা বললেন।

—তাহলে আমাকে নিয়ে চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। একটু রাত হোক। গৃহকর্তা বলল।

—বেশ। আমাকে ডাকবেন। ফ্রান্সিস বলল।

রাত গভীর হল। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ও তখন ভাবছে কখন ভাইকিং বন্ধুরা আসবে। জোরদার লড়াই হবে। রাজা জুবেদার সৈন্যরা শুধু বর্শা হাতে লড়াই করবে। একবার বর্শাটা ছুঁড়লেই সৈন্যদের হাতে লড়াই করার অস্ত্র থাকবে না। তখন অতি সহজে সৈন্যদের ধরে ফেলা যায়। তরোয়ালের কাছে ওরা তখন হার স্বীকার করতে বাধ্য।

বাড়ির কর্তা এল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কো ওর ছোরাটা রেখে গেছে। ফ্রান্সিস ছোরাটা কোমরে গুঁজে নিল। পিরেল্লো বলল—আমিও যাবো। ফ্রান্সিস বলল—দোভাষী হিসেবে আপনাকে যেতেই হবে।

আকাশে ভাঙা চাঁদ। চারদিক মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। তিনজনে হেঁটে চলল। একটা ইঁদারার কাছে এল ওরা। বাড়ির কর্তা ডানদিকে ঘুরে একটা বাড়ির সামনে এল। পাথর আর কাঠের বাড়ি। বাড়িটা বেশ বড়। চারদিকে ফুলের গাছ। বিচিত্র সব ফুল ফুটে আছে।

ওরা বড় দরজাটার কাছে এল। সাধারণ বাড়িটাড়ির থেকে অনেক ভালো। বেশ অর্থব্যয়েই বাড়িটা করা হয়েছে। গৃহকর্তা দরজায় কান রেখে দরজায় আঙুল দিয়ে খট্‌খট্ শব্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল। একজন প্রহরী মুখ বাড়াল। দুচোখ কুঁচকে সেই গৃহকর্তাকে দেখল। আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে গেল। ফ্রান্সিসরা ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর। বাঁকা পাথরের চেয়ার। শ্বেতপাথরের টেবিল। একেবারে অন্ধকার ঘর। ঐ ঘরের পরে এল গৃহকর্তা। ফ্রান্সিসকে বলল—ভেতরের ঘরে আসুন।

ভেতরের ঘরে মোটা মোমবাতি জ্বলছে। সেই আয়নায় ফ্রান্সিস দেখল বাঁ দিকে একটা খাট। রাজা মুজার্তা তাঁর ওপর শুয়ে আছেন। ফ্রান্সিসরা ঢুকতে উনি পাশ ফিরে শুলেন। পিরেল্লো দুজনের কথা দোভাষীর মতো বুঝিয়ে দিতে লাগল।

—মাননীয় রাজা—আপনি কেমন আছেন। ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল।

—একজন রাজ্যহারা রাজা যেমন থাকে। রাজা বিষাদের সুরে বললেন।

—আপনি আবার রাজ্য ফিরে পাবেন। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা মুজার্তা একটু অবাক চোখে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল।

—হ্যাঁ—আপনি জয়ী হবেন। আমি ফ্রান্সিস বলছি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা কিছুক্ষণ ওপরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ফ্রান্সিস দেখল স্বল্প আলোয়—আর একটা খাটে রাণী শুয়ে আছেন। সঙ্গে শিশুপুত্র। ফ্রান্সিস বলল—মাননীয় রাজা আপনি ভেঙে পড়বেন না। মনে সাহস রাখুন। রাণীর কাছে এল। পিরেল্লোও এল। ফ্রান্সিস বলল—মাননীয়া রাণী—আপনি শক্ত থাকুন। দুশ্চিন্তা করবেন না। মাননীয় রাজা আবার তাঁর রাজ্য ফিরে পাবেন। রাণী কোন কথা বললেন না। চুপ করে শুয়ে রইলেন।

গৃহকর্তার সঙ্গে ফ্রান্সিসরা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসকে গৃহকর্তা বলল—একটা কথা বলি,

—বলুন, কর্তা বলল।

—আমার একত্রিশ জন বন্ধু কাল পরশুর মধ্যে এখানে আসবে। তাদের থাকা খাওয়ার ব্যাপারটা আপনি দেখবেন আমার অনুরোধ। ফ্রান্সিস বলল।

—তারা এখানে আসবে কেন? গৃহকর্তা জানতে চাইলেন।

—রাজা মুজার্তার হয়ে লড়াই করবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তারা কি জুবেদার সৈন্যদের হারাতে পারবে? গৃহকর্তা সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

—আমরা ভাইকিং। আমার বন্ধুরা যে কী দুর্ধর্ষ যোদ্ধা সেটা লড়াই দেখলেই বুঝবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে রাজা মুজার্তার মুক্তির আশা আছে। পিরেল্লো বলল।

—নিশ্চয়ই আছে। ফ্রান্সিস কথাটা জোর দিয়ে বলল।

—আপনার কথা শুনে আমি আশ্বস্ত হলাম। এই রাজাকে আমরা শ্রদ্ধা তো করিই বড় ভালোবাসি। গৃহকর্তা বলল।

পরের সারাটা দিন ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে রইল। বাড়ির কর্তা দু-তিনবার এসে জানতে চাইল—আপনার শরীর ভালো তো?

—আমি ভালো আছি। একখানা তরোয়াল হাতে পেলে আমি এক্ষুনি লড়াইয়ে নামতে পারি। ফ্রান্সিস দাঁত চেপে কথাটা বলল।

—তরোয়াল কী? গৃহকর্তা জানতে চাইল।

—একটা যুদ্ধাস্ত্র। এই অস্ত্রটি আমাদের হাতে থাকলে আমাদের পরাস্ত করা অসম্ভব। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা এই তরোয়াল দিয়ে লড়াই করেন? গৃহকর্তা জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। ঐ অস্ত্রটা দিয়েই আমরা শত্রুদের পরাস্ত করি। ফ্রান্সিস বলল।

পরের সারাটা দিন ফ্রান্সিস ঘর থেকে বেরুলো না। রাজা জুবেদার সেনাপতি রাজা মুজার্তার প্রজাদের নাচ-গান-বাজনা করতে আদেশ দিয়েছিল। কিন্তু প্রজারা রাজি হয়নি। কথাটা ফ্রান্সিস গৃহকর্তার মুখে শুনল। ফ্রান্সিস বলল—এটা ঠিক

কাজ হল না। আপনি রাজার অনুমতি নিয়ে প্রজাদের গানবাজনা করতে বলুন। এসব করলে রাজা জুবেদার সৈন্যরা অলস হয়ে পড়বে। ওরা নিশ্চিন্তে থাকবে। ওরা বুঝে যাবে যে আর লড়াই করতে হবে না আমি এটাই চাইছি। ওদের মধ্যে আর শৃঙ্খলা থাকবে না। আমাদের লড়াই করতে সুবিধে হবে।

—দেখি। বলে বাড়ির কর্তা চলে গেল। ফ্রান্সিস এক গ্লাশ জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যের সময় ফ্রান্সিস শুনল বাইরে বাজনার সঙ্গে নাচগান শুরু হয়েছে। ফ্রান্সিস আপন মনে হাসল। বুঝল বাড়ির কর্তা কাজটা করতে পেরেছে। এবার যুদ্ধের জন্যে প্রতীক্ষা।

ফ্রান্সিস মধ্যরাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে এসে অপেক্ষা করল। ও পায়চারি করতে লাগল। বনের ওপরের আকাশটা পূবদিকে লাল হল। কিছুক্ষণ পরে সূর্য উঠল। ফ্রান্সিস সারারাত ঘুমোতে পারল না।

সকালেও বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। চোখ বনের পাশের রাস্তার ওপর। কিন্তু বন্ধুদের দেখা নেই।

ফ্রান্সিস পেটপুরে দুপুরের খাবার খেল। কিছুক্ষণ শুয়ে রইল। তারপর উঠে বসল। বাড়ির বাইরে এল। তাকিয়ে রইল দূরের রাস্তার দিকে।

হঠাৎ দেখল—ধুলো উড়িয়ে তিনটে শস্যটানা গাড়ি আসছে। ফ্রান্সিস সেইদিকে ছুটল। গাড়িগুলোর কাছে এল। বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। ফ্রান্সিস দুহাত ওপরে তুলে বন্ধুদের ধ্বনি থামাতে বলল। বন্ধুরা এবার চুপ করল। বন্ধুরা গাড়ি থেকে নামল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে চলল বাড়িটার দিকে। বাড়ির কাছে এসে বিস্কোকে বলল—তোমরা খাবে তো?

—না-না, আমরা এক সরাইখানায় খেয়ে এসেছি। বিস্কো বলল।

—বাঁচালে। তোমাদের এতজনের জন্যে রান্না করতে বলবো ভেবেছিলাম। কিন্তু বাড়ির কর্তাকে রাঁধতে বলিনি। এত রান্না হবে। তোমরা না এলে সব নষ্ট হবে। ঘরের কাছে এসে ফ্রান্সিস বলল—আপাতত এই ঘরেই ঠেসেঠুসে বসো। বেশি শব্দ করবে না। তোমাদের কথা কেউ যেন জানতে না পারে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির কর্তা আসবে। তোমাদের আসার জন্য কর্তাকে বলেছি। উনি ভাঁড়ার ঘর খালি করে দেবেন। তাতে অনেকেই থাকতে পারবে। ঘরে ঢুকে কয়েকজন শুয়ে পড়ল। বাকিরা কেউ কাঠের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। ফ্রান্সিস ঘরটায় ঢুকল। বলল—শাঙ্কোর মুখে সব শুনেছো তোমরা। নৃশংস রাজা জুবেদা এখানকার রাজা মুজার্তাকে হারিয়ে রাজবাড়ি দখল করে বসে আছে।

রাজা মুজার্তার মতো এমন সহৃদয় প্রজাবৎসল রাজা আমি দেখিনি। এখন রাজা জুবেদার সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে। আমরা সৈন্যসহ রাজা জুবেদাকে দেশ থেকে তাড়াবো। এবার বলো কখন আক্রমণ শুরু করতে চাও? ভাইকিং বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। কিছু পরে বিস্কো বলল,

—ফ্রান্সিস আমরা রাতের বেলা রাজবাড়ি ঘিরে ফেলবো। তখন রাজার সৈন্যরা লড়াই করতে আসবে। তখন লড়াইও হবে। রাজা জুবেদার সৈন্যরা তখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকবে।

—আমার এতে আপত্তি নেই। ফ্রান্সিস বলল।

এরমধ্যে গৃহকর্তা এলো। ভাঁড়ার ঘর থেকে মালপত্র সরিয়ে ফ্রান্সিসদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। দুটো ঘর পাওয়ায় শোয়া বসার জায়গা পাওয়া গেল

ফ্রান্সিস গৃহকর্তাকে ডাকল। বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর কর্তাকে বলল—রাজা মুজার্তার খবর কী?

—চুপ করে বসে থাকেন। কারো সঙ্গে কথা নেই। মাঝে মাঝে ফুঁপিয়েও ওঠেন। তখন রাণী সান্ত্বনা দেন। এভাবেই রাজার দিন কাটছে। গৃহকর্তা বলল।

—আমাকে রাজা মুজার্তার কাছে নিয়ে চলুন। রাজার সঙ্গে কিছু কথা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনাকে তো বাড়িটা চিনিয়ে দিয়েছি। গৃহকর্তা বলল।

—বাড়ি চিনি। কিন্তু প্রহরীরা আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। আমাকে তো ওরা চেনে না। তার ওপর আমি বিদেশী। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। চলুন যাওয়া যাবে। গৃহকর্তা বলল।

—পরে নয়, আজকেই সন্ধ্যের সময় যেতে হবে। পরে অনেক কাজ আছে আমাদের। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা কি রাজা জুবেদার সৈন্যদের আজকেই আক্রমণ করবেন? গৃহকর্তা জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। কাজ সেরে আমাদের জাহাজে ফিরে যেতে হবে।

গৃহকর্তা মাথাটা এপাশ ওপাশ করল। বলল—আপনারা কি পারবেন?

—অবশ্যই পারবো। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। তাহলে সন্ধ্যের সময় যাবো। আমাকে ডেকে নিয়ে যাবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। গৃহকর্তা চলে গেল। বিস্কো বলল—ফ্রান্সিস আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।

—সে যেও। এবার পিরেল্লো এগিয়ে এল। বলল—আমিও যাবো।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

সন্ধ্যের সময় গৃহকর্তা এলো। ফ্রান্সিসকে বলল—

—আপনি তৈরি তো?

—অবশ্যই। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনাদের জন্যে তিনটি রাঁধুনি এনেছি। গৃহকর্তা বলল।

—সে তো বটেই। এতজনের রান্না একা আপনার স্ত্রীর পক্ষে অসম্ভব।

—বেশ। গৃহকর্তা বলল।

—রাধুনিকে আমরা কিছু পারিশ্রমিক দেবো। ফ্রান্সিস বলল।

—এবার চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

চারজন রাস্তায় নেমে চলল উত্তরমুখো। ওদিকেই অমাত্যের বাড়ির দিক।

এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। ধুলো উড়ছে। আকাশে চাঁদ আছে। অস্পষ্ট চাঁদের আলো ছড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস ভাবলো—মোটামুটি চাঁদের আলো পাওয়া যাবে। এতে লড়াই চালাতে সুবিধেই হবে।

চারজনে অমাত্যের বাড়িতে পৌঁছল। পিরেল্লো দরজার টোকা দিল। দরজা খুলে দিল।

ফ্রান্সিসরা ভেতরে ঢুকল। গৃহকর্তার পেছনে পেছনে ফ্রান্সিসরা রাজার শোয়ার ঘরে এল। মোমবাতির আলোয় দেখল রাজা মুজার্তো চুপ করে বিছানায় বসে আছেন। ফ্রান্সিসদের মুখ তুলে দেখলেন। কোন কথা বললেন না। ফ্রান্সিস একটু মাথা নুইয়ে দিল। তারপর বলল—আপনাকে একটা শুভসংবাদ দিচ্ছি। আমার বীর যোদ্ধা বন্ধুরা এসেছে। রাজা জুবেদাকে আমরা হারাতে পারবো। আমাদের দু'একজন বন্ধু যুদ্ধে মারা যেতে পারে আহত হতে পারে। তবুও আপনাকে আপনার রাজ্য ফিরিয়ে দিতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

রাজা মুজার্তো কিছু বললেন না।

—মাননীয় রাজা আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। ফ্রান্সিস বলল—এবার আপনার কাছে জানতে চাইছি যুদ্ধে রাজা জুদেবার পরাজয় ঘটলে আপনি কী চান?

—কী আর চাইবো। তিনি বেঁচে থাকা সৈন্যদের নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে যাবেন। রাজা বললেন।

—যদি বলি আমরা রাজা জুবেদাকে হত্যা করতে পারি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা মুজার্তো চমকে উঠলেন। দুহাত নেড়ে বললেন—না-না। তার মৃত্যু আমি চাই না।

—রাজা জুবেদা কিন্তু নির্মম নিষ্ঠুর হিংস্র। ফ্রান্সিস বলল।

—তবু আমি কখনও তার মৃত্যু চাই না। রাজা মুজার্তো বললেন।

—ও কিন্তু আপনাকে খুঁজে পেলে বন্দী করতে পারে, আপনাকে হত্যা করতে পারে। ফ্রান্সিস বলল—

—তা হোক। তবুও আমি ওর মৃত্যু চাই না। রাজা বললেন।

—বেশ। তা হলে আমি স্থির করলাম—রাজা জুবেদাকে এবং সৈন্যদের হাত বেঁধে তার রাজ্যের সীমান্তে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। তারপর তারা যেখানে খুশি যায় যাক। ফ্রান্সিস বলল।

—তাই করুন। আমিও এটাই চাই। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস বলল—বেশ। তাই করবো।

হঠাৎ বাইরের দরজার কাছ থেকে দরজা ধাক্কা দেবার শব্দ হল। কারা গলা চড়িয়ে বলছে—দরজা খোলো। বাড়ির মালিক অমাত্য ভেতরের ঘর থেকে ছুটে এলেন।



বর্শাটা ঐ সৈন্যের হাতছাড়া হল

রাজা বললেন অমাত্যকে—বোধহয় রাজা জুবেদার সৈন্যরা আমার খোঁজ পেয়েছে। তাই আমাকে বন্দী করতে এসেছে।

—দেখছি—দেখছি। অমাত্য চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল বর্শা উঁচিয়ে দুজন সৈন্য এই ঘরের দিকে আসছে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—বিস্কো।

বিস্কো সঙ্গে সঙ্গে বুকের কাছে হাত ঢুকিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। অমাত্য ছুটে ঐ দুজন সৈন্যের দিকে এগোলেন। একজন সৈন্য বর্শা নামিয়ে অমাত্যের বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। বর্শা অমাত্যর বুকে বিঁধে গেল। অমাত্য বর্শাটা ধরে মাটিতে পড়ে গেলেন। বর্শাটা ঐ সৈন্যের হাতছাড়া হল। ফ্রান্সিস ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওর চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুঁষি চালাল। সৈন্যটি ছিটকে মেঝেয় পড়ে গেল। অন্য সৈন্যটি বর্শা হাতে এগিয়ে এল। বিস্কো দ্রুত ছুটে গিয়ে ঐ সৈন্যটির বুকে ছোরা বিঁধিয়ে দিল। সৈন্যটির মুখ থেকে অক্ শব্দ বেরিয়ে এল। ও মেঝেয় পড়ে গেল।

ওদিকে ফ্রান্সিস ঐ সৈন্যটির কানের ওপর চোয়ালে কপালে ঘুঁষি চালাতে লাগল। সৈন্যটি কাটা কলাগাছের মতো ধপ্ করে মেঝেয় পড়ে গেল। সৈন্যটি জ্ঞান হারালো।

ফ্রান্সিস অমাত্যের বুক থেকে বর্শাটা খুলে নিল। বলল—বিস্কো। এই দুটোকে বাড়ির বাইরে ফেলে দিতে হবে। হাত লাগাও। দুজনে একটা একটা করে দুটো সৈন্যকে বাড়ির বাইরে নিয়ে এল। অস্পষ্ট আলোয় দেখল রাস্তার পাশেই একটা জলা। দুজনে একটা সৈন্যকে হাতে আর পায়ে ধরে ঝুলিয়ে দুপাশে দোলাতে দোলাতে ছুঁড়ে জলায় ফেলে দিল। সমুদ্রে এই রীতিতেই মৃতদেহ ফেলা হয়। অন্যটিকেও সেই ভাবে ফেলল। অমাত্যের বাড়িতে এল। বাড়ির অন্দরমহল তখন কান্নার রোল উঠেছে।

ফ্রান্সিস রাজা মুজার্তার কাছে এসে বলল—আমরা যাচ্ছি কাল সকালে রাজা জুবেদা তার সৈন্যদল নিয়ে আপনার রাজত্ব ছেড়ে চলে যাবে।

—আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। সে সময় আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না।

পিরেল্লো এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্রান্সিস তাকে ডাকল।

ফ্রান্সিসরা অমাত্যের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। বন্ধুদের কাছে এসে অমাত্যের বাড়ির ঘটনাটা বলল। সবাই উৎসাহিত হল।

—রাতের খাবার একটু তাড়াতাড়িই খেয়ে নিতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে বসে বিশ্রাম নিয়ে আমরা রাজবাড়ি আক্রমণ করবো। একটু অন্যরকম লড়াই হবে। ওরা লড়বে বর্শা দিয়ে আমরা লড়বো তরোয়াল দিয়ে। এরা জীবনে কখনো তরোয়াল দেখেনি। কাজেই ওই তরোয়াল দিয়ে কীভাবে লড়ে এসম্বন্ধে এদের কোনো ধারণাই নেই। ফ্রান্সিস বলল। হঠাৎ একটা চিন্তা ওর মাথায় এল। রাজা মুজার্তার তো সৈন্যদল নিশ্চয়ই আছে।

ফ্রান্সিস পিরেল্লোর দিকে তাকাল। বলল—পিরেল্লো—রাজা মুজার্তার তো সৈন্যবাহিনী ছিল। সেই সৈন্যরা এখন কোথায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—মা মেরিই জানে। কোথায় কোথায় লুকিয়ে আছে। বাইরে বেরোতে সাহস পাচ্ছে না। পিরেল্লো বলল।

—আপনি এক্ষুণি রাজা মুজার্তার কাছে যান। তিনিই হয়তো তাঁর সৈন্যদের খোঁজ দিতে পারতেন। ফ্রান্সিস বলল।

—মনে হয় না। রাজার এখন যা অবস্থা। আসলে রাজা মুজার্তার সৈন্যরা সংখ্যায় খুবই কম। রাজা তো যুদ্ধবিগ্রহের কথা ভাবতেনই না। পিরেল্লো বললেন।

—এটা ভুল। রাজত্ব রাখতে গেলে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী সৈন্যবাহিনী রাখতে হয়। উনি নিজে যুদ্ধ চান না। ভালো কথা। কিন্তু অন্যদেশের শাসক যে কোন মুহূর্তে তাঁর রাজত্বের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এজন্যে আগে থেকে তৈরি থাকা উচিত।

—আসলে রাজা মুজার্তা এত সব ভাবতেন না। পিরেল্লো বললেন।

—যাক গে। আপনি সৈন্যদের খোঁজ কী করে পাবেন তা জেনে আসুন। আমাদের খেতে বসার আগে আপনি চলে আসবেন। ফ্রান্সিস বললেন।

পিরেল্লো চলে গেলেন। ভাইকিংরা নিজেদের মধ্যে শুয়ে বসে গল্পটল্প করতে লাগল।

পিরেল্লো অমাত্যের বাড়িতে পৌঁছল। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দেখল বাড়ির সামনে তিনচারজন যোদ্ধা। বোঝাই যাচ্ছে ওরা রাজা জুবেদার সৈন্য।

পিরেল্লো তাদের সামনে এলো। প্রধান দরজার দিকে চলল। যোদ্ধারা হাত তুলে পিরেল্লোকে আটকাল। পিরেল্লো বললেন—আমি রাজপুরোহিত। রাজা মুজার্তার সঙ্গে দেখা করব। দরকারি কথা আছে। দলনেতা নাকেমুখে শব্দ করল—হুঁ। তারপর বলল,

—রাজা মুজার্তা আর কতক্ষণ বেঁচে থাকবে। কাল সকালেই ফাঁসি দেওয়া হবে বাজারের সামনে ফাঁসিকাঠে।

—ঠিক আছে। তার আগেই আমাকে কথাটা বলতে হবে। পিরেল্লো বললেন।

—এখন কী কথা? একজন সৈন্য বলল।

—আছে—আছে—আপনারা বুঝবেন না। পিরেল্লো বলল।

—বেশ যান। শুনে রাখুন আমাদের কোন ক্ষতি করার যদি চেষ্টা করেন—তাহলে আপনাকে মরতে হবে। সৈন্যটি বলল।

—ঠিক আছে। পিরেল্লো মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে চলল।

পিরেল্লো বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। রাজার কাছে এলেন। রাজা শুয়েছিলেন। পিরেল্লোকে দেখে উঠে বসলেন। ম্লানমুখে হেসে বললেন—পিরেল্লো শেষ রক্ষা হলো না।

—আপনি একেবারে দুশ্চিন্তা করবেন না। পিরেল্লো বললেন। তারপর গলা

নামিয়ে বললেন—ভাইকিংরা দুঃসাহসী, লড়াইয়ে অপরাজিত। দেখবেন আপনি কালকেই মুক্তি লাভ করবেন।

—দেখি। রাজা মৃদুস্বরে বললেন।

—মাননীয় রাজা আপনার কাছে যেজন্য এসেছি সেটা বলি। তারপর পিরেল্লো ফিসফিস করে বলল—আপনার সৈন্যরা সব কোথায়?

—সবার কথা তো বলতে পারবো না—রাজা গলা নামিয়ে বললেন—ওরা বেশির ভাগই বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

—বনে কীভাবে আছে? পিরেল্লো বললেন।

—বনের মধ্যে আমার একটা সুতাকল আছে। বাড়িটা আমাদেরই তৈরি। বেশ বড় বাড়ি। সুতাকলের কর্মীরা থাকে। সেখানে আমার সৈন্যরা আশ্রয় নিয়েছে। রাজা বললেন।

—তাহলে ঐ সুতাকলের বাড়িতেই ওদের পাবো। পিরেল্লো বললেন।

—হ্যাঁ, কিন্তু ওদের কেন? রাজা জানতে চাইলেন।

—ওরা তো সৈন্য। লড়াই আরম্ভ হলে ওদের তো লড়তে হবে।

—ওরা কি পারবে লড়াইয়ে জিততে? রাজা বললেন।

—চেষ্টা তো করতে হবে। ভাইকিংরা আপনার কথা শুনেছে। ওরা আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করে। ওরা মনেপ্রাণে আপনার মুক্তি চায়। পিরেল্লো বলল।

রাজা মুখে শব্দ করলেন—হুঁ। আর কোন কথা বললেন না।

পিরেল্লো বাড়ির বাইরে এলেন। চললেন বনের দিকে।

ফাঁকা প্রান্তরটায় তবু চাঁদের অস্পষ্ট আলো ছিল। এখানে একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। প্রায়ই গাছের মোটা শেকড়ে হোঁচট খেতে হচ্ছে। পিরেল্লো চলল। কিন্তু কোথায় সেই বাড়িটা? আবার কয়েক পাক দিয়ে পিরেল্লো খুঁজতে লাগল।

হঠাৎ দেখল একটু ফাঁকায় বেশ বড় জন্তুর মত একটা লম্বাটে ঘর। পিরেল্লো দ্রুত পায়ে এসে বাড়িটার দোরগোড়ায় দাঁড়ালেন। কাঠের দরজায় আঙুল ঠুকলো। ভেতরে কোন সাড়া নেই। আবার শব্দ করল। দরজা খুলে গেল। বর্শা তুলে এক সৈন্য দাঁড়িয়ে। পিরেল্লো দুহাত ওপরে তুলে বললেন—আমি বন্ধু, শত্রু নই। যোদ্ধাটি বর্শা নামাল। বলল—আপনাকে আমরা চিনি। আপনি রাজা আনকহনার দেশের রাজপুরোহিত।

—হ্যাঁ। এখন আর অন্য কথা নেই। শুধু লড়াইয়ের কথা। আরো কয়েকজন যোদ্ধা ততক্ষণে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

পিরেল্লো বললেন—আপনারা লড়াইয়ে হেরে গেছেন। এখানে লুকিয়ে আছেন। কিন্তু এখন আপনাদের লুকিয়ে থাকা চলবে না। আবার লড়াই করতে হবে। এই লড়াইয়ে যোগ দেবে কিছু ভাইকিং যোদ্ধা। জয় আমাদের হবেই। আপনারা তৈরি হয়ে নিন। তারপর আমাদের সঙ্গে চলুন। একজন যোদ্ধা মৃদুস্বরে বলল—নিশ্চয়ই যাবো।

—আপনি বসুন। একজন যোদ্ধা বলল।

পিরেল্লো একটা বস্তার ওপর বসলেন। বস্তাভর্তি তেলের বীজ। যোদ্ধারা তৈরি হল। তারপর ঘরের দরজার দিকে চলল। একজনকে চারদিক দেখার জন্য পাহারায় রাখল।

সবাই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। যে এখানে পাহারায় রইল সে দরজা বন্ধ করল।

পিরেল্লোরা আধো আলো আধো অন্ধকারে ভেজা ভেজা বনের মধ্যে দিয়ে চলল সবাই। আবছা আলোর মধ্যে দিয়ে সবাই চলল ফ্রান্সিসদের ডেরার দিকে।

ফ্রান্সিসদের ডেরায় যখন সবাই এল তখন ফ্রান্সিসদের খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। ফ্রান্সিস রাজা মুজার্তার সৈন্যদের কাছে এল। বলল—

—আপনাদের খাওয়া হয়েছে?

একজন সৈন্য বলল—না। আমাদের তো খেতে দেরি হয়।

—ঠিক আছে। আমরা সব খাবার ভাগ করে খাবো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস বিস্কো খেতে বসল না। খাবার পরিবেশন করতে লাগল। রুটি বুনো আলুর ঝোল শাকপাতা দেবার সময় ফ্রান্সিস বলল—কেউ দুবার চাইবেন না। রাজা মুজার্তার সৈন্যরা আমাদের সঙ্গে যাবে লড়াই করতে। তাদের জেন্যে তো রান্না হয়নি। কাজেই খাবার কম পড়ে গেছে। পেটপুরে খাওয়া হবে না। বেশি চাইবেন না। একটা কথা বলি—বেশি খেয়ে লড়াই করতে গেলে দ্রুত চলাফেরা করা যায় না। অল্প খাওয়ার জন্যে তোমাদের চলাফেরা দ্রুত হবে। তরোয়াল চালানো সহজ হবে। একদিক থেকে এই ভালো হল।

ভাইকিংরা খাওয়া শেষ করল। উঠে দাঁড়াল। এবার রাজা মুজার্তার সৈন্যরা খেতে বসল। তাদের সঙ্গে ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বসিয়ে দিল।

খাওয়া চলল। বিস্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। গলা নামিয়ে বললো—ফ্রান্সিস আমাদের দুজনের মত খাবার অল্প পড়ে আছে। কী করবো?

—এরা চাইলে দিয়ে দাও। ফ্রান্সিস বলল।

—তার মানে—বিস্কো বলতে গেল।

—হ্যাঁ। উপবাস। ফ্রাসিস বলল।

সবার খাওয়া হল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—

—বলে লাভ নেই। তবু বলছি কেউ ঘুমিয়ে পড়বে না। রাজা মুজার্তার সৈন্যদেরও বলছি কথাটা। সময় হলেই আমি ডাকবো।

ভাইকিংরা, সৈন্যরা শুয়ে বসে সময় কাটাতে লাগল।

ফ্রান্সিস আর বিস্কো পাশাপাশি বসেছিল। বিস্কো বলল—ফ্রান্সিস। আমাদের বন্ধুরা রাজা জুদেবার সৈন্যদের কীভাবে চিনবে?

—পোশাক দেখে আর গায়ের বাদামী রং দেখে। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা বন্ধুদের বলে দাও। বিস্কো বলল।

—তুমিই বলো। আমি একটু বিশ্রাম করবো। ফ্রান্সিস বললো।

বিস্কো উঠে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব আমরা রাজা জুবেদার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি। সেই সৈন্যদের পরনে থাকবে জামার রঙ হলুদ আর চোঙের মতো প্যান্টের রঙ কালো। এটা আমি জেনেছি রাজপুরোহিত পিরেল্লোর কাছ থেকে। তাদের গায়ের রং তামাটে। এসব দেখেই ওদের চিনবে। এসময় পিরেল্লো উঠে দাঁড়াল। বলল—শাঙ্কো যা বলল সেটা রাজা জুবেদার সৈন্যদের পোশাক সম্বন্ধে। তোমরা অবশ্য সহজেই চিনবে।

ভাইকিংরা রাজা মুজার্তার সৈন্যরা কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। কেউ বসে রইল। তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে।

ফ্রান্সিস শুয়ে শুয়ে আক্রমণের নকশা ঠিক করছিল ও ভাবছিল—সদর দেউরি দিয়ে একদল ভাইকিং আর সৈন্যরা ঢুকবে। রাজবাড়ির পেছনে বিস্কো খিড়কির দরজা দিয়ে ভাইকিং, সৈন্যদের দিয়ে আক্রমণ করবে। যতক্ষণ রাজা জুবেদার সৈন্যরা হার স্বীকার না করবে ততক্ষণ লড়াই চলবে। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—ভাইসব—আমার পরিকল্পনা শোন। একদল সদর দেউড়ির সৈন্যদের আক্রমণ করবে। অন্য দল রাজবাড়ির পেছনের খিড়কি দরজার প্রহরীদের আক্রমণ করবে। একসঙ্গে। দু'জায়গাতেই লড়াই হবে। রাজা জুবেদার সৈন্যরা পরাজয় স্বীকার করবে। ওরা হেরে যাবে এটা ঠিক। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—কিন্তু আসল লড়াই হবে এরপরে। ওরা রাজা মুজার্তার সৈন্যাবাস দখল করেছে। সেখানে রাজবাড়ি আক্রান্ত এই খবর ওদের দেওয়া হবে। তখন ওরা ছুটে আসবে। ঐ প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়াব আমরা। ওখানেই ওদের সঙ্গে আমাদের লড়াই হবে। শেষ লড়াই। তোমরা সেই আক্রমণের মোকাবিলার জন্য তৈরি থাকো। একটু থেমে বলল—রাজবাড়ির পাহারাদাররা হয় মরেছে, আহত হয়েছে নয়তো পালিয়েছে। এখন রাজা বন্দী, রাজবাড়িও আমার কব্জায়। শেষ লড়াই। তোমরা তৈরি হও।

সূর্য উঠল। পূবের আকাশ লাল হয়ে গেছে। এখন সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চারদিক আলোয় আলোময়।

জুদেবার সৈন্যরা ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আক্রমণ করো। ওদের একমাত্র অস্ত্র বর্শা। যে করেই হোক সেই অস্ত্র ওদের হাত থেকে ছাড়াতে হবে। তাহলেই ওরা নিরস্ত্র হয়ে পড়বে। খালি হাতে ওরা কী লড়াই করবে। অস্ত্র কাড়ো।

ফ্রান্সিসরা প্রান্তরে উঠে এল। সারি বেঁধে দাঁড়াল।

জুদেবার সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের ওপর বর্শা ছুঁড়ে মারল। ফ্রান্সিসরা বিদ্যুৎগতিতে সরে সরে গেল। বর্শাগুলো মাটিতে পড়ে রইল। অবশ্য দুজন-একজন ভাইকিং অন্যটি রাজা মুজার্তার সৈন্য আহত হল। ফ্রান্সিসরা কয়েকজন আহত যুবককে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে রাজবাড়িতে এক একটা ঘরে মেঝেয় শুইয়ে দিল।

ওদিকে প্রান্তরে লড়াই চলছে। জুবেদার সৈন্যরা বর্শা ছুঁড়তে লাগল। বর্শা হাতছাড়া হতেই তারা অস্ত্রহীন দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাইকিংরা তাদের তরোয়াল চালিয়ে আহত করতে লাগল। জুদেবার সৈন্যরা কখনও তরোয়ালের সঙ্গে লড়াই করে নি। ওরা হকচকিয়ে গেল। কীভাবে লড়বে তা বুঝে উঠতে পারল না।

লড়াই চলল। রাজা জুদেবার সৈন্যরা বিদ্যুৎগতিতে তরোয়ালের মার রুখতে পারল না। দলে দলে হার স্বীকার করতে লাগল।

বিকেলের দিকে জুদেবার সব সৈন্য হার স্বীকার করল। ওদের দড়িতে হাত বেঁধে রাজবাড়িতে নিয়ে আসা হল।

রাজা জুদেবা শয়নকক্ষে পালঙ্কের ওপর বসে রইলেন। পরাজিত অসহায় রাজা জুদেবা পিরেল্লোকে নিয়ে ফ্রান্সিস শয়নকক্ষে এল। পিরেল্লো বলল—লড়াইয়ের খবর জানেন তো?

—আন্দাজ করতে পারছি। আমার সৈন্যরা পরাজিত। জুদেবা বললেন।

—হ্যাঁ। বেশ কিছু সৈন্যকে বন্দী করা হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল—এই রাজবাড়ির দেউড়িতে প্রহরীরা পেছনের খিড়কি দুয়ারের প্রহরীরা সবাই হেরে গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আমাকে তো—রাজা জুদেবা বলতে গেল।

—এই রাজ্য থেকে বিদায় সঙ্গে আপনার সৈন্যদেরও বিদায় নিতে হবে। আর একটা কথা—আপনাকে মুক্তির একটা শর্ত আছে। আপনি ভবিষ্যতে কোনদিন এই রাজ্য আক্রমণ করবেন না।

—বেশ। বেশ ভারি গলায় রাজা জুদেবা বলল।

—আপনাদের একটু পরেই রওনা হতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—না—না। অন্ধকারে খুব অসুবিধে হবে। রাজা বলল।

—না। আপনাকে একটু পরেই যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা রাতের খাবার খেয়ে—রাজা বলতে গেল।

—না। আপনাকে খেতে দেওয়া হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—উপবাস?

—হ্যাঁ। পিরেল্লোর কাছে শুনেছি—আপনি নাকি নিরীহ প্রজাদের উপোসী রেখে তাদের তিলে তিলে মৃত্যু দেখতে ভালোবাসেন। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—বলুন—ঠিক কি না।

—না—মানে—অপরাধ করলে—রাজারা বলতে গেল—

—না। নির্দোষকেও হত্যা করে থাকেন। ফ্রান্সিস বলল। রাজা জুদেবা কোন কথা বলল না। তারপর বলল—

—দুটো মশাল যদি—

—না। অন্ধকারে হেঁটে যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল—হ্যাঁ শুনেছি আপনী নিরীহ প্রজাদের অন্ধকার রাতে বনের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেন। অন্ধকারে

বনের মধ্যে গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে অনেকেই মারা যেত। তাছাড়া বন্য পশুদের আক্রমণ বা সাপের ছোবলে তারা মারা যেত। বলুন—ঠিক কি না।

রাজা জুদেবা চুপ করে রইল। হয়তো বিনা অপরাধে প্রজাদের উপর যে অত্যাচার করেছে তার কথাই ভাবল।

রাতের খাওয়া শেষ হল। বিস্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস এবার রাজা জুদেবা আর তার সৈন্যদের নিয়ে কী করবে?

—রাজা জুদেবা রাতে অন্ধকারে বনের মধ্যে দিয়ে ফিরে যেতে হবে। সৈন্যরাও রাজার সঙ্গেই যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু সৈন্যদের কী দোষ? ওরা তো রাজার হুকুম তামিল করেছে। বিস্কো বলল।

—বেশ ওদের হাতের দড়ি কেটে দাও। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটাই এখন করি তাহলে। বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ। যাও। ফ্রান্সিস বলল।

বিস্কো রাজা জুদেবার সৈন্যদের হাতে বাঁধা দড়ি কেটে দিল। তারপর প্রান্তরে নিয়ে এল। হাতের বাঁধন কাটা হয়েছে। ওরা এতেই খুশি। ওরা অন্ধকারে হেঁটে চলল। রাজা জুদেবাকে প্রান্তরে নিয়ে আসা হল। ফ্রান্সিস অন্ধকারে রাজার কাছে এসে বলল—নিন—পথে খাবেন। এই বলে দুটো আপেল রাজাকে দিল। রাজা নিল। তারপর তার দেশের দিকে পা বাড়াল।

রাজা জুদেবাকে সামনে রেখে তার সৈন্যরা চলল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ঐ বনের মধ্যে দিয়ে রাজাকে নিয়ে যেতে হবে।

—কিন্তু রাজা কি পারবেন? এই অন্ধকারে যেতে হবে। রাজা জুদেবার একজন সৈন্য বলল।

—তোমাদের রাজা নিরপরাধ প্রজাদের এইভাবে শাস্তি দিত। নিরপরাধ মানুষগুলোকে কী কষ্টে এই বনভূমি পার হতে হতো আজ তোমাদের রাজা সেই কষ্টটা ভোগ করুক। বুঝুক কষ্ট কাকে বলে। তোমাদের রাজাকে আমি রাতের খাওয়াও খেতে দিই নি। ফ্রান্সিস বলল। ফ্রান্সিস প্রান্তরে কিছুদূর পর্যন্ত রাজা জুদেবা আর তার পরাজিত সৈন্যদের সঙ্গে চলল বনের দিকে। বনের কাছাকাছি এসে ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ফিরে চলল রাজবাড়ির দিকে। ওখানেই বন্ধুরা আছে।

ফ্রান্সিস রাজবাড়িতে ফিরে এল। দেখল বন্ধুরা সব ছড়িয়ে টড়িয়ে শুয়ে আছে। মোমবাতির আলোয় যা দেখল তাতে বুঝল কিছু ভাইকিং গৃহকর্তা ভদ্রলোকের বাড়িতে চলে গেছে।

ফ্রান্সিস রাজা মুর্তাজার শয়নকক্ষে এল। রাজার জাজিম বিছানো বিছানায় বন্ধুরা শুয়ে আছে। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বিস্কো বলে উঠল—এসো তোমার জন্যে জায়গা রেখেছি। ফ্রান্সিস বিস্কোর পাশে শুয়ে পড়ল। ভীষণ ক্লান্ত মনে

হচ্ছে নিজেকে। বিস্কোর সঙ্গেও কথা বলতে ইচ্ছে করল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস সাধারণত ভোরেই ওঠে। সেদিন পারল না। উঠতে একটু বেলাই হল। উঠে দেখল রাজপুরোহিত পিরেল্লো ওর পাশেই বসে আছেন। ফ্রান্সিস উঠে বসল। তারপর ভেতরের ঘরে এসে হাতমুখ ধুল। দুহাত তুলে হাই তুলল। পিরেল্লোর কাছে এল। বলল—

—কিছু বলবেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। তারপর গলা নামিয়ে বলল—দেবতার মূর্তিগুলো বোঁচকায়—ফেরৎ দিন।

—উঁহু। রাজা কানবহনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার সমস্ত পরিকল্পনাই মাঠে মারা গেল। পিরেল্লো বলল।

—হ্যাঁ—চোরাই মাল হাতছাড়া হয়ে গেল। ফ্রান্সিস বলল।

বিস্কো খাবার নিয়ে এল। তিনজনের জন্যেই আনল। বুনো আলু আর সব্জিপাতার ঝোল। সঙ্গে দুটো করে রুটি। তিনজনে খেতে লাগল।

—এখন কী করবে? বিস্কো বলল।

—সেকথাই ভাবছি কাল রাত থেকে। রাজা হানমের গুপ্তধনের কথা জেনেছি। কাজেই ঐ গুপ্তধন উদ্ধার করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী করে করবে? পিরেল্লো জানতে চাইল।

—আগে তো রাজা হানমের মন্দিরে যাই। সব দেখিটেখি। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে সোনার মূর্তিগুলো ফেরৎ পাবো না? পিরেল্লো বলল।

—না। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি—গুপ্তধন খোঁজার ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করতে পারতাম। পিরেল্লো বলল।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—আপনি যদি ঐ ধনভাণ্ডারের খোঁজ জানেন তবে উদ্ধার করলেন না কেন?

—চেষ্টা করেছি। নানাভাবে। গুপ্তধন পাইনি। আরো চেষ্টা করলে পেয়ে যাবে হয়তো। পিরেল্লো বলল।

—তাহলে সেই চেষ্টাই করুন। আমরা চলে যাই। বিস্কো বলল।

—না না। এটা রাজা কানবহনা শুনলে আমি বিপদে পড়ে যাবো। পিরেল্লো বলল।

—তাহলে আর কথা না। গৃহকর্তার বাড়িতে যান। গৃহকর্তাকে দিয়ে তিনটে শস্যটানা গাড়ির ব্যবস্থা করুন। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে যাচ্ছি। পিরেল্লো বলে গেলেন।

রাজা মুজার্তা রাণী ও পুত্রকে নিয়ে বিকেলে এলেন। শয়নকক্ষে ফ্রান্সিসদের দেখলেন। রানী ছেলেকে নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন। পরিচারক পরিচারিকারা ফিরে এল। রাজবাড়িতেও সমস্ত দেশে আনন্দ উৎসব শুরু হল।

রাজা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের ডানহাতটা ধরলেন। বললেন—আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম। আপনাদের জন্যেই আমি সব ফিরে পেলাম। ফ্রান্সিস বলল—আপনি আপনার সব ফিরে পেয়েছেন এতেই আমি আনন্দিত।

—আপনারা কি আজকেই চলে যাবেন? রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ। বন্ধুরা জাহাজে চলে যাবে। আমরা কয়েকজন রাজা কানবহ্নার রাজধানীতে থাকবো কিছুদিন।

—আপনারা কয়েকজন থাকবেন কেন? রাজা জানতে চাইলেন।

ফ্রান্সিস একটু থেমে বলল—অতীতের রাজা হানমের গুপ্তধনের কথা তো শুনেছেন।

—হ্যাঁ। শুনেছি। রাজা বললেন।

—সেই গুপ্তভাণ্ডার আমরা উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবেন? রাজা একটু হতাশার সঙ্গেই বললেন।

—নিশ্চয়ই পারবো। ফ্রান্সিস জোর দিয়ে বলল।

ফ্রান্সিসরা খেতে বসেছে তখনই পিরেল্লো দুটো ঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়ে এল। গাড়ি রেখে পিরেল্লো রাজবাড়িতে ঢুকল। খাওয়ার ঘরে ঢুকে দেখল ফ্রান্সিসরা খেতে বসেছে। ফ্রান্সিস গলা তুলে বলল—পিরেল্লো আপনি আসুন এখানে আপনার জন্যে জায়গা রেখেছি। পিরেল্লো এসে বিস্কোর পাশে বসল।

—ক'টা গাড়ি পেলেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—দুটো। তবে ঐ গৃহকর্তা বলেছেন আর একটা গাড়ি তিনি এনে রাখবেন। পিরেল্লো বললেন।

—তাহলে কোন সমস্যাই নেই। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসদের খাওয়া শেষ হল।

ফ্রান্সিস আর বিস্কো রাজবাড়ির বাইরে এল। দেখল ভাইকিং বন্ধুরা রাজবাড়ির বাইরের প্রান্তরটায় সবাই বসে আছে।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—ভাইসব যে কাজের জন্যে আমাদের এখানে আসতে হয়েছিল সেই কাজ বলা যায় সুসম্পন্ন হয়েছে। এখন জাহাজে ফেরা। তোমরা গিয়ে জাহাজে উঠবে কিন্তু আমি আর বিস্কো যাবো না। এরপরেই রাজা কানবহ্নার রাজ্য। সেখানে রাজা হানমের গুপ্তধন খুঁজে বের করতে হবে। এই কাজ সেরে আমরা জাহাজে ফিরবো। ভাইকিং বন্ধুরা চুপ করে ফ্রান্সিসদের কথা শুনল। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—গাড়ি এসে গেছে। আমরা এক্ষুনি যাত্রা শুরু করবো। তবে আমাদের তিনটি গাড়ি পেলে ভালো হত। যে বাড়িতে আমরা ছিলাম তার কর্তা আর একটা গাড়ির ব্যবস্থা করবেন জানিয়েছেন। যাওয়ার পথে গাড়ি পেলেই আমাদের ঠাসাঠাসি করে আর যেতে হবে না। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—তাহলে এবার যাত্রা শুরু।

সব ভাইকিংরা গাড়ি দুটোয় উঠল। সবার জায়গা হল না। ওরই মধ্যে

চাপাচাপি করে ভাইকিং বন্ধুরা জায়গা করে নিল। পিরেল্লোও ফ্রান্সিসের পাশে জায়গা করে নিল।

গাড়োয়ানের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—এবার চলো।

গাড়ি চলল। ভাইকিংরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। কাঠের চাকায় ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ তুলে গাড়ি দুটো চলল।

গাড়ি বেশ আস্তে আস্তে চলল। দু-একজন ভাইকিং বন্ধু গলা তুলে বলল—ও ভাই গাড়োয়ান—একটু তাড়াতাড়ি চালাও। একটু তাড়াতাড়ি চলেই আবার টিকির টিকির চলল।

প্রায় সন্ধ্যের মুখে ফ্রান্সিসরা সেই গৃহকর্তার বাড়ির সামনে এল। দেখল একটা শস্যটানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভাইকিংরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

গৃহকর্তা বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল—

—আপনাদের জন্য গাড়ি আনিয়ে রেখেছি।

—অনেক ধন্যবাদ। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

বিস্কো ডাকল—ফ্রান্সিস।

—কী বলছো? ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকাল।

—বলছিলাম এখন সামনে রাত। কোথায় থাকবো, খাবো। বরং এখানেই আমরা আশ্রয় নিই। থাকা-খাওয়া দুটোই জুটবে। কাল ভোরে বেরিয়ে পড়বো। বিস্কো বলল।

ফ্রান্সিস গৃহকর্তাকে বলল—এই রাতে গেলে রাতের খাওয়াদাওয়ার সমস্যায় পড়বো। আপনি যদি আমাদের—মানে এই রাতটা—

—অবশ্যই। আসুন—আসুন। গৃহকর্তা বলল।

রাতে ঐ বাড়িতেই ভাইকিংরা থাকল-খেল। গাড়ির ঝাঁকুনিতে সবাই কমবেশি গা হাত কোমরের ব্যথায় কাহিল হয়ে পড়ল।

হাত পায়ে ব্যথা নিয়েই রাত কাটাল ভাইকিংরা।

ভোর হল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙল। বন্ধুরা মুখটুখ ধুচ্ছে। নিজেও মুখ ধুয়ে এল। একটু পরেই সকালের খাবার দেওয়া হল। বাসি মোটা রুটি আর তরিতরকারী। খেতে খেতে বিস্কো বলল—

—ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

—আমরা দুজন বাদে তোমরা সবাই জাহাজে ফিরে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা হানমের গুপ্তধন খুঁজবে? বিস্কো বলল।

—নিশ্চয়ই। ফ্রান্সিস বলল।

এবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস যদি কিছু না মনে কর তবে একটা কথা বলি।

—বলো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি ভাবছি—মানে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। এটা তো সবাইকে বলা

যায় না। আমি জাহাজেই থাকবো। কয়েকটা দিন বিশ্রাম নেবো। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—তুমি কি দেশে ফিরে যেতে চাও? শাঙ্কো চমকে গিয়ে বলল—না, না ফ্রান্সিস। তোমার সঙ্গ আমি কোনমতেই ছাড়বো না। একটু থেমে বলল—আমি জাহাজে যাবো না।

—না তোমার বিশ্রাম চাই। আমি বিস্কোকে নেব। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। কয়েকদিন বিশ্রাম না নিলে আমি পারবো না। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। তুমি বিস্কোকে ডেকে দাও। ফ্রান্সিস বলল।

একটু পরে শাঙ্কো বিস্কোকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর শরীর খারাপের কথা বলল। এটাই বলল—শাঙ্কো বিশ্রাম নেবে। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

—ঠিক আছে। তবে শাঙ্কোর ছোরা ছোঁড়ার হাত আমার নেই। ও নিঁখুত।

কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু এল ফ্রান্সিসের কাছে। বলল—দুপুরের খাওয়াটা খেয়ে বিকেল নাগাদ রওনা দিতে চাই। ফ্রান্সিস মাথা এপাশ ওপাশ করল। বলল—না। এখনই রওনা দেব।

—দুপুরে কোথায় খাব? একজন ভাইকিং বন্ধু বলল।

—যদি খাবারের ব্যবস্থা না করতে পারি তবে খাব না। ফ্রান্সিস বলল।

—রাতও তো হয়ে যাবে। একজন ভাইকিং বলল।

—হ্যাঁ তা তো হবেই। আমরা রাতেই গাড়ি চালাবো।

এবার যাওয়ার তোড়জোড় চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভাইকিংরা গিয়ে গাড়িতে চড়ল। ফ্রান্সিস এ বাড়ির কর্তা ভদ্রলোককে কাছে আসতে বলল। ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। ফ্রান্সিস তার দু'হাত নিজের দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। বলল—আপনি আপনার স্ত্রী মেয়েকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবেন।

গাড়ি ভাইকিংদের নিয়ে চলল। ঝাঁকুনিও চলল। আজকে আর আগের দিনের মত কষ্ট হচ্ছে না। পাথরের টুকরো পাতা মাটির পথ। বোধহয় সেইজন্যেই।

অন্ধকার। কোনদিকে কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নেই।

হঠাৎ একটা মোড়ে কিছু মোমবাতির আলো দেখা গেল। কিছু দোকানপাট। ভাগ্যি বলতে হবে একটা সরাইখানাও পাওয়া গেল।

ফ্রান্সিস বিস্কোকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল। দুজনে সরাইখানায় ঢুকলো। কয়েকটা টানা টেবিল মতো। তার ওপর জ্বলন্ত মোমবাতি রাখা। সরাইখানার মালিক এগিয়ে এল। কৃতার্থের হাসি হেসে বলল—আপনারা খাবেন?

ফ্রান্সিস মোটামুটি বুঝল। মাথা ঝাঁকাল। তারপর মালিককে বাইরে নিয়ে এল। গাড়ি দেখিয়ে বলল—আমরা সবাই খাবো। মালিক ভাইকিংদের অন্ধকারে যতটুকু দেখল বুঝল এত লোকের খাবার তার নেই। সে বলল সে কথা। ফ্রান্সিস বিস্কোকে বলল—যাও শাঙ্কোর কাছ থেকে দুটো সোনার চাকতি নিয়ে এসো। বিস্কো চলে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সোনার চাকতি নিয়ে এল। দুটো চাকতিই মালিককে দিল। বলল—রান্না চড়ান। বুনো মুরগী কিনে আনুন। বুনো মুরগীর

ঝোল আলু দিয়ে আর রুটি। কী? পারবেন তো? মালিক হাসল। বলল পারবো।

দোকানের মালিক তার দুই রাঁধুনিকে নিয়ে রান্নার আয়োজন করতে লাগল। গাড়ি থেকে কিছু ভাইকিং বন্ধু নেমে এল। দোকানে ঢুকল। লম্বা টুলে হাত পা ছড়িয়ে বসল। গল্পটল্প চলল। এক বন্ধু ডাকল—ফ্রান্সিস?

ফ্রান্সিস তার দিকে তাকাল। ভাইকিং বন্ধুটি বলল—মনে হয় কাল সকালের আগে খেতে পাবো না।

—কী যে বলো। এদের পেশাই হল রান্না করা, পরিবেশন করা। ঠিক পারবে। দেখো। ফ্রান্সিস বলল।

সময় তো কাটাতে হবে। ভাইকিংরা কয়েকজন দল বেঁধে রাস্তার ওপর দাঁড়াল। হাততালি শুরু হল তারপর সেইসঙ্গে নাচ। ইয়া মোটা এক বন্ধু গান ধরল। দেশের গান। কয়েকজন ভাইকিং ওকে থামিয়ে দিল। বলল—অন্য গান গা। দেশের গান শুনলে ভীষণ মনখারাপ করবে। মোটা গায়ক তাই সরু নাকি গলায় অন্য গান ধরল। গান আর হাততালির সঙ্গে নাচও চলল।

একসময় রান্না শেষ হল। সবাই দুড়দাড় ছুটে এল। লম্বা টুলে সবাই বসতে পারল না। মালিক আর একটা লম্বা টুল এনে দিল। তাতেও কুলোল না। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—দু'তিনটে করে পাতা নাও। তারপর মাংসের ঝোল আটকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাও। ফ্রান্সিস আর কয়েকজন ভাইকিং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে লাগল।

ফ্রান্সিস যা আশঙ্কা করছিল তাই হল। মাংসের ঝোলে টান পড়ল। মালিক ফ্রান্সিসের কাছে এল। মুখ কাঁচুমাঁচু করে বলল—মাংস তো শেষ। কী করি?

—কী আর করবেন। একটা দুটো মুরগী কাটতেই পারতেন।

—আর মুরগী ছিল না। সরাইওয়ালা বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—মাংস কম পড়ে গেছে। শুধু রুটি খাও। একটু গুঞ্জন উঠল। কিন্তু কেউ কিছু বলল না। গাড়োয়ান তিনজনকেও ফ্রান্সিস খেতে ডাকল।

আবার গাড়ি চলল অন্ধকারে।

ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ সাদাটে হয়েছে। পুবদিকে আকাশ লালচে হয়েছে।

একটু পরেই সূর্য উঠল।

ভোর ভোর সময়ে ওরা কনিবজ্জনার রাজ্যে পৌঁছল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—গাড়ি থামাও। তিনটে গাড়িই থামল।

ফ্রান্সিস বিস্কো আর পিরেল্লোকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব জাহাজে উঠে রাজকুমারীকে বলো যে আমি দিনকয়েকের মধ্যেই ফিরবো। আমার জন্যে যেন দুশ্চিন্তা না করে।

—ঠিক আছে। তুমি তাড়াতাড়ি কাজ সার। শাঙ্কো বলল। তারপর ওর

বোঁচকাটা বিস্কোকে দিল। বলল—এই বোঁচকায় চোরাই মাল আছে। বেশ দামি। সাবধানে রাখবে। ফ্রান্সিস তোমায় সবকিছু বলবে।

শাঙ্কোদের গাড়ি চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা ওদের ঘরের সামনে এল। ঘর তালাবন্ধ। ফ্রান্সিস পিরেল্লোর দিকে তাকাল। বলল—সেনাপতি মশাইকে একটু খবর পাঠাতে হয় যে আমরা এসেছি। ঘরের চাবিটাও তো আনতে হয়।

—যাচ্ছি। পিরেল্লো চলে গেল।

কিছু পরে একজন সৈন্যকে নিয়ে ফিরলেন। সৈন্যটি বলল—আপনারা যেন কাল রাজদরবারে যান। আপনাদের সঙ্গে সেনাপতি কথা বলবেন।

সৈন্যটি ঘরের দরজাটা খুলল। ফ্রান্সিসের দিকে চাবিটা বাড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস চাবিটা নিল।

তিনজনে ঘরে ঢুকল। ঘরে পাতা ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। বিস্কোও বোঁচকাটা মেঝেয় রাখল।

পিরেল্লো বলল—ফ্রান্সিস বোঁচকাটা এবার আমাকে দিন।

—না। ফ্রান্সিস মাথা নাড়লেন। রাজা কানবহ্নাকে দিয়ে দেব।

—পেলেন কোথায় জিজ্ঞেস করলে আপনি কী বলবেন? পিরেল্লো বলল।

আপনার কথা বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি দেবমূর্তি চুরি করেছি জানলে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। পিরেল্লো বলল।

—ঠিক আছে। দেখি কী করা যায়। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনি এখন কী করবেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—বাড়ি যাবো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবো। আমার কাজের বৌটিকে ডাকবো। কিছু খাবো। তারপর রাজসভায় যাবো।

—সেখানেই দেখা হবে। ফ্রান্সিস বলল।

পিরেল্লো চলে গেলেন।

ফ্রান্সিসরাও কিছু খেয়ে নিল। তারপর রাজবাড়ির দিকে চলল।

রাজসভায় বেশ ভিড়। বিচার চলছে। ফ্রান্সিসরা গিয়ে দাঁড়াল। সেনাপতিও একপাশে বসে আছে। সেনাপতি রাজার অনুমতি নিয়ে আসন থেকে নেমে এল। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল—আপনাদের কী ব্যাপার? কোথায় গিয়েছিলেন?

—রাজা মুর্জাতার দেশে। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? সেনাপতি জানতে চাইল।

—কী আর বলবো। আমাদের মিথ্যে বলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বিস্কো বলল।

—সে আবার কী? সেনাপতি বলল।

—সব পরে বলবো। এখন আমারা রাজা হানমের গুপ্তধন উদ্ধার করতে কাজ শুরু করবো। রাজার কাছে সেই ব্যাপারে অনুমতি নিতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি রাজার কাছে এল। কী বলল রাজাকে। রাজা কী বললেন। সেনাপতি ফ্রান্সিসদের ডাকল। ফ্রান্সিসরা এগিয়ে গেল। রাজা ফ্রান্সিসকে চিনলেন। বললেন—

—শুনুন। আপনাদের সবরকম সাহায্য দেওয়া হবে। আপনারা কাজ শুরু করুন।

হঠাৎ ফ্রান্সিস শুনল পেছন থেকে রাজপুরোহিত পিরেল্লো গলা চড়িয়ে বলে উঠল—মান্যবর রাজা এই দুই বিদেশী মন্দিরের শায়িত সাত দেবমূর্তি চুরি করেছে।

—মিথ্যে কথা। বিস্কো গলা চড়িয়ে বলল। ফ্রান্সিসের কাছে এরমধ্যে বিস্কো সবই শুনেছিল।

—আমার কথা বিশ্বাস না হয়—মাননীয় সেনাপতিকে পাঠান। উনি নিজের চোখে সব দেখবেন। এরা চোর। পিরেল্লো বললেন।

রাজা ক্রুদ্ধ চোখে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকালেন। বললেন—তোমরা মূর্তি চুরি করেছো?

ফ্রান্সিস এরকমভাবে একটা সমস্যায় জড়িয়ে যাবে এটা আগে ভাবে নি। একটা বোকার মত কাজ করেছে ও। মনে জোর আনল। বলল—মহামান্য রাজা আমরা এখনও জানি না সাত দেবতাদের মন্দির কোথায়? মূর্তি দেখা তো দূরস্থান, চুরিটুরির কথা তো ওঠেই না।

—দেখা যাক। রাজা সেনাপতিকে ডাকলেন। সেনাপতি কাছে এল।

রাজা বললেন—মূর্তি চুরির খবর আপনি কবে পেয়েছেন?

—দিন সাতেক আগে। সেনাপতি বলল।

—ঠিক আছে। আপনি যান। রাজা বললেন। তারপর পিরেল্লোকে বললেন—আপনি যান। দেবমূর্তিগুলো যথাস্থানে রাখবেন।

—আমার একটা কথা ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—কী কথা?

—দিন ছয় সাতেক আগে—এক গভীর রাতে এই রাজপুরোহিত পিরেল্লো আমাদের জাহাজে এসেছিলেন। তিনি বললেন—আমি সোনার দেবমূর্তি চুরি করে এনেছি। এই দেশ থেকে পালাবো। আমাদের জাহাজে চড়ে। আমরা বলি এ দেশের রাজপুরোহিত আপনি। কত সম্মান আপনার। এসব ছেড়ে চলে যাবেন কেন? উনি বলেন—বহুদিন দেশছাড়া। আর এখানে ভালো লাগছে না। জিজ্ঞেস করলাম—আপনার দেশ কোথায়? বললেন পর্তুগাল। আমরা তাঁকে স্পষ্ট বলি আমরা একজন চোরকে আশ্রয় দেব না। ফ্রান্সিস বলল তারপর আপনার সভায় আসবো আর বোঁচকায় বাধা দেবমূর্তি দিয়ে দেবো। কিন্তু পরে

আমি মত পাল্টালাম। পিরেল্লো বলছিলেন—ধরা পড়লে তাঁকে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হবে। তখন ঠিক করলাম রাজপুরোহিতকে আর বিপদে ফেলবো না। মূর্তিগুলো একটা বোঁচকায় ভরে সেটা আমাদের ঘরে রেখে এলাম। রাজা হানমের গুপ্তধন উদ্ধারের বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলবো। তাই এসেছি। আমরা চোর না। যা ঘটেছিল তার সবই আমি বললাম। ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল—যদি অনুমতি দেন আমার আরও কিছু বলার ছিল।

—ঠিক আছে, বলো। রাজা বললেন।

—আমি পিরেল্লোকে বললাম—আমাদের মন্দিরে নিয়ে চলুন আমরা ওখানে যথাস্থানে মূর্তি রেখে দেব। পিরেল্লো রাজি হল। আমাদের নিয়ে আর দেবমূর্তি নিয়ে আমাদের মন্দিরে নিয়ে চললেন। ফ্রান্সিস একটু থামলো। পরে বলতে লাগলো—আমরা হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় মন্দির? আমরা মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করেছি মন্দির কোথায়? পিরেল্লো বলেছেন সে মন্দির মাটির নীচে। ওপর থেকে দেখাবো কী করে। আমরা আর কোন কথা না বলে হাঁটতে লাগলাম। দেবমূর্তির বোঁচকাটা আমরা হাতছাড়া করলাম না। সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময় আমরা রাজা মুজার্তার রাজত্বে পৌঁছালাম। গর্ভগৃহের মন্দির আর আমাদের দেখা হল না। সব ঘটনা সত্যি সত্যি বললাম। এখন আপনার বিচার।

রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে তোমরা মন্দির দেখোনি। কাজেই সাত দেবমূর্তি চুরির সঙ্গে তোমরা জড়িত নও।

—না, না। ওরা মিথ্যেবাদী। পিরেল্লো বলে উঠলেন।

—না। মিথ্যেবাদী আপনি। আপনিই কারো সাহায্য নিয়ে মূর্তি চুরি করেছিলেন। বিস্কো বলল।

সেনাপতি রাজার দিকে এগিয়ে এলেন। বলল—

—মান্যবর রাজা। ঐ ঘরে একটা বোঁচকায় মূর্তিগুলো রাখা আছে।

রাজা কানবহনা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। চারদিকে তাকিয়ে বললেন—আজকের সভা এখানেই শেষ। ততক্ষণে সভায় আসা প্রজারা চলে যেতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রজারা চলে গেল। রাজা পিরেল্লোর দিকে তাকালেন।

বললেন—আপনি স্নান করে আসুন। আপনি দেবমূর্তিগুলো যথাস্থানে রেখে দেবেন। পিরেল্লো মাথা একটু নুইয়ে চলে গেলেন।

—সেনাপতি। রাজা ডাকলেন।

—বলুন মান্যবর। সেনাপতি বলল।

—আমাদের ঐ ঘরে নিয়ে চলুন। রাজা বললেন।

—আসুন। সেনাপতি বলল।

রাজা সেনাপতি আর ফ্রান্সিসরা রাজবাড়ির বাইরে এলেন। সেনাপতি একটু এগিয়ে হাঁটতে লাগলেন। ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে এসে ঘরটা সেনাপতি দেখালেন।

সেনাপতি দরজার তালা খুলল। রাজা ভেতরে ঢুকলেন। সেনাপতি বোঁচকাটা দেখালেন। রাজা বোঁচকাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—কেউ যেন বোঁচকাটা না ছোঁয়। স্নান সেরে এখুনি পিরেল্লো আসছেন। উনি দেবমূর্তিগুলো যথাস্থানে রাখবেন।

রাজা আর ফ্রান্সিসরা বাইরে এল। ফ্রান্সিস বলল—মাননীয় রাজা, আমরা এখন কী করবো?

—হুঁ। ভেবেছিলাম কয়েদঘরে ঢোকাবো। এখন ভাবছি একটা সুযোগ তোমাদের দেব। রাজা বললেন।

—তাহলে রাজা হানমের গুপ্তধনের সন্ধান শুরু করবো? ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। তবে একটা কথা না বলতে পারলে তোমাদের ফাঁসি দেব। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—মাননীয় রাজা আমাদের ওপর অতটা নির্মম হবেন না। আমাদের ফাঁসী দিয়ে আপনার লাভ? আমরা তো আপনার শত্রু নই। আপনার দেশবাসীও নই।

—ঠিক আছে। পরে সব দেখা যাবে। রাজা বললেন। তখনই পিরেল্লো এলেন।

—আপনারা কাজ করুন। এই বলে সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে রাজা চলে গেলেন।

ফ্রান্সিস আর বিস্কো ঘরটায় ঢুকলো। দেখল পিরেল্লো বোঁচকাটা তুলছে—ফ্রান্সিস বলল—আপনাদের সঙ্গে আমরাও যাবো।

—কোথায়? পিরেল্লো বলল।

—মন্দিরটা দেখতে। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা বিদেশী। মন্দিরে ঢোকা বারণ। পিরেল্লো বললেন।

—রাজামশাইতো সেনাপতিকে ঢালাও বলে দিয়েছেন, আমরা এই রাজ্যের যেখানে খুশি যেতে পারি। আমাদের যাতে কেউ বাধা না দেয় রাজা সেকথাও বলেছেন। আপনিও তখন রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন।

—বেশ। চলুন। পিরেল্লো অগত্যা রাজী হলেন।

পিরেল্লো বোঁচকাটা মাথায় তুলে নিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা দরজা বন্ধ করে বাইরে এলো। তিনজনে চলল।

মন্দিরটা রাজবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই। মন্দিরে ঢুকতেই চারজন প্রহরী ফ্রান্সিসদের আক্রমণ করল।

অন্য প্রহরীটি ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে বর্শা তুলতে গেল কিন্তু ফ্রান্সিস ওকে হাত তুলতেই দিল না। এক লাফে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রহরীটি কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিস ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রহরীর বর্শাটা ধরে ফেলল। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে বর্শাটা প্রহরীর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল। বিস্কো তখন অন্য প্রহরীর

হাত থেকে ছোরাটা বের করে নিয়ে তার পিঠে বসিয়ে দিল। প্রহরীটি মুখে শব্দ তুলল—আঁ। তারপর পাথরের সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ল।

হাতে ধরা বর্শাটা ফ্রান্সিস পিরেল্লোর বুকে তাক করল। চাপাস্বরে বলল, এখন আপনি আমার নিশানার সামনে। শুধু বর্শাটা ছোঁড়ার অপেক্ষা।

পিরেল্লো কেঁদে ফেললেন। বলে উঠলেন, দোহাই আমায় হত্যা করবেন না।

আপনি আমাদের হত্যা করতে চেয়েছিলেন। বলুন, তাই কিনা? ফ্রান্সিস গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল।

না। হত্যা নয়, আপনাদের আহত করতে চেয়েছিলাম। পিরেল্লো বললেন।

কিন্তু কেন?

সোনার লোভে। আমি বুঝেছিলাম আপনারা রাজা হানমের গুপ্ত ধনসম্পদ উদ্ধার করতে পারবেন। তখন আহত নিরস্ত্র আপনারা আমাকে বাধা দিতে পারবেন না। দুজন প্রহরী আর আমি মিলে আপনাদের উদ্ধার করা ধনসম্পদ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারব।

হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর বলল, কাল সকালে আমি রাজসভায় যাবো। রাজা কানবহ্নাকে সব বলব। উনি আপনাদের যা করবার করবেন।

না-না। দোহাই, আপনি রাজাকে কিছু বলবেন না। রাজা আমাদের ফাঁসিতে লটকাবেন। পিরেল্লো বললেন।

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। তারপর বলল, আপনারা আমাদের হত্যা করতে চেয়েছিলেন। আমরা কোনরকমে জীবন রক্ষা করলাম। তার আগে কি একবারও ভেবেছিলেন যে আমরা বিদেশী, নিরস্ত্র, অসহায়!

—আপনাদের হত্যা করতে গিয়েছিলাম এই অপরাধের জন্যে যা শাস্তি দিতে চান দিন। শুধু একটা অনুরোধ, রাজাকে কিছু জানাবেন না।

ফ্রান্সিস, একে ছেড়ে দাও। কী হবে এই ছুঁচোটাকে মেরে? বিস্কো বলল।

আহত প্রহরীরা তখন সিঁড়ির ওপর শুয়ে কাতরাচ্ছে। তাদের পাশ দিয়ে ফ্রান্সিসরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাইরে চলে এল। বাইরে তখন সন্ধ্যে। চলল রাজবাড়ির দিকে।

ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। বিস্কো ফ্রান্সিসের পাশে বসল। বলল, এবার কি করবে?

রাজা হানমের গুপ্তধন আছে ঐ সাজঘরে। ফ্রান্সিস বলল।

ছড়াটায় সাজঘরের উল্লেখ আছে। বিস্কো বলল।

হ্যাঁ। সেইজন্যই সাজঘরটা ভালো করে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

তুমি কি নিশ্চিত যে গুপ্তধন সাজঘরেই আছে? বিস্কো বলল।

সম্পূর্ন নিশ্চিত নই। তবে পুজোর ঘরে অথবা সাজঘরে রাজা হানমের গুপ্তধন আছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

এখন কি করবে? বিস্কো জানতে চাইল।

কাল সকালে রাজসভায় যাব। রাজা কানবাহনার অনুমতি নেব, তারপর খোঁজাখুঁজি শুরু করবো।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। বিস্কো ঘুমিয়ে পড়লেও ফ্রান্সিস-এর চোখে কিন্তু ঘুম নেই। রাজা কানবহনার অনুমতি পাওয়া যাবে। কারণ ফ্রান্সিস আগেই বলে দেবে যে গুপ্তধন উদ্ধার করাই তার উদ্দেশ্য। গুপ্তধন থেকে ওরা কিছুই নেবে না। এটা শুনলে রাজামশাই লাফিয়ে উঠবেন। গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন। গুপ্তধন পাওয়ার লোভ কেউ দমন করতে পারে না। রাজাও পারবেন না। মনে হয় অনুমতি সহজেই পাওয়া যাবে। এইসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালের জলখাবার খেয়ে ফ্রান্সিসরা রাজসভার দিকে চলল।

রাজসভায় ঢোকার মুখে দেখল রাজপুরোহিত পিরেল্লো ওদের অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছেন। কাছাকাছি আসতেই রাজপুরোহিত বলেলন আমি আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বললেন, গতকালের কথা ভুলে যান। আপনাদের আমরা আহত করতে চেয়েছিলাম তার জন্য মাপ চাইছি।

বেশ আমি এ ব্যাপারে রাজাকে কিছু বলব না। আপনি আমাদের তার সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিন।

দেখছি। পিরেল্লো চলে গেলেন। একটু পরে ফ্রান্সিসরা দেখল, মন্ত্রীর সামনে মাথা নীচু করে পিরেল্লো কী বলছেন। মন্ত্রী মাথা ঝাঁকালেন। পিরেল্লো ফ্রান্সিসদের কাছে এলেন। বললেন, কিছু পরে আপনাদের ডাক পড়বে। ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। দুজনে অপেক্ষা করতে লাগল।

সেনাপতি ফ্রান্সিসদের নাম ডাকলেন। ফ্রান্সিস, বিস্কো এগিয়ে গেল মাথা ঝুঁকিয়ে রাজাকে সম্মান জানিয়ে বলল, আপনি আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তাতে আমরা খুশি। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, এবার কাজের কথা বলি। রাজপুরোহিত পিরেল্লো আমাদের মন্দিরে নিয়ে গেছেন, গর্ভকক্ষে নিয়ে গেছেন। পাশের সাজকক্ষও দেখিয়েছেন। শুধু একবার দেখেছি সেসব। কাজেই মাত্র একবার দেখে কিছু সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। আমরা আবার ভালোভাবে দেখব। তারপর বলতে পারব—রাজা হানমের ধনসম্পদ কোথায় রাখা হয়েছে।

হুঁ। দেখ চেষ্টা করে। কোনকিছুর প্রয়োজন পড়লে সেনাপতিকে বলবে। সব পাবে। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিসরা একটু মাথা ঝুঁকিয়ে চলে এল। পিরেল্লোও ওদের কাছে এলেন। পিরেল্লো নিশ্চিন্তের হাসি হেসে বললেন, আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম। আমার বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠলে আজ রাতেই আমার জীবন শেষ হয়ে যেত। এই রাজা কি খুব বদরাগী? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

সাংঘাতিক। যে তাঁকে মাথা নুইয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা না জানায় তাকে হাত-পা বেঁধে ইরা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।

ভাগ্যিস যথাসময়ে মাথা নীচু করে শ্রদ্ধা-ভক্তি জানিয়েছি। আমরা খুব বেঁচে গেলাম। বিস্কো বলল।

ফ্রান্সিসরা তাদের আস্তানায় ফিরে এল। পিরেল্লো পিছু ছাড়লেন না। ঘরের তালা খোলা হলো। সবাই ঘরটায় ঢুকল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। পিরেল্লো বিস্কো বলল।

ফ্রান্সিস? পিরেল্লো ডাকলেন।

হুঁ।

সত্যিই কি আপনি এই রহস্যের সমাধান করতে পারবেন?

সবকিছু না দেখে না বুঝে বলতে পারবো না। তবে রাজা হানমের গুপ্তধন আমি উদ্ধার করবোই। তার জন্য একটু সময়ের দরকার। সেই সময়টা আমাদের পেতে হবে।

সেই সময় আপনারা পাবেন। পিরেল্লো বললেন।

দেখা যাক।

ফ্রান্সিস, আপনারা তো মন্দিরে রাজা হানমের গুপ্তধনের খোঁজে যাবেনই। অনুরোধ, আমাকেও সঙ্গে নিন। পিরেল্লো বললেন।

না। আপনাকে বিশ্বাস করি না। আপনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

আমি আপনাদের কোনো ক্ষতি করব না। বরং আপনাদের সাহায্য করব।

আপনার সাহায্যের দরকার নেই। আমরাই সব পারব। বিস্কো বলল।

তবু আমাকে সঙ্গে নিন। পিরেল্লো বললেন।

না। আপনার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বিদেয় হোন। ফ্রান্সিস বলল।

আমার অনুরোধ—পিরেল্লো বলতে গেলেন।

আপনার কোনো অনুরোধ শুনতে আমার আগ্রহ নেই। ফ্রান্সিস বলল।

পিরেল্লো আর কোনো কথা বললেন না। বেরিয়ে চলে গেলেন।

ফ্রান্সিস? বিস্কো ডাকল।

বলো। ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকাল।

পিরেল্লোকে সঙ্গে রাখলে ভালো হতো।

বিস্কো তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি। পিরেল্লো গুপ্তধনের লোভে প্রায় পাগল হয়ে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের হত্যা করতে পারে।

ওর হাতে তো কোনো অস্ত্রই নেই।

কোমরে একটা বড় ছোরা গোঁজা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

বলো কি? বিস্কো আঁতকে উঠল।

হ্যাঁ। আমরা কাজে ব্যস্ত থাকবো। গুপ্তধন উদ্ধারের মুখে ও আমাদের হত্যা করবে।

হুঁ। এটা হতে পারে। এখন কী করবে? বিস্কো জানতে চাইল। শোন। একটা লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। পিরেল্লো এ-দেশের রাজপুরোহিত। প্রহরীরা ওর কথা শুনবে। ও প্রহরীদের গুপ্তধনের লোভ দেখাবে। দলে টানবে। প্রহরীরা নির্দেশ পেলেই আমাদের অক্রমণ করবে। কাজেই আমাদেরও সাবধান থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

অর্থাৎ আমাদেরও লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বিস্কো বলল।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। কয়েকজনকে তরোয়াল নিয়ে আসতে বলবে। ওরা সবাই এলে মন্দিরে নামব। ফ্রান্সিস বলল।

বিস্কো খাবার খেয়ে রওনা হয়ে গেল।

একটু রাতে জাহাজে পৌঁছল বিস্কো। ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে এল। সকলেই জানতে চাইছে—ফ্রান্সিস ভালো আছে কিনা। গুপ্তধন উদ্ধার হয়েছে কিনা।

বিস্কো সব বলল। ফ্রান্সিসের শেষ নির্দেশটাও বলল। বিস্কোরা চারজন পোশাক পাল্টে কোমরে তরোয়াল গুঁজে জাহাজের ডেকে উঠে এল।

শাঙ্কো তৈরী হয়ে এল। বলল আমিও যাব চলো।

ডেকের একপাশে মারিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। বিস্কো মারিয়ার কাছে এল। বলল, ভয়ের কিছু নেই। ওখানে একটা ছোটোখাটো লড়াইয়ের মতো হতে পারে। আমরা জিতব। কোনোরকম দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো। শাঙ্কোরা এবার চলল রাজবাড়ির দিকে।

ভোর হয় হয় এমন সময় ওরা রাজবাড়ি পৌঁছল। প্রধান প্রবেশদ্বারে পেতলের বর্শা হাতে চারজন প্রহরী পথ আটকাল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল, সেনাপতি আমাদের সবরকম স্বাধীনতা দিয়েছেন। আমাদের আটকাবে না। একজন প্রহরী শাঙ্কোকে চিনল। দরজা খুলে বলল, আপনারা আসুন।

শাঙ্কোরা বিরাট মাঠে এল। শাঙ্কোর পেছনে পেছনে ওরা চলল ফ্রান্সিসদের আস্তানার দিকে। ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে এল সবাই। শাঙ্কো দরজায় ধাক্কা দিল।

আসছি। ফ্রান্সিসের গলা। ফ্রান্সিসের দরজা খুলল। বন্ধুরা ঘরে ঢুকল।

শাঙ্কো আর বিস্কোর কাছে সবই শুনেছিল ওরা। নতুন করে জানার মতো কিছু ছিল না। ফ্রান্সিসের কাছে আর কিছু জানতে চাইল না।

শুকনো খড়ের বিছানায় বসল সবাই। ফ্রান্সিস বলল, সবই শুনেছ। আমার কেমন মনে হচ্ছে গুপ্তধনের কথা বলে পিরেল্লো কয়েকজন প্রহরীকে দলে টেনেছে। গুপ্তধন আবিষ্কৃত হয়ে গেলে ওরা আমাদের আক্রমণ করতে পারে। আমাদের সাবধান থাকতে হবে।

মন্দিরে কখন যাবে? বিস্কো বলল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে। ঐ মন্দিরে কতক্ষণ থাকতে হবে জানি না। কাজেই পেট ভরে খেয়ে যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

একসময় রাজবাড়ির রাঁধুনি এসে খবর দিয়ে গেল, এখন খেতে দেওয়া হবে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ফ্রান্সিসরা তৈরী হলো। বিস্কো ফ্রান্সিসের তরোয়ালটা এনেছিল। এবার ফ্রান্সিসকে দিল।

ফ্রান্সিসরা চলল মাটির নীচের মন্দিরের দিকে।

মন্দিরের সামনে যখন ওরা এল, দূর থেকেই ফ্রান্সিস দেখল প্রহরীর সংখ্যা বেশী। ওখানে নিশ্চয়ই পিরেল্লো আছেন। উনি এত সহজে হাল ছেড়ে দেবেন না।

প্রবেশদ্বারের সম্মুখে দেখল পিরেল্লো দাঁড়িয়ে আছেন।

ফ্রান্সিসরা এসে দাঁড়াল। পিরেল্লো কি ইঙ্গিত করলেন প্রহরীরা সারি দিয়ে মন্দিরে ঢোকার মুখে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস প্রহরীদের সামনে গেল। বলল, আমরা লড়াই চাই না। আমাদের দুজনকে গর্ভমন্দিরে ঢুকতে দাও।

না। সর্দার প্রহরী বলল।

তুমি ভাই সেনাপতির হুকুম জানো না। ফ্রান্সিস বলল।

কী হুকুম? সর্দার জিগ্যেস করল।

গুপ্তধনের সন্ধান করতে আমরা যে কোনো জায়গায় যখন খুশি যেতে পারবো। এটা রাজার হুকুম। ফ্রান্সিস বলল।

অদ্ভুত হুকুম। সর্দার বলল।

হ্যাঁ, একটু অদ্ভুতই। পথ ছাড়ো।

সেনাপতির কাছে লোক পাঠাচ্ছি সেনাপতির হুকুম জানতে। সর্দার প্রহরী বলল।

বেশ। মিছিমিছি দেরি হবে এই আর কি। ফ্রান্সিস হতাশার ভঙ্গি করে বলল।

একজন প্রহরী বর্শা হাতে ছুটে গেল। কিছু পরে তাকে দেখা গেল মাঠের ওপার দিয়ে ছুটে আসছে। সর্দার প্রহরীর কাছে এসে সে হাঁপাতে লাগল। বলল, সেনাপতি বলেছেন, এঁরা যেখানে খুশি যেতে পারেন। আর আমরা যেন এঁদের সাহায্য করি।

ঠিক আছে। আপনি যান। সর্দার বলল।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের বলল, প্রথমে আমি আর বিস্কো যাবো। তোমরা এখানেই থাকো। ফ্রান্সিস-বিস্কো পাথরের দরজার দিকে চলল।

পিরেল্লো ছুটে এসে বললেন, আমাকেও নিয়ে চলুন।

না, আপনি যাবেন না। শাঙ্কো বলল।

কেন যাবো না? এ দেশ আমাদের। দেশের ভালো-মন্দ তো আমরাই দেখবো। আপনারা তো বিদেশী। পিরেল্লো উত্তর দিলেন।

ফ্রান্সিস ঢোকার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, ঠিক আছে। আপনারাই যান। রাজা হানমের গুপ্ত ধনসম্পদ খুঁজে বের করুন।

আমরা পারব না। আপনারা পারবেন। গুপ্তধন পেলে আপনারা সেটা নিয়ে পালিয়ে যেতে পারেন। পিরেল্লো বললেন।

সেটা দেখার জন্যে এই প্রহরীরা আছে। রাজা আছেন। ফ্রান্সিস বলল।

না। রাতের অন্ধকারে আপনারা সব মূল্যবান গুপ্তধন নিয়ে পালাবেন। পিরেল্লো বললেন।

ঠিক আছে। আপনার যখন এরকম সন্দেহ, আসুন আমাদের সঙ্গে। শুধু একটা কারণে আপনাকে সঙ্গে নিচ্ছি। রাজা হানমের ছড়াটা আপনি আমাদের দেখিয়েছেন। এতে গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজতে সুবিধে হবে। চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

পাথরের দরজার পাশে লোহার আংটায় আটকানো দুটো মশাল বিস্কো নিল। পিরেল্লো বললেন, একটা আমাকে দিন। বিস্কো ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে শাঙ্কো দুটো মশাল ধরাল। ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাইসব, তোমরা অপেক্ষা কর। অধৈর্য হয়ো না।

শাঙ্কো একটা মশাল নিল। পিরেল্লো অন্যটা। সিঁড়ি দিয়ে ওরা নামতে লাগল। বেশ গরম লাগছে। তিনজনই ঘামছে।

সিঁড়ি শেষ। একটা পাথরের মেঝে। ফ্রান্সিস মশালের আলোয় চারদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে-দেখতে ছড়াটা ও আওড়াতে লাগল ঃ

ছোট্ট সাজের ঘরে
রেখেছি বড় আদরে।
ধনসম্পদ কার তরে?
বুদ্ধিমান উদ্ধার করে
বোকারা হা-হুতাশ করে।

ফ্রান্সিস বলল, কী পিরেল্লো! ঠিক বলেছি।

হ্যাঁ। আশ্চর্য। আপনি ছড়াটা একবার দেখেই মুখস্থ করে ফেলেছেন।

ফ্রান্সিস কিছু বলল না। দেওয়ালগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বেদীর মতো টানা পাথরের উপর ফুলপাতা।

ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বলল, এই বেদীটা কি বরাবর আছে নাকি আপনারা গেঁথে ছিলেন?

না। এই বেদী আমরা বরাবর এইরকমই দেখে আসছি।

হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর পাথরের জোড়াগুলো খুব ভালো করে দেখতে লাগল। নাঃ, কোনো আলগা জোড়া নেই।

এবার ফ্রান্সিস পেছনের সাজঘরে ঢুকল। দেবতাদের পোশাক একটা লম্বাটে পাথুরে পাটাতনের ওপর জড়ো করা। ফ্রান্সিস চারপাশে তাকিয়ে দেখল। পাথরের দেওয়াল। এবড়ো-খেবড়ো। শুধু দেবতাদের পোশাক যে পাথুরে পাটাতনের ওপর রাখা সেই পাটাতনটা মসৃণ পাথরের।

ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল কোথায় থাকতে পারে রাজা হানমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার। ফ্রান্সিস বলল, পিরেল্লো—দেবতাদের পোশাক এখানেই থাকে।

হ্যাঁ। বছর অন্তর-অন্তর পুরোনো পোশাক খুলে ফেলে দেবতাদের নতুন সাজপোশাক পরানো হয়।

পুরোনো পোশাকগুলো ফেলে দেওয়া হয়? ফ্রান্সিস বলল।

না। সে-সব পোশাক রাজ্যের ধনীরা কিনে নেয়। খুব পবিত্র সেই পোশাকগুলো। পিরেল্লো বললেন।

এত পোশাক জমে আছে কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

এখনও বিক্রি করার সময় আসেনি। পিরেল্লো বললেন।

ফ্রান্সিস পাথুরের পাটাতনে রাখা সাজপোশাক দেখতে লাগল। একটা পাটাতনে কুঁদে কুঁদে গোল দাগ তোলা হয়েছে। এর নীচে কী আছে? এখানে পাথুরে পাটাতনটা কি ফাঁপা? নীচে কিছু আছে? বিস্কোকে ডাকল। মশালটা বিস্কোর হাতে ছিল। বলল, মশালটা নিচু কর।

বিস্কো মশলাটা নীচু করে ধরল। ফ্রান্সিস গোল দাগটা ভালো করে দেখল।

বিস্কো মশাল হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। একটু দ্রুতই পা ফেলে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিঁড়ি শেষ। বাইরে বেরিয়ে দেখল উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। চারদিক বেশ ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছে। বন্ধুদের দেখল মাঠটায় বসে আছে। দুজন ভাইকিং বন্ধু এগিয়ে এল। বলল, কী খবর বল।

ফ্রান্সিস খুব সম্ভব হদিস পেয়েছে।

তাহলে মনে হচ্ছে ফ্রান্সিস রহস্যের সমাধান করেছে। বন্ধুটি বলল।

তাই তো মনে হচ্ছে। বিস্কো বলল।

বিস্কো নিজেদের আস্তানায় চলল।

ওদিকে পিরেল্লো সর্বক্ষণ ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। এতে ফ্রান্সিস বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। কিন্তু উপায় নেই।

এবার পিরেল্লো এগিয়ে এলেন, বললেন, কোনো হদিস পেলেন?

না। তবে চেষ্টা করছি। ফ্রান্সিস বলল।

মিথ্যে কথা। আপনি গুপ্তধনের হদিস পেয়েছেন।

না। হদিস পাইনি এখনও। তবে কিছুটা আন্দাজ করেছি। ফ্রান্সিস বলল।

তবে সেটা বলুন। পিরেল্লো বললেন।

না। গুপ্তধন সম্বন্ধে সব বলতে আমি আপনার কাছে দায়বদ্ধ নই। ফ্রান্সিস উত্তর দিল।

তবে কাকে বলবেন আপনার এই গুপ্তধন খোঁজার কথা। পিরেল্লো জানতে চাইলেন।

বলবো রাজা কানবহনাকে। ফ্রান্সিস বলল।

না। আপনি আমাকে সব বলবেন। পিরেল্লো জোর দিলেন।

আগেই বলেছি আপনার কাছে আমি দায়বদ্ধ নই।

তাহলে আপনাদের মরতে হবে। পিরেল্লো বললেন।

অতটা কব্জির জোর থাকলে আমাদের হত্যা করুন। ফ্রান্সিস জানাল।

ফ্রান্সিস কিছু বোঝার আগেই পিরেল্লো কোমর থেকে একটা বাঁকা মাথা বড় ছোরা বের করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অন্যমনস্ক ফ্রান্সিস ছিটকে পড়ল মেঝেয়। পিরেল্লো ছোরাটা ফ্রান্সিসের বুক লক্ষ্য করে বিঁধতে গেলে ফ্রান্সিস ঘুরে গেল আর ছোরাটা বিঁধল ওর বাঁ বাহুমূলে। রক্ত বেরিয়ে এল। বিস্কো একটা লাফ দিয়ে পিরেল্লোকে জাপটে ধরল। তারপর বুকের নীচে হাত দিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে উঠল, ওকে হত্যা করো না। গুপ্তধনের ব্যাপারে ভাবতে-ভাবতে ওর মাথার ঠিক নেই।

শাঙ্কো দ্রুত ফ্রান্সিসের কাছে এল। মশালের আলোয় দেখল কাটা জায়গাটা বড় না হলেও বেশ রক্তপাত হচ্ছে। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে কাপড় ছিঁড়ে ফ্রান্সিসের কাটা জায়গাটা বেঁধে দিল। ফ্রান্সিসের একটু আরাম লাগল। রক্ত পড়া বন্ধ হলো।

ওদিকে পিরেল্লো দ্রুত উপরে উঠে এলেন। চার বর্শাধারীকে ডাকলেন। বললেন, দুটো চোর রাজা হানমের গুপ্তধন উদ্ধার করেছে। সেই ধনভাণ্ডার নিয়ে ওরা বাইরে আসবে। পালাতে চাইবে। ওদের পালাতে দিও না। তৈরী থাকো।

বিস্কো গলা চেপে বলল, বোঝাই যাচ্ছে এই লোকটা প্রহরীদের সাহায্যে ফ্রান্সিস আর বিস্কোকে বন্দী করবে।

এখনই প্রহরীদের আক্রমণ করবো? একজন ভাইকিং বন্ধু জানতে চাইল।

না। আগে ফ্রান্সিসরা উঠে আসুক। বিস্কো বলল।

কিছুপরে ফ্রান্সিসকে ধরে ধরে বিস্কো প্রধান দ্বার পর্যন্ত এল। এবার পিরেল্লো গলা চড়িয়ে বললেন, এই দুজনেরই কথাই বলছিলাম। ওদের হত্যা কর।

বিস্কো দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, ও---হো---হো---।

বন্ধুরাও ধ্বনি তুলল, ও-হো-হো।

প্রহরীরা বর্শা হাতে ফ্রান্সিস আর বিস্কোর দিকে ছুটে এল। বিস্কোরা প্রহরীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হলো লড়াই। বর্শা দিয়ে তরোয়াল ঠেকানো অসুবিধে। একবার বর্শা হাতছাড়া হলে আক্রমণকারী নিরস্ত্র হয়ে যায়। লড়াইয়ের মধ্যে ফ্রান্সিসের উচ্চস্বর শোনা গেল, ভাইসব, কাউকে হত্যা করো না। প্রয়োজনে বন্দী কর।

অল্পক্ষনের মধ্যে লড়াই শেষ। প্রহরীদের মধ্যে দু তিনজন আহত হয়ে ঘাসে ঢাকা মাঠে পড়ে রইল।

ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে পিরেল্লোকে খুঁজতে লাগল। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখল পিরেল্লো আর একজন প্রহরী একটা ওক গাছের তলা দিয়ে ছুটছে। ফ্রান্সিস বলল, বিস্কো আমি ছুটতে পারছি না। রক্তপড়া বেড়ে যাবে। তুমি ছুটে গিয়ে পিরেল্লোকে ধর।

বিস্কো সঙ্গে-সঙ্গে ছুটল। পলায়মান পিরেল্লো আর একজন প্রহরী তখন রাজবাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। বিস্কো দ্রুত ছুটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্কো পিরেল্লোদের কাছে এসে পড়ল। চেঁচিয়ে বলল, পিরেল্লো পালিয়ে রেহাই পাবেন না। কাজেই পালাবার চেষ্টা না করে আমাদের কাছে আসুন। ফ্রান্সিস আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে।

পিরেল্লো দাঁড়িয়ে পড়লেন। সঙ্গের যোদ্ধাটিও থামল। দুজনেই মুখ খুলে হাঁপাতে লাগল। বিস্কো ওদের কাছে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বিস্কো বলল—যদি রাজা হানমের ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করতে পারি, রাজা কানবহ্নাকে বলবো ধনভাণ্ডারের কিছু অংশ আপনাকে যেন দেন।

সত্যি বলছো? পিরেল্লো বললেন।

হ্যাঁ, সত্যি বলছি। আপনি ফ্রান্সিসের কাছে চলুন। আমরা আপনার কোনোরকম ক্ষতি করবো না। বরং আপনি ফ্রান্সিসকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন সেইজন্যে আমি আপনাকে এক্ষুণি মেরে ফেলতে পারি। বিস্কো বলল।

আমার দোষ হয়ে থাকলে—পিরেল্লো বলতে লাগলেন।

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বিস্কো বলল, ঠিক আছে, আপনি ফিরে চলুন।

তিনজন ফিরে চলল মন্দিরের দিকে। মন্দিরের দরজার কাছে এসে দেখল প্রহরীরা আহত হয়ে এখানে ওখানে ঘাসের ওপর পড়ে আছে। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টিতে তরোয়াল ঢুকিয়ে রেখেছে।

ফ্রান্সিস মশালের আলোয় খুব ভালো করে পাথরের পাটাতনটা দেখতে লাগল। দেবতাদের পোশাকের স্তূপ সরিয়ে দেখতে লাগল। তারপর পোশাকগুলো সরাতে শুরু করল। হঠাৎই দেখল—পাথরের নয় মসৃণ কাঠের বেদীমত। ফ্রান্সিস মাথা তুলে বলল—বিস্কো—মশালটা নামিয়ে ধরো। এ জায়গাটা ভালোভাবে দেখতে হবে। বিস্কো মশাল নামিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস বুঝল ওর অনুমান ঠিক। ঐ একহাত লম্বা জায়গাটা মসৃণ কাঠের।

—বলেন কী?

—হ্যাঁ। পিরেল্লো কাঠের পাটাতনটা দেখলেন। বললেন—আশ্চর্য—আমরা কোনদিন এটা লক্ষ্য করি নি। ওখানকার পোশাকও তুলে দেখি নি।

—আরো আছে। ফ্রান্সিস আঙুল দিয়ে দেখাল নীচের দিকে কাঠের ভাকমত। ফ্রান্সিস আঙুল চেপে দেখল তাকটা ভীষণ শক্ত। ফ্রান্সিস বলল—মশালটা কাছে আন। বিস্কো তাই করল। ফ্রান্সিস দেখল—কাঠ কুঁদে কুঁদে একটা ত্রিভুজমত আঁকা। তার মাঝখানে একটা ফুটোমত। বোঝাই যাচ্ছে ওটা তালা। কিন্তু এই তালার চাবি কই? ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে বলতে লাগল। কথাটা বলতে বলতে ঐ জায়গাতেই কয়েক পাক ঘুরল।

তারপর বলে উঠলো—শায়িত দেবতার গর্তগুলো দেখতে হবে। বিস্কো এসো। দেবমূর্তিগুলো দেখবো। দুজনে গুনল। সব মিলিয়ে সাতটা গর্ত। তাতে

দেবমূর্তি শায়িত। ফ্রান্সিস সাতের শেষে আরো দুটি গর্তমত দেখল। ফ্রান্সিস মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। তখনই মশালটা নিভু নিভু হয়ে এল।

—পিরেল্লো তেল পাওয়া যাবে কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

—বাইরে। সদর দরজার পাহারাদারদের কাছে। বিস্কো প্রায় নিভে যাওয়া মশালের আলোয় আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এল। প্রহরীদের কাছ থেকে একটা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে নীচে নেমে এল।

—মশাল দেবমূর্তির মুখের কাছে নিয়ে এস। বিস্কো তাই করল। ফ্রান্সিস বলল—এখন অনেক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করলএখানে মাটি একটু উঁচু হয়ে আছে। ফ্রান্সিস আঙুল দিয়ে জায়গাটা ঘসল। মাটি ঝুর্‌ঝুর্‌ করে পড়ল। দেখা গেল গর্ত। অন্য গর্তওগুলোর মতোই। ফ্রান্সিস বলল—পিরেল্লো বলুন তো এখানে একটা গর্ত আছে কিন্তু দেবমূর্তি নেই।

—হ্যাঁ। তাই দেখেই তো ভাবছি বাড়তি গর্ত। আমরা এটা কোনদিন লক্ষ্য করিনি।

—পিরেল্লো হঠাৎ বলল—ফ্রান্সিস?

—বলুন।

—আপনী কি গুপ্তধনের হদিশ করতে পারলেন?

—না। ঠিক জায়গাটা এখনও বুঝতে পারি নি। আচ্ছা পিরেল্লো সেই চামড়ায় লেখা ছড়াটা আপনার কাছে আছে?

—ওটা সবসময় আমার বুকে সাঁটা থাকে। ছড়াটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। কাজেই ওভাবে রেখেছি। আমি বহুবার ছড়াটা দেখেছি। কিন্তু ছড়াটা ছাড়া আর কিছুই বুঝি নি।

—আমি পুরো চামড়াটা একবার দেখব। খুলে দেখাতে পারেন?

—বেশ দেখুন। পিরেল্লো কথাটা বলে বুকে দুহাত দিল। তারপর আঙুল দিয়ে খুঁটে খুঁটে চামড়ার টুকরোটা খুলে নিল। ফ্রান্সিসের হাতে দিল। ফ্রান্সিস একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে ছড়াটা বলতে লাগল। তারপর চামড়াটা ওল্টাল। খুব অস্পষ্ট আঁকিবুঁকির মতো। ফ্রান্সিস বলে উঠল—শাঙ্কো আরও একটা জ্বলন্ত মশাল আনা চাই। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। শাঙ্কো একছুটে দরজায় একটা মশাল নিয়ে এল। ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বলল—আচ্ছা এটার উল্টোপিঠ কোনদিন দেখেছিলেন?

—না তো। পিরেল্লো বোকার মত ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—তবু এবারে আরেকটু স্পষ্ট দেখা গেল। একটা অস্পষ্ট ত্রিকোণ আঁকা। এই চিহ্নটাও পূজোর ঘরে দেখিনি। এবার সাজঘরটা দেখতে হবে।

—চলো। ফ্রান্সিস মন্দিরের দরজার দিকে চলল। মশাল হাতে ফ্রান্সিস নামতে লাগল। পূজোর ঘরে এল। তারপর সাজঘরে এল। মশাল শাঙ্কোর হাতে দিল। পাথরের তাকে জড় করা পোশাক সব সরাতে লাগল। পোশাকগুলি সরিয়ে

দিতেই পাটাতনের কোণার দিকে অস্পষ্ট দাগ—ত্রিকোণ। তার ঠিক মাঝখানে ছোট্ট গোল দাগ। সেটাও অস্পষ্ট।

ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে চামড়াটা ফিরিয়ে দিল। পিরেল্লো নিয়ে বুকে সেঁটে রাখলেন। বললেন—কিছু হদিশ পেলেন। ফ্রান্সিস হেসে বলল—অত সহজে।

—তাহলে কী নিয়ে আপনি ভাবছেন? পিরেল্লো জানতে চাইলেন।

—একটা সমস্যা। পিরেল্লোকে বলল ফ্রান্সিস।

—কী সমস্যা?

—আপনার গুরুদেব হোমক যে চামড়ার টুকরো আপনাকে দিয়েছেন তাতে কিছু নির্দেশ আছে। ছড়াটা এমনি এমনি লেখা নয়। এটারও অর্থ আছে। সেটা নিয়েও ভাবছি।

—বুঝলাম—বাঁকা হাসি হেসে পিরেল্লো বললেন—গুপ্তধন উদ্ধার করা আপনার অসাধ্য। ঠিক কিনা?

—উঁহু। ফ্রান্সিস বলল—আমি সমাধানের শেষ পর্যায়ে।

—তাহলে বের করুন।

—এখনই হবে না। শুধু শেষ সমস্যাটার সমাধান বাকি।

—সমস্যাটা কী?

—শেষ সাত সংখ্যক গর্তটায় দেবমূর্তি ঢুকিয়ে শায়িত রাখা আছে। কিন্তু তারপরেও আট সংখ্যক একটা গর্তমত রয়েছে। তাতে দেবমূর্তি নেই। তাহলে ওটা কেন রাখা হয়েছে? গর্তটা কিছু মাটি দিয়ে ভরা আছে। কথাটা বলে ফ্রান্সিস গর্ত থেকে সব মাটি বের করল। বলল—বিস্কো—এই গর্তটায় কী আছে দেখ তো।

এবার বিস্কো গর্তটার মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেখল শুধু মাটিই নয় আরো কিছু আছে। নরম কিছু। ও আঙ্গুল বেঁকিয়ে সেই নরম জিনিসটা টেনে বের করল। তুলো। নরম তুলো। বিস্কো বলল—ফ্রান্সিস—এই দেখ শুধু তুলো। ফ্রান্সিস হাতে নিয়ে দেখল। বলল—নিশ্চয়ই একটা শক্ত কিছু লাগল। ফ্রান্সিস ঠিক বুঝতে পারল না ওটা কী? আস্তে আস্তে জিনিসটার গায়ে আঙ্গুল বুলোতে বুলোতে বলল—মনে হচ্ছে—একটা হ্যাঁ—একটা চাবি।

—চাবি? পিরেল্লো বললেন।

—হ্যাঁ চাবি। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে চাবিটা বের করল। ফ্রান্সিস চাবিটা চোখের সামনে এনে দেখাল।

—কীসের চাবি? চাবিটা কেন রাখা আছে? পিরেল্লো বলল।

—কারণ নিশ্চয়ই আছে। দামী কোন কিছু জিনিস গোপনে রাখার জন্যে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে কি রাজা হানমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার খোলার চাবি এটা? পিরেল্লো বললেন।

—সেটা দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাই দেখুন। পিরেল্লো বললেন।

—শুধু আমরা থাকলে সেটা হবে না। সেনাপতি মশাইকেও থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো মাননীয় সেনাপতিকে ডাকতে হয়। পিরেল্লো বললেন।

—সে কথাই বলছিলাম। আপনি বিস্কোকে নিয়ে যান। সেনাপতিমশাইকে বলবেন রাজা হানমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার আমরা প্রায় উদ্ধার করেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—মিথ্যে কথা। আপনি গুপ্তধনের হদিশ পেয়েছেন। পিরেল্লো বলল।

—না। হদিশ এখনও পাই নি। ফ্রান্সিস বলল।

—তবে সেটা বলুন। পিরেল্লো বলল।

—না। গুপ্তধন সম্বন্ধে সব আপনাকে বলতে আমি দায়বদ্ধ নই। ফ্রান্সিস বলল।

—তবে কাকে বলবেন এই গুপ্তধন খোঁজার কথা? পিরেল্লো জানতে চাইল।

—বলবো মাননীয় রাজা আর সেনাপতিকে। ফ্রান্সিস বলল।

—না। আপনি আমাকে সব বলবেন। পিরেল্লো গলায় জোর দিয়ে বলল।

—আগে সব বলেছি, আমি আপনার কাছে দায়বদ্ধ নই। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আপনাদের মরতে হবে। পিরেল্লো কড়া গলায় বলল।

অতটা কব্জির জোর থাকলে আমাদের হত্যা করুন। ফ্রান্সিস শান্ত সুরে বলল।

ফ্রান্সিস কিছু বোঝার আগেই পিরেল্লো কোমর থেকে একটা বাঁকা মাথা বড় ছোরা বের করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অন্যমনস্ক ফ্রান্সিস ছিটকে পড়ল মেঝেয়। পিরেল্লো ছোরাটা ফ্রান্সিসের বুক লক্ষ্য করে বিঁধতে গেলে ফ্রান্সিস ঘুরে গেল আর ছোরাটা বিঁধল ওর বাঁ বাহুমূলে। রক্ত বেরিয়ে এল। বিস্কো একটা লাফ দিয়ে পিরেল্লোকে জাপটে ধরল। তারপর বুকের নীচে হাত দিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে উঠল, ওকে হত্যা করো না। গুপ্তধনের ব্যাপারে ভাবতে-ভাবতে ওর মাথার ঠিক নেই।

বিস্কো দ্রুত ফ্রান্সিসের কাছে এল। মশালের আলোয় দেখল কাটা জায়গাটা বড় না হলেও বেশ রক্তপাত হচ্ছে। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে কাপড় ছিঁড়ে ফ্রান্সিসের কাটা জায়গাটা বেঁধে দিল। ফ্রান্সিসের একটু আরাম লাগল। রক্ত পড়া বন্ধ হলো।

ওদিকে পিরেল্লো দ্রুত উপরে উঠে এলেন। চার বর্শাধারীকে ডাকলেন। বললেন, দুটো চোর রাজা হানমের গুপ্তধন উদ্ধার করেছে। সেই ধনভাণ্ডার নিয়ে ওরা বাইরে আসবে। পালাতে চাইবে। ওদের পালাতে দিও না। তৈরী থাকো।

বিস্কো গলা চেপে বলল, বোঝাই যাচ্ছে এই লোকটা প্রহরীদের সাহায্যে ফ্রান্সিস আর বিস্কোকে বন্দী করবে।

এখনই প্রহরীদের আক্রমণ করবো? একজন ভাইকিং বন্ধু জানতে চাইল।

না। আগে ফ্রান্সিসরা উঠে আসুক। বিস্কো বলল।

কিছুপরে ফ্রান্সিসকে ধরে ধরে বিস্কো প্রধান দ্বার পর্যন্ত এল। এবার পিরেল্লো গলা চড়িয়ে বললেন, এই দুজনেরই কথাই বলছিলাম। ওদের হত্যা কর।

বিস্কো দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, ও—হো—হো—।

প্রহরীরা বর্শা হাতে ফ্রান্সিস আর বিস্কোর দিকে ছুটে এল। বিস্কোরা প্রহরীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হলো লড়াই। বর্শা দিয়ে তরোয়াল ঠেকানো অসুবিধে। একবার বর্শা হাতছাড়া হলে আক্রমণকারী নিরস্ত্র হয়ে যায়। লড়াইয়ের মধ্যে ফ্রান্সিসের উচ্চস্বর শোনা গেল, ভাইসব, কাউকে হত্যা করো না। প্রয়োজনে বন্দী কর।

অল্পক্ষনের মধ্যে লড়াই শেষ। প্রহরীদের মধ্যে দু তিনজন আহত হয়ে ঘাসে ঢাকা মাঠে পড়ে রইল।

ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে পিরেল্লোকে খুঁজতে লাগল। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখল পিরেল্লো আর একজন প্রহরী একটা ওক গাছের তলা দিয়ে ছুটছে। ফ্রান্সিস বলল, বিস্কো আমি ছুটতে পারছি না। রক্তপড়া বেড়ে যাবে। তুমি ছুটে গিয়ে পিরেল্লোকে ধর।

বিস্কো সঙ্গে-সঙ্গে ছুটল। পলায়মান পিরেল্লো আর একজন প্রহরী তখন রাজবাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। বিস্কো দ্রুত ছুটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্কো পিরেল্লোদের কাছে এসে পড়ল। চেঁচিয়ে বলল, পিরেল্লো পালিয়ে রেহাই পাবেন না। কাজেই পালাবার চেষ্টা না করে আমাদের কাছে আসুন। ফ্রান্সিস আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে।

পিরেল্লো দাঁড়িয়ে পড়লেন। সঙ্গের যোদ্ধাটিও থামল। দুজনেই মুখ খুলে হাঁপাতে লাগল। বিস্কো ওদের কাছে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বিস্কো বলল—যদি রাজা হানমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করতে পারি, রাজা কানবহনাকে বলবো ধনভাণ্ডারের কিছু অংশ আপনাকে যেন দেন।

সত্যি বলছো? পিরেল্লো বললেন।

হ্যাঁ, সত্যি বলছি। আপনি ফ্রান্সিসের কাছে চলুন। আমরা আপনার কোনোরকম ক্ষতি করবো না। বরং আপনি ফ্রান্সিসকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন সেইজন্যে আমি আপনাকে এক্ষুণি মেরে ফেলতে পারি। বিস্কো বলল।

আমার দোষ হয়ে থাকলে—পিরেল্লো বলতে গেলেন।

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বিস্কো বলল, ঠিক আছে, আপনি ফিরে চলুন।

তিনজন ফিরে চলল মন্দিরের দিকে। মন্দিরের দরজার কাছে এসে দেখল প্রহরীরা আহত হয়ে এখানে ওখানে ঘাসের ওপর পড়ে আছে। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টিতে তরোয়াল ঢুকিয়ে রেখেছে।

ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বলল—আপনি একটা কাজ করুন। একবার

সেনাপতিমশাইয়ের বাড়িতে যান। সেনাপতিকে বলুন—আমরা গুপ্তধন উদ্ধার করেছি। আপনি কিছু যোদ্ধাকে পাঠিয়ে দিন। নিজেও আসুন। বিস্কো বলল—ফ্রান্সিস আমি রাজপুরোহিত পিরেল্লোকে কথা দিয়েছি যে তাঁকে আমরা গুপ্তধনের কিছু অংশ দেব।

—বেশ। রাজাকে বলবো। তারপর অনুরোধ করবো। ফ্রান্সিস বলল।

ভোর হয়েছে। রাজবাড়ির পেছনে বিরাট বাগান। গাছগাছালি। পাখির ডাক শুরু হয়ে গেছে। রোদও উঠল।

পিরেল্লো আর বিস্কো সেনাপতির বাড়ির সামনে এল। বাইরের দরজা বন্ধ। একজন প্রহরী বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে। প্রহরী পিরেল্লোকে দেখে মাথা একটু নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাল। পিরেল্লো বললেন—প্রহরী সেনাপতিকে খবর দাও। খুব দরকারি কথা আছে।

প্রহরীটি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। পিরেল্লোদেরও ঢুকতে বলল। পিরেল্লো আর বিস্কো ঢুকল। একটা বেশ বড় ঘর। গোল শ্বেতপাথরের টেবিল ঘরের মাঝখানে। টেবিলটার চারপাশে কালো আবলুস কাঠের আসন পাতা। গদিপাতা। দুজনে বসল।

একটু পরে প্রহরী ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। বলল—অপেক্ষা করুন। মাননীয় সেনাপতি আসছেন।

আরো কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি এল। বিস্কোরা উঠে দাঁড়াল। সেনাপতিমশাই বসতে ইঙ্গিত করল। বিস্কোরা বসল। পিরেল্লোর দিকে তাকিয়ে বলল—কী ব্যাপার বলুন তো? এত সকালে এসেছেন।

পিরেল্লো বিস্কোকে কিছু বলার জন্যে ইঙ্গিত করলেন। বিস্কো বলতে লাগল — আমরা জাতিতে ভাইকিং। দেশে দেশে আমাদের জাহাজটায় চড়ে ঘুরে বেড়াই। কোথাও কোনো গুপ্তধনের কথা জানলে আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করি।

—তারপর উদ্ধার করা গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে যাব। সেনাপতি গোঁফের ফাঁকে হাসলেন।

—অনেক জায়গাতেই এই ধরনের কথা আমরা শুনেছি। কথাটা আমাদের কাছে নতুন নয়। আর একথাটা যে সত্যি নয় সেটার প্রমাণ আপনাকে দিয়ে যাবো। বিস্কো বলল।

—ঠিক আছে। এখন রাজপুরোহিত বলুন আমার কাছে এসেছেন কেন?

—এই ভাইকিংরা রাজা হানমের গুপ্তধন উদ্ধার করেছে বলে দাবি করছে। তাই একবার সব বুঝেশুনে নিতে আপনাকে যেতে অনুরোধ করেছে। পিরেল্লো বললেন।

—সত্যিই কি পেরেছে গুপ্তধন উদ্ধার করতে? সেনাপতি বললেন।

—মন্দিরে গেলেই সব জানতে পারবেন। বিস্কো বলল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সেনাপতি বলল—ঠিক আছে। আপনারা যান—আমি আসছি।

বিস্কোরা ফিরে এল। ফ্রান্সিসকে বলল—সব বলা হয়নি। তবে সেনাপতি বললো যে সে আসবে।

—ফ্রান্সিস—বিস্কো ডাকল।

—হুঁ। বলো। ফ্রান্সিস বিস্কোর দিকে তাকাল।

—সত্যিই কি তুমি রাজা হানমের গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছো? বিস্কো বলল। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টিতে রাখা একটা লম্বা চাবি বের করল। বিস্কোকে চাবিটা দেখিয়ে বলল—সমাধান। সেনাপতি মশাইকে আসতে দাও।

কিছুপরে সেনাপতি ঘোড়ায় চড়ে এল। সঙ্গে চারজন প্রহরী।

ঘোড়া থেকে নেমে সেনাপতি বলল—রাজপুরোহিত কী উদ্ধার করেছেন দেখান। পিরেল্লো ফ্রান্সিসের দিকে তাকালেন। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে মাথা একটু নিচু করে সম্মান জানিয়ে বলল—আমার সঙ্গে আসুন।

সবাই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল আহত প্রহরীরা এখান থেকে চলে গেছে। ফ্রান্সিস ভাবল যাক বাঁচা গেল। কিছুক্ষণের লড়াইয়ের খবরটা সেনাপতি পায় নি।

মশালের আলোয় মন্দিরের গর্ভকক্ষে এল সবাই। ফ্রান্সিস পেছনের সাজঘর দেখিয়ে বলল—মাননীয়, গুপ্তধন রয়েছে ঐ সাজঘরে।

—তাই নাকি! সেনাপতি গলা চড়িয়ে বলল।

সেনাপতিকে নিয়ে ফ্রান্সিস আর পিরেল্লো সাজঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস কাঠের বেদীর কাছে এল। ফেট্টি থেকে চাবিটা বের করল। বেদীটার ওপর জড়ো করা পোশাক সরিয়ে দিল। বেদীর গায়ে চাবির ফুটো। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ওর চাবিটা ঢোকাতে লাগল। চাবিটা শেষ পর্যন্ত ঢুকিয়ে আসতে ডানদিকে মোচড় দিল। ডালা খুলল না।

বিস্কো দ্রুত ফ্রান্সিসের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। যদি গুপ্তধন দেখাতে না পারে তবে ফ্রান্সিস বিপদে পড়তে পারে। তখন সাহায্য চাই।

ফ্রান্সিসের মুখ তখন ঘেমে উঠেছে। শুধু হাতে মুখ কপাল মুছে নিয়ে ফ্রান্সিস আবার চাবিটা ঢোকাল। দুএকবার এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে জোরে ডানদিকে মোচড় দিল। কট্। একটা মৃদু শব্দ হল। পাটাতন খুলে গেল। ফ্রান্সিস পাটাতনের ঢাকনাটা এবার খুলে ফেলল। একটা কালো চামড়ার ব্যাগমত দেখা গেল। ফ্রান্সিস ব্যাগটা তুলে বেদীর ওপর রাখল। তারপর মুখে বাঁধা সোনালি মোটা সুতোয় বাঁধা দড়িটা খুলে ফেলল। মুখটা খুলে একমুঠো সোনার চাকতি তুলে এনে বেদীতে রাখল। তারপরে বের করল একটা চারপাশে হীরে বসানো আয়না। সবাই অবাক হয়ে দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস একটা মুক্তোর মালা তুলে দেখিয়ে সব কালো চামড়ার ব্যাগটায় ভরে রাখল। দড়ি বন্ধ করে ব্যাগটা সেনাপতিকে দিয়ে বলল—মাননীয় সেনাপতি এটাই রাজা হানমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার। আমাদের কাজ শেষ। এবার আমরা জাহাজে ফিরে যাবো।

—সে কি। সেনাপতি বলল—ধনভাণ্ডারের কিছু অংশ তো আপনাদের প্রাপ্য।

—না। আমরা কিছু নেব না। তবে একটা অনুরোধ করছি। মাননীয় রাজাকে বলবেন এই গুপ্ত ধনভাণ্ডারের কিছু অংশ যেন রাজপুরোহিত পিরেল্লোকে দেওয়া হয়। উনি গুপ্তধনের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলেন। এবার ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বলল—এবার দেখলেন তো গুপ্তধনের প্রতি আমাদের কোন লোভ নেই।

বিস্কো ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

ভাইকিং বন্ধুরাও গলা মেলালো—ও—হো—হো।

ফ্রান্সিসরা সদর রাস্তায় এল। চলল বন্দরের দিকে। গরম হাওয়া ছুটেছে। তার মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিসরা হাঁটতে লাগল। বিস্কো বলল—ফ্রান্সিস।

—হুঁ। বলো।

—বলছিলাম বেশ বেলা হয়েছে। জাহাজে ফিরে আর আমাদের জন্যে রান্না করতে হবে না।

—ঠিক আছে। একটা সরাইখানা দেখ। ফ্রান্সিস বলল।

পাওয়া গেল একটা বেশ বড় সরাইখানা। ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় ঢুকল। সবার বসার জায়গা হল না। ফ্রান্সিস সরাইওয়ালাকে গিয়ে বলল—যত তাড়াতাড়ি পারো খেতে দাও। আমরা খুব ক্ষুধার্ত। নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই। সরাইওয়ালা পাকা দাড়ি নেড়ে বলল। ছুটল রান্নাঘরের দিকে।

ফ্রান্সিসরা খাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।



চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। ডেকে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস আর মারিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে সমুদ্রের জলে চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি দেখছিল।

সমুদ্রতীরে বিস্তৃত বনভূমি। ফ্রান্সিসের জাহাজ বনভূমির কাছে এল।

পেড্রো একটা গাছের মোটা ডালের সঙ্গে মাস্তুলের টানা দাঁড় বাঁধল ও আর নোঙর ফেলল না। জাহাজ আর বনভূমির ভেতরে ঢুকল না।

পেড্রো মাস্তুল থেকে নেমে এল। ফ্রান্সিসকে বলল— বনের মধ্যে আর জাহাজ ঢোকালাম না।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

রাত বাড়ল, সে আসার জন্য হাঁকডাক শুরু হল।

রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ হল। আজকে বেশ গরম পড়েছে। সমুদ্রের হাওয়ারও তেমন জোর নেই।

খালাশিরা অনেকেই ডেকের ওপরই শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ল।

ফ্রান্সিসরা এখনও জানে না কী বিপদের মুখে ওরা জাহাজ বেঁধেছে।

ঐ বনভূমির ওপাশে ঘন গাছের আড়ালে নোঙর করা ছিল একদল জলদস্যুর জাহাজ। ফ্রান্সিসদের সাড়া পেতেই জলদস্যুরা সব চুপ করে গেল। নিঃশব্দে চলল ওদের চলাফেরা। কারো মুখে কথা নেই।

নিস্তব্ধ রাত। শুধু সমুদ্রের বাতাসের শন্ শন্ শব্দ। সময় বুঝে জলদস্যুনেতা ওদের জাহাজটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে চালিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছে নিয়ে এল। এত নিঃশব্দে যে ফ্রান্সিসরা বুঝতে পারল না। ফ্রান্সিসরা তখন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

জলদস্যুরা নিঃশব্দে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠতে লাগল। ডেকের ওপর ঘুমিয়ে-থাকা ভাইকিংদের কাছে বিস্ময় শালকাদের পিঠে-বুকে তরোয়ালের খোঁচা দিতে লাগল। শাঙ্কোদের ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়েই দেখে জলদস্যুর দল। ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি আবার জলদস্যুদের পাল্লায় পড়বে। ভাইকিংরা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে লাগল। জলদস্যুদের জনাকয়েক নিচে কেবিন ঘরে নেমে গেল। দুজন খোলা তরোয়াল হাতে অস্ত্রঘরের সামনে দাঁড়াল যাতে ফ্রান্সিসরা অস্ত্র না নিতে পারে।

জলদস্যুরা ভাইকিংদের সারি বেঁধে দাঁড় করাল কেবিনঘর থেকে সবাইকে বন্দী করে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস মারিয়াও এল।

জলদস্যুপতি বলল—তোমাদের দলনেতা কে?

ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল—আমি।

—তোমরা বিদেশী?

—হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং।

—তা তোমাদের কথা শুনেছি। জাহাজ চালাতে আর তরোয়াল চালাতে তোমরা ওস্তাদ। সমুদ্রের সঙ্গে তোমাদের নাড়ির যোগ। একটু থেমে জাহাজের চারদিকে তাকিয়ে জলদস্যুনেতা বলল—তোমাদের তো ভিখিরির দশা। তোমাদের জাহাজ লুঠ করে কিছুই পাবনা।

দলনেতা এবার মারিয়ার দিকে তাকাল। বলল—এ কে?

—আমাদের দেশের রাজকুমারী। হ্যারি বলল।

—তা এখানে কেন?

—আমাদের দলনেতা এঁর স্বামী। কাজেই স্বামীর সঙ্গেই তিনি যাবেন। হ্যারি বলল।

—আগে হলে এর কাছ থেকে গয়নাগাঁটি পাওয়া যেত। এখন তো ভিখারিনী। দলনেতা থামল। তারপর বলল—না-না। গলায় সোনার হার আছে। দলপতি মারিয়ার দিকে হাত বাড়াল। মারিয়া ওর হাত সরিয়ে দিল। দলনেতা দ্রুত হাত বাড়িয়ে হারটা ছিঁড়ে নিল। মারিয়া কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—কান্নাকাটি করো না। দলনেতা গলা বাড়িয়ে বলল সবাইকে আমাদের ক্যারাভেল জাহাজে নিয়ে চল। সবচেয়ে নিচের কয়েদঘরে বন্দী করে রাখো। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল—আমরা কী অপরাধ করেছি যে আমাদের বন্দী করবে?

দলনেতা হো হো করে হেসে উঠল। বলল—শোন তাহলে তোমাদের নিয়ে ক্রীতদাস বেচাকেনার হাটে নিয়ে যাবো। য়ুরোপীয় ক্রীতদাস তো পাওয়া যায় না। তোমাদের জন্য ভালো দাম পাবো। তার ওপর রয়েছে তোমাদের রাজকুমারী। ক্রীতদাসী হিসেবে দারুণ দাম পাবো। শাঙ্কো ওদের দেশিয় ভাষায় বলল—ফ্রান্সিস—লড়াই। ফ্রানিস মাথা নাড়ল। বলল—আমরা কি এখনও নিরস্ত্র সহজেই হেরে যাবো।

—এদের সবকটাকে কয়েদ ঘরে ঢোকাও জলদস্যুপতি বলল। ফ্রান্সিস বলল—না। আমাদের রাজকুমারীকে ঐ নরককুণ্ডে রাখা চলবে না।

—তাহলে তো এখানে রাজপ্রাসদে নিয়ে আসতে হয়। জলদস্যুপতি বলল।

—তার দরকার নেই। উনি আমাদের জাহাজে থাকবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি পালিয়ে যায়, জলদস্যুপতি বলল।

—উনি একা সমুদ্র সাঁতরে পার হবেন অসম্ভব? ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে তাই থাকবে। জলদস্যুপতি বলল।

মারিয়ার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাটা হতে ফ্রান্সিস খুশি হল। এবার পালানোর ধান্দা। কিন্তু ঐ নরক থেকে কি পালানো সম্ভব? চেষ্টা চালিয়ে দেখতে হবে।

ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল জলদস্যুরা। একেবারে নিচেরতলায় কয়েদখানা।

প্রহরীরা কয়েদখানার লোহার দরজার বড় বড় তালা খুলল। সশব্দে দরজা খোলা হল। ফ্রান্সিসরা দলবেঁধে ঢুকল।

লোহার দরজা বন্ধ করা হল। অন্ধকার ঘরে দুটো মশাল জ্বলছে। ফ্রান্সিসরা বসে পড়ল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। ও দেখল ওদের আগেও চারপাঁচজন কয়েদী আছে। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ। একে বন্দী করেছে কেন? ক্রীতদাস কেনা বেচার হাটে এই বৃদ্ধের কী মূল্য?

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সেই বৃদ্ধের কাছে গেল। পাশে গিয়ে বসল। বলল—আপনি এখানে কতদিন বন্দী আছেন?

—হিসাব করে বলতে পারবো না। তবে দীর্ঘদিন। বৃদ্ধ বলল।

—আপনাকে নিয়ে ওরা কি করবে? ক্রীতদাস কেনাবেচার হাটে আপনার কোন মূল্যই নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—কী জানি। কেন যে ওরা আমাকে এভাবে ফেলে রেখে দিয়েছে তা ওরাই জানে। বৃদ্ধ বলল।

—আপনাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। ফ্রান্সিস বলল।

—এরা উচিত অনুচিতের ধার ধারে না। বৃদ্ধ বলল।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের কাছে ফিরে এল। জলদস্যুদের এই ক্যারাভেল জাহাজের বন্দীশালা যে কী ভয়াবহ তার অভিজ্ঞতা ফ্রান্সিসদের আছে। ফ্রান্সিস ভাবল যে ভাবেই হোক এই বন্দীশালা থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কীভাবে? ও এটাও স্থির করল প্রহরীদের সঙ্গে লড়াই করে পালাতে হবে। নিরস্ত্র অবস্থায় লড়তে গেলে হয়তো পালানো যাবে কিন্তু তাতে কিছু বন্ধুর জীবন যাবে। ও ভাবল—এই ব্যাপারে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা যাক। ও বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব একটা কথা বলছিলাম। এই কয়েদঘরে আমাদের জীবন শেষ করতে আমি রাজি নই। তাই বলছিলাম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা প্রহরীদের সঙ্গে লড়াই করে পালাবো। কিন্তু সেটা করতে গেলে কিছু বন্ধুর প্রাণ যাবে। তোমরা কজন প্রাণ দিতে রাজি বল।

বন্ধুরা ফ্রান্সিসের কথা শুনে বেশ অবাকই হল। ফ্রান্সিস এভাবে বলছে কেন? ফ্রান্সিস বলল—এখানে থাকলেও আমাদের প্রাণ যাবে। সুতরাং আগে থেকে মৃত্যু বরণ করে কয়েকজন বন্ধুর জীবনের বিনিময়ে আমরা পালাতে পারবো।

—কিন্তু ফ্রান্সিস তুমি শুধু আমাদের মুক্তির কথা ভাবছো রাজকুমারী মারিয়ার কী হবে? হ্যারি বলল।

—আমরা মুক্তি পেলে মারিয়াকেও মুক্ত করতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

—সেক্ষেত্রে সমস্ত জলদস্যুদের লড়াইয়ে হারাতে হবে। সেটা কি পারবে? শাঙ্কো বলল।

—একটা তরোয়াল হাতে পেলে পারবো। ফ্রান্সিস বলল। বন্ধুরা চিন্তায় পড়ল। ফ্রান্সিস এরকম সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কেন বুঝে উঠতে পারল না। আসলে ফ্রান্সিস অধৈর্য হয়ে উঠেছিল।

বন্ধুরা কয়েকজন বলে উঠল—ফ্রান্সিস তুমি যদি বল আমরা প্রাণ দিতে রাজি।

—তাহলে সেভাবেই তৈরি থাকব। লড়াই হবেই। ফ্রান্সিস বলল।

লোহার দরজাটার ঢং ঢং শব্দ হল। প্রহরীরা খাবার নিয়ে এসেছে। দরজা খুলে দুজন প্রহরী খোলা তরোয়াল হাতে দরজার দুপাশে দাঁড়াল। বাকি দুজন প্রহরী খাবার নিয়ে ঢুকল। ফ্রান্সিসদের সামনে একটা করে গোল পাতা পেতে দিল। তারপর দুজনে মিলে খাবার দিল। পোড়া রুটি। তরিতরকারির ঝোল আর মাছ। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে সেই একই কথা বলল—পেটপুরে খাও। ভালো না লাগলেও খাও। শরীর ঠিক রাখো।

খাওয়া শেষ। প্রহরীরা এঁটো পাতা নিয়ে চলে গেল। দরজা বন্ধ হল।

ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে সময় কাটাতে লাগল।

ফ্রান্সিস বৃদ্ধটির কাছে গেল। কথাইবা বলে সময় কাটানো। বৃদ্ধটি শুয়ে ছিল, ফ্রান্সিস কাছে আসতে উঠে বসল। ফ্রান্সিস বলল—আপনার দেশ কোথায়?

—পর্তুগাল।

—কী করে বন্দী হলেন?

—সে অনেক কথা। আমাদের জাহাজ জলদস্যুরা লুঠ করল। সবাইকে বন্দী করল। তারপর ক্রীতদাসের বেচাকেনার হাটে অনেককে বিক্রি করল। আমার তখন প্রচণ্ড জ্বর। অসুস্থ মানুষকে কে কিনবে? আমি বেঁচে গেলাম। আমাকে যতবারই ঐসব হাটে নিয়ে গেছে আমি হাত পা ভাঙার ভান করেছি। খরিদদার একজন হাত পা ভাঙা মানুষকে কিনবে কেন? জলদস্যুরা যত বলে আমি সুস্থ আমি ততবারই হাত পা ভাঙার ভান করি। এভাবেই আমি বেঁচে গেলাম। অবশ্য যদি এই নরককুণ্ডে থাকাকে তুমি বেঁচে থাকা বলো।

—আপনি কখনও পালাবার চেষ্টা করেন নি। ফ্রান্সিস জিজ্ঞাসা করল।

—না। সেটা অসম্ভব। বৃদ্ধ বলল। তারপর দরজার দিকে একবার দেখে নিয়ে বলল—আমি একটা কাজ অনেকদূর এগিয়ে রেখেছি। বাকিটা পারবে?

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলল কী কাজ?

—জাহাজের তলায় যে জোড়া থাকে আমি দীর্ঘদিন ধরে তা ঘষে ঘষে পাতলা করেছি। বৃদ্ধ বলল।

—সত্যি? ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বৃদ্ধ কী বলছে?

—হ্যাঁ এই লোহার হাতল দিয়ে। বৃদ্ধ একটা লোহার হাতল পাশ থেকে দেখাল। তারপর বলল—ঐ জোড় একবারে পাতলা হয়ে গেছে। এখন শক্ত কিছু দিয়ে চাড় দিতে পারলে জোড় খুলে যাবে। মানুষ বেরোবার মত ফাঁক অনায়াসে করা যাবে।

স্থান কাল ভুলে ফ্রান্সিস ধ্বনি তুলল—হো হো হো। বন্ধুরা অবাক। সঙ্গে ওরাও অবশ্য ধ্বনি তুলল। সবাই ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল—এখন কিছু বলা যাবে না। সব পরে বলছি।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিল। প্রহরীরা দরজা থেকে দূরে ওদের দৃষ্টির আড়ালে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

—চলুন। দেখান ব্যাপারটা। ফ্রান্সিস বৃদ্ধকে বলল। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল। দুজনে নিচে নেমে এল। বৃদ্ধ জোড়ের জায়গাটায় এল। আলো খুবই কম। তার মধ্যেই বৃদ্ধ জোড়াটা দেখাল ফ্রান্সিস হাত দিয়ে দেখল—সত্যি জোড়ের মুখটা পাতলা লাগছে। ও বুঝল শক্ত লোহার শাবল দিয়ে চাড় দিলে জোড় খুলে যাবে। এবার শেষ সমস্যা একটা লোহার শাবল। এটা জোগাড় করা সম্ভব নয়। তবে চেষ্টা করতে হবে।

ফ্রান্সিস এবার প্রহরীদের একবার দেখে নিল? ওরা ধারে কাছে নেই। ও এবার বন্ধুদের কাছে ডাকল। তারপর সমস্ত ঘটনাটা বলল। তারপর বলল—এখন সমস্যা একটা শাবলের মত লোহার।

হ্যারি বলল—প্রহরীরা যে লোহার ডাণ্ডাটা দিয়ে শব্দ করে ওটা ওখানে ঝোলানো থাকে। ওটা হলে হবে তো?

সাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। দরজার কাছে গেল। ঝুলিয়ে রাখা লোহার ডাণ্ডাটা নিয়ে এল। দেখা গেল এটার মুখ ভোঁতা। হবে না।

হ্যারিই এবার বুদ্ধি দিল। বলল—যদি একটা তরোয়াল পাওয়া যায় তাহলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যায়। তরোয়ালের চাড় দিলে ফাঁক বাড়ানো যাবে।

—কিন্তু তরোয়াল পাবো কোথায়? বিস্কো বলল।

—চাইলে প্রহরীরা দেবে না? শাঙ্কো বলল।

—অসম্ভব—ফ্রান্সিস বলল—তাছাড়া তরোয়ালটা অনেকক্ষণ আমাদের কাছে রাখতে হবে। অত সময় পাবো না।

এবার হ্যারি বলল—শোন। আমি একটা উপায় বলছি। আমরা দস্যুনেতাকে বলবো যে আমাদের তরোয়াল পূজোর একটা রীতি আছে। দুটো তরোয়াল আমাদের দিতে হবে। একদিন একরাত ধরে পূজো হবে। পূজো হয়ে গেলে তরোয়াল ফেরত দেব।

—সাবাস হ্যারি। এটাই একমাত্র পথ। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস প্রহরীদের ডাকলেন প্রহরী এগিয়ে এল।

ফ্রান্সিস বলল—তোমাদের দলনেতাকে বল আমি একটা অত্যন্ত দরকারি কথা বলবো।

—কী কথা? প্রহরী বেশ আয়েসি ভঙ্গীতে বলল।

—মুণ্ডু। ফ্রান্সিস বলল।

—এ্যাঁ? প্রহরী চমকে উঠল।

—আমার কথা হবে দলনেতার সঙ্গে। তুমি কে হে? ফ্রান্সিস বলল।

—না। না মানে—প্রহরী আমতা আমতা করতে লাগল।

—যাও। দলনেতাকে আসতে বল। ফ্রান্সিস হুকুমের সুরে বলল। প্রহরী চলে গেল।

কিছু পরে দলনেতা এল। দাঁত ছড়িয়ে হেসে বলল—

—কেমন আছো সব?

—খুব ভালো। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ শরীরটা ঠিক রাখো। এবার থেকে মাংসও খেতে দেওয়া হবে। দলনেতা বলল।

—তাহলে তো খুবই ভালো। হ্যারি বলল।

এবার ফ্রান্সিস বলল—একটা দরকারি কথা ছিল।

—বলো। দলনেতা উৎসুখ মুখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

—আমাদের দেশের একটা রীতি আছে—তরোয়াল পুজো। ফ্রান্সিস বলল।

—সে আবার কী? দলনেতা বেশ আশ্চর্য হলো।

—বীরত্বের পূজো। সেটা আমরা এখানে করবো। তার জন্য দুটো তরোয়াল লাগবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তো দুটো তরোয়াল নিও। তবে আগেই বলছি, পালাবার মতলব থাকলে কেউ রেহাই পাবে না। দলনেতা চড়া গলায় বলল।

—পালাবার মতলব থাকলেই কি পালাতে পারবো। আপনার কয়েদখানা থেকে পালানো প্রায় অসম্ভব। শাঙ্কো বলল।

—প্রায় অসম্ভব মানে? একেবারে অসম্ভব। দলনেতা বলল।

ফ্রান্সিস সাবধান হল। বলল—ঐ একই কথা। এবার দুটো তরোয়াল দিন।

—পূজো হবে কখন? দলনেতা জিজ্ঞেস করল।

—সন্ধ্যে থেকে শুরু হবে। সারারাত চলবে। হ্যারি বলল।

—ও। জলদস্যুপতি আস্তে আস্তে চলে গেল। যাবার সময় একজন—প্রহরীকে বলল—ওদের দুটো তরোয়াল দে। প্রহরী দুটো তরোয়াল দিল।

সন্ধ্যের একটু পরেই ফ্রান্সিসরা দুটো জ্বলন্ত মশালই খুলে নিল। তরোয়াল মশাল নিয়ে চলল নিচে খোলের দিকে। প্রহরীরা বলল—কী ব্যাপার? তোমাদের পূজো কোথায় হবে?—নিচে। সেলে। মশাল লাগাব। বিস্কো বলল।

নিচে খোলে নেমে এল ওরা। দুজন দুদিকে মশাল ধরে রইল। ফ্রান্সিস একমুহূর্ত দেরি করল না। একটা তরোয়ালের মাথা পাতলা জোড়টায় ঢুকিয়ে দিল। শাঙ্কো একটু দূরে আর একটা তরোয়ালের মাথা ঢোকাল। এবার আস্তে আস্তে চাড় দিতে লাগল। জোড় খুলে যেতে লাগল। খুলতে খুলতে একজন মানুষের শরীরের সমান হল।

সকালের আলো দেখা গেল—নিচে বালি। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল—শেষ সমস্যাটা মিটল। ভেবেছিলাম জলের মধ্যে পড়ব। এখন সহজেই নেমে যাওয়া যাবে। কিন্তু ফাঁক তো বেশি নয়। বেশ টেনে হিঁচড়ে শরীরটা জাহাজের নিচে থেকে বের করে আনতে হল। হাতপা কেটে গেলেও তবু মুক্তি। এখন সহজেই নিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু ফাঁক যে বেশি নয়। তবু আস্তে আস্তে সবাই বেরিয়ে এল।

ভাইকিংরা মশাল নিভিয়ে দিল। বৃদ্ধকে ধরাধরি করে বাইরে আনল।

সবাই একত্র হল।

আকাশের চাঁদ উজ্জ্বল। চারদিক মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জলদস্যুদের

জাহাজটার সঙ্গে ওদের জাহাজ দড়ি দিয়ে বাঁধা। এবার নিজেদের জাহাজ চালিয়ে পালানো।

সবাই জলে নামল নিঃশব্দে সাঁতরে চলল ওদের জাহাজের দিকে।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে নিয়ে হাল বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠল। তখনই দেখল কয়েকজন জলদস্যু মাস্তুলের নিচে বসে আছে। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল—শাঙ্কো তরোয়াল দুটো আনো। শাঙ্কো নিচের দিকে তাকিয়ে তরোয়াল দিতে বলল।

একটু পরেই দুজনে তরোয়াল হাতে পেল। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল—এরা নরঘাতক। নিরীহ মানুষ নির্বিকারে হত্যা করে। এদের ওপর দয়া দেখানোর কোন মানে হয় না। দুটোকে খতম কর। বাকি দুটোকে দড়ি দিয়ে বাঁধো। তারপর কিছুদূরে গিয়ে জলে ফেলে দাও। এখানে ফেললে শব্দ হবে। জলদস্যুরা টের পাবে।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো খোলা তরোয়াল হাতে জলদস্যুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা ভুত দেখার মত চমকে উঠল। ওরা তরোয়াল খোলার আগেই ফ্রান্সিস একজনের বুকে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল। সে ডেকের ওপর গড়িয়ে পড়ল। অন্যজন ততক্ষণে তরোয়াল তুলেছে। শাঙ্কো দ্রুত দুপা সরে গিয়ে তরোয়ালের কোপ বসালো ওর মাথায়। জলদস্যুটি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

অন্য দুজনের সঙ্গে তরোয়ালের লড়াই চলল। ফ্রান্সিস জলদস্যুটির সঙ্গে হালকা চালে তরোয়াল চালাতে লাগল। ও চাইছিল জলদস্যুদের ক্লান্ত করতে। তাহলে সহজেই বন্দি করা যাবে।

লড়াই চলল। যে জলদস্যু ফ্রান্সিসের সঙ্গে লড়াই করছিল সে হঠাৎই লড়াই থামিয়ে হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। ফ্রান্সিস দ্রুত ওর তরোয়াল দিয়ে জলদস্যুটির তরোয়ালে ঘা মারল। জলদস্যুর তরোয়াল ছিটকে পড়ল। মাস্তুলের গা থেকে ছেঁড়া দড়ি এনে ফ্রান্সিস ওর হাত বেঁধে ফেলল। অন্য জলদস্যুটিকে সঙ্গে তখন শাঙ্কোর তরোয়ালের লড়াই চলছে। শাঙ্কো তক্কে তক্কে রইল ওর পায়ে তরোয়ালের ঘা মারতে। সুযোগ পেয়ে গেল, শাঙ্কো হঠাৎ এক লাফে ওর সামনে গিয়ে হাজির হল। জলদস্যুটি হকচকিয়ে গেল। শাঙ্কো এক মুহূর্ত দেরি না করে ওর পায়ে তরোয়াল চালাল। পা কেটে গেল। জলদস্যু পা টিপে বসে পড়ল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের দেখা দেখি মাস্তুল থেকে ছেঁড়া দড়ি নিয়ে জলদস্যুটির হাত বেঁধে ফেলল। হাত বাঁধা দুজনে ডেকের ওপর বসে রইল।

ততক্ষণে বন্ধুরা জাহাজে উঠে পড়েছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ ছাড়। দাঁড়ঘরে যাও। দাঁড় টানা শুরু কর। পাল খাটাও। কিন্তু কোনরকম শব্দ যেন না হয়। সব কাজ নিঃশব্দে করতে হবে। জলদস্যুদের জাহাজে হৈচৈ শুরু হয়েছে। ওরা এতক্ষণ বুঝতে পেরেছে যে আমরা পালিয়েছি। সব জলদি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসদের জাহাজের পাল ফুলে উঠল। জাহাজ গতি পেল। জলদস্যুদের জাহাজ পেরিয়ে যাবার সময় শাঙ্কো চার জলদস্যুকে দুহাতে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলল।

ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাল। মারিয়া কোথায়? মারিয়া ডেকে উঠে আসেনি। ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল ও দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিজেদের কেবিনঘরে এসে দেখল দরজা খোলা। ফ্রান্সিস এক লাফে ঘরে ঢুকল। দেখল মারিয়া চাদর জড়িয়ে শুয়ে আছে। দুচোখ বোঁজা। ফ্রান্সিস দ্রুত কাছে এসে ডাকল মারিয়া-মারিয়া। মারিয়া চোখ মেলে তাকাল। হাসল।

—কী হয়েছে তোমার?

—জ্বর হয়েছে। তবে ভাল আছি। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস মারিয়ার কপালে গলায় হাত বুলোল। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে।

ফ্রান্সিস বলল—কী বলছো? সাংঘাতিক জ্বর। আমি ভেনকে ডেকে আনছি।

একটু পরে ভেন এল। হাতে দুটো বোয়াম। ন্যাকড়া, দুটো পাথর। ভেন মারিয়ার কপালে হাত রাখল।

ঝোলা থেকে দুটো শুকনো ফুল বের করল। পাথর দুটো চেপে ফল দুটো গুঁড়ো করল। ন্যাকড়ায় ছাঁকল জল মিশিয়ে হাতের তালুতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তিনটে বড়ি বানাল। মারিয়ার হাতে দিয়ে বলল—এখন একটা খান। রাত্রে একটা খাবেন। কাল সকালে একটা খাবেন। মারিয়া বড়ি তিনটে নিল ফ্রান্সিস কাঠের গ্লাসে জল নিয়ে এল। মারিয়া একটা বড়ি নিলো।

ভেন চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—কিছুনা। ঠাণ্ডা লেগেছে।

—তাই হবে। কাল রাত্রে অনেকক্ষণ ডেকএর ওপর ছিলাম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগেছে। তবু ফ্রান্সিসের চিন্তা গেল না। এই বিদেশে এমন কঠিন অসুখ করলে মারিয়াকে বাঁচানোই যাবে না। মারিয়ার কপালে সারা রাত ফ্রান্সিস জলপট্টি লাগল। ভেন এর ওষুধে কাজ হল। পরদিন সন্ধ্যে নাগাদ মারিয়া সুস্থ হল।

সেই বৃদ্ধ লোকটিকে ফ্রান্সিসরা নিজেদের জাহাজেই তুলে নিয়েছিল। ফ্রান্সিসদের সঙ্গেই রইল।

দিন কয়েক পরে

সেদিন ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—ফ্রেজার কিছু দিক ঠিক করতে পারলে?

—কিছু না। বলতে পারো একেবারে আন্দাজে চলছে জাহাজ।

—শুধু উত্তরদিকটা ঠিক রাখো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাই বা পারছি কই। ফ্রেজার বলল।

—এ ছাড়া কোন উপায় নেই। দেখি ধারে কাছে কোন দেশ দ্বীপ পাই কি না। পেলে দিক চেনাটা সহজ হবে। ফ্রান্সিস বলল।

চারপাঁচদিন পরের কথা। সেদিন দুপুরে নজরদার পেড্রো চেঁচিয়ে বলল—আমাদের দেশের এক জাহাজ যাচ্ছে। জাহাজে দেশের পতাকা উড়ছে। ফ্রান্সিসকে বলো। বিস্কো সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে এল, বলল—আমাদের দেশের একটা জাহাজ আমাদের জাহাজের খুব কাছে। ওদের সঙ্গে কথা বলব?

—নিশ্চয়ই। দেশবাসী বলে কথা। চলো ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল।

—আমাদের কাছে যে কোন পতাকাই নেই। ওরা বুঝতে পারেনি। বিস্কে বলল।

—আমাদের জাহাজে অনেকদিন আগেই ছিঁড়ে উড়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রেজার তাদের জাহাজ নতুন জাহাজের কাছাকাছি আনল। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—ভাই তোমরা কি ভাইকিং? ভাইকিং দেশ থেকে এসেছো?

—হ্যাঁ। ঐ জাহাজের একজন গলা চড়িয়ে বলল। ফ্রান্সিসদের জাহাজের ভাইকিং বন্ধু ধ্বনি তুলল—ও হে বো। ঐ জাহাজ থেকেও ভাইকিংরাও গলা মেলাল। সবাই আনন্দ করতে লাগল।

জাহাজ দুটো গায় গায় লাগল। ফ্রান্সিস লাফিয়ে ঐ জাহাজে গেল। ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাদের দলনেতা। একজন বেশ শক্তসমর্থ যুবক এগিয়ে এল। বলল—আমি। ডেভিড।

—আমি ফ্রান্সিস তোমরা এদিকে এসেছো কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—ব্যবসা করি আমরা। বড় বড় বন্দর থেকে দড়িপালের কাপড় সস্তায় কিনে বিভিন্ন ছোট ছোট বন্দরে বিক্রি করি।

—তোমরা গুপ্তধনের সন্ধান করো না? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না-না। ডেভিড মাথা নাড়ল।

—আমরা তাই করি। অনেক গুপ্তধন আমরা আবিষ্কার করেছি। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে, গুপ্তধন খুঁজে বের করতে আমরা আনন্দ পাই। ফ্রান্সিস বলল।

—বদলে তোমরা কি পাও? ডেভিড জানতে চাইল।

—কিছুই না। ফ্রান্সিস বলল।

—সে কি কত কষ্ট করে গুপ্তধন খুঁজে বের করলে অথচ বিনিময়ে কিছুই নাও না। ডেভিড বলল।

—হ্যাঁ। ওটাই আমাদের নীতি। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো বহু দেশ ঘুরেছো? ডেভিড বলল।

—অনেক অনেক দেশ। ফ্রান্সিস বলল।

—দেশে ফিরবে না? ডেভিড জানতে চাইল।

—সেটাই আর হয়ে উঠবে না। ফ্রান্সিস বলল।

ডেভিড হঠাৎ বলল—দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি তোমার নাম বললে ফ্রান্সিস।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

—তুমি আর তোমার বন্ধুরাই কি সোনার ঘণ্টা উদ্ধার করেছো? ডেভিড বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা রাজবাড়িতে দেখেছি। ডেভিড বলল। তোমাদের বীরত্বের কথা সারা দেশ জানে। তোমাকে চিনতে আমার দেরি হল এজন্য মাফ কর। ডেভিড বলল।

—না না তাতে কী? তোমরা কবে দেশে ফিরবে? ফ্রান্সিস বলল।

—মাস ছয়েক পরে। ডেভিড বলল।

—আমরাও দেশে ফেরার চেষ্টা করছি। কিন্তু সমুদ্রপথ হারিয়ে কোথায় যে যাচ্ছি তার ঠিক নেই।

—সোজা উত্তরমুখো জাহাজ চালাও—দেশে পৌঁছুতে পারবে। ডেভিড বলল।

অন্য জাহাজের ভাইকিংরা এতক্ষণে ফ্রান্সিসের কথা জেনে গেছে। ওরা দলবেঁধে এসে ফ্রান্সিসের সঙ্গে করমর্দন করে গেল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—তোমরা কোথা থেকে ফিরছ?

—ঐ যে পাহাড়ি দ্বীপ হিচকক ওখান থেকে আসছি। ডেভিড বলল।

—এখন ওখানকার রাজা কে? ফ্রাসিস জানতে চাইল।

—রাজা সামুল। ভীষণ রগচটা না? কারো কথায় ব্যবহারে একটু এদিক ওদিক দেখলেই কয়েদ ঘর। আমাদেরও ধরেছিল। বলেছিল—নিশ্চয়ই তোমাদের জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র আছে।

বললাম—আমরা ব্যবসায়ী মানুষ। অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আমরা কী করব? বিশ্বাস করল না আমাদের জাহাজ তল্লাসী করল। বিপদ হল—আমরা তরোয়াল বর্শা তৈরি করি জমা করি। বিক্রি করি। একটা ঘরে এসব জমা রাখতাম। কিন্তু সেসব পাচার করার সময় পেলাম না। ধরা পড়ে গেলাম। রাজা মামুলির সে কি রাগ। আমাদের এই মারে তো সেই মারে। আমাদের পাঁচদিন কয়েদঘরে আটকে রাখলো পরে কী ভেবে কে জানে আমাদের সমস্ত অস্ত্রপাতি নিয়ে আমাদের মুক্তি দিল।

মুক্তি পেয়ে আমরা আর জাহাজে ফিরলাম না। কখন আবার আমাদের ধরে। উঠলাম গিয়ে এক সরাইখানায়।

সেখানে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনলাম। সেদিন গভীর রাত। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কে গোঙাচ্ছে। কে? সরাইখানায় অনেকেই ঘুমিয়ে আছে। শুনলাম একটা কোণ থেকে কাতরানোর শব্দ ভেসে আসছে। একটু দেখতে হয়। কী ব্যপার? বিছানা ছেড়ে উঠলাম। সেইদিকে গেলাম। একটা আলোঅন্ধকারে দেখলাম এক বৃদ্ধ শুয়ে গোঙাচ্ছে। বৃদ্ধের মুখের ওপর ঝুঁকে বললাম—আপনি কি অসুস্থ? বেশ কষ্ট করে বৃদ্ধ বলল—হ্যাঁ। আমি বাঁচবোনা। কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যিই বৃদ্ধ গুরুতর অসুস্থ। বৃদ্ধ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—আমার কাছে একটা জিনিস আছে। সেটা কাকে দিয়ে যাবো তাই আমার চিন্তা।

—সেটা কী? আমি জানতে চাইলাম।

—একটা পেতলের মাপকাঠি। বৃদ্ধ বলল।

—একটা মাপকাঠি নিয়ে এত ভাবছেন কেন? আমি বললাম।

—সব ঘটনা শুনলে তুমি বুঝতে পারবে। ডেভিড বলল—এবার সেই বৃদ্ধ যা বলল—তাই বলছি। প্রায় দেড়শো দুশো বছর আগে বর্তমান রাজা মামুনের পূর্ব পুরুষ এক রাজা ছিল। রাজা সুমালী। সেও ছিল এক আধ পাগল রাজা। তার মাথায় বিচিত্র সব চিন্তা আসতো। একদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছে একটা ঝুনো নারকেল তার কাঁধে পড়ল। রেগে গিয়ে সে এলাকার সব নারকেল গাছ কেটে ফেলার হুকুম দিল। তার বিচিত্র সব কাণ্ড কারখানার কথা শুনলে অবাক হয়ে যাবে।

সবচেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড করল রাজা প্রাসাদের বিরাট এক ঘরে ছোট ছোট ঘর তৈরি করলো। কোন ঘরেরই দরজা জানলা নেই। ঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে গলি। রাজা সুমালীর শখ—সেই ঘরের আড়ালে আড়ালে গলিপথ দিয়ে ছুটো ছুটি করে লুকো চুরি খেলবেন।

সেই খেলা যেদিন শুরু হল প্রাসাদের বাইরে রাজ্যের লোক ভেঙে পড়ল। দুপুরে রাজা সুমালী এলো। মন্ত্রী সেনাপতি অমাত্যরা সবাই এলেন। পাকা দাড়ি গোঁফের ভিড়। তারা ঘরের আড়ালে আড়ালে লুকোচুরি খেলা শুরু করল। সে কি উৎসাহ কী উদ্দীপনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলা জমে গেল। বুড়োদের সে কি ছুটোছুটি। প্রজারা হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিতে লাগল।

কিন্তু হাজার হোক বয়েস তো হয়েছে। কতক্ষণ আর ছুটোছুটি করবেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুড়োরা হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। খেলা বন্ধ হয়ে গেল।

আবার পরদিন খেলা হল। এই অদ্ভুত খেলা দেখতে বিদেশী রাজাদের লোকেরাও এল। প্রজারাতো আছেই।

কয়েকদিন পর পর খেলা চলল রাজ অন্তঃপুরের মেয়েরাও খেলা দেখতে এল। সেখানেই খেলা শেষ হতে রানি এসে দাঁড়ালেন। রাজা সুমালীকে ধমক দিয়ে বললেন—বুড়ো বয়েসে ভিমরতি ধরেছে। বন্ধ কর এসব খেলা। এই পরিশ্রম আমাদের সহ্য হবেনা। অকালে মারা যাবেন। এই খেলা আর হবে না।

রাজা সুমালী মাথা চুলকোতে লাগলেন। কী বলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। প্রজাদের সামনে মন্ত্রী অমাত্যের সামনে রাজা বেশ অপ্রস্তুত হলেন।

আর কি। খেলা বন্ধ হয়ে গেল। রাজা সুমালীর মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

ঘরগুলো আর ভাঙা হল না। সেগুলো রয়েই গেল।

পাগল রাজার বিচিত্র সব কাহিনী হিচকক দ্বীপের ধারে সমুদ্রে প্রচুর ঝিনুক। ঝিনুকে বড় বড় মুক্তো। সমুদ্রের ধারে ঝিনুক তুলে মুক্তো খোঁজে যারা তাদের ভিড় লেগেই আছে। দলে দলে লোক ঝিনুক তোলে আর ঝিনুকের মুখ খুলে খুলে মুক্তো বের করে। অনেক লোকের এটাই জীবিকা।

হঠাৎ রাজা সুমালী ঘোষণা করলেন কেউ সমুদ্র থেকে মুক্তো তুলতে পারবে না। শুধু উনি নিজে তুলবেন।

হাতে ছোট জাল নিয়ে রাজা সুমালী একদিন সকালে সমুদ্রের ধারে এলেন। সেদিনও প্রজাদের সে কি ভিড়।

মুক্তো শিকারীদের মতই রাজার পরনে নেংটি। জাল হাতে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। উঠলেন একটু পরেই। জালে পড়া ঝিনুক। জাল নিয়ে পাড়ে রাখলেন। এক সৈন্যকে বললেন—এ্যাই সব ঝিনুক ভাঙ্। দ্যাখ—মুক্তো পাস কিনা। সৈন্যটি ঝিনুক ভাঙতে লাগল।

রাজা আবার নামলেন জলে। কিছুক্ষণ পরেই উঠে এলেন। জাল ভর্তি ঝিনুক। আবার এক সৈন্যকে বললেন—ঝিনুক ভাঙ্।

ঝিনুক ভাঙা হতে লাগল। রাজার ভাগ্যি। দু দফায় ঝিনুকে দুটো বড় মুক্তো পাওয়া গেল। সমবেত প্রজারা রাজার জয়ধ্বনি দিল—রাজা সুমালীর জয় হোক। রাজা সুমালীও খুশি। সগর্বে চারিদিক তাকাতে তাকাতে পোশাক পরলেন। রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন।

মুক্তো শিকারীদের জীবিকাই ছিল এটা। তারা রাজার দরবারে গেল। নিজেদের সমস্যার কথা বলল। রাজা অনড়—না—শুধু আমি মুক্তো তুলবো।

এবারেও রানিই প্রজাদের বাঁচালেন। রানি রাজসভায় প্রজাদের বললেন—দাঁড়াও। আমি দেখছি। রাজার দিকে চেয়ে বললেন—তোমার কি মাথা খারাপের বাকি নেই। ঐ জলে চুবানি খেয়ে মুক্তো তুলতে যাচ্ছ? বন্ধ কর এসব। মুক্তো শিকারীরা এই মুক্তো বিক্রী করে সংসার চালায়—বেঁচে আছে, আর সেটা তুমি বন্ধ করে দিতে যাচ্ছ?

রাজা সুমালী কয়েকবার মাথা চুলকে বললেন—ঠিক আছে। তোরা মুক্তো তুলবি। রাজসভায় উপস্থিত প্রজারা উচ্চকণ্ঠে রাজার নামে জয়ধ্বনি দিল।

তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

—এই পাগলা মনভুলা রাজা আর একটি কাণ্ড করেছিলেন। সেটা জানা গেল তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে।

তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়।

হঠাৎ ঘোষণা করলেন—আমি ইনকা কর্মকারদের সাহায্যে একটা সম্পূর্ণ সোনার ঘর তৈরি করিয়েছে। সেটা আমি অত্যন্ত গোপনে করিয়েছি। কিন্তু সমস্যা হল আমি যে মাপকাটি ব্যবহার করেছিলাম সেটা হারিয়ে ফেলেছি। আমি জানি না সেটা কোথায়? কাজেই একমাত্র নির্ভর উত্তরপুরুষরা। তারা যদি সেই সোনার ঘর আবিষ্কার করতে পারে। আমি কোন সূত্রও দিয়ে যেতে পারলাম না।

রাজা সুমালী মারা গেলেন।

রাজা সুমালী ঘরটি তৈরি করেছিলেন অত্যন্ত গোপনে। যে দরজা জানালাহীন ঘরগুলো তৈরি করা হয়েছিল সেটাকে চারদিক দিয়ে দেওয়াল গাঁথা হল। একটা মাত্র দরজা। তাও তালাবন্ধ। গভীরভাবে ইনকা কর্মকারেরা আগুনের উনুন জ্বেলে মোম গলিয়ে সোনার ঘরে ঢালে। আস্তে আস্তে সোনার ঘর তৈরি হয়। বেশ সময় লেগেছিল। সেই কাজের সময় ধারেকাছে কাউকে যেতে দেওয়া হত না। এমন কি প্রহরীদেরও না।

রাজা সুমালীর প্রচুর স্বর্ণসম্পদ ছিল। দু'তিন পুরুষের সঞ্চয়। কাজেই একটা ছোট ঘর নিশ্চয়ই তৈরি করার মত সোনা তাঁর ছিল।

সোনার ঘর তৈরির চিন্তাটাই পাগল রাজার মাথায় এসেছিল কেন সেটা বোঝার উপায় ছিল না। পাগলের খেয়াল।

—তাহলে সেই সোনার ঘর কেউ উদ্ধার করতে পারে নি। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তোমরা চেষ্টা করবে? ডেভিড বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল।

—তাহলে মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলতে পারো। মন্ত্রীমশাই খুব ভাল মানুষ। ডেভিড বলল।

—দেখি ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা নিজেদের জাহাজে ফিরে এল। ফ্রান্সিস নিজের কেবিনঘরে ঢুকল। মারিয়া চুপচাপ বসেছিল। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া তোমার এ দেশের অতীতের এক রাজার কথা বলি। সে এক বিচিত্র কাহিনী।

হ্যারি দরজায় এসে দাঁড়াল।

—এসো এসো হ্যারি। এই হিচকক দ্বীপের অতীতের এক রাজার কাহিনী বলি।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে শোনা কাহিনী সব বলল। সব শুনে মারিয়া হ্যারি দুজনেই অবাক।

—সেই সোনার ঘর তাহলে হিচকক দ্বীপে আছে? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। কোথায় আছে সেটার খোঁজখবর করতে গেলে ওখানে যেতে হবে। সব দেখতে হবে জানতে হবে। মারিয়ার মুখ ভার হল। আস্তে আস্তে বলল—তার মানে আরো কিছুদিন এখানে থাকতে হবে।

—হ্যাঁ মারিয়া। কী করবো বলো। আমার ভালো লাগে এসব। কী হবে দেশে ফিরে? সেই তো খাও দাও ঘুমোও এর জীবন। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু আমার তো বাবা মাকে দেখতে ইচ্ছে করে। মারিয়া বলল।

—খুবই স্বাভাবিক। তবু বলে মারিয়া এই কষ্টটা মেনে নাও। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ মারিয়া আর কোন কথা বলল না।

এরমধ্যে ভাইকিংরা পাগলারাজা সুমালীর কাহিনী শুনে নিয়েছে। ফ্রান্সিস সোনার ঘর খুঁজে বের করার পরিকল্পনা নিয়েছে তাও জানল ওরা।

সেদিন শাঙ্কো ছুটতে ছুটতে এল। খুব খুশী। শাঙ্কো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—উৎসব—উৎসব

—কীসের উৎসব? হ্যারি জানতে চাইল।

—এই হিচকক দ্বীপে প্রতিবছর এই দিনে সমুদ্র পূজা হয়। মেলা বসে সমুদ্রতীরে। রাজা রানি আসেন। রাজ পুরোহিত ফুলপাতা দিয়ে সমুদ্র পূজা করে। শাঙ্কো বলল।

—সমুদ্র পূজা কথাটা নতুন শুনলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস—হ্যারি হেসে বলল—আমরাও তো তরোয়ালি পূজা করেছিলেন।

ফ্রান্সিস হেসে ফেলল। বলল—ঐ তরোয়ালপূজা করেই তো পালাতে পারলাম। তুমি মাথা থেকে জব্বর পরিকল্পনা বের করেছিলে। কত লোক সমুদ্রতীরে জড়ো হয়েছে। মেলা বসেছে। নানা দোকানপাট বসেছে। জোর কেনাকাটা চলছে। আমরাও যাবো।

—বেশ। সবাই যাবো। এরকম মেলাটেলায় তো যাওয়া হয় না।

—দেশের মেলার কথা মনে করিয়ে দিলে ফ্রান্সিস। মনটা খারাপ হয়ে গেল। হ্যারি একটু ভারি গলায় বলল।

—পাগল। ওসব নিয়ে ভেবো না। আমরা কি কোনদিন দেশে ফিরবো না? ফ্রান্সিস বললো।

—সত্যিই কি দেশে ফিরে যেতে পারবো ফ্রান্সিস? হ্যারি বলল। হ্যাঁ। এটা ঠিক কয়েকজন বন্ধুকে আমরা হারিয়েছি। এটা তো স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন ধরে কত কত দ্বীপে, দেশে ঘুরে বেড়ালাম। বিপদ আপদ তো হবেই। এর জন্যে ভয় পেয়ে দেশে ফিরে যাওয়া কোন কাজের কথা নয়। ফ্রান্সিস বলল আমরা এখনই যাবো।

—ঠিক আছে। বন্ধুদের বল। সবাইকে খবর দিতে শাঙ্কো প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস নিজের কেবিনঘরে গেল। দেখল মারিয়া সুঁচ-সুতে দিয়ে ছেঁড়া পোশাক সেলাই ফোঁড়াই করছে। ফ্রান্সিস হেসে বলল—মারিয়া—অনেকদিন তো মেলা-টেলা দেখ না।

—সমুদ্রের জলে মেলা বসে? হুঃ! মারিয়া মুখ ঘুরিয়ে বলল।

—না ডাঙাতেই বসে। মেলায় যাবে? ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া হাঁ করে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস জানে মেলায় লোকজন দোকানপাট এসব দেখলে মারিয়া সবচেয়ে খুশি হয়।

—কী বলছো বুঝে উঠতে পারছি না। মারিয়া বলল। এসো—সমুদ্রের ধারে কত লোক এসেছে। ডেক-এ উঠে দেখে এসো—সমুদ্রের ধারে কত লোক এসেছে। মেলা বসেছে? ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি। দেখি তো! মারিয়া হাতের কাজ রেখে দরজার দিকে ছুটল।

একটু পরেই ফিরে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মেলা দেখতে যাবো।

—সবাই যাবে। এবার তুলে রাখা ভালো পোশাক-টোশাক গুলো বের কর। আমরা সবাই ভালো পোশাক পরে যাবো।

মারিয়া পোশাক বের করার জন্যে বাক্সটাক্স চামড়ার ঝোলা খোঁজাখুঁজি শুরু করল।

একটু পরেই দরজায় টোকা দেয়ার শব্দ। ফ্রান্সিস দরজা খুলল। শাঙ্কো দাঁড়িয়ে। পরনে নতুন পোশাক। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—তোমরা এখনও তৈরি হওনি। ওদিকে—

—আরে বাবা আমরা যেতে যেতে মেলা উঠে যাবে না। তোমরা ডেকে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমরা যাচ্ছি। শাঙ্কো ছুটে চলে গেল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর সাজসজ্জা দেখে খুশি হল। ময়লা পোশাক পরে জাহাজের হাজারটা কাজ, কখনও কখনও ডেকে রাত কাটালো দুপুরের চড়া রোদ কয়েক ঘন্টার কষ্ট—যাক অন্তত একদিনের জন্যে হলেও নিজের খুশিমত সাজতে পেরেছে।

মারিয়া ফ্রান্সিসকে একটা নতুন পোশাক বের করে দিল। পরিয়েও ছিল। পরিয়েও দিল। ফ্রান্সিস হেসে বলল এবার এই ঘরে একটা আয়না রাখবো। দেওয়ালে আটকে রাখবো। জাহাজের ঝাঁকুনিতে পড়ে যাবে না।

—কোন দরকার নেই—মারিয়া বলল—আয়নায় মুখটুখ দেখলে মন খারাপ হবে। তার চেয়ে এই বেশ আছি।

—বেশ। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

মারিয়াও একটা নতুন গাউন পরল। নীল সবুজ রঙের। মাথার চুল আঁচড়াল। মুখটা একবার দু'হাতে ঘসে নিল। তারপর বলল—চলো। ফ্রান্সিস একবার মারিয়াকে দেখল। মারিয়ার চেহারায় এখনও রাজকুমারীর সৌন্দর্য মুছে যায় নি। শুধু গায়ে ও মুখের দুধ আলতা রংটা আর নেই। একটু তামাটে হয়েছে।

দুজনে ডেকে উঠে এল। বন্ধুরা হৈ হৈ করে উঠল। আজকে সবাই নতুন পোশাকে উচ্ছল। ফ্রান্সিস বলল—সবাই যাবে।

—সবাই যাবো। শাঙ্কো বলল।

—কয়েকজন জাহাজের পাহারায় থাকো। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। সবাই যাবো। বিস্কো বলল।

—ঠিক আছে। শুধু ভেন থাকুক। ও বয়স্ক মানুষ। হৈ চৈ করতে পারবে না। হ্যারি বলল।

—বেশ। শাঙ্কোরা বলল।

সবাই জাহাজ থেকে নেমে এল। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে।

মেলা এলাকায় লোকজনের ভিড়। ফ্রান্সিসরা ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

শাঙ্কো বিকেলেই এক স্বর্ণকারের দোকানে গিয়েছিল। দুটো সোনার চাকতি বদলে কিছু স্থানীয় মুদ্রা এনেছিল। সেসব বন্ধুদের দিল। বনসুরা মনের আনন্দে কেনা কাটা করল। কারো জাহাজে ফেরার নাম নেই।

তখন রাত হয়ে গেছে। মেলার এলাকায় লোকের ভিড় কমে গেছে।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাই সব আর নয়। এবার জাহাজে ফেরা।

বেশ আনন্দে সময় কাটল ভাইকিংদের। সবাই জাহাজ ঘাটের দিকে ফিরে আসতে লাগল।

জাহাজ ঘাটে এসে সবাই হতবাক। একী? ওদের জাহাজ কোথায়? সেখানে ছোট নৌকা ভাসছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাই সব জাহাজ চুরি হয়ে গেছে। একা ভেন রয়েছে সেই জাহাজে। ভেন নিশ্চয়ই বুঝতে পারে নি। এরকম বিপদে কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না।

—ফ্রান্সিস দেখো তো নৌকোটার মাঝিকে বলে। ও কিছু দেখেছে কিনা? হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস নৌকাটার কাছে গেল। গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল—ভাই শুনছো? মাঝি বোধহয় রান্নাটান্না করছিল এগিয়ে এসে বলল—আমাকে ডাকছো কেন?

—এখানে আমাদের জাহাজ ছিল। তুমি দেখেছো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। মাঝি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—ওটা চুরি হয়ে গেছে। তুমি দেখেছো কিছু? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ, দেখলাম আটদশজন লোক জাহাজটায় উঠল। নোঙর তুলে জাহাজ ছেড়ে দিল। ভাবলাম তোমারই বোধহয়। মাঝি বলল।

—কতক্ষণ আগে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—ঘণ্টা খানেক হবে। হ্যারি বলল।

—তাদের হাতে অস্ত্র ছিল? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। তরোয়াল ছিল। মাঝি বলল।

—তাদের তুমি আগে দেখেছো? ফ্রান্সিস জিজ্ঞাসা করল।

—না। মাঝি মাথা নাড়ল।

—জাহাজ কোনদিকে গেল? হ্যারি জানতে চাইল।

—দক্ষিণ মুখো। মাঝি হাত তুলে দক্ষিণ দিকে দেখাল।

এবার শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস কী করবে?

—এখানে জাহাজ কিনবো। দক্ষিণমুখো জাহাজ চালাবো। জাহাজ চোরদের ধরতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—জাহাজ কিনবে। অত সোনার চাকতি তো আমার কাছে নেই। মারিয়া এগিয়ে এল। বলল—আমাদের বোধনঘরের কাঠের দেওয়ালে আমি সোনার চাকতি রেখে ছিলাম।

—জাহাজ তো নেই। ফ্রান্সিস তারপর বলল—শাঙ্কো তোমার কাছে ক'টা সোনার চাকতি আছে? শাঙ্কো পেটি থেকে সোনার চাকতিগুলো বের করল। গুনে বলল—ছোট জাহাজ কেনা যেতে পারে।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে মাঝিকে জিজ্ঞেস করল আমরা জাহাজ কিনবো। এখানে বিক্রির জন্য জাহাজ আছে?

—যে সব রুবিন বলতে পারবে। ও জাহাজ কেনাবেচার কাজ করে। মাঝি বলল।

—রুবিন কোথায় থাকে?

মাঝি আঙ্গুল তুলে সমুদ্রতীরের একটা ঘর দেখাল। বলল—ওখানেই রুবিন থাকে। তবে ওর বদনামও আছে। খালি জাহাজ পেলে ও নিজের বলে বিক্রি করে দেয়। মাঝি বলল।

—রুবিন নিশ্চয়ই আমাদের জাহাজের বেলায়ও এই কাণ্ডটি করেছে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—রুবিনকে পাকড়াও কর। হ্যারি বলল।

—চলো। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

ওরা রুবিনের ঘরের কাছে এল। ছোট ঘর। তবে শক্তপোক্ত। ঘরের দরজা খোলা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘরে ঢুকল। দেখল একটা বিছানায় একটা লোক শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখল লোকটা ঘুমুচ্ছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকল—রুবিন। লোকটা ধড়মড়িয়ে উঠে বলল—কী ব্যাপার?

—ব্যাপার গুরুতর। তুমিই রুবিন? ফ্রান্সিস ভারি গলায় জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। রুবিন মাথা নত করল।

—জাহাজ কেনাবেচার কাজ কর। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি তো তোমাদের চিনি না। রুবিন বলল?

—এবার চিনবে? আমাদের জাহাজে মাত্র একজন লোক ছিল। সেই অবস্থায় তুমি আমাদের জাহাজ বিক্রি করে দিয়েছো। ফ্রান্সিস বলল।

—কী সব বলছো। তোমাদের জাহাজের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। রুবিন মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—শাঙ্কো-ছোরাটা নিয়ে এসো তো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল। ডালা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করে ফ্রান্সিসের হাতে দিল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ছোরাটার মুখ রুবিনের গলায় চেপে ধরল। দাঁতচাপাস্বরে বলল—আসল ঘটনাটা বল।

রুবিন মাথা নেড়ে বলল—আমি কিছুই জানি না। ফ্রান্সিস ছোরার চাপ বাড়াল। একইভাবে বলল—যদি মরতে না চাও সত্যি ঘটনাটা বলো। তোমাকে এখানে কেউ বাঁচাতে আসবে না।

রুবিন আবার মাথা নাড়ল। ফ্রান্সিস ছোরার চাপ বাড়াতেই রুবিনের গলায় একটু চেপে রক্ত বেরিয়ে এল। এবার রুবিন বুঝলো জীবন বিপন্ন। এই বিদেশিটা ওকে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারে। ও বলে উঠল—ছোরা সরাও—বলছি। হ্যাঁ চেড়ে রুবিন বলল—তোমাদের জাহাজে কেউ নেই দেখে ঐ জাহাজ আমার বলে বিক্রি করে দিয়েছি।

—কার কাছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—একজন নয়। জন দশ বারো লোকের কাছে। রুবিন বলল।

—তারা কোথাকার লোক? ফ্রান্সিস আবার প্রশ্ন করল।

—পাতুই দ্বীপ থেকে এসেছিল। রুবিন বলল।

—পাতুই দ্বীপ কোথায়? কতদূর? ফ্রান্সিস আবার জিজ্ঞেস করল।

—দক্ষিণ দিকে। এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারি বলল—যাক একটা হদিশ পাওয়া গেল। এবার ফ্রান্সিস রুবিনের দিকে তাকাল। বলল—আমাদের জাহাজ বিক্রি করে যে মুদ্রা পেয়েছো সে সব কোথায়?

—সে সব দিয়ে আর একটা জাহাজ কিনেছি। রুবিন বলল।

—চুরি করে—না দাম দিয়েছো। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ—দাম দিয়েই কিনেছি। শেঠ মালিকের কাছ থেকে। রুবিন বলল।

—সেই জাহাজ কোথায়? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

রুবিন পূর্বদিক আঙ্গুলি দেখিয়ে বলল—ঐখানে নোঙর করা।

—চলো? সেই জাহাজ দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—পুরনো জাহাজ। ভাঙাচোরা। রুবিন বলল।

—ঠিক আছে। তুমি জাহাজটি দেখাবে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু ঐ জাহাজ আমি—রুবিন কথাটা শেষ করতে পারল না?

—কথা বাড়িওনা। চলো ফ্রান্সিস বাধা দিয়ে বলল। ফ্রান্সিস ছোরাটা শাঙ্কোকে ফিরিয়ে দিল। শাঙ্কো ছোরাটা বুকের কাছে পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল।

ঘরের বাইরে এসে রুবিন ফ্রান্সিসের বন্ধুর দলকে দেখল। মারিয়াকে দেখে একটু অবাকও হল। রুবিন বুঝল এরা দলে ভারি। একটু এদিক-ওদিক হলে ওরা ওকে বিপদে ফেলতে পারে?

সবাই পূবমুখো চলল।

দু-তিনটি জাহাজ ছাড়িয়ে রুবিন একটা জাহাজের সামনে এল। জাহাজটা দেখিয়ে বলল—দেখ একেবারে লজ্ঝর একটা জাহাজ। সস্তাতেই কিনেছি।

জাহাজাটার পাটাতন ফেলাই ছিল। রুবিন আগে জাহাজটায় উঠল। পেছনে ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কো।

ভালো করে দেখল ফ্রান্সিস। সত্যিই একটা পুরোনো আধভাঙা জাহাজ। ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো? শাঙ্কো এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—ভালো করে জাহাজটা দেখতো। মেরামতি করে জাহাজটা চালানো যাবে কিনা। রুবিন প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল—আমার কেনা জাহাজ— তোমরা নেবে কেন?

—আমাদের জাহাজ তুমি চুরি করে বিক্রি করেছিলে কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—তাই বলে আমার জাহাজ নিয়ে নেবে? রুবিন গলা চড়িয়ে বলল।

—তোমাকে মেরে ফেলিনি এটাই যথেষ্ট। এখন বিদেয় হও। ফ্রান্সিস বলল।

—তার মানে—রুবিন কী বলতে গেল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—

—আর একটা কথাও নেই। এই জাহাজ এখন আমাদের। রুবিন কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। বলল—আমি রাজার কাছে নালিশ করবো।

—আমরা বলবো এক জাহাজ চোরের জাহাজ আমরা নিয়ে নিয়েছি। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। তোমাদের এই দ্বীপ থেকে আমি তাড়াবো। রুবিন বলল।

—তার আগে তুই জাহাজ থেকে নেমে যা। ফ্রান্সিস বলল।

রুবিন গজর গজর করতে করতে জাহাজ থেকে নেমে গেল

শাঙ্কো জাহাজের সব দেখেটেকে ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—কেমন দেখলে?

—জাহাজটার অবস্থা খুব খারাপ। হাল আধভাঙা। ডেকের কাঠের পাটাতন কোথাও কোথাও ভাঙা। মাস্তুল পালের দড়িদড়া জরাজীর্ণ।

—নিচে যাও। কেবিন ঘরটরগুলো দেখ। জাহাজাটা কেমন? কাঠটাট, যন্ত্রপাতি মজুত আছে দেখ। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো চলে গেল।

এবার মারিয়া আর বন্ধুরা জাহাজে উঠে এল। বিস্কো বলে উঠল—এ তো একশো বছরের পুরোনো জাহাজ।

—এই জাহাজ নিয়েই আমাদের জাহাজ উদ্ধারের জন্য যেতে হবে।

নতুন জাহাজ কেনার মত স্বর্ণমুদ্রা নেই। ফ্রান্সিস বলল।

বনসুরা ঘুরে ঘুরে জাহাজটা দেখতে লাগল। কত সুন্দর মজবুজ ওদের জাহাজ।

এই জাহাজের সঙ্গে তুলনাই চলবে না। কিন্তু এখন এই জাহাজই ভরসা। চুরি হয়ে যাওয়া জাহাজ উদ্ধার না করা পর্যন্ত এই জাহাজই চালাতে হব।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে ফিরে এল।

—কেমন দেখলে?

—অবস্থা খুব একটা খারাপ নয়। আর আশ্চর্য হল গুদাম ঘরে যথেষ্ট কাঠ আর যন্ত্রপাতি আছে। জাহাজের মালিক বোধ হয় জাহাজটা সারাইটারাই করবে ভেবেছিল। কিন্তু করে নি। এই অবস্থাতেই বিক্রি করে দিয়েছে।

—যাক। তাহলে মেরামতি করে কাজ চালানো যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—জাহাজ কি এই অবস্থাতেই চালাবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। দেরি করবো না। জাহাজ চলতে চলতেই মেরামতির কাজ চলবে। ফ্রান্সিস বলল?

—সবার আগে খাদ্য আর জলের ব্যবস্থা করতে হবে। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ ওটাই প্রাথমিক কাজ। শাঙ্কো কয়েকজনকে নাও। জলের পীপে বস্তা নিয়ে যাও। কেনাকাটা সেরে খাবার জল নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল?

শাঙ্কোরা কয়েকজন বস্তা পীপে নিয়ে চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে শাঙ্কোরা আটা ময়দা চিনি পীপে ভর্তি খাবার জল নিয়ে ফিরে এল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এখন কী করবে?

—ফ্রেজারকে বলো ও জাহাজ ছেড়ে দিক। যাবো দক্ষিণের পাতুই দ্বীপে। জাহাজ উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু এই ভাঙা জাহাজ নিয়ে—হ্যারি আপত্তি করতে গেল।

—পারবো। তবে ঝড়ঝাপটা এলে সমস্যায় পড়বো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে এই বন্দরে জাহাজ মেরামতি করিয়ে নেবে না? হ্যারি বলল

—না। দেরি করা চলবে না। জাহাজ চলতে চলতেই মেরামতির কাজ চালাতে হবে। সবাইকে হাত লাগাতে হবে। জাহাজে অনেক কাঠ যন্ত্রপাতি আছে। সমস্যা হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তুমি যা বলো। হ্যারি বলল।

—জাহাজ চালাবার দায়িত্বে থাকাবে তিনজন—ফ্রেজার, শাঙ্কো আর সিনেত্রা। বাকি সবাই জাহাজ সারাইয়ের কাজে লাগবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে—আজ রাতেই জাহাজ ছাড়বে! হ্যারি জানতে চাইল।

—হ্যাঁ—দেরি করা চলবে না। ফ্রান্সিস বলল।

রাতের খাওয়া সেরে তিনজন বাদে সবাই জাহাজ মেরামতিতে হাত লাগল। তার আগে পালগুলো পালের কাঠে ভালো করে বেঁধে দিল। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ। আলোর অভাব হচ্ছিল না।

সমুদ্রে জোর হাওয়া পালগুলো জোর বাতাস পেয়ে ফুলে উঠল। দু-একটা পালে ফুটো ছিল। তবু পালের টানে জাহাজ বেশ বেগেই চলল।

প্রথমেই ফ্রান্সিসরা ভাঙা হাল মেরামতিতে হাত লাগল। কর্মরত ভাইকিংদের কথাবার্তা হাতুড়ির ঠুকঠাক শব্দ কাঠের পাঠাতন টানাটানির গর্ গর্ শব্দ চলল। সারারাত সারাইয়ের কাজ চলল।

পূব আকাশে কমলা রং ছড়িয়ে সূর্য উঠল। ভোর হল। নরম রোদ পড়ল সমুদ্রে জাহাজে।

ভাইকিংরা কাজ থামিয়ে ডেকে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

সকালের খাবার খেয়ে আবার কাজে হাত লাগাল।

কাজ চলল দুপুর পর্যন্ত।

দুপুরের খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম তারপর আবার কাজ।

সন্ধ্যের মধ্যেই হাল মেরামত হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস ফ্লেজারের কাছে এল। বলল হাল ঠিক হয়েছে। ফ্লেজার হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল—ঠিক আছে। হালের জোর বেড়েছে। জাহাজ এবার ভালো চলবে।

একটা দিন কাটল।

এর মধ্যে জাহাজের ফুটো ফাটা ভাঙা রেলিং সিঁড়ি ঘরের ডেক-এর মেরামতি চলল। আরো কাজ বাকি।

সেদিন গভীর রাতে ফ্রান্সিস যা আশঙ্কা করেছিল তাই হল।

প্রচণ্ড ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসদের জাহাজের ওপর। সমস্ত জাহাজটা কেঁপে উঠল। তারপরেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ তুলে বাজ পড়া।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব যে করেই হোক জাহাজ ডুবতে দেওয়া চলবে না। সবাই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়।

ভাইকিংরা দ্রুত পাল নামিয়ে ফেলল। পালের কাঠের দড়িদড়া মাস্তুলের দড়িদড়া প্রাণপণে টেনে ধরে জাহাজটা ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা চালাল। ভাইকিংরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ নাবিব। ঝড়ঝাপটার সঙ্গে লড়াই করা ওদের কাছে নতুন কিছু নয়। চলল ঝড়ের সঙ্গে লড়াই। ফ্লেজার দৃঢ়হাতে হুইল ঘোরাতে লাগল। উঁচু উঁচু ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজ একবার দুলুনীতে কয়েকজন ভাইকিং ছিটকে ডেক-এর ওপর পড়ে গেল। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজে লাগল।

জাহাজের ডেক-এর ওপর ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল। সমস্ত জাহাজটাতেই ক্যাঁক ক্যাঁক শব্দ হতে লাগল।

হঠাৎ বৃষ্টি থেমে গেল। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়তে লাগল। আকাশ মেঘমুক্ত হতে লাগল। ঝড়ো বাতাস অনেকটা শান্ত হল।

মেঘ সরে গিয়ে উজ্জ্বল চাঁদ দেখা দিল।

ঝড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে ক্লান্ত ভাইকিংরা জলজমা ডেক-এর এখানে ওখানে শুয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলে উঠল—সাবাস ভাইসব। ভাঙ্গা জাহাজ নিয়েও আমরা ঝড়ের বিরুদ্ধে জিতে গেলাম। ও হো হো। ভাইকিংরাও গলা মেলাল। তবে তাদের কণ্ঠস্বরে ভীষণ ক্লান্তি।

ডেক-এর জমা জল সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। শাঙ্কো বলল— ফ্রান্সিস। ডেক-এর ধারে ফুটো করতে হবে। নইলে জমা জল বেরোবে না।

তখনই মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল—নিচে কেবিন ঘরগুলোতে জল পড়ছে। কেবিন ঘরের মেঝেয় জল জমে গেছে।

—বোঝা যাচ্ছে জাহাজের ভাঙা ফাঁকফোকর দিয়ে নিচে জল পড়ছে। ফ্রান্সিস বলল।

—জল সরাবার উপায় কী? মারিয়া জানতে চাইল।

—জল ছেঁচে ফেলতে হবে। এছাড়া উপায় নেই। শাঙ্কো বলল।

—কী ভাবে জল ছেঁচবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—আমাদের তো গোটা চারেকের কাঠের বালতি রয়েছে। সেই বালতিগুলোয় কেবিন ঘরের জল তুলতে হবে। আমরা কেবিন ঘর থেকে ডেক-এর রেলিং পর্যন্ত সার দিয়ে দাঁড়াব। জল ভর্তি বালতি ধরাধরি করে রেলিং পর্যন্ত নিয়ে আসব। তারপর জল সমুদ্রে ফেলে দেব। এছাড়া কেবিন ঘরের জমা জল সরাবার অন্য কোন উপায় নেই। শাঙ্কো বলল?

—হুঁ। পদ্ধতিটা মন্দ বলো নি। তবে এভাবে জল সরাতে গেলে সময় লাগাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা লাগবে। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে কাজ শুরু কর। এবার ডেক-এর জমা হল। রেলিং-এর একেবারে নিচে বেরিয়ে সমুদ্রের সমতলে একটা দুটো ফুটো করতে হবে। জল গড়িয়ে বেরিয়ে সমুদ্রের জলে পড়বে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। তা করা যাবে। শাঙ্কো বলল।

—দুটো কাজই শুরু কর। ফ্রান্সিস বলল।

কাজ শুরু হল। ভাইকিংরা কেবিন ঘরগুলো থেকে সার দিয়ে জাহাজের রেলিং পর্যন্ত এসে দাঁড়াল। নিচে কেবিন ঘরের জল বালতিতে ছেঁচে তোলা হতে লাগল। জলভর্তি বালতি হাতে হাতে রেলিং পর্যন্ত আনা হতে লাগল। তারপর সমুদ্রে ঢেলে ফেলা হতে লাগল। এভাবেই কেবিন ঘরগুলো থেকে জল সরানোর কাজ চলল।

শাঙ্কো আর বিস্কো গেল ফুটো করতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে হাতুড়ি বাটালি দিয়ে কেটে কেটে দুটো ফুটো করে ফেলল। ডেক-এর জমা জল ঐ দুটো ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে ডেক-এর জল একেবারেই বেরিয়ে গেল। আনন্দে শাঙ্কো ভাঙা ডেক-এর ওপরেই শুয়ে পড়ল। বিস্কোও হাসতে হাসতে ওর পাশে শুয়ে পড়ল। ওদের দুজনের কাণ্ড দেখে ভাইকিং বন্ধুরাও কেউ কেউ হেসে উঠল।

ওদিকে কেবিন ঘর থেকে জল ছেঁচাও চলল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কেবিন ঘরগুলো জলমুক্ত হল। তবে কাঠের মেঝে ভেজাই রইল।

সেদিন ভোরে ফ্রান্সিসদের জাহাজ একটা দ্বীপের কাছে পৌঁছিল।। মাস্তুলের ওপর থেকে নজরদার পেড্রো চিৎকার করে বলল—একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস, হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। তাকিয়ে দ্বীপটা দেখল।

নিস্তেজ রোদ পড়েছে সমুদ্রে ফ্রান্সিসদের জাহাজে কাছের দ্বীপটায়।

—বুঝতে পারছি না—এটা পাপুই দ্বীপ কিনা? হ্যারি কি বলো? ফ্রান্সিস বলল।

—কাছে গেলেই বোঝা যাবে? পাপুই দ্বীপ হলে জাহাজ ঘাটে আমাদের জাহাজ দেখতে পাবো। হ্যারি বলল।

—তা ঠিক। চলো—জাহাজ ঘাটের কাছে যাই। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে গেল। বলল—ঘাটেই জাহাজ ভেড়াও। জাহাজ ঘাটের কাছে এল।

কিছুদূর থেকে ভাইকিংরা দেখল একটা জাহাজ ঘাটে নোঙর করা। কাছাকাছি আসতেই বুঝল ওটা ওদের চুরি যাওয়া জাহাজ।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ ঘাটে ভিড়ল। পাটাতন নামানো হল। মারিয়া আর ফ্রেজার বাদে সবাই দল বেঁধে নেমে এল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি ওদের চুরি করা জাহাজের পাতা পাটাতনের কাছে গেল। তারপর জাহাজে উঠল। দেখল ডেক ও মাস্তুলের কাছে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখে লোকটি প্রায় ছুটে এল। বলল —এখানে কী চাই?

—দাঁড়াও দাঁড়াও কথা আছে ফ্রান্সিস একহাত তুলে বলল?

—এই জাহাজটা তোমরা হিচকক দ্বীপ থেকে এনেছো—তাই না? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। লোকটি বলল।

—এটা আমাদের জাহাজ। রুবিন এটা চুরি করে বিক্রি করেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—অতসব আমরা জানি না। আমরা দস্তুরমত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কিনেছি। লোকটি বলল।

—বলছিলাম পাশের ঐ জাহাজটা তোমরা নাও। আমাদের জাহাজটা ফিরিয়ে দাও। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে লোকটা বলল—ঐ ভাঙা জাহাজের সঙ্গে আমাদের জাহাজ বদল করবো! পাগল হয়েছো।

—আমরা ভাইকিং। জাহাজ মেরামতিতে ওস্তাদ। ঐ জাহাজাটা এখন যথেষ্ট ভালো অবস্থায় আছে। ওটা নাও। ফ্রান্সিস আবার বলল।

লোকটা কী বলে চিৎকার করে উঠল। নিচের কেবিনঘর থেকে দু-তিনজন লোক উঠে এল। সবাই যুবক। লোকটা ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বলল এরা ঝামেলা করতে এসেছে। এই জাহাজটা নাকি ওদের।

এক যুবক মুখভঙ্গী করে বলে উঠল—কী পেয়েছো তোমরা? এ্যাঁ? জানো—এই জাহাজ এখন রাজা কুতুবুর।

কে রাজা কুতুবু—কী ব্যাপার আমরা জানি না। এটাই আমাদের চুরি-যাওয়া

জাহাজ এটাই জানি। ফ্রান্সিস বলল। এসময় ভেন আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল। ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে ভেনকে জড়িয়ে ধরল। বলল ভেন ভালো আছো ভাই?

ভেন হেসে বলল—ভাল আছি।

ঠিক তখন একজন যুবক জাহাজ থেকে পাটাতনের ওপর দিয়ে দ্রুত নেমে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে তীরভূমির দিকে ছুটল। শাঙ্কো বাধা দিতে গিয়েও পারল না।? যুবকটি ছুটতে ছুটতে সমুদ্রতীর পার হয়ে গেল।

—ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—ফ্রান্সিস বিপদ হতে পারে। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস আর ঐ যুবকদের কিছু বলল না।

অল্প সময়ই কেটেছে। ফ্রান্সিসরা দেখল তীরভূমির ওপর দিয়ে একদল যোদ্ধা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে আসছে। বোঝা গেল যে, যুবকটি বলে গেল সেই রাজাকে খবর দিয়েছে।

ফ্রান্সিসরা নড়বারও সময় পেল না। যোদ্ধার দল দ্রুত ছুটে এসে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। যোদ্ধাদলের সবাই কালো। যোদ্ধা দলের সর্দার এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল—কী ব্যাপার? তোমরা নাকি রাজা কুতুবুর জাহাজ জোর করে নিয়ে যেতে এসেছো?

—না। আমরা কোনরকম জোর করিনি। এই জাহাজ আমাদের হিচকক দ্বীপের বন্দরে চুরি হয়ে গিয়েছিল। আমরা সেই জাহাজ ফিরিয়ে নিতে এসেছি। বদলে আমরা যে জাহাজ জড়ে এসেছি সেই জাহাজটা দিয়ে দেব বলেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে রাজা কুতুবুর কাছে চল। যা বলার তাঁকেই বলো।

ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল।

—বললাম আমার সঙ্গে এসো। বেশ ধমক দিয়ে সর্দার বলল।

যোদ্ধারা ফ্রান্সিসদের ঘিরে নিয়ে চলল। কেউ এদিক ওদিক করে গেলে তরোয়ালের খোঁচা দিতে লাগল। ফ্রান্সিসদের ঘিরে নিয়ে যোদ্ধারা চলল তীরভূমি ছাড়িয়ে বসতির দিকে।

এখানে ওখানে ছাড়া ছাড়া বাড়ি ঘরদোর। কালো কালো মানুষজন। তারা অবাক চোখে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল।

একটা বড় বাড়ির সামনে এসে যোদ্ধারা দাঁড়াল। বোঝা গেল এটাই রাজবাড়ি। মাটি বালি আর পাথরের বাড়ি।

বাড়ির সামনে কিছুটা ফাঁকা ঘাসের জমি। সেখানে একটা কাঠের আমলে একজন মধ্যবয়স্ক কালো মানুষ বসে আছে। কাটা ডাব মুখের কাছে নিয়ে ডাবের জল খাচ্ছে।

যোদ্ধা-সর্দার লোকটির কাছে গেল মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে কিছু বলে গেল। ডাব ছুঁড়ে ফেলে লোকটি ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর ফ্রান্সিসদের এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল।

যোদ্ধা-সর্দার মৃদুস্বরে বলল—রাজা কুতুবুর কাছে যাও।

ফ্রান্সিসরা রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। রাজা কুতুবু বলল—তোমরা বিদেশী? আশ্চর্য তোমরা সবাই নতুন জামাকাপড় পরে আছো।

—হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং। জাহাজে চড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।

—উদ্দেশ্য? রাজা কুতুবু কুৎকুতে চোখে তাকিয়ে বলল।

—কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। গুপ্তধন ভাণ্ডারের কথা জানতে পারলে সেসব বুদ্ধি খাটিয়ে পরিশ্রম করে উদ্ধার করি।

—তারপর গুপ্তধন চুরি করে জাহাজে চড়ে পালাও। রাজা কুতুবু বলল।

—না। গুপ্তধনের যিনি প্রকৃত মালিক তাঁকে দিয়ে দি। ফ্রান্সিস বলল।

—বিশ্বাস হচ্ছে না। যাক গে—তোমরা আমার জাহাজ চুরি করতে এসেছো। তোমাদের সাহসতো কম নয়। কুতুব বলল

—আমরা আপনার জাহাজ চুরি করতে আসি নি। ঐ জাহাজটা আমাদের। হিচকক দ্বীপের একজন লোক ঐ জাহাজটা চুরি করে আপনার লোকজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। তাই আমরা আমাদের জাহাজের খোঁজে এসেছি। অনুরোধ আমাদের জাহাজটা আমাদের ফিরিয়ে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—কক্ষনো না। ঐ জাহাজ আমার। কুতুবু গলা চড়িয়ে বলল।

—ঠিক আছে। আমরা ফিরে যাচ্ছি।

—না। তোমাদের কাউকে ছাড়া হবে না। তোমাদের এখানে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

—আমাদের অপরাধ?

—তোমরা জাহাজ চোর। আমার জাহাজ চুরি করতে এসেছিলে। তার শাস্তি পেতে হবে। কুতুবু বলল।

—আমরা যে জাহাজটা চড়ে এসেছি সেই জাহাজটা আপনি রাখুন আমাদের জাহাজটা আমাদের ফিরিয়ে দিন। হ্যারি বলল।

—তোমরা যে জাহাজ চড়ে এসেছো সেটাও চোরাই জাহাজ। আমার সর্দার তাই বলছে। কুতুব বলল।

—আমাদের ওপর মিথ্যে অপবাদ। ফ্রান্সিস বলল।

—কোন কথা শুনতে চাই না। রাজা কুতুবু বলল।

তারপর যোদ্ধা সর্দারকে বলল—বন্দী মাঠে নিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখ্। দেখিস্ পালাতে না পারে। জাহাজ চোরের দল। কুতুবু বলল।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

যোদ্ধারা আবার ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। নিয়ে চলল একটা জঙ্গলের দিকে।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ। সেই পথ দিয়ে সবাই চলল। ফ্রান্সিস দুদিকে ভালোভাবে তাকাতে তাকাতে চলল। একটা শুকনো মরা গাছ দেখল ডানদিকে। ঘন জঙ্গল নয়। গাছপালা ছাড়া ছাড়া।

কিছু পরে সবাই একটা ঘাসে ঢাকা ফাঁকা জায়গায় এল। ফাঁকা জায়গাটা প্রায় গোল। চারদিকে কোন পাথরের দেওয়াল বা গাছের ডাল পুঁতে রাখা হয়নি।

সর্দার যোদ্ধা বলল—কয়েদী মাঠের মাঝখানে গিয়ে তোমরা বসো।

ফ্রান্সিসরা মাঠটার মাঝামাঝি জায়গায় এল। তারপর ঘাসের ওপর বসে পড়ল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। তখনই দেখল আরো কয়েকজন মানুষ হাত-পা বাধা অবস্থায় বসে অছে। বোঝা গেল ওরাও বন্দী।

একটু পরেই সর্দার যোদ্ধা কয়েকজন যোদ্ধাকে নিয়ে এল। যোদ্ধারা ফ্রান্সিসদের হাত-পা শক্ত শুকনো লতাগাছ দিয়ে বাঁধতে লাগল। ফ্রান্সিস হাত মুছড়ে বুঝল বুনে লতা বেশ শক্ত। দড়ি বাঁধলে তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু এই শুকনো বুনোলতা হাতে পায়ে যেন কেটে বসছে।

দুপুর হয়ে এল। শাঙ্কো একজন্ যোদ্ধার দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল—আমাদের খিদে পেয়েছে। খেতে দাও। খাবার জল দাও।

—চেঁচিও না। অপেক্ষা কর। যোদ্ধা সর্দার বলল।

হাত-পা বাঁধা শেষ হল।

একটু পরেই নারকোল গাছের গুড়ি কুঁদে বড় পাত্র মত করার পাত্র নিয়ে কয়েকজন এল। মাটির পাত্রে জল। সবার সামনে পাতা দেওয়া হল। ভাত সামুদ্রিক মাছের ঝোলমত দেওয়া হল।

হ্যারি যোদ্ধা সর্দারের দিকে তাকিয়ে বলল—হাত-বাঁধা। খাবো কী করে?

—ওভাবেই খেতে হবে। রাজার হুকুম। যোদ্ধা সর্দার বলল।

ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা কেউ আর কোন কথা বলল না। বেশ অসুবিধার মধ্যেই ওরা খাবার খেয়ে নিল।

—সান্ধ্য হল। ফ্রান্সিসরা কোনরকমে শুয়ে বসে রইল।

রাতের খাওয়া শেষ হল। চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। চারপাশে সব কিছু মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল—ছোরাটা বের করবো?

—না আজকে নয়। দু-একদিন যাক। আমরা নতুন। ওরা এখন আমাদের কড়া পাহাড়ায় রাখবে। ফ্রান্সিস বলল।

—প্রহরীই তো নেই। শাঙ্কো বলল।

—রাজবাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখো ঝাউ গাছটার নিচে তিনজন প্রহরী বসে আছে। ফ্রান্সিস আস্তে বলল।

—মাটিতে বসে আছে? শাঙ্কো বলল।

—না। নারকোল গাছের কাটা কাঠের ওপর। আমি অনেকক্ষণ যাবৎ লক্ষ্য করছি তাই দেখতে পেয়েছি।

—তাহলে পালাব না? শাঙ্কো বলল।

—নিশ্চয়ই পালাবো। সমস্ত সুযোগ বুঝে। ফ্রান্সিস আস্তে বলল।

সকলের খাবার খাওয়া হল। হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই। বাঁধা হাত নিয়ে খাওয়া। অর্ধেক খাবারই পড়ে গেল। কিন্তু ওরা বুঝল এই অবস্থাতে থাকতে হবে। পালাতে না পারলে এই জীবনই মেনে নিতে হবে।

দুপুরে রাজা কুতুবু এল। হাতের শেকলে বাঁধা একটা অ্যালশেসিয়ান কুকুর। ফ্রান্সিসদের ঐ অবস্থায় দেখে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ শুরু করল। বিরক্তির সঙ্গে শাঙ্কো বলে উঠল—কুকুরের ডাক থামান।

—তোমাদের বিদেশি দেখে তো তাই ডাকছে। চিনে গেলে আর ডাকবে না। কালো মুখে সাদা দাঁত বের করে কুতুবু হেসে ফেলল। তারপর বলল—ভাবছি তোমাদের ভাঙা জাহাজটা বিক্রি করে দেব। কী হবে আর ঐ জাহাজটা রেখে। তোমরা তো আর ঐ ভাঙা জাহাজে এই জীবনে আর চড়তে পারবে না। বিক্রি করে মাঝখান থেকে আমার কিছু স্বর্ণমুদ্রা আয় হবে।

ফ্রান্সিসরা কেউ কোন কথা বলল না।

—তোমরা কী বল? কুতুবু হেসে জানতে চাইল।

ফ্রান্সিস বেশ কষ্ট করে উঠে দাঁড়াল। বলল—তাহলে আপনার জীবন বিপন্ন হবে।

—কী? আমাকে হত্যা করবে? রাজা কুতুবু চিৎকরে করে বলে উঠল। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে চাপা স্বরে বলল—ফ্রান্সিস শান্ত হও। ভুলে যেও না আমরা বন্দী। রাজা আমাদের আরও ক্ষতি করতে পারে।

রাজার চিৎকার শুনে প্রহরীরা খোলা তরোয়াল হতে ছুটে এল।

—তোমাদের এক বেলার খাবার বন্ধ করে দেওয়া হল। দেখি তোমাদের গায়ে কত জোর। রাজা কুতুবু গলা চড়িয়ে বলল।

—একবেলা কেন—দু'বেলার খাবারই বন্ধ করে দিন। তাড়াতাড়ি মরে যেতে পারবো। এই জানোয়ারের মত বেঁচে থাকা—। হ্যারি বলল।

—জাহাজ চোরদের এভাবেই শাস্তি দিতে হয় যাতে ভবিষ্যতে আর জাহাজ চুরি না করে। রাজা কুতুবু বলল।

—আমাদের আর ভবিষ্যৎ কোথায়। এখানেই তো আমাদের জীবন শেষ। ফ্রান্সিস বলল। রাজা ছুটে ফ্রান্সিসের কাছে এল। চেঁচিয়ে বলল—তুমিই এই দলের সর্দার—না?

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস ঘাড় নাড়ল।

—আমাকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছো। রাজা কুতুবু বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাকে গাছের ডালে লটকাবো। কথাটা বলেই রাজা কুতুবু প্রহরীদের দিকে তাকাল। চেঁচিয়ে বলল অ্যাই—এটাকে ঐ বড় গাছটার ডালে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখ।

প্রহরী কয়েকজন তরোয়াল কোমরে গুঁজে ফ্রান্সিসদের কাছে ছুটে এল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়েই ছিল। ওরা ফ্রান্সিসকে টেনে নিয়ে চলল বড় গাছটার দিকে।

গাছের প্রথম ডালটা বেশ উঁচুতে। প্রহরীরা গাছের ডালে উঠল। ডালে দড়ির ফাঁস পড়াল। তারপর দড়ির মাথা নামিয়ে দিল। নিচে থেকে প্রহরীরা ফ্রান্সিসের বাঁধা হাতের মধ্যে দড়ি ঢুকিয়ে ডালে বসা প্রহরীটার হাতে দড়ির মুখটা ছুঁড়ে দিল। প্রথমবার ডালেবসা প্রহরীটি দড়ির মুখটা ধরতে পারল না। আবার দড়ির মুখাটা ছোঁড়া হল। এবার ও ধরে ফেলল। দঁড়িটা টানতে লাগল। হাত-পা বাঁধা ফ্রান্সিস ওপরের দিকে উঠতে লাগল। বেশি কিছুটা উঠতে প্রহরীটা দড়িটা ডালে জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল। ফ্রান্সিসের শরীরটা ঝুলতে লাগল।

রাজা কুতুবু গাছের তলায় এল। ওপরের ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—আমাকে হত্যার হুমকি? মর্ না খেয়ে। খাবার জলও পাবি না।

—আমাদের জাহাজী জীবন। মাঝে মাঝেই খাদ্যে জলে টান পড়ে। ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। আর কিছু বলতে গেলে রাজা চটে যেতে পারে। চুপ করে থাকাই ভালো।

রাতে খাওয়ার পর শাঙ্কো হ্যারির কাছে এল। বলল —হ্যারী কি করবে?

—কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ফ্রান্সিস এভাবে মেজাজ হারাবে ভাবি নি। হ্যারি বলল।

—কিন্তু ফ্রান্সিসকে তো বাঁচাতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—সেটা একমাত্র তুমি পারো। ছোরাটা আছে তো? হ্যারি বলল।

—তা আছে। শাঙ্কো মাথা ওঠানামা করল।

—আর একটা দিন দ্যাখো। হ্যারি বলল।

—খাবার না পেয়ে, জল না পেয়ে ফ্রান্সিস বাঁচবে না। শাঙ্কো বলল। আমরা তার আগেই ওকে নিয়ে পালাবো। হ্যারি বলল।

—দুপুরে খেতে দেয় নি। রাতের বেলায়। কিন্তু হাত বাঁধা। অর্ধেক খাবার ফেলা গেল। শাঙ্কো বলল।

—তা তো হবেই। হ্যারি বলল।

—শরীর বেশ দুর্বল লাগছে। শাঙ্কো বলল।

—দুর্বলতাকে প্রশয় দিও না। শরীরের দুর্বলতা মনকেও দুর্বল করে করে। হ্যারি বলল

—তাহলে বলছো কালকে পালাব। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ আমি ছক কষেছি। প্রহরীদের কাছে যাচ্ছি। হ্যারি বলল।

—প্রহরীদের কাছে? কেন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—গায়ে দেবার চাদরের মত মোটা কাপড় চাইবো। হ্যারি বলল।

—দেবে? শাঙ্কো বলল।

—দেখি। না দিলে রাজা কুতুবুর কাছে চাইবো। তাই একদিন সময় নিচ্ছি। হ্যারি বলল।

—এই গরমে গায়ের চাদর নিয়ে কী করবে?

—ছক বলবো। আর বুঝবে। হ্যারি বলল।

হ্যারি উঠে দাঁড়াল। পা বাঁধা। থপ্ থপ্ করে লাফিয়ে লাফিয়ে প্রহরীদের কাছে গেল।

চাঁদের আলোয় হ্যারিকে দেখে একজন প্রহরী উঠে এল। বলল—কী ব্যাপার?

—বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। গায়ে দেবার মত মোটা কাপড় চাই। হ্যারি বলল।

প্রহরীটি হো হো করে হেসে উঠল। বলল—ঠাণ্ডা? তোমায় ঠাণ্ডা?

—আমাদের ঠাণ্ডা লাগছে। মোটা কাপড় দাও। হ্যারি বলল।

—আমরা দিতে পারবে না। রাজা বললে তবে পাবে। প্রহরী বলল।

—বেশ। রাজাকে বলবো। হ্যারি ফিরে এলো।

হ্যারি ফিরে এলে শাঙ্কো জানতে চাইল—

—কী? দেবে কাপড়?

—এরা দেবে না। রাজা কুতুবুকে বলতে হবে। কালকে বলবো?

—দেখ বলে। কিন্তু এই গরমে মোটা কাপড় চাইছো কেন?

—পালবার ছক।

—খুলে বলো তো।

হ্যারি আস্তে আস্তে ওর পালাবার ছকের কথা বলল? শাঙ্কো চাপা গলায় বলে উঠল—শাবাস হ্যারি।

—এখন সবকিছু নির্ভর করছে তোমার ওপর। ছোরা দিয়ে কত তাড়াতাড়ি হাত পায়ের বাঁধা লতা কাটতে পারো। হ্যারি বলল।

—দড়ি কাটার চেয়ে কম সময় লাগবে। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে তো ভালোই। হ্যারি বলল।

পরের দিন দুপুরেও হ্যারিদের খেতে দেওয়া হল না।

বিকেলের দিকে রাজা কুতুবু এল। হেসে বলল— এবার তোমাদের গায়ের জোর কমবে। মেজাজ ঠাণ্ডা হবে। পালাবার কথা আর কল্পনাতেও আনবে না।

হ্যারি উঠে দাঁড়াল। বলল—মহামান্য রাজা আমার কিছু বলার ছিল। কুতুবু খুব খুশি। ওকে মহামান্যটান্য তো কেউ বলে না। হেসে বলল—বলো।

—আমরা ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছি। হ্যারি বলল।

—তোমাদের ঠাণ্ডা লাগছে? বলো কি? রাজা বলল।

—হ্যাঁ। একবেলা খেয়ে শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারছি না। আমাদের মোটা কাপড় দিন যাতে আমরা একসঙ্গে গায়ে দিতে পারি। হ্যারি বলল।

তখন মোটা কাপড় বালিয়ারিতে পাতা হয়। সেই কাপড়টা দেয়া যায় কিনা দেখি। রাজা বলল।

—মাননীয় রাজা। আর একটা অনুরোধ। হ্যারি বলল।

—বলো। রাজা বলল।

—আমি ফ্রান্সিস মানে আমাদের দলনেতা যে গাছের ডালে ঝুলছে তাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। হ্যারি বলল।

—বেশ। গিয়ে বল। কিন্তু ওর মুক্তি নেই। রাজা বলল।

—তা জানি। আমি বললে ও হয়তো আপন্যর কাছে মাফ চাইবে। হ্যারি বলল।

—তাহলে যাও। কথা বল। রাজা বলল।

রাজা কুতুবু চলে গেল। যাবার আগে ঝুলন্ত ফ্রান্সিসের দিকে একবার তাকিয়ে গেল। যাবার সময় প্রহরীদের কী বলে গেল।

একজন প্রহরী হ্যারিদের কাছে এল। বলল কথা বলতে যাবো। এসো।

হ্যারি দাঁড়িয়ে ছিল। প্রহরীর পিছু পিছু চলল।

ফ্রান্সিস ডালে ঝুলছে।

হ্যারি এসে নিচে দাঁড়াল। দেশীয় ভাষায় বলল—না —হেসো না। কোনরকম আনন্দ প্রকাশ করো না। আমার ছক বলছি। তারপর হ্যারি গরগর্ করে ওর ছক বলে গেল। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

ফেরার পথে প্রহরী বলল—কী বললে? —বললাম যে ও যেন রাজা কুতুবুর কাছে মাফ চায়। হ্যারি বলল, প্রহরী খুশির হাসি হাসল।

সন্ধ্যের সময় প্রহরীরা একটা বিরাট মোটা কাপড় নিয়ে এল। কাপড়টা হ্যারিদের সামনে রাখল।

—তাতে খাওয়ার পর সবাই গায়ের ওপর পেতে দেব। এখন থাক। হ্যারি বলল।

প্রহরীরা কাপড় রেখে চলে গেল। হ্যারি গলা নামিয়ে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো হ্যারির কাছে এল।—সবাইকে ফিসফিস করে আমার পালাবার ছকের কথা বলে দাও। হ্যারি আস্তে বলল।

শাঙ্কো একে একে সবার কাছে গেল। হ্যারির ছকের কথা ফিসফিস করে বলে এল। শাঙ্কো সাবধান করে বলে এল—এই ছকের বাইরে কেউ যাবে না।

রাতের খাওয়া শেষ হল।

হ্যারি বলল—সবাই শুয়ে পড়। ভাইকিংরা সবাই শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো আর বিস্কো বিরাট কাপড়টা সবার গায়ের ওপর পেতে দিল। এক বন্ধু বলল—এই গরমে গায়ে মোটা কাপড়। — আপত্তি করো না। হ্যারি বলল।

সবাই কাপড়ের নিচে শুয়ে পড়ল।

তখন মাঝ রাত।

হ্যারি চাপাস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। চলো।

দু'জনে কাপড়ের তলা থেকে বেরিয়ে এল। তারপর ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলল একটা আগাছার ঝোপের দিকে।

পৌঁছল সেখানে। বেশ কিছু আগাছা মাঠ থেকে উপড়ে তুলল। তারপর ফিরে এল। অনেকের হাতে আগাছা গুলো দিল। ওরা আগাছা গুলো মাটিতে চেপে

রাখল। আগাছাগুলি কাপড়টার এখানে-ওখানে উঁচিয়ে রইল। দূর থেকে দেখাবে যেন মানুষের মাথা। মানুষ শুয়ে আছে।

এইবার আসল কাজ। কাপড়ের তলা দিয়ে শাঙ্কো বিস্কোর কাছে এল। বিস্কোর ওর বাঁধা হাত শাঙ্কোর গলার দিক দিয়ে ঢুকিয়ে ওর পোশাকের তলা থেকে ছোরাটা বের করল। তারপর দ্রুত হাতে শাঙ্কোর হাতের লতার বাঁধন কাটতে লাগল। একটু পরেই শুকনো লতা কেটে গেল। শাঙ্কো ছোরাটা নিল। পায়ের বাঁধন কাটল। তারপর বিস্কোর হাত পায়ের বাঁধন কাল। এবার বিস্কো ছোরাটা নিল। হ্যারির হাত-পায়ের বাঁধন কাটল। আস্তে আস্তে সবার হাত পায়ের বাঁধন কাটা হল। এমন কি দু'জন কালো বন্দীর হাত পায়ের বাঁধন কাটা হল।

হ্যারি চাপা গলায় বলল—যে গাছটায় ফ্রান্সিস ঝুলছ সেই গাছের তলা দিয়ে পায়ে চলা পথ। সবাই গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাও। আস্তে আস্তে। শব্দ না হয়। তারপর পায়ে চলা পথ ধরে সমুদ্রেতীরে।

হ্যারি যখন এই নির্দেশগুলো দিচ্ছে শাঙ্কো ফ্রান্সিসের ঝুলে থাকা গাছটার নিচে চলে এসেছে।

শাঙ্কো কোন শব্দ না করে দ্রুত গাছটায় উঠল। ফ্রান্সিসদের হাতের বাঁধন কেটে দিল। ফ্রান্সিস সোজা এক ঝোপের ওপর পড়ল। যাতে শব্দ না হয় তার জন্যে সোজা হয়েই নেমেছিল। তবু শব্দ হল। দুজনেই চুপ করে যে যার জায়গায় রইল। একটু পরে বোঝা গেল শব্দটা প্রহরীদের কানে যায়নি।

ওদিকে হ্যারিরা দ্রুত ছুটছে সমুদ্রতীরের দিকে।

শাঙ্কো নিচু হয়ে ফ্রান্সিসের পায়ে বাঁধা দড়ি কেটে দিল। এবার দু'জনে পায়ে চলা পথটা ধরে ছুটল সমুদ্রতীরের দিকে। সবাই সমুদ্রতীরে পৌঁছল। ওদের জাহাজের কাছে এসে দাঁড়াল। কম বেশি সবাই হাঁপাচ্ছে।

জাহাজ থেকে পাটাতন পাতা নেই। চাঁদের আলোয় চারদিকে মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

—শাঙ্কো—পাটাতন। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো জলে নামল। ডুব দিল। ডুব সাঁতার দিয়ে ওদের জাহাজের গায়ে গিয়ে উঠল। দড়ির মই ঝোলানো নেই। ডেকও তোলা। হালের কাছে ঝুলন্ত দড়িদড়া ধরে শাঙ্কো ডেক-এ উঠে এল। মাস্তুলের আড়াল থেকে দেখল কেউ নেই। ও আস্তে আস্তে পাটাতনটা বের করে নিয়ে এল। কোন শব্দ না করে পাটাতনটা পেতে দিল। তারপর ছুটল অস্ত্র ঘরের দিকে। আট-দশটা তরোয়াল বগলদাবা করে নিয়ে এল। ডেক থেকে তরোয়ালগুলো একটা একটা করে বালির ওপর ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। বালির ওপর তরোয়ালগুলো পড়ায় কোন শব্দ হল না। প্রথম তরোয়ালটা ফ্রান্সিস তুলে নিল। অন্য বন্ধুরাও এবার তরোয়াল তুলে নিল।

ফ্রান্সিস ভাবল জাহাজে নিশ্চয়ই সেই যুবকরা আছে। তার মানে সামনেই লড়াই।

আস্তে আস্তে তরোয়াল হাতে সবাই জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। এত মানুষের জাহাজে ওঠা মৃদুস্বরে কথাবার্তা। কেবিন ঘরের এক যুবকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে তরোয়াল হাতে ডেক-এ উঠে এল। চাঁদের আলোয় ফ্রান্সিসদের দেখে সে অবাক।

—তরোয়াল ফেলে দাও। লড়তে এলে মরবে। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়েই বলল। যুবকটি বুঝল লড়তে গেলে ওর জীবন বিপন্ন হবে। ও ডেক-এর ওপর তরোয়াল ফেলে দিল। তাতে ঝনাৎ করে শব্দ হল। কেবিন ঘরে ঘুমন্ত যুবকদের ঘুম ভেঙে গেল। তখন ভোর হয়ে এসেছে।

যুবকরা দল বেঁধে তরোয়াল হাতে ওপরে ডেক-এ উঠে এল। খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের দেখে ওরা থমকে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস তরোয়াল ঘুরিয়ে দাঁত চাপাস্বরে বলল—তোমরা যদি লড়াই চাও আমরা লড়াই করবো। কিন্তু আমরা সংখ্যায় বেশি। প্রত্যেকের হাতেই তরোয়াল রয়েছে। ভুলে যেও না ভয় পাই না। লড়াই হলে তোমরা কেউ বাঁচবে না।

যুবকরা মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। ওদিকে একটি যুবক মারিয়ার কেবিন ঘরে ঢুকল। মারিয়ারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মারিয়া ডেক-এ আমার জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠল। দেখল দরজায় তরোয়াল হাতে একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। যুবকটি ছুটে এসে হাতের তরোয়ালের ডগাটা মারিয়ার গলায় চেপে ধরে গম্ভীরগলায় বলল—ওপরে চলো। নিরুপায় মারিয়া দরজার দিকে চলল। ডেক-এ উঠে এল।

ফ্রান্সিস অবাক। মারিয়া এই জাহাজে এলো কী করে? বোধহয় ওদের খোঁজেই মারিয়া এই জাহাজে এসেছিল। তারপর বন্দী হয়েছে।

ফ্রান্সিসরা দেখল যুবকটি মারিয়ার গলায় তরোয়াল চেপে আছে।

এখানে তো মারিয়ার জীবন বিপন্ন।

যুবকটি গলা চাপাস্বরে বলল—সবাই জাহাজ থেকে নেমে যাও। তারপর রাজা কুতুবুর যোদ্ধাদের হাতে ধরা দাও। নইলে তোমাদের এই সঙ্গিনীকে মেরে ফেলবো।

কেউ কিছু বোঝার আগেই শাঙ্কো দ্রুত গলার দিকে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। তারপর এক মুহূর্ত দেরি না করে যুবকটির বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। শাঙ্কোর নিশানা নিখুঁত। ছোরাটা যুবকটির বুকে বিঁধে গেল। ও চিৎ হয়ে পড়ে গেল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। ও এপাশ ওপাশ করল। তারপর স্থির হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস বুঝল আবার মারিয়াকে হত্যার চেষ্টা হবে। এক মুহূর্তে দেরি না করে ও তরোয়াল হাতে যুবকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—ও হো হো। তারপর ওরাও যুবকদের ঠোকাঠুকির ধাতব শব্দ। সুযোগ বুঝে মারিয়া ছুটে এসে ফ্রান্সিসদের পেছনে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস প্রথম সুযোগেই একজন যুবকের বুকে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল। ও চিৎ হয়ে ডেক-এর ওপর পড়ে গেল। লড়াই চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সংখ্যায় বেশি

ভাইকিংদের কাছে যুবকরা হার স্বীকার করতে লাগল। কেউ কেউ আহত হয়ে ডেক-এ পড়ে গেল। দুজন যুবক তরোয়াল ফেলে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরে তীরে উঠল। তারপর ছুটল রাজবাড়ির দিকে।

আহত যুবকরা জাহাজ থেকে নেমে গেল।

তখনই ভোরের আলোয় দেখা গেল রাজা কুতুবের প্রহরীরা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে আসছে।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আর লড়াই না। পাল খোল। দাঁড় ঘরে যাও। নোঙর তোল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজ চালাও।

ততক্ষণে পাল খোলা হয়ে গেছে। দাঁড়াটানতেও ভাইকিং বন্ধুরা চলে গেছে। ফ্রেজার হুইলে দাঁড়াল। নোঙর তোলা হয়ে গেছে।

জাহাজ চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজ গতি পেল। রাজা কুতুবুর প্রহরীরা ভাঙা জাহাজে উঠল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ ধরবার জন্যে ওরাও ভাঙা জাহাজ চালাল। কিন্তু তাদের জাহাজ তেমন গতি পেল না। ফ্রান্সিসদের জাহাজের সঙ্গে তাদের জাহাজের দূরত্ব বেড়েই চলল।

প্রহরীরা হাল ছেড়ে দিল। ওদের জাহাজ থেমে গেল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলল।

ভাগ্য ভালো। ওদের ঝড়ের মুখে পড়তে হল না।

একদিন পরে। জাহাজে জলাভাব দেখা দিল।

চারটে পীপের মধ্যে মাত্র একটা পীপেয় অর্ধেক জল আছে। তিনটি পীপেই ফাঁকা।

হ্যারি ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস কী করবে?

—পেড্রোকে বলো—ভালো ভাবে নজর রাখতে। কোন দ্বীপটীপ দেখা যায় কিনা।

জাহাজ চলল। নজরদার পেড্রো মাস্তুলের ওপর থেকে নজর রেখে চলেছে।

পরদিন দুপুরের দিকে পেড্রো মাস্তুলের ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠল — ডাঙা দেখা যাচ্ছে ডাঙা। বিস্কো ফ্রান্সিসকে ডেকে নিয়ে এল।

ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে গেল। বলল

—একটা দ্বীপমত দেখা যাচ্ছে। কত বড় দ্বীপ আর এই দ্বীপে মানুষ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। দ্বীপের কাছে যাও। জাহাজ ভেড়াও। জল নিতে হবে।

দ্বীপটা বেশি বড় নয়। তবে বেলাভূমি বিস্তৃত। ফ্রান্সিস আরসিনাকে জল আনতে যেতে বলল। দুজনে কিছু আগেই দুপুরের খাবার খেয়ে নিল। জাহাজ থেকে পাটাতন ফেলা হল।

শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস আমি গেলে ভালো হত না। —না-না। জল আনবো। এইজন্যে তোমার মাস্তুলের দরকার নেই। ফ্রান্সিস বলল

বিস্কো আর সিনেত্রা দুটো খালি পীপে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এল। বালিয়াড়ি পার হয়ে চলল। কিছু দূরেই কয়েকটা ঘরবাড়ি দেখল।



তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল

—চলো। ওখানকার লোকদের কাছে জলের খোঁজ করি। বিস্কো বলল।

—চলো। সিনেত্রা মাথা নেড়ে বলল।

বাড়িগুলোর কাছাকাছি এসে দেখল। সব কালো নারীপুরুষ বাচ্চা-ছেলেমেয়ে। বোঝা গেল এখানে কালো লোক স্বজনেরই বাস।

বর্শা হাতে এক যুবক ওদের দিকে এগিয়ে এল। বলল—তোমরা কে?

—আমরা বিদেশি—ভাইকিং। বিস্কো বলল।

—এখানে কেন এসেছো? যোদ্ধাটি জিজ্ঞেস করল।

—আমরা জাহাজে চড়ে এখানে এসেছি। জাহাজে খাবার জল ফুরিয়ে এসেছে। তাই খাবার জল নিতে এসেছি। বিস্কো বলল।

—তোমরা জানো আমাদের সর্দার অনুমতি না দিলে এখান থেকে এক ফোঁটাও জল নিয়ে যেতে পারবে না। যোদ্ধাটি বলল।

—না। আমরা জানি না। সিনেত্রা বলল।

—সর্দারের কাছে চলো। এই বলে যুবকটি একটা বড় বাড়ির দিকে হেঁটে চলল। বিস্কোরাও পীপের হাতে পেছনে পেছনে চলল।

যেতে যেতে সিনেত্রা বলল—বোধহয় বিপদে পড়লাম।

—না-না। সর্দারের কাছে অনুমতি নেব। জল নিয়ে চলে যাবো। বিস্কো বলল।

যোদ্ধা যুবকটি বাড়ির সামনে ঘরটার কাছে এল। বলল—ঘরে ঢোক।

দুজনে ঘরে ঢুকল। প্রায় অন্ধকার ঘর। অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতে দেখল ঘরে একটা নারকোল গাছ কেটে পায়াওয়ালা একটা কাঠের তক্তপোষ একটি কালো মতো বয়স্ক লোক বসে আছে। গায়ে বেশ দামি কাপড়ের জামা। পরনে রঙিন পায়জামা।

যোদ্ধা যুবকটি বলল—আমাদের সর্দার। মাথা নোয়াও। দুজনে মাথা একটা নোয়াল। যোদ্ধাটি বলল—এরা বিদেশি। কী যেন কিং-এর জাত। এখানে খালি পীপে হাতে জল নিতে এসেছে.

—চালাকি—চালাকি। এরা চোর। আমার রত্নভাণ্ডার চুরি করতে এসেছো। বেশ গলা চড়িয়ে সর্দার বলল।

—আমাদের মিথ্যে দোষ দিচ্ছেন। আমরা চোর নই। বিস্কো বলল।

—উঁহু। তোমরা জল খোঁজার নাম করে রাত পর্যন্ত এখানে থাকবে। তারপর রাত বেশি হলে আমার রত্নভাণ্ডার চুরি করে পালাবে।—এই মতলব তোমাদের। সর্দার বলল।

—আমরা এই দ্বীপে এই প্রথম এসেছি। আমরা জানিই না যে আপনার রত্নভাণ্ডার আছে। সিনেত্রা বলল।

—সব জানো তোমরা। আমার রত্নভাণ্ডারের খোঁজে এসেছো তোমরা। সর্দার বলল। তারপর চেঁচিয়ে বলল—দুটোকেই কয়েদ ঘরে ঢোকা। আরো দুটো চোর বোধহয় আছে ওখানে।

—হ্যাঁ। যোদ্ধাটি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

দুজনে কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। সিনেত্রা বলবার চেষ্টা করল—

—শুধু সন্দেহের বশে আমাদের—

—চোপ্—সর্দার ধমকে উঠল!

যোদ্ধাটি ওদের ঘরের বাইরে নিয়ে এল। তখনও দুজনের হাতে পীপে।

বাইরে এসে দেখল প্রায় আট-দশখানা যোদ্ধা বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। যোদ্ধাটি এগিয়ে গিয়ে ওদের কী বলল। দু'জন যোদ্ধা এগিয়ে এল। ওর পেছনে পেছনে আসতে ইঙ্গিত করল।

দু'জনে পিপে হাতে চলল।

একটা বড় গাছের নিচে ছোটঘর। গাছের ডাল দিয়ে তৈরি দেয়াল। মাটি লেপা। ঘরটার সামনে দু'জন প্রহরী দাঁড়িয়ে। দুজনে যেতেই একজন প্রহরী কোমরের ফেটি থেকে চাবি খুলল। দরজার তালা খুলে ঢুকতে বলল। দু'জনে ঢুকে যাবে একজন প্রহরী পীপেটা নেবে বলে হাত বাড়াল। সিনেত্রা পীপে সরিয়ে নিয়ে বলল—না পীপে দুটো আমাদের কাছেই থাকবে। প্রহরীটি আপত্তি করল না।

ঘর অন্ধকার। জানালা বলে কিছু নেই। মাথার ওপরে বেশ উঁচুতে বেলে মাটি আর শুকনো ঘাসের ছাঁউনি।

মেঝেয় নারকেল পাতায় ছড়ানো। তার ওপরেই দুজনে বসল। প্রহরী এসে নারকেলের দড়ি দিয়ে দুজনের হাত বেঁধে দিয়ে গেল।

অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে দেখল আরো দুজন বন্দী রয়েছে। দুজনেই কালো। একজন বিস্কোর কাছে এগিয়ে এল। বলল—তোমার তো বিদেশি। তোমাদের আটকালো কেন?

—আমরা নাকি চোর। সর্দারের রত্নাভাণ্ডার চুরি করতে এসেছি। সিনেত্রা বলল।

—আমরা পাকুই দ্বীপের বাসিন্দা। বেকার। এখানে এসেছিলাম কাজের খোঁজে। আমাদেরও চোর বলে আটকে রেখেছে। কালো লোকটা বলল।

—সর্দারের এটা একটা চালাকি। চোর অপবাদ দিয়ে এইভাবে আটকে রাখা। বিস্কো বলল। কালো লোকটা আর কোন কথা বলল না। অন্য লোকটি এগিয়ে এল। ফিস ফিস করে বলল—এখান থেকে পালানো যায় না?

—কী করে পালাব? দরজায় দুজন প্রহরী বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। পালাতে গেলে মরতে হবে। বিস্কো বলল।

—একটা উপায় বের করতে হবে। লোকটা বলল।

—দেখি কয়েকটা দিন। সিনেত্রা বলল।

সেদিন কাটল।

ওদিকে ফ্রান্সিসরা চিন্তায় পড়ল। বিস্কো সিনেত্রা জল আনতে গিয়ে সারা রাতেও ফিরল না।

পরদিন সকালে শাঙ্কো বলল—আমি একা যাচ্ছি। জাহাজে জলভাব। জল তো আনতে হবে।

—বেশ যাও। তবে বিপদ দেখলে পালিয়ে এসো। কোনরকমে ওদের দুজনের খোঁজ নিয়ে এসো। তেমন অবস্থা দেখলে আমরা সবাই যাবো। আর তরোয়াল নিয়ে যেও না। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো জাহাজ থেকে নেমে এল। চলল। বাড়িঘরগুলোর দিকে।

বাড়িঘরগুলোর কাছে আসতে দু'জন বর্শাধারী যোদ্ধা ছুটে এলো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। বালিয়ারির মধ্যে দিয়ে জাহাজের দিকে ছুটল। কিন্তু পালাতে পারল না। বালির ওপর দিয়ে দৌড়ানো যায় না। পা আটকে আছে। যোদ্ধারা বালির ওপর দিয়ে দৌড়াতে অভ্যস্ত। সহজেই শাঙ্কোকে ধরে ফেলল। বর্শা উঁচিয়ে বলল—আমাদের সঙ্গে চলো।

—কোথায় শাঙ্কো জানতে চাইল।

সর্দারের কাছে। যোদ্ধাটি বলল।

—বেশ। চলো। শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো সর্দারের কাছে এসে দাঁড়াল। সর্দার পাতায় মোড়া তামাক টানছিল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল—

এই দ্বীপে কেন এসেছো?

—জল নিতে। শাঙ্কো বলল।

—কীসে করে জল নেবে? সর্দার বলল।

—বন্ধুদের কাছে পীপে আছে। শাঙ্কো বলল।

—ও। তাহলে যে দুটোকে কয়েদ ঘরে আটকে রেখেছি তারা তোমার।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো মাথা ওঠানামা করল।

—তোমরা সবাই চোর। আমার রত্নভাণ্ডার চুরি করতে এসেছো। সর্দার বলল।

—আপনার রত্নভাণ্ডারের নামও আমরা শুনিনি। শাঙ্কো বলল।

—এসব চালাকির কথা। তুমিও বন্ধুদের কাছে যাও। সর্দার বলল।

—তার মানে আমিও—শাঙ্কো কথাটা শেষ করতে পারল না।

—হ্যাঁ। বিদেশিদের আমি বিশ্বাস করি না। সর্দার চেঁচিয়ে বলল।

সর্দার কার নাম ধরে ডাকল। একজন যোদ্ধা ঘরে ঢুকল।

—যা। এটাকেও কয়েদঘরে ঢোকা। সর্দার বলল।

যোদ্ধাটি ইঙ্গিতে শাঙ্কোকে বাইরে আনতে বলল। শাঙ্কো সর্দারের ঘরের বাইরে এলো।

আরও একজন যোদ্ধা এগিয়ে এল। দুজনে শাঙ্কোকে নিয়ে চলল কয়েদঘরের দিকে।

শাঙ্কোকে কয়েদ ঘরের সামনে এনে শাঙ্কোর দু'হাত দড়ি দিয়ে বাঁধল। তারপর দরজা খুলে শাঙ্কোকে ঢুকিয়ে দিল।

অন্ধকার ঘরে শাঙ্কো বিস্কোদের ভালো করে দেখতে পেল না।

—শাঙ্কো—তুমিও আটকা পড়লে? বিস্কোরা বলে উঠল।

—পালাতে পারলাম না। অবশ্য আমি ধরা দিতে চেয়েছিলাম যাতে তোমাদের কী হল জানতে পারি শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো নারকোল পাতার ওপরে বসে পড়ল। তারপর শুয়ে পড়ল।

—তাহলে এখান থেকে পালানো যাবে না। সিনেত্রা বলল।

—যাবে। পালানোর ছক কষে ফেলেছি। এখন কাজে লাগানো। শাঙ্কো বলল।

তারপর শাঙ্কো শুয়ে শুয়েই ওর পালাবার ছকের কথা চাপা গলায় বলল। বিস্কো ও সিনেত্রা বলে উঠল—সাবাস শাঙ্কো।

—পীপে দুটো কোথায়? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—ঐদিকে কোথায় রেখে দিয়েছি। বিস্কো বলল।

—জল নিয়ে যাওয়া যাবে না। যে অর্ধেক পীপে জল আছে তাই দিয়ে চালাতে হবে হিচকক দ্বীপে পৌঁছোবার আগে পর্যন্ত। শাঙ্কো বলল।

—কখন পালাবে? বিস্কো জানতে চাইল।

—রাতে যখন খাবার দিতে আসবে। শাঙ্কো বলল।

সঙ্কোচ হল। শাঙ্কো উঠে বসল। মাথা নিচু করে বলল—বিস্কো—আমার জামার তলায় ছোরা আছে। বের কর। বিস্কো দড়িবাঁধা হাত শাঙ্কোর জামার নিচে ঢোকাল। আস্তে আস্তে ছোরাটা বের করে আনল। তারপর শাঙ্কোর হাত বাঁধা বিস্কো আর সিনেত্রার হাত বাঁধা দড়ি কেটে দিল। তারপর দুজন কালো মানুষ অবাক চোখে এই কাণ্ড দেখছিল। শাঙ্কো গিয়ে ওদের হাতের দড়িও কেটে দিল। মৃদুস্বরে বলল—রাজাকুতুবু বন্দী মাঠে আমাদের হাত পা বাঁধা ছিল। সেখান থেকে আমরা অতগুলো মানুষ পালাতে পেরেছি। আর এ তো শুধু হাত বাঁধা।

একটু রাত হল।

দুজন প্রহরী খাবার দিতে এল।

দরজা খোলা হল।

একজন প্রহরী খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল।

শাঙ্কো একটা পীপে তুলে নিয়ে তৈরিই ছিল। পীপেটা ছুড়ল প্রহরীটির মুখের দিকে। প্রহরীটি দরজার ওপর পড়ল। হাতের থালা খাবারও ছিটকে গেল। দরজার দুটো পাটাই খুলে গেল।

সবাই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। সামনেই অন্য প্রহরীটিও অবাক। পরক্ষরেই বর্শা তুলল। শাঙ্কো তৈরি ছিল। ছোরাটা ছুড়ল প্রহরীটির বুকে লক্ষ্য করে। কিন্তু ছোরাটা গেঁথে গেল প্রহরীটির ডান হাতে। বর্শা ফেলে ও মাটিতে বসে পড়ল। শাঙ্কো এক লাফে সামনে গিয়ে ছোরাটা খুলে নিয়ে চাপাস্বরে বলল—ছোটো —প্রাণপণে—জাহাজের দিকে। আহত প্রহরীটি আর্তনাদ করে উঠল।

তিনজনে ছুটল সমুদ্রতীরের দিকে। কালো লোক দুজনও ওদের পিছু পিছু

ছুটল। আহত প্রহরীটির আর্তনাদ শুনেই বোধহয় ঘুমন্ত যোদ্ধাদের কারো কারো ঘুমে ভেঙে গেল। তারা বর্শা হাতে ছুটে বাইরে এল।

চাঁদের আলো ম্লান। তবু শাঙ্কোদের ছুটতে দেখা গেল।

যোদ্ধারা পিছু ধাওয়া করল। শেষে কাছাকাছিও এসে গেল। একজন বর্শা ছুঁড়ল। কালো মানুষের একজনের পিঠে বর্শা ঢুকে গেল। সে গড়িয়ে বালিয়াড়ির ওপর পড়ে গেল।

শাঙ্কোরা ছুটছে। আবার একজন যোদ্ধা বর্শা ছুঁড়ল। কারো গায়েই লাগল না। অন্যজন ছুঁড়ল। শাঙ্কোর বাঁ কাঁধ কেটে বর্শাটা বালির ওপর পড়ল। কাঁধ থেকে রক্ত পড়তে লাগল। কিন্তু শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল না। সমানে ছুটে চলল।

ফ্রান্সিস তখনও ঘুমোয় নি। জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে তীর ভূমির দিকে তাকিয়ে ছিল। বন্ধুরা ফিরল না। এই নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল ওর।

হঠাৎ দেখল কারা ছুটে আসছে। চাঁদের ম্লান আলোয় চিনল শাঙ্কোরা। পিছনে উদ্ধত বর্শা হাতে ছুটে আসছে যোদ্ধারা। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—ভাইসব। তরোয়াল নিয়ে চলে এসো। তখনও সবাই ঘুমোয় নি।

অল্পক্ষণের মধ্যে তরোয়াল হাতে অনেক বন্ধু ডেক-এ উঠে এল। যোদ্ধারা তখনও বর্শা ছুঁড়ছে। কিন্তু আর কারো গায়ে বর্শা লাগল না।

শাঙ্কোরা তখন জাহাজের পাতা কাঠের তক্তার কাছে এসে গেছে।

তরোয়াল উঁচিয়ে ভাইকিংরা পাতা তক্তা দিয়ে নেমে আসতে লাগল।

শাঙ্কোদের পিছু ধাওয়া করা যোদ্ধারা থমকে দাঁড়াল। শাঙ্কোরা জাহাজে উঠে এল। যোদ্ধারা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করতে করতে চলে গেল। শাঙ্কো জাহাজের ডেক-এর ওপর শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস ছুটে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। দেখল শাঙ্কোর বাঁ কাঁধের ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকল—শিগগির ভেনকে আসতে বল। বেশি রক্ত বেরুলে শাঙ্কো একেবারে দুর্বল হয়ে পড়বে।

হ্যারি ছুটল ভেনকে ডাকতে। একটু পরে ভেন ওর পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে এল। শঙ্কো পাশে বসল। একটা বোতল থেকে সমুদ্রের নোনা জল, কয়েকটা শুকনো পাতা বের করল। পাতাগুলো হাতের তালুতে ডলে গুঁড়ো করল। গুঁড়োটা ক্ষতস্থানে ছড়িয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রক্তপড়া বন্ধ হয়ে গেল। এবার বোয়াম থেকে কালো আঠার মত ওষুধ বের করল। ক্ষতস্থানে আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিল। শাঙ্কো একটু নড়ে উঠে স্থির হল। ভেন পোঁটলা-পুঁটলি গোছাতে লাগল। বিড় বিড় করে বলল—কিছু না। কয়েকদিন ওষুধ পড়লেই সেরে যাবে। সব গুছিয়ে নিয়ে বলল—ফ্রান্সিস এখন কোথায় যাবে?

—সোজা হিচকক দ্বীপে। ফ্রান্সিস বলল।

—ওখানে কটা ছোট টিলা দেখেছি। চারপাশে জঙ্গল। আমার ওষুধের জন্যে কিছু গাছপাতা শেকড় খুঁজে বের করতে হবে। আমি দেখব খুঁজতে যাবো। ভেন বলল।

—তা যেও। ওখানে তো আমরা লড়াই করতে যাচ্ছি না। কাজেই শান্তিতেই তোমার কাজ করতে পারবে। ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিস কালো লোকটিকে দেখল। বিস্কো সিনেত্রার সঙ্গে সেও ডেক-এ বসে আছে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—ওকে?

—আমাদের সঙ্গে বন্দী ছিল। আমাদের সঙ্গেই পালিয়ে এসেছে। পাতুই দ্বীপের বাসিন্দা। এই দ্বীপে কাজের খোঁজে এসেছিল। সর্দার চোর অপবাদ দিয়ে কয়েদ ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। চলুক আমাদের সঙ্গে হিচকক দ্বীপে। সেখানে না হয় কাজ জোগাড় করে নেবে। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। বলল—তোমার নাম কী?

—তুতুম্বা। যুবকটি কালো মুখে সাদা দাঁত বের করে হাসল।

—ঠিক আছে। চলো আমাদের সঙ্গে। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস। শাঙ্কো একটু দুর্বলকেই ডাকল।

—বলো।

—রাতের খাওয়া হয় নি। বড্ড খিদে। শাঙ্কো বলল।

—চলো। তোমাকে খাবার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোর বাঁ বগলটা ধরে শাঙ্কোকে দাঁড় করাল। শাঙ্কো ডান হাত দিয়ে ফ্রান্সিসের গলা জড়িয়ে ধরল। দুজনে সিঁড়ি ঘরের দিকে চলল।

যেতে যেতে শাঙ্কো বলল—জল আনতে পারলাম না।

—ঠিক আছে। পীপের অর্ধেক জল অল্প অল্প করে খেয়ে চালিয়ে দেব। হিচকক দ্বীপ বেশি দূরে নয়। ফ্রান্সিস বলল।

সিঁড়ি ঘরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—জাহাজ ছেড়ে দাও। দাঁড় টানো, আমাদের যত দ্রুত সম্ভব হিচকক দ্বীপে পৌঁছতে হবে। যতটুকু জল না খেলে নয় ততটুকু জল খাবে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ তীরভূমি ছাড়ল। হাওয়ার বেশ তেজ। পালগুলো ফুলে উঠল। ওদের জাহাজ বেশ দ্রুতই চলল।

একদিন পরে ফ্রান্সিসদের জাহাজ হিচকক দ্বীপের জাহাজ ঘাটে এসে নোঙর করল।

এবার সোনার ঘর খোঁজার পালা।

একদিন পর ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—সোনার ঘরের খোঁজের আগে আর একটা কাজ। শুনলাম এই দেশবাসী একজনের মুখে এই হিচককের দক্ষিণে এক সমুদ্র আছে। তারপরেই এক দ্বীপ ক্রীট। হিচকক দ্বীপের সঙ্গে চির বিরোধ। ঐ যে মাঝখানের সমুদ্রের ফালি বললাম ঐ ফালিতে প্রচুর ঝিনুক। মুক্তোও পাওয়া যায়। কিন্তু দুই দ্বীপের কেউ ঐ সমুদ্রের ফালিতে ঝিনুক তুলতে নামে না। দুদেশের প্রহরীরাই বর্শা ছুঁড়ে মারে।

—তা তুমি কী স্থির করেছো? শাঙ্কো বলল।

—ঐ একফালি সমুদ্রে মুক্তো শিকার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—পাগল হয়েছো? ঐ প্রহরীদের বর্শার কথা ভাবছো না। শাঙ্কো বলল।

—সেসব ভাবতে গেলে কোন কাজই করা হয় না। মনে আছে আর তো আমার সেই মুক্তোর সমুদ্রে ডুব দিয়ে মুক্তো তোলা। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। তুমি তো মুক্তো শিকারীদের দলে ভিড়ে কী করে বেশিক্ষণ দম রাখতে দ্রুত ঝিনুক তুলতে হয় এসব শিখেছিলে। শাঙ্কো বলল।

—এবার সেটা কাজে লাগানো। ফ্রান্সিস বলল।

—কবে যাবে? শাঙ্কো বলল।

—পূর্ণিমার রাতে। তুমি তো জানো না পূর্ণিমার রাত কবে? ফ্রান্সিস বলল।

—না। ভেন এসব জানে। শাঙ্কো বলল।

—ভেন-এর কাছে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে ভেনএর কাছে এল। ভেন হিসেব করে বলল—পরশুদিন পূর্ণিমা।

ফ্রান্সিস সেই দিনটাই স্থির করল।

কিন্তু ফ্রান্সিসের দুর্ভাগ্য। দক্ষিণের দ্বীপে ক্রীট সেই রাতেই হিচকক দ্বীপ আক্রমণ করে বসল।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো—ফালি সমুদ্রের তীরে এল। সারি সারি নারকেল গাছের পেছন দিয়ে আড়ালে আড়ালে ওরা ফালি সমুদ্রের জলে নামল। হিচকক দ্বীপের প্রহরী তখন দূরে পাহারারত। ফ্রান্সিসরা বেশ কায়দা করে ওদের চোখকে ফাঁকি দিল।

দুজনে জলে নামল। কিছুটা ডুব সাঁতার দিয়ে গেল। মাথা তুলল।

আজই ক্রীট দ্বীপের দিকে হৈ হৈ চিৎকার শোনা গেল। ফ্রান্সিসরা দেখল একটি দ্বীপের সৈন্যরা চিৎকার করতে করতে ছুটতে ছুটতে আসছে। হাতে খোলা তরোয়াল। হিচকক দ্বীপের পাহারাদাররা পড়ি মরি ছুটল রাজবাড়ির দিকে। ক্রীট এর সৈন্যরা আক্রমন করেছে। লড়াই।

ওদিকে ক্রীটের সৈন্যরা জলে নেমে পড়েছে। সাঁতরে আসতে শুরু করেছে। হিচকক দ্বীপের সৈন্যদের মধ্যেও সাজো সাজো রব পড়ে গেল। তারাও তরোয়াল হাতে ছুটে এল। জলের মধ্যেই লড়াই শুরু হয়ে গেল। চিৎকার আর্তনাদ গোঙ্গানি শোনা যেতে লাগল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো জল পার হয়ে ক্রীট দ্বীপের দিকে চলে এল।

লড়াই তখনও চলছে। লড়াইয়ের চিৎকার তরোয়ালের ঝনঝনানি চলল।

হিচককের সৈন্যরা সংখ্যায় বেড়ে গেল। ক্রীটের সৈন্যরা সংখ্যায় বেশ কমে গেল। ওরা লড়াই চালাল। তবে বোঝা গেল ক্রীটের সৈন্যরা পারবে না। হেরে যাবে।

হলও তাই। ক্রীটের সৈন্যরা আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসতে লাগল। একসময় সবাই পিছিয়ে এল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো একটা নারকেল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। ক্রীটের সৈন্যদের এক দলনেতা হঠাৎ ফ্রান্সিসের হাত ধরে ফেলল। অন্য হাতে ধরল শাঙ্কোর

হাত। চিৎকার করে উঠল—এরা বিদেশী গুপ্তচর। হিচককের সৈন্যরা এত তাড়াতাড়ি আমাদের আক্রমনের কথা জানল কী করে? নিশ্চয়ই এরা আগেভাগেই খবর দিয়েছে।

—আপনি অন্যায় কথা বলছেন। ফ্রান্সিস বলল আপনাদের এই লড়াইয়ের সঙ্গে আমাদের কোন যোগ নেই। আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তোমরা গুপ্তচর। দলনেতা গলা চড়িয়ে বলল—এ্যাই এই দুজনকে বাঁধ। দুজন সৈন্য দড়ি হাতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস রেগে গেল। বলল—দুটো তরোয়াল দিন তারপর আমাদের হার স্বীকার করুন।

—না। তোমাদের লড়তে দেওয়া হবে না। দুজনকে কয়েদ ঘরে ঢোকাও। দলনেতা বলল। শাঙ্কো মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস শান্ত হও।

আরো কিছু হিচকক দ্বীপের সৈন্যকেও বন্দী করা হল। সবাইকে কয়েদ ঘরে ঢোকানো হল।

ঘরে একটা মাত্র মশাল জ্বলছে। তাতেই যা অন্ধকার দূর হয়েছে। মেঝেয় ঘাসপাতা বিছোনো। ফ্রান্সিস প্রথমে বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। ও ভাবল—বোকার মত ধরা পড়লাম। পালাতে পারতাম। যা হবার হয়েছে। এখন এই বন্দী দশা থেকে পালাবো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

আরো কিছু হিচকক দ্বীপের সৈন্যও বন্দী ছিল।

একটু রাত হল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো দলনেতাকে আসতে বলো তো।

শাঙ্কো লোহার দরজার কাছে গেল। দরজায় ধাক্কা দিল। একজন প্রহরী এল। বলল—কী ব্যাপার?

—তোমাদের দলনেতাকে আসতে বল। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা কী এমন রাজা এলে যে তোমরা ডাকলেই দলনেতা আসবে। প্রহরী বলল।

—বাজে কথা ছাড়ো। ডেকে আনো। ফ্রান্সিস বলল।

—না। প্রহরী মাথা নাড়ল।

ফ্রান্সিস উঠে এল। আস্তে আস্তে বলল—ভাই—আমরা কোন অপরাধ করি নি অথচ কয়েদ খাটা। আমাদের গুপ্তচর বলে মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। দলনেতাকে এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবো। আজ বন্দি হয়েই এই অন্যায় আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে।

—হুঁ। দেখছি।

কিছু পরে দলনেতা এল। বলল—কী বলবে তোমরা?

—একটা কথাই বলবো। গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে আমাদের অন্যায়ভাবে বন্দী করা হয়েছে। আমরা নির্দোষ। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তোমাদের কথা রাজাকে বলা হয়েছে। রাজা তোমাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। দলনেতা বলল।

—মৃত্যুদণ্ড? ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলল ঠিক আছে আমরা রাজার সঙ্গে কথা বলবো।

—রাজা কথা বলতে রাজি নাও হতে পারেন। দলনেতা বলল।

—তবু একবার বলে দেখুন। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে রাজা এলেন। ফ্রান্সিস বলল—মাননীয় রাজা আমাদের অন্যায়ভাবে বন্দী করা হয়েছে। আমরা নির্দোষ।

—তোমরা বিদেশী। রাজা বলল।

—হ্যাঁ আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—জলদস্যুর জাত। রাজা বলল। ফ্রান্সিস রেগে আগুন হয়ে গেল। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল। বলল—আমরা বিদেশী। আপনাদের এই দেশের যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে আমাদের কী যোগ বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা হিচকক দ্বীপের সৈন্যদের কাছে আমাদের সৈন্যসজ্জার খবর পৌঁছে দিয়েছো নইলে ওরা অত দ্রুত আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করল কী করে? রাজা বলল।

—আমরা সর্বক্ষণ সমুদ্রের জলেই ছিলাম। হিচকক দ্বীপের সৈন্যদের খবর দেব কী করে? ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব বুঝি না। তোমাদের জন্যই আমরা লড়াইয়ে হেরে গেছি। রাজা বলল।

—'না আমাদের কোন দোষ নেই' ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব বলে লাভ নেই। তোমাদের কয়েদঘরে থাকতে হবে। মুক্তি নেই। মুক্তি আছে একবারে মৃত্যুতে। রাজা বলল।

—তার মানে আপনি আমাদের হত্যা করবেন? ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়ই। রাজা বলল।

—কী অন্যায় বিচার। শাঙ্কো বলল।

—এটাই তোমাদের প্রাপ্য শাস্তি। রাজা বলল।

ফ্রান্সিস বুঝল রাজা কোন যুক্তি মানবে না। ওদের হত্যা করবেই।

কয়েকদিন কাটল। ফ্রান্সিস শাঙ্কো চুপচাপ শুয়ে বসে থাকে। ভাবে ভবিষ্যৎ কী? এখান থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কি ভাবে? যা থেকে সব এখানকার নিয়মটিয়ম দেখতে বুঝতে হবে। তারপর উপায়।

কদিন পর গভীর রাত্রে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় শুরু হল। কালো আকাশ যেন ছিঁড়ে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সেইসঙ্গে প্রবল বাতাস।

প্রচণ্ড জোর শব্দে একটা বাজ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েদ ঘরের একটা কোনা ভেঙে পড়ল। ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। যাক প্রকৃতিই বাঁচার পথ করে দিল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—আর বসে থেকো না। রাস্তা খোলা, পালাও।

দু'জনে এক লাফে ভাঙা কয়েদ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পেছনে অন্য বন্দীরাও।

দুজনে ছুটল দক্ষিণের সমুদ্রের দিকে।

ততক্ষণে বৃষ্টি কমে গেছে। হাওয়ার গতিও কমের দিকে। ছুটতে ছুটতে শাঙ্কো বলল—দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে গিয়ে কী হবে?

—ওখানে নৌকো পাবো। নোকায় চড়ে পালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—চলো। দেখা যাক। ফ্রাঙ্কো বলল।

দুজনে দক্ষিণ সমুদ্রতীরে পৌঁছল। এবার নৌকো জোগাড় করা। সমুদ্রতীর থেকে বেশ কিছু দূরে লোকজনের বাড়ি-ঘর। সেই বাড়িঘরটরের কাছে বালিতে নৌকো রাখা। নৌকোর ভেতরে দাঁড়। তখন ভোর হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসরা নৌকা খুঁজতে লাগল।

ফ্রান্সিসরা যেখানে এল। স্থানীয় বাসিন্দারা ওদের দেখল কিন্তু ওরা যে কয়েদঘর থেকে পালিয়েছে তা তো ওরা জানে না। ফ্রান্সিসরা নিশ্চিন্তমনেই ঘুরে বেড়াতে লাগল। নজর নৌকার দিকে।

দেখল একটা নৌকা একটা ঝোপের কাছে রাখা। ধারে কাছে কোন বাড়িঘর নেই।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে নৌকোটার কাছে গেল। তারপর দাঁড় দুটো ফ্রান্সিসের হাতে দিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে নৌকাটা মাথার ওপর তুলে ফেলল। তারপর সমুদ্রের দিকে ছুটল। পেছনে ফ্রান্সিস।

দুজনে সমুদ্রের ধারে এল তখনই দেখল নৌকার মালিক লাঠি হাতে ছুটে আসছে। ওরা দুজনে লাফিয়ে নৌকায় উঠে গেল। তারপর দাঁড় বাইতে শুরু করল। নৌকার মালিক লাফিয়ে জলে নৌকায় দিকে সাঁতার কাটতে শুরু করল। ফ্রান্সিসরা নৌকার গতি বাড়িয়ে দিল।

মালিক মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। হাত-পা টেনে মালিক হাল ছেড়ে দিল। সমুদ্রতীরের দিকে ফিরে চলল। তীরে উঠে গেল।

সমুদ্রের ঢেউ তখনও শান্ত হয় নি। উঁচু উঁচু ঢেউ তার মাঝখান দিয়েই ফ্রান্সিস নিপুন হাতে দাঁড় বেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে কাত হওয়া নৌকায় ছিটকে জল উঠছে। শুধু হাতেই শাঙ্কো করুন জল ছেঁচে ফেলছে।

নৌকো চলেছে। কোথায় চলেছে ওরা জানে না। ফ্রান্সিস বলল—মোটকথা ক্রীট দ্বীপ থেকে পালাতে হবে। তারপর সেখানে গিয়ে পৌঁছোই।

বিকেলের দিকে দূরে একটা দ্বীপমত মনে হল। শাঙ্কো চেঁচিয়ে বলল—ফ্রান্সিস—একটা দ্বীপ। ঐ দিকেই নৌকো চালাচ্ছি তখন শাঙ্কো নৌকো বাইছিল।

সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার নেমে এল। সেই আলো অন্ধকারে ফ্রান্সিসদের নৌকো দ্বীপটার তীরে ভিড়ল।

দুজনে নামল। সামনেই কিছু বাড়িঘরদোর। বাড়িগুলোয় মশাল জ্বলছে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো কী করবে।

—চলো। এসেছি যখন। দেখা যাক কেমন মানুষ এরা। শাঙ্কো বলল।

দরজায় জানালায় উৎসুক মুখের ভিড়। ফ্রান্সিস সামনের বাড়িটায় এল। বোধহয় বাড়ির মালিক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল—জায়গাটা কি দ্বীপ?

—হ্যাঁ। পিলকে দ্বীপ।

—আপনাদের পেশা কী?

—এই দ্বীপের মাঝখানে রয়েছে একটা বিরাট হ্রদ। মিষ্টি জলের হ্রদ। এই হ্রদই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এই হ্রদেই আমরা মাছ ধরি। মাছ চাষ করি। সেই মাছ বিক্রির অর্থেই আমরা সংসার চালাই। ওটাই আমাদের রোজগার। বাইরের দ্বীপ থেকেও মানুষ আসে মাছ কিনতে। নিজেরাও চালান দিই। খাড়ির মালিক বলল।

আবার বলল আপনারা বোধহয় বিদেশী।

—হ্যাঁ। সারা পৃথিবী আমরা ঘুরে বেড়াই। এতেই আমরা আনন্দ পাই। হিচ্‌কক দ্বীপে আমাদের জাহাজ রয়েছে। মাঝখানে ক্রীট দ্বীপে আমরা বন্দী হয়ে রইলাম। সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। এখন এখান থেকে আমাদের জাহাজ ফিরবে।

—ততদিন কি এখানে থাকবেন? গৃহকর্তা জিজ্ঞাসা করল।

—কিছু ঠিক করি নি তবে দু'চারদিন তো থাকবোই। যাক গে—সারা দিন না খেয়ে আছি। কিছু খেতে দিন। শাঙ্কো বলল।

—নিশ্চয়ই। আসুন। গৃহকর্তা বলল।

দুজনে ঘরের মধ্যে ঢুকল। কাঠ ও মাটির তৈরী বাড়ি। ছাউনি শুকনো ঘাসপাতার। ঘরে তিমি মাছের তেলের প্রদীপ জ্বলছে। অন্ধকার মোটামুটি দূর হয়েছে।

মালিক তার স্ত্রীর সঙ্গে কী কথাবার্তা বলল। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল দুপুরের বাসি খাবার তো বেশি নেই। আমাদের পেট ভরবে না। তার চেয়ে রাতের রান্নার তো সময় হয়ে গেল। একটু অপেক্ষা করুন। আপনাদের টাটকা খাবার দেওয়া হবে।

ঘাস দিয়ে বোনা একটা আচ্ছাদন মাটিতে পাতা। তার ওপরেই বসল দুজনে।

তারপর কথাবার্তা চলল। বাড়ির মালিক বলল—আমাদের কোথায় আর শোবেন। খেয়েদেয়ে এখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। পাশের ছোট ঘরটায় আমরা থাকবো।

ফ্রান্সিস শাঙ্কো বেশ পেট ভরেই খেলো। ঘুমও পেল তাড়াতাড়ি। দুজনে বেশ তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে তিনখানা রুটি আর শাকপাতার ঝোল দিয়ে খেল। তারপর হ্রদ দেখতে গেল। সত্যিই বিরাট হ্রদ। পরিষ্কার ঝকঝকে জল। মাছ ধরা চলছে নৌকায়। পাত্র ভরে খাবার জল তুলে নিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে লোকজনের সাড়াশব্দ।

কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে ফ্রান্সিসরা গৃহকর্তার বাড়িতে ফিরে এল। যাত্রীরা ওদের ছাড়ল না। বলল গৃহকর্তা।

—যে কদিন এখানে থাকবেন আমাদের বাড়িতেই থাকুন। আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না।

—না-না—আপনি যত্নে আমাদের রেখেছেন। ঠিক আছে কটা দিন এখানেই থাকবো। ফ্রান্সিস বলল।

বিকেলে ফ্রান্সিসরা ঘুরে ফিরে আসার জন্য বেরুবে তখন ভদ্রলোক বললেন—



তারপর দাঁড় বাইতে শুরু করল

এখানে তো সবই ভালো। কিন্তু বিপদ হল উত্তরের-আগ্নেয়গিরিটা। ওটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। মাঝে মাঝেই মাটি কাঁপে। তবে অগ্নুদগার হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। আবার কবে অগ্নুদগার হয় সেই ভয়ে থাকি আমরা।

—আগ্নেয়গিরিটা কোথায়? ফ্রান্সো জিজ্ঞেস করল।

—হ্রদের উত্তর কোণায়। যান—দেখে আসুন। গৃহকর্তা বলল।

—শাঙ্ক। চলো দেখে আসি। ফ্রান্সিস বলল।

দু'জনে হ্রদের ধারে এল। উত্তর দিকে চলল। জঙ্গল এখানে। তার মধ্য দিয়ে দু'জনে হেঁটে চলল। জঙ্গল খুব ঘন নয়।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় আগ্নেয়গিরিটা দেখল। কালো পাহাড়। ওরা পাহাড়ের নিচে এসে পৌঁছাল। বিকেলের নরম রোদে পাহাড়টা মাথা উঁচিয়ে আছে।

দুজনে পাহাড়টায় উঠতে লাগল। জমাট গলা পাখিরা মাঝে মাঝে ছাইয়ের মত কিছু ছড়ানো।

ফ্রান্সিস বলল—কী মাথায় উঠবে?

—এতদূর এলাম। একটু আগ্নেগিরির মুখটা দেখে আসব না? শাঙ্কো বলল।

—না শাঙ্কো। যদি হঠাৎ জেগে ওঠে আমরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবো। অত ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। এখান থেকে যা দেখা যায় তাই দেখে ফিরে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে ওখানেই দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। জ্বালামুখ থেকে পাতলা কুয়াশার মত নিলচে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এটাই জীবন্ত আগ্নেয়গিরির প্রমাণ।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল দুজনে। হঠাৎই দেখল ধোঁয়াটা ঘন হতে শুরু করেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই জ্বালামুখ দিয়ে ঘন ধোঁয়া আকাশে উঠতে লাগল। মাটিতে খুব মৃদু কম্পন অনুভব করল দুজনে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো লক্ষণ সুবিধের নয়। ফিরে চলো।

দুজনে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যতটা দ্রুত সম্ভব ফিরে চলল।

যখন গৃহকর্তার কাছে ফিরল তখন সন্ধে হয়ে গেছে।

বসতি এলাকার মানুষের মধ্যে তখন উৎকণ্ঠা ছড়িয়েছে। লোকজন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো বোধহয় অগ্নুদগার হবে। এরা অভিজ্ঞ। জানে কখন কী অবস্থায় আগ্নেয়গিরি জাগে।

—কী করবে? শাঙ্কো বলল?

—আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। চলো পালাই। ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ নৌকোয় চড়ে পালাতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—পারবো? ফ্রান্সিস বলল।

—পারতেই হবে। এখানে থাকলে মারা পড়বো। চলো।

গৃহকর্তা ওদের দেখে এগিয়ে এল। বলল—আগ্নেগিরি জেগেছে। তবে এরকম মাঝেমাঝে হয়। ঘণ্টা কয়েক গলিত লাভা ছাই ছিটকে বেরোয়। তারপর সব বন্ধ

হয়ে যায়। আগ্নেয়গিরি ঘুমিয়ে পড়ে। ভয় পাবার কিছু নেই। এই আগ্নেয়গিরি আমাদের কাছে দেবতার মত। আমরা বছর বছর ফুল পাতা দিয়ে পূজা করি। আমরা রক্ষা পাই।

ফ্রান্সিস বলল—এটা সবসময় হয় না। আগুনে পাথর লাভাস্রোত শুরু হলে রেহাই নেই। আমরা চলে যাচ্ছি।

—ঐ ছোট নৌকোয় চড়ে? ফ্রাসিস বলল।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো মাথা ঝাঁকাল।

—দাঁড়ান আপনাদের একটা বড় নৌকো দিচ্ছি। গৃহকর্তা কোথায় চলে গেলেন। একটু পরে ফিরে এল। ওদের সমুদ্রের ধারে নিয়ে গেল। দেখা গেল একটা বেশ বড় নৌকো। মাথা ঢাকা নৌকোর কাছে গিয়ে ওরা দেখল নৌকায় দাঁড় হাল রাখা।

ফ্রান্সিসরা দেরি করলো না। নৌকায় উঠে বসল। নৌকা ছেড়ে দিল। দূর থেকে দেখল সত্যিই আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে আগুনের ধোঁয়া বেরুনো অনেকটা কমে গেছে। কিন্তু ফ্রান্সিসরা তীরে নেমে এল না। নৌকা ভাসাল।

যতটা জেগেছে আগ্নেয়গিরি তাতেই সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে উঠছে। ফ্রান্সিসরা দক্ষ হাতে হাল ধরে রইল। শাঙ্কো দাঁড় বাইতে লাগল। আগ্নেয়গিরির মাথার আকাশটা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হল। আগুনের আভা নিভে এল। গৃহকর্তা ঠিকই বলেছিল ওরা আগ্নেয়গিরিকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে ফুলপাতা দিয়ে পূজো করে। আগ্নেয়গিরিটিও ওদের বাঁচিয়ে রাখে।

ফ্রান্সিসরা নৌকো বেয়ে চলল। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের ধাক্কায় ওরা নৌকো থেকে ছিটকে জলে পড়তে লাগল। আবার সাঁতরে নৌকোয় উঠতে লাগল।

রাত কাটল। ওর মধ্যেই জলে দাঁড়বন্ধ করে ওরা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিল। জল ফুলে ফেঁপে ওঠা বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ।

পরদিন দুপুরে দূর থেকে একটা দ্বীপ দেখল। দূর থেকে ঠিক বুঝল না কতদূর। তবু ঐ দ্বীপ লক্ষ্য করেই ওরা নৌকো চালাল।

সন্ধ্যের অন্ধকারে সেই দ্বীপে পৌঁছল। তীরে বেশ কয়েকপা যেতেই ফ্রান্সিস বলে উঠল—সর্বনাশ।

—কী হল? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—আমরা সেই ক্রীট দ্বীপেই ফিরে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—কী করে বুঝলে? শাঙ্কো বলল।

—ফ্রান্সিস আঙুল তুলে একটা বাজ পড়া নারকেল গাছ দেখাল।

—আবার কয়েদ ঘর? শাঙ্কো বলল?

—অগত্যা উপায় কি। এখন উপায়।

ওরা কয়েকটা ঝোপের আড়ালে বসে রইল।

রাত বাড়ল। খিদেয় পেট জ্বলছে। ফ্রান্সিস বলল—চলো খাবার চুরি করবে। ভীষণ খিদে।

দুজনে এবাড়ি ওবাড়ির গা ঘেঁষে ঘুরতে লাগল। একটা ফাঁকা এলাকায় একটা বাড়ি পেল। ফ্রান্সিস বলল—এই বাড়িটার ধারে কাছে বাড়ি নেই। এটাতেই চেষ্টা করি।

দু'জনে জানলা দিয়ে তাকাল। দেখল মেঝেয় দুটো বিছানো পাতায় খাবার সাজানো। গাছের ডালে তৈরি বিছানায় একজন পুরুষ শুয়ে আছে। একজন স্ত্রীলোক। মেঝেয় বসেছিল। এবার পাশের ঘরে গেল। বোধহয় জল অথবা নুন আনতে।

ফ্রান্সিস কাঁপা গলায় বলল—জলদী। দুজনে গোল দরজা দিয়ে ঘরটায় ঢুকে পড়ল। স্ত্রীলোকটি ফেরার আগেই দুটো পাতাভর্তি খাবার নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। পুরুষটি হৈ হৈ করে উঠল। ফ্রান্সিসরা তার আগেই একটা বড় ঝোপে ঢুকে পড়ল।

দুজনে হাঁপাচ্ছে তখন ওরা একটুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর অল্প অন্ধকারে গোগ্রাসে খাবার গিলতে লাগল।

খাওয়া শেষ। কোথায় আর হাত মুখ ধুতে যাবে। জংলি গাছের পাতা ছিঁড়ে হাত মুছল। জামার হাতায় মুখ মুছল।

রাত বেড়ে চলল। রাতের মত খাওয়া হয়েছে।

নিশ্চিন্ত মনে দুজনে গাছের ডাল ভেঙে মাটিতে পাতল। তারপর ওখানেই শুয়ে পড়ল।

—এবার কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—ধরা দেব। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি। আবার কয়েদ ঘর? শাঙ্কো বলল।

—উপায় নেই। এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে থেকে লাভ নেই যদি না পালাতে পারি। কয়েদ ঘর থাকলে দুটো খাওয়া ও নিশ্চিন্তে থাকা যায়। তারপর পালানো। ফ্রান্সিস বলল।

—বড় বেশি ঝুঁকি নেওয়া হবে। শাঙ্কো বলল।

—ঝুঁকি তো থাকবেই। কালকে সোজা কয়েদ ঘরে গিয়ে হাজির হবে। প্রহরীদের কাছে আমরা যথেষ্ট পরিচিত। ওরাই আমাদের কয়েদঘরে পাঠাবে। রাজা বা দলনেতার দরকার নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—এভাবে ধরা দেওয়া। শাঙ্কো বলল।

—দাঁড়াও। দুচারটে দিন বিশ্রাম নিই। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে টুমিয়ে শরীরে কিছু জোর করি। তারপর পালানো। ফ্রান্সিস বলল।

সকাল হল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোর ঘুম ভাঙল। কাছেই পুকুর থেকে হাত মুখ ধুয়ে এল।

—এখন যাবে কয়েদখানায়? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। সকালের খাবারটাও জুটবে। চলো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে কয়েদঘরের সামনে এল। প্রহরীরা হাঁ। কয়েদী নিজেরাই হাজির। প্রহরীরা লাফিয়ে এগিয়ে এল।

ওরা দুজনকে ঘিরে ধরল।

একজন প্রহরী দলনেতাকে নিয়ে এল। দলনেতা হেসে বলল—তাহলে নিজেরাই এসে ধরা দিলি। আমাদের খাটুনি কমিয়ে দিলে।

—সকালের খাবার খেতে দাও। ফ্রান্সিস বলল।

—আগে কয়েদঘরে ঢোকো। দলনেতা বলল। প্রহরীরা দুজনকে কয়েদঘরে ঢোকাল। দুজনে ঘরে ঢুকেই বসে পড়ল। একটু পরেই সকালের খাবার এল। দুজনে পেটপুরে খেল।

এখন তো শুধু শুয়ে বসে সময় কাটানো।

পরদিন রাজা কয়েদ ঘরে এল। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল শুনলাম তোমরা নিজেরাই ধরা দিয়েছ।

—হ্যাঁ। খিদে পেয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল?

—ঠিক আছে। থাকো। দেখি তোমাদের কী শাস্তি দেওয়া যায়। রাজা বলল।

—কী আর শাস্তি দেবেন। এই নরককুণ্ডে আছি এটাই তো যথেষ্ট শাস্তি। শাঙ্কো বলল।

—উঁহু, অন্য কোন শাস্তি। রাজা বলল।

—দোহাই প্রাণে মারবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি ভেবে। রাজা গম্ভীর গলায় বলল। তারপর চলে গেল।

রাতে শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস পালানোর একটা জব্বর উপায় ভেবে বের করেছি। রাজার পেটে ছোরা ঢুকিয়ে দুজনে পালাবো। পরদিন বিকেলে ফ্রান্সিস প্রহরীদের একজনকে বলল—রাজাকে খবর দাও। তিনি যেন এখানে আসেন।

—ডাকলেই রাজা আসেন না। প্রহরী বলল।

তখনই দলনেতা এসে হাজির। প্রহরীটি তাকে ফ্রান্সিসের কথা বলল। দলনেতা বলল—রাজাকে কী দরকার?

—রাজার সঙ্গে কথা আছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাকে বল তাহলেই হবে। দলনেতা বলল।

—আপনাদের বলে লাভ নেই। রাজাকে বলবো। ফ্রাসিস বলল।

—ঠিক আছে। কী এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা। দলনেতা বলল।

—কী আর করি। আপনাকেই বলি। দক্ষিণে যে মিঠে জলের ছোট-পুকুরটা আছে তাতে গুপ্তধন আছে। ফ্রান্সিস ফিস ফিস করে বলল।

দলনেতা চমকে উঠল। বলল—সত্যি?

—হ্যাঁ অতীতের কোন এক রাজা গোপনে রেখে গেছেন হীরে মুক্তো মনি মাণিক্য। একটা দ্বীপের মধ্যে। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা এতদূর জানো? দলনেতা বলল।

—হ্যাঁ। আরো জানি কী করে সেটা উদ্ধার করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো—দলনেতা বেশ অস্থির হয়ে পড়ল।

মনিমুক্তো বোঝাই পিপে। ও ছুটল রাজাকে খবর দিতে। ফ্রান্সিস প্রহরীদের কাছে কাগজ কলম চাইল। প্রহরীরা হাসল। এখানে কাগজ কলম কোথায়? একটু পরেই রাজা এল। মুখ চোখ লাল। জোরে শ্বাস ফেলছে। বোঝা গেল ছুটে এসেছে। বলল—কী ব্যাপার গুপ্তধনের ব্যাপারে তোমরা কী জানো?

—সব বলছি। তার আগে একটু কাগজ আর কলমখানির ব্যবস্থা করুন। রাজা দলনেতাকে হুকুম দিল কাগজ কলম আনার জন্য। দলনেতা কাগজ কলম নিয়ে এল। ফ্রান্সিস কাগজ কলম মেঝেয় পেতে রাজাকে বলল এসে দেখুন। রাজা সোৎসাহে গিয়ে মেঝেয় বসল। ফ্রান্সিস কাগজে নকশা আঁকতে আঁকতে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে গলাবুক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। তারপর রাজার পিঠে ঠেকিয়ে বলল—উঠে আসুন। রাজার প্রহরীরা অবাক। এরকম একটা কিছু ঘটবে ওরা কল্পনাও করতে পারে নি। শাঙ্কো প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলল—কেউ চেঁচালে রাজাকে খতম করে দেব। আমরা ফালি সমুদ্রের দিকে যাবো চলো।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল রাজামশাই আমাদের সঙ্গে চলুন।

রাজা আর কী করে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

রাজাকে সামনে রেখে পিঠে ছোরা ঠেকিয়ে শাঙ্কো বলল—কয়েদঘরের বাইরে চলুন।

প্রহরীরা কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না? ভাইকিংটা যে কোন মুহূর্তে রাজার পিঠে ছোরা বসিয়ে দিতে পারে। তাহলেই রাজার দফা শেষ।

প্রহরীরা, রাজা, ফ্রান্সিসরা চলল ফালি সমুদ্রের দিকে।

সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার হয়ে এল চারদিক। ফালি সমুদ্রের সামনে এল সবাই।

ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—সবাই দূরে যাও। প্রহরীরা কিছু দূরে সরে গেল। রাজার মুখ শুকনো। হঠাৎ যদি ছোরাটা ঢুকিয়ে দেয় পিঠে। দফারফা।

হঠাৎ ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো জলে ঝাঁপ দিল। কেউ কিছু বোঝার আগেই। অন্ধকারও হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসদের ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না।

অন্ধকারে সাঁতরে চলল ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো। পেছন থেকে প্রহরীরা বর্শা ছুড়ল। কিন্তু কোনটাই ফ্রান্সিসদের গায়ে লাগল না।

কিছু পরে ফ্রান্সিসরা হিচ্‌কক দ্বীপের তীরে উঠল। মুক্তি!

দুজনে আস্তে আস্তে হেঁটে চলল রাজবাড়ির দিকে। রাজবাড়ির কাছে যখন পৌঁছল তখন অন্ধকার ঘন হয়েছে। রাজবাড়ির প্রধান প্রবেশ পথে এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে।

ওরা সমুদ্রতীরের দিকে চলল।

একটু রাতেই ওরা ওদের জাহাজের কাছে এল। দু হাতের চেটো গোল করে শাঙ্কো ডাকল—হ্যারি—আমরা এসেছি।

বারকয়েক ডাকতে হ্যারি ডেকএ উঠে এল। অন্ধকারে আন্দাজে ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে দেখল। চেঁচিয়ে বলল—নৌকো নামাও। ফ্রান্সিসরা এসেছে।

একটা নৌকা জলে নামানো হল। নৌকোর বিস্কো জানিয়ে পারে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস শাঙ্কো নৌকোয় উঠে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসরা জাহাজে উঠে এল।

বন্ধুরা ওদের ঘিরে ধরল। শাঙ্কো আস্তে আস্তে সব ঘটনা বলতে লাগল। মারিয়া এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল—কিচ্ছু ভেবোনা আমরা অক্ষত। ভালোভাবেই ফিরেছি। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—সবার আগে আমাদের খেতে দাও। আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত।

পরদিন ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—এখানকার সমুদ্রে মুক্ত পাওয়া যায়। চেষ্টা করবো নাকি?

—পারবে?

—মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো তুলেছি। মুক্তো শিকারীদের দলে ভিড়ে নানা কৌশল শিখেছি। ঠিক পারবো। তবে ঝিনুক না ভেঙে তো বলা যাবে না। দেখি কয়েকটা ঝিনুক তুলে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফ্রান্সিস দড়ি ধরে ধরে জাহাজ থেকে জলে নামল। সঙ্গে নিল ঝিনুক-তোলার ছোট জাল।

কিছুক্ষশ পরে জাল ভর্ত্তি ঝিনকু এনে বিস্কোকে দিল। বিস্কো সব ঝিনুক ডেকএ ঢালল। বন্ধুরা ছুরি হাতে বসে পড়ল। ঝিনুকের মুখ ছুরি দিয়ে চাপ দিয়ে খুলতে লাগল।

ফ্রান্সিস আর এক দফা ঝিনুক আনল। তারপর ভেজা জামাকাপড় ছেড়ে এল। সবাই ভিড় করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভিড়ে মারিয়াও আছে।

আজ ঝিনুক প্রায় সব তোলা হয়ে গেল। মুক্তো পাওয়া গেল না।

হঠাৎ বিস্কো একটা মুখখোলা ঝিনুক হাতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ভাঙ্গা ঝিনুকে একটা মুক্তা। সবাই ধ্বনি তুলল—ও-দো-দো। ফ্রান্সিস হেসে বলল—সবে একটা মুক্তা পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস মুক্তটা হাতের চেটোয় রাখল। সবাইকে দেখাতে লাগল। স্থির হল মুক্তোটা মারিয়ার গহনার বাক্সে থাকবে। সবাই খুশি।

ফ্রান্সিস বলল—এবার সোনার ঘর খুঁজে বের কর।

—কী মনে হয়? পারবে? হ্যারি বলল।

—কিছু সূত্র জানা নেই। যেমন পাঁচরিদেয় মাপকাঠিটা। দরজা জানালাহীন ঘরগুলো। ওখান থেকেই হদিস বার করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সেদিন সন্ধেবেলা হ্যারি জাহাজে এসে ফ্রান্সিসের কাছে এল।

—কী ব্যাপার? তোমাকে বেশ চিন্তাগ্রস্ত দেখছি। ফ্রান্সিস বলল।

—চিন্তারই কথা ফ্রান্সিস আবার হিচ্‌কক আর ক্রীটের লড়াই। ক্রীটের রাজা বিদেশ থেকে বহু সৈন্য ভাড়া করে এনেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই হিচ্‌কক আক্রমণ করবে। হিচ্‌কক দ্বীপ জয় করবে।

—পারবে কী? ফ্রান্সিস বলল।

—এবার মনে হয় পারবো। শাঙ্কো বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

দুদিন পরে গভীর রাতে ক্রীটের রাজা হিচকক দ্বীপ আক্রমণ করল। হাজার হাজার সৈন্য নিঃশব্দে ফালি সমুদ্র পার হয়ে আক্রমণ করল।

হিচ্‌ককের সৈন্যরাও ঘুম ভেঙে ছুটল লড়াই করতে। লড়াই চলল। ক্রীটের সৈন্যরা সংখ্যায় অনেক বেশি। তারা হিচককের সৈন্যদের ঘিরে ফেলল।

হিচ্‌ককের রাজা মামুন শয়নঘরে পায়চারি করছিলেন। মাঝে মাঝে দূতেরা এসে খবর দিয়ে যাচ্ছে। সেসব খবর সুখবর নয়। তিনি বুঝতে পারলেন—লড়াইয়ে জিতবেন না। স্থির করলেন বন্দী হবেন না। আত্মগোপন করবেন।

একজন দূতকে ডাকলেন। বললেন—সমুদ্রতীরে যাও। দেখবে কিছু বিদেশী জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে কথা বলা চলল রাজা মানুন রানি ও পুত্রকন্যাসহ আশ্রয় চান। তারা আশ্রয় নিতে পারবেন কিনা।

দূত রাজপ্রাসাদের পেছনের গোপন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। দেরি করার উপায় নেই। প্রায় ছুটে চলল সমুদ্রতীরের দিকে। প্রথমেই ফ্রান্সিসদের জাহাজটা পেল। জাহাজের সামনে এসে চিৎকার করে বলল—আপনাদের সঙ্গে কথা ছিল। আমি জাহাজে উঠলে কথা বলবো।

ওদিকে লড়াই চলছে। তার চিৎকার হৈ হল্লায় ভাইকিংদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ওরা অনেকেই জাহাজের বানিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা দূতের কথা শুনল। ফ্রান্সিসকে ডাকল। ফ্রান্সিস রেলিং ধরে উঁচু হয়ে গলা চড়িয়ে বলল—

—বিশেষ কোন কথা আছে?

—হ্যাঁ। আমাকে জাহাজে উঠতে দিন। দূত বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বিস্কোকে বলল—লোকটি কী বলতে চায় জানি না। ওকে জাহাজে নিয়ে এসো।

বিস্কো হালের কাছে এল। দড়ি বেয়ে বেয়ে নৌকোয় নামল। সেটিকে ধরে তীরে নিয়ে এল। দূতটি দ্রুত উঠল। বলল—একটু তাড়াতাড়ি চলুন। বিস্কো একটু দ্রুতই ** বেয়ে দূতকে জাহাজে নিয়ে এল।

দূত জাহাজে উঠে বলল—আপনাদের ক্যাপ্টেন কে?

ফ্রান্সিস এগিয়ে এল।·বলল—বলো কী ব্যাপার?

—আমাদের রাজা আমুন খুবই বিপদগ্রস্ত। আমরা ক্রীটদের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা প্রাসাদ দখল করবে। রাজা আমুন আমাকে সমুদ্রতীরে পাঠিয়েছেন কোন বিদেশী জাহাজে উনি আশ্রয় নেবেন। বিদেশী জাহাজেই ঠিক আশ্রয় পাওয়া যাবে।

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। তারপর বলল—ভাই তোমাদের এই লড়াইয়ের সঙ্গে আমাদের তো কোন সম্পর্ক নেই। আমরা এর মধ্যে জড়াবো কেন?

—এটা মানবিকতার প্রশ্ন। স্ত্রী সন্তান সহ রাজাকে বন্দী করা হবে। বন্দীর জীবন কী কষ্টের হয় সে তো আপানদের জানা আছে। এটা একটা বিনীত আবেদন। দূত বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকালো। বলল—হ্যারি কী করবে?

—দেখ রাজা মানমুনের জীবন সংশয়। যদি আমরা আমাদের জাহাজে আশ্রয় দিই তাহলে হয়তো বেঁচে যাবেন। হ্যারি বলল।

—কিন্তু ক্রীটদের রাজা কি চুপ করে বসে থাকবে? সব জাহাজে তল্লাশী চালাবে। রাজা মামুনকে খুঁজে বের করবে। শাঙ্কো বলল সেটা হতে পারে। আমরা জাহাজ নিয়ে দূরে গিয়ে নোঙর করবো। ক্রীটের দলনেতা এতদূর গিয়ে তল্লাশী নাও করতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ তা হতে পারে—ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে রাজা মামুনকে আমরা আশ্রয় দেব। দূত বলল—আপনাকে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো। রাজা মামুনের জীবন বাঁচালেন আপনি।

—তুমি বেশি দেরি কর না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজা রানি আর পুত্রকন্যাকে নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

দূত দ্রুত হালের দিকে ছুটল। দড়ি বেয়ে বেয়ে নৌকোয় বেয়ে নেমে এল। বিস্কোও এল। নৌকো চালিয়ে তীরে ভেড়াল। দ্রুত তীরে নেমে রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটল?

বিস্কো নৌকায় বসে রইল।

ওদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের চিৎকার চ্যাঁচামেচির শব্দ অনেক কমে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে গায়ে দামি কাপড়ের চাদর জড়িয়ে রাজা ও রানি এলেন। দূত পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। সূর্য ওঠে নি। দূত রাজা রানি ও পুত্রকন্যাকে নৌকোয় তুলে দিয়ে নিজে উঠল। বিস্কো দ্রুত নৌকো বেয়ে এনে জাহাজের হালের কাছে লাগাল।

শাঙ্কো ওপর থেকে দড়ির মই ফেলে দিল। বিস্কো রাজপুত্র রাজকুমারীকে ধরে ধরে মইয়ের থাকে তুলে দিল। দুজনে মই বেয়ে বেয়ে উঠে পড়ল। তারপর রানি উঠতে লাগলেন। মইটা পাক খেল। রানি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন। বিস্কো দুহাত দিয়ে রানির কোমর ধরল। রানি টাল সামলালেন। আস্তে আস্তে উঠে পড়লেন।

ফ্রান্সিস নিজেদের কেবিন ঘর রাজা রানিদের ছেড়ে দিল। মারিয়া আগেই যা কিছু ভালো বিছানার জিনিস আছে সব পেতে দিল।

রাজা রানি বিছানায় বসলে। রাজকুমার রাজকুমারীকে শাঙ্কো জাহাজের সবকিছু দেখাতে নিয়ে গেল।

রাজা শুকনো মুখে বসে রইলেন। রানিও চুপ করে বসে রইলেন।

একসময় রাজা বললেন—আপনাদের ক্যাপ্টেন কে? ফ্রান্সিস একটু এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে বলল—আমি। আমরা জাহাজে চড়ে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াই। কোথাও কোন গুপ্তধনের সংবাদ পেলে সেই গুপ্তধন উদ্ধার করি।

—যখন আমার পূর্বপুরুষ জারা সুমালার সোনার ঘরও আপনারা খুজে দেখতে পারেন। হঠাৎ থেমে বললেন— কী বা বলছি। আমি তো আর হিচককের রাজা নই।

—আপনার দুর্ভাগ্য কাটুক আপনি আবার রাজ্য ফিরে পান। আমি আপ্রান চেষ্টা

করবো রাজা সুমার গুপ্ত সোনার ঘর খুঁজে বের করতে—আপনাকে আমি ফ্রান্সিস এই কথা দিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা কিছু বললেন না। এই দুঃখের দিনেও একজন বিদেশী তাঁকে সম্মান জানাচ্ছে দেখে রাজার দুচোখ জলে ভরে উঠল। রানি তাঁর মাথা ঢাকা দামি পাতলা কাপড়ের কানা দিয়ে রাজার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

রাজরানির জন্য ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে কাছিমের মাংস দুধের মিষ্টি এসব আনতে পাঠাল। শাঙ্কো দেখেশুনে ভালো ভালো জিনিস আনলো।

রাজারানির কাছে এসব খুবই সাধারণ খাবার।

রাজা-রানির ছেলেমেয়েরা সেই খাবারই খেল। ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে বোঝা গেল ওদের খুব অসুবিধে হচ্ছে। রাজরানি কিন্তু কোনরকম মুখভঙ্গী না করেই খেয়ে নিলেন।

পরদিন সকালে শাঙ্কো নৌকোয় চড়ে তীরভূমিতে গেল। ক্রীটের রাজা কী করছে সেটা জানতে।

রাজপ্রাসাদের কাছে এসে দেখল ক্রীটের সৈন্যরা রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে। লোকের বাড়ি বাড়ি রাজারানির খোঁজে তল্লাশী চলছে।

তাহলে ক্রীটের সৈন্যরা এখনও জাহাজ তল্লাসী শুরু করে নি।

শাঙ্কো ফিরে এল। ফ্রান্সিসকে বলল সব। হ্যারি বলল—ওরা ছাড়বে না। আমাদের জাহাজেও তল্লাসী চালাবে।

সারা দুপুর ক্রীটের সৈন্যরা জাহাজগুলোও তল্লাশী চালান। রাজরানিকে পেল না।

সন্ধ্যের সময় ফ্রান্সিসদের জাহাজ ওদের নজরে পড়ল। ওরা একটা বড় নৌকোয় চড়ে দশ পনেরজন সৈন্য নিয়ে দলনেতা ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে আসতে লাগল।

ফ্রান্সিস বুঝল বিপদ। কিন্তু কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। হ্যারিকে বলল—এখন কী করবে?

—চলো রাজার সঙ্গে কথা বলি। হ্যারি বলল।

দুজনে রাজার কেবিনঘরে এল। রাজা পায়চারি করছিলেন। ফ্রান্সিসদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হ্যারি বলল মাননীয় রাজা কয়েকটা কথা বলছিলাম।

—বলো। রাজা বলল।

—ক্রীটের সৈন্যরা সংখ্যায় দশ পনেরজন হবে একটা বড় নৌকায় চড়ে আমাদের জাহাজ তল্লাশী করতে আসছে। হ্যারি বলল।

—জানতাম আত্মগোপন করলেও ধরা পড়তে হবে। রাজা বেশ দুঃখের সঙ্গে বললেন—দেখুন আমরা ওদের হারিয়ে দিতে পারি। ওরা খালি হাতে ফিরে যেতে বাধ্য হবে। আমাদের সঙ্গে লড়াই হবে। ওদের কয়েকজন মরবে। আমাদেরও আহত হবে। কিন্তু এদিকে গেলেও আরো নৌকো আরো সৈন্য ক্রীটের রাজা পাঠাবে। তখন পুরোদস্তুর লড়াইয়ে নামতে হবে। আমরা তা চাইছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। তোমরা এর মধ্যে জড়াবে কেন। আমি ধরা দেব। রাজা বললেন।

—কিন্তু আপনার প্রাণসংশয় হবে। হ্যারি বলল।

—তা জানি। কিন্তু আমি নিরুপায়। রাজা বললেন।

ক্রীটের দলনেতার নৌকো ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। দলনেতা গলা চড়িয়ে বলল—এই জাহাজে রাজা মামুন আছেন?

—এসে দেখ। বিস্কো বলল।

ওরা নৌকার হালের দিকে নিয়ে গেল। ঝুলন্ত দড়ি ধরে ধীরে ধীরে দশজনের মত সৈন্য ডেকে উঠে এল।

রাজা মামুন রানি আর রাজকুমার রাজকুমারীকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ডেকে উঠে এলেন। দলনেতা ছুটে গিয়ে নৌকোটা দড়ি মইয়ের নিচে আনতে বলল। নৌকো আনা হল। রাজা ও রানি ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বললেন অনেক ধন্যবাদ তোমাদের।

রাজারানি ছেলেমেয়েদের নিয়ে দড়িমইয়ের সাহায্যে দলনেতার নৌকায় নামলেন।

ওদিকে রাজা মামুনের সেনাপতি ধরা পড়তে পড়তেও ক্রীট সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েনি। হিচ্‌কক্‌দ্বীপের মানুষের কাছে সেনাপতি খুবই জনপ্রিয়। সেনাপতি এ বাড়িতে সে বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচল। এবার সেনাপতির চিন্তা হল কী ভাবে ক্রীটের রাজার সৈন্যদের এখান থেকে তাড়ানো যায়। এজন্য অনেক সৈন্য প্রয়োজন। এইজন্য অন্য দ্বীপে যেতে হবে। প্রচুর সৈন্য এনে ক্রীট সৈন্যদের আক্রমণ করতে হবে। বেশি সৈন্যের চাপে ওদের হারিয়ে দেওয়া সহজ হবে।

কিন্তু অত সৈন্যকে ভাড়া করে আনতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এত অর্থ দেবে কে? রাজা এখন ফ্রান্সিসদের জাহাজে।

সেনাপতি দূতের কাছে খোঁজ নিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজে এসে উঠল। বলল—রাজা মামুনের সঙ্গে কথা আছে।

—যান।

সেনাপতি রাজার ঘরে ঢুকল। রাজা রানিকে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলল—একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি।

—বলুন সেটা কী। রাজা বললেন।

—এই ক্রীটদ্বীপের সৈন্যদের হারাতে হলে আমাদের আরো অনেক ভাড়াটে সৈন্য চাই। তারজন্যে সোনার চাকতি অর্থ চাই। বেশ কিছু পরিমান ভাড়া করা সৈন্য আনতে হবে। সেনাপতি বলল।

—সোনার চাকতি অত অর্থ পাবেন কোথায়? রাজা বললেন।

এবার রানি বললেন—দেখুন—রানিমাতার অনেক অর্থ আছে। সোনার চাকতিও আছে। এসব নিয়ে সেনাপতিমশাই অনেক সৈন্য আনতে পারবেন।

—কিন্তু রানিমাতা আমাকে এত অর্থ স্বর্ণ দেবেন কেন? সেনাপতি বলল।

—রানিমাতা আপনাকে চেনেন। রানি বললেন।

—তার একটা চিহ্ন ছিল।

রাজা ভাবলেন। তারপর মধ্যমা আঙ্গুল থেকে একটা আংটি বের করে সেনাপতিকে

দিলেন। বললেন—এই আংটিটাই চিহ্ন। আমাকে তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন, এটা দেখলেই রাজমাতা চিনবেন।

সেনাপতি চলে গেল। ফ্রান্সিস রাজাকে বলল—সেনাপতি সঠিক পথ ধরেছেন। এই উপায় ছাড়া ওদের তাড়ানো যাবে না।

সেনাপতি বলল—মাননীয় রাজা—আপনি ক্রীটের রাজার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন।

—ক্রীটের রাজা কি আমাদের ফাঁসি দেবে? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ। ওর মনোভাব তাই। তবে বলছিলাম ক্রীটের রাজার সঙ্গে কোন তর্কবিতর্কে যাবেন না। যা বলে মেনে নেবেন। মোট কথা আপনাকে অন্ততঃ পাঁচদিন বেঁচে থাকতে হবে। তার মধ্যেই আমি সৈন্য নিয়ে ফিরে আসবো। আমরা একবার আসতে পারলে আর কোন ভয় নেই।

সেদিনই গভীর রাতে সেনাপতি প্রাসাদের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকল। এ ঘর ওঘর করতে করতে রানীমাতার ঘরে এল।

রানীমাতা ঘুমিয়ে আছে। রানিমাতা যাতে বেশি চমকেনা ওঠে তার জন্য সেনাপতি রানিমাতার কপালে হাত। একটু পরেই রানীমাতা নড়লেন। আবছা আলোয় সেনাপতির মুখের দিকে তাকালো। বলল—তুমি সেনাপতি।

—আজও আমি ওই দেশের সেনাপতি। সেনাপতি বলল।

—কী করে বিশ্বাস করবো। রানিমাতা বললেন।

সেনাপতি আংটিটা বের করে রানিমাতার হাতে দিল। বলল—এই আংটি আপনি রাজা মামুনকে দিয়েছেন। উনি চিহ্ন হিসেবে ওটা আমায় দিয়েছেন যাতে আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন।

—আমার কাছে যখন এসেছো তখন নিশ্চয়ই আমার কাছে কিছু চাও? কী চাও?

—তাহলে সব বল। ক্রীটের রাজা প্রচুর সৈন্য নিয়ে আমাদের আক্রমণ করে আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। এখন ওদের হারাতে হলে আমাদেরও সৈন্য ভাড়া করতে হবে বিভিন্ন দেশ থেকে। তারপর লড়াই।

—বেশ তবে সৈন্য সংগ্রহ করে লড়াই করো।

কিন্তু মাননীয় রাজমাতা—সোনার চাকতির বিনিময়ে সৈন্য দের ভাড়া করতে হবে। তার জন্যে বেশি পরিমান সোনার চাকতি চাই।

—তার মানে সোনার চাকতি আমাকে দিতে হবে। রানিমাতা বললেন।

—হাঁ নইলে কোথায় পাবো? সেনাপতি বলল।

—বেশ। রানিমাতা মাথা নাড়লেন।

রানিমাতা বিছানা থেকে নামলেন। সেনাপতির **** বাড়িয়ে দিলেন। তারপর একটা করে কাজ করা কালো বাক্সের সামনে এলেন। তালা খুলে বাক্স খুললেন। সেনাপতি কোমরের ফেট্টিটা খুলে ফেলল। সোনার চাকতিও থোলেতে ভরতে লাগল। বাক্সের প্রায় অর্দ্ধেক সোনার চাকতি সেনাপতি বেঁধে নিল।

তারপর বলল—ঠিক আছে। এতেই হবে।

সেনাপতি সোনার চাকতির বস্তাটা কাঁধে ঝুলিয়ে এক বন্ধুর বাড়ি এল। বন্ধু বলল—ক্রীট সৈন্যরা তোমাদের খুব খুঁজছে।

—খুঁজুক। আমার নাগাল পাবে না। সেনাপতি বলল।

সেনাপতি বিকেলের আলো আঁধারিতে চাদরে মুখ ঢেকে সমুদ্রতীরে এল। বিদেশি জাহাজ খুঁজতে লাগল। দুটো বিদেশী জাহাজ পেল। একটাতে উঠল। ক্যাপ্টেন দাড়িওয়ালা। মোটা। এগিয়ে এল। বলল কী ব্যাপার?

—আপনারা কোন দেশের? সেনাপতি জানতে চাইল।

—এখানে কেন? ক্যাপ্টেন বলল।

—আপনারা এরমধ্যে জাহাজ ছাড়ছেন? সেনাপতি বলল।

—না আমাদের দেশে যেতে এখনও দিন দশেক লাগবে। ক্যাপ্টেন বলল।

সেনপাতি অন্য জাহাজটায় এল। সোজা ক্যাপ্টেনের ঘরে গেল। বলল—আপনারা কোন দেশের।

—আপনারা কি এর মধ্যে দেশে ফিরছেন? সেনাপতি জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। আজ শেষ রাতে আমরা পোর্তুগালের দিকে জাহাজ চালাবো। ক্যাপ্টেন বলল।

—আমার একটা বিনীত অনুরোধ ছিল। যদি আপনাদের জাহাজে আমাকে নিয়ে যান তাহলে আমার বড়ই উপকার হয়। সেনাপতি বলল।

—আপনার পরিচয়? ক্যাপ্টেন জানতে চাইল।

—আমি এই হিচ্‌কক্‌দ্বীপের সেনাপতি। সেনাপতি বলল।

—ভাড়া তো লাগবে। ক্যাপ্টেন বলল।

সেনাপতি কোমরের ফেট্টি থেকে দুটো সোনার চাকতি বের করে দিল। ক্যাপ্টেন খুব খুশি। ভাড়া হিসেবে অনেক পাওয়া গেল।

—তাহলে শেষ রাতে আমি আসছি। সেনাপতি বলল। তারপর জাহাজ থেকে পাটাতন দিয়ে হেঁটে নেমে এল।

শেষরাতে সেনাপতি তৈরি হল। একটা মোটা কাপড়ের বস্তা নিল। পোশাকটোশাকের সঙ্গে একটা থলেতে সোনার চাকতিগুলো নিল। ঠিক করল এটাই হবে ওর বালিশ।

ঠিক সময়েই জাহাজে পৌঁছল সেনাপতি।

শেষ রাতে জাহাজ ছাড়ল।

কয়েকদিন পরে জাহাজটা একটা দ্বীপে পৌঁছল। সেনাপতি নেমে গেল। দ্বীপের বন্দরটা মোটামুটি বড়ই। সেনাপতি দ্বীপের রাজার সভায় গেল। শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজাকে বলল—আমি হিচ্‌কক দ্বীপের সেনাপতি। শত্রুরা আমাদের দেশ দেখল করেছে। আমরা তাদের জানিয়ে দিতে চাই। তার জন্য সৈন্য চাই। আপনি যদি আমাকে কিছু সৈন্য ধার দেন তাহলে তাদের নিয়ে লড়াই চালাতে পারি।

—সৈন্য ভাড়া করবেন তার মূল্য তো দিতে হবে। রাজা বলল। সেনাপতি কোমরের ফেট্টি থেকে চারটে স্বর্ণমুদ্রা বের করে রাজাকে দিল। রাজা খুশি হলেন। নিজের সেনাপতিকে হুকুম দিলেন সৈন্য ভাড়া দেওয়ার জন্য।

এক দল সৈন্য পাওয়া গেল। এবার সৈন্যদের নিয়ে সেনাপতি জাহাজঘাটায় এল। দরদস্তুর করে একটা জাহাজ কিনে ফেলল। সৈন্যদের নতুন কেনা জাহাজে তুলে দিল। এবার কিছু অভিজ্ঞ জাহাজী জোগাড় করল। তারা জাহাজে উঠে কাজে লাগল। পালটাল খাটাল। সন্ধ্যের মধ্যেই জাহাজ রওনা হবার জন্যে তৈরি হয়ে গেল।

ভোরবেলা জাহাজ ছাড়া হল। আবার এক দ্বীপে গেল জাহাজ। এইভাবে সেনাপতি সৈন্য যোগাড় করল। আর একটা জাহাজ মিলল। দ্বীপদেশ থেকে সৈন্য জোগাড়ও করল।

এবার দেশে ফেরা।

সৈন্যবোঝাই দুই জাহাজ নিয়ে সেনাপতি ফিরে চলল।

ওদিকে ক্রীটের রাজা মামুনের ফাঁসির ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

বাজারের কাছে ফাঁসিকাঠ তৈরি হয়েছে। দেশের লোক রাজার ফাঁসি হবে দেখে দুঃখে ভেঙে পড়ল।

সেদিন একটু বেলায় রাজা মামুনের ফাঁসির ব্যবস্থা হল। বাজারে অনেক লোক জড় হল। সকলেই দুঃখে কাতর। একটু ক্ষ্যাপাটে হলেও রাজা মামুনকে ওরা ভালোবাসে।

সেদিনই সেনাপতির জাহাজ জাহাজঘাটায় ভিড়ল।

সেনাপতি তীরে নামল। তখনই নৌকোর আড়াল থেকে দুজন দেশবাসী সেনাপতির কাছে ছুটে এল। বলল—মাননীয় সেনাপতি ক্রীটের রাজা রাজামশাইকে ফাঁসি দেবার সব ব্যবস্থা করেছে। বাজারের কাছে।

সেনাপতি একদৃষ্টে নিজের জাহাজে গিয়ে উঠল। গলা চড়িয়ে বলল—সৈন্যভাইয়েরা আমরা এখনই আক্রমণ করবো। তোমরা তৈরি হয়ে নেমে এসো।

সৈন্যরা খোলা তরোয়াল উঁচিয়ে জাহাজ থেকে নেমে আসতে লাগল।

তখন রাজা মামুনকে ফাঁসির মঞ্চে তোলা হয়েছে। ফাঁসুড়েও হাজির। কিন্তু ক্রীটের রাজা হুকুম দেবার আগেই সেনাপতির সৈন্যরা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ফাঁসি বন্ধ হয়ে গেল। লড়াই শুরু হল। সেনাপতির সৈন্যরা অভিজ্ঞ যোদ্ধা-রণকুশলী। রাজা ক্রীটের সৈন্যরা কচুকাটা হতে লাগল। বাকিরা দক্ষিণমুখো নিজেদের দ্বীপের দিকে পালাতে লাগল।

রাজা মামুনের প্রাসাদ শত্রুমুক্ত হল। দ্বীপবাসীরা রাজার জয়ধ্বনি তুলল। হিচ্‌কক দ্বীপ শত্রু মুক্ত হল। দ্বীপে আনন্দ উৎসব চলল।

ক্রীটের রাজা পরাজয় স্বীকার করল। সৈন্যবাহিনী নিয়ে ক্রীটে পালিয়ে গেল।

এবার ফ্রান্সিস সোনারঘরের খোঁজ শুরু করল। ও একটা জিনিস বুঝল সোনার ঘর প্রাসাদের বাইরে নয়। প্রাসাদের মধ্যেই আছে। রাজা সুমালা যে খেলাঘরগুলো তৈরি করেছিল ওখানেই আছে সোনার ঘর।

ফ্রান্সিস মাপকাঠিটা নিয়ে বসল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না পাঁচ হাত লম্বা মাপকাঠিটা। পেতলের মাপকাঠিটা যেখানে থেকে শুরু হয়েছে ওখানে একটা ইংরেজি S-এর মত চিহ্ন। ফ্রান্সিস এই চিহ্নটার অর্থ বুঝল না।

ফ্রান্সিস খুব বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবে মন্ত্রীর কাছে শুনেছে।

সেদিন মন্ত্রীমশাইয়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। প্রহরীরা বলল—বল গে ভাইকিং দলনেতা সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। বিশেষ প্রয়োজন। প্রহরী চলে গেল। একটু পরে ফিরে এল। ফ্রান্সিসের ইঙ্গিতে প্রথম ঘরটায় ঢুকতে বলল।

ফ্রান্সিস ঘরটায় ঢুকল। বেশ সাজানো গোছানো ঘরে একটা বড় গোল টেবিল। চারদিকে বসার চেয়ার। পায়াওলা বাঁকা একটা চেয়ারে বসল ফ্রান্সিস।

কিছু পরে মন্ত্রী ঢুকলেন। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। মন্ত্রী বললেন—বসে বসে ফ্রান্সিস বললেন—তোমরাই তো ভাইকিং?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা কী কর? মন্ত্রী বললেন।

—দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াই। কোথাও গুপ্ত-ধনভাণ্ডারের খবর পেলে সেই ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করি। ফ্রান্সিস বলল।

—বদলে গুপ্তধন ভাণ্ডারের অংশ নাও না? মন্ত্রী বলল।

—আজ্ঞে না। ফ্রান্সিস বলল।

—বাঃ। তোমাদের নীতিবোধের প্রশংসা করছি। কিন্তু আমি তোমাদের কী উপকার করতে পারি? মন্ত্রী বলল।

—আপনি তো সোনার ঘরের কথা জানেনই। সেই ঘরটা রাজা সুমালা কোথায় তৈরি করেছিলেন বলে আপনার মনে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা বের করা খুবই মুশকিল। কারণ কোন সূত্র নেই। মন্ত্রী বললেন।

—আমার কাছে একটা সূত্র আছে। অনেক হাত ঘুরে আমার হাতে এসেছে ওটা। ফ্রান্সিস মাপকাঠিটা বের করল।

—কী সেটা? মন্ত্রী বললেন।

—ফ্রান্সিস পাঁচ হাত লম্বা মাপকাঠিটা দেখালে মন্ত্রী কিছুক্ষণ হাতে নিয়ে দেখলেন তারপর বললেন—এটা কিসের মাপ?

—রাজা সুমাল যে সব খেলার জন্য ঘর বানিয়েছিলেন এই মাপকাঠিটা দিয়েই মাপা হয়েছিল সেসব। ফ্রান্সিস বলল।

—তা হতে পারে। মন্ত্রী বলল।

—মাপকাঠিই নাকি ওখানেই ইটবালি ধুলোর মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন বল আমার কাছে এসেছো কেন?

ফ্রান্সিস আঙ্গুল দিয়ে মাপকাঠির 'S'+3 চিহ্নটা দেখিয়ে বলল—এই চিহ্নটার অর্থ কী?

মন্ত্রীমশাই বেশ কিছুক্ষণ চিহ্নটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—এটা আমি বলতে পারবো না। সবচেয়ে ভালো হয় যদি জ্ঞান বৃদ্ধের কাছে যেতে পারো। উনি আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। তা ছাড়া পুরোনো আমলের লেখা চিহ্ন এসব—নিয়ে চর্চা করেন। সহজেই চিহ্নের অর্থ বলে দিতে পারবেন।

—তাঁকে কোথায় পাবো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—ঐ উত্তরের পাহাড়ের নিচে তাঁর আশ্রম। মন্ত্রী বললেন।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। তখনই হ্যারি এল ফ্রান্সিসের খোঁজে। দুজনে চলল উত্তরের পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের নিচে এসে দেখল—একটা আশ্রম। বাড়ি ও গাছগাছালি। কয়েকটা হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি অল্পবয়স্ক ছেলে হরিণগুলোর সঙ্গে খেলা করছিল। ফ্রান্সিস ছোট ছেলেটিকে ডাকল। ছেলেটি কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—জ্ঞানবৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করবো। তিনি কোথায় আছেন?

—আমার সঙ্গে আসুন। ছেলেটি ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। পেছন দিকে একটা ছোট ঘর। ঘাসপাতায় তৈরি। সেই ঘরের দরজায় এসে ছেলেটি দাঁড়াল। হাত দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখাল।

দুজনে ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। দেখল—এক বৃদ্ধ একটা হরিনের চামড়ার আসনে বসে আছেন। হ্যারি বলল—একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছিলাম।

—ঠিক আছে। ভেতরে এসে বসো।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি একটা পাতা কম্বলে গিয়ে বসল। ফ্রান্সিস মাপকাঠিটা জ্ঞানবৃদ্ধকে দিল। বলল—একটা S+3 চিহ্ন আছে মাপকাঠিটায়। এটার অর্থ কী?

জ্ঞানবৃদ্ধ কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। তারপরে বললেন—এটার অর্থ গুণ। মাপকাঠিটা দিয়ে কিছু একটা মাপতে হবে তারপর গুণ করতে হবে। মহন্ত বললেন।

—তাহলে তো তিন পাঁচে পনেরো দাঁড়ায়। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। মহন্ত বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন।

—ঠিক আছে। এইটাই আমার জানার দরকার ছিল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। হ্যারিও উঠল।

—কিন্তু তোমরা এই মাপামাপি করছো কেন? জ্ঞানবৃদ্ধ বলল।

—আপনি তো জানেন রাজা সুমালো একটা সোনার ঘর তৈরি করিয়েছিলেন। আমার সেই সোনার ঘরটা খুঁজছি। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ কঠিন কাজ। দেখ পাও কিনা। জ্ঞানবৃদ্ধ বললেন।

দুজনে আশ্রম থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি। সোনার ঘর বের করতে পারবে।

—মাপকাঠির মাপটাপ সমাধান করেছো? হ্যারি বলল।

হ্যারি, এবার রাজা মামুনকে খেলাঘরগুলির জায়গায় নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে রাজপ্রাসাদে এল। একটু পরে রাজা মামুন মন্ত্রী দুজনেই এলেন খেলাঘরের এলাকাটায় রাজা সুমালা দেয়াল তুলে ঘিরে দিয়েছিল। তার যে ঢোকার দরজাটা ছিল ফ্রান্সিস সেই দরজার ঠিক মাঝখান থেকে মাপকাঠি দিয়ে মেপে চলল। একটা ঘরের সামনে এসে পনেরো হাত শেষ হল। ফ্রান্সিস বলল—কুড়ুল চাই। ঘরটা ভাঙতে হবে।

ততক্ষণে সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। সোনার ঘর দেখা যাবে—সোজা কথা নয়। রাজা মামুন এলেন। তিনিও উত্তেজিত। সোনার ঘর আবিষ্কৃত হবে। তাঁর আনন্দের শেষ নেই।

হ্যারি একজন সৈন্যকে একটা কুড়ুল আনতে বলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কুড়ুল আনা হল।

ফ্রান্সিস ঘরটায় কুড়ুল চালাতে লাগল। ইটের টুকরো ধুলোবালি ছিটকে বেরুতে লাগল। প্রায় অর্দ্ধেক ভাঙা হয়ে গেল। সোনার ঘরের দেখা নেই।

আরো ভাঙা হল। কিছুই পাওয়া গেল না। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে রইল। রগচটা রাজা মামুন বিরক্তির সঙ্গে বলল—কী সব কাণ্ড। সোনার ঘর বের করা অত সহজ কাজ নয়। আমি যাচ্ছি। রাজা মামুন চলে গেলেন। মন্ত্রী বললেন—আরো ভালোভাবে খোঁজ কর। পাওয়া যাবে ঠিকই।

বেশ লোকজন জড়ো হয়েছিল। তারাও চলে যেতে লাগল। তখনই শাঙ্কো বিস্কোরা এল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—কী ব্যাপার ফ্রান্সিস।

—ঠিক বুঝতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—আর একবার মাপজোক কর। হ্যারি বলল।

—দেখি। ফ্রান্সিস পেতলের মাপকাঠিটা নিল। হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎই দেখল একটা হাতার কোনায় একটা ছোট কড়া। ফ্রান্সিস চমকে উঠল তাহলে তো এখানেও একটা এক হাতের সমান পিতলের কাঠি ছিল যার মাপ অন্যগুলির মতই এক হাত।

—তুমি কি এ বিষয়ে নিশ্চিত? হ্যারি।

—নিশ্চিত। এখন কাজ। বিস্কোকে ডাকল।

—বলো। বিস্কো বলল।

—জাহাজে যাও তোমার কাঠের কাজে হাত ভালো। মাপকাঠিটা নিয়ে যাও। এই কাঠির সমান একটা টুকরো কর তারপর সেটাকে একটা কড়া দিয়ে পেতলের কড়ার সঙ্গে আটকে দাও। মাপকাঠিটা ছয় হাতই ছিল। পরে একটা হাতা ভেঙে হারিয়ে যায়। বিস্কো পেতলের মাপকাঠিটা নিয়ে চলে গেল। ভাইকিং বন্ধুরাও সেখানে এল।

ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল। কিছু পরে বিস্কো ফিরে এল। সঙ্গে মাপকাঠিটা। কাঠের হাতা লাগানোয় দৃঢ় হাত হল।

এবার ফ্রান্সিস দৃঢ় হাত মাপের মাপকাঠিটা নিয়ে মাপতে লাগল। একেবারে সদর

দরজা থেকে মাপতে লাগল। মেপে মেপে আঠারো হাত পরে থামল। S এর সঙ্গে ছিল তিন। তাই তিন দিয়ে গুণ করল ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিস কুড়ুল চালিয়ে আঠারো নম্বর ঘরটা ভাঙতে লাগল। কিন্তু কোথায় সোনা? পাথর ধুলো বালি ছিটকোচ্ছে।

ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল। ওর গণনায় কোন ভুল নেই। সোনার ঘর এখানেই আছে। এই আঠারো নম্বর ঘরের নিচে আছে।

উৎসাহে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—শাঙ্কো বিস্কো কুড়ুল জোগাড় করে আনো। এই ভিতের নিচে খুঁড়তে হবে।

শাঙ্কো বিস্কো কুড়ুল জোগাড় করে নিয়ে এল। তিনজনে ঘরের ভিত ভাঙতে লাগল। কুড়ুলের ঘায়ে গর্ত হতে লাগল। হঠাৎ একটা সোনার টুকরো ছিটকে পড়ল। ফ্রান্সিস সোনার টুকরোটা হাতে নিয়ে তুলে ধরল। লোকের ভিড়ে চাঞ্চল্য জাগল। সবাই অবাক। তাহলে এখানেই আছে সোনার ঘর?

ফ্রান্সিসরা তিনজনে বসে পড়ল। হাঁপাতে লাগল। সেনাপতি এগিয়ে এল। বলল— তোমরা নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের দেশের সম্পদ উদ্ধার করছো। তোমরা বিশ্রাম কর। বাকি খোঁড়ার কাজ আমরা করবো। সেনাপতি কয়েকজন সৈন্যকে বলল—খুঁড়ে ফেল ভিতটা।

সৈন্যরা কুড়ুল চালাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সোনার স্তর দেখা গেল। আস্তে আস্তে সবটা খোঁড়া হল। সোনার ঘর দেখা গেল। নিরেট সোনার ঘরের মত। জমাট সোনা। রোদের আভা পড়ে চক্‌চক্‌ করছে। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস একটা কাজ করতে হবে যে।

—কী কাজ? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—শাঙ্কোর কাছে সোনার চাকতি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। রাজা মামুনকে বল আমাকে হাজার পাঁচেক স্বর্ণমুদ্রা দিতে।

—বেশ বলছি। ফ্রান্সিস রাজা মামুনের কাছে গেল। বলল—মাননীয় রাজা দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াই। অর্থের খুবই প্রয়োজন। এখন সেই অর্থ আমাদের কমে এসেছে। আপনি যদি আমাদের পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেন তাহলে বড়ই উপকার হয়।

—নিশ্চয়ই দেব। আমার সঙ্গে কেউ আসুক। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে যেতে বলল। হ্যারি রাজার সঙ্গে গেল।

কিছুক্ষণ ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করল। হ্যারি কোমরের মধ্যেও সোনার চাকতি ভরে নিয়ে এল। জাহাজঘাট নয় জাহাজের কাছে আসতেই জাহাজ থেকে বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—হো -হো-রে। ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখে বলল—মারিয়া এবার কিছু স্বর্ণমুদ্রা এনেছি। কাল সকালে আমরা কাপড়ের দোকানে যাব। সবাই পোশাক তৈরি করাবো। বিছানাপত্রের কাপড় চোপড়ও কিনবো। আমরা দরিদ্র নই। জলদস্যু আমাদের ভিখিরি বলেছিল।

রাজা আলফ্রেডের স্বর্ণখনি



স্বদেশে ফেরার জন্য ভাইকিংদের আগ্রহ তুঙ্গে উঠল। এখন ওরা কোন কথা শুনতেই রাজি নয়। স্বদেশে ফিরবেই। কিন্তু ফ্রান্সিস? তাকে বোঝাবে কী করে? হ্যারি ব্যাপারটা আঁচ করতে পারল। কিন্তু ফ্রান্সিসকে কিছু বলল না। ও দেখবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল বন্ধুরা কী করে।

ভাইকিং বন্ধুরা হ্যারিকে বলল—তুমিই ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে দেশে ফেরার জন্য রাজি করাও।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস আমার কথা শুনবে না।

—তুমি ওর প্রাণের বন্ধু। তোমার কথা শুনবে না।

—না। ও যা মনস্থির করে তাই করে। কারো মতামত গ্রাহ্য করে না। হ্যারি বলল।

—তাহলে উপায়? বন্ধুরা বলল।

—আমার অবশ্য বলা উচিত না তবু বলছি একমাত্র রাজকুমারীই পারে ফ্রান্সিসকে রাজি করাতে। হ্যারি বলল।

—ঠিক বলেছো। আমরা রাজকুমারীকে বলবো। বন্ধুরা বলল।

মারিয়া প্রতিদিন সূর্যাস্ত দেখতে জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়ায়। সেদিনও এসেছে।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সূর্য নেমে আসছে সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায়। আস্তে আস্তে উঁচু উঁচু ঢেউয়ের মধ্যে সূর্য ডুবে গেল। একটু অন্ধকার হয়ে এল চারদিক।

শাঙ্কো বিস্কোরা রাজকুমারীর কাছে এল। এভাবে ভাইকিংরা কখনো রাজকুমারীর কাছে আসে না। সেদিন এল। রাজকুমারী একটু অবাক হয়েই ওদের দিকে তাকাল।

—রাজকুমারী। শাঙ্কো ডাকল।

—কী ব্যাপার বলো তো। তোমরা আমাকে কিছু বলবে? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো বলল।

—বলো। মারিয়া বলল।

—আমরা আর ঘুরে বেড়াতে রাজি নই। এবার আমরা দেশে ফিরে যেতে চাই। বিস্কো বলল।

—সে তো আমিও চাই। কতদিন বাবা-মাকে দেখি না।

—আপনি ফ্রান্সিসকে বলুন যাতে ও দেশে ফিরে যেতে রাজি হয়। বিস্কো বলল।

—আমি বললেই কি ও রাজি হবে? তবু তোমরা বলছো। দেখি বলে। রাজকুমারী বলল।

শাঙ্কোরা চলে গেল। মারিয়া কেবিনঘরে এল। দেখল ফ্রান্সিস চুপ করে চোখ বুঁজে শুয়ে আছে।

রাজকুমারী বিছানার পাশে বসল। আস্তে আস্তে বলল—একটা কথা বলছিলাম।

—কী কথা? ফ্রান্সিস চোখ খুলে বলল।

—এবার দেশে ফিরে চলো। রাজকুমারী বলল।

—আমরা তো এ দেশ ঐ দ্বীপ এসব জায়গায় থেমে থেমে ফিরবো। যদি কোন গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খবর না পাই—ফিরে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি কোন গোপন ধনভাণ্ডারের খোঁজ পাও? মারিয়া জিজ্ঞেস করল।

—তাহলে তো উদ্ধারের কাজে নামবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তার মানে তো আরো বেশ কিছুদিন নষ্ট হওয়া। মারিয়া বলল।

—নষ্ট বলবো কেন? সময়টা তো আমরা কাজে লাগাবো।

—না না। আর বিলম্ব নয়। এখন সোজা দেশে চলো। মারিয়া বলল।

—আমি সে কথা দিতে পারছি না। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

—না। আর কোথাও থামা চলবে না। মারিয়া বলল।

—তা হয় না মারিয়া। গোপন ধনভাণ্ডারের খবর পেয়ে আমাকে আবার লাগতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। এটাই আমি চাইছি না।

গোপন ধনভাণ্ডারের খবর পেলেও তুমি এড়িয়ে যাও। জাহাজে দেশের দিকে চলুক। মারিয়া বলল।

—দেখি। তবে কথা দিতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তোমাকে কথা দিতে হবে। মারিয়া গলায় জোর দিয়ে বলল।

—না মারিয়া। পারবো না। তবে তোমরা যদি চলে যেতে চাও যেতে পারো। যেসব বন্ধুরা আমার সঙ্গে থাকতে চাইবে তাদের নিয়ে আমি জাহাজ কিনে আমার কাজ করে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি ভালো করেই জানো তোমাদের কয়েকজনকে একা ফেলে আমরা কখনই যাবো না। মারিয়া বলল।

—আমিও সেটাই চাই। ফ্রান্সিস বলল।

যদি কোন গোপন ধনভাণ্ডারের খবর না পাও তাহলে দেশে ফিরে যাবে তো? মারিয়া জানতে চাইল।

—হঠাৎ সেক্ষেত্রে আমার তো কিছু করার নেই। দেশের দিকেই থাকে।

ফ্রান্সিস বলল—

—তাহলে ওকথাই রইল। মারিয়া বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। শাঙ্কোরা কয়েকজন রাজকুমারীর জন্যে অপেক্ষা করছিল। রাজকুমারী ওদের কাছে এল। শাঙ্কোরা এগিয়ে এল। রাজকুমারীর ফ্রান্সিসের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে বলল। তারপর বলল—কোন গোপন ধন ভাণ্ডারের খবর না পেলে ফ্রান্সিস দেশে ফিরতে রাজি হবে।

—তাহলে দেখা যাক—কী ঘটে। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে।

সেদিন দুপুরে মাস্তুলের ওপর থেকে নজরদার পেড্রো চেঁচিয়ে বলল—ডাঙা দেখা যাচ্ছে—ডাঙা। সিঁড়িঘরের কাঠের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বিস্কো বসেছিল। পেড্রোর কথাটা ও শুনল। ও ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে।

একটু পরে ফ্রান্সিস মারিয়া হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিস ভালো করে দেখেটেখে বলল—একটা ছোট বন্দর। চলো—খোঁজ নেওয়া যাক। জাহাজ বন্দরে ভেড়াতে বল।

জাহাজ চালক ফ্লেজার বন্দরে জাহাজ ভেড়াল।

বিকেলে কিছু বন্ধু ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—বরাবর তুমিই খোঁজখবর করতে যাও। আজকে আমরা যাবো।

—বেশ তোমরাই খোঁজ নিয়ে এসো। কিন্তু কোন লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ো না। ফ্রান্সিস বলল।

দশ বারোজন বন্ধু দল বেঁধে নেমে গেল।

শাঙ্কো হ্যারি বিস্কো আর কয়েকজন বন্ধু গেল না। জাহাজেই রইল।

অন্ধকার হয়ে এল। বন্ধুরা ফিরল না।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে এল। বলল—ফ্রান্সিস বন্ধুরা এখনও ফিরল না। খুবই বিপদের কথা।

—মাটিতে নামার সুযোগ তো ওরা পায় না। আজকে পেয়েছে। ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া হেসে বলল—জাহাজের বাঁধাবদ্ধ জীবন। একটু বৈচিত্র্য সবাই চায়। বিশেষ করে ডাঙায় উঠে।

—তা ঠিক। তবু এটা আমাদের কাছে বিদেশ। ওদিকে অন্ধকারও হয়ে আসছে। বন্ধুরা কোন বিপদে পড়ল কিনা কে জানে। হ্যারি বলল।

বন্দরটার নাম রেজিল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা হৈ হৈ করে বন্দরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই দলের মধ্যে ছিল সিনাত্রা। সিনাত্রা বেশ বুদ্ধিমান। বন্ধুরাও ওকে খুব ভালোবাসে।

ওরা বাজার এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তখনই এক একজন কালো মানুষ

ওদের দিকে এগিয়ে এল। বলল—তোমরা বিদেশি?

—হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং। সিনাত্রা বলল।

—বন্দরে তোমাদের জাহাজ দেখলাম। লোকটি বলল।

—হ্যাঁ। আমরা দুপুরে এখানে এসেছি। একজন ভাইকিং বলল।

—তোমরা ঘুরে বেড়াচ্ছো নিশ্চয়ই তোমাদের খিদে পেয়েছে। আমার সঙ্গে এসো। খেতে দেব। কালো লোকটি বলল।

—খুব ভালো কথা—সিনাত্রা বলল—চলো ভাইসব নিমন্ত্রণ রক্ষা করা যাক।

লোকটার পেছন পেছন ওরা চলল।

একটা বেশ বড় বাড়ির সামনে এল ওরা।

লোকটি বলল—বাড়ির ভেতরে চলো।

ওরা বাইরের ঘরে ঢুকল। বেশ সাজানো গোছানো ঘর। বোঝাই যাচ্ছে গৃহকর্তা ধনী। ওরা এদিক-ওদিকে রাখা চেয়ারে বসল। সবাইয়ের জায়গা হল না। কয়েকজন মেঝেয় বসল।

লোকটি বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

কিছু পরে একজন বেশ শক্তসমর্থ চেহারার মধ্যবয়স্ক পুরুষ ঘরে ঢুকল। সামনের ফাঁকা চেয়ারটায় বসল। বলল—শুনলাম তোমরা বিদেশি।

—হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং। সিনাত্রা বলল।

—তোমরা বোধহয় লক্ষ্য করোনি আমার বাড়ির পেছনে বিরাট তুলোর ক্ষেত। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি বলল।

—না। অন্ধকার হয়ে এসেছে তো। সিনাত্রা বলল।

কথা হচ্ছে তখনই আট দশজন বলিষ্ঠদেহী নিগ্রো দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। সিনাত্রা বিপদ আঁচ করলো। কিন্তু কিছু বলল না। লোকটি বলল—আমার বাড়ির পেছনে বন্দীশালা। আমার তুলার ক্ষেতে কাজ করার জন্যে যাদের ধরে আনি তারা প্রথমে ঐ বন্দীশালায় থাকে। তারপর ক্ষেতে পাঠাই। দশবারোজন পাহারাদার থাকে ক্ষেতগুলোর চারপাশে।

এবার সিনাত্রা উঠে দাঁড়াল। বলল—এসব আমাদের বলছেন কেন?

—কারণ তোমরা এখন বন্দী। তবে যে তোমাদের তুম্বা মানে যে তোমাদের নিয়ে এসেছে সে বোধহয় বলেনি তোমাদের—আমি প্রচুর অর্থ দেব।

সিনাত্রা গলা চড়িয়ে বলল—কিন্তু আমাদের কেন বন্দী করা হবে?

—কারণ তোমরাই আমার তুলোর ক্ষেত চাষ করবে। তুলো ফলাবে। তুলোর গাঁটরি কাঁধে করে জাহাজে চালান দেবার জন্য জাহাজে তুলে দেবে।

—তার মানে আপনি আমাদের ক্রীতদাস করে রাখবেন। সিনাত্রা বলল।

—হ্যাঁ। পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। কারণ দরজায় দেখতেই পাচ্ছো আমাদের সব বাছাই করা যোদ্ধারা রয়েছে। ওদের সঙ্গে লড়াই করে পালাতে

গেলে তোমরা অর্দ্ধেকও বাঁচবে না। কাজেই আমার ক্ষেতের চাষি হও তোমরা। প্রচুর অর্থ পাবে।

সিনাত্রা বুঝল এখন ঐ নিগ্রো যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়তে যাওয়া বোকামি। ওরা গুরুতর আহত হবে। কয়েকজন মরবেও। তার চেয়ে এই লোকটি যা বলছে মেনে নেওয়াই ভালো। ভবিষ্যতে সুযোগ বুঝে পালানো যাবে।

তুম্বা তখনই ঘরে ঢুকল। বলল—তোমরা যদি এখন পালিয়েও যাও তোমাদের জাহাজে উঠতে পারবে না। তোমাদের জাহাজ এখন প্রায় মাঝ সমুদ্রে।

সিনাত্রা ও বন্ধুরা ভীষণভাবে চমকে উঠল। সিনাত্রা বলল—আপনি দেখেছেন?

—না। আমি যখন দেখেছি তখন জলদস্যুরা সবেমাত্র তোমাদের জাহাজে উঠেছে। তারপর কী ঘটতে পারে ভেবে নাও। তুম্বা বলল। সিনাত্রাদের মন খারাপ হয়ে গেল। নিজেরা তো একটু পরেই বন্দীশালায় বন্দী হবে। ফ্রান্সিসরাও বন্দী হল?

সূর্যাস্ত দেখে মারিয়া কেবিনঘরে নেমে এল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দুজনেই বন্ধুদের জন্যে ভাবছে। হ্যারি ফ্রান্সিসের বিছানায় বসে আছে। মারিয়া মোমবাতির আলোয় সূঁচসুতোর কাজ করছে।

হঠাৎ ওপরের ডেক-এ অনেক পায়ের শব্দ। হ্যারি বলল—সিনাত্রারা বোধহয় ফিরে এল।

ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের বন্ধ দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ। হ্যারি দরজা খুলতে গেল। বন্ধুরা এসেছে। হ্যারি দরজা খুলে দিল।

কালো দাড়ি গোঁফওয়ালা জলদস্যু ক্যাপ্টেন। সঙ্গে খোলা তরোয়াল হাতে কয়েকজন জলদস্যু।

জলদস্যু ক্যাপ্টেন দাঁত বের করে হাসল। বলল—তোমাদের জাহাজের সঙ্গে আমাদের জাহাজ বাঁধা হয়ে গেছে। এখন আমাদের ক্যারাভেল জাহাজ তোমাদের জাহাজকে টেনে নিয়ে চলেছে। মাঝ সমুদ্রে।

ততক্ষণ ফ্রান্সিসদের জাহাজ দুলতে শুরু করেছে। বড় বড় ঢেউ ভেঙে পড়ছে জাহাজের গায়ে।

—নাও। দেরি করো না। ওপরের ডেক-এ উঠে এসো। ক্যাপ্টেন বলল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি উঠে দাঁড়াল। হ্যারি দেশীয় ভাষায় বলল—কয়েদঘর থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

—তাই দেখছি। এখন কতদিন বন্দীদশা চলবে মা মেরিই জানে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া ওপরে ডেক-এ উঠে এল। দেখল শাঙ্কো বিস্কো আর কয়েকজন বন্ধু ডেক এর একপাশে বসে আছে। পাহারা দিচ্ছে খোলা তরোয়াল হাতে কয়েকজন জলদস্যু।

পাহারাদার জলদস্যুরা ফ্রান্সিসদের শাঙ্কোদের পাশে বসিয়ে দিল। শাঙ্কো বলল—আমরা ছক্কা-পাঞ্জা খেলছিলাম। ডেক-এ কেউ ছিল না। আমরা বুঝতেই পারিনি কী ঘটে গেছে।

—যা ঘটে গেছে, গেছে। এখন আমাদের বন্দী জীবনই মেনে নিতে হবে। হ্যারি বলল।

কিছুক্ষণ পরে জলদস্যু ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসদের কাছে এল। হেসে বলল—এবার বেশ তরতাজা ইউরোপীয় যুবক পাওয়া গেছে। ভালো দাম পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস বলল—ওদের ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করা হবে। ক্যাপ্টেন গলা চড়িয়ে বলল—এগুলোকে কয়েদঘরে ঢোকা। তিনচারজন জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল—চলো সব। ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস ক্যাপ্টেনকে বলল—একটা কথা ছিল?

—কী? ক্যাপ্টেন বলল।

—আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের দেশের রাজকুমারী। তাঁকে আমাদের সঙ্গে কয়েদঘরে রাখবেন না। তাঁকে আমাদের জাহাজেই রাখুন। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল। জলদস্যু ক্যাপ্টেন একটু ভাবল। তারপর বলল—রাজকুমারী? তা বেশ। তবে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পালাতে গেলে মরবে।

—সেটা উনি ভালোভাবেই জানেন। বোকার মত উনি তা করতে যাবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

—তা হলেই ভালো। তোমাদের রাজকুমারীকে বিক্রি করতে গেলে ভালো দাম পাবো। ক্যাপ্টেন বলল।

তিন চারজন জলদস্যুর পেছনে পেছনে ফ্রান্সিসরা চলল। নিজেদের জাহাজ থেকে জলদস্যুদের জাহাজে গিয়ে উঠল। সিঁড়ি দিয়ে একেবারে নিচের কয়েদঘরে নিয়ে আসা হল ফ্রান্সিসদের।

প্রহরীদের একজন কোমর থেকে চাবির গোছা বের করল। চাবি বেছে নিয়ে ঢং-ঢাং শব্দে লোহার দরজা খুলল।

ফ্রান্সিসরা আস্তে আস্তে কয়েদঘরে ঢুকল। দুধারের দুই মশালের আলোয় ফ্রান্সিসরা দেখল কিছু কৃষ্ণকায় মানুষও বন্দী রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে—ক্রীতদাস কেনাবেচার হাটে এদেরও বিক্রি করা হবে।

ফ্রান্সিসরা মেঝেয় বসল। হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এবার আমাদের খুবই দুর্ভাগ্য। শাঙ্কো ফিরলো না আমরাও বন্দী হলাম। সব কেমন তছ্‌নছ্‌ হয়ে গেল।

—বুঝতে পারছি না কীভাবে মুক্তির চেষ্টা করবো। একবার মুক্তি পেলে বন্ধুদের খোঁজে রোজিল বন্দরে যাবো। মনে তো হয়—ওরা ভালো আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—মনে হয় না। হয়তো ওদেরও কোন বিপদ হয়েছে। হ্যারি বলল।

—বিপদ হলে ওদেরই মোকাবিলা করতে হবে। আমরা তো অসহায় এখন। ফ্রান্সিস বলল।

—মুক্তির ব্যাপারটা গভীরভাবে ভাবো। হ্যারি বলল।

—তা তো ভাবতে হবেই। ফ্রান্সিস বলল।

একজন বলিষ্ঠ কৃষ্ণকায় বন্দী যুবক ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—'আপনাদের দলনেতা কে?

হ্যারি নিঃশব্দে আঙুল তুলে ফ্রান্সিসকে দেখল। যুবকটি ফ্রান্সিসদের পাশে এসে বসল।

—তোমার নাম? যুবকটি জানতে চাইল।

—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার নাম কোলা। যুবকটি বলল।

—ও। তুমি কিছু বলবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। অনেক ভেবেচিন্তে এখান থেকে পালাবার উপায় বের করতে হবে। কোলা বলল।

—কোন উপায় নেই। জলদস্যুরা আমাদের নিয়ে যা করতে চাইবে তাই করবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তার মানে ক্রীতদাসের জীবনই আমাদের ভাগ্য। কোলা বলল।

—তাই তো মনে হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা পালাতে পারি। কোলা বলল।

—কীভাবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—যখন এরা খেতে দিতে আসে তখন লোহার দরজা খোলা থাকে। তখন খোলা দরজা দিয়ে পালালো। কোলা বলল।

—দরজার দুপাশে খোলা তরোয়াল হাতে প্রহরী থাকে। সেটা লক্ষ্য করেছো। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল।

—ওদের কাবু করে? কোলা বলল।

—অসম্ভব। ওরা অভিজ্ঞ তরোয়াল যুদ্ধে। খালি হাতে ওদের কাবু করা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো আমাদের মুক্তির কোন আশাই নেই। কোলা বলল।

—না নেই। ফ্রান্সিস বলল।

কোলা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল—তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান। তোমরাই যখন পালাবার উপায় বের করতে পারছো না তখন আমরা আর কী করবো। তবে তোমরা যদি লড়াই করে পালাতে চাও আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি।

—না। লড়াই করে পালাবার কথা এখন ভাবছি না। সেটা করতে গেলে বেশ কয়েকজন বন্ধুকে হারাতে হবে। আমি তা চাই না। ফ্রান্সিস বলল।

—লড়তে গেলে বাঁচামরা তো আছেই। কোলা বলল।

—তা ঠিক। তবে জেনেশুনে কেন মরতে যাবো? ফ্রান্সিস একটু থেমে বলল—বেশ কয়েকজন বন্ধুকে রেজিল বন্দরে ফেলে এসেছি। জানি না ওরা বেঁচে আছে কি না। তারপর আমরা যে কয়েকজন মাত্র আছি এদের মধ্যেও আবার কয়েকজনকে হারালে আমাদের দুঃখের শেষ থাকবে না।

—তুমি বন্ধুদের খুব ভালোবাসো? কোলা জিজ্ঞেস করল।

—প্রাণের চেয়ে বেশি। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল—যখন অভিযানে বের হয়েছিলাম তখন বন্ধুদের বলেছিলাম তোমাদের রক্ষা করার জন্যে আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আজকে সব জেনেশুনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিই কী করে?

—তাহলে ক্রীতদাসের হাটেই আমরা বিক্রি হয়ে যাবো, এটাই আমাদের ভাগ্য। কোলা বলল।

—তাই তো দেখছি। ফ্রান্সিস বলল।

কোলা উঠে দাঁড়াল। বলল—পালাবার ফন্দী আমিও আঁটছি। দেখি শেষ পর্যন্ত কী করতে পারি।

কোলা নিজের জায়গায় চলে গেল। ফ্রান্সিসের সঙ্গে যা কথাবার্তা হল বন্ধুদের বলতে লাগল।

শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস যে লোহার ডান্ডাটা দিয়ে খাবার দেবার আগে লোহার দরজায় শব্দ করে সেই ডাণ্ডাটা হাতের কাছেই থাকে। ওটা দিয়ে অন্তত দুটো প্রহরীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া যায়।

—শাঙ্কো ঐ পাগলামি করতে যেও না। যাই কর আমাকে না জানিয়ে কিছু করো না। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস, শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্রীতদাসের জীবনই কাটাতে হবে। কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

—এবার আমারও তাই মনে হচ্ছে। এই জলদস্যুরা পশুর মতো। হিংস্র হ্যারি আর কোন কথা বলল না।

জলদস্যুদের জাহাজ চলল। পেছনে ফ্রান্সিসদের জাহাজ বাঁধা। সেই জাহাজের কেবিনঘরে রাজকুমারী মারিয়া দুশ্চিন্তায় দিন কাটায়। ফ্রান্সিসদের দুর্বিষহ কষ্টের কথা ভেবে মারিয়া মাঝে মাঝে কাঁদে।

হঠাৎই জাহাজ দুটো ঝড়ের মুখে পড়ল। জাহাজের সজোরে এপাশ-ওপাশ দুলুনিতে ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরের মেঝেয় এধার-ওধার গড়াতে লাগল। বিরাট বিরাট ঢেউয়ের ফাটলে জাহাজ পড়ছে উঠছে। সাংঘাতিক ঝাঁকুনিতে ফ্রান্সিসরা ছিটকে পড়ছে। বিদ্যুতের তীব্র আলো যেন আকাশ চিরে ফেলতে লাগল। সেইসঙ্গে গুরুগম্ভীর মেঘগর্জন আর প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া। বহুকষ্টে ফ্রান্সিসরা ঝড়ের দুলুনি সহ্য করতে লাগল।



হঠাৎ জাহাজটা ঝড়ের মুখে পড়ল

ঝড় আধঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয়নি। তাতেই জলদস্যুদের প্রাণান্তকর অবস্থা। ঝড় থামলে দেখা গেল জলদস্যুরা ডেক-এর ওপর জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। অসাড় নিস্পন্দ।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জলদুস্যরা উঠে দাঁড়াতে লাগল। পালের মাস্তুলের হালের ছেঁড়া দড়িটড়ি বাঁধতে লাগল।

ততক্ষণে ফ্রান্সিসরা কেউ কেউ উঠে বসেছে। কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়েছে কেউ কেউ পায়চারি শুরু করেছে। ঝড়ের ধাক্কায় ফ্রান্সিসদের অবস্থা কাহিল।

জলদস্যুদের ক্যাপ্টেন তেমেলো একবার এসে ফ্রান্সিসদের অবস্থা দেখে গেল। হেসে বলে গেল—ঝড়ে এরকম অবস্থাই হয়। দু-একদিনের মধ্যেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। পেট পুরে খাও। শরীর ঠিক রাখো। ভালো দাম উঠবে। ফ্রান্সিসরা কেউ কিছু বলল না।

জলদস্যুদের ক্যাপ্টেন তেমেলোকে মারিয়া বলল—এই ঝড়জলে আমার স্বামী ও বন্ধুরা কেমন আছে আমি দেখতে যাবো।

—বেশ। যান। ক্যাপ্টেন তেমেলো আপত্তি করল না।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখে দরজার কাছে এগিয়ে এল।

—এই ঝড়জলে তোমাদের কোন কষ্ট হয়নি তো? মারিয়া জানতে চাইল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—ঝড় একেবারে দলাই মালাই করে দিয়ে গেছে। তবে মারাত্মক আহত হয়নি কেউ। কয়েকদিনের মধ্যেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। তোমার কিছু হয়নি তো?

—না না। আমি ভালো আছি। আমার চিন্তা তোমাদের জন্যে। মারিয়া বলল।

—আমাদের জন্যে ভেবো না। এখন চিন্তা এরপরে কী হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস—মনে হয় এবার আমাদের কপালে অনেক দুঃখকষ্ট আছে। মারিয়া বলল।

—দেখা যাক। তুমি মন শক্ত রেখো। আমাদের জন্যে দুশ্চিন্তা করো না। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। তবু তুমি বলছো চেষ্টা করবো বেশি চিন্তা না করতে। মারিয়া বলল।

—আমি সেটাই বলছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

আকাশ নির্মেঘ। হাওয়ারও প্রচণ্ড বেগ। জলদস্যুদের জাহাজের আর ফ্রান্সিসদের জাহাজের পাল ফুলে উঠেছে। দুটো জাহাজই চলেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।

সেদিন দুপুরে। ফ্রান্সিসদের, জলদস্যুদের দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছে। রোদ বেশ চড়া। জলদস্যুদের জাহাজের ডেক-এ মাত্র কয়েকজন সিঁড়িঘরের ছায়ায় বসে আছে।

হঠাৎ ওরা লক্ষ্য করল জলদস্যুদের একটা জাহাজ ওদের জাহাজ লক্ষ্য করে দ্রুত আসছে। ওদের দুজন ছুটল সিঁড়িঘরের দিকে। কেবিনঘরের কাছে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল—একটা জলদস্যুদের জাহাজ আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। সবাই তরোয়াল নিয়ে এসো। সেই দু'জন ক্যাপ্টেন তেমেলোকেও গিয়ে বলল। তেমেলো তখন দিবানিদ্রায় ছিলো। ওদের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠল। ওরা জলদস্যুদের জাহাজ ওদের জাহাজ লক্ষ্য করে আসছে একথা বলল। ক্যাপ্টেন তেমেলো গলা চড়িয়ে বলল—লড়াই। সবাইকে ডেক-এ উঠে আসতে বলো।

—আমরা বলেছি। ওরা তৈরী হয়ে ওপরে উঠছে। সেই দুজন বলল।

ক্যাপ্টেন তেমেলো ডেক-এ উঠে এল। দেখল আক্রমণকারী জাহাজটা মাত্র কয়েকহাত দূরে। ঐ জাহাজের জলদস্যুরা খোলা তরোয়াল হাতে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত। দুটো জাহাজ গায়ে গায়ে লাগান। আক্রমণকারীরা জাহাজের জলদস্যুরা লাফিয়ে তেমেলোর জাহাজে উঠে এল। শুরু হল লড়াই। তরোয়ালে তরোয়ালে ঠোকাঠুকি চলল। চিৎকার আর্তনাদ গোঙানি শোনা যেতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিসরা প্রহরীদের ছুটোছুটি দেখে বুঝল কিছু একটা হয়েছে।

—হ্যারি—দেখো তো কী ব্যাপার। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি দরজার কাছে গেল। একজন প্রহরীকে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার বলো তো?

—এক জলদস্যুদের জাহাজ আমাদের জাহাজ আক্রমণ করেছে। ডেক-এ লড়াই চলছে। একজন প্রহরী বলল।

—লড়াইয়ে তোমরা হেরে গেলে কী হবে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—অসম্ভব। আমাদের বন্ধুরা দুর্ধর্ষ লড়িয়ে। তাদের হারানো যাবে না। লড়াই শেষ হোক দেখবে আমরা জয়ী হয়েছি। প্রহরীটি বলল।

—কিছুই বলা যায় না। উল্টোটাও হতে পারে। হ্যারি আস্তে বলল।

—হ্যাঁ। তোমরা তো আমাদের পরাজয়ই চাও। তাহলেই মুক্তি পাবে। ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ না। প্রহরীটি বলল। তোমরা কিন্তু মুক্তি পাবে না। আমরা হেরে গেলে আমাদের জায়গায় ওরা তোমাদের বিক্রি করবে। তোমাদের মুক্তির কোন আশা নেই।

—তা তো বুঝতেই পারছি। তোমরা জলদস্যুরা সবাই এক চরিত্রের। ভালো মানুষ কখনও জলদস্যু হয় না। হ্যারি বলল।

—কথা বাড়িও না। চুপচাপ বসে থাকো তো। প্রহরী বলল।

—তা তো বটেই। হ্যারি বলল। তারপর ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বসল।

—হ্যারি—সব শুনলাম। একটা আশার আলো দেখছি। ক্যাপ্টেন তেমেলো যদি হেরে যায় তাহলে নতুন জলদস্যুদের পাল্লায় পড়বো আমরা। এটা ঠিক হয়তো এরা আমাদের বিক্রি নাও করতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস—আমার কিন্তু তা মনে হয় না। অর্থের লোভ বড় সাংঘাতিক।

আমাদের বিক্রি করলে হাজার হাজার পাউণ্ড পাওয়া যাবে। সেই লোভে এরাও আমাদের বিক্রি করতে নিয়ে যাবে। সব জলদস্যুদের চরিত্রই এক। হ্যারি বলল।

—এটা ঠিক বলেছো। তবু আশা হয়তো নতুন জলদস্যুরা আমাদের মুক্তি দিতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—সম্ভাবনা কম। হ্যারি বলল।

ডেক-এ তখন লড়াই প্রায় থেমে এসেছে। ক্যাপ্টেন তেমেলোর জলদস্যুরা জয়ের মুখে। তরোয়াল ঠোকাঠুকির শব্দ কমে এসেছে। চিৎকারও প্রায় থেমে এসেছে। এখন শুধু আর্তনাদ গোঙানি ও শ্বাস ফেলার শব্দ।

ক্যাপ্টেন তেমেলো জিতে গেল। আক্রমণকারী জলদস্যুরা নিজেদের জাহাজে উঠতে লাগল। ওদের ক্যাপ্টেন অসহায়ভাবে মাস্তুলে হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ওদের জাহাজ আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনেকটা সরে গেল। তারপর আরো দূরে সরে যেতে লাগলো।

ক্যাপ্টেন তেমেলোর জলদস্যুরা তরোয়াল উঁচিয়ে হাত তুলে হৈ হৈ করতে লাগল লড়াই জেতার আনন্দে।

আক্রমণকারী জাহাজ অনেক দূরে চলে গেল। ক্যাপ্টেন তেমেলোর জলদস্যুরা আক্রমণকারী মৃত ও আহত জলদস্যুদের দুহাত দুপা ধরে ধরে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। সিঁড়িঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন তেমেলো মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিসদের কয়েদঘরের সামনে এসেই প্রহরীটি চিৎকার করে বলতে লাগল—তোমরা তো ভেবেছিলে আমরা লড়াইয়ে হেরে যাবো। দেখ—আমরা জিতেছি। লড়াইয়ে আমাদের হারানো অত সোজা নয়।

শাঙ্কো গলা বাড়িয়ে বলল—অত চেঁচিও না। আমাদের তরোয়াল দাও। আমরাই তোমাদের হারিয়ে দেব। প্রহরীটি কেমন থতমত খেয়ে গেল। বলল—তোমরা ভাইকিং। ভালো লড়িয়ে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে পারবে না।

—সেই পরীক্ষাটা তো আর হবার উপায় নেই। তোমরা তো আর আমাদের তরোয়াল দেবে না। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। তোমার কথাটা ক্যাপ্টেন তেমেলোকে আমি বলব। প্রহরী বলল।

—হ্যাঁ বলো। দেখ ক্যাপ্টেন তেমেলো কী বলে। শাঙ্কো বলল।

ক্যাপ্টেন তেমেলো আর ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে।

ফ্রান্সিসদের একঘেয়ে জীবন কাটতে লাগল। ওরা জানে না কোন্ বন্দরে জাহাজ দুটো ভিড়বে।

একসময় ফ্রান্সিস ডাকল—হ্যারি।

—কিছু বলবে? হ্যারি বলল।

—একটা সমস্যার কথা বলছি। যে বন্দরে তেমেলো জাহাজ ভেড়াবে সেখানে আমাদের জাহাজটা ও যদি বিক্রি করে না দেয়? হ্যারি একটুক্ষণ ভাবল। বলল—কথাটা ভাববার। তেমেলো এটা করতে পারে।

—তার আগে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কীভাবে তেমেলোকে নিবৃত্ত করবো বুঝে উঠতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—উপায় একটা বের করতেই হবে—হ্যারি বলল—আচ্ছা ফ্রান্সিস—আমরা হিচকক দ্বীপের রাজার কাছ থেকে সোনার চাকতি নিয়েছিলাম। সেই সোনার চাকতিগুলো কোথায় আছে? হ্যারি জানতে চাইল।

—কিছু শাঙ্কোর কোমরবন্ধনীতে আর বাকি সবটাই আমার কেবিনঘরের কাঠের ফাঁকে। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজকুমারী জানেন? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। ওই রেখেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি তেমেলো আমাদের জাহাজটা বিক্রি করতে চায় তাহলে আমরাই কিছু সোনার চাকতি দিয়ে জাহাজটা কিনে নেবো। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে বলল—ঠিক বলেছো। ক্যাপ্টেন তেমেলো অর্থপিশাচ। ও সোনার চাকতি পেলে সহজেই রাজি হয়ে যাবে।

—এছাড়া তো অন্য কোন উপায় দেখছি না। আমাদের জাহাজটা হাতছাড়া করা চলবে না। হ্যারি বলল।

প্রায় একমাস পরে তেমেলো আর ফ্রান্সিসদের জাহাজ একদিন সকালে একটা বন্দরে ভিড়ল।

ফ্রান্সিসরা বুঝল যে জাহাজ কোনো বন্দরে ভিড়ল। জাহাজ চলাচলের খুঁটিনাটি ফ্রান্সিসরা সহজেই বুঝতে পারে।

শাঙ্কো একজন প্রহরীর কাছে গেল। বলল—

—জাহাজদুটো কোন্ বন্দরে ভিড়েছে?

—এই বন্দরের নাম তো শোননি।

—না শুনিনি।

—আমারগো বন্দর। ক্রীতদাস বেচাকেনার বাজার হিসেবে আমারগো বিখ্যাত। প্রহরীটি বলল।

—বিখ্যাত নয়, কুখ্যাত। হ্যারি বলল।

—সে তোমরা যা বল। প্রহরীটি বলল।

—তাহলে এখানেই আমাদের বিক্রি করা হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন তাই এই বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়েছে।

—বাঃ সুন্দর পরিকল্পনা। হ্যারি ঠাট্টা করে বলল।

—আমাদের ক্যাপ্টেন খুব বুদ্ধিমান। খুব ভেবেচিন্তে কাজ করে। প্রহরীটি বলল।

—মহাপুরুষ। হ্যারি আবার ঠাট্টা করল।

—ঠাট্টা করছো? প্রহরীটি বলল।

—তুমি ঠাট্টা বোঝো? হ্যারি একটু হেসে বলল।

—ঠাট্টা বুঝি বৈ কি। তুমি ক্যাপ্টেনকে ঠাট্টা করে মহাপুরুষ বলেছো এটা যদি আমি ক্যাপ্টেনকে বলি ক্যাপ্টেন তোমার মুণ্ডু নেবে। প্রহরীটি বলল।

—না ভাই। এত তাড়াতাড়ি আমি মুন্ডু দিতে রাজি নই। তোমাদের মনমেজাজ তো বুঝি না। কাজেই কথাটা আমি ফিরিয়ে নিলাম। বলতে হলে বলো যে আমরা ক্যাপ্টেনের প্রশংসাই করি। বীর বুদ্ধিমান তরোয়াল চালনায় দক্ষ—এসব। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। তোমরা প্রশংসা করেছো এটাই বলবো। প্রহরীটি বলল।

—হ্যাঁ। সেটাই বলো। তাহলে দুবেলা মাংস খেতে পাবো। হ্যারি বলল।

সেদিন হাটবার নয়। কাজেই ফ্রান্সিসদের কয়েদঘর থেকে বের করা হল না।

রাতে পরিবেশক দু'জন খাবার নিয়ে এলো। শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল—আমাদের ক্রীতদাস বিক্রির হাটে নিয়ে যাওয়া হল না কেন?

—কাল রোববার—হাটবার? কালকে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রহরীটি বলল। তারপর পরিবেশকটি বলল—আজকে অঢেল মাংসের ঝোল। তোমরা পেট পুরে মাংস খাও।

—খুব ভালো কথা। শাঙ্কো বলল। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। খিদেও পেয়েছিল। তার ওপর চাইতেই মাংসের ঝোল পাওয়া যাচ্ছে। সবাই পেটপুরেই খেল।

ফ্রান্সিসরা তখন শুয়ে পড়েছে। কোলা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—তাহলে আমাদের বিক্রি করতে কালকে নিয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ। প্রহরী তাই বলল। ফ্রান্সিস বলল।

—আর পালানো হল না। কোলা বলল।

—তাই তো দেখছি। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের যাতে একজন খরিদ্দার কেনে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা ক্যাপ্টেন তেমেলোকে বলবে। কোলা বলল।

—তা কি হবে? হয়তো ভাগ ভাগ করে আমাদের বিক্রি করল। ফ্রান্সিস বলল।

—তবু চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা একসঙ্গে থাকি। কোলা বলল।

—দেখি বলে। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন পালাতে পারলাম না। পরে মালিকের হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করতে হবে। কোলা বলল।

—মালিক আমাদের নিয়ে কী করে সেটা আগে দেখি। তারপর সময় সুযোগমতো পালানো। ফ্রান্সিস বলল।

—তা কি পারবো? কোলা সংশয় প্রকাশ করল।

—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা যাতে একই মালিকের হাতে যাই তার ব্যবস্থাটা আগে করতে হবে। কোলা বলল।

—দেখি কীভাবে সেটা করা যায়। ফ্রান্সিস বলল।

কোলা আর কিছু বলল না। ঘুমুতে চলে গেল।

পরের দিন সকালের খাওয়ার পরই তেমেলো কয়েদঘরের সামনে এল। হেসে বলল—তোমাদের ক্রীতদাস কেনাবেচার হাটে নিয়ে যাওয়া হবে। সাবধান কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না। পালাতে গেলে মরতে হবে। ফ্রান্সিসরা কোন কথা বলল না।

—হাত বেঁধে নিয়ে চল্। প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন তেমেলো বলল।

দু'জন প্রহরী কয়েদঘরে ঢুকল। সকলের হাত বেঁধে দিল। কোলা ফ্রান্সিসের কাছে এল। মৃদুস্বরে বলল—শুনেছি মালিকরা ক্রীতদাসদের পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে নিয়ে যায়।

—লোহার বেড়ি? ফ্রান্সিস চমকে উঠল।

—হ্যাঁ। এখানেই কামারশালা আছে। কামারদের কাজই হল ক্রীতদাসদের পায়ে লোহার বেড়ি পরানো। কোলা বলল।

ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। পায়ে লোহার বেড়ি পরালে তো পালাবার কোন আশাই নেই। সারা জীবনই ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে।

কোলা বলল—তোমরা পাঁচজন আমরা তিনজন। মোট আটজন যাতে একই মালিকের হাতে পড়ি তার চেষ্টা করতে হবে।

—সব দেখিটেখি। তারপর। ফ্রান্সিস বলল।

ক্যাপ্টেন তেমেলো চলে গেল।

প্রহরীরা খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিস পিছু ফিরে দেখল তেমেলোর জাহাজের মাথায় মড়ার হাড় ও মড়ার মাথা আঁকা পতাকা নামানো। সেখানে সাদা পতাকা উড়ছে। ফ্রান্সিস তখন মারিয়ার কথা ভাবছিল। যে করেই হোক মারিয়াকে সঙ্গে রাখতে হবে। যে খরিদ্দার ওদের কিনবে তাকে বলে ব্যবস্থা করতে হবে।

ফ্রান্সিসরা সারি বেঁধে জাহাজ থেকে পাতা পাটাতনের ওপর দিয়ে নামল। জাহাজঘাটায় বেশ কয়েকটি জাহাজ নোঙর করা। তার মধ্যে একটা ছোট সুদৃশ্য জাহাজও আছে।

রোদ চড়া। ভ্যাপসা গরম। ফ্রান্সিসরা ঘামতে লাগল।

বন্দরের কাছেই একটা মাঠমত। তার মাঝখানে একটা পাথরের বেদীমতো। যাদের বিক্রি করা হবে তাদের সেই বেদীতে তোলা হচ্ছিল। তিন-চারজন

কালো পোশাক পরা লোক এই কাজ করছিল। তারা দুজন কৃষ্ণকায় যুবককে বেদীতে তুলল। বেদী ঘিরে বহু লোকের ভিড়। খরিদ্দাররা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেই যুবকদের দেখছিল। নিলামের মতো দর হাঁকা শুরু হল। কালো পোশাকপরা লোকেরা যুবকদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল।

দুজন যুবক বিক্রি হয়ে গেল। যে কিনল সে তাদের নিয়ে চলে গেল।

এবার ফ্রান্সিসদের বেদীতে ওঠার পালা। কালো পোশাকপরা লোকেরা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—আমাদের একসঙ্গে বেদীতে তোল। যাতে একজন খরিদ্দার আমাদের কেনে।

—বেশ। তোমাদের একসঙ্গেই তুলছি। তবে একজন খরিদ্দারই কিনবে এটা নাও হতে পারে। একজন কালো পোশাক পরা লোক বলল।

—ঠিক আছে। তুমি তোল তো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসদের বেদীর ওপর তোলা হল। ফ্রান্সিস একবার চারদিকে তাকাল। অনেক লোকের ভিড়। সবাই ক্রেতা নয়। কিন্তু ভিড় জমিয়েছে। দুঃখে ফ্রান্সিসের বুক ভেঙে যেতে লাগল। ও মন শান্ত করল। আমরা বিক্রি হতে চলেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্রীতদাস হতে চলেছি। ওপরের দিকে তাকাল। সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশ। সামুদ্রিক পাখি উড়ছে। তীক্ষ্ণসুরে ডাকছে। সবাই মুক্ত। সে সারাজীবনের জন্যে বন্দী হতে যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস দেখল ক্যাপ্টেন তেমেলো একপাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। অনেক পাউণ্ড পাওয়া যাবে।

এবার কালো পোশাক পরা লোকটি ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে গলা চড়িয়ে বলল—এরা চাইছে এদের কেউ একসঙ্গে কিনুন। বোধহয় সবাই বন্ধু।

দাম হাঁকা শুরু হল। ভিড়ে চারদিক থেকে ক্রেতারা দর হাঁকতে লাগল। সবচেয়ে বেশি দাম যে দিল তার দিকে ফ্রান্সিস তাকাল। মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক। মাথার চুল গোঁফ সোনালি রঙের। পরনের পোশাক বেশ দামী।

ভদ্রলোক বেদীর দিকে এগিয়ে এলেন। কালো পোশাকপরা লোকটি এগিয়ে ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বলল—এই আটজন আপনার ক্রীতদাস। ভদ্রলোকের সঙ্গে চার পাঁচজন সশস্ত্র দেহরক্ষী। দেহরক্ষীরা ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল।

তখনই রাজকুমারী মারিয়কে বেদীতে তোলা হল। ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। এরকম সুন্দরী মেয়ে ক্রীতদাসী হবে?

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্রেতা ভদ্রলোকের দুহাত জড়িয়ে ধরল। বলল—আমরা তো আপনার ক্রীতদাস হলাম। যে ভদ্রমহিলাকে বিক্রির জন্য তোলা হল তিনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। আমার স্ত্রী। আমার একান্ত অনুরোধ এই রাজকুমারীকে আপনি কিনুন। তাহলে উনি আমাদের কাছাকাছি থাকতে পারবেন। বলতে বলতে ফ্রান্সিসদের চোখে জল এল। ভদ্রলোক ফ্রান্সিসদের মানসিক আবেগ বুঝতে পারলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন—অনেক দাম উঠছে যে।

—আপনি পারবেন কিনতে। দোহাই আমার এই বিনীত অনুরোধটা রাখুন।

—দেখছি। ততক্ষণে মারিয়ার জন্য বেশ দাম উঠেছে। ভদ্রলোক বেশি দাম হাঁকলেন। দামাদামি চলল কিছুক্ষণ। সবশেষে ঐ ভদ্রলোকই বেশি দাম হেঁকে মারিয়াকে কিনলেন।

আনন্দে ফ্রান্সিস প্রায় কেঁদে ফেলল। হ্যারি ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রাখল। চোখ মুছে বলল—ঈশ্বর করুণাময়। আমার পরিকল্পনা সার্থক হল।

কালো পোশাকপরা লোকেরা আরো লোক বেদীতে তুলতে লাগল। একজন কালো পোশাকপরা লোক মারিয়াকে ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে এল। মারিয়া ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ফ্রান্সিসের মন দমে গেল। হ্যারি ফ্রান্সিসদের কাঁধ চাপ দিয়ে বলল—আবেগপ্রাপ্ত হয়ো না। তাহলে রাজকুমারী আরো দুর্বল হয়ে পড়বেন। শান্ত হও। ফ্রান্সিস তখন আবেগে কাঁপছে। ক্রেতা ভদ্রলোক এটা লক্ষ্য করলেন। মৃদুস্বরে বললেন—তোমার স্ত্রীর যাতে বেশী কষ্ট না হয়, সেদিকটা আমি দেখবো। ভদ্রলোকের দুহাত ঝাঁকুনি দিয়ে ফ্রান্সিস ছেড়ে দিল। ভদ্রলোক বললেন—তোমার নাম কী?

—ফ্রান্সিস।

—আমার নাম পার্তাদো। আমার অনেক জমি-জিরেত আছে। সেখানে কাজ করার জন্যেই তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি।

—তাহলে আপনি বড় জমিদার।

—হ্যাঁ, তোমরা চাষের কাজ জানো?

—না।

—তাহলে শিখে নেবে। তোমাদের কিন্তু বন্দী হয়ে থাকতে হবে। আমি কাজ চাই। সেটা ভালোভাবে পেলেই আমি সন্তুষ্ট। এবার চলো। পালাবার চেষ্টা করো না। আমার দেহরক্ষীরা রয়েছে। পালাতে গেলে মরবে। চলো। তোমাদের পায়ে লোহার বেড়ি পরাতে হবে। ভদ্রলোক বললেন।

—বেড়ি না পরালে চলে না? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না। বেড়ি পড়াতেই হবে।

পার্তাদো হাঁটতে লাগল। ফ্রান্সিসরা পিছু পিছু চলল। সঙ্গে দেহরক্ষীরাও চলল।

কিছুদূর যাওয়ার পর বাঁ পাশে একটা কামারশালা দেখা গেল। ফ্রান্সিসদের কামারশালায় ঢোকানো হল। ফ্রান্সিসরা দেখল আগে যেসব যুবকদের ক্রেতারা কিনেছে তাদেরও সেখানে আনা হয়েছে। তাদের পায়ে লোহার বেড়ি পরানো হচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝল পায়ে বেড়ি পরানো হবেই।

আগের যুবকদের বেড়ি পরানো শেষ হল। এবার ফ্রান্সিসদের পালা।

কামাররা কয়েকজন ফ্রান্সিসদের পায়ে লোহার বেড়ি পরাতে লাগল। গায়ে তপ্ত লোহার আঁচ লাগছে। কিন্তু ফ্রান্সিসদের তা সহ্য করতে হল। উপায় নেই।

তবে সান্ত্বনা এটুকু পেল যে কথাবার্তায় বুঝল পার্তাদো মানুষটা খারাপ নয়। হয়তো ওদের ওপর অত্যাচারটা কমই হবে। কিন্তু তবু ক্রীতদাসের জীবন। ফ্রান্সিস খুশি হল দেখে যে মারিয়াকে বেড়ি পরানো হল না।

এবার বেড়িপরা অবস্থায় হাঁটতে গিয়ে লোহার ভারে ভালো করে হাঁটতেই পারছিল না কেউ।

জাহাজঘাটায় এল সবাই। ফ্রান্সিস দেখল জলদস্যুদের জাহাজটা নেই। বুঝল ক্যাপ্টেন তেমেলো প্রচুর অর্থ নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেছে।

একপাশে নোঙর করা ছিল যে সুদৃশ্য ছোট জাহাজটা, সেটার কাছে এল সবাই। বেশ কষ্ট করে হেঁটে জাহাজটায় উঠল সবাই।

পার্তাদো বলল—শোন—কেবিনঘরে জায়গা নেই। আমাদের সবাইকে ডেক-এ থাকতে হবে। শুধু ঝড়বৃষ্টির সময় তোমাদের নীচে নামানো হবে।

ফ্রান্সিস পার্তাদোর দিকে এগিয়ে গেল। বলল—

—একটা কথা ছিল।

—বলো। পার্তাদো বলল।

—এখানে আমাদের জাহাজ নোঙর করা আছে। জলদস্যুরা খুব ভাগ্যি যে আমাদের জাহাজটা নিয়ে পালিয়ে যায়নি। আমার অনুরোধ আমাদের জাহাজটা আপনি আপনার জাহাজের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলুন।

—আমার ছোট জাহাজ। তোমাদের জাহাজকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে? পার্তাদো বললেন।

—তাহলে আমি কথা বলি। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। পার্তাদো বললেন।

—আমাদের চারজনকে আমাদের জাহাজ চালাতে দিন। জাহাজটা আপনার জাহাজের পেছনে পেছনেই চালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তোমাদের হাতের বাঁধন খোলা হবে না। পার্তাদো বললেন।

—হাত বাঁধা অবস্থাতেই আমরা জাহাজ চালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যেতে পারো। পার্তাদো বললেন।

—আমাদের পায়ের বেড়ি যে কী ভারী আপনার তা ধারণাই নেই। এই লোহার বেড়ি পায়ে সাঁতরানো অসম্ভব। জলে নামলেই আমরা জলে তলিয়ে যাবো। হাঙরের মুখে পড়বো আমরা। কেউ বাঁচবো না। জীবনের ভয় তো আমাদের আছে। ফ্রান্সিস বলল।

পার্তাদো কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—ঠিক আছে। কিন্তু সবাই তোমাদের জাহাজে থাকবে না। মাত্র একজন—যে তোমাদের জাহাজ চালাবে।

—বেশ। তাই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—একটা কথা। পার্তাদো বলল।

—বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—এই জাহাজে তোমরা ডেক-এ থাকবে। ঝড়-বৃষ্টির সময় শুধু নীচে নামবে। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেলে আবার ডেক-এ চলে আসবে। পার্তাদো বলল।

—ঠিক আছে। আমরা রাজি। হ্যারি বলল।

—আমাদের খুব খিদে পেয়েছে। খেতে দিন। শাঙ্কো বলল।

—পাঁচসাতজন যুবকই আমি কিনবো ভেবেছিলাম। তাই তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা জাহাজে আগেই করে রেখেছি। একটু পরেই খাবার দেওয়া হচ্ছে। পার্তাদো বললেন।

পার্তাদো সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

ফ্রান্সিসরা ডেক-এ বসে পড়ল। পা নাড়াতে কষ্ট হচ্ছে। লোহার বেড়ি পায়ে পায়ে লেগে শব্দ তুলছে।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। চোখ বুজল। হ্যারি ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ রেখেই মুখে শব্দ করল—হুঁ।

—রাজকুমারী কোথায় থাকবেন? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—মারিয়াকেও আমাদের জাহাজে রাখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা তো বললে না। হ্যারি বলল।

—একসঙ্গে সব চাওয়া না। মনে তো হচ্ছে পার্তাদো ভদ্রলোক। আপত্তি করবে না। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া তখনই ফ্রান্সিসের কাছে এসে বসল। বলল—শেষ পর্যন্ত ক্রীতদাস হতে হল।

—উপায় কি। অবস্থার বিপাকে সবই মেনে নিতে হয়। তবে সময় সুযোগ বুঝে ঠিক পালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ক্রীতদাসের জীবন। শরীরের শক্তি অর্ধেক হয়ে যাবে। তখন পারবে পালাতে? মারিয়া বলল।

—অবশ্যই পারবো। মনের জোরটাই বড় কথা। মনে জোর থাকলে অথর্ব অবস্থায়ও পালানো যায়। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখা যাক। কিন্তু আমিও কি এই ডেক-এই থাকবো? মারিয়া বলল।

—না। তোমাকে আমাদের জাহাজে রাখার জন্যে অনুরোধ করবো। পার্তাদো নিশ্চয়ই রাজি হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ বলে। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল।

এবার ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকাল। বলল—অনেক করে বলে পার্তাদোকে রাজি করিয়েছি। ফ্রেজার নেই। তুমি জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?

—নিশ্চয়ই পারবো। তুমি ঠিক জানো না ফ্রেজার কি আর সবসময় হুইলে থাকতো? ওর জায়গায় আমিও অনেকদিন জাহাজ চালিয়েছি। কাজেই আমি ঠিক জাহাজ চালিয়ে যেতে পারবো। শাঙ্কো বলল।

—দু'হাত কিন্তু বাঁধা থাকবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা নিয়েও পারবো। আমার জামার নীচে ছোরা আছে। হাতের বাঁধন কেটে ফেলবো। শাঙ্কো বলল।

—পারবে না। পার্তাদোর দেহরক্ষীরা জাহাজে থাকবে।

—হ্যাঁ। এটা ভুলে গিয়েছিলাম। ঠিক আছে হাত বাঁধা অবস্থাতেই জাহাজ চালাবো। শাঙ্কো গলায় জোর দিয়ে বলল।

ওরা কথাবার্তা বলছে তখনই সকলের জন্যে খাবার নিয়ে রাঁধুনি এল। চিনেমাটির বাসনে ওদের খেতে দেওয়া হল। সবাই ক্ষুধার্ত। প্রথমে সুপ দেওয়া হল। চেটে খেয়ে ফেলল সবাই। তারপর সবজি তরকারি। কী সুস্বাদু! সবাই সাগ্রহে খেতে লাগল। তারপর দেওয়া হল মাংস-রুটি। এত সুস্বাদু খাবার কতদিন খায়নি। সবাই চেটেপুটে খেতে লাগল। বারবার মাংসের ঝোল চাইতে লাগল। রাঁধুনিও দিতে লাগল। তারপর রাঁধুনি হেসে বলল—আর নেই। শুধু আমাদের মালিক আর রক্ষীদের আর জাহাজ চালকের খাবার রয়েছে।

—কিন্তু তুমি? হ্যারি জানতে চাইল।

—আমি অল্প খাবো। তোমরা এরকম রাক্ষসের মতো খাবে তাতো জানতাম না। রাঁধুনি হেসে বলল।

—তুমি বুঝবে না ভাই। কতদিন পরে যে এরকম সুস্বাদু খাবার খেলাম তা মনেও করতে পারছি না। হ্যারি হেসে বলল।

—জাহাজ কখন ছাড়া হবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—মালিক জানে। রাঁধুনি বলল।

তখনই পার্তাদো ডেক-এ উঠে এলেন। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। পার্তাদোর কাছে গেল। বিনীতভাবে বলল—আপনি আমাদের সব অনুরোধই রেখেছেন। এটাই আমার শেষ অনুরোধ। মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—আমার স্ত্রীকে আমাদের জাহাজে তার কেবিনঘরে থাকতে দিন। এই ডেক-এর ওপর তার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। পার্তাদো মারিয়ার দিকে তাকাল। ভাবতে লাগল। মারিয়া মৃদুস্বরে বলল বলল—আপনি দয়া করে এই অনুরোধ রাখুন।

—বেশ। তাই হবে। তবে পালাবার চেষ্টা করবে না। পার্তাদো বলল।

—আপনার দেহরক্ষীরা তো থাকবে। মারিয়া বলল।

—ওরা তো রাত জেগে তোমাকে পাহারা দিতে পারবে না। পার্তাদো বললেন।

—আমি আমার স্বামী-বন্ধুদের ফেলে একা পালাতে যাবো কেন? মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে। তুমি ঐ জাহাজেই থাকবে। পার্তাদো বলল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো বুঝতে পারছি না।

—ধন্যবাদের কিছু নেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। পার্তাদো বলল।

—আপনি জাহাজ কবে ছাড়ছেন? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—আমার সব কাজ মিটে গেছে। কাল সকালেই জাহাজ ছাড়বো। পার্তাদো বললেন।

পার্তাদো জাহাজ চালকের সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন।

ফ্রান্সিস ডেক-এ বসে রইল।

বিকেল হল। সূর্য তখন অস্ত যায় যায়। মারিয়া গিয়ে কাঠের রেলিং ধরে দাঁড়াল। মনে যত দুঃখ থাক মারিয়া সূর্যাস্ত দেখবেই।

সূর্য অস্ত গেল। গভীর কমলা রঙ তখনও পশ্চিমের আকাশ জুড়ে। মারিয়া সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

রাতের খাবারে মাংস দেওয়া হল না। ফ্রান্সিসরা অবশ্য সেটা আশাও করেনি। সামুদ্রিক মাছের ঝোলই খেতে হল। খাওয়ার সময় একজন রক্ষী এসে ফ্রান্সিসদের হাতের বাঁধন খুলে দিল। খাওয়া হলে আবার হাত বেঁধে দিয়ে গেল। দুপুরেও খাওয়া-দাওয়ার সময় এভাবেই ওদের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে পরে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

সেই রাতে মারিয়াকে আর তাদের জাহাজে পাঠানো হল না। মারিয়া ফ্রান্সিসদের সঙ্গে ডেক-এই ঘুমোলো। পরের দিন সকালে পার্তাদো জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—

—তোমাদের জাহাজ যে চালাবে সে উঠে এসো। শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। পার্তাদোর কাছে গেল। পার্তাদো বলল—তোমাদের জাহাজে যাও। তোমাদের রাজকুমারীকে নিয়ে যাও। দুজন দেহরক্ষীও যাবে। হাত খোলা হবে শুধু খাওয়ার সময়। অন্য সময় বাঁধা থাকবে।

—বেশ। শাঙ্কো মাথা ঝুঁকিয়ে বলল—হাত বাঁধা নিয়ে আমি জাহাজ চালাবো।

মারিয়াকে নিয়ে শাঙ্কো পার্তাদোর জাহাজ থেকে নেমে গেল। পেছনে দু'জন সশস্ত্র দেহরক্ষী।

নিজেদের জাহাজের কাছে গিয়ে দেখল পাটাতন পাতা নেই। শাঙ্কো সমুদ্রের জলে নামল। সাঁতরে নিজেদের জাহাজের কাছে গেল। দড়ির মই বেয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠল। কাঠের পাটাতন এনে পেতে দিল। মারিয়া আর দেহরক্ষীরা জাহাজে উঠে এল।

ভেজা জামাকাপড় নিয়েই শাঙ্কো পাল খুলে দিল। দড়িদড়া বাঁধন। মারিয়া নিজের কেবিনঘরে চলে গেল।

একটু বেলা হতেই পার্তাদোর জাহাজ ছাড়ল। সেই জাহাজের পেছনে পেছনে শাঙ্কোও ওদের জাহাজ চালাল। দুহাত বাঁধা হুইল ঘোরাতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু শাঙ্কোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভালোভাবে জাহাজ চালাবেই। পায়ের বেড়িও কোন বাধা বলে মানবে না।

শান্ত সমুদ্র। বাতাসেরও তেমন বেগ নেই। দুটো জাহাজই দ্রুত চলল।

পার্তাদোর জাহাজের ডেক-এই ফ্রান্সিসদের রাতদিন কাটতে লাগল।

পার্তাদোর জাহাজ একটা ছোট বন্দরে থামলো। পাটাতন ফেলা হল। পার্তাদোর রাঁধুনি নেমে গেল। ওদিকে শাঙ্কোও ওদের জাহাজ থামাল।

তখন বিকেল। মারিয়া জাহাজ থেকে নেমে ফ্রান্সিসদের জাহাজে এল। শাঙ্কোও এল। ফ্রান্সিস আর হ্যারির সঙ্গে কথাবার্তা বলল।

পার্তাদোর রাঁধুনি একগাদা ফুলফলের চারা নিয়ে এল। হয়তো পার্তাদোর বাড়িতে বাগানটাগান আছে। গাছগুলো লাগানো হবে।

সূর্য অস্ত গেল। মারিয়া সূর্যাস্ত দেখে নিজেদের জাহাজে চলে গেল। শাঙ্কোও ফিরে গেল।

আবার জাহাজদুটো চলল। সমুদ্র কিছুটা অশান্ত হলেও জাহাজ চালাতে অসুবিধে হচ্ছিল না।

হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল—

—একটা ব্যাপারে আমারা খুব ভাগ্যবান। ক্যাপ্টেন তেমেলো আমাদের জাহাজটা বিক্রি করে দিয়ে পালায়নি।

—যা বলেছো। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—কিন্তু পার্তাদোর জমিদারিতে ক্রীতদাসের কাজ করতে করতে কি আমরা পালাতে পারবো? পায়ের এই বেড়ি নিয়ে?

—এখন কিছু বলতে পারছি না। আমাদের থাকার ব্যবস্থা, কাজের ব্যবস্থা সব দেখি তখন ভাববো।

হ্যারি একটু থেমে বলল—ফ্রান্সিস—আমার কি ভয় জানো? হয়তো দেশে আর ফেরা হবে না।

—হবে। মন দুর্বল করো না। আমরা মুক্তিও পাবো, দেশেও ফিরবো। ফ্রান্সিস গলায় জোর দিয়ে বলল।

—তুমি আশাবাদী। আমি অতটা আশাবাদী হতে পারছি না। হ্যারি আস্তে আস্তে বলল।

—আগে থেকেই হতাশ হয়ে পড়ছো কেন? দেখই না কি হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—অগত্যা দেখা যাক। হ্যারি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

সেদিন দুপুরে আকাশ অন্ধকার করে গভীর কালো মেঘ জমল। ফ্রান্সিসরা বুঝল—ঝড় আসছে। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সেইসঙ্গে ঘন ঘন বাজ পরার গুরুগম্ভীর শব্দ।

পার্তাদোর রাঁধুনি ডেক-এ উঠে এল। বলল—ঝড়বৃষ্টি আসছে। মালিক তোমাদের নিচে আসতে বলেছেন।

ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল। তারপর একে একে নীচে নামল। দুটো কেবিনঘর।

একটা বড়। একটা ছোট। বড়টা বোধহয় পার্তাদোর জন্যে। অন্যটা রক্ষী আর রাঁধুনির জন্য।

সেই ঘরেই ফ্রান্সিসরা ঢুকল। কিন্তু এত ছোট কেবিনঘর যে ফ্রান্সিসদের প্রায় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। পাশের কেবিনঘর থেকে পার্তাদো বলল—তোমরা কয়েকজন এইঘরে আসতে পারো।

ফ্রান্সিসরা কয়েকজন পার্তাদোর কেবিনঘরে গেল। ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। বোঝাই যাচ্ছে পার্তাদো খুব বিলাসী মানুষ। ঘরের সবকিছু সাজানো গোছানো। বিছানার চাদর ফুল আঁকা ধবধবে সাদা।

কাঠের দেয়ালে একটা ঝকঝকে আয়না আটকানো। আয়নার চারপাশের কারুকাজ দেখার মতো। তার সামনের তাকে দাড়ি কামাবার ক্ষুর। দাড়ি কামাবার সাবান রাখার একটা রুপোর বাটি। সুন্দর একটা তোয়ালে ঝুলছে। উল্টোদিকের দেয়ালে একটা তৈলচিত্র। স্টিল লাইফ ছবি। একটা আপেল, ভাঙা বেদানা, কলা একটা ফুল, জ্বলন্ত মোমবাতি। মোমবাতির আলো একপাশ থেকে পড়েছে। বড় সুন্দর ছবি। একটা ছোট্ট টেবিল। তার ওপর কয়েকটা বাঁধানো বই। তাহলে পার্তাদোর পড়াশুনোর অভ্যেস আছে। এরকম মানুষ খারাপ হতে পারে না।

পার্তাদো বলল—সবাই দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াও।

ঝড়ের প্রথম ধাক্কায় জাহাজটা জোরে লাফিয়ে উঠল। ফ্রান্সিসরা প্রায় ছিটকে পড়ল। শুরু হল প্রচণ্ড দুলুনি। ফ্রান্সিসদের অনেক সময়ও জাহাজে কাটে। ঝড় জল বৃষ্টির ধাক্কা ওরা ভালোই সামলাতে পারে।

প্রায় কুড়ি পঁচিশ মিনিট ঝড়-বৃষ্টি চলল। জাহাজে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠল।

পার্তাদো চুপ করে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আয়না ছবি দেয়ালে শক্ত করে গাঁথা। ওগুলো নড়তে লাগল কিন্তু ছিটকে পড়ল না।

ফ্রান্সিস ভাবছিল একা শাঙ্কো ঝড়ের মোকাবিলা করতে পারছে কি না। দেহরক্ষীরা তো আর নাবিক না। সমুদ্রের ঝড়ে জাহাজ সামলে নিয়ে যাওয়া ওরা জানে না। শাঙ্কোকে একাই সব সামলাতে হয়েছে। মারিয়াও একা। তবে ঝড়বৃষ্টিতে জাহাজে থাকা ওর অভ্যাস হয়ে গেছে।

বৃষ্টি থেমে গেল। ঝোড়ো বাতাসের বেগও কমে গেল। মেঘ কেটে গেল। সূর্য দেখা গেল। বিকেল হল। সূর্য অস্ত গেল। সমুদ্র অনেকটা শান্ত হল। জাহাজ দুটো চলল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল। শাঙ্কো একাই বোধহয় পালটাল ঠিক করছিল। জাহাজের গতি বাড়িয়েছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসদের জাহাজ পার্তাদোর জাহাজের কাছে চলে এল।

পরে দিনকয়েক ধরে সমুদ্র শান্তই রইল। পার্তাদোর নির্দেশে জাহাজের গতি বাড়ানো হল। উন্মুক্ত ডেক-এ ফ্রান্সিদের দিনরাত কাটতে লাগল। একঘেয়ে জীবন। উপায় নেই। মেনে নিতেই হচ্ছে।

তিন-চারদিন পর একদিন সকালে পার্তাদো ডেক-এ উঠে এলেন। ফ্রান্সিসদের কাছে এলেন। বললেন—সামনেই এনকোবার বন্দর। আমরা ওখানেই নামবো।

দূর থেকে এনকোবার বন্দর দেখা গেল। যতদূর দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা গেল—খুব বড় বন্দর নয়।

আস্তে আস্তে দুটো জাহাজ এনকোবার বন্দরের জাহাজঘাটায় এসে থামল। নোঙর ফেলা হল। পাটাতন পাতা হল।

নিজেদের জাহাজ থেকে শাঙ্কো আর মারিয়া নেমে এল। পার্তাদোর ছোট জাহাজে এল। দেখল ফ্রান্সিসরা ডেক-এ শুয়েবসে আছে। ফ্রান্সিসকে দেখে মারিয়া চমকাল। ফ্রান্সিসের চেহারা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। ও তাড়াতাড়ি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—তোমার শরীর ভালো আছে তো? ফ্রান্সিস হেসে বলল—আমার জন্যে ভেবো না।

—তোমার শরীর বেশ খারাপ হয়ে গেছে। মারিয়া বলল।

—বন্ধুদের দেখ! ওদেরও আমার মতো অবস্থা। দিনরাত ডেক-এ পড়ে থাকা। বেঁচে আছি এটাই যথেষ্ট। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল।

—তুমি কক্ষনো মৃত্যুর কথা বলবে না। অভিমানী স্বরে মারিয়া বলল।

—আমরা কি মৃত্যুকে এড়াতে পারবো? ফ্রান্সিস আগের মতোই হেসে বলল।

—সেসব বুঝি না। তুমি এভাবে কখনও বলবে না। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল।

পার্তাদো ডেক-এ উঠে এলেন। বললেন—তোমরা এখানে নামো। আমার দেহরক্ষীরা তোমাদের পাহারা দিয়ে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবে।

ফ্রান্সিসরা আস্তে আস্তে জাহাজ থেকে নামতে লাগল। পায়ে বেড়ি। শব্দ হচ্ছে। হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে। তবু যেতে হবে। নতুন আস্তানা কেমন হবে কে জানে। তবে ক্রীতদাসদের আস্তানা। সে কি কখনও ভালো হয়।

নীচে নেমে ফ্রান্সিস পার্তাদোর কাছে গেল। বলল—আপনার জাহাজের জন্য তো পাহারাদার থাকবে।

—নিশ্চয়ই। পাহারাদার থাকবে জাহাজচালক। পার্তাদো বললেন।

—তাহলে একটা অনুরোধ। সে যেন আমাদের জাহাজটাও পাহারা দেয়। আমাদের কেউ তো থাকতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তোমাদের কাউকে ছাড়া হবে না। পার্তাদো বললেন।

—তাহলে আপনার জাহাজচালক যেন আমাদের জাহাজটারও দেখাশুনো করে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। বলে দিচ্ছি। পার্তাদো বললেন। তারপর ইশারায় জাহাজচালককে ডাকলেন। জাহাজচালক ওর কাছে এল। পার্তাদো বললেন—শোনো।

আমাদের জাহাজটার যেমন দেখাশুনো করবে তেমনি এদের জাহাজটারও দেখাশুনো করো। দেখো দুটো জাহাজই যেন চুরি না হয়ে যায়। তারপর বললেন—

—তোমাদের জাহাজটার জন্যে আর মায়া বাড়াচ্ছো কেন? আর কোনদিন কি জাহাজটায় চড়তে পারবে?

—তবু আমাদের অনেক সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঐ জাহাজটা। ওটা চুরি হয়ে যাক এটা চাই না।

—বেশ। তোমরা চাইছো তাই পাহারার ব্যবস্থা করে দিলাম। এবার চলো সব। পার্তাদো হাত নেড়ে বললেন। দেহরক্ষীরা ততক্ষণে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। হাতে খোলা তরোয়াল। খুব বড় বন্দর নয় এই এনকোবার বন্দর। ছোট বন্দরই বলা যায়। আরো দুটো জাহাজ নোঙর করে আছে দেখা গেল।

ফ্রান্সিসরা বাঁচল যে রোদের তেমন তেজ নেই। বেশ হাওয়া ছেড়েছে। কষ্ট একটু কমল।

ফ্রান্সিস চারদিকে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল। দুপাশে দোকানপাট। লোকজনেরও ভিড় আছে। লোকেরা ফ্রান্সিসদের দেখল। তবে খুব একটা অবাক হল না। ক্রীতদাস দেখায় তারা অভ্যস্ত। তবে কৃষ্ণকায় যুবক-যুবতীদেরই ওরা দেখে থাকে। আজকে দেখল বিদেশি ইউরোপীয় যুবক ও মারিয়াকে। তাই একটু অবাকই হল।

একজন দেহরক্ষী ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। একটা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে পার্তাদো ওদের পেছনে পেছনে চলল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস, ডানদিকে তাকিয়ে দেখ—একটা কামারশালা। ফ্রান্সিস দেখল।

হ্যারি বলল—তার মানে এখানে বেশ কয়েকজন জমিদার আছে। ক্রীতদাসদের বেড়ি পরানোর কাজ এখানে ভালোই চলে।

—হুঁ। ঠিকই বলেছো। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

তখনই কোলা ফ্রান্সিসদের পেছনে এসে দাঁড়াল। বলল—ভাই, তাহলে পালানো গেল না।

—তাই তো দেখছি। ফ্রান্সি একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—আর কি পালানো যাবে? কোলা বলল।

—দেখা যাক। সময় আর সুযোগ বুঝে পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে না। কোলা হাত নেড়ে বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস আস্তে বলল।

পথ প্রদর্শক দেহরক্ষীটি একটা বিরাট বাড়ির প্রবেশপথের সামনে এসে দাঁড়াল। বেশ বড় একটা লোহার দরজা। একজন প্রহরী দরজায় পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিসদের দেখে ঘর্ ঘর্ শব্দে দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিসরা ঢুকল।

বাড়ি দেখে ফ্রান্সিস বেশ অবাক হল। কত বড় বাড়ি। পাথর আর কাঠে তৈরী। এসব অঞ্চলে এরকম বাড়ি দেখবে আশা করেনি। বোঝা গেল পার্তাদো বেশ বর্ধিষ্ণু জমিদার।

ডানদিকে তাকিয়ে দেখল দূরে বিস্তৃত জমি। শূন্য। বোঝা গেল যা ফসল হয়েছিল তা কেটে ফেলা হয়েছে। নতুন করে চাষ শুরু হবে।

বাড়িতে ঢোকার দরজার সামনে এসে দেহরক্ষী দাঁড়াল। তখনই পার্তাদোর গাড়ি ঢুকল। পার্তাদো কোন কথা বললেন না। বাড়ির ভেতর ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মারিয়াকে তার সঙ্গে যেতে ইঙ্গিত করলেন। মারিয়া দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—যাও। মারিয়া পার্তাদোর পেছনে পেছনে বাড়িতে ঢুকে গেল। ফ্রান্সিস স্বস্তির শ্বাস ফেলল—যা হোক মারিয়া বাড়ির অন্দরমহলেই থাকবে।

দেহরক্ষীটি আবার হাঁটতে শুরু করল। ফ্রান্সিসরাও ওর পেছনে পেছনে চলল।

বাড়ির পেছনদিকে এল সবাই। একটা লোহার ফাঁক ফাঁক দরজাওয়ালা ঘরের সামনে এল ওরা। দরজায় তালা ঝুলছে। দরজার কাছে দুজন সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়েছিল। একজন দরজা খুলে দিল। রক্ষীটি ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকতে বলল।

ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। বেশ বড় পাথরের ঘর। এই দিনের বেলাতেও কেমন অন্ধকার অন্ধকার। অনেক ওপরে দু'দিকে দুটো ফোকর। জানালার মতো। সারা ঘরের মেঝেয় শুকনো ঘাস আর পাতায় তৈরি দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা বিছানার মতো। এককোণে দু'জন কৃষ্ণকায় যুবক বসে আছে। ওরাও ক্রীতদাস।

ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস বসল। হ্যারি পাশে এসে বসল। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—হ্যারি শরীর ভালো আছে তো?

—আমার তো জানোই। খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। এতটা পথ পায়ের বেড়ি টানতে টানতে আসা। ক্রীতদাস হব কোনদিন ভাবিনি।

—অবস্থা বিপাকে সবই হতে হয়। ফ্রান্সিস বলল—এই নিয়ে দুঃখ কোরো না। দেখি না কী করা যায়।

পরদিন ফ্রান্সিসরা সবে সকালের খাবার খেয়েছে দুজন কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস দরজায় এসে দাঁড়াল। কয়েদঘরের দরজা খোলা হল।

কৃষ্ণকায়দের একজন এগিয়ে এল। বলল—তোমাদের কয়েকটা কথা বলার আছে—মানে কাজের কথা। তার আগে আমার নাম বলে রাখি। আমার নাম ওঙ্গা। তোমাদের মাতব্বর কে?

মাতব্বর কথাটা শুনে ফ্রান্সিসদের রাগ হল। ও প্রথমে কথা বলতে চাইল না। তারপর ভেবে দেখল এখন রাগারাগি করাটা বুদ্ধিমানের কাজ না। ও উঠে দাঁড়াল। বলল—

—আমি ফ্রান্সিস।

—ঠিক আছে। শোন—ওঙ্গা বলতে লাগল—এখানে গত চারমাস এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি অথচ এটাই বৃষ্টি হওয়ার ঠিক সময়। এখানে মুষলধারেই বৃষ্টি হয়। কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার নাম নেই। তাই কর্তাসাহেবের নির্দেশ এই ঘরের পেছনে যে ইঁদারা আছে সেখান থেকে জল নিয়ে ক্ষেতে জল ছিটোতে হবে।

—ক্ষেতে জল ছিটিয়ে চাষ হয়? হ্যারি বলল।

—সেটা কর্তাসাহেব বুঝবেন। ক্রীতদাসদের কর্তারা ক্রীতদাসদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ায় না। যতটা কাজ তাদের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব তা আদায় করে নেয়। তোমাদের যা বলা হচ্ছে তাই করতে হবে। রাজি না হলে সবাইকে চাবুক খেতে হবে। ওঙ্গা বলল।

—চাবুক? কর্তাসাহেব চাবুক মারবে? শাঙ্কো বেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—পার্তাদো চাবুক মারেন?

—হ্যাঁ। দরকার পড়লে। কর্তাসাহেবদের চেহারা সর্বত্রই এক। ওঙ্গা বলল।

—ঠিক। আমি ব্যতিক্রম আশা করেছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—তবু তো চাবুক। কোথাও কোথাও হাত পা ভেঙে দিয়ে রাস্তায় বের করে দেওয়া হয়। ভিখারির জীবন কাটাতে হয় সেইসব ক্রীতদাসদের।

—এটা হতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক গে—যেজন্যে এলাম। আমরা সব দেখিয়ে দিচ্ছি—তোমরা সেইভাবেই কাজে লাগো। ওঙ্গা বলল। তারপর হাত নেড়ে বলল—

—এবার সবাই বেরিয়ে এসো।

ফ্রান্সিসরা বেরিয়ে এল। পুরনো বন্দী দুই কৃষ্ণকায়ও এল। কারো বেড়িই নেই।

ফ্রান্সিসদের ঘরের পেছনে নিয়ে যাওয়া হল। একটা মস্তবড় ইঁদারা। তার ধারে ধারে আট দশটা বড় বড় কাঠের বালতি রাখা। ওঙ্গা বলল—এই বালতিগুলোয় জল ভরে ভরে ক্ষেতে ছিটোতে হবে। ক্ষেত জলে ভেজাতে হবে।

—অত বড় ক্ষেত—এ তো অনেকদিন লাগবে। শাঙ্কো বলল।

—যতদিন লাগে লাগুক। তবে তোমাদের ভাগ্যি যদি ভালো হয় তবে হয়তো ততদিনে বৃষ্টি শুরু হবে। তাহলেই ক্ষেত ভেজানোর কাজ তখন বন্ধ হবে। ওঙ্গা বলল।

—তাহলে এখনই কাজ আরম্ভ করতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ এখনই। দুপুরে একঘণ্টা বিশ্রাম। তখন এখানে এসে খেয়ে যাবে। ওঙ্গা বলল।

—আমরা তো ক্ষেত থেকে পালাতে পারি। হ্যারি আস্তে বলল।

—পায়ের ঐ বেড়ি নিয়ে? সাত পাও যেতে পারবে না। তার আগেই প্রহরীরা মেরে ফেলবে। কাজেই পালাবার ভাবনা ছাড়ো। ভুলে যেও না তোমরা

ক্রীতদাস। কর্তাসাহেবের সব হুকুম। মরে গেলেও সেই হুকুম মানতে হবে। একসময় আমরা দুজনেও এমনি অত্যন্ত কষ্টকর কাজ করেছি। দেখেছি সব সহ্য হয়ে যায়। সহ্য না হলে উপায়ও নেই। ওঙ্গা বেশ বিজ্ঞের মত বলল।

—ঠিক আছে। আমরা কাজ শুরু করছি। শাঙ্কো বলল।

—কিন্তু একটা কথা। পায়ে বেড়ি নিয়ে তো আমরা দ্রুত কাজ করতে পারবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ করতে হবে। ওঙ্গা বলল।

ফ্রান্সিসরা ইঁদারার ধারে গেল। দড়ি-বাঁধা দুটো বড় বালতি। শাঙ্কো আর বিস্কো দুটো বালতির দড়ি হাতে নিল। তারপর জল তুলতে লাগল। বালতিতে ঢালতে লাগল।

বাকি সবাই জলভর্তি বালতি নিয়ে ক্ষেতের দিকে চলল। রোদ চড়া নয় বলে বাঁচোয়া।

ফ্রান্সিস দেখল ক্ষেতের মাটি শুকনো খটখটে। এত দূরবিস্তৃত ক্ষেতের মাটি শুধু বালতির জলে ভেজানো কি সম্ভব? কিন্তু উপায় নেই।

কর্তাসাহেবের হুকুম।

ফ্রান্সিসই প্রথম বালতি থেকে জল ছিটোলো। মুহূর্তে জল শুষে গেল। তবে জল পড়ে মাটির রঙ কালো হল। ফ্রান্সিস বুঝল কালো মাটি। তার মানে তুলোর চাষ হয়।

মাটিতে জল ছিটোনো চলল। বেড়ি পায়ে এতবার ইঁদারা থেকে ক্ষেত-এ যাওয়া। সবাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। হাঁপাতে লাগল। কিন্তু ওঙ্গাদের কোনো হেলদোল নেই। ওরা নির্বিকারে দেখতে লাগল। রোদের তেমন তেজ নেই বলে ওদের কষ্টটা একটু কম হচ্ছিল।

ফ্রান্সিস এবার ভালো করে চারিদিকে তাকাল। দেখল চার-পাঁচজন সশস্ত্র প্রহরী দূরের চেস্টনাট গাছটার নীচে বসে আছে। পালাবার পথ বন্ধ।

ক্ষেতে জল ছিটোনোর কাজ চলল।

দুপুর হল। ওঙ্গা গলা চড়িয়ে বলল—খেতে চল।

ফ্রান্সিসরা হাঁপাতে হাঁপনাতে কয়েদঘরে ফিরে এল। প্রায় সবাই ঢক্ ঢক্ করে জল খেতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—এক্ষুনি অত জল খেও না। একটু জিরিয়ে নাও।

কিছু পরেই খাবার এল। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা চেয়ে চেয়ে রুটি মাংস খেল। সবজীর ঝোল খেল।

আবার কাজে নামা।

বিকেল পর্যন্ত জল ছিটোনোর কাজ চলল। ওঙ্গারা ঘুরে ঘুরে কাজ দেখতে লাগল। কেউ বসে পড়লে উঠিয়ে দিতে লাগল। বোঝাই গেল কাজের সময় বিশ্রাম পাওয়া যাবে না।

ওঙ্গার উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল—এবার কয়েদঘরে চলো।

তখনই পার্তাদো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। ওঙ্গারা ছুটে পার্তাদোর কাছে গেল। পার্তাদো ওদের সঙ্গে কী কথাবার্তা বললেন। তারপর বাড়ির ভেতর চলে গেলেন। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকালেনও না। ক্ষেতের ধারে চেস্টনাট গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীরাও ফিরে এল।

দুপুরের মতো এবারও সবাই পরিশ্রান্ত। অনেকেই হাঁপাচ্ছে। কয়েকজন শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসের হুঁশিয়ারিতে কেউ তক্ষুণি জল খেল না। একটু জিরিয়ে নিয়ে জল খাওয়া চলল।

বিকেলের খাবার দেওয়া হল। কলা আর আটার পিঠে। তাই ফ্রান্সিসরা গোগ্রাসে গিলল।

কয়েদঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

হ্যারি শুয়ে পড়েছিল। হঠাৎ শুয়ে থেকেই হ্যারি হো হো করে হেসে উঠল। হ্যারি কখনও এরকম হাসে না। বন্ধুরা অবাক। ফ্রান্সিসের পাশেই হ্যারি শুয়ে পড়েছিল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে হ্যারির মুখের ওপর ঝুঁকে বলে উঠল—

—হ্যারি কী হয়েছে? তোমার শরীর ভালো তো?

হ্যারি উঠে বসল—জানো তো আমি শরীরের দিক থেকে দুর্বল। খুবই পরিশ্রান্ত লাগছে।

—তুমি পরিশ্রম সহ্য করতে পারবে? ফ্রান্সিস বলল।

—এই পরিশ্রম আর কতদিন? হ্যারি হেসে বলল।

—তার মানে? ফ্রান্সিস কথাটা শুনে বেশ অবাক হল।

—ইঁদারা কি সমুদ্র না নদী? হ্যারি আবার হেসে বলল।

—অ্যাঁ? ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। গলা চড়িয়ে বলল—সাবাস হ্যারি—আমি এটা আগে ভাবতেই পারি নি। শুধু পরিশ্রম কষ্টের কথা ভেবেছি। এবার ফ্রান্সিস সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—বেশ দ্রুত ইঁদারা থেকে জল তুলতে থাকো। তাড়াতাড়ি ইঁদারার জল শেষ কর। তাহলেই এই অমানুষিক খাটুনি থেকে মুক্তি।

এবার সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারল। বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—হো—হো—হো। প্রহরীরা ছুটে এল। ভাবল বন্দীদের মধ্যে বোধহয় মারামারি লেগেছে। ফ্রান্সিসরা হাসতে লাগল। প্রহরীর বুঝল তেমন কিছু না। ওরা নিশ্চিন্ত মনে পাহারা দিতে লাগল।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর কোলা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—তোমরা হো হো করছিলে। কী ব্যাপার?

—আরে বাবা ইঁদারার জল তো অঢেল নয়। দিন কয়েকের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। তখন আর জল উঠবে না। কাদামাটি উঠবে।

—তখন ঐ কাদামাটিই তুলতে বলবে। ফ্রান্সিস বলল—কিন্তু সেটাই বা কতদিন? তারপর তো শুধুই মাটি।

—তা ঠিক। আমরা এটা ভাবিনি। তাহলে তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জল তুলে ফেলতে হয়। কোলা বলল।

—সে কথাই সবাইকে বলছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—এটা করতেই হবে। কোলা বলল। তারপর বলল—এখানে আমাদের দেশের লোকও আছে।

—ওঙ্গাই তো তোমাদের দেশের লোক। ফ্রান্সিস বলল।

—একবার ওদের বলে দেখবো? যদি ওরা আমাকে মুক্তি দিতে পারে। কোলা বলল।

—অসম্ভব। তোমার দেশের কেউ যদি তোমাকে পালাতে দেয় তাহলে সে পার্তাদোর চাবুক খেয়ে মরে যাবে। এসব বড় সাংঘাতিক জায়গা। কেউ একটু ওদিক করলে আর রক্ষা নেই। বেঘোরে মরতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি ঠিক বলেছো। এখান থেকে পালানো অসম্ভব। কোলা বলল। তারপর শুতে চলে গেল।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। তখনই পায়ের দিকে তাকাল। মশালের আলোয় দেখল—লোহার বেড়িতে ঘষা লেগেলেগে ঘা মতো হয়ে গেছে। জলের বালতি নিয়ে ছুটোছুটিতে আরো ঘা বাড়বে। পাশেই হ্যারি ঘুমিয়ে আছে। ফ্রান্সিস হ্যারির পায়ের দিকে তাকাল। হ্যারির পায়েরও এক অবস্থা। ওষুধ চাই। পার্তাদোকে বৈদ্যির কথা বলতে হবে। মারিয়াকেও দিনে একবার ওদের কাছে আসতে দিতে বলবে।

সেদিন জল ছিটোনোর কাজ সেরে ফ্রান্সিসরা সবে বিকেলের খাবার খাচ্ছে তখনই পার্তাদো কয়েদঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। প্রহরীরা মাথা নুইয়ে সম্মান জানান।

—কেমন আছো তোমরা? একটু হেসে পার্তাদো বললেন।

—ভালো নেই। ফ্রান্সিস কথাটা বলে দরজার কাছে গেল।

—কেন? খাবার দাবার তো যথেষ্ট দেওয়া হচ্ছে। পার্তাদো বললেন।

—ক্ষেতে জল ছিটোনো অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ। শাঙ্কো বলল।

—পরিশ্রমের জন্যেই তো তোমাদের কিনে এনেছি। আমার লোক দিয়েই যদি হবে তাহলে আর তোমাদের আনলাম কেন!

—পরিশ্রম তো করতেই হবে। কিন্তু তার জন্য তো শরীরটাকেও সুস্থ রাখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? তোমাদের কারো অসুখ করেছে? পার্তাদো বললেন।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস পা দেখিয়ে বলল—লোহার বেড়ির ঘষায় আমাদের ঘা হয়ে গেছে।

পার্তাদো তাকিয়ে দেখলেন। মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করলেন। বললেন—বৈদ্যি পাঠিয়ে দেব।

—পায়ের বেড়ি খুলে ফেললে হয় না? শাঙ্কো বলল।

—না। ওটি হবে না। পার্তাদো মৃদু হেসে বললেন।

এবার ফ্রান্সিস বলল—একটা কথা বলছিলাম।

—বলো। পার্তাদো ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকালেন।

—বলছিলাম—রাজকুমারী মারিয়াকে বিকেলবেলা মানে আমাদের কাজের শেষে যদি এখানে একবার—সারাদিনেই একবার আসতে দেন তাহলে ভালো হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের রাজকুমারী ভালো আছে। আমার স্ত্রীর খাস সহচরী হয়ে আছে। সহচরী হিসেবে অমন শিক্ষিতা মেয়ে তো পাওয়া যায় না। পার্তাদো হেসে বললেন।

—সেটাই ওর মুখ থেকে শুনতে চাই। ও নিজেও আমাদের জন্য চিন্তায় থাকে। আমাদের দেখলে, আমাদের সঙ্গে কথা বললে ওর মনটাও ভালো থাকে। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের অনুরোধের দেখছি সীমা নেই। পার্তাদো আবার হেসে বললেন।

—এটাই শেষ অনুরোধ। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। দেখছি। পার্তাদো বললেন।

পরদিন সকালের খাবার খাচ্ছে ফ্রান্সিসরা। তখন বদ্যি এল। গায়ে কালো রঙের বিরাট আলখাল্লা। মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ। সব সাদা। গলায় নানারঙের পাথরের মালা। হাতে ঝোলানো কাপড়ের ঝোলা।

কয়েদঘরের দরজা খুলে দেওয়া হল। বদ্যি ঝোলা থেকে দুটো চিনেমাটির বোয়াম বের করল। আঠা-আঠামত কালচে মলম বের করল। দুটো মশাল। তারপর ফ্রান্সিসদের পায়ের ক্ষতে লাগাতে লাগল। শাঙ্কোকে প্রথমে লাগাল। উরি বাবা! কী জ্বলুনি! শাঙ্কো প্রায় লাফাতে লাগল। একটু পরেই জ্বলুনি কমল। কোনো জ্বালা যন্ত্রণা নেই। সকলেরই এক অবস্থা হল।

বদ্যি হেসে বলল—খুব কড়া ওষুধ। লোহার বেড়ির ক্ষত এই ওষুধে অনেকটা সেরে যাবে। সবটা সারবে বিশ্রাম পাবার পর। অবশ্য যদি তোমাদের কপালে বিশ্রাম জোটে। সকলেরই কষ্ট যন্ত্রণা মোটামুটি কমল। বদ্যি ঝোলা তুলে চলে গেল।

এবার কাজ। ক্ষেতে জল ছিটোনো। জল ছিটোনোর কাজ চলল দুপুর পর্যন্ত। তারপর খাওয়া। আবার ক্ষেতে নামা। বিকেলের দিকে ছুটি মিলল।

কয়েদঘরে ফিরে সবাই কমবেশি হাঁপাতে লাগল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো?

শাঙ্কো এগিয়ে এল।

—ইঁদারার জলের অবস্থা কী দেখলে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—অসম্ভব। এত গভীর ইঁদারা আর এত জল যেন সমুদ্রের জল। কবে ঐ জল ফুরোবে বলা কঠিন। শাঙ্কো বলল।

এমনসময় মারিয়া এল। পেছনে একটি কৃষ্ণাঙ্গিনী মেয়ে। বোঝা গেল পার্তাদো মারিয়াকে পাহারার ব্যবস্থাও রেখেছে।

মারিয়া দরজার কাছে এল। ফ্রান্সিস উঠে দরজার কাছে গেল।

—তোমাদের খুব খাটাচ্ছে? মারিয়া জানতে চাইল।

—ক্রীতদাস দিয়ে তো খাটানোই হয়। তবে শুনে নিশ্চিন্ত হলাম তুমি নাকি কর্ত্রীর সহচরী হয়েছো? ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—হ্যাঁ। তবে ক্রীতদাসী তো। সাবধানে থাকতে হয়। বেশি বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়। মারিয়া বলল।

—এ ব্যাপারে খুব সাবধানে থেকো। ফ্রান্সিস বলল।

—শুনলাম বদ্যি এসেছিল। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। বেড়ির ঘষায় পা ছুলে গিয়ে—ফ্রান্সিস বলল।

—ওষুধ দিয়েছে তো? মারিয়া জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। ওষুধে ভালো কাজ হয়েছে। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

ইতিমধ্যে কোলা উঠে এল। সে হেসে হেসে কৃষ্ণাঙ্গিনী মেয়েটির সঙ্গে হাতমুখ নেড়েই ইঙ্গিতে কথা বলতে লাগল। মেয়েটি এবার একটু হেসে কী বলে উঠল। কোলা চেঁচিয়ে বলল—ফ্রান্সিস এ আমার দেশের মেয়ে।

—তাহলে গল্প জুড়ে দাও। ফ্রান্সিস হেসে বলল। মারিয়াও হাসল। এবার কোলা অনর্গল কী সব বলতে লাগল। মেয়েটি কোনটার জবাব দিল কোনটার জবাব দিল না। এতে মারিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সিসের কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল। ফ্রান্সিস একবার কোলার দিকে দেখে নিয়ে হেসে বলল—মারিয়া, ওদের কথা বলতে দাও। আমাদের কথা থাক। মারিয়াও হেসে সম্মতি জানাল। কোলার কথার তখনও শেষ নেই।

মারিয়া ফিরে দাঁড়াল। মেয়েটিও মারিয়ার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। দুজনে সদর দরজার দিকে চলল। কোলা তখনও ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। ফ্রান্সিস বুঝল কোলা কতদিন পরে দেশের লোক পেয়েছে। ওর কথা তাই ফুরোচ্ছে না।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর কোলা ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস তখন চোখ বুঁজে শুয়ে পড়েছে। কোলা ওর মাথার কাছে বসল। বলল—মেয়েটির বাড়ি আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামে। একদিন গভীর রাতে ক্রীতদাস ব্যবসায়ী গুণ্ডারা ওদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে ওদের ধরে নিয়ে আসে। ঐ আমারগো বন্দরের ক্রীতদাসের হাটেই বিক্রি করে। ওদের কাজ হল যাঁতায় গম ভাঙা।

—একদিনেই এত কথা জেনে গেলে। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজেই হেসে বলল।

—জিজ্ঞেসটিজ্ঞেস করে জানলাম। কোলা হেসে বলল।

কালকেও তো ঐ মেয়েটি এলে বকর-বকর করবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কতদিন পরে দেশের লোক পেয়েছি। কোলা হেসে বলল।

—তাহলে এক কাজ কর। তোমরাই কথা বল। আমরা বলবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—না—না। তা কী করে হয়। তোমরাও বলবে আমরাও বলবো। কোলা বলল।

—তাহলে ব্যাপারটা জগাখিচুড়ি হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে—আমরা অল্প কথা বলবো।

—আরে না না।—ফ্রান্সিস হেসে উঠল—তোমরা বেশি কথাই বলো।

—ঠিক আছে। কোলা বলল।

—গতকাল বিকেলের খাবার খাওনি। ফ্রান্সিস বলল।

—মনেই ছিল না। কোলা হেসে বলল।

—না খেয়ে থেকো না। শরীরটা ঠিক রাখো। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন বিকেল নাগাদ জল ছিটোনোর কাজ সেরে সবাই কয়েদঘরে ফিরে এল। সবাই শুয়ে বসে বিশ্রাম করছে। কোলা কিন্তু একা ঠায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। চোখ বাড়ির পূব দেয়ালের দিকে। ওদিক দিয়েই মারিয়ারা আসে।

তখনই বিকেলের খাবার দেওয়া হল। ফ্রান্সিস ডাকল—কোলা। কোলা ফ্রান্সিসের দিকে ফিরে তাকাল।

কোলা দরজা থেকে সরে এসে খাবার খেতে লাগল। তখনই মারিয়ারা এল। কোলার তখনও খাওয়া শেষ হয়নি। ফ্রান্সিস ধমক দিয়ে বলল—কোলা—খাবার খেয়ে যাও। এবার কোলা খাওয়া শেষ করল।

ফ্রান্সিসের আগেই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ও গিয়ে দরজায় দাঁড়াল। মারিয়া বলল—ওষুধে কাজ হয়েছে?

—হ্যাঁ। জ্বালা যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে। তবে যতদিন ধরে বালতি টানাটানি করবো ততদিন সবটা সারবে বলে মনে হয় না। ফ্রান্সিস বলল।

—কর্তাসাহেব বদ্যিকে বলেছে সবাইকে কাজ করবার মতো সুস্থ করে তুলতে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় বদ্যি ওষুধ দিতে আসবে। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। আমাদের তো সুস্থ থাকতেই হবে। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল।

ততক্ষণে কোলা এসে দাঁড়িয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে। ফ্রান্সিস একবার হেসে ওদের দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। মারিয়ার সঙ্গে এটা ওটা নিয়ে কথা বলতে লাগল।

হ্যারি দরজার কাছে এগিয়ে এল। মারিয়াকে জিজ্ঞেস করল—রাজকুমারী, আপনি কেমন আছেন?

—আজ ভালোই আছি। কিন্তু তোমরা তো ভালো নেই। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ, গাধার খাটুনি খাটছি। হ্যারি বলল।

—হ্যারি তোমার শরীরের দিকে নজর রেখো। এত খাটুনি তুমি সহ্য করতে পারবে না। মারিয়া বলল।

—উপায় নেই। ক্রীতদাসত্ব এমনিই। হ্যারি বলল।

মারিয়া আর কিছু বলল না। ফ্রান্সিসও নিজেদের জায়গায় ফিরে এল। কোলা তখনও বক্‌বক্‌ করে চলেছে।

মারিয়া ঘুরে দাঁড়াল। কোলাদের কথা বন্ধ হল। মারিয়া আর কালো মেয়েটি চলে গেল।

ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ওর কাছে এল।

—ইঁদারার জলের অবস্থা কী? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—অফুরন্ত জল। জলের থই পাচ্ছি না। ইঁদারাটার সঙ্গে বোধহয় সমুদ্রের যোগ আছে।

—সমুদ্রের নোনা জলে চাষ হয়? তা নয়। পার্তাদো খুব ভেবেচিন্তে কাজ করে। পার্তাদো খুব গভীর করে ইঁদারা খুঁড়িয়েছে। যাতে জলের অভাব না হয়। কবে জল শেষ হবে। ততদিন পশুর মত খাটতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস তাহলে পালানো যাবে না। শাঙ্কো বলল।

—তুমিই ভেবে বের করো না কীভাবে পালানো যায়। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার মতো বুদ্ধি আমার নেই। তুমি যা বল তাই আমরা করি। এটা তোমারই কাজ। শাঙ্কো মাথা নেড়ে বলল।

—ভাবছি—বুঝলে? আমরা যাতে কেউ আহত না হই, মরে না যাই—সেভাবেই সব ভাবতে হচ্ছে। ফ্রান্সিস চিন্তিত স্বরে বলল।

—দেখ ভেবে। এই জীবন অসহ্য। শাঙ্কো বলে উঠল।

—মেনে নাও। তাহলে দেখবে কষ্টটা কম হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো আর কিছু বলল না। নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

জমিতে জল ছিটোনোর কাজ চলল। সারাদিন। মাঝখানে খাওয়ার জন্যে যেটুকু সময় বিশ্রামের।

সন্ধ্যেবেলা বৈদ্য আসে। ওদের পায়ের অবস্থা দেখে। ওষুধ দিয়ে যায়। রাতে জ্বালা যন্ত্রণা কমে। ওরা ঘুমুতে পারে। কিন্তু ক্ষত একেবারে সারে না। বোধহয় পার্তাদো এভাবেই ওদের দিয়ে কাজ করাতে চায়।

বিকেলবেলা মারিয়া আর মেয়েটি আসে। মারিয়া ফ্রান্সিসদের সঙ্গে কথাটথা বলে। কোলা আর মেয়েটির বকবকানিও চলে। এটা ফ্রান্সিসদের গা সওয়া হয়ে গেছে। কোলার দুই বন্ধুস্থানীয় কোলার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করে। কোলা কোন কথা বলে না। গুম হয়ে বসে থাকে।

সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর কোলা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—পাংলু এক অদ্ভুত কথা বলল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়েছিল। চোখ বুঁজেই বলল—পাংলু কে?

—কালো মেয়েটা। ওরা নাম পাংলু। কোলা বলল।

—অদ্ভুত নাম। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের দেশের বাড়িতে এমনি অদ্ভুত নামই হয়। কোলা একটু অভিমানের সুরে বলল।

—তা অদ্ভুত কথাটা কী? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—তুমিতো আমারগো বন্দরের কথা জানো। কোলা বলল।

—হ্যাঁ। ওখানেই তো ক্রীতদাসের হাট থেকে আমাদের কেনা হয়ে হয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—সেই আমারগো বন্দর থেকে বেশ কিছুটা দূরে রাজা আলফ্রেডের ভাঙা দুর্গ আছে। তার পাশেই থাকেন এক ইহুদী ভদ্রলোক। নাম সামুছা। ওখানকার জমিদার। আমারগো বন্দরের ক্রীতদাসের হাট থেকে পাংলুকে কিনেছিলেন। পাংলু সামুছার বাড়িতে ক্রীতদাসী হয়েছিল।

—অদ্ভুত ব্যাপারটা কী তাই বলো? ফ্রান্সিস বলল।

—বলছি। সামুছার বাড়ির কাছেই রাজা আলফ্রেডের ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গ। ঐ দুর্গে আছে রাজা আলফ্রেডের গুপ্ত ধনভাণ্ডার।

—গুপ্ত ধনভাণ্ডার? ফ্রান্সিস চমকে চোখ মেলল। দ্রুত উঠে বসল। বলল—ঐ ভাঙা দুর্গে?

—হ্যাঁ। জমিদার সামুছা সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করার জন্যে ভাঙা দুর্গের আনাচেকানাচে খুঁজে বেড়ায়। জমিদারি দেখে আর ধনভাণ্ডার খোঁজে। কোলা বলল।

—ঠিক আছে। আমি কয়েকটা বিষয় জানতে চাইছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কী কী বিষয় বলো। কোলা বলল।

—জানবে কতকাল আগে রাজা আলফ্রেড রাজত্ব করতো। সামুছা কতদিন যাবৎ গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজছেন? তিনি কোন সূত্র পেয়েছেন কিনা। গুপ্ত ধনভাণ্ডার খোঁজার জন্য উনি কাউকে সাহায্য করতে রাজি কি না। ফ্রান্সিস বলল।

—এতসব ব্যাপার পাংলু বলতে পারবে? কোলা সংশয় প্রকাশ করল।

—তুমি জিজ্ঞেস তো করো। সামুছার বাড়িতেই ও কাজ করত। কাজেই ভেতরের অনেক খবর ওর পক্ষে জানা সম্ভব।

—দেখি কথা বলে। কোলা মাথা নেড়ে বলল।

পরের দিন বিকেলে পাংলু মারিয়ার পেছনে পেছনে এল। কোলা আগে থেকেই লোহার ফোকরওয়ালা দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল।

ফ্রান্সিস বলল—পাংলুর কাছ থেকে কিছু দরকারি কথা কোলাকে জানতে বলেছি। কোলা সেসব জানুক। আমরা বেশি কথা বলবো না।

—বেশ। মারিয়া হেসে বলল। তারপর বলল—কী এমন দরকারি কথা?

—রাজা আলফ্রেডের গুপ্ত ধনভাণ্ডারের কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—ব্যস্। দেশে ফেরা হয়ে গেল। মারিয়া বলল।

—ব্যস্ত হচ্ছো কেন। দেখাই যাক না। হদিশ করতে পারি কি না। ফ্রান্সিস বলল।

—গুপ্ত ধনভাণ্ডার কি এখানে? মারিয়া জানতে চাইল।

—না। আমারগো বন্দর থেকে কিছুদূরে রাজা আলফ্রেডের ভগ্নদুর্গে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো আমারগো বন্দরে যেতে হবে। যাবে কী করে? মারিয়া বলল।

—পালাবো। ফ্রান্সিস গলায় জোর দিয়ে বলল।

—পারবে? মারিয়া বলল।

—পারতে হবে। ক্রীতদাস হয়ে বাকি জীবন কাটাবো নাকি? ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। মারিয়া বলল।

ওদিকে কোলা আর পাংলুর কথা শেষ হয় না। ফ্রান্সিস মারিয়া দুজনেই চুপ করে রইল। কোলা আর পাংলু দেশোয়ালি ভাষায় তখনও কথা বলে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে মারিয়া আর পাংলু ফিরে গেল। কোলা সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

—কোলা বসবে চলো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর নিজের জায়গায় এসে বসল। কোলা এসে পাশে বসল।

—এবার বলো পাংলু কী বলল? ফ্রান্সিস বলল।

—দেখলাম ও অনেক কিছু জানে। কোলা বলল।

—তাহলে বলো রাজা আলফ্রেড কতকাল আগে ওখানে রাজত্ব করতো?

—সামুছা কতদিন যাবৎ গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—সেটা পাংলু বলতে পারল না। তবে যখন থেকে সামুছার বাড়িতে ক্রীতদাসী হয়ে এল তখন থেকেই দেখেছে সামুছা প্রতি রোববার নেভানো মশাল নিয়ে ভাঙা দুর্গের দিকে যায়। বোধহয় ওখানে চক্‌মকি পাথর ঠুকে মশাল জ্বালিয়ে গুপ্ত ধনভাণ্ডার খোঁজে। কোলা বলল।

—হুঁ। তাহলে খুব বেশিদিন নয়। আচ্ছা সামুছা কি এ ব্যাপারে কারো সাহায্য নিয়েছিল? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—পাংলু বলল—একজন স্পেন দেশের লোক নাকি একটা কি ছবির কাগজ নিয়ে এসেছিল। সামুছার সঙ্গে সেও কিছুদিন ভাঙা দুর্গে যেতো। কিন্তু দুজনের ঝগড়া হয়। স্পেনীয় লোকটি পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গিয়েছিল। কোলা বলল।

—তার মানে বখরায় বনেনি। ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ রকমই কিছু হবে। কোলা বলল।

—বখরা না চাইলে সামুছা একসঙ্গে ধনভাণ্ডার খুঁজতে রাজি হতো। এটা

আমার জানা দরকার ছিল। পাংলুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটা পাংলুকে বলো। ফ্রান্সিস বলল।

—বলবো। তাহলে তোমার সব জানা হল। কোলা বলল।

—মোটামুটি। এখনও অনেক কিছু জানতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু এসব জেনে তোমার কী হবে? কোলা বলল।

—আমি ঐ গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি কি পাগল হয়েছো? কোলা হেসে বলল—এখান থেকে বেরোতে পারলে তবে তো গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজবে।

—এখান থেকে পালাবার ছক কষেছি। ফ্রান্সিস বলল।

কোলা চমকে উঠল। বলল—তোমার ছক কষা হয়ে গেছে?

—প্রায়। আর কিছুদিন এখানকার ব্যবস্থাটা দেখতে হবে। কারণ রাতে তো আমরা বেরোতে পারি না। কাজেই জানি না বড় গেট-এ দরজায় কতজন প্রহরী থাকে। এটা জানতে হবে। গেট-এর দরজায় ক'টা তালা লাগানো থাকে। বাইরে ভেতরে দুদিকেই কি তালা লাগানো হয়? ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা কী করে জানবে? কোলা বলল।

—একটু রাতে পাংলু বেরিয়ে সেটা জেনে আসবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের রাজকুমারীও জানতে পারে। কোলা বলল।

—না রাজকুমারী গেলে প্রহরীদের সন্দেহ হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে পাংলুকে একথা বলতে হয়। কোলা বলল।

—হ্যাঁ। বলবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে মুক্ত জীবন পাবো? কোলা বেশ আবেগের সঙ্গে বলে উঠল।

—হ্যাঁ পাবে। তবে এখনই একেবারে নিশ্চিন্ত থেকো না। সব খবরাখবর এখনও নেওয়া হয়নি। ফ্রান্সিস বলল।

একটু চুপ করে থেকে কোলা বলল—আমি একাই পালিয়ে যাবো।

—পাগল হয়েছো! ঐ কাজটিও করতে যেও না। বেঘোরে মরবে। ফ্রান্সিস কোলাকে সাবধান করল।

—না। আমি পারবো। আমি অনেক জোরে ছুটতে পারি। কোলা বলল।

—পায়ের ঐ বেড়ি নিয়ে? পারবে? ফ্রান্সিস সংশয় প্রকাশ করল।

—হ্যাঁ পারবো। কোলা গলায় বেশ জোর দিয়ে বলল।

—ঠিক আছে। কিছুদিন অপেক্ষা করো। দেখি না ছক খাটে কি না। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার অতো ধৈর্য্য নেই। তোমার ছক নাও খাটতে পারে। কোলা বলল।

—হ্যাঁ তা পারে। তবে একবার চেষ্টা তো করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—গেট ডিঙিয়ে পালাতে গেলে ঐ প্রহরীরা নিরস্ত্র আমাদের মেরে ফেলবে। কোলা বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস মাথা ওঠা নামা করে বলল।

পরদিন ফ্রান্সিসরা সকালের খাবার খাচ্ছে তখনই পার্তাদো এল। কয়েদঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—শোন। আমি বাইরে যাচ্ছি। কয়েকদিন পরে ফিরবো। তোমরা ভালা হয়ে থাকবে। কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না। করলে জীবন যাবে।

ফ্রান্সিসরা কেউ কিছু বলল না। পার্তাদো বললেন—আজ থেকে ক্ষেতের কাজ বন্ধ। আমার জমির দুপাশে যে জঙ্গল রয়েছে সে দুটো জঙ্গল সাফ করতে হবে। আমি ক্ষেত বাড়াবো। তোমাদের কাজ হল দুধারের জঙ্গল সাফ করা। ঠিক আছে। ওঙ্গারা তোমাদের দেখিয়ে দেবে। ভালো কথা দুধারের জঙ্গলের শেষে তিনজন তিনজন করে দেহরক্ষী থাকবে যাতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তোমরা পালাতে না পারো। ঠিক আছে।

ফ্রান্সিসরা কোন কথা বলল না। পার্তাদো ওঙ্গাদের আঙুল নেড়ে ডাকলেন। ওঙ্গারা এগিয়ে এল। ওদের দুহাতে তিনচারটে করে কুড়ুল।

পার্তাদো আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন।

কয়েদঘরের দরজা খুলে দেওয়া হল। কুড়ুল কম পড়ে গেল। ওঙ্গা বলল—কালকে আরো কুড়ুল পাবে। আজকে যে কটা পাচ্ছো তাই দিয়ে কাজ চলুক।

ফ্রান্সিসরা এই ভেবে খুশি হল যে এখন কটা দিন জঙ্গলের ছায়ার গাছ কাটা খুব একটা পরিশ্রমের কাজ নয়।

দুপাশে দু'দল ভাগ হয়ে গেল। শুরু হল গাছ আগাছা কাটা। ফ্রান্সিস এক ফাঁকে জঙ্গল ছাড়িয়ে এল। দেখল তিনজন সশস্ত্র দেহরক্ষী এক ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ও চলে এল। দেহরক্ষীরা ছাড়াও রয়েছে ওঙ্গারা দু'জন। কড়া পাহারারই ব্যবস্থা হয়েছে।

দুপুরে খাওয়া। একটু বিশ্রাম। তারপরেই গাছ কাটা।

পরদিন দুপুরের দিকে আকাশ অন্ধকার করে মেঘ জমতে লাগল। হ্যারি গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে এটা লক্ষ্য করল। ও খুশির স্বরে বলে উঠল—ফ্রান্সিস—সৌভাগ্য। আকাশে মেঘ জমেছে।

—বলো কি? ফ্রান্সিস গাছের মাথার ওপর দিয়ে তাকাল। সত্যিই কালো মেঘের জটলা।

একটু পরেই শুরু হল বিদ্যুৎ চমকানো আর ঘন ঘন বাজ পড়া। তারপরই শুরু হল বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টি। একটু পরেই মুষলধারে বৃষ্টি। গাছ কেটে ফেলায় ওপরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসরা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল। গাছ কাটা বন্ধ।

ওঙ্গা গলা চড়িয়ে বলল—কাজ চালাও। শাঙ্কো বলল—ভাই কতদিন গরমে সেদ্ধ হয়েছি। এবার বৃষ্টিতে ভিজে একটু ঠাণ্ডা হতে দাও। ওঙ্গা বলল—না, না। কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

ফ্রান্সিসরা আর আপত্তি করল না। আবার গাছ কাটতে লাগল। তখনও বৃষ্টি চলছে।

বিকেল হল। ওঙ্গা গলা চড়িয়ে বলল—এবার সবাই ক্ষেতের ওপর এল। ক্ষেতের মাটি তখন প্রায় কাদা হয়ে গেছে। ঐ কাদার ওপর দিয়েই ওরা হেঁটে চলল কয়েদঘরের দিকে। আজকে ওরা খুশি। দুএকজন কাদা ছোঁড়াছুঁড়িও করল। কাল থেকে আর জল ছিটোতে হবে না।

ওঙ্গা বলল—কর্তাসাহেব থাকলে খুব খুশি হত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজত।

বৃষ্টির জোর কমে গেছে। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। চারদিক বেশ অন্ধকার হয়ে গেল। আকাশের মেঘ কাটে নি। রাতেও বৃষ্টি হতে পারে।

ফ্রান্সিসদের বিকেলের খাবার তখন খাওয়া হয়ে গেছে। কোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবার খেল।

মারিয়া আর পাংলু এল। মারিয়া হেসে ফ্রান্সিসকে বলল—তোমাদের আর জল ছিটোতে হবে না। ফ্রান্সিসও হাসল। বলল—হ্যাঁ। বৃষ্টি হতে বেঁচে গেলাম। ওদিকে কোলা পাংলুর সঙ্গে কথা বলছে।

ফ্রান্সিস একটু গলা নামিয়ে বলল—একটা খুব দরকারি কথা বলছি। বাড়িতে কোথায় অস্ত্রশস্ত্র মানে ঢাল তরোয়াল রাখা হয় কোথায়—সেই ঘরটা একবার দেখবে। সাবধান প্রহরীদের যেন কোনরকম সন্দেহ না হয়। খুব গোপনে কাজটা করতে হবে। পারবে তো?

—এটা কী এমন কাজ? মারিয়া বলল।

—কাউকে জিজ্ঞেস করে জানতে যেও না। তুমি একাই খুঁজে দেখবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল।

রাতের খাওয়া সেরে কোলা ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস যথারীতি চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। বলল—

—পাংলুকে বলেছো?

—হ্যাঁ। ও বলেছে রাতে ও লক্ষ্য করবে। কোলা বলল।

—ভালো কথা। ফ্রান্সিস বলল।

রাতে বৃষ্টি হল।

পরের দিন আবার জঙ্গল কাটা চলল।

বিকেল হল। ক্ষেতে কাদা আরও বেড়েছে। ওরা ক্ষেত পার হয়ে কয়েদ ঘরে এল।

তখনও ফ্রান্সিসদের বিকেলের খাবার খাওয়া হয়নি। মারিয়ারা একটু তাড়াতাড়ি এল। কোলা দরজায় দাঁড়িয়েই ছিল। পাংলুর সঙ্গে কথা বলছিল। ফ্রান্সিস একবারে তাকিয়ে দেখল। কিছু বলল না। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল—

—খোঁজ পেলে?

—হ্যাঁ। মারিয়াও আস্তে বলল—সদর দরজা দিয়ে ঢুকে ডানহাতি প্রথম ঘরটাই অস্ত্রাগার—তরোয়াল ঢাল চাবুক লোহার শেকল এসব রাখা।

—ঘরটা কি বন্ধ থাকে? ফ্রান্সিস বলল।

—না। দরজা ভেজানো থাকে। ঠেললেই খুলে যায়। মারিয়া বলল।

—কোন প্রহরী থাকে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না। ফ্রান্সিস হেসে বলল—সবই অনুকূল। এবার হুক কাজে লাগানো।

রাতে কোলা এল।

—পাংলুকে জিজ্ঞেস করেছো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। ও বলল—শুধু ভেতর থেকে তালা দেওয়া থাকে। বাইরে কোন তালা লাগানো হয় না। কোলা বলল।

—কাজটা সহজ হয়ে গেল। ফ্রান্সিস হাঁফ ছেড়ে বলল।

—তোমরা কি পালাতে পারবে? কোলা জিজ্ঞেস করল।

—এখনই ঠিক বলতে পারছি না। আগে কাজ শুরু করি। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা কবে পালাতে পারবে কে জানে। আমি একাই পালাবো। কোলা অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বলল।

—সাবধান। এভাবে বিপদ ডেকে এনো না। ফ্রান্সিস বলল।

কোলা গম্ভীরগলায় বলল—আমি তোমাদের বিশ্বাস করি না। কথাটা বলে ও চলে গেল। আর একটা কথাও বলল না। কথাটা ফ্রান্সিসের ভালো লাগল না। ও নিজের সম্পর্কে এরকম কথা ও কখনও শোনেনি। ও ভাবল কোলার ওপর রাগ না করে ওকে বুঝিয়ে বলবে।

জঙ্গল প্রায় অর্ধেক কাটা হয়ে গেল। শুধু কাটা গুঁড়িগুলো উঁচিয়ে আছে।

গাছকাটার কাজ সেরে ফ্রান্সিসরা ফিরে এল। আসতে আসতে ওঙ্গা বলল—গাছ কাটা হলে তোমাদের চাষের কাজে নামতে হবে।

—এই ক্ষেতে কীসের চাষ হয়? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—তুলো। ওঙ্গা বলল।

—তুলো? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। দেখছো না এখানে মাটির রঙ ঙ্গলো। ওঙ্গা বলল।

ওরা কয়েদঘরে ফিরে এল।

ফ্রান্সিস কয়েকদিন যাবৎ লক্ষ্য করল কোলা রাতের খাওয়ার পর আর ওর কাছে আসে না। কাজ করতে করতেও কথা বলতে আসে না। কেমন গুম মেরে থাকে।

দু'দিন পরের ঘটনা।

সেদিন ফ্রান্সিসরা গাছ আগাছা কাটছে। ফ্রান্সিস ভাবল দেখে আসি জঙ্গলটা কত বড়। ও কুড়ুল রেখে গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে হাঁটতে লাগল।

বন শেষ। বনের বাইরে এল। ওকে দেখে দেহরক্ষীরা তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে

এল। ফ্রান্সিস দুহাত তুলে ওদের থামাল। তারপর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। কাজের জায়গায় এল।

—কোথায় গিয়েছিলে? ওঙ্গা জানতে চাইল।

—জঙ্গলটা দেখলাম। জঙ্গলের গাছ আর বেশী বাকি নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—পালাতে চেয়েছিলে? ওঙ্গা বলল।

—না। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

—সেই চেষ্টাও কোরো না। সাহেবকর্তার হুকুম কেউ পালাতে গেলে মেরে ফেলবে। বনের শেষে দেহরক্ষীরা আছে। ওঙ্গা বলল।

—জানি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস কাজে লাগল। হঠাৎ ওঙ্গা আর তার সঙ্গীর চিৎকারে ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। দেখল কোলা বনের মধ্যে দিয়ে ছুটে পূবমুখো যাচ্ছে আর ওঙ্গারা চিৎকার করে বলছে—পালাচ্ছে—পালাচ্ছে।

গাছের কাটা গুঁড়িতে পা লেগে কোলা মুখ থুবড়ে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটল। উঁচিয়ে থাকা গাছের গুড়ি দুপায়ে বেড়ি। কোলা জোরে ছুটতে পারছিল না।

ফ্রান্সিসও কোলার পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল। চিৎকার করে বলতে লাগল—কোলা পালাবার চেষ্টা করো না। ফিরে এসো। কোলা—আ। কিন্তু কোলা ছুটে জঙ্গলের বাইরে চলে এল। ফ্রান্সিস দেখল চারজন দেহরক্ষী মধ্যে কোলা একজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে খোলা প্রান্তর দিয়ে ছুটল। কিন্তু পায়ে বেড়ি। ও আর কত জোরে ছুটবে? প্রান্তরের প্রায় মাঝামাঝি এসেছে দেহরক্ষীরা ওকে ধরে ফেলল। ছুটন্ত কোলার মাথায় এক দেহরক্ষী কোপ বসাল। অন্যজন ওর বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল। কোলা ঘাসের ওপর গড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে এই দৃশ্য দেখল। কোলা বারকয়েক এপাশ ওপাশ করে স্থির হয়ে গেল। ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। বন্ধুরাও তখন ছুটে এসেছে। কিন্তু ওঙ্গা আর সঙ্গী দু'হাত ছড়িয়ে ওদের বনের বাইরে আসতে দিল না।

—ফ্রান্সিস—শাঙ্কো অস্ফুটস্বরে ডাকল। ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। শাঙ্কো ওভাবেই বলল—এখন পালানো যায় না?

—পায়ে বেড়ি নিয়ে কত জোরে আর ছুটবে। দেখছো না কোলার কী অবস্থা হল। ফ্রান্সিস বলল।

দেহরক্ষীরা কোলার মৃতদেহ দু'হাত ধরে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসতে লাগল। উপস্থিত সবাই তখন স্তব্ধ। কোলার মৃতদেহ দেখে বন্ধুদের অনেকের চোখেই জল এল। শুধু ফ্রান্সিস অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলল—আমি কোলাকে অনেকবার মানা করেছি। ও শুনল না।

বনের মধ্যে দিয়ে কোলার মৃতদেহ টেনে হিঁচড়ে দেহরক্ষীরা নিয়ে আসতে লাগল।

ওঙ্গা গলা চড়িয়ে বলল—আজকের মতো কাজ শেষ। ফিরে চলো সব।

কাদাটে ক্ষেতের ওপর দিয়ে কোলার মৃতদেহ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল ওরা। কোলার দেহ কাদায় মাখামাখি।

মৃতদেহ এনে কয়েদঘরের সামনে ফেলে রাখা হল।

ফ্রান্সিসদের কয়েদঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বাড়ির ভেতর থেকে কৃষ্ণকায়া পরিচারিকা এল। কিন্তু তাদের চোখেমুখে কোন দুঃখের চিহ্ন দেখা গেল না। কারণ ওরা এসব দেখে অভ্যস্ত।

কিছু পরে মারিয়া আর পাংলু এল। কোলার কাদামাখা মৃতদেহ দেখে পাংলু হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। মারিয়াও দুচোখ দুহাতে চেপে কান্না থামাল।

ফ্রান্সিসদের খুব তাড়াতাড়ি প্রহরীরা কয়েদঘরে ঢুকিয়ে দিল। পাছে কোলার এই নির্মম মৃত্যু দেখে ফ্রান্সিসরা ক্ষেপে ওঠে।

কয়েদঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। বার বার কোলার কথা মনে হতে লাগল। কোলার এই মৃত্যু ও মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না। কী হত কোলাকে না মেরে যদি বাঁচিয়ে রাখা হত। ওকে তো কয়েদঘরেই বন্দী হয়ে থাকতে হত। কেন ওকে হত্যা করা হল?

গতরাতে ফ্রান্সিস অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পালাবার ছক কষেছিল। এবার সেসব গুছিয়ে ভাবতে লাগল।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডাকল। হ্যারি ওর পাশেই বসে। ফ্রান্সিস গলার স্বর নামিয়ে দেশীয় ভাষায় ওর পালানোর ছকের কথা বলতে লাগল। হ্যারি আর শাঙ্কো মাথা নীচু করে শুনতে লাগল।

সব শুনে হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—সাবাস ফ্রান্সিস।

—তাহলে পার্তাদো ফেরার আগেই ছক কাজে লাগাবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—সেটাই ইচ্ছে। কিন্তু পার্তাদো কবে ফিরবে ওঙ্গাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওঙ্গা বলতে পারল না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক। পালানোর রাতটা ঠিক কর। হ্যারি বলল।

—সেটাই ভাবছি। ফ্রান্সিস বলল।

—অনেক রাত হল। ঘুমিয়ে পড়। হ্যারি বলল।

তিনজনে শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো ভাবল—ফ্রান্সিস অনেক দায়িত্ব দিল। পারবো? পরক্ষণেই ভাবলো—পারতেই হবে। এই ক্রীতদাসের জীবন থেকে মুক্তি চাই। যে কোন মূল্যে!

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিসরা সবে সকালের খাবার খেয়েছে পার্তাদো এসে হাজির। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পার্তাদো গলা চড়িয়ে বলল—কেমন আছো সব?

—একজন আপনার দেহরক্ষীর হাতে মারা গেছে। বাকিরা বেঁচে আছি। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। ওঙ্গার কাছে সব শুনলাম। আমি তো বলেছি পালাবার চেষ্টা করবে না। ওটা করলে মরতে হবে। পার্তাদো বলল।

—যে ভাবে বেঁচে আছি। মরে যাওয়াই ভালো। হ্যারি বল।

—না না। শুধু শুধু মরতে যাবে কেন? দেখছি তো—ভালোই আছো তোমরা। পার্তাদো একাই হেসে বলল।

কেউ কোন কথা বলল না। কোলার মৃত্যু দেখে সবাই রাগে ফুঁসছে। কিন্তু কথা বলা বৃথা। পার্তাদো ওদের মানুষ হিসেবে দেখে না। ক্রীতদাস হিসেবেই দেখে।

—আমি বলেছি তোমাদের মাংসটাংস দিতে—যাতে তোমরা গায়ে জোর পাও। পার্তাদো বলল।

এবার কেউ কোন কথা বলল না।

পার্তাদো চলে গেল।

—ফ্রান্সিস—পার্তাদো তো ফিরে এল। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। ছক অনুযায়ী কাজ চলবে। ফ্রান্সিস বলল।

বল কাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বিকেলে কাজের শেষে ফ্রান্সিসরা ফিরে আসছে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—শাঙ্কো, দেহরক্ষীরা এখনও ফেরে নি। সবাইকে বলে রেখেছি। ওঙ্গা আর তার সঙ্গী দরজা দিয়ে ঢুকছে। কাজে লাগো।

তারপর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বলল—সব সদর দরজায় চলো। একসঙ্গে।

সবাই বেশ ছুটেই সদর দরজার কাছে গিয়ে জড় হল। শাঙ্কো ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

দেহরক্ষীরা তখনই ক্ষেতের ওপর দিয়ে ফিরে আসছিল। দূর থেকে ফ্রান্সিসদের জটলা দেখে ছুটে এল। তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্রান্সিসদের সামনে এল ওরা। তখনও ওরা হাঁপাচ্ছে। একজন দেহরক্ষী এগিয়ে এল। বলল—কী ব্যাপার? তোমাদের তো কয়েদঘরে ঢোকার কথা। এখানে কী চাই?

—কর্তাসাহেবকে ডেকে দাও। কথা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কর্তাসাহেব তোমাদের মত ক্রীতদাস নয় যে ডাকলেই আসবে। অন্য রক্ষীটি বলল।

—কিন্তু একটা দরকারি কথা ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—কী কথা। রক্ষীটি বলল।

—তোমাকে নয়। কর্তাসাহেবকে বলব। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আমাকে বলো। আমি কর্তাসাহেবের কাছে গিয়ে বলছি। রক্ষী বলল।

—তাহলে শোন। গত দুদিন যাবৎ বদ্যি আসছে না। আমাদের পায়ের ক্ষত এখনও শুকোয়নি। আরো ওষুধ চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তোমরা কয়েদঘরে যাও। আমি গিয়ে বলছি। দেহরক্ষীটি বলল। তারপর ওরা বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরে ফিরে এল। বিকেলের খাবার খেল। তখনই মারিয়া আর পাংলু এল। পাংলুর চোখমুখ দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল পাংলু খুব কান্নাকাটি করেছে। ফ্রান্সিস মনে গভীর ব্যথা অনুভব করল। পাংলু চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

ফ্রান্সিস দেশীয় ভাষায় চাপাস্বরে বলল—মারিয়া আজ রাতে আমরা পালাবো। মারিয়া চমকে উঠল। একবার চারিদিক তাকিয়ে নিয়ে বলল—পারবে?

—আলবাৎ পারবো। এবার তোমাকে যা বলছি মন দিয়ে শোন। আজ রাতে ঘুমিয়ে পড়বে না। পাংলুকেও বলবে না ঘুমোতে। রাত গভীর হলে তোমরা দু'জনে সদর দরজার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমাদের অন্দরমহলে কোন প্রহরী থাকে?

—না। মারিয়া বলল।

—তারপর কান পেতে থাকবে বাইরে কুকুরের ডাক শোনার জন্য। ফ্রান্সিস বলল।

—এ বাড়িতে তো কুকুর নেই। মারিয়া বলল।

—দরকার নেই। কুকুরের ডাক শুনলেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসবে। দেখবে আমরা আছি। পাংলু দরজা বন্ধ করে অন্দরমহলে চলে যাবে। পাংলুকে সব বুঝিয়ে বলতে পারবে? ফ্রান্সিস বলল।

—অনেকদিন একসঙ্গে আছি। ইশারা ইঙ্গিতে পাংলু আমার কথা বোঝে। ওর কথাও আমি বুঝি। সেদিক থেকে কোন অসুবিধে হবে না। তবে একটা কথা বলছিলাম পাংলুকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো না। পাংলুও তো মুক্তি চায়।

—পাংলুকে সঙ্গে নিলে সমস্যায় পড়তে পারি। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি গেলে পাংলুও যেতে পারবে। আমার সঙ্গে থাকবে। কোনো বন্দরে ওকে নামিয়ে দিও। ওর সমস্যার সমাধান ওই করবে। মারিয়া বলল।

—বেশ। পাংলুকে বলো। ফ্রান্সিস বলল—যা বললাম ঠিক সেইমতো কাজ করবে। একটু এদিক ওদিক হলে জীবন সংশয় হবে।

—না-না। আমি আমার কাজ ঠিক পারবো। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে। আর একটা হাত বাঁধার কিছু দড়ি নিয়ে আসবে। অস্ত্র ঘরেই পাবে। ফ্রান্সিস বলল।

ওদিকে শাঙ্কো অস্ত্রঘরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। কান পেতে সব শুনছে।

কিছুক্ষণ পর বাড়ির দরজা খোলার শব্দ হল। শাঙ্কো বুঝল কেউ ঢুকল। দেহরক্ষীরা ঢুকল। অস্ত্রঘরের দরজা খুলল। দরজায় দাঁড়িয়ে থেকেই

ডাঁইকারে রাখা তরোয়ালগুলোর ওপর ওদের তরোয়ালগুলো ছুঁড়ে ফেলল। ঝন্‌ঝনাৎ শব্দ হল। শাঙ্কো তখন দেয়ালে প্রায় সেঁটে আছে। চার দেহরক্ষী চলে গেল। ঘরে ঢুকল না। ঘরে একটা মাত্র মশাল জ্বলছে। শাঙ্কোও ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ঢুকলেও ওরা শাঙ্কোকে দেখতে পেত না। একটু পরেই সদর দরজার কাছে হালকা পায়ের শব্দ শোনা গেল। শাঙ্কো বুঝল মারিয়া আর পাংলু ফিরে এল। পাংলু দরজা বন্ধ করে দিল।

শাঙ্কো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করল। তারপরে আস্তে আস্তে কোন শব্দ না করে পাঁচটা তরোয়াল তুলে নিল। বগলে চেপে ধরল। তারপর পায়ের বেড়ি চেপে ধরে দরজার কাছে গেল। কিছু শব্দ না করে বসে বসে আস্তে আস্তে যাওয়ার জন্যে ওর সময় লাগল।

নিঃশব্দে দরজা খুলল। বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর যতটা সম্ভব দ্রুত দেবদারু গাছগুলোর দিকে ছুটে গেল। সদর দরজার দুপাশেই লম্বালম্বা দেবদারু গাছ জায়গাটাকে বেশ অন্ধকার করে রেখেছে।

শাঙ্কো একটা একটা করে তরোয়াল যতটা সম্ভব দ্রুত দেবদারু গাছগুলোর আড়ালে লুকিয়ে রাখল। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে কয়েদঘরের দিকে চলল। কয়দঘরের সামনে প্রহরীরা তখন এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। শাঙ্কো বুঝল ওকে খোঁজা হচ্ছে।

শাঙ্কো কয়েদঘরের আলোর কাছে এসে দাঁড়াল। প্রহরীরা ভূত দেখার মতো লাফিয়ে উঠল। একজন প্রহরী তরোয়াল খুলে শাঙ্কোর কাছে ছুটে এল। বলল—গুনতে গিয়ে দেখি একজন কম। কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

—প্রস্রাব করতে। শাঙ্কো নির্বিকার মুখে বলল।

—কয়েদঘরে করলেই পারতে। প্রহরী বলল।

—ভীষণ পেয়েছিল। যাক গে—আমি তো এসে গেছি।

—ভেতরে ঢোক। প্রহরী গম্ভীরগলায় বলল।

শাঙ্কো কোন কথা না বলে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। প্রহরীরা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। মৃদুস্বরে বলল—ছকমতো কাজ হয়েছে? শাঙ্কো মৃদু হেসে বলল—পাঁচটা তরোয়াল দেবদারু গাছের আড়ালে। ফ্রান্সিসও মৃদুস্বরে বলল—সাবাস।

রাতের খাওয়ার পর পরিবেশক চলে গেল। ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল—প্রহরীরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলতে লাগল—ভাইসব—পালাবার ছক প্রত্যেককে বলেছি। সবাইকে সেইমতো কাজ করতে হবে। কোনরকম ভুল যেন না হয়। এবার সবাই শুয়ে পড়। কিন্তু কেউ ঘুমিয়ে পড়বে না। ছক ঠিকমতো খাটলে আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি। কাজ অনেকদূর এগিয়েছে। এবার শেষ কাজটা বাকি।

রাত গভীর হতে লাগল। কয়েদঘর নিঃস্তব্ধ। বেশ গভীর রাতে ফ্রান্সিস মৃদু স্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো কাছেই ছিল। বলল—বলো।

—সেই পুরনো কায়দাটাই কাজে লাগাতে হবে। সেই পেটব্যথা। প্রহরীদের ঘরে ঢোকানো। বন্দী কর। শুরু কর। ফ্রান্সিস বলল।

হঠাৎ শাঙ্কো চাপা চিৎকার শুরু করল। প্রায় সবাই উঠে পড়ল। শাঙ্কো বিছানার ওপর এপাশ ওপাশ করতে লাগল আর গোঙাতে লাগল। প্রহরী দু'জন ছুটে দরজার কাছে এল। ওরা বুঝে উঠতে পারল না কী করবে।

বিস্কো উঠে দরজার কাছে গেল। বলল—শিগগির বদ্যি ডাকো। আমাদের এক বন্ধু পেটের ব্যথায় মারা যাচ্ছে।

—এত রাতে বদ্যি কোথায় পাবো? একজন প্রহরী বলল।

—তাহলে বন্ধুটি কি মারা যাবে? বিস্কো বলল।

অন্য প্রহরীটি বলল—ও কিছুক্ষণ পরেই ঠিক হয়ে যাবে।

—ঠিক আছে। একবার এসে তো দেখ বন্ধুর অবস্থাটা।

তখনও শাঙ্কোর গোঙানি চলছে।

—দেখি তো কী ব্যাপার? চলো। একজন প্রহরী বলল।

দরজা খুলে একজন প্রহরী ঢুকল। অন্যজন দরজা ভেজিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—ঢুকল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে গলার কাছ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করে ছোরাসুদ্ধ হাতটা পিঠের নীচে রাখল। প্রহরীটি শাঙ্কোর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ছোরাটা ওর বুকে ঠেকাল। দাঁতচাপা স্বরে বলল—চুপ করে থাকো। চিৎকার করেছো কি মরেছো। দরজায় দাঁড়ানো প্রহরীটি বুঝল কিছু গণ্ডগোলে ব্যাপার। ও খাপ থেকে তরোয়াল খুলে ছুটে ঘরে ঢুকল। বিস্কো তৈরীই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে প্রহরীটির পেটে জোর ঢুঁ মারল। প্রহরীটি দেয়ালের গায়ে গিয়ে পড়ল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। দেয়ালে মাথা ঠুকে গেল। ও মেঝেয় বসে পড়ল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের নির্দেশমত ওর কোমরের ফেট্টি খুলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে লম্বা ফিতের মতো করে রেখেছিল। হ্যারি সেসব বের করল। শাঙ্কো একজন প্রহরীর হাত বাঁধল ঐ ফিতে দিয়ে। ফ্রান্সিস তার মুখ চেপে ফিতে বাঁধল। প্রহরীটি গোঁ গোঁ করতে লাগল। শাঙ্কো ওর গালে জোরে এক থাপ্পড় মারল। প্রহরীটির গোঁ গোঁ বন্ধ হল। অন্যটিরও হাত মুখ বাঁধা হল।

কয়েদঘরের দরজা খোলা।

মুক্তি।

ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল—আস্তে।

আস্তে আস্তে সবাই কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সদর দরজার মাথায় মশাল জ্বলছে। মশালের আলোর বাইরে এসে ওরা অন্ধকারে দাঁড়াল। শাঙ্কো দেবদারু গাছের নীচে ঢুকল। তরোয়ালগুলো বের

করে নিল। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল—কুকুরের ডাক। শাঙ্কো মুখের সামনে হাতের তালু রেখে ডেকে উঠল—ভৌ—ভৌ।

খট্ করে সদর দরজা খুলে গেল। মারিয়া আর পাংলু বেরিয়ে এল। ওদের সঙ্গে যোগ দিল।

—গেট এর দিকে ছোটো। দু'পা ফাঁক করে ছুটতে হবে। তাহলে বেড়িতে বেড়িতে লেগে শব্দ হবে না। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল।

মারিয়া হাত বাঁধার দড়ির টুকরোগুলো হ্যারিকে দিল।

দেউড়ির দুপাশে মশাল জ্বলছে। সেই আলোতে ফ্রান্সিস দেখল তিনজন প্রহরী পাহারা দিচ্ছে।

—তাড়াতাড়ি দেউড়ির সামনে চল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল।

দেউড়ির সামনে মশালের আলোয় প্রহরীরা অবাক। ওরা হকচকিয়ে গেল। তরোয়ালও বের করতে পারল না। ফ্রান্সিস একজনের বুকে তরোয়াল ঠেকিয়ে বলল—দরজা খুলে দাও। নইলে মারবে। শাঙ্কো আর বিস্কো অন্য দুটি প্রহরীর বুকে তরোয়াল চেপে ধরেছে। ফ্রান্সিস যার বুকে তরোয়াল চেপে ধরেছিল তার কোমরেই ঝুলছিল চাবির গোছা। সে চাবি বের করতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—দুটোর হাত মুখ বাঁধো। হ্যারি দড়ি এগিয়ে দিল। শাঙ্কো দ্রুত হাতে একজনের হাত বাঁধল। ফিতে কাপড় দিয়ে মুখ বাঁধল। অন্যজনকে বিস্কো বাঁধল। তারপর দুজনকেই ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। দুজনের মুখ দিয়েই গোঁ গোঁয়ানির শব্দ বেরিয়ে এল। শাঙ্কো ওদের গলায় তরোয়ালের মুখ ঠেকিয়ে বলল—গোঁ-গোঁ বন্ধ কর। নইলে মরবে। ওদের গোঁ গোঁ বন্ধ হল।

ততক্ষণে চাবিওয়ালা প্রহরী তালা খুলে দিয়েছে। সবাই দেউড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। শুধু শাঙ্কো চাবিওয়ালার হাতমুখ বেঁধে একটু পরে এল।

সদর রাস্তায় এসে ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল—যতটা দ্রুত সম্ভব ছোটো। কামার শালার পেছনে লুকোবো।

সবাই যতটা সম্ভব জোরে ছুটল। কামারশালার সামনে পৌঁছতে পেছনে প্রহরীদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনল।

ওরা কামারশালার পেছনে গিয়ে লুকোল। ফ্রান্সিস কামারশালার ঘরের আড়াল থেকে পেছনে তাকাল। দেখল খোলা তরোয়াল হাতে চারজন দেহরক্ষী ছুটে আসছে।

ওরা কামারশালা ছাড়িয়ে ছুটতে ছুটতে জাহাজঘাটের দিকে চলে গেল। ওরা জানে ফ্রান্সিসরা জাহাজে চড়ে পালাবার চেষ্টা করবে।

এতগুলো লোক। ফিস্‌ফাস্ কথাবার্তাও চলছিল। কামারের ঘুম ভেঙে গেল। সে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকে তরোয়াল ঠেকাল। দাঁতচাপাস্বরে বলল—

—একটি কথাও বলবে না। আমাদের পায়ের বেড়ি খুলে দাও।

—ঠিক আছে। দিচ্ছি। কিন্তু এতজনের বেড়ি—

—আরো কয়েকজন কামারকে ডাকো। ফ্রান্সিস একইভাবে বলল।

—আমার তিন ছেলেই পারবে। ওদের ডাকি। কামার বলল।

—কিন্তু আস্তে। কোন শব্দ করবে না। ফ্রান্সিস বলল।

কামার ওর ঘরে ঢুকল। আস্তে ডাকাডাকি করল। কামার বেরিয়ে এল। তিন ছেলেও এল। ওরা ফ্রান্সিসদের দেখে অবাক। ফ্রান্সিসরা আবার বলল—কেউ কোন শব্দ করবে না।

কামাররা আগুন জ্বালল। আগুনে লোহার শাবলমতো লোহা ঢোকাল। হাঁপড় টানতে লাগল।

কিছুপরে সেই আগুন লাল লোহার মুখ দিয়ে পায়ের বেড়ি কাটা শুরু হল। ফ্রান্সিস বলল—দেহরক্ষীরা পিছু ধাওয়া করছে। ওদের সঙ্গে লড়তে হবে। কাজেই আমি শাঙ্কো বিস্কোর আর হ্যারি আগে বেড়ি কাটিয়ে নিচ্ছি।

বেড়ি কাটা শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচজনের বেড়ি কাটা হয়ে গেল। আগুন মুখ লোহার আঁচে তখনও ফ্রান্সিসদের পা দপ্‌দপ্ করছে। তবু বেড়ি থেকে মুক্তি। অন্যদের বেড়ি কাটা চলল।

ওদিকে দেহরক্ষীরা জাহাজঘাটে পৌঁছল। কিন্তু ফ্রান্সিসদের চিহ্নমাত্র নেই। কোথায় পালালো সব? একজন বলল—নিশ্চয়ই ওদের জাহাজে লুকিয়ে আছে। কিন্তু কোনটা ফ্রান্সিসদের জাহাজ তা বুঝল না। পার্তাদোর বাহারি জাহাজটা জলে ভাসছিল। ওরা সেই জাহাজে উঠল। ঘুমন্ত চালককে তুলল। একজন বলল—ক্রীতদাসরা পালিয়েছে। এদিকেই এসেছে। ওদের জাহাজ কোনটা? চালক আঙুল তুলে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা দেখাল।

দেহরক্ষীরা ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছে এল। পাটাতন পাতা নেই। একজন জলে নামল। সাঁতার দিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছে গেল। হালের কাছে দড়িদড়া ধরে জাহাজে উঠল। ডেক-এ এল। ডেক জনশূন্য। ও পাটাতন টেনে আনতে লাগল। কিন্তু দারুণ তারি পাটাতন। আনতে সময় লাগল। বেশ কষ্ট করে পাটাতন পাতল। বাকি তিনজন উঠে এল।

ওরা তরোয়াল হাতে সিঁড়ি দিয়ে কেবিনঘরগুলোর কাছে এল। কেবিনঘর, রান্নাঘর খুঁজে দেখল। কেউ নেই। তাহলে ওরা গেল কোথায়? বেশিদূর তো যেতে পারেনি। পায়ের বেড়ি নিয়ে আর কত জোর ছুটবে?

তখনই একজন বলল—ওরা নিশ্চয়ই কামারশালায় গেছে। বেড়ি কাটিতে।

—ঠিক। আর একজন বলল।

ওরা কামারশালার দিকে চলল।

কামারশালার কাছে এসে হাঁপর টানার শব্দ শুনল। তাহলে বেড়ি কাটার কাজ চলছে।

ফ্রান্সিস কামারশালার আড়াল থেকে নজর রেখেছিল। রক্ষীদের দেখল।



আর দেরি করল না। রক্ষীটির গলায় তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল

গলা বাড়িয়ে বলল—শাঙ্কো, বিস্কো তোমরা এসো। ওরা এসেছে। একটাকেও ছাড়বে না। সব কটাকেই হত্যা করবে। কোলাকে ওরা নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। বদলা নিতে হবে।

ফ্রান্সিস দ্রুত ছুটে গিয়ে একজন রক্ষীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রক্ষীরা এত দ্রুত আক্রমণ আশা করেনি। পায়ে বেড়ি নেই। এখন পায়ের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে না। ফ্রান্সিস সেই রক্ষীর তরোয়ালে এত জোরে ঘা মারল যে রক্ষীর তরোয়াল ছিটকে গেল। খালি হাতে ও বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস একমুহূর্তও দেরি করল না। সোজা ওর বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল। তারপর তরোয়ালটা টেনে খুলে নিল। রক্ষীটি গড়িয়ে রাস্তার পাশের ঝোপে পড়ে গেল।

অন্য তিনজনের সঙ্গে তখন শাঙ্কোরা লড়াই চালাচ্ছে। পায়ে বেড়ি নেই। ওরা স্বচ্ছন্দে লড়াই চালাচ্ছে। শুধু হ্যারিই পারছিল না। তরোয়ালের ডগা লেগে ওর জামা জায়গায় জায়গায় কেটে গেছে।

ফ্রান্সিস লাফিয়ে গিয়ে হ্যারিকে আড়াল করে দাঁড়াল। শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। ফ্রান্সিস ভাবল একে হত্যা করতেই হবে। ও সাবধানে তরোয়াল চালাতে লাগল আর সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস ঐ রক্ষীটির পেছন দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলে উঠল—মারো একে। রক্ষীটি পেছনে ফিরে তাকাল। ফ্রান্সিস এই সুযোগই খুঁজছিল। আর দেরি করল না। রক্ষীটির গলায় তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল। রক্ষীটি রাস্তার ওপর গড়িয়ে পড়ল। আর উঠল না।

অন্য রক্ষীটি একজন সঙ্গীদের এভাবে মরতে দেখে ভয় পেয়ে গেল। সে তরোয়াল ফেলে পার্তাদোর বাড়ির সদর গেট-এর দিকে ছুটল। বাকি একজনকে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো মিলে হত্যা করল।

হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—কোলা—তোমাকে হত্যার বদলা নিলাম। তবে একটা বেঁচে গেল।

কামারশালায় তখন সকলেরই পায়ের বেড়ি কাটা হয়ে গেছে।

শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা সোনার চাকতি বের করে কামারকে দিল। কামার খুব খুশি। এর আগেও বেড়ি কেটেছে। কিন্তু সোনা পায়নি। সবাই জাহাজঘাটের দিকে চলল। জাহাজঘাটে যখন পৌঁছল তখন ভোর হয়ে এসেছে।

পাটাতন পাতাই ছিল। সবাই একে একে জাহাজে উঠল।

ডেক-এ উঠে ফ্রান্সিস ডেক-এর ওপর শুয়ে পড়ে ডেক-এ চুমু খেল। ওদের সুখদুঃখের সঙ্গী জাহাজটাকে আবার পাওয়া গেছে।

ফ্রান্সিসের দেখাদেখি ওর বন্ধুরাও শুয়ে পড়ে ডেক-এ চুমু খেল।

এবার ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—জাহাজ চালাও। এক মুহূর্তও দেরি নয়। পালা খাটাও। কয়েকজন দাঁড়ঘরে চলে যাও। দাঁড় বাও। জাহাজের গতি বাড়াও।

শাঙ্কো হুইল ধরো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরে যেতে হবে।

সবাই কাজে লেগে গেল। নোঙর তোলা হল। জাহাজ চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জোর গতি পেল। পালগুলো ফুলে উঠল। জাহাজ চলল দক্ষিণমুখো।

নিজের পরিচিত কেবিনঘরে ঢুকেই মারিয়া মাথার কাছে কাঠের দেয়ালের কাছে গেল। কাঠ ফাঁক করে দেখল সোনার চাকতিগুলো রয়েছে। কাঠ চেপে ফাঁক বন্ধ করে দিল। পাংলুও ঘরে ছিল। কিছু বুঝল না মারিয়া ওভাবে ছুটে গেল কেন? কী দেখল? পাংলু কাঠের মেঝেয় বসল।

ফ্রান্সিস ঢুকল। সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। মারিয়াও বিছানার একপাশে বসল। মৃদুস্বরে বলল—

—তোমার পায়ের অবস্থা কী?

—অনেকটা সেরে গেছে। দিনকয়েকের মধ্যেই সেরে যাবে। বেড়ির ঘষা তো আর লাগছে না। ফ্রান্সিস মৃদু স্বরে বলল।

দরজায় আঙুল ঠোকার শব্দ হল। পাংলু উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। হ্যারি শাঙ্কো আর একজন বন্ধু ঘরে ঢুকল।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস জাহাজ দক্ষিণদিকে চালাতে বললে কেন? দেশে যেতে হলে তো উত্তরদিকে জাহাজ চালাতে হবে।

—না। রেজিল বন্দরে নেমে যাবো। বাকি বন্ধুরা কী অবস্থায় আছে কে জানে। ওদের তো সঙ্গে নিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা ঠিক। বন্ধুদের নিয়ে তো দেশে ফিরবে? শাঙ্কো বলল।

—না। ফেরার পথে আমারগো বন্দরে নামবো। ওখান থেকে কিছুদূরে রাজা আলফ্রেডের গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করবো।

—আবার? প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মারিয়া।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—হ্যাঁ। আবার। তারপর উত্তরমুখো—দেশে।

—কিছু বলার নেই। তুমি যা ভালো বোঝ। মারিয়া গোমড়ামুখে বলল।

হ্যারিরা চলে গেল। রেজিল বন্দর লক্ষ্য করে জাহাজ চলল।

জাহাজ আমারগো বন্দরে ভিড়ল। জাহাজ নোঙর করল।

তিনজন কৃষ্ণকায় ফ্রান্সিসের কাছে এল। আকারে ইঙ্গিতে বলল—আমরা এখানেই নেমে যাবো।

—বেশ তো। ফ্রান্সিস বলল।

—পুরনো মনিবের কাছেই থাকবে বলছে। মারিয়া বলল।

—ও যা চাইবে তাই হবে। আমিও ওর পুরনো মনিব সামুছার কাছে আসবো। সামুছার সাহায্য না পেলে কিছুই করতে পারবো না। ফ্রান্সিস বলল।

পাংলু আর কৃষ্ণকায় তিনজন নেমে গেল। পাংলুর জন্য মারিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল। অনেকদিন একসঙ্গে ছিল। পাংলুর ওপর কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল।

জাহাজ চলল।

পনেরো কুড়িদিন পর জাহাজ রেজিল বন্দরে পৌঁছল। বন্দরে ব্যস্ত জীবন। দোকানে বাজারে ভিড়।

ফ্রান্সিস বলল—শোন—দেরি করা চলবে না। এক্ষুনি বন্ধুদের খোঁজে বেরোতে হবে। প্রথমে শাঙ্কো আর আমি যাচ্ছি।

ফ্রান্সিস ও শাঙ্কো পাটাতন দিয়ে নেমে এল। এদিক ওদিক ছোট ছোট বাড়িঘর। সেসব ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা আসতে দেখল একটা বড় বাড়ি। বোঝাই যাচ্ছে বেশ অর্থব্যয় করে বাড়িটা তৈরী। কোন বড় জমিদারের বাড়ি হবে।

বাড়ির সামনেই অনেকদূর পর্যন্ত গমের ক্ষেত। একটা নয়, পরপর কয়েকটা। ক্ষেতের চারপাশে সশস্ত্র প্রহরী। ক্ষেতে চাষের কাজ চলছে।

ফ্রান্সিস ক্ষেতের সীমার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একজন প্রহরী খাপ থেকে তরোয়াল খুলে ছুটে এল। গম্ভীর গলায় বলল—কী চাই?

—কিছু না। দেখছিলাম—চাষীদের মধ্যে আমার বন্ধুরা আছে কি না। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি তো বিদেশি।

—হ্যাঁ। আমার বন্ধুরাও তো বিদেশি। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ কিছু বিদেশি আছে চাষীদের মধ্যে। প্রহরী বলল।

—বিদেশি আছে। ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলল—তাদের একজনকে ডেকে দেবে।

—আমি তোমার ক্রীতদাস? হুকুম করলেই শুনবো। প্রহরী বলল।

—চাষীরা কি ক্রীতদাস? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না। তবে ক্রীতদাসের মতোই। পায়ে বেড়ি নেই। কিন্তু বন্দী। পালাবার পথ বন্ধ। প্রহরী বলল।

—কোথায় রাখা হয় ওদের? ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার অত প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না। ভুরু মোটা প্রহরীটি বলল—যাও। রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও।

ফ্রান্সিস ক্ষেতের সীমা থেকে সরে এল। বুঝল বেশী কিছু জানা যাবে না। তবে বন্ধুরা এখানে বন্দী হয়ে থাকতে পারে। অন্তত সম্ভাবনা আছে।

ফেরার পথে ফ্রান্সিস দেখল একটা বাড়ির বারান্দায় একজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রান্সিস বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে বলল—দেখুন, আমরা বিদেশি। এই রেজিল বন্দর এলাকা আমরা চিনি না। এখানকার বড় বড় জমিদারেরা কি চাষাবাদের জন্যে ক্রীতদাস রাখে?

—কী বলবো? ঐ জমিদার কেদিয়া এখানকার রাজা বললেই হয়। কার সাধ্য ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। বৃদ্ধ বলল।

—তুম্বা কী করে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—তুম্বার কাজই হল যেসব জাহাজ বন্দরে আসে তাই থেকে যুবকদের লোভ দেখিয়ে কেদিয়ার বাড়িতে নিয়ে আসা পেট ভরে খাওয়ান। বলে এখানে চাষের কাজ করলে দুমাসে তোমরা বড়লোক হয়ে যাবে। জাহাজে কাজ করে কী পাও? বৃদ্ধ বলল।

—তারপর? ফ্রান্সিস আগ্রহী হল।

তারপরেই তাদের বন্দীঘরে বন্দী করে রাখা হয়। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া আদরযত্ন চলে। কিন্তু বন্দী হয়েই থাকতে হয়। বাইরে বেরোবার উপায় নেই। কড়া পাহারা। বৃদ্ধ বলল।

—তারপর তাদের চাষের কাজে লাগায়। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক। সারাদিন ক্ষেতের কাজ করায়। খাওয়াও আর আগের মতো দেওয়া হয় না। বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন মিলিয়ে যায়। বৃদ্ধ বলল।

—এ তো ক্রীতদাসেরই জীবন। ফ্রান্সিস বলল।

—সত্যিই তাই। বৃদ্ধ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। ফ্রান্সিসরা ফিরে এল।

জাহাজে এসে ফ্রান্সিস হ্যারি বিস্কো আর কয়েকজন বন্ধুকে ডাকল। যা খবর এনেছে বলল। তারপর বলল—যা বুঝতে পারছি আমাদের বন্ধুরা প্রায় ক্রীতদাস হয়ে আছে। হয় কেদিয়া বা অন্য কোন জমিদারের বাড়িতে। এবার খোঁজখবর নিতে হবে। রাতে আমি আর শাঙ্কোই যাবো খোঁজখবর নিতে।

—মনে হয় কেদিয়ার বাড়িতেই ওদের পাবো। হ্যারি বলল।

—আমারও তাই মনে হয়। যারা চাষ করছিল তাদের এতদূর থেকে দেখেছি চিনতে পারিনি। কেদিয়াই বোধহয় এখানকার সবচেয়ে বড় জমিদার। অঢেল জমি। মনে হয় তার বাড়িতেই বন্ধুরা বন্দী হয়ে আছে। তুম্বাই ওদের ভুল বুঝিয়ে নিয়ে গেছে। কেদিয়ার বাড়িটাই আগে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সেদিন রাতে খাওয়ার পর ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। বিশ্রাম করতে লাগল।

কিছুপরে দরজায় টোকার শব্দ। ফ্রান্সিস উঠে পড়ল।

—কোথায় যাচ্ছো? মারিয়া জিজ্ঞেস করল।

—বন্ধুদের খোঁজে। ফ্রান্সিস বলল।

এত রাতে। এই বিদেশ। কোন বিপদআপদ—

—হতে পারে। তবে সাবধানে থাকবো। ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলল। শাঙ্কো দাঁড়িয়ে।

দুজনে জাহাজ থেকে নেমে এল। রাস্তা ধরে চলল কেদিয়ার বাড়ির দিকে।

রাস্তা জনশূন্য। চাঁদের আলো উজ্জ্বল। দুজনে হাঁটতে লাগল।

কেদিয়ার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

বিরাট বাড়ি। ফ্রান্সিসরা বাড়ির পেছন দিকে এল। দেখল একটা লম্বাটে

কাঠের ঘর। একেবারে ওপরে দুটি জানলামত। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—শাঙ্কো—এটাই বন্দীঘর।

ফ্রান্সিস কাঠের দেওয়ালের কাছে গেল। চাপাস্বরে ডাকল—ফ্রেজার—সিনাত্রা। ঘরের ভেতরে কোন সাড়াশব্দ নেই। বেশি জোরে ডাকতে সাহস পাচ্ছে না। নিশ্চই ঘরের প্রহরী আছে। আবার বার দুয়েক ডাকল—ফ্রেজার—ভেন। ঘরের ভেতর থেকে কোন শব্দ শোনা গেল না।

—দাঁড়াও। কাঠের দেয়াল ফুটো করছি। শাঙ্কো বলল। তারপর গলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। কাঠের দেয়ালে ছোরা চেপে ঘোরাতে লাগল। শক্ত কাঠ। তবু শাঙ্কো হাল ছাড়ল না। ছোরা ঘোরাতে ঘোরাতে সত্যিই একটা ফুটো মত হল। সেই ফুটোয় মুখ চেপে ফ্রান্সিস গলা চেপে ডাকল—ফ্রেজার—সিনাত্রা—ফ্রেজার। ভেন—ভেন।

একটু পরে ঘরের ভেতরে নড়াচড়ার শব্দ পেল। কেউ যেন উঠে এল। ফুটোয় মুখ চেপে ফ্রান্সিস বলল—এইখানে এসো। এখানে ফুটো।

যে উঠেছিল সে ফুটোর কাছে এগিয়ে এল। ফুটোয় মুখ রেখে বলল—কে? ফ্রেজারের গলা। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে হাসল। শাঙ্কোও হাসল।

এবার ফ্রান্সিস ফুটোয় মুখ রাখল। বলল—

—আমি ফ্রান্সিস। সঙ্গে শাঙ্কো। তোমরা কী বন্দী?

—হ্যাঁ। আমাদের দিয়ে চাষের কাজ করায়। ফ্রেজার বলল।

—জানি। ফ্রান্সিস বলল। ও বুঝল ফুটোর কাছে এসে কয়েকজন দাঁড়িয়েছে।

—আর দু'একদিন অপেক্ষা কর। তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করছি। ততদিন চুপচাপ থাকো। প্রহরীদের মনে যেন কোন সন্দেহ না হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রেজার বলল।

—বন্ধুদের আমাদের কথা বল। কালকে আবার আসবো। পালাবার ছক বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা আস্তে আস্তে চলে এল।

জাহাজে ফিরে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো হ্যারির কাছে গেল। হ্যারির ঘুম ভাঙিয়ে বলল—তোমার অনুমানই ঠিক। কেদিয়ার বন্দীঘরেই আমাদের বন্ধুরা বন্দী হয়ে আছে। এখন আমাদের কাজ হল ওদের মুক্ত করা।

ফিরে আসার সময় শাঙ্কো বলল—বন্ধুরা পালিয়ে আসতে গেলেই প্রহরীরা ওদের তাড়া করবে। তখন তরোয়ালের লড়াই চালাতে হবে। হয়তো প্রহরীদের কয়েকজনকে হত্যা করতে পারবো। কিন্তু আমরাও অক্ষত থাকবো না। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে তীরধনুক নিয়ে ওদের সঙ্গে লড়া।

—তাহলে সকালের খাবার খেয়েই চলো তীরধনুকের ব্যবস্থা করতে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাই চলো। শাঙ্কো বলল।

পরদিন সকালে ওরা দুজনে রাস্তা দিয়ে চলল। দোকানপাটে বাজারে বেশ ভিড়। ওরা একটা কামারশালা খুঁজতে লাগল। পেয়েও গেল। ছোট দোকান। ওরা দোকানে ঢুকল। কামার একটা কুড়ুল বানাচ্ছিল।

—ভাই, তীরধনুক বানাতে পারো? শাঙ্কো বলল।

—কেন পারবো না। অনেকেই শিকার ধরার জন্য তীরধনুক বানিয়ে নিয়ে যায়। তবে খাটুনি বেশি। বেশি দাম দিতে হবে। কামার হাপড় টানতে টানতে বলল।

শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা সোনার চাকতি বের করে দিল। কামার সন্তুষ্ট। হেসে বলল—কালকে সকালেই পেয়ে যাবেন।

সেদিন গভীর রাতেই ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো কেদিয়ার বাড়ির পেছনদিককার বন্দীঘরের কাছে গেল। ফ্রান্সিস ফোকরে মুখ দিয়ে চাপাস্বরে ডাকল—ফ্রেজার, সিনাত্রা—আ। ফ্রেজাররা জেগেই ছিল। ফ্রেজার ফোকরে মুখ রেখে বলল—বলো। ও মুখ সরাল। এবার ফ্রান্সিস বলল—তোমরা যখন ক্ষেতে কাজ করবে আমরা তখনই যাবো। শাঙ্কোর হাতে থাকবে একটা সাদা রঙের পতাকা। পতাকাটার দিকে নজর রাখবে। পতাকা দেখলেই আমাদের কাছে ছুটে আসবে।

—প্রহরীরাও তো আমাদের পিছু ধাওয়া করবে। ফ্রেজার বলল।

—শাঙ্কো তীর ছুঁড়ে ওদের আটকাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—শাঙ্কোর হাতে তীরধনুক থাকলে নিশ্চিন্ত। ফ্রেজার বলল।

ফ্রান্সিসরা জাহাজে চলে এল। বন্ধুদের কাছে ছকের কথা বলল। বন্ধুরা সব শুনে ঘুমুতে গেল।

সকালের খাবার খেয়েই ফ্রান্সিসরা তরোয়াল কোমরে গুঁজে জাহাজ থেকে নেমে এল। দোকানে বাজারে রাস্তায় ভিড়। তার মধ্যে দিয়েই ওরা চলল। শাঙ্কোর হাতের কাঠের ডান্ডায় সাদা পতাকা উড়ছে। ভিড়ের মধ্যে অনেকেই ফ্রান্সিসদের দেখল। তারা ভেবে পেল না কোমরে তরোয়াল গুঁজে হাতে পতাকা নিয়ে ওরা কোথায় চলেছে।

যেতে যেতে শাঙ্কো হেসে বলল—ফ্রান্সিস সাদা পতাকা কিন্তু শান্তির পতাকা।

—আমাদের কাছে আজ অশান্তির পতাকা। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

ফ্রান্সিসরা ক্ষেতের কাছে পৌঁছল। দেখল ক্ষেতের এক কোনায় একজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। কোমরে তরোয়াল। আর একজন প্রহরী একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

পতাকা হাতে ফ্রান্সিসদের দেখে প্রহরীটি কেমন হকচকিয়ে গেল। প্রহরীটি কিছু বোঝার আগেই শাঙ্কো পতাকা ফ্রান্সিসের হাতে দিয়ে ছুটে গিয়ে প্রহরীটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রহরীটি চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। শাঙ্কোর হাতে ছুরি ছিলই। ও প্রহরীটির বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিল।

ওদিকে ফ্রান্সিসের হাতের সাদা পতাকা দেখে ফ্রেজাররা ছুটে আসতে লাগল। প্রহরীরা বুঝল ওরা পালাচ্ছে। প্রহরীরাও ওদের পেছনে ছুটে আসতে লাগল। কাছাকাছি যে দাঁড়িয়ে ছিল সে খাপ থেকে তরোয়াল খুলে ফ্রান্সিসদের দিকে ছুটে এল। ফ্রান্সিস দ্রুত ছুটে গিয়ে প্রহরীটির ডান হাত লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। প্রহরীটি সেই মার ঠেকাতে গেল। কিন্তু পারল না। ওর ডানহাতে তরোয়াল বসে গেল। ও তরোয়াল ফেলে হাত চেপে বসে পড়ল।

ততক্ষণে ফ্রেজাররা ফ্রান্সিসদের কাছে এসে গেছে। প্রহরীদের একজন ফ্রান্সিসদের অনেক কাছে চলে এসেছিল। শাঙ্কো ধনুকে তীর পরিয়ে তীর ছুঁড়ল। শাঙ্কোর নিশানা নিখুঁত। তীর গিয়ে বিঁধল প্রহরীটির পেটে। প্রহরীটি ক্ষেতের ওপর পড়ে গেল।

এই দেখে অন্য প্রহরীরা থমকে দাঁড়াল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। এই সুযোগে শাঙ্কো একটার পর একটা তীর ছুঁড়তে লাগল। তীরগুলো কারো হাঁটুতে, কারো কাঁধে, কারো বুকের কাছে বিঁধল।

প্রহরীদের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—জাহাজঘাটের দিকে—জলদি।

সবাই জাহাজঘাটের দিকে ছুটল। লোকের ভিড়ের মধ্য দিয়েই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটল সবাই।

তিনজন প্রহরী কিন্তু জাহাজঘাটের কাছে এসে গেল।

ফ্রান্সিসরা ততক্ষণ জাহাজে উঠে গেছে। পাতা পাটাতনের কাছে দাঁড়াল ঐ তিনজন। ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল খুলল। চেঁচিয়ে বলল—উঠে এসো। তোমাদের লড়াইয়ের সাধ মিটিয়ে দিচ্ছি।

প্রহরী তিনজন নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করল। তারপর পিছু ফিরে হাঁটতে লাগল।

ওদিকে ফ্রেজারদের পালাবার সময় অন্য বন্দীরাও পালাল। প্রহরীরা ফিরে এসে দেখল একজন বন্দীও নেই। ওদের রাগ পড়ল ফ্রান্সিসদের ওপর। কিন্তু কিছুই করার নেই। এখন কর্তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এই চিন্তা নিয়ে অলস পায়ে কেদিয়ার বাড়ির দিকে চলল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—জাহাজ ছাড়ো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কেদিয়া এখানকার জমিদার। তার যথেষ্ট লোকবল আছে। আমরা বিপদে পড়বো।

সবাই ভাগ হয়ে ছুটলো। পাল খুলে দেওয়া হল। পালগুলো ফুলে উঠল। নোঙর তোলা হল। দাঁড়ঘরে দাঁড় বাওয়া শুরু হল। জাহাজ চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ গতি পেল।

জাহাজ তখন বেশ দূরে চলে এসেছে। দূর থেকে ওরা দেখল জাহাজঘাটে বেশ ভিড় জমেছে।

জাহাজ ক্রমে মাঝ সমুদ্রে চলে এল। তখনও দাঁড় বাওয়া চলছে।

জাহাজ উত্তরমুখো চলল।

দুদিনের মাথায় জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়ল। ভাইকিংরা ঝড়ের মোকাবিলায় অভ্যস্ত। ওরা পাল নামিয়ে দড়িদড়া টেনে জাহাজ ভাসিয়ে রাখল।

প্রায় দিন পনেরো কুড়ি পরে ওদের জাহাজ আমারগো বন্দরে ভিড়লো।

তখন শেষ রাত।

ফ্রান্সিস স্থির করল আর দেরি করবে না। পরদিন সকালেই সামুছার খোঁজে যাবে।

পরদিন সকালেই ফ্রান্সিস, শাঙ্কো আর হ্যারিকে নিয়ে বন্দরে নামল। দোকানের লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে সামুছার বাড়িতে এল।

এমন কিছু বিশাল বাড়ি নয়। ছোট বাড়ি। কাঠ পাথরে তৈরি।

বাড়ির ওপাশে তাকাতেই রাজা আলফ্রেডের দুর্গের প্রায় ধ্বংসস্তূপ দেখল। সমস্ত দুর্গটাই প্রায় ভেঙে পড়েছে। দুএকটা জায়গায় তখনও ছাদমত আছে। কয়েকটা দেয়ালও খাড়া আছে।

সামুছার বাড়ির দরজায় ফ্রান্সিস আঙুল দিয়ে টোকা দিল। একটু পরেই দরজা খুলে গেল। পাংলু দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস এখানে আসবে এটা পাংলু ফ্রান্সিসের কথা থেকে জেনেছিল। ও খুব অবাক হল না। হাসতে হাসতে ফ্রান্সিসের দুহাত জড়িয়ে দরজা খুলে ধরল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—কেমন আছো পাংলু। পাংলু ওর দেশীয় ভাষায় কী বলে গেল ফ্রান্সিস কিছুই বুঝল না। তবে এটুকু বুঝল যে পাংলু ভালোই আছে।

এবার ফ্রান্সিস আকারে ইঙ্গিতে কর্তাকে ডেকে দিতে বলল। পাংলু চলে গেল।

কিছু পরে সামুছা দরজায় এসে দাঁড়াল। মুখে কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ। বেশ রোগাটে চেহারা। তবে চোখদুটো খুব বুদ্ধিদীপ্ত। মাথার কাঁচাপাকা চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে সামুছা বললেন—আপনারা কী চান? আপনারা তো বিদেশী।

—হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং। একটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। বলুন। সামুছা বললেন।

—এখানে নয়। একটু বসে কথা বলতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—খুব দরকারি কথা? সামুছা বললেন।

—হ্যাঁ। খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। ফ্রান্সিস বলল।

সামুছা পেছন ফিরে বললেন—আসুন।

একটা ছোট ঘরে ঢুকল সবাই। গদীওয়ালা কয়েকটা চেয়ার। পাথরের দেয়ালে পাথরের পাটাতন পেতেই কিছু চামড়ার বই সাজানো। মাঝখানে একটা চৌকোনো টেবিলমত। সামনের চেয়ারটায় গদী নেই। সাধারণ কাঠের চেয়ার। সামুছা ওটাতেই বসলেন। ফ্রান্সিসরা গদী আঁটা চেয়ারে বসল।

ফ্রান্সিস একবার চারদিকে দেখে নিয়ে বলল—আমার নাম ফ্রান্সিস।

—ও। সামুছা মুখে শব্দ করলেন।

—আমরা শুনেছি যে আপনি রাজা আলফ্রেডের গুপ্ত ধনভাণ্ডার আবিষ্কারের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—ভুল শুনেছেন। সামুছা বললেন।

—না। ভুল শুনিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—কথাটা যে সত্যি এটা কী জন্যে মনে করছেন। সামুছা বললেন।

—আপনি আমারগো বন্দর থেকে এতদূরে একা একা এই বাড়িতে নির্জন জায়গায় দিন কাটাচ্ছেন কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—বেশি লোকজন আমি একেবারে পছন্দ করি না। সামুছা বললেন।

—তাহলে রোববার রোববার রাতে রাজা আলফ্রেডের ঐ ভাঙা দূর্গে যান কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—কে বলল? সামুছা একটু চমকালেন।

—তা বলবো না। সত্যি কিনা তাই বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ যাই। ঘুরে ফিরে দেখি। সামুছা বললেন।

—এটা একটা যুক্তি হল? গভীর রাতে মশাল হাতে একটা ভাঙা দূর্গে ঘুরে বেড়ানো—বিনা কারণে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। সামুছা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—না। আপনি গুপ্ত ধনভাণ্ডারের কোন সূত্র পান কি না তাই দেখে বেড়ান। ফ্রান্সিস বলল।

সামুছা বুঝল যুক্তিতে তিনি হেরে যাচ্ছেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন—বেশ যদি খুঁজেই থাকি তাতে আপনাদের কী?

—কিছুই না। গুপ্ত ধনভাণ্ডার যে কেউ খুঁজতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

সামুছা এবার আঙ্গুল দিয়ে তাকের চামড়ার বইগুলো দেখালেন। বললেন—ঐ বইয়ের একটাতে রয়েছে রাজা আলফ্রেডের নিজের লেখা তাঁর জীবনী।

—তাহলে তো আপনি অনেক তথ্য পেয়েছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—না। গুপ্ত ধনভাণ্ডার নিয়ে রাজা আলফ্রেড একটি কথাও লেখেন নি। যাক গে। অনেক কষ্টে বইটা জোগাড় করেছিলাম কিন্তু আমার কোন কাজেই লাগল না। সামুছা বললেন।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—

—এবার আমার কথা বলি। আমি এর আগে অনেক গুপ্তধন বুদ্ধি খাটিয়ে পরিশ্রম করে খুঁজে বের করেছি। আমার খুব ইচ্ছে যে রাজা অ্যালবার্টের গুপ্তধনও খুঁজে বের করি।

—কেন? সামুছা জানতে চাইলেন।

—এমনি। আমি এসব কাজ ভালোবাসি তাই। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। খুঁজে বের করলেন। তারপর? সামুছা বললেন।

—সেই গুপ্তধন যার প্রাপ্য তাকে দিয়ে চলে আসি। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা অ্যালবার্টের গুপ্তধন কার প্রাপ্য? সামুছা বললেন।

—কেন—আপনার। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনি কোন অংশ নেবেন না? সামুছা জানতে চাইলেন।

—না। গুপ্তধনের প্রতি আমার কোন লোভ নেই। ফ্রান্সিস বলল। সামুছা বেশ চমকে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললেন—সত্যিই আপনি কিছু চাইবেন না? ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—

—না।

—ঠিক আছে। আমি একটু ভেবে দেখি। আপনারা কাল সকালে আসুন। সামুছা বললেন।

ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল।

বাড়ির বাইরে এল। পিংলা ছুটে এল। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে হাসল। ফ্রান্সিসও হাসল। কিছু বলল না। বললেও পাংলু বুঝবে না।

ফেরার পথে হ্যারি ডাকল—ফ্রান্সিস।

—বলো। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকাল।

—গুপ্তধন উদ্ধারে সামুছা কি তোমার সাহায্য নেবে? শাঙ্কো বলল।

—আলবাৎ নেবে। আমার পিঠে চড়ে সামুছা গুপ্তধন হাতাবার তালে আছে।

—এটা ঠিক গুপ্তধন উদ্ধার হলে ওরই লাভ। শাঙ্কো বলল।

—সেটা ও ভালো করেই জানে। ফ্রান্সিস বলল।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিসরা আবার সামুছার বাড়িতে গেল। তার আগে বন্ধুদের সব কথা বলে গেল।

গতকালের মত পাংলুই দরজা খুলল। ফ্রান্সিসদের বসার ঘরে বসিয়ে গেল।

সামুছা এলেন। চেয়ারে বসল। বললেন—ভেবে দেখলাম আমি তো দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও গুপ্তধন আবিষ্কার করতে পারলাম না। ভাবছি তোমাদের সাহায্য নেব। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। সামুছা এবার বললেন—যে কথাটা কেউই জানে না সে কথাটাই বলছি। গুপ্ত ধনভাণ্ডার নয় রাজা অ্যালবার্ট একটা স্বর্ণখনি স্থাপন করেছিলেন।

—স্বর্ণখনি? ফ্রান্সিস বেশ চমকে উঠল।

—হ্যাঁ। রাজা অ্যালবার্ট তাঁর বইতে এই স্বর্ণখনির কথা উল্লেখ করে গেছেন। দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছে সেই স্বর্ণখনির ওপরেই। উনি দক্ষিণ দেশ থেকে কয়েকজন স্বর্ণখনি বিশেষজ্ঞ আনিয়েছিলেন। তারা স্বর্ণরেণু জড়ানো পাথর থেকে সোনা গলিয়ে সোনার মণ্ড তৈরি করেছিল। সেসব তিনি আর ওপরে নিয়ে আসার সময় পান নি। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

—তাহলে তো সোনার মণ্ড সোনার খনি এই ভাঙা দুর্গের নীচেই রয়েছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। সেই স্বর্ণখনিই খুঁজে বের করতে হবে। রাজা অ্যালবার্টের গুপ্ত ধনভাণ্ডার বলে কিছু নেই। সামুছা বললেন।

—আশ্চর্য! আমরা তো ধনভাণ্ডারের কথাই শুনেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—ওটাই প্রচলিত গল্প। আমি স্বর্ণখনির কথা কাউকে বলিনি। তোমাদেরই প্রথম বললাম সামুছা।

ফ্রান্সিস মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর মাথা তুলে বলল—স্বর্ণখনি সম্পর্কে রাজা অ্যালবার্ট তাঁর বইতে কিছু লিখেছেন?

—না। যা বললাম শুধু সেইটুকু। সামুছা বললেন।

—ঠিক আছে। কালকে সকাল থেকে আমি কাজ শুরু করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—লোকজনের দরকার হলে বলবেন। সামুছা বললেন।

—না। আমার বন্ধুদের সাহায্য নেব। সমস্ত ভাঙা দুর্গটা ভালোভাবে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

পরের দিন সকাল থেকেই ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কো কাজে নেমে পড়ল।

ওরা ঘুরে ঘুরে ভাঙা দুর্গটা দেখতে লাগল। কোথাও কোথাও পাথর আলগা বলে ফ্রান্সিসরা বারকয়েক আলগা পাথরে পা রেখে হড়কে যাচ্ছিল। কোথাও পায়ের চাপে আলগা পাথর নীচে গরগর করে গড়িয়ে গেল। অগত্যা সাবধানে পা ফেলে ফেলে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

তখনই সামুছা এলেন। ফ্রান্সিসরা তখন দূর্গের ভাঙা ছাদে দাঁড়িয়ে। সামুছা গলা চড়িয়ে বললেন—পূবদিকে যাবেন না। ওখানে সব আলগা পাথর। গড়িয়ে নীচে পড়ে যাবেন।

ফ্রান্সিসরা পূবদিকে গেল না। অন্য দিকগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

—ভাঙা দূর্গের দেওয়াল যেমন হয়। ভাঙা পাথরের স্তূপ। এটাও তেমনি নতুনত্ব কিছু নেই। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর বলল—বোঝা যাচ্ছে—অনেকগুলো ঘর ছিল আর বেশ বড় বড় ঘর। একটা লম্বাটে ঘর দেখলাম। তার দেওয়ালে এখনও কয়েকটা কড়া বসানো। তার মানে কয়েদঘর। রাজা অ্যালবার্ট শাস্তির ব্যবস্থাও রেখেছিলেন।

ওরা ভাঙা দূর্গ থেকে নেমে এল।

—তাহলে দেখলেন সব। সামুছা বললেন।

—হ্যাঁ। তবে প্রাথমিকভাবে। এবার ঘরগুলো দেখতে হবে। আমাদের দেখতে হবে মেঝে। খনি ওপরে থাকে না। ফ্রান্সিস বলল।

—তা ঠিক। যাক গে এখন আর জাহাজে ফিরে যাবেন না। আমি এখানেই আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। সামুছা বললেন।

দুপুরে সামুছার খাবার ঘরে ওরা খেতে বসল। পাংলু আর একটি কৃষ্ণকায় মেয়ে ওদের খেতে দিল। চিংড়িমাছের খাবারটা ওদের খুব সুস্বাদু লাগল। ওরা চেয়ে খেল। খেতে খেতে হ্যারি বলল—আপনার কাছে একটা অনুরোধ ছিল।

—বলুন। সামুছা বলল।

—রাজা আলফ্রেডের লেখা বইটা একটু দেবেন? হ্যারি বলল।

—পড়তে পারবেন? পুরোনো স্পেনীয় ভাষায় লেখা। সামুছা বললেন।

—আমি স্পেনীয় ভাষা অল্প জানি। পড়তে চেষ্টা করবো। তাছাড়া ছবিটবি থাকলে দেখবো। হ্যারি বলল।

—ছবি আছে। তবে সে সব নানা জাতের ফুলের ছবি। সামুছা বললেন।

—তাহলে রাজা অ্যালবার্ট ফুল ভালোবাসতেন। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। তাঁর বিরাট ফুলের বাগান ছিল। সামুছা বললেন।

খাওয়াদাওয়া শেষ। ফ্রান্সিসরা বাইরের ঘরে এসে বসল। সামুছা এলেন। তাক থেকে চামড়া বাঁধানো বেশ বড় একটা বই টেবিলে রেখে বললেন—বই পড়ুন। সামুছা বই দিয়ে চলে গেলেন।

ফ্রান্সিস চেয়ারে বসেছিল। উঠে দাঁড়াল। বলল—

—দেরি করবো না। চলো।

—আমি বইটা দেখছি। তোমরা যাও। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ভাঙা দুর্গে এল। এবার ফ্রান্সিস ভাঙা ঘরগুলো দেখতে লাগল। সবই ভাঙা। কয়েকটিকে ঘর বলে মনে হয় এই পর্যন্ত।

দুজনে ঘুরে ঘুরে ভাঙা ঘরগুলো দেখতে লাগল। ঘরগুলোর বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। চারকোনা ঘর। প্রায় সবগুলো ঘরই দেখা হল। কিন্তু পূবদিকের ঘরগুলো দেখা হল না। ওদিকটা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। ঢোকার পথ নেই। সামুছা এইজন্যেই বোধহয় পূবদিকে যেতে বারণ করেছিল।

ফিরে এল দুজনে।

হ্যারি তখনও বইটা দেখছে।

—কিছু তথ্য পেলে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—যতটুকু পড়তে পারলাম স্বর্ণখনি সম্পর্কে সামুছা যা বলেছে তাই। বেশি কিছু নেই। তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম প্রায় সব পাতায় বিভিন্ন জাতের ফুলের ছবি।

—সামুছা তো বলল—উনি ফুল ভালোবাসতেন। ফ্রান্সিস বলল।

—প্রথম পাতাতেই একটা বিরাট ত্রিভুজ এঁকেছেন। মা মেরিই জানে কেন এঁকেছেন। তার মধ্যেও ফুল।

—ত্রিভুজের মধ্যে ফুল? ফ্রান্সিস বেশ চমকে উঠল।

—মনে হয় রাজা অ্যালফ্রেডের কোন ত্রিকোন বাগান ছিল। হ্যারি বলল।

—হতে পারে। তবে—ফ্রান্সিস কথাটা শেষ করল না।

—ত্রিকোণ বাগানের এক কোণায় ফুল। হ্যারি বলল।

—উঁহু। এই ফুল আঁকার গুরুত্ব আছে। ফ্রান্সিস বলল।

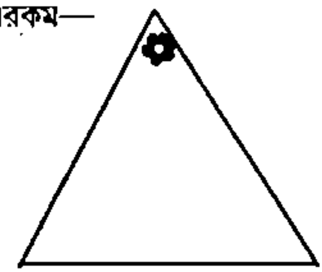
—তুমি কি ফুলটাকে গুরুত্ব দিচ্ছো? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। তবে এখনও নিশ্চিন্ত নই। মনে করছি ফুলটা কোন কিছু নির্দেশ করছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী নির্দেশ করছে? হ্যারি জানতে চাইল।

—সেটাই বুঝতে পারছি না। ত্রিকোণ ছবিটা দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি বইটা ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে দিল। ফ্রান্সিস মলাট উল্টে ত্রিকোণ ছবিটা দেখল। ত্রিকোণটি সারা পাতা জুড়ে আঁকা। উত্তর কোণে একটা সূর্যমুখী ফুল আঁকা। ছবিটা এরকম—



সামুছা ঘরে ঢুকে বসলেন।

ফ্রান্সিস বইটা এগিয়ে দিয়ে বলল—আচ্ছা—এই ত্রিভুজ-ফুলের ব্যাপারটা কী বলুন তো?

—এ তো একটা ছবি। রাজা আলফ্রেড ফুল ভালোবাসতেন। এন্তার এঁকে গেছেন। সামুছা বললেন।

—কিন্তু বইটাতে কোথাও তো কোনো ছবির মধ্যে ফুল আঁকা নেই। তাহলে এই ত্রিভুজের মধ্যে কেন আঁকলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—রাজরাজরাদের খেয়াল। বিচিত্র ধরনেরই হয়। সামুছা বললেন।

—আচ্ছা—আপনি আমাদের পূবদিকে যেতে মানা করেছিলেন। পূবদিকে কি ঘরটর আছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—থাকতে পারে। আমি যখন থেকে দেখছি তখন থেকেই পূবদিক ভাঙা। সামুছা বললেন।

—আমার মনে হয় ওদিকে ঘর আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা থাকতে পারে। কিন্তু সেই ঘর দেখবে কী করে? সামুছা বললেন।

—দড়ি বেয়ে নেমে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবেন? সামুছা বললেন।

—পারবো।

—আজকে বিকেল হয়ে এল। মশালের আলোয় ভালো দেখা যাবে না। কাল সকালে আসছি। পূবদিকে নামবো। দড়ি আমরাই আনবো।

পরদিন ফ্রান্সিসরা একটু সকাল সকালই এল। জাহাজ থেকে দেখেশুনে বেশ লম্বা দড়ি নিয়ে এল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো পাথরে পা রেখে ভারসাম্য বজায় রেখে ভাঙা দুর্গের মাথায় উঠল। হ্যারি নীচে রইল। দুর্গের মাথাটাও ভাঙা। সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে।

পূবদিকে গেল দু'জনে। সত্যিই এদিকটা ভেঙে পড়েছে। ফ্রান্সিস পাকানো দড়ি কাঁধে নিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। দড়ি বাঁধার জায়গা খুঁজতে লাগল। তখনই শাঙ্কো একটা ছোট নিরেট পাথুরে দেওয়াল দেখাল। ফ্রান্সিস কাঁধ থেকে দড়ি নামাল। আস্তে আস্তে দড়ির একটা মুখ নামাতে লাগল। প্রায় সবটা দড়ি ছেড়ে দেখল বেশ নীচে নেমেছে।

এবার ফ্রান্সিস দড়ির মাথাটা দেয়ালে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল। টেনে দেখল বেশ শক্তভাবেই বাঁধা হয়েছে। ওরা দড়ি বাঁধায় ওস্তাদ। কারণ জাহাজে দড়ির কাজ অনেক। নানারকম গিঁট বাঁধায় ওরা অভ্যস্ত। ওরা মশাল এনেছিল। কিন্তু তখনও জ্বালে নি।

ফ্রান্সিস দড়ি ধরে ধরে ভাঙা পাথরে পা রেখে রেখে নীচে নেমে আসতে লাগল। তখনও ভাবছে নীচে বোধহয় কোন অটুট ঘর পাবে না।

বেশ কিছুটা নেমে আসতে ভাঙা পাথরের মধ্যে একটা ভাঙা দরজামতো পেল। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল ভেতরটা বেশ অন্ধকার। রোদ অল্পই ঢুকছে।

ফ্রান্সিস ভাঙা দরজায় পা রাখল। তারপর দড়ি ধরে ধরে ভেতরে ঢুকল। অন্ধকারটা চোখে সরে আসতে দেখল একটা ঘর। ও একনজর দেখে বুঝল একটা ভাঙা চৌকোনো ঘর। ও ঘরের ভেতর নামল। তখনই আবছা দেখল ওপাশে আর একটা ভাঙা দরজা। তবে ছোট।

ফ্রান্সিস দড়ির মুখ কাঁধে ঝুলিয়ে ভাঙা পাথরের মেঝের ওপর দিয়ে সেই ঘরের দরজার কাছে গেল। এদিকটা ভেঙে পড়ায় ওপরে ছাদের মত হয়ে গেছে। সেই ঘরটায় ঢুকতে গিয়ে ফ্রান্সিস দ্রুত পিছিয়ে এল। আবছা দেখল সেই ঘরটা বেশ নীচে। ওর মনে হল বোধহয় দুর্গের ভিতেরও নীচে। কিন্তু একেবারে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঘরটা কেমন বোঝাই যাচ্ছে না। শুধু পাথর আর পাথর।

মশাল চাই। ফ্রান্সিস সরে এল। দড়ি ধরে ধরে আগের ঘরের দরজার কাছে এল। দুহাতের তালু মুখের কাছে গোল করে চিৎকার করে ডাকল—শাঙ্কো—শাঙ্কো।

শাঙ্কো ডাক শুনে ঘাবড়ে গেল। ফ্রান্সিস কি কোন বিপদে পড়ল? ও চিৎকার করে বলল—কোন বিপদ নয়তো?

—না—না। তুমি একটা মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

কিছু পরে শাঙ্কো একটা জ্বলন্ত মশাল বাঁ হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে দড়ি ধরে ধরে নেমে এল।

দড়ি ধরে ধরে দুজনে প্রথম ভাঙা ঘরটায় ঢুকল। সেই ঘর পার হয়ে সেই ছোট ঘরটার ভাঙা দরজার কাছে এল।

ফ্রান্সিস এবার জ্বলন্ত মশালটা নীচের ঘরের মাঝখানটায় ছুঁড়ে ফেলল। মশালের আলোয় ছোটঘরটা কিছুটা স্পষ্ট দেখা গেল। ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল। আশ্চর্য! ঘরটা ত্রিকোণ ঘর। এরকম ত্রিকোণ ঘরভাঙা দুর্গ কোথাও দেখেনি। রাজা আলফ্রেডের বইয়ে ত্রিকোণ আঁকা আছে। তাহলে তিনি এই ঘরটাকেই বুঝিয়েছেন। ত্রিকোণের উত্তরের মাথাটায় আঁকা আছে একটা চন্দ্রমুখী ফুল। সেই ঘরের উত্তরের কোণের দিকে তাকাল ফ্রান্সিস। খুব অস্পষ্ট দেখল—পথটা পাথরের স্তূপ।

ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে ডাকল—শাঙ্কো।

—বলো। শাঙ্কো এগিয়ে এল।

ঘরের উত্তরের কোণার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—ঐখানে আছে স্বর্ণখনি।

শাঙ্কো বলল—ওখানে তো পাথরের স্তূপ।

—ওসবের নীচেই আছে স্বর্ণখনি। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি নিশ্চিত? শাঙ্কো সংশয় প্রকাশ করল।

—হ্যাঁ নিশ্চিত। এবার স্বর্ণখনি খুঁজে বের করা। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো এই ঘরে নামতে হয়। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ নামবো। তারপর পাথরের পাটা সরাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। চলো। নামি। শাঙ্কো বলল।

দুজনে দড়ি বেয়ে বেয়ে সেই ত্রিকোণ ঘরটার ভাঙা মেঝেয় নামল। ভাঙা পাথরে পা রেখে রেখে শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে ওরা উত্তর কোণায় এল। দেখল স্তূপাকার পাথরের ভাঙা পাটা।

—সব পাথর সরাতে হবে। হাত লাগাও। ফ্রান্সিস বলল।

—বলছো কি। আমরা দুজনে সব সরাতে পারবো? শাঙ্কো বলল।

—হাত তো লাগাই। দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে পাথরের পাটা সরাতে লাগল। ভাঙা হলেও কোন কোন পাটা বেশ ভারি। ওরা পাথরের পাটা সরাচ্ছে। ভাঙা দুর্গে শব্দ উঠছে—দুম্—দুম্।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা হাঁপিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ভাঙা পাটায় বসে বিশ্রাম নিল। আবার সরাতে লাগল। বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে পাটা সরানোর কাজ চলল। স্তূপীকৃত পাটার উচ্চতা কিছু কমল। কিন্তু রইল অনেক।

শাঙ্কো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এসব সরানো দুজনের কর্ম নয়। আরো লোক লাগবে।

—হুঁ। দেখি সামুছাকে বলে—লোক পাই কিনা। তবে সোনার খনি আবিষ্কার করতে যাচ্ছি। সমস্যা আছে। যদি সত্যিই সোনার খনি পাই তখন

যারা সাহায্য করতে আসবে তারা রুদ্রমূর্তি ধরতে পারে। তখন আমাদের জীবন বিপন্ন হবে। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ এটা হতে পারে।

—হতে পারে না—হবেই। সোনার লোভেই সামুছা এখানে বছরের পর বছর একা পড়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে কী করবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—লোক আনবো। কিন্তু আগে থেকেই সাবধান থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—চলো উঠে পড়ি। লোক জোগাড় করে কালকে আসবো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস ফেরার পথে হ্যারিকে সব বলল।

সামুছা বাইরের ঘরেই বসেছিলেন। ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকতেই বললেন—কোন খোঁজ পেলে?

—এখনও নিশ্চিত নই। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

—এত বছর ধরে চেষ্টা করে আমি পারলাম না। তোমরা পারবে? সামুছা সংশয় প্রকাশ করলেন।

—দেখি। একটা কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। সামুছা বললেন।

—প্রায় স্তূপাকার পাথর একটা ঘরে। সেসব সরিয়ে ভাঙা মেঝেটা বের করতে হবে। কিন্তু আমাদের তিনজনের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। ফ্রান্সিস বলল।

—সময় নাও। তোমরাই সরাও। সামুছা বললেন।

—না। আমাদের তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা পারবো না। ভীষণ খাটুনি। শাঙ্কো বলল।

—পিংলা বলছিল তোমরা ক্রীতদাস ছিলে। অনেক দিন। শুকনো ক্ষেতে জল ছিটোনোর কাজ করেছো। সামুছা বললেন।

—হ্যাঁ। তবে মুক্ত অবস্থায় পারবো না। শাঙ্কো বলল।

—তাই বলছি তিনচারজন লোক যদি দিতে পারেন তাহলে দ্রুত কাজ সারতে পারি। ফ্রান্সিস বলল।

—তা দেয়া যাবে। পাংলুকে খবর দিতে পাঠাচ্ছি। সামুছা বললেন।

—ঠিক আছে। আমরা কাল সকালে আসবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। সামুছা বললেন।

ফেরার পথে শাঙ্কো বলল—ত্রিকোণ ঘর ফুলের ছবি এসব নিয়ে তো সামুছাকে কিছু বললে না।

—মাথা খারাপ। এসব বললে সামুছা আমাদের হটিয়ে নিজেই কাজে নেমে পড়বে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তুমি তো ওকেই সব দেবে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। তা দেব। কিন্তু একটা ব্যাপার আছে। মারিয়াকে দেখতে বলবো কত সোনার চাকতি আছে। যদি দেখি অনেক কম তাহলে স্বর্ণখনি আবিষ্কার করতে পারলে সামুম্বার কাছ থেকে কিছু সোনা নেব। ফ্রান্সিস বলল।

—সোনা থাকলে কেমনভাবে আছে? চাকতির মত? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—সঠিক কী করে বলি। তবে পুরোনো আমলে খনির সোনা গোল তাল করে রাখা হত। হয়তো সেভাবেই রাখা আছে।

জাহাজে এসে ফ্রান্সিস মারিয়াকে জিজ্ঞেস করল—সোনার চাকতি কেমন আছে? মারিয়া দেয়ালের কাঠ সরিয়ে দেখল। বলল—কমে গেছে। কিছু আছে শাঙ্কোর কাছে।

—তাহলে সোনা চাই। ফ্রান্সিস বলল।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিরা এল।

দেখল বসার ঘরের বারান্দায় চারজন কালো যুবক বসে আছে। সামুম্বা বেরিয়ে এলেন। বললেন—এই যে তোমাদের লোক। ফ্রান্সিস বুঝল তরতাজা বলিষ্ঠ যুবক ওরা। ওদের দিয়ে দ্রুতই কাজ হবে।

ফ্রান্সিস পাংলুর কাছে দড়িটা রেখে গিয়েছিল। পাংলু সেটা নিয়ে এল।

সকলে চলল ভাঙা দুর্গের দিকে। হ্যারি নীচে রইল।

গতকালের মত দড়ি বেঁধে প্রথমে ফ্রান্সিস নেমে গেল। শাঙ্কোও নামল। দুজনের হাতেই জ্বলন্ত মশাল। সঙ্গীদের একজনও একটা জ্বলন্ত মশাল নিল।

সবাই প্রথম ভাঙা ঘরটার ভাঙা দরজার সামনে এল। ভাঙা মেঝের ওপর দিয়ে ছোট ঘরটার দরজার কাছে এল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস এল। দেখল চারজন কালো যুবক বারান্দায় বসে আছে। তাদের নিয়ে ফ্রান্সিস চলল।

তিনটে মশাল নিয়ে সবাই ছোট ঘরে নামল। এখন চারদিক অনেক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

এবার ফ্রান্সিস কালো যুবকদের বলল—ঐ উত্তরকোনায় একটা তামার খনি আছে। তামা এমন কিছু দামি নয়। আমরা সেই খনিটা খুঁজে বের করবো। সেটা করতে গেলে ঐ স্তূপাকার পাথর সরাতে হবে। বুঝেছো? ওরা ঘাড় নাড়ল।

—তাহলে কাজে লাগা যাক। ফ্রান্সিস বলল। মশালগুলো পাথরের খাঁজে রাখা হল। মশালের আলোয় সবাই মিলে পাথরের ভাঙা পাটা সরাতে লাগল। বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে পাথর সরানো দুপুরের পরেই শেষ হয়ে এল। সবাই কাজ থামাল। সবাই কমবেশি হাঁপাতে লাগল।

ফ্রান্সিস উত্তর কোনায় ভাঙা মেঝের কাছে এল। ভাঙা পাথর সরাতে লাগল। ভাঙা পাথর ফেলে দিতেই দেখল—একটা তিনকোণা পাথরের পাটা। তার ওপর উত্তর কোনায় চন্দ্রমুখী ফুল কুঁদে তোলা।

ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে নিজের উচ্ছ্বাস গোপন করল। ফিরে তাকিয়ে বলল—বৃথা চেষ্টা। এখানে তামার খনিটনি নেই। সবটাই ভাঙা পাথরে ভর্তি।

শাঙ্কো হতাশ গলায় বলল—তাহলে সব চেষ্টাই মাটি।

—হ্যাঁ। একটু বিশ্রাম নিয়ে ওপরে উঠে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

কালো যুবকরা বসেছিল। একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তাহলে আমরা চললাম।

—হ্যাঁ তাই। আমরাও একটু পরে চলে যাবো। ফ্রান্সিস দুহাত ছড়িয়ে বলল।

কালো যুবকরা উঠে যাবার জন্যে দড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল।

ফ্রান্সিস তখন একটা পাথরের ওপর বসেছিল।

কিছু পরে উঠে দাঁড়াল। বলল—শাঙ্কো উঠে দেখতো ওরা চলে গেল কিনা। শাঙ্কো দড়ি বেয়ে উঠে এল। ওপরে তাকিয়ে দেখল চার যুবকই উঠে গেছে।

শাঙ্কো নেমে এল। বলল—ওরা চলে গেছে। ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। চাপাগলায় সজোরে বলে উঠল—

—শাঙ্কো—আমি সফল।

—সেকি? শাঙ্কো অবাক।

—এসো। দেখাচ্ছি। ফ্রান্সিস হাসতে হাসতে বলল।

দুজনে সেই ত্রিকোণ ফুল তোলা পাথরের পাটার কাছে এল। ফ্রান্সিস পাটাটা তুলে দেখিয়ে বলল—শাঙ্কো—এর নীচেই আছে স্বর্ণখনি।

—নিশ্চিন্ত? শাঙ্কোর বিস্ময়তার তখনও কাটেনি।

—এখন নিশ্চিত। চলো। পাটাটা তুলি। এবার দুজনকেই তুলতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে মিলে পাটাটা টানতে গেল। আশ্চর্য। আস্তে পাটাটা উঠে এল। ভেতরটা অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—দুটো মশাল নিয়ে এসো। শাঙ্কো দুটো মশাল পাথরের খাঁজ থেকে তুলে নিয়ে এল।

গর্তটার দু'পাশে দুজনে মশাল দুটো ধরল। ফ্রান্সিস একটা মশাল গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। এবার প্রায় স্পষ্ট দেখা গেল কয়েকটা গোল তালা। মশালের আলোয় একটু ঝিকিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস অভিজ্ঞ চোখে বুঝল—

—সোনা। ও প্রায় চিৎকার করে উঠল—শাঙ্কো—সোনা। শাঙ্কোও আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

ফ্রান্সিস দুহাতে ভর রেখে আস্তে আস্তে গর্তটায় নেমে গেল। একটা সোনার তাল নিয়ে ওপরে উঠে এল।

এবার মশালের আলোয় সোনার তালের এবড়োখেবড়ো গা বেশ ঝিকিয়ে উঠল।

—চলো। মুখটা বন্ধ করি। ফ্রান্সিস বলল। পাটা দিয়ে গর্তটার মুখ বন্ধ করে দুজনে ওপরে উঠে এল। হ্যারি ফ্রান্সিসের হাতে সোনার তাল দেখে ছুটে এল।

হেসে বলল—সাবাস ফ্রান্সিস। তিনজনেই হেসে উঠল। তারপর মৃদুস্বর ধ্বনি তুলল—হো—হো—হো।

ফ্রান্সিস হেসে গলা নামিয়ে বলল—এখন কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করো না। দেখবে সামুছাও এই কথা বলবে।

ওরা সামুছার বসার ঘরে এল। বসল।

ফ্রান্সিস সোনার তালটা লুকিয়ে রাখল।

একটু পরে সামুছা এলেন। চেয়ারে বসলেন।

সামুছা মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন—হদিশ পেলে?

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা কাত করে হেসে বলল।

তখনই পাংলু বিকেলের খাবার নিয়ে ঢুকল। সবাইকে দিল। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা প্রায় গোগ্রাসে খাবার গিলতে লাগল। সামুছা মৃদু হেসে বললেন—ওদের আরো খেতে দাও। আবার খাবার। এবার ফ্রান্সিসরা আস্তে আস্তে খেল। পাংলু তখন ঘরে নেই।

সামুছা আবার মৃদুস্বরে বললেন—প্রমাণ? ফ্রান্সিস লুকিয়ে রাখা সোনার তালটা সামুছার হাতে দিল। সামুছার দুচোখ যেন জ্বলে উঠল। সোনার তালটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। তারপর উঠে আলমারিতে ঢুকিয়ে রাখলেন। এসে চেয়ারে বসলেন। মৃদুস্বরে বললেন—আরো সোনার তাল আছে?

—হ্যাঁ, আছে। ফ্রান্সিস বলল।

সামুছা বললেন—তোমাদের বুদ্ধি চিন্তার প্রশংসা না করে পারছি না। কিন্তু একটা কথা। সোনার খনির কথাটা যেন জানাজানি না হয়। শুধু আমরা চারজন। এমন কি পাংলুকেও বলা হবে না। আমি পরে সোনার খনির ব্যবস্থা করছি।

—এবার আমার একটা অনুরোধ। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা ধনী নই। তবে হতে পারতাম। সে থাক—আমরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। সব দেশের মুদ্রা তো আমাদের কাছে থাকে না। তাই সোনাই আমাদের একমাত্র দাম দেবার মাধ্যম। আপনি যদি আমাকে কিছু সোনার চাকতি এই মণ্ড থেকে দেন তাহলে খুবই উপকার হত।

—নিশ্চয়ই দেব। তোমরাই তো কষ্ট করে উদ্ধার করলে। তবে এই সোনা থেকে নয়। আমার কাছে একথলি খাঁটি স্পেনীয় স্বর্ণমুদ্রা আছে। সেটাই দিচ্ছি।

সামুছা উঠে বাড়ির ভেতরে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এলেন। একটা নীল সাটিন কাপড়ের থলি টেবিলে রেখে বললেন—এই তোমাদের পারিশ্রমিক। থলিটা তুলে নিয়ে ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে দিল। শাঙ্কো সেটা কোমরের ফেট্রিতে ঝুলিয়ে রাখল।

ফ্রান্সিস বলল—তাহলে আমরা চলি।

—বেশ। তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। সামুছা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন।

ফ্রান্সিসরা জাহাজঘাটের দিকে চলল।

শাঙ্কো বলল—পাংলুকে দুটো মুদ্রা দিয়ে আসবো।

—না। সামুছা জানতে পারলে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন।

ফ্রান্সিসরা পাটা পাটাতন দিয়ে জাহাজে উঠে এল। বন্ধুরা ছুটে এল। জানতে চাইল ফ্রান্সিসরা স্বর্ণখনি খুঁজে বের করতে পেরেছে কিনা।

—হ্যাঁ। আমরা সফল। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—হো—হো—হো। আশেপাশের জাহাজ থেকে লোকেরাও দেখল।

বুঝল না এত উল্লাসের কারণ কী?

মারিয়া হাসিমুখে এগিয়ে এল। শাঙ্কো মারিয়াকে স্বর্ণমুদ্রা ভরা থলিটা দিল। ফ্রান্সিস শুধু বলল—লুকিয়ে রেখো। মারিয়া মাথা কাত করল।

শাঙ্কো তখন হাত পা নেড়ে বন্ধুদের স্বর্ণখনি আবিষ্কারের ঘটনা বলছে।

তখনও সূর্য অস্ত যায় নি। মারিয়া সূর্যাস্ত দেখার জন্যে রেলিঙ ধরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসও এসে পাশে দাঁড়াল।

সূর্য পশ্চিম আকাশে গভীর কমলা ছড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে ডুবে গেল।



ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো এক বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। সমুদ্রের ধারে ওদের জাহাজ নোঙর করে আছে। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো এসেছে যদি কারো সঙ্গে দেখা হয় তাহলে জেনে নেবে কোথায় এসেছে ওরা। কিন্তু প্রথমেই সব কথা জিজ্ঞেস করতে ভরসা পাচ্ছে না। কোনো কিছু না শুনেই যদি ওদের আক্রমণ করে তাহলে তো লড়াই অনিবার্য। নিজেরা তরোয়াল আনেনি। ফ্রান্সিস এসব ক্ষেত্রে লড়াইয়ের পক্ষপাতী নয়। সে ভাবছে আমাদের শুধু জানতে আসা আমরা কোথায় এলাম। লড়াই-টড়াইয়ের কোনো প্রশ্নই নেই।

দু'দিন আগে এক রাতে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়েছিল ওরা। বহু কষ্টে স্রেফ মনের জোরে জাহাজডুবির হাত থেকে বেঁচেছে। ফ্রান্সিসের শরীর এখনও দুর্বল।

বন শেষ। বেরিয়ে এল ওরা। দুটো বাড়ি দেখল। সেই পাথর, কাঠ, ঘাস দিয়ে তৈরি। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। তবে চারদিক মোটামুটি দেখা যাচ্ছে।

—ফ্রান্সিস, এখন কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—বাড়ি চাই, খাদ্য চাই, পানীয় জল চাই, ফ্রান্সিস উত্তর দিল।

—বাব্বাঃ, এত সব তোমাকে কে দেবে?

—দেয় দেয়, তেমন পবিত্র মানুষ পেলে তার কাছ থেকে সব পাওয়া যায়।

—দেখো, কপালে মেলে কি না। শাঙ্কো হেসে বলল।

বনের কাছেই ওরা পেল দুটো তক্তা। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দেকা গেল তক্তা দুটো দিয়ে নিচের বড় গর্ত ঢাকা দেওয়া হয়েছে। দুজনে তক্তা দুটোর কাছে এল। শক্ত করে চেপে ধরে একটা তক্তা সরাল। অস্পষ্ট হলেও চাঁদের আলোয় এবার সিঁড়ি দেখা গেল। পাথরের সিঁড়ি।

ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো নামতে শুরু করল। নামতে নামতে মানুষের কথাবার্তা শুনতে পেল ওরা। এটা তাহলে মানুষের বসবাসের জন্যেই তৈরি হয়েছে। নামতে নামতে ওরা দেখল—বেশ বড় ঘর। পাথর কেটে ঘরটা তৈরি। ঘরের দু'পাশে দেয়ালের খাঁজে মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় সবকিছু মোটামুটি দেখা যাচ্ছে।

ওরা দেখল এক প্রৌঢ় একটা পাথরের ছোট চাঁইয়ের ওপর বসে আছেন।

এতক্ষণ বিড় বিড় করে কথা বলছিলেন। এবার কয়েকজন সৈন্য ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোকে ধরে প্রৌঢ়ের কাছে নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা বাধা দেবার চেষ্টাও করেনি।

প্রৌঢ় ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, রাজা তুরীনের সৈন্য তোমরা। কিন্তু আমাদের রাজা পারকোনের সঙ্গে পারবে না। পারকোনকে তার প্রজারা দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে। বন্ধুর মতো ভালোবাসে। অ্যাই—অ্যাই—অ্যাই—বলতে বলতে প্রৌঢ় হঠাৎ সটান দাঁড়িয়ে উঠে দাঁড়ে বসে থাকা বাজপাখিটার মাথায় আঙুল চালিয়ে দিলেন। বাজপাখিটা পড়ে যেতে যেতে উঠে বসল। ফ্রান্সিস বাজপাখিটিকে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখল। পাখনার রং খয়েরি সাদা মিশেল। চোখ দুটো গোল গোল, কালো। যে জন্যে বাজপাখিটার কদর সেটা হচ্ছে ওর ঠোঁট। বঁড়শির মতো বাঁকানো। প্রৌঢ় বাজটাকে আদর করে ছেড়ে দিলেন। বাজপাখিটা আবার দাঁড়ে গিয়ে বসল। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে চেয়ে বললেন, আমাদের রাজা পারকোনের সঙ্গে রাজা তুরীনের লড়াই হবে। কবে হবে সেটা কারো জানা নেই। সেই লড়াই কালও হতে পারে আবার একশো দিন পরেও হতে পারে।

ফ্রান্সিস একটু জোর দিয়ে বলল, আপনি আমাদের মিথ্যে সন্দেহ করছেন। আপনাদের এই ঘরে সৈন্যরা থাকে জানলে আসতাম না। তবে একটা কথা স্পষ্ট বলছি, আপনাদের এই কাটাকাটি-মারামারির মধ্যে আমরা নেই। তবে কেন আমাদের বন্দী করে রাখবেন!

—তাহলে তোমরা এখানে এসেছো কেন? প্রৌঢ় বললেন।

—এই কথা জানতে যে এই জায়গার নাম কী? য়ুরোপ থেকে কতদূর এই দেশ, শাঙ্কো বলল।

সেটা জেনে কী হবে? প্রৌঢ় বললেন।

তাহলে বুঝতে পারবো য়ুরোপ থেকে কত দূরে আমরা আছি। বুঝতে পারবো কবে নাগাদ দেশে পৌঁছোতে পারবো।

—সে সব জেনে আর কী হবে? তোমরা তো এখান থেকে যেতে পারবে না। প্রৌঢ় বললেন।

—কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—কারণ মাটির নিচে এই ঘর-টরের কথা তোমরা জেনে ফেলেছো। এটা একটা দুর্গের মতো। এই দুর্গের কথা তোমরা জেনে ফেলেছ। তোমাদের আর বাইরে যেতে দেওয়া হবে না।

—অর্থাৎ আমাদের এখানে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ, তোমাদের এখন এখানেই বন্দী হয়ে থাকতে হবে। লড়াই শুরু হোক তখন তোমাদের কথা ভাবা যাবে, প্রৌঢ় বললেন।

শাঙ্কো চাপাস্বরে ওদের দেশীয় ভাষায় বলল, ফ্রান্সিস, আমরা বিপদে পড়লাম।

হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর বলল, দেখুন, আমরা ভুল করে এখানে চলে এসেছি। আপনাদের রাজাটাজার কথা আমরা জানি না। ওসব জেনে কী হবে? ভুল করে এসে পড়েছি সেটা বুঝে আমাদের মুক্তি দিন।

—না। তোমাদের যুদ্ধে জেতে হবে আমাদের হয়ে, মানে রাজা পারকোনের হয়ে লড়াই করতে হবে। তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে না।

—রাজা তুরীন আর রাজা পারকোন কবে যুদ্ধ শুরু করবেন, সেটা কে বলতে পারবে? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—কেউ বলতে পারবে না, প্রৌঢ় উত্তর দিলেন।

—তাহলে আমাদের স্বাধীন চলাফেরায় কেন বাধা দিচ্ছেন?

—কারণ আছে। তাহলে তোমাদের একটু ইতিহাস বলতে হয়। এই অঞ্চলে আমার বাবা-ঠাকুর্দা মন্ত্রী হয়ে রাজাকে রাজ্যশাসনে সাহায্য করে গেছেন। উত্তরাংশে বর্তমান রাজা তুরীন ও তাঁদের পূবপুরুষরা রাজত্ব করে গেছেন। উত্তরাংশের সঙ্গে আমাদের দক্ষিণাংশের লড়াই প্রায়ই লেগে থাকে। আমার পিতা নির্বিবাদে থাকার জন্যে পাথর কেটে এই ঘর তৈরি করিয়েছিলেন। এখানেই পরিবার-পরিজন নিয়ে আমিও বাস করতে লাগলাম। এই পাহাড়ের ওপাশে একটা বড় লম্বাটে ঘর বানালাম—পাথরের। ওখানে সৈন্যাবাস তৈরি করলাম। সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলাম। আমরা ধীরে ধীরে রাজা তুরীনের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। তাই আমরা সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছি। তোমাদের মতো অভিজ্ঞ যুবকদের আমাদের সৈন্যদলে রাখতেই হবে। লড়াই শুরু হলে তোমরা আমাদের রাজা পারকোনের হয়ে লড়াই করবে—এই জন্যেই তোমাদের চাই। কী রাজী? প্রৌঢ় বললেন।

—যদি রাজী না থাকি? শাঙ্কো বলল।

—তাহলে নির্জলা উপোস করে থাকতে হবে। নইলে তোমাদের কী অবস্থা হবে বুঝতেই পারছো।

ফ্রান্সিস বুঝল—সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে না। ও বলল, আমরা একটু ভেবে দেখি। আসল কথা, সমুদ্রের তীরে আমাদের জাহাজ রয়েছে। সেই জাহাজে আছে আমার স্ত্রী ও বন্ধুরা। আমরা না ফিরলে ওদের দুশ্চিন্তা বাড়বে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রৌঢ় বললেন, আমি এখানকার রাজা পারকোনের মন্ত্রী। বয়েস হয়েছে। নিয়মিত রাজসভায় যেতে পারি না। যাকগে, দূত পাঠাচ্ছি। তোমরা যে-খবর দিতে চাও তা বলে পাঠাও।

ফ্রান্সিস বলল—আমরা বিশেষ প্রয়োজন এদিকে এসেছি। আমাদের জাহাজে খাদ্য পানীয় জল ফুরিয়ে এসেছে। এখানে খাদ্য জল পাবো কি না।

—হ্যাঁ, পাবে। আমাদের মজুদ থেকে দেয়া যাবে। কিন্তু এর জন্যে দাম লাগবে।

শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে কোমরের ফেট্টি থেকে দুটো স্বর্ণমুদ্রা বের করে মন্ত্রীমশাইয়ের হাতে দিল। মন্ত্রী খুশী। বলল—তোমরা দুজন তো খাদ্য জল নিয়ে যেতে পারবে না।

—সেইজন্যেই আপনার দূতকে দিয়ে খবার পাঠাবো—বস্তা জলের পীপে নিয়ে যেন ছ'সাতজন বন্ধু আসে। খাদ্য, জল নিয়ে যেতে পারবে।

—সেই খবল পাঠাও। মন্ত্রী বলল।

মন্ত্রী হাতে মৃদু তালি দিলেন। একজন শুটকো চেহারার সৈন্য এগিয়ে এল। মন্ত্রী বললেন—ওকাজা এরা কী বলে শোন। সেইমত কাজ কর।

ফ্রান্সিস বলল—ভাই, তুমি সমুদ্রতীরে জাহাজঘাটায় যাও। সেখানে বেশ কটা জাহাজ নোঙর করা আছে। তার মধ্যে যে জাহাজে একটা সাদা পতাকা উড়ছে দেখবে সেটাই আমাদের জাহাজ। জাহাজে উঠে তুমি হ্যারির সঙ্গে দেখা করবে। বলবে যে আমরা এখানে খাদ্য ও জলের ব্যবস্থা করেছি। ওরা ছ'সাতজন যেন বস্তা, পীপে নিয়ে আসে।

—বেশ। ওকাজা বলল।

—তুমিই ওদের এখানে নিয়ে আসবে। তুমি কি এখনই যাবে?

—হ্যাঁ, খেয়েটেয়ে যাবো। ওকাজা বলল।

ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হল। যাক—খাদ্য আর জলের একটা ব্যবস্থা করা গেল।

মন্ত্রী বললেন—ওকাজা—এদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কর। ফ্রান্সিসদের বললেন—যাও—ওর সঙ্গে।

ঘরের পেছনে একটা ঝর্ণা। দুজনে বেশ অবাকই হল। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ। জল ঝরে পড়ছে। বেশ বড়ই ঝর্ণাটা। ফ্রান্সিস ভাবল এত জল পড়ছে কিন্তু যাচ্ছে কোথায়? দেখা গেল একটা ফাটলমত জায়গায় জল ঢুকে যাচ্ছে। অনেকেই স্নান করছে।

—স্নানটা সেরে নিলে হত না। শাঙ্কো বলল।

—না। আগে বন্ধুরা আসুক। খাদ্য জল নিয়ে যাক। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান খাওয়া। ফ্রান্সিস বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্কোরা পীপে বস্তা নিয়ে এল। মন্ত্রীমশাই ওকাজাকে বললেন—এদের প্রয়োজনমত খাদ্য দিয়ে দাও। ঝর্ণা থেকে জল দাও।

ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে বিস্কোদের আসতে বলল। পেছনের দিকে একটা ঘরে নিয়ে এল। বস্তার পর বস্তা সাজানো। বোঝা গেল ভাঁড়ার ঘর। বিস্কোরা আটা ময়দা চিনি বস্তায় ঢেলে নিল।

—আরো লাগলে নিতে পারেন। ওকাজা বলল।

—না-না। পরে কোন বন্দরে খাবার যোগাড় করবো। বিস্কো বলল।

হ্যারি ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—কী ব্যাপার? তোমরা কী বন্দী?

—হ্যাঁ। যে কোন দিন যেকোন মুহূর্তে এদের লড়াই লাগতে পারে। এদের শত্রু এক রাজার সঙ্গে। আমাদের লড়াইতে নামিয়ে দেবার মতলব। আমরাও চুপ করে আছি। দেখি কী হয়। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—এখানে গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খোঁজ পেয়েছি। কাজেই থাকছি।

—বেশ। হ্যারি বলল।

বিস্কো হ্যারিরা খাদ্যজল নিয়ে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। হ্যারি ভাবল—খুব সময়মত খাবার জল পাওয়া গেছে। এখন ফ্রান্সিসরা কবে নাগাদ মুক্তি পায় সেটাই চিন্তার।

ওকাজা ফ্রান্সিসদের কাছে এল। দুজনকে একটা ঘরে নিয়ে এল। কিছু যুবক শুয়ে বসে আছে। এরা যোদ্ধা। মেঝেয় মোটা কম্বল পাতা। ফ্রান্সিসরা বসল।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর দুজনে নিজেদের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল।

—ফ্রান্সিস—শাঙ্কো ডাকল।

—বলো—ফ্রান্সিস বলল।

—সব ব্যাপারেই বেশি ঔৎসুক ভালো না।

হ্যাঁ। এখন সেটা বুঝতে পারছি। বেশি জানতে গিয়ে এই ঝামেলায় পনলাম। নিচে নামাটা উচিত হয়নি।

শাঙ্কো বলল—শুনলাম, রাজা পারকোন প্রতি রোববার এখানে আসেন। তখন এই গর্ভগৃহে আর কেউ থাকতে পারে না। রাজা আর এক রাঁধুনি থাকে। সেই রাঁধুনিও রাতের খাবার তৈরি করে দিয়ে সন্ধ্যের আগেই এখান থেকে চলে যায়।

—তুমি এসব শুনেছো, না? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, এসব শোনা অব্দি আমার মনে একটা সম্ভাবনা জাগছে। রাজা পারকোনের এই আচরণের অর্থ কী?

—দেখ শাঙ্কো, সংসারে নানা মনোভাবের মানুষ থাকে। রাজা পারকোনও এরকম এক মানুষ। তিনি মাঝে মাঝে একা হতে ভালোবাসেন। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস, আমার কিন্তু একটা সন্দেহ হয়। শাঙ্কো বলল।

—কী সেই সন্দেহ?

—নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো গুপ্ত ধনভাণ্ডারের ব্যাপার আছে।

—এ-বিষয়ে জেনেছো কিছু?

—না, তবে মনে হয় মন্ত্রীমশাই এ সম্বন্ধে সব জানেন। এই ব্যাপারে কী বলেন?

—চলো।

দুজনে মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে গেল। তখন মন্ত্রীমশাই পাথরের বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। শাঙ্কো আস্তে ডাকল, মন্ত্রীমশাই। মন্ত্রীমশাই সোজা উঠে বসলেন।

—কী ব্যাপার? মন্ত্রী বললেন।

ফ্রান্সিস বলল, দেখুন একটা ব্যাপার আমরা শুনেছি।

—কী শুনেছো? মন্ত্রী জানতে চাইলেন।

—শুনেছি রাজা পারকোনের পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার নাকি এখানেই কোথাও গোপনে রাখা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ, তোমরা ঠিকই শুনেছো। রাজা পারকোনের পিতা অনেক চেষ্টা করেও তার হদিস পাননি।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে বলুন, আমি সেই ধনভাণ্ডারের হদিস বের করবো।

মন্ত্রী একটু অবাকই হলেন। তারপর বললেন, পারবে সেই ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করতে?

আমার কিছু জানা প্রয়োজন। আপনারা যদি সেসব আমাকে জানান তাহলে আমি পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে, বলছি সব। এই বলে মন্ত্রীমশাই পূর্বাপর ঐ এলাকার রাজাদের কথা সংক্ষেপে বললেন। সবশেষে যোগ করলেন, রাজা পারকোন আর রাজা তুরীন দুজনেরই ধারণা কোনো গর্ভগৃহে সেই ধনভাণ্ডার গোপনে রাখা হয়েছে। সবচেয়ে সহজ হতো যদি রাজা পারকোনের পিতামহ পুত্রকে বলে যেতে পারতেন কোথায় গোপনে রাখা আছে সব ধনসম্পদ। কিন্তু তিনি তা বলে যাননি।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল, আমি রাজা পারকোনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।

—ঠিক আছে। তবে কাল রোববার। রাজামশাই একা এখানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাটাবেন। এ সময় তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না। চুপচাপ শুয়ে থাকেন।

—তাহলে তো গর্ভগৃহে কারো থাকা চলবে না। শাঙ্কো বলল।

—পাহাড়ের ওপারে আরো একটা গৃহ আছে, সেখানে থাকতে হবে।

ফ্রান্সিস বলল, তাহলে যাচ্ছি। রাজা পারকোনকে আমার কথা বলবেন। দেখুন উনি রাজী হন কি না।

—নিশ্চয়ই রাজী হবেন। কত দেশ-বিদেশের লোককে তিনি নিয়ে এসে একানে রেখেছেন ঐ গুপ্ত ধনভাণ্ডারের উদ্ধারের জন্যে। কিন্তু কেউ পারেননি। অগত্যা প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছেন। মন্ত্রী বললেন।

ফ্রান্সিস, শাঙ্কো নিজের জায়গায় ফিরে এল। শুয়ে পড়তে পড়তে শাঙ্কো বলল, —ফ্রান্সিস কিছু সূত্রটুত্র পেলে?

—এই গর্ভগৃহেই আছে সেই গোপন ধনভাণ্ডার। ফ্রান্সিস উত্তর দিল।

—এটা ভাবছো কেন? শাঙ্কো প্রশ্ন করল।

—রাজা পারকোন এই গর্ভগৃহে এসে থাকেন। অন্য কোনো গর্ভগৃহে যান না। কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—এই গর্ভগৃহেই ভালো লাগে থাকতে তাই। উত্তরে শাঙ্কো বলল।

—উহুঁ, ব্যাপারটা শুধু ভালো-লাগা নয়। হয়তো রাজা পারকোন সোনা-হীরে-মুক্তোর ভাণ্ডারের কিছু হদিস করতে পেরেছেন। এ অবস্থায় হয়তো আমাদের অনুমতি দেবেন না।

পরদিন অন্ধকার থাকতে থাকতেই সবাই তল্পি-তল্পা গুটিয়ে সেই গর্ভগৃহ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল সবাই।

ভোরের দিকে রাজা পারকোন এলেন। গায়ে সাধারণ পোশাক। খাপে ভরা তরোয়াল আনেননি। মাথায় মুকুট নেই।

গর্ভগৃহে নামবার পাথরের সিঁড়ির কাছে মন্ত্রীমশাই দাঁড়িয়েছিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, এক বিদেশী ভাইকিংকে পেয়েছি। ও বলছে, গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবে। রাজা চমকে মন্ত্রীর দিকে তাকালেন। হাতের ইশারায় জানালেন নিয়ে আসতে। রাজা নিচে নেমে গেলেন। ফ্রান্সিসরা কাছেই ছিল। মন্ত্রীমশাই বললেন, দেরি করো না। চলো।

ফ্রান্সিস একা মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল। দেখল রাজামশাই মন্ত্রীর আসনে বসে আছেন। সামনে পাথরের টেবিলে কালির দোয়াত আর কলম।

ফ্রান্সিস ও মন্ত্রী ঐ টেবিলের কাছে এল। রাজামশাই কাগজটা এগিয়ে দিলেন। রাজামশাই কাগজে লিখলেন, তুমি সব ঘটনা জানো?

—হ্যাঁ, মোটামুটি জানি। ফ্রান্সিস মুখে বলল।

তোমার নাম কী? রাজা লিখলেন।

—ফ্রান্সিস।

গুপ্তধন খোঁজখুঁজির জন্যে তোমার যা প্রয়োজন পড়বে মন্ত্রীমশাই সেসবের ব্যবস্থা করবেন। তারপর লিখলেন—গুপ্তধন তুমি যদি উদ্ধার করতে পারো সে সবকিছুই আমার, তুমি কিছুই পাবে না।

ফ্রান্সিস পড়ে মৃদু হেসে বলল, তাই হবে।

রাজা লিখলেন—সন্দেহ নেই বেশ কষ্ট করে তোমাকে গুপ্তধন উদ্ধার করতে হবে। তার বদলে তুমি কিছুই চাও না?

—না। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

ঠিক আছে। আগে তো উদ্ধার হোক তারপর দেখা যাবে। যাও। কাজ শুরু কর। রাজা লিখলেন।

মন্ত্রী আর ফ্রান্সিস ওপরে উঠে এল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল, ফ্রান্সিস, কী কথা হলো?

—উনি রাজী হয়েছেন। মন্ত্রীমশাই সব ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবেন।

মন্ত্রী বললেন, এখানে আপনারা বসুন। আপনাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। মন্ত্রী চলে গেলেন।

কিছু পরে এক সৈন্য ওদের জন্যে সকালের খাবার নিয়ে এল। একটা পাথরের চাঁইয়ের গায়ে ওরা বসল। খাবার খেতে লাগল। সৈন্যটি দাঁড়িয়ে ছিল। খাওয়া শেষ হতে বলল, আপনারা আসুন। আপনাদের জন্যে একটা ছোট ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দুজনে ঐ সৈন্যটির পেছনে পেছনে চলল। ছোট পাহাড়টার পরেই আর একটা গর্ভগৃহ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ওরা একটা ছোট ঘরের সামনে এল। সৈন্যটি বলল, এই ঘরে আপনারা দুজন থাকবেন। কোনো কিছুর দরকার হলে আমাদের বলবেন। সৈন্যটি চলে গেল।

রাত শেষ হলো। রাজা পারকোনের মৌনব্রত শেষ হলো। তিনি রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন। ফ্রান্সিসরা আবার গর্ভগৃহে ফিরে এল।

এইবার ফ্রান্সিস কাজে নামল। শাঙ্কোকে নিয়ে রাজবাড়ি থেকে শুরু করে সব গর্ভগৃহেই গেল। একাগ্র দৃষ্টিতে সম্ভাব্য সব জায়গাগুলি দেখতে লাগল। পাথুরে দেয়াল। ঘরগুলো প্রায় একইরকম। সব গর্ভগৃহ। একই রীতি মেনে তৈরি। ফ্রান্সিস বসেছিল। এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, শাঙ্কো, চলো মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে।

দুজনে মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে এল। মন্ত্রী কাগজে কী লিখছিলেন। বললেন, আবার আমার কাছে কেন?

—সন্দেহ না মিটলে আপনার কাছেই বারবার আসতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কী ব্যাপার? মন্ত্রীমশাই জানতে চাইলেন।

—আচ্ছা, এই গর্ভগৃহগুলো কি একই সময়ে একই সঙ্গে তৈরি হয়েছিল? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—এটা তো বলা সম্ভব নয়। তবে রাজা পারকোন এ বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন।

—কোন গর্ভগৃহটা সবচেয়ে পুরোনো? ফ্রান্সিস জানতে চাইলো।

—সেটাও বলতে পারবো না। মন্ত্রী বললেন।

—রাজা পারকোন? ফ্রান্সিস বলল।

—হয়তো তাঁর কিছু ধারণা আছে।

—আমি রাজার সঙ্গে দেখা করবো। একটু ব্যবস্থা করুন। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। আমি কিছুক্ষণ পরেই রাজসভায় যাচ্ছি। তুমিও চলো।

ফ্রান্সিসরা মন্ত্রীর সঙ্গে যখন রাজসভায় এল তখন বেশ বেলা হয়েছে। মন্ত্রী নিজের আসনের দিকে চলে গেলেন। ফ্রান্সিসরা সভার কাজ দেখতে লাগল। রাজা বিচার করছেন।

একসময় সভা শেষ হলো। প্রতিহারীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকজন সামলাতে। রাজা উঠবেন সিংহাসন থেকে। মন্ত্রী এগিয়ে গিয়ে রাজাকে কিছু বললেন। রাজা আবার বসে পড়লেন। একজন প্রতিহারী এসে ফ্রান্সিসদের ডেকে নিয়ে গেল। ফ্রান্সিসরা একটু মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়াল। রাজা বললেন, কোনো বিষয়ে কিছু জানতে চাও?

—আমরা একটা সমস্যায় পড়েছি।

—কী সমস্যা।

—আপনার পিতামহের নির্দেশে কবে ক'টা গর্ভগৃহ তৈরি হয়েছিল?

রাজা একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, যে গর্ভগৃহে আমি রবিবার যাই সেই গর্ভগৃহটি আমার প্রপিতামহের আমলে নির্মিত।

অন্য গর্ভগৃহগুলো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

পরে আমার পিতামহ অন্য গর্ভগৃহগুলো তৈরি করেছিলেন।

তবে মান্যবর রাজা, বোঝা যাচ্ছে যে ঐ গর্ভগৃহটাই প্রথম তৈরি হয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল।

আমরাও তাই মনে হয়। রাজা বললেন।

মান্যবর রাজা, এই থেকে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—আপনার প্রপিতামহই সব ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন। তারপর থেকে আপনার পিতামহ, আপনার পিতা সকলেই ঐ গুপ্তধন খুঁজেছেন কিন্তু কেউ সন্ধান পাননি।

রাজা একটু থেমে বললেন, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি। তোমার অনুমান মনে হয় ঠিক।

—এবার আমাদের কাজটা অনেক সহজ হলো। ফ্রান্সিস বলল।

—কী করে? রাজা জানতে চাইলেন।

—এবার শুধু আপনার প্রপিতামহের তৈরি গর্ভগৃহটাই ভালো করে দেখতে হবে। অন্য গর্ভগৃহগুলো পরবর্তীকালের।

—কথাটা ঠিক বলেছো। এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই তুমি এগিয়ে চল।

রাজা কাঠের সিংহাসন ছেড়ে উঠলেন। ফ্রান্সিসরাও সম্মান দেখিয়ে উঠে দাঁড়াল।

প্রায় মাসখানেক সময় ধরে শোনা যাচ্ছিল যে যে কোনোদিন রাজা তুরীন রাজা পারকোনের রাজ্য আক্রমণ করতে পারেন। সবশেষে সেটাই ঘটল।

সেদিন বিকেল থেকেই আকাশ প্রায় অন্ধকার মেঘে ঢাকা। সন্ধ্যের মুখে জোর হাওয়া ছুটল। ফ্রান্সিসরা প্রথম তৈরি গর্ভগৃহে ছিল। বাইরের প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝার আভাসও ওরা পায়নি।

হঠাৎ ফ্রান্সিসরা দেখল সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পায়ে চার-পাঁচজন সৈন্য নেমে এল। চিৎকার করে বলল, সবাই তৈরি হও। রাজা তুরীন আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। চলে এসো সব।

সৈন্যদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। ওরা দ্রুতপায়ে ছুটল অস্ত্রাগারের দিকে। পোশাকের দিকে তাকাবার সময় নেই। তরোয়াল হাতে ওরা দলে দলে বেরিয়ে এল। ওরা সবাই উঠে গেলে প্রৌঢ় মন্ত্রী সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। ফ্রান্সিসরা ছুটে তাঁর কাছে গেল। মন্ত্রী বললেন, সবাই যাও। প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়েছে!

ফ্রান্সিসরা বুঝে উঠতে পারল না কী করবে? দুজনে মন্ত্রীমশাইয়ের বিছানার কাছে এল। মন্ত্রী তখনও অল্প অল্প হাঁপাচ্ছেন। তিনি আধশোয়া হয়ে আছেন। ফ্রান্সিস বলল, রাজা তুরীন কি বেশি সংখ্যায় সৈন্য এনেছেন?

—ঠিক বুঝতে পারলাম না। ঐ অন্ধকারের মধ্যে কিছুই ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না। বিদ্যুৎ চমকাতে যা দেখেছি। কিন্তু তোমরা লড়াইতে নামলে না কেন?

মন্ত্রীমশাই, কিছু মনে করবেন না। আপনাদের দুই দেশই আমাদের কাছে বিদেশ। আপনাদের লড়াই আপনাদের। সমস্যার সমাধান আপনারাই করবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—কথাটা ঠিক। কিন্তু বিপদের দিনে রাজা পারকোনের হয়ে লড়াইতে নামলে রাজা খুশি হতেন।

ওপরে যাচ্ছি। অবস্থা দেখে সব বুঝে নিই। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস সিঁড়ির দিকে চলল। সিঁড়ির মুখের কাছে দুজন সৈন্য তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা বলে উঠল, উঠবেন না, উঠবেন না, জোর লড়াই চলছে।

—আমরা লড়াই দেখবো। শাঙ্কো বলল।

—খালি হাতে থাকবেন না। তরোয়াল আনুন। সৈন্যরা বলল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকাল। শাঙ্কো ছুটে গিয়ে দুটো তরোয়াল নিয়ে এলো। এবার দুজনে ওপরে উঠে এল। তেমন বৃষ্টি আর নেই। তবে মাঝেমধ্যেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

বিদ্যুতের সেই হঠাৎ আলোতেই দেখা যাচ্ছে দু'দল সৈন্যের মধ্যে প্রবল লড়াই চলছে। ফ্রান্সিস বলল, শাঙ্কো, রাজা পারকোন আমাদের সঙ্গে ভালো

ব্যবহার করেছেন। গুপ্তধন উদ্ধারের কাজে যাতে আমাদের কোনো অসুবিধে না হয় তা দেখার জন্য মন্ত্রীকে আদেশ দিয়েছেন। মন্ত্রী বললেন, এমন সৎ ও ঈশ্বরভক্ত রাজা দেখা যায় না।

—হ্যাঁ, তাঁকে আমাদের সাহায্য করা খুবই প্রয়োজন। শাঙ্কো উত্তর দিল।

—তাহলে চলো রাজা তুরীনকে বন্দী করি।

—চলো।

ফ্রান্সিসরা রাজা তুরীনকে খুঁজতে লাগল। দু'পক্ষের সৈন্যরা গোবরভেজা। ফ্রান্সিস রাজা তুরীনের একজন সৈন্যকে পেল। সে তাকে বলল, রাজা তুরীন কোথায় আছেন? সৈন্যটি রেগে গেল। বলল, তুমি বিদেশি, তুমি কেন আমাদের রাজাকে খুঁজছো?

—প্রয়োজন আছে। এই লড়াই থামাতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি পারবে না।

—দেখা যাক, তুমি শুধু বলো রাজা তুরীন কোথায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—চলো। নিয়ে যাচ্ছি। সৈন্যটি বলল।

অন্ধকারের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি লড়াই চলছে। তার মধ্যে দিয়ে সৈন্যটি ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা একটা ঝাঁকড়া-মাথা গাছের কাছে এল। সৈন্যটি ইঙ্গিতে গাছের নিচে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকা একজন মধ্যবয়সীকে দেখাল। রাজা তুরীন বেশ অসহায়ভাবে বসে আছেন। মাথার কাঁচাপাকা চুল নাকমুখ পর্যন্ত ছুড়য়ে আছে। পোশাক সব ভিজে, বাঁ হাতে বৃষ্টিভেজা রক্তের দাগ।

তখন লড়াই থেমে গেছে। চিৎকার আর তরোয়ালে-তরোয়ালে ঠোকাঠুকির ধাতব শব্দ বন্ধ।

রাজা তুরীনের চারপাশে রাজা পারকোনের চার/পাঁচজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রান্সিস রাজা তুরীনের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, মাননীয় রাজা, আপনার ও রাজা পারকোনের মধ্যে লড়াই চলছে শুধু একটা বিষয় নিয়ে—কে পাবে অতীতের এক রাজার গুপ্তধন।

রাজা তুরীন একটু অবাক হয়ে বিদেশি যুবকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফ্রান্সিস বলতে লাগল, কিন্তু গুপ্তধন গুপ্তই থেকে গেছে, অন্তত এখনো পর্যন্ত। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল, মাননীয় রাজা তুরীন, আমার বিনীত অনুরোধ যুদ্ধের কথা ভুলে যান। পরাজিত হলেও আপনার কথার মূল্য আমার কাছে কম নয়। আজকে আপনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। তাড়াতাড়ি খেয়ে আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। কাল রাজা পারকোনের রাজসভায় আপনাকে যেতে হবে। আমরাই নিয়ে যাবো।

—কী আর বলবো সেখানে গিয়ে! রাজা তুরীন অসহায়ভাবে বললেন।

—আপনাকে কিছুই বলতে হবে না। শুধু আমার কাজটায় সম্মতি দেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি। কথাটা বলে রাজা তুরীন হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ফ্রান্সিস শান্তভাবে বলল, মান্যবর রাজা, দুঃখ করবেন না। আমি আপনাকে আপনার রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করবো। আপনি শান্ত হোন।

রাতে একটু তাড়াতাড়িই খাওয়া-দাওয়া সারল সবাই। রাজা তুরীনকে শুকনো পোশাক দেওয়া হলো। শোবার জায়গাও করে দেওয়া হলো।

পরদিন বেশ ভোরে ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙল। ও আর শুয়ে রইল না। উঠে মন্ত্রীর কাছে এল। মন্ত্রী উঠে বসেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল, মন্ত্রীমশাই, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

—কী কাজ?

—রাজসভায় রাজা তুরীনকে বসাবার ব্যবস্থা করবেন।

—রাজা তুরীন হয়তো রাজসভায় যেতেই চাইবে না।

—সেটা আমি দেখবো। আপনি শুধু সম্মান জানিয়ে তাঁকে বসতে দেবেন।

—এখন রাজা পারকোনকে বলা। অবশ্য আমিও বলবো।

ফ্রান্সিস রাজা তুরীনের কাছে এল। রাজা তুরীন অল্প জায়গার মধ্যেই পায়চারি করছিলেন। মাথা নিচু, দু'হাত পেছনে জড়িয়ে পায়চারি করছিলেন। চোখের নিচে কালি। মাথার চুল অবিন্যস্ত। ফ্রান্সিস সামনে এসে দাঁড়াল। রাজা তুরীনও দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভারী গলায় বললেন, কী ব্যাপার? কারাগারে নিয়ে যাবে?

—না না, সেসব কিছু না। একটু থেমে বলল, মান্যবর রাজা, আমি বিদেশি ভাইকিং। কখন আসি কখন যাই। আপনাকে একটা বিনীত অনুরোধ।

—হুঁ। রাজা মুখে শব্দ করলেন।

—দু'তিন পুরুষ আগে একজন রাজা, আপনাদের পূর্বপুরুষদের একজন, পারিবারিক হীরে মুক্তো সোনার ভাণ্ডার গোপনে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে আপনার আর রাজা পারকোনের শত্রুতা কমেনি। এই ভাবে দুটো পরিবারের মধ্যে মাঝে মাঝেই লড়াই দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। ঐ গুপ্ত ধনভাণ্ডার কে পাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি এত কিছু জানলে কী করে? তুরীন বললেন।

—রাজা পারকোনের মন্ত্রীর কাছ থেকে। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, এবার আমার অনুরোধ, আপনি আজ রাজা পারকোনের রাজসভায় আসুন। আপনাদের বিবাদ-বিসম্বাদ আমি মিটিয়ে দিতে চাই।

—পারবে? মৃদু হেসে রাজা তুরীন বলেন।

—আপনারা দুজনে আমার প্রস্তাব সম্মত হলেই পারবো। তাহলে সকালের খাওয়া সেরেই আমরা যাবো?

রাজা তুরীন কিছু বললেন না।

ফ্রান্সিস আর মন্ত্রীর চেষ্টায় রাজা তুরীন রাজসভায় এলেন। মন্ত্রী তাঁকে এক অমাত্যের আসনে বসালেন। এসময় ফ্রান্সিস রাজা পারকোনের কাছে বলল—মাননীয় রাজা, এবার আমি কিছু কথা বলতে চাই।

—বেশ বলো। রাজা পারকোন বললেন। ফ্রান্সিস রাজা তুরীনকে একই কথা বলতে রাজা তুরীন সম্মতি জানান।

ফ্রান্সিস রাজসভায় দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, মান্যবর রাজা, অতীতের ইতিহাস আপনারা জানেন। আমি সে সব কথায় যাবো না। দুই রাজাকে অনুরোধ করছি আপনারা ধনসম্পদের লোভে দীর্ঘকাল ধরে লড়াই চালিয়ে যাবেন না। আমার বিনীত অনুরোধ আপনারা শত্রুতা ভুলে যান। যে ধনসম্পদ নিয়ে এই লড়াই সেই গুপ্তধন এখনও কেউ উদ্ধার করতে পারেনি। কিন্তু আমি পারবো।

দুই রাজা ভীষণভাবে চমকে উঠলেন, এই যুবকটি বলে কি!

—কত বছর ধরে খোঁজ চলছে। কেউ পারেনি, তুমি পারবে? তুরীন বললেন।

—আমাকে দিন সাতেক সময় দিন, আমি তার মধ্যেই পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলতে লাগল, আপনারা আর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবেন না। মাননীয় রাজা পারকোন, রাজা তুরীনকে তাঁর সৈন্যসহ মুক্তি দিন।

—বেশ। পারকোন বললেন।

ফ্রান্সিস বলল, এইবার প্রশ্ন ঐ ধনসম্পত্তি কার? কে পাবে ঐ ধনসম্পদ?

—আমার। রাজা তুরীন বেশ চড়া গলাতেই বললেন।

—আমার। রাজা পারকোন বললেন।

ফ্রান্সিস বলল—না, কারো একার নয়। ঐ ধনসম্পদ দু'ভাগে ভাগ করে দুজনকে দেওয়া হবে।

—না। সব চাই আমি। রাজা পারকোন বলে উঠলেন।

—ভাগ করা চলবে না, সবটাই আমার। রাজা তুরীন বলে উঠলেন।

—তাহলে, ফ্রান্সিস বেশ গলা চড়িয়েই বলল, তাহলে আমি সেই গোপন সম্পদ আর খুঁজবো না। আমি চলে যাচ্ছি। আপনাদের সমস্যা আপনারাই মেটান।

ফ্রান্সিস রাজসভার মঞ্চ থেকে নেমে আসছে তখনই শাঙ্কো এসে ফ্রান্সিসকে থামাল। রাজাদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, এর নাম ফ্রান্সিস। আমার প্রাণের বন্ধু। ফ্রান্সিস এর আগে অনেক গুপ্তধন খুঁজে বের করেছে। ও যখন বলছে এই গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করতে পারবে তখন জানবেন এটা ফাঁকা কথা নয়। গুপ্তধন উদ্ধারের এই চেষ্টাই শেষ চেষ্টা। আপনারা ওর সাহায্য নিন।

—বুঝলাম, কিন্তু সেসব দু' ভাগ হবে কেন। রাজা পারকোন বললেন।

—এটাও মেনে নিন। নইলে ঐ ধনসম্পত্তি গুপ্তই থাকবে। আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। ভেবে দেখুন। শাঙ্কো বলল।

রাজসভায় নৈঃশব্দ্য। সবাই রাজার দিকে তাকিয়ে। হঠাৎই রাজা তুরীন বললেন, এই সমস্যাটা দুই রাজ্যের মধ্যে চলে আসছে দীর্ঘকাল। যাকগে, আমি অর্ধেক পেলেই সন্তুষ্ট থাকবো।

ফ্রান্সিস রাজা পারকোনের দিকে তাকাল। পারকোন মন্ত্রীকে ডেকে কী বললেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, আমিও অর্ধেক চাই। সভাঘরে সকলেই আনন্দপ্রকাশ করল।

রাজা তুরীন ও রাজা পারকোনের মধ্যে শত্রুতা মিটে গেল। ওই দুদেশের প্রজারা খুশি হল। যুদ্ধের পরিবেশ কারোই ভালো লাগছিল না। সবাই শান্তি চাইছিল।

রাজা তুরীন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে নিজের দেশে ফিরে গেলেন। দুদেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হল এইজন্যে একদিন উৎসব হল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকেও উৎসবে যেতে অনুমতি দেওয়া হল।

প্রাকৃতিক খেয়ালেই গড়ে ওঠা একটা বিরাট পাথরের বেদীমতো। বোঝা গেল এই পাথরের চাতালেই উৎসব-টুৎসব হয়। চারপাশে দর্শকরা বসেছে। চাতাল ঘিরে বড় বড় প্রদীপজ্বালা হয়েছে। তাতে বেশ আলোকিত হয়েছে বেদী। প্রথমে মন্ত্রীমশাই বেদীতে উঠে এলেন। ভাঙা গলায় যতটা জোরে সম্ভব বললেন—দেশবাসীরা—আজকে আমাদের খুব আনন্দের দিন। আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছি। তার চেয়েও বড় কথা রাজা তুরীনের সঙ্গে আমাদের সমঝোতা হয়েছে। আমরা এখন পরস্পরের বন্ধু। এই উপলক্ষে আজকের এই আনন্দ সন্ধ্যা। একটু থেমে মন্ত্রী বললেন—আপনারা আনন্দ উপভোগ করুন।

মন্ত্রীমশাই বেদী থেকে নেমে গেলেন।

একদল সুসজ্জিত পুরুষ এল। বাজনদাররা বাজনা বাজাতে লাগল। হাতের রুমাল নেড়ে নেড়ে বাজনার তালে তালে ওরা নাচতে লাগল। নাচ বেশ জমে উঠল।

এরপর এল একদল মেয়ে। তারা সুরেলা গলায় গান গাইতে গাইতে ঘুরে

ঘুরে নাচতে লাগল। নাচ জমে উঠল। দর্শকরা জোর গলায় উৎসাহ দিতে লাগল। নাচ শেষ হল।

এবার এল বেঢপ পোশাক পরা একটি হোঁৎকা পুরুষ। হেঁড়ে গলায় সে কি গান। শ্রোতারা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তারপর আরো কিছুক্ষণ নাচগান হল। উৎসব শেষ। শ্রোতা দর্শকরা বাড়ি ফিরে চলল। ফ্রান্সিসরাও ফিরে এল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ওকাজা ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—মাননীয় রাজা আপনাদের ডেকেছেন।

—কেন বলো তো?

—কী করে বলবো। আপনারা চলুন। ওকাজা বলল।

—বেশ চলো।

ফ্রান্সিস, শাঙ্কো তৈরি হয়ে রাজার গর্ভগৃহের দিকে চলল।

এই গর্ভগৃহ মোটামুটি সুসজ্জিত মশালের বদলে মোটা পলতের প্রদীপ জ্বলছে। পাথরের আসনে গদীপাতা। তাতে রাজা পারকোন বসে আছেন।

ফ্রান্সিসরা মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে দাঁড়াল।

—তোমরা বিদেশি—রাজা বললেন—এ দেশের সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আজ আমি বিপদগ্রস্ত। আমাদের পশ্চিমে একটি রাজ্য আছে—জামিনা—সেই রাজ্যের রাজা কাদর্জা এক নৃশংস রাজা। আমার রাজ্যের ওপর তাঁর বড় লোভ। কী করে আমার রাজ্য দখল করা যায় এই তার চিন্তা। অবশ্য আর একটা লোভও আছে। আমার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত গুপ্তধন। সে এই গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টা করবে।

—জানি না রাজা কাদর্জা কতটা বুদ্ধিমান। গুপ্তধন উদ্ধার বেশ জটিল ব্যাপার। ফ্রান্সিস বলল।

—উদ্ধার করতে পারুক না পারুক—চেষ্টা তো করবে। এটাই কাদর্জার উদ্দেশ্য। রাজা পারকোন বললেন।

—বোঝাই যাচ্ছে কাদর্জা লড়াই চায়। আপনি আক্রান্ত হলে লড়াইই করুন। ফ্রান্সিস বলল।

—আক্রান্ত হলে লড়াই তো করতেই হবে। সেক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য চাই। যদিও এ দেশ তোমাদের নয় তবু আমার অনুরোধ যুদ্ধ হলে আমাদের হয়ে তোমরা লড়াই কর। রাজা পারকোন বললেন।

—নিশ্চয়ই করবো। অবশ্য তার আগে বন্ধুদের সম্মতিটা নিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাই নেবে। রাজা বললেন।

—কাদর্জা কবে আক্রমণ করতে পারে বলে আপনার মনে হয়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—যেকোন দিন। কাদর্জা বিদেশ থেকে সৈন্য আমদানি করছে। সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র এনেছে। তাতেই সন্দেহ যেকোন দিন আক্রমণ করতে পারে। রাজা বললেন।

—রাজা কাদর্জা সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই। কী ধরনের মানুষ। কতটা বুদ্ধি ধরে। গুপ্তধনের লোভ কতটা। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা পারকোন ওকাজাকে দেখিয়ে বললেন—ওকাজার জামিনাতেই জন্ম। ওকাজা রাজা কাদর্জা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। ওর সঙ্গে কথা বলুন সব জানতে পারবেন।

ফ্রান্সিস ওকাজার দিকে তাকাল। বলল—ভাই তুমি একটু আমাদের সঙ্গে এসো। আমরা রাজা কাদর্জা ও তার দেশ জামিনা সম্বন্ধে জানতে চাই। এসো।

ফ্রান্সিস রাজা পারকোনকে সম্মান জানিয়ে চলে এল। নিজেদের ঘরে এসে বসল। ফ্রান্সিস বলল—ওকাজা এবার বলতো রাজা কাদর্জা ও ঐ দেশ জামিনা সম্বন্ধে।

ওকাজা আস্তে আস্তে বলতে লাগল—রাজা কাদর্জার মত নৃশংস মানুষের নরকেও ঠাঁই হবে না। জামিনার প্রজারা রাজা কাদর্জাকে ঘৃণার চোখে দেখে। মুখে তো কিছু বলতে পারে না। জামিনায় চলছে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব। রাজার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার উপায় নেই। গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে রাজ্যময়। রাজার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে গুপ্তচর টুঁটি চেপে ধরছে। সৈন্যাবাসের কাছেই কয়েদখানা। সঙ্গে সঙ্গে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দেবে। কাদর্জার কয়েদখানা সবসময়ই ভর্তি। নরকের আর এক নাম কাদর্জার কয়েদখানা। একবার ঐ কয়েদখানায় ঢুকলে একমাত্র মরলেই বেরিয়ে আসা যায়। নইলে নয়। ঐ কয়েদখানায় দশ-বারো বছরের ছেলেরাও রয়েছে। রাস্তায় হয়তো খেলাচ্ছলে কাদর্জার নিন্দে করেছে। প্রহরীরা ওদের ধরে নিয়ে গেছে। জামিনাতে এই অবস্থাই চলছে।

একটু থেমে ওকাজা বলল—একটা ঘটনা শুনুন। রাজা কাদর্জাকে হত্যার চেষ্টা চলেছে বছর কয়েক। একবার রাজা কাদর্জা পাহাড়ি এলাকার জনবসতি দেখেটেখে নেমে আসছে—কোত্থেকে একটা বর্শা উড়ে এল। লাগল রাজার ডানবাহুতে। রাজা বসে পড়ল। প্রহরীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। ধারেকাছের লোকজন পালিয়ে গেল। দুর্ভাগ্য যে যুবকটি বর্শা ছুঁড়েছিল সে প্রহরীদের হাতে ধরা পড়ল। ওখানেই প্রহরীদের হাতে মারাত্মক মার খেল। কিন্তু যুবকটি কাঁদল না।

রাজাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে রাজবাড়িতে নিয়ে আসা হল। রাজার চিকিৎসা শুরু হল।

পরদিন রাজার হুকুমে ঐ পাহাড়ি জনবসতির ওপর রাজার দেড়শ দু'শ সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। নির্বিচারে মানুষ মরতে লাগল। শিশুনারীও বাদ গেল না। তাতেও হল না। বাড়িগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। সব বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ওকাজা থামল। তারপর বলল—কাদর্জার নৃশংসতার কত ঘটনা বলবো।

—সেই যুবকটির কী হল? শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল।

—যুবকটিকে কয়েদ ঘরে আটকে রাখা হল। দু'দিন না খাইয়ে এমনকি জল পর্যন্ত খেতে না দিয়ে ফাঁসি দেওয়া হল রাজবাড়ির সামনে। অনেক প্রজা ভিড় করে দেখতে এসেছিল। অনেকেই কেঁদেছে। যুবকটি কিন্তু বিন্দুমাত্র কষ্ট প্রকাশ করেনি। আমি অবাক হয়ে যুবকটির দিকে তাকিয়েছিলাম।

কাদর্জার আর এক শাস্তির নমুনা—পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলা। আর একটি নদীর জলে চুবিয়ে মারা। দেশবাসী ক্ষেপে আগুন হয়ে রয়েছে। কিন্তু নিরুপায়।

—ঐ নৃশংস অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে দেশবাসী রুখে দাঁড়াতে পারছে না? ফ্রান্সিস বলল।

ওকাজা বলল—অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষ দল বাঁধে। জামিনাতেই দল বাঁধা হয়েছে। তবে এখনও বেশিদিন হয়নি। তবে সেই দল প্রজাদের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছে। দল বাড়ছে। একদিন তারা বিদ্রোহ করবেই। ওকাজা বলল।

—এই তো কাজের কথা। ফ্রান্সিস বলল—কাপুরুষের মতো পড়ে পড়ে মার খাওয়া কোন কাজের কথা নয়।

ওকাজা উঠে দাঁড়াল। বলল—চলি।

—পরে হয়তো তোমার কাছ থেকে আরো কিছু জানতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাকে ডাকলেই আমি আসবো। ওকাজা বলল।

—তুমি যে বিদ্রোহের কর্তা বললে তার কি প্রস্তুতি চলছে?

—হ্যাঁ। অত্যন্ত গোপনে বিদ্রোহী নেতা পারেলার দল তৈরি হচ্ছে। আমিও সেই দলে আছি। মাঝে মাঝে জামিনায় যাই। বিদ্রোহীদের সাহায্য করি। নানাভাবে। পারেলা আমাকে খুব ভালোবাসে। আমিও পারেলার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। একদিন বিদ্রোহ হবেই। নৃশংস কাদর্জার সন্ত্রাসের রাজত্ব শেষ হবে। জামিনায় নতুন যুগের সূচনা হবে। ওকাজা বলল।

—তাই যেন হয়। ফ্রান্সিস বলল।

ওকাজা বলল—জানেন—পারেলার দলের দশজনকে কাদর্জা ফাঁসি দিয়েছে। কিন্তু বিদ্রোহীদের দমাতে পারে নি। ওকাজা চলে গেল।

রাজা পারকোনের আশঙ্কা সত্য হল।

একদিন রাজা পারকোন গুপ্তচর মারফৎ সংবাদ পেল রাজা কাদর্জা তাঁর দেশ আক্রমণ করতে আসছে। দু'একদিন মধ্যেই কাদর্জার সৈন্যবাহিনী পৌঁছে যাবে।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—সামনেই লড়াই। বন্ধুদের নিয়ে আসতে হয়।

—আমিই যাবো। কিন্তু মন্ত্রীকে বলে যেতে হবে। ওঁর অনুমতি দরকার। শাঙ্কো বলল।

—বেশ তো। বলে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো মন্ত্রীর কাছে গেল। মন্ত্রী চুপচাপ পাথরের আসনে বসেছিলেন।

—মাননীয় মন্ত্রীমশাই—শুনেছেন বোধহয় রাজা কাদর্জা এই দেশ আক্রমণ করতে আসছে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ শুনেছি। সামনে বড় দুর্দিন। মন্ত্রী বললেন।

—একটা কথা বলছিলাম। শাঙ্কো বলল।

—বলো। মন্ত্রী বলল।

—এই লড়াইয়ে আমার ভাইকিং বন্ধুরাও অংশ নেবে। রাজা পারকোনের হয়ে তারা লড়বে। ফ্রান্সিস বলল।

—খুব ভালো কথা। মন্ত্রী বললেন।

—সমুদ্রতীরে জাহাজঘাটে আমাদের জাহাজ নোঙর করা আছে। জাহাজে বন্ধুরা আছে। তাদের মধ্যে থেকে দশ-বারোজনকে নিয়ে আসতে হবে। আপনি অনুমতি—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। যাও। বন্ধুদের নিয়ে এসো। আমাদের জিততেই হবে। মন্ত্রী বললেন।

দুপুরে খেয়েদেয়ে শাঙ্কো সমুদ্রতীরের দিকে রওনা হল। যখন জাহাজে পৌঁছল তখন বিকেল। শাঙ্কোকে দেখে বন্ধুরা হৈ হৈ করে উঠল। ছুটে শাঙ্কোর কাছে এল। ওদের জিজ্ঞাসা ফ্রান্সিস ভালো আছে তো? মারিয়াও এল। শাঙ্কো বলল—রাজকুমারী—কোনরকম দুশ্চিন্তা করবেন না। ফ্রান্সিস সুস্থ সবল আছে। তারপর শাঙ্কো পারকোনের রাজত্বে লড়াইয়ের কথা বলল। বলল—ফ্রান্সিসের সিদ্ধান্ত আমরাও লড়াইয়ে অংশ নেব। লড়াইয়ের কথা শুনে ভাইকিংরা খুশি হল। কর্মহীন অবস্থায় জাহাজে থাকা ওদের ভালো লাগছিল না।

—বেশি না। দশ বারোজন তৈরি হয়ে আমার সঙ্গে চলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধুরা তৈরি হল। জাহাজ থেকে নেমে এল। প্রত্যেকেই তরোয়াল নিল। সবাই চলল রাজা পারকোনের রাজত্বের দিকে। সন্ধ্যে নাগাদ সবাই সেখানে পৌঁছল।

বন্ধুরা ফ্রান্সিসদের সঙ্গেই রইল।

রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ হল। তখন রাজা পারকোন এলেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল। পারকোন বললেন—বসো বসো। সবাই বসল। পারকোন বলনেল—খবর পেয়েছি কাল সকালেই রাজা কাদর্জা আমাদের রাজ্য আক্রমণ করবে। তোমরা বীরের জাতি। তোমাদের সাহায্য আমাদের অবশ্য প্রয়োজন। অনুরোধ তোমরা আমাদের হয়ে লড়াই করো।

—আমরা লড়াই করবো। ফ্রান্সিস বলল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—তোমাদের সাফল্য কামনা করি। রাজা পারকোন বললেন। তারপর চলে গেলেন।

পরদিন সকালেই সারা রাজ্য জুড়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। রাজা পারকোনের সৈন্যরা অস্ত্র হাতে ছুটে এল। রাজার গর্ভগৃহের সম্মুখে বিরাট প্রান্তর। সব সৈন্য সেখানে জড়ো হল। কিছু পরে দূরে দেখা গেল কাদর্জার সৈন্যবাহিনী আসছে। একেবারে সামনে একটা কালো ঘোড়ায় চড়ে রাজা কাদর্জা।

রাজা পারকোনের সৈন্যদের দেখে চিৎকার করতে করতে কাদর্জার সৈন্যরা ছুটে আসতে লাগল। রাজা পারকোনের সৈন্যরাও ছুটে গেল।

লড়াই শুরু হল। চিৎকারে আর্তনাদে তরোয়ালে তরোয়ালে ঠোকাঠুকির শব্দে প্রান্তর ভরে উঠল।

একপাশে ফ্রান্সিসরা লড়াই চালাল। যোদ্ধা হিসেবে ভাইকিংরা যে কম যায় না কিছুক্ষণ লড়ে কাদর্জার সৈন্যরা বুঝতে পারল।

চারজন সৈন্য ফ্রান্সিসকে ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস বিদ্যুৎগতিতে তরোয়াল চালাতে লাগল। বুকে গলায় তরোয়াল চালিয়ে ফ্রান্সিস দুজনকে মেরে ফেলল। বাকি দুজন লড়তে লাগল। ফ্রান্সিস হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে একজনের তরোয়ালে ঘা মারল। সৈন্যটির হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। সৈন্যটি হতভম্ব হয়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ও তরোয়াল খুঁজতে চলে গেল। অন্যটির বুকের কাছে তরোয়াল চালিয়ে জামা কেটে দিল। সৈন্যটি খালি গায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস হঠাৎ দ্রুত শুয়ে পড়ল। গড়িয়ে গিয়ে সৈন্যটির পায়ে তরোয়ালের ঘা মারল। সৈন্যটির পা কেটে গেল। ও পা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল।

ভাইকিং বন্ধুরাও জোর লড়াই চালাল। চিৎকার গোঙানি আর্তনাদে প্রান্তর ভরে উঠল।

রাজা কাদর্জা ঘোড়ার পিঠে চেপে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তার সৈন্যদের উৎসাহ দিতে লাগল।

রাজা পারকোন শান্তস্বভাবের মানুষ। যুদ্ধবিগ্রহ মোটেই পছন্দ করেন না। যুদ্ধক্ষেত্রের এক কোণে এক গাছের নিচে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। যুদ্ধ চলল।

বেশ কয়েকঘণ্টা পরে যুদ্ধের জয়পরাজয়ের আভাস পাওয়া গেল। রাজা পারকোনের সৈন্যদের সংখ্যা কমে গেল। আহত ও মৃতের সংখ্যা বেড়ে গেল। কাদর্জার সৈন্যরা উল্লাসে চিৎকার করতে লাগল। সন্ধ্যের সময় পারকোনের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে লাগল। রাজা পারকোন তাদের ফেরাবার চেষ্টা করলেন না। ফ্রান্সিসরা কয়েকজন তাদের ফেরাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তারা ফিরলো না।

যুদ্ধের ফলাফল এখন স্পষ্ট। রাজা পারকোনের জয়ের কোন আশাই রইলো না। কাদর্জার সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরতে লাগল। পারকোনের আহত সৈন্যদের হত্যা করতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। এই নিষ্ঠুরতা দেখে ওর মন বিচলিত হল। এরা কি মানুষ? কিন্তু নিরুপায়। ওরা পরাজিত।

ফ্রান্সিসদের বন্ধুরা একত্রিত হল। একদল কাদর্জার সৈন্য ওদের ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিসদের চেহারা-পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বুঝল ওরা বিদেশী। ওদের যত রাগ পড়ল ফ্রান্সিসদের ওপর। দড়ি দিয়ে ফ্রান্সিসদের হাত বেঁধে ফেলল। দুজন আহত ভাইকিং কোনরকমে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাল। তিনজন মারা গেল।

রাজা কাদর্জার সেনাপতি তখনই ওখানে এল। ফ্রান্সিসদের বন্দী দেখে খুশি হল। বলল—ভালো করেছিস। এরা আমাদের অনেক সৈন্যকে মেরেছে। সন্দেহ নেই ভালো লড়িয়ে।

ফ্রান্সিস বলল—একটা কথা বলছিলাম।

—বলো। সেনাপতি বলল।

—আমাদের তিন বন্ধু মারা গেছে। আমরা তাদের কবর দিতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—কবরটবর দেওয়া চলবে না। আমরা সব মৃতদেহ পাহাড়ের গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলে দেব। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকাল। সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু উপায় কি। এই নির্মমতা মেনে নিতেই হবে।

সেনাপতি একটা ছোট্ট গর্ভগৃহে ফ্রান্সিসদের বন্দী করে রাখল। ফ্রান্সিসরা প্রায় জড়াজড়ি করে শুয়ে রইল। ওদিকে রাজা পারকোনের সভাঘরের পাথরের সিংহাসনে রাজা কাদর্জা বসল। হা হা করে হাসতে হাসতে একজন অমাত্যকে বলল—যান পরাজিত রাজা পারকোনকে নিয়ে আসুন। অমাত্য চলে গেল।

কিছু পরে রাজা পারকোনকে নিয়ে এল। কাদর্জা হেসে বলল—আরে—এখনও আপনার হাত বাঁধা হয়নি। প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলল—এ্যাই—হাত বেঁধে দে। একজন প্রহরী দড়ি এনে রাজা পারকোনের দুহাত বেঁধে দিল।

—আমার সঙ্গে লড়তে এসেছিলেন। আপনার দুঃসাহস। ফল দেখলেন তো? আমাকে যুদ্ধে হারায় এই অঞ্চলে কেউ নেই। কাদর্জা বলল।

পারকোন কোন কথা বললেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—এবার আসল কথায় আসি—রাজা কাদর্জা বলল—আপনার কোন পূর্বপুরুষ আপনাদের ধনসম্পদ এখানকার কোন গর্ভগৃহে গোপনে রেখে গেছে। সেই ধনসম্পদ আমার চাই। এবার বলুন কোথায় আছে সেই ধনভাণ্ডার। কাদর্জা গলা চড়িয়ে বলল।

—আমি জানি না। রাজা পারকোন মৃদুস্বরে বললেন।

—জোরে বলুন। কাদর্জা চেঁচিয়ে বলল।

—আমি জানি না। পারকোন জোরে বললেন।

—বাজে কথা আপনি জানেন। আমি লড়াই করতে আসছি শুনে সেই ধনভাণ্ডার বাইরে বের করেন নি। এবার বলুন কোথায় সেই ধনভাণ্ডার? কাদর্জা বলল।

—আমি কিছ্ছু জানি না। পারকোন বললেন।

—এ্যাই—চাবুকওয়ালাকে ডাক। কাদর্জা চিৎকার করে বলল।

একপাশ থেকে কালো পোশাক পরা একজন লোক চাবুক হাতে এগিয়ে এল।

—মার্ চাবুক। চাবুকের মার না খেলে মুখ খুলবে না। কাদর্জা বলল।

লোকটি পারকোনের পিঠ লক্ষ্য করে চাবুক চালাল। বাতাসে শ্-শ্ শব্দ উঠল। পারকোনের শরীর কেঁপে উঠল।

—মার্ চাবুক। কাদর্জা চেঁচিয়ে বলল। আবার চাবুকের মার নেমে এল। রাজা পারকোনের পিঠের দিকে জামা ছিঁড়ে গেল। কালশিটে দাগ ফুটে উঠল।

—এবার বলুন। কোথায় সেই গুপ্তধনভাণ্ডার? কাদর্জা বলল।

—আমি জানি না। রাজা পারকোন একই স্বরে বললেন।

—আপনি জানেন। পাছে আমি জেনে ফেলি তাই কোন কথাই বলছেন না। ঠিক আছে। আজকে থাক। সারারাত ভাবুন। কালকে আবার চাবুক মারা হবে। কাদর্জা বলল।

রাজা পারকোনের মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। হাত তুলে বললেন—মাননীয় রাজা কাদর্জা—রাজা পারকোনকে এভাবে চাবুক মেরে কোন লাভ নেই। কারণ উনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। যদি জানতেন তাহলে কি এতদিনে উদ্ধার করতেন না?

—ঠিক আছে। আমার সেনাপতিকে আমি এ দেশের রাজা করে দিয়ে যাবো। সে গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খোঁজ করবে। উদ্ধার হলে সমস্ত ধনভাণ্ডার আমার হবে। আর কোন দাবিদার থাকবে না। কাদর্জা বলল।

—ঠিক আছে। এটা আপনি করতে পারেন। মন্ত্রী বললেন।

—আপনি কে? মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রাজা কাদর্জা বলল।

—আমি রাজা পারকোনের মন্ত্রী। মন্ত্রী বললেন।

—দেখছি আপনাকে বন্দী করা হয় নি। কাদর্জা বলল।

—আমার মত বৃদ্ধকে বন্দী করে কী লাভ? আমি ছুটোছুটিও করতে পারবো না, তরোয়াল হাতে লড়তেও পারবো না! আমি বড়জোর বুদ্ধি দিতে পারি। প্রয়োজনে পরামর্শ দিতে পারি। মন্ত্রী বললেন।

—যাক গে—আপনাকে আর বন্দী করা হবে না। আমার সেনাপতি এখানে নতুন রাজা হবে। আপনি তার পরামর্শদাতা হয়ে থাকবেন। বদলে ভালো মাইনে পাবেন। কাদর্জা বলল।

—আপনাকে ধন্যবাদ! মন্ত্রী বললেন।

ফ্রান্সিস যে ঘরে বন্দী হয়ে ছিল রাজা পারকোনকে সেই ঘরেই ঢোকানো হল। পারকোন ঘাসপাতা ছড়ানো মেঝেয় শুয়ে পড়লেন। রাজার শরীরের দশা দেখে ফ্রান্সিসরা চমকে উঠল। কী নির্মমভাবে চাবুক মারা হয়েছে। রাজা কিন্তু গোঙাচ্ছেন না।

ফ্রান্সিস রাজার কাছে গেল। আস্তে আসতে বলল,

—মাননীয় রাজা—খুব কষ্ট হচ্ছে?

রাজা শুকনো ঠোঁটে হাসলেন। নিম্নস্বরে বললেন—চাবুক খেয়ে কষ্ট হবে না?

—আপনাকে চাবুক মারা হল কেন? হ্যারি জানতে চাইল।

—রাজা কাদর্জার ধারণা আমি আমার পূর্বপুরুষদের ধনসম্পত্তির হদিশ জানি। যাতে আমি হদিশ বলে দিই তাই নির্মমভাবে চাবুক মারা। রাজা পারকোন বললেন।

ফ্রান্সিসদের দলে ভেন ছিল না। ভেন থাকলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেত।

শাঙ্কো জালায় রাখা জল থেকে কাঠের গ্লাসে এক গ্লাশ জল নিয়ে এল। রাজার পিঠে কালশিটে দাগের ওপর আস্তে আস্তে জল বুলিয়ে দিতে লাগল। রাজা একটু নড়ে উঠে স্থির হলেন। চুপ করে শুয়ে রইলেন।

শুধু যুদ্ধে জয়লাভ করেই রাজা কাদর্জা সন্তুষ্ট রইল না। সে লুঠ করা শুরু করল। সে চারপাঁচজন অনুচর নিয়ে গর্ভগৃহগুলো অধিবাসীদের সোনা, হীরে, মুক্তো, দামি পাথর লুঠ করতে শুরু করল। কেউ বাধা দিতে সাহস পেল না। অবাধ লুঠ চলল। রাজা কাদর্জা খুব খুশি। অনেক মণিমুক্তো দামি গয়না পেল।

কাদর্জা দেশে ফিরে যাবার জন্যে তৈরী হল। রাজা পারকোনের সভাঘর সেনাপতিকে রাজা করার জন্যে আয়োজন চলল। রাজার দূত এদেশীয়দের মধ্যে প্রচার করল রাজা পারকোনের রাজার সভাগৃহে আসার জন্যে।

রাজসভাগৃহে ভালোই লোক হল। এদেশীয়রা তো ছিলই কাদর্জার সৈন্যরাও সারি দিয়ে দাঁড়াল।

রাজসিংহাসনের কাছে রাজা কাদর্জা দাঁড়াল। সেনাপতি নিচে থেকে উঠে এল। রাজা কাদর্জা তরোয়াল খুলে সেনাপতির দুই কাঁধ ছোঁয়াল। হাত বাড়িয়ে সিংহাসন দেখাল। সেনাপতি আস্তে আস্তে গিয়ে সিংহাসনে বসল। সেনাপতি ঐ দেশের রাজা হয়ে গেল। উপস্থিত সৈন্যরা হৈ হৈ করে আনন্দ প্রকাশ করল। এদেশীয়রা মুখে কোন শব্দ করল না। আস্তে আস্তে রাজসভা ছেড়ে চলে গেল।

এবার ফেরার পালা। রাজা কাদর্জার হুকুমে রাজা পারকোন আর ফ্রান্সিসদের পেছনে রাখা হল। তাদের আগে পিছে সৈন্যরা একেবার সামনে কালো ঘোড়ার ওপরে কাদর্জা।

তখন সকাল। রোদ্দুরের তেমন তেজ নেই। আকাশ মেঘলা। শোভাযাত্রা চলল জামিনার দিকে। হাঁটতে হাঁটতে হ্যারি ডাকল—ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল।

—কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন? হ্যারি বলল।

—হয়তো আমাদের বিচারটিচার হবে। তারপর শাস্তি। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের অপরাধ? শাঙ্কো বলল।

—রাজা পারকোনের হয়ে লড়েছি। কাজেই আমাদের সহজে ছেড়ে দেবে না। আমাদের জীবন সংশয়। ফ্রান্সিস বলল।

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল। কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা। যুদ্ধ জয় করে ফিরছে। রাজা কাদর্জা মাঝে মাঝেই তরোয়াল উঁচিয়ে হা হা করে হাসছে।

হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামল। অঝোর বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্যে দিয়েই শোভাযাত্রা চলল। সবাই ভিজে একশা। কাদর্জাও বাদ গেল না। কাদর্জা নড়লও না। ঠায় বসে রইল।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে শোভাযাত্রা জামিনাতে ঢুকল। সদর রাস্তার ধারে ধারে লোকজন জড় হল ঠিকই। কিন্তু কোথাও কোন আনন্দ উচ্ছ্বাস নেই। কাদর্জা বেশ ক্রুদ্ধ হল। দেশজয় করে ফেরার পরেও প্রজাদের মধ্যে আনন্দ উল্লাস নেই। কিন্তু উপায়ও তো নেই। কিছু করারও নেই। শোভাযাত্রা রাজবাড়ির সামনে এসে শেষ হল।

লোকজন ফ্রান্সিসদের দেখে বেশ অবাকই হল। এরা কারা? এদের বন্দী করে আনা হয়েছে কেন? রাজা ঘোড়া থেকে নেমে রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ল। সৈন্যরা সৈন্যাবাসের দিকে চলল। প্রহরীদের দলপতি ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। সৈন্যদের থেকে ফ্রান্সিসদের আলাদা করল। ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল রাজবাড়ির পূর্ব কোণার দিকে। বোধহয় ওদিকেই কয়েদ ঘর।

ফ্রান্সিসদের কয়েদঘরের সামনে নিয়ে আসা হল। ঠং-ঠং শব্দে লোহার দরজা খোলা হল। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস আবার কয়েদ ঘরের জীবন। জীবনের বেশ কিছুটা সময় কয়েদ ঘরেই কেটে গেল।

—ঠিকই বলেছো। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল।

কয়েদ ঘরে ঢুকল ফ্রান্সিসরা। বেশ বড় ঘর। বন্দীদের সংখ্যাও অনেক। হতেই হবে। রাজা কাদর্জার রাজত্বে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারো মুখে রাজার নিন্দা শুনলে সৈন্যরা ধরে এনে কয়েদঘরে ঢুকিয়ে দেয়। কাজেই বন্দীর সংখ্যা বেশি হবে এটা স্বাভাবিক।

ফ্রান্সিস দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল। হ্যারি পাশে বসল।

শাঙ্কো দরজার কাছে গেল। প্রহরীদের ডেকে বলল—ভাই ঘরেই তো আটকে আছি। তবে আর হাত বাঁধা থাকে কেন? হাত খুলে দাও।

—দলপতি যদি চায় তবেই তোমাদের হাত খোলা হবে। প্রহরী বলল।

—দলপতির সঙ্গে কথা বলবো। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। বলছি। প্রহরী বলল।

একটু পরেই দলপতি এল। দলপতির মুখে দাড়ি গোঁফ। বেশ দীর্ঘদেহী। বলিষ্ঠ। বলল—কী ব্যাপার?

—বলছিলাম পুরোনো বন্দীদের তো হাত খোলা। তবে আমাদেরও হাত খোলা হোক। ঘরেই তো আটকা আছি তবে আর হাত বাঁধা থেকে কী হবে। শাঙ্কো বলল।

দলপতি কিছুক্ষণ শাঙ্কোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—বেশ। তোমাদের বাঁধা হাত খুলে দেওয়া হচ্ছে। খোলা হাতপা নিয়ে যে ক'টা দিন বাঁচার বাঁচো।

—ঠিক বুঝলাম না। শাঙ্কো বলল।

—তোমাদের বাঁচার কোন আশা নেই। রাজা কাদর্জা বেশ কিছুদিন ফাঁসিটাসি দেখেন না। তোমাদের ফাঁসিতে লটকিয়ে সেই দৃশ্য দেখবেন। লোকের কষ্ট যন্ত্রণা মৃত্যু দেখলে রাজা কাদর্জা খুব খুশি হল। ওসব উপভোগ করেন। দলপতি বলল।

শাঙ্কো বুঝল ওদের রেহাই নেই। রাজা কাদর্জা নিশ্চয়ই ওদের ফাঁসি দেবে। বলল—আমরা তো বিদেশী আমাদের বাঁচামরা নিয়ে রাজা অত ভাবছে কেন?

—তোমরা রাজা পারকোনের হয়ে লড়াই করেছো। কাজেই তোমাদের শাস্তি পেতে হবে। দলপতি বলল।

—তাই বলে ফাঁসি? শাঙ্কো বলল।

—এতে তো কষ্ট কম। রাজা অপরাধীকে কষ্ট দিয়ে মারেন। তোমরা কষ্টকর মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলে। দলপতি বলল।

—হুঁ। শাঙ্কো মুখে শব্দ করল।

একজন প্রহরী একটা ছোরা হাতে ঘরে ঢুকল। একে একে ফ্রান্সিসদের হাতবাঁধা দড়ি কেটে দিল। ফ্রান্সিসদের কষ্টটা কমল। বাঁধা হাতের অস্বস্তি থেকে বাঁচা গেল।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। ডাকল—ফ্রান্সিস?

—বলো। ফ্রান্সিস বলল।

—একটা কথা বলছিলাম। শাঙ্কো বলল।

—কী কথা? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—রাজা পারকোনের হয়ে লড়াই করাটা বোধহয় আমাদের উচিত হয়নি। শাঙ্কো বলল।

—এ কথা বলছো কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—দলপতি বলছিল আমাদের ফাঁসি দেওয়া হবে। কারণ রাজা পারকোনের হয়ে আমরা লড়াই করেছি। শাঙ্কো বলল।

—আমাদের ফাঁসি হবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। দলপতি তাই বলল। শাঙ্কো বলল।

—রাজা পারকোনের হয়ে লড়াই করে আমরা কোনো ভুল করি নি। রাজা পারকোন একজন প্রজাবৎসল সৎ রাজা। আমরা তাঁর জয় চেয়েছি। হেরে গেছি সেটা আলাদা কথা। ফ্রান্সিস বলল,

—ফাঁসির হাত থেকে তো বাঁচার কোনো উপায় নেই। শাঙ্কো বলল।

—সেটা দেখতে হবে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল—রাজা পারকোনকে দেখে এলাম। খুবই কাহিল হয়ে পড়েছেন গায়ে বেশ জ্বর। অজ্ঞান-টজ্ঞান না হয়ে যায়।

ঠিক তাই ঘটল। রাজা পারকোন জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল—তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। নইলে মারা যাবেন। শাঙ্কো ছুটে গেল রাজার কাছে। কাঠের গ্লাশে জল নিয়ে রাজার মাথায় ঢালল। কপালে জল বুলিয়ে দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস উঠে লোহার দরজার কাছে গেল। একজন প্রহরীকে বলল—তোমাদের দলনেতাকে ডাকো।

—পারবো না। প্রহরী বলল।

—ভাই রাজা পারকোন জ্বরে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাঁর এক্ষুনি চিকিৎসার প্রয়োজন। ফ্রান্সিস নরম সুরে বলল—নইলে মানুষটা মারা যাবে।

—দলনেতা আসবে না। প্রহরী বলল।

—তোমাকে আমি ভাই বলে বলছি। দলনেতাকে আসতে খবর দাও। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি পারবো না। প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে। কাছে এসে দেখো। ফ্রান্সিস বলল।

প্রহরী দরজার কাছে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস এটাই চাইছিল। হাতের নাগালের কাছে আসতেই ফ্রান্সিস দ্রুত হাত বাড়িয়ে ওর গলা চেপে ধরল। প্রহরী তরোয়াল তুলতে গেল। ফ্রান্সিস তার আগেই লোহার দরজায় ওর মাথা ঠুকে দিল। প্রহরী ও'মাগো বলে চিৎকার করে উঠল। প্রহরীরা সব ছুটে এল।

শাঙ্কোরাও উঠে এসে দরজার কাছে ভিড় করল। প্রহরীরা তরোয়াল চালাবার আগেই ফ্রান্সিস প্রহরীকে ছেড়ে দিল। বলল—এবার যাও। দলনেতাকে ডেকে আনো। প্রহরীটির কপাল থেকে রক্ত বেরিয়ে এল। ও কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। শাঙ্কো চেঁচিয়ে বলল—শিগগির দলনেতাকে ডেকে আনো। ভাইকিংরা একসঙ্গে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। প্রহরীরা ঘাবড়ে গেল।

এখানকার গোলমাল শুনল দলনেতা। সে প্রায় ছুটে এলো। বলতে লাগল—কী ব্যাপার? এত গোলমাল কীসের?

ফ্রান্সিস বলল—রাজা পারকোন জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। এক্ষুনি বৈদ্যকে ডেকে নিয়ে আসুন।

দলনেতা বলল—চাবুকের মার খেয়েছে তো। সহ্য করতে পারেনি। যাক গে—রাজাকে বলছি। উনি অনুমতি দিলে বৈদ্যকে ডাকা হবে।

হ্যারি বলল—একজন মানুষ এত সাংঘাতিক অসুস্থ তার চিকিৎসার জন্য রাজার অনুমতি লাগবে? অবাক কাণ্ড।

—এই জামিনায় রাজার অনুমতি ছাড়া কিছু হবার উপায় নেই। যাক গে—আমি দেখছি। দলপতি চলে গেল।

শাঙ্কো নিজের পোশাক ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে রাজার মাথায় জলপট্টি দিতে লাগল। রাজা তখনও জ্ঞান ফিরে পান নি।

কিছুক্ষণ পরে দলনেতা বৈদ্যকে নিয়ে এল।

ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হল—যাক রাজা কার্দর্জা তাহলে চিকিৎসার অনুমতি দিয়েছে।

বৈদ্যের মাথা ঢাকা সাদা কাপড়ের টুপি মত। দাড়ি গোঁফ ইয়া মোটা গলায় নানা রঙের পাথরের মালা। গায়ে টকটকে লাল রঙের জামা। কাঁধে ঝোলা।

দরজা খোলা হল। প্রহরীরা দরজার দুপাশে খোলা তরোয়াল নিয়ে দাঁড়াল। বৈদ্য আর দলনেতা ঘরে ঢুকল। বৈদ্য রাজার কাছে গেল। বসল। কাঁধের ঝোলা নামাল। রাজার চোখের পাতা খুলে দেখল। কপালে গলায় হাত বোলাল। রাজার

ঠোঁট ফাঁক করে দেখল দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে ওষুধ খাওয়ানো যাবে না।

বৈদ্য এবার ঝোলা থেকে মাটির মুখ ঢাকা ভাঁড় বের করল। সেটা থেকে দুটো বড়ি বের করল। তারপর রাজার দুই নাকের ফুটোতে চেপে ধরল। বড়ি দুটোয় নিশ্চয়ই কোন গন্ধ আছে। গন্ধ নাক দিয়ে মাথায় গেল।

কিছুপরে রাজার শরীরটা নড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজা চোখ মেলে তাকালেন। শূন্য দৃষ্টি। কিছু নির্দিষ্টভাবে দেখছেন বলে ফ্রান্সিসদের মনে হল না। বৈদ্য নাক থেকে বড়ি দুটো সরিয়ে নিল।

আবার ঝোলা থেকে একটা কাপড়ের পুটুলি বের করল। পুটুলি থেকে দুটো কালো বড়ি বের করল। শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—খাইয়ে দাও।

হ্যারি কাঠের গ্লাসে জল এনে দিল। শাঙ্কো ওর ঊরুর ওপর রাজার মাথাটা শুইয়ে দিল। এতে মাথাটা উঁচু হল। শাঙ্কো এবার গলা চড়িয়ে বলল—মাননীয় রাজা, মুখ খুলুন। বড়ি দুটো খেয়ে নিন। রাজার ততক্ষণে শরীরের সাড় ফিরেছে। আস্তে আস্তে মুখ খুললেন। শাঙ্কো বড়ি দুটো খাইয়ে দিল।

এবার ফ্রান্সিস রাজাকে তুলে বসাল। বৈদ্যকে রাজার পিঠ দেখাল। কালসিটে দাগ আর জায়গায় জায়গায় কালচে রক্ত জমে আছে। বৈদ্য দলনেতার দিকে তাকাল। দলনেতা বলল—চাবুক মারা হয়েছিল। ওষুধ দিন।

বৈদ্য ঝোলা থেকে একটা চিনেমাটির বোয়াম বের করল। মুখ খুলে বৈদ্য সবজে রঙের আঠালো কিছু বের করল। ওষুধটা রাজার পিঠে ঠেকাতেই রাজার সারা শরীর কেঁপে উঠল। বৈদ্য আস্তে আস্তে ওষুধটা কালসিটের ওপরে লাগিয়ে দিল। রাজার বোধহয় একটু স্বস্তি পেলেন। চুপ করে বসে রইলেন।

বৈদ্য পোটলা ভাঁড় ঝোলায় ভরল। শুধু ঝোলা থেকে ওষুধটা একটা ছোট্ট ভাঁড়ে ভরে দিয়ে শাঙ্কোকে দিল। বলল—রাতে কালকে লাগিয়ে দিও। চিন্তার কিছু নেই। সেরে যাবে।

বৈদ্য চলে গেল। দলপতি গলা চড়িয়ে বলল

—চিকিৎসার ব্যবস্থা তো হল। এবার চাচামেচি বন্ধ কর।

ফ্রান্সিসরা কেউ কিছু বলল না। ফ্রান্সিসদের চিন্তা এইসব ওষুধে রাজা পারকোন সুস্থ হবেন তো? তারপরেই ভাবল—কয়েকদিনের মধ্যেই তো ফাঁসি মৃত্যু। সুস্থ হওয়া না হওয়া সমান।

ফ্রান্সিসদের মন খারাপ হয়ে গেল। কয়েদঘর থেকে নিরস্ত্র অবস্থায় পালাতে গেলে আরো কিছু বন্ধু মারা যাবে। ফাঁসির হাত থেকে বাঁচার উপায় ভাবতে হবে। দুহাত বাঁধা থাকবে। দৌড়ে পালানো যাবে না। গভীরভাবে উপায় ভাবতে হবে। ফ্রান্সিস ঘাসপাতার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

শাঙ্কো তখনই এল। বলল—রাজা পারকোন কি বাঁচবে?

—দেখা যাক। ওষুধ তো পড়েছে। এর বেশি এখানে আমরা আর কী করতে পারি। এখন তো আমাদের ভেন নেই। ফ্রান্সিস বলল।

ওদিকে রাজা কাদর্জা খুব উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ফ্রান্সিসদের ফাঁসির ব্যবস্থা করতে শুরু করেছে। রাজবাড়ির সামনে একটা ছোট্ট প্রান্তর। তারপরেই বড় বড় গাছগাছালির বন। তারই কাছে ফাঁসিকাঠের মঞ্চ তৈরি হতে লাগল।

প্রহরীরা নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে কথাবার্তা বলে। তাই থেকে ফ্রান্সিসরা ফাঁসির মঞ্চের কথা জানতে পারল।

ফ্রান্সিসদের মন প্রায় ভেঙে গেল। কেউ কোন কথা বলছে না। সবাই চুপ। একটাই চিন্তা ওদের আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই নেই। নীরবতা ভেঙে এক বন্ধু বলে উঠল—আমরা রাজা পারকোনের হয়ে লড়তে গিয়ে ভুল করেছি। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠল—

—কোন ভুল করি নি। এক সৎ প্রজাবৎসল রাজার হয়ে লড়াই করেছি। দুর্ভাগ্য হেরে গেছি। কিন্তু এরকম একজন নৃশংস রাজার পাল্লায় পড়বো স্বপ্নেও ভাবিনি। রাজা কাদর্জা আমাদের ফাঁসি দেবে এতটা ভাবতে পারিনি। কথাগুলো বলে ফ্রান্সিস হাঁপাতে লাগল। হ্যারি বলে উঠল—ফ্রান্সিস একটা প্রশংসনীয় মানবিক কাজ করেছে। তার জন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে। আমি রাজা কাদর্জার কাছে যাচ্ছি। ওরকম একটা রাজার কাছে প্রার্থনা করা অপমানজনক। কিন্তু আমি প্রার্থনা করব। বলবো—আমাকে ফাঁসি দিন। কারণ আমার নির্দেশেই আমার বন্ধুরা লড়তে এসেছিল। এজন্য আমিই দায়ী। আমাকে ফাঁসি দেওয়া হোক। বন্ধুদের মুক্তি দিন।

—রাজা কাদর্জার মত লোক এই প্রার্থনা শুনবে না। বন্ধুদের মুক্তি দিতে রাজি হবে না। শাঙ্কো বলল।

—একবার বলে তো দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। দরজায় শব্দ করল। একজন প্রহরী এগিয়ে এল। বলল—কী ব্যাপার?

—দলপতিকে খবর দাও একজন বন্দী কথা বলবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আবার তোমরা ঝামেলা পাকাচ্ছো। প্রহরী বলল।

—আমার অনুরোধ দলপতিকে আসতে বল। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। এই শেষবার। দলপতিকে আর ডাকতে বলবে না। প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যে দলপতি এল। কয়েদঘরের দরজার কাছে এসে বলল—আবার কী হল? ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে বলল—আমার একটা অনুরোধ ছিল।

—কী অনুরোধ? দলপতি বলল।

—রাজা কাদর্জার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করে দিন। কাদর্জা বলল।

—সম্ভব নয়। দলপতি বলল।

—একটু চেষ্টা করে দেখুন। বলবেন ভাইকিংদের দলপতি একটা অনুরোধ জানাতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। ফ্রান্সিস বলল।

—অনুরোধটা কী? দলপতি জানতে চাইল।

—সেটা আমি রাজাকেই বলবো। আপনি দেখা করার ব্যবস্থাটা করে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার কপাল ভালো রাজা কাদর্জা এখন খুব খোশ মেজাজে আছেন। এতগুলি লোকের ফাঁসি উনি কখনও দেখেন নি। সেটা দেখবেন। এই আনন্দে আত্মহারা। দলপতি বলল।

—মানুষ এরকমও হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা কাদর্জা এরকমই মানুষ। যাকগে দেখি রাজার সঙ্গে কথা বলে। দলপতি চলে গেল।

হ্যারি গলা চড়িয়ে বলে উঠল—ফ্রান্সিস—তোমার জীবনের বিনিময়ে আমরা মুক্তি চাই না। বন্ধুদের মধ্যেও গুঞ্জন উঠল। কয়েকজন বন্ধু বলে উঠল—তুমি অনুরোধ করবে না।

—অনুরোধ করেই দেখা যাক না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক রাজা রাজি হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দলপতি এল। হেসে বলল—রাজা কথা বলতে রাজি হয়েছেন।

—তাহলে—দরজাটা খুলতে বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

কয়েদঘরের দরজা খোলা হল। ফ্রান্সিস বেরিয়ে এল। চারজন প্রহরী খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল। সবচেয়ে আগে দলপতি।

রাজবাড়ির মন্ত্রণাকক্ষে ফ্রান্সিসকে নিয়ে আসা হল। একটা বড় শ্বেতপাথরের টেবিল। চারপাশে চেয়ার সাজানো।

ফ্রান্সিসকে চেয়ারে বসিয়ে দলপতি ভেতরে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল। অনুচ্চস্বরে বলল—রাজা আসছেন।

কিছু-পরে রাজা কাদর্জা ঘরে ঢুকলেন। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল না। রাজা কড়া চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালে না কেন?

ফ্রান্সিসের প্রায় মুখের ডগায় এসে গিয়েছিল—আপনার মত একটা নরপশুকে—। কষ্টে নিজেকে সংযত করল। বলল—আমার পায়ে ভীষণ ব্যথা। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট।

—হেঁটে তো এলে। রাজা বলল।

—অনেক কষ্টে। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা কাদর্জা চেয়ারে বসল। আলখাল্লার মত জামার পকেট থেকে চৌকোনো নস্যির কৌটো বের করল। সজোরে এক টিপ নস্যি নিল। বলল—হুঁ—বলো আমার সঙ্গে তোমার কী প্রয়োজন?

—একটা কথা বলছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। রাজা বলল।

—রাজা পারকোনের হয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আমার নির্দেশেই আমার বন্ধুরা এই লড়াই করেছিল। কাজেই এর পুরো দায়িত্ব আমার। ফ্রান্সিস বলল।

—তুই তাহলে দলের পান্ডা। রাজা বলল।

—হ্যাঁ। তাই আমার অনুরোধ—বিনীত অনুরোধ আমাকে ফাঁসি দেওয়া হোক। আমার বন্ধুদের মুক্তি দেওয়া হোক। রাজা হো হো করে হেসে উঠল—কী যে বলো। অতগুলো মানুষকে একসঙ্গে ফাঁসি দেব—কী রোমাঞ্চকর। সেখানে একজনের ফাঁসি দেখে কী হবে।

—তাহলে আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। সবার ফাঁসি হবে একসঙ্গে। আমি বলে দিয়েছি মঞ্চেও একটা লম্বা পাটাতন থাকবে। ফাঁসির সময় পাটাতন সরিয়ে দেওয়া হবে একসঙ্গে সবাই ঝুলবে। কী চমৎকার।

ফ্রান্সিসের আর কথা বলতে ইচ্ছে করল না। এরকম একটা নির্মম মানুষের সঙ্গে কী কথা?

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বেশ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরের বাইরে এল। পায়ের ব্যথাটা যদি রাজা মিথ্যে বুঝতে পারে বলা যায় না হয়তো দলপতির তরোয়াল খুলে নিয়ে ওকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করতে পারে। এইরকম মানুষ সব পারে।

বাইরে এসে প্রহরীদের পাহারায় ফ্রান্সিস চলল। দলপতি বলল—তুমি রাজাকে মিথ্যে কথা বললে কেন?

—আমি একথার উত্তর দেব না। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? দলপতি বলল।

—তোমাদের বিশ্বাস নেই। ফ্রান্সিস বলল।

কয়েদঘরে ঢুকতে বন্ধুরা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—ভাইসব, যা বলেছিলাম। তাই হল। রাজা গররাজি। একসঙ্গে এতজনের ফাঁসি দেখতে রাজা উদগ্রীব হয়ে আছে। এ নাকি এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য। এরকম মানুষের সঙ্গে

আমরা কথা বলতেও ঘৃণা হয়। রাজা ঘরে ঢুকতে আমি উঠে দাঁড়াই নি। রাজা বেশ ক্ষেপে গেল। আমি পায়ে ব্যথা বলে সমস্যাটার পাশ কাটিয়েছি। যাহোক রাজা রাজি হয়নি। অবশ্য এটা আমি আগেই জানতাম।

বন্ধুরা কেউ কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিসকে ওরা প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। একা ফ্রান্সিসের ফাঁসি হবে না—এটা জেনে ওরা খুশিই হল। ফ্রান্সিসদের সঙ্গেই সবাই মৃত্যুবরণ করবে। সবাই এই সংকল্প নিল।

পরদিন সকাল হল। ফাঁসির মঞ্চে দড়িটড়ি টাঙানো হল। যারা ফাঁসি দেবে তারা ঝুলন্ত দড়ির ফাঁস টেনে টেনে দেখল। মঞ্চের পেছনটায় স্তূপাকার শুকনো ডালপাতা। ওসব রাখা হয়েছে কেন প্রহরী সৈন্যরা বুঝল না। ওরা ওসব ফেলেও দিল না। তখন ফাঁসি হবে তার উত্তেজনা।

প্রহরীরা দল বেঁধে দুহাত বাঁধা ফ্রান্সিসদের সারি বেঁধে নিয়ে আসছে।

রাজা অনেক আগেই এসে গেছে। মঞ্চের মুখোমুখি একটা সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। তার নিচে রাজার সিংহাসন এনে পাতা হয়েছে। রাজা এল। তার সাজসজ্জার বহর কত। মাথায় বোধহয় নতুন মুকুটটা রোদ পড়ে ঝক্ঝক্ করছে। গায়ে সোনালি-রূপালি কাজ করা আলখাল্লার মত।

ফাঁসি দেখতে খুব বেশি লোক আসে নি। এই ঘৃণ্য ঘটনা দেখার আগ্রহ অনেক মানুষেরই নেই। তবু রাজার উৎসাহে কমতি নেই। হাত-পা নেড়ে দলপতিকে নানা নির্দেশ দিচ্ছে। লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবারই লক্ষ্য ফাঁসির মঞ্চ।

ফ্রান্সিসরা সার বেঁধে আসছে।

হঠাৎ ওকাজা কোত্থেকে ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। হাত বাঁধা ফ্রান্সিস মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল। ওকাজা ফ্রান্সিসদের হাত ধরে তুলতে তুলতে বিড় বিড় করে বলল—আগুন—মঞ্চ পলিকা—পেছনে জঙ্গল।

ওকাজা এক ছুটে চলে গেল। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে যীশুকে স্মরণ করল। গলা চড়িয়ে দেশীয় ভাষায় বলল—সবাই পালাবার জন্য তৈরী থাকো। পেছনের জঙ্গলে আত্মগোপন।

ফ্রান্সিসরা মঞ্চে উঠল। ফাঁসুড়েরা ফ্রান্সিসদের ওপর থেকে ঝোলানো ফাঁসগুলোর ঠিক নিচে দাঁড় করিয়ে দিতে লাগল। হঠাৎ মঞ্চের পেছনের শুকনো ডালপাতায় কোত্থেকে একটা জ্বলন্ত মশাল উড়ে এসে পড়ল। শুকনো ডালপাতায় সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠল। ফাঁসুড়েরা হতবাক। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। আগুন মঞ্চেও ছড়াল। দর্শকদের মধ্যে ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ মঞ্চ ডানদিকে একেবারে কাত হয়ে মাটি ছুঁল। প্রহরীরা, সৈন্যরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। পীপেভর্তি জল আনছে আগুন নেভাবার জন্যে।

হঠাৎ রাজার মাথার ওপরের সামিয়ানা ভেঙে পড়ল। ফ্রান্সিসরা কাত হওয়া মঞ্চ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। শাঙ্কো রাজা পারকোনকে কাঁধে তুলে নিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটল। এবার ফ্রান্সিসরাও ছুটল।

সৈন্যরা তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে আসতে লাগল। সৈন্যরা জঙ্গলের কাছে পৌঁছোবার আগেই ফ্রান্সিসরা বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। গভীর বন। সৈন্যরা ওদের খুঁজে বের করতে পারবে না।

ফ্রান্সিসরা গাছগাছালির নিচে দিয়ে চলল। কিন্তু দুহাত বাঁধা থাকায় খুবই অসুবিধে হচ্ছিল। মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ফ্রান্সিসরা বেশ কিছুদূরে এল।

সবাই হাঁপাতে লাগল। বেশ কষ্ট করে রাজা পারকোন ফ্রান্সিসদের সঙ্গে সঙ্গে এল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—

—সবাই বসে পড়ল। বিশ্রাম নাও। সবাই এখানে ওখানে বসে পড়ল।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসদের কাছে এল। মাথা নিচু করে ফ্রান্সিসকে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর বুকের কাছ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে জামার তলা থেকে ছোরাটা বের করল। তারপর ঘষে ঘষে শাঙ্কোর হাতের দড়ি কেটে দিল। ছোরা নিয়ে এবার শাঙ্কো একে একে সকলের হাতের দড়ি কেটে দিল। হাত খোলা পেয়ে ফ্রান্সিসদের অস্বস্তি কাটল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এখন কী করবে?

—বুঝতে পারছি না। এই বনটা তো পার হয়ে যাই। তারপরে নিশ্চয়ই লোকজনের বসতি পাব।

—হ্যাঁ। এ ছাড়া তো কোন উপায় নেই। হ্যারি বলল।

হঠাৎ সামনের দিকে শুকনো ডালপাতা ভাঙার শব্দ উঠল। সকলেই শুনল সেটা। ফ্রান্সিস কান খাড়া করল। শব্দটা সামনে থেকেই আসছে।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—সবাই লড়বার জন্য তৈরি হও। রাজা কাদর্জার সৈন্যরা বোধহয় আসছে। নিরস্ত্র অবস্থাতেই লড়বো আমরা। আর বন্দী হব না।

ডালপাতা ভাঙার শব্দ কাছে এল। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। শুধু রাজা পারকোন বসে আছে। এক্ষুনি উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই।

তিনজন লোক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ওকাজা!

ফ্রান্সিস হেসে বলল—ওকাজা সময়মতই এসেছো। আমরা কী করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

—আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। ওকাজা বলল।

—কোথায় যাবো? ফ্রান্সিস বলল।

—বিদ্রোহীদের আস্তানায়। আসুন। ওকাজা বলল।

ওকাজারা সামনে এগিয়ে চলল। ফ্রান্সিসরা পেছনে পেছনে চলল। এই দিনের বেলাও বনতল অন্ধকার। সাবধানে পা ফেলে চলতে হচ্ছে। নইলে আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা।

বেশ কিছুটা যেতে গাছগাছালির আড়ালে ফ্রান্সিসরা দেখল একটা বড় ঘর। সবটাই কাঠের। ফ্রান্সিসরা ওকাজার পেছনে পেছনে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘর থেকে এক বলিষ্ঠ যুবক বেরিয়ে এল। মুখে দাড়ি গোঁফ। খুব বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ। বলল—ওকাজার কাছ থেকে আপনাদের কথা শুনেছি। ফাঁসির হাত থেকে বেঁচে এসেছেন। আপনাদের মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি। ভেতরে আসুন।

ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। ওকাজা ফ্রান্সিসদের কাছে এল। নিম্নস্বরে বলল—ঐ যুবকটিই পারেলো। বিদ্রোহীদের নেতা। ফ্রান্সিস পারেলার কাছে গেল। হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল। বলল—রাজা কাদর্জার মত নরপশুর সন্ত্রাসের রাজত্ব আপনারা শেষ করুন।

—আমরা সেই চেষ্টাতেই আছি। পারেলো বলল।

ফ্রান্সিস টানা পাতা দড়ি দিয়ে শুকনো ঘাস বুনে তৈরি বিছানায় বসল। হ্যারিরাও বসল। হ্যারি বলল—

—ফ্রান্সিস—রাজা পারকোনের চিকিৎসার ব্যবস্থা এখানে কর। পিঠের ঘাটা শুকিয়ে গেছে কিন্তু দুর্বলতাটা এখনও যায় নি।

—ঠিক বলেছো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ওকাজাকে ডাকল। ওকাজা এল। ফ্রান্সিস বলল—ওকাজা—একটা উপকার যে করতে হয়।

—বলুন কী উপকার। ওকাজা বলল।

—রাজা পারকোনকে রাজা কাদর্জার হুকুমে চাবুক দিয়ে মারা হয়েছিল। পিঠে ঘাটা সেরেছে কিন্তু দুর্বলতাটা যায় নি। যদি ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দাও।

—নিশ্চয়ই। ওকাজা বলল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছু পরে ওকাজা এক বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। বৃদ্ধের কাঁধে ঝুলছে বুনো লতা দিয়ে তৈরি ঝোলা। বোঝা গেল এই বৃদ্ধই বৈদ্য।

ফ্রান্সিস বৃদ্ধকে রাজা পারকোনের কাছে নিয়ে গেল। চাবুক মারার কথা বলল। বৃদ্ধ চুপ করে সব শুনল। তারপর রাজার পিঠের ছেঁড়া পোশাক সরিয়ে দেখল। বলল—ভেতরে এখনও ঘা আছে। সম্পূর্ণ সারে নি।

বৈদ্য ঝোলার মুখ খুলল। কয়েকটা শুকনো পাতা বের করল। রাজার পিঠে চেপে চেপে বসিয়ে দিল। পাতাগুলো চেপ্টে লেগে রইল। বৈদ্য তারপর ঝোলা থেকে একটা ছোটো চিনেমাটির বোয়াম বের করল। বোয়াম থেকে চারটে

কালোবড়ি বের করল। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—এখন একটা বড়ি খাইয়ে দিন। কাল থেকে দৈনিক একটা করে বড়ি খাবে। দিন দশেকের মধ্যে আগের শক্তি ফিরে পাবেন। বৈদ্য চলে গেল।

তৃষ্ণার্ত ফ্রান্সিসরা জল খেল। এবার খিদে। হ্যারি সেকথা ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস ওকাজাকে ডাকল। ওকাজা কাছে এলে বলল—সেই সকালে কিছু খেয়েছি। এখনো কিছু খাওয়া জোটে নি।

—কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের খেতে দেওয়া হবে। সকাল থেকে কী কষ্ট হয়েছে আপনাদের তা তো আমরা জানি। ওকাজা চলে গেল।

কিছু পরে ওকাজা এল। গলা চড়িয়ে বলল—আপনাদের খেতে দেওয়া হচ্ছে।

এবার ফ্রান্সিস ভালো করে চারদিকে দেখল। অনেক যুবক শুয়ে বসে আছে। ঘরের এককোণে জলের জালা। অন্য কোনে তরোয়ালের স্তূপ। বর্শাও রয়েছে।

প্রত্যেকের সামনে লম্বাটে পাতা পেতে দেওয়া হল। কম পোড়া তিনকোণা রুটি আর তরিতরকারির ঝোল। একটা করে ঝোলসহ মাছের টুকরোও দেওয়া হল। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা চেটেপুটে খেল।

রাত হল। সারাদিনের উত্তেজনায় ক্লান্ত ফ্রান্সিসরা ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু বেলায় ঘুম ভাঙল ফ্রান্সিসের। হাতমুখ ধুয়ে এসে সকালের খাবার খেতে বসল। হ্যারি পাশে এসে বসল। বলল—

—এখন কী করবে?

—কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না। কয়েকটা দিন এখানে বিশ্রাম নেব। তারপর যা করবার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

খেয়েদেয়ে শুয়ে বসে কয়েকদিন কাটাল।

সেদিন ফ্রান্সিস ওকাজাকে কাছে ডাকল। বলল—

—ওকাজা আমরা এখন কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না। রাজা পারকোনের রাজত্ব চালাচ্ছে রাজা কাদর্জার সেনাপতি। ওখানে যাওয়া যাবে না। এখানে তো থাকা যাবেই না।

—এক কাজ করতে পারেন। উত্তরে দিকে একটা দেশ আছে—কানজেন। রাজা নয় রানি ইচিনা ঐ দেশের প্রধান। মন্ত্রী অমাত্যের সহায়তায় রাজত্ব চালায়। খুব বুদ্ধিমতী। কানজেন-এ আশ্রয় নিতে পারেন। তারপর আমরা এই জামিনায় আমাদের শাসন কায়েম করতে পারলে এখানে চলে আসবেন। ততদিন কানজেন-এ থাকুন।

ফ্রান্সিস এই নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলল। হ্যারি বলল—ওকাজা ভালো



সৈন্য দু'জান হতবাক

বুদ্ধিই দিয়েছে। কানজেনেই চলো। আশ্রয়, আহার দুটোই মিলবে। রাজা কাদর্জার রাজত্ব শেষ হলেই আমরা চলে আসবো।

বনজঙ্গল গাছগাছালি কেটে এখানে ঘর বানানো হয়েছে। চারিদিকে গাছ। কাজেই ঘরটা দৃষ্টির আড়ালেই থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওকাজাদের আর ফ্রান্সিসদের।

তখন দুপুরের খাওয়া সেরে শাঙ্কো ঘরটার বাইরে একটু দূরে একটা গোড়া কাটা গাছের গোড়ায় বসেছিল। হঠাৎ শুকনো পাতাডাল ভাঙার শব্দে ফিরে তাকাতেই দেখে দুজন রাজা কাদর্জার সৈন্য। সৈন্য দুজন হতবাক। শাঙ্কোরও মুখে কথা নেই। শাঙ্কো সেই অবস্থাটা কাটিয়ে উঠল। দ্রুত ছুটল সৈন্য দুজনের দিকে। সৈন্য দু'জন তখন পালাতে ব্যস্ত। শাঙ্কো মাথা নিচু করে পোশাকের নিচ থেকে ছোরাটা বের করল। তারপর একটা সৈন্যকে লক্ষ্য করে ছোরা ছুঁড়ল। পরিষ্কার হাত শাঙ্কোর। ছোরাটা সৈন্যটির গলায় গেঁথে গেল। ও বসে পড়ল। শাঙ্কো অন্যটির দিকে ছুটে গেল। কিন্তু সেই সৈন্যটি লাফ দিয়ে সরে গেল। তারপর গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

এবার সমূহ বিপদ। এই ঘরের কথা রাজা কাদর্জার কাছে গোপন থাকবে না। নিশ্চয়ই নতুন সেনাপতিকে সৈন্যসহ পাঠাবে এই ঘরের খোঁজে। শাঙ্কো ভাবল এসব। ও দ্রুত পারেলার কাছে গেল। ঘটনাটা বলল। পারেলা তখন গলা চড়িয়ে বলল—কাদর্জা এই আস্তানার খোঁজ পেয়ে যাবে। এক মুহূর্তও দেরি না। সব অস্ত্রশস্ত্র জঙ্গলে লুকিয়ে রাখো। তারপর যে যেদিকে পারো পালাও। আমরা সংখ্যায় কম। লড়াই করবো না। সাত দিন পরে সবাই এখানে চলে আসবো।

পারেলার দলের লোকেরা তরোয়াল বর্শা সব জঙ্গলে লুকিয়ে ফেলল। তারপর যে যেদিকে পারল পালালো।

ফ্রান্সিস জোরে বলল—ভাইসব—উত্তরদিকে পালাও।

ফ্রান্সিসরা উত্তরমুখো ছুটল। কিছুদূর যাবার পর পেছনে কাদর্জার সৈন্যদের চিৎকার ডাকাডাকি শুনল। ফ্রান্সিস জোরে বলল—জলদি।

একসময় ফ্রান্সিসরা বনভূমি থেকে বেরিয়ে এল। সামনে বিস্তৃত প্রান্তর। ফ্রান্সিসরা দ্রুত ছুটল। বনের বাইরে এসে কাদর্জার সৈন্যরা ওদের দেখে ফেলতে পারে।

প্রান্তর শেষ। সামনে বাড়িঘরদোর জনবসতি। কাঠপাথরে তৈরি প্রথম বাড়িটার কাছে এল ওরা। বন্ধুরা অনেকেই হাঁপাতে হাঁপাতে মাটিতে বসে পড়ল।

ফ্রান্সিসও ভীষণ হাঁপাচ্ছে তখন। কথা বলতে পারছে না। একটুক্ষণ দম নিয়ে ফ্রান্সিস বাড়ির সামনের দরজাটার কাছে এল। দেখল দরজা খোলা।

ফ্রান্সিস ডাকল—কেউ আছেন? কোন সাড়াশব্দ নেই। আবার ডাকল—কেউ আছেন?

—কে? ভেতর থেকে শোনা গেল। একটু পরে একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। পাকা দাড়ি গোঁফ। গায়ে ঢোলা জামা।

ফ্রান্সিস বলল—আমরা বিদেশী ভাইকিং। এদেশে ঘটনাচক্রে এসেছি। রাজা কাদর্জা আমাদের ফাঁসি দিতে চেয়েছিল। অনেক কষ্টে আমরা পালিয়ে এসেছি।

—রাজা কাদর্জা? ওতো সাংঘাতিক মানুষ। বৃদ্ধ বলল।

—হ্যাঁ, আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। যা হোক আমরা এখন এখানে আশ্রয় চাই। খাদ্যও চাই। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই বাড়ি থেকে এক যুবক বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের দেখে একটু অবাকই হল। এতজন বিদেশি। হ্যারি বলল—এটা বোধহয় রানি ইচিনার রাজত্ব?

—হ্যাঁ। যুবকটি বলল—কিন্তু আপনারা?

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সবই বলল। যুবকটি বলল—তাহলে আপনারা এখন কী চান?

—আমরা আপনার বাড়ীতে আশ্রয় চাই। খাদ্যও চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—তা দেব কিনা বাবা বলুক। যুবকটি বলল।

—এরা আশ্রয়হীন। বিপদগ্রস্ত। এদেশ ওদের কাছে বিদেশ। কোথায় আর আশ্রয় পাবে? আমাদের বাড়ীতেই থাকুক। বৃদ্ধ বলল।

—তুমি রাজি হলে আমার আপত্তি নেই। যুবকটি বলল—তবে বেশিদিন আপনাদের আশ্রয় ও খাদ্য দিতে পারবো না।

—না-না। আজকের রাতটা। কাল আমরা রানির দরবারে যাবো। আশ্রয় খাদ্য চাইবো। মনে হয় উনি ব্যবস্থা করে দেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। আপনারা থাকুন। তবে ছোট ঘর। আপনাদের কষ্ট হবে। বৃদ্ধ বলল।

—আমরা কয়েদঘরে থেকে অভ্যস্ত। আমাদের কোন কষ্ট হবে না। হ্যারি বলল।

ঘরের জিনিসপত্র সরানো হল। ভাইকিংরা যুবকটিকে সাহায্য করল।

ফাঁকা ঘরে মোটা কাপড় পেতে দেওয়া হল। ফ্রান্সিসরা বসল। রাজা পারকোন শুয়ে পড়লেন। ফ্রান্সিস পারকোনের কাছে এল। বলল—এখন নিজের হারানো রাজ্যে ফিরে যেতে পারবেন?

—তোমাদের পোশাক পরে বনভূমি পার হয়ে চলে যেতে পারবো। এখন শরীরে জোর হয়েছে। তবে শাঙ্কো যদি আমাকে বনভূমিতে পৌঁছে দেয় তাহলে ভালো হয়। রাজা পারকোন বললেন।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো আপনাকে নিয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

রাতে ফ্রান্সিসদের খেতে দেওয়া হলো। আনাজের তরকারী মাছের ঝোলমত। পরিষ্কার রুটি। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা পেট পুরে খেল।

শাঙ্কো রাজা পারকোনকে নিয়ে রওনা হল। রাজা পারকোন সকালের খাবার খেল। বললেন—ফ্রান্সিস তোমার কাছে ঋণী রইলাম।

ফ্রান্সিস রানির বাড়ির দিকে চলল। যুবকটিই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

রানির পাথরের বাড়ি খুব বড় নয়। তবে দেখতে সুন্দর। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, রানি যদি আশ্রয়, খাদ্য না দেয় তবে খুবই বিপদে পড়বো।

—না, না। বলবো—আমরা কিছুদিন থাকবো। প্রয়োজনে আপনার হয়ে লড়াই করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আবার পরের হয়ে লড়াইয়ে নামবে? শাঙ্কো বলল।

—এক্ষুনি তো আর লড়াই হচ্ছে না। আমরা যে তাঁর সহায় এটা তো বোঝাতে হবে। নইলে আমাদের গুরুত্ব কী? ফ্রান্সিস বলল।

—দেখো বলে। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিসরা সভাঘরে ঢুকল। অনেকেই ওদের দিকে তাকিয়ে দেখল। এই বিদেশিরা কোত্থেকে এল? প্রহরীরা ফ্রান্সিসদের আটকালো না। কাঠের সিংহাসনে রানি ইরিনা বসে আছেন। দুপাশে মন্ত্রী ও অমাত্যরা। ঘরটায় তেমন আলো ঢোকে নি। রানি বিচার করছেন। রানির মাথায় মুকুট। পরনে ঝলমলে পোশাক। দেখতে সুন্দরী। চেহারায় ব্যক্তিত্ব আছে।

একটা বিচার শেষ হল। ফ্রান্সিসরা ততক্ষণে রানির নজরে পড়েছে। সভাঘরে ভর্তি লোক। বোঝা গেল রানি জনপ্রিয়। হয়তো তাঁর সুশাসনই তাঁকে জনপ্রিয় করেছে।

ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল। বিচার চলল।

বেশ কিছুক্ষণ বিচার চলার পর বিচারপর্ব শেষ হল। রানি হাততালি দিলেন। আস্তে আস্তে সভার লোকজন বেরিয়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বিচারসভা নির্জন হল। ফ্রান্সিসরা তখনও দাঁড়িয়ে। এবার রানি ফ্রান্সিসদের দিকে তাকালেন। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলেন।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে ফ্রান্সিস বলল—আপনার কাছে আমাদের কিছু নিবেদন ছিল।

—বলো কী নিবেদন? রানি বললেন। তখন ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সব ঘটনা বলল।

—ও। রাজা কাদর্জা তো একটা সাক্ষাৎ শয়তান। দু'দুবার এই কালজেন আক্রমণ করেছিল। আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমরা বিপদমুক্ত এই। উত্তরের এক দেশ। বুনোদের রাজত্ব। ওরা সুযোগ পেলেই আমাদের দেশ

আক্রমণ করে। হেরে পালিয়ে যায়। কিন্তু এভাবে কতদিন ওদের আক্রমণ করে। হেরে পালিয়ে যায়। কিন্তু এভাবে কতদিন ওদের আক্রমণ ঠেকাতে পারবো জানি না। তবে আমার বীর সৈন্যরা হার স্বীকার করতে জানে না। এটাই আমার ভরসা। যাকগে—তোমরা কী চাও বলো।

—আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আমরা কিছুদিন এখানে থাকবো। তারপর ফিরে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তোমরা ভাইকিং—দক্ষ জাহাজচালক দুঃসাহসী। প্রয়োজনে তোমরা আমার সহায় হবে—এই আশা আমার। রানি বললেন।

—আমরা নিশ্চয়ই আপনাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবো। এমন কি যদি আপনি চান আপনার হয়ে লড়াই করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো খুবই ভালো হয়। রানি বললেন।

রানি আঙ্গুল নেড়ে সেনাপতিকে ডাকলেন। অমাত্যদের পাশে বসা সেনাপতি দ্রুত উঠে দাঁড়াল। সেনাপতি রোগা লম্বা। এ কী লড়াই করবে? শাঙ্কো ভাবল।

সেনাপতি মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে দাঁড়াল। রানি ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বললেন—এদের থাকার জন্যে সেনানিবাসের একটা ঘর ছেড়ে দিন। সেনাদের সঙ্গেই ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এরা কিছুদিন থাকবে। আপনি একটু দেখাশোনা করবেন।

—যে আজ্ঞে। সেনাপতি মাথা নিচু করে বলল। তারপর ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল—আমার সঙ্গে আসুন।

সবাই সভাঘরের বাইরে এল। বেশ রোদ বাইরে। এলোমেলো বাতাস বইছে।

সভাঘরের বাইরে একটা ছোট মাঠ মতো। তারপরেই কতগুলো লম্বাটে ঘর টানা চলে গেছে। ঘরের বারান্দায় মাঠে সৈন্যরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা ফ্রান্সিসদের বেশ অবাক চোখেই দেখল। সেনাপতি কাকে ডাকল। একজন সৈন্য এগিয়ে এল। কোমরে ঝোলানো চাবির বড় গোছা।

সেনাপতি একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরে তালা ঝুলছে। সেনাপতি চাবিওয়ালা সৈন্যটিকে ইঙ্গিত করল। চাবিওয়ালা সৈন্যটি তালা খুলে দিল। সেনাপতি দরজা খুলে বলল—এই ঘরে আপনারা থাকবেন। প্রয়োজনে আমার খোঁজ করবেন। এখন আপনারা বিশ্রাম করুন।

ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। বেশ খোলামেলা ঘর। ভালো হাওয়া খেলছে।

ঘরের মেঝেয় মোটা কাপড়ের চাদর পাতা। ফ্রান্সিস বসল। শুধু ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। শুয়ে থেকেই বলল—বিস্কো, বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। শাঙ্কো ফিরে এসে আমাদের খুঁজবে। ও সহজেই যেন আমাদের দেখা পায়।

বিস্কো বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। তখনই দেখল শাঙ্কো সভাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। বিস্কো চিৎকার করে ডাকলো—শাঙ্কো, আমরা এখানে।

শাঙ্কো তখন বিস্কোকে দেখতে পেয়েছে। মাঠ পার হয়ে বিস্কোর কাছে এল। দুজনে ঘরে ঢুকল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস, রানি তাহলে আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করল।

—হ্যাঁ। বদলে অবশ্য বলতে হল লড়াই হলে রানির হয়ে আমরা লড়বো।

—নিরুপায়। এমনি এমনি কে কাকে আশ্রয় দেয়, খাদ্য দেয়। স্বার্থের ব্যাপারটা থেকেই যায়। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক গে। তোমার অভিমতের বিরোধিতা কখনও করিনি, করবোও না। সব মেনে নিলাম। প্রয়োজনে লড়াই করবো। শাঙ্কো বলল।

—রাজা পারকোনের অবস্থা কী দেখলে? পারবে নিজের দেশে ফিরে যেতে? হ্যারি বলল।

—পারবে। তবে বন পার হতে কষ্ট হবে। পেছল গাছের গুঁড়ি। তার মধ্যে দিয়ে যাওয়া। কী আর করার আছে। উনি তো আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজি হলেন না। শাঙ্কো বলল।

—উনি যা ভালো বুঝেছেন, করেছেন। আমাদের কিছু করণীয় নেই। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসদের একঘেয়ে দিন কাটতে লাগল। সকাল বিকেল ওরা সৈন্যদের কুচকওয়াজ দেখে। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

বিকেলে ফ্রান্সিস একা সদর রাস্তায় যায়। তারপর নাক বরাবর হাঁটতে শুরু করে। বাড়িঘর দোকানপাট দেখে। রাত হতেই ফিরে আসে। এভাবেই দিন কাটছিল ফ্রান্সিসদের।

সেদিন সকালে সৈন্যদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। সবাই ব্যস্ত। একজন সৈন্যকে কাছে পেয়ে শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে ভাই?

—বুনো রাজা আমাদের দেশ আক্রমণ করতে আসছে। সৈন্যটি বলল।

—তাহলে তো লড়াই। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। সৈন্যটি বলল।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসদের কাছে এল। লড়াইয়ের কথা বলল।

রানি ইরিনা সভাঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সৈন্যরা সেখানে গিয়ে জড় হল।

রানি ইরিনা গলা চড়িয়ে বলতে লাগলেন—আমার বীর সেনানীরা, দূত খবর এনেছে—বুনো রাজা আমাদের দেশ আক্রমণ করতে আসছে। সব তৈরি হও। এর আগেও ওদের আমরা লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়েছি। এবারও ওদের



বুনোরা ফ্রান্সিসকে আক্রমণ করল

হারাতে হবে। জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই চালাতে হবে। জয় আমাদের হবেই। রানি ইরিনা থামলেন।

রানি ইরিনার গায়ে আঁটোসাঁটো পোশাক। মাথার চুল চেপে বাঁধা। হাতে খোলা তরোয়াল। বোঝা গেল রানি ইরিনাও লড়াই করবেন।

উত্তরের পাহাড়ি এলাকা দিয়ে বুনো রাজার সৈন্যরা ছুটে আসতে লাগল। হাতে বর্শা। মাত্র কয়েকজনের হাতে তরোয়াল। ওরা রানি ইরিনার সৈন্যদের কাছে আসতেই ইরিনার সৈন্যরা বুনো রাজার সৈন্যদের আক্রমণ করল। লড়াই শুরু হল। আর্ত্তনাদ গোঙানি।

হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল—কী করবে?

—কথা দিয়েছি। রানি ইরিনার হয়ে লড়াই করবো। ভাইসব—সেনাপতি আমাদের তরোয়াল দিয়ে গেছে। উনি আগে থেকেই আঁচ করেছিলেন—দু'একদিনের মধ্যে বুনোরা আক্রমণ করতে পারে। তরোয়াল নাও। লড়াই।

ফ্রান্সিসরা অল্পক্ষণের মধ্যেই তরোয়াল নিয়ে লড়াইয়ের মাঠে নামল। বুনোরা বর্শা বিঁধিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু একবার বর্শা বিঁধিয়ে দিলেই ওদের বর্শা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিসরা সেই সুযোগ নিল। তরোয়াল চালিয়ে ওদের আহত করতে লাগল।

নিজের সৈন্যদের সঙ্গে মিশে রানি ইরিনাও লড়াই করতে লাগলেন। নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাতে লাগলেন।

ফ্রান্সিসরা ঘুরে ঘুরে লড়াই করতে লাগল। ফ্রান্সিস অবাক হয়ে দেখল রানি ইরিনা নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাচ্ছে। বুনো সৈন্য মারা পড়ছে। পরিশ্রমে রানির মুখ লাল টকটকে হয়ে গেছে। তবু তরোয়াল চালানোয় বিরাম নেই।

ফ্রান্সিসদের দুই বন্ধু আহত হল। শাঙ্কো লড়াই থামিয়ে বন্ধু দু'জনকে এক এক করে ওদের থাকার ঘরে নিয়ে এল।

ফ্রান্সিস বুনোদের রাজাকে দেখল। মুখে হলদেটে গোঁফ দাড়ি। মাথার হলদেটে চুল চুড়ো করে বাঁধা। হাতে তরোয়াল। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। বুনো রাজার সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। ফ্রান্সিস বুনো রাজার মাথার ওপর দিয়ে তরোয়াল ঘুরিয়ে আনল। বুনো রাজা চমকে গেল। ফ্রান্সিস সেই সুযোগ ছাড়ল না। বুনো রাজার হাত লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। বুনো রাজার হাত বেশ গভীরভাবে কেটে গেল। বুনো রাজা বসে পড়ল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'জন বুনো সৈন্য রাজাকে ধরে ধরে লড়াইয়ের জায়গা থেকে সরিয়ে নিল।

ওদিকে কোন বুনো সৈন্যের ছোঁড়া বর্শা রানি ইরিনার কাঁধে লাগল। রানি তরোয়াল ফেলে হাত দিয়ে কাঁধ চেপে ধরলেন। রক্ত পড়তে লাগল।

দু'তিনজন সৈন্য রানি ইরিনাকে ধরে ধরে লড়াইয়ের জায়গা থেকে সরিয়ে

নিয়ে গেল। সভাঘরের বারান্দায় রানিকে শুইয়ে দিল। একজন সৈন্য কোমরের ফেট্টি খুলে রানির ক্ষতস্থানে বেঁধে দিল। রক্ত পড়া বন্ধ হল।

রানির আহত হওয়ার সংবাদে রানির সৈন্যদের একাংশ কেমন মুষড়ে পড়ল। লড়াইয়ে আর মন নেই যেন। বুনো সৈন্যরা এই সুযোগ কাজে লাগল। পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ চালাল। রানির সৈন্যরা হেরে যেতে লাগল।

অভিজ্ঞ ফ্রান্সিস বুঝল জেতার আশা নেই। রানির সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করল। কিছু সময় পরে যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি স্পষ্ট হল। চারদিকে প্রচুর বুনো সৈন্যরা। রানির সৈন্যরা নেই বললেই চলে।

ফ্রান্সিস হাতের তরবারি মাটিতে ফেলে গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—আর লড়াই নয়। অস্ত্রত্যাগ কর।

বুনোরা যুদ্ধজয়ের আনন্দে আত্মহারা। নিরস্ত্র ফ্রান্সিসদের আক্রমণ করল না। একদল বুনো সৈন্য ফ্রান্সিসদের ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিসরা আত্মসমর্পণ করল। বুনোরা ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল রানির কয়েদঘরের দিকে। যেতে যেতে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, আবার কয়েদঘর। বুনোরা আমাদের নিয়ে কী করবে জানি না। এবার পালানোর পরিকল্পনা।

—সেটা আমি আগে থেকেই ভাবছি। একটা আশা—বুনোরা বোধহয় আমাদের হত্যা করবে না। শুধু বন্দী করে রাখবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিছুই বলা যায় না। ওদের মতলব এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হ্যারি বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

রানির কয়েদঘরের বেশ বড়। আগে থেকেই কিছু বন্দী ছিল। তাদের হাতপা বাঁধা নয়। ফ্রান্সিস বলল—হয়তো আমাদেরও হাত-পা বাঁধবে না। ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরের ঘাসের বিছানায় বসল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস, যে করেই হোক পালাতে হবে।

—সব দেখিটেখি। তারপর পালানোর উপায় ভাববো। ফ্রান্সিস বলল।

কয়েদগরের লোহার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বুনো সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে কয়েদঘর পাহারা দিতে লাগল।

ওদিকে কয়েকজন প্রহরী রানি ইরিনাকে ধরাধরি করে অন্তঃপুরে নিয়ে গেল। বিছানায় শুইয়ে দিল। রানি ব্যথায় গোঙাতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে বৈদ্য এল। রানির চিকিৎসা শুরু হল।

বুনোদের আহত রাজাকে বারান্দায় শুইয়ে দেওয়া হল।

বুনো রাজা সেনাপতিকে ডেকে পাঠাল। সেনাপতি বুনো রাজার কাছে এল।

রাজা বলল—রানিকে যে বৈদ্য চিকিৎসা করতে এসেছে তাকে ধরে নিয়ে এসো। সে আমারও চিকিৎসা করবে।

সেনাপতি অন্তঃপুরের দিকে চলল।

রানির প্রহরীরা সেনাপতিকে বাধা দিতে সাহস পেল না। বৈদ্য তখন রানির ক্ষতস্থানে সবজে রঙের আঠালো একটা ওষুধ লেপে দিচ্ছিল।

রানির শয়নকক্ষে ঢুকে সেনাপতি দেখল—বৈদ্য রানির শয্যার পাশে বসে আছে। বুনো সেনাপতিকে দেখে রানি উঠে বসতে গেল। বৈদ্য বলল—এখন নড়াচড়া করবেন না। রানি বুনো সেনাপতিকে বলল—এখানে কী চাই? প্রহরী? প্রহরীর এগিয়ে এল। কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সেনাপতি বলল—আপনি তো এখন আমাদের বন্দিনী। আমরা যা বলবো আপনি তাই শুনতে বাধ্য। তবে আমি আপনার কাছে আসি নি। আমাদের রাজাও আহত। ঐ এক ভাইকিং দস্যুর অস্ত্রাঘাতে। তার চিকিৎসার জন্য বৈদ্যকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—ও। রানি আর কিছু বললেন না। সেনাপতি বৈদ্যকে বলল চলুন। বৈদ্য উঠে দাঁড়াল। বলল—চলি মাননীয়া রানি। যে ওষুধগুলো দিয়ে গেলাম নির্দেশমত খাবেন। ভয়ের কিছু নেই। এক সপ্তাহের মধ্যে ঘা শুকোতে থাকবে। অল্পদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবেন। বৈদ্য সেনাপতির সঙ্গে রানির শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এল।

সভাঘরের বারান্দায় সেনাপতির পেতে দেওয়া মোটা চাদরের ওপর বুনো রাজা শুয়েছিল। বৈদ্যকে দেখে উঠে বসল। সৈন্য পাশে বসল। বুনো রাজার ক্ষতস্থান দেখতে লাগল। বলল দেখছি—রক্ত এখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। যাকগে—আমি রক্তপড়া বন্ধ করে দিচ্ছি।

বৈদ্য কাঁধ থেকে ঝোলা নামল। ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে একটা কাচের বোতল বের করল। বোতলে কালো কালো বড়ি। সেনাপতিকে বলল—জল আনুন। সেনাপতি প্রায় ছুটে গেল। একটু পরেই কাঠের গ্লাশে জল নিয়ে এল। বৈদ্য বলল—মাননীয় রাজা—এই বড়িটা খেয়ে ফেলুন। বুনো রাজা বড়িটা খেল।

বৈদ্য এবার রানিকে যে ওষুধ দিয়েছিল সেটাই সেনাপতিকে দিল। একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা বড়িগুলো সেনাপতি নিল। রানির ক্ষতস্থানে যে ওষুধ লাগিয়েছিল সেই ওষুধই বুনো রাজার ক্ষতস্থানেও লাগিয়ে দিল। বুনো রাজা একটু কঁকিয়ে উঠে চুপ করে গেল।

সন্ধ্যে হয়ে এল। বুনো রাজা সেনাপতিকে ডাকল। সেনাপতি এলে বলল—এখন আমার অনেক ভালো বোধ হচ্ছে। আমি দেশে ফিরে যাবো।

—অসুস্থ শরীরে পারবেন? সেনাপতি বলল।

—হ্যাঁ পারবো। এবার তোমাকে কী করতে হবে বলি। রানি কোথায় আছে?

—অন্তঃপুরের শয়নকক্ষে। সেনাপতি বলল।

—রানিকে কয়েদখানায় ঢোকাও। বুনো রাজা বলল।

—কিন্তু অন্তঃপুরে থাকলেও তো একরকম বন্দিনীই থাকবে। সেনাপতি বলল।

—উঁহু।—যে কোন মুহূর্তে প্রহরীদের সাহায্যে পালাতে পারবে। কয়েদঘরই উপযুক্ত জায়গা। বুনো রাজা বলল।

—কিন্তু ঐ কয়েদঘর—সেনাপতি আমতা আমতা করে বলল।

—আরে, রানি আর রানি নেই। যুদ্ধে হেরে এখন তো সাধারণ মানুষ। যেখানে থাকতে বলবো সেখানেই থাকতে হবে। তুমি যাও—রানিকে কয়েদঘরে নিয়ে যাও। বুনো রাজা বলল।

সেনাপতি রানির শয়নকক্ষে এল।

—আবার কী হল? রানি বলে উঠলেন।

—হল অনেক কিছু—সেনাপতি বলল—রাজার হুকুম আপনাকে কয়েদঘরে থাকতে হবে। সেনাপতি বলল।

—কী বললে? রানি ভীষণভাবে চমকে উঠে বসলেন।

—রাজার হুকুম। আপনার রাজবাড়িতে থাকা চলবে না। সেনাপতি বলল।

—আমি যাবো না। রানি বললেন।

—তাহলে আপনাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হবে। রাজার হুকুম আমাকে তালিম করতেই হবে। সেনাপতি বলল।

—বেশ। জোর করেই নিয়ে যাও। রানি বললেন। রানির প্রহরীরা কয়েকজন সবই দেখছিল শুনছিল। তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। তাদের সকলের মাননীয় রানিকে কয়েদঘরে থাকতে হবে?

সেনাপতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরে পাঁচ-ছ'জন সৈন্য নিয়ে ঢুকল। বলল—রানিকে কয়েদঘরে নিয়ে চলো। বুনো সৈন্যরাও একটু অবাক হলো। কিন্তু সেনাপতির নির্দেশ। মানতেই হবে।

ওরা বিছানার কাছে গিয়ে রানির ডানহাত ধরল। রানির বাঁ কাঁধে বর্শার ক্ষত। রানি একবার তাঁর প্রহরীদের দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছু বললেন না। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে সৈন্যদের কাছে গেলেন। তারপর হেঁটে চললেন। রানিকে ঘিরে সৈন্যরাও চলল।

কয়েদঘরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। লোহার দরজার ফাঁক দিয়ে ফ্রান্সিসরা রানিকে দেখল। ওরা অবাক হয়ে গেল। রানি কয়েদঘরে থাকবেন?

ঢং-ঢং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খোলা হল। রানি কয়েদঘরে ঢুকলেন।

ফ্রান্সিস ঘরের কোণার দিকে রানির জন্যে একটা জায়গা করে দিল। রানি বসলেন। একটু কষ্ট করেই বসতে হল। বাঁ কাঁধে বর্শার ক্ষত।

রানির থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। নিজের জায়গায় চলে এল। হ্যারি বলল—বুনো রাজা বুনোর মতই এই কাণ্ড করল। রানিকে কয়েদঘরে ঢোকাল। রানি তো একজন মহিলা তাকে এই জঘন্য পরিবেশে বন্দী করে রাখা—কোনভাবেই এটাকে মেনে নেওয়া যায় না।

রানি ব্যাপারটাকে অত্যন্ত অপমানজনক মনে করলেন। নিজের তৈরি কয়েদঘরে নিজেই বন্দী। রানি মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইলেন।

ফ্রান্সিস তার আহত দুই বন্ধুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করছিল। বৈদ্য তাদের ওষুধ দিয়েছিল। ওষুধ ক্ষতস্থানে লাগিয়ে বড়ি খেয়ে ওরা এখন অনেকটা সুস্থ।

বিকেলে বৈদ্য এল। কয়েদঘরে ঢুকে রানির ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিল। খাওয়ার জন্যে কয়েকটা বড়িও দিয়ে গেল। ফ্রান্সিসের বন্ধুদের খাওয়ার জন্যে কালো বড়ি দিয়ে গেল। ফ্রান্সিসদের বন্ধুদেরও জন্য কালো বড়ি দিয়ে গেল। রানি অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগলেন।

একদিন পরে সন্ধ্যেবেলা বুনো সৈন্যদের খুব হৈ হল্লা শোনা গেল।

রাত হতেই হৈ-হল্লা বাড়ল। হল্লোড় চলল।

প্রহরীরা রাতের খাবার দিতে এল। খেতে খেতে হ্যারি জিজ্ঞেস করল—এত হৈ হল্লা কীসের ভাই?

—ব্বাঃ আমরা যুদ্ধে জিতেছি না। যুদ্ধজয়ের উল্লাস আনন্দ চলছে। দেশ থেকে পাঁচ পিপে আরক আনা হয়েছে। একটু পরেই নেশার আরক খাওয়া শুরু হবে।

প্রহরীরা চলে গেল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস বুঝলে কিছু?

—হ্যাঁ। বুঝলাম সৈন্যরা নেশাটেশা করবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের পালানোর সুবর্ণ সুযোগ। বুনোদের নেশার আরক। মানে সাংঘাতিক নেশার জিনিস। আরক খেলে কেউ উঠে দাঁড়াতে পারবে না। হ্যারি বলল।

উত্তেজনায় ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। চাপাস্বরে বলল—ভাইসব, মুক্তির উপায় পেয়ে গেছি। ঘটনা আমাদের স্বপক্ষে এলে আমরা অনায়াসে পালাতে পারবো।

ওদিকে সৈন্যদের হৈ-হল্লার শব্দ স্তিমিত হয়ে এল।

কিছু পরে চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। নেশার আরক খেয়ে সৈন্যরা সব মাঠে গাদাগাদি হয়ে পড়ে আছে। এমন কি প্রহরী দুজনও কয়েদঘরের সামনে খোলা তরোয়াল হাতে শুয়ে পড়েছে। বোঝাই যাচ্ছে নেশার আরক সবাই খেয়েছে।

ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। দেখল চাবিওয়ালা পাহারাদারটি লম্বালম্বি পড়ে আছে। অনড়। কোমরে চাবির গোছা। ফ্রান্সিস দরজার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়াল। প্রহরীটিকে ধরতে পারল না। কিন্তু প্রহরীটিকে ধরতে না পারলে চাবির গোছা পাওয়া যাবে না।

বন্ধুরা অনেকেই এসে তখন দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। সবাই উত্তেজিত। পালাবার সুযোগ এসেছে।

—হ্যারি, প্রহরীটাকে কী করে কাছে আনা যায়? ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি বলল—শাঙ্কো—খাবার দেবার আগে প্রহরীরা একটা লোহার ডান্ডা দিয়ে দরজায় ঘা দেয়—ঐ ডান্ডাটা নিয়ে এসো।

শাঙ্কো দ্রুত দরজায় ঝোলানো লোহার ডান্ডাটা নিয়ে এল। হ্যারি ডান্ডাটা দেখে লাফিয়ে উঠল। বলল—ফ্রান্সিস যা চেয়েছি ঠিক পেয়ে গেছি।

—ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো। ফ্রান্সিস বলল।

—বুঝলে না? ডান্ডাটার মাথাটা দেখ বাঁকানো। ডান্ডাটা দরজার ফাঁক দিয়ে বের করে বাঁকানো মাথাটা চাবিওয়ালা প্রহরীর কোমরের ফেট্টিটায় আটকে নাও। তারপর ওকে টেনে টেনে দরজার কাছে নিয়ে এসো। তখন চাবি হাতের মুঠোয়।

ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—সাবাস হ্যারি।

ফ্রান্সিস কাজে লাগল। লোহার ডান্ডাটা দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে বের করল। তারপর চাবিওয়ালা প্রহরীর কোমরের ফেট্টিতে আটকে টানতে লাগল। আস্তে আস্তে প্রহরীর শরীরটা দরজার কাছে আসতে লাগল। তারপর একেবারে নাগালের মধ্যে। ফ্রান্সিস চাবি খুঁজতে লাগল। শাঙ্কো বলল—আমি দেখেছি দরজার চাবিটা। শাঙ্কো সবচেয়ে বড় চাবিটা দেখাল। প্রহরী জড়ানো গলায় কী বলল। উঠতে পারল না।

এবার দরজা খোলা। ফ্রান্সিস ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে তালায় চাবি ঢোকাতে লাগল। একটু এদিক ওদিক করতে চাবি ঢুকে গেল। ফ্রান্সিস ডানদিকে মোচড় দিল। তালা খুলে ঝুলে রইল।

ফ্রান্সিস দ্রুত রানির কাছে গেল। বলল—মাননীয়া রানি কয়েদঘরের দরজা খুলেছি। আমরা পালাচ্ছি। আপনি অসুস্থ। কী করবেন?

—তোমাদের সঙ্গে ছুটোছুটি করতে পারবো না। আমি মন্ত্রীর বাড়িতে আত্মগোপন করবো। পরে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে বুনোদের তাড়াবো। রানি বললেন।

—তাহলে আমার বন্ধু আপনাকে মন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছে দেবে। চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। দেখল মাঠে সব সৈন্য জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। চাঁদের আলোয় দেখল বুনোদের রাজা একটা কাঠের সিংহাসনে চিৎপাৎ হয়ে পড়ে আছে।

ফ্রান্সিসরা খুব সাবধানে মাটিতে পড়ে থাকা সৈন্যদের গায়ে পা না ঠেকিয়ে মাঠটা পার হল।

ওদিকে শাঙ্কো রানিকে ধরে ধরে মন্ত্রীর বাড়ির দিকে চলল। রানি ছুটতে পারছিলেন না। যতটা দ্রুত সম্ভব চললেন। মন্ত্রীর বাড়ির সামনে এল দুজনে। শাঙ্কো আস্তে বলল—ডাকাডাকি করা যাবে না বা দরজায় ধাক্কা দেওয়া যাবে না—কোনরকম শব্দ করা চলবে না। নিশ্চয়ই পেছনের দিকে দরজা আছে। সেদিকে চলুন।

দুজনে পেছনের দরজার কাছে এল। শাঙ্কো দরজায় মৃদু টোকা দিল। কিন্তু ভেতরে কারো সাড়াশব্দ নেই।

এবার শাঙ্কো গলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করল। দরজার ফাঁক দিয়ে ছোরাটা ঢোকাল। তারপর খুব জোরে ওপরের দিকে ছোরাটা টানল। খিল খুলে গেল।

—ঢুকে পড়ুন। শাঙ্কো বলল। রানি দ্রুত ঢুকে পড়ল। শাঙ্কো ছুটল ফ্রান্সিসদের ধরবার জন্যে।

সদর রাস্তায় এসে চাঁদের আলোয় দেখল ফ্রান্সিসরা বেশ দূরে চলে গেছে। শাঙ্কো প্রাণপণে ছুটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসদের ধরল।

এবার ভাইকিংরা দ্রুত ছুটতে লাগল। গভীর রাত। রাস্তা জনশূন্য। ফ্রান্সিসরা ছুটল।

ছুটতে ছুটতে ওরা গৃহকর্তার বাড়ির কাছে এল। শাঙ্কো বলল—চলো না—এই গৃহকর্তার বাড়িতে বাকি রাতটা কাটিয়ে—

—পাগল হয়েছো। এই কালজেন ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা ছুটতে ছুটতে সেই বনভূমির কাছে এল। তারপর বনভূমিতে ঢুকে প্রায় নিকষ অন্ধকারে কিছুদূর গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—দাঁড়াও। এবার বিশ্রাম।

সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। এখানে ওখানে গাছের গুড়িতে ঘাসে ঝরাপাতায় সবাই বসে পড়ল। অনেকটা পথ ছুটে এসেছে। কমবেশি সবাই হাঁপাচ্ছে তখন।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এবার কী করবে?

—এই অন্ধকারে বন পার হতে গেলে জখম হওয়ার সম্ভাবনা। তার চেয়ে

দিনের বেলা—একটু আধটু আলো পাওয়া যাবে তখন পার হওয়াই নিরাপদ। ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

সবাই ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কেউ কেউ গাছের গুঁড়িতেই শুয়ে পড়ল। কেউ ঝরাপাতায়, কেউ ঘাসে।

ভোর হল। পাখিপাখালির ডাক শুরু হল। ফ্রান্সিসরা সজাগ হলো। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—চলো।

সবাই উঠে দাঁড়ালো। বনতল দিয়ে চলল। আবছা দেখা যাচ্ছে গাছের গুড়ি ডালপাতা। সেসবের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিসরা চলল।

হঠাৎই দেখল বিদ্রোহী পারেলাদের বড় ঘরটা পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে আছে। ফ্রান্সিস দুঃখ পেল। ও মনেপ্রাণে পারেলাদের সাফল্য কামনা করল।

বনভূমি শেষ। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—আমরা ছুটে রাজা কাদর্জার রাজ্য পার হয়ে যাবো। কেউ দাঁড়িয়ে পড়বে না। প্রাণপনে ছুটবে।

ফ্রান্সিসের কথামতোই বন্ধুরা প্রাণপনে ছুটল। রাস্তার লোকজন দাঁড়িয়ে দেখল। এরা ছুটছে কেন?

রাস্তায় টহলরত কিছু সৈন্য ফ্রান্সিসদের চিনল। কিন্তু ওরা কী করবে বুঝে ওঠার আগেই ফ্রান্সিসরা অনেক দূরে চলে গেল। রাজা কাদর্জার রাজ্য জামিনা শেষ হল।

এবার রাজা কাদর্জার সেনাপতির রাজত্ব।

তখন দুপুর। সবারই খিদে পেয়েছে। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, চলো কারো বাড়িতে আশ্রয় নি। খেয়ে বিশ্রাম করে সন্ধ্যের সময় এই রাজত্ব পার হই।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—তা মন্দ বলোনি। অন্ধকারে পার হয়ে যাবো।

—তাহলে একটা বাড়ি দেখি। শাঙ্কো বলল। তারপর এদিক ওদিক ঘুরে এসে আঙ্গুল দিয়ে একটা বড় বাড়ি দেখাল। বলল—ঐ বাড়িতেই চল।

ওরা ঐ বাড়ির দরজার কাছে এল। বাইরের দরজা খোলা। দেখল একজন মাঝবয়সী স্ত্রীলোক উঠোনে পাতা মোটা কাপড়ের ওপর বসে আসন বুনছে। দুটি ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করেছে।

দরজায় ফ্রান্সিসদের দেখে মহিলাটি একটু চমকালো। ফ্রান্সিসদের বিদেশী পোশাকই তার কারণ।

মহিলা দরজার কাছে এগিয়ে গেল। হ্যারি মহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল—মা, আমরা বিদেশি। সেই কানজেন রাজ্য থেকে আসছি। আমরা খুবই ক্ষুধার্ত। খাদ্য চাই। বিশ্রাম চাই। আপনি কি তার ব্যবস্থা করতে পারবেন?

একটু চুপ করে থেকে মহিলা বলল—আমার স্বামী তো কাজে গেছে। সে

থাকলে ভাবতাম না। কিন্তু তোমরা বিদেশী অতিথি। তোমাদের কি না খাইয়ে ফেরাতে পারি? তোমরা উঠোনে বসো। আমি সব জোগাড়-টোগাড় করছি।

মহিলাটি উঠোনে আর একটা মোটা চাদর বিছিয়ে দিল। ফ্রান্সিসরা বসল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল।

মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তখনই একটি বড় মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলতে লাগল। ফ্রান্সিসরা কেউ কেউ ছেলেমেয়ে দুটিকে ডেকে নিয়ে আদর করল।

কিছুক্ষণ পর মহিলাটি ঝোলাভর্তি বোধহয় আলুটালু, আনাজ নিয়ে ঢুকল। বলল—তোমাদের ভাগ্য ভাল মাছ পেয়েছি।

রান্না চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রান্না হয়ে গেল। ফ্রান্সিসরা উঠোনেই খেতে বসল। মাছ ঝোলতরকারি শাক দিয়ে ফ্রান্সিসরা মোটামুটি পেট পুরেই খেল।

ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

বিকেল হল। মহিলাটির স্বামী ফিরল। হ্যারি গৃহকর্তার কাছে গেল। বলল—আমরা বিদেশী। আপনার বাড়িতে অতিথি হয়েছি। আপনার স্ত্রী আমাদের খেতে দিয়েছেন। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। সন্ধ্যে হলেই আমরা চলে যাবো।

—রাতেও থেকে যেতে পারেন। গৃহকর্তা হেসে বলল।

—না। আমাদের তাড়া আছে। হ্যারি বলল।

শাঙ্কো কোমরবন্ধনী থেকে একটা সোনার চাকতি বের করে বলল—এটা আপনাকে নিতেই হবে।

—না-না। আপনারা অতিথি। ভদ্রলোক বললেন।

—তবু কিছু তো কেনাকাটা করতে হয়েছে। নিন। শাঙ্কো বলল।

—বেশ। দাও। গৃহকর্তা সোনার চাকতি নিল।

সন্ধ্যে হল। চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—আর দেরি নয়। ছোটো। রাজা কাদর্জার সেনাপতির রাজত্বে ছুটে আমরা দক্ষিণ দিকে চলে যাবো। সেখানে পাহাড়ি এলাকায় কোন গুহায় আশ্রয় নেব।

ফ্রান্সিসরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তারপর অন্ধকারে ছুটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা সৈন্যাবাসের কাছে এল। ফ্রান্সিসরা গলা চড়িয়ে বলল—কেউ দাঁড়িয়ে পড়বে না। সমান গতিতে ছুটবে।

সৈন্যাবাস থেকে কয়েকজন সৈন্য অলস দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসদের দৌড়ে যেতে দেখল। ফ্রান্সিসরা দৌড়ুচ্ছে কেন ওরা বুঝল না।

পাহাড়ি এলাকার কাছাকাছি এসেছে তখনই সেনাপতির একদল সৈন্যকে

দক্ষিণ দিক থেকে আসতে দেখা গেল। সৈন্যদের কয়েকজন ফ্রান্সিসদের চিনল। ওরা নিরস্ত্র। খালি হাতে ফ্রান্সিসদের ধরতে এল। খালি হাতে লড়াই লেগে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন সৈন্য আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

ফ্রান্সিসরা আর দাঁড়াল না। আবার ছুটতে শুরু করল। সৈন্যরা আর পিছু ধাওয়া করল না।

ম্লান জ্যোৎস্নায় পাহাড় জঙ্গল এলাকা দেখা গেল।

ফ্রান্সিস স্থির করেছিল পাহাড়ের কোন গুহায় ওরা আত্মগোপন করবে। দিনকয়েক অপেক্ষা করে রাজা পারকোনের খোঁজ করবে। রাজা পারকোনকে পেলে তাঁর সৈন্যদের জড়ো করবে। নিজেরাও যুদ্ধের জন্য তৈরি হবে। রাজা কাদর্জা তার সেনাপতি আভিন্দাকে এই রাজ্যের রাজা করে দিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস স্থির করল আভিন্দার সৈন্যদলকে আক্রমণ করবে। এখন ওরা নিশ্চিন্ত। এই সুযোগেই আক্রমণ করতে হবে।

ফ্রান্সিসরা ঝোপজঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাহাড়টার ঢালের দিকে চলল। ওরা অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল যে বর্তমান রাজা আভিন্দার সৈন্যদের মুখোমুখি হতে হবে না। ওরা নিশ্চিন্ত মনেই বনের মধ্য দিয়ে চলল। বনজঙ্গল শেষ হতেই ওদের থমকে দাঁড়াতে হল। সামনেই পাহাড়ের পাদদেশে রাজা আভিন্দার একদল সৈন্য বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে। এই আকস্মিক ঘটনায় নিরস্ত্র ফ্রান্সিসরা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আমাদের হাতে অস্ত্র নেই। ওদের ওপর পাথর ছোঁড়ো। ভাইকিংরা সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে রাজা আভিন্দার সৈন্যদের দিকে ছুঁড়তে লাগল। এবার আভিন্দার সৈন্যরাও ফ্রান্সিসদের দিকে পাথর ছুঁড়তে লাগল। পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি চলল। দুপক্ষেরই কয়েকজন আহত হল।

শাঙ্কো আর বিস্কো পাহাড়ের ধার থেকে একটা বড় পাথরের চাঁই ঠেলে গড়িয়ে দিল। পাথরের চাঁই গড়িয়ে আভিন্দার সৈন্যদের ওপর পড়ল। সবাই সরে যেতেও পারল না। পাথরের চাঁই-এর নিচে চাপা পড়ে কয়েকজন সৈন্য মারা গেল। কিন্তু সৈন্যরা দলে ভারি। অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্রুত ওরা ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বুঝল—এখন লড়াই করতে যাওয়া বোকামি। ওদের হাতে লড়াইয়ের অস্ত্র নেই। লড়তে গেলে মরতে হবে। ততক্ষণে সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের ঘিরে ফেলেছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আত্মসমর্পণ কর। এছাড়া বাঁচার কোন উপায় নেই।

ভাইকিংরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। সৈন্যদের দলনেতা এগিয়ে এল। বলল—রাজবাড়ির দিকে চলো। কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না।

সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের ঘিরে নিয়ে চলল। সবাই বনের মধ্যে ঢুকল। ছাড়া ছাড়া গাছের বন। বনতল ততটা অন্ধকার নয়। এখানে ওখানে ভাঙা ভাঙা রোদ দেখা যাচ্ছে। যেতে যেতে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস আবার বন্দীদশা।

—পালাবার উপায় বের করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ ভেবে। হ্যারি বলল।

সবাই চলল। যেতে যেতে দু'একজন ভাইকিং বন্ধু দেশীয় ভাষায় বলল—ফ্রান্সিস—লড়াই করে পালাতে পারতাম।

—না। পারতে না। লড়াই করতে গেলে বেশ কিছু বন্ধুর প্রাণ যেত। আমি সেটা চাই না। সময়সুযোগ বুঝে ঠিক পালাবো। এখন বন্দীদশাই মেনে নাও। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই চলল। রাস্তার লোকেরা ওদের দেখে একটু অবাকই হল। এই বিদেশীরা এখানে কেন?

সবাই পাথরের সিঁড়ি দিয়ে গর্ভগৃহে নেমে গেল। রাজসভার একপাশে ফ্রান্সিসদের দাঁড় করিয়ে রাখা হল। ফ্রান্সিস তখনও ভেবে পাচ্ছে না রাজা আভিন্দা ওদের নিয়ে কী করবে। বন্দী করে রাখবে না মুক্তি দেবে। তবে এটাও বুঝল মুক্তির সম্ভাবনা খুবই কম। ওদের কয়েদঘরেই পাঠানো হবে।

বিচারসভা শেষ। সৈন্যদের দলনেতা এগিয়ে গিয়ে রাজা আভিন্দাকে কিছু বলল। রাজা ফ্রান্সিসদের এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল।

—তোমরা রাজা পারকোনের হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছো। রাজা আভিন্দা বলল।

—হ্যাঁ। করেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? রাজা আভিন্দা বলল।

—রাজা পারকোনকে একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ রাজা বলে মনে করেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা পারকোন এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

—হ্যাঁ। শুনেছি। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করে বলল।

—তোমরা ফাঁসির মঞ্চ থেকে পালিয়েছো। আভিন্দা বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস আবার মাথা ওঠানামা করল।

—কিন্তু এবার আমার পাল্লায় পড়েছো। পালাবার সব রাস্তা বন্ধ করে দেব। আভিন্দা বলল।

—আপনি রাজা। নিশ্চয়ই তা পারেন। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আভিন্দা দলনেতার দিকে তাকাল। বলল—সব কটাকে কয়েদঘরে ঢোকাও। পরে ফাঁসিতে লটকাবো।

দলনেতা ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—চলো সব।

ফ্রান্সিসরা দলনেতার পেছনে পেছনে চলল। কয়েকজন সৈন্য বর্শা হাতে ফ্রান্সিসদের পেছনে পেছনে চলল। বোঝা গেল আভিন্দা ওদের পালাবার কোন সুযোগই দেবে না।

গর্ভগৃহের একটা ঘরের সামনে এল সবাই। ঘরটার দরজা লোহার। দরজায় তালা ঝুলছে। দুজন প্রহরী বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে। একজন চাবির গোছা কোমর থেকে খুলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তালা খুলল। দলপতি হাতের ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকতে বলল। ফ্রান্সিসরা একে একে ঘরটায় ঢুকল। ঘরে একটা মশাল জ্বলছে। মশালের অলোতে দেখা গেল ঘরটা বেশ ছোট। পাথর-কাটা দেয়াল। মেঝেয় গম গাছের শুকনো পাতা বিছানো। দুজন বন্দী শুয়ে আছে। ফ্রান্সিসদের ঢুকতে দেখে ওরা উঠে বসল। ফ্রান্সিসরা বসল। বেশ অসুবিধার মধ্যেই বসতে হল। ঘরের ঐ ছোট মেঝেয় ছড়িয়ে বসার উপায় নেই। ফ্রান্সিস দুপা গুটিয়ে শুয়ে পড়ল। ভাইকিং বন্ধুরাও কেউ কেউ হাত পা গুটিয়ে কেউ কেউ কুকুর কুণ্ডলী হয়ে শুল। হ্যারি ফ্রান্সিসের পাশেই বসে ছিল। বলল—পালানোর উপায় ভাবো।

—বন্দী হবার সময় থেকেই ভাবছি। এবার সব ভালোভাবে নজর দিতে হবে। দেখা যাক—কোন ফাঁক পাই কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

বিকেল হল। প্রহরীরা বিকেলের খাবার দিয়ে গেল। পোড়া রুটি আনাজপাতির ঝোল। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা গোগ্রাসে খেল। অনেকে আবার খাবার চাইল। প্রহরীরা কোন কথাই বলল না। চলে গেল। অগত্যা অপেক্ষা করতে হবে রাতের খাবারের জন্যে।

কয়েকদিন কাটল। শুয়ে বসে। আভিন্দা মাত্র একদিন এসেছিল। হেসে বলেছিল—রাজা কাদর্জা শুনেছেন তোমাদের বন্দী করা হয়েছে। আমাদের একসঙ্গে ফাঁসি দেবার দিন স্থির করবেন রাজা কাদর্জাই। এরকম একটা গণফাঁসি দেখবার জন্যে উনি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। মানুষের মৃত্যু দেখতে উনি খুব ভালোবাসেন। ফ্রান্সিসরা কেউ কোন কথা বলল না।

—দেখা যাক রাজা কাদর্জা কোনদিনটা স্থির করেন? আভিন্দা হেসে বলল।

—দিনটা রাজা কাদর্জার জন্মদিন হলে ভালো হয়। হ্যারি বলল।

—ব্বাঃ আভিন্দা প্রায় লাফিয়ে উঠল—ভালো বলেছো তো। এ মাসের বাইশ তারিখ রাজা কাদর্জার জন্মদিন। আজকে আঠারো তারিখ। মাত্র চারদিন পরে। ব্বাঃ। আজকেই এই কথাটা রাজা কাদর্জাকে বলার জন্যে লোক পাঠাবো। এবার ফ্রান্সিস বলল—এখানে কি অন্য কোন কয়েদঘর নেই?

—কেন বলো তো? রবার্তো বলল।

—এই ছোট ঘরটায় আমাদের গাদাগাদি করে থাকতে হচ্ছে।

আভিন্দা হা হা করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বলল—আর তো মোটে তিন রাত বেঁচে থাকবে। চারদিনের দিন তো তোমাদের জীবন শেষ। এ'কটা দিন একটু কষ্ট করে থাকো। ফ্রান্সিসরা আর কেউ কোন কথা বলল না।

আভিন্দা চলে গেল। যাবার সময় প্রহরীদের বলে গেল—কড়া পাহারায় রাখছি। একজনও যাতে পালাতে না পারে। যদি পালায় তোরা মরবি।

রাতে খাওয়া শেষ হল। হ্যারি ডাকল—ফ্রান্সিস।

—হুঁ। বলো।

—রাজা কাদর্জা নরপশু। সে গণ ফাঁসি দেখার জন্যে মুখিয়ে আছে। তার আগেই আমাদের পালাতে হবে। গভীরভাবে ভেবে উপায় বের কর। হ্যারি বলল।

—উপায় একটা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—উপায় আছে? হ্যারি সাগ্রহে বলল।

—হ্যাঁ। তবে পালানো নয়। অন্যভাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কীভাবে? হ্যারি জানতে চাইল।

—রাজা আভিন্দাকে লোভানি দিতে হবে। ধনভাণ্ডারের লোভ বড় সাংঘাতিক। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে ওকে কব্জা করতে? হ্যারি বলল।

—অবশ্যই পারবো। কাল সকালে রাজা আভিন্দার সঙ্গে কথা বলবো। দেখা যাক—ও কতটা লোভী হয়।

পরদিন সকালের খাবার খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। একজন প্রহরীকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। প্রহরী এগিয়ে এল। কিন্তু ফ্রান্সিসের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বুঝল প্রহরীরা খুব সাবধান হয়ে গেছে।

—রাজা আভিন্দাকে একবার আসতে বলো।

—কেন? প্রহরী বলল।

—সেটা রাজাকেই বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা এখন রাজসভায় বসেছেন। প্রহরী বলল।

—বিচারটিচার সেরেই যেন আসেন। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার কথায় রাজা আসবেন না। প্রহরী বলল।

—তুমি গিয়ে বলবে এই গর্ভগৃহের গুপ্ত ধনভাণ্ডার নিয়ে আমি কথা বলবো। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল।

—বেশ। বলে দেখি। প্রহরী বলল।

প্রহরী আর একজন প্রহরীকে পাহারায় রেখে চলে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে প্রহরীটি ফিরে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—রাজা আসছেন। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল—বোঝ ধনলিপ্সা কী জিনিস। রাজকার্য ছেড়ে রাজা ছুটে আসছে।

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতেই রাজা আভিন্দা এসে হাজির। হেসে বলল—গুপ্ত ধনভাণ্ডারের ব্যাপারে তোমরা কী বলতে চেয়েছো শুনলাম।

—হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছেন। এখানকার গর্ভগৃহগুলোর মধ্যে কোথাও আছে রাজা পারকোনের পিতামহের গুপ্ত ধনভাণ্ডার। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা শুনেছো তবে। রাজা আভিন্দা বলল।

—হ্যাঁ। রাজা পারকোনই বলেছেন—ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার নাম কী? আভিন্দা জানতে চাইল।

—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি পারবে সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করতে? আভিন্দা বলল।

—হ্যাঁ। পারবো। ফ্রান্সিস মাথা কাত করে বলল। এবার হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এর আগে অনেক গুপ্তধন খুঁজে বের করেছে। বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করে।

—বেশ। দেখ চেষ্টা করে। আভিন্দা বলল।

—কিন্তু আমার শর্ত আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তার মানে সেই ধনভাণ্ডার তুমি নেবে। আভিন্দা বলল।

—না। একটা স্বর্ণমুদ্রাও নেব না। ফ্রান্সিস বলল।

—তবে কী শর্ত? আভিন্দা বলল।

—আমরা দুজন কয়েদ হয়ে থাকবো। বাকি আমার সব বন্ধুদের মুক্তি দিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আগে গুপ্তধন আবিষ্কার কর। তারপর তোমাদের মুক্তির কথা ভাবা যাবে। আভিন্দা বলল।

—না। আগে বন্ধুদের মুক্তি চাই। ফ্রান্সিস বলল।

আভিন্দা মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর মাথা তুলে বলল—ঠিক আছে। আমার গুপ্তধন চাই। গুপ্তধন উদ্ধার হলে তার ভাগীদার কেউ হবে না। তুমি তো কিছুই পাবে না। আভিন্দা বলল।

—আমি কিছু চাইবোও না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। আর একটা কথা। এই গুপ্তধনের খোঁজাখুজির ব্যাপারটা রাজা কাদর্জাকেও জানানো চলবে না। আভিন্দা বলল।

—তার মানে আপনি একাই গুপ্তধনের সবটাই নেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আভিন্দা হেসে বলল—তুমি বেশ বুদ্ধিমান।

বন্ধুরাও বলে বটে। ফ্রান্সিস এতক্ষনে হেসে বলল।

—মনে হয়, তুমি পারবে। আভিন্দা বলল।

দেখি চেষ্টা করে। তবে আমার কিছু বলার আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। বলো। আভিন্দা বলল।

—আমাদের দুজনকে সবরকম স্বাধীনতা দিতে হবে। সব গর্ভগৃহ আমরা খুঁজবো। যেখানে প্রয়োজন পড়বে যাবো। কেউ আমাদের বাধা দেবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। তবে খোঁজার কাজ সন্ধ্যার আগেই এই কয়েদ ঘরে থাকতে হবে। আর এই রাজ্যের বাইরে কোথাও যেতে পারবে না। আভিন্দা বলল।

—বেশ। আমি মেনে নিলাম। ফ্রান্সিস মাথা কাত করে বলল।

এবার রাজা আভিন্দা প্রহরীদের দিকে তাকাল। বলল—কাল সকালে দুজন বাদে বাকি সবাইকে ছেড়ে দিবি। রাজা আভিন্দা চলে গেল।

রাতে খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। হ্যারি ডাকল—ফ্রান্সিস।

—হুঁ। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল।

—বন্ধুরা বলছিল তোমার আমার বন্দীত্বের বিনিময়ে ওরা মুক্তি চায় না। হ্যারি বলল।

—ওরা আবেগ তাড়িত হয়ে এসব বলছে। ঠিক আছে আমি সব বুঝিয়ে বলছি। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। ওর দেশীয় ভাষায় বলল—ভাইসব তোমরা আমাকে আর হ্যারিকে ভালোবাসো। তাই আমারা বন্দী হয়ে থাকবো এটা মেনে নিতে পারছো না। কিন্তু এখন আবেগটাবেগের কথা বলো না। শোন—তোমরা মুক্তি পেয়ে জাহাজে ফিরে যাবে না। দক্ষিনের পাহাড়ের কোন গুহায় আশ্রয় নেবে। রাজা পারকোন ঐ এলাকায় কোন গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন। সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত সৈন্যরাও নিশ্চয়ই রয়েছে। তোমরা ওখানে আশ্রয় নিয়ে রাজা পারকোনোর খোঁজ করবে। সময় লাগলেও এটা করবে। রাজা পারকোনকে পেলে তাঁর সৈন্যদের সন্ধান করে বের করবে। যত সৈন্য এভাবে জড়ো করা সম্ভব হবে। আমি সময়মত তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো। তারপর দলে ভারি হয়ে আমরা রাজা আভিন্দার নিশ্চিন্ত সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। তারপর লড়াই। রাজা আভিন্দাকে এই রাজ্য থেকে তাড়াবো। রাজা পারকোনকে সিংহাসনে বসাবো। তারপর গুপ্তধন খুঁজবো। খুঁজে পাই তো রাজা পারকোনকে সব দিয়ে আমরা জাহাজে ফিরে যাবো। এছাড়া অন্য কোন উপায়ে আমি হ্যারি মুক্তি পাবো না। এবার বলো আমার পরিকল্পনা সঠিক কিনা। ফ্রান্সিস থামল। বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। কিছু পরে শাঙ্কো উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস

তোমার পরিকল্পনা আমরা মেনে নিলাম। অন্য দু'চারজন বন্ধুও বলল—আমাদের কোন আপত্তি নেই।

—আমি তোমাদের কাছ থেকে এটাই আশা করেছিলাম। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বসে পড়ল। একটু পরেই শুয়ে পড়ল।

পরেরদিন সকালের খাবার খেয়ে ভাইকিংরা তৈরি হল। সকলেরই চিন্তা সামনে অনেক কাজ।

ঢং ঢং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। একজন প্রহরী দরজায় দাঁড়িয়ে বলল—তোমরা কোন দু'জন বন্দী থাকবে? হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল—ও আর আমি।

—বেশ। বাকিরা বেরিয়ে এসো। রাজার হুকুম মুক্তি পেয়ে তোমরা সবাই তোমাদের জাহাজে চলে যাবে। এই রাজ্যে থাকবে না। প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল।

এবার সবাই একে একে কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। গর্ভগৃহগুলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে সিঁড়ির কাছে এল। দেখল সিঁড়ির গোড়ায় মন্ত্রীমশাই দাঁড়িয়ে। মন্ত্রীমশাই ওদের দিকে তাকিয়ে বলল—সব শুনেছি। তোমাদের দুই বন্ধু কি পারবে গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে?

—চেষ্টা তো করুক। শাঙ্কো বলল।

—না পারলে কিন্তু নতুন রাজা সহজে ছেড়ে দেবে না।

—হতে পারে। তবে আমাদের দুই বন্ধুকে কয়েদঘরে রাখা অসম্ভব। শাঙ্কো বলল।

—দেখা যাক। মন্ত্রী বললেন।

সিঁড়ি দিয়ে শাঙ্কোরা ওপরে উঠে এল। চলল দক্ষিণমুখো রাজ্যের সীমান্তের দিকে। রাজা আভিন্দার সৈন্যরা দেখল সেটা। পাহাড়ি জঙ্গল বাঁদিকে রেখে শাঙ্কোরা অনেক দূরে চলে এল।

শাঙ্কো হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। গলা চড়িয়ে বলল—আর দূরে যাবো না। এবার পাহাড় জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে পাহাড়ে যাবো।

সবাই ফিরে দাঁড়াল। ফিরে চলল পাহাড়ের দিকে। নিঃশব্দে। পাহাড়টার তলায় এসে সবাই থামল। তারপর দল বেঁধে পাহাড়ে উঠতে লাগল। কিছুদূর উঠতেই একটা গুহা দেখতে পেল। গুহার মুখে এসে দাঁড়াল। শাঙ্কো আস্তে আস্তে গুহার মধ্যে ঢুকল। বাইরের আলো থেকে এসে কিছুই দেখতে পেল না। অন্ধকার চোখে সরে আসতে দেখল গুহাটা খুবই ছোটো। ও গুহা থেকে বেরিয়ে এল। বন্ধুদের কাছে এসে বলল—গুহাটা ছোট। বড় গুহা খুঁজতে হবে। চলো সব। ওপর দিকে। ওপর দিকে উঠে ওরা গুহা খুঁজতে লাগল। পেলও একটা গুহা।

শাঙ্কো গুহাটায় ঢুকতে যাবে, চারপাঁচজন যোদ্ধা খোলা বর্শা হাতে ছুটে এল। বন্ধুরা দাঁড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কো যোদ্ধাদের দেখেই বুঝল—ওরা রাজা পারকোনের যোদ্ধা। গায়ে নীল পোশাক। শাঙ্কো দ্রুত দুহাত ওপরে তুলে বলল—আমরা ভাইকিং। তোমাদের বন্ধু। রাজা পারকোনের যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা শাঙ্কোদের চিনল—ভাইকিং এরা। শাঙ্কো এগিয়ে গেল। বলল—রাজা পারকোন কোথায়?

—এই গুহাতেই আছেন। একজন যোদ্ধা বলল।

—আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে চলো। শাঙ্কো বলল।

—এসো। একজন যোদ্ধা বলল।

সবাই গুহার মধ্যে ঢুকল। অন্ধকার চোখে সরে আসতে সবাই দেখল একটা মোটা কাপড়ের ওপর রাজা পারকোন বসে আছেন। বেশ বড় গুহা। আর যোদ্ধারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে বসে আছে। একপাশে উনুন জ্বেলে রান্না হচ্ছে। শাঙ্কোর খিদে বেড়ে গেল। সেই সকালে খেয়েছে। এখন শেষ বিকেল। গুহার পাথরের গর্তে মশাল জ্বলছে।

শাঙ্কো রাজা পারকোনের কাছে গেল। রাজা পারকোন হেসে বললেন—তোমরা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো। তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

—কিন্তু মান্যবর, আপনি এখনও আপনার রাজত্ব ফিরে পান নি।

একটু চুপ করে থেকে রাজা পারকোন বললেন—সে কি আর ফিরে পাবো?

—নিশ্চয়ই পাবেন। আমরা আপনাকে আপনার রাজত্ব ফিরিয়ে দেব। শাঙ্কো বলল।

—সেটা কি পারবে? রাজা পারকোন বললেন।

—সেটা নির্ভর করছে আপনার সৈন্যদল কতটা আমাদের সাহায্য করতে পারবে তার ওপর। কারণ আমরা সংখ্যায় বেশি নই। আপনার অন্য সৈন্যরা কোথায় আছে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—এই পাহাড়ের কোন গুহায় পাহাড়ের নিচের জঙ্গলে। পারকোন বললেন।

—তাদের আমরা একত্র করবো। তারপর সময় সুযোগ বুঝে নতুন রাজা আভিন্দার সৈন্যদের আক্রমণ করবো। শাঙ্কো বলল।

—লড়াই হবে।

—নিশ্চয়ই লড়াই হবে। আমরা অবশ্যই জয়ী হবো। আপনি নিশ্চিত জানবেন। শাঙ্কো বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। রাজা বললেন।

—এবার আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করুন। সেই সকালে খেয়ে বেরিয়েছি। আমরা ক্ষুধার্ত। শাঙ্কো বলল।

—নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হবে। রাজা পারকোন গলা চড়িয়ে ডাকলেন—

—মিনাকা—। মিনাকা রান্নার জায়গাতে ছিল। রাজার কাছে এগিয়ে এল।

—এদের খেতে দাও। রাজা পারকোন বললেন।

—এদের জন্যে রান্না করা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার দেওয়া হবে। মিনাকা নিজের জায়গায় চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মিনাকা শাঙ্কোর কাছে এল। বলল—আপনারা খেতে আসুন।

শাঙ্কোরা খেতে বসল। কোন গাছের তিনকোনা পাতা পেতে দেওয়া হল। খেতে দেওয়া হল রুটি আর আনাজপাতির ঝোল। ক্ষুধার্ত শাঙ্কোরা তাই পেট পুরে খেল। তারপর শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

শাঙ্কো আর দেরি করল না। মিনাকাকে নিয়ে সন্ধ্যের মুখে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল। পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে অন্য গুহার খোঁজ করতে লাগল। মিনাকাই ওকে একটু দূরের এক গুহামুখে নিয়ে এল। বলল—এই গুহাতেও কিছু সৈন্য আশ্রয় নিয়েছে। গুহামুখে দাঁড়িয়ে মিনাকা আস্তে করে নাম ধরে ডাকল। একজন যোদ্ধা বর্শা হাতে বেরিয়ে এল। মিনাকাকে দেখে বলল—এসো। মিনাকা আর শাঙ্কো গুহাটায় ঢুকল। গুহায় মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় শাঙ্কো দেখল প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন যোদ্ধা গুহার মেঝেয় শুয়ে বসে আছে। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব আমরা ভাইকিং। আমরা স্থির করেছি নতুন রাজা আভিন্দাকে এই রাজ্য থেকে তাড়াবো। তোমাদের সঙ্গে আমরাও লড়াই করবো। রাজা পারকোনকে তাঁর রাজত্ব ফিরিয়ে দেব। সময় হলেই তোমাদের ডাকা হবে। তোমরা লড়াইয়ের জন্যে তৈরি থেকো। শাঙ্কো থামল। যোদ্ধারা কেউ কোন কথা বলল না। মিনাকা গলা চড়িয়ে বলল—বন্ধুরা—এটাই শেষ লড়াই। আমাদের জিততেই হবে।

দুজনে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। চলল পাহাড়ের পূবদিকে। এবার পেল একটা ছোট গুহা। সেখানেও দশ-পনেরোজন রাজা পারকোনের যোদ্ধাদের পেল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে তাদেরও একটা কথা বলল। বেরিয়ে এল।

বাইরে চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। সেই আলোয় খুঁজে খুঁজে মিনাকা শাঙ্কোকে আর একটা গুহার মুখে নিয়ে এল। মশালের আলোয় দেখা গেল এখানেও ত্রিশ-চল্লিশজন যোদ্ধা রয়েছে। শাঙ্কো আগের কথাগুলো বলল। যোদ্ধারা নীরবে কথাগুলো শুনল। কেউ কোন কথা বলল না।

বাইরে এসে মিনাকা বলল—আর সব গুহা রাজা রবার্তোর রাজত্বের দিকে। ঐসব গুহায় বোধহয় কেউ আশ্রয় নেয়নি। এবার চলুন নিচের জঙ্গলে। শুনেছি সেখানেও কিছু যোদ্ধা আত্মগোপন করে আছে।

দু'জনে পাহাড় থেকে নিচের বনজঙ্গলে নেমে এল। ছাড়া ছাড়া গাছের

জঙ্গল। গাছের ডালপাতার ফাঁক দিয়ে এখানে ওখানে ভাঙা জ্যোৎস্না পড়েছে। কিছুদূর যেতে ওরা দেখল তিন-চারটে গাছের জটলা। সেই জটলার মাথায় ডাল কেটে তৈরি ডালপাতার ছাউনি। সেই ছাউনির কাছাকাছি আসতে অন্ধকার থেকে একটা বর্শা ছুটে এল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বর্শাটা মিনাকার মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল। মিনাকা চাপাস্বরে বলল—আমি মিনাকা। বর্শা ছুঁড়ো না। সেই ছাউনি থেকে দুজন যোদ্ধা বর্শা হাতে বেরিয়ে এল। ভাঙা জ্যোৎস্নায় মিনাকাকে চিনল। শাঙ্কোকে দেখিয়ে বলল—এঁরা ভাইকিং। দুঃসাহসী। তোমাদের কিছু বলবেন। শোন। শাঙ্কো চাপাগলায় আগের কথাগুলো বলল। ছাউনির ভেতর থেকে আরো কিছু যোদ্ধা বেরিয়ে এল। সবাই শাঙ্কোর কথা শুনল। কিছু বলল না। শুধু একজন যোদ্ধা বলল—আমরা তৈরি থাকবো।

শাঙ্কোরা রাজা পারকোনের গুহায় ফিরে এল।

ওদিকে ফ্রান্সিস গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খোঁজে সব গর্ভগৃহেই খোঁজ করতে লাগল। তিন চারদিন ধরে খোঁজ চলল। হ্যারি সঙ্গেই থাকলো।

সেদিন হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—কিছু হদিশ করতে পারলে?

—আমরা প্রথম যে গর্ভগৃহে নেমেছিলাম সেই গর্ভগৃহটা রাজা পারকোনের পিতামহ প্রথম তৈরি করেছিলেন। ওটাতেই আছে গুপ্ত ধনভাণ্ডার। এখন ঐ গর্ভগৃহের কোথায় গোপনে রাখা আছে সেই ধনভাণ্ডার এটাই খোঁজ করতে হবে। অন্য গর্ভগৃহগুলোও খুঁটিয়ে দেখেছি। সেসব গর্ভগৃহ পরে তৈরি হয়েছে। কাজেই প্রথম গর্ভগৃহই খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

—সেটাই দেখ। হ্যারি বলল।

—হুঁ। কিন্তু এখন শুধু খোঁজার ভান করবো। সেসব দেখে রাজা আভিন্দা খুশিই হবে। আগে লড়াই। তারপর ভালোভাবে খোঁজ করবো।

পরদিনই ফ্রান্সিসরা দেখল বেশ বড় এক সৈন্যদল সৈন্যাবাস ছেড়ে রাজা কাদর্জার রাজত্বের দিকে চলেছে। তার মানে রাজা আভিন্দা এখন নিশ্চিন্ত। ধরেই নিয়েছে আর লড়াইয়ের সম্ভাবনা নেই। কাজেই বড় একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছে। ফ্রান্সিস খুশির স্বরে বলে উঠল—

—হ্যারি আমি এটাই চাইছিলাম। আভিন্দার যে সৈন্যরা রইল তারা যতটা নিশ্চিন্ত হবে ততটাই ওরা হার স্বীকার করবে। আর দেরি না। কালকে গভীর রাতে রবার্তোর সৈন্যাবাস আক্রমণ করতে হবে। দুজনে নয়। আমি কাল একা দুপুরে শাঙ্কোদের খোঁজে যাবো। খবর দেব। কালকে রাতেই আক্রমণ করা হবে। আর সময় নষ্ট করবো না।

পরদিন দুপুরে ফ্রান্সিস একজন প্রহরীকে বলল—আমি ঐ পাহাড়ের নিচের জঙ্গলে যাচ্ছি। গুপ্তধনের খোঁজ করতে।

—তোমার বন্ধু যাবে না? প্রহরী জানতে চাইল।

—না। আমি একাই যাবো। রাজা জানতে চাইলে বলবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিস পাহাড়ের দিকে চলল। কিছু পরে জঙ্গলে ঢুকল। কিছুদূর যেতে যেতে ডালপালা ছাওয়া ছাউনিটা দেখল ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বর্শা হাতে তিন চারজন যোদ্ধা ছুটে বেরিয়ে এসে ফ্রান্সিসকে ঘিরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসও সঙ্গে সঙ্গে দু হাত তুলে চাপাস্বরে বলে উঠল—আমি ভাইকিং। তোমাদের বন্ধু। যোদ্ধারা বর্শা নামাল। ফ্রান্সিস বলল—আজ গভীর রাতে নতুন রাজা আভিন্দার সৈন্য রাজা কাদর্জার রাজ্যে চলে গেছে। ওদের সৈন্য সংখ্যা কমে গেছে। এখনই লড়াইয়ের ঠিক সময়। রাজা আভিন্দা ছেড়ে যেতে বাধ্য। তোমাদের ঠিক সময়ে ডাকা হবে। তোমরা লড়াইয়ের জন্যে তৈরি থাকবে। আমি রাজা পারকোনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তোমরা নিশ্চয়ই জানো উনি কোথায় আছেন? একজন যোদ্ধা এগিয়ে এল। বলল—চলুন। রাজা পারকোনের কাছে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

তাহলে খুবই ভালো হয়। ফ্রান্সিস বলল।

যোদ্ধাটি এগিয়ে চলল। পেছনে পেছনে ফ্রান্সিসও চলল।

বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যোদ্ধাটি বলল—তাহলে আপনি কিছু সৈন্যকে চলে যেতে দেখেছেন।

—হ্যাঁ। রাজা আভিন্দার সৈন্য সংখ্যা কমে গেছে। এই সুযোগ আর আসবে না।

বনের পরে যোদ্ধাটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল। পেছনে ফ্রান্সিসও চলল।

একসময় ওরা রাজা পারকোনের গুহার সামনে এল। দু'জন যোদ্ধা বর্শা হাতে ছুটে এল। যোদ্ধাটিকে বিকেলের আলোয় দেখে বর্শা নামাল।

দু'জনে গুহার মধ্যে ঢুকল। শাঙ্কো ছুটে এল। ফ্রান্সিসের হাত ধরে রাজা পারকোনের কাছে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে রাজা আভিন্দার সৈন্যসংখ্যা কমে যাওয়া আর আক্রমণের পরিকল্পনা সবই বলল।

—সন্দেহ নেই বর্তমান অবস্থা আমাদের অনুকূলে। কিন্তু পারবে কি ওদের হারাতে? রাজা পারকোন বললেন।

অনায়সে পারবো। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনার রাজ্য আপনাকে ঠিক ফিরিয়ে দিতে পারবো। নতুন রাজা আভিন্দাকে এই রাজ্য থেকে তাড়াবো। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখো চেষ্টা করে। পারকোন বললেন।

ফ্রান্সিস এবার শাঙ্কোর দিকে তাকাল। বলল রাজার সব সৈন্যকে বলেছো এই লড়াইয়ের কথা?

—হ্যাঁ বলেছি তৈরি থাকতে। সময়মতো সবাইকে জমায়েত করবো। শাঙ্কো বলল।

—আজ গভীর রাতে আক্রমণ করবো। তুমি সবাইকে জড়ো করে রাজা আভিন্দার সৈন্যাবাসের পেছনে নিয়ে আসবে। তারপর নিদ্রিত সৈন্যদের ওরা কিছু বোঝার আগেই আক্রমণ করবো। বুঝেছো? ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তুমি কয়েদঘর থেকে বেরোবে কী করে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—আমি আর কয়েদঘরে ফিরে যাবো না। সন্ধ্যের পর থেকেই সৈন্যাবাসের পেছনের চেষ্টনাট গাছটার নিচে থাকবো। ফ্রান্সিস বলল্।

কিন্তু হ্যারি একা থাকবে। ওর কোন বিপদ হবে না তো। শাঙ্কো বলল।

—না। কারণ রাজা আভিন্দা ধরে নেবে বন্ধুকে কয়েদ রেখে পালাবো না। ঠিক ফিরে আসবো। তাছাড়া শুধু আজকের রাতটা। কাল ভোরের এই রাজ্যের ইতিহাস পাল্টে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আমরা শেষ রাতে যাবো। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস বসে ছিল। এবার উঠে দাঁড়াল। বলল—মাননীয় রাজা আমি যাচ্ছি। কাল সকালে আপনি আবার এই রাজ্যের রাজা হবেন।

ভাইকিং বন্ধুদের কাছে এল ফ্রান্সিস। বলল ভাইসব—শাঙ্কোকে সব বলে গেলাম। ও যা বলবে শুনবে। শক্ত দেহমন নিয়ে লড়াই করবে। আমাদের জয় হবেই।

—ফ্রান্সিস—তোমার জন্যে আমরা জীবন দিতে প্রস্তুত। বিস্কো বলল।

—সেটা জানি বলেই আজকে রাতের লড়াইয়ে নামতে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস গুহার বাইরে এল। মিনাকা এগিয়ে এল। বলল চলুন আপনাকে অন্য দিক দিয়ে পাহাড় থেকে নামিয়ে দিচ্ছি যাতে রাজা অভিন্দার সৈন্যদের নজরে না পড়েন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস কিছু জংলা গাছের ডাল দিয়ে আস্তে আস্তে রাজা আভিন্দার সৈন্যদের আবাসের পেছনে চেস্টনাট গাছটার নিচে পাতলা ডালপাতার আড়াল তৈরি করে মাটিতে শুয়ে পড়ল। ওখান থেকে সৈন্যবাসে সৈন্যদের চলাফেরা কথাবার্তার শব্দ পাচ্ছিল।

রাত হল। সৈন্যাবাসে ঘন্টা বাজল। রাতের খাওয়া শুরু হল। খাওয়াদাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিসদের ক্ষুধাবোধটা এবার মাথা চাড়া দিল। কিন্তু আজ রাতে কিছু খাওয়া হবে না। একেবারে নির্জলা উপোস।

সৈন্যরা যে যার ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক নিস্তব্ধ

হয়ে গেল। শুধু দূরের বন থেকে ভেসে আসছে গাছের ডালপাতায় বয়ে যাওয়া বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দ।

ফ্রান্সিস আকাশর দিকে তাকাল। উজ্জ্বল চাঁদ। চারদিকে জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। তারায় ছাওয়া আকাশ। ভাবল—কোথায় আমার মাতৃভূমি। আর কোথায় আমি ডালপাতার আড়ালে ঘাসের ওপর শুয়ে আছি। অপেক্ষা করছি এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের জন্য। যদি এই লড়াই করতে গিয়ে মরে যাই। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে এই চিন্তাটা তাড়াল।

রাত গভীর হল। ফ্রন্সিস পাশ ফিরে পাহাড়ের দিকে তাকাল। শাঙ্কোরা এখনও আসছে না।

কিছু পরেই ও ফিস্‌ ফিস্‌ ডাক শুনল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। দেখল বন্ধুরা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে বর্শা হাতে রাজা পারকোনের যোদ্ধারা। সংখ্যায় তারা কম নয়।

চাঁদের আলোয় সবই দেখা যাচ্ছিল। ফ্রন্সিস হাত বাড়িয়ে সৈন্যবাসের সামনের দিকে সবাইকে যেতে ইঙ্গিত করল। সৈন্যাবাসের বারান্দায় উঠে ফ্রান্সিস সবাইকে ভাগ ভাগ করে ঘরের দরজার সামনে দাঁড় করাল। দু'জন যোদ্ধাকে দাঁড় করালো অস্ত্রঘরের সামনে কোন প্রহরী ছিল না।

এবার ফ্রান্সিস চাপা গলায় যোদ্ধাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বলল—দরজা বন্ধ থাকলে লাথি মেরে ভাঙো। ঘরে ঢুকে আক্রমণ কর। একটু থেমে ফ্রান্সিস এবার বলে উঠল—ভাঙো একসঙ্গে।

ভাইকিংরা যোদ্ধারা একসঙ্গে দরজায় লাথি মারতে লাগল। সময়ের একটু এদিক ওদিক হতে দরজা ভেঙে যেতে লাগল । সৈন্যদের ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠবার আগেই ভাইকিংরা তরোয়াল হাতে, যোদ্ধারা বর্শাহাতে আভিন্দার সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিরস্ত্র সৈন্যরা মরতে লাগল আহত হতে লাগল। কয়েকজন সৈন্য অস্ত্রঘরের সামনে এল। দেখল—বর্শা উচিয়ে দু'জন যোদ্ধা দাঁড়িয়ে। ওরা লাফ দিয়ে প্রান্তরের ওপর নামল তারপর ছুটে পালাতে লাগল। যারা মারা গেল না তেমন আহত হল না। তারা প্রান্তরে নেমে ছুটে পালাতে লাগল। আহতদের আর্তনাদে গোঙানিতে ভরে উঠল সৈন্যাবাস। আভিন্দার সৈন্যরা সহজেই হার স্বীকার করল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আর কাউকে হত্যা করবে না। বন্দী কর। ভাইকিংরা সৈন্যাবাসের মালখানা থেকে দড়ি নিয়ে এল। আভিন্দার সৈন্যদের বন্দী করতে লাগল।

ওদিকে গর্ভগৃহের সৈন্যাবাসের সৈন্যরা এই লড়াইয়ের শব্দ চিৎকার আর্তনাদ অস্পষ্ট শুনল। এই গর্ভগৃহে বেশি সৈন্যদের রাখা যাচ্ছিল না বলে রাজা আভিন্দা ওপরে সৈন্যদের জন্য বাড়ি তৈরি করিয়েছিল। সেই সৈন্যরা হেরে গেল। এবার

গর্ভগৃহের সৈন্যাবাস থেকে সৈন্যরা বেরিয়ে এল। প্রান্তরের ওপর আসতে ফ্রান্সিস এক বন্ধুর হাত থেকে তরোয়াল নিয়ে ওদের দিকে ছুটে গেল। বাঁ হাত তুলে বলে উঠল—তোমরা অস্ত্র ত্যাগ কর। লড়াই করতে এলে কেউ বাঁচবে না। ওপরের সৈন্যাবাসের সবাই হার স্বীকার করেছে। তোমরাও আত্মসমর্পণ কর। লড়াই মৃত্যু রক্তপাত আমরা চাই না।

সৈন্যরা থমকে দাঁড়াল। দেখল ভাইকিংরা রাজা পারকোনের সৈন্যরা ওদের চেয়ে অনেক বেশি। ওদের জেতার কোন উপায় নেই। একজন সৈন্য তার বর্শা মাটিতে ফেলে দিল। একে একে সবাই বর্শা ফেলে দিল। সবাইকে বন্দী করা হল।

তখন আকাশ সাদাটে হয়ে গেছে। পূব আকাশে কমলা রং ধরেছে। সূর্য উঠতে দেরি নেই।

ওদিকে বাইরের লড়াইয়ের শব্দ রাজা আভিন্দার কানে এল। সে বিছানা ছেড়ে উঠে সৈন্যাবাসের দিকে গেল। একজন সৈন্যও নেই। তাহলে ওপরে লড়াই চলছে।

আভিন্দা ওপরে উঠে এল। তখন সূর্য উঠেছে। নিস্তেজ রোদ পড়েছে প্রান্তরে সৈন্যাবাসে। সেই আলোয় রাজা আভিন্দা দেখল তার সৈন্যরা সব বন্দী। তখনও আহতদের গোঙানি শোনা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে আভিন্দা বলল—আমার সৈন্যরা হেরে গেছে।

—হ্যাঁ। আপনার হাত বাঁধবো না। তবে আপনাকে এই মুহূর্তে যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থায় জামিনায় আপনার নরপশু রাজা কাদর্জার কাছে চলে যেতে হবে। আবার রাজা পারকোন এখানকার রাজা হবেন।

—কিন্তু গুপ্তধন? আভিন্দা বলল।

—গুপ্তধনের আশা ছাড়ুন। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে গুপ্তধন খুঁজে দেবে বলে তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছিলে? আভিন্দা বলল।

—হ্যাঁ। আপনাকে এখান থেকে তাড়াতে। তবে সেই গুপ্তধন আমি নিশ্চয়ই খুঁজে বের করবো। তবে সেটা পাবেন রাজা পারকোন। আপনি বা কাদর্জা নন।

আভিন্দা ভালো করেই বুঝল লড়াইয়ে সে হেরে গেছে। এখন এই রাজত্ব ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। বলা যায় না যেতে না চাইলে হয়তো এরা তাকে ফাঁসিও দিতে পারে।

—আমার ব্যক্তিগত সম্পদ কিছু নিয়ে যেতে পারবো না? আভিন্দা জানতে চাইল।

—না। যে পোশাক পরে যে ভাবে আছেন সেই ভাবেই এই রাজ্য আপনাকে ছেড়ে যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

আভিন্দা আর কিছু বলল না। প্রান্তরের ওপর দিয়ে উত্তরমুখো হেঁটে চলল। ফ্রান্সিস আভিন্দার বন্দী সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল—আভিন্দার সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও বিদেয় হও। আর এখানে লড়াই করতে এসো না।

বন্দী সৈন্যরা আভিন্দার পেছনে পেছনে চলল। কিছু পরে ওরা প্রান্তরের শেষে চলে গেল।

এবার ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকাল। বলল—শাঙ্কো তুমি রাজা পারকোনের গুহায় যাও। রাজাকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এসো। এখন আমার দুটো কাজ—রাজা পারকোনকে তাঁর রাজত্ব ফিরিয়ে দেওয়া আর গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার।

শাঙ্কো কিছু বলল না। চলল উত্তরমুখো পাহাড়টার দিকে।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—রাজা পারকোনের সৈন্যদের আর বন্ধুদের বলছি—যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি। ভাইকিংরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। পারকোনের সৈন্যরাও বর্শা উঁচিয়ে হৈ হৈ করে উঠল। ফ্রান্সিস বলল—এবার তোমরা বিশ্রাম করতে পারো। বন্ধুরা, সৈন্যরা চলে গেল।

ফ্রান্সিস প্রান্তরেই দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে শাঙ্কোর সঙ্গে রাজা পারকোন এলেন। প্রায় ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরলেন। বলে উঠলেন—সাবাস ফ্রান্সিস। তোমার জন্যেই আমি আমার রাজত্ব ফিরে পেলাম।

—এবার গর্ভগৃহে আপনার রাজসভাঘরে চলুন। আপনাকে আপনার সিংহাসনে বসিয়ে আমি আমার কর্তব্য শেষ করতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। চলো। রাজা পারকোন বললেন।

সম্মুখে রাজা পারকোন পেছনে ফ্রান্সিস শাঙ্কোরা এগিয়ে চলল গর্ভগৃহের দিকে। সবাই সিঁড়ি দিয়ে নামল। রাজসভাঘরে এল। রাজা পারকোন গিয়ে সিংহাসনে বসলেন। তখনই মন্ত্রীমশাই এলেন। শাঙ্কো তাঁকে ধরে ধরে মন্ত্রীর আসনে বসিয়ে দিলেন।

মন্ত্রী ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি আমাদের মহামান্য রাজাকে তাঁর রাজত্ব ফিরিয়ে দিলে। কিন্তু আর একটা কাজ যে রইল।

—গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করা। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। মন্ত্রী বললেন।

—এবার খোঁজাখুঁজি শুরু করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি যেন সফল হও। মন্ত্রী বললেন।

—মহামান্য রাজা—ফ্রান্সিস বলল—আমি সব গর্ভগৃহই খুঁজেছি। আমার দৃঢ়

বিশ্বাস এই গর্ভগৃহগুলোর কোন একটাতেই আছে গুপ্ত ধনভাণ্ডার। এবার আমার একটা প্রশ্ন—প্রত্যেক গর্ভগৃহের পাথুরে ছাদে আছে ঢালুর মত কিছু। ওগুলো কী?

ওগুলো আমাদের রাজবংশের প্রতীক চিহ্ন। তাছাড়া ওগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে বাইরের বাতাসও চলাফেরা করে। রাজা পারকোন বললেন।

—এছাড়া ওগুলোর আর কোন গুরুত্ব নেই? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না। পারকোন মাথা নাড়লেন।

—ওগুলো সবই কি পাথরের? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। পাথর কেটেই ওগুলো বানানো হয়েছে। রাজা বললেন।

—কে তৈরি করে বসিয়েছিলেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—আমার প্রপিতামহ। উনিই ওগুলো তাঁর আদেশেই তৈরি হয়েছিল এবং লাগানো হয়েছিল। রাজা বললেন।

—আপনি নিজে কি কখনও ওগুলো ওপরে উঠে কাছ থেকে দেখেছিলেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না—না। অত উঁচুতে উঠে—প্রয়োজন মনে করি নি। রাজা বললেন।

—আমি ঐ প্রতীক চিহ্নগুলো কাছ থেকে ভালো করে দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। দেখো। কথাটা বলে রাজা পারকোন সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মন্ত্রীও উঠে দাঁড়ালেন।

রাজা বললেন—আমার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।

রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এলেন। পেছনে মন্ত্রী। দুজনে সিঁড়ির দিকে চললেন। সভা ভঙ্গ হল।

ঘরে এসে ফ্রান্সিস শুকনো গম পাতার বিছানায় শুয়ে পড়ল। হ্যারি এসে পাশে বসল। বলল—কিছু সূত্রটূত্র পেলে?

—না। এখনও পাই নি। তবে গর্ভগৃহগুলো আমি মোটামুটি তন্নতন্ন করে দেখেছি। কিন্তু ধনভাণ্ডার গুপ্তভাবে রাখা যায় এমন কোন জায়গা পাই নি। বাকি আছে ঐ রাজকীয় প্রতীকচিহ্নগুলো খুঁটিয়ে দেখতে। ফ্রান্সিস বলল।

—অত উঁচুতে? কী করে দেখবে? হ্যারি বলল।

—মই বানাবো। গাছের ডাল কেটে। জোড়া দিয়ে দিয়ে মই তৈরি করবো। তারপর মইয়ে উঠে ঐগুলো দেখবো। শাঙ্কোকে বল মন্ত্রীমশাইকে বলে দুটো কুড়ুলের ব্যবস্থা কর। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো চলল কুড়ুল আনতে। মন্ত্রীর নির্দেশে দুটো কুড়ুল পেলও।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো কুড়ুল নিয়ে গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এল। চলল

পাহাড়টার নিচে জঙ্গলের দিকে। খুঁজে খুঁজে দুটো টানা লম্বা গাছ পেল। ফ্রান্সিস কুড়ুল চালিয়ে গাছটা কাটল। দুভাগ করল। খন্ড খন্ড করে ডাল কাটল সিঁড়ির জন্যে। তারপর সেগুলো বুনো শুকনো লতা দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা উঁচু মই হয়ে গেল।

মই নিয়ে ফিরে এল দুজনে। ফ্রান্সিস বলল—প্রথমে দূরের গর্ভগৃহগুলো দেখবো। চলো।

দূরের গর্ভগৃহটায় এল দুজনে। মেঝেয় এসে দাঁড়াল। গর্ভগৃহের লোকেরা বেশ অবাক হয়েই ওদের কান্ড দেখতে লাগল। মই পাতা হল। ফ্রান্সিস সিঁড়ির ধাপ বেয়ে বেয়ে পাথুরে ছাদের কাছে উঠে গেল। তারপর হাত বাড়িয়ে ঢালমত প্রতীকটা ধরল। ওটার ফোকরগুলোয় হাত রাখল। বাতাস লাগল হাতে। জোর বাতাস নয়। হালকা বাতাস। ফ্রান্সিস হতাশ হল। তাহলে হাওয়া চলাচলের জন্যেই প্রতীকগুলো গেঁথে বসানো হয়েছে।

ফ্রান্সিস মই বেয়ে নেমে এল। শাঙ্কো বলল—তাহলে হাওয়া চলাচলের জন্যেই ওগুলো গাঁথা হয়েছে।

—হ্যাঁ। তাই তো দেখলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—অন্য গর্ভগৃহগুলো দেখবে? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। একটা প্রতীক পাবোই যেটা অন্য কারণে গাঁথা হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে সব কটাই খুঁটিয়ে দেখতে হয়। শাঙ্কো বলল।

—তাই দেখবো। চলো। ফ্রান্সিস বলল।

পরের গর্ভগৃহে এল। ফ্রান্সিস মই বেয়ে উঠল। ততক্ষণে গর্ভগৃহের অধিবাসীরা মই ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস মইয়ে চড়ে কী দেখছে সেটা ওরা বুঝল। জন্মাবধি ঐ প্রতীকচিহ্ন ওরা দেখে আসছে। কারো মনেই কোনদিন ওটা নিয়ে কোন ঔৎসুক্য জাগে ওরা বুঝল না এই বিদেশীরা ওটা এভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে কেন।

এবারও ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে মৃদু বাতাস অনুভব করল। তাহলে এগুলো হাওয়া চলাচলের জন্যেই গাঁথা হয়েছে। প্রতীকচিহ্নও রাখা হল আবার ফোকর রেখে বাতাস চলাচলের পথও হল।

একে একে সব গর্ভগৃহের প্রতীকগুলোই দেখা হল। কিন্তু কোন প্রতীকচিহ্নেই নতুনত্ব কিছু নেই। একইরকমভাবে তৈরি সব। ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। তবে কি কোন গর্ভগৃহের দেওয়ালে লুকোনো কোন গর্ত আছে? তাহলে তো এবার দেওয়ালগুলো খুঁটিয়ে দেখতে হয়। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল সে কথা।

শাঙ্কো বলল—তাহলে তো সেভাবেই সন্ধান চালাতে হবে।

—তার আগে প্রথম গর্ভগৃহটা দেখতে হয়। এটাই দেখা বাকি। এই গর্ভগৃহটাই রাজা পারকোনের পিতামহ প্রথম তৈরি করেছিলেন। এখানেই রাজাদের সভাঘর। রাজা পারকোনের পূর্বপুরুষরা এই গর্ভগৃহের সিংহাসনে বসেই রাজত্ব করে গেছেন। কাজেই এই গর্ভগৃহের গুরুত্ব রয়েছে। চলো।

প্রথম গর্ভগৃহটায় নামল ওরা। সভাঘরের ওপাশেই যোদ্ধাদের থাকবার ঘর। ফ্রান্সিসরা যখন মই বসাচ্ছে তখনই দুজন তিনজন করে যোদ্ধারা মইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস সিঁড়ির মাথায় চলে এল। ভালো করে তাকিয়ে দেখল এই প্রতীকচিহ্নে কোন ফোকর নেই। এটা অন্যরকম। হাত দিয়ে ছুঁতেই হাত পিছলে গেল। পাথর নয় কাচ। কাচের তৈরি এই প্রতীক চিহ্ন। কালো রং করা। তার ভেতরটা অস্পষ্ট। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সবগুলো পাথরের। এটা কাচের কেন? ফ্রান্সিস চমকে উঠল। তাহলে কি এর ভেতরেই কি রাখা আছে গুপ্ত ধনভাণ্ডার?

ফ্রান্সিস নিচের দিকে তাকিয়ে ডাকল—শাঙ্কো?

—বলো। শাঙ্কো ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল।

—একটা পাথরের টুকরো নিয়ে এসো।

শাঙ্কো ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে পাথরের টুকরো খুঁজল। পেলও। পাথরের টুকরোটা নিল। মই ছেড়ে সরে যাওয়া চলবে না। কাজেই ও পাথরের টুকরোটা ফ্রান্সিসের দিকে ছুঁড়ে দিল। ফ্রান্সিস লুফে নিল। তারপর কাচটার ওপরের দিকে আস্তে আস্তে ঠুকতে লাগল। যোদ্ধারা অবাক হয়ে ফ্রান্সিসদের কান্ড দেখতে লাগল।

বারকয়েক আস্তে আস্তে ঠুকে একবার জোরে ঠুকল। কাচ ভেঙে ফুটো হয়ে গেল। কাচের টুকরো নিচে পড়ল। যোদ্ধারা দেখল। পাথর থেকে কাচ পড়ছে। সবাই হতবাক।

ফ্রান্সিস ভাঙা কাচের ফুটো দিয়ে তাকিয়ে আবছা দেখল হীরে পান্না বসানো নেকলেস-এর অংশ। ফ্রান্সিস এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। স্থির মইয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এখানেই মহামূল্যবান অলঙ্কার-টলঙ্কার সোনার চাকতিও থাকতে পারে। এইসব যদি নিচে পড়ে যায় তাহলে যোদ্ধারা আর সাধারণ লোকেদের মধ্যে লুঠ করার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। খুনোখুনিও লেগে যেতে পারে। এত মূল্যবান গুপ্ত ধনভাণ্ডার। লোভার্ত মানুষেরা উন্মাদ হয়ে যাবে।

ফ্রান্সিস মই বেয়ে বেয়ে আস্তে আস্তে নিচে নেমে এল। দু'তিনজন যোদ্ধা এগিয়ে এল। একজন বলল—কী ব্যাপার? ওখানে উঠেছিলে কেন?

—বাতাস চলাচলের ফোকর বুঁজে গিয়েছিল। মেরামত করে দিয়ে এলাম।

—ও। যোদ্ধাটি মুখে শব্দ করল। যোদ্ধারা সাধারণ লোকেরা একজন দু'জন করে চলে যেতে লাগল।

—পেয়েছো? শাঙ্কো ওদের দেশীয় ভাষায় চাপাস্বরে বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিসও দেশীয় ভাষায় বলল—শিগগিরি রাজার কাছে যাও। রাজা যেন এক্ষুনি তাঁর দেহরক্ষীদের নিয়ে এখানে আসেন। কোন ব্যস্ততা দেখিও না।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। ওপরে উঠেই ছুটল রাজার গর্ভগৃহের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে রাজার শয়নকক্ষের সামনে আসছে তখনই দেহরক্ষীরা ওকে আটকাল। শাঙ্কো বলল—শিগগির রাজা পারকোনকে আসতে বলো। গুপ্তধন উদ্ধার করা হয়েছে।

রাজার দেহরক্ষীরা রাজার শয়নকক্ষে ঢুকে রাজাকে সংবাদটা জানাল। শোবার পোশাক পরেই রাজা পারকোন বেশ দ্রুত শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। হেসে বললেন—গুপ্তধন পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ। আপনি কয়েকজন সশস্ত্র দেহরক্ষী নিয়ে আসুন।

—কোথায়? রাজা জানতে চাইলেন।

—আপনার সভাগৃহের গর্ভগৃহে।

রাজা প্রহরীদের আসতে ইঙ্গিত করে সিঁড়ির দিকে চললেন।

রাজার সঙ্গে সবাই সেই গর্ভগৃহে নামল। শাঙ্কো মইয়ের নিচে তখনও কিছু অত্যুৎসাহী লোক আর যোদ্ধরা দাঁড়িয়ে আছে।

রাজাকে দেখে সবাই সরে দাঁড়াল। রাজা ফ্রান্সিসকে বললেন—তুমি উদ্ধার করতে পেরেছো?

ফ্রান্সিস বলল—হ্যাঁ। তারপর ওপরের প্রতীক চিহ্নটি আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বলল—ওটা পাথরের তৈরি নয়। কাচের তৈরি। কালো রং করা। ওটা ভাঙলে মহা মূল্যবান হীরে মুক্তো সোনা ঝরে পড়বে। আপনার প্রহরীদের বলুন—সেসময় এই জায়গাটা ঘিরে রাখতে।

—বেশ। তুমি কাচ ভাঙো। রাজা বললেন। তারপর প্রহরীদের গোল করে দাঁড় করালেন।

ফ্রান্সিস সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। তারপর হাতের পাথরটা সজোরে কাচের ঢাকনাটায় ঘা মারল। কালো কাচ ভেঙে পড়ল। সঙ্গে ঝর ঝর করে পড়তে লাগল দামি দামি অলঙ্কার সোনা রূপোর চাকতি। মেঝের ঝরে পড়ল সেসব। যোদ্ধারা লোকেরা অবাক বিস্ময়ে সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডারের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস বা শাঙ্কো অবাক হল না। এরকম দৃশ্য ওরা আগেও দেখেছে।

রাজা পারকোনও বিস্ময়ে হতবাক। দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও এই গুপ্ত ধনভাণ্ডার তিনি উদ্ধার করতে পারেননি। তিনি হা হা করে হাসতে হাসতে মূল্যবান হীরের অলঙ্কার মুক্তোর মালা দুহাতে তুলে তুলে রেখে দিতে লাগলেন।

তারপর হাসি থামিয়ে দুজন দেহরক্ষীকে বললেন—তোমরা এইসব একটা কাপড়ে বেঁধে নিয়ে আমার সঙ্গে চলো। দেহরক্ষী দুজন একটা কাপড় পেতে সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার বাঁধল। সেটা তুলে নিয়ে রাজা পারকোনের পেছনে দাঁড়াল।

এবার রাজা পারকোন ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমারও তো কিছু প্রাপ্য হয়।

—না। আমরা কিছু নেব না। একটাই বিনীত নিবেদন—রাজা তুরীন যেন তাঁর প্রাপ্য পান।

—এই ধনভাণ্ডার আমার পূর্বপুরুষের। তুরীনের প্রাপ্য হয় কী করে? রাজা পারকোন বললেন।

—কিন্তু গুপ্ত ধনভাণ্ডারের কিছু অংশ রাজা তুরীনও পাবেন এই কথা বলেই আপনাদের শত্রুতা আমি মিটিয়েছিলাম।

—সে পরে দেখা যাবে। রাজা পারকোন বললেন।

—ঠিক আছে। না হয় পরেই দেখবেন। ফ্রান্সিস বলল।

উদ্ধার করা ধনভাণ্ডার নিয়ে রাজা পারকোন চলে গেলেন।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—এখন আমরা জাহাজে ফিরে যাবো। আর সময় নষ্ট করবো না।

গর্ভগৃহ থেকে সবাই বেরিয়ে এল। চলল দক্ষিণমুখো। ওদিকেই বন্দর, যেখানে ওদের জাহাজ রয়েছে।

কিছুদূর যেতেই পূব আকাশে কমলা রং ছড়িয়ে সূর্য উঠল। ফ্রান্সিসরা হাঁটতে লাগল।

জাহাজঘাটে যখন পৌঁছল তখন একটু বেলা হয়েছে। ফ্রান্সিসরা দেখল মারিয়া আর কয়েকজন ভাইকিং জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাইকিংরা জাহাজে উঠতে উঠতে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। মারিয়া হাসিমুখে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—মারিয়া এবারও আমার হাত খালি। কিছুই আনতে পারিনি।

—আমার তাতে কোন দুঃখ নেই। মারিয়া হেসেই বলল।

ফ্রান্সিস ডাকল—ফ্রেজার। ফ্রেজার এগিয়ে এল।

—এখনই জাহাজ ছাড়ো—আমাদের মাতৃভূমির দিকে। সবাই হৈ হৈ করে উঠল। তারপর যে যার কাজে লেগে গেল।

ঘর্ ঘর্ শব্দে নোঙর তোলা হল। জাহাজ চলতে শুরু করল। খুলে দেওয়া পালে জোর হাওয়া লাগল। হাওয়ার তোড়ে পালগুলো ফুলে উঠল।

পূর্ণবেগে জাহাজ সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে চলল।

———

সোনার সিংহাসন



সোনার সিংহাসন

অনিল ভৌমিক

সন্ধ্যে থেকেই বাতাস পড়ে গেছে। আকাশে গভীর কালো মেঘ জমছে অনেকক্ষণ থেকেই। ফ্রান্সিসরা ঝড়ের পূর্বাভাস ভালোই বোঝে। সন্দেহ নেই ঝড় বৃষ্টি হবে। ওরা সাবধান হল। জাহাজের পালে হাওয়া নেই। পালগুলো নেতিয়ে পড়েছে।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের কাছে এল। সঙ্গে সিনাত্রা। ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের দরজায় টোকা দিল। মারিয়া দরজা খুলে দিল ঘরে ঢুকে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস আকাশের অবস্থা ভালো নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় আসছে। কী করব? ফ্রান্সিস একটু ভাবল। বলল—একেবারেই সময় নষ্ট করা চলবে না। সবাইকে রাতের খাবার খেয়ে নিতে বলো। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ফান্সিস বলল—চলো। ডেক-এ যাবো।

—তাহলে ঝড় বৃষ্টি হবে? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হবে। সিনাত্রা বলল।

মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ফান্সিসরা সিঁড়িঘরের দিকে চলল। ডেকএ উঠল। বন্ধুরা ভিড় করে এল। ফ্রান্সিস চারিদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখল। ঝড়ের পূর্বাবস্থা। দক্ষিণ দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকানো শুরু হয়েছে। ভেজা হাওয়া ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস বলল—দুরে নিশ্চয়ই কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। বেশি দেরি করা চলবে না।

তখনই মাস্তুলের ওপর থেকে নজরদার পেড্রোর চড়াগলা শোনা গেল—ভাইসব—সাবধান—ঝড় আসছে। ফ্রান্সিস ডেক থেকে গলা চড়িয়ে বলল—দড়িদড়া ধরে ধরে পেড্রো নেমে এসো। একটু পরেই মাস্তুলের দড়িদড়া ধরে ধরে পেড্রো নেমে এল। পেড্রো পশ্চিমদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল—ঐদিকে ডাঙ্গা দেখেছি! তবে মাটি জঙ্গল আর পাহাড়ের মত কিছু।

—ফ্রান্সিস এখন কী করবে? হ্যারি জানতে চাইল। চারদিকে জড়ো হওয়া বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আমরা পাহাড়ের দিকেই জাহাজ চালাবো।

—কিন্তু পাহাড়ের ধাক্কা লেগে—হ্যারি আর কথাটা শেষ করল না।

—উপায় নেই। ঝড়ের প্রচন্ড ঝাপটা থেকে বাঁচতে ঐ পাহাড়ের আড়ালে যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। তাহলে ফ্রেজারকে বলো। হ্যারি বলল। তারপর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব সবাই রাতের খাবার খেয়ে নাও—যত তাড়াতাড়ি পারো। এবার ফ্রান্সিস জাহাজচালক ফ্রেজারের কাছে গেল। ফ্রেজার এদিক ওদিক হুইল ঘোরাচ্ছিল। ফ্রান্সিসকে দেখে বলল—ঝড় আসছে। কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না। ফ্রান্সিস পশ্চিমদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল—ঐদিকে আবছা একটা পাহাড়ি এলাকা দেখা যাচ্ছে। ঐদিকেই জাহাজ চলাও। কাছাকাছি গিয়ে দেখা যাক ওটার আড়ালে জাহাজ ভেড়ানো যায় কিনা। এছাড়া ঝড় এড়ানোর অন্য কোন উপায় নেই।

ফ্রেজার জাহাজের মুখ ঘোরাল। জাহাজ চলল আবছা-দেখা পাহাড়ী এলাকার দিকে। ফ্রান্সিস ভুরু কুঁচকে দেখল—পাহাড়গুলোর মধ্যে মাঝেরটা বেশ উঁচু। অন্যগুলো ততটা উঁচু নয়। ওখানে কাছাকাছি গিয়ে বোঝা যাবে কোথাও আড়াল পাওয়া যায় কিনা।

ওদিকে বন্ধুরা সব তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেতে শুরু করল। ফ্রান্সিসও মারিয়া আর হ্যারিকে নিয়ে খাবার ঘরে চলল। শাঙ্কো ততক্ষণে খেয়ে নিয়েছে। ও এসে হুইল ধরল। ফ্রেজার খেতে গেল। জাহাজ দুলতে দুলতে চলল পাহাড়ী এলাকার দিকে।

ততক্ষণে মাথার ওপর আকাশে বিদ্যুৎ চমকানো শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে ঘন ঘন বাজ পড়ার গুরুগম্ভীর শব্দ।

সবারই রাতের খাবার খাওয়া হয়ে গেল। সবাই ছুটোছুটি করে দ্রুত সব পাল নামিয়ে ফেলল। মাস্তুলের পালের কাঠামোর হালের দড়িদড়া টেনে ধরতে ধরতেই প্রচন্ড ঝড় জাহাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাহাজটা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল। বেশ কয়েকজন ভাইকিং ছিটকে ডেক-এর উপর পড়ে গেলো। অবশ্য পরেক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে জাহাজের দড়িদড়া টেনে ধরল। তখনই শুরু হল বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। তারপরই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। চারদিক যেন একটা সাদাটে আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেল। ঝড়বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়তে লাগল। জাহাজ একবার ঢেউয়ের মাথায় ওঠে পরক্ষণেই ঢেউয়ের কাটলে আছড়ে পড়ে।

জাহাজের এই দুলুনির মধ্যে মাস্তুলের দড়িদড়া ধরে ফ্রান্সিস ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে দুহাত দড়িদড়া থেকে ছিটকে সরে যাচ্ছে। বেশ কষ্টে ফ্রান্সিস সেই ধাক্কা সামলাচ্ছে আর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উঁচু পাহাড়টার দিকে।

কিছু পরে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা কমল। তখনই ফ্রান্সিস আব্‌ছা অন্ধকারের মধ্যে দেখল পাহাড়টায় একটা বড় বেশ উঁচু গুহামত। ফ্রান্সিস আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠল—ও—হো হো। ঝড়ের শব্দের মধ্যেও সেই ধ্বনি কয়েকজন ভাইকিংএর কানে গেল। ওরাও চিৎকার করে ধ্বনি তুলল—ও—হো হো। এবার সবাই সেই ধ্বনি শুনল। সবাই মিলে ধ্বনি তুলল—ও হো হো।

ফ্রান্সিস জাহাজের মধ্যে টলতে টলতে ফ্রেজারের কাছে এল। চিৎকার করে বলল—ফ্রেজার—ঐদিকে দেখ। একটা বড় গুহা। দেখ ভালো করে। ফ্রেজারও তীক্ষ্মদৃষ্টিতে তাকাল। গুহাটা আবছা দেখতে পেল। তখন বৃষ্টি আরো কমেছে।

এবার গুহাটা অনেক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—দেখেছো?

—হ্যাঁ। দেখছি। ফ্রেজারও চিৎকার করে বলল।

—ঐ গুহার মধ্যে জাহাজটা ঢুকিয়ে দাও। সাবধান গুহার মুখে যেন ধাক্কা না লাগে। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল। এবার ফ্রেজার দুলতে থাকা জাহাজটা চালিয়ে গুহার মুখের কাছে নিয়ে এল। দৃঢ়হাতে হুইলটা ঘোরাতে লাগল। দোল খেতে খেতে জাহাজটা গুহার মুখের কাছে এল। তারপর সাবধানে অন্ধকার গুহাটায় জাহাজ ঢুকিয়ে দিল। বোঝা গেল পাহাড়টা বেশ বড়। কিছুটা এগোতেই আর ঝড়ের ঝাপটা নেই। বৃষ্টি নেই। ভাইকিংরা ধ্বনি তুলল ও—হো—হো।

এখন জাহাজটা নিরাপদ। জলের ওপর গুহার এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো গা। জাহাজটা অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেল। শান্ত পরিবেশে ঝড়ের অস্পষ্ট শব্দ শোনা যেতে লাগল। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত সিক্ত ভাইকিংরা জাহাজের ডেক-এ এখানে ওখানে শুয়ে পড়ল। বসে পড়ল। সবাই মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে।

জাহাজটা আরো ভেতরে ঢুকল। অন্ধকার গাঢ় হল। ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে দাঁড়িয়েছিল। এবার বলল—ফ্রেজার-জাহাজ থামাও। ঝড়বৃষ্টি থামলে জাহাজ গুহা থেকে বের করবে। ফ্রেজার জাহাজ থামাল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস দেখল—কিছুদূর কয়েকটা মশাল জ্বলে উঠল। বেশ চমকে উঠল ফ্রান্সিস। তার মানে এখানে মানুষের বসতি আছে। ততক্ষণ আরো কয়েকটা মশাল জ্বলে উঠল। ফ্রেজার বিস্ময়ের সঙ্গে বলল—ফ্রান্সিস—অবাক কান্ড।

—হ্যাঁ! এখানে মানুষ থাকে। জানি না তারা কেমন মানুষ। ফ্রান্সিস বলল। ওদিকে ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ওরাও মশালের আলো দেখেছে।

এবার মশালের আলোয় সবাই দেখতে পেল কিছুদূরে একটা এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো পাথরের বেদী মত। তার ওপর একটা পাথরের আসনমত। তাতে কে

একজন বসে আছে। বেদীটার চারপাশে মশাল জ্বলছে। প্রায় পনেরো কুড়িজন কালো মানুষ বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রেজার মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস—এরা কারা?

—কালো মানুষ। পাথরের আসনে যে বসে আছে সে নিশ্চয়ই এদের রাজা। ফ্রান্সিস আস্তে বলল।

—এখানে কী করবে? ফ্রেজার জানতে চাইল।

—দেখি—এদের মতলব কী? ফ্রান্সিস বলল।

হঠাৎ মশালের অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল একদল কালো মানুষ বর্শা দাঁতে কামড়ে ধরে সাঁতরে ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে আসছে। সবাই দেখল সেটা। শাঙ্কো ছুটে ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস কী করবে? আরো কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু ছুটে এল। বলল—ফ্রান্সিস—লড়াই। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর মাথা তুলে বলল—না। আত্মসমর্পণ। বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত। শরীরের এই অবস্থায় লড়াই করতে গেলে আমরা হেরে যাব। বেশ কিছু বন্ধু মারাও যাবে। তার চেয়ে দেখা যাক ওরা আমাদের নিয়ে কী করে। লড়াই না করলে ওরা নিশ্চয়ই আমাদের কোন ক্ষতি করবে না। শুধু বন্দীই করবে। দেখা যাক আমাদের কোথায় কীভাবে বন্দী করে। তারপর সময় সুযোগ বুঝে পালাবো। এখন লড়াই নয়।

ওদিকে হালের দড়ি বেয়ে কালো মানুষেরা ডেকএ উঠে আসতে লাগল। ওদের জলে-ভেজা কালো কালো শরীরে মশালের আলো পড়ে চকচক করছে। এতক্ষণ বর্শা দাঁতে চেপে ধরে ওরা সাঁতরে এসেছে। এখন হাতে বর্শা উঠিয়ে ওরা দ্রুত ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। একজন বেঁটেমত যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। বোঝা গেল সেই দলনেতা। গলা উঁচু করে ভাঙা ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বলল—নেতা —কে? ফ্রান্সিস এগিয়ে এল।

বলল-আমি।

—বন্দী—তোমরা। দলপতি বলল।

—কেন? আমরা তো কোন অপরাধ করিনি। ফ্রান্সিস পোর্তুগীজ ভাষায় বলল।

—লড়াই চাও? দলনেতা বলল।

—না। সুবিচার চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা নিকুম্বা-চল। দলনেতা বলল।

—রাজা নিকুম্বা কোথায়? ফ্রান্সিস জানাতে চাইল।

দলপতি আঙ্গুল তুলে পাথরের বড় বেদীমত জায়গাটা দেখাল। বলল—সিংহাসন। তাহলে পাথরের সিংহাসনে যে বড় বড় গোঁফ দাড়িওয়ালা লোকটি বসে আছে সেই রাজা নিকুম্বা।

—এখান থেকে সাঁতরে আমরা যাব না। জাহাজ ওখানে নিয়ে যাব। তারপর কাঠের পাটাতন পেতে ঐ বেদীতে উঠবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আচ্ছা বেশ —চল। দলপতি বলল।

—জাহাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দাঁড় বাইতে হবে। ফ্রেজার বলল।

—না—তোমরা—আমরা। দল নেতা কয়েজনকে কী বলল। কয়েকজন দাঁড় ধরে নেমে গেল। তখনও কয়েকজন ভাইকিং ক্লান্তিতে ভেজা ডেকে-এর ওপরই শুয়ে বসে ছিল।

একটু পরেই জাহাজ আস্তে আস্তে চলল। সেই এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো পাথরের বড় বেদীমত জায়গাটায় জাহাজ এসে লাগল। দলনেতা ভাইকিংদের উঠে যেতে ইঙ্গিত করল। ওদিকে কিছু কালো যোদ্ধা সিঁড়ি বেয়ে নেমে কেবিনঘর খাবার ঘরে নেমে গিয়েছিল। ওরা মারিয়াসহ রাঁধুনিদেরও ধরে নিয়ে এল।

মারিয়া ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—কী করবো?

—আমাদের আর কিছুই করার নেই। এদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—বন্দীত্ব মেনে নেবে? মারিয়া বলল?

—উপায় নেই। এখন লড়াইয়ে নামালে আমরা কেউ বাঁচবো না। নির্ঘাৎ মৃত্যু। এখন এদের কথা মতই চলতে হবে। বাধা দিয়ে লাভ নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু এরা তো যে কোন সময় আমাদের মেরে ফেলতে পারে। মারিয়া বলল।

—সেই ঝুঁকি নিতেই হবে। আগে এদের রাজার সঙ্গে কথা বলি। তখনই বুঝতে পারবো এরা আমাদের নিয়ে কী করতে চায়। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি এদের বিশ্বাস করি না। মারিয়া বেশ জোর দিয়ে বলল।

—এখন আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। এখন আমরা বন্দী। ভবিতব্য মেনে নিতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ওদিকে দলপতির নির্দেশে ভাইকিংরা সার বেঁধে পাটাতন দিয়ে পাথরের বেদীমতন জায়গাটায় উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে নিয়ে সেই সারিতে দাঁড়াল।

কালো যোদ্ধাদের পাহারায় সবাই সেই বেদীমত জায়গাটায় উঠে এল। ক্লান্ত ভাইকিংরা কেউ কেউ বসে পড়ল।

এবার মশালের আলোয় রাজা নিকুম্বাকে অনেক স্পষ্ট দেখা গেল। রাজা নিকুম্বা পাথরের আসনে বসে আছে। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে আছে। মাথা ভর্তি কাঁচাপাকা বড় বড় চুল। কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ। দাড়ি বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। কুঁৎকুতে চোখের দৃষ্টি কুটিল।

দলপতি রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটু মাথা নুইয়ে সন্মান জানিয়ে এক নাগাড়ে কী বলে গেল।

রাজা দু-একবার মাথা ওঠা-নামা করে কী বলল। দলপতি ফ্রান্সিসের কাছে এল। রাজার দিকে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস বুঝল রাজাকে সন্মান না জানালে বিপদ হতে পারে। ও রাজার সামনে এসে মাথা একটু নুইয়ে সন্মান জানাল।

রাজা নিকুম্বা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে একটু হেসে ভাঙা ভাঙা পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—কে—তোমরা?

—আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন—এখানে? রাজা জানতে চাইল।

—আমরা দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াই। গোপন ধন ভান্ডার উদ্ধার করি। ফ্রান্সিস বলল।

—নিয়ে পালাও। রাজা নিকুম্বা বলল।

—না। সেই গুপ্ত ভান্ডারে যার অধিকার তাকে দিয়েদি। ফ্রান্সিস বলল

—বদলে—নাও—না। রাজা নিকুম্বা বলল।

—না। একটা তামার মুদ্রাও নিই না। ফ্রান্সিস বলল।

রাজার সঙ্গে ফ্রান্সিসের কথা হচ্ছে তখনই রানি এল। পরনে রাজার মতই ঢোলা হাতা হলুদ রঙের ময়লা পোশাক। যেমন কালো তেমনি মোটা। মাথায় ঝাঁকড়া লম্বা চুল। রাজার পাথরের আসনের পাশেই একটা ছোট পাথরের আসনে বসল। এসে অব্দি রানী হেসেই চলেছে। কালো মুখে সাদা দাঁতের হাসি। মারিয়াকে দেখে রানির হাসি বেড়ে গেল। রাজাকে ফিস্‌ফিস্ করে কী বলল। রাজা মারিয়াকে দেখিয়ে ফ্রান্সিসকে বলল—

—কে?

—আমাদের দেশের রাজকুমারী মারিয়া। ফ্রান্সিস বলল। রাজা রানীকে কী বলল। রানীর হাসি বেড়ে গেল। অবাক চোখে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। মারিয়ার গা জ্বলে গেল। কিন্তু কিছুই বলার নেই। এখন রাজা রানির দয়ার ওপর ওদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

এবার রাজা একই গম্ভীরস্বরে বলল—জলদস্যু—তোমরা। ফ্রান্সিস একটু

চমকাল। পরক্ষণেই বলে উঠল—এই অপবাদ আমাদের অনেকেই দিয়েছে। কিন্তু আমরা জলদস্যু নই। আমরা কখনও কারো কাছ থেকে একটা স্বর্নমুদ্রাও জোর করে নিই নি। যে যেমন দিয়েছে নিয়েছি আমাদের খাদ্য পোশাকের জন্য।

—উঁহু। জাহাজ দেখা হবে—খুঁজে। দামি কিছু—। রাজা বলল। হ্যারি নিম্নস্বরে বলল—দামি কিছ্ছু নেই। ফ্রান্সিস কথাটা শুনল। বলে উঠল—জাহাজ তল্লাশী করতে পারেন। দামী কিছুই পাবেন না।

—দেখি। রাজা নিকুম্বা বলল। তারপর দলনেতার দিকে তাকিয়ে কী বলল। দলপতি কয়েকজন যোদ্ধাকে কী বলল। জনা ছয় সাতেক যোদ্ধা পাতা পাটাতনের দিকে গেল। পাঁটাতন দিয়ে হেঁটে জাহাজে উঠল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে কেবিনঘরগুলোর তল্লাশী চালাতে লাগল। মারিয়া নিশ্চিন্ত ছিল সোনার চাকতিগুলো ওরা খুঁজে পাবে না। তবে ওর নিজের পোশাক ভাইকিংবন্ধুদের পোশাক ওরা চুরি করতে পারে। এর আগেও এরকম হয়েছে। ও ওদের জাহাজের দিকে তাকিয়ে রইল কখন ঐ যোদ্ধারা ফিরে আসে।

প্রায় আধঘন্টা পরে জাহাজে তল্লাশী সেরে যোদ্ধারা দলপতির সঙ্গে ফিরে এল। মারিয়ার একটা নতুন পোশাক ভাইকিংদের কিছু নতুন পোশাক কয়েকটা তরোয়াল এসব নিয়ে যোদ্ধারা ফিরে এল। দলপতি রাজার কাছে গিয়ে কোমরের ফোট্টিতে গুঁজে রাখা মারিয়ার গলার সোনার নেকলেসটা রাজাকে দিল। রাজা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে হেসে হারটা নিল। রানি হাসতে হাসতে রাজার হাত থেকে হারটা প্রায় কেড়ে নিয়ে হাতে জড়াল। রানি জানে না যে হারটা গলায় পরতে হয়। ফ্রান্সিস বুঝল এখন রাজারানির মন রেখে চলতে হবে। তাই মৃদুস্বরে বলল—মারিয়া—হারটা রানির গলায় পরিয়ে দিয়ে এসো। মারিয়া শুনল কথাটা মৃদুস্বরে বলল—হতচ্ছাড়ি রানি।

—যাও। ফ্রান্সিস গলায় জোর দিয়ে বলল। মারিয়া আর আপত্তি করল না। আস্তে আস্তে রানির কাছে গেল। রানির হাত থেকে হারটা খুলে নিল। রানির ঝাকড়া চুল সরিয়ে গলায় পরিয়ে দিল। এবার রানি খুব খুশি। খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল। এবার রাজা নিকুম্বা দলপতিকে কী বলল। রানি দু'হাত তুলে চিৎকার করে কী বলে উঠল। রাজা একটু চুপ করে থেকে দলপতিকে কী একটা আদেশ করল। দলপতি একবার মাথা ঝুঁকিয়ে নিয়ে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। ওর পেছনে পেছনে আসতে ইঙ্গিত করে ডানদিকের গুহামুখ দিয়ে ভেতরে চলল। ফ্রান্সিসরাও দলপতির পেছনে পেছনে চলল। এই গুহায় রাজার প্রজাদের ঘরসংসার। সব নারীপুরুষ শিশুর দল। এখানেই রান্না খাওয়া দাওয়া শোয়া। সে সব সংসারের পাশ দিয়ে ফ্রান্সিসরা চলল। গুহার শেষে এলো

ওরা। সারা গুহাটাতেই এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। তারই আলোয় ফ্রান্সিস দেখল একেবারে গুহার শেষে ডানদিকে একটা বিরাট গর্তমত। উত্তপ্ত বাষ্প বেরুচ্ছে গর্তটা থেকে। ফ্রান্সিস মুখ নিচু করে দেখল—গর্তের নিচে জল ফুটছে। বোঝাই যাচ্ছে কী প্রচন্ড উত্তপ্ত সেই জল। দলপতি ফ্রান্সিসের কাছে এল। মৃদুস্বরে বলল—রাজা—এই কুণ্ডে—তোমাদের শাস্তি—রানি বাঁচাল। ফ্রান্সিস বুঝল রাজা ওদের এই উষ্ণকুন্ডে ছুঁড়ে ফেলতে আদেশ দিয়েছিল। রানি আপত্তি করেছিল। তাই ওরা বেঁচে গেল। ফান্সিস মৃদুস্বরে হ্যারিকে বলল সেই কথা। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—অবধারিত প্রচন্ড যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যু থেকে বেঁচে গেলাম। রাজকুমারীর হার পেয়ে রানি খুশি হয়েছিল।

দলপতি বাঁদিকে ঘুরল। কিছু দূর থেকেই দেখা গেল লোহার গরাদ। হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকা যায় এরকম একটা দরজা। দরজার মাথায় মশাল জ্বলছে। দরজায় একটা বড় তালা ঝুলছে। দু'জন বর্শাধারী যোদ্ধা দরজায় পাহারা দিচ্ছে।

দলপতি সবাইকে ঘরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। এবার ফ্রান্সিস দলপতির সামনে গেল। মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। এই কয়েদ ঘরে থাকতে পারবেন না।

—নিরুপায়—রাজা নিকুম্বার হুকুম। দলপতি বলল।

—তাহলে রাজার কাছে নিয়ে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা নিকুম্বা—বিশ্রাম।

ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকাল। বলল—রাজার সঙ্গে তো এখন কথা হবে না। আজকের রাতটা কষ্ট করে থাকো।

—তোমরা কষ্ট করে থাকলে আমিও থাকবো। মারিয়া বলল।

—না না। কাল রাজার সঙ্গে কথা বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিস আর মারিয়া হামাগুড়ি দিয়ে কয়েদ ঘরে ঢুকল। মশালের আলোয় দেখল বন্ধুরা বেশ চাপাচাপি করে বসেছে। বাসযোগ্য ঘর তো নয়। গুহারই একটা অংশ। ওরই মধ্যে ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে গুহার এবড়ো খেবড়ো পাথুরে দেয়ালে গা ঠেকিয়ে বসল। হ্যারি এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস—এতো অন্ধকূপ। রাজকুমারী এখানে থাকতে পারবেন?

—রাজা নিকুম্বা এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। কালকে সকালে রাজার সঙ্গে কথা বলবো। যে করে হোক মারিয়াকে আমাদের জাহাজে রাখতে হবে। খাবার টাবারও ওরাই দিয়ে আসবে। আজ রাতে আর কিছুই ব্যবস্থা করা যাবে না। বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। এই বন্দী দশা কিছু বন্ধু মেনে নিতে পারছিল না। সিনাত্রা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—লড়াই করে জাহাজ নিয়ে পালালে হত।

ঐ গাদাগাদির মধ্যে বেশ কয়েকজন বন্ধু কোনরকমে আধশোয়া হয়ে পড়েছিল। ফ্রান্সিস ওদের দেখিয়ে বলল—ঐ দেখ কী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে ওরা। উঠে বসে থাকার সাধ্যটুকুও নেই। শরীরের এই অবস্থা নিয়ে লড়তে গেলে অনেক বন্ধুর মৃত্যু হত। আমি সেটা চাইনি।

—কিন্তু এখানে এভাবে বন্দী জীবন কাটাতে গিয়েও তো অনেকে মারা যেতে পারে। সিনাত্রা বলল।

—তার আগেই পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে? সিনাত্রা বলল।

—পারতেই হবে। তখন সুস্থ সবল শরীর নিয়ে লড়াই করতে হবে। এখন সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা। বন্ধুদের বোঝাও সেটা। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি...বোঝাতে পারি কিনা। সিনাত্রা উঠে বন্ধুদের কাছে চলে গেল।

রাত বাড়ল। ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন থেমে গেছে। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত শরীর নিয়ে লড়াই করা সত্যিই সম্ভব ছিল না। এখন ভরসা ফ্রান্সিস। যদি পালানোর উপায় ভেবে দেখতে হয় সে ক্ষেত্রে ফ্রান্সিসই একমাত্র পারবে।

একসময় লোহার গরাদে শব্দ তুলে দরজা খুলে গেল। প্রহরী দু'জন খাবার নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল। পাথর কুঁদে থালা মত তৈরি করা হয়েছে। পাঁচটা করে রুটি ঐ থালায় খেতে দেওয়া হল। মাছের টুকরো বোধহয় ভাজাই হয় নি। আঁশটে গন্ধ। প্রায় কেউই কোনরকমে খেল। ফ্রান্সিস তখনও খায়নি। ও রান্নার অবস্থা বুঝতে পারল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—খেতে ভালো না লাগলে নাক টিপে খাও। পেটপুরে খাও। শরীরটা তেজি রাখো। কম খেয়ে শরীর দূর্বল হলে পালাবার শক্তি থাকবে না। বন্ধুরা ফ্রান্সিসের কথা শুনল। কেউ আঁশটে গন্ধ সত্ত্বেও খাবার ফেলল না। পেট পুরেই খেলো সবাই। থালা কম। কাজেই দফায় দফায় খেতে হল।

সবার খাওয়া হলে প্রহরীরা এঁটো থালা নিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজায় তালা লাগিয়ে বর্শা হাতে পাহারা দিতে লাগল।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—কী করবে ফ্রান্সিস?

—সব দেখিটেখি। উপায় একটা হবেই। ফ্রান্সিস বলল।

—পাহারাদার তো মোটে দু'জন। খাবার দিতে তো ঐ দু'জনই আসে। ঐ দুটোকে কবজা করে পালানো যায় না? শাঙ্কো বলল।

—এখন নয়। এখন শুধু বিশ্রাম। দিন কয়েক চুপচাপ থাকো। পাহারাদাররা পাহারায় একটু ঢিলে দিক। ফ্রান্সিস বলল।—ভেবে দেখো তাহলে। এই কথা বলে শাঙ্কো নিজের জায়গায় চলে গেল।

একে শরীরের ক্লান্তি। তারপর এইভাবে গাদাগাদি করে থাকা, গুহায় অসহ্য

গরম। প্রায় সবাই ভালো করে ঘুমতে পারল না। হ্যারির কষ্ট হল সবচেয়ে বেশি। একে ও শরীরের দিক থেকে বরাবরই দুর্বল। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—হ্যারি খুব কষ্ট হচ্ছে? হ্যারি ম্লান হাসল। বলল—তা একটু হচ্ছে।

—উপায় নেই। সহ্য কর। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার ভয় কি জানো? হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া—এই রোগ তো আমার আছে। হ্যারি আস্তে আস্তে বলল। ফ্রান্সিস বেশ চমকাল। হ্যারির কাঁধে হাত রেখে বলল—আমার উরুর উপর মাথা রাখো।

—না-না। হ্যারি মাথা নাড়ল। ফ্রান্সিস শুনল না। হ্যারির মাথাটা ধরে নিজের উরুর ওপর শুইয়ে দিল। মারিয়া দেখল সেটা। একটু এগিয়ে হ্যারির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটু পরেই হ্যারি ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—মারিয়া তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। হ্যারিকে আমি দেখছি। মারিয়া আপত্তি করল না। সরে এসে গুহার এবড়ো খেবড়ো পাথরের মেঝেয় মাথা রেখে আধশোয়া হল। ফ্রান্সিস বসে থেকেই ঘুমিয়ে পড়ল। ওর এভাবে ঘুমোবার অভ্যেস আছে।

ভোর হল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। একজন দু'জন করে বন্ধুরা ঘুম থেকে উঠতে লাগল। ওদের অস্বস্তি দেখেই ফ্রান্সিস বুঝতে পারল অনেকেরই ভালো ঘুম হয়নি। ততক্ষণে মারিয়ারও ঘুম ভেঙে গেছে। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকাল। বলল—ঘুম হয়েছে?

—ঘন্টা দুয়েক ঘুমিয়েছি। মারিয়া বলল।

—সে কি! সারারাত ঘুম হয়নি? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—ঐ সব মিলিয়ে ঘন্টা দুয়েক। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস আর কিছুই বলল। হ্যারিরও তখনই ঘুম ভাঙল। তাড়াতাড়ি ফ্রান্সিসের উরু থেকে মাথা তুলে হেসে বলল—আমার জন্যে তোমার বোধহয় ঘুম হয় নি।

—আমি গাছের গুড়ির মতো ঘুমিয়েছি। তোমার ঘুম হয়েছে তো? ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। হ্যারি মাথা কাত করল।

গুহার মধ্যেই কোনার দিকে একটা পাথরের চৌবাচ্চা মত। তাতে জল রাখা। সবাই হাত মুখ ধুল।

কিছু পরে প্রহরীরা সকালের খাবার দিয়ে গেল। সেই দফায় দফায় পাথরের থালায়। পোড়া রুটি আর সবজির ঝোল। সবজির ঝোলের স্বাদটা ভালই। সবাই পেটপুরেই খেল।

ফ্রান্সিস প্রহরীটিকে বলল—তোমাদের দলনেতা কোথায়? প্রহরীটি কিছুই বুঝল না। এবার হ্যারি আকার ইঙ্গিতে দলনেতার কথা বোঝাল। এবার প্রহরীটি বুঝল। মৃদুস্বরে কী বলল। তারপর মাথা ওঠানামা করল। বোঝা গেল দলপতি আসবে।

এখানে তো অন্ধকারের রাজত্ব। রোদ নেই যে ফ্রান্সিসরা কত বেলা হল বুঝবে। তবে বেশ কিছুক্ষণ পরে দলপতি এল। ফ্রান্সিস গরাদের কাছে এগিয়ে গেল। গরাদে গাল চেপে বলল—রাজামশাই সভায় এসেছেন?

—না—পরে। দলপতি বলল।

—এলে আমাকে বলবেন—রাজার সঙ্গে একটু কথা আছে। ফ্রান্সিস বলল। দলপতি মাথা ওঠা নামা করল। তারপর বলল—সকালে—খাবার—।

—হ্যাঁ খেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। দলপতি মৃদু হাসল।

দলপতি প্রহরীদের কী বলল। তারপর চলে গেল। ফ্রান্সিস ওর ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে দলপতি ফিরে এল। একজন প্রহরীকে কী বলল। প্রহরী সেই গুহার ঘরের দরজা খুলে দিল। হামাগুড়ি দিয়ে ফ্রান্সিস মারিয়াকে নিয়ে বেরিয়ে এল। দলপতির পেছনে পেছনে চলল। গুহাপথে কালো মানুষদের পাতা সংসার। সে সবের পাশ দিয়ে চলল তিনজনে।

সেই বেদীমত উচুঁ জায়গায় পৌঁছাল দুজনে। ফ্রান্সিস দেখল রাজা নিকুম্বা পাথরের আসনে বসে আছে। বোধহয় বিচার চলছে। পাথরের ছোট আসনে রানি বসে আছে। গলায় মারিয়ার গলার হার। রানি আপন মনে হাসছে। হারটায় হাত বুলোচ্ছে। বোঝা গেল হার পেয়ে রানি খুব খুশি হয়েছে।

কয়েকজন কালো মানুষ রাজার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন একনাগাড়ে কী বলে যাচ্ছে। রাজা শুনছে। মাঝে মাঝে ভুরু কোঁচকাচ্ছে। লোকটির বলা শেষ হল। রাজা চিৎকার করে কী বলে উঠল। দুজন যোদ্ধা বর্শা হাতে ছুটে এসে দু'জন কালো মানুষকে ধরল। টেনে নিয়ে চলল ফ্রান্সিসরা যে কয়েদঘরে আছে সেইদিকে। রানিও হাসতে হাসতে ওদের পেছনে পেছনে চলল। ফ্রান্সিস বুঝল—ওদের মৃত্যুদন্ড হয়েছে। নিশ্চয়ই ঐ উষ্ণকুন্ডে এদের ছুঁড়ে ফেলা হবে। সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখতেই বোধহয় রানিও যাচ্ছে। ওদের মৃত্যু যন্ত্রণা রানি তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করবে। ফ্রান্সিস দু'চোখ বুঁজে একবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে ওরা বেঁচে গেছে।

এবার এক বৃদ্ধকে ধরে একজন যোদ্ধা রাজার সামনে নিয়ে এল। বৃদ্ধটি মাথা নিচু করে একনাগাড়ে কী বলে গেল। রাজা ডান হাত তুলে ইঙ্গিত করল।

একজন যোদ্ধা এগিয়ে এসে বৃদ্ধকে সরিয়ে নিয়ে এল। বৃদ্ধটি হাসতে হাসতে বার বার মাথা নিচু করে চলে এল।

বোধহয় বিচার পর্ব শেষ হল। দলপতি রাজাকে কাছে গিয়ে কিছু বলল। রাজা ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া এগিয়ে গেল। একটু মাথা নিচু করে ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। কয়েদঘরের কষ্টকর জীবন ইনি সহ্য করতে পারবেন না।

—বন্দী—থাকতে—হবে। রাজা বলল।

—যদি রাজকুমারীকে আমাদের জাহাজে বন্দী করে রাখেন তাহলে আমরা বাধিত হব। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা? রাজা নিকুম্বা বলল।

—আমরা কয়েদঘরেই থাকবো। রাজকুমারীকে বন্দী রেখে আমরা পালাতে পারব না।

এই সময় রানি ফিরে এল। আগের মতই হাসতে হাসতে। এসে রাজার পাশে ছোট পাথরের আসনে বসল। রাজা রানিকে কিছু বলল। বোধহয় ফ্রান্সিসের আবেদনের কথাই বলল। রানি খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল। তারপর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে কী বলে উঠল। ফ্রান্সিস মারিয়া কিছুই বুঝল না। এবার রাজা বলল—বেশ—পাহারা —থাকবে। ফ্রান্সিস হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

—তোমরা এত কষ্টের মধ্যে থাকবে আর আমি—মারিয়া বলল।

—ওসব ভাবনা ছাড়ো। এছাড়া কোন উপায় নেই। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল।

রাজা কী বলে উঠল। দু'জন যোদ্ধা বর্শা হাতে এগিয়ে এল। দলপতি মারিয়াকে বলল—জাহাজ—যাও।

দুজন যোদ্ধার পেছনে পেছনে মারিয়া পাটাতনের উপর দিয়ে হেঁটে নিজেদের জাহাজের ডেক এ নামল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে কেবিনঘরে নেমে এল।

এবার ফ্রান্সিস রাজার দিকে তাকাল। বলল—আমাদের বন্দী রেখে আপনার কী লাভ। আমাদের জাহাজ তল্লাশি করেও মূল্যবান কিছু পাননি। এবার আমাদের মুক্তি দিন। রাজা ঝাঁকড়া চুলো মাথা নেড়ে বলল— না। দলপতিকে বলল— কয়েদঘর। দলপতি ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। উপায় নেই। বন্দীদশাই মেনে নিতে হবে।

দলপতির সঙ্গে ফ্রান্সিস কয়েদঘরে ফিরে এল। হ্যারি জিজ্ঞেস করল—রাজা রাজি হল?

—হ্যাঁ। মারিয়া জাহাজেই থাকবে। কিন্তু আমাদের মুক্তি দেবে না। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি কিছু বলল না। উপায় নেই। বন্দীদশা মেনে নিতেই হবে।

গুহাঘরে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে ফ্রান্সিসদের দিনরাত কাটতে লাগল। প্রায় অখাদ্য খাবার পানীয় জলের টানাটানি অসহ্য গরম—এসবের মধ্যে দিয়েই ফ্রান্সিসদের বন্দীজীবন কাটতে লাগল।

দু'জন বন্ধু বিশেষ করে শরীরের দিক থেকে দুর্বল হ্যারি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ল। হ্যারির চিকিৎসার প্রয়োজন। প্রচন্ড জ্বরে হ্যারি প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে গেল। ওদের এক বন্দি পোশাকের প্রান্ত ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে হ্যারির কপালে চেপে চেপে দিতে লাগল। অন্য দুই বন্ধু চুপ করে শরীরের অসুস্থতা সহ্য করতে লাগল।

ফ্রান্সিস গরাদের দিকে ছুটে গেল। হাতছানি দিয়ে প্রহরীকে ডাকল। প্রহরী কাছে এল আকার ইঙ্গিতে দলপতিকে ডাকতে বলল। প্রহরীটি বুঝল সেটা। ও চলে গেল। ফ্রান্সিস গরাদের কাছে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছু পরে দলপতি এল। ফ্রান্সিস গরাদে মুখ চেপে বলল—আমাদের তিন বন্ধু খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একজন বৈদ্য ডেকে দাও।

—খুব অসুখ? দলপতি বলল।

—হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা দরকার। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি। দলপতি বলল। তারপর চলে গেল।

ফ্রান্সিস হ্যারির পাশে এসে বসল। অপেক্ষা করতে লাগল যদি কোন বৈদিটৈদ্যি আসে।

রাত হল। খাওয়ার সময় হল তখনও বৈদি এল না। প্রহরীরা দফায় দফায় ওদের খাবার দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস মনের এই উদ্বেগ নিয়েও পেট পুরে খেল। শরীর ঠিক রাখতে হবে।

একটু রাতে দলপতি এল। তার পেছনে একজন রোগা লিকলিকে কালো মানুষ। কোঁকড়ানো মাথার চুল দাড়ি গোঁফ। কাঁধে একটা মোটা কাপড়ের ঝোলা ঝোলানো। বোধহয় কাপড়টা জাহাজের পাল থেকে কাটা।

বৈদ্যি হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল। পাথুরে মেঝেয় ঝোলাটা রাখাল। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে হ্যারিকে দেখাল। বৈদ্যি হ্যারির কপালে হাত দিয়ে দেখল। হ্যারির গলায় হাত দিয়ে দেখল। দুচোখের পাতা টেনে দেখল। ফ্রান্সিস দুই অসুস্থ বন্ধুকেও দেখাল। বৈদ্যি তাদেরও দেখল। এবার ঝোলা থেকে দুটো চিনে মাটির বোয়াম বার করল। দুটো বোয়াম থেকে কাদার মত কালো দুটো জিনিস বাঁ হাতের তালুতে ঢালল তারপর দুটো হাতের তালু ঘষতে লাগল। কিছু পরে দেখা গেল

কাদার মত জিনিসগুলো শক্ত হয়ে গেছে। বৈদ্যি তাই থেকে বেশ কয়েকটা বড়ি বানাল। বড়িগুলো তিন ভাগ করল। ছটা করে ভাগ ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে দিল। প্রথমে একটা আঙ্গুল দেখাল। তার মানে একবার। তারপর তিনটে আঙ্গুল দেখাল। তার মানে তিনবার করে। এবার একটু হেসে হাতের তালু দেখাল। বোধহয় অভয় দিল। তারপর বোয়াম ঝোলায় পুরে চলে গেল হামাগুড়ি দিয়ে। ফ্রান্সিস একটু আশ্বস্ত হল। হয় তো এই ওষুধেই কাজ হবে।

দিন দুয়েকের মধ্যে অসুস্থ দুই বন্ধুর সুস্থ হল। হ্যারিও অনেকটা সুস্থ হল। বৈদ্যি অবশ্য দু'দিন ধরেই ওষুধ দিয়ে গেছে। কিন্তু হ্যারিকে নিয়ে ফ্রান্সিসের দুশ্চিন্তা গেল না। হ্যারি যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে? গভীরভাবে ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল কী করে এই কয়েদঘর থেকে পালানো যায়। এখানে দিনের পর দিন থাকলে কারো বাঁচার আশা নেই। এর মধ্যে ঘটল এক কান্ড। সেই রাতে দু'জন প্রহরী খাবার দিতে এসেছিল। সবারই খাওয়া হয়ে গেছে তখন। হঠাৎ সিনাত্রা পাগলের মতো এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে এক প্রহরীর চিবুকে প্রচন্ড জোরে ঘুঁষি মারল। প্রহরীটি ছিটকে দরজার উপরে পড়ল। সিনাত্রা দরজার দিকে দ্রুত গেল। কিন্তু পায়ের কাছে পড়ে থাকা প্রহরীটিকে ডিঙ্গোতে পারল না। অন্য প্রহরীটি ততক্ষণ দরজার কাছে এসে গিয়েছে। সে পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা বর্শাটা তুলে নিল। বর্শার মুখ তাক করে ধরল সিনাত্রার দিকে। সিনাত্রা আর দরজা দিয়ে বেরোতে পারল না।

ঘুঁষিতে আহত প্রহরীটিকে নিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে প্রহরীটি চলে গেল।

কিছু পরে তিন-চার জন যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে দলনেতা ফিরে এল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাদের একজন আমাদের এক প্রহরীকে আহত করেছে। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। বলবার কিছু নেই। সিনাত্রা পাগলের মত যা কান্ড করলে এতে যে ওদের বিপদ বাড়ল সেটা বুঝল ও। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে ফ্রান্সিস এবার বলল—যা হবার হয়েছে। প্রহরীকে মারা উচিত হয়নি। অনুরোধ—রাজা নিকুম্বাকে কিছু বলো না।

—রাজা জানলে—উষ্ণকুন্ডে—মরণ। দলনেতা বলল।

—সেটা জানি বলেই বলছি রাজা যেন কিছু না জানে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ—এবারের মতো—। দলপতি বলল। চারজন যোদ্ধাকে পাহারায় রেখে দলপতি চলে গেল।

ফ্রান্সিস সিনাত্রাকে কাছে ডাকল। সিনাত্রা কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছো। বোকার মত। এখনও হ্যারি বন্ধুরাও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। এর মধ্যে এই কান্ড করে পাহারাদারদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে। দু'জন প্রহরী থাকলে তবু পালনো সম্ভব ছিল। এখন সেটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

তোমার জন্যে। সিনাত্রা ঘাড় গোঁজ করে বসে ছিল। বলল—এখানে থাকলে এমনিতেই মরবো।

—না। তার আগেই পালাবো। তখন তোমার সাহস আক্রমনের ক্ষমতা এসব দেখিও। পরিকল্পনা করে কাজ করতে হয়। ভুলে যেও না রাজকুমারী জাহাজে বন্দী হয়ে আছে। তাকে নিয়ে পালাতে হবে। কাজটা সহজসাধ্য নয়। সব পরিকল্পনা বানচাল করে দিলে। তোমার জন্য বিপদ বাড়ল। রাজা যদি এই ব্যাপারটা জানতে পারে আমাদের পালাবার সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে। উষ্ণকুন্ডে ছুঁড়ে ফেলবে আমাদের। তুমি একা পালাতে গিয়ে সবাইকে ভীষণ বিপদে ফেললে। এখন আমাদের জীবন সংশয়। বেঁচে থাকব কিনা জানি না। তবে তোমাকে বলি এরকম অবিবেচকের মত কাজ করে না। যাও—নিজের জায়গায় যাও। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসদের ভাগ্য ভাল দলপতি রাজা নিকুম্বাকে কিছু বলল না। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল ফ্রান্সিসরা। এবার এই অন্ধকূপ থেকে পালাবার উপায় ভাবতে হবে। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। একটাই চিন্তা কী করে বন্ধুদের নিয়ে মারিয়াকে নিয়ে পালানো যায়। তবে লড়াই করে নয়। বুদ্ধি করে সবাইকে নিরাপদে নিয়ে কী করে এই দুঃসহ জীবন থেকে বাঁচা যায়।

প্রায় এক মাস কাটল। হ্যারি আর দুই বন্ধু এখন অনেক সুস্থ। কয়েদঘরে পাহারাদারদের সংখ্যা দুজন কমানো হয়েছে। পাহারার কড়াকড়িটা কমেছে। ফ্রান্সিস পালাবার ছক ভাবছে গভীরভাবে। হ্যারি শাঙ্কোর সঙ্গে কথাও বলছে। কিন্তু বিনা বাধায় পালানো সম্ভব মনে হচ্ছে না।

এবার ফ্রান্সিস ভাবল ওদের মুক্তির ব্যাপারে রাজার সঙ্গে কথা বলবে। সকালের খাবার খাওয়া হলে ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। একজন প্রহরীকে ইশারায় ডাকল। ইঙ্গিতে দলনেতাকে ডেকে দিতে বলল। প্রহরীটি চলে গেল।

কিছু পরে দলপতি এল। বলল—কেন?

—রাজা নিকুম্বার সঙ্গে কথা বলবো। তুমি ব্যবস্থা করে দাও।

—রাজসভায় চল। দলপতি মাথা নেড়ে বলল। কয়েদঘরের দরজা খোলা হল। ফ্রান্সিস হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। দলপতির পিছনে পিছনে চলল রাজসভার দিকে। কালো মানুষদের ঘর সংসারের পাশ দিয়ে হেঁটে রাজসভায় এল দুজনে।

তখন রাজসভায় একটা বিচার চলছিল। বিচার শেষ হলে দলপতি রাজার সামনে গেল। মাথা একটু নুইয়ে বোধহয় ফ্রান্সিসের কথা বলল। আজকে পাশের আসনে রানি নেই। ফ্রান্সিস একটু হতাশই হল। রানির জন্যই ওরা বেঁচে

গিয়েছিল। রানি থাকলে হয়তো ওদের স্বপক্ষে কিছু বলতো। এখন তো রাজা নিকুম্বা একা। রাজাকে বোঝানো মুশকিল হবে। তবু চেষ্টা করে দেখা যাক মুক্তি মেলে কিনা।

রাজা ততক্ষণে ফ্রান্সিসকে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করেছে। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল।

—বল। রাজা বলল।

—আমরা তো কোনভাবেই আপনাদের বা আপনার এই রাজত্বের কোন ক্ষতি করিনি। তবে আমাদের বন্দী করে রেখেছেন কেন? ফ্রান্সিস বলল—জলদস্যু—আসবে—বিক্রি—। রাজা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে হেসে হাতের আঙ্গুল গোল করে ঘুরিয়ে বলল—সোনা। ফ্রান্সিস বুঝল—ওদের জলদস্যুদের কাছে বিক্রি করা হবে। বদলে রাজা সোনার চাকতি পাবে। ফ্রান্সিসের মন দমে গেল। তবু হাল ছাড়ল না। বলল—আমরা নিরীহ। আপনাদের কোন অপকার করি নি। তবে আমাদের ক্রীতদাসের হাটে বিক্রির জন্যে জলদস্যুদের হাতে তুলে দেবেন কেন?—সোনা—চাই। রাজা এবার একটু জোরেই হেসে উঠল। ফ্রান্সিসের মন নিরাশায় ভরে উঠল। বুঝল—কোন যুক্তিতর্কে লাভ হবে না। রাজা তার সিদ্ধান্তে অটল। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

রাজা পাথরের সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বিচারসভা শেষ। এবার ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল রাজার কোমরে একটা চামড়ার কোমর বন্ধনী। তাতে গোল গোল সোনা বসানো। তাহলে একটা গুহার রাজা হলেও রাজা সোনার মূল্য বোঝে। রাজা গুহার সামনের দিকে চলে গেল।

ফ্রান্সিস কয়েদঘরে ফিরে এল। হ্যারি এগিয়ে এল। বলল—কথা হল?

—হ্যাঁ। আমাদের মুক্তি নেই। রাজা জলদস্যুদের কাছে আমাদের বিক্রি করবে বলে বন্দী করে রেখেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি? হ্যারি বেশ আশ্চর্য হল। বলল—রাণী কিছু বলল?

—রানি ছিল না। আমি বোঝবার চেষ্টা করলাম। লাভ হল না। রাজা স্থির প্রতিজ্ঞ। আমাদের ক্রীতদাসের জীবন মেনে নিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

বন্ধুরা সব কথা শুনল। শাঙ্কো এগিয়ে এল, বলল—ফ্রান্সিস—এখন আমরা আর ক্লান্ত নই। আমরা লড়াই করে পালাতে পারবো।

—না। সেই অসম লড়াইয়ে অনেকের প্রাণ যাবে। এটা আমি মেনে নেব না। ক্রীতদাসের জীবন মেনে নিলে তবু তো আমরা বেঁচে থাকবো। একবার তো ক্রীতদাসের জীবন থেকে পালিয়েছি। সময় সুযোগ বুঝে আবার পালাবো। কিন্তু অসম লড়াইয়ে নামলে অনেকেই মারা যাবো। অপেক্ষা কর। দেখা যাক ঘটনা কোনদিকে গড়ায়? ফ্রান্সিস বলল।

সেদিন দুপুরে। সবার খাওয়া হয়ে গেছে। প্রায় অখাদ্য খাবার। তবু ভাইকিংরা পেট পুরে খায়। ফ্রান্সিস বলে—শরীর ঠিক্ রাখো। পেটপুরে খাও।

ভাইকিংরা কেউ কেউ আধশোয়া হয়ে আছে। বেশিরভাগ বসে আছে। এইটুকু গুহাঘর। শোওয়া প্রায় অসম্ভব। হঠাৎ প্রচন্ড দুলুনি। সেইসঙ্গে গুর্‌গুর্ শব্দ।

দুচারজন ভাইকিং উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। দুলুনিতে ছিটকে পড়ল। সমস্ত পাহাড়াটাই দুলে উঠল। কয়েদঘরের বাঁ পাশের পাথুরে দেয়াল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। নিচেই সমুদ্রের জল। ঢেউয়ের মাথায় রোদ ঝল্‌সাচ্ছে। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—ভাইসব ভূমিকম্প। সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ো। ওদিকে গুহাঘরের ভিতর থেকে স্ত্রী পুরুষ শিশুর আর্ত চিৎকার কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। মশাল নিভে গেছে।

ফ্রান্সিসের নির্দেশে বন্ধুরা সবাই বাইরের সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাইরে দুপুরের রোদ। সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস জল থেকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে বলল—গুহা মুখের দিকে সাঁতরে চলো। আমাদের জাহাজ উদ্ধার করতে হবে।

সবাই গুহা মুখের দিকে সাঁতারে চলল। তখনই দেখা গেল ডানদিকে পাহাড়ের একটা অংশ ভেঙে পড়ল। গুর্ গুর্ শব্দ কমল। সমুদ্রের জলে ঢেউয়ের মাতামাতি। তার মধ্যে দিয়েই ফ্রান্সিসরা সাঁতরে চলল।

গুহামুখের কাছে এল সবাই। একে একে গুহার মধ্যে ঢুকল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারদিক। সব মশাল নিভে গেছে। ততক্ষণে গুর্ গুর্ শব্দ থেমে গেছে।

শাঙ্কোই সবার আগে সাঁতরে যাচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারটা ওর চোখে সয়ে গেল। অস্পষ্ট দেখল রাজার সিংহাসন বসানো পাথরের বেদীটা ভেঙে দুভাগ হয়ে গেছে। কালো মানুষদের চিৎকারে আর্তস্বর তখনো শোনা যাচ্ছে।

শাঙ্কো এবার স্পষ্ট দেখল ওদের জাহাজের গা। ও সাঁতারে গিয়ে জাহাজের ঝোলানো দড়ি ধরে হাঁপাতে লাগল। ততক্ষণে ফ্রান্সিসরাও এসে গেছে। আবছা অন্ধকারে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে ফ্রান্সিস দড়ি ধরে হাঁপাতে লাগল। ও খুঁজছিল হ্যারিকে। একটু গলা চড়িয়ে ডাকল—হ্যারি? একটু দূর থেকে হ্যারি বলল—যাচ্ছি। একটু পরেই হ্যারি এসে দড়ি ধরল। মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল।

একটু বিশ্রাম নিয়েই শাঙ্কো দড়ি বেয়ে জাহাজের অন্ধকার ডেকএ উঠে এল। অস্পষ্ট দেখল—দু'জন প্রহরী মাস্তুল আঁকড়ে ধরে আছে। হাতে বর্শা

নেই। শাঙ্কো এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। দেখল একপাশে দুটো বর্শা পড়ে আছে। আসলে জাহাজের দুলনির জন্যে প্রহরী দু'জন টাল সামলাতে মাস্তুল জড়িয়ে ধরে আছে। এরকম দুলনি শাঙ্কোদের কাছে সমস্যাই নয়। ও দুলুনির মধ্যে ছুটে গিয়ে বর্শা দুটো তুলে নিল। প্রহরী দুজন এবার নিজেদের নিরস্ত্র অবস্থাটা বুঝল। কোন কথা বলল না।

শাঙ্কো সিঁড়িঘরে এল। সিঁড়ি বেয়ে নিচে ফ্রান্সিস মারিয়ার কেবিন ঘরে এল। দরজা বন্ধ । শাঙ্কো দরজায় টোকা দিয়ে ডাকল—রাজকুমারী—রাজকুমারী। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। ঘরে একটা মোমবাতি জ্বলছিল। সেই আলোয় শাঙ্কো দেখল মারিয়ার মাথার চুল উস্কো খুস্কো। ভয়ার্ত মুখ। রাজকুমারী শুধু বলল—ফ্রান্সিস?

—কিছু ভাববেন না। আমরা সবাই মুক্ত আর সুস্থ।

—ভূমিকম্প। ভয়ার্তস্বরে মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। এখন থেমে গেছে। শাঙ্কো বলল।

এরমধ্যে ফ্রান্সিসরা জাহাজে উঠে পড়েছে। ফ্রান্সিস ডেকএ দাঁড়িয়ে বলল—একদল দাঁড় ঘরে চলে যাও। জাহাজ উল্টো দিকে গুহার বাইরে নিয়ে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। একদল ভাইকিং চলে গেল দাঁড় বাইতে।

জাহাজ চালক ফ্রেজার ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। বলল—

—ফ্রান্সিস সর্বনাশ হয়েছে।

—কী হয়েছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হালের ওপর পাথরের চাঁই ভেঙে পড়েছে। হাল ভেঙে গেছে।

—ঠিক আছে। তুমি যেভাবে পারো গুহা থেকে জাহাজটা বের কর। ফ্রান্সিস দ্রুত বলল।

—দেখি। ফ্রেজার চলে গেল।

ওদিকে দাঁড় বাইতে থাকায় জাহাজটা একটু নড়ল। তারপর গুহার মুখের দিকে চলল। শাঙ্কো মারিয়াকে নিয়ে ডেকও উঠল। মারিয়ার মুখ দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল মারিয়া ভীষন ভীত হয়ে পড়েছে। মারিয়ার ডান হাতটা ধীরে ধীরে ফ্রান্সিস একটু চাপ দিল। মারিয়ার ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করল। বলল—কোন ভয় নেই। আমরা সবাই নিরাপদ। এক্ষুনি জাহাজ বাইরের সমুদ্রে বেরিয়ে আসবে। তুমি বরং কেবিনঘরে যাও। বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নাও।

—না। আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকব। মারিয়া বলল।

—বেশ। ভূমিকম্প আমাদের উপকারই করেছে। কয়েদঘর ভেঙে পড়েছে। তাই আমরা নিরাপদে পালাতে পেরেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—জাহাজের ওপর পাথর ভেঙে পড়েছে।

—হ্যাঁ হাল ভেঙে গেছে। ওটা আমরা সরিয়ে নেব। জাহাজের আর কোন ক্ষতি হয়নি। ফ্রান্সিস বলল।

জাহাজটা আস্তে আস্তে গুহা মুখ থেকে বেরিয়ে এসে উন্মুক্ত সমুদ্রে পড়ল।

তখন বিকেল হয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস ফ্রেজারকে সঙ্গে নিয়ে হালের কাছে এল। সত্যিই হাল প্রায় ভেঙে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে পাথরের চাঁইটা বেশ বড়ই ছিল। হাল ভেঙে চাঁইটা গুহার জলে পড়ে গেছে।

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাল মেরামত করতে হবে। নইলে হাওয়ার ধাক্কায় জাহাজ যেদিকে খুশি যাবে। হুইলই ঘোরানো যাবে না। ফ্রেজার বলল।

—হ্যাঁ—দেখছি। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল—কী বলছো?

—কয়েকজনকে নিয়ে কাঠ যন্ত্রপাতি বের কর। নইলে হাওয়ার ধাক্কায় কোন দিক ঠিক রাখতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল। তারপর ছুটল বন্ধুদের জোগাড় করতে।

ওদিকে নজরদার পেড্রো কয়েকজনকে নিয়ে পাল টাঙাবার জন্যে পালবাঁধার কাঠামোয় উঠতে লাগল। ফ্রেজার ছুটে গিয়ে বলল—পেড্রো—এখন পাল টাঙিওনা। তাহলে জাহাজ এদিক ওদিক ছুটবে। সব দিকটিক গুলিয়ে যাবে। আগে হাল ঠিক হোক। তারপর পাল টাঙাবে। পাল ছাড়াও জাহাজ এদিক ওদিক ছুটল। ফ্রেজার অসহায় চোখে তাকিয়ে দেখল। হাল মেরামত না হলে কিছুই করার নেই।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মারিয়া এসময় প্রতিদিন সূর্যাস্ত দেখে। আজও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু মনে দুশ্চিন্তা। বেহাল জাহাজ কোনদিকে চলছে যা মেরিই জানে। সূর্য অস্ত গেল। সন্ধে নামল। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক।

ওদিকে সিনাত্রা রাজা নিকুম্বার দুই প্রহরীকে ওদের কেবিন ঘরে বন্দী করে রেখে ছিল। দু'জনেরই হাত বাঁধা। এবার সিনাত্রা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—রাজা নিকুম্বার দুই প্রহরীকে বন্দী করে রেখেছি। কী করবে ওদের নিয়ে?

—এখন তো আমরা কোথায় এসেছি কিছুই বুঝতে পারছি না। কোন বন্দর টন্দর পাই। সেখানে ওদের দুজনকে নামিয়ে দেব। ওদের বন্দী করে রেখে কী লাভ। ফ্রান্সিস বলল।

রাতে শাঙ্কো কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে হাল মেরামতির কাজ করতে লাগল। মশালের আলোয় কাজ চলল। বড় বড় কাঠের তক্তা এনে কেটে ঘষে হাল

সারাই হয়। কাজ চলল সারারাত। ফ্রান্সিসের নির্দেশ- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাল সারাই করতে হবে।

ভোর হল। তখনও শাঙ্কোরা কাজ করে চলেছে। সমুদ্রের উত্তাল হাওয়ায় জাহাজ এদিক ওদিক ছুটছে।

শাঙ্কোরা প্রায় দিন সাতেক রাতদিন খেটে জাহাজের হালটা মেরামত করল। ফ্রেজার হুইল চেপে ধরল। ফ্রান্সিস কাছেই ছিল। বলল—মোটামুটি উত্তরদিকটা ঠিক রেখে জাহাজ চালাও। ফ্রেজার সেভাবেই জাহাজ চালাতে লাগল।

জাহাজ চলল। দিন যায় রাত যায় ডাঙার দেখা নেই।

ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। তবে কি দিক্ হারালাম। ও ফ্রেজারের কাছে যায়। জিজ্ঞেস করে—ফ্রেজার আমরা কি দিক হারলাম?

—কতকটা তাই। ডাঙা না পেলে এভাবেই জাহাজ চালাতে হবে।

—উত্তরদিকটা ঠিক রেখে চালাও। ডাঙা পেতেই হবে। ঘাবড়ে যেও না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রেজার মাথা কাত করল। জাহাজ চলল।

সেদিন বিকেলে মাস্তুলের ওপর থেকে পেড্রো চিৎকার করে বলল—ডাঙা দেখা যাচ্ছে ডাঙা। ভাইকিংরা ভিড় করে এসে রেলিং ধরে দাঁড়াল। সিনাত্রা চেঁচিয়ে বলল—কোন দিকে?

—ডান দিকে। পেড্রো চেঁচিয়ে বলল।

একটু পরেই ডানদিকে একটা সবুজ পাহাড় দেখা গেল। তারপর গাছগাছালি। ফ্রেজার ডাঙার দিকে জাহাজ ঘোরাল।

সমুদ্রের তীরভূমি দেখা গেল। মানুষজন দেখা গেল না। হ্যারি ছুটে ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের দরজায় এসে টোকা দিল।

—এসো। ফ্রান্সিস বলল।

দরজা খুলে গেল। মারিয়া দাঁড়িয়ে।

—আমি সূর্যাস্ত দেখতে যাচ্ছি। মারিয়া চলে গেল।

—ফ্রান্সিস—ডানদিকে ডাঙা দেখা গেছে। সমুদ্রতীর নির্জন। একটা ঘাসে ঢাকা সবুজ পাহাড় দেখা গেছে। হ্যারি বলল।

—চলো—ডেকএ যাই। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে ডেকএ উঠে এল। সূর্য ডোবার আগে সমুদ্রতীর মোটামুটি দেখা গেল। টানা বালিয়াড়ি চলে গেছে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত। গাছগাছালি নেই তারপর একটানা চলে গেছে শুকনো গাছের সারি। দূর থেকে বোঝা গেল না কী গাছ ওগুলো।

সূর্য অস্ত গেল।

অন্ধকার নামল

—কী করবে? হ্যারি বলল।

—এই রাতে নামা চলবে না। বিদেশ বিভুঁই। বিপদে পড়বো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ফ্রেজারকে গিয়ে বলল—জাহাজটা কাছাকাছি নিয়ে চলো।

—তীরে জাহাজ ভেড়ানো যাবে না। জল অগভীর। ফ্রেজার বলল। তারপর জাহাজ থামাল। শাঙ্কোরা জাহাজের পালগুলো গুটিয়ে ফেলল। জাহাজ অনড় দাঁড়িয়ে রইল।

—কাল সকালে খাবার খেয়ে নামব। আজকে জাহাজ এখানেই থাকুক। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। হ্যারি বলল।

রাতের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস আর মারিয়া নিজেদের কেবিনঘরে এল।

—কী করবে ঠিক করলে? মারিয়া জানতে চাইল।

—বেশ কিছুদিন পর ডাঙার দেখা পেলাম। কাল সকালে নামব। খোঁজখবর করব। ফ্রান্সিস বলল।

—অচেনা জায়গা! যদি বিপদ হয়? মারিয়া বলল।

—উপায় নেই। সেই ঝুঁকিটা নিতেই হবে। নাহলে কোথায় এলাম জানব কী করে? ফ্রান্সিস বলল।

সকালে খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস সমুদ্রতীরে নামবার জন্যে তৈরী হল। সঙ্গে শাঙ্কো আর সিনাত্রাকে নিল। হ্যারি যেতে চাইল। কিন্তু ফ্রান্সিস রাজি হল না। বলল—তুমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নও। কী রকম অবস্থায় গিয়ে পড়ব কে জানে। তারপর বলল—রাজা নিকুম্ভার দুই প্রহরী রয়েছে জাহাজে। ওদের আসতে বলো। এখানেই ওদের নামিয়ে ' দেব।

হ্যারি গিয়ে প্রহরী দু'জনকে ডেকে আনল। ওরা পাহাড় জঙ্গল দেখে নামতে সাহস পেল না। একজন বলল—এখানে নামব না। কোন বড় বন্দরে আমাদের নামিয়ে দিও। এখানে কোন বাড়ি ঘরদোর আছে কিনা কে জানে। শেষে কোন বিপদে না পড়ি। এই প্রহরীটি মোটামুটি পোর্তুগীজ ভাষা বলতে পারে।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল—কোন বন্দরেই তোমাদের নামিয়ে দেব।

একটা নৌকা জলে নামানো হল। ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে দড়ির মধ্যে পা রেখে নৌকায় নেমে এল। ফ্রান্সিস নৌকোয় রাখা বৈঠা তুলে নিল। নৌকো ছেড়ে দিল। ফ্রান্সিস নৌকো বাইতে লাগল। আস্তে আস্তে নৌকো গিয়ে তীরভূমিতে লাগল।

ফ্রান্সিসরা একে একে নেমে এল। নৌকোটা মাটিতে কিছুদূর টেনে এনে রাখল যাতে জোয়ার এলে নৌকোটা ভেসে না যায়।

বালিয়াড়ি ভেঙে চলল সবাই। কিছুদূর গিয়ে দেখল কাছেই কিছু পাথরের ঘর বাড়ি। ডানদিকে বুনো গমের ক্ষেত প্রায় সবুজ পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। পাশে তামাক পাতার ক্ষেত।

বাড়িগুলোর দিকে যেতে যেতে দেখল বাড়িগুলো ঘিরে কালো কালো লম্বা লম্বা নিস্পত্র কাঁটাগাছের সারি। জাহাজ থেকে ফ্রান্সিস এই গাছগুলো দেখেছিল। ফ্রান্সিস ভেবে পেল না কী করে এই কাঁটা গাছের বেড়ার মধ্যে দিয়ে ঢুকবে।

বেড়াটার পাশে পাশে ওরা চলল। এক জায়গায় এসে দেখল প্রবেশদ্বার মত। ঐ কাঁটাগাছের কাঁটা ছেটে ফেলে লাঠির মত ব্যবহার করা হয়েছে।

ফ্রান্সিস ঘরগুলোর দিকে তাকাল। কিন্তু জনপ্রাণী দেখল না। ও একটু অবাকই হল। এমন সময় একটা ঘরের সামনে বারান্দা মত জায়গায় একজন বৃদ্ধ এসে বসল। হাতে একটা মাটির হাঁড়ি। হাঁড়িটা রেখে তার ভেতর একটা নল মত ঢোকাল। তামাক টানতে লাগল। হাঁ করে ধোঁয়া ওড়াতে লাগল।

—চলো। ঐ লোকটার কাছেই খোঁজ নেওয়া যাক। প্রবেশদ্বারের কাছের ডালগুলো সরিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকল। বারান্দায় সেই বৃদ্ধের কাছাকাছি এসেছে হঠাৎ একদল লোক সেই ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল। গায়ের রং হলদেটে। বেঁটে। মাথার চুল চূড়ো করে বাঁধা। হাতে ছুঁচোলোমুখ বর্শা। মুখে শব্দ করছে—বু-বু-বু-ম্।

ফ্রান্সিস হকচকিয়ে গেল। ফ্রান্সিস পিছন ফিরে বলল— দরজার দিকে— পালাও। তখনই কয়েকটা বর্শা ওদের দিকে উড়ে এল। ফ্রান্সিস কোনমতে পাশ কাটাল। কোন বর্শাই ওদের গায়ে লাগল না। শাঙ্কো বলে উঠল—পালাতে গেলে মরব। ফ্রান্সিসও বলল—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

যোদ্ধারা দ্রুত ওদের ঘিরে ফেলল। বর্শাগুলো মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল। লোকগুলোর পরনে শুকনো লম্বা ঘাসের ঘাঘরা মত। ওরা ফ্রান্সিসের গায়ে বর্শার খোঁচা দিতে দিতে ঘরটার দিকে যেতে ইঙ্গিত করল।

ফ্রান্সিসরা আস্তে আস্তে পাথরের বারান্দামত জায়গাটায় উঠে এল। যোদ্ধাদের মধ্যে একজন এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধকে কিছু বলল। বৃদ্ধ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে চিৎকার করে কী বলে উঠল। তারপর ফ্রান্সিসদের আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল—পিতালি। ফ্রান্সিসরা কথাটার কোন অর্থই বুঝতে পারল না। তবে এটুকু বুঝল বৃদ্ধ— ওদের সর্দার। সে তাদের অভিযুক্ত করেছে। ফ্রান্সিস পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—আমরা বিদেশি— ভাইকিং। এখানে খোঁজখবর নিতে এসেছি যে আমরা আমাদের দেশ থেকে কতদূরে আছি। বৃদ্ধ এবার ভাঙা ভাঙা পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—না—বন্দী।



—কী করবে? শাঙ্কো মৃদুস্বরে বলল।

—আবার বন্দী দশা মেনে নিতে হবে। ফ্রান্সিসও মৃদুস্বরে বলল। ওদের ঘিরেছিল যারা এবার বর্শা দিয়ে তারা খোঁচা দিয়ে দিয়ে হাঁটতে ইঙ্গিত করল। কয়েকজন যোদ্ধা ওদের বাড়িটার পেছনদিকে নিয়ে চলল। পেছনে আসতে দেখা গেল একটা ঘরের দরজা। সেই শুকনো গাছের। দরজা বুনো শুকনো লতাগাছে বাঁধা। একজন যোদ্ধা গিয়ে লতা খুলল। বর্শার খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফ্রান্সিসদের ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বাইরের আলো থেকে অন্ধকারঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস স্পষ্ট কিছু দেখতে পারছিল না। অন্ধকার একটু সয়ে আসতে দেখল ঘরটা বেশ বড়। ছাদ লম্বা লম্বা শুকানো ঘাসের। তার ওপর পাথর চাপানো। একপাশে একটা মাটির জালায় জল রাখা। ঘরটা বড় দেখেই বুঝল অনেক বন্দী রাখার ব্যবস্থা। এখানে কত জন আর বন্দী হয়।

পাথরের মেঝেয় লম্বা লম্বা শুকনো ঘাস পাতা। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ বসে থেকে শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো সিনাত্রা বসে পড়ল।

—আবার বন্দী হলাম। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। এবার পালানোর কথাটা ভাবতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে পালাতে? সিনাত্রা বলল।

—অবশ্য পারব। তবে উপায়টা ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে। সর্দারের হাবভাব যা বুঝলাম এমনিতে আমাদের মুক্তি দেবে না। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো বলল—সর্দার আমাদের দেখিয়ে বলল—পিতালি। কথাটার অর্থ কি?

—শত্রু। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা শত্রু হলাম কী করে। শাঙ্কো বলল।

—তার মানে এদের শত্রু আছে। বোধহয় আমাদের সেই শত্রুই ভেবেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিছুই বুঝতে পারছি না। সিনাত্রা বলল।

—মনে হয় এরা শত্রুর আক্রমনের আশঙ্কা করছে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে না হতে দূরের পাহাড়টার দিক থেকে অনেক মানুষের চিৎকার শব্দ ভেসে এল। ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে বুনো গমের ক্ষেত দেখা যাচ্ছিল।

একটু পরেই দেখা গেল সেই গম ক্ষেত মাড়িয়ে বর্শাহাতে একদল যোদ্ধা ছুটে আসছে। এখানকার যোদ্ধারাও ততক্ষণ ধ্বনি তুলেছে—বু-উ-উ-উ-ম্। তারাও বর্শাহাতে লড়াই করার জন্যে তৈরী হল।

গমক্ষেত পার হয়ে ঐ যোদ্ধার দল আসতেই এখানকার যোদ্ধার দল ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গম ক্ষেত তছনছ করে শুরু হল দু'দলের লড়াই। দু'দলই

বর্শা দিয়ে লড়াই করছে। তুমুল লড়াই চলল। গমক্ষেত ভরে উঠল আর্তচিৎকার আর গোঙানিতে। পাহাড়ের দিক থেকে আগত যোদ্ধাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা গেল। কাঠের গরাদের ফাঁক দিয়ে লড়াই দেখতে দেখতে ফ্রান্সিস মন্তব্য করল—পাহাড়ের দিক থেকে যারা এসেছে ওরা হেরে যাবে। ওরা সংখ্যায় কম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এদিকের যোদ্ধাদের হাতে হয় আহত হতে লাগল নয় তো মরতে লাগল। ওরা পিছু হটতে লাগল। কিন্তু যারা বেঁচে রইল গমক্ষেতের দিক দিয়ে পাহাড়ের দিকে পালাতে লাগল। এরা পিছু ধাওয়া করল। আরোও মরল। জীবিতরা কোনরকমে পালাল।

বিজয়ী এরা বর্শা উঁচুতে তুলে ধ্বনি তুলল—বু-উ-উ-উ-ম্। ফ্রান্সিস বলল—থাক —নতুন কারো কাছে আর বন্দী হয়ে থাকতে হবে না। এরা আমাদের নিয়ে কী করে দেখা যাক।

যোদ্ধারা ফিরে এল। যুদ্ধজয়ের আনন্দে উল্লাস চলল। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—এরা তো জিতল। কিন্তু আমরা যেই তিমিরে সেই তিমিরে। আমাদের কপালে মুক্তি নেই।

—একেবারে হতাশ হয়ো না। একটা না একটা উপায় হবেই। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

রাতে প্রহরীরা ফ্রান্সিসদের খেতে দিল। গোল রুটি আর সামুদ্রিক মাছের ঝোলমত। মাছও ভাজা নয় আগুনে পোড়ানো। ফ্রান্সিসরা ক্ষুধার্ত ছিল। পোড়া মাছ রুটি পেট পুরেই খেল।

এদিকে বন্দী শত্রুদের জন্য দশেককে নিয়ে আসা হল। সর্দারের হুকুমে তাদের ফ্রান্সিসদের কয়েদঘরেই ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ওদের খেতেও দেওয়া হল। ঘরটা বড় বলেই ফ্রান্সিসদের খুব একটা অসুবিধা হল না। সবাই কোনরকমে শুতে পারল।

রাত বাড়ল। ফ্রান্সিস তখনও ঘুমোয় নি। পালাবার উপায় ভাবছে। শত্রুদের কয়েকজনকে ফ্রান্সিস কাছে ডাকল। লোকটি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস দেখল লোকটির মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা নয় ছড়ানো কাঁধ পর্যন্ত। গালে হলুদ সাদা উল্কি আঁকা। ফ্রান্সিস বলল—তোমরা পিতলি? লোকটি মাথা ওঠানামা করল। ফ্রান্সিস বলল—ভাই-সর্দার আমাদের সন্দেহ করেছে তোমাদের সঙ্গে যোগ আছে। অথচ আমরা বিদেশী ভাইকিং। এখানকার কিছুই চিনি না আমরা। লোকটা বোধহয় আন্দাজে কিছু বুঝল। কিছু বললও। ফ্রান্সিস সে কথার কিছুই বুঝল না। তবে এটা বুঝল যে এরা অত্যন্ত ভয়ে কাতর হয়ে পড়েছে। বুঝল না সর্দার এদের নিয়ে কী করবে?

পরদিন ফ্রান্সিস সবে সকালের খাবার খেয়েছে। সর্দার এল। এখন আর সর্দার তামাক টানছে না। কয়েদঘরের দরজার কাছে এসে সর্দার দাঁড়াল। তারপর পিতলিদের দিকে তাকিয়ে বলল— পিতলি। তারপর একনাগাড়ে কিছু বলল।ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল পিতলিদের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। ও বুঝল পিতলিদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। হয়তো মেরেই ফেলা হবে। তাই কাঠের গরাদের কাছে মুখ নিয়ে বলল—

—পিতালিদের নিয়ে কী করবে?

—শাস্তি—হত্যা। সর্দার বলল।

—পিতলিরা আপনাদের শত্রু ঠিকই। তবে বন্দীদের হত্যা করা উচিত নয়। এরা তো অসহায়। ফ্রান্সিস বলল।

সর্দার মাথা নেড়ে বলল—না—হত্যা।

—আমাদের বন্দী করে রেখেছেন কেন? আমাদের মুক্তি দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—পিতলির বন্ধু—তোমরা—পরে-হত্যা। সর্দার বলল।

—আমরা বিদেশী। জাহাজ চড়ে এসেছি। পিতলিদের নামও শুনেনি কখনো। বন্ধুত্ব তো দূরের কথা। হ্যারি বলল।

—আদেশ—হত্যা। সর্দার একই ভঙ্গীতে বলল। ফ্রান্সিস বুঝল এই সর্দার কোন অনুরোধই শুনবে না। একরোখা মানুষ। যে কোন সময় ওদের মেরে ফেলতে পারে। তবুও ফ্রান্সিস বোঝাবার চেষ্টা করল। বলল—আমরা বিদেশী। আমাদের হত্যা করে আপনার কী লাভ?

—সিদ্ধান্ত—হত্যা। কথাটা বলে সর্দার আর দাঁড়াল না। চলে গেল।

—ফ্রান্সিস—অবস্থা যা বুঝছি এই সর্দার একগুঁয়ে। আমাদের কোনো কথাই শুনবে না। হয়তো পিতলিদের সঙ্গে আমাদেরও হত্যা করবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালানো যায় তার উপায় ভাবো। হ্যারি বলল।

—দেখি। তবে একটু সুলক্ষণ আছে। প্রহরী মাত্র একজন। পালাতে হলে একেবারের চেষ্টাতেই পালাতে হবে। না পারলে বিপদের আশাঙ্কা বাড়বে। ফ্রান্সিস বলল।

—সেই চেষ্টাই দেখ।

সেদিন রাতের খাওয়া সেরে ফ্রান্সিস জেগে বসে আছে। নানা চিন্তা মাথায়। ফিরতে দেরি হচ্ছে। মারিয়া বন্ধুরা জাহাজে নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তায় পড়েছে। এদিকে পালাবার উপায়ও ভেবে পাচ্ছে না।

কয়েদঘরের কাঠের গরাদের বাইরে তাকাল। ফুটফুটে জ্যোৎস্না পড়েছে গম ক্ষেতে। প্রহরীকে দেখল। একটা বর্শায় ভর দিয়ে সে একটা পাথরের ওপর বসে আছে।

এই সময় শাঙ্কো আস্তে আস্তে ওর কাছে এল। ফিস্‌ফিস্‌ করে ডাকল—ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে শুয়ে ছিল। চোখ মেলে তাকাল। শাঙ্কো ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল।—কাঠের গরাদ দেখলাম লোহার মত শক্ত। ওটা কাটতে সময় লাগবে। কিন্তু গরাদে বাঁধা বুনো লতাগাছ কাটা যাবে। ফ্রান্সিস আস্তে উঠে বসল। ফিস্‌ফিস করে বলল—পরীক্ষা করে দেখেছো?

—হ্যাঁ। তখন প্রহরীটি খেতে গিয়েছিল। শাঙ্কো বলল।

—কিন্তু একরাতের মধ্যেই কাটতে হবে। পারবে? ফ্রান্সিস বলল।

—পারবো। আমি দুটো লতার বাঁধন কেটেছি। বেশি কাটিনি। খাবার দিতে এসে প্রহরীদের সন্দেহ হতে পারে। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে কাল রাতে প্রহরীরা খাবার দেওয়ার পর কাজে লেগো। ভোর হওয়ার আগেই পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

পরের দিন। বেশ রাত তখন। ফ্রান্সিস ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল—সজাগ থেকো। ঘুমিয়ে পড়ো না। কিন্তু ঘুমের ভান করে থেকো। পিতালি বন্দীরা ফ্রান্সিসের নির্দেশ বুঝল না। ওরা ঘুমিয়ে পড়ল।

একসময় ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে কাঠের গরাদের কাছে গেল। চাঁদের আলোয় দেখল—প্রহরী একটা পাথরে বসে আছে। হাতের বর্শাটায় ভর রেখে। বোঝাই যাচ্ছে তন্দ্রাচ্ছন্ন। ফ্রান্সিস ফিস্‌ফিস করে ডাকল—শাঙ্কো।

শাঙ্কো তৈরীই ছিল। ও সঙ্গে সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার কাছে গেল। বুকের পোশাকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বার করল। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বুনো লতার বাঁধন কাটাতে লাগল। একটু শব্দ হতে লাগল। কিন্তু তাতে প্রহরীর তন্দ্রাভাব কাটল না। একইভাবে ঝিমুতে লাগল। একটার পর একটা লতার বাঁধন কাটতে লাগল শাঙ্কো। ফ্রান্সিস একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রহরীটির দিকে। প্রহরীটির কোন নড়াচড়া নেই। গ্রামের ক্ষেতের ওপর দিয়ে মুক্ত হাওয়া জোরে বইছে। আরামে প্রহরীটি বেশ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

কাঠের ধাঁচায় বাঁধা চার পাঁচটা কাঠের গরাদ শাঙ্কো খুলে ফেলল। তারপর দ্রুত বেরিয়ে এসে প্রহরীটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনেই মাটির ওপর পড়ে গেল। প্রহরীটি কোন শব্দ করার আগে বুনো লতার ফাঁস প্রহরীটির মুখ চেপে বেঁধে দিল। প্রহরীটির মুখ দিয়ে কোঁ কোঁ শব্দ বেরিয়ে আসছিল। শাঙ্কো ওর গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের এক চড় কষালো। শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। শাঙ্কো দ্রুত হাত দুটো লতা দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলে উঠল—পালাও। জেগেই ছিল। শাঙ্কোর কথা কানে যেতেই হ্যারি দ্রুত কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল—গম ক্ষেত পার হয়ে—পাহাড়ের দিকে। ফ্রান্সিসের এই দিক নির্দেশের কারণ ছিল। কারণ সামনের দিকে কাঁটাগাছের বেড়া। দরজাও ছোট।

সবাই গমক্ষেতের দিকে ছুটল। ওদিকে পিতালির কয়েকজন দেখল কয়েদ ঘরের দরজা খোলা। ফান্সিসরা গমক্ষেত দিয়ে পাথড়ের দিকে ছুটেছে। ওরা অন্য বন্ধুদের ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। তারপর সবাই ফ্রান্সিসদের পিছু পিছু ছুটল।

গমের গাছে ফ্রান্সিসদের বুক পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে। ওরা প্রানপণে ছুটেছে পাহাড়টার দিকে। চাঁদের আলোয় চারদিক বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে।

গমের ক্ষেত শেষ। শুরু হল পাথর ছড়ানো মাটি।

সবাই যখন পাহাড়টার নিচে পৌঁছাল তখন ওরা ভীষণ হাঁপাচ্ছে। পিতলিরাও পৌঁছল তখন। ফ্রান্সিস বলল—দাঁড়াও। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস একজন পিতালিকে জিঞ্জেস করল—সমুদ্র কোন দিকে? সেও হাঁপাচ্ছে তখন। সে মাথা নাড়ল। ফ্রান্সিসের কথাটা বুঝল না। ফ্রান্সিস এবার হাত দিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের ইঙ্গিত করল। এবার লোকটা বুঝল। হাত তুলে পূর্বদিক দেখাল। একটা বনভূমির ওপারটা দেখাল।

ফ্রান্সিস বলে উঠল—পূর্বদিকে ছোটো। কিছুটা ছুটে গিয়ে বনভূমিতে ঢুকল। যাহোক গাছের আড়াল পেল। দূরে সর্দারের এলাকা থেকে খুব অস্পষ্ট হৈহল্লার শব্দ ভেসে এল। ফ্রান্সিসরা এখন নিরাপদ।

ঘন বনভূমি। গায়ে গায়ে গাছগাছালির জটলা। সেই গাছ গাছালির মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিসরা ছুটল। ঠিক ছুটতে পারছিল না। পায়ের নিচে মাটি জলে ভেজা। পেছল। সাবধানে গাছের গুড়িতে পা রেখে রেখে ছুটতে হচ্ছিল। যে কোনসময় পিছলে পড়ে যাওয়ার সমস্যা। কাজেই ফ্রান্সিসদের ছোটার বেগ কমে আসছিল।

একসময় বনভূমি শেষ। সামনেই সমুদ্র। তখন সূর্য উঠছে। পূব আকাশে কমলা রঙের জোয়ার। সূর্য উঠল। সকালের নরম আলোর মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে ওরা ছুটল।

মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে ওরা। কিছুদূর যেতেই দেখল তীরভূমির কাছে ওদের জাহাজ নোঙর করা আছে। তিনজনেই আনন্দে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। জাহাজ থেকেও ধ্বনি উঠল —ও—হো—হো।

নৌকা তীরের বালিয়াড়িতে তোলা। ফ্রান্সিসরা দ্রুতহাতে নৌকা টেনে নিয়ে জলে ভাসাল। ফ্রান্সিস বৈঠা তুলে নিল। নৌকা জাহাজের দিকে চলল। নৌকা জাহাজের গায়ে লাগল। দড়ির মই খোলা হল। ফ্রান্সিসরা একে একে জাহাজে উঠে এল।

তখনই দেখা গেল সেই সর্দারের যোদ্ধারা বর্শা উঁচিয়ে তীরভূমির বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে ছুটে আসছে।

ওরা সংখ্যায় তিরিশ চল্লিশজন। তীরে জলের কাছে এসে ওরা দাঁড়াল। জাহাজ বেশ কিছুটা দূরে। ওখান থেকেই কয়েকজন বর্শা ছুড়ল। কিন্তু বর্শা গুলো জলে পড়ল। ওরা হতাশ চোখে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে রইল। শাঙ্কো চেঁচিয়ে বলল—ফ্রান্সিস—লড়াই।

—না। আমরা চলে যাব। তারপর ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—নোঙর তোল। জাহাজ মাঝ সমুদ্রে চালাও। ঘর্ ঘর্ শব্দে নোঙর তোলা হল। একবার ঝাঁকুনি খেয়ে জাহাজ চলল মাঝ সমুদ্রের দিকে। হ্যারি বেরিয়ে এল। বলল—এবার কী করবে?

—ডাঙা খুঁজবো। দেখি—কবে ডাঙার দেখা মেলে। তারপর বলল—নজরদার পেড্রোকে ডেকে নিয়ে এসো। পেড্রোকে আনা হল। ফ্রান্সিস বলল—পেড্রো—ভালোভাবে নজর রাখো। —ডাঙার দেখা পাও কিনা।

জাহাজ চলল। পেড্রোও মাস্তুলের ওপর থেকে নজর রাখল কোনদিকে ডাঙার দেখা পায় কিনা।

জাহাজ চলেছে। দিন যায় রাত যায়। ডাঙার দেখা নেই । পেড্রো তীক্ষ্ম নজর রেখে চলেছে।

সেদিন গভীর রাত। আমাবস্যার রাত। চারিদিক ঘন অন্ধকার। আকাশে উজ্জ্বল তারার ভিড়। চাঁদও নেই। ক্ষীণ আলোয় যাহোক চারিদিক খুব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কেবিনঘরে ডেকএর ওপরেও কয়েকজন ভাইকিং ঘুমিয়ে আছে। সমুদ্রের ফুর ফুরে হাওয়ায় তাদের ঘুম বেশ গভীর। রাতে খাওয়ার পর একটু তন্দ্রা মত এসছিল। সেটা কাটিয়ে উঠলেও রাত একটু বাড়তে পেড্রো নিজের আসনে একেবারে ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুতেই জেগে থাকতে পারল না। ফ্রান্সিস ওকে বার বার সাবধান করে দিয়েছে। বিশেষ করে রাতে এবং অন্ধকার রাতে ও যেন বেশি সজাগ থাকে। অন্য কোন জাহাজ বিশেষ করে জলদস্যুদের জাহাজ যেন ওদের জাহাজ দখল করতে না পারে। পেড্রো সেইসব ভুলে গেল সেই রাতেই। কাজেই লক্ষ্য করল না একটা জাহাজ ওদের জাহাজের দিকে দ্রুত আসছে। জাহাজটাও বড় নয়। কাছে আসতেই জাহাজের মাস্তুলের উড়তে থাকা সাদা পতাকা নামিয়ে ফেলা হল। উড়ল কালো পতকা। মাঝখানে মড়ার মাথা আর হাড়ের ঢ্যাড়া আঁকা। বোঝাই গেল জলদস্যুদের জাহাজ।

পেড্রো তখন গভীর ঘুমে। ও আর বন্ধুদের সজাগ করতে পারল না। জাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। ফ্রান্সিসদের জাহাজটা একটু ঝাঁকুনি খেল। কেবিনঘরে কয়েকজনের ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ে জাহাজের গায়ে। তখন একটু ঝাঁকুনি লাগেই। ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

একদল জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেকএ উঠে এল। যারা ডেকএ ঘুমিয়ে ছিল তাদের গায়ে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে ঘুম ভাঙাল। ঘুম ভেঙে ওরা উঠে দেখল খোলা তরোয়াল হাতে জলদস্যুদের দল দাঁড়িয়ে। ওরা ভীত হল। আবার জলদস্যুদের পাল্লায় পড়লাম। আবার জাহাজের কয়েদঘরে বন্দীর জীবন। একজন বলশালী জলদস্যু এগিয়ে এল। স্পেনীয় ভাষায় চাপাগলায় বলল—টু শব্দটি করবে না। এখানেই বসে থাকো।

এবার কিছু জলদস্যু এখানে পাহারায় রইল। বাকিরা সিঁড়ি দিয়ে নিচের কেবিনঘরের দিকে। দু'জন অস্ত্রঘরের সামনে খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিতে লাগল। বাকিরা কেবিনঘরে ঢুকে ঢুকে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে ভাইকিংদের ঘুম ভাঙাতে লাগল।

সিনাত্রার একটু আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দরজা দিয়ে জলদস্যুদের ঢুকতে দেখেই ও বিপদ আঁচ করল। ও বিছানা থেকে গড়িয়ে এক কোনায় পড়ল। জলদস্যুরা বন্ধুদের ঘুম ভাঙিয়ে বন্দী করে নিয়ে চলে যেতে সিনাত্রা একটুক্ষণ অপেক্ষা করল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ কানে আসছে। জলদস্যুদের নজর এড়ানো গেছে।

ও কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে ছুটল অস্ত্রঘরের দিকে। অস্ত্রঘরের সামনেই দেখল দু'জন জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে পাহারাত। এরা জলদস্যু হলেও লড়াইয়ের কায়দা কানুন ভালোই জানে।

সিনাত্রা ফিরে এল। সিঁড়ি দিয়ে ডেকএ উঠে এল। দেখল বন্ধুদের সব ডেকএ বসিয়ে রেখেছে। একজন জলদস্যু ওকে তরোবারি দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করল। সিনাত্রা কোন আপত্তি না করে বন্ধুদের সঙ্গে বসে পড়ল।

ওদিকে নজরদার পেড্রো মাস্তলের মাথায় ওর আসনে ঘুমিয়ে ছিল। একজন জলদস্যু সেখান থেকে উঠে পেড্রোর পিঠে তরোয়ালের খোঁচা দিল। ঘুম ভেঙে পেড্রো লাফিয়ে উঠল। বুঝল বিপদ যা হবার হয়ে গেছে। এখন জলদস্যুদের পাল্লায় পড়েছে। ওরা যা বলবে মেনে নিতে হবে। পেড্রো জলদস্যুদের পিছনে মাস্তলের থেকে নেমে এল। বন্ধুদের সঙ্গে বসে পড়ল।

চারজন জলদস্যু ফ্রান্সিস আর মারিয়ার কেবিনঘরের দরজার কাছে এল। দরজায় ধাক্কা দিল না। ধাক্কা দিলে ভেতরের লোক সাবধান হয়ে যেতে পারে। আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দিল। মারিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। ও আর ফ্রান্সিসকে ডাকল না। ভাবল—হ্যারি এসেছে। মারিয়া দরজা খুলতেই খোলা তরোয়াল হাতে চারজন জলদস্যু লাফিয়ে ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিসের তখন ঘুম ভেঙে গেছে। ও বিছানার তলা থেকে তরোয়াল বের করবে বলে হাত বাড়াল। মারিয়া ছুটে এসে ওর হাত চেপে ধরল। চেঁচিয়ে বলল—না। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল।

একজন জলদস্যু তরোয়াল ঘুরিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস কিছু বলল না। মারিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে দরজার দিকে চলল। মারিয়াও পেছনে পেছনে চলল। ফ্রান্সিস ভাবল পেড্রোর গাফিলতিতে জলদস্যুদের হাতে বন্দী হতে হল।

ডেক এ উঠে দেখল বন্ধুরা সার বেঁধে বসে আছে। কোন কথা না বলে মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে বসল।

ভোর হল। সমুদ্রে আকাশে জাহাজ দুটোয় রোদ ছড়াল। ফ্রান্সিসের রাত জাগা চোখ জ্বলে উঠল। জাহাজ জলে ভাসতে লাগল। জলদস্যুরা ততক্ষণ দুটো জাহাজের পালই নামিয়ে দিয়েছে। দুটো জাহাজই গায়ে গায়ে লেগে আছে।

হ্যারি ফ্রান্সিসের পাশে এসে বসল। বলল—আবার বন্দী হলাম।

—পেড্রোর নির্বুদ্ধিতা। বন্দী জীবন মেনে নিতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—এদের হাত থেকে পালানো সম্ভব? হ্যারি বলল।

—সব দেখি টেখি। তারপর ভাববো। ফ্রান্সিস বলল।

—এদের সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ কথা তো হবেই। জানতে হবে ওরা আমাদের বন্দী করে কী চায়? ফ্রান্সিস বলল।

—আরে কী চাইবে। আমাদের কাছে মূল্যবান কিছু আছে কিনা সেসবের খোঁজ করবে। যা পারে লুঠ করবে। হ্যারি বলল।

—সেটাই আটকাতে হবে। অবশ্য মারিয়া সোনার চাকতি গুলো সাবধানেই রেখেছে। মনে হয়না ওরা খুঁজে পাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখা যাক। এরা কী করে। হ্যারি বলল।

কয়েকজন জলদস্যু সকালে খাবার নিয়ে এল। কাগজে প্যাঁচানো পোড়া রুটি আনাজ। খেতে খেতে ফ্রান্সিস একজন জলদস্যুকে জিজ্ঞেস করল তোমাদের সর্দার আসবে না?—সময় হলেই আসবে। জলদস্যুটি বলল।

সকালের খাবার খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস জলদস্যুদের সর্দারের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। দু'চোখে হাতে চাপা দিয়ে ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল।

কিছু পরে হ্যারির কথা শুনল—ফ্রান্সিস—দেখ—দেখ—নারী সর্দার। দেখল জলদস্যুদের জাহাজ থেকে এক নারী জলদস্যু লাফ দিয়ে ওদের ডেক এ উঠে এল। মাথায় সোনালি চুল। গায়ে আঁটোসাটো পুরুষালি পোষাক। নারী জলদস্যুদের কথা ফ্রান্সিসরা শুনছে। কিন্তু কোনদিন চোখে দেখেনি।

দস্যুরানি ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের দেখে হাসছে। কী কারণে ফ্রান্সিস বুঝল না। দস্যুরানি ফ্রান্সিসদের সামনে এসে দাঁড়াল। গলা

চড়িয়ে বলল—তোমাদের দলপতি কে? ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—আমি।

—তোমরা তো দেখছি বিদেশি। দস্যুরানি স্পেনীয় ভাষায় বলল।

—হ্যাঁ—আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—এখানে এসেছ কেন? দস্যুরানি বলল।

—আমরা দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াই। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? দস্যুরানি একটু অবাক হয়েই জানতে চাইল।

—ভালো লাগে তাই। ফ্রান্সিস সহজ ভঙ্গীতে বলল।

—মনে হয় তোমাদের এই ঘুরে বেড়ানোর পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে। দস্যুরানি বলল।

—ঠিক উদ্দেশ্য কিছু নেই। তবে একটা কাজ আমরা করি, কোন গুপ্ত ধনসম্পদের খোঁজ পেলে সেটা খুঁজে বার করি। ফ্রান্সিস বলল।

—ও—তাই বলো। তাহলে তোমরা তো যথেষ্ট ধনী। দস্যুরানি একটু ঠাট্টার স্বরেই বলল।

—না। কারণ সেই গুপ্তধনের আসল মালিককে আমরা তা দিয়ে দি। ফ্রান্সিস বলল।

—বদলে তো কিছু পাও। দস্যুরানি বলল।

—একটা স্বর্ণমুদ্রাও নিই না। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

—আশ্চর্য! তোমাদের কথায় বিশ্বাস কি? তোমাদের জাহাজ তল্লাশি হবে। দস্যুরানি বলল।

—আমাদের কোন আপত্তি নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—আপত্তি হলেও শুনেছে কে? তোমরা তো এখন বন্দী। দস্যুরানি বলল।

—সেটাই জানতে চাইছি? আমাদের বন্দী করা হয়েছে কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—পিতুজা বন্দরের নাম শুনেছো? দস্যুরানি বলল।

—না। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল।

—ওখানে প্রতি মাসে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসে। দস্যুরানি বলল।

—হ্যাঁ—সেরকম হাট দেখেছি। সে হাটে আমাদের একবার বিক্রি করা হয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—আমিও তোমাদের বিক্রি করব। যুরোপীয় ক্রীতদাস। ভালো দাম পাব। দস্যুরানি একটু বাঁকা হেসে বলল।

—এটা অন্যায় জুলুম। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল। দস্যুরানি হেসে উঠল। কোন কথা বলল না। এতক্ষণে মারিয়াকে দেখল। দস্যুরানির চোখে মুখে উৎসুক ফুটে উঠল। বলল—এ কে?

—আমাদের দেশের রাজকুমারী। হ্যারি বলল।

—তা এখানে কেন? দস্যুরানি বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল।

—উনি আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। হ্যারি বলল।

—ব্বা! মজার ব্যাপার। রানি আবার হাসল তারপর আবার গলা চড়িয়ে বলল—শোন—আমাদের জাহাজের ডেকএ গিয়ে তোমাদের থাকতে হবে। কড়া পাহারায়। আমাদের জাহাজ ছোট। অত কেবিনঘর নেই। কয়েদঘরও নেই।

—রোদ ঝড় বৃষ্টি—শাঙ্কো বলতে গেল। দস্যুরানি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল হ্যাঁ— তার মধ্যেই থাকতে হবে।

—আমার একটা কথা ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের রাজকুমারী অত কষ্ট করে ওখানে থাকতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—থাকতে থাকতে অভ্যেস হয়ে যাবে। দস্যুরানি হেসে বলল।

—না—ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলে উঠল—না। উনি আমাদের জাহাজে থাকবেন। চড়া গলায় ফ্রান্সিসের একথা শুনে দস্যুরানি একটু চুপ করে থেকে কী ভেবে বলল— বেশ তাই থাকবে। রাজকুমারীকে ফেলে তো তোমরা পালাতে পারবে না। এদিক থেকে এটা ভালোই হবে। কথাটা শেষ করে জলদস্যুদের দিকে তাকিয়ে বলল—এদের আমাদের জাহাজে নিয়ে চল। আমাদের জাহাজের ডেকএ নিয়ে চল্। এরা ওখানেই থাকবে।

দস্যুরানি অদ্ভুত দক্ষতায় ফ্রান্সিসদের জাহাজ থেকে নিজেদের জাহাজের ডেকএ উঠে গেল। দস্যুরানি চলাফেরায় পুরুষালি ভাব। দেখে হ্যারি মৃদুস্বরে মন্তব্য করল—

—দেখেছো ফ্রান্সিস চলাফেরায় দস্যুরানি কেমন তৎপর। হ্যারি বলল।

—জলদস্যুদের ওপর সর্দারি করা সোজা কাজ নয়। ফ্রান্সিস মন্তব্য করল।

জলদস্যুরা দল বেঁধে এগিয়ে এল। তরোয়াল দেখিয়ে ইশারা করল ওদের জাহাজে ওঠার জন্যে। ফ্রান্সিসরা একে একে জলদস্যুদের জাহাজে উঠতে লাগল।

সিনাত্রা একজন জলদস্যুকে বলল—ভাই—আমি রাজকুমারীকে কেবিনঘরে পৌঁছে দিয়ে আসছি। জলদস্যু মাথা নেড়ে বলল—না।

—আরে ভাই আমি পালাবো না। রাজকুমারীকে পৌঁছে দিয়ে এক্ষুণি উঠে আসছি। সিনাত্রা বলল।

—বেশ যাও। কিন্তু পালাবার চেষ্টা করো না। জলদস্যু বলল।

—কোথায় পালাবো। এ তো মাঝ সমুদ্র। সিনাত্রা হাত ঘুরিয়ে চারিদিক দেখিয়ে বলল।

—আমাদের দলরানি খুব রাগী। রেগে গেলে সঙ্গে সঙ্গে বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে। জলদস্যু বলল।

—না—না। এত তাড়াতাড়ি আমি মরতে রাজি নই। আমি যাব আসবো। সিনাত্রা বলল। তারপর মারিয়ার কাছে এসে বলল—রাজকুমারী—চলুন আপনাকে আপনার কেবিনঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না। আমি তোমাদের সঙ্গেই যাব। মারিয়া বলল।

—পাগলামি করবেন না। ফ্রান্সিস এতে রাজি হবে না। ওই তো আপনাকে আমাদের জাহাজে থাকার ব্যবস্থা করেছে। খোলা ডেক-এ আপনি থাকতে পারবেন না। সিনাত্রা বলল।

—না—ফ্রান্সিসকে ডাকো। মারিয়া বলল। তখন সিনাত্রা চাপা গলায় বলল— অন্য কারণ আছে। মারিয়া সিনাত্রার মুখের দিকে একবার তাকাল। তারপর আর কোন কথা বলল না। সিঁড়ি ঘরের দিকে চলল। পেছনে সিনাত্রা।

নীচে নেমে মারিয়া নিজের কেবিনঘরে ঢুকে গেল। সিনাত্রা দ্রুতপায়ে রান্না ঘরে এল। সেই ঘরের টেবিলে রাখা চকমকি পাথর আর লোহার টুকরোটা নিয়ে কোমরে গুঁজল। তারপর উপরে ডেকএ উঠে এল। দেখল সেই জলদস্যুটি তরোয়াল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—দেখ—ভাই—ফিরে এসেছি কিনা। সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পালাই নি। সিনাত্রা বলল। জলদস্যুটি শুকনো হাসল। বলল—রানি ইরিনার হুকুমে জাহাজ মাঝ সমুদ্র দিয়ে যাবে। জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেও ডাঙ্গা খুঁজে পাবে না। হাঙরের মুখে পড়ে জীবন শেষ হবে। এবার আমাদের জাহাজে চলো।

সিনাত্রা আর কোন কথা বলল না। শান্তভাবে জলদস্যুদের জাহাজে উঠে এল। বন্ধুরা সব ডেকএ বসে আছে। সিনাত্রা এবার একজন জলদস্যুর কাছে গেল—বলল —ভাই —বন্দী তো হয়েছি। তার মানে একঘেয়ে জীবন। দুটো কাঠের টুকরো দিতে পারো?

—কাঠের টুকরো কী করবে? জলদস্যুটি জানতে চাইল।

—কাঠ ঠুকে ঠুকে একটু গান বাজনা করব। সিনাত্রা বলল।

—যত সব পাগলামি। জলদস্যুটি বলল।

—বেশ পাগলামি না হয় হলো। কাঠের টুকরো দাও। সিনাত্রা বলল।

—এখন পাহারা দিচ্ছি।—এখন পারব না। সন্ধ্যেবেলায় নতুন জলদস্যু আসবে তখন দেবো। জলদস্যুটি বলল।

—বেশ তাই দিও। দেবে কিন্তু। জাহাজে তো কাঠের অভাব নেই। সিনাত্রা বলল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ দেবো। জলদস্যুটি ঘাড় নেড়ে বলল।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল। সিনাত্রা সাগ্রহে বসে আছে কখন জলদস্যুটি কাঠের টুকরো নিয়ে আসে। জলদস্যুটি কথা রাখল। দুটো কাঠের টুকরো এনে দিল। সিনাত্রা কাঠের টুকরো পেয়ে খুব খুশি। ফ্রান্সিস হ্যারি অবাক। সিনাত্রা কাঠের টুকরো নিয়ে কী করবে? হ্যারি বিস্ময় চাপতে না পেরে বলল—এই দুটো কাঠের টুকরো নিয়ে কী করবে?

—গান বাজনা করবো। সিনাত্রা হেসে বলল।

—গান বাজনা? তোমাকে তো কোনদিন গান গাইতে দেখিনি। হ্যারি বলল।

—আনন্দ—আনন্দ। ওটাই আসল। সুর গলায় থাকুক না থাকুক। এই এক ঘেয়ে বন্দী জীবন তো কাটাতে হবে। সিনাত্রা একই ভাবে হেসে বলল।

রাতের খাওয়া শেষ হল। কম পোড়া রুটি আর সামুদ্রিক মাছের ঝোল। খাওয়া সেরে অনেকেই শুয়ে পড়ল।

সিনাত্রা কাঠের টুকরো টক্ টক্ শব্দ বাজিয়ে গান ধরল। ওদের দেশের সমুদ্রের তীরের জেলেপাড়া থেকে জেলেরা নৌকা চড়ে মাছ ধরতে যায় যখন তখন যে গলায় গায় —সেই গান। সুন্দর সুরেলা গলায় সিনাত্রা গান গাইতে লাগল। তালে তালে টক্ টক্ শব্দে কাঠের টুকরো বাজাতে লাগল। ফ্রান্সিস আর বন্ধুরা অবাক। সিনাত্রা এত সুন্দর গান করে? সিনাত্রা এত ভালো গান গায় ওরা কোনদিনও জানতে পারেনি। সিনাত্রা গান গেয়ে চলে। মাতৃভূমির গান। বন্ধুদের অনেকের চোখেই জল দেখা দিল। সিনাত্রা আপন মনে গেয়ে চলেছে তখন।

রাত বাড়ে। সিনাত্রা নতুন গান ধরে। ওর চোখে ঘুম নেই। জলদস্যু পাহারাদাররাও ওর গান শোনে। ওদেরও ভালো লাগে।

গভীর রাত পর্যন্ত সিনাত্রা গান গাইল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

সিনাত্রা প্রতি রাতেই অনেকক্ষণ পর্যন্ত গান করে। বন্ধুদের ভালো লাগে। কেউ আপত্তি করে না। সিনাত্রা সারা জাহাজ ঘুরে ঘুরে গান করে। পাহারাদাররাও আপত্তি করে না।

একরাতে মাস্তুলের মাথায় উঠে গেল। নজরদারদের জায়গায় বসে গান গাইল। আর একদিন পাল খাটানোর কাঠের কাঠামোর ওপর বসে গান গাইল। সেই কাঠের টক্ টক্ শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গান। এই ভাবে জাহাজের যেখানে সেখানে বসে সিনাত্রা গান গায় আর টক্ টক্ শব্দে কাঠ বাজায় তালে তালে।

জাহাজ চলছে। ফ্রান্সিসের চিন্তা। পিতুজা বন্দর কতদূর? ওদের ভাগ্যেই বা কী আছে।

দু'দিন দস্যুরানি এসেও সিনাত্রার গান শুনল। শুনে বোধহয় খুশি হল। কিছু বলল না।

টক্ টক্ শব্দ আর গানের সঙ্গে জলদস্যুরা অভ্যস্ত হয়ে গেল।

একদিন গভীর রাতে পাল খাটাবার কাঠের কাঠামোয় বসে গান গাওয়া শেষ করে সিনাত্রা ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস তখনও ঘুমোয়নি। গান শুনছিল আর ভাবছিল কী ভাবে এই বন্দী দশা থেকে পালানো যায়। ফ্রান্সিসকে একটু ঠেলে জিজ্ঞেস করল —আমার গান কেমন লাগছে। ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল— খুব ভালো। তুমি এত ভালো গান কর এতদিন জানতাম না। একদিন মারিয়াকে গান শুনিয়ে এসো। এক ঘেয়ে জীবন ওর ভাল লাগবে।

—নিশ্চয়ই শোনাবো। তারপর চারিদিকে তাকাল। দেখল দু'জন পাহারাদার ডেক-এর কোনায় বসে আছে। ও ফিস্ ফিস্ করে বলল—ফ্রান্সিস আমার টক্ টক্ শব্দটা বোধহয় তোমাদের কানে সয়ে এসেছে।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। ফ্রান্সিস ঘাড় নাড়ল।

—তাহলে পাহাদারদের কানেও সয়ে গেছে। সিনাত্রা বলল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—যদি চক্মকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাতে পারি? সিনাত্রা বলল।

—পাথর লোহা পাবে কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

—আমার কোমরে গোঁজা। সিনাত্রা বলল।

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল। আগের মতই ফিস্ ফিস করে বলল—কিন্তু শব্দ হবে যে।

—কাঠের টুকরোর শব্দই ভাববে পাহারাদারেরা। সিনাত্রা বলল।

—তাই তুমি কাঠের শব্দ করে গান গাও। ফ্রান্সিস একটু অবাক হয়েই বলল।

—হ্যাঁ। আগেই সব ভেবে এই শব্দ করছি। সিনাত্রা বলল। ফ্রান্সিস চাপা উল্লাসে বলে উঠল—সবা্স সিনাত্রা। তাহলে দেরি নয়। কাল রাতেই আগুন লাগাও। এখন গাঢ় অন্ধকার রাত চলছে।

পরেদিন রাতের খাবার খেয়ে সবাই ডেক-এর এখানে ওখানে শুয়ে বসে রইল। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে ডাকল—হ্যারি। হ্যারি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—রাত গভীর হলেই সিনাত্রা জাহাজের পালে আগুন লাগাবে।

—বলো কি? ও পারবে? হ্যারি চমকে উঠে বলল।

—হ্যাঁ পারবে। চক্মকি পাথর লোহা ওর কাছে আছে। পাহারাদাররা ভাববে কাঠের টুকরোর শব্দ। ওরা শব্দের পার্থক্য ধরতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—সাবাস্ সিনাত্রা। হ্যারি চাপাস্বরে উল্লাস প্রকাশ করল।

—এবার সবাইকে গিয়ে বলো সবাই যেন জেগে থাকে। পালে আগুন

লাগলে সবাই যেন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাঁতরে আমাদের জাহাজে ওঠে। তারপর শাঙ্কো যেন জলদস্যুদের জাহাজের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা কেটে দেয়। তারমধ্যে সবাই যেন অস্ত্রঘর থেকে তরোয়াল নিয়ে এসে ডেকএ দাঁড়িয়ে পড়ে। জলদস্যুরা আগুন নেভাতে ব্যাস্ত হয়ে পড়বে। তবু যদি আমাদের জাহাজে দল বেঁধে উঠে আসে—লড়াই হবে। যাও সবাইকে বলো। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে নির্দেশ দিল।

হ্যারি আস্তে আস্তে ডেকএর ওপরে গড়িয়ে গড়িয়ে এক এক বন্ধুর কাছে গেল। চাপাস্বরে বলে এল—এই জাহাজের পালে আগুন লাগবে। সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমাদের জাহাজে গিয়ে উঠবে। সবাই ঘুমিয়ে থাকার ভান করবে। কিন্তু ঘুমুবে না কেউ।

বন্ধুরা সবাই পালাবার জন্যে তৈরী হল।

রাতের খাওয়া সেরে সবাই শুয়ে পড়ল। রাত গভীর হল। সেই তারার অস্পষ্ট আলো চারদিকে।

রাত একটু গভীর হল। তখন অন্ধকার রাত। আকাশে উজ্জ্বল তারার মেলা। সেই তারার অস্পষ্ট আলো চারদিকে।

রাত আরো একটু গভীর হল। সিনাত্রা যথারীতি কাঠের টুকরো টক্ টক্ বাজিয়ে গান গেয়ে চলল। ডেকএ বসে কিছুক্ষণ গাইল। তারপর পালের কাঠের কাঠামোয় উঠে গাইতে লাগল। পাহারাদাররা জানে সিনাত্রা কখনও ডেকএ বসে কখনও হালের কাছে গিয়ে কখনও মাস্তুলের মাথায় কখনও পালখাটাবার কাঠের কাঠামোয় বসে গান গায়। এই রাতেও দেখল পালখাটাবার কাঠের কাঠামোতে বসে গান গাইছে। গান শুনতে শুনতে তিনজন পাহারাদার জলদস্যু ঝিমুতে লাগল। সিনাত্রার গান শুনতে ওদের ভালোই লাগে।

এবার সিনাত্রা কোমরে গোঁজা চক্মকি পাথর বের করল। চক্মকি পাথরে লোহার টুকরো ঠুকে গান গাইতে লাগল। টক্ টক্ শব্দ চলল। পাহারাদাররা শব্দের পার্থক্য বুঝতে পারল না। সিনাত্রা গাইতে লাগল—

সাগরে চলো ভাই।
সাগর আমাদের মা
অন্য কেউ নাই—
চলো সাগরে যাই।

পালের গায়ে চক্মকি পাথর ঠেকিয়ে লোহার টুক্রো ঠুকতে লাগল তালে তালে ঠক্ ঠক্।

আগুনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠে পালে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে গেল।

সিনাত্রা দ্রুত চক্‌মকি ঠুকে আরোও দুটো পালে আগুন লাগাল। তিনটে পালেই আগুন লেগে গেল। সমুদ্রের জোর হাওয়ায় তিনটে পালই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। মুহূর্তে অন্য পালগুলোতেও আগুন ছড়াল।

আগুন দেখে তিন পাহারাদার জলদস্যু ছুটে এল। ওরা বুঝে উঠতে পারল না কী করে আগুন লাগল। ভাইকিংরা ততক্ষণে উঠে পড়েছে। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—পালাও। তার আগেই সিনাত্রা চক্‌মকি পাথর কোমরে গুঁজে অন্ধকার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শাঙ্কো ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। দু'জনেই সাঁতরে চলল নিজেদের জাহাজের দিকে।

পাহারাদারদের চিৎকার চেঁচামেচিতে কিছু জলদস্যু ডেকএ উঠে এল। সমুদ্র থেকে জল তুলে আগুনে ছিটতে লাগল। কিন্তু আগুন নিভল না। বরং আগুন লেগে গেল কাঠের কাঠামোয়। ওরা ফ্রান্সিসদের বাঁধা দেবে কি আগুন নেভেতেই হিমসিম খাচ্ছে।

দস্যুরানি ইরিনাও ডেকএ উঠে এল। দেখল ডেক ফাঁকা। একজন বন্দীও নেই। মাথার ওপর পালগুলো পুড়ে ছাই। কাঠামোর কাঠ জ্বলছে। মাস্তুলের দড়িতে আগুন লেগেছে। আগুনের আভায় চারিদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ইরিনা চেঁচিয়ে বলল—ওদের জাহাজ আক্রমন কর। কাউকে পালাতে দিবি না। কয়েকজন জলদস্যু বলল—আগে আমাদের জাহাজতো আগুনের হাত থেকে বাঁচাই। পরে দেখা যাবে। ইরিনা এবার বুঝল—এখন লড়াই করতে গেলে সমস্ত জাহাজটাই পুড়ে যাবে। সব জলদস্যু ডেকএ উঠে এল। সমুদ্র থেকে জল তুলে জল ছিটানো চলল। কিন্তু সবটা আগুন নিভল না। বরং মাস্তুলেও আগুন লেগে গেল।

ওদিকে শাঙ্কো আর সিনাত্রা দড়ি দড়া ধরে নিজেদের জাহাজে উঠে পড়েছে। শাঙ্কো এক ছুটে জাহাজের মাথার কাছে এসে গেল। দেখল জলদস্যুদের জাহাজ থেকে আগুনের ফুলকি ওদের জাহাজেও উড়ে আসছে। এক্ষুণি জাহাজটা সরিয়ে না আনলে ওদের জাহাজের পালেও আগুন লাগতে পারে। ও-ছুটে জলদস্যুর জাহাজের সঙ্গে বাঁধা দড়ির কাছে এল। জামার তলা থেকে ছোরা বের করল। দ্রুত দড়ি কাটতে লাগল। সিনাত্রা শাঙ্কোর কাছে এল। শাঙ্কো দড়ি কাটতে কাটতে বলল—তরোয়াল নিয়ে এসো জলদস্যুরা আক্রমন করতে এলে লড়তে হবে। সিনাত্রা দ্রুত ছুটল অস্ত্রাগারের দিকে । দু'জনেই হাপাচ্ছে তখন।

দড়ি কেটে গেল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে বেশ দূরে সরে এল। এবার নিশ্চিন্ত। আগুনের ফুলকি থেকে আগুন লাগার কোন সম্ভবনা রইল না।

ততক্ষণে ফ্রান্সিসরা ওদের জাহাজে উঠে এসেছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে

বলল—দাঁড় ঘরে যাও। পাল তুলে দাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরে চলে যেতে হবে। জনা কয়েক ভাইকিং বন্ধু দাঁড়ঘরে চলে গেল। কয়েকজন পাল খাটাবার কাঠামোতে উঠে পড়ল। পাল খুলে দিল। পালে জোর হাওয়া লাগল। ওদের জাহাজ বেশ দূরে চলে এল। তখনও জলদস্যুদের জ্বলন্ত জাহাজটা দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আর দেখা গেল না। তখন পূব আকাশে কমলা রং ছড়িয়ে সূর্য উঠল। ফ্রান্সিস স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল।

মারিয়ার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। ডেকএ অনেক মানুষের পায়ের শব্দ শুনে ডেক-এ উঠে এল। দেখল বন্ধুরা ডেক-এ ছোটাছুটি করছে। যাক-ওরা অক্ষত ফিরে এসছে।

ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—কী করে পালালে?

—জলদস্যুদের জাহাজে আগুন লাগিয়ে। ঐ দেখো। ফ্রান্সিস হেসে বলল। মারিয়া দূরে জলদস্যুদের জলন্ত জাহাজটা দেখল। বলল—আগুন লাগালে কী করে?

—সিনাত্রার বুদ্ধি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ঘটনাটা বলল।

—তাহলে সিনাত্রাই তোমাদের বাঁচিয়েছে বলো। মারিয়া হেসে বলল।

—ঠিক তাই। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলল। চারিদিকে অনন্ত জলরাশি। ডাঙার দেখা নেই।

নজরদার পেড্রো মাস্তুলের ওপর নিজের জায়গায় উঠতে যাবে ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। বলল—পেড্রো—আর আমাদের বিপদ বাড়িও না। বিশেষ করে রাতে ঘুমিয়ে পড়ো না। দিনে তো আমরা চারিদিক দেখি টেখি। বিপদ হয় রাতে। তখন তোমার নজরই আমাদের ভরসা। দয়া করে একটু সজাগ থেকো। পেড্রো মাথা নিচু করে বলল—আর ভুল হবে না।

—দেখ—যতটা সাবধান থাকা যায়। এবার নিজের জায়গায় যাও। ফ্রান্সিস বলল। পেড্রো মাস্তুলের দড়ি ধরে ধরে উঠতে লাগল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলতে লাগল। জাহাজচালক ফ্রেজার আন্দাজে জাহাজ চালাচ্ছে। জাহাজ কোথায় চলছে কেউ জানে না। চারিদিকে জল। বোঝার উপায় নেই।

দিন যায়। রাত যায়। ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলছে। এর মধ্যে ঝড় হয়েছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি। ভাইকিংরা সাহসের সঙ্গে ঝড়ের মোকাবিলা করল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে। কুলকিনারহীন সমুদ্র। ফ্রান্সিস মাঝে মাঝেই জাহাজচালক ফ্রেজারের কাছে আসে। জানতে চায় ফ্রেজার দিক্ ঠিক রাখতে পারছে কিনা। ফ্রেজার বলে—কতটা আন্দাজেই চালাচ্ছি। কবে কখন ডাঙার দেখা মিলবে কে জানে।

ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ে। এ কোথায় চলেছি? ভাইকিং বন্ধুদের মনেও প্রশ্ন—কতদূর কোথায় চলেছি আমরা? শুধু হ্যারি ফ্রান্সিসকে সান্ত্বনা দেয়—কিছু ভেবো না। ডাঙার দেখা পাবো। ফ্রান্সিস কিছু বলে না। বোঝে বন্ধুরা যদি জানে যে ও অধৈর্য হয়ে পড়েছে তাহলে ওদের মনও ভেঙে যাবে। তাই বন্ধুরা এসব নিয়ে ওকে প্রশ্ন করলে ফ্রান্সিস বলে—ধৈর্য হারিও না। জাহাজে খাদ্য আর জলের অভাব পড়ে নি। আরও কিছুদিনের নামে আমরা নিশ্চিন্ত। তোমাদের তো সমুদ্রযাত্রার আগেই বলেছি—না না সমস্যায় পড়তে পারি। তার মধ্যেই আমাদের অভিযান চালাতে হবে।

মারিয়াও দিনে দিনে অধৈর্য হয়ে উঠছে। বলে—আর নয়। এবার দেশে ফিরে চলো।

—না। অভিযান চলবে। অতটা ভেঙে পড়ো না। একেবারে হতাশ হয়ে পড়ার কিছু ঘটেনি। ফ্রান্সিস বলল।

—ঘটেনি কিন্তু ঘটতে কতক্ষণ। মারিয়া রাগ করে বলে।

—তাহলে এক কাজ করি। সামনে যে বন্দর পাবো সেখানে অসহিষ্ণু বন্ধুর সঙ্গে তুমিও নেমে যাও। জাহাজ জোগাড় করে দেব। দেশে চলে যাও। কথাটা শুনে মারিয়াও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস মারিয়ার পিঠে হাত রেখে বলল—কান্নাকাটি করে আমার মন দূর্বল করে দিও না। মারিয়ার কান্না থামল। চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না।

ওদিকে নজরদার পেড্রো শুধু সকালে কয়েক ঘন্টা ঘুমোয়। সারারাত মাস্তুলের মাথায় বসে নজর রাখে। ডাঙার দেখা পেতেই হবে।

সেদিন দুপুরে পেড্রো পশ্চিমদিকে একটা পাহাড় মত দেখল। চিৎকার করে বলে উঠল—ভাইসব—পশ্চিমদিকে—ডাঙা।

কেবিনঘরে ডেকএ শুয়ে থাকা ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে জাহাজের রেলিঙের ধারে এসে জড়ো হল। সবাই পশ্চিমদিকে তাকিয়ে পাহাড় দেখল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে নিয়ে ডেক-এ উঠে এল। সবুজ পাহাড় দেখল। ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—ওদিকেই জাহাজ চালাও। নেমে দেখবো কোথায় এলাম। বন্দর নয়। তবে এখানে জাহাজ নোঙর করা আছে। জাহাজটায় লোক নেই দেখল।

ফ্রেজার হুইল ঘোরাল। জাহাজ আস্তে আস্তে তীরভূমির কাছে এল। কিন্তু তীরের কাছে জল গভীর নয় বলে ফ্রেজার জাহাজ ভেড়াতে পারল না।

হ্যারি ফ্রান্সিসের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

বলল—ফ্রান্সিস কী করবে?

—এটা বড় বন্দর নয়। তবে কিছু ঘরদোর আছে দেখছি। শুকনো পাতাঘাস ছাওয়া বাড়ি। তীরে কিছু মাছধরার নৌকা দেখছি। তার মানে জেলেদের

বসতি। ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবেই জানতে পারবো যে এটা কোন দ্বীপ না দেশের অংশ। ফ্রান্সিস বলল।

—এখনই খোঁজখবর করতে যাবে? হ্যারি জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। বেশি দেরি করা চলবে না। শাঙ্কো আর সিনাত্রাকে ডাকো। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি ওদেরকে ডেকে আনল। ফ্রান্সিস বলল—তোমরা তৈরী হয়ে এসো। তরোয়াল নিও না।

—তীরে নামবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। আমি তৈরী হয়ে আসছি। ফ্রান্সিস চলে গেল। তিনজন তৈরি হয়ে দড়ির মই বেঁধে একটা নৌকায় নামল। জাহাজের গা থেকে দড়ির বাঁধন খুলে ফ্রান্সিস নৌকা ভাসাল। ও দাঁড় বাইতে লাগল।

আস্তে আস্তে নৌকা তীরে ভিড়ল। নৌকাটা তীরের বালিয়াড়িতে তুলতে তুলতে ফ্রান্সিস বলল—বাড়িগুলোয় কোন লোকজন দেখছিনা। কোথায় গেল সব?

নৌকা রেখে তিনজন বাড়িগুলোর দিকে চলল। বাড়িগুলোর কাছে এসে দেখল বাড়িগুলোর দরজা গাছের ডাল কেটে তৈরী। দরজা বন্ধ। জনমানব শূন্য ফ্রান্সিস একটু অবাকই হল। বন্ধ দরজায় দরজায় ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘরের দরজা খোলা দেখল। ফ্রান্সিস ভেতরে উঁকি দিল। দেখল দু'টো বাচ্চা কোলে নিয়ে একটা বুড়ি বসে আছে। পরনে মোটা কাপড়ের ময়লা পোশাক। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—এই জায়গার নাম কী? বুড়ি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। বুঝল— বুড়ি হয় কালা নয়তো ওর কথা বুঝতেই পারেনি।

অন্য ঘরগুলোর দিকে গেল ওরা। আর একটা ঘরের দরজা খোলা। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো— দেখোতো। শাঙ্কো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দেখল একজন বৃদ্ধ। পরনে মোটা কাপড়ের পোশাক। বৃদ্ধ একটা বাচ্চা ছেলে কোলে নিয়ে বসে আছে। আর একটা বাচ্চা মেয়ে মেঝেয় বালির ওপর খেলা করছে।

শাঙ্কো বৃদ্ধটির সামনে গেল। জোরে বলল—এই জায়গার নাম কী? বৃদ্ধ চুপ। এবার ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। বেশ গলা চড়িয়ে বার কয়েক বলল—এই জায়গার নাম কী? এবার যেন বৃদ্ধটি বুঝল। ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল—তিয়েরা।

—এখানকার রাজা—কে? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল। বৃদ্ধ চুপ। ফ্রান্সিস অঙ্গভঙ্গী করে রাজা বোঝাল। এবার বৃদ্ধটি শ্লেষ্মাজড়িত গলায় বলল—রাজা—আসারিয়া।

—এখানকার লোকেরা কোথায়? সিনাত্রা জিজ্ঞেস করল? এবার কয়েকবার প্রশ্নটা করতে হল। বৃদ্ধটি আঙ্গুল তুলে সবুজ পাহাড়ের দিকটা দেখাল। বলল

—তিয়েরা—মেলা। ফ্রান্সিস শাঙ্কোদের দিকে তাকাল। বলল—ঐ পাহাড়ের দিকেই বোধহয় রাজধানী তিয়েরা। ওখানে মেলাটেলা চলছে। সবাই সেই মেলাতে গেছে।

—কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—চলো—আমরাও মেলায় যাব। ফ্রান্সিস বলল।

—আবার না কয়েদ ঘরে ঢুকতে হয়। শাঙ্কো বলল।

—সেই সমস্যা তো আছেই। কিন্তু সবাই তো ঐ মেলাতেই গেছে। ওখানে না গেলে জানবো কী করে কোথায় এলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু রাস্তা কোথায়? সিনাত্রা বলল।

—এখানকার লোকেরা যখন গেছে তখন রাস্তামত নিশ্চয়ই কিছু আছে। দেরি করো না। চল। ফ্রান্সিস বলল।

তিনজনে ঘরের বাইরে এল। বাড়িঘর ছাড়িয়ে আসতেই দেখল সেই পাহাড়ের দিকে একটা বালিভর্তি রাস্তা চলে গেছে। ফ্রান্সিস বলল—পাহাড়ের নিচে দেখ। ঘন বন। এরা ওখান থেকে গাছপালা এনে এখানে বাড়িঘর তৈরী করেছে। এই রাস্তায় ওদের যাতায়াত আছে। সত্যি বালিয়াড়িতে একটা রাস্তামত দেখা গেল। তিনজন পাহাড় বন জঙ্গলের দিকে চলল।

বেশ কিছুদূর যেতেই দূর থেকে লোকজনের কোলাহল শোনা গেল। কাছাকাছি আসতে বাড়িঘর দেখা গেল। কিছু বাড়িঘর পাথরের। তার মধ্যে একটা বড় পাথরের লম্বাটে বাড়ি দেখা গেল। শাঙ্কো বলল—ঐ বাড়িটা বোধহয় রাজবাড়ি। ওরকম বাড়ি আর একটাও দেখা যাচ্ছে না।

বাড়িগুলোর কাছাকাছি আসতে দেখল জায়গাটার মাঝখানে একটা বড় বট গাছ। নিচেটা পাথর দিয়ে বাঁধানো। ওটাকে ঘিরে ভিড়। বটগাছের বিরাট ঝুড়ি নেমেছে। জায়গাটা প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে এই বিকেলেই। গাছের সামনে একটা পাথরের বড় বেদী। বেদীটাকে ঘিরে মানুষের ভিড়। বটগাছের গায়ে একটা পাথরের দেবমূর্তি গাঁথা। গাছের নিচে পাতা ফুল ছড়ানো। বোধহয় দেবপূজা চলছে। একজন পুরোহিত দেবী মূর্তির সামনে বসে আছে। মোটা কাপড়ের পোশাক পরা নারী পুরুষ বেদী ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। উচ্চস্বরে কী বলছে। একজন একটা ফাঁপা কাটাগাছের কান্ডে কাঠের ডান্ডা দিয়ে ঘা মারছে। বুম্ বুম্ শব্দ হচ্ছে।

এতক্ষণে ফ্রান্সিসরা লক্ষ্য করল জনতার একপাশে একদল সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। ঢোলা হাতা মোটা হলদে কাপড়ের পোশাক পরা। কোমরে সাদা কাপড়ের ফেট্টি। তাতে তরোয়াল ঝোলানো। ওদের মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল।

ফ্রান্সিসরা বেদীর কাছাকাছি যেতেই ওদের ওপর সৈন্যদের নজর পড়ল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস সৈন্যরা—বোধহয় বিপদে পড়লাম।

একজন লম্বা মত সৈন্য ফ্রান্সিসের কাছে এগিয়ে এল। বোঝা গেল সে সৈন্যদের দলপতি। ফ্রান্সিসদের সে স্পেনীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করল—তোমরা কে?

—আমরা বিদেশী—ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল?

—এখানে কী করে এলে? দলপতি জিজ্ঞেস করল।

—জাহাজে চড়ে। ফ্রান্সিস বলল।

—এখানে এসেছো কেন? দলপতি প্রশ্ন করল।

—এই মেলা উৎসবে যোগ দিতে। আর একটি কারণ আছে। এখানে জানতে এসেছি এই রাজত্বের নাম আর রাজার নাম। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? দলপতি জানতে চাইল।

—এখনও সবকিছু জানতে পারিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা যে সবুজ রাজার চর নও তার প্রমান কী? দলপতি বলল।

—সবুজ রাজার নাম আমরা জীবনে শুনি নি। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তোমাদের কথা বিশ্বাস করলাম। আমাদের রাজা আসারিয়ার কাছে চলো। উনি জ্ঞানী পুরুষ অনেক ভাষা জানেন। হয়তো তোমাদের সাহায্য করতে পারবেন। যদি জানা যায় যে তোমরা সবুজ রাজার চর তাহলে রাজার সামনেই তোমাদের মেরে ফেলা হবে। দলপতি চলল।

—বেশ। আমরা নির্ভয়। কারণ চরবৃত্তির মত হীন কাজ আমরা করি না। ফ্রান্সিস বলল।

—আচ্ছা। এসো আমাদের সঙ্গে। দলপতি বলল। এই বলে দলপতি রাজবাড়ির দিকে চলল। দলপতির পেছনে পেছনে ফ্রান্সিসরা রাজবাড়ির সামনে এল। পাথরের বাড়ি। পাথরের গায়ে কুঁদে কুঁদে ফুল লতাপাতার নকশা।

দরজার সামনে খোলা তরোয়াল হাতে দুজন প্রহরী। সর্দারকে দেখে মাথা একটু নুইয়ে দরজা খুলে দিল। ওরা অবাক হয়ে দেখল ফ্রান্সিসদের। এরা কোথা থেকে এল? ফ্রান্সিস একটা কথা বুঝল—এই সর্দারই সেনাপতির সম্মান পাচ্ছে।

একটা ঘরে ঢুকল সবাই। মাঝখানে একটা কালো পাথরের টেবিল মতো। চারপাশে পাথরের আসন। একটা শুধু কাঠের হাতলওয়ালা আসন। বোধহয় রাজা আসারিয়ার আসন। এটা বোধহয় রাজার মন্ত্রণাকক্ষ। সেনাপতি রাজবাড়ির অন্দরে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল। আস্তে বলল—রাজা আসারিয়া আসছেন।

ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে রাজা আসারিয়া ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়িয়ে সন্মান জানাল। রাজা হাতলওয়ালা আসনে বসলেন। ফ্রান্সিসদের ব্যবহারে খুশি হলেন। রাজা প্রায় ফ্রান্সিসের সমবাসী। রাজার মুখে অল্প কালো দাড়ি গোঁফ। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চোখ মুখ। পরনে হলুদ পাতলা কাপড়ের পোশাক। বললেন—বসো। ফ্রান্সিসরা বসল। রাজা বলল—তোমাদের কথা শুনলাম। য়ুরোপ এখান থেকে বেশ দূর। যদি দিনরাত জাহাজ চালাও তবুও চারমাস আগে য়ুরোপ পৌঁছাতে পারবে না।

—আমরা কোনদিকে যাবো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—উত্তর পূর্ব মুখে। রাজা বললেন।

—আপনার পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের তিয়েরা রাজ্য কেমন দেখলে? রাজা একটু হেসে বললেন।

—মাত্র এসেছি। সব কিছু তো দেখিনি। শাঙ্কো বলল।

—আজ রাতে এখানে সূর্য দেবের পুজোর উৎসব। দু'দিন চলবে। তোমরা দেখে যেতে পারো। রাজা বললেন।

—হ্যাঁ। সন্ধে হয়ে এল। কোন সরাইখানায় থাকবো ভাবছি। ফ্রান্সিস বলল।

—তা কেন? তোমরা আমার অতিথিআবাসে থাকবে। পূজো দেখবে উৎসব দেখবে। ইচ্ছে করলে কালও থাকতে পারো। ফ্রান্সিস অবাক হয়ে গেল। বেশির ভাগ রাজাই তো ওদের ধরে কয়েদঘরে ঢুকিয়েছে। এই রাজা আসারিয়া অন্য রকম মনে হচ্ছে।

—আপনার আমন্ত্রন আমরা নিশ্চয়ই রাখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি খুশি হলাম। তোমাদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু একটা ব্যাপার নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছি। রাজা বললেন।

—যদি কিছু না মনে করেন—মানে—কারণটা জানতে পারি? ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়ই। আমার রাজত্বের পশ্চিমদিকে সবুজ রাজার রাজত্ব। রাজা বললেন।

—সবুজ রাজা? ফ্রান্সিস কথাটার অর্থ বুঝতে পারল না।

—উনি নিজে আর তাঁর সৈন্যরা সবুজ পোশাক পরে। আর আমরা হলুদ পোশাক পরি। রাজা বললেন।

—ও। সবুজ রাজা বোধহয় আপনার শত্রুপক্ষ। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। রাজা মাথা ওঠানামা করলেন।

—তবু তাকে সম্মান দিয়ে আপনি কথা বললেন। ফ্রান্সিস বলল।

—শত্রুপক্ষ হলেও তিনি রাজা। তাঁর সম্মান প্রাপ্য। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস এবারও একটু অবাক হল।

—যাক গে। তোমরা থাকবে উৎসব দেখবে। রাজা বললেন।

—নিশ্চয়ই থাকবো। ফ্রান্সিস বলল।

এবার রাজা আসারিয়া সেনাপতির দিকে তাকালেন। বললেন—এদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। রাজা চলে গেলেন।

সেনাপতি ফ্রান্সিসদের পেছনে আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা চলল।

বাইরে এসে পাশের একটা ঘরে ঢুকল সবাই। এই ঘরটাও পাথরের। দেয়াল কুঁদে নকশা আঁকা। ঘরের মধ্যে মেঝেয় ঢালাও শুকনো ঘাসপাতার বিছানা। ওপরে মোটা কাপড়ের পরিষ্কার ঢাকা।

—এটাই অতিথি ঘর। অতিথি যাতে খুশিমত বাইরে বেরোতে পারেন তার জন্যে এই ঘরের কোন দরজা নেই। একটা পাথরের পাটা আছে শুধু। রাতের উৎসবে বটগাছের নিচে ঐ বেদীতে নাচগান হবে। আপনারা অবশ্যই দেখবেন। সেনাপতি বললেন।

ফ্রান্সিসরা কিছু বলল না।

—একজন রক্ষী রেখে যাচ্ছি। ওকে যা বলবেন ও তাই করবে। আপনাদের সুবিধে-অসুবিধের কথাও ওকেই বলবেন। সেনাপতি বলল। তারপর চলে গেল।

একটু পরে একজন রক্ষী এল। কিন্তু তার হাতে বর্শা তরোয়াল কিছু নেই। ফ্রান্সিস হেসে বলল—শাঙ্কো, এই প্রথম বোধহয় কোন প্রহরী ছাড়া ঘরে থাকছি। বরাবর তো তরোয়াল-বর্শা উঁচিয়ে রাখা প্রহরীদেরই দরজার সামনে দেখেছি। শাঙ্কোও হেসে বলল—তা যা বলেছো। এত আদর-যত্ন আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। বিছানায় বসে পড়ল। তারপর শুয়ে পড়ল। জোরে শ্বাস ছেড়ে বলল—একটু আরাম করে নেওয়া যাক। দেখাদেখি শাঙ্কোও শুয়ে পড়ল। শুধু সিনেত্রা শুয়ে পড়ল না। বসে রইল। রক্ষী ঘর দুটোয় মশাল জ্বেলে দিয়ে গেল। তারপর ঘরের কোনা থেকে একটা বড় মাটির হাঁড়িতে জল ভরে নিয়ে এল। কাঠের একটা গ্লাস রাখাই ছিল। ফ্রান্সিস উঠে গিয়ে জল খেয়ে এল।

রাত হল। বাইরে বটতলায় বোধহয় নাচগানের আসর বসার তোড়জোড় চলছে। লোকজনের হৈ-হট্টগোল এখন অনেকটা কম।

ফ্রান্সিসরা রাতের খাবার একটু আগেই খেয়ে নিল। রক্ষীটিই খাবার এনে দিল। বেশ মোটা গোল রুটি। একটু পোড়া হলেও খেতে ভালো। সামুদ্রিক মাছের ঝোল আর কী সব সব্জির ঝোল। খুবই সুস্বাদু খাবার। ফ্রান্সিসরা পেট পুরে খেল।

এবার নাচগানের আসরে যাওয়া।

ফ্রান্সিসরা তৈরি হয়ে ঘরের বাইরে এল। রক্ষী ওদের আসরের দিকে নিয়ে চলল।

বেদী ঘিরে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। বেশি হৈ-চৈ হচ্ছে না। সবাই গভীর আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখা গেল বেদীর সামনেই দুটো কাঠের আসনে রাজা আসারিয়া ও রানি বসে আছেন।

ফ্রান্সিসরা একপাশে দাঁড়াল। তখনই দেখল পশ্চিমমুখো রাস্তার দু'পাশে রাজার সৈন্যরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলো উজ্জ্বল। সেই আলোয় দেখল সেনাপতি ওখানে পায়চারী করছে। ফ্রান্সিস বুঝল এসব আত্মরক্ষার আয়োজন কেন। সবুজ রাজার দেশ ওদিকেই। শত্রুরাজা যে কোন সময় আক্রমণ করতে পারে। তাই অতন্দ্র পাহারার ব্যবস্থা। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে শাঙ্কো আর সিনাত্রাকে বলল সেকথা। সিনাত্রা বলল—যদি আক্রমণ হয় আর সবুজ রাজা জিতে যায় তাহলে আমাদের কপালে ভোগান্তি আছে। শাঙ্কোও মাথা নেড়ে কথাটা সমর্থন করল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বুম্-বুম্ শব্দে সেই ফাঁপা গাছের কান্ডটা বাজানো শুরু হল। রাজা আসারিয়া হাত তুলে ইঙ্গিত করলেন। একদল যুবক-যুবতী বেদীর ওপরে উঠে এল। রংদার পোশাক পরেছে সবাই। হাতে রুমাল। রুমাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচ, সুরেলা গলার গান। কিছু সময়ের মধ্যে নাচগান জমে গেল। দর্শকদের মধ্যে হর্ষ-উল্লাস। নাচগান চলল।

একটু সময়ের জন্যে নাচগান থামল। আবার বুম্-বুম্ বাদ্যি। আবার নাচগান শুরু হল। ফ্রান্সিসদের ভালোই লাগছিল।

ফ্রান্সিস বলল—সিনাত্রা তুমিও এই আসরে একটা গান গাও।

—পাগল হয়েছো। এরা আমার গানের কী বুঝবে? সিনাত্রা হেসে বলল।

—গান বোঝার দরকার নেই। সুরই ভালো লাগবে সবারই। শাঙ্কো বলল।

—না-না। সিনাত্রা মাথা নাড়ল।

—আসলে আমার ইচ্ছে রাজাকে খুশি করা। এই আসরে তোমার গান একটা বৈচিত্র্য আনবে। আমি অনুরোধ করছি তুমি এখানে একটা গান গাও। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু—। সিনাত্রা বলতে গিয়ে থামল।

—আমি ব্যবস্থা করছি। শাঙ্কো কী বল? ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়ই গাইবে। এত ভাল গায় ও। জানতামই না। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস রক্ষীকে বলল—রাজা আসারিয়াকে গিয়ে বলো যে একজন ভাইকিং গান গাইতে চায়। উনি যেন অনুমতি দেন। রক্ষীটি চলে গেল কিছু পরে

একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। লোকটার পোশাক-টোশাক দেখে বোঝা গেল লোকটি মাতব্বর গোছের কেউ। লোকটি হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল। বললে—কে গান গাইবেন? আসুন। রাজার হুকুম। ফ্রান্সিস সিনাত্রাকে এগিয়ে দিল। সিনাত্রা আর আপত্তি করল না। বেদীর দিকে এগিয়ে গেল মাতব্বরের সঙ্গে।

নাচগান থামতে মাতব্বরটি বেদীতে উঠে এল। চেঁচিয়ে বলল—একজন বিদেশী ভাইকিং এখানে এসেছে। সে একটি গান গাইবে। মাতব্বরটি দেশীয় ভাষায় বলল ফ্রান্সিস আন্দাজে বুঝল।

সিনাত্রা মঞ্চে উঠল। তারপর গান শুরু করল—

সাগরে চলো ভাই
সাগর আমাদের মা—
অন্য কেউ নাই—
চলো সাগর যাই।

মুহূর্তে গান জমে উঠল। কেউই গানের মানে বুঝল না। কিন্তু সুর আর সিনাত্রার সুন্দর গলা শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হল। গান শেষ হল। শ্রোতাদের মধ্যে হর্ষ ধ্বনি শোনা গেল। আবার যদি গাইতে বলে এই ভেবে সিনাত্রা দ্রুত বেদী থেকে নেমে এল।

রাজা আসারিয়া ইশারায় সিনাত্রাকে কাছে ডাকল। সিনাত্রা এগিয়ে গেল। রাজা সিনাত্রার পিঠ চাপড়ালেন। রানিও হেসে কিছু বললেন। ফ্রান্সিস বুঝল সিনাত্রার গান শুনে দু'জনে খুশি হয়েছেন। সিনাত্রা ফ্রান্সিসদের কাছে এসে দাঁড়াল।

আবার বাদ্যি বেজে উঠল। এবার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নানারঙের পোশাক পরে বেদীতে উঠে নাচতে গাইতে লাগল। আসর জমে উঠল।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে দিয়ে সেনাপতি রাজারানির আসনের কাছে এল। রাজা রানিকে কিছু বলল। রাজা রানি দ্রুত রাজবাড়ির দিকে চলে গেলেন। ফ্রান্সিসরা বুঝল নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে।

সেই মাতব্বরটি ততক্ষণে মঞ্চে উঠে এসে নাচ গান থামিয়ে দিল। চিৎকার করে বলে উঠল—সাবধান—সবুজ রাজা আমাদের দেশ অক্রমন করেছে। সবাই যে যার বাড়ির দিকে যাও।

দর্শকদের মধ্যে চিৎকার চ্যাচামেচি শুরু হয়ে গেল। সবাই যে যার বাড়ির দিকে ছুটল। বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল। কিছু দর্শক ভিড়ের চাপে মাটিতে পড়ে গেল। আহত হল। ফ্রান্সিস বলল—লড়াই শুরু হবে। চলো অতিথি শালায় ফিরে যাই।

অতিথিশালায় ওরা ফিরে আসছে তখনই চাঁদের আলোয় দেখল

পশ্চিমদিকের রাস্তায় লড়াই শুরু হয়েছে। তরোয়ালের ঠোকাঠুকি আর্তনাদ গোঙানি শোনা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিসরা অতিথিশালায় ঢুকল। হ্যারিও ওদের পেছনে পেছনে গেল। বিছানায় বসতে বসতে শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

—এখনই বাইরের রাস্তায় গেলে বিপদে পড়বো। যা বুঝতে পারছি এখন বটতলার কাছাকাছি লড়াই চলছে। নিরস্ত্র অবস্থায় ওদিকে গেলে মারা যেতে পারি। এখানেই অপেক্ষা করি। দেখি লড়াইয়ে কারা জেতে। ফ্রান্সিস বলল।

বাইরে তুমুল লড়াই চলছে তখন। ফ্রান্সিসরা চুপ করে বসে রইল। বাইরে চিৎকার আর্তনাদ গোঙানি চলল।

প্রায় ঘন্টাখানেক লড়াই চলল। আস্তে আস্তে চারিদিক শান্ত হয়ে এল। দ্বারী ঘরে ঢুকে একটু দূরে বসে ছিল। ফ্রান্সিসরা দ্বারীকে বলল—দেখ তো ভাই লড়াই থামল কিনা। দ্বারী দরজার কাছে গেল। চারিদিক ভালো করে দেখে ফিরে এল। মাথা নেড়ে বলল—আমরা হেরে গেছি। সবুজ রাজার সৈন্যরা দুটো বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে। তখন সত্যি মানুষদের ভয়ার্ত চিৎকার ছোটাছুটির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

—তুমি ভাই পালিয়ে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

—না। সেনাপতি আপনাদের দেখাশুনোর জন্যে রেখে গেছেন। আমি হুকুম মানবো। ফ্রান্সিস আর কিছুই বলল না। ফ্রান্সিসরা ঘুমের আশা ছাড়ল। তিনজনে সারারাত জেগে রইল।

তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। চারদিক শান্ত। তার মধ্যে মাঝে মাঝে সবুজ রাজার সৈন্যদের জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

ভোর হল। হঠাৎ বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। ফ্রান্সিস ভাবল—আবার বন্দী জীবন শুরু হবে। হয়তো সবুজ রাজার সৈন্যরা আসছে। ফ্রান্সিসের অনুমানই ঠিক হল। রাজা আসারিয়া ঘরে ঢুকলেন। পেছনে পাঁচজন খোলা তরোয়াল হাতে সবুজ পোশাক পরা সবুজ রাজার সৈন্য। রাজাকে ওরা ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিল। তারপর দু'জন যোদ্ধা খোলা তরোয়াল হাতে দরজার সামনে দাঁড়াল। একজন যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের দেখে একটু অবাকই হল। বলল—তোমরা কে?

—আমরা বিদেশী—ভাইকিং। সিনাত্রা বলল।

—ঠিক আছে। সকালে তোমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।

—বেশ। সিনাত্রা বলল। যোদ্ধাটি চলে গেল।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—মানাবর রাজা আপনি এখানে বসুন। রাজা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। রাজার মুখ শুকনো। মাথার চুল উসকোখুসকো। বোঝাই যাচ্ছে সারারাত ঘুমোন নি। ফ্রান্সিস বলল—আপনি ভাল আছেন তো?

—শরীর ঠিক আছে। কিন্তু হেরে গেলাম। মন ভালো নেই। রাজা বললেন।

—রানি কোথায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—অন্দর মহলে—নজর বন্দী। রাজা বললেন।

—সেনাপতি? ফ্রান্সিস বলল।

—জীবিত সৈন্যদের নিয়ে আমি তাকে পালাতে বলেছি। আমি আর রক্তপাত চাইনি। রাজা বললেন।

—কিন্তু এই অতিথিশালায় আপনাকে বন্দী করল কেন? শাঙ্কো বলল। রাজা ম্লান হেসে বললেন—আমার রাজত্বে কয়েদঘর নেই। আমি মানুষের সততায় বিশ্বাস করি। ফ্রান্সিস রাজার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ করল। এমন একজন উদার মনের মানুষ আজ অসহায়।

—আপনি হেরে গেলন কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—আমার সৈন্যরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি আর মৃত্যু চাইনি। ওদের হার স্বীকার করতে বলেছি। আর বলেছি সেনাপতির সঙ্গে পালিয়ে যাও। সবুজ রাজাকে তো জানি। ওঁর মতো নৃশংস রাজা কাউকে বেঁচে থাকতে দিতে পারেন না। এই নিয়ে সবুজ রাজা চারবার আমার রাজত্ব আক্রমন করল। আমার বীর সৈন্যদের কাছে তিনবার হেরে ফিরে গেছেন। এবার আর ফেরাতে পারলাম না। একটু থেমে রাজা বলতে লাগলেন—আমার সৈন্য সংখ্যা কম ছিল। গতবছর এখানে অনাবৃষ্টি হয়ে গেছে। আমার অনেক বীর সৈন্য মারা গেছে। আসার সময় সমুদ্রতীরে একটা জাহাজ বোধহয় দেখেছো।

—হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কোন লোক ছিল না। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। জাহাজটা ওখানকার জেলেরাই দেখাশোনা করে। এই জাহাজে করে বিদেশ থেকে খাদ্য আনিয়েছিলাম। তাতে সবাইকে বাঁচাতে পারিনি। শুনলে অবাক হবে সবুজ রাজার দেশেও দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তিনি তাঁর বহু প্রজাকে আমার রাজত্বে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। আমি সেই ক্ষুধার্ত প্রজাদের ঠেলে ঐ রাজত্বে পাঠিয়ে দিইনি। বরং ওদের আশ্রয় দিয়েছি—খাদ্য দিয়েছি। একটু থেমে বললেন—ঐ যে বললাম আমার অনেক বীর সৈন্য সেই-দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিল। সবুজ রাজা জানতেন সেটা। বুদ্ধি করে তাই এবার আমাদের দেশ আক্রমন করলেন। কম সৈনা নিয়ে লড়াই করে এবার আমরা হেরে গেলাম। আমার সৈন্যরা প্রানপণ লড়াই করেছে। আমি ওদের লড়াই চালাতে দিইনি। রাজা থামলেন।

—বাকি সৈন্যদের নিয়ে সেনাপতি কোথায় গেছেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলেন।

—ঐ উত্তরের পাহাড়ের দিকে। ঐদিকে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে বোধহয়। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। ওখানে যাবো। সেনাপতি আর সৈন্যদের খুঁজে বার করব। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু এখান থেকে পালাবে কী করে? রাজা বললেন।

—এখান থেকে অনেক কঠিন পাহারার মোকাবিলা করেছি আমরা আর পালিয়েছি। এই ঘরের তো দরজাই নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখো চেষ্টা করে। রাজা একটু হতাশার সুরেই বললেন।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আপনাকে মুক্ত করবই। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আসারিয়া আর কিছু বললেন না।

সকালের খাবার দিয়ে গেল প্রহরীর একজন। রুটি আর আনাজপাতির ঝোল। এটা রাজার খাদ্য নয়। বন্দীর খাদ্য। কিন্তু রাজা নিঃশব্দে খেলেন। অন্য খাবার চাইলেন না।

একটু পরে একজন বেশ মোটা লোক এল। ওর কোমরে তরোয়াল ঝুলছে। গায়ে সবুজ ঢোলা হাতা জামা। প্রহরীরা একটু মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। বোঝা গেল— লোকটি সেনাপতি।

ঘরে ঢুকে সেনাপতি বলল—সবাই চলুন। রাজ দরবারে।

রাজাকে নিয়ে ফ্রান্সিসের ঘরে থেকে বেরিয়ে এল। প্রহরীদের পাহারায় রাজবাড়ির সামনে এল সবাই। বড় দরজাটা দিয়ে ঢুকল। দুটো ঘর পেরিয়ে রাজসভাকক্ষ। দুটো কাঠের আসন পাতা। তাতে গাঢ় লাল রঙের মোটা কাপড় পাতা। আসনে সবুজ রাজা বসা। দুপাশের আসনের একটায় সেনাপতি গিয়ে বসল। অন্যটা একজন বৃদ্ধ বসে। তিনি বোধহয় মন্ত্রী। সবুজ রাজার ঝকঝকে সবুজ রাজপোশাক। সন্দেহ নেই কাপড়টা বেশ দামি। একটু ভারি গলায় রাজা বলল—এসো—আমাদের প্রিয় বন্ধু রাজা আসারিয়া। রাজা আসারিয়া কোন কথা বললেন না। চুপ করে দাঁড়ালেন। সবুজ রাজা তাকে বসতেও দিল না।

সবুজ রাজা মন্ত্রীর দিকে তাকাল। বলল—মন্ত্রী মশাই— বলুন তো রাজা আসারিয়া কী শাস্তি দেওয়া যায়।

—ফাঁসি দিন। মন্ত্রী মৃদু স্বরে বললেন।

—ওটা তো অল্পক্ষণের শাস্তি। আমি চাই একটু কষ্ট ভোগ করে মরুক। বেশ তরোয়াল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বর্শা দিয়ে শরীরটা এফোঁড় ওফোঁড় করে— কথাটা শেষ না করে সবুজ রাজা হা হা করে হেসে উঠল। ফ্রান্সিস ভাবল রাজা আসারিয়া ঠিকই বলেছিলেন সবুজ রাজা নৃশংস। রাজা আসারিয়া কোন কথা বললেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—যাক গে—যে কথা বলছিলাম। তোমার এক পূর্বপুরুষ রাজা সামেনা জলদস্যু ছিল। তাই কিনা? সবুজ রাজা বলল।

—হ্যাঁ। উনি আমাদের বংশের কলঙ্ক। রাজা বললেন।

—সে যাক। কিন্তু জলদস্যুতা করে প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়েছিল। জনশ্রুতি বলে সে এই রাজ্যেরই পাতালঘরে তার ধন সম্পদ গোপনে সে রেখে গেছে। সবুজ রাজা বলল।

—হ্যাঁ আমরাও শুনেছি। রাজা আসারিয়া বলল।

—সেই ধনসম্পদ কোথায় আছে? সবুজ রাজা প্রশ্ন করলেন।

—আমি জানি না। রাজা আসারিয়া বললেন।

—তুমি খোঁজখবর করনি? সবুজ রাজা জানতে চাইল।

—না। প্রয়োজন মনে করিনি। রাজা বললেন।

—কেন? সবুজ রাজা একটু ক্রুদ্ধ হয়েই বলল।

—ওটা অভিশাপ্ত ধনসম্পদ। নিরীহ জাহাজযাত্রীদের জাহাজ লুঠ করে আনা ধন সম্পদের প্রতি আমার কোন লোভ নেই। রাজা আসারিয়া দৃঢ়স্বরে বললেন।

—কিন্তু আমার আছে। তোমার রাজত্ব এই জন্যেই বার বার জয় করার চেষ্টা করেছি। এবার জয়ী হয়েছি। এখন এই রাজ্য আমার। আমি এখন এই রাজ্যের রাজা। তোমার সিংহাসনে বসে আছি। আমি সেই গুপ্ত ধনসম্পদ উদ্ধার করতে চাই। সবুজ রাজা বলল।

—বেশ। চেষ্টা করুন। রাজা আসারিয়া বললেন।

—কিন্তু তোমার সাহায্য চাই। সবুজ রাজা বলল।

—আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করব? কারণ আমি সেই ধনসম্পদ সম্বন্ধে নিজেই কিছু জানি না। রাজা আসারিয়া বললেন।

—অসম্ভব। নিশ্চয়ই জানো। সবুজ রাজা গলায় জোর দিয়ে বলল।

—বললাম তো জানি না। শুধু জানি একটা পাতাল ঘর আছে।

—কোথায় সেই পাতাল ঘর? সবুজ রাজা প্রশ্ন তুলল।

—আমি কিছুই জানি না। রাজা আসারিয়া মাথা নেড়ে বললেন।

—তুমি আমার কাছে সত্য কথাটা লুকোচ্ছো।

—তরোয়াল আর বর্শার খোঁচা খেলে সব সত্যি কথা বেরিয়ে আসবে। সবুজ রাজা বলল।

রাজা আসারিয়া কোন কথা বললেন। সবুজ রাজা সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠল—এখনও সত্যি কথাটা বলো।

—এখন তো এই রাজ্য আপনার। সন্ধান করুন সেই গুপ্ত ধন ভান্ডারের। সবুজ রাজা আবার চেঁচিয়ে বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ। সারা রাজ্য আমি তোলপাড় করে ফেলবো। ঐ ধনভান্ডার আমার চাই।

শাঙ্কো চাপা গলায় বলল—ফ্রান্সিস চেষ্টা করবে? ফ্রান্সিস বলল—এই জঘন্য চরিত্রের লোকটার জন্য আমি এক আঙ্গুলও নাড়বো না। জাহান্নামে যাক। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দেশীয় ভাষায় কথা বলছিল। সবুজ রাজা এবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—কী বলাবলি করছিলে তোমরা?

—বলছিলাম—আপনি মহান রাজা। ফ্রান্সিস বলল।

—রসিকতা? সবুজ রাজা হো হো করে হেসে উঠল। হঠাৎ মুখ গম্ভীর করে বলল —জানো—এই মূহুর্তে তোমার মুন্ডু নামিয়ে দিতে পারি।

—আমি নিরস্ত্র। কাজেই— ফ্রান্সিস আর কথাটা শেষ করল না।

—যদি তোমাকে তরোয়াল দেওয়া হয়। সবুজ রাজা বলল।

—তাহলে মুন্ডু বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করতাম। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো মৃদুস্বরে ডাকল—ফ্রান্সিস। কিন্তু ফ্রান্সিস সবুজ রাজাকে সহ্য করতে পারছিল না। এবার সবুজ রাজা বলল—তোমরা বিদেশী?

—হ্যাঁ—আমরা ভাইকিং। শাঙ্কো বলল।

—এখানে কী করে এলে? সবুজ জিজ্ঞেস করল।

—জাহাজে চড়ে। ফ্রান্সিস বলল।

—শুনেছি তোমরা সমুদ্রে জলদস্যুতা কর। সবুজ রাজা বলল।

—একথাটা অনেক জায়গায় অনেকবার শুনেছি আমরা। কথাটা গায়ে মাখি না। শাঙ্কো বলল।

—তোমাদের ফাঁসিতে লটকালে কেমন হবে? সবুজ রাজা একটু হেসে বলল।

—আপনি জয়ী রাজা। আমাদের নিয়ে যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু জানতে চাইছি আমরা কী অপরাধে অপরাধী? ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা আসারিয়ার হয়ে আমার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছো তোমরা। সবুজ রাজা বলল।

—আমরা অতিথিশালায় ছিলাম। একমুহূর্তের জন্যেও ঘর ছেড়ে বেরোয় নি। ফ্রান্সিস বলল।

—মিথ্যে কথা। সবুজ রাজা গলায় জোর দিয়ে বলল।

—আপনার সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করুন। উনি আমাদের লড়াইয়ের সময় দেখেছেন কিনা। ফ্রান্সিস বলল। সবুজ রাজা সেনাপতির দিকে তাকাল। সেনাপতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল—না মান্যবর রাজা—আমি ওদের লড়াই করতে দেখিনি।

—যাকগে—তোমাদের কালকেই ফাঁসি দেওয়া হবে।

—কারণটা জানতে চাইছি। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—তোমাদের সাহস তো কম নয়। আমার মুখের ওপর কথা বলছো। বেশ গলা চড়িয়ে রাজা বলল। শাঙ্কো আবার মৃদুস্বরে ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। এবার রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—রাজা আসারিয়া আর এই তিন জনকে হত্যার আদেশ দিলাম।

—রানির প্রতি কী সাজা হল? রাজা আসারিয়া বললেন।

—রানি অন্তঃপুরে বন্দিনী হয়ে থাকবে। কথাটা বলে রাজা গট্ গট্ করে চলে গেল।

চার পাঁচজন সৈন্য এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের পাহারা দিয়ে অতিথিশালায় নিয়ে এল। ঘরের বাইরে দু'জন প্রহরী দাঁড়াল। ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস দেখল রক্ষী শুয়ে গোঙাচ্ছে। শাঙ্কো ওর কাছে এল। বলল—কী হয়েছে তোমার?

—পালিয়ে ছিলাম। কিন্তু সবুজ রাজার সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। আমাকে মেরেছে। তবে একেবারে মেরে ফেলেনি। রক্ষী আস্তে আস্তে গোঙাতে লাগল। রাজা আর ফ্রান্সিসরা বিছানায় বসল।

—কী দেখলে বাইরে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—সাংঘাতিক ব্যাপার। সবুজ রাজার সৈন্যদের অত্যাচার চরমে উঠছে। স্ত্রীলোক শিশুরা—কেউ বাদ যাচ্ছে না। নির্বিবাদে সবাইকে হত্যা করছে। যারা কোনরকম বেঁচেছে তারা উত্তরে জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। সবুজ রাজার সৈন্যরা এখন হত্যা করার জন্যে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কপাল জোরে আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি। রক্ষী বলল।

—সবুজ রাজার মত ওর সৈন্যরাও নৃশংস। রাজা আসারিয়া মৃদুস্বরে বললেন। শাঙ্কো ভাবল সুযোগ পেলে এই প্রহরীদের হত্যা করবে।

ফাঁসির কথা শুনে সিনাত্রা খুবই ভেঙে পড়ল। একটু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—ফ্রান্সিস— আমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই।

—কিছু ভেবো না। অত হতাশ হয়ে পড়লে কোন কাজই হয় না। শাঙ্কো বলল।

—আমরা ফাঁসির হাত থেকে বাঁচবো? সিনাত্রার কণ্ঠে সংশয়।

—শোন সিনাত্রা—ফ্রান্সিস বলল—মনে জোর রাখো। শুধু শরীরের জোরে সব কাজ হয় না। পালানোর ছক আমার ভাবা হয়ে গেছে। শুধু নরহত্যা আমি চাই না। সেটাই করতে হবে। ধৈর্য ধরে। রাজা আসারিয়া ফ্রান্সিসের কথা শুনলেন। আস্তে বললেন—তাহলে আমরা বাঁচবো?

—হ্যাঁ মান্যবর রাজা। ঠিক সময়ের জন্যে অপেক্ষা করুন। তবে সব কাজ আমাদের যত দ্রুত সম্ভব সারতে হবে। সবুজ রাজা আমাদের ফাঁসির আদেশ দিয়েছে। কালকেই কাজেই আজ রাতেই পালাতে হবে ফ্রান্সিস বলল। রাজা ফ্রান্সিসের কথা ঠিক বুঝলেন না। তবে আর কোন কথা বললেন না।

রাত হল। একটু রাতে ফ্রান্সিসদের খাবার এল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—কেউ ঘুমবে না। মান্যবর রাজা আপনিও ঘুমুবেন না।

—বেশ। রাজা মৃদুস্বরে বললেন।

একসময়ে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। খোলা দরজার কাছে গিয়ে বলল—একবার ঘরে এসো তো?

—কেন? কী হল? প্রহরীটি জিজ্ঞেস করল।

—মশালগুলো নিভিয়ে দিয়ে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? বেশ তো আলো পাচ্ছো। প্রহরীটি বলল।

—আলো চোখে লাগছে। ঘুম আসছে না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। যেমনটি চাও। প্রহরটি বলল। তারপর তরোয়াল কোমরে গুঁজে ঘরের মধ্যে ঢুকল। উঁচু হয়ে হাত বাড়িয়ে মশাল দুটো নিভিয়ে দিল। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো এক লাফে উঠে দাঁড়াল। বুকের কাছে পোশাকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করল। তারপর অন্ধকারে নিশানা ঠিক করে প্রহরীটির বুকে ছোরা বিঁধিয়ে দিল। প্রহরীটির মুখ থেকে কোন শব্দই বেরুলো না! ও বিছানার ওপর পড়ে যাচ্ছিল । শাঙ্কো ওকে চেপে ধরে বিছানার ওপর আস্তে শুয়ে দিল। কোন শব্দ হল না।

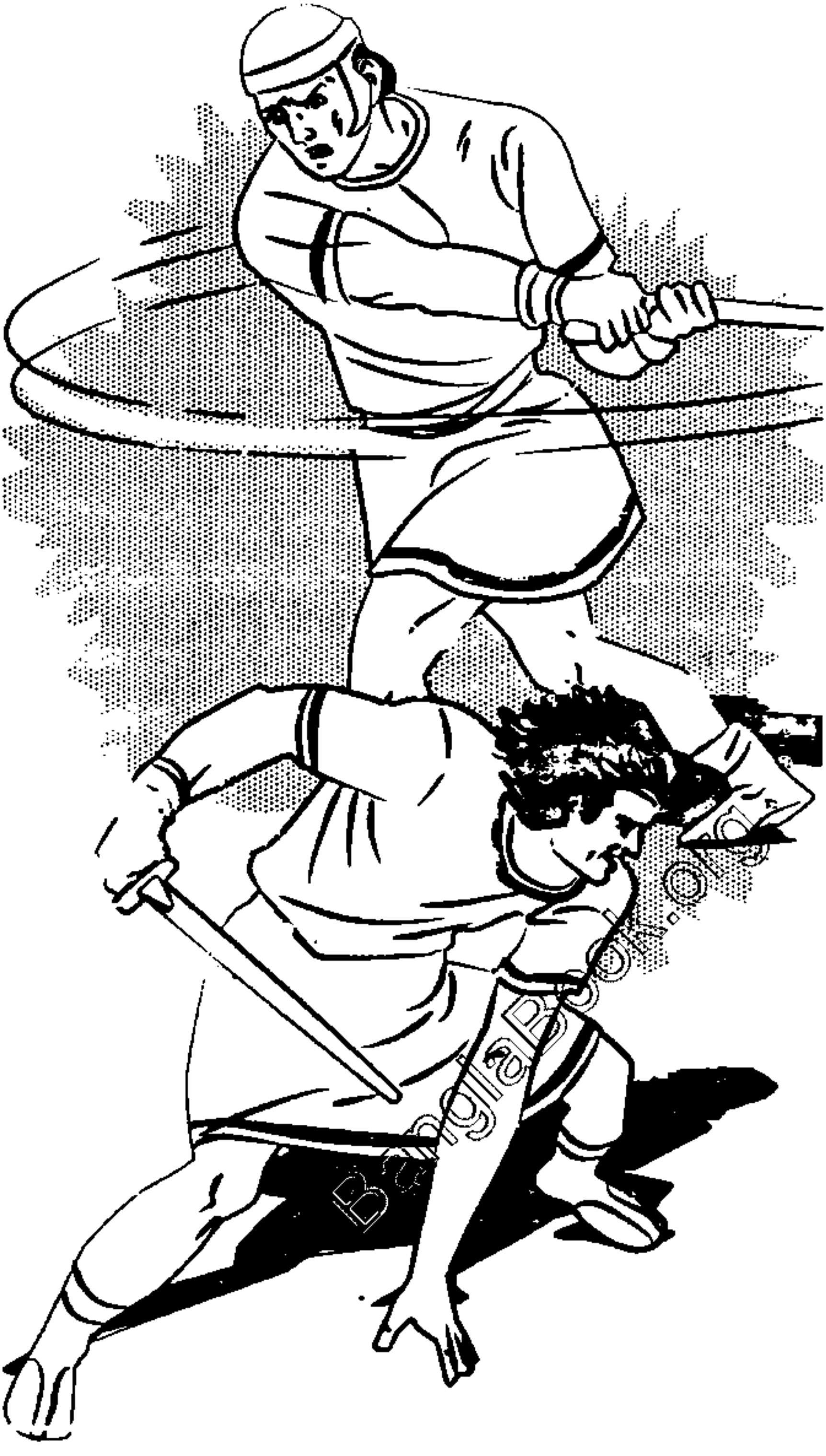
ততক্ষণে ফ্রান্সিস বাইরে চলে এসেছে। অন্য প্রহরীটি কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিস ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রহরীটি চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে দ্রুত তরোয়াল তুলে প্রহরিটির বুকে বসিয়ে দিল। একটা মৃদু 'ওক্' শব্দ ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। দু'একবার এপাশ ওপাশ করে প্রহরীটি স্থির হয়ে গেল।

শাঙ্কো চাপাস্বরে বলল—বাইরের আলোটা? ফ্রান্সিস বলল—ওটা থাক। নইলে সৈন্যদের সন্দেহ হবে। মান্যবর রাজা সিনাত্রা—বাইরে আসুন সব। ঐ জঙ্গলের দিকে ছুটুন সবাই।

বাইরে চাঁদের আলো অনুজ্জ্বল। তবে আবছা সবকিছু দেখা যাচ্ছে।

রাজবাড়ির আড়ালে আড়ালে ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে ছুটল সবাই। রাজ বাড়ির আড়াল ছাড়িয়ে রাস্তায় নামল সবাই। এইভাবে পালানো যাবে রাজা আসারিয়া ভাবতেও পারেন নি। সেটাই ঘটল। রাজা মনে মনে ফ্রান্সিসের বুদ্ধির প্রশংসা করলেন।

রাস্তার ডানদিকেই বনভূমির শুরু। সবাই রাস্তা পার হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এতক্ষণে আড়াল পাওয়া গেল। দূরে রাজবাড়ির কাছে হৈ হল্লা ডাকাডাকি শোনা গেল। ওরা বুঝেছে বন্দীরা পালিয়েছে। তাদের সঙ্গে রাজাও পালিয়েছেন।



বনে ছাড়া ছাড়া গাছ। ছুটতে সুবিধে হচ্ছিল। গুঁড়িতে পা রেখে ঘন ঝোপঝাড় ঠেলে সরিয়ে চলল সবাই।

এবার ফ্রান্সিস থামল। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। কম বেশি সবাই হাঁপাচ্ছে তখন। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—মান্যবর রাজা এখানে বা পাহাড়ে কোথাও আশ্রয় নেবার মত জায়গা আছে?

—আছে। মনে হয় সেনাপতি বাকি সৈন্যদের নিয়ে সেখানেই আশ্রয় নিয়েছে। রাজা বললেন।

—কোথায় সেটা? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—একটা বড় ঘর এই বনে তৈরী করিয়েছিলাম। আমার ঈশ্বরচিন্তার ঘর। মাঝে মাঝে রাজবাড়ি ছেড়ে এখানে এসে থাকি। ঈশরের ধ্যান করি। কিছুদিন থেকে আবার রাজবাড়িতে ফিরে যাই। রাজা বললেন।

—ঘরটা খুঁজে পাবেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কেন জানি না সেই ঘরের চারপাশের গাছগুলো মরে গেছে। সেই জায়গাটা দেখলেই বুঝতে পারবো। রাজা বললেন।

—তাহলে চলুন। খুঁজে দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই চলল এবার। রাজা হাত তুলে ডানদিক দেখালেন। ডানদিকে চলল সবাই।

হঠাৎ দেখা গেল কিছু মরা গাছ। তখনই অস্পষ্ট দেখা গেল একটা বড় টানা ঘর।

সবাই ঘরটার দরজার কাছে এল। ঘরে ঢোকার দরজাটা হাঁ করে খোলা। সবাই ঘরটায় ঢুকল। অন্ধকার ভাবটা চোখে সয়ে আসতে দেখা গেল ঘরের একপাশে একটা বড় বিছানা আর কয়েকটা কাঠের আসন। ঘরে কেউ নেই।

—বোঝা যাচ্ছে সেনাপতি এখানে আশ্রয় নেন নি। ফ্রান্সিস বলল। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল—সেনাপতি ঠিক কাজই করেছেন। এখানে আশ্রয় নিলে সহজেই ধরা পড়তেন। সবুজ রাজা নিশ্চয়ই সেনাপতি ও সৈন্যদের খোঁজে এখানে তার সৈন্য পাঠাবে। এই বাড়িটার চারপাশে মরা গাছের বন। সহজেই ঘরটা নজরে পড়বে। এখন সেনাপতি অন্যত্র কোথাও আশ্রয় নিয়েছেন সেটা আপনি বুঝতে পারছেন? ফ্রান্সিস রাজা আসিরিয়াকে জিজ্ঞেস করল।

—না। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। রাজা মাথা নেড়ে বললেন।

—যাক গে। রাত আর বেশি বাকি নেই। এখানেই বাকি রাতটা কাটাই। কাল সকালে সেনাপতির খোঁজ করবো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল—সবাই যতটা পারো ঘুমিয়ে

নাও। রক্ষীকে বলল—তোমার শরীর ভালো নেই। তুমি বিছানায় শোও। রাজাকে বলল—বিছানা বড়। আপনিও বিছানায় শোন। পরিশ্রান্ত রাজা বিছানায় শুয়ে পড়লেন। রক্ষীও শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো আর সিনাত্রা চেয়ার-টেবিলে বসল। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। ওরা এভাবে ঘুমুতে অভ্যস্ত। ফ্রান্সিসও একটা চেয়ার বসল। চোখ বন্ধ করল। কিন্তু ঘুমোল না।

পাখির কিচিমিচির ডাকে ঘুম ভাঙল সকলের। ফ্রান্সিস বলল—এখনই চলো সব। সেনাপতি আর সৈন্যদের খুঁজে বার করতে হবে। ফ্রান্সিস রাজাকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা ঐ দুটো পাহাড়ের কোথাও গুহাটুহা আছে?

—আমি ঠিক বলতে পারছি না। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। চলুন খুঁজে দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই বনের মধ্যে দিয়ে উত্তরমুখো চলল। কিছু পরেই বন শেষ। সামনে দুটো পাহাড়। ডানদিকের পাহাড়টা সবুজ ঘাসে ঢাকা। বাঁদিকের পাহাড়টার অন্যরূপ। পাহাড়টায় গাছ নেই, ঘাস নেই। রুক্ষ ধূসর রঙের পাহাড়। দুটো পাহাড়ের বৈপরীত্য লক্ষ্য করল ফ্রান্সিস। বুঝল গুহা থাকলে বাঁদিকের রুক্ষ পাহাড়টাতেই আছে। ডানদিকের পাহাড়ে গুহাটুহা থাকার সম্ভাবনা কম।

ও বাঁদিকের পাহাড়টার দিকে চলল। কিছুদুর যেতেই সামনে দুই পাহাড়ের মাঝখানে উপত্যকামত। ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে উপত্যকটায় নামল সবাই। চারদিকে তাকিয়ে সবাই গুহামুখ খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোন গুহামুখ দেখল না।

—মান্যবর রাজা—ফ্রান্সিস রাজাকে বলল—আপনি জোর গলায় সেনাপতিকে ডাকুন। রাজা দুই হাতের তালু গোল করে ডাকলেন—

—সেনাপতি—কোথায় আছেন? পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল—

—এন-এন-এন। কিছুক্ষণ রাজা অপেক্ষা করলেন। পরে আবার ডাকলেন। প্রতিধ্বনিত হল এন-এন-এন। কিন্তু সেনাপতির কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

—চলুন—পাহাড়ের ওপাশে যাই। ফ্রান্সিস বলল। সবাই পাহাড়টা ঘুরে ওপাশে গেল। রাজা আবার ডাকলেন। কিন্তু সেনাপতির কোন সাড়া নেই।

আরো কিছুটা গিয়ে এবার ফ্রান্সিস ডাকল—

—সেনাপতি—মান্যবর রাজা এসেছেন। বারকয়েক ডাকতে ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল কিছুটা উঁচুতে একটা পাথরের চাঁই নড়ছে। ফ্রান্সিস বলে উঠল—ঐখানে গুহা আছে। চলুন।

সবাই পাথরের ওপর পা রেখে রেখে সেই পাথরের চাঁইটার সামনে এল। ততক্ষণে পাথরের চাঁইটা অনেকটা সরে গেছে। গুহার মুখ দিয়ে সেনাপতি বেরিয়ে এল। সঙ্গে দুজন সৈন্যও বেরিয়ে এল।

সেনাপতি এগিয়ে এসে বলল—আসুন মান্যবর রাজা—

আমরা এই গুহাতেই আশ্রয় নিয়েছি। শুনলাম আপনি বন্দী হয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। তারপর ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বললেন—এদের জন্যে পালিয়ে আসতে পেরেছি।

সবাই গুহার মধ্যে ঢুকল। কয়েকজন সৈন্য মিলে পাথরের চাঁইটা দিয়ে গুহামুখ আটকে দিল। অবশ্য একেবারে বন্ধ করে দিল না। কিছুটা ফাঁক রাখল বাতাস চলাচলের জন্যে।

গুহার মধ্যে মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় দেখা গেল বেশ কিছু সৈন্য গুহার পাথুরে মেঝেয় শুয়ে বসে আছে। গুহার মাঝখানে তরোয়াল-বর্শা স্তূপ করে রাখা। একপাশে রান্নার জায়গা।

একটা মোটা কাপড় গুহার মেঝেয় দেয়াল ঘেঁষে পাতা ছিল। সেনাপতি রাজাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বসাল। রাজা চুপ করে বসে রইলেন।

ফ্রান্সিসরাও বসল। ফ্রান্সিস পাথুরে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। শুনল রাজা আর সেনাপতির মধ্যে কথাবার্তা চলছে। সেনাপতি বলল—মান্যবর আপনার শরীর ভালোতো?

—হ্যাঁ শরীর ভালো। কিন্তু মন ভালো নেই। কী করে সবুজ রাজার দখল থেকে রাজ্য উদ্ধার করবো তাই ভাবছি। রাজা বললেন। কথাটা শুনে ফ্রান্সিস উঠে বসল। আস্তে আস্তে রাজার কাছে গেল। বলল—মান্যবর, আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনার জাহাজ সমুদ্রের যে ঘাটে আছে আমার বন্ধু সেখানে যাবে। আমাদের জাহাজ থেকে আমার সব বন্ধুদের এখানে নিয়ে আসবে। আমরা কৌশলে লড়াই করবো যাতে অল্প সৈন্য নিয়েও যুদ্ধে জেতা যায়।

—আমি তো কোন আশা দেখছি না। রাজা বললেন।

—নিরাশ হবেন না। আমি ফ্রান্সিস—প্রতিজ্ঞা করছি আপনার রাজত্ব আপনাকে ফিরিয়ে দেব। রাজা কিছু বললেন না।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোদের কাছে ফিরে এল। বলল—শাঙ্কো সিনাত্রা—আমি স্থির করেছি এই মহানুভব রাজা আসারিয়ার হয়ে আমরা লড়াই করবো। শাঙ্কো তুমি আজকেই সন্ধ্যেবেলা সমুদ্রতীরে যাও। কাল রাতে বন্ধুদের নিয়ে এখানে চলে এসো।

—একটা কথা ফ্রান্সিস—শাঙ্কো বলল—সেনাপতির যে সৈন্যদের দেখছি তারা তো সংখ্যায় বেশি নয়। আমাদের বন্ধুরা এসে যোগ দিলেও সংখ্যাটা তো তেমন বাড়বে না।

—সবুজ রাজার সৈন্যদের ওপর আমরা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাবো। বুদ্ধি করে ওদের হার মানাবো। সামনা সামনি লড়াইতে যাবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—এটা মন্দ বলোনি। ওভাবেই লড়াই চালাতে হবে। শাঙ্কো বলল।

সকালের খাবার দেওয়া হল। গাছের লম্বাটে পাতার ওপর পোড়া রুটি আর আনাজের ঝোল। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা পেট পুরে খেল। রাজা আসারিয়া এমন খাবারে অভ্যস্ত নয়। তবু বিনা দ্বিধায় খেলেন।

সারাদিন কাটল। গতরাতে ভালো ঘুম হয় নি। ফ্রান্সিসরা দুপুরে ঘুমিয়ে নিল।

সন্ধ্যের পরে পরেই যা রান্না হয়েছিল শাঙ্কো সেইটুকুই খেয়ে নিল। কিছুক্ষণ ছোরাটা পাথরে ঘষে ধার করল।

একটু রাত হতেই গুহা থেকে বেরিয়ে এল। রাজা আসারিয়া বলে দিয়েছিলেন বনের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণমুখো গেলেই সমুদ্রতীরে যাওয়ার রাস্তাটা পাওয়া যাবে। শাঙ্কো অন্ধকার বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দিক ঠিক করে চলল।

যেতে যেতে রাত শেষ হয়ে এল। ভোর হবার কিছু আগে শাঙ্কো সমুদ্রের ধারে পৌঁছল। দেখল ওদের জাহাজের পাশেই রাজার জাহাজটা নোঙর ফেলে আছে।

সমুদ্রতীরের বালিয়াড়িতে তুলে রাখা নৌকোটা টেনে নিয়ে জলে ভাসাল। দাঁড় টেনে চলল। অস্পষ্ট চাঁদের আলো। শাঙ্কো আস্তে আস্তে নৌকোটা জাহাজের গায়ে ভেড়াল। দড়ি দিয়ে নৌকোটা বাঁধল। তারপর হালের দড়িদড়া ধরে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল।

কয়েকজন বন্ধু ডেক-এ ঘুমিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে বিস্কো ছিল। শাঙ্কো ঠেলা দিয়ে বিস্কোর ঘুম ভাঙাল। বিস্কো ধড়ফড় করে উঠে বসল। আবছা আলোয় শাঙ্কোকে চিনে ফেলে গলা চড়িয়ে বলে উঠল—আরে শাঙ্কো। চারদিকে তাকিয়ে বলল—ফ্রান্সিস, সিনাত্রা? বিস্কোর কথা শুনে অন্যদেরও ঘুম ভেঙে গেছে তখন। ওরাও ফ্রান্সিসদের কথা জিজ্ঞেস করল।

—ফ্রান্সিস সিনাত্রা ভালো আছে। এখন হ্যারিকে ডাকো। কথা আছে। শাঙ্কো কথাটা বলে ক্লান্ত দেহে ডেক-এ বসে পড়ল। বিস্কো ছুটল হ্যারিকে ডাকতে।

একটু পরেই হ্যারি ছুটতে ছুটতে এল। বলল শাঙ্কো—।

—সব বলছি। শাঙ্কো হাতের চেটো তুলে বলল। ততক্ষণে মারিয়াও ছুটে এসেছে। অন্য বন্ধুরা আসতে লাগল।

তখন শাঙ্কো সব ঘটনা বলল। তারপর বলল—

—তোমরা সন্ধ্যেবেলা সবাই তৈরী হয়ে নেবে। একটু রাতে অন্ধকারে আমরা সেই পাহাড়ে যাবো। বনের মধ্যে দিয়ে।

—আবার লড়াই হবে? মারিয়া মৃদুস্বরে বলল।

—হ্যাঁ। সবুজ রাজা নৃশংস। তাকে তাড়াতেই হবে। শুনলেন তো সবুজ

রাজা আমাদের ফাঁসি দিতে চেয়েছে। রাজা আসারিয়া একজন উদার মনের রাজা। তাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করতে চেয়েছিল। আমরা এসব পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছি। শাঙ্কো বলল।

ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। শুয়ে বসে দিন কাটানো ওদের ধাঁতে নেই। লড়াইয়ের মধ্যে থাকতেই ওরা ভালবাসে। বীর জাতির এটাই লক্ষণ।

সন্ধ্যের পরই খেয়ে নিল সবাই। একটু রাত হতেই সবাই তরোয়াল কোমরে গুঁজে বেরিয়ে ডেকএ উঠে এল।

দু'টো নৌকাতে চড়ে দফায় দফায় ওরা সমুদ্রতীরে উঠল। তারপর রাস্তা ধরে চলল। হাঁটতে হাঁটতে শাঙ্কো চাপা স্বরে বলল—এই রাস্তাটা তাড়াতাড়ি পার হতে হবে। পা চালাও। সবাই দ্রুত হাঁটতে লাগল। চাঁদের আলো উজ্জ্বল নয়। তবে চারপাশ মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল।

এবার রাস্তার ধারেই বনভূমির শুরু হল। শাঙ্কোর পিছনে পিছনে সবাই বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে চলা শুরু হল।

এক সময়ে ওরা রাজা আসারিয়ার সেই ঘরের কাছে এল। এবার ঘর পার হয়ে উত্তর মুখো পাহাড়ের দিকে চলল। পাহাড়ের তলায় যখন পৌঁছল তখনও ভোর হয়নি। সবাই কম বেশি হাঁপাচ্ছে তখন।

গুহামুখের কাছে পৌঁছাল সবাই। গুহামুখের পাথরের চাইয়ের ফাঁকে মুখ রেখে শাঙ্কো বেশ জোরেই ডাকল—ফ্রান্সিস? নানা চিন্তায় ফ্রান্সিসের ঘুম প্রায় হয়-ই নি। প্রথম ডাকটাই ওর কানে গেল। ও উঠে পড়ল। কয়েকজন সৈন্যকে ঠেলা দিয়ে তুলল। ওদের নিয়ে গুহামুখে পাথরের চাঁই সরাল। ভাইকিং বন্ধুরা একে একে গুহার মধ্যে ঢুকল।

রাজা আসারিয়া সারারাত ঘুমোন নি। জেগে বসে ছিলেন। তাঁরও চিন্তার শেষ নেই। তিনি ভাইকিংদের ঢুকতে দেখলেন। একটু আশ্বস্ত হলেন। যোদ্ধার সংখ্যা বাড়ল। সবুজ রাজাকে হার স্বীকার করতেই হবে। নিজেকে রানিকে মুক্ত করতে হবে।

সকাল হল। রাজার সৈন্যরা ভাইকিংরা গুহার পাথুরে মেঝেয় শুয়ে বসে আছে।

ফ্রান্সিস ঘুম ভেঙে দেখল রক্ষীটি নেই। রক্ষীটি ওর কাছেই শুয়ে ছিল। ও রাজাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—রক্ষীটি কোথায়? ও তো অসুস্থ ছিল।

—শেষ রাতে পালিয়েছে। অবশ্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কী করে খবর পেয়েছে ওর একমাত্র ছেলেকে সবুজ রাজার সৈন্যরা হত্যা করেছে। রাজা বললেন।

সকালের খাবার খাওয়ার পর ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, আমি আর শাঙ্কো সবুজ রাজার সৈন্যদের কাছে ধরা দেবো। তোমরা আমাদের পেছনে পেছনে বনের শেষে এসে গাছের আড়ালে অপেক্ষা করবে। সবুজ রাজার কিছু সৈন্য যাতে বনের মধ্যে ঢোকে আমি সেই ব্যবস্থা করবো। তারা সংখ্যায় কম হবে। তোমরা বনের আড়াল পাবে। সেই সৈন্যদের হারাতে হবে। জোর লড়াই চালাবে। তারপর রাজবাড়ি আক্রমণ করবে। সবাই উঠে তৈরি হয়ে নাও।

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে রাজার সৈন্যরা ভাইকিং বন্ধুরা উঠে দাঁড়াল। তৈরি হয়ে কোমরে তরোয়াল গুঁজে নিল। ফ্রান্সিস রাজাকে বলল—মান্যবর আপনি এখানেই থাকুন। রাজা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—না। বিপদের মুখে তোমরা যাচ্ছো। আমিও যাবো।

—বেশ চলুন। কিন্তু সঙ্গে তরোয়াল নিন। আপনাকেও হয়তো লড়তে হতে পারে। ফ্রান্সিস বলল। রাজা তাঁর তরোয়ালটা কোমরের খাপে ভরে নিলেন।

এবার সবাই আস্তে আস্তে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। প্রায় অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে চলল সবাই।

বনের শেষ প্রান্তে পৌঁছল সবাই। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে নিয়ে বন থেকে বেরোতে যাবে তখন হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—শুনলাম সবুজ রাজা নৃশংস। তোমাদের কোন বিপদ—তরোয়াল নাও।

—কিছ্ছু ভেবো না। আমার ছক কষা হয়ে গেছে। জয় আমাদের হবেই। ফ্রান্সিস হ্যারিকে আশ্বস্ত করল। তরোয়াল ছাড়াই দুজনে চলল।

দুজনে বন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠল। চলল রাজবাড়ির দিকে। এ সময়ই সবুজ রাজাকে রাজসভায় পাওয়া যাবে।

রাজবাড়ির কাছাকাছি আসতেই সবুজ রাজার কয়েকজন প্রহরী ওদের দেখতে পেল। ওরা ছুটে এসে ওদের দুজনকে ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস দুহাত তুলে বলে উঠল—আমরা নিরস্ত্র। তরোয়াল চালিও না। আমাদের সবুজ রাজার কাছে নিয়ে চল। রাজার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।

—কী কথা? একজন প্রহরী জিজ্ঞেস করল।

—সেটা রাজাকেই বলবো। নিয়ে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

সবুজ রাজা কাঠের সিংহাসনে বসে আছে। সভাকক্ষে খুব ভিড় নেই। একপাশে কয়েকজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। তরোয়াল কোষবদ্ধ। লড়াইয়ে জিতে গেছে। কাজেই ওরা নিশ্চিন্ত।

বন্দী ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোকে দেখে সবুজ রাজা হেসে উঠল। বলল—ধরা পড়েছো তাহলে? ফ্রান্সিসরা কোন কথা বলল না।

—এবার আর তোমাদের রেহাই নেই। ফাঁসিতে লটকাবোই। আমার দুজন সৈন্যকে তোমরা হত্যা করে পালিয়েছো। রাজা বলল।

—আমরা হত্যা না করলে ওরা আমাদের হত্যা করতো। আপনার সৈন্যরা আপনার মতই। বন্দী-টন্দী বোঝে না। সোজা মেরে ফেলে। ফ্রান্সিস বলল।

—এই দোষারোপের জন্যে এক্ষুণি তোমাকে মেরে ফেলতে পারি, তা জানো? সবুজ রাজা বেশ রেগেই বলল।

—তার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কী খবর? সবুজ রাজা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

—রাজা আসিরিয়া তার সেনাপতি সৈন্যদের নিয়ে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে তা আমরা দেখেছি। ফ্রান্সিস বলল। সবুজ রাজা বেশ চমকে উঠল। বলল—কোথায়?

—তার আগে বলুন সেটা জানালে আমাদের মুক্তি দেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—সে পরে দেখা যাবে। সবুজ রাজা বলল।

—তাহলে আমরাও সে সংবাদ দেব না। ফ্রান্সিস বলল।

—চাবুক মেরে খবর বের করবো। সবুজ রাজা গলা চড়িয়ে বলল।

শাঙ্কো মৃদুস্বরে ডাকলো—ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস একটু ভাবলো। বলল—

—ঠিক আছে। বলছি। ঐ বনের মধ্যে রাজা আসিরিয়ার একটা ঘর আছে।

—ঘর? বনের মধ্যে? সবুজ রাজা বলল।

—হ্যাঁ। সেই ঘরে রাজা আসিরিয়া সেনাপতি আর সৈন্যদের নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি। সবুজ রাজা সেনাপতির দিকে তাকাল। সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—আমি সৈন্য নিয়ে এক্ষুণি যাচ্ছি।

—বেশি সৈন্য নিয়ে যাবেন না। এখানে রাজবাড়িতেও তো সৈন্য রাখতে হবে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—সেনাপতি বেশ রেগে গেল। বলল—তুমি লড়াইয়ের কী বোঝ?

—তা ঠিক। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল। শাঙ্কো মৃদু হাসল। সেনাপতি বলছে ফ্রান্সিস লড়াইয়ের কিছু বোঝে না। সেনাপতি ছুটে চলে গেল।

তখনই কয়েকজন প্রহরী সেই রক্ষীটিকে নিয়ে এল। তার পোশাক ছেঁড়া। সারা গায়ে পিঠে চাবুকের দাগ। পিঠটা যেন ফুলে উঠেছে। গায়ে পিঠে জমাট রক্ত। ফ্রান্সিস আর তাকিয়ে দেখতে পারল না। মাথা নিচু করল।

—অ্যাই? কী হয়েছে তোর? সবুজ রাজা ব্যঙ্গ করে বলল।

রক্ষীটি গোঙাতে গোঙাতে বলল—আপনার—সৈন্যরা—আমার একমাত্র— ছেলেটাকে—।

—মেরে ফেলেছে? সবুজ রাজা গলা চড়িয়ে বলল।

রক্ষী মাথা ওঠানামা করল। ফ্রান্সিস স্থির থাকতে পারল না। বলে উঠল—এ ভাবে মেরে ফেলা—। সবুজ রাজা চিৎকার করে উঠল—চোপ্। ফ্রান্সিস তবু বলল—ছেলেটাকে মারা হল। একেও বিনা দোষে এভাবে চাবুক—

—তাহলে একে মেরে ফেলি। সবুজ রাজা কথাটা বলেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। কোমর থেকে তরোয়াল কোষমুক্ত করল। চেঁচিয়ে বলল—তবে এটাও মরুক। মুহূর্তে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল রক্ষীটির বুকে।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল—শাঙ্কো। শাঙ্কো তৈরিই ছিল। জামার তলা থেকে দ্রুতহাতে ছোরাটা বের করল। প্রহরীরা রাজসভার লোকেরা কিছু বোঝার আগেই সবুজ রাজার ওপর শাঙ্কো ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমূল ছোরা বিঁধিয়ে দিল সবুজ রাজার বুকে। সবুজ রাজা উল্টে পড়ল সিংহাসনের ওপর। তারপর সিংহাসনসুদ্ধু উল্টে পড়ল মেঝেয়। তার হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। ফ্রান্সিস একলাফে ছুটে গিয়ে তরোয়ালটা তুলে নিল। ওদিকে রক্ষীটিও মেঝেয় পড়ে মারা গেছে।

এতক্ষণে প্রহরীরা সচকিত হল। তরোয়াল কোষমুক্ত করে দুজন প্রহরী শাঙ্কোর দিকে ছুটে এল। ফ্রান্সিস এক ছুটে শাঙ্কোকে আড়াল করে দাঁড়াল। একজন প্রহরী ফ্রান্সিসের তরোয়ালের মার ঠেকাতে গিয়ে বাঁদিকে ঝুঁকে পড়ল। ফ্রান্সিস এই সুযোগ ছাড়ল না। প্রচন্ড জোরে তরোয়ালের ঘা মারল প্রহরীটির ডান কাঁধে। প্রহরীটি তরোয়াল ফেলে বাঁ হাতে ডান কাঁধ চেপে ধরল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে তরোয়ালটা মেঝে থেকে তুলে নিল। বাঁ হাতে ছোরা আর ডানহাতে তরোয়াল নিয়ে শাঙ্কো প্রহরীদের সঙ্গে লড়াই চালাল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রহরীরা হার স্বীকার করল। ফ্রান্সিসদের নিপুণ তরোয়াল চালানো দেখে ওরা অবাক হয়ে গেল।

তখনই রাজবাড়ির বাইরে চিৎকার হৈহৈ শোনা গেল। একটু পরেই রাজবাড়ির দ্বারদেশে ধ্বনি উঠল—ও—হো—হো। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোও ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

দল বেঁধে খোলা তরোয়াল হাতে ভাইকিং বন্ধুরা রাজসভায় ঢুকে পড়ল। সঙ্গে রাজা আসিরিয়ার সৈন্যরাও ঢুকল। ফ্রান্সিস বুঝল ওদের জয় হয়েছে।

হ্যারি ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ওর চোখে জল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে মৃদুস্বরে বলল—এই কেঁদো না। রাজা আসিরিয়া কোথায়?

—আসছেন। উনিও লড়াইয়ে পটু। হ্যারি বলল।

সিনাত্রা গড়িয়ে পড়া সিংহাসনের কাছে গেল। টেনে তুলে ওটা ভালোভাবে পেতে দিল। শাঙ্কোও ওকে সাহায্য করল।

কিছুপরে রাজা আসিরিয়া ঢুকলেন। তার পেছনে সেনাপতি।

রাজা আসিরিয়া সবুজ রাজাকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বললেন—উনি কি মারা গেছেন?

—হ্যাঁ। তার প্রাপ্য শাস্তি পেয়েছে। মৃত সবুজ রাজার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রাজা সিংহাসনে বসলেন। এবার ফ্রান্সিকে বললেন—তোমাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তোমাদের জন্যে আমি শুধু জীবনই ফিরে পেলাম না আমার রাজত্বও ফিরে পেলাম। তারপর হেসে বললেন—

—আমার কাছে তো তোমাদের কিছু প্রাপ্য হয়।

—আমরা কিছুই চাই না। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল।

—কিছ্ছু না? রাজা বললেন।

—না—কিছ্ছু না। শুধু একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা কী? রাজা সাগ্রহে বলে উঠলেন।

—সেটা কালকে এখানে এসে বলবো। আমরা সবাই ক্লান্ত। আজকে আর কোনো কথা নয়। আপনিও অন্দরমহলে যান। রানিমা নিশ্চয়ই খুব দুশ্চিন্তায় আছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক-ঠিক। রাজা সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। অন্দরমহলের দিকে চললেন।

ফ্রান্সিসরা অতিথিশালায় ফিরে এল। একজন রক্ষী এসে বলল—আপনাদের দেখাশোনা করতে সেনাপতি পাঠালেন।

—ঠিক আছে। তুমি এখানেই থাকো। শাঙ্কো বলল। ফ্রান্সিসের সেই মৃত রক্ষীর কথা মনে পড়ল। ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ফ্রান্সিসরা অতিথিশালায় শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। দুপুরের খাওয়ার পরও বিশ্রাম নেওয়া চলল।

সন্ধ্যেবেলা কয়েকজন বন্ধু তিয়ের নগর দেখতে বেরুলো। ওরা ফিরে এসে বলল—কী আর দেখবো। মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে। সৎকার চলছে। আগুনে পোড়া বাড়িঘর। কান্নাকাটি। শাঙ্কো বলল—দুদিন আগেও কত বড় উৎসব হয়ে গেল এখানে। নাচ গান। মারিয়াও সেই আসরে গান গেয়েছে। আজ তো শ্মশানের মতই অবস্থা।

রাতে খাওয়ার পর ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। হ্যারি কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস?

—হুঁ। বলো। ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকালো।

—কালকে জাহাজে ফিরলে হয় না? হ্যারি বলল।

—না। একটা কাজ বাকি আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী কাজ? হ্যারি বলল।

—কালকে রাজসভায় রাজাকে বলবো। শুনো। ফ্রান্সিস বলল।

—বুঝেছি। হ্যারি বলল।

—কী বুঝেছো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—কোন গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খবর পেয়েছো। তাই কিনা? হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—এই জন্যেই তোমাকে এত ভালো লাগে। ঠিক ধরেছো।

—আজ রাত হয়েছে। তুমি ক্লান্ত। ঘুমিয়ে পড়ো। কালকে সব শুনবো। হ্যারি বলল। তারপর শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারি রাজসভায় এল।

রাজা আসিরিয়া কাঠের সিংহাসনে বসে ছিলেন। প্রজাদের মধ্যে কয়েকজন রাজাকে সবুজ রাজার অত্যাচারের কথা বলছিল। রাজা তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রাজা ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন—

—তুমি কিছু বলবে বলেছিলে।

—হ্যাঁ—আপনার পূর্বপুরুষ কোন রাজা তাঁর ধনসম্পদ এই রাজত্বের কোথাও গোপনে রেখে গেছেন। এ ব্যাপারে আপনি কী জানেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—কিছুই জানি না। শুনেছি আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা সার্মেনো অনেক ধনসম্পদ পাতালঘরে গোপনে রেখে গেছেন। রাজা বললেন।

—সেই পাতালঘর কোথায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—জানি না। রাজা মাথা নেড়ে বললেন।

—আপনি সেই ধনসম্পদের খোঁজ করেন নি? ফ্রান্সিস বলল।

—না। কারণ সেই ধনসম্পদ রাজা সার্মেনো জলদস্যুতা করে সঞ্চয় করেছিলেন। নিরীহ জাহাজযাত্রীদের রক্তে ভেজা সেই ধনসম্পদের ওপর আমার কোন লোভ নেই। রাজা বললেন।

—কেউ কি ধনভাণ্ডার খুঁজেছিল? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ তিনজন খুঁজতে সমুদ্রতীরের পাহাড়টায় গিয়েছিল। কিন্তু তারা জীবিত অবস্থায় ফেরেনি। রাজা বললেন।

—তাদের মৃতদেহও পাওয়া যায়নি? ফ্রান্সিস বলল।

—না। রাজা মাথা নেড়ে বললেন।

—তারা সমুদ্রতীরের পাহাড়ের দিকে গিয়ে খুঁজেছিল কেন? ফ্রান্সিস বলল।

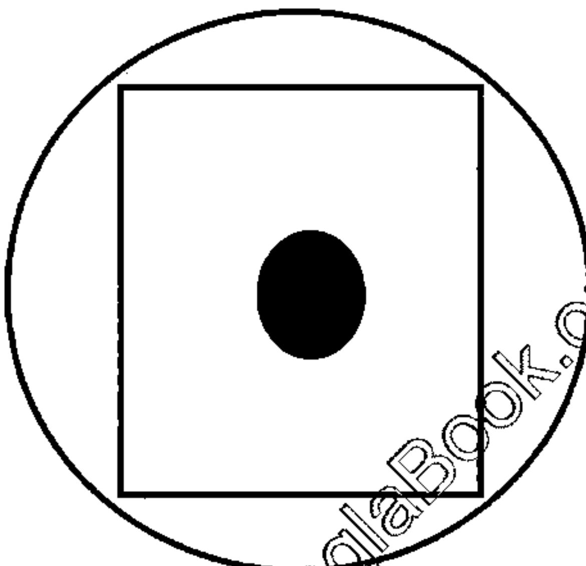
—আমি তাদের বলেছিলাম অতীতের রাজবাড়ি ছিল ঐ পাহাড়ের কাছে। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। আমরা খুঁজে দেখতে চাই। আমাদের অনুমতি দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তিনজন ফেরেনি। তারপরেও তোমরা—রাজা বলতে গেলেন।

ফ্রান্সিস বাধা দিয়ে বলল—বেশ কিছু গুপ্ত ধনভান্ডার আমি বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করেছি। আশা করছি এই ধনভান্ডারও উদ্ধার করতে পারবো।

—বেশ। কথাটা বলে রাজা আসিরিয়া সেনাপতির দিকে তাকালেন। সেনাপতি পাশে রাখা কাঠের আসনের দিকে হাত বাড়াল। একটা ছোটো চৌকোনো চামড়া মেশানো কাগজ তুলে ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস দেখল কাগজের মাঝখানে একটা শীলমোহর। দেখতে এরকম—



শীলমোহরের ছবি

নিচে স্পেনীয় ভাষায় লেখা—অনুমতিপত্র।

—এটা আপনার অনুমতির শীলমোহর? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। এই অনুমতিপত্র নিয়ে আমার রাজ্যের যে কোন জায়গায় তোমরা অবাধে যেতে পারবে। এমনকি রাজঅন্তঃপুরেও যেতে পারবে। রাজা বললেন।

—এই শীলমোহর কি আপনিই প্রচলিত করেছেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না। শুনেছি পূর্বপুরুষ রাজা সার্মেনো এই শীলমোহর ব্যবহার করতেন। তখন থেকেই এই শীলমোহরের ব্যবহার চলে আসছে। এই শীলমোহর আমার সিংহাসনেও আছে। রাজা বললেন। রাজা আসনের ওপরের কাপড়ের ঢাকনা সরালেন। দেখা গেল সিংহাসনের মাথায় এই শীলমোহর কাঠ কুঁদে তোলা আছে। এখানকার সব আসনেই। তাছাড়া অন্দরমহলের প্রত্যেক পাথরের দেয়ালে এই শীলমোহর কুঁদে তোলা আছে। রাজা বললেন।

—আমি শীলমোহরের নকশাগুলো দেখতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাকে তো অনুমতিপত্র দেওয়াই হয়েছে। যাও। রাজা বললেন।

—তাহলে অন্দরমহলে একটু খবর পাঠান যে আমরা যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা একজন প্রহরীকে ডাকলেন। স্থানীয় ভাষায় কিছু বললেন। প্রহরীটি চলে গেল।

কিছুপরে প্রহরীটি ফিরে এল। ফ্রান্সিসদের আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি অন্দরমহলে ঢুকল। এঘর ওঘর ঘুরে ঘুরে দেখল। সব পাথরের দেয়ালেই শীলমোহর কুঁদে তোলা। দেয়ালে ফুলপাতার নকশার মধ্যে ঐ শীলমোহরের নকশা।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি রাজসভায় ফিরে এল।

—দেখলে? রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ। ঐ শিলমোহরগুলো ভেঙে দেখা যায় কিনা সেটা পরে ভেবে দেখবো। এখনও আরো কিছু দেখার আছে। কাজেই আগেই দেয়াল ভাঙতে যাবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—ওগুলো ভাঙতে গেলে সমস্ত দেয়ালই হয়তো ভেঙে পড়বে। রাজা বললেন।

—সাবধানে। হিসেব করে ভাঙতে হবে। তবে ওসব ভাঙার মধ্যে এখন যাচ্ছি না। বললাম না—আরো কিছু দেখতে হবে। ভাবতে হবে। এবার আমরা যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর দু'জনে রাজসভা থেকে বেরিয়ে এল।

দু'জনে অতিথিশালায় এল। বন্ধুরা জানতে চাইল ওরা দু'জনে রাজা আসিরিয়ার সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলেছে। ফ্রান্সিস সব কথা বলল।

—তাহলে আবার অভিযান শুরু। শাঙ্কো খুশির স্বরে বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল। তারপর বলল—সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে। তারপর সমুদ্রতীরে পাহাড়ী এলাকায় যাবো। কারণ ওখানেই কোথাও পুরোনো রাজবাড়ি ছিল। ঐ এলাকাটা ভালো করে খুঁজতে হবে।

দুপুরের খাবার খেয়ে সবাই তৈরি হল। ফ্রান্সিস বলল—সবাই তরোয়াল নিয়ে নাও। বলা যায় না সবুজ রাজার সেনাপতি হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে।

সবাই তরোয়াল কোমরে গুঁজে চলল। তিয়ারার লোকজন ফ্রান্সিসদের বেশ ঔৎসুক্যের সঙ্গেই দেখল কোথায় চলেছে ওরা? আবার লড়াই করতে যাচ্ছে নাকি?

পাহাড়ী এলাকায় পৌঁছল সবাই। দেখল সমুদ্রের ধারেই কয়েকটা ছোট পাহাড়। মাঝখানের পাহাড়টাই সবচেয়ে উঁচু। ফ্রান্সিস স্থির করল পাহাড়ের মাথায় উঠতে হবে। তাহলেই চারদিক ভালো দেখা যাবে। ঐসব পাহাড়ের মধ্যেই নিচে কোথাও পাতালঘর থাকলে তার হদিশও পাওয়া যাবে।

এবারে পাহাড়ে ওঠা। মাঝখানে উঁচু পাহাড়টাকেই বেছে নিল ফ্রান্সিস। শাঙ্কো সিনাত্রা বিস্কোকে নিয়ে ফ্রান্সিস পাহাড়টায় উঠতে লাগল। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরের চাঁইয়ে পা রেখে রেখে ওরা পাহাড়টার চূড়ার কাছাকাছি এল। দেখা গেল চূড়ার কাছাকাছি কোনো পাথরের চাঁই নেই। তবে পাথরের খাঁজ রয়েছে। সেইসব খাঁজেই পায়ের ওপর ভর রেখে রেখে চূড়োয় উঠতে হবে।

—তোমরা থাকো। আমি একা উঠে সব দেখছি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর পাথরের খাঁজে খাঁজে দেহের ভর রেখে রেখে চূড়োয় উঠে এল। চারদিকে তাকিয়ে অন্য ছোট পাহাড়গুলো দেখল। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখল সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউ পাহাড়টার গোড়ায় আছড়ে পড়ছে। আট-দশ হাত উঁচু পর্যন্ত জল ছিটকে উঠছে। চোখ ফিরিয়ে আনতে তখনই দেখল কাছেই একটা গহ্বর নিচের দিকে নেমে গেছে। গহ্বরের গা খুব এবড়ো খেবড়ো নয়। কিছুটা বা মসৃণ। যেন কেটে করা হয়েছে।

ফ্রান্সিস গহ্বরের ভেতরে তাকাল। অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ও ভাবল এই গহ্বরটা নিশ্চয়ই পাথর কেটে করা হয়েছে। নিশ্চয়ই এই গহ্বরে কিছু আছে। হয়তো পাতালঘরটাই আছে।

ও চূড়ো থেকে নেমে এল। বন্ধুদের কাছে এসে বলল,

—সবকিছু দেখলাম। একটা গহ্বরও দেখলাম। কালকে ঐ গহ্বরে নামবো। শক্ত দড়ি আর মশাল চকমকি পাথর লোহার টুকরো আনতে হবে। এখন নেমে চলো।

সবাই পাহাড়ের চাঁইয়ের ওপর পা রেখে রেখে নেমে এল।

—তোমার কি মনে হয় ওখানে কোন পাতালঘর আছে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—গহ্বরে না নেমে বলতে পারছি না। তবে এখানেই তো পুরোনো রাজবাড়ি

ছিল। কাজেই গহ্বরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে ওখানে। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন দুপুরের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিসরা আবার পাহাড়ী এলাকায় এলো। শাঙ্কোদের নিয়ে ফ্রান্সিস পাহাড়টায় উঠল। চূড়োর কাছাকাছি এসে শাঙ্কো সঙ্গে আনা দড়িটার একটা মাথা একটা বড় পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল। অন্য মাথাটা ফ্রান্সিসের হাতে দিল। ফ্রান্সিস দড়ির মাথাটা কোমরে বাঁধল। সিনাত্রা চকমকি ঠুকে একটা মশাল জ্বালিয়ে দিল।

মশালটা বাঁ হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে গহ্বরে নামতে লাগল। ওপর থেকে শাঙ্কোরা দড়ি ছাড়ছিল। গহ্বরে মশালের আলো পড়ল। চারপাশের পাথুরে প্রায় মসৃণ দেয়াল দেখা যেতে লাগল।

একসময় ফ্রান্সিসের পায়ে পাথরের মেঝে ঠেকল। ও দেখল একটা ঘর। মশালের আলো ফেলে ফেলে ঘরটার চারদিকে দেখতে লাগল। শুধুই একটা ঘর। তার জানালা দরজা নেই। তবে দেখে মনে হল এই ঘরটা ব্যবহৃত হত। এই ঘরটা কয়েদঘর হবার সম্ভাবনাই বেশি। ফ্রান্সিস বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল যদি শীলমোহরের নকশা কোথাও খোদাই করা থাকে। না। সেরকম কোন নকশা কুঁদে তোলা নেই। আর কিছু দেখার নেই।

ফ্রান্সিস দড়িতে দুটো হ্যাঁচকা টান দিল। ওপর থেকে শাঙ্কোরা দড়ি টানতে লাগল। আস্তে আস্তে ফ্রান্সিস ওপরে উঠে এল। চূড়ো থেকে নেমে আসতে হ্যারি বলল—কিছু দেখলে?

—একটা পুরোনো ঘর। বোধহয় কয়েদঘর ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—কোন চিহ্নটিহ্ন কিছু পেলে? হ্যারি জানতে চাইল।

—না। সেরকম কিছু নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে ওটা পাতালঘর নয়। হ্যারি বলল।

—তাই তো মনে হল। তবে পাহাড়গুলো খুঁজে দেখতে হবে। এরকম কোন ঘর পাওয়া যায় কিনা। গহ্বর গুহা সবই দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ওরা পাহাড়ী এলাকায় ঘুরে বেড়াল। কিন্তু কোন গহ্বর বা গুহা পেল না। ফ্রান্সিস বলল—চলো সমুদ্রের দিক থেকে দেখি। সমুদ্রের দিকে গেল সবাই। সমুদ্রের জলের বড় বড় ঢেউ পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে। জল ছিটকে উঠেছে। তার মধ্যে দিয়েই ওরা পাহাড়ের ধার দিয়ে চলল।

বিকেলের ম্লান আলোয় হঠাৎ একটা গুহামুখ নজরে পড়ল। সমুদ্রের জলের বড় বড় ঢেউ সেই গুহামুখে আছড়ে পড়ছে। একদিকে ঢেউয়ের ছিটকানো জল অন্যদিকে পায়েব নীচে শ্যাওলাধরা পিছল পাথর। তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে ওরা গুহামুখে এসে দাঁড়াল।

গুহামুখ দিয়ে বিকেলের নিস্তেজ আলোয় যতদূর দেখা গেল বোঝা গেল গুহাই। অন্য কিছু দেখা গেল না। গুহার ভেতরটা অন্ধকার।

—ভেতরে ঢুকে গুহাটা দেখতে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—সন্ধ্যে হতে বেশি দেরি নেই। এখন একটা অজানা অচেনা গুহায় ঢুকবো? হ্যারি বলল।

—উপায় নেই। মারিয়া ওরা নিশ্চয় ভাবছে। তাই দেরি করতে চাই না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ চলো। হ্যারি বলল।

সবাই গুহার মধ্যে ঢুকল। কিছুটা এগোতেই দেখা গেল একটা লম্বাটে পুকুর মত। জল কতটা গভীর বোঝা গেল না। পুকুরটার ওপারে অন্ধকার গুহা।

—সিনাত্রা—একটা মশাল জ্বালো। ফ্রান্সিস বলল।

সিনাত্রা চকমকি পাথর ঠুকে একটা মশাল জ্বালাল। ফ্রান্সিস জ্বলন্ত মশালটা কয়েকবার দুলিয়ে দুলিয়ে পুকুরটার ওপারে ছুঁড়ে ফেলল। এবার মশালের আলোয় ওপারটা দেখা গেল। টানা গুহা চলে গেছে। ফ্রান্সিস বলে উঠল—জলে নেমে ওদিকটা দেখে আসি। কতটা দূরে গেছে গুহাটা।

—কিন্তু আলো পড়ে গেছে। এখন ফিরে চলো। কালকে না হয়—হ্যারি বলতে গেল।

—না-না। এই ধনসম্পদ উদ্ধারের কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। সাঁতরে কিছুটা যেতেই দেখলে আব্‌ছামত কী একটা চোখের সামনে দিয়ে সরে গেল। এবার অস্পষ্ট দেখল একটা বিরাট পাখ্‌না জল কেটে বেরিয়ে গেল। হাঙর! দেখল অতিকায় হাঙর একটু দূরে মোড় ঘুরল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বন্ধুদের দিকে যত দ্রুত সম্ভব সাঁতরে চলল। তীরের পাথরে পা রেখে শরীরের এক ঝটকা ওপরে উঠে এল। ও হাঁপাচ্ছে তখন। হ্যারি শাঙ্কো এগিয়ে এল। হ্যারি বলল—কী হয়েছে?

—একটা অতিকায় হাঙর। বীভৎস। হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল। এই কথা শুনে এক ভাইকিং বন্ধু জলের কাছে গিয়ে মুখ বাড়াল। জলে হাঙরের লেজটা ভেসে উঠেই প্রচন্ড জোরে আছড়ে পড়ল বন্ধুটির ওপর। মুহূর্তে বন্ধুটি ছিটকে জলে পড়ে গেল। জল আলোড়িত হল। জলে ঢেউ উঠল। পরক্ষণেই আর কোন শব্দ নেই।

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে বলে উঠল—সবাই জলের ধার থেকে সরে এসো। ভয়ঙ্কর হাঙর। সবাই দ্রুত সরে এলো।

—এই হাঙরটা না মেরে ওপারে যাওয়া যাবে না। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল।

বন্ধুর এই আকস্মিক মৃত্যুতে সবারই মন খারাপ হয়ে গেল। ফ্রান্সিস আবার গলা চড়িয়ে বলল—আমাদের এক বন্ধুকে এই ভয়ঙ্কর হাঙর মেরে ফেলেছে। আমি এটাকে নিকেশ করবোই। কাল দুপুরে আবার আসবো আমরা। এখন ফেরা যাক।

সারা রাস্তা কেউ কোন কথা বলল না। কারো মন ভালো নেই।

সন্ধের সময় সবাই অতিথিশালায় ফিরে এলো।

পরদিন সকালে হ্যারিকে নিয়ে ফ্রান্সিস রাজসভায় গেল। তখন বিচার চলছিল। বিচার শেষ হতে রাজা ফ্রান্সিসদের কাছে ডাকলেন।

—পাতালঘরের হদিশ করতে পারলে? রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

—এখনও পারিনি। তবে দু'তিনটি জায়গা এখনও দেখা বাকি। তারপর ফ্রান্সিস গতকালের ঘটনা সব বলল। রাজা আসিরিয়া মাথা নেড়ে দুঃখপ্রকাশ করলেন।

—মান্যবর রাজা—আমাদের দশ-পনেরোটা বর্শা চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—বর্শা নিয়ে কী করবে? রাজা বললেন।

—এই ভয়ঙ্কর হাঙরটা হত্যা করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের কোন বিপদ না হয়। রাজা আশঙ্কা প্রকাশ করলেন।

—না। আমরা সাবধানে কাজ সারবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। প্রহরীকে পাঠাচ্ছি। ও বর্শা দিয়ে আসবে। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিসরা অতিথিশালায় ফিরে এল।

ফ্রান্সিসের নির্দেশে সবাই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। প্রহরী বর্শা দিয়ে গেছে। সবাই বর্শা হাতে নিল। শুধু ফ্রান্সিস একটা তরোয়াল কোমরে গুঁজে নিল।

সবাই চলল সেই পাহাড়ের দিকে। উজ্জ্বল রোদের দিন।

ফ্রান্সিসরা যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তিয়েরাবাসীরা ওদের দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল সবুজ রাজা তো হেরে গেছে তবে ওরা কাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছে?

ফ্রান্সিসরা পাহাড়ী এলাকায় পৌঁছল। সমুদ্রের ঢেউয়ের ঝাপ্টা পার হয়ে ওরা গুহামুখে এল। তারপর গুহায় ঢুকে সেই লম্বাটে পুকুরের সামনে এল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে একটু দূরে দাঁড়াল সবাই। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—একটা ভয়ঙ্কর হাঙরের সঙ্গে লড়াই আজ। বন্ধুর নির্মম মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার দিন আজ। একটু থেমে বলল—প্রথমে আমি একা জলে নামছি। হ্যারি চম্‌কে উঠে ফ্রান্সিসের হাত চেপে ধরল। বলল—পাগল হয়েছো। নিশ্চিত মৃত্যু।

—উপায় নেই। যখন সবাই মিলে বর্শা চালাবে তখন জল রক্তে লাল হয়ে যাবে। তখন নিশানা ঠিক রেখে আক্রমণ করা যাবে না। এখন আমি পরিষ্কার

জলে হাঙরটাকে দেখতে পাবো। আজকে রোদও উজ্জ্বল। ঠিক ওটার ফুস্‌ফুসে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিতে পারবো। তারপর সবাই মিলে আক্রমণ। তুমি নিশ্চিন্ত হও। হাঙরের সঙ্গে এর আগেও লড়েছি। আমি ওদের মতিগতি বুঝি। আক্রমণের ফন্দীফিকির জানি। ঠিক ঘায়েল করবো ওকে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস তরোয়াল কোমর থেকে খুলে দাঁতে চেপে ধরল। তারপর আস্তে আস্তে জলে নামল। বন্ধুরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

ফ্রান্সিস হাত পা নেড়ে জলে শব্দ করল। তারপর ডুব দিল। দেখল একটু দূরে হাঙরের মুখটা। সত্যিই বীভৎস। মুখে গায়ে কালচে শ্যাওলা জমে গেছে। সাত আট হাত দূরে একটা বড় পাক খেয়ে হাঙরটা একটু দূরে চলে গেল। অভিজ্ঞ ফ্রান্সিস বুঝল এবার হাঙরটা আক্রমণ করবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ও হাতে পায়ে জল ঠেলে নিচে চলে এল। তখনই হাঙরটা ছুটে ওর মাথার কাছে এল। হাঙরের বিরাট পেটটা দেখল ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস দাঁতে চেপে ধরা তরোয়ালটা খুলে হাতে নিল। এইবার হাঙরটা এসে ওকে আক্রমন করতে উদ্যত হল। ফ্রান্সিস তৈরী ছিল। হাঙরের বুকের ফুস্‌ফুস্‌ লক্ষ্য করে ফ্রান্সিস ওর তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল। যতটা জোরে সম্ভব। রক্ত বেরিয়ে এল। হাঙরটা বোধহয় এরকম আক্রমন আশঙ্কা করেনি। ওটা পাক খেয়ে সরে গেল।

ফ্রান্সিস আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। ডুব সাঁতার দিয়ে দ্রুত পারের দিকে চলে এল। তারপর পারে উঠে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। —তোমার কিছু হয় নি তো? হ্যারি ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে মাথা নাড়ল। বলল—ঠিক ফুসফুসে তরোয়াল বিঁধিয়েছি। এখন বর্শা দিয়ে ওটাকে মারতে হবে। সবাই তৈরী হও।

সবাই বর্শা হাতে জলের ধারে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস উঠে বলল—খুব কাছে যেও না। লেজের ঝাপটায় ফেলে দেবে। আর বর্শা হাত ছাড়া করোনা। কারণ অনবরত বর্শার ঘা মেরে যেতে হবে।

পাখ্‌না দিয়ে জল কেটে আহত হাঙরটা পারের দিকে এগিয়ে এল। সবাই বর্শার ঘা মারল হাঙরটার পিঠে। দু'একটা বর্শা একেবারে গেঁথে গেল হাঙরটার পিঠে। যেগুলো খুলে আনা গেল না। পুকুরের জল রক্তে লাল হয়ে উঠল। হাঙরটা একটু দূরে সরে গেল।

ফ্রান্সিস পার ধরে জলে নামল। জলে হাত পা নেড়ে শব্দ করে দ্রুত পারে উঠে এল। হাঙরটা ছুটে এল। পার থেকে ভাইকিংরা দ্রুত বর্শার ঘা মারল হাঙরটার পিঠে। হাঙরটা চিৎ হয়ে গেল। এবার ওটার বুকে বর্শা বিঁধিয়ে দিতে লাগল।

পুকুরটার জল লাল হয়ে গেল। জল তোলপাড় করে হাঙরটা ডুবে গেল।

সবাই পারের কাছে দাঁড়াল। বসে পড়ল কেউ কেউ।

—হাঙরটা কি করছে? শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করল।

—বুঝতে পারছি না। জলে নেমে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ভুলে যেও না হাঙরটা আহত। ক্ষেপে আছে। হ্যারি বলল।

—ঝুঁকি নিতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বসে রইল।

এবার ফ্রান্সিস জলে নামল। ডুব দিল। জল রক্তে লাল। ভালো দেখা যাচ্ছে না। একটু অপেক্ষা করে ডুব সাঁতার দিয়ে এগিয়ে গেল। তখনই অস্পষ্ট দেখল ক্ষত বিক্ষত হাঙরের বিরাট দেহটা পাথরের মেঝেয় পড়ে আছে। অনড়। তখনও সারা গা পেট থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝল হাঙরটা মারা গেছে। ও জলের ওপর ভেসে উঠল। হেসে বলে উঠল—একেবারে খতম। বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

ফ্রান্সিস পারে উঠে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এখনও বেলা আছে। আর দেরি করবো না। এই জলাটা পার হয়ে ওপারে যাবো। তার আগে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও।

হাত পা ছড়িয়ে বসল সবাই। বিশ্রাম করতে লাগল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—রাজা আসিরিয়া বলেছিলেন না তিনজন পাতালঘরের খোঁজে বেরিয়ে জীবিত ফেরেনি। ওরা এই পুকুরের জল পর্যন্ত এসেছিল। হয়তো এটা পার হতে গিয়েছিল। হাঙরটা ওদের মেরে ফেলেছে।

কিছুক্ষণ পর ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। একটু গলা চড়িয়ে বলল—সবার যাবার দরকার নেই। আমি শাঙ্কো আর সিনাত্রা যাব।

—না ফ্রান্সিস—হ্যারি বলল—আবার ওখানে যদি কোন বিপদে পড়। আমরা সবাই একসঙ্গে যাব। বন্ধুরাও অনেকে বলে উঠল—ফ্রান্সিস আমরাও যাব।

—বেশ চলো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর সিনাত্রাকে বলল—তিনটে মশাল জ্বালো। আমরা তিনজন জ্বলন্ত মশাল নিয়ে যাবো।

সিনাত্রা তিনটে মশাল জ্বালল। তিনটে মশাল হাতে নিয়ে তিনজনে জলে নামল। বাকি বন্ধুরাও জলে নামল। তিনজনে বাঁহাতে মশাল জলের ওপর তুলে ডান হাতে সাঁতরে চলল ওপারের দিকে। বন্ধুরাও সাঁতরে চলল। বন্ধ গুহার শেষ প্রান্ত এসে দেখা গেল একটা পাথরের চাঁই।

ফ্রান্সিস মশালের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল পাথরের চাঁইটার ডানপাশে হাতখানেক ফাঁকা। পিছু ফিরে ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকাল। বলল—এই পাথরের চাঁইটা সরাতে হবে। সবাই হাত লাগাও। ফ্রান্সিস মশাল ধরে রইল।

শাঙ্কো আর সিনাত্রা সেই ফাঁকটায় হাত গলিয়ে টানল। বেশ ভারি পাথরের চাঁই। ওরা দুজনে কিছুক্ষণ টানল। ছেড়ে হাঁপাতে লাগল। আরো দু'জন বন্ধু এগিয়ে এল। চলল পাথরের চাঁইটা ধরে টানা।

একসময় পাথরের চাঁইটা আস্তে আস্তে সরে এল। এবার কয়েকজন মিলে পাথরের চাঁই অনেকটা সরিয়ে আনল। ফ্রান্সিস মশালের আলো ফেলে দেখল একটা মসৃণ কালো পাথরের দরজা। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—পাথরের চাঁইটা আরো সরাও। চাঁইটা সবটা সরানো হতেই মশালের আলোয় ফ্রান্সিস দেখল—দরজাটায় একটা মস্তবড় লোহার কড়া ঝুলছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—বাকি দুটো মশাল নিয়ে এসো। শাঙ্কো আর সিনাত্রা মশাল নিয়ে এগিয়ে এল। তখনই দেখা গেল গোল কড়াটার মাঝখানে কীসের চিহ্ন। একনজর দেখেই ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে উঠল—হ্যারি এটাই পাতালঘর। ফ্রান্সিসের কথা গুহায় প্রতিধ্বনিত হল। হ্যারি এগিয়ে এসে পাথরের দরজার গায়ে কুঁদে-তোলা শীলমোহর দেখে বলে উঠল—এটাই তো রাজা আসিরিয়ার শীলমোহর।

—হ্যাঁ। রাজা আসিরিয়ার পূর্বপুরুষ রাজা সার্মেনো প্রচলিত শীলমোহর। এবার এই দরজা খুলতে হবে। সবাই হাত লাগাও।

চার-পাঁচজন বন্ধু এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস মশাল ধরে রইল। কিছুক্ষণ কড়া ধরে টানলে ওরা। ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগল। এবার আরো চার-পাঁচজন মিলে টানল। দরজার ডানদিকে ফাঁক দেখা গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলে উঠল—সবাই তাড়াতাড়ি সরে এসো। বিষাক্ত বাতাস বেরোতে পারে।

সবাই দ্রুত সরে এল। দরজার সেই ফাঁক লক্ষ্য করে ফ্রান্সিস মশালটা ছুঁড়ে দিল। দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠে ভেতরেও আগুন ছড়িয়ে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে আগুন ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে লাগল। সবাই দূরে সরে গিয়েছিল। কাজেই আগুন ওদের কোন ক্ষতি করতে পারল না।

ভেতরে আগুন নিভল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে দরজার ফাঁকের কাছে গেল। চোখ কুঁচকে ভেতরে তাকাল। একটা ঘরমত দেখা যাচ্ছে। অস্পষ্ট দেখা গেল ঘরের মাঝখানে একটা সিংহাসন। সিংহাসনের ওপর কিছু আছে।

ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভেতরে একটা ঘরমত দেখা যাচ্ছে। এখন দরজা সবটা খুলতে হবে। হাত লাগাও।

লোহার বড় কড়াটা ধরে আবার টানটানি শুরু হল। একসময় দরজা সবটা খুলে গেল। শাঙ্কোর হাত থেকে মশাল নিয়ে ফ্রান্সিস ঘরটায় ঢুকে পড়ল।

এক আশ্চর্য দৃশ্য। সোনার মোটা পাতে মোড়া একটা সিংহাসন ঠিক ঘরের মাঝখানটায়। তার ওপর বসা অবস্থায় এক নরকঙ্কাল। হাত দু'টো হাতলে রাখা।

সবাই ঘরটায় ঢুকে পড়েছে তখন। দেখা গেল ঘরটার দেয়ালগুলো



মসৃণ পাথরের। তাতে নানা রঙের মূল্যবান হীরে মনিমানিক্য গাঁথা। সোনার সিংহাসনের গায়ে ফুল লতাপাতার কারুকাজ। সবাই অবাক হয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল।

ফ্রান্সিস কত গুপ্তধন খুঁজে উদ্ধার করেছে। সেই ফ্রান্সিসও এই দৃশ্য দেখে অবাক হল। বুঝল নরকঙ্কালটি রাজা সামেনোর। সবাই ধ্বনি তুলতে ভুলে গেল। কিন্তু হ্যারি উল্লাসধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। এবার সবাই আনন্দে গলা মেলাল। গুহার গায়ে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হল।

এবার ফেরার পালা। কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ফ্রান্সিস পাথরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

জলে সাঁতার কেটে সবাই পারে এসে উঠল। তারপর গুহা থেকে বেরিয়ে এল। সবাই রাজবাড়ির দিকে চলল। হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এখন রাজাকে পাতালঘর আবিষ্কারের কথা বলবে না?

—না। এখনই সব জানাবো না। কাল সকালে রাজসভায় বলবো। জানাজানি হয়ে গেলে অরক্ষিত গুহাটা দেখতে রাতেই লোকজন ছুটবে। আজ রাতটা চুপ করে থাকবো। কালকে রাজাকে বলবো আর সুরক্ষিত রাখতেও বলবো। আজ রাতটুকু বিশ্রাম। ঘুম। ফ্রান্সিস বলল।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে রাজসভায় গেল।

আজকে কোন বিচার চলছিল না। রাজা আসিরিয়া ফ্রান্সিসকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করলেন। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল।

—পাতালঘর বোধহয় খুঁজে বের করতে পারো নি। রাজা বললেন।

—না। খুঁজে পেয়েছি। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি। রাজা অবাক।

এবার ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনা বলল। রাজা আসিরিয়া সব শুনে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না। পরে বললেন,

—তোমরা বেশ চিন্তা করে কষ্ট করে আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা সার্মেনোর সম্পদ উদ্ধার করেছো। শত্রুর হাত থেকে আমার রাজ্য উদ্ধার করে দিয়েছো।—কী বলে যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো।

—না মান্যবর রাজা। গুপ্ত ধনসম্পদ উদ্ধার করতে আমরা ভালোবাসি। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করেছি। সবুজ রাজার সঙ্গে লড়াইয়ে আপনাকে সাহায্য করেছি, আপনি একজন মহানুভব রাজা বলে। কিন্তু দুঃখ এই যে আপনার সব প্রজাদের রক্ষা করতে পারিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—চেষ্টা তো করেছো। সেটাই বা কম কী। রাজা বললেন।

—এবার তাহলে সমুদ্রতীরে ফিরে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা সার্মেনো জলদস্যুতা করে সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন। আগেই বলেছি সেই ধনসম্পদের প্রতি আমার কোন লোভ নেই। চাইলে তোমাদের সব দিয়ে দিতে পারি। রাজা বললেন।

—আমরা তো কিছুই নেবো না। তাই বলি ঐ সোনার সিংহাসন, মণিরত্ন বিক্রি করে যে অর্থ পাবেন তাই দিয়ে আপনার প্রজাদের মঙ্গল করুন। প্রজাদের জন্যে অনেক কিছুই করতে পারেন আপনি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন—ঠিক আছে। তোমার কথাই আমি মেনে নিলাম। প্রজাদের দুঃখদৈন্য দূর করতে এই মূল্যবান সম্পদ কাজে লাগাবো। তোমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি অতিথিশালায় ফিরে এল। ফ্রান্সিস বন্ধুদের সব বলল। তারপর বলল—দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা সমুদ্রতীরের দিকে যাত্রা করবো। সবাই তৈরী হয়ে নাও।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া সারল ওরা। তারপর রাস্তায় নেমে এল। বালিভরা রাস্তা দিয়ে চলল সমুদ্রতীরের দিকে। যেতে যেতে দেখল তিয়েরাবাসীরা দলে দলে ছুটেছে সমুদ্রের ধারের পাহাড়ী এলাকার দিকে। পাতালঘর আবিষ্কারের কথা এখন বোধহয় তারা জেনে গেছে।

—এত লোক যাচ্ছে—রাজা নিশ্চয়ই গুহাটা পাহারার ব্যবস্থা করেছেন। হ্যারি বলল।

—নিশ্চয়ই। সিংহাসনে বসা নরকঙ্কাল—এটা কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার। ফ্রান্সিস বলল।

—অদ্ভুত বলে অদ্ভুত। আমি তো ভীষণ চমকে উঠেছিলাম। হ্যারি বলল।

বন্ধুদের নিয়ে ফ্রান্সিস যখন সমুদ্রতীরে পৌঁছল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বালিয়াড়িতে দুটো নৌকোই তোলা ছিল। নৌকোয় চড়ে দফায় দফায় ফ্রান্সিসরা জাহাজে উঠতে লাগল।

জাহাজে ছিল মারিয়া, ভেন আর এক অসুস্থ বন্ধু। তিনজনেই রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—মারিয়া এবারও আমার হাত খালি। মারিয়া হেসে বলল—তোমরা অক্ষত শরীরে ফিরে এসেছো এটাই আমার কাছে অনেক। ফ্রান্সিস অসুস্থ বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করল—কেমন আছো?

ওদের বদ্যি ভেন বলল—ও এখন সুস্থ। তোমাদের সঙ্গে যেতে পারল না। খুবই দুঃখ ওর।

—পরের বার নিয়ে যাবো। আমরাও দুঃখ পেয়েছি। এক বন্ধুকে হারিয়েছি। ফ্রান্সিস বলল।

ওদিকে শাঙ্কো তখন হাত পা নেড়ে মারিয়াকে পাতালঘর আবিষ্কারের কথা বলছে।

——



ফ্রান্সিসদের জাহাজ পূর্ণগতিতে চলেছে। জাহাজের পালগুলো বেগবান হাওয়ায় ফুলে উঠেছে। মোটামুটি উত্তর দিক ধরে জাহাজ চলছে। জাহাজচালক ফ্লেজারের লক্ষ্য স্বদেশে ফেরার। ডেক ধোওয়া মোছা সেরে ভাইকিংদের হাতে যথেষ্ট সময়। কারন দাঁড়ও বইতে হচ্ছে না বেশ খুশির মেজাজে ভাইকিংরা।

রাতের খাওয়া সেরে ডেক-এ নাচগানের আসর বসায়। ফ্রান্সিস ওদের উৎসাহই দেয়। আসরে মারিয়াকে নিয়ে আসে। নাচের আসরে দুজনে নাচেও। মারিয়া খুশি মনে এসব দেখে। হাসে। যাক্ মারিয়া খুশি। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হয়।

সিনাত্রা সুরেলা কণ্ঠে দেশের চাষীদের ভেড়াপালকদের গান গায়। দ্রুত লয়ের বিয়ের বাসরের গানও গায়। আসর জমে ওঠে। কাঠের ডেকেএ থপ থপাথপ্ পা ঠুকে ভাইকিংরা নাচে। শাঙ্কো খালি জীপে বাজায়। এভাবেই রাতের আসর জমে ওঠে।

মাঝে কয়েকদিন বাতাস পড়ে গিয়েছিল। তখন ভাইকিংদের ব্যস্ততা। পাল খাটাবার কাঠের কাঠোমোয় উঠে পাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যথাসাধ্য হাওয়া লাগাতে চেষ্টা করে। অনেকে দাঁড় ধরে গিয়ে দাঁড় টানে। তখন আর নাচের আসর বসে না। তখন শুধু কাজ। ছক্কাপাঞ্জা খেলা বন্ধ। সব্বাই ব্যস্ত। নাচগানের আসর আর বসে না। জাহাজের চলার বেগ বাড়াবার জন্যে চেষ্টা চলে। দেশে ফিরে যাচ্ছে এই চিন্তা উৎসাহ জোগায়।

দিনকয়েক পরে বাতাসের বেগ বাড়ে। জাহাজ চলে দ্রুত গতিতে। আবার আনন্দ ভাইকিংদের মনে। জাহাজের কাজ কমে যায়। অবসর। আবার নাচ গানের আসর বসে। নেচে গেয়ে খুশির সময় কাটায় ওরা।

জাহাজ পুর্ণগতিতে চলছে। কিন্তু ডাঙার দেখা নেই। এভাবেই দিন দশেক কাটল। ভাইকিংরা চিন্তায় পড়ে—পথ হারালাম না তো?

রাতে ফ্রান্সিসরা ডেকেএ উঠে আসে। অনুজ্জ্বল চাঁদের আলোয় চারিদিকে তাকায় যদি ডাঙ্গার দেখা পাওয়া যায়। ওপরের দিকে তাকিয়ে নজরদার পেড্রোকে বলে— ঘুমিয়ে পড়ো না। নজর রাখো। পেড্রো মাস্তুলের ওপরে

নিজের গলা চড়িয়ে বলে— কিছ্ছু ভেবো না। ঠিক নজর রাখছি। হ্যারিও ডেকেএ উঠে আসে। ফ্রান্সিস বলে হ্যারি— চিন্তার কথা। এখনও ডাঙ্গার দেখা পাচ্ছি না।

—ঠিক ডাঙ্গার দেখা পাওয়া যাবে। আট দশদিন কেটেছে মাত্র। কয়েকদিনের মধ্যেই ডাঙ্গার দেখা পাওয়া যাবে। তাছাড়া খাদ্য জল সব মজুত আছে। আরোও কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত। জাহাজ চলুক। হ্যারির কথা শুনে ফ্রান্সিসের উদ্বিগ্ন মন শান্ত হয়। ও কিন্তু শুধুমাত্র হ্যারির সঙ্গেই এসব কথা বলে। অন্য বন্ধুদের সঙ্গে এসব কথা বলে না। তাহলে মারিয়াও উদ্বিগ্ন হবে। সেটা মারিয়ার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে।

দিন কয়েক পরের কথা। সেদিন শেষরাতে মাস্তুলের ওপর থেকে পেড্রো চেঁচিয়ে বলল—ভাইসব-সাবধান জলদস্যুদের জাহাজ। এদিকেই আসছে। ফ্রান্সিসকে খবর দাও। সবাই তৈরী হও। সামনে লড়াই।

ডেকের ওপর কয়েকজন বন্ধুদের সঙ্গে শাঙ্কোও ঘুমিয়ে ছিল। পেড্রোর উঁচু গলায় কথায় ওর ঘুম ভেঙে গেল। ছুটে জাহাজের রেলিংয়ের ধারে গেল। কিছুটা উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দেখল একটা জাহাজ দ্রুত গতিতে ওদের জাহাজের দিকে আসছে। জলদস্যুদের ক্যারাভেল জাহাজ।

শাঙ্কো আর একমূহূর্তে দেরি করল না। সিঁড়ির দিকে ছুটল। নিচে নামতে নামতে গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—ভাইসব—তৈরী হও—তৈরী হও। একটা জলদসুদের জাহাজ আসছে। লড়াই। অস্ত্র নাও।

ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে শাঙ্কো চেঁচিয়ে বলল—ফ্রান্সিস জলদস্যুদের জাহাজ আসছে শিগগির এসো।

ফ্রান্সিসসের ঘুম ভেঙে গেল। এক লাফে বিছানা থেকে নামল। বিছানার তলা থেকে তরোয়াল বের করল। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

ততক্ষনে জাহাজে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। ভাইকিংরা অস্ত্রঘর থেকে তরোয়াল বের করে ডেকএ উঠে আসতে লাগল।

অল্পক্ষনের মধ্যেই খোলা তরোয়াল হাতে ডেকএ এসে জড়ো হল সবাই। সবাই দেখল জলদস্যুদের জাহাজের ডেকএ খোলা তরোয়াল হাতে জলদুস্যরা দাঁড়িয়ে। মাথায় কালো কাপড়ের ফট্টি। গাল অব্দি জুলপি মোটা গোঁফ। জলদস্যুর দল ভেবেছিল নিঃশব্দে জাহাজ দখল করবে। কিন্তু যখন দেখল ফ্রান্সিসরা ওদের দেখে ফেলেছে তখন ওরা লড়াইয়ের জন্য তৈরী হল।

জলদস্যুদের জাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। জলদস্যুরা তরোয়াল উঁচিয়ে লাফ দিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিসরা ওদের প্রথম আক্রমণ করল। শুরু হল লড়াই। জলদস্যুরা ফ্রান্সিসদের চেয়ে সংখ্যায় কম। তবে ওরা তো নৃশংস আর নির্ভীক। ওদের প্রাণেরও মায়া নেই। ওরা জানে মানুষ মেরে ফেলতে। কাজেই ওরা প্রথম উন্মাদের মত তরোয়াল চালাতে লাগল। দুজন ভাইকিং আহত হয়ে ডেক-এ পড়ে গেল। কয়েকজন ভাইকিং থমকে গেল। ফ্রান্সিস উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। এই ধ্বনি লড়াইয়ের ধ্বনি। মন্ত্রের মত কাজ হল। ভাইকিংরা নতুন উদ্যমে লড়াই চালাতে লাগল। কয়েকজন জলদস্যুকে আহত করল ওরা। ফ্রান্সিস নিপুনহাতে তারোয়াল চালিয়ে ঘুরে ঘুরে লড়াই করতে লাগল।

একজন জলদস্যু মারা গেল। দু'তিনজন আহত হল।

এমন সময় জলদস্যুদের ক্যাপ্টেন তাদের জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়াল। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে লড়াই দেখতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝল—ভাইকিংরা তরোয়াল চালনায় যথেষ্ট দক্ষ। জলদস্যুরা হেরে যেতে লাগল। ক্যাপ্টেন গলা চড়িয়ে বলে উঠল—লড়াই থামাও। সবাই চলে এসো। জলদস্যুরা লড়াই করতে করতে নিজেদের জাহাজে পালাতে লাগল।

ফ্রান্সিসও গলা চড়িয়ে বলল—যে ক'টাকে পারো আহত করো। জাহান্নামে যাক্ সব। ভাইকিংরা নতুন উদ্যমে জলদস্যুদের আক্রমন করল। এবার জলদস্যুরা বুঝল লড়াই করতে গেলে বাঁচার আশা নেই। ওরা দ্রুত লড়াই থামিয়ে নিজেদের জাহাজের ডেকএ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লড়াই শেষ। নিহত আহত জলদস্যুরা ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেকএ পড়ে রইল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—এগুলোকে জলে ফেলে দাও। ভাইকিংরা সব ক'টা জলদস্যুকে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলল।

জলদস্যুদের জাহাজের মুখ ঘুরল। আস্তে আস্তে জলদস্যুদের ক্যারাভেল জাহাজটা মাঝ সমুদ্রের দিকে চলে যেতে লাগল। লড়াইয়ে বিজয়ী ভাইকিংরা ধ্বনি তুলল—ও —হো—হো।

জলদস্যুদের হাত থেকে বাঁচা গেছে এই ভেবে ফ্রান্সিস স্বস্তির শ্বাস ফেলল। গলা চড়িয়ে ডাকল—পেড্রো? পেড্রো নিজের জায়গা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল—কী বলছো? —অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। সময়মত জানানি দিয়েছো। ফ্রান্সিস বলল।

তখন ভোর হয়েছে। ভোরের নিস্তেজ আলো পড়েছে সমুদ্রে জাহাজে নির্মেঘ আকাশে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলল।

দিন কয়েকের মধ্যেই ডাঙা দেখা গেল। সেদিন ভোরে মাস্তুলের ওপর থেকে নজরদার পেড্রো গলা চড়িয়ে বলে উঠল—ভাইসব বাঁদিকে ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে—ডাঙ্গা। ডেক-এ ঘুম ভেঙে শাঙ্কো বসেছিল। ছুটল ফান্সিসকে খবর দিতে। একটু পরেই ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। ডানদিকে তাকিয়ে দেখল একটা খাঁড়িরমত। তার এ পাশে গভীর বন। ওপাশে পাহাড়। বুঝতে পারল না-এটা কোন দ্বীপ না দেশের অংশ। এপাশে একটা ঘাটমত দেখা গেল। এদিকে সমুদ্র গভীর। বড় বন্দর নয়। তবে জাহাজ ভেড়ানো থাকে।

হ্যারি এসে ওর পাশে দাঁড়াল। ওকে ফ্রান্সিস এসব কথা বলল। হ্যারি বলল—দেখা যাক জাহাজ ভেড়ানো যায় কিনা। ফ্রেজারের কাছে চলো। দু'জনে জাহাজ চালক ফ্রেজারের কাছে এল।

—ফ্রেজার —ফ্রান্সিস বলল—বুঝতে পারছিনা এটা কোন দ্বীপ না দেশের অংশ। যাহোক তুমি দেখো জাহাজ তীরে ভেড়ানো যায় কিনা।

জাহাজ ততক্ষণে তীরের কাছে চলে এসেছে। ফ্রেজার বলল—তীরের কাছে জল গভীর। জাহাজ তীরে ভেড়ানো যাবে। ফ্রেজার আস্তে আস্তে জাহাজটা তীরে ভেড়াল।

দেখা গেল বালিয়াড়ির পরেই বনভূমি। টানা বনভূমি চলে গেছে। বসতির চিহ্নমাত্র নেই।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—কী করবে?

—এখনই এখানে নামবো। দেখি মানুষজনের দেখা পাই কিনা। ফ্রান্সিস বলল,

—কিন্তু এ তো গভীর বন। এখানে মানুষজন কোথায় পাবে? হ্যারি বলল।

—মনে হচ্ছে বনের ওপাশে বসতি আছে। এখন নেমে গিয়ে সেটা দেখাত হবে। ফ্রান্সিস বলল।

একটু পরেই ফ্রান্সিসরা সকালের খাবার খেয়ে নিল। এবার ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডেকে পাঠাল। শাঙ্কো আসতে বলল—শাঙ্কো—সিনাত্রা আর তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমরা নামব।

—এখনই? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ দিনে দিনেই দেখব সব। মনে হচ্ছে এই বনভূমির ওপারে লোকজনের বসতি এলাকা পাব। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। চলো।

কিছুক্ষনের মধ্যেই ফ্রান্সিস শাঙ্কো আর সিনাত্রা তৈরী হল। শাঙ্কো আর সিনাত্রা কাঠের পাটাতন পাতল তীরভূমি পর্যন্ত। পাটাতন দিয়ে তিনজন নেমে এল। বেলাভূমি পার হয়ে বনের মধ্যে ঢুকল। সেই অদ্ভুত গাছের জঙ্গল। গাছের পাতা প্রায় গোল। মোটা ভারী পাতা। শক্ত ডাল। অন্য গাছও রয়েছে। কিন্তু এরকম গাছের সংখ্যাই বেশি। এই গাছগুলো বেশ উঁচু। ডালগুলো দেখে মনে হল বেশ শক্ত।

হঠাৎই ওরা দেখল গাছের মধ্যে ঘর। গাছের চারটে ডালের মধ্যে ডাল কেটে বেড়ামত। তাতে দরজা। ঘরের মাথায় শুকনো লম্বাটে ঘাসের ছাউনি। এরকম তিন চারটে ঘর দেখল ওরা। তাহলে এখানাকার বাসিন্দারা একরম ঘরেই থাকে। অবাক কান্ড! ঘরগুলো থেকে গাছের ডাল থেকে তৈরি মই লাগানো। ঐ মই বেঁধেই ওঠানামা।

ফ্রান্সিসরা ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটা ঘর থেকে একজন বাদামি রঙের পুরুষ মুখ বাড়িয়ে ফ্রান্সিসদের দেখেই —ই—ই করে মুখে জোরে শব্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ঘরগুলো থেকে পুরুষরা হাতে গাছের ডাল কেটে তৈরী বর্শা নিয়ে মই বেয়ে দ্রুত নেমে আসতে লাগল। মই বেয়ে ওঠা নামায় ওরা অভ্যস্থ । কাজেই ফ্রান্সিসরা পালিয়ে আসার সুযোগ পেল না। ততক্ষণে বর্শা হাতে যোদ্ধারা ঘিরে ধরেছে। ফ্রান্সিস দু'হাতে ওপরে তুলে চীৎকার স্পেনীয় ভাষায় বলে উঠল—আমরা বন্ধু। তোমাদের শত্রু নই। যোদ্ধারা আর বর্শা ছুঁড়ে মারল না।

—পালিয়ে গেলে হত। শাঙ্কো মৃদুস্বরে বলল।

—এখন আর সম্ভব নয়। পালাতে গেলে আহত হবো বর্শা বুকে ঢুকে গেলে মরেও যেতে পারি। তার চেয়ে দেখা যাক এরা আমাদের নিয়ে কি করে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

একজন যোদ্ধা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের গায়ে বর্শা খোঁচা দিল। ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। যোদ্ধা ওকে সামনের জঙ্গলের দিকে হাঁটতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস রেগে গেল। কিন্তু কিছু বলল না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল। শাঙ্কো আর সিনাত্রাও চলল।

কিছুদূর যেতে দেখা গেল চারপাঁচটা গাছের গায়ে শুকনো লতার ডালমত। সমস্ত জায়গাটতেই লতার জাল। ফুট পাঁচেক উঁচু। সেই যোদ্ধাটি এগিয়ে গেল। জালির গায়ে গাছের ডাল কেটে দরজামত বানানো। যোদ্ধাটি

দরজা দিয়ে ফ্রান্সিসদের ভেতরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা একে একে ঢুকলো। ওপরের ডাল মাথায় লেগে যাচ্ছে। তিনজনে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস দেখল আরোও তিনজন বন্দী ঐ জালঘরে আগে থেকেই রয়েছে। জালঘরের মেঝে বালিভরা। তার ওপর শুকনো ঘাস বিছানো। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়তে পড়তে বলল—শাঙ্কো এরকম বিচিত্র কয়েদঘর আর কোনদিন হয়ত দেখবো না।

—হ্যাঁ। মনে হচ্ছে আমরা যেন জীবজন্তু। ফাঁদে ধরা পড়েছি।

—আমাদের মেরে ফেলবে না তো? সিনাত্রা ভয়ার্তস্বরে বলল।

—সময় সুযোগ মত পালাবো। কিছ্ছু ভেবো না। শ্যাঙ্কো বলল। যোদ্ধাটি দরজাটা শুকনো লতা দিয়ে বাঁধল। শ্যাঙ্কো যোদ্ধাটিকে ইঙ্গিত ওদের সর্দার আছে কিনা জানতে চাইল। যোদ্ধাটি মাথা দোলাল। একজন যোদ্ধাকে পাহারাদার রেখে অন্য যোদ্ধারা চলে গেল।

ফ্রান্সিস মাথা তুলে চারিদিক এবার দেখে নিল। দেখল চারদিকেই গভীর জঙ্গল। সেই মোটা ভারিপাতার গাছের সংখ্যাই বেশি।

ফ্রান্সিস শুয়ে বসে সময় কাটাতে লাগল। দুপুর নাগাদ কয়েকজন যোদ্ধাকে নিয়ে একজন লম্বামত লোক জালঘরের দরজার সামনে এল। পাহারাদার তাকে দেখে ডান হাত তুলে নামল। ফ্রান্সিস বুঝল এই লোকটাই গোষ্ঠীপতি। ফ্রান্সিস এই গোষ্ঠিপতির জন্যেই সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। গোষ্ঠীপতি ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় শব্দে বলল—পরিচয়?

—আমরা বিদেশী— ভাইকিং। জাহাজে চড়ে জাহাজ ঘাটায় এসেছি। ফ্রান্সিস বলল। গোষ্ঠীপতি মোটামুটি বুঝল। কিন্তু সত্যি বলে মেনে নিল না। দুপাশে মাথা নেড়ে বলল—ওরা—ইকাবু—একসঙ্গে—শাস্তি।

—কী শাস্তি? শাঙ্কো বলে উঠল। গোষ্ঠীপতি এতক্ষণে একটু হাসল। বলল—দেখবে।

—কিন্তু আমাদের শাস্তি দেবেন কেন? আমারা কী অন্যায় করেছি? ফ্রান্সিস বলল।

—ইকাবু—গুপ্তচর। গোষ্ঠীপতি বলল। ফ্রান্সিস বুঝল ইকাবুরা এদের শত্রু। ফ্রান্সিসদের ইকাবুদের গুপ্তচর ধরে নিয়েছে। ফ্রান্সিস বুঝল গোষ্ঠীপতিকে বোঝানো যাবে না। তবু ও হাল ছাড়ল না। বলল—ইকাবু কারা কী ব্যাপার আমরা কিছুই জানি না। আমরা এখানে এই প্রথম এসেছি। ইকাবু তো দূরের কথা এই জায়গাই আমরা চিনতাম না। গোষ্ঠীপতি আবার

মাথা দোলাল। বলল—বন্দী—শাস্তি। কথাটা বলেই গোষ্ঠীপতি ফিরে দাঁড়ল। তারপর বনের দিকে চলে গেল। একজন পাহারাদার রইল। বাকিরা গোষ্ঠীপতির পিছনে পিছনে চলে গেল।

দুপুরে ফ্রান্সিসদের ভারী শুকনো পাতায় খেতে দেওয়া হল। বুনো গমের রুটি, আনাজের ঝোল আর আধ কাঁচা চিংড়ি মাছ। একটু অন্যরকম খাবার। একনাগারে সামুদ্রিক মাছ আর ভাল লাগছিল না। ওরা চেটে পুরে খেল।

ওদের খাওয়া শেষ হতেই কালো মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ল। ফ্রান্সিস বলল—জালঘরের মাথায় কোন ছাউনি নেই। বৃষ্টি হলে ঠায় বসে বসে ভিজতে হবে।

হঠাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল।

ঝির ঝির বৃষ্টি শুরু হল। বনের গাছগাছালির পাতার শব্দ হতে লাগল—চট্ চট্। ফ্রান্সিসরা ভিজতে লাগল।

ওদের ভাগ্য ভাল। একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। ততক্ষণে মেঘ সরে গিয়ে সূর্য দেখা দিয়েছে। চড়ারোদ উঠল। ওদের ভেজা পোশাক গায়েই শুকোতে লাগল।

শাঙ্কো তখন বন্দী তিনজনের সঙ্গে ভাব জমাতে ওদের কাছে গেল। স্পেনীয় ভাষায় বলল—তোমরা কে?

ওরা কিছুই বুঝল না। বারকয়েকের চেষ্টায় একজন বলল—ইকাবু। শাঙ্কো বুঝল এরা গোষ্ঠীপতির শত্রু আর এক গোষ্ঠীর মানুষ। শাঙ্কো আকার ইঙ্গিতে কী ধরনের শাস্তি গোষ্ঠীপতি দিতে পারে সেটা জানতে চাইল। বন্দী ইকাবু হাত পা জোড়া করে দেখিয়ে দিতে বোঝাল হাত পা বাঁধা হবে। তারপর সমুদ্রের খাঁড়িতে ছুড়ে ফেলা হবে। শাঙ্কো আর কোন কিছু জানতে চাইল না। ফ্রান্সিসের কাছে এসে বন্দীটির কথা জানাল। ফ্রান্সিস মৃদু স্বরে বলল। তাহলে তো পালাতে হয়।

—কিন্তু কী ভাবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—দেখছো তো হাত পা বাঁধে নি। খোলা হাত পা নিয়ে একবার বনের মধ্যে ঢুকতে পারলে সহজেই পালাতে পারবে।

—তা ঠিক। শাঙ্কো মাথা ওঠা নামা করল।

—পালাতে পারবে? সিনাত্রা আগ্রহে বলল।

—অনায়াসে। এসব শুকনো লতা বুনে বানানো দড়ি। শাঙ্কো সহজেই ছোরা দিয়ে কাটতে পারবে। রক্ষী ও মাত্র একজন। ও বুঝতেই পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। সিনাত্রা বলল।

—সিনাত্রা একটা গান গাও। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার মাথা খারাপ। ভয়ে আমার গলা দিয়ে কথা সরছে না। আর গান গাইব? সিনাত্রা বলল।

—ঠিক আছে! শুয়ে বিশ্রাম কর। গায়ের জোর রাখো। এখান থেকে বনের দুরত্ব হাত পঞ্চাশেক। সময় মত এ টুকু ছুটে পার হবার মত মনের জোর রাখো। তাহলেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি। সিনাত্রা দু'হাত ছড়িয়ে বলল। তারপর ফ্রান্সিসের কথা মত শুয়ে পড়ল। বৃষ্টির জল বালির মধ্যে তখন অনেকটা শুষে গেছে। ভেজা বালির ওপরই শুয়ে রইল ওরা।

রাতে সেই একই খাবার খেতে দেওয়া হল। দু'জন প্রহরী পাহারায় রইল। দু'জন প্রহরী খাবার দিল। ফ্রান্সিসরা বেশ খুশি মনে খেয়ে নিল। ফ্রান্সিসের ততক্ষণে পালাবার ছক ভাবা হয়ে গেছে।

কিন্তু তারপরই বোঝা গেল গোষ্ঠীপতি ফ্রান্সিসদের মত চালাক না হলেও যথেষ্ঠ বুদ্ধি ধরে। প্রহরীরা প্রত্যেকের হাত আর পা লতা দিয়ে বেঁধে দিল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস গোষ্ঠীপতিকে যতটা বোকা ভেবেছিলাম সে ততটা বোকা নয়। পালাবার রাস্তা বুদ্ধি করে আটকে দিল।

—কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। হাত পা বাঁধা হল। তবে কি আজ রাত্রেই আমাদের সমুদ্রের খাঁড়িতে ফেলে দেবে? ফ্রান্সিস বলল।

—চিন্তার কথা। শাঙ্কো মাথা দুপাশে নাড়িয়ে বলল।

—শাঙ্কো একটা কাজ কর। বন্দীদের কাছ থেকে জানো তো হাত পা কেন বাঁধা হল? ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো বন্দীদের কাছে গেল। বেশ কয়েকবার আকার ইঙ্গিতে কথাটা জানতে চাইল। একজন বন্দী আকার ইঙ্গিতে সেই মোটা পাতার গাছ দেখাল। ফুল টুল দেখাল। দু'হাত তুলে প্রনাম করার ভঙ্গী দেখাল। শাঙ্কো বুঝল সমুদ্রের খাঁড়িতে ছুড়ে ফেলার আগে এরা বৃক্ষপূজা করে। ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল সে কথা। ফ্রান্সিস বলল—এই বড় বড় মোটা পাতাওয়ালা গাছ গুলো এদের কাছে খুব পবিত্র গাছ। দেখছো না গাছের ডালে ঘর তৈরী করে। এই গাছের শুকনো পাতা আর ঘাস দিয়ে ঘরের ছাঁউনি তৈরী করে। এই গাছের পাতা পেতে খাবার খায়। বোধহয় কাছেই কোথাও কোন গাছ ওরা কোন কাজের আগে মানে বিয়েটিয়ে বন্দীকে শাস্তি দেওয়ার আগে পূজো করে ফুল পাতা দিয়ে। ঐপূজো সেরেই আমাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

আজ রাতে সেই পূজো হচ্ছে না। হলে হৈ চৈ শুনতাম। কাজেই আজ রাতের মত আমরা নিশ্চিন্ত। তবে সময় নষ্ট করা চলবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সারতে হবে।

ফ্রান্সিসরা শুয়ে পড়ল। আকাশে চাঁদ উজ্জ্বল। চারিদিক মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস আড়চোখে প্রহরীর ওপর নজর রাখল। প্রহরী বর্শা হাতে ঘরাঘুরি করছিল। একটু রাত হতেই প্রহরী আবার কাটাগাছের গুঁড়িতে বসল। হাতের বর্শাটা মাটিতে রাখল। বোধহয় একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার চেষ্টা।

ফ্রান্সিস একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস বুঝল প্রহরটি অনড় বসে। তাহলে একটু ঘুম মত এসেছে। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ঘুমোয় নি। শুয়ে শুয়েই গড়িয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস বাঁধা দু'হাত শাঙ্কোর বুকের কাছ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। তারপর শাঙ্কোর জামার তলা থেকে ছোরাটা বের করল। শাঙ্কোর হাত বাধা লতাটায় ছোরাটা ঘষতে লাগল। লতা কেটে গেল। শাঙ্কো ছোরাটা নিয়ে গড়িয়ে পেছনে জালের কাছে গেল। তারপর জাল কাটতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ ছোরা ঘষেও লতার জাল কাটতে পারল না। ঘন বুনটের জাল কাটা প্রায় অসম্ভব মনে হল। শাঙ্কো গড়িয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফিস্ ফিস্ করে বলল—লতা কাটা যাচ্ছে না।

—বলো কি? ফ্রান্সিস বেশ চমকে উঠল।

—সর্বনাশ। ঐ লতার জাল না কাটতে পারলে তো—আবার দেখ। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল।

শাঙ্কো আবার গড়িয়ে জালের কাছে গেল। জোরে ছোরা ঘষতে লাগল জালে। জাল একটু কাটল। কিন্তু সময় লাগল বেশি। যেটুকু কাটল তাতে ফাঁক হল সামান্যই। সেই ফাঁকা দিয়ে গলে যাওয়া অসম্ভব। আবার গড়িয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এল। ওর অসাফল্যের কথা বলল। ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। বোঝাই যাচ্ছে সহজে ঐ লতার বুনট করা কাটা যাবে না। অন্য উপায় ভাবতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রহরীকে কব্জা করে পালাতে হবে এবং একবারের চেষ্টায় না পারলে প্রহরীর সংখ্যা গোষ্ঠীপতি বাড়িয়ে দেবে। তখন পালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

ফ্রান্সিস এসব ভাবতে ভাবতে পাশ ফিরল। তখনই দেখল বন্দী তিনজন একেবারে কোনে লতার জালের কাছে শুয়ে পড়ে কী করছে। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ওর কাছে এল।

—দেখ তো ঐ তিনজন কী করছে? শাঙ্কো একবার প্রহরীর দিকে তাকাল।

দেখল প্রহরী ঝিমোচ্ছে। ও গড়িয়ে কোনার দিকে এল। বন্দীদের একজন হাতের চেটো দেখিয়ে শাঙ্কোকে চুপ করে থাকতে বলল। শাঙ্কো দেখল তিনজন লতার দড়ি বুনট নিপুন হাতে খুলছে। শাঙ্কো এবার বুঝল লতা দড়ি কাটা যাবে না। বুনট খুলে লতার দড়ির জাল খুলতে হবে। আর সেটা করতে হবে উল্টো দিকের বুনট খুলে। ও গড়িয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এল। বন্দীরা কী করছে বলল। ফ্রান্সিস বলল—এটাই পালাবার সহজ পথ। ওরা বুনট খুললেই বেরিয়ে যাওয়া যাবে।

তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। বন্দীরা চেষ্টা করেও বেশি অংশ খুলতে পারল না।

ভোর হওয়ার আগেই ওরা খোলা লতার দড়ি জালে জড়িয়ে রাখল। তারপর সরে এল। ফ্রান্সিস এবার শাঙ্কোর হাতের কাটা বাঁধনটা নিয়ে শাঙ্কোর হাতে বেঁধে দিল। শাঙ্কোর হাত খোলা দেখলে বিপদে পড়তে হবে। বাঁধা হাত নিয়ে শাঙ্কো শুয়ে পড়ল।

তখনই সিনাত্রার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ও এতসব ঘটনা জানতে পারল না। ফ্রান্সিস ওকে কিছু বলল না। ও ফ্রান্সিসকে বলল—তাহলে পালাতে পারবে না?

—হ্যাঁ পারবো। সময় এলেই দেখবে। শাঙ্কো বলল।

—কী ভাবে সেটা বল। সিনাত্রা জানাতে চাইল।

—আজ রাতেই দেখবে। ফ্রান্সিস বলল।

ততক্ষণে বন্দী তিনজন কোনা থেকে সরে এসে মাঝামাঝি জায়গায় শুয়ে পড়েছে। অবশ্যই ঘুমের ভান করে।

সকাল হল। প্রহরীরা সকালের খাবার নিয়ে এল। সবার হাতের বাঁধন খুলে দিল। সবাই খেল। প্রহরীরা জাল ঘরের দরজা বন্ধ করে চলে গেল। একজন প্রহরী বর্শা হাতে পাহারা দিতে লাগল।

এরপরে প্রহরীরা ওদের দুবার খেতে দিল। দুপুরে আর রাতে। রাতের খাওয়া দাওয়ার পর আবার সবার হাত পা বেঁধে দেওয়া হল। দু দুবারেও খোলা জাল প্রহরীদের নজর পড়ল না। প্রহরীরা একজন প্রহরীকে রেখে চলে গেল। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল—যাক—ফাঁড়া কাটল। আজ রাতেই পালাতে হবে।

সব বন্দীরাই শুয়ে পড়ল।

রাত বাড়তে লাগল। প্রহরীটি কাটাগাছের গোড়ায় বসল। একটু পরেই তন্দ্রায় ঢুলতে লাগল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল সেটা। ও গলা চেপে ডাকল—

শাঙ্কো। শাঙ্কো উঠে বসল। ফ্রান্সিস ওর জামার মধ্যে হাত চালিয়ে ছোরাটা বার করল। শাঙ্কোর হাতের বাঁধনে ঘষতে ঘষতে কেটে ফেলল। এবার শাঙ্কো ছোরাটা ঘষে ঘষে ওর পায়ের বাঁধন কাটল। ঘুমন্ত সিনাত্রার পিঠে আস্তে ধাক্কা দিয়ে বলল—চুপ করে শুয়ে থাকো। তারপর সিনাত্রার হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিল। সিনাত্রা হাঁ করে দেখতে লাগল। এবার শাঙ্কো বন্দী তিনজনের হাতপায়ের বাঁধন কেটে দিল। খোলা হাত পা পেয়ে ওরা খুশি। এবার অনেক দ্রুত হাতে বুনট খুলতে হবে।

শেষ রাত নাগাদ অনেকটা বুনট ওরা খুলে ফেলল। ওরা আর দাঁড়ল না ফাঁক গলে দ্রুত বনের দিকে ছুটল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—পালাও। তিনজনে ফাঁক গলে তাড়াতাড়ি বাইরে এল।

ফ্রান্সিসের পালাও কথাটা বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরীর কানে গিয়েছিল। ওর তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। ও অবাক হয়ে দেখল ফ্রান্সিসরা জাল ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ও মাটি থেকে বর্শা তুলে ছুটে এল। ওদের কাছাকাছি এসে বর্শা তোলার আগেই শাঙ্কো ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ধাক্কা খেয়ে প্রহরীটি মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। হাত থেকে বর্শাটা ছিটকে পড়ল। শাঙ্কো দ্রুত ফ্রান্সিসের কাছে এল। এবার তিনজনই ছুটল বনের গাছগাছালির দিকে। প্রহরীটা উঠে বসে গলায় শব্দ করল—হি—হি—ই। এটা বোধহয় ওদের লড়াইয়ের ডাক।

তখন ফ্রান্সিসরা বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কখনও গাছের গুঁড়িতে পা রেখে কখনও গাছের পাশ দিয়ে ওরা ছুটল সমুদ্রের দিকে। বনতলে অন্ধকার। কাজেই খুব জোরে ওরা ছুটতে পারল না। সিনাত্রা দু'একবার হোঁচট খেল। ওদিকে প্রহরীর চিৎকার বনের মধ্যে শোনা যেতে লাগল। গাছের ঘরে ঘরে লোক জনের কথা শোনা যেতে লাগল। যোদ্ধারা বর্শা হাতে মই বেয়ে গাছের ওপরের ঘর থেকে নেমে আসতে লাগল। কিন্তু অন্ধকারে ফ্রান্সিসদের দেখতে পেল না। ওরা এদিক ওদিক খুঁজতে লাগল। ততক্ষণে ফ্রান্সিসরা বনের বাইরে চলে এসেছে। ছুটে চলেছে বালিয়াড়ির দিকে। বালিয়াড়ি পার হচ্ছে তখনই যোদ্ধারা বনভূমি থেকে বেরিয়ে এল। দূর থেকে বর্শা ছুঁড়ল কয়েকজন যোদ্ধা। বর্শাগুলো বালিয়াড়ির বালিতে গেঁথে গেল।

জাহাজের পাটাতন পাতাই ছিল। তখন সূর্য উঠেছে। ভোরের আলোয় পাটাতন দিয়ে দ্রুতপায়ে ওরা জাহাজে উঠে পড়ল। ফ্রান্সিসরা তখন মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে। ওরা দু'জনে পটাতন তুলে ফেলল।

জাহাজের ডেক-এ যেসব ভাইকিংরা শুয়ে ছিল তারা ছুটে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপতে বলল—এখন কথা নয়। পাল খুলে দাও। দাঁড় ঘরে যাও। নোঙর তোল। যত তড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালাবো আমরা।

ভাইকিং বন্ধুরা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যোদ্ধারা তখন হালের কাছাকাছি চলে এসেছে। কিন্তু অসহায় চোখে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। কিছুই করার নেই। ওরা লড়াইয়ের ডাক দিল—হি—ই—ই। কিন্তু কাদের সঙ্গে লড়াই করবে? জাহাজ ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে সমুদ্রতীর থেকে জাহাজের দূরত্ব বাড়তে লাগল। এক সময় ফ্রান্সিসদের জাহাজ মাঝ সমুদ্রে চলে এল। শাঙ্কো তখন হাত পা নেড়ে বন্ধুদের বলছে বৃক্ষবাসী মানুষদের কথা। কী করে পালাল সেইসব কথা।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলছে। সেদিন সকাল থেকে বাতাস পড়ে গেছে। কেমন একটা গুমোট ভাব। অগত্যা জাহাজের গতি বাড়াতে দাঁড় ঘরে যেতে হল কিছু ভাইকিংকে। বিনেলো নামে এক ভাইকিংকে ফ্রান্সিস দায়িত্ব দিল দাঁড় ঘরের কাজ দেখার জন্যে। বিনেলো শাঙ্কোর মতই দুঃসাহসী। ফ্রান্সিস ওকে নানা দায়িত্ব দিয়ে দিয়ে তৈরী করতে লাগল। বিস্কোর অভাব ও পূরণ করবে। ভাইকিংরা বিনেলোর নির্দেশ মানতে লাগল। বিনেলো লক্ষ্য রাখল যাতে দাঁড় টানার ছন্দে কোন ছেদ না পড়ে।

দিন আট দশ কাটল। সমুদ্রে সেদিন উত্তাল হাওয়া। পালগুলো ফুলে উঠছে যেন বেলুনের মত। পূর্ণ গতিতে জাহাজ চলছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ডাঙ্গা দেখা গেল না। নজরদার পেড্রো মাস্তুলের উপরে নিজের জায়গায় বসে চারিদিক নজর রাখছে। কিন্তু কোথায় ডাঙ্গা?

দিন পনেরো পরে সেদিন বিকেলে পেড্রো ডাঙ্গা দেখতে পেল। বরাবরের মত চিৎকার করে মাস্তুলের ওপর থেকে বলল—ডাঙা—ভাইসব ডাঙা দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে। মারিয়া তখন জাহাজের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে। ও যেমন প্রত্যেকদিন সূর্যাস্ত দেখতে আসে। ডানদিকে তাকিয়ে দেখল—সূর্যাস্তের ঘোর কমলা রঙের আকাশের নিচে কালো মাটি। অস্পষ্ট দেখল জাহাজ ঘাট। দু'একটা জাহাজও রয়েছে।

ততক্ষণে ফ্রান্সিসও ডেক-এ উঠে এসেছে। সঙ্গে হ্যারি। দু'জনেই জাহাজ ঘাট দেখল। অন্য বন্ধুরাও এসেও রেলিং ধরে দাঁড়াল। হ্যারি বলল—এখন কী করবে ফ্রান্সিস?

—একটু পরেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। অন্ধকারে এখানে নামা চলবে না?

এখানের কিছুই আমারা জানি না। এটা কোন দ্বীপ না দেশের অংশ তাও জানি না। কাল সকালে নামা যাবে। ফ্রেজারকে গিয়ে বলো তীরের কাছে জল গভীর থাকলে তীরে জাহাজ ভেড়াতে—ফ্রান্সিস বলল। কিছুক্ষণ পরে ফ্রেজার জাহাজ তীরে ভেড়াল। জল ওখানে গভীর। নোঙর ফেলা হল। তখনই ঘাটে নোঙর করা জাহাজ দুটো হ্যারি মনোযোগ দিয়ে দেখল। একটা জাহাজ ছোট। অন্যটা মালবাহী জাহাজ। ছোট জাহাজের মাথায় সাদা পতাকা। তার মানে যে কোন দেশের জাহাজ হতে পারে ওটা। মালবাহী জাহাজের মাথায় স্পেন দেশের পতকা উড়ছে। তার মানে স্পেনীয় মানুষদের জাহাজ।

আশ্চর্য। দুটো জাহাজই জনহীন। কোন মানুষের চিহ্নমাত্র নেই।

—ফ্রান্সিস—হ্যারি ডেকে বলল—লক্ষ্য করে দেখ জাহাজে দু'টোয় কোন নাবিক বা ক্যাপ্টেন কেউ নেই।

—কী জানি। শাঙ্কো বলল—তবে হতে পারে কাছেই এখানকার নগর। জাহাজীরা ফুর্তিটুর্তি করতে গেছে। কতদিন পরে মাটির দেখা পেয়েছে। খুশি হওয়ারই কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—উঁহু। ব্যাপারটা তেমন মনে হচ্ছে না। হ্যারি মাথা নেড়ে বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

গভীর রাত তখন। শাঙ্কোরা কয়েকজন ডেক-এ ঘুমিয়ে আছে। পেড্রোও ওদের সঙ্গে ঘুমিয়ে আছে। নজরদারি করছে না। সমুদ্রের বেগবান বাতাসে অন্যরাও ঘুমোচ্ছে।

হঠাৎ তরোয়ালের খোঁচা খেয়ে পেড্রোর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে ও ভাঙা চাঁদের আলোয় দেখল খোলা তরোয়াল হাতে কয়েকজন যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে। ও চিৎকার করে উঠতে গেল। যোদ্ধাটা তরোয়ালের ডগাটা ওর গলায় ঠেকিয়ে মৃদুস্বরে বলল—কোন শব্দ করবে না। উঠে চুপ করে বসে থাকো। পেড্রো আর কী করবে? উঠে বসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। শাঙ্কোরাও উঠে বসেছে। যোদ্ধাদের সবার হাতেই খোলা তরোয়াল। ওরা সংখ্যায় আট দশজন। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। গায়ে নানা রঙের সুতোয় কাজ করা ঢোলা হাতা পোশাক?

শাঙ্কো তখন ভাবছে হাতে তরোয়াল থাকলে একটা লড়াই দেওয়া যেত। শাঙ্কো লক্ষ্য করল যোদ্ধাদের পোশাক ভেজা। তার মানে জলে ডুব সাঁতার দিয়ে এসে ওরা জাহাজে উঠেছে। বোঝাই যাচ্ছে এরা জলদস্যু নয়। কিন্তু এভাবে সহজে এসে ওদের বন্দী করার কারন কী? এরা কারা?

ওদিকে চারপাঁচজন যোদ্ধা সিড়ি দিয়ে নিচের কেবিনঘরের দিকে নেমে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্রান্সিস, মারিয়া, হ্যারি, ভেন আর অন্য বন্ধুরা ডেক-এ উঠে এল। পেছনে খোলা তারোয়াল হাতে যোদ্ধারা। একজন বেশ মোটা যোদ্ধা গলা চড়িয়ে বললে—তোমাদের দল নেতা কে? ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে বলল—আমি।

—তোমরা রাজা কার্তিলার আদেশে বন্দী হলে। দলপতি বলল।

—আমাদের অপরাধ? ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা মহামান্য রাজা কার্তিলা বুঝবে। দলপতি বলল।

ওদিকে সিঁড়িঘরের আড়ালে বিনেলো ঘুমিয়ে ছিল। ওই জায়গাটাই ওর বরাবরের ঘুমের জায়গা। মোটা যোদ্ধাটিই যোদ্ধাদের সর্দার। ওর কথাবার্তায় বিনেলোর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ও আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে সব দেখল।

কেউ কিছু বোঝার আগেই বিনেলো ছুটে এসে এক দলপতিকে প্রচন্ড ধাক্কা দিল। দলপতি এই হঠাৎ আক্রমণে টাল সমালাতে পারল না। উবু হয়ে ডেক-এ উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। হাতের তরোয়াল খাস পড়ল। বিনোলা তরোয়ালটা তুলে নিল। তারপর বিনেলো নিপুণ হাতে ওদের সঙ্গে লড়াই চালাতে লাগল। ফ্রান্সিস বাধা দেবার সময়ই পেল না। চারজন সৈন্যের সঙ্গে বিনেলা একাই লড়াই করছে। একজন যোদ্ধা সুযোগ বুঝে বিনেলোর পায়ে তারোয়ালের ঘা বসাল। রক্ত বেরিয়ে এল। তবু বিনেলো লড়াই চালাতে লাগল। দু'জন যোদ্ধা আহত হয়ে সরে দাঁড়াল। শাঙ্কো আর স্থির করতে পারল না। ও বুকের দিক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। তারপর যে যোদ্ধাটি বিনেলোকে আহত করেছিল ছুটে গিয়ে তার পেটে আমূল ছোরা বসিয়ে দিল। ফ্রান্সিস বুঝল বিপদ। এবার যোদ্ধারা সবাই ওদের দু'জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিনোলা আর শাঙ্কোর জীবন বিপন্ন হবে।

ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে উঠে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—বিনোলা—শাঙ্কো—লড়াই নয়। বিনোলা দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। যোদ্ধারাও হাঁপাচ্ছে তখন। লড়াই থেমে গেল। দলপতি চেঁচিয়ে বলল—তোমাদের বিচার হবে। চলো সব।

যোদ্ধারা নিজেরাই কাঠের পাটাতন পেতে দিল। আগে আহত যোদ্ধাদের নিয়ে ওরা কয়েকজন নেমে গেল। দলপতি ফ্রান্সিসদের ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা নেমে গেল। অন্য যোদ্ধারা ওদের পেছনে পেছনে নামল। সবাই বড় রাস্তা ধরে চলল।

তখন ভোর হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজনের চলাচল শুরু হয়েছে। রাস্তার

দু'পাশে দোকান টোকান খুলছে। ফ্রান্সিসরা নির্দেশমত চলল। হাঁটতে হাঁটতে ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ওর কাছে এল। ফ্রান্সিস একই স্বরে বলল—ওরকম মাথা গরম করা তোমার উচিত হয়নি। এতে আমাদের বিপদ বাড়ল।

—যোদ্ধাটি অন্যায়ভাবে বিনেলোকে আহত করেছে। শাঙ্কো বলল।

—স-অব মেনে নিতে হবে। পরে অস্ত্রহাতে লড়াইয়ের সুযোগ করে নেবে। এখন চুপচাপ সব সহ্য করে যাও। ফ্রান্সিস বিনেলোকে কাছে ডেকে একই কথা বলল।

রাস্তার লোকজন ফ্রান্সিসদের বেশ উৎসুকের সঙ্গে দেখছে। এতজন বিদেশী নিশ্চয়ই সাজা হবে এদের।

ওদিকে বিনেলোর পায়ের ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছে। ফ্রান্সিস পিছনে ফিরে ভেনকে দেখল মারিয়ার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। ও বলল—ভেন। বিনেলোর তো চিকিৎসার দরকার।

—উপায় কি বলো। আমার ওষুধ পড়লে এক্ষুণি রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু ওষুধ তো জাহাজে। ভেন বলল।

—দেখ রাজাকে বলে। ভেন বলল। মারিয়া নিজের পোশাকের নিচে থেকে কিছুটা লম্বা কাপড় ছিঁড়ে ভেনকে দিয়ে বলল—তুমি অন্তত পট্টিটা বেঁধে দাও। ভেন কাপড়ের পুটলিটা নিয়ে বিনেলোর কাছে যাচ্ছে তখনই একজন যোদ্ধা ছুটে এল বলল—নড়াচড়া চলবে না। সব দাঁড়িয়ে থাক।

—ওর পা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না। অন্তত পট্টিটা বাঁধতে দাও। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল।

—না। মহামান্য রাজার হুকুম না হলে কিছু হবে না। যোদ্ধাটি বলল।

—তাহলে তোমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। ঢ্যাঙা মাথার হ্যারি চিৎকার করে বলল।

—না। রাজার হুকুম চাই। যোদ্ধাটি বলল। ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর যোদ্ধাদের দলপতি এগিয়ে এল। বলল—সবাইকে রাজসভায় নিয়ে যাও।

যোদ্ধারা সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসদের রাজসভায় নিয়ে চলল।

রাজসভায় ঢুকে ফ্রান্সিসরা দেখল বেশ বড় ঘর। রাজা কার্তিলা একটা কাঠের সিংহাসনে বসে আছে। ফ্রান্সিসরা গিয়ে দাঁড়াতেই দলপতি এগিয়ে গিয়ে

সেনাপতিকে কিছু বলল। সেনাপতি ফ্রান্সিসদের রাজার কাছে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি এগিয়ে গেল। রাজা কিছু বলার আগেই ফ্রন্সিস বলে উঠল—আমরা বিদেশী ভাইকিং। আপনার রাজত্বে আমরা এই প্রথম এলাম। এখানকার নিয়ম কানুন আমরা কিছুই জানি না। কী অপরাধে আমাদের বন্দী করা হল তাই জানতে চাইছি। রাজা দলপতির দিকে তাকাল। দলপতি মাথা একটু নিচু করে সম্মান জানিয়ে বলল—মহামান্য রাজা এরা আমাদের সঙ্গে লড়াই করেছে। দু'জনকে আহত করেছে। আর একজনকে হত্যা করেছে। ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বুঝল—খুবই বিপদ উপস্থিত। হ্যারি বলে উঠল—

—আমাদেরও একজন আহত হয়েছে। তবু মৃত্যুর জন্যে আমরা গভীরভাবে দুঃখিত। আমাদের বন্ধু এক বন্ধুকে আহত হতে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। আঘাতকারীকে সে আহতই করতে চেয়েছিল। হত্যা করতে চায়নি।

—কোন কথা শুনতে চাই না। রাজা প্রায় চিৎকার করে বলল। তারপর সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলল—কে সেই হত্যাকারী?

দলপতি শাঙ্কোকে অঙ্গুল তুলে দেখাল।

—চাবুক মারো। উপযুক্ত শাস্তি। রাজা বলে উঠল।

দলপতি ছুটে এসে শাঙ্কোকে রাজার সামনে নিয়ে এল। একজন প্রহরী চাবুক হাতে এগিয়ে এল। দলপতি চাবুকটা হাতে নিল। তারপর শাঙ্কোর পিঠে চাবুক মারতে লাগল। চারপাঁচটা চাবুকের ঘা শাঙ্কো মুখ বুঝে সহ্য করল। তারপর আর পারল না। ওর মুখ থেকে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল। শাঙ্কোর কষ্ট বিকৃত মুখের দিকে ফ্রান্সিস তাকিয়ে থাকতে পারল না। মাথা নিচু করল। শাঙ্কোর পিঠের দিকে পোশাক ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে এল।

ফ্রান্সিস হাত তুলে চিৎকার করে উঠল—থামো। দলপতি হাঁপাতে হাঁপতে রাজার দিকে তাকাল।

—চাবুক চালিয়ে মেরে ফেল। রাজা কাৰ্তিনা চেঁচিয়ে বলে উঠল। ফ্রান্সিস দাঁত চাপাস্বরে বলল—আর একবার চাবুক মারলে আমরা লড়াইয়ে নামব।

রাজা হো হো করে হেসে উঠল। বলল—তোমাদের হাতে একটা লাঠিও নেই।

—নিরস্ত্র অবস্থায় কী করে লড়াই করতে হয় আমরা জানি। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা সবাই মরবে। রাজা বলল।

—আমাদের বন্ধুকে বাঁচাতে আমরা মরতে প্রস্তুত। ফ্রান্সিস বলল। মনে রাখবেন আমরা ভাইকিং। আমরা মৃত্যুর পরোয়া করি না।

তখনই মন্ত্রী উঠে দাঁড়াল। বলল—কিন্তু ও তো আমাদের এক যোদ্ধাকে হত্যা করেছে।

—তার জন্যে আমরা ক্ষমা চাইছি। আমরা তো বললাম—ও হত্যা করতে চায়নি। যোদ্ধাটিকে আহত করতে চেয়েছিল। হ্যারি বলল।

—বেশ। তার শাস্তি ও পেয়েছে। মন্ত্রী বলল। তারপর আসনে বসে পড়ে রাজাকে বলল—মান্যবর রাজা—ক্ষমা করে দিন। রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—বেশ। আপনার কথাই থাক।

—মান্যবর রাজা—ফ্রান্সিস বলল—আমাদের কোথায় বন্দী হয়ে থাকতে হবে?

—কয়েদ ঘরে। রাজা বলল।

—একটা কথা ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। রাজা বলল।

মারিয়াকে দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। কয়েদঘরের পরিবেশে উনি থাকতে পারবেন না। অনুরোধ করছি তাঁকে আমাদের জাহাজে রাখুন। উনি তো আর একা জাহাজ চালিয়ে পালাতে পারবেন না।

—থাকুক। তবে আমাদের এক যোদ্ধা পাহারায় থাকবে। রাজা বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস এবার ভেনকে দেখিয়ে বলল—ইনি আমাদের চিকিৎসক বৈদ্য। ইনিও মধ্যবয়স্ক। একা ওর পক্ষে পালানো অসম্ভব। ওঁকেও আমাদের জাহাজে থাকতে অনুমতি দিন।

—তাহলে দুজন প্রহরী থাকবে। রাজা বলল।

—ঠিক আছে। আমাদের আহত দুই বন্ধুকে উনিই চিকিৎসা করবেন। সেই অনুমতি দিন।

—আমার কোন আপত্তি নেই। তোমাদের আর কোন অনুরোধ রাখা আমার হবে না। রাজা এবার সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলল—এদের দু'জন ছাড়া সব কজনকে কয়েদঘরে বন্দী করুন। সেনাপতি বলল—মাননীয় রাজা—আমাদের হুকুমে বন্দরে একটা স্পেনীয় জাহাজ থেকে আর একটা মালবাহী জাহাজ থেকে নাবিকদের বন্দী করে এনে কয়েদঘরের রাখা হয়েছে।

—জাহাজ দুটো তল্লাশী হয়েছে? রাজা জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। সেনাপতি ঘাড় কাত করে বলল।

—মূল্যবান কিছু পাওয়া গেছে? রাজা আবার প্রশ্ন করল।

—সামান্য কিছু বিদেশী স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। সেনাপতি বলল।

—ওদের মুক্তি দাও। প্রতিদিনের খাওয়ার খরচ বাঁচানো যাবে। রাজা বলল।

সেনাপতি মাথা নুইয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল—চলে সব। বিনেলো শাঙ্কোকে ধরে ধরে নিয়ে এল। সিনাত্রাও সাহায্য করল।

রাজবাড়ির বাইরে এল সবাই। সামনে পেছনে যোদ্ধারা। রাজবাড়ির পেছনে কয়েদঘরের সামনে এল। দলপতি সকলের আগে ছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে সবাইকে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করল। তারপর এগিয়ে গিয়ে প্রহরীদের একজনকে বলল—বন্দর থেকে যে নাবিকদের বন্দী করা হয়েছে তাদের সবাইকে ছেড়ে দাও।

প্রহরীরা দরজা খুলে নাবিকদের বেরিয়ে আসতে বলল। বন্দী নাবিকরা আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। তারা সংখ্যায় পঁচিশ তিরিশ জন।

তারা সদর রাস্তায় নেমে জাহাজ ঘাটের দিকে চলল।

তোমরাতো হত দরিদ্র। তল্লাশী হয়ে গেছে। প্রায় কিছুই পাওয়া যায় নি। দলপতি বলল। কথাটা হ্যারিও শুনতে পেল। গলা নামিয়ে বলল—রাজকুমারীর বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। ভাগ্যিস তোমাদের কেবিনঘরের কাঠের দেয়ালের ফাঁকে সোনার চাকতি গুলো লুকিয়ে রেখেছিলেন। ফ্রান্সিস কিছু বলল না। মৃদু হাসল। কষ্ট করেই হাসল। কারন শাঙ্কোর জন্যে ওর মন ভালো নেই।

ফ্রান্সিসদের কয়েদঘরে ঢোকানো হতে লাগল। মারিয়া আর ভেন একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরে ঢুকে গেল।

দলপতি দু'জন প্রহরীকে সঙ্গে নিয়ে মারিয়াদের কাছে এল। প্রহরীদের দেখিয়ে বলল—এরা তোমাদের জাহাজে যাচ্ছে। পালাবার চেষ্টা করবে না। মারিয়ার কথা বলতে ইচ্ছা করল না। দু'জনে প্রহরীর পাহারায় জাহাজ ঘাটের দিকে চলল।

কয়েদঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস দেখল ঘরটা নেহাৎ ছোট না। হাত পা ছড়িয়ে থাকা যাবে। দেখল আগে থেকেই তিন'জন বন্দী রয়েছে। মধ্য বয়স্ক একজন বৃদ্ধ আর অন্যজন যুবক। মধ্যবয়স্কর চেহারায় বেশ রাশভারি। মুখে অল্প কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ। সুগোঠিত দেহ। একজন সাহসী যোদ্ধার মতই চেহারা।

শাঙ্কোকে ততক্ষণে ধরে ধরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ও চিৎ হয়ে শুতে পারছে না। ও বাঁদিকে কাতর হয়ে শুয়ে রইল। ও গোঙাচ্ছে না। কিন্তু ওর যন্ত্রনাক্লিষ্ট মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ও প্রাণপণে যন্ত্রনা সহ্য করছে।

ফ্রান্সিস আশায় রইল কতক্ষণে ভেন আসে।

বেশ কিছুক্ষর পরে ভেন ঝোলা কাঁধে এল। যাহোক প্রহরীরা ওকে বাধা দিল না। দরজা খোলা হল। ভেন ঘরে ঢুকল। কাঁধ থেকে ঝোলা নামিয়ে মেঝেতে রাখল। শাঙ্কোর কাছে গেল। বলল—জামাটা খোল। শাঙ্কো মাথা নেড়ে বলল—পারবে না। খুলে দাও। বিনেলো এগিয়ে গেল। শাঙ্কোর গায়ে চাবুকের মারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাওয়া জামাটা কোনরকমে খুলে দিল। তারপর পিঠের ক্ষত ভেন পরীক্ষা করল। বোঝা থেকে দুটো বোয়াম বের করল। হাতের তালুতে ওষুধ নিয়ে ঘষে ঘষে বড়ি বানাল। বিনেলোকে বলল—এখন একটা বড়ি খাইয়ে দাও। পরে দিনে তিনটে করে বড়ি খাওয়াবে। ওষুধগুলো ঠিকমত খাইয়ে দিও। বিনেলোর পা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে তখনও। ভেন ঝোলা থেকে একটা কাঠের কৌটো বার করল। কৌটার মুখ খুলে সব্জেমত গুঁড়ো ক্ষতস্থানে ঢেলে দিল। বিনেলা আঃ শব্দ করল মুখে। ভেন বলল—রক্ত পড়া বন্ধ হবে। ব্যাথাও কমবে। একটু সহ্য কর। বিনেলো কিছু বলল না।

ভেন ঝোলায় বোয়াম কৌটো ভরতে ভরতে বলল—

—তরোয়ালের ক্ষত শুকিয়ে যাবে। ভয়ের কিছু নেই। তবে শাঙ্কোর ঘা সারতে একটু সময় লাগবে। ও যেন বেশি নাড়াচাড়া না করে। আমি পরশু আসবো। ওষুধ দেব।

—রাজকুমারীর দিকে নজর রেখো। জাহাজে তুমি ছাড়া আর কেউ তো রইল না। হ্যারি বলল।

—তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। রাজকুমারীকে আমি প্রাণ দিয়ে হলেও রক্ষা করব। ভেন বলল। তারপর ঝোলা কাঁধে নিয়ে চলে গেল।

দুপুরে খাবার দেওয়া হল। লম্বাটে শুকনো পাতায় দেওয়া হল আধপোড়া গোলরুটি আনাজের ঝোল আর সবশেষে আশ্চর্য পাখির মাংস। ফ্রান্সিসরা পেট পুরে খেল। প্রহরীরাই খেতে দিয়েছিল। শাঙ্কোকে ওষুধ খাওয়ানো হল। পাখীর মাংস বেশ পেট পুরেই খেল ওরা। পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ফ্রান্সিস চোখ বুজে ছিল। হঠাৎ প্রশ্ন শুনল—তোমরা তো বিদেশী। ফ্রান্সিস চোখ মেলে তাকাল। দেখল লম্বা চুলওয়ালা যুবকটি কখন ওর কাছে এসে বসেছে। শাঙ্কোর জন্যে মনটা ভালো নেই তবু কথা বলল—

—হ্যাঁ অমারা ভাইকিং।

—ও। দুঃসাহসী হিসেবে তোমাদের সুনাম আছে। যুবকটি বলল।

ফ্রন্সিস চুপ করে রইল।

—তোমার নাম কী? যুবকটি জানতে চাইল।

—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার নাম আতলেতা। পর্তুগালে আমার জন্ম। কিন্তু বড় হয়েছি এখানে। আতলেতা বলল।

—রাজা কার্তিনা তোমাদের বন্দী করেছেন কেন? আতলেতা জিজ্ঞেস করল।

ফ্রান্সিস আহত শাঙ্কোকে দেখিয়ে বলল—ও মাথা গরম করে কার্তিনার এক যোদ্ধাকে মেরে ফেলেছে।

—মাত্র একটাকে মেরেছে। গোটা পাঁচেক যোদ্ধাকে মারতে পারল না। আতলেতা বলল।

—একটাকে মেরেই চাবুক খেয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা কার্তিনা তোমার বন্ধুকে মেরে ফেলেনি এটাই আশ্চর্য। কার্তিনার মত নরপশু দু'টি নেই। আতলেতা বলল।

—তোমাদের অপরাধ। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

সেই রাশভারি চেহারার মানুষটি দেখিয়ে আতলেতা বলল—

—উনি এই লাগাস রাজ্যের রাজা—এনিমার। বৃদ্ধকে দেখিয়ে বলল—উনি মন্ত্রীমশাই। রাজা কার্তিনার রাজ্য পশ্চিমের পাহাড়ের ওপর। লড়াই করে এই লাগাস রাজ্য জয় করেছে রাজা কার্তিনা। মন্ত্রীকে আর আমাকে এই কয়েদ ঘরে বন্দী করে রেখেছে। এখন আমাদের ফাঁসি দিলেও আমরা অবাক হব না। আতলেতা বলল।

—আর সেনাপতি? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—লড়াইয়ে মারা গেছেন। তখন আমাকেই সেনাপতির কাজ চালাতে হচ্ছিল। সেই আমিও হেরে গিয়ে বন্দী। আতলেতা বলল।

—রাজা এনিমারের তো এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল।

—উনি অন্য রকম মানুষ। নিজের গ্রন্থাগারেই দিনের অধিকাংশ সময় কাটাতেন। লড়াই রক্তপাত মৃত্যু এসব মোটেই পছন্দ করেন না। তাই রাজা কার্তিনা সহজেই জয়লাভ করেছে।

—রাজত্ব রাখতে গেলে যুদ্ধ লড়াই আছেই। তারপর পার্শ্ববর্তী রাজ্য যদি আক্রমণকারী হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা এনিমার এসব ব্যাপারে উদাসীন। ভালো মানুষ যেমন হয় আর কি। আতলেতা বলল।

—তোমরা বন্দী হলে কীভাবে। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—রাজা এনিরের জন্যে। দিন দশেক আগের কথা। তখন বেশ রাত। ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎই বড় রাস্তায় হৈ চৈ শুনলাম। তরোয়াল নিয়ে বেরিয়ে এলাম। দেখি রাজা কার্তিনার নেতৃত্বে তার যোদ্ধারা রাস্তা দিয়ে ছুটছে আমাদের সৈন্যবাসের দিকে! বুঝলাম ঘুমন্ত সৈন্যদের ওরা অক্রমন করতে চলেছে। তখন আর আমাদের সৈন্যদের সাবধান করার সময় নেই। রাজা এনিমারকে বাঁচাতে আমি বাড়িঘরের ছায়ায় ছায়ায় লুকিয়ে রাজবাড়ির সামনে এলাম। দেখলাম প্রহরীদের সঙ্গে ওদের সৈন্যদের লড়াই চলছে। আমি লড়াইয়ে জড়ালাম না। যেকরে হোক রাজা এনিমারকে বাঁচতে হবে। লড়াইয়ের ফাঁকে আমি রাজবাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে পড়লাম। দেখি রাজা এনিমার ঘুম ভেঙ্গে বিছানায় উঠে বসে আছেন। আমি ছুটে এসে অন্দরমহলে প্রহরীকে বললাম—

—শিগগিরি যাও। পেছনের দরজা খুলে দাও। ফিরে এসে দেখি রাজা পোশাক বদল করেছেন। বেরোবার জন্যে তৈরি। আমি বললাম—

—প্রহরীরা শত্রুসেনার সঙ্গে লড়ছে। এই সুযোগ আমরা পেছনের দরজা দিয়ে পালাবো।

—না। আমি ধরা দেবো। রাজা এনিমার বলল।

—বলেন কি? আমি বেশ চমকে উঠলাম।

—হ্যাঁ। আমি ধরা দিলেই লড়াই বন্ধ হবে। আর রক্ত ঝরবে না। রাজা বললেন।

—আপনার ফাঁসিও দিতে পারে। আমি বললাম।

—দিক। তবু রক্তপাত তো বন্ধ হবে। রাজা বললেন।

আমি নানাভাবে রাজা এনিমার বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু রাজা অনড়। বন্দীদশাই মেনে নেবেন। আতলেতা থামল।

—তারপর? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—তখনই একজন প্রহরী এসে জানিয়ে গেল লড়াই করতে করতে সেনাপতি মৃত্যবরণ করেছেন। মন্ত্রীর বাড়ি আক্রমন করে মন্ত্রীকে বন্দীকে করা হয়েছে। রাজা এনিমার আমাকে বললেন—যাও। এখনও যে যোদ্ধারা বেঁচে আছে তারা যেন অস্ত্রত্যাগ করে। অথবা লড়াই থামিয়ে পশ্চিমে বনজঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। মোট কথা লড়াই নয়। রাজার আদেশ। মানতেই হবে। একটু থেমে আতলেতা বলতে লাগল—রাজবাড়ির দেউড়ি ছাড়িয়ে রাস্তায় এলাম। তখন প্রহরীদের সঙ্গে লড়াই শেষ। আহত মৃত

প্রহরীরা দেউড়ি এখানে ওখানে পড়ে আছে। একটু থেমে আতলেতা বলতে লাগল—

রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। তখনও আমাদের যোদ্ধারা লড়াই করে চলেছে। আমি দুহাত তুলে চিৎকার করে লড়াই থামালাম। আমাদের যোদ্ধাদের রাজার আদেশ জানালাম। আত্মসর্মপন করতে বললাম। যোদ্ধারা আমার ইঙ্গিত বুঝল। গ্রেপ্তারি এড়াতে সবাই দলে দলে পশ্চিমের জঙ্গলের দিকে ছুটল। কিছু বন্দী হল অবশ্য। তাদের সৈন্যবাসের একটি ঘরে বন্দী রাখা হয়েছে। একটু থেমে আতলেতা বলতে লাগল—রাজবাড়ির অন্তঃপুরে তখন রাজা কার্তিনার সৈন্যরা ঢুকে পড়েছে। রাজা কার্তিনা স্বয়ং রাজা এনিমারের শয়নঘরে এসে হাজির হল। হাতে খোলা তরোয়াল। রাজা এনিমার বললেন—আমাকে বন্দী করুন। অনুরোধ লড়াই বন্ধ করুন। লড়াই ততক্ষণে থেমে গেছে। রাজা কার্তিনা আমাকে আর রাজাকে বন্দী করল। তারপরে আমাদের এই কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হল। ওরা মন্ত্রীর বাড়িও আক্রমন করেছিল। সেখান থেকে মন্ত্রীকেও বন্দী করেছিল। ফ্রান্সিস চুপ করে সব শুনল। তারপর বলল—আতলেতা আমাকে তুমি তোমাদের রাজার কাছে নিয়ে চলো।

—বেশ। চলো। আতলেতা বলল।

দু'জনে রাজা এনিমার কাছে এল। আতলেতা ফ্রান্সিসদের সম্পর্কে সব কথাই বলল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রাজা এনিমার বলল—তোমাদের দেখেই বুঝেছি তোমরা বিদেশী। তোমাদের শাস্তি দেওয়া হবে এটা ভেবেও আমার কষ্ট হচ্ছে।

—মহামান্য রাজা—আমরা নির্বিঘ্নে পালাবো। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুক। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল। রাজা এনিমার কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। কিছু বললেন না।

—শুধু এদের খাওয়ার দেওয়ার ব্যবস্থা আর পাহারা দেওয়ার অবস্থাটা দেখতে দিন। মুশকিল হয়েছে আমার এক বন্ধু আহত। এসব ব্যাপারে আমি তার ওপর খুব নির্ভর করি। যাইহোক আর কোন বন্ধুকে নিয়েই সেই কাজটা করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু রাজা কার্তিনা খুব ধুরন্ধর লোক। পাহারায় কোন গাফিলতি রাখবে না। এনিমার একটু নিম্নস্বরে বলল।

—তাহোক। অনেক কড়া পাহাড়া থেকে আমরা এর আগে পালিয়েছি।



এখন সময় আর সুযোগ বুঝে নেওয়া। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখো—যদি পারো। একটু হতাশভঙ্গীতেই রাজা এনিমার বললেন।

—আপনি একজন সত্যিকারে মহানুভব রাজা। ফ্রান্সিস বলল।

—মহারাজা আমাদের সন্তানতুল্য দেখেন। আতলেতা বলল।

—সেইজন্যে আমি স্থির করেছি আপনাদের যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলে আমরাও আপনাকে মুক্ত করতে আর আপনার রাজত্ব আপনাকে ফিরিয়ে দিতে রাজা কার্তিনার বিরুদ্ধে লড়াই করব।

—রাজা কার্তিনার সৈন্য সংখ্যা কিন্তু কম নয়। রাজা বললেন।

—আমরা চোরাগোপ্তা আক্রমন করে ওদের নাজেহাল করে ছাড়বো। ফ্রান্সিস বলল। রাজা এনিমার আর কিছুই বলল না। ফ্রান্সিস নিজের জায়গায় চলে এল। হ্যারি এগিয়ে এসে বলল—রাজার সঙ্গে কী কথা হল? ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সব কথা বলল।

—আবার লড়াইয়ে নামব? হ্যারি প্রশ্ন করল।

—আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেই লড়াই চালাবো। রাজা এনিমার সম্পর্কে সব তো শুনলে। এরকম একজন মানুষের জন্যে একটু করব না? ফ্রান্সিস বলল।

দুপুর হল। দু'জন পাহারাদার কাঠের গামলায় খাবার দাবার নিয়ে এল। সবার সামনে একটা করে গাছের লম্বাটে পাতা একজন প্রহরী পেতে দিল। তারপর অন্যজনের সঙ্গে মিলে খাবার দিতে লাগল। আধপোড়া রুটি আনাজপাতির ঝোল আর সমাদ্রিক মাছের ঝোল মত। ফ্রান্সিসরা পেট পুরে খেয়ে নিল। শুধু শাঙ্কো খেতে পারছিল না। ফ্রান্সিস ওকে জোর করে খাওয়াল। রাজাও নিঃশব্দে একই খাবার খেলেন। বন্দীদের জন্য রান্না করা খাবার রাজা কখনও খাননি। কিন্তু এই খাবার খেলেন। তাঁর বিরক্তির কোন কারন নেই। নিজের জীবনে এই আকস্মিক দুরবস্থা সরল মনেই মেনে নিয়েছেন। এটা ফ্রান্সিসের খুব ভাল লাগল। যখন খাবার খাচ্ছিল তখন লক্ষ্য করছিল দু'জন প্রহরী বর্শা হাতে দরজায় পাহারা দিচ্ছে। আর দু'জন যোদ্ধা খোলা তরোয়াল হাতে এদিক-ওদিক ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে পাহারায় কোন ঢিলেমি নেই।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হল। আতলেতা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—রাজা এনিমার বলছিলেন পালানোর ব্যাপারে তুমি কিছু ভেবেছো কিনা।

—রাজার কাছে চলো। রাজার সঙ্গে কথা আছে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারিকে ডেকে নিয়ে রাজার কাছে এল। রাজা দেওয়াল ঠেস দিয়ে চোখ বুঁজে বসেছিলেন। পাশে মন্ত্রী।

—মান্যবর রাজা—আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

—বলো। চোখ খুলে রাজা বললেন।

—আপনি রাজা কার্তিনার সঙ্গে কথা বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি মুক্তিভিক্ষা করব না। রাজা বলল।

—আমাকে ভুল বুঝবেন না। সেসব কথা বলতে বলছি না। দু'টো কথা আপনি বলবেন—এক—মন্ত্রী বৃদ্ধ মানুষ। তিনি কোনভাবেই রাজা কার্তিনার কোন ক্ষতি করতে পারবেন না। তাঁকে তাঁর বাড়িতে নজরবন্দী করে রাখা হোক। কয়েদঘরের কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। আর কি নিয়ে কথা বলবে? রাজা বললেন।

—দুই—বন্দরের জাহাজ থেকে বেশকিছু নাবিক ও জাহাজীকে বন্দী করে এই কয়েদঘরে রাখা হয়েছিল। তারা মুক্তি পেয়ে চলে গেছে। এখন এই বড় কয়েদঘরে আপনার বন্দী যোদ্ধাদের বন্দী করে রাখা হোক অর্থাৎ আমরা ঐ যোদ্ধাদের সঙ্গেই শাস্তি ভোগ করতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু এই ঘরে অত সৈন্য—থাকতে অসুবিধা হবে না? রাজা বললেন।

—তা হবে। কিন্তু আমাদের সেটা মানিয়ে নিতে হবে। এসব বলছি এই জন্যে যে আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে। দু'একদিন আমাদের সবাইকে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। কথা বলব। তবে কথা রাখবে কিনা জানি না। রাজা বলল।

—রাখবে। কারন এসবের জন্যে তার কোন ক্ষতি হবে না। তাহলে কাল সকালে রাজসভায় গিয়ে—ফ্রান্সিস কথা শেষ করতে পারল না।

— না। এখানেই আসতে বলল। রাজা বললেন।

—বেশ। তাই বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। একজন প্রহরীকে ডেকে বলল—এসো। রাজা এনিমার রাজা কার্তিনার সঙ্গে কথা বলবেন। রাজা কার্তিনাকে খবর পাঠাও।

—রাজা কার্তিনা কি দেখা করবেন? প্রহরী বলল।

—তুমি একবার বলে তো দেখ। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি বলে। প্রহরী কথাটা বলে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল—রাজা, কার্তিনা দেখা করবে না। ফ্রান্সিস বেশ হতাশ হল। অথচ যে দুটি ব্যাপার নিয়েও কথা বলাবে ভেবেছিল সেসব অবশ্যই করাতে হবে।

এবার আতলেতো এগিয়ে এল। বলল—রাজা কার্তিনা যাতে কথা বলতে

আসে আমি তার ব্যবস্থা করছি। ও রাজা এনিমারকে বলল—মান্যবর রাজা আপনি অতীতের রাজা সিয়াভোর গুপ্ত রত্নভান্ডারের কথা বলবেন এই খবর পাঠান। দেখবেন লোভী রাজা কার্তিনা ছুটে আসবেন।

—ওসব নিয়ে আর কি বলবো? রাজা বললেন।

—প্রোমিওর কথা বলবেন। তারপর ফ্রান্সিস যা বলতে চাইছেন তা বলবেন। আতলেতো বলল।

—ঠিক আছে। প্রহরীকে বল। রাজা বললেন। আতলেতো দরজার কাছে গেল। প্রহরীকে বলল—তুমি রাজা কার্তিনাকে খবর দও যে রাজা এনিমার অতীতের এক রাজার গুপ্ত রত্ন ভান্ডারের কথা বলবেন।

—বেশ। গিয়ে বলছি। তবে রাজা কার্তিনা আসবে না। প্রহরী বলল।

—দেখা যাক। আতলেতো বলল। প্রহরী চলে গেল।

অল্পক্ষনের মধ্যেই রাজা কার্তিনার এসে হাজির। পিছনে সেই প্রহরী। রাজা কার্তিনার হেসে বলল—রাজা সিয়েভোর গুপ্ত রত্নভান্ডারের কথা শুনেছি। কোথায় আছে সেই রত্নভান্ডার?

—তা বলতে পারবো না। রাজা এনিমার বলল।

—কেউ কি সেই গুপ্ত রত্নভান্ডার খোঁজার চেষ্টা করে নি? কার্তিনা বলল।

—হ্যাঁ। আমার পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোন হদিশ পাননি। সবশেষে চেষ্টা করেছিল এক স্পেনিয় যুবক—প্রোমিও। কিন্তু সে রহস্যজনকভাবে মারা গেছে। রাজা এনিমা বললেন।

—এবার আমি খুঁজবো। কার্তিনা বলল।

—বেশ। রাজা এনিমার মাথা কাত করে বললেন। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—মান্যবর রাজা—আমার কথা দু'টো।

—একটা কথা। আমার দুটো অনুরোধ আছে। রাজা এনিমার বললেন।

—বলুন বলুন। নিশ্চয়ই আপনার অনুরোধ রাখার চেষ্টা করবো। কার্তিনা বলল।

—বিশেষ কিছুই না। এক—মন্ত্রী মশাই বৃদ্ধ। এই কয়েদঘরের ধকল তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তাঁকে তাঁর বাড়িতে নজরবন্দী করে রাখুন।

—বেশ তো। আর একটা অনুরোধ? রাজা কার্তিনা বলল।

—এই ঘরে যথেষ্ট জায়গা আছে। আমার বন্দী যোদ্ধাদের এইঘরে ওদের রাখুন। ওদের সঙ্গে আমি দন্ডভোগ করতে চাই। রাজা এনিমার বললেন।

—কিন্তু আপনার অত সৈন্য কি এইঘরে আঁটবে? কার্তিনা বলল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। আমরা কষ্ট করেই থাকব। রাজা এনিমার বলল।

—আপনার যেমন অভিরুচি। কার্তিনা বলল। তারপর দু'জন প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা সৈন্যাবাস থেকে দু'জন প্রহরীকে নিয়ে এসো। তারপর মন্ত্রীমশাইকে মুক্ত করে তার বাড়িতে তাঁকে নিয়ে গিয়ে রাখো। বাড়ির বাইরে সেই দু'জন প্রহরী দিনরাত পাহারা দেবে। নজর রাখবে—মন্ত্রীমশাই যেন পালাতে না পারে। মন্ত্রীকে নিয়ে প্রহরী দু'জন চলে গেল। রাজা কার্তিনা বলল—আপনি একজন স্পেনীয় যুবক প্রোমিওর কথা বলছিলেন। সে কী ভাবে গুপ্তধন খুঁজেছিল?

—প্রোমিও একটা বইমত লিখে গেছে—জনৈক জলদস্যুর কাহিনী। যে সরাইখানা প্রোমিওর আকস্মাৎ মৃত্যু হয়েছিল বইটা সেখানেই পাওয়া গিয়েছিল। সেই বইতে ওর গুপ্তধন খোঁজার কথা লেখা আছে। রাজা এনিমার বললেন।

—কোথায় আছে সেই বই? রাজা কার্তিনা বললেন।

—আমার পাঠকক্ষে। বই নিন পড়ুন। কিন্তু দোহাই—হারাবেন না। যথাস্থানে রেখে দেবেন। রাজা এনিমার বলল।

—নিশ্চয়ই। রাজা কার্তিনা ঘাড় নেড়ে বলল। তারপর কিছু না বলে চলে গেল।

ফ্রান্সিস গুপ্তধনের কথা এই প্রথম শুনল। ও সমস্ত কাহিনীটা জানতে আগ্রহী হল। কিন্তু বইটা তো এখন পাওয়া যাবে না। অগত্যা অপেক্ষা করতে হবে। এখন ভাবতে হবে মুক্তির কথা। ও মনকে তাই বোঝাল।

পরের দিন সকালেই রাজা এনিমার বন্দী সৈন্যরা দল বেঁধে এল। রাজা কার্তিনার সৈন্যরা ওদের পাহারা দিয়ে নিয়ে এল। তারা সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও কয়েদঘরে গাদাগাদি ভিড় হল। অসুস্থ শাঙ্কোরই কষ্ট হল বেশি। ওর পিঠের ক্ষত ভেনের ওষুধে এখন শুকিয়ে যাবার মুখে। তবে এরকম গাদাগাদি করে থাকা। হ্যারি শরীরের দিক থেকে বরাবরই দুর্বল। ওরও কষ্ট হতে লাগল।

ফ্রান্সিস ওদের কাছে এল। বলল—দু'একটা দিন কষ্ট করে থাকো। এরমধ্যেই পালাবো। রাজা এনিমারের সৈন্যরা আসায় আমাদের যোদ্ধা সংখ্যা বাড়ল। পালাতে সুবিধে হবে। সৈন্যবাসে গিয়ে ঐ বন্দীদের আমরা মুক্ত করতে পারতাম না। এখান থেকে মুক্তি হওয়া অনেক সহজ। ছক কষা হয়ে গেছে। এখন কাজে লাগানো।

পরের দিনটা ফ্রান্সিস প্রায় শুয়ে শুয়ে কাটাল। সর্বক্ষণ পালাবার ছকটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবল। পালানোর ছক নিখুঁত হওয়া চাই।

সন্ধ্যেবেলা আতলেতা আর বিনেলোকে কাছে ডাকল। আতলেতাকে বলল—তোমাদের অস্ত্রাগারটা কোথায়?

—এই কয়েদঘরের ওপাশে রাজার পাঠকক্ষ। তারপরের ঘরটাই অস্ত্রগার।

—ঠিক আছে। এবার বিনেলোকে বলল—শাঙ্কো অসুস্থ। এসব কাজে শাঙ্কোই আমার বড় ভরসা ছিল। যাহোক তোমাকে যা বলছি তা শাঙ্কোরই মতই করতে হবে। সব কাজ যত দ্রুত সম্ভব সারতে হবে। তারপর ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে পালাবার ছকটা বুঝিয়ে দু'জনকে বলল। বিনেলোক চাপাস্বরে বলে উঠল—সাবস্ ফান্সিস। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। বলল—সাফল্য নির্ভর করছে তোমাদের তৎপরতার ওপর আর আমাদের সাহসের উপর।

এবার ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকল। সব বলল। হ্যারি বলল—তোমার পরিকল্পনা নিখুঁত।

তারপর ফ্রান্সিস চারজন বন্ধুকে ডাকল। ওরা কাছে এলে বলল—তোমরা কোমরেব ফেট্টি খুলে সিনাত্রার হাতে দাও। চারজনই ফেট্টি খুলে সিনাত্রাকে দিল।

—এ ব্যাপারে রাজাকে কিছু বলবে না? আতলেতা জানতে চাইল।

—না এসব শুনে রাজার দুশ্চিন্তা বেড়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল—

—রাজাকে নিশিন্তে থাকতে দাও। বিনেলো শাঙ্কোর কাছ থেকে ছোরাটা নিয়ে রাখলো। শাঙ্কোকে ছোরাটা বের করে দিল।

রাত হল। ফ্রান্সিস কয়েকজন নিয়ে তৈরি হল।

রাত দাড়ল। রাতের খাবার নিয়ে দু'জন প্রহরী ঢুকল। একজনের হাতে কাঠের গামলায় খাবার রাখার লম্বাটে শুকনো পাতা। ফ্রান্সিস বাইরের দিকে তাকাল। ভেজানো দরজার লম্বাটে ফাঁকের মধ্যে দিয়ে দেখল তরোয়াল হাতে দু'জন যোদ্ধা এদিক ওদিক ঘুরছে। তরোয়াল কোষবদ্ধ।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে এক প্রহরীর হাতের খাবার-ভরা কাঠের গামলাটা তুলে নিয়ে প্রহরীর মুখে ছিটিয়ে দিল। প্রহরীটি এই হঠাৎ আক্রমনে দিশেহারা হল। খাবারের ঝোল লেগে ওর চোখ জ্বালা করে উঠল। দুহাতে দুচোখ চেপে বসে পড়ল। বিনেলো ততক্ষণে অন্য প্রহরীর ওপর ঝাপিয়ে পড়েছে। তার হাত থেকে রুটির থালা পাতা ছিটকে গেল। ও ছিটকে মেঝেয় পড়ে গেল। সিনাত্রা ছুটে এসে ফেট্টির কাপড় দিয়ে ওর মুখ বেঁধে ফেলল। অন্য প্রহরীটি তার চোখ দু'হাতে চোখ মুছে দিল। সিনাত্রা এক লাফে তার সামনে এসে ফেট্টি

কাপড় দিয়ে ওর মুখ বেঁধে ফেলল। দু'জন প্রহরীর মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ বেরোতে লাগল।

বাইরের যোদ্ধা দু'জন তরোয়াল খাপ থেকে খুলে নিয়ে ছুটে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। বিনেলো সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রহরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কাঁধে ছোরা বসিয়ে দিল। প্রহরীটি তরোয়াল ফেলে দিয়ে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল তুলে নিল। অন্য প্রহরীটা ফ্রান্সিসের মাথা লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। ফ্রান্সিস তৈরিই ছিল। এখন লড়াইয়ের সময় নেই। দ্রুত প্রহরীটিকে পরাস্ত করতে হবে। ফ্রান্সিস প্রচন্ড বেগে তার তরোয়ালের ঘা মারল। প্রহরীর হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। বিনেলো সঙ্গে সঙ্গে সেই তরোয়ালটা তুলে নিল।

সিনাত্রা ছুটে এসে আহত প্রহরীটির মুখ বেঁধে ফেলল। অন্য প্রহরীটিকে তখন কয়েকজন ভাইকিং চেপে ধরেছে। তার মুখ ফেট্টির কাপড় দিয়ে বাঁধা হল। চারজনের মুখই বাঁধা পড়ল। ফ্রান্সিস প্রহরী আর যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বলল—কেউ টুঁ শব্দটি করবে না। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—পালাও—জল্‌দি। বন্ধুরা খোলা দরজার দিকে ছুটল। রাজা এনিমার হাঁ করে এসব দেখছিলেন। আতলেতো রাজার কাছে এসে বলল—মাননীয় রাজা বেরিয়ে আসুন—তাড়াতাড়ি। রাজা উঠে দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত কয়েদঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। কার্তিনার যোদ্ধাদের ঘর থেকে বেরোতে দিল না ফ্রান্সিস। নিজে বাইরে এসে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিল। চাবি নেই। ঝোলানো তালাতেই কাজ চলবে।

সবাই বাইরের ছোট মাঠটায় এল। ফ্রান্সিস ডেকে বলল—আতলেতো—কোনদিকে পালাবো?

—পশ্চিম দিকে। পাহাড়ে জঙ্গলে। চলো সব। আতলেতো বলে উঠেই বড় রাস্তা দিয়ে পশ্চিমদিকে ছুটল। পেছনে আর সবাই। বিনেলো শাঙ্কোকে প্রায় জড়িয়ে ধরে ছুটল। চাঁদের আলো উজ্জ্বল। সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সবাই ছুটে চলেছে। সিনাত্রা রাজাকে ছুটতে সাহায্য করছে। ফ্রান্সিস আগেই ওদের এই দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছে।

সবাই হাঁপাচ্ছে তখন।

ফ্রান্সিস পিছনে তাকিয়ে দেখল দূরে সৈন্যরা ছুটে আসছে। ততক্ষণে ফ্রান্সিস বনের গাছগাছালির কাছে চলে এসেছে।

অল্পক্ষনের মধ্যেই সবাই অন্ধকার বনভূমিতে ঢুকে পড়ল।

পেছনে দূর থেকে সৈন্যদের হৈ হল্লা শোনা যাচ্ছে। বনের মধ্যে ভাঙা

জ্যোৎস্না পড়েছে। কখনও বড় বড় গাছের গুঁড়ির ওপর পা রেখে কখনো পাশ কাটিয়ে ফ্রান্সিসরা বনের মধ্যে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে সৈন্যদের হৈ হল্লা আর শোনা গেল না।

হঠাৎ সামনে একটা আধভাঙা ঘর। আতলেতা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এই মন্দিরেই আশ্রয় নেওয়া যাক। এই মন্দিরে রাজা এনিমারের কুলদেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাজা এখানেই প্রতি শনিবার সকালে পূজো দিতেন।

সবাই মন্দির ঘরে ঢুকল। লম্বাটে ঘরটার এক কোনায় উঁচু পাহাড়ের বেদী। তার উপর একটা পাথরের এবড়ো খেবড়ো মূর্তিমত। কিছুটা ভাঙা চালা দিয়ে জোৎস্না পড়েছে। মূর্তির সামনে ফুলপাতা ছড়ানো।

এবড়োখেবড়ো পাথরের মেঝেয় সবাই বসে পড়ল। সবাই হাঁপাচ্ছে। রাজা এনিমার বেদীর কাছে গিয়ে বসে পড়লেন। বেদী ছুঁয়ে হাতটা বুকে রাখলেন।

ফ্রান্সিস দ্রুত শাঙ্কোর কাছে এল। বলল—শাঙ্কো—তুমি—। ওকে থামিয়ে দিয়ে শাঙ্কো হেসে বলল—আমি ঠিক আছি। আমার জন্যে ভেবো না। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

এবার ফ্রান্সিস হ্যারির কাছে এল। দেখল হ্যারি শুয়ে পড়েছে। হ্যারি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—ওরা হয়ত আমাদের খোঁজে এখানে আসবে।

—উঁহু। এখন নয়। কাল সকালে আসবে। দিনে তবু কিছু আলো পাবে। তখনই খোঁজা সুবিধে। এখন তো বনতল অন্ধকার। ফ্রান্সিস হ্যারির পাশে শুয়ে পড়ল।

রাতে কারো খাবার খাওয়া হয়নি। খাবারভর্তি কাঠের গামলা প্রহরীর মুখে ছুঁড়ে ফেলে ফ্রান্সিসরা পালিয়েছে। কাজেই সবাই ক্ষুধার্ত।

ফ্রান্সিস শুয়ে শুয়ে এই খাবারের সমস্যার কথাই ভাবছিল। একটু পরে ডাকল-হ্যারি?

—বলো।

—আমরা সবাই ক্ষুধার্ত। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ।

—কতদিন বনে জঙ্গলে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকতে হবে বুঝতে পারছি না। সুতরাং খাবারের জোগাড় রাখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো খাবারের দোকান থেকে সেসব চুরি করে বা সোনার চাকতির বিনিময়ে কিনে আনতে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে? হ্যারি একটু সংশয়ের সঙ্গে বলল।

—সেটা সদর রাস্তায় না গেলে বুঝতে পারছিনা। মনে হয় রাজা কার্তিনার

সৈন্যরা সৈন্যাবাসে চলে গেছে। অন্ধকার বনে জঙ্গলে-আমাদের খোঁজ পাবে না। কাজেই সকালের জন্যে ওরা অপেক্ষা করবে। এই সুযোগে আমাদের খাবার জোগাড় করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে লুকিয়ে নগরে যেতে হয়। হ্যারি বলল।

—তাই যাবো। আজ রাতের মধ্যেই কাজটা সারাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বন্ধুদের ডাকো। হ্যারি বলল।

—না। শুধু আমি একা যাবো। রাজা এনিমারের জন দশেক সৈন্য নিয়ে। আমরা বিদেশী দোকানদাররা আমাদের চিনে ফেলবে। রাজা এনিমার সৈন্যরা গেলে দোকানদারের মনে কোন সন্দেহ হবে না। সহজেই আটা ময়দা চিনি পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তো। তুমিই ওদের নিয়ে খাবারের জিনিসপত্র আনো। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল। আতলেতার কাছে গেল। আতলেতা শুয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল—আতলেতা—ওঠ। কাজ আছে। আতলেতা উঠে বসল।

—তুমি নগরের আটা ময়দার দোকান তো চেনো। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আতলেতা মাথা কাত করে বলল।

—সে সব আনতে যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন? আতলেতা জানতে চাইল।

—হ্যাঁ আজ বাকি রাতের মধ্যেই আনতে হবে। তুমি কয়েকজন তোমাদের সৈন্য নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু—আতলেতাকে থামিয়ে ফ্রান্সিস বলল—

—কোন কিন্তু নয়। আমরা সবাই ক্ষুধার্ত। না খেয়ে লড়াই করা যাবে না। খাদ্য চাই। যাও কয়েকজনকে নিয়ে এসো।

—বেশ। চলো। আতলেতা বলল। তারপর শুয়ে বসে থাকা কয়েকজন সৈন্যকে ডাকতে গেল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোর কাছে এল। বলল—শাঙ্কো এখন কেমন আছো?

—অনেকটা ভালো আছি। শাঙ্কো বলল।

—শোন—খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি চারটে সোনার চাকতি দাও। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টিতে গোঁজা চারটে সোনার চাকতি বের করে ফ্রন্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস দেখল কয়েকজন সৈন্যকে সঙ্গে দিয়ে আতলেতা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা ভাল করে কোমরে গুঁজে নিলো।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সবার আগে আতলেতা চলল। ফ্রান্সিসরা পিছন পিছন চলল।

কিছুক্ষনের মধ্যেই বনাঞ্চল শেষ। সবাইকে গাছের আড়ালে রেখে ফ্রান্সিস বড় রাস্তাটায় এসে দাঁড়াল। চাঁদের আলোয় যতদূর দৃষ্টি যায় দেখল। রাজা কার্তিনার সৈন্যদের চিহ্নমাত্র নেই। ফ্রান্সিস হাত নেড়ে সবাইকে ডাকল।

বড় রাস্তার ধার দিয়ে ফ্রান্সিস চলল। পিছনে আতলেতারা।

দুধারে দোকানপাট শুরু হল। ফ্রান্সিস দূরে নজর রেখে চলল। বেশ দূরে রাস্তায় রাজা কার্তিনার কয়েকজন সৈন্যের নড়াচড়া লক্ষ্য করল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা থেকে একটা দোকানের পেছনে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আতলেতা সৈন্যদের নিয়ে এসে ফ্রান্সিসের পিছনে দাঁড়াল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চলা শুরু হল। আরোও বেশ কিছুটা গিয়ে ফ্রান্সিস নিম্নস্বরে বলল—আতলেতা—দোকানটা কোথায়?

—এসে গেছি। ঐ খেজুর গাছটার নিচে। আতলেতা মৃদুস্বরে বলল। খেজুর গাছের কাছে এসে দাঁড়াল সবাই। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে সোনার চারটে চাকতি বার করে আতলেতাকে দিল। বলল—আটা ময়দা চিনি ছাড়াও মাটির বড় হাঁড়ি কাঠের বড় থালা একখন্ড কাঠের ছোট পাটাতন কাঠের কিছু গ্লাস এসব লাগবে। দোকানদারকে দিয়েই একটু তাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সারবে। হাতে সময় কম।

—তুমি যাবে না? আতলেতা বলল।

—না আমি এই খেজুর গাছের নীচে তোমাদের অপেক্ষায় থাকব। ফ্রান্সিস বলল।

আতলেতা এগিয়ে গিয়ে দোকানের পিছনে কাঠের দরজায় টোকা দিল। বারকয়েক টোকা দিতে দরজা খুলে গেল। দোকানদার এসে দাঁড়াল। আতলেতার সঙ্গে তার কথাবর্তা হল। আতলেতা সৈন্যদের নিয়ে পিছন দিয়ে দোকানে ঢুকল।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে রইল। অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষনের মধ্যেই সৈন্যরা কাঁধে আটা ময়দা চিনির বস্তা নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। একটু পড়ে আতলেতার সঙ্গে বাকিরাও বেরিয়ে এল। হাঁড়ি কাঠের ছোট পাটাতন গ্লাস এসব নিয়ে। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলে উঠল—জলদি চলো সব। এক মুহূর্ত দেরি নয়।

সবাই জিনিসপত্র নিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বনভূমির দিকে চলল।

ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল। তবে ওরা তো সৈন্য। কষ্ট গায়ে মাখল না। চলল সবাই।

কিছুক্ষনের মধ্যেই বনের ধারে এসে পৌঁছল সবাই। ফ্রান্সিস পেছনে ফিরে তাকাল। রাজা কার্তিনার সৈন্যদের দেখা নেই।

আধ-ভাঙা মন্দিরঘরের এসে পৌঁছল সবাই। ফ্রান্সিস বন্ধুদের কাছে এসে বলল—সবাই যাও। উনুনের জন্যে পাথর কাঠকুটো জোগাড় করে আনো। ভোরের আগেই খাওয়া সেরে নিতে হবে। জল্‌দি।

বন্ধুরা বেশ কয়েকজন উঠে দাঁড়াল। ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। চলল কাঠকুঠো পাথর জোগাড় করতে।

সেসব জোগাড় করে ফিরে এল অল্পক্ষনের মধ্যে-ই। ফ্রান্সিস দুই রাধুনি বন্ধুকে বলল —রান্নায় লেগে পড়।

—জল চাই। একজন রাঁধুনি বলল। আতলেতা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। বলল—ঝর্না আছে দুটো। হাঁড়ি নিয়ে চলো। হাঁড়ি নিয়ে একজন আতলেতার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

ভোরের আগেই রুটি তৈরী হয়ে গেল। চিনি দিয়ে রুটি খেল সবাই। রাজাও খেল। যাহোক ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হল।

ওরা খাচ্ছে তখনই গাছে গাছে পাখির ডাক শুরু হল। বোঝা গেল ভোর হয়ে এসেছে।

ভোর হল। সবাই শুয়ে শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

কিছু পরেই ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। একটু উঁচু গলায় বলল—উঠে পড়ো সবাই। এখানে থাকলে আমরা ধরা পড়ে যাবো। এই মন্দিরের ঘর কার্তিনার সৈন্যরা চেনে। ভুলে যেও না আমাদের মাত্র দু'জনের হাতে তরোয়াল আছে। বাকি সবাই নিরস্ত্র। আমাদের আত্মগোপন করতে হবে।

—ফ্রান্সিস—একটা গুহা আছে। অতলেতা বলল।

—না। ওখানে নয়। গুহার কথাও ওরা জানে। ঘন বনের এলাকাটা কোনদিকে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—একটা সরোবর আছে। তার পূর্বদিকে বন খুব ঘন। বড় বড় গাছলতাপাতার সংখ্যাটা বেশি। নিচে দিয়ে হাঁটাই যায় না। আতলেতা বলল।

—ওখানেই চলো সব। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই উঠে দাঁড়াল। সারা রাত ঘুম নেই কারো। শরীর একটু দুর্বল লাগছে সবারই। কিন্তু উপায় নেই। সবাই নিরস্ত্র। কার্তিনার সৈন্যরা এলে ধরা পড়তে

হবে সহজেই। এসব কথা ভাবতে হল সবাইকে। রাজা এনিমার উঠে দাঁড়ালেন। আতলেতার পেছনে পেছনে চলল সবাই।

বেশ কিছুটা যেতে দেখা গেল সামনেই একটা সরোবর। সকালের আলো পড়ে জলে মৃদু ঢেউ চিক্‌চিক্ করছে। সরোবরের ডানপাশে জঙ্গলে ঢুকল সবাই। সত্যিই গভীর বন। বড় বড় গাছের জটলা। একফোটাও রোদ ঢুকছে না। অন্ধকার বনতল। মোটা মোটা গাছের গুঁড়িতে পা রেখে অথবা কোনরকেমে পাশ কাটিয়ে একটা একটু ফাঁকা জায়গায় এল সবাই। অতলেতো বলল—এখানেই বিশ্রাম নেব। চারধারে বড় বড় গাছ। নজরে পড়ার কোন সম্ভবনা নেই। সবাই এখানে ওখানে বসল। কেউ মোটা দুলছে এমন লতায় কেউ গাছের গুঁড়িতে কেউ ঝরাপাতার স্তূপের ওপর। সবাই কম বেশি হাঁপাচ্ছে তখন । রাজা এনিমার বসলেন একটা গাছের গুড়িতে। কেউ কোন কথা বলছে না।

তখন একটু বেলা হয়েছে। হঠাৎ দূরে ঐ মন্দিরঘরের দিকে রাজা কার্তিনার সৈন্যদের ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির শব্দ কিছুটা অস্পষ্ট শোনা গেল। বোঝা গেল ফ্রান্সিসের অনুমান ঠিক। ওরা সকলেই ফ্রান্সিসদের খুঁজতে বেরিয়েছে।

হঠাৎ রাজা এনিমার গাছের গুঁড়ি থেকে উঠে দাঁড়ালেন। একটু গলা চড়িয়ে বললেন—তোমরা এখানেই থাকো। আমি রাজা কার্তিনার হাতে ধরা দিতে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস শুকনো পাতার স্তূপের উপর বসেছিল। দ্রুত উঠে রাজার কাছে ছুটে এল। বলল—আপনি কী বলছেন? আপনি ধরা দিলে রাজা কার্তিনা আপনাকে ফাঁসি দিতে পারে।

—দিক। লড়াইতো বন্ধ হবে। আর কারো প্রান যাবে না। রক্তপাত বন্ধ হবে। রাজা বললেন।

—আপনি ধরা দিলে রাজা কার্তিনা নির্বিঘ্নে আপনার প্রজাদের হত্যা করতে মরীয়া হয়ে উঠবে। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। ও এই লাগাস রাজত্বে রাজা হবে। আর নরহত্যা করবে না। রাজা বললেন। ফ্রান্সিস নানাভাবে রাজা এনিমাকে বোঝাতে লাগল। কিন্তু রাজা এনিমা নিজের সিদ্ধান্তে অটল। ফ্রান্সিস আতলেতাকে বলল—ভাই তুমি রাজাকে বোঝাও। আতলেতো মৃদুস্বরে বলল—তুমি রাজা এনিমাকে জানোনা। ওর সঙ্কল্প থেকে কেউ ওকে নড়াতে পারবে না। তখন ফ্রান্সিস রাজাকে বলল—মান্যবর রাজা আমার অনুরোধ—আজকের রাতটা আমাকে সময় দিন। যা করবার কালকে করবেন।

—দেখ—তোমরা বিদেশী—আমার জন্যে তোমরা প্রান দেবে কেন? রাজা বললেন।

—আমরা সবাই মারা যাবো এটা ভাবছেন কেন? আমরা পরিকল্পনা মত এগোব। যাতে একজন যোদ্ধাও মারা না যায়। তার জন্যে সাবধান হব আমরা। আর আমাদের দু'একজন বন্ধু যদি লড়াই করতে গিয়ে মারা যায় বা আহত হয় তার জন্যে আপনাকে আমরা দোষী মনে করব না। তাই আবার অনুরোধ করছি—আজ রাতটা আমাকে সময় দিন। রাজা মাথা নিচু করলেন। কিছুক্ষণ ভাবলেন। মাথা তুলে বললেন—ঠিক আছে। আজকের রাতটাই তোমাকে সময় দিলাম। কিন্তু যাই করনা কেন কেউ যেন মারা না যায়।

—কিন্তু মান্যবর রাজা লড়াই হবেই। ওরা সহজে আত্মসমর্পন করবে না। তবে কেউ যাতে মারা না যায় সেভাবেই লড়াই চালাব আমরা। তবে আহত হতে পারে। এটা আপনাকে মেনে নিতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। মৃত্যু না হলেই হল। রাজা বলল।

—কিন্তু ওরা তো মারা যেতে পারে আহত হতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—তার দায়িত্ব ওদের রাজার কার্তিনার— আমার নয়। রাজা বললেন।

যাইহোক রাজা এনিমাকে তাঁর সংকল্প থেকে সরাতে পেরেছে এই ভেবে ফ্রান্সিস খুশি হল। তবে দায়িত্ব বাড়লো। মাত্র আজ রাতের মত সময়টুকু পেল। রাজা কার্তিনাকে যুদ্ধে হারাতে হবে। তার জন্যে পরিকল্পনা চাই। বেশ ভেবে চিন্তে আক্রমণ করতে হবে। জয়ী হতেই হবে। ভরসা এইটুকুই যে দুর্ধষ যোদ্ধা বন্ধুরা রয়েছে। রাজা এনিমার সৈন্যরাও রয়েছে। লড়াইটা প্রায় সমানে সমানেই হবে। আর একটা বড় সমস্যা ভাবতে হচ্ছে। ওরা দু'জন বাদে সবাই নিরস্ত্র। যে করেই হোক রাজা এনিমারের অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র জোগাড় করতে হবে। এটা করতে পারলে অর্দ্ধেক লড়াই জেতা হয়ে যাবে। লড়াই করতে হবে বুদ্ধি খাটিয়ে যাতে আমাদের হতাহতের সংখ্যা কম হয়।

রাজা এনিমার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। সবাই নিশ্চিন্ত হল। ফ্রান্সিস হ্যারির কাছে এল। ও যা ভাবছে সব বলল। সব শুনে হ্যারি বলল—চোরাগোপ্তা আক্রমন চালাতে হবে। আমাদের লোকক্ষয় যাতে কম হয় অথবা একেবারেই যাতে না হয়।

—হ্যাঁ। দায়িত্বটা বেড়ে গেল। এখন চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্যে আমাদের তৈরী হতে হবে।

হঠাৎ আরো দূরে রাজা কার্তিনার সৈনাদের হৈ হল্লা খুব অস্পষ্ট শোনা

গেল। আতলেতা কাছেই বসে ছিল। বলল—গুহার কাছে গেছে ওরা। ভেবেছে ঐ গুহাতেই আশ্রয় নিয়েছি আমরা।

—বলিছিলাম কি না যে গুহায় আশ্রয় নেওয়া চলবে না। ধরা পড়ে যাবো। নিরস্ত্র অসহায় আমরা। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল। রাজা কার্তিনার সৈন্যরা হয়ত বনের মধ্যে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে। কিন্তু এদিককার গভীর বনের দিকে ওরা এল না। বোধহয় বুঝে নিল ফ্রান্সিসরা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে চলে গেছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। সকলেই ক্ষুধার্ত সেই রাতে শুধু রুটি খাওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সিস ঝরা পাতার স্তূপের উপর বসে ছিল। এবার উঠে দাঁড়াল। একটু গলা চড়িয়ে বলল—মন্দিরঘরে চলো সবাই। আগে খেয়ে বিশ্রাম করে নিতে হবে। রাতে ওদের আক্রমন করতে হবে। চলো।

গভীর বনের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিসদের চলা শুরু হল। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—দেখবে যাতে কম শব্দ হয়।

বেশ সাবধানে চলল সবাই। সবার আগে ফ্রান্সিস আর বিনেলো খোলা তরোয়াল হাতে চলল। তরোয়াল দিয়ে জংলা ঝোপের গাছ লতা কাটতে কাটতে চলল।

মন্দির ঘরের কাছাকাছি এসে ফ্রান্সিস হাত তুলে সবাইকে দাঁড়িয়ে পড়তে ইঙ্গিত করল। তারপর এক গাছের আড়ালে আড়ালে মন্দিরঘরের খুব কাছে চলে এল। একটা গাছের আড়াল থেকে দেখল মন্দিরঘরে ধারে কাছে কার্তিনার কোন সৈন্য নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। মন্দিরঘরের মধ্যেও কোন শব্দ হচ্ছে না।

ফ্রান্সিস ফিরে এসে চাপা গলায় বলল—ওরা চলে গেছে। সবাই মন্দিরঘরে এসো।

সবাই মন্দিরঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস আর বিনেলো খোলা তরোয়াল হাতে মন্দিরঘরে আস্তে আস্তে ঢুকল। দেখল মন্দিরঘর জনশূন্য। ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে বলল—এসো সবাই।

সবাই ঘরে ঢুকল। মেঝেয় বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বন্ধু রাঁধুনি দু'জনকে বলল—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রুটি করো। রুটি চিনি খাওয়া হবে।

রাঁধুনি বন্ধুরা রান্নায় লেগে পড়ল। উনুন জ্বালা হল। কাঠের পাটাতনে আটাময়দা মাখা চলল। ভাগ্য ভাল রাজা কার্তিনার যোদ্ধারা হাঁড়ি উনুন

ভেঙ্গে দিয়ে যায়নি। অনেক তাড়াতাড়ি রুটি করা হল। চিনি দিয়ে রুটি খাওয়া হল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে সবাই শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। শুধু রাজা এনিমার মন্দিরঘরের বেদীর কাছে চুপ করে বসে রইলেন। ফ্রান্সিস তাঁর কাছে এল। বলল —মান্যবর—আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন। আপনি কিন্তু আমাদের সঙ্গে যাবেন না। আপনি এখানেই থাকবেন ঘুমোবেন।

—না—রাজা মাথা নাড়লেন—আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো। আমার জন্যে তোমরা জীবন বিপন্ন করবে আর আমি এখানে নিশ্চিন্তে ঘুমাবো এটা হয় না। আমি অবশ্য লড়াই করতে ভাল জানি না। তবু আমি তোমাদের কাছাকাছি থাকব।

—বেশ। আপনার যেমন ইচ্ছে। তবে চেষ্টা করবেন যেন ওদের হাতে ধরা না পড়েন।

—আমার জন্যে ভেবো না। রাজা বললেন।

এবার ফ্রান্সিস নিজেও শুয়ে পড়ল। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়ল। তবে বেশির ভাগ বন্ধু আর রাজার সৈন্যরা জেগেই রইল।

রাত গভীর হল। ফ্রান্সিসের একটু তন্দ্রা মত এসেছিল। পরক্ষণেই তন্দ্রা ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—তুমি থাকো।

—বেশ। শাঙ্কো বলল। সবাইকে নিয়ে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মন্দিরঘর থেকে বেরিয়ে এল। সবশেষে রাজাও চললেন। প্রায় অন্ধকার বনতল দিয়ে সবাই চলল।

বন শেষ। সামনেই সদর রাস্তা। দোকান ঘরগুলোর পেছনের ঝোপঝাড় দিয়ে সবাই চলল। ফ্রান্সিস কাউকে সদর রাস্তায় উঠতে দিল না। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় সবই দেখা যাচ্ছিল।

রাজবাড়ির কাছাকাছি এসে দেখল রাজবাড়ির দেউড়িতে দু'জন প্রহরী রয়েছে। ফ্রান্সিস রাজবাড়ির পেছনে দিয়ে ঘুরে চলল। তারপর রাজবাড়ির পাশে এল। দেখল সৈন্যাবাসের সামনে মশাল জ্বলছে। সামনের মাঠে বা সদর রাস্তায় কোন সৈন্য নেই। ফ্রান্সিস অশ্বস্ত হল।

এবার ফ্রান্সিস শুধু বিনেলোকে সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়ির ছায়ায় ছায়ায় অস্ত্রঘরের কাছে এল। দেখল দু'জন প্রহরী বর্শা হাতে অস্ত্রাগার পাহাড়া দিচ্ছে। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ লক্ষ্য করে চাপা গলায় বলল—আমি বাঁদিকেরটা তুমি ডানদিকেরটা। লড়াইয়ের জন্যে সময় দেবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের আহত করবে। চলো—।

দ্রুত ছুটে গিয়ে দু'জনে দুই প্রহরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাঁদিকের প্রহরীটি ফ্রান্সিসের তরোয়ালের কোপ বাঁ কাঁধে পেয়ে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস এক ঝট্‌কায় ওর হাত থেকে বর্শা কেড়ে নিল। বর্শার ছুঁচোলো মুখ ওর বুকে ঠেকিয়ে বলল—একেবারে শব্দ করবে না। কয়েদঘরে গিয়ে ঢোকো। প্রহরীটি বাঁ কাঁধ ডান হাতে দিয়ে চেপে বিকৃতমুখে কয়েদঘরের দিকে চলল। ততক্ষণে বিনেলো অন্য প্রহরীটির পায়ে তরোয়ালের ঘা মেরেছে। প্রহরীটি পা দু'হাত চেপে বসে পড়েছে। ফ্রান্সিস তাকেও কয়েদঘরের দিকে নিয়ে চলল। দু'জনকেই খোলা দরজা দিয়ে কয়েদঘরে ঢুকিয়ে দিল। দরজার পাশে বড় তালাটা ঝুলছিল। দরজা আস্তে বন্ধ করে কড়ায় তালা ঝুলিয়ে দিল। চাপাস্বরে বলল—কোনরকম শব্দে করলেই মরবে। একেবারে চুপ করে থাকবে। এবার অস্ত্রঘরের চাবিটা দাও। একজন কোমরের চামড়ার বন্ধনী থেকে চাবিটা খুলতে লাগল। ফ্রান্সিস তাড়া দিল—জলদি। প্রহরীটি চাবি খুলে নিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে চাবিটা ফ্রান্সিসকে দিল।

ফ্রান্সিস ছুটল। অস্ত্রঘরের সামনে এল। পেছনে বিনেলো। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—সবাইকে ডাকো। তাড়াতাড়ি। বিনেলো সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সবাই অস্ত্রাগারের সমানে এল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস দরজার তালা খুলে ফেলেছে। সবাই ঘরে ঢুকে তরোয়াল নিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। রাজবাড়ির আড়াল থেকে রাজা এনিমার এসব দেখতে লাগলেন।

সবাই তরোয়াল হাতে একত্র হলে ফ্রান্সিস সবাইকে চাপাস্বরে বলল—এবার আমরা সৈন্যাবাস আক্রমন করব। ওরা নিরস্ত্র এবং ঘুমন্ত। নিজের জীবন বিপন্ন না হলে কাউকে হত্যা করবে না। আহত করবে। চলো সব। এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না। সবাই খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে মাঠ পার হয়ে সৈন্যাবাসের দরজার সামনে এল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—লাথি মেরে দরজা ভাঙো। ওরা দরজায় লাথি মারতে লাগল। দরজা ভেঙে যেতে লাগল। রাজা কার্তিনার সৈন্যদের ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। বিছানায় উঠে বসে দেখল সামনে তরোয়াল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে হয় ভাইকিংরা নয় তো রাজা এনিমারের সৈন্যরা। রাজা কার্তিনার নিরস্ত্র সৈন্যরা সহজেই হার স্বীকার করল।

—এদের মাঠে নিয়ে চলো। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল। রাজা কার্তিনার সৈন্যরা স্বপ্নেও ভাবে নি এভাবে তারা পরাস্ত হবে। তখনও ওদের ঘুম কাটেনি। দু'তিনজন সৈন্য গাঁইগুই করছিল। তারা হাতে পায়ে তরোয়ালের ঘা খেল। আর বন্দী হতে আপত্তি করল না।

রাজা কার্তিনার সৈন্যদের মাঠে সারি দিয়ে দাঁড় করানো হল। ফ্রান্সিসরা

ওদের ঘিরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস এই ভেবে স্বস্তি পেল যে ওদের কেউ মারা যায় নি বা তেমন আহত হয়নি। অভিযান সফল।

ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—বিনেলো—সিনাত্রা—যাও দড়ি নিয়ে এসো। এদের হাত পা বাঁধো দু'জনে সৈন্যাবাসের দিকে ছুটল। খুঁজে খুঁজে পাকানো দড়ি নিয়ে এল। বিনেলো জামার তলা থেকে ছোরা বের করল। দড়ি কেটে কেটে টুকরো করতে লাগল। ভাইকিং বন্ধুরা দড়ি নিয়ে রাজা কার্তিনার সৈন্যদের হাত পা বাঁধতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবার হাত পা বাঁধা হয়ে গেল। ফ্রান্সিস ওদের বসে পড়তে বলল। ওরা মাঠের ঘাসের ওপর বসে পড়ল।

রাজা এনিমার বেশ ক্লান্ত বোধ করলেন। সৈন্যাবাসের বারান্দায় বসে পড়লেন। ফ্রান্সিস তাঁর কাছে এল। বলল—রাজা কার্তিনার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। আপনিও চলুন।

—তাঁকে আর কী বলব বলো। রাজা বললেন।

—অন্তত এদেশ থেকে সসৈন্যে চলে যেতে বলতে পারেন। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। চলো। রাজা উঠলেন। দু'জন রাজবাড়ির প্রধান প্রবেশপথের দিকে যাচ্ছে আতলেতা ছুটে এসে দু'জনের সঙ্গে চলল। ফ্রান্সিস দেখল কিন্তু কিছু বলল না।

প্রধান প্রবেশপথের সামনে আসতে প্রহরী দু'জন বেশ চমকাল। বর্শা বাগিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—ও! তোমরা এখনও দেখো নি। এগিয়ে এসে মাঠের দিকে তাকাও। একজন বর্শা নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেল। মাঠের মধ্যে বসে থাকা কার্তিনার বন্দী সৈন্যদের দেখল। ফ্রান্সিস আর আতলেতার হাতে খোলা তরোয়াল দেখে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। ও পড়িমরি সদর রাস্তার দিকে ছুটল। অন্য প্রহরীটিও ওকে পালাতে দেখে ওর পেছনে পেছনে ছুটল।

তিনজন প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকল। আর কোন প্রহরীর দেখা পেল না। সোজা রাজার শয়নকক্ষে এল। ঘুম থেকে উঠে রাজা কার্তিনা বিছানাতেই বসে পড়ল। মাথা নোয়ালো । ফ্রান্সিস পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল। বলল—সব জানি। আমাকে কি বন্দী করা হবে?

—সেটা রাজা এনিমার বলবেন। ফ্রান্সিস বলল।

কার্তিনা রাজা এনিমারের দিকে তাকাল। এনিমার বলল—দেখুন—আমি আপনার দেশ আক্রমণ করি নি। আপনিই আগ বাড়িয়ে আমার রাজত্ব জয় করতে এসেছিলেন। রাজা কার্তিনা বলল—যাক গে—আমি এই দেশ ছেড়ে

চলে যাচ্ছি। কিন্তু আমার সৈন্যদের হাতপা—পায়ের বাঁধন খুলে দিতে হবে—কিন্তু হাতের বাঁধন—খোলা হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আমি বাঁধা অবস্থাতেই আমার সৈন্যদের নিয়ে যাবো। রাজা বলল।

—আর একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে আপনাকে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী প্রতিজ্ঞা? রাজা কার্তিনা জানতে চাইল।

—আপনি ভবিষ্যতে আর কখনও রাজা এনিমারের এই রাজ্য আক্রমন করবেন না। ফ্রান্সিস বলল। একটুক্ষন চুপ করে থেকে কার্তিনার বলল—বেশ। প্রতিজ্ঞা করলাম।

—অবশ্য আপনি এই প্রতিজ্ঞা কতটা রাখবেন তাই নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ফ্রান্সিস বলল। রাজা কার্তিনা কোন কথা বলল না। এবার ফ্রান্সিস বলল আপনি কখন এই রাজ্য ছেড়ে যাবেন?

—কালকে? রাজা কার্তিনা বলল।

—না। আজকে। এক্ষুনি। ফ্রান্সিস গলায় জোর দিয়ে বলল। রাজা কার্তিনা একটু থামল। তারপর মাথা কাত করে বলল—বেশ।

—পোশাক পাল্টে রাজবাড়ির বাইরে আসুন। ফ্রান্সিস বলল। তারপর রাজ এনিমারের দিকে তাকিয়ে বলল—মাননীয় রাজা—আপনি অন্তঃপুরে যান। আমরা দেখি কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।

—না। তোমরা আমরা অতিথিশালায় থাকবে। রাজা এনিমার বললেন—চলো আমি তোমাদের অতিথিশালায় নিয়ে যাচ্ছি। আতলেতা বলল।

ফ্রান্সিস আতলেতাকে নিয়ে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তখন ভোর হয়ে গেছে। রাজবাড়ির বাগানে পাখির ডাক শুরু হয়েছে। আকাশে চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

বন্ধুদের কাছে আসতে আসতে ফ্রান্সিস ডাকল—আতালেতা।

—বলো। আতলেতা ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল।

—বলছিলাম—রাজা সিয়াভোর গুপ্ত ধনভান্ডার সম্বন্ধে তুমি কী জানো? প্রোমিও নামে এক স্পেনীয় যুবকের লেখা একটা বইয়ের কথা শুনেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। বইটা বোধহয় রাজা কার্তিনার কাছে আছে। আতলেতা বলল।

—সেই বইটা আমার চাই। তুমি যদি বইটা জোগাড় কর আমাকে দাও তাহলে আমার খুব উপকার হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক সময়ে কথাটা মনে করিয়েছো। রাজা কার্তিনার কাছ থেকে আমি

বইটা নিয়ে আসছি। তোমরা আমাদের কোন সৈন্যকে গিয়ে বল। সে তোমাদের অতিথিশালায় নিয়ে যাবে। আতলেতো বলল।

—বেশ। আর একটা অনুরোধ। তাড়াতড়ি কিছু খাবারের ব্যবস্থা কর। তুমি তো জানো কী খেয়ে আছি। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—কিছুছ্ ভেবো না। রাজবাড়ির রাঁধুনিরা তো আর বন্দী হয়নি। কাজেই কিছু গরম খাবারের ব্যবস্থা যত তাড়াতড়ি সম্ভব করছি।

কথাটা বলে আতালেতো রাজবাড়ির দিকে চলে গেল।

মাঠে এসে ফ্রান্সিস দেখল বন্ধুরা মাঠে ঘাসের ওপর বসে আছে। রাজা এনিমারের সৈন্যরা সৈন্যবাসের দখল নিয়ে নিয়েছে। বন্দীরাও মাঠে বসে আছে। ফ্রান্সিস বিনোলোকে ডাকল। বলল—সৈন্যাবাসে যাও। ওদের কাছ থেকে জেনে এসো অতিথিশালাটা কোথায়? আর একটা কথা। একটু পরেই রাজা কার্তিনা এখানে তার বন্দী সৈন্যদের কাছে আসবে। তখন ঐ বন্দী সৈন্যদের পায়ের বাঁধন কেটে দিও।

—সেকি! ওরা তখন তো আমাদের আক্রমন করবে। বিনেলো বলল।

—পাগল। নিরস্ত্র ওরা ভালো মারেই করেই জানে খালি হাতে লড়াই করতে এলে ওরা মরবে। যাক গে—যা বললাম করো। ফ্রান্সিস বলল।

বিনেলো সৈন্যাবাসের দিক চলে গেল। তখন কয়েকজন কাঠের মিস্ত্রী সৈন্যাবাসের ভাঙা দরজা মেরামত করছিল।

ফ্রান্সিস হ্যারির কাছে এল। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব—নিঁখুত পরিকল্পনা করে আমরা জয়লাভ করেছি। তোমাদের শৌর্য সাহসের জন্য ই এটা সম্ভব হল। আমাদের কেউ মারাও যায় নি আহতও হয়নি। আমাদের কাজ শেষ। এখন খাবার আনতে বলছি। আমরা সবাই ক্ষুর্ধাত। একটু পরেই রাজা কার্তিনা আসবে। তার সৈন্যদের নিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে। তখন আমাদের কাজও শেষ হবে। তাই বলছিলাম দুপুরের খাবার খেয়ে তোমরা জাহাজে ফিরে যাও। আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। এখানে এখন আমি থাকব আর আমার সঙ্গে থাকবে হ্যারি আর বিনোলা। এখন খাবার খেয়ে দু'জন পশ্চিমের বনভূমিতে মন্দিরঘরে চলে যাও। শাঙ্কো ওখানে রয়েছে। ওকে নিয়ে এসো। শাঙ্কো এখনও সম্পূর্ন সুস্থ নয়। জাহাজে ওর চিকিৎসার প্রয়োজন। ফ্রান্সিস থামল।

দু'জন ভাইকিং বন্ধু পশ্চিমের বনভূমির দিকে শাঙ্কোকে আনতে চলে গেল।

বিনেলো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—অতিথিশালায় চলো। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—এখন অতিথিশালায় চলো। বিনেলো ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। একজন ভাইকিং বন্ধু যেতে যেতে বলল—ফ্রান্সিস—আমরা কি তরোয়াল গুলো অস্ত্রঘারে রেখে আসব?

—না। এখনও আমরা বিপদ-মুক্ত নই। আগে রাজা কার্তিনা তার সৈন্যদের নিয়ে চলে যাক। তারপর আমরা অস্ত্র জমা দেব। ফ্রান্সিস বলল।

রাজবাড়ির উত্তর কোণায় অতিথিশালা। ফ্রান্সিসরা অতিথিশালায় ঢুকল। বেশ বড় ঘর। মেঝেয় দড়ি বাঁধা শুকনো ঘাসের বিছানামত। ভাইকিংরা কেউ কেউ বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস সটান শুয়ে পড়ল। তারপর হ্যারিকে কাছে আসতে বলল। হ্যারি ওর কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—

—অতীতের রাজা সিয়াভোর রত্নভান্ডারের কথাতো শুনেছো।

—হ্যাঁ। তাই আমরা তিনজন থেকে যাবো। রাজা এনিমারের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলব। তবে আজ নয়। আজ বিশ্রাম। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ফ্রান্সিস একটু হাঁপিয়ে উঠে বলল।

—কাল সকালে হয়ত রাজসভা বসবে। তখনই কথা বলব। হ্যারি বলল।

—তাই ঠিক করেছি। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই রাজবাড়ির রাঁধুনিরা কয়েকজন কাঠের বড় বড় পাত্রের খাবার নিয়ে এল। আগে পাতা পেতে দিল। তারপর খাবার দিল। পাখির মাংসের ঝোল। ভাইকিংরা চেটে পুটে খেল। রাজবাড়ির রান্না। তার স্বাদই আলাদা। শাঙ্কোকে নিয়ে দুই বন্ধু এল। তারাও খেল।

তখনই ওরা দেখল— হাত বাঁধা বন্দী সৈন্যদের নিয়ে রাজা কার্তিনা চলে যাচ্ছে। তার মাথা নিচু। বোঝাই যায় এভাবে ছেড়ে যাবে তা কল্পনাও করতে পারেনি।

দুপুর হল। আর এক দফা খাবার এল। সবাই খেল। এবার ভাইকিংরা অস্ত্রঘরের তরোয়াল জমা দিয়ে জাহাজ ঘাটের দিকে দল বেঁধে চলল। ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

সন্ধ্যের একটু পরে আতলেতা এল। হাতে একটা মোটা চামড়ার বই। বইটা ফ্রান্সিসের হাতে দিল। বলল—সেই স্পেনীয় যুবক প্রোমিওর লেখা বই। রাজা দিলেন।

ফ্রান্সিস শুয়ে ছিল। দ্রুত উঠে বসল। বলল—মনে হচ্ছে বইটা কাজে লাগবে। হ্যারির হাতে বইটা দিয়ে বলল—হ্যারি তুমি বইটা পড়ে যাও। আমি

শুনি। হ্যারি বইটা নিল। চামড়া বাঁধাই বইটার মলাট ওল্টালো। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—জনৈক জলদস্যুর কাহিনী। হ্যারি পড়তে শুরু করার আগে একটু পড়ে নিয়ে বলল—পুরোন স্পেনীয় ভাষায় লেখা। শোন—আমার নাম প্রোমিও। অনেক দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে দিন কেটেছে আমার। স্পেনের সমুদ্র তীরবর্তী একটা ছোট বন্দরশহরে আমার জন্ম। জন্মবধি শুধু অভাবই দেখেছি আমি। বাবা ছিল সেই ছোট বন্দরের মোট বাহক। মা মারা গিয়েছিল। আমরা তিন ভাইবোন। আমি সকলের বড় ছিলাম। বাবা আমাকে একটা চাল-ভাঙা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। ছাত্র হিসাবে খারাপ ছিলাম না। কিন্তু বাবা তো আমাকে বই খাতাই কিনে দিতে পারত না। কাজেই স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকে বই ধার নিতে হত। তারাও সব সময় বই দিত না। হঠাৎ বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাস মাইনে দিতে না পেরে আমি বিপদে পড়লাম। স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিতে আর পাড়লাম না। শেষ পর্যন্ত বাবার কাজটা পেলাম। তখন আমি যুবক। মোট বাহকের কাজ করতে লাগলাম। বাবা সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দিল। বন্দরের কর্তা আমাকে ছাড়িয়ে দিল।

আমার বয়সী যুবকদের দেখতাম সুখে আছে। কেউ কেউ বিয়ে করে সংসারীও হয়েছে। বড়লোকের ছেলেদের উদ্দাম আনন্দের জীবন দেখতাম। তখনই ভেবেছিলাম—বড়লোক হতে হবে। তখন এক যাত্রীবাহী জাহাজে কাজ নিলাম।

জাহাজের খালাসি হয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়লাম। একঘেয়ে জীবন কাটতে লাগল। তখনই এক জলদস্যু দলের জাহাজের পাল্লায় পড়লাম আমরা। লড়াই করলাম। কিন্তু ওদের সঙ্গে পারলাম না। কিছু যাত্রীর সঙ্গে আমাদেরও অনেকে মারা গেল। তাদের কোনরকম শেষকৃত্য হল না। জলদস্যুদের ক্যাপটন পরে নাম জেনেছি—সার্ভানো—সব মৃতদেহ ছুঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দিতে আদেশ দিল। আদেশ পালিত হল। যাত্রীদের স্বর্ণমুদ্রা সহ জামাকাপড় সব লুঠ করা হল। আমি দেখলাম জলদস্যুতা করলে বড়লোক হতে পারব। আমি ক্যাপটেন সার্ভানোকে আমার ইচ্ছে জানালাম। আমি অভাবের মধ্যে মানুষ হলেও আমি দীর্ঘদেহী সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলাম। সার্ভানো আমাকে পছন্দ করল। জলদস্যুদের জাহাজে আশ্রয় নিলাম।

শুরু হল এক নতুন জীবন। যাত্রীবাহী জাহাজ লুঠ করা, যাত্রীদের বন্দী করে ক্রীতদাসের হাটে বিক্রী করা—লড়াই নরহত্যা—এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু বড়লোক হতে পারলাম না। লুণ্ঠিত সবকিছুই ক্যাপ্টেন সার্ভানো নিজের কাছে নিয়ে নিত। বদলে আমাদের সামান্য কিছু দিত। অথচ

লড়াই করছি আমরাই লুঠ করছি আমরাই আহত হয়েছি রক্ত হয়েছি আমরাই—সেই আমরাই বঞ্চিত হয়েছি।

তখন জলদস্যুদের পাকড়াও করতে বিভিন্ন দেশ থেকে নৌবাহিনী পাঠানো শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকটি জলদস্যুদের জাহাজ ধরা পড়েছে। সেই সব দেশে জলদস্যুদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের ফাঁসিও দেওয়া হয়েছে।

হতাশ আমি পালবার উপায় ভাবতে লাগলাম। ক্যাপ্টেনের সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে পালানো সহজ কাজ নয়। কিন্তু আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি যদিও জানতাম ধরা পড়লে মৃত্যু।

সেসময় আমাদের জাহাজ একটা ছোট বন্দরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। রাতও ছিল অন্ধকার রাত। গভীর রাতে ডেক থেকে উঠে গড়াতে গড়াতে হালের কাছে এলাম। দড়িদড়া ধরে জলে কোন শব্দ না তুলে জলে ডুব দিলাম। ভেসে উঠে দেখলাম জাহাজ বেশ দূরে চলে গেছে। অন্ধকার সমুদ্রে আস্তে আস্তে জলে কোন শব্দ না তুলে তীরের দিকে সাঁতরাতে লাগলাম। তীরের বন্দরে যখন পৌঁছলাম তখন ভোর হয় হয়। কোমরে আমার পুরোনো পোশাক বেঁধে এনেছিলাম। জল দস্যুর মার্কামারা পোশাক ছেড়ে সেই ভেজা পোশাক পরলাম।

বন্দরের দোকানপাট খুলছে তখন। একটা ছোট সরাইখানায় আশ্রয় নিলাম।

তারপর বেঁচে থাকার লড়াইয়ের জীবন। এ জাহাজ সে জাহাজ কাজ নিয়ে এদেশে সেদেশে ঘুরে বেড়ালাম। কিছু স্বর্নমুদ্রাও জমালাম।

অবশেষে এক জাহাজে চড়ে এলাম এই লাগাসে। আশ্রয় নিলাম এক সরাইখানায়। ভেবেছিলাম কয়েকদিন থাকব। মাটির ওপরেতো বিশেষ থাকতে পারিনি। শুধু জলে জলেই দিন কেটেছে। কাজেই মাটির ওপর ভীষন টান আমার। কিন্তু এদেশ ছেড়ে যাওয়া হল না। একদিন একটা ঐতিহাসিক ঘটনা শুনলাম।

সেদিন রাজা এনিমারের রাজসভায় গেছি। রাজবাড়ি রাজসভা রাজাকে দেখতে। দেখলাম একটা শুনানি চলছে রাজসভায়। অপরাধী এক পোর্তুগীজ যুবকের বিচার চলছে। রাজা জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কী?

—কাবানা। যুবকটি বলল।

—তুমি কোন দেশের মানুষ? রাজা জানতে চাইলেন।

—পোর্তুগাল। কাবানা বলল।

—এই দেশে এসেছো কেন? রাজা জিজ্ঞেস করল।

—মাননীয় রাজা জাহাজে আসার সময় এক বৃদ্ধ নাবিকের কাছে শুনেছিলাম এই লাগাসে অতীতের এক রাজার মহামূল্যবান গুপ্ত রত্নভান্ডার আছে। যুবকটি বলল।

—হ্যাঁ—রাজা সিয়োভোর গুপ্ত রত্ন ভান্ডার। কিন্তু সেসবের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? রাজা বললেন।

—আমি সেই রত্নভান্ডার উদ্ধার করার জন্যে চেষ্টা করছি। যুবক কাবানা বলল।

—বৃথা চেষ্টা। অতীতে সিয়াভোর পরে দু তিনজন রাজা সেই রত্নভান্ডার উদ্ধার করার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কোন হদিশ পান নি। তুমি এখানে কয়েকদিনের মধ্যেই তা উদ্ধার করবে ভেবেছো?

—আমি চেষ্টা করব। আপনি অনুমতি দিন। কাবানা বলল।

—তোমার এই অপরাধের জন্যেই তোমাকে বন্দী করা হয়েছে। তুমি আমার অনুমতি না নিয়েই গোপনে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলে। কেন? রাজা বললেন।

—গোপন রত্নভন্ডার খুঁজতে। কাবানা বলল।

—অথচ আমার কোন অনুমতি নাওনি। রাজা বললেন।

—মাননীয় রাজা—আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা করুন। গুপ্ত রত্নভান্ডার উদ্ধারের জন্যে আমাকে অনুমতি দিন। কাবানা বলল।

—বেশ। তুমি এখানে বিদেশী। তবু তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু তোমার পরিশ্রম বৃথাই যাবে। রাজা এনিমার বললেন।

—তবু আমি চেষ্টা করব। কাবানা বলল।

—করো চেষ্টা। কিন্তু অন্তঃপুরে আবার যেতে হলে দু'জন প্রহরী তোমার সঙ্গে থাকবে। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। আপনার আদেশ শিরোধার্য। কাবানা বলল।

—কোথায় উঠেছো তুমি? রাজা এনিমার জানতে চাইলেন।

—এক সরাইখানায়। কাবানা বলল।

—না। সরাইখানায় থাকা চলবে না। আমার অতিথিশালায় আমার প্রহরীদের নজরের মধ্যে থাকবে। রাজা বললেন।

—কিন্তু আমাকে তো সারা রাজ্য ঘুরে বেড়াতে হবে। কাবানা বলল।

—বেশ তো। ঘুরে বেড়াবার সময় একজন প্রহরী তোমার সঙ্গেই থাকবে।

যদি গুপ্ত রত্নভান্ডার উদ্ধার করতে পারো তবে আর ঐ রত্নভান্ডার নিয়ে পালাতে পারবে না। রাজা এনিমার বললেন।

—ঠিক আছে। যেমন আপনার আদেশ। কাবানা বলল।

—যাও। একজন প্রহরী তোমাকে অতিথিশালায় নিয়ে যাবে। তোমাকে পাহারা দেবে। রাজা এনিমার বললেন।

একজন প্রহরীর সঙ্গে কাবানা বেরিয়ে গেল।

এই ঘটনা আমার মনে গভীর রেখাপাত করল। মনের বড়লোক হওয়ার ইচ্ছাটা মাথা চড়া দিল। আমিও চেষ্টা করে উদ্ধার করতে পারে কি না। সেটা করতে গেলে সমস্ত ঘটনাটা জানতে হবে। তার চেয়ে সহজ পথ কাবানাকে অনুসরন করা। ও কীভাবে খোঁজে সেটা আবিষ্কার করা। যদি ও সত্যিই সেই রত্নভান্ডার আবিষ্কার করতে পারে তখন ও কে আর যদি ওর সঙ্গে প্রহরী থাকে তাহলে দু'জনকেই মেরে রত্নভান্ডার নিয়ে পালাতে পারবো। একটা ছোরা সবসময়ই আমার কোমরে গোঁজা থাকে। আর ছোরা চালাতে আমি ওস্তাদ। তরোয়ালের দরকার নেই।

দুপুরে সরাইখানার খাওয়া সেরেই বেরিয়ে পড়লাম রাজার অতিথিশালায় খোঁজে। রাজবাড়ির দেউড়ির সামনে পাহারারত এক প্রহরীকে জিজ্ঞেস করতে সে আঙ্গুল তুলে রাজবাড়ির পেছনে বাঁদিকে একটা ঘর দেখিয়ে দিল।

আমি ঘরটার সামনে উপস্থিত হলাম। দেখলাম একজন প্রহরী দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছে। প্রহরীটি আছে। তার মানে কাবানা এখন রত্নভান্ডার খুঁজতে বেরোয়নি। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম ঠিক সামনেই একটা বিরাট চেস্টনাট গাছ। আমি গাছের তলায় দাঁড়ালাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম—কখন কাবানা বেরোয়।

কিছুক্ষণ পরে কাবানা বেরিয়ে এল। আমি বেশ দূরত্ব রেখে কাবানা আর প্রহরীর পেছনে পেছনে চললাম।

বড় রাস্তা দিয়ে ওরা চলল পশ্চিমের পাহাড় জঙ্গলের দিকে। আমিও ওদের পেছনে চললাম। লক্ষ্য করলাম কাবানা একটা নেভানো মশাল নিয়ে যাচ্ছে। কারণ বুঝলাম না। তারপর রাস্তাটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে দক্ষিণমুখো। ঐদিকে কাবানা গেল না ও পাহাড়ের নিচের জঙ্গলে ঢুকল। আমিও একটু দুরত্ব রেখে ওদের পেছনে পেছনে চললাম। এখানে নগরের ভিড় নই যে লোকের আড়াল নেব। তাই সাবধানে চললাম।

ঘন বন। অন্ধকার। গাছ লতাপাতার আড়ালে আড়ালে চললাম। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরল ওরা। তারপর একটা আধভাঙা ঘরের কাছে এল। বুঝলাম

না এখানে ঘর তৈরী হয়েছিল কীসের জন্যে? কাবানা ঘরের মধ্যে ঢুকল। প্রহরী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। আমি গাছের আড়ালে লুকোলাম।

কিছুক্ষণ পরে কাবানা বেরিয়ে এল। চলল পশ্চিমমুখে।

প্রায় অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে সামনেই পাহাড়ের পাদদেশ। কাবানা পাহাড়ে উঠতে লাগল। পেছনে প্রহরী। আমিও পাথরের আড়ালে আড়ালে উঠতে লাগলাম। কিছুক্ষণে মধ্যেই দেখলাম একটা বড় গুহামুখ। এবার বুঝলাম কেন কাবানা একটা মশাল্ নিয়ে এসেছে। ও কোমর থেকে চক্‌মকি্ পাথর বার করল। পাথরে লোহার টুকরো ঠুকে মশাল জ্বালাল। তারপর জলন্ত মশাল হাতে গুহায় ঢুকল।

আমিও ওদের পেছনে পেছনে ঢুকলাম। মশালের আলো লক্ষ্য করে আমিও চললাম। মশাল হাতে কাবানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গুহার এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো পাথুরে গা দেখতে দেখতে চলল। ওদের এগোতে সময় লাগছিল। বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর একটু দূর থেকে মশালের আলোয় দেখলাম গুহা শেষ। কাবানা সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। তারপর ফিরে আসতে লাগল। বুঝলাম এর আগে ও এখানে এসেছিল।

আমিও ফিরে দাঁড়িয়ে দ্রুত গুহার মুখের দিকে চললাম। আমার পায়ের শব্দ হল। কাবানা চেঁচিয়ে বলল—কে? গুহায় জোর শব্দ হল। আমি ততক্ষণে গুহার বাইরে চলে এসেছি। ছুটে গিয়ে একটা পাথরের চাঁইয়ের পেছনে গিয়ে লুকোলাম।

কিছুক্ষণ পরেই ওরা দু'জনেই বেরিয়ে এল। আড়াল থেকে কাবানার মুখ দেখেই বুঝলাম ও গুপ্তধনের খোঁজ পায়নি।

দু'জন বনের মধ্যে ঢুকল। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি ওদের পেছনে পেছনে আর গেলাম না। এখন আর ওদের অনুসরন করার কোন অর্থ নেই। কাবানার সব দেখা হয়ে গেছে। ও আর এখন অন্য কোথাও যাবে না। আমি এখানেই একটা ভুল করলাম। আমি অন্য পাশ দিয়ে বনের বাইরে রাস্তার কাছে এলাম। বনের আড়াল থেকে লক্ষ্য করলাম ওরা কখন বেরিয়ে আসে। কিন্তু অপেক্ষাই করতে লাগলাম। ওরা আর বেরিয়ে আসে না। তাহলে ওরা কি অন্য কোথাও গেল? কোথায় গেল?

আমি আবার বনের মধ্যে ঢুকলাম। ওদের খুঁজতে লাগলাম। দক্ষিণমুখো চললাম। বেশ কিছুটা যেতে হঠাৎ দেখি সামনে একটা হ্রদ। কাবানা আর প্রহরীটি জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি দ্রুত জলের ধারে জংলা

গাছের জঙ্গলের আড়ালে বসে পড়লাম। হ্রদের ধারে ধারে কাবানা একবার ডানদিকে একবার বাঁদিকে গেল। ঘুরে ঘুরে চারপাশ ভালো করে দেখল। তারপর দু'জনেই ফিরে এল। বুঝলাম ও কিছু হদিশ করতে পারেনি। এবার আর আমি ভুল করলাম না। বনের মধ্যে দিয়ে ওদের পেছনে পেছনে আসতে লাগলাম। এখানে একটা হ্রদ আছে তা আমি জানতাম না। কাজেই আবার ওদের হারাই তাই ওদের দিকে লক্ষ্য রেখে বনের মধ্যে দিয়ে আসতে লাগলাম। কী জানি-কাবানা যদি অন্য কোথাও যায়?

বন শেষ। ওরা রাস্তায় উঠল। এবার আমি ওদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে দিলাম। অল্প লোকই রাস্তায় যাতায়াত করছে। কাজেই ওদের ওপর নজর রাখার সুবিধে হল।

নগরীর ভিড় শুরু হল। কাবানা আর অন্য কোথাও গেল না। সোজা অতিথিশালায় ঢুকল। আমি চেস্টনাট গাছটার নিচে কিছুক্ষণ গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর কাবানা আর বেরোলো না দেখে সরাইখানায় ফিরে এলাম।

সেদিন রাতে খাবার আগেই আমি মহাবিপদে পড়লাম। বিপদে ফেলল আমার ডান গালের আঁচিল। আমি জানতাম না জলদস্যু ক্যাপ্টেন সার্ভানো এই বন্দরেই জাহাজ ভিড়িয়েছে। জানতাম জলদস্যু এসব সময়ে জাহাজের মাথায় সাদা মরার হাড় আর মাথা আঁকা কালো পতকা নামিয়ে সাদা পতকা উড়িয়ে দেয়। কেউ ওদের জলদস্যু বলে চিনতে পারে না।

আমি যে জাহাজে চড়ে এসেছিলাম সেই জাহাজটা তখনও বোধহয় নোঙর করা ছিল। সেই জাহাজের কারে-কাছ থেকে আঁচিলওয়ালা আমার খোঁজ পেয়েছিল ক্যাপ্টেন সার্ভানো।

আমাকে ঠিক খুঁজে খুঁজে আমার সরাইখানায় এসে হাজির। সঙ্গে একজন সাধারন পোশাকের জলদস্যু। ক্যাপ্টেনের পোশাক ক্যাপ্টেনের মতই। ক্যাপ্টেন সার্ভানো তরোয়াল কোষমুক্ত করে আমার গলায় তরোয়ালের ডগাটা ঠেকিয়ে বলল—পালিয়েছিলে। এর শাস্তি তো জানো। জাহাজে চলো। বুঝলাম—রেহাই নেই। সরাইখানার লোকজন তার মারমূর্তি দেখে এগোতে সাহস করল না। আমি তখন অসহায়। বুঝলাম ক্যাপ্টনকে ঠেকাতে হলে গুপ্তধনের লোভ দেখাতে হবে। এছাড়া উপায় নেই। আমি তখন বললাম—একটা গুপ্তধনের উদ্ধারের কাজে লেগেছি। এখন জাহাজে চলে গেলে গুপ্তধনের আশা ছাড়তে হবে।

—গুপ্তধন? সার্ভানো বেশ চমকে উঠল। বলল—কোথায় সেই গুপ্তধন?

—সেটার খোঁজেই তো আমি এখানে আছি। সার্ভানো তরোয়াল কোষবদ্ধ করে আমার পাশে এসে বলল—সব ব্যাপারটা খুলে বলো তো?

আমি তখন অতীতের রাজা সিয়াভোর গুপ্ত রত্নভান্ডারের কথা কাবানাকে অনুসরনের কথা সব বললাম। ক্যাপ্টেন সার্ভানো খুশির ভঙ্গিতে উরুতে এক চাপড় দিয়ে বলল— এইতো একটা খবরের মতো খবর দিলে। চলো—আমিও তোমার সঙ্গে থাকবো। গুপ্তধন উদ্ধার হলে দু'জনে ভাগাভাগি করে নিয়ে পালাবো।

—এক্ষেত্রে কাবানাকে অনুসরন করতে হবে। কিন্তু সেটা করতে গেলে আপনাকে এই মার্কামারা ক্যাপ্টেনের পোশাক ছাড়তে হবে।

—ঠিক আছে। সঙ্গের জলদস্যুকে বলল— যাও আমার সাধারন পোশাক নিয়ে আয়। আর সবাইকে বলবি জাহাজ এই বন্দরে থাকবে। আমি ফিরে গিয়ে জাহাজ ছাড়বো। সঙ্গী জলদস্যু চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সঙ্গী সার্ভানোর জন্যে সাধারন পোশাক নিয়ে এল। ওকে সার্ভানো চলে যেতে বলল—এখন তোমার সঙ্গে এখানেই থাকবো। রত্নভান্ডার নিয়ে জাহাজে ফিরবো।

পরের দিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। সার্ভানোকে নিয়ে প্রায় ছুটে অতিথিশালার সামনে এলাম। চেস্টনাট গাছের নীচে দাঁড়ালাম দু'জনে।

দাঁড়িয়ে আছি। কাবানার বেরোবার নাম নেই। চিন্তায় পড়লাম। তবে কি ও আগেই বেরিয়েছে। না—ঐতো কাবানা বেরিয়ে এল। পেছনে সেই প্রহরী।

এবার দু'জনে চলল পুবমুখো সমুদ্রের দিকে। আমরাও পিছু নিলাম। ভাবলাম ওরা বোধহয় বন্দরে যাবে। দেখলাম ওরা বন্দরে এল না মরুভূমি মত বালিভর্তি এলাকায় এল। এখানে শুধু কাঁটাগাছ আর ফণিমনসার ঝোপ।

মরুভূমির মত শুধু বালি। সেই সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। আমরা সহজেই কাবানার নজরে পড়তে পারি। তাই আমরা কখনও এই কাঁটা ঝোপ ঐ ফনীমনসার ঝোপের পিছনে আত্মগোপন করে করে চললাম।

কিছুদুর যেতেই দেখা গেল একটা পাথরের থামমত কী একটা বালির ওপর বেরিয়ে আছে। কাবানা ওখানে গিয়ে থামল। খুব মনোযোগ দিয়ে পাথরের থামটা চারপাশের বালির এলাকাটা দেখতে লাগল। ও হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেই আমাদের দেখতে পেত। তার আগেই আমি ক্যাপ্টেন সার্ভানোকে হাত টেনে ধরে একটা মনসাঝোপের আড়ালে উবু হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঠিক তখনই কাবানা প্রহরীকে কি বলতে বলতে পিছু ফিরে তাকাল। মনসাগাছের আড়ালে আমাদের দেখতে পেল না।

কিছুক্ষণ পাথরের থামটার কাছে দাঁড়াল কাবানা। তারপর এদিক ওদিক ঘুরে বালিভরা জায়গা দেখে পিছু ফিরল। ফিরে আসতে লাগল। ফনীমনসার গাছের আড়াল থেকে দেখলাম কাবানা কিছু গভীর ভাবে ভাবতে ভাবতে আসছে। ওকে কিছু আশান্বিত মনে হল।

ওরা যত এগিয়ে যেতে লাগল। আমরাও মনসা গাছের আড়ালে তত সরে সরে যেতে লাগলাম। ওরা আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। বালি এলাকা ছেড়ে বড় রাস্তার পাশয় গিয়ে ওরা পৌছালেই আমরা আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। বড় রাস্তায় লোকজনের ভিড়। ওরা তারমধ্যে দিয়ে চলল। আমরাও অনুসরন করতে লাগলাম।

কাবানা আর কোথাও গেল না। অথিতিশালায় ঢুকে পড়ল। প্রহরীটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। আমিও ফিরে আসব ভাবছি হঠাৎ কাবানা বেরিয়ে এল। খুব কাছে না থাকলেও শুনতে পেলাম কাবানা প্রহরীটিকে বলল—কালকে কখন রাজসভা বসবে?

—দুপুরে। কাল শনিবার । রাজা বনে দেবপূজা করতে যাবেন। প্রহরী বলল।

—কখন। কাবানা জানতে চাইল।

—সকলে। প্রহরী বলল।

কাবানা আর কিছু বলল না। অতিথিশালায় ঢুকে পড়ল।

আমরা সরাইখানায় ফিরে এলাম। সার্ভানোকে বললাম মনে হচ্ছে কাবানা রাজার সঙ্গে কিছু দরকারি কথা বলবে। আমরাও রাজ সভায় যাব। যেন নতুন এসেছি সব দেখে বেড়াচ্ছি।

সেভাবেই দুপুরে খাবার খেয়েই দুজনে রাজসভায় এলাম। তখন একটা বিচার চলছিল। আড়চোখে দেখলাম কাবানা প্রজাদের সঙ্গে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন কাবানার ডাক পড়ে।

একটা বিচার শেষ হল। মন্ত্রী তার আসন থেকে উঠে রাজাকে গিয়ে কিছু বললেন। রাজা এনিমার কাবানাকে এগিয়ে আসার ইঙ্গিত করলেন। কাবানা এগিয়ে এসে মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—মাহামান্য রাজা শুনেছি সমুদ্রের তীরের কাছে নাকি প্রাচীন রাজধানী ছিল।

—ঠিক শুনেছো। প্রাচীন রাজধানী ওখানেই ছিল। পরে বালি পড়ে পড়ে ঐ রাজধানি বালির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। রাজা বললেন।

—তাহলে তো রাজপ্রাসাদও ওখানে ছিল। কাবানা বলল।

—হ্যাঁ। তবে এখন তো সেই প্রাসাদ বালির নীচে। রাজা বললেন।

—আমি বালি তুলে ফেলে ঐ রাজবাড়ি উদ্ধার করতে চাই। কাবানা বলল।

—কী লাভ তাতে? তাছাড়া ওখানে তো প্রাসাদের কোন চিহ্নই নেই। রাজা বললেন।

—না। আছে। আমি একটা পাথরের থাম দেখেছি। ওখানে বালি খোঁড়ার অনুমতি আমাকে দিন। কাবানা বলল।

—বেশ খুঁড়ে দেখো। রাজা বলল।

—তার জন্যে তিরিশ জন লোক দিন। তাদের দিয়ে বালি খোঁড়ার কাজ করাবো। তিরিশটা বেলচাও লাগবে। কাবানা বলল।

রাজা সেনাপতির দিকে তাকালেন বললেন—ওকে বালি খোঁড়ার কাজের জন্যে লোক দিন। সেনাপতি উঠে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে আসন থেকে নেমে এল। কাবানার কাছে গিয়ে বলল—চলো—লোক বেলচা দিচ্ছি। তবে সবটাই পণ্ডশ্রম হবে।

—তবু আমি একবার খুঁড়ে দেখতে চাই। কাবানা বলল।

—বেশ। কাবানা সেনাপতির পেছনে পেছনে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেল।

আমরাও ওদের দু'জনকে অনুসর করলাম। সেনাপতি যোদ্ধাদের আবাসে গেল। আমরা সামনের মাঠে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে তিরিশ জন যোদ্ধা বেলচা হাতে মাঠে এসে দাঁড়াল। সেনাপতি তাদের কাজের কথা বুঝিয়ে দিল। কাবানা যোদ্ধাদের নিয়ে সমুদ্রেরতীরের দিকে চলল। আমরাও অনুসরণ করতে লাগলাম। যেতে যেতে আমি সার্ভানোকে বললাম—বোঝাই যাচ্ছে বালি খোঁড়ার কাজ বেশ কিছুদিন ধরে চলবে। আত্মগোপনের জন্যে একটা ভাল জায়গা দেখে নিতে হবে। আমরা যেন কোনভাবেই কাবানার নজরে না পড়ি।

যোদ্ধাদের নিয়ে কাবানা সেই পাথরের থামের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কীভাবে কোথা থেকে বালি খুঁড়তে হবে সেটা বোঝাল।

আমি আর সার্ভানো সেই ফনীমনসার আর কাঁটাঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়লাম। দৃষ্টি কাবানার দিকে। ওখানে থেকে কাবানার কিছু কথাবর্তাও শুনতে পাচ্ছিলাম।

যোদ্ধারা বালি তোলার কাজে লাগল। বেলচা দিয়ে বালি তোলা আর একপাশে সমুদ্রের দিকে বালি ফেলা। বালির স্তূপ হতে লাগল।

কাজ চলল। বুঝলাম এত বালি তুলতে সময় লাগবে। তবে যোদ্ধারা কর্মঠ এবং সংখ্যায়ও বেশি। বেশিদিন লাগার কথা নয়।

দুপুর হল। এখন খাওয়ার সময়। কাবানার নির্দেশে যোদ্ধারা নগরের দিকে ফিরে আসতে লাগল। আমরা শুয়ে থেকে বালির এদিক ওদিক সরে সরে অতগুলো লোকের নজর এড়ালাম।

ওরা নগরের কাছাকাছি চলে গেছে তখন আমি উঠে দাঁড়ালাম। দু'জনে খোঁড়ার জায়গায় গেলাম। দেখলাম পাথরের স্তম্ভের বেশ নিচে পর্যন্ত খোঁড়া হয়ে গেছে। গর্তের নিচে পাথরের বালিচাপা সিঁড়ির মত দেখা যাচ্ছে। তাহলে কাবানার অনুমান ঠিক। এখানে রাজপ্রাসাদ ছিল।

যোদ্ধারা বেলচাগুলি জড়ো করে রেখে গিয়েছিল। আমি নিজে একটা বেলচা নিলাম আর একটা সার্ভানোকে দিলাম। সার্ভানোকে নিয়ে সেই ফনীমনসার আর কাঁটার ঝোপের পেছনে এলাম বেলচা দিয়ে বালি খুঁড়তে লাগলাম। দু'জনেই হাত লাগালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বড় গর্তমত হল। নিশ্চিন্ত হলাম। এখানে আত্মগোপন করে সবদিক নজর রাখা যাবে। বেলচাগুলো যেখানে ছিল সেখানেই বেলচা দুটো রাখলাম।

সরাইখানায় ফিরে এলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে আবার চললাম সমুদ্রতীরে ঐ জায়গটার দিকে।

ওখানে পৌঁছে সেই গর্তে আত্মগোপন করে নজর রাখতে লাগলাম। কাবানা ফিরে এল। বালি খোঁড়ার কাজ চলল।

এইভাবে দিন সাতেক কেটে গেল। ওখানে যাওয়া লুকিয়ে নজর রাখা যেন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল।

দুপুরে ওরা চলে গেলে আর বিকেলে চলে গেলে আমরা কতটা খোঁড়া হয়েছে তা দেখতে যাই।

একদিন বিকেলে গিয়ে দেখলাম অনেক খোঁড়া হয়েছে। খননকাজের পাশেই বালির স্তূপ জমে উঠেছে। আমরা নিচে নামলাম। থাক করা বালির সিড়ি দিয়ে নামলাম। তারপরই পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে। একটা বিরাট ছাদহীন ঘর। ঘরের দুপাশে দুটো কাঠের সিন্দুকমত। আমি ছুটে গিয়ে একটা সিন্দুক খুললাম। ভেতরে মরচে পড়া তরোয়াল আর ঢাল। অন্যটা খুললাম—জাহাজের পাল ভাঁজ করে রাখা। তাহলে কাবানা এখনও গুপ্ত রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পায়নি। ঘরটার উত্তর দিকে একটা ভাঙা দরজা। তারপরই একটা ছোট পাথরের দেওয়াল। দেখে ভাবলাম নিশ্চয়ই ঐ দেওয়ালের পেছনে কিছু আছে। নিশ্চয়ই ওখানেই রত্নভাণ্ডার আছে। তখন উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। কিন্তু আমার ধারনার কথা সার্ভানোকে বললাম না। চুপ করে সব দেখে টেখে ওপরে চলে এলাম।

সরাইখানায় ফিরে এলাম।

আমার কেমন মনে হল কাবানা ওই দেওয়াল ভাঙার চেষ্টা করবে। দেখতে চাইবে দেওয়ালের ওপাশে কী আছে। কিন্তু সেটা ও প্রহরীকে এড়িয়ে যোদ্ধাদের এড়িয়ে একা করবে। সুতরাং দিনে নয় রাতে।

সেদিন রাতে খাবার পর আমি শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুমোলাম না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইলাম। উদ্দেশ্য—সার্ভানোকে না জানিয়ে অতিথিশালায় যাওয়া। রাতে কাবানা বেরিয়ে এসে সমুদ্রতীরে সেই জায়গায় যায় কিনা সেটা দেখা ও পিছু নেওয়া।

হঠাৎ অন্ধকারে সার্ভানোর গলা শুনলাম—

—ঘুমোচ্ছো না কেন? বুঝলাম ধরা পড়ে গেছি। বুঝলাম সার্ভানোও আমার ওপর নজর রাখছে। তখন বাধ্য হয়ে বললাম—সেই বড়ঘরের উত্তরদিকে একটা পাথরের দেওয়াল দেখেছেন তো?

—হুঁ। সার্ভানো মুখে শব্দ করল।

—ঐ দেওয়ালের ওপাশেই আছে গুপ্ত রত্নভান্ডার। আমি বললাম। বেশ চমকে সার্ভানো উঠে বসল। বলল—তাহলে চলো ঐ দেওয়াল ভাঙবো।

—আমরা না। কাবানাই আজ রাতে ঐ দেওয়াল ভাঙতে যাবে। আমি বললাম।

—কী করে বুঝলে। সার্ভানো জানতে চাইল।

—আড়াল থেকে ওর চোখে মুখে বেশ উত্তেজনা লক্ষ্য করছি। রাতেই যাবে। একা কাজ সারতে যাবে। আমি বললাম।

—তাহলে অতিথিশালার সামনে ঐ বড় গাছটার নীচে—সার্ভানো বলতে গেল। বাধা দিয়ে বললাম—না। সমুদ্রতীরের দিকেই যাবো। কাবানাকে তো ওখানেই যেতে হবে। সেইজন্যেই ঘুমোয়নি। আমি বললাম।

—ওঠো তাহলে। সার্ভানো বলল।

—হুঁ। চলুন। এখন রাস্তাঘাট নির্জন। আমরা অনুসরন করতে গেলে আমরা ধরা পড়ে যাবো। তাহলে কাবানা সাবধান হয়ে যাবে। সমস্ত পরিশ্রম মাটি হবে। আমি বললাম।

আমরা সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এলাম। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার রাত। নির্জন বড় রাস্তা দিয়ে চললাম সমুদ্রের দিকে। খননকাজের জায়গায় পৌঁছালাম। তখন বেশ রাত। সেই ফনীমনসার গাছের আড়ালে শুয়ে পড়লাম।

অপেক্ষা করছি কখন কাবানা আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর থেকে

দেখলাম কাবানা আসছে। একা। প্রহরীর নজর এড়িয়ে এসেছে। ও দ্রুত সেই খননের জায়গায় এল। ওর চলা দেখে বুঝলাম ও বেশ উত্তেজিত। তখনই চাঁদের আলোয় দেখলাম ও একহাতে একটা কুড়ুল অন্যহাতে একটা মশাল নিয়ে আসছে। যা ভেবেছিলাম তাই। ও ছোট দেওয়ালটা ভাঙতে আসছে।

ও খননের জায়গায় এল। ও একবার চারিদিক ভালো করে তাকাচ্ছে তখনই আমরা আড়াল নিলাম।

ও বালির ধাপ বেয়ে নীচে নেমে গেল। দূর থেকে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ শুনলাম। কাবানা মশাল জ্বালাচ্ছে। ও তৈরী হয়ে এসেছে।

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপরই দেওয়ালে কুড়ুলে ঘা মারার শব্দ শুনলাম। চারিদিক নির্জন নিস্তব্ধ।

হঠাৎ কাবানার চিৎকার শুনলাম—পেয়েছি। আমরা ভীষন ভাবে চমকে উঠলাম। সার্ভানো মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল। ও ছুটল। আমি তার পিছু নিলাম।

বালির সিঁড়ির ধাপ বেয়ে দু'জনেই নিচে নেমে পড়লাম। মশালটা বালির দেওয়ালে পোঁতা। মশালের আলোয় সার্ভানোর মুখ দেখেই বুঝলাম তাঁর মাথায় খুন চেপেছে। সে কাবানাকে মেরে ফেলবে। হলও তাই। সাভার্নো কাবানার ওপর শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাবানার হাত থেকে কুঁড়ুল ছিটকে গেল। কাবানা পাথরের বালিভরা মেঝেয় ছিটকে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে সার্ভানো কুড়ুলটা তুলে নিল। তারপর দুহাতে কুড়ুলটা ধরে কাবানা বুকে বসিয়ে দিল। নরহত্যার দৃশ্য তো অনেক দেখেছি। আমি বিচলিত হলাম না। সার্ভানো আমার দিকে ফিরে তাকাল। আমি এক ঝলকশুধু দেখছিলাম দেওয়ালে কয়েকটা পাথরের খন্ড নিচে পড়ে আছে। একটা ফোকরের সৃষ্টি হয়েছে। দেওয়ালটা পুরো ভেঙে পড়েনি। কিন্তু তখন আর কিছু দেখার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। বুঝলাম এবার আমার পালা। সার্ভানো আমাকে হত্যা করবে।

আমি একমুহূর্ত আর দাঁড়ালাম না। পেছনে ফিরে বালির সিঁড়ির ধাপ দিয়ে উঠে এলাম। ছুটলাম নগরের দিকে।

একটা নতুন সরাইখানায় আশ্রয় নিলাম। সেখানে বসেই রাত জেগে লিখছি। সার্ভানো নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজছে। আমার জীবন বিপন্ন। গুপ্ত ধনভান্ডারের লোভ—

বড়লোক হবার স্বপ্ন শেষ—রাজা সিয়েভোর রত্নভান্ডারের খবর আমরা দু'জন মাত্র জানি—আমি আর ক্যাপ্টেন সার্ভানো। কাজেই নৃশংস ক্যাপ্টেন সার্ভানো আমায় বেঁচে থাকতে দেবে না।



রাত শেষ হয়ে আসছে। দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনছি। সরাইয়ের মালিক দরজা খুলে দিল। আমার জীবনের আন্তিম মুহূর্ত—

বইয়ের লেখা এখানেই শেষ। তারপর বাকি সব পাতা সাদা। কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস বলল—ক্যাপ্টেন সার্ভানো ঐ গুপ্ত রত্নভান্ডার অবিষ্কার করতে পারে নি। পারলে প্রোমিও হয়ত পারত। তার আগেই ওর মৃত্যু হয়। মৃত্যু মানে ক্যাপ্টেন সার্ভানো ওকে হত্যা করে। তারপর খুঁড়ে বের করা সেই প্রাচীন প্রাসাদের সর্বত্র খোঁজাখুঁজি করেছিল নিশ্চয়ই কিন্তু ওর বুদ্ধিতে কুলায় নি। হাল ছেড়ে সে চলে গিয়েছিল নিজের জাহাজে। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—প্রোমিও আমার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে। তবে আমি প্রথমেই খুঁড়ে তোলা প্রাসাদ দেখতে যাব না। পশ্চিমের বন মন্দিরঘর গুহা সরোবর সব দেখবো। তন্ন তন্ন করে খুঁজবো। তারপর খুঁড়ে-তোলা প্রাসাদে যাবো। যা হোক কাল সকালে রাজসভায় গিয়ে রাজার সঙ্গে কথা বলতে হবে। দেখি রাজার কাছ থেকে কোন সূত্র পাই কিনা। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস প্রোমিওর লেখাটা আমার বড় ভালো লাগল। ও বড় দরদ দিয়ে লিখেছে। ওর লেখা থেকে নিশ্চয়ই কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।

—নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তবে আমি প্রথমে আমার মত করে খুঁজবো।

—তাহ'লে চলো। কালকে রাজার কাছে যাওয়া যাক। আতলেতার দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল—আতলেতা তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে। সব জায়গাতো তোমার ভাল চেনা। তোমার সাহায্য খুব কাজে লাগবে।

—বেশ। আমি তোমাদের সঙ্গী হব। আতলেতা বলল।

—পরের দিন সকালে ফ্রান্সিস ও হ্যারি রাজসভায় এল। তখন একটা বিচার চলছিল। আতলেতা এপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ও এখনো সেনাপতির পদ পায় নি। এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসদের বলল—রাজা তোমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলেছেন।

ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে বিচার পর্ব দেখতে লাগল। বিচার পর্ব শেষ। প্রজারা চলে যেতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজসভা জনশূন্য হয়ে গেল।

রাজা এনিমার ইশারায় ফ্রান্সিসদের এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস রাজার দিকে এগিয়ে গেল। মাথা একটু নুইয়ে নিয়ে বলল—মান্যবর রাজা—আমরা স্থির করেছি অতীতের রাজা সিয়োভোর গুপ্ত রত্নভান্ডার আমরা উদ্ধার করবো।

—বেশ তো। চেষ্টা করে দেখ। আচ্ছা তোমরা প্রোমিওর বইটা পড়েছো তো? রাজা জানতে চাইলেন।

—হ্যাঁ। বইটা পড়ে কিছু দরকারি তথ্য পেয়েছি। তবে নতুন করে অনুসন্ধান চালাবো। এখন অনুরোধ আপনি যদি ঐ গুপ্ত ধনভান্ডার সম্পর্কে যা জানেন বলেন তাহলে আমরা উপকৃত হব।

—আমি যা জানি তা প্রোমিওকে বলেছিলাম। নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে শুনেছি ঐ গুপ্তধন শুধু চুন্নিপান্না মুক্তো হীরের টুকরোর। সোনা রুপো নেই। ওটা শুধু মনিরত্নের ভান্ডার। রাজা বললেন।

—আচ্ছা—ঐ রত্নভান্ডার গোপনে কোথায় রাখা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—কী করে বলি। আমার পূর্বপুরুষরা খুঁজছে আমিও খুঁজেছি। কিন্তু কোন হদিশ পায়নি। রাজা বললেন—ঐ প্রোমিও কম খোঁজেনি। মরে না গেলে হয়তো ও খোঁজ পেত। ফ্রান্সিস তারপর বলল—

—এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে আপনার সাহায্য চাই।

—বলো কী রকম সাহায্যে চাও। রাজা জানতে চাইলেন।

—প্রোমিও প্রাচীন রাজপ্রাসাদের অর্ধেকটা বালি খুঁড়ে উদ্ধার করেছে। আমি বাকি অর্দ্ধেকটা উদ্ধার করতে চাই। তাঁর জন্যে বেলচা পঁচিশ তিরিশ জন যোদ্ধা চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা আতলেতাকে বল সে সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেবে। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। মাথা কাত করল ফ্রান্সিস। তারপর বলল—

—আমরা আপনার অন্তঃপুরে খুঁজবো।

—বেশ তো। তবে দু'তিন দিন পরে এসো। রানি অসুস্থ। রাজা বললেন।

—ও। ঠিক আছে। পরেই যাবো। আমাদের সব রকম সাহায্যে করছেন এর জন্যে ধন্যবাদ। আমার আর কিছু বলার নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—আশা করছি—তোমরা সফল হবে। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস হ্যারি আতলেতা সভাঘর থেকে বেরিয়ে এল। রাজবাড়ির বাইরে এসে ফ্রান্সিস বলল—

—আতলেতা। আমি এখনই পশ্চিমের বনটা খুঁজে দেখতে চাই।

—বেশ তো চলো। বনে একটা গুহা আছে। দু'টো মশাল চকমকি পাথর নিয়ে আসছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই আতলেতা ফিরে এল। তিনজন সদর রাস্তায় এল। চলল—পাহাড় ও বনের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বনের ভেতরে ঢুকল তিনজনে। কিছুদূর যেতেই সামনে পড়ল আধ-ভাঙা মন্দির—ঘর।

—আচ্ছা আতলেতা। মন্দিরঘরটা তো ভেঙে পড়ার অবস্থা। রাজা এটার সংস্কার করেন না কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—এটা রাজা সিয়োভো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজা এনিমার এটাকে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় রাখতে চায়নি। পূর্বপুরুষদের স্মৃতি হিসাবে। আতলেতা বলল।

—স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে আর কি। হ্যারি বলল।

ওরা মন্দির—ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল। পাথরের বেদীর কাছে এল। বেদীর ওপর একটা বড় লাইলাক ফুল ঘিরে নানা ফুললতা পাতার রঙীন নক্‌শা। অবশ্য রঙগুলি প্রায় বিবর্ন। তবু এখনও নকশাগুলো সুন্দর দেখাচ্ছে।

—ফ্রান্সিস —দেখেছো কী সুন্দর নক্‌শা। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। রাজা সিয়োভোর শিল্পবোধের প্রশংসা করতে হয়। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বেদীর পাথরের জোড়াগুলো খুঁটিয়ে দেখল। বেশ শক্ত জোড়। মাথা নিচু করে দেখছিল। এবার মাথা তুলে বলল—চলো। এই বেদীটা পরে ভালো করে দেখতে হবে।

তিনজনে মন্দিরঘরের বাইরে এল। ফ্রান্সিস বলল—আতলেতা এখানে একটা গুহা আছে বলেছিলে।

—হ্যাঁ। চলো। দেখাচ্ছি। আতলেতা বলল।

বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গুহাটার মুখে এসে দাঁড়াল ওরা। আতলেতা চক্‌মকি পাথর ঠুকে মশাল জ্বালল। ফ্রান্সিস আর আতলেতা মশাল নিল। গুহায় ঢুকল ওরা। ফ্রান্সিস মশাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। গুহার এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো পাথরের গা যেমন হয়। গুহার উচ্চতা কোথাও বেশি কোথাও কম। এবড়ো খেবড়ো গুহার দেওয়াল দেখে ফ্রান্সিস বুঝল কোথাও মানুষের হাত পড়েনি। দু'তিনটে খোঁদল পেল। কিন্তু সেগুলোর মুখ পাথর-চাপা নয়। খোলা।

গুহা শেষ। টানা দেয়াল উঠে গেছে। দেয়ালের নিচে একটা পাথরের ছোট চাঁই পড়ে আছে। তার নিচে একটা খোঁদলের মুখ মত। ফ্রান্সিস বসে পড়ল। বলল—হাত লাগাও। পাথরের চাঁইটা সরাতে হবে। আতলেতা আর হ্যারি চাঁইটা ধরল। ফ্রান্সিসও বাঁ হাতে মশাল নিয়ে ডানহাতে ধরল। তিনজন মিলে দু'তিনবার টানতেই পাথরের চাঁইটা সরে গেল। হুড় হুড় করে বেশ কয়েকটা চামচিকে খোঁদল থেকে বেরিয়ে উড়ে গুহামুখের দিকে উড়ে গেল। ফ্রান্সিস খোঁদলটা দেখল। ফাঁকা। কিছছু নেই।

তিনজনে ফিরে এল। মশাল নিভিয়ে দিল আতলেতা। ফিরে চলল। অতিথিশালায় এল।

ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিসরা বসল। একটু পরেই দুপুরের খাবার খেয়ে নিল। আতলেতাও ফ্রান্সিসদের সঙ্গে খেয়ে নিল। আতলেতা বলল—আজকে আর কোথাও যেতে হবে?

—না। কাল সকালে বনে যাবো। দেখি বনের কোথাও কোন হদিশ পাই কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

—গ্রোমিও যে জায়গাটা খুঁড়িয়েছিল সেখানে কবে যাবে? আতলেতা বলল।

—রাজবাড়ির অন্তঃপুরটা প্রথমে দেখবো। রানি সুস্থ হল কিনা এই খবরটা এনো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তাহলে আমি যাচ্ছি। আতলেতা চলে গেল।

পরের দিন সকালে আতলেতা এল। বিনেলো বলল—এখানে একা একা পড়ে থাকবো না। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।

—বেশ। চলো। ফ্রান্সিস বলল।

চারজন হাঁটতে হাঁটতে বনের কাছে এল। বনে ঢুকল। আজকে আকাশটা মেঘলা। তেমন রোদ ওঠে নি। বনতল বেশ অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ফ্রান্সিস বলল—সরোবরের ধারে নিয়ে চলো। ওদিকে সেদিন আত্মগোপন করেছিলাম। তখন ভালো করে ঐ জায়গাটা দেখা হয় নি।

কিছুক্ষণ পরে ওরা সরোবরের ধারে এল। আকাশ মেঘলা বলেই সরোবরের জল কেমন যেন কালচে দেখাচ্ছে। এখানে ঘন বন। গাছগাছালির মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখল। কিন্তু গাছ লতাপাতা বুনো ফুল ছাড়া কিছুই দেখা গেল না।

—ওপারে চলো। ফ্রান্সিস বলল—ওদিকটা গ্রোমিও দেখে নি। সরোবরের পাশ দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরোবরের ওপারে এল ওরা। এদিকে বন তত ঘন নয়। ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে দেখল। সেই গাছগাছালি লতাপাতা বুনো ফুল। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ফিরে এল সবাই।

ফেরার পথে আতলেতা বলল—ফ্রান্সিস রানিমার সঙ্গে কথা বলেছি। তোমরা অন্তঃপুর খোঁজাখুঁজি করতে আসবে সে কথা বলেছি। রানিমা এখন অনেকটা সুস্থ। তোমাদের অন্তঃপুরে যেতে অনুমতি দিয়েছেন।

—ঠিক আছে। কাল সকালে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

পরের দিন সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিসরা রাজসভাঘরের পাশ দিয়ে অন্তঃপুরের দরজার সামনে এল। প্রহরী দাঁড়িয়ে। ওকে দিয়ে ভেতরে খবর পাঠানো হল। প্রহরী ফিরে এসে বলল—আপনারা যান।

ফ্রান্সিসরা অন্দরমহলে ঢুকল। বেশ ছিমছাম। সাজানো গোছানো চারদিক। ফ্রান্সিসরা ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল। পাথরের দেয়ালে রঙীন ফুল লতাপাতা আঁকা। কোথাও কোন পরিত্যক্ত ঘর নেই। ফ্রান্সিস পাথরের মেঝে ভালোভাবে দেখতে লাগল। না। মেঝের নিচে কোন ঘর নেই। আলমারি সিন্দুক সবই ব্যবহৃত হয়। গোপনীয় কিছুই ওসবের মধ্যে থাকতে পারে না। ফ্রান্সিসরা গুপ্ত ধনভান্ডারের কোন হদিশ করতে পারল না। ওরা অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসছে তখনই ফ্রান্সিসরা দেখল কোনার দেয়ালে একটা রঙীন লাইল্যাক ফুল আঁকা। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। কাছে গিয়ে দেখল ফুলটার হাল্‌কা নীলে রক্তিমাভ রং। রং মোটামুটি উজ্জ্বল। ও বুঝল অতীতের রাজা সিয়াভো ফুল ভালোবাসতেন। বিশেষ করে লাইলাক ফুল। রাজবাড়ির অন্দরমহল দেখা শেষ। বাকি রইল বালি খুঁড়ে বের করা প্রাচীন রাজপ্রাসাদ।

ওরা অতিথিশালায় ফিরে এল। শুয়ে পড়তে পড়তে ফ্রান্সিস বলল—আতলেতা কালকে পুরোনো রাজপ্রাসাদ দেখতে যাবো।

—বেশ। আমি সকাল সকাল চলে আসবো। আতলেতা চলে গেল।

হ্যারি বলল—ঐ পুরোনো প্রাসাদ তো সবটা খুঁড়ে বার করা হয়নি।

—কী মনে হচ্ছে তোমার? হ্যারি প্রশ্ন করল।

—দু'টো জায়গাই ভালোভাবে দেখতে হবে। এক—ঐ মন্দিরঘরটা আর পুরোনো রাজপ্রাসাদটা। এই দুটোর মধ্যে কোনটাতে আছে গুপ্ত রত্নভান্ডার। ফ্রান্সিস বলল।

—কোন সূত্র পেলে? হ্যারি জানতে চাইল।

—না। এখনও অন্ধকারে আছি। তবে ওখানে খোঁড়ার কাজ তো চলুক। দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

—কালকেই কি খোঁড়ার কাজ শুরু করবে? হ্যারি বলল।

—না। কালকে যতটা খোঁড়া হয়েছে দেখাবো। পরশু থেকে খোঁড়ার কাজে হাত দেব। ফ্রান্সিস বলল।

পরের দিন আতলেতা সকাল সকাল এল। চারজন তৈরি হয়ে চলল সমুদ্রতীরের দিকে।

খোঁড়া জায়গাটায় পৌঁছল সবাই। বালিতে কাটা সিঁড়ি দিয়ে চারজনে নিচে

নামল। প্রধান প্রবেশপথের কাঠের দরজাটা ভেঙে পড়ে আছে। দরজার কাঠে নানা ফুল লতাপাতার রুপো গেঁথে নকশা করা। দরজা পার হয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। ঢুকেই একটা লম্বা ঘরের শুধু পাথরের মেঝে। কয়েকটা পাথরের ভাঙা থাম এদিক ওদিক পড়ে আছে। দুপাশে দুটো কাঠের সিন্দুকের মতো। প্রোমিত্ত ওর বইতে এই সিন্দুকদুটোর কথা লিখেছে।

ঐ ঘরের পরেই পাথরের দেয়াল। অর্ধেকটা ভাঙা। ফ্রান্সিস বলল—প্রোমিত্ত ওর বইতে এই দেয়ালের কথা লিখেছে। তবে ও দেয়াল ভাঙবার চেষ্টা করেছিল। পরে জলদস্যু ক্যাপ্টেন সার্ভানো নিশ্চয়ই দেয়ালের অনেকটা ভেঙেছিল। কিছুই পায় নি। চলো ভাঙা দেয়ালের মধ্যে দিয়ে ওপাশে যাবো।

চারজনে পর পর ভাঙা দেয়ালের মধ্যে দিয়ে ওপাশে গেল। ছাদ তো ভেঙে পড়েছে। সূর্যের আলোয় দেখল ঘরটার মাঝখানে একটা মসৃণ পাথরের বেদী। বড় বেদীর ওপরে একটা ছোট চৌকোনো পাথরের বেদী। তার মাথায় লাইলাক ফুলের নকশা। তবে রংগুলো অনুজ্জ্বল। বোধহয় রোদে জলে।

ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে বেদীটা দেখল। লাইলাক ফুলের নকশাটাও ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল বেশি। রাজা সিয়াভো এত জায়গায় লাইলাক ফুলের নকশা করিয়েছেন কেন? ফ্রান্সিসের মনে এই প্রশ্নটা ঘুরে ঘুরে এল।

ঐ পর্যন্তই বালি খোঁড়া হয়েছে। এরপরে আরও ঘর আছে নিশ্চয়ই। অন্দরমহলটা এখনও বালি খুঁড়ে বের করা যায় নি। ফ্রান্সিস স্থির করল অন্দরমহলটা খুঁড়ে বের করবে। অন্দরমহলের কোথাও গুপ্ত রত্নভাণ্ডার থাকার সম্ভাবনা বেশি।

দুপুরের আগেই ওরা অতিথিশালায় ফিরে এল। আতলেতোকে বলল—কাল সকালে বেলচাসহ যোদ্ধাদের নিয়ে এসো। খোঁড়ার কাজ শুরু করবো।

—ঠিক আছে। আতলেতো মাথা কাত করে বলল। তারপর বলল—

—গুপ্ত রত্নভাণ্ডার উদ্ধারের আশা আছে?

—এখনই বলতে পারছি না। সবটা খোঁড়া হোক আগে। ফ্রান্সিস বলল। একটু থেমে বলল—রাজা এলিমারের সঙ্গে একবার দেখা করা প্রয়োজন।

—এখনই চলো। রাজসভাতেই রাজাকে পাবে।

—চলো। হ্যারিদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা অপেক্ষা কর। আমি ঘুরে আসি।

দুজনে রাজসভায় এল। তখন বিচারপর্ব শেষ হয়েছে। লোকজনের ভিড়ও কম। আতলেতো এগিয়ে গিয়ে রাজাকে কিছু বলল। রাজা ফ্রান্সিসকে ইঙ্গিতে

এগিয়ে আসতে বললেন। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। বলল—মহামান্য—একটা কথা বলছিলাম।

—বলো। রাজা বললেন।

—অতীতের রাজা সিয়াভো যা কিছু নির্মাণ করেছিলেন সেসব জায়গায় লাইলাক ফুলের নকশা করিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। যতদূর শুনেছি উনি লাইলাক ফুল খুব ভালোবাসতেন। তাঁর যেসব পোশাক অন্তঃপুরে সযত্নে রাখা আছে সেসব পোশাকে লাইলাক ফুলের নকশা তোলা আছে। পোশাকের বুকের কাছে। শুনেছি তাঁর আমলের প্রাসাদের বাগানে শুধু লাইলাক ফুলের গাছই লাগিয়েছিলেন। লাইলাক ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন তিনি। রাজা বললেন।

—লাইলাক ফুল সত্যিই সুন্দর। ফ্রান্সিস বলল।

অতিথিশালায় ফিরে আসার পথে আতলেতাকে ফ্রান্সিস বলল—কাল থেকে বালি খোঁড়ার কাজে লাগবো। তুমি যোদ্ধাদের এনো। অন্দরমহলটাকে বের করতে হবে।

—ঠিক আছে। আতলেতা বলল। তারপর চলে গেল।

অতিথিশালায় ঢুকে ফ্রান্সিস দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল।

—রাজার সঙ্গে কী নিয়ে কথা বললে? হ্যারি জানতে চাইল। ফ্রান্সিস সব বলল।

পরদিন সকালেই পঁচিশ তিরিশজন যোদ্ধাকে নিয়ে আতলেতা অতিথিশালার সামনে এসে হাজির হল। আতলেতা বলল—প্রোমিত্তু যাদের নিয়ে বালি খোঁড়ার কাজ চালিয়েছিল বেশিরভাগ তাদেরই এনেছি।

—এটা একটা কাজের কাজ করেছো। অভিজ্ঞ লোকের খুব দরকার ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

সকালের খাবার খেয়েই সবাইকে নিয়ে ফ্রান্সিস চলল। খোঁড়ার জায়গায় পৌঁছে ফ্রান্সিস যোদ্ধাদের বলল—খোঁড়ার সময় লক্ষ্য রাখবে যেন খুব বেশি ভাঙচুর না হয়। বেলচার হাতল ঠুকতেই দেয়াল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। যোদ্ধারা ভেতরে ঢুকল। তারপর বালি খুঁড়তে লাগল।

দুপুর পর্যন্ত কাজ চলল। ফ্রান্সিসরা যোদ্ধাদের নিয়ে নগরে ফিরে এল। সবাই খাওয়াদাওয়া সেরে আবার খোঁড়ার জায়গায় এল। আবার বালি খোঁড়া শুরু হল। চলল বিকেল পর্যন্ত। সন্ধ্যের আগেই সবাই ফিরে এল।

প্রতিদিনই এইভাবে বালি খোঁড়া চলল।

দিন সাতেকের মধ্যে অন্দরমহলের বালি খোঁড়া হয়ে গেল। অন্দরমহলের

আয়তন বেশ বড়। কিছু ভাঙা কাঠের আসবাবপত্র পাওয়া গেল। পাথরের দেয়ালে কোথাও কোথাও দেয়াল আলমারিমত ছিল। সেসব এখন ফাঁকা। কয়েকটা ভেঙেও পড়েছে।

পুবদিকে একটা ছোট ঘর দেখা গেল। সেই ঘরে ফ্রান্সিসরা ঢুকল। বালি সরানো হয়েছে। ছোট ঘরটার মাঝখানে একটা মোটা কার্পেট পাতা। বালি সরানোতে এখন কার্পেটটা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে। কার্পেটে হালকা নীল ও রক্তিমাভ রঙের লাইলাক ফুলের নকশা। বেশ বড়।

—আবার লাইলাক ফুল। ফ্রান্সিস বিড় বিড় করে বলল। তারপরে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল নিরেট পাথরের দেয়াল। এটা বোধহয় নিরলংকার প্রার্থনা ঘর ছিল।

প্রার্থনা ঘর থেকে বেরিয়ে এল সবাই। হ্যারি বলল—

—ফ্রান্সিস গুপ্তধন রাখার মত সম্ভাব্য কোন জায়গাই তো দেখা যাচ্ছে না।

—দেয়াল ভেঙে যে ঘরটা পেলাম সেই ঘরটায় চলো। ফ্রান্সিস বলল। সেই ঘরটায় ওরা এল। বেদীটা দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—এই বেদীটা ভাঙতে হবে। আতলেতার দিকে তাকিয়ে বলল—কালকে কয়েকটা কুড়ুল আনতে হবে। যোদ্ধাদের বলে দাও।

—ঠিক আছে। তাহলে বেদীটা ভাঙবে? আতলেতা জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। লাইলাক ফুলের রহস্য ভেদ করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সেদিনের মতো ওরা অতিথিশালায় ফিরে এল।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিসরা আবার খোঁড়ার জায়গায় এলো। দু'তিনজন যোদ্ধা কুড়ুল নিয়ে এসেছিল।

সেই ঘরে এসে ফ্রান্সিস যোদ্ধাদের বলল—

—এই বেদীটা ওপর থেকে ভাঙতে হবে। কুড়ুল চালাও।

বেদীর মাথায় যোদ্ধারা কুড়ুলের ঘা মারতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চৌকোনো মাথাটা ভেঙে গেল। দেখা গেল চৌকোনো একটা গর্ত মত। ফ্রান্সিস হাত তুলে যোদ্ধাদের থামাল। চৌকোনো গর্তটার কাছে গিয়ে দেখল ভেতরে একটা কিছু আছে। হাত ঢুকিয়ে দেখল একটা কালো কাঠের বাক্সমত। ও দুহাত দিয়ে বাক্সটা তুলে আনল। হ্যারি বলে উঠল—ফ্রান্সিস। এটাই কি রত্নভাণ্ডার?

—বাক্সটা খুবই ছোটো। খুলে দেখছি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বাক্সটা খুলল। আশ্চর্য। ভেতরে একটা শুকনো লাইলাক ফুল। ফুল বিবর্ণ।

—আবার লাইলাক ফুল। ফ্রান্সিস বলল। ততক্ষণে সবাই ফুলটা দেখল। বাক্সটার গায়ে সোনারূপের কাজ করা নানা ফুলপাতার নক্‌শা। বড় সুন্দর দেখতে বাক্সটা।

—হ্যারি—বোঝা যাচ্ছে লাইলাক ফুলের নকশা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবার আর কোথায় আছে লাইলাক ফুলের নকশা সেটা দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—লাইলাক ফুলের নকশাই তাহলে গুপ্ত রত্নভাণ্ডারের নিশানা। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। চলো দেখি আর কোথায় আছে লাইলাক ফুলের নকশা। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস আবার ভাঙা অন্দরমহল ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। ন্নাঃ। অন্দরমহলে কোথাও আর লাইলাক ফুলের নকশা নেই।

ফ্রান্সিস প্রার্থনাকক্ষে ঢুকল। মেঝেয় পাতা ভারি কার্পেটে রয়েছে লাইলাক ফুলের নকশা। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ কার্পেটটার দিকে তাকিয়ে বলল—হাত লাগাও। কার্পেটটা তুলতে হবে। আটদশজন যোদ্ধার সঙ্গে ফ্রান্সিসরা কার্পেটের চারপাশ ধরল। টেনে তুলে ফেলা হল মোটা ভারি কার্পেটটা। আবার লাইলাক ফুল। এবার ফুলটার হালকা নীল রক্তিমাভ পাপড়িগুলোর রং উজ্জ্বল। কতদিন নকশাটা কার্পেটের তলায় চাপা পড়েছিল কে জানে। ফুলের নকশাটা ঘরের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে। বেশ বড়। সবাই বেশ অবাক হয়ে ফুলের নক্‌শাটা দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—

—হ্যারি। আবার লাইলাক ফুল। এটা সবচেয়ে বড় নকশা। সবচেয়ে সুন্দর।

ফ্রান্সিস উবু হয়ে মেঝেয় বসল। নকশায় হাত বুলোলো কয়েকবার। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—পাথর কেটে ফুলের ছাঁচ করা হয়েছে। পরে রঙ দেওয়া হয়েছে। এখন এই পাথরের ছাঁচটা তুলে ফেলতে হবে।

—তা কেন। ভেঙে ফেললেও তো হয়। বিনেলো বলল।

—না। এত সুন্দর প্যাথরের ওপর ফুলের নকশা। আভাঙা অবস্থায় তুলে নেব। তাহলেই নীচে কী আছে দেখা যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু আভাঙা অবস্থায় তোলা যাবে? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। হাত দিয়ে দেখেছি। কুড়ুলের মাথা দিয়ে আস্তে চাড় দিয়ে দিয়ে তোলা যাবে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বলল—দুপুর হয়ে এসেছে। চলো খেতে সবাই।

কাজ বন্ধ করে সবাই নগরের দিকে চললো। আসতে আসতে ফ্রান্সিস যোদ্ধাদের দলনেতাকে ডেকে বলল—ভাই তোমাদের আর প্রয়োজন নেই। বালি খোঁড়া হয়ে গেছে। এখন অনুসন্ধানের পালা। ওটা আমরা কয়েকজনে পারবো।

—ঠিক আছে। বাকি কাজ আপনারাই করুন। দলনেতা বলল।

দুপুরে খাবার খেয়ে ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। বিনেলো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—যোদ্ধাদের চলে যেতে বললে বাকি কাজ আমরা পারবো?

—পারতে হবে। ঐ যোদ্ধাদের ধারে কাছেও রাখবো না বলে ওদের আসতে মানা করেছি। যদি ওদের সামনে সেই গুপ্ত রত্নভাণ্ডার উদ্ধার হয় ওরা ঐ ভাণ্ডার লুঠ করে নেবে। আমরা বাধা দিতে গেলে আমাদের ঐ কুডুল দিয়েই মেরে ফেলবে। ধনসম্পদের লোভ বড় সাংঘাতিক। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে কালকের অনুসন্ধানে শুধু আমরাই যাবো? আতলেতা বলল।

—কালকে নয়। আজ রাতে। ফ্রান্সিস বলল।

—রাতে খুঁজবে? আতলেতা জানতে চাইল।

—হ্যাঁ—যতটা সম্ভব গোপনে। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস —আমার এভাবে একা একা এই অতিথিশালায় পড়ে থাকতে ভালো লাগছে না। তোমাদের সঙ্গে আমিও যাবো।

—তোমার শরীর—ফ্রান্সিস বলতে গেল। শাঙ্কো বলে উঠল—

—আমি এখন অনেক সুস্থ।

—বেশ। যেও। তবে আমাদের কাজে হাত লাগাবে না। শুধু বসে থাকবে।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো মাথা কাত করে বলল। হ্যারি বলল—

—ফ্রান্সিস—কোন সূত্র পেলে?

—একমাত্র সূত্র ঐ লাইলাক ফুলের নকশা। ঐরকম নকশা কয়েকটা জায়গায় রয়েছে। তার একটা ভেঙে ছোট বাক্সে শুকনো লাইলাক ফুল পেয়েছি। এবার প্রার্থনা ঘরের মেঝের নকশা খুলে কী পাই দেখি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বিনেলোর দিকে তাকিয়ে বলল—বিনেলো কুডুলগুলো যোদ্ধাদের কাছ থেকে চেয়ে রেখেছো তো?

—সব ঘরের কোনায় রেখেছি। বিনেলো বলল।

—ভালো করেছ। সিনাত্রার দিকে তাকিয়ে বলল—সিনাত্রা—তিনটে বেশ

ভালো করে তেল ভেজানো মশাল জোগার করে আনো। কার কাছে মশাল চাইবে?

—সৈন্যাবাস থেকে আনবো। সিনাত্রা বলল।

—কী বলবে? ফ্রান্সিস বলল।

—রাতে পুরোনো প্রাসাদে গুপ্ত ধনভান্ডার খুঁজতে যাবো। সিনাত্রা বলল।

—নির্বোধ। ওসব বললে সব জানাজানি হয়ে যাবে। বলবে অতিথিশালার মশাল শেষ রাতে নিভে যায়। কাজেই বেশি তেল মাখানো মশাল চাই। বুঝেছো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। সিনাত্রা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—তবে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

সিনাত্রা চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা রাতের খাবার বেশ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—একটু বিশ্বাস করে নাও। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বে না কেউ।

রাত বাড়ল। ফ্রান্সিস শুয়ে ছিল। উঠে দাঁড়াল। বলল—কুড়ুল মশাল নাও। চলো সবাই।

সবাই হাতে কুড়ুল মশাল নিয়ে অতিথিশালার বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশে ভাঙা চাঁদ। জ্যোৎস্না অনুজ্জ্বল। ওরা নিঃশব্দে চলল বালি খুঁড়ে তোলা পুরোনো রাজপ্রসাদের দিকে।

সেখানে এসে বালির ধাপে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল সবাই।

দেওয়ালে জ্বলন্ত মশাল রাখা হল। প্রার্থনা ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস একটা কুড়ুল নিল। কুড়ুলের মুখটা দিয়ে নকশার ধার গুলোতে চাড় দিতে দিতে বলল—এইভাবে চাড় দিয়ে দিয়ে নকশা অভগ্ন অবস্থায় তুলতে হবে। নকশা এখানে ওখানে একটু নড়ল। চলল সাবধানে চাড় দেওয়া। যাতে কোনভাবেই ভেঙে না যায় সেভাবেই সাবধানে কাজ চলছিল। কাজেই সময় লাগছিল।

বাকি সারারাত ধরে কাজ চলল। মশাল নিভু নিভু হয়ে এল। ভোরের দিকে সবটা নকশা আলগা হ'ল। শাঙ্কো ছাড়া সবাই মিলে—হাত লাগাল—আস্তে আস্তে লাইলাক ফুলের নকশাটা তুলে ধরল সবাই। পাথরের দেওয়ালে ওটা ঠেসান দিয়ে রাখা হল। কী সুন্দর দেখাচ্ছিল নকশাটা। ফ্রান্সিস এই ভেবে তৃপ্তি পলে যে নকশাটা নষ্ট হয়নি।

এবার নকশার বাকি ফোকরওয়ালা পাথরের পাটটা তুলে ফেলল। ভেতরে তিনকোনা গর্তমত। ফ্রান্সিস নিভু নিভু একটা মশাল ভেতরে ফেলে দিল। নিভু নিভু

আলোয় দেখা গেল একটা তিনকোনা কালেকাঠের বাক্স। বেশ বড়। বাক্সটার গায়ে সোনার লতাপতার কাজ। বাক্সের সঙ্গে ওপরে কাঠের হাতল।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ দেখল। ততক্ষনে ভোরের আবছা আলো পড়েছে। এবার ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—এটাই রাজা সিয়োভোর রত্নভান্ডার।

—তুমি নিশ্চিত? হ্যারি বলল।

—আমি নিশ্চিত। দেখ। কথাটা বলে ফ্রান্সিস কাঠের হাতলটা ধরে বাক্সটা আস্তে তুলে আনল। চাবির জায়গায় একটা বড় ফুটো। ফ্রান্সিস হাতল ধরে টানল। বাক্স খুলল না। বিনেলো সিনাত্রাকে ডাকল। তিনজনে মিলে হাতলটা টানাটানি করল। কিন্তু বাক্স খুলল না। একটু হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল—উপায় নেই। বাক্সটা ভাঙতে হবে। ও বাক্সটার ফুটোর কাছে ডালা দু'টোর ফাঁকে কুড়ুলের মাথা দিয়ে চাড় দিতে লাগল। সামান্য ফাঁক হল। ফ্রান্সিস বলল—বিনেলো ঐ মুখটায় চাড় দাও। বিনোলাও কুড়লের মুখ চেপে চাড় দিতে লাগল। আরো একটু ফাঁক হল।

—কুড়ুল চালিয়ে ভেঙে ফেললেই তো হয়। শাঙ্কো বলে উঠল।

—না। এত সুন্দর বাক্সটা অধৈর্য হয়ে এটা নষ্ট করব? ফ্রান্সিস বলল। এ ভাবেই খুলবো।

আবার চাড় দেওয়া শুরু হল। দড়াম করে বাক্সের ডালাটা খুলে গেল। উজ্জ্বল রোদে ঝিকিয়ে উঠল বাক্সের অদ্ধের্ক বোঝাই চুন্নি পান্না হীরে জহরত। ফ্রান্সিসরা খুবএকটা অবাক হল না। এরকম গুপ্তধন ওরা আগেও উদ্ধার করেছে। আতলেতার মুখ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। একসঙ্গে চুনিপান্না হীরে জহরৎ দেখবে —কোনদিন কল্পনাও করেনি।

বাক্স বন্ধ করে ফ্রান্সিস মেঝেয় বসে পড়ল। একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এবার বাকি কাজটা। বাক্সটা ভেঙে গেছে। হাতল ধরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কাঁধে করে নিয়ে চলো। রাজা এনিস্মারকে দিতে হবে। যে বাক্সটায় শুকনো লাইলাক ফুল পাওয়া গিয়েছিল হ্যারি সেই বাক্সটা নিল।

বিনেলো আর সিনাত্রা বাক্সটা দুপাশে ধরে কাঁধে তুলল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। সবাই নগরের দিকে চলল।

তখন রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়েছে। সবাই দেখল একটা সুন্দর কারুকাজকরা কালো কাঠের তিনকোণা বাক্স বিদেশীরা কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সকলেরই ঔৎসুক্য কী আছে বাক্সটায়?

সবাই রাজবাড়ির প্রধান প্রবেশপথের সামনে এসে দাঁড়ালো প্রহরীরা

ফ্রান্সিসদের দেখল। বাধা দিতে গেল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল—আমাদের বাধা দিও না। রাজার সঙ্গে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। দেখা করতে হবে।

প্রহরীরা এই ক'দিনে ফ্রান্সিসদের চিনেছে। ওরা আর বাধা দিল না।

ফ্রান্সিসরা অন্দরমহলের দরজার কাছে এল।

ফ্রান্সিস প্রহরীদের বলল—রাজামশাই ঘুম থেকে উঠেছেন?

—হ্যাঁ। এখন সকালের খাবার খাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরেই রাজসভায় বসবেন।

—না। রাজসভায় নয়। আমাদের জন্য মন্ত্রণাকক্ষটা খুলে দাও আর রাজামশাইকে বলো যে বিদেশীরা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। মন্ত্রণাকক্ষ ভোরেই খুলে দেওয়া হয়েছে। আপনারা গিয়ে বসুন। প্রহরীটি বলল।

ফ্রান্সিসরা বাক্স নিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে এসে বসল। ওরা অপেক্ষা করতে লাগল কখন রাজা আসেন তার জন্যে।

কিছুক্ষণ পরেই রাজা এনিমার ঘরে ঢুকলেন। ফ্রান্সিসরা একটু উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল। রাজা বসতে বসতে বললেন—বসো বসো। এই সকালে এসেছো। কী ব্যাপার? ফ্রান্সিস বলল—আপনার পূর্বপুরুষ রাজা সিয়োভোর রত্নভান্ডার আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করেছি।

—কোথায় সেই রত্ন ভাণ্ডার? রাজা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন।

—আপনার সম্মুখে। কথাটা বলে ফ্রান্সিস হাতল ধরে বাক্সটার ডালা খুলল। রাজা অবাক চোখে সেই চুনি-পান্না-হীরে জহরতের ভান্ডারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সোল্লাসে বলে উঠলেন—তোমরা তো অসাধ্য সাধন করেছো। তারপর চুনি পান্না জহরৎ মুঠো করে তুলে তুলে দেখলেন। বললেন—তোমরা উদ্ধার করেছো। তোমরাও কিছু নাও।

—না। আমরা কিছু নিই না। আমাদের মাফ করবেন। ফ্রান্সিস বলল।

এবার হ্যারি কালো ছোট বাক্সটা দেখিয়ে বলল—শুধু এই বাক্সটা আমরা নেব।

—বেশ তো। রাজা বললেন।

—বলো কি? যাক গে—এই লাগাস রাজ্য তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ রইল। রাজা বললেন।

—আমার কয়েকটা কথা ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। বলো। রাজা বললেন।

—আমরা প্রাচীন প্রাসাদের প্রার্থনাঘরের মেঝেয় করা লাইলাক ফুলের নকশার নিচে থেকে এই রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করেছি। খুব যত্নের সঙ্গে লাইলাক ফুলের নকশাটা ঐ ঘরেই রেখে দিয়েছি। বড় সুন্দর নকশাটা। অনুরোধ ওটা আপনার প্রাসাদে এনে রাখুন।

—খুব ভালো বলেছো। নিশ্চয়ই এখানে রাখবো। রাজা বললেন।

—আর একটা কথা। এই বাক্সে রত্নগুলো মাত্র অর্ধেক রাখা হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আরো রত্নভান্ডার আছে? রাজা জানতে চাইলেন।

—হ্যাঁ। মহামান্য রাজা। আপনার রাজত্বে যেখানে যেখানে লাইলাক ফুলের নকশা রয়েছে যেমন অন্দরমহলের একটা দেয়ালে আর মন্দির—ঘরের বেদীতে সেসব ভাঙলে আরও মণিমাণিক্য হীরে জহরত পাওয়া যাবে।

—ওসব ভেঙে নষ্ট করবো? রাজা বললেন।

—সেটা আপনার বিবেচনা। আমি শুধু সম্ভাবনার কথা বললাম। ফ্রান্সিস বলল।

—ভেবে দেখি। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। আমাদের কাজ শেষ। আমরা জাহাজঘাটে আমাদের জাহাজে ফিরে যাচ্ছি। আপনার সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ। ফ্রান্সিস বলল। রাজা উঠে দাঁড়ালেন। ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল।

রাজবাড়ির বাইরে এসে হ্যারি বলল—তাহলে এখন জাহাজে ফিরে যাই।

—না। দুপুরের খাওয়াটা সেরে যাবো। কাজও তো হয়ে গেছে। এখন আর এখানে থাকবো কেন? ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরে খাওয়া সেরে সবাই জাহাজঘাটের দিকে চলল। ওরা জাহাজে উঠতেই বন্ধুরা ছুটে এল। মারিয়া হাসিমুখে এগিয়ে এল। বলল—রাজা সিয়োভোর রত্নভান্ডার নিশ্চয়ই উদ্ধার করতে পেরেছো? ফ্রান্সিসও হাসলো। বলল—হ্যাঁ। একটা তিনকোণা বাক্স প্রায় ভর্তি চুনি পান্না হীরে জহরৎ। রাজা এলিমার খুব খুশি। কিন্তু—

আমাদের হাত শূন্য।

—তোমরা নিরাপদে ফিরে এসেছো এটাই আমার কাছে অনেক। তবে শাঙ্কো নাকি অসুস্থ। ওকে আমি আর ভেন মিলে কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ করে তুলবো। ওর জন্যে ভেবো না।

হ্যারি এতক্ষণ সেই কালো কাঠের কারুকাজকরা ছোট বাক্সটা দুহাতে পেছনে ধরে ছিল। মারিয়া দেখতে পায়নি। এবার বাক্সটা এগিয়ে ধরে বলল—রাজকুমারী আমাদের হাত একেবারে শূন্য নয়। এই নিন বাক্সটা। বাক্সটা হাতে নিয়ে মারিয়া শিশুর মত লাফিয়ে উঠল—ঈস্ কী সুন্দর বাক্সটা। বিকেলের রোদ পড়ে বাক্সটার গায়ের সোনারূপোর কাজকরা ফুললতাপাতাগুলো চক্‌চক্ করছিল তখন।

বন্ধুরা ততক্ষণে বিনেলোর মুখে সব শুনেছে। কারুকার্যময় ছোট বাক্সটাও দেখল। আনন্দে সবাই ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—নোঙর তোল। পাল তোল। দাঁড় বাও। ফ্রেজারকে বলো জাহাজ চালাতে উত্তর-পূর্ব মুখো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ চলতে শুরু করল।

———

মৃত্যু-সায়রে ফ্রান্সিস



মৃত্যু-সায়রে ফ্রান্সিস

অনিল ভৌমিক

সেদিন গভীর রাত। একেবারে অন্ধকার রাত নয়। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোয় চারদিক মোটামুটি দেখা যাচ্ছে।

প্রায় দিন পনেরো হতে চলল—ডাঙার দেখা নেই। ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে। ফ্রান্সিস খুবই চিন্তায় পড়ল। তবে নিজের দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেতে দিল না। বন্ধুরা তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখলে তাদের মনোবল ভেঙে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বিপদ বাড়বে বই কমবে না।

রাত হলে ফ্রান্সিস জাহাজের ডেক-এ উঠে আসে। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কখনও কখনও উঁচু গলায় পেড্রোকে ডেকে বলে—পেড্রো ঘুমিয়ে পড়ো না। ডাঙার দেখা পেতেই হবে। নজরদার পেড্রো মাস্তুলের ওপর নিজের জায়গায় রাত জেগে জেগে চারদিকে নজর রাখে। ও চেঁচিয়ে বলে—কিছ্ছু ভেবো না। আমি জেগে আছি। পেড্রোকে একই সঙ্গে দুটো কাজ করতে হয়। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ডাঙার খোঁজ করতে হয় আবার হঠাৎ জলদস্যুদের দ্বারা তাদের জাহাজ আক্রান্ত হতে না হয় সেদিকেও নজর রাখতে হয় দু'বার ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে জলদস্যুদের পাল্লায় পড়তে হয়েছিল। কাজেই কড়া নজরদারি চালাতে হয় ওকে।

রাতে ফ্রান্সিস যখন একা একা ডেক-এ পায়চারি করে বেড়ায় হ্যারি উঠে আসে। একমাত্র হ্যারিকেই ফ্রান্সিস নিজের দুশ্চিন্তার কথা বলে। হ্যারি অবশ্য সান্ত্বনা দেয়। বলে—

—কেন দুশ্চিন্তা করছো? এর আগেও আমরা কিছুদিনের মধ্যেই ডাঙা খুঁজে পেয়েছি। এবারও পাবো। তুমি হতাশ হয়ে পড়লে কার ওপর ভরসা করবো আমরা? তোমার মনের জোর আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। মনটা শান্ত রাখো।

—হ্যারি—আমার চিন্তা তো শুধু আমার নিরাপত্তা নিয়ে নয়। এত বন্ধু, মারিয়া সবার কথাই তো আমাকে ভাবতে হয়। বন্ধুরা তো আমার, ওপরে বিশ্বাস আমার সঙ্গী হয়েছে। যদি সত্যি বিপদ-জনক কিছু ঘটে তার দায় তো আমি এড়াতে পারি না। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—বিপদ তো যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে। তোমার নেতৃত্বে আমারা তো অনেক বিপদের মোকাবিলা করেছি। এখনও করবো। তা ছাড়া তোমার ভুলে তো আমরা দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়িনি। বলা যায় এটা নিয়তি। এতে কারো হাত নেই। ডাঙার দেখা পাবোই। দেশে ফেরার পথ খুঁজে পাবই। অনুরোধ সকলের কথা ভেবে নিজের মন দুর্বল করে ফেলো না। হ্যারিও মৃদুস্বরে বলল। এসব

কথা যাতে ভাইকিং বন্ধুদের কানে না যায় তাই দু'জনেই মৃদুস্বরে কথা বলছিল। এমন কি ফ্রান্সিস এই নিয়ে মারিয়াকেও কিছু বলেনি। মারিয়া থাকুক ওর মনখুশি নিয়ে। ওকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে কী লাভ?

রাত বাড়ছে। দু'জনে ঘুমুতে চলে গেল।

ফ্রান্সিস নিজের কেবিন-ঘরে ঢুকল। বিছানায় শুয়ে পড়ল। ভেবেছিল মারিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। তখনই শুনল মারিয়া বলছে—

—এত রাত পর্যন্ত ডেক-এ একা একা পায়চারি কর। কী ভাব এত?

—ভাবনার কি শেষ আছে? তাছাড়া রাতে ডেক-এ পায়চারি করা আমার অভ্যেস। তুমি ঘুমোও। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—তুমি ডেক থেকে না নামা পর্যন্ত আমি ঘুমাতে পারিনা মারিয়া বলল।

—এটা তোমার বাড়াবাড়ি। তা'ছাড়া প্রত্যেক দিন তো আমি ডেক-এ পায়চারি করি না। তুমি মিছিমিছি রাত জাগবে কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার কোনরকম দুশ্চিন্তা হলে তুমি এটা করো। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ—দুশ্চিন্তা তো হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—জানি তোমার দুশ্চিন্তা কি? মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস সাবধান হল। বলল—আরে বাবা দুশ্চিন্তা তো এক সময় কেটে যায়। কতবার কয়েদঘর থেকে পালালাম, ক্রীতদাসের জীবন থেকে পালালাম। দুশ্চিন্তা একদিন কেটে যায়।

—তুমি অনেকদিন হল ডাঙ্গার দেখা পাচ্ছ না। এটাই তোমার দুশ্চিন্তা মারিয়া বলল।

—আরে না-না। মাঝে মাঝে কতদিন ডাঙা খুঁজে পাই নি। পরে তো পেয়েছি। সেসব নয়—এমনি এটা ওটা ভাব নাও। তুমি ঘুমোও। তুমি খুশি থাকো এটাই আমি চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাকে চিন্তাগ্রস্ত দেখলে আমি খুশি থাকি কী করে? মারিয়া বলল।

—ওসব পাগলামি ছাড়ো। ফ্রান্সিস হাল্‌কাসুরে বলল। মারিয়া আর কোন কথা বলল না। পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আরও দিন সাতেক কাটল। কিন্তু ডাঙার দেখা নেই। এদিকে খাবার আর পানীয়, জল ফুরিয়ে এসেছে। শুরু হল কৃচ্ছ্রসাধন। অর্থাৎ যথাসম্ভব জল কম খাওয়া খাবার কম খাওয়া। ভাইকিং বন্ধুদের চিন্তা শুরু হল। এভাবে কতদিন চলবে? ডাঙার দেখা না পেলে সবাইকে উপবাসী থাকতে হবে। উপোস করে তবু কিছুদিন থাকা যায় কিন্তু জল না খেয়ে থাকা তো মারাত্মক।

দিন কাটে। রাত কাটে। খাবার প্রায় শেষ। সবাই একটা করে রুটি আর গলা ভেজাবার মত জল খেতে লাগল। এভাবেই চলল। তারপর দুদিন না জল না খাবার। ফ্রান্সিস মারিয়াকে বুঝতে না দিয়ে নিজের রুটি জল মারিয়াকে দিতে লাগল। মারিয়া জিজ্ঞেস করে—তুমি কখন খেলে?

—আমি আগেই খেয়ে নিয়েছি। ফ্রান্সিস হেসে বলে। জাহাজে চরম খাদ্য জল ঘাটতির কথা মারিয়াকে বুঝতে দেয় না।

কিন্তু আর কতদিন? ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধে। ফ্রান্সিস রাতে ঘুমুতে পারে না। মারিয়া ঘুমিয়ে পড়লে ও ডেক-এ উঠে আসে। প্রায় সারারাত ডেক-এ পায়চারি করে আর ডাঙার খোঁজে চারিদিকে তাকায়। মাঝে মাঝে মাস্তুলের উপর উঠে যায়। পেড্রোর সঙ্গে বসে চারিদিকে তাকায়। ডাঙার দেখা পেতেই হবে। নইলে খাদ্যাভাব জলাভাবে সবাইকে মরতে হবে। তৃষ্ণা সহ্য করতে না পেরে কয়েকজন বন্ধু সমুদ্রের লবণাক্ত জলই খেয়ে ফেলেছিল। বমি করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে তারা। এই ঘটনার পর বন্ধুদের মধ্যে অসন্তোষ আরও বাড়ল। ফ্রান্সিস তো নিজের চিন্তায় মগ্ন। বন্ধুদের অসন্তোষের কথা ওর জানার কথা নয়। তবে বন্ধুদের ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল।

সেদিন রাতে ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করছে আর চারিদিকে তাকাচ্ছে তখনই হ্যারি এল। দু'এককথার পর বলল—ফ্রান্সিস কিছু মনে করো না। জাহাজে খাদ্য জল শেষ।

—জানি। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—বন্ধুদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। ওদের বক্তব্য আমরা পথ হারিয়েছি। কোথায় চলেছি আমরা জানি না। এরজন্য তোমাকেই দোষী সাব্যস্ত করতে চলেছে। হ্যারি আস্তে আস্তে বলল।

—তাহলে ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। হ্যারি মাথা ওঠা নামা করল।

—ঠিক আছে। ডাকো সবাইকে। ফ্রান্সিস বলল।

—অনেকেই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। হ্যারি বলল।

—কই? আমি তো ঘুমোইনি। সবাইকে ডেকে-এ আসতে হবে। ডেকে আনো সবাইকে। একে খাদ্যভাব জলাভাব এর মধ্যে ওদের অসন্তোষ বাড়তে দেওয়া যায় না। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল।

হ্যারি চলে গেল। কিছু পরে বন্ধুরা একে একে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। কয়েকজন ডেক-এ ঘুমিয়ে ছিল। তারাও উঠে দাঁড়াল।

আকাশে চাঁদের আলো অনেকটা উজ্জ্বল। জোর হাওয়া ছুটছে। জড়ো হাওয়া বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—ভাইসব। এই অভিযানে বেরোবার সময় আমি বলেছিলাম অনেক সমস্যা আমাদের সামনে আসতে পারে। জল খাদ্য ফুরিয়ে যেতে পারে। আমরা দিক্ ভ্রষ্ট হতে পারি। ভীষন বিপদে পড়তে পারি—কিন্তু অধৈর্য হলে চলবে, না ভয় পাওয়া চলবে না। অভিযান চালিয়ে যেতে হবে। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল—শুনলাম তোমাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। আমার ওপর তোমরা বিশ্বাস হারাতে বসেছো। যদি তাই হয় আমি সরে দাঁড়াচ্ছি। তোমাদের মধ্যেই কেউ জাহাজের দায়িত্ব নাও। যেভাবে জাহাজ চালাতে চাও চালাও। যেভাবে পারো সমস্যার মোকাবিলা কর। ফ্রান্সিস থামল। গত কয়েকদিন কিছুই খায়নি ও। শুধু গলা ভেজানোর মত জল খেয়ে আছে। বুঝতে পারছে শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস হাঁপাতে লাগল।

বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। শাঙ্কো ভিড়ের মধ্যে থেকে গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস—আমরা তোমার ওপর বিশ্বাস হারাই নি। শুধু দুশ্চিন্তায় পড়ছি এই খাদ্যাভাব জলাভাবে আর কতদিন আমাদের চলবে? আসলে আমাদের সহ্য শক্তির পরীক্ষা চলছে। আমরা নিশ্চয়ই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ন হবো। আমাদের ধৈর্য হারালে চলবে না। শাঙ্কো থামল। কয়েকজন বন্ধু শাঙ্কোকে সমর্থন করল। এবার হ্যারি উচ্চস্বরে বলল—ভাইসব—ফ্রান্সিস শাঙ্কোর বক্তব্য শুনলে। এবার তোমরাই বিচার কর আমাদের করণীয় কি? ফ্রান্সিসের ওপর বিশ্বাস হারালে আমাদের বিপদ বাড়বে বই কমবে না। একমাত্র ফ্রান্সিসই আমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। একটু থেমে হ্যারি বলল—খাদ্যাভাব জলাভাবের সমস্যা আমাদের কাছে খুব নতুন কিছু নয়। সেই সমস্যার সমাধানও হয়েছে। অনেকদিন জাহাজ চলছে। অচিরেই ডাঙার দেখা পাবো। সব সমস্যার সমাধান হবে। শুধু অনুরোধ-অধৈর্য হয়ো না।

বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। গুঞ্জন চলল। এবার কয়েকজন বন্ধু বলে উঠল—আমরা ধৈর্য হারাবো না। ফ্রান্সিস—তোমাকে আমরা অবিশ্বাস করবো না।

—ঠিক এই উত্তরই আমি তোমাদের কাছ থেকে আশা করেছিলাম। ফ্রান্সিস বলল। বন্ধুদের জটলা ভেঙে গেল। সবাই ঘুমুতে চলে গেল। সবাই জানে খালি পেটে জলের তৃষ্ণা নিয়ে ভাল ঘুম হয় না। তবু শুয়ে থাকা। শরীরের দুর্বলতা কাটাতে এছাড়া উপায় নেই।

সবাই চলে গেলে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস আমি জানি তুমি না খেয়ে আছো।

—উপায় কি! মারিয়া উপবাস সহ্য করতে পারবে না। ওকে তো পেট পুরে খাওয়াতে হবে।

—ঠিক আছে। দুর্বল শরীরে তুমি রাত জেগো না। ঘুমুতে যাও। হ্যারি বলল।

—তুমিও তো দূর্বল হয়ে পড়েছো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার শরীর তো জানো বরাবরই দূর্বল। এখন আরো দূর্বল হয়ে পড়েছি এই যা। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। তুমি যাও। আমি পেড্রোর সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি চলে গেল। ফ্রান্সিস উচ্চস্বরে ডাকল। পেড্রো?

—বলো। মাস্তুলের ওপর থেকে পেড্রোর গলা শোনা গেল।

—সাবধান। ঘুমিয়ে পড়বে না। আর একটা কথা—খাওয়া হয়েছে?

—না। না খেয়ে ভালো আছি। ঘুম আসবে না। পেড্রো বলল।

—নেমে এসে একটু জল খেয়ে নাও। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি ঠিক আছি। আমার কথা ভেবো না। পেড্রো বলল।

ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। সিঁড়িঘরের দিকে চলল।

শেষ রাতের দিকে হঠাৎ মাস্তুলের উপর থেকে পেড্রোর চিৎকার শোনা

গেল—ভাইসব—ডাঙা দেখা যাচ্ছে—ডাঙা। ফ্রান্সিসের তন্দ্রামত এসেছিল। তন্দ্রা ভেঙে গেল। ও প্রায় ছুটে ডেক-এ উঠে এল। ডেক-এ যারা ঘুমোচ্ছিল, যারা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল সবাই উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়াল। বন্ধুরাও কাছে এসে দাঁড়াল। পেড্রো মাস্তুলের ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল—ডানদিকে—পাহাড়—বাড়িঘরও দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস চোখ কুঁচকে ডানদিকে তাকাল। মোটামুটি স্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখল সমুদ্রতীরে একটা ছোট বন্দর মত। খুব বড় বন্দর নয়। বন্দরে কোন জাহাজও নোঙর করা নেই। বাড়িঘরও কিছু দেখা গেল। একপাশে একটা পাহাড়।

ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। জাহাজ সমুদ্রতীরে ভেড়ানো হবে কিনা। জানা নেই এটা কোন দ্বীপ না দেশের অংশ। কিন্তু জাহাজে অনাহার চলছে। জলও প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। খাদ্য চাই, জল চাই। কাজেই নামতে হবে এখানে। কারা থাকে এখানে, নামলে কোন বিপদে পড়তে হবে কিনা এসব ভাবার সময় নেই।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়াল। বলল—কী করবে এখন?

—নামতে হবে। আর এক্ষুণি। আটা-ময়দা-চিনি জল সব জোগাড় করতে হবে। খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে। বিপদে পড়ার আগেই। ফ্রান্সিস বলল। তারপর শাঙ্কোকে ডাকল। শাঙ্কো কাছে এলে বলল—শাঙ্কো—আমি শরীরের দিক থেকে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছি। তুমি সিনাত্রা বিস্কো আর একজন বন্ধুকে নিয়ে যাও। বস্তা পীপে নিয়ে যাও। আটা-ময়দা জল যা পাও নিয়ে এসো। দেরি নয়। এখুনি। ভোর হয়েছে। তৈরি হয়ে এসো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কো সিনাত্রা বিস্কো আর এক বন্ধু তৈরি হয়ে এল। হালের দিকে দড়ির সিঁড়ি দিয়ে বস্তা পীপে নিয়ে একটা নৌকোয় নামাল। অন্যটায় দাঁড় হাতে বসল। সিনাত্রারাও বসল। দুটো নৌকো তীরের দিকে চলল।

নৌকো দু'টো তীরে ভিড়ল। তীরের বালির ওপর নৌকো ঠেলে তুলে চলল বাড়িঘরগুলোর দিকে। ওখানকার বাসিন্দাদের দেখল। বেঁটে মত। গায়ের রঙ কিছুটা তামাটে। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। নাক একটু চ্যাপটা মত। ওরা বেশ অবাক হয়েই শাঙ্কোদের দেখছিল। এই বিদেশীরা কোত্থেকে এল?

সামনে যে লোকটাকে পেল শাঙ্কো তাকে বলল—আটা ময়দার দোকান কোথায়? বার কয়েক বলাতে হাত দিয়ে খাওয়ার ইঙ্গিত করাতে লোকটা বুঝল। হাত বাড়িয়ে একটা ঘর দেখাল। শাঙ্কোরা ঘরটার কাছে এল। এবড়োখেবড়ো কাঠের দরজা বন্ধ। শাঙ্কো দরজায় ধাক্কা দিল। ততক্ষণে রোদ উঠেছে। চারদিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বাজার এলাকা। লোকজন বাজার হাট করতে আসছে। দড়াম করে দরজা খুলে গেল। একজন বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে। শাঙ্কো বলল—আটা ময়দা আছে? লোকটি বুঝল না। শাঙ্কো হাত বাড়িয়ে কয়েকটা কাপড়ের বাস্তা দেখাল। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে দুটো সোনার চাকতি বার করে লোকটির হাতে দিল। লোকটা খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠল। দ্রুত কী বলে গেল।

বোধহয় আটা ময়দা নিয়ে যেতে বলল। শাঙ্কোরা কাপড়ের বস্তাসুদ্ধ আটা ময়দা কাঁধে তুলে নিয়ে জাহাজ ঘাটার দিকে চলল।

তখনই শাঙ্কো দেখল দু'জন পাহারাদার খোলা তরোয়াল হাতে বাজারে ঘুরছে। শাঙ্কো চাপাস্বরে বলল—ছোটো। চারজনই বাজারের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ছুটল। পাহারাদার দু'জন ঠিক বুঝল না। শাঙ্কোরা ততক্ষণে ভিড়ে মিশে গেছে।

ওরা বস্তাকাঁধে নৌকার কাছে এল। একটা নৌকো ঠেলে জলে নামাল। বস্তাগুলো নৌকায় তুলল। সঙ্গী বন্দুটিকে শাঙ্কো বলল—তুমি নৌকা নিয়ে চলে যাও। আমরা পীপে নিয়ে জল আনতে যাচ্ছি। বন্ধুটি বস্তা বোঝাই নৌকা জাহাজের দিকে চালাল।

এবার অন্য নৌকা থেকে তিনজন তিনটে জলের পীপে কাঁধে নিয়ে বাজার এলাকায় ঢুকল। শাঙ্কো সেই দোকানদার কাছে এল। ইশারায় পীপে দেখিয়ে জলের কথা বলল। দোকানদার বুঝল। হেসে পাহাড়ের দিকে দেখাল।

তিনজনে পীপে কাঁধে পাহাড়টার দিকে চলল।

পাহাড়ের নিচে বনভূমি। গভীর বন নয়। পাহাড়ের ঢাল দিয়ে দু'জন স্ত্রীলোক কাঠের বালতিমত নিয়ে আসছে। শাঙ্কো বুঝল ওরা জল আনছে। ততক্ষণে ওরা ঝর্ণার জলধারার মৃদুশব্দ শুনছে। শব্দ লক্ষ্য করে এগোতেই ঝর্নাটা পেল। তিনটে পীপেতে জল ভরল। তারপর তিনজনেই, আঁজলাভরে জল খেল। পেট ভরেই খেল। তারপর গায়ে মাথায় জল ছিটোলো। বেশ কয়েকদিন পরে তৃপ্তিভরে জল খাওয়া। তবে উপোসী পেটে এখনও খাবার পড়েনি। তবে নিশ্চিন্ত। সে ব্যবস্থা করেছে।

জলভরা পীপে কাঁধে নিয়ে ফিরে বাজার এলাকায় এল। এবার পাহারাদার দুজনের নজরে পড়ল। শাঙ্কো লক্ষ্য করল সেটা। চাপা স্বরে বলল—জোরে পা চালাও। তিনজনেই পীপে কাঁধে প্রায় ছুটে চলল। সমুদ্রতীরে পৌঁছোলোও। নৌকোয় পীপে তিনটে তুললও। টেনে নিয়ে নৌকো নামাচ্ছে তখনই পাহারাদাররা তরোয়াল তুলে ছুটে এল। শাঙ্কো বলে উঠল—তোমরা নৌকো চালাও। আমি সাঁতরে যাবো। কিন্তু তার আগেই একজন পাহারাদার শাঙ্কোর গায়ে তরোয়ালের ঘা বসাল। শাঙ্কোর আর জলে নামা হল না। ও বালির ওপর গড়িয়ে পড়ল। তারপর দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে জামার ভেতর থেকে ছোরা বের করল। এক ঝট্‌কায় সরে এসে সেই পাহারাদারেরা হাতে ছোরা বসিয়ে দিল। তরোয়াল ফেলে পাহারাদারটি বালির ওপর বসে পড়ল। অন্য পাহারাদারটি তখন সতর্ক হয়ে গেছে। সে তরোয়ালের ডগাটা শাঙ্কোর বুকের ওপর ঠেকিয়েছে। শাঙ্কো দ্রুত ওর ছোরাটা ওদের নৌকোর ওপর ছুঁড়ে দিল। ছোরা নৌকোর গলুইয়ের মধ্যে পড়ল। শাঙ্কো আর এক পাহারাদার দু'জনেই আহত। অক্ষত পাহারাদারটি শাঙ্কোকে বাজারের দিকে হাঁটতে ইঙ্গিত করল। আহত শাঙ্কো কোন কথা না বলে চলল। ওর পেছনে অক্ষত পাহারাদারটি চলল। আহত পাহারাদারও চলল।

বাজারের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় অনেক লোক ওদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। পাহারাদাররা একটা বড় বাড়ির সামনে শাঙ্কোকে নিয়ে এল। পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি বাড়ি। ছাউনি লম্বা লম্বা শুকনো ঘাস আর কাঠের। কাঠ সব এবড়োখেবড়ো। লম্বা বারান্দা পাথরের। শাঙ্কো দেখল আরও কয়েকজন পাহারাদার বারান্দায় কোমরে মোটা কাপড়ের ফেট্টিতে তরোয়াল গুঁজে বসে আছে। গত কয়েকদিন খাদ্য জল জোটে নি। শরীর এমনিতেই দুর্বল। তার ওপর পিঠ দিয়ে তখনও রক্ত গড়াচ্ছে। শাঙ্কো বেশ কাহিল হয়ে পড়ল। একটাই আশা—বন্দী যখন করেছে খাদ্য জল তো খেতে দেবে। তখন যদি শরীরে কিছু জোর পায়।

এবড়ো-খেবড়ো কাঠের দরজায় একজন পাহারাদার হাত ঠুকে শব্দ করল। দরজা খুলে গেল। বেশ লম্বা একজন বয়স্ক লোক দরজা খুলে দাঁড়াল। পাহারাদার মাথা একটু নিচু করে নিয়ে অনর্গল কিছু বলে গেল। আহত পাহারাদারকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল। শাঙ্কো বুঝল ওর বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা বলল।

লম্বা লোকটি শাঙ্কোকে ভেতরে নিয়ে আসার ইঙ্গিত করল। পাহারাদার শাঙ্কোকে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। ঘরের অন্ধকার ভাবটা চোখে সয়ে আসতে শাঙ্কো দেখল ঘরে একটা পাথর আর কাঠের তৈরি চৌকি মত। তাতে মোটা চাদর কাপড়চোপড় পাতা। লম্বা লোকটি বিছানায় গিয়ে বসল। শাঙ্কো বুঝল এই লোকটি এদের সর্দার। সর্দার স্পেনীয় ভাষায় ভাঙা ভাঙা শব্দ জুড়ে বলল—এখানে—এসেছো—কারণ?

—আমরা বিদেশী—ভাইকিং। জাহাজ চড়ে এখানে এসেছি। জাহাজঘাটায় আমাদের জাহাজ নোঙর করা আছে। আমাদের জাহাজে খাদ্য আর জল ফুরিয়ে গেছে বেশ কয়েকদিন আগে। আমরা এখানে আটাময়দা চিনি জল নিতে নেমেছিলাম। আপনার পাহারাদার—এই দেখুন—কথা থামিয়ে শাঙ্কো পিঠ দেখাল। তখনও কাটা জায়গা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছিল। শাঙ্কো বলল—আপনার পাহারাদারই প্রথমে তরোয়াল চালিয়েছিল। তারপরে আমি—। শাঙ্কোকে থামিয়ে দিয়ে সর্দার বলে উঠল—তোমরা দস্যু—। আগে—এসেছিলে—স্ত্রীপুরুষ ধরে—নিয়ে গেছো—ক্রীতদাস।

—না—আমরা দস্যু নই। শাঙ্কো বেশ জোর দিয়ে বলল। সর্দার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—না। শাঙ্কো তবুও তারা যে দস্যু নয় এটা বোঝাবার জন্যে অনেক কথা বল। কিন্তু সর্দারের এক কথা।

শাঙ্কো বুঝল সর্দারকে বোঝানো যাবে না। ওর এক গোঁ। কারা কবে এখানকার স্ত্রীপুরুষ জাহাজে তুলে নিয়ে পালিয়েছে সেই অভিজ্ঞতা সর্দার ভুলতে পারছে না। শাঙ্কো বলেছে—আমি একা আপনাদের কী ক্ষতি করতে পারবো?

—তোমার—দল—আসবে—ক্ষতি করবে। সর্দার বলল।

—আমার বন্ধুরা এখানে আসবে না। খাদ্য জলের ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। আমি গেলেই বন্ধুরা জাহাজ ছেড়ে দেবে।

—বিশ্বাস নেই—বন্দী—। সর্দার পাহারাদারদের ইঙ্গিত করল। দু'জন পাহারাদার ঘরে ঢুকল। শাঙ্কোকে ঠেলে পাশের একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিল। ছোট ঘর। মেঝেয় মোটা কাপড় পাতা। তার নিচে শুকনো ঘাস বিছোনো। ওপাশের দেয়ালে উঁচুতে একটা জানালামত। তাতে গাছের ডাল কেটে বসানো। ঘরে দু'জন বন্দী রয়েছে। একজন শুয়ে আছে। অন্যজন বসে আছে।

পাহারাদার দরজা বন্ধ করে দিল। কয়েদঘর নয়। তবে কয়েদঘরের মত ব্যবহার করা হয়। যে শুয়েছিল সে উঠে বসল। শাঙ্কো কোন কথা বলল না। বলে লাভ নেই। বন্দীরা বুঝবে না।

শাঙ্কো কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। চিৎ হয়ে শোওয়ার উপায় নেই। পিঠে ক্ষত। ও ভাবল—প্রথম সুযোগেই পালাতে হবে। পিঠের ক্ষতের চিকিৎসা এখানে হবে না। সর্দারকে বলে লাভ নেই। ওষুধ না পড়লে দিন কয়েকের মধ্যেই ক্ষত বিষিয়ে উঠতে পারে। বেঘোরে মারা যেতে হবে। তার আগেই পালাতে হবে। একে বেশ কয়েকদিন খাবার জোটেনি। শুধু ঝর্ণার জল খেয়ে আছে। তার ওপর পিঠে ক্ষতের যন্ত্রণা। শাঙ্কো খুব কাহিল হয়ে পড়ল।

দুপুরে দড়াম্ করে দরজা খুলে গেল। একজন পাহারাদার মাটির হাঁড়িতে খাবার নিয়ে ঢুকল। বন্দীদের খেতে দিল। অন্য পাহারাদারটি খোলা তরোয়াল হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। ক্ষুধার্ত শাঙ্কো খাবারের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। পোড়া গোল রুটি আর সামুদ্রিক মাছের ঝোল। রুটি দিয়েছে চারটে। শাঙ্কো গোগ্রাসে গিলল। রুটি শেষ। শাঙ্কো ইশারায় আরো দুটো রুটি চাইল। পাহারাদার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তরোয়াল হাতে অন্যজন দরজায় দাঁড়িয়েই রইল। পাহারাদার আরও দু'টো রুটি নিয়ে এল। শাঙ্কো খেল। ক্ষুধা মিটল। ও ইঙ্গিতে জল খেতে চাইল। পাহারাদার ইঙ্গিতে ঘরের কোনার দিকটা দেখাল। শাঙ্কো উঠে এল। দেখল একটা কাঠের গামলামত। তাতে জল। একটা কাঠের গ্লাস ভাসছে। ও গ্লাস তুলে পরপর চার গ্লাশ জল খেল। বন্দী দু'জনও খাবার খেয়ে জল খেল। পাহারাদার দু'জন দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

শাঙ্কো কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। বন্দীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু ওরা শাঙ্কোর কোন কথাই বুঝল না। হাল ছেড়ে দিয়ে শাঙ্কো জানলার দিকে তাকাল। ঈস্-যদি ছোরাটা থাকত! ঐ ডালগুলো অনায়াসে কাটা যেত। তারপর ফোকর গলে বেরিয়ে পালানো যেত। কিন্তু সঙ্গে ছোরাটাই তো নেই।

শাঙ্কো জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থেকে বুঝল বিকেল হয়ে এসেছে। ও পালাবার ছক কষতে লাগল।

হঠাৎ দড়াম করে দরজা খুলে গেল। শাঙ্কো দেখল ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ঢুকছে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শাঙ্কো লাফিয়ে উঠে বসল। বলে উঠল—ফ্রান্সিস। 'তুমি ধরা দিতে গেলে কেন? ফ্রান্সিস বিছানায় বসতে বসতে মৃদু হেসে বলল—আহত তুমি এখানে পড়ে থাকবে আর আমি খাবো ঘুমুবো? এটা হয়?

—কিন্তু দুজনেই বন্দী হয়ে গেলাম যে। শাঙ্কো বলল।

—তাতে পালাবার সুবিধেই হবে। যাক গে—খেয়েছো তো? কয়েকদিন তো কিছুই খাও নি। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ খেতে দিয়েছে। এখন অনেকটাই ভালো আছি। শাঙ্কো বলল।

—দু'পায়ে জোর পাচ্ছো? ফ্রান্সিস বলল।

—অনেকটা। শাঙ্কো ঘাড় কাত করে বলল।

—তাহলে ছুটে পালাতে পারবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমরা খেয়েছে তো? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। তোমার উপস্থিতবুদ্ধি আটাময়দার বস্তা জল বাঁচিয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—পালাবার ছক কিছু ভেবেছো? শাঙ্কো বলল।

—খাবার দিতে ক'জন পাহারাদার আসে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—দু'জন। শাঙ্কো বলল।

—তরোয়াল থাকে কারো হাতে? ফ্রান্সিস আবার জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। একজন খাবার দিতে ঘরের মধ্যে আসে। অন্যজন খোলা তরোয়াল হাতে দরজায় পাহারা দেয়। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—ছক কষা হয়ে গেছে।

—বলো কি? তাহলে খাবার দেবার সময়ই পালাবে? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। যে খাবার দিতে আসবে তাকে দরজার ধাক্কায় ফেলে দেবে। তরোয়ালওয়ালাকে আমি সামলাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার ছক কাজে লাগবে? শাঙ্কো বলল।

—সেটা নির্ভর করছে কত তাড়াতাড়ি আমরা কাজ সারতে পারি তার ওপর। খাবার দেবার সময় তৈরি থেকো। ফ্রান্সিস বলল।

বন্দী দুজন ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোর কথা শুনছিল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিল না। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—এদের সঙ্গে কথা বলেছো?

—বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুই বোঝাতে পারিনি। শাঙ্কো বলল।

—দরকার নেই। এদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। ফ্রান্সিস বলল।

রাত হল। রাত বাড়তে লাগল। কখন খাবার দিতে আসে তার জন্য ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

একসময় দড়াম্ করে দরজা খুলে গেল। একজন পাহারাদার পাতায় রাখা খাবার নিয়ে ঢুকল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। আকারে ইঙ্গিতে বোঝাল ও সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে। ও যেন খাবার রেখে দেয়।

ফ্রান্সিস দরজা দিয়ে বেরুতে অন্য পাহারাদারটি ওর পেছনে পেছনে তরোয়াল হাতে চলল। ফ্রান্সিস দেখল—সর্দার বিছানায় শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল—একটু উঠুন। আপনাকে কয়েকটা কথা বলবো। সর্দার বিছানা থেকে উঠে বসল। বিরক্তির সঙ্গে বলল—কী? ফ্রান্সিস ইনিয়ে বিনিয়ে একই কথা

বলতে লাগল—আমাদের মুক্তি দিন। কথা বলার সময় ফ্রান্সিস আড়চোখে দেখল বাইরের বারান্দায় দুজন পাহারাদার রয়েছে। তরোয়াল কোমরের ফেট্টিতে গোঁজা। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো তৈরিই ছিল। খাবার দিয়েছিল যে পাহারাদারটি সে তখন দরজার কাছে এসেছে। শাঙ্কো দ্রুত হাতে খাবারের পাতা ছুঁড়ে দিল পাহারাদারের মুখে। সে মুখ নিচু করল। তখনই শাঙ্কো দরজার পাল্লা ধাক্কা দিল পাহারাদারের পিঠে। দরজার ধাক্কায় পাহারাদার ঘরের মেঝেয় উবুড় হয়ে পড়ল। দরজার ধাক্কায় পাহারাদারের পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে তরোয়াল হাতে পাহারাদারটি ঘরের দিকে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস এই সুযোগটাই চাইছিল। ও ছুটে এসে পাহারাদারটিকে এক ধাক্কায় ঘরের মেঝেয় ফেলে দিল। পাহারাদারের হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। মশালের আলোয় ফ্রান্সিস দেখল তরোয়ালটা কোনায় জলের জায়গার কাছে পড়েছে। ফ্রান্সিস এক লাফে সেখানে গিয়ে তরোয়ালটা তুলে নিয়ে ছুটে বাইরের ঘরে চলে এল। সর্দারের বুকে তরোয়ালের ডগাটা ঠেকিয়ে বলল—উঠে দাঁড়ান। সর্দার তখন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। এভাবে আক্রান্ত হবে স্বপ্নেও ভাবে নি। সর্দার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

ওদিকে এখানকার শব্দ শুনে বারান্দা থেকে দুই পাহারাদার তরোয়াল হাতে ছুটে বাইরের ঘরে ঢুকল। দেখল সর্দারের বুকে তরোয়াল ঠেকিয়ে ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই হতবাক। সর্দারের জীবন বিপন্ন। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা এক টান দিল। সর্দারের বুকের কাছে পোশাক কেটে গেল। দেখা গেল চিরে গিয়ে বুক থেকে রক্ত বেরোচ্ছে।

পাহারাদাররা ফ্রান্সিসকে বাধা দিতে সাহস পেল না। ফ্রান্সিস গম্ভীর গলায় বলল—সর্দার আমাদের জাহাজে তুলে দেবেন চলুন।

—না—না। সর্দার বলে উঠল।

—তাহলে মরবেন। কথাটা বলে ফ্রান্সিস তরোয়ালের চাপ বাড়াল। সর্দার আর আপত্তি করতে সাহস পেল না।

—চলুন। ফ্রান্সিস তাড়া দিল।

সর্দার আস্তে আস্তে বাইরের বারান্দায় এল। ফ্রান্সিস বলল—আপনার পাহারাদারদের এখান থেকে চলে যেতে বলুন। সর্দার গলা চড়িয়ে কী বলল। পাহারাদার দুজন উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল।

ওদিকে দুই বন্দী দরজা খোলা পেয়ে এক ছুটে বাইরে চলে এল। তারপর ছুটল পাহাড়টার দিকে।

সামনে সর্দার। পেছনে সর্দারের পিঠে তরোয়াল ঠেকিয়ে ফ্রান্সিস। পেছনে শাঙ্কো। তিনজনে চলল জাহাজঘাটের দিকে।

বাজার এলাকা জনহীন। রাস্তা দিয়ে তিনজন চলল। জোৎস্না অনুজ্জ্বল হলেও চারদিক মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল।

তিনজনে জাহাজঘাটে পৌঁছল। ফ্রান্সিস পেছনে তাকিয়ে দেখল দূরে

পাহারাদাররা দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিসরা সমুদ্রতীরে জলের কাছে এল। হঠাৎ অনুচ্চস্বরে ফ্রান্সিস বলে উঠল—শাঙ্কো—সাঁতরে। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্ষতস্থানে নোনা জল লাগতে ভীষণ জ্বালা করে উঠল। ওর মুখ থেকে কাতর ধ্বনি উঠল—আঁ। ফ্রান্সিস বলে উঠল—কী হল?

—কিছু না। এসো। শাঙ্কো জাহাজের দিকে সাঁতরাতে লাগল। এবার ফ্রান্সিস তরোয়ালটা দাঁতে চেপে ধরে জলে ঝাঁপ দিল। তারপর জাহাজের দিকে সাঁতরে চলল।

ওদিকে বেশ কিছু বন্ধু এসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসদের দেখছিল। সিনাত্রা দ্রুত হালের দিকে গেল। দড়ির মইটা খুলে নামিয়ে দিল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো মই বেয়ে বেয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—বিস্কো—নোঙর তোল। কয়েকজন দাঁড়ঘরে যাও। পাল খুলে দাও। আমরা এখান থেকে চলে যাবো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নোঙর তোলা হল পাল খোলা হল। দাঁড় বাওয়া শুরু হল। জাহাজ মাঝসমুদ্রের দিকে চলল।

ফ্রান্সিস তাকিয়ে দেখল সর্দার বালিয়াড়িতে বসে আছে। তাকে ঘিরে পাহারাদারদের ভিড়। ওরা অসহায় দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে তাকিয়ে আছে।

জাহাজ চলল মাঝসমুদ্রের দিকে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে। বাতাস বেগবান। পালগুলো ফুলে উঠেছে। দাঁড় বাইতে হচ্ছে না। খুশির হাওয়া ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে। ডেক-এ ছক্কাপাঞ্জা খেলছে দল বেঁধে।

বিকেলের দিকে ফ্রান্সিস এল জাহাজচালক ফ্রেজারের কাছে। বলল—দিক ঠিক রাখতে পারছো?

—চেষ্টা করছি। রাতে আকাশে মেঘ জমলেই প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়ি। ফ্রেজার বলল।

—তার মানে ধ্রুবতারাটা দেখতে পাও না। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

—হ্যাঁ। তখন কতকটা আন্দাজেই জাহাজ চালাতে হয়। ফ্রেজার বলল।

—অগত্যা তাই করো। এখনও তো ডাঙার দেখা পেলাম না। কাজেই বুঝতে পারছি না কোথায় এলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি। জাহাজ তো চলুক। ফ্রেজার বলল।

ভাইকিংরা জেনেছে জাহাজ ওদের দেশের দিকেই চলেছে। সংবাদটা আনন্দের। তাই শাঙ্কো ছক্কাপাঞ্জা খেলার আসর ছেড়ে এসে গলা চড়িয়ে বলল—রাতের খাওয়া সেরে ডেক-এ এসে নাচগানের আসর বসাও। প্রায় সব বন্ধুরা হৈহৈ করে শাঙ্কোর কথা সমর্থন করল।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বরাবরের মত মারিয়া ডেক-এ এসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছে। শাঙ্কো মারিয়ার কাছে এল। বলল—রাজকুমারী আমরা

ঠিক করেছি আজ রাতে ডেক-এ নাচগানের আসর বসাবো। আপনি থাকবেন।

—নিশ্চয়ই থাকবো। সবাই আনন্দ করবে আর আমি থাকবো না? মারিয়া হেসে বলল।

—খুব খুশি হলাম। শাঙ্কো হেসে বলল। সবাই রাতের নাচগানের আসরের কথা জানল। ফ্রান্সিসও জানল। কিন্তু ওর মন থেকে দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না। জাহাজ কোথায় চলেছে? দিক ঠিক আছে কিনা। দিনে রাতে বার কয়েক ফ্রেজারের কাছে আসে। জানতে চায় জাহাজ ঠিক উত্তরমুখো যাচ্ছে কিনা। ফ্রেজার খুব নিশ্চিন্তভাবে বলতে পারছে না ঠিক কোনদিকে জাহাজ চলেছে। এই সংশয়ের কথা ফ্রান্সিস অবশ্য বন্ধুদের বলে না। এসব জানলে বন্ধুদের মধ্যে হতাশা আসবে। সেটা এই অবস্থায় বিপজ্জনক। তাই ফ্রেজারকে মৃদুস্বরে বলে—

—এসব কথা বন্ধুরা কেউ যেন না জানে।

—ঠিক আছে। এই নিয়ে তুমি ভেবো না। জাহাজে এখন খাদ্য জলের অভাব নেই। কাজেই বেশ কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত। ফ্রেজার বলল।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকল। ভাইকিংরা সবাই ডেক-এ উঠল। পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। ফ্রান্সিস আর মারিয়াও মাস্তুলের গা ঘেঁষে বসল। মাঝখানে গোল জায়গা রেখে সবাই গোল হয়ে বসল। শাঙ্কো কোত্থেকে একটা খালি পিপে নিয়ে এল। টম্ টম্ শব্দে খালি পিপে পিটিয়ে গলা চড়িয়ে বলে উঠল—গান শুরু হোক। ফ্রান্সিস হেসে জোরে বলল—সিনাত্রা-গান শোনাও। কয়েকজন বন্ধু সেনাত্রাকে ঠেলাদিয়ে বলল—যাও—গান শোনাও।

সিনাত্রা হাসল। তারপর উঠে গিয়ে গোল জায়গাটায় দাঁড়াল। শুরু করল গান। ওদের দেশের গান। বসন্ত এলে যখন ওদের দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে নতুন ঘাস গজায় তখন ভেড়াপালকরা ভেড়ার পাল নিয়ে আসে সেই ঘাস খাওয়াতে। তখন ওরা ভেড়ার পাল ছেড়ে দিয়ে ঘাসের ওপর বসে গান গায়—

সবুজঘাসে ঢাকল পাহাড়
দেখে যা রে কেমন বাহার
ফুটলো কলি
জুটলো অলি
এ দেশ তোমার আমার।

সুরেলা গলায় সিনেত্রা গাইতে লাগল ভেড়াপালকদের গান। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল। মারিয়া রাজপ্রাসাদে মানুষ হয়েছে। ভেড়াপালকদের গান ও কখনও শোনেনি। তাই গভীর আগ্রহ নিয়ে মারিয়া গানটা শুনতে লাগল। ফ্রান্সিসেরও শুনতে ভালো লাগছিল। কিন্তু বন্ধুদের মন আনন্দের বদলে বিষাদে ছেয়ে গেল। কারণ গান শুনে নিজেদের মাতৃভূমির কথাই বেশি করে মনে পড়ল। সবাই চুপ করে বসে রইল। শাঙ্কো বুঝল সেটা। কোথায় নাচবে হৈ হৈ করবে তা নয় সবার মন ভারাক্রান্ত। গান শেষ হতে শাঙ্কো লাফিয়ে উঠে পীপে

বাজাতে বাজাতে বলে উঠল—সিনাত্রা বিয়ের গান গাও। আনন্দের উল্লাসের।

সিনাত্রা হেসে বিয়ের চটুল গান ধরল। বর বিয়ে করতে যাওয়ার সময় যে গান গাওয়া হয়। ছন্দে তালে সুরে গান জমে উঠল। শাঙ্কোর পীপের বাজনার তালে তালে কয়েকজন উঠে ডেক-এর ওপর থপ্ থপ থপ্ পা ঠুকে নাচতে আরম্ভ করল।

একটা গান শেষ হতেই সিনাত্রা আর একটা তালের গান ধরল। চলল থপ্ থপ্ থপ্ নাচ। এবার প্রায় সবাই নাচতে লাগল। ফ্রান্সিস মারিয়াও বাদ গেল না। শুধু বয়েসে বড় ভেন হাসিমুখে নাচ দেখতে লাগল। মারিয়া রাজপ্রাসাদে ঢিমে লয়ে বাজনার সঙ্গে নাচতে অভ্যস্ত। এত দ্রুত তালের নাচ ও কোনদিন নাচে নি। আজকে নাচল। এই নাচে একটা উন্মাদনা আছে। মারিয়া ফ্রান্সিসের সঙ্গে নেচে উপভোগই করছিল নাচটা।

প্রায় দুঘণ্টা নাচ চলল। শেষের দিকে জাহাজ চালক ফ্রেজার কড়ার সঙ্গে হুইল আটকে রেখে নাচে যোগ দিল। নাচগানের শব্দ জ্যোৎস্না ধোওয়া সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

একসময় সিনাত্রা গান থামাল। বাজনা নাচ বন্ধ হল। একঘেয়ে জাহাজী জীবনে এই বৈচিত্র্য ভালো লাগল সবার। একমাত্র পেড্রো এই আসরের মজা থেকে বঞ্চিত হল। ওকে তো নজরদারি চালাতে হয়। এর পরে কয়েকদিন পরপরই রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ডেক-এ নাচগানের আসর বসতে লাগল। এই আনন্দঘন সময় সবাই উপভোগ করতে লাগল। ফ্রান্সিস এই ব্যাপারে উৎসাহই দিল। ওরা আনন্দে থাকুক এটাই ফ্রান্সিস চাইছিল।

দিন কুড়ি কাটল। জাহাজ দ্রুতই চলেছে। তবে ডাঙার দেখা নেই। ফ্রান্সিস একটু চিন্তায় পড়ে। কিন্তু উপায় নেই। ডাঙার দেখা পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে।

পেড্রো মাস্তুলের মাথায় নিজের জায়গায় বসে চারদিকে নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে। তার জন্যে পেড্রোকে রাতও জাগতে হচ্ছে।

দিনরাত জাহাজ চলেছে। ডাঙার দেখা নেই। এই নিয়ে ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন হয়। তবে ফ্রান্সিসের ওপর ওদের অগাধ বিশ্বাস। ফ্রান্সিসের চিন্তা হয়। এতগুলো মানুষের জীবনের দায়িত্ব তো ওর কাঁধেই। বন্ধুরা হৈ হৈ করে। আনন্দ করে। নাচগানের আসর বসায়। আর ফ্রান্সিস থাকে নিজের চিন্তা নিয়ে। হ্যারি সান্ত্বনা দেয়—খাদ্য আছে জল আছে। চলুক না জাহাজ। ডাঙার দেখা পাবই।

দিন পনেরো পরে ডাঙার দেখা মিলল। মাস্তুলের ওপর থেকে পেড্রোর চিৎকার শোনা গেল—ভাইসব—ডাঙা দেখা যাচ্ছে। হ্যারি ডেক-এই ছিল। গলা চড়িয়ে বলল—কোনদিকে?

—ডানদিকে। পেড্রো গলা চড়িয়ে বলে। কয়েকজন ভাইকিং পেড্রোর কথা শুনল। ওরা রেলিং ধরে দাঁড়াল। ডানদিকে তাকাল। দেখল জঙ্গল। জঙ্গল ঘন না ছাড়া ছাড়া গাছগাছালির সেটা বুঝল না।

হ্যারি ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে ডেকে আনল। ফ্রান্সিসের সঙ্গে মারিয়াও এল।

জাহাজটা ততক্ষণে জঙ্গলের অনেক কাছাকাছি এসেছে। বোঝা গেল জঙ্গলটা মোটামুটি ঘনই। বড় বড় গাছের জঙ্গল। বালিয়াড়ির পরেই জঙ্গলের শুরু। এখান থেকে সমুদ্র অনেকটা গভীর। সেটা বোঝা গেল জাহাজটা যখন তীরভূমির কাছাকাছি এল।

ফ্রান্সিস জাহাজচালক ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—

—কী মনে হয় তোমার। জাহাজ তীরে ভেড়ানো যাবে?

—তা যাবে। জলে গভীরতা আছে। ফ্রেজার বলল।

—তাহলে জাহাজ তীরে ভেড়াও। ফ্রান্সিস বলল।

—কী ভাবছো ফ্রান্সিস। এখানে নামবে? হ্যারি জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। জাহাজঘাটটা ছোট। কোন জাহাজও নোঙর করা নেই। তবে বোঝা যাচ্ছে জাহাজঘাট হিসেবেই এটা ব্যবহার করা হয়।

—লোকজন কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। হ্যারি বলল।

—নেমে দেখতে হবে। হয়তো জঙ্গলের ওপারে বসত আছে। সেখানে গিয়েই খোঁজ করতে হবে। জানতে তো হবে কোথায় এলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন তো বিকেল হয়ে এসেছে। এখনই নামবে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। দিনে দিনেই খোঁজখবর নেওয়া ভাল। রাতে কিছু করা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ফ্রেজারের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল—জাহাজ তীরে ভেড়াও।

ফ্রেজার আস্তে আস্তে জাহাজ তীরে ভেড়াল। শাঙ্কো আর বিস্কো মিলে পাটাতন ফেলল। ফ্রান্সিস শাঙ্কো আর সিনাত্রাকে তৈরি হয়ে আসতে বলল। শাঙ্কো বলল—তাহলে এখনই নামবে?

—হ্যাঁ। একটু পরেই নামবো। দেরি করবো না। ফ্রান্সিস বলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কো আর সিনাত্রা তৈরি হয়ে এল। তিনজনে পাটাতনের দিকে এগোল। হ্যারি মারিয়া আর অন্য কয়েকজন বন্ধু রেলিং ধরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসরা তরোয়াল নিল না।

ফ্রান্সিসরা জাহাজঘাটায় নেমে দেখল একটা রাস্তামত বনের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। তার মানে এই পথে লোক চলাচল করে। কাজেই নিশ্চয়ই বনের পরে লোকবসতি আছে।

তিনজনে বনের পথ ধরে পশ্চিমমুখো হাঁটতে লাগল। রাস্তার দুপাশে ঘন বন। এখানে ওখানে ভাঙা রোদ পড়েছে। তবে বনতল অন্ধকারই।

ওরা কিছুটা এগিয়েছে। হঠাৎ শুকনো পাতা ভাঙার জোর শব্দ। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে উঠল—পালাও। ওরা ঘুরে দঁড়াতে যাবে তখনই হঠাৎ দেখল প্রায় অন্ধকারে পথের ওপর দাঁড়িয়ে তিনজন লোক। হাতে উদ্যত বর্শা। বনের অন্ধকারে মোটামুটি দেখা গেল ওদের পরনে মোটা কাপড়ের আঁটোসাটো পোশাক। গায়ের রং কালো। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—পেছনে ছোটো।

ঘুরে দাঁড়িয়েই ওরা দেখল আরো তিনচারজন কালো মানুষ উদ্যত বর্শা হাতে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিসদের পালানো হল না। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—কোনরকম বাধা দিও না। আমাদের নিয়ে কী করে দেখি।

রাস্তার দু'দিক থেকে দু'দল যোদ্ধা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। একজন মোটামত যোদ্ধা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসদের সামনের দিকে হাঁটতে ইঙ্গিত করল। সবাই বনপথ দিয়ে চলল। সামনে তিনজন। পেছনে চারজন। সবার হাতেই লম্বা ডাল কেটে তৈরি ছুঁচোলো মুখ লোহা বাঁধানো বর্শা। সবাই চলল। বন শেষ। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ফ্রান্সিস দেখল বাঁদিকে শুকনো লম্বা লম্বা ঘাস ঢাকা হল দূরবিস্তৃত। সম্মুখে বাড়িঘর দোর। ঘরগুলো ছাউনি ঘাসের। দেয়াল মাটি পাথরের। বসতি এলাকা। বাড়িঘরের মধ্যে বাইরে স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়ের ওরা অনেকেই বেশ অবাক হয়ে ফ্রান্সিসদের দেখছিল।

বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে ঢুকতেই দেখা গেল একটা বেশ বড় উঠোনমত। উঠোনের মাঝখানে একটা খুঁটির মত আস্ত একটা শুকনো গাছ পোঁতা। ঐ পরিষ্কার উঠোন ঘিরেই বাড়িঘর।

সামনেই একটা বড় ঘর। তার মাটির বালিপাথরে তৈরি বারান্দায় একটা কাঠের আসনে বসে আছে এক যুবক। মাথায় লম্বা চুল পিঠ পর্যন্ত নেমে এসেছে। গায়ের রং তামাটে। পরনে আঁটো সাটো মোটা কাপড়ের পোশাক। কাঠের গ্লাস করে কিছু খাচ্ছে। টক্‌টকে লাল চোখ ক্রূর দৃষ্টি। তার সামনে এসে ফ্রন্সিসদের দাঁড় করানো হল। মোটা যোদ্ধাটি মাথা একটু নুইয়ে এক নাগাড়ে কিছু বলে গেল। বোঝাই গেল ফ্রান্সিসদের বন্দী করার ঘটনা বলল। আরো বোঝা গেল যুবকটি এখানকার সর্দার।

যুবক সর্দার এবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল—কে তোমরা?

—আমরা বিদেশী। য়ুরোপ থেকে জাহাজ চড়ে এখানে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কীভাবে? সর্দার জানতে চাইল।

—জাহাজে চড়ে । ফ্রান্সিস বলল।

সর্দার একটু চুপ করে থেকে গ্লাসের পানীয় সবটা খেয়ে গ্লাসটা পাশে রাখল। তারপর সরাসরি বলে বসল—না—তোমরা—রাজা প্রোফেনের—গুপ্তচর—আমাদের যোদ্ধা—সংখ্যা—খবর।

—আপনি আমাদের ভুল বুঝছেন। রাজা প্রোফেন নামে কাউকে আমরা চিনি না। কোথায় তার রাজত্ব তাও জানি না। ফ্রান্সিস বলল।

—বিশ্বাস—নেই। বন্দী—হত্যা। সর্দার বলল।

ফ্রান্সিস ভীষনভাবে চমকে উঠল। বুঝল চরম বিপদের মুখে ওরা। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আমাদের কেন হত্যা করবেন? কী অপরাধ করেছি আমরা?

—রাজা প্রোফেনের গুপ্তচর—রাতে—দেখবে—শাস্তি।

ফ্রান্সিস বুঝল রাজা প্রোফেনের যোদ্ধাকে শাস্তি দেওয়া হবে। তবে ওদের

মুক্তি নেই। পরে ওদেরও শাস্তি দেওয়া হবে। আজ রাতেই ঐ যোদ্ধাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কীরকম শাস্তি সেটা দেখে বোঝা যাবে ওদেরও ভাগ্যে কীরকম শাস্তি জুটবে। সর্দার বলছে—হত্যা। ওদেরও হত্যা করা হবে। এই চিন্তাটাই ফ্রান্সিসকে উদ্বিগ্ন করল। ফ্রান্সিস অবার বলল—আমাদের শাস্তি দেওয়া হবে কেন? আমরা তো আপনাদের কোন ক্ষতি করিনি।

—কথা নয়—যাও—বন্দী। সর্দার গভীরস্বরে বলল। ফ্রান্সিস বুঝল এই সর্দারের মনে কোন দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই। নরহত্যা এর কাছে কোন অন্যায়ই নয়। ফ্রান্সিস ক্রুদ্ধ হল। চিৎকার করে বলে উঠল—আমাদের হত্যা করার চেষ্টা করলে আপনিও রেহাই পাবেন না। সর্দার একলাফে উঠে দাঁড়াল। যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে কী বলে উঠল। যোদ্ধারা ছুটে এসে তিনজনের পিঠে বর্শা খোঁচা দিয়ে হাঁটতে ইঙ্গিত করল। তিনজনকে নিয়ে যোদ্ধারা উঠোনের মাঝখানে লম্বা খুঁটির কাছে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস দেখল দু'জন বন্দীকে খুঁটির সঙ্গে হাত পা বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়েছে। শক্ত বুনো লতা দিয়ে ফ্রান্সিসদেরও খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হল। পা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হল। বাঁধা হাত আর খুঁটির সঙ্গে বাধা হল না। একজন যোদ্ধা ওদের সামনে পাহারায় রইল। অন্য যোদ্ধারা চলে গেল।

—ফ্রান্সিস—যে করেই হোক পালাতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—ছক কষেছি। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—তুমি মাথা গরম করে ফেললে—শাঙ্কো অনুযোগের সুরে বলল।

—কোন কারন নেই—আমাদের হত্যা করা হবে? এসব শুনলে কারো মাথার ঠিক থাকে। ফ্রান্সিস বলল। বেশ ভয়ার্তস্বরে সিনাত্রা বলল—তাহলে আমরা আর বাঁচবো না?

—নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবো সিনাত্রা। ইচ্ছে করলে তুমি এখন গান গাইতে পারো।

—কী পাগলের মত কথা বলছো? মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে—

—অত সহজে ফ্রান্সিস মৃত্যু মেনে নেয় না। শুধু সময় সুযোগের অপেক্ষা। ফ্রান্সিস বলল।

—সত্যি কি সর্দার আমাদের মেরে ফেলবে? সিনাত্রা বলল।

—ওর চোখের দৃষ্টিই বলছে। ও নরঘাতক। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহ'লে—সিনাত্রা বলতে গেল। ফ্রান্সিস ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল—

—ভয় পেওনা। মনে সাহস রাখো। সাহস হারিও না।

তারপর ওরা আর কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিস পালানোর উপায় ভেবে চলল। শাঙ্কোর কেমন মনে হল বন্দী দু'জন নিশ্চয়ই রাজা প্রোফেনের যোদ্ধা। ধরা পড়ে এখন শাস্তির মুখে। শাঙ্কো নিশ্চিত হতে বলল—ভাই তোমরা কি রাজা প্রোফেনের দেশের যোদ্ধা? শাঙ্কোর সব কথা ওরা বুঝল না। কিন্তু রাজা প্রোফেন শুনে একজন মাথা ওঠা নামা করল। শাঙ্কো বুঝল ওর অনুমান ঠিক। এবার শাঙ্কো বলল—তোমাদের দেশ কোনদিকে? বার কয়েক বলার পর ওরা

বুঝল। একজন দু'হাত তুলে শুকনো ঘাসের বনের দিকে দেখাল। ফ্রান্সিস এসব দেখছিল। বুঝল ঐ ঘাসের বনেরও পাশেই রাজা প্রোফেনের রাজত্ব। সন্দেহ নেই এই সর্দার রাজা প্রোফেনের শত্রু।

সন্ধ্যে হয়ে এল। ফ্রান্সিসরা দেখল যোদ্ধারা জঙ্গল থেকে শুকনো গাছডাল নিয়ে আসছে। আর একদল বড় বড় আঁটি বেঁধে শুকনো ঘাস নিয়ে আসছে। উঠোনের ওপাশে একটা গাছের নীচে সব জড়ো করছে। ঘাস ডালপাতার স্তূপ গাছটার নিচে কান্ডের চারিদিকে জড়ো করা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ উঁচু হয়ে গেল শুকনো ঘাস গাছ ডালের স্তূপ। সিনাত্রা এসব দেখে বলল—এরা বোধহয় আগুন জ্বেলে নাচ গান করবে। শুধু ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—সিনাত্রা এখন এই সর্দারকে চেনোনি। শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে।

—বলো কি! শাঙ্কো বলে উঠল—তার মানে এই বন্দী দু'জনকে—ফ্রান্সিস ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল—হ্যাঁ পুড়িয়ে মারা হবে।

—কী সাংঘাতিক! সিনাত্রা আঁৎকে উঠল।

—এর আগেও কতজনকে এভাবে শাস্তি দিয়েছে কে জানে। কাজেই এই সর্দারের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। শুধু ভাবছি যা সন্দেহ করছি তা ঘটে কি না। ফ্রান্সিস মৃদু স্বরে বলল।

সন্ধ্যের পরেই ফ্রান্সিসদের, বন্দীদের খেতে দেওয়া হল। গোল গোল পাতায় পোড়া পোড়া রুটি আর আনাজের ঝোল।

একটু রাত হতেই সব নারীপুরুষ খেয়ে নিল। উঠোনে এসে সবাই জড়ো হতে লাগল। গাছটা ঘিরে লোকজন দাঁড়িয়ে গেল।

এবার বন্দী দুজনকে যোদ্ধারা বন্দী পায়ের বাঁধন খুলে গাছটার দিকে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিস যা আশঙ্কা করছিল তাই ঘটতে চলল। বন্দী দু'জনকে সেই কাঠের স্তূপের ওপরে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে তোলা হল। বুনো লতা দিয়ে গাছের সঙ্গে তাদের বেঁধে দেওয়া হল। উপস্থিত লোকজনরা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। বন্দী দু'জনে যোদ্ধাদের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ওদের হাত এড়াতে পারল না। দু'জনে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

তখনই সর্দার ডানপাশের একটা বড় ঘর থেকে বেরিয়ে এল। যোদ্ধা কয়েকজন সর্দারের কাঠের আসনটা পেতে দিল। সর্দার গ্লাসে নেশার তরল পদার্থ নিয়ে আসনে বসল। যোদ্ধারা সর্দারের নির্দেশের অপেক্ষা করতে লাগল। একসময় গ্লাসে চুমুক দিয়ে সর্দার ডানহাত উঁচু করল। একজন যোদ্ধা চকমকি পাথর ঠুকে গাছের নীচে শুকনো ঘাসে আগুন জ্বালিয়ে দিল। আগুন দ্রুত জ্বলে উঠে ছড়িয়ে গেল। শুকনো কাঠে আগুন লেগে গেল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। বন্দী দু'জনকে আগুন অচিরেই স্পর্শ করল। বন্দী দু'জন উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল। আর্ত চিৎকার শোনা গেল।

ফ্রান্সিস আর তাকিয়ে দেখতে পারল না। মুখ নিচু করে চুপ করে বসে রইল। মর্মান্তিক আর্তনাদ শুনতে শুনতে ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। শাঙ্কো সিনাত্রাও

মুখ নিচু করে বসে রইল। ওদিকে জড়ো হওয়া মানুষের মধ্যে উল্লাসের ধ্বনি উঠল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—কী নিষ্ঠুর এই মানুষেরা। বোঝাই যাচ্ছে এখানকার মানুষেরা এরকম দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত।

শাস্তি শেষ। ভোর হয়ে এল। সর্দার নিজের বড় ঘরটায় ঢুকে পড়ল। লোকজন নিজেদের ঘরে ফিরে গেল।

সেদিন দুপুরে দু'জন যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের খাবার দিতে এল। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে বলল—আমি খাব না। যোদ্ধা দু'জন অবাক। বার বার খাবারের পাতা এগিয়ে দিল। ফ্রান্সিস সরিয়ে দিল। শাঙ্কো আর সিনাত্রাও মাথা নেড়ে খেতে অস্বীকার করল। যোদ্ধারা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ওরা খাবার নিয়ে ফিরে গেল। বোধহয় সর্দারকে গিয়ে সেকথা বলল।

কিছু পরে সর্দার এল। হাত নেড়ে বলল—খাও। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। সর্দার কিছুক্ষণ চাপাচাপি করল। তারপর আর কিছু না বলে চলে গেল। তারপর থেকে ফ্রান্সিস একটি কথাও বলল না।

রাত হল। শাঙ্কো ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস ওর দিকে ফিরে তাকাল।

—রাতেও খাবে না। শাঙ্কো জানতে চাইল।

—রাতে খাব। পালাতে গেলে উপবাসী পেটে থাকা চলবে না।

রাতের খাবার যোদ্ধা দু'জন দিয়ে গেল। ফ্রান্সিসরা পেট পুরে খেল। সারা দিন উপোবাসী থেকে বেশ দুর্বল লাগছিল শরীর। রাতে খেয়ে গায়ে একটু জোর পেল। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল—একটু ঘুমিয়ে নাও। কয়েদঘরে কখনও কখনও হাত পা বাঁধা অবস্থায় থেকে ঘুমোন ফ্রান্সিসদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। তিনজনে ঐ অবস্থায় কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিল। ঘুম ভেঙে দেখল একজন পাহারাদার বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে।

তখন শেষ রাত। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এগিয়ে এল। পাহারাদারদের চোখ এড়িয়ে ফ্রান্সিস শাঙ্কোর গলার কাছ দিয়ে বাঁধা দু'হাত ঢোকাল। তারপর আস্তে আস্তে ছোরাটা তুলল। শাঙ্কোর বাঁধা হাতে দিল। শাঙ্কো আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের হাতের বাঁধা লতা কাটতে লাগল। একটু সময় লাগল। বুনো লতাটা বেশ শক্ত। ফ্রান্সিসের হাতের লতা কেটে গেল। এবার ছোরাটা নিয়ে শাঙ্কোর হাতের বাঁধন কাটল। শাঙ্কো ছোরা নিল। সিনাত্রার হাতের বাঁধন কাটল। তারপর সকলেই পায়ের বাঁধন কাটল। সিনাত্রা চাপা স্বরে বলে উঠল—সাবাস শাঙ্কো।

তিনজনের খোলা হাত পা নিয়ে একটু বসে রইল। ফ্রান্সিস চোরা দৃষ্টিতে পাহারাদারদের দেখতে লাগল। পাহারাদাররা পায়চারি করছিল। একবার ঘুরে দাঁড়াতেই ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে একলাফে পাহারাদারের ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ল। পাহারাদার চিৎ হয়ে পড়ে গেল। হাত থেকে বর্শাটা ছিটকে গেল। ফ্রান্সিস একলাফে গিয়ে বর্শা তুলে নিল। ওদিকে শাঙ্কো হাতের ছোরাটা পাহারাদারের পেটে ঢুকিয়ে দিল। পাহারাদারের মুখে মৃদু

শব্দ উঠল—ওঃ। ততক্ষণে ফ্রান্সিস সর্দারের ঘরের দরজার কাছে ছুটে এসেছে। জোরে লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলল। ঘরে মশালের আলোয় দেখল দরজা ভাঙার শব্দে সর্দার বিছানায় উঠে বসেছে। সর্দার আগে বুঝে ওঠার আগে ফ্রান্সিস বর্শাটা সর্দারের বুকে ঢুকিয়ে দিল। সর্দার দু'হাতে বেঁধা বর্শাটা ধরে চিৎ হয়ে বিছানায় পড়ে গেল। চিৎকার করে উঠল—আঁ—আঁ—।

ফ্রান্সিস এক লাফে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে চাপা স্বরে বলে উঠল—উত্তর দিকের বনের দিকে ছোটো। তিনজনে ঘাসের বনের দিকে ছুটল। কিন্তু দরজা ভাঙার শব্দে সর্দারের চিৎকারে অনেকেরই ঘুম ভেঙে গেল। যোদ্ধারা কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে বর্শা হাতে বেরিয়ে এল। এরা যোদ্ধার জাত। লড়াই করতে অভ্যস্ত। ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমে হকচকিয়ে গেল। কিন্তু কয়েক মূহুর্ত। চাঁদের অনুজ্জ্বল আলোতে ফ্রান্সিসদের ঘাসবনের দিকে ছুটতে দেখল। বন্দীরা পালাচ্ছে। মুখে থাবড়া দিয়ে উ—উ শব্দ তুলল। আরো যোদ্ধা বর্শা হাতে ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে এল। সবাই ছুটল ফ্রান্সিসদের দিকে।

ততক্ষণে ফ্রান্সিসরা ঘাসের বনে ঢুকে পড়েছে। ঘাসের উচ্চতা বুক পর্যন্ত। তাও ফ্রান্সিসদের মাথা ঢাকা পড়ল না। ওদের মাথা দেখে যোদ্ধারা বর্শা হাতে ছুটে এল। শুকনো ঘাসের বনে ঢুকে পড়ল। ফ্রান্সিসদের ধাওয়া করল। ফ্রান্সিসরা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটল। কিন্তু ঘাসের গোড়ায় পা জড়িয়ে যেতে লাগল। ফ্রান্সিসদের গতি কমে আসতে লাগল। অনেকটা কাছে এসে পড়ল যোদ্ধার দল। ফ্রান্সিস পিছনে ফিরে দেখল সেটা। ফ্রান্সিস হঠাৎ নিচু হয়ে এক মুঠো ধুলো তুলল। উড়িয়ে দেখল বাতাস দক্ষিণমুখী। অর্থাৎ যেদিক থেকে যোদ্ধারা ছুটো আসছে। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল— সিনাত্রা— চকমকি —পাথর লোহা আছে তো।

—কোমরে ফেট্টি তে গোঁজা। সিনাত্রা বলল।

—ঘাসে আগুন লাগাও। জলদি। ফ্রান্সিস বলল।

সিনাত্রা বসে পড়ল। কোমর থেকে চকমকি পাথর লোহা বের করে হাঁপাতে হাঁপাতে ঠুকতে লাগল। চকমকি পাথর থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকে শুকনো ঘাসে লাগল। দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শুকনো ঘাসে আগুন লেগে গেল। উত্তরমুখী হাওয়া। ওদিক থেকে যোদ্ধারা ছুটে আসছিল। আগুনের ধোঁয়া ছুটল যোদ্ধাদের দিকে। যোদ্ধারা মরিয়া হয়ে বর্শা ছুঁড়ল। কিন্তু সে সব বর্শা আগুনের মধ্যে পড়ল। আগুন তখন হাওয়ায় ভর করে ওদের দিকে ছুটে আসছে। ওরা চিৎকার করতে করতে পিছনে ফিরে ছুটল। ফ্রান্সিসের সঙ্গে তখন ওদের আগুনের ব্যবধান। ফ্রান্সিসরা ততক্ষণ হাঁপাতে হাঁপাতে ঘাসের বনের বাইরে চলে এসেছে। সামনেই একটা জলাশয় মত। ওরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জল গভীর নয়। কোমর পর্যন্ত। ওরা জল ঠেলে চলল। চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট কিছু বাড়িঘর দেখল। ফ্রান্সিস পেছনে ফিরে দেখল সারা ঘাসের বনে আগুন আর ধোঁয়া। সামনের বাড়িঘর দেখে ফ্রান্সিস বলল—ওটা নিশ্চয়ই রাজা প্রোফেনের রাজত্ব। সর্দারের শত্রু রাজ্য। ওখানেই আশ্রয় নিতে হবে।

জলাশয়টার মাঝামাঝি এসে ফ্রান্সিস বাঁদিকে তাকাল। অনেক দূরের সমুদ্রের বিস্তার দেখে বুঝল এটা জলাশয় নয়। সমুদ্রের খাঁড়ি। এখানে নিশ্চয়ই জোয়ার ভাঁটা খেলে।

জল ঠেলে এগোতে সময় লাগছিল। ততক্ষণে চাঁদ নিভে গেছে। পূর্বদিকের আকাশে কমলা রং ধরেছে। ফ্রান্সিসরা ওপারে পৌঁছাল। তিনজনই বালির পারে বসে পড়ল। হাঁপাতে লাগল।

সূর্য উঠল। ফ্রান্সিস দেখল অনেক বাড়ি ঘরদোর। পশ্চিমদিকে তাকিয়ে দেখল খাঁড়ি থেকে একটা উঁচু পাহাড় উঠে গেছে। পাহাড়টার নিচে বিস্তৃত বনভূমি।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—চলো। দেখি কোথায় এলাম।

শাঙ্কো সিনাত্রা উঠে দাঁড়াল। তিনজনে হেঁটে চলল বাড়িঘরগুলোর দিকে। দু'পাশের বাড়ির পুরুষ স্ত্রী লোক বাচ্চারা বেশ আবাক চোখে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। সবারই বোধহয় জিজ্ঞাসা এই বিদেশীরা কোত্থেকে এল? কার কাছেই বা যাচ্ছে। ফ্রান্সিসরা এসব দেখে অভ্যস্থ। ওরা হেঁটে চলল। বাড়িগুলোর পরেই একটা ঘাসে ঢাকা প্রান্তর। তারপরই একটা বড় বাড়ি। কাঠ পাথর বালি দিয়ে তৈরী বাড়ি। মাথায় শুকনো ঘাসের ছাউনি।

প্রান্তর পার হয়ে বাড়িটার কাছাকাছি আসতে কয়েকজন প্রহরী ছুটে এল। ওদের কোমর বন্ধনীতে তরোয়াল ঝুলছে। শুধু দু'জনের হাতে বর্শা। ওরা এসে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। কোমরে তরোয়াল ঝোলা একজন এসে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল—তোমরা কে? কোথায়?

—এটা কি রাজা প্রোফেনের দেশ?

প্রহরী কোন কথা না বলে মাথা ওঠা নামা করল। তারপর বলল—তোমরা কোত্থেকে এসেছো? ফ্রান্সিস আঙুল তুলে পোড়া ঘাসবন দেখাল।

—ও—এলুডা দেশ থেকে। কোথায় যাবে? প্রহরী জিজ্ঞেস করল।

—এখানেই কোন সরাইখানায় থাকব। কয়েকদিন বিশ্রাম নেব। তারপর চলে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই ফ্রান্সিস দেখল—বড় ঘরটার পেছন থেকে একজন লোক আসছে। পেছনে আট দশ জন যোদ্ধা। লোকটির পরনে আটসাটো মোটা কাপড়ের পোশাক। কোমরে চামড়ার কোমরবন্ধনী। তাতে পেতলের বাটওয়ালা তরোয়াল ঝুলছে। লোকটি প্রান্তরে এসে দাঁড়াল। লোকটিকে দেখে ফ্রান্সিসের কেমন মনে হল লোকটি এদেশীয় নয়। যুরোপীয়। ধাঁধা কাটাতে ফ্রান্সিস প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলে—ঐ লোকটি কে?

—উনি মন্ত্রী স্তিফানো। প্রহরী বলল।

—রাজা প্রোফেনের মন্ত্রী? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ।

—আমি ভেবেছিলাম সেনাপতি। ফ্রান্সিস বলল।

—না। প্রহরী বলল।

স্তিফানো ততক্ষণে তরোয়াল কোষমুক্ত করেছে। যোদ্ধারাও তরোয়াল খুলে স্তিফানোকে ঘিরে দাঁড়াল। শুরু হল তরোয়ালের খেলা। স্তিফানো ঘুরে ঘুরে যোদ্ধাদের তরোয়ালের মার ঠেকাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জন যোদ্ধা অল্প আঘাত নিয়ে খেলা থেকে সরে দাঁড়াল। স্তিফানোর অভিজ্ঞ হাতে তরোয়াল চালানো দেখে মৃদুস্বরে ফ্রান্সিস বলল—পোড় খাওয়া লড়িয়ে। তারপর চাপাস্বরে বলল—শাঙ্কো —আমি নিশ্চিত মন্ত্রী স্তিফানো য়ুরোপীয় জলদস্যু।

—বলো কি? শাঙ্কো একটু আবাকই হল। তখন নকল লড়াই চলছে। আরো তিনজন যোদ্ধা লড়াই থেকে সরে দাঁড়াল। এবার ফ্রান্সিস প্রহরিটিকে জিজ্ঞেস করল উনি কি এদেশের লোক?

—না—স্পেন দেশের লোক।

—তাহলে রাজা প্রোফেনের মন্ত্রী বিদেশী। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। উনি নিয়মিত যোদ্ধাদের অস্ত্র শিক্ষা দেন। প্রহরীটি বলল।

—আর সেনাপতি? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—শুধু সেনাপতি নয় রাজা প্রোফেন ও মন্ত্রীমশাইয়ের নির্দেশে চলেন। এখানে মন্ত্রী স্তিফানোর কথাই শেষ কথা। তাঁর ওপরে কথা বলার কেউ নেই। প্রহরী বলল।

নকল লড়াই শেষ। মন্ত্রী স্তিফানো তরোয়াল কোষবদ্ধ করল। তারপর কোমরে গোঁজা একটা রুমাল বের করে মুখের কপালের ঘাম মুছতে লাগল। প্রহরী ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—

—মন্ত্রী মশাইয়ের কাছে চল।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল। তারপর প্রহরীর পেছন পেছন স্তিফানোর কাছে এল। স্তিফানো ফ্রান্সিসদের দেখে সামান্য চম্‌কাল। কিন্তু সেটা বুঝতে না দিয়ে বলল—তোমরা তো দেখছি বিদেশী।

—হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। তোমরা তো জলদস্যুতা কর। স্তিফানো বলল।

—এসব অভিযোগ আমরা এর আগেও শুনেছি। আমরা এসব গায়ে মাখি না। তবু বলি—আমরা জলদস্যু নই। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। তোমরা কোত্থেকে কেন এখানে এলে? স্তিফানো জিজ্ঞেস করল। ফ্রান্সিস এলুডায় কী ঘটেছে সব বলল।

—হুঁ। এলুডার সর্দার নিজেকে রাজা মনে করতো। দু'দুবার ওরা এদেশে আক্রমণ করেছিল। দু'বারই ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি। যাক গে। স্তিফানো প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলল—এদের রাজসভায় নিয়ে এসো। স্তিফানো চলে গেল।

—যাক্—কয়েদঘরের হাত থেকে বাঁচলাম। শাঙ্কো শ্বাস ফেলে বলল।

—এখনই অতটা নিশ্চিত হয়ো না। স্তিফানো খুব ধুরন্ধর পুরুষ। ও বুঝেছে

আমি ওকে সহজেই চিনে ফেলেছি। কাজেই আমাদের মুক্ত রাখবে সে ভরসা কম। ফ্রা ন্সিস আস্তে আস্তে বলল।

প্রহরী ওদের চলার ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা প্রহরীটির পেছন পেছন চলল। সদর প্রবেশ পথ দিয়ে ওরা রাজবাড়িতে ঢুকল। একটা ছোট দরজা পার হয়ে ওরা রাজসভায় এল। প্রজাদের বেশ ভিড়। রাজা প্রোফেন প্রবীন পুরুষ। মুখে কাঁচা পাকা দাঁড়ি গোঁফ। একটু রোগাটে। মাথায় হীরে বসানো সোনার মুকুট। গায়ে মোটা চক্‌চকে কাপড়ের ঢোলা হাতা জামা। রাজাপ্রজাদের দিকে তাকিয়ে দেশীয় ভাষায় কিছু বলছিলেন। সিংহাসনে কাঠের চক্‌চকে কাপড়ের গদি পাতা। সিংহাসনের গায়ে রুপোর গিল্টি। দু'পাশে দুটি আসন। মন্ত্রী স্তিফানো আর সেনাপতি বসে আছে।

রাজা প্রোফেনের বক্তৃতা শেষ হল। প্রজারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল। ভিড় কমল।

মন্ত্রী স্তিফানো রাজাকে কিছু বলল। রাজা ফ্রান্সিসদের দেখলেন। হাত নেড়ে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলেন। ফ্রান্সিসরা এগিয়ে এল। রাজা স্পেনীয় ভাষায় কথা বলতে লাগলেন—তোমাদের কথা বলো। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে এলুডায় যা ঘটেছে সব বলল। পরে বলল—আপনার রাজত্বে আত্মরক্ষার জন্যে এসেছি। কোন সরাইখানায় আশ্রয় নেব। কয়েকদিন থেকে জাহাজে ফিরে যাব। মন্ত্রী স্তিফানো এবার গলা চড়িয়ে বলল—সব শুনলাম। কিন্তু এদেশের নিয়ম হচ্ছে বিদেশী দেখলেই তাকে বন্দী করা।

—আপনিও তো বিদেশী। ফ্রান্সিস বলল।

—আমিও প্রথমে বন্দী হয়েছিলাম। পরে নিজের যোগ্যতা প্রমান করে মন্ত্রী হয়েছি। স্তিফানো বেশ গর্ব্বের সঙ্গে বলল।

—আমরাও আমাদের যোগ্যতা প্রমান করতে—

—প্রয়োজন নেই। স্তিফানো ফ্রান্সিসকে থামিয়ে দিল। তারপর বলল—তোমাদের কয়েদঘরে ঢোকানো হবে। কথাটা বলে স্তিফানো রাজার মুখের দিকে তাকাল। রাজা আমতা আমতা করে বললেন এখানকার নিয়ম, কী করা যাবে। এখানে এটাই নিয়ম। বোঝা গেল স্তিফানোর ওপর কথা বলার ক্ষমতা রাজার নেই।

—কিন্তু আমাদের অপরাধ? ফ্রান্সিস বলল।

—অপরাধ নিয়ে কোন কথা নেই। বিদেশী হলেই হল। স্তিফানো হাত ঘুরিয়ে বলল—ফ্রান্সিস বুঝল—কয়েদঘরের বাস থেকে মুক্তি নেই। আবার পালাবার উপায় ভাবতে হবে। স্তিফানো প্রহরীদের ইঙ্গিত করল। একজন প্রহরী এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। ফ্রান্সিস এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল। তারপর দরজার দিকে হাঁটতে লাগল। তিনজন প্রহরী ফ্রান্সিসদের নিয়ে রাজবাড়ির বাইরে এল। ওদের নিয়ে চলল রাজবাড়ির পিছন দিকে।

রাজবাড়ির পূব কোণায় কয়েদঘর। ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল সবাই।



একজন প্রহরী কোমরে ঝোলানো চাবির বড় রিং বের করল। কয়েদঘরের তালা খুলল। ঢং ঢাং শব্দে লোহার দরজা খুলল। ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। কয়েদঘরে ঢুকে দেখা গেল মেঝেয় শুকনো ঘাসপাতা ছড়ানো। ফ্রান্সিস বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বসতে গিয়ে দেখল এক রোগাটে চেহারার বন্দী দেয়ালে ঠেসান দিয়ে চোখ বুঁজে বসে আছে। ততক্ষণে শাঙ্কোর চোখে ঘরের অন্ধকার সয়ে এল। এবার ভালো করে দেখল লোকটাকে। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ। পরনের পোশাক শতচ্ছিন্ন। শুকনো চোখমুখ।

শাঙ্কো লোকটার কাছে গেল। বলল—ভাই তুমি কতদিন বন্দী হয়ে আছো?

—হিসেব রাখি নি। লোকটি স্পেনীয় ভাষায় বলল। শাঙ্কো বেশ অবাক হল। বলল—তুমি স্পেনদেশী? লোকটি মাথা ওঠানামা করল।

—তোমাকে রাজা প্রোফেন বন্দী করেছেন কেন? শাঙ্কো বলল।

—রাজা নয়। স্তিফানো—স্তিফানো। আমার সাথী-সঙ্গী। লোকটি বলল।

—তোমার সঙ্গী হয়ে তোমাকে বন্দী করল? অবাক কান্ড। শাঙ্কো বলল।

—স্তিফানোর সব কান্ডই অবাক হওয়ার মত। লোকটি বলল।

—তোমার নাম কী? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—সার্ভো। লোকটি বলল।

—মনে হচ্ছে স্তিফানোর ওপরে তোমার বেশ রাগ। শাঙ্কো বলল।

—সব শুনলে বুঝবে স্তিফানো কী সাংঘাতিক লোক। সার্ভো বলল।

—কী ব্যাপার বলো তো। বলছো স্তিফানো তোমার সঙ্গী সাথী আবার বলছো সাংঘাতিক লোক। শাঙ্কো বলল।

—যাক গে। সে সব শুনে কী হবে। তোমরা তো স্তিফানোকে শায়েস্তা করতে পারবে না। সার্ভো কাশতে লাগল। কাশি আর থামে না।

—তুমি তো বেশ অসুস্থ দেখছি। শাঙ্কো বলল।

—বেঁচে আছি এটাই আমার ভাগ্য। তবে স্তিফানো যে কোনদিন আমাকে ফাঁসিতে লটকাতে পারে। আমার সঙ্গী হয়েও আমাকে মেরে ফেলতে ওর হাত কাঁপবে না। সার্ভো বলল।

—কী ভাবে তোমরা সঙ্গী ছিলে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

সার্ভো আবার কাশতে লাগল। কাশির শব্দে ফ্রান্সিস বিরক্ত হল। সার্ভোর দিকে তাকিয়ে বলল—এত কাশছো কেন? শরীর ভালো নেই? কাশি থামল। সার্ভো বলল—দিনের পর দিন এই কয়েদঘরে পড়ে থাকলে শরীর সুস্থ থাকে? বোকার মত কথা বলছো। ফ্রান্সিস আর কথা বলল না। বুঝল রোগার্ত মানুষটা বেশিদিন বাঁচবে না।

—ঠিক আছে। সবকিছু খুলে বলো তো। শাঙ্কো বলল।

—সে অনেক কথা। তুমি শুনে কী করবে? সার্ভো বলল।

—কিছু করতে পারি কিনা ভেবে দেখবো। শাঙ্কো বলল।

—আমরা দুজনে ছিলাম এক জাঁদরেল জলদস্যুর দলে। তুমি তো জানো না

একবার জলদস্যুদের দলে ঢুকলে পালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। দস্যু সর্দার তার সঙ্গীদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। নিরীহ নিরস্ত্র জাহাজযাত্রীদের ধনসম্পদ লুঠ করে ভাগ পেতাম। আমাদের সুখে থাকারই কথা। কিন্তু ভয়ও ছিল। য়ুরোপের কোন কোন রাজা দক্ষ সেনাপতির অধীনে সশস্ত্র সৈন্যসহ জাহাজ সমুদ্রে পাঠাতো। জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের হারিয়ে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতো। তারপর ফাঁসি দিতো। এই ভয় ছিল। তাই পালাবার তালে ছিলাম। স্তিফানো ছিল আমার দলের সঙ্গী। এই দেশের কাছ দিয়ে সেই রাতে আমাদের ক্যারাভেল জাহাজ যাচ্ছিল। একদিন গভীর রাতে জাহাজের গায়ে বাঁধা নৌকো খুলে নিয়ে পালালাম। এই দেশে এলাম।

সার্ভো আবার কাশতে লাগল। কাশি থামলে শাঙ্কো বলল—

—তারপর?

—এই দেশে আশ্রয় নিয়ে কিছুদিন সুখেই কাটল। স্তিফানো আমাকে বারবার বোঝালো রাজা প্রোফেন কোনভাবেই যেন জানতে না পারেন যে আমরা জলদস্যু ছিলাম। আস্তে আস্তে স্তিফান যোদ্ধাদের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। স্তিফান তরোয়ালের লড়াই ভালোই জানতো। ওর নিপুণহাতে তরোয়াল চালানো দেখে এদেশের যোদ্ধারা অবাক। স্তিফান ওদের তরোয়াল চালানো শেখাতে শেখাতে যোদ্ধাদের নিজের দলে টানতে লাগল। যোদ্ধাদের ওপর সেনাপতির আর কোনও প্রভাবই রইল না। স্তিফান সর্বশক্তিমান হয়ে উঠল। এবার স্তিফান রাজাকে মৃত্যুভয় দেখাতে লাগল। রাজাও দেখলেন যোদ্ধারা স্তিফানের কথায় ওঠে বসে। স্তিফান যে কোন মুহূর্তে তাঁকে হত্যা করতে পারে। অসহায় রাজা স্তিফানের আধিপত্য মেনে নিলেন। সার্ভো থামল। একটু কাশতে লাগল।

—পরের ঘটনা বলো। শাঙ্কো বলল।

—এবার স্তিফানোর নজর পড়ল আমার ওপর। স্তিফানের আসল পরিচয় একমাত্র আমিই জানি। আমার ওপর রাজাকে বিরূপ করে তুলল। বলল—এক, আমি বিদেশী। দুই আমি জলদস্যু ছিলাম। অনেক নিরীহ মানুষ হত্যা করেছি। স্তিফানের পরামর্শে রাজা আমাকে কয়েদঘরে বন্দী করলেন। সার্ভো থামল।

—আমার মনে হয় রাজা বাধ্য হয়ে তোমাকে বন্দী করেছেন। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক তাই। তবে রাজা আমাকে দেশত্যাগ করার শাস্তি দিতে পারতেন। তাহলে এই কয়েদঘরে আমাকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হত না। সার্ভো বলল।

—ঠিক আছে। ভাই সার্ভো—পরে কথা হবে। শাঙ্কো বলল।

তারপর ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল ফ্রান্সিস—তোমার অনুমানই ঠিক। স্তিফানো জলদস্যুদের দলে ছিল। সার্ভোকে দেখিয়ে বলল—

—ও সার্ভো। ও নিজেও সেই জলদস্যুদের দলে ছিল। তারপর শাঙ্কো আস্তে আস্তে সার্ভোর কাছে যা শুনেছে সব বলল। সব শুনে ফ্রান্সিস বলল—

—স্তিফানোকে দেখে ওর সঙ্গে কথা বলেই বুঝেছি ও সাংঘাতিক মানুষ।

সার্ভোকে যে এতদিনে মেরে ফেলেনি এটা সার্ভোর সৌভাগ্য। তারপর ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল—দেখবে—স্তিফানো সার্ভোকে এখান থেকে সরাবে।

—কেন? শাঙ্কো বলল।

—কারণ স্তিফানো জানে ওর আসল পরিচয় জানে একমাত্র সার্ভো। এখন এই ঘরেই ও আছে। আমরাও আছি। ও নিশ্চয়ই কথাপ্রসঙ্গে স্তিফানোর আসল পরিচয় আমাদের কাছে বলবে। এটা স্তিফানো চাইবে না। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

ফ্রান্সিসের অনুমান যে সঠিক সেটা কিছুক্ষণ পরেই বোঝা গেল। একজন প্রহরী লোহার দরজায় ঢং ঢং শব্দ করে বলল—সার্ভো—তুমি বেরিয়ে এসো।

—কেন? বেশ তো আছি। সার্ভো বলল।

—না। মন্ত্রীর আদেশ—তুমি অন্য জায়গায় থাকবে। প্রহরী বলল।

—না। আমি অন্য কোথাও যাবো না। সার্ভো মাথা নেড়ে বলল।

—মন্ত্রীমশাই ডেকেছেন। তোমাকে যেতেই হবে। প্রহরী চেঁচিয়ে বলল।

ফ্রান্সিস বলে উঠল—মন্ত্রীমশাইকে এখানে আসতে বলো।

—কী বলছো? মন্ত্রীমশাই এলে তোমাদের দু'জনেরই প্রাণ যাবে। প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে। তুমি গিয়ে বলো তো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তোমাদের মরতে হবে। প্রহরী বলল। তারপর চলে গেল।

শাঙ্কো বলল—এটা কি ভালো হল? স্তিফানো চটে গেলে আমাদের বিপদই বাড়বে।

—আমি নিশ্চিত স্তিফানো সার্ভোকে মেরে ফেলবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ওদের ব্যাপার ওরা বুঝুক। সিনাত্রা বলল।

—তা হয় না। একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করবে—এটা নির্দ্বিধায় মেনে নেবো? ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি সার্ভোকে বাঁচাতে পারবে? শাঙ্কো বলল।

—এখানে থাকলে ওর জীবন বিপন্ন হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই স্তিফানো এসে হাজির। ঢং ঢং শব্দে দরজা খুলে গেল। স্তিফান কয়েদঘরে ঢুকল।

—সার্ভো—স্তিফানো প্রায় গর্জন করে উঠল—তোমার এত সাহস আমার হুকুম অমান্য করো।

সার্ভো ভয়ে কুঁকড়ে গেল। ভীতস্বরে বলল—আমি তো যেতেই চেয়েছিলাম। ফ্রান্সিসসকে দেখিয়ে বলল—ও আমাকে যেতে দিল না। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে স্তিফানো বলল—তুমি সার্ভোকে যেতে দাও নি?

—হ্যাঁ। ও এখানেই থাকবে। ফ্রান্সিস শান্তভঙ্গীতে বলল।

—সার্ভো আমার সম্পর্কে তোমাদের কিছু বলেছে? স্তিফানো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—কী বলেছে? স্তিফানো বলল।

—বলেছে—ও আর আপনি একসঙ্গে এক জলদস্যুর দলে ছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—মিথ্যে কথা। স্তিফানো বলল।

—আমি সত্যি কথাটাই বললাম। ফ্রান্সিস বলল। কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্তিফোনো তরোয়াল কোষমুক্ত করল। দাঁত চাপাস্বরে বলল—

—এই পাহারাদারদের সামনে আমাকে অপমান করছো। জানো তোমাদের দু'জনকে এক্ষণি আমি হত্যা করতে পারি। স্তিফানো বলল।

—নিশ্চয়ই পারেন। আমরা নিরস্ত্র। ফ্রান্সিস বলল।

—অস্ত্র থাকলে কী করতে। স্তিফানো বলল।

—বাঁচবার চেষ্টা করতাম। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তোমাকে তরোয়াল দেওয়া হবে। আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি। স্তিফানো দাঁতচাপাস্বরে বলল।

—মিছিমিছি লড়াই—ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে দিল না।

—কাপুরুষ। স্তিফানো দেঁতো হাসি হেসে বলে উঠল।

—ঠিক আছে। আমি রাজি। ফ্রান্সিস বলল।

—কাল সকালে তোমাকে ডাকা হবে। স্তিফানো বলল।

—বেশ তবে লড়াইয়ের জায়গায় আমার বন্ধুরা আর সার্ভো থাকবে। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ।। পাহারায় থাকতে হবে। স্তিফানো কট্‌মট্ করে একবার সার্ভোর দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল। তরোয়াল কোষবদ্ধ করল। তারপর চলে গেল। শাঙ্কো বলল—

ফ্রান্সিস—এটা কী করলে? স্তিফান তোমাকে হত্যা করবে। তারপর সার্ভোকেও—শাঙ্কোর কথা শেষ হল না। ফ্রান্সিস বলল—

—জানি। জেনেশুনেই আমি রাজি হয়েছি। শোন—স্তিফানোকে তরোয়াল চালাতে দেখেছি। আক্রমন করার সময় ও বাঁদিকটা অরক্ষিত রাখে। ওখান দিয়েই আমি আক্রমন করবো। ফ্রান্সিস বলল।

রাতে খেতে বসে সার্ভো ফ্রান্সিসকে বলল—

—ভাই—তুমি আমার জন্যে তোমার জীবন বিপন্ন করছো। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে সার্ভোর পিঠ চাপড়াল।

—জানো না স্তিফানো কত বড় যোদ্ধা। তরোয়ালের লড়াইয়ে ওকে কখনও হারতে দেখিনি। সার্ভো বলল।

—দেখা যাক্। ফ্রান্সিস খেতে খেতে মাথা ওঠা নামা করল।

পরদিন সকালের খাবার দিতে এসে প্রহরী বলল—

—খেয়ে দেয়ে তৈরী হয়ে নাও। তোমাদের সবাইকে যেতে হবে।

প্রান্তরের একপাশে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। তার নীচে একটা কাঠের আসন পাতা হয়েছে। দ্বন্দ্বযুদ্ধের খবর রটে গেছে। দলে দলে লোক ভিড় করল। যোদ্ধারাও ভিড় করল এসে।

এক সময় রাজা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে স্তিফানো। রাজা এসে আসনে বসলেন। পাশে সেনাপতি।

কড়া পাহারায় ফ্রান্সিস ও শাঙ্কোরা এল। একজন যোদ্ধা ফ্রান্সিসকে একটা তরোয়াল দিল। তরোয়াল নিয়ে ফ্রান্সিস রাজার সামনে গোল ফাঁকা জায়গাটায় এসে দাঁড়াল। এবার স্তিফানো এসে ফ্রান্সিসের সামনে দাঁড়াল। ঝনাৎ শব্দে তারবারি কোষমুক্ত করল। বলল—

—আমাকে যে অপবাদ দিয়েছো। তার জন্যে-সর্বসমক্ষে মাপ চাও।

—আমি মিথ্যে অপবাদ দিই না। যা বলেছি সত্যি বলেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে মরো। স্তিফানো বলল।

স্তিফানো তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দ্রুত মার ঠেকাল। দু'জনেই তরোয়াল চালাতে লাগল ঠং ঠং ধাতব শব্দ হতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই লড়াই জমে উঠল। স্তিফানো ভেবেছিল সহজেই ফ্রান্সিসকে কাবু করা যাবে। কিন্তু ফ্রান্সিসের নিপুণ তরোয়াল চালানো দেখে বুঝল এ বড় কঠিন ঠাঁই। সহজে হারানো যাবে না। দু'জনেই তীক্ষ্ণ চোখে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। তরোয়ালের মার কোনদিক থেকে আসছে আন্দাজ করে নিচ্ছে। দু'জনেই ঘন ঘন শ্বাস ফেলেছে। উপস্থিত রাজা প্রজারা, শাঙ্কোরা দুই যোদ্ধার দ্বন্দযুদ্ধ রুদ্ধশ্বাসে দেখছে। ফ্রান্সিস খুব বেশি আক্রমন করছিল না। ও স্তিফানোকে বেশি নড়া চড়া করতে বাধ্য করল। এতে স্তিফানো বেশি পরিশ্রান্ত হল। ফ্রান্সিস সেই সুযোগটা নিল। এবার স্তিফানোর মার ঠেকিয়ে এক লাফে এগিয়ে বাঁ দিক দিয়ে স্তিফানোর তরোয়ল প্রানপনে এক ঘা মারল। স্তিফানোর হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। স্তিফানো বসে পড়ল। নিরস্ত্র স্তিফানে মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। চোখে মুখে মৃত্যু-ভীতি। ফ্রান্সিস স্তিফানোর বুকের ওপর দিয়ে তরোয়ালের ডগা টেনে নিল। স্তিফানোর জামা বুকের দিকে কেটে গেল। দেখা গেল বুকে তরোয়ালের ঘা-এর ক্ষত। গভীর ক্ষত চিহ্ন। স্তিফানো তাড়াতাড়ি জামা টেনে বুক ঢাকল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এবার তো বলবেন আমি মিথ্যে অপবাদ দিইনি। স্তিফানো কোন কথা বলল না। মাথা নিচু করে হাঁপাতে লাগল। ওর আশঙ্কা ছিল হয়ত ফ্রান্সিস ওর বুকে তরোয়াল বসিয়ে দেবে। ফ্রান্সিস তা করল না দেখে ওর মৃত্যু ভয়ে কেটে গেল। ও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

উপস্থিত লোকেদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। ওরা কল্পনাও করেনি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে স্তিফানো হেরে যাবে। সার্ভো ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল।

রাজা আসন থেকে উঠে রাজবাড়ির দিকে চললেন। দর্শকদের ভিড় পাতলা

হতে লাগল। স্তিফানো মাটি থেকে তরোয়াল তুলে কোষবদ্ধ করল। তারপর কোন কথা না বলে রাজবাড়ির পেছন দিকে চলল। বোধহয় ওদিকেই মন্ত্রীর আবাস। ফ্রান্সিস শাঙ্কোদের কাছে এল।

চার পাঁচজন প্রহরী ছুটে এসে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। ওদের কয়েদঘরের দিকে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিসের শরীরও অক্ষত ছিল না। বাঁ বাহুতে তরোয়ালের খোঁচা লেগেছিল। রক্ত পড়ছিল। ক্ষতস্থান ডানহাতের চেটো দিয়ে চেপে ধরে হাঁটতে লাগল। একজন প্রহরী ফ্রান্সিসের হাত থেকেও তরোয়ালটা নিয়ে নিল।

কয়েদঘরের সামনে এল ওরা। প্রহরী ঢং ঢং শব্দে দরজা খুলল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। একজন প্রহরীকে ডাকল।

প্রহরী ওর কাছে এল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল—

—ওর হাত কেটে গেছে। একজন বৈদ্যি ডাকো।

—মন্ত্রীমশায়ের হুকুম ছাড়া বৈদ্যি ডাকা যাবে না। প্রহরী বলল।

—ওর হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে। ওর কষ্ট হচ্ছে। অথচ মন্ত্রীর হুকুম ছাড়া বৈদি আনাবে না। শাঙ্কো বেশ গলা চড়িয়ে বলল।

—নিয়ম নেই। প্রহরীরও এক কথা।

—বেশ মন্ত্রীকে গিয়ে ওর অবস্থার কথা বল। দেখা যাক মন্ত্রী কী বলে। শাঙ্কো বলল। প্রহরী কিছুক্ষণ পরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে একজন বৃদ্ধকে নিয়ে এল। বৃদ্ধের হাতে কাপড়ের ঝোলা। বোঝা গেল বৈদ্যি। বৈদ্যি কয়েদঘরে ঢুকল। শায়িত ফ্রান্সিসকে ইঙ্গিতে উঠে বসতে বলল। ফ্রান্সিস উঠে বসল। একটু ক্লান্ত স্বরে বলল—ওষুধের দরকার নেই। এমনিতেই সেরে যাবে।

—হুঁ—দেখছি। বৈদ্যি বিড় বিড় করে বলল।

বৈদ্যি ফ্রান্সিসদের জামার হাতা সরিয়ে বেশ মনোযোগ দিয়ে কাটা জায়গাটা দেখলো। আস্তে আস্তে বলল—ঘা বিষিয়ে উঠতে পারে। শুনলাম তরোয়াল লড়াইয়ে তুমি মন্ত্রীমশাইকে হারিয়েছো। তুমি বাহাদুর—এটা বলতেই হবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। বৈদ্যি কাপড়ের ঝোলা থেকে কয়েকটা কাঠের বোয়াম বের করল। বোয়ামগুলো থেকে আঙুলের ডগায় কালো হলুদ সবুজ রঙের গলা কিছু বের করল। তারপর সব মিশিয়ে হাতের তালুতে ঘষে বড়ি বানাল। একটা হাতে পিষে ক্ষতস্থানে লাগাল। উঃ ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। বোধহয় জ্বালা করে উঠেছে। একটু পরেই বোধহয় জ্বালা কমল। বৈদ্যি বড়ি গুলো হাতে নিয়ে শাঙ্কোর দিকে বাড়িয়ে ধরল। বলল—প্রতিদিন একটা বড়ি খাওয়াবে। ভয় নেই। সেরে যাবে।

বৈদ্যি কাঠের বোয়ামগুলো ঝোলায় ভরল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর উঠে দাঁড়াল। দরজায় দাঁড়নো প্রহরীদের দেখে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল—মন্ত্রীমশাই লোক ভালো না। সাবধান। ফ্রান্সিসের ক্ষতস্থান দেখল। যাক্—রক্ত। পড়া বন্ধ হয়েছে। বৈদ্যিবুড়ো চলে গেল।

একটু বেলায় দু'জন প্রহরী খাবার নিয়ে এল। গোল একটা পোড়া রুটি। আর সামুদ্রিক মাছের ঝোল। খেতে খেতে শাঙ্কো বলল—এখন কেমন বোধ করছো?

—ভালো। জ্বালা যন্ত্রনা অনেকটা কমেছে ফ্রান্সিস বলল।

—স্তিফানো আমার ওপর এত সদয় হল—বৈদ্যি পাঠাল। সিনাত্রা বলল।

—স্তিফানো ধুরন্ধর পুরুষ। সময় সুয়োগ বুঝে ঠিক আমাদের ক্ষতি করতে চাইবে। ওকে বিশ্বাস নেই। দীর্ঘদিন নিরস্ত্র নিরীহ জাহাজ যাত্রীদের হত্যা করেছে। দয়া মায়া বলে ওর মনে কিছু নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—আমারও তাই মনে হয়। তার ওপরে রাজার সামনে প্রজাদের সামনে যোদ্ধাদের সামনে ওভাবে তোমার কাছে হেরে গেল। শোধ তুলতে ও তক্কে তক্কে থাকবেই। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক বলেছো। আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। সার্ভো ফ্রান্সিসদের কথা শুনছিল। এবার বলল—স্তিফানো অনেক বড়কিছুর জন্যে এখানে ঘাঁটি গেড়েছে।

—বড় কিছু মানে? ফ্রান্সিস সার্ভোর দিকে তাকাল।

—তাহলে তো তোমাদের এখানকার এক অতীত ইতিহাস বলতে হয়। সার্ভো বলল।

—বেশ বলো।

—খেয়ে নিয়ে বলছি। সার্ভো বলল।

দুপুরে খাওয়ার পাট চুকল। এবার ফ্রান্সিস বলল—এখানকার অতীত ইতিহাস কী বলছিলে।

—এখানে এসেই জেনেছি সেই ইতিহাস। একটু থেমে সার্ভো বলতে লাগল—প্রায় শ'দড়েক বছর আগে এখনকার রাজা প্রোফেনের এক পূর্বপুরুষ রাজা ছিলেন—মুস্তাকিন। প্রচুর ধনসম্পদের মালিক ছিলেন তিনি। সোনা হীরে মনি মুক্তোর ভান্ডার ছিল তাঁর। কীভাবে তিনি সেসব সংগ্রহ করেছিলেন তা কেউ জানে না। এই নিয়ে নানা জনে নানা কথা বলে। তিনি সেসব কোথায় গোপনে রাখতেন তা তাঁর রানিও জানতেন না। সার্ভো থামল।

—তাহ'লে রাজা মুস্তাকিনের ধনসম্পদের হদিশ কেউ জানে না? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। রাজা প্রোফেনও কিছু জানে না।

—রাজা প্রোফেন সেই ধনভান্ডার উদ্ধার করার চেষ্টাও করেন নি?

—শুনেছি রাজা হয়ে প্রোফেন অনেক চেষ্টা করেছিলেন ঐ ধনভান্ডার উদ্ধার করতে কিন্তু পারেন নি। সার্ভো বলল।

—স্তিফানো? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো।

—সেটাই তো আমার বলার। ঐ ধনভান্ডার খুঁজে বেড়িয়েছে। তখন আমার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল। আমাকেও বার কয়েক সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল।

—কোথায়? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—ঐ লুভিনা পাহাড়ে। পাহাড়ের নিচে জঙ্গলে। সার্ভো বলল।

—রাজবাড়িতে খোঁজে নি? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। রাজবাড়িতেও খুঁজেছে। কিন্তু কোন হদিশ পায়নি। তখনই আমাকে ও বলেছিল—ঐ ধনভান্ডার খুঁজে বের করে সব নিয়ে এই রাজত্ব থেকে পালিয়ে যাবো। ওর লোভের শেষ নেই। সার্ভো বলল।

—তাই স্তিফানো এখানে ঘাঁটি গেড়েছে। ওর লক্ষ্য ঐ ধনভান্ডার চুরি। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক বলেছো। সার্ভো বলল।

—কিন্তু আমি তা হতে দেব না। ঐ ধনভান্ডার আমিই উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি! পারবে? সার্ভো অবাক হয়ে বলল—কেউ পারছে না তুমি পারবে? এবার শাঙ্কো বলল—ওর নাম ফ্রান্সিস —এর আগে অনেক গুপ্ত ধনভান্ডার ও আবিষ্কার করেছে চিন্তা বুদ্ধি আর পরিশ্রমের সাহায্যে। কাজেই নিশ্চিন্ত থাকো ফ্রান্সিস ঠিক ঐ ধনভান্ডারের হদিশ বের করতে পারবে।

—তাহলে তো খুবই ভালো হয়। কিন্তু গুপ্ত ধনভান্ডার আবিষ্কৃত হলে স্তিফানো আসল চেহারা ধরবে। তোমাদের খুন করতেও পেছপা হবে না। নরহত্যা করেও ও নিবিঘ্নে ঘুমোয়। ও কী নির্মম কী নিষ্ঠুর তা কল্পনাও করতে পারবে না। সার্ভো বলল।

—সে সব সময়মত ভাববো। এখন রাজা প্রোফেনের সঙ্গে দেখা করা দরকার। ফ্রান্সিস বলল। সিনাত্রা সব শুনছিল। এবার একটু ভীত স্বরে বলল—রাজাকে চটিও না যেন।

—না-না। ফ্রান্সিস মাথা নাড়িয়ে হেসে বলল—আমি শুধু জানতে চাইবো এই গুপ্ত ধনভান্ডার সম্পর্কে উনি কী জানেন। দেখি রাজা কী বলেন? দেখি রাজার কথা থেকে কোন সূত্র পাই কিনা। তারপর শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—প্রহরীকে বলো তো আমরা রাজার সঙ্গে দেখা করব।

—বলছি। শাঙ্কো দরজার কাছে গেল। একজন প্রহরীকে ইশারায় ডাকল। প্রহরী কাছে এলে বলল—রাজা প্রোফেনকে গিয়ে বলো যে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—মন্ত্রীমশাই-এর হুকুম নাহলে রাজার সঙ্গে দেখা করা যাবে না। প্রহরী ঘাড় নেড়ে বলল।

—মজা মন্দ না—শাঙ্কো হেসে বলল—সব ব্যাপারেই মন্ত্রীমশাইয়ের অনুমতি নিতে হবে। প্রহরী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা বলল না।

—যাও। শাঙ্কো তাড়া লাগল।

—মন্ত্রী মশাইকে বলছি। এই বলে প্রহরীটি চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে স্তিফানো এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—কী ব্যাপার? রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাইছো কেন? ফ্রান্সিস দরজার দিকে যেতে যেতে বলল—যা বলার রাজাকেই বলবো।

—উঁহু—তার আগে আমাকে বলো।

—বেশ। শুনলাম রাজা প্রোফেনের এক পূর্বপুরুষ রাজা মুস্তাকিম তাঁর প্রচুর ধনসম্পদ গোপনে এই রাজ্যের কোথাও রেখে গেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি কী ভাবে শুনলে? স্তিফানো জানতে চাইল।

—সার্ভো বলেছে। ফ্রান্সিস বলল। স্তিফানো গলা চড়িয়ে বলল—সার্ভো তুমি এসব বলেছো?

—এটা গোপনে রাখার ব্যাপার নয়। প্রজাদের জিজ্ঞেস করুন। বোধহয় তারাও জানে। তবে কেউ জানে না সেই ধনসম্পদ গোপনে কোথায় রাখা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। এসব জেনে তোমার লাভ? স্তিফানো বলল।

—আমি সেই ধনসম্পদ উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

স্তিফানো হো হো করে হেসে উঠল। বলল—রাজা প্রেফেনের পূর্বপুরুষরা কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন রাজা প্রোফেনও কম চেষ্টা করেননি—কেউ সেই ধনভাণ্ডারের হদিশ পেল না আর তুমি কোত্থেকে এলে সেসব উদ্ধার করতে। এসব পাগলামি ছাড়ো।

—ঠিক আছে। ধরে নিন না এটা আমার পাগলামি। রাজার সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। কাল সকালে রাজসভায় এসো। তবে এটাও জেনো রাজার পূর্বপুরুষ রাজা এবং আমিও তোমার চাইতে কম বুদ্ধিমান নই। স্তিফানা বলল।

—তাহ'লে কাল সকালে আমরা রাজসভায় যাবো? শাঙ্কো বলল।

—এসো। দেখ কথা বলে। তবে গুপ্ত ধনভান্ডার খুঁজতে গিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই হাল ছেড়ে দেবে। যেমন অনেকেই অনেকদিন আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছে। স্তিফানো বলল

—দেখা যাক। শাঙ্কো বলল।

স্তিফানো হাসতে হাসতে চলে গেল।

পরদিন ফ্রান্সিসরা সবে সকালের খাবার খাওয়া শেষ করেছে একজন প্রহরী কয়েদঘরের দরজার কাছে এল। বলল—চলো—তোমাদের রাজসভায় নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে। কিন্তু সার্ভো নামে যে আছে সে যেতে পারবে না। শাঙ্কো সার্ভোকে বলল—তুমি ভাই থাকো। আমরাই যাচ্ছি।

ফ্রান্সিসদের কয়েদঘর থেকে বের করা হল। তিনজন প্রহরী খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল।

ফ্রান্সিসরা যখন রাজসভায় পৌঁছল তখন বিচারের কাজ চলছিল। ফ্রান্সিসদের অপেক্ষা করতে হল।

বিচার শেষ। বিচার প্রার্থী চলে গেল। ফ্রান্সিস একটা জিনিস লক্ষ্য করল বিচারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ও রাজা স্তিফানোর সঙ্গে পরামর্শ করে নিচ্ছেন। বোঝাই গেল স্তিফানো রাজাকে বেশ ভালো ভাবে কব্জা করেছে।

এবার রাজা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকালেন। কাছে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

ফ্রান্সিস এগিয়ে মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—মহামান্য রাজা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।

—কী প্রয়োজন?

ফ্রান্সিস রাজা মুস্তাকিমের গুপ্ত ধনের কথা বলে বলল—আপনার কাছে জানতে এসেছি এ ব্যাপারে আপনি কী জানেন?

—কেন বলো তো? রাজা বললেন।

—আমরা সেই গুপ্তধন খুঁজে বের করব। ফ্রান্সিস বললেন।

—অসম্ভব। পারবে না। রাজা বললেন।

—আমি ওদের সেকথা বলেছি। স্তিফানো হেসে বলল।

—ঠিক আছে। মান্যবর রাজা—তবু আপনাকে অনুরোধ করি—এ ব্যাপারে আপনি যা জানেন বা শুনেছেন বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—সত্যি বলতে কি আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা মুস্তাকিম বেশ খেয়ালি ধরনের মানুষ ছিলেন। সময় নেই অসময় নেই মাঝে মাঝেই ঐ লুভিনা পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। তখন তিনি তাঁর দেহরক্ষীদেরও সঙ্গে নিতেন না। রাজা বললেন।

—আচ্ছা— এই রাজবাড়িতেও খোঁজা হয়েছে কী? ফ্রান্সিস জানতে চাইল। রাজা স্তিফানোর দিকে তাকালেন। স্তিফানো বলল—তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। কোন হদিশ মেলে নি।

—ঠিক আছে। এবার আমার একটা অনুরোধ। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। রাজা বললেন।

—পাশের রাজ্য এলুডায় নিরপরাধকেও পুড়িয়ে মারা হয়। এই পাশবিক শাস্তি বন্ধ হোক এটাই আমি চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে এলুডা জয় করতে হয়। রাজা বললেন।

—আমি তাই করতে আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। ওখানকার সর্দারকে আমরা হত্যা করেছি। কিন্তু আবার কেউ না কেউ সর্দার হয়েছে আর ঐ অমানবিক শাস্তির নিয়ম চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা ও ব্যবস্থা বন্ধ করতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তোমরা তো মাত্র তিনজন। রাজা বললেন।

—না। আমাদের জাহাজে আরোও পঁচিশ তিরিশ জন বন্ধু রয়েছে। সবাই মিলে আমরা এলুডা আক্রমন করবো। আমাদের জয় হবেই। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা প্রোফেন স্তিফানোর দিকে তাকালেন। স্তিফানো কিন্তু ফ্রান্সিসের অনুরোধে রাজি হল। ফ্রান্সিস একটু অবাকই হল যখন স্তিফানো বলল—এ তো ভাল কথা। এলুডা জয় করতে পারলেই আমরা ঐ শাস্তির ব্যবস্থা বন্ধ করতে পারবো।

—আর একটা অনুরোধ। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। রাজা বললেন।

আমাদের বন্ধুদের এখানে নিয়ে আসতে হবে। তাদের তো এনে কয়েদঘরে তোলা যায় না। আপনি একটা বড় ঘরের ব্যবস্থা করুন। কথা দিচ্ছি-আমরা পালাবো না। ফ্রান্সিস আরো বলল—তাছাড়া গুপ্ত ধনসম্পদ খুঁজতে গেলে আমাদের তিনচারজনকে স্বাধীনভাবে চলা ফেরার সুযোগ তো দিতে হবে। রাজা স্তিফানোর দিকে তাকালেন।

—এ ব্যাপারে আমার একটা নিয়ম তোমাদের মানতে হবে। স্তিফানো বলল—

—বলুন—কী নিয়ম? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—এক—তোমরা জঙ্গল পাহাড় থেকে পালাতে পারবে না। দুই—গুপ্তধন উদ্ধার করে সেসব নিয়ে পালাতে পারবে না। স্তিফানো বলল।

—বেশ—আপনার নিয়মে আমরা রাজি। তবে এই সঙ্গে বলে রাখি গুপ্ত ধনভান্ডার উদ্ধার করতে পারলে একটা রুপোর মুদ্রাও আমরা নেব না। রাজাকেই সব দেব। কারণ গুপ্তধনের উপর একমাত্র তাঁরই অধিকার আছে। ফ্রান্সিস বলল।

স্তিফানো হেসে বলল—এমন ভাবে বলছ যেন এরমধ্যেই গুপ্তধন আবিষ্কার করে ফেলেছো।

—এখনই সে কথা বলার সময় যে আসেনি—সেটা আমি জানি। গুপ্তধন আবিষ্কার করার পর আমরা কি করব সেটাই বলে রাখলাম। এবার আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

স্তিফানো সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলল—যান—সৈন্যাবাসের একটা ঘর ওদের ছেড়ে দিন। সেনাপতি আসন থেকে উঠে ফ্রান্সিসদের তার সঙ্গে আসার জন্যে ইঙ্গিত করল।

ফ্রান্সিসরা ফিরে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তখনই স্তিফানো বলে উঠল—কিন্তু সার্ভো কয়েদঘরে থাকবে। ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। বলল—মান্যবর রাজা—সার্ভোকেও আমাদের সঙ্গে থাকতে দিন। সার্ভো এখানকার সব জায়গা ভালোভাবে চেনে জানে। ওকে নিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে আমাদের সুবিধে হবে। রাজা একবার স্তিফানোর দিকে নিয়ে তাকিয়ে বলল—সার্ভোর দায়িত্ব তুমি নিচ্ছো?

—হ্যাঁ। সার্ভো পালালে আমাকে যা শাস্তি দেবার দেবেন। ফ্রান্সিস বলল। স্তিফানো আর কোন আপত্তি করলো না। বোধহয়, ভাবল সার্ভো পালালে ফ্রান্সিসকে চিরদিনের জন্যে কয়েদঘরে আটকে রাখা যাবে। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

ফ্রান্সিসরা সেনাপতির সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ির বাইরে চলে এল। সেনাপতি সৈন্যাবাসের দিকে চলল। সৈন্যাবাসের কাছে এসে কয়েকটা ঘর পার হয়ে একটা বড় লম্বাটে ঘরের সামনে এল। দরজা ভেজানো ছিল। সেনাপতি দরজা খুলল। খালি ঘর। বলল—এই ঘরে তোমরা থাকবে। কিন্তু পালাবে না। পালাবার চেষ্টা করলে বাঁচবে না।

—জানি। আর একটা অনুরোধ—আমাদের একজন বন্ধু আপনার সঙ্গে যাবে। কয়েদঘরে সার্ভো নামে একজন বন্দী হয়ে আছে। তাকে মুক্ত করে এই ঘরে পাঠিয়ে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। আমার সঙ্গে কে আসবে এসো। সেনাপতি বলল।

—চলুন। শাঙ্কো এগিয়ে এল।

দু'জনে কয়েদঘরের দিকে চলল। কয়েদঘরের সামনে এসে সেনাপতি প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বলল—একজন বন্দী আছে। ওকে ছেড়ে দাও। প্রহরীদের মধ্যে একজন লোহার দরজা ঢং ঢং শব্দ খুলে ডাকল—ওহে—বাইরে এসো। তোমাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

সার্ভো দু'লাফে কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। শাঙ্কো বলল—আমার সঙ্গে চলো। সেনাপতি চলে গেল। সার্ভো দাঁড়িয়ে রইল। ও তখনও ওর মুক্তির ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। শাঙ্কো হেসে বলল—আবার কয়েদঘরে ঢোকার ইচ্ছে নাকি?

—না-না—সার্ভো বলল—ভাই তোমরা আমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিলে। আমি তোমাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

—ঠিক আছে। এখন চলো। শাঙ্কো বলল।

সার্ভোকে নিয়ে শাঙ্কো ওদের ঘরে নিয়ে এল। সার্ভো প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—ভাই তোমার জন্যেই আমি মুক্তি পেলাম। ফ্রান্সিস বলল—

—এখনও তুমি সম্পূর্ন মুক্ত নও। তবে আমি তোমাকে সম্পূর্ন মুক্ত করবো। কিন্তু একটা কথা। তোমার পক্ষে এখন পালানো খুব সহজ। কিন্তু আমার অনুরোধ পালাবার চেষ্টা কর না। যদি তুমি পালিয়ে যাও আমাদের সারা জীবন ঐ কয়েদঘরে পচতে হবে। আশা করি তুমি সেটা করবে না।

—না-না। ফ্রান্সিস—ভাই তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই করবো। সার্ভো বলল।

—কথাটা মনে থাকে যেন। ফ্রান্সিস বলল।

ঘরের মেঝেতে শুকনো ঘাস পাতারই বিছানা। তবে সেসব দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। তার ওপর পরিষ্কার মোটা কাপড়ের বিছানা পেতে দিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়তে পড়তে বলল—একটু আরাম করা যাক। কয়েদঘরে যেভাবে দিনরাত কেটেছে। শাঙ্কোও আধশোয়া হল। সিনাত্রা আর সার্ভো বসে রইল।

তখন দুপুর। সৈন্যবাসের রাঁধুনি ওদের খেয়ে নিতে ডাকল। সৈন্যবাসের লাগোয়া খাবার ঘরে ফ্রান্সিসরা খেতে গেল। মেঝেয় টানা খাবারের জায়গা করা হয়েছে। সৈন্যদের সঙ্গে ফ্রান্সিসরাও খেতে বসল। খেতে দেওয়া হল তেলে ভাজা রুটি আর পাখির মাংস। ফ্রান্সিস হেসে বলল—আমরা তাহলে জাতে উঠেছি। ঐরকম মাংস খেয়ে বুদ্ধি আর শক্তি দুটোকেই কাজে লাগানো যায়।

—যা বলেছো। শাঙ্কোও হেসে বলল। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল—

—এখন চিন্তা হল বন্ধুদের কী করে এখানে আনা যায়। ফ্রান্সিস বলল।

—এটা তো সমস্যাই। এলুডা রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যাওয়া যাবে না। ওরা আমাদের কাউকে পেলে পুড়িয়ে মারবে। ওদের নজর এড়িয়েও যাওয়া আসা করা যাবে না। শাঙ্কো বলল।

—একমাত্র উপায় খাঁড়ির মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে পৌঁছানো কিন্তু তার জন্যে নৌকা তো চাই। নৌকা পাবো কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

সার্ভো খেতে খেতে ওদের কথা শুনছিল। এবার বলল—তোমাদের নৌকা চাই?

—হ্যাঁ। তুমি জানো এখানে কোথায় নৌকা পাবো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—লুভিনা পাহাড়ের এপারে জেলেদের নৌকার ঘাট আছে। সেখানে নৌকা পাবে। এপারেই জেলেদের নৌকা রাখার ঘাট।

—তুমি শাঙ্কোকে নিয়ে যেতে পারবে? ফ্রান্সিস বলল।

—কেন পারবো না। আমি এই রাজ্যের সব জায়গা ভালভাবেই চিনি। সার্ভো বলল।

—তাহলে খাওয়া সেরে শাঙ্কোকে ওখানে নিয়ে যাও।

—বেশ তো। সার্ভো বলল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—

—শাঙ্কো-খাঁড়ির মধ্যে দিয়ে নৌকা চালিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। ওখান থেকে সমুদ্রের ধারে ধারে গিয়ে জাহাজ ঘাটায় আমাদের জাহাজে যেতে পারবে।

—খুব সহজেই যাওয়া যাবে। এলুডা রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না। শাঙ্কো বলল।

—তিনটে নৌকা নিয়ে যেও। আমাদের দুটো নৌকা রয়েছে। মারিয়া আর ভেন বাদে সবাইকে এক ভাবে নিয়ে আসতে পারবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। বলল—সার্ভো চলো। সার্ভোও উঠে দাঁড়াল।

খাওয়া শেষ। শাঙ্কোদের ফ্রান্সিস বলল—চেষ্টা করবে সন্ধ্যের আগেই চলে আসতে। আমি বেশি দেরি করতে রাজি নই।

শাঙ্কো আর সার্ভো সৈন্যাবাস থেকে সামনের প্রান্তরে নামল। সার্ভো আগে আগে চলল। পেছনে শাঙ্কো।

বসতি এলাকায় এল। এপথ সেপথ দিয়ে ওরা খাঁড়ির কাছে এল। সার্ভো আগে আগে চলল। পেছনে শাঙ্কো।

দূর থেকে শাঙ্কো বেশ কয়েকটা দেশি নৌকা তীরে বাঁধা। ওরা ঘাটে এল। দেখল কিছু জেলেদের বাড়ি ঘর। কয়েকজন জেলে ঘরের বাইরে বসেছিল। সার্ভো ওদের একজনকে দেশীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করল—

—তোমাদের কর্তা কোথায়? একজন আঙুল তুলে একটা ঘর দেখাল। সার্ভো আর শাঙ্কো সেই ঘরে ঢুকল। দেখল একজন কালো মানুষ মেঝের ঘাসপাতার বিছানার ওপর বসে আছে। সার্ভো বলল—কর্তা— তিনটে নৌকা চাই।

—নৌকা নিয়ে কী করবেন? কর্তা জানতে চাইল।

—এলুডার জাহাজ ঘাটায় একটা জাহাজ আছে। সেই জাহাজে যাবো।

—ভোরে মাছ ধরতে যাবো আমরা। তার আগেই নৌকা নিয়ে ফিরে আসা চাই। জেলে কর্তা বলল।

—আমরা সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসবো। শার্ভো বলল।

—বেশ। কিন্তু ভাড়া লাগবে। জেলে কর্তা বলল।

সার্ভো শাঙ্কোর দিকে তাকাল। ভাড়ার কথা বলল। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা সোনার চাকতি বের করে কর্তাকে দিল। সোনা দেখে কর্তা খুব খুশি। বলল—নৌকা চালানোর লোক লাগবে? সার্ভো শাঙ্কোকে সেই কথা বলল। শাঙ্কো বলল—বলো যে আমি একাই নৌকা বেঁধে নিয়ে যাবো। সার্ভো কর্তাকে বলল—সে কথা। কর্তা আপত্তি করল না। শুধু বলল—আজ রাতে জোয়ার আসবে? তার আগেই চলে আসে যেন। জোয়ারের সময় নৌকা চালানো কঠিন। সার্ভো শাঙ্কোকে সে কথা বলল। শাঙ্কো বলল— বলো যে আমরা ভাইকিং। নৌকা চালানোয় দক্ষ। সার্ভো কর্তা সে কথা বলল। কর্তা আর কিছু বলল না। শাঙ্কো সার্ভোকে বলল—কর্তাকে বল একগাছি দড়ি দিতে। সার্ভো তা বলল। কর্তা ঘরের কোনা থেকে দড়ি বের করে আনল।

সবাই ঘরের বাইরে এল। কর্তা ঘাটের দিকে চলল। পেছনে শাঙ্কোরা। কর্তা তিনটে নৌকা দেখাল। তার মধ্যে একটা নতুন নৌকা। শাঙ্কো সেই নৌকাটায় উঠল। পেছনে আরো দু'টো নৌকা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিল। তারপর নৌকাগুলোর ঘাটে বাঁধা দড়ি খুলে দাঁড় হাতে নিল। সার্ভো দুটো নৌকা পেছনে বেঁধে নিল শাঙ্কো দাঁড় বাইতে লাগল। ও দ্রুত দাঁড় বাইতে লাগল। নৌকাগুলো দ্রুতই চলল। ফেরার তাড়া রয়েছে। কাজেই শাঙ্কো দ্রুত দাঁড় বইতে লাগল।

খাঁড়ির জলে ঢেউ কম। খাঁড়ি পার হতেই সমুদ্রের বড় বড় ঢেউয়ের মুখোমুখি হল। নৌকার ওঠাপড়া শুরু হল। সমুদ্রতীরের কাছ দিয়ে দিয়ে শাঙ্কো নৌকা বেয়ে চলল।

ওদের জাহাজের কাছাকাছি যখন পৌঁছাল তখন বিকেল হয়ে গেছে। মারিয়া তখন সূর্যাস্ত দেখার জন্যে জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। মারিয়া প্রথম শাঙ্কোকে দেখল। মারিয়া গলা চড়িয়ে বলে উঠল—দেখ—শাঙ্কো আসছে। ডেক-এঁর ওপর শুয়ে বসে থাকা কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু শুনল কথাটা। রেলিংয়ের কাছে ভিড় করল সবাই। বিস্কো ছুটে গিয়ে দড়ি মই ঝুলিয়ে দিল। শাঙ্কো নৌকাগুলো জাহাজের গায়ে ভেড়াল। বিস্কো চেঁচিয়ে বলল—

—শাঙ্কো—ফ্রান্সিসরা ভালো আছে তো?

—সবাই ভালো আছে। চিন্তার কোন কারণ নেই। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল। এতক্ষণে মারিয়া হাসল—যাক্—ফ্রান্সিসের কোন বিপদ হয় নি।

শাঙ্কো দড়ির মই বেয়ে ডেক-এ উঠে এল। সবাই ওকে ঘিরে ধরল। শাঙ্কো তখন হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সব ঘটনা বলল। তারপর বলল—তোমরা

এখনই তৈরি হয়ে নাও। এক্ষুণি ফিরে যাবো। সন্ধ্যের আগেই রাজা প্রোফেনের দেশে পৌঁছতে হবে। ফ্রান্সিস আর দেরি করতে চাইছে না। আবার লড়াইয়ের ময়দানে নামব এই ভেবেই ওরা খুশি। এভাবে জাহাজে অলস জীবন ওদের ভালো লাগে না। হাজার হোক—বীরের জাত। লড়াইটা ওরা ভালোবাসে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পোশাক পাল্টে কোমরে তরোয়াল গুঁজে ভাইকিং দল বেঁধে ডেক-এ উঠে এল। তারপর একে একে দড়ির মই বেয়ে নৌকোগুলোয় উঠতে লাগল। নিজেদের নৌকাতেও অনেকে বসল। শুরু হল দাঁড় বাওয়া। একেবারে সামনে রইল শাঙ্কোর নৌকো। তার পেছনে পেছনে অন্য নৌকাগুলো চলল।

তখন সূর্য অস্ত যায় যায়। পশ্চিম আকাশ জুড়ে লালচে আভা ছড়িয়েছে। মারিয়া জাহাজের রেলিং ধরে একবার সূর্যাস্ত দেখছে আর একবার শাঙ্কোদের চলন্ত নৌকাগুলো দেখছে।

সমুদ্রের তীরের কাছ দিয়ে এসে নৌকাগুলো খাঁড়িতে এল। বাঁক ঘুরে চলল রাজা প্রোফেনের দেশের দিকে।

জেলেদের নৌকার ঘাটে যখন নৌকাগুলো পৌঁছালো তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। তবে চারদিকে মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল জ্যোৎস্না পড়েছে জেলে পাড়ায় খাঁ ড়িতে ওপারের লুভিনা পাহাড়ে।

কর্তার ঘর থেকে সার্ভো বেরিয়ে এল। এতক্ষণ সার্ভো শাঙ্কোর ফিরে আসার জন্যে ঐ ঘরেই অপেক্ষা করছিল। ওর চিন্তা ছিল এই কাজটা শাঙ্কো একা পারবে কিনা। দেখল শাঙ্কো পেরেছে। এর থেকেই প্রমাণ হয় ভাইকিংরা বীরের জাত। সমুদ্রের নাড়ি নক্ষত্র ওরা চেনে।

ভাইকিংরা দল বেঁধে নৌকা থেকে নেমে এল। সবাই চলল সৈন্যাবাসের দিকে। সবচেয়ে আগে শাঙ্কো। তারপরে বন্ধুরা। বসতির পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন লোকজন ওদের দেখছে। এত বিদেশি দল বেঁধে কোথায় চলেছে?

তারপরই সবুজ ঘাসের প্রান্তর। প্রান্তর পার হয়ে ভাইকিংরা ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে এল। বিস্কো গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস আমরা এসেছি।

সবাই ঘরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর। সবাই এঁটে গেল। ভাইকিংরা বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—শাঙ্কোর কাছে নিশ্চয়ই সব শুনেছো। আমরা কালকেই এক সর্দারের দেশ এলুডা আক্রমন করবো। রাজা প্রোফেনের সৈন্যরাও আমাদের সঙ্গে থাকবে। আক্রমন করবো শেষ রাতে। এবার সার্ভো বলবে আমরা কোথা দিয়ে অক্রমণ করবো। সার্ভো বলল—লুভিনা পাহাড় তোমরা আসার সময় দেখেছো। ঐ পাহাড়ের নিচেই গভীর জঙ্গল। খাঁড়ি পার হবো আমরা ওপারে যাবো। ওখানে তখন ভাঁটা চলবে। জল বড় জোর কোমর পর্যন্ত থাকবে। খাঁড়ি পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকব। জঙ্গল এলুডার বসতি এলাকার খুব কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা বসতি এলাকায় ঢুকে পড়তে

পারব। তারপর লড়াই কীভাবে করবে সেটা তোমরাই ঠিক করো। ফ্রান্সিস বলল—এবার একটু অন্যরকম ভাবে লড়াই করবো। এলুডাবাসী যোদ্ধারা বর্শা দিয়ে লড়াই করে। আমরাও প্রথমে বর্শা দিয়ে লড়াই করবো। তারপর তরোয়ালের লড়াই চালাবো।

—তার জন্যে আমাদের তো বর্শা চাই। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। আমি কাল সকালে রাজসভায় যাচ্ছি। আমরা আমাদের জন্যে বর্শা চাইবো। কীভাবে আমরা লড়াই করতে চাই সেটা সেনাপতিকে বুঝিয়ে বলবো। কেউ কিছু বলবে? কেউ কোন কথা বলল না। বোঝা গেল লড়াইয়ের জন্যে ফ্রান্সিসের পরিকল্পাই মেনে নিল সবাই।

পরদিন ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে রাজদরবারে গেল। তখন রাজদরবারের কাজকর্ম চলছিল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি একপাশে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে কাজকর্ম শেষ হল। উপস্থিত প্রজারা বেরিয়ে গেল। রাজা প্রোফেন ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসকে ডাকল। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। একটু মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—মান্যবর রাজা—আমরা কাল গভীর রাতে খাঁড়ি পার হয়ে এলুডা আক্রমন করবো স্থির করেছি। আমার বন্ধুরা এসে গেছে। এবার আপনার সেনাপতিকে দয়া করে নির্দেশ দিন তিনি যেন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমাদের সঙ্গে যান।

রাজা প্রোফেন যথারীতি স্তিফানোর দিকে তাকালেন। স্তিফানো বলল—ঠিক আছে সেনাপতি প্রান্তরে সৈন্য সামাবেশ করবেন। তখন তোমরা যাবে। সেনাপতি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে তোমাদের পেছনে পেছনে যাবে।

—বেশ। তবে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী সমস্যা? রাজা জানতে চাইলেন।

—আমাদের তো বর্শা নেই। আমাদের সবাইকে বর্শা দিতে হবে।

—কেন? স্তিফানো একটু বিরক্তির ভঙ্গীতে বলল। ফ্রান্সিস সেই বিরক্তি গায়ে মাখল না। বলল—এলুডার যোদ্ধারা বর্শা দিয়ে লড়াই করবে। ওদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে বর্শাও চাই।

—তোমরা কীভাবে লড়াই করতে চাও? সেনাপতি জিজ্ঞেস করল।

—আমরা প্রথমে বর্শা দিয়ে লড়াই করে ওদের আহত করবো। আমরা হত্যাটা যথাসাধ্য এড়িয়ে চলি। তারপর তরোয়াল দিয়ে লড়াই করবো। ফ্রান্সিস বলল। সেনাপতির সঙ্গে কথা বলে।

নিজেদের ঘরে ফিরল ফ্রান্সিস আর হ্যারি। বন্ধুরা সব জানতে চাইল। ফ্রান্সিস রাজা ও স্তিফানের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সেসব বলল। আর বলল সন্ধ্যের সময় আমরা বর্শাগুলো পেয়ে যাবো।

দুপুরে সৈন্যবাসের খাবার ঘরে ফ্রান্সিসরা যখন খাচ্ছে তখনই সেনাপতি এল। ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল—

—কী? তোমরা তৈরি তো?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা কাত করে বলল।

—কখন রওনা হবে তোমরা? সেনাপতি জানতে চাইল।

—একটু বেশি রাতে। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা আগে প্রান্তরে জমায়েত হবে। তোমরা এলে আমাদের সৈন্যরা আসবে। সেনাপতি বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ, বন্দী ছিল—সার্ভো—ও-ও কি যাবে? সেনাপতি জানতে চাইল।

—হ্যাঁ—ওকে দরকার পড়বে। আমার কিছু বলার থাকলে সার্ভো এদেশীয় ভাষায় আপনার সৈন্যদের বোঝাতে পারবে। ফ্রান্সিস বলল।

—সব নির্দেশ আমিই দেব। সেনাপতি গলায় একটু জোর দিয়েই বলল।

—সে অধিকার আপনার নিশ্চয়ই আছে। তবে সময় বিশেষে আমার নির্দেশও আপনার সৈন্যদের মানতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—না। শুধু আমার নির্দেশই সবাইকে মানতে হবে। সেনাপতি বলল।

তখন হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস উনি সেনাপতি। কী ভাবে আমরা লড়াই করবো সেটা তো উনিই বলবেন।

—বেশ। ও কথাই রইল। তবে কখনো আমি কোন নির্দেশ দিলে আপনার অনুমতি নিয়েই সেই নির্দেশ দেব। এতে আপনি রাজি তো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। এতে আমার আপত্তি নেই। সেনাপতি বলল। তারপর চলে গেল।

সন্ধ্যের কিছু আগে। ফ্রান্সিস নিজেদের ঘরে শুয়ে বসে আছে এমন সময় কয়েকজন যোদ্ধা বর্শা নিয়ে এল। বর্শা রেখে ওরা চলে গেল। ফ্রান্সিসদের পাঁচটা বর্শা কম পড়ল। ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে যা পেয়েছি তাই নিয়ে লড়বো।

রাতের খাবার বেশ তাড়াতাড়িই খাওয়া হল।

ফ্রান্সিসরা সবাই শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়তে পড়তে বলল—কেউ ঘুমুবে না। বিশ্রাম নাও।

রাত বেড়ে চলল। এক সময় ফ্রান্সিস উঠে বসল। গলা চড়িয়ে বলল—সবাই উঠে পড়। বাইরের প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়াও। রাজার সৈন্যরা ওখানেই আসবে।

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সার্ভো বলল—

—ফ্রান্সিস—আমি আর যাবো না।

—না। তুমিও চলো। তোমাকে লড়াই করতে হবে না। আমাদের সঙ্গে থাকবে শুধু। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই তৈরি হয়ে প্রান্তরে এসে দাঁড়াল। আজকে চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। চারিদিক ভালোই দেখা যাচ্ছে।

কিছু পরে রাজা প্রোফেনের সৈন্যরা দল বেঁধে এল। সেনাপতি এল। উঁচু গলায় বলল—সবাই জেলেপাড়ার দিকে চলো। ওখান দিয়েই আমরা খাঁড়ি পার হবো।

ফ্রান্সিসরা আগে পেছনে চলল রাজার সৈন্যরা। তাদের সঙ্গে সেনাপতি।

এত লোকেরা যাচ্ছে। শব্দ হল। জেলেপাড়ার লোকেদের কারো কারো ঘুম ভেঙে গেল। জানালা দিয়ে সৈন্যদের যেতে দেখে বুঝল ওরা লড়াই করতে যাচ্ছে। ফ্রান্সিসদের দেখে ভাবল তাহলে এই বিদেশীরাও সৈন্যদের সঙ্গে চলেছে লড়াই করতে।

জেলেপাড়ায় ঘাট দিয়ে সবাই জলে নামল। অগভীর খাঁড়ি। জল হাঁটুর ওপর উঠল না। কিন্তু জল ঠেলে যাওয়ার শব্দ হতে লাগল। ফ্রান্সিস জল ঠেলে সেনাপতির কাছে এল। বলল—

—জলে যাতে বেশি শব্দ না হয় সেটা আপনার সৈন্যদের বলুন। সেনাপতি একটু গলা চড়িয়ে দেশীয় ভাষায় বলল সে কথা। এবার জলে কম শব্দ হতে লাগল।

খাঁড়ি পার হল সবাই। জনা পাঁচেক বাদে ফ্রান্সিসদের সবার হাতে বর্শা। সেনাপতি ও সৈন্যদের কোমরে তরোয়াল। খাঁড়ি থেকে উঠে সামনেই বনভূমি। খুব ঘন বন নয়। ছাড়া ছাড়া গাছ গাছালি। সবাই বনের মধ্যে দিয়ে চলল। ভাঙা ভাঙা জ্যোৎস্না পড়েছে বনের এখানে ওখানে। গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে সবাই চলল।

কিছু পরে বন শেষ। হাত পঞ্চাশেক দূরে এলুডার বসতি এলাকা শুরু হয়েছে। বন থেকে বেরিয়ে ফ্রান্সিস আক্রমনের জন্যে তৈরি। হঠাৎ পেছনে সেনাপতি উঁচু গলায় দেশীয় ভাষায় কী বলে উঠল। ফ্রান্সিস বুঝল না সেটা। ভাবল সার্ভোকে জিজ্ঞেস করবে সেনাপতি কী আদেশ দিল। পেছন ফিরে দেখল সার্ভোরা তখনও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসেনি। ওদিকে নিস্তব্ধ রাতে সেনাপতির নির্দেশের শব্দ বেশ জোরালো হল। কাছেই বসতি এলাকার লোকদের কানে পৌঁছাল সেই কথা। সঙ্গে সঙ্গে এসব ঘর থেকে কোনো যোদ্ধার তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল—কু—উ—উ—উ। সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশে ঘর গুলো থেকে বর্শা হাতে যোদ্ধারা বেরিয়ে আসতে লাগল। এরা যোদ্ধার জাত। সবসময় লড়াই-এর জন্যে তৈরী থাকে। কু—উ—উ ধ্বনি চলল।

ফ্রান্সিস বুঝল এখন লড়াই ছাড়া উপায় নেই। ও পেছনে ফিরে তাকাল। সেনাপতি বা তার সৈন্যদের চিহ্নমাত্র নেই। ও ভাবল হয় তো আসতে দেরি হচ্ছে। কিন্তু এক্ষণি তো লড়াই শুরু করতে হবে। তখনই সার্ভো ছুটে ফ্রান্সিসসের কাছে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—সেনাপতি তার সৈন্যদের পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

—বলো কি। ফ্রান্সিস ভীষনভাবে চমকে উঠল। কিন্তু এখন আর পিছু ফেরা যাবে না। এলুডার যোদ্ধারা অনেক কাছে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—আক্রমন কর। ভাইকিংরা ছুটে গেল এলুডার যোদ্ধাদের দিকে। মুহূর্তে লড়াই শুরু হল।

প্রথম সংঘর্ষেই দুতিনজন ভাইকিং যোদ্ধা অল্পবিস্তর আহত হল বর্শার ঘায়ে। অন্যেরা আগুপিছু বর্শা চালাতে লাগল। এলুডার যোদ্ধারা বর্শা ছুঁড়তে লাগল।

একটা বর্শা উড়ে এসে সার্ভোর বুকে বিঁধে গেল। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। ও ছুটে গিয়ে বর্শাটা সার্ভোর বুক থেকে টেনে বের করল। রক্ত পড়তে লাগল। সার্ভো ম্লান হাসল। তারপর আস্তে আস্তে চোখ বুঁজল। সার্ভো মারা গেল। তখনই একটা বর্শা উড়ে এসে ফ্রান্সিসের মাথার ওপর দিয়ে সামনে মাটিতে গেঁথে গেল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। তারপর বর্শা ছুঁড়ে মারল এলুডার যোদ্ধার দিকে। একজন যোদ্ধার কাঁধে গেঁথে গেল সেই বর্শা।

ততক্ষণে এলুডার অনেক যোদ্ধার হাতে বর্শা ছুঁড়ে মারার আর কোন অস্ত্র নেই। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—

—তরোয়াল—আক্রমন। বর্শা ফেলে ভাইকিংরা তরোয়াল বের করে ছুটল নিরস্ত্র যোদ্ধাদের দিকে। নিরস্ত্র যোদ্ধারা তখন অসহায়। প্রাণভয়ে ওরা পালাতে করল। যাদের হাতে বর্শা ছিল তাদেরও পরাস্ত করল ভাইকিংরা।

কিছুক্ষণের মধ্যে মাঠের মধ্যে পড়ে রইল আহত এলুডার যোদ্ধারা। ফ্রান্সিসের নির্দেশে আহত ভাইকিং ক'জন বনের আড়ালে চলে গেল।

ফ্রান্সিস এবার নিরস্ত্র যোদ্ধাদের তাড়া করল। বাকি যোদ্ধারা পালাতে লাগল। ফ্রান্সিস বসতি এলাকায় ঢুকে পড়ল।

বাড়ি ঘরে আড়াল পড়ে যাওয়ায় বিস্কো একা পড়ে গেল। এপথ ওপথ ঘুরে ও সেই উঠোনের মত জায়গাটায় এল। এক কোণে দুটো মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় দেখল উঠোনের মাঝখানে একটা বড় কাঠের খুঁটি। খুঁটির সঙ্গে পা বাঁধা তিনজনের দু'জন পুরুষ আর একটি মেয়ে। বিস্কো ঠিক করল ওদের মুক্তি দেবে। বিস্কো আস্তে আস্তে ওদের কাছে গেল। বিস্কোকে খোলা তরোয়াল হাতে ওদের দিকে আসতে দেখে মেয়েটি ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল। বিস্কো হেসে হাতের তেলো দেখিয়ে মেয়েটিকে আশস্ত করল। তারপর নিচু হয়ে তরোয়াল দিয়ে পোঁচ দিয়ে দিয়ে ওদের পায়ে বাঁধা শুকনো লতার বাঁধন কেটে দিল। বাঁধন কাটতেই পুরুষ দু'জন ছুটে পালিয়ে গেল। মেয়েটিও পালাত। কিন্তু পালাল না যখন দেখল একটা ঘরের আড়াল থেকে একজন এলুডার যোদ্ধা একটা বর্শা ছুঁড়ে মারছে আর বিস্কো সাবধান হবার আগেই বর্শা বিস্কোর বাঁ কাঁধে কেটে দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। বিস্কো উঃ শব্দ করে বাঁ কাধ চেপে ধরল। রক্ত বেরিয়ে এল। বিস্কো উঠে দাঁড়াল। ততক্ষণে যোদ্ধাটি পালিয়ে গেছে। মেয়েটির শুকনো মুখ। মাথার চুল অবিন্যস্ত। ওর আর পালানো হল না। ও বিস্কোর ডান হাত ধরল। ইঙ্গিত করল ওর সঙ্গে হাঁটার জন্যে। বিস্কো মাথা নাড়ল। মেয়েটি করুণ চোখে বিস্কোর দিকে তাকিয়ে দেশীয় ভাষায় কিছু বলল। বিস্কো কিছু বুঝল না। মেয়েটি বার বার ওর কাটা জায়গাটা দেখতে লাগল। বিস্কো বুঝল যে ও যে আহত সেটাই মেয়েটা বোঝাতে চাইছে। দেখা যাক মেয়েটি ওকে কোথায় নিয়ে যায়। বিস্কো ওর পাশে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি একসঙ্গে হাঁটার জন্যে ইঙ্গিত করল। তারপর হাঁটতে লাগল।

তখন লড়াই শেষ। এলুডার যোদ্ধারা হেরে গেছে। বিস্কো তার কিছুই জানে

না। ও মেয়েটির পেছনে পেছনে হেঁটে চলল। বসতি এলাকায় এসে একটা ঘরের সামনে মেয়েটি এসে দাঁড়াল। পাথর বালি মাটির ঘর। ছাউনি শুকনো ঘাসপাতার। ঘরের এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো কাঠের দরজা। মেয়েটি দরজা খুলে ফেলল। ঘরে একজন বয়স্ক লোক মেঝের বিছানায় শুয়ে ছিল। মেয়েটিকে দেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে এসে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। বিস্কো তো জানে না কী ভয়ানক শাস্তি থেকে ও মেয়েটিকে বাঁচিয়েছে।

মেয়েটি ঐ অবস্থায়ই বিস্কোকে দেখিয়ে বার বার কী বলল। বয়স্ক লোকটি বিস্কোকেও জড়িয়ে ধরল। তখন লোকটি কাঁদছে। এবার কান্না থামিয়ে বিস্কোকে ঘাসের বিছানায় বসতে ইঙ্গিত করল। বিস্কো বিছানায় করল। রক্ত পড়ায় বিস্কো নিজেকে বেশ দুর্বল মনে করছিল। ও একটু বসে থেকে শুয়ে পড়ল। লোকটি পাশের ছোট ঘরটায় ঢুকল। একটা হলুদ রঙের গলা ডেলা নিয়ে এল। বিস্কোর কাঁধের জায়গায়টায় ঐ ডেলাটা চেপে ধরল। ক্ষতস্থানটা যেন জ্বলে উঠল। বিস্কোর মুখ থেকে কাতরোক্তি বেরিয়ে এল—আ—হ্‌। মেয়েটি একটু হেসে হাতের তেলো দেখিয়ে ওকে অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করল। এবার মেয়েটির সঙ্গে লোকটির কিছু কথাবার্তা চলল। বিস্কো কিছুই বুঝল না। তবে এটা বুঝল লোকটি মেয়েটির বাবা। বোধহয় মা নেই।

আস্তে আস্তে কাটা জায়গার জ্বালা কমল। রক্ত পড়াও বন্ধ হল। মেয়েটি তখন একটা মোটা কাপড়ের ন্যাকড়া নিয়ে এল। কাটা জায়গাটা বেঁধে দিল। বিস্কো অনেকটা আরাম বোধ করল।

মেয়েটি বয়স্ক লোকটিকে কী বলল, লোকটি বেরিয়ে গেল। মেয়েটি হাত নেড়ে বিস্কোকে অপেক্ষা করতে বলে পাশের ঘরে ঢুকে গেল। বিস্কো শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল ও তো দলছাড়া হয়ে গেল। চারপাশের শান্ত অবস্থা দেখে বুঝল লড়াই শেষ। আর এলুডা যোদ্ধাদের কু উ উ—ডাক শোনা যাচ্ছে না। ওরা নিশ্চয়ই হেরে গেছে। ফ্রান্সিসরা ওর খোঁজ না পেয়ে নিশ্চয়ই চিন্তায় পড়েছে। বিস্কো ভাবল—এখানেই থাকি। সুস্থ হয়ে রাজা প্রোমেনের দেশে গিয়ে ফ্রান্সিসদের সঙ্গে যোগ দেব।

অল্প পরে মেয়েটি পাশের ঘর থেকে এ ঘরে এল। হাতে দুটো কাঠের বাটি। একটা বাটি বিস্কোর দিকে এগিয়ে ধরল। বিস্কো বাটিটা নিল। দেখল বাটিতে আনাজপত্রের ঝোলমত। মেয়েটি নিজেও একটা বাটি নিয়ে চুমুক দিয়ে খেতে ল্যাগল। বিস্কোও খেতে লাগল। বেশ সুস্বাদু। খেতে খেতে বিস্কো বলল—তোমার নাম কি? প্রোমা। মেয়েটি হেসে বলল।

তখন সকাল হয়ে গেছে। বাইরে লোকজনদের কথাবর্তা শোনা যাচ্ছে। প্রোমা বাটি নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল।

ওদিকে ফ্রান্সিসরা খুব চিন্তায় পড়ে গেছে। বিস্কোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কি বিস্কো লড়াইএ মরে গেল? তিনচারজন ছুটল বিস্কোকে খুঁজতে। ওরা নিরাশ হয়ে ফিরে এল।

ভোরের আলো ফুটল। ফ্রান্সিস সর্দারের বাড়ির সামনে এল। মোটামুটি কাঠের ভালো দরজা জানালা।

—সিনাত্রা—দরজায় ধাক্কা দাও তো। ফ্রান্সিস বলল। সিনাত্রা এগিয়ে গিয়ে দরজায় জোরে ধাক্কা দিল। বার কয়েক ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। সেই মোটামত লোকটা এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসকে দেখেই চিনল। বলল—তোমরা—হত্যা—সর্দার। ফ্রান্সিসও লোকটাকে আগে দেখেছিল।

—তাই তো তুমি সর্দার হতে পারলে। যাক্‌গে—তোমরা হেরে গেছ। এই এলুডা দেশ এখন আমাদের দখলে। তবে আমরা এখানে থাকবো না। তোমাদের দেশ এখন তোমরাই রাজত্ব করবে। কিন্তু এই দেশ জয় করার পিছনে আমাদের একটা উদ্দেশ্য আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী? নতুন সর্দার বলল।

—এখানে অপরাধী যে কোন রকম অপরাধ করুন না কেন তাকে জ্যান্ত পোড়ানো চলবে না। এই প্রথা চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে। এই শর্তে তোমাকে সর্দার রেখে এ দেশ ছেড়ে আমরা চলে যাব। কী—রাজি? ফ্রান্সিস বলল।

—এবার তোমাদের একটা উঠোনমত আছে যেখানে খুঁটির সঙ্গে তোমাদের বিবেচনায় যে বা যারা অপরাধী তাদের বেঁধে রাখো। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। রেজাম। সর্দার বলল।

—তার মানে ঐ উঠোনের নাম। সর্দার মাথা ওঠা নামা করল।

—কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ রেজামে দেশবাসীদের যোদ্ধাদের একত্র কর। তাদের উদ্দেশে আমার কিছু বলার আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। খবর—হবে। সর্দার বলল।

—তাহলে আমরা রেজামে যাচ্ছি। তুমি এর মধ্যে খবর দাও। সবাইকে একথাও বলো যে আমরা কারোও কোন ক্ষতি করবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তবে—পুড়িয়ে মারা—বিরোধী—আমি—সর্দার—তাড়িয়ে—আমাকে—মাপ—ফিরেছিলাম। সর্দার বলল।

—হুঁ। ঠিক আছে। তুমি সবাইকে ডাকো। আমি তোমাদের কিছু বলতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

সর্দার চলে গেল।

দুপুরের আগে থেকেই রেজামে লোক জড়ো হতে লাগল। অনেক যোদ্ধাও এল। রেজাম ভরে গেল লোকে।

ফ্রান্সিস সেই জমায়েতের সামনে এসে দাঁড়াল। সর্দারকে ওর কাছে ডাকল। বলল—আমার সব কথা তো সবাই বুঝবে না। তুমি আমার কথা ওদের ভাষায় বুঝিয়ে দাও। সর্দার ফ্রান্সিসের পাশে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—এলুডার—ভাই বোনেরা—আমরা এদেশ জয় করেছি। কিন্তু আমরা এখানে থাকব না। তোমাদের দেশ তোমাদের সর্দারই শাসন করবে। স্বাধীন ভাবে। মাত্র একটা উদ্দেশ্যেই আমরা এই দেশ জয় করেছি। এখানে অপরাধীকে

পুড়িয়ে মারার প্রথা প্রচলিত আছে। আমাদেরও বন্দী করে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল। এখানে এই অমানবিক ভয়াবহ প্রথা বন্ধ করতে হবে। তোমাদের সর্দারকে সেই নির্দেশ দিয়েছি। আমাদের কাজ শেষ। আমরা আমাদের এক মৃত বন্ধুকে কবর দিয়ে রাজা প্রোফেনের দেশে ফিরে যাব। রাজা প্রোফেনকে অনুরোধ করব তিনি যেন তোমাদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখেন। তোমরাও রাজা প্রোফেনের দেশের সঙ্গে সদ্ভাব রাখবে—এই অনুরোধ। আমার আর কিছু বলার নেই। ফ্রান্সিস থামল। সর্দার দেশীয় ভাষায় ফ্রান্সিসের বক্তৃতা গলা চড়িয়ে বলল। উপস্থিত জনতা বেশ সমর্থন জানাল। সভা ভেঙে গেল। সবাই চলে যেতে লাগল।

তখনই শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে ছুটে এল। বলল—ফ্রান্সিস আমাদের এক আহত বন্ধু মারা গেল। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করল। সখেদে বলে উঠল—ওদের চিকিৎসা পর্যন্ত করাতে পারলাম না। যাক গে—চলো—ওদের কবরের ব্যবস্থাটা আগে করি।

—কিন্তু ফ্রান্সিস—আমরা সবাই খুব ক্ষুধার্ত। সিনাত্রা বলল।

—না। ওদের কবর না দিয়ে আমরা কেউ খাবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—পরে খাবারের ব্যবস্থা করি। শাঙ্কো বলল।

—বেশ—সর্দারকে বলো আমাদের এখানেই খাবারের বন্দোবস্ত করুক। ফ্রান্সিস বলল।

—কোথায় কবর দেবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—ঐ এলুডা পাহাড়ের নীচের বনভূমিতে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বলল—মাটিতে গর্ত খোঁড়ার জন্য বেলচা জাতীয় কিছু জোগাড় কর। শাঙ্কো চলে গেল। সঙ্গে দু'তিনজন বন্ধুও গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে শাঙ্কোরা বেলচা জাতীয় জিনিস নিয়ে ফিরে এল। সবাই দল বেঁধে বনভূমির দিকে চলল। বনভূমির কাছে পৌঁছে ওরা দেখল মৃতদেহ দুটিকে ঘিরে কয়েকজন বন্ধু বসে আছে। ফ্রান্সিসরা যেতেই ওরা উঠে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস মৃত সার্ভো আর বন্ধুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ওর দু'চোখ জলে ভরে উঠল। হাত দিয়ে চোখ মুছে বলল—বনের ভিতর মৃতদেহ নিয়ে চলো। কয়েক জন বন্ধু মৃতদেহ দু'টি কাঁধে নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। বনের মধ্যে ঢুকে ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলল। কিছুদুর যেতেই দেখল একটা বড় গাছে অজস্র ফুল ফুটে আছে। জংলা গাছ। কিন্তু বেগুনি রঙের ফুলগুলি দেখতে বড় সুন্দর। ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো এগিয়ে এল।

—এই গাছের নীচেই কবর দেওয়া হবে। গর্ত কর। ফ্রান্সিস বলল। বন্ধুরা সেই জায়গা ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। সিনাত্রা মৃদুস্বরে দেশের গান গাইতে লাগল। শোকের গান, দুঃখের গান।

খুব বেশি সময় লাগল না। দুটো কবর খোঁড়া দেওয়া হল। মৃতদেহ দুটি

আস্তে আস্তে কবরে নামিয়ে দেওয়া হল। বন্ধুরা সেই গাছে আর ধারে কাছের গাছগুলোয় উঠে দু'হাত ভরে ফুল নিয়ে এল। মৃতদেহের ওপর ছড়িয়ে দিল। ফ্রান্সিস গর্তে নামল। দুটো তরোয়াল নিয়ে মৃতদেহের বুকের ওপর রেখে দিল। বন্ধুরা হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিসকে ওপরে তুলে নিল। ভাইকিং বন্ধুরা মারা গেলে ভেনই শেষকৃত্য করে। কিন্তু ভেন জাহাজে। কাজেই শেষকৃত্য কিছু হল না। ফ্রান্সিস এক মুঠো মাটি মৃতদেহের ওপর ছড়িয়ে দিল। এবার সবাই মাটি ঢেলে কবর ভরাট করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিতে কবর ভরাট হয়ে গেল। ফ্রান্সিস ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—চলো। বসতি এলাকার দিকে ফ্রান্সিস হাঁটতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরাও চলল। তখন সেই জংলা গাছ থেকে টুপটুপ ফুল ঝরে পড়ছে কবরের ওপর।

ওরা রেজামে যখন এল তখন বিকেল হয়ে এসেছে। সেই খুঁটির কাছে সর্দার দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্রান্সিসকে দেখে বলল—রান্না হয়ে এসেছে। একটু পরেই খাওয়া।

ভাইকিংরা রেজাম চত্বরে বসে পড়ল। সবাই ক্ষুধার্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবার সামনে লম্বাটে পাতা পেতে দেওয়া হল। পরিবেশন করা হল একটু পোড়া রুটি আর আনাজের ঝোল। তারপর মাংস। ক্ষুধার্ত ভাইকিংরা চেটে পুটে খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হল।

সন্ধ্যে হয়ে এল। ফ্রান্সিস চত্বরে বসেছিল। এবার উঠে দাঁড়াল। বলল—হ্যারি—সবাই কে বলো। আর এখানে নয়। আমরা এখন ফিরে যাব। এখনো বিস্কোর খোঁজ পেলাম না। ও নিশ্চয়ই একাই ফিরে গেছে। এখানে আর দেরি করবো না। হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—উঠে পড়ো। আমরা এখন ফিরে যাবো। এখানে আর নয়।

সব ভাইকিংরা উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বনভূমির দিকে হাঁটতে শুরু করল। পেছনে ভাইকিং বন্ধুরাও চলল। বন পার হয়ে খাঁড়ির কাছে এল। বোধহয় জোয়ার শুরু হয়েছে। জল একটু বেড়েছে। জলে নামল সবাই। জলের মধ্যে পা টেনে টেনে পার হল সবাই।

বসতি এলাকা পার হয়ে প্রান্তর আর রাজবাড়ির কাছে যখন এলো তখন হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—রাজার সঙ্গে এখন দেখা করবে না?

—না। আগে দেখি বিস্কো ফিরল কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

প্রান্তর পার হ'য়ে ফ্রান্সিস দ্রুত এসে ওদের ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়াল। ঘর ফাঁকা। কেউ নেই। বিস্কো ফিরে আসে নি। ফ্রান্সিস চিন্তা হল। ও বিছানায় বসল। হ্যারি ওর কাছে এল। বলল—তাহলে বিস্কো ফিরে আসেনি।

—তাইতো দেখছি। ওর কি হল কিছুই বুঝতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে হয়তো জাহাজে ফিরে গেছে। হ্যারি বলল।

—কিন্তু এভাবে না বলে কয়ে? ফ্রান্সিস একটু অবাক হয়েই বলল।

—বলার মত কাউকে কাছে পায়নি হয়তো। কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো। ও নিশ্চয়ই আসবে। হ্যারি বলল।

তখনই সেনাপতি এসে হাজির। দু'হাতে দুটো মশাল। মশাল দুটো ঘরের দেওয়ালের খাঁজে বসিয়ে দিল। হেসে বলল—

—অন্ধকারে বসে আছো। তাই মশাল নিয়ে এলাম।

—আপনি আনলেন কেন? শাঙ্কো বলল।

—না-না। তাতে কি। তা শুনলাম তোমরা লড়াইয়ে জিতেছো। সেনাপতি বলল।

—হ্যাঁ। আপনাদের কোন রকম সাহায্য ছাড়াই। হ্যারি বলল।

—আপনি তো আপনার সৈন্যদের পালিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। আমি আপনাদের পেছনে পেছনে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। সেনাপতি বলল।

—না। পালিয়ে আসতে বলেছিলেন। ফ্রান্সিস গলায় জোর দিয়ে বলল।

—আমি তো এদেশীয় ভাষায় নির্দেশ দিয়েছিলাম। তুমি বুঝলে কী করে? সেনাপতি বলল।

সেনাপতি এবার দরজার দিকে দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল—আসলে সৈন্যরা সব মন্ত্রীর নির্দেশ মানে। আমার নির্দেশ মানে না। হয়ত মন্ত্রীমশাই সেরকম কোন নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।

—যাক্ এসব কথা। যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। হ্যারি বলল।

সেনাপতি আরোও কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্সিসদের অনাগ্রহী দেখে আস্তে আস্তে চলে গেল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি—সবকিছুর মূলে ঐ মন্ত্রী স্তিফানো।

—আমারও তাই মনে হয়। হ্যারি বলল।

পরদিন সকালের খাবার খাওয়া হল। হ্যারি বলল—

—ফ্রান্সিস রাজার কাছে তোমার একবার যাওয়া উচিত।

—কী আর বলবো রাজাকে গিয়ে। ফ্রান্সিস বলল।

—অন্তত বিশ্বাসঘাতক স্তিফানোর ব্যাপারটা যাচাই করতে পারবে। হ্যারি বলল।

—কী হবে? স্তিফানো যেভাবে রাজাকে কব্জা করেছে তা থেকে রাজার মুক্তি নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—তবু—ব্যাপারটা কী তা তো বোঝা যাবে। হ্যারি বলল।

—বলছো যখন—চলো। ফ্রান্সিস যেতে রাজি হল।

দু'জনে রাজসভায় গেল। আজকে স্তিফানো আসন ছেড়ে উঠে উপস্থিত প্রজাদের স্পেনীয় এদেশী দুই ভাষা মিশিয়েই কিছু বলছিল। ফ্রান্সিসদের দেখেই বোধহয় তাড়াতাড়ি বক্তৃতা থামিয়ে বসে পড়ল।

উপস্থিত প্রজারা চলে গেল। রাজা ইশারায় ফ্রান্সিসদের কাছে ডাকল। ফ্রান্সিস কাছে আসতেই হেসে বলল—তোমরা সত্যিই বীরের জাতি। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল।

তারপর বলল—হ্যাঁ মাননীয় রাজা—আপনার যোদ্ধাদের সাহায্য ছাড়াই আমরা লড়াইয়ে জিতেছি।

—তার মানে? রাজা বেশ আশ্চর্য হলেন।

—আপনার মন্ত্রী মশাই বোধহয় জানেন ব্যাপারটা। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি কিছু জানি না। স্তিফানো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল।

—তাহলে আর জেনে দরকার নেই। লড়াইয়ে আমরা দু'জন বন্ধুকে হারিয়েছি। একজন এখনও নিখোঁজ। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা লড়াই করতে চেয়েছিল। স্তিফানো বলল।

—তা' ঠিক। যাহোক এলুডাবাসীকে বলে এসেছি তারা যেন আপনাদের সঙ্গে সদ্‌ভাব রাখে। আপনার ও তাদের সঙ্গে সদ্‌ভাব রাখবেন এই অনুরোধ। আর কিছুই বলার নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তুমি বলেছিলে—রাজা মুস্তাকিমের গুপ্তধন উদ্ধার করবে। রাজা বললেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু সবার আগে নিখোঁজ বন্ধুর হদিশ পাই। তারপর কাজে নামবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। রাজা বললেন। তারপর বললেন—হয়তো তোমার বন্ধু আহত হয়ে ঐ এলুডাতেই আছে।

—হ্যাঁ। কয়েকদিন অপেক্ষা করে বন্ধুর খোঁজে এলুডাতে যাবো। খোঁজ পেলে কাজে নামবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাড়া কিছু নেই। তোমার সুবিধে মতো যা কিছু করার করো। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস মাথা ওঠা নামা করে চলল।

দু'জনে রাজসভা থেকে ফিরে এল।

ওদিকে বিস্কো তিন চারদিন যাবৎ প্রোমাদের সংসারে আছে। এখন অনেকটা সুস্থ। প্রোমা নিয়মিত ওর কাঁধের ঘায়ে ওষুধ দেয়। ওর সেবা শুশ্রূষা করে। বিস্কোর যাতে কোন কষ্ট না হয় তার জন্যে ওর চেষ্টার অন্ত নেই। প্রোমা ঘরে ঢুকলে বিস্কো প্রোমার দিকে তাকিয়ে হাসে। প্রোমাও হাসে। আকার ইঙ্গিতে দু'জনেই এখন দু'জনের কথা বোঝে। বিস্কো কয়েকটা দেশীয় শব্দও শিখেছে। যেমন—জল—ওষুধ—খিদে। প্রোমার বাবাও বিস্কোকে খুব স্নেহ করে। দেশীয় ভাষায় বলে বিস্কো কী খেতে চায়? বিস্কো বোঝে না। প্রোমা বুঝিয়ে দেয় বিস্কো মাংস খেতে চায়। প্রোমার বাবা পাখির মাংস নিয়ে আসে। বিস্কো তৃপ্তি করে খায়। এই কয়েকদিনের মধ্যেই বিস্কো প্রোমার ওপর একটা টান অনুভব করে। প্রোমা ওর পাশে এসে বসে। আকার ইঙ্গিতে নানা কথা বলে। বিস্কো কোনটা বোঝে কোনটা বোঝে না। তবু সব কথা বোঝার চেষ্টা করে। পরস্পরের সঙ্গ ভালোবাসে। প্রোমার বান্ধবীরা আসে। বিস্কোকে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টা করে। বিস্কো সেসবের কিছুই বোঝে না। প্রোমা আকার ইঙ্গিতে বোঝায় বান্ধবীরা কী বলে গেল।

চার পাঁচ দিন কেটে গেল। বিস্কোর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। ফ্রান্সিস ভীষণ চিন্তায় পড়ে। বন্ধুদের মনও ভালো নেই। বিস্কো এভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল।

—তবে কি বিস্কো মারা গেছে? ফ্রান্সিস চিন্তিতস্বরে একদিন হ্যারিকে বলল।

—তাহলে তো ওর মৃতদেহ আমরা পেতাম। হ্যারি বলল।

—হয়তো বনের মধ্যে কোথাও। ফ্রান্সিসকে থামিয়ে দিয়ে হ্যারি বলল—বড় বেশি ভাবছো। শোন বিস্কোর কিছুই হয়নি। ও ভালোই আছো। কালকে এলুডায় চলো। ওখানে ভালোভাবে খোঁজ করতে হবে।

—আমি জাহাজে খোঁজ করতে যাবো? শাঙ্কো বলল।

—তার আগে এলুডায় যাবো। হ্যারি বলল।

পরদিন সকালে খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারি এলুডার দিকে চলল। প্রান্তর আর খাঁড়ি বনভূমি পার হয়ে এলুডায় এসে পৌঁছাল। প্রথমেই গেল সর্দারের বাড়িতে। সর্দার ঘর থেকে বেরিয়ে ফ্রান্সিসদের দেখে হাসল। বলল—কী ব্যাপার?

—আমাদের এক বন্ধু এখানে কোথাও আছে কিনা খুঁজতে এসেছি। দু'জন লোক দাও।

—বেশ তো। সর্দার বলল। তারপর হাততালি দিল। তিনচারজন যোদ্ধা আশপাশের বাড়ি থেকে ছুটে এল। সর্দার তাদের বুঝিয়ে বলল। দু'জন যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের ইঙ্গিত করল ওদের সঙ্গে আসার জন্যে।

ফ্রান্সিসরা যোদ্ধা দু'জনের পেছনে পেছনে চলল। দু'জন যোদ্ধা এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও বিস্কোর কোন হদিশ করা গেল না। রেজাম চত্বরের কাছে একজনকে কি জিজ্ঞেস করল যোদ্ধারা। লোকটি আঙ্গুল তুলে প্রোমাদের ঘরটা দেখাল। ফ্রান্সিস ছুটে গেল সেই ঘরের দিকে। যোদ্ধারা ডেকে কী বলল। প্রোমা বেরিয়ে এল। যোদ্ধারা বোধহয় জিজ্ঞেস করল কোন বিদেশী ওখানে আশ্রয় নিয়েছে কিনা। প্রোমা ঘাড় কাত করল। ফ্রান্সিস প্রোমাকে সরিয়ে ঘরটায় ঢুকে পড়ল। দেখল—বিস্কো বিছানায় বসে আছে। ফ্রান্সিস বিস্কোকে জড়িয়ে ধরল। বিস্কো উঃ করে বলে উঠল—কাঁধে ঘা। এখনও সারেনি। হ্যারিও ছুটে এল। বলল—কী চিন্তায় ফেলেছো আমাদের। কী হয়েছিল? ফ্রান্সিস জানতে চাইল। বিস্কো আস্তে আস্তে সব ঘটনা বলল। ততক্ষণে প্রোমা ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রোমাকে দেখিয়ে বিস্কো বলল—এই মেয়েটির নাম প্রোমা। ওর বাবার চিকিৎসায় আর ওর সেবা শুশ্রূষায় আমি বেঁচে গেছি। নয়তো ঘা বিষিয়ে উঠে মরেই যেতাম। ফ্রান্সিস প্রোমার দিকে ফিরে তাকাল। এ দেশীয় মেয়ে। গায়ের রং তামাটে। তবে চেহারায় লাবণ্য আছে। ফ্রান্সিস বার বার প্রোমাকে ধন্যবাদ জানাল। বিস্কো ইঙ্গিতে বোঝাল সেকথা। প্রোমা হেসে মাথা নিচু করল। মেয়েটিকে বড় ভালো লাগলো ফ্রান্সিসের।

এবার ফ্রান্সিস বলল—এখানে আর থাকা নয় আমাদের সঙ্গে ফিরে চলো।

—না ফ্রান্সিস—আমি আর ফিরে যাবো না—বিস্কো বলল।

—সে কি? এখানে পড়ে থাকবে? তুমি তো এখনও সম্পূর্ন সুস্থ নও। হ্যারি বলল।

—না। আমি প্রোমাকে বিয়ে করবো। বিস্কো বলল।

—সর্বনাশ। ফ্রান্সিস আঁৎকে উঠল।

—এতে সর্বনাশের কিছু নেই। প্রোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। বিস্কো বলল।

—তাহলে ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছে। ঠিক আছে বিয়ে করে জাহাজে নিয়ে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

—না। আমি এখানেই থাকবো। বিস্কো বলল।

—দেশে ফিরলে তোমার বাবা মা যখন জানতে চাইবে তুমি ফিরলে না কেন আমি কী বলবো তখন? ফ্রান্সিস বলল।

—এখানে যা ঘটল আর যা ঘটবে সব বলবে। বিস্কো বলল।

—কিন্তু তোমার জীবনের মরণের দায়িত্ব নিয়েছি আমি। ফ্রান্সিস বলল।

—আর তোমার কোন দায়িত্ব রইল না। আমি যা করছি স্বেচ্ছায় করছি। বিস্কো বলল।

—তাহলে তুমি ফিরে যাবে না? হ্যারি বলল।

—না। এটাই আমার সিদ্ধান্ত। বিস্কো বলল।

—কিন্তু একটা বিদেশী মেয়ে—হ্যারি বলতে গেল।

—আমরা আকার ইঙ্গিতে সব কথাই বলি। ওদের কথাও আমি কিছু কিছু শিখেছি। বিস্কো বলল।

হ্যারি মাথা দুলিয়ে বলল—ফ্রান্সিস কিছু বলে লাভ নেই। বিস্কো আর ফিরবে না।

তখনই প্রোমার বাবা ঘরে ঢুকল? ফ্রান্সিস তাকে জিজ্ঞেস করল—আপনি কে?

—উনি প্রোমার বাবা। বিস্কো বলল।

—আপনি কি জানেন ওরা বিয়ে করবে? ফ্রান্সিস বলল। প্রোমার বাবা কিছুই বুঝল না। ফ্রান্সিস বুঝল প্রোমার বাবা রাজি। আর কী বলার আছে। বিস্কোর আর ফেরার আশা নেই।

—তাহলে এখানেই বিয়ে হবে? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। বিস্কো বলল।

—কবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—এখনও দিন ঠিক হয়নি। তোমরাই বলো কবে হলে তোমাদের সুবিধে হয়। বিস্কো বলল।

—পরশু বিয়ের দিন স্থির করেছি। মারিয়া আর ভেনকে জাহাজ থেকে এখানে আনতে হবে তো। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজকুমারী আসবেন? বিস্কো সাগ্রহে বলল।

—নিশ্চয়ই আসবেন। তোমার বিয়ে। আমাদের সবার কাছে কত আনন্দের দিন আর মারিয়া আসবে না? ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরের দিকে ফ্রান্সিস আর হ্যারি ফিরে এল। বন্ধুরা সবাই ছুটে এল। হ্যারি বলল—বিস্কোকে পাওয়া গেছে। তবে কাঁধে একটা বর্শার ঘায়ের ক্ষত হয়েছে। এখন ভালোর দিকে। ফ্রান্সিস একবার বন্ধুদের মুখের দিকে তাকাল। দেখল। তারপর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল—পরশু বিস্কোর বিয়ে? দু'তিনজন চেঁচিয়ে বলে উঠল—বিয়ে?

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বিছানায় বসতে বসতে আস্তে আস্তে সব কথা বলতে শুরু করল। কথা শেষ হতে বন্ধুরা অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কারো মুখে কথা নেই। ফ্রান্সিস হেসে বলল—সবাই বোবা হয়ে গেলে যে। বিস্কোর বিয়ে বলে কথা। আনন্দ কর। হৈ হৈ কর।

—এটা আমাদের কাছে খুবই আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু আর এক বন্ধুকে আমরা হারালাম এটা দুঃখের। শাঙ্কো বলল।

—তোমরা বিস্কোকে বোঝাতে পারতে। সিনাত্রা বলল।

—অসম্ভব। বিস্কোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। হ্যারি বলল।

—যা হবার হবে। দুঃখ নয়—খুশির হাওয়া তোল। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

এবার সব বন্ধু ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—তোমাদের তো খাওয়া হয়ে আছে?

—হ্যাঁ। শাঙ্কো ঘাড় কাত করে বলল।

—তাহলে শাঙ্কো—তোমাকে একবার জাহাজে যেতে হবে। মারিয়া আর ভেনকে আনতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়ই যাবো। শাঙ্কো বলল—সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছবো। আজকে রাতটা জাহাজে কাটিয়ে কালকে দুপুরের মধ্যে রাজকুমারী আর ভেনকে নিয়ে আসবো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কো তৈরী হয়ে নিল। ওদের দুটো নৌকা জেলেদের ঘাটে বাঁধা ছিল। শাঙ্কো সেই ঘাটে গেল। বাঁধা দড়ি খুলে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে দাঁড় তুলে নিল। নৌকা চালাল খাঁড়ির মুখের দিকে। কিছু পরে নৌকা সমুদ্রে পড়ল।

পরের দিন দুপুরেই মারিয়া আর ভেন এলো। ফ্রান্সিস ওদের আসার পথ চেয়ে ঘরের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। দূরে প্রান্তরের ওপরে মারিয়াদের আসতে দেখল। প্রান্তরে মাঝামাঝি আসতে শাঙ্কো আঙুল তুলে ফ্রান্সিসকে দেখাল। মারিয়া প্রায় ছুটতে ছুটতে আসতে লাগল। প্রান্তরের হাওয়ায় মারিয়ার মাথার চুল উড়ছে। পোশাকের প্রান্ত দেশ উড়ছে। মারিয়া হাসছিলও। মারিয়ার এই উচ্ছল রূপ দেখে ফ্রান্সিসের মন খুশিতে ভরে গেল। মারিয়ার এক নতুন রূপ দেখল।

মারিয়া ফ্রান্সিসের সামনে এসে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—বিস্কোর বিয়ে। আমি না এসে পারি।

—তাই তো শাঙ্কোকে পাঠালাম। শাঙ্কোর কাছে মারিয়া সবই শুনেছে। বলল—বিস্কো আর আমাদের সঙ্গে থাকবে না এটা জেনে কিন্তু আমার মন খারাপ হয়ে গেছে।

—কী আর করা যাবে। মানুষের মন। ফ্রান্সিস হাসল। বলল—ঘরে এসো।

ঘরে ঢুকে মারিয়া এক পাশে বসল। প্রায় সকলেই এসে এসে মারিয়াকে কেমন আছে জানতে চাইল। মারিয়াও বার বার বলল—আমি আর ভেন ভালো আছি। তোমরাও ভালো আছো নিশ্চয়ই।

—আমাদের দু'জন বন্ধু মারা গেছে। একজন অবশ্য এখানকার বন্ধু। শাঙ্কো বলল। মারিয়া একটু বিষন্ন হলো। ফ্রান্সিস প্রসঙ্গটা পাল্টাতে বলল—

—শাঙ্কো মরিয়াদের খাওয়ার ব্যবস্থাটা কর।

শাঙ্কো চলে গেল।

সন্ধ্যেবেলা ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেল। রাজা মন্ত্রণাকক্ষে ফ্রান্সিসদের সঙ্গে দেখা করলেন। ফ্রান্সিসের অনুরোধে মারিয়ার অন্তঃপুরে থাকার ব্যবস্থা হল।

রাতের খাবার খেয়ে মারিয়া ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—বিস্কোর বিয়ে হয়ে গেলেই তো তোমরা জাহাজে ফিরে যাবে।

—এই বার আসল কথা। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—আবার গুপ্তধন—তাই না? মারিয়া বলে উঠল।

—ঠিক ধরেছো। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—শাঙ্কোর কাছে কিছু কিছু শুনলাম। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস গুপ্তধনের সমস্ত ব্যাপারটা বলল।

—আমি গুপ্তধন খোঁজার সময় তোমার সঙ্গে থাকবো। মারিয়া বলল।

—দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি না। আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে। মারিয়া গলায় জোর দিয়ে বলল।

—বেশ—যে সব জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এবার একটা কথা বলি। তুমি রানিকে বলো রাজবাড়ির অন্তঃপুরে কোথাও গুপ্তধন থাকার মত জায়গা আছে কি না। ফ্রান্সিস বলল।

—রানি কি সেরকম কোন হদিশ দিতে পারবে? মারিয়া বলল।

—তা পারবেন না। তবে কোন গোপন জায়গার কথা নিশ্চয়ই বলতে পারবেন। তুমি একবার কথার কথা বলো তো। ফ্রান্সিস বলল।

—আচ্ছা। বলবো। মারিয়া বলল।

একটু পরেই হ্যারি রাজকুমারীকে নিয়ে রাজবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এল।

ওদিকে শাঙ্কো পাঁচজন বন্ধুকে নিয়ে জেলেপাড়ার ঘাটে চলে গেছে। নৌকা থেকে একটা বড় গাঠারি নিয়ে এল সবাই মিলে। শাঙ্কো গাঠারিতে ভরে এনেছে সকলের নতুন পোশাক। বিস্কোর বিয়ে বলে কথা। সবাই নতুন পোশাক পরবে বিয়ের রাতে। বন্ধুরা শাঙ্কোকে বাহবা দিল। এতে বন্ধুরা আরোও খুশি হল।

পরদিন সকালেই মারিয়া রাজবাড়ি থেকে চলে এল ফ্রান্সিসদের ঘরে। ফ্রান্সিস বলল—রানির সঙ্গে কিছু কথা হল?

—হ্যাঁ। উনি বললেন এর আগে নাকি রাজবাড়িতে খোঁজাখুঁজি হয়েছে। কিন্তু কেউ ঐ গুপ্তধনের হদিশ করতে পারেননি। মারিয়া বলল।

—হুঁ। কিন্তু কোন গোপন জায়গার কথা কিছু বলেছেন। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—একটা গর্ভ গৃহের কথা বলেছেন। রাজবাড়ির পূবকোণায় নাকি মেঝের নিচে একটা ঘর আছে। মারিয়া বলল।

—ঘরটা কি পরিত্যক্ত? ফ্রান্সিস বলল।

—এখন পরিত্যক্তই। রানির বক্তব্য ঐ ঘরটা নাকি অতীতে কয়েদঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত। মারিয়া বলল।

—হুঁ। ঘরটা দেখতে হবে। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সবাই শুয়ে বসে বিশ্রাম নিল। মারিয়াও রাজবাড়িতে গেল না। ফ্রান্সিসদের সঙ্গে খেল। ঐ ঘরেই থাকল।

ফ্রান্সিস শুয়ে শুয়ে রাজা মুস্তাকিমের গুপ্ত ধনভান্ডারের উদ্ধারের কথাই ভাবছিল।

বিকেল হল। ফ্রান্সিস উঠে বসল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—তৈরি হও। আজ যুদ্ধ নয়—বিয়ে। শাঙ্কো সবার নতুন পোশাক নিয়ে এসেছে। পরে টরে তৈরি হও।

মারিয়া নিজের ভালো পোশাকটা একটা চমড়ার থলিতে ভরে নিয়ে এসেছিল। বিয়ের কথা শুনে রানি বলেছিলেন উনিই তো সাজিয়ে দেবেন।

—বেশ তো। তুমি এলে আমরা রওনা হবো। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া চামড়ার থলিটা নিয়ে রাজবাড়িতে চলে গেল।

সন্ধ্যের আগেই মারিয়া চলে এল। রানি মারিয়াকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। ফ্রান্সিস আর বন্ধুরা অবাক হয়ে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। রাজকুমারীর মতই দেখাচ্ছে মারিয়াকে। এই রূপসজ্জায় মারিয়াকে দেখে ফ্রান্সিসেরও ভালো লাগল। মারিয়ার সেই দুধে আলতায় গায়ের রংটা তামাটে হয়ে গেছে। তবু এখনও মারিয়া সাজগোজ করলে অতি সুন্দরী। মারিয়া তখন হাসিখুশিতে উচ্ছ্বল।

ওদিকে ভাইকিং বন্ধুরাও নতুন পোশাক পরে নিয়েছে। সবাই খুশি। মারিয়া ফ্রান্সিসকে নতুন পোশাক পরিয়ে দিল।

সবাই তৈরি হলে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—চলো সব।

দল বেঁধে ওরা প্রান্তর পার হল। বসতি এলাকায় এল। আশপাশের ঘর থেকে স্থানীয় লোকজন ফ্রান্সিসদের দেখে বেশ অবাক হল। নতুন পোশাক পরে বিদেশীরা কোথায় যাচ্ছে? আবার লড়াই করতে? কিন্তু কারো হাতে তো তরোয়াল নেই? খুশিতে হৈ হৈ করতে করতে যাচ্ছে সবাই।

ওরা যখন জেলেপাড়ার ঘাটে পৌঁছল তখন আকাশের নিষ্প্রভ চাঁদ উজ্জ্বল হয়েছে। জ্যোৎস্না পড়েছে জেলেপাড়ায় খাঁড়ির জলে লুভিনা পাহাড়ে নিচের বনভূমিতে।

একটা নৌকোয় মারিয়াকে নিয়ে ফ্রান্সিস উঠল। ওদের বৈদ্যি ভেনকেও তুলে নিল। ফ্রান্সিস নৌকো বেয়ে চলল ওপারে। অন্য ভাইকিং বন্ধুরা খাঁড়ির জলে নামল। জলে শব্দ তুলে হেঁটে চলল ওপারের দিকে।

খাঁড়ি পার হল সবাই। তারপর বনভূমিতে ঢুকল। প্রায় অন্ধকার বনতল দিয়ে মাঠমত জায়গাটায় এল।

যখন বসতি এলাকার মধ্যে দিয়ে রেজাম চত্বরে এসে পৌঁছল তখন রাত হয়েছে।

দেখা গেল রেজাম চত্বরেই বিয়ের আয়োজন হয়েছে। ফ্রান্সিস একটা জিনিস দেখে খুশি হল যে চত্বরের মাঝখানের খুঁটিটা তুলে ফেলা হয়েছে। দেখা গেল ফুল পাতা দিয়ে চত্বরময় ঝালরের মত টাঙানো হয়েছে। চারদিকে বেশ কিছু মশাল জ্বলছে। তার ওপর চাঁদের আলোও রয়েছে। জায়গাটা আলোকিত।

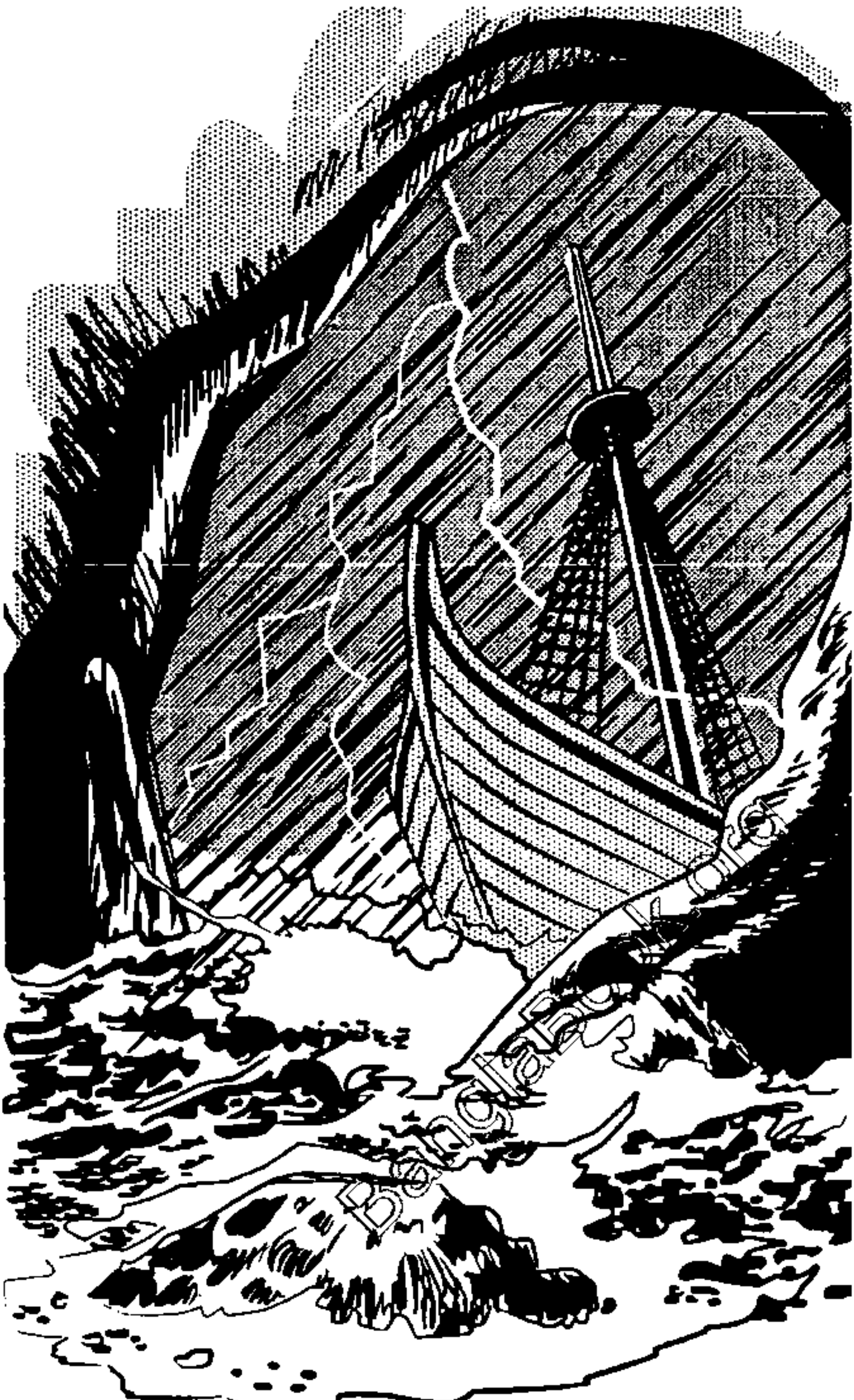
ফ্রান্সিস দেখল সর্দার ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখাশুনো করছে। চড়য়ের মাঝখানে চারকোণে গাছের ডাল পোঁতা হয়েছে। মাঝখানে একটা কাঠের লম্বা পাটাতন। তাতে হলুদ রঙের ফুলপাতা আঁকা। ওটা বোধহয় রবকনের বসার আসন।

সর্দারের নির্দেশে চত্বরে মোটা কাপড় পেতে দেওয়া হল। ফ্রান্সিসরা বসল তাতে। শাঙ্কো এসে মারিয়াকে বিস্কোর নতুন পোশাক দিয়ে গেল। মারিয়া পোশাক নিয়ে হ্যারিকে বলল—চলো—বিস্কোকে তো সাজিয়ে গুজিয়ে দিতে হবে।

হ্যারি মারিয়াকে নিয়ে প্রোমাদের ঘরে নিয়ে এল। মারিয়াকে দেখে বিস্কো হেসে উঠে দাঁড়াল। বলল—আপনি এসেছেন। খুব খুশি হলাম। পাশের ঘর থেকে প্রামা এই ঘরে এল। মারিয়া দেখিয়ে বলল—উনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। বিস্কো আকার ইঙ্গিতেও সেটা বোঝাল। প্রোমা মোটামুটি বুঝল। খুশির হাসি হাসল। মারিয়া বলল—বিস্কো—এবার তোমাকে সাজিয়েগুছিয়ে দিচ্ছি। মারিয়া নতুন পোশাক নিয়ে কাজে নেমে পড়ল। মারিয়া প্রোমাকেও সাজিয়ে গুজিয়ে দিল। কিছু প্রসাধনী সঙ্গে করে এনেছিল। সেসব কাজে লাগল।

তখনই প্রোমার বাবা ঘরে ঢুকল। প্রোমাকে কিছু বলল। প্রোমা বিস্কোকে আকার ইঙ্গিতে বোঝাল—তলব এসেছে। এখন যেতে হবে। কয়েকজন স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকল। ওদের পেছনে পেছনে বিস্কো আর প্রোমা রেজাম-চত্বরের দিকে চলল। সঙ্গে মারিয়া আর হ্যারি।

ততক্ষণে চত্বর লোকজনে ভরে গেছে। বিদেশীর সঙ্গে বিয়ে। কাজেই তাদের ঔৎসুক্য সীমাহীন। কয়েকজন যোদ্ধা ধ্বনি তুলল—কু-উ-উ-। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—কু-উ-উ-টা লড়াইয়ের ডাক আবার আনন্দেরও ধ্বনি। শাঙ্কোও হাসল।



বিস্কো আর প্রোমাকে কাঠের পাটাতনে বসানো হল। একজন ভীষণ রোগামত লোক ওদের সামনে দাঁড়িয়ে নাকিসুরে কিছুক্ষণ কী আউড়ে গেল। তারপর দুজনের গলায় ফুলপাতার মালা পরিয়ে দিল।

মারিয়া ফ্রান্সিসের পাশে এসে বসল। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল—আমার এত ভালো লাগছে।

—তুমি খুশি থাকলে আমিও খুশি। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এলুডার নিয়মরীতি মেনে বিয়ে শেষ হল। বিস্কো আর প্রোমা হাত ধরাধরি করে চলে গেল। পেছনে একদল স্ত্রীলোক।

এবার খাওয়া দাওয়া। সর্দার এসে ফ্রান্সিসদের ওখানেই খেয়ে যেতে অনুরোধ করল। ফ্রান্সিসরা মোটামুটি সারি দিয়ে বসল। পাত পাতা হল। খেতে দেওয়া হল আনাজের মোটা রুটি আর মাংস। সবাই তৃপ্তি করে খেল। কেউ কেউ দুতিনবারও খাবার চাইল। উপস্থিত দেশীয় লোকজনের সঙ্গেই ওরা খেল।

তারপরই হল বিপত্তি। দেশীয় এক ধরনের ফলের রস কাঠের গ্লাসে করে খেতে দেওয়া হলা। সর্দার দ্রুত ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—ফলরস—খুব নেশা—কম—বলুন। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—এই ফলের রসে ভীষণ নেশা হয়। কম করে খাও। ফ্রান্সিস মারিয়া হ্যারি ভেন সেই রস খেল না। বন্ধু ভাইকিংরা ততক্ষণে দু'এক গ্লাশ খেয়ে ফেলেছে। সবচেয়ে বেশি খেয়েছে শাঙ্কো। ফলের রসের প্রতিক্রিয়া শুরু হল। ভাইকিংদের মাথা ঘুরতে লাগল। শাঙ্কো তো শুয়েই পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে আরো কয়েকজন শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস একটু অবাক হয়েই দেখল ঐ দেশীয় লোকেদের মধ্যে তেমন প্রতিক্রিয়া হল না। তার কারণ বোধহয় ওরা এই ফলের রস খেয়ে অভ্যস্ত।

ফ্রান্সিসরা ওখানেই শুয়ে পড়ল। ঘুম তেমন হল না। মারিয়া তো ঘুমুতেই পারল না।

ভোর হল। সিনাত্রা আর কয়েকজন উঠে বসল। বাকিরা উঠতেই পারল না।

সকালে সবাইকে সকালের খাবার দেওয়া হল। যাদের একটু বেশি নেশা হয়েছিল তারা শুয়েই রইল। উঠে বসে খেতে পারল না। শাঙ্কো একেবারে অসাড়।

ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। সবাইকে নিয়ে কীভাবে ফিরবে?

বেলা বাড়ছে দেখে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ওঠো সবাই। ফিরতে হবে।

যারা উঠে দাঁড়াতে পারছিল তারা উঠল। শাঙ্কো উঠতেই পারল না। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে টেনে তুলল। বলল—যাও—বিস্কোকে ডেকে নিয়ে এসো। আমরা এখান যাবো।

—আমি দাঁড়াতেই পারছি না। শাঙ্কো ধরা গলায় বলল।

—বলো কি! ঠিক আছে। আমাকে ভর দিয়ে দাঁড়াও। শাঙ্কো প্রায় ফ্রান্সিসের গায়ে গা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—যাও বিস্কোকে ডেকে নিয়ে এসো। ওকে বলো আমরা ফিরবো।

হ্যারি বিস্কোকে ডেকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—বিস্কো আমরা এবার যাচ্ছি। আরো কয়েকটা দিন আমরা কয়েকজন রাজা প্রোফেনের রাজত্বে থাকবো। তুমি যদি এর মধ্যে প্রোমাকে নিয়ে জাহাজে যেতে চাও যেও।

—দেখি। বিস্কো বলল।

বন্ধুরা একে একে বিস্কোর কাছে বিদায় নিল। এবার সবাই চলল বনভূমির দিকে। কয়েকজন বন্ধু এলেমেলো পা ফেলে হাঁটছিল। ফ্রান্সিস ধমক দিয়ে বলল—ঠিক করে হাঁটো। টাল খাওয়া শরীর সামলে কোনরকমে হেঁটে চলল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে প্রায় জড়িয়ে ধরে নিয়ে চলল।

বন পার হয়ে খাঁড়ির ঘাটে আসতে বেশ সময় লাগল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ধরে ধরে নৌকোয় বসালো। মারিয়া ভেনও নৌকোয় উঠল। যাদের হাত-পা টলছিল ফ্রান্সিস তাদের বলল—আমি ওপারে গিয়ে নৌকো নিয়ে আসছি। তোমরা জলে নামবে না। বাকিরা জলে নেমে পার হও।

নৌকো চালিয়ে ফ্রান্সিস ওপারে গেল। আবার নৌকো নিয়ে ফিরে এল। হাত-পা টলা বন্ধুদের নৌকোয় তুলে পার করে দিল। শাঙ্কো তখনও পারে বসে আছে। ফ্রান্সিস ওকে ধরে ধরে প্রান্তর পার হয়ে ঘরে নিয়ে এল।

রাতে ফ্রান্সিস মাথার নিচে দুহাত রেখে চোখ বুঁজে শুয়েছিল। ভাবছিল রাজা মুন্ডাকিমের গুপ্ত ধনভান্ডার কোথায় থাকতে পারে? রাজবাড়িতে বনভূমিতে লুভিনা পাহাড়ে—এসবের মধ্যে যে কোন জায়গায় থাকতে পারে। সব তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে। হ্যারি পাশেই শুয়ে ছিল। বলল—ফ্রান্সিস কী ভাবছো?

—রাজা মুন্ডাকিমের গুপ্তধনের কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—রাত হচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়ো। হ্যারি বলল।

—ভেবে কী ঠিক করলে? হ্যারি বলল।

—কাল রাজসভায় যাবো। রাজার সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

—কী লাভ? রাজা তো কিছুই জানেন না। হ্যারি বলল।

—উঁহু। ওঁর একটা কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রান্সিস বলল।

—কোন কথা? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—খেয়ালি রাজা মুন্ডাকিম একা একা পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা উনি খেয়ালি ছিলেন বলে। হ্যারি বলল।

—উঁহু—ব্যাপারটা ভাববার মত। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ আর কী জানতে পারো। কথাটা বলে হ্যারি পাশ ফিরে শুল।

পরদিন সকালে খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারি তৈরি হল। রাজসভায় যাবে। কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস আমরা এখন কী করবো? লড়াই তো হয়ে গেছে! আমরা এখানে থেকে কী করবো? আমরা জাহাজে চলে যাই।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল।

—আজকে দুপুরেই চলে যাই। তাহলে সন্ধ্যের আগেই জাহাজে পৌঁছতে পারবো। ভাইকিং বন্ধু ক'জন বলল।

—শোন। আমাদের এখানে একটা কাজ বাকি আছে। আমি হ্যারি শাঙ্কো আর মারিয়া এখানে থাকবো। কাজ সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজে চলে যাবো। শাঙ্কো তোমাদের নিয়ে যাবে। তোমাদের পৌঁছে দিয়ে জেলেদের নৌকোগুলি নিয়ে আসবে। ও তোমাদের পৌঁছে দিয়ে জেলেদের নৌকোগুলি নিয়ে আসবে। ফ্রান্সিস বলল।

—শাঙ্কো—তাহলে দুপুরের খাবার খেয়েই চলো। ওরা শাঙ্কোকে বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল। ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল—দেখ এখানে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা আছে। তখন হয়তো তোমাদের আবার আসতে হতে পারে। তবে আমরা সাবধানে থাকবো।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি রাজবাড়ির দিকে চলল। রাজসভায় পৌঁছল। দেখল আজকে প্রজাদের ভিড় কম। একটা বিচার চলছিল। রাজার দু'পাশের আসনে মন্ত্রী স্তিফানো আর সেনাপতি বসে আছে।

বিচার শেষ হল। বিচারপ্রার্থীরা চলে গেল। প্রজাদের অনেকেই চলে গেল।

ফ্রান্সিসদের দেখে রাজা ওদের এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলেন। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—মান্যবর রাজা—আমরা আপনার পূর্বপুরুষের গুপ্ত ধনভান্ডারের সন্ধান আজ থেকে শুরু করছি। এখন আপনার কাছে ধনভান্ডার সম্পর্কে কিছু কথা জানতে এসেছি।

—আমি তো যা জানি বলেছি। রাজা বললেন।

—আপনার কী মনে হয়? ঐ ধনভান্ডার কোথায় থাকতে পারে? ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ—রাজা মুণ্ডাকিমের পরের বংশধরেরা সন্ধান চালিয়েছিল। আমিও অনেক সন্ধান করেছি। আমার মন্ত্রীও চেষ্টা করেছেন। ধনভান্ডার কোথায় গোপনে রাখা হয়েছে এ ব্যাপারে সবাই অন্ধকারে। এবার তুমি চেষ্টা করে দেখ। রাজা বললেন।

—চেষ্টা তো করবোই। আমি জেনেছি যে আপনার বাড়িতে একটা গর্ভগৃহ আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। বহুদিন আগে থেকেই ওটা ছিল। হয়তো অবাধ্য প্রজাদের ওপর অত্যাচারের জন্যই ঐ গর্ভগৃহ তৈরি করা হয়েছিল। প্রজা সন্তানের মত। তারা যে অপরাধই করুক তাদের এভাবে শাস্তি দেওয়ার বিরোধী আমি। যা হোক—সেই গর্ভগৃহ আমি পাথর চাপা দিয়ে রেখেছি। রাজা বললেন।

—কেউ কি সেই গর্ভগৃহে নেমে সন্ধান চালিয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল। রাজা এবার স্তিফানোর দিকে তাকালেন। স্তিফানো উঠল—হ্যাঁ—আমি ঐ গর্ভগৃহ তন্নতন্ন করে দেখেছি। গুপ্তধনের কোন হদিশ পাই নি। তুমিও দেখবে নাকি?

—নিশ্চয়ই।

—ওখানে এক ঝাঁক চামচিকে পাবে। সাপটাপও পেতে পারো। স্তিফানো হেসে বলল।

—তবু দেখবো। ফ্রান্সিস রাজার দিকে তাকিয়ে বলল—আপনি অনুমতি দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—সানন্দে অনুমতি দিলাম। তবে তুমি মারা গেলে তার দায় আমার ওপর চাপানো চলবে না। রাজা বললেন।

—কক্ষণো তা করা হবে না। তবে জেনে রাখুন—আমি মারা যাবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো ভালোই। রাজা বললেন।

—লুভিনা পাহাড়ের নিচে যে জঙ্গল আছে সেটাও আমরা দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তো। রাজা বললেন।

—সেই জঙ্গলে দেখার কী আছে? স্তিফানো বলল—

জঙ্গল বনভূমি যেমন হয়। ঘন গাছ লতাপাতা। পাখি।

—আর অন্য কিছু।

—অন্য কিছুই নেই। হ্যাঁ ভালুক বুনো শুওর আছে। স্তিফানো বলল।

—লুভিনা পাহাড়ে কী দেখার আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—পাহাড়-টাহাড় যেমন হয়। রাজা বললেন।

—তবু—সেই পাহাড়ে কী আছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—গিয়ে দেখো। স্তিফানো বলল।

—আপনার কাছে জানতে চাইছি। ফ্রান্সিস রাজাকে বলল।

রাজার যেন মনে পড়ল। বললেন—হ্যাঁ—লুভিনা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে একটা গুহা আছে।

—গুহাটা কত বড়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—বেশ বড়। এপার থেকে ওপার পর্যন্ত চলে গেছে। রাজা বললেন। এবার স্তিফানো বলল—পাহাড়ের মাথার দিকে আছে একটা সরোবর।

—সরোবর? ফ্রান্সিস বলে উঠল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। রাজা মাথা ঝাঁকালেন। বললেন—কোন সময় ওখানে হয়তো আগ্নেয়গিরি ছিল। এখন মৃত। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখেই জল জমে ঐ সরোবর হয়েছে। তার নাম শুনলে বেশ ভয় পাবে?

—কী নাম? ফ্রান্সিস বলল।

—মৃত্যু-সায়র। রাজা বললেন।

—এরকম একটা নাম কেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—শোন্—সায়র বলা হলেও তেমন বড় কিছু নয়। একটা ছোট পুকুরের মত। তবে তার জল এত বিষাক্ত যে প্রাণী পাখি তার মধ্যে পড়লে মুহূর্তে মৃত্যু হয়। রাজা বললেন।

—মানুষ পড়লে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—তার চিহ্নও পাওয়া যাবে না। তাই তো নাম মৃত্যু-সায়র। রাজা বললেন।

—তুমি মৃত্যু-সায়রে নামবে নাকি? স্তিফানো ঠাট্টার সুরে বলল।

—আমি অত সহজে মৃত্যু মেনে নিতে রাজী নই। যাহোক মৃত্যু—সায়র তো দেখতে হবেই। ফ্রান্সিস বলল।

—কেউ ওর ত্রিসীমানায় যায় না। রাজা বললেন।

—আমরা সাবধানে দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—যাহোক—একটা মজার খবর পেলাম। স্তিফানো বলল।

—কী খবর? ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের এক বন্ধু নাকি এক এদেশী মেয়ে বিয়ে করেছে? স্তিফানো বলল।

—হ্যাঁ। মানুষের মন বিশেষ করে যুবকের মন। ফ্রান্সিস বলল।

—সে কি? এই বিদেশে পড়ে থাকবে? রাজা বেশ অবাক হয়ে বললেন।

—তোমার বন্ধুকে এলুডার সর্দার করে দাও। ঠাট্টার সুরে স্তিফানো বলল।

—সে তার যোগ্যতায় যদি সর্দার হতে পারে হবে যেমন আপনি এখানকার মন্ত্রী হয়েছেন। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

স্তিফানো আর কিছু বলতে পারল না। মুখের মত জবাব ফ্রান্সিসের।

—যা হোক—আশা করি তোমরা সফল হবে। রাজা বললেন।

—দেখবো চেষ্টা করে। মাননীয় রাজা—কালকে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে আপনার বাড়ির অন্দরমহল গর্ভগৃহ দেখতে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ এসো। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি ফিরে এল। মারিয়া এগিয়ে এল। বলল—রাজার সঙ্গে কী কথা হল তোমাদের? ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সব বলল। মারিয়া বলল—সেই মৃত্যুসায়র তাহলে ঐ লুভিনা পাহাড়েই আছে?

—হ্যাঁ সব দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো। মারিয়া বলল।

—বেশ। যেও। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করে বলল।

—এখন কী করবে? হ্যারি জানতে চাইল।

—দেরি করবো না। দুপুরেই চলো। আগে বনাঞ্চলটা দেখে আসি। ফ্রান্সিস বলল।

—বনাঞ্চলটা দেখবে কেন? হ্যারি বলল।

—রাজা প্রোফেন বলেছিল অতীতের রাজা মুগুাকিম কখনও কখনও একা একা ঐ বনে লুভিনা পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। উনি খেয়ালি রাজা ছিলেন। হ্যারি বলল।

—ব্যাপারটার গুরুত্ব আছে। কেন একা একা ঘুরে বেড়াতেন? কোন উদ্দেশ্যই কি তাঁর ছিল না? ফ্রান্সিস বলল।

—কী উদ্দেশে ঘুরে বেড়াতেন? হ্যারি বলল।

—সেটাই জানতে হবে। তাই প্রথমে বনভূমিটা দেখবো। দুপুরের খাওয়া সেরে তৈরি হয়ে নিও। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুর হল। খাওয়াদাওয়া শেষ।

হ্যারি শাঙ্কো মারিয়াকে নিয়ে ফ্রান্সিস প্রান্তরে নামল। প্রান্তর পার হচ্ছে তখনই দেখল সেনাপতি ছুটে আসছে ওদের দিকে। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে পড়ল। কাছে এসে সেনাপতি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—তোমরা কোথায় যাচ্ছো?

—ওপারের বনে। হ্যারি বলল।

—কেন? সেনাপতি জিজ্ঞেস করল।

—দেখি গুপ্ত ধনভান্ডারের কোন হদিশ করতে পারি কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু কথা ছিল গুপ্ত ধনভান্ডার খোঁজার সময় আমাকে সঙ্গে রাখতে হবে। সেনাপতি বলল।

—হ্যাঁ। চলুন তাহলে। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই জেলেপাড়ার ঘাটের দিকে চলল। দু'টো নৌকোয় চড়ে খাঁড়ি পার হল। বনের মধ্যে ঢুকল। খুব গভীর বন নয়। ফ্রান্সিসরা বনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ফ্রান্সিস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক দেখতে লাগল। গাছগাছালি লতা ফুল। ঘুরতে ঘুরতে সার্ভো আর বন্ধুর কবরের কাছে এল। ফ্রান্সিস হাত তুলে সবাইকে দাঁড় করালো। তারপর ফুলে ঢাকা গাছটা থেকে ফুল পাড়ল। কবরের ওপর ছড়িয়ে দিল। হ্যারিরাও এদিক ওদিক থেকে ফুল তুলে এনে কবরের ওপর ছড়িয়ে দিল।

সারা বনেই ফ্রান্সিসরা ঘুরে বেড়াল। কিন্তু গুপ্ত ধনভান্ডারের হদিশ পাওয়া যায় এমন কিছু পেল না। একটা কালো রোমশ ভালুকের দেখা পেয়েছিল। তবে ভালুকটা ওদের আক্রমণ করেনি। দেখা দিয়েই বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল।

বেশ ক্লান্ত হয়েই ফ্রান্সিসরা খাঁড়ির ঘাটে এল। নৌকোয় উঠতে উঠতে সেনাপতি মন্তব্য করল—ঘোরাই সার।

—হ্যাঁ। তবু সবকিছুই দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা যখন প্রান্তর পার হয়ে ওদের ঘরে ফিরল তখন বিকেল হয়ে গেছে।

ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে পড়ল। হ্যারি এসে পাশে বসল। বলল—ঐ বনে তো কিছু হদিশ করা গেল না।

—না—এবার বাকি জায়গাগুলো দেখবো।

তখনই সেনাপতি এসে দরজায় দাঁড়াল। হেসে বলল—ভূতের বেগার খাটছেন। ফ্রান্সিস সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল—আপনার সঙ্গে লোক দিচ্ছি। তিনটে মশাল পাঠিয়ে দেবেন।

—মশাল নিয়ে কী করবে? সেনাপতি বলল।

—রাজবাড়িতে তল্লাশী চালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—এবার তাহলে রাজবাড়ি। সেনাপতি হেসে বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—গুপ্তধন উদ্ধারের আশা ছেড়ে দাও। সেনাপতি হেসে বলল।

—সে যখন আশা ছাড়ার ছাড়বো। ফ্রান্সিস বলল।

—যাকগে—তোমাদের বেগার খাটার সঙ্গী হব না আর। দু'জন যোদ্ধাকে দেব। তারাই তোমাদের ওপর নজর রাখবে যাতে তোমরা পালাতে না পারো। সেনাপতি বলল।

—বেশ তো। ওদের হাতেই মশাল পাঠিয়ে দিন। হ্যারি বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ বলিষ্ঠ দু'জন যোদ্ধা মশাল নিয়ে এল। শাঙ্কো মশালগুলো নিল।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—হ্যারি তুমি থাকো। অন্দরমহলেই যাবো। তাই মারিয়াকে সঙ্গে নিচ্ছি। শুধু শাঙ্কোকে নিয়ে যাচ্ছি। হ্যারি কিছু বলল না।

যোদ্ধা দু'জনের পেছনে পেছনে ফ্রান্সিসরা রাজবাড়ির দিকে চলল। বর্শা হাতে প্রহরী দরজা ছেড়ে দিল। মন্ত্রণাকক্ষের পাশ দিয়ে ফ্রান্সিসরা অন্দরমহলে ঢুকল। ফ্রান্সিস যোদ্ধা দু'জনকে বলল—তোমরা অন্দরমহলে যেতে পারবে না। এখানে থেকেই আমাদের ওপর নজর রাখো।

ফ্রান্সিস অন্তঃপুরের প্রহরীকে বলল—

—একজন রাণির পরিচারিকাকে ডাকো। প্রহরী ভেতরে চলে গেল। একটু পরে একজন পরিচারিকা নিয়ে এল।

—আমরা অন্দরমহলে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—জানি। রাণিমা বলেছেন আপনারা আসবেন। পরিচারিকা বলল।

ফ্রান্সিসরা অন্তঃপুরে ঢুকল। ফ্রান্সিসরা চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সুন্দর সাজানোগোছানো সব কিছু। ফ্রান্সিস পাথরের দেয়ালগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল যদি কোন চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু তেমন কিছু নজরে পড়ল না। পরিচারিকা ওদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব ঘরই দেখাল। একসময় রাণি হেসে মারিয়ার সঙ্গে কিছু কথাও বললেন।

এবার পরিচারিকা বলল—আর কী দেখবেন?

—গর্ভগৃহ। ফ্রান্সিস বলল—পূবদিকে।

—সেতো সাংঘাতিক জায়গা। পরিচারিকা বেশ ভীতস্বরে বলে উঠল।

—ঠিক আছে। তুমি নিয়ে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

পরিচারিকা ফ্রান্সিসদের রাজবাড়ির পূব অংশে নিয়ে এল। একটা ভেঙে পড়া ঘরের কাছে এসে মেঝের দিকে দেখাল। দেখা গেল একটা পাথরের চৌকোনো পাটাতন। তাতে একটা বড় লোহার কড়া গাঁথা।

—এটাই গর্ভগৃহ। পাটাতনের নিচে। পরিচারিকা বলল।

ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে কড়াটা ধরে টানল। পাটাতনটা ভারি।

—শাঙ্কো—পাটাতন তুলতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। দুজনে

উবু হয়ে বসল। তারপর একসঙ্গে কড়াটা ধরে টানতে লাগল। কয়েকটা জোর হ্যাঁচকা টান পড়তে পাটাতনটা নড়ল। তারপর আরো কয়েকটা জোরে টান পড়তে পাটাতনটা উঠে এল। ভেতরে নিষ্প্রভ আলোয় দেখা গেল পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে।

—শাঙ্কো—মশাল জ্বালো। শাঙ্কো কোমরে গোঁজা চকমকি পাথর আর লোহার টুকরো বের করল। পাথর ঠুকে দু'টো মশাল জ্বালল।

ফ্রান্সিস জ্বলন্ত মশাল হাতে নামতে যাবে শাঙ্কো জামার তলা থেকে ওর ছোরাটা বের করে ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস ছোরাটা কোমরে গুঁজে নিল। তারপর আস্তে আস্তে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

মশালের আলোয় ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। নিরেট এব্ড়োখেব্ড়ো পাথরের ঘর। একপাশে একটা মাটির বড় জ্বালা। আরও একটা কী। কাছে এসে দেখল একটা ভাঙা কাঠের সিংহাসন। সিংহাসনটা সরাতে গেল। ওটা একেবারেই ভেঙে পড়ল। বেশ শব্দ হল।

—কী হল? ওপর থেকে মারিয়ার ভয়ার্ত গলা শোনা গেল।

—কিছু না। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল। ফ্রান্সিস মশাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক ভালোভাবে দেখতে লাগল। মাকড়সার জাল একটা নাক চাপা গন্ধ এসব নিয়ে পরিত্যক্ত ঘর। কে জানে কত বন্দীর দীর্ঘশ্বাস মিশে আছে এখানকার পরিবেশে। নাঃ। কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

ফ্রান্সিস সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল। উৎসুক মারিয়া জিজ্ঞেস করল—কিছু হদিশ পেলে? ফ্রান্সিস মাথা এপাশ ওপাশ করল।

মশাল নিভিয়ে ফ্রান্সিসরা রাজবাড়ির বাইরে চলে এল। যোদ্ধা দু'জনকে ফ্রান্সিস বলল—আজকে আর কোন খোঁজাখুঁজি নয়। তোমরা চলে যেতে পারো। যোদ্ধারা চলে গেল।

ঘরে এসে ফ্রান্সিস বিছানায় বসল। হ্যারি বলল—

—কোন সূত্র পেলে?

—নাঃ। ঐ গর্ভগৃহে গুপ্তধন রাখা হয়নি। এখন বাকি রইল লুভিনা পাহাড়। কালকে পাহাড়ে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—গুপ্তধনের ব্যাপারটাই গন্ডগোলে। মারিয়া মন্তব্য করল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—গুপ্তধন বলে কথা। ওসব বরাবরই গোলমেলে ব্যাপার।

—বনেজঙ্গলে দেখলে গর্ভগৃহে দেখলে কোথাও তো পেলে না। মারিয়া বলল।

—পাহাড়টাও দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি ওখানে না পাও। মারিয়া বলল।

—আমরা সব নতুন করে দেখবো।

—আবার? মারিয়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

ফ্রান্সিস হেসে উঠল। বলল—সত্যি তোমার ধৈর্যশক্তি খুবই কম। এত সহজে হাল ছেড়ে দিচ্ছো?

—না বাপু। জাহাজে ফিরে চলো। মারিয়া বলল।

—শাঙ্কো যাক—তোমাকে জাহাজে রেখে আসুক। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়ার একটু অভিমানই হল। দেয়ালে হেলান দিতে দিতে বলল—

—তাহলে ধৈর্য ধরতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

রাত হল। মারিয়া ফ্রান্সিসদের সঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে রাজবাড়ি চলে গেল। বার বার বলে গেল—আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো কিন্তু।

—রাজকুমারী আপনাকে রেখে আমরা যাবো না। আপনি সকালেই চলে আসবেন। হ্যারি বলল।

পরদিন ভোরেই মারিয়া চলে এল। সকালের খাবার খেয়ে এসে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—দেরি করো না। রোদ চড়ে যাবে। এখনই চলো।

তখনই সেনাপতি এল। সঙ্গে গতকালের সেই দুই পাহারাদার যোদ্ধা। সেনাপতি হেসে বলল—শুনলাম কালকে রাজবাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে খালি হাতে ফিরে এসেছো?

—কে আর দু'হাত ভরে গুপ্তধন দেবে? ফ্রান্সিসও হেসে বলল।

—হদিশ পেলে কিছু? সেনাপতি বলল।

—সময়ের সদ্ব্যবহার কীভাবে করবো? খাবোদাবো ঘুমুবো? ফ্রান্সিস বলল।

—না—তা নয়—মানে—

—আমরাই সময়ের ঠিক সদ্ব্যবহার করছি। চিন্তাভাবনা করছি—বুদ্ধির গোড়ায় শান দিচ্ছি। বুদ্ধিকে শাণিত করছি। আলস্যে সময় কাটাচ্ছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক্‌গে—যেমন তোমাদের মর্জি। চলি। সেনাপতি চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা দ্রুত তৈরী হয়ে নিল। প্রান্তর পার হয়ে জেলেপাড়ার ঘাটের দিকে চলল। সঙ্গে যোদ্ধা দুজনও চলল।

যেতে যেতে ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল বেশ বলশালী যোদ্ধাটি মাঝে মাঝেই ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। নৌকোয় উঠেও সে ফ্রান্সিসের পাশে বসল। এতে দাঁড় টানতে ফ্রান্সিসের বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু ও কিছু বলল না ব্যাপারটা হ্যারিও লক্ষ্য করেছিল।

বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে যখন তখন হ্যারি নিম্নস্বরে বলল—ফ্রান্সিস কী ব্যাপার বলো তো?

—কোন ব্যাপারে বলছো? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—একজন যোদ্ধা তোমার মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছে। হ্যারি বলল।

—হুঁ—ফ্রান্সিসও গলা নামিয়ে বলল—আমিও লক্ষ্য করেছি। তবে কেন এরকম করছে সেটা ঈশ্বরই জানে।

—ব্যাপারটা আমার ভালো ঠেকছে না। ওরা তরোয়ালও নিয়ে এসেছে। তুমি সাবধানে থেকো। ওর ওপর নজর রেখো। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল।

—আরে যেতে দাও। ফ্রান্সিস তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলল।

—উঁহু—তুমি ব্যাপারটা এভাবে উড়িয়ে দিও না। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

বনভূমির মধ্যে দিয়ে হেঁটে সবাই লুভিনা পাহাড়ের নিচে এল। 'খুব একটা উঁচু পাহাড় নয়। আর খুব ছোটও নয়।

ফ্রান্সিস যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বলল-আমাদের গুহাটার মুখে নিয়ে চলো।

—তাহলে পাহাড়ে উঠতে হবে। যোদ্ধাদের একজন বলল

—চলো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজন এ পাথর সে পাথর কখনও ধরে কখনও ডিঙিয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। পেছনে লাইনে ফ্রান্সিসরাও উঠতে লাগল। মারিয়ার উঠতে দেরি হচ্ছিল। শাঙ্কো মারিয়াকে পাহাড়ে উঠতে সাহায্য করছিল।

একসময় গুহার মুখে এসে পৌঁছল সবাই। রোদের বেশ তেজ। আর জোর হাওয়া বইছিল। তাতে কষ্টটা কম হচ্ছিল। ফ্রান্সিস গুহার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—শাঙ্কো—মশাল জ্বালো। শাঙ্কো দুটো মশাল কোমরে ফেট্টিতে গুঁজে উঠেছিল। ও চকমকি পাথর লোহার টুকরো বের করল। ঠুকে ঠুকে মশাল জ্বালল। একটা মশাল ফ্রান্সিস অন্যটা হ্যারিকে দিল। শাঙ্কো মারিয়াকে হাত ধরে নিয়ে চলল।

কিছুটা এগোতেই নিকষ অন্ধকার। গুহার মেঝেয় পাথরের টুকরো ছড়ানো। একটু উঁচু নিচুও। চারদিক থেকে দেখে হাঁটছিল। এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো পাথর এখানে ওখানে উঁচিয়ে আছে। বেশ কিছুটা যেতে গুহা পথের উত্তর মুখো ঢাল শুরু হল। এখানে গুহার অংশটা উঁচু। ফ্রান্সিস হাতের মশালটা উঁচু করে তুলে ওপরের দিকে তাকাল। দেখল এক খোঁদল মত ওপরের দিকেও উঠে গেছে। ওপরে কী আছে বোঝা গেল না। এবার উত্তরের ঢাল বেয়ে ওরা চলল। এরকম অভিযানে তো মারিয়া অভ্যস্ত নয়। ও ভাবছে কতক্ষণে গুহা থেকে বেরোবে। আর সবাই নির্বিকার হেঁটে চলেছে।

কিছু পরে ওদিককার গুহামুখ দেখা গেল। প্রায় গোল মুখ। যেমন একটা রোদ মাখানো গোলাকার কাপড় ঝুলছে। গুহা পথ শেষ। সবাই বাইরে উজ্জ্বল রোদে এসে দাঁড়াল। অন্ধকার থেকে এসে চোখে একটু অস্বস্তি হল। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই অস্বস্তিটা কেটে গেল।

উত্তরের বনের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস একটা ব্যাপার দেখে বেশ আশ্চর্য হল। এদিকে নিচে বেশ দূর পর্যন্ত টানা ঊষর মাটি। ঘাসের বা গাছের কোন চিহ্ন নেই বেশ কিছু দূর পর্যন্ত। যেন এই টানা জায়গাটা আগুনে পুড়ে গেছে। অথচ দু পাশে ঘাস গাছগাছালি। ফ্রান্সিস হ্যারিকে দেখাল সেটা। দেখেটেখে হ্যারি বলল—এখানে হয়তো দাবাগ্নি জ্বলেছিল।

—তেমনি কিছু হবে। ফ্রান্সিস বলল। ফ্রান্সিস ওপরের দিকে তাকাল। পাহাড়ের এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো গা উঠে গেছে সেই চূড়ো পর্যন্ত।

ফ্রান্সিস ফিরে যোদ্ধাদের বলল—মৃত্যু সায়রটা কোথায়?

—এদিক দিয়ে উঠেও যাওয়া যায় আবার ওদিক থেকেও উঠেও দেখা যায়। বলশালী যোদ্ধাটি বলল?

—আমরা এদিক দিয়ে উঠবো। ফ্রান্সিস বলল। এবার মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি শাঙ্কোর সঙ্গে এখানে থাকো। পাহাড়ে উঠতে পারবে না।

—না আমি উঠতে পারবো। শাঙ্কো উঠতে সাহায্য করবে। মারিয়া বলল

—বেশ চলো। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই এপাথরের চাঁই ওপাথরের চাঁইয়ের পাশ দিয়ে কখনো চাঁই ডিঙিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

বেশ সময় লাগল উঠতে। পাহাড়ের চূড়োর কাছাকাছি উঠে দেখল একটা মাত্র শুকনো আঁকাবাঁকা ডালওয়ালা গাছ। তার পাশেই একটা ছোট জলাশয়। বলিষ্ঠ যোদ্ধাটি বলল—এটাই মৃত্যু-সায়র।

ছোট জলাশয়। ফ্রান্সিস ঢাল বেয়ে জলাশয়ের একেবারে কাছে চলে এল। ভালো করে মৃত্যু-সায়রটা দেখতে লাগল। হলদেটে রঙের জল। কেমন একটা নাক-চাপা গন্ধ। পাথরের গা থেকে নিশ্চয়ই বিষাক্ত কিছু বেরিয়ে এই জলে মেশে। তাতেই বিষাক্ত হয়ে গেছে এই জল।

হঠাৎ শাঙ্কোর উত্তেজিত ডাক শুনল ফ্রান্সিস। সেইসঙ্গে মারিয়ার ভয়ার্ত চিৎকার। ফ্রান্সিস এক পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বলিষ্ঠ যোদ্ধাটি তখন দ্রুত ওর সামনে নেমে এসেছে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। ফ্রান্সিসকে ধাক্কা দিয়ে মৃত্যু-সায়রে ফেলে দেওয়া। ফ্রান্সিস তৎক্ষণাৎ শরীর ঘুরিয়ে সরে গেল। ঢালু পাথরে টাল সামলাতে পারল না যোদ্ধাটি। পাথরের নুড়িতে পা হড়কে মৃত্যু-সায়রে পড়ে গেল। একগাদা নুড়ি পাথরও সেইসঙ্গে জলে পড়ল। ঝপাৎ করে শব্দ হল। যোদ্ধাটি দু'হাত তুলে জলে ডুবে গেল। আর উঠল না। আস্তে আস্তে জলের ঢেউ বন্ধ হল।

মুহূর্তে ঘটে গেল সব। মারিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস একটু হাঁপাতে হাঁপাতে গাছটার কাছে উঠে এল। সঙ্গের যোদ্ধাটির মুখ তখন ভয়ে সাদা। এরকম ঘটনা ও হয়তো কল্পনাও করেনি। ফ্রান্সিস ওর কাছে এল। বলল—তোমার যোদ্ধা বন্ধু আমাকে ঠেলে ফেলতে চেয়েছিল কেন? মাথা দুলিয়ে যোদ্ধাটি বলল—জানি না।

—ফ্রান্সিস? হ্যারি ডাকল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল।

—আর এখানে নয়। নেমে চলো। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। মৃত্যু-সায়রটাই দেখা বাকি ছিল। চলো। কথাটা বলে ফ্রান্সিস মারিয়ার কাছে এল। মারিয়া তখনও ফোঁপাচ্ছে। মারিয়ার মাথায় হাত রেখে মৃদুস্বরে বলল—কেঁদো না। অত সহজে আমার মৃত্যু হবে না। এবার তো বুঝলে এ সব অভিযানে এমনি ভয়ানক ঘটনা ঘটে। তাই তোমাকে সঙ্গে আনিনা। যাক্‌গে—শান্ত হও। মারিয়ার ফোঁপানি বন্ধ হল।

এবার ফ্রান্সিসরা পাহাড়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে নামতে লাগল। নামতে নামতে হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—এর মূলে স্তিফানো। নিশ্চয়ই ওর এরকম নির্দেশ ছিল।

—অসম্ভব নয়। ফ্রান্সিসও গলা নামিয়ে বলল। ফ্রান্সিস দেখল দক্ষিণ দিক দিয়ে পাহাড়টায় ওঠানামা সহজ। প্রান্তরের কাছে এসে যোদ্ধাটি সৈন্যাবাসের দিকে চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকল। মারিয়া দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। হ্যারি শাঙ্কো বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ে চোখ বুঁজল। কেউ কোন কথা বলল না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস বলল—কালকে আবার লুভিনা পাহাড়ে যাবো। গুহাটা ভালো করে দেখা হয়নি। গুহাটা আর তার চারপাশ ভালো করে দেখতে হবে।

—আমিও যাবো। মারিয়া বলল।

—বেশ। যেও। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালে সেনাপতি এল। ফ্রান্সিসকে বলল—

—তোমাকে রাজা মন্ত্রীমশাই দু'জনেই ডেকেছেন। রাজসভায় চলো।

—ফ্রান্সিস—কালকের ব্যাপারটা। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল। ফ্রান্সিসও মৃদুস্বরে বলল—বোঝাই যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—আমি আর হ্যারি যাচ্ছি।

দুজনে যখন রাজসভায় পৌঁছল দেখল রাজসভায় কোন বিচার চলছে না। বোধহয় আগেই সে সব কাজ সেরে ফেলা হয়েছে। রাজসভায় প্রজাদের ভিড় নেই।

রাজা প্রোফেন ফ্রান্সিসদের এগিয়ে আসতে বললেন। পাশে বসা মন্ত্রী স্তিফানোর মুখ বেশ গম্ভীর।

—কালকে তোমরা লুভিনা পাহাড়ে গিয়েছিলে? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা কাত করে বলল।

—আমাদের একজন যোদ্ধা কী করে মৃত্যু-সায়রে পড়ে গেল? রাজা বললেন।

—সে আমাকে ঠেলে মৃত্যু-সায়রে ফেলতে চেয়েছিল। আমি সময়মত সরে যেতে সে শরীরের ভারসাম্য রাখতে না পেরে মৃত্যু-সায়রে পড়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—দুর্ঘটনাটা কি এভাবেই ঘটেছিল? স্তিফানো বলল। ফ্রান্সিস চারপাশে তাকাল। দেখল সঙ্গী যোদ্ধাটি কখন ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস তাকে দেখিয়ে বলল—আমাদের কথা বিশ্বাস না হলে এই যোদ্ধাটিকে জিজ্ঞেস করুন। সত্যি ঘটনাটা ওই বলবে।

—ও যা বলার বলেছে। রাজা বললেন।

—নিশ্চয়ই দুর্ঘটনার কথা বলেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা বলেছে—কিন্তু আমার সন্দেহ যাচ্ছে না। স্তিফানো বলল।

—আমি অকারণে নরহত্যা করি না। তাছাড়া সেই যোদ্ধা এদেশের একজন যোদ্ধা। ওর সঙ্গে তো আমার রাগদ্বেষের সম্পর্ক থাকার কথা নয়। ও নিজেই পা পিছলে পড়ে গেছে।

—যাক গে—ব্যাপারটা আমি দেখছি। তোমরা এ দেশ ছেড়ে যেতে পারবে না। স্তিফানো বলল।

—আমরা গুপ্ত ধনভান্ডারের খোঁজ করছি। কাজেই এখান থেকে চলে যাওয়ার প্রশ্ন উঠছে না। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে আমার স্ত্রী রয়েছে। তাকে ফেলে রেখে আমরা পালাতেও পারবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা কি লুভিনা পাহাড়ে আবার যাবে? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ। আজ দুপুরে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—এবার চারজন যোদ্ধা তোমাদের পাহারা দিতে যাবে। স্তিফানো বলল।

—সমস্ত সৈন্যবাহিনী গেলেও আমাদের আপত্তি নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশি বাজে বকো না। স্তিফানো প্রায় গর্জে উঠল। হ্যারি চাপাস্বরে বলে উঠল—ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। তারপর বলল—

—মান্যবর রাজা আমরা তাহলে চলে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে রাজবাড়ি থেকে চলে এল।

মারিয়া জানতে চাইল রাজা ডেকেছিলেন কেন? ফ্রান্সিস সব কথা বলল।

—আশ্চর্য। তুমি ঐ যোদ্ধাকে হত্যা করেছো বলে সন্দেহ করছে? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। আমাকে বিপদে ফেলাই স্তিফানোর উদ্দেশ্য। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরে ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে সেনাপতির কাছে পাঠাল। কিছু পরে চারজন যোদ্ধার সঙ্গে শাঙ্কো ফিরে এল। যোদ্ধারা ফ্রান্সিসদের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিসরা তৈরি হয়ে প্রান্তরে এসে নামল। পেছনে চারজন যোদ্ধাও চলল।

জেলেপাড়াঘাট বন পার হয়ে লুভিনা পাহাড়ের গুহামুখে এল। শাঙ্কো দুটো মশাল জ্বালল। শাঙ্কো আর ফ্রান্সিস মশাল হাতে গুহায় ঢুকল।

গুহার এবড়োখেবড়ো মেঝের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল সবাই। প্রায় মাঝামাঝি এসে মাথার ওপর খোঁদলের জায়গাটা পার হবার সময় ওপরের খোঁদলটা দেখল একবার। খোঁদলটা হাত দশবারো উঁচুতে। একনজর দেখে হাঁটতে শুরু করল ফ্রান্সিস।

গুহা শেষ। উত্তর দিকে সামনেই সেই অনুর্বর এলাকা। ফ্রান্সিস এবার বলল—হ্যারি এখন আমরা দেশীয় ভাষায় কথা বলবো। যোদ্ধারা কিছু কিছু স্পেনীয় ভাষা বোঝে। শোন—সামনে যে অনুর্বর লম্বাটে জায়গাটা দেখছো সেই জায়গা দিয়ে নিশ্চয়ই অন্তত একবার মৃত্যু-সায়রের বিষাক্ত জল বয়ে গিয়েছিল। কারণ গুহার ঢালটা এদিকেই। কিন্তু পাহাড়ের ওপর থেকে বিষাক্ত জল নামল কী করে?

—কোনভাবে নেমেছে।

—জল বাইরে দিয়ে পড়ে নি। গুহার মধ্যে পড়ে এসেছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে মৃত্যু-সায়রের সঙ্গে গুহাটার যোগ আছে? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ আছে। এখন সেই যোগটা খুঁজে দেখতে হবে। মনে হয় আজ রাতেই সেই যোগটা খুঁজে পাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু চারজন যোদ্ধা পাহারায় থাকবে। হ্যারি বলল।

—না। ওদের নজর এড়িয়ে আমি আর শাঙ্কো আসব। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ না হয় জল নেমে এল। তাতে কী হল? হ্যারি বলল।

—মৃত্যু-সায়রের শুকনো তলদেশটা দেখতে পারবো। আমার কেমন মনে হচ্ছে ওটার তলদেশে নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—অসম্ভব নয়। হ্যারি বলল।

যোদ্ধারা ওদের দেশীয় ভাষা কিছুই বুঝল না। বোকার মত তাকিয়ে রইল।

—এখন ফিরে চলো। আর কিছু দেখবো না। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই ফিরে চলল। নৌকোয় উঠে মারিয়া মৃদুস্বরে বলল—গুহা দেখে কিছু হদিশ পেলে?

—প্রায়। তবে আজ রাতে সব লুকিয়ে দেখতে হবে। ফ্রান্সিসও গলা নামিয়ে বলল।

ঘরে এসে ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখ বুঁজে চিন্তা করতে লাগল। চোখ বুঁজেই ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো এগিয়ে এল।

—সেনাপতিকে বলে একটা কুড়ুল নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজেই বলল।

শাঙ্কো চলে গেল। একটু পরেই একটা কুড়ুল নিয়ে ফিরল। পেছনে পেছনে সেনাপতিও এল। হেসে বলল—কুড়ুল দিয়ে কী করবে?

—মই বানাবো।

—মই? মই দিয়ে কী করবে?

—লুভিনা পাহাড়ের মাথায় উঠবো। পাহাড়ের চূড়োটা দেখা হয়নি।

—মইয়ে চড়ে চূড়োয় উঠবে? অদ্ভুত কথা শোনালে। সেনাপতি হাসতে লাগল।

—হ্যাঁ। আমরা একটু অদ্ভুত। আমাদের কান্ডকারখানাও একটু অদ্ভুত। ফ্রান্সিস হেসে বলল। সেনাপতি হাসতে হাসতে চলে গেল।

রাত হল। খাওয়াদাওয়া শেষ। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়তে পড়তে বলল—শাঙ্কো এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। গভীর রাতে লুভিনা পাহাড়ে যেতে হবে।

—রাতে কী খোঁজাখুঁজি করবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—আছে—আছে। এখনও দেখার মত কিছু আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—পাহারাদার যোদ্ধারা? শাঙ্কো বলল।

—খুব গোপনে যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়ার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বলল—তাহলে আমিও যাবো।

—না মারিয়া। এই কাজটা খুব গোপনে সারতে হবে। তোমাকে নিয়ে গেলে ধরা পড়ে যেতে পারি। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আমি রাজবাড়ি শুতে যাচ্ছি। কাল ভোরে এসে সব শুনবো।

মারিয়া রাজবাড়ি চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত গভীর হল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ডাকল—শাঙ্কো। কুড়ুল আর মশাল।

—সব গুছিয়ে রেখেছি।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—হ্যারি তোমাকে আর নিয়ে যাব না।

—না-না। লোক যত কম হয় ততই ভালো। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্রান্তরে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। ফ্রান্সিস দেখল রাজবাড়ির ছায়া পড়েছে। ও শাঙ্কোর হাত টেনে সেই ছায়ায় নিয়ে এলো। ছায়ার মধ্যে দিয়ে দুজন চলল।

প্রান্তর শেষ। বসতি এলাকার শুরু। পাহারাদারদের এলাকাটা নির্বিঘ্নে পার হওয়া গেল।

নৌকোয় খাঁড়ি পার হয়ে বনভূমি পার হয়ে যাচ্ছে তখনই শাঙ্কোকে বলল—লম্বা গাছ কেটে মই বানাতে হবে। চলো গাছ কাটতে হবে। খুঁজে খুঁজে দুটো সরু অথচ লম্বা গাছ পেল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো পড়েছে। সেটুকু আলো কাজে লাগাল। দুটো লম্বা গাছ কাটল। তারপর গাছের ডালগুলো কাটল। বুনো শুকনো লতা জোগাড় করে কাটা ডাল বেঁধে বেঁধে মই বানাল।

এবার লুভিনা পাহাড়ের দিকে চলল। শাঙ্কো মই কাঁধে চলল।

গুহামুখে এসে দাঁড়াল। মশাল জ্বালল। মশাল আর মই নিয়ে দু'জনে গুহায় ঢুকল। যেতে যেতে প্রায় মাঝামাঝে জায়গায় মইটা নিয়ে এল। মশালের আলোয় ফ্রান্সিস খোঁদলটা দেখল। তারপর মই পাতল। মইটা প্রায় মাপমত হল। শাঙ্কোকে মইটা ধরতে বলে ফ্রান্সিস মই বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। হাতে মশাল। মশালের আলোয় দেখল খোঁদলটা ওপরে বড়। একপাশে পাথরের থাক। সেই থাকটা আর সামনের পাথুরে অংশটা কেটে কেটে তৈরি। প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। মানুষের হাত পড়েছে এখানে। এখানে মানুষ এসেছিল কেন?

ফ্রান্সিস মশালটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। তখনই স্তম্ভের মত পাথরের গায়ে একটা পাথরের ফলক মত দেখল। ফলকটা মোটামুটি কেটে মসৃণ করা। বাঁদিকে একটা পাথুরে খাঁজ। সেই খাঁজে মশালটা রেখে ফলকটায় হাত দিয়ে দেখল। কী যেন কুঁদে তোলা আছে। নিশ্চয়ই কুঁদে কিছু লেখা। ফ্রান্সিস লেখাটা পড়বার চেষ্টা করল। নাঃ কিছুই বুঝতে পারল না। শুধু বুঝল স্পেনীয় অক্ষর। তাও দুর্বোধ্য। ও ফলকটা ধরে কয়েকবার নাড়া দিল। আশ্চর্য। ফলকটা নড়ে গেল। ও চাপাস্বরে বলল—শাঙ্কো কুড়ুলটা। শাঙ্কো মই বেয়ে উঠে ওকে কুড়ুলটা দিয়ে গেল। ও কুড়ুলের মাথা ফলকের কোনাগুলোতে চেপে চেপে

আস্তে ঠুকতে লাগল। ফলকটা নড়ল। তারপর আস্তে আস্তে খুলে এল। ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। ফলকটা একহাতে ঝুলিয়ে নিল। মশালটা পাথুরে দেয়ালে ঘষে নিভিয়ে ফেলল।

এবার নামা। ফ্রান্সিস ফলকটা বাঁহাতে ঝুলিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে মই বেয়ে নেমে এল। শাঙ্কো বলল—কিছু হদিশ পেলে?

—একটা সূত্র পেয়েছি। এই ফলকটা। এটায় কিছু কুঁদে লেখা। লেখাটা কী সেটা জানতে হবে। তবে অক্ষরগুলো স্পেনীয় ভাষায়। চলো। আগে এই ফলকের পাঠোদ্ধার করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—মইটা কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—মইটা নিয়ে চলো। জঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে রাখবো। ফ্রান্সিস বলল।

দু'জনে মইটা নামিয়ে ধরে ধরে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। তারপর বনভূমিতে ঢুকল। একটা ঝাঁকড়াপাতার গাছের আড়ালে মইটা লুকিয়ে রাখল। জায়গাটা ভালো করে দেখে রাখল ফ্রান্সিস। পরে যাতে খুঁজে পাওয়া যায়।

বনভূমি থেকে বেরিয়ে এল। প্রান্তর রাজবাড়ির ছায়ায় ছায়ায় পার হয়ে নিজেদের ঘরের দরজায় টোকা দিল। হ্যারি দরজা খুলে দিল। হ্যারির হাতে পাথরের ফলকটা নিয়ে ফ্রান্সিস বলল—এটাতে কুঁদে কিছু লেখা আছে। দেখতো পড়তে পারো কিনা।

—কোথায় পেলে এটা? হ্যারি জানতে চাইল।

—সব বলছি। তার আগে লেখাটা পড়তে পারো কিনা দেখ। ফ্রান্সিস একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। তারপর বিছানায় বসে পড়ল। হ্যারি ঘরের মশালের আলোর কাছে নিয়ে ফলকের লেখাটা পড়বার চেষ্টা করতে লাগল।

ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে শুয়ে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে রাজার বাগানের গাছপালাগুলিতে পাখির ডাক শোনা গেল। বাইরে ভোর হল।

হ্যারি পাথরের ফলকটা বিছানায় রাখতে রাখতে বলল—পড়তে পারলাম না। তবে মনে হয় প্রাচীন স্পেনীয় ভাষায় কিছু লেখা।

—এখন কাকে দিয়ে পড়াবো তাই ভাবছি। অথচ এই শব্দের অর্থ জানাটা খুবই জরুরী। ফ্রান্সিস বলল।

—সেনাপতিকে একবার বলে দেখতে পারো। হ্যারি বলল।

—অন্যভাবে বলতে হবে। এই ফলকের কথা বলা চলবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—সেনাপতিকেই অন্যভাবে বলো। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস বলল—

—শাঙ্কো একবার সেনাপতিকে ডাকো। শাঙ্কো চলে গেল। তখনই মারিয়া এল। মৃদুস্বরে বলল—কিছু হদিশ করতে পারলে?

—অনেকটা এগিয়েছি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর পাথরের ফলকটা বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখতে রাখতে বলল—এই ফলকটা পেয়েছি। এটার মধ্যে কিছু

লেখা আছে। সেটার পাঠোদ্ধার করতে পারলেই গুপ্তধনের হদিশ পেয়ে যাবো।

সেনাপতি শাঙ্কোর সঙ্গে এল। বলল—কী ব্যাপার?

—আপনাদের বৈদ্যি আমাকে একটা ওষুধ দিয়েছিল। তার নামটা মনে পড়ছে না। বৈদ্যিকে যদি একবার ডেকে দেন তাহলে খুবই ভালো হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—বৈদ্যিবুড়োর কথা বলছো। ও তো পুরনো আমলের লোক। ওর চিন্তাভাবনা সবই পুরোনো আমলের। এমন সব ওষুধের নাম বলে যার অর্থই আমরা বুঝি না। সেনাপতি বলল।

—তাই বলছিলাম যদি বৈদ্যিকে একবার ডেকে দেন। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। লোক পাঠাচ্ছি। সেনাপতি চলে গেল।

ফ্রান্সিসদের এক চিন্তা—বৈদ্যিবুড়ো কি শব্দটা পড়তে পারবে? অর্থটা বলতে পারবে?

কিছুক্ষণ বাদেই বৈদ্যিবুড়ো কাঠের বোয়াম ঝোলায় নিয়ে এল।

—কার কী হয়েছে? বৈদ্যিবুড়ো বিছানায় বসল।

—সব বলছি। তার আগে একটা কথা। আপনি তো পুরোনো আমলের লোক। পুরোনো স্পেনীয় শব্দের অর্থ বলতে পারবেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—কী শব্দ? আমি প্রাচীন স্পেনীয় ভাষা মোটামুটি জানি। বৈদ্যি বলল।

—আর একটা কথা অতীতের রাজা মুস্তাকিম কি স্পেনীয় ভাষা মানে—প্রাচীন ভাষা জানতেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—কী যে বলো। রাজা মুস্তাকিম বিদেশেও ব্যবসার কাজে যেতেন। স্পেনীয় পোর্তুগীজ ইংরেজি ভালো জানতেন। বেশ খেয়ালি মানুষ হলেও যথেষ্ট জ্ঞানী ছিলেন। বৈদ্যি বলল।

এবার ফ্রান্সিস বিছানার তলা থেকে পাথরের ফলকটা বের করল। বিছানায় ফলকটা পেতে বলল—এই পাথরের ফলকে কিছু খুঁদে লেখা আছে—দেখুন তো আপনি এর অর্থ বোঝেন কিনা।

—এই পাথরের ফলক কোথায় পেলে? বৈদ্যি জানতে চাইল।

—সামনের প্রান্তরের পুবকোনায় মাটির নিচে। ফ্রান্সিস মিথ্যে করে বলল।

—ও দেখি তো। বৈদ্যিবুড়ো মাথা নিচু করে বেশ কিছুক্ষণ লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইল। বিড়বিড় করে বলল—প্রাচীন স্পেনীয় শব্দ। যতদূর বুঝতে পারছি কথাটা হল—এ বিয়েন্তো ইনন্দার।

—তার মানে। ফ্রান্সিস সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

—মুক্ত ধারা। বৈদ্যিবুড়ো বলল। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ বৈদ্যিবুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর উচ্ছ্বাস গোপন করে বলল—

—ঠিক আছে। আমাদের কারো অসুখ করেনি। আপনি যেতে পারেন। বৈদ্যিবুড়ো ঝোলা হাতে বেরিয়ে যেতেই ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠে চাপাস্বরে বলে উঠল—হ্যারি রাজা মুস্তাকিমের গুপ্ত ধনভান্ডার হাতের মুঠোয়। শাঙ্কো মারিয়া কেউই ফ্রান্সিসের কথা থেকে কিছুই বুঝল না। শুধু হ্যারি বলল—

—সাবাস ফ্রান্সিস।

এবার ফ্রান্সিস শান্ত হয়ে বিছানায় বসল। তারপর চাপাস্বরে বলল—আজ রাতে আবার লুকিয়ে লুভিনা পাহাড়ে যেতে হবে। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। শুয়ে পড়ে চোখ বুঁজল। কী করতে হবে তাই ভাবতে লাগল।

গভীর রাত তখন। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। চাপাস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়াল। দুটো মশাল নিয়ে তৈরি হলো। ফ্রান্সিস কুড়ুলটা নিল।

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে উজ্জ্বল জোৎস্না। রাজবাড়ির ছায়ার আড়ালে আড়ালে বসতি এলাকায় ঢুকল। নৌকোয় উঠে খাঁড়ি পার হয়ে বনভূমিতে ঢুকল। একটু খুঁজতেই মাটিতে শুইয়ে রাখা মইটা পেল। শাঙ্কো মই কাঁধে চলল।

গুহার মুখ দিয়ে ঢুকলো দু'জনে। ফ্রান্সিস সেই খোঁদলের কাছে এসে মই পাতল। শাঙ্কো চকমকি পাথরে লোহা ঠুকে আগুন জ্বালল। দু'টো মশালে। ফ্রান্সিস বলল—এবার শাঙ্কো—তুমি গুহার দক্ষিণদিকে গিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো। সাবধান। উত্তরে চালের দিকে যাবে না আর বাইরে গিয়ে মশাল নিভিয়ে ফেল।

ফ্রান্সিসের কথামত শাঙ্কো দক্ষিণদিক দিয়ে গুহার বাইরে বেরিয়ে এল। মশাল নিভিয়ে ফ্রান্সিসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ফ্রান্সিস একহাতে জ্বলন্ত মশাল আর অন্যহাতে কুড়ুল নিয়ে ভারসাম্য রেখে আস্তে আস্তে মই বেয়ে সেই খাঁজটার জায়গায় এসে দাঁড়াল। পাথরের দেয়ালে গর্ত ছিল। সেখানে মশালটা ঢুকিয়ে রাখল। তারপর যে পাথরে ফলকটা বসানো ছিল সেই পাথরে কুড়ুলের ঘা মারতে লাগল। কুড়ুলের ঘায়ের শব্দ গুহায় প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তখনই ও কুড়ুলের ঘা সাবধানে মারতে লাগল যাতে বেশি শব্দ না হয়।

পরপর কয়েকটা জোর ঘা পড়তেই পাথরটা দু'ভাগ হয়ে ভেঙে পড়ল। ঝর্‌ঝর্ করে হলদেটে জলের ধারা নেমে এল। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল—মৃত্যু-সায়রের জল। ও খাঁজের দেয়ালে পিঠ চেপে দাঁড়াল যাতে বিষাক্ত জলের ছিঁটে না লাগে। জল পড়তে লাগল।

গুহার বাইরে দাঁড়ানো শাঙ্কো কুড়ুলের ঘায়ের জল পড়ার মৃদু শব্দ শুনল। বুঝল মৃত্যু সায়রের জলই পড়ছে। এই এক চিন্তা হল এই বিষাক্ত জল যদি ফ্রান্সিসের গায়ে লাগে! তবে এটা ভাবল ফ্রান্সিস সব দিক ভেবেই ঐ জল নামিয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জলপড়া বন্ধ হল। মৃত্যু-সায়রে জল নিঃশেষ। তবু টুপ্‌টাপ্ জল পড়ছিল। সেটাও যেন গায়ে না লাগে। সাবধান হল ফ্রান্সিস। ও অপেক্ষা করতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই টুপটাপ জল পড়াও বন্ধ হল। ফ্রান্সিস মশালটা তুলে নিয়ে মই বেয়ে নিচের দিকে নামল। মই থেকেই দেখল ওর অনুমান সঠিক। বিষাক্ত জলধারা উত্তরের ঢাল বেয়ে গুহার বাইরে চলে গেছে। কিন্তু এইবার ও চিন্তায়

পড়ল। গুহার মেঝেয় অল্প হলেও কিছু পরিমাণ বিষাক্ত জল জমে আছে। পা ফেলা যাবে না। জল যাতে না লাগে তার উপায় ভাবতে হল। ও ভাবল ওপরে পাথরের চাঙর দিয়ে যে বা যারা ঐ 'মুক্তধারা' কথাটি ফলকের গায়ে উৎকীর্ণ করেছিল তারা নিশ্চয়ই মই ব্যবহার করে নি। অন্য কোন পথে ঐ খাঁজে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাকে বা তাদের জলের স্পর্শ এড়াতে হয়েছিল। সেই পথ ওখানেই আছে যে পথ দিয়ে সে বা ওরা ওখানে এসেছিল আবার বেরিয়েও গিয়েছিল।

ফ্রান্সিস মশাল হাতে মই বেয়ে ওপরের পাথরের খাঁজে উঠে এল। তারপর মশাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। বার কয়েক মশাল ঘোরাতেই নজরে পড়ল একটা ছোট মুখ। কাছে গিয়ে দেখল একটা সুড়ঙ্গের মুখ। আগে এই সুড়ঙ্গমুখ ওর নজরে পড়ে নি।

সুড়ঙ্গের মুখের কাছে গেল। ভেতরে তাকিয়ে দেখল অন্ধকার। ফ্রান্সিস হাতের মশালটা ছুঁড়ে দিল সুড়ঙ্গের মধ্যে। একটু দূরে গিয়েই পড়ল মশালটা। মশালের আলোয় দেখল ভেতরটা মুখের মত ছোট নয়। বড়ই।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। তারপর মাথা ঢুকিয়ে শরীর হিঁচড়ে টেনে নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকল। সুড়ঙ্গের এব্‌ড়োখেবড়ো মেঝে দিয়ে চলল মশালটার দিকে।

মশালের কাছে এল। আবার ছুঁড়ে দিল মশালটা। মশালটা কিছু দূরে পড়ল। আমার শরীর হিঁচড়ে টেনে চলল। মশালের কাছে এসেই দেখল একটু দূরে সুড়ঙ্গের মুখ। অস্পষ্ট চাঁদের আলো ঐ মুখে। আবার হিঁচড়ে চলল। সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখল জ্যোৎস্নালোকিত পাহাড় গাছগাছালি।

হাঁপাতে হাঁপাতে চলল গুহামুখের দিকে। গুহামুখে এসে দেখল—শাঙ্কো দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস একটা পাথরে বসতে বসতে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো গুহামুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। চমকে পিছু ফিরে তাকাল। দেখল ফ্রান্সিস একটা পাথরে বসে হাঁপাচ্ছে। ফ্রান্সিসের সারা গায়ে ধুলোবালি। নতুন জামার এখানে ওখানে ছেঁড়া। শাঙ্কো বলে উঠল—এ কী চেহারা হয়েছে তোমার?

—অক্ষত ফিরে এসেছ। এটাই যথেষ্ট। ফ্রান্সিস হাতের মশাল নেভাল।

—গুহার ভেতরে কুড়ুলের শব্দ জলের শব্দ। কী ব্যাপার? শাঙ্কো বলল।

—সব বলবো। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—ভোর হতে দেরি নেই। শেষ কাজটা এখনো বাকি। চলো।

—কোথায়? শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল।

—মৃত্যু-সায়রে। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? শাঙ্কো বলল।

—গিয়ে দেখবে। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল।

দুজনে পাহাড়ে উঠতে লাগল। কিছু পরে মৃত্যু-সায়রের পাশে শুকনো ডালের গাছটার কাছে এল। ঢাল বেয়ে দু'জনে নেমে মৃত্যু সায়রের মধ্যে তাকাল। মৃত্যু সায়র জলশূন্য। পড়ে আছে একটা নরকঙ্কাল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—সেই যোদ্ধার কঙ্কাল। আমাকে যে হত্যা করতে চেয়েছিল।

—বিষাক্ত জল কোথায় গেল? শাঙ্কো তখনও ঠিক বুঝতে পারছিল না।

—সব বিষাক্ত জল গুহায় নেমে গেছে। ভালো করে নিচে তাকিয়ে দেখ। শাঙ্কো চাঁদের আলোয় দেখল মৃত্যু-সায়রের তলদেশে হীরের অলঙ্কার সোনার মুকুট। আরো কী কী রয়েছে। শাঙ্কো অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। বলল তাহলে—

—হ্যাঁ। রাজা মুস্তাকিমের গুপ্ত ধনভান্ডার। মশাল জ্বালো। আরো দেখতে পাবো। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো মশাল জ্বালল। ফ্রান্সিস জ্বলন্ত মশালটা মৃত্যু-সায়রে ছুঁড়ে ফেলল।

দপ্ করে মৃত্যু-সায়রের গন্ধকের স্তরে আগুন লেগে গেল। ফ্রান্সিস সরে যেতে যেতে বলে উঠল—বিষাক্ত ধোঁয়া বেরুবে। সরে এসো।

ওরা গাছটার কাছে উঠে এল। মৃত্যু-সায়র থেকে নীলচে ধোঁয়া বেরোতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ধোঁয়া কেটে গেল। মৃত্যু-সায়রের ধারে এসে দাঁড়াল দু'জনে। তখনও মৃত্যু-সায়রের তলদেশে অল্প আগুন জ্বলছিল। সেই আগুনের আলোয় দেখা গেল তলদেশে কত সোনার চাকতি হীরে মণিমানিক্য ছড়ানো। শাঙ্কো খুশিতে মৃদুস্বরে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

—এখন এই ধনসম্পদ তুলবে না? শাঙ্কো বলল।

—না। সে সব রাজা করবেন। তিন চারদিন পর। ভোর হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি নেমে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে বেশ দ্রুতই নেমে এল পাহাড় থেকে। তখন বনভূমিতে পাখিদের কাকলি শুরু হয়েছে। বনভূমি পার হতে হতে সূর্য উঠল।

দুজনে যখন নিজেদের ঘরের কাছে এল তখনই দেখল সেনাপতি আসছে।

ফ্রান্সিস দ্রুত ঘরে ঢুকে পড়ল। ওর ধূলোবালি মাখা পোশাক দেখলে সেনাপতির সন্দেহ হতে পারে। ফ্রান্সিসের অবস্থা দেখে মারিয়া কিছু বলতে গেল। ফ্রান্সিস মুখে আঙ্গুল দিয়ে ওকে চুপ করিয়ে দিল।

সেনাপতি প্রান্তরে নেমে চলল রাজবাড়ির পেছনের দিকে। ফ্রান্সিস দেখে নিশ্চিত হল। বলল—মারিয়া আমার পুরোনো পোশাকটা নিয়ে এসো। মারিয়া দ্রুত হেঁটে রাজবাড়িতে চলে গেল। ফিরল ফ্রান্সিসের আর একটি নতুন পোশাক নিয়ে। ফ্রান্সিস পোশাক নিয়ে স্নান করতে গেল।

মারিয়ারা ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল। হ্যারি একটু অধৈর্য হয়ে বলল—শাঙ্কো ফ্রান্সিস রাজা মুস্তাকিমের ধনসম্পদ উদ্ধার করতে পেরেছে?

—হ্যাঁ। শাঙ্কো হেসে বলল।

—সত্যি? মারিয়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

—রাজকুমারী—আস্তে। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস আসুক সেই সব বলবে।

স্নান সেরে ফ্রান্সিস ঘরে এল নতুন পোশাক পরে। মারিয়া অনুচ্চস্বরে বলল—তুমি নাকি—। ফ্রান্সিস হেসে ওকে হাতের চেটো দেখিয়ে থামিয়ে

বলল—সব বলছি। তার আগে সকালের খাবারটা খেয়ে নি। খাওয়ার ঘরে চলো।

সবাই খেতে চলল। ওরা খাওয়া সেরে ঘরে ফিরে এল।

সবাই বিছানায় বসলে ফ্রান্সিস বলতে লাগল—গুহাটা দেখার সময় একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম। উত্তরের দিকে গুহার ঢাল। সেটার মুখের পরেই নিচে লম্বালম্বি অনুর্বর লম্বাটে একটা অংশ। একটা ঘাসও নেই। অথচ ও জায়গার দুপাশে বন গাছপালা। কেন এরকম হল? নিশ্চয়ই কিছু ও জায়গায় ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। কী বয়ে যেতে পারে? সোজা উত্তর মৃত্যু-সায়রের বিষাক্ত জল। তাহলে সেই জল বেরোবার পথ গুহার মধ্যে আছে। অতীতের রাজা মুস্তাকিম ঐ পথ লোক লাগিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। একটা ফলকও গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। তাতে উৎকীর্ণ ছিল—একটা প্রাচীন স্পেনীয় শব্দ—এ বিয়োর্তা ইনান্দার। অর্থ মুক্তধারা। সুতরাং আমি নিশ্চিত হলাম এই ফলক আটকানো পাথরটা ভাঙলেই মৃত্যু-সায়রের জল নেমে আসবে। আমি তাই করেছি। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল—আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। রাজা মুস্তাকিম খেয়ালি রাজা ছিলেন। একা একা বনভূমিতে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। এই তথ্য থেকে আমার সন্দেহ হয় ঐ মৃত্যু-সায়রেই উনি তার ধনরত্ন ফেলে দিতেন। সকলের অগোচরে। মৃত্যু-সায়রে নেমে ধনরত্ন চুরি করা অসম্ভব। অতএব মৃত্যু-সরোবর থেকে বিষাক্ত জল নামাতে হবে।

তারপর ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলে গেল কীভাবে ও বিষাক্ত জল নামিয়েছে। শুকনো মৃত্যু সায়রে কীরকম ধনরত্ন ওরা দেখেছে তাও বলল।

—সাবাস ফ্রান্সিস। এখন কী করবে? মারিয়া বলে উঠল।

—আজ সন্ধ্যেবেলা রাজাকে সব জানাবো। আমি ভিক্কালোকে বিশ্বাস করি না। ধনরত্ন উদ্ধার হয়েছে এটা জানতে পারলে ও আসলি চেহারা ধরবে। তখন রাজাকে হত্যা করতে পারে। আমাদেরও বন্দী করতে পারো। অতএব রাজাকে খুব সাবধানে ঐ ধনরত্ন উঠিয়ে আনতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সন্ধ্যে হল। ফ্রান্সিস বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। ডাকল—হ্যারি। হ্যারিও উঠে দাঁড়াল। তারপর রাজবাড়ির দিকে দুজন চলল।

সদর দরজায় দু'জন প্রহরী দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস বলল—

—রাজামশাইকে বলো আমরা বিদেশীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। খুব বিশেষ প্রয়োজন।

একজন প্রহরী চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল। বলল—চলুন। ফ্রান্সিসরা প্রহরীর পেছনে পেছনে রাজবাড়ির মন্ত্রণাকক্ষে এল। আসনে বসল।

কিছুক্ষণ পরে রাজা এলেন। বললেন—কী ব্যাপার?

ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানিয়ে বসে পড়ল। তারপর ফ্রান্সিস বলল—মান্যবর রাজা—আমরা কাল সকালে চলে যাচ্ছি। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

—ও। তাহলে আমাদের এক পূর্বপুরুষের ধনরত্নের ভান্ডার উদ্ধার করতে পারলে না। রাজা বললেন।

—না। আমরা সেই ধনরত্নের গোপন ভান্ডার খুঁজে পেয়েছি।

—বলো কি? রাজা প্রোফেন প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—কোথায় সেই ধনরত্নের ভান্ডার?

—লুভিনা পাহাড়ের মৃত্যু-সায়রে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ সাংঘাতিক বিষাক্ত জলে নামবে কে? রাজা বললেন।

—এখন ঐ মৃত্যু-সায়রে জল নেই। কয়েকদিন পরে একফোঁটা জলও থাকবে না। তখন আপনি সেই ধনভান্ডার তুলে আনতে পারবেন। কিন্তু এরমধ্যে আদেশ জারি করে দিন মৃত্যু-সায়রে যেন কেউ না যায়।

—আদেশ জারির দরকার নেই। কেউ ওখানে যেতে সাহস পায় না। রাজা বললেন।

—তবু আদেশ জারি করবেন। আর একটা কথা—আপনার মন্ত্রী স্তিফানো যেন গুপ্ত ধনভান্ডারের খোঁজ না পায়। সমস্ত ব্যাপারটাই আপনি গোপন রাখবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—মন্ত্রীমশাই হয়তো কোনভাবে জানতে পারে। রাজা বললেন।

—আপনি সে ব্যাপারে সাবধান হবেন। আমি কারো সম্বন্ধে অন্য কাউকে কিছু বলি না। সহজে দোষারোপও করি না। কিন্তু আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি—স্তিফানো অত্যন্ত শঠ ও নির্দয়। ও ধনভান্ডারের সংবাদ পেলে আপনার জীবনও বিপন্ন হতে পারে। তাকে বিশ্বাস করবেন না—এই অনুরোধ। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন তাহলে কী করবো? রাজা বললেন।

—কয়েকদিন অপেক্ষা। আমি আগুন জ্বেলে জল অনেকটা শুকিয়ে দিয়েছি। কয়েকদিন সূর্যালোক পেলে সব জল বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। তখন নেমে ধনসম্পদ তুলে নেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তাই করবো। রাজা বললেন।

—আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্তজন কে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—সেনাপতি। মন্ত্রী স্তিফানোর প্রতি তাঁর রাগ আছে। রাজা বললেন।

—সেটাই স্বাভাবিক। সেনাপতিকে স্তিফানো কোন পাত্তাই দেয় না। যাহোক সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে কোন গভীর রাতে মৃত্যু-সায়র থেকে ধনরত্ন তুলে নিয়ে আসুন। আপনি একা যাবেন না। কিন্তু ধনভান্ডারের কথা গোপন রাখবেন। বিশেষ করে স্তিফানোর কাছ থেকে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তাই হবে। কিন্তু তোমরা ধনভান্ডার উদ্ধার করলে। তোমাদের তো কিছু প্রাপ্য হয়। রাজা বললেন।

—আমরা কিছুই চাই না। বুদ্ধি খাটিয়ে পরিশ্রম করে উদ্ধার করলাম এতেই আমরা খুশি। ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল।

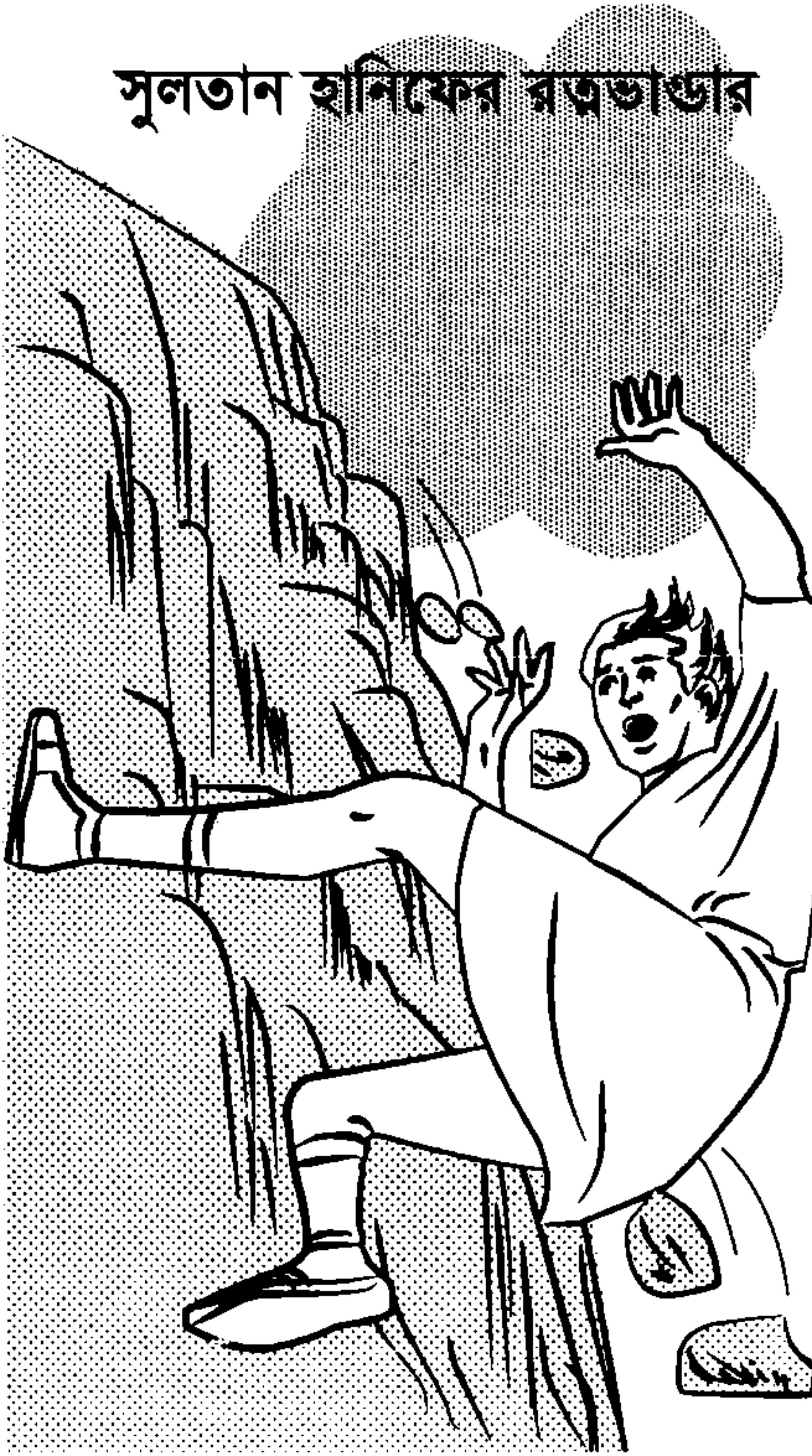
—আপনার জন্যেই আমরা বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ রইলাম। হ্যারি বলল।

—তা'হলে চলি। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে রাজবাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল।

পরদিন ভোরে মারিয়া রাজবাড়ি থেকে চামড়্যার থলে আর কাপড়ের বোঝা নিয়ে চলে এল ফ্রান্সিসদের ঘরে। সৈন্যাবাসে গিয়ে ঘর থেকে দল বেঁধে বেরিয়ে এল। প্রান্তর পার হয়ে জেলেপাড়ার ঘাটে এল। ওরা দুজন নৌকোয় উঠল। দাঁড় বাইতে লাগল ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো। খাঁড়ি পার হয়ে নৌকো দুটো সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে পড়ল। দ্রুত নৌকো চালিয়ে ওরা ওদের জাহাজের কাছে এল। শাঙ্কো ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। সেই ধ্বনি শুনে জাহাজে ভাইকিং বন্ধুদের কয়েকজন ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। বন্ধুরা জাহাজ থেকে দড়ির মই নামিয়ে দিল। ফ্রান্সিসরা মই বেয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। বন্ধুরা ছুটে এসে ওদের ঘিরে দাঁড়াল। সবাই জানতে চায় ফ্রান্সিস গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে পেরেছে কিনা। ফ্রান্সিস বলল—বড় ক্লান্ত। শাঙ্কো সব বললে। সবাই শাঙ্কোর কাছে এল। শাঙ্কো হাত পা নেড়ে ফ্রান্সিসের অভিযানের কাহিনী বলতে লাগল।

সুলতান হানিফের রত্নভাণ্ডার



সেদিন ভোর থেকে জোর বাতাস ছুটেছে। ফ্রান্সিসদের জাহাজের পালগুলো ফুলে উঠেছে। আকাশ মেঘলা তবে বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। জোর হাওয়ায় সমুদ্রের বিরাট বিরাট ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ছে জাহাজের গায়। জাহাজের জোর দুলুনির মধ্যে ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে। জাহাজের কাজ সহজ নয়। ডেক ধোয়া মোছা। বাতাসের গতি বুঝে পাল ঘোরানো। রান্নার জায়গা খাবারের জায়গা পরিষ্কার রাখা। প্রায় পঁচিশ তিরিশজনের রান্না করা চার বেলা খাবার তৈরি করা। কাঠের বাসনটাসন ধোয়া। দু'চারজন অসুস্থ বন্ধু থাকেই। তাদের জন্যে পথ্যর ব্যবস্থা। চিকিৎসা। শুশ্রুষা। শুশ্রুষার কাজটা মারিয়াকেই করতে হয়। এর মধ্যেই দিক ঠিক রেখে ফ্লেজার আর শাঙ্কো দু'জন মিলে জাহাজ চালায়। জাহাজের পালের মেরামতির কাজও চালাতে হয়। এ ভাবেই দিন কাটে ভাইকিংদের। এর মধ্যেই জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ডেকএ উঠে আসে সবাই। নাচগানের আসর বসে মাঝে মাঝে। সুকণ্ঠী সিনাত্রা ওদের দেশের চাষীদের, ভেড়াপালকদের, মাঝিদের গান গায়। শাঙ্কো খালি পীপেয় থাবড়া দিয়ে দিয়ে তাল দেয়। দু'চারজন কাঠের ডেক-এ থপ্ থপ্ শব্দ তুলে নাচে। সেই নাচে ফ্রান্সিসকে মারিয়াকেও অংশ নিতে হয়। নাচগান জমে ওঠে। একসময় নাচগান শেষ হয়। ক্লান্ত ভাইকিংরা অনেকেই ডেক-এই এখানে-ওখানে শুয়ে পড়ে। বাকিরা কেবিনঘরে ফিরে আসে। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবেই দিনরাত কাটে ভাইকিংদের।

এর মধ্যে ওদের নিজেদের মধ্যেও ঝগড়াঝাঁটি হয়। ঝগড়া বাড়াবাড়ি হলে ফ্রান্সিসের শরণাপন্ন হয় ওরা। ফ্রান্সিস বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঝগড়া মিটিয়ে দেয়। জাহাজে ফ্রান্সিসের কথাই শেষ কথা। ঝগড়া মিটে যায়। বন্ধুরা পরস্পর হাত ধরে ঝগড়া মিটিয়ে নেয়। ফ্রান্সিসকে ওরা বিশ্বাস করে, ভালোবাসে। ফ্রান্সিসের নির্দেশ মেনে চলে। ফ্রান্সিসের কড়া নির্দেশ—যত ঝগড়া হোক মনমালিন্য হোক মারামারি করা চলবে না। ভাইকিং বন্ধুরা ফ্রান্সিসের নির্দেশ মেনে চলে। তাই পরস্পরে মারামারির মত কোন ঘটনা ঘটে না। সবাই শান্তিতে থাকে।

দিন যায় রাত যায়। জাহাজ চলেছে। দিন দশ পনেরো হয়ে গেল ডাঙার দেখা নেই। মাস্তুলের মাথায় বসে পেড্রো দিন রাত নজর রাখে। ওর নজর—কোন জলদস্যুদের জাহাজ আসছে কিনা আর ডাঙা দেখা যায় কিনা।

একদিন দুপুরে ফ্রান্সিসদের দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সবে শেষ হয়েছে। ওরা শুনল পেড্রোর চিৎকার করে বলা—ভাই সব—ডাঙা দেখা যাচ্ছে। হ্যারি তখন ডেক-এই ছিল চেঁচিয়ে বলল—কোনদিকে? পেড্রো ডানদিকে দেখিয়ে গলা তুলে

বলল—ডানদিকে? হ্যারি ডানদিকে চোখ কুঁচকে তাকাল। দুপুরের উজ্জ্বল রোদে সমুদ্রতীর দেখল। একটা বন্দর বলেই মনে হল। দুটো জাহাজ নোঙর করা। তারপর টানা বালি-ঢাকা জমি। আরো কয়েকজন ভাইকিং বন্ধুও জাহাজের রেলিঙ ধরে দাঁড়াল। বন্দর বালি-ঢাকা প্রান্তর দেখল।

হ্যারি দ্রুত পায়ে ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে নেমে এল। বন্ধ দরজা খুলে ফ্রান্সিস তখনই বেরিয়ে এল। বলল পেড্রোর কথা শুনেছি। চলো—কোথায় এলাম দেখি। মারিয়াও—চলো। ফ্রান্সিস বলল।

তিনজনে জাহাজের ডেকএ উঠে এল। ততক্ষণে জাহাজ ডাঙার অনেক কাছে চলে এসেছে। ফ্রান্সিসরা রেলিঙ ধরে দাঁড়াল। তখনই দেখল সেই বালি ঢাকা প্রান্তরের বাঁ দিক থেকে একদল যোদ্ধা খোলা তরোয়াল আর বর্শা হাতে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে। তাদের তরোয়ালে দুপুরের রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে। তাদের গায়ে কালো কাপড়ের পোশাক। তখনই ডানদিক দিয়ে দেখা গেল আর একদল যোদ্ধা খোলা তরোয়াল বর্শা নিয়ে ছুটে আসছে। তাদের পোশাক নানা রঙের। সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দু'দল যোদ্ধা পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল লড়াই। তরোয়ালে তরোয়ালে বর্শায় বর্শায় ঠোকাঠুকির শব্দ শুরু হল। সেই সঙ্গে চিৎকার আহতদের গোঙানি আর্তস্বর। দেখতে দেখতে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস আমরা এক লড়াইয়ের মধ্যে এসে পড়লাম। আমরা কী করবো?

—নীরব দর্শক। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—জাহাজ ঘোরাতে বল। এখানে নামবো না আমরা। মারিয়া বলল।

—লড়াইয়ের শেষটা দেখি। এই লড়াইয়ে তো আমরা জড়াবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—তবে আর এখানে থাকবো কেন? হ্যারি বলল।

—এটা তো জানতে হবে কোথায় এলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—এই লড়াইয়ের পরিবেশে? হ্যারি একটু অবাক হয়েই বলল।

—আরে বাবা-লড়াই তো একসময় থামবে। কোন পক্ষ তো জিতবে? তাদের কাছেই জানবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বড্ড বেশি ঝুঁকি নিচ্ছো ফ্রান্সিস। এই দুই দলের লোক কারা কেমন আমরা জানি না। যারা জিতবে তাদেরও পরিচয় আমরা জানি না। তাদের কাছে সব জানতে গেলে বিপদেও পড়তে পারি। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। বিপদ হতে পারে। তবে খোঁজ খবরটা সাবধানে নিতে হবে।

ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি আর কোন কথা বলল না। মারিয়া বলে উঠল—এসব মারামারি কাটাকাটি আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আমি চললাম। মারিয়া চলে গেল।

লড়াই ততক্ষণে শেষের দিকে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে রঙ-বেরঙের পোশাকপরা যোদ্ধারা হেরে যাচ্ছে। ওদের সংখ্যা কমে আসছে। তখনও অক্ষত থাকা তারা অনেকেই ছুটে পালাচ্ছে। কালো পোশাকপরা যোদ্ধারা তাদের ধাওয়া করছে। যোদ্ধাদের পায়ের চাপে ধুলোবালি উড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রঙবেরঙের পোশাকপরা অনেকেই মারা গেল নয়তো আহত হয়ে বালির ওপর পড়ে রইল।

লড়াই শেষ। কালো পোশাকপরা যোদ্ধারা সোৎসাহে খোলা তরোয়াল শূন্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিজয় উল্লাসে মাতল। তারপর পশ্চিমমুখো যেতে লাগল। বোঝা গেল—ওদিকেই রঙবেরঙের পোশাকপরা যোদ্ধাদের দেশ।

—লড়াই থেমে গেছে। কিন্তু যুদ্ধে যে কালোপোশাক পরা যোদ্ধাদের জয় হল তারা তো চলে গেল। ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তো আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আমাদের জাহাজ এখানেই থাকবে? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস ঘাড় কাত করে বলল।

বিকেল হয়ে এল। বিজয়ী যোদ্ধাদের কোলাহল আর শোনা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস হ্যারি নিজেদের কেবিনঘরে ফিরে এল। ভাইকিং বন্ধুরা যারা রেলিং ধরে লড়াই দেখছিল তারাও অনেকে নিজেদের কেবিনঘরে নেমে এল। কয়েকজন অবশ্য ডেক-এই বসে রইল।

মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। আবার। সূর্যাস্ত দেখতে মারিয়া প্রতিদিন ডেক-এ উঠে আসে। পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পশ্চিমের আকাশে হালকা মেঘের গায়ে নানা রঙের খেলা চলেছে। একসময় সব রঙ মিলিয়ে গিয়ে আকাশে গভীর কমলা রঙ ছড়িয়ে পড়ল। একটা বিরাট কমলা রঙের থালার মত সূর্য দিগন্তে নেমে এল। সূর্য অস্ত গেল। বেশ কিছুক্ষণ পশ্চিম আকাশে কমলা রঙ ছড়িয়ে রইল। আস্তে আস্তে সেই রঙ মুছে গেল। সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এল। মারিয়া কেবিনঘরে চলে এল।

ফ্রান্সিস কেবিনঘরের কাঠের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বিছানায় বসে ছিল। মারিয়া মোমবাতি জ্বালতে গেল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—অন্ধকারই থাক। আলো জ্বেলো না। মারিয়া আর আলো জ্বালল না। বিছানায় বসতে বসতে মারিয়া বলল—ডাঙায় নামবে না?

—হ্যাঁ। নামতে তো হবেই। তবে এখন নয়। কাল সকালের খাবার খেয়ে নামবো। ফ্রান্সিস বলল।

—এখানে তো দেখলাম দুই দলে লড়াই চলছে। এই পরিবেশে নামাটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

—উপায় নেই। খোঁজ খবর করতেই হবে।

—বিপদে পড়বে না তো।

—বিপদ তো যে কোন মুহূর্তে হতে পারে। বিপদের আশঙ্কাটা বড় করে দেখলে তো হাত পা ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকতে হয়।

তাতে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। ধরো—কোনরকম খোঁজখবর করলাম না। জাহাজ যেদিকে খুশি চলল। তাহলে কি কোনদিন স্বদেশে পৌঁছতে পারবো? উল্টে আরো বড় বিপদে পড়বো। কাজেই খোঁজ খবর নিয়ে দিক ঠিক রেখে জাহাজ চালাতে হবে। বিপদের আশঙ্কায় চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। বিপদ হতে পারে আবার নাও হতে পারে। বিপদের কথা ভেবে লাভ নেই। তাতে মন দুর্বল হয়ে পড়ে। মনটা শান্ত রাখতে হবে।—ফ্রান্সিস বলল।

—আমি আর কী বলবো। তুমি তোমার মতোই চল। মারিয়া বলল।

—তোমার অভিমান হল। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—না-না। অভিমান হতে যাবে কেন। মারিয়া বলল।

—যাক্ গে—এসব নিয়ে তুমি ভেবো না। তুমি খুশি থাকো।

—ঠিক আছে। মারিয়া বলল

—এবার আলো জ্বালো। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া বিছানা থেকে উঠে মোমবাতি জ্বালল। ঘরে আলো ছড়ালো। ফ্রান্সিস মোমবাতির আলোর দিকে তাকিয়ে একইভাবে বসে রইল।

রাত বাড়ল। সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিল। তারপর কেবিন ঘরে ডেক-এর ওপরে সবাই শুয়ে পড়ল। সারাদিন গরমের পর এখন সমুদ্রের জলেভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটেছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন গভীর রাত। শাঙ্কো ডেক-এর ওপর হালের কাছে ঘুমিয়ে ছিল। গভীর ঘুম। হঠাৎ কীসের খোঁচা লেগে ঘুম ভেঙে গেলো ও ধড়মড় করে উঠে বসল। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখল কালো পোশাকপরা একজন যোদ্ধা ওর বুকের ওপর তরোয়াল চেপে ধরেছে। ও চারপাশে তাকাল। দেখল একদল কালো পোশাক পরা যোদ্ধা বন্ধুদের ঘিরে ধরেছে। সবার হাতে খোলা তরোয়াল। কয়েকজনের বর্শা। এই কালো পোশাকপরা যোদ্ধাদের শাঙ্কো দেখেছে লড়াই করতে আর লড়াইয়ে জিতে উল্লাস প্রকাশ করতে। তারপর পশ্চিমমুখো চলে যেতে। তাহলে ওরাই ফিরে এসে ওদের জাহাজ দখল করেছে।

ওরা জনকয়েক সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেছে। ততক্ষণে। উদ্দেশ্য কেবিনঘরের বন্ধুদের বন্দী করা। এখন তাকিয়ে, তাকিয়ে দেখা ছাড়া কোন উপায় নেই। নিরস্ত্র ওদের আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছু করার নেই।

কিছু পরে ফ্রান্সিসরা নিচের কেবিনঘর থেকে ডেক-এ উঠে এল। প্রত্যেকের পেছনে একজন করে কালো পোশাকপরা যোদ্ধা। মারিয়াও রেহাই পেল না। তাকেও উঠে আসতে হল।

ফ্রান্সিসদের সবাইকে ডেকএ বসানো হল। কালো পোশাকপরা যোদ্ধারা ওদের চারপাশ

থেকে ঘিরে দাঁড়াল। যোদ্ধাদের মধ্যে থেকে একজন রোগা লম্বা যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। শরীরের তুলনায় ভারি গলায় বলল—তোমাদের দলনেতা কে? ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। বলল—আমি। যোদ্ধাটি ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করল—

—তোমাদের পরিচয় বলো। ভাঙা ভাঙা পোতুর্গীজ ভাষায় বলল।

—আমরা ভাইকিং। বিদেশি। ফ্রান্সিস বলল।

—এখানে এসেছো কেন? যোদ্ধাটি জিজ্ঞেস করল।

—এমনি। এ বন্দর সে বন্দর ঘুরে এখানে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—উঁহু। তোমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। যোদ্ধারা বলল।

—আমাদের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—ধনসম্পদ লুঠ করা। তোমরা লুঠের দল। যোদ্ধাটি বলল।

—আমরা লুঠেরা হলে বেশ কিছু সম্পদ আমাদের জাহাজে থাকতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—থাকতে পারে বৈ কি। যোদ্ধাটি বলল।

—তাহলে জাহাজ তল্লাশী নিন। ফ্রান্সিস বলল।

—সে তো নেবই যোদ্ধাটি বলল।

—কিছুই পাবেন না। কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখা যাক। যাক গে—তোমাদের বন্দী করা হল। যোদ্ধাটি বলল।

—কেন? আমরা কী এমন অপরাধ করেছি? ফ্রান্সিস বলল।

—যে সব আমাদের রাজা আনোতার বুঝবেন। সকালে তোমাদের রাজসভায় নিয়ে যাওয়া হবে। রাজা আনোতারের হাত থেকে মিুক্তি পাওয়ার আশা কম। তোমাদের বন্দী করেই রাখা হবে। যোদ্ধাটি বলল।

—আপনার পরিচয় জানতে পারি? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—নিশ্চয়ই। আমি রাজা আনোতারের সেনাপতি। সেনাপতি বলল।

—ও। তা এখন আমাদের নিয়ে কী করবেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—এখন তোমাদের এখানেই রাখা হবে। তারপর তল্লাশী চলবে। সেনাপতি বলল।

—বেশ। আপনার মর্জি। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি ছ'সাতজন যোদ্ধার একটা দল করল। হুকুম দিল—জাহাজ লুঠ করো। যোদ্ধাদের দলটি সিঁড়ি দিয়ে নিচে কেবিনঘর গুলোর দিকে ছুটল। ওরা তল্লাশী শুরু করল।

পূবের আকাশে কমলা রঙ ধরল। অল্পক্ষণের মধ্যে সূর্য উঠল।

তল্লাসী শেষ। তল্লাশী চালাচ্ছিল যারা তারা ফিরে এল। একজন যোদ্ধা একটা রুমালে বাঁধা কিছু সোনার চাকতি সেনাপতিকে দিল। রুমালটা মারিয়ার।

—তেমন কিছু পেলেন? ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল।

—না। সেনাপতি মাথা নাড়ল।

—তাহলেই বুঝতে পারছেন যে আমরা লুঠেরার দল নই। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আগে রাজসভায় চল। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিসের পাশেই মারিয়া বসেছিল। মৃদুস্বরে বলল—আমার বড় পছন্দের রুমালটা।

—দুঃখ করো না। ওর বদলে পাঁচটা ভালো রুমাল কিনে নিও। ফ্রান্সিসও মৃদুস্বরে বলল। তারপর হ্যারির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল—মারিয়ার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। স্বর্ণমুদ্রাগুলো ও লুকিয়ে রেখেছিস বলেই দুতিনবার আমাদের জাহাজ লুঠ হলেও ঐ স্বর্ণমুদ্রাগুলোর হদিস কেউ পায় নি। এবার মারিয়া একটু অভিমানের সুরে বলল—আমি আর একটা বুদ্ধিমতীর মত কথাও বলেছিলাম।

—হুঁ। তুমি এখান থেকে চলে যেতে বলেছিলে। ফ্রান্সিস বলল।

—এবার বোঝ—আমার মতটা ঠিক ছিল কিনা। মারিয়া বলল।

—হুঁ। কিন্তু লড়াইয়ে জিতে যোদ্ধার দল চলে গিয়েছিল। ওরা ফিরে এসে আমাদের জাহাজ দখল করবে অতটা ভাবি নি। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটাই তো হল। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে। দেখা যাক এরা আমাদের নিয়ে কী করে? ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস এবার ভাবলো একটা খোঁজখবর করতে হবে। ও সেনাপতির কাছে এগিয়ে এল। বলল—একটা খবর জানতে চাইছিলাম।

—কী খবর? সেনাপতি ফ্রান্সিসদের দিকে ফিরে তাকাল।

—এটা কি একটা দেশের অংশ নাকি একটা দ্বীপ। ফ্রান্সিস বলল।

—দ্বীপ নয় এটুকু বলতে পারি। কারণ পশ্চিমমুখো আমরা যতদূর গেছি শেষ পাইনি। সেনাপতি বলল।

—এই দেশের নাম কী? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—বাতোরিয়া। এখানকার রাজা ছিল পাকার্দেন। তাকে লড়াই করে হারিয়ে আমাদের রাজা আনোতার এই বাতোরিয়ার রাজা হয়েছেন। সেনাপতি বলল।

—তাহলে আপনাদের অন্য এক রাজত্ব ছিল। ফ্রানিস বলল।

—হ্যাঁ। ঐ যে দক্ষিণদিকে পাহাড় দেখছো ঐ পাহাড়ের ওপারে আছে ভিঙগার দেশ। ওটাই আমাদের দেশ। এখন ঐ ভিঙ্গার দেশ আর এই বাতোরিয়া দুই দেশেরই রাজা হলেন আনোতার।

—রাজা পাকার্দেনকে তো বন্দী করা হয়েছে। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—নিশ্চয়ই। তার দেহরক্ষীদেরও বন্দী করা হয়েছে। সেনাপতি বলল।

—তাদের কোথায় বন্দী করা হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ পাহাড়ের নিচে কয়েদঘরে। সেনাপতি বলল।

—তাহলে আমাদেরও ওখানেই বন্দী করে রাখা হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আর কথা নয়। রাজধানীতে চলো। সব দেখবে জানব। এখন তোমাদের রাঁধুনিদের বলো সকালের খাবার তৈরি করতে। সকালের খাবার খেয়ে আমরা রাজবাড়িতে যাবো। সেনাপতি বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল। তারপর রাঁধুনি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—সকালের খাবার তৈরি কর। তিনজন রাঁধুনি বন্ধু উঠে দাঁড়াল। রসুইঘরে যাবে বলে নিচে নামার সিঁড়ির দিকে চলল। খোলা তরোয়াল হাতে তিনজন যোদ্ধাও ওদের পাহারা দেবার জন্য সঙ্গে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সকালের খাবার তৈরি হয়ে গেল। সবাইকে খেতে দেওয়া হল। খাওয়া শেষ হল। সেনাপতির আদেশে সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের পাহারা দিয়ে জাহাজ থেকে পাতা পাটাতন দিয়ে তীরে নামানো হল। পাহারা দিয়ে ফ্রান্সিসদের নিয়ে পশ্চিমমুখো চলা শুরু হল।

বালি ভর্তি এলাকা দিয়ে চলল সবাই। কিছুদূর যেতে বালির এলাকা শেষ। শুরু হল মাটির রাস্তা। একসময় দূর থেকে রাজধানীর বাড়িঘর দেখা গেল। বাড়িঘর সব পাথর বালি আর কাঠের। পাহাড়ের নিচে বনভূমি। সহজেই কাঠ পাওয়া গেছে। বাড়িগুলোর ছাউনি লম্বা শুকনো ঘাস আর পাতার।

অন্যবাড়িগুলোর তুলনায় একটা বেশ বড় লম্বাটে বাড়ি। বোঝা গেল রাজবাড়ি। ফ্রান্সিসরা সেই বাড়ির প্রধান দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

সেনাপতি ফ্রান্সিসদের নিয়ে রাজসভায় ঢুকল। প্রহরীরা মাথা নুইয়ে সেনপাতিকে সম্মান জানাল। ফ্রান্সিস দেখল কাঠের সিংহাসনের গদীতে রাজা আনোতার বসে আছে। অসম্ভব মোটা। মুখে অল্প দাড়ি গোঁফ। মাথায় চৌকোনো সোনার গিল্টিকরা মুকুট। কুঁৎকুঁতে চোখ।

তখন বিচার চলছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিচার শেষ হল। বিচার প্রার্থীরা চলে গেল। দোষী লোকটিকে দুজন প্রহরী হাতে দড়ি বেঁধে নিয়ে চলে গেল।

রাজার সিংহাসনের দুপাশে দুটো ছোট কাঠের আসন। তাতে গদী পাতা। সেনাপতি রাজার সম্মুখে গিয়ে মাথা একটু নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে পাশের আসনে গিয়ে বসা অন্য আসনে বৃদ্ধ মন্ত্রী বসেই ছিল।

ফ্রান্সিস ভালো করে রাজা আনোতারকে দেখল কুঁৎকুঁতে চোখে রাজা ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টি কুটিল। একে অতবড় মুখমণ্ডল তার ওপর ঐ দৃষ্টি। ফ্রান্সিস বুঝল লোকটা ধুরন্ধর, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী।

বিচারপর্ব শেষ। সেনাপতি আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। আঙ্গুল দিয়ে ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে দেশীয় ভাষায় কী সব বলে গেল। সেনাপতির কথা শেষ হলে রাজা আনোতার একটু হেসে ভাঙা ভাঙা পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—শুনলাম তোমরা ভাইকিং। এখানে নাকি বেড়াতে এসেছো।

—ঠিক বেড়াতে নয়। তবে কোন উদ্দেশ্য নিয়েও আসি নি। নানা দ্বীপ ঘুরে এখন নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না। নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা এখানে এসেছো। রাজা আনোতার বলল।

—না। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এখানে আসি নি। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

—ঠিক আছে। সে সব পরে ভেবে দেখছি। এখন তোমাদের বন্দী করা হল। রাজা আনোতার বলল।

—কিন্তু আমরা তো আপনার বা আপনার দেশের কোন ক্ষতি করি নি। ফ্রান্সিস বলল।

—ক্ষতি করতে পারো এটা ধরে নিয়েই তোমাদের বন্দী করা হচ্চে। রাজা বলল। তারপর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল।—এটা কে? কথাটা শুনে ফ্রান্সিসের ভীষণ রাগ হল। কিন্তু সেই ভাবটা গোপন করে বলল—এটা নয় ইনি—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী।

—রাজকুমারী তো রাজপ্রাসাদে থাকে। রাজা বলল।

—না। ইনি আমাদের সঙ্গে থাকতেই ভালোবাসেন। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক গে যার যেমন অভিরুচি। এবার সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলল—এদের কয়েদঘরে ঢোকান। পরে ভেবে দেখছি এদের নিয়ে কী করা যায়।

ফ্রান্সিস বুঝল রাজা ওদের কোন কথাই শুনবে না। কিন্তু মারিয়ার কথাটা ভাবতে হয়। তাই ও বলল —আমরা না হয় কয়েদ ঘরেই রইলাম। কিন্তু একটা অনুরোধ রাজকুমারীকে রাজবাড়ির অন্দরমহলে রাখুন।

তিনি তো আর আমাদের ফেলে রেখে পালাতে পারবেন না।

—কিন্তু তাকেও তো বন্দী হয়েই থাকতে হবে। রাজা বলল।

—অন্তঃপুরে বন্দী করেই রাখুন। কয়েদ ঘরের কষ্ট ওঁর সহ্য হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব পরে হবে। এখন তো কয়েদ ঘরে থাকুক। রাজা বলল।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। বুঝল বলে লাভ নেই।

সেনাপতি ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের হাঁটতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা সেনাপতির পেছনে পেছনে চলল।

সবাই রাজবাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসদের দেখতে স্থানীয় অধিবাসীরা প্রায় ভিড় করে এল। বোঝা গেল ফ্রান্সিসদের দেখতেই ভিড়। সবাই বেশি অবাক হলে মারিয়াকে দেখে। মারিয়ার পোশাক দেখে।

সবার আগে সেনাপতি চলল পাহাড়ের দিকে। তার যোদ্ধারা ফ্রান্সিসদের ঘিরে নিয়ে চলল যাতে কেউ পালাতে না পারে। যেতে যেতে হ্যারি ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস আবার সেই কয়েদঘরেই বন্দী হতে চলেছি।

—ভেবো না। ঠিক সময় সুযোগমত পালাবো। আমার শুধু একটাই চিন্তা মারিয়া এই কয়েদঘরের কষ্টকর জীবন কতদিন মেনে নিতে পারবে। ফ্রান্সিস চিন্তিত স্বরে বলল।

—তুমি কালকেই রাজা আনোতারের সঙ্গে কথা বলো। যে করে হোক রাজকুমারীকে অন্য কোথাও রাখতে রাজাকে অনুরোধ কর।

—ঠিক বুঝতে পারছি না রাজা আনোত্তর রাজি হবে কিনা। ফ্রান্সিস বলল

—বলে তো দেখো। হ্যারি বলল।

—হুঁ। বলতে হবেই ফ্রান্সিস বলল।

পাহাড়ের নিচেই বনভূমি। খুব গভীর বন নয়। ছাড়া ছাড়া গাছগাছালি জংলা ঝোপঝাড়। সে সবের মাঝখান দিয়ে পায়ে চলা পথ। বনের সেই পথ ধরে চলল সবাই।

কিছু পরে একটা লম্বাটে ঘরের সামনে এসে সেনাপতি দাঁড়িয়ে পড়ল। বোঝা গেল এই ঘরটাই কয়েদঘর। ঘরের ছাউনি শুকনো ঘাস পাতার। ঘরের দরজার সামনে বর্শা হাতে দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে। সেনাপতিকে দেখে দুজনে মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল। একজন প্রহরী কোমরের কাপড়ের ফেট্টিতে ঝোলানো চাবি বের করে লোহার দরজা শব্দ করে খুলে দিল। সেনাপতি ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা একে একে ঘরটায় ঢুকল।

ঘরের মেঝেয় শুকনো ঘাস লতাপাতা বিছানো দেখা গেল আগে থেকেই বেশ কিছু বন্দী শুয়ে আছে। ঘরের দেয়াল এবড়ো খেবড়ো পাথরের। ঘরটার ওপর দিকে একটা ফোকর মত। ওটাই জানালা। বাইরের যেটুকু আলো হাওয়া ঐ পথ দিয়েই আসছে ফ্রান্সিসরা কেউ কেউ বসল, কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসল। রাজকুমারী ফ্রান্সিসদের পাশে এসে বসল। ফ্রান্সিস ভাবছিল রাত পাহারার জন্যে পেড্রো কে বলা উচিত ছিল। পেড্রো নজর রাখলে। এভাবে বিনা লড়াইয়ে বন্দী হতে হত না।

একটু চুপ করে থেকে মারিয়া বলল—আমাকে তাহলে এখানেই থাকতে হবে।

—না-না। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—তোমাকে অন্য কোথাও রাখার জন্য রাজাকে অনুরোধ করবো।

—কোন দরকার নেই। আমি এখানেই তোমাদের সঙ্গে থাকবো। মারিয়া বলল।

—তা হয় না। এই বদ্ধ ঘরে এভাবে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাতে আমাদের বিপদই বাড়বে। ফ্রান্সিস বলল।

— তোমরা এত কষ্ট সহ্য করে থাকবে আর আমি থাকতে পারবো না? মারিয়া বলল।

—না পারবে না। কাল সকালে রাজার সঙ্গে দেখা করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজাকে দেখে আমার ভালো লাগে নি। লোকটা দাম্ভিক। মারিয়া বলল।

—শুধু দাম্ভিক নয় তার চেয়েও বেশি কিছু। কিন্তু উপায় নেই। ওর মন রেখে কথা বলতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সিনাত্রা ফ্রান্সিসের কাছে সরে এল। বেশ ভীতস্বরে বলল—রাজা আমাদের মেরে ফেলবে না তো?

—অত ভয় পেও না। আমাদের মেরে ফেলে রাজার কী লাভ। লাভের জন্য তো আমাদের জাহাজ তল্লাশীই করেছে। কয়েকটা সোনার চাকতি ছাড়া কিছুই পায় নি। কাজেই রাজা মিছিমিছি আমাদের মেরে ফেলবে না। তবে আমাদের বন্দী করে রাখবে। তারপর কিছু দিন যাক। দেখা যাক আমাদের নিয়ে কী করে। সিনাত্রা আর কিছু বলল না। তবে ওর মন থেকে ভয় গেল না।

দুপুর হল। দুজন প্রহরী লম্বাটে শুকনো পাতা নিয়ে ঢুকল। সবার সামনে পাতা পেলে দিল। দুজনে মিলে তাতে খাবার দিল। আধপোড়া রুটি আর পাখির মাংস। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা চেটেপুটে খেল। কেউ কেউ বাড়তি খাবারও নিল। খাওয়া শেষ হলে ঘরের কোনায় মাটির পাত্রে রাখা জল খেল। প্রহরীরা এঁটো পাতা নিয়ে চলে গেল। পাখির মাংস সুস্বাদু। ওরা খেয়ে তৃপ্ত হল। এবার শুয়ে বসে রইল ওরা।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়েছিল। মৃদুস্বরে ডাকল হ্যারি। হ্যারি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—আগে থেকে যে বন্দীরা ছিল তাদের সঙ্গে কথা বলো তো। ওরা কারা। কেনই বা ওদের বন্দী করা হয়েছে—খবর নাও।

আগে থেকে যারা বন্দী ছিল হ্যারি তাদের কাছে গেল। ও কিছু বলার আগে ঐ বন্দীদের একজন যুবক দেশীয় ভাষায় হ্যারিকে কিছু বলল। হ্যারি বুঝল না। তাই ও মাথা নাড়ল। যুবকটি এবার ভাঙা ভাঙা পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—আমার নাম বিত্তানো। তোমার নাম কী? হ্যারি বলল—হ্যারি।

—তোমরা বিদেশি। বিত্তানো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। রাজা তোমাদের বন্দী করেছে কেন?

—শত্রুতা—শত্রুতা। এটাই আমাদের দেশ বাতোরিয়া রাজা আনোতারের দেশ হচ্ছে ঐ পাহাড়ের ওপাশে। রাজা আনোতার ধূর্ত ফন্দীবাজ নিষ্ঠুরও। হঠাৎ আমাদের দেশ আক্রমণ করে জয় করেছে। এখন দুই দেশেরই রাজা হয়ে বসেছে। বিত্তানো বলল।

—তোমাদের দেশের রাজা? তিনি কোথায়? হ্যারি প্রশ্ন করল।

বিত্তানো চোখের ইঙ্গিতে দেখালে ঠেস-দিয়ে বসা একজন দাড়ি গোঁফওয়ালা রোগাটে চেহারার লোককে দেখাল। হ্যারি দেখল লোকটির পরনে দামি কাপড়ের পোশাক। লোকটি চুপ করে বসে আছে।

—উনিই তোমাদের রাজা?

—হ্যাঁ রাজা পাকার্দো আমরা কয়েকজন তাঁর দেহরক্ষী। বিস্তানো বলল।

—তোমাদের সেনাপতি? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—লড়াইয়ে মারা গেছেন। এখন আমরা অবাক হবো না যদি রাজা আনোতার আমাদের রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। সেক্ষেত্রে আমরাও যে কজন আছি মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বাঁচবো না। আমরাও। বিস্তানো বলল।

—রাজাসহ তোমাদেরও মৃত্যুদণ্ড দেবে কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা আনোতার সব পারে। লড়াইয়ে হেরে গেছি কাজেই আমাদের জীবনের কোন দাম নেই। বিস্তানো বলল।

—তোমাদের রাজা পাকার্দো কেমন মানুষ? ফ্রান্সিস বলল।

—দেবতা—দেবতা। প্রজারা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করে আবার বন্ধুর মত ভালোবাসে। আজকে উনি এই জঘন্য কয়েদঘরে বন্দী হয়ে আছেন এটা জেনে আমাদের বুক ভেঙে যাচ্ছে। বিস্তানো বলল।

—লড়াইয়ে হারজিৎ আছেই। ওসব ভেবে কী হবে। হ্যারি বলল।

—তোমরাও রেহাই পাবে বলে মনে হয় না। বিস্তানো বলল।

—আমরা তার আগেই পালাবো। হ্যারি বলল।

—পারবে? বিস্তানো একটু অবিশ্বাসের সুরে বলল।

—পারতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—সেই চেষ্টাই করতে হবে। এখানে পড়ে থাকলে আমরা কেউ বাঁচবো না। এবার বিস্তানো মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—ইনি কে?

—আমাদের দেশের রাজকুমারী। হ্যারি বলল।

—রাজা আনোতার কেমন মানুষ বোঝ। উনি মহিলা। রাজকুমারী। তাঁকেও এই কয়েদঘরে বন্দী করে রেখেছে। বিস্তানো বলল।

—তোমাদের রানিকে কী করেছে? হ্যারি জানতে চাইল।

—অন্দরমহলে বন্দী করে রেখেছে। বিস্তানো বলল।

—রাজকুমারীকে নিয়েই আমাদের সমস্যা। উনি সুস্থ থাকতে থাকতে। তাকে নিয়ে পালাতে হবে। হ্যারি বলল।

—পারবে পালাতে? এত প্রহরী সৈন্যসামন্ত। সবার চোখে ধূলো দিয়ে পালানো সম্ভব? বিস্তানো বলল।

—আমাদের দলনেতার নাম ফ্রান্সিস। ও অনেক অঘটন ঘটাতে পারে। কত গুপ্ত ধনভাণ্ডার ও খুঁজে বের করেছে। বুদ্ধি খাটিয়ে পরিশ্রম করে। তা ছাড়া এরকম পাহারার মধ্যেও আমরা অনেকবার পালিয়েছি। দেখো—ঠিক পালাবো। হ্যারি বলল।

—তাহলে তো ভালোই একসঙ্গে আমরাও পালাতে পারবো। বিস্তানো বলল।

—সেই উপায়টাই এখন ভাবতে হবে। হ্যারি বলল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে ফিরে এল। বিত্তানোর সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে বললল। ফ্রান্সিস রাজা পাকোর্দোর দিকে তাকাল। রাজার মাথার চুল উস্কোখুস্কো। রোগাটে মুখে দুশ্চিন্তার স্পষ্ট চিহ্ন। চোখের কোল বসে গেছে। পরনে দামি পোশাক ময়লা। দু'চোখ বুঁজে চুপচাপ বসে আছেন। রাজা ফ্রান্সিসের পরিচিত কেউ নন। তবু রাজার এই দুরবস্থা দেখে ফ্রান্সিস তাঁর প্রতি গভীর সহানুভূতি বোধ করল।

পরদিন সকালের খাবার খাওয়া সবে শেষ হয়েছে—দুজন প্রহরী কয়েদঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। একটু গলা চড়িয়ে বলল—রাজা পাকোর্দো বেরিয়ে আসুন। আমাদের মাননীয় রাজা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। প্রহরী দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিস দরজার কাছে গিয়ে বলল—আমরা দু'জন রাজা আনোতারের সঙ্গে দেখা করবো।

—কেন বলো তো? প্রহরী জানতে চাইল।

— বিশেষ দরকার। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—বেশ। চলো প্রহরী বলল।

রাজা পাকোর্দোর সঙ্গে ফ্রান্সিস আর হ্যারি বেরিয়ে এল। তিনজনে প্রহরীদের সঙ্গে রাজ বাড়ির দিকে চলল।

রাজ সভায় খুব ভিড় ছিল না। রাজা আনোতার রাজা পাকোর্দোর জন্যে অপেক্ষা করছিল। রাজা পাকোর্দোকে দেখে কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল—এই যে—রাজা পাকোর্দো। আসুন— আসুন। রাজা পাকোর্দো কোন কথা বললেন না।

—তা কয়েদঘরে থাকতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? সেই একইভাবে হেসে বলল।

—না আমি ভালো আছি। রাজা পাকোর্দো বললেন।

—এটা মিথ্যে বললেন। কয়েদঘরের ঐ পরিবেশে কেউ ভালো থাকে না। রাজা আনোতার বলল।

—না আমি ভালো আছি। আমার থাকা খাওয়ার ভালোমন্দ বোধটা একটু কম? রাজা পাকোর্দো বললেন।

—তার মানে আপনি সবরকম অবস্থাতেই খুশি। রাজা আনোতার বলল।

—হ্যাঁ। কোনকিছুর বিরুদ্ধেই আমার কোন অভিযোগ নেই। রাজা পাকোর্দোর বললেন।

—আপনি রাজা না হয়ে সাধু সন্ন্যাসি হলে ভালো করতেন। রাজা আনোতার বলল।

—রাজা হয়েও সাধু সন্ন্যাসীর মত থাকা যায়। তার জন্যে বনে জঙ্গলে যেতে হয়। রাজা পাকোর্দো বললেন।

—এইজন্যেই আপনি লড়াইয়ে হেরে গেলেন। রাজা আনোতার বলল।

—তা'তে আমার দুঃখ নেই। শুধু একটাই দুঃখ আমার সুখী প্রজারা আপনার মত একটা পাষণ্ডের হাতে পড়ল। রাজা পাকোর্দো বললেন।

রাজা আনোতার এক লাফে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলে উঠল—আপনার এত সাহস আমাকে পাষণ্ড বললেন।

—আপনি আমার বন্দী সৈন্যদেরও হত্যা করেছেন। এ ধরণের কাজ একমাত্র পাষণ্ডরাই করে রাজা পাকোর্দো বললেন। রাজা আনোতার সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—সেনাপতি এটাকে চাবুক মারুন। সেনাপতি একজন প্রহরীকে ইঙ্গিত করল। প্রহরী চাবুক হাতে এগিয়ে এল। তারপর রাজা পাকোর্দোর পিঠে চাবুক মারল। রাজা পাকোর্দোর শরীরটা কেঁপে উঠল। পর পর কয়েকটা চাবুকের মার খেয়ে রাজা পাকোর্দো বসে পড়লেন। মাথা নিচু করে জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে লাগলেন। রাজা আনোতার হাত তুলে প্রহরীকে থামতে ইঙ্গিত করল। প্রহরী চাবুক গুটিয়ে সরে দাঁড়াল।

এবার রাজা আনোতার বলল—যাক গে ভবিষ্যতে সাবধানে কথা বলবেন। এখন যে জন্যে আপনাকে ডেকেছি সেটা বলছি। শুনেছি আপনার যথেষ্ট ধনসম্পদ আছে।

—সেই ধন সম্পদ আমার পৈতৃক ধনসম্পদ। রাজা পাকোর্দো বললেন।

—সেই ধনসম্পদের জন্যে আপনার রাজকোষাগার তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় নি। এখন বলুন কোথায় রেখেছেন সেসব। রাজা আনোতা বলল।

—আমি জানি না রাজা পাকোর্দো মাথা নাড়লেন।

—নিশ্চয়ই জানেন। আমার আক্রমণের খবর পেয়ে সে সব কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। রাজা আনোতার বলল।

—বললাম তো আমি কিছুই জানিনা। রাজা পাকার্দো বলল।

—আপনি সে সব ধনভাণ্ডারের কোন খোঁজই রাখতেন না। রাজা আনোতার বলল।

—না। রাজা পাকার্দো বললেন।

—কেন? রাজা আনোতার বলল।

—সে সব আমার পিতার ধনভাণ্ডার। আমার নয়। ঐ ধনভাণ্ডারের ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভও ছিল না। রাজা পাকার্দো বললেন।

—তাহলে সে সবের খোঁজ রাখতো কে? রানি? রাজা আনোতার প্রশ্ন করল।

—ন। মন্ত্রী মশাই। তিনিই যেসব দেখাশুনো করতেন। মন্ত্রী মশাইকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারেন। রাজা পাকার্দো বললেন।

—কিন্তু এখানেই হয়েছে সমস্যা। আপনি জানেন না যে আপনার মন্ত্রী মশাই গতরাতে ফুয়েন্ত সরোবরে জলে ডুবে মারা গেছেন। রাজা আনোতার বলল।

রাজা পাকার্দো চমকে উঠলেন। তারপর বললেন—যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি বোধহয় তিনি সহ্য করতে পারেন নি। রাজা পাকার্দো বললেন

—যে কারণেই হোক। আর কেউ কি সেই ধনভাণ্ডারের খোঁজ রাখে?

—জানি না। রাজা পাকার্দো বললেন।

—মিথ্যে কথা। রাজা আনোতার চিৎকার করে বলল। তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে বলল—চাবুকের মার পড়লে বলতে বাধ্য হবেন।

—চেষ্টা করে দেখতে পারেন। রাজা পাকার্দো বললেন।

—ঠিক আছে। আমি নিজে কয়েকদিন চেষ্টা করে দেখি। রাখা আনোতার বলল

—দেখুন চেষ্টা করে। রাজা পাকার্দো বললেন।

রাজা আনোতার এবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। বলল—তোমরা এসেছো কেন?

—একটা অনুরোধ জানাতে। ফ্রান্সিস বল।

—বলো। রাজা বলল।

আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশের রাজকুমারী রয়েছে। কয়েদঘরের ঐ পরিবেশ তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। তাঁকে অন্য কোথাও বন্দী করে রাখুন। রাজ অন্তঃপুরে হলে ভালো হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—এটা পরে ভেবে দেখছি। এখন আমি গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধারে ব্যস্ত থাকবো। রাজা আনোতার বলল।

—বেশ পরেই দেখবেন। রাজা আনোতার প্রহরীদের ইঙ্গিত করল। প্রহরীরা এগিয়ে এল। বলল—চলো সব।

রাজা পাকার্দোর সঙ্গে ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরে ফিরে এল। ঘরে ঢুকে রাজা পাকার্দো বসলেন। তারপর আস্তে কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। পিঠে চাবুকের ক্ষত। চিৎ হয়ে শুতে পারলেন না। পাথরের দেয়ালে পিঠ দিয়েও বসতে পারলেন না।

ফ্রান্সিস ভেন-এর কাছে এল। বলল ভেন রাজা মশাইয়ের পিঠে চাবুক মারা হয়েছে। কী করা যায়?

—কী করবো বলো। সঙ্গে তো ওষুধ নেই। কোমরের ফেট্টি থেকে কিছুটা কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে রাজকুমারীকে দাও। জলে ভিজিয়ে সেই কাপড়ের টুকরো যেন রাজার পিঠে বুলিয়েদেন। কষ্ট কমবে।

মারিয়া ফ্রান্সিসের পাশেই বসেছিল। সব শুনে বলল—আমি—সব করছি। মারিয়া নিজের ঝুল পোশাক থেকে কাপড় ছিঁড়ে নিল। তারপর জলে ভিজিয়ে নিয়ে রাজার কাছে এসে বলল—মাননীয় রাজা—আপনার পিঠে জল বুলিয়ে দিচ্ছি। আমাদের বৈদ্যি বলছে এতে আপনার যন্ত্রণা একটু কমবে।

—বেশ। রাজা উঠে বসলেন। মারিয়া রাজার পোশাকটা পেছন দিকে তুলল।

চাবুকের স্পষ্ট দাগ। রাজা নিঃশব্দের কী কষ্ট সহ্য করছেন সেটা মারিয়া বুঝতে পারল। ও রাজার জন্যে গভীর সহানুভূতি বোধ করল। আস্তে আস্তে ভেজা কাপড়ের টুকরোটা পিঠে বুলিয়ে দিতে লাগল। রাজার মুখ থেকে মৃদু গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল। সেই শব্দ শুনে ফ্রান্সিস স্থির থাকতে পারল না। কয়েদঘরের দরজার কাছে গেল। একজন প্রহরীকে ডাকল। প্রহরী কাছে এলে বলল—রাজা পাকার্দো খুব অসুস্থ। একজন বৈদ্যকে আসতে বলো।

—আমাদের রাজার হুকুম না হলে বৈদ্যকে ডাকা চলবে না। প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে। তোমাদের সেনাপতির সঙ্গে কথা বলতে চাই তাকে ডাকো।

—তিনি কি আসবেন? প্রহরী বলল।

—একবার বলে তো দেখো। বলবে যে একজন বিদেশি ডাকছে।

—হুঁ। প্রহরীটি চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি এল। দরজায় মুখ রেখে বলল—কে ডাকছিলে?

—আমি। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। বলল—চাবুকের মারে রাজা আতোয়ার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর চিকিৎসা প্রয়োজন।

—দেখি রাজাকে বলে। তবে রাজা চিকিৎসার অনুমতি দেবেন বলে মনে হয় না। সেনাপতি চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। কিন্তু সেনাপতি ফিরে এল না। ফ্রান্সিস বুঝল রাজা চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই করবে না। ফ্রান্সিস ভেন-এর কাছে এল। বলল—ভেন রাজার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় না?

—দাঁড়াও। এখানে তো গাছগাছালি আছে। আমি খুঁজছি। ভেন লোহার দরজায় মুখ চেয়ে বাইরের জঙ্গলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস ওর পাশে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ কী দেখে ভেন বলে উঠল—পেয়েছি। ফ্রান্সিস বলল—কী পেয়েছো?

—ওষুধ। ভেন বলল। তারপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—

—ঐ যে চেস্টনাট গাছটা দেখছ তার পেছনে দেখ একটা ছোট গাছ। হাত চারপাঁচ লম্বা। ঐ গাছের শেকড়টা চাই। দেখ প্রহরীদের দিয়ে গাছটা আনতে পারো কিনা।

ফ্রান্সিস একজন প্রহরীকে ইশারায় ডাকল। বলল—একটা উপকার করবে ভাই?

—সেনাপতিকে ডাকতে যেতে পারবো না। প্রহরী বলল।

—না-না। অন্য ব্যাপার বলছি। ফ্রান্সিস এবার আঙুল তুলে সেই ছোট গাছটা দেখালো। বলল ঐ গাছটার শেকড় সুদ্ধ তুলে এনে দাও।

প্রহরী অবাক। বলল—ঐ গাছটা দিয়ে কী করবে?

—দাঁত মাজবো। নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। পারবো না। প্রহরী মাথা নেড়ে বলল।

ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—একটা সোনার চাকতি দাও তো। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা সোনার চাকতি বের করে দিল। ফ্রান্সিস সোনার চাকতিটা প্রহরীকে দেখিয়ে বলল—এবার পারবে? সোনার চাকতিটা প্রায় কেড়ে নিয়ে প্রহরী একগাল হাসল। বলল—এটা এমন কী কাজ? ও চলে গেল। একটু পরেই গাছটা শেকড় সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে এল। দেখে ভেন বলল—ভাই শুধু শেকড়টা কেটে দাও।

—বেশ। প্রহরী তরোয়াল বের করল। গাছের গোড়ার কাছে কেটে শেকড়টা দিল। ভেন শেকড়টা নিয়ে ঘরের ভেতরে এসে বসল। শেকড়ে আটকে থাকা মাটি ঝেড়ে ঝুড়ে ফেলে ফ্রান্সিসকে বলল—এই শেকড় চিবিয়ে ছিবড়েটা রাজার পিঠে মারের জায়গা গুলোয় চেপে লাগিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আমার দাঁত তো অত শক্ত নয়।

—ঠিক আছে। আমি চিবিয়ে ছিবড়ে করে দিচ্ছি। ফ্রান্সিস হাত বাড়াল

—কিন্তু এর রস পেটে গেলে মৃত্যু হতে পারে। ভেন বলল।

কিচ্ছু ভেবো না। আমি সাবধান থাকবো। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া পাশেই ছিল। ও ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল—না-না। তুমি এটা করতে পারবে না।

—কাউকে তো চিবোতেই হবে—ফ্রান্সিস বলল—কিচ্ছু ভেবো না। এ এমন একটা কঠিন কাজ নয়।

—চিবিয়ে ছিবড়েটা বের করে দাও। তারপর ভালো করে মুখটা ধুয়ে ফেলো। ভেন বলল।

ফ্রান্সিস শেকড়টা মুখে ঢোকাল। চিবোতে লাগল। বেশ তেতো স্বাদ। মুখ কুঁচড়ে চিবোতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ছিবড়ে মত হল। ফ্রান্সিস সেটা বের করে ভেন-এর হাতে দিল। ভেন ছিবড়েটা আমার পিঠে চেপে চেপে দিতে লাগল। রাজা একবার কঁকিয়ে উঠলেন। তারপর চুপ করে রইলেন। ফ্রান্সিস কাঠের গ্লাসে জল নিয়ে বারকয়েক কুলকুচি করে মুখ ধুয়ে ফেলল। কোন বিপদ হল না।

—মোক্ষম ওষুধটা পেয়েছি। রাজা দু'তিন দিনের মধ্যে সুস্থ হবেন। ভেন বলল। উদ্বিগ্ন মারিয়া এতক্ষণে স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। বলল—ভেন—ফ্রান্সিস এখন সব খেতে পারবে তো?

—হ্যাঁ রাজকুমারী। আর কোন বিপদ নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ভেন বলল।

—তোমার শরীর ভালো আছে তো? মারিয়া ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। শুধু মাথাটা একটু ঘুরছে। ফ্রান্সিস বলল।

—ওটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। ভেন বলল। এতক্ষণে রাজা ফ্রান্সিদের দিকে তাকালেন। আস্তে আস্তে বললেন—আমি তোমার নাম জানি

না। কী বলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো তাও বুঝে উঠতে পারছি না। আমাকে সুস্থ করবার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করলে না। তুমি সত্যিই মহৎ।

—এটা মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি আমার কর্তব্য। আপনি দ্রুত সুস্থ হোন এটাই এখন চাই। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আর কিছু বললেন না। চুপ করে কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই রাজা পাকার্দো সুস্থ হলেন। পিঠের ঘা শুকিয়ে গেল।

এর মধ্যে রাজা আনাতোর রাজা পাকার্দোকে রাজসভায় ডেকে পাঠিয়েছিল। বলেছিল—এখন কেমন আছেন?

—ভালো। রাজা পাকার্দো বলেছিলেন।

—আবার যদি চাবুকের ঘা খেতে না চান তো এখনও বলুন সেই ধনভাণ্ডার কোথায় রেখেছেন। রাজা আনোতার বলেছিল। না।

—আমি তো বলেছি এই ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। যিনি জানতেন সেই মন্ত্রী মশাই তো মৃত। এই বাতোরিয়া দেশ তো এখন আপনার দখলে। বিনা বাধায় তল্লাশী চালান। রাজা পাকার্দো বলেছিলেন।

—কিন্তু কিছু একটা সূত্র তো চাই। রাজা আনোতার বলেছিল।

—আমি আপনাকে কোন সূত্র দিতে পারবো না। রাজা পাকার্দো বলেছিলেন।

—আচ্ছা মন্ত্রীমশাই কেমন মানুষ ছিলেন? রাজা আনোতার জানতে চাইল।

—সৎ পরিশ্রমী অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আবার একই সঙ্গে সরল স্নেহশীল। প্রজাদের নিজের সন্তানের মত ভালোবাসতেন। তাকে কখনও ক্রুদ্ধ হতে দেখি নি। নিজে সংসারটংসার করেন নি। তাঁর একমাত্র চিন্তাই ছিল প্রজাদের মঙ্গল সাধন। আমি সবসময় তাঁর পরামর্শ নিয়েই রাজকার্য করেছি। রাজা পাকার্দো বলেছিলেন।

—আচ্ছা রাজকার্যে সাহায্য করা ছাড়া তিনি আর কী করতেন? রাজা পাকার্দো একটু থেমে বললেন—শুনলে আশ্চর্য হবেন—অবসর সময়ে তিনি ছবি আঁকতেন।

—অ্যাঁ? অবাক কাণ্ড। রাজা আনোতার বলেছিলেন।

—হ্যাঁ। অবাক হবারই কথা। রাজা পাকার্দো বলেছিলেন।

—কীসের ছবি আঁকতেন? মানুষ জীবজন্তু? রাজা আনোতার বলেছিলেন।

—না প্রকৃতির ছবি। ফুয়েন্ত সরোবর আর তার চারপাশের বনজঙ্গল, পাহাড়, আকাশ—এই সময়ের ছবি। রাজা পাকার্দো বলল।

দুই রাজার এই কথোপকথনের দিন ফ্রান্সিস রাজসভায় উপস্থিত ছিল। মন্ত্রীমশাই ছবি আঁকতেন একথা শুনে ও নিজেও কম অবাক হয় নি। মৃত মন্ত্রী মশাইয়ের প্রতি ওর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

সেদিন দুই রাজার এই পর্যন্তই কথাবার্তা হয়েছিল। ফ্রান্সিসের একটা লাভ

হয়েছিল সেদিন। রাজা আনোতার মারিয়াকে অন্তঃপুরে থাকার অনুমতি দিয়েছিল। মারিয়া অবশ্য যেতে চাইছিল না। ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনে মিলে অনেক বুঝিয়ে টুঝিয়ে ওকে যেতে বাধ্য করেছিল। আসলে ফ্রান্সিসরা এত কষ্ট করে এই কয়েদঘরে পড়ে থাকবে আর ও রাজ-অন্তঃপুরের সুখ স্বাচ্ছন্দের মধ্যে থাকবে এটা ও মেনে নিতে পারছিল না। কিন্তু ফ্রান্সিসদের পেড়াপেড়িতে শেষ পর্যন্ত মানতে বাধ্য হল। ফ্রান্সিসরা নিশ্চিন্ত হল।

দিন যায় রাত যায়। ফ্রান্সিস রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারে না। একমাত্র চিন্তা—কী করে এই কয়েদঘর থেকে পালানো যায়। এই নিয়ে হ্যারির কথা হয়।

ওদিকে রাজা আনোতার রাজা পাকার্দোর পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ধনভাণ্ডারের খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে। চারপাশের বনজঙ্গলপাহাড়। ফুটন্ত সরোবরের আশেপাশে অন্বেষণকারী দল পাঠাচ্ছে। নিজের অন্তঃপুর অস্ত্রাগার সৈন্যাবাস সর্বত্র খোঁজ করে বেড়াচ্ছে তার বাছাই করা আট দশ জন সৈন্য। কিন্তু গুপ্তধনভাণ্ডার কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মাঝে মাঝেই রাজা পাকার্দোকে রাজসভায় ডেকে পাঠায়। তর্জন গর্জন করে। চাবুকের মারের ভয় দেখায়। রাজা পাকার্দো নির্বিকার। এক কথাই বিরক্তির সঙ্গে বারবার বলেন—আমি কিছুই জানি না। যিনি জানতেন তিনি মৃত।

রাজঅন্তঃপুরে রাজার শয়নকক্ষে মন্ত্রী মশাইয়ের আঁকা তিনটে ছবি আছে। তিনটে ছবিতেই শুধু গাছপালা পাহাড় আকাশের ছবি। সন্দেহ নেই ছবিগুলো সুন্দর। রাজা আতোয়ার সময় পেলে ছবিগুলো দেখে। ছবি দেখে মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারে না। সে রেগে গিয়ে ছবি তিনটে নামিয়ে বস্তাবন্দী করে মালখানা ঘরে রেখে দিয়েছে।

মন্ত্রীর বাড়িতেও তাঁর আঁকা কয়েকটা ছবি ছিল। সেগুলোকেও রাজা আতোয়ার আনাল। দেখল ছবিগুলি সেই পাহাড় ঝর্ণা নীল আকাশে আকাশে সাদা মেঘ ভেসে চলেছে পাখি উড়ছে। ক্রুদ্ধ রাজা সেই ছবিগুলোও মালখানাঘরে পাঠিয়ে দিল।

মন্ত্রীমশাইয়ের ছবি আঁকার ব্যাপারটা ফ্রান্সিসকে খুব কৌতূহলী করল। রাজকার্যে সাহায্যের ফাঁকে ফাঁকে একজন ব্যস্ত মন্ত্রী ছবি আঁকে এ তো অদ্ভুত ব্যাপার। এই সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য সেদিন রাতে খাওয়াদাওয়ার পর শাঙ্কোকে বলল—বিত্তানোকে আমার কাছে আসতে বলো।

—কেন বলো তো? হ্যারির জানতে চাইল।

—দরকার আছে। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো গলা চড়িয়ে ডাকল। বিত্তানো একবার এখানে এসতো। বিত্তানো ওদের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল বিত্তানো—একটা ব্যাপারে তোমার কাছে কিছু জানতে চাইছি।

—বেশ বলো। বিত্তানো বলল।

—বংশানুক্রমে রাজা পাকার্দো যে ধনসম্পদ পেয়েছিল যে সম্পর্কে তুমি কিছু জানো। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—কী যে বলো। সেই ধনসম্পদ সম্বন্ধে রাজা পোতার্দোর নিজেরই কোন আগ্রহ ছিল না আর আমি কী জানবো। বিত্তানো বলল।

—আমার কেমন মনে হচ্ছে মন্ত্রীমশাই যেভাবেই হোক কোন সূত্র নিশ্চই রেখে গেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হয়তো। তবে তার হদিশ করবোকে? সেই ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী সেই রাজা আনোতারেরই তো কোন হুঁশ নেই। তুমি আমি ভেবে কী করবো। বিত্তানো বলল।

—আচ্ছা মন্ত্রীমশাই কীসে ছবি আঁকতেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—সাদা চামড়ার ওপর বিত্তানো বলল।

—রং দেবেন কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

—গাছের ফল, ছাল, গাছের শেকড়টেকড় গুঁড়ো করে। বেশ কিছু রং আমিই তৈরি করে দিয়েছিলাম। আসলে মন্ত্রীমশাইকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। উনি আমাকেও খুব ভালোবাসতেন। ছবি আঁকার সময় বেশ কয়েকবার তাঁর সঙ্গী হয়েছি আমি। পাখি, প্রাণি বা মানুষ এসব আঁকতেন না। শুধু চোখ মেলে দেখা প্রকৃতি—পাহাড় সরোবর বনজঙ্গল আকাশ।

—হ্যাঁ শিল্পীর মেজাজ বোঝা দায়। আচ্ছা আঁকা ছবি গুলো তিনি কী করতেন? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—রাজা পাকার্দোকে তিনটি ছবি দিয়েছিলেন। রাজা যত্ন করে তাঁর শয়নকক্ষে টাঙিয়ে রেখেছেন। কয়েকটা ছবি তাঁর বাড়িতে টাঙিয়ে ছিলেন। খুব বেশি ছবি আঁকেন নি। একটা ছবিই অনেকদিন ধরে আঁকতেন। বিত্তানো বলল।

—মন্ত্রীমশাইয়ের আঁকা ছবিগুলো দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বোধ হয় দেখতে পাবেন না। বিত্তানো বলল।

—কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা আনোতার সব ছবি মালখানাঘরে বস্তাবন্দী করে রেখে দিয়েছে। বিত্তানো বলল।

—তার উপযুক্ত কাজই করেছে। ছবির কদর বোঝার মত মানুষ সে নয়। কথায় কথায় চাবুক চালায়—এ কেমন রাজা? ফ্রান্সিস বলল।

—তা তো বটেই। বিত্তানো বলল।

—যাক গে—রাত হল। শুয়ে পড়ো। ফ্রান্সিস বলল।

বিত্তানো চলে গেল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস তুমি মন্ত্রীমশাই তাঁর আঁকা ছবি এসব নিয়ে ভাবছো কেন?

—মনটা কখনও শূন্য রাখতে নেই। কিছু না কিছু নিয়ে ভাবতে হয়। হ্যারি

পাশেই শুয়ে ছিল। হেসে বলল—ফ্রান্সিস গুপ্তধনের সংবাদ পেয়েছ। ওর এত আগ্রহের কারণ ওটাই এখন ঐ নিয়ে ভাববে।

—না-না হ্যারি। আমি এখন পালানোর উপায় ভাবছি। মন্ত্রীমশাই ছবি গুপ্ত ধনভাণ্ডার এসব পরে ভাববো। ফ্রান্সিস বলল।

—একটা কাজ তো করতে পারো ফ্রান্সিস—শাঙ্কো বলল—রাজা আতোয়ারকে বলো তুমি গুপ্তধন খুঁজে উদ্ধার করে দেবে এবং একটা স্বর্ণমুদ্রাও নেবে না। তুমি বললেই রাজা আতোয়ার রাজি হবে। আমরাও মুক্তি পাবো।

—অসম্ভব। রাজা আতোয়ার অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। একজন মানুষ গুপ্তধন উদ্ধার করে দেবে কিন্তু বদলে কিছুই নেবে না—এমন মানুষও আছে রাজা আতোয়ার সেটা বিশ্বাসই করবে না।

তুমি বিশ্বাস করাতেই পারবে না। ভাববে অন্য বদমতলব আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি ঠিকই অনুমান করেছো। হ্যারি বলল।

—নাও শুয়ে-পড়ো সব। রাত জাগা চলবে না। ফ্রান্সিস কথাটা বলে শুয়ে পড়ল।

—বলছো বটে কিন্তু তুমি অনেক রাত অব্দি জেগে জেগে থাকো। হ্যারি বলল।

—তুমি টের পাও? ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—তুমি আমার বাল্যবন্ধু। তোমাকে আমি ভালো করেই চিনি। মাথায় চিন্তা নিয়ে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারো না। হ্যারি বলল।

—তা যা বলেছো। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

ফ্রান্সিসদের বন্দীজীবন কাটতে লাগল। ফ্রান্সিস মাঝে মাঝেই কয়েদঘরটা ঘুরে দেখে যদি কোনভাবে পালানো যায়। কিন্তু পাথর চাপিয়ে চাপিয়ে তৈরি ঘর বেশ মজবুজ। পাথরের দেয়াল ভাঙার বা সরাবার কোন উপায় নেই। ওপরের ছাউনিও পাথর চাপা দিয়ে মজবুত করা।

সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর শাঙ্কো ফ্রান্সিসদের কাছে এল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল—পালাবার উপায় বের করেছি। ফ্রান্সিস বলল—কী উপায়?

—ঐ যে জানালার মত ফোকরটা ঐ পর্যন্ত ওঠার ব্যবস্থা করেছি। ওটাতে পা রেখে ছাউনি সরিয়ে ঘরের ওপরে উঠতে পারবো। তারপর বুদ্ধি করে পালানো। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—আমার ছক ভাবা হয়ে গেছে। তোমাকে ছাউনি দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে প্রহরীদের কোমর থেকে চাবি বের করে নিয়ে দরজা খুলবে। আমরা পালাবো। তবে তুমি একা এতসব পারবে না। বিনেলোকে সঙ্গে নেবে। মোটকথা নিঃশব্দে সব কাজ সারতে হবে। আজ রাতেই লেগে পড়ো। তার আগে দেখে এসো ক'জন প্রহরী রয়েছে। শাঙ্কো উঠে গেল। দরজার কাছে গিয়ে দেখে এসে বলল—মাত্র দু'জন।

—হাতে কী? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—বর্শা। শাঙ্কো বলল।

—এতে তোমাদের সুবিধেই হবে। দু'জনকে কবজা করা সহজ। কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর। রাত বাড়লে কাজে লাগা। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো বিনেলোর কাছে গেল। কী করতে হবে ফিস্ ফিস্ করে বলল। দু'জন শুয়ে পড়ল। বিশ্রাম চাই।

রাত বাড়ল। শাঙ্কো উঠে পড়ল। বিনেলোও সজাগ ছিল। উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কো দরজার কাছে গেল। লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখল—একজন প্রহরী একটা কাঠের পাটাতনের ওপর বসে আছে। বোঝাই যাচ্ছে ঝিমোচ্ছে। অন্যজন দাঁড়িয়ে আছে।

শাঙ্কো সরে এলো। জানালার মত ফোকরটার একেবারে নিচে দাঁড়াল। তারপর পাথরের অল্প খাঁজে পা রাখল। তারপর উঁচু দিকে ছোট হাতলটায় একটা পা রেখেই এক ঝটকায় ফোকরটা ধরে ফেলল। নিচের দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—বিনেলো—এইভাবে ওপরে উঠে আসবে। এবার শাঙ্কো শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জানালামত ফোকরটায় উঠে বসল। হাতের কাছেই ঘরের ছাউনি। ও ছাউনি ঠেলল। বেশ ভারি। বোঝা গেল ওখানে পাথরের চাপা দেওয়া। তিনচারবার জোরে ঠেলে ঠেলে পাথর চাপা সরাল। মাথা ঢুকিয়ে দিল ঘাসপাতার ছাউনি দিয়ে। ছাউনি থেকে ওর মাথা বেরিয়ে এল। গাছের কাটা ডালের বুনানীতে হাত রাখল। পরে ওটা ধ'রে ছাউনির ওপর উঠে এল।

ওদিকে বিনোলো শাঙ্কোর দেখাদেখি নিজেও ছাউনির ওপরে উঠে এল। সাবধানে কোন শব্দ না করে দু'জনে ছাউনির ওপরে উঠে এল। শাঙ্কো ফিস্‌ফিস্ করে বলল—দাঁড়ানাটাকে আমি ধরব। বসে ঝিমোচ্ছে ওটাকে তুমি ধরবে। নিজের কোমরের ফেট্টি খুলতে খুলতে বলল—কোমরের ফেট্টি খুলে ওটা দিয়ে মুখ চেপে দরজার গরাদের সঙ্গে বেঁধে ফেলবে। মুখে যেন কোনরকম শব্দ না করতেপারে।

ফেট্টি খুলে হাতে নিয়ে দু'জনে নিচে তাকাল। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় সবই দেখা যাচ্ছিল। শাঙ্কো চাপাস্বরে বলল—ঝাঁপাও। দু'জনেই দু'জন প্রহরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জন প্রহরীর হাত থেকেই বর্শা ছিটকে গেল। দুজনেই মাটিতে পড়ে গেল। শাঙ্কো এক প্রহরীর মুখে ফেট্টির কাপড় চেপে ধরল। দেখাদেখি বিনোলাও তাই করল। ওরা চেঁচিয়ে উঠতে পারল না। শাঙ্কো ঐ প্রহরীকে ধরে এক হ্যাচকা টানে ঘরের দরজার কাছে নিয়ে এল। তার মুখ চেপে ফেট্টির কাপড়টা দরজার লোহার গরাদের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। প্রহরীটির গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুলো না। শাঙ্কোর দেখাদেখি বিনোলাও অন্য প্রহরীটিকে একইভাবে বাঁধল। প্রহরীটির মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বেরুতে লাগল। শাঙ্কো তার গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের এক চড় কষাল। গোঙানি বন্ধ হল।

শাঙ্কো দ্রুত প্রহরীটির কোমরে ঝোলানো চাবির গোছাটা খুলে নিল। চাপাস্বরে বলল—চাবিটা দেখাও। প্রহরীটি চাবিটি দেখিয়ে দিল। মুখে উঁ-উঁ শব্দ করল। শাঙ্কো চাপাস্বরে ধমক দিল—চোপ। শব্দ বন্ধ হলেও বুঝল শব্দ বন্ধ না করলে আবার চড় খেতে হবে।

শাঙ্কো ছুটে গিয়ে দরজার তালা খুলে ফেলল। চাপা স্বরে বলল—বেরিয়ে এসো সবাই। বন্ধুরা ছুটে এসে খোলা দরজার বাইরে চলে এল। রাজা পাকার্দো শুয়ে ছিল। ফ্রান্সিস তাঁর কাছে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—উঠে আসুন। দরজা খোলা। রাজা উঠে বসলেন। তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। ততক্ষণে সবাই বাইরে চলে এসেছে। এখন রাজা আর ফ্রান্সিস বেরিয়ে এলেই হয়।

ফ্রান্সিস রাজাকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে এল।

সময় নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলে উঠল—পাহাড়ের দিকে সবাই ছোটো—জলদি।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় চারদিকে দেখা যাচ্ছে। সবাই ছুটল। রাজা পাকার্দোও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সবাই বনভূমির কাছে চলে এল। বনভূমিতে ঢুকে পড়ল। পাহাড়ের ওপারেই রাজা আনোতারের ভিঙ্গার রাজত্ব। এখন রাজা আনোতার তো এখানকার রাজত্ব দখল করে এখানেই সৈন্যদের নিয়ে আছে। এখন তার রাজত্বে বোধহয় অল্প যোদ্ধাই আছে। কাজেই বিপদের সম্ভাবনা কম। ফ্রান্সিস বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এসব ভাবছিল। আরো ভাবছিল ওরা পালিয়েছে এটা রাজা আতোয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে জানতে পারবে। ওরা এই বনের দিকেই পালিয়েছে। তাও জানতে পারবে। নিশ্চয়ই ফ্রান্সিসদের খুঁজে বের করতে বনের মধ্যে তার যোদ্ধাদের পাঠাবে। ফ্রান্সিসদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ওরা নিরস্ত্র। ঐ যোদ্ধাদের মুখোমুখি হওয়া চলবে না। নিরস্ত্র অবস্থায় সবাইকে মরতে হবে। একমাত্র উপায়—আত্মগোপন করে থাকা। কিন্তু ও জানেনা পাহাড়ের ওপারে বনাঞ্চল আছে কিনা।

বনের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে সবাই হাঁপাচ্ছে তখন। কেউ বেশি হাঁপাচ্ছে কেউ কম। ছুটতে ছুটতে ফ্রান্সিস বিস্তানোকে জিজ্ঞেস করল—পাহাড়ের ওপারে তো রাজা আনোতারের রাজত্ব।

—হ্যাঁ। বিস্তানো ছুটতে ছুটতে বলল।

—ওপারে পাহাড়ের নিচে বনাঞ্চল আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। বিস্তানো বলল।

—পাহাড় পার হয়ে ওখানেই আমরা গা ঢাকা দেব। ফ্রান্সিস বলল।

পাহাড়ের নিচে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—পাহাড় পেরিয়ে ওপারে যাবো। ছোটো সবাই।



পাহাড়ের চড়াইয়ে উঠতে লাগল সবাই। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—যতটা সম্ভব গাছগাছালি ঝোপঝাড়ের আড়ালে থেকে ওঠো সবাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের ওপর উঠল সবাই। ফ্রান্সিস পেছন ফিরে তাকাল। দেখল দূরে হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে রাজা আনোতারের সৈন্যরা এই পাহাড়ের দিকেই আসছে।

এবার পাহাড় থেকে নামা শুরু হল। যতটা সম্ভব দ্রুত সবাই নামতে লাগল। রাজা পাকার্দো বয়স্ক মানুষ। আহত তিনি বেশ হাঁপাতে লাগলেন। ফ্রান্সিস তাঁকে মাঝে মাঝেই ধরছিল। সাহায্য করছিল তাঁকে নামতে।

পাহাড় থেকে নামল সবাই। কম বেশি সবাই হাঁপাচ্ছে তখন।

নিচে গভীর বনভূমি ফ্রান্সিস সবাইকে ডানদিকে গভীর বনের দিকে নিয়ে গেল। একটা বিরাট উঁচু গাছের নিচে সবাইকে দাঁড় করাল। বলল—এখানেই আশ্রয় নেব আমরা। এটাই হবে আমাদের গোপন আস্তানা। একটু ফাঁকা জায়গাটা। একটু ঘাসে ঢাকা জমি। কেউ কেউ ঘাসের ওপর বসে হাঁপাতে লাগল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। রাজা পাকার্দো ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লেন। খুব পরিশ্রান্ত। ফ্রান্সিস বলল—সবাই বিশ্রাম নাও। কেউ কোন শব্দ করো না। রাজা আনোতারের সৈন্যরা আমাদের খুঁজবে। তবে খুঁজে পাবে না। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে যা করবার করবো।

সবাই চুপ করে শুয়ে বসে। চারদিক নিস্তব্ধ শুধু গাছের ডালে পাতায় বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ।

হঠাৎ কিছু দূরে রাজা আনোতারের সৈন্যদের হাঁক ডাক শোনা গেল। তারপরই চারদিকে স্তব্ধতা।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সৈন্যদের হাঁক ডাক আরো দূরে শোনা গেল। বোঝা গেল হতাশ সৈন্যরা ফিরে যাচ্ছে। ভোর হল। ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে আছে। তখনও বনতলের অন্ধকার কাটে নি।

কিছুক্ষণ পরে আবছা আলো ছড়াল বনতলে।

তখন কম বেশি সবাই ক্ষুধার্ত। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস খাবারের ব্যবস্থা তো করতে হয়।

—হ্যাঁ। কিন্তু এখন নয়। দুপুরের খাবার জোগাড় করে যেতে হবে। এখন এই বনেই ফলমূল খুঁজতে হবে। সবাইকে বলো সেটা। হ্যারি উঠে দাঁড়াল। চাপা গলায় বলল ভাইসব কাছাকাছি ফলমূল খুঁজে পাও কিনা দেখো। তবে বেশিদূর যাবে না। গাছের ডাল ঝোপের গাছ ভেঙে ভেঙে যাবে, যাতে এখানে পথ চিনে ফিরে আসতে পারো। ভাইকিং বন্ধুরা উঠে দাঁড়াল। বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ফলমূল নিয়ে ফিরে এল। সবাইকে ফলমূল ভাগ করে দেওয়া হল। ফলমূল খেয়েই খিদে মেটাতে হল।

—ফ্রান্সিস দুপুরের খাবারের কী হবে? শাঙ্কো বলল।

—বনের ওপারেই তো রাজা আনোতারের ছেড়ে আসা রাজত্ব ভিঙ্গার। ওখানকার রাজবাড়িতে টুঁ দিতে হবে। বেশির ভাগ সৈন্যই এখন রাজা পাকার্তোর রাজত্বে। এখানে রাজবাড়িতে প্রহরীর সংখ্যাও বেশি থাকবে না। বিনা রক্তপাতে রাজবাড়ি থেকে খাবার চুরি করে আনতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে? প্রহরীদের নজর এড়িয়ে? শাঙ্কো বলল।

—পারতে হবে। বুদ্ধি করে। খাবার জোগাড় করতেই হবে যে ভাবে হোক। না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বো। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। হ্যারি বলল।

দুপুর হল। ফ্রান্সিস ঘাসের ওপর শুয়ে খাবার চুরির উপায় ভাবছিল। এবার উঠে দাঁড়াল। ডাকল—শাঙ্কো বিনেলো এসো। শাঙ্কো বিনোলা উঠে এল।

—চলো রাজবাড়ি থেকে খাবার চুরি করতে হবে। এছাড়া খাবার জোগাড় করার অন্য কোন উপায় নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ চলো। শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো বিনোলোক নিয়ে ফ্রান্সিস চলল। গাছগাছালির নিচে দিয়ে ঝোপঝাড় ঠেলে ভেঙে বনের মধ্যে দিয়ে তিনজনে চলল।

একসময় বনভূমি শেষ হল। বনের গাছের আড়াল থেকে দেখল বনভূমির খুব কাছেই বড়বাড়িটা। বোঝা গেল ওটা রাজাবাড়ি। রাজবাড়ি ছাড়িয়ে পাথরের বাড়িঘরদোর। রাজা আনোতারের প্রজাদের বসতি এলাকা। সামনে একটা ঘাসে ঢাকা মাঠমত। তারপরেই সৈন্যাবাস। লম্বাটানা বাড়ি। এদিকটা সৈন্যাবাসের পেছন দিক। পেছনের জানালাগুলো খোলা। সব দেখে ফ্রান্সিস বলল—একটা লম্বা গাছের ডাল ভেঙে আনো। বিনেলো বাঁ পাশে তাকাতেই একটা লম্বা গাছ পেল। ছোট ছোট ডালওয়ালা। ও ছুটে গিয়ে গাছটা টানতে লাগল। কিন্তু গাছটা টেনে তুলতে পারল না। আস্তে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। দুজনে মিলে কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দিতেই গাছটা উঠে এল। গাছটা ফ্রান্সিসের কাছে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস গাছের শেকড় থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলল। মাথার কাছে ছোট ডালটা ভাঙল। একটা আঁকশির মত হল। শাঙ্কো বলল—

—এই আঁকশি দিয়ে কি করবে?

—সৈন্যাবাসের জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখ। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখছি তো ফ্রান্সিস বলল।

—দেয়ালে আনোতারের সৈন্যদের পোশাক ঝুলছে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। কালোরঙের পোশাক বুকে হলুদ রঙ।

—আঁকশে দিয়ে তিনটে পোশাক টেনে আনবো। সেসব পোশাক পরে রাজবাড়ির রসুইঘরে থাকো। তারপর—। শাঙ্কো সোৎসাহে বলে উঠল—সাবাস ফ্রান্সিস।

—খুব সহজে কাঠের ডেকচিতে বড় থালায় খাবার নিয়ে চম্পট। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন কী করবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—লক্ষ্য কর—সৈন্যাবাসের জানালার কাছে পৌঁছতে হলে একটা ছোট মাঠমত পার হতে হবে। এই মাঠটা আমাকে হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে হবে। নইলে জানালা দিয়েই সৈন্যরা আমাদের দেখতে পাবে।

ফ্রান্সিস মাঠের লম্বা লম্বা ঘাসের ওপর হামা দিয়ে বসল। তারপর দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে একটা জানালার দিকে লক্ষ্য রেখে চলল ঐ জানালা দিয়েই দেয়ালে ঝোলানো পোশাক দেখা যাচ্ছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস জানালাটার কাছে পৌঁছল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ঘরটায় কারো সাড়া শব্দ নেই। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে আঁকশিটা ঢুকিয়ে দিল। সন্তর্পণে একটা ঝোলানো পোশাক টান দিয়ে নামল। সাবধানে পোশাকটা টেনে বাইরে নিয়ে এল। একইভাবে তিনটে পোশাক সাবধানে নিয়ে এল। পোশাক ফস্‌কে নিচে মেঝেয় পড়ে গেলে শব্দ হবে তাই খুব সাবধানে পোশাক তিনটে নিয়ে এল। তারপর পোশাকগুলো পিঠে রেখে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল। মাঠের ঘাসগুলো লম্বা হওয়ায় ফ্রান্সিসের শরীরের অনেকটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। এতে ফ্রান্সিসের সুবিধেই হল।

তিনজনে পোশাকগুলো নিয়ে বনের আড়ালে চলে গেল। তিনজনেই নিজেদের পোশাকের ওপর কালো পোশাক পরে নিল।

ওরা বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। চলল রাজবাড়ির দিকে।

রাজবাড়ির সদর দেউড়ির কাছে এসে দেখল মাত্র একজন পাহারাদার বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে। রাজা আনোতার এখানে নেই। কাজেই পাহারার কড়াকড়ি নেই। ফ্রান্সিসরা প্রহরীর সামনে দিয়েই রাজ বাড়ির আর এক পাশে চলে এল। ফ্রান্সিস দূরত্বটা হিসেব করে দেখল রাজবাড়ি থেকে বনভূমির দূরত্ব খুবই কম। এই দূরত্ব দ্রুত ছুটে পার হতে বেশি সময় লাগবে না।

একপাক রাজবাড়িটা ঘুরে এল। কিন্তু রসুই ঘরটা কোথায় বুঝে উঠতে পারল না। এবার বড় দেউড়ির সামনে এল। দেউড়ি দিয়ে রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। প্রহরীটি ওদের একবার দেখল শুধু কিছু বলল না।

রাজবাড়িতে ঢুকেই ডানদিকে মন্ত্রণাকক্ষ। বাঁ হাতি একটা গলিমত। ফ্রান্সিস বুঝল সোজা গেলে রাজসভা ঘর পড়বে। ও বাঁ দিকের গলিপথটা দিয়ে ঢুকে চলল। কিছুদূর গিয়ে গলিপথটা ডানদিকে চলে গেছে। সেই গলিপথে ঢুকতেই নাকে ঘিসলার গন্ধ লাগল।

ফ্রান্সিস হেসে মৃদুস্বরে বলল—রান্নাঘর সামনেই।

ডানহাতি একটা দরজা। তিনজনই রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। বিরাট উনুন জ্বলছে। তিনজন রাঁধুনি রান্না করছে। একজন রাঁধুনি ওদের দেখে বলল—যাও। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিবেশনকারী খাবার নিয়ে যাবে।

—আমাদের খুব তাড়া। রাজার হুকুম এক্ষুণি পেয়েই আমাদের পাহাড়ের ওপারের বাতারিয়ায় যেতে হবে।

—তাহলে পেছনের রসুইঘরে বসে খেয়ে নাও। আমরাই খেতে দেব। রাঁধুনি বলল।

—তাহলে তো ভালোই হয় ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা পাশের রসুইঘরে ঢুকল। দেখল দুটো বিরাট থালাভর্তি রুটির স্তূপ। একটা বড় কাঠের ডেকচিও রয়েছে। একজন রাঁধুনি এল। দেয়ালে আটকানো একটা লম্বা কাঠের পাটাতনে রান্না করা খাবার রাখা। রাঁধুনি একটা হাতা নিয়ে এসেছিল। পাটাতনের একপাশে রাখা লম্বা শুকনো পাতা নিয়ে পেতে দিল। রাঁধুনি দ্রুতহাতে চারটে করে রুটি পাতার ওপর রাখল। ফ্রান্সিস চারপাশে ভালো করে তাকিয়ে পেছন দিকে একটা হুড়কো লাগানো দরজা দেখল। বলল—একটু হাত ধোবো যে। রাঁধুনি জলের বিরাট জালাটা দেখিয়ে বলল—গ্লাসে করে জল নিয়ে এসো। ফ্রান্সিসরা কাঠের গ্লাসে জল নিয়ে এল। রাঁধুনি ততক্ষণে পেছনের দরজাটার হুড়কো খুলে দিয়েছে। বলল—এই দরজার বাইরে গিয়ে হাত ধুয়ে এসো। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে দরজার বাইরে গেল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল—হাত কুড়ি দূরে বন শুরু হয়েছে। হাতমুখ ধুতে ধুতে ও মৃদুস্বরে বলল—এই দরজা দিয়েই আমরা পালাবো। হাত বাড়ানো দূরত্বে বনের আড়াল পাবো।

রসুই ঘরে ফিরে এসে খেতে বসল। রাঁধুনি ততক্ষণে মাংসের ঝোলও পাতায় ঢেলে দিয়ে গেছে। ফ্রান্সিসরা গোগ্রাসে খেতে লাগল।

রাঁধুনি চলে গিয়েছিল। ফিরে এল। ফ্রান্সিস বলল—আর একদফা রুটি মাংস দাও। আমাদের ওতেই হবে। তোমাকে আর আসতে হবে না। রাঁধুনি আর একদফা খাবার দিয়ে চলে গেল। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল—আর দেরি নয়। দু'জনে দুটো রুটির থালা নাও। আমি মাংসের ডেকচিটা নিচ্ছি।

তিনজনে দ্রুত সব খাবার নিয়ে পেছনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস উঁকি দিয়ে দেখল রাজবাড়ির সামনের মাঠ ফাঁকা। মাঠে কোন সৈন্য নেই। চাপাস্বরে বলল—ছোটো—জঙ্গলের দিকে। তিনজন ছুটে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

তিনজনেই হাঁপাচ্ছে তখন। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলল তিনজন। একটু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে সেই বিরাট গাছটা দেখতে পেল। গাছের নিচে এল। খাবার নিয়ে তিনজনকে আসতে দেখে বন্ধুরা মৃদুস্বরে আনন্দধ্বনি তুলল—ও—হোহো।

সবাই ক্ষুধার্ত খাবারের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজা পাকার্দোও গেলেন। হেসে ফ্রান্সিস বললেন—তোমরা যে অক্ষত দেহে ফিরে আসতে পেরেছো এতেই আমি খুশি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ। সন্ধ্যা হয়ে এল।

ফ্রান্সিস ঘাসের ওপর শুয়ে ছিল। হ্যারি ওর কাছে এল। বলল ফ্রান্সিস—কী

করবে এখন? এখানে আত্মগোপন করে কতদিন থাকবে? প্রত্যেকদিন দু'বেলা খাবার জোগাড় করতে পারবে না।

—উঁহু। এভাবে থাকা চলবে না। আশ্রয় চাই, খাদ্য চাই। ভুলে গেলে চলবে না। মারিয়া বন্দিনীজীবন কাটাচ্ছে। তাকেও মুক্ত করতে হবে।

—সেই জন্যেই বলছিলাম যা করার তাড়াতাড়ি কর। হ্যারি বলল।

—শোন—রাজা আনোতারের এই রাজত্বে এখন বেশ কিছু সৈন্য আছে। রাজা পাকার্দোর রাজত্ব থেকে ওরা এখানে ফিরে এসেছে। লড়াই করে এই সৈন্যদের হারিয়ে এই ভিঙ্গার রাজত্ব দখল করতে হবে।

—কিন্তু আমাদের তো একটা তরোয়ালও নেই। হ্যারি বলল।

—যারা ফিরে এসেছে তারা তো তরোয়াল নিয়েই ফিরেছে। তরোয়ালি বর্শায় এখানকার অস্ত্রাগারে জমা রেখেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। তা রেখেছে। হ্যারি বলল।

—আমরা সেই অস্ত্রাগার লুঠ করবো। অস্ত্র নিয়ে ওদের আক্রমণ করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—অস্ত্রাগার লুঠ করতে পারবো? হ্যারি সংশয় প্রকাশ করলে।

—পারতেই হবে। আমার ছক ভাবা হয়ে গেছে। আজ রাতেই কাজে নামবো। নিরস্ত্র অবস্থায় এভাবে আত্মগোপন করে উপবাস করে পড়ে থাকা চলবে না। এই বনভূমি তো বিরাট এলাকা নিয়ে নয়। আজ হোক কাল হোক ওরা আমাদের ঠিক এই বনে খুঁজে বের করতে পারবে। তখন নিরস্ত্র অসহায় আমরা কেউ ওদের হাত থেকে বাঁচবো না। কাজেই আমাদেরই অস্ত্র জোগাড় করে আগে আক্রমণ করতে হবে ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আজ রাতেই কাজে নামাবে? হ্যারি জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। একটু গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—ভাইসব—রাতে খাওয়া জুটবে না। এটা জেনে নিজেদের তৈরি রাখো। রাতে কেউ ঘুমিয়ে পড়বে না। মান্যবর রাজা আপনিও ঘুমুবেন না। বেশ রাত হলে আমরা এখানে রাজা আনোতারের সৈন্যদের সৈন্যাবাসে আক্রমণ করবো।

—কিন্তু ফ্রান্সিস আমরা তো নিরস্ত্র। বিনেলা বলল।

লুঠ করবো। তারপর অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করবো। তখন ওরা ঘুমে অচেতন থাকবে। আমরা লাথি দিয়ে বন্ধ দরজা ভেঙে ঢুকবো। ওদের তৈরি হতে সময় দেব না। ঠিক এভাবেই আমরা ওদের বন্দী করবো। আমরা সব ছকের কথা বললাম। এটাকে কাজে পরিণত করার দায়িত্ব তোমাদের। আমার কথা শেষ। এবার তোমরা বিশ্রাম কর। ফ্রান্সিস বসে পড়ল। তারপর হ্যারিকে ডেকে বলল, হ্যারি রাজা পাকার্দোর দুজন দেহরক্ষীকে আমার কাছে নিয়ে এসো। হ্যারি চলে গেল। একটু পরেই দুজন দেহরক্ষীকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস ওদের জিজ্ঞেস

করল—রাজা জানি না। তবে রাজবাড়ির সঙ্গেই অস্ত্রাগার এটা জানি। আর একজন বলল—বোধহয় দক্ষিণ দিকের ঘরটাই অস্ত্রঘর। ঘরটা দখল করা যাবে। প্রহরী কেমন থাকে?

—অস্ত্রাগার বলে কথা। দু'চারজন প্রহরী তো থাকবেই একজন বলল।

—হ্যাঁ তা থাকবে—ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে। তোমরা তরোয়াল পাবে। লড়াইয়ের জন্যে তৈরি থেকো।

—বেশ। দেহরক্ষী দুজন চলে গেল।

রাতে তো পেট ভরে খাবার জুটবে না। দুপুরের যেটুকু খাবার বেঁচে ছিল তাই সবাই ভাগ করে খেল। তারপর শুয়ে পড়ল।

রাত একটু গভীর হতে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। একটু গলা চড়িয়ে বলল—সবাই তৈরি হও। চলো।

সবাই উঠে দাঁড়াল। লড়াই করতে যাচ্ছে এতেই ভাইকিংদের আনন্দ। শুয়ে বসে সময় কাটানো ওদের ধাঁতে সয় না।

বনের মধ্যে দিয়ে সবাই রাজবাড়ির দিকে চলল। বন শেষ হয়ে আসতে ছাড়া ছাড়া ছাড়া গাছের বন শুরু হল।

এখানে ওখানে ডালপালার ফাঁক দিয়ে ভাঙা চাঁদের আলো পড়েছে। আস্তে আস্তে সবাই বনের ধারে চলে এল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—থামো। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস বন থেকে বেরিয়ে এল। চাঁদের আলোয় দেখল রাজবাড়ির দক্ষিণ দিকে একটা ঘরের সামনে কালো হলুদ পোশাক পরা দুজন প্রহরী প্রহরারত। ফ্রান্সিস ভাবল—যাক দু'জন প্রহরী। পরাভব জানানো সহজ হবে। ও ফিরে এসে শাঙ্কো আর বিনেলোকে বলল—শাঙ্কো—ছোরা ছুঁড়ব। বিনেলো অন্যটাকে কবজা করবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সারতে হবে। কোনরকম শব্দ যেন না হয়।

তিনজনে বন থেকে বেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে প্রহরীদের কাছাকাছি চলে এল। শাঙ্কো হঠাৎ দাঁড়িয়ে জামার তলা থেকে ছোরা বের করে ছুঁড়ে মারল। ছোরাটা একজন প্রহরীর ডান কাঁধে বিঁধে গেল। সে তরোয়াল ফেলে দিয়ে কাঁধ চেপে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস এক লাফ এগিয়ে গিয়ে তরোয়ালটা তুলে নিল। অন্য প্রহরীটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। বিনেলো ততক্ষণে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সে এই অতর্কিত আক্রমণে টাল সামলাতে পারল না। মাটিতে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস তরোয়াল হাতে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। চাপাস্বরে বলল তরোয়াল ফেলে দাও। কোন শব্দ করবে না। প্রহরীটি বোকার মত তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস তাড়া দিল জলদি। প্রহরীটি উঠে বসে তরোয়ালটা ফেলে দিল। বিনেলো সঙ্গে সঙ্গে তরোয়ালটা তুলে নিল। ফ্রান্সিস তরোয়াল উঁচিয়ে বলল তোমরা শব্দ করলেই মরবে। আমরা অস্ত্রাগার লুঠ করবো। কেউ বাধা দিতে এলে মরবে। তারপর শাঙ্কোকে বলল—শাঙ্কো বন্ধুদের

ডাকো। বলবে সবাই যেন নিঃশব্দে আসে। রাজাকে অপেক্ষা করতে বলবে। উনি যেন না আসেন।

শাঙ্কো বনের দিকে চলে গেল। একটু পরেই বন্ধুরা আর রাজার দেহরক্ষীরা যতটা দ্রুত সম্ভব ছুটে এল। আহত প্রহরীটির কোমরে অস্ত্রাগারের দরজার তালার চাবি ঝুলছিল। ও কাঁধ থেকে ছোরাটা খুলে মাটিতে ফেলে দিল। শাঙ্কো দ্রুত ছোরাটা তুলে নিল। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে ওর কোমর থেকে চাবিটা নিয়ে নিল। তারপর অস্ত্রাগারের তালা খুলতে গেল। ফ্রান্সিস আর বিনেলো খোলা তরোয়াল হাতে প্রহরী দু'জনের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

শাঙ্কো তালা খুলে ফেলল। বন্ধুরা দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। স্তূপ করে রাখা তরোয়াল বর্শার থেকে তরোয়াল-বর্শা তুলে নিল। তারপর বাইরে চলে এল।

ফ্রান্সিস প্রহরী দুজনকে বলল—অস্ত্রঘরে ঢোকো। প্রহরী দুজনকে অস্ত্রঘরে ঢোকানো হল। শাঙ্কো তালা লাগিয়ে দিল।

এবার ফ্রান্সিস বলল—সৈন্যবাসে চলো। লাথি মেরে দরজা ভেঙে ঢোকো। সৈন্যদের হাতে অস্ত্র নেই। সবকটাকে বন্দী কর। কেউ যেন পালাতে না পারে।

সবাই দ্রুত সৈন্যবাসের দিকে ছুটল। বারান্দা পার হয়ে ঘরগুলোর দরজায় লাথি মারতে লাগল। দরজা ভেঙে যেতে লাগল। ঘুমন্ত সৈন্যরা উঠে দেখল উদ্যত তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে সব সৈন্যকে সামনের মাঠে নিয়ে আসা হল। মাঠে বসিয়ে দেওয়া হল।

শাঙ্কো ততক্ষণে সৈন্যবাস থেকে লম্বা দড়ি নিয়ে এল। ছোরা দিয়ে দড়ি টুকরো টুকরো কাটল। সৈন্যদের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দেওয়া হল।

তখন ভোর হয়ে গেছে। সকালের রোদ পড়েছে বনভূমিতে, রাজবাড়িতে মাঠে।

রাজা পাকার্দো ফ্রান্সিসের কাছে এলেন। বললেন—এদের বন্দী করলে। কিন্তু আমাদের বিপদ এখনও কাটে নি।

—তা ঠিক। ওরা আমাদের আক্রমণ করবেই। তবে সংখ্যায় ওরা বেশি হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

একটু বেলা হল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডেকে বলল—রাজবাড়িতে যাও? রাঁধুনিদের বলো সবাইকে সকালের খাবার দিতে। গতরাতে তো আমরা আধ পেটাও খাইনি।

শাঙ্কো রাজবাড়ির দিকে চলে গেল। রাঁধুনীকে বলে এল।

কিছুক্ষণ পরে রাঁধুনিরা আর দু'তিনজনকে নিয়ে এল। সবার হাতে কাঠের হাঁড়ি কাঠের থালায় রুটি। বন্দী সৈন্যদের সঙ্গে ফ্রান্সিসরাও খেতে বসে পড়ল। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা গোগ্রাসে খেতে লাগল। রাজা পাকার্দো অবশ্য ফ্রান্সিসদের সঙ্গে খেলেন না। উনি রাজবাড়িতে চলে গেলেন।

সকালের সবজির ঝোল রুটি খাওয়া শেষ হল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস আমাদের কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না।

—সেটা ভেবেছি। রাজা আনোতারের সঙ্গেও কিছু সৈন্য রয়েছে। তারা নিশ্চয়ই এখানে আসবে। তাদের সঙ্গে শেষ লড়াইটা তো লড়তে হবে। এখন অপেক্ষা—কখন ওরা আক্রমণ করে।

ফ্রান্সিস এবার গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—শেষ লড়াইটা এখনও বাকি। রাজা আনোতারের বাকি সৈন্যরা আমাদের নিশ্চয়ই আক্রমণ করবে। সবাই তৈরি থেকো। কেউ তরোয়াল বর্শা হাত ছাড়া করবে না। আক্রান্ত হলে যাতে সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়াতে পারো।

সবাই বুঝল বিপদ এখনও কাটেনি। লড়াই এখনও শেষ হয়নি।

বন্ধুরা কয়েকজন বন্দীদের পাহারায় রইল। বাকিরা সৈন্যাবাসের খালি ঘরগুলোয় গিয়ে বসে রইল। সবাই বিশ্রাম করতে লাগল। বন্দীরা আশায় রইল ওদের রাজা আনোতার নিশ্চয়ই ওদের সাহায্য করতে সৈন্য নিয়ে আসবে। সময় বয়ে যেতে লাগল।

তখন সবে দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছে। বনের দিকে হৈহল্লা শোনা গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—তৈরি হও। রাজা আনোতার সৈন্যদের নিয়ে আসছে।

একটু পরেই বনের আড়াল থেকে রাজা আনোতার বেরিয়ে এল। হাতে খোলা তরোয়াল। পেছনে কুড়ি পঁচিশ জন যোদ্ধা। সবার হাতেই খোলা তরোয়াল। রাজা মাঠের দিকে তাকিয়ে তার বন্দী যোদ্ধাদের দেখে থমকে দাঁড়াল। রাজা ধরে নিয়েছিল এখানকার যোদ্ধাদের সাহায্য পাবে। কিন্তু তাকে হতাশ হতে হল। রাজা আনোতার ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না কী করবে। সে তার সৈন্যদের থামতে ইঙ্গিত করল।

ফ্রান্সিস রাজা আনোতারের দিকে এগিয়ে গেল। গলা চড়িয়ে বলল—দেখতেই পাচ্ছেন আমরা বন্দী নই। হাতে অস্ত্রও আছে। লড়াই হলে আপনারা পরাজিত হবেন। ভেবে দেখুন—কী করবেন। বন্দীদশা মেনে নেবেন না লড়াই করবেন?

—লড়াই করে তোমাদের এদেশ থেকে তাড়াবো। রাজা আনোতার যেন গর্জে উঠল।

—ঠিক আছে। লড়াইটা হোক। ফ্রান্সিস তরোয়াল উঁচিয়ে চিৎকার করে বলল—ভাইসব আক্রমণ করো। ভাইকিং বন্ধুরা আর দেহরক্ষীরা তরোয়াল বর্শা হাতে ছুটে গিয়ে রাজা আনোতারের সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মাঠের ধারে শুরু হল লড়াই। তরোয়াল বর্শার ঠোকাঠুকির শব্দ আর্তস্বর চিৎকার গোঙানির শব্দ উঠল।

ফ্রান্সিস বিপক্ষের কয়েকজন যোদ্ধাকে আহত করে রাজা আনোতারের সামনে এসে দাঁড়াল। রাজা আনোতার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর ফ্রান্সিসকে আক্রমণ করল। ফ্রান্সিস এদিক ওদিক সরে গিয়ে রাজাকে ক্লান্ত করতে লাগল। রাজা ফ্রান্সিসের ফন্দী ঠিক বুঝতে পারল না। ঘুরে ঘুরে তরোয়াল চালাতে লাগল। একসময়ে তারোয়াল মাটিতে ঠেকিয়ে হাঁফাতে লাগল। ফ্রান্সিস তেমন ক্লান্ত হয়নি। ও এই সুযোগ ছাড়ল না। দ্রুত পাক খেয়ে রাজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজা ফ্রান্সিসের তরোয়ালের মার ঠেকাতে ঠেকাতে পিছু হটতে লাগল। রাজা আনোতার মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে। ফ্রান্সিস দু-তিন বার দ্রুত তরোয়াল চালিয়ে রাজার বুকের ওপর দিয়ে তরোয়াল সজোরে টেনে নিলে। রাজার বুকের কাছে পোশাক দু ফালি হয়ে গেল। কাটা জায়গা থেকে রক্ত বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসও হাঁপাচ্ছে তখন। রাজা ফ্রান্সিসের নিপুণ হাতে তরোয়াল চালানো দেখে বুঝল এবার এর হাত থেকে রক্ষা নেই। ফ্রান্সিস হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—আপনার সৈন্যদের লড়াই থামাতে বলুন। অযথা প্রাণহানি আমরা চাই না। এর পরেও লড়াই চালালে আপনারা কেউ বেঁচে থাকবেন না।

রাজাকে এভাবে আহত হতে দেখে তার সৈন্যরা লড়াইয়ের উদ্যম হারিয়ে ফেলল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ভাইকিংদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে তাদের অনেকেই মারা গেছে নয়তো মাটিতে শুয়ে কাতরাচ্ছে। ওরা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—ভাইসব আর হত্যা নয়। লড়াই বন্ধ কর। ভাইকিংরা লড়াই থামিয়ে একই দূরে সরে গেল। কিন্তু তরোয়াল নামাল না কেউ। দেখতে লাগল রাজা আনোতার কী করে।

রাজা আনোতার হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল। তার পোশাক রক্তে ভিজে উঠেছে। যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে উঠছে। ডান হাত তুলে কাতরস্বরে বলে উঠল—লড়াই নয়। রাজার সৈন্যরা দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—তোমরা অস্ত্র ত্যাগ কর। আপত্তি করলে মরতে হবে।

রাজা আনোতারের সৈন্যরা তরোয়াল মাটিতে ফেলে দিল। শাঙ্কো আর সিনাত্রা এগিয়ে গিয়ে তরোয়ালগুলো তুলে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস উচ্চস্বরে বলল—সবার হাত বেঁধে দাও। বিনেলা ছুটে গিয়ে দড়ি নিয়ে এল। দড়ি টুকরো করে রাজা আনোতারের সব সৈন্যের হাত বেঁধে দেওয়া হল। তারপর আগের বন্দীদের সঙ্গে বসিয়ে রাখা হল। রাজা আনোতারের হাত বাঁধতে গেলে ফ্রান্সিস হাত নেড়ে মানা করল।

তখনই দেখা গেল রাজা পার্কার্দো এইদিকে আসছেন। উনি ফ্রান্সিসের কাছে এলেন। বললেন—তোমার জন্যেই আমি মহা বিপদ থেকে উদ্ধার পেলাম। তোমার কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।

—রাজা আনোতার তার সৈন্যসহ পরাজয় স্বীকার করেছে। আমরাও ওদের বন্দী করে রেখেছি। এবার আপনি এদের নিয়ে যা করবার করুন। আমি বলি—

রাজা আনোতারসহ সব সৈন্যকে এদেশ থেকে তাড়ান। এই দেশেরও রাজা হোন আপনি। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তা হয় না। এই দেশ রাজা আনোতারেরই থাক। সবাইকে মুক্ত করে দাও। আমি আমার দেশে চলে যাবো। রাজা পাতার্দো বললেন।

—বেশ। আপনি যা চান। আমি রাজা আনোতারের সঙ্গে কথা বলছি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস রাজা আনেতারের কাছে এল। বলল—

—রাজা পাকার্কো চান আপনার রাজত্ব আপনারই থাকুক। উনি নিজের রাজ্যে চলে যাবেন। আমরাও আমাদের জাহাজে ফিরে যাবো। কিন্তু আপনাদের মুক্তি দেবার একটা শর্ত আপনাকে মানতে হবে।

—কী শর্ত? রাজা আনোতার বলল।

—আপনি ভবিষ্যতে কক্ষণো রাজা পাকার্দোর রাজত্ব আর আক্রমণ করবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

—ভবিষ্যতের কথা—কী করে বলি। রাজা আনোতার বলল।

—তাহলে আপনাদের সবাইকে কয়েক ঘরে বন্দী করে আমরা কয়েদঘরের দরজা পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ করে চলে যাবো। অনাহারে তৃষ্ণায় কয়েকদিনের মধ্যেই আপনারা সবাই মারা যাবেন। ভেবে দেখুন—শর্ত মানবেন না অবধারিত মৃত্যু মেনে নেবেন? ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আনোতার একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—ঠিক আছে। তোমার শর্তই মেনে নিলাম।

—এবার বৈদ্যকে ডেকে চিকিৎসা করান। ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল। রাজা একবার ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। কিছু বলল না।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডাকল। শাঙ্কো কাছে এলে বলল—সবাইকে মুক্ত করে দাও। রাজা আনোয়ারের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।

শাঙ্কো আর বিনেলা গিয়ে বন্দীদের হাতে বাঁধা দড়ি কেটে দিতে লাগল। বন্দীরা মুক্ত হয়ে সৈন্যাবাসে চলে গেল।

ফ্রান্সিস রাজা পাকার্দোর কাছে এল। বলল—এখন কী করবেন?

—আমি আমার রাজত্বে ফিরে যাবো। এখানে এক মুহূর্তও থাকবো না। রাজা বললেন।

—বেশ। আমরাও আপনার সঙ্গে ফিরে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—কেউ অস্ত্র ত্যাগ করবে না। অস্ত্র হাতেই ফিরবো আমরা। সবাই তৈরি হও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই রাজা পাকার্দোর কাছে এসে দাঁড়াল। রাজা পাকার্দো বনভূমির দিকে চললেন। পেছনে তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসরা।

বনে ঢুকল সবাই। বিকেল হয়ে এসেছে। বনতল বেশ অন্ধকার। গাছগাছালির নিচে দিয়ে বোনঝাড় পার হয়ে সবাই পাহাড়টার দিকে চলল।

পাহাড়ের নিচে এল সবাই। তারপর চড়াই বেয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে এল। পাহাড় থেকে একে একে নেমে আবার বনভূমিতে ঢুকল। বনভূমি পার হয়ে যখন রাজার পাকার্দোর রাজবাড়ির সামনে এল তখন বেশ রাত। রাজা পাকার্দো রাজবাড়িতে ঢুকলেন। তাঁর দেহরক্ষীরাও তাঁর সঙ্গে গেল।

রাতের খাবার খাওয়া হয়নি। সবাই ক্ষুধার্ত।

শাঙ্কো রাজবাড়িতে ঢুকে রান্নাঘরে গেল। রাঁধুনিরা তখনও মেঝেয় বিছানা পেতে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। শাঙ্কো ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তাদের ঘুম ভাঙাল। বলল—রাজার সঙ্গে আমরা ফিরে এসেছি। এখনও রাতের খাওয়া জোটেনি। শিগগির যা পারো রেঁধে দাও। অগত্যা ঘুম ভেঙে রাঁধুনিদের উঠতে হল। ওরা রান্না চাপাল।

ফ্রান্সিসরা সৈন্যাবাসের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সবাই বেশ ক্লান্ত। শুয়ে পড়ল কেউ কেউ। বাকিরা বসে। কখন রান্না হয়।

তখনই মারিয়া ছুটতে ছুটতে এল। ফ্রান্সিসদের কাছে এল। ফ্রান্সিসকে বলল—তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি তো?

—না-না। শুধু দুজন বন্ধু আহত হয়েছে। আজ তো রাত হয়ে গেছে। কালকে বৈদ্য ডেকে চিকিৎসা করাব।

—তাহলে কাল খাওয়া দাওয়া সেরে চলো জাহাজে ফিরে যাই। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—অত তাড়া কীসের? দু' একটা দিন থাকি না।

—তার মানে কোন গুপ্তধনের খোঁজ করবে। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। ঠিক ধরেছো। একটু ধৈর্য ধরো। আর কটা দিন। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—গুপ্তধনের ভূত যখন তোমার মাথায় ঢুকেছে তখন তোমাকে আটকাবে কে। মারিয়া বলল।

—রাজবাড়িতে তো আরামেই আছো। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—তা আছি। তবু দেশে ফিরে যাওয়া—মারিয়া আর কিছু বলল না।

—ঠিক আছে। মাত্র তো কয়েকটা দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—আমিও তোমার সঙ্গে গুপ্তধন খুঁজতে যাবো। মারিয়া বলল।

—বেশ। যেও। রাতের খাবার খেয়েছো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। মারিয়া বলল।

—তাহলে এখন ঘুমুতে যাও। কাল সকালে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। মারিয়া উঠে দাঁড়াল। তারপর রাজবাড়িতে ফিরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে রাঁধুনিরা খাবর টাকর নিয়ে এলো। ফ্রান্সিসরা পাতা পেতে খেতে বসল। গরম গরম মাংসের ঝোল রুটি। ক্ষুধার্ত সবাই খেতে লাগল। খেতে খেতে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস তাহলে দিন কয়েক এখানে থাকবে?

—হ্যাঁ। শুনেছো তো—এখানকার মন্ত্রীমশাই কিছু ধনসম্পদ গোপনে কোথাও রেখে গেছেন। সেসব উদ্ধার করবো।

—কিছু সূত্র পেলে? হ্যারি প্রশ্ন করল।

—এখনও তেমন দরকারি সূত্র কিছু পাইনি। কালকে সকাল থেকে লাগতে হবে। এখন বিস্তানোকে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ তো বিস্তানো আমাদের সঙ্গেই খাচ্ছে। হ্যারি বিস্তানোকে দেখিয়ে বলল। ফ্রান্সিস বিস্তানোর দিকে তাকিয়ে বলল—বিস্তানো খাওয়া সেরে একবার আমার কাছে এসো। খেতে খেতে বিস্তানো মাথা কাত করল।

খাওয়া শেষ করে বিস্তানো ফ্রান্সিসের কাছে এল।

—কী ব্যাপার বলো তো? ও জানতে চাইল।

—তোমাদের মন্ত্রীমশাই এক ধনভাণ্ডার এই রাজ্যেই কোথাও গোপনে রেখে গেছেন যার খোঁজ রাজা পাকার্দো বা রানি কেউ রাখেন না। হ্যারি বললো।

—হ্যাঁ। তবে রাজা পাকার্দো সেই ধনভাণ্ডার খোঁজার কোন চেষ্টাই করেননি। এই রাজা পাকার্দো এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ। বিস্তানো বলল।

—যাক গে। আমি সেই ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা আনোতারও অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কোন হদিশই করতে পারেনি। বিস্তানো বলল।

—রাজা আনোর্তোর মাথা মোটা লোক। ওর বুদ্ধিতে কুলোয় নি। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি পারবে? বিস্তানো বলল।

—চেষ্টা তো করি। যাকগে তুমি রাজা পাকার্দোর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসো—আমরা রাজবাড়ির সব জায়গা খুঁজবো।

—বেশ। আমি রাজার অনুমতি নিতে যাচ্ছি। বিস্তানো বলল।

বিস্তানো চলে গেল। তখনই।

পরদিন সকালে মারিয়া এল। বলল—সকালে গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজতে বেরুবে বলেছিলে।

—হ্যাঁ যাবো। আমরা রাজবাড়ির অন্দরমহলে যাবো। বিস্তানো রাজার অনুমতি নিয়ে এসেছে।

মারিয়া আর হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস চলল। যেতে যেতে মারিয়াকে বলল—রানি আর অন্দরমহলের স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে জানবে অন্দরমহলের কোথাও গুপ্ত গর্ভঘর আছে কিনা। অথবা অব্যবহার্য কোন ঘরটর আছে কি না।

—আচ্ছা। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল।

—ফ্রান্সিস! ডাক শুনে ফ্রান্সিস পিছু ফিরে তাকাল। দেখল বিস্তানো আসছে। বিস্তানো এগিয়ে এসে বলল—আমি তোমাদের সঙ্গে গেলে সব দেখতে টেখতে তোমাদের সুবিধে হবে।

—বেশ। চলো। ফ্রান্সিস বলল।

রাজবাড়িতে ঢুকল সবাই। অন্দরমহলের দরজায় দাঁড়ানো প্রহরীকে হ্যারি বলল—রানিমাকে খবর দাও—আমরা বিদেশিরা এসেছি। প্রহরী চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বলল—আপনারা আসুন।

ফ্রান্সিসরা অন্দরমহলে ঢুকল। খুব দামি আসবাবে অন্দরমহল সজ্জিত নয়। তবে যা কিছু আছে সেসব খুব সাজানো গোছানো। সুন্দর রুচির পরিচায়ক। শয়ন কক্ষগুলো দাসীদের ঘর ছক্কাপাঞ্জা খেলার ঘর—সব দেখল ফ্রান্সিসরা। ফ্রান্সিস বিশেষ করে পাথরের পাটা দিয়ে তৈরি দেয়ালগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। তখনই দেখল রাজার শয়নকক্ষের দেয়ালের একটা জায়গায় পরপর তিনটে পেরেক পোঁতা। পেরেকগুলোর নিচে আব্‌ছা চৌকোনো দাগ। ফ্রান্সিস বুঝল এখানে কিছু টাঙানো ছিল। এখন নেই।

জায়গাটা ভালো করে দেখতে দেখতে ফ্রান্সিস বলল—

—বিস্তানো—এখানে এই তিনটে জায়গায় নিশ্চয়ই কিছু ছিল।

—ঠিকই ধরেছো। এখানে তিনটে ছবি টাঙানো ছিল। বিস্তানো বলল।

—কী ছবি? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—মন্ত্রীমশাইয়ের আঁকা তিনটে ছবি। বিস্তানো বলল।

—কী আঁকা ছিল সেই ছবিগুলোয়? ফ্রান্সিস বলল।

—মন্ত্রীমশাই যেমন আঁকতেন। বন-জঙ্গল, পাহাড় ঝর্ণা—এসব। বিস্তানো বলল।

—সেই ছবিগুলো এখন কোথায়? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—সব ছবি মালখানা ঘরে। আগের রাজা আনোতাব সব ছবি বস্তাবন্দী করে মালখানা ঘরে রেখে দিয়েছে। বিস্তানো বলল।

—সেই মালখানা ঘর কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

—ডানদিকে। শেষ ঘরটা। বিস্তানো বলল।

—চলো। ঐ ঘরটা দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে মশাল লাগবে। ঘুপচি ঘর। আমি প্রহরীদের কাছ থেকে মশাল জ্বালিয়ে আনছি। বিস্তানো বলল।

—তাই আনো। ফ্রান্সিস বলল। বিস্তানো মশাল আনতে চলে গেল। একটু পরেই দুটো জ্বলন্ত মশাল নিয়ে এল। ফ্রান্সিসকে একটা মশাল দিল।

সবাই ডানদিকে চলল। বেশ কিছুটা যেতে দেখা গেল ডানদিকে একটা ঘর। বেশ বড় ঘর। পাথরের দরজা ভেজানো। ফ্রান্সিস ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলল। ভেতরে ঢুকল সবাই। বাইরে থেকে ঘরটা যতটা বড় মনে হয়েছিল ভেতরে ঢুকে দেখা গেল ঘরটা তার চেয়েও বড়। মশালের আলোয় দেখা গেল ভাঙা আসবাবপত্র ভাঙা তরোয়াল বর্শা মাকড়শার জাল। একটা নাক চাপা গন্ধ।

একপাশে দেখা গেল কাপড়ের বস্তা রাখা। বিস্তানো বলল—এই বস্তাগুলোয় বোধহয় ছবিগুলো রাখা হয়েছে।

ফ্রান্সিস হাতেধরা মশালটা হ্যারির হাতে দিয়ে বলল—বস্তার কাছে মশালটা ধরো। ফ্রান্সিস বস্তাগুলোর কাছে এল। মশালের আলোয় দেখল বস্তুগুলোর মুখ বাঁধা নেই। ফ্রান্সিস টেনে টেনে ছবিগুলো বের করতে লাগল। গুণে দেখল ছটা ছবি আছে। ফ্রান্সিস বলল—বিস্তানো মন্ত্রীমশাইর সব ছবিই কি এখানে আছে?

—হ্যাঁ। এই রাজবাড়িতে ছিল তিনটে ছবি। বাকি তিনটে ছিল মন্ত্রীমশাইর বাড়িতে। একটা ছবিই তিনি বেশিদিন ধরে আঁকতেন। তাই ছবির সংখ্যা বেশি নয়। বিস্তানো বলল।

এবার ফ্রান্সিস একটা ছবি বের করল। চামড়া মেশানো কাগজের ওপর ছবিগুলো আঁকা। চারপাশ কাঠের টুকরো দিয়ে বাঁধানো। ফ্রান্সিস ছবিটা ভালোভাবে দেখল। সত্যিই—গাছ লতাপাতা ফুল আর পাহাড় আঁকা। ফ্রান্সিস সব ছবিগুলোই একে একে দেখল। একটা ছবিতে ঝর্ণা আঁকা আছে। দুটো ছবিতে বনের মাথায় পাখি উড়ছে এরকম আছে। ফ্রান্সিস ছবিগুলো আবার দেখল। নিসর্গ চিত্র। এর মধ্যে কোন সূত্র পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। মনের আনন্দে আঁকা এক শিল্পীর ছবি।

সবাই ছবিগুলো দেখল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে বলল—মারিয়া তুমি তো ছবি বোঝ। তোমার কাছে কেমন লাগছে ছবিগুলো।

—বেশ উঁচু মানের ছবি। মন্ত্রীমশাই নিঃসন্দেহে একজন যথার্থ শিল্পী ছিলেন। ছবিগুলোতে খুব বেশি রঙ ব্যবহার করা হয়নি। শুধু সবুজ নীল আর লাল। পাহাড়ের মাথায় সূর্যাস্তর লাল সূর্য আর মেঘ আঁকা হয়েছে। অন্য কোন ছবিতে লাল রঙ ব্যবহার করা হয় নি। কিন্তু আমি বলছি এই রঙ্গুলো উনি পেলেন কোথায়?

বিস্তানো বলল—গাছ-গাছালির রস সবুজ পাথর ফলের রস এসব থেকেই উনি রঙ তৈরি করে নিতেন। এই কাজে কখনো সখনো মন্ত্রী মশাইকে আমিও সাহায্য করেছি।

—হুঁ—ফ্রান্সিস বলল—ছবিগুলো নিয়ে চলো। পরে ভালোভাবে দেখতে হবে।

সবাই মালখানা ঘর থেকে ছবিগুলো নিয়ে বেরিয়ে এল। মশাল নিভিয়ে ফেলা হল।

বেরিয়ে আসার আগে ফ্রান্সিস রাজার শয়নকক্ষে ঢুকল। দেখল রাজা একটা চামড়া মেশানো লম্বা কাগজ পড়ছেন। ফ্রান্সিস বলল—ভেতরে আসবো? রাজা কাগজ রেখে উঠে বসলেন। বললেন—এসো এসো। ফ্রান্সিস রাজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল—মাননীয় রাজা—আপনার এই ঘরের দেয়ালে তিনটে চতুষ্কোণ ছাপ দেখলাম। কী ছিল ঐ তিনটে জায়গায়?

—মন্ত্রীমশাইয়ের আঁকা তিনটে ছবি পেরেকে ঝোলানো ছিল। অনেকদিন ছিল। তাই পাথরের দেয়ালে ছাপমত পড়ে গেছে। রাজা বললেন।

—আমরা মালখানা ঘর থেকে বস্তাবন্দী করে রাখা ছবিগুলো নিয়ে এসেছি। অনুরোধ—কোন তিনটে ছবি টাঙানো ছিল যদি দয়া করে দেখিয়ে দেন। কথাটা বলে ফ্রান্সিস ছবিগুলো তুলে তুলে রাজাকে দেখাতে লাগল। রাজা তিনটে ছবি দেখালেন।

—ঠিক এই তিনটে ছবিই? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। তিনরাত তো ছবিগুলো দেখতাম। ভুল হবে কী করে। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস বিত্তানোকে বলল—ছবি তিনটে যেখানে ঝোলানো ছিল সেভাবে ঝুলিয়ে দাও। বিত্তানো ছবি তিনটে নিয়ে পেরেকে ঝুলিয়ে দিল। ফ্রান্সিস দেখল—একটা ছবিতে শুধু গাছপালা ফুল। অন্যটায় একটা ঝর্ণা আঁকা চারপাশে গাছপালা ফুল। অন্যটায় পাহাড়ের পেছনে লাল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গাছাপালা ফুল।

—তাহলে বাকি ছবিগুলো মন্ত্রীমশাইয়ের বাড়িতে ছিল। তাই না বিত্তানো?

—হ্যাঁ। মন্ত্রীমশাইয়ের বাড়িতে ঐ তিনটে ছবি আমি দেখেছি অনেকদিন। ফ্রান্সিস মনোযোগ দিয়ে ছবিগুলো দেখতে লাগল। ছবিগুলোর রঙ খুব উজ্জ্বল নয়। কিন্তু রঙগুলো বেশ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। রঙগুলো অনুজ্জ্বল হওয়ায় কেমন যেন স্বপ্নে দেখা গাছ লতাপাতা ফুল পাহাড় মনে হচ্ছে।

—ম্যান্যবর রাজা—আমরা তাহলে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

—এসো। রাজা বললেন। তারপর কাগজটা পড়তে লাগলেন।

ফ্রান্সিরা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। সৈন্যাবাসের দিকে আসতে আসতে হ্যারি বলল—এবার কী করবে?

—দুপুরে খেয়েদেয়ে বনভূমি পাহাড়ের দিকে যাবো। মন্ত্রীমশাই কোন কোন জায়গার ছবি এঁকেছিলেন সেটা মেলাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে বনপাহাড় এলাকায় যাবে? বিত্তানো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে। ছবির সঙ্গে ঐ এলাকা মেলাবো। তুমি সঙ্গে থাকলে সুবিধে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমিও যাবো। মারিয়া বলল।

—নিশ্চয়ই যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া সারল ফ্রান্সিসরা। বিত্তানো আর মারিয়া এল। ফ্রান্সিসরা চলল বনভূমি আর পাহাড়ের দিকে।

বনের মধ্যে ঢুকল সবাই। বনতলে অন্ধকার। গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলল সবাই।

একটা অল্প ফাঁকা জায়গায় এল সবাই। সামনের দিকে তাকিয়ে বিত্তানো বলল—এখানে বসে মন্ত্রীমশাই ছবি এঁকেছিলেন। ফ্রান্সিস ভালো করে তাকিয়ে

দেখল সমানে—গাছগাছালি লতাপাতা। গাছে গাছে জড়ানো লতাগাছগুলোয় সুন্দর ঘন নীল রঙের ফুল ফুটে আছে। ফ্রান্সিস চিন্তা করে দেখল এমনি গাছলতার ফুল মন্ত্রীমশাই এঁকেছেন। বিত্তানো এগিয়ে চলল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। একটা খাদের কাছে এল। খাদের ধারে এসে বিত্তানো বলল—এখানে বসেও মন্ত্রীমশাই ছবি এঁকেছেন। ফ্রান্সিস সামনের দিকে বেশ মনোযোগের সঙ্গে তাকাল। দেখল গাছগাছালির পেছনে পাহাড়ের মাথাটা দেখা যাচ্ছে। গাছগুলো হলুদ ফুলে ফুলে ছাওয়া। ফ্রান্সিস চিন্তা করল মন্ত্রীমশাইয়ের একটা ছবির কথা। বুঝল এমনি দৃশ্যই দেখেছে একটা ছবিতে।

আবার চলল সবাই। তখনই জলে ছড়িয়ে পড়ার মৃদু শব্দ শুনল। বেশ কিছুটা এগোতেই দেখল একটা ঝর্ণা। কালচে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ঝর্ণার জল গড়িয়ে নামছে। এখন জলের শব্দ স্পষ্ট। ঝর্ণার দু'ধারে ফার্ন গাছের ঝোপ। ফ্রান্সিসের মনে পড়ল ঝর্ণা আঁকা ছবিটা। এখানেও বড়বড় গাছ রয়েছে। তবে ফুল নেই কোথাও। দূরে পাহাড়ের মাথাটা অনেক বড় দেখাচ্ছে। পাহাড়ের মাথার দিকে সূর্য। সূর্য অস্তগামী। এই ছবিটাও ফ্রান্সিসের মনে পড়ল।

বন শেষ। তারপরেই কালচে পাথরের পাহাড় শুরু। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—এদিকে আর গাছগাছালি নেই।

—ঠিকই ধরেছো—বিত্তানো হেসে বলল—শুধু পাহাড় মন্ত্রীমশাই কখনও আঁকেন নি। শুধু গাছপালা ঝর্না ফুল এসব এঁকেছেন। তবে পাহাড়ের দিকে বসে এদিকে তাকিয়ে বনের ছবিও এঁকেছিলেন।

—চলো। দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা বিত্তানোর পেছনে পেছনে চলল। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে বিত্তানো চলল। এক জায়গায় এসে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। কিছুটা উঠতেই দেখা গেল পাথরের একটা বড় চাঁই। অঙ্গুল আঙ্গুল দিয়ে চাঁইটা দেখিয়ে বিত্তানো বলল—ঐ চাঁইটার ওপর উঠতে হবে।

—হ্যারি—তোমরা থাকো। আমি উঠছি। ফ্রান্সিস বলল। ফ্রান্সিস পাথরের চাঁইয়ের খাঁজ ধরে ধরে উঠতে লাগল। বিত্তানো কিন্তু উঠল না। এটা দেখে মারিয়া বলল—তুমি উঠলে না?

—আগে তো উঠেছি। তাই আর উঠলাম না। বিত্তানো বলল। কিন্তু মারিয়া অত সহজভাবে ব্যাপারটা নিল না। ও দুশ্চিন্তায় পড়ল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস পাথরের চাঁইটার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। মারিয়া চিৎকার করে ফ্রান্সিসকে সাবধান করতে গেল। তখনই পাথরের চাঁইটা জোরে নড়ে গেল। ফ্রান্সিস টাল সামলাতে পারল না। পা হড়কে চাঁইটার পেছনে পড়ে গেল। সেইসঙ্গে কিছু পাথরের টুকরো ধুলো ঝুরঝুর করে পড়ল। ফ্রান্সিসের আর্ত চিৎকার শুনে ঘটনার আকস্মিকতায় হ্যারি মারিয়া দু'জনেই থ হয়ে গেল। দু'জনেই হতবাক। একটু

পরেই মারিয়া চিৎকার করে ডাকল ফ্রান্সিস। তারপর ঐ চাঁইটার পেছন দিকে ছুটল। কিন্তু দ্রুত যাবে কী করে? ছোট ছোট পাথরের চাঁই ছড়ানো। তার মধ্যে দিয়েই মারিয়া টাল সামলে নিল। হ্যারি সম্বিত ফিরে পেল। সেও চলল ওদিকে। শুধু বিস্তানো দাঁড়িয়ে রইল। পাথরের ছোট ছোট চাঁইয়ের ওপর পা রেখে রেখে টাল সামলাতে সামলাতে বেশ কিছুক্ষণ পরে দুজনে ওপারে পৌঁছল। দেখল একটা বুনো জংলা গাছের ঝোপের ওপর ফ্রান্সিস কাত হয়ে পড়ে আছে। কাছে এসে দেখল ফ্রান্সিসের কপাল দিয়ে রক্ত ঝরছে। ফ্রান্সিস চোখ বুজে পড়ে আছে।

মারিয়া কেঁদে ফেলল। ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসের মাথা কোলে তুলে নিয়ে বসে পড়ল। ভীতস্বরে ডাকল—ফ্রান্সিস—ফ্রান্সিস—হ্যারিও ততক্ষণে এসে পড়েছে। ফ্রান্সিস চোখ মেলে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসল।

—খুব লেগেছে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—মাথাটা—ঘুরছে। ম্লান হেসে ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে ওর পোশাকের নিচে লম্বালম্বি ছিঁড়ে ফেলল। আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের মাথায় বাঁধতে লাগল। ফ্রান্সিস চোখমুখ কুঁচকে বলল—লাগছে। এবার মারিয়া সাবধানে বাঁধতে লাগল। বাঁধা শেষ হল। ফ্রান্সিসের বোধহয় একটু কষ্ট কমল। ও আস্তে আস্তে উঠতে গেল।

—এখন উঠো না। একটু শুয়ে থাকো হ্যারি বলল।

—ঝোপটা থাকায়—চোটটা—নইলে হাত পা ভাঙতো। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

—ঠিক আছে। একটু বিশ্রাম নাও। হ্যারি বলল।

—না-না—গায়ে তেমন লাগেনি। ফ্রান্সিস বলল।

—তবু—একটু পরে ওঠো। মারিয়া বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস শুয়ে রইল। একটু পরে বলল—বিস্তানো কোথায়?

—ও আসেনি। হ্যারি বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস শুয়ে রইল। মারিয়া হ্যারি বসে রইল।

এবার ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তখনও ওর শরীরটা অল্প অল্প কাঁপছে। বলা যায় একেবারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলোও। একেবারে মৃত্যু না হলেও হাত পা ভেঙে চিরদিনের জন্যে পঙ্গু হয়ে যেত।

মারিয়া তখনও ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—আমি সুস্থ। কেঁদো না। মারিয়া হাতের উল্টো পিঠে দু'চোখ মুছে বলল—হাঁটতে পারবে?

—মনে হয়—পারবো। কথাটা বলে ফ্রান্সিস একবার টাল নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। হ্যারি ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরে চলল। হ্যারি শরীরের দিক থেকে বরাবরই দুর্বল। ও কি পারে ফ্রান্সিসের শরীরের ভার সামলাতে? তবু টান নিতে নিতে চলল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনজনে পাথরের চাঁইটার পেছন থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

আশ্চর্য! বিস্তানো নেই। হ্যারি আশা করেছিল বিস্তানো এসে ফ্রান্সিসকে ধরলে ফ্যান্সিসকে বাকি পথটা সাবধানে নিয়ে যাওয়া যাবে। হ্যারি এদিক ওদিক তাকিয়ে বার বার ডাকতে লাগল—বিস্তানো—বিস্তানো। নাঃ। বিস্তানো এই তল্লাটেই নেই। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল—

—এই সন্দেহ আমি আগেই করেছিলাম।

—কী সন্দেহ? তার মানে—মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। বিস্তানো জানতো ঐ পাথরের ওপর দাঁড়ানো বিপজ্জনক। ফ্রান্সিস বলল।

—বিস্তানো সব জেনেশুনে—হ্যারি কথাটা শেষ করতে পারল না। ফ্রান্সিস বলল—

—হ্যাঁ। বিস্তানো মন্ত্রীমশাইয়ের ছবি সম্বন্ধে এমন কিছু জানে যা ও আর কাউকে জানাতে চায় না। আমার খোঁজখবরের নমুনা দেখেও বুঝতে পেরেছে আমি ঠিক পথে এগোচ্ছি। তাই ও আমাকে মেরে ফেলতে বা আহত করতে চেয়েছিল যাতে আমি খোঁজাখুঁজি করতে না পারি।

—আশ্চর্য! আমরা এতটুকু বুঝতে পারি না। হ্যারি বলল—এরমধ্যে ওকে শাস্তি পেতে হবে।

—ঠিক আছে। যা করার ঠিক করবো। ফ্রান্সিস বলল।

ওরা বনে ঢুকল। গায়ে হাতে পায়ে ব্যথা যন্ত্রণা নিয়ে ফ্রান্সিস বনের মধ্যে দিয়ে চলল। হ্যারি বেশ কষ্ট করে ফ্রান্সিসকে ধরে ধরে নিয়ে চলল।

বনের বাইরে মাঠে এসে ওরা যখন পৌঁছলো তখন বিকেল হয়ে গেছে।

ওরা সৈন্যাবাসের ঘরে ঢুকতে বন্ধুরা প্রায় ছুটে এল। সবাই জানতে চায় ফ্রান্সিস কিভাবে আহত হল। হ্যারি আস্তে আস্তে সব বলতে লাগল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে ঘাসপাতার বিছানায় শুয়ে পড়েছে।

মারিয়া ভেনএর কাছে ছুটে এল। বলল—ফ্রান্সিস আহত। কপাল কেটে গেছে। একটা কিছু করুন।

—কী করবো রাজকুমারী। আমার ওষুধ টষুধ সবই তো জাহাজে। আপাতত একটা কাজ করুন। শুনলাম ও পড়ে গিয়ে লেগেছে। এক কাজ করুন। গায়ে হাতে পায়ে জলে ভেজা ন্যাকড়া বুলিয়ে দিন। কষ্ট অনেকটা কমবে।

—বেশ। তাই করছি। মারিয়া বলল।

—বলছিলাম—রাজা পাকার্দোর সঙ্গে তো ফ্রান্সিসের সম্পর্ক খুব ভালো। রাজাকে বললে তাঁর বৈদ্য এসে ওষুধ দিয়ে যেতে পারবে। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। এটা করা যায়। আমি নিজে রাজাকে বলতে যাবো। মারিয়া বলল।

মারিয়া ফ্রান্সিসের কাছে এল। নিজের পোশাকের ঝুল থেকে আরো কাপড়

ছিঁড়ল। একটা কাঠের গ্লাসে জল নিয়ে এল। তারপর ন্যাকড়া ভিজিয়ে ফ্রান্সিসের সারা গায়ে আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে শুয়ে রইল।

এবার মারিয়া হ্যারিকে ডাকল। বলল—হ্যারি—ফ্রান্সিসের গায়ে হাতে পায়ে জলে ভেজা ন্যাকড়াটা বুলিয়ে দাও। আমি বৈদ্য ডাকার ব্যবস্থা করছি।

—বেশ। আপনি যান। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া রাজার সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে রাজবৈদ্য এল। ফ্রান্সিসকে পরীক্ষা টরীক্ষা করে কপালে ওষুধ লাগাল। শরীরেও মাখবার ওষুধ দিয়ে গেল। ওষুধ পড়ায় ফ্রান্সিস একটু সুস্থবোধ করল। চুপ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—বিস্তানোকে দেখেছো?

—না। হ্যারি মাথা নেড়ে বলল।

—একটু রাজবাড়িতে যাও। ওকে খুঁজে বের কর। তারপর ধরে নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—ও যদি আসতে না চায়? হ্যারি বলল।

—জোর করে নিয়ে আসবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব জোরাজুরি—আমি পারবো না। বরং শাঙ্কো আর বিনেলো যাক।

—ঠিক আছে। তুমি ওদের দু'জনকে ডাকো। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি দু'জনকে ডেকে নিয়ে এল। ওরা আসতে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি বিস্তানোকে ধরে আনতে যাচ্ছে। যদি বিস্তানো আসতে না চায় শাঙ্কো তুমি ছোরা দেখিয়ে ওকে নিয়ে আসবে।

শাঙ্কো আর বিনেলোকে নিয়ে হ্যারি চলল রাজবাড়ির দিকে।

ওরা রাজবাড়ির রাজসভাঘর এঘর ওঘর খুঁজলো। কোথাও বিস্তানোকে পেল না। খুঁজতে খুঁজতে রান্নাঘরের পাশের রসুইঘরে গেল। দেখল কাঠের লম্বা পাটাতনে বসে বিস্তানো খাবার খাচ্ছে। হ্যারি ওর সামনে এসে দাঁড়াল। খেতে খেতে বিস্তানো মুখ তুলে বলল—কী ব্যাপার?

—তোমাকেই খুঁজছিলাম। ফ্রান্সিস তোমাকে ডেকেছে। আমাদের সঙ্গে চলো। হ্যারি বলল।

—আমি কী করে যাবো? আমার অনেক কাজ। রাজা খবর পেয়েছিল। তাঁর বেশ কিছু সৈন্য বনে পাহাড়ে আত্মগোপন করে আছে। তাদের আনতে যেতে হবে। রাজার হুমুক। বিস্তানো খেতে খেতে বলল।

—তার আগে ফ্রান্সিসের কাছে চলো। হ্যারি বলল।

—না না। রাজার হুকুম। বিস্তানো বলল।

হ্যারি ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো জামার তলায় হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করল। ছোরাটা বিস্তানোর পিঠে চেপে ধরে শাঙ্কো বলল—তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। বিস্তানো এতটা ভাবেনি। ও বোকাটে মুখে

শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে রইল। শাঙ্কো তাড়া লাগাল—জলদি খেয়ে নাও। বিস্তানো বুঝল এ বড় কঠিন ঠাঁই। ওকে মেরেই না ফেলে। ও হাপুস্ হুপুস্ করে খেয়ে নিল। হাতমুখ ধুয়ে বলল—বেশ চলো।

বিস্তানোকে নিয়ে ফিরে এসে ওরা দেখল ফ্রান্সিস শুয়ে আছে। ওদের দেখে ফ্রান্সিস উঠে বসল। বলল—বিস্তানো—দুর্ঘটনার পরে আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি—এসব না দেখেই পালিয়ে এলে কেন?

—ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। বিস্তানো বলল।

—যদি বলি তুমি ভালো করেই জানতে ঐ পাথরের চাঁইটা নড়বড়ে। যে কেউ ওটায় উঠলে টাল সামলাতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। আমি জানতাম না। বিস্তানো জোরে মাথা নেড়ে বলল।

—না বিস্তানো—তুমি জানতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মন্ত্রীমশাই নিশ্চয়ই তাঁর গুপ্ত ভাণ্ডারের কিছু হদিশ তোমাকে দিয়ে গেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। আমি কিছু জানি না। মন্ত্রীমশাই এই ব্যাপারে আমায় কিছু বলে যান নি। বিস্তানো একইভাবে বলল।

—উঁহু। তুমি জানো ফ্রান্সিস বলল।

—বললাম তো—ফ্রান্সিস ওকে কথাটা শেষ করতে দিল না। বলে উঠল—

—কথা বাড়িও না। ঐ ছবিগুলো সম্বন্ধে মন্ত্রীমশাই নিশ্চয়ই তোমাকে কিছু বলে গেছেন।

—বলেছিলেন—তবে তেমন কিছু না।

—তেমন কিছু কিনা সেটা আমি বুঝবো। তুমি বলো—মন্ত্রীমশাই কী বলেছিলেন?

—কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—আমার আঁকা ছবিগুলো সাংকেতিক।

—'সাংকেতিক'—এই শব্দটাই বলেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কোন বিশেষ একটা ছবি না সব ছবি?

—তা' তো বলতে পারবো না।

—কাজেই বোঝা যাচ্ছে—ছবিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমি আগেই ভেবেছিলাম। এবার নিশ্চিত হলাম। যাক গে—বিস্তানো—জেনে রাখো—তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ। তোমাকে আমি আর বিশ্বাস করি না। একটা কথা—এই গুপ্ত ধনভাণ্ডার আমি উদ্ধার করবোই। রাজাকে বলে তোমাকে তার কিছু অংশ দিতাম। সেটা আর তোমার ভাগ্যে জুটল না। তুমি যাও। আর কক্ষণো আমাদের কাছে এসো না। বিস্তানো আর কোন কথা বলতে পারলো না। আস্তে আস্তে চলে গেল।

—ছবিগুলো আবার ভালো করে দেখতে হবে। মেলাতে হবে বাস্তব বনের দৃশ্যগুলোর সঙ্গে। সব রহস্যের সমাধান আছে ঐ ছবিগুলোরই মধ্যে। ফ্রান্সিস বলল।

—এতগুলো ছবির মধ্যে থেকে সূত্র পাবে কী করে? হ্যারি জানতে চাইল।

—সেটা ছবিগুলো বাছাই করে হিসেব করতে হবে। সেইজন্যেই ছবিগুলো ভালোভাবে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—চলো। রাজবাড়িতে যাবো। ছবিগুলো ওখানেই রাখা হয়েছে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি রাজসভায় যখন পৌঁছল তখন রাজসভায় বিচার চলছে।

—একটু অপেক্ষা করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

বিচারের কাজ চলল। একসময় বিচার শেষ হল। রাজা পাকার্দো ফ্রান্সিসকে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে মাথা একটু নিচু করে সম্মান জানিয়ে বলল—মান্যবর রাজা—আমরা মন্ত্রীমশাইয়ের আঁকা ছবিগুলো আমাদের ঘরে নিয়ে যাবো। ছবিগুলো ভালো করে দেখতে চাই।

—বেশ তো। রাজা বললেন। তারপর একজন প্রহরীকে ইশারায় ডাকলেন। ফ্রান্সিসকে বললেন—প্রহরী যাচ্ছে। ওই ছবিগুলো তোমাদের ঘরে পৌঁছে দেবে।

ফ্রান্সিস হ্যারি রাজবাড়ির বাইরে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে প্রহরী ছবিগুলো নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা ওকে নিয়ে চলল।

ফ্রান্সিসদের ঘরে ছবিগুলো রেখে প্রহরী চলে গেল। ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—তুমি তিনখানা ছবি নাও। হ্যারিকে বলল—তুমি একটা নাও। বাকি দুটো আমি নিচ্ছি। এবার চলো—বন পাহাড়ের দিকে।

ছবি নিয়ে বনভূমিতে ঢুকল তিনজনে।

আগের দিন দেখা জায়গাটায় এল। ফ্রান্সিস দৃশ্যটার সঙ্গে ছবিগুলো মেলাতে মেলাতে একটা ছবি মেলাল। হিসেব করে দেখল ছবিটা মন্ত্রীমশাইর বাড়িতে ছিল।

আবার চলল তিনজনে। গতকালের জায়গায় এসে ছবি মেলাল। মন্ত্রীর বাড়িতে রাখা ছবিটা মিলল।

এমনি করে ঝর্নার কাছে এল। ছবি মিলিয়ে দেখল দু'টো ছবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এই দুটো ছবি রাজার শয়ন কক্ষের দেয়ালে টাঙানো ছিল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে—এই তিন রশ্মির ছবিটা মিলল না। এটাও রাজার শয়নকক্ষে টাঙানো ছিল। ফ্রান্সিস ছবিটা নিয়ে আরো বাঁদিকে সরে এল। আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য প্রায় মাথার ওপর। যদি সূর্যটাকে পাহাড়ের গায়ে নামিয়ে ভাবা যায় অর্থাৎ অস্ত যাচ্ছে এরকম ভাবা যায় তাহলে মিলে যাচ্ছে। তখনই ভালোভাবে মেলাতে গিয়ে দেখল পাহাড়ের নিচে একটা গুহামত। কিছু গাছ ডালপাতার আড়াল দেখা যাচ্ছে। খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু ছবিতে সেটা আঁকা নেই। ফ্রান্সিস একটু আশ্চর্যই হল। মন্ত্রীমশাই এত নিখুঁত গাছডালপালা পাহাড়ের অংশ নীল আকাশ পাখি এঁকেছেন অথচ ঐ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে গুহামুখটা সেটাই আঁকেন নি। কী করে এই ভুলটা হল? তাহলে কি উনি গুহামুখটা দেখতে

পাননি? অথবা ইচ্ছে করেই ওটা বাদ দিয়েছেন। বাদ দিয়ে থাকলে কেন বাদ দিয়েছেন? ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি একটা ব্যাপার লক্ষ্য কর। ভালো করে দেখ—গাছ ডালপালার আড়ালে একটু দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা অস্পষ্ট গুহামুখ। হ্যারি ভালো করে তাকাল। সত্যিই তো! একটা গুহামুখ। তবে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। হ্যারি বলল—হ্যাঁ। তবে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

—অথচ ছবিতে ঐ গুহামুখটা নেই। প্রশ্ন হ'ল—কেন নেই? ফ্রান্সিস বলল।

—মন্ত্রীমশাই তো বৃদ্ধই ছিলেন। নজরে পড়েনি হয়তো। হ্যারি বলল;

—উঁহু। ব্যাপারটা অত সহজ সরল নয়। বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই ওটা আঁকেন নি। সামান্য ফুল পাখি বাদ যায় নি আর ঐ গুহামুখটা বাদ যাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—এই ব্যাপারটা তো রাজা পাকার্দোর নজর পড়ার কথা। হ্যারি বলল।

—নজরে পড়ে নি। কারণ উনি ছবিটা আমার মত মিলিয়ে দেখেন নি। ভুলে যেও না মন্ত্রীমশাই তাঁর ছবিগুলো সম্পর্কে বলেছিলেন—তাঁর ছবিগুলো সাংকেতিক। কোন সংকেত না দেওয়াও এক ধরনের সংকেত। চলো ঐ গুহামুখটা দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

তিনজনে গাছপালা বুনো ঝোপের মধ্যে দিয়ে চলল। একটু পরেই গুহামুখে এসে দাঁড়াল। গুহামুখ খুব বড় নয়। মাথা নিচু করে একজন মানুষ ঢুকতে পারে এমন।

ফ্রান্সিস গুহামুখের দিকে চলল। হ্যারি বলে উঠল—সাবধান ফ্রান্সিস—অচেনা অজানা গুহা। ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে বলল—কিন্তু দেখতে তো হবে—গুহাটা কত লম্বা। ভেতরেও কী আছে।

ফ্রান্সিস পায়ে পায়ে মাথা নিচু করে গুহার মধ্যে ঢুকল। বাইরের উজ্জ্বল রোদ থেকে গুহায় একটু ঢুকে দেখল শুধু অন্ধকার। এবড়ো খেবড়ো গুহার গায়ের আভাস। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতে অস্পষ্ট দেখল গুহাটা খুব বড় নয়। আর একপা ফেলতেই পায়ের নিচে কী কিলবিল করে উঠল। সাপ! ফ্রান্সিস লাফ দিয়ে সরে এল। ভাগ্য ভালো। কামড়ায় নি।

ফ্রান্সিস গুহা থেকে বেরিয়ে এল। হ্যারিদের কাছে এল। বলল—গুহাটা বেশি বড় নয়। ভেতরে সাপের গায়ে পা দিয়েছিলাম। যাক গে মশাল ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না।

তখনই হঠাৎ পেছনে ডাল ভেঙে পড়ার শব্দ হল। সঙ্গে কার আর্তস্বর। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে পেছনে লাফ দিয়ে এক বুনো ঝোপের ওপর পড়ল। তারপর যে গাছের ডাল ভেঙে ঝুলছিল আর এক লাফে সেখানে গিয়ে পড়ল। আলো অন্ধকারে দেখল বিস্তানো চিৎ হয়ে পড়ে আছে। শাঙ্কো ওকে টেনে তুলল। বিস্তানো চোখমুখ কুঁচকে বলল—কোমরে বড্ড লেগেছে।

—আমরা কী করি তাই দেখতে গাছে উঠেছিলে—তাই না? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। খুব আক্কেল হয়েছে। বিস্তানো বলল।

—ফ্রান্সিসের কাছে চলো। শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো বিস্তানোকে ধরে ধরে ফ্রান্সিসের কাছে নিয়ে এল। শাঙ্কো বলল—এই যে বিস্তানো। আমাদের ওপর নজরদারি চালাতে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙে মাটিতে পড়েছে।

—বিস্তানো কী শাস্তি চাও? ফ্রান্সিস বলল।

—যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে আমার। কোমরটা বোধহয় ভেঙেই গেছে।

—ঠিক আছে ঐ ভাঙা কোমর নিয়ে যাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দু'টো মশাল নিয়ে এসো।

—বেশ। যাচ্ছি। কিন্তু মশাল নিয়ে কী করবে? বিস্তানো জানতে চাইল।

—এই গুহায় ঢুকবো। ফ্রান্সিস বলল।

—সর্বনাশ। এই গুহায় সাপের আড্ডা। এই গুহার ত্রিসীমানায় কেউ আসে না। বিস্তানো বলল।

—ঠিক আছে। তুমি মশাল চকমকি পাথর নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। যাচ্ছি। তবে কোমরের যা অবস্থা। বিস্তানো বিরসমুখে বলল।

—ওটাই তোমার শাস্তি। যাও। ফ্রান্সিস বলল।

বিস্তানো বিড়বিড় করে আপনমনে বকতে বকতে চলে গেল। ফ্রান্সিসরা এখানে ওখানে পাথরের ওপর বসে রইল।

বিস্তানো যখন মশাল নিয়ে ফিরে এল তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে। বিস্তানো দু'টো মশাল ফ্রান্সিসের হাতে দিয়ে একটা পাথরের ওপর বসে হাঁফাতে লাগল। মুখ কুঁচকে কোমরের ব্যথা সহ্য করতে লাগল।

শাঙ্কো চকমকি পাথর ঠুকে মশাল জ্বালল। ফ্রান্সিসকে একটা মশাল দিল। অন্যটা নিজে নিল।

এবার দুজনে মশাল হাতে গুহার মধ্যে ঢুকল। একটা কেমন ঠাণ্ডা হাওয়া গুহার মধ্যে থেকে ছুটে এল। ফ্রান্সিসের শরীরটা একটু কেঁপে উঠল।

বেশ কিছুটা যেতেই চোখের সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্য। ফ্রান্সিস থম্‌কে দাঁড়াল। পেছনে শাঙ্কোকে হাত দিয়ে থামাল। সামনেই একটা অমসৃন পাথরের বেদী মত। কত বিচিত্র রঙের সাপ ছোটবড় সাপ এদিক ওদিক কিলবিল করছে। নড়ছে জড়াজড়ি করছে ফণা তুলছে। মশালের আলো পড়ে সাপগুলোর গায়ের আঁশ চক্‌চক্ করছে। আরও আশ্চর্য—ছোট চত্বরটা জুড়ে ছড়ানো হীরে মুক্তো। মণিমানিক্য গয়না গাটি। ওগুলোর মধ্যে দিয়েই সাপগুলো যেন খেলে বেড়াচ্ছে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—

—শাঙ্কো—মন্ত্রীমশাই এখানেই এই ধনসম্পদ গোপনে রেখেছিলেন।

—তাহ'লে এটাই সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার? শাঙ্কো মৃদুস্বরে বলল।

—হ্যাঁ। ছবিতে কোন সংকেত না দিয়েই এই সংকেত দিয়ে গিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—কী করবে এখন? শাঙ্কো প্রশ্ন করল।

—সাপ তাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। বাইরে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

দু'জনে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। হ্যারি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল—কিছু হদিশ পেলে?

—হ্যাঁ। এই গুহাতেই আছে গুপ্তধন। কিন্তু তা উদ্ধার করতে এখনও কিছু কাজ বাকি। চলো—বেশ কিছু শুকনো কাঠ জোগাড় করতে হবে।

একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিস্তানো এগিয়ে এল। বলল—গুপ্তধন এখানেই আছে?

—হ্যাঁ। তবে এখনো হাতের নাগালের বাইরে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা মশাল পাথরের খাঁজে রেখে বনের মধ্যে ঢুকল। গাছের শুকনো ডালপাতা জোগাড় করে নিয়ে এল। গুহার মুখে জড়ো করল। মশালের আগুনে ডালপাতায় আগুন জ্বালল। তারপর সেসব গুহার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। আগুনে ধোঁয়ারও সৃষ্টি হল। গুহা ধোঁয়ায় ভরে গেল। সেইসঙ্গে আগুনও ছড়াল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—গুহামুখ থেকে সরে এসো।

দুজনেই একটু দূরে সরে এল। ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাপগুলো কিলবিল করতে করতে বেরিয়ে আসতে লাগল। হ্যারি আর বিস্তানো অবাক। এত সাপ? সাপগুলো এদিক ওদিক পালিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক সাপ বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর বলল—হ্যারি তোমার কোমরের ফেট্টিটা খোল। হ্যারি খুলে দিল। ফেট্টিটা নিয়ে বলল শাঙ্কো এবার গুহার মধ্যে চলো। বোধ হয় সব সাপ পালিয়েছে।

তিনজনে গুহার মধ্যে ঢুকল। বিস্তানোও খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওদের পেছনে পেছনে চলল।

গুহায় ঢুকে ফ্রান্সিস মশালের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে ভালো করে দেখল। না। কোন সাপ নেই। হ্যারি আর বিস্তানো অত সোনা পান্না হীরে চুনি দেখে হতবাক।

ফ্রান্সিস বেদীটার কাছে গেল মশালটা হ্যারির হাতে দিল তারপর ফেট্টির কাপড়টা পাতলা। সোনার চাকতি হীরে মুক্তো চুনি পান্না সব কাপড়টায় ভরল। কাপড়ের মুখটা বাঁধল। একটা বোচ্‌কামত হল। শাঙ্কো বাঁ হাতে মশালটা নিয়ে বোঁচকাটা ডানহাতে ঝুলিয়ে নিল।

সবাই গুহা থেকে বেরিয়ে এল। বনের মধ্যে ঢুকল। চলল প্রায় অন্ধকার পথ বনতল দিয়ে। সঙ্গে বিস্তানো।

বন থেকে যখন বেরিয়ে এল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। দুপুরে খাওয়া হয় নি। সবাই ক্ষুধার্ত।

শাঙ্কো বলল—এখন কী করবে?

—আগে খেয়ে নি। ভীষণ খিদে পেয়েছে। তারপর রাজার কাছে যাবো। বিস্তানোকে বলল—তুমিও আমাদের সঙ্গে খেয়ে নাও।

ঘরে ঢুকতে বন্ধুরা হৈ হৈ করে উঠল। তাদের প্রশ্ন ছিল—না খেয়ে এতক্ষণ কোথায় ছিলে তোমরা। রাজকুমারী সেই তোমরা বেরিয়ে যাবার পর এসেছেন। এখনও কিছুই মুখে দেননি।

—মারিয়া তুমি খেয়ে নিলে পারতে। ফ্রান্সিস বলল।

—উপবাসী তোমরা কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছো আর আমি পেট ভরে খাবো?

—ঠিক আছে। আমাদের সঙ্গে খাবে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু গুপ্ত ধনভাণ্ডারের কোন হদিশ পেলে? মারিয়া জানতে চাইল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—শাঙ্কো বোঁচ্‌কা খোল।

শাঙ্কো হাতের বোঁচকাটা ঘাসপাতার বিছানায় রাখল। গিঁট খুলে কাপড়টা খুলে দিল। একসঙ্গে সেই সোনার চাকতি হীরে মুক্তো দেখে সবাই হতবাক। কিছুক্ষণ সবাই চুপ। সিনাত্রা একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে ধ্বনি তুলল—

—ও-হো-হো। সবাই ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোরা খাওয়া দাওয়া সেরে নিজেদের ঘরে এল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। তারপর উঠে বসল। বলল—হ্যারি চলো—রাজা পাকার্দোকে তার প্রাপ্য দিয়ে আসি। কাল সকালেই আমরা জাহাজে ফিরে যাবো।

ফ্রান্সিস হ্যারি চলল রাজবাড়ির দিকে। সঙ্গে ধনভাণ্ডারের বোঁচকা নিয়ে শাঙ্কোও চলল।

সদর দেউড়িতে পাহারারত প্রহরীকে হ্যারি বলল—যাও। রাজাকে গিয়ে বলো—বিদেশিরা এসেছে। দেখা করতে চায়। বিশেষ প্রয়োজন।

প্রহরী চলে গেল। কিছু পরে ফিরে এসে বলল—মন্ত্রণাঘর খুলে দিয়েছি। আপনারা বসুন। মান্যবর রাজা আসছেন।

ফ্রান্সিসরা রাজবাড়িতে ঢুকে মন্ত্রণাকক্ষে এল। একটা পাথরের টেবিল ঘিরে আসনপাতা। একজন প্রহরী একটা মশাল জ্বেলে রেখে গেল। ফ্রান্সিসরা আসনে বসল। শাঙ্কো বোঁচকাটা টেবিলের ওপর রাখল।

কিছুক্ষণ পরে রাজা ঢুকলেন। বললেন—আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো?

—হ্যাঁ। কালকে সকালে আমরা আমাদের জাহাজে ফিরে যাচ্ছি।

—বেশ। তোমরা আমার জন্যে যা করেছো তা আমি কোনদিন ভুলবো না।

—মান্যবর রাজা—মন্ত্রীমশাই যে ধনরত্ন গোপনে রেখেছিলেন তা আমরা উদ্ধার করেছি।

—বলো কি। এ তো সত্যিই সুসংবাদ। রাজা একটু আশ্চর্য হয়েই বললেন। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ইঙ্গিত করল। শাঙ্কো গিঁট খুলে কাপড়টা টেবিলে পেতে দিল। সোনা হীরে মনিমুক্তো গয়নাগাটি ছড়ানো কাপড়ের ওপর। রাজা পাকার্দো কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—এত দামি জিনিস। আমি কল্পনাও করি নি। যা হোক—তোমরা কষ্ট করে উদ্ধার করেছো—তোমাদেরও তো কিছু দিতে হয়।

—আমাদের দশটা সোনার চাকতি দিন তাহলেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। এত সামান্য—রাজা বললেন।

—না। এর বেশি কিছু চাই না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তোমরা যেমন চাও। রাজা কুড়িটা সোনার চাকতি দিলেন। ফ্রান্সিস আর আপত্তি করল না।

ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল—তাহ'লে আমরা যাচ্ছি।

ফ্রান্সিসরা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। নিজেদের ঘরে এল।

রাত হচ্ছে। মারিয়া আর রাজবাড়িতে গেল না। ফ্রান্সিসদের সঙ্গে থেকে গেল।

ভোর হল। সবাই উঠে পড়ল। সবাই তৈরি হতে লাগল।

সকাল হল। সকালের খাবার এল। খেয়ে দেয়ে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মাঠ পার হয়ে বনভূমিতে ঢুকল। চলল সমুদ্রের দিকে।

একটু বেলায় জাহাজঘাটে পৌঁছল। ফ্রান্সিস রাঁধুনি বন্ধুদের ডেকে বলল—রান্না শুরু কর। দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে জাহাজ ছাড়বো। রাঁধুনি বন্ধুরা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। কয়েকজন পালের দড়িফড়ী বাঁধতে লাগল।

দুপুরের খাওয়া শেষ হতে জাহাজের নোঙর তোলা হল। জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হল। জাহাজ চলল সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে।

দুপুর থেকেই আকাশে কালো মেঘ জমতে শুরু করেছিল। ঝড়ের পূর্বাভাস। ভাইকিংরা জাহাজেই ঘুরে বেড়ায়। আকাশের গতিগতি ওরা ভালো বোঝে। মেঘে সূর্য ঢাকা পড়ে গেল। প্রায় অন্ধকার হয়ে এল চারদিক।

শুরু হল মেঘগর্জন। সেইসঙ্গে কালো আকাশ চিরে বিদ্যুতের ঝলকানি।

ফ্রান্সিস ডেক-এর ওপর উঠে এল।

গলা চড়িয়ে বলল, ভাইসব—সামাল। ঝড় আসছে। ততক্ষণে ভাইকিংরা জাহাজের পাল নামিয়ে ফেলেছে। ফ্রেজার দৃঢ় হাতে জাহাজের হুইল চেপে ধরেছে। মাস্তুলের ওপর থেকে পেড্রো নেমে এসেছে। নীচের দাঁড়ঘর থেকে দাঁড়ীরা ডেক-এ উঠে এসেছে। মাস্তুল আর হালে বাঁধা দড়িদড়া টেনে ধরে সবাই প্রস্তুত হতে হতেই প্রচণ্ড বেগে ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসদের জাহাজের ওপর। শুরু হল ভাইকিংদের সঙ্গে ঝড়ের লড়াই। তখনই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। ফুঁসে উঠতে লাগল সমুদ্রের ঢেউ।

আজ আর মারিয়ার সূর্যাস্ত দেখা হল না।

ঝড় চলল। উঁচু উঁচু ঢেউ এসে জাহাজের গায়ে ভেঙে পড়তে লাগল। প্রচণ্ড দুলুনির মধ্যেও ভাইকিংরা দড়িদড়া টেনে ধরে জাহাজ ভাসিয়ে রাখল।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে ঝড়ের ঝাপটা চলল। তারপরই আকাশের কালো মেঘ উড়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্তাচলগামী সূর্য দেখা গেল। ঝড়ের ঝাপটার বেগ কমল। ডেক-এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ভাইকিংরা যেন স্নান করে উঠেছে। কেউ কেউ এখানে-ওখানে বসে রইল। কেউ কেবিনে গেল ভেজা পোশাক পাল্টাতে।

ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে এল। বলল, দিক ঠিক রাখতে পেরেছ?

অসম্ভব। ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজ যে কোনদিকে চলেছে বুঝতে পারছি না।

তাহলে যে কোনো ডাঙায় জাহাজ ভেড়াও। সেখানে খোঁজ নিতে হবে কোথায় এলাম। মোটামুটি উত্তরদিকটা ঠিক রাখার চেষ্টা করো।

দেখি, ফ্রেজার বলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলছে। মাস্তুলের ওপরে পেড্রো নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ডাঙার দেখা নেই।

আট-দশদিন কেটে গেল। কিন্তু কোথায় ডাঙা? ফ্রান্সিসরা চিন্তায় পড়ল। কোথায় চলেছে জাহাজ? বন্ধুরা ফ্রান্সিসের কাছে আসে। আশঙ্কা প্রকাশ করে। বলে, লোকবসতি থেকে আমরা অনেক দূরে কোথাও চলে এসেছি।

না-না। এখনও সেটা বল যায় না। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলে। ফ্রান্সিসের কথার প্রতিবাদ করে না ওরা। কিন্তু মন থেকে বিপদের আশঙ্কা যায় না।

ডাঙার দেখা নেই। ফ্রান্সিসের বন্ধুদের মধ্যে দুশ্চিন্তা বেড়েই চলল।

সেদিন বিকেলে নজরদার পেড্রো মাস্তুলের ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, ডাঙা, ডাঙা দেখা যাচ্ছে। শাঙ্কো ডেকএই বসেছিল। ছুটে রেলিঙের কাছে গেল। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দেখল সত্যিই ডাঙা। তবে গাছপালায় ভরা। খুব সম্ভব জঙ্গল। তা হোক, শক্ত মাটি তো বটে। বন্ধুরা এসে ভিড় জমাল। সবাই খুশি। ডাঙার দেখা পাওয়া গেছে।

শাঙ্কো ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে। ফ্রান্সিসেরও দুশ্চিন্তা কম ছিল না। একটু পরেই ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। পেছনে মারিয়া আর হ্যারি। জঙ্গল এলাকা পার হয়ে জাহাজ তখন একটা ছোট বন্দরের কাছে এসেছে। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, যাক ডাঙার দেখা মিলল। ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে এল। বলল, এই ছোট বন্দরেই জাহাজ ভেড়াও। দেখা যাক কোথায় এলাম?

দেখা গেল বাড়ি-ঘরদোর জাহাজঘাট থেকে বেশ দূরে।

কী করবে? হ্যারি জানতে চাইল।

রাতে আর যাব না। রাতের অচেনা অজানা জায়গায় গিয়ে বিপদে পড়েছি। ভোর হোক। তখন যাব খোঁজ করতে। ফ্রান্সিস বলল।

আবার একদিন দেরি হবে। মারিয়া বলল।

জোরে জাহাজ চালিয়ে একদিন পুষিয়ে নেব। ফ্রান্সিস উত্তর দিল।

জাহাজঘাটে নোঙর ফেলা হল। রাতের খাওয়া সেরে সবাই শুতে গেল। শাঙ্কো কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ডেক-এই শুয়ে পড়ল। আকাশের চাঁদের আলো অনুজ্জ্বল। চারধার মোটামুটি আবছা দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের জোর হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। সারাদিনের রোদে পোড়া শরীর আরাম পেল। শাঙ্কো আর বন্ধুরা ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন শেষ রাত। হঠাৎ বর্শামুখের খোঁচা খেয়ে শাঙ্কোর ঘুম ভেঙে গেল। দেখল উদ্যত বর্শা হাতে দু'তিনজন কালো মানুষ। তাদের সারা শরীর ভেজা। বোঝা গেল সাঁতরে এসে জাহাজে উঠেছে। অন্য বন্ধুদেরও বর্শা দিয়ে খোঁজা দিতে লাগল তারা। সকলের ঘুম ভেঙে গেল। ওরা উঠে বসল। কালো বর্শাধারীরা সংখ্যায় দশ-বারো জন। বর্শাধারীদের মধ্যে থেকে একজন মোটা মতো লোক এগিয়ে এল। দাঁত বার করে হেসে বলল, আমরা তোমাদের জাহাজ লুঠ করতে এসেছি। তোমাদের দেখেই বুঝতে পারছি এখানে দামি কিছু পাব না। তবু সোনার মুদ্রা-টুদ্রা যা পাব তাতেই আমাদের লাভ। তাছাড়া পোশাক-টোশাক তো আছেই।

পোশাক-আসাকও লুঠ করবে? শাঙ্কো অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

যা পাওয়া যায়। লোকটি বলল। বোঝা গেল লুঠেরার দলের সর্দার এই লোকটিই।

নাও, যার কাছে যা আছে বের করো শিগগিরি। সর্দার তাগাদা লাগাল।

ভাইকিংরা বাধ্য দিতে পারল না। নিরস্ত্র অবস্থায় এখন লড়াইও করা যাবে না। যে যার ফেট্টি থেকে খুচরো মুদ্রা ডেক-এর ওপর ঠক ঠক করে ফেলতে লাগল। সর্দারের সঙ্গীরা তা কুড়িয়ে নিল। শাঙ্কো ফেট্টি থেকে একটা সোনার চাকতি ফেলল। ঠক করে চাকতির শব্দ হল। সর্দার সঙ্গে সঙ্গে শাঙ্কোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শাঙ্কোর কোমরের ফেট্টি খামচে ধরতেই আর একজন শাঙ্কোকে পেছন থেকে চেপে ধরল। সর্দার এক টানে শাঙ্কোর কোমরের ফেট্টি খুলে ফেলল। ঠক ঠক শব্দে আরও কয়েকটা সোনার চাকতি পড়ল। সর্দার নিজেই সেগুলো কুড়িয়ে নিল। হেসে বলল, এই তো, কে বলল যে তোমরা গরিব?

ওপরের ডেক-এ যখন লুঠ চলছে তখন ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও বুঝল ওপরে কিছু একটা ঘটছে। বিছানার নীচ থেকে একটানে তরোয়াল বের করে সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ উঠে এল ফ্রান্সিস। দেখল বর্শা হাতে একদল লোক। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল, জাহাজ লুঠ করতে এসেছে। একজন বর্শার ফলাটা

শাঙ্কোর পিঠে চেপে ধরল। শাঙ্কো আর কিছু বলল না। অন্য এক লুঠেরা ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে সিঁড়ির কয়েক ধাপ নীচে নেমে এল। বর্শাটা সিঁড়ির ওপর গেঁথে গেল।

ফ্রান্সিস একা লড়াই করতে ভরসা পেল না। সর্দার গলা তুলে বলল, কেউ কথা বললেই মরবে। দুজন বর্শাধারী দুজন ভাইকিং-এর বুকে বর্শার ফলা চেপে ধরল। ফ্রান্সিস বুঝল এদের কথা মতো চলতে হবে। নইলে বন্ধুরা মরবে। ও ডেক-এ উঠে এল। হাতের তরোয়াল ডেক-এর ওপর ফেলে দিল। বলল, আমরা লড়াই করব না, তোমরা লুঠপাট করে চলে যাও।

সর্দার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, নীচে চল্।

ওরা পাঁচজন সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। কেবিন ঘরগুলোয় ঢুকতে লাগল। শোরগোলে ভাইকিংদের ঘুম ততক্ষণে ভেঙ্গে গেছে। সর্দার তাদের সতর্ক করে বলল, চুপচাপ সব বসে থাকো। ভাইকিংরা চুপ করে বিছানায় বসে রইল। চলল পোশাক লুঠ। ভাইকিংরা বিছানায় বসে অবাক চোখে দেখতে লাগল।

ফ্রান্সিস বেরোবার সময় কেবিন ঘরের দরজা খুলে রেখে বেরিয়েছিল। সর্দার খোলা দরজা পেয়ে ঢুকে পড়ল। তখন মারিয়া ঘুম ভেঙে বিছানায় বসে আছে। মারিয়াকে দেখে সর্দার বুঝল এখানে কিছু গয়নাগাটি পাওয়া যাবে। ও বর্শাটা মারিয়ার দিকে তাক করে বলল, সব গয়নাগাটি দিয়ে দাও।

আমি তো বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে আসিনি যে গয়নাগাটি পরে আসিনি। মারিয়া বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল।

সর্দার বিশ্বাস করল না। কড়া গলায় শাসাল, কথা বাড়িও না। যা আছে দাও নইলে মরতে হবে।

মারিয়া এবার ভয় পেল। যেভাবে বর্শা তাক করে আছে, একটু এদিক ওদিক দেখলে ছুঁড়ে মারতে পারে।

ফ্রান্সিস কোথায়? মারিয়া জিগ্যেস করল। সর্দার বুঝল তরোয়াল হাতে লোকটাই ফ্রান্সিস। বলল, ওপরের ডেক-এ। আমার চারজন সঙ্গী ওকে ঘিরে আছে। আর কথা না। গয়নাগাটি দাও।

মারিয়া আর কিছু বলল না। বিছানার ধারে রাখা চামড়ার ঝোলাটা বের করল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে গয়নার কাঠের বাক্সটা বের করে আনল। বাক্সটা এগিয়ে ধরে বলল, এই নাও। কাউকে হত্যা করতে পারবে না। সর্দার খুশির হাসি হেসে বলল, না না। আমাদের দামি জিনিস পেলেই হল। মানুষ মারব কেন? তারপর জিগ্যেস করল আর কিছু নেই?

না। আমার কাছে আর কিছু নেই।

সর্দার কথা বাড়াল না। গয়নার বাক্সটা বগলে চেপে বেরিয়ে গেল।

পোশাক লুঠ শেষ করে সঙ্গীরা ডেক-এ উঠে এল। সর্দারও এল। দুজন গিয়ে

পাটাতন ফেলল। সর্দারের কাছে মারিয়ার গয়নার বাক্স দেখে ফ্রান্সিস বুঝল মারিয়া সব গয়নাই দিয়ে দিয়েছে।

পাতা পাটাতন দিয়ে লুঠেরার দল দ্রুত নেমে গেল। তারপর পাটাতনটা জলে ফেলে দিল। তখনই সূর্য উঠল। ভোরের আলোয় দেখা গেল ওরা ডানপাশের জঙ্গলের দিকে চলেছে।

ততক্ষণে ভাইকিংরা খোলা তরোয়াল হাতে ডেক-এ উঠে এসেছে। পাটাতন নেই, পাঁচ-সাতজন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তরোয়াল দাঁতে চেপে ধরা। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বাধা দিতে গেল, বিপদ বাড়িও না। চলে এসো। ওরা শুনল না। তীরভূমিতে উঠে লুঠেরার দলের দিকে ছুটল। কিন্তু ধরবার আগেই জঙ্গলে ঢুকে পড়ল দলটা। ভাইকিংরা জঙ্গলের কাছে গিয়ে থমকে গেল। এই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় খুঁজবে লুঠেরাদের? ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। দলের মধ্যে বিস্কো ছিল। সে বলল, আমরা সংখ্যায় কম। এখন জঙ্গলে ঢোকা নিরাপদ নয়। ফিরে চলো। তবু কয়েকজন জঙ্গলে ঢুকতে চাইল। বিস্কো বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওদের সামলাল।

বিস্কোরা ফিরে এসে দেখল শাঙ্কোরা পাটাতন জল থেকে এনে পেতে দিয়েছে। তারা জাহাজের ডেক-এ উঠে আসতেই ফ্রান্সিস বলল, আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। আবার একদল লুঠেরা এসে হাজির হবে। তখন সমস্যা বাড়বে। পাল তুলে দাও। নোঙর তোলো। দাঁড়ঘরে যাও। ফ্রেজার জাহাজ ছাড়ো।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ আবার ভাসল। সমুদ্র এখন অনেকটা শান্ত। ফ্রান্সিস ফ্রেজারকে বলল, উত্তরদিক ঠিক রেখে চালাও।

ঢেউ ভেঙে জাহাজ এগিয়ে চলল। দু'দিন পরে একটা বন্দরের কাছে এল। জাহাজটা। তখন বেলা হয়েছে।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, একটা বন্দর দেখা যাচ্ছে। কী করবে?

জাহাজ বন্দরে ভেড়াতে বলো। দেখি খোঁজখবর করে।

ফ্রেজার জাহাজঘাটে জাহাজ ভেড়াল। শাঙ্কো নোঙর ফেলল। ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। দেখল জাহাজঘাটে আরও কয়েকটা জাহাজ নোঙর করা। বড় বন্দর। বাড়ি-ঘরদোর, লোকজন আছে। বাজার এলাকায় লোকজনের ভিড়। সকলেই কালো। বোঝা গেল এখানে কালো মানুষদেরই বসতি।

হ্যারি জিগ্যেস করল, নামবে?

হ্যাঁ, উত্তর দিল ফ্রান্সিস, দুপুরের খাওয়া সেরে যাব। রাতে খোঁজখবর করতে গেলে বিপদ হতে পারে।

আমি যাব?

না। শাঙ্কোকে নিয়ে আমি নামব।

বন্ধুরা নেমে একটু ঘুরে বেড়াতে চাইছিল, হ্যারি বলল।

না, আবার কোনো বিপদে পড়বে। তখন ওদের বাঁচাতে আমাদের কয়েকজনকে ছুটতে হবে। আমি আর শাঙ্কো গেলেই হবে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো কোমরে তরোয়াল গুঁজে জাহাজ থেকে নামল।

বেশ কিছু গাছের নীচে বাজার বসেছে। ফ্রান্সিস লক্ষ করল, প্রথম গাছটার নীচে কোমরে তরোয়াল গোঁজা কয়েকজন কালো যোদ্ধা। যোদ্ধারা ওদের দুজনকে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। ফ্রান্সিস বিপদ আঁচ করল। কিন্তু এখনই ফিরে যেতে গেলে বিপদ বাড়বে।

ফ্রান্সিস বাজারের কাছে এল। একজন বৃদ্ধ কেনাকাটা সেরে ফিরছিল। বৃদ্ধটি ফ্রান্সিসদের দেখে হাসল। ফ্রান্সিস একটু অবাকই হল। বৃদ্ধটি হাসল কেন? ও বৃদ্ধের কাছে গেল। জিগ্যেস করল, আমাদের দুজনকে দেখে হাসলেন কেন?

তোমরা বিদেশি, তাই দেখে। বৃদ্ধ আবার হাসল।

হাঁ, আমরা বিদেশি। এই বন্দরের নাম কী? শাঙ্কো বলল।

ত্রিম্বা।

এখানকার রাজা কে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

রাজা নেই। তবে শ' দেড়েক বছর আগে এক সুলতান ছিল। সুলতান হানিফ।

মুসলিম রাজা? ফ্রান্সিস অবাক।

হ্যাঁ। কিছুদূরে সুলতানের বাড়ি এখন ধ্বংসস্তূপ।

খুব বড়লোক ছিল বুঝি? কৌতূহল বাড়তে থাকে ফ্রান্সিসের।

হ্যাঁ। তার স্বর্ণভাণ্ডারের কথা লোকে এখনও বলে।

এখান থেকে পোর্তুগাল কত দূরে?

তা বলতে পারব না। গরিব মানুষ। দেশ বিদেশে ঘুরব সাধ্য নেই। বৃদ্ধ উত্তর দিল।

তবু কিছু তো ধারণা আপনার আছে?

হবে উত্তরমুখো কোথাও।

ঠিক আছে। এটুকু জানলেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ওদের কথা শেষ হতে না হতেই গাছের নীচে দাঁড়ানো যোদ্ধার দল ওদের কাছে এল। একজন রোগাটে চেহারার যোদ্ধা জিগ্যেস করল, কী কথা হচ্ছিল তোমাদের?

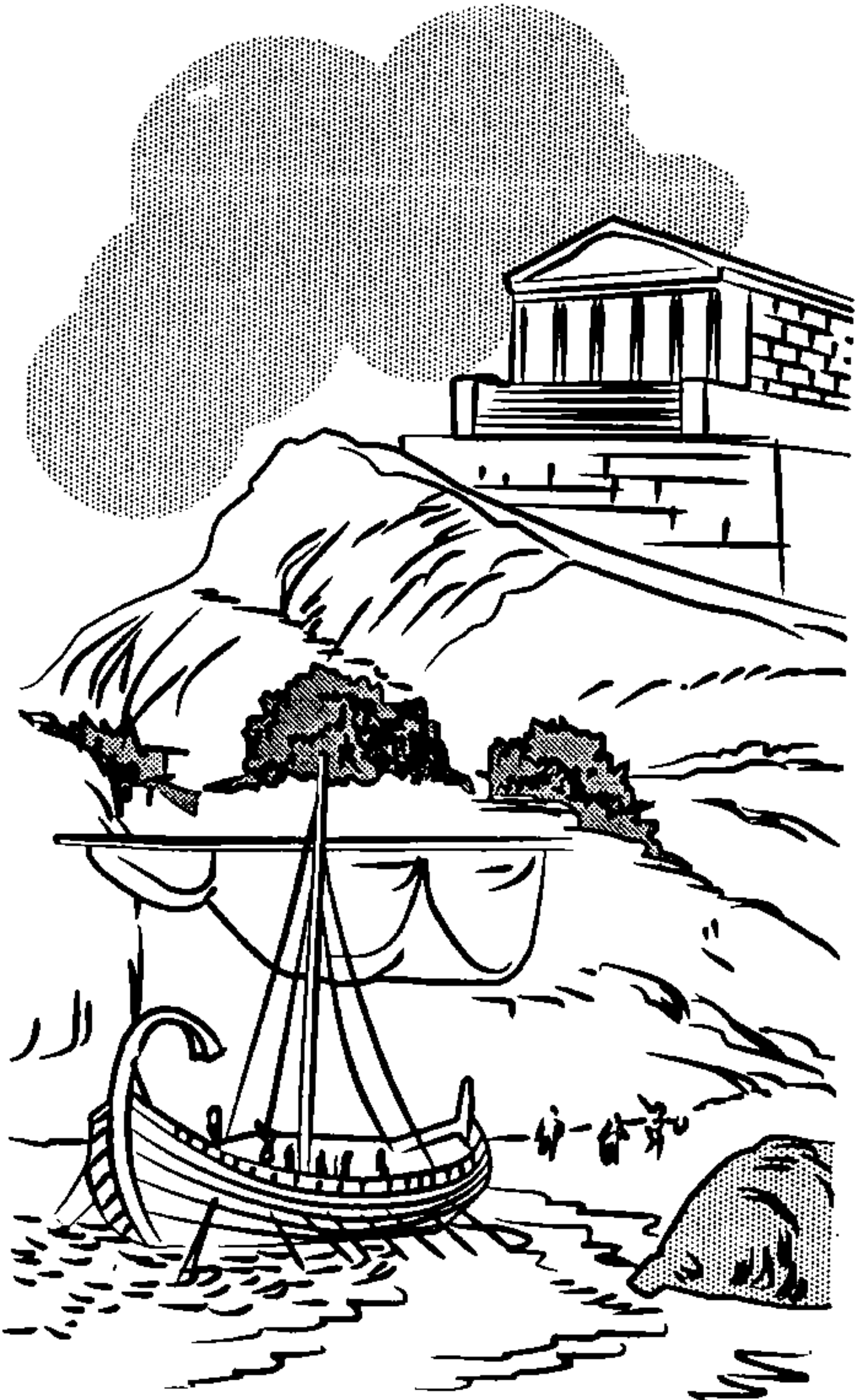
এখান থেকে পোর্তুগাল কতদূর সেটাই জানতে চেয়েছিলাম। শাঙ্কো বলল।

তোমরা বিদেশি? যোদ্ধাটি জানতে চাইল।

হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং। শাঙ্কো বলল।

লুঠেরার জাত। যোদ্ধা যুবকটি হেসে বলল।

লোকে বলে বটে। কিন্তু আমরা লুঠেরা নই। বরং আগের বন্দরে একদল



লুঠেরা আমাদের জাহাজ লুঠ করেছে। ফ্রান্সিস ওদের কথোপকথনে যোগ দিল।

তোমরা এখানে এসেছ কেন? যোদ্ধা যুবকটি বলল।

আমাদের দেশ মানে ইউরোপ কতদূর সেটা জানতে। ফ্রান্সিস বলল।

তরোয়াল এনেছ কেন?

যদি হঠাৎ আক্রান্ত হই তাহলে লড়াই করব বলে, ফ্রান্সিস বলল।

আমাদের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে পারবে?

তোমাদের সঙ্গে লড়াই করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও নেই। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে তরোয়াল ফেলে দাও। যোদ্ধাটি বলল।

বেশ, আমরা আমাদের জাহাজে ফিরে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস জানাল।

না। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে তরোয়াল খুলে বলল, আমাদের সঙ্গে লড়াই করো। যদি তারপরেও বেঁচে থাকো তবে জাহাজে ফিরে যাবে।

আমরা দুজনমাত্র। লড়াই করব না। ফ্রান্সিস বলল।

কাপুরুষ! তাচ্ছিল্যে মুখ বাঁকাল যোদ্ধাটি।

বিনা কারণে রক্তপাত আমরা চাই না। ফ্রান্সিস বলল।

তোমাদের বন্দী করা হল। চলো আমাদের সঙ্গে।

কোথায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

আমাদের দলপতির কাছে। দলপতি কী হুকুম করে দেখো। যোদ্ধাটি ওদের বলল।

কিন্তু আমরা তো কোনো অপরাধ করিনি। এবার শাঙ্কো উত্তর দিল।

সেসব দলপতি বুঝবে। এখন চুপচাপ আমাদের সঙ্গে চলো।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল, ওদের বাধা দিতে যাওয়া বোকামি হবে।

কথাটা ও নিজেদের ভাষায় বলল। ফলে যোদ্ধারা কিছু বুঝল না। যে ওদের সঙ্গে কথা বলছিল সেই যোদ্ধাটি বেশ চড়াগলায় হুকুম করল, তরোয়াল ফেলে দাও।

ফ্রান্সিস বলল, শাঙ্কো, তরোয়াল ফেলে দাও। শাঙ্কো তবু ইতস্তত করছিল, যোদ্ধাটি শাঙ্কোর মাথার ওপর তরোয়াল উঁচিয়ে ধরল। এবার শাঙ্কো তরোয়াল ফেলে দিল।

একজন যোদ্ধা তরোয়াল দুটো তুলে নিল।

যোদ্ধাদের পেছনে পেছনে যেতে যেতে ফ্রান্সিস শাঙ্কো দেশীয় ভাষায় বলল, অতজনের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে আমাদের জীবন বিপন্ন হবে। দেখা যাক ওদের দলপতি কী বলে?

বাজার এলাকা ছাড়িয়ে লালচে ধুলোর পথ। মাঝে মাঝে সমুদ্রের দিক থেকে জোর হাওয়া আসছে। লালচে ধুলো উড়ছে। চোখ-মুখ ঢেকে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট পাহাড়।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পরে ফ্রান্সিসরা দেখল সামনে একটা বড় বাড়ি। বাড়িটা তৈরি পাথর আর কাঠ দিয়ে। তার পাশেই একটা ছোট সম্পূর্ণ ঘর।

শাঙ্কো মৃদুস্বরে বলল, পাশেরটা নিশ্চয়ই কয়েদঘর।

হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। কিছু বলল না।

বড় ঘরটার দরজা খোলা। সেই রোগা যোদ্ধাটি বলল, ভেতরে ঢোকো। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ঘরটায় ঢুকল। বাইরের চড়া রোদ থেকে এসে প্রথমে কিছুই দেখতে পারছিল না। চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে দেখল, একজন বয়স্ক লোক একটা কাঠের আসনে বসে আছে। আশ্চর্য! এই কালো লোকদের দেশে বয়স্ক লোকটি শ্বেতকায়। বোঝাই যাচ্ছে এ দলপতি। দলপতি ফ্রান্সিসদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর মোটা গলায় বলল, তোমরা বিদেশি?

আপনিও তো বিদেশি। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। পোর্তুগীজ। আমার নাম এস্তানো। তোমরা? দলপতির প্রশ্ন।

আমরা ভাইকিং। আমার নাম ফ্রান্সিস।

তোমাদের বদনাম আছে। এস্তানো বলল।

জানি। আমরা তার পরোয়া করি না। ফ্রান্সিস গলায় জোর দিয়ে বলল।

তুমি দেখছি বেশ তেজি। ভালো।

ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না।

কিন্তু তোমাদের তো বিশ্বাস নেই।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল।

অবিশ্বাসের কোনো কাজ তো আমরা করিনি। এবার বলল শাঙ্কো।

তাছাড়া আমরা এখানে থাকতে আসিনি। ফ্রান্সিস যোগ করল।

আসার সময় তো একটা ছোট পাহাড় দেখেছ?

হ্যাঁ দেখেছি। পেছন দিকে। ফ্রান্সিস বলল।

ঐ পাহাড় থেকে কত যে চুনিপান্না মূল্যবান পাথর পেয়েছি। দেখবে?

না। ওসব দেখে কী হবে? ফ্রান্সিস বলল।

ঐ চুন্নিপান্না সব বিক্রি করে দেব। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে রাজার হালে বাকি জীবন কাটিয়ে দেব।

এসব আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা শুনে কী করব? ফ্রান্সিস বলল।

এইজন্য শুনবে যে তোমরা সেই দামি পাথর চুরি করতে এখানে এসেছ।

ফ্রান্সিস অবাক। কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। শাঙ্কো বলে উঠল— আপনার দামি পাথরের কথা আমরা এই প্রথম শুনলাম।

উঁহু। এস্তানো হাসল, তোমরা সব খোঁজখবর নিয়েই এসেছ।

এ আপনার অন্যায় দোষারোপ। ফ্রান্সিস প্রতিবাদ করে উঠল।

তোমরা জাহাজে চড়ে এসেছ? এস্তানো জানতে চাইল।

হ্যাঁ, ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল।

বাজারে একজন বুড়োর কাছে এসব খবর পেয়েছে। এস্তানো আবার হাসল।

আমরা খোঁজ নিচ্ছিলাম—শাঙ্কো বলতে গেল। এস্তানো ডান হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল। বলল, এই ত্রিম্বার সর্বত্র আমার চর আছে। আমি এখানে বসে থাকি, কিন্তু এই তল্লাটের সব খবর রাখি।

ফ্রান্সিস বুঝে উঠতে পারল না। কী বলবে তবে এটা বুঝল যা-ই বলুক না কেন এস্তানো ওদের চোর অপবাদ দেবেই। তার ওপর জলদস্যু বলে ওদের বদনাম তো আছেই। তাই ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। এস্তানো রোগা যোদ্ধাটির দিকে তাকাল। বলল, ওদের কয়েদঘরে নিয়ে যাও। শাঙ্কো মৃদুস্বরে দেশীয় ভাষায় বলল, আবার কয়েদঘর। ফ্রান্সিসও সেই ভাষায় বলল, উপায় নেই। ও যা বলে সে ভাবেই চলতে হবে।

পালাব না? শাঙ্কো জানতে চাইল।

সব দেখে বুঝে তবে। এখন চলো, বলে এগোল ফ্রান্সিস।

রোগা যোদ্ধাটির পেছনে পেছনে ওরা চলল। ওদের অনুমান ঠিক। সেই পাথরের ঘরের শক্ত কাঠের দরজার সামনে আনা হল ওদের। তিনজন প্রহরী দাঁড়িয়ে। তারা ঘরের তালা খুলে দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিসরা ঢুকল।

ঘর অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকার বাড়ল। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল।

আস্তে আস্তে অন্ধকার চোখে সয়ে এল। ওরা দেখল মেঝেতে শুকনো ঘাস বিছানো। আর তিন-চারজন কালো মানুষ বন্দী সেখানে। তারা ফ্রান্সিসদের একবার শুধু দেখল। বুঝল না দলপতি নিজে শ্বেতাঙ্গ হয়ে সেই সাদা মানুষদেরই বন্দী করল কেন?

ফ্রান্সিস বিছানো ঘাসে শুয়ে পড়ল। আবার কয়েদঘরের একঘেয়ে অসহ্য জীবন। কিন্তু কিছুই করার নেই। দরজার দিকে তাকাল। পালাবার ছক কষতে হলে ঘরের সব কিছু ভালোভাবে দেখতে হয়। ঘরটায় কোনো জানালা নেই। দরজায় কিছু ফাঁকফোঁকর করা। ওখান দিয়েই যা আলো-বাতাস আসছে।

একজন বন্দী ফ্রান্সিসকে জিগ্যেস করল, তোমরা তো দলপতি বিস্তোনোর মতো সাদা মানুষ। তোমাদের বন্দী করল কেন?

আমরা নাকি এস্তানোর দামি পাথর চুরি করতে এসেছি।

আমাদেরও চোর বলেছে। বন্দী করেছে। পালাতে হবে। কালো যুবকটি বলল।

দেখো চেষ্টা করে পারো কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালে ওদের সামান্য খাবার দিল। সবজির ঝোল আর একটা করে পোড়া রুটি। শাঙ্কো প্রতিবাদ করল, এত কম খাবার দিলে হবে? এই খেয়ে কি খিদে মেটে?

সেটা দলপতিকে বলো। তার হুকুমেই দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশনকারী বলে চলে গেল।

একটু বেলায় কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। এক প্রহরী ঢুকে জিগ্যেস করল, ভাইকিং কারা?

আমরা দুজন। শাঙ্কো বলল।

চলো, দলপতি ডেকেছে।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। চলল প্রহরীদের প্রহরায় এস্তানোর ঘরের দিকে।

আধো-অন্ধকার ঘরে ঢুকল দুজনে। এস্তানো সেই একইভাবে কাঠের আসনে বসে আছে। ওদের দেখে হেসে বলল, কেমন আছ তোমরা?

ভালো নেই। আধপেটা খেতে হচ্ছে শাঙ্কো জানাল।

ঠিক আছে। খাবারের পরিমাণ বাড়ানো হবে। এস্তানো বলল। তারপর যোগ করল, তোমাদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ আছে।

আপনার চরেরা বলেছে বোধহয়? ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। তাছাড়া যে বুড়োটার সঙ্গে তোমরা কথা বলেছিলে তাকেও নিয়ে আসা হয়েছিল। সে বলেছে, তোমরা নাকি সুলতান হানিফের গুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডারের কথা জানতে চেয়েছিলে?

মিথ্যে কথা। আমরা জানতে চেয়েছিলাম পোর্তুগাল কতদূর। ফ্রান্সিস বলল।

উঁহু, এস্তানো মাথা নাড়ল। তোমরা সুলতান হানিফের গুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডারের কথা জানতে চেয়েছিল।

আমরা এই প্রথম সুলতান হানিফের নাম জানলাম। বুড়ো এটুকু বলেছিল যে, দেড়শো দু'শো বছর আগে এখানে একজন সুলতান রাজত্ব করে গেছেন। সুলতানের স্বর্ণভাণ্ডার নিয়ে আমরা কিছুই জানি না। ফ্রান্সিস বলল।

বিশ্বাস হচ্ছে না। এস্তানো মাথা নাড়ল।

ঠিক আছে সেই স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করে দেব। ফ্রান্সিস বলল।

এস্তানো বেশ চমকে উঠল, দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে আমি সেই স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারিনি। আর তুমি কালকে এসে বলছ পারবে!

হ্যাঁ, পারব, ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে জানাল। শাঙ্কো একবার ফ্রান্সিসের প্রতিজ্ঞাদৃঢ় মুখের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস এখনই এতটা নিশ্চিত হচ্ছে কেন? মৃদুস্বরে সে বলল, এতটা নিশ্চিত হয়ো না।

উপায় নেই। মুক্তি পেতে হবে। ফ্রান্সিসও তেমনি মৃদুস্বরে বলল।

বিস্ময়ের বদলে এস্তানোর মনে এবার উঁকি দিল সন্দেহ। সে বলল, তোমরা স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করে সব সোনা নিয়ে পালিয়ে যাবে!

একটা সোনার টুকরোও নেব না। ফ্রান্সিস তাকে অভয় দিল।

এবার শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল, এই বন্ধু অনেক গুপ্ত ধনভাণ্ডার বুদ্ধি খাটিয়ে পরিশ্রম করে উদ্ধার করেছে। আপনি ওকে বিশ্বাস করতে পারেন।

বেশ! দেখো চেষ্টা করে। এস্তানো অবিশ্বাসের সুরে বলল।।

আমি সুলতান হানিফের কথা, স্বর্ণভাণ্ডারের কথা বিস্তৃতভাবে জানতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

তাতে লাভ?

এইসব ইতিহাসের মধ্যেই থাকে গুপ্তধনের সূত্র। আপনি বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

এস্তানো বলতে শুরু করল, সুলতান হানিফের জন্ম পারস্যে। ভাগ্যান্বেষণে মিশরে আসে। সেখান থেকে জাহাজে করে এখানে। পথে জলদস্যুদের পাল্লায় পড়ে। জাহাজ লুঠ হয়। হানিফ সেই জলদস্যুদের দলে ঢুকে পড়েছিল। সেই দস্যুরা বেশ কিছু জাহাজ লুঠ করেছিল। লুণ্ঠিত বেশ কিছু জাহাজ লুঠ করেছিল। লুণ্ঠিত সোনা-হীরে-মণি-মুক্তো লুকিয়ে রাখার জন্য দ্বীপ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। হানিফ চোরের ওপর বাটপাড়ি করল।

কী রকম! ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

একদিন গভীর রাতে জাহাজে রাখা ধনসম্পত্তি সব চুরি করে একটা নৌকায় চড়ে পালিয়ে গিয়েছিল হানিফ। সমুদ্রের উঁচু উঁচু ঢেউয়ের সঙ্গে লড়ে একসময় এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল। বেশ অর্থ ব্যয় করে ঐ পাহাড়ের নীচে বিরাট বাড়ি তৈরি করেছিল, এখন সেটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে আর নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করে দিল। এখানকার কালো অধিবাসীরা ওকে স্বীকারও করে নিয়েছিল।

তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

সুলতান হানিফের ইচ্ছে হল, সে আরো ধনী হবে। সোনার ভাণ্ডার গড়ে তুলবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে এখানকার কিছু বলশালী যুবকদের নিয়ে সে একটা লুঠেরার দল গড়ে তুলল। শক্তপোক্ত একটা জাহাজও কিনল।

তারপর এই সুমদ্রে যাতায়াতকারী জলদস্যুদের জাহাজ আক্রমণ করতে লাগল। জলদস্যুদের হারিয়ে দিয়ে সে তাদের ধনসম্পদ লুঠ করতে লাগল। যাত্রীবাহী জাহাজও বাদ গেল না। দিনে দিনে তার সংগ্রহ করা সোনা বেড়েই চলল।

এস্তানো থামল। তারপর আবার বলতে লাগল—এ কাহিনীর সঙ্গে আমার এক পূর্বপুরুষ জড়িয়ে আছে। তিনিও এস্তানো নামে পরিচিত ছিলেন। আসলে আমরা পূর্বপুরুষদের নাম বহন করি কিনা, তাই।

বলেন কি? আপনার এক পূর্বপুরুষ জলদস্যু ছিল? ফ্রান্সিস একটু অবাক হয়েই বলল।

হ্যাঁ। সেই এস্তানো জলদস্যুদের দলে ঢুকেছিলেন। পরে ক্যাপ্টেন হয়ে ছিলেন।

অনেকে কিন্তু বংশের সঙ্গে জলদস্যুদের সম্পর্ক স্বীকার করে না। ফ্রান্সিস বলল।

আমি স্বীকার করি। যা সত্য তা জানাতে লজ্জা বা ভয় করি না।

ঠিক আছে। বলুন ফ্রান্সিস বলল।

সুলতান হানিফ একদিন ক্যাপ্টেন এস্তানোর জাহাজ আক্রমণ করে বসল। আর সেটাই হল মস্ত ভুল। ক্যাপ্টেন এস্তানোর জলদস্যুরা ছিল অভিজ্ঞ যোদ্ধা। সংখ্যাতেও বেশি। হানিফ হার স্বীকার করতে বাধ্য হল। কিন্তু তাকে বন্দী করা গেল না। বন্দিত্বের অপমান এড়াতে সে তরোয়াল বিঁধিয়ে আত্মহত্যা করল। তার স্বর্ণভাণ্ডার গুপ্তই রয়ে গেল। এস্তানো থামল।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, সুলতান হানিফ কি কোনো সূত্র রেখে যাননি?

সূত্র বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু নয়। এসব কাহিনি আমাদের পরিবারে অনেকদিন যাবৎ চলে আসছে।

তা থেকে কিছু জানা আছে আপনার? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

হ্যাঁ, একটা ব্যাপার জানি। কিন্তু সেটা কোনো সূত্র কিনা বলতে পারব না।

তবু আপনি বলুন। ফ্রান্সিস আগ্রহী হল।

সুলতান হানিফ আত্মহত্যা করলে তার পোশাক তল্লাশি করেছিলেন আমার পূর্বপুরুষ এক ক্যাপ্টেন এস্তানো পেয়েছিলেন একটা সাদা চামড়ার টুকরো। তাতে গোলমতো আঁকাবাঁকা রেখা। দুর্বোধ্য।

ফ্রান্সিস বেশ চমকে উঠল। সেই চামড়ার টুকরোটা কোথায়?

আমার কাছেই আছে। ওটা দেখেই তো সন্ধান চালিয়েছিলাম।

ওটা দেখতে পারি?

দেখতে দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু স্বর্ণভাণ্ডারের সন্ধান পেলে সব আমার। তুমি কিন্তু কিছুই পাবে না। এস্তানো বলল।

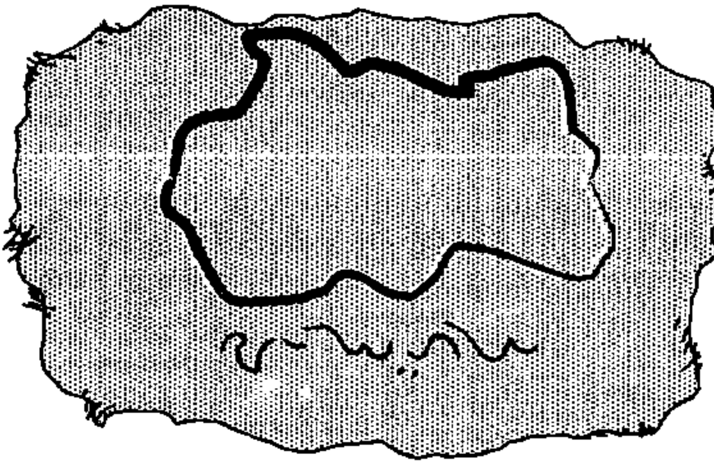
আমি তো আগেই বলেছি। স্বর্ণভাণ্ডারের ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

বেশ। তাহলে দেখো। এই বলে এস্তানো পোশাকের ভেতর থেকে চামড়ার টুকরোটা বের করে ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস দেখল একটা কালচে হয়ে যাওয়া চামড়ার টুকরো। একপিঠে আঁকাবাঁকা গোলমতো দাগ। নীচে মনে হল মাত্র দুটো শব্দ আরবী অক্ষরে লেখা।

নীচে কী লেখা? ফ্রান্সিস দেখতে দেখতে বলল।

একজন আরবদেশীয় লোককে দিয়ে পড়িয়েছিলাম, সে বলেছিল ওতে নাকি দুটো শব্দ লেখা—সূর্য দর্শন।

নকশাটা দেখতে এরকম—



এই আঁকাবাঁকা রেখাগুলো কী মনে হয় আপনার? ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল।

গুহামুখ এস্তানো বলল।

ঐ পাহাড়ে তাহলে একটা গুহা আছে।

হ্যাঁ। আর আছে একটা হ্রদমতো।

হ্রদ? পাহাড়ের মধ্যে? ফ্রান্সিস একটু অবাকই হল।

হ্যাঁ। প্রকৃতির খেয়াল। এস্তানো বলল।

সব দেখতে হবে। নকশাটা আমি রাখব?

ঠিক আছে। ওটা হারিও না যেন।

না-না। আমি যত্ন করে রেখে দেব। এটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। কোনোমতেই হারানো চলবে না। কিন্তু একটা কথা, কয়েদঘরে বসে তো এই নকশার রহস্য সমাধান করা যাবে না। আমাদের চলাফেরায় স্বাধীনতা দিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

তোমরা যদি স্বর্ণভাণ্ডার খোঁজার নাম করে পালিয়ে যাও। এস্তানো বলল।

সঙ্গে দুজন সশস্ত্র প্রহরী দিন। তাহলে নিরস্ত্র আমরা পালাতে পারব না, প্রস্তাব দিল ফ্রান্সিস।

বেশ। তাহলে দুজন নয়, তিনজন সশস্ত্র প্রহরী তোমাদের পাহারা দেবে।

তাহলে আজ দুপুর থেকেই কাজে নামব। ফ্রান্সিস বলল।

কোনো আপত্তি নেই। প্রহরীদের বলে দিচ্ছি। এস্তানো বলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দুপুরে খেতে বসল। এবেলা খাবারের পরিমাণ বেশি। ফ্রান্সিস হাসল। শাঙ্কো বলল, তুমি হাসছ?

খাবার কত বাড়িয়ে দিয়েছে দেখেছ! সোনার লোভ বড় সাংঘাতিক।

তুমি এত নিশ্চিত হয়ে বললে, না পারলে ভীষণ বিপদে পড়ব।

আগে সব দেখি শুনি। এই চামড়ার টুকরোয় আঁকা নকশার রহস্যের সমাধান

নিশ্চয়ই করতে পারব। তাহলেই সুলতান হানিফের স্বর্ণভাণ্ডার হাতের মুঠোয়।

আজ থেকেই কাজ শুরু করবে?

হ্যাঁ। দেরি করব না। আমাদের দেরি দেখলে বন্ধুরা চিন্তায় পড়বে। ফ্রান্সিস খেতে খেতে বলল।

খাওয়া শেষ হলে একজন প্রহরী এগিয়ে এল। সে বলল, চলো। তোমরা নাকি সোনা খুঁজতে যাবে? আমরা তিনজন তোমাদের পাহারা দেব।

হ্যাঁ। সেই কথাই হয়েছে। দুটো মশাল নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে কয়েদঘরের বাইরে বেরিয়েএল। সবাই পাহাড়মুখো চলল। প্রহরীর একজনের হাতে দুটো নেভানো মশাল।

পাহাড়ের কাছে এসে গুহামুখটা দেখতে পেল ফ্রান্সিস। সে কোমরের ফেট্টিতে গোঁজা চামড়ার টুকরোটা বের করল। গুহামুখের সঙ্গে মেলাল। মাথা নেড়ে বলল, এন্তোনো ভুল দেখেছে। গুহামুখের সঙ্গে আঁকাবাঁকা রেখার কোনো মিল নেই।

তাহলে এই আঁকাবাঁকা রেখা কীসের? শাঙ্কো জানতে চাইল।

সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

প্রহরীর একজন চকমকি ঠুকে মশাল দুটো জ্বালাল। তারা সবাই ঢুকল অন্ধকার গুহার ভেতরে। মশালের আলোয় দেখল চারপাশে এবড়ো-খেবড়ো পাথর। ছাদ এত নিচু যে মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। কিছুটা গিয়েই অবশ্য ছাঁদ উঁচু হল। তখন সোজা হয়ে ওরা এগিয়ে চলল।

হঠাৎই আলোর ঝলকানি। সামনেই একটা ছোট জলাশয়। একে হ্রদ বলা যায় না। তেমন বড় কিছু নয়। জলাশয়ের তীরে দাঁড়িয়ে ওপরে তাকাতেই ফ্রান্সিস অবাক। ওপরটায় বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে ফাঁকা। আকাশ দেখা যাচ্ছে। সূর্য অবশ্য সরে গেছে। তবে তার আলো আসছে। তাই জলাশয় এলাকাটা মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওপর থেকে কি অতীতে কখনও বিরাট পাথরের চাঁই ভেঙে পড়েছিল? তাই কি ওপরটা ফাঁকা? ফ্রান্সিসের ভাবনার মধ্যে শাঙ্কো বলে উঠল, গুহা তো এরপরেই শেষ। এখানে কি আর কিছু দেখার আছে?

না। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল, এবার পাহাড়ের ওপরটা দেখব, চলো।

শাঙ্কো প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলল, চলো, ওপরে ওঠা যাক।

সবাই গুহা থেকে বেরিয়ে এল। তারপর পাথরে পা রেখে রেখে ওপরে উঠতে লাগল। বেশ কিছুটা উঠতেই সেই ফাঁকা জায়গাটায় এল। ফ্রান্সিস পাথরে ভর রেখে ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নীচে জলাশয়টার দিকে তাকাল। জলাশয়টা মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উঠে আসবে হঠাৎ জলাশয়ের চারপাশের পাড়টা কেমন পরিচিত মনে হল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে কোমরের ফেট্টিতে গোঁজা চামড়ার টুকরোটা বের করল। আঁকাবাঁকা রেখা।

আশ্চর্য! জলাশয়ের পাড়ও তো এমনি আঁকাবাঁকা। ও আবার পাথরে ভর

রেখে ফাঁকা জায়গাটায় ঝুঁকে পড়ল। জলাশয়ের আঁকাবাঁকা পাড়টা দেখল। নকশার সঙ্গে মেলাল। হুবহু এক। জলাশয়টির পাড়ই নকশাটাতে আঁকা হয়েছে। ও গলা চড়িয়ে ডাকল, শাঙ্কো। শাঙ্কো তখন আরও ওপরে উঠতে যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল, কী ব্যাপার? ফ্রান্সিস ওর হাতে নকশাটা দিল। বলল, ঝুঁকে পড়ে নীচের জলাশয়টার দিকে তাকাও। দেখ ওটার আঁকাবাঁকা পাড়ের সঙ্গে নকশার আঁকাবাঁকা রেখা মেলে কিনা!

শাঙ্কো পাথরে ভর রেখে ফাঁকটার মধ্যে দিয়ে জলাশয়টার দিকে তাকাল। তারপর নকশাটা বের কর জলাশয়ের আঁকাবাঁকা পাড়ের সঙ্গে মেলাল। ও অবাক হয়ে গেল। দুটো হুবহু মিলে যাচ্ছে। শাঙ্কো লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধ্বনি তুলল, ও হো হো—

ফ্রান্সিস হেসে ভাইকিংদের ভাষায় বলল, ঐ জলাশয়েই আছে সুলতান হানিফের গুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডার।

—কিন্তু সূর্য দর্শন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

তার মানে সূর্য যখন মাথার ওপরে আসবে, উজ্জ্বল রোদ পড়বে, নীচে জলাশয় স্পষ্ট দেখা যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে কী করবে এখন?

ফিরে যাব। এখন সূর্য সরে গেছে।

জলাশয়ের জলে স্পষ্ট কিছুই দেখা যাবে না। কাল জলাশয়ে নামব যখন সূর্য ঠিক মাথার ওপর থাকবে।

ফিরে আসার সময় ফ্রান্সিস একজন প্রহরীকে বলল, তোমাদের দলপতি এস্তানো তো আমাদের জাহাজে যেতে পারবে না। অথচ প্রায় কুড়ি হাত লম্বা শক্ত দাড় চাই। তোমরা দিতে পারবে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। কয়েদঘরেই দড়ি রাখা আছে। প্রহরীটি জানাল।

প্রহরীদের সঙ্গে ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরে ফিরে এল।

শাঙ্কো, দেখো তো এখানে দড়ি আছে কিনা। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়তে পড়তে বলল। শাঙ্কো এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে দড়ি পেল। দড়িটা টেনেটুনে বুঝল শক্ত দড়ি। ওরা অভিজ্ঞ, সহজেই দড়ি কত শক্ত বুঝতে পারে।

পরদিন দুজনে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। তারপর প্রহরীদের পাহারায় ওরা যখন জলাশয়ের ধারে পৌঁছল তখন সূর্য প্রায় মধ্যগগনে।

ওরা অপেক্ষা করতে করতেই সূর্য ফাঁকা জায়গাটার মাথায় এল। চড়া রোদ পড়ল জলাশয়ে।

শাঙ্কো দড়ি চেপে ধরল। ফ্রান্সিস দড়ি ধরে ধরে জলাশয়ে নামল। জলের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চারদিক।

এবার চিন্তা—কোথায় থাকতে পারে সেই গুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডার। ফ্রান্সিস এবড়ো খেবড়ো পাথুরে দেওয়ালের গায়ে হাত দিয়ে দেখে দেখে খুঁজতে লাগল কোনো গোপন গহ্বর পায় কিনা।

হঠাৎ কী যেন সাঁৎ করে সরে গেল।

ফ্রান্সিস ঘুরে তাকাল। হাঙর! ভীষণভাবে চমকে উঠল ফ্রান্সিস। দড়ি ধরে সে মারল এক হ্যাঁচকা টান। ওপরে শাঙ্কো তার সংকেত পেয়ে তাড়াতাড়ি দড়িটা গোটাতে শুরু করল। ফ্রান্সিস দড়িটা দু'পায়ে জড়িয়ে ধরল, ফলে দড়ির সঙ্গে সেও উঠতে লাগল ওপরে। ওদিকে হাঙরটা ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস প্রায় তখন পৌঁছে গেছে। সে এক লাফ দিয়ে পাড়ে উঠে পড়ল। ভয়ে উত্তেজনায় সে তখন হাঁপাচ্ছে।

কী হল, লাফিয়ে উঠে পড়লে যে? শাঙ্কোর স্বরে রাজ্যের বিস্ময়।

হাঙর, কোনো রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল ফ্রান্সিস।

বলো কী? এখানে! শাঙ্কো স্তম্ভিত।

হ্যাঁ। দেখছো না সমুদ্র একেবারে পাহাড়ের ধারেই। নিশ্চয় এই জলাশয়ের সঙ্গে সমুদ্রের যোগ আছে।

নির্ঘাত আছে, নইলে এখানে হাঙর আসবে কোথা থেকে? তা এখন কী করবে?

আবার নামব। হাঙরটাকে মারতে হবে। প্রহরীদের কাছ থেকে একটা তরোয়াল চেয়ে আনো।

শাঙ্কো প্রহরীদের কাছে গিয়ে হাঙরের ব্যাপারটা বলল। শুনে তারাও কম আশ্চর্য হল না। তারপর যখন শুনল ফ্রান্সিস তরোয়াল নিয়ে জলে নামবে তখন তাদের মুখে আর কথা যোগায় না। এই বিদেশিটা জলের মধ্যে একা হাঙরের সঙ্গে লড়াই করবে? সত্যি-মিথ্যে যাচাই করতে একজন তার তরোয়াল তুলে দিল শাঙ্কোর হাতে।

তরোয়াল পেয়ে আবার ডুব দিল ফ্রান্সিস। আস্তে আস্তে নামতে লাগল নীচে। দাঁত দিয়ে তরোয়াল চেপে ধরে আছে। ওই তো হাঙরটা! দড়ি ছেড়ে এবার হাত ও পায়ে আস্তে জল ঠেলে এক জায়গায় স্থির হয়ে রইল সে। ভয়াল বিভীষিকা তার চারপাশে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে এক কোনার দিকে গিয়েই সেটা ছুটে এল ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে। হাঙরটা যেভাবে আক্রমণ করবে ফ্রান্সিস সেটা আগেই আঁচ করেছিল তাই সে দ্রুত জল ঠেলে আরও কিছুটা নীচে নেমে গেল। তরোয়াল নিল হাতে। হাঙর তখন তার মাথার ওপর এসে গেছে। ফ্রান্সিস শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে তরোয়ালটা হাঙরের পেটে ঢুকিয়ে দিল। নরম শরীর ভেদ করে সেটা প্রায় অর্ধেকটা ঢুকে গেল। জল উঠলো লাল হয়ে। ফ্রান্সিস তরোয়াল টেনে বার করেই দড়ি ধরে ঝাঁকানি দিতে শুরু করল। শাঙ্কো তৈরি ছিল। তাড়াতাড়ি দড়ি টেনে ফ্রান্সিসকে তুলে নিল ওপরে।

হাঙরটা মরেছে? শাঙ্কো জিগ্যেস করল।

এখুনি মরবে। ওর হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছি। হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল।

এখন কি ফিরে যাবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

ফ্রান্সিস ওপারের দিকে তাকাল। সূর্য সরে গেছে।; তবে উজ্জ্বল রোদ এখনও আসছে।—না আবার নামব। এখনও আলো আছে। ফ্রান্সিস বলল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ফ্রান্সিস আবার দাঁড় ধরে জলে নামল। নীচে নামতেই দেখল তিনটে হাঙর ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা বড়, দুটো ছোট। মৃত হাঙরের চিহ্নমাত্র নেই। ওরা খেয়ে ফেলেছে।

ফ্রান্সিসকে আবার ওপরে উঠে আসতে হল। শাঙ্কো বলল, কী হল, উঠে এলে যে?

ফ্রান্সিস বলল তিনটে হাঙর এসেছে। এখন আর নামা যাবে না। আলোও কমে আসছে। ফিরে চলো। কালকে এ সময় আসতে হবে।

দড়ি তুলে নিয়ে ওরা ফিরল।

জলের লাল রং দেখে প্রহরীরা বুঝেছিল হাঙরটা তরোয়ালের ঘা খেয়ে মারা গেছে। ওরা বেশ সমীহ নিয়ে ফ্রান্সিসকে দেখতে লাগল। একা একটা তরোয়াল দিয়ে হাঙর মেরে ফেলল?

বিকেলের দিকে এন্তানো কয়েদঘরের দরজার কাছে এল। ফোকর দিয়ে তাকিয়ে বলল, ওখানে জলে নাকি হাঙর আছে।

হ্যাঁ। একটাকে মেরেছি। এখনও তিনটে আছে। ফ্রান্সিস বলল।

বুঝেছি। সমুদ্রের সঙ্গে এই জলাশয়ের যোগ আছে। একটা সুড়ঙ্গ মতো আছে সমুদ্রের দিক থেকে।

এটা আগে বলেননি।

তুমি ঐ জলাশয়ে নামবে তা তো আমি জানতাম না। যাক গে, স্বর্ণভাণ্ডারের হদিস পেলে কিছু?

এখনও সন্ধান পাইনি। কালকে যাব। দেখি।

দেখো চেষ্টা করে। তোমাদের মাংস-টাংস খেতে দিতে বলেছি। এন্তানো হেসে বলল।

হ্যাঁ। এখন খাবারটাবার ভালোই পাচ্ছি। শাঙ্কো বলল।

এন্তানো চলে গেল।

ফ্রান্সিস ডাকল, শাঙ্কো!

বলো। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

এন্তানো ভালো করেই জানে ঐ জলাশয়ে হাঙর আসে। হয়তো সারা পাহাড় খুঁজেছে। কোনো হদিস না পেয়ে কতকটা আন্দাজে ঐ জলাশয়ে লোকজন নামিয়েছিল। হাঙরের মুখ থেকে কেউ বেঁচে ফেরেনি। এন্তানো সব জানে। শুধু জানে না গুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডার কোথায় আছে। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

পরের দিন ফ্রান্সিসরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। আবার প্রহরীদের পাহারায় চলল পাহাড়ের দিকে।

গুহার কাছে এসে এবার ফ্রান্সিস ভালোভাবে চারদিকে দেখল। পাহাড়ের বাঁপাশ পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। সুড়ঙ্গ থাকলে ওখানেই আছে। ডানপাশে সুলতান হানিফের বাড়ির ধ্বংসস্তূপ।

ওরা গুহায় ঢুকল। মাথা নিচু করে কিছুটা জায়গা পার হল। সামনেই জলাশয়। এখানে আলো আছে।

শাঙ্কো দড়ির একটা মাথা জলে ফেলে অন্য মাথাটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস দড়ি ধরে বলল, শাঙ্কো, তুমি একা ঠিক পারবে না। ওদেরও সময়মতো দড়ি ধরে টানতে বলো।

শাঙ্কো প্রহরীদের কাছে ডাকল। তিনজন এগিয়ে এলে শাঙ্কো বলল, আমি বললে দড়ি ধরে টানতে শুরু করবে।

আবার তোমার বন্ধু হাঙরের পাল্লায় পড়বে নাকি? একজন প্রহরী বলল

দেখা যাক। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল। তারপর দড়ি ধরে জলে নামল। সূর্যের আলো তখন সরাসরি জলাশয়ের ওপর পড়ল। ফ্রান্সিস ডুব দিয়েই দেখল হাত কয়েক দূরে হাঙর তিনটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দড়িতে হ্যাঁচকা টান দিল। চারজন মিলে দড়ি টানতে লাগল। ফ্রান্সিস এবার বেশ দ্রুতই উঠে এল।

এখনও হাঙর আছে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

হ্যাঁ। তিনটেই আছে।

কী করবে?

ওগুলোকে এখান থেকে তাড়াতে হবে।

কী করে?

ফ্রান্সিস শক্ত পাথরের ওপর শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, ভাবছি।

কিছু পরে ফ্রান্সিস উঠে বসল। বলল, হুক কষা হয়ে গেছে। ও একজন প্রহরীকে বলল, আমরা তো বন্দী। তুমি বাজার এলাকা থেকে মাংস নিয়ে এস।

কীসের মাংস?

শুয়োর, ঘোড়া, ভেড়া—যে কোনো মাংস। তিনটে ঠ্যাং আনবে। ফ্রান্সিস বলল।

দাম? প্রহরী হাত বাড়াল।

শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা দিল। প্রহরীরা স্বর্ণমুদ্রা দেখে একটু অবাকই হল। একজন প্রহরী চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে প্রহরী তিনটে ভেড়ার ঠ্যাং নিয়ে এল। ফ্রান্সিস ঠ্যাং তিনটে নিয়ে বলল, চলো, সমুদ্রের দিকে যাব।

সবাই চলল। পাথরের ওপর পা রেখে রেখে সবাই সমুদ্রের ধারে এল। সমুদ্রের ঢেউ পাহাড়ের গায়ে ভেঙে পড়ছে। জল ছিটকে উঠছে। ফ্রান্সিস ঠ্যাং তিনটে কোমরে গুঁজল।

তারপর জলাশয় কোন দিকটায় সেটা বুঝে নিয়ে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ল। জলের তলাটা মোটামুটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল পাথরের গা। ডুব সাঁতার কাটতে গিয়ে হঠাৎই দেখল একটা প্রায় গোল মুখমত। ও বুঝল এখান দিয়েই সুড়ঙ্গের শুরু। জলের ওপর ভেসে উঠল ফ্রান্সিস। একটু দূরেই প্রহরীরা আর শাঙ্কো দাঁড়িয়ে আছে। বুকভরে দম নিয়ে ফের ডুব দিল। প্রায় অন্ধকার গুহামুখ দিয়ে ঢুকে পড়ল। দ্রুত জল ঠেলে ডুব সাঁতার দিয়ে সুড়ঙ্গের অনেকটা ভেতরে ঢুকে

গেল। তারপর কোমরের ফেট্টি থেকে তিনটে ঠ্যাং বের করে একটু দূরে দূরে ঠ্যাংগুলো সুড়ঙ্গের এবড়ো-খেবড়ো মেঝেয় রেখে দিল।

দম ফুরিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস দ্রুত ডুব সাঁতার কেটে সুড়ঙ্গমুখে ফিরে এল। তারপর জল ঠেলে ওপরে ভেসে উঠল খোলা হাওয়ায়। মুখ হাঁ করে বড় বড় শ্বাস নিতে লাগল সে।

একটু ধাতস্থ হতে ধীরে সাঁতার কেটে তীরের দিকে এগিয়ে গেল ফ্রান্সিস। তীরের পেছল পাথরে পা রেখে রেখে উঠে এল।

ফ্রান্সিস, ঠ্যাং তিনটে কী করলে? শাঙ্কো বলল।

সুড়ঙ্গের মধ্যে রেখে এসেছি মাংসের গন্ধে এবার হাঙর তিনটে ওখানে চলে আসবে। তখন জলাশয় নিরাপদ। চলো, গুহার মধ্যে যাই। মাথার ওপর সূর্য থাকতে থাকতে জলাশয়ে নেমে খোঁজ শেষ করতে হবে।

সবাই গুহামুখ দিয়ে আবার জলাশয়ের কাছে এলো।

একটু বিশ্রাম করে নাও। শাঙ্কো বলল।

না-না, আলো চলে যাবে। দড়ি ধর ফ্রান্সিস বলল।

আবারও ফ্রান্সিস দড়ি ধরে জলাশয়ের জলে নামল। জলের মধ্যে দেখল হাঙর তিনটে নেই। দেরি করা যাবে না। যদি ওরা মাংস খাওয়া শেষ করে ফিরে আসে।

ফ্রান্সিস জল ঠেলে একেবারে নীচে নেমে এল। পাথুরে দেয়াল ধরে ধরে ডুব সাঁতার দিয়ে চলল।

না! পাথর ছাড়া কিছু নেই।

জল ঠেলে ওপরে উঠল। হাঁ করে শ্বাস ফেলল। দম নিল। আবার ডুব দিল। এবার অন্যদিকে। হাতড়ে চলল পাথরের দেয়াল।

হঠাৎ একটা প্রায় চৌকোনো পাথর হাতে ঠেকল। ফ্রান্সিস পাথরটা ধরে টানল। নড়ল পাথরটা। আবার প্রাণপণ জোরে টানল। চৌকোনা পাথর সবটা খুলল না।

খোঁজ পেলে? শাঙ্কো বলে উঠল।

প্রায়।

দম নিয়ে আবার ডুব দিল ফ্রান্সিস দ্রুত চৌকোনা পাথরের কাছে এল। আবার প্রাণপণে টানল। পাথরটা এবার খুলে এল। প্রায় অন্ধকার খোঁদল একটা। ভালো করে তাকাতে দেখল খোদলভর্তি সোনার চাকতি। অল্প আলোতেও চকচক করছে। ও দ্রুত হাতে দু'মুঠো সোনার চাকতি তুলে নিল। কোমরের ফেট্টিতে চেপে চেপে গুঁজতে গুঁজতে ওপরে উঠে আসতে লাগল।

দম ফুরিয়ে এসেছে। দ্রুত জল ঠেলে ওপরে উঠে আসতে লাগল। তখনই আবছা দেখল বড় হাঙরটাকে।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। হাঙরটা যে ছুটে আসছে! দড়িতে জোর হ্যাঁচকা টান দিল সে। ওপর থেকে শাঙ্কো আর প্রহরীরা দড়ি ধরে প্রাণপণে টেনে ওকে

তুলতে লাগল। হাঙরও ধেয়ে আসছে পিছন পিছন। একেবারে শেষ মুহূর্তে তার দাঁতের ঘষা লাগল ফ্রান্সিসের হাঁটুতে। মাংস খুবলে এল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

ততক্ষণে ওরা জল থেকে টেনে তুলে ফেলেছে ফ্রান্সিসকে। ফ্রান্সিস পাড়ে উঠে শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো ঝুঁকে পায়ের ওপর পড়ল। দরদর করে রক্ত পড়ছে ক্ষত দিয়ে। ফ্রান্সিস ডান হাতটা কপালের ওপর রেখে যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল।

শাঙ্কো নিজের কোমরের ফেট্টি খুলে ফেলল। ছোরাটা পড়ে গেল। খুঁড়িয়ে নিয়ে কোমরে গুঁজে নিল। পাথরের ওপর টং টং শব্দ করে সাত-আটটা স্বর্ণমুদ্রা পড়ে গেল। একটা গড়িয়ে গেল জলে। শাঙ্কোর সেদিকে খেয়াল নেই। ও ক্ষতস্থানে ফেট্টিটা চেপে ধরল। রক্ত পড়া একটু বন্ধ হল। শাঙ্কো এবার ফেট্টিটা হাঁটুতে জড়িয়ে শক্ত করে বাঁধল। ফ্রান্সিস একটু ককিয়ে উঠল। শাঙ্কো গড়িয়ে পড়া সোনার চাকতি ক'টা কোমরে গুঁজল।

শাঙ্কোর আর জিগ্যেস করতে মন হল না ফ্রান্সিস স্বর্ণভাণ্ডারের খোঁজ পেয়েছে কিনা। সে তখন আহত ফ্রান্সিসকে নিয়ে উদ্বেগে কাতর। প্রহরীরাও এই আকস্মিক ঘটনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

শাঙ্কো কোলের ওপর ফ্রান্সিসের মাথা তুলে নিল। ফ্রান্সিস চোখ বুজে যন্ত্রণা সহ্য করছে। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের মাথায় হাত বুলোতে লাগল। মুখে কথা নেই। প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। তবু ওর চোখ দিয়ে জল পড়ল না। ও কাঁদলে ফ্রান্সিসের মন দুর্বল হয়ে পড়বে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে তিনটে সোনার চাকতি বের করল। হেসে আস্তে আস্তে দুর্বলস্বরে বলল, শাঙ্কো, সুলতান হানিফের—স্বর্ণভাণ্ডারের—সন্ধান-পেয়েছি।

ওসব কথা থাক। এখন কোনো কথা বলো না। কষ্ট বাড়বে। অশ্রুরুদ্ধ স্বরে শাঙ্কো বলল।

চোখ খুলে ফ্রান্সিস ওপরের ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকাল। মৃদুস্বরে বলল, সূর্যদর্শন।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে বলল, জাহাজে চলো। ফ্রান্সিস আস্তে মাথা নাড়ল। বলল, না। এন্তানোর কাছে চলো। স্বর্ণভাণ্ডারের হদিসটা দিয়ে আসি।

বেশ চলো। হেঁটে যেতে পারবে? শাঙ্কো বলল।

দেখি। চেষ্টা করি। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে বসল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের ডান হাতটা নিজের কাঁধে তুলে নিল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল।

সবাই চলল। গুহার-এবড়ো-খেবড়ো মেঝের ওপর দিয়ে আহত ফ্রান্সিসের হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। শাঙ্কো প্রহরীদের বলল, ভাই তোমরাও ওকে ধরো। প্রহরীরা দুজন এগিয়ে এল।

ফ্রান্সিসকে নিয়ে সবাই আস্তে আস্তে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। চলল এন্তানোর বাড়ির দিকে।

বেশ সময় লাগল ওদের পৌঁছতে কয়েদঘরের সামনে এলে একজন প্রহরীকে ফ্রান্সিস বলল, এন্তানোকে খবর দাও। প্রহরীটি চলে গেল।

এন্তানো প্রহরীটির কাছেই সব শুনেছিল। প্রায় ছুটে এল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সব চলল। এন্তানো খুব খুশি। এবার শাঙ্কো বলল, আমরা জাহাজে ফিরে যাব। আপনার দুজন প্রহরীকে সঙ্গে যেতে বলুন।

নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। এন্তানো বলে উঠল। যে দুজন প্রহরী ফ্রান্সিসকে ধরে ধরে নিয়ে এসেছিল তাদের বলল, ওদের জাহাজে পৌঁছে দিয়ে এসো।

ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে বেশ কিছু সোনার চাকতি আস্তে আস্তে বের করল। সেগুলো এন্তানোর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, এই নিন। এন্তানো লাফিয়ে এগিয়ে এল। শাঙ্কোও পোশাকের মধ্যে থেকে স্বর্ণমুদ্রাগুলো রেখে সোনার চাকতিগুলো এন্তানোর হাতে দিল। এন্তানো খুশিতে প্রায় লাফাতে লাগল।

ফ্রান্সিসকে ধরে ধরে সবাই চলল। জাহাজঘাটের দিকে। ফ্রান্সিস খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল।

পথে শাঙ্কো লক্ষ্য করল ফ্রান্সিসের পায়ে বাঁধা ফেট্টির কাপড়টা রক্তে ভিজে উঠেছে। রক্ত-পড়া বন্ধ হয়নি।

শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রহরীদের বলল, কাঁধে করে নিয়ে চলো। বেশ রক্ত পড়ছে। হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না। রক্ত পড়ে ও দুর্বল হয়ে পড়বে।

না না, হেঁটে যেতে পারব। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

চুপ করে থাকো। শাঙ্কো প্রায় ধমকের সুরে বলল। তিনজনে ফ্রান্সিসকে কাঁধে তুলে নিল।

শেষ বিকেলে জাহাজঘাটে পৌঁছল ওরা। পাটাতন দিয়ে উঠছে, হ্যারি রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। ও চেঁচিয়ে উঠল, এসো সবাই। ফ্রান্সিস আহত।

বন্ধুরা ছুটে এল ডেক-এ। হ্যারির কথা মারিয়া অস্পষ্ট শুনল। ও বুঝল না ঠিক কী হয়েছে। ও এ সময় সূর্যাস্ত দেখতে যায়। তাই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। তখনই ফ্রান্সিসের বন্ধুদের গুঞ্জন শুনল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আহত ফ্রান্সিসকে কাঁধে নিয়ে বন্ধুরা দরজার সামনে এল। মারিয়া কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। বন্ধুরা ফ্রান্সিসকে বিছানায় শুইয়ে দিল। এতক্ষণে ফ্রান্সিসের রক্তমাখা পা দেখে মারিয়া হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

ফ্রান্সিস তাকে অভয় দিয়ে বলল,

কেঁদো না। সামান্য কেটেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যাব। একথায় মারিয়া সান্ত্বনা পেল না। ও একইভাবে কাঁদতে লাগল।

ততক্ষণে শাঙ্কো ভেনকে ডেকে এনেছে। ভেন ওর বদ্যি-ঝোলা ওষুধ বয়াম নিয়ে এসে লেগে পড়ল ফ্রান্সিসের চিকিৎসায়। শাঙ্কো, বিস্কো, সিনাত্রা ফ্রেজার, আর সব বন্ধুরা নিশ্চুপ হয়ে দেখতে লাগল। মনে মনে বিশ্বাস, ভেন থাকতে ফ্রান্সিসের বিপদ হবে না। ও ঠিক সেরে উঠবে। সূর্য বিদায় নিলেও কাল নতুন আশার আলো নিয়ে সে উদয় হবে। বন্ধুরা সব নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল।

———

অভিশপ্ত দ্বীপে ফ্রান্সিস



অতিকায় হাঙরের কামড়ে গুরুতর আহত ফ্রান্সিসের দিন কাটতে লাগল বিছানায় শুয়ে। ফ্রান্সিসের ডান হাঁটুর কাছে মাংস খুবলে নিয়েছিল সেই বড় হাঙরটা। ফ্রান্সিসের দুশ্চিন্তা বেড়েছে। ক্ষত সম্পূর্ণ না সারা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। বয়স্ক বৈদ্য ভেন চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষত শুকোবার সব রকম ওষুধই ভেন ব্যবহার করছে। তবু ভয় যাচ্ছে না ওর মন থেকে। যদি ক্ষত বিষিয়ে ওঠে? ভেন তিনবেলা ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে আর মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে যেন ক্ষত বিষিয়ে না ওঠে। এই আশঙ্কার কথা, এই ভয়ের কথা ভেন কাউকে বলছে না।

ওদিকে ফ্রান্সিসও মনে মনে ওর এই অসহায় অবস্থাটা মেনে নিতে পারছে না। ওর মতো দুঃসাহসী দৃপ্ত যুবক এই ভাবে বিছানায় পড়ে আছে এটা মারিয়াও মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু উপায় তো নেই। মারিয়া দিনরাত সেবাশুশ্রূষা করে চলেছে। পাছে মারিয়ার মন দুর্বল হয়ে পড়ে তাই ফ্রান্সিস মুখ বুঁজে সব জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করে যাচ্ছে। বন্ধুদের মুখে হাসি নেই। রাতে আর জাহাজের ডেকে নাচ-গানের আসর বসে না। ওরা মাঝে মাঝেই এসে ফ্রান্সিসকে দেখে যায়। নীরবে নিজেদের কাজ করে যায়। ভেনের চিকিৎসার ওপর ওদের গভীর বিশ্বাস। ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই সুস্থ হবে। আবার আগের মতোই তরোয়ালের লড়াই চালাতে পারবে।

দিন সাতেকের মধ্যে ফ্রান্সিস খুবই দুর্বল হয়ে পড়ল। ও যদিও সেটা কাউকে বুঝতে দিচ্ছিল না। কিন্তু মনের দুশ্চিন্তা কাটতে চায় না। যদি সত্যিই ও এভাবে মারা যায় তাহলে মারিয়ার কী হবে? বন্ধুরাই বা কী করবে?

আস্তে আস্তে ফ্রান্সিস কিছুটা সুস্থ হল। ভেনের ওষুধ আর মারিয়ার শুশ্রূষায় ফ্রান্সিস দিন পনেরোর মধ্যে হৃতশক্তি অনেকটাই ফিরে পেল। মারিয়া ও ফ্রান্সিসের বন্ধুরা নিশ্চিন্ত হল।

এক সকালে ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডেকে বলল, হ্যারি, আমি এখন অনেকটা সুস্থ। আর এখানে পড়ে থেকে কী হবে? জাহাজ ছাড়তে বলো। উত্তরমুখো। দেশের দিকে। হ্যারি শাঙ্কোদের ডেকে বলল সে কথা। সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল। পাল খাটাল। জাহাজ ছেড়ে দিল। কয়েকজন চলে গেল দাঁড়ঘরে।

দ্রুত দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজ পূর্ণগতিতে চলল। পালগুলো জোরালো বাতাসে ফুলে উঠল। জাহাজ সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে দ্রুত ছুটল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে হাঁটতে পারছে এখন।

রাত হলে সিড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে ডেকে উঠে আসে ও। ধীরে ধীরে ডেকে পায়চারি করে। মাস্তুলের ওপর বসে থাকা নজরদার পেড্রোকে ডেকে বলে, পেড্রো, ঘুমিয়ে পড়ো না। নজর রাখো। পেড্রোও গলা চড়িয়ে বলে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। রাত জেগো না। তোমার বিশ্রামের, ঘুমোবার খুব দরকার। এ সময় হ্যারিও ডেকে উঠে আসে। দুজনের কথা হয়। জাহাজ ঠিক দিকে যাচ্ছে কিনা, কবে নাগাদ দেশে পৌঁছোনো যাবে এসব নিয়ে আলোচনা চলে।

দিন পনেরো-কুড়ি নির্বিঘ্নেই কাটল। ঝড়-বৃষ্টির মুখে পড়তে হয়নি। কিন্তু ডাঙার দেখা নেই। পেড্রো দিনরাত মাস্তুলের ওপর থেকে চারদিকে নজর রাখছে। কিন্তু চারদিকেই জল। ডাঙার কোনো চিহ্নই দেখতে পাচ্ছে না।

ফ্রান্সিস এখন একটু খুঁড়িয়ে হলেও মোটামুটি হাঁটাচলা করতে পারছে। মাঝে মাঝে শাঙ্কো বিনেলোর সঙ্গে তরোয়ালের খেলা খেলে। আগের মতো তড়িৎগতিতে অবশ্য চলাফেরা করতে পারছে না। বাঁ পায়ের জোর বেশ কমে গেছে।

জাহাজ চলছে। কিন্তু কোথায় ডাঙা? ফ্রান্সিস, হ্যারি বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ল। ওদিকে জাহাজে পানীয় জল, খাদ্য ফুরিয়ে আসছে। ডাঙায় পৌঁছোতেই হবে। বন্ধুরা পাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দাঁড় টেনে জাহাজের গতি বাড়াতে লাগল। জাহাজের গতি বাড়ল। কিন্তু ডাঙা চোখে পড়ছে না।

ভাইকিংরা সমুদ্রকে ভালোভাবেই চেনে। আবাল্য দেখে এসেছে এই সমুদ্রকে। ভোরের আবছা কুয়াশায় ঢাকা সমুদ্র তারপর সূর্যোদয়ের সেই অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। আকাশে সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় উজ্জ্বল রোদের ঝিকিমিকি পূর্বের আকাশে রক্তিমাভা ছাড়াছাড়া মেঘের গায়ে কত বিচিত্র রঙের খেলা। তার মধ্যে দিয়ে সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য। মাঝিরা তো এসময় ডেক-এ উঠে রেলিং ধরে দাঁড়াবেই। বড় ভালোবাসে এই সূযাস্তের দৃশ্য দেখতে। সন্ধ্যার মুখে দুটো একটা করে তারা ফুটতে থাকে। তারপরে রাত্রির আকাশের বিপুল শূন্যতায় লক্ষ তারার ভিড়। ক্ষীণ চাঁদ দিনে দিনে পূর্ণতা পায়। পূর্ণিমায় মস্তবড় চাঁদ। আদিগন্ত সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় জ্যোৎস্নার ঝলকানি। সমুদ্রের হাওয়ায় ভাইকিংরা অনেকেই ডেক-এ এসে শুয়ে বসে থাকে। সারাদিনের কাজ শেষ।

আবার কখনও কখনও সমুদ্রের ভয়ঙ্কর রূপও দেখে। ঘন কলো মেঘে আকাশ ঢেকে যায়। আঁকা বাঁকা বিদ্যুৎ মাথার ওপর ঝলসে ওঠে। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের জাহাজের ওপর। শুরু হয় ঝড়ের তাণ্ডবের সঙ্গে লড়াই। ভাইকিংদের জাহাজের জীবন তো এটাই। এই জীবনই ওদের প্রিয় একান্ত আপন।

এখন কিন্তু ভাইকিংরা বড় চিন্তায় পড়েছে। অনেকদিন হয়ে গেল জাহাজ চলেছে তে চলেছেই। মাটির দেখা নেই। অবশ্য এই অভিজ্ঞতা ওদের কাছে নতুন কিছু নয়। তবু এই সময় ওরা বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কখনও দল বেঁধে, কখনও একা একা জাহাজের রেলিং ধরে। চারপাশে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যদি পাহাড়ের মাথায় সবুজ গাছগাছালি দেখা যায়। নজরদার পেড্রো অবশ্য মস্তুলের ওপর ওর বসার জায়গায় চারদিকে নজর রেখে চলেছে। তবু ভাইকিংদের মন মানে না। সময় পেলেই ডেক-এ এসে রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। জাহাজে এখন আর নাচ-গানের আসর বসে না। সকলেরই মন খারাপ। শুধু ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিরুদ্বেগ। দুজনে কখনও কখনও ডেক-এ উঠে আসে। বন্ধুরা বেশ চিন্তিত মুখে দুজনের কাছে আসে ফ্রান্সিস হেসে ওদের আশ্বস্ত করে। বলে—সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো তোমাদের কাছে নতুন কিছু তো নয়। সাহস হারিও না। এখনও খাদ্য আর পানীয় জলে তেমন টান পড়েনি। নাচগানের আসর বসাচ্ছো না কেন? সিনাত্রার দিকে তাকিয়ে বলে— সিনাত্রা—নতুন নতুন গান বাঁধো। গান গাও। মনে কোন দুর্ভাবনাকে কোনরকম প্রশ্রয় দিও না। ফ্রান্সিসের কথায় বন্ধুরা কিছুটা আশ্বস্ত হয়। সিনাত্রা উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠে — ভাই সব— নতুন নতুন গান বেঁধেছি। রাতে শোনাবো। বন্ধুদের মধ্যে একটা উৎসাহের সঞ্চার হয়। কেউ কেউ বলে ওঠে — ঠিক আছে। বসাও নাচগানের আসর।

দিন কাটে। বিকেল হয়। পশ্চিম আকাশে রঙের আলোর বন্যা বইয়ে সূর্য অস্ত যায়। সেই সূর্যাস্ত আর কেউ না দেখুক মারিয়া রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখবেই। সেই সূর্যাস্তের দৃশ্য মারিয়ার কাছে প্রতিদিনই নতুন বলে মনে হয়। দেশ থেকে বাবা-মার কাছ থেকে কত দূরে ক্ষুধা তৃষ্ণায় দুর্বল শরীর তবু মারিয়া সূর্যাস্ত দেখতে আসে। এতে মারিয়া যেন মনে খুব শান্তি পায়। ভুলে থাকতে পারে ক্ষুধাতৃষ্ণার কষ্ট। শরীরের দুর্বলতা।

রাতের খাবার খেয়ে অনেক বন্ধু ডেক-এ উঠে আসে। ডাঙার দেখা নেই। কাজেই ফুরিয়ে আসা খাদ্য জল খাওয়া সবাই কমিয়ে দিয়েছে। ডাঙায় না পৌঁছানো পর্যন্ত — খাদ্য জল না পাওয়া পর্যন্ত বেঁচে তো থাকতে হবে। এটা

জানতে পেরে ফ্রান্সিস হ্যারিও খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। কাউকে না জানিয়ে মারিয়াও খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে।

সেদিন পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়। নক্ষত্র ছাওয়া কালো আকাশে উজ্জ্বল প্রায় গোল চাঁদ জ্যোৎস্না ছাড়িয়েছে ডেউয়ের মাথায় অনেক দূর পর্যন্ত। হাওয়া ছুটেছে শন্ শন্। জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়াল সিনাত্রা। জ্যোৎস্না ধোয়া সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ওর ক্ষুধা তৃষ্ণাকাতর শরীর যেন রোমাঞ্চিত হল। ও চিৎকার করে বলে উঠল — হে পৃথিবী তুমি কী সুন্দর। দুজন চারজন করে অনেকেই ডেক-এ উঠে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্রান্সিসও হ্যারি আর মারিয়াকে নিয়ে ডেক-এ উঠে এল। শাঙ্কো নিয়ে এসেছে একটা খালি পীপে। গান নাচের সঙ্গে তাল দেবে বলে। দাঁড়িয়ে থাকা সিনাত্রার চারপাশে গোল হয়ে বসল সবাই। সিনাত্রা ওর সুরেলা কণ্ঠে গান ধরল—

স্বদেশ তুমি স্বদেশেই থাকো
আমি তো সারা বিশ্বের
এই সাগরই আমার ঘরবাড়ি
এই সাগরই আমার মা
এই মায়ের কোলই আমার শেষ শয্যা।

নাচের গান নয়—টানা বড় সুন্দর সুরের গান। সিনাত্রার সুরেলা কণ্ঠের গান চলল। শাঙ্কো পীপে হাত ঠুকে বাজাতে ভুলে গেল। মারিয়ার চোখে তো জল এসে গেল। হ্যারিও মুখ নিচু করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ঘিরে বসা বন্ধুদেরও মন বিষণ্ণ হল। ফ্রান্সিস একবার চারদিকে তাকিয়ে নিল। বুঝল সিনাত্রার কণ্ঠের জাদুতে গানটা বড় সুন্দর। কিন্তু এই বিষাদের গান সুর মনকে দুর্বল করে দেয়। ফ্রান্সিস বলে উঠল—সিনাত্রা আনন্দের গান গাও, সুখের গান গাও। জানো তো — দেশের পাহাড়ি এলাকায় যখন বরফ গলে গিয়ে প্রথম কচিকচি সবুজ ঘাস গজিয়ে ওঠে—মেষ পালকেরা নবজীবনের গান গাইতে গাইতে ভেড়ার পাল নিয়ে যায়, সেই আনন্দ উল্লাসের গান গাও। সিনাত্রা হেসে বলল বেশ। আবার সিনাত্রা গান ধরল—

কিন্তু রাজকুমারী নই। তোমাদের মতই একজন। মারিয়া একটু অভিমানের সুরে বলল।

—এটা ভালো করেই জানি। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—

মারিয়া—এরকম কথা তোমাকে আগে কোনদিন বলিনি। আজ কেন বললাম জানো—বাবা-মার জন্যে দেশের কথা ভেবে ভেবে এতদিন পরে তোমার মন

অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। তাই তোমার মনে সাহস জোগা। ক্ষুধাতে তৃষ্ণার সঙ্গে লড়াই করতে যাতে মনকে শক্ত রাখতে পারো তাই এসব কথা বলা। রাজকুমারী বলে তোমাকে এসব কথা বলিনি। মারিয়া কিছুক্ষণ ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল — তুমি আগে থেকে অনেককিছু ভেবে রাখো।

—নইলে আমাদের আর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী বলা হয় কেন। যাক গে—শোন—আমাদের এখন সাবধান হবার সময় হয়েছে। তুমি হ্যারিকে এখানে আসতে বলো। আমি এখন সিঁড়ি দিয়ে বেশি ওঠানামা করতে চাই না। পা দুটোকে যথাসাধ্য বিশ্রাম দিচ্ছি। মারিয়া উঠে হ্যারিকে খবর দিতে চলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হ্যারি এল। বলল—কী হয়েছে ফ্রান্সিস? তোমাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে।

—স্বাভাবিক। জাহাজে খাদ্যাভাব, জলের অভাব চলছে। কিছুদিনের মত খুব ভেবে চিন্তে আমাদের চলতে হবে।

—এসব তো নতুন কিছু নয়। এই সমস্যা তো এর আগে হয়েছে। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। ডাঙায় পৌঁছেতেই হবে। খাদ্য চাই, জল চাই।

—কিন্তু কী করবে? ফ্রেজার তো অভিজ্ঞ হাতেই জাহাজ চালাচ্ছে। পেড্রো মাস্তুলের ওপর থেকে দিনরাত নজর রেখে চলেছে। ও না অসুস্থ হয়ে পড়ে।

—আমরাও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি। এখন আমরা যাতে আরো কিছুদিন সুস্থ থেকে ডাঙার সন্ধান করতে পারি তার ব্যবস্থা করতে হবে। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—রাতের খাবার খেয়ে সবাইকে ডেক-এ আসতে বলো। আমার কিছু বলার আছে।

—বেশ বলছি। হ্যারি চলে গেল।

রাতের খাওয়া শেষ হল। ভেন বাদে আর সব ভাইকিং বন্ধুরা জাহাজের ডেক-এ উঠে এল।

মেঘমুক্ত আকাশে অনেক তারার ভিড়। সারাদিন গুমোটের পর জোর হাওয়া ছুটেছে। আধভাঙা চাঁদের আলো পড়েছে সমুদ্রের জলের ঢেউয়ের মাথায়। সবাই জড়ো হতে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে ডেক-এ উঠে এল। পেছনে মারিয়াও এল।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলতে লাগল।—ভাই সব।

আমরা খাদ্য ও পানীয় জলের সমস্যার মুখোমুখি পড়েছি। এরকম সমস্যায় এর আগেও পড়েছি। তখন দেখা গেছে জল কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বুদ্ধি হারিয়ে দু-একজন সমুদ্রের নোনা জল খেয়েছে। তারপরেই যা হওয়ার হয়েছে। বমি করেছে, মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। কষ্ট বেড়েছে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি প্রথমেই সাবধান করে দিচ্ছি—দাঁত চেপে জল তেষ্টা সহ্য করবে। সমুদ্রের নোনা জল খাবে না। এতে খুব কষ্ট হবে। কিন্তু ক্ষুধার সঙ্গে জল তেষ্টার সঙ্গে লড়াই করার বাড়তি শক্তি শরীরে থাকবে। ফ্রান্সিস থামল।

সবাই নিশ্চুপ। শুধু দুরন্ত বাতাসের শন শন শব্দ শোনা যাচ্ছে। সব বন্ধুরা মনোযোগ দিয়ে ফ্রান্সিসের কথা শুনতে লাগল ফ্রান্সিসের ওপর ওদের অগাধ বিশ্বাস। ওরা জানে বিপদের মুখে ফ্রান্সিস কক্ষণো বিচলিত হয় না। বরং আরো বেশি ধীর স্থির হয়। অবশ্য তরোয়ালের লড়াই চালাবার সময় কিন্তু ফ্রান্সিসের অন্য রূপ। দৃঢ় মুখ। চোখে শ্যেন দৃষ্টি। টান টান শরীর। ফ্রান্সিস বলতে লাগল —ভাইসব — জাহাজে অল্প দিনের মধ্যেই ভীষণ খাদ্যাভাব জলের অভাব দেখা দেবে যদি না এর মধ্যে আমরা ডাঙায় পৌঁছে খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারি। তাই বলছি—কাল থেকে যতট পারো কম খাবার খাবে আর কম জল খাবে। অন্তত ডাঙার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত। নজরদার পেড্রো রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে নজর রেখে চলেছে। ডাঙার দেখা আমরা পাবোই। আমরা বীরের জাতি। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অসহায়ভাবে মৃত্যু আমরা মেনে নেব না। আমার যা বলার বললাম। আমার বিশ্বাস আমরা আমাদের সঙ্কল্পে অটল থাকতে পারবো। ফ্রান্সিস থামল। উৎসাহিত বন্ধুরা ওদের সংকল্পের ধ্বনি তুলল ও-হো-হো.... মৃদু স্বরে কথা বলতে বলতে সবাই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে লাগল। শুধু শাঙ্কো বিনেলো আর অন্য দুএকজনকে নিয়ে ডেক-এর ওপর শুয়ে পড়ল। বৃষ্টি না হলে শাঙ্কো বরাবর ডেক-এ শুয়ে ঘুমোয়। তবে ঘুমের মধ্যেও ও সজাগ থাকে। বলা যায় না — পেড্রোর নজর এড়িয়ে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ওঠা কোন জলদস্যুদের ক্যারাভেল একেবারে কাছে চলে আসতে পারে। বিদেশি লোকরাও নৌকোয় চড়ে এসে ওদের আক্রমণ করতে পারে। সে সময় শাঙ্কোরা চিৎকার করে বন্ধুদের ঘুম ভাঙিয়ে সেই অতর্কিত আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারবে।

ফ্রান্সিস হ্যারিক সঙ্গে নিয়ে জাহাজ চালক ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—ফ্রেজার দিক ঠিক রেখেই চালাচ্ছে তো!

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ফ্রেজার মাথা কাত করে বলল।

—জাহাজের গতি কেমন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—দিনের বেলা বাতাস পড়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যের পরই বাতাসের জোর বেড়েছে। এখন গতিবেগ ভালোই।

—জাহাজ উত্তর পশ্চিম দিকে চালাচ্ছো তো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আমাদের দেশ তো ঐদিকেই। ফ্রেজার বলল।

—কিন্তু ফ্রেজার আমরা পথ হারাই নি তো?

—খুব জোর দিয়ে বলতে পারছি না। কারণ কোন দ্বীপে বা দেশের অংশে না পৌঁছাতে পারলে কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু দ্বিধার সঙ্গে ফ্রেজার বলল?

—কিন্তু আমি বন্ধুদের কী বললাম শুনেছো তো?

—হ্যাঁ। শুনেছি। ফ্রেজার বলল।

—জাহাজে খাদ্য ও জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কাজেই যে করে হোক ডাঙায় আমাদের পৌঁছাতে হবে। সে কোন জঙ্গলেই হোক বা পাহাড়ি এলাকায়ই হোক। জঙ্গলে পৌঁছলে খাবার মত ফলটল পাবো। পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছলে ঝর্ণার জল পাবো। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—উত্তর পূর্ব নয়—সোজা পূর্ব দিকে জাহাজ চালাও। দেশের দিকে নয়। জাহাজের মুখ ঘোরাও। আগে তো প্রাণে বাঁচি দেশে পৌঁছতে না হয় কিছুদিন দেরিই হোক।

—বেশ। জাহাজের মুখ ঘোরাচ্ছি। ফ্রেজার বলল।

জাহাজ চলল। সব ভাইকিং বন্ধুরা, ফ্রান্সিস মারিয়াও কম খাবার কম জল খেতে লাগল।

দিন যায়। রাত যায়। নজরদার পেড্রোর চোখে ঘুম নেই। বিশ্রাম নেই ওর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি খুঁজছে গাছপালার আভাস। মাটি পাহাড়। কিন্তু সে সবের দেখা নেই। এক বেলা খাওয়া আর সামান্য জল খাওয়া চলল। সবাই বেশ দুর্বল হয়ে পড়ল। মারিয়া তো খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। এইমাত্র খেয়ে এলাম। ফ্রান্সিস আর কিছু বলে না।

সেদিন সূর্যাস্ত দেখবে বলে মারিয়া জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। সূর্য পশ্চিম দিগন্তে অনেকটা নেমে এসেছে। দক্ষিণ দিকে তাকাতেই মারিয়ার বুক কেঁপে উঠল। দক্ষিণ দিগন্ত থেকে ঘন কালো মেঘ এসেছে। বেশ দ্রুতই উঠে আসছে মাঝ আকাশের দিকে। বাতাস পড়ে গেছে। রোদের তেজ অনেক কমে গেছে। শাঙ্কোর উচ্চস্বর শোনা গেল—ভাই সব, ঝড় আসছে? তৈরি হও। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু হল। কিন্তু সকলেরই শরীর আধপেটা খেয়ে সামান্য জল খেয়ে খেয়ে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই দুর্বল শরীর নিয়েই ঝড় বৃষ্টির

সঙ্গে লড়তে হবে। অনেকেই বেশ চিন্তায় পড়ল।

দক্ষিণ আকাশ থেকে ঘন কালো মেঘ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মাঝ-আকাশে উঠে আসতে লাগল। সূর্য ঢাকা পড়ে গেল। অন্ধকার হয়ে এল আকাশ সমুদ্র। অন্ধকার আকাশ চিরে শুরু হল আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের ঝলকানি। ভাইকিংরা দ্রুত পাল নামিয়ে ফেলল। দাঁড় বাওয়া আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সবাই ডেক-এ এসে জড়ো হল। প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে ওরা লড়তে অভ্যস্ত। ঝড়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলাবার জন্যে সবাই মাস্তুলের পালের কাঠের দড়িদড়া ধরে তৈরি হল। কিন্তু আধপেটা খেয়ে তৃষ্ণায় দুর্বল সবাই। ওদের নির্ভীক মনে একটু সন্দেহের অনুভূতিও জাগল। এই দুর্বল শরীরে কতক্ষণ লড়তে পারবে ঝড়ের সঙ্গে। হ্যারি ছুটে এল শাঙ্কোদের কাছে। চিৎকার করে বলল শাঙ্কো শিগগির নিচে যাও কয়েকজন। তিনটে জলের পীপেই নিয়ে এসো। ডেক-এ রাখো। যতটা সম্ভব বৃষ্টির জল ধরে রাখো। এই সুযোগ কাজে লাগাও। পানীয় জলের সমস্যাটা কিছু দিনের জন্যে মেটানো যাবে। শাঙ্কোরা তিন চারজন ছুটল সিঁড়ির দিকে খালি জলের পীপে আনতে।

দেখতে দেখতে প্রচণ্ড জোরে ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাহাজের ওপর। ঝড়ের প্রথম ধাক্কায় জাহাজটা কাত হয়ে গেল। পরক্ষণেই সোজা হল। শুরু হল বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। বিদ্যুতের ঝলকানি আর বাজ পড়ার মুহুর্মুহু গম্ভীর ধ্বনি আর মুষলধারে বৃষ্টি। দুর্বল শরীর নিয়েও ভাইকিংরা ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই চালাল। দু'চারজনের দড়িধরা হাতের মুঠি ঝড়ের ঝাপটায় আলগা হয়ে গেল। ছিটকে ডেক-এর ওপর পড়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে পরক্ষণেই উঠে এসে দড়ি চেপে ধরতে লাগল। ঝড়ের তাণ্ডব চলল।

ভাইকিংদের সৌভাগ্য বলতে হবে ঝড়বৃষ্টি বেশিক্ষণ চলল না। বৃষ্টি আস্তে আস্তে কমে গেল। ঝড়ের ঝাপটার তীব্রতাও কমল। বিদ্যুৎ ঝলকানি আর বজ্রনাদ অবশ্য চলল কিছুক্ষণ।

আস্তে আস্তে মেঘ কেটে গেল। বিদ্যুতের ঝলকানি বন্ধ হল। বন্ধ হল বজ্রধ্বনি। আকাশ পরিষ্কার হল। পশ্চিম আকাশে ডুবে গেছে সূর্য। কমলা রঙের আভা তখনও লেগে আছে পশ্চিম দিগন্তের কাছে। একটা দুটো করে তারা ফুটতে লাগল।

দুর্বল শরীর নিয়ে অসহ্য ক্লান্তিতে বেশ কয়েকজন ভাইকিং ডেক-এর ওপর শুয়ে রইল। বৃষ্টিতে ভেজা সপ্‌সপে পোশাক গায়ে। শাঙ্কোরা কয়েকজন পীপের কাছে ছুটে এল। দেখল—বেশ বৃষ্টির জল জমেছে পীপে তিনটেতে।

ওদের মুখে হাসি ফুটল। হ্যারি এসে পীপের জল দেখে বলে উঠল —সাবাস শাঙ্কো। শাঙ্কোরা কয়েকজন পীপে তিনটে কাঁধে নিয়ে সিঁড়ির দিকে চলল। যাক কিছুদিনের জন্যে খাবার জলের সমস্যা মিটল।

জাহাজ চলল। কিন্তু সেই এক ঘেয়েমি সীমাহীন জলরাশি চারদিকে। ডাঙার দেখা নেই। পেড্রো মাস্তুলের মাথায় নিজের জায়গায় বসে চারদিকে নজর রাখছে। কিন্তু কোথায় ডাঙা? কোথায় মাটি পাহাড় সবুজের ছোঁয়া। পেড্রোকে দুপুরে খাওয়ার সময় ডাকা হয়। রাতে তো খাওয়া বন্ধ। পেড্রো তাড়াতাড়ি নেমে আসে। খেয়ে নিয়েই আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে। তৃষ্ণায় জল পাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু খাওয়া তো সামান্য। দুর্বল শরীরেও বড় ক্লান্তি নেমে আসে। দিনের বেলা খেয়ে এসে নিজের ছোট্ট গোল ঘরের জায়গায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়। তারপরেই শুরু হয় সারারাত জেগে তীক্ষ্ণ নজরদারি। কিন্তু ডাঙা কোথায়? ডাঙার দেখা নেই।

এদিকে ভাইকিংদের প্রায় না খেয়ে দিন কাটছে। খিদে অসহ্য হয়ে উঠলে ওরা পেট ভরে জল খাচ্ছে। এতে খিদেটা কমছে। ফ্রান্সিস থেকে শুরু করে সবারই এই অবস্থা। কিন্তু ফ্রান্সিস মারিয়াকে সতর্ক করে দিয়েছে এই বলে—তোমাকে পেট পুরে খেতেই হবে। উপোষ করে থাকা তোমার চলবে না। উপোস করে থাকার অভ্যেস তোমার নেই। তাহলে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। আমাদের বিপদ সমস্যা আরো বেড়ে যাবে। মারিয়া অবশ্য হেসে বলেছে—না না। আমি দুবেলাই পেট পুরে খাচ্ছি। তুমি আমার জন্য ভেবো না। কিন্তু মারিয়া আধ পেটা তো খাচ্ছেই না। মাঝে মাঝে না খেয়েও দু'তিন দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। দুপুরে রাতে খাওয়ার সময় কেবিন ঘর থেকে বেরিয়ে ডেক-এ উঠে আসে। সময় কাটায়। তারপর কেবিন ঘরে এসে ঢোকে। ফ্রান্সিস একই দুর্বলস্বরে জিজ্ঞেস করে খেয়ে এসেছো তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। এই তো খেয়ে এলাম। হ্যারি কিন্তু মারিয়ার এই ফাঁকি একদিন ধরে ফেলল। যেটুকু খাবার জুটছে তা খাবার সময় খাবার ঘরে ও মারিয়াকে দেখতে পাচ্ছিল না। দুদিন আগে হ্যারি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে নিঃশব্দে ডেক-এ উঠে এসেছিল। দেখল মারিয়া রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারি কোন কথা না বলে নিঃশব্দে নেমে এল। পরিষ্কার বুঝতে পারল রাজকুমারী মাঝে মাঝে উপোষ করে থাকছে। এটা ফ্রান্সিসকে বুঝতেও দিচ্ছে না। কারণ তাহলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ফ্রান্সিসের উদ্বেগ বাড়বে। ফ্রান্সিসের ক্ষতি হবে।

সেদিন দুপুরে মারিয়া কেবিন ঘরে ঢুকতে ফ্রান্সিস যে সামান্য খাবার খাচ্ছিল তাই খেতে খেতে বলল—

—কী খেয়ে এলে?

—হ্যাঁ। মারিয়া মাথা কাত করে বলল।

—ভালো করে খেয়েছো তো? ফ্রান্সিস তবু বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। মারিয়া মৃদু হেসে বলল।

—এবার শুয়ে পড়ো। বিশ্রাম করো। ঘুমোও। মারিয়া শুয়ে পড়ল। না খেয়ে থাকতে থাকতে খিদের বোধটাই যেন নেই আর। কোনদিন তো খিদে কাকে বলে ও জানতো না। ক্ষুধার্ত মানুষের ঘুম আসতে চায় না। এই সত্যটা মারিয়া এবার জানতে পারল। সত্যি। ক্ষুধার্ত মানুষেরা ঘুমিয়ে একটু শান্তি পাবে তারও উপায় নেই। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে চুপ করে শুয়েছিল। একই কারণে ওরও ঘুম আসছিল না। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে মারিয়া উঠে পড়ল। বলল—বড্ড গরম লাগছে। একটু ডেক-এ হাওয়া খেয়ে আসি। মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিস অবশ্য সিঁড়ি দিয়ে বেশি ওঠানাম করে না। শুয়ে থাকে।

ডেক-এ উঠে এসে মারিয়া দেখল আকাশ মেঘ শূন্য। শেষ বিকেলে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে অনেকটা নেমে এসেছে। অস্ত যেতে খুব বেশি দেরি নেই। আকাশে রোদ উজ্জ্বল। চারপাশে সমুদ্রের জলের মাথায় রোদের ঝিকিমিকি। তখনই কানে এল মাস্তুলের ওপর থেকে নজরদার পেড্রোর চিৎকার ভাই সব ডাঙা ডাঙা দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকে। ক্ষুধার্ত ভাইকিংদের কারো চোখে ঘুম নেই। কেবিনঘরে ডেক-এর ওপরে শুয়ে ছিল সবাই। ফ্রেজার নিঃশব্দে জাহাজের হুইল ধরে ছিল। পেড্রোর চিৎকার করে বলা কথা অনেকের কানেই গেল। ডেক-এ শুয়ে থাকা মাস্তুলের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে থাকা শাঙ্কোরা কেবিন ঘর থেকে অন্য বন্ধুরা ছুটে এসে ডেক-এ জড়ো হল। রেলিং ধরে দাঁড়াল। বিকেলের আলোয় মারিয়া আর অন্য বন্ধুরা দেখল ডানদিকে—তীর ভূমি। একটা কালো রঙের টিলা মাথা উঁচিয়ে আছে। তার নিচে বিস্তৃত সবুজ বনভূমি। উঁচু উঁচু গাছ ঝোপ ঝাড়। ফ্রেজার জাহাজের তীরভূমির দিকে চালাতে লাগল। হ্যারি শাঙ্কোকে ডেকে বলল—যাও ফ্রান্সিসকে খবর দাও। উপবাস ক্লিষ্ট মানুষগুলোর মধ্যে যেন নবজীবনের সঞ্চার হল। যাক খাদ্য জল তো পাওয়া যাবে।

জঙ্গলা জায়গাটার পরেই দেখা গেল বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি ঢালু হয়ে সমুদ্রের তীরে নেমে এসেছে। একটা ছোট বন্দর মত। একটা ছোট জাহাজ নোঙর করা আছে। বালিয়াড়ির পরেই দুধারে পাথরের কাঠের শুকনো ঘাসপাতার ছাউনি নিয়ে সারি দিয়ে কিছু বাড়ি ঘর। ফেরি জাহাজ চালাতে চালাতে ফ্রেজার

সমুদ্রের জলের গভীরতা আন্দাজ করে বুঝল এখানে তীর ভূমিতে জাহাজ ভেড়ানো যাবে। কিন্তু ফ্রান্সিস আজও ডেক-এ উঠে আসে নি। ফ্রান্সিস আসুক। ফ্রেজার আস্তে আস্তে জাহাজ থামাল।

তখন ফ্রান্সিস সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে। রেলিং ধরে দাঁড়ানো মারিয়া হ্যারিদের ভিড়ের কাছে এল ও। ফ্রান্সিসকে দেখে হ্যারি তাড়াতাড়ি ওর কাছে ছুটে এল। বলল— কী করবে?

—দাড়াও। আগে সব দেখি টেখি। ফ্রেজারের কাছে চলো। দুজনে ফ্রেজারের কাছে এল।

—ফ্রেজার কী মনে হয়? এখানে জাহাজ ভেড়ানো যাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—মনে হয় যাবে। একটা জাহাজও নোঙর বাঁধা দেখছি। তার মানে এখানে জাহাজ ভেড়ানো হয়। একটা ছোট খাটো বন্দরই বলা যায়। ফ্রেজার বলল।

—ঠিক আছে। এখনই ভিড়িও না। ভালো করে আগে সব দেখি। দুজনে রেলিং এর কাছে এল। রেলিং ধরে দাঁড়াল। শেষ বিকেলের আলোয় দেখা গেল বেশ কয়েকটা দেশীয় নৌকাও বাঁধা আছে ঘাটে। তীরে ওখান থেকেই বালি ভরা পথ মত চলে গেছে বাড়ি ঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে পশ্চিম মুখো। কিছু লোকজন দেখা গেল—কিছু দূরে বালি ভরা রাস্তায় তাদের হাতে কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই। বোঝা গেল সাধারণ মানুষ যোদ্ধা নয়।

—এখন নামবে? হ্যারি ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

—না। জাহাজ ঘাটের চেয়ে একটু দূরেই থাকুক। সন্ধ্যে হতে বেশি দেরি নেই। আমরা তৈরি হয়ে নামতে নামতে সন্ধ্যে হয়ে যাব। অন্ধকার নেমে আসবে। অজানা অচেনা জায়গা। কোন দ্বীপ না দেশের অংশ তাও জানি না। কী ধরনের লোক এরা জানি না। সকালে নেমে গিয়ে কথা বলা যাবে। তখন জানা যাবে এটা কোন দ্বীপ বা কোন দেশের অংশ কিনা। কোন যোদ্ধাটোদ্ধা তো দেখা গেল না। তবু সাবধান থাকা ভালো। একটা জায়গা যখন তখন নিশ্চয়ই রাজাটাজা নয় তো কোন উপজাতির সর্দার গোছের কেউ আছে।

—তাহলে কাল সকালে নামবে। হ্যারি জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

—কিন্তু ফ্রান্সিস—বলছিলাম—ক্ষুধা তৃষ্ণা নিয়ে কতদিন কাটছে আমাদের তার তো হিসেব নেই। আমাদের কথা ছেড়ে দাও। রাজকুমারীও যে কতদিন না খেয়ে আছেন তুমি তা জানো না। হ্যারির কথা শেষ হতেই মারিয়া চমকে

উঠে বলল—হ্যারি।

—একবার ভালো করে রাজকুমারীর শুকনো রোগার্ত মুখের দিকে চেয়ে দেখ। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল।

—হ্যারি কী বলছো সব? ফ্রান্সিস অবাক হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস এবার মারিয়ার মুখের দিকে তাকাল। সত্যিই রাজকুমারীর মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে। চোখের নিচে বেশ কালচে ভাব। ফ্রান্সিস একটু ক্ষুব্ধস্বরে বলল—তাহলে তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছো। হ্যারি বিব্রত হল। বলে উঠল—

—ফ্রান্সিস মাননীয়া রাজকুমারী কক্ষণো মিথ্যে কথা বলেন না। কিন্তু তুমি যাতে উদ্বিগ্ন না হও তুমি যাতে তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকো তাই তিনি তোমাকে মিথ্যে বলতে বাধ্য হয়েছেন। রাজকুমারীর কোন দোষ নেই।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। হ্যারি বলল—তাই বলছিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের অন্তত কয়েকদিনের মত খাদ্য জল সংগ্রহ করতে হবে। বলা যায় না এখন আমরা যদি হঠাৎ আক্রান্ত হই এত দুর্বল শরীর নিয়ে আমার সর্বশক্তি দিয়ে তরোয়াল চালাতে পারবো না।

—ঠিক আছে। বলো কী করতে চাও। ফ্রান্সিস শান্তভাবে বললো। যতখানি খাদ্য জল সংগ্রহ করা সম্ভব আজকে সন্ধ্যের মধ্যেই তা এখান থেকে জোগাড় করতে হবে। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। তবে দু'তিনজন নয়। শাঙ্কো একা যাবে। আমাদের নৌকায় চড়ে। যতটা পারে খাদ্য নিয়ে আসবে। জল যা আছে আরো কয়েকদিন চলে যাবে। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকাল।

—আমি একাই যাবো। কাজ সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে আসবো। শাঙ্কো বলল।

—তোমার উপর সেই বিশ্বাস আছে আমার শাঙ্কোর। ফ্রান্সিস বলল।

ভিড় ভেঙে গেল সবাই চলে এল। দু'একজনের সঙ্গে শাঙ্কো রেলিং ধরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দূরের লোকজন দেখতে লাগল। দেখল ঐ লোকজনদের মাথার চুল লম্বা। উঁচু করে চুড়ো বাঁধা। কয়েকজনকে দেখল খালি গা। গলায় ঝুলছে লাল সুতোর মোটা মালা মত। পরনে মোটা কাপড়ে নানারঙের সুতো দিয়ে ফুল পাতা তোলা। প্রায় ঐ রকম লম্বা চুল উঁচু করে চূড়োর মত বাঁধা। শাঙ্কো মাথা নিচু করে ছক ভেবে নিল। তারপর দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে

ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরে নেমে এল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসে ছিল। মারিয়া মাথার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ফ্রান্সিসের সঙ্গে কথা বলছিল। দুজনেই শাঙ্কোর দিকে তাকাল।

শাঙ্কো বলল রাজকুমারী আপনার ফুলপাতা আঁকা একটা গাউন আছে না? মারিয়া অবাক। বলল—হ্যাঁ তো। ওটা কোমরের কাছে কাটুন আর নিচের নীল কাপড়ের ঝালরটা কেটে ফেলুন। মারিয়ার বিস্ময় আরো বাড়ল। কিন্তু মারিয়া কিছু বলার আগেই শাঙ্কো বলল পরে সব বলবো। আমি আসছি।

—কিন্তু আমি তো এখন সূর্যাস্ত দেখতে যাবো। মারিয়া বলল।

—আজকে না হয় নাই গেলেন। কাজটা সেরে রাখুন। তাড়াতাড়ি সারতে হবে সব। শাঙ্কো দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল।

কিছু পরে শাঙ্কো দু'টো বস্তা নিয়ে ফিরে এল।

দেখল রাজকুমারী সেই গাউনটা বের করে কাঁচি দিয়ে কাটছে। ফ্রান্সিস বলল—উঁহুঁ। শাঙ্কো একটা বস্তা নিয়ে যাও। দুটো বস্তা কাঁধে নিয়ে দ্রুত ছুটতে পারবে না। আর বিপদ আঁচ করলেই সব ফেলে পালিয়ে আসবে।

—কিন্তু আটা চিনি তো আনতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—না আনতে পারলেও আর কয়েক দিন না খেলে মরে যাবো না। কিন্তু তোমার জীবনের মূল্য আমার কাছে অনেক। একটা বস্তাই নিয়ে যাও। চিনি পেলে যতটা পারো আটার সঙ্গেই মিশিয়ে নিয়ে আসবে।

—বেশ। তোমার কথার অবাধ্য হবো কী করে। ততক্ষণে মারিয়ার পোশাক কাটা হয়ে গেছে। টানা কাটায় মারিয়ার অভিজ্ঞ হাত। সেই বিচিত্র পোশাকটা নিয়ে শাঙ্কো চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে খালি গায়ে ঐ বিচিত্র পোশাকটা পরে শাঙ্কো এল। মারিয়া তাই দেখে না হেসে পারলে না। এবার শাঙ্কো বলল রাজকুমারী— এবার আমার মাথার চুল চুড়ো করে বেঁধে দিন। শাঙ্কোর চুল বেশ বড় বড়। জাহাজের জীবন। নিয়মিত তো চুল দাড়ি কাটা হয় না। মারিয়া আজও কিছু বুঝে উঠতে পারল না। হাসি মুখে শাঙ্কোকে বসিয়ে মাথার চুল আঁচড়ে চুড়ো করে বেঁধে দিল। শাঙ্কো উঠে দাঁড়াতে ঐ চুড়ো করে বাঁধা চুল আর ঐ বিচিত্র পোশাক খালি গা দেখে মারিয়া মুখে হাত চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। ফ্রান্সিসও হাসি না চাপতে পেরে হেসে উঠল।

—এবার আপনার মাথার চুল বাধার মোটা লাল ফিতে থাকলে দিন। মারিয়া হাসতে হাসতে ওর চামড়ার ঝোলা থেকে একটা লাল রঙের ফিতে বের করে দিল। শাঙ্কো গিট দিয়ে ওটা গলায় ঝোলালো। মারিয়া আবার হেসে

উঠল। মারিয়াকে হাসতে দেখে ফ্রান্সিসের খুব ভালো লাগল। মারিয়া খুব খুশি হলে ঐ রকম খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া—শাঙ্কোর এরকম অদ্ভুত সাজে সাজার কারণ আছে। শাঙ্কো খুব বুদ্ধিমান। শাঙ্কো হেসে বলল—রাজকুমারী —তীরে কয়েকজন মানুষকে এরকম পোশাক পরে চলাফেরা করতে দেখেছি। এই পোশাকে তাদের সঙ্গে মিশে গেলে অনেক সহজে কার্যোদ্ধার করতে পারবো চলি।

শাঙ্কো ডেক-এর উঠে এল। ওর বন্ধুরা ওকে এই পোশাকে মাথায় চুড়ো করে বাঁধা চুল দেখে হেসে গড়াগড়ি। শাঙ্কো গম্ভীর মুখে দড়ির মই বেয়ে ওদের বাঁধা নৌকোটায় নেমে এল। দড়ির বাঁধন খুলে দাঁড় তুলে নিল। নৌকো চালাল তীর- ভূমির দিকে তখন সূর্য অস্ত গেছে। তবে অন্ধকার খুব গাঢ় হয়নি। নৌকো তীরে ভিড়ল। শাঙ্কো নৌকোটা টেনে তীরের বালির ওপর তুলে রাখল জোয়ার এলেও ভেসে যাবার আশঙ্কা রইল না।

তারপর আবছা অন্ধকারে বালির ওপর দিয়ে আস্তে হেঁটে চলল ঘরবাড়িগুলোর দিকে। কাঁধে নিল বস্তাটা। বস্তা মত কিছু কয়েকজনের কাঁধে দেখেছিল। কয়েকটা দোকান মত পেল। মোটা সুতোয় বোনা কাপড়-টাপড়ের দোকান। মাটির দুচার রকম পাত্রের দোকান। এ সব পার হয়ে দেখল একটা বড় মোটা হলুদ সুতোয় তৈরি বস্তা রাখা একটা দোকান। সব দোকানের সামনেই ততক্ষণে ছোট মশাল মত জ্বালা হয়েছে। কিছু দোকান বন্ধও দেখল। সেই বস্তা রাখা দোকানে গিয়ে শাঙ্কো দেখল বস্তায় আটা ময়দা আর ছোট ছোট দানামত কিছু রাখা। ওসব সেদ্ধ করে খাওয়া হয়। শাঙ্কোকে কারো বিদেশী বলে মনেই হল না। ওর মুখ আবছা অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না। শাঙ্কো গাঁট থেকে দুটো সোনার চাকতি তুলে চুড়ো করে বাঁধা দোকানিকে দেখাল। তারপর সোনার চাকতি দেখে দোকানি খুব খুশী। হাত বাড়িয়ে সোনার চাকতিটা নিল। তারপর একটা কাঠের পাত্র দিয়ে মেপেমেপে শাঙ্কো মেলে ধরা বস্তায় আটা চিনি ঢেলে নিল। এবার শাঙ্কো আঙ্গুল দিয়ে দানা মত জিনিসটার বস্তা দেখাল। দোকানি হেসে সে সব এক পাত্র দিল। শাঙ্কো সব নিয়ে বস্তাটা কাঁধে তুলতেই একজন ওদেশীয় লোক অদ্ভুত ভাষায় শাঙ্কোকে কিছু জিজ্ঞেস করল। শাঙ্কো হেসে মুখের সামনে আঙুল ছোঁয়ালো। অর্থাৎ ও বোবা। শাঙ্কো আর দাঁড়ালে না। বালি ভরা রাস্তায় নেমে এল। ওপাশে তাকাতেই দেখল একটা বুড়ো পাঁচ ছটা বড় বড় বুনো মুরগী নিয়ে বসে আছে।

কতদিন পেট পুরে মাংস খাওয়া হয় না। শাঙ্কো বুড়োটার কাছে গেল। মুরগী গুলোর পায়ে দঁড়ি বাঁধা। শাঙ্কো বুঝল। সব কটা মুরগী নেওয়া যাবে না। ও আবার গাঁট থেকে একটা ছোট সোনার চাকতি বের করে বুড়োকে দিল। বুড়ো ঝুঁকে পড়ে ঐ চাকতি সোনার বুঝতে পেরে মুখ তুলে ফোকলা মুখে হাসল। শাঙ্কো বস্তা নামিয়ে চারটে মুরগীর পাগুলো দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। তারপর বস্তা কাঁধে তুলে নিয়ে দঁড়ি বাধা মুরগীগুলো ঝুলিয়ে সমুদ্রের দিকে চলল। শুরু হল মুরগীগুলোর কোকরকোঁ ডাক। শাঙ্কো নির্বিঘ্নেতে সমুদ্র তীরে পৌঁছল। আবছা অন্ধকারে দেখল নোঙর করা জাহাজটা জনশূন্য। ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলছে। নৌকো টেনে জলে নামিয়ে বস্তা মুরগীগুলো রাখল। তারপর দাঁড় তুলে নিয়ে নৌকো চালাল। কয়েকজন ডেক-এ ছিল তারা মুরগীর ডাক শুনল। তাড়াতাড়ি সেই কজন ছুটে এল। নৌকো বেঁধে শাঙ্কো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এর কাছে উঠে এল। বন্ধুরা ধরাধরি করে বস্তাটা নামল। মুরগীগুলো নিয়ে ছুটল সিড়ির দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাইকিংদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। শাঙ্কো খাবার দাবার তো এনেছেই সঙ্গে বড় বড় চারটে বুনো মুরগীও এনেছে।

রাতে পেট ভরে খেল সবাই। আটা চিনি আর ঐ দানাগুলো মিশিয়ে যে খাবার রাঁধুনি বন্ধু তৈরি করল তার স্বাদই হল আলাদা। রাঁধুনি বন্ধুটির খুব প্রশংসা করল সবাই। কতদিন পরে পেট ভরে খেল সবাই।

রাতে রান্না করা খাবার কাঠের থালায় করে রাধুনি ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরে এল। ফ্রান্সিস বলল—রাজকুমারীর খাবারও এখানে দিয়ে যাও। ওকে আমার সামনে খেতে হবে। রাঁধুনি মারিয়ার খাবারও দিয়ে গেল। মাংস অবশ্য দু টুকরোর বেশি কেউ পেল না। তবু সুস্বাদু রান্না। খাওয়া শেষ করে মারিয়া বলল—যাই আরো দুটো মোটা রুটি নিয়ে আসি।

—যদি বাড়তি থাকে তবেই এনো। ফ্রান্সিস বলল।

রুটি দুটো খাওয়া হলে মারিয়া বলল—রাঁধুনি বন্ধুর রান্নার হাত এত ভালো যে এই অদ্ভুত রান্নাও কী সুস্বাদু হয়েছে।

—তা ঠিক। তবে খিদের মুখে রান্না করা সব কিছুরই স্বাদ বেড়ে যায়। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল। তখনই হ্যারি এল। ফ্রান্সিস বলল হ্যারি পেট ভরে খেয়েছো তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। শাঙ্কো সত্যিই বুদ্ধিমান। হ্যারি হেসে বলল।

—আমি সেটা ভালো করে জানি। ফ্রান্সিস বলল।

—এই পাঁচ মিশেলি রান্না আমার তো কেকেএর মত খেতে লাগল। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দুজনেই হেসে উঠল। মারিয়া একটু মনক্ষুণ্ন হয়ে বলল—যা প্রশংসার আমি নির্দ্বিধায় তার প্রশংসা করে থাকি।

—মাননীয় রাজকুমারী আমাদের মাপ করবেন। হ্যারি বলল।

—যাক গে — ফ্রান্সিস বলল— হ্যারি এই সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। এখানকার অধিবাসী কারো সঙ্গে আমাদের একটা কথাও হয়নি কাজেই রাতের অন্ধকারে ওরা যদি দল বেঁধে আমাদের জাহাজে আক্রমণ করে আমরা বিপদে পড়বো। কাজে নজরদার পেড্রোকে বলো গে—ও যেন সজাগ থাকে।

—পেড্রোর ওপর ভরসা রাখো। হ্যারি হেসে বলল।

— ভরসা তো রাখতেই চাই। কিন্তু আগে দু-তিনবার ও আমাদের সাংঘাতিক বিপদে ফেলেছিল।

—তা ঠিক। যা হোক —অনেকদিন পরে পেট ভরে খেয়ে সত্যিই আজ শরীরটা অনেক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল হ্যারি—দেখবে আজ রাতে ঘুমও ভালো হবে। ক্ষুধার্ত মানুষের ঘুম আসতে চায় না। তন্দ্রামত আসে। ক্ষুধা মানুষকে কী অস্থির করে তোলে কী দুর্বল করে শরীরে যেন সাড় থাকে না, — এটা যার অভিজ্ঞতা নেই সে কিছু বুঝবে না। আমার তো মনে হয়—মানুষের ক্ষুধার অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। কয়েকদিন হলেও। তাহলেই সে ক্ষুধার্ত মানুষকে ঠিক বুঝতে পারবে। তখন আমরা সবাই কাছাকাছি আসতে পারবো। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হবো। সব মানুষকে ভালোবাসতে পারবো। উপলব্ধি করতে পারবো সবার দুঃখ বেদনা। ফ্রান্সিস তুমি এসব ভাবো? একটু অবাক হয়ে হ্যারি বলল।

—ভাবি বৈ কি। কত দেশ দ্বীপ তো ঘুরলাম, কত রাজা সুলতানকে তো দেখলাম। আবার দুঃখী অজ্ঞানী মানুষও দেখেছি। ক্ষুধার্ত মানুষও দেখেছি। মনের মধ্যে কোথাও তাদের কথা ঠাঁই নিয়েছিল। তাই মানুষের ক্ষুধার কথা উঠতেই সেই সব অভিজ্ঞতা ভিড় করে এল। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল।

—কিন্তু সত্যিই তো ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা দূর করার সাধ্য আমাদের কতটুকু? হ্যারি বলল।

—যতটা পারি। নইলে আমরা আর মানুষ কীসে। ফ্রান্সিস বলল। একটু চুপ করে থেকে বলল—ফ্রান্সিস তুমি শুধু দুঃসাহসী অভিযাত্রীই নও অনেক কিছু ভাবো তুমি। যাকগে রাত বাড়ছে। চলি। হ্যারি চলে গেল। মারিয়া এতক্ষণ ফ্রান্সিসের কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনছিল। হ্যারি চলে গেলে

বলল—ফ্রান্সিস তুমি অনেককিছু ভাবো। ফ্রান্সিস হেসে বলল—ঘুমিয়ে পড়ো। দেখবে আজ রাতে কী নিটোল ঘুম হয়। সকালে নিজেকে মনে হবে যেন অন্য মানুষ। পরিতৃপ্ত সুখী—কোন ক্লান্তি নেই শরীরে।

কতদিন পরে ভাইকিংরা পেট ভরে খেতে পেল। সারারাত গভীর ঘুমে কাটল। শুধু নজরদার পেড্রোর চোখে ঘুম নেই। তীর ভূমির দিকে তো বটেই সমুদ্রের দিকেও আধভাঙা চাঁদের ম্লান আলোর মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে থেকে রাত কাটল পেড্রোর। নির্বিঘ্নেই কাটল রাতটা। এখানকার অধিবাসীরাও জাহাজে আক্রমণ চালাল না। ওদিকে সমুদ্রের দিক থেকেও কোন আক্রমণ হল না।

ভোর হল। ঘুম ভেঙে ফ্রান্সিসের প্রথম চিন্তাই হল তীরে নামতে হবে। জানতে হবে কোথায় এলাম। এখানকার লোকেরাই বা কেমন। সবচেয়ে বড় কাজ যথেষ্ট খাদ্য ও পানীয় জল সংগ্রহ করা। সকালের জলখাবার খেয়েই ও শাঙ্কো আর বিনেলোকে ডেকে পাঠাল মারিয়াকে দিয়ে। শাঙ্কো আর বিনেলো এল। ফ্রান্সিস বলল—তোমরা তৈরী হয়ে এসো। তীরে নামবো। সব খোঁজ খবর নিতে হবে।

—তরোয়াল নিয়ে যাবো? শাঙ্কো বলল।

—না। আমরা তো লড়াই করতে যাচ্ছি না। খোঁজ খবর করতে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু আমি তো বেশি খাদ্য আনতে পারিনি। জল তো ফুরিয়ে এসেছে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ জানি। কিন্তু এখনই আমরা বস্তা পীপে নিয়ে যাবো না। এখনও তো জানি না কাদের মধ্যে কী অবস্থায় গিয়ে আমরা পড়বো। বিপদের আশঙ্কা নেই বুঝলে তখন খাদ্য জলের জন্যে যাবো। যাও। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কোরা চলে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। দেখল আকাশ পরিষ্কার। চারদিক উজ্জ্বল রোদে ভেসে যাচ্ছে। শাঙ্কো আর বিনেলো তৈরী হয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। হ্যারি এগিয়ে এল। বলল। আমি যাবো?

—না হ্যারি। তিনজনই ভালো। বিপদে পড়লে সুযোগ বুঝে পালাতে সুবিধে হবে। তরোয়াল তো নিয়ে যাচ্ছি না। লড়াই-টড়াইয়ে কোন ভাবে জড়াবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু ফ্রান্সিস —জীবন বিপন্ন হলে? হ্যারি আশঙ্কা প্রকাশ করল।

—তখন আত্মরক্ষার জন্যে লড়াই করতে হবে। কিন্তু এখন অস্ত্রশস্ত্র না

নিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস জাহাজ চালক ফ্রেজারের কাছে এল।

ফ্রেজার হুইলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

— ফ্রেজার —জাহাজ তীরে ভেড়াও। আমরা নামবো। ফ্রেজার গিয়ে হুইল ধরল। আস্তে আস্তে জাহাজটা চালিয়ে তীরে ভেড়াল। শাঙ্কো আর বিনেলো ধরে ধরে কাঠের লম্বা পাটাতনটা তীরের বালিভরা মাটিতে নামাল। পাটাতন দিয়ে তিনজনে তীরে নামল।

সামনেই বালিয়াড়ি এলাকা। তিনজনে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। বালিতে পা বসে যায়। আস্তে আস্তে হাঁটতে হচ্ছিল। রোদের তাপ তখনও বাড়েনি। হাওয়ার তোড়ে কিছু ধুলো বালি উড়ছিল। কিছুদূর যেতে দেখল. বাড়ি ঘরদোর শুরু হয়েছে। দু পাশে মাঝখান দিয়ে বালি ভর্তি রাস্তু মত চলে গেছে পশ্চিমমুখো। এখানে স্থানীয় লোকজনের ভিড়। দোকানে দোকানে কেনাকাটা চলছে। বোঝা গেল এইটা বাজার এলাকা। স্থানীয় লোকজনের মাথায় লম্বা লম্বা চুল। চূড়ো করে বাঁধা। ঢোলা হাতা নানা রঙের সূতো দিয়ে ফুলপাতা তোলা ঢোলা হাতা পোশাক। কিছু লোকের গায়ে কিছু নেই। গলায় মোটা সূতোর মালার মত। এখন শাঙ্কোর গায়ে জাহাজী পোশাক। বাজারের লোকজন অনেকেই বেশ অবাক চোখে বিদেশি পোশাক পরা ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। বুঝল না এরা কোথা থেকে এসেছে। কেনই বা এসেছে।

—শাঙ্কো— আটা চিনির দোকান কোথায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—চলো দেখাচ্ছি। আটা চিনির দোকানের সামনে এল ওরা।

—ঠিক আছে। এবার জল কোথায় পাওয়া যায় দেখি চলো। কিছুটা এগোতে দেখল একটা লোক দুটো ভেড়া খুঁটিতে বেঁধে রাস্তার পাশে বসে আছে। ফ্রান্সিস এগিয়ে লোকটার কাছে গেল। কিনতে হবে ভেড়া দুটো। শাঙ্কোকে বলল—ছোট্ট চাকতি আছে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। শাঙ্কো কোমরের গাঁট থেকে দেখে দেখে একটা ছোট সোনার চাকতি বের করল। লোকটা সোনার চাকতি দেখে খুব খুশি। বিদেশি লোকগুলো ভাল দাম দেবে। তখনই শাঙ্কো চাপাস্বরে বলে উঠল —ফ্রান্সিস ডানদিকে দেখ। ফ্রান্সিস আড়চোখে তাকিয়ে দেখল তিনজন যোদ্ধা ঘোড়ায় চেপে এদিকেই আসছে। বোধ হয় টহল দিতে বেরিয়েছে। যোদ্ধাদের গায়ে আটোসাঁটো সবুজ রঙের মোটা কাপড়ের পোশাক। বেশ ভারিকির ভঙ্গি। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—ওদের দিকে তাকিও না। ফ্রান্সিস ভেড়াওয়ালার সঙ্গে

সোনার চাকতি দেখিয়ে ইঙ্গিত করতে লাগল। ফ্রান্সিস ঝুঁকে পড়ে দামের ইঙ্গিত করছিল। কিন্তু ওদের গয়ে বিদেশি পোশাক। যোদ্ধাদের সজাগ দৃষ্টি ওরা এড়াতে পারল না। এগিয়ে এসে ওদের দলপতি গোছের দাঁড়িগোঁফওয়ালা যোদ্ধাটি ঘোড়ায় বসেই ঐ দেশী ভাষায় কি জিজ্ঞেস করল ফ্রান্সিসরা কথাটা কানেই তুলল না। শাঙ্কো কথাটা আন্দাজে বুঝে নিয়ে বলল—আমরা ভাইকিংদের দেশ থেকে এসেছি। শাঙ্কো স্থানিয় ভাষায় কথাটা বলল। দলনেতা এবার ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল তোরা কেন এসেছিস? ফ্রান্সিস মুখ ঘুরিয়ে বলল—বেড়াতে। তারপর বেশ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে একটা ভেড়ার গলায় বাধা দড়ি খুলতে লাগল। এই উপেক্ষাটা দলপতির সহ্য হল না। ওকে সকলে সমীহ করে ভয় করে আর এই বিদেশি ভূতটা ওর দিকে তাকাচ্ছেই না? হেঁকে বলল—অ্যাই আমার দিকে তাকিয়ে বল। ফ্রান্সিস তাকাল না। ক্ষেপে গিয়ে যোদ্ধাটা কোমরের খাপ থেকে দ্রুত তরোয়ালটা খুলল। তরোয়ালের ডগাটা ফ্রান্সিসের কাঁধের কাছে চেপে এক টান দিল। পোশাক কেটে গেল। একটু কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। রক্ত দেখে ফ্রান্সিসের মাথায় রাগ চড়ে গেল। শাঙ্কো ফ্রান্সিস বুঝল সেটা। বাধা দেবার আগেই লাফিয়ে ফ্রান্সিস উঠে দলপতির তরোয়াল ধরা হাতে জোর করে কামড়ে ধরল। এরকম হতে পারে দলপতি বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবে নি। সঙ্গের যোদ্ধা দুজনও অবাক। ওরা এই কাণ্ড দেখে কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। শাঙ্কো চাপাস্বরে ডাকল — ফ্রান্সিস। ফান্সিস কামড় ছেড়ে দিল। কামড়ে দলপতির হাত থেকে রক্ত বেরিয়ে এল। হাত থেকে তরোয়াল খসে নিচের বালিতে পড়ল। দলপতি ব্যথায় চোখমুখ কুঁচকে ক্ষতস্থান চেপে ধরল। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে নিচু হ'য়ে তরোয়ালটা তুলে নিল। তারপর মাথা নিচু করে ঘোড়াটার পেটে জড়িয়ে বাধা আসনের মোটা দড়িটায় তরোয়াল চালাল। দড়িটা কেটে গেল। ঘোড়াটার পেটটাও বেশ কিছুটা কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চিঁহি চিঁহি ডেকে উঠে ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আসনসুদ্ধ দলপতি নিচে বালির ওপর গড়িয়ে পড়ল। চোখের নিমেষে এত ঘটনা ঘটে গেল। আহত ঘোড়া ছুট লাগাল। সঙ্গী যোদ্ধা দুজন হতবাক হয়ে দেখছিল এসব। ওরা এবার তৎপর হল। ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসেই খাপ থেকে তরোয়াল খুলল। ফ্রান্সিসের দিকে ছুটে গেল। ওদের আক্রমণ করার আগেই ফ্রান্সিস তরোয়াল উঁচিয়ে ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল দুজনের সঙ্গে একজনের লড়াই। ফ্রান্সিস এগিয়ে পিছিয়ে নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাতে

লাগল। দুই যোদ্ধাই ফ্রান্সিসের তরোয়ালের আচমকা মার ঠেকাতে ঠেকাতে বুঝল এ বড় কঠিন ঠাঁই। ফ্রান্সিসের সঙ্গে তরোয়ালের লড়াই করা দুঃসাধ্য। ওদিকে দলপতি আহত হাত কোমরের কাপড়ের ফেট্টি খুলে বাঁধতে বাঁধতে এই লড়াই দেখতে লাগল। এবার শাঙ্কো লক্ষ্য করল ফ্রান্সিস সেই আগের মত বিদ্যুৎগতিতে এদিক ওদিক সরে গিয়ে লড়াই চালাতে পারছে না। কারণটা বোঝাই যাচ্ছে। ফ্রান্সিসের বাঁ পায়ের দুর্বলতা, শাঙ্কো বিনোলার দিকে তাকিয়ে সখেদে বলল ঈস্—তরোয়ালটা আনতে হত। ও উদ্বিগ্ন স্বরে গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস—আমাকে তরোয়ালটা দাও। দুটোকেই নিকেশ করবো। —না তাহলে আরো বিপদে পড়বো। ফ্রান্সিস হাত থেকে তরোয়াল ফেলে দিয়ে দুহাত তুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—লড়াই নয়। শাঙ্কো অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস—যে কোনদিন তরোয়ালের লড়াইয়ে কারো কাছে হার স্বীকার করেনি যার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে কত ধুরন্দর লড়াইয়ে হয় মারা গেছে নয় তো মাথা নিচু করে হার স্বীকার করেছে। সেই আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। ফ্রান্সিস আজ হার স্বীকার করল। দঃখে বেদনায় শাঙ্কোর দু'চোখ জল ভিজে গেল। যোদ্ধা দুজন তরোয়াল নামিয়ে তখন হাঁপাচ্ছিল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে শাঙ্কোর মনের অবস্থা বুঝতে পারল। অল্প হাঁপাতে হাঁপাতে মৃদুস্বরে ফ্রান্সিস বলল শাঙ্কো আমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নই। অনর্থক ঝুঁকি নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ওদিকে দলপতি তখন এগিয়ে এল। ফ্রানিসের ফেলে দেওয়া তরোয়ালটা তুলে নিয়ে খাপে ভরতে ভরতে দাঁত চেপে বলল—তোকে কয়েদখানায় ঢোকাবার ব্যবস্থা করছি। চল্। ফ্রান্সিসরা কেউ কোন কথা বলল না। দলপতি যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বলল, নিয়ে চল সব কটাকে। ফ্রান্সিসের তরোয়ালের ঘা খাওয়া ঘোড়াটার লাগাম ধরে নিয়ে এল। কেউ ঘোড়ায় উঠল না। দলপতি ধমকের সুরে বলল—চল্ বিদেশি ভূতের দল। মজা দেখাচ্ছি।

সামনে ফ্রান্সিসরা পেছনে ঘোড়ার লাগাম ধরে সবাই পশ্চিমমুখো চলল। হাঁটতে হাঁটতে শাঙ্কো মৃদুস্বরে বল ফ্রান্সিস—বড্ড রেগে গিয়েছিলে।

—তুই তুই করছিল। মেজাজ ঠিক থাকে? ফ্রান্সিসও মৃদু স্বরে বলল দুধারে ছাড়া ছাড়া বাড়ি ঘর। পাথর কাঠের। ঘাসপাতার ছাউনি। এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে মেয়ে পুরুষ বাচ্চা-কাচ্চা অনেকেই অপরিচিত পোশাকপরা ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। এটা বুঝল যে এই বিদেশিরা নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করেছে। দলপতি এদের তাই রাজা জোস্তাকের রাজদরবারে বিচারের জন্য নিয়ে যাচ্ছে। সবাই যেন



আমাকে তরোয়ালটা দাও। দুটোকেই নিকেশ করবো।

কিছুটা ভীত। রাজা জোস্তাকের পাল্লায় যখন পড়েছে তখন এদের কপালে দুঃখ আছে। ওদের মুখের ভাব লক্ষ্য করে ফ্রান্সিসও বুঝল বেশ বিপদেই পড়তে হল।

রাস্তায় বালিভরা রাস্তা শেষ হয়ে মাটির রাস্তা শুরু হল। রোদের তেজ বাড়ল। গা ঘেমে উঠছে। তবে দূরের সমুদ্র থেকে হাওয়া আসছিল অবাধেই। তাই হাঁটতে হাঁটতে বিনোলা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—তাহলে আমরা বিপদে পড়লাম।

—বিপদ তো যে কোন সময় আসতে পারে। দেখা যাক এরা আমাদের কোথায় নিয়ে যায়। তবে আমাদের আদর করে অতিথি আবাসে রাখবে না এটা ঠিক। ফ্রান্সিস মৃদু স্বরে বলল। ওরা হেঁটে চলল। ঘোড়ার লাগাম ধরে ধরে দলপতি আর যোদ্ধা দুজনও চলেছে। ওরা কোন কথাই বলছে না।

কিছু দূরে দেখা গেল বেশ কিছু বাড়িঘর তারপরেই একটা লম্বাটে বড় বাড়ি। পাথরের চাঙড় গেঁথে তৈরি। বাড়িটার মূল ফটকের সামনে এল ওরা। দু'জন প্রহরী। বেশ জমকালো পোশাক গায়ে। মূলপ্রবেশ পথের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খোলা তরোয়াল হাত পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিসরা বুঝল এটাই রাজবাড়ি। প্রহরীদের সামনে ওরা আসতেই প্রহরীরা দলপতির দিকে তাকিয়ে একটু মাথা নুইয়ে সদর দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। শুধু দলপতির পেছনে পেছনে ওরা রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকল। একটু চাতাল পার হয়েই রাজসভাকক্ষ। পাথর গেঁথে তৈরি লম্বাটে ঘর। দুটো মাত্র পাথরের জানালা। সভাকক্ষ একটু অন্ধকার অন্ধকার। প্রজাদের বেশ ভিড়। রাজা জোস্তাক কাঠ আর পাথরের তৈরি সিংহাসনে বসে আছে। সিংহাসন ফুল লতা তোলা মোটা কাপড় ঢাকা। দু'দিকের পাথরের দেয়ালের খাঁজে দু'টো বড় মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় ফ্রান্সিস দেখল রাজা জোস্তাক বয়স্ক মানুষ। মুখে অল্প পাকা দাড়ি গোঁফ। গায়ে পাতলা হলুদ রঙের পোশাক। আলখালা মত। পাশের আসনে বৃদ্ধ মন্ত্রীও বলশালী চেহারার সেনাপতি বসে আছে। রাজসভায় তখন বিচার টিচার চলছিল বোধহয়। সে সব নিয়ে ব্যস্ত রাজা। এক নজর ফ্রান্সিসদের দেখে নিল। বিদেশী। দলপতি ফ্রান্সিসদের নিয়ে সামনে এগিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। এখানে দেখার মত কিছু নেই। তাই ফ্রান্সিস এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে সময় কাটাতে লাগল। রাজা বেশ কয়েকবার ভারি গলায় বিচারের রায় শোনাল। তারপর ডান হাত তুলল। আজকের মত বিচার শেষ। সবাই নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে চলে গেল।

এবার রাজা আঙ্গুল নেড়ে ইঙ্গিতে দলপতিকে কাছে আসতে বলল। দলপতি রাজার কাছে গিয়ে মাথা একটু নামিয়ে সম্মান জানিয়ে দেশীয় ভাষায়

বলে গেল। বোধহয় কোথায় ফ্রান্সিসদের দেখা পেয়েছে সেসব। ফ্রান্সিস শুধু ভাইকিং কথাটা বুঝতে পারল। দলপতি রাজাকে হাতের তোড়ে বাঁধা কামড়ের ক্ষত দেখাল। মুখ দিয়ে কামড়াবার ভঙ্গীও করল। রাজা এবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে কী বলল। ফ্রান্সিস স্পেনীয় ভাষায় বলল আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না। রাজা থেমে থেমে স্পনীয় ভাষায় বলল—নেতা কে?

—আমি? ফ্রান্সিস কথাটা বলে এগিয়ে গেল।

—বিদেশী ভাইকিং — সাহস —দলপতি—কামড়েছো। রাজা ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল।

—আমাকে তুই তুই বলে ডেকে কথা বলছিল। অপমান সহ্য হয় নি। ফ্রান্সিস বেশ দৃঢ়স্বরে বলল।

—শাস্তি পাবে। আমার রাজত্বে এসেছো কেনো? রাজা বলল।

—কোন উদ্দেশ্যে নিয়ে আসিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—আশ্চর্য! বিনা কারণে? রাজা বলল।

—আমরা দ্বীপ দেশ ঘুরে বেড়াই। নতুন নতুন দেশ —কত বিচিত্র মানুষ তাদের ভাষা জীবনযাত্রা ভালো লাগে এসব। সকলের মঙ্গল করার চেষ্টা করি। ফ্রান্সিস বলল।

—শুধু এই? রাজা বেশ অবাক হয়ে বলল।

—এইটুকু কি কম হল? তবে আর একটা কাজও আমরা করি। ফ্রান্সিস বলল।

—কী? রাজা জানতে চাইল।

—কোন গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খোঁজ পেলে সে সব বুদ্ধি খাটিয়ে কোন না কোন সূত্র ধরে উদ্ধার করি। কখনও জীবনের ঝুঁকিও নিয়ে থাকি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা খুক্‌খুক্ করে হেসে উঠল। বলল এইবার আসল কথা — গুপ্তধন নিয়ে পলায়ন—পেশা তোমাদের।

—আমাদের ভুল বুঝবেন না। অনেক গুপ্তধন ভাণ্ডার আমরা উদ্ধার করেছি। — সাংকেতিক চিহ্ন নকশা মানচিত্র দেখে। কিন্তু একটি স্বর্ণমুদ্রাও আমরা নিইনি। আসল মালিককে দিয়ে দিয়েছি।

—আদর্শবাদী —অ্যাঁ? আবার রাজা খুক্ খুক্ করে হেসে উঠল।

—হ্যাঁ। খুব কম রাজা বা দলপতি আমাদের বিশ্বাস করেছেন। বাকিরা অবিশ্বাস করেছে। আপনিও অবিশ্বাস করছেন। অনুরোধ—আমাদের অবিশ্বাস করবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

—উঁহু— কয়েদঘরই তোমাদের আসল জায়গা। আগেও একটা বিদেশী স্পেন থেকে এসেছিল। আমরা স্পেন ভাষা শিখেছিলাম। প্রজাদের বলে বেড়াত যীশু না কে— শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। বাঃ আমি রাজা জোস্তাক — কেউ না? ফুটো নৌকোয় চড়িয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। তোমরা ভাগ্যবান— বেঁচে তো থাকবে। ফ্রান্সিস এবার রাজা জোস্তাকের মুখের দিকে তাকাল। পাতলা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে ক্রূর হাসি। কুড়কুড়ে চোখে বদ মতলব এর কাছে সুবিচার পাওয়া অসম্ভব।

—ঠিক আছে। আমাদের কতদিন কয়েদ হবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—যতদিন না স্বীকার করছো তোমরা ঠগ—প্রবঞ্চক—লুঠেরা। রাজা বলল। ফ্রান্সিস ভালো করেই বুঝল এই রাজার হাত থেকে নিস্তার নেই। পালাবার ছক কষতে হবে। তারপর দ্রুত ভাবতে লাগল।—পালাতে কদিন লাগবে কে জানে। সেটা কয়েদঘরে না ঢুকলে পাহারার ব্যবস্থা না দেখলে ঠিক বোঝা যাবে না। জাহাজে যা খাদ্য জল আছে কদিন আর যাবে তাতে? তারপর তো মারিয়া হ্যারিদের উপোশ করে থাকতে হবে। বিস্কো নেই। ভেন বয়স্ক। অন্য বন্ধুরা সাহসী ঠিকই কিন্তু তাদের চালনা করবে কে? সিনাত্রা গান গায় ভালো। কিন্তু ভীতু। হ্যারি শরীরের দিক থেকে দুর্বল। কিন্তু খুব বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই। তবে আমি কাছে না থাকলে ও মনের দিক থেকেও দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই চটানো চলবে না। ফ্রান্সিস খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল মহামান্য রাজা আপনার দেওয়া শাস্তি আমরা মাথা পেতে নিলাম। যত দোষ আমাদের এই তিনজনের। আপনার দলপতির হাত কামড়ে দিয়েছি। শাস্তি আমাদের অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু মহামান্য রাজা আমাদের বেশ কিছু বন্ধু আমাদের জাহাজে রয়েছে। তাদের খাদ্য জল ফুরিয়ে গেছে। কাউকে পাঠিয়ে যদি তাদের খাদ্য জল সংগ্রহ করতে সাহায্য করেন। তাহলে আপনি যে যীশুর চেয়েও মহানুভব সেটা ভালোভাবে প্রমাণিত হবে। ফ্রান্সিস দেখল—কাজ হয়েছে। রাজা জোস্তাক খুশিতে মিটিমিটি হাসছে। মাথা দুলিয়ে রাজা বলল—এ আর বেশি কথা কি। আমার লোক গিয়ে খাদ্য জল দিয়ে আসবে।

—সত্যিই আপনি মহারাজা। ফ্রান্সিস সজোরে বলে উঠল। কিন্তু ভবি ভোলবার না। কয়েদ ঘরে বন্দী থাকার আদেশের নড়চড় হল না। সেনাপতি আসন থেকে নেমে এল। ফ্রান্সিসদের কছে এসে বলল চলো। ফ্রান্সিস মাথা অনেক নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানাল। আগে সেনাপতি। পেছনে ফ্রান্সিসরা চলল। রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সেনাপতি উত্তরমুখো চলল। রাজবাড়ি

এলাকা শেষ হল। তারপর বাদিকে একটা পাথরের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। পাথর আর কাঠ দিয়ে বেশ শক্ত গাঁথুনির ঘরটা বোঝা গেল এটা কয়েদঘর। সেনাপতিকে দেখে কোথা থেকে দুজন প্রহরী খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল। ঘরটার দরজার সামনে এস দাঁড়িয়ে পড়ল। বোঝা গেল এই দুজনই কয়েদঘর পাহারা দেবে। সেনাপতিকে একটু মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল দু'জনে। একজন কোমরের ফেট্টিতে ঝোলানো একটা বড় লোহার রিং মত খুলে নিয়ে বন্ধ দরজার সামনে গেল। দরজার বড় কড়ায় ঝুলছিল একটা বেশ বড় গোল তালা। প্রহরীটি রিং থেকে লম্বা একটা চাবি বের করে দরজাটা খুললে। লোহার দরজাটা বেশ জোরে ঠেলে খুলল। ঢটাং ধাতব শব্দ হল। অন্য প্রহরীটি ফ্রান্সিসদের একে একে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। ওরা যখন এক এক করে ঢুকছে তখন প্রহরীটি প্রত্যেককে জোরে ঠেলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। ফ্রান্সিসের আবার মেজাজ চড়ে গেল। কিন্তু ও চোখ কুঁচকে নিজেকে সহমত করল। এই অপমানজনক ব্যবহার মুখ বুজে সহ্য করল। নিরুপায় এখন।

এই ভর দুপুরেও ঘরটা কেমন অন্ধকার অন্ধকার। চারপাশে নিরেট পাথুরে দেয়াল। দুজন প্রহরীই ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিসদের দুহাত দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। কিন্তু পা বাঁধলো না। ফ্রান্সিস স্বস্তির হাঁপ ছাড়ল। দেখা গেল দু'পাশের দেয়ালে দুটো লোহার কড়া গাঁথা। একটা কড়ায় লম্বা একটা মোটা দড়ি ঝুলছিল। একজন প্রহরী সেই দড়ির একটা মাথা এনে ফ্রান্সিসদের দড়ি বাঁধা হাতের মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে ওপাশের কড়ায় শক্ত করে বেঁধে দিল দ'হাত তো বাঁধাই। তাঁর মধ্যে দিয়ে লম্বা দড়ি ঢুকিয়ে ফ্রান্সিসদের নড়াচড়াই প্রায় বন্ধ করে দিল। ঘরে ঘুরে বেড়ানো যাবে না। ফ্রান্সিস একটু হেসে এক প্রহরীকে বলল—সত্যিই ভাই— তোমাদের রাজা শুধু মহানই নন— বুদ্ধিমান ধুরন্ধর। প্রহরীরা ফ্রান্সিসের কথা কিছুই বুঝল না। বেরিয়ে গেল। ঢটাং। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ঘরের মেঝেয় শুকনো খড় ঘাসপাতা ছড়ানো। হাত বাঁধা অবস্থায় ফ্রান্সিস ঐ মেঝের মধ্যেই শুয়ে পড়ল। বাঁধা হাত বুকের ওপর রেখে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরটা দেখতে লাগল। শাঙ্কো আর বিনোলা বসে পড়ল। ফ্রান্সিস দেখল ঘরটার উত্তর দিকে বেশ কিছু ওপরে একটা জানালা মত। জানালা না বলে ওটাকে খোদলই বলা যায়। এবড়ো-খেবড়ো করে ভাঙা। ওটাই একমাত্র আলো আর হাওয়া চলাচলের পথ। আর কোন ফোকর নেই। হঠাৎ হাওয়ার

ধাক্কায় একটা ডাল এসে ফোকরটায় ঝাপটা মারল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াও। বলল শাঙ্কো তোমরা উঠে দাঁড়াও। আমি দড়িটা টেনে নিয়ে ঐ দেয়ালের কাছে যাবো। শাঙ্কো বিনোলা উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস ফোকরের দেয়ালের দিকে ঠিক পায়ে পায়ে এগোল। হাতে টানা দড়ি বাঁধা। কাজেই শাঙ্কোদের সেই সঙ্গে এগোতে হল। ফ্রান্সিস মাথা তুলে ফোকরের মধ্যে দিয়ে তাকাল। ফোকরের হাত কয়েক দূরেই একটা মোটামুটি মোটা ডাল বাইরের আলোয় দেখল। আস্তে আস্তে ফিরে এল। শাঙ্কোরাও ফিরে এসে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস আবার শুয়ে পড়ল।

—ফ্রান্সিস—কী দেখছিলে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—মুক্তির পথের ইঙ্গিত। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—অসম্ভব। যা শক্ত দেয়াল। ছাউনিও উঁচুতে। কী করে মুক্তির কথা ভাবছো? বিনোলা একটু অসহায় ভঙ্গীতে বলল।

—ছক কষছি বিনোলা। শাঙ্কো কিছু বলল না। ও ফ্রান্সিসকে ভালো করেই চেনে। ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই কিছু গভীরভাবে ভাবছে। ঠিক একটা উপায় বের করবেই।

এবার শাঙ্কোও বুকে দুহাত রেখে শুয়ে পড়ল। দেখাদেখি বিনোলাও কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে চুপ করে শুয়ে রইল। ভাবছিল রাজা কথা দিয়েছে। নিশ্চয়ই ওদের জাহাজে খাদ্য ও জল পাঠিয়েছে। মারিয়া আর বন্ধুরা আজ থেকেই পেট ভরে খেতে পাবে। পর্যাপ্ত পানীয় জলও পাবে। একটু তন্দ্রা এল ফ্রান্সিসদের। হঠাৎ ঢং শব্দে ফ্রান্সিসের তন্দ্রা ভেঙে গেল। দরজা খুলে গেল। বগলে লম্বাটে শুকনো বড় পাতা আর হাতে একটা মাটির হাঁড়ি নিয়ে একজন প্রহরী ঢুকল। অন্যজনের হাতে আর একটা মাটির হাঁড়ি। সে সব মেঝেয় রেখে একজন এসে ফ্রান্সিসদের হাত বাঁধা দড়ি খুলে দিল। ওদের সামনে পাতা পেতে দেওয়া হল। পাতে দেওয়া হল সেদ্ধ দানার খাবার। কিছুটা খেয়ে শাঙ্কো বলল—এই দানা গুলো আমি এনেছিলাম। কালকের সেই বিচিত্র রান্নার রুটিতে দেওয়া হয়েছিল। খেয়ে দেখো ভাল লাগবে। এবার একটা বড় টুকরোর মাছ আর ঝোলমত দেওয়া হল। মাছটা এক কামড় খেয়ে ফ্রান্সিস বলে উঠল—কী সুন্দর স্বাদ। সামুদ্রিক মাছ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে। ফ্রান্সিস এক প্রহরীকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে চুপ করে গেল। ও কিছুই বুঝবে না। সেনাপতি এলে জানতে হবে। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বরাবরের মতই বলল—আজ খুব সুস্বাদু খাবার। বেশি করে খাও।

শরীর তৈরী রাখো।

খাওয়া শেষ। একজন প্রহরী বড় মাটির হাঁড়ি ভর্তি জল নিয়ে ঢুকল। কাঠের গ্লাসও দিল। ওরা হাতমুখ ধুয়ে জল খেয়ে নিল। ওদের হাত বেঁধে প্রহরীরা চলে গেল। আরো খেতে চাইলে মাথা এপাশ ওপাশ করেছিল। আর নেই। তবু খাওয়া ভালোই হল। কারণ তিনজনই ছিল ক্ষুধার্ত। দড়ি দিয়ে হাত বেঁধে ওরা চলে গেল। ঘটাং — দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ওরা শুয়ে পড়ল।

বিকেলে সেনাপতি এল। ঘরে ঢুকে একটু হেসে বলল—ভাল?

—ভালো আছি। দুপুরে পেট পুরে খেয়েছি। আচ্ছা মাছটা খুব সুস্বাদু লাগল। সমুদ্রের মাছ, ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—তাল্পি মাছ। খাঁড়িতে আসে। ডিম পাড়ে অসংখ্য—বড় জলায় একটু দূরে।

—ও। যাক গে—রাজা কাউকে খাদ্য জল নিয়ে আমাদের জাহাজে পাঠিয়েছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—নাঃ। কেউ — না। সেনাপতি মাথা এপাশ-ওপাশ করল। ফ্রান্সিস সবিস্ময়ে বলে উঠল—রাজা যে বললেন। কথা দিলেন। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল।

—রাজা—কত কাজ—মনে নেই— বড় চিন্তা— রাজা মিরান্দার লুকোনো—রাজৈশ্বর্য—রাজা পাগল— খুঁজছে। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিস বেশ আগ্রহ বোধ করল। বলল —ব্যাপারটা বলুন তো?

—অনেক কথা—ইতিহাস—সময় নেই চলি। ফ্রান্সিস তাকে থামাবার সময়ও পেল না। তার আগেই সেনাপতি চলে গেল।

—ফ্রান্সিস—গুপ্তধনের ব্যাপার। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমার চিন্তা বন্ধুদের জন্যে। আর কিছু ভাবতে পারছি না। লোকটা এত নীচ এত হীনমনা।

—কী আর করবে? ফ্রান্সিস চিন্তিত স্বরে বলল।

—শাঙ্কো—ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল— দ্রুত ছক কষতে হবে। আজ রাতেই পালাতে হবে। রাজা সেনাপতি বা প্রহরীরা জানে না আমার নাম ফ্রান্সিস কোন বাধাই আমার কাছে বাধা নয়। আজ রাতে পালাতে হবে।

—এই ঘর থেকে —প্রহরীদের ধোঁকা দিয়ে?

ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যে হল। একজন প্রহরী জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ঢুকল। ফোকরের দিককার পাথুরে দেয়ালের খাঁজে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল।

রাত হল। চোখ বুঁজেই ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো? শাঙ্কো মুখে শব্দ করল হুঁ।

—যদি আমরা পরস্পরের কাঁধে উঠি — ঐ খোঁদলটার কাছে তুমি পৌঁছতে পারবে না? শাঙ্কো খোঁদলটার উচ্চতা মনে মনে মেপে নিয়ে বলল—

—মনে হয়— পৌঁছোনো যাবে।

—অন্তত তুমি হাতের নাগালে পাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তবে ঐ হাত চারেক খোঁদল। পার হবো কী করে? শাঙ্কো একটু অসহায় ভঙ্গীতে বলল।

—তাহলে তুমি আর নিজেকে দুঃসাহসী ভাইকিং বলে পরিচয় দিও না। ফ্রান্সিস বলল।

—না মানে—। শাঙ্কো কথাটা শেষ করতে পারল না। ফ্রান্সিস বলে উঠল আমরা ভাইকিং —সব কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি। এমন কি কষ্টদায়ক মৃত্যু পর্যন্ত। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল।

বলল—পারবো। কিন্তু সবার নিচে কে থাকবে?

—আমি। ফ্রান্সিস বেশ দৃঢ় স্বরে বলল।—তুমি? বাঁ পা—এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ নও তুমি। শাঙ্কো বলল।

—পারবো—পারতেই হবে। ফ্রান্সিসের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা।

—তবে আমিও পারবো। কিন্তু তারপর? শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল।

—বাইরে ঐ বুনো গাছটার একটা মোটা ডাল আছে। হাত বাড়িয়ে না পেলেও—ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরা যাবে। চোখ বুঁজেই ফ্রান্সিস কথাগুলো বলে গেল। শাঙ্কো কিছুটা উঠে ভালো করে খোঁদলটা দিয়ে চেয়ে রইল। ম্লান জ্যোৎস্নায় দেখল সত্যি একটা ডালের আভাস। মশালের অস্পষ্ট আলোতে আরো স্পিষ্ট দেখল।

—রাতে খাওয়া শেষে সব বলবো। এখন হাত পা ছেড়ে স্রেফ বিশ্রাম। কী ভাবে কী করবে ভাবো। অন্য কোন চিন্তা নয়। শাঙ্কো শুয়ে পড়ল। কী ভাবে খোঁদলে উঠবে কী ভাবে বাইরে বেরোবে ডাল ধরবে এ সব ভাবতে লাগল।

ঢঢাং ঢং— রাতের খাবার দিতে এল প্রহরীরা। সেই দানাসেদ্ধ তাল্লি মাছ। বোঝাই যাচ্ছে তাল্লি মাছ অজস্র পাওয়া যায়। খাওয়া শেষ। প্রহরীরা চলে গেল।

রাত বাড়তে লাগল। ফ্রান্সিস চোখ বুজেই মৃদুস্বরে বলতে লাগল। —

শাঙ্কো তোমার ছোরা—দড়ি কাটা—বড় মোটা দড়িটা খুলে কোমরে জড়াবে আমি বসবো কাঁধে উঠবে বিনোলা তার কাঁধে তুমি — খোঁদল ধরবে—শরীর যতটা পারো গুটিয়ে বাইরে বেরোবে—যে ভাবেই পারো মোটা ডালটা ধরবে। দড়ির মাথাটা শক্ত করে ডালে বাঁধবে—। শাঙ্কো চাপা স্বরে বলে উঠল—

—সাবাস ফ্রান্সিস।

—আস্তে। এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। গায়ে জোর পাবে। ভালো দড়ি বেঁধে সংকেত দেবে। ফ্রান্সিস চোখ বুজে থেকেই বলল।

—মোরগের ডাক? শাঙ্কো বলল।

—পাগল। মোরগরা রাতে ডাকে না। ভোর হলে ডাকে। অন্য যে কোন পাখির ডাক। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল।

—ঘুমোও। ফ্রান্সিস বলল।

রাত গভীর হল। তন্দ্রা ভেঙে ফ্রান্সিস উঠে বসল। ফিস্ ফিস্ করে ডাকল শাঙ্কো বিনোলা। দু'জনেরই ঘুম ভেঙে গেল। দুজনেই তাড়াতাড়ি উঠে বসল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের খুব কাছে এসে নিচু হল। ফ্রান্সিস দড়ি বাঁধা হাতদুটো শাঙ্কো বুকের কাছ দিয়ে জামার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শাঙ্কোর ছোরাটা বের ক'রে আনল। তারপর ছোরাটা ধরে শাঙ্কোর হাত বাঁধা দড়ির মাঝখানে ঘষতে লাগলো। অনেকটা কেটে গেল। শাঙ্কো এক হ্যাঁচকা টানে দড়িটা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর একইভাবে ফ্রান্সিস ও বিনোলার হাতে বাঁধা দড়ি কেটে ফেলল। ফ্রান্সিস—মোটা লম্বা দড়িটা খুলে পাথুরে দেয়ালে গাঁথা কড়ার কাছে গেল। কড়ায় বাঁধা দড়ির দুটো মাথাই কাটল। দড়ির একটা মাথা শাঙ্কো কোমরে বেঁধে নিল। এবার ফ্রান্সিস ঐ খোঁদলটার দিকে নিচে মেঝেয় উঁচু হয়ে বসল। বিনোলে কাঁধের দু'পাশে পা ঝুলিয়ে বসল। শাঙ্কো এবার দেয়ালে দু হাতে ভর দিয়ে বিনোলার কাঁধের ওপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু খোঁদলটা তখনও হাতখানেক দূরে। এবার ফ্রান্সিস দেয়ালে দু'হাতে ভর রেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। এবার শাঙ্কো খোঁদলটা দু'হাতে ধরে ফেলল। তারপর শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে খোঁদলটায় বুক চেপে ঝুলে পড়ল। এই ঝাঁকুনিতে ফ্রান্সিস একটু টাল খেয়েও সামলে নিল। বাঁ পাটা টন টন করছে। কিন্তু ফ্রান্সিস মুখ থেকে কোন কাতর শব্দ করল ন। দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল। শাঙ্কোর শরীরের ভার কমে যেতে ফ্রান্সিসের একটু স্বস্তি হল। শাঙ্কো বাইরে মুখ বাড়িয়ে অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় মোটা ডালটা অনেকটা স্পষ্ট দেখতে পেল।

প্রায় চৌকোনো খোঁদলটায় ভর দিয়ে ও আস্তে আস্তে শরীরটা ঘোরাল। তারপর হাত বাঁড়িয়ে মোটা ডালের গায়ের একটা ছোট ডাল ধরে ভর নিল। তারপর খোঁদলের মধ্যে দিয়ে জোরে শরীরটা টেনে নিয়ে মোটা ডালটা প্রথমে একহাত পরে দুহাতে ধরে ফেলল। তখনও একটু হাঁপাচ্ছে। একটু দম নিয়ে খোঁদল থেকে দু পা সরিয়ে নিয়ে ডালটায় ঝুলে পড়ল। পরক্ষণেই পাক খেয়ে ডালটার ওপর বসে পড়ল। দেরি করা চলবে না। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। কোমর থেকে দড়ির মাথাটা খুলে খুব কষে ডালটায় বেঁধে ফেলল। শাঙ্কো মৃদু হাসল। ফ্রান্সিসের নিখুঁত ছক। ও এবার দুহাতের তালু মুখে চেপে কুউ কু ঔ পাখির ডাক ডাকল। ঘরে নিশ্চিন্ত ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল— বিনোলা দড়ি ধরে ওঠো। বিনোলা দড়ি টেনে ধরে আস্তে আস্তে খোঁদলটায় বুক দিয়ে ঝুলে পড়ল। শাঙ্কোর মতই শরীর ঘুরিয়ে দড়ি টেনে ধরে ডালটায় উঠে এল। ফ্রান্সিস দেয়ালে হাত চেপে হাঁপাতে লাগল। একটু দম নিল। তারপর দড়ি ধরে উঠতে লাগল। জাহাজের দড়ি ধরে নামা ওঠা ওদের কাছে জল ভাত। একটু উঠে বাঁ হাত দিয়ে জ্বলন্ত মশালটা তুলে নিল। তারপর ডান হাত দিয়ে উরু দিয়ে দড়ি জড়িয়ে খোঁদলের গায়ে ঝুলে পড়ল। ডান হাতে টেনে দড়ির ঝোলানো মাথাটা তুলে নিল। জ্বলন্ত মশালটা মেঝেয় ছুড়ে ফেলেই শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দড়ির সাহায্যে ডালটা ধরে ফেলল। বিনোলা একটু সরে বসল। ফ্রান্সিস ডালের ওপর বসে পড়ল। ওদিকে ঘরের মেঝের খড় ঘাসপাতায় আগুন জ্বলে উঠেছে। খোঁদল দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

—জলদি—নেমে পড়। দড়ি ধরে ঝুলে পড়া শাঙ্কো চাপা স্বরে বলল— ঘরের পেছনে কোন প্রহরী নেই। শাঙ্কোর দড়ির শেষে নেমে এসে নিচে তাকিয়ে দেখল তখনও দুহাত নিচে শুকনো পাতার স্তূপ। আর ফ্রান্সিসকে একই ভাবে নামতে হল। শুকনো পাতার স্তূপে শব্দ হল। খসস্ ওদিকে আগুন সারা কয়েদ ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। দরজার কাছে প্রহরীরা হৈ হৈ ডাকাডাকি শুরু করেছে। চাপাস্বরে ছোটে জাহাজ ঘাটের দিকে। বলেই ফ্রান্সিস এক ছুটে শুকনো ঝরাপাতা ঘাস মাড়িয়ে সামনের ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তিনজনেই ঝোপঝাড় ঠেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটে চলল।

ওদিকে আরো যোদ্ধা এসে জড়ো হয়েছে সেই জ্বলন্ত কয়েদঘরের কাছে। একটু কাছে জলা থেকে পীপে জলে ভর্তি করে আগুন নেভাতে লাগল।

সৈন্যাবস থেকে আরো সৈন্য ছুটে এল। ততক্ষণে আগুন লেগে গেছে

কয়েদঘরের ছাউনিতে।

দুজন প্রহরী ছুটল সেনাপতিকে খবর দিতে। শয়নকক্ষে তখন সেনাপতির ঘুম ভেঙে গেছে। বুঝে উঠতে পারল না। বাইরে এত চ্যাঁচামেচি কীসের জন্যে। আগুন 'আগুন' চিৎকারটা শুনছিল। সেনাপতি সবে বিছানা থেকে নেমেছে তার বাড়ির প্রহরী ছুটে এল।

—কী ব্যাপার? বাইরে এত গোলমাল কীসের? সেনাপতি জিজ্ঞেস করল।

—আজ্ঞে কয়েদঘরে আগুন লেগেছে। প্রহরী হাঁপধরা গলায় বলল।

—সে কী? কী করে আগুন লাগল? সেনাপতির প্রশ্ন।

—আজ্ঞে — তা তো বলতে পারবো না। প্রহরীটি মাথা নেড়ে বলল।

—তুই যা। রাজা মশাইকে খবর দে। কয়েদ ঘরে আগুন লেগেছে। উনি যেন আসেন। সেনাপতি বলল। প্রহরী ছুটে বেরিয়ে গেল।

ওদিকে ফ্রান্সিস দেখল—ঝোপ জঙ্গল এলাকা শেষ। ডানদিকে কিছু দূর দিয়ে সদর রাস্তা। টানা চলে গেছে জাহাজ ঘাটের দিকে।

ফ্রান্সিস রাস্তার ধারে এসে এক ঝলক পেছনটা দেখে নিল? জ্যোৎস্নার নিষ্প্রভ আলোয় দেখা গেল রাস্তা জনশূন্য। যাক নিশ্চিন্ত। তখনই দেখল কয়েদঘরের ছাউনিতে আগুন লেগে গেছে। আগুনের লেলিহান শিখা আর কালো ধোঁয়া কুণ্ডুলী পাকিয়ে উঠেছে আকাশের দিকে। ওরা প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল। ঝোপ-জঙ্গলের বাধা নেই। উন্মুক্ত রাস্তায় ওদের চলার গতি বেড়ে গেল। সমুদ্রের দিক থেকে জোর হাওয়া ছুটে আসছে। ধুলো বালি উড়ছে। চোখ কুঁচকে ওরা ছুটল প্রাণপণে।

সেনাপতি দ্রুত কয়েদঘরের দিকে চলল। জ্বলন্ত কয়েদ ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। সেনাপতি প্রহরীদের জিজ্ঞেস করল—ঘরে তিনজন বিদেশি ছিল। তারা কোথায়?

—বোধহয় পুড়ে মরে গেছে। একজন প্রহরী বলল।

—কী করে বুঝলি? ওদের চিৎকার কান্নাকাটি শুনতে পেয়েছিলি? সেনাপতি জিজ্ঞেস করল।

—আজ্ঞে না। প্রহরীটি মাথা এপাশ ওপাশ করল।

—আগুনে পুড়তে থাকলে নিশ্চয়ই চীৎকার চ্যাঁচামেচি করতো। কথাটা বলে সেনাপতি এগিয়ে পোড়া ঘরের দিকে তাকাল। তখন কয়েদ ঘরের দরজা ভেঙে পড়ে গেছে। ওপরের জ্বলন্ত ছাউনি থেকে কাঠ পাথর ভেঙে পড়ছে। আগুনের আভায় ঘরের ভেতরে ভালো করে দেখল সেনাপতি। না কোন

পোড়া শরীর পড়ে নেই। সঙ্গে সঙ্গে বুঝল বন্দীরা পালিয়েছে। পালাবার আগে আগুন লাগিয়ে গেছে। কিন্তু কীভাবে পালাল? সেনাপতি পোড়া কয়েদ ঘরের ওপাশে গেল। আগুনের আভায় সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেখল পেছনের উঁচু গাছটার একটা মোটা ডাল থেকে কয়েদঘরের মোটা দড়িটা ঝুলছে। তার মানে যে করেই হোক খোঁদল দিয়ে দড়ি ধরে নেমে পালিয়েছে। একটু দূরে দাড়ি গোঁফওয়ালা দলপতি জল ছিটানোর তদারিক করছিল। সেনাপতি ইশারায় তাকে ডাকল। কাছে এসে বলল—যে তিন বিদেশিকে এখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল তাদের জাহাজঘাটায় নোঙর করা আছে—তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দলপতি মাথা ওঠানামা করল।

—বন্দীরা পালিয়েছে। নিশ্চয়ই জাহাজঘাটায় যাবে। তুমি সাতজন ঘোড়সওয়ার সৈন্য নিয়ে এক্ষুনি এসো। জলদি। জাহাজে ওঠার আগেই ওদের বন্দী করতে হবে। বালির ওপর দিয়ে ওঁরা জোরে ছুটতে পারবে না। ধরা পড়বেই। সেনাপতি বলল।

দলপতি দ্রুত ছুটল সৈন্যবাসের দিকে।

তখনই রাজা জোস্তাক সেখানে এল। দেখল খোলা কয়েদঘরে কাঠামো। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। সেনাপতি রাজার কাছে এল। যে যা ভেবেছে যা করেছে সে সব মৃদুস্বরে বলল। সেই সময় সাতজন ঘোড়সওয়ার সৈন্য শূন্যে খোলা তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে তাদের কাছে এল। সেনাপতি গলা চড়িয়ে বলল—বিদ্যুৎগতিতে জাহাজঘাটের দিকে ঘোড়া ছোটাও। বন্দীরা ঐ জাহাজ ঘাটের দিকেই পালাচ্ছে। বন্দীদের পাকড়াও করো। সাতজন ঘোড়সওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছোটাল। এবার সেনাপতি বাকি সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল— তোমরাও যাও। ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের সাহায্য করবে। বন্দীদের ধরা চাই। কিন্তু ওদের দলকে ধরতে জাহাজে উঠবে না। পরে এক ফোঁটা রক্ত না ঝরিয়ে কবজা কবে। কাজেই ওদের সঙ্গে এখন লড়াই নয়।

সৈন্যরা দলপতির নেতৃত্বে চিৎকার করতে করতে জাহাজঘাটের দিকে ছুটল।

ওদিকে ফ্রান্সিসদের ছোটার গতি কমে এল। কারণ বালির রাস্তায় এসে পড়েছে তখন। বালিতে পা হড়কে যাচ্ছে। পা চেপে বসছে না। ফ্রান্সিস আবার বাঁ পায়ে তেমন জোর পাচ্ছিল না। মাঝে মাঝেই একটু পিছিয়ে পড়ছিল। শাঙ্কো বিনোলা একটু থেমে ফ্রান্সিসের কাছে আসছিল। আবার তিনজন একসঙ্গে ছুটছিল। তিনজনেই তখন ভীষণ হাঁপাচ্ছে। ফ্রান্সিস হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছিল। ওরই কষ্ট হচ্ছিল বেশি। ফ্রান্সিস দ্রুত একবার পেছন দিকে তাকিয়ে

দেখল—ধূলোবালি উড়িয়ে একদল ঘোড়সওয়ার সৈন্য ছুটে আসছে। সামনে তাকিয়ে ওদের জাহাজটা দেখল। কিন্তু বেশ দূরে জাহাজঘাট। ফ্রান্সিস হাঁপানো গলায় বলল—জোরে ছোটো। ছুটতে ছুটতে তখন ওরা জাহাজ ঘাটের অনেক কাছে চলে এসেছে। ও আবার পেছন দিকে তাকাল? অশ্বারোহী সৈন্যদল দুরন্ত গতিতে অনেক কাছে চলে এসেছে। বুঝল—শেষ রক্ষা হবে না। জাহাজঘাট পর্যন্ত দূরত্ব আর বেশি বাড়ানো যাবো না। তবু ছুটল। প্রাণপণে। জাহাজঘাটের কাছাকাছি আসতেই পেছন থেকে অশ্বারোহী সৈন্যরা চীৎকার করতে করতে প্রায় ওদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। অশ্বারোহী সৈন্যরা ওদের ধরে ফেলল। জাহাজঘাট তখন হাত কুড়ি দূরে। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বালির ওপর বসে পড়ল। মুখ হাঁ করে হাঁপাতে হাঁপাতে যথাসাধ্য গলা চড়িয়ে বলে উঠল—শাঙ্কো বিনোলা—দাঁড়াও ছোটার চেষ্টা করো না। ওরা তরোয়াল চালাবে। বসে পড়ো। সত্যি—সৈন্যরা নিরস্ত্র ওদের তরোয়োল চালিয়ে হত্যা করতে পিছু পা হবে না। দুজনেই বালির ওপর বসে পড়ল। হাঁপাতে লাগল। তখন পূর্ব আকাশে লাল রং ধরেছে। সূর্য উঠতে বেশি দেরি নেই। সৈন্যদের চিৎকারের শব্দে জাহাজে তখন ফ্রান্সিস সব বন্ধুদের অনেকেরই ঘুম ভেঙে গেছে। হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল। ও বাইরে সৈন্যদের চিৎকার হৈ হল্লা শুনতে পেল। বুঝল — নিশ্চয়ই ফ্রান্সিসরা কোন বিপদে পড়েছে। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির দিকে ছুটল। চিৎকার করে বলতে লাগল ভাইসব —তরোয়াল নাও। ডেকএ চলো। ফ্রান্সিসরা বিপদে পড়েছে। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপায়ে উঠতে গিয়ে হ্যারি সিঁড়ির ধাপে পা আটকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। পেছনে থেকে এক বন্ধু ওকে ধরে ফেলল। ভাইকিংরা ছুটে গেল অস্ত্রঘরের দিকে। তরোয়াল নিয়ে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ডেক এ উঠে এল। হ্যারি রেলিঙের কাছে ছুটে গেল। তখন সূর্য উঠছে। ভোরের আবছা আলোয় দেখল তীরের কাছে বালিয়াড়িতে কয়েকটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। একদল সৈন্য গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। গোলের মাঝখানে তিনজন বসে আছে। তখনই সূর্য উঠছে। এবার দেখল সেই তিনজন ফ্রান্সিস শাঙ্কো আর বিনোলা। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে। শাঙ্কো আর বিনোলা সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে আছে। সূর্য উঠল। সমুদ্রে জাহাজে তীর ভূমিতে আলো ছড়াল। হ্যারি বুঝে উঠতে পারল না কী করবে। তখনই একজন বন্ধু তরোয়াল হাতে হ্যারির কাছে ছুটে এল। গলা চড়িয়ে বলল—হ্যারি পাটাতন ফেলাই আছে। ফ্রান্সিসদের ওরা বন্দী করেছে। নেমে লড়াই করে ফ্রান্সিসদের মুক্ত করতে

হবে। চলো আর এক মুহূর্ত দেরি নয়।

—একটু দাঁড়াও। ফ্রান্সিস এত কাছে। ও নিশ্চয়ই আমাদের ডেকে কিছু বলবে। তখনই ফ্রান্সিস মুখ তুলে জাহাজের দিকে তাকাল। বন্ধুদের হাতে তরোয়াল দেখেই ও বুঝল বন্ধুরা লড়াইয়ের জন্যে তৈরি। ভোরের নরম আলোয় হ্যারি এবার ফ্রান্সিসদের মুখ চোখ স্পষ্ট দেখতে পেল। বুঝল ওরা ভীষণ ক্লান্ত অশ্বারোহী সৈন্যরা ওদের অনেক দূর তাড়া করে এসে ধরেছে। ফ্রান্সিস তখন বুঝতে পেরেছে। বন্ধুরা যে কোন মুহূতে নেমে আসতে পারে। ফ্রান্সিস রাস্তার দিকে তাকাল। দেখল সৈন্যদল আসছে। সবার সামনে দাঁড়িয়ে গোঁফওয়ালা দলপতি। ভীষণ বিপদ সামনে। ও দ্রুত উঠে দাঁড়াল। যথাসাধ্য গলা চড়িয়ে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব আমার কথা শোন। কেউ জাহাজ থেকে নামবে না। লড়াই নয়। আমরা ধরা দিয়েছি। যে করেই হোক আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। এখন লড়াইয়ে নামলে আমরা কেউ বাঁচবো না।

হ্যারিও দু'হাত তুলে বলে উঠল, ভাই সব, ফ্রান্সিসের কথা মেনে চলো। বন্ধুরা সব তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে রইল।

ততক্ষণে খোলা তরোয়াল হাতে দলে দলে সৈন্যরা এসে জাহাজঘাটে জড়ো হলো। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা এবার বুঝতে পারল ফ্রান্সিস সঠিক কথাই বলেছে। এত সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া বোকামি ছাড়া কিছু নয়।

ওদিকে বেশ কয়েকজন খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসদের পিঠে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে রাজধানীর দিকে হাঁটতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা হাঁটতে শুরু করল। ওরা এই ভেবে নিশ্চন্ত হল যে একটা অবধারিত লড়াই এড়ানো গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে বিনেলো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, খুব বুদ্ধি করে পালিয়েছিলাম কিন্তু ধরা পড়তে হল। এবার কোথায় আমাদের বন্দী করে দেখি।

নিশ্চয়ই মজবুত কোনো ঘরে আটকাবে। পাহারার কড়াকড়িও বাড়াবে। ওর মধ্যেই পালাবার ছক কষতে হবে।

পারবে? বিনেলো একটু হতাশার সঙ্গেই বলল।

সব দেখিটেখি। উপায় একটা বের করতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসদের রাজবাড়ির সামনে নিয়ে আসা হল। রাজবাড়ির সদর দেউড়িতে সেনাপতি ফ্রান্সিসদের দেখে সেনাপতি দুজন প্রহরীকে কী বলল। প্রহরী দুজন এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। রাজবাড়ির পুব কোনায়

একটা তালাবন্ধ ঘরের সামনে এসে প্রহরী দুজন দাঁড়াল। একজন প্রহরী কোমরে ঝোলানো চাবির গোল গোছা থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলল। সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা কয়েকজন এসো। অস্ত্রশস্ত্র বার করতে হবে। বোঝা গেল এটা অস্ত্রঘর। অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে ফেলে এই ঘরেই ফ্রান্সিসদের বন্দী করে রাখা হবে। প্রহরী আর সৈন্যরা মিলে ঢাল তরোয়াল বর্শা ঘর থেকে বের করে এনে ঘরের সামনে স্তূপাকার করল। সৈন্যরাও তাদের অস্ত্রশস্ত্র রাখল সেখানে।

ফাঁকা ঘরে ফ্রান্সিসদের ঢোকানো হল। দমবন্ধ করা ঘর। লোহা আর কাঠ দিয়ে তৈরি দরজা। ফাঁকফোকর বলে কিছু নেই। এই দিনের বেলায়ও ঘর অন্ধকার। ঘরের ভেতরে বেশ গরম। পাথরের মেঝেয় ঘাসপাতা বিছানো নেই। কঠিন পাথরের মেঝেয় ফ্রান্সিস বসে পড়ল। পাশে শাঙ্কো-বিনোলা বসল।

এই ঘরে তো দমবন্ধ হয়ে মরে যাব। শাঙ্কো বলল মৃদুস্বরে।

হুঁ। এখানে কীভাবে পাহারা দেয়, কীভাবে খেতে দেয় এসব দেখি। তারপর পালাবার ছক কষব। তবে পালানো খুব সহজে হবে না। লড়াইও করতে হতে পারে। দেখা যাক। তখনই ওরা দেখল চারজন প্রহরী এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। হাতে খোলা তরোয়াল। দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

দুপুরে দরজা খোলা হল। দুজন প্রহরী দরজায় দাঁড়াল। বাকি দুজন বাইরে রইল। দুজন রাঁধুনি খাবার দিয়ে গেল। রুটি, মাছ আর আনাজের ঝোল। ফ্রান্সিসরা খাবার চেয়ে নিয়ে পেট ভরে খেল। সন্ধ্যা হল। প্রহরী একটা মশাল জ্বেলে দিয়ে গেল।

রাতে অসহ্য গুমোট গরমে ফ্রান্সিসদের প্রায় ঘুমই হল না।

ভোর হতে শাঙ্কো বলল, ফ্রান্সিস, আমরা তো গরমে সেধ হয়ে যাব।

দেখছি। সেনাপতির সঙ্গে কথা বলতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সকালে সেনাপতি এলে দরজা খোলা হল।

সেনাপতি দরজায় এসে দাঁড়াল। একটু হেসে বলল, কয়েদঘরে আগুন লাগিয়ে পার পাবে ভেবেছিলে। এবার এই অস্ত্রঘরে মর।

এখনই মরবার ইচ্ছে নেই। শাঙ্কো বলল।

মরতে হবেই, সেনাপতি বলল।

একটা কথা বলছিলাম, ফ্রান্সিস বলল।

বলো। সেনাপতি ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

ঘোড়ার আস্তাবলেও জানালা থাকে। এই ঘরে তাও নেই। ফ্রান্সিস বলল।

অস্ত্রঘরে কেউ জানালা রাখে না।

কিন্তু আমরা তো অস্ত্র নেই। মানুষ। আমাদের তো শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়।

তাহলে কি দেয়াল ভেঙে জানালা করে দিতে হবে? সেনাপতি একটু কড়া গলায় বলল।

তাহলে তো খুবই ভালো হয়। শাঙ্কো অমায়িক হেসে বলল।

আবদার! রাজাকে একবার বলে দেখ না। উল্টে তোমাদের হাত-পা বেঁধে রাখার হুকুম দেবে।

ঠিক আছে। এখন তো রাজা রাজসভায় আসবেন। আমাদের নিয়ে চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

কোনো লাভ নেই। সেনাপতি মাথা এপাশ-ওপাশ করে বলল।

তবু। আমাদের সমস্যার কথাটা একবার বলে দেখি।

তাহলে সত্যি কথাটাই বলি। সেনাপতি একটু থেমে বলল, আজ রাতেই তোমাদের জাহাজের সঙ্গীদের বন্দী করা হবে। সবাইকে এই ঘরে বন্দী করে রাখা হবে।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। তাহলে সেনাপতি অনেকদূর ভেবে রেখেছে।

বন্ধুদের আর সাবধান করার উপায় নেই। ওদের বন্দীদশা মেনে নিতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল, আমাদের বন্দী করার অর্থ কি? আমরা তো রাজা জোস্তাকের কোনো ক্ষতি করিনি।

সে সব বুঝি না। রাজার হুকুম। সেনাপতি কথাটা বলে চলে যেতে উদ্যত হল।

ফ্রান্সিস বলল, আমরা রাজার সঙ্গে দেখা করব।

বললাম তো, রাজার সঙ্গে দেখা হবে না।

আমাদের অনুরোধ—রাজাকে একবার বলে দেখুন। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। বলছি। সেনাপতি চলে গেল।

শাঙ্কো বলল, ফ্রান্সিস, এরকম অনুরোধ আর করো না।

উপায় নেই শাঙ্কো, এরা আমাদের জাহাজ আক্রমণ করবে। বন্ধুদের বন্দী করবে। বন্ধুরা অস্ত্র হাতে নেবার সময়ও পাবে না। বন্ধুদের বাঁচাতে রাজার সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি অস্ত্রঘরের দরজার সামনে এসে বলল, তোমাদের কাপাল ভালো। রাজা দেখা করবেন। রাজসভায় চলো।

প্রহরীদের পাহারায় ফ্রান্সিসরা রাজবাড়ির দিকে চলল। রাজসভায় যখন

পৌঁছল তখন সেখানে বিচারপ্রার্থী বেশি নেই। ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

বিচার পর্ব শেষ হলে সেনাপতি তার আসন থেকে উঠে রাজার কাছে গেল। কিছু বলল। তারপর ফ্রান্সিসদের রাজার সিংহাসনের দিকে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা এগিয়ে গেল।

বলো, তোমাদের কী বলবার আছে। রাজা বেশ গম্ভীর গলায় জানতে চাইল।

মান্যবর রাজা, শুনলাম আমাদের জাহাজের বন্ধুদের বন্দী করার হুকুম দিয়েছেন।

হ্যাঁ, আজ রাতেই সবাইকে বন্দী করে আনা হবে। রাজা বলল।

কিন্তু কেন? আমাদের অপরাধ? ফ্রান্সিস বলল।

কৈফিয়ৎ চাইছ? তোমাদের সাহস তো কম নয়।

আমরা বন্দী। আপনার দয়ায় বেঁচে আছি। আপনার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়ার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। শুধু এই অনুরোধ জানাই—বন্ধুদের বন্দী করবেন না।

আমরা পালিয়েছিলাম, কয়েদ ঘরে আগুন লাগিয়েছিলাম। এই অপরাধের জন্যে আমাদের তিনজনকে যে শাস্তি দেবেন মেনে নেব। দয়া করে বন্ধুদের বন্দী করবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

না, না। কাউকে রেহাই দেব না। রাজা বলল।

ফ্রান্সিস বুঝল রাজা মনস্থির করে ফেলেছে। কোনোভাবেই বোঝানো যাবে না। রাজা ওদের জাহাজ আক্রমণ করবেই। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল, ঠিক আছে। একটা অনুরোধ রাখুন। অস্ত্রঘরে একটাও জানালা নেই। দরজা বন্ধ থাকে। দারুণ গরমে বন্ধ ঘরটায় আমরা আর কিছুদিন থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়ব।

উপায় কি। অস্ত্রঘর তো শোবার ঘর নয়। রাজা বলল।

বলছিলাম, আমাদের হাত-পা বেঁধে রাখুন। কিন্তু দরজাটা খুলে রাখতে বলুন। প্রহরীর সংখ্যা বাড়ান। আমরা পালাব না।

তোমাদের বিশ্বাস কী? দরজা দিন রাত বন্ধ থাকবে। শুধু খাবার দেবার সময় খোলা হবে। রাজা মাথা এপাশ ওপাশ করল।

ফ্রান্সিস ভালো করেই বুঝল এই রাজাকে কোনো অনুরোধেই রাজি করানো যাবে না। উপায় নেই। পালাবার ছক কষতে হবে।

ফ্রান্সিসরা অস্ত্রঘরে ফিরে এলো। প্রহরীরা দরজা বন্ধ করে দিল। শাঙ্কো মেঝেয় বসতে বসতে বলল, তাহলে বন্ধুদের বন্দী করে এই ঘরেই রাখা হবে।

হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর বলল, আবার পালাতে হবে। কিন্তু যা বুঝছি সেনাপতি খুব ধুরন্ধর মানুষ। ও বন্ধুদের সাবধান হবার সময় দেবে না। মনে হচ্ছে আজ রাতেই আক্রমণ করবে। ওদের আগে থেকে জানাতে পারলে তবু একটা লড়াই হত। কিন্তু সেনাপতি সেই সুযোগ দেবে না।

খাবার দেবার সময় প্রহরীদের কব্জা করা যাবে না? শাঙ্কো জিগ্যেস করল।

সম্ভব নয়। ওরা চার-পাঁচ জন অস্ত্র হাতে পাহারা দেবে। নিরস্ত্র আমরা এই ঘর থেকে বেরোতে পারব হয়তো। কিন্তু পালাতে পারব না। ধরা পড়ে যাব। আহত হব। আমাদের মেরে ফেলতেও কসুর করবে না। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো আর কোনো কথা বলল না। বুঝল ভীষণ বিপদে পড়েছে ওরা।

ওদিকে একটু রাত বাড়তেই সেনাপতি সৈন্যদের লম্বাটে ঘরের বারান্দায় এল। সঙ্গে সেই দাড়ি গোঁফওয়ালা সৈন্যটি। সেনাপতি তাকে বলল, যাও, সবাইকে ঘুম থেকে ওঠাও। নতুন অস্ত্রঘর থেকে অস্ত্র নিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াতে বলো। দেখবে, বেশি গোলমাল হৈচৈ যেন না হয়।

দাঁড়ি-গোঁফওয়ালা দলপতি আরও কয়েকজন সৈন্য নিয়ে সৈন্যদের ঘরে ঢুকে সবার ঘুম ভাঙল। সেনাপতির আদেশের কথা বলল। সৈন্যরা নতুন অস্ত্রঘর থেকে তরোয়াল, বর্শা নিয়ে এসে সৈন্যাবাসের বারান্দায় দাঁড়াল। ঘোড়সওয়ার সৈন্যদেরও খরব দেওয়া হল। একটু পরে ঘোড়সওয়ার সৈন্যরাও ঘোড়া ছুটিয়ে এল। সেনাপতি সবাইকে বলল, জাহাজঘাটে বিদেশিদের একটা জাহাজ নোঙর করে আছে। সেই জাহাজ আক্রমণ করে ওখানে যারা আছে তাদের বন্দী করতে হবে। সাবধান, কোনোরকম শব্দ যেন না হয়। নিঃশব্দে কাজ সারতে হবে। চলো সব।

প্রথম ঘোড়সওয়ার, পেছনে পদাতিক সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে জাহাজঘাটের দিকে চলল। সেনাপতি একটা সাদা ঘোড়ায় উঠে সৈন্যদের পেছনে পেছনে চলল।

সৈন্যরা একেবারে নিঃশব্দে কাজ সারতে পারল না। এতে সৈন্যের চলাচলে মৃদু কথাবার্তায় শব্দ হল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও অসহ্য গরমে প্রায় জেগেই ছিল। বুঝল সৈন্যরা ওদের জাহাজ আক্রমণ করতে যাচ্ছে। ও মৃদুস্বরে ডাকল, শাঙ্কো?

জেগে আছি। সেনাপতি তার পরিকল্পনা মতো চলেছে। শাঙ্কো মৃদুস্বরে

'বলল। তারপর উঠে বসে বলল। বন্ধুদের সাবধান করতে পারলাম না। ঘুমের মধ্যে হঠাৎ আক্রমণ বন্ধুদের হার স্বীকার করতেই হবে।

সবই মেনে নিতে হবে। শুধু ভাবছি—বন্ধুদের এনে এই ঘরে বন্দী করবে। মারিয়া, বয়স্ক ভেনকেও রেহাই দেবে না। এই অসহ্য কষ্ট ওরা দুজন সহ্য করবে কী করে! তাছাড়া সবাইকে নিয়ে পালানোও প্রায় অসম্ভব।

শাঙ্কো মেঝেয় শুয়ে পড়ল। কোনো কথা বলল না। বিনেলোও ততক্ষণে জেগে গেছে। বলল, ফ্রান্সিস, কিছু একটা উপায় বের করো। এইভাবে সবাই এই ছোট ঘরটায় বন্দী হয়ে থাকা—

উপায় নেই বিনেলো। আমার সব চিন্তাভাবনা কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। স্থির হয়ে কিছু ভাবতে পারছি না। বড় অসহায় অবস্থা আমাদের।

ফ্রান্সিস, তুমি ভেঙে পড়ো না। তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। শাঙ্কো বলল। ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না।

ওদিকে সেনাপতি সৈন্যদের নিয়ে জাহাজঘাটে এসে উপস্থিত হল। ম্লান জোৎস্নায় ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ভালো করে দেখল। জাহাজের কোথাও আলো জ্বলছে না। বোঝাই যাচ্ছে বিদেশিরা নিশ্চিন্ত ঘুমে।

সেনাপতি দাড়ি-গোঁফওয়ালা দলপতিকে ডাকল। গলা নামিয়ে বলল, দুজন জলে নামো। ডুব সাঁতার দিয়ে জাহাজটার হালের কাছে ওঠো। কোনো শব্দ না হয় যেন। হাল বেয়ে জাহাজের ডেকে উঠবে। কেউ কেউ ডেকেও শুয়ে থাকতে পারে। ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে কাঠের পাটাতনটা আস্তে আস্তে পেতে দেবে। পাটাতন দিয়ে উঠে সৈন্যরা আক্রমণ করবে। যাও। জলদি।

দাড়ি গোঁফওয়ালা দলপতি সঙ্গী জোগাড় করে সমুদ্রের ধারে এল। জলে কোনো শব্দ না তুলে নামল। ডুব দিল দুজনে। হালের কাছে গিয়ে ভেসে উঠল। হালে পা রেখে রেখে ঝুলন্ত দড়িদড়া ধরে ডেকে উঠে এল। অনুজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দেখল চার-পাঁচজন বিদেশি ডেকে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

দুজনে পা টিপে টিপে সিঁড়িঘরের কাছে এল। পাটাতনটা পড়ে আছে দেখল। দুজনে মিলে পাটাতনটা নিয়ে জাহাজের মাথার কাছে এল। আস্তে আস্তে পাটাতনটা তীরের বালিমাটিতে ঠেকিয়ে পেতে দিল। সমুদ্রের বাতাস জোরে বইছে। সিনেত্রা ও অন্যেরা আরামে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। তাদের মধ্যে নজরদার পেড্রো, জাহাজচালক ফ্রেজারও রয়েছে। হ্যারি কেবিনঘরে ঘুমিয়ে আছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে সৈন্যরা একে একে দ্রুত জাহাজের ডেকে উঠে এল। ঘুমন্ত

সিনেত্রাদের ঘিরে দাঁড়াল ওরা। দাড়ি গোঁফওয়ালা এগিয়ে এল। খোলা তরোয়ালের ডগা দিয়ে সিনেত্রাকে খোঁচা দিল। বার তিনেক খোঁচা দিতে সিনেত্রা ধড়মড় করে উঠে বসল। খোলা তরোয়াল হাতে চারদিকে দাঁড়ানো সৈন্যদের দেখে ও তো হতবাক। দাড়ি গোঁফওয়ালা ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চাপাস্বরে বলল, চুপ, কোনো শব্দ নয়। সিনেত্রার মুখ দিয়ে আর কোনো শব্দ বেরুল না। সৈন্যরা এবার তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে যে ছ-সাত জন ভাইকিং ডেকে ঘুমোচ্ছিল তাদের জাগাল। সবাই উঠে বসল। তখনও ওদের ঘুমের ভাব কাটেনি। সবাই বুঝল লড়াইয়ের কোনো সুযোগ নেই। ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি এভাবে বন্দীদশা মেনে নিতে হবে। দাড়ি-গোঁফওয়ালার নির্দেশে এবার সৈন্যরা সিঁড়িঘরের দিকে গেল। সিঁড়িতে কোনোরকম শব্দ না তুলে ওরা কেবিনঘরগুলোতে ঢুকতে লাগল। ঘুমন্ত ভাইকিংদের ঘুম ভাঙিয়ে ওপরে ডেকে নিয়ে আসতে লাগল। মারিয়া, ভেনও বাদ গেল না। মারিয়াকে দেখে সৈন্যরা অবশ্য একটু অবাকই হল। কিন্তু তাকেও রেহাই দিল না। সবাইকে ডেকে এনে সারি দিয়ে বসানো হল। সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগল।

রাত শেষ হয়ে এল। কালো আকাশে সাদা রং ধরল। একটু পরেই পুবে সূর্য উঠল। সকালের নিস্তেজ রোদ ছড়াল আকাশে সমুদ্রে জাহাজে।

দাড়ি-গোঁফওয়ালা গলা চড়িয়ে বলল, রাজা জোস্তাকের হুকুমে তোমরা সব বন্দী হলে। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বা ছুটে পালাতে গেলে মরবে। চলো সবাই।

সৈন্যদের প্রহরায় ভাইকিংরা একে একে জাহাজ থেকে নেমে এলো। সৈন্যরা ওদের ঘিরে নিয়ে চলল রাজধানীর দিকে। সমুদ্রের দিক থেকে দমকা হাওয়া ছুটে আসছে। বালি উড়ছে। রোদও চড়েছে। তার মধ্যে দিয়ে ভাইকিংরা চলল।

হাঁটতে হাঁটতে সিনেত্রা হ্যারিকে বলল, ফ্রান্সিসরাও বন্দী। আমরাও বন্দী হলাম। মুক্তির কোনো উপায়ই তো দেখছি না

ফ্রান্সিসের ওপর ভরসা রাখো। ও নিশ্চয়ই একটা উপায় বের করবে। হ্যারি বলল। তারপর মারিয়ার দিকে তাকাল। দেখেই বুঝল—এই রোদের মধ্যে গরম বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে রাজকুমারীর বেশ কষ্ট হচ্ছে। ও ভাবল দাড়ি-গোঁফওয়ালাকে রাজকুমারীর এই কষ্টের কথা বলবে। দেখা যাক সৈন্যটি কী বলে?

ও দাড়ি-গোঁফওয়ালার কাছে এল। বলল, একটা কথা বলছিলাম।

কী কথা? সৈন্যটি বেশ গম্ভীর গলায় বলল।

সেনাপতি কি চলে গেছেন? হ্যারি জানতে চাইল।

হ্যাঁ। তাকে কীসের দরকার।

বলছিলাম, ঐ মেয়েটি আমাদের দেশের রাজকুমারী। উনি এই বন্দীদশা, এত কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না।

সহ্য করতে হবে। রাজা জোস্তাকের হুকুম সবাইকে বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে। কারো রেহাই নেই।

রাজকুমারীকে আর বয়স্ক ভেনকে জাহাজে রাখলে ভালো হত। ওঁরা তো আর জলে ঝাঁপ দিয়ে পালাতে পারবেন না।

কোনো কথা নয়। সবাইকে অস্ত্রঘরে বন্দী থাকতে হবে। তোমার বন্ধুরা আমাদের ফাঁকি দিয়ে একবার পালিয়েছে। বারবার পারবে না। দাড়ি-গোঁফওয়ালা বলল।

হ্যারি আর কোন কথা বলল না। মারিয়ার কাছে এল। বলল, রাজকুমারী, বুঝতে পারছি আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। ওদের বললাম সে কথা। কিন্তু আমার কথা কানেই তুলল না।

না না, মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ওদের কোনো অনুরোধ করতে যেও না। তোমরা কষ্ট সহ্য করছ আর আমি পারব না?

ঠিক আছে। এ ব্যাপারে ফ্রান্সিস কী করে দেখি। হ্যারি বলল।

দু'পাশে রাজধানীর বাড়ি-ঘর-দোর দেখা গেল। লোকজন সাগ্রহে ফ্রেজারদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। বিশেষ করে মারিয়াকে দেখেই ওরা উৎসুক হল বেশি। এই বিদেশিরা কোত্থেকে এল? এদের বন্দীই বা করা হল কেন? ওরা রাজা জোস্তাককে ভালো করে চেনে। যা বদরাগী রাজা এরা সহজে রেহাই পাবে না।

ফ্রান্সিস অস্ত্রঘরের মেঝেয় শুয়েছিল। বাইরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ, সৈনদের চলার শব্দ ওর কানে গেল। ও উঠে বসল। মৃদুস্বরে বলল, শাঙ্কো, বোধহয় বন্ধুদের বন্দী করে আনা হল।

তখনই অস্ত্রঘরের দরজা খুলে গেল। হ্যারিরা একে একে ঢুকতে লাগল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, হ্যারি, লড়াই তো হয়নি?

আমরা তখন গভীর ঘুমে। কথাটা বলতে বলতে হ্যারি এসে ফ্রান্সিসের

পাশে বসল।

একটা বিরাট ভুল হয়েছে আমার। তোমাদের সময়মতো সাবধান করতে পারিনি। পেড্রোকে যদি নজরদারির জন্যে রাখা হত তবে তোমরা এত সহজে বন্দী হতে না। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। ভুলের সে মাসুল দিতেই হবে। তারপর ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বলল, এ কেমন কয়েদঘর? দরজা চেপে বন্ধ করা। একটা জানালাও নেই।

এটা কয়েদঘর নয়। কয়েদঘরটা আমরা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি। এটা অস্ত্র রাখার ঘর ছিল।

তাই এরকম দম বন্ধ করা পরিবেশ। হ্যারি বলল।

হ্যাঁ। এখানেই থাকতে হবে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

মারিয়া এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্রান্সিস বলল, মারিয়া, দাঁড়িয়ে থেকো না। বসো। বিশ্রাম করো। মারিয়া ফ্রান্সিসের পাশে এসে বসল। মৃদুস্বরে বলল, এ তো অন্ধকূপ-হত্যা।

বন্দীদশা এরকমই হয়। বলে মারিয়ার শ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, তোমার শরীর ভালো আছে তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি আমার জন্যে ভেবো না। মারিয়া ম্লান হাসল।

হ্যারি বলল, জান, রাজকুমারী আর ভেনকে জাহাজেই রাখার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু গোঁফ ওয়ালা লোকটা আমার কথা কানেই তুলল না।

ওকে বলে কিছু হবে না। রাজা জোস্তাককে বলতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা জোস্তাক আবার কেমন মানুষ কে জানে। হ্যারি বলল।

দেখা যাক। ফান্সিস উত্তর দিল।

বন্ধুদের মধ্যে তখন গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ছোট ঘরে বেশ গাদাগাদি করে বসতে হয়েছে সবাইকে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। তখনই ফ্রেজার বলল, ফ্রান্সিস, এই ঘরে থাকলে আমরা বোধহয় বাঁচব না। যা হোক করে মুক্তির উপায় ভাবো।

ভাবছি। পাহারার ব্যবস্থাটা ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে। তারপর পালানোর ছক কষতে হবে।

সন্ধ্যেবেলা সেনাপতি এল। দরজার একটা পাল্লা খুলে গলা বাড়িয়ে হেসে বলল, শুনেছি তোমরা নাকি খুব কষ্ট সহিষ্ণু, বীর জাতি। এই অস্ত্রঘরে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে কি?

খুব ভালো আছি আমরা। এখনও দম বন্ধ হয়ে মরে যায়নি। হ্যারি গলা নামিয়ে বলল।

সেনাপতি কথাটা ঠিক বুঝল না। বলল, কী বললে?

ফ্রান্সিস বলে উঠল, কিছু না। একটা দরকারি কথা বলছিলাম।

কী বলবে বলো।

বলছিলাম রাজা জোস্তাকের সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

আগেই বলেছি কোন লাভ নেই। রাজা জোস্তাক এককথার মানুষ। তোমাদের মুক্তি দেবে না। সেনাপতি বলল।

ঠিক আছে। অন্তত একবার বলে দেখুন। আমরা মুক্তি চাই না। এভাবে দমবন্ধ হয়ে মরতে চাই না। বলবেন দরকারি কয়েকটা কথা বলব। ফ্রান্সিস বলল।

অত করে বলছ। ঠিক আছে, রাজাকে বলব। সেনাপতি চলে গেল, দরজার পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল।

রাতের খাওয়াটা ভালোই হল। পাখির মাংস, রুটি আর আনাজের ঝোল। ক্ষুধার্ত ভাইকিংরা পেট পুরে খেল। কিন্তু রাতটা কাটল বেশ কষ্টে। কারো প্রায় ঘুমই হল না। ফ্রান্সিস খুবই চিন্তায় পড়ল। বিশেষ করে মারিয়ার জন্যে। এভাবে কতদিন চলবে? হ্যারিরও সহ্যক্ষমতা কম।

সবে সকালের খাবার খাওয়া হয়েছে সেনাপতি এল। বলল রাজা জোস্তাক খুবই দয়ালু। তোমার কথা শুনতে রাজি হয়েছেন। তবে আগেই বলেছি আজে -বাজে কথা একদম বলবে না। রাজা চটে গেলে কিন্তু তোমাকে ফাঁসিতে লটকে দেবে। ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না।

চলে এসো। রাজসভার কাজ শুরু হয়ে গেছে। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। চারজন সৈন্য এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল।

ওরা সৈন্যদের পাহারায় সভাকক্ষে ঢুকল। তখন কোনো বিচার চলছিল না। দুদিকে পাথরের জানালা থাকা সত্ত্বেও সভাকক্ষ বেশ অন্ধকার। পাথরের সিংহাসনে রাজা বসে আছে। দু'পাশের আসনে সেনাপতি ও মন্ত্রী। সভাকক্ষে প্রজাদের বেশ ভিড়। সিংহাসনে বসেই রাজা একনাগাড়ে বলে চলেছে, কাজেই আমাদের সাবধান হবার সময় এসেছে। দক্ষিণের রাজ্যের জংলীদের সর্দার যে কোনোদিন আমার রাজত্ব আক্রমণ করতে পারে। ঐ দলপতি রাজা মিলিন্দার

গোপন ধনৈশ্বর্যের সংবাদ জানে। ওদের লক্ষ্য সেই ধনৈশ্বর্য উদ্ধার করা। এই জন্যেই ওরা আমার রাজত্ব দখল করতে চায়। তখন লড়াই হবে। আমার সৈন্যবাহিনী রয়েছে। কিন্তু তোমাদেরও লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। রাজা থামল। উপস্থিত প্রজারা ধ্বনি তুলল, রাজা জোস্তাকের জয় হোক।

রাজা জোস্তাকের কথা শুনে ফ্রান্সিস চমকে উঠল। এই রাজত্বের কোথাও গুপ্ত ধনৈশ্বর্য আছে এটা ও প্রথম শুনল না। সেনাপতিও বলেছিল। রাজা জোস্তাক আর কিছু বলল না। গুপ্ত ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ফ্রান্সিস আর কিছু জানতে পারল না। দরবারকক্ষ থেকে প্রজারা বেরিয়ে যেতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দরবার কক্ষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ল।

রাজা ফ্রান্সিসদের দেখল। সেনাপতি আসন থেকে উঠে রাজার কাছে এল। কিছু বলল। তারপর নিজের আসনে ফিরে গেল। রাজা বলল, তোমরা বিদেশি—ভাইকিং।

হ্যাঁ। এ তো আগেই বলেছি। ফ্রান্সিস একটু এগিয়ে গিয়ে বলল।

কী বলতে চাও তোমরা? রাজা জানতে চাইল।

কয়েদঘর নয় অস্ত্রঘরে আমাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। ঘরে একটা জানালাও নেই। কোনো ফোকরও নেই। দরজা সবসময় বন্ধ করে রাখা হয়। আমরা এতজন একসঙ্গে আছি। দম বন্ধ হয়ে আসে।

কয়েদঘর তোমরাই আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছ। এবার তার ফল ভোগ কর। রাজা বলল।

একটা আর্জি। ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ। বলো।

আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের দেশের রাজকুমারী আর একজন বয়স্ক বৈদ্য। তারা দুজন এত কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। তাদের অন্য কোথাও বন্দী করে রাখা হোক।

না, সবাইকে ঐ অস্ত্রঘরে থাকতে হবে। তোমাদের এভাবে আমার রাজত্বে আসা সন্দেহজনক। নিশ্চয়ই তোমাদের কোন উদ্দেশ্য আছে রাজা বলল।

কোন উদ্দেশ্য নেই। আগেও বলেছি এখনও বলছি জাহাজ চালাতে চালাতে এসে পড়েছি। আমরা এরকমই কোন উদ্দেশ্য না নিয়েই দ্বীপে দ্বীপে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। আপনাকে আগেই বলেছি আরো একটা কাজ আমরা করি। গুপ্তধন ভাণ্ডারের খোঁজ পেলে কোন সূত্র ধরে চিন্তা আর বুদ্ধি খাটিয়ে আমি আর বীর বন্ধুরা সেসব উদ্ধার করি।



—যাকগে সে সব নিয়ে জাহাজে চড়ে পালাও।

—আর সে সব নিয়ে জাহাজে চড়ে পালাও। রাজা গম্ভীর হয়ে বলল।

—না। আগেও বলেছি —যথার্থ মালিককে সব দিয়ে দি। দু-একবার পোশাক খাদ্য কেনার জন্য তাঁর সম্মতি নিয়ে কিছু স্বর্ণমুদ্র নিয়েছি। বাঁচতে হবে তো। নইলে কিছুই নিই নি। ফ্রান্সিস বেশ দৃঢ় স্বরে বলল। রাজা ফ্রান্সিসের এই আত্মপ্রত্যয় দেখে খুব খুশি হল। দেখা যাক এদের দিয়ে কার্যোদ্ধার হয় কিনা। বেশ ভাবান্তর ঘটল রাজার। সাগ্রহে বলল—এই রাজত্বের কোথাও গোপনে রাখা আছে অতীতের এক রাজা মিরান্দার ঐশ্বর্য ভাণ্ডার। পারবে উদ্ধার করতে। ফ্রান্সিস একটু চমকে রাজার মুখের দিকে তাকাল। মনে পড়ল সেনাপতিও এই গুপ্তধনের কথা কথাপ্রসঙ্গে বলেছিল। কিন্তু ফ্রান্সিস বিশেষ আগ্রহ দেখল না। রাজাকে বিশ্বাস নেই। বলল—চেষ্টা করতে পারি।

—উঁহু। তোমরা কাল থেকেই লেগে পড়ো। রাজার লোভর্তি চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝল রাজা সত্যিই গুপ্তধনের জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে। আবার ভাবল—অস্ত্রঘরের নরকযন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে গেলে যত শিগগির সম্ভব গুপ্তধন খুঁজে বের করতে হবে। বলল—দেখুন গুপ্ত ঐশ্বর্য সন্ধান করে উদ্ধার করতে পারবো এরকম কথা দিতে পারবো না। তবে রাজ্যের চারদিকে দেখে শুনে চিন্তা ভাবনা করে তবেই উদ্ধার করতে পারবো। তারপর বলল—যদি অনুমতি দেন তবে কাল থেকেই লাগতে পারি।

—খুব ভালো কথা। রাজা হেসে বলে উঠলেন।

—কিন্তু তার আগে কয়েকটা কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো বলো সাগ্রহে রাজা বলল।

—শুধু আমরা তিনজন থাকবো। বাকি সব বন্ধুদের মুক্তি দিয়ে জাহাজে চলে যেতে দিতে হবে।

—উঁহু। তা হবে। গুপ্ত ঐশ্বর্য উদ্ধার করলে তবেই তোমরা মুক্তি পাবে। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারিও চাপাস্বরে বলল—এ সুযোগ হাতছাড়া করো না। কাজ হয়ে যাবে।

—বেশ—ফ্রান্সিস বলল—আমাদের তিনজনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। খোঁজখবর নিতে যে কোন জায়গায় আমাদের যেতে দিতে হবে। কোন শর্ত চাপানো চলবে না।

—আপত্তি নেই। খোঁজ খবর সেরে ঐ অস্ত্রঘরেই ফিরে আসতে হবে। একটা কথা—তোমাদের সঙ্গে সব সময় থাকবে—এক বিশ্বস্ত যোদ্ধা—রাজা বলল।

—কেন?

—তোমরা পালিয়ে যেতে পারো। রাজা বলল।

—রাজকুমারীকে, বন্ধুদের বন্দী রেখে আমরা পালিয়ে যাবো? এটা আপনিও ভাবতে পারেন—আমরা কল্পনাও করতে পারি না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। ঠিক আছে। কাল থেকে কাজে লেগে পেড়ো। তবে ঐ গুপ্ত ঐশ্বর্য—পারবে না উদ্ধার করতে। রাজা মিলিন্দার পরে যারা রাজা হয়েছিল—তারা অনেকদিন চেষ্টা করেও পারেনি। তাদের তো লোকবল কিছু কম ছিল না।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস মাথা উঠানামা করে বলল।

ফ্রান্সিসরা সৈন্যদের পাহারায় অস্ত্র ঘরে ফিরে এল। ওদের দুজনকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। মারিয়ার বন্ধুরা গভীর আগ্রহে ফ্রান্সিসদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি বলল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল—কিছু সুরাহা হল? হ্যারি মাথা নাড়ল। তারপর রাজার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে গুপ্ত ধনভাণ্ডার রাজার শর্ত সব বলল। সকলেই শুনল সে সবকথা। বুঝল—এই দমবন্ধ করা বন্দী দশা থেকে আপাতত মুক্তি নেই। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই গুপ্তধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে হবে।

—সে আর বলতে। তবে এরকম পরিস্থিতিতে আগে কখনও পড়িনি। খোঁজ খবর চালাতে হবে। দ্রুত। বিশ্রাম টিশ্রাম কপালে নেই। যত তাড়াতাড়ি ঐ ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবো তত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবো। ফ্রান্সিস বলল। একটু থেমে বলল—কিন্তু হ্যারি ঐ ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে তেমন কোন তথ্যই এখানো জোগাড় করতে পারিনি। যা হোক—দুপুরের খাবার খেয়েই কাজে নামতে হবে।

—প্রথম কী ভাবে খোঁজ খবর শুরু করবে? হ্যারি জানতে চাইল।

—প্রথম রাজবাড়ির ভেতরটা দেখবো। তন্ন তন্ন করে খুঁজবো। দেখি কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই কিনা।

—না পেলে? হ্যারি প্রশ্ন করল।

রাজা জোস্তাকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। গুপ্তধন সম্পর্কে সে কতটা জানে তা জানতে হবে। সেই গুপ্তধন কোথায় থাকতে পারে বলে তার ধারণা। রাজাও তো এই ব্যাপারে অনেক খোঁজখবর করেছে, ভেবেছে। দেখা যাক সে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য পাই কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

হবে। রাজার কী অনুমান সেটা জানতে হবে।

তাহলে তো কালকে রাজসভায় যেতে হবে। হ্যারি বলল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কোকে বলল, রাজবাড়িতে চলো।

মারিয়া বলে উঠল, আমিও যাব।

বেশ চলো। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো উঠে গিয়ে দরজায় জোরে ধাক্কা মারল। দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল। প্রহরী মুখ বাড়িয়ে বলল, দরজা ধাকাচ্ছ কেন?

সেনাপতিকে ডেকে দাও। কথা আছে। শাঙ্কো বলল।

হুঁ। প্রহরী পাল্লা বন্ধ করে চলে গেল।

কিছু পরে সেনাপতি এল। দরজার দুটো পাল্লা খুলে বলল, কী ব্যাপার?

ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল, রাজা জোস্তাকের সঙ্গে আমার কী কী কথাবার্তা হয়েছে তা আপনি শুনেছেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ। সেনাপতি মাথা কাত করল।

আমরা রাজবাড়িতে খোঁজটোজ করতে যাব।

বেশ, সেনাপতি বলল। তারপর পেছন ফিরে দাঁড়ি গোঁফওয়ালা সেই সৈন্যটিকে বলল, এরা তিনজন রাজবাড়িতে খোঁজাখুঁজি করতে যাবে। এদের কড়া পাহারায় রাখতে হবে। যেন পালাতে না পারে।

কে কে আসবে এস। দাড়ি গোঁফওয়ালা বলল।

মারিয়া, হ্যারি আর শাঙ্কোকে নিয়ে ফ্রান্সিস অস্ত্রঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর দাঁড়ি-গোঁফওয়ালার পাহারায় রাজবাড়ির দিকে চলল। যেতে যেতে ফ্রান্সিস বলল, আমরা খোঁজটোজ করব। আর তুমি আমাদের পাহারায় থাকবে। কাজেই তোমার নামটা তো জানা দরকার।

সৈন্যটি দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, আমার নাম লার্দো।

বাঃ সুন্দর নাম, হ্যারি হাসি চেপে বলল। লার্দো দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে হাসল। বলল, লার্দো মানে হল মোটা।

নামটা কে দিয়েছিল? শাঙ্কো জিগ্যেস করল।

দিদিমা। ছোটবেলায় খুম মোটা ছিলাম তো, লার্দো বলল।

এখনও কিছু কম যাও না। হ্যারি মুখ টিপে বলল। এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও ফ্রান্সিস হো হো করে হেসে উঠল।

চোপ! কোনো বাজে কথা না। লার্দো বলল, বেশ ধমকের সুরে।

তরোয়ালটা খাপে ভরে ফেলো। শাঙ্কো নিরীহ ভঙ্গিতে বলল।

না-না। সেনাপতির হুকুম, কোনো রকম বেচাল দেখলে তরোয়াল চালাবে, লার্দো বলল।

ফ্রান্সিসরা আর কিছু বলল না। সবাই সদর দেউড়ি পার হয়ে রাজ বাড়িতে ঢুকল। অন্দরমহলের দরজায় দুজন প্রহরী বর্শাহাতে পাহারা দিচ্ছে। লার্দো এগিয়ে গিয়ে বলল, এই বিদেশিদের রাজা অনুমতি দিয়েছেন। এরা অন্দরমহল ঘুরে দেখবে। মাননীয়া রানিকে বলো গে। একজন প্রহরী চলে গেল। কিছু পরে ফিরে এল। বলল, যাও,। ভবে মাননীয়া রানি হুকুম দিয়েছেন তোমরা বেশিক্ষণ থাকবে না।

ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই অন্দরমহলে ঢুকল। পাথরের ঘর-দোর খুব সুসজ্জিত। দামি কাঠের আসবাবপত্র। বিছানায় দামি কাপড়ের সজ্জা। ফ্রান্সিস অবশ্য সে সব দেখছিল না। দেখছিল পাথরের দেয়াল, ছাদ। দেয়ালে রঙিন ছবি আঁকা। পাথরের দেয়াল নিরেট। দেয়ালের মধ্যে কোন গোপন কুঠুরি থাকার সম্ভাবনা নেই।

ফ্রান্সিসরা ঘুরে ঘুরে সব ঘর দেখল। কোথাও কোন সাংকেতিক চিহ্ন পেল না। ঘরগুলো, দেয়ালগুলো খুব পরিচ্ছন্ন। ফ্রান্সিসের কেমন মনে হল রাজবাড়িটা খুব বেশিদিন তৈরি হয়নি। তবু লার্দোকে জিজ্ঞেস করল, এই রাজবাড়িতে কোনো পুরোনো পরিত্যক্ত ঘর বা পাথরের মেঝের নীচে ঘর আছে?

না, এই রাজবাড়ি বেশিদিনের নয়। রাজা জোস্তাকের পিতার আমলের তৈরি। লার্দো বলল।

এটা আমারও মনে হয়েছে। আচ্ছা রাজা মিলিন্দার আমলে রাজবাড়ি কোথায় ছিল, ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল।

—সে তো উত্তর দিকের টিলার নিচে। এখন ধ্বংসাব শেষ। লার্দো বলল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—ওটাই দেখবো। চলো।

রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ওরা উত্তরমুখো চলল। দূর থেকেই একটা ঝোপ জঙ্গল ঢাকা টিলা দেখল। কাছাকাছি আসতে দেখল টিলার নিচেই পুরনো রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। ওরা পাথরের ভাঙা পাটা ছড়ানো জায়গাটায় এল। এখন আর ঐ ধ্বংসাবশেষ দেখে বোঝার উপায় নেই

কোথায় ছিল সদর দেউড়ি কোথায় ছিল রাজসভা অন্দরমহল বা বারান্দা জানালা দরজা। স্তূপাকার পাথরের পাটা দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কিছুক্ষণ সেই ধ্বংসস্তুপের দিকে তাকিয়ে থেকে ফ্রান্সিস বলল—সব কিছু ভালোভাবে দেখতে হবে। চলো ধ্বংসস্তূপের ওপরে ওঠা যাক।

—এখানে দেখার কী আছে? সবই তো ভেঙে শেষ। লার্দো বলল।

—রাজসভা দরজা অন্দরমহল দেখে দেখে এসব বুঝে নিতে হবে। তুমি বরং নিচে থাকো। তুমি তো একটু মোটা মানুষ। তুমি পারবে না।

—না-না। রাজার হুকুম। তোমাদের চোখে চোখে রাখতে হবে। লার্দো মাথা নেড়ে বলল।

—তাহলে এসো। শাঙ্কো বলল।

সবাই সাবধানে ভাঙা পাথরের ওপর পা রেখে ধ্বংসস্তূপের একেবারে ওপরে উঠে এল। ভাঙা পাথরের মধ্যে বুনো গাছগাছালি গজিয়েছে। অনেক জায়গায় জংলা ঝোপঝাড়। পাথরে শ্যাওলার মোটা ছোপ। ফার্ণ গাছ।

এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে করতে একটা ধ্বসে যাওয়া অংশের কাছে এল। ধ্বসের পাশেই একটা গহ্বর মত। ফ্রান্সিস গহ্বরটার মাথায় হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর মুখ নিচু করে তাকাল। গহ্বরের উত্তর দিকে ধ্বসে গেছে বলে গহ্বরটায় রোদ পড়েছে। তবু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। আবছা দেখল একটা ভাঙা ঘরের অংশ। ওর মনে প্রশ্ন — এই অংশটাতেই কি রাজবাড়ির অন্দর মহল ছিল। এই ভাঙা অংশ দিয়ে নেমে দেখতে হবে। এমনি ধ্বসে যাওয়া আরো ঘর হয়তো পাওয়া যাবে। ঠিক তখনই ভাঙা পাথরে পিছনে হ্যারি পড়ে যেতে যেতে একটা বুনো ঝোপে আটকে গেল। ফ্রান্সিস ভাঙা পাথরে ভারসাম্য রেখে যতটা দ্রুত সম্ভব হ্যারির কাছে। হ্যারিকে টেনে তুলে দাঁড় করালো। তেমন কিছু আঘাত নয়। হ্যারি হেসে বলল—আমি ঠিক আছি। তোমরা যা দেখার দেখ। হ্যারির হাঁটু কনুই ছেড়ে গেছে। অল্প রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

—আজ বেলা হয়ে গেছে। খিদেও পেয়েছে। চলো ফিরি। কালকে আসবো ফ্রান্সিস বলল।

চার জনে ভারসাম্য রেখে আস্তে আস্তে পাথরের স্তূপ থেকে নেমে এল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে ফান্সিস বলল হ্যারি চলো আগে রাজার সঙ্গে কথা বলে নি। তারপর পুরনো রাজবাড়ির দিকে যাবো।

ওরা যখন রাজসভায় এল তখন দেখল রাজা মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে। রাজসভায় আজ ভিড় কম। কথাবার্তা শেষ করে রাজা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। বলল—কী? কিছু হদিশ করতে পারলে?

—সবে তো খোঁজ শুরু করেছি। এতদিন আগে গোপন রাখা ধনসম্পদ—কিছু দিন তো সময় লাগবে। এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে এসেছি। এই গুপ্তধন কোথায় থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়? ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা কী করে বলি। রাজা বলল।

—তবু—আপনার অনুমান? ফ্রান্সিস বলল।

—রাজবাড়ির কোথাও। রাজা বলল।

না। রাজবাড়ি আমি তন্নতন্ন করে দেখেছি। ফ্রান্সিস বলল

—তাহলে এই রাজত্বেরই কোথাও। রাজা বলল।

—আচ্ছা—প্রাচীন রাজবাড়িতে? ফ্রান্সিস বলল।

—ও তো ধ্বংসস্তূপ! রাজা বলল।

—কিন্তু রাজা মিলিন্দা তো ঐ রাজবাড়িতেই থাকতেন। ফ্রান্সিস বলল

—হ্যাঁ শেষ জীবনে ঐ বাড়িতে ছিলেন। রাজা বলল।

—উনি কী ভাবে মারা গিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে। রাজা বলল।

—এমনও তো হতে পারে উনি মৃত্যুর আগে কাউকে বলে গেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—রানি আগেই মারা গিয়েছিলেন। রানি ছাড়া আর কাকে ব'লে যাবেন। রাজা বলল।

—ছেলেমেয়ের কাউকে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো গোপনীয় কিছুই থাকতো না। রাজা বলল।

—যা হোক—যা বুঝতে পারছি প্রাচীন ভাঙা রাজবাড়িতেই কিছু হদিশ পাওয়া যেতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। রাজা একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলল।

লার্দোর পাহারায় ওরা প্রাচীন ভাঙা প্রাসাদের কাছে এল। ফ্রান্সিস ঘুরে টিলার দিকে গেল। ওপর থেকে যে গহ্বরটা দেখেছিল তার পাশে এল। একটা আধভাঙা দেয়ালের ওপাশেই গহ্বরটা। ও পাথরের পাটার খাঁজে

খাঁজে পা রেখে রেখে দেয়ালে উঠল। তরপর দেয়ালের ওপাশে একই ভাবে নামল। গহ্বরের ভাঙা অংশে রোদ পড়েছে। অস্পষ্ট হলেও ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে নেমে এল। দেখল ভাঙা পাথরের পাটায় ঢাকা একটা মেঝে মত। চারপাশে তাকিয়ে আন্দাজ করে বুঝল এখানে একটা বড় ঘর ছিল। খুব সম্ভব অন্দরমহলের ঘর। মেঝের ওপর জমে থাকা পাথরের ভাঙা পাটাতন সরাতে পারলে ঘরটা দেখা যাবে। ও মুখ উঁচু করে ডাকল—শাঙ্কো শাঙ্কো।

—বলো। শাঙ্কোর গলা শুনল। ও বলল—আমার মত দেয়াল ধরে ধরে এখানে নেমে এসো। লার্দোকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। হ্যারি পারবে না। হ্যারি থাক্।

কিছু পরে শাঙ্কো আর লার্দো নেমে এল। ফ্রান্সিস বলল—হাত লাগাও। সব ভাঙা পাথরের পাটা সরাতে হবে।

তিনজন মিলে পাথরের ভাঙা পাটা তুলে তুলে একপাশে জড়ো করতে লাগল। গহ্বরে শব্দ হতে লাগল। খট্ খট্ খটাৎ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাথরের মেঝেটা দেখা গেল। সেই স্বল্পালোকে ফ্রান্সিস মেঝেটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কোন বিশেষ চিহ্ন কিছু দেখল না। দক্ষিণ কোণায় গিয়ে দেখল এদিকটায় ধ্বস নেমেছে। সেখানে একটা কিছুর কোনা বেরিয়ে আছে। ফ্রান্সিস ডাকল শাঙ্কো। শাঙ্কো এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—ঐ দেখ। একটা চৌকোনো ফোকর। ওখানকার পাথর সরাও। তিনজনে ওখানকার পাথর সরাতে লাগল। জায়গাটা পরিষ্কার হল। দেখা গেল একটা চৌকোনো গর্ত মত। গর্তের গা মসৃণ পাথরের। বোঝাই যাচ্ছে এই চৌকোনো গর্তে কিছু রাখা ছিল। ফ্রান্সিস গর্তটার চারপাশ ভালো করে দেখতে দেখতে বলল—শাঙ্কো এইখানে রাজকোষ ছিল। নিশ্চয়ই কোন কাঠের অথবা লোহার বাক্স এখানে ছিল। রাজা মিলিন্দার আমলে।

—তাহলে কোথায় গেল সেই বাক্স? শাঙ্কো বলল।

—সেটাই প্রশ্ন মনে হয় রাজা মিলিন্দা সেই রাজকোষ অন্য কোথাও গোপনে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু ফ্রান্সিস —এও তো হতে পারে যে পরের কোন রাজা সেটা পেয়েছিলেন। শাঙ্কো বলল।

—উঁহু। তাহলে সেটা গোপন থাকতো না। সবাই জানতো। সন্দেহ নেই—এখান থেকে রাজকোষ অন্যত্র কোথাও সরানো হয়েছিল—কাজেই

এখানে আর দেখার কিছু নেই। এখানে সব ভেঙেচুরে গেছে এই অংশটুকুই যা মোটামুটি আস্ত আছে। এবার অন্য জায়গাগুলো দেখতে হবে। চলো টিলাটা ভালো করে দেখি।

তিনজনে ভাঙা দেয়ালে পা রেখে রেখে উঠে এল। হ্যারি বলল—কিছু হদিশ পেলে? ফ্রান্সিস সব বলল। হ্যারি বলল—বোঝাই যাচ্ছে রাজা মিলিন্দার রাজকোষ অন্য কোন নিরাপদ জায়গায় রেখেছেন।

চারজন ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে টিলার ওপরে উঠল। টিলার মাথাটা নিরেট পাথরের। টিলার মাথা থেকে ফ্রান্সিস চারদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কিন্তু লুকিয়ে রাখার মত কোন গুহা বা গর্ত দেখতে পেল না।

এখানে কালকে আবার আসবো ফান্সিস বলল। জঙ্গল এলাকাটা দেখতে হবে। বেলা হয়েছে। ফিরে চলো এখন।

চারজন ফিরে এল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি চলো রাজার কাছে যাবো। প্রাচীন রাজাবাড়ির ধ্বংসস্তূপ যা দেখলাম সে সব নিয়ে কথা বলবো। তখন বন্ধুরা কয়েকজন এগিয়ে এসে বলল—ফ্রান্সিস এভাবে বন্ধ ঘরে অসহ্য গরমে রাতদিন —তুমি রাজাকে বলো এভাবে থাকলে আমরা বাঁচবো না। ফ্রান্সিস বলল—আমার চিন্তা মারিয়া আর হ্যারিকে নিয়ে। তোমরা তবু সহ্য করতে পারবে অন্তত কিছুদিন। কিন্তু মারিয়া আর হ্যারি কতদিন পারবে সেটাই চিন্তার। কাল থেকে দিন রাত ধরে সারা রাজ্য ঘুরে বেড়াবো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুপ্তধন ভাণ্ডার উদ্ধার করবো। তাহলেই আমাদের মুক্তি। অনুরোধ — ধৈর্য হারিও না। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। বন্ধুরা আর কিছু বলল না।

তখনই লার্দো এসে হাজির। বন্ধ দরজার একটা পাল্লা খুলে ও মুখ বাড়াল। বলল কী? তোমরা বেরোবে নাকি?

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কো আর হ্যারি তৈরিই ছিল।

লার্দোর পাহারায় ওরা রাজবাড়ি চলল।

রাজসভায় আজ বিচার চলছিল। ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

একসময় বিচার শেষ হল। রাজা ডান হাত তুলে অপরাধীকে দেখিয়ে বলে উঠল — একে অভিশপ্ত দ্বীপে রেখে আয়। বিচারের শাস্তির কথা

শুনে অপরাধী লোকটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল—

—আমাকে এই শাস্তি দেবেন না মহামান্য রাজা। আমাকে অন্য শাস্তি দিন। অপরাধী বার বার বলতে লাগল।

—না। অভিশপ্ত দ্বীপে নির্বাসন যা। রাজা মাথা নেড়ে বলল। দুজন সৈন্য এগিয়ে এসে অপরাধীকে টেনে ধরে নিয়ে চলল। অপরাধী চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। সৈন্য দুজন ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। লোকটা তখনও তারস্বরে কেঁদে চলেছে।

ফ্রান্সিস এই প্রথম অভিশপ্ত দ্বীপের কথাটা বলল। ও বুঝল না এরকম নাম একটা দ্বীপের? কেন? ফ্রান্সিস কথাটা ভাবছে তখনই সেনাপতি বলল তোমরা এগিয়ে এসো। কী বলতে চাও বলো। ফ্রান্সিস কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ধ্বংপ্রাপ্ত পুরনো রাজাপ্রাসাদে কী ঘটল সব বলল। সবশেষে বলল—যতদূর বুঝতে পারছি রাজা মিলিন্দার রাজকোষ ঐ প্রাসাদেই ছিল। উনি পরে মন পরিবর্তন করে অন্য কোন গোপন স্থানে রেখেছেন।

—হুঁ। তা এখন কী করতে চাও? রাজা জোস্তাক বলল।

—অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ খুঁজে। রাজা বলল।

—একটা কথা বলছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। রাজা বলল।

—অভিশপ্ত দ্বীপ কি একটা দ্বীপ? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ ছোট দ্বীপ একটা। রাজা বলল।

—অভিশপ্ত বলা হচ্ছে কেন? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—ঐ দ্বীপে নামলে কেউ জীবিত ফিরে আসতে পারে না। রাজা বলল

—কেন? ফ্রান্সিস বেশ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—ঐ দ্বীপে তর্নার নামে এক রকমের বিষাক্ত গাছ আছে। সেই গাছের পাতার রং সবসময়ই হলদু। বসন্তকালে সেই গাছে টকটকে লাল রঙের ফুল হয়। গাছ-ফুল সবই বিষাক্ত। ঐ দ্বীপে নামলেই অবধারিত মৃত্যু। ঐ অভিশপ্ত দীপের ধারে কাছেও কেউ যায় না। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে ঐ দ্বীপে নামিয়ে দেওয়া হয়। দু'হাত-পা বেঁধে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। কারণ ঐ দ্বীপের মাটিও বিষাক্ত।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, আমরা ঐ দ্বীপ দেখতে যাব।

ঐ দ্বীপের ধারেকাছেও যেও না। মরবে। রাজা বলল।

দূর থেকেই দেখব। একটা নৌকো দেবেন? ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। একটা ডোঙা নৌকো পাবে। রাজা বলল।

আর একটা কথা—গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারলে আমাদের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে।

এমনভাবে বলছ যেন গুপ্তধন উদ্ধার করে ফেলেছ। রাজা বাঁকা হাসি হাসল।

আমি ওভাবেই কথা বলি। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে। তোমাদের তারপরে মুক্তি দেওয়া হবে।

আর খাবার জল আর খাদ্য দিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

দেখা যাক, আগে উদ্ধারকাজ সারো।

সেনাপতি আসন থেকে উঠে এগিয়ে এল। বলল, চলো।

সেনাপতির সঙ্গে ওরা রাজবাড়ির বাইরে এল। পেছনে লার্দো।

কখন যাবে? সেনাপতি জানতে চাইল।

এক্ষুনি যাব। ফ্রান্সিস বলল।

অত তাড়া কীসের? সেনাপতি বলল।

আপনি বুঝবেন না।

সেনাপতি লার্দোকে বলল, যাও, ওদের একটা ডোঙা নৌকা, দাঁড় দাও। জেলেপাড়ায় পাবে। সেনাপতি চলে গেল।

লার্দোর সঙ্গে ওরা দক্ষিণমুখো চলল। কিছু পরে একটা খাঁড়ির কাছে এল। খাঁড়ির তীরে কিছু বাড়িঘর। বোঝা গেল জেলেপাড়া। তীরভূমির কাছে কিছু গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরি নৌকো ভাসছে। লার্দো একটা ডোঙা নৌকো নিয়ে এল। দূরে অভিশপ্ত দ্বীপটা দেখাল সে। তীরভূমি থেকে খুব একটা দূরে নয়।

ফ্রান্সিস ডোঙা নৌকো দেখে বলল, হ্যারি, তুমি থাকো। ডোঙা নৌকো বেশি লোক নিয়ে যেতে পারবে না। লার্দো তো পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে।

শাঙ্কো আর লার্দোকে নিয়ে ফ্রান্সিস ডোঙা নৌকোয় উঠল। দাঁড় তুলে নিয়ে নৌকো চালাল অভিশপ্ত দ্বীপের দিকে।

খাঁড়ির জল শান্ত। নৌকো বেশ জোরেই চলল। দ্বীপের কাছাকাছি এসে

লার্দো বলে উঠল, বেশি কাছে যাওয়া বিপজ্জনক। নৌকো এখানেই থামাও। ফ্রান্সিস নৌকো থামাল। দুপুরের উজ্জ্বল রোদে স্পষ্ট দেখা গেল অভিশপ্ত দ্বীপ। পাঁচ-ছ'সাত উঁচু তর্নার গাছ। হলুদ লম্বা লম্বা পাতা। লাল টকটকে ফুল ফুটে আছে। সমুদ্রের হাওয়ায় গাছগুলো মাথা দোলাচ্ছে। এত সুন্দর গাছগুলো অথচ বিষাক্ত।

কিছুটা এগোতেই দ্বীপের দিক থেকে হাওয়া ছুটে এল। ওদের গা জ্বালা করে উঠল। তাহলে গাছ-ছোঁয়া হাওয়াও বিষাক্ত। শাঙ্কো বলল, ফ্রান্সিস, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। ফিরে চলো।

তর্নার গাছগুলোর জন্যে দ্বীপের মাটি ভালো দেখা যাচ্ছে না। ভালো ভাবে দেখতে গেলে অন্য উপায় নিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

কী সেটা? শাঙ্কো বলল।

আমার ছক কষা হয়ে গেছে। আজ ফিরে চলো। কাল দুপুরে তৈরি হয়ে আসব।

আবার কালকে আসবে? লার্দো অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, ভালোভাবে সব দেখতে হবে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

ফ্রান্সিস নৌকোর মুখ ঘোরাল। চলল তীরভূমির দিকে।

তীরে ভিড়ল নৌকো। ফ্রান্সিসরা নেমে এল। একটা বড় গাছের তলায় হ্যারি বসেছিল। ফ্রান্সিসের দেখে বলল, ফ্রান্সিস, একটা জিনিস দেখলাম।

কী দেখলে?

ঐ দেখ খাঁড়ির তীরে দুটো বড় পাথরের ধাপ।

ফ্রান্সিস দেখল সেটা। একটু চমকাল। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, নৌকোয় ওঠার ব্যবস্থা, আগে লক্ষ করিনি। তার মানে এখান দিয়ে অভিশপ্ত দ্বীপের দিকে যাওয়া হয়।তাহলে জীবন বিপন্ন না করেও ঐ দ্বীপের মাটিতে ওঠা যায়। কথা শেষে দ্বীপের কী কী দেখেছে সব বলল হ্যারিকে।

জেলেপাড়ায় ডোঙা নৌকো ফিরিয়ে দিয়ে ওরা অস্ত্রঘরে ফিরে এল। ঘরে ঢোকার আগে ফ্রান্সিস বলল, লার্দো, আজকে আমরা আর টিলার নীচের জঙ্গলে যাব না। কাজেই আমাদের পাহারা দেবার জন্যে তোমাকে আর আসতে হবে না। কিন্তু একটা কাজ করতে হবে।

কী কাজ? লার্দো জানতে চাইল।

কাল সকালে ভালো করে তেলে-ভেজানো দুটো মশাল আনতে হবে।

মশাল? দিনের বেলা? লার্দো তো অবাক।

হ্যাঁ। তুমি নিয়ে আসবে। ফ্রান্সিস বলল।

ঘরে ঢুকতে মারিয়া, বন্ধুরা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস কোনো কথা না বলে শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো তখন অভিশপ্ত দ্বীপের কথা, তর্নার গাছের কথা, গা জ্বলুনির কথা সব বলতে লাগল। ওরা শুনে অবাক হয়ে গেল। মারিয়া বলে উঠল, ফ্রান্সিস, ঐ সাংঘাতিক দ্বীপে আবার যাবে নাকি?

হ্যাঁ, ঐ অভিশপ্ত দ্বীপ হচ্ছে ধনরত্ন লুকিয়ে রাখার উপযুক্ত জায়গা।

কী বলছ তুমি? সমস্ত দীপটাই তো বিষাক্ত? মারিয়া বলল।

দেখি, দ্বীপের বিষ এড়ানো যায় কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া জানে কৃতসংকল্প ফ্রান্সিসকে নিরস্ত করা যাবে না। কাজেই ও আর কোনো কথা বলল না।

রাতে ফ্রান্সিসের ঘুম হল না। একে অসহ্য গরমে গাদাগাদি করে থাকা, তার ওপর যে ছক করেছে তা কতটা ফলপ্রসূ হবে সে নিয়েও চিন্তা। ছটফট করতে করতে ভোর হয়ে গেল।

বেলা বাড়তে রাঁধুনিরা সকালের খাবার নিয়ে এল। প্রহরীরা পাহারায় রইল। খাবার খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, শাঙ্কো, চেয়ে নিয়ে পেট পুরে খাও। ওখানে কতক্ষণ থাকতে হয় কে জানে! তিনজনেই চেয়ে চেয়ে খাবার খেল।

খাওয়া শেষ। ফ্রান্সিস বলল, শাঙ্কো, সিনাত্রার কাছ থেকে চকমকি পাথর আর লোহার টুকরো নাও। শাঙ্কো সিনাত্রার কাছ থেকে সেসব নিল। তারপর কোমরে গুঁজল।

কিছু পরে লার্দো দুটো মশাল নিয়ে এল। সবাইকে নিয়ে ফ্রান্সিস চলল খাঁড়ির দিকে। লার্দো ডোঙা নৌকো নিয়ে এল। খাটের মতো পাতা পাথরের ওপর দিয়েই তিনজন নৌকোয় উঠল। হ্যারি গিয়ে গাছের নীচে বসল।

নৌকোয় ওঠার আগে ফ্রান্সিস একমুঠো বালি নিয়ে শূন্যে ওড়াল। বুঝল হাওয়ার গতি উত্তরমুখো। বলল, আমাদের দ্বীপের দক্ষিণ দিকে মানে ওপাশে যেতে হবে। হাওয়ার গতির উল্টোদিকে যাব আমরা।

ফ্রান্সিস দাঁড় হাতে নিয়ে নৌকো ছাড়ল। প্রায় শান্ত সমুদ্রের খাঁড়ি দিয়ে নৌকো চলল। অভিশপ্ত দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছে দ্বীপ ঘুরে দক্ষিণ দিকে এল। দ্বীপের কাছাকাছি নিয়ে এল নৌকোটা। নৌকো থামাল। হাওয়া

উল্টোদিকে বইছে। কাজেই গা জ্বালা করল না। ফ্রান্সিস বলল, শাঙ্কো, মশাল জ্বালো। শাঙ্কো চকমকি পাথরে লোহা ঠুকে ঠুকে দুটো মশালই জ্বালাল। ফ্রান্সিস বলল, উঠে দাঁড়াও। দুজনে নৌকোয় উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল, যত জোরে পারো মশাল ছোঁড়ো ঐ তর্নার গাছগুলোর মধ্যে। কথাটা বলে ফ্রান্সিস জ্বলন্ত মশালটা কয়েক পাক ঘুরিয়ে তর্নার গাছের ওপর ছুঁড়ে দিল। শাঙ্কোও জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠল, সাবাস ফ্রান্সিস।

মুহূর্তে তর্নার গাছের জঙ্গলে আগুন লেগে গেল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। ফ্রান্সিস দ্রুত বসে পড়তে পড়তে বলল, এই তল্লাট ছেড়ে সরে যেতে হবে। ধোঁয়া উঠবে। যদিও বাতাস আমাদের উল্টোদিকে বইছে তবু সাবধানের মার নেই। ধোঁয়াও বিষাক্ত। জ্বলন্ত তর্নার গাছ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডুলি উঠল। ধোঁয়া উড়ে যেতে লাগল উত্তর দিকে। উল্টোদিকে ফ্রান্সিস দ্রুত নৌকো চালিয়ে বেশ কিছু দূরে চলে এল।

আগুন জ্বলতে লাগল। কালো ধোঁয়াও উঠতে লাগল ওপরের দিকে। ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আগুন নিভে এল। ধোঁয়া ওঠাও বন্ধ হয়ে গেল। এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে দ্বীপের কালো কুচকুচে মাটি।

কী করবে এখন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

দ্বীপে নামব। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো ভীষণবাবে চমকে উঠল। বলল, মাথা খারাপ! বিষাক্ত গাছ না হয় নেই। কিন্তু ওখানকার ঐ কালচে মাটিও তো বিষাক্ত।

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল, শাঙ্কো, খাঁড়ির তীরে দুটো বড় পাথর পোঁতা আছে দেখে এসেছ?

হ্যাঁ, নৌকোয় ওঠার জন্যে। শাঙ্কো বলল।

যদি আমার অনুমান সত্যি হয় তাহলে ঐ দ্বীপেও এরকম পাথরে ধাপ আছে। যদি পাথরের ধাপ থাকে তাহলে রাজা মিলিন্দার গুপ্ত ধনভাণ্ডার পোঁতা আছে ওখানেই। যে বা যারা ওখানে গুপ্তধন রেখে এসেছে, সে বা তারা ঐ ধাপের ওপর দিয়েই হেঁটে গিয়েছিল। বিষাক্ত মাটি স্পর্শও করেনি।

শাঙ্কো কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, আবার সাবাস, ফ্রান্সিস। কিন্তু তোমার অনুমান সত্যি হবে যদি—

ওকে থামিয়ে দিয়ে ফ্রান্সিস বলে উঠল, হ্যাঁ, যদি ওখানে পাথরের ধাপ

পাওয়া যায়। সেটাই দেখতে যেতে হবে।

ফ্রান্সিস আর কোনো কথা বলল না। নৌকো চালাল অভিশপ্ত দ্বীপের দিকে।

আস্তে আস্তে নৌকো তীরের একেবারে কাছে আসতে দেখা গেল সত্যিই কালো মাটির ওপরে পর পর কয়েকটা পাথরের ধাপ গাঁথা, যেমন আছে খাঁড়ির তীরের ভূমিতেও।

দুপুরের চড়া রোদ পড়েছে দ্বীপে। সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস দাঁড় রেখে দিল। তীরের পাথরে পা রেখে সাবধানে নামল। কিছু আগে আগুন জ্বলেছিল। কাজেই পাথরটা বেশ গরম। তারপর শরীরের ভারসাম্য রেখে পরের পাথরে পা রাখল। মাটিতে পা রাখার উপায় নেই। পাথরে পা না পড়ে তাও হিসেবে রাখতে হচ্ছে। গুনে গুনে আটটা পাথরের ধাপ পার হতেই উজ্জ্বল রোদে দেখল একটা হাতলওয়ালা কালো কাঠের বাক্স একটা বড় পাথরের ওপর রাখা। ফ্রান্সিস শরীরের ভারসাম্য রেখে আস্তে আস্তে বাক্সটার হাতল ধরল। খুব সাবধানে বাক্সটা তুলে নিল। ওটা বেশ ভারী। ও বাক্স খোলার ঝুঁকি নিল না। আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। একটা ভারী জিনিস নিয়ে শরীরের ভারসাম্য রাখতে হচ্ছে। কাজেই খুব সাবধানে পাথরে পা রেখে রেখে নৌকোর কাছে ফিরে এল। বাক্সের ভারে শরীরের ভারসাম্য রাখতে কষ্ট হচ্ছে। ও তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই বাক্সটা এগিয়ে ধরে বলল, শাঙ্কো, এটা নৌকোয় রাখো। দুজনেই ধরো।

লার্দো হতবাক—এই সাংঘাতিক দ্বীপে বাক্স রেখে গেছে কে? সে কি মানুষ না দৈত্য?

দুজনে ধরাধরি করে বাক্সটা নিয়ে নৌকোয় রাখল। ফ্রান্সিস সাবধানে নৌকোয় উঠে এল। তারপর দাঁড় তুলে নিল। নৌকো চালাল তীরেরভূমির দিকে।

এই বাক্সেই কি আছে রাজা মিলিন্দার গুপ্তধন? শাঙ্কোর মনে তখনও সংশয়।

খুলে দেখো। ফ্রান্সিস দাঁড় বাইতে বাইতে বলল।

শাঙ্কো বাক্সের গায়ে হাতড়ে তালার গর্তে হাত দিয়ে দেখল একটা ছোট্ট চাবি আটকানো। ও চাবিটা ডানদিকে মোচড় দিল। কট করে একটা শব্দ হল। ও হাতল ধরে টানল। বাক্সের ওপরের ডালা খুলে গেল। বাক্সভর্তি

সোনার অলঙ্কার, হীরে-মুক্তো, মণিমাণিক্য। উজ্জ্বল রোদে সব ঝকঝক করতে লাগল। লার্দো এসব দেখে চিৎকার করে উঠল, ওঁ-ওঁ-ওঁ। এরকম দৃশ্য ফ্রান্সিস, শাঙ্কো অতীতেও দেখেছে। তবু শাঙ্কো চেঁচিয়ে উঠল, ও হো হো। তীরে গাছের তলায় বসে-থাকা হ্যারি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তাহলে ফ্রান্সিস গুপ্তধন উদ্ধার করতে পেরেছে। হ্যারিও ধ্বনি তুলল, ও হো হো।

ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। তারপর আস্তে আস্তে নৌকো তীরে ভেড়াল। শাঙ্কো বাক্সটা কাঁধে তুলে নিল। তিনজনে চলল নগরের দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে শাঙ্কো বলল, আচ্ছা ফ্রান্সিস, এই গুপ্তধনের বাক্স তো কারো না কারো নজরে পড়তে পারত।

না, পারত না। প্রথম ঐ অভিশপ্ত দ্বীপের ধারেকাছে কেউ যেত না। তর্নার গাছের আড়ালে ছিল ঐ বাক্স।

রাজা মিলিন্দা কীভাবে ওখানে বাক্সটা রেখেছিলেন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

রাজা মিলিন্দা একজন বা দুজন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীকে সকলের অগোচরে ওখানে নৌকোয় করে বাক্স সহ পাঠিয়েছিলেন। রাজার নির্দেশ ছিল সাত আটটা পাথরের ধাপও নিয়ে যাবার। কয়েক দফায় ওরা নৌকোয় করে পাথরের ধাপগুলো নিয়ে গিয়েছিল। দ্বীপের মাটিতে সেগুলো গেঁথে ধাপের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে বাক্স রেখেছিল। কিন্তু তর্নার গাছের ছোঁয়া ওরা এড়াতে পারেনি। ওখানেই বিষাক্ত মাটিতে মিশে গেছে ওদের দেহ।

তাহলে রাজা মিলিন্দা কি পরে গুপ্তধনের বাক্সটা আনবেন ভেবেছিলেন? শাঙ্কো বলল।

হ্যাঁ। কিন্তু তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তাহলে জীবিত অবস্থায় কীভাবে আনতেন?

যে ভাবে আমি এনেছি, ফ্রান্সিস বলল, বিষাক্ত তর্নার গাছ পুড়িয়ে ফেলে। খাঁড়ির তীরে দুটো বড় পাথর দেখেই আমার কাছে সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। ঐ দুটো পাথর ছিল ঠিক দ্বীপের পাথরের উল্টোদিকে। তাই দিক ঠিক রাখতে পেরেছিলাম।

রাজবাড়ির সামনে এসে পৌঁছল ওরা। ফ্রান্সিস লার্দোকে বলল, যাও, রাজার সঙ্গে আমাদের দেখা করার ব্যবস্থা করে দাও। লার্দোর হতভম্ব ভাব

তখনও সবটা কাটেনি। ফ্রান্সিস বলল, বলবে যে গুপ্তধন উদ্ধার হয়েছে। উনি যেন সেটা বুঝে নেন।

লার্দো চলে গেল। একটু পরেই প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, রাজসভায় চলো। ওখানেই রাজা আসবেন।

ফ্রান্সিসরা রাজসভায় এসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছু পরে রাজা জোস্তাক এসে সিংহাসনে বসল। শাঙ্কো কাঁধ থেকে বাক্স নামিয়ে রাজার পায়ের কাছে রাখল। তারপর হাতল টেনে ওপরের ডালা খুলল। অত স্বর্ণলঙ্কার হীরে, মণি, মুক্তো দেখে রাজা জোস্তাকের মুখে আর কথা নেই। কিছু পরে অভিভূতের মতো বলল, কী করে উদ্ধার করলে? ফ্রান্সিস সংক্ষেপে সব বলল। তারাপর রাজাকে অনুরোধ করল, এবার আপনার শর্ত রাখুন। ঐ বন্ধ ঘর থেকে আমাদের মুক্তি দিন। আমরা জাহাজে ফিরে যাব।

বেশ। কিন্তু এত দামি অলঙ্কার, মণি, মুক্তো, তোমরা কিন্তু কিছু দাবি করবে না। রাজা বলল।

আমরা একটা রুপোর টাকাও নেব না। আপনার প্রহরীদের হুকুম দিন। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই সেনাপতি এসে হাজির হল। লার্দো শুধু সেনাপতিকেই খবরটা দেয়নি, রাস্তায় যাকে দেখেছে তাকেই এই গুপ্তধন উদ্ধারের কথা বলেছে। দলে দলে লোক ছুটে আসতে শুরু করল রাজবাড়ির দিকে। রাজা সেনাপতিকে হুকুম দিল ওদের ছেড়ে দিতে। সেনাপতি বলল, চলো তোমরা।

অস্ত্রঘরের সামনে এল সবাই। সেনাপতি প্রহরীদের বলল, এদের ছেড়ে দাও। রাজার হুকুম। প্রহরী দরজা খুলে দিল।

হ্যারি গলা চড়িয়ে বলে উঠল, বাইরে বেরিয়ে এসো। ফ্রান্সিস গুপ্তধন উদ্ধার করেছে। এবার জাহাজে চলো। সব ভাইকিং বন্ধুরা ধ্বনি তুলল, ও হো হো। তারা বাইরে বেরিয়ে এল।

শাঙ্কো বলল, বেলা অনেক হয়েছে। এখানে খেয়ে গেলে হত না?

না, ফ্রান্সিস বলল, এই অন্ধকূপে আর এক মূহূর্তও থাকব না। আমাদের জাহাজেই রান্না সেরে খাব। এখন চলো। মারিয়া হাসতে হাসতে এসে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। সবাই দল বেঁধে চলল জাহাজঘাটের দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, ফ্রান্সিস, খাবার জল আর খাদ্য নিতে হবে যে।

সে সব কাল সকালে শাঙ্কোরা এসে নিয়ে যাবে। গত কয়েক রাত ঘুমোতেই পারিনি। আজ রাতে মড়ার মতো ঘুমোব। ফ্রান্সিস বলল।

শুধু তোমার নয়, আমাদেরও এক হাল। হ্যারি বলল।

রাজা ম্যাগনামের পাণ্ডুলিপি



কতদিন হয়ে গেল ফ্রান্সিস মারিয়া আর ভাইকিং বন্ধুরা দেশছাড়া। কত দ্বীপ, দেশ ঘোরা হল। কত মানুষ, কত বিচিত্র তাদের ভাষা, জীবনযাত্রা। কতবার বন্দী হল ওরা। কখনও লড়াই করে, কখনও বুদ্ধি খাটিয়ে পালাতে হল। মৃত্যু হল কয়েকজন বন্ধুর। বিস্কো তো আর ফিরেই এল না। ওদের মাঝে মাঝেই মন খারাপ হয়। দেশের কথা মনে পড়ে। বিশেস করে সিনেত্রা যখন দেশের গান গায়। কত বীর ওরা। কত শক্ত মন ওদের। তবু সেই সব গান শুনে ওদের অনেকের চোখেই জল আসে। ফ্রান্সিসেরও মন খারাপ হয়। প্রয়াত মার কথা মনে পড়ে। বাবার কথা, দেশের বাড়ির কথা মনে পড়ে। সবচেয়ে ব্যাকুল হয় মারিয়ার মন। তখন ও একেবারে গুম হয়ে থাকে। ফ্রান্সিস বোঝে সেটা। বেশ কষ্ট করে মারিয়ার মনকে শান্ত করে।

সেদিন ফ্রান্সিসদের জাহাজ মাঝ সমুদ্রে চলে এসেছে। তখন পশ্চিম দিকের আকাশ অস্তগামী সূর্যের শেষ গাঢ় কমলা রঙে স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। বরাবরের মতো মারিয়া সূর্যাস্ত দেখছে—জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কী এক গভীর দুঃখে মারিয়ার মন ভরে উঠল। চোখে উপচে এল জল। লম্বা হাতা জামায় চোখ মুঝতে গিয়ে দেখল হাতার কাপড়টা ছেঁড়া। সেলাই করা হয়নি। এবার ভালো করে নিজের ময়লা পোশাকটার দিকে তাকাল। এ কী শ্রী হয়েছে ওর! কোথায় সেই রাজবাড়ির আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে সুবেশা নরনারীর মাঝে সম্রাজ্ঞীর মতো সে ঘুরবে ফিরবে তা নয় ভিখারিনির বেশে জাহাজে চড়ে অকূল সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে! মারিয়া রেলিঙে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ঠিক তখনই হ্যারি যাচ্ছিল জাহাজচালক ফ্রেজারের সঙ্গে কথা বলতে। মারিয়াকে কাঁদতে দেখে ও তাড়াতাড়ি ওর কাছে এল। বলে উঠল, রাজকুমারী, কী হয়েছে? আপনার শরীর ভালো তো?

মারিয়া মাথা নাড়তে নাড়তে আরও জোরে কেঁদে উঠল।

ডেকের একপাশে শাঙ্কোরা কয়েকজন বসেছিল। মারিয়াকে কাঁদতে দেখে ছুটে এল। হ্যারি বুঝল এক্ষুনি ফ্রান্সিসকে নিয়ে আসতে হবে। নইলে

রাজকুমারীকে কেউ শান্ত করতে পারবে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ফ্রান্সিসকে নিয়ে এল। মারিয়া তখনও কেঁদে চলেছে। ফ্রান্সিস এসে মারিয়ার মাথায় হাত রাখল। মৃদুস্বরে বলল, মারিয়া শান্ত হও। তুমি অস্থির হয়ে পড়লে আমরাই বা স্থির থাকব কী করে? বলো, কী হয়েছে? কেন মন খারাপ করছ?

মারিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, দেশের কথা মনে পড়ছে, বাবা-মাকে ভীষণ দেখতে.. মারিয়া কথাটা শেষ না করে আবার কাঁদতে শুরু করল।

ওদিকে ভাইকিং বন্ধুরা মারিয়ার দুঃখ দেখে বেশ বিচলিত হল। প্রায় সবাই সেখানে এসে জড়ো হয়েছে। রাজকুমারী হলেও মারিয়ার ব্যবহারে, আচার-আচরণে এতটুকু আভিজাত্যের গর্ব কেউ কোনোদিন দেখেনি। আপন বোনের মতো ওরা সবাই মারিয়াকে ভালোবাসে। ওদের অসুখ-বিসুখে মারিয়া কখনও কখনও রাত জেগেও সেবা শুশ্রূষা করেছে। বৈদ্য ভেন বলে, আমার ওষুধে কাজ হয় অর্ধেক। বাকিটা রাজকুমারীর সেবা-শুশ্রূষা।

এবার ফ্রান্সিস বন্ধুদের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ডাকল, হ্যারি!

বলো? হ্যারি এগিয়ে এল।

আমরা দেশে ফিরব।

হ্যারি একটু চুপ করে থেকে বলল, ফ্রান্সিস তোমার কথাই তো আমাদের কাছে শেষ কথা। তাহলে ফ্রেজারকে ডাকি?

ডাকো।

হ্যারি জাহাজচালক ফ্রেজারের কাছে চলে গেল।

ফ্রান্সিসের কথায় গভীর নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছিল জাহাজে। শুধু কানে আসছিল সমুদ্রের দুরন্ত হাওয়ার শন্ শন্ শব্দ। আচমকা শাঙ্কো ধ্বনি তুলল—ও হো হো। সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত ধ্বনি উঠল। হো হো হো। দেশে ফেরার আনন্দে ওরা তখন মাতোরায়া। মারিয়া মৃদুস্বরে বলল, আমার ওপরে নিশ্চয়ই তোমার রাগ হয়েছে।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল, না। আমিই সবসময়ই চাই, তুমি সুখী হও। আনন্দে থাক। তখনই হ্যারি ফ্রেজারকে নিয়ে এল।

ফ্রেজার, ফ্রান্সিস বলল, মোটামুটি উত্তর দিকটা ঠিক রেখে জাহাজ চালাও। এবার দেশে ফিরব আমরা।

ঠিক আছে। ধ্রুব নক্ষত্রই আমার ভরসা। মনে হয় দিকভুল হবে না। তবে কতদিনে য়ুরোপে পৌঁছব জানি না।

ফ্রান্সিস বলল, মারিয়া, যাও বিশ্রাম করো গে।

মারিয়া আর কোনো কথা বলল না। চলে গেল ওর কেবিনের দিকে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে পূর্ণ গতিতে। দিন যায়। রাত যায়। রাতে বন্ধুরা জাহাজের ডেকে নাচগানের আসর বসায়। সিনাত্রা গান গায়। বন্ধুরা ছোট ছোট দল বেঁধে নাচে। সিনাত্রা কখনও গায় ওদের দেশের বিয়ের গান, কখনও মেষপালকদের গান, কখনও বা রাজসভার গান।

নাচ গানের আসরে ফ্রান্সিস মারিয়াও যোগ দেয়।

দু'দুবার ঝড়-বৃষ্টির পাল্লায় পড়তে হল। সেই আকাশ অন্ধকার করে মেঘজমা, বিদ্যুতের ঝলকানি যেন ফালা ফালা করে দিচ্ছে আকাশ। সেই সঙ্গে বজ্রনির্ঘোষ আর মুষলধারায় বৃষ্টি। পালের কাঠামোর দড়িদড়া ধরে ভাইকিংদের লড়াই চলে ঝড়ের বিরুদ্ধে।

জাহাজ চলার পথে বেশ কয়েকটা ছোট-বড় বন্দর পেল ওরা। কিন্তু জাহাজ ভেড়ানো হল না। শুধু পাল দড়ি মেরামতের জন্যে একটা বন্দরে থামতে হয়েছিল। অন্য একটা বড় বন্দরে খাবার আর জলসংগ্রহের জন্যে জাহাজ ভেড়াতে হয়েছিল। নজরদার পেড্রোর কাজও হালকা হয়ে গেছে। শুধু রাত পর্যন্ত মাস্তুলের ওপরে উঠে নজরদারি করে সে।

সেদিন সকালে ফ্রান্সিস-মারিয়া সবে সকালের খাওয়া শেষ করেছে, হ্যারি ছুটে এল। বলল, ফ্রান্সিস, একটা জাহাজ আসছে দেখলাম। মাস্তুলের মথায় স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার পতাকা উড়ছে। মনে হচ্ছে আমরা দেশের কাছে চলে এসেছি।

তাহলে তো ওদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। মারিয়া উঠল। তিনজনে ডেকে উঠে এল। উজ্জ্বল রোদে আকাশ ঝলমল করছে দেখা গেল। জাহাজটা অনেক কাছাকাছি এসে গেছে। ফ্রান্সিস পতাকাটা দেখল। হ্যারিকে বলল, যাও। ফ্রেজারকে বলো ঐ জাহাজটার কাছে যেতে। হ্যারি চলে গেল। শাঙ্কোরা কয়েকজন এগিয়ে এল। ওদের জাহাজটা আস্তে আস্তে স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার জাহাজের গায়ের কাছে এল। ঐ জাহাজের লোকেরাও ততক্ষণে ওদের জাহাজের রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিসদের দেখছে।

কী করবে? হ্যারি জানতে চাইল।

ওদের জাহাজে যাব।

একাই যাবে? দূর থেকে কথা বলা যাবে না?

না

ফ্রান্সিসদের জাহাজ আস্তে আস্তে ঐ জাহাজের গায়ে এসে লাগল। জোর ঝাঁকুনি খেল ফ্রান্সিসদের জাহাজটা। ঝাঁকুনি সামলে ফ্রান্সিস লাফিয়ে ঐ জাহাজের ডেকে উঠে এল।

জাহাজে উঠে বুঝল যাত্রী জাহাজ নয়। জাহাজের লোকেদের পরনে যোদ্ধার পোশাক। ফ্রান্সিস বুঝল, ওরা কোথাও যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। যোদ্ধাদের কয়েকজন ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়াল। ভাইকিংদের দেশীয় ভাষায় জিগ্যেস করল, তোমাদের দেখে তো মনে হচ্ছে ভাইকিং।

হ্যাঁ, আমরা ভাইকিং। তোমাদের দলপতির সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

দুজন গিয়ে দলপতিকে ডেকে আনল। দলপতির পরনে বেশ দামি পোশাক। কোমরে তরোয়াল ঝুলছে। ফ্রান্সিসদের সেলাই করা ময়লা পোশাক দেখে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে দলপতি বলল, শুনলাম তোমরা আমাদের দেশের মানুষ।

হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং।

কিন্তু আসছ কোত্থেকে? চেহারা পোশাকে তো দেখছি একেবারে ভিখিরি।

মন্তব্য শুনে ফ্রান্সিস মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও নিজেকে সংযত করল। ও তখন জানতে ব্যস্ত কোথায় ওরা এসেছে। তাই বলল, আমরা অনেকদিন আগে দেশ থেকে বেরিয়েছি। অতলান্তিক সাগরে, ভূমধ্য মহাসাগরে ভেসে বেড়িয়ে অনেক দ্বীপ দেশ ঘুরে দেখেছি।

এমনি এমনি এত দেশ ভ্রমণ করেছ?

কতকটা তাই। তবে কিছু গুপ্ত ধনভাণ্ডারও বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করেছি।

তাহলে তোমাদের এই দুর্দশা কেন? দলপতি হেসে বলল।

ওসব কথা থাক। আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন?

ব্রিটেনে। রৌয়েন বন্দর থেকে ফিরছি।

ব্রিটেনে কেন গিয়েছিলেন? ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল।

ব্যবসা করতে। সীলমাছের চর্বি, পশুর লোমের পোশাক—এসব।

ফ্রান্সিস একটু চমকাল। দলপতি মিথ্যে কথা বলছে। এবারও ভালো করে দলপতির মুখের দিকে তাকাল। ধূর্ত দৃষ্টি। কিন্তু মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই মিথ্যে কথা বলছে। দলপতির দেখেই বোঝা যাচ্ছে মোটেই ব্যবসায়ীদের মতো নিরীহ চেহারার মানুষ নয় ওরা।

দেশের কোন বন্দরে যাবেন?

দোরস্তাদ। ওখানে কিছুদিন থেকে—কিন্তু এত কথা জিগ্যেস করছ কেন?

অনেকদিন পরে দেশের মানুষদের দেখছি, কথা বলছি—দেশের বন্দরের নাম শুনছি, কত কাছে চলে এসেছি— ভালো লাগছে বন্ধুর মতো কথা বলতে। চলুন না একসঙ্গে ফিরি।

ঠিক আছে। চলো। কিন্তু তার আগে জানতে হয় তুমিই কি দলপতি?

হ্যাঁ।

নামটা?

ফ্রান্সিস।

অ্যাঁ। দলপতি বেশ চমকে উঠল। বলল, মানে—আপনিই কি সেই ফ্রান্সিস যে সোনার ঘণ্টা, হাঁসের ডিমের মতো মুক্তো—

হ্যাঁ, আমিই সেই ফ্রান্সিস। সঙ্গে আমার বীর বন্ধুরা।

ও। তা—এ তো আনন্দের কথা। চলুন। একসঙ্গেই যাওয়া যাক।

চলুন। ফ্রান্সিস রেলিং ধরে লাফিয়ে নিজেদের জাহাজে চলে এল। হ্যারিরা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস ওদের সব কথা বলল। সবাই চলে গেল। হ্যারি আর মারিয়ার সঙ্গে ফিরে আসতে আসতে ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে ডাকল, হ্যারি!

হ্যারি ওর দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস একইভাবে বলল, ওদের দলপতি বলল বটে ওরা ব্যবসায়ী কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। ওরা ব্রিটেনে এমন কিছু করতে গিয়েছিল যা করতে বলপ্রয়োগ প্রয়োজন। নিছক ব্যবসার ব্যাপার নয়। স্পষ্ট বুঝতে পারছি ওরা কিছু গোপন করছে। ওদের কাউকে জিগ্যেস করে দলপতির নামটা জেনো তো। লোকটা মোটেই সুবিধের নয়। জানি তো আমাদের দেশের কিছু বিপথগামী মানুষের দল আছে। জাহাজে চড়ে এদিকে ব্রিটেন ওদিকে স্থলপথে রাশিয়া পর্যন্ত গিয়ে ব্যবসার নামে দস্যুতা করে। ধনসম্পদ লুঠ করে আনে। বিক্রির জন্য ধনী ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে তাদের। এরা তেমনি একদল বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। ফ্রান্সি আর কিছু বলল না। কিন্তু স্থির করল ওদের জাহাজটা ভালো করে দেখবে।

হ্যারি চলে গেল। ঘরে ঢুকে মারিয়া বলল, হ্যারিকে চুপিচুপি কী বলছিলে?

তোমাকে পরে বলব। এখনও বলার মতো কিছু ঘটেনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হ্যারি এল। বলল, ওদের দলপতির নাম হ্যারল্ড।

হুঁ। হ্যারল্ডের জাহাজটা যেভাবে হোক ভালো করে দেখতে হবে। হ্যারল্ড অনেক কিছু গোপন করছে।

কিন্তু বেশ ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাবে না? যদি সত্যি ওরা দস্যু হয়? হ্যারি আশঙ্কা প্রকাশ করল।

সবদিক ভেবেই কাজে নামব। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়তে পড়তে বলল।

পরের দিন সন্ধেবেলা ফ্রান্সিস ডেকে উঠে এল। শাঙ্কো মাস্তুলে ঠেসান দিয়ে বসেছিল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর কাছে এল। আস্তে আস্তে বলল, শাঙ্কো, একটা জরুরি কাজ আছে। শোনো। শাঙ্কো উঠে এল। ফ্রান্সিস বলল, ঐ জাহাজের দলপতির নাম হ্যারল্ড। আজ গভীর রাতে ঐ জাহাজে যাবে। লুকিয়ে জাহাজটা ঘুরে ভালোভাবে সবকিছু দেখবে। ওরা যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়।

তরোয়াল নিয়ে যাব?

না। পরে দরকার পড়লে লড়াই করা যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

তুমি গেলে ভালো হত না?

না। যদি ধরা পড়ে যাও তাহলে বলতে পারবে, আমাদের জাহাজে শুয়ে বড্ড অসুবিধে হচ্ছে তাই দেখতে এসেছিলাম আমাদের কয়েকজন এখানে এসে রাতটা থাকতে পারব কিনা। তোমাদের দলপতি হিসাবে আমার এই অনুরোধ করাটা ওরা সন্দেহের চোখে দেখতে পারে। তুমি বললে ওদের কোনো সন্দেহ হবে না।

রাত হল। শাঙ্কো ডেকে এসে হালের কাছে শুয়ে পড়ল। দু'চারজন বন্ধু ওকে ওদের কাছে এসে শুতে বলল। শাঙ্কো গেল না।

আকাশে আধভাঙা চাঁদ অনেকটা উজ্জ্বল। জোর হাওয়া বইছে। রাত বাড়তে লাগল। চাঁদের আলোয় হ্যারল্ডের জাহাজের দিকে ও তাকিয়ে রইল। দেখল, মাস্তুলের ওপর কোনো নজরদার নেই। উঠে বসল। রেলিঙের ধারেও কেউ নেই। ওরা শুয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। ঘুমুচ্ছে। শাঙ্কো আস্তে আস্তে গড়িয়ে হালের কাছে এল। উঠে দাঁড়াল। হালের দড়িদড়া ধরে আস্তে আস্তে সমুদ্রের জলে নামল। যেটুকু আওয়াজ হল বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দে ঢাকা পড়ে গেল। ও ডুব সাঁতার দিয়ে হ্যারল্ডের জাহাজের কাছে গিয়ে ভেসে উঠল। হাঁ করে শ্বাস নিল। তারপর হ্যারল্ডের জাহাজের হালের কাছে গেল। দড়িদড়া ধরে নিঃশব্দে জাহাজের ডেকে উঠে এল। দেখল কেউ পাহারা দিচ্ছে না। ডেকের এখানে-ওখানে দু'তিনজন ঘুমুচ্ছে। শাঙ্কো চারদিকে তাকাল। মাস্তুল-পাল-দড়িদড়া। নজরে পড়ার মতো কিছু নেই। আর পাঁচটা জাহাজে যেমন থাকে। ও নিঃশব্দে সিঁড়িঘরের কাছে এল। তারপর আস্তে আস্তে পা ফেলে নীচে

নামল। এখানে-ওখানে বাতি ঝুলছে। দু'পাশের ছোট ছোট কেবিন পার হল। সামনেই একটা ঘর। বেশ বড়। অল্প আলোয় দেখল। সেই ঘরের দরজা লোহার গরাদের। ভিতরে কোনো আলো নেই। গরাদের গায়ে একটা বড় তালা ঝুলছে। শাঙ্কো হামাগুড়ি দিয়ে তালাটার কাছে গেল। উঁকি দিয়ে দেখল, অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় ব্যবসার মালপত্র রাখা হয়। তখনই হঠাৎ নিঃশ্বাস ফেলার মৃদু শব্দ শুনল। শাঙ্কো চমকে উঠল। তাহলে ভেতরে মানুষ আছে। স্পষ্ট শুনল কেউ যেন পাশ ফিরল। ও আবার তাকাল। খুব অস্পষ্ট দেখল শুয়ে থাকা মানুষ। ক'জন বুঝল না। কোনায় একটা লম্বাটে সিন্দুকের আভাস। শাঙ্কো বুঝল এটা কয়েদঘর। ও দ্রুত পিছিয়ে এল। তারপর পা টিপে টিপে সিঁড়ির কাছে চলে এল। আস্তে আস্তে সিঁড়ির মাথায় আসতে ও ডেকে শুয়ে থাকা একজনের বিরক্তি ভরা কথা শুনল, অ্যাই, চাদরটা নিয়েছিস কেন?

বেশ করেছি। অন্যজনের ঘুমজড়িত কণ্ঠস্বর। শাঙ্কো মাথা তুলতে গিয়েই নামিয়ে ফেলল। তবু যে লোকটা ঘুম ভেঙে উঠে বসেছিল সে ওর মাথাটা দেখে ফেলেছে। সতর্ক কণ্ঠে বেশ জোর গলায় বলে উঠল—কে রে ওখানে? অ্যাই—?

শাঙ্কো বুঝল ধরা পড়ে গেছে। ও আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। ডেকে উঠেই দ্রুত ছুটে গিয়ে রেলিং ডিঙিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা দু'একজন কিছু বুঝে ওঠার আগে ঘটে গেল ঘটনাটা। ওরা অবাক। শাঙ্কো ডুব সাঁতার দিয়ে ওদের জাহাজের কাছে এসে আস্তে মাথা তুলল। হাঁপাতে হাঁপাতে দু'হাতে জল ঠেলে হালের কাছে চলে এল। হাল ধরে চুপ করে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ওরা ততক্ষণে ডেকে ছুটোছুটি করে চারদিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু শাঙ্কোকে দেখতে পেল না। শাঙ্কোর মাথা তখন হালের আড়ালে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা হতাশ হয়ে ডেকে গিয়ে শুয়ে পড়ল। একজন ছুটে গেল হ্যারল্ডের কাছে, খবরটা দলপতিকে জানাতে। দলপতি কিছু পরে ডেকে উঠে এল। চারদিকে সমুদ্রের জল দেখল। সব শুনল। তারপর ফিরে গেল। শাঙ্কো অপেক্ষা করতে লাগল। ওদিক আকাশে চাঁদ ম্লান হয়ে আসছে। পুব আকাশ সাদাটে হয়ে গেছে। সূর্য উঠতে বেশি দেরি নেই। শাঙ্কো আর অপেক্ষা করল না। ডেকে উঠে এসে ভেজা পোশাকেই শুয়ে পড়ল। আর ওদের নজরে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

সকাল হল। ডেক থেকে শাঙ্কো নেমে এল নিজেদের কেবিনে। বন্ধুরা ওর ভেজা পোশাক দেখে বলল, কী রে—জলে নেমেছিলি কেন?

গরম লাগছিল। স্নান করলাম। শাঙ্কো ভেজা পোশাক ছাড়তে ছাড়তে বলল।

সকালের খাবার খেয়ে শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস ওর জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তখনই হ্যারিও এল। হ্যারি এ সময় প্রায় নিয়মিত ফ্রান্সিসের কাছে আসে কথা বলতে। জাহাজের কাজকর্ম ঠিক চলছে কিনা, কারও অসুখ-বিসুখ হল কিনা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা—এসব নিয়ে কথা হয় দুজনের।

শাঙ্কো কী দেখলে বলো, ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল। শাঙ্কো আস্তে আস্তে সব বলে গেল। দুই বন্ধু শুনল সব।

যাক নির্বিঘ্নে পালাতে পেরেছ। এখন কথা হল, কেন কয়েদঘর আছে ঐ জাহাজে। কেন কিছু মানুষকে বন্দী করে রাখা হয়েছে? হ্যারি, কী বলো?

এটা তো স্পষ্ট হয়ে গেল যে হ্যারল্ডরা ব্যবসায়ী নয়। তবে এও হতে পারে শৃঙ্খলা ভাঙায় বা দলবিরোধী কিছু করেছিল বলে ওদের বন্দী করে রাখা হয়েছে।

উহুঁ। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। হ্যারি, ব্যাপারটা অত সহজ সরল নয়। ভুলে যেও না ইংল্যান্ডে গিয়ে আমাদের দেশের কিছু দুরাচারী মানুষ লুঠপাট করে ধনসম্পদ নিয়ে এসেছে। আমরা দুর্নামের ভাগী হয়েছি। কাজেই খুব পরিষ্কার—হ্যারল্ডরা ডাকাতের দল। যারা এসবের বিরোধিতা করেছে তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। এবার শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল, সিন্দুকের মতো কিছু দেখেছ বলছিলে।

হ্যাঁ। অন্ধকারে তো স্পষ্ট দেখতে পাইনি, খুব আবছা দেখেছি।

লুঠের ধনসম্পদ ওটাতেই রাখা আছে, হ্যারি বলল।

হুঁ। এখন আমরা কী করব? ফ্রান্সিস একটু চিন্তিত স্বরে বলল।

চুপ করে থাকব। দোরস্তাদ বন্দরে নেমে ওদের রাজার সৈন্যদের হাতে ধরিয়ে দেব, হ্যারি বলল।

অত সহজে হবে না। ডাকাত লুঠেরার দল। বিপদ আঁচ করতে পারলে আমাদের মেরে ফেলতেও এদের হাত কাঁপবে না। এবার আমাদের সাবধান হবার সময় এসেছে।

উহুঁ, বেশি সাবধান হতে গেলে তামাদের আচার-আচরণে, কথাবার্তায় অস্বাভাবিকতা এসে যাবে। জানলাম শুধু আমরা চারজন। তারপর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, ঘটনাক্রমে তুমিও সব জানলে। সাবধান, এইসব নিয়ে কারো সঙ্গে কোনো কথা বলবে না।

হ্যারিরা চলে গেল।

দিন দুয়েক পরের কথা। সকালের দিকে হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, হ্যারল্ড তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। বলছে বিশেষ দরকার।

দুজনে ডেকে উঠে এল। দেখা গেল হ্যারল্ডের জাহাজটা ঘুরিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে লাগানো হয়েছে। ঐ জাহাজের রেলিং ধরে হ্যারল্ড দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস, হ্যারি এগিয়ে গিয়ে হ্যারল্ডের মুখোমুখি দাঁড়াল। হ্যারল্ড বলল, খুব সমস্যায় পড়েছি। আপনাদের জাহাজে কোনো বৈদ্য আছে?

হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

আমাদের একজন সঙ্গী বৃদ্ধ। খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যদি আপনাদের বৈদ্য তাকে দেখে ওষুধ-টষুধের ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে খুবই উপকার হয়। হ্যারল্ড বলল।

মুশকিল হয়েছে আমাদের বৈদ্য ভেনও প্রৌঢ়। রোগী দেখতে হবে, ওষুধ দিতে হবে, ওষুধে কাজ হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। তিনি তো বারবার আপনাদের জাহাজে যাওয়া-আসা করতে পারবে না। তাও এই মাঝ সমুদ্রে। তার চেয়ে ভালো হয় আপনার রোগী আমাদের জাহাজে এসে থাকুক। চিকিৎসা সেবা-শুশ্রূষার কোনো গাফিলতি হবে না, কথা দিচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারল্ড কিছুক্ষণ কী ভাবল। তারপর বলল, হুঁ। এছাড়া তো উপায় দেখছি না। তবে একটা কথা বলছি, বৃদ্ধটি মানে ক্রেভান বেশ ছিটগ্রস্ত। প্রায় পাগলই। আজেবাজে বকে। ওর কোনো কথা বিশ্বাস করবেন না। যত আজগুবি কথাবার্তা।

বেশ, ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে ক্রেভানকে পৌঁছে দিচ্ছি আপনাদের জাহাজে।

ঠিক আছে। ফ্রান্সিস, শাঙ্কো, সিনাত্রা আর দু'একজন বন্ধুকে ডাকল। হ্যারল্ডের জাহাজের কয়েকজন বৃদ্ধ ক্রেভানকে কাঁধে করে রেলিঙের ধারে নিয়ে এল। শাঙ্কোরা এগিয়ে গেল। ওরা ক্রেভানকে শোয়া অবস্থাতেই আস্তে

আস্তে এগিয়ে দিল শাঙ্কোদের দিকে। শাঙ্কোরা ক্রেভানকে ধরে ধরে নিয়ে এল।

শাঙ্কো, ক্রেভানকে আমার কেবিনে নিয়ে যাও আর ভেনকে আসতে বলো। শাঙ্কোদের কাঁধে ক্রেভান দু'চোখ বুজে শুয়ে আছে। রোগজীর্ণ চোখমুখ। সারা মুখে পাকা দাড়ি-গোঁফ। মাথার ঝাঁকড়া চুলও সাদা ধবধবে। শাঙ্কোরা ক্রেভানকে নিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে নিজের কেবিনে এল। ক্রেভানকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্সিস ক্রেভানের কাছে এল। দু'চোখ বোজা। শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, ক্রেভান। ক্রেভান চুপ। ফ্রান্সিস আবার ডাকল, ক্রেভান, শুনছেন? ক্রেভান এবার আস্তে আস্তে চোখ খুলল।

কী কষ্ট আপনার?

ব—ড়—দু—র্ব—ল। ক্রেভান মৃদুস্বরে টেনে টেনে বলল।

আমাদের বৈদ্য ভেন ওষুধ দেবে। ও খুব ভালো বৈদ্য। ওষুধ খাবেন। মারিয়া আপনার সেবা-শুশ্রূষর করবে। কয়েকদিনের মধ্যে ভালো হয়ে যাবেন।

তখনই ভেন ওর ওষুধের বোয়াম নিয়ে এল। ক্রেভানের পাশে বসল। চোখের নীচে টেনে, কপালে গলায় হাত দিয়ে যেমন করে রোগী পরীক্ষা করে তেমনি করে পরীক্ষা করল। ভেন জিগ্যেস করল, দেখছি জ্বর আছে। ক'দিন জ্বর হয়েছে আপনার?

জানি না, তবে সা—ত—আ—ট—দিন—বেশিও—

হুঁ। আর কী কষ্ট?

মাথা—য়—অ—স—হ্য—ব্য—আথা। বলতে বলতে ক্রেভানের শরীর খুব জোরে কেঁপে উঠল। বু—কেও ক—ষ্ট। ক্রেভান খুব আস্তে আস্তে বলল।

হুঁ। ভেন ওর ঝোলা থেকে বোয়ামগুলো বের করে পাথরের বাটিতে কীসের শেকড়ের টুকরো নিয়ে ঘষতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেনের ওষুধ তৈরি হয়ে গেল। ভেন এবার মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনিই তো সেবা-শুশ্রূষা করবেন। ওষুধ-পথ্যি বুঝে নিন। ভেন মারিয়াকে সব বুঝিয়ে দিল।

কেমন দেখলে ভেন? ফ্রান্সিস সাগ্রহে জানতে চাইল।

রোগীর শরীরের ওপর দিয়ে খুব ধকল গেছে। ভালো খাওয়া জোটেনি,

ঠাণ্ডা লেগে বুকে সাংঘাতিক কফ জমেছে। বলতে গেলে কোনো চিকিৎসাই হয়নি। সুস্থ হতে সময় লাগবে। ভেন বলল।

কিছুক্ষণ পরে হ্যারল্ড ফ্রান্সিসের কেবিনে এল। বৈদ্য কেমন দেখল, ওষুধ দিয়েছে কিনা, কবে নাগাদ সুস্থ হবে এসব কথা জিগ্যেস করল। তারপর বলল, সেবা-শুশ্রূষার জন্যে লোক পাঠাব?

দরকার নেই। ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখিয়ে বলল, উনিই সব করবেন।

এতক্ষণ হ্যারল্ড মারিয়াকে বারবার দেখছিল। কৌতূহল চেপে ছিল। এবার বলল, মানে—ইনি কে?

রাজকুমারী মারিয়া, হ্যারি বলল।

কিন্তু উনি রাজকুমারী হয়ে মানে—

ও প্রসঙ্গ থাক। ফ্রান্সিস বলে উঠল।

হ্যারল্ড ক্রেভানের দিকে তাকিয়ে বলল, বুড়ো, চুপ করে শুয়ে থাকবে। একেবারে আজেবাজে বকবে না। তারপর ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল, মাথায় ছিট আছে, পাগলের মতো বকে। ওর কোনো কথা বিশ্বাস করবেন না।

হ্যাঁ, আপনি বলেছেন আগে। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারল্ড চলে গেল।

দু'দিন কাটল। এর মধ্যে হ্যারল্ড এসেছে। বারবার একই কথা বলে গেছে, পাগল, ক্ষ্যাপা।

ওষুধ, সেবা-শুশ্রূষায় ক্রেভান অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল। এর মধ্যে ক্রেভান কখনও পথ্য খাবার সময়, কখনও ঘুমের ঘোরে নানা অসংলগ্ন কথা বলেছে—কত দেশ ঘুরলাম... বাড়িছাড়া দেশছাড়া... রাজা ম্যাগনাম... কী সংঘাতিক ঝড়... ডুবে গেল... সব ডুবে গেল।

ফ্রান্সিস ভেনকে এসব কথা বলেছে। তারপর জিগ্যেস করেছে, তোমার কি মনে হয় লোকটা পাগল?

ভেন মাথা নেড়ে বলেছে, জ্বরের ঘোরে অনেকে আবোল-তাবোল বকে। ঘুমের মধ্যে কথা বলাও অনেকের অভ্যেস। তবে রোগীর সঙ্গে আমার যা কিছু কথাবার্তা হয়েছে তাতে বুঝেছি, কোনো কারণেই হোক ও খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারছে না। তাই বলে ওকে পাগল বলা যায় না। মনে হয় ওর সঙ্গে নির্দয় আচরণ করা হয়েছে। ভেন ক্রেভানকে দেখে-টেখে কিছু জিগ্যেস-টিগ্যেস করে মারিয়াকে নির্দেশ দিয়ে চলে যাবার আগে বলল, রোগী অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে।

ভেন বেরিয়ে যেতেই হঠাৎ ক্রেভান বলে উঠল, উঠে বসি।

ফ্রান্সিস দ্রুত এগিয়ে এল। বলল, না না, শুয়ে থাকুন।

ক্রেভান মৃদু হেসে বলল, বন্ধ ঘরে মেঝেয় শুয়েই তো থাকতাম সবসময়। ইচ্ছে করে খেতাম না। মরতেই চেয়েছিলাম... কিন্তু... ক্রেভান থেমে গেল।

ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল, এ তো পাগলের কথা নয়। ও ক্রেভানকে ধরে আস্তে আস্তে বসাল। ক্রেভানের মুখের দিকে তাকাল। বৃদ্ধের চোখে-মুখে বেশ উজ্জ্বলতা। ক্রেভান অল্পক্ষণ বসে থেকে বলল, দাঁড়াব।

না-না, একদিনে এতটা পারবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

পারব। শুধু একটা শর্ত, হ্যারল্ডের হাতে আমাকে ছেড়ে দেবেন না। ক্রেভান কাতর দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল।

কেন বলুন তো?

সে অনেক কথা। অত কথা এক নাগাড়ে বলতে পারব না। আর একটু সুস্থ হলে—।

ফ্রান্সিস দ্রুত মারিয়ার দিকে তাকাল। মারিয়াও ক্রেভানের কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল।

শীগগির হ্যারিকে ডাকো। মারিয়া চমক ভেঙে দ্রুত উঠে গেল। একটু পরেই হ্যারি ছুটে এল।

ক্রেভান বলল, কথা দিন।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার কোনো ক্ষতি আমি হতে দেব না। আমি ফ্রান্সিস। সঙ্গে আমার বীর বন্ধুরা। কোনো অন্যায় অবিচার অত্যাচার আমরা সহ্য করি না।

ক্রেভান একটু থেমে থেমে বলতে শুরু করল—

তবে শুনুন। সংক্ষেপে বলি। চিরকাল বাউণ্ডুলে আমি। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করেছি এদেশ-ওদেশে—নরওয়ে থেকে রাশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত। একটু থামল ক্রেভান। বলল, জল। মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে কাচের গ্লাসে জল নিয়ে এল। জল খেয়ে যেন একটু ধাতস্থ হল। তারপর ফের শুরু করল, নরওয়ের রাজবাড়ির গ্রন্থাগারে একটা সূত্র পেয়েছিলাম। পুরোনোকালের এক ইতিহাসবিদের লেখা বই, কাগজের মতো পাতলা চামড়ায়। প্রায় জরাজীর্ণ অবস্থা তার। বইতে ছিল অতীতের এক রাজা ম্যাগনামের কথা। সাতটা জাহাজে দুর্ধর্ষ সব সৈন্যদের নিয়ে সাধারণ পোশাক পরে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। ওদের কাছে নিজের

পরিচয় দিয়েছিলেন ব্যবসায়ী বলে। ক্রেভান থামল। একটু জিরিয়ে বলতে লাগল, তীরের কাছাকাছি বড় বড় মঠ-গির্জা লুঠ করেছিলেন। নরহত্যা থেকে শুরু করে সব রকম অত্যাচার করেছিলেন। যা হোক ফিরে এলেন জাহাজঘাটায়। নৌযুদ্ধে ইংল্যান্ডের লোকেরা অত্যন্ত দক্ষ। রাজা ম্যাগনামের একটা মাত্র জাহাজ ডুবে গেল না। সেই জাহাজেই প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে আসছে যে বন্দরে, হ্যারল্ডের জাহাজও যাবে সেই দোরস্তাদ বন্দরে, নোঙর করবে বলে—উঠল প্রচণ্ড ঝড়। জাহাজডুবি হয়ে রাজা ম্যাগনাম মারা গেলেন।

আর সেই ধনসম্পদ? ফ্রান্সিস সাগ্রহে জিগ্যেস করল।

সলিল সমাধি।

কোথায়?

উত্তরের খাঁড়িতে। কিন্তু সেই ইতিহাসবিদ সবশেষে একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন—রাজা ম্যাগনাম মারা যাননি, যদিও সবাই জানত যে রাজা বেঁচে ফেরেননি।

সেই ইতিহাসবিদ জানলেন কী করে?

তিনি ফুটনোটে এই কথাগুলি খুব অস্পষ্ট অক্ষরে লিখেছিলেন, ঠিক এই কথা—'সেই খাঁড়ির ধারে, স্লাভিয়া গিয়েছিলাম, একপাটি জুতো পেয়েছিলাম, দামি, অভিজাত—।' ব্যস—পরের পাতা নেই। হয়তো কিছু লেখা ছিল। ক্রেভান থামল। একটু হাঁপাতে লাগল। দম নিয়ে বলল, একটু ধরো তো উঠে দাঁড়াব। পায়ের জোর দেখি, পালাতে হলে—। ফ্রান্সিস আর হ্যারি এসে দু'দিক থেকে ক্রেভানকে ধরল। আস্তে আস্তে উঠিয়ে দাঁড় করাল। ক্রেভানের শরীরটা একটু কেঁপে উঠল। সে পা ফেলে দু'তিন পা হাঁটল। হেসে বলল, একটু জোর পাচ্ছি। তখনই দরজার বাইরে শাঙ্কোর গলা শোনা গেল, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু ভালো আছেন।

হুঁ। তাহলে তো নিয়ে যেতে হয়। হ্যারল্ডের গলা। হ্যারল্ডের গলা শোনামাত্র আতঙ্কে ক্রেভানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ফ্রান্সিসদের হাত ছাড়িয়ে এক ছুটে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। দ্রুত হাতে কম্বলটা টেনে নিল। হ্যারল্ড ঢুকল।

এই যে বুড়ো, শুনলাম ভালো আছ। কাষ্ঠহাসি হেসে বলল হ্যারল্ড। ক্রেভান কোনো কথা বলল না। ফ্রান্সিস তখন ভাবছে ক্রেভান এতটা

আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল কেন? নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর ব্যাপার আছে।

ফ্রান্সিস বলল, তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। আমাদের বৈদ্য বলছিল, 'দু'চার দিন না গেলে ঠিক বোঝা যাবে না।

না-না। আর এখানে ফেলে রাখা যায় না।

ঠিক আছে। বৈদ্য ভেন কী বলে দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

বসতে পারছে? দাঁড়াতে পারছে? হ্যারল্ড জানতে চাইল।

না, এসে অব্দি তো শুয়েই থাকেন। ফ্রান্সিস বলল।

ও। কাল সকালে খবর নিতে আসব। দেখি কেমন থাকে।

হঠাৎই ক্রেভান বলতে লাগল, কালো অন্ধকার আকাশ... পাথরের মতো জমাট মেঘ... বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে... ঝড় ধেয়ে এল... প্রচণ্ড ঝড়... হাল ভেঙে গেল।

ঐ শুনুন। একে পাগল ছাড়া কী বলবেন? যত আজগুবি প্রলাপ। বিশ্বাস করবেন না ওর কথা। হ্যারল্ড হাত নেড়ে বলল।

বিকেল হল। ক্রেভানকে ওষুধ খাইয়ে মারিয়া সূর্য্যাস্ত দেখতে চলে গেল। হ্যারি এল। ফ্রান্সিস বলল, খুব সময়ে এসেছ। এবার চোখ বুজে থাকা ক্রেভানের মুখের ওপর ঝুঁকে ফ্রান্সিস ডাকল, ক্রেভান শুনছেন? ক্রেভান চোখ খুলে তাকাল।

আপনার যদি কষ্ট না হয় তাহলে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?

বলো।

হ্যারল্ডের সঙ্গে আপনার কীভাবে পরিচয় হল? হ্যারল্ডকে আপনি এত ভয় পান কেন? মরে যেতে চান কেন?

ক্রেভান একটু চুপ করে থেকে বলল, সব বলছি সংক্ষেপে, তাই থেকে বুঝে নাও। তারপর বলতে লাগল, অনেক বছর এ-দেশ ও-দেশ ঘুরে বয়েসের ভারে আর পারছিলাম না। জাহাজ থেকে নামলাম ঐ দোরস্তাদ বন্দরে। মনে পড়ে গেল সেই ইতিহাসবিদের বইয়ের কথা। লোভ হল, ধনসম্পত্তির তৃষ্ণা। দেখিই না রাজা ম্যাগনামের ডুবে-যাওয়া জাহাজের হদিস পাই কি না। স্লাভিয়া গেলাম। খোঁজ—খোঁজ। কয়েক বছর ধরে খুঁজছি। একটা কৃষকের বাড়িতে গেলাম, যত্ন করে রেখেছিল এক পাটি জুতো। দেখেই বুঝেছিলাম। সোনার কাজ ছিল, দামি পাথর-টাথর বসানো ছিল। রাজাদের জুতোই। বুঝলাম, রাজা ম্যাগনামের জাহাজ পাশের খাঁড়ি এই স্লাভিয়া পর্যন্ত এসেছিল। খাঁড়ি, খাঁড়ির

আশপাশ, দু'পাশের এলাকা চষে বেড়ালাম। কাটল বেশ কিছুদিন। মনে পড়ল, বইয়ের লেখা... ইংল্যান্ডের রউয়েন বন্দর থেকে লয়ের উপত্যকার মঠ-গির্জার ধন-সম্পদ... লুঠ... হত্যা। একটু থামল ক্রেভান।

আপনি লয়ের উপত্যকায় গিয়েছিলেন?

ঠিক ধরেছ। দোরস্তাদ বন্দরে হ্যারল্ডের দলের সঙ্গে পরিচয়। ব্যবসায়ী, কিন্তু—লয়ের উপত্যকায় পৌঁছে স্বমূর্তি। লুঠ, হত্যা। দস্যুর দল, পালাতে পারলাম না। হ্যারল্ডকে রাজা ম্যাগনামের জাহাজডুবি, খাঁড়িতে লুণ্ঠিত ধনসম্পদের কথা সব বলেছিলাম। ওরা আমাকে বন্দী করল। কী অত্যাচার! মরতে চাইলাম, মরতে দিল না। ক্রেভান দম নেবার জন্যে থামল।

মনে হয় আরো কিছু লোক বন্দী।

হ্যাঁ, ক্রীতদাস ওরা। ধনী মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করবে। লুণ্ঠিত সম্পদ, বিক্রির দাম কত কত রি্কা, আরবীয় স্বর্ণমুদ্রা—

এবার ফ্রান্সিস চমকে উঠল—ক্রীতদাস!

ফ্রান্সিস, হ্যারল্ড কী জঘন্য মানুষ! হ্যারি বলে উঠল।

ক্রেভান বলতে লাগল, স্লাভিয়ার সেই বাড়িতে বহু পুরোনো পাণ্ডুলিপি—রাজা ম্যাগনামের লেখা পেয়েছিলাম। হ্যারল্ডকে দেখিয়েছিলাম। সেটাই কাল হল। ছিনিয়ে নিল। অনেক কষ্টে পড়ে পড়ে মুখস্থ করল। কিন্তু অসম্পূর্ণ। হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে।

সেই পাণ্ডুলিপির সবটা মনে আছে আপনার? ফ্রান্সিস তখন উত্তেজিত। সাগ্রহে জিগ্যেস করল।

হ্যাঁ।

বলুন।

প্রথমে লুঠপাটের কথা। সেসব থাক, দরকারি জায়গাটা বলছি। একটু থেমে বলতে লাগল, 'ইংল্যান্ডবাসীরা জাহাজ ডোবাল। একটা জাহাজেই ধনসম্পদ নিয়ে ফিরে আসতে লাগলাম। লক্ষ্য দোরস্তাদ বন্দর। ব্যবসায়ীর পোশাক ছেড়ে লুকোনো রাজপরিচ্ছদ পরলাম। জাহাজ চলল তীরবেগে। দু'রাত জেগে আনন্দ হৈ-হল্লা নাচগান চলল। দোরস্তাদ বন্দরের কাছে এলাম।' আবার একটু থামল ক্রেভান। তারপর বলল, 'ঝড় শুরু হল। প্রচণ্ড ঝড়।' ফের বিরতি। তারপর বলল, এখান থেকে অক্ষর-গুলো আঁকাবাঁকা হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে পাঠোদ্ধার করেছি, 'আমি লিখে চলেছি, কী দেখছি

লিখছি। বুঝলাম খাঁড়িতে ঢুকে পড়েছি। মুষলধারে বৃষ্টি। দু'পাশে টাল খেতে খেতে... আর লিখতে পারছি না, প্রচণ্ড ধাক্কা। কে ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে বলল, সামনে, সাদাটে—' ক্রেভান বলল, এখানেই পাণ্ডুলিপির শেষ, তার পরই ছেঁড়া। জানি না আরও কিছু লেখা ছিল কিনা।

ফ্রান্সিস এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে ক্রেভানের কথা শুনছিল। এবার বলল, বোঝা গেল রাজা ম্যাগনামের জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। আপনার কি মনে হয় রাজা ম্যাগনামের ডুবে-যাওয়া জাহাজে ধনৈশ্বর্য ছিল?

অবশ্যই। শুধু খুঁজে উদ্ধার করা। ক্রেভান বলল।

আমাকে আরও কিছু জানতে হবে। তার জন্য স্লাভিয়ার গ্রামে যেতে হবে। তার আগে আপনাকে আর হ্যারল্ডের জাহাজে বন্দী ক্রীতদাসের মুক্ত করতে হবে।

ক্রেভান ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল, হ্যারল্ড সাংঘাতিক লোক—নিষ্ঠুর, নৃশংস। তোমাদের হত্যা—

ফ্রান্সিস তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, দেখা যাক।

হ্যারল্ড পরদিন সকালেই এসে হাজির। দেঁতো হাসি হেসে বলল, অ্যাই বুড়ো খুব আয়েস করেছিস, চল্ এবার।

ফ্রান্সিস দেখল হ্যারল্ড তিন-চারজন সঙ্গী নিয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে সোজা হ্যারল্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরস্বরে বলল, ক্রেভান যাবে না। হ্যারি চমকে উঠে চাপাস্বরে বলে উঠল, ফ্রান্সিস! হ্যারল্ড এরকম কথা বোধহয় আশা করেনি। চোখ কুঁচকে বলল, কেন বলুন তো? ক্রেভান আমাদের সঙ্গে ইংল্যান্ডে এসেছে, আমাদের সঙ্গেই ফিরবে।

ক্রেভান বলেছে, ও ইচ্ছে করে কম খেত কারণ ও মরে যেতে চেয়েছিল।

বলেছিলাম না পাগল। আর কী বলেছে ও?

আপনারা ব্যবসায়ী সেজে দক্ষিণ ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। তারপর ওখানকার মঠ-গির্জার সঞ্চিত ধনৈশ্বর্য লুঠ করে এনেছেন। নরহত্যা, অত্যাচার—

বদ্ধ পাগল। বলেছিলাম না—। হ্যারল্ড চড়া গলায় বলে উঠল।

শুধু তাই নয়, আরবীয় ধনী ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করবেন বলে ক্রীতদাসের মতো ইংরেজদের বন্দী করে এনেছেন।

পাগলের প্রলাপ। হ্যারল্ড হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, আপনি ভালো করে দেখুন আমরা সশস্ত্র।

আমি আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি। কথাটা বলে ফ্রান্সিস হাত বাড়াল, হ্যারি তরোয়ালটা দাও। দুজনের কথা চলতে চলতে ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে কেউ ভাবেনি এক ফ্রান্সিস ছাড়া।

ফ্রান্সিস, শান্ত হও, ভয়ার্ত গলায় মারিয়া বলে উঠল।

কাঁপা কাঁপা গলায় ক্রেভান বলল, ফ্রান্সিস, আমার জন্যে—

শুধু আপনার জন্যে নয়। সমস্ত ভাইকিং জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করতে আমাকে লড়তেই হবে। হ্যারি ততক্ষণে ফ্রান্সিসের বিছানার নীচ থেকে ফ্রান্সিসের তরোয়ালটা নিয়ে এসেছে। হ্যারল্ড কেমন নিরীহের মতো বলল, দেখুন, এইসব লড়াই, রক্তপাত, আমি পছন্দ করি না। তার চেয়ে আপনি আমার জাহাজে আসুন, সব নিজের চোখে দেখবেন। ক্রেভান কতবড় মিথ্যেবাদী সেটাও বুঝতে পারবেন।

বেশ চলুন। কিন্তু আপনাকে নিরস্ত্র যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ভালো কথা। হ্যারল্ড কোমরবন্ধনী থেকে তরোয়াল খুলে একজন সঙ্গীর হাতে দিল। তারপর বলল, কিন্তু আপনাকে একা যেতে হবে। তরোয়াল রেখে দিন।

বেশ। তাই যাব। ফ্রান্সিস মাথা তুলে বলল। তারপর হ্যারিকে তরোয়ালটা দিয়ে দিল।

সবার আগে হ্যারল্ড চলল সিঁড়ির দিকে। শাঙ্কো বন্ধু কয়েকজনকে নিয়ে তার আগেই দ্রুত ডেকে উঠে এল। শাঙ্কোর মনে তখন আশঙ্কা। হাঙরের কামড়ে আহত ফ্রান্সিস এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। তরোয়ালের লড়াইয়ে আগের মতো বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ করতে পারে না। দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামলে ফ্রান্সিস জয়ী হলেও অক্ষত থাকবে না। ও নিঃশব্দে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে অস্ত্রঘরে চলে এল। ডেকে উঠে এল সবাই। জাহাজ দুটো গায়ে গায়ে লাগানো রয়েছে। প্রথমে হ্যারল্ডের সঙ্গীরা লাফ দিয়ে ওদের জাহাজে গিয়ে উঠল। পেছনে হ্যারল্ড আর ফ্রান্সিস। হ্যারল্ড ডেকের চারদিক হাত ঘুরিয়ে দেখিয়ে বলল, 'দেখুন, কোথায় ধনসম্পদ? কোথায় বন্দী ক্রীতদাস?

ও সব ডেকে কেউ সাজিয়ে রাখে না। ফ্রান্সিস ক্রুদ্ধ হলেও মৃদু হাসল। বলল, সিঁড়ি দিয়ে নীচে চলুন। সিঁড়ির ধারে এসে হ্যারল্ড ফিরে দাঁড়াল। ওর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, আগে তোরা নেমে যা। যে সঙ্গীটি হ্যারল্ডের তরোয়ালটার হাতল ধরে ঝুলিয়ে আসছিল সে এগিয়ে এল।

ফ্রান্সিস বলে উঠল, সবাই তরোয়াল ডেকে রেখে যাবে। ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে না হতেই হ্যারল্ড দ্রুত হাতে সঙ্গীর হাত থেকে তরোয়ালটা ছিনিয়ে নিল। সতর্ক ফ্রান্সিস শরীরের এক ঝটকায় কয়েক পা পিছিয়ে এল। কিন্তু একটু কমজোরি বাঁ পাটার জন্যে ভারসাম্য রাখতে পারল না। ডেকের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। মুখে ক্রুর হাসি হত্যাকারীর জ্বলন্ত চোখ নিয়ে হ্যারল্ড এক লাফে উদ্যত তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস গড়িয়ে গেল। বিদুৎবেগে পাক খেয়ে ছুটে এল শাঙ্কোর ছোঁড়া ছোরাটা। হ্যারল্ডের বুকে লাগল না। ওর ডান কাঁধ ছুঁয়ে গেল। এইটুকু বাধাতেই হ্যারল্ড আর ফ্রান্সিসের শরীর লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাতে পারল না। ও একটু থমকাল।

ততক্ষণ হ্যারিও জোরগলায় 'ফ্রান্সিস' ডাক দিয়ে তার দিকে তরোয়াল ছুঁড়ে দিয়েছে। ফ্রান্সিস দ্রুত মুখ তুলে তরোয়ালের ফলাটা ধরে ফেলল। ওর হাতের তালু ও আঙুল কিছুটা কেটে গেল। রক্ত বেরিয়ে এল। তরোয়ালের হাতলটা ধরে ও দ্রুত উঠে দাঁড়াল। কাঁধে ছোরার ক্ষত নিয়ে হ্যারল্ড তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তরোয়ালের প্রথম মারটা ঠেকিয়ে ফ্রান্সিস একটু পিছিয়ে এল। তারপর রুখে দাঁড়াল। শুরু হল দুজনের লড়াই। হ্যারল্ড তরোয়াল চালাতে চালাতে চড়া গলায় বলে উঠল, সবাইকে ডাকো। খতম করো এগুলোকে। ওদিকে শাঙ্কো, বিনোলারা খোলা তরোয়াল হাতে উঠে এসেছে হ্যারল্ডের জাহাজে। হ্যারল্ডের বাকি সঙ্গীরাও কেবিন থেকে ডেকে উঠে এসেছে।

লড়াই শুরু হয়ে গেল। অল্পক্ষণ লড়াই চালিয়েই হ্যারল্ডের দলের যোদ্ধারা বুঝল, ফ্রান্সিসের বন্ধুরা তরোয়ালের লড়াইয়ে কতটা নিপুণ, কত অভিজ্ঞ। ওরা আহত হতে লাগল। কমজোরি পাটা নিয়ে ফ্রান্সিসের লড়াই চালাতে অসুবিধেই হচ্ছিল। তবু ফ্রান্সিস হ্যারল্ডের চোখের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে তরোয়াল চালাতে লাগল। ও এটা বুঝতে পারল হ্যারল্ডের উদ্দেশ্য দলপতি হিসেবে ফ্রান্সিসকে মারাত্মক আহত করে জাহাজে চড়ে পালানো। স্লাভিয়া গিয়ে রাজা ম্যাগনামের নিরুদ্দিষ্ট ধনভাণ্ডারের উদ্ধারের চেষ্টা করবে—এটা ও ভেবেছিল। কিন্তু যার সাহায্য ছাড়া সেটা সম্ভব নয় সেই ক্রেভানকে তো পাওয়া যাবে না। ফ্রান্সিস ততক্ষণে ভেবে নিয়েছে হ্যারল্ডকে হত্যা করতে হবে। ওকে বাঁচিয়ে রাখা চলবে না। ও মারা গেলে ওর সঙ্গীরা সহজেই



হ্যারল্ডের বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল।

পরাজয় স্বীকার করবে। বেশি রক্তপাত এড়ানো যাবে। কাজেই ফ্রান্সিস হ্যারল্ডের তরোয়ালের মার ঠেকাতে লাগল। হ্যারল্ডকে ক্লান্ত করতে লাগল। একসময় হ্যারল্ড বেশ ক্লান্ত হল। জোরে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস সেই সুযোগ কাজে লাগাল। হঠাৎই দ্রুত দু'পা এগিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে তরোয়াল চালাল। হ্যারল্ড সেই মার ঠেকাল বটে কিন্তু ওর হাতের তরোয়াল নেমে এল। ফ্রান্সিস এই সুযোগ ছাড়ল না। হ্যারাল্ডের বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল। হ্যারাল্ডের মুখ থেকে কাতরধ্বনি ছিটকে গেল। ও হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। দু'হাতে বুকে বেঁধা তরোয়াল খুলে আনতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। কাত হয়ে ডেকের ওপর গড়িয়ে পড়ল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। আস্তে আস্তে ওর দেহ স্থির হয়ে গেল।

ওদিকে হ্যারল্ডের সঙ্গীদের বেশ কয়েকজন মারা গেছে। আহতের সংখ্যাও কম না। ফ্রান্সিসের বন্ধুরাও দু'তিনজন আহত হল। একজন মারাও গেল। ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠল, ভাইসব, লড়াই নয়। হ্যারল্ডের সঙ্গীরা শোনো। হ্যারল্ড মারা গেছে। তোমরা অস্ত্র ত্যাগ করো। আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। হ্যারল্ডের সঙ্গীরাও ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে লড়াই করে জেতা যাবে না। ওরা আস্তে আস্তে তরোয়াল ডেকের ওপর ফেলে দিয়ে হাঁপাতে লাগল। ভাইকিং বন্ধুরা তরোয়াল উঁচিয়ে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো।

হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস ডাকল, হ্যারি—শাঙ্কো। হ্যারি আর শাঙ্কো এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস ওদের নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। দু'পাশের কয়েকটা কেবিন পার হয়ে সেই তালাবন্ধ কয়েদঘরের কাছে এল। বড় তালা ঝুলছে। ফ্রান্সিস ডাকল, শাঙ্কো।

শাঙ্কো এদিক-ওদিক খুঁজে একটা বড় হাতুড়ি নিয়ে এল। তারপর প্রচণ্ড জোরে তালাটায় ঘা মারল। তিন-চারটে ঘা পড়তেই তালা ভেঙে ঝুলে পড়ল। ততক্ষণে বন্দীরা এসে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। শাঙ্কো দু'হাতে ঠেলে দরজা খুলে ফেলল। ক্যাঁচকোঁচ ধাতব শব্দ তুলে দরজা খুলে গেল। প্রায় অন্ধকার ঘর থেকে বন্দীরা বেরিয়ে এল। শাঙ্কো দেখল, বন্দীরা সকলেই বেশ সুস্থ-সবল। তবে পরনের পোশাক শতচ্ছিন্ন। একটু অবাক হয়েই শাঙ্কো বলল, ফ্রান্সিস, এরা তো ভালোই আছে দেখছি।

সেটাই তো স্বাভাবিক। অসুস্থ ক্রীতদাসকে কে কিনবে? ফ্রান্সিস বলল।

একজন বন্দী বলে উঠল, আমরা খেতে না চাইলে জোর করে খাইয়েছে।

ভাই, তোমরা মুক্ত। যেখানে খুশি যেতে পারো। ফ্রান্সিস বলল।

আমরা ইংল্যান্ডে—আমদের দেশে ফিরে যেতে চাই। কয়েকজন বলল।

বেশ। আমরা দোরস্তাদ বন্দরে যাচ্ছি। ওখানে নেমে তোমাদের দেশে যাওয়ার জাহাজে উঠে চলে যেও। তোমরা ডেকে উঠে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিস ঘরটার চারদিকে তাকাতে লাগল। অন্ধকার ভাবটা অনেকটা সয়ে এসেছে। দেখল, এককোণে কালো কাঠের লম্বাটে সিন্দুকের মতো রয়েছে। তাহলে শাঙ্কো ঠিকই দেখেছিল! সিন্দুকের ডালায় দুটো বড় বড় তালা ঝুলছে। ওটা তো খুলতে হবে। ফ্রান্সিস ডাকল, শাঙ্কো। শাঙ্কো বাইরে থেকে হাতুড়িটা নিয়ে এল। একটা তালায় দমাদম হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল। তালা ভেঙে ছিট্‌কে গেল। অন্যটাও একইভাবে ঘা মেরে ভাঙল। হ্যারি আর ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। হাতুড়ি রেখে শাঙ্কো ডালা ধরে চার পাঁচবার হ্যাঁচকা টান দিল। ডালা নড়ল। ফ্রান্সিসও হাত লাগাল। টেনে দুজনে ডালা খুলল। অন্ধকারেও দেখা গেল অনেক স্বর্ণমুদ্রা ও গয়নাগাটিও রয়েছে। তবে দামি পাথর নেই। একপাশে বেশ কিছু আরবীয় স্বর্ণমুদ্রা, রুপোর বাট।

হ্যারল্ডের লুঠ করা ধনসম্পদ। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল।

হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে সায় দিল। তারপর শাঙ্কোকে বলল, বিনোলা আর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে এসো। এই সিন্দুক আমাদের জাহাজে নিয়ে চলো। শাঙ্কো চলে গেল। বিনোলারা কয়েকজন এল। সিন্দুকটা বাঁধে নিয়ে ওপরে ডেকে উঠে এল। ওপরে এসে ফ্রান্সিস দেখল, ভেন আহতদের ওষুধ দিচ্ছে। ক্ষতস্থান বেঁধে দিচ্ছে মারিয়া। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। কাজ সেরে মারিয়া ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল, শাঙ্কোরা কী নিয়ে গেল?

সব বলছি। চলো।

ওরা নিজেদের জাহাজে ফিরে এল। নিজের কেবিনে ঢুকে ফ্রান্সিস মারিয়াকে সব কথা বলল। হ্যারল্ডের লুঠ করা ধনসম্পদের লম্বা সিন্দুকটা শাঙ্কোরা রেখেছিল কোনার দিকে কাঠ, পাল আর যন্ত্রপাতি রাখার জায়গাটাতে। মারিয়া সাগ্রহে সে-সব দেখতে ছুটল।

ফ্রান্সিস বিছানায় আধশোয়া হল। হাতের কাটা জায়গাটায় তখনও রক্ত জমে আছে। শরীরের নানা জায়গায় বিশেষ করে বুকে তরোয়ালের খোঁচা লেগে কেটে গেছে। হ্যারি পাশে বসল। বলল, ভেনকে ডাকব?

না-না। যারা বেশি আহত হয়েছে ভেন তাদের দেখুক। আমি তেমন কিছু আহত হইনি।

এখন কী করবে?

কোন ব্যাপারে?

ঐ সব ধনসম্পদ। ও সবই তো ইংরেজদের নিজেদের দেশের। ওদেরই দিয়ে দাও। ওদের দেশের সম্পদ ওরা নিয়ে যাক। হ্যারি বলল।

হ্যারি, ফ্রান্সিস হেসে বলল, কথাটা কি খুব ভেবে বললে?

কেন বলো তো?

বিনা পরিশ্রমে পাওয়া ধনসম্পদের লোভ বড় সাংঘাতিক। ঐ ধনসম্পদ নিয়ে যে জাহাজে চড়ে ওরা দেশে ফিরবে সেই জাহাজে মাঝসমুদ্রেই ওদের মধ্যে খুনোখুনি শুরু হয়ে যাবে। তাতে অন্য যাত্রীরাও জড়িয়ে পড়বে। তা ছাড়া সত্যিকারের দাবিদার কোন মঠ বা গির্জা তা কে খুঁজে বের করবে?

হ্যারি একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমার যুক্তি অকাট্য, আমি অত ভেবে বলিনি। পাশে শুয়ে-থাকা ক্রেভান এবার আস্তে আস্তে উঠে বসল। বলল, তোমার বন্ধুদের মুখে সব শুনলাম। দোরস্তাদ বন্দরে আমাকে নামিয়ে দিও। ওখান থেকেই হেঁটে বিরকা চলে যাব।

কিন্তু স্লাভিয়ার রাজা ম্যাগনামের নিরুদ্দিষ্ট ধনভাণ্ডার—তার কী হবে? ফ্রান্সিস বলল।

ওটার ওপর আমার আর বিন্দুমাত্র লোভ নেই। তুমি কি ঐ ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে যাবে?

অবশ্যই যাব।

অনেক ধনসম্পদ তো পেলে। আর কেন? ক্রেভান একটু বিরক্তির সুরেই বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, এই ধনসম্পদ সব আমাদের রাজাকে দিয়ে দেব। উনি প্রজাদের কল্যাণের কাজে লাগাবেন। ক্রেভান একটু অবাক হল। ফ্রান্সিসকে সে আর পাঁচজন মানুষের মতোই অর্থলোভী ভেবেছিল।

ক্রেভান, ঐ নিরুদ্দিষ্ট ধনভাণ্ডারের খোঁজ করতে গেলে আপনার সাহায্য ছাড়া এক পাও এগোনো যাবে না। আমাদের সঙ্গে আপনাকেও যেতে হবে। কাজের শেষে আপনাকে আমরা বিরকায় পৌঁছে দেব।

কতদিন আগের কথা। কীভাবে কোথায় পড়ে আছে সেই ধনভাণ্ডার। এখন কি আর সেটার হদিস পাবে?

আগে তো এরকম গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করেছি। এবারও দেখি চেষ্টা করে। এখন আপনার শরীর কেমন? ফ্রান্সিস বলল।

প্রায় সুস্থ। একটু আগেই হেঁটে দেখলাম। শরীরটা একটু কাঁপছে বটে তবে মনে হয় দু'একদিনের মধ্যেই সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারব।

আমি সেটাই চাই। স্লাভিয়ায় গিয়ে আপনাকে তো আমার সঙ্গে একটু হাঁটাহাঁটি করতেই হবে। পারবেন তো?

মনে হয় পারব।

ঠিক আছে। শুয়ে পড়ুন। বিশ্রাম করুন। ভালো কথা, দোরস্তাদ বন্দরটা ঠিক কোনদিকে পড়বে?

উত্তর-পশ্চিম দিকে কোনাকুনি।

হ্যারি, ফ্রেজারকে ঐ দিকেই জাহাজ চালাতে বলো।

আচ্ছা। হ্যারি উঠে চলে গেল। তখনই মারিয়া ঢুকল। বলল, সোনা-রুপোর গয়না-টয়নাও আছে দেখলাম।

হ্যাঁ। ভক্তরা মঠে, গির্জায় মূল্যবান জিনিস যীশুর নামে উৎসর্গ করে থাকে। এটা তো একদিনের ব্যাপার নয়। দীর্ঘদিন চলে আসছে। সঞ্চিত হয়েছে। আচ্ছা ক্রেভান, স্লাভিয়া তো একটা গ্রাম?

হ্যাঁ, খাঁড়ি থেকে উঠে যাওয়া ঢালের গায়ে। ক্রেভান বলল।

ভালো কথা। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল, আচ্ছা, রাজা ম্যাগনামের পাণ্ডুলিপিটা কি হ্যারল্ড নষ্ট করে ফেলেছিল?

বলতে পারব না। তবে আমার তো পড়ে, পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে।

উঁহু। ঐ পাণ্ডুলিপিটা খুঁজতে হবে। ওটা পেলে কিছু না কিছু সূত্র পাব। ফ্রান্সিস দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মারিয়া ক্রেভানকে ওষুধ খাওয়াতে বসল।

হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস হ্যারল্ডের জাহাজে এল। দেখল হ্যারল্ডের নিরস্ত্র সঙ্গীরা ও যারা বন্দী ছিল তারাও কয়েকজন ডেকের এখানে-ওখানে বসে আছে।

সিঁড়ি দিয়ে দুজনে নীচে নেমে এল। প্রথমেই হ্যারল্ডের কেবিনে গেল। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় দেখল ঘরটা বেশ সাজানো-গোছানো। একপাশে দামি পোশাক-টোশাক গুছিয়ে রাখা। বিছানাটা দামি চাদরে ঢাকা। বোঝা গেল হ্যারল্ড একটু শৌখিন ছিল। একপাশে কয়েকটা মরক্কো চামড়ার ঝোলানো ব্যাগ। ফ্রান্সিস ব্যাগগুলো খুলতে লাগল। হ্যারিও হাত লাগাল। কাগজপত্র বিশেষ কিছু পেল না। কাপড়-টাপড়, সোনার কাজ করা কোমরবন্ধনী, এসব পেল। সব কটা ঝোলাই দেখা হল। সেই ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেল না।

ফ্রান্সিস, মনে হয় হ্যারল্ড সেটা বেছে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল। হ্যারি বলল।

উঁহু। হ্যারল্ডের লক্ষ্য ছিল দোরস্তাদ বন্দরের পাশের খাঁড়ি দিয়ে স্লাভিয়া যাওয়া। ঐ পাণ্ডুলিপি আর ক্রেভানের সাহায্যে রাজা ম্যাগনামের নিরুদ্দিষ্ট ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে। আরো সম্পদ চাই, আরো ঐশ্বর্য। এ বড় সাংঘাতিক তৃষ্ণা। ফ্রান্সিস আবছা আলোয় চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল। হঠাৎ ও খুব অস্পষ্ট দেখল, একেবারে নীচে কাঠের কিছুটা চৌকোনো কাঠ উঁচু হয়ে আছে। চামড়ার ঝোলাগুলো সরিয়ে আনতে ওটা দেখা গেল। ফ্রান্সিস দ্রুত এগিয়ে এসে উবু হয়ে বসল। উঁচু হওয়া কাঠটা টানতেই খুলে এল। দেখা গেল কারুকাজ করা একটা চৌকো চামড়ার থলিমতো। ফ্রান্সিস থলিটা নিয়ে হ্যারির কাছে এল। হ্যারিও থলিটা দেখে অবাক হল। ফ্রান্সিস থলিটা খুলল। কাগজের মতো পাতলা ভাঁজ করা দুটো চামড়া। একটা খুব পুরোনো। বিবর্ণ। অন্যটা পরিষ্কার। ফ্রান্সিস দুটোই হ্যারিকে দিয়ে বলল, দ্যাখো তো? হ্যারি প্রথমে পরিষ্কার চামড়াটার ভাঁজ খুলে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ বলে উঠল, ফ্রান্সিস, এটা একটা হাতে আঁকা মানচিত্র।

কোন দেশের?

দেখছি... লন্ডন। তার মানে দক্ষিণ ইংল্যান্ডের?

কোনো চিহ্ন দেখছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ছোট ফুটকি আর ত্রিভুজ মতো।

ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে ভাবল। মাথা তুলে বলে উঠল, গুনে দেখো ফুটকির সংখ্যা কম, ত্রিভুজের সংখ্যা বেশি। একটু দেখেই হ্যারি বলল, ঠিক বলেছ।

সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ত্রিভুজগুলো হল মাঠের চিহ্ন, ফুটকিগুলো গির্জার চিহ্ন। সংখ্যায় গির্জা কমই হবে। হ্যারল্ড আটঘাট বেঁধেই লুঠ করার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ। রউয়েন বন্দরের নাম রয়েছে। হ্যারল্ড ঐ বন্দর থেকেই জাহাজ চালিয়ে ফিরছিল।

এবার অন্যটা দেখো। ভাঁজ খুলে ঐ বিবর্ণ চামড়াটা দেখতে দেখতে হ্যারি বলল, খুব অস্পষ্ট। আঁকাবাঁকা পুরোনো স্ক্যান্ডিনেভীয় দ্বীপ এটা বুঝতে পারছি কিন্তু পড়তে সময় লাগবে। তবে অসম্পূর্ণ। এই দেখো নীচের দিকে ছেঁড়া।

চলো। সব ভালো করে দেখতে হবে।



দুজনে জাহাজে উঠতেই শাঙ্কোরা কয়েকজন এগিয়ে এল।

দুজনে নিজেদের জাহাজে ফিরে এল। ফ্রান্সিস ক্রেভানকে পাণ্ডুলিপিটা দিয়ে বলল, দেখুন তো এটাই সেই রাজা ম্যাগনামের পাণ্ডুলিপি কিনা?

ওটা দেখেই ক্রেভান বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই। কিন্তু আরও কিছু পাতা ছিল। আলো জ্বালো—দেখি।

অন্ধকার হয়ে এসেছিল। মারিয়া সূর্যাস্ত দেখতে গেছে। হ্যারিই চকমকি পাথর ঘষে মোমবাতিটা জ্বালল। সেই আলোয় চোখ কুঁচকে দু'এক লাইন পড়ে ক্রেভান বলে উঠল, হ্যাঁ, এটাই শেষ পাতা। বাকি পাতাগুলো হ্যারল্ড ছিঁড়ে ফেলেছে। ঠিক বুঝেছিল এই পাতাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

দু'তিন দিন পরে। সেদিন সকালের খাবার খেয়ে শাঙ্কো ডেক-এ উঠে এল। আকাশ পরিষ্কার। রোদ উজ্জ্বল। শাঙ্কো পূবদিকে তাকাতেই সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় দূরে বেশ কয়েকটা জাহাজের মাস্তুল দেখল। মাস্তুলের মাথায় বিভিন্ন দেশের পতাকা উড়ছে। শাঙ্কো একটু গলা চড়িয়ে বিনোলাকে ডাকল। বিনোলা কাছে এলে বলল—ফ্রান্সিসকে গিয়ে বলো—একটা বন্দর দেখা যাচ্ছে। বোধহয় ওটাই দোরস্তাদ বন্দর। খবর পেয়ে ফ্রান্সিস এসে রেলিং ধ'রে দাঁড়াল। জাহাজ তখন সেই বন্দরের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। কিছু পরে জাহাজে বাড়িঘর দেখা গেল। তখনই হ্যারি সেখানে এল। বলল—এটাই দোরস্তাদ বন্দর। ক্রেভানের নির্দেশমতই তো ফ্রেজার জাহাজ চালিয়েছিল।

কাছে গেলেই বোঝা যাবে।

—তবু। নামবার আগে তো জানতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ক্রেভানকে এখানে আনতে পারলে ভালো হ'ত। হ্যারি বলল।

—না-না। ক্রেভানকে এখন বেশি টানাটানি করা ঠিক হবে না। ও বিশ্রাম করুক। বরং তুমি ওকে জিজ্ঞেস করে এসো একটা বড় বন্দরের কাছে আমরা এসেছি। সেই বন্দরে বেশ কয়েকটা জাহাজ নঙর ক'রে আছে। সেটা কোন বন্দর ঠিক বুঝতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—ক্রেভানকে বলছি। হ্যারি চলে গেল। এতক্ষণে ফ্রান্সিসদের জাহাজ বন্দরের অনেক কাছে চলে এসেছে। লোকজন, বাড়িঘর, গাছপালা, নোঙরকরা জাহাজ সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই হ্যারি ফিরে এল। বলল—ক্রেভান বলছে—বন্দর এলাকার ডানদিকে একটা বড় গাছের পাশে একটা গীর্জার উঁচু চূড়ো দেখা যাবে। মাথায় পেতলের ক্রুশ।

—ঐ তো। ফ্রান্সিস আঙুল তুলে বলল।

—হ্যাঁ। গাদাগীর্জার ক্রশ বসানো চূড়ো। এটাই দোরস্তাদ বন্দর। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—হ্যারি কতদিন পর পরম নিশ্চিন্তে একটা বন্দরে নামতে পারবো। কত বন্দরে ঘাটে কত দুশ্চিন্তা নিয়ে হঠাৎ আক্রান্ত হবার আশঙ্কা নিয়ে জাহাজ ভেড়াতে হয়েছে। নামতে হয়েছে। পানীয় জল খাদ্য সংগ্রহের জন্যে। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস—সভ্য দেশেই নামছি সত্য কিন্তু এখানেও বিপদে পড়তে পারি। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বিপদ সব জায়গাতেই হতে পারে। তবে মানুষ ভাষা পরিবেশতো মোটামুটি পরিচিত। বিপদ আঁচ করা অনেক সহজ। কঙ্কাল দ্বীপ বা রেসিকের মত ??????? দ্বীপ রাজ্য তো নয়। কথাটা ব'লে ফ্রান্সিস জাহাজচালক ফ্রেজারের কাছে গেল। বলল—ফ্রেজার জাহাজ ভেড়াও। ফ্রেজার জাহাজের হুইল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে বন্দরে জাহাজ ভেড়াল। শাঙ্কো আর বিনোলা গিয়ে পাটাতন পেতে দিল পাথুরে জাহাজ ঘাটে। একে তো দেশে ফেরার আনন্দ সেই সঙ্গে কতদিন পরে ইউরোপের ডাঙা। সুসজ্জিত ভদ্র মানুষদের ভিড়। রঙ বেরঙের পোশাকপরা মহিলারা পরিচিত ভদ্র মানুষদের মুখ। শহরের কত আনন্দ উচ্ছাসের হাতছানি। কয়েকজন বন্ধু মিলে উৎসাহের সঙ্গে হ্যারির কাছে ছুটে এল। বলল চলো এখনই নামি। একটু ঘুরেফিরে আসী হ্যারি হেসে বলল—তোমাদের মনে খুব আনন্দ উৎসাহ। স্বাভাবিক। কিন্তু ফ্রান্সিস কী বলে দেখি। তারপর নামা। শহর দেখা। ঘুরে বেড়ানো।

—তাহলে রাজকুমারীকে বলি গিয়ে। ওরা বলল।

—কোন লাভ নেই। ফ্রান্সিস না বলা পর্যন্ত কেউ রাজকুমারীকে গিয়ে বিরক্ত করবে না। ডাঙায় নামবে না। হ্যারির কথায় ওদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। দেখা যাক—ফ্রান্সিস কী বলে।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। মারিয়াও যেন বিছানার একপাশে এসে ছেঁড়া পোশাক সেলাই করছিল। দেখে হ্যারি বেশ দুঃখ পেল। বলল—রাজকুমারী—আমরা একটা বড় বন্দর শহরে এসেছি। ছেঁড়া পোশাক টোশাক আর সেলাই করবেন না। নতুন পোশাক কিনতে নামবো আমরা। মারিয়া হেসে বলল—হ্যারি—পুরোনো পোশাকের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেক স্মৃতি। কোন পোশাক

পরে জাহাজে রাতের নাচগানের আসরে গেছি। কোন পোশাক পরে কোন বিদেশি রাজার অন্দরমহলে থেকেছি বা কয়েদগারে থেকেছি। এইসব স্মৃতি কি ভোলা যায়? ফ্রান্সিস সপ্রশংস দৃষ্টিতে মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। মৃদু হাসল। কিছু বলল না। একপাশে সে চোখ বন্ধ করে বসেছিল। এবার মাথা নেড়ে পাকা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে হেসে বলল—বড় সুন্দর কথা বলেছেন।

—ক্রেভান—এই আমাদের রাজকুমারী। আমাদের এই ছন্নছাড়া জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা মা বোনেদের স্নেহ সাহচর্য পাই ওঁর কাছেই। হ্যারি বলল ফ্রান্সিস অমনি উঠে দাঁড়াল। বলল—হ্যারি চলো হ্যারল্ডের জাহাজে যাবো। কিছু কাজ বাকি আছে।

—কিন্তু বন্ধুরা তো এখনই এখানে নামতে চাইছে। শহরটা ঘুরেফিরে—। কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ফ্রান্সিস বলল—উঁহু, এখন না। বাকি কাজগুলো সেরে তারপর।

দু'জনে ডেকএ উঠে এল। দেখল—শাঙ্কোরা অনেকে দল বেঁধে রেলিং ধরে দোরস্তাদ শহরের দিকে আগ্রহে তাকিয়ে আছে।

—শাঙ্কো শোনো। ফ্রান্সিস ডাকল। শাঙ্কো এগিয়ে এল।

—যাও। হ্যারল্ডের জাহাজের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা কেটে দাও। আর ওদের জাহাজ চালককে বলো ওদের জাহাজটাকে বন্দরে ভেড়ায়। পাটাতন ফেলো আমরা ওদের জাহাজে যাবো। ফ্রান্সিস চলল। শাঙ্কো চলে গেল। জামার তলা থেকে ওর ছোরাটা বের করে বাঁধা দড়িটা কেটে দিল। হ্যারল্ডের জাহাজ চালককে ডেকে—ওদের জাহাজের পাশেই জাহাজ ভেড়াতে বলল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজ থেকে নেমে পাতা পাটাতন দিয়ে হ্যারল্ডের জাহাজে গিয়ে উঠল। দেখল ইংরেজ বন্দীরা খুব উৎসাহ নিয়ে জাহাজের রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে শহরের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের কাছে তো এটা নতুন দেশ। কিন্তু হ্যারল্ডের লুঠেরা সঙ্গীরা চুপ করে ডেকে বসে আছে। ওদের কাছে এটা নতুন জায়গা নয়। এর আগেও এখানে এসেছে ওরা। মাস কয়েক আগেও ওরা এই বন্দর থেকেই ইংল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছিল। একজনের হাতে কাঁধে কাপড়ের পট্টি বাঁধা দেখা গেল। তরোয়ালের লড়াইয়ের সময় কেটে ছড়ে যাওয়া ওরা গায়ে মাখে না। সমুদ্রের লবণাক্ত জলই এসবের ভালো ওষুধ। বেশি কেটে গেলে বেশি রক্তপাত হলে তবেই সঙ্গী বৈদ্যরা চিকিৎসা করে ওষুধ দেয়। ভাইকিংদের ক্ষেত্রেও এই রীতিই চলে আসছে।

ওদের দু'জনকে দেখে ইংরেজ বন্দীরা এগিয়ে এল। দু'একজন হাসি মুখে বারবার বলতে লাগল—আপনাদের কী ব'লে ধন্যবাদ জানাবো। ক্রীতদাসত্বের দুঃসহ জীবন থেকে আমাদের বাঁচালেন। আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। কথাগুলো ব'লে ওরা একে একে এসে ফ্রান্সিস ও হ্যারিকে জড়িয়ে ধরতে লাগল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—ঠিক আছে—ঠিক আছে। এখন বলো তোমরা কী করবে। একজন বলল—আমরা ঠিক করেছি এই জাহাজে চড়েই আমরা ইংল্যান্ডে ফিরে যাবো।

—ভালো কথা। তাই করো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারিকে নিয়ে সেই ভাইকিং লুঠেরার দলের কাছে এল। ওরা চুপ করে ডেকে বসেছিল। একজন এসে ফ্রান্সিসের সামনে দাঁড়াল বলল—আমরা আপনাদের সঙ্গে দেশে ফিরে যাবো।

—তোমার নাম কী? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—চার্মান্ত। লোকটি বলল।

—না। তা হবে না। ফ্রান্সিস বলল—তোমরা ইংল্যান্ডে গিয়ে লুঠপাট করেছো নিরীহ মানুষদের হত্যা করেছো। ভাইকিং জাতির কলঙ্ক তোমরা।

—আমরা তো হ্যারল্ডের নির্দেশেই এইসব করতে বাধ্য হয়েছি। চার্মান্ত বলল।

—এটা একটা যুক্তি হল? হ্যারি বলল—হ্যারল্ড তো একটা কুলাঙ্গার। সে বলল আর তোমরা নির্বিবাদে নরহত্যা করলে।

—আমরা তো আপনাদের স্বজাত, আপনাদের স্বদেশবাসী। চার্মান্ত বলল।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—না-না। তোমাদের মত ঘাতকদের কোন দায়িত্ব আমরা নেব না। তোমাদের এই বন্দরেই নেমে যেতে হবে। তারপর বাঁচো মরো—তোমাদের ব্যাপার।

—হ্যারল্ডের ধনসম্পদ তো আপনারা নিয়ে গেছেন। সেখান থেকেই আমাদের খাওয়া পরা জাহাজের ভাঁড়ার জন্য— কথার শেষ করতে না দিয়েই ফ্রান্সিস বলল—ঐ সম্পদ তোমাদের না। ঐ সম্পদ ইংল্যান্ডবাসীদের। দিতে হলে ঐ ইংরেজ বন্দীদেরই দেব। তোমাদের নয়।

চার্মান্ত ভালো করেই বুঝল স্বজাতি হলেও ফ্রান্সিসরা ওদের কোনরকম সাহায্য করবে না। ও চুপ করে রইল। মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল। দুজনে ইংরেজ বন্দীদের কাছে ফিরে এল। বলল—তাহ'লে তোমরা কখন দেশের দিকে জাহাজ চালাবে?

—কত দিনের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েছি। অন্তত একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে ফিরবো ভাবছি। একজন বলল। অন্যজন বলল—

—কিন্তু আমাদের জামা কাপড়ের অবস্থা তো দেখছেন। আমরা কপর্দকশূন্য। পথে খাদ্যওতো লাগবে।

—ঠিক আছে। ভাই আমরাও ধনী নই। দু'একজন রাজা খুশি হ'য়ে আমাদের সোনার চাকতি কিছু কিছু দিয়েছে। আমি কিছু তোমাদের পাঠিয়ে দেব। এই বিদেশে পড়ে থেকো না। এখানে তোমাদের কে চেনে যে খাদ্য আশ্রয় দেবে। ফ্রান্সিস বলল।

—না না। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরে যাবো। একজন বলল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের জাহাজে ফিরে এল। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে শাঙ্কো দু'জনের কাছে এল। ফ্রান্সিস ওদের মুখ দেখেই বুঝল—ওরা কী বলতে চাইছে। হেসে বলল—দুপুরে খাওয়া শেষ ক'রে আমরা এই বন্দর শহরে যাবো। ঠিক আছে। বন্ধুরা খুশিতে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। কেবিন ঘরে ঢুকলে মারিয়া বলল—বন্ধুরা খুশির ধ্বনি তুলল। কী ব্যাপার?

—দুপুরে এইখানে নামবে। ঘরেটুরে আনন্দ করবে। ফ্রান্সিস বলল খুশি হ'য়ে মারিয়া বলল—সত্যি?

—হ্যাঁ। বড় শহর। অনেক কিছু পাওয়া যাবে। দু'দুবার জাহাজ লুঠ হয়েছে। অন্তত কাপড় জামা তো কটা বানাতে হবে। ফ্রান্সিস হাসতে হাসতে বলল। মারিয়া খুশিতে লাফিয়ে উঠে হাততালি দিল। মারিয়াকে এত খুশি দেখে ফ্রান্সিস নিজেও খুশি হল। মারিয়ার বিমর্ষ ভাবনা অনেকটা কেটে গেছে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরেই সবাই পোশাক পাল্টাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নতুন পোশাকগুলো তো সব ডাকাতরা নিয়ে গেছে। বাকি পোশাক যেগুলো একটু ভালো অবস্থায় আছে সেসব পরে ওরা একে একে ডেকে এসে জড়ো হ'ল। ক্রেভানের দেখাশুনার জন্যে বৈদ্য ভেনকে রেখে ফ্রান্সিস আর মারিয়া ডেকে উঠে এল। দু'জনের গায়েই ভালো পোশাক। মারিয়া একটা হালকা নীল রঙের পোশাক পরেছে। গলার নেকলেসটা ডাকাতরা নিয়ে নিয়েছে। সবচেয়ে দামি নেকলেসটা পরেছে। মাথার চুল বেঁধেছে টান টান করে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে রাজকুমারীকে। সবাই পরস্পর দৃষ্টিতে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যারিও নতুন পোশাক পরে ততক্ষণে এসে গেছে।

সবাই পাটাতন দিয়ে হেঁটে হেঁটে পাথুরে তীরে নামল। সবাই একত্র হলে হ্যারি বলল—শোন—আমাদের জামা কাপড় তো ডাকাতি হয়ে গেছে। সবার আগে আমরা কোন দর্জির দোকানে যাবো। কাপড় বেছে মাপটাপ দেব। তারপর তোমাদের হাতে সোনার চাকতি দেওয়া হবে। সবাই ঘুরে ঘুরে শহর দেখবে। শহরের বাইরে দূরে যাবে না। আনন্দ করবে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আঙুল তুলে উঁচু গীর্জাটা দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—সবাই ঐ গীর্জাটার নিচে এসে জড়ো হবে। বেশি দেরি করবে না। সবাই বড় রাস্তাটায় এল। দু'দিকে বাড়িঘর লোকজন দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগল। দু'চারটে বেশ শৌখিন ঘোড়ার গাড়ি দেখল। সুবেশ পুরুষ মহিলাদের দেখল।

হ্যারল্ডের জাহাজের ডেক-এ বসেছিল লুটেরা ভাইকিংরা। চার্মান্তই ওদের দলনেতা। হ্যারল্ডের ডান হাত। ফ্রান্সিসরা ওদের লুঠ করা ধনসম্পদ নিজেদের জাহাজে নিয়ে গেল এটা ওদের সহ্য হচ্ছিল না। ওরা একই সঙ্গে নিষ্ঠুর আর মিথ্যেবাদী। চার্মান্ত এবার বন্ধুদের বলল—শোন—স্বজাতি স্বদেশের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ফ্রান্সিস আমাদের জন্যে কিছুই করতে চাইল না। বরং এই জাহাজের আশ্রয় থেকেও আমাদের বিতাড়িত করতে চাইল। একটু থেমে বলল—থাক সেসব—হ্যারল্ডের সঙ্গে এই বন্দরে ঐ শহরে বেশ ঘুরেছি। কয়েকটা আস্তানা জানা আছে আমার। এই দারস্তানে আছে ইউসুফ। লোকে ওকে অন্য নামে চেনে। ইউসুফ আসলে আরবদেশের মানুষ। বাইরে ব্যবসায়ী। আসলে ক্রীতদাস কেনাবেচার ব্যবসা। বেশ ধনী। ওর বাড়িতেও আমি গেছি। বাইরে থেকে সাদামাটা বড় বাড়ি। ভেতরে আছে গরাদ দেওয়া কয়েদ ঘর। আমরা য়ুরোপের ইংলন্ডের সাদা মানুষ ধরে আমাদের জাহাজে আটকে রেখে এখানে আসি। গভীর রাতে তাদের ইয়ুসুফের বাড়িতে নিয়ে যাই। ইয়ুসুফের কয়েদঘরে ওদের বন্দী ক'রে রাখা হয়। হ্যারল্ড তাদের বিক্রি করে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে চলে আসে। ইয়ুসুফ আরো বেশি কুফি মানে আরবীয় স্বর্ণমুদ্রায় তাদের বিক্রি করে। চার্মান্তের সঙ্গীরা এতসব খবর জানতো না। হেরল্ডের নির্দেশমত নরহত্যা লুঠপাট করতো। একজন দলের লোক বলে উঠল—এসব ভেতরের খবর শুনে আমাদের কী হবে। আমরা দেশেও ফিরে যেতে পারবো না। ফ্রান্সিস আমাদের রাজার খুব প্রিয়পাত্র। কোনভাবে আমাদের কথা জানতে পারলে আমাদের হয় মেরে ফাঁসি দেবেন নয়তো দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। না খেয়ে মরবো আমরা—সেইজন্যেই সবদিক ভেবে বলছি—হ্যারল্ড তো

মারা গেছে। ও যা করে স্বর্ণমুদ্রা পেতো আমরা তাই করবো। চার্মান্ত বলল। সঙ্গী লুঠেরারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। চার্মান্তের মতলব বুঝতে পারল না। চার্মান্ত এবার চারদিকে তাকাল। দেখল সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীরা একটু দূরে গল্পগুজব করছে। চার্মান্ত গলা নামিয়ে বলল—শোন—আমি নেমে যাচ্ছি। ইয়ুসুফের আস্তানায় যাবো। হ্যারল্ড মারা গেছে এটা বলবো না। বলবো আমরাই এগারোটা ইংরেজ ক্রীতদাস এনেছি। শ্বেতকায় মানে আরবীয়র। যাদের সাহিব বলে সেইসব ক্রীতদাসের দাম অনেক। অর্ধেক দাম পেলেও আমাদের হাতে যথেষ্ট কুফি আসবে। তখন যে যার মত নিজের রাস্তা দেখবো। বুঝলি বোকার দল?

সঙ্গীরা নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে কথা বলতে লাগল।

তারপর একজন বলল—ঠিক আছে। এ ছাড়া তো বেঁচে থাকার কোন উপায় দেখছি না। কিন্তু আমাদের সমান স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে।

—অবশ্যই। তবে আমার বুদ্ধিতেই তো এসব হবে। কাজেই আমি বেশিরভাগটা নেব। কী? তোরা রাজী।

—তোমার খুব কূটবুদ্ধি চার্মান্ত। একজন বলল।

—আগে বল্ তোরা আমাকে সাহায্য করবি কিনা। চার্মান্ত বলল।

—উপায় কি। নইলে এই বিদেশে না খেয়েই মরতে হবে একজন বলল। চার্মান্ত দ্রুত উঠে দাঁড়াল। বলল আমি সব ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। তোদের জাহাজ থেকে নামিয়ে দিতে এলে বলবি আমার এক বন্ধু গেছে আমাদের আস্তানা খুঁজতে। ও এলেই আমরা নেমে যাবো। ঠিক আছে? ওরা আর কী বলবে। চুপ করে রইল। চার্মান্ত একটু সতর্কভাবে চারদিক দেখেটেখে পাটাতন দিয়ে জাহাজঘাটে নেমে পড়ল। তারপর দ্রুত ভিড়ের রাস্তার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ছোট মোড় পার হয়ে দুটো গাছের মাঝখানে একটা বড় পাথর গাঁথা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়িটার নিচে রাস্তায় দুটো ঘোড়ায়টানা মালবাহী গাড়ি দেখল। গাড়ি দুটোর পেছনে একটা বেশ বড় লোহার দরজা খোলা। বিরাট ঘর। মালপত্র বোঝাই। একপাশে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে বসে আছে। খাটের আসনে একজন বসে একটা লম্বা কাগজে বোধহয় হিসেবটিশেব লিখছে। চার্মান্ত নিঃশব্দে ওদের দৃষ্টি ছাড়িয়ে বাড়িটার পাশের চিলতে গলিটায় ঢুকে পড়ল। কিছুটা এগিয়েই বাঁদিকে পেল একটা কাঠের দরজা। চার্মান্ত চিনতো। গলিটার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে

নিয়ে দরজাটায় দুটো টোকা দিল। একটু পরেই দরজাটা খুলে গেল। এক দশাসই চেহারার কালো মানুষ মুখ বাড়াল। তার চামড়ার কোমর বন্ধনীতে ঝুলছে একটা বড় ছোরা। ছোরাটার কোন খাপ নেই। প্রহরীর খালি গা। একটা চামড়ার ফিতে বুকেপিঠে আড়াআড়ি বাঁধা। চার্মান্তকে দেখে মৃদু হেসে বলল—হ্যারল্ড।

—সাহিব?

—পরে আসবে। লোকটা সরে দাঁড়াল। চার্মান্ত একটু দ্রুত ঢুকে পড়ল। দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। বেশ অন্ধকার সামনে। চার্মান্তের পরিচিত জায়গা। তবু ও অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। কিছুটা এগোতে ডানদিকে একটা বেশ কাজ করা দরজা। চার্মান্ত দরজাটা আস্তে ঠেলল। দরজাটা খুলে গেল। একটা বড় ঘরে ঢুকল ও। ঘরটায় বেশ আলো দু'ধারে কয়েকটা কাঁচে ঢাকা আলো জ্বলছে। মেঝেয় কার্পেট পাতা। সামনে একটা ঝলমল কাপড় পাতা বিছানায় একটা ফুলপাতা বোনা কাপড়ে ঢাকা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে মধ্যবয়স্ক ইউসুফ বসে আছে। পরনে এই অঞ্চলের অভিজাত মানুষদের জাঁকালো পোশাক। মুখ পরিষ্কার কামানো। ইয়ুসুফ একটু হেসে স্পেনীয় ভাষায় বলল—কী ব্যাপার? হ্যারল্ড সাহিব কই?

—উনি এখন ইংল্যান্ডে। একদফা পাঠিয়েছে আমার সঙ্গে। মোট এগারোজন উনি নতুন জাহাজ নিয়ে পরে আবার একদফা আসবেন।

—হুঁ। কখন পাঠাবে? ইসুয়ুফ বলল।

—গভীর রাতে। যেমন পাঠানো হয়। চার্মান্ত বলল।

—পাহারা দিয়ে আসবে। চ্যাচামেচি যেন না হয়। ইয়ুসুফ বলল।

—না-না। চার্মান্ত জোরে মাথা নাড়ল।

—পৌঁছে দিলে দাম পাবে। সব সাহেব তো? ইয়ুসুফ বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। চার্মান্ত মাথা কাত করল। তারপর হ্যারল্ডের সম্পত্তির কথা ফ্রান্সিসদের কথা—সিন্দুক নিয়ে যাওয়ার কথা বলল। বেশ মন দিয়ে শুনে ইয়ুসুফ বলল—ঐ ধনসম্পত্তির সিন্দুকের কথা পরে ভাবা যাবে। কী নাম ওদের দলনেতার?

—ফ্রান্সিস। চার্মান্ত বলল—আমাদের মতই ভাইকিং।

—ওরা এখানে কতদিন জাহাজ নোঙর করে থাকবে? ইয়ুসুফ জানতে চাইল।

—বোধহয় দু-তিন দিন। চার্মান্ত বলল।

—হুঁ। মুখে শব্দ করল ইয়ুসুফ। তারপর বলল—তোমরা যেভাবে বরাবর আনো সেভাবে আনা যাবে না। ফ্রান্সিসরা পাশের জাহাজে থাকবে। কিছু কথাবার্তা তোমাদের মধ্যে হবেই। কারণ তোমাদের জোর খাটাতে হবে। ফ্রান্সিসরা টের পাবে। ধরা পড়ে যাবে। কাজেই কৌশলে কাজ সারতে হবে। আমি বিকেলে তোমাদের জাহাজে যাবো। যা ব্যবস্থা করার করবো।

—চার্মান্ত ঠিক বুঝল না। বলল—ওরা খুব দুর্ধর্ষ।

—এক ফোঁটাও রক্ত পড়বে না। যাও। আমি সময়মত যাবো। তারপর মুখে একটা বা হাতে তুড়ি দিল। ওপাশের দরজা খুলে দু'জন বলশালী কালো যোদ্ধা দ্রুত ঢুকল। ওদেরও কোমরে খোলা বড় ছোরা ঝুলছে। ইয়ুসুফ আঙ্গ্ল তুলল। একজন প্রহরী ছুটে গিয়ে একটু অন্ধকারে কাজ করা লোহার টেবিল থেকে একটা ছোট লাল রঙের থলে নিয়ে এলো। ইয়ুসুফের হাতে দিল। ইয়ুসুফ থলি থেকে বাঁহাতে দুটো স্বর্ণমুদ্রা বের করে চার্মান্তকে দিল। বলল—পরে আরো পাবে। চার্মান্ত ইয়ুসুফের ডান হাতটা কোমর বন্ধনীতে ঢোকানো দেখল। আগেও তাই দেখেছে।

চার্মান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বুঝে উঠতে পারল না ইয়ুসুফ নিজেই যাবে কেন। তবে কি ইয়ুসুফ ওকে বিশ্বাস করছে না? এসব ভাবতে ভাবতেই চার্মান্ত জাহাজে ফিরে এল। জাহাজের সঙ্গীদের কাছে এসে মৃদুস্বরে বলল—ইউসুফ বিকেলে আসবে। কীসব ব্যবস্থা করবে বলল। সবাই চুপ করে রইল। এখন শুধু অপেক্ষা করা।

ওদিকে ফ্রান্সিস মারিয়ারা জাহাজ ঘাটে নেমেছে। ঘরবাড়ি লোকজন দেখতে দেখতে ওরা চলল। সবাই বেশ খুশি। প্রথমেই শাঙ্কোকে পাঠানো হল একটা ভালো কার্পড় জামার দোকানের খোঁজে। শাঙ্কো একটু পরেই ফিরে এসে একটু দূরে ডানদিকে একটা বড় দোকান দেখাল। সবাই এগিয়ে এসে দোকানে ঢুকল। দোকানের একপাশে কাপড়ের গাঠরি সাজিয়ে রাখা। টাকমাথা দোকানদার হাসিমুখে এগিয়ে এল। স্পেনীয় ভাষায় বলল—আসুন আসুন। এত খদ্দের। ভালো বিক্রি হবে। ওরা অভ্যস্ত চোখেই বুঝল এরা বিদেশি। এদের জামা, পোশাকই বলছে অনেকদিন এরা সমুদ্রে জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়িয়েছে। এরা কী কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেসব জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহও দোকানদার দেখাল না। ও জানে জলদস্যুরাও পোশাক পাল্টে নতুন পোশাক

কিনতে আসে। কিন্তু মারিয়াকে দেখে বেশ কৌতুহলী চোখে মারিয়ার দিকে তাকাল। পরক্ষণেই চোখ ঘুরিয়ে বলে উঠল আপনারা নিশ্চয়ই নতুন পোশাক তৈরি করাবেন?

—হ্যাঁ। হ্যারি বলল। সবার মাপ টাপ নিন। আর—হ্যারি মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—এই ভদ্রমহিলারও পোশাকের জন্যে যে কোন দামের যে কাপড় এর পছন্দমত হবে সেই মতো দেবেন।

—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। ওপাশেই আমার সেলাইয়ের দোকান। সব পোশাক আমি তৈরি করে দেব ঠিক যেমনটি আপনারা চাইবেন।

—তাহ'লে তো ভালোই। কিন্তু সব পোশাক তৈরি করিয়ে দিতে হবে কাল দুপুরের মধ্যে। আমরা কাল সন্ধ্যের আগেই জাহাজ ছাড়বো।

—নিশ্চয়ই পাবেন। তবে কিছু অগ্রিম দেবেন। রাত জাগতে হতে পারে। মারিয়া কোমরবন্ধনী থেকে পাঁচটা সোনার চাকতি বের করল। হাত বাড়িয়ে দিল।

—আসুন কাপড় পছন্দ করুন। দোকানদার নিজেই গাঠরির মুখ খুলে কাপড় দেখাতে লাগল। ভাইকিংরাও আগ্রহের সঙ্গে পছন্দমত কাপড় দেখতে লাগল।

—সবাই একরকম কাপড় পছন্দ কর ফ্রান্সিস বলল। সবাই কাপড় দেখেশুনে বাছতে লাগল। এবার দোকানদার মারিয়ার জন্যে কাপড়ের একটা ছোট গাঁটরি খুলে মারিয়াকে দেখাতে লাগল। সবাইমিলে একরকম কাপড় পছন্দ করল। দোকানদার মাথা চুলকে বলল—অতজনের কাপড় তো হবে না। এবার বাকি কাপড় অন্যরকম পছন্দ করা হল। মারিয়াও একটা দামি কাপড় পছন্দ করল। ফ্রান্সিসের দিকে হেসে তাকিয়ে বলল—এটা তোমার পছন্দ হচ্ছে? ফ্রান্সিস বলল—ভালোই তো এসব পছন্দ টছন্দের বালাই আমার নেই। বরং হ্যারিকে বলো। কিন্তু যা করবে তাড়াতাড়ি কর। পছন্দের পাট চুকল। সবাই রাস্তায় নেমে এল। হ্যারি বলল—এবার নিজেদের মত ঘুরে বেড়াও। খেতে চাইলে খেতেও পারো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই যেমন বলা হয়েছে গীর্জার সামনে এসে জড়ো হবে। দুজন তিনজন একসঙ্গে কেউ একা ছড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস মারিয়া আর হ্যারি ঘোরাঘুরি শুরু করল।

কিছুক্ষণ পরেই একজন দুজন করে গীর্জাটার সামনে এসে জড়ো হল। ফ্রান্সিসরাও এল। শাঙ্কোর হাতে একটা গোল চামড়ার ঢাকনাওয়ালা বাজনা। যন্ত্রটার গায়ে ঘুঙুরমত আটকানো। হাত দিয়ে চাপড় দিয়ে বাজিয়ে শাঙ্কো ওটা

বাজাতে বাজাতে হাসতে লাগল। বাজবার সঙ্গে ঘুঙুরের শব্দও তালে তালে বাজছিল।

—ওটা এখানকার জীপসিদের বাজনা। মারিয়া দেখে বলল।

সবাই শেষ বিকেলে জাহাজে ফিরে এল। ওরা যখন পাটাতন দিয়ে জাহাজে উঠছে তখন হ্যারি দেখল পাশে নোঙর করা হ্যারল্ডের জাহাজের পাটাতন দিয়ে এক অভিজাত পোশাকপরা মধ্যবয়স্ক লোকও উঠছে। আর চার্মান্ত তাকে সাদরে তুলে আনছে। হ্যারি ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—ভদ্রলোক কে?

এবার ফ্রান্সিসও তাকিয়েই ইয়ুসুফকে দেখল। ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঐ দিকে তাকিয়ে দেখল ইয়ুসুফকে চার্মান্তরা আর ইংরেজরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইয়ুসুফ সবাইর দিকে তাকিয়ে কিছু বলছে।

—তাহ'লে চার্মান্তরা এখনও জাহাজ থেকে নেমে যায়নি। হ্যারি বলল।

—তাইতো দেখছি। কিন্তু এরকম অভিজাত চেহারা পোশাকের মানুষ। ওদের জাহাজে এল কেন। ওদের বলছেই বা কী? ফ্রান্সিস একটু চিন্তিত স্বরে বলল।

—বোধহয় জাহাজটা কিনতে এসেছে। হ্যারি বলল।

—হতে পারে। তবু মনে একটা খট্‌কা লাগছে। চলো তো দেখি। ফ্রান্সিস বলল। বলে ফ্রান্সিস পাটাতনের দিকে এগোল। হ্যারিও পেছনে পেছনে এল।

দু'জনে হ্যারল্ডের জাহাজের ডেকএ উঠে এল। ভিড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে চার্মান্ত বেশ সতর্ক ভঙ্গীতে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। ও কিছু বলার আগেই ইয়ুসুফ ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—আপনারা—মানে—এখানে এসেছেন কেন?

—আমরা ঐ চার্মান্তের দেশের লোক। ভাইকিং। আপনার পরিচয়? ফ্রান্সিস বলল।

চর্মান্ত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—ইনি এই শহরের সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী। এর নাম—। কিন্তু ইয়ুসুফ সঙ্গে সঙ্গে চার্মান্তকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলল—শুনলেন তো—আমি ব্যবসায়ী। এই জাহাজটার মালিক আমি—ফিগান আমার নাম।

—ঠিক বুঝলাম না। এই জাহাজ তো হ্যারল্ডের। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। হ্যারল্ড মাস ছয়েক আগে আমাকে বিক্রি করেছে। ইয়ুসুফ সাদা মাটা গলায় বলল।

—কিন্তু হ্যারল্ড তো মারা গেছে। ইয়ুসুফ একটু চমকে উঠেও বেশ নির্বিকার গলায় বলল—হ্যাঁ—চার্মান্ত আমাকে বলেছে সেকথা।

—কিন্তু আপনিই যে এই জাহাজ কিনেছেন তার প্রমান কিছু আছে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল। ইয়ুসুফ মৃদু হেসে বাঁহাত দিয়ে ডানদিকের পোশাকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা এক ভাঁজ করা লম্বাটে ছাইরঙা পার্চসমেন্ট কাগজ বের ক'রে বাঁহাতেই হ্যারির হাতে দিল। হ্যারি পড়ল স্পেনীয় ভাষায় লেখা একটা জাহাজ বিক্রির দলিল। হ্যারি পড়ল—ফিগোন নামে দোরস্তাদের ব্যবসায়ীকে এই জাহাজ পঁচিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রি করলাম। নিচে হ্যারল্ডের স্বাক্ষর। তারিখ ছ' মাস আগেকার।

হ্যারি পড়ে কাগজটা ফিগোনকে ফেরৎ দিল। ফিগোন ওটা নিয়ে আবার বাঁহাতে পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। মাথা ওঠানামা করে হ্যারি বলল—হ্যাঁ। হ্যারল্ড ছ'মাস আগে এই জাহাজটা পাঁচিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রায় এঁর কাছে বিক্রি করেছে। ফ্রান্সিস এতক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে ইয়ুসুফের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করছিল—লোকটার চোখেমুখে কোন ভাবান্তর নেই। কেমন একটা অদ্ভুত নির্বিকার ভঙ্গী। এমনকি হ্যারল্ড মারা গেছে শুনেও একটু চম্‌কে উঠলেও পরক্ষণেই নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়েছে। এসব লোকের মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই মনে মনে কী ফন্দী আঁটছে। একেবারে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ফ্রান্সিস বলল— কিন্তু এতদিন দখল নেননি কেন?

—হ্যারল্ড ইংল্যান্ড চলে গেল। বলে গিয়েছিল ফিরে এসেও জাহাজটা আমাকে দিয়ে অন্য জাহাজ কিনে নিয়ে নিজের দেশে চলে যাবে। ইয়ুসুফ বলল।

—কিন্তু একটা জাহাজ কেনার ক্ষমতা আর আছে সে তার জাহাজটা বিক্রি করবে কেন? ফ্রান্সিস প্রশ্ন তুলল।

—ব্যবসা সেরে লাভের টাকা থেকে নতুন একটা ভালো জাহাজ কেনার ক্ষমতা হবে তখন। অকাট্য যুক্তি। ফ্রান্সিস কিছু বলল না। লোকটার বেশ কূটবুদ্ধি আছে সন্দেহ নেই।

তখনই ইয়ুসুফ হাততালি দিয়ে বলল—তোমরা সবাই সার দিয়ে দাঁড়াও। কিছু অগ্রিম দেব। বাঁহাতে তুড়ি দিয়ে চার্মান্তকে ইশারায় ডাকল। আবার বাঁহাত পোশাকের ভেতর ঢুকিয়ে একটা সাটিন কাপড়ের নীল থলে বের করল। বাঁহাতে থলেটা ধরে চার্মান্তকে দিয়ে বলল—সবাইকে দুটো করে স্বর্ণমুদ্রা দাও। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল ফিগোন সেই যে ডান হাতটা প্রায় কব্জি

পর্যন্ত কোমরের রুপোর কাজ করা চামড়ার বেলটে ঢুকিয়ে রেখেছে একবারও সেই কোমরবন্ধনী থেকে তুলে আনল না। বোধহয় লোকটা বাঁহাতী। অনেকেরই বাঁহাতটা বেশি শক্তি ধরে। তারা বাঁহাতই বেশি ব্যবহার করে। এমনকি লেখেও। প্রত্যেককে যখন স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হচ্ছে তখন ইয়ুসুফ বলল—তাহলে চার্মান্তর সঙ্গে তোমরা চলে এসো। তোমাদের জামা কাপড়ের যা অবস্থা—যাক গে—যাবার সময় চার্মান্ত তোমাদের কাপড়ের দোকানে নিয়ে যাবে। কাল সকালেই তৈরি পোশাক পেয়ে যাবে। আজ রাতটা আমার বাড়িতেই থাকবে। তোমাদের জন্যে নৈশ ভোজের ব্যবস্থা রয়েছে। কাল সকালেই নতুন পোশাক পরে থলিপত্র এনে জাহাজে তুলবে। ঠিক আছে। ইংরেজরা ভাইকিংরা খুব খুশি হল স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে। ওরা দু'তিন জন মাথা ঝাঁকাল।

—তাহ'লে ওদের মাল বাহকের কাজে লাগালেন। হ্যারি বলল।

ইয়ুসুফ হ্যারির কথা গ্রাহ্যই করল না। একটু দ্রুত পাটাতনের দিকে হাঁটতে লাগল। আর একবারও পেছনদিকে না তাকিয়ে ঘাটে নেমে গেল।

জাহাজে ফিরে হ্যারি বলল—যাহোক ওরা এই বিদেশে কাজ পেয়ে গেল। এখানে ওদের খাওয়াপরা জুটে যাবে। ফ্রান্সিসকে একটু চিন্তিত করে বলল—হ্যারি—ব্যাপারটা বোধহয় এত সহজ সরল না। অবশ্য ফিগোল ব্যাপারটা খুবই সাধারণ—মানে জাহাজ কেনা লোককে অগ্রিম দিয়ে কাজে লাগানো এভাবেই দেখাবার চেষ্টা করেছে।

—কিন্তু লোকটা তো নিজের পরিচয় দিলই। সবাই তো ওর প্রস্তাবে রাজি হল। গণ্ডগোলটা কোথায়? হ্যারি বলল।

—আছে আছে। ওরা কাল সকালে মালপত্র নিয়ে জাহাজে উঠতে এলে তবেই এটা একটা মালিক মজুরের সম্পর্ক ব'লেই মেনে নেব। তার আগে নয়। দু'জনের মধ্যে আর কোন কথা হল না।

সেই রাতটা ফ্রান্সিস বেশ অস্বস্তির মধ্যে কাটাল।

পরদিন সকালে দেখল হ্যারল্ডের জাহাজ জনশূন্য। চার্মান্তরা তখনও ফিরল না।

দুপুর হল। সন্ধ্যা হল। তখনও চার্মান্তদের বা অন্যদের দেখা নেই। হ্যারি বিকেল থেকেই জাহাজের রেলিঙ ধরে ঘাটের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু ওরা কোথায়?

পর্যন্ত কোমরের রুপোর কাজ করা চামড়ার বেলটে ঢুকিয়ে রেখেছে একবারও সেই কোমরবন্ধনী থেকে তুলে আনল না। বোধহয় লোকটা বাঁহাতী। অনেকেরই বাঁহাতটা বেশি শক্তি ধরে। তারা বাঁহাতই বেশি ব্যবহার করে। এমনকি লেখেও। প্রত্যেককে যখন স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হচ্ছে তখন ইয়ুসুফ বলল—তাহলে চার্মান্তর সঙ্গে তোমরা চলে এসো। তোমাদের জামা কাপড়ের যা অবস্থা—যাক গে—যাবার সময় চার্মান্ত তোমাদের কাপড়ের দোকানে নিয়ে যাবে। কাল সকালেই তৈরি পোশাক পেয়ে যাবে। আজ রাতটা আমার বাড়িতেই থাকবে। তোমাদের জন্যে নৈশ ভোজের ব্যবস্থা রয়েছে। কাল সকালেই নতুন পোশাক পরে থলিপত্র এনে জাহাজে তুলবে। ঠিক আছে। ইংরেজরা ভাইকিংরা খুব খুশি হল স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে। ওরা দু'তিন জন মাথা ঝাঁকাল।

—তাহ'লে ওদের মাল বাহকের কাজে লাগালেন। হ্যারি বলল।

ইয়ুসুফ হ্যারির কথা গ্রাহ্যই করল না। একটু দ্রুত পাটাতনের দিকে হাঁটতে লাগল। আর একবারও পেছনদিকে না তাকিয়ে ঘাটে নেমে গেল।

জাহাজে ফিরে হ্যারি বলল—যাহোক ওরা এই বিদেশে কাজ পেয়ে গেল। এখানে ওদের খাওয়াপরা জুটে যাবে। ফ্রান্সিসকে একটু চিন্তিত করে বলল—হ্যারি—ব্যাপারটা বোধহয় এত সহজ সরল না। অবশ্য ফিগোনি ব্যাপারটা খুবই সাধারণ—মানে জাহাজ কেনা লোককে অগ্রিম দিয়ে কাজে লাগানো এভাবেই দেখাবার চেষ্টা করেছে।

—কিন্তু লোকটা তো নিজের পরিচয় দিলই। সবাই তো ওর প্রস্তাবে রাজি হল। গণ্ডগোলটা কোথায়? হ্যারি বলল।

—আছে আছে। ওরা কাল সকালে মালপত্র নিয়ে জাহাজে উঠতে এলে তবেই এটা একটা মালিক মজুরের সম্পর্ক ব'লেই মেনে নেব। তার আগে নয়। দু'জনের মধ্যে আর কোন কথা হল না।

সেই রাতটা ফ্রান্সিস বেশ অস্বস্তির মধ্যে কাটাল।

পরদিন সকালে দেখল হ্যারল্ডের জাহাজ জনশূন্য। চার্মান্তরা তখনও ফিরল না।

দুপুর হল। সন্ধ্যা হল। তখনও চার্মান্তদের বা অন্যদের দেখা নেই। হ্যারি বিকেল থেকেই জাহাজের রেলিঙ ধরে ঘাটের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু ওরা কোথায়?

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস তখন বিছানায় চোখ বুজে আধশোয়া হয়ে আছে। হ্যারি বলল—ওরা তো এখনও ফিরল না।

—জানতাম। মৃদুস্বরে কথাটা বলে ফ্রান্সিস চোখ খুলে উঠে বসল। বলল—চলো। ওদের খোঁজ করতে হবে।

—তাহ'লে তো ফিগোনের বাড়ি যেতে হবে। হ্যারি বলল।

—তাই যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ওরা হয়তো কাল সকালে মালপত্র নিয়ে আসতে পারে। হ্যারি বলল।

—হ্যারি—মনে হয় ওরা আর ফিরবে না। ফ্রান্সিস কথাটা বলে দরজার দিকে এগোল।

—কী ব্যাপার? এভান জানতে চাইল।

—এসে বলবো। হ্যারি কথাটা বলে ঘরের বাইরে চলে এল।

দু'জনে ডেক-এ উঠে এল। জাহাজঘাটের দু'পাশে দু'টো মশাল জ্বলছে। অন্ধকার মত জাহাজঘাটে নামল। বড় রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়ে বাঁদিকে দেখল একটা দোকানে বেশ ভিড়। কিছু কিছু বিদেশি জাহাজের নাবিক গ্লাসে চুমুক দিয়ে কী খাচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝল ওরা অবাকজাতীয় কিছু নেশার পানীয় খাচ্ছে। ওদের জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। ওরা বিদেশি। একটা বুনো মধু বিক্রির দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল—ভাই—ফিগোনার বাড়িটা কোথায় জানো? দোকানদার আঙুল তুলে বেশ দূরে দেখিয়ে বলল—ঐ যে ডানদিকে লাল বাড়িটা ওটাই ফিগোনার বাড়ি। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ঐ লাল বাড়িটার সামনে এল। বড় পাথর দিয়ে গাঁথা বাড়ি। কাঠের বড় দরজাটায় ফুল লতাপাতার কাজ করা। একজন দ্বাররক্ষী দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সশস্ত্র নয়। আঁটোসাঁটো হলদে পোশাক পরা। হ্যারি জানালায় আলোর আভাস। দরজার মাথায় একটা কাঁচে ঢাকা আলো জ্বলছে। হ্যারি দ্বাররক্ষীর কাছে গেল। বলল—ফিগোন আছেন?

—না। উনি এক বন্ধুর বাড়ি গেছেন। দ্বাররক্ষী বলল।

—ফিরতে দেরি হবে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—একাই গেছেন। এখনই ফেরার কথা। বলতে বলতেই দ্বাররক্ষী রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল —ঐ তো। উনি আসছেন। দেখা গেল একজন বেশ মোটামত মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। দরজার আলোয় ভদ্রলোককে দেখে ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ব'লে উঠল—

—হ্যারি—লোকটা ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। ভদ্রলোক কাছাকাছি এসে বলল—আপনারা?

—আমরা ভাইকিং। জাহাজে চড়ে এসেছি। আপনিই কি ফিগোনা?

—হ্যাঁ। ভদ্রলোক একটু মাথা ওঠানামা করলেন।

—আপনিই কি আজ বিকেলে জাহাজঘাটে গিয়েছিলেন? হ্যারল্ডের জাহাজে? ফ্রান্সিস বলল।

—কে হ্যারল্ড? নামই শুনিনি কখনো। ফিগোনা বললেন।

—আপনি হ্যারল্ডের জাহাজ কেনেন নি? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—না না। একটু থেমে বললেন—সত্যি কথাটাই বলি। বেশ কিছুদিন আমার ব্যবসায় খুব মন্দা চলছে। জাহাজ কেনার সাধ্য নেই। তবে ডন তিমব্রান্টের এখন খুব সুদিন আছে। একটা কেন দু'তিনটে জাহাজ কেনার ক্ষমতা ওঁর আছে। ফ্রান্সিস চম্‌কে উঠল। বলল—আচ্ছা—ডন তিম্‌ব্রান্ট কি বাঁহাতি। মানে—। ফিগোনা মৃদু হেসে বললেন—

—ওর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা নেই। উনি বলেন—জন্ম থেকেই নাকি নেই। লোকে অবশ্য অন্য কথা বলে। থাকগে—লোকে তো কত কিছুই ভাবে।

—আপনাকে বিরক্ত করলাম। কিছু মনে করবেন না। হ্যারি বলল।

—না না। দ্বাররক্ষী দরজা খুলে দিল।

—আচ্ছা ডন তিমব্রান্টের বাড়িটা কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

আঙুল তুলে ডানদিকের রাস্তাটা দেখিয়ে বললেন ভদ্রলোক — ঐ রাস্তা ধরে সোজা চলে যান। দশ বারোটা বাড়ির পর বাঁদিকে দুটো চেস্টনাট গাছের মাঝখানে যে বাড়িটা দেখবেন সেটাই ডন তিমব্রান্টের বাড়ি।

—অনেক ধন্যবাদ। ফ্রান্সিস বলল।

দু'জনে একটু এগিয়ে ডানদিকের রাস্তাটা ধরল। দু' পাশের বাড়িঘরের জানালায় আলোর আভাস। প্রায় অন্ধকার পথ ধরেই দু'জনে চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাঁদিকে দুটো গাছ দেখল। বাঁদিকে একটা লোহার নানা কাজ করা বড় কাঠের দরজা বন্ধ। কিন্তু সামনে কোন দ্বাররক্ষী নেই। মাঝখানে বেশ বড় একটা বাড়ি। নিচে বিরাট গুদাম । বিরাট দরজার একপাট বন্ধ। অন্যপাট আধখোলা। ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে সেখান দিয়ে গুদামে ঢুকল। পেছনে হ্যারি। দেখা গেল একটা কাঠের বড় চৌকোনো আসনে একজন লোক মাথা নিচু করে কী লিখছে। অন্য একটি লোক দাঁড়িয়ে থেকে কিছু বলছে। বোঝা গেল

কর্মচারি। মাথার ওপর একটা বড় কাঁচে থেকে আলো জ্বলছে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দু'জনের কাছে কাছে এসে দাঁড়াল। যে দাঁড়িয়ে ছিল সে দু'জনকে দেখতে পেয়ে ব'লে উঠল—কী চাই? যে লিখছিল সেও মুখ তুলে তাকাল।

—বাইরে দরজায় কোন দ্বাররক্ষী নেই দেখে আপনাদের কাছে এলাম। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। কী চাই বলুন। বসে থাকা লোকটি জিজ্ঞেস করল।

—আমরা ব্যবসা সূত্রে এসেছি। জাহাজঘাটে আমাদের জাহাজ নোঙর করা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা কোন দেশের ব্যবসায়ী লোকটা জানতে চাইল।

—পোর্তুগালের। প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রার মালপত্র কিনতে এসেছি।

—বেশ তো। কী কী চাই লিখে দিন। লোকটি বেশ খুশি হয়ে বলল।

—কিন্তু এই ব্যাপারে ডন তিমব্রান্টের সঙ্গে আগে কথা বলতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—অসুবিধে আছে। সন্ধ্যের পর ডন তিমব্রোন্ট কারোর সঙ্গে দেখা করেন না। লোকটি গম্ভীর হয়ে বলল।

—কিন্তু আমরা তো দেরি করতে পারবো না। তাছাড়া ব্যবসা সংক্রান্ত জরুরী কথা আছে। কাল দুপুরের মধ্যেই জাহাজে মালপত্র নিয়ে চলে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—মুস্কিল হ'ল। ঠিক আছে। কথা বলে আসছি। অপেক্ষা করুন। লোকটি পেছনের একটা ছোট দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। কিছু পরে এসে বলল—আসুন। পেছনের দরজা দিয়ে ফ্রান্সিসরা ঢুকতেই দেখল এক বলশালী কালো দ্বাররক্ষী অল্প আলোয় পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। কোমর বন্ধনীতে খোলা বড় ছোরা গোঁজা। আর কোন অস্ত্র নেই। ওদের হাত বাড়িয়ে এগোতে ইঙ্গিত করে সামনের দিকে চলল। কিছুটা যাওয়ার পর পাথুরে দেয়ালে সুদৃশ্য কাঁচে-ঢাকা আলো দেয়ালে ঝুলছে দেখল। আবার দুটো বাঁক। ফ্রান্সিস সর্বক্ষণ চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চলল। এইবার ডানদিকে একটা টানাপথ পড়ল। পথের শেষে আলোয় দেখল বলশালী চেহারার এক দ্বাররক্ষী পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে ওদিক দিয়ে ঢোকার দরজা আছে। এবার

ডানদিকের ঘরের সামনে এসে দ্বাররক্ষী দাঁড়াল। একটা সেই লোহার কারুকাজকরা দরজা দেখিয়ে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস হ্যারি দরজা খুলে ঢুকল। চার্মান্ত এই ঘরেই আগে ঢুকেছিল। দেখল সেই লোকটি বসে আছে। গায়ে পাতলা হলদে রঙের দামি কাপড়ের পোশাক। সেই মোটা চামড়ার কোমরবন্ধনী। তবে অন্যরকম। ফ্রান্সিসদের দেখেই ইয়ুসুফ একটু চমকাল সঙ্গে সঙ্গে স্থির দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু চুপ করে থেকে বলল—ব্যবসার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছেন।

কীসের ব্যবসা আপনাদের?

ফ্রান্সিস সে কথার জবাব না দিয়ে বলল—কাল বিকেলে আপনি জাহাজঘাটে গিয়েছিলেন। নিজেকে ব্যবসায়ী ফিগোনা বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। আর—। ফ্রান্সিসকে থামিয়ে দিয়ে ইয়ুসুফ গম্ভীর স্বরে বলে উঠল—থামুন। ওসব বাজে কথা রেখে ব্যবসার কথা বলুন।

—তাহ'লে আপনি কালকে বিকেলে—। আবার ফ্রান্সিসকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল—স্টপ। তারপর বাঁহাতে তুড়ি দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁপাশের দরজা দিয়ে দুই দশাসই কালো প্রহরী ছুটে এল।

—এই দু'টোকে বাইরে বের করে দে। ইয়ুসুফ বলল। দ্বাররক্ষী দু'জন দ্রুত এসে ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে ধরতে এল। ফ্রান্সিস হাত তুলে বলল—থাক। আমরা যাচ্ছি। দু'জনে ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল দরজার দিকে।

সেই গুদামের মধ্যে দিয়েই ফ্রান্সিসরা বাইরে এসে রাস্তায় নামল। চলল জাহাজ ঘাটের দিকে।

—কী সাংঘাতিক লোক। হ্যারি গলা নামিয়ে বলল।

—আর সন্দেহ নেই। ঐ লোকটা ক্রেমব্রান্ট—শ্বেতকায় ক্রীতদাস কেনাবেচার ব্যবসা করে। তাই এই দোরস্তাদ বন্দরের সবচেয়ে বড় ধনী ব্যবসায়ী। ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী করবে?

—এই নরাধমের হাত থেকে ওদের বাঁচাতেই হবে। হ্যারি বলল—যে ভাবেই হোক।

—ছক ভাবছি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর কেউ আর কোন কথা বলল না।

আসতে আসতে সেই আরকের দোকানের সামনে এল। ভিড় কমে এসে গেছে। ফ্রন্সিস বলল—ঐ দোকানে চলো। হ্যারি তো অবাক। বলল তুমি তো এসব খাওনা।



এতক্ষণে ফ্রান্সিসদের জাহাজ বন্দরের কাছে এল।

—আজও খাবো না। তবে খাওয়ার ভান করবো। ফ্রান্সিস বলল।

একটু ভেবে নিয়ে হ্যারি বলল—তাহ'লে তুমি সন্দেহ করছো যে তিম্‌ব্রান্টের লোক আমাদের অনুসরণ করছে।

ঠিক তাই, তিম্‌ব্রান্টের লোককে দেখাতে হবে যে আমরা সাধারণ জাহাজীদের মত এসব খাই। বিদেশি ধনী ব্যবসায়ীদের জন্যে মালপত্র কিনতে এসে ফূর্তি টুর্তি করি। তিম্‌ব্রান্টের সন্দেহ দূর হবে। ও নিশ্চিন্ত হবে। অত্যন্ত ধূর্ত ও। ফ্রান্সিস বলল।

দোকানটায় ঢুকে দেখল প্রায় সবাই গা এলিয়ে বসে আছে। সবাই বিদেশি নাবিক। একজন আবার জড়ানো গলায় গান গাইছে। দু' গ্লাস আরক চেয়ে ফ্রান্সিস ও হ্যারি টানা কাঠের আসনে বসল। একজন হাড় জিরজিরে লোক ওদের সামনে দু'গ্লাশ আরক রেখে গেল। দু'জনে চুপ করে বসে রইল। ফ্রান্সিস আড় চোখে রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখল। একটু পরেই দোকানের ঝোলানো আলোয় দেখল একটা কালো মানুষ দোকানটার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। একনজর ভেতরে তাকিয়ে ফ্রান্সিসদের দেখেই দ্রুত সরে গেল। কিছু পরে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল চলো রাস্তায় এবার মৃদুস্বরে বলল—তিম্‌ব্রান্টের কাছে খবর চলে যাবে। ও নিশ্চিন্ত হবে। আর দেরি নয়। আজ রাতেই ওদের মুক্ত করতে হবে। জোরে হাঁটো।

দু'জনেই দ্রুত হেঁটে চলল জাহাজঘাটের দিকে।

দু'জনে জাহাজে উঠতেই শাঙ্কোরা কয়েকজন এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—সব পরে বলবো। শাঙ্কো বিনোলা যত তাড়াতাড়ি পারো খেয়ে নাও। তরোয়াল নিয়ে তৈরি হয়ে এসো। ফ্রান্সিস আর কেবিনঘরে ঢুকল না। খাবার জায়গায় চলে এল। রাঁধুনী বন্ধুরা বলল—সব তো রান্না হয়নি।

—দরকার নেই। যা হয়েছে তাই খেতে দাও। হ্যারি আমার তরোয়ালটা নিয়ে এসো। জলদি।

কেবিনঘরে বিছানার একপাশে বসে মারিয়া ফ্রান্সিসের পোশাকের ছেঁড়া জায়গাগুলো সেলাই করতে করতে ক্রেভানের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। হ্যারিকে ঢুকতে দেখে মারিয়া বলল—

—ফ্রান্সিস কোথায়?

—খাচ্ছে। হ্যারি বলল।

—এত তাড়াতাড়ি মারিয়া অবাক। হ্যারি বিছানার তলা থেকে তরোয়ালটা

বের করে বলল—রাজকুমারী—আমি এসে সব বলছি। হ্যারি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শাঙ্কো আর বিনোলা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে তরোয়াল কোমরে গুঁজে ডেক্‌এ উঠে এল। ফ্রান্সিস আগেই অপেক্ষা করছিল। তিনজনে পাটাতন দিয়ে হেঁটে পাথুরেঘাটে নেমে এল।

রাস্তা দিয়ে তিনজনে চলল। লোকজনের ভিড় কমে গেছে। দু'পাশের বাড়িঘরে কোন বাড়ির জানালায় আলোর আভাস। বেশির ভাগ বাড়িই অন্ধকারে ডুবে আছে। চাঁদের আলোও অনুজ্জ্বল। ওরা নিঃশব্দে হেঁটে চলল।

ইয়ুসুফের বাড়ির সামনে এসে দেখল গুদাম ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরে কোন রক্ষী নেই। ফ্রান্সিস একটু দাঁড়াল। বাঁদিকে খাবার সময়ে কিছু দূরে গলিপথের শেষে যে বন্ধ দরজা আর তার সামনে প্রহরী মোতায়েন দেখেছিল সেই দিকটা হিসবে করে নিয়ে মৃদুস্বরে বলল—চলো। বাড়িটার ডানদিকের চিল্‌তে গলিটা দিয়ে ঢুকে আবছা অন্ধকারে কিছুটা এগোতেই বাঁদিকে একটা দরজা দেখল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিসফিস্ করে বলল—এই দরজা দিয়েই ভেতরে ঢুকতে হবে। দরজার ওপারেই প্রহরী আছে। বড় ছোরা কোমরে গোঁজা। ওকে কবজা করতে হবে। একটু থেমে বলল—নিশ্চয়ই দরজায় কোন সাঙ্ঘাতিক শব্দ করতে হয়। তিমস্ত্রাটের সব ব্যবস্থা পাকা। ফ্রান্সিস দরজাটায় আঙুল দিয়ে দুটো টোকা দিল। দরজা খুলল না। আন্দাজে আর একটা টোকা দিল। দরজার একপাট খুলে প্রহরীটি মুখ বাড়াল আর ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই শাঙ্কো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলশালী কালো প্রহরীটি সেই হঠাৎ ধাক্কায় মেঝেয় পড়ে গেল না। দ্রুত কোমরে হাত বাড়িয়ে ছোরা বের করতে গেল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে খোলা তরোয়ালে ডগাটা ওর গলায় চেপে ধরে চাপাস্বরে বলল—চেঁচিয়েছো কি মরেছো। পেছোও। প্রহরীটি বিপদ বুঝতে পারল। এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেল। তিনজনেই দ্রুত ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বিনোলা তখনই তরোয়ালের ডগাটা প্রহরীর বুকে চেপে ধরল।

—কাল যাদের আনা হয়েছিল তারা কোথায়? ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল।

—ভীতমুখে প্রহরীটি ভেতরদিকে ইঙ্গিত করল।

—চলো। ওদের নিশ্চয়ই বন্দী করে রাখা হয়েছে? ফ্রান্সিস বলল। প্রহরীটি মাথা ওঠানামা করল।

—আমাদের নিয়ে চলো। জলদি। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল।

দরজার মাথায় একটা সুদৃশ্য কাঁচের আলোবদানে আলো ঝুলছিল। প্রহরীটি নিঃশব্দে সেই আলোয় গলিপথটা দিয়ে চলল। বুকে পিঠে তরোয়াল চেপে ধরে ফ্রান্সিস নিঃশব্দে চলল। গলিপথ শেষ হতেই দেখা গেল পাথর বাঁধানো চত্বর। তারপরেই ডানদিকে লোহার গরাদ দেওয়া একটা ঘর। ঘরটার লোহার দরজার মাথায় আলো জ্বলছে। একজন প্রহরী খোলা তরোয়াল হাতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কালো। বেশ বলশালী। ফ্রান্সিস হাত তুলে পাথুরে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস ফিস্ ফিস্ করে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে সেই অবছা অন্ধকারে খোলা তরোয়াল হাতে প্রহরীটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল। এই হঠাৎ আক্রমণে প্রহরীটি প্রায় ছিটকে লোহার গরাদের ওপর পড়ল। মাথাটা লোহার গরাদে জোর ধাক্কা খেল। গরাদে ঠন্-ন্-ন্—শব্দ হল। ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলে উঠল—শাঙ্কো শব্দ নয়। মাথায় প্রচণ্ড ঘা খেয়ে প্রহরীটি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস একলাফে প্রহরীটির বুকে তরোয়াল চেপে ধরে চাপাস্বরে বলল—দরজা খোল। নইলে মরবে। এরকমভাবে হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে দুই প্রহরীই তখন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। তখনই বাঁদিকের ঘর থেকে একটা শব্দ উঠল—শব্দ কীসের? ফ্রান্সিস তরোয়ালের ডগাটা প্রহরীটির বুকে জোরে চেপে ধরে দাঁত চাপাস্বরে বলল—বলো—দরজা খুলছি। প্রহরীটি তখনও অবাক চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে আছে। ফ্রান্সিস জোরে তরোয়াল চাপল। বুকে কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। প্রহরীটির পোশাকের ঐ জায়গাটা রক্তে ভিজে গেল। ফ্রান্সিস আবার চাপাস্বরে বলল—বলো। প্রহরীটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল—দরজা খোলার শব্দ।

—তালা খোল। আস্তে তরোয়াল ফেলে দাও। ফ্রান্সিস একইভাবে বলল—খোল দরজা। প্রহরীটি অবশ্য পাথুরে মেঝেতে তরোয়াল রাখল। কোমরের ফেট্টি থেকে চাবি বের করে কয়েদঘরের দরজা খুলে দিল। শাঙ্কো একলাফে এগিয়ে এগিয়ে দরজার সবটা খুলে দিয়ে চাপাস্বরে বলল—পালাও। প্রথমেই ছুটে বেরিয়ে এল চার্মান্ত। ফ্রান্সিস ওকে দেখে খুব একটা অবাক হল না। তারপরেই বাকিরা দরজার দিকে ছুটল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—সবাই জাহাজঘাটের দিকে ছোটো। যত জোরে পারো। দুই প্রহরীকে ফ্রান্সিসরা তরোয়াল ঠেকিয়ে আটকে রাখল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—শাঙ্কো—বিনোলা—পালাও। ওরা তিনজনই এবার তরোয়াল সরিয়ে নিয়ে পেছন ফিরে

দরজার দিকে ছুটল। প্রহরী দু'জন এবার—পালাচ্ছে—পালাচ্ছে ব'লে চেঁচিয়ে উঠল। দুজনেই ফ্রান্সিসদের ধরবার জন্য দরজার দিকে ছুটে এল। শাঙ্কো বিনোলা একলাফে দরজা পার হ'য়ে চিলতে গলিতে নামল। নেমেই আবছা অন্ধকারে চিলতে গলি ধরে রাস্তার দিকে ছুটল। ফ্রান্সিস দেখল—চার্মান্ত দাঁড়িয়ে আছে। চার্মান্ত চাপাগলায় ব'লে উঠল—সাবধান—ওপাশের ঘরে একজন যোদ্ধা থাকে। তখনই একজন প্রহরী চ্যাচাতে চ্যাচাতে দরজার কাছে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস এই সুযোগটাই চাইছিল। ও সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল ফেলে দু'হাতে প্রচণ্ড জোরে দরজার পাল্লাটা দিয়ে প্রহরীর মুখের ওপর বন্ধ ক'রে দিল। তখনই চিলতে গলি দিয়ে একজন যোদ্ধাকে ছুটে আসতে দেখা গেল। কিন্তু কারো হাতে অস্ত্র নেই। অস্ত্র নেবার সময় পায়নি। চার্মান্ত ততক্ষণ চিলতে গলি দিয়ে রাস্তার দিকে ছুটেছে। ফ্রান্সিসও তরোয়ালটা ফেলে রেখে চার্মান্তর পেছনে পেছনে প্রাণপণে ছুটে রাস্তায় চলে এল। অনুজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দেখল শাঙ্কোরা বেশ দূরে ছুটে চলেছে।

ফ্রান্সিসের পাশে পাশে ছুটতে ছুটতে চার্মান্ত হাঁপানো গলায় বলল—আর ভয় নেই। ঐ যোদ্ধারা সদর—রাস্তায়—আসবে না। ইয়ুসুফ যে একদল যোদ্ধা পোষে—এ খবরটা ও গোপন রাখে সবার কাছে।

—হুঁ। ধুরন্দর—সন্দেহ—নেই। হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিসও বলল। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে ছুটে চলা শাঙ্কোকে লক্ষ্য ক'রে বলল—ছুটো না। আস্তে। আস্তে। ও নিজেই গতি কমাল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—তুমি ইয়ুসুফ—বলছিলে কাকে?

ঐ তিমব্রানটকে। ও আসলে আরব দেশের লোক। ক্রীতদাস ব্যবসা—

—গোপন রাখতে—ঐ নাম নিয়েছে। চার্মান্ত হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

—এখানকার রাজা কে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—রাজা নেভেল। ইয়ুসুফের সঙ্গে খুব ভাব রাজা নেভেলের।

—ইয়ুসুফ তো—ধনী ব্যবসায়ী। চার্মান্ত বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস বলল—এভাবে ছোটা চলবে না। তরাজার পাহারাদের নজরে পড়ে যেতে পারি। ও আবার চেঁচিয়ে বলল—শাঙ্কো—থামো। শাঙ্কোরা দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। কাছে এসে ফ্রান্সিস বলল—সবাই স্বাভাবিকভাবে হাঁটো। কারো নজরে যেন না পড়ি। সবাই এবার হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁটতে লাগল।

—শাঙ্কো—তুমি একটু জোরে ছুটে যাও। জাহাজের নোঙর তুলে ফেল। নয়ত পোল তোল। দাঁড় বাইতে বলো। এই বন্দরে আর এক মুহূর্তও থাকবো না। এখানকার রাজা নেভেল আমাদের বিপদে ফেলতে পারে। যাও। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ঘাটের দিকে ছুটল।

জাহাজঘাটে পৌঁছে ফ্রান্সিস দেখল ওদের জাহাজে বন্ধুরা ততক্ষণে পাল খাটিয়ে ফেলেছে। বোধহয় দাঁড়ঘরেও দাঁড় বাইতে চলে গেছে একদল। ও বুঝল—বন্ধুরা কেউ ঘুমোয় নি। যথেষ্ট সজাগ ছিল। রেলিঙ ধরে মারিয়াও দাঁড়িয়েছিল।

ইংরেজ বন্দীরা কয়েকজন এসে ফ্রান্সিসদের দুহাত জড়িয়ে ধরল। একজন বলল—কী ব'লে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো।

—ওসব পরে হবে। এখনও আমাদের বিপদ কাটেনি। তোমরা তাড়াতাড়ি তোমাদের জাহাজে উঠে পড়ো। জাহাজ ভাসিয়ে দাও। কিছুদূরের কোন বন্দরে জাহাজ নিয়ে যাও। শিগগির দেরি করো না। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—কিছু স্বর্ণমুদ্রা তোমরা পেয়েছো। আমরা তো ধনী নই। কিছু সোনার চাকতি পাঠাচ্ছি। তোমরা খাদ্য জল সংগ্রহ করে দেশে ফিরে যেও। তখনই চার্মান্ত এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস—আমরা কী করবো?

—তোমরা ইয়ুসুফের হাত থেকে রেহাই পাবে না। ওদের জাহাজে উঠে পালাও। তারপর লুঠেরাদের দলে ঢুকবে না—স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে সেটা তোমাদের বিবেচনা। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা আর লুঠপাট করবো না। আমাদের দেশে নিয়ে চলো চার্মান্ত বলল।

—না। তোমরা অনেক নিরীহ মানুষ হত্যা করেছো। তোমাদের সেই নৃশংসতার শাস্তি পেতেই হবে। আমি তোমাদের দায়িত্ব নেব না। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস জাহাজে উঠতেই মারিয়া এগিয়ে এল। বলল—

—তোমাদের কোন বিপদ হয়নি তো।

—না-না যাও—শিগগির কিছু সোনার চাকতি নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস তাগাদা দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মারিয়া সোনার চাকতি নিয়ে ফিরে এল। একটা রুমালে বেঁধে। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে শাঙ্কোকে হালের কাছে দেখল। কয়েকজন বন্ধুকে রাতের অভিযানের কথা বলছে। ফ্রান্সিস ভাবল—শাঙ্কো

এসো। শাঙ্কো তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। রুমালে বাঁধা সোনার চাকতিগুলো শাঙ্কোকে দিয়ে বলল—তাড়াতাড়ি যাও। ইংরেজদের সোনার চাকতিগুলো দিয়ে এসো। দেরি করবে না। এক্ষুনি জাহাজ ছাড়া হবে। শ্যাঙ্কো ছুটে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ ছাড়া হ'ল। কিছুদূর জাহাজ চলে আসতেই পূব আকাশে কমলা রঙের বন্যা বইয়ে সূর্য উঠল। ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে এসে বলল—ক্রেভান যে খাঁড়িটা দেখিয়েছে সেই খাঁড়িতে যত তাড়াতাড়ি পারো জাহাজ ঢুকিয়ে দাও। মনে হয় খাঁড়িটা বড়। জলও গভীর। কারণ প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কা, রাজা ম্যাগনামের জাহাজ খাঁড়িতে নির্বিঘ্নে ঢুকতে পেরেছিল। জাহাজ চলল খাঁড়ির দিকে।

সমুদ্রতীরের ছোট ছোট টিলা বনজঙ্গল দেখা গেল। মানুষের বসতি নেই। সমুদ্রতীরের বেশ কাছে ফিরে যেতে যেতে দূর থেকে খাঁড়ির মুখ দেখা গেল। বেশ বড় খাঁড়ি। ধারেকাছে কোন জনবসতি নেই।

তখন একটু বেলা হয়েছে। হ্যারি ডেকএ ফ্রেজারের পাশে দাঁড়িয়েছিল। বিনোলাকে ডেকে বলল—ফ্রান্সিসকে খবর দাও। একটু পরেই ফ্রান্সিস ডেকএ উঠে এল। ফ্রেজার ও হ্যারির পাশে এসে দাঁড়াল।

—হ্যারি—এইটাই সেই খাঁড়ি কিনা একমাত্র ক্রেভানই বলতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আমরা ক্রেভানকে নিয়ে আসছি। হ্যারি চলে গেল। হ্যারি আর শাঙ্কো ক্রেভানকে ধরে ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে এল ফ্রান্সিসদের কাছে ক্রেভান এল।

—দেখুন তো—এটাই সেই খাঁড়ি কিনা? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল। ক্রেভান খাঁড়ির মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল—হ্যাঁ-এটাই সেই খাঁড়ি। তবে আগে মুখের দু'পাশে কিছু গাছপালা ছিল। এখন দেখছি নেই।

—ফ্রান্সিস কী করবে? হ্যারি বলল।

—এক্ষুনি জাহাজ খাঁড়িতে ঢোকাতে হবে। কিছুদূর গেলেই আড়ালে পড়ে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—দুপুরে নেয়েটেয়ে—হ্যারি বলতে গেল।

—না না ইয়ুসুফ আমাদের সহজে ছেড়ে দেবে না। নিশ্চয়ই রাজা নেভেলের সৈন্য নিয়ে জাহাজে চড়ে ইয়ুসুফ আমাদের খুঁজতে বেরোবে। তার

আগেই আমরা যতটা পারি খাঁড়ির ভেতর ঢুকে পড়বো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ক্রেভানের দিকে তাকিয়ে বলল—

—সেই স্লাভিয়াগ্রাম কতদূর?

—বেশ ভেতরে। জাহাজ চলুক। দেখিয়ে দেব। ক্রেভান বলল।

ফ্রেজার জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে জাহাজটা খাঁড়ির মধ্যে ঢোকাল। বেশ চওড়া খাঁড়ি। দু'দিকের তীর ভূমিই পাথুরে।

ফ্রান্সিস এবার বলল—ফ্রেজার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালাও।

বাতাস, বেশ জোরে বইছিল। পালগুলো দুলে উঠেছে। শাঙ্কোরা কয়েকজন চলে গেল দাঁড়ঘরে। দ্রুত দাঁড় টানতে লাগল। খাঁড়ির দুদিকের পাড়ই বেশ উঁচু।

বেশ বেলায় বাঁদিকে একটা ছোট পাহাড় দেখা গেল। খাঁড়ি থেকে খাড়া উঠে গেছে। চূড়াটা যেন ডাঙা সমান। ক্রেভান বলে উঠল—এসে গেছি। ঐ পাহাড়ের উল্টোদিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল—ঐ যে বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। ওটা স্লাভিয়াগ্রাম। আমি যখন এসেছিলাম তখন এত ঘরবাড়ি দেখিনি। ঘাটমত আছে একটা। ঐ ঘাটেই জাহাজ ভেড়াতে হবে। গ্রামের কাছাকাছি এসে দেখা গেল বেশ জলকাদা ছাড়িয়ে পাথুরে তীর উঠে গেছে। এখানে জোয়ার ভাটা খেলে বলেই কাদাটে। ফ্রেজার আস্তে আস্তে ঐ ঘাটমত জায়গাটায় জাহাজ ভেড়াল। তখন দুপর হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, কত অজানা-অচেনা ঘাটে বেশ চিন্তা-ভাবনা করে বিপদের আশঙ্কা মাথায় নিয়ে নেমেছি। তারপর তো কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এখানে যাহোক নিশ্চিন্তে নামা যাবে।

এখন কি নামবে? হ্যারি জানতে চাইল।

অনেক বেলা হয়েছে। খাওয়া সেরে ক্রেভানকে সঙ্গে নিয়ে নামব। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরের খাওয়া শেষ হল। শাঙ্কো আর সিনাত্রা ঘাট মতো জায়গাটায় পাটাতন ফেলল। হ্যারি আর ফ্রান্সিস নামল। তখনই মারিয়া এল।

—আমিও যাব।

—বেশ। এসো।

শাঙ্কো আর সিনাত্রা ধরে ধরে ক্রেভানকে নামাল। মারিয়াকেও নামতে সাহায্য করল। ঢাল বেয়ে সবাই উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে ফ্রান্সিস বলল,

অন্য কোনো বাড়িতে যাওয়ার দরকার নেই। যে বাড়িতে আপনি রাজা ম্যাগনামের একপাটি জুতো দেখেছিলেন, পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন সেই বাড়িতে নিয়ে চলুন।

আস্তে আস্তে হোঁচট খেতে খেতে ক্রেভান ফ্রান্সিসদের একটা বাড়ির সামনে নিয়ে এল। বাড়িটা অন্য বাড়িগুলোর মতোই। তবে খাঁড়ির জলের কাছে। ওদিকে গ্রামের লোকজন কৌতূহলী হয়ে ফ্রান্সিসদের কাছে এসে দাঁড়াল। সকলেই জানতে চায় ওরা এসেছে কেন? তবে ক্রেভানকে অনেকে আগে এখানে থাকতে দেখেছে। তাদের কেউ কেউ এসে ক্রেভানের সঙ্গে কুশল বিনিময় করল।

বাড়িটায় ঢুকল সবাই। প্রথম ঘরটাতে দেখল একটা গাছের কাটা ডাল থেকে তৈরি বিছানায় পশুলোমের কম্বল জড়িয়ে এক বেশ বৃদ্ধ, সারা মুখে দাড়িগোঁফ, বসে আছে। তখনই ভেতরে থেকে এক বয়স্ক লোক এগিয়ে এল। ঢোলা হাতা জামা পরা। ক্রেভানকে দেখে হেসে এগিয়ে এল। দুজনে কিছু কথাবার্তা কুশল বিনিময় হল।

ক্রেভান, জুতোটা দেখাতে বলুন। ক্রেভান লোকটিকে বলল সে কথা।

এই ঘরেই আছে। লোকটি উবু হয়ে পাথরের মেঝেতে বসল। মাথা নিচু করে হাত বাড়িয়ে একপাটি জুতো নিয়ে এল। ফ্রান্সিস হাতে নিল জুতোটা। দেখল, বেশ দামি চামড়ায় তৈরি জুতো। জুতোর এখানে-ওখানে ছোট ছোট গর্ত দেখে বুঝল দামি কিছু সোনা-হিরেও হতে পারে জুতোটায় গাঁথা ছিল। কাজ করাও ছিল। জুতোটার কোথাও ছেঁড়া নেই। মজবুত চামড়ার জুতো। তবে খুব পুরোনো।

—জুতোটা আপনাদের বাড়িতে কী করে এল? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—সেসব তো গল্পকথা। বংশানুক্রমে আমরা শুনে আসছি।

সেই বৃদ্ধকে দেখিয়ে ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল, উনি কিছু বলতে পারবেন?

—অনেক বয়েস হয়েছে ঠাকুর্দার। শরীরের মনে কোনো সাড়াই নেই। তবে ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি, অনেক দিন আগে এই খাঁড়িতে প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল। তার পরদিন সকালে নাকি একজন খুব অভিজাত সুপুরুষ আমাদের বাড়ি এসেছিলেন।

—সেই রাতে কি এই খাঁড়িতে জাহাজডুবি হয়েছিল?

—তেমন তো কিছু শুনিনি।

সেই সুপুরুষ কোথা থেকে এসেছিলেন?

তা তো শুনিনি।

সেই সুপুরুষ কিছু বলেননি?

তিনি কথাই বলতে পারেননি।

কেন?

তাঁর দু'হাত ভাঙা ছিল। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত। সারা পোশাক, রাজারাজড়ার পোশাক যেমন হয়, রক্তে ভেজা। সারা শরীর, মুখ-হাত কাদায় মাখামাখি। পায়ে ছিল নাকি ঐ একপাটি জুতো।

হুঁ। পাও ভেঙেছিল। বোঝাই যাচ্ছে বুকে হিঁচড়ে খাঁড়ি থেকে উঠে এসেছিলেন। আচ্ছা, পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া কিছু পাতা কি আপনাদের সেই সময়কার পূর্বপুরুষ কেউ পেয়েছিলেন? ফ্রান্সিস সাগ্রহে জিগ্যেস করল।

এটা তো সেদিনের কথা। ক্রেভানকে দেখিয়ে লোকটি বলল, উনি এখানে অনেকদিন ছিলেন। ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। মনে হত উনি কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমাদের কাঠকুটো রাখার ঘরে এক দড়ির ঝোলায় নাকি উনি কিছু পাতা পেয়েছিলেন। কী সব নাকি লেখা ছিল তাতে। তা আমরা তো মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—পড়তেই জানি না। উনিও অবশ্য এই ব্যাপারে কোনো কথা আমাদের কিছু বলেননি।

শুনুন, সেই সুপুরুষ ছিলেন নরওয়ের রাজা ম্যাগনাস। পাতাগুলোয় কিছু লিখে রেখেছিলেন তিনি। ফ্রান্সিস বলল।

তাই নাকি? লোকটি ভীষণ অবাক হল। সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, তাহলে এসব গল্পকথা নয়?

না। উনি কতদিন বেঁচে ছিলেন?

শুনেছি মাত্র কয়েক ঘণ্টা। এখানে ভালো বৈদ্য কোথায়?

তারপর?

এসবই শুনেছি। খাঁড়ির তীরে কোথায় নাকি তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব জেনে কী হবে?

সেটা আপনাকে কয়েকদিন পরে বলব। আরো কিছু জানার থাকলে আসব। আশা করি আপনি আমাদের সাহায্য করবেন। ফ্রান্সিস বলল।

ক্রেভান আমাদের মত পরিচিত। কত ভালো মানুষ। তাঁকে নিয়ে আপনারা এসেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য পাবেন। লোকটি হেসে বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারিদের দিকে তাকিয়ে বলল, চলো ফেরা যাক। ঢাল বেয়ে নেমে পাটার ওপর দিয়ে সবাই জাহাজে ফিরে এল। ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, রাতে এসো। কথা আছে।

শাঙ্কো ক্রেভানকে ধরে ধরে নিয়ে এল। বিছানায় শুইয়ে দিল।

রাতের খাওয়া শেষ। ফ্রান্সিস নিজেদের কেবিনে এসে আধশোয়া হল। মারিয়া ক্রেভানের সারা গা ভেজা কাপড়ে মুছিয়ে দিয়ে খাইয়ে দিল। তারপর ওষুধ খাইয়ে ফ্রান্সিসের পাশে এসে বসল। হ্যারি তখনই এল। ফ্রান্সিস ডাকল, ক্রেভান?

উঁ?

রাতে ছেঁড়া পাণ্ডুলিপিটা ঠেকে ঠেকে পড়লাম। বুঝলাম, শেষ পাতা ওটা। পাণ্ডুলিপির আরম্ভটা আর একবার বলতে পারবেন?

কতবার পড়েছি। সব মুখস্থ হয়ে গেছে। বলছি, শুনুন। ক্রেভান শুয়ে শুয়ে দু'চোখ বুজে বলতে লাগল—

'আমি, ম্যাগনাম, নরওয়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা আজ হঠাৎই লিখতে শুরু করলাম এই সব। কেউ পড়বে সেজন্য নয়। এ যেন আমার মনের সঙ্গে কথা বলা। বলা যায় মনের সঙ্গে বোঝাপড়া। একটা ঘটনা—জানি না শুনেছিলাম কিনা হঠাৎই মনটা ভীষণ নাড়া দিল। এইমাত্র নেমে এলাম ডেক থেকে। ওখানে—রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম ধূসর কুয়াশা ঢাকা সমুদ্রের দিগন্ত। ওপরে ধোঁয়াটে মেঘের মধ্যে অস্পষ্ট পূর্ণ চাঁদ। চারদিকে আবছা আলো। বাতাসের শন্ শন্ শব্দ নেই। নিস্তেজ বাতাস। অসীম নৈঃশব্দ্যের মধ্যে জাহাজের গায়ে ভেঙে পড়া ঢেউয়ের মৃদু ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। হঠাৎ খুব অস্পষ্ট একটা কথা শুনলাম, ধিক্। ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। কে বলল কথাটা? চারদিকে তাকালাম। গভীর রাতে ডেকে কেউ নেই। ঠাণ্ডার রাত। কান পাতলাম। খুব মৃদুস্বরে, ধিক্। কথাটা কে বলল? মুহূর্তে বুকে একটা অসহ্য কষ্ট—। এ কি আমাকেই লক্ষ্য করে বলা? কষ্টটা সহ্য করতে করতে এলোমেলো পা ফেলে কেবিনে এসে শুয়ে পড়লাম। জানি না—ঘুম—।'

ক্রেভান থামল। ফ্রান্সিসরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ক্রেভান বলল, তারপরের পাতাগুলিতে বর্ণনা করেছেন লুঠ, অগ্নিসংযোগ আর নির্বিচারে নরহত্যার কাহিনি। কী অনির্বচনীয় কী অর্থবহ কী নিপুণ ভাষায় মৃত্যুকে বর্ণনা করেছেন। কী গভীর মমতায় স্মরণ করেছেন সেইসব নারী-পুরুষ-শিশুর মৃত মুখগুলি।

ক্রেভান থামল। তার পরের পাতাটায় কিছু লেখা নেই। শুধু কাটাকুটি আঁকিবুকি। তারপর লেখা—'দেশে ফিরে সব লুটের ধন প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। শূন্য করে দেব রাজকোষের সঞ্চিত সবকিছু। রাজপ্রাসাদের রাজকীয় বিলাসবাসন, আত্মসুখী উদ্দাম উজ্জ্বল জীবন—সব পেছনে ফেলে চলে যাব দীর্ঘ রাত্রি আর দীর্ঘ দিবসের দেশ আইসল্যান্ডে। শুনেছি কয়েকটা ধর্মীয় মঠ আছে ওখানে। মঠবাসীর কঠিন তপস্যাই হবে আমার শেষ জীবন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। 'ধিক্' কথাটা যেন আমাকে আর শুনতে না হয়।'

ক্রেভান থামল। ফ্রান্সিসরা কেউ একটি কথাও বলতে পারল না। ক্রেভান একটু চুপ করে থেকে বলল, তারপরের শেষাংশ তো তোমাদের হাতেই আছে। ফ্রান্সিস মুখ নিচু করে শুনছিল। এবার মৃদুস্বরে ডাকল, হ্যারি।

হ্যাঁ। রাজা ম্যাগনামের মনে গভীর বৈরাগ্য এসেছিল—আশ্চর্য পরিবর্তন। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস ডেকে উঠে এল। চারদিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখতে লাগল। রাজা ম্যাগনামের জাহাজ ঝড়ের ধাক্কায় এতদূর এসেছিল। তারপর ডুবে গিয়েছিল। এখানেই। কিন্তু কোথায়? মোটামুটি বিস্তৃত খাঁড়ির জলরাশি। এদিকে স্লাভিয়া গ্রামের সেই লোকটির বাড়ি। মারাত্মক আহত রাজা ঐ বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওপাশে দেখা যাচ্ছে একটাই মাত্র পাহাড়। তেমন উঁচু নয়। পাহাড়ের গায়ে সবুজ ছাড়া ছাড়া গাছ-গাছালি। একটা ব্যাপার একটু অদ্ভুত লাগল। পাহাড়ের মাথাটা ভাঙা। ওপরে গাছ-গাছালি নেই। ঘাসও নেই। কেমন ধূসর রঙ। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে পাহাড়ের যেটুকু ছাড়া ছাড়া গা দেখা যাচ্ছে তারও রঙ ধূসর। ফ্রান্সিস চুপ করে গভীর ভাবে সব কিছু ভাবতে লাগল।

হ্যারি এসে পাশে দাঁড়াল। বলল, জাহাজ কীভাবে ডুবেছিল?

প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজ ভেঙে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল।

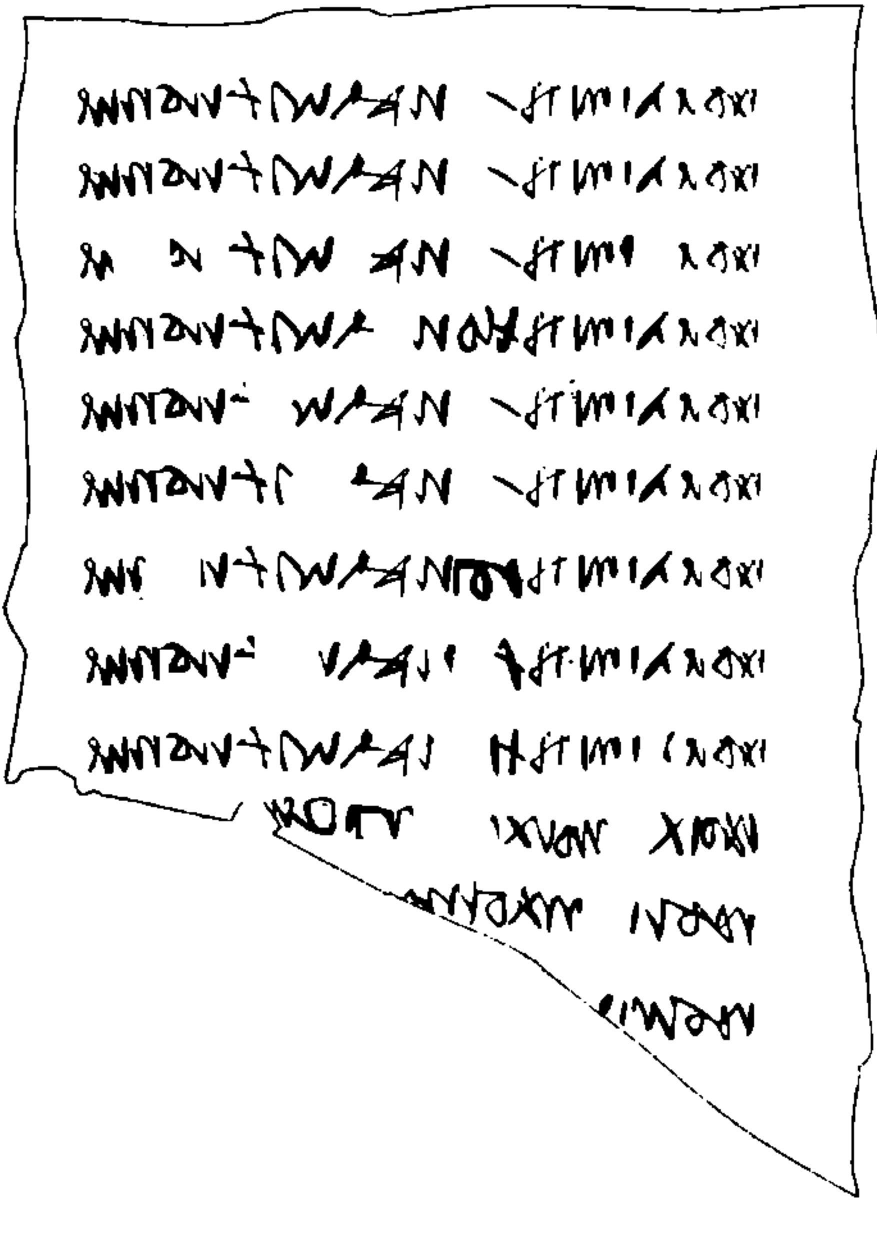
তাহলে ডুবে-যাওয়া জাহাজটা তো এখানেই কোথাও জলের নীচে—

হ্যাঁ কিন্তু কোথায়? এতটা বিস্তৃত খাঁড়ির জল। এখানে জোর জোয়ার-ভাটা খেলে। ভাঙা ডোবা জাহাজটা যে কোনোদিকে সরে যেতে পারে।

আবার বালি-কাদার স্তরে গেঁথেও যেতে পারে।

হ্যাঁ, তা পারে।

তাহলে কোথায় খুঁজবে?



সেটাই তো আসল রহস্য। কোথায়? একটা জায়গা তো নির্দিষ্ট করতে হবে। কিন্তু সেটা কীভাবে করব? একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, জাহাজটা ডুবে যাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত রাজা ঐ কাগজে লিখছিলেন। আচ্ছা হ্যারি, ঐ ছেঁড়া পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে এসো তো। ঐটা কোনোরকমে বাঁচিয়েছিলেন তিনি।

আমার কোমরেই গোঁজা আছে। সময় পেলেই পড়ি।

বের করো। শেষের দিককার লেখাগুলো পড়ো তো।

হ্যারি কোমরে-গোঁজা পাণ্ডুলিপিটা বের করল। সামনে মেলে ধরে পড়তে লাগল—মুষলধারে বৃষ্টি...দু'পাশে টাল খেতে খেতে.... আর লিখতে পারছি না... প্রচণ্ড ধাক্কা... কে ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে বলল, 'সামনে সাদাটে—ব্যস্, এখানেই শেষ। শেষ শব্দ ঐ সাদাটে।

ঐ সাদাটে কী?

বৃষ্টির সময় চোখের সামনে সাদাটে আস্তরণ মতো মনে হয়। এটা তো সাধারণ অভিজ্ঞতা। হ্যারি বলল।

না হ্যারি। ভুলে যেও না তখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল বারবার। সেই আলোয় বৃষ্টির আস্তরণ ছাড়িয়েও কিছু দূরের জিনিস দেখা যায়। তাই প্রশ্ন, সাদাটে কী? আচ্ছা, সাদাটে শব্দটা আর কোথাও আছে?

দেখছি। হ্যারি কাগজটা উঁচু করল। দেখছে, তখনই ফ্রান্সিস কাগজটার দিকে তাকাল। আলো পড়েছে কাগজটায়। ফ্রান্সিস অস্পষ্ট দেখল, কাগজটার আবছা তিনকোনা বড় দাগমতো। ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলে উঠল, দাঁড়াও। কাগজটা ধরে থাকো। ফ্রান্সিস দ্রুত এগিয়ে গেল। এবার আবছা তিনকোনা দাগটা দেখতে পেল।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস দ্রুত ঘুরে তাকাল ঐ পাহাড়টার দিকে। অস্পষ্ট ছাপটা ঠিক ঐ পাহাড়ের মতো। পাহাড়ের মাথাটা ভাঙা। বেশ সমান। ঠিক ছাপটার মতো। ফ্রান্সিস বলে উঠল, হ্যারি, ঐ পাহাড়টার দিকে তাকাও। পাহাড়টা দেখো। হ্যারি কিছু বুঝল না। পাহাড়টা দেখতে লাগল।

এবার ঐ মাথাভাঙা পাহাড়ের সঙ্গে কাগজের এই অস্পষ্ট ছাপটা মেলাও। দেখো একরকম কিনা। কাগজটা উল্টে নাও, ভালো করে মেলে ধরে দেখো।

হ্যারি কাগজটা ঘুরিয়ে উঁচু করে মনোযোগ দিয়ে দেখল। সত্যিই খুব অস্পষ্ট তিনকোনা দাগ। বেশ মোটা দাগ।

দেখো, পাহাড়টা দেখতে এরকম কিনা। মাথাটা ভাঙা, সমতল। হ্যারি

মিলিয়ে দেখে বলে উঠল, তাই তো।

এসব কাগজের মতো পাতলা চামড়ায় তো কোনো দাগ থাকে না। কীসের দাগ এটা?

রক্তের দাগ। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

বলো কী! হ্যারি চমকে উঠল।

আবার কল্পনার রাশ আলগা করছি। রাজা ম্যাগনাম মৃত্যুর পূর্বে রক্তঝরা হাতের আঙুল দিয়ে শেষ দেখা এই পাহাড়টা এঁকেছিলেন। অবশ্য এটাকে আঁকা বলা চলে না। চিহ্ন বলা যায়।

কিন্তু এই পাহাড়টা তো সবুজ। সাদাটে কথাটা লিখেছিলেন কেন?

ভালো করে পাহাড়টার দিকে তাকাও। দেখো মাথায় গাছ-গাছালি নেই, পাথরের রঙ ধূসর। তাছাড়া গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে বেশ দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গা। ধূসর, প্রায় সাদাটে। জাহাজ ডুবেছিল অনেকদিন আগে, তখন এই পাহাড়ে গাছপালা বলে কিছু ছিল না। আসলে পাহাড়টা চুনা পাথরের সাদা পাহাড় ছিল। পরে দীর্ঘ দিন ধরে অল্প অল্প মাটি জমে জমে আজকের গাছ-গাছালির জন্ম। লক্ষ করো ঘাস নেই। সবুজে ভাবটাই নেই।

তাহলে কি—

হ্যাঁ, ঐ পাহাড়ের নীচে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে রাজার জাহাজ ভেঙে ডুবে গিয়েছিল। ঐ পাহাড়ের নীচেই জলের মধ্যে দেখতে হবে। খুঁজতে হবে।

এখনই যাবে?

হ্যাঁ, এখুনি। শাঙ্কোকে ডাকো। আর আমার তরোয়ালটা নিয়ে এসো। হ্যারি শাঙ্কোদের ডাকল। ফ্রান্সিসের তরোয়াল আনতে কেবিনে নেমে এল। বিছানার পাশ থেকে ও তরোয়াল নিল। মারিয়া বলে উঠল, কী ব্যাপার হ্যারি?

ফ্রান্সিসরা ঐ পাহাড়ের নীচে যাবে।

আমিও যাব। মারিয়া উঠে দাঁড়াল।

আসুন। দেখুন, ফ্রান্সিস নিয়ে যেতে রাজি হয় কিনা। ক্রেভান তাকিয়ে রইল। কিছুই বুঝল না।

দড়ির মই বেয়ে ফ্রান্সিসরা নৌকোয় নেমে এল। শাঙ্কো নৌকো বাইতে লাগল। খাঁড়ির জলে খুব ঢেউ নেই। উজ্জ্বল রোদ চারদিকে। একসময় নৌকো তিনকোনা পাহাড়টার নীচে এসে থামল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে নৌকো একপাশে থামানো হল। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা কোমরে গুঁজে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর ডুব দিল।

ওপরের সূর্যালোকে নীলচে জলের নীচে বেশ কিছুটা দেখা যাচ্ছে। সেই মুক্তোর সমুদ্রে মুক্তো তোলার জন্যে ফ্রান্সিস ওর দেশের ডুবুরিদের কাছে জলে বেশিক্ষণ ডুবে থাকার কায়দা শিখেছিল। সেই শিক্ষাটা এবারে কাজে লাগল।

ফ্রান্সিস অল্পক্ষণের মধ্যেই দু'হাতে জল ঠেলে ঠেলে একেবারে নীচে নেমে এল। পাথরের ছোট ছোট চাঁই ছড়ানো। সামুদ্রিক শ্যাওলাগাছ, ঝোপটোপ নেই। পাথরের এদিক-ওদিক কখনও আড়ালে নানা রঙিন মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফ্রান্সিস পাথরে পা ফেলে ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড়ের মাঝামাঝি এলাকার দিকে চলল। এখানে নিস্তেজ আলো। বেশ আবছা দেখাচ্ছে সবকিছু। দম ফুরিয়ে গেল। ফ্রান্সিস ডোবা পাথরে পা দিয়ে ধাক্কা মেরে দ্রুত ওপরে উঠে এল। জল থেকে ভুস্ করে মুখ তুলে হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। দেখল বাঁ দিকে কিছুদূরে নৌকো ভাসছে। ফ্রান্সিসকে জল থেকে মাথা তুলতে দেখে শাঙ্কো দ্রুত নৌকো চালিয়ে ওর কাছে এল। গলা চড়িয়ে বলল, কিছু হদিস পেলে?

ফ্রান্সিস মাথা এপাশ-ওপাশ নাড়ল।

মারিয়া বলে উঠল, হাঙর-টাঙর নেই তো?

চোখে পড়েনি। ফ্রান্সিস হাঁপানো স্বরে বলল। একটুক্ষণ দম নিয়ে ফ্রান্সিস আবার ডুব দিল। দ্রুত জল কেটে নীচে নেমে এল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবছা আলোর মধ্যে দিয়ে দেখতে দেখতে দশ-পনেরো পা যেতেই দেখল একটা বিরাট পাথরের চাঁইয়ের গায়ে জাহাজের ভাঙা কাঠামো। চারদিকে ছড়ানো ভাঙা মাস্তুল, কাঠ, ছেঁড়া পাল, দড়িদড়া। কিন্তু দম ফুরিয়ে এসেছে। আবার জল ঠেলে দ্রুত ওপরের দিকে উঠতে লাগল। জলের ওপর হুস করে মাথা তুলল। হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। বেশ কিছুটা দূরে নৌকোটা ভাসছে।

শাঙ্কো দ্রুত নৌকো চালিয়ে এল। গলা চড়িয়ে বলল, চোখে পড়ল কিছু? ফ্রান্সিস হেসে হাত তুলল। শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে নৌকোয় উঠে এল। মারিয়া সাগ্রহে বলে উঠল, জাহাজটা দেখেছ?

হ্যাঁ। তবে ভেঙে চৌচির। আজকে আর নয়। কাল সকালে আসতে হবে। হাতে সারাটা দিন পাওয়া যাবে। ভালো আলো পাওয়া যাবে।

পরের দিন সকালেই নৌকোয় চড়ে এল ওরা। ফ্রান্সিস জলে ডুব দিল, ভাঙা জাহাজের ছড়ানো কাঠ, বড় বড় পেরেক, এটা-ওটা পড়ে আছে। ফ্রান্সিস

সেই আবছা আলোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক তাকাতে তাকাতে দেখল সাদাটে মাটির আস্তরণের মধ্যে একটা বসে যাওয়া লম্বাটে সিন্দুক। দম ফুরিয়ে আসছে। দু'হাতে দ্রুত জল সরিয়ে ফ্রান্সিস ভুস করে জলের ওপর মাথা তুলল। হাঁপাতে হাঁপাতে গলা চড়িয়ে বলল, রাজা ম্যাগনামের ধনসম্পদ—শুধু তুলে আনার অপেক্ষা। হ্যারির কাছে শাঙ্কো মারিয়া ফ্রান্সিসের উদ্দেশ্যের কথা শুনেছিল।

মারিয়া বলল, তাহলে তোমার অনুমানই সত্য হল।

হ্যাঁ। ও নৌকোয় উঠে বলল, চলো, জাহাজটা এখানে আনতে হবে। নৌকো দিয়ে হবে না।

বেলা হয়েছে। খেয়েটেয়ে এসো।

হুঁ। শাঙ্কো জাহাজ লক্ষ করে নৌকো বাইতে লাগল।

ওরা জাহাজে ফিরে এল। ভাইকিং বন্ধুরা এগিয়ে এসে ওদের ঘিরে দাড়াল। শাঙ্কো বলল, রাজা ম্যাগনামের ডুবেথাকা ধনসম্পদের হদিস মিলেছে।

ফ্রান্সিস সব বলে বলল, চলো, খাওয়া সেরে যাব।

না। আমরা সবাই এখনই যাব। বিনোলা বলে উঠলো। দু'চারজন বন্ধুও তখন বলে উঠলো—চলো, এখনই যাই। এসে খাওয়া-দাওয়া হবে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, খাটাখাটুনির ব্যাপার আছে। উপোসী থেকে সে সব করা কঠিন। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও সবাই।

এবার ফ্রেজার জাহাজ চালিয়ে সেই জায়গায় নিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল, দড়িসুদ্ধু নোঙরটা নিয়ে এসো আর শাঙ্কো—তুমি দেখো তো যেমন-তেমন একটা নোঙর পাও কিনা। শাঙ্কো চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই খুঁজে পেতে মরচে ধরা প্রায় বাতিল একটা নোঙর নিয়ে এল। ফ্রান্সিস একটা শক্ত লম্বা দড়ি নিল। ও আরও দুটো লম্বা দড়ি আনাল।

ফ্রান্সিস সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাই সব—মন দিয়ে শোনো। আমি আর শাঙ্কো কয়েক দফা জলের নীচে ডুবে গিয়ে সিন্দুকটা দড়ি দিয়ে বাঁধব। তারপর দুটো নোঙর সিন্দুকটার দু'পাশে বাঁধা দড়িতে আটকে দেব। তোমরা ডেক থেকে ওটা টেনে তুলবে। খুব আস্তে আস্তে তুলবে। রেলিঙের ওপর দিয়ে আনবে সাবধানে। দেখো, কাঠের রেলিং না ভেঙে যায়। এবার তৈরি থাকো সবাই। আমরা জলে নামছি।

ফ্রান্সিস লম্বা দড়ির একটা কোমরে জড়িয়ে নিল। তরোয়াল খুলে হ্যারির

হাতে দিল। তারপর জলে ঝাঁপ দিল। দ্রুত জল কেটে নীচে নেমে এল। কোমর থেকে দড়ি খুলে দ্রুত সিন্দুকটা পাশাপাশি বাঁধতে তৈরি হল। ওরা শক্ত গিঁট বাঁধার নানা কৌশলে অভিজ্ঞ। কিন্তু কতদিন আগে থেকে সিন্দুকটা জলের তলায় পড়ে আছে। সাদাটে মাটিতে বেশ এঁটে বসে গেছে। সিন্দুকটা দু'হাতে ধরে তুলতে দেরি হল।

দম ফুরিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস দড়ি রেখে জলের ওপরে তাড়াতাড়ি উঠে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, শাঙ্কো ডুব দাও। সিন্দুকটার একপাশে বাঁধা। শাঙ্কো তৈরি হয়েই ছিল। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শাঙ্কোও জল কেটে দ্রুত নীচে নেমে এল। আবছা আলোয় দেখল ফ্রান্সিস একটা পাশ তুলে রেখেছে। ও দ্রুত দড়িটা সেই পাশে বেঁধে গিঁট দিয়ে জলের ওপরে উঠে এল। হাঁ করে হাঁপাতে লাগল।

এবারে ফ্রান্সিস ডুব দিল। সিন্দুকের অন্য পাশটা দু'হাতে জোরে কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে কাদার ওপর তুলে জলের ওপরে উঠে এল। এবার শাঙ্কো ডুব দিল। দড়ি বাঁধল। শক্ত গিঁট দিল। জলের ওপরে উঠে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে রেলিঙের কাছে জড়ো হওয়া বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, মরচে পড়া নোঙরটা দড়ির মাথায় বাঁধো। দুটোই আমাকে দাও। বন্ধুরা অল্প সময়ের মধ্যেই বেঁধে দড়ি ধরে নামিয়ে দিল। ফ্রান্সিস দড়ি বাঁধা নোঙর দুটো কাঁধে রেখে এক হাতে জল ঠেলে ঠেলে নীচে নামল। দ্রুত নামতে পারল না। সিন্দুকটার দু'পাশে আড়াআড়ি বাঁধা দড়ির মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি নোঙরের মাথা দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে জলের ওপর হুস করে ভেসে উঠল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, সাবধানে আস্তে আস্তে টেনে তোল। চুনমাটির কাদায় সিন্দুকের কাঠ ক্ষয়ে গেছে। ঝাঁকুনি লাগলেই ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে।

এবার বন্ধুরা দড়ি দুটো ধরে আস্তে আস্তে টানতে লাগল। জলের মধ্যে বস্তুর ওজন কমে যায়। কাজেই জলের ওপরে ওঠা পর্যন্ত সিন্দুকের সঠিক ওজনটা বোঝা যাচ্ছিল না। জলের ওপরে সিন্দুকটা উঠে এল। এবার টেনে তুলতে গিয়ে ওরা বুঝল ওজনটা ভালোই। সিন্দুকটা ওঠাতে লাগল। খুব আস্তে আস্তে। রেলিঙের গায়ে পর্যন্ত সিন্দুকটা উঠে এল। এবার রেলিংটা পার করতে গিয়েই হল বিপত্তি। দড়াম করে রেলিঙের বেশ কিছুটা অংশ ভেঙে গেল। সিন্দুকটা প্রায় ছিটকে ডেকের ধারে পড়েই তলার কাঠটা ভেঙে ছিটকে গেল। সোনার কত চাকতি, মণিমুক্তো, দামি গয়না-টয়না ডেকের ওপর ছড়িয়ে গেল। কিছু কিছু সমুদ্রের জলেও পড়ে গেল। পচা কাঠের টুকরোও এদিক-

ওদিক ছিটকে গেল।

ভাইকিংরা থমকে দাঁড়াল। দেখতে লাগল ডেকে ছড়িয়ে-থাকা সোনা-রুপোর ধনসম্পদ। তারপরই ধ্বনি তুলল, ও হো হো। হ্যারি ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। নীচে নেমে একটা ছেঁড়া পালের বড় টুকরো নিয়ে এল। সেটা ডেকে পেতে ছড়িয়ে-থাকা সোনার চাকতি, রুপো, মণি-মুক্তো কাপড়ের ওপর রাখতে লাগল। দেখাদেখি বন্ধুরাও কয়েকজন এগিয়ে এল ওকে সাহায্য করতে। সব রাখা হলে হ্যারি আর শাঙ্কো একটা গাঁঠরি মতো বাঁধল।

হ্যারি বলল, বিনোলা, এটা ফ্রান্সিসের কেবিনে রেখে দাও। বিনোলা গাঁঠরিটা কাঁধে নিয়ে চলে গেল।

ওদিকে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো জাহাজে উঠে এল। ফ্রান্সিস ভেজা পোশাকেই ডেকের ওপর শুয়ে পড়ল। হ্যারি এসে ওর পাশে বসল।

মারিয়া এসে বলল, ভেজা পোশাক ছাড়বে এসো।

ও আমার অভ্যেস আছে। খুব খাটাখাটুনি গেছে। একটু জিরিয়ে নিই। ফ্রান্সিস তখনও হাঁপাচ্ছিল।

হ্যারি বলল, সাবাস ফ্রান্সিস! তোমার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। কিছু বলল না।

রাজা ম্যাগনামের ধনসম্পদ কী করবে? হ্যারি জানতে চাইল।

হ্যারল্ডের সিন্দুকে ভরে রাখব।

সব দেশে নিয়ে যাবে তো? পাশে বসা মারিয়া বলল।

না। নরওয়ে যাব আমরা। নরওয়ের বর্তমান রাজাকে সব দিয়ে দেব। রাজা ম্যাগনামের শেষ সিদ্ধান্তটা জানাব। অনুরোধ করব সেই অনুযায়ী ধনসম্পদ কাজে লাগাতে। হ্যারি, কী বলো?

তোমার সিদ্ধান্ত সঠিক। হ্যারি বলল।

মারিয়া বলল, এবার চলো। ফ্রান্সিস উঠে বসল। আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে হেঁটে চলল।

আবু হামিদের রোজনামচা



বিকেল হয়ে এসেছে। সূর্য পশ্চিম দিগন্তের কাছাকাছি নেমে এসেছে। মারিয়া সূর্যাস্ত দেখবে বলে ডেক-এ উঠে এসেছে। ক্লান্ত ফ্রান্সিস তার কেবিনে আধশোয়া হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। হ্যারি ওর কাছে এল। বলল, তাহলে আজ রাতটা এখানেই থাকি। কালকে না হয় জাহাজ ছাড়া যাবে।

না। এখানে আরও দু'একদিন থাকব। ফ্রান্সিস বলল।

কেন বলো তো? হ্যারি জানতে চাইল।

ভুলে যেও না ইয়ুসুফ সাংঘাতিক ধুরন্ধর। রাজা নেভেলের সঙ্গে তার খুব ভাব। হাজার হোক—ইয়ুসুফ যথেষ্ট ধনী। ও ঠিক রাজা নেভেলকে বলে তার সৈন্য নিয়ে জাহাজে চড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের খোঁজে নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়েছে। এই খাঁড়ি থেকে বেরোলেই আমরা ধরা পড়ে যাব। কাজেই এখন এই খাঁড়িতে জাহাজ রেখে দু'একদিন অপেক্ষা করতে হবে। বাইরের সমুদ্রে আমাদের জাহাজের হদিস না পেলে ওরা হতাশ হয়ে ফিরে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু ইয়ুসুফ তো আমাদের খোঁজে জাহাজ নিয়ে এই খাঁড়িতেও ঢুকতে পারে। হ্যারি বলল।

সেই জন্যেই দিনের বেলা আমরা জাহাজে থাকব। কিন্তু রাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই স্নাভিয়া গ্রামে আশ্রয় নেব। সারারাত সজাগ থাকব। জাহাজের ডেক-এ লড়াই করার চেয়ে গ্রামে থেকে লড়াই করা সহজ হবে। কারণ ওখানে আমরা বাড়িঘর গাছগাছালির আড়াল পাব। লড়াই করার অনেক সুবিধে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি একটু ভেবে নিয়ে বলল, বরাবরই দেখেছি—তুমি আগে থেকে অনেক কিছু ভেবে নাও।

সেটাই তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ। অবশ্য তুমিও কম বুদ্ধিমান নও। কিন্তু ইদানিং দেশে ফিরে যাওয়ার আনন্দে তুমি বড় দ্রুত জাহাজ চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

হ্যারিও হাসল। বললে, তুমি ঠিকই বলেছ।

হ্যারি, সভ্য তারাই যারা আগে থেকে ভবিষ্যতের কথা ভেবে তৈরি থাকে। অসভ্য জাতিরা কিন্তু সেটা পারে না। বর্তমানের কথাই ভাবে শুধু। ফ্রান্সিস বলল।

বৃদ্ধ ক্রেভান চুপ করে এতক্ষণ দু'জনের কথাবার্তা শুনছিল। এবার বলল, ফ্রান্সিস, সত্যি তুমি বুদ্ধিমান আবার সাহসীও। অবশ্য বলা উচিত দুঃসাহসী।

হ্যারি হেসে বলল, আপনি আর ক'দিন ফ্রান্সিসকে দেখছেন। ওর কত দুঃসাহসিক বিচিত্র ঘটনার সাক্ষী আমরা।

ফ্রান্সিস মৃদু হেসে চোখ বন্ধ করে বলল, ক্রেভান—ঐ গাঁঠরিটা তো দেখেছেন। ওটাই রাজা ম্যাগনামের গুপ্ত সম্পদ।

কিন্তু এসব কীভাবে উদ্ধার করলে তা তো বললে না। ক্রেভান বলল।

হ্যারিকে পাঠাচ্ছি শাঙ্কোকে ডেকে দিতে। শাঙ্কো এসব ঘটনা খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ বলতে পারে। বন্ধুদের মুখে শুনেছি। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া তখনই ঢুকল। বলল, এত কিছু ঘটল ফ্রান্সিস, তুমি তো কিছুই বললে না।

অপেক্ষা করো। শাঙ্কো আসবে। সব বলবে। এখন আমার বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে চলি। হ্যারি বেরিয়ে গেল। মারিয়া বিছানায় বসতে বসতে বলল, আমি জাহাজে থাকব না।

তাহলে কোথায় থাকবে? ফ্রান্সিস একটু অবাক চোখে মারিয়ার মুখের দিকে তাকাল।

দেখো, শুধু তোমাদের সঙ্গে থেকে থেকে আমি যে মেয়ে সেটাই মাঝে মাঝে ভুলে যাই।

ফ্রান্সিস জোরে হেসে উঠল। বলল, বেশ বলেছ।

আমি এই শ্লাভিয়া গ্রামের কারো বাড়ির অন্দরে মেয়েদের মধ্যে থাকব। একটু হাঁপ ছাড়তে পারব। মারিয়া বলল।

খুব ভালো কথা। তবে এখানকার মেয়েরা আমাদের ভাষায় পরিষ্কার কথা বলতে পারে কিনা জানি না। ফ্রান্সিস বলল।

যেটুকু বলতে পারবে তাই শুনে সব বুঝে নিতে পারব। মারিয়া বলল।

তা পারবে। কিন্তু গরিব চাষি বৌ-মেদের কথা কি তোমার—মানে রাজবাড়ির অন্তঃপুরেই তো তোমার দিন কাটত, ওদের কথাবার্তা কি তোমার ভালো লাগবে? ফ্রান্সিস বলল।

কেন লাগবে না? ঘর-সংসার ছেলে-মেয়ের কথা সব মেয়েদেরই ভালো লাগে, সে রাজকুমারীই হোক আর গরিব ঘরের মেয়েই হোক। মারিয়া বলল।

মারিয়া, আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে আমরা কিন্তু এখনও নিরাপদ নই। যে কোনো সময় আমরা আক্রান্ত হতে পারি। তাই রাতে আমাদের এই শ্লাভিয়া গ্রামেই থাকতে হবে। গরিব চাষি এরা। পাথুরে জমিতে চাষের মাটি বেশি পাওয়া যায় না। অন্য সময় নিশ্চয়ই এই খাঁড়িতে ওরা মাছ ধরে। ওদের বাড়ি-ঘরে থাকার মতো বাড়তি জায়গাও বেশি নেই। কাজেই তুমি জাহাজেই খাওয়া সেরে সারাদিন ওদের বাড়িতে থাক। রাতে তোমাকে জাহাজে এসে থাকতে হবে। ভেন থাকবে আর অসুস্থ ক্রেভান থাকবে। ওকেও তো দেখাশোনার জন্যে লোক চাই। বলো, এই ব্যবস্থা তোমার পছন্দ কি না। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া একটু ভেবে নিয়ে বলল, ঠিক আছে। তাই হবে।

দু'জনে যখন কথা বলছে তখনই শাঙ্কো এল।

শাঙ্কো, সমস্ত ঘটনাটা বলো তো এদের। ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু ফ্রান্সিস, সব ঘটনা তো আমি দেখিনি। শাঙ্কো বলল।

সেসব আমি বলব এখন। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো উৎসাহের সঙ্গে হাত-পা নেড়ে সে যতটুকু ঘটনা জানে সব বলতে শুরু করল। চুপ করে মারিয়া আর ক্রেভান শুনল। বাকিটুকু ফ্রান্সিস খুব সংক্ষেপে বলল। ক্রেভান বলে উঠল, সত্যি ফ্রান্সিস, ভাইকিং জাতির গৌরবগাথায় তোমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে পাশ ফিরে শুল।

সন্ধে হল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে শাঙ্কো নোঙর তুলল। ফ্রেজার জাহাজটা চালিয়ে স্লাভিয়া গ্রামের ঘাটে এনে ভেড়াল। নোঙর ফেলা হল। হ্যারিকে ডেকে ফ্রান্সিস বলল, জাহাজে শুধু মারিয়া, ভেন আর ক্রেভান থাকবে। বাকি সবাইকে অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে তীরে নামতে হবে। সবাইকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলো।

হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। সবাইকে ডেকে ফ্রান্সিসের নির্দেশ জানাল।

রাঁধুনি বন্ধুরা তাড়াতাড়ি রান্না সারল। সবাই খেয়ে নিল। তরোয়াল নিয়ে ফ্রান্সিস ও হ্যারি সবার আগে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। ততক্ষণে পাটাতন পাতা হয়ে গেছে। দু'জনে পাটাতন দিয়ে হেঁটে তীরে নামল। একটু খাড়াই তীর দিয়ে উঠে গ্রামের বাড়িগুলোর কাছে এল। যে বয়স্ক লোকটির বাড়িতে ওরা রাজা ম্যাগনামের পুরনো এক পাটি জুতো পেয়েছিল সেই বাড়িটার সামনে এল দু'জনে। গাছের কাটা ডালের টুকরো দিয়ে তৈরি দরজাটা বন্ধ। হ্যারি এগিয়ে গিয়ে দরজায় হাত দিয়ে ধাক্কা দিল। ভেতর থেকে বোধহয় বয়স্ক লোকটিই বলে উঠল, কে?

দরজাটা খুলুন। কথা আছে। হ্যারি বলল।

ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে দরজাটা খুলে গেল। বাইরের ম্লান জ্যোৎস্নায় ফ্রান্সিসদের চিনতে পেরে হাসল লোকটি। বলল, আপনারা জাহাজ নিয়ে ঐ পাহাড়ের কাছে গেলেন, ফিরে এলেন, কী ব্যাপার?

সব পরে বলব। আপনার নামটা যদি বলেন। ফ্রান্সিস বলল।

আমার নাম লায়েন্ড। অর্থ—পরিচ্ছন্ন। লায়েন্ড হেসে বলল।

দেখুন লায়েন্ড কোনো কারণে কয়েকটা রাত আমরা আপনাদের এই গ্রামের সকলের বাড়িতে থাকব।

কারণটা পরে বলব। তবে ঘরে বেশিক্ষণ একসঙ্গে সবাই থাকব না। রাতে দফায় দফায় কয়েকজন করে থাকব। বেশির ভাগই বাইরে থাকবে। জানি আপনাদের

ঘর বেশি নেই। থাকার জায়গারও খুব অভাব। তবে কথা দিচ্ছি—কোনো ভাবেই আপনাদের অসুবিধে ঘটাব না। আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন। ভেতরের ঘরে কেউ থাকবে না। ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু আপনারা কষ্ট করে এই বাড়িগুলোয় থাকবেন কেন? আপনাদের জাহাজ তো ঘাটেই নোঙর করা আছে! লায়েন্ত বলল।

কারণ আছে বললাম তো—সেসব পরে বলব। এখন আপনি আমার এই বন্ধু হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে আপনার প্রতিবেশীদের আমাদের অনুরোধ জানান। ফ্রান্সিস বলল।

আপনারা ভালো মানুষ সন্দেহ নেই। তার ওপর ক্রেভান, যাঁকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, তিনি আপনাদের সঙ্গে এসেছেন। কেউ আপত্তি করবে না। লায়েন্ত বলল।

সে তো ভালো কথা। তাহলে হ্যারিকে নিয়ে আপনি বলে আসুন। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে লায়েন্ত চলে গেল। ততক্ষণে অন্য বন্ধুরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। সবার কোমরেই তরোয়াল ঝুলছে। সিনাত্রা শাঙ্কোর তীর ধনুকও নিয়ে এসেছে।

বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল, ভাইসব, এই গ্রামের মানুষরা সৎ আর অতিথিবৎসল। কিন্তু এরা গরিব। বাড়িঘর খুবই ছোট। তোমাদের পালা করে এদের ঘরে রাতে থাকতে হবে। সাবধান, তোমরা বেশি কথাবার্তা বলবে না। এদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে না। ঘুমিয়ে পড়লেও সবাই সতর্ক থাকবে। এখানকার কোনো একটা উঁচু গাছের মাথায় নজরদার পেড্রো সারারাত পাহারায় থাকবে। ওর হাঁক শোনা মাত্র সবাই এই খাঁড়ির সামনে এসে জড়ো হবে। কারণ এক মহা ধুরন্ধর লোক—ইয়ুসুফ জাহাজভর্তি সৈন্য নিয়ে এই খাঁড়ি দিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করতে পারে। এই আক্রমণ রাতের অন্ধকারেই হতে পারে বলে আমার মনে হয়। কাজেই সবাইকে সারারাত সর্তক থাকতে হবে। ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল, হ্যারি ফিরে এলে বাড়িগুলোয় আশ্রয় নিতে যাবে। হ্যারি এসে তোমাদের চারটে দলে ভাগ করবে। দু'দল শুতে যাবে। দু'দল পাহারা দেবে মাঝরাত পর্যন্ত। তারপর অন্য দুই দল যাবে পাহারা দিতে।

বন্ধুরা বুঝল লড়াই হতে পারে। ওরা ভীত হল না। বরং খুশিই হল। জাহাজে নিরুপদ্রবে হেসে-খেলে সময় কাটাতে ওরা বাধ্য হয়। লড়াইয়ের উন্মাদনা ওরা পছন্দ করে। যেন বেঁচে থাকার একটা অর্থ খুঁজে পায়। লড়াই করা এবং লড়াইয়ে জেতার আনন্দই আলাদা এদের কাছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লায়েন্ডকে নিয়ে হ্যারি ফিরে এল। ফ্রান্সিসকে বলল, সবার সঙ্গেই কথা হয়েছে। সবাই সাগ্রহে রাজি হয়েছে। তবে সবাই এর কারণ জানতে চাইছিল।

স্বাভাবিক। জাহাজ থাকতে আমরা গ্রামের বাড়িগুলোয় রাতে আশ্রয় নিচ্ছি কেন এর কারণ তো জানতে চাইবেই। যাক গে, এবার দুটো করে দল করো। কীভাবে পাহারার কাজ চলবে বন্ধুদের বলেছি। কাজে লাগো সবাই। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি দল গড়তে তৎপর হল। এর মধ্যে পেড্রো খুঁজে খুঁজে একটা বেশ উঁচু চেস্টনাট গাছ পেল। গ্রামের ভেতরেই। ও গাছে চড়তে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাছটার মগডালে উঠে গেল। গাছটার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে দু'টো মোটা ডালের গোড়ায় বসার জায়গা বানাল। তারপর বসে পড়ল। ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় খাঁড়ির যতদূরে দৃষ্টি যায় ততদূরে তাকিয়ে রইল। চারদিক নিস্তব্ধ। দু'একটা রাতজাগা পাখির পাখা ঝাপটানোর শব্দ শোনা গেল। হাওয়ায় গাছের পাতায় সরসর শব্দ হতে লাগল। রাত বাড়তে লাগল।

হ্যারি বন্ধুদের দুটি ভাগ করে বিভিন্ন বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। বাকি দু'দল তখন গ্রামের আশেপাশে তীরভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাহারা দিতে শুরু করল। সবারই চোখ মূল সমুদ্রের দিকে। ওখান দিয়েই কোনো জাহাজ খাঁড়ির দিকে আসছে কিনা। অবশ্য গাছের ওপর থেকে পেড্রো নজর রাখছে। তবু আবছা জ্যোৎস্নার আলোয় ওরা তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলল।

ফ্রান্সিস, হ্যারি আর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে লায়েন্ড-এর বাইরের অন্ধকার ঘরে ঢুকল। ছোট ঘর। অন্ধকারে কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। লায়েন্ড অন্ধকারের মধ্যে থেকে বলল, দাঁড়ান। আলো জ্বেলে দিচ্ছি।

ফ্রান্সিস আপত্তি করল, আপনার ঠাকুর্দার ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে।

না, না, ঠাকুর্দা সব সময় শুয়েই থাকে। কখন ঘুমোয় কখন জাগে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারি। অন্ধকারে আপনাদের নড়াচড়া করতে অসুবিধে হবে। লায়েন্ড বলল।

খুব বেশি আলো হবে না তো?

হ্যারি জিগ্যেস করল।

না না। সামুদ্রিক এক ধরনের মাছের তেল। মৃদু আলো হয়। ওতেই রাতের কাজ চালাই আমরা। লায়েন্ড বলল। তারপর চকমকি পাথর ঠুকে আলো জ্বালল। সত্যিই মৃদু আলো। এখন ফ্রান্সিসরা সবকিছুই মোটামুটি স্পষ্ট দেখতে পেল। এক কোনায় বৃদ্ধটি বিছানায় শুয়ে আছে। বাকি জায়গা থেকে লায়েন্ড সংসারের

জিনিসপত্র সরিয়ে নিল। বেশ কিছুটা জায়গা ফাঁকা হল। পাথুরে মাটির কিছুটা এবড়ো-খেবড়ো মেঝেয় ফ্রান্সিস বসে পড়ল। হ্যারিরাও বসল। ফ্রান্সিস হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে পড়ল। হ্যারি পা মুড়ে দেয়ালে পিঠ ঠেসে বসল। সবার শোয়ার মতো জায়গা নেই। তবু কয়েকজন গুটিসুটি মেরে শুল। বাইরে নিশুতি রাত। দূরের সমুদ্রের হাওয়া ধারে-কাছের গাছপালার পাতা ও ডালের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। মৃদু শব্দ হচ্ছে। আর কোনো শব্দ নেই চারিদিকে।

রাত বাড়তে লাগল। ফ্রান্সিসরা কোনো কথা বলছে না। মাঝে মধ্যে বৃদ্ধের কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সারারাত পালা করে পাহারা দেওয়া চলল। খাঁড়ির জলে কোনো জাহাজকে আসতে দেখা গেল না।

রাত শেষ হল। ফ্রান্সিস হ্যারি সারারাতই জেগে ছিল। দূরের গাছপালায় পাখির ডাকাডাকি শুরু হতে ফ্রান্সিসের তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেল। কাছের গাছে কয়েকটা পাখির স্পষ্ট ডাক শোনা গেল।

ভোর হল। বন্ধুরা আস্তে আস্তে নিজেদের জায়গা থেকে বেরিয়ে বাড়ির সামনে এসে জড়ো হতে লাগল। ফ্রান্সিসরা উঠে বসল। কয়েকজন বন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চলে এল। বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে কথা বলতে লাগল।

লায়েন্ড এসে ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি উঠে দাঁড়াল। আড়মোড়া ভেঙে হ্যারি বলল, আপনি রাতে ঘুমোননি?

কী করে ঘুমোই! বেশ বুঝতে পারছিলাম কোনো আশঙ্কা নিয়ে আপনারা একরকম জেগে আছেন। আমারও একটু চিন্তা হচ্ছিল। লায়েন্ড হেসে বলল।

শুনুন, আজকের রাতটাও আমাদের এই গ্রামেই থাকতে হবে। দুশ্চিন্তায় রাত জাগা এসবে আমরা অভ্যস্ত। আপনি মিছিমিছি রাত জাগবেন না। নিশ্চিন্তে ঘুমুবেন। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। লায়েন্ড হেসে মাথা কাত করল।

একটা কথা। আমার স্ত্রী সকালের খাবার খেয়ে এখানে আসবেন। আপনার আর অন্য কোনো কোনো বাড়ির অন্দরমহলে গল্পগুজব করবেন। দুপুরে খেয়ে এসেও থাকবেন। বিকেলে জাহাজে ফিরে যাবেন। আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না তো? ফ্রান্সিস বলল।

না, না। এ তো আমাদের সৌভাগ্য। খুব খুশি হয়ে লায়েন্ড বলল।

আমরা এখন জাহাজে ফিরে যাচ্ছি, হ্যারি বলল, আপনাকে ধন্যবাদ।

বন্ধুদের নিয়ে ফ্রান্সিসরা এক এক করে জাহাজে উঠে এল। ডেক-এ উঠে একজন

বন্ধু সখেদে বলল, রাত জাগাই সার। কোনো জাহাজও এল না। লড়াইও হল না। পেছনেই ছিল হ্যারি। মৃদুস্বরে বলল, বন্ধু হে, লড়াইয়ের দিন এখনও শেষ হয়নি।

ডেক-এ উঠে ফ্রান্সিস দেখল রেলিং ধরে মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস কাছে এসে বলল, সেকি—তুমি রাতে ঘুমোওনি।

হ্যাঁ হ্যাঁ। খুব ভোরে পাখির বিচিত্র ডাকাডাকি শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সমুদ্রে তো ডাঙার পাখির ডাক শোনা যায় না। এত ভালো লাগছিল উঠে পড়লাম। মারিয়া বলল।

সামুদ্রিক পাখির ডাক তো শোনো। ফ্রান্সিস বলল।

সে তো বন্দরের কাছে এলে। তাও কী তীক্ষ্ণ ডাক। ডাঙার পাখির ডাক কত সুন্দর। কত বিচিত্ররকম।

তা ঠিক। ফ্রান্সিস সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে বলল।

কেবিনে ঢুকে দেখল ফ্রেভান বিছানার একপাশে চুপ করে বসে আছে। ফ্রান্সিস বলল, কী? ঔষুধ খেয়েছ তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ। মারিয়া বড় লক্ষ্মী মেয়ে। আমার হাত-মুখ ধুইয়ে ওষুধ খাইয়ে গেছে। কিন্তু তুমি সারারাতে ফিরলে না। কী ব্যাপার? ফ্রেভান বলল।

ফ্রেভান, ফ্রান্সিস তরোয়ালটা বিছানার নীচে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলল, ইয়ুসুফ যে কী সংঘাতিক লোক কল্পনাও করতে পারবে না। ইয়ুসুফ সৈন্যভর্তি জাহাজ নিয়ে আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের খোঁজে এই বাড়িতে ঢুকেও হামলা চালাবে। তাই আমরা গ্রামেই ছিলাম। রাত জেগে পাহারা দেওয়া চালিয়েছি।

সত্যি, চিন্তার কথা, ফ্রেভান বলল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসে পায়ের দিকে তাকাল। ছোট্ট ঘর। প্রায় পায়ের কাছে রাখা হ্যারল্ডের লুঠ করা ধনসম্পদের সিন্দুকটা। ওটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফ্রান্সিসের মনে হল কী হবে এই লুঠেরার সম্পদ নিয়ে? দেশের রাজাকে গিয়ে দিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু রাজা ম্যাগনামের সম্পদের গাঁঠরিটাও তো রয়েছে। এত মূল্যবান সম্পদ জাহাজে রাখা কি উচিত হবে? জলদস্যুর পাল্লায় পড়লে তো আমাদের জীবন বিপন্ন হবেই। এইসব ধনসম্পদও লুঠ হয়ে যাবে। এত ধনসম্পদ জাহাজে রাখা বিপজ্জনক নয় কি? তখনই মারিয়া ঢুকল। পেছনে সকালের খাবার হাতে রাঁধুনি বন্ধু। তিনজনে বিছানায় বসে খেতে লাগল। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল, মারিয়া, যার বাড়িতে আমরা রাজা ম্যাগনামের এক পাটি জুতো পেয়েছিলাম তার নাম লায়েন্ড। তাকে বলে এসেছি তুমি যাবে।

আমি এখনই যাব। খুশিতে বলে উঠল মারিয়া।

ঠিক আছে। কিন্তু দুপুরে জাহাজে এসে খাবে। ওরা কিন্তু দরিদ্র। বাড়তি লোকের খাবার জোগাড় করা ওদের পক্ষে কষ্টকর হবে। ফ্রান্সিস বলল।

না, না। ওরা খেতে অনুরোধ করলেও আমি শুনব না। চলে আসব। কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যাব। ওদের দেব। মারিয়া বলল।

একটু চমকে উঠে ফ্রান্সিস বলে উঠল, ঠিক। এ কথাটা এতক্ষণ আমার মাথায় আসেনি।

মারিয়া অবাক। বলল, হঠাৎ এ কথা বলছ?

হ্যাঁ মারিয়া। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। অবাক মারিয়া বলল।

শোন। হ্যারল্ডের লুঠ করা ধনসম্পদের অর্ধেক এই স্লাভিয়া গ্রামবাসীদের জন্যে লায়েন্ডকে দিয়ে যাব। যে অর্থ ওরা এসব বিক্রি করে পাবে তাই দিয়ে চাষবাসের কাজে লাগাতে পারবে, বাড়িঘর মেরামত করতে পারবে, মাছ ধরবার ভালো ভালো জাল কিনতে পারবে, নৌকো কিনতে পারবে। এই দারিদ্র্য সবটা না হলেও কিছু তো ঘুচবে। জীবনে কোনোদিন এই গ্রামে আর আসব না। কিন্তু ওরা তো আমাদের মনে রাখবে। কত মানুষ, নারী, শিশুর রক্ত লাগা এই অভিশপ্ত সম্পদ সৎকাজে তো ব্যয় হবে।

সত্যি ফ্রান্সিস, তুমি কত কিছু ভাবো। মারিয়া বলল।

ভাবায় বলেই ভাবি। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

আমি তাড়াতাড়ি যাব। মারিয়া বলল।

নিশ্চয়ই। যাও।

মারিয়া উঠতে উঠতে বলল, ফ্রান্সিস, ভিয়েস্তাদ বন্দরে যে নতুন পোশাকটা তৈরি করিয়েছিলাম সেটা তো একবারও পরিনি। ওটা পরে যাব?

না, না। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল, এই দামি পোশাক পরে গেলে ওরা তোমাকে আপন করে নিতে পারবে না। আর একটা কথা, তুমি যে আমাদের দেশের রাজকুমারী এ কথা কক্ষনো বলবে না। যা পরে আছ তাই পরে যাও। ওদের ঘর রাজপ্রাসাদের আলোকোজ্জ্বল অন্তঃপুর নয়।

বেশ, তোমার কথা তো অমান্য করতে পারি না। মারিয়া বলল। তারপর মাথার চুলে চিরুনি বুলিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধ ক্রেভান এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। এবার বলল, ফ্রান্সিস, আমি তোমাকে যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি। তুমি সত্যিই ভাইকিং জাতির গর্ব।

ক্রেভান, মানুষের প্রীতিভালোবাসা পেতে গেলে নিজের আচার-আচরণকে পবিত্র রাখতে হয়। বলো, তাই কিনা? ফ্রান্সিস বলল।

অবশ্যই। এই বৃদ্ধ বয়েসেও তোমার কাছে আমার অনেক কিছু শেখার আছে। ক্রেভান বলল।

থাক ওসব। আজকের রাতটাও আমাদের প্রায় জেগেই কাটবে। যদি বিপদ না ঘটে তাহলে কালকে দুপুরেই জাহাজ ছাড়ব। এখন বলুন, আপনি কী করবেন? আমাদের সঙ্গে থাকবেন? ফ্রান্সিস বলল।

না, না। তোমরা আমার জন্যে অনেক করেছ। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। দোরেস্তাদ বন্দরে আমাকে নামিয়ে দিও। তোমাদের বোঝা হব না। ক্রেভান বলল।

মুশকিল হয়েছে দোরেস্তাদ বন্দরে জাহাজ ভেড়ালে আমাদের জীবন বিপন্ন হবে। বরং আমাদের সঙ্গে চলুন। পরে যে দেশের বন্দরে থামব সেখানে আপনাকে বেশকিছু সোনার চাকতিদিয়ে নামিয়ে দেব। তারপর আপনার যা মন চায় করবেন। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে। সেটাই ভালো হবে। তোমাদের যেন কোনো বিপদ না হয়, ক্রেভান বলল। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা আমার।

দুপুরে খুশিতে উচ্ছল মারিয়া এল। ফ্রান্সিসকে বলল, উফ, যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। প্রায় সব বাড়ির মেয়েরা এসে জড়ো হয়েছিল। কত কথা, কত গল্পগুজব—কী আনন্দে যে সময়টা কাটল। মারিয়াকে এত খুশি, এত উচ্ছল দেখে ফ্রান্সিসের মনও প্রসন্ন হল। ও সব সময়ই চায় মারিয়া আনন্দে থাকুক, খুশিতে উচ্ছল থাকুক। খেয়ে নিয়ে আবার যাও কিন্তু বিকেলেই ফিরে এসো ফ্রান্সিস বলল।

ওদিকে বন্ধুরা কয়েকজন মিলে দূর সমুদ্র-মুখের দিকে নজর রেখে চলেছে। পেড্রো তো সকাল থেকেই ওর নজরদারির জায়গায় বসে আছে।

দুপুরে গড়িয়ে বিকেল হল। কোনো বিপদ ঘটল না। মারিয়া ফিরে এসে রেলিং ধরে সূর্যাস্ত দেখতে লাগল।

সন্ধের পরেই গত রাতের মতো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সব বন্ধুরা তীরভূমিতে নেমে এল। গত রাতের মতোই পাহারা দেওয়ার কাজ শুরু হল। ফ্রান্সিস, হ্যারিরা কয়েকজন লায়েন্ডের বাড়ির বাইরের ঘরে ঠাসাঠাসি করে রাত কাটাল। প্রায় কেউই সারারাত ঘুমোবার সুযোগ পেল না।

ভোর হতে সবাই জাহাজে ফিরে এল।

জাহাজের ডেক-এ উঠে ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, নীচে এসো কাজের কথা আছে। কাল রাতে পাছে বৃদ্ধের ঘুম ভেঙে যায় তাই তোমাকে বলা হয়নি। শাঙ্কোকে ডেকে নিয়ে এসো।

ফ্রান্সিস কেবিনে ঢুকল। একটু পরেই হ্যারি আর শাঙ্কো এল। ফ্রান্সিস বলল, শাঙ্কো, ছেঁড়া পালের একটা বড় টুকরো নিয়ে এসো। শাঙ্কো চলে গেল। একটু পরেই শাঙ্কো ছেঁড়া পালের একটা বড় টুকরো নিয়ে এল। ফ্রান্সিস ওটা মেঝেয় পাতল। তারপর হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যারি, আমি স্থির করেছি হ্যারল্ডের অভিশপ্ত ধনভাণ্ডারের অর্ধেক এই স্লাভিয়া গ্রামের মানুষদের কল্যাণের জন্য দিয়ে যাব।

খুব ভালো কথা। এটা একটা কাজের কাজ হবে। হ্যারি আনন্দে বলে উঠল।

শাঙ্কো, সিন্দুকটা খুলে সবকিছু এই কাপড়টায় ঢালো। দুটো ভাগ করবে। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়ল। সিন্দুক খুলে সব অলঙ্কার মুদ্রা সোনার চাকতি মণিমুক্তো কাপড়টার ওপরে ঢালল। তিনজনে মিলে দেখে দেখে দু'টো ভাগ করল সব। এক ভাগ কাপড়টায় রেখে গাঁঠরি মতো বাঁধা হল। বাকি ভাগ সিন্দুকে তুলে রাখা হল।

হ্যারি বলে, এখনই কাজটা সেরে আসি। শাঙ্কো গাঁঠরিটা নাও। শাঙ্কো গাঁঠরিটা কাঁধে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিস হ্যারিও এল। তিনজনে একে একে পাটাতন দিয়ে হেঁটে তীরে নামল। উঁচু পাড়ে উঠল। চলল লায়েন্ডের বাড়ির দিকে। লায়েন্ড দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের দেখে হেসে বলল, এখন এলেন?

ভেতরে চলুন, কথা আছে ফ্রান্সিস বলল। ভেতরে ঢুকে মেঝেয় গাঁঠরিটা রেখে শাঙ্কো বলল, আমাদের রাজকুমারী কোথায়?

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল, আঃ শাঙ্কো! লায়েন্ড তো অবাক। বলল, উনি রাজকুমারী? আপনাদের দেশের? ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে বলে, আরে না না। উনি গরীব ঘরের মেয়ে। আমরা ঠাট্টা করে রাজকুমারী বলে ডাকি।

ও। তাই বলুন। লায়েন্ড হাসতে হাসতে বলল।

শাঙ্কো, ফ্রান্সিস বলল, মুখটা খোলো। শাঙ্কো গাঁঠরির মুখটা খুলল। অত অলঙ্কার, সোনা দেখে লায়েন্ড হাঁ করে সেই দিকে চেয়ে রইল। বিস্ময়ে হতবাক।

লায়েন্ড, এসব কোথা থেকে কী করে পেলাম আপনার জানার দরকার নেই। এই সব সম্পদ আপনাকে দিলাম। কিন্তু শর্ত আছে। এই সম্পদ বিক্রি করে যে অর্থ পাবেন গ্রামের সব পরিবারকে সমানভাবে ভাগ করে দেবেন সততার সঙ্গে। এই সব কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে আপনি কিছু বেশি অর্থ নেবেন। আমরা চাই আপনাদের গ্রামের মানুষেরা দুঃখ-দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হোক। এটা কিন্তু দয়া দেখানো নয়। কৃতজ্ঞতার উপহার। ফ্রান্সিস বলল।

এতক্ষণে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে লায়েন্ড বলল, আপনাদের যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব। সত্যি, বড় কষ্টে দিন কাটে আমাদের।

ঠিক আছে। এবার অর্থের বিনিময়ে উন্নতির সুযোগ কাজে লাগান। কিন্তু রাজকুমারী কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

ওপাশের এক ধার্মিক বুড়ি রাজকুমারীকে প্রায় জোর করে নিয়ে গেছে। বোধহয় ধর্মকথা শোনাতে। লায়েন্ড হেসে বলল।

ঠিক আছে। চলি। আজ দুপুরেই আমরা জাহাজ ছাড়ব। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জাহাজে ফিরে ডেক-এ দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, ভাই সব, কাছে এসো আমার কিছু বলার আছে। বন্ধুরা অনেকেই ডেক-এর এদিকে-ওদিকে কাজে ব্যস্ত ছিল অনেকে ডেক-এও বসেছিল। ফ্রান্সিস বলতে লাগল, শোন, এখন মনে হচ্ছে বিপদ কেটে গেছে। দুপুরেই আমরা জাহাজ চালাব। কিন্তু দাঁড়ঘরে যারা থাকবে তারা ছাড়া বাকি সবাই ডেক-এ তরোয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই এলাকা ছেড়ে যত দ্রুত সম্ভব পালাতে হবে। সবাই তৈরি হও। গভীর সমুদ্রে পড়ে যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ চালাতে হবে। যাও।

বন্ধুদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। পাল খোলা, হালের দড়িদড়া পরীক্ষা করা, কাজ তো কিছু কম না।

দুপুরে নোঙর তোলা হল। একদল দাঁড় টানতে দাঁড়ঘরে চলে গেল। কয়েকজন পালের কাঠামোয় উঠে বেশি বেশি হাওয়া ধরার জন্যে পাল ঠিক করতে লাগল। ফ্রেজার জাহাজ চালাতে শুরু করল। জাহাজের গতি বাড়তে লাগল। ফাঁড়ির মুখে জাহাজ এল। দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে পড়ে জাহাজ উঁচু উঁচু ঢেউ ভেঙে ছুটল। জাহাজের দুলুনির মধ্যেও ভাইকিংরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল জাহাজের গতি বাড়াতে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ দ্রুত চলল। সন্ধেবেলা ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। ফ্রেজারের কাছে এসে বলল, দিক ঠিক রেখেছ তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তবে কোনো ছোট-বড় বন্দর পেলে বুঝতে পারব কত দূরে এলাম।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। ভেবে নিশ্চিন্ত হল ইয়ুসুফের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে আসা গেছে।

সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে জাহাজ চলল। এতদিন ভাইকিংরা সমুদ্রে যাত্রীবাহী বা মালবাহী জাহাজ খুব কমই দেখেছে। কিন্তু এখন ইউরোপে এসে মাঝে মাঝে জাহাজগুলোর মাস্তুলের মাথায় বিভিন্ন দেশের পতাকা উড়ছে। ওদের দেশের জাহাজও একটা দেখেছে। কিন্তু বেশ দূরে। সেই জাহাজের কাছে যেতে ফ্রান্সিস খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। হ্যারল্ডের মতো আবার যদি কোনো লুঠেরা দস্যুদলের পাল্লায় পড়তে হয়!

সেদিন শেষ বিকেলে মারিয়া রেলিং ধরে সূর্যাস্ত দেখছে। সূর্য এখনও অস্ত যায়নি। নজরদার পেড্রোর চিৎকার শোনা গেল, ডাঙা দেখা যাচ্ছে। বন্দর শহর। ওদিক থেকে একটা জাহাজ আসছে। মনে হচ্ছে আমাদের দিকে।

শাঙ্কো সিঁড়িঘরের কাঠের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেলিং ধরে পুব দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যারি আর মারিয়া ওর পাশে এসে দাঁড়াল। একটু পরেই ফ্রান্সিস বুঝল জাহাজটা ওদের জাহাজ লক্ষ্য করেই আসছে। হতে পারে জাহাজটা ওদের জাহাজের পাশ দিয়েই চলে যাবে। কাছে না এলে বোঝা যাবে না। জাহাজটা অনেক কাছে চলে এল। সূর্যাস্তের শেষ আলোর আভায় দেখা গেল মাস্তুলে একটা পতাকা উড়ছে। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল, পতাকাটা কোন দেশের ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ক্রেভানকে ডেকে আন তো।

হ্যারি দ্রুত ছুটে গিয়ে ক্রেভানকে নিয়ে এল। ক্রেভান এখন বেশ সুস্থ। একাই হেঁটে এল। মনোযোগ দিয়ে জাহাজের পতাকাটা দেখতে লাগল। জাহাজটা তখন অনেক কাছে এসে গেছে। সেই জাহাজের ডেকে দেখা গেল সশস্ত্র যোদ্ধাদের। গায়ের রং কালো। আঁটোসাঁটো কালো পোশাক। কোমরে চামড়ার চওড়া বেল্ট। তাতে তরোয়াল ঝুলছে।

এরা মুর। মুরদের টহলদারি জাহাজ। হয় পর্তুগাল নয় তো স্পেনের কাছে এসেছি আমরা। দুই দেশের বেশ কিছু এলাকায় মুররা রাজত্ব করছে। ক্রেভান বলল।

ফ্রান্সিস, কী করবে? হ্যারি জানতে চাইল।

দেখি ওরা আমাদের কাছে আসে কিনা। এলে কী বলে শুনি। ফ্রান্সিস একটু চিন্তিত স্বরে বলল। ক্রেভান মৃদুস্বরে বলতে লাগল, আমি এইসব জায়গায় আগে এসেছি। মুররা হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার একটি মুসলিম জাতি। পোর্তুগাল, স্পেনের বেশ কিছু অঞ্চল জয় করে রাজত্ব করছে। যুদ্ধে পারদর্শী। কিন্তু পরধর্ম-অসহিষ্ণু। তবে এই মুর শাসকদের মধ্যে শিল্পানুরাগী, সাহিত্যপ্রেমিকও আছেন। এদের কবলে পড়লে কিন্তু মারিয়ার বিপদ হতে পারে।

বেশ চমকে উঠে ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, মারিয়া তুমি চলে যাও। আগে সব দেখি বুঝি। মারিয়া ঠিক বুঝল না কিছু। তবে নেমে কেবিন ঘরে চলে এল।

এবার সন্ধ্যার আবছা আলোয় জাহাজের সব কিছুই দেখা গেল। মুর যোদ্ধারা বেশ তৎপর দেখা গেল। ফ্রান্সিসদের জাহাজটাই যে ওদের লক্ষ্য বোঝা গেল এবার। জাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। ঝাঁকুনি খেল দুটো

জাহাজই। মুর যোদ্ধারা লাফিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেক-এ উঠে এসে সারি দিয়ে দাঁড়াল। জলদস্যুর দল হলে লড়াইয়ের কথা ভাবা যেত। কিন্তু মুরদের উদ্দেশ্য কি তা তো স্পষ্ট নয়।

মুরদের জাহাজ থেকে এবার যে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এল সে যোদ্ধা নয়। বেশ দামী কাপড়ের ঢোলা গভীর নীল রঙের পোশাক পরা। বেশ সুগঠিত শরীর। মুর যোদ্ধারাও বলিষ্ঠ চেহারার। লোকটির মাথায় পেঁচিয়ে বাঁধা লাল রঙের দামী কাপড়। মুখে দাড়ি-গোঁফ। বেশ ভারিক্কি ভঙ্গি চলাফেরায়। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে পর্তুগিজ ভাষায় বলল, তোমরা কারা? ফ্রান্সিস লোকটির চোখের দিকে তাকাল। বেশ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি চোখে। বেশ ক্ষমতাধর মানুষের চাউনি।

আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

এখানে এসেছ কেন? লোকটি জানতে চাইল।

তার আগে বলুন আপনার পরিচয় আর এটা কোন বন্দর? ফ্রান্সিস বলল।

লোকটা এই প্রশ্নে খুশি হল না। বোঝা গেল প্রশ্ন করা পছন্দ করে না। তবে বিরক্তি চেপে বলল আমি উজীর ইয়েপুদা। এটা পোর্তুগালের একটি বন্দর শহর পোতো। কিছুদূরে রাজধানী পৌরো। শাসকের নাম খলিফা হাকিম। একনাগাড়ে বলে গিয়ে উজির ইয়েপুদা এবার বলল, তোমাদের পরিচয় বলো।

আমরা ভাইকিং। দেশ থেকে বহুদিন আগে জাহাজে চড়ে বেরিয়েছি। কত দ্বীপদেশ ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ। কিন্তু লুঠেরা দস্যুর বদনাম আছে তোমাদের। উজির বলল।

আমাদের সঙ্গে লড়াই করে যারা হেরে যায় তারা এই দুর্নাম দেয়। আর কিছু ভাইকিং জাতির কলঙ্ক ভাইকিং নিশ্চয়ই আছে। তাদের দলেরএক সর্দারকে আমি আমার স্বদেশবাসী হওয়া সত্ত্বেও হত্যা করেছি। বাকিদের বিন্দুমাত্র করুণা না করে তাড়িয়ে দিয়েছি। ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ। প্রথম শুনলাম। সমুদ্রের ধারে টহলদারি করি আমরা। আমি উজির, মাঝে মধ্যে আসি টহলদারির কাজ দেখতে। যাক গে, তোমাদের সঙ্গে দরবারে পরে কথা হবে। কিন্তু আমাদের জাহাজের সঙ্গে তোমাদের জাহাজ বাঁধা হবে। পোতো বন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে। জাহাজ তল্লাশি করা হবে। কালকে সকালে খলিফা হাকিমের দরবারে হাজির করা হবে। খোঁজখবর করা হবে। উজির বলল।

তাহলে কি আমাদের বন্দি করা হল? হ্যারি বলল।

সেটা সব খোঁজখবর নিয়ে পরে স্থির হবে। উজির বলল।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল, আমাদের জাহাজ বাঁধার দরকার নেই। আপনার জাহাজের পাশে পাশেই বন্দরে যাব।

বেশ। উজির ইয়েপুদা বলল। তারপর চলে যেতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলল, সাবধান! পালাবার চেষ্টা করবে না। একবার লড়াইয়ে নামলে আমরা শত্রুদের কাউকে বেঁচে থাকতে দিই না। শুনেছি তোমরা সাহসী, লড়াইয়ে দক্ষ। অনেক লড়াইয়ে বোধহয় জিতেছও। কিন্তু তবু সাবধান! উজির ইয়েপুদা নিজেদের জাহাজে চলে গেল। চারজন মুর যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের পাহারায় রইল। বাকিরা চলে গেল।

ফ্রান্সিস বেশ চিন্তায় পড়ল। আজ রাতেই যদি তল্লাশি হয় তাহলে মারিয়াকে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব। মারিয়ার বিপদ হতে পারে অভিজ্ঞ ক্রেভানের এই আশঙ্কা অমূলক নয়। একটা উপায় বের করতেই হবে এবং আজ রাতের মধ্যেই। কিন্তু তল্লাশি হলে কখন হবে, কতটা সময় হাতে পাবে তাও তো ফ্রান্সিস বুঝতে পারছে না। তবে কথায় ব্যবহারে ইয়েপুদাকে যা দেখল তাতে এটা ভালো করেই বুঝল ঐ লোকটাকে চটানো চলবে না। বরং বিনাবাক্যে ওর হুকুম দ্রুত পালন করতে হবে। এটা ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে এল। মুর যোদ্ধা ক'জনকে দেখল ডেক-এর এদিক-ওদিক পায়চারি করছে। ফ্রান্সিস দেশীয় ভাষায় বলল, ফ্রেজার, এক্ষুনি জাহাজ ঐ জাহাজের সামনে নিয়ে যাও। তারপর ঐ বন্দর লক্ষ্য করে আস্তে চালাও। তাহলে ঐ জাহাজও আমাদের পাশে পাশে আসবে। শুনলে তো ঐ উজিরের কথা।

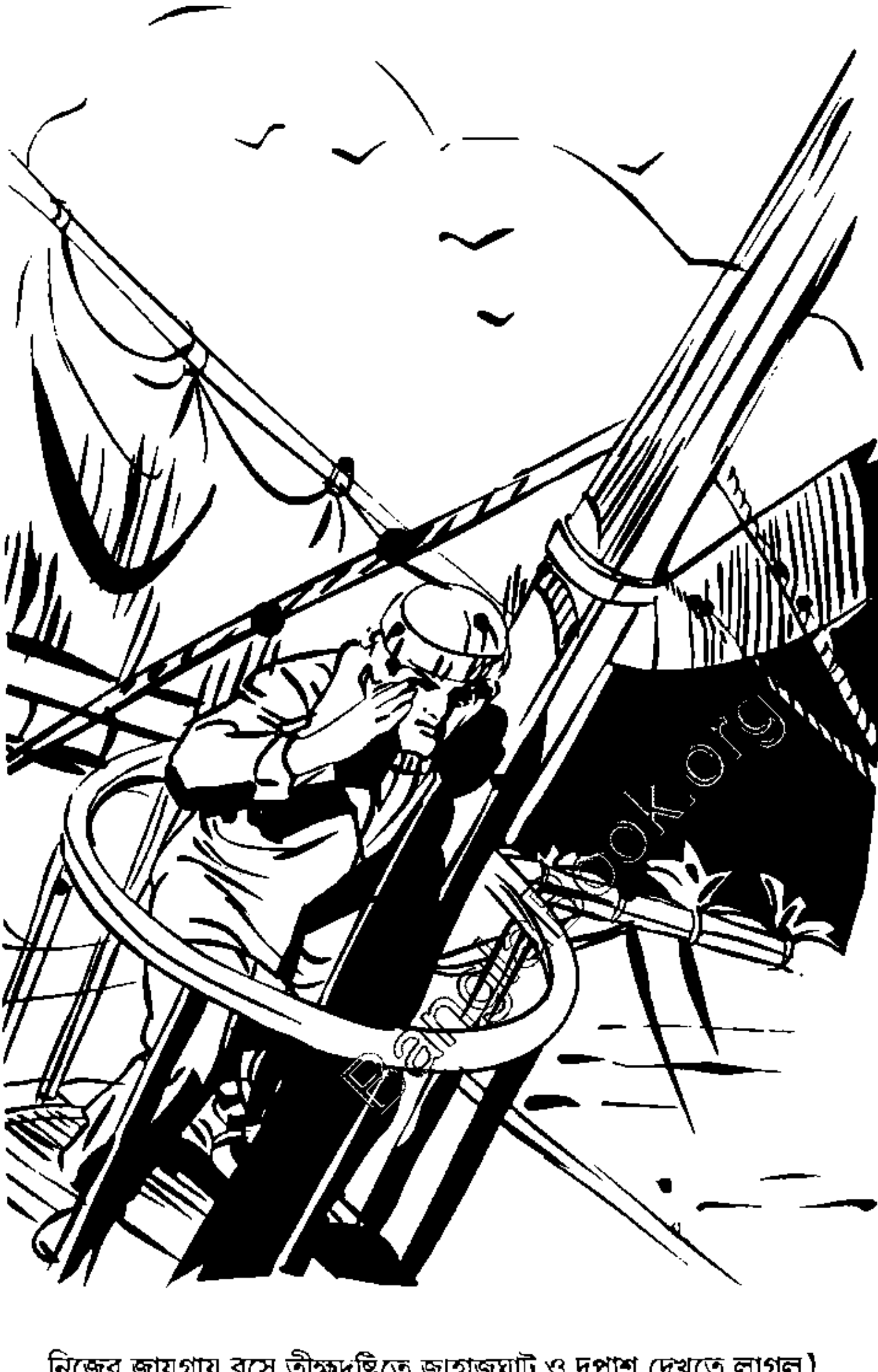
আমাদের ভাগ্য খারাপ, ফ্রেজার বলল।

দুর্ভাগ্য-টুর্ভাগ্য বাজে কথা। ভাগ-টাগ্য বলে কিছু নেই। ঘটনা ঘটে। কখনও আমাদের স্বপক্ষে কখনও বিপক্ষে। বিপক্ষে গেলে লড়তে হয়। যাক ওসব কথা। এখন অনেক চিন্তা। জাহাজ ছাড়ো। ফ্রান্সিস দ্রুত হ্যারিদের কাছে এল। মৃদুস্বরে বলল, হ্যারি এসো। কথা আছে।

কেবিন ঘরে ঢুকে দেখল মারিয়া চুপ করে বসে আছে। ঘর অন্ধকার।

আলো জ্বালো। ভয়কে জয় করতে হয়। ফ্রান্সিস আস্তে কথাটা বলে অভ্যেস মতো বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। ক্রেভান নিশ্চুপ। আস্তে আস্তে একপাশে বসল। হ্যারি চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মারিয়া আলো জ্বালল। কোনো কথা বলল না। ফ্রান্সিস চোখ বুজে শুয়েই রইল। ঘর নিস্তব্ধ। কেউ কোনো কথা বলছে না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস চোখ খুলে দ্রুত উঠে বসল। একবার মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর বলল, হ্যারি, ছক কষা হয়ে গেছে। শুধু দুটো সুযোগ চাই। এক, আজকের রাতটা আর এই বন্দর এলাকায় নৌকো চলাচল করে কিনা। তারপর বলল, সন্দেহ নেই ঐ উজির ইয়েপুদা অর্থপিশাচ। প্রবল ক্ষমতালোভী। ওকে বাগে আনতে হবে। হ্যারি। চুপ করে রইল। এবার ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ওর



নিজের জায়গায় বসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জাহাজঘাট ও দুপাশ দেখতে লাগল।

সমস্ত পরিকল্পনা সংক্ষেপে বলল। হ্যারি অল্পক্ষণ ভেবে নিয়ে বলে উঠল, সাবাস ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, পারবে তো যা করতে বললাম?

কেন পারব না। এমন কি কঠিন কাজ? হ্যারি তো সঙ্গেই থাকবে। মারিয়া বলল।

এবার বন্দরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা। হ্যারি, তুমি, মারিয়া আর শাঙ্কো তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে। উপোসি পেটে কোনো কাজ হয় না। একটু চুপ করে থেকে বলল, হ্যারি, এবার শাঙ্কোকে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলো। মুর যোদ্ধারা আছে। দেশীয় ভাষায় বলবে। যাও।

হ্যারি কোনো কথা না বলে চলে গেল। ক্রেভান মৃদুস্বরে বলল, ফ্রান্সিস, তুমি শুধু দুঃসাহসী নও, বুদ্ধিমানও। ফ্রান্সিস কোনো কথা না বলে আবার শুয়ে পড়ল। মারিয়া বলল, তাহলে আমার বিপদ হবে না, কিন্তু তোমাদের কী হবে? চোখ বন্ধ করে ফ্রান্সিস বলল, পরের ঘটনা কী ঘটে তা দেখে বাকি ছক ভাবব।

উজির ইয়েপুদার টহলদারি জাহাজের পাশে পাশে ফ্রান্সিসদের জাহাজ বন্দরের কাছে এল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে ডেক-এ উঠে এসেছে। পাশে দাঁড়ানো হ্যারিকে মৃদুস্বরে বলল, পেড্রোকে ডাকো। হ্যারি দ্রুত গিয়ে পেড্রোকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস আগের মতোই মৃদুস্বরে বলল, পেড্রো, মাস্তুলে ওঠো। কেউ এই অন্ধকারে দেখবে না। জাহাজঘাটে মালের আলো আছে। ওপরে উঠে যতটা সম্ভব নজর দিয়ে দেখবে তীরের কাছে কোথাও নৌকো আছে কিনা। ঘাটে পৌঁছবার আগেই নেমে আসবে। তাড়াতাড়ি যাও।

পেড্রো এ ব্যাপারে অভ্যস্ত। মুর যোদ্ধাদের দেখল। দু'জন সিঁড়িঘরের কাঠের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। অন্য দু'জনের একজন জাহাজের মাথার দিকে, অন্য জন হালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। পেড্রো নিঃশব্দে দ্রুত মাস্তুলের মাথায় উঠে গেল। নিজের জায়গায় বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জাহাজঘাট ও দু'পাশ দেখতে লাগল। ঘাটে বেশ কয়েকটা মশাল জ্বলছে। কয়েকজন প্রহরীকেও দেখল। ডানদিকে তীরভূমিতে কিছু বাড়ি-ঘর অস্পষ্ট দেখল। বাঁদিকে তাকাতেই দেখল বেশ দূরে কয়েকটা নৌকোর কালো ছায়া মতো। বালিয়াড়িতে কয়েকটা খুঁটিও।

তার মানে ওগুলো মাছ-ধরা জাল টাঙানোর খুঁটি। ওটা জেলেপাড়া। পেড্রো নিঃশব্দে দ্রুত নেমে এল। তারপর কোনো ব্যস্ততা না দেখিয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এসে মৃদুস্বরে বলল, বাঁদিকে জেলেপাড়া, নৌকো কয়েকটা বাঁধা। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল, হ্যারি, মূল্যবান তথ্য। এবার রাতের তল্লাশি আটকানো।

দুটো জাহাজই জাহাজঘাটে ভিড়ল। মুর যোদ্ধা চারজন নামার জন্যে তৈরি হল।

ফ্রান্সিস দ্রুত ওদের কাছে এল। বলল, আমাদের জাহাজের নোঙর ফেলব। তবু তীরের কোনো খুঁটির সঙ্গে শক্ত কাছি দিয়ে আমাদের জাহাজের হালটা বাঁধো। কাজটা করে মান্যবর উজিরকে গিয়ে বলবে আর আমাদের একটা অনুরোধ জানাবে। উনি মান্যবর উজির, সম্মানিত মানুষ— তাঁকে তো এখানে আসতে বলতে পারি না। তাঁকে বলবে যে আমরা অনেকটা সমুদ্র এলাকা একটানা চলে এসেছি। আজকের রাতটা বিশ্রাম করতেই হবে। নইলে কালকে উঠে দাঁড়াতে পারব না। কাজেই উনি যেন কাল সকালে তল্লাশির ব্যবস্থা করেন। অনুরোধ, আমার কথাগুলো বুঝিয়ে বলো, কেমন?

একজন যোদ্ধা মোটামুটি স্পষ্ট পোর্তুগিজ ভাষায় বলল, ঠিক আছে, বলব। তবে মাননীয় উজির বড়ো মেজাজের মানুষ। তোমার অনুরোধ রাখবে কিনা জানি না।

তুমি ভাই বলো তো, তারপর যা হবার হবে। ফ্রান্সিস বেশ বিনয় দেখিয়ে বলল। যোদ্ধা চারজন নেমে গেল।

ওদিকে একটা ঘোড়ায় টানা সুদৃশ্য গাড়ি এসে থামল জাহাজঘাটে। মশালের আলোয় দেখা গেল ঘাটের প্রহরীরা সার বেঁধে গাড়িটার দু'পাশে দাঁড়াল। উজির ইয়েপুদা আস্তে আস্তে পাটাতন দিয়ে নেমে গাড়িটার দিকে চলল। ফ্রান্সিস গভীর মনোযোগ দিয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিসের তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সেই যোদ্ধাটিকে খুঁজতে লাগল। হ্যাঁ, সেই যোদ্ধাটি উজিরের কাছে গিয়ে মাথা নুইয়ে সম্মান দেখিয়ে কিছু বলতে লাগল। উজির দাঁড়িয়ে পড়ে শুনল। বোধহয় কিছু বলল। তারপর গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাড়ি চলে গেল। ফ্রান্সিস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একটু আগেই পাতা পাটাতন দিয়ে চারজন যোদ্ধা নেমে গিয়েছিল। প্রায় আট-দশজন যোদ্ধাকে দেখা গেল পাটাতনের দিকে আসতে। সবার সামনে বেশ জবরজং পোশাক পরা একজন। মাথায় শিরস্ত্রাণ। সবাই যখন উঠে আসছে হ্যারি চাপাস্বরে ডাকল, ফ্রান্সিস!

দাঁড়াও তল্লাসি ঠেকাতেই হবে। ফ্রান্সিসও বেশ চাপা স্বরে বলে উঠল।

যোদ্ধাদের নিয়ে সামনের জন ফ্রান্সিসদের কাছে এল। কোমরে সোনারুপোর কাজ করা চওড়া বেল্ট। তরোয়ালের হাতলে সোনারুপোর গিল্টি করা। বোঝা গেল সেনাপতি। সেনাপতি কাছে এসে বলল, তোমাদের অস্ত্রঘরে যত অস্ত্রশস্ত্র আছে নিয়ে এসো। সব বাজেয়াপ্ত করা হবে।

খুব ভালো কথা। ফ্রান্সিস দ্রুত বলে উঠল, সত্যিই তো আমরা বিদেশী। লুঠেরা দস্যু বলে আমাদের বদনামও আছে। কখন কী করে বসি। এক্ষুনি সব অস্ত্রশস্ত্র

জমা দিচ্ছি। আপনারা অপেক্ষা করুন। শাঙ্কো যাও তাড়াতাড়ি। মাননীয় উজিরের হুকুম মানতেই হবে। শাঙ্কোর সঙ্গে আরো কয়েকজন বন্ধুও জুটে গেল। ফ্রান্সিস বলল, কিন্তু একজন যোদ্ধাকে তো বলেছিলাম আমরা অনেকটা দূর থেকে জাহাজ চালিয়ে আসছি। খুব পরিশ্রান্ত আমরা।

হুঁ। মান্যবর উজিরের হুকুম— কাল সকালে জাহাজ তল্লাশি হবে। সেনাপতি বলল।

খুব অনুগৃহীত হলাম। মহামান্য উজির দীর্ঘজীবী হোন। ফ্রান্সিস খুব খুশির ভঙ্গি তে বলে উঠল। হ্যারি ফ্রান্সিসের এই বিগলিত ভাব দেখে বেশ আশ্চর্যই হল। তবে মনে মনে ফ্রান্সিসের বেশ প্রশংসাই করল। উজিরের বিশ্বাস উৎপাদনে এই কৃতার্থভাব দেখাতেই হবে।

শাঙ্কোরা সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এল। ডেক-এ জড়ো করল।

কোনো অস্ত্রশস্ত্র পড়ে নেই তো? ফ্রান্সিস বলল।

না—না। সব এনেছি। এমনকি তীর-ধনুকও। শাঙ্কো বলল। সেনাপতি অস্ত্রের পরিমাণ দেখে খুশিই হল। সে ইঙ্গিতে যোদ্ধাদের সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে বলল। যোদ্ধারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলে যেতে লাগল। সেনাপতি বলল, কালকে তোমাদের মহামান্য খলিফার দরবারে হাজির করা হবে।

খুব আনন্দের কথা, ফ্রান্সিস বলল। সেনাপতি ও যোদ্ধারা নেমে গেল। ঘাটে নেমে সেনাপতি পিছু ফিরে পাটাতন তুলে নিতে ইঙ্গিত করল। শাঙ্কো, বিনোলা ছুটে গিয়ে পাটাতন তুলে ফেলল। ফ্রান্সিস ছুটে এসে রেলিং থেকে ঝুঁকে গলা চড়িয়ে বলল, মাননীয় সেনাপতি, নোঙর ফেলা হয়েছে, কিন্তু মোটা কাছি দিয়ে ঘাটের ঐ খুঁটির সঙ্গে কাছিটা বাঁধা হয়নি। সেনাপতি দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর হাত নেড়ে কথাটার কোনো গুরুত্ব না দিয়ে চলে গেল। পেছনে যোদ্ধারাও চলল।

হ্যারি, দুটো সিঁড়ি পেরোলাম। এবার তৃতীয় সিঁড়িটা। তোমরা শিগগির এসো।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি চলে আসে কেবিনঘরে। মারিয়া চিন্তাগ্রস্ত মুখে তখন থেকে বসে আছে। ক্রেভানও কম চিন্তিত নয়। ফ্রান্সিস কোনোদিকে না তাকিয়ে দ্রুত গিয়ে সিন্দুকের ডালাটা খুলল। হিসেব করে দেখল সিন্দুক যতটা ফাঁকা হয়েছে তাতে বেশ কিছু কাপড়-চোপড় আঁটানো যাবে। শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল, দোরেস্তাদ বন্দরে তোমাদের যে নতুন পোশাকগুলি তৈরি করালে তারই গোটা সাত-আট পোশাক নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি। শাঙ্কোরা কয়েকজন প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার নতুন পোশাকটা বের করো। আর একটা তুলে রাখা মানে কম ব্যবহার করেছ এমন পোশাক আর একটা গায়ে দেবার চাদর বের করে আনো।

সেই চাদর তো গরম চাদর। ফুল-পাতার কাজ করা। দামি। মারিয়া বলল।

ক্ষতি নেই। বের করো তাড়াতাড়ি। মারিয়া ছুটে গিয়ে ওর সবচেয়ে শৌখিন চামড়ার ঝোলা থেকে দুটোই বের করে আনল। ফ্রান্সিস সেই দামি চাদরটা একবার দেখল। তারপর মেঝেয় পাতল। মারিয়াই পাততে সাহায্য করল। ততক্ষণে শাঙ্কো নতুন পোশাকগুলি নিয়ে এল।

মারিয়া, সব পোশাক দ্রুত পরিপাটি করে ভাঁজ করে সিন্দুকে সাজিয়ে দাও। মারিয়া সব পোশাক তাড়াতাড়ি পরিপাটি করে ভাঁজ করে সিন্দুকে ভরল। ফ্রান্সিস বলল, তোমার নতুনপোশাকটা একেবারে ওপরে রাখো। মারিয়া পোশাকটা ভাঁজ করতে করতে ভাবল পোশাকটা একবারও পরা হয়নি। কিন্তু এই ভাবনাটা আমল দিল না। ওটা ভরা হলে ফ্রান্সিস ডালাটা নামাল। দেখল আঙুল তিনেক উঁচু হয়ে আছে ডালাটা। ফ্রান্সিস ডাকল শাঙ্কো তোমরা হাত লাগাও। জোরে চেপে ডালা বন্ধ করো। শাঙ্কোরা এগিয়ে এসে চেপে চেপে ডালা লাগাল। ফ্রান্সিস ডালাটার কড়া নেড়ে নীচের গোল ছ্যাঁদাটায় ঢুকিয়ে জোরে সিন্দুকটা বন্ধ করল। তারপর শাঙ্কোদের দিকে তাকিয়ে আরো কিছু পোশাক নিয়ে আসতে বলল। নতুন না হলেও চলবে। শাঙ্কোরা আগের মতোই ছুটে চলে গেল। আরো কিছু পোশাক নিয়ে এল। মেঝেয় পাতা চাদরটা দেখিয়ে ফ্রান্সিস মারিয়াকে বলল, ভালো ভাবে ভাঁজ করে পোশাকগুলি ওখানে রাখো তাড়াতাড়ি। মারিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই কাজটা সারল।

এবার একটা চৌকোনো গাঁঠরি করো। শাঙ্কো, এসো।

মারিয়া আর শাঙ্কো মিলে বেশ সুন্দর একটা গাঁঠরি করল।

গাঁঠরি বাঁধা হচ্ছে তখনই রাঁধুনি বন্ধু এল। বলল, তাড়াতাড়ি খাবে চলে এসো।

হ্যারি, শাঙ্কো, যাও তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

চলো, আমিও খেয়ে নেব। ফ্রেভান উঠে দাঁড়াল।

আমি একেবারে পোশাক পাল্টে খাব। মারিয়া বলল।

ঠিক আছে। আমিও যাচ্ছি। তোমার খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি, শাঙ্কো আর মারিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সিসরাও খেয়ে নিল। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, একটু ভালো পোশাক পরে নাও তুমি আর শাঙ্কো। তারপর শুয়ে বিশ্রাম করো। ঘুমিয়ে পড়ো না। আমি সময়মতো ডাকতে যাব।

তিনজনে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। শেষ ধাপটা পেরোতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। মারিয়া নিরাপদে থাকবে। কী করতে হবে ফ্রান্সিস আগেই হ্যারিদের বলে রেখেছে।

বন্দর এলাকা, রাস্তাঘাট আস্তে আস্তে নির্জন হয়ে গেল। দু'জন প্রহরী এতক্ষণ

ঘাটের পাথুরে চাতালে ঘোরাঘুরি করে বোধহয় পরিশ্রান্ত হয়ে জাহাজ-বাঁধা খুঁটির কাছে বসে গল্পগুজব করছে।

রাত একটু বাড়ল। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু তীরে ঢেউ ভাঙার শব্দ আর সমুদ্রের হাওয়ার শব্দ।

এবার পায়চারি থামিয়ে ফ্রান্সিস বেরিয়ে গেল হ্যারি আর শাঙ্কোকে ডাকতে। দু'জনেই তাড়াতাড়ি চলে এল। নতুন নয় তবে বেশ ভালো পোশাকই পরেছে দু'জনে। মারিয়া তো আগে থেকেই পোশাক পরে তৈরি। ফ্রান্সিস গাঁঠরিটা কাঁধে তুলে নিয়ে হ্যারি ও শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল, সিন্দুকটা ধরাধরি করে নিয়ে চলো ডেক-এ। পারবে তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, শাঙ্কো বলল। গাঠরিটা কাঁধে নিয়ে ফ্রান্সিস সিঁড়ির দিকে চলল। পেছনে ক্রেভান বিড়বিড় করে কী বলতে লাগল। বোধহয় ঈশ্বরের কাছে সকলের জন্যে আশীর্বাদ চাইছিল। বেশ ভারী সিন্দুকটা। তবু শাঙ্কো আর হ্যারি দু'দিকের লোহার কড়া ধরে নিয়ে চলল। ডেক-এ উঠে ফ্রান্সিসের কাছে ,সে হ্যারি বলল, সিন্দুকটা নৌকোসুদ্ধু ডুবে যাবে না তো?

না। আমার দেখা হয়ে গেছে। সমুদ্র আজ শান্ত। ঢেউয়ের বড়রকম ঝাপ্টা লাগার সম্ভাবনা নেই। তবু তোমরা তীরের কাছাকাছি থেকে নৌকো চালিয়ে যাবে। যদি নৌকো ডুবে যায় চিৎকার-চ্যাচামেচি করবে না। মারিয়া ভালো সাঁতার জানে। মারিয়া জলে ভেসে থাকবে। তোমরা দু'জন নৌকো সোজা করে জলের তলা থেকে সিন্দুক আর গাঁঠরি নৌকোয় তুলে নেবে। তবে মনে হয় এত সব করতে হবে না। শাঙ্কো, সাবধানে নৌকো চালাবে। দেরি হোক। ভোর হবার একটু আগেই যা বলেছি সেভাবে কাজ সারবে। সকালের মধ্যেই শাঙ্কো নৌকো নিয়ে ফিরে আসবে। শেষ রাতে এই অঞ্চলে জেলেদের নৌকো মাছ ধরতে চলাচল করে। কাজেই কারো মনে সন্দেহ হবে না। খুব অন্ধকার আজ। নজরে পড়তে পড়তে তীরে নেমে যেতে পারবে। ফ্রান্সিস কথাগুলি যেতে যেতে বলে গেল।

হালের কাছে এসে ওরা দেখল বিনোলারা কয়েকজন ডেক-এ শুয়ে আছে। শাঙ্কো চাপাস্বরে ডাকল, বিনোলা! বিনোলা ঘুমোয়নি। রাতের অভিযানের কথা শাঙ্কোর কাছে আগেই শুনেছে। বিনোলা আর এক বন্ধুকে নিয়ে মাথা নিচু করে শাঙ্কোদের কাছে এসে সিন্দুকটা ধরে নিয়ে চলল।

ততক্ষণ ফ্রান্সিস হালের কাছে চলে এসেছে। চারদিক ভালো করে নজর বুলিয়ে নিয়েছে। জাহাজঘাটের মশালের আলোয় অস্পষ্ট দেখে নিয়েছে প্রহরী দু'জন তখনও ঘাটের ওপর ঘোরাঘুরি করছে। বন্দর শহরের রাস্তা, বাড়িঘর ঘন অন্ধকারে

ডুবে আছে। অনেকটা নিশ্চিন্ত হল ফ্রান্সিস। এবার গাঁঠরি, সিন্দুক নিয়ে নিঃশব্দে নীচে জাহাজে বাঁধা নৌকোটা নামাবে বন্ধুদের সাহায্যে। শাঙ্কো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে সিন্দুকটা আস্তে আস্তে ঢেউয়ের ঠেলায় দুলতে থাকা নৌকোর মাঝখানে রাখল। অন্ধকারে খুব অস্পষ্ট দেখল নৌকোর গলুই থেকে জল অন্তত ছ'সাত আঙুল নীচে। ও অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। বিনোলা গাঁঠরি নামিয়ে আনল। মারিয়া আর হ্যারিও আস্তে আস্তে নিঃশব্দে নৌকোর মাঝখানে নামল। শাঙ্কো চাপাস্বরে বলল, দু'জন একপাশে। হ্যারি ও মারিয়া সে ভাবেই বসে পড়ল। জাহাজে বাঁধা দড়ি ধরে ধরে অন্ধকারে দড়ির মুখটা খুলে দিয়েই শাঙ্কো নৌকোর আর এক কানায় বসে পড়ল। টাল খেয়ে নৌকোটা সরে এল। শাঙ্কো দাঁড় তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে এতটুকু নড়াচড়া না করে নিঃশব্দে বইতে লাগল। নৌকো জাহাজ থেকে দূরে সরে এল। হ্যারি, মারিয়ার কাছে নৌকো চড়ার অভিজ্ঞতা নতুন কিছু নয়। ওরা দু'জনে চুপ করে নিথর বসে রইল। নৌকো শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলল জেলেদের ঘাটের দিকে। আজও জেলেদের নৌকো জলে নামানো হয়নি। তীরের কাছাকাছি নৌকো আনল শাঙ্কো। তারপর খুব সাবধানে দাঁড় বাইতে লাগল। জেলেপাড়ার এলাকা ছাড়িয়ে আসতেই অন্ধকারে আবছা দেখল দুটো জেলেদের নৌকো গভীর সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। জেলেরা শাঙ্কোদের দেখতে পেল না। অস্পষ্ট দেখলেও মাছধরা নৌকো বলেই ভাবত। তীরের ধার দিয়ে নৌকো চলল। হাওয়াও বেশ নিস্তেজ। মারিয়া আকাশের দিকে তাকাল। লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলছে। টুকরো টুকরো সাদাটে মেঘ স্তব্ধ হয়ে আছে ফিসফিস করে বলল, হ্যারি, দেখো ওপরে—কী সুন্দর আকাশ!

হ্যারি মৃদু হেসে ফিসফিস করে বলল, এ তো আমাদের পরিচিত দৃশ্য। তবু যতবার দেখি আশ্চর্য হয়ে যাই। এই বিরাট বিশ্বে নিজেকে কত ক্ষুদ্র মনে হয়। অথচ দুঃখ এই পৃথিবীর সব মানুষই তো এই রহস্যময় উদার আকাশ দেখে। অথচ ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রবঞ্চনা হত্যা লুঠ রক্তপাত নিয়ে ব্যস্ত তাদের মনে কোনো দাগই কাটে না।

সত্যি। মারিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

শাঙ্কোরা এবার তীরভূমির একটু জংলা এলাকায় তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলল। বেশ কিছুটা আসার পর আবছা দেখল উঁচু তীরভূমিতে পাশাপাশি দুটো বড় পাথর পড়ে আছে। তার মাঝখানে ঘাস নেই। শাঙ্কো নৌকো উল্টোদিকে, বেয়ে প্রায় নিশ্চল করে ফেলল। ফিসফিস করে বলল, হ্যারি, দেখো তো এইটা কি একটা ঘাট? মনে হচ্ছে এখান দিয়ে লোক চলাচল করে।

হ্যারিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বলল, হ্যাঁ, একটা সাদাটে জায়গা দেখা যাচ্ছে। মনে হয় কাছেই মানুষের বসবাস আছে। নৌকো ভেড়াও।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে নৌকো ভেড়াল। তারপর নৌকো থেকে হাত দশেক দূরের বালিয়াড়িতে নামল। দ্রুত ওপরের দিকে ছ'সাত পা গিয়ে আবার দ্রুত ফিরে এল। ফিসফিস করে বলল, পায়ে-চলা পথের আভাস দেখলাম।

এখানেই নামব। হ্যারি বলল।

শাঙ্কো হাত বাড়িয়ে বলল, রাজকুমারী, নেমে আসুন। মারিয়া আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর শাঙ্কোর বাড়ানো হাত ধরে তীরের বালি-কাদার মধ্যে নামল। তারপর হ্যারিও একইভাবে নামল।

শাঙ্কো ডান হাত দিয়ে সিন্দুকের একপাশের কড়াটা ধরল। অন্য পাশে হ্যারি ধরল। তারপর উঁচু তীরভূমির দিকে আবছা অন্ধকারে উঠতে লাগল। পেছনে মারিয়া। দুটো পাথরখণ্ডের মাঝখান দিয়ে উঠে অস্পষ্ট দেখল একটা সাদাটে পায়ে-চলা রাস্তা পুবমুখো চলে গেছে। দু'পাশে কালো কালো গাছ-গাছালি। কিছুটা দূরে ডানদিকের অন্ধকারে ডুবে আছে একটা বাড়ি। পাথরের বাড়ি। সামনে টানা বারান্দা। ফুলের বাগান। বোঝা গেল অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি। হ্যারি বলল, এই বাড়িতে নয়। এরা বড়লোক। সাবধানী নানা প্রশ্ন করবে। এগিয়ে চলো। ঐ বাড়িটা পার হয়ে কিছুটা এগোতে বাঁ দিকে একটা বাড়ি দেখা গেল আবছা অন্ধকারে ডুবে আছে। ছাউনি শুকনো ঘাস-পাতার। তবে খুব শক্ত করে সমান করে বাঁধা। হ্যারি ঐ বাড়ির দিকে চলল। ছোট ছোট গুল্মের বেড়া। কয়েকটা ফুলগাছ। ওসব পার হয়ে হ্যারি বন্ধ দরজার সামনে সিন্দুকটা রেখে একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বন্ধ দরজায় আঙুল ঠুকে শব্দ করল। একবার। ভেতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই। আবার একবার আঙুল ঠুকতেই ডান পাশের কাঠের জানালাটা খুলে গেল। এক বৃদ্ধ চাদর গায়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। বললেন, কে?

একটু বাইরে আসবেন। কিছু বলব। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল।

ভদ্রলোকটি মাথা সরালেন। একটু পরেই দরজা খুলে বাইরে এলেন। অন্ধকারে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বললেন, কী চাই?

দেখুন আমরা বিদেশি বণিক। কাপড়ের তৈরি পোশাক বিক্রি করতে এসেছি। হ্যারি বলল।

জাহাজে চড়ে? ভদ্রলোক বললেন।

হ্যাঁ। হ্যারি মাথা নেড়ে বলল।

বন্দরে তো থাকার মতো সরাইখানা আছে। ভদ্রলোক বললেন।

তা আছে। কিন্তু মুস্কিলে পড়েছি প্রহরীদের নিয়ে। বেশ কিছু মেতাকালেশ মানে স্বর্ণমুদ্রা চায়। আগেও তো ব্যবসার কাজে এসেছি। এখানকার সরাইখানায়

থেকেছি। কিন্তু প্রহরীদের অন্যায় দাবি মেটাতে গিয়ে ব্যবসার ক্ষতি হয়েছে। তাই জাহাজ থেকে কিছু মালপত্র নৌকোয় চাপিয়ে লুকিয়ে এখানে এসেছি। কয়েকদিন থাকব। যদি আপনি আশ্রয় দেন তাহলে বাধিত হব। হ্যারি বলল।

একটু ভেবে নিয়ে বৃদ্ধ বললেন, আসুন, তবে এখানে উজির ইয়েপুদার প্রহরীরা কিন্তু মাঝে মাঝে টহল দিয়ে যায়। বিদেশী দেখলে সন্দেহ করে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন।

তখন না হয় লুকিয়ে পড়ব। হ্যারি বলল।

ঠিক আছে। আসুন। গৃহস্থ ভদ্রলোক বললেন। উনি সরে দাঁড়ালেন। তিনজনে সিন্দুক, গাঁঠরি নিয়ে ঢুকল। অন্ধকার ঘর। ভদ্রলোক চকমকি ঠুকে ঘরের এককোণে একটা তেলের দীপ জ্বাললেন। ছোট ঘর। একপাশে একটা কাঠের পাটাতনে ছোট বিছানামতো। একটু অগোছালো। আলোতে এবার মারিয়াকে দেখে একটু চুপ করে থেকে বললেন, ইনি কে?

আমার স্ত্রী। ব্যবসার জন্যে তো অনেক জায়গায় যেতে হয়, উনি সঙ্গে থাকেন। আমাদের দেখাশুনো করেন। হ্যারি বলল।

ছেলেপুলে? ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন।

মাদ্রিদের শহরতলিতে আমার কাপড়ের ব্যবসা। ওখানেই দিদিমার কাছে ওরা থাকে। হ্যারি বলল।

স্পেনই তো আপনাদের দেশ। পোর্তুগিজ ভাষা তো ভালোই বলছেন।

পাশাপাশি দেশ। ব্যবসা করি। কথাবার্তা তো চালাতে হয়।

তা ঠিক। ভদ্রলোক বললেন।

তা আপনার নামটা জানতে পারি? হ্যারি বলল।

নিশ্চয়ই। আমার নাম সার্মেন্তো। মুস্কিল হল আমার তো বেশি বাড়তি ঘর নেই। আপনারা তিনজন মানে—এখানে—

না-না। শাঙ্কোকে দেখিয়ে হ্যারি বলল, ও শাঙ্কো আমাদের কর্মচারী। ব্যবসার মালপত্র ওই সব দেখেটেখে। শাঙ্কো এখুনি জাহাজে ফিরে যাবে। আরও মালপত্র তো আছে। সেসবও তো আনতে হবে। আর এই ঘরে আমরা বেশ থাকতে পারব। উনি—মারিয়া, অন্দরে কোথাও থাকবেন। কোনো অসুবিধে নেই। হ্যারি বলল।

হ্যাঁ হ্যাঁ যদি ওর কোনো অসুবিধে না হয়। সার্মেন্তো বললেন।

না না। কয়েকটা দিন তো! ভালোই থাকবেন। হ্যারি বলল। তারপর শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল, শাঙ্কো, ডন সার্মেন্তোকে দুটো স্বর্ণমুদ্রা দাও। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে দুটো স্বর্ণমুদ্রা বের করল।

সেকি! আপনারা আমাদের অতিথি। সার্মেন্তো বললেন।

এ দুটো আপনাকে নিতেই হবে। ব্যবসা করি তো। এরকম আতিথেয়তা তো মূল্য দিয়েও সরাইখানায় পাব না। এই সামান্য খরচের মূল্য আপনাকে নিতেই হবে। হ্যারি বলল।

ঠিক আছে। এত করে বলছেন। সার্মেন্তো তারপর মুদ্রা দুটো নিয়ে বললেন, আপনারা বিশ্রাম করুন। ভোর হতে খুব দেরি নেই। তারপর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি ভিতরে এসে শুতে পার।

একটু পরে যাচ্ছি। বিছানাটা একটু গুছিয়ে দিয়ে যাই। মারিয়া বলল।

বেশ। সার্মেন্তো বেশ খুশি হলেন। উনি চলে গেলে মারিয়া বলল, বিছানা ঢাকা চাদরটাদর তো কিছু আনতে পারিনি।

দরকার নেই। যে কাপড়টা আছে ওটাই একটু গুছিয়ে দিন। হ্যারি বলল।

তাহলে আমি যাচ্ছি। ভোর হবার আগেই জাহাজে পৌঁছতে হবে। শাঙ্কো বলল।

হ্যাঁ হ্যাঁ। চলে যাও। ফ্রান্সিসকে বলো ভালো আশ্রয় পেয়েছি। হ্যারি বলল।

শাঙ্কো বাইরের আবছা অন্ধকারে বেরিয়ে এল। দ্রুত পায়ে সমুদ্রতীরের দিকে চলল।

নৌকো চালাতে চালাতে শাঙ্কো দেখল আকাশের তারাগুলি উজ্জ্বলতা হারাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পুব আকাশ ফর্সা হয়ে গেল। যখন নৌকো জাহাজে বেঁধে দড়িদড়া বেয়ে জাহাজে উঠছে তখন পুব দিগন্তে কমলা রঙ ছড়িয়ে সূর্য উঠল। শাঙ্কো এসে ফ্রান্সিসকে সব বলল। ফ্রান্সিস অনেকটা নিশ্চিন্ত হল।

ভাইকিংদের সকালের খাবার খাওয়া সবে শেষ হয়েছে। সেই সেনাপতির সঙ্গে সাত-আটজন যোদ্ধা জাহাজঘাটে এসে সার বেঁধে দাঁড়াল। সেনাপতি ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছে এসে দাঁড়াল। সিনাত্রা রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। সেনাপতি গলা চড়িয়ে বলল, পাটাতন ফেল। তল্লাশি হবে। ততক্ষণে আরও দু'জন বন্ধু এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা তাড়াতাড়ি পাটাতন তীরে পেতে দিল। যোদ্ধাদের নিয়ে সেনাপতি জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে চড়া গলায় বলল, তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালাও। মূল্যবান কিছু পেলেই এসে আমাকে বলবে। যোদ্ধারা তল্লাশির কাজে নেমে পড়ল। জোর তল্লাশি শুরু হল। ছোট্ট কেবিন ঘরগুলি, রান্না ও খাবার ঘর, বাতিল পাল-দাঁড় রাখার ঘর, ফাঁকা অস্ত্রঘর, কাঠের তক্তা-পেরেক রাখার স্থান, মেরামতির কাজের জন্যে ব্যবহৃত ঘর। দু'জন যোদ্ধা এল ফ্রান্সিসের ছোট্ট কেবিন ঘরে। ফ্রান্সিস আর ক্রেভান বিছানায় চুপ করে বসেছিল। মারিয়ার

ব্যাগ, ঝোলা-টোলা খুলে মেয়েদের পোশাক পেল। একটু অবাক চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাতেই ফ্রান্সিস বলল, ওসব আমার স্ত্রীর পোশাক। গত মাসে মারা গেছেন। এবার সেই ময়লা ছেঁড়া পালের গাঁঠরি দেখল। কাছে গিয়ে একজন যোদ্ধা ফ্রান্সিসকে জিগ্যেস করল, এটা কী?

অভিশপ্ত ধনসম্পদ। ফ্রান্সিস নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল। যোদ্ধাটি অবাক। কথাটার অর্থ ঠিক বুঝল না। কোমরে ঝোলানো তরোয়াল বার করল। গাঁঠরিতে কয়েকটা খোঁচা দিল। ছোট্ট ছেঁড়া দিয়ে কিছু বেরিয়ে এল না।

ঠাট্টা করছ, অ্যাঁ? যোদ্ধাটি বলল।

যদি ঠাট্টা মনে কর তবে তাই। ফ্রান্সিস একইরকম উদাস ভঙ্গিতে বলল।

যত্ত সব। নাক কুঁচকে বলে উঠল। তারপর চলে গেল। সব যোদ্ধা তল্লাশির শেষে ডেক-এ বসে জড়ো হল।

দামি কিছু পেলে? সেনাপতি বলল।

কিছুই না। একজন বলল।

ভিখিরির দল। আর একজন বলল।

কোমরবন্ধনীগুলো খুলিয়ে হয়তো কিছু মুদ্রাটুদ্রা পাওয়া যেত। তবে সোনার নয়। আর একজন বলল।

যে দু'জন ফ্রান্সিসের কেবিন ঘর তল্লাশি করেছিল তাদের একজন বলল, একটা ময়লা ছেঁড়া পালের গাঁঠরি দেখলাম।

তাতে কী আছে? সেনাপতি জানতে চাইল।

ছেঁড়া কাপড়জামা বোধহয়। যোদ্ধাটি বলল।

খুলে দেখেছ? সেনাপতি বলল।

ঐ নোংরা কাপড়ের বস্তা?

বস্তা নয়। কিছু বেঁধে রাখা হয়েছে। চলো তো। সেনাপতি সিঁড়ির দিকে চলল। পেছনে ঐ যোদ্ধা দু'জনও চলল। ফ্রান্সিস একই ভাবে বিছানায় বসেছিল। ক্রেভান মৃদুস্বরে ডাকল, ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস কিছু বলল না। ঘরে ঢুকে সেনাপতি বলল, এই গাঁঠরি ঘরের মধ্যে রেখেছ কেন?

পছন্দ হলে আপনি নিয়ে যেতে পারেন। ফ্রান্সিস নির্বিকারভাবে বলল।

ঠাট্টা রাখো। কী আছে এতে যে বেঁধে রেখেছ?

বলেছি তো অভিশপ্ত ধনসম্পদ—রক্তে ভেজা। ফ্রান্সিস নির্বিকার।

সেনাপতি চড়া গলায় বলে উঠল, অ্যাই, খোল গাঁঠরিটা।

দু'জন যোদ্ধা লাফিয়ে এসে গাঁঠরির মুখ টেনে টেনে খুলে ফেলল। দু'চারটে

অলঙ্কার গড়িয়ে পড়ল। অন্য যোদ্ধাটি টান মেরে মুখটাই খুলে ফেলল। কাঠের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল সোনার চাকতি, মুদ্রা, অলঙ্কার, মণি-মুক্তো। ঝিকিয়ে উঠল হীরে বসানো গলার হার। সেনাপতি, যোদ্ধা দু'জন হাঁ করে তাকিয়ে রইল সেই দিকে। অল্পক্ষণ। তারপরই ফ্রান্সিসের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে সেনাপতি বলল, মিথ্যে বলে পার পাবে ভেবেছিলে?

আমি তো মিথ্যে বলিনি। যা সত্য তাই বলেছি। ফ্রান্সিস বলল।

এই সোনাটোনা, অলঙ্কার—তোমরা যে জলদস্যুতা কর এটাই তো বড় প্রমাণ। সেনাপতি বেশ গম্ভীর গলায় বলল।

লুঠ-ডাকাতি করলে এসবের ওপর মায়া থাকত নিশ্চয়ই, লুকোবার চেষ্টা করতাম। এভাবে সকলের চোখের সামনে ঘরে রেখে দিতাম না। ফ্রান্সিস বলল।

ওসব দরবারে গিয়ে শুনিও। তোমাদের সবাইকে বন্দী করা হল। দু'জন যোদ্ধার দিকে তাকিয়ে বলল, গাঁঠরি বেঁধে নিয়ে চলো।

ফ্রান্সিস এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, একটা অনুরোধ। সবাইকে বন্দী করে বেঁধে নিয়ে চলুন। কিন্তু এই বৃদ্ধ এখানেই নেমে যাবে। অন্য একজন আমাদের বৈদ্য—বয়স্ক। তাকে এই জাহাজেই থাকতে দিন। তাকে ফেলে তো আমরা পালাতে পারব না।

একটু ভেবে নিয়ে সেনাপতি বলল, তোমাদের অনুরোধ মাননীয় উজিরকে জানাব। তিনি যা বলবেন তাই হবে।

বেশ। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল।

সবাই ডেক-এ উঠে এসো। সেনাপতি গলা চড়িয়ে বলে উঠল। ফ্রান্সিসরা ওপরে ডেক-এ উঠে আসতে লাগল। দু'একজন ফ্রান্সিসকে মৃদুস্বরে বলল, এভাবে হার মানবে?

অস্ত্রঘরে একটা ছোরাও পড়ে নেই। আমার একটা মাত্র তরোয়াল বিছানার নীচে লুকোনো আছে। খালি হাতে লড়াই হয়? চলো, দেখা যাক সব।

আগে-পিছে যোদ্ধাদের পাহারায় ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নেমে এল। সদর রাস্তা দিয়ে পুবমুখো চলল। পোতো বন্দর শহর ছাড়িয়ে হেঁটে চলল সবাই। রোদের তেজ বাড়ছে। দু'পাশে গম জলপাইয়ের ক্ষেত-খামার। রাস্তার লোকজন কেউ কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে দেখল। ভাইকিংরা কোনো কথা বলছিল না। হেঁটে চলল।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর কাঠ আর পাথরের ঘর-বাড়ি দেখা গেল। রাজধানী পৌরো শহরে এসে পৌঁছল সবাই। বাঁ দিকে কিছুদূরে দেখা গেল একটা মাথাভাঙা পাথরের দুর্গ। আগে অটুট ছিল উঁচু দুর্গটা। রাস্তায় ঘোড়ায় টানা গাড়ি, বাজার এলাকায়

দোকানপাট, লোকজনের ভিড়। কেনাকাটা চলছে। বেশ গুঞ্জনধ্বনি। ডান দিকে একটা লম্বাটে পাথর ও কাঠের বড় বাড়ি। তার সামনে এসে সেনাপতি সবাইকে থামবার ইঙ্গিত করল। বিরাট কাঠের দরজা। তার কোথাও কোথাও কুঁদে কুঁদে নানা নকশা তোলা। বোঝা গেল খলিফা হাকিমের প্রাসাদ। প্রবেশপথের ধারেকাছে কোনো প্রহরী নেই। লোকজন ঢুকছে বেরোচ্ছে নির্বিবাদে। ফ্রান্সিস একটু অবাকই হল। সেনাপতি আছে। যোদ্ধারা আছে। অথচ প্রাসাদে কোনো দ্বাররক্ষী নেই। এবার ফ্রান্সিসরা সবাই অবাক হল যখন দেখল মূল দরবারের প্রবেশদ্বারেও কোনো দ্বাররক্ষী নেই। অদ্ভুত ব্যাপার। শাসক খলিফা হাকিম আত্মরক্ষার ব্যবস্থা রাখেননি? ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাল। পাথরের গাঁথনিতে তৈরি লম্বাটে বড় ঘর। দু'পাশে বড় বড় জানালা। জানালার চারপাশে দেয়ালে সুন্দর কারুকাজ। নানা রঙের। কালো কাঠের গদ্দিপাতা আর তাতে সোনা-রুপোর গিলটি করা। একটি আসনে খলিফা হাকিম বসে আছেন। একটু মোটা। মুখে অল্প দাড়ি গোঁফ। পরনে ঢোলা হাতা ঘন হালকা সাটিন্ কাপড়ের পোশাক। মাথায় নীল কাপড়ের পাগড়ির মতো। কপালের ওপরেই পাগড়িতে বসানের একটা বড় গোল হীরে। আসনের নীচে একপারে সুন্দর কাজ করা আলবোলা রাখা লম্বা নলটায় সোনা-রুপোর কাজ করা। খলিফা আলবোলার নল মুখে নিমীলিত চোখে বসে আছেন। পাশের আসনে ইয়েপুদা, অন্য আসনে সেনাপতি বসে আছে। বেশ ভিড় দরবারে। একজন মোটা মতো লোক ঢোলা কালো পোশাক, মুখে অল্প দাড়ি-গোঁফ। গানের সুরেলা সুর টেনে থেমে থেমে বলে থামতেই দরবারে প্রশংসার ঢেউ উঠল। কি হচ্ছে ফ্রান্সিস বুঝল না। সিনাত্রা থাকলে হয়তো বলতে পারত। ক্রেভান আর ভেনকেও ফ্রান্সিসদের সঙ্গে আসতে হয়েছিল। ফ্রান্সিস ক্রেভানের কাছে সরে এল। বলল, ক্রেভান, কী ব্যাপার বলুন তো?

আরবী ভাষায় মুখে মুখে কবিতা বলার আসর চলছে। ঐ দেখো আর একজন কবিতা বলা শুরু করল। এইসব কবি তাকে বলে গিজেল। খলিফা হাকিমদের সম্মান করেন। বলেছিলাম না কোনো কোনো মুর শাসক গান, কবিতা ভালোবাসেন। অর্থাৎ যাকে বলে কাব্য-প্রেমিক। ক্রেভান মৃদুস্বরে বলল। পর পর কয়েকজন এইভাবে মুখে মুখে গিজেল বলে গেল। প্রশংসার উঠল শ্রোতাদের মধ্যে।

ফ্রান্সিস ভাবল—হ্যারি, মারিয়া থাকলে খুশি হত। কবিতার অর্থ হ্যারি কিছু কিছু বুঝত। এই সুন্দর পরিবেশটা ভালো লাগত ওদের। শাঙ্কো বলল, ফ্রান্সিস, এ কেমন রাজদরবার? অভিযোগ নেই, বিচার নেই, শাস্তি নেই। একজনের বলা শেষ হলে ইয়েপুদা আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। চোখেমুখে প্রচণ্ড বিরক্তি। খলিফা হাকিমের কাছে এসে মাথা নিচু করে একনাগাড়ে কিছু বলে গেল।

খলিফা হাত তুললেন। আস্তে আস্তে শ্রোতারা বেরিয়ে গেল। দরবারে ভিড় কমে গেল। খলিফা ফ্রান্সিসদের এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলেন। তারপর পোর্তুগিজ ভাষায় বললেন, তোমরা ভাইকিং দেশ থেকে এসেছ। তোমাদের জাহাজে মূল্যবান ধনসম্পত্তি পাওয়া গেছে। তোমরা লুঠ কর, ডাকাতি কর। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল, মাননীয় খলিফা, এই অভিযোগ সত্য নয়। তারপর ফ্রান্সিস অল্প কথায় হ্যারল্ডের ঘটনাটা বলল।

বিশ্বাস করলাম। আমি কাউকে অবিশ্বাস করি না। আচ্ছা, একটা কথা, তোমাদের দেশে কবিতা, গানের প্রচলন আছে? খলিফা জানতে চাইলেন।

দেখুন মান্যবর খলিফা—আমি কাঠখোট্টা মানুষ। সিনাত্রাকে দেখিয়ে বলল, ও আমার বন্ধু সিনাত্রা। আমাদের দেশের গান গায়। নিজে গানও বাঁধে।

খলিফা হাকিম খুব খুশি হয়ে বলে উঠলেন, তাহলে তো শুনতে হয়। সিনাত্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, শোনাও তো সিনাত্রা। অসহায় ভাবে ফ্রান্সিসের দিকে একবার তাকিয়ে সিনাত্রা বলল, মহামান্য খলিফা, আমাদের ভাষা তো আপনি বুঝবেন না।

সুরটা তো বুঝব। আর অর্থটা পোর্তুগিজ ভাষায় বলবে। খলিফা বললেন।

সিনাত্রা বলল, আমার অল্প বয়সে আমাদের বাড়ির কাছে একজন কবি ছিল। সকলে তাকে পাগল বলত। তার একটা কবিতা বলছি। সিনাত্রা সুরে সুরে নিয়ে আস্তে আস্তে কবিতাটা সুর করে বলে গেল। খুশি হয়ে খলিফা বলে উঠলেন, বাঃ। সুন্দর তো! বড় সুরেলা তোমার কণ্ঠ। এবার অর্থটা বলো।

সিনাত্রা আস্তে আস্তে অর্থটা বলল—

সূর্য আছে চন্দ্র আছে
অস্তে গেলে অন্ধকারও আছে,
সুখও আছে দুঃখও আছে
বন্ধু হে, কোনটা নেবে?
আমি বলি—দুটোই নাও।
সবই তো ঈশ্বরের দান।

খলিফা হাকিম আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, বাঃ বাঃ! সুন্দর কবিতা তো!

এবার ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। একটু মাথা নুইয়ে বলল, মান্যবর, একটা আর্জি।

বলো। খলিফা বললেন।

আমাদের সঙ্গে একজন বৃদ্ধ আছেন তিনি এখানে এই দেশেই থাকবেন।

অন্যজন আমাদের চিকিৎসক। বয়স্ক মানুষ। আমাদের বিচারের জন্যে বন্দী করা হোক, কিন্তু তাকে জাহাজে থাকতে দেওয়া হোক।

খলিফা ইয়েপুদার দিকে তাকালেন। ঠিক আছে। তাই হবে।

ইয়েপুদা কেন জানি আপত্তি করল না। ফ্রান্সিস এত সহজে মিটবে ব্যাপারটা কল্পনাও করেনি। খলিফা হাকিম বলে গেলেন। সেনাপতিকে ডেকে ইয়েপুদা কী সব নির্দেশ দিল। সেনাপতি ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল, চলো।

কোথায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

গেলেই দেখতে পাবে। সেনাপতির গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

বেশ। ফ্রান্সিসরা প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এল। আগে-পিছে যোদ্ধার দল।

ক্রেভানকে ডেকে সেনাপতি বলল, এই বুড়ো, তুই যেখানে খুশি চলে যা। ভেনকে ডেকে বলল, তুই জাহাজে গিয়ে থাকবি। পালাবার চেষ্টা করবি না। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল, চলো সব।

প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়াল সবাই। ক্রেভান হাতে একটা কাপড়-চোপড়ের ঝোলা এনেছিল। সেটা শাঙ্কোর হাতে দিয়ে প্রায় ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ক্রেভানের দু'চোখ জলে ভরে উঠল। অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলল, ফ্রান্সিস, তোমার মতো মানুষ এই বৃদ্ধ বয়েস পর্যন্ত দেখিনি। ঈশ্বরের কাছে তোমার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। ফ্রান্সিস আস্তে ক্রেভানের পিঠে চাপড় দিল। বলল, আমরা তো এখন জাহাজ থেকে নির্বাসিত। কী অবস্থায় পড়ব জানি না তবু এখানে থাকতে অসুবিধে হলে নিশ্চয়ই আমার কাছে আসবেন। চোখ মুছে ক্রেভান ঝোলা হাতে আস্তে আস্তে চলে গেল। ভেনও এগিয়ে এসে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। চড়া রোদের মধ্যে যোদ্ধাদের পাহারায় ফ্রান্সিসরা হাঁটতে লাগল।

রাস্তায় লোকজনের ভিড়। দোকানপাটে কেনাবেচা চলছে। ভাইকিংরা এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে চলল। কিছুদূর যেতেই আগে-দেখা সেই পাথর গাঁথা আধভাঙা দুর্গটা দেখল। তার পাশেই পরপর দুটো পাহাড়। খুব উঁচু নয়। গাছ-গাছালি আছে। সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়। চুড়োয় অবশ্য বেশি গাছ-গাছালি নেই। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল পাহাড় দুটোর মাঝখানে একটা সরু গিরিসংকট। উপত্যকার মতো। বিস্তৃত নয়। সেই গিরিসংকটের কাছে এসে সেনাপতি বলে উঠল, দাঁড়াও সব। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। এখানে কিন্তু দু'জন সশস্ত্র প্রহরীকে দেখা গেল। দু'জনের পেছনে লোহার বেশ কয়েকটা গরাদ পোঁতা। মাঝখানে লোহার দরজা মতো। তাতে একটা বড় তালা ঝুলছে।

ফ্রান্সিস, মনে হচ্ছে কয়েদ ঘর। শাঙ্কো বলল।

ঘর নয়। অদ্ভুত ব্যবস্থা কয়েদ রাখার। এর মধ্যেই বন্দীজীবন কাটাতে হবে। নীচের মেঝে পাথুরে, ঝড়বৃষ্টির সময় মাথার উপরে থাকবে শুধু দু'পাশের ঝুঁকে পড়া গাছের ডাল-পাতা। কী অদ্ভুত ব্যবস্থা! ফ্রান্সিস ঐ গিরিসংকটটা দেখতে দেখতে বলল।

এখান থেকে পালানো যাবে না ফ্রান্সিস। সিনাত্রা বেশ ভীত গলায় বলল।

আগেই হাল ছেড়ো না। দেখা যাক সব ব্যবস্থা। ফ্রান্সিস বলল।

একজন প্রহরী এগিয়ে এসে কোমর থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে দিল। তারপর ফ্রান্সিসদের ঢুকতে ইঙ্গিত করল।

তাহলে বন্দীই হলাম। বিনোলা মৃদুস্বরে বলল। ফ্রান্সিস বলল, ইয়েপুদাই সর্বেসর্বা। খলিফার কোনো ক্ষমতাই নেই। কবি আর কবিতা নিয়ে মশগুল। তাই মানুষ হিসেবে ভালো। দেখা যাক কয়েকটা দিন। ফ্রান্সিস ঢুকতে ঢুকতে মৃদুস্বরে বলল।

ভেতরে সরাসরি সূর্যালোক পড়েছে। এখানে-ওখানে ঝুঁকে-পড়া গাছের ছায়া। দেখা গেল আগে থেকে বন্দী আট-দশজন লোক শুয়ে-বসে আছে। দু'জন মুর, বাকিরা শ্বেতকায়। এবড়ো-খেবড়ো পাথরের মেঝে। ফ্রান্সিস সেখানেই বসে পড়ল। ভাইকিং বন্ধুরাও বসে পড়ল। বন্দী রাখার এই ব্যবস্থায় সবাই অবাক। এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। কিছুটা দূরে গরাদ পোঁতা। পালাবার সব রাস্তাই বন্ধ। দু'পাশে প্রায় খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। এক টুকরো ঘাসও নেই। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। ওপরে দুপুরের আলোকোজ্জ্বল নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেক চিন্তা মাথায়। হ্যারি, মারিয়া নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে সত্যি কিন্তু বেশি দিন তো থাকতে পারবে না। শাঙ্কোও যেতে পারবে না। ব্যবসার কাজ ফেলে হ্যারি, মারিয়া ঘরে শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছে, 'কর্মচারীও মালপত্র নিয়ে আসছে না। স্বাভাবিকভাবেই সেই সার্মেন্তো নামের ভদ্রলোকের মনে সন্দেহ হতে পারে। হ্যারিরা বিপদে পড়তে পারে। হাতে সময় খুব কম।

গরাদ বসানো দরজায় শব্দ হল। দু'জন প্রহরী আর একজন রাঁধুনি খাবার নিয়ে ঢুকল। চিনেমাটির বড় প্লেটে হাতে হাতে খাবার দেওয়া হল। বুনো আনাজ-টানাজ নয়। চাষ করা জমির আনাজপাতি। রান্নাও সুস্বাদু। সঙ্গে সামুদ্রিক মাছ। ফ্রান্সিসরা মোটামুটি পেট পুরে খেল। একটা বেশ বড় মাটির জালা থেকে জল খেল। প্রহরীরা এঁটো প্লেট নিয়ে চলে গেল। ফ্রান্সিস এবার ভালো করে সব বন্দীদের দেখল। সবার শরীরই বেশ রোগাটে। এমনকি মুর দু'জনেই কেমন রক্তশূন্য চোখমুখ। বুঝল এই পরিবেশে কেউ সুস্থ থাকতে পারে না। ইয়েপুদা অত্যন্ত ধুরন্ধর। ও বন্দীদের

হত্যা করে না। কিন্তু এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে যে, রোদে-জলে, প্রচণ্ড গরমে, শীতে এমনিতেই বন্দীরা অসুস্থ হয়ে মারা যাবে। অসুখে মারা গেলে ওর ঘাড়ে কোনো দোষই পড়বে না।

সারাদিন রোদে পুরে বিকেলে একটু স্বস্তি পেল ফ্রান্সিসরা। খুব হাওয়া ছুটেছে। সন্ধে হল। ফ্রান্সিস পাথরের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছিল। পিঠের এখানে-ওখানে ছুঁচোলো পাথর যেন হাড়ে বিঁধে যাচ্ছিল। ও ডাকল, শাঙ্কো, শোনো। শাঙ্কো শুয়েছিল। উঠে এগিয়ে এল। বন্দীদের দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল, ওদের সঙ্গে কিছু কথা বলো তো। জেনে নাও ওরা কী অপরাধে বন্দী হয়েছে। এখানে থাকতে থাকতে কী অভিজ্ঞতা হয়েছে। ওদের সব কথা জানতে হবে। শাঙ্কো বন্দীদের কাছে গিয়ে গল্প জমাল। নিজের কথা বলল। তারপর খবরাখবর নিতে লাগল। কিছুক্ষণ শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে ফিরে যাবে বলল, ঐ মুর যুবক দু'জন ভাই। গুপ্তচর এই অভিযোগে উজির বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সবাই মরেছে। ওরা গ্রামের দিকে গিয়েছিল বলে বেঁচে গেছে। কিন্তু পরে ধরা পড়েছে।

হ্যাঁ, গুপ্তচর এই বদনাম সবরকম অত্যাচার চালানো যায় হত্যাকেও অপরাধ বলে গণ্য করবে না। অন্যদের কথা বলো। ফ্রান্সিস বলল।

ওরা কেউ স্পেন, কেউ পোর্তুগালের মানুষ। একজন ফরাসি, নাম আস্তাসো। ঐ আস্তাসোই এখানে সব থেকে বেশিদিন বন্দী হয়ে আছে। শাঙ্কো বলল।

হুঁ, ওর সঙ্গে কথা বল অনেক কিছু জানা যাবে। প্রহরীদের সামনে নয়। বলে এসো রাতে খাওয়া সেরে ও যেন আমাদের কাছে আসে। তখন কথা হবে।

শাঙ্কো চলে গেল। আস্তাসোকে ফ্রান্সিসের কথা বলল। আস্তাসো বলল বেশ। তোমার বন্ধু বুদ্ধিমান। প্রহরীদের নজর আমি এড়িয়ে যাব।

ওদিকে বিকেলে হ্যারি ও মারিয়া চুপ করে ছোট বিছানাটায় বসেছিল দু'জনেই বেশ চিন্তান্বিত। শাঙ্কো এল না। ফ্রান্সিসদের কোনো খবরই পাওয়া গেল না। একসময় হ্যারি বলল, সন্দেহ নেই। ঐ উজির ইয়েপুদা ফ্রান্সিসদের জাহাজ তল্লাশি করিয়েছে। হ্যারল্ডের সেই ধনসম্পদ ওরা পেয়েছে। কাজেই ফ্রান্সিসদের রেহাই দেয়নি। নিশ্চয়ই বন্দী করেছে।

চিন্তা হচ্ছে ফ্রান্সিসরা বন্দীদশা থেকে পালাতে পারবে কিনা। মারিয়া বলল।

সব নির্ভর করছে ঐ খলিফা হাকিমের ওপর। তিনি কেমন মানুষ তা তো জানি না যদি উজিরের মতো ক্রূরপ্রকৃতির হন তাহলে ফ্রান্সিসদের ভীষণ বিপদে পড়তে হবে। হ্যারি বলল।—যাকগে। আপনি এসব নিয়ে ভাববেন না ফ্রান্সিস, শাঙ্কো

নিশ্চয়ই বিপদ-আপদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। মুসকিল হয়েছে। আপনি সমুদ্রতীরে গিয়ে সমস্ত দেখে আসুন।

নাঃ। ভালো লাগছে না। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল।

না-না। মন খরাপ করবেন না। বীরের পক্ষে সেটা ভালো না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে যান। বেশি দূরে তো নয়। জানেনও। তবে সাবধান। মুর যোদ্ধারা নাকি এদিকে টহল দিতে আসে। কেউ যেন আপনাকে দেখতে না পায়। আর অন্ধকার হবার আগেই চলে আসবেন। দুশ্চিন্তা করবেন না। রাত জাগবেন না। নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন। শরীরটা সুস্থ রাখতেই হবে। যান। হ্যারি বলল।

মারিয়া আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলে বাইরের বাগানটা ছাড়িয়ে পায়ে-চলা রাস্তায় এল। চারপাশে ভালো করে তাকিয়ে দেখল। একজন লোক দূরে পায়ে-চলা পথটা দিয়ে চলেছে। আর কোনো মানুষ দেখল না। মারিয়া একটু পা চালিয়ে সমুদ্রতীরের দিকে চলল। সেই দুটো পাথরখণ্ডের একটাতে বসে পশ্চিমের দিগন্তের দিকে তাকাল। সূর্য তখনও অস্ত যায়নি। দু'পাশে গাছ-গাছালিতে ঘরে ফেরা পাখিরা ডাকছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর কমলারঙের আলোয় দিগন্ত মায়াময় হয়ে উঠেছে। দুশ্চিন্তার মধ্যেও মারিয়ার মন আনন্দে ভরে উঠল। কত পরিচিত দৃশ্য। যতবার দেখে আনন্দ যেন বাঁধ মানে না।

রাত হল। প্রহরী আর রাঁধুনি এসে ফ্রান্সিসদের খাবার দিল। সেই আনাজ মাছের ঝোলমতো, মোটা সুস্বাদু রুটি। এঁটো প্লেট নিয়ে ওরা চলে গেল। গরাদের দরজা বন্ধ হল।

শাঙ্কো শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে রইল। আস্তাসোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। চারদিক নিস্তব্ধ। মাথার ওপর কালো আকাশে তারাগুলি জ্বলজ্বল করছে।

কিছু পরে আস্তাসো নিঃশব্দে ফ্রান্সিসের কাছে এল। গলা নামিয়ে বলল—আপনিই ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে ছিল। চোখ খুলে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁ। আস্তাসোর গায়ে এখানে-ওখানে ছেঁড়া পোশাক। মুখে অল্প লালচে দাড়ি-গোঁফ। মাথার চুলও লালচে। ফ্রান্সিস দেখেই বুঝল—একসময় বলিষ্ঠ শরীর ছিল। কিন্তু এখানে রোগা হয়ে গেছে। বেশ শুকনো চোখ মুখ। তবে চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল। বুদ্ধিদীপ্ত।

সংক্ষেপে বলুন তো আপনার সব অভিজ্ঞতার কথা। আপনি তো ফ্রান্সের মানুষ। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। ক্রুসেডের লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলাম। কিন্তু ধর্মের নামে অযথা খুনোখুনি রক্তপাত মৃত্যু দেখে অল্পদিনের মধ্যেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লাম। জানেন তো সৈন্যবাহিনী থেকে পালানো কত কঠিন। ধরা পড়ে গেলে সহযোদ্ধাদের হাতেই অবধারিত মৃত্যু। তবু জীবন বিপন্ন করেই পালালাম। এদেশ-ওদেশ উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এই পৌরোয় এসে পড়লাম। নানা বিপদ-আপদের কথা থাক। মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানোয় ছেদ পড়ল। উজির ইয়েপুদার যোদ্ধাদের কুনজরে পড়লাম। আমাকে এখানে গুপ্তচর সন্দেহে বন্দী করা হল।

পালাবার চেষ্টা করেননি? ফ্রান্সিস বলল।

সেটাই সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা। এখানে ধারেকাছের দেশের বন্দীদের পেয়েছিলাম। একজন স্পেনীয় যুবকের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হল। খাবার ভাগ করে খেতাম। পাশাপাশি শুতাম। সুখ-দুঃখের কথা হত। খুব দুঃসাহসী ছিল যুবকটি। কী ভাবে জানি না যুবকটি এই পাহাড়ের প্রায় খাড়া গায়ে ওঁচানো পাথরের খোঁদল ধরে ধরে ওপরে প্রায় পাহাড়ের মাথার কাছে একটা ঝুঁকে পড়া গাছের কাছাকাছি পৌঁছোবার উপায় বের করেছিল। ও বলেছিল প্রায় কুড়ি-পঁচিশ দিন অন্ধকারে রাত জেগে ঐ পথটা ও খুঁজে খুঁজে বের করেছিল। আস্তাসো থামল।

তারপর? আগ্রহে ফ্রান্সিস বলে উঠল।

এক অন্ধকার রাতে ওরা পাঁচজন ঐ পথে অসম্ভব কষ্ট করে ঐ পাহাড়ের মাথার গাছটার কাছে পৌঁছেছিল। ঝুঁকে পড়া গাছটার ডাল ধরে ধরে তিনজন নাকি উঠছিল। পালাবার আনন্দে উত্তেজনায় ওরা তিনজনই ডালটা ধরে একসঙ্গে উঠতে গিয়েছিল বোধহয়। ডাল ভেঙে তিনজনের সঙ্গে বন্ধুটিও একবারে নীচে পাথরের মেঝের ওপর আছড়ে পড়েছিল। কেউ বাঁচেনি।

ফ্রান্সিস খুব মন দিয়ে শুনছিল। বলল—তাহলে ওপরে ওঠার একটা উপায় আছে।

হ্যাঁ। কিন্তু সেই ঝুঁকে পড়া গাছটা পরদিনই যোদ্ধারা কেটে ফেলেছিল। আস্তাসো বলল।

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল। বলে উঠল, তার মানে ওপর থেকে নেমে গাছটা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়।

নিশ্চয়ই। নইলে ওরা ওপর থেকে নেমে এসে গাছটা কাটল কী করে? আস্তাসো বলল।

ওপরে ওঠার রাস্তাই বলুন আর উপায়ই বলুন—সেটা ওরা নেমে এসে নষ্ট করে দিতে পারেনি। ফ্রান্সিস বলল।

না। তা পারেনি। আস্তাসো অন্ধকারে মাথা নাড়ল। ফ্রান্সিস আবার ঠেস দিয়ে বসল। দু'চোখ বোঁজা। একটু অপেক্ষা করে আস্তাসো বলল—কী হল?

ছক কষা বোঝেন তো? ছক কষছি। পালাবার ছক। তবে তার আগে ঐ গোড়াকাটা গাছটা পর্যন্ত পৌঁছোতে হবে। ফ্রান্সিস থেমে থেমে বলল।

পাগলামি করবেন না। ঐ মৃত্যুর দৃশ্য দেখলে—

আস্তাসোকে আর কিছু বলতে না দিয়ে ফ্রান্সিস বলে উঠল—এইখানে এভাবে থেকেও কি বাঁচার আশা রাখেন?

দেখুন—খলিফা হাকিমকে তো দেখেছেন। তাঁর দরবারও দেখেছেন। তাঁর কাছ থেকে উজির কিন্তু সব কিছু গোপন রাখে। আস্তাসো বলল।

তাহলে তো খলিফা হাকিমের কানে আমাদের এই নরকবাসের কথা পৌঁছোবেই না। ফ্রান্সিস বলল।

কোনোদিন হয়তো কোনো কারণে শুনতে পারবেন। সেটাই একমাত্র আশার আলো। আস্তাসো বলল।

ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল—দেখুন। আপনার চেয়ে অনেক বেশি দ্বীপ, দেশ আমি ঘুরেছি। নিষ্ঠুর হত্যাকারী প্রবঞ্চক মিথ্যেবাদী হীনমনা মানুষ অনেক দেখেছি। আমি মানুষের মুখ দেখে কথা শুনে সহজেই তার চরিত্র বুঝতে পারি। অবশ্য উদার মনের দয়ালু মানুষও দেখেছি। সংখ্যায় কম। তবে এঁরা আছেন বলেই মানুষের জীবন সুন্দর, পৃথিবী বাসযোগ্য। বলুন—তাই কি না? ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

আপনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে দেখছি। একটু অবাক হয়ে আস্তাসো বলল।

অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—উজির ইয়েপুদা ক্ষমতালোভী, অর্থপিশাচ। ও যে কেন খলিফা হাকিমকে মেরে ফেলেনি সেটাই ঠিক বুঝতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে পালাবার জন্যে তো আপনাকে ঐ পথটা খুঁজে বের করতে হবে এবং ছক কষতে হবে। আস্তাসো বলল।

অবশ্যই। খোলা আকাশের নীচে তো কম রাত কাটেনি। দেখেছি—তারার আলো খুব অস্পষ্ট হলেও চোখের সামনে অনেক কিছু দেখা যায়। খোঁজ পাবোই। ফ্রান্সিস বলল।

এক কাজ করুন না। আর তেরো দিন পরে পূর্ণিমা পাবেন। আস্তাসো বলল।

এত নিশ্চিত হয়ে বলছেন? ফ্রান্সিস বলল।

দিনরাত তো ওপরের ঝুঁকে পড়া গাছের ডালপাতার মধ্যে দিয়ে সূর্য-চাঁদের আকাশ দেখে হিসেব রাখতে ভালোবাসি। সময়ও বেশ কাটে। আস্তাসো বলল।

আবার জলঝড়ের আকাশও দেখতে হয়। ফ্রান্সিস একটু হাসল।

তখন পাথুরে মেঝেতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকি। গায়ের ভেজা পোশাক গায়েই শুকোয়। আন্তাসোও অন্ধকারে হাসল।

আন্তাসো আমার অতদিন অপেক্ষা করবার মতো সময় নেই। যত দ্রুত পারি পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

কী আর বলব? আন্তাসো উঠে চলে গেল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। চোখ বুঁজল। যাক একটা ক্ষীণ আশার রেখা দেখা যাচ্ছে। কাল রাতের অন্ধকারে কাজে নামতে হবে। দুপুরের কড়া রোদে তেতে ওঠা পাথরের মেঝে যেমন গরম রাতে তেমনি ঠাণ্ডা। ফ্রান্সিস কোমরে ফেট্টির কাপড়টা খুলে গায়ে যতটা পারল জড়াল।

পরের দিন সকালে শাঙ্কো জিগ্যেস করল—আন্তাসোর সঙ্গে কথা হল? ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল। তারপর সব কথা বলল।

তাহলে তো একবার চেষ্টা করতে হয়। শাঙ্কো বলল।

আজ রাতের অন্ধকারে খোঁজ চালাতে হবে। কতদিন এখানে পচে মরব? ফ্রান্সিস বলল।

আমিও থাকব। শাঙ্কো বলল।

না। আমি একাই দেখব। তোমরা কয়েকজন নীচে হাঁটু মুড়ে বসে তৈরি থাকবে। যদি হাত ফসকে পড়ে যাই তোমরা আমাকে ধরবে। খুব সাবধানে আগে পাঁচজন আছড়ে পড়ে মারা গেছে ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে ফ্রান্সিস দরকার নেই এই ঝুঁকি নেওয়ার। শাঙ্কো মৃদুস্বরে বলল।

না শাঙ্কো। একটা চেষ্টা করতেই হবে তোমরা আমাকে ধরে ফেলতে পারবে না? ফ্রান্সিস বলল।

এটা কী বলছ? তোমাকে বাঁচাতে আমরা মরতে রাজি। এটা কি নতুন করে বলতে হবে! শাঙ্কো অভিমানের সুরে বলল।

ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে শাঙ্কোর হাত ধরে চাপ দিয়ে হেসে বলল—তাই তো আমি এত দুঃসাহসী হতে পেরেছি।

সন্ধে থেকে রাত। কিছুক্ষণ পরে প্রহরী আর রাঁধুনি রাতের খাবার নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা নিঃশব্দে খেয়ে নিল। প্রহরীরা চলে গেল। শাঙ্কো অন্ধকারে বিনোলাদের কাছে এল। ফ্রান্সিসের রাতের অভিযানের কথা বলল। ওদের কী করতে হবে সেসবও বলল। তারপর ফ্রান্সিসের পাশে এসে শুয়ে পড়ল।

রাত গভীর হল। ভাইকিংরা কেউ ঘুমোল না। একসময় ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে চাপাস্বরে ডাকল, শাঙ্কো। শাঙ্কোও আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। চাপাস্বরে ডাক হলেও তা শুনে বন্ধুরাও আস্তে আস্তে উঠে বসল। ফ্রান্সিস মশালের আলোয় গরাদ

দিয়ে দেখল দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। অন্য দুজন একটা ছোট পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে আছে। বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন। প্রহরীদের সংখ্যা বেড়েছে। তবু এই সুযোগ ছাড়া হবে না। শাঙ্কোকে মৃদুস্বরে বলল—যাও, আস্তাসোকে নিঃশব্দে নিয়ে এসো। মাথা নিচু করে যাবে আসবে।

অন্ধকারে শাঙ্কো আস্তাসোকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল, আস্তাসো, সেই ওপরে ওঠার জায়গাটা দেখিয়ে দাও তো।

তাহলে উঠবেন? আস্তাসো একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল।

আমার সংকল্প বড় দৃঢ়, আস্তাসো। মাথা নিচু করে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

আস্তাসো আর কিছু বলল না। প্রায় হামা দিয়ে সে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ভেতরের দিকে গেল। অন্ধকারে একটা জায়গায় এল। পেছনে পেছনে ফ্রান্সিসও এল। অন্ধকারে আস্তাসো উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে একটা ওঁচানো পাথরের মাথায় হাত দিয়ে বলল—এই পাথরটা ধরে উঠতে হবে। নীচে একটা খোঁদল আছে। ওখানে পা চেপে উঠুন।

ফ্রান্সিস হাত বুলিয়ে খোঁদলটা পেল। ও পায়ের চাপে উঠে ওঁচানো পাথরটা ধরে পাহাড়ের গায়ে বুক চেপে উঠতে লাগল। ততক্ষণে শাঙ্কোরা চার-পাঁচজন ঠিক নীচে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে। ফ্রান্সিস হাত দিয়ে খুঁজে খুঁজে আর একটা বেশ উঁচিয়ে থাকা পাথর পেল। ওটা ধরে উঠতে শুরু করল। পাহাড়ের পাথরে বুক চেপে চেপে শরীরের ভর রেখে রেখে সেই সঙ্গে শরীরের ভারসাম্য রেখে রেখে উঠতে ভাবল, সেই দুঃসাহসী যুবকটি কত রাত জেগে প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে এই পথটা বের করতে পেরেছে। হয়তো পাথর সরিয়ে ঘষে ঘষে এই পথ করেছে। সেই পাঁচ মৃত বন্দী কী কষ্ট করেই না উঠেছিল।

ফ্রান্সিস একটু থেমে দম নিল। হাঁপ ধরা ভাবটা একটু কমল। ওপরে তাকিয়ে তারার আলোয় দেখল ঝুঁকে পড়া কাটা গাছের কাণ্ডের অনেকটা আবছা দেখা যাচ্ছে। তখনও ওখানে পৌঁছতে হাত পাঁচেক উঠতে হবে। ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে একটা ওঁচানো পাথর পেল ওপরে ডানদিকে। পাথরটার পাশেই হাতে ঠেকল একটা লম্বাটে মোটা দড়ির মতো। বুঝল, গাছটার শেকড় নেমে এসেছে। শেকড়টা আস্তে টেনে দেখল বেশ শক্ত। ভাবল, এই শেকড়ের সবটা টেনে বের করতে পারলে বাকি পাঁচ হাত পার হয়ে অনায়াসে কাটা কাণ্ডটা ধরা যাবে। অত সতর্ক ঠান্ডা মাথার ফ্রান্সিসও মুক্তির আনন্দে ভুল করে বসল। শেকড়টা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। শেকড় বেশ কিছুটা বেরিয়ে এল সত্যি, কিন্তু ওঁচানো পাথরটা খুলে এসে পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে জোরে গড়গড় শব্দ তুলে

পাথরটা গিয়ে পড়ল ঘুমন্ত কোনো বন্দীর ওপর। মুর যুবকটি ঘুম ভেঙে চিৎকার করে উঠল—মাথাটা গেল! ও—ও—মাথাটা গেল! মুহূর্তে ফ্রান্সিস হাত-পা ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে নেমে এল। পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দে সচকিত বন্ধুরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ন্ত ফ্রান্সিসকে হাত বাড়িয়ে আটকাল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল—শুয়ে পড়ো। ওদিকে মুর যুবকটিও চ্যাচামেচি শুরু করেছে। অনেক বন্দীই ততক্ষণে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। একটু পরেই প্রহরীরা গরাদের কাছে ছুটে এল! একজন গলা চড়িয়ে বলল—ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়েছে। একজনের মাথায় পড়েছে। পাথর গড়িয়ে পড়া দেখিনি কোনোদিন।

ও। ঠিক আছে। শুয়ে পড়ো। প্রহরীটি বলল।

তোমাদের বৈদ্যিকে ডাকো।

বৈদ্যি নয়। হেকিম। হেকিম তোমাদের জন্যে রাত জেগে বসে আছে—না? প্রহরী বলল।

খুব লেগেছে। শাঙ্কো বলল।

ঠিক আছে। কাল সকালে দেখা যাবে। প্রহরী সরে গেল।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল—প্রহরীদের বললাম। কানেই নিল না।

ওরা এরকমই। শুধু হুকুম তামিল করতে পারে আর বন্দীকে পালাতে দেখলে নির্দ্বিধায় হত্যা করতে জানে।

তখনই আস্তাসো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—কেমন আছেন?

মনটা ভালো নেই। একজন নিরীহ মানুষকে আহত করলাম। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

আপনি তো ইচ্ছে করে পাথর ছুঁড়ে মারেননি। এ তো দুর্ঘটনা। নিজেকে দোষী মনে করবেন না।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—যাও, আহত লোকটিকে দেখে এসো।

শাঙ্কো তাড়াতাড়ি সেই মুর যুবকটির কাছে এল। অন্ধকারে মাথায় হাত বুলিয়ে দেখে বুঝল ফেটে যায়নি। ও তাড়াতাড়ি ওর কোমরবন্ধনী ছিঁড়ে যুবকটির মাথায় বেশ শক্ত করে বেঁধে দিল। যুবকটি একটু আরাম পেল। গোঙানি বন্ধ হল।

সকালে শাঙ্কো গরাদের সামনে গিয়ে তাগাদা দিল। কিছুক্ষণ পরে দরজা খোলা হল। লম্বাটে, রোগা, সাদা দাড়ি-গোঁফ-ওয়ালা তালিমারা ঝোলা কাঁধে হেকিম ঢুকল। শাঙ্কো হেকিমকে আহত যুবকটির কাছে নিয়ে এল। ও ফেট্টি খুলে ফেলল। আস্তে ক্ষত জায়গাটার চারপাশে চাপ দিয়ে দেখল। চোখ দেখল। তারপর শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে আরবি শব্দ মেশানো পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—ফাটেনি। সেরে

যাবে। বলে ঝোলা থেকে বোয়াম বের করল। ভেন-এর মতোই দু'হাতে একটা কালো দলামতো নিল। ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিল। তারপর হাতের তালুতে অন্য বোয়াম থেকে কী নিয়ে চেপে চেপে ঘুরিয়ে কয়েকটা বড়ি বানাল। বোয়াম ঝোলায় ভরে উঠে দাঁড়াল। বলল—ভয় নেই। চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই সেরে যাবে। হেকিম চলে গেল। শাঙ্কো যুবকটির পাশে বসে বলল—সব কথা তো ভাই বলা যাবে না। এটাকে দুর্ঘটনা বলেই মনে করো। কোনো অসুবিধে হলে আমাকে ডেকো। এখন শুয়ে বিশ্রাম করো।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। কথাটা মনে হতেই বলল—তুমিও দেখিয়ে নিলে পারতে।

কী যে বল! ওরা অভিজ্ঞ বৈদ্যি। বুকে, কনুইয়ে, হাঁটুতে হ্যাঁচড়ানোর দাগ থেকে সব বুঝে ফেলবে।

খুব কেটেছে? শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস বলল, দু-তিনটে জায়গায় পাথরের খোঁচায় বেশ কেটে গেছে। বুঝতে পারছি রক্ত বেরিয়ে এসেছে। বাকি জায়গা ছড়ে গেছে। ভীষণ জ্বালা করছে। কিন্তু আমার কোনো শব্দ করার উপায় নেই। প্রহরীদের কানে গেলে সন্দেহ করবে। একটু থেমে বলল—আমার বেশি কষ্ট হচ্ছে না। একটা নিরীহ মানুষকে আহত করলাম।

এটা একটা দুর্ঘটনা। শাঙ্কো বলল।

ঘটিয়েছি তো আমি। যাক গে, তোমাদের কারো লাগেনি তো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

সে সামান্য। শাঙ্কো বলল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। ফ্রান্সিস চুপ করে বসেছিল। পাথর গড়িয়ে পড়ার আগে ফ্রান্সিস আবছা একটা মোটা শেকল দেখেছিল। শেকড়টা ধরতে চেয়েছিল তাড়াতাড়ি। বিপত্তি ঘটল। শেকড়টা কত লম্বা সেটাই দেখা হল না। অগত্যা দু'একদিন চুপ করে থাকতে হবে। পরে আবার উঠতে হবে।

এসময় একজন প্রহরী গরাদে মুখ চেপে গলা চড়িয়ে বলল—মহামান্য খলিফার দরবারে তোমাদের মধ্যে কে নাকি কী শুনিয়েছ। সে এগিয়ে এসো।

সিনাত্রা ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল—চলো তো ব্যাপারটা দেখি।

দুজনে গরাদের কাছে এলো। দেখল সেদিন দরবারে যে রোগামতন লোকটি মুখে মুখে কবিতা বলছিল সে দাঁড়িয়ে আছে। সিনাত্রাকে দেখে বলে উঠল, হ্যাঁ

আপনি। শুনুন মহামান্য খলিফার আজ শরীর ভালো নেই। দরবারেও আসেননি। আজ রাতে মহামান্য খলিফার প্রাসাদেই গিজেলের এক মেহফিল হবে। সময়মতো মহামান্য খলিফার দুজন দেহরক্ষী আসবে। আপনাকে মেহফিলে নিয়ে যাবে। আবার পৌঁছে দেবে। আপনার গিজেল মহামান্য খলিফার খুব ভালো লেগেছে।

ওর নাম সিনাত্রা। খুব ভালো গান গায়। আমাদের দেশের ভেড়া-পালকদের গান ও জানে। ওর গলা খুব সুরেলা—ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে তো শুনতেই হবে। লোকটি বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল।

বুঝবেন না তো। ফ্রান্সিস বলল।

সুর তো বুঝব। পর্তুগীজ ভাষায় অর্থ বললে আরও ভালো লাগবে। ভেড়া-পালকদের গান, মাটি-পাহাড়ের গান সরল সুন্দর। তাই কিনা? লোকটি হেসে বলল।

আপনার নামটা? ফ্রান্সিস বলল।

গরিবের নাম রামাদ্দি।

আপনি কবি?

আমি আর কী কবি! আমার কবিগুরু আবিদি রব্বাহি। কতো বছর আগেকার কবি! আজও বাজারে-ঘাটে-মাঠে লোকে সেইসব কবিতা সুর করে শোনায়। অনেক আরবী কবিতা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। আমি তাঁর দীন ভক্ত। রামাদ্দি হেসে বলল।

ফ্রান্সিস বলল—দেখুন রামাদ্দি, আমরা এখানে বড়ো কষ্টে আছি। আপনি যদি—

ফ্রান্সিসকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই একটু যেন ভীত স্বরে রামাদ্দি বলে উঠল—এসব মান্যবর ইয়েপুদার হুকুম। এসব ব্যাপার আমাকে কিছু বলবেন না। আমি মুখে মুখে গিজেল বানাই, মেহফিলে বলি—ব্যস! এতেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

ফ্রান্সিস বুঝল রামাদ্দিকে বিরক্ত করা উচিত হবে না।

রামাদ্দি এবার একটু দুঃখের সঙ্গে বলল—আমার কবিগুরু দরবারের গিজেল শুনিয়ে প্রচুর ধনসম্পদ পেয়েছিলেন। কিন্তু কী যে হল, তাঁর শেষ জীবনটা স্বেচ্ছানির্বাসনে কেটেছে। যখন তাঁর কবিখ্যাতি দেশকাল ছাড়িয়ে গেছে তখন এক গভীর রাতে সব ধনসম্পত্তি নিয়ে আর এক আবাল্যবন্ধু আবু হামিদকে সঙ্গে নিয়ে ঐ যে প্রায় ভেঙে পড়া দুর্গটা দেখছেন তারই একটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর তাঁর ও আবু হামিদের যে কী হল কেউ জানে না।

আর তাঁর ধনসম্পদ? ফ্রান্সিস সাগ্রহে জিগ্যেস করল।

নিখোঁজ। কেউ জানে না কোথায় গেল সেই ধনসম্পদ। রামাদ্দি বলল।

একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে। পরে আপনার কাছ থেকে যতটা আপনি জানেন শুনব। সিনাত্রা যাবে, সানন্দে যাবে। এ তো কত সম্মানের ব্যাপার।

তাহলে চলি।

রামাদ্দি চলে গেল। কেমন এক আত্মভোলা চলার ভঙ্গি। একবার পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছে, একবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। ফ্রান্সিস অনেকক্ষণ রামাদ্দির দিকে তাকিয়ে রইল।

রামাদ্দি সত্যিই কবি। অন্যরকম মানুষ। সিনাত্রা মৃদুস্বরে বলল।

ফ্রান্সিস বলল—সিনাত্রা, এসো কথা আছে।

ভেতরে ঢুকে দুজনে বসল। ফ্রান্সিস বলল—তুমি তো যাবে, যেভাবে হোক খলিফাকে বলবে আমরা বন্দী হয়ে পড়ে আছি। খুব কষ্ট আমাদের। আমাদের মুক্তি দিন।

ঠিক আছে। সুযোগ পেলেই বলব।

ফ্রান্সিস সরে এসে শুয়ে পড়ল।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধে হল। কিছুক্ষণ পরে গরাদের পাশে মশাল জ্বালানো হল। প্রহরীর সংখ্যাও বাড়ল। তখনই খলিফার দুই দেহরক্ষী এল। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। গায়ে অন্যরকম জমকালো পোশাক। মাথায় শিরস্ত্রাণ। সিনাত্রা যে পোশাক পরেছিল, সেটা পরেই প্রহরীর সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে, ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—যা বলেছিলাম। সিনাত্রা মাথা নেড়ে বেরিয়ে এল। দেহরক্ষীদের সঙ্গে চলল।

গরাদ ধরে ফ্রান্সিস তাকিয়ে রইল। একটু আশান্বিত হল। হয়তো খলিফা এসব জানলে ওদের মুক্তি দিতে পারেন।

বেশ রাতে সিনাত্রা ফিরে এল। হাসিমুখে ফ্রান্সিসদের খলিফার দেওয়া পারিতোষিক নতুন সুন্দর পোশাক, পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা দেখাল।

ঠিক আছে। খলিফা হাকিম গুণীদের সম্মান দিতে জানেন। এবার আসল কথাটা বলো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস, কড়া পাহারায় নিয়ে গেছে আমাকে। রক্ষীরা যেতে যেতে বলেছে পথে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। যে বিরাট ঘরটায় কবিগানের আসর বসেছিল সেখানে বেশ লোকজন জড়ো হয়েছিল। মুখে মুখে কবিতা বলা, গানটান চলল। শ্রোতারা সবাই উৎসাহ দিয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছে। কিন্তু উজিরের সেদিকে

কোনো নজর নেই। উৎসাহও নেই। সে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে। সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। আমি তো খলিফার কাছে যাবারই সুযোগ পাইনি। ফেরার পথেও কড়া পাহারা। সিনাত্রা বলল।

হুঁ। উজির ইয়েপুদা ধুরন্ধর লোক। যাক্‌গে, প্রাসাদ কেমন দেখলে?

অপূর্ব। পাথরের থামে কত কারুকাজ। ছাদে, দেওয়ালে কী সুন্দর ভাস্কর্য। রঙিন ছবি আঁকা। কবি রামাদ্দি বলল খলিফা নিজেও নাকি অবসর সময়ে এসবে হাত লাগিয়েছেন।

হুঁ। খলিফা হাকিম শিল্পী মানুষ। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, ক্রেভান ঠিকই বলেছিল।

জানো ফ্রান্সিস, রামাদ্দি খলিফা হাকিমের সভাকবি।

বলো কী! ফ্রান্সিস বেশ অবাক হয়ে বলল।

হ্যাঁ। অথচ কী বিনয়ী। কী ভদ্র! কোনো গর্ব নেই। ফিরে আসার সময় আমাকে জড়িয়ে ধরে কত প্রশংসা করল। বলল আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছি তিনি যেন আপনাকে দীর্ঘজীবন দান করেন। আর একটা কথা, আমি একটা কবিতার পুঁথি লিখেছি, সেটা আপনাকে সসম্মানে উপহার দেব। শুনে আমি তো অবাক।

সত্যি, রামাদ্দি অন্যরকম মানুষ। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালে খাবার খাওয়া সবে শেষ হয়েছে, একজন প্রহরী গরাদের কাছ থেকে গলা বাড়িয়ে বলল—সিনাত্রা কে? এদিকে এসো।

সিনাত্রা উঠে গরাদের কাছে গেল। ফ্রান্সিস, শাঙ্কোও উঠে এল। গরাদের কাছে এসে দেখল রামাদ্দি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ধরা কালো সুতোয় বাঁধা পার্চমেন্ট কাগজের একটা পুঁথি। সিনাত্রার দিকে পুঁথিটা বাড়িয়ে ধরে বলল—কবিবন্ধু, আপনার জন্য এই সামান্য প্রীতি উপহার কাল সারারাত জেগে পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করেছি। আপনার বুঝতে সুবিধে হবে।

ভালো করেছেন। আরবী ভাষা তো সিনাত্রা বুঝত না। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

জানেন, পর্তুগীজ ভাষায় অনেক আরবী শব্দ মিশে গেছে। রামাদ্দি বলল।

সবই বুঝলাম। কিন্তু এই নরকে থাকলে আপনার কবিবন্ধু আর কতদিন বেঁচে থাকবেন? ফ্রান্সিস বলল।

রামাদ্দির মুখ একটু গম্ভীর হল। বলল—বলেছি তো এসব ব্যাপার থেকে আমি দূরে থাকি। আমার মনের শান্তি আমি নষ্ট হতে দিতে রাজি নই।

কিন্তু মাননীয় খলিফাকে যদি আমাদের এই দুঃখকষ্টের কথা জানানো হয়—

কোন লাভ নেই। এসব ব্যাপারে মহামান্য খলিফা উদাসীন। তাই তো দেশের সব ধর্মের সব মানুষ মহামান্য খলিফাকে এত ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। শুনলে আশ্চর্য হবেন মহামান্য খলিফা যতদিন এখানে শাসনক্ষমতায় আছেন কোনো শত্রুর দ্বারা এদেশ আক্রান্ত হয়নি। তাঁর দরবারে বিচার-টিচার হয়, সব মানুষ তো লোভ ক্রোধ হিংসা থেকে মুক্ত নয়; কিন্তু অপরাধ খুব অল্পই হয় এখানে। রামাদ্দি বলল।

আচ্ছা, আপনি কবি আবিদি রব্বাহির নিখোঁজ ধনভাণ্ডারের কথা বলছিলেন। আমরা এরকম বহুদিন আগের নিখোঁজ গুপ্তধন উদ্ধার করেছি চিন্তা করে বুদ্ধি খাটিয়ে। যদি মহামান্য হাকিম আমাদের সেই সুযোগ দেন তবে—

কোনও লাভ নেই। ধনসম্পদের প্রতি মহামান্য খলিফার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। রামাদ্দি মাথা নেড়ে বলল।

তবে মান্যবর উজিরকেই বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

অত কথা আমি বলতে পারব না। আমি শুধু মান্যবর উজিরকে বলতে পারি ভাইকিংরা আপনাকে কিছু বলতে চান। এর বেশি আমি কিছু বলতে পারব না। রামাদ্দি বলল।

বেশ। তাই বলুন। কিন্তু শুধু এটুকু বললে উনি ভাববেন আমরা মুক্তির জন্য অনুরোধ করব। উনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে কোনো আগ্রহই বোধ করবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে। আমি বলব 'একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবে'। এর বেশি একটি কথাও বলব না। রামাদ্দি বলল।

ওতেই হবে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। ফ্রান্সিস বলল।

রামাদ্দি হেসে হাত বাড়িয়ে সিনাত্রার হাত ধরল। বলল—চলি কবিবন্ধু। তারপর রামাদ্দি আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে রাস্তায় উঠল। সেই উদাস ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল।

অদ্ভুত মানুষ। ফ্রান্সিস অস্ফুট স্বরে বলল।

যাই বলো ফ্রান্সিস—এরকম কবিতা-পাগল মানুষ আমি মাত্র একজনকে দেখেছি। সেই পাগল কবিকেই দেখেছিলাম। সিনাত্রা বলল।

কবিতার পুঁথিটার চামড়ার মলাটে আরবী ভাষায় নাম লেখা। নীচে পর্তুগীজ ভাষায় অর্থটা লেখা—বিষাদ। ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন নাম কেন? কী বেদনা কবি রামাদ্দির?

বিকেলের দিকে গরাদের কাছ থেকে একজন প্রহরীর হাঁক শোনা গেল—

মান্যবর উজির এসেছেন। ভাইকিংরা এখানে এসো। ফ্রান্সিস পাথুরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল। উঠে তাড়াতাড়ি উজিরের কাছে এল। দেখল উজির ইয়েপুদা দাঁড়িয়ে। প্রহরীরা সন্ত্রস্ত। ইয়েপুদা বলল, তুমিই তো দলনেতা?

'হ্যাঁ মান্যবর। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে ইয়েপুদা বলল—কী এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবে শুনি?

সে অনেক কথা। শুধু এইটুকু বলি যে আগে আমরা অনেক গুপ্ত ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছি ছড়া নকশা পাণ্ডুলিপি এসবের সাহায্যে। সভাকবি রামাদ্দির কাছে শুনলাম অনেকদিন আগে আপনাদের বিখ্যাত কবি আবিদি রব্বাহির ঐশ্বর্য সম্পদ নিখোঁজ হয়ে গেছে। উনি নাকি ঐ আধভাঙা দুর্গের একটি কুঠুরিতে তাঁর এক দীর্ঘদিনের সহচর আবু হামিদকে নিয়ে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত স্বেচ্ছানির্বাসনে ছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ। ঠিকই শুনেছো। তারপর বলো। উজির বলল।

আপনি যদি দয়া করে অনুমতি দেন তবে আমরা কয়েকজন মিলে সেই ঐশ্বর্যভাণ্ডার উদ্ধার করতে প্রস্তুত। ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে উজির জোরে হেসে উঠল। বলল—জানো কয়েকজন শাসক জ্ঞানী পণ্ডিতদের নিয়ে ঐ স্বর্ণভাণ্ডার দীর্ঘদিন খুঁজেছিলেন। আমিও দরবারের দুই পণ্ডিতকে নিয়ে কম চেষ্টা করিনি। আর শোনামাত্র তুমি তা উদ্ধার করবে? পাগলের প্রলাপ।

ঠিক আছে। আপনি আমাদের অনুমতি দিন। ফ্রান্সিস বলল।

তার মানে পালাবার ফিকির। উজির দেঁতো হাসি হাসল।

বন্ধুদের জন্য আমরা জীবন বিসর্জন দিয়ে থাকি। তাদের ফেলে রেখে হাজার প্রলোভনেও আমরা সরে পড়ি না। আমাদের এটুকু বিশ্বাস করতে পারেন। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে। এবার আসল কথাটা বলো তো। সেই ঐশ্বর্য ধরো উদ্ধার করলে। তারপরে? উজির মৃদু হেসে জানতে চাইল।

মহামান্য খলিফা হাকিমকে সব ঐশ্বর্য সম্পদ দিয়ে দেব। আমরা একটা স্বর্ণমুদ্রাও নেব না। ফ্রান্সিস বলল।

আশ্চর্য! তোমরা এত নির্লোভ? উজির একটু অবাক হয়ে বলল।

হ্যাঁ মান্যবর। যে সম্পদ কষ্ট করে ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে সঞ্চিত করিনি, তার প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

বিশ্বাস হল না। উজির মাথা নাড়ল।

আপনিই প্রথম নন। এর আগেও অনেকেই আমাদের বিশ্বাস করেনি। তারপরে গুপ্ত ধনভাণ্ডার যখন উদ্ধার করেছি, তাঁরা উল্লসিত হয়ে অনেকে অর্ধেক ধনসম্পদ আমাদের দিতে চেয়েছেন। আমরা একটা সাধারণ সোনার আংটিও নিইনি। আর যদি আমাদের বিশ্বাস না করেন তবে মহাকবির ঐ স্বর্ণভাণ্ডার চিরদিনের জন্য নিখোঁজই হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। তোমার আর কী বলবার আছে? উজির বলল।

আর দুটো কথা। এক—সভাকবি রামাদ্দি আমাদের সঙ্গী হবেন। কারণ আরবী ভাষা আমরা জানি না। কবি রামাদ্দি নানাভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ। আর একটা? উজির জানতে চাইল।

যদি আমরা ঐ নিখোঁজ সম্পদ উদ্ধার করতে পারি তাহলে আমাদের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে। ফ্রান্সিস বেশ জোর দিয়ে বলল।

ভেবে দেখি। উজির বলল।

আমারও তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে চাই। কাজেই কাল সকালের মধ্যে আমাদের খবর পাঠান। আমরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে পারব না। ফ্রান্সিস বলল।

আমরাও একটা শর্ত আছে। উজির বলল।

বলুন।

ঐ সম্পদ উদ্ধার হলে সব তোমাদের গোপন রাখতে হবে। কাউকে বলা চলবে না। উজির আস্তে বলল যাতে প্রহরীরা শুনতে না পারে।

কিন্তু কবি রামাদ্দি তো আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। ফ্রান্সিস বলল।

রামাদ্দি? ওটা উটের মতোই বোকা। উজির বিরক্তির সঙ্গে বলল।

তাহলে আমাদের নজরে রাখতে কেউ কি থাকবে না? ফ্রান্সিস বলল।

দরকার নেই। আমার লোকজনকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

উজির ঘুরে দাঁড়াল। প্রহরীরা সার বেঁধে দাঁড়াল। উজির চলে গেল।

ফ্রান্সিসের বুঝতে অসুবিধা হল না উজিরের লক্ষ্য কী। খলিফাকে অন্ধকারে রেখে সব সম্পদ গোপনে আত্মসাৎ করবে। উজির আগে থেকে অনেকদূর ভেবে রেখেছে। উজির একই সঙ্গে বুদ্ধিমান আর ধূর্ত। এটা বুঝল। উজির চলে গেল ফ্রান্সিসদের সুযোগ দেওয়া যাবে কিনা এসব ভাবতে ভাবতে। রাতে চোখ বুজে ভীষণ ঠাণ্ডা পাথুরে মেঝেয় শুয়ে শুয়ে ফ্রান্সিস ভাবছিল উজির ওর প্রস্তাবে রাজি হবে কিনা। ও বুঝে নিয়েছে উজিরের সঙ্গে কথায় আর ব্যবহারে খুব সতর্ক থাকতে হবে। উজির সন্দেহবাতিক। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলেই উজির বেঁকে দাঁড়াবে। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। মৃদুস্বরে বলল—ঘুমোওনি?

অনেক চিন্তা শাঙ্কো, ঘুম কী আসে! ফ্রান্সিস বলল।

কী ভাবছো? শাঙ্কো জিগ্যেস করল।

আকাশ-পাতাল। মৃদু হেসে ফ্রান্সিস বলল।

সাবধান ফ্রান্সিস। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে—

মায়েদের মতো উপদেশ দিও না তো। শোনো, মনে হয় কাল সকালেই জানতে পারব উজির কী সিদ্ধান্ত নিল। আর একটা কথা, উজিরের সামনে বেফাঁস কিছু বলে বসো না। তোমরা চুপ করে থাকবে, যা কথা বলার আমি বলব।

শাঙ্কোর একটু অভিমান হল। কিন্তু কিছু বলল না। পাশ ফিরে শুল।

সকালে গরাদে মুখ চেপে একজন প্রহরী হেঁড়ে গলায় বলল—রামাদ্দি এসেছেন। ফ্রান্সিস কে? এখানে এসো।

ফ্রান্সিস তখন বসেছিল। বেশ দ্রুতই গরাদের কাছে এল। দেখল রামাদ্দি দাঁড়িয়ে আছে। মুখে হাসি নেই। ফ্রান্সিসকে দেখে বলে উঠল—এ কী ঝামেলায় ফেললেন আমাকে?

কোনও ঝামেলায় আপনাকে ফেলা হবে না। এবার বলুন মাননীয় উজির কী বললেন? ফ্রান্সিস সাগ্রহে বলে উঠল।

আপনাদের মধ্যে নাকি কী সব শর্তটর্ত হয়েছে। যাকগে, ওসব নিয়ে আমার কোনও আগ্রহ নেই। মাননীয় উজির বললেন, আপনারা কী সব খোঁজাখুঁজি করবেন, আমাকে আপনাদের সঙ্গে থাকতে হবে অর্থাৎ সাহায্য করতে হবে।

হ্যাঁ, আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমাদের কাজ আমরা করব। প্রয়োজনে আপনার কাছে নানা বিষয় জানতে চাইব। ব্যস। আপনাকে একটা আঙুলও নাড়তে হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। রামাদ্দি দ্বিধান্বিত সুরে বলল।

সময় আসুক, সব জানবেন—বুঝবেন—দেখবেন। আমরা দেরি করব না। তাড়াতাড়ি দেশে ফিরব। আমরা আজ এখনই কাজে নামব।

বেশ, চলুন। কিন্তু উজিরের হুকুম মাত্র দু'জন ছাড়া পাবেন।

মুশকিল হল। ঠিক আছে। প্রথমে দু'জনই থাকব। পরে আরও লোকজন লাগবে কিনা দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

কোথায় যাবেন? রামাদ্দি জিগ্যেস করল।

ঐ আধভাঙা দুর্গে।

ওটা তো একটা পরিত্যক্ত দুর্গ। কখন ভেঙে পড়ে। রামাদ্দির আবার দ্বিধা।

বন্ধু রামাদ্দি, দুর্গের গাঁথনি অত পলকা হয় না। থাকগে, আমরা দুজন এখন বেরোতে চাই।

রামাদ্দি আর কথা না বাড়িয়ে প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলল—মাননীয় উজিরের হুকুম দু'জন বন্দীকে ছেড়ে দিতে হবে। আমার সঙ্গে যাবে ওরা।

একজন প্রহরী এগিয়ে এল। গরাদের তালা খুলে দিল। শাঙ্কোকে নিয়ে ফ্রান্সিস বেরিয়ে এল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল উজ্জ্বল রোদে ভরা এক সুন্দর সকাল। কিন্তু এই সৌন্দর্য দেখার বা মুগ্ধ হবার সময় কোথায়? সামনে তো অনিশ্চিত ঘটনার অন্ধকার। সেই অন্ধকারে খুঁজে বের করতে হবে মুক্তির আলো।

প্রথমে কোথায় যাবেন? রামাদ্দি জানতে চাইল।

প্রথমে যাব ঐ ভাঙা দুর্গে। কারণ, ওখানেই কোনও একটা কক্ষে কেটেছে কবি আবিদির শেষ নির্বাসিত জীবন। তাই কিনা? ফ্রান্সিস বলল।

বেশ, চলুন। রামাদ্দি হাঁটতে শুরু করল।

পাথুরে পথ দিয়ে কিছুদূর এসে একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে রামাদ্দি আঙুল তুলে ভাঙা দুর্গটা দেখাল। কালচে শক্ত পাথরে গাঁথা দুর্গ যেমন হয়। দুর্গে যাবার পথটা একসময় নিশ্চয়ই বড় ছিল। পাথরে বাঁধানো ছিল। এখন পরিত্যক্ত। ভাঙা পাথর ছড়িয়ে আছে। তার ওপর দিয়ে দেখেশুনে হেঁটে চলল তিনজনে। এখানে-ওখানে বুনো ঝোপঝাড়। পাথরের ফাঁক-ফোকরে সবুজ ঘাস গজিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা প্রবেশদ্বারের কাছে এল। এখানে-ওখানে ভেঙে পড়লেও অর্ধচন্দ্রের মতো দেউড়িটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। দেউড়ি পার হয়ে তিনজনে ভেতরে ঢুকল। উজ্জ্বল রোদে সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দুর্গ ঘিরে আধভাঙা প্রাকার দেখা গেল পেছনে। তাও সবটা দেখা গেল না। কারণ, মূল দুর্গের প্রায় গা ঘেঁষে শুরু হয়েছে বিরাট বিরাট গাছের জঙ্গল। খুব ঘন জঙ্গল নয়। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে নানারকম গাছ। বোঝাই যাচ্ছে অনেক বছর ধরে এই গাছগুলো গজিয়েছে। বড় হয়েছে। বিনা যত্নেই।

রামাদ্দি, কবি আবিদি কোন কক্ষে আশ্রয় নিয়েছিলেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

এখানেই তো রহস্য। কেউ জানে না। তখন দুর্গটা ছিল প্রায় জনশূন্য। শোনা যায়, তৎকালীন মুর শাসকের কিছু সৈন্য, কর্মচারী নাকি বিভিন্ন কক্ষে থাকত। তারা জানতই না যে অত বিখ্যাত একজন কবি সেখানে আশ্রয় নিয়েচেন। তিনি কারও সঙ্গে দেখা করতেন না। একমাত্র আবু হামিদ ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। শোনা যায়, আবু হামিদ ছিল নিরক্ষর। কবিই তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। প্রভুভক্ত আবু হামিদের কোনও পিছুটান ছিল না। ঘরসংসার বলেও কিছু ছিল না। সে নাকি কবিকে খাদ্য-পানীয় এনে দিত। তাও নাকি গভীর রাতে। রামাদ্দি বলল।

কিন্তু যেখান থেকে খাদ্য-পানীয় আনত তারা তো জানত। ফ্রান্সিস বলল।

মাত্র একজন খোঁড়া দোকানদারের কাছ থেকে আনত। আবু হামিদ নাকি অনেক মেতাশমেস মানে স্বর্ণমুদ্রা তাকে দিয়ে গেছিল। সেই খোঁড়া দোকানি কোনোদিন জানতেও পারেনি আবু হামিদ কে? জানতেও চায়নি কেন সে গভীর রাতে খাদ্য-পানীয় নিতে আসে। অত স্বর্ণমুদ্রা পেয়েই সে খুশি ছিল।

হুঁ, চলুন। যতখানি দেখা যায় আগে দেখে নিই। ফ্রান্সিস বলল।

চলুন। রামাদ্দি ওপরে ওঠার ভাঙা সিঁড়িটা। দেখিয়ে বলল।

ভারসাম্য বজায় রেখে ওরা ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। এপাশে-ওপাশে কয়েকটা ভেঙে পড়া মেঝে দেখে বোঝা গেল সেখানে থাকবার ঘর ছিল। তারপর ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে ছোট বারান্দা মতো। তারপরেই ভাঙা মেঝের চিহ্ন। ওখান থেকে পেছনের প্রাকার পর্যন্ত বনজঙ্গল স্পষ্ট দেখা গেল। খুব মন দিয়ে চারপাশে তাকাতে তাকাতে ফ্রান্সিস বলল—এখানেও একটা ঘর ছিল। তবে মেঝেসুদ্ধু ভেঙে পড়েছে। ওপরে তাকিয়ে খোলা আকাশ দেখল। এর পরে সিঁড়িটা অর্ধেক মতো উঠে একেবারে ভেঙে পড়েছে। আর ওপরে কিছু নেই। নীচের দিকে দেখল পাথরের পাটার স্তূপ। ভাঙা-আস্ত মেশানো।

আর কিছু আস্ত নেই। রামাদ্দি বলল।

হ্যাঁ, চলুন।

তিনজনে নেমে আসতে লাগল। এবার ফ্রান্সিস লক্ষ করল একেবারে নীচে মোটামুটি আস্ত পাথুরে দেওয়ালে বন-জঙ্গলের দিকে একটা চৌকোনা ভাঙা ফোকর। ফ্রান্সিস ঐ ফোকরটার কাছে গেল। ফোকরটা ভালো করে দেখেটেখে বুঝল এখানে একটা জানলা ছিল। নীচে ভাঙা পাথরের স্তূপে দেখল একটা লোহার ডাণ্ডা কিছুটা উঁচিয়ে আছে। রামাদ্দির দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল—তাহলে এই দুর্গের জানলাগুলিতে লোহার গরাদ বসানো ছিল।

আস্ত দুর্গটা যারা দেখেছে তারা তো কেউ বেঁচে নেই যে বলবে জানলা ছিল কি না। তবে এব্রো উপত্যকার একটা খুব পুরোনো দুর্গে মোটা মোটা গরাদ বসানো জানলা দেখেছি। বেশির ভাগই অবশ্য ভাঙা। রামাদ্দি বলল। তারপর বলল—ফিরে চলুন। এই ভাঙা দুর্গে কেউ আসে না। এই দুর্গে জঙ্গলে বড় সাপের উপদ্রব। বিষধর সব সাপ।

তিনজনে সাবধানে নেমে এল আধভাঙা সিঁড়ি দিয়ে।

পেছনের বন-জঙ্গলটা একবার দেখে আসি। ফ্রান্সিস বলল।

রামাদ্দি আঁতকে উঠে বলল—মাথা খারাপ! সাপের আড্ডা ওখানে।

কী করে জানলেন?

বাঃ! ভাঙা দুর্গে তো অনেক সময় দামি ধনরত্ন গোপনে রাখা হয়। অন্তত পাঁচজন চোর সেই ধনরত্ন খুঁজতে এসে নাকি সাপের কামড়ে মারা গেছে। রামাদ্দি বলল।

রামাদ্দি—ফ্রান্সিস হেসে বলল—ধনরত্ন যেটুকু ছিল তা আগেই লোপাট হয়ে গিয়েছিল। মনে হয় ওরা রাতের অন্ধকারে এসেছিল বলেই সাপের মুখে পড়েছিল। এখন তো উজ্জ্বল রোদের দিন। চলুন, যতটা দেখা যায়।

রামাদ্দি বেজার হয়ে বলল, চলুন।

দুর্গের পাথুরে দেওয়ালে প্রায় গা লাগিয়ে জঙ্গল শুরু হয়েছে। ফ্রান্সিস একবার মাথা উঁচু করে যে ধসে-পড়া ঘর আর ভাঙা জানলাটা দেখেছিল সেটার বরাবর জঙ্গলে ঢুকল। বেশ ঘন বন এদিকটায়। বনের নীচে এই দুপুরেও আবছা অন্ধকার। সাবধানে চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বেশ কিছুটা চলে আসতেই দেখল দুটো জোড়া খেজুর গাছ। গাছ দুটোর মধ্যে মাত্র হাতখানেক দূরত্ব।

তাহলে এসব জায়গায় খেজুর গাছও হয়? ফ্রান্সিস রামাদ্দিকে জিগ্যেস করল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। মরুভূমিতে হয় আর এখানে হবে না? খেজুর গাছ বাঁচেও অনেক বছর। রামাদ্দি বলল।

ফ্রান্সিস মুখ তুলে দেখল বেশ উঁচু গাছ দুটো। ছুঁচোলো পাতাগুলো অনেকটা ছড়ানো। খেজুরও হয়েছে। তবে পাকা নয়, কাঁচা।

এগুলো কেমন জাতের খেজুর গাছ? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

একবার ওপরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে রামাদ্দি বলল, খুব ভালো জাতের খেজুর গাছ। এ সব গাছের খেজুর খুব মিষ্টি হয়। এবার ফিরে চলুন। রামাদ্দি একটু বিরক্ত হয়েই বলল।

সাপের ভয়? তাই না? ফ্রান্সিস হেসে বলল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। কখন দুটো-একটা ফোঁস করে ওঠে তার কি ঠিক আছে?

ঠিক আছে, চলুন। পরে না হয় আসা যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

বন-জঙ্গল, ঝোপঝাড় ঠেলে তিনজন বেরিয়ে এল।

আর কিছু দেখার আছে? আমার তো মনে হয়—

রামাদ্দিকে থামিয়ে ফ্রান্সিস বলল, দেখি ভেবে।

পাটা-ভাঙা, পাথর-ছড়ানো রাস্তাটা দিয়ে তিনজনে পাহাড়ি রাস্তাটায় উঠল। চলল সেই গিরিসংকটের দিকে। বেলা বেড়েছে। খিদেও পেয়েছে। রামাদ্দি দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, আমি তাহলে চলি?

কালকে সকালে আসবেন কিন্তু। ঐ দুর্গে যাব।

ঠিক আছে। বেশ ব্যাজার মুখে রামাদ্দি বলল। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল।

ঘেরা জায়গার বন্দীশালায় আসতে বিনোলারা কয়েকজন এগিয়ে এল। শাঙ্কো ভাঙা দুর্গ দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগল।

রাতে ওপরের তারাজ্বলা কালো আকাশ আর ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল—হাতে সময় বেশি নেই। যত দ্রুত সম্ভব ঐ ধনৈশ্বর্যের ভাণ্ডার খুঁজে বের করতে হবে। মারিয়া, হ্যারি আর কতদিন ঐ বাড়িতে থাকতে পারবে? কিন্তু কোনও সূত্রই তো আজ পাওয়া গেল না।

পরের দিন সকালে রামাদ্দি এল। আবার তিনজন দুর্গের দিকে চলল। রামাদ্দির মুখে হাসি নেই। ফ্রান্সিস আড়চোখে ওর মুখ দেখে বুঝল, কবিতার ভাবনা ছেড়ে এইসব ধনৈশ্বর্যের সন্ধান ওর কবিস্বভাবের বিরোধী। কিন্তু উজিরের হুকুম। ও নিরুপায়।

ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে সন্তর্পণে ওপরে উঠতে উঠতে ফ্রান্সিস ভাবল, প্রথমেই খুঁজে বের করতে হবে কোন ঘরে কবি আবিদি স্বেচ্ছাবন্দী ছিলেন। ফ্রান্সিস আবার সেই ধসে-পড়া মেঝে আর ভাঙা জানলাটার কাছে এল। ভাঙা প্রায় চৌকোনা খোঁদলটা দিয়ে পেছনের বন-জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইল। আবার সেই জোড়া খেজুর গাছ দুটো অন্য গাছগুলির মধ্যে দিয়ে বেশ দেখা যাচ্ছে। বোধহয় ছড়ানো থাকায় খেজুর গাছের পাতাগুলিও দেখা যাচ্ছে। এবার ফ্রান্সিস নীচে ভাঙা পাথরের পাটাগুলির দিকে তাকাল। ভালো করে হিসেব করে দেখল মেঝের পাথরের পাটাগুলি ভেঙে পড়লেও সব একেবারে নীচে পড়ে যায়নি। কারণ, নীচের ঘরের মেঝেটা অটুট আছে। সেখানেই ভাঙা পাথরের পাটাগুলি পড়েছে। কিছু লোকের সাহায্য পেলে সরানো যাবে। যদি ধরে নেওয়া যায় এখানে একটা ঘর ছিল তাহলে এই ঘরে যা কিছু ছিল, যেমন খাওয়ার বাসন-কোসন, জলের জায়গা, শোবার জন্য কাঠের কোনও আসবাব সবই চাপা পড়ে গেছে পাথরের পাটার তলায়। ফ্রান্সিস রামাদ্দিকে বলল, ঐ তলার পাথরের ভাঙা পাটাগুলি সরাতে হবে। আপনি উজিরকে গিয়ে বলুন আমাদের কিছু লোক লাগবে। আমরা মাত্র তিনজন ওসব সরাতে গেলে সাত-আটদিন লেগে যাবে।

কিন্তু ওসব সরিয়ে কী হবে? রামাদ্দি কিছুই বুঝে উঠতে পারল না।

ঠিক আছে। আগে তো জায়গাটা পরিষ্কার করা হোক। ফ্রান্সিস বলল।

কী যে পাগলামি! রামাদ্দি বিরক্ত হয়ে বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, আমার পাগলামি বলেই ধরে নিন না। তারপর বলল, কাজটা আমি এখনই শুরু করতে চাই। দেশে ফিরব। খুব তাড়া আমাদের।

কিন্তু এখন উজিরের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তো উনি খেপে যাবেন। আপনাদের ছেড়ে চলে এলাম কেন তার জবাবদিহি তো করতে হবে। রামাদ্দি বলল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। উনি খুব বুদ্ধিমান মানুষ তো। ধরে নিতে পারেন এটা আমাদের দু'জনের পালাবার ফিকির। ফ্রান্সিস বলল।

কী জানি! রামাদ্দি কথাটা ঠিক বুঝল না।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, কাল থেকে এখানে আসা-যাওয়ার সময় পাগড়িপরা একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। উজিরের নজরদারিতে কোনও ফাঁক নেই। এক কাজ করুন—ঐ লোকটিকে বলুন এখানে এসে আমাদের নজরে রাখতে। সুবিধে পেলে আমরা পালিয়ে যেতে পারি একথাও বলবেন।

একটু ভেবে নিয়ে রামাদ্দি বলল, ঠিক আছে, যাচ্ছি। এসব ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি মিটে যায় ততই ভালো।

কথাটা বলে রামাদ্দি নীচে নেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে সেই পাগড়িপরা লোকটি এল। কোনও কথা না বলে একটা লম্বা পাথরের পাটাতনে চুপ করে বসে রইল। ভাবভঙ্গি নির্বিকার।

রাজি হবে? শাঙ্কো দেশের ভাষায় মৃদুস্বরে বলল।

আলবৎ রাজি হবে! ধনৈশ্বর্য পাবে অথচ একটা আঙুল নাড়ার কষ্টও হবে না—এ হয়? ফ্রান্সিসও দেশিয় ভাষায় বলল।

ফ্রান্সিস অপেক্ষা করতে লাগল। বেশ কিছু সময় গেল। রাস্তার দিকে পাথরের টুকরোর ওপর দিয়ে লোকজনের চলার শব্দ হল। একটু পরেই একদল যোদ্ধা উঠে এল। পেছনে রামাদ্দি।

নিন—লোকজন আনা হয়েছে। আপনার ইচ্ছে পূরণ করুন। একটু বিরক্তির সঙ্গেই রামাদ্দি বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—কবিরা বোধহয় একটু অভিমানী হয়। এবার রামাদ্দি হেসে বলল—সত্যি, এভাবে বলা আমার উচিত হয়নি। মাফ চাইছি।

ফ্রান্সিস যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বলল—নীচে যে ভাঙা পাটা পাথরের স্তূপ পড়ে আছে, ওগুলো সব হাতে হাতে ফেলে দিতে হবে।

যোদ্ধারা কিছুই বুঝল না কেন ঐ সব ধসে-পড়া ভাঙা পাথর তুলে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু যোদ্ধা তো। প্রশ্ন করতে ওরা অভ্যস্ত নয়। ওরা ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে নীচে

নেমে এল। বন-জঙ্গলের দিকে পাথরের দেওয়ালটা ভেঙে গেলেও সবটা ভেঙে পড়েনি। ওরা পাথরের ভাঙা ও আস্ত পাটাগুলো তুলে সেই ভাঙা জায়গাটা দিয়ে বাইরে ফেলতে শুরু করল। নিস্তব্ধ জায়গাটায় পাথর ফেলার শব্দ শুরু হল। বেশ কিছু পাটা ফেলা হতেই পাথরের মধ্যে একটা কাঠের পায়া উঁচু হয়ে আছে দেখা গেল। সেখানকার পাথর ফেলে দিতেই একটা শোবার আসবাব দেখা গেল।

খুব সাধারণ আসবাব। ধুলো-কাদায় মাখামাখি। ফ্রান্সিস খুশির চোখে শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল, শাঙ্কো, এবার আমি নিশ্চিত। এর ওপরে একটা ঘর ছিল। কবি আবিদি সেই ঘরেই স্বেচ্ছাবন্দী ছিলেন।

ভাঙা দেওয়ালের দিকটায় দেখা গেল বেশ কয়েকটা ময়লা চামড়া মেশানো হলদেটে কাগজ। ফ্রান্সিস বলে উঠল, শাঙ্কো, যাও, খুব সাবধানে কাগজগুলো তুলে আনো। আর কাউকে হাত লাগাতে দিও না। শাঙ্কো খুব একটা বিস্মিত হল না। ফ্রান্সিসের অনেক বিস্ময়কর আবিষ্কারের প্রত্যক্ষদর্শী শাঙ্কো। ও একছুটে গিয়ে খুব সাবধানে কাগজগুলো তুলতে লাগল। তবু জীর্ণ পাতাগুলোর এখানে-ওখানে ছিঁড়ে গেল। রামাদ্দির বিস্ময়ের শেষ নেই। শাঙ্কো সব ক'টা কাগজ সাবধানে তুলে এনে ফ্রান্সিসের হাতে আস্তে আস্তে একটা একটা করে দিতে লাগল। প্রথমটায় খুব অস্পষ্ট কিছু লেখা দেখে ফ্রান্সিস বুঝল আরবি অক্ষর। ওর বোধগম্য নয়। তখনই বাইরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। ফ্রান্সিস কোথাও কোথাও খসে পড়া পাতাগুলির একটা রামাদ্দির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—সাবধানে ধরুন। রামাদ্দি সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে পাতাগুলি নিতে লাগল।

পরে পড়বেন। সাবধানে, ছেঁড়ে না যেন। ফ্রান্সিস মৃদু স্বরে বলল।

রামাদ্দি যন্ত্রচালিতের মতো পাতাগুলি হাতে জোড়া করতে লাগল। তখনই সেনাপতি উঠে এল। যোদ্ধারা সন্ত্রস্ত হয়ে কাজ থামাল।

কাজ চলছে? যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে সেনাপতি গম্ভীর গলায় বলল। দু'একজন যোদ্ধা বলে উঠল—হ্যাঁ, জনাব।

ফ্রান্সিস বলল—রামাদ্দি, ভালো করে দেখুন তো, কিছু লেখা আছে মনে হচ্ছে।

একটা কাগজ আলতো হাতে নিয়ে একটুক্ষণ অস্পষ্ট হয়ে আসা অক্ষরগুলো দেখে রামাদ্দি বলল, আপনার অনুমান ঠিক।

কী লেখা আছে? ফ্রান্সিস সাগ্রহে জিগ্যেস করল।

ভালো পড়া যাচ্ছে না। যা পড়া যাচ্ছে সেটুকু পড়ে মনে হল, কেউ রোজনামচা মতো কিছু লিখেছে। তবে সন-তারিখ কিছু নেই।

রামাদ্দি, ওসব কবি আবিদির ছায়াসঙ্গী আবু হামিদের লেখা রোজনামচা।

তাড়াতাড়ি পাঠোদ্ধার করুন। এই লেখাগুলো থেকে অনেক কিছু জানা যাবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ সব। ফ্রান্সিস বলে উঠল।

দেখছি বানান-টানান ভুল আছে। রামাদ্দি বলল।

স্বাভাবিক। আবু হামিদ খুব উচ্চশিক্ষিত ছিল না। এক কাজ করুন, বাইরে চড়া রোদে গিয়ে বসুন। সাবধানে পাতাগুলো পরপর সাজাবার চেষ্টা করুন। আস্তে আস্তে পাঠোদ্ধার করুন। দেখবেন, কোনও কাগজ যেন একেবারে ছিঁড়ে না যায়। একটু তাড়াতাড়ি করুন।

বিস্মিত রামাদ্দি কাগজগুলো নিয়ে ভাঙা ঘরের বাইরে চলে গেল। একটা লম্বাটে পাথরের পাটায় বসে আলতো হাতে কাগজগুলো নিয়ে নিয়ে পরপর সাজাল। তারপর পড়তে লাগল। সেনাপতি কোনও কথা না বলে ফ্রান্সিসের কাণ্ড দেখছিল। তার বিরক্ত মুখ দেখেই শাঙ্কো বুঝল, সেনাপতি এসবের কোনও অর্থই বুঝে উঠতে পারছে না। যোদ্ধারা কাজ থামিয়ে দাঁড়িয়ে একটু একটু হাঁপাচ্ছিল। ফ্রান্সিস ওদের দিকে তাকিয়ে বলল—মেঝের কোনার দিকটা এখনও পরিষ্কার হয়নি। হাত লাগাও ভাই। ওরা সেনাপতির মুখের দিকে তাকাল। সেনাপতি মাথা তুলে সম্মতির ইঙ্গিত করল। শুরু হল পাথর সরানোর কাজ। ভাঙা দেওয়ালের বাইরে পাথরের ভাঙা আস্ত পাটা পড়তে লাগল। আবার ঠক্ ঠকাস্ শব্দ শুরু হল। তখনই দেখা গেল কোনার দিকটা ভেঙে পড়েছে। ফ্রান্সিস দ্রুত এগিয়ে এসে ভাঙা জায়গাটা দিয়ে নীচের দিকে তাকাল। বাইরে কড়া রোদ। কিন্তু ওখানটা খুব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অস্পষ্ট একটা উঁচিয়ে থাকা গোল লোহার কড়ামতো দেখল ভাঙা পাথরগুলির মধ্যে। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হল। ও উজিরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সব গোপন রাখবে। দু'তিনজন যোদ্ধাও ঐ লোহার কড়াটা অস্পষ্ট দেখেছিল। তাদের একজন ফ্রান্সিসকে বলল—ওটা কী? ফ্রান্সিস প্রশ্নটার কোনও গুরুত্ব না দিয়ে বলল—তেমন কিছু না। দেওয়ালে গাঁথা থাকে মশাল রাখার যে কড়া তেমনই কিছু। তোমরা ভাই কাজ বন্ধ রাখো।

যোদ্ধারা ওখান থেকে সরে ওপরের ভাঙা সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। সেনাপতি কাছেই দাঁড়িয়েছিল। যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বলল—কী ব্যাপার? ওখানে কী আছে? একজন যোদ্ধা হাত নেড়ে বলল—কিছু না। একটা ভাঙা লোহার কড়া।

ও। সেনাপতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল। তখনই রামাদ্দি কাগজগুলো নিয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—আপনি ঠিকই বলেছেন। এগুলো আবু হামিদেরই লেখা রোজনামচা। যথাসম্ভব পরপর সাজিয়েছি। অনেক শব্দ পড়া যায়নি। সবই কেমন ছাড়া ছাড়া হয়ে গেছে।

আসুন। ফ্রান্সিস সরে এসে সিঁড়িতে বসল। রামাদ্দিকে পাশে বসতে ইঙ্গিত করল। রামাদ্দি পাশে বসল।

এবার পরপর বলে যান। যতটুকু পড়তে পেরেছেন, সাজাতে পেরেছেন—পড়ুন। রামাদ্দি পাতাগুলো একটা একটা করে নিয়ে পড়তে লাগল—

শহরে জোর গুজব—সীমান্তে শত্রুসৈন্য—ক'দিন ধরেই গুজবের পর গুজব—আতঙ্ক। গভীর রাত। ঘুম ভেঙে—জনাব রব্বাহিকে—রব্বাহি প্রচণ্ড উত্তেজিত—পায়চারি—ভীষণ বিপদ—জনাব রব্বাহিকে—অনেক রাতে—মুখে মুখে গিজেল—লুকিয়ে লিখি—এরকম দেখিনি। আজ দেখছি—অন্যরকম—দেখছি—হামিদ—সব ধনসম্পদ—পালাব—লুঠ হয়ে যাবে। রামাদ্দি থামল। বলল—পাতা নেই। তারপর আবার লেখা—চোরকুঠুরি থেকে—কাঠে গিল্টি করা—ভার—জনাব তৈরি—অন্ধকার পথ—কাঁধ ভেঙে আসছিল—জনশূন্য চারদিক—আমাকেই দুর্গে ঢোকার ব্যবস্থা—পরিত্যক্ত ঘর—। রামাদ্দি থামল। বলল—পাতা নেই। একটা পাতা পড়াই যাচ্ছে না।

ফ্রান্সিস উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল—তারপর?

রামাদ্দি পড়তে লাগল—খাদ্য-পানীয়—গভীর রাতে—খোঁড়া সুলেমান—সব জমা করি। রামাদ্দি থামল। বলল—পড়া যাচ্ছে না।

যা পড়তে পারছেন বলে যান। ফ্রান্সিসের গলায় স্পষ্ট উত্তেজনা। রামাদ্দি পড়তে লাগল—একটা বিষধর সাপ—মেঝেয় ঘোরে—মারতে দিলেন না—সিন্দুক রাখা—ফোঁস ফোঁস শব্দ—ঘুম—ভয়—আদর করেন—পোকামাকড়—বনজঙ্গল ঘুরে—জমাই—জানালার গরাদে—রাতে জাগেন—গিজেল শুনি—গোপনে লিখি—জমিয়ে রাখি—এক গভীর রাতে—চিৎকার—অর্থহীন ঐশ্বর্য ছুঁড়ে ফেলে দেব—সিন্দুক ওঠা—গরাদে—বাইরে জোড়া খেজুর গাছ—খেজুর গাছ—দীর্ঘজীবী—মানুষের জীবন—ফেলে দেব সব—ছুঁড়ে—ঈশ্বরের আরাধনাই—শ্রেষ্ঠতম—সঞ্চয়ে শান্তি নেই—ছুঁড়ে ফেলে দেব। মহা শান্তি—ফুঁসে উঠল সাপ—। রামাদ্দি থামল। বলল—আর কোনও কাগজ নেই। হয়তো আরও কিছু গুছিয়ে লেখা ছিল। ফ্রান্সিস উত্তেজনার মধ্যে কথাগুলির ফাঁকগুলো মনে মনে সাজিয়ে ভেবে নিচ্ছিল। হ্যারির কথা বারবার মনে পড়তে লাগল। হ্যারি থাকলে ঠিক সব সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পারত। কিন্তু হতাশ হওয়া চলবে না। ও বলে উঠল—রামাদ্দি, মান্যবর উজিরকে খবর পাঠান, আর সব যোদ্ধাকে চলে যেতে বলুন। ওদের কাজ শেষ।

রামাদ্দি এ কথার কোনও অর্থই বুঝল না। ও ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। শাঙ্কো পাশে বসে সব শুনছিল। মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস যখন বলছে জানবেন এর পেছনে কোনও—মানে—গোপন কারণ আছে। ও যা বলছে তাই করুন।

রামাদ্দি উঠে দাঁড়াল। কাগজগুলো রেখে সেনাপতির কাছে এল।

কী সব বকবক করছিলেন? গিজেল বানাচ্ছিলেন? বিরক্ত সেনাপতি বলল।

ঐ রকমই। তবে লেখা গিজেল। এক্ষুনি মান্যবর উজিরকে খবর দিন। উনি যেন তাড়াতাড়ি আসেন। রামাদ্দি বলল।

সেনাপতি চলে গেল। বাইরে পাথুরে রাস্তায় ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল—ঠক্ ঠকাস্। রামাদ্দি যোদ্ধাদের কাছে গেল। বল—ভাই, কাজ শেষ। মান্যবর উজির আসছেন। তোমাদের ছুটি। মান্যবরকে আমি যা বলার বলব।

যোদ্ধারা আস্তে আস্তে চলে গেল। শাঙ্কো দেশের ভাষায় মৃদুস্বরে বলল—উনি আসছেন। তুমি কি নিশ্চিত?

নীচে একটা গোল লোহার কড়া দেখেছ তো? ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

হ্যাঁ, খুব অস্পষ্ট। শাঙ্কো বলল।

ওটা একটা গিল্টিকরা সিন্দুকের কড়া। ওটাতেই রয়েছে কবি আবিদি রব্বাহির গুপ্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডার। অবশ্য এখনও সঠিক সেটা বলার সময় আসেনি। অপেক্ষা করি।

সাবাস ফ্রান্সিস! তোমার সব অনুমান সত্যি। শাঙ্কো খুশির স্বরে বলে উঠল।

ওদের মৃদুস্বরে কথা বলতে দেখে রামাদ্দি কাছে এল। বলল—কী কথা হচ্ছিল?

এই ঘরের ওপরের ঘরেই কবি আবিদি রব্বাহি তাঁর স্বেচ্ছা নির্বাসনের শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর বিশ্বস্ত ছায়াসঙ্গী আবু হামিদ। সাপ পোষ মানে কিনা জানি না। তবে এক বিষধর সাপের কামড়ে আবিদি মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু আবু হামিদের মৃত্যুর কারণ বা সময় এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। ফ্রান্সিস বলল।

তবে তো তাঁদের পবিত্র দেহাবশেষ এইখানেই পাওয়া যাবে। রামাদ্দি বলল।

নিশ্চয়ই পাবেন। যদিও এতদিন পরে কতটা অক্ষত আছে বলতে পারব না। ফ্রান্সিস বলল।

আর কী সব খুঁজছিলেন সে সব? রামাদ্দি জানতে চাইল।

মান্যবর উজির এলে সবই জানবেন, দেখবেন। ফ্রান্সিস বলল।

একটু পরেই ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল পাথুরে রাস্তায়। ফ্রান্সিস আর



ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ঝোপজঙ্গল সরিয়ে সরিয়ে দেখতে লাগল।

শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। দ্রুতপায়েই উঠে এলেন উজির। একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—কী ব্যাপার? উদ্ধার করতে পেরেছ সেই ঐশ্বর্যভাণ্ডার?

না। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল।

শুনে উজির দু'হাত ছড়িয়ে হতাশার ভঙ্গি করলেন। বললেন—তাহলে আমাকে কেন এভাবে ছুটিয়ে মারলে?

সেনাপতিকে বলুন একটা শক্ত দড়ি আর জাহাজের একটা নোঙর আনতে। ফ্রান্সিস বলল।

কী হবে ও সবে? উজির অবাক।

একটু তাড়াতাড়ি আনতে বলুন। ফ্রান্সিস শান্ত স্বরে বলল।

বিরস মুখে উজির সেনাপতিকে শক্ত দড়ি আর একটা নোঙর আনতে বললেন। রামাদ্দি তখনও অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে। ও তখন ভাবছে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! পরক্ষণেই ভাবল, ফ্রান্সিস তো কবি আবিদির মৃত্যুর ঘটনা বেশ গুছিয়ে বলে গেল। এটা কী করে সম্ভব? এত কথা যে বলতে পারে সে কখনওই পাগল নয়। সবাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল। শুধু উজির হাতে ধরা ঘোড়া চালানোর চাবুকটা হাতে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আবার ছেড়ে দিচ্ছিলেন। বেশ অসহিষ্ণু ভঙ্গি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দড়ি আর নোঙর নিয়ে সেনাপতি এল। এত তাড়াতাড়ি কী করে আনল সেটা আর কেউ জিগ্যেস করল না। ফ্রান্সিস বলল, মান্যবর, এবার সেনাপতিকে চলে যেতে বলুন। ওঁকে আর দরকার নেই।

উজির আর কারণ জানতে না চেয়ে সেনাপতিকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। সেনাপতি ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ফ্রান্সিস চুপ করে কান পেতে রইল। বাইরে সেনাপতির ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। সেটাও মিলিয়ে গেল এক সময়। ফ্রান্সিস উজিরের দিকে তাকিয়ে বলল—সব গোপন রাখব কথা দিয়েছিলাম। তাই সবাইকে সরিয়ে দিলাম। কবি রামাদ্দিকে আপনি কোনও গুরুত্বই দেননি। তাই উনি থাকুন। উনি অন্যরকম মানুষ। এবার আমার সঙ্গে আসুন।

ফ্রান্সিস ধীর পায়ে সেই ভেঙে পড়া জায়গাটায় এসে দাঁড়াল। উজির পাশে এসে দাঁড়ালেন। ফ্রান্সিস সেই কড়াটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—ওটা একটা কাঠের গিল্টিকরা সিন্দুক। ওটার মধ্যেই আছে বিখ্যাত কবি আবিদি রব্বাহির ঐশ্বর্যভাণ্ডার।

উজির ভীষণভাবে চমকে উঠে বললেন—বলো কী? তাঁর তখন দু'চোখ কপালে।

ওটা তুলতেই দড়ি-নোঙর আনিয়েছি। ওখানে নামতে গেলে যে কোনও মুহূর্তে মেঝে ভেঙে পড়তে পারে। তাতে প্রাণহানি ঘটবে। এবার কাজে নামা যাক। শাঙ্কো, দড়ি নিয়ে এসো। রামাদ্দিও আসুন।

শাঙ্কো তো এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত। ও দড়ি এনে নোঙরের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল। ওরা দক্ষ নাবিক। দড়ির নানারকম গিঁট বাঁধতে ওস্তাদ। তারপর ঐ ভাঙা গর্তের মতো জায়গাটায় নোঙরটা নামিয়ে দিল। আবছা আলোয় লক্ষ্য স্থির করে নোঙরের বঁড়শির মতো মুখটা আস্তে আস্তে ঐ কড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর টেনে ধরল।

রামাদ্দি, হাত লাগান। ফ্রান্সিস দড়িটা ধরে বলল—খুব বেশি ভার হবে না। আবু হামিদ একাই কাঁধে করে এতখানি পথ এসেছিল।

বিস্ময়াভিভূত রামাদ্দি যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে এসে দড়িটা ধরল। দেখে উজিরও এগিয়ে এসে ধরলেন। চারজনে মিলে টানতে লাগল। একটু পরেই ভাঙা-আস্ত পাথরের পাটাতনে ঢাকা-পড়ে-যাওয়া সিন্দুকটা উঠে আসতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওটা তোলা হল। সত্যি কাঠের ওপর সোনা-রুপোর সুন্দর কাজ করা সিন্দুক। কিন্তু কোনও তালা ঝুলছে না। উজির একলাফে এগিয়ে এসে ডালা ধরে টান দিলেন। বেশ শক্তভাবে আঁটা কতদিন আগের সিন্দুক! দু'একবার টানাটানি করে জোরে শ্বাস ফেলে সরে দাঁড়ালেন। এবার শাঙ্কো এগিয়ে এসে জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই ডালাটা খুলে গেল। কিন্তু এ কী?—ভেতরটা শূন্য! পড়ে আছে চামড়া মেশানো কাগজের একটা বান্ডিল মতো। পাশে ওল্টানো একটা পাথরের দোয়াত আর ছুঁচোলো করে কাটা কলম। দোয়াতের কালো কালি কাগজের কোনায় আঠার মতো সেঁটে আছে। উজির স্তব্ধ হয়ে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু রামাদ্দি উল্লাসে আনন্দে দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠল। দ্রুত হাত বাড়িয়ে তুলে নিল কাগজগুলো। ওপরের কাগজটায় আরবি ভাষায় লেখা কয়েক লাইন পড়েই সব কাগজগুলি বুকে চেপে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। চরম বিরক্তিতে নির্বাক উজির সেই কান্নার শব্দে সচকিত হয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন—থাম্ উজবুক।

কিন্তু কে থামাবে রামাদ্দিকে? রামাদ্দি কেঁদেই চলল। উজির অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ-মুখ শুকিয়ে গেছে যেন। উজির উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন—এই তোমার আবিষ্কার! কতকগুলো বস্তাপচা কাগজ!

শাঙ্কোও বিস্ময়ে নির্বাক। ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়েই রইল।

এই রামাদ্দি, এই সিন্দুক তোল—তোল।

কাকে বলা? রামাদ্দি তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। কাগজগুলো বুকে জড়িয়ে বসে বসে কেঁদে চলেছে।

ঠিক আছে, আমিই ছুঁড়ে ফেলছি। উজির কথাটা বলে ছুটে এসে ভারী সিন্দুকটা তুলে নিলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে ভাঙা দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে সেটাকে বাইরে ফেলে দিলেন। খুব জোরে শব্দ হল না। কতদিন আগেকার সিন্দুক। হয়তো ভেঙে কাঠের ডালা ছিটকেই গেল। সেই শব্দে ফ্রান্সিস চমকে উঠে ভাঙা দেয়ালের দিকে তাকাল। গরাদ থাকলে উজির কি পারতেন ঐ সিন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলতে? সঙ্গে সঙ্গে রামাদ্দির পড়া শেষ দিকটা মনে পড়ল—সব ছুঁড়ে ফেলে দেব—মহা শান্তি—! ফ্রান্সিসের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখে হাসি ফুটে উঠল। উজিরের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বলল—বাইরে ঐ জঙ্গলের দিকে চলুন।

তার মানে? উজিরের বিস্ময়ের শেষ নেই।

ওখানেই ছড়িয়ে আছে কবি আবিদির ঐশ্বর্যভাণ্ডার। চলুন। ফ্রান্সিস একই ভাবে শান্ত স্বরে বলল। উজির বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন। লোকটা বলে কী?

ফ্রান্সিস ভাঙা সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে বলল—আসুন। উজির কী বুঝল কে জানে। ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। পেছনে শাঙ্কো। ফ্রান্সিসের উজ্জ্বল চোখ-মুখ দেখেই বুঝল—ফ্রান্সিস এবার ঠিক খুঁজে পেয়েছে।

তিনজন পেছনের জঙ্গলের কাছে এল। দুর্গের ভাঙা জানালাটা দেখিয়ে ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডেকে বলল—ওই জানালা বরাবর জোড়া খেজুর গাছ পর্যন্ত এলাকাটা ভালো কের খুঁজতে হবে। সাবধান—বিষধর সাপ আছে। খুঁজো ঝোপ-জঙ্গল, গাছের নীচে পাবে মূল্যবান মণিরত্ন, সোনা-রুপো। রামাদ্দি থাকলে খুঁজতে সুবিধে হত। কিন্তু উনি এখন হিসেবের বাইরে। এসো। উজির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ঝোপ-জঙ্গল কখনো উপড়ে ফেলে কখনো ডাল-টাল ভেঙে ফেলে নীচের পাথরকুচি মেশানো মাটি দু'হাতে সরিয়ে সরিয়ে দেখতে দেখতে এগোতে লাগল। কিছু পাওয়া গেল না। ফ্রান্সিস বুঝল প্রায় দেড়শো বছর আগের ঘটনা। পাথরকুচি মাটি জমে উঁচু হয়েছে। খুঁড়ে না ফেললে কিছু পাওয়া যাবে না। তখন জোড়া খেজুর গাছের কাছে এসে একটা ছোট বুনো গাছ হ্যাঁচকা টান দিয়ে উপড়ে ফেলল। এক চাপড়া পাথরকুচি মেশানো মাটি উপড়ে এল সেই সঙ্গে। দেখল চৌকোনা কিছুর একটা কোনা বেরিয়ে আছে। শাঙ্কো দ্রুত বসে পড়ে দু'হাতে ঘাস ছিঁড়ে মাটি সরিয়ে দেখল একটা ধুলো-মাটি মাখা চৌকোনা কিছু। ওটাও কয়েকটা টানে তুলে ফেলে ডাকল—ফ্রান্সিস, দেখো তো এটা কী? ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে শাঙ্কোর

কাছে এল। কোমর থেকে ফেট্টিটা খুলে চেপে চেপে মাটি, ঘাস, ঘষে তুলে ফেলতে ফেলতে দেখল সোনার লম্বাটে চৌকোনা পাটা মতো। তাতে কিছু লেখা। কিন্তু ভাষাটা বুঝল না। ওটা হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস উজিরের কাছে এল। উজিরের হাতে দিয়ে বলল—দেখুন তো, সোনার ওপরে কী যেন কুঁদে লেখা? উজির নিরেট সোনার জিনিসটা দেখে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল। মাটিমাখা লেখাগুলো দেখতে দেখতে সবিস্ময়ে বলে উঠল—কবি আবিদি রব্বাহিকে দেওয়া মানপত্র। হিব্রু ভাষায় লেখা। নীচে একজন খলিফার নাম রয়েছে। সন-তারিখটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

—এবার ওই জোড়া খেজুর গাছ পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটারই জঙ্গল, ঘাস খুঁড়ে ফেলুন। কিন্তু এখন নয়। গোপনে। রাত্রে। কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক নিয়ে খুঁড়বেন। কারণ আপনি সব গোপন করবেন বলেছিলেন।

—সব ধনৈশ্বর্য এখানে আছে? উজির আগ্রহে অধীর।

ফ্রান্সিস বলল—অবশ্যই আছে। একটা নমুনা তো আপনার হাতে। তারপর শান্তস্বরে বলল—এবার আমার শর্ত মনে করুন। আমাদের সবাইকে মুক্তি দিন।

—আগে সব উদ্ধার করি। উজির বলল।

—তাহলে আজ রাতেই কাজে নামুন। সারারাতে কিছু সম্পদ তো পাবেনই। তাহলে কাল সকালে আমাদের মুক্তি দিন। ফ্রান্সিস বলল—আমরা তাড়াতাড়ি পোতো বন্দরে গিয়ে জাহাজে উঠবো।

একটু ভেবে নিয়ে উজির বলল—কয়েকটা দিন থাকো। কিছু ভাগটাগ তো নেবে।

—একটি স্বর্ণমুদ্রাও চাই না। আমরা শুধু মুক্তি চাই। ফ্রান্সিস দৃঢ় স্বরে বলল।

—ঠিক আছে। কাল সকালে দেখা যাবে। উজির বলল।

তখনই দেখা গেল রামাদ্দি ওদের দিকে ছুটে আসছে। ওর দু'গাল, বুকের কাছে পোশাক চোখের জলে ভেজা। ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া কালি লেগে আছে। উজির দ্রুত সোনার মানপত্রটা ঢোলা আলখাল্লার বুকের কাছে লুকিয়ে ধরে রইল। রামাদ্দি ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফ্রান্সিসের কাঁধে মুখ ঘষতে ঘষতে কান্নাভেজা গলায় বলল—কী অমূল্য সম্পদ যে আমাকে দিলেন! ফ্রান্সিস বুঝল ওর কাঁধের কাছে পোশাক রামাদ্দির চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে। হেসে বলল—বানান ভুল আছে কিন্তু। রামাদ্দি সে কথা কানেই তুলল না। বলল—আমার মহা সৌভাগ্য গুরুদেবের শেষ লিখিত গিজেলের আমিই প্রথম পাঠক। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে! ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ওর আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে ওর আনন্দ উদ্ভাসিত মুখের

দিকে তাকিয়ে রইল। তখনই রামাদ্দি বলে উঠল—আপনি কি এই মহা-সম্পদ খুঁজছিলেন?

—এর কাছে সেসব তুচ্ছ। ফ্রান্সিস হেসে বলল। উজিরের দিকে তাকিয়ে বলল—তাহলে বন্দীশালায় ফিরে যাচ্ছি।

কাল সকালেই আমরা মুক্তি চাই।

—রাতটা তো হাতে আছে। সকালেই খবর পাবে। উজির বলল।

—চলো শাঙ্কো। ফ্রান্সিস বলল—আমাদের কাজ শেষ।

উজিরের কাছে ফ্রান্সিসদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। রাস্তায় এসে দেখল সেই লোকটা আজ দাঁড়িয়ে নেই। দুজনে হাঁটতে লাগল। শাঙ্কো বলল—অত মূল্যবান সম্পদ জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলল?

—মানুষের মন বড় বিচিত্র শাঙ্কো। কতরকম মানুষই তো দেখলাম।

—অত দামি দামি জিনিস কারো নজরে পড়ল না? শাঙ্কো বলল।

—দুর্গে সাধারণ লোকের প্রবেশ নিষেধ। তখনও সামান্য হলেও গাছ-গাছালি ছিল। সেই সময় যোদ্ধারাও বোধহয় বেশি থাকতো না দুর্গে। তারা জঙ্গলে যাবে কেন? তবে চোরটোর হয়তো গিয়েছিল। কিন্তু সব মূল্যবান সামগ্রী তো পায়নি। রাতের অন্ধকারে হাতের কাছে তাড়াতাড়ি যদি পেয়েও থাকে কিন্তু ভয়ে বাইরে প্রকাশ করেনি। তবে লোকমুখে হয়তো কিছু গল্পটল্প চালু ছিল। নইলে এখানে চোরেরা আসবে কেন? গভীর রাতে সাপের কামড় খেয়ে মরতে লোকে কি যায়?

আধভাঙা দুর্গের বাইরে এল সবাই। উজির তো খুশিতে ডগমগ। সোনার মানপত্র লুকিয়ে নিয়ে দ্রুত লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘোড়ায় উঠল। জোরে ঘোড়া ছোটাল। রামাদ্দি সেই গিজেল লেখাগুলো নিয়ে ফ্রান্সিসদের কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিল। সেই মন্থর গতিতে হেঁটে চলল পাথুরে রাস্তা দিয়ে। সে-ও আনন্দিত। তবে ধনসম্পদের চেয়েও অনেক মূল্যবান গুরুদেবের লিখিত গিজেল পেয়ে।

একজন প্রহরী এসে গরাদ দেওয়া দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিস ও শাঙ্কো ঢুকতেই বিনোলারা দ্রুত ছুটে এল। শাঙ্কো একটু ক্লান্ত স্বরে বলল—খাওয়ার সময় সব বলবো। এখন খিদেয় পেট জ্বলছে। খেতে খেতে শাঙ্কো হাত ঘুরিয়ে চোখ-মুখে নানা ভাব প্রকাশ করে ফ্রান্সিসের কৃতিত্বের কথা বলতে লাগল।

রাতে ফ্রান্সিসের পাশে শুয়ে শাঙ্কো বলল—কী মনে হয় তোমার? উজির আমাদের মুক্তি দেবে?

—অবশ্যই। ধনসম্পদ রাত জেগে খুঁজে পাবেই। দু'এক রাত লাগতে পারে সব

সব উদ্ধার করতে। উজিরের কাছে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। কাজেই আমাদের মুক্তি দিতে আপত্তি করবে না। কারণ তাতে ওর কোনো লাভ নেই।

ভোর হল। সকালের খাবার খাওয়া হয়েছে সবে। গরাদে মুখ রেখে চড়া গলায় এক প্রহরী বলল—শুধু ভাইকিংরা বাইরে বেরিয়ে এসো। বাকিদের কয়েদ চলবে। মান্যবর উজিরের হুকুম।

শাঙ্কো লাফিয়ে উঠে পড়ল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, উঠে এসো! আমরা মুক্তি পেয়েছি। ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে এসে গরাদের সামনে জড়ো হল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াতেই আন্তাসো ছুটে এসে ফ্রান্সিসের দু'হাত জড়িয়ে ধরল। খুশি তবু দু'চোখে দুঃখ, কাতরতা। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে আস্তে আস্তে বলল—ভাই আন্তাসো, দুঃখিত। তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারলাম না। আমরাও যে এত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাব ভাবিনি। উজির ইয়েপুদা মানুষটা বড় ধূর্ত। একটু থেমে বলল—ঈশ্বরের কাছে তোমাদের দ্রুত মুক্তি কামনা করছি। আর কোনো কথা বলতে পারল না।

শব্দ করে গরাদের দরজা খেলা হল। বাইরে এসে ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকাল। উজ্জ্বল রোদের আকাশ। সাদাটে খণ্ড মেঘ নিথর দাঁড়িয়ে। আঃ মুক্তি! পৃথিবী কী সুন্দর!

ভাইকিংরা দল বেঁধে পাথর ছড়ানো রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সদর রাস্তায় উঠে এল। হাঁটতে লাগল পোতো বন্দরের দিকে।

রোদের তাত বাড়ছে। জোরে হাওয়া বইছে। ধুলো-বালি, শুকনো পাতা উড়ছে। রাস্তায় লোকজন। দু'পাশের বাড়ি-ঘর শেষ হল। শুরু হল চাষ-আবাদের এলাকা।

হঠাৎ শাঙ্কো বলে উঠল—ফ্রান্সিস, ওই দেখো কবি রামাদ্দি ছুটে আসছে। দেখা গেল রামাদ্দি ছুটতে ছুটতে আসছে। ওদের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—তোমরা মুক্তি পেয়েছো শুনে ছুটে আসছি। বলেই সিনাত্রাকে জড়িয়ে ধরল। বলল—কবি-বন্ধু, কাল সারারাত জেগে কবিগুরুর গিজেলগুলো পড়েছি। কবি-বন্ধু, তোমাকে ছাড়া আর কাকে শোনাবো এসব? কী অপূর্ব সেইসব গিজেল!

—কিন্তু আমরা যে দেশে ফিরে যাবো। বড় তাড়া আমাদের। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—সবাই দাঁড়াও। রামাদ্দির দিকে তাকিয়ে বলল—ঠিক আছে। একটা গিজেল বলুন। ওই রোদ, ধুলো-পাতা ওড়া পরিবেশ রামাদ্দিকে দমাতে পারল না। ও সুর করে একটা গিজেল বলল—অর্থাৎ পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—কবে শুনেছিলাম ইবন্ মন্জিরের গিজেল—

ঐশ্বর্য সবার জন্য নয়। বিশ্বাস করেছিলাম। সঞ্চয় করেছি ঐশ্বর্য, খ্যাতি, সম্মান। আজ আমি সেই বিশ্বাস হারিয়েছি। উপলব্ধি করেছি ঐশ্বর্য সবার জন্য। খ্যাতি, সম্মান তুচ্ছ। ঐশ্বর্য আজ আমার কাছে তুচ্ছ।

—ব্বাঃ কী সুন্দর! মুগ্ধস্বরে সিনাত্রা বলে উঠল।

—কবি রামাদ্দি, রাত জেগে আপনি এখন ক্লান্ত। এবার ফিরে যান। বিশ্রাম করুন। ফ্রান্সিস শান্তস্বরে বলল।

—না না। আমার অভ্যাস আছে রাত জাগার। কত রাত—

—তবু আপনার মতো মানুষ যত দীর্ঘজীবী হয় আমাদের ততই মঙ্গল। ফিরে যান।

—বেশ। আপনার কথা রাখতেই হবে। আপনি শুধু বুদ্ধিমান নন, হৃদয়বানও। রামাদ্দি বলল।

সিনাত্রার দিকে তাকিয়ে রামাদ্দি বলল—কবি-বন্ধু, গায়ক-বন্ধু, তাহলে বিদায়। রামাদ্দি ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ধুলো-পাতা ওড়া পথ দিয়ে ফিরে চলল।

—চলো। ফ্রান্সিস বলল। আবার চলা শুরু হল। সিনাত্রা মৃদুস্বরে বলল—আশ্চর্য মানুষ। কেউ কোনো কথা বলল না।

জাহাজের ডেকে উঠে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো, এখুনি নৌকোয় চড়ে চলে যাও। মারিয়া, হ্যারিকে নিয়ে এসো। তোমরা এলে সবাই একসঙ্গে খাবো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে হালের দিকে ছুটল। ভেন হাসিমুখে এগিয়ে এল।

—ভেন, তোমার কোনো কষ্ট হয়নি তো? ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল।

—না না। ভালো কথা, কয়েকজন যোদ্ধা এসেছিল। সব বাজেয়াপ্ত করা অস্ত্রশস্ত্র ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। ওই যে ডেকে জড়ো করা।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—যাক, নতুন অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্যে কিছু সোনার চাকতি বাঁচল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, হ্যারিরা ফিরে এলে আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে জাহাজ চালাবো। মাতৃভূমির দিকে।

বন্ধুরা সমস্বরে ধ্বনি তুলল—ও হো-হো।

তথ্যসূত্র

১। দ্য ভাইকিংস—নিপোর্ড পি পোর্তুগাল—পান্ডি আর

২। ওরাল ট্র্যাডিশান অব অ্যানসিয়েন্ট অ্যারাবিক পোয়েট্রি—ব্রিকাকি পি. জে.

৩। স্প্যানিশ অ্যান্ড পোর্তুগীজ মনাস্টিক হিস্ট্রি—বিশকো সি. জে.

ইবু সলোমনের রত্নভাণ্ডার



বিকেল বিকেল সময়ে পোর্তো বন্দর থেকে ফ্রান্সিসদের জাহাজ ছাড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য পশ্চিমদিগন্তে সমুদ্রের ঢেউয়ের কাছে নেমে এল। লাল রং ছড়িয়ে পড়ল প্রায় মধ্য আকাশ পর্যন্ত। মারিয়া জাহাজের রেলিঙ ধরে বরাবরের মতো সূর্যাস্ত দেখছিল। ওর মনে আজ খুব আনন্দ। কতদিন পরে য়ুরোপে এসেছে ওরা। দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের পাশের দেশগুলিতে তো য়ুরোপের দেশগুলির মতো অত বাড়ি-ঘর নেই, উঁচু উঁচু গির্জার চুড়োও দেখা যেত না। লোক জনও পরিচিত পোশাক পরা নয়। মালবাহী যাত্রীবাহী জাহাজগুলির চলাচলও কম। এখানে তো মাঝে মাঝেই তেমনি জাহাজের দেখা পাচ্ছে। জাহাজগুলোর মাথায় মাস্তুলের উপরে উড়ছে পতপত করে নানা য়ুরোপীয় দেশের পতাকা—স্পেনের, ফ্রান্সের, জার্মানির এমনকি দূরের দেশ ফিনল্যাণ্ডের পতাকাও দু'একটা দেখেছে। হ্যারি অনেক দেশের খবর জানে, পতাকাও চেনে। জলদস্যুদের ক্যারাভেলের (ছোট দ্রুতগামী জাহাজ) সাক্ষাৎ এখনও পায়নি। তবে ওরাও কম বুদ্ধিমান নয়। ওদের ক্যারাভেল জাহাজে নানা দেশের পতাকা ওড়ায়। কিন্তু কাছাকাছি এসে লুঠপাটের মতলব থাকলে হঠাৎ দুটো ঢ্যাড়া-দেওয়া সাদা হাড় আর নরকঙ্কালের মাথা আঁকা কালো পতাকা উড়িয়ে দিয়ে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে যাত্রীজাহাজে নয়তো মালবাহী জাহাজের ওপর। অবাধে লুঠপাট চালিয়ে সবকিছু নিয়ে অন্য কোনও দেশের পতাকা উড়িয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। অবশ্য এটা য়ুরোপের এলাকা। বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের নজরদারি জাহাজ ঘুরে বেড়ায়। জলদস্যুদের মতলব বুঝতে পারলে সেই জাহাজ কয়েকশো মাইল তাড়া করে ধরে ফেলে। নিরীহ যাত্রীদের গভীর সমুদ্রে অসহায় অবস্থায় পেয়ে সর্বস্ব লুঠ করা, হত্যা করা কোনও সভ্য দেশই সহ্য করে না। বন্দী করে দেশে নিয়ে যায়। ক্যাপটেন তো বটেই সঙ্গী জলদস্যুরাও রেহাই পায় না। প্রকাশ্য স্থানে জনসমক্ষে ফাঁসিকাঠে দেয়। তাই এই অঞ্চলে জলদস্যুদের ভয় অনেক কম।

চারদিক অন্ধকার করে সন্ধ্যা নেমে এল। আকাশে বাঁকা চাঁদের আলো উজ্জ্বল হল। ভাইকিংরা রাতের খাওয়া সেরে জাহাজের ডেকে অনেকেই এসে জড়ো হল। বসে যায় নাচগানের আসর। সিনেত্রা সুরেলা গলায় দেশের গানও গায়। নিজের তৈরি গানও গায়। ফ্রান্সিস ওকে খুব উৎসাহ দেয়। সবাই খুশি। স্বদেশ আর বেশি দূরে নয়।

দুদিন পরে সেদিন রাতে আর আসর বসেনি। সবাই কেবিন ঘরে, ডেক-এ হালের কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। জোরে হাওয়ার আরামে ঘুমোচ্ছে সবাই। নজরদার পেড্রোও মাস্তুলের মাথায় ওর ছোট্ট জায়গাটায় গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

গভীর রাত তখন। আবছা চাঁদের আলোয় একটা ছোটো জাহাজ বেশ দ্রুত দুলতে দুলতে এসে ফ্রান্সিসদের জাহাজে ধাক্কা দিয়ে থেমে গেল। দশ-বারো জন য়ুরোপীয় নিঃশব্দে লাফিয়ে লাফিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে আসতে লাগল। সকলের হাতেই খোলা তরোয়াল। সমুদ্রে ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজে দুলুনিতো আছেই। জাহাজটায় গায়ে জোর ধাক্কা লাগলেও ফ্রান্সিসদের কারো ঘুম ভাঙল না। হালের কাছেই ঘুমিয়ে থাকা শাঙ্কোর সামনে একজন তরোয়াল হাতে দ্রুত এসে জোরে তরোয়ালের খোঁচা দিল। শাঙ্কো উঃ শব্দ করেই উঠে বসল। অবাক চোখে দেখল অল্প দাড়িগোঁফওয়ালা একজন য়ুরোপীয় লোক ওর দিকে তাকিয়ে মুখে আঙুল চেপে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করল। লোকটার দশাসই চেহারা। গায়ে য়ুরোপীয় পোশাক। বেশ দামি। মাথায় লালচে লম্বা চুল সমুদ্রের হাওয়ায় এলোমেলো। কোমরে চামড়ার ফেট্টি। জলদস্যু নয় বোঝাই যাচ্ছে। তবে এ কে? ওদিকে বাকি কয়েকজনের গায়ে সাধারণ পোশাক। বোঝাই যাচ্ছে দামি পোশাক পড়া লোকটাই দলপতি। অন্য ভাইকিং বন্ধুদের সঙ্গীরা তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছিল। সবাই উঠে বসতে লাগল।

শাঙ্কো জিগ্যেস করল—তোমরা কারা?

—ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসী। তোমরা নোর্স। তাই না? লোকটা মৃদুস্বরে বলল। লোকটা ফিনদের ভাষায় বলল। ফিনল্যাণ্ড শাঙ্কোদের দেশ থেকে উত্তরে। খুব একটা দূরে নয়। শাঙ্কো মোটামুটি বুঝল। বলল হ্যাঁ, আমরা ভাইকিং। য়ুরোপে আমরা নোর্স বলেও পরিচিত। কিন্তু হঠাৎ তরোয়াল উঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছ কেন?

—পাশেই আমাদের জাহাজ। নিশ্চয়ই আমাদের জাহাজে খাবার জন্যে তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে আসিনি। লোকটি দাঁত বের করে হাসল।

—তা তো ওরকম তরোয়ালের খোঁচা খেয়েই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের জ্বালাতে এলে কেন? শাঙ্কো বলল।

—খুব সহজ। তোমাদের জাহাজে দামি কিছু জিনিস মানে সোনা রূপো হীরে মুক্তো নিশ্চয়ই আছে। জলদস্যু হিসেবে তোমরাও জাহাজ লুঠ কর। আমরা সেসব লুঠ করতে এসেছি। বলে না, চোরের ধন চুরি করা। লোকটা, আবার দেঁতো হাসি হাসল।

—আর কিছু?

—সেটা পরে মানে শ্বেতাঙ্গ লোকদের ধরে বন্দী করে আরবীয় বনিকদের কাছে বিক্রিও করি। আশাতীত স্বর্ণমুদ্রা পাই। —আবার দেঁতো হাসি।

শাঙ্কো চুপ করে রইল। নিরস্ত্র অবস্থায় এদের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া বোকামি। যা বলে শুনে যাও। যা করে দেখে যাও। এরা লুঠেরার দল। ও শুধু বলল—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—এটা উত্তর পোর্তুগাল। কাছেই সিনহো শহর বন্দর। তারই শহরতলিতেই আমরা আস্তানা গেড়েছি। এখানে অনেক জায়গায় আমরা দলবদ্ধভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আস্তানা করেছি।

—তাহলে সিনহো বন্দর নগরটা লুঠ করলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত।

—উঁহু। এই অঞ্চলের শাসক মুর। মুরদের রাজত্ব এখানে। শাসকের নাম ইবু গ্যাব্রিওল। সাংঘাতিক লোক, হিংস্র প্রকৃতির। সব সময় সন্দেহ। অবশ্য আমাদের ব্যবসায়ী বলে জানে। পশুর লোম, চামড়া, হাতে বোনা সুন্দর কাপড়টাপড়, কার্পেট এসব ধনী আরবীয় বণিকদের কাছে কেনা বেচা করি। থাকগে ওসব। তোমরা কতজন জাহাজে আছ? লোকটা জানতে চাইল।

—বেশি না। জনা পাঁচ-ছয়।

—তাহলে তো কেল্লা ফতে। একটু গলা চড়িয়ে সঙ্গীদের বলল—অ্যাই, তোরা পাঁচজন নীচে কেবিন ঘরটাতে তল্লাশি চালা। নিশ্চয়ই ওদের লুঠ করা দামি সম্পত্তি পাবি।

দলনেতার কথা শেষ হতেই সিনাত্রা সুরেলা গলায় গেয়ে উঠল—চলো হে বন্ধুরা—পাহাড়ের উপত্যকায় বসন্ত এসেছে—ও-ও। শাঙ্কো সাঙ্গে সঙ্গে কাঠের ডেক-এ জুতো ঠুকে থপ্ থপ্ নাচ শুরু করে দিল। দলপতি সঙ্গে সঙ্গে থাম, বলে জোরে চেঁচিয়ে উঠেই সিনাত্রার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তরোয়াল চালাল সঙ্গে সঙ্গে। সিনাত্রার কাঁধের কাছে পোশাক কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। তবে খুব বেশি গভীর ক্ষত হল না। কারণ শাঙ্কো দ্রুত এক ধাক্কায় সিনাত্রাকে সরিয়ে দিয়েছিল।

ওদিকে ডেক-এ অনেকের চলাফেরার শব্দে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুমের মধ্যেও সতর্ক থাকা ফ্রান্সিসদের চিরদিনের অভ্যেস হয়ে গেছে। পরক্ষণেই সিনাত্রার গান আর শাঙ্কোর নাচের শব্দে ফ্রান্সিস দ্রুত বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। মারিয়াও ঘুম ভেঙে দেখল ফ্রান্সিস বিছানার তলা থেকে এক ঝটকায় তরোয়ালটা বের করে ফেলেছে।

—কী হল? মারিয়া ভীতস্বরে বলে উঠল। ফ্রান্সিস ঠোঁটে আঙুল রেখে চাপাস্বরে বলে উঠল—ওপরের ডেক-এ নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। নইলে এত গভীর রাতে সিনাত্রা কক্ষনো গান গায় না, শাঙ্কোও নাচ জুড়ে দেয় না। ফ্রান্সিস সিঁড়ির দিকে ছুটল। কিন্তু ওপরে উঠল না। সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওপরে কী ঘটছে আর এক্ষুনি ওপরে উঠবে কিনা, শাঙ্কোরা কোনও সঙ্কেত দেয় কিনা তার জন্যে কান পেতে রইল।

ওপরের ডেক-এ এবার দলপতি নিঃশব্দে তরোয়াল উঁচিয়ে সিঁড়িঘর দেখাল। তারপর নিজেই সিঁড়িঘরের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে পেছন ফিরে সঙ্গীদের নামতে ইঙ্গিত করল। পাঁচজন সঙ্গী খোলা তরোয়াল হাতে দলপতির পেছনে এসে দাঁড়াল। অন্যেরা ঘুরে ঘুরে শাঙ্কোদের পাহারা দিতে লাগল। বিনোলা এই সুযোগের জন্যে তক্কে তক্কে ছিল শেষ সঙ্গীটির ওঁচানো তরোয়ালের ডগাটা সিঁড়িঘরের মাথায় লেগে গেল। ও টাল খেয়ে মাথা নিচু করতেই বিনোলা বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে মাথার কাছে ঝুলন্ত কাচ-ঢাকা আলোটা এক থাবড়ায় নিভিয়ে দিয়েই শেষ সঙ্গীটির ওপর প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই ধাক্কায় অন্ধকারে শেষ সঙ্গীটি ছিটকে পড়ল সামনের সঙ্গীদের ওপর, সবাই মিলে অন্ধকারে টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ল সবার সামনে দলপতির উপর। সেই প্রচণ্ড ধাক্কায় দলপতি মুখ থুবড়ে পড়ল সিঁড়ি থেকে ছিটকে নীচের কাঠের মেঝেয়। দলপতির হাত থেকে অন্ধকারে কোথায় ছিটকে পড়ল তরোয়ালটা। ওর নাক ভেঙে গেল। ঠোঁট ফেটে গেল। সারা মুখে রক্ত ছুটল। পেছনের সঙ্গীদেরও কয়েকজনের কপাল ফেটে গেল, কারো হাঁটু ভাঙল, কারো হাত। তাদের হাতের তরোয়ালও ছিটতে গেল। শুধু দুজন সবার ওপরে ছিল। তাদের হাতেধরা তরোয়াল হাতেই রইল। সকলের ওপর পড়ল বিনোলা, অক্ষত। ওর ওপরে তো কেউ ছিটকে পড়েনি। সিঁড়িঘরের অন্ধকারে আর্তনাদ, গোঙানি, শুরু হল। বিনোলা ততক্ষণে ডিগবাজি খেয়ে কয়েক হাত দূরে ফ্রান্সিসের পায়ের কাছে পড়েছে। ফ্রান্সিস বিনোলাকে তুলে পেছনে ঠেলে দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল—কেউ লড়তে এসো না, নির্ঘাৎ মারা যাবে। যে দুজনের হাতে তরোয়াল ছিল তারা উঠে দাঁড়াল ঠিকই, কিন্তু বাকি সবাই তখন ভাঙা কনুই,-পা, ফাটা কপাল নিয়ে গোঙাতে শুরু করেছে। অন্ধকারে সিঁড়িঘরে আর্তনাদ, গোঙানি চলল। তরোয়াল হাতে দুই সঙ্গী অন্ধকারে ফ্রান্সিসকে দেখতেই পেল না। ফ্রান্সিস এক ঝটকায় এগিয়ে এসে সামনের সঙ্গীটির গলায় তরোয়ালের ডগা চেপে বলল—তরোয়াল ফেলে দাও। ও কিছু না বুঝে থমকে গেল। ফ্রান্সিস তরোয়ালের ডগা আরো জোরে চেপে ধরল। কেটে গেল গলা। অন্যজন তখন ভয়ে তরোয়াল ফেলে দিয়েছে।

ফ্রান্সিস সিঁড়িঘর দিয়ে আসা নিস্তেজ আলোয় ভালো করে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। গলা চড়িয়ে বলল—মারিয়া, মোমবাতি জ্বেলে নিয়ে এসো। কোনও ভয় নেই।

একটু পরেই মারিয়া মোমবাতি জ্বেলে নিয়ে এল। মোমবাতিটা বিনোলা হাতে নিয়ে তুলে ধরল। মোমবাতির আলোয় দেখা গেল, সামনেই চিৎ হয়ে পড়ে আছে দলপতি। পরনে দামি পোশাক ও কোমরের চওড়া চামড়ার কোমরবন্ধনী সোনার কাজ করা। নাক-চোখ মুখ রক্তে মাখামাখি। ফ্রান্সিস সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল—বিনোলা এটাই গুণ্ডা দলের সর্দার, তাই না?

—হ্যাঁ, বিনোলা বলল।

—যা দেখছি মাসখানেক বিছানা থেকে উঠতে পারবে না। কিন্তু এই গুণ্ডার দল এখানে এল কী করে?

—একটা ছোটো জাহাজ চড়ে। এরা ফিনল্যাণ্ডের লোক। এখানে উত্তর পোর্তুগা ডেরা বেঁধেছে। নিজেদের সাধারণ ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেয়। আসলে দাস-ব্যবসায়ী। তবে খুব উঁচু দরের। শুধু শ্বেতাঙ্গদের ধরে। তারপরে প্রচুর আরবীয় স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বড়লোক আরবীয় বণিকদের কাছে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে। বিনোলা বলল।

—ব্বাঃ! তাহলে তো শুধু মুখ-হাত-পা ভাঙলে চলবে না, সবকটাকে নিকেশ করতে হবে। কথাটা বলে ফ্রান্সিস তরোয়াল উঁচিয়ে ধরল।

আহত সঙ্গীরা তখন কেউ ভাঙা পা চেপে ধরে, হাতে কনুই চেপে ধরে উঠে দাঁড়াতে শুরু করল। সকলেই মুখচোখ বিকৃত করে ব্যথাবেদনা সহ্য করছে। মৃদু গোঙাচ্ছেও। যে সঙ্গীটি তরোয়াল ফেলে দিলেছিল, সে এবার করুণ স্বরে বলে উঠল—আমাদের মেরো না। সর্দারের নির্দেশেই আমরা এই জঘন্য কাজ করতে বাধ্য হয়েছি।

—ঠিক আছে তোমাদের জাহাজে চলে যাও। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো—বরং উপোস করে মরবো কিন্তু এরকম দস্যুতা আর ক্রীতদাস ব্যবসায়ে জড়াবে না।

দুজনই একসঙ্গে বলে উঠল—আমরা প্রতিজ্ঞা করছি। ফ্রান্সিস আহতদের দিকে তাকিয়ে বলল—সবাই ওপরের ডেক-এ যাও। কেউ নিজেদের জাহাজে গিয়ে উঠতে পারবে না। চলো, আমরাও যাচ্ছি। আহতরা হাত-পা চেপে ব্যাথায় গোঙাতে গোঙাতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

ওদিকে ওপরে যে কজন দলপতির সঙ্গী ছিল তারা বিনোলাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখল। দলপতি আর সঙ্গীদের হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ার জোর শব্দ শুনল। বুঝল ওরা পরস্পর জড়াজড়ি করে গড়িয়ে পড়ল। তারপরই

আর্ত চিৎকার। ওরা হকচকিয়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। শাঙ্কো এই সুযোগটা কাজে লাগাল। দেশীয় ভাষায় গলা চড়িয়ে বলল— সবাই এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করতে থাকো। সবাই সারি ভেঙে হালের দিকে, সামনের দিকে, সিঁড়িঘরের দিকে ছুটোছুটি শুরু করল। কিন্তু সব কজনকে সামলাবে কী করে? ওরা অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে পরে হাঁপাতে লাগল। এবার শাঙ্কো আবার গলা চড়িয়ে বলল—ওদের ওপর ঝাঁড়িয়ে পড়ো। তরোয়াল কেড়ে নাও। সঙ্গে সঙ্গে ভাইকিং বন্ধুরা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে ক্লান্ত সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এসব লড়াই শাঙ্কোরা অনেক বার লড়েছে। দুজন সঙ্গীর হাতের তরোয়াল ছিটকে গেল। শাঙ্কোরা কয়েকজন ছুটে গিয়ে তরোয়াল দুটো তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়াল। সঙ্গীরা এত দ্রুত আক্রমণের আশঙ্কা করেনি। হতবাক হয়ে শাঙ্কোদের দিকে তাকিয়ে রইল। তরোয়াল হাতেই রইল। শাঙ্কো জোর গলায় বলে উঠল—তরোয়াল ফেলে দে। লড়তে এলে কেউ বাঁচবি না। বাকিরা তবু তরোয়াল ফেলল না। তখনই আহত সঙ্গীরা গোঙাতে গোঙাতে ডেক-এ উঠতে লাগল। সবাই উঠে এল। নীচে দলপতির তখনও জ্ঞান ফেরেনি। অসাড় পড়ে আছে।

ততক্ষণে সূর্য উঠেছে। চারদিকে ভোরের নরম রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস-বিনোলা-মারিয়াও এবার ডেক-এ উঠে এল। তিনজনের হাতে তরোয়াল দেখে ফ্রান্সিস তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল। ফ্রান্সিদের সেই রুদ্রমূর্তি দেখে ওরা পিছু হটে গেল। শাঙ্কো আর এক বন্ধু তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে ছুটে এস। সঙ্গীরা এবার ভয়ে হাতের তরোয়াল ডেক-এর ওপর ফেলে দিল।

ফ্রান্সিস দলপতির ছোট জাহাজটার কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল দলপতির পাঁচ-সাতজন সঙ্গী খোলা তরোয়াল হাতে ডেক-এর ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—তোদের মারাত্মক জখম সঙ্গীদের তো দেখতেই পেলি। তোদের দলপতি অজ্ঞান হয়ে নিচে পড়ে আছে। ওরা ওকে নিয়ে আসছে। তোরা গোপনে ক্রীতদাস ব্যবসা করিস। এই জঘন্য নির্মম কাজের জন্যে তোদের সভ্য সমাজে স্থান নেই। লড়তে এলে সব কটাকে আহত নয়, একেবারে নিকেশ করে দেব।

ওদিকে দলপতিসহ তার সঙ্গীদের সিঁড়ি দিয়ে ছিটকে গড়িয়ে পড়ার জোর শব্দে অন্য ঘুমন্ত ভাইকিংদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হ্যারিও ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠে পড়েছিল। তিলমাত্র দেরি না করে অস্ত্রঘরের দিকে ছুটে যেতে যেতে চিৎকার করে বলে উঠল, ভাইসব, তরোয়াল নিয়ে ডেক-এ উঠে আসো। ওরাও উঠে পড়ে দ্রুত অস্ত্রঘরের দিকে যেতে লাগল। তরোয়াল নিয়ে ওরা সিঁড়ির দিকে

ছুটল। আবছা আলোয় কেউ দেখল সিঁড়ির নিচে কে কনুই চেপে ভর করে দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। অন্যরকম পোশাক। কেউ দলপতিকে ডিঙিয়ে ছুটল। কেউ ওর কাঁধ, হাত মাড়িয়ে দিয়ে গেল। দলপতি আবার সটান শুয়ে পড়ল। কয়েকজন ওর মুখ বুক মাড়িয়ে দিয়ে ছুটে গেল। দলপতি আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

দু-তিনজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়াল। বাকিরা কাছে এসে দাঁড়াল। বাকিরা আহত ও অন্য সঙ্গীদের ঘিরে দাঁড়াল।

—সিঁড়িতে নীচে কে পড়ে আছে? হ্যারি জিগ্যেস করল।

—এই জাহাজের দলপতি। ওর সঙ্গীদের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। কথাটা বলে ফ্রান্সিস গায়ে লাগা ছোট জাহাজের সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল—সবার আগে একটা কাজ করতে হবে। তোদের জাহাজে নিশ্চয়ই কিছু শ্বেতাঙ্গকে ক্রীতদাস হিসেবে আরবীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করবি বলে বন্দী করে রেখেছিস। এক্ষুনি সবাইকে আমাদের জাহাজে তুলে দে। তোদের দলপতি আর সঙ্গীদের তখন তোদের জাহাজে তুলে দেব। তার আগে নয়।

সঙ্গীরা দলপতিকে না দেখে আর সঙ্গীদের ঐ অবস্থা দেখে বুঝেছিল একটা কিছু হয়েছে। দু'তিনজন তরোয়াল ফেলে দিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সাতজন শ্বেতাঙ্গ বন্দীকে ডেক-এ নিয়ে এল। শতচ্ছিন্ন পোশাক। মাথার চুলে জট পাকানো। তবে সুস্থ সবাই। ক্রীতদাসের ব্যবসাতে সুস্থদেহী যুবকই বেশি দাম দিয়ে কেনা হয়। শেষের জনকে দু তিনজন সঙ্গী ধরে ধরে নিয়ে এল। বয়স্ক। মাথার চুল দাড়ি গোঁফ সাদা। বেশ দুর্বলও। পরনে শতচ্ছিন্ন পোর্তুগীজ পোশাক। হ্যারি বলে উঠল-আশ্চর্য। এই বৃদ্ধকে তো একটা রুপোর মুদ্রা দিয়েও কেউ কিনবে না। একে বন্দী করে রেখেছিস কেন?

—নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। ফ্রান্সিস বলল। সুস্থরা সবাই সহজেই দুলনির মধ্যেও ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এল। কিন্তু বৃদ্ধকে কাঁধে চাপিয়ে সঙ্গীরা আর কয়েকজন ভাইকিং মিলে এই জাহাজে নিয়ে এল।

—এর পরেও এই জঘন্য ব্যবসায়ীদের বাঁচিয়ে রাখা উচিত? ফ্রান্সিস দাঁত চাপাস্বরে বলে উঠল। হ্যারি শান্তস্বরে বলল—ফ্রান্সিস, ভুলে যেও না এরা সভ্যদেশের মানুষ। সভ্যজগতেই ওরা মানুষ হয়েছে। কাজই সভ্যভদ্র নীতিবাদী মানুষদের তো ওরা দেখেছে। দেখো না এদের সভ্য, সৎ ও ভদ্র জীবন কাটাবার জন্যে একটা সুযোগ দিয়ে। ভুল বুঝতে পেরে অন্যায় অমানবিক কাজ ছেড়ে হয়তো ভালো হতে পারে। যারা পারবে না তারা উচ্ছন্নে যাক।

ঠিক আছে। তোমার কথাই মেনে নিলাম। সেই বৃদ্ধকে তখন শাঙ্কোরা ধরে ধরে সিঁড়িঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ঐ বৃদ্ধকে আমার কেবিন ঘরে নিয়ে যাও। ওকে প্রথমে ভালো করে স্নান করাবে। নতুন পোশাক পরাবে। ভেনকে ডেকে আনবে। ভেন যেমন বলে করবে। তারপর ওকে মারিয়ার জিম্মায় রেখে চলে আসবে। শাঙ্কোরা বৃদ্ধকে কাঁধে নিয়ে সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। মারিয়াও ওদের পেছনে পেছনে চলল। এবার ফ্রান্সিস সুস্থ দুই সঙ্গীকে—তোমরা সিঁড়ির নীচে যাও। তোমাদের সর্দারের জ্ঞান ফিরুক বা না ফিরুক তুলে নিয়ে ডেক-এ এসো।

ওরা দুজনেই ছুটল সিঁড়িঘরের দিকে। একটু পরেই ওরা অনেক কষ্টে দলপতিকে এনে ডেক-এ শুইয়ে দিল। দলপতির তখন জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু নড়াচড়া নেই। কোনোরকমে চোখ খুলে পিটপিট করল। মুখ দিয়ে শব্দও করতে পারছিল না। আহত সঙ্গীরা ডেক-এর এক পাশে শুয়ে-বসে ছিল। অল্পস্বল্প কাতরাচ্ছে নয়তো গোঙাচ্ছে। ওদের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—সবাই যেভাবে পারো তোমাদের জাহাজে গিয়ে ওঠো। তারপর ডেক-এ সবাই এসে দাঁড়াবে।

—ওরা একা একা গিয়ে জাহাজে উঠতে গেলে বেলা হয়ে যাবে। তার চেয়ে আমরা একটু সাহায্য করলে ওদের তাড়াতাড়ি বিদেয় করতে পারব। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল।

হ্যারি বিনোলাকে ডেকে ঐ আহতদের ওদের জাহাজে উঠতে সাহায্য করতে বলল। সুস্থ দুই সঙ্গী আর কয়েকজন ভাইকিং বন্ধুকে নিয়ে বিনোলা ওদের অনেক কষ্টে ঐ দুলুনির মধ্যে ওদের জাহাজে তুলে দিল। দলপতিকে ওরা তখন কেবিন ঘরে নামিয়ে নিয়ে গেলে বাকিরা এসে ওদের ডেক-এ সার দিয়ে দাঁড়াল। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে না পরে বসে পড়ল।

ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে গলা চড়িয়ে বলতে শুরু করল—ভালো করে শোনো। আমরা তোমাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। তোমাদের সবকটাকে নিকেশ করার ক্ষমতা আমাদের আছে। যারা আহত হবে তাদের ছুঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। ক্ষুধার্ত হাঙরের পাল তাহলে খুশিতে লাফালাফি করবে। কিন্তু আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধুর অনুরোধে তোমাদের মুক্তি দিলাম। ফ্রান্সিস থামল। দলপতির সঙ্গীরা ততক্ষণে ফ্রান্সিসের ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে বুঝে গেছে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল ওরা। ফ্রান্সিস আবার বলতে লাগল—কিন্তু একটা শর্ত আছে। কেউ আর দাস-ব্যবসার মতো জঘন্য কাজে জড়াবে না। সোজা তোমাদের

জন্মভূমিতে ফিরে যাবে। যারা আবার এখান থেকে ডেরা বেঁধে ঐ ব্যবসায় সাহায্য করবে তারা নরকে যাক। ব্যস্‌-আর কিছু বলার নেই। এক্ষুনি জাহাজ ছেড়ে দাও। এক্ষুনি—যাও।

সঙ্গীদের মধ্যে নিজেদের জন্মভূমিতে ফিরে যাবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। রাতের আবছা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে নিঃশব্দে যে কাছিটা ওরা ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছির সঙ্গে বেঁধেছিল, শাঙ্কো ছুটে গিয়ে সেই কাছিটা তরোয়াল দিয়ে কয়েকবার পোঁচিয়ে কেটে ফেলল। ওদের জাহাজটা যেন জোরে ধাক্কা খেয়ে দুলতে দুলতে বেশ দূরে চলে গেল। তিনটে পাল নামানো ছিল। দ্রুত সেই তিনটে পাল খুলে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দস্যু ও দাস-ব্যবসায়ীদের জাহাজ অনেক দূরে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্তৃত সমুদ্রের বিশাল ঢেউয়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। হ্যারিকে নিয়ে ফ্রান্সিস নিজেদের কেবিন ঘরে এল। দেখল সেই বৃদ্ধটি বিছানার একপাশে বসে আস্তে আস্তে খাচ্ছে। সামনে মারিয়া দাঁড়িয়ে থেকে বৃদ্ধের খাওয়া দেখাশুনো করবে। বৃদ্ধের পরনে নতুন পোশাক। বোঝা যাচ্ছে সযত্নে বৃদ্ধকে স্নান করানো হয়েছে। মাথার পাকা চুলও অনেকটা বিন্যস্ত। ফ্রান্সিসরা ঢুকতে বৃদ্ধ তৃপ্তির হাসি হেসে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিসও হেসে বলল—কী? এখন ভালো লাগছে তো? পোর্তুগীজ ভাষাতেই জিগ্যেস করল।

বৃদ্ধ কোনও কথা না বলে মাথা কাত করল। তারপর আস্তে আস্তে খেতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল বৃদ্ধ পোর্তুগীজ। ও বলল—আপনার নাম কী?

—আলফানসো। খাওয়া থামিয়ে বৃদ্ধ মৃদুস্বরে বলল।

—আপনি পোর্তুগীজ?

—হ্যাঁ, দক্ষিণ পোর্তুগালে সমুদ্রের ধারে একটা গ্রামে আমার জন্ম।

—তবে এখানে এলেন কেন?

বৃদ্ধ ফোকলামুখে হেসে বলল—আমি আপনাদের দেশে স্ক্যান্ডানেভিয়াতেও গেছি। আপনাদের দেশের ভাষা শুধু বুঝিই না বলতেও পারি। ফরাসি জার্মান আরবী ফার্সি মিলিয়ে পাঁচ-ছটা ভাষা আমি আমার মাতৃভাষার মতোই বলতে পারি।

ফ্রান্সিস অবাক হয়ে হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারিও অবাক। বলল —এত দেশ ঘুরেছেন কেন?

—জ্ঞানসংগ্রহের জন্যে। একটা সত্য জেনেছি প্রত্যেক জাতিই তার মাতৃভাষাকে নিজের মায়ের মতো ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে।

ফ্রান্সিস্ বলল—আপনার এই অবস্থা দেখে বুঝতেই পারছি—বেশ অত্যাচার হয়েছে আপনার ওপর। দেশ-দেশান্তরে গেছেন, ঘুরেছেন। শরীরটা আপনার তাই ভেঙেও পড়েছে। আপনার কাছে সবকিছু জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে আমাদের। কিন্তু এখন নয়। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে নিন। রাতের খাওয়ার পরে আপনার সঙ্গে আমরা কথা বলব। ততক্ষণে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন। ওদিকে বাকি সাত শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসদের জন্য একই ব্যবস্থা হল।

রাতের খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিসরা নিজেদের ঘরে এসে বসল। আলফানসোকে অনেক তরতাজা মনে হল।

—আপনি এখন ভালো আছেন তো? ফ্রান্সিস একপাশে বসে আলফানসোকে জিজ্ঞেস করল। আলফানসো হেসে মাথা কাত করল। তারপর বলল-শুনলাম তোমরা ভাইকিং। তোমার নাম ফ্রান্সিস। অনেক গুপ্তধন নাকি বুদ্ধি খাঁটিয়ে খুঁজে বের করেছ।

—ওসব থাক। আপনার কথা বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—সে তো এক ইতিহাস। গপ্‌পো লেখা যায়। তবে সব সত্যি, গপ্‌পো না। থেমে বলল-শোনো তোমাদের বিরকা নগরেও আমি কিছুদিন ছিলাম। একটা সত্যিই আমি বুঝেছি তোমরা দুঃসাহসী বীরের জাত। অন্যায় তোমরা সহ্য কর না।

—আবার জলদস্যু হিসেবে আমাদের দুর্নামও আছে। হ্যারি হেসে বলল।

—হ্যাঁ তাও শুনেছি। দেখো, সবাই যদি নীতিবাদী সত্যবাদী হত, সব মানুষকে ভালোবাসতে পারত তাহলে তো স্বর্গই হত এই পৃথিবী। যাক গে—সে সব কথা। অতি সংক্ষেপে প্রথম থেকেই বলি। একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে যে। ফোকলা মুখে হেসে আলফানসো বলল।

—নিশ্চয়ই শুনব। আপনি জ্ঞানীগুণী মানুষ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাই এমন একজন মানুষের এইরকম দুরবস্থা হল কেন সেটাই বুঝতে চাইছি। ফ্রান্সিস বলল।

—ছোটবেলা কেটেছে দক্ষিণ বন্দর এলাকায়। অভাবী ঘরের সন্তান। দুবেলা খেতেই পেতাম না। পড়াশুনা করার কথা তো স্বপ্নেও ভাবতাম না। দিনরাতের অনেকটা সময় সমুদ্রতীরেই কাটাতাম। আর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম সীমাহীন সমুদ্রের দিকে। কত কথা ভাবতাম। সমুদ্রের সঙ্গে সেই আমার বন্ধুত্বের শুরু। সবে যুবক তখন। এক মালবাহী জাহাজে এক আবছা অন্ধকার সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়লাম। নামেই নাবিক। ডেক মোছা থেকে শুরু করে রান্নার সাহায্য

করা সবই করতে হত। স্পেনের এক বন্দরে একরাতে নেমে পড়লাম। কাজ করে যে অর্থ রোজগার করেছিলাম তাই নিয়ে এক সস্তা সরাইখানায় আশ্রয় নিলাম। থেমে একটু দম নিল আলফানসো।

ঠিক আছে। এখন ঘুমোন। পরে না হয়—হ্যারি বলল।

আলফানসো মৃদু হেসে ওর পাকা চুলভর্তি মাথা নাড়ল। বলল—দেখো, স্মৃতি—তা যত সুখেরই হোক বা যত দুঃখের, যত বেদনারই হোক—অনেকটা কবিতা বা গানের মতো মনে করতে বসলে ডুবে যেতে হয়। বলতে ভালো লাগে। নিজেকে যেন নতুন করে বার বার চেনা যায়। যা হোক-একটা দুঃখ কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই আমার ছিল। অভাব দারিদ্র্য নয়—অশিক্ষার নিরক্ষরতার দুঃখ। এই দুঃখ দূর করব-শিক্ষিত হব এই সংকল্পটা আমার বরাবরই ছিল। তাই যেখানে গেছি, সেই দেশের ভাষা তো বটেই, সাহিত্য, ইতিহাস জানার সুযোগ নিয়েছি। সেই দেশে পৌঁছেই খোঁজ করেছি শিক্ষার জায়গার। অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা নেব সে সাধ্য তো ছিল না।

শিক্ষাদানের স্থানে কাকুতি-মিনতি করে শিক্ষার্থীদের সবার পেছনে জায়গা জুটিয়েছি। আশ্চর্য কি জান তাঁরা কিন্তু কেউ আমাকে বিমুখ করেননি। উপোসী থেকেও সেসব জায়গায় গেছি। পাঠ শুনেছি। কোনও কোনও রাত কোনও কোনও দিন আমার অনাহারে কেটেছে। একটা সত্য আমি জীবন দিয়ে বুঝেছি—যদি সততার সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের জ্ঞান সংগ্রহের চেষ্টা কর—কোনও বাধাই বাধা নয়। কথাটা বলে আলফানসো পোশাকের হাতা দিয়ে চোখ মুছল। ফ্রান্সিসরা কেউ কোনও কথা বলল না।

—যাক ওসব কথা। সবশেষে উত্তরের অর্ত ঠান্ডা সহ্য করতে পারলাম না। চেয়ে চিন্তে ছেঁড়া পোশাক পরে থাকা—বেশ অসুস্থ হয়ে ফিরে এলাম ফরাসিদের দেশে। জান তো ফরাসিরা ভীষণ কবিতা ভালোবাসে। কত জায়গায় কবিতার আসর বসে। সময় পেলে শরীর সুস্থ থাকলে সেইসব আসরে যেতাম। মানুষ, পোশাক নিয়ে ওখানে কারো কোনও কৌতূহল নেই। কিছুদিনের মধ্যে ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করে ফেললাম। এবার আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা কাজে লাগালাম। সমুদ্র আজও আমার কাছে বিস্ময়। প্রকৃতির বিচিত্র রূপও দেশে দেশে দেখেছি। কবিতা লিখতে লাগলাম। কিছু কিছু আসরে কবিতা পাঠও করতে লাগলাম। আমার মাতৃ ভাষা ফরাসি নয়। কাজেই অনেক কবির সঙ্গে এইজন্যেই আমার বন্ধুত্ব হল। এবার অভিজাত শ্রেণীর আসরেও আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হল। অর্থ ও খাদ্য যথেষ্ট পেলাম। আমি যেন নতুন জীবন পেলাম। এমনি এক আসরে

পরিচয় হল এক বিখ্যাত কবির সঙ্গে। তিনি অযাচিতভাবে আমার কবিতার খুব প্রশংসা করলেন। কয়েকদিন মেলামেশার পর বললেন—আপনি বিদেশি। কিন্তু আমাদের ভাষাকে ভালোবেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে কবিতা লিখেছেন। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। তাই আপনি নতুন একটা ধারা আনতে পেরেছেন। এটা কম কথা নয়। তবু আমি অনুরোধ করছি—দেশে ফিরে যান। নিজের মাতৃভাষায় কাব্যসাহিত্য রচনা করে স্বদেশের ভাষাকে সমৃদ্ধ করুন। একেই বলে মাতৃঋণ শোধ করা। আন্তরিক চেষ্টা করুন। আলফানসো থামল। কয়েবার জোরে শ্বাস নিল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—ফ্রান্সিস ওঁকে বিশ্রাম করতে দাও। ঘুমিয়ে পড়ুক। মারিয়া একটু ভয়-মেশানো সুরে বলল।

আলফানসো মৃদু হেসে হাত তুলে অভয় দিল। তারপর বলতে লাগল—সেই রাতে সরাইখানার শুয়ে খুব গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম সেই কবির কথাগুলো। তারপর প্রায় শেষ রাতে স্থির করলাম—আর বিদেশে-বিভুঁইয়ে নয়। দেশে এই সিনহো বন্দর নগরে ফিরে এলাম। দেখলাম—স্বদেশের চেহারা পাল্টে গেছে। দুর্ধর্ষ মুরজাতি স্বদেশের অনেক অংশ দখল করে নিয়েছে। এখানেও যিনি শাসক তিনিও মুর। ইবু সালোমান। দুর্ধর্ষ সাহসী যোদ্ধা ওরা। তবে মুররা ছিল পরধর্ম-অসহিষ্ণু। দোষ কী দেব বলো? জীবনকে যে যেমনভাবে দেখে। কিন্তু আশ্চর্য কি জান এই ইবু সালোমান একেবারে অন্য ধাতুতে তৈরি। নিজের ধর্মের প্রতি যেমন পরধর্মের প্রতিও তেমনি শ্রদ্ধা। শুধু তাই নয়—নিজে যথার্থ কবি। মুওয়া মু মুহাম মানে আরবী ভাষায় মুখে মুখে কবিতা বানিয়ে বলা—মানে—

—হ্যাঁ। জানি—জিগেল। সুর করে বলা হয়। হ্যারি বলল।

—তোমরা জান? আলফানসো একটু আশ্চর্য হল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই প্রকৃতির এক মুর শাসকের পরিচয় আমরাও পেয়েছি। ফ্রান্সিস বলল।

—সত্য অদ্ভুত মানুষ এই ইবু সালোমান। তাঁর কথা বলে শেষ করতে পারব না। যাক—কী করে তাঁর সংস্পর্শে এলাম, কী করে তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু হয়ে গেলাম সে অনেক কথা। বিরাট তাঁর বাড়ির একটি ঘর নির্দিষ্টই ছিল। জিগেলের আসর বসত সেখানে। সেই ঘরের পাশেই একটি শয়নকক্ষের পালঙ্কে তিনি মাঝে মাঝেই আমাকে ডাকতেন। কত রাত আমরা কাব্যর্চচা করেছি। আরবী ভাষা জানাই ছিল। ভাষা শিক্ষার সূত্র আমার আয়ত্তে ছিল। অল্প দিনের মধ্যেই আমি আমার পুরোনো কবিতাগুলি আরবী ভাষায় অনুবাদ করে তাঁকে শোনাতে লাগলাম। তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন।

আমি তো খোদ কবিতার দেশেই সুনাম অর্জন করেছিলাম। কাজেই আমার কবিতার গভীরতা তিনি সহজেই বুঝতেন। আলফানসো থামল। তারপর বলতে লাগল—তিনি কিন্তু আরবীয় ধনী বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা সূত্রেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। আর প্রচুর কুফি বা আরবীয় স্বর্ণমুদ্রা জমিয়েছিলাম। সব রাখতেন একটা সোনার গিল্টিকরা লম্বাটে সিন্দুকে। আমি সেটা দেখেছিলাম। তাঁর কড়া হুকুম ছিল কেউ যেন সেটা স্পর্শ না করে। কিন্তু সেই সিন্দুক ভর্তি স্বর্ণমুদ্রাই তাঁর কাল হল। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইবু গ্যাব্রিওল ছিল পিতার ঠিক উল্টো প্রকৃতির /দুর্বিনীত, হিংস্র প্রকৃতির, চূড়ান্ত স্বার্থপর। কিছু অসৎ বন্ধুর পাল্লায় পড়ে হয়ে উঠেছিল অত্যাচারী নিষ্ঠুর। মাঝে মাঝেই ও অসৎ সঙ্গীদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে মজা করতে যেত। কোনও কারণে রেগে গেলে প্রজাদের বাড়িঘর, ক্ষেত-খামারে আগুন লাগিয়ে দিত। এই জায়গায় ইবু সলোমন ছিলেন ভীষণ দুর্বল। পুত্রস্নেহে অন্ধ। কারণ, ঐ একটি মাত্র সন্তানই তাঁর বেঁচেছিল। অসৎ বন্ধুদের পরামর্শে সে ক্রমে ক্রমে যোদ্ধাদের প্রচুর অর্থের বিনিময়ে নিজের কব্জায় নিয়ে এল। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। কারণ, যোদ্ধারা জানত ইবু সালোমনকে প্রজারা দেবতার মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তাদের বাগ মানানো খুব কঠিন] বন্ধুরা পরামর্শ দিল—পিতাকে চিরদিনের মতো সরিয়ে দিতে না পারলে শাসকের আসন পাওয়া যাবে না। ইবু সালোমন সবই জেনেছিলেন। এক রাতে মাত্র কয়েকজন বিশ্বস্ত বলশালী প্রহরীকে নিয়ে যে কোথায় চলে গেলেন কেউ জানতেই পারল না। জানল কয়েকদিন পরে ফিরে না আসার জন্যে। তিনি ফিরেছিলেন একা। বিশ্বস্ত প্রহরীর কথা জিগ্যেস করাতে তিনি বলেছিলেন—তারা প্রচুর অর্থ নিয়ে স্পেনে চলে গেছে। তাঁর হঠাৎ অন্তর্ধানের পরেই জানা গেল পালঙ্কের নীচে রাখা স্বর্ণমুদ্রা বোঝাই সেই সিন্দুকটাও উধাও। কিন্তু সিন্দুকটা নিয়ে কেউ কিছু জিগ্যেস করতে সাহস করল না। এমনকি প্রধান পরামর্শদাতাও না। আলফানসো থামল। ফ্রান্সিস বেশ আয়েসি ভঙ্গিতে বসে শুনছিল। এবার দ্রুত উঠে বসল। হ্যারি তাই দেখে সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বলে উঠল—ঠিক আছে। এখন থাক। আপনি বিশ্রাম করুন। পরে শুনব সব। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল—হ্যারি একমাত্র তুমিই আমার চিন্তাভাবনা, মনোভাব সঠিক বুঝতে পার। মারিয়াও বুঝতে ভুল করে। যাক গে—আলফানসো, আপনি আরামে ঘুমিয়ে পড়ুন। পরে আমার কিছু জানার আছে।

আলফানসো এতক্ষণ একটানা কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আর কোনও কথা না বলে পাশ ফিরে ঘুমের উদ্যোগে করল।

পরের সারাদিন এ বিষয়ে আর কথা হল না। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আবার সবাই বসল।

—এবার আপনার কথা সংক্ষেপে বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—ইবু সালোমন কবি ছিলেন সত্যি। সেই সঙ্গে অত্যন্ত বুদ্ধিমানও ছিলেন। কে কেমন মানুষ, কী তার উদ্দেশ্য, বিশ্বাসযোগ্য কিনা সহজেই বুঝি নিতেন। একমাত্র পুত্র যে অত স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সহ্য করবে না সেটা তিনি খুবই সহজেই বুঝে ফেলেছিলেন। কিন্তু ঐ যে বললাম অন্ধ পুত্রস্নেহ। তিনি কাউকে কিছু বললেন না। ছেলেকে তো নয়ই। নিঃশব্দে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সেই সময়ে যে জিগেলগুলো রচনা করেছিলেন তা মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষারত নির্ভীক এক মানুষের মর্মকথা। অপূর্ব জিগেল সে সব। কথাগুলো বলার সময় আলফানসোর গলা কান্নার বুজে এল। বলতে লাগলেন—সেই রাতটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেই শয়নকক্ষে অনেক রাত অব্দি পরস্পরকে জিগেল শোনাচ্ছিলাম। রাত গভীর হল। দুজনেই বিশ্রাম নিলাম। ওঁর একটাই পছন্দের জিনিস ছিল—ক্লান্তিবোধ হলে একটা সুদৃশ্য কাচের বড় লম্বাটে নলওয়ালা পাত্রে আঙুরের রস রাখতেন। সেখান থেকে নিজেই পাশে রাখা একটা গ্লাসে ঢেলে খেতেন। আমাকেও দিতেন। সেই ঘরে অন্য কারো প্রবেশের অধিকার ছিল না। একে যদি বিলাসিতা বল তো বলতে পার। কিন্তু আলবোলার নল মুখে তামাক খেতে তাঁকে কোনোদিন দেখিনি। যাক গে—হঠাৎ তিনি গ্লাসে অর্ধেকটা নিয়ে তাড়াতাড়ি রেখে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন—কোন রকম শব্দ শুনলেন? শব্দটা আমিও শুনেছিলাম। গভীর রাতের স্তব্ধতায় এরকম শব্দ শোনা যায়। উনি বলে উঠলেন—একটা জিগেল বলছি। লিখে ফেলুন তো। সুন্দর চামড়া মেশানো কাগজ ওখানে বরাবরই থাকত। বাজপাখির পাখা থেকে তৈরি কলমও। আমিও গ্লাস রেখে লিখতে লাগলাম। এক পংক্তি লিখেই বুঝলাম এটা তাঁর পূর্বেই ভেবে নেওয়া কবিতা। আমি দ্রুত লিখতে লাগলাম। তাড়াতাড়িই শেষ হল কবিতাটা। উনি ম্লান হেসে বললেন, এটাই আমার শেষ কবিতা। জিগেল না কিন্তু। আমার সব লেখা কবিতা আপনি রেখে দিয়েছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। যত্ন করে রেখে দিয়েছি। আমি বললাম। আপনি রাজি হলেই সব বাঁধিয়ে রাখব।

—তাই রাখুন। অনেক সুখ দুঃখ বেদনার স্মৃতি তো জড়িয়ে আছে ঐ কবিতাগুলোর সঙ্গে। তবে এই শেষ কবিতাটা শুধু আলাদা করে আপনার কাছে রেখে দিন। একমাত্র আপনার মতো একজন যথার্থ উচ্চমানের কবিই এই কবিতাটার অর্থ বুঝবেন। অন্যের কাছে এটা দুর্বোধ্য মনে হবে। অবশ্য সেই অর্থের বাইরেও একটা অন্য অর্থও আছে। এখন নয়—পরে—অর্থাৎ আমার অবর্তমানে—মানে—

আমি বাধা দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে যাব তখনই বাইরের দিককার দরজায় মৃদু টক্‌টক্‌ শব্দ শোনা গেল। ইবু সালোমান আস্তে বললেন—দয়া করে দরজাটা খুলে দিন। গভীর রাতের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে শব্দটা বেশ জোরেই শোনা গেল। আমি তো হতবাক। একে তাঁর এই কক্ষে কারো প্রবেশের হুকুম নেই। তার ওপর এত রাতে কে এল? তাঁর অন্দরমহল থেকে কি কেউ এল? কিন্তু বাইরের দরজা দিয়ে তাঁরা আসবেন কেন? এলে ভেতরের দরজা দিয়েই তো আসবেন। আবার টোকা দেওয়ার শব্দ। এবার একটু জোরে।

—যান। খুলে দিন দরজা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন যেন আপন মনে —নিঃশব্দ মৃত্যু। এর অপেক্ষাতই ছিলাম। আমি চমকে উঠলাম। একথার অর্থ কী? আবার টোকা দেওয়ার শব্দ। উনি নিঃশব্দে আঙুল তুলে দরজাটা দেখালেন। আমি তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে দিলাম। ঘরের মৃদু আলোয় দেখলাম তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ইবু গ্যাব্রিওল দাঁড়িয়ে। তার পেছনে তার দুজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষী। কঠিন মুখ তাদের। গ্যাব্রিওল একটু হেসে বলল—বাড়ি যান। অনেক রাত হয়েছে। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। এক ঝলক পেছনে তাকিয়ে দেখি ইবু সালোমন দু'চোখ বন্ধ করে নিথর বসে আছেন। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়ছে। বোধ হয় কিছু প্রার্থনা করছেন।

—যান। ইবু গ্যাব্রিওল প্রায় চাপা ধমকের সুরে বলল। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম নিঃশব্দ মৃত্যুর অর্থ কি? আমি দ্রুত বাইরে চলে এলাম। বুকে একরাশ আতঙ্ক নিয়ে কী করে সরাইখানায় ফিরে এলাম বলতে পারব না। একটু থেমে ভগ্নস্বরে বৃদ্ধ আলফানসো বলল—ওটাই তাঁর শেষ কবিতা। কথাটা বলে আলফানসো দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

উত্তেজনায় তখন ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সংযত করল। বসে পড়ল আবার। আলফানসো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল একটু পরে শান্ত হল। ফ্রান্সিসরা তিনজনেই ততক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। হ্যারি আস্তে আস্তে চলে গেল। ফ্রান্সিস নিঃশব্দে কম্বলটা টেনে নিয়ে মেঝেয় পেতে শুয়ে পড়ল। মারিয়া হাত বাড়িয়ে আলফানসোকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল।

পরেরদিনও খাবার খেতে খেতে আলফানসোকে ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল,

—এখন আপনার শরীর কেমন?

আলফানসো খুশির হাসি হেসে বলল—বুকে জমে থাকা এত কথা তোমাদের বলতে পেরে আমি যেন হালকা বোধ করছি। তোমাদের ধন্যবাদ।

ফ্রান্সিস তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—আমরা এরকমই। তবে ইবু সালোমনের

শেষ কবিতার প্রসঙ্গটা অন্তত আমার মনে একটা প্রশ্ন তুলেছে। সেই কবিতাটা এখন কোথায়?

—সে তো আর এক ইতিহাস। আলফানসো বলল।

—সে সব আমার জানা। শুনুন অতি সংক্ষেপে বলছি—ইবু গ্যাব্রিওল দেশটায় অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। সর্বপ্রথমে সে আপনাকেই বন্দী করেছিল। ইবু গ্যাব্রিওল অত্যন্ত ধুরন্ধরের মতো পরিকল্পনা করে এগিয়েছিল। অবশ্য তার অসৎ বন্ধুরাও তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিল। ফ্রান্সিস বলল—তাই কিনা?

—ঠিক তাহলেই বুঝতেই পারছ যে অমানুষটা নিজের দেবতুল্য পিতাকে হত্যা করতে পারে, সে আমার ওপর কী রকম অত্যাচার করতে পারে! ওই অমানুষটাকে আমি কতবার বলেছি—ইবু সালোমান তাঁর স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার সম্বন্ধে একটি কথাও আমাকে বলেননি। সেটা ও বিশ্বাসই করতে চাইল না। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম ইবু সালোমনের শেষ কবিতাটা লুকিয়ে রাখার জন্যে। কিন্তু অতটুকু কয়েদঘরে কোথায় লুকোব। সব পোশাক কেটেকুটে খোলার সময় কাগজটা মেঝেয় পড়ে গেল। ঘামে জলে লেখাগুলো প্রায় মুছে গেছে তখন। ওটা এক লাফে তুলে নিয়ে ও পড়ল। মুখ বেঁকিয়ে বলল—ও! উদ্ভট পাগলের প্রলাপ। এ পড়ে কী হবে?

—কবিতা ওরকমই হয়। আমি মৃদুস্বরে বলেছিলাম।

—জাহান্নামে যাক সব। কথাটা বলে ও কবিতা লেখা কাগজটা একটা টানে দু ফালি করে ফেলল। হাত বাড়িয়ে বললাম ঐ পাগলের প্রলাপটা একেবারে ছিঁড়ে ফেল না। আমাকে দাও। ও কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল। কী যে দুঃখ হল আমার, কী বলবো!

—কবিতাটা মনে আছে আপনার? ফ্রান্সিস সাগ্রহে জিগ্যেস করল।

—আমিই তো লিখেছিলাম। কতবার পড়েছি। আলফানসো বলল।

—মারিয়া। কাগজ-কলম বের করো। লিখে ফেলো তো। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া ওর চামড়ার সুদৃশ্য ব্যাগ থেকে কাগজ আর পাখার কলম বের করে তৈরি হল। আলফানসো আস্তে আস্তে বলতে লাগলো—

চির উদাসীন লোভাত বয়ে চলেছে।
কোথাও প্রচণ্ড ঘূর্ণির আবর্ত।
হিংসা দ্বেষ স্বর্ণতৃষা
হানাহানি রক্তপাত অমোঘ মৃত্যু।

জেনো অতল তলে
গভীর অবঞ্চল প্রশান্তির সম্পদ।
যারা আজীবন কাঁদে
একটু শান্তির জন্যে
তাদের সেই প্রশান্তির সম্পদ।
বিলিয়ে দাও।
সার্থক হোক তোমার মনুষ্যজীবন।

লেখা শেষ হলে ফ্রান্সিস কাগজটা হ্যারিকে দিল। হ্যারি কয়েকবার পড়ে বলল—সত্যি অপূর্ব! একজন প্রকৃত মানবপ্রেমীর অন্তরের ডাক।

—সত্যি তাই। এই শেষ কবিতাটার গুরুত্ব অপরিসীম। এই কবিতাটায় একটা রহস্যময় নির্দেশ আছে। আলফানসো বলল।

একটু ভেবে নিয়ে হ্যারি বলল—হতে পারে। অসম্ভব নয়।

ফ্রান্সিস আলফানসোর দিকে তাকাল। বলল—লোভাত কী?

—একটা নদী, উত্তরের দিকে।

—কত দূরে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—সিনহো থেকে একদিনের পথ। আলফানসো বলল।

—খুব বড় নদী? ফ্রান্সিস বলল।

—শীতকালে নয়। কিন্তু বর্ষাকালে আর সমুদ্রে জোয়ারের সময় দু'পাশের বসতি ভাসিয়ে দিয়ে বন্যা হয়।

—দু'পাশের বসতি কি খুব ঘন?

—না না। ছাড়া ছাড়া কয়েকটা গ্রাম মতো। আলফানসো বলল।

—আমাদের জাহাজ ঢুকবে? হ্যারি জিগ্যেস করল।

—উঁহু। অত গভীর নয়। আলফানসো মাথা এপাশ-ওপাশ করল।

—ইবু সালোমান কি মাঝে মাঝেই ঐ নদীর দিকে যেতেন? ফ্রান্সিস বলল।

—জানি না। তবে আমি বার দুয়েক দেখেছিলাম তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত দেহরক্ষী এতামকে সঙ্গে নিতে।

—হুঁ। তিনি ঐ নদী দেখতে যেতেন। তাই না? হ্যারি বলল।

—মনে হয় উনি নগরের হইহট্টোগোল থেকে কিছুদিনের জন্যে প্রকৃতির কোলে যেতে ভালোবাসতেন। একটা ছোট্ট কবিতায় লিখেছিলেন—

নগরবাসী বন্ধু—
সে ও হে প্রকৃতির মায়ের কোলে—
অনেক সান্ত্বনা পাবে।

—সন্দেহ নেই তিনি সত্যিকারের কবি ছিলেন। আলফানসো, আমাদের জাহাজেও আছে একজন ভালো গায়ক বন্ধু। তাকে পেলে আপনি খুশি হবেন। হ্যারি বলল।

আর কোনও কথা হল না। আলফানসো শুয়ে পড়ল। মারিয়া মেঝেয় কম্বল পাততে পাততে বলল—আমি এখানে শোব আজ।

—কী যে বলো। ঐ কাঠের মেঝেয় তোমার কষ্ট হবে। ফ্রান্সিস আপত্তি করল।

—পারব। মারিয়া শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসও শুয়ে পড়ল। আলফানসো ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে জাহাজচালক ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—ফ্রেজার আমাদের জাহাজ উত্তর পোর্তুগালের বন্দর নগর সিনহোর কাছে এসেছে। আমরা ঐ বন্দর-নগরে যাব না। এবার অন্যভাবে ছক কষেছি। ঐ অঞ্চলের শাসক ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির। নিজের পিতাকে সকলের অগোচরে ধুরন্ধর খুনির মতো ছক কষে হত্যা করেছে। ওকে বিশ্বাস নেই। তুমি উত্তরের দিকে দিক ঠিক রেখে চালাও। যেতে যেতে ডানদিকে একটা নদী—লোভাতের মুখ পাবে। ঐ নদীতে আমাদের যেতে হবে। জাহাজ ঢুকবে না। নৌকো নিতে হবে। যতটা দ্রুত পার চলো। আমরা আর বিনা কারণে এক মুহূর্তও দেরি করব না।

—ঠিক আছে। হুইল ঘুরিয়ে ফ্রেজার বলল।

দুজনে সরে এসে রেলিঙ ধরে দাঁড়াল। শাঙ্কোও এসে দাঁড়াল।

—কী ঠিক করলে, ফ্রান্সিস? হ্যারি জানতে চাইল।

—আমরা সিনহো নগরে যাব না। ইবু গ্যাব্রিওলের থাবা এড়িয়ে লোভাত নদী এলাকায় যাব। শুধু তুমি, শাঙ্কো আর আমি নৌকা নিয়ে সমুদ্রের মুখ থেকে নদীতে ঢুকব। আগে নদীটা ঘুরে ভালো করে দেখব।

—তবে কি ঐ নদীতেই ইবু সালোমনের আরবী স্বর্ণভাণ্ডার গোপনে রাখা আছে? হ্যারি জিগ্যেস করল।

—অবশ্যই কোনও সন্দেহ নেই।

—কিন্তু কোথায়? লোভাত নদী কত লম্বা তা তো জানি না। হ্যারি সংশয় প্রকাশ করল।

—উজিয়ে গিয়ে দেখতে হবে। খোঁজাখুঁজি করতে হবে। হয়তো কাছাকাছি কোথাও সূত্র পেয়ে যাব। উৎস পর্যন্ত যেতে হবে। ইবু সালোমন খুব বেশি দূর যাননি বলেই আমার বিশ্বাস। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু সঠিক জায়গাটা খুঁজে পেতে তো অনেকদিন লাগবে। শাঙ্কো বলল।

—সেটা তো সব খোঁজখবর না নিয়ে এখনই বলতে পারব না। একটা সমস্যা তো আছেই—মাঝে মাঝে আকাশে মেঘ জমছে। কখনও কখনও বৃষ্টিও হচ্ছে। পুরো বর্ষা আসতে খুব একটা দেরি নেই। তার আগেই সবরকম খোঁজাখুঁজি চালাতে হবে। গোপনে রাখা কুফির মানে আরবী স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার উদ্ধার করতে হবে। এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না।

জাহাজের গতি বাড়ানো হয়েছে। মনে হয় দু একদিনের মধ্যেই লোভাত নদীর মুখে পৌঁছতে পারব। তারপর কাজে নামতে হবে। তাও ভাটার সময়। নদীর জল তখন সমুদ্রমুখী বইবে। নদীটা কত বড়, স্রোত কেমন,উজানে নৌকো চালাতে হলে অনেককিছু জানার আছে, বোঝার আছে।

শাঙ্কো বা হ্যারি কেউ কোনওকথা বলল না। ওরা জানে ফ্রান্সিস অনেক ভেবেচিন্তে ছক কষে।

এও তো হতে পারে—শাঙ্কো বলতে গেল।

ফ্রান্সিস ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল—জানি তুমি কী বলবে। হ্যাঁ, তাও হতে পারে। হয়তো গোপন স্বর্ণ ভাণ্ডার সেখানে নেই। কিন্তু আছে কিনা তুমি বা আমি কেউ এক্ষুনি বলতে পারব না। দেখাই যাক না।

আর কোনও কথা হল না। ফ্রান্সিস পুবদিকের একটু মেঘলা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বলল—শাঙ্কো, নজরদার পেড্রোকে গিয়ে বলো আজ রাতে ওর বিশ্রাম নেই। সারারাত পুবদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। শাঙ্কো বাধ্যের মতো সঙ্গে সঙ্গে পেড্রোর খোঁজে চলল।

—হ্যারি, আমরাও আজ রাতে ঘুমোতে পারব না। তৈরি থাকতে হবে। লোভাত নদীর মুখ নজরে পড়বেই। কারণ, এখন সারারাত চাঁদের উজ্জ্বল আলো থাকবে। নদীমুখ চিনতে আমরা অভ্যস্ত। চলো, এখন বিশ্রাম করে নিই।

রাতের খাওয়া সেরে ফ্রান্সিস সেই যে ডেক-এ এসে ঐ রেলিঙ ধরে দাঁড়াল, আর নামল না। হ্যারি মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসই বলল—হ্যারি, তোমার শরীর কিন্তু আমাদের মতো শক্তপোক্ত নয়। তুমি শুয়ে পড়ো গে।

রাত গভীর হতে লাগল। একটানা সমুদ্রের শোঁ শোঁ শব্দের বিরাম নেই। মাস্তুলের ওপরে নজরদার পেড্রো তো নজরদারির ব্যাপারে চির অভ্যস্ত। চারদিকে উজ্জ্বল চাঁদের আলো। আকাশে কালচে মেঘের আনাগোনা চলছে। কখনও চাঁদের মুখ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। মেঘ সরে যেতেই আবার চারদিকে জ্যোৎস্নার বন্যা। ঢেউ ভেঙে জাহাজ দ্রুত চলেছে।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মাস্তুলের ওপর নজরদার পেড্রোর হাঁক শোনা গেল—ডানদিকে—নদীর মুখ। তখন হ্যারিও ফ্রান্সিসের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আকাশে চাঁদ তখন উজ্জ্বলতা হারাচ্ছে। মাথার ওপরে আকাশ সাদাটে হয়ে এসেছে। সূর্য উঠতে দেরি নেই। অস্পষ্ট হলেও দুজনে লোভাত নদীর মুখ দেখল। জাহাজ আরো কাছে এল। সূর্য উঠল। ভোরের নরম রোদে দেখা গেল নদীর জল সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বেশ ঘোলাটে জল। নদীটা মোটামুটি দেখে নিয়ে বুঝল জাহাজ ঢোকার মতো বড় নদী নয়। অভিজ্ঞ চোখে বুঝল খুব গভীর নয় লোভাত নদীর জল। এখন ভাটার টান চলেছে।

—খাঁড়ি নয়। জলের গভীরতাও তেমন নয়। কী বলো? হ্যারি বলল।

—হুঁ। এখানেই তীরে কোথাও জাহাজ নোঙর বাঁধতে হবে। নদী ধরে এগোতে গেলে নৌকা ছাড়া গতি নেই। তাও ভাটা চলছে। নৌকো স্রোতের বিপরীতে চালাতে হবে। ফ্রান্সিস ভাবতে ভাবতে বলল।

ততক্ষণে শাঙ্কোরা কয়েকজনও এসে দাঁড়িয়েছে। শাঙ্কো বলল—কিন্তু কতদূর যেতে হবে তাও তো বুঝতে পারছি না।

—বাঃ শাঙ্কো। এটা একটা কথা হল? আমরা তো নদীতে এখনও ঢুকতেই পারিনি। তার আগেই বুঝে যাব কোথায় কতদূর যেতে হবে! ফ্রান্সিস বলল।

—না না, তা কেন? একটু থতমত খেয়ে শাঙ্কো বলল।

—তাহলে ঐ ভাবনা ছাড়ো। যাও—তিনটে নৌকার ব্যবস্থা করো। দাঁড় বেশি সংখ্যায় নাও। কয়েকজন সকালের খাবার খেয়েই লোভাত নদীতে ঢুকব। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কোরা কয়েকজন তিনটে নৌকোয় নেমে এল। নৌকোর সব কিছু খুঁটিয়ে দেখল। পরীক্ষা করল কোথাও ফুটো রয়েছে কিনা—কাঠ ফেটেছে কিনা। একটায় দেখা গেল মাঝামাঝি একটু জল জমেছে। জলটা ছেচে ফেলে কাঠের টুকরো জুড়ে জায়গাটা শক্ত করা হল।

ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরে রাঁধুনি বন্ধু খাবার দিয়ে গেল। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল—আলফানসো, ইবু সালোমনের শেষ কবিতাটা তো আপনার মুখস্থ। আচ্ছা, কবিতাটার ঠিক অর্থটা কি?

—তেমন কঠিন অর্থ কিছু না। সমুদ্রে বা নদীর জলে যে প্রবল ঘূর্ণি এখানে-সেখানে দেখা যায়, মানুষের জীবনেও তেমনি সেই ঘূর্ণি আছে। হিংসা হানাহানি রক্তের ঘূর্ণি।

স্বাথপর নির্মম হৃদয়ের মানুষদের জীবন ঐ ঘূর্ণির মতো। কিন্তু সেই সব ঘূর্ণির

নিচে যে জলভাগ সেখানকার জল কিন্তু শান্ত অচঞ্চল। স্থিতধী মহান মানুষেরাও তেমনি। সুন্দর অর্থ তাঁরা ঘূর্ণিপাকের নীচে অচঞ্চল থাকেন।

—দেখুন, আমি কাঠখোট্টা মানুষ। কবিতা-টবিতা তেমন বুঝি না। কথাটা বলে ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—হ্যারি, তুমি কিছু বলো।

হ্যারি একটু চুপ করে থেকে বলল—আমারও তাই মনে হয়েছে। কিন্তু তবু আমার মনে খটকা যাচ্ছে না মনে হয় কবিতাটা আলফানসোকে লক্ষ্য করেই যেন লেখা। নইলে বিলিয়ে দাও কথাটা আসত না। আবার দেখো প্রশান্তি সম্পদ। প্রশান্তি নিশ্চয়ই মানুষের মনের সম্পদ। এটাই সঠিক বুঝতে পারছি না।

একপাশে বসে মারিয়া ওদের কথা শুনছিল। বলল—মনের সম্পদ কি বিলিয়ে দেওয়া যায়? সোনা হীরে মুক্তা এসব বিলোনো যায়। তারপর খাদ্যটাদ্যও। কিন্তু মনের সম্পদ? সেটা কি বিলোতে পারে?

আলফানসো, আপনি কী বলেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

আলফানসো কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল। দুজনের ব্যাখ্যা ভাবল। তারপর চোখ পিটপিট করে তাকাল। বলল—ফ্রান্সিস, তোমার বন্ধু সত্যিই জ্ঞানী। শব্দের গভীর অর্থ বোঝে। রাজকুমারীও কম যান না। উনি কবিতা লেখেন কিনা জানি না। তবে কবিতার অর্থ উদ্ধারে নিঃসন্দেহে দক্ষ। একটু থেমে বলল—এভাবেও অর্থটা করা যায়। সত্যি কথাটা হল—কবিতার দু'এক পংক্তি মনে হতেই আমি আর শেষটুকু মনে করার কথা ভাবতামই না। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যেত। তাই খুব গভীরে বোঝবার চেষ্টাও করিনি কোনোদিন। তোমরা দুজন যেভাবে পংক্তিগুলির অর্থ উদ্ধার করেছ, একজন সামান্য কবি হিসেবে আমি তোমাদের ভূয়সী প্রশংসা করছি। হ্যাঁ, এইবার আমি সত্যিই বুঝতে পারছি উনি শেষ কবিতাটার মধ্যে দিয়ে আমাকেই কিছু একটা নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। আগ্রহে বলে উঠল—হ্যারি, তোমরা তৈরি হও। আমার চিন্তায় যেটুকু ধোঁয়াশা ছিল তা কেটে গেছে। দেরি করা চলবে না। সকালের খাবার খেয়ে ইবু মাদ্রিওল কিছু আঁচ করার আগেই আমাদের কাজ শেষ করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব।

ফ্রান্সিস অবশ্য দুটো নৌকা নিল। নৌকো দুটো তৈরিই ছিল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে একটা নৌকোয় হ্যারি বিনোলা আর সিনাত্রাকে নিয়ে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। অন্যটায় ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো বসল। দুটো নৌকোই ছেড়ে দেওয়া হল। খুব উঁচু ঢেউ উঠছে না। নদীমুখে আসতেই দেখা গেল মুখটায় নদীর ঘোলা জল এসে মিশে যাচ্ছে। স্রোত খুব তীব্র নয়। সামনে রইল ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোর

নৌকো। দুজনেই দাঁড় বাইতে লাগল। গতি বাড়াতে হবে। পেছনেরটায় হ্যারি বিনোলা আর সিনাত্রা। নদীর ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে বেশ দ্রুতই চলল নৌকো দুটো। ফ্রান্সিস দু'ধারে তাকিয়ে দেখল—বাঁদিকে টানা উঁচু-নিচু পাহাড়। ডানদিকে কিন্তু বনভূমি। বড় বড় গাছগাছালি ঝোপঝাড়। নৌকো দুটো চলল। কিন্তু দু'পাড়ে কোনও জনবসতি নেই। তবে বাঁদিকে পাহাড়ি এলাকা কমে গিয়ে গাছগাছালি দেখা গেল।

মাথার ওপর সূর্যের তেজ তেমন নেই। মাঝে মাঝে হালকা মেঘে সূর্য ঢাকাও পড়ছিল। তাই দুপুর হয়ে এলেও দাঁড় টানতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছিল না। একটা ছোটো বাঁক আসতেই দেখা গেল জনবসতি শুরু হয়েছে ডানদিকে। কাঠ-পাথরের বাড়ি। গাছের ডাল ফালা করে জানালা-দরজা তৈরি করা হয়েছে। নদীর পাড়ে বেশ কিছু দেশীয় মাছধরা নৌকো। তীরে খুঁটিতে জাল শুকোচ্ছে। বোঝা গেল জেলেপাড়া। এদের মাছ ধরাই প্রধান পেশা। তবে খাটো ছোট ফসলি জমিও দেখা যায়। শাঙ্কোই প্রথম একটু অধীর হয়ে হ্যারির দিকে তাকাল। বলল হ্যারি, আমরা কোথায় যাচ্ছি, কখন থামব কিছুই তো বুঝতে পারছি না

—অধৈর্য হয়ো না। বলবার সময় এলে ফ্রান্সিস নিজেই সব বলবে। হ্যারি শান্তস্বরে বলল।

—আমরা কি কোনও গুপ্তধন উদ্ধার করতে যাচ্ছি? বিনোলা বলল।

—অবশ্যই। নইলে কি হাওয়া খেতে এসেছি? সমুদ্রে কি হাওয়া কিছু কম? হ্যারি বলল।

তখনই ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—এভাবে হবে না হ্যারি, নৌকো ভেড়াতে বলো।

দুটো নৌকো তীরে ভেড়ানো হল। দেখা গেল তীরে বেশ কয়েকটা দেশীয় জেলে নৌকো বাঁধা। তীরের এখানে ওখানে ছড়িয়ে কয়েকটা পাথরখণ্ড। তার উপর বসে কয়েকজন জেলে জাল বুনছে। পরনে গ্রামের জেলেদের সাধারণ পোশাক। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন পোশাক। সবচেয়ে সামনে একটা পাথরের কাছে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিল। কোমরে হাত দিয়ে জেলেরা কেউ কেউ ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ফ্রান্সিসদের নৌকোও দেখছিল। অন্যরকম নৌকো। বোঝাই যাচ্ছে এরা বিদেশি।

নৌকো থেকে ফ্রান্সিস সেই বৃদ্ধের কাছে এল। সঙ্গে হ্যারিও এল। ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল—এই গ্রামটার নাম কি?

—ইরেকাস। বৃদ্ধ ফোকলা মুখে হেসে বলল—আপনারা কারা?

—আমরা বিদেশি। আমাদের জাহাজ এই লোভাত নদীর মুখেই নোঙর করা আছে। এই নদীতে জাহাজ তো ঢোকে না। তাই নৌকোতে চড়ে এসেছি। সমুদ্রে ঘূর্ণিটুর্নি দেখেছি। শুনলাম এই লোভাত নদীতেও নাকি একটা বেশ বড় ঘূর্ণি আছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—সেটা কোথায়?

আঙুল বেশ দূরের একটা ছোট পাহাড় দেখিয়ে বৃদ্ধ বলল—ঐ খানে। বেশ দূরে। ওখানে নদীটা বাঁক খেয়েছে। ওখানেই আছে ঘূর্ণিটা বর্ষাকালে তো সে ভয়ংকর চেহারা নেয়। এখনও কম নয়। কত নৌকো যে ঐ ঘূর্ণির কাছাকাছি যেতেই ডুবে গেছে তার হিসেব নেই। আমরা ভুলেও ওদিকে মাছ ধরতে যাই না।

—তাহলে তো এখন ওটার কাছে যাওয়াই যাবে না। হ্যারি বলল।

—বলেন কী! ঘূর্ণির প্রচণ্ড টানে নৌকাসুদ্ধ তলিয়ে যাবেন। একজন জেলে বলে উঠল।

—তাহলে কী করবে? হ্যারি ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল।

—নৌকো দুটো এখানেই থাক। আমরা নদীতীর দিয়ে হেঁটে ঐ ঘূর্ণির কাছে যাব। চলো এসো সবাই।

সবাই নৌকো থেকে নেমে এল।

শাঙ্কোরা যখন নৌকো দুটোকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধছে তখন সিনাত্রা বলল—ফ্রান্সিস, সেই সকালে খেয়েছি। তারপর এই দুপুরে হতে চলল—। ফ্রান্সিস হেসে ডান হাতের চেটো দেখিয়ে বলল—গির্জার পাদরিদেরও খেতে হয়। ব্যবস্থা হচ্ছে। ফ্রান্সিস জেলেদের কাছে গেল। একজন বয়স্ক জেলেকে বলল—আপনি তো আমার পিতৃতুল্য। আপনি গররাজি হলেও আমি মোটেই দুঃখিত হব না। বয়স্ক জেলে হাঁ করে ফ্রান্সিসদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। হেসে ফ্রান্সিস বলল—লোভাত নদীর সেই মুখ থেকে নৌকো চালিয়ে আসছি। কিচ্ছু পেটে পড়েনি। যদি আমাদের জন্যে সামান্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেন তাহলে আমরা নতুন উদ্যমে কাজে নামতে পারি।

—সেকি কথা? আপনারা তো আমাদের অতিথি! দেখছি কী করা যায়।

বৃদ্ধ জাল বুনছিল। জাল বোনা বন্ধ রেখে চলে গেল ঘরগুলোর দিকে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল—আপনাদের খেতে দেবার মতো খাবার হয়ে গেছে।

একটা মোটামুটি বড় বাড়ির উঠোনে একধরনের লম্বাটে শুকনো পাতায় ওদের খাবার দেওয়া হল। ফ্রান্সিসরা বসে পড়ে খেতে লাগল। মাছের ঝোল মতো আর রুটি দুটো করে। খাওয়া শেষ করে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—

এখন বিশ্রাম-টিশ্রাম চলবে না। আমার সঙ্গে চলো।

নদীতীরের বালিমাটি অনেক দূর টানা চলে গেছে। সেই ভেজা ভেজা বালিমাটির এলাকা ধরে ফ্রান্সিস হাঁটতে শুরু করল দূরে নদীর বাঁকের দিকে। আগে-পাছে হেঁটে চলল সবাই। কিছুদূর যেতেই বালিমাটি এলাকা শেষ। পাথুরে মাটি শুরু হল। মাঝে মাঝে ছোটো বড়ো পাথুরে চাই। সেখানে উঠে চলা শুরু হল। চলার গতি অনেক কমে গেল। এবড়ো খেবড়ো পাথুরে মাটি ছোটো ছোটো চাঁইয়ে উঠে পাশ কাটিয়ে গাছগাছালির গুঁড়ি এড়িয়ে বাঁকের কাছ আসাতে দেখা গেল নদীটা এখানে অনেকটা বাঁক নিয়েছে। দুপাশের পাথুরে মাটির ঢাল নেমে এসেছে। দুপাশের দূরত্ব এখানে অনেক কম। দুপাশের ঢালে ধাক্কা খেয়ে তীব্র স্রোতের জলে একটা বড় আকারের ঘূর্ণি তৈরি হয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, তুমি কি এই ঘূর্ণির কথাই ভাবছিলে?

—হ্যাঁ। লক্ষ করেছো নদীর দুই তীরের দূরত্ব এখানে অনেক কম। এপারে উঁচু উঁচু গাছ আর ঝোপঝাড় টানা চলে গেছে। ওপারে অবশ্য মাত্র একটা চেস্টনাট গাছ দেখছি।

—তাহলে কি ইবু সালোমন এখানেই এসেছিলেন। হ্যারি বলল।

—অবশ্যই। ভুলে যেও না তিনি সঙ্গে ছসাতজন বলশালী দুঃসাহী দেহরক্ষী এনেছিলেন।

—কিন্তু তারা তো কেউ ফিরে আসেনি?

—এখানেই প্রশ্ন। উত্তর সহজ—সেই দুঃসাহসী দেহরক্ষীদের সাহায্যে তিনি এখানেই কোথাও আরবী স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার লুকিয়ে রেখেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে অন্য সব রাজা-শাসকেরা যা করে তিনিও তাই করেছেন। তাদের ছলেবলে কৌশলে হত্যা করেছেন। হ্যারি বলল।

—এতো তোমার অনুমান। হ্যারি বলল।

—দেখি আমার অনুমান সত্যি কিনা। এবার চলো, ঘূর্ণিটার যত কাছে সম্ভব যাব। ফ্রান্সিস বলল।

বড় বড় গাছ-ঝোপঝাড় তীরের কাছ পর্যন্ত নেমে গেছে। তারপর নদীর জল বয়ে চলেছে। ঘূর্ণি বরাবর শেষ দুটো গাছের একটা কাণ্ড ধরে ফ্রান্সিস ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘূর্ণিটার দিকে তাকিয়ে রইল। পাশে দাঁড়ানো শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস,

এই ঘূর্ণির যা পাক দেখছি নৌকো তো নৌকো, জাহাজ ও ডুবে যেতে পারে।

—হ্যাঁ, সমুদ্রেও কোথাও কোথাও ডুবো পাহাড়ের ধাক্কায় এরকম প্রচণ্ড ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। জাহাজও পাক খেতে খেতে ডুবে যায়। এই ঘূর্ণিটা তেমন বড় কিছু না। তবে জেলে নৌকো ডুবে যাবে। তাই জেলেরা এদিকে নৌকোয় চড়ে মাছ ধরতে আসে না।

—আলফানসো বলেছিল ইবু সালোমনের পালঙ্কের নীচে নাকি একটা লম্বাটে সিন্দুকে স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার সযত্নে রাখা ছিল। তাহলে ইবু সালোমান তাঁর দেহরক্ষীদের দিয়ে এই ঘূর্ণির মধ্যেই ফেলে দিয়েছিলেন সেই স্বর্ণভাণ্ডার? হ্যারি ভাবতে ভাবতে বলল।

—মনে হয় সেটাই হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তাহলে তো এই সিন্দুক উদ্ধারই করা যাবে না। হ্যারি হতাশ ভঙ্গিতে বলল।

—এইটাই সবচেয়ে জটিল ধাঁধা। তিনি কি সব জেনেও ঐ সিন্দুকটা এখানে ফেলে দিয়ে গেছেন? ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো ওটা চিরকালের জন্যে মানুষের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। হ্যারি বলল।

—না। সিন্দুকটা এখানেই ফেলা হয়েছিল। কীভাবে ফেলা হয়েছিল এটা জানতে পারলেই বোঝা যাবে তিনি কি সিন্দুকটা চিরদিনের জন্য লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন? তারপর—একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল-হ্যারি, সেই ছেলেবেলায়—তুমি তো জানো কতদিন সমুদ্রের সামনে বসে থেকেছি আমি। কত জাহাজ কত দূর দূর দেশ থেকে আসত। নাবিকদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনি গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনতে শুনতেই বড় হয়েছি আমি। এক বৃদ্ধ নাবিক আমায় বলেছিল—এক সামুদ্রিক ঘূর্ণির কথা। প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে পড়ে পাক খেতে খেতে সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে তলিয়ে গিয়েছিল। আশ্চার্য! গভীরে জল ছিল অনেক শান্ত। ঘূর্ণির পাক কতদূর পৌঁছোয়নি।এত দ্রুত তলিয়ে গিয়েছিল যে তখনও তর দম ফুরোয়নি। সে শান্ত জলে দুপায়ের তলায় পাথর বালিতে ধাক্কা দিয়ে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় শান্ত এলাকা দিয়ে ওপরে উঠে এসেছিল। বেঁচে গিয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কাজেই এই ঘূর্ণির প্রবল মোচড় ওপরেই। একেবারে তলায় জল কিন্তু শান্ত। আসলে অগভীর এই লোভাত নদী। তা নইলে সহজেই দু-তীর বন্যায় ভেসে যেত না। মনে হয় ইবু সলোমন সেই সিন্দুক তুলে আনার জন্যে একটা ব্যবস্থা রেখেছিলেন।

—কেন? হ্যারি বলে উঠল।

—হয় তো তিনি তখনও পুত্রের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারাননি। কত দূরাচারী নির্মম নরঘাতকও তো পরে সাধুপুরুষ হয়েছেন। তাই তাঁর শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল হয়তো পুত্র ইবু গ্যাব্রিওলের মানসিক পরিবর্তন হবে। সে শুধরে যাবে। তখন এই স্বর্ণভাণ্ডার তুলে এনে পুত্রকে দিয়ে যাবেন।

হ্যারি চুপ করে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল—হ্যাঁ ফ্রান্সিস, তোমার অনুমান ঠিক। মানুষের এরকম পরিবর্তনের অনেক কাহিনি আছে।

—তাই-সেই শয়নকক্ষের বাইরে পুত্রের মৃদু পদশব্দ শুনেই বুঝেছিলেন—নিঃশব্দে মৃত্যু হবে তাঁর। পুত্র তাঁকে হত্যা করতে আসছে। তাই তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও সৎ আলফানসোকে গুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডারের হদিস তাঁর শেষ কবিতায় জানিয়ে দিয়ে গেছেন। কীভাবে সেই স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করতে হবে, তারপর কীভাবে হতভাগ্য সর্বহারাদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিতে হবে তার ইঙ্গিতও দিয়ে গেছেন।

কথাটা শুনে হ্যারি চোখ বুজে ভাবল। তারপর তাকিয়ে বলল-সাবাস ফ্রান্সিস! তুমি কবি না হয়েও শেষ কবিতাটার অর্থ সঠিক উদ্ধার করতে পেরেছ। তাহলে উদ্ধারের একটা উপায় নিশ্চয়ই আছে।

—অবশ্যই আছে। এবার এই ঘূর্ণির দু'পাশের গাছের সারি, ঝোপজঙ্গল সব তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে। দেখা যাক কোনও সূত্র পাওয়া যায় কিনা। কারণ, নৌকোয় চড়ে গিয়ে সিন্দুক ঐ ঘূর্ণিতে ফেলে দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু ঐ ঘূর্ণির মধ্যে সিন্দুক ফেলতে গেলে তো যেতেই হবে। কীভাবে দুঃসাহসী দেহরক্ষীরা ওখানে গিয়েছিল? উড়ে উড়ে তো যায়নি। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে কীভাবে গিয়েছিল? হ্যারি বলল।

—সেই সূত্রটাই পেতে হবে। আজ তো বিকেল হয়ে এসেছে। চলো, ঐ জেলেদের গ্রামে ফিরে যাই। আজকের রাত্তিরটা ঐ গ্রামে কাটিয়ে কাল তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে এখানে চলে আসব। মোটেই দেরি করা চলবে না। ইবু গ্যাব্রিওল কিন্তু ভীষণ ধুরন্ধর। তাছাড়া এসব লোকেরা অত্যন্ত সন্দেহবাতিক হয়। যে নিজের পিতাকে নিঃশব্দে হত্যা করতে পারে, সে সব পারে। তার শাসনের বিরুদ্ধে কেউ কোথাও তলে তলে লোক ক্ষ্যাপাচ্ছে কিনা তা জানতেও ইতিমধ্যে সারা রাজ্যে গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছে। গুপ্তচরদের পোশাকে তো আর তাদের আসল পরিচয় লেখা থাকে না। সে ভালো করেই জানে ইবু সালোমন মাঝে মাঝেই এই লোভাত নদী এলাকায় প্রকৃতির কোলে কিছুদিন কাটিয়ে যেতেন। সুতরাং এমনটা হতেই পারে যে স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার লুকিয়ে রাখতে তিনি এই নদী এলাকাটাই বেছে

নিয়েছিলেন। কাজেই লোভাত নদীর তীর বরাবর সব জায়গা ওপরই নজর রাখতে ইতিমধ্যেই গুপ্তচর পাঠিয়েছে। ইরেকাস গ্রামে আমরা এসে ডেরা বেঁধেছি এ খবর খুব সহজেই পাবে ওরা। কারণ, আমরা বিদেশি। এখানকার মানুষ নই। আমাদের শনাক্ত করা সহজ।

—তুমি ঠিকই বলেছ, ফ্রান্সিস। হ্যারি মাথা ওঠানামা করে বলল।

ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—শাঙ্কো, বিনোলা, তাড়াতাড়ি ফিরে চলো। নদীর তীর কিন্তু চলার পক্ষে ভালো রাস্তা নয়। বেশ সময় লাগবে ফিরে যেতে। সন্ধের মধ্যেই ইরেকাস গ্রামে পৌঁছাতে হবে।

সবাই ফিরে চলল। এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথ ভেঙে ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে ওরা যখন ঐ গ্রামে ফিরে এল তখন সন্ধে নেমেছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে সঙ্গে নিয়ে সেই বৃদ্ধের বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল। দেখল বৃদ্ধটি চুপ করে উঠোনের একপাশে একটা গাছের কাটা গুঁড়িতে বসে আছে। ফ্রান্সিস কাছে এসে বলল—কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলছি। বৃদ্ধ কিছু বুঝতে না পেরে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—দেখুন, আমরা এখানে এসেছি ঐ ঘূর্ণিটা দেখতে। তবে সন্ধে হয়ে এল, ভালো করে দেখাই হল না। কালকে একটু সকাল সকাল গিয়ে ভালো করে দেখব। মুশকিল হল সেই সমুদ্রমুখে আমাদের জাহাজ নোঙর করা আছে। জাহাজে ফিরে আবার কাল সকালেই আসা অসম্ভব। কাজেই আমাদের আজকের রাতটা এখানে থাকতে হবে। আমাদের এই ক'জনকে খেতে দিতে আপনাদের তো খরচ হবে। তাই অনুরোধ করিছ—ধারে-কাছে গম, চিনি এসবের দোকান টোকান আছে?

—আছে একটু দূরে। সেখান থেকেই এসব কিনি আমরা। বৃদ্ধ বলল।

—তাহলে আমরা আপনাকে দুটো স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি। আপনারা কিনে আনুন। এই দামটা আপনাকে নিতেই হবে। ফ্রান্সিস অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল।

—আপনি সত্যিই বিবেচক। এতজনকে খাওয়ানো—

বৃদ্ধকে থামিয়ে দিয়ে ফ্রান্সিস বলল—সেটা বুঝি বলেই এই মূল্য ধরে দিচ্ছি। আপত্তি করবেন না।

—ঠিক আছে। দিন । বৃদ্ধ বলল।

—শাঙ্কো, দুটো স্বর্ণমুদ্রা দাও।

—শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে তিনটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে দিল। বৃদ্ধ ফোকলা দাঁতে হেসে বলল—দুটো হলেই হবে।

—তিনটেই রাখুন। শাঙ্কো হেসে বলল।

বৃদ্ধ আর আপত্তি করল না। মুদ্রা তিনটি নিয়ে নিচু দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

ক্লান্ত ফ্রান্সিসরা উঠোনের এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে বসল। শাঙ্কো ঘরের দরজার কাছে গেল। ডাকাডাকি শুরু করল। এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। শাঙ্কো তেষ্টার কথা বলে একটা মাটির বড় প্যাত্রে খাবার জল নিয়ে এল। বলল—মেপে খাও সবাই। রাতে খাওয়ার পর জলে যেন কম না পড়ে। সবাই মুখের কাছে পাত্রটা ধরে অল্প অল্প জল খেল। বেশি খেতে ভরসা পেল না। এবার ওরা শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

একটু রাতে ঐ উঠোনেই দুপুরের মতোই খেতে দেওয়া হল। বৃদ্ধের ছেলে মাঝখানে একটা জ্বলন্ত মশাল একটা গর্তে ঢুকিয়ে রাখল। সেই লম্বাটে শুকনো পাতা। পাঁচটা করে রুটি দেওয়া হল প্রত্যেকের পাতে। ভাজা, ঝোল মতো মিলিয়ে প্রত্যেককে চারটে করে মাছ দেওয়া হল। সঙ্গে আনাজের ঝোল। সবাই ক্ষুর্ধাত। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাত ফাঁকা। ফ্রান্সিস মাছভাজা চিবুতে চিবুতে একটু জোরে বলল—আর চেও না। পেট ভরে খেতে গেলে হয়তো এদের খাবারে টান পড়ে যাবে।

খাওয়ার পর উঠোনেই সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুয়ে পড়ল। নদীর দিক থেকে বেশ ঠান্ডা হাওয়া বইতে লাগল। ক্লান্ত ভাইকিংরা প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ও তাকিয়ে রইল নদীর ওপারের গাছগাছালি আর উঁচু পাহাড়টার দিকে। জ্যোৎস্না-ধোওয়া রাত। চাঁদ পাহাড়ের মাথায়। নিস্তব্ধ রাত। নদীর জলে গাছগাছালি আর পাহাড়ের উপর উজ্জ্বল জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ল। বড় সুন্দর দৃশ্য। সেই সঙ্গে নদীর ঢেউয়ের মৃদু শব্দ। ফ্রান্সিস মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে চেয়ে রইল। এবার সহজেই বুঝল কেন ইবু সালোমন মাঝে মাঝেই এই লোভাস্তি নদী দেখতে আসতেন। একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ফ্রান্সিস।

সকালে বাসি রুটি আর ঝোল খেয়ে আবার যাত্রা শুরু হল। গতকালের মতো একই জায়গায় নৌকোগুলো তীরে পুঁতে রাখা খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বেঁধে হাঁটতে লাগল সবাই। আজকে সূর্যের তেজটা কম। মাঝে মাঝে কালচে মেঘে সূর্য ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। তবে রাস্তা বলে তো কিছু নেই। তাই একটু মন্থর গতিতে হাঁটতে হচ্ছিল। ঘূর্ণির কাছাকাছি পৌঁছে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—বিশ্রাম নেওয়া চলবে না। ঘূর্ণি বরাবর তীরের দিকে ঝুঁকেপড়া গাছগুলোর কান্ড খুব খুঁটিয়ে

দেখতে থাকো। গাছের কাণ্ডের কোথাও কুড়ুলের কোপের দাগ বা অন্য কোনো অস্বাভাবিক চিহ্ন মানে মানুষের হাতে তৈরি কোনও কিছু নজরে পড়লেই আমাকে ডাকবে। ছড়িয়ে পড়ল সবাই। ঝুঁকে পড়া ডাল সরিয়ে বা উঁচু ঝোপগাছের ডালপালা সরিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজা শুরু করল।

ঝোপঝাড় ভাঙার শব্দ শোনা যেতে লাগল। খোঁজাখুঁজি চলছে। হঠাৎ শাঙ্কোর চড়া গলা শোনা গেল—ফ্রান্সিস, এদিকে এসো তো। ফ্রান্সিস খোঁজা বন্ধ রেখে ঝোপঝাড় ঠেলে শাঙ্কোর কাছে ছুটে এল। শাঙ্কো বিরাট উঁচু গাছের নীচে ঝোপঝাড় ভাঙছে তখন। ফ্রান্সিসকে গাছটার প্রায় পনেরো হাত ওপরে কাণ্ডটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—ঐ দেখো।

ফ্রান্সিস মুখ উঁচু করে দেখলে ওখানটার কাছাকাছি সব ডালগুলো কাটা। তার মানে কেউ ওখান পর্যন্ত উঠেছিল গাছ বেয়ে। ওখানে একটা মোটা কাছির অংশ পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধা। আশ্চর্য! কাছিটা কাটা। হাত দুয়েক কাটা কাছি ঝুলছে। ফ্রান্সিস জোর গলায় ডাকল—হ্যারি, দেখে যাও।

ওদের জোর গলায় ডাকাডাকি শুনে হ্যারি ছুটে এল। খোঁজাখুঁজি রেখে বিনোলাও ছুটে এল। হ্যারি কাছে এলে কাটা কাছিটা দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—দেখো, আমার অনুমান সত্যি কিনা।

হ্যারি প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। সে চুপ করে ভাবছে তখন ফ্রান্সিস বলল—বুঝিয়ে দিচ্ছি। লক্ষ করো, এখানে ওপারের পাহাড়ি ঢাল অনেকটা নদীর বুকে নেমে এসেছে। তাতে নদীর দুই তীরের দূরত্ব অনেক কমে গেছে। ওপারের ঢালের পরেই মাত্র একটা বিরাট চেস্টনাট গাছ দাঁড়িয়ে আছে।

হ্যারি ওপারের চেস্টনাট গাছের সঙ্গে এপারের এই উঁচু গাছটার দূরত্ব আন্দাজ করে বলল—হ্যাঁ, দুটো গাছের দূরত্ব অনেক কম।

—ওপারে না গিয়েও আমি বলে দিচ্ছি—ওপারের চেস্টনাট গাছটার দশ-পনেরো হাত ওপরের কাণ্ডে ঠিক এমনি একটা মোটা কাছি বাঁধা আছে। সেটাও কেটে ফেলা হয়েছে।

তার অর্থ দাঁড়াল—ইবু সালোমনের নির্দেশে তাঁর দুঃসাহসী যোদ্ধারা দু'পারের দুটো গাছে ঐ উচ্চতায় একটা মোটা কাছি শক্ত করে বেঁধেছিল। এবার কল্পনা করো ঐ কাছিটা ঠিক ঘূর্ণির ওপর দিয়ে গেছে কিনা। হ্যারি ঘূর্ণিটার দিকে তাকাল। হিসেবে করল। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। কাছিটা টানা হলে ঠিক ঘূর্ণিটার ওপর দিয়েই যাবে। ও বলে উঠল—সাবাস ফ্রান্সিস। এবার সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। একজন বা দুজন দেহরক্ষী—

—দুজন। অত ভারী সিন্দুকটা একজনের পক্ষে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। টানা কাছিটায় একটা মোটা দড়ির ফাঁস পরানো হয়েছিল। সেই ফাঁসে সোনার মুদ্রাভর্তি সিন্দুকের দু'পাশের কড়া দুটোয় দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। তারপর ঝুলিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঐ ঘূর্ণিটার ঠিক ওপরে। দড়ির নানারকম গিঠ বাঁধা ফাঁস দড়িতে ঝুলিয়ে মালপত্র এ জাহাজ থেকে ঐ জাহাজে নিয়ে যাওয়া এসব রীতিতে আমরা অভ্যস্ত। দেহরক্ষীরা সেটাই করেছিল।

—তারপর ওপর থেকে দড়ি কেটে সিন্দুকটা ঐ ঘূর্ণির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। এই তো? হ্যারি বলল।

—ঠিক তাই। এ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা ভেবে নিয়েছি।

—তাহলে তো যে কথাটা আমি আগে বলেছিলাম সেটাই বলি—ইবু সালোমন কি ঐ সম্পত্তি চিরদিনের জন্য মানুষের নাগালের বাইরেই রেখে দিতে চেয়েছিলেন? হ্যারি বলল।

—এই জায়গায়টাতেই আসল রহস্য। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

তোমার কী মনে হয়? হ্যারি জানতে চাইল।

—না। উনি প্রয়োজনের সময় এই গোপনে ফেলে দেওয়া সিন্দুকটা উদ্ধারের উপায় রেখেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল। কবিতাটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। শেষের দিকের পংক্তি—তাদের সেই প্রশান্তির সম্পদ বিলিয়ে দাও।' তাহলে তো সহজেই বোঝা যাচ্ছে সেই সম্পদ উদারতা ভালোবাসা বা ওরকম কিছু না—এমন কিছু যা অকাতরে বিলিয়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ স্বর্ণ সম্পদ—তাই কিনা? ফ্রান্সিস হেসে বলল।

ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রেখে হ্যারি বলে উঠল—আবার বলছি সাবাস ফ্রান্সিস।

—এখনও কিন্তু সেই সিন্দুক উদ্ধার করতে পারিনি। কথাটা বলে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, একটা সূত্র পেয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটি এখনও খুঁজে পাইনি। আজ আর খোঁজাখুজি নয়। এখন আমরা ঐ ইরেকাস গ্রামে ফিরে যাব। চলো সব।

আবার ইরেকাস গ্রামের দিকে চলা শুরু হল। সেই পাথর-পাথুরে মাটি গাছ-ঝোপের মধ্যে দিয়ে। দুপুর পেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিস একটু চিন্তিত স্বরে বলল—হ্যারি, দুপুরে খাওয়ার কথা কিছু তো বলে যাইনি। হ্যারি হেসে বলল—তুমি যখন নিজের ভাবনা-চিন্তা নিয়ে চুপ করে থাক তখন অন্য দিকগুলো তো আমাকেই ভাবতে হয়। চিন্তা নেই—শাঙ্কোর কাছ থেকে আরো দুটো স্বর্ণমুদ্রা বৃদ্ধকে দিয়ে বলে রেখেছি—আরো দু'একদিন আমরা এখানে থাকব। আপনি আমাদের.

খাওয়ার ব্যবস্থা রাখবেন। এই জন্যেই হ্যারি, তোমাকে ছাড়া আমার এক মুহূর্তও চলে না। এমনকি—মারিয়াও মাঝে মাঝে আমার মন বোঝে না। স্বাভাবিক রাজকুমারী তো সেদিনের।

—তা ঠিক, হ্যারি, ফ্রান্সিসের কথার উত্তর দিল।

রান্না হয়ে গিয়েছিল। পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত ভাইকিংরা আর দেরি করল না। নিজেরাই উঠোনের একপাশে জড়ো করে রাখা লম্বাটে শুকনো পাতা নিয়ে এসে খেতে বসে গেল। খেতে খেতে পাশে বসা শাঙ্কোকে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো একটা খুব দরকারি কাজ তোমাকে করতে হবে। একা। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। তুমি কাল দুপুরে খেয়ে একটা নৌকো নিয়ে বেরিয়ে যাবে। জাহাজে উঠে যত লম্বা পাও একটা শক্ত কাছি আর মোটামুটি হাতকুড়ি শক্ত দড়ি নিয়ে আসবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

—এটা এমন কিছু কাজ নয়। সমস্যা হল-এখন ভাটার টান চলছে। নৌকো গুলো নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু ফেরার সময় জোয়ারের টান না পেলে উজান বেয়ে আসতে বেশ কষ্ট হবে।

—তাহলে একটা নৌকোতে না হয় বিনোলা যাবে। তোমাকে সাহায্য করতে পারবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। কাছিটা পাকিয়ে রাখতে একটা নৌকোর জায়গায় না হয় দুটো নৌকোয় ছড়িয়ে রাখব। আর একটা নৌকো নিয়ে আসব।

—যেমন সুবিধে বুঝবে। তবে ঐ নৌকোটায় আমার মায়ের আদ্যক্ষর 'এফ' আমি খোদাই করে রেখেছি। ওটা চেপেই ডুবো পাহাড়ের প্রচণ্ড ধাক্কা সামলে সোনার ঘন্টার দ্বীপে গিয়েছিলাম। আমি মারা গেলে ঐ নৌকোটা রাজার যাদুঘরে সোনার ঘন্টাটার পাশে রেখে দিও।

—ফ্রান্সিস, মৃত্যুচিন্তা মনকে দুর্বল করে দেয়। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল।

—হ্যারি, ফ্রান্সিস হেসে বলল—আমার ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা। বেঁচে থাকতে আমাকে উজ্জীবিত করে। মৃত্যু তো অমোঘ সত্য। আমি কক্ষনো ভুলি না—যে কোনো মুহূর্তে আমার মৃত্যু হতে পারে। কাপুরুষের কলঙ্কিত মৃত্যু নয়—বীরের মৃত্যু।

—এজন্যেই সত্যি বলছি, মাঝে মাঝে আমার বড় ভয় করে। হ্যারি আবার মৃদুস্বরে বলল। তারপর বলল—এই যে তুমি দু'ধারের গাছে কাছি বেঁধে দুরন্ত ঘূর্ণির ঠিক ওপরে কাছি বেয়ে বেয়ে যাবে বলে স্থির করেছ—জান এটা কতবড় মারাত্মক ঝুঁকি!

—সে তো হাত ফসকে ঘূর্ণিতে পড়ে গেলে। শোনো একটা সূত্র পাওয়া বাকি। সেটা পেলে নির্বিঘ্নে ঐ সিন্দুক ঘূর্ণির মধ্যে থেকে তুলে আনতে পারব। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে? নির্বিঘ্নে? জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে?

—আলবাৎ পাড়ব। কিন্তু হ্যারি, আমার মন বলছে অত সহজে সিন্দুকটা উদ্ধার করা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল।

রাতে উঠোনেই খাওয়ার-দাওয়া চলছে। দুপুরের মতো বৃদ্ধ এদিক ওদিক ঘুরে তদারকি করছে। হ্যারি হেসে বলল— আপনি ঘরে যান। বিশ্রাম করুন। বৃদ্ধ আর কোনও কথা না বলে চলে গেল।

'রাতে আগের মতোই উঠোনে এখান-সেখানে শুয়ে পড়ল সবাই। নদীর দিকে থেকে সারাদিনের গরমের পর ঠান্ডা বাতাস ছুটে আসছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল প্রায় সবাই। শুধু ফ্রান্সিস মাথার পেছনে দুহাতের চেটো রেখে চোখ বুজে শুয়ে আছে। হাতে সময় নেই। শাঙ্কোদের ফিরতে দেরি হয়ে গেলে সমস্যা বাড়বে। সবাইকে নিয়ে ঐ বাঁকে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। সন্ধের অন্ধকারের আগে কতক্ষণ আর সময় পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ খুলল। আকাশে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে যেন। আগণন তারা জ্বলছে। হালকা সাদা মেঘ উড়ছে। আঃ পৃথিবী কী সুন্দর! এই চোখে দেখা আকাশই তো শেষ সীমা নয়। সহপাঠী হ্যারির সঙ্গে এক পাকা দাড়ি-গোঁফওয়ালা বৃদ্ধর পাথরের ঘুপ্‌চি ঘরে ওরা জনা দশবারো ছাত্র পড়ত। বৃদ্ধের নাম মনে নেই। মাঝে মাঝে অদ্ভুত কথা বলত বৃদ্ধই। তোমরা যে আকাশটা দেখ সেটা ছাড়িয়ে এই যে শূন্যতা তার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। এরকমই কী যেন। ফ্রান্সিস মনে মনে ভাবছিল—হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল তখনই দেখল ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

—ঠিক জানি। ঘুমোওনি। হ্যারি বিড়বিড় করে বলল। হ্যারি, ছেলেবেলাটা সত্যি বড় সুন্দর তাই না?

—কী এমন নতুন কথাটা বললে আঁ?

—শাঙ্কোরা যে কখন ফিরতে পারবে তাই ভাবছি। ফ্রান্সিস একই চিন্তিত স্বরে বলল।

—ভেবে কী করবে? যখন আসার আসবে। কিন্তু রাত জাগলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। হ্যারি বলল।

—ও আমার অভ্যেস আছে তা জান। ফ্রান্সিস পাশ ফিরতে ফিরতে বলল।

পরেরদিন সকালে ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল বৃদ্ধকে গিয়ে বলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন দুজনের মতো খাবার এক্ষুনি বেঁধে দেবার ব্যবস্থা করেন। বেশি কিছু না। শুধু রুটি মাছের ঝোলমতো। হ্যারি সেই বৃদ্ধকে দেখল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারি কাছে গিয়ে বলল দেখুন বাধ্য হয়ে আপনাকে একটু বিরক্ত করছি। বৃদ্ধ কোমল মুখে হেসে বলল বলুন কী ব্যাপার। রান্না ভালোই হচ্ছে না?

—না, না। এত সুস্বাদু মাছ আমরা কোনদিন খাই নি। আচ্ছা এই মাছগুলোর নাম কী?

—লিতানি। এই নদীতে প্রচুর পাওয়া যায়। বর্ষার সময় তো হাজারে হাজারে মাছ। কাছাকাছি গ্রাম থেকে ব্যবসায়ী আসে। নৌকো ভর্তি করে মাছ কিনে নিয়ে যায়। সেই সব মরশুমে আমাদের আয় যথেষ্ট হয়। বলতে পারেন ঐ আয়ের ওপরেই আমরা বেঁচে আছি।

—শুনে ভাবতে লাগল। এখন যা বলছিলাম আমাদের দুই বন্ধু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গিয়ে আমাদের নোঙ্গর করা জাহাজে যাবে। খুব দরকারি কিছু জিনিস নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। কাজেই এই দুজনের জন্যে—

—বুঝেছি।

—যদি বলেন রান্নার ব্যাপার আমরা সাহায্য করতে পারি।

—সে কি! আপনারা আমাদের অতিথি। আপনাদের নিজেদের রান্না করা খেতে দিলে আমাদের গ্রামের অমঙ্গল হবে। নিশ্চিন্ত থাকুন। বাড়ির মেয়েদের বলছি—অল্পক্ষণের মধ্যেই রান্না করে দিতে।

হ্যারি শাঙ্কোকে গিয়ে তাড়া লাগাল। বলল তোমাদের দুজনের জন্যে যা হোক রেধে দেওয়া হচ্ছে। দেরি না করে খাওয়া শেষ করেই যাত্রা শুরু করবে। আর হ্যাঁ পেট পুরে খাবে। তোমাদের বেশি খেলে আমাদের খাবার কম পড়ে যাবে কিনা এসব একেবারে ভাববে না। যাও—শুয়ে পড়ে বিশ্রাম যতটা পার করে নাও।

শাঙ্কো বিনোলাকে ডেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সারল। তারপর তৈরি হয়ে নদীর ধারে চলে এল। দুটো নৌকোয় উঠল দুজনে। নদীর জলের ভাঁটার টানে নৌকো ছেড়ে দিল। দুপুরের রোদের তেজ কম।এদিক ওদিক আকাশ ছাড়া ছাড়া মেঘ রোদের তেজ চাপা পড়ে গেছে।

নদীর মুখের কাছাকাছি এসেছে আজ শাঙ্কো আর বিনোলা। শাঙ্কো হিসেব করে বুঝল ভাটার টানে বেশ তাড়াতাড়িই এসেছে। পশ্চিমের তারাজ্বলা আকাশে বাঁকা

চাঁদ। খুব উজ্জ্বল চাঁদের আলো নেই। এর অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় চারিদিক মোটামুটি দেখে বোঝা যাচ্ছে একপাশে গাছগাছালি অন্য পাশে উঁচুনিচু পাহাড়ি এলাকা।

দূর থেকে শাঙ্কো অস্পষ্ট দেখল ওদের জাহাজটা বাঁদিকের তীরে নোঙ্গর করা হয়েছে। ঢেউয়ের ধাক্কায় আস্তে আস্তে দুলছে। শাঙ্কোদের রাত তো চাঁদের আলো না থাকলে অন্ধকারেই কাটে। কাজেই অন্ধকারে ওরা বেশ আন্দাজে সব বুঝে নেয়। অন্তত জাহাজ বন্দর সহজেই বুঝতে পারে।

ওদের জাহাজের কাছে এসে দেখল জাহাজের সব আলো নেভানো এমনকি সিঁড়ির ঘরের আলোও। শাঙ্কোর কেমন খটকা লাগলো। ওরা সাধারণত রাতে সিঁড়িঘরের আলোটা জ্বেলে রাখে যাতে জাহাজে রাতের অন্ধকারে জলদস্যুরা জাহাজে উঠলে দেখা যায়। কয়েকজন বন্ধু জাহাজের উপর ঘুমোয়। ওদের তো ডাকতে হয়। শাঙ্কোরা আসবে এটা তো ওরা জানে না। জাহাজের গায়ের কাছে এসে শাঙ্কো হাতের চেটো গোল করে চেঁচিয়ে ডাকল—ভাইসব একটু সজাগ থাকো। এভাবে মড়ার মতো ঘুমিও না। কিন্তু কারও কোন সাড়া পেল না। অবাক কাণ্ড! কেউ কি তাহলে উপরে শোয়নি। যাক গে জাহাজে উঠে দেখা যাবে। নৌকো দুটো জাহাজের গায়ে লাগল। দড়ির মইটা নামানো নেই। অবশ্য বন্ধুদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওরা যে এত তাড়াতাড়ি মাত্র দুজন আসবে এটা তো ওদের জানা নেই। হালের কাছে গোটানো দড়ি ধরে ধরে শাঙ্কো জাহাজের অন্য পাশে চলে এলো। তখনই অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখল নদীর মুখের ওপাশে একটা জাহাজ দেখল। চলন্ত জাহাজ নয়। নোঙ্গর করা জাহাজ। শাঙ্কো দড়ি ধরে উঠতে উঠতে ভাবল—এই জাহাজটা বোধহয় ওদের পর এখানে এসেছে। কিন্তু জাহাজে চড়ে এখানে কারা এল? যাক গে দুজনে পরপর অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় জাহাজের উপর উঠে এল। সামনে তাকিয়েই শাঙ্কো দেখল—রাজকুমারী চুপ করে সিঁড়িঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শাঙ্কো রাজকুমারীর দিকে যেতে যেতে বলল—রাত জাগবেন না। যান ঘুমিয়ে পড়ুন। ফ্রান্সিসরা সবাই সুস্থ। ভালো আছে। রাজকুমারীর কাছে এসে শাঙ্কো সেই স্বল্প আলোয় দেখল—রাজকুমারী কেমন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখমুখ শুকনো। মাথার চুল এলোমেলো। কেমন রোগার্ত। রাজকুমারী—আপনার শরীর ভালো আছে তো? আপনি অসুস্থ শুনলে ফ্রান্সিস কিন্তু —কথটা শাঙ্কো শেষ করতে পারল না। দেখল সিঁড়ি দিয়ে দুতিনজন মূর যোদ্ধা খোলা তরোয়াল হাতে দ্রুত উঠে এল। বিদ্যুৎ চমকের মতো ওর মনে পড়ল একটা জাহাজ ও আগে দেখে এসেছে। তাহলে মুর যোদ্ধারা



দু তিন জন মূর যোদ্ধা খোলা তরোয়াল হাতে দ্রুত উঠে এল।

ওদের জাহাজ দখল করেছে। রাজকুমারীসহ সবাই তাহলে বন্দী। শাঙ্কো ত্বড়িৎ গতিতে রেলিঙ্গের দিকে ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে বললো—বিনোলা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ো। পালাও। কথাটা বলতে বলতেই শাঙ্কো লাফ দিয়ে রেলিঙ টপকে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপরেই একটু ডুবে ওদের একটা নৌকার কাছে ভেসে উঠল। ভেজা শরীর নিয়ে এক ঝটকায় একটা নৌকায় উঠে পড়েই এক হাঁচ্‌কা টানে দড়িটা ছিঁড়ে নৌকাটা নিয়েই দাঁড় তুলে বাইতে লাগল। জোরে দাঁড় বেয়ে অনেকটা দূরে চলে এল। মাথা তুলে এক নজর দেখল—রেলিঙ ধরে মূর যোদ্ধারা তাকিয়ে আছে। শাঙ্কো জোরে শ্বাস ফেলল। একটু হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণপণ দাঁড় বাইতে লাগল। জোয়ার তখন শুরু হয়ে গেছে। বেশ কষ্ট করেই নৌকাবাইতে লাগল। জোয়ারের টান বাড়ল। নৌকো দ্রুত চলল।

ততক্ষণে মূর যোদ্ধারা বিনোলাকে ধরে সিঁড়িঘরের দিকে নিয়ে চলেছে। রাজকুমারী দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। এই বন্দী জীবনে একটাই সান্ত্বনা ফ্রান্সিসরা সকলেই সুস্থ আছে, ভালো আছে। অবশ্য কবে সবাই ফিরবে সেটা আর আতর্কিতে আক্রান্ত শাঙ্কো বলতে পারে নি।

শাঙ্কো দাঁড় বাওয়া একেবারে বন্ধ করতে সাহস পেল না। প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগল । পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল খুব অস্পষ্ট ওদের জাহাজটা তখন বেশ দূরে। চাঁদের আবছা আলো চারদিকে। আস্তে আস্তে জোয়ারের টান আরও বাড়ল। সেই টানে নৌকো বেশ তাড়াতাড়িই ভেসে চলল। এতক্ষণে শাঙ্কো বুঝতে পারল ও কতটা ক্লান্ত। একটু আস্তে আস্তে দাঁড় বাইতে লাগল। নদীর জলে চাঁদের নিস্তেজ আলো পড়েছে। নদীর দুপাশে এবার কালো কালো গাছগাছালি শুরু হল। আস্তে আস্তে চারদিকে একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। শাঙ্কো আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল কালো মেঘ জমেছে আকাশে। হঠাৎই জলে ছড় ছড় শব্দ তুলে বৃষ্টি নামল। কেমন ধূসর হয়ে গেল আকাশটা। ঝাপসা হয়ে গেল চারদিক। এক তো সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে গায়ের পোশাক ভিজে গিয়েছিল এখন বৃষ্টির জলে পোশাক সপসপে হয়ে গেল। মেঘ উড়ে গিয়ে বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশ সাদাটে হয়ে গেল। বোঝা গেল ভোর হতে দেরি নেই।

তখন সবে সূর্য উঠেছে। চারিদিক ভোরের রোদ ছড়িয়ে পড়ল। দূরে ইরেকাস গ্রামের ঘাট দেখা গেল। শাঙ্কো আস্তে আস্তে ঘাটে নৌকো দুটো ভেড়াল। নৌকো চালিয়ে এত দূরে যাওয়া আসা। শাঙ্কো ক্লান্তিতে অবসাদে তখন প্রায় নড়তেই

পারছে না। ঘাটে বন্ধুরা কেউ দাঁড়িয়ে নেই। শাঙ্কো শরীরের সমস্ত জোর এক করে প্রাণপণে ডাকল—ফ্রান্সিস। কিন্তু সেই ডাক খুবই মৃদু শোনাল। শাঙ্কো বুঝল তীরে উঠে না ডাকলে কেউ শুনতে পাবে না। ও ওঠার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না গা ছেড়ে দিয়ে নৌকায় জমা বৃষ্টির জলের মধ্যে চোখ বুজে পড়ে রইল। নৌকটা ভাসতে ভাসতে তীরের কাছে এসেছে তখন। ফ্রান্সিস দুহাতের মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছিল। শাঙ্কোরা ফিরবে বলে। কাজেই সারারাত প্রায় জেগেই কেটেছে। শাঙ্কোর ডাক খুব অস্পষ্ট ওর সতর্ক কানে পৌঁছলো ও এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েই তীরভূমির দিকে ছুটলো। ফ্রান্সিসকে ছুটতে দেখে হ্যারিও পেছনে পেছনে ছুটল।

তীরের কাছে নৌকো ভাসছে। তখন ফ্রান্সিস জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকার কাছে এসে ফ্রান্সিস দেখল নৌকোর মধ্যে শাঙ্কো একা অসাড় পড়ে আছে। হাতে দাঁড়টা ধরা আছে। ও তাড়াতাড়ি ছুটে এসে শাঙ্কোকে টেনে তুলল। তখনই হ্যারি আর দুই বন্ধুও এসে হাত লাগাল। ওরা শাঙ্কোর অসাড় দেহটা তুলে এনে পাথুরে শুকনো মাটির উপরে শুইয়ে দিল। এতক্ষণ শাঙ্কো চোখ বুঁজে ছিল। এবার চোখ মেলে ফ্রান্সিসদের দেখল। ফ্রান্সিস পাশের বন্ধুটিকে বলল—শিগগির শাঙ্কোর জন্যে শুকনো কাপড় নিয়ে এস। বন্ধুটি ছুটে গেল। হ্যারি শাঙ্কোর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল শাঙ্কো তুমি সুস্থ আছো তো? শাঙ্কো ম্লান হেসে মাথা কাত করল।

—শাঙ্কো-বিনোলা কোথায়? ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল। শাঙ্কো হাতের চেটোতুলে ইঙ্গিত করল—পরে বলবে। ফ্রান্সিস আর কোন কথা জিজ্ঞেস করল না। তখনই বন্ধুটি শাঙ্কোর জন্য শুকনো পোশাক নিয়ে এল। সবাই মিলে শাঙ্কোকে দাঁড় করাল। তারপর ভিজে পোশাক খুলে শুকনো পোশাক আস্তে আস্তে পরিয়ে দিল। শুকনো পোশাক পরে শাঙ্কোর শরীর যেন সাড় এল।

হেঁটে যেতে পারবে? হ্যারি জানতে চাইল। শাঙ্কো মাথা কাত করল। দুতিন জন শাঙ্কোকে ধরে ধরে বাড়ির উঠোনে নিয়ে এল। যে মোটা কাপড় পেতে ওরা কয়েক জন রাতে শুয়ে ছিল সেখানে শাঙ্কোকে আস্তে করে শুইয়ে দিল।

—সিনাত্রা দেখো তো কারো বাড়িতে দুধ পাও কি না ফ্রান্সিস বলল, সিনাত্রা চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বড় গ্লাসে করে দুধ নিয়ে এলো। গ্লাসটা হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস বুঝল বেশ গরম দুধ। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর মাথা তুলে ধরল। হ্যারি আস্তে আস্তে শাঙ্কোকে দুধ টুকু খাইয়ে দিল।

—ছাগলের দুধ। সিনাত্রা বলল।

—গরম হলেই হল। ফ্রান্সিস বলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই এত ক্ষণ ভিজে পোশাকে থাকা শাঙ্কো শরীরের উষ্ণতা অনুভব করল। ও আস্তে আস্তে উঠে বসল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ওর পাশে বসল।

—এখন ভালো লাগছে তো? হ্যারি বলল।

শাঙ্কো মাথা কাত করে দুর্বল স্বরে বলল। হ্যাঁ।

—শাঙ্কো আমার মনের আশঙ্কা যাচ্ছে না জাহাজের সবাই ভালো আছে তো? ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল।

—মনে হয় ভালো আছে। তবে সবাই বন্দী হয়ে আছে জাহাজে। রাজকুমারী শরীর খারাপ হয়ে গেছে। তবে অসুস্থ নয়। তারপর শাঙ্কো থেমে থেমে আস্তে আস্তে সব ঘটনা খুলে বলল। ফ্রান্সিস হ্যারি দুজনেই চুপ চাপ রইল। ততক্ষণে বন্ধুরাও এসে ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সব শুনে ফ্রান্সিস বলল—এখন সবই পরিষ্কার বুঝতে পারছি ইবু গ্যাব্রিওল জাহাজ ভর্তি যোদ্ধা নিয়ে আমাদের হন্য হয়ে খুঁজে বেরিয়েছে। উদ্দেশ্য ইবু সালোমনের স্বর্ণভাণ্ডারের উদ্ধারের জন্যে আমরা চেষ্টা করছি কিনা। ও ভালো করেই জানে ঐ স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করার বুদ্ধি ওর নেই। ওর বন্ধুদেরও নেই। খুব ধুরন্ধর তো ঠিক আন্দাজ করেছে আলফানসো আমাদের জাহাজেই আশ্রয় নিয়েছে আর আমরা স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করতে নেমেছি। আমরা সেই স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারলে নিশ্চয়ই সেটা নিয়ে জাহাজে ফিরবো। তাই ও বুদ্ধি খাটিয়ে জাহাজ দখল করে বন্ধুদের বন্দী করছে। অপেক্ষা করছে কখন আমরা আসব তারই জন্যই।

—তাহলে এখন কী করবে? হ্যারি জানতে চাইল।

—বন্ধুদের আগে মুক্ত করবো। ফ্রান্সিস ভাবতে ভাবতে বলল।

—তাহলে তো আমাদের জাহাজে ফিরে যেতে হবে। আর একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায়। ঐ দুর্ধর্ষ মুর যোদ্ধাদের সঙ্গে তো লড়াইয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। হ্যারি বলল।

—হ্যারি কব্জির জোরের চেয়ে বুদ্ধির জোর বেশি। আজকের দিনটা থাক। শাঙ্কোর যা অবস্থা। একদিন বিশ্রাম পেলে শাঙ্কো অনেকটা সুস্থ হবে। ওকে এই অবস্থায় সাথে নেওয়া যাবে না। আবার ওকে এখানে একা রেখেও যাওয়া যাবে না। একটা দিন তো হাতে আছে। ঠিক একটা ছক কষতে পারবো।

—কিন্তু ইবু গ্যাব্রিয়েল শুধু ধুরন্দর নয় ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির। নিজের অমন নিরীহ পিতাকে যেভাবে নিঃশব্দে হত্যা করেছে—। ফ্রান্সিস হাত তুলে হ্যারিকে

থামিয়ে দিয়ে বলল—অনেক দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষেরই কোন না কোন দুর্বলতা থাকে। ইবু গ্যাব্রিয়েল সম্পদ পিশাচ। এটাই ওর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। সেই ফাঁদেই ওকে ফেলতে হবে।

—তাহলে তো সেই স্বর্ণসম্পদ উদ্ধার করতে পারলে—

—হ্যাঁ। ওকেই দিয়ে দেব। হাজার হোক ও তো ইবু সালোমানের পুত্র। পিতার সম্পদের অধিকারী তো ইবু গ্যাব্রিয়েলই। প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করবো ধনী হবো সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তো আমরা গুপ্তধনভাণ্ডার উদ্ধার করি না। ফ্রান্সিস বলল।

—তা ঠিক। কিন্তু ওর মতো নরপশুকে কি বিশ্বাস করা যায়?

—ভাবতে হবে। একটা পুরো দিন তো পাচ্ছি। দেখি সবদিক ভেবে। কথাটা বলে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি তুমি এই বৃদ্ধকে বল—তাড়াতাড়ি যা হোক রেঁধে দিতে। শাঙ্কোকে সুস্থ করাই এখন আমার প্রাথমিক কাজ। শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—শাঙ্কো—এখন শুয়ে বিশ্রাম কর রান্না হলেই পেট পুরে খাবে। সারা দুপুর শুয়ে ঘুমিয়ে বিশ্রাম করবে। রাতেও বিশ্রাম ঘুম হলে কাল সকালেই তুমি সুস্থ বোধ করবে। আর কথা নয়। এবার বিশ্রাম কর। ফ্রান্সিস উঠে এল। শাঙ্কোর জন্য রান্না হল কি না সেই খোঁজে চলল। বন্ধুরা কয়েকজন এসে শাঙ্কোর কাছে বসল। শাঙ্কো মৃদুস্বরে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। কিন্তু মাঝে মাঝেই উন্মানা হয়ে যেতে লাগল। রাজকুমারী ও বন্ধুরা বন্দী হয়ে আছে। এই কথা ভেবে। ফ্রান্সিস কী ভাবে ওদের মুক্ত করবে সেই চিন্তাই করছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কোকে বাসি পাঁচ-ছটা রুটি গরম করে সঙ্গে বেশ কয়েকটা মাছের ঝোল দেওয়া হল। শাঙ্কো খেতে লাগল।

রাতে খাওয়ার সময় হ্যারি বলল—জাহাজে কখন যাবো আমরা?

—দুপুরে তাড়াতাড়ি খেয়েই বেরিয়ে পড়বো ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরের খাওয়া ফ্রান্সিসরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। শুধু রুটি আর মাছের ঝোল। অন্য কোন পদ নয়।

পেট পুরে খাও। রুটি খাওয়া নাও জুটতে পারে। ফ্রান্সিস যেমন বরাবর বলে তাই গলা বাড়িয়ে বলল। পরদিন বিশ্রাম করে ঘুমিয়ে শাঙ্কো আবার গায়ে জোর পেল। তারপর তৈরি হয়ে নদীর ধারে চলে এল। দুটো নৌকোয় উঠল সবাই। নদীর জলের ভাঁটার টানে নৌকো ছেড়ে দিল।

কেউ কোন কথা বলছিল না। ফ্রান্সিস অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবল।

একটাই সমস্যা। আবু গ্যাব্রিয়েল নিজে ঐ জাহাজে আছে কিনা। শাঙ্কো বলতে পারেনি।

কারণ ও তরোয়াল হাতে কয়েকজন মূর যোদ্ধাকেই দেখেছে শুধু। ইবু গ্যাব্রিয়েল থাকলে যে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে পারবো। দলপতি সেটা পারলেও কোন সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পাবে। ওরা ইবু গ্যাব্রিয়েলকে যমের মতো ভয় করে। এটাই স্বাভাবিক।

সন্ধ্যের কাছাকাছি সময়ে ফ্রান্সিসদের নৌকোদুটো নদীর মুখের কাছাকাছি এল। শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় দেখা গেল দুটো জাহাজই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস আশান্বিত হল নিশ্চয়ই ইবু গ্যাব্রিয়েল এসেছে সরেজমিনে সব দেখতে।

জাহাজ দুটোর কাছাকাছি আসতে ফ্রান্সিসরা দেখল খোলা তরোয়াল হাতে বেশ কয়েকজন যোদ্ধা জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। সিনাত্রা হ্যারির কাছে এসে বলল—ওরা তো আমাদের মেরে ফেলবে।

—এখনই ঠিক বলতে পারছি না। তবে ফ্রান্সিস খুব ভেবেচিন্তে পা ফেলে। কাজেই প্রাণের ভয় নেই। হ্যারি বলল।

নৌকো দুটো জাহাজের গায়ে এসে লাগল। ফ্রান্সিস নৌকোয় উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে গলা তুলে বলল—ভাই, আমরা নিরস্ত্র। আমরা লড়াই করতে আসিনি একথা আগেই বলেছি। আমরা বন্ধুদের খোঁজ নিতে এসেছি। তখন যোদ্ধাদের মধ্যে একজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে এল। বেশ গর্বোদ্ধত ভঙ্গি অন্য যোদ্ধাদের মতো পোশাক হলেও মাথায় একটা কালো কাপড়ের পাগড়ির মতো। তরোয়ালের বাঁটে সোনারূপোর কাজ করা। বেশ বলশালী চেহারা। গলায় বুটিমতো সোনার হার ঝুলছে। ফ্রান্সিসদের বুঝতে অসুবিধে হল না এই লোকটিই দলপতি। কাছে আসতে বলল। গায়ের আটোসাটো কালো পোশাকটা দামি কাপড়ের। হয় তো এই যোদ্ধার হাতেই ইবু সালোমানের মৃত্যু হয়েছে। মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব এলেও নিজেকে সংযত করল।

তোমার বন্ধুরা আমাদের জাহাজে বন্দী হয়ে আছে। দলপতি বলল।

কেন?

—তোমরা ইবু সালোমনের কুফির ভাণ্ডার উদ্ধার করে এই জাহজেই আসবে। যাতে তোমরা আমাদের স্বর্ণমুদ্রার সিন্দুক নিয়ে পালাতে না পার আগাম সেই ব্যবস্থা করে রাখতে। বেশ গম্ভীর গলায় দলপতি বলল।

—তাকিয়ে দেখুন আমাদের দুটো নৌকোয় কয়েকটা দাঁড় আর কিছু পোশাক পড়ে আছে।

—ও তাহলে তোমরা সেই সোনার ভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারো নি? দলপতি যেন একটু হতাশ হল।

—তার আগে একটা কথা জানতে চাই বর্তমান শাসক ইবু গ্যাব্রিয়েল কি এই জাহাজে আছেন?

—হ্যাঁ উনি দুপুরের সব ব্যবস্থা দেখতে এসেছেন।

—তাঁর সঙ্গে কিছু কথা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাকে বলতে পারো। আমি রব্বানি। সেনাপতি।

—না। আমি তাঁর সঙ্গেই কথা বলতে চাই। বোঝা গেল সেনাপতি রব্বানি বেশ মন ক্ষুণ্ণ হল। তবে আর কোন কথা না বলে বলল—দাঁড়াও। ইবু গ্যাব্রিয়েলকে সংবাদ পাঠাচ্ছি। একজন যোদ্ধাকে এসে ইঙ্গিত করল যোদ্ধাটি দ্রুত চলে গেল।

একটু পরে ইবু গ্যাব্রিয়েল সিঁড়িঘর দিয়ে ডেক-এ উঠে এল। জেনারেল পোষাক পরনে। মাথায় পাগড়ির সামনে একটা বড় মুক্তো বসানো। বলল—

—তোমরা তো ভাইকিং? বেশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল।

—হ্যাঁ ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

—তোমাদের দলনেতা কে? ইবু গ্যাব্রিয়েল জিজ্ঞেস করল।

—আমি। ফ্রান্সিস বলল—আমার নাম ফ্রান্সিস।

—হুঁ। আমি সব খবর রাখি। আলফানসোকে তোমরা আশ্রয় দিয়েছো। লোকটা আমার হাত ফসকে পালিয়েছিল। যাকগে—আমাদের পৈতৃক সম্পদ-সিন্দুক ভর্তি কুফি তোমরা উদ্ধার করতে পেরেছো! বেশ সাগ্রহে ইবু গ্যাব্রিয়েল বলল।

—না। তবে অনুমান করছি। সেই অনুমান কতটা সত্যি তা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি? ইবু গ্যাব্রিয়েল প্রায় লাফিয়ে উঠল। এইবার ভুরু কুঁচকে ফ্রান্সিসের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ পিট্ পিট্ করতে করতে বলতে লাগল-এই নিখোঁজ সোনার মুদ্রাভর্তি সিন্দুকটা একমাত্র আমিই দেখেছিলাম। আর আলফানসো বুড়োটা হয়তো দেখেছে। তুমি বুড়োটার সুযোগ বুঝে পালিয়েছে। ইবু গ্যাব্রিয়েলের চোখ পিট্পিটানি দেখে ফ্রান্সিস বুঝল

লোকটা শুধু নরপশুই নয় ধুর্ত। সাবধানে কথা বলতে হবে।

কিন্তু অনুমানটা করলেন কি করে? ইবু গ্যাব্রিয়েল জানতে চাইল।

ইবু সালোমান একজন সত্যিকারের কবি ছিলেন তবে একইসঙ্গে বুদ্ধিমানও ছিলেন। নইলে আরবীর বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা করে অত ধনসম্পদ বাঁচাতে পারতেন না।

—ও সব শুনে লাভ কী । আসল কথা বল। ইবু গ্যাব্রিয়েল তাড়া লাগাল।

—তাঁর শেষ কবিতা থেকে। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। ওটা তো পাগলের প্রলাপ। ইবু গ্যাব্রিয়েল দেঁতো হাসি বলল।

—না। ওটা গিজেল না বেশ ভেবেচিন্তে লেখা। কবিতা।

—কিন্তু আমি ঐ কবিতা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছি।

—কবিতাটা আলফানসোর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। বৃদ্ধটা তো আভাসেও একথা বলেনি।

—কারণ উনি একটা মর্মন্তুদ ঘটনা আন্দাজ করে ঐ কবিতাটা দু এক পংক্তি মনে করতেই তাঁর চোখে জল আসতো অর্থটা আর ভাবতে পারেন নি। আমরা সেই অর্থটা বুঝতে পেরেছি। তার সাহায্যেই এগিয়েছি। তবে এখনও নিশ্চিন্তই কবিতার মধ্যে দিয়ে ইবু সালোমান যা বলতে চেয়ে ছিলেন তার সত্যতা এখনও যাচাই করতে পারিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি তোমার অনুমান সত্যি হয় তবে ঐ স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবে? ইবু গ্যাব্রিয়েল আবার চোখ পিট্ পিট্ করতে লাগল।

—এখনই বলতে পারছি না। ফ্রান্সিস মাথা এপাশ ওপাশ করল।

—যদি উদ্ধার করতে পারো তহলে আমাদের ফাঁকি দিয়ে ঐ ধনসম্পদ নিয়ে গোপনে পালাবে। এটাই তো তোমাদের মতলব।

—একটা স্বর্ণমুদ্রাও নেব না। ফ্রান্সিস আস্তে বলল।

—অবাক কাণ্ড। তোমাদের এই জাহাজটা তো একটা সিন্দুকে দামি দামি গয়না সোনার চাকতি পেরেছি। সে সব কি কেউ তোমাদের বিলিয়ে দিয়েছে? ইবু গ্যাব্রিয়েল ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলল।

—সেই সম্পদের সঙ্গে বহু মানুষের রক্ত চোখে জল মিশে আছে। এই সম্পদ অভিশপ্ত সম্পদ। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন ভাল ভাল কথা বলো হয়তো। অত স্বর্ণমুদ্রা খুঁজে পেলে তখন অন্য চেহারা ধরবে। তোমরা তো লুঠেরার দল।

—এই অভিযোগ এই সন্দেহের চেহারা আমরা আগে দেখেছি। কিন্তু যখন তারা দেখেছে আমরা একটা সোনার আংটিও চাই নি তখন আমাদের বিশ্বাস করেছে। ইবু গ্যাব্রিয়েল, আমরা অন্য ধরনের মানুষ। যদি সোনা ভর্তি সিন্দুক উদ্ধার করতে পারি ইবু সালোমানের যর্থাথ দাবিদার আপনাকেই সব দিয়ে যাবো। বললাম তো একটা স্বর্ণমুদ্রাও নেব না।

—আমাকে বোকা বুঝিয়ে পালিয়েও যেতে পারবে না।

—আমরা আমাদের বন্ধুদের বন্দী অবস্থায় রেখে হাজার প্রলোভনেও এক পা যাবো না। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল।

—বিশ্বাস কি! আবার ইবু গ্যাব্রিয়েল চোখ পিট্ পিট্ করতে লাগল।

—বেশ। আপনার সেনাপতি রব্বানি নিশ্চয়ই খুব বিশ্বস্ত। তার সঙ্গে আপনার কিছু দুধর্ষ যোদ্ধা আমাদের সঙ্গে চলুক। তাহলে তো আপনার বিশ্বাস হবে আমার কথা? ওদের হুকুম দিয়ে রাখবেন আমরা কেউ পালাতে গেলে তারা যেন তাকে হত্যা করে। আমরা তো নিরস্ত্র। ইবু গ্যাব্রিয়েল একবার রব্বানির দিকে তাকাল। তারপর বলল—বেশ। তোমাদের ওপর নজর রাখতে ওরা তোমাদের সঙ্গে যাবে। ফ্রান্সিস এটাই চাইছিল। ও নিশ্চিন্ত হল।

—কবে কোথায় যাবে তোমরা? ইবু গ্যাব্রিয়েল জানতে চাইল।

—সেটা রব্বানি দেখতেই পাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশি না। এখানে তোমরা যে কজন আছো শুধু তারা যাবে। তার বাইরে আর কেউ যাবে না। ইবু গ্যাব্রিয়েল বলল।

— কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে?

—কি শর্ত?

—গুপ্তধন উদ্ধার করে যখনই আপনাকে দেব তখনই আমাদের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে। ফ্রান্সিস কথাটা বেশ জোর দিয়ে বলল।

—সে তখন দেখা যাবে। ডান হাত শূন্যে ঘুরিয়ে গ্যাব্রিয়েল বলল।

—উঁহু। আগে এই শর্তটা আপনাকে মেনে নিতে হবে। ফ্রান্সিস জোর দিয়ে বলল।

ইবু গ্যাব্রিয়েল একবার চোখ পিট্ পিট্ করে রব্বানির দিকে তাকাল। রব্বানি—বলল মান্যবর শর্ত মেনে নিন। ওরা ঐ স্বর্ণসিন্দুক কোনদিন উদ্ধারই করতে পারবে না। তখন ওদের বন্দি করে জাহাজ সুদ্ধ রাজধানী ফিরে যাবো আমরা।

—হুঁ। বেশ তোমার শর্ত মেনে নিলাম। তোমরা কখন যাবে? ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে গ্যাব্রিয়েল বলল।

—আজ রাতের খাওয়া শেষ করে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু যাবে যে থাকবে কোথায়? খাবে কী?

—ইরেকোশ নামে একটা গ্রাম আছে। ওখানেই আমরা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—ব্বাঃ! বেশ আটঘাট বেঁধেই নেমেছো। ঠাট্টা করে গ্যাব্রিয়েল বলল।

—বুদ্ধিমানরা তাই করে। অবশ্য জঘন্য চরিত্রের মানুষেরাও তাই করে থাকে। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল।

—হুঁ। রব্বানিরা আমাদের নৌকোয় যাবে।

—তাহলে তো ভালই হয়। কারণ—কিছু লম্বা কাছি আর দড়ি নিয়ে যেতে হবে আমাদের। নৌকো দরকার।

—ব্বাঃ! বেশ অনুমান মাত্র করেছো। এর মধ্যেই—

—হ্যাঁ। আমি ভেবেচিন্তে বুদ্ধি খাটিয়ে এর আগেও বেশকিছু গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করেছি। অবশ্য বন্ধুদের সাহায্যও পেয়েছি।

—ভাল—ভাল। ইবু গ্যাব্রিয়েল পিছু ফিরে হালের দিকে চলল। বোধ হয় নিজের জাহাজের দিকে যাবে বলে।

সিঁড়িঘরের কাছে এখন মারিয়া দাঁড়িয়ে ছিল। তখন অস্পষ্টই জ্যোৎস্না মারিয়াকে দেখে ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি মারিয়ার কাছে এল। অস্পষ্ট আলোয় মারিয়ার মুখচোখ দেখেই বুঝল—পেট ভরে খায় নি মারিয়া চিন্তায়। রাতও জেগেছে। ফ্রান্সিস কাছে এসে বলল মারিয়া—তোমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাদের বিপদ বাড়বে। তুমি সুস্থ থাকার চেষ্টা কর। কিচ্ছু ভেবো না। ঐ স্বর্ণভাণ্ডার আমরা উদ্ধার ঠিক করতে পারবো। সবাই মুক্তি পাবো। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে জাহাজ দেশের দিকে চালাবো। একেবারে দুশ্চিন্তা করো না। শুধু আমার উপরে বিশ্বাস রেখো। মারিয়া মৃদু হাসল।

—যাও—গিয়ে শুয়ে পড়ো। বিশ্রাম করো। গুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডার খোঁজ করে ফ্রান্সিসরা কতটা সফল হয়েছে সেটা আর জিজ্ঞেস করল না। আস্তে আস্তে নিঃশব্দে মারিয়া নেমে গেল। রব্বানি এগিয়ে ফ্রান্সিসকে একসঙ্গে বসতে নির্দেশ দিল। দুজন যোদ্ধা খোলা তরোয়াল হাতে ওদের পাহারা দিতে লাগল। ফ্রান্সিসরা কজন চুপচাপ ডেকএ বসে রইল। সেনাপতি রব্বানি ফ্রান্সিসের কাছে এল।

বলল—বন্ধুদের দেখবে না?

—কি হবে দেখে? ওদের মুক্ত তো করতে পারবো না বরং ওদের কষ্ট বাড়িয়ে দেবো। তবে একটু অনুরোধ একটা খবর ওদের দিলে উপকার হয়। খবর দেবেন যে আমরা সবাই সুস্থ আছি আর আজ রাতেই স্বর্ণভাণ্ডার অনুসন্ধানে যাচ্ছি। আমার প্রতিজ্ঞা বন্দী বন্ধুদের মুক্ত করবোই।

—বেশ। খবর দেওয়া যাবে। তবে তুমি বড্ড বেশি এগিয়ে ভাবছো। ঐ স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধারের জন্যে মাননীয় শাসক ইবু গ্যাব্রিয়েল কম চেষ্টা করেন নি।

—দেখা যাক। আমরা যে বেশি বুদ্ধিমান সেই প্রমাণ করতে পারি কি না। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

ফ্রান্সিসরা রাতের খাওয়া ঐ ডেক এ মশালের আলোয় বসে খেয়ে নিল।

—চলো সব। দেরি করবো না। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

কাছি দড়ি জোগাড় করে নৌকোয় উঠতে উঠতে একটু দেরিই হল। ফ্রান্সিসরা দেখল ইবু গ্যাব্রিয়েল জাহাজের দিক থেকে বেশ একটা শক্তপোক্ত নৌকোয় চড়ে চারজন বলশালী সশস্ত্র যোদ্ধাকে নিয়ে রব্বানি আসছে। রব্বানিদের নৌকো ওদের নৌকোর পিছনে পিছনে এসে দাঁড়াল।

—নৌকো ছাড়া। ফ্রান্সিসের হুকুম শোনা গেল সব নৌকো পরপর যাত্রা শুরু করল। অস্পষ্ট স্রোতের মধ্যে দিয়ে নৌকোগুলি চলল নদীর ওপর দিয়ে ভেসে।

—জোয়ারের টান এসেছে। শাঙ্কো দাঁড় বাইতে বাইতে গলা চড়িয়ে বলল।

—তবু-দাঁড় বাওয়া বন্ধ করল না। ভোর ইরেকাবা গ্রামে পৌঁছতেই হবে। ফ্রান্সিসও গলা চড়িয়ে বলল। কাছি দড়ি বোঝাই নৌকোয় শুধু সিনাত্রা একা দাঁড় বাইতে লাগল।

সারা নদীপথে ফ্রান্সিসরা কেউ প্রায় কোন কথা বলল না। হ্যারি ভেবে চলল—ফ্রান্সিস কি সত্যিই স্বর্ণভাণ্ডার হদিশ বের করতে পারবে? ফ্রান্সিস নদীর জলধারার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। হ্যারি একবার ভাবল ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু চিন্তান্বিত ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা বলল না।

এক সময় ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল। যদি নৌকোর মধ্যে ঘুমুতে চাও ঘুমিয়ে নাও। কালকে অনেক কাজ করতে হবে। হ্যারি আর দুই বন্ধু নৌকার মধ্যে গুটিসুটি মেরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। নৌকোগুলো বেশ দ্রুতই চলল। রব্বানির নৌকোটা ফ্রান্সিসদের শেষ নৌকোটার সঙ্গে বাঁধা ছিল। ওদের তো আর কোন

তাড়া নেই। চিন্তাও নেই। শুধু নিরস্ত্র ফ্রান্সিসদের ওপর নজর রাখা। কেউ পালাতে গেলে তরোয়াল চালিয়ে হত্যা করা।

তখন ভোর হয় হয়। চারটে নৌকোই ইরেকাবা গ্রামের নদীতীরে বাঁধা হল। নামল সবাই। গ্রামের লোকেরা আর সবাই ঘুম ভেঙ্গে উঠেছে। সবার আগে হ্যারি সেই বৃদ্ধের বাড়ীতে এল। দরজায় ধাক্কা দিতে বৃদ্ধ বেরিয়ে এল।

—শুনুন আমরা আমাদের জাহাজ থেকে দড়ি কাছি এসব দরকারি জিনিস আনতে গিয়েছিলাম এই মাত্র এসেছি আমাদের সময় কম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের জন্যে যাহোক কিছু খাবার তৈরি করতে বলুন। সঙ্গে আমাদের আরো কয়েকজন এসেছে। সকলের জন্যে অন্তত দুটি করে রুটি আর মাছের ঝোল ব্যবস্থা করুন। শাঙ্কো তখনই এসে হ্যারির পাশে দাঁড়াল। শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে হ্যারি বলল শাঙ্কো তোমার পট্টি থেকে চারটে সোনার চাকতি বের করে দিও।

—এই দামটা রাখুন আরও দরকার পড়লে দেব। কিন্তু রান্নাটা তাড়াতাড়ি হতে হবে। আমাদের দুই বন্ধু আশপাশের সাহায্য করবে। বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বলল—না না। আপনারা আমাদের অতিথি। আপনাদের রান্নার কাজ করতে দিলে গ্রামের অমঙ্গল হবে। আপনারা নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন। গ্রামের মহিলাদের মধ্যে ভালো রাঁধুনি এসে আপনাদের খাবার তৈরি করে দিচ্ছে।

হ্যারি ফিরে এসে ফ্রান্সিসকে সব বলল। তারপর বলল—কাল সারা রাত কারো তেমন ঘুম হয়নি। এই অবস্থায়—

উপায় নেই হ্যারি। সব কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সারতে হবে। ঐ নরপশুর উপর আমার বিন্দু মাত্র বিশ্বাস নেই। যত তাড়াতাড়ি স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করে ওর জাহাজে পাঠিয়ে মুক্তি নিতে হবে। বেশি দেরি হলে ইবু গ্যাব্রিয়েল বিগড়ে যেতে পারে। ঐ লোকটা কাউকে বিশ্বাস করে না। নিজেকেও না।

—বেশ। তাহলে খাওয়া সেরেই যাত্রা শুরু করবো। হ্যারি মাথা নাড়িয়ে বলল।

বন্ধুরা সিনাত্রার নৌকোয় কাছি দড়ি নিয়ে বৃদ্ধের বাড়ির উঠোনে এসে এখানে ওখানে শুয়ে পড়ল। রব্বানি সঙ্গী সহ একপাশে একটা গাছের ছায়ায় বসল। রব্বানি তীক্ষ্ণ নজর রাখল ভাইকিংদের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—রান্না হয়ে গেছে। আপনারা খেতে বসুন। সবাই একপাশে জড়ো করা শুকনো পাতা নিয়ে উঠোনে বসে গেল। হ্যারি রব্বানির কাছে এসে বলল—আপনারাও খেতে চলুন।

—এই লোনা উঠোনে? রব্বানি বেশ অবাক হয়ে বলল।

—কী করা যাবে। এদের ঘরের জায়গা খুবই কম। আসুন। হ্যারি বলল।

সকলেরই খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিসের কণ্ঠ উচ্চস্বরে শোনা গেল।

—বিশ্রাম টিশ্রাম হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ ঘূর্ণির কাছে যেতে হবে। চলো সব।

ভাইকিংরা একে একে নৌকাতে উঠল। রব্বানি তখনও ভেবে পাচ্ছে না—এরা কাছি দড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? মরুক গে। দেখাই যাক না ওদের কাজ তো ভাইকিংদের উপর কড়া নজর রাখা যাতে কেউ পালাতে না পারে। রব্বানিও ওদের নৌকোয় উঠল। নৌকোয় বাঁধা দড়ি। কাজেই রব্বানিদের নৌকো চালাতে হচ্ছিল না। ফ্রান্সিস ভালো করেই বুঝল রব্বানিরা বিশ্রামের সুযোগ নিচ্ছে। কিন্তু ফ্রান্সিস এই চিন্তাটাকে আমল দিল না। একসময় রব্বানি গলা চড়িয়ে বলল—কেউ চালাকি করতে যাবে না। করতে গেলে খতম হয়ে যাবে। ভাইকিংরা চুপ করে রইল।

যে ঘাটে নেমে ওরা তীর ভূমির পাথর ছড়ানো পাথুরে জমি ঝোপ জঙ্গল গাছপালার মধ্যেই দিয়ে আগে গিয়েছিল নৌকো থেকে নেমে সবাই চলল। রব্বানিরা সব পিছনে পিছনে চলল।

বেশকিছুক্ষণ পর সেই কাণ্ডে কাটাদড়ি বাঁধা গাছটার নিচে এল সবাই। হ্যারি রব্বানির কাছে গিয়ে বলল—আপনারা এখানে গাছের নিচে পাথরে বসুন বিশ্রাম করুন। আমরা কাজে নামছি। রব্বানি কিন্তু হাঁ করে দেখছিল ফ্রান্সিসদের ।এরা কাছি দড়ি এনেছে কেন কি করবে ওসব দিয়ে তাই জিজ্ঞেস করল—এসব কাছি দড়ি দিয়ে কী করবেন? এখন কি ঠিক বুঝবেন না। দেখতে থাকুন পরে বুঝবেন। রব্বানি যোদ্ধাদের বলল ওরা ওদের মত যা করছে করুক। আমাদের শুধু কড়া নজর রাখা। কাজই যে যেখানে পারো বসে পড়। কিন্তু চোখের বাইরে কাউকে যেতে দেবে না।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোরা ততক্ষণ নৌকো থেকে কাছি দড়ি এনে সেই গাছটার নিচে জড় ক'রে ফেলেছে। দ্রুত কাজ করছে সবাই। রব্বানি নদীর ঘূর্ণিটা এখন কাছ থেকে স্পষ্ট দেখাও গেল। লোকমুখে এতদিন শুনেছে সমুদ্রে নদীতে প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে জাহাজে প্রচণ্ড পাক খেতে খেতে ডুবে যায়। নদীর ঘূর্ণির টানে আরোহী সুদ্ধ নৌকো ডুবে যায়। ঘূর্ণির প্রচণ্ড টান জাহাজ নৌকো মানুষ তো বটেই কোন কিছুর সাধ্য নেই সেই টান থেকে উদ্ধার পাওয়ার।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডেকে বল—আর এক মুহূর্তেও দেরি নয়। কাছির

একদিকের মাথা নিয়ে গাছটায় ওঠ। কাটা দড়ির কাছে গিয়ে কাণ্ডটায় শক্ত করে ধরো। বিনালা নেই। সিনাত্রা তোমার পেছনে পেছনে উঠবে। কাটা দড়িটা এত দিনের রোদে বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই আর তেমন শক্ত নেই। ওটা ছিঁড়তে গেলে সময় নষ্ট হবে। ওটার ওপরেই কাছিটা যত শক্ত করে পারো বাঁধবে দুজন মিলে। যাও। পারবে তো?

—কিছ্ছু ভেব না। শাঙ্কো দড়ির মাথাটা আলগা ফাঁস দিল। কাঁধে ঝুলিয়ে গাছটা বেয়ে উঠতে লাগল। এখানে ওখানে ডাল ধ'রে ধ'রে। সিনাত্রাও ওর দেখাদেখি সেইভাবে উঠতে লাগল। জাহাজে জাহাজেই তো জীবন কেটেছে এতদিন। শক্ত বাঁধনের কৌশল ওরা ভালভাবেই জানে। অল্প সময়ের মধ্যেই বাঁধা শেষ ক'রে নেমে এল।

—এবার কাছিটা নিয়ে গিয়ে কিছু দূরে নদীতীরে আমাদের নৌকোটা বাঁধা আছে সেই নৌকোয় চড়ে ও পারে চলে যাও। এখন ভাঁটার টান চলছে। কাজেই নৌকো স্রোতের টানে ঘূর্ণির দিকে যাবে না। ওপারে পৌঁছে দু'জন কাছিটা নিয়ে ঐ চেস্টনাট গাছের নিচে যাবে। কাছির থোকা কোমরে আল্‌গা ক'রে বেঁধে চেস্টানাট গাছটায় উঠবে। এপারের গাছটার প্রায় সমান উচ্চতায় কাছিটা শক্ত করে বাঁধবে। তারপর নেমে আসবে। তখন নদীর ঐ ঘূর্ণিটার ওপর দিয়ে কাছিটা টান টান হয়ে থাকবে। যাও দেরি করো না। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল।

দুজনে ঝোপঝাড় পার হয়ে নৌকার কাছে এল। দুজনের হাতে তখন কাছিটা ধরা। নৌকা বাঁধার দড়িগুলি খুলে দুজন নৌকা ভাসিয়ে দিল। কিছুদূর ঘূর্ণিটা দেখা গেল। কিন্তু ভাঁটার টানে নৌকো ওদিকে গেল না। ওপারে নৌকা পৌঁছল। শাঙ্কো কাছিটা নিয়ে বসল। সিনাত্রা ওকে পেছনে কাছি ধরতে সাহায্য করল। দুজন কাছি নিয়ে চেস্টনাট গাছটায় কাণ্ড বেয়ে বেয়ে উঠল। দেখল—ফ্রান্সিসের অনুমান সত্য। একই উপায়ে কাটা কাছি বাঁধা। দুজনে কাণ্ড পেঁচিয়ে কাটা দড়ির ওপরে খুব শক্ত ক'রে কাছিটা বাঁধল। দু'জন নেমে এল। দেখল এপারে মাত্র একটাই চেস্টনাট গাছ। ওপারের তুলনায় এ পারটা অনেক সমতল। সবুজ ঘাসে ঢাকা। এবার নদীর দিকে তাকিয়ে দেখল ঘূর্ণিটার ওপর দিয়ে কাছিটা টানা টান বাঁধা হয়ে গেছে।

এ পারে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল ইবু সালোমদের দেহরক্ষীরা এভাবেই দু'ধারের গাছদুটিতে বেঁধেছিল। কাজেই নিচে ঘূর্ণির ভয় ছিল না। আমরাও দড়ি ধরে ঝুলে ঝুলে ঘূর্ণির ওপর দিয়ে ওপারে চলে যেতে পারবো। নিরাপদে।

—তাহলে তো হাত ফসকে নিচের ঘূর্ণীর জলে পড়তে হবে না।

—ঠিক তাই। প্রথমে ঝুলে ঝুলে আমিই যাব। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি চমকে উঠে বলল পাগল হয়েছো? ঘূর্ণির ওপর দিয়ে এভাবে যাওয়া? হাত ফসকে গেলে তো। ওকে থামিয়ে দিয়ে ফ্রান্সিস বলল—আমার অভ্যাস আছে এটা তো তুমি জানো। কাছি দড়ির রকমসকম ও বহন ক্ষমতা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। উপায় নেই এভাবে না গিয়ে। এ পারটা তন্নতন্ন করে খোঁজা হ'য়ে গেছে। বাকি রয়েছে ওপারটা। শাঙ্কো সিনাত্রা ওপারে আছে। আমরাও পর পর কাছি তে ঝুল ঝুল করে ওপারে যাব। তুমি পারবে না। তুমি কাউকে নিয়ে নৌকায় চড়ে ওপারে যাও। কাজে নেমে পড়ো।—কিন্তু সবাই পার হ'ল না হয়—ফ্রান্সিস বলে উঠল—হ্যারি—এখনও শেষ রহস্যের সমাধানটা বাকি। ইবু সালোমন নিশ্চয়ই কোন না কোন ব্যবস্থা রেখেছিল যাতে প্রয়োজন হলে স্বর্ণভাণ্ডার ভরা সিন্দুকটা তুলে আনা যায় সহজে। সেই সুত্রটাই খুঁজে বের করতে হবে। কথাটা শেষ করেই ফ্রান্সিস গাছটায় উঠতে শুরু করল। কাটা গাছটার কাছে উঠে ঝোলানো কাছিটা ধরে দু'তিনবার খুব জোরে হ্যাঁচকা টান দিল। বুঝল কাছিটা বেশ শক্ত করেই বাঁধা হয়েছে। এবার দুলতে-থাকা কাছিটা ধ'রে ফ্রান্সিস ঝুলে পড়ল। নিপুণভাবে হাত দুটো পর পর ছেড়ে ধরে দুলতে দুলতে ওপারে দিকে চলল। ঘূর্ণির ওপরটায় আসতেই বুঝল নিচ থেকে যেন একটা হাওয়া ওপরের দিকে উঠে আসছে। ফ্রান্সিস কাছিটা শক্ত হাতে ধরে জায়গাটা আস্তে আস্তে সাবধানে পার হল। বেশ হাঁপানো গলায় চিৎকার ক'রে বলল—ঘূর্ণির ঠিক ওপরে দিয়ে সাবধানে পার হবে। এখানকার পাক-খাওয়া হাওয়াটা বিপজ্জনক।

আস্তে আস্তে একসময় ও পারে চলে এল। গাছের কাণ্ডটা দু হাতে জড়িয়ে ধরে একটুক্ষণ দম নিল। তারপর কাণ্ড জড়িয়ে ধ'রে নিচে মাটিতে নেমে এল। দেখল গাছটার গোড়ায় প্রায় হাতখানেক উঁচু পাথরের টুকরোর স্তূপ। বড় টুকরোও আছে। যেন কেউ সাজিয়ে রেখেছে। এটা প্রকৃতির খেয়াল হয়ে নি। ও ভুরু কুঁচকে ভাবল—এরকম ছোট বড় পাথরের টুকরো কারণ কি? কোন বাচ্চা ছেলেমেয়ের কাণ্ড এটা নয়। এভাবে পাথরের টুকরো সাজিয়ে রাখার কারণ কি? ততক্ষণে শাঙ্কো আর সিনাত্রা ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। একটুক্ষণ ঘাসের ওপর বসে বিশ্রাম নিয়ে ফ্রান্সিস বলল—কেমন এই চেস্টনাট গাছের তলাটা আর চারপাশ খুঁটিয়ে দেখতে হবে। একটাই গাছ, ঝোপজঙ্গলও বেশি নেই। খোঁজা শুরু কর। ইবু সালোমনের দেহরক্ষীরা এপারে নিশ্চয়ই এসেছিল আর চুপ করে

বসে থাকে নি। এখানেও ওরা কিছু করেছে। কী করেছে সেটা খুঁজে দেখতে হবে। সমস্ত জায়গাই তন্ন তন্ন করে খোঁজো। বেলা বাড়ছে।

ওপারে একটা পাথরের ওপর বসে রব্বানি দূর থেকে ফ্রান্সিসদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। ওরা ওপারে কী করছে বোঝা যাচ্ছে না। ওপারে ওর কোন যোদ্ধাও নেই। রব্বানি দ্রুত উঠে বসল। ও সজাগ হল। যদি ঐ তিনজন ভাইকিং সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় ইবু গ্যাব্রিয়েল ওদের গর্দান নেবে। ও তাড়াতাড়ি হ্যারির কাছে এল। রব্বানি বলল—ওপারে আমাদের কোন যোদ্ধা এ যাবৎ যায় নি। তোমাদের বিশ্বাস নেই। আমি দুজন যোদ্ধাকে নিয়ে ওপারে যাবো।

—বেশ। চলুন নৌকোয় চড়ে আমিও একসঙ্গে যাবো।

রব্বানি দু'জন যোদ্ধাকে ইশারায় ডাকল। ওরা কাছে এলে বলল—

—চলো ওপারে যাবো। তোমরা কাছিতে ঝুলে ঝুলে যাবে।

—ওভাবে কি যাওয়া যাবে? একজন যোদ্ধা বলল।

—ঐ ভাইকিংটা গেল কী করে?

—ওর বোধহয় জীবনের ওপর কোন মায়া দয়া নেই। যোদ্ধাটি বলল।

—মরুক গে। চলো নৌকোয় চড়েই যাবে। রব্বানি বলল। হ্যারি আর রব্বানিরা ঝোপঝাড় ভেঙে পাথরের চাঁইয়ের গাছের মোটা মোটা শেকল এড়িয়ে নৌকাগুলির দিকে চলল।

—কিন্তু কী খুঁজব? শাঙ্কো ঠিক বুঝতে না পেরে বলল।

—এমন কিছু যা প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। মানুষের হাতে গড়া। গাছটার গোড়ায় পাথর-টুকরো কেমন যেন মানুষের হাতে সাজিয়ে রাখা। অবশ্য এলোমেলোভাবে। নাও—খোঁজা শুরু করো।

তিনজনে চারপাশ মাথা নিচু করে খুঁজতে লাগল। ততক্ষণে আরো কয়েকজন ভাইকিংও কাছি ঝুলে ঝুলে এপারে চলে এসেছে। সবাই মিলে খোঁজা শুরু হল। তারপরই হ্যারি এল। সঙ্গে রব্বানির দুজন যোদ্ধা সবাই মিলে খোঁজা শুরু হল। ঝোপঝাড় টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হল। হঠাৎ শাঙ্কো নদীর জলের কাছাকাছি দেখল ওখানেও টানা পাথরের ছোটো-বড়ো টুকরো যেন একটানা এই গাছটার দিকে এসে শেষ হয়ে গেছে। ও গলা চড়িয়ে ডেকে বলল—ফ্রান্সিস, এদিকে দেখো তো। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে এল। দেখল পাথরের সারি যেখানে এসে শেষ হয়েছে সেখানে বালি-মেশানো মাটি কেমন যেন চেপে বসানো।

ফ্রান্সিস বলে উঠল—সবাই হাত লাগাও। পাথরের খণ্ডগুলো সরিয়ে ফেলো। দেখা যাক নীচে কী আছে। ততক্ষণে হ্যারিও এসে দাঁড়িয়েছে। সবাই ছুটে এসে হাত লাগাল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাথরখণ্ডগুলো সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেল টানা গর্তমতো। গর্তের ওপরকার বালি মেশানো মাটি তুলে ফেলতেই দেখা গেল একটা মোটা কাছি। ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—হ্যারি, রহস্য আর রহস্য নেই। এই কাছি দিয়ে সিন্দুকটা বেঁধে ফেলে দেওয়া হয়েছিল ঐ ঘূর্ণির মধ্যে। পরে প্রয়োজনে যাতে সিন্দুকটা টেনে তুলে আনা যায়।

—বলো কী? শাঙ্কো প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

—তাহলে তো এই দড়ি ধরে টানলেই ঐ সাংঘাতিক ঘূর্ণি থেকে সিন্দুকটা উঠে আসবে। হ্যারি বলল।

—অবশ্যই। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—তবে তো যে কেউ এসে এই কাছি টেনে সিন্দুকটা তুলে আনতে পারত। শাঙ্কো বলল।

—পারত যদি সে বুঝতে পারত এভাবে পাথরখণ্ড মানুষই সাজিয়েছে, প্রকৃতি নয়। এটা বুঝতে গেলে তাকে অন্তত আমার মতো বুদ্ধিমান হতে হবে। যাক গে, দেরি নয়। সবাই মিলে কাছিটা টেনে তুলে ফেলো।

সবাই কাছি টেনে তুলে ফেলল সবটা তুলতে দেখা গেল কাছির মাথাটা চেস্টনাট গাছের গোড়া পর্যন্ত গেছে। আর অনুমান নয়। চেস্টনাট গাছটার ঠিক গোড়ায় কাছিটা বেঁধে রাখা হয়েছে। তাই ওখানে পাথরখণ্ড দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল।

—তাহলে তো এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। নিশ্চয়ই ঐ সিন্দুকের হাতল দুটোয় এই কাছিটা বেঁধে ওরা টানা কাছিতে ঝুলিয়ে এনে ঐ ঘূর্ণির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। ওরা সত্যিই দুঃসাহসী ছিল। কোনও সন্দেহ নেই। হ্যারি বলল। কাছি টানতেই বোঝা গেল ওটার সঙ্গে খুব ভারী কিছু বাঁধা আছে।

শাঙ্কোরা বারকয়েক টানতেই বুঝল, যে ভারী জিনিসটা বাঁধা আছে সেটা উঠে আসছে। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে কাছি ছেড়ে দিয়ে দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল—ফ্রান্সিস, কাছিটার সঙ্গেই সিন্দুকটা বাঁধা আছে। মারো টান।

হ্যারি হেসে বলল—ফ্রান্সিস, এত সহজে সিন্দুকটা উদ্ধার হবে ভাবিনি।

ফ্রান্সিস কিন্তু হাসল না। বলল—হ্যারি, সিন্দুকটা জলের তলা থেকে এখনও কিন্তু পারে নিয়ে আসতে পারোনি। পারলে বুঝব সফল হলাম। ফ্রান্সিসের কথা

শেষ হতে না হতেই কাছিটা ছিঁড়ে গেল। শাঙ্কোরা ভারসাম্য হারিয়ে এ ওর গায়ে গড়িয়ে গেল। ছেঁড়া কাছিটা জল থেকে উঠে এল। সবাই হতবাক।

—যাঃ। বিনোল্ড মুখে হতাশার শব্দ করে ঘাসে ঢাকা বালির ওপর বসে পড়ল। ছেঁড়া কাছিটা হাতে নিয়ে ভাইকিংরা এ ওর মুখের দিকে হতাশার ভঙ্গিতে তাকাল। হ্যারি ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—ফ্রান্সিস, এটা কী হল? এত মোটা কাছিটা—

—হ্যাঁ ছিঁড়ে গেল। কিন্তু কেন? কথাটা বলেই ফ্রান্সিস কাছির ছেঁড়া জায়গাটা মাটি থেকে তুলে খুঁটিয়ে দেখে বলল—বোঝাই যাচ্ছে কাছিটার এই জায়গাটা দীর্ঘদিন অত্যন্ত ধারালো কিছুর সঙ্গে ঘষা খেয়ে খেয়ে ছিবড়ে মতো বেরিয়ে গেছে। জোরে টান পড়তে একেবারে ছিঁড়ে গেছে।

—জলের নীচে এমন কী ধারালো জিনিস থাকতে পারে? হ্যারি বলল।

—অনেক কিছু। বড় শামুকের ভাঙা খোল, কাঁচ বা পাথরের চাঁইয়ের ধারালো মাথা। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো আর স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধারের কোনও আশাই রইল না। শাঙ্কো বলে উঠল।

—উঁহু। হাল ছাড়তে আমি রাজি নই। একটু সময় চাই। ছক কষতে হবে। কথাটা বলে ফ্রান্সিস ঘাসে-ঢাকা বালির ওপর বসে পড়ল। বন্ধুরা সব একজন দুজন করে এসে ফ্রান্সিসকে ঘিরে দাঁড়াল। হতাশায় ম্লানমুখ সকলেরই। এত কষ্ট করে এতদূর এগিয়ে এসে হার স্বীকার করতে হবে? ফ্রান্সিস দু'হাত হাঁটুতে রেখে মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল। সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নিস্তব্ধ চারিদিক। শুধু পাখপাখালির ডাক আর ঘূর্ণিরত পাক খাওয়ায় জলের শব্দ শোনা যেতে লাগল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—দড়ির কুণ্ডলীটা নিয়ে এসো। শাঙ্কো আর সিনাত্রা কাঁধে দড়ির কুণ্ডলীটা নিয়ে ফিরে এল।

—দড়ি দিয়ে কী করবে? শাঙ্কো কিছু বুঝতে না পেরে বলল।

—ঐ ঘূর্ণিতে নামতে হবে। ফ্রান্সিস দড়ির মুখটা বের করতে করতে বলল।

—সর্বনাশ! ফ্রান্সিস, এ তো আত্মহত্যা। হ্যারি ভীতস্বরে চেঁচিয়ে বলল।

—না হ্যারি। কাপুরুষ আত্মহত্যা করে। বীরপুরুষ লড়াই করে বেঁচে থাকে। এটা জীবনের ঝুঁকি। বলা যায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষা। এই ঝুঁকি নিতেই হবে। নইলে হার মেনে মাথা নিচু করে চলে যেতে হবে। সেই বৃদ্ধ অভিজ্ঞ নাবিক



জলের নীচটা পুরোপুরি অন্ধকার নয়।

বলেছিল—ঘূর্ণির একেবারে নীচে ওপরের চক্করের দাপট থাকে না। সেখানে জল অনেক শান্ত থাকে। আজকে সেটা হাতে-কলমে পরীক্ষার সময় এসেছে।

ফ্রান্সিস লম্বা দড়িটার একটা মাথা কোমরে দুটো প্যাচ দিয়ে বাঁধল। তারপর বলল—আমি দড়ির মাথাটা নিয়ে কাছিতে ঝুলে ঘূর্ণির ঠিক ওপরে যাব। ওখান থেকে ঘূর্ণির মধ্যে নামব। তারপর ঘূর্ণির পাকই আমাকে দ্রুত টেনে নিচে নামাবে। একেবারে নীচে অনেকটা শান্ত জলস্তর পাব। কোমর থেকে দড়ির মাথাটা বের করে ছেঁড়া কাছিটায় শক্ত করে বেঁধেই দড়িতে জোরে দুটো হ্যাঁচকা টান দেব। সঙ্গে সঙ্গে দড়ির অন্য মুখটা ধরে তোমরা সবাই মিলে আমাকে টেনে তুলবে। খুব সাবধান। এতটুকু দেরি করা চলবে না। জলের নীচে সাধারণ মানুষের চেয়ে আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারি। দেশের ডুবুরিদের কাছ থেকে এই কৌশলটা আমার শেখা আছে। আমার নিরাপত্তার কথা একেবারে ভাববে না। তাতে সময় নষ্ট হবে। তৈরি হও সবাই।

কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ফ্রান্সিস চেস্টনাট গাছটায় উঠে পড়ল। তারপর কাছিটা ধরে ঝুলে পড়ল। হাত দুটো দিয়ে কাছি ধরে দুলতে দুলতে চলে এল ঠিক ঘূর্ণির ওপর। একটুক্ষণ দম নিল। তারপর দু'হাত ছেড়ে দিয়ে দ্রুত হাঁটু দুটো দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে মাথা নিচু করে ঘূর্ণির মাঝখানে পড়ল। মুহূর্তে প্রচণ্ড পাক খেয়ে মাথাটা ঘুরে উঠল। জোর পাক খেতে খেতে নীচে তলিয়ে গেল। হাত-পা খোলা থাকলে বোধহয় ছিঁড়ে বেরিয়ে যেত ঘূর্ণির প্রচণ্ড পাকে। ওর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। আশ্চর্য! নীচে জলের সেই প্রচণ্ড পাক নেই বললেই চলে। ফ্রান্সিস একটা বড় পাথরের মাথায় পা রাখল। জলের নীচেটা কিন্তু পুরোপুরি অন্ধকার নয়। ঘোলা জলের মধ্যে দিয়েও সূর্যের অল্প একটু আলো জলতল অবধি পৌঁছচ্ছে। সেই ম্লান আলোয় ফ্রান্সিস দেখল ছেঁড়া কাছিটা ঐ পাথরের চাঁইয়ের মাথার কাছে পড়ে আছে। পাশেই একটা অন্ধকার গভীর খাদে কাছিটা নেমে গেছে। এই গহ্বরের জন্যেই এখানে এরকম প্রচণ্ড ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছে। কোমর থেকে দড়ির মাথাটা বের করতে করতে দেখল পাথরের চাঁইয়ের মাথাটা উঁচিয়ে আছে। ভীষণ ধারালো। এখানে ঘষা খেয়ে খেয়েই কাছিটার ছিবড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাই জোর টান পড়তেই ছিঁড়ে গেছে। অভিজ্ঞ হাতে দ্রুত কাছিটার ছেঁড়া মাথায় দড়িটা শক্ত করে বেঁধে পাথরের ছুঁচোলা মাথা থেকে এক ঝটকায় দড়িটা সরিয়ে দিয়ে পরপর দুটো হ্যাঁচকা টান মারল ফ্রান্সিস। ওপরে দড়ি ধরে দাঁড়ানো শাঙ্কোরা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠে দড়ি টানতে শুরু করল।

ফ্রান্সিস প্রাণপণে দড়িটা হাতে-পায়ে জোরে চেপে ধরে রইল। ঘূর্ণির মুখ থেকে অনেকটা সরে এসেছে বলে ঘূর্ণির প্রচণ্ডতা এখানে কম। এর পাক খাওয়া জলের টান চোখ বুজে সামলাতে লাগল। চোখের সামনে একটা কালচে ভাব বাড়তে লাগল। মাথা ঘোরা বেড়ে গেল। কিন্তু ফ্রান্সিস প্রাণপণে দড়ি চেপে ধরে রইল। এখন এই দড়িই একমাত্র ভরসা। ঘূর্ণির পাক তখনও ওকে নীচে টানছে।

দম ফুরিয়ে আসছে। চোখের সামনে সবকিছু কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে। তবু ফ্রান্সিস ভয় পেল না। চোখ বুঁজে দড়ি চেপে ধরে রইল। মুঠি আলগা করল না। প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ফ্রান্সিস জলের ওপর ভুস করে মাথা তুলল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। ফ্রান্সিসকে জলের উপরে মাথা তুলতে দেখেই শাঙ্কোরা কয়েকটা জোর টান দিয়ে ফ্রান্সিসকে তীরের বালুর ওপর টেনে আনল। কোমরের ওপরটা তীরের বালিতে কোমর থেকে পা জলের মধ্যে। হ্যারি দ্রুত ছুটে এসে ফ্রান্সিসের মাথার কাছে বসল। মাথাটা আস্তে কোলে তুলে নিয়ে উৎকণ্ঠার সুরে বলে উঠল—ফ্রান্সিস, ফ্রান্সিস, ভালো আছ তো? ফ্রান্সিস চোখ খুলল। দেখল বন্ধুদের ঝুঁকে পড়া মুখগুলো কেমন নড়ছে। মাথা ঘুরছে তখনও। ও চোখ বুজল।

—ফ্রান্সিস, শরীর ঠিক আছে? হ্যারি ব্যাকুলকণ্ঠে জিগ্যেস করল।

ফ্রান্সিস চোখ বোঁজা অবস্থায় আস্তে ডান হাত তুলে মাথায় ছুঁইয়ে আঙুল ঘোরাল। তার মানে ওর মাথা ঘুরছে।

—এক্ষুনি মাথা ঘোরা কমবে। তুমি চোখ বুজে বিশ্রাম করো। ভেন তো নেই। ভেন থাকলে ওষুধ দিতে পারত। হ্যারি বলল।

কারো মুখে কথা নেই বালি ঘাসের মধ্যে কেউ কেউ বসে আছে, কেউ কেউ শুয়ে পড়েছে। শুধু শাঙ্কো ফ্রান্সিসের শিয়রের কাছে একঠায় দাঁড়িয়ে রইল। পারে তুলে আনা কাছিটার কাছে কেউ গেল না। কাছিটা দিয়ে ফ্রান্সিস সিন্দুকটা বাঁধতে পেরেছে কিনা এই নিয়ে কেউ ভাবলই না। কতক্ষণে ফ্রান্সিস সুস্থ হবে—এই একটাই দুশ্চিন্তা সবার।

ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ খুলল। হ্যারি ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করল—মাথা ঘোরাটা কমেছে? ফ্রান্সিস দুর্বল ভঙ্গিতে আস্তে মাথাটা কাত করল। হ্যারি বলে উঠল—শাঙ্কো, ফ্রান্সিসের মাথা-মুখ আস্তে আস্তে মুছে দাও। এতক্ষণ জলে ছিল।

শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে নিজের জামাটা খুলে ফেলল। হাঁটু গেড়ে বসে ফ্রান্সিসের মুখ কপাল মাথায় আস্তে আস্তে একটু চাপ দিয়ে মুছে দিতে লাগল। মোছা শেষ হলে

ফ্রান্সিসের বোধহয় একটু ভালো লাগল। ম্লান হাসল। শাঙ্কো তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল—সিনাত্রা, এখানে এসো। ফ্রান্সিসকে জল থেকে তুলে আনব। তুমি ধরো।

তারপর দুজনে আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসকে টেনে বালি ঘাসের ওপর তুলে আনল। এবার শাঙ্কো আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের জামাটা টেনে বুকের কাছে তুলে দিল। তারপর বুক-পেট মুছিয়ে দিতে লাগল। জলে ভিজে শরীর কেমন সাদাটে হয়ে গেছে। তারপর পা মুছিয়ে দিল। বেশ আরাম হল ফ্রান্সিসের। ও হাত দিয়ে ছেঁড়া কাছিতে বাঁধা দড়িটার দিকে ইঙ্গিত করল। হ্যারি বুঝল সেটা বলল—জাহান্নামে যাক ঐ সিন্দুক। আগে তুমি সুস্থ হও। ফ্রান্সিস চোখ বুজল।

মাথার ওপরে সূর্য তখন পশ্চিম আকাশের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে। সারাদিন এত খাটুনি গেছে। সবাই উপোসী। কিন্তু কেউ এই নিয়ে একটি কথাও বলল না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস নড়েচড়ে উঠল। আস্তে ডাকল—হ্যারি!

হ্যারি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ল।

—কাছিতে বাঁধা—দড়িটা—টানো। ফ্রান্সিস থেমে থেমে বলল।

—আগে তুমি সুস্থ হও তো তারপর। হ্যারি প্রায় ধমকের সুরে বলল।

—উঁহু, হাতে একদম সময় নেই। ইবু গ্যাব্রিওল মোটেই ভালো মানুষ নয়। ফ্রান্সিস দম নিয়ে নিয়ে নিম্নস্বরে বলল।

হ্যারি শাঙ্কোর দিকে তাকাল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—ভাইকিংস, এসো। দড়ি টেনে সিন্দুকটা তুলতে হবে। হাত লাগাও। কিন্তু খুব আস্তে আস্তে টানতে হবে। আবার না দড়ি ছিঁড়ে যায়।

শুয়ে-বসে থাকা ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে এল। কাছিতে বাঁধা দড়িটা আস্তে আস্তে টানতে লাগল। নীচের ধারালো মাথাওয়ালা পাথরের চাঁইটা এড়িয়ে ফ্রান্সিস কাছিটা সরিয়ে রেখে এসেছিল। দড়ির ঘষা খাওয়ার আশঙ্কা ছিল না। ছিঁড়ে যাবার আশঙ্কাও ছিল না। আস্তে আস্তে সিন্দুকটা টেনে এনে তীরে তোলা হল। ফ্রান্সিসের অনুমান ঠিক। চারপাশে এখানে-ওখানে সোনার গিল্টি করা সিন্দুকটার ওপরেও একটা মোটা লোহার হাতল। দু'পাশের লোহার হাতল দুটোও বেশ মোটা। হ্যারি বুঝল ইবু সালোমন বেশ ভেবেচিন্তেই এসব করেছিলেন। এই লোভাত নদীর তীরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে তিনি মাঝে মাঝে আসতেন। হয়তো তখনই এই পরিকল্পনা করেছিলেন। অসৎ দুরাচারী পুত্রকে তিনি অনেকদিন আগেই চিনেছিলেন।

সিন্দুকটার কাছে গিয়ে সবাই ভিড় জমিয়েছে। সামনের কড়ায় একটা বড় তালা জুলছে। শাঙ্কো তালাটা ধরে টানাটানি করল। কিন্তু তালা খুলল না। তখন ও কোমর থেকে বড় ছোরাটা বের করল। তালা লাগানো কড়াটায় ছোরাটা ঢুকিয়ে প্রাণপণে চাড় দিতে লাগল। চাড় দিতে দিতে জলে ভেজা জংধরা কড়াটা বেশ খানিকটা আলগা হল। এবার কড়ার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে জোরে হ্যাঁচকা টান। কড়াটা আরো আলগা হল। হাঁপাতে হাঁপাতে শাঙ্কো বলল—তোমরা একে একে কড়াটা টানতে থাকো। একজন একজন করে বন্ধুরা কড়া ধরে টান মারতে লাগল। একসময় কড়াটা সশব্দ খুলে এল। শাঙ্কো ডালার ওপরের কড়া ধরে টান দিল। ডালা খুলল না। শাঙ্কো আবার টান দিল।—আবার—আবার। শেষ পর্যন্ত ডালা খুলে গেল। বিকেলের নিস্তেজ আলোতেও ঝিকিয়ে উঠল আরবী স্বর্ণমুদ্রাগুলি। বেশ কিছু হিরে বসানো স্বর্ণালঙ্কার ও চুনি-পান্না একপাশে রয়েছে দেখা গেল। ভাইকিং বন্ধুরা উল্লাস ধ্বনি তুলল—ও হো হো।

ততক্ষণে ফ্রান্সিসকে উঠে বসতে দেখে ওরা ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল।

—দেরি নয়। এখনই ফিরব। ফ্রান্সিস খোলা সিন্দুকটার দিকে একবার তাকিয়ে নিল। এরকম বহুমূল্য গুপ্তধন ওর কাছে তো নতুন কিছু নয়।

রব্বানিরা তখন ছুটে এল। ভিড়ের মধ্যে এসে ওরাও অবাক চোখে তাকিয়ে রইল ঝিকিয়ে ওঠা কুফি অলঙ্কারের দিকে। রব্বানি জীবনের কোনদিন এত সোনার ভাণ্ডার অলঙ্কার দেখেনি। হঠাৎ রব্বানি হাসলেন উল্লাসে দু'হাত ওপরে তুলে নাচতে লগাল। ভাইকিংরা আনন্দে ধ্বনি তুলল—ও হো হো। ওরা অবশ্য ফ্রান্সিসের উদ্ধার করা এরকম স্বর্ণভাণ্ডার আগেও দেখেছে। কাজেই ওরা খুব আশ্চর্য হল না। ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধুরাও বুঝল ফ্রান্সিস স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করেছে। ওরাও ও-হো-হো-হো ধ্বনি তুলল। রব্বানি তখনও নেচে চলেছে। কাছে এসে মৃদু হেসে হ্যারি বলল—ঐ সিন্দুকের একটা কুফিও কিন্তু আপনি পাবেন না। রব্বানি নাচা থামাল। সত্যিই তো এবারই তো গ্যাব্রিয়েল নিয়ে নেবে দয়া করে দু'চারটে স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারে। এবার ও ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল— তোমরা কিন্তু একটা কুফিও পাবে না।

—তা তো বটেই। ফ্রান্সিস হেসে বলল—আবার আপনারাও কেই পাবেন না। এত স্বর্ণসম্পদ দেখে ইবু গ্যাব্রিয়েল সম্পদের অংশ যে দাবি করবে সেই মরবে।

—এই সিন্দুক আমরা আমাদের নৌকায় তুলে নিয়ে যাবো। বেশ গম্ভীর

গলায় রব্বানি বলল।—বেশ। আপনারা খুশি হলে আমরাও খুশি। রব্বানি গলা চড়িয়ে বলল—অ্যাই—হাতলাগা। এই সিন্দুক আমাদের নৌকায় তোল।

উল্লাসে যোদ্ধা কজন এক লাফে এসে। সিন্দুকটা ধরল। তারপর আস্তে আস্তে কাঁধে তুলে ওদের নৌকোর দিকে চলল। উৎসাহের চোটে রব্বানিও নিজের পদমর্যাদা ভুলে গিয়ে কাঁধ লাগল।

—চলো হ্যারি ওপারে যাই। আমাদের কাজ শেষ। ফ্রান্সিস ওদের নৌকা যেখানে ভেড়ানো রয়েছে সেদিকে চলল। সিনাত্রা শাঙ্কো এগিয়ে এল। এত ভেবে চিন্তে এত কষ্ট করে ওরা এই সম্পদ তুলল সেটা ওদের চোখের সামনে দিয়ে বিন্দুমাত্র পরিশ্রম না করে রব্বানিরা নিয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস ওদের মুখ দেখেই বুঝল ওরা কি বলতে চায়। সেটাকে আমলে না দিয়ে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—যে বাড়তি কাছি দড়ি পড়ে আছে সে সব নিয়ে এসো। এবার নৌকোয় চড়েই ওপারে যাবো। ওসব কখন কি কাজে লাগে। যাও। শাঙ্কো আর সিনাত্রা গিয়ে কাটা কাছি দড়ি নিয়ে এল।

—নৌকায় চলো বিকেল হয়ে এসেছে। কাল রাতে আমাদের কারও ভালো ঘুম হয় নি। ভীষণ ক্লান্ত আমরা। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই নৌকোর দিকে চলল। যেতে যেতে এবার হ্যারি বলল—এত স্বর্ণমুদ্রা ঐ পিতৃহন্তাকে দিয়ে দেবে ফ্রান্সিস?

—কী করবে বলো হ্যারি? এই ভাণ্ডার নিয়ে না গেলে আমাদের জীবন বিপন্ন হবে। রব্বানি আমাদের সহজে পালাতে দেবে না। পিছু ধাওয়া করবে। এত স্বর্ণসম্পদ দেখে ওরা ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো আমাদের পিছু নেবে। ধরা পড়বই। ভুলে যেওনা ওরা সশস্ত্র। আমাদের অস্ত্র একমাত্র শাঙ্কোর ছোরা। এমনি ওদের মানিয়ে চললে আমরা প্রাণে রক্ষা পাবো। কিন্তু পালাতে গিয়ে ধরা পড়তেই হবে। রব্বানি ঠিক আমাদের হত্যা করবে। আর একটা কথাও তো মানতে হবে। মারিয়া আর বন্দী বন্ধুদের কী অবস্থা হবে তা এই নরপশুর হাতে। হ্যারি হাঁটতে হাঁটতে ভাবল সত্যি এছাড়া কোন উপায় নেই।—ভেবে দেখ—আমরা তো এই স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করতে আসি নি। স্বর্ণভাণ্ডার তো একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে ইবু গ্যাব্রিয়েলরই। ওরই তো অধিকার এই সম্পদে। আমাদের তো এই সম্পদের ওপর কোন অধিকারই নেই।

নৌকোয় চড়ে সবাই ওপরে এল। সব ভাইকিং বন্ধুরা নিঃশব্দে নৌকোয় উঠল। সিন্দুক নিয়ে সামনে রইল রব্বানির নৌকা। আজ শেষ বিকেল।

নৌকোগুলো চলল ইতেরাস গ্রামের দিকে।

ইরেকাবা গ্রামের ঘাটে গিয়ে সব নৌকো ভিড়ল। সেই সকালে আধপেটা খেয়ে গিয়েছিল। এখন ক্ষুধাতৃষ্ণায় সবাই কাতর ভীষণ ক্লান্তও। সিন্দুকটা রব্বানি দুজন যোদ্ধার জিম্মায় রেখে গ্রামের দিকে চলল। গ্রামে ঢুকে ক্লান্তিতে ফ্রান্সিসও শুয়ে পড়ল। পাশে বসা হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

—এখন বিশ্রাম অবশ্য প্রয়োজন। রাতের খাওয়া সেরেই নৌকো ভাসিয়ে দেব। ফ্রান্সিস ক্লান্ত স্বরে বলল।

—কিন্তু রব্বানিরা যদি রাতটা এখানেই থাকতে চায়।

—থাকবে। আমরা কোনমতেই থাকবো না। একটা কাজ কর—বৃদ্ধকে দুটো স্বর্ণমুদ্রা দাও আর বলো যে বেশি করে যেন রুটি তৈরি করে। সবাই ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত। পেট পুরে খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেই বেশ তরতাজা হয়ে যাবো। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি চলে গেল বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলতে। একটু রাত হতেই সবাই শুক্‌নো পাতা উঠনে পেতে খেতে বসল। যথেষ্ট রুটি করা হয়েছে। মাছের তো অভাবই নেই।

খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—সবাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও। তারপর আমরা নৌকা ভাসাবো। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকবো না। রব্বানি এসে হ্যারিকে বলল—আমরাও আপনাদের সঙ্গে একসঙ্গে ফিরবো বেশ। চলুন। হ্যারি বলল।

নৌকাগুলো ছেড়ে দেওয়া হল। আজ আকাশ—জ্যোৎস্না উজ্জ্বল। ফ্রান্সিসের ক্লান্তি অনেকটা কেটেছে। ও নৌকায় গুটিয়ে শুয়ে রইল তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। এই একই আকাশ তো ওদের দেশেও। তবে ওদের দেশের আকাশের জ্যোৎস্না এত উজ্জ্বল হয়। শীতের দেশ। কিন্তু এই চিন্তার মধ্যে একটা চিন্তা কিছুতেই ওর পিছু ছাড়ছিল না। বেশ কষ্ট করেই তো স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার হল। এই পরিশ্রম ও বিশেষ গায়ে মাখে না। কিন্তু চিন্তাটা হ'ল ইবু গ্যাব্রিয়েল তো স্বর্ণভাণ্ডার পেলেই ওদের সম্বন্ধে আর কোন আগ্রহই থাকবে না। ঐ লোকটাকে বিশ্বাস নেই। বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণভাণ্ডার পেলে ওর মতো লোভী নীচ মানুষ কী চেহারা ধরবে সেটা ভেবেই ফ্রান্সিসের মন ভীষণ উদ্বেগকাতর হল। পাশেই বসেছিল হ্যারি। ও তো ভালো করেই চেনে ফ্রান্সিসকে। সহজেই বুঝে নিল—ফ্রান্সিস জেগে আছে বটে কিন্তু গভীরভাবে কিছু ভাবছে। তাই ডাকল ফ্রান্সিস?

—হুঁ।

—নিশ্চয়ই খুব চিন্তায় পড়েছো।

—স্বাভাবিক। স্বর্ণভাণ্ডার পেয়ে যদি ইবু গ্যাব্রিয়েল আমাদের শর্ত অস্বীকার করে।

—অসম্ভব নয়। তবে এতদিন ধরে যে গোপন স্বর্ণভাণ্ডারের চিন্তায় উদ্ধার করে নিজের হাতে পাবার জন্যে চেষ্টা করেছে নিজের পিতাকে হত্যা করেছে তা পেয়ে হয়তো লোকটা উদার হয়ত হতেই পারে। হয়তো আমরা বাঁচলাম কি মরলাম তাই নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাববে না। হয়তো আমরা আজ ওর কাছে বাতিল হ'য়ে যাবো।

—সেটা হলেই মঙ্গল। একটু ভেবে ফ্রান্সিস বলল—

—আমি স্থির করেছি—তুমি আর আমি রব্বানীর সঙ্গে প্রথমে ইবু গ্যাব্রিয়েলের জাহাজে যাবো। কথা বলবো। ওর মনোভাবটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারবো। যদি বুঝি ও শর্ত মানবে না তাহলে পালাবার ছক কষবো।

—দেখা যাক। তোমার অনেক খাটুনি গেছে। অনেক চিন্তাভাবনা গেছেই। আপাতত বিশ্রাম করো। পারো তো ঘুমোও।

—অসম্ভব। বন্ধুরা মুক্তি পেলে তবেই আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুবো। নিজেদের জাহাজ। বন্ধুদের মধ্যে পরিচিত পরিবেশের মধ্যে।

নিজেদের জাহাজের সঙ্গে বাঁধা ইবু গ্যাব্রিয়েলের জাহাজের কাছে যখন নৌকোগুলো পৌঁছল তখন সকাল হয়ে গেছে। চারদিক রোদে চনমন করছে। কাছাকাছি আসতে দেখল জাহাজের রেলিঙ্ ধ'রে মারিয়া আর বয়স্ক ভেন দাড়িয়ে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—শাঙ্কো তোমরা আমাদের জাহাজে গিয়ে ওঠো। প্রথমেই মারিয়াকে গিয়ে বলবে আমরা সবাই সুস্থ। স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার হয়েছে। আমাদের কাজ শেষ করে আমি আর হ্যারি ইবু গ্যাব্রিয়েলের জাহাজে উঠবো। তাড়াতাড়িই নিজেদের জাহাজে ফিরে আসব। মরিয়া যেন কোনরকম দুশ্চিন্তা না করে।

রব্বানিদের নৌকোর পেছনে পেছনে ফ্রান্সিস আর হ্যারির নৌকো নিয়ে চলল। ইবু গ্যাব্রিয়েলে দেখা গেল জাহাজের রেলিঙ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি আসতে রব্বানি নৌকায় উঠে দাঁড়িয়ে সিন্দুকটা দেখিয়ে বার বার গলা জড়িয়ে বলতে লাগল—মাজার—স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার ক'রে এনেছি। এতক্ষণে ইবু গ্যাব্রিয়েলের উদ্বিগ্ন মুখে হাসি ফুটল। জাহাজের যোদ্ধারাও আনন্দে চিৎকার করে উঠল। শূন্যে খোলা তরোয়াল ঘোরাতে লাগল।

এবার নৌকো থেকে সিন্দুক তোলার জোড়জোর শুরু হল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি যখন দড়ির সিড়ি বেয়ে জাহাজে উঠল সিন্দুকের সামনে তখন ইবু গ্যাব্রিয়েল

প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে সিন্দুকটার দিকে তাকিয়ে আছে। যোদ্ধারাও চারপাশে এসে জড়ো হয়েছে। সবাই খুশিতে আটখানা।

রব্বানি এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকের ডালা এক হ্যাঁচ্‌কা টানে খুলে ফেলল। হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা সোনা হীরে মুক্তো বসানো গয়নাটা উজ্জ্বল রোদ পড়তে বিজিয়ে উঠল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। হ্যারি গলা নামিয়ে ডাকল ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকাল—এখন কথা বলতে যেও না। ইবু গ্রাবি ফেলের কানেই যাবে না কোন কথা। ওর প্যান্ড খুশির জোয়ার ভাঁটা পড়তে দাও। দুজনই চুপ করে দাঁড়িয়ে যোদ্ধাদের আনন্দাল্লাশ দেখতে লাগল। ইবু গ্যাব্রিয়েল হাসিমুখে চারদিকে তাকাতে লাগল।

—রব্বানি—কী ক'রে উদ্ধার করলে? হাসিমুখে ইবু গ্যাব্রিয়েল বলল।

—এই লোকটা। ভীষণ দুঃসাহসী। ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে রব্বানি বলল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল—মান্যবর—কয়েকটা কথা ছিল। ইবু গ্যাব্রিয়েল হাত নেড়ে ব'লে উঠল।

পরে এমন সর রব্বানির দিকে তাকিয়ে বলল—সিন্দুক আমরা ঘরে নিয়ে রাখো একটা বুফিও যেন কেউ না নেয়। আর কাল একা তুমি ছাড়া আর কেউ আজ্ঞে না জানিয়ে আগে ঘরে ঢুকবে না।

—মান্যবর এটা তো আপনার বরাবরের হুকুম। রব্বানী ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে ইবু গ্যাব্রিয়েল বলল—তোমরা কিন্তু একটা বুফিও চাইবে না।

—এ কথা তো আমি আগেই বলেছি। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল।

—তাহলে কী বলতে এসেছো?

—আপনার সঙ্গে একটা শর্ত ছিল। ইবু গ্যাব্রিয়েল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে।

—ফ্রান্সিসের শর্ত? কী শর্ত?

—এই শর্ত যে স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারলে আর আপনাকে দিলে আপনি আমার বন্ধুদের মুক্তি দেবেন।

—ও। তাই নাকি? ঠিক আছে। এই নিয়ে পরে কথা হবে।

—পরে না। এক্ষুনি। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল। ইবু গ্যাব্রিয়েল কড়া চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

—ঠিক আছে। স্বর্ণভাণ্ডার তো পেয়ে গেছি। বিদেয় হও সব। রব্বানিকে বলল—যাও ঐ ভিখিরিগুলোকে ছেড়ে দাও।

রব্বানি চলল সিঁড়িঘরের দিকে।

—হ্যারি—তুমি যাও। কয়েদঘরের ঐ জঘন্য পরিবেশে বন্ধুদের দেখলে আমার সহ্য হয় না।

—বেশ হ্যারি চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই মুক্ত বন্দীরা ডেকে উঠে আসতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল সবারই চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। পরনের পোশাক নোংরা হয়ে গেছে। কয়েকজনের পোশাক ছিঁড়ে গেছে। ওরা কয়েকজন ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আর এখানে না। আমাদের জাহাজে চলো। ওরা কেউ আর নৌকায় নেমে যাওয়ার আগ্রহ দেখাল না। ছুটে গেল হালের দিকে বাঁধা দাড়িতে ঝুল খেয়ে নিজেদের জাহাজের ডেকএ গিয়ে উঠল। হ্যারি বরাবরই দুর্বল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে নৌকোয় চড়ে নিজেদের জাহাজের ডেকএ উঠে এল। মারিয়া হাসতে হাসতে ছুটে এল। সত্যি মারিয়ার শরীর বেশ খারাপ হ'য়ে গেছে। চোখমুখ শুকনো মাথার চুল উড়ে উড়ো। অশান্ত মন শান্ত হল। মারিয়া এসে ওর হাত চেপে ধরল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—মারিয়া—এক কাজ কর। বন্ধুদের অবস্থাতো দেখছ। শিগগির ওদের স্নান করার ব্যবস্থা করো। তারপর ভাল পোশাক পরে নিতে বলো। রাঁধুনি বন্ধুদের তাড়াতাড়ি রান্নার ব্যবস্থা করতে বলো। বন্ধুরা তখন শাঙ্কো আর সিনিত্রার কাছে গুপ্তধন উদ্ধারের কথা শুনছে। মারিয়া কাছে এসে বলল—

—গল্প পরে হবে। আগে স্নান করে নতুন পোশাক পরে নাও। এসো। সবাই।

—ভাইসব তোমাদের শরীর বেশ খারাপ হয়ে গেছে, হ্যারি বলল।

অসুখেই ভুগেছে অনেকে। তবে ভেন দু'বেলা ঐ জাহাজে গিয়ে ওষধু দিয়েছে। রাজকুমারীও আমাদের সেবা শুশ্রূষা করেছেন। এক ভাইকিং বন্ধু বলল।

শাঙ্কো ছোরা বের করে পোঁচ দিয়ে দিয়ে ইবু গ্যাব্রিয়েলের জাহাজের বাঁধা দড়ি কেটে দিল। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে জাহাজ সরে এল। বিলোনো ততক্ষণে শেকল তুলে দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ বেশ দূরে চলে এল। চলল মাঝ সমুদ্রের দিকে। চারদিকে ঝলসানো রোদ। সমুদ্রের ঢেউও আনেকটা শান্ত। সব পাল খুলে দেওয়া হল। ফ্রেজার জাহাজ চলল দ্রুত বেগে। স্বদেশের দিকে।

শেষ